

সম্পাদকের কাজ করতে করতে এই বিবোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজ্ঞানাগর। মুদ্রক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী হবার পরিবর্তন। তখনই তিনি করেছিলেন। পদত্যাগের পূর্বেই সম্ভূত প্রেস ও ডিপজিটরী স্থাপিত হয়েছিল।

ছাপাখানা স্থাপনের জ্ঞান অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ করা তখন মনমোহন বা বিজ্ঞানাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সামান্য চাকরী করে, বিরাট পোষাখ্যা প্রতিপালন করে, অর্থসঞ্চয় করা সম্ভবও নয়। ঋণ করে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা করতে হয়েছিল। এদিকে তাঁর সন্তানের শঙ্কুচক্র লিখেছেন। (৪)

এই সময়ে অগ্রজ, মনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-বস্তু নাম দিয়া একটি মুদ্রণস্থল স্থাপন করেন। ৬০০ টাকার একটি প্রেস ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতো তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা স্বয়ং নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শেল সাহেবক বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয় বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিজ্ঞানী সিবিদ্যানগণকে যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণান্ত্রিক আছে। অতএব যদি কখনগণের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া দ্বারা ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জ্ঞান আমি এক শত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিব, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে।' স্ততঃবাৎ রক্ষণগণের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এক শত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিয়েই বিজ্ঞানাগর মুদ্রক ও প্রকাশকের ইব্যবসায়ের অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশে মুদ্রণস্থল ও মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের মণিঃ সম্পর্ক আছে। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে)। তাঁর পর পশ্চিম বছরের মধ্যে, ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে মুদ্রণস্থল স্থাপিত হয়। হাতেলেশা পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগ অন্ত্যালে যায়। প্রথম দিকে ইংরেজী ভাষাতেও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত যেসব বই ছাপা হয়, তাতেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে উদ্ভূতি ভূমিকায় ও মৃদুভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন হুগ্গেডের বাকরণে (১৭৭৮), ফরষ্টারের অভিধান (১৭৯১-১৮০২), লেবেডেফের বাকরণ (১৮০১)। ক্রমশঃবাসী লেবেডেফ বাংলা দেশে প্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানেও প্রথম

দিনের অভিনয়ের পর ভারতচন্দ্রের কয়েকটি গান যন্ত্রসহযোগে গীত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বাংলাদেশে বাঙালীর পুস্তক প্রকাশন বাণিজ্যের হুদপাত হয় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য মুদ্রিত করে। প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে। গঙ্গাকিশোর বাবা খোদাই চিত্রগ্রহ হুম্মার মচিত্র সংকলন প্রকাশ করেন। আজ পর্যন্ত যা মুদ্রিত বাংলা বই পাওয়া গিয়েছে তাতে গঙ্গাকিশোরের ছাপা এত মই-ই প্রথম বাংলা ছাপা দৃষ্টিতে বই। ছাপাখানা ও মুদ্রিত বইয়ের বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায় : (৫)

The central figure of the early book-trade was the printer. He procured the services of an engraver to cut punches specially for him and had them cast at a local foundry; he chose the manuscripts he wished to print and edited them; he determined the number of copies to be printed; he sold them to his customer...

মুদ্রণযুগের আদিপর্বে, বিনেইন্ড্রাঙ্গ-যুগের ইটালীতে ও ইথ্যোপিয়া, মুদ্রক প্রকাশক শোকানবাব লেখক ও সম্পাদক, প্রধানতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন। বই-প্রকাশের ব্যাপারে সমস্ত কাজই প্রায় একজন ব্যক্তিকে করতে হত। একমাত্র কাগজ বারী তৈরি করতেই এবং বই বাঁধাই করতে, তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। (৬)

It is only the paper-makers and book-binders who from the beginning to the present have kept their independence: their crafts went back to the times of handwritten book...

বাংলাদেশে গঙ্গাকিশোরের চরিত্রে বিনেইন্ড্রাঙ্গ-যুগের আদি মুদ্রক প্রকাশকের এই প্রতিভা সবচেয়ে বেশি পরিদৃষ্ট হয়ে ওঠে; শ্রীচামপুরের মিশন প্রেসের একজন সামান্য কম্পোজিটর থেকে তিনি বাংলা বইয়ের প্রথম প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি নিজে বই লিখেছেন, সম্পাদন করছেন, ছেপেছেন, বিক্রয় ব্যবস্থা করেছেন। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে এদিক দিয়ে গঙ্গাকিশোরের কীতি চিরস্মরণীয়। এ-পথে বিজ্ঞানাগর তাঁরই অগ্রগামী। কিন্তু বাঙালী বিজ্ঞ-শ্রেণীর মধ্যে বিজ্ঞানাগরই এ-পথের প্রথম প্রদর্শক।

বিজ্ঞানাগর যখন সংস্কৃত-বস্তু প্রেস ও ডিপজিটরী স্থাপন করেন, তার ত্রিশ বছর আগে গঙ্গাকিশোরের আমল থেকে এই ব্যবসায়ের হুদপাত হলেও, বিধান ও বুদ্ধিমান লোক যুব অল্পই এ-পথে এসেছিলেন। বিজ্ঞানাগরের সমসাময়িক বিজ্ঞ-জনদের অনেকের

(৫) S. H. Steinberg: Five hundred years of Printing, P. 91

(৬) টাইনবার্গ; ঐ।

(৪) শঙ্কুচক্র বিজ্ঞানাগর: বিজ্ঞানাগর জীবনচরিত, ৩য় সংস্করণ, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা



মধ্যে বাণিজ্যযুক্ত প্রবল ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা পণ্যস্বার্থের বাণিজ্য ছেড়ে কেউ বিজ্ঞানভিত্তিক পণ্যের ব্যবসা করেন নি। বিজ্ঞানগণ তাঁর স্বার্থের মধ্যে এই বাণিজ্যের প্রথম উদযোগী বণিক। গজাকিশোরের তৃতুগামী হয়েই তিনি প্রথম তাঁর ছাপাখানা থেকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শাল সাহেব বইকেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ফেদল সেই উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তিনি অন্নদামঙ্গল ছেপেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর আগে কেবল গজাকিশোর মন, আরও অনেকে অন্নদামঙ্গল ছেপেছিলেন। ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ছাপাখানার প্রবর্তনের জগৎ এই জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পুথির যুগের রাজসভার গভীর থেকে তিনি বাইরের জনসমাজের যুক্তর পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও তাঁর মোগসেহরা ছাড়া তাঁর অন্যান্য পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল বাইরে। তাঁর কবিতার ও গানের চাঞ্চল্য ছিল, বিশেষ করে অন্নদামঙ্গলের বঙ্গভাষী 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের। প্রথম পার্শ্ব বাংলা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা তাই সক্ষেই প্রায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার প্রকাশকরাও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের স্তম্ভ সন্মরণ প্রকাশ করেছিলেন। সত্যতা মার্শাল সাহেবের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অল্প বাণিজ্যিক যুক্তিও ছিল। বিজ্ঞানগণের কাছে সে-যুক্তির আবেদনও কম ছিল না।

তা ছাড়া, 'অন্নদামঙ্গল' ফোট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো হত এবং বিজ্ঞানগণ যখন কলেজের পড়িত ছিলেন তখন তিনিই পড়াতেন। বিজ্ঞানগণের অংশ পড়াতে তিনি রীতিমত সঙ্কটবোধ করতেন। এসময়কে আচার্য কৃষ্ণকমল লিখেছেন। (৭)

বিজ্ঞানগণ যখন ফোট উইলিয়ম কলেজ সিবিলিয়ান-দিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দর' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাবে প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন যুগোপায়ী তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাণ্ডমাতৃ করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May; এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকার তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিজ্ঞানগণের মুখে শুনিয়াছি।

ছাত্রদের পড়ানোর জগৎই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিজ্ঞানগণ, তা নয়। তাঁর কবিতা প্রথর থাকলেও, কবিতায় ছিল না। সাহিত্যবোধ ও রসবোধ ছিল গভীর। বিজ্ঞানগণের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে সঙ্কট হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ

প্রিয় কবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন : (৮)

বিজ্ঞানগণ ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দস্তুর সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সান্ত্বত কলেজের অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কবিতা গদ্যগদ্যে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতছে, একমিনি তিনি 'হোয়া ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'বেশ দেখি, কেমন পরিষ্কার স্বরধরে ভাষা!'

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পুঁথি সংগ্রহের জগৎ বিজ্ঞানগণ নিজে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী যান। সেই যুগে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিজ্ঞানগণ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সত্যচন্দ্রের পিতা মহারাজ ক্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রীতি গ্রন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর-বংশের পরিদর্শন যুগে এই সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। মহারাজ ক্রীশচন্দ্র বিজ্ঞানগণ মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট স্বাধুশ্রমে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ ক্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষায়ীন দরিত্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমাত্মিন দিতে কিঙ্কিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সঙ্গে বিজ্ঞানগণের এই বন্ধুত্ব পরবর্তী কালে আরও দৃঢ় হয়। কারণ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে প্যারীসার তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজারা অজ্ঞাত। কেবল রাজবংশের সঙ্গে নয়, তাঁদের দেওয়ান-বংশের সঙ্গেও বিজ্ঞানগণের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। স্বিজেন্ডাল রায়ে পিতা দেওয়ান কাহ্নিকচন্দ্র রায়, তাঁর সমবয়সী ও বিশেষ প্রীতিপাত্র ছিলেন। কৈনরিক থেকেই কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সহযোগিতালাভে তাঁর বাধা ছিল না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করবার পর, বিজ্ঞানগণ আরও অনেক পুথিপাণ্ডুলিপি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সান্ত্বত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ তখন পাওয়া যেত না। অধঃশিক্ষিত প্রকাশকরা সেগুলি কিছুকিছু বিকৃত আকারে প্রকাশ করতেন হুনাখার গোডো। বিজ্ঞানগণের গভীর থেকে পুথিবন্দী সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী তিনি জনসমাজে প্রকাশ করে দেন। বিজ্ঞানগণের একী ইয়োপোপের রিনেইতাস যুগের উদযোগী প্রিন্টার-প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনীয়।

বই ছেপে প্রকাশ করতে পারলে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না

বাণিজ্যক্ষেত্রে এখন মুদ্রক (Printer), প্রকাশক (Publisher) ও পুস্তকবিক্রেতার (Book-seller) স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুদ্রিত গ্রন্থের বিক্রেতারাও তখন পোকা খুলে ব্যবসা করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিদেশী বই কলকাতা শহরে আমদানি হত, এদেশী ছাপা বইয়েরও কিছু চাচিদা বাড়ছিল পাঠক মহলে। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র বইয়ের দোকানের প্রচলন তখনও হয়নি। বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসার নিয়োগ করে গ্রামা মেলায় ও লোকের বাড়ি বাড়ি ঘরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। গাঁৱা তা করতেন না, কাঁচা ছাপাখানা বা পরিচিত কোন গৃহের ঠিকানা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকায় এবং ক্ষেতাদের সেখান থেকে বই কিনে নেবার জন্য অনুবোধ করতেন। অল্পসংখ্যক বইয়ের পোকা হা গড়ে উঠেছিল, তা বটতলা ও চীনাবাজার অঞ্চলে, ব্রিন্সলেন্ড সাস্কৃত কলেজের আশে-পাশে (কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে) নব। চীনাবাজারই ছিল বড় বইয়ের কেন্দ্র। (১)

Bookshops have attractions all their own, even in the China Bazar—The stock of books in some of these native shops is heavy and the authors are commonly of the first rank in literature and popular science; Shakespeare, Addison, Burns, Chalmers, Scott, Marryatt, indeed almost every author of note with general readers, has a place on the shelves of the bazaar bookseller. If the visitor wishes, to have a non-Scientific work recently published in London and already popular, he is certain of obtaining it in the New or Old China Bazaar.

বাঙালী ব্যবসায়ী গাঁৱা বইয়ের দোকান করতেন, বাণিজ্যই তাঁদের প্রধান পেশা ছিল। বিজ্ঞানাগারের পেশা ভিন্ন হলেও, বইয়ের দোকান করেছিলেন তিনি, বই প্রকাশ করে বিক্রেতাদের বিক্রি করতেন বেন নি। বইয়ের দোকানের নাম ছিল 'সম্ভূত প্রেস ডিপজিটরি'। কেবল নিজের প্রকাশিত বই দোকান থেকে বিক্রি করতেন না, অন্তরে প্রকাশিত বইও এজেন্টী নিয়ে বিক্রি করতেন। ব্রিন্স কলেজ ও সম্ভূত কলেজ অঞ্চলে কলকাতা শহরের প্রধান ইক্সচেঞ্জ গড়ে উঠেছিল। এই বিজ্ঞানক্ষেত্রের অনতিদূরেই তিনি এই বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এ-অঞ্চল প্রকৃষ্টরূপে গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞানাগারই বোধ হয় প্রথম এই ক্ষেত্রে বইয়ের দোকান করেন এবং তার পর থেকে ধীরে ধীরে পুরু শতাধী ধরে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানক্ষেত্র প্রধান গ্রন্থকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এ বিজ্ঞানাগার বিলাসী গ্রন্থব্যবসায়ী ছিলেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশের বাণিজ্য তিনি সব বা খোয়াল চরিতার্থ করার জন্য অবতীর্ণ হানি। শিক্ষা তাঁর জীবনের প্রধান পেশা হলেও, এবারসাকে যেনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে

তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা তখনকার দিনে খুব কম ব্যবসায়ীরই ছিল। বিহারীলাল লিখেছেন : (১০)

... ছাপাখানার কার্য-সৌকর্য্য তিনি যে কি পরিচয় করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ৭০৭২টি ঘর; বাংলালায় ৫০০ ঘর। 'ব' ফলা, 'ক' ফলা, 'খ' ফলা, এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিজ্ঞানাগার মহাশয় বহু পরিচয় করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পূর্বে অক্ষর-যোজনায় এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষরসংকলনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকূল হইয়া থাকে। তাহার নাম 'বিজ্ঞানাগার মার্ট'।

মুদ্রণের টেকনিকাল ব্যাপারেও বিজ্ঞানাগারের কতখানি আগ্রহ ছিল, তা তাঁর এই অক্ষরবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। 'টাইপ-কেসে' বাংলা মুদ্রণকারের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের জন্য বহু মুদ্রক ন্যূনকাল ধরে চিন্তা করেছেন। অনেক ভুল ভ্রান্তি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার ক্রমোন্নতি হয়েছে। গাঁৱা মুদ্রণের উন্নতির জন্য এই ভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানাগার অন্যতম। বাঙালী বিশ্বশ্রেণীর মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি, যার সজাগ দৃষ্টি বাংলাভাষার মুদ্রণমস্তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। শোখিন মুদ্রণ-ব্যবসায়ী, গ্রন্থকার বা প্রকাশক হলে, মুদ্রণের প্রতি তাঁর এতখানি ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : (১১)

বিজ্ঞানাগার মহাশয় খুব পরিচয় করিতে পারিতেন। তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রাক-নির্ভে দেখিতেন এবং সর্বদাই উত্তার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বিস্তারিত। বহুদিন ধরিয়া তিনি সম্ভূত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সম্ভূত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সাসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সম্ভূত প্রেস ডিপজিটরি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোক ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন।

মুদ্রক প্রকাশক গ্রন্থকার ও গ্রন্থবিক্রেতার কাজ বিজ্ঞানাগার কি ভাবে একাই করতেন, প্রত্যক্ষদৃষ্টার তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। একাজে তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুবান্ধবদেরও উৎসাহিত করেছেন। প্রথম থেকেই পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর অংশীদার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর অল্পজুতলা বন্ধু পণ্ডিত গির্জাচন্দ্র বিজ্ঞানাগার তাঁর প্রেসেই কাজকর্ম শিখে, পরে স্বাধীনভাবে মুদ্রণব্যয় প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা

(১০) Sketches of Calcutta etc : By A Griffin (Glasgow 1843), P.P.98-109

(১১) বিজ্ঞানাগার প্রসঙ্গ : ভূমিকা।

(১) বিহারীলাল সরকার : বিজ্ঞানাগার, ৪০৪ পৃষ্ঠা।

আরম্ভ করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক পণ্ডিত ষাটকানোথ বিজাভরণেরও বাণিজ্য প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস ও ডিশজিটারির বাণিজ্যিক সাফল্যে তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা বিশেষভাবে অমুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিজায়ের পুত্র লিখেছেন : (১২)

যে সময়ে পিতৃদেব অর্ধোপার্জনের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় বিজাঙ্গার মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 'সংস্কৃত বসু' নামে একটি মুদ্রাবস্তু স্থাপন করেন। তিনি পিতৃদেবকেও এই যন্ত্রের একজন অংশী করিয়া লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সফলতা অর্জিত হইল না, স্তবরা স্বর্ণ করিয়া উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিতে হইল; এবং তিনজনেই নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়া এই মুদ্রাযন্ত্রের কার্য চালাইতে লাগিলেন...

কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুর্শিদাবাদের জঙ্গপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাজেই মুদ্রাবস্তু চালাইবার ভার উভয়ের উপর জ্ঞাত হয়। বিজাঙ্গার মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন; স্তবরা তাঁহার তন্ত্বে অনেক কার্যভার ছিল; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন; পিতৃদেব এগুলি মুদ্রিত করা, এক শোধান করা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিতেন। প্রদর্শন বিষয়ে পিতৃদেবের ঈর্ষাশক্তি ছিল যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদই এড়াইয়া যাইত না।...

কালক্রমে বিজাঙ্গার মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিক সংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অত্যধিক জল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া মুদ্রাবস্তু চালাইতেন বলিয়া বিজাঙ্গার মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের স্বাস্থ্যসঙ্গত বোধ হইল না। তিনি একদিন বিজাঙ্গার মহাশয়কে বলিলেন, 'আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রেয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; মদনেরও এইরূপ মত হইবে; আপনি তাঁহাকে পর লিখিয়া জামুন।' বিজাঙ্গার মহাশয় প্রথমে ঐ কথা কণ্ঠপাত করেন নাই। পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পর লিখিয়া বধন তাঁহারও ঐরূপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পিতৃদেবের উভয়ে সংস্কৃত বস্তু বিজাঙ্গার মহাশয়কেই দিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন।

এর পর গিরিশচন্দ্র নিজের নামে একটি মুদ্রাবস্তু স্থাপন করে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র পিতার চরিতকথায় এই 'গিরিশচন্দ্র বিজায়বস্তু' স্থাপনের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। সে-কাহিনী বাস্তবিকই রোমাঞ্চিক। তখন গিরিশচন্দ্র গড়পার অঞ্চলে

বাস করতেন। সেখানে লালচাঁদ বিশ্বাস নামে এক মুদ্রণব্যবসারী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বাদ্যব্যবসার জন্ত তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তখন বাড়িতে বসেই থাকতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ছাপাখানা করার পরামর্শ দেন এবং উভয়ে একটি ছাপাখানা করেন, 'সুচাক্ষর' নামে। অল্পকালের মধ্যে লালচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রেস বিক্রী করে গিরিশচন্দ্র নিজ অংশ ৮০০ টাকা পান এবং তাই দিয়ে এটালি অঞ্চলের একটি মুসলমানের প্রেস নিজে কেনেন। সেই প্রেসে 'বাল্লা পাইকা' অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, দেবনাগর পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, এবং পাশী পাইকা ও মল-পাইকা অক্ষরের প্রায় ১০০ ছেনি ও তাঁবা ছিল। ছেনি ও তাঁবা মূল্যবান, তখন টাকার দুখানি করে বিক্রী হত। বিক্রী করলে গিরিশচন্দ্র ছেনি ও তাঁবা থেকে প্রায় এক হাজার টাকা পেতেন। "কিন্তু তাহা না করিয়া স্থির করিলেন যে পাশী অক্ষর ও তাহার ছেনি ও তাঁবাগুলি কোন মুসলমান মুদ্রাকরকে বিক্রয় করবেন; এবং বাল্লা ও দেবনাগর ছেনি ও তাঁবা দ্বারা অক্ষর চালাইবার কারবার গুলিবেন; আর বাল্লা, দেবনাগর ও ইংরাজি অক্ষর দ্বারা ছাপাখানার কার্য চালাইবেন।"

বিজাঙ্গার সব করেছিলেন, কেবল টাইপ ফাউন্ডি বা অক্ষর চালাইয়ের কোন কারবার করেন নি। ছাপা ও অক্ষর চালাইয়ের কাজে মুসলমানরাই তখন অগ্রগণ্য ছিলেন। বিজাঙ্গারের মন্ত্রণায্য গিরিশচন্দ্র তাতেও পশ্চাৎপদ হননি। গুরু পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুদ্রণ বাণিজ্যে তিনি গুরুকে ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছিলেন। টুলো পণ্ডিতবংশের একজন সন্তানের পক্ষে, সব বাণিজ্য ছেড়ে, মুদ্রণ-বাণিজ্যের পথে এই ঐতিহাসিক অভিযান বিস্ময়কর মনে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত ষাটকানোথ বিজাভরণও কলিকাতা থেকে দক্ষিণে চাঁড়িগোলা গ্রামে 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিকা প্রকাশিত করে নিয়ে গিয়ে যে স্থানীয় ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিজাঙ্গার।

ইয়োরাপের শাক্ষকেশরী ও ফিউডাল অভিজাতশ্রেণীর একটা বড় অংশ দীর্ঘকাল ধরে মুদ্রণযন্ত্রের ও মুদ্রিত বইয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করে, তপিকরদের দিয়ে পুঁথি নকল করিয়ে তাঁরা স্বল্পমূল্যে সেগুলি বিক্রী করে, মুদ্রিত বইয়ের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করতও কুড়িত হন নি। কিন্তু সে অসমর্থ সাধন সম্ভব হয়নি তাঁদের দ্বারা। জ্ঞানবিজ্ঞার ভাণ্ডার তাঁরা পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারেন নি। মুদ্রণযন্ত্র তাঁদের বিজ্ঞার 'মনোপালি' ধ্বংস করে সাধারণের সামনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলি দরছে। বাংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের মধ্যে একটা বড় অংশ মুদ্রণের প্রসার কামনা করতেন না। পণ্ডিত-পুত্রোচিতদের কুসংস্কৃত শাস্ত্রবিজ্ঞা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে জনসমাজে প্রচারিত হলে, তাঁদের কণ্ঠগত শাস্ত্রবিজ্ঞার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁদের ভয়। নবমুগের বিজ্ঞার বণিকদের, মুসল প্রকাশক ও লেখকদের তাই তাঁরা স্নানজলে দেখতেন না। মুদ্রণের ঐতিহাসিক শক্তির তাৎপর্য বুঝেই বিজাঙ্গার অল্প কোন স্বাধীন বাণিজ্যের প্রেতি আকৃষ্ট হননি। কাব্য আদিক আত্মনির্ভরহাট বা হুস্তিহাট তাঁর একমাত্র কাম্য

ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ত্রুতের অবিলম্বে অঙ্গ করে তোলা। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার ধীর জীবনের ত্রুত, স্বাধীন মুদ্রক প্রকাশক ও গ্রন্থকারের বৃত্তিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপযোগী বৃত্তি। ত্রুতের সঙ্গে বৃত্তির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না এক্ষেত্রে। মুদ্রক ও লেখক যিনি, তিনি স্বাধীনভাবেও সারাজীবন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। চাকুরিজীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে বিজ্ঞানসাগরের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বৃত্তির জন্ত।

সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার পর, প্রেসের কাজকর্মেও গ্রন্থচর্চায় তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন। বহুরূপে বৃত্তিকের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। ১৮৪১ সালের মার্চ মাসে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকরি পান। ১৮৫০ সালের শেষদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুদ্রণশিল্পবাদের জ্ঞানপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। উক্ত মস্টার সাহেবের অমুরোধে বিজ্ঞানসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তাঁর অল্প দিন পরেই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যাপক পদ সঞ্চিত করা হয় এবং বিজ্ঞানসাগর সেই পদে নিযুক্ত হন।

বসময় মস্তের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি 'চাকরি কখনও করব না' এরকম কোন প্রতিজ্ঞা করে পদত্যাগ করেন নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করে দেশের কল্যাণের জন্ত কোন কাজ করা যে সম্ভব হবে না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান আত্মমর্যাদা ও স্বাভাবিক বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীন ভাবে ছাপাখানা ও গ্রন্থচর্চায় কাজে মনোনিবেশ করেছেন। মুদ্রক ও লেখকের পেশাই তাঁর এই স্বাধীন মনোবৃত্তির শক্তি যুগিয়েছে। বিজ্ঞান বাণিজ্যে তিনি ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। নবযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার মুদ্রণযন্ত্র ও লেখনী তাঁর আয়ত্তে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপিউটারির মালিক, এবং স্বাধীন লেখক। কোন চাকুরিতেই আর তাঁর কোন উদ্য নেই। বিজ্ঞানজ্ঞানে থেকেও তিনি নির্ভয়ে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ত্রুত গ্রহণ করতে পারেন। চাকুরি কোন দিন তাঁকে পরাবীন করতে পারবে না। তাঁর স্বাধীন চিন্তার পথে কোন অন্তরায়কেই আর মাথা ঠেট করে স্বীকার করতে হবে না।

[ ক্রমশঃ ]

## শি—ল কু—টা—বে

সৈয়দ হোসেন হালিম

যখনই দুপুর-রোদে পীচ-গলা দারুণ উত্তাপ,  
সমস্ত জটলা বাঁধা ঘরে-ঘরে ভেজানো দুয়ারে,  
যখনই বকুল-শাখা-বসা শুধু একজোড়া কাক  
কালের অচল ঘট। বার-বার নড়িয়ে-বাজিয়ে  
সময় ঘোষণা করে আর শুধু পাক মাঝে চিল,  
তখনই পাতালে কান, ওর ঠিক ডাক শোনা যাবে—  
কান্ত স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

আশ্চর্য্য ওই যে লোক—

পোড়ানো কাঠের মতো যার কালে নিকষ শরীরে  
সময় শঙ্খচূড় প্রতিদিন কালকূট করেছে উল্কার ;  
একটু প্রাচুর্য্য চেয়ে যার হুই চোয়ালের হাড়  
বেকার ছেলের মতো বার-বার করেছে বিদ্রোহ,  
কি আশ্চর্য্য, তার কণ্ঠে প্রতিদিন ঠিকই শোনা যাবে—  
কান্ত স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

ও আসে,

ঝালিয়ে দেয়, তাই চলে প্রাত্যহিক জীবনের কাজ ;  
জীবন কিশোর হয়—ফুলে-ফুলে মায়ারী আশ্রিন ;  
একটি হাতুড়ি আর একটি ছেনিতে ও কি ভীষণ দারুণ চোঁয়ার  
পাথরে নম্রা কাটে, অথচ জীবন ওর কি ভীষণ বৈচিত্র্যময়—  
নিটোল মৃগশ !

কতো রাষ্ট্র, জনপদ, শহর, বন্দর

উপান-পতনে কান্ত, ইতিহাস রাখবে স্বাক্ষর ;

কতো গান রেকর্ড হবে, কত ফুল হবে সে আভার,

তবু জানি এর কথা কেউ জানবে না !

কলুর বলদ হ'য়ে দিনে-দিনে শোধ করি জীবনের দেনা

কান্ত পদ, জীর্ণ মন ও তো চলে যাবে,

শুধু তার শূন্য স্থানে তারি মতো আর কণ্ঠ ডাক দিয়ে যাবে—

কান্ত স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

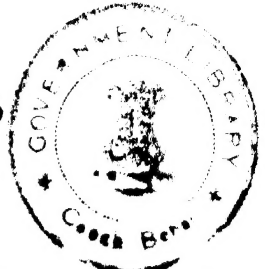
তারপর তার-ও বর্ণাধ্যক্ষের কাকের মতন

কালের অচল ঘটনা নেড়ে-নেড়ে চলবে কখন !

# সরম পুস্তক

## শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



### একশো বাষট্টি

দুপুর বেলা। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, বোমে ভরা আকাশ, হঠাৎ একটা বাজ পড়ল। আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। চমকে উঠলেন শ্রীমা।

বিনা মেঘে বজপাত! এ কি অলক্ষণ!

হুজনেই ছুটে গেল ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর বললেন, 'কি গো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি?'

তা ছাড়া আবার কি! হুজনে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল ক দুটে। ঠাকুরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

'রাম-অবতারে লীলা অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং সেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'এবার বজ্রধ্বনিতে সঙ্কেত করে গেলেন ন' তার নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।

লক্ষ্মী বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'কিসের দুঃখ, কিসের শোক!' লক্ষ্মীকে সাধনা দিলেন ঠাকুর: 'খানকার কত কথাই তো শুনলি, সেই সব কথাই কইবি সবাইকে।' তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রত্নাবীর আছে, কে নিয়ে থাকবি। আর কত দিনের জন্মেই বা এই তিরোধান। নি, একশো বছর—মোট একশো বছর—

হুজনে তাকাল উৎস্রক হয়ে।

'একশো বছর পরে আবার আসব।'

'এই একশো বছর থাকবে কোথায়?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।

'বাকব ভক্তহৃদয়ে।'

'আপনি আসুন গে। আমি আর আসছি না।' অভিমান ভরে লে লক্ষ্মী, 'তামাককাটা করলেও না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি ষায়? শ্রীমা টিকবে না যে আমাকে ছাড়া। কলমির দল জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

লক্ষ্মীকে ঠাকুর শীতলাজ্ঞান করতেন। কামারপুকুরের ঘরে মা-শীতলা আছেন লক্ষ্মী তারই প্রতিকর।

হৃদয় বখন চলে যায় ঠাকুরকে বলেছিল, 'মামা, এখানে কি তে পড়ে আছে? গজার ঘারে তোমার জন্মে যে একখানা পান লেখে এসেছি সেখানে চলে, তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই। পের দেখাই একবার ভানুমতীর খেল।'

ঠাকুর বললেন, 'শালা, তুই আমাকে শীতলা পেয়েছিস? সার বায়নের মত তুই আমাকে ফিরি করে বেড়াবি? ম তোয় পরসা বোজগারের ফিকির? এই হীনবুদ্ধি নিয়ে তুই ন কাটাবি? তোর হৃৎক জবে কে খোঁচাবে?'

যে শীতলা বায়নের খালায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না, যে শীতলা ভক্তের হৃদয়গহ্নে স্থির হয়ে থাকে সেই লক্ষ্মী।

ভবতারিণী ও রাধাকান্তের জন্মে কত ভোগসামগ্রী আসে, কত ভালো-ভালো ফল আর মিষ্ট, আচা, আমার কামারপুকুরের শীতলা কিছুই খেতে পায় না, এই ভেবে কষ্ট হয় ঠাকুরের। একদিন মা-শীতলা স্বপ্ন দিলেন ঠাকুরকে: 'গদাই, আমি এক রূপে ঘটে আরেক রূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমার খাওয়া হবে।'

কাশীপুরে ছুবার ঠাকুর পূজা করলেন লক্ষ্মীকে। তার উচ্ছ্রিত খেলেন।

গিরিশকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে মিষ্টিটাই একদিন খাইও। তা হলেই মা-শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। লক্ষ্মী মা-শীতলারই অংশ।'

লক্ষ্মীকে বললেন, 'আমার বড় সাধ, লক্ষ্মীকে একজোড়া বালা ও একছড়া হার দি।'

রাম দস্ত কাছে ছিল, বলে উঠল, 'বেশ তো, আগামী রোববারেই আমি নিয়ে আসব।'

আগামী রোববার আর আসে না।

ঠাকুর বললেন, 'শালা ভেগেছে।'

লক্ষ্মী বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন এত সাধ, আমার পুরোনো বালা ও হার লক্ষ্মীকে দিয়ে দি।'

'না, না, তোমাবাটা দিতে যাবে কেন? আমার নতুন গড়িয়ে দেবার সাধ। মা-শীতলা বলে দেব।'

লক্ষ্মীর কানে গেল কথাটা। বললে, 'আমি হাব-বালা চাই না। আমি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে যাব।'

'সে তো বাবাই। কিন্তু তোর নতুন গয়নাও চাই যে।'

ঠাকুর বেঁচে থাকতে সে গয়না হয়নি। পরে ভক্তরা বখন জানতে পারল ঠাকুরের সাধের কথা, হার বালা গড়িয়ে দিল লক্ষ্মীকে। ঠাকুরের সাধ, লক্ষ্মী তাই হাতে-গলায় পরল সে গয়না। কিন্তু পরামাত্রই খুলে ফেলল। দিয়ে দিল অস্ত্রকে।

লক্ষ্মী বললেন, 'কাল উনি বীজময় আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুই বা না। তাকেও লিখে দেবেন দেখিস।'

লক্ষ্মী কেমন কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমার বড় লজ্জা করে।'

'সে কি রে? তাঁর কাছে বাবি, লজ্জা কিসের?'

'কি বলে চাইব?'

'মুখে চাইতে হবে কেন? অন্তরে অভিশ্রাবটি নিয়ে ঠাঁড়াবি, তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। একবার শোনাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন, নিজের থেকেই ব্যবস্থা করবেন।'

গা সব আছে।'

দিন গেল না লক্ষ্মী। তারপর এমন একদিন গিয়েছে প্রাণাধর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যা রে, তোর কোন ঠাকুর ভালো?'

লীল বকের ভিতরে আনন্দ উথলে উঠল। মুখ দিয়ে বেহিরে ষাকুফ।

জন্ম বার কর।' জিনের উপর বীজ ও নাম লিখে দিলেন। বললেন, 'তোর গলায় দেখছি তুলসীর মালা। কে দিয়েছে?'

হ্যা, ঐ মালা রাখবি। তোকে বেশ দেখায়।' শ্রীমা এসে বললেন, 'সে কি গো? লক্ষ্মীর বে আগে শক্তিমত্তে হয়ে গিয়েছে।'

সে আবার কবে?' ঐ যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী এসেছিল কামারপুরে, নাম পূর্ণানন্দ তার কাছ থেকে।'

তা হোক গে। লক্ষ্মীকে আমি যে মন্ত্র দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি।' পুরী এসেছে লক্ষ্মী। স্বর্গদ্বারে নেমেছে স্নান করতে। চেউয়ের য কি করে কে জানে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে চক্রতীর্থ। গোপবেশী কে একজন হিন্দুস্থানী যুবক জলে নেমে তাকে। করল, টেনে তুলল ডাঙার উপর। স্তম্ভ হয়ে চোখ মেলে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মী।

রাজ্য দেখে মুহম্মানের মত বাড়ি ফিরে এল লক্ষ্মী। তারপর আরো একটু বল এলে গেল জগন্নাথ দর্শনে। একি! র বলরামের জায়গায় যে সেই গোঁপবালক।

মাঝে মাঝে বলরামের আবেশ হয় লক্ষ্মীর। তখন গলায় নব-চাঁদ মালা হুলিয়ে উত্তাল কেশ এলিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে।

সঙ্গে গান ধরে বিভোর হয়ে। পায়েব নিচে মাটি টলমল ত থাকে। বলে, 'মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, নইলে দেখাতাম, ক বলে নৃত্য, কা'কে বা কাঁচন।'

জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখে, যে জগন্নাথ সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর বললেন, 'ঠাকুর দেবতা যদি মরণ না আসে তো আমাকে বি। তা হলেই হবে। কি রে, আমাকে মনে হয় তো? ন, মনে হয়?'

লক্ষ্মী ষাড় হেলিয়ে বললে, 'হ্যা, তা হয়।'

'কি রকম হয়?'

'এই যেমন দেখছি তেমন।'

লক্ষ্মীকে ভিক্ষেয় পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'যা বাড়ি-বাড়ি নাম দিয়ে আয়।'

'লোক যদি গালাগাল দেয়?'

'দিক না গালাগাল। তোর পায়েব ধূলা তো তাদের বাড়িতে বে। তাতেই ওদের মঙ্গল।'

কুঠিঘাটা রতন বাবুর বাড়িতে ভিক্ষে করতে গেল লক্ষ্মী। তারা টা সিকি দিল। লক্ষ্মী তো মহা খুশি। ঠাকুরকে এসে বললে স্মিত হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'বড়লোকের বাড়ি গেলি কেন? গরিবের বাড়ি হোক।'

ঠাকুরকে কি ভাবে মরণ করবে জানো? লক্ষ্মী প্রাণালী বাতলে দিল। প্রথমে ভাববে, ভোববেলা, ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। মুখ-হাত ধু'লেন, গেলেন খাউতলায়। তারপর তাঁর পা ধুয়ে দিলে। কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। তারপর তাঁর গলায় দিলে বেলফুলের মালা। তারপর তাঁকে খেতে নিলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রস আর গঙ্গাজল। সঙ্গে মাখন-মিছরি। তারপর খেতে দিলে পান-তামাক। তারপর খাবার জিনিস এগিয়ে দিলে হাতের কাছে।

দুপুরবেলা খাইয়ে দিলে, ডাল-ভাত দুহুর কাঁচকলার ঝোল। তারপর তাঁকে শুতে দিলে। পাখা করতে থাকলে। কখনো বা পা টিপলে।

রাতে সামান্ত লুচি আর পায়ের দিলে খেতে। তারপর আবার শয়ন দিলে। হাওয়া করলে। বললে শাদপদ্মের সেবায়।

শ্রীমা আর লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বলরামকেও বলেছি আর বেশি দিন বঠোঁজ করতে হবে না।'

'আচ্চা, বলরামের কি স্বভাব!' বলছেন ঠাকুর, 'রাত-দিন ঠাকুর নিয়ে আছে। যেন মালা ফুলের মালাই গাঁথছে অবিরাম। আমার জন্তে উড়িয়ায় কোঠাবে যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছিমিছি কেন এত টাকা খরচ! ও সব কথা কান তুলল না বলরাম। শুধু আমার কাছে থাকবে বলে। আমাকে দেখবে বলে।'

বলরামের বাড়িতে রথ টা-লেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিশ, নরেন, কালী, রাম দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, মণ্ডার মশাই, শশধর তর্কচূড়ামণি। সকলেই দড়ি ধরল। গান ধরলেন ঠাকুর, সঙ্গে ভারবজ্র নৃত্য। 'নদে টলমল করে, গৌরপ্রেমের তিলোলে রে।'

শশধরকে বললেন, 'শশধর, একেই বলে ভজনানন্দ। মাসোহারা বিষয়ানন্দ ভোগ করে, ভক্তরা ভজনানন্দ। ভজনানন্দ ভোগ করতেই ব্রহ্মানন্দ।'

গলায় কয়াকের মালা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শশধরের বাড়ি এলেন ঠাকুর। জিগগেস করলেন, 'আচ্চা, তুমি কি রকম লেকচার দাও?'

বিনীত স্বরে শশধর বললে, 'আজ্ঞে, শাস্ত্রের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।'

ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, আজ-কালকার অসে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে কৃগীর এদিকে হয়ে যায়। আজ-কাল ফিলার মিকশচার।

এত বড় পণ্ডিত, কথাটার মানে যেন ধরতে পারল না শশধর।

'বুঝলে না, শাস্ত্রবিহিত কর্ম কববার মত মায়ের সময় কই, সামর্থ্য কই? আজকাল শুধু নারীদয় ভক্তি। ভক্তিবোগাই যুগধর্ম।'

শশধরের দিকে স্নেহচোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বাবা, আরেকটু বল বাড়ো! আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কোরো না। তবে, সম্ভেদ কি, যেটুকু করছ লোকের ভালোর জন্তেই সব করছ।' বলে ঠাকুর মাথা নত করে শশধরকে নমস্কার করলেন। ভবতারিণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মা সেদিন ঈশ্বর বিজ্ঞাসাগরকে দেখালি। তার পর আজ আবার এখানে এনেছিস। দেখলুম শশধরকে।'

আমি কীদলম আয় বলতাম, 'মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর বললে, 'তবে আপনারও বিচারবুদ্ধি ছিল?'

'ভা এক সময় ছিল।'

'তাহলে বলে দিন আমাদেরও একদিন যাবে? আপনার কেমন করে গেল?'

'অমনি এক রকম করে গেল।' বললেন ঠাকুর, 'এখন এই সার কথা, ভক্তির সার, ঈশ্বরকে ভালোবাসাই সার।' শুধু ইচ্ছা নিয়ে থেকো না! প্রেম ধরো। প্রেমই সচিদানন্দকে রবার দড়ি।'

'প্রেমই সর্বসাধার।' এ হচ্ছে সেই অমুরাগ বা 'অমুদিন' ষড়ল অবধি না গেল।' তদগণিতাখিলাচারিতা তদবিস্ময়গণে রম বাস্কলতা।

ঈমাকে বললেন, 'তোমাকে থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে, লক্ষী তোমার দোসর হবে। কখনো তাকে কাছছাড়া হবে না। আমার তো হয়ে এল। সে তোমার কাছে থাকলে ত ভালো কথা কয়ে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা করবে।'

কেন শোক করছি, কিসের জ্বরে, কার জ্বরে শোক? শরীর মন স্রিয় দিনে-দিনে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে মৃত্যুরূপ বিরতনকে ভয় কেন? মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের পরেও তো আছে ঐক্য অস্তিত্ব। লোকবিচ্ছেদ চরামরণবর্তিত অস্তিত্ব। সেই স্তিত্বই তো অবিদ্য। আত্মব্রহ্মহিত আনন্দরসাত্মক অস্তিত্ব। মায়ায় হ্রষ্ট হুংহ, ভাস্তব জ্বলেই হুংহ। কিসের ভাস্তি কিসের মায়া।

মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেরই বর্তমান, কিন্তু নিজে তিনি যায় আবদ্ধ নন। সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সে বিষে সাপ নিজে র না; সে মুখ দিয়ে সে খাচ্ছে, ঢৌক গিলছে, তবুও না, কিন্তু কে কামড়ায় সেই মরে।

সমস্ত জগৎ মায়ায়ই বিজ্ঞান মাত্র। মায়া পরমেশ্বরশ্রয়া।

মনই মায়া। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মন কলেই বিকার আর বিকার থাকলেই বিনাশ। বিকার মিথ্যা, ধাতু সত্য। বিধ তাই স্বপ্নমায়ায় মত, গন্ধর্ভনগরের মত। সঙ্গে জীব সর্গাবস্থায়ই মুক্ত, শুধু অবিজ্ঞার বলে আয়তনরূপবিশ্রুত। স গীমাছা আছে, কপালে-তোলা চশমা আছে, শুধু মনে নেই। হ যায় না কাঁধে, চশমা ঠিক বসে না চোখের সামনে।

যা তিন কাল ও তিন অবস্থায় সং তাই সত্য, যা অবাসিত, নৈক্য তাই সত্য। যার বাধ হয়, হোষ হয়, তা মিথ্যা। সত্য কাল সমস্ত অবস্থাতেই সত্য। শুধু দৃষ্ট বা বিষয়ের পরিবর্তন। সত্য মিথ্যা নিয়েই চলছে লোকবাবসার। এক বন্ধকে অজ্ঞান বোধই অজ্ঞান। যথার্থ স্বরূপের বোধই জ্ঞান।

যথার্থস্বরূপকে দেখ।

যা বৃহৎ যা মহান যা বাণ্যবহিত মাত্রাবহিত বা নিরতিশয় তাই স্বরূপ। যার চেয়ে ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট কিছু নেই তাই স্বরূপ। যা নশ্বর তাই দৌবদ্যুত। যা দৌবদ্যুতশূন্য, যতদূর নিত্যবুদ্ধ নিত্যযুক্ত তাই যথার্থস্বরূপ। তাই ব্রহ্ম। তাই ঈ, সকলের আত্মা। অরম্যাত্মা ব্রহ্ম।

পুরী থেকে মা কিয়েছেন কলকাতায়, সে জেরোশ' এগারো দশ বাঁধ মাস। এদেশেই বললেন, চলো একবার আমার শাওড়ি-কণকে দেখে আসি।

পালকি এসে খালি বোসপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখানে মার শাওড়ি কে? এখানে তো নিবেদিতা থাকে!

নিবেদিতা তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছে অযোধ্যাবিক, গোপালেশ্বর মাকে। হাটবার-চলবার শক্তি নেই গোপালের মার, কেউ দেখবার শোনবার নেই, তাই নিবেদিতা নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আর কে না জানে গোপালের মাই সারদামণির শাওড়ি।

শরায় মিশে আছে গোপালের মা। বাইরে কি একটা কথা বলেছে সারদামণি, কষ্টস্বর ঠিক চিনতে পেরেছে। কে ও? আমার মা কি এলে? আমার বউমা? আমার বউমা এসেছে?

'হ্যাঁ, মা, আমি এসেছি।' কয়েকটি ফল হাতে নিয়ে সারদামণি ঘরে ঢুকল। ফল ক'টি গোপালের মার হাতে দিয়ে প্রণাম করল সারদামণি। চিবুকে আঙুল ঠকিয়ে একটু আদর করল গোপালের মা। বললে, 'ও বউমা, আমার গোপাল কেমন আছে?'

'তিনি তো ভালোই আছেন।'

'তুমি সময় মত আমার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিও, মা!'

'তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন।'

এই গোপালই তো মীরাবাইএর বাছোড়, তার গিরিধারী নাগর।

'সেই তো গিরিধর গোপাল, হুসরা ন কোঁদি।' আমার আছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মায়ায় ময়ূবপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাধা মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন। আমি কুলের মর্ষাদা ছেড়েছি, আর কে কী আমার করবে? সাধুদের সঙ্গে করে লোকলজ্জা খুইয়েছি। চোখের জল ঢেলে ঢেলে প্রেমলতা পুতেছি, সে লতায় ফুল ধরেছে, ধরেছে আনন্দফল। আমাকে দেখে সঙ্গার কাঁদছে কিন্তু ভক্তের দল খুশি। হে ভক্তের ভগবান, তুমিও খুশি হও। হে লাল-গিরিধর, মীরা তোমার দাসী, তাকে তুমি জাগ করো।

মেবার মেড়তা-তালুকের জমিদার বতনসিংএর মেয়ে মীরাবাই। ছেলেবেলায় কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গিয়েছে বিয়ের নৈমন্ত্যে। মাকে জিজ্ঞেসে করছে, 'মা, আমার বিয়ে কার সঙ্গে? আমার বর কই?'

বাড়িতে 'কুলদেবতা' গিরিধারীলাল, সেই বিগ্রহ দেখিয়ে মা বললেন, 'ঐ তোমার বর, ওইই সঙ্গে তোমার বিয়ে।'

মীরার স্বপ্ন সত্যি বিয়ে হল, দেখল, সংসার বিলাসে স্তম্ভ নেই, 'হরি বিন বহগে ন জায়।' সখি আর যে থাকতে পারি না হরিহারা হয়ে। শাওড়ি কাটাব্য করে, নন্দ গজনা দেয়, রাণা তো বিয়স' বিরক্ত হতেই আছেন। ঘরে বন্দী করেছেন, দরজায় তালা লাগিয়েছেন, রেখেছেন পাশারওয়ালা। কিন্তু এ তো আমার পূর্বপূর্ব জন্মের পুরোনো প্রেম, এ আমি ভুলি কি করে? হে মীরার গিরিধারী নাগর, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে আমার মনে ধরে না।

হে মিঠাবোলা, সাজন-করে একবার এস। পথের পাশে কাড়িয়ে পাড়িয়ে কত দিন আর চেয়ে থাকব? আসতে তোমার ভয় কি, তুমি এলেই তো নুখোঁদস্ব। হে স্বামলমোহন, তোমাকেই তো দেব আমার দেহ মন, তুমি এলেই তো রত্নপূর্ণ হবে। আর দেবি কোরো না। 'কাজল-তিলক-ভূমোলা' সব রঙ ত্যাগ করেছি



মীর জন্তে, তোমারই রঙে রঙিন হব বলে। তোমার জন্তে  
কর আঁচল আঁজ খুলে দিয়েছি, তুমি এস।

হে প্রভু, মীরাকে তোমার 'সঁচা দাসী' করে নাও। মিথ্যা  
সারমায়ার ঝাঁপ ছাড়িয়ে দাও। আমার বিবেকের ঘর এরা লুণ্ঠ  
র নিল, শত বলবৃদ্ধি খাটিয়েও এঁটে উঠতে পারছি না। হে রাম,  
কুই যে আমার বশে নেই, মৃত্যুর পথে চলেছি বিফল হয়ে, তুমি  
ন, আমাকে বাঁচাও। প্রত্যহ ধর্মের উপদেশ শুনিছি, মনকে ভয়  
ইয়ে রেখেছি কুপথ থেকে, সর্বদা সাধুসেবা করছি স্মরণে ধ্যানে  
জুকে ধরে আছি দৃঢ় করে। তুমি এবার মুক্তির পথ দেখাও।  
রাকে 'সঁচা দাসী' বনাও।'

নন্দ এসে বললে, 'ভাবি, সাধুসঙ্গ ছাড়া, তোমার কলকে যে  
নি আর পাতা যায় না, তোমার নিম্নার শহরগী তোলপাড়।  
মি রাজকুলের বধু, তা কি ভুলে থাকবে?'

'আমি গিরিধারীর দাসী। গিরিধারীই আমার যশ, গিরিধারী  
আমার নিম্না।'

'তোমার এই শুভ বেশ আর দেখতে পারি না। পরো তোমার  
জাগার, তোমার কেয়-কল্পণ। রাজকুল শোভা হয়ে বিবাজ  
রো।'

মীরা বললে, 'অসার রত্নভরণ ছেড়ে শীলসন্তোষকেই আমি  
বশ করছি।'

মা গো, আমি রামরতনধন পেয়েছি। আমি তো রামরতনধনই  
পেয়েছি। এ ধন খরচ হয় না, চুরি যায় না। দিন-দিনই বেড়ে  
লে। এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত প্রকাণ্ড যে  
রবীও ধরে উঠতে পারে না। নামের তরীতে ভজনের প্রদীপ জ্বলে  
সেছি, হে কাণ্ডারী, হে নাগর গিরিধর, আমাকে ভবসাগর পার  
ফরে দাও।

রাণা হরিচরণামৃত বলে বিষ পাঠাল মীরাকে। মীরা সে বিষ  
ধরে ফেলল। মীরার স্পর্শে সে বিষ অমৃত হয়ে গেছে।

হে প্রিয়, তুমি এ বন্ধন ছিঁড়তে পারো, আমি ছিঁড়ব না।  
তোমার প্রীতির ডোর ছেড়ে আর কার সঙ্গে বঁধব? আমার আর  
ক আছে? তুমি তরু আমি বিতঙ্গ। তুমি সরোবর আমি মীন।  
দামি চকোর তুমি স্নহাস্ত। তুমি মুক্তো আমি সূতো। তুমি  
দামার সোনা আমি তোমার সোহাগ। হে ব্রজবাসী, মীরার প্রভু,  
হুমি ঠাকুর, আমি তোমার দাসী।

বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই বিধবা হল মীরা। সবাই বললে  
হুলবধুর মত অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাকো। লজ্জাহীনর মত পথে-  
কিন্দে সাধুসঙ্গ করে বেড়িও না। কে কার উপদেশ শোনে!  
সসারবিষ পান করে হরিপ্রেমস্পর্শে অমৃতত্ব আশ্বাস করছি, বলো,  
কাঁথার গেলে সে হরির দর্শন পাব।' সসারত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী  
সঙ্গে মীরা চলল বৃন্দাবনে।

'তুমি বিন সব জগ ধারা।' তোমাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ  
বিখাদ। আমার হৃৎক যে বোঝে বলো। তোমার বিরহে শূল-  
শব্যায় শুয়ে আছি, কি করে ঘুম আসে? তোমার শয্যা গগন-  
গুপ্তে, সেখানে তোমার সঙ্গে কি করে মিলব? ব্যথিত যে সেই  
ব্যথা বোঝে আর বোঝে সে, যার জন্তে ব্যথা। রক্তের মূল্য বোঝে  
রক্ত আর যে কেনে সেই রক্ত। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে বনে

ঘুরে বেড়াছি কোথায় সেই অরহর? আমার ভ্রামল স্তম্ভর স্বপন  
বৈজ হয়ে দেখা দিবে তখনই আমি শীতল হব।

ফার্মন যে শেখ হতে চলল, দিন চারেক আর বাকি। ওরে  
মন, হোলি খেলে নে। করতাল নেই, পাখোয়াজ নেই, শুধু  
অনাহন্তের বন্ধার উঠেছে, রোমে রোমে অনুভব করছি সেই পুলক  
প্রবেশ। প্রেম-প্রীতির পিচকিরি করছি, শীলসন্তোষের কেশর  
গুলেছি, গুলালের বাসলে অপার আনন্দ বয়ে পড়ছে। 'ঘটকে  
সব পট খোল দিয়ে হৈ লোকলাজ সব ডার রে।' সমস্ত আবরণ  
খুলে দিয়েছি, জলাঞ্জলি দিয়েছি লোকলজ্জা। ওরে মন, হোলি  
খেলে, ঐ ত্যাগ মনোহরের চরণকমল, প্রি়তম ঘরে এসেছেন।

সখি আমি তো প্রিয়তমের রঙে রঙিন। পাঁচরঙে আমার  
ঢেলি রঙিয়ে দে, এবার আমি স্বরমুট খেলতে চাই। স্বরমুট খেলায়  
পাব আমার প্রিয়তমকে, দেহের আবরণ ফেলে মিলব আমি তাঁর  
সঙ্গ। তখন আর কিছুই থাকবে না, চাঁদ যাবে সূর্য যাবে  
পৃথিবী আকাশ সব যাবে, থাকবে শুধু সেই অটল অবিনাশী।  
মনের প্রদীপে নিত্যস্মরণের শিখা জ্বালাও, প্রেমের হাট থেকে তেল  
আনো তার জন্তে, সে নীপের নির্ণয় নেই। আমার বাস বাণের  
বাড়িতেও না, স্বপ্নবাড়িতেও না, সদগুরু উপদেশই আমার আশ্রয়।  
অস্তুরসখি, আমারও ঘর নেই তোরও ঘর নেই; শুধু হরির  
রঙেই রঙে আছি আমরা। হরিরই আমাদের ঘরদোর।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর দর্শন যাচণা করল। গোস্বামী  
বলে পাঠালেন, 'আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সন্তোষ  
করি না।'

মীরা বলে পাঠাল, 'আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবন'  
চন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা  
আমার জানা নেই।'

লজ্জা শেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর  
এসে পৌছেছে। দর্শন দিলেন মীরাকে।

নিম্নাকুৎসা নির্বাতন অত্যাচার কিছুই গ্রাহ্য করেনি মীরা।  
তোমার জন্তে সব ছাড়লাম, তুমি আমাকে কি করে ছেড়ে  
থাকবে? দিনরাত্রি এই কান্নাই শুধু তার সম্বল। মেবার ছেড়ে  
বৃন্দাবনের দিকে যেদিন যাত্রা করে মীরা, সেই দিন থেকেই  
মেবারের দুর্দিনের সূচনা। মেবারবাসীরা বুঝল মীরাই মেবারের  
রাজলক্ষ্মী, যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মীরা তখন  
ধারকায়। সেখানে মেবার দূত এসে অনেক মিনতি-বিনতি করতে  
লাগল। তুমি ফিরে চলে। মেবারের দুঃস্থরা দেখবে একবার  
স্বচক্ষে। তার রাজলক্ষ্মী আঁজ ধুলায় নির্বাসিত।

রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল মীরা। গান ধরল। 'সাজন,  
সুখ জ্যো জানে ত্যো লোজে হো।' হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে  
শুদ্ধ বলে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি  
ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। অল্পে কৃতি নেই, চোখে নিজা  
নেই, দিন নেই রাত নেই, পথ পলে সেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।  
হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে  
আর বিচ্ছেদ করিও না।'

গাইতে গাইতে চলে পড়ল মীরা। রণছোড়জীর বিগ্রহে বিলীন  
হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, 'সংসারীদের অম্মরণ কৃশিক, তপ্ত খোলায় জল বতকণ থাকে। একটা ফুল দেখে হয়তো ঝলসে, আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি! বাস, হয়ে গেল।'

এতটুকুতে হবার নয়। দুর্দম ব্যাকুল হও। বস্তার উলঙ্গ উদ্গাদনা, আঙনের সেলিহান আনন্দ।

'ব্যাকুলতা চাই।' বললেন আবার ঠাকুর, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি বেকালে জন্ম দিয়েছেন সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিন্দা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা, তাঁর উপর জোর খাটে। দাও পরিচয়। নয় গলায় এই ছুরি বিলাম।'

সারদামণির দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমিও যা আমিও তা। আমরা অভেদ। আমি হাব তুমি থাকবে।'

দুধে যেমন ধাবলা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমিই তোমাতে ওতপ্রোত আছি। আমি অচ্যুতবীজ রূপ আর তুমি সৃষ্টির আশাবৃত্ত। সমতুল্য প্রকৃতিপুরুষ। আমাদের অনশ্বর একা, শাস্ত সাদৃশ্য।

### একশো তেষটি

দুই শালতরুর মাঝখানে অমিতাভ বৃক্ষ শুয়েছেন বিশ্রামের জন্তে। আশ্রয়! অকাল-বসন্তের উদয় হল বৃক্ষশাখে। কমিত পুষ্পভারে বৃক্ষশাখা হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল অমিতাভের শয়ন-মঞ্চের উপর। আপনা হতেই ফুল রবে পড়তে লাগল। আকাশ থেকে গীতধ্বনি নেমে এল মাটিতে।

আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন তথাগত: 'আনন্দ দেখ, দেখ, এখন ফুল-ফোটবার সময় নয়, তবু গাছ ভরে অতন্ত ফুল ফুটেছে। শুধু তাই নয়, সে ফুল করে পড়ছে আমার উপর। আকাশ স্তর বাজছে মধুরা। দেবতার বৃক্ষপুষ্প করছেন। তাই না?'

': তাই।' আনন্দ চোখ নত করল।

'কিন্তু আনন্দ, এই ভাবে বৃক্ষের সম্যক পূজা হয় না।' বললেন বৃক্ষদেব। 'সত্যে শ্রদ্ধাবান সকল নরনারী নিজের জীবনে ধর্মের বধ্যাথ শীলন ও পালন করলেই বৃক্ষের যথার্থ পূজা হয়। তাই তোমাকে বলি ধর্মহীনতার জীবন যাপন করবে। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারেও ধর্মের পবিত্র বিধি পালন করতে কুণ্ঠিত হবে না।'

আনন্দ কান্দছে। পাছে তার কান্না দেখে ফেলেন, আনন্দ সরে পড়ল।

আমি এখনো লক্ষ্যে উপনীত হইনি। এর জন্তে আনন্দের কান্না। আমার কাম্যবস্ত্র পাইয়ে দেবার গাংগাই চলে যাচ্ছে কাম্যতম। জগজ্জ্যোতিষ ব্যাধি করেছ নির্বাণে।

আনন্দকে ডেকে পাঠালেন বৃক্ষদেব। বললেন, 'আনন্দ, শোক করো না, হতাশ হয়ো না। ভেবে দেখ, শোকের বা নৈরাশ্রের কি-ই বা আছে। বা আমাদের প্রীতিকর বা আমাদের ভালোবাসার বস্ত্র তার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হবই। যা অচিরস্থায়ী তাকে হারিয়ে শোক কি? যা জ্ঞাত, গঠিত, তা কি করে অবিনাশী হবে? তা ক্ষাস্ত হতে বাধ্য।'

আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত

থেকে আমার পাশে পাশে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে তোমার আশ্রয় থেকে এক তন্তু ভ্রষ্ট হওনি। এই তো যথার্থ পথ। এই পথ ধরে চলে যাওয়াতেই তো সিদ্ধি।'

যুগ্মশালতরুর নিচে ভগবান বিশ্রাম করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে দলে বৃক্ষকে পূজা করবার জন্তে আসতে লাগল মরনারী।

নিশীথ রাত্রি। বৃক্ষদেবের কাছে এসে বসল আনন্দ। বৃক্ষদেব বললেন, 'আনন্দ, তোমার হৃদয়ে মনে হবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আর কেউ রইলেন না! কিন্তু তা মোটেই নয়। ধর্ম রইল, যে ধর্ম আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এই ধর্মই তোমাকে পথ দেখাবে। এই ধর্মই তোমার একমাত্র রাস্তা।

আবার বললেন, 'বা নির্মিত হয়েছে তা বিনষ্ট হবই। তার জন্তে শোক করা বৃথা। আনন্দ, তুমি নিজেই নিজের আসৌক্যবর্তিকা হও, নিজেই এই আশ্রয় গ্রহণ করো। অবিশ্রান্ত যত্ন করে নিজের যুক্তির পথ নিজে পরিষ্কার করো।'

নিজের খোঁজ নাও। চলে কৃত্রিমকে লজ্জন করে সহজের মধ্যে। যারা বলে তিনি দূরে আছেন তারাই দূরে আছে। অমৃতভবের রসে মাতাল হও। অমৃতভবই অগম্যের বাণী।

আমি নিজেই নৌকা, নিজেই মাঝি, নিজেই নদী, নিজেই ফুল। আত্মপূজা করছেন ঠাকুর।

ঠাকুরের সামনে পুষ্পপাত্র ফুলচন্দন এনে রেখেছে। ঠাকুর উঠে বসেছেন শয্যায়। ফুলচন্দন দিয়ে নিজেই পূজা করছেন সচন্দন ফুল কখনো রাখছেন মাথায়, কখনো কণ্ঠে, কখনো হৃদয়ে কখনো নাভিদেশে। ফুলের মালা নিজেই নিজের গলায় পোলালেন পূজা-অন্তে গনোন্মোহনকে নির্মালা দিলেন। মাঠার মশাইয়ে একটি চাপা ফুল। আর স্মরেন মিস্তির এলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

আমি কাকে পূজা করি? আমার মাঝে মাঝে আসে সেটো শুদ্ধবোধানন্দময়ী মাকে পূজা করি। সর্বকল্মষরূপী মুখাসিকুনিবাসিনী মাকে।

তুলসী দত্ত, নির্মলানন্দ স্বামী, যখন প্রথম আসে দক্ষিণেশ্বর দেখল ঠাকুর নিজ সাধন স্থান পঞ্চবাটীতে প্রণাম করে বসে নিচের সিঁড়িতে আর ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্নাথার সঙ্গে কথা বল লাগলেন। কি যে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তুলসীর, শুধু মা মাঝে কানে আসতে লাগল হৃদয়-পরিপূর্ণ ধ্বনি, মা, মা!

বাগবাজারে তুলসীর বাড়ি। সে বাড়িরই এক অংশে গঙ্গা অংশানন্দ স্বামী থাকে, সামনেই হরিনাথ বা তুরীয়ানন্দের বা তিন জনের গলায়-গলায় ভাব।

হরিনাথ আর গঙ্গাধর ঠাকুরকে প্রথম দেখে দীননাথ বাড়িতে, তুলসী দেখে বলরাম বস্তুর বাড়িতে। হরিনাথরা কে একটা পাগল গান গাইছে, যশোদা নাচাতো তোমার নীলমণি, আর তুলসী দেখল কে একটা মাতাল, উলটে টে বৈঠকখানায় এসে চুকেছে। চোখে চোখ পড়ল তুলসীর মুহূর্তে মেকদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিত্যাংকল্পন উঠে গেল।

যেন বার্তা পাঠালেন। বাস দক্ষিণেশ্বর। বাস একাধি যখন শুধু তোতো-আমাতো।

কাশীর ত্রৈলোক্য বামী, ঠাকুরের ভাষায়, জীবন্ত শিব। তুলসী নিত্যন্ত বালক মা-বাবার সঙ্গে কাশী এসেছে। খেলবার গা করেছে যেখানটায় মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন ত্রৈলোক্য। দল ছেলের সঙ্গে তুলসীও ত্রৈলোক্যর শান্তিভঙ্গ করছে। এক-খাঙ্গা হয়ে সব শিশুগুলোকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু কি মনে করে মধ্যে থেকে তুলসীকে সে ডাকিল ইসারায়। কি জানি তাকে একটু প্রসাদ খেতে দিল।

তুলসী বলে, দীক্ষা নানারকমের হয়, কখনো বা হয় উদরের দ। ত্রৈলোক্য আমার কাছে আমি উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা পেলুম। কিন্তু এই দীক্ষা দৃষ্টির মাধ্যমে। যে হয় আপনজন, সহজেই যে চেনা।

কদিন দুপুরবেলা একা-একা গিয়েছে তুলসী। বলা-কওয়া টান চুকে পড়েছে ঠাকুরের ঘরের মধ্যে। কোনটা যে। ঘর এও তার জানার কথা নয়। গিয়ে দেখল ঠাকুর। বলা-কওয়া নেই, মেয়ের উপর নিচু হয়ে চিপ করে করল। এই কি প্রণাম করবার ছিঁরি? খাবার সময় প্রণাম করে! কে জানে! নিয়ম-কানুন শিখলুম কোথায়! ওয়া শেষে ঠাকুর ঘাটে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখস্থ হাত সে বসেই পানি-তামাক খেতে লাগলেন। বললেন, 'জানিস তন একটা ছেলে সেদিন এসেছিল আমার কাছে—' মার মতন?

বিকল তোর মতন। এমনি মুখ-চোখ, এমনি ছিঁরি-ছাঁদ।' তুই-ই এসেছিলি।'

আমি আসলুম কখন?'

তুই কি করে জানবি। ধর ঘূমের মধ্যে ঢলে এসেছিলি।'

কি বললাম?'

লি, আমার মধ্যস্থ হতে পারবেন?'

আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম যে আপনাকে মধ্যস্থ?'

ঝগড়ার মধ্যস্থ নয়, মিলনের মধ্যস্থ। বুঝতে পারছিস না?'

এসে আমাকে বললি, আপনি আমাকে ভগবানের সঙ্গে দিতে পারবেন? তুই যদি আগে এসে না মিলিস তবে

তোকে মেলাব কি করে? ঠাকুর তাঁর বা হাতখানা রাখলেন তুলসীর কাঁধের উপর।

তুলসী চকিতে বুঝল ইনিই হচ্ছেন গুরু, মধ্যস্থ। পরে বুঝল, অনাদিমধ্যস্থ। 'নাস্তব ন মধ্য ন পুনস্তবাদিঃ পশ্যামি বিবেচ্যঃ বিশ্বরূপঃ।'

বরানগরের নারায়ণ শিরোমণি প্রকাশও কথক। ঠাকুরকে দেখতে একবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। বলছে, 'আমি দেশবিদেশ ঘুরে কত হরিনাম করে বেড়াই, কত গীতা-ভাগবতের কথা শোনাই, কত লোককে মাতিয়ে দি। স্তনতে পাই আপনিও নাকি অনেক উপদেশ দেন, হরিশ্রবণ করে লোক মাতান। আমাতে-আপনাতে তবে তফাৎ কতটুকু? স্তনতে পাই, আপনার নাকি খুব উচ্চ অবস্থা। বলতে পারেন সে অবস্থায় পৌঁছতে আমার কত দেরি?'

ঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন, 'ওগো, বেশি দেরি নেই, বেশি তফাৎও নেই—এই একটুকুন বাকি।' বলে আত্মার একটি কড় দেখালেন। 'তুমি কি কম লোক গা? তোমার গুণের অবধি নেই। তুমি হরিকথা শুনিয়ে কত প্যালা পাও, আর আমার এখানে কাক প্যালা লাগে না। তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে কি আমার তুলনা হতে পারে? আমি মুখস্থ স্তবধ্ব মাতব, লেখাপড়ার ধার ধারি না, মা যা বলান তাই বলি। আর তোমার কত বিজ্ঞা, কত মুখস্ত কত জ্ঞানগরিমা—'

আবার বললেন, 'মাকে বলি, মা, মুখস্থের মত গাল নেই। তুই আমার এই গালটা বুচিয়ে দে। কিন্তু মা আমার কথায় কানও দেয় না।'

যোগীন্দকে ডাকলেন ঠাকুর। 'যোগীন, পাণ্ডিখানা নিয়ে আয়তো।'

যোগীন পাণ্ডি নিয়ে এল।

'পাঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথিনন্দন সব পড়ে পোনা তো।'

যোগীন পড়তে লাগল। পাঁচিশে, ছাব্বিশে, পড়তে লাগল পর-পর। পড়তে-পড়তে এল শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। একত্রিশে শ্রাবণ।

'রাধ, আর পড়তে হবে না।' ইহিতে পত্রিকা রেখে দিতে বললেন।

'কেন? যোগীনের কণ্ঠ উবেগভারাক্রম।'

'বেশ রাত্রি, বেশ তিথি। বলনপূর্ণিমা।' [ ক্রমশঃ ]

## শিগ্পাস্নন

হর্গাদাস সরকার

গ্যালারির চারি ধারে অল্পময় রঙের স্তরভি, তারি মাঝে প্রাণময় ভাষা ছুটি চোখের তারায়। সে চোখের আকর্ষণে গৃহী আসে; সন্ধ্যারী দাঁড়ায়, অল্পভবে ভাসে তার পুনরায় সঙ্গারের ছবি।

হাসিমুখ : শ্রীত মন : ঠিক যেন জীবন্ত মুখর। শাস্ত্র শিষ্ট মুখে মুখে সে ছবির ছড়ানো আভাস; তারি মুখ মনে ভেবে ভোলা যায় দূরের প্রবাস। কেউ বলে : বঙ্গ শিল্পী, তুলি তার আশ্চর্য সুলভর।

কেদারায় মৌন শিল্পী : টেবিলে কহুই : গালে হাত।

শুভ তার দেহাধার। এ ছবিতে সমস্ত চেতনা।

'বর্ষ দুধা লুঠন-প্রয়াস'—ভাবে শিল্পী কতো রাঙ।

গ্যালারিতে আছে তবু সৌন্দর্যের মন্ত প্রেরণা।

# পাণ্ডু

রামমোহন রায়ের চিঠি

মহামহিমামিত শ্রীযুক্ত লর্ড আমহার্ট গভর্নর জেনারেল  
মহোদয় সমীপে—

মাই লর্ড,

ভারতবাসী গবর্ণমেন্টের কার্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একপ ক্ষমতার ভাব পোষণ পূর্বক নীরব থাকিও অত্যন্ত দৃশ্যীয়। ভারতের বর্তমান শাসনকর্তৃগণ বহু সহস্র মাইল দূর হইতে এমন একটি জাতিকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষা, শাস্ত্র, আচার, ব্যবহার ও মনোগত ভাব তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত এবং তজ্জগুই তাঁহাদের প্রস্তুত অবস্থা তাঁহারা দেশীয়দিগের দ্বারা সহজে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব যদি আমরা এই বর্তমান প্রয়োজনীয় ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের শাসনকর্তৃগণকে বাস্তবিক রূপে না বলি যদ্বারা তাঁহারা এদেশের মঙ্গলজনক উপায় উদ্ভাবন ও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন, এবং যদি আমাদের স্থানীয় জ্ঞান এবং বহুদর্শিতা দ্বারা তাহাদিগের এই উন্নতি সাধন জন্য সমিচ্ছার অনুমোদন না করি, তাহা হইলে আমরা নিজদের প্রতি কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন বলিয়া অপরাধী হইব এবং আমরা শাসনকর্তৃগণকে আমাদের বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে উপযুক্ত স্রোণ প্রদান করিব।

গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে যে শিক্ষা দ্বারা উন্নত করিতে সমুৎসুক, কলিকাতায় একটি নূতন সংস্কৃত স্কুল স্থাপনই সেই মহাদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। এই মঙ্গলজনক কার্যের জন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। মানবজাতির মঙ্গলাাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিবেন যে, এই শুভকার্যের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক চেষ্টা সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা একপভাবে পরিচালিত হয় যেন তদ্বারা ভারতবাসীর জনপ্রোত উত্তরোত্তর উন্নতির অভিপ্রেত প্রবাহিত হইতে থাকে।

যখন এই বিজ্ঞান্য স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। তখন আমাদের নিশ্চয় আশা জন্মিয়াছিল যে এই অর্থ দ্বারা ভারতবাসীকে গণিত, প্রায়ত্তিক, বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরস্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিজ্ঞ যুগোপীয় পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইবেন। কারণ এই সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্র যুগোপ অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তদ্বারা উহার অবিবাসিগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবিবাসিগণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে।

আমাদের ভাবী রক্ষণবিদগণকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উন্নত করা হইবে,

এই আশাবিত প্রতিশ্রুতি শ্রবণে আমাদের হৃদয় আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জগু ইংরেজের নিকট আমরা এই বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি যে এশিয়াতে আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ রোপণ করিবার জন্য এই উদার ও উন্নত জাতিকে তিনি এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি, যে জ্ঞান ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেন্ট দেশীয় অধ্যাপকদিগের তত্ত্বাবধান একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতেছেন। লর্ড বেকনের পূর্বের যুগোপে যেকপ বিজ্ঞান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বিজ্ঞান্য তদনুরূপ হইবে। ইহাতে যুবকগণ কেবল জ্ঞানের কীকি ও ব্যাকরণের কুট তর্ক শিক্ষা করিবে। তাহাতে সমাজের ও শিক্ষার্থীর কাহারও কোন উপকার হইবে না। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, এখনও যুবকদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎসঙ্গে তাহারা জ্ঞানশীল মনুষ্যগণের কলনাপ্রবৃত্ত কতকগুলি শূন্যগর্ত বাকচাতুর্য শিক্ষা করিবে, বাহা বর্তমানে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে সচরাচর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে, উহা শিক্ষা করিতে একটি জীবন অতিবাহিত হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন, বহুকাল হইতে এই ভাষা দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে জ্ঞান নির্বাহী রহিয়াছে তাহা শিক্ষা করিলে পরিশ্রমাত্মক বল পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে যে মূল্যবান জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি এই ভাষা বিস্তারের প্রয়োজন হয় তবে সংস্কৃত বিজ্ঞান্য স্থাপন ব্যতীতও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ইহা বিস্তার করা হইতে পারে। কারণ, এই নূতন বিজ্ঞান্য যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করার প্রস্তাব হইতেছে, বর্তমানে দেশের নানা স্থানে যে সকল সংস্কৃতভাষাপক এই ভাষা ইহার জ্ঞানদর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি শিখিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধািত হইতে পারে। সুতরাং যদি এই সহায়ক শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয় তবে যে সকল সংস্কৃত চতুঃপাশীর বিজ্ঞতম অধ্যাপকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই ভাষা শিক্ষা শিখিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক আর্থিক কিছু কিছু বৃত্তি প্রদান করিলেই তাঁহারা অধিক উৎসাহিত হইবেন। তাহা হইলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হইবে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মহাশয়ের নিকট কিছু সম্মান পুরস্কার এই প্রার্থনা করিতেছি, যে অর্থ এদেশীয় লোক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের রাজপুত্রগণ প্রদান করিতে করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যদি নূতন প্রস্তাবিত বিজ্ঞান্য স্থাপিত তবে উহা দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য কখনও সাধািত হইবে না! যদি যুবকেরা বার বৎসর কাল—বাহা তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ—কেবল ব্যাকরণের কুটতর্ক শিক্ষা করিতে ব্যয় করে, তাহাদের দ্বারা কোন উন্নতির আশাই করা বাইতে

দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে “খাদ” শব্দের অর্থ খাওয়া। “খাদিত” এই শব্দ দ্বারা পুং, স্ত্রী ও ল্লীৰ এই ত্রিবিধ লিঙ্গবাচক বচনান্ত পদার্থের খাওয়া বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে “খাদিত” অর্থ “খাদ” এবং তি এই অংশসমূহই উল্লিখিত। যে লিঙ্গবোধক পদার্থের খাওয়া বুঝাইতেছে। কিংবা শব্দের ভেদ দ্বারা উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন স্ত্রী ভাষাতে প্রশ্ন হইতে পারে ‘Eat’ শব্দের কি পরিমাণ এবং S এর দ্বারা কি পরিমাণ অর্থ হয়। ঐ শব্দের অর্থ তাহার উক্ত দুই অংশ পৃথকরূপে কিবা একত্র প্রকাশ কি না?

আমরা ইচ্ছা করিতেছি কি প্রকারে বিলীন হয়, পরমাঙ্গার সহিত কি সম্বন্ধ প্রভৃতি বেদান্ত-প্রদর্শিত জ্ঞানার আলোচনা দ্বারাও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। যে বেদান্তে দুগ্ধমান পদার্থেরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। পিতা, ভাতা প্রভৃতি সত্য নাই, সুতরাং তাঁহার যথার্থ আদরের যোগ্য নহে। অতএব পৃথিবী এবং তাহাদিগকে পরিভাগ করা যায়, ততই প্রভৃতি শিক্ষা দেয়, সেই বোধে শাস্ত্রের মত শিক্ষা দ্বারা সমাজের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সভা হইতে পারে না। বেদান্তের কোন শ্লোক উদ্ধারণ দ্বারা ছাগ হত্যার পাতক নিরাকৃত এবং বেসের কোন কোন শ্লোকের কি প্রকার প্রকৃতি বল তাহা মীমাংসাসাধ্য হইতে শিক্ষা করিবার কোন উপকার সাধিত হয় না।

জ্ঞানের সমস্ত পদার্থ কত প্রকার কাল্পনিক শ্রেণীতে বিভক্ত—

সহিত শরীরের, শরীরের সহিত আত্মার এবং চক্ষুর সহিত ক’প্রকার সম্বন্ধ, ত্রায়শাস্ত্র হইতে এই সমস্ত শিক্ষা করিয়াই র কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে?

বেকনের পূর্বে যুরোপে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অবস্থা যেরূপ প্রতীত এবং সকল প্রকাশিত হওয়ার পর জ্ঞানের যেরূপ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি পূর্বেলিখিত বিষয়ের তুলনা তাহা হইলেই আপনি ঐরূপ কাল্পনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবেন।

ইংরেজ জাতিকে প্রকৃতজ্ঞানে অভ্যস্ত রাখাই অভিপ্রেত হইত, ইলে অজ্ঞানতা বিস্তার করিতে সমর্থ উপযোগী প্রাচীন কল্পাদিগের প্রবর্তিত পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া লর্ড বেকনের চিন্তামোদিত এবং গৃহীত হইত না। সেইরূপ যদি একে অজ্ঞানতাকারে আবৃত রাখাই ইংলণ্ডীয় আইন-এর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এদেশীয়গণকে উন্নত করাই যখন গবর্নমেন্টের প্রধান গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শাণীরতত্ত্ব, উদার বিদ্যাশিক্ষা অধ্যয়ন প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই হইতে উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য প্রস্তাবিত টাকা দ্বারা পুস্তক ও নানাবিধ যন্ত্র সম্বলিত একটি কলেজ স্থাপন হইত, ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুরোপ হইতে পণ্ডিত আনয়ন হইত।

গবর্নমেন্ট এই বিষয় নিবেদন করিয়া আমি আমার দেশের প্রতি এবং আমার দেশীয়দিগের উন্নতি সম্পাদনোচ্ছাস

দ্বারা প্ররোচিত হইয়া যে উদারমনা ভূপতি এবং আইনকর্তাগণ এই সুদূর ভূতলে তাঁহাদের মঙ্গলজনক বস্ত্র প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এক অতি গভীর কৃতজ্ঞতা সম্পাদন করিয়া বসিয়া অস্থূল করিতেছি।

আমি বিনীতভাবে বিশ্বাস করি যে, মহাশয়ের নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে আমি যে স্বাধীনতা পাইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা করিবেন।

একান্ত বশব্দে ভূত্যা  
শ্রীরামমোহন রায়

রাজা রামমোহনের সময় সাধারণ লোকে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন না। ব্রহ্মসম্মেলন যামুন-পশ্চিম সংস্কৃতের চর্চা করতেন। আগলতের ভাষা ছিল ফারসি, তাই দ্বারা চাকরির উদ্দেশ্যে তাহাই সেই ভাষা শিখতেন। এই অবস্থায় বিদ্যাহার শাসনকর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেন। গবর্নমেন্ট এই টাকায় এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখানো সাব্যস্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতা একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আর কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা খোলা হয়। কলিকাতাতে আর একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের জরুরীও চলতে থাকে। কিন্তু শ্রীরামমোহন হাইড্রো ইন্সটিটিউট হওয়ার এবং রাজা রামমোহন রায় এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা এদেশের লোকের সংস্কৃত ফারসি বদলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বদলে এদেশের লোকের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অস্বীকার করে। তিনি পরিষ্কার যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, বহু শতাব্দীর কুসংস্কারে কখনো ইংরেজী শিক্ষা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া দূর করা যাবে না।

এই চিঠির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবর্নমেন্ট শিক্ষা বিভাগের কমিটির কাছে ইহা পঠান। অবশ্য এর ফলে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একেবারে বহিত হয়নি, তবু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়।

( চিঠিটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। )

## দেবেপ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

১

সমালিঙ্গনপূর্বক নিবেদনমিদং—

গত বৎসরের এই আগস্ট মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুণ্যকাননে অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রত্যেককালে আপনাদের উদার হস্ত হইতে যে রূপা ও প্রেম আশ্রয়ন করিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আশ্রয়িত হইয়া এই পূর্ববর্তের অরণ্যমাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আপনাকে দেখিয়া আপনাকে গভীর দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনাদের চিরপরিচিত বর্ণালীবিদ্যুৎ পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবামাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য ও চমকিত হইলাম এবং

যারপরনাই আনন্দ অন্বেষণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আশ্চর্য সহিত আশ্চর্য কি প্রেমবোধ—সে শরীর-ব্যবধান জানে না। আমি আপনাকে শরণ করিলাম আপনায় পত্র বেনে আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে আপনি সপরিবারে কলীসে আছেন, এই সংবাদ লাভ করিয়া আমার মনের হর্ষ আরো বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ বেনে সর্বদা পাই।

মধ্যে আপনি রূপা করিয়া আমাদের বাটীতে বাইয়া বিজ্ঞপ্ত ও তেমন্তকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পরিতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্য্যাকিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে, এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাঠিলে বর্ণায় আনন্দ অন্বেষণ করিতাম। “নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নভিগমে! চন্দ্র-কমল বিকাশ বার নামে। গগনে ভাসু সহস্রকর বিস্তারি গাং-মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর গনিয়া স্তম্ভর উজ্জল অমুগমে।” কোথায় গত বঙ্গের এই আশ্রিত সের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্পকাননে— পার কোথায় অল্প প্রাতঃকালে এ বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে বিবর্তে এই পত্র লিখিতেছি। আবার আগামী বঙ্গের এই সময়। কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে মায় ডাকিতেছেন, ‘তু আওরে।’ কিছুই বলা যায় না—হয়ত গাগল ফাঙ্কন মে তুমসে মেলোঙ্গি’। আওর ‘মন কি কমলল লিখা শুনোঙ্গি’। সম্প্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় ফলদের ইত আশীর্বাদ করিতেছি যে, মনের মত আপনার সাধুসঙ্গ লাভ কর এবং আপনি পুষ্পপুঞ্জের পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন বকাসিক সর্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা শ্রীগুণ্ডল জামাতা সপরিবারে চিরজীবী হইয়া সর্বদা সর্বত্র কুশলে হন এবং আপনার সদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত ল। ইতি।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ ও  
সত্যত রূপাপ্রাধিনঃ  
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা

এই চিঠিখানি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ধর্মশালা পাঠ্য থেকে শেষ বয়সের অন্তরঙ্গ সন্তান শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে লেখেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ছিল রায়পুরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে পিতার এই বক্তৃতির অতি স্মরণ ছবি এঁকেছেন। কবির ভাষায়—“বৃদ্ধ বারে স্পৃহা বোধাই কমিটির মত অন্তরঙ্গের আভাস বজ্রিত—র স্বভাবের কোথাও এতটুকু জীর্ণ ছিল না। মাথাভরা টাক, লাড়ি কামানো, স্নিগ্ধমধুর মুখাবিরের মধ্যে শান্তের কোন ই ছিল না, বড় বড় দুই চক্ষু অবিরাম হাতে সমুজ্জল। তাঁহার বিক ভাবি গলায় বখন কথা কহিতেন, তখন তাঁহার সমস্ত হাত চাখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্শ্বপাড়া রসিক। ইংরেজির কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের পিন্ধি ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সবদাই ফিরিত একটি। এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গেলেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা

করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ‘শান্তিনিকেতনের বুলবুল’ বলে ডাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গান আর সেতারের বজ্রার তাঁর শান্তিনিকেতনের নির্জন মুহূর্তগুলি ভরপুর করে রাখতো। শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে লেখা তাঁর সব চিঠিই এমনি অমূল্যে ভরা এবং রসোচ্ছল।

ব্রজেনাটা শিখর  
৮ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক

প্রেমাম্পাদেয়

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গনপূর্বক নমস্কার—

বিজ্ঞপ্তের কল্যাণ সর্বোজার শুভ বিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গুণগড়িকে লইয়া বেদিতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্যের কার্য্য সমাধা করিয়া এই শুভবিবাহ স্বসম্পন্ন করিয়া দিবে। শ্রী আচার্য হইয়া বরকল্যা দালানে আইলে তবে ব্রজোপাসনা আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্বে তাহাতে বসিবে না। বিজ্ঞপ্তের সঙ্গে বরষাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরষাত্রদিগকে দালানের বেলীর পশ্চিমভাগে আদরপূর্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কর্ণ আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জগ্ন বাটার ভিতরে পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার দুই পার্শ্বে বৈঠকী সেজ বেলীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেলীতে আলো কম হইবে না এবং তুমি পূর্ণি বেষ দেখিতে পাইবে। সমস্ত আছে বলিয়া এইসকল তোমাকে বলিয়া দিলাম, নতুবা বাহ্যমাত্র। তোমার বেহালায় বাটীতে সকলে কেমন আছেন এবং তোমার নিজের শরীর বা কেমন আছে, জানাইয়া আপ্যায়িত করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ  
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা

পুঃ—যদি গুণগড়ি আসিতে না পারেন, তাহার কোন ব্যাঘাত হয় তবে তাঁহার স্থানে কোরগরের দয়ালটাদ ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া দিবে।\*

[\* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অজিতকুমার চক্রবর্তী শ্রীণীত ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন থাকলেও বিষয়কমে যে উপাসীন এক পরাধীন ছিলেন না এই চিঠি তাঁর স্বপ্নের নিদর্শন। কোন ক্রিয়াকর্ম কোন জিনিষ কোথায় থাকবে, কোন অহুষ্ঠান কখন করতে হলে, কে কোন দিকে বসবে এ সমস্তই তিনি ভাল করে ভেবে তারপর লিখে পাঠিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কল্পনা এবং কাজের মধ্যে এই রকম নিখুঁত শৃঙ্খলা থাকতো, কোথাও এতটুকু ঝাঁক বা শৈথিল্য তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন না। এ সমস্ত সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজও বেন তাঁর ধ্যানের অঙ্গীভূত উঠছিল।

## বিভাসাগর মহাশয়ের চিঠি

অশেষ গুণাশ্রয়

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয়

পরম কল্যাণভাজনে

সারস সজ্জাধমাবেদনম্—

• • আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক বন্ধু ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সফলিত বিষয়ে বৈরপ ব্যাঘাত ঘটয়াছে তাহার বিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায় সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। “শ্রেয়াসি বহুবিনিয়ানি” শুভ কার্যের নানা বিঘ্ন! অগ্নি যে অবধি এই বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলেন সর্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাবেক। অবশেষে তাহাই ঘটয়া উঠিল। বাহা হউক, এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা, কত উত্তোষ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাহাদের অভিপ্রায় সং ও প্রাশসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমনতর অসংখ্য চেষ্টা করিয়া বহুদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে বৈরপ শ্রদ্ধা ও প্রাশসা করিতাম এইরূপে ব্যাঘাত ঘটতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম সম্পন্ন হউক আর নাই হউক, আপনকার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন হইত। আপনি বৈরপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনি দীর্ঘজীবী হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অনেকবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক। • •

ভবদীয়ত

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা:

কেশব চিত্তরঞ্জন দাশের পিতামহ হাইকোর্টের প্রেসিড উকিল দুর্গামোহন দাশ বিভাসাগর মহাশয়ের অমৃত্যুর পর তাহার বালিকা বিমাতার বিবাহ দেওয়ান জম্মে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাহার বড় ভাই কালীমোহন দাশ এই বিবাহের যোবতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তির ফলেই দুর্গামোহন বাবু বার্ষ হয়ে বিভাসাগর মহাশয়কে ক্রমোপেক্ষণ একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে বিভাসাগর মহাশয় নিজের নানা বিপদ ও অন্তর্বিহার মধ্যে দুর্গামোহন বাবুকে সাহায্য করে এই চিঠি পাঠান। এই সময়ে বিবাহবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা

করতে করতে বিভাসাগর মহাশয়কে নিরন্তর বাধাবিপত্তির বিক্ষোভ সংগ্রাম করতে হয়েছে কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হননি।

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোঁসা করিয়া নিবার উপায় করিতে পারিলাম না। স্ততরাং সখ্য তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলম্ব অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তির যে সাহায্য দান অস্বীকার করিয়াছেন তদ্বারা অন্যায়সে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অস্বীকৃত সাহায্যদানে পরাভূত হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এবিধের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আর ক্রমে খরচ হইয়া উঠিয়াছে, স্ততরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই সকল ব্যক্তি অস্বীকার প্রতীপালন করিলে, আমাকে এরূপ সম্মুখ পড়িতে হইত না, কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন চেষ্টা দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্থদান দিয়াছ, অবশিষ্টাংশ এ পর্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এতরূপে আরের অনেক খরচ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূর্ণাঙ্গের অধিক হইয়া উঠিয়াছে। স্ততরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অল্প উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময় তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, একজন অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপসার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে বৈরপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সংকল্পোৎসাহী মহাপুরুষদের বাক্যে আশ্রয় করিয়া যখনপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করে দূরে থাকুক, কেহ তুলিয়া এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না। • •

ভবদীয়ত

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা:

এই চিঠিটি বিভাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু, এবং বাণিজ্যের স্তর স্তরে কল্যাণসাধকের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। বিধবাবিবাহের খরচ পূরণের উদ্দেশ্যে দুর্গাচরণ বাবুর কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল



পরে হর্গাচরণ বাবু আর্থিক কষ্টে পড়ে বিজ্ঞাপনের মহাশয়ের কাছে সেই টাকার জন্যে চিঠি দেন। বিজ্ঞাপনের মহাশয় তার উত্তরে এই চিঠি লেখেন।

শ্রীশ্রীহরি শরণ:

ভক্তাশ্রয়: সন্ত—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবস্থানীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অন্তঃপ্রবৃত্তি নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যিক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রসূত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা জল্পরোধে করে নাই। খন সুনীলাম সে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং কল্যাণ উপস্থিত ইয়াছে তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোন মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবা বোধের প্রবর্তক, আমরা উজ্জ্বল করিয়া অনেকের বিবাহ দাড়াই, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পরিত্যক্ত না, দমসজ্জে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধের হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রসূত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবক, তাহার কবিতা করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান কৰ্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সংকল্প কথিতে পারিব হার সম্ভাবনা নাই, এবিষয়ের জন্ত সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং বন্ধক হইলে প্রাপ্যস্ত স্বীকারও পরামুখ নহি; সে বিবেচনার প্রবর্তন অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহারব্যবহার ত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমি অপেক্ষা ধর্ম আর কেহই হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে প্রসূত হইয়া এই বিবাহ করিতে আমি আপনাকে চরিতার্থ করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত বাহা উচিত বা আবশ্যিক বোধ হক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচিৎ হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহারব্যবহার করিতে বাহা-সাহস বা প্রসূতি না হইবেক, তাহার স্বচ্ছন্দে তাহা বহিত বন, সে জন্ত নারায়ণ কিছুমাত্র দ্বিগুণিত হইবে, এরূপ বোধ না এবং আমিও তজ্জন্ত বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। র বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতঃপ্রসূত, অমলীয়। অমলীয় বা অমল্যোধের বশবর্তী হইয়া চলা কাহারও নহে। ইতি ৩১শ শ্রাবণ।

ভক্তাক্ষিপ:

শ্রীশ্রীশরণ শরণ:

এই পত্রটি বিজ্ঞাপনের মহাশয় তাঁর তৃতীয় সহোদর শঙ্করচরণ বিজ্ঞাপনকে লেখেন। বিজ্ঞাপনের মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বধাধর্ম লিখেছেন: “তিনি বিধবা বিবাহ করিয়া চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং আরও কতটা করিতে পারিতেন তাহার নিখুঁত ছবি ঐ পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।”

৪

শ্রীশ্রীহরি: শরণম্

পূজাপাদ শ্রীমৎ শিভুদেব শ্রীচরণবিশেষ

প্রণতিপূর্বক নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্তও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের ঘেরণ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব, এরূপ বোধ হয় না। একজন্ম স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিতৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্ট করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার লায় হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ‘যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।’ এই প্রাচীন কথা কোন-ক্রমেই অর্থ নাহে। সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও রেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও রেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অমুমান সশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া প্রশ্নোত্তর করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্ত্তবাব কষ্ট। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংসার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই যে, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, হুতরা আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বর্ণনা যায় না। তজ্জন্ত কৃতান্তলিপিতে কতবার বচন শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মাফ করিবেন।

কার্ধ্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি ঋণ পরিশোধ না হইলে লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বাস্তবতে সখ্য ঋণমুক্ত হই তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিমজ্জিত পাইলেই কোন নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থিত করিব। \*\* আপনকার নিত্যনিমিত্তিক

ব্যয় নির্বাহার্থে বাছা প্রেরিত হইয়া থাকে, বতরদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিরেক ঘটবে না।

ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬। \*

ভূত্য: শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ:

\* বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের চিঠিগুলি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

এই চিঠির মধ্যে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের দারুণ মনস্তাপ এবং ক্ষোভের যে প্রকাশ ঘটেছে তাহার কারণ ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। তিনি দেশের মঙ্গলের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাই সে কাজে পদে পদে বাধা পেয়ে এবং অনেকের কাছে প্রত্যাশিত হয়েও তিনি নিষ্ফল হ'ননি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কারণ হ'ল তিনি সংসারেও ঐক্যে শান্তি পাননি। সংসারের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে কোনদিন তাঁর ক্রটি হয়নি কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছেন ঔদাসীন্য আর পূর্তপ্রমাণ বাধা। তাই ভগ্নমনে, শূন্যপ্রাণে শিতামাতা, স্বেদমণী, সহোদরদের কাছে বিনীত ভাবে বিদায় চেয়েছেন। এই বিদায় নেওয়ার সময়ও তিনি কর্তব্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

### অক্ষয়কুমার দত্তের চিঠি

পরমশ্রদ্ধাপ্রদেয়—

সবিনয় নিবেদনমিঃ—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া ১১ই পৌষে কীটগঞ্জে লাল বংশীধরের দরুণ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যায়নি। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, স্তন্যগ্রন্থ স্ফীতপ্রায় আহবাস করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে, ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্গসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চিরকাল হইবে। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের হিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার

এ দুঃখ কল্পনাতেও বাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবা-বিবাহ হইবার সজ্জাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাহিত করিবেন। লাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পক্ষে নিযুক্ত হইবেন এই শুভ সংবাদ সম্বল কি না অগ্রহণ্য কর্তব্য লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু জামাচন্দ্র বিশ্বাস ও প্রফুল্লকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সমস্ত শ্রীতাদার নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

[ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ]

অক্ষয়কুমার দত্ত যে বিজ্ঞানাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে লেখা সেই সময়ের এই চিঠি থেকে তা জানা যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচারিত হয় এবং তার তিন মাস পরে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ বিবাহের তারিখ হল ১২৬৩ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ। নানী স্থানের পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দারকানাথ মিত্র, শত্ৰুনাথ পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিবোমশি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১১১৩ সালের ১ই পৌষের 'তত্ত্বাবোধিনী' পত্রিকায় এই বিবাহের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। 'তত্ত্বাবোধিনী' পত্রিকা স্পষ্টভাবে এই বিবাহ সমর্থন করেন। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত সে সময় কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি কয়েক দিন পরে এলাহাবাদ থেকে বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে উক্ত চিঠি লেখেন। পণ্ডিত রামদন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিস্তারত ভাটচার্যের সঙ্গে পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা-এভাবে বিবাহ দেওয়া হয়।

মতধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দারকানাথ মিত্র, শ্রীশচন্দ্র বিজ্ঞানিধি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজনারায়ণ বসু, প্রেসকুমার সর্বাধিকারী, কালীকুমার মহিকরায়, হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিত ও শ্রদ্ধিমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহের বৈধতা স্থির করতঃ প্রেরিত আবেদন পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হলে রাজনারায়ণ বসু দেওঘর থেকে সাধুবাদ জানিয়ে বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে চিঠি দেন।

আপাদনী সংখ্যা থেকে রোমাঞ্চকর ধারাবাহিক রচনা

## ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা

মূল লেখা থেকে অনুবাদ করছেন শান্তা বসু এম, এ

## তিন

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে

ঘণ্টা বাজছে ঢং !

একটি রাতের রঙ্গমঞ্চ

কেউ রাজা ; কেউ সং

ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং ;

সেয়ানা কিছা নেশায় যে ঢং

শেষের এবার্ত্তে সবার বরাতে

বাজে বারোটার ডং !

পাপ ও পুণ্য দুয়েই শূন্য ;

সবার জবাব wrong !

শুধু নিশীথের নষ্ট চন্দ্র

তখনো মাথছে রং ;

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে

ঘণ্টা বাজছে ঢং !

দুঃখ-স্বপ্নের দোলনরঙ্গে

জীবন-ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে

এখানে-সেখানে কোথায় কে জানে

পড়ছে কেবলি গং ;

এ-থোলা খতম, পয়সা হজম ;

মিথো এ রং-চং !

সবাইকে নিয়ে কি বল বানিয়ে

খেলছে কে পিং পং ?

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে

ঘণ্টা বাজছে ঢং !

ঘণ্টা বাজছে এক, দুই, তিন ;

ষ্টেশন ছাড়ছে মেল ;

মেল নয় বুলি, লখা কফিন ;

ক্যালকাটা-ব্যাংগল ।

বাত্রী ক'জন ? বাত্রী ক'টা যে ?

বলবে কে বলো ? ধোঁয়ার ঘটা যে !

একটি রাতের সঙ্গী সবাই

এক-কামরার বাত্রী ;

তবুও ভাগ্যে ভোর হবে কার,

কার শুধু অমারাজি !

প্রথম ফুটবে কার মুখে বুলি,

কার বা swan song ।

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে

ঘণ্টা বাজছে ঢং !

জীবনকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করা সেক্সপীয়রের যুগে সম্ভব ; সে-প্রাণীলের যুগে অসম্ভব। আজকের জীবন এত জটিল যে তার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু ষ্টুডিও-ক্রোরেরই। প্রবেশ ও প্রস্থান নয় ; লং শট, ক্লোস শট, কম্পোজিট শট, ক্লোস আপ, ফেডইন, ফেডআউট। চোখ দিয়ে জল বার করে কাঁদা নয় ; ট্রিসারিানের কুপায় কাঁদতে বাধা



## নীলকণ্ঠ

হওয়া। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের উপান-পতনে কখনো উদ্ভঞ্জন রঙ্গমঞ্চকে উজ্জ্বলিত করে তোলা ; কখনো রহস্তে রুদ্ধধ্বনি। কখনো বেদনায় মুক, আনন্দে উদ্বেল করা নয় ; ছায়াচিত্রে এই সব কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি ; অনুপস্থিতি সেখানে শুধু পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিত্ব সব কিছুই করিয়ে নেয় কামেরা, সাউণ্ড, লাইট, স্পেশাল ইফেক্ট-আপ, ট্রিক আসলে এদেরই প্রাণা রুতিধ্বের স্বীকৃতি। এমন গানের জগৎও স্বরে টেঁট নাড়াই যথেষ্ট ; নেপথ্যে সঙ্গীতাদেবী রুতিধ্বের জহর গাঙ্গুলীর গলায় হেমন্তকুমারের গান, গানের বেশি ; প্রায় মেশিনগান-সমান !

পশ্চিমবঙ্গের কোনও কলেজের বাংলা সাহিত্যের সভায় এ বাঙ্গালী লেখককে শ্রোতার প্রমত্ত করেন যে, বাংলা সাহিত্য বলা বন্ধা কেন ? কেন বাংলা সাহিত্যে তেমন একটি 'চরিত্র'ও হচ্ছে না যা নাকি সকলের টনক নড়তে সক্ষম ? এই প্রশ্নের চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন বঙ্কিম। তিনি বলেছিলেন : সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। আজকের সমাজে তেমন মাত্রা ডাক্তারের কাছে যান, তিনি রক্ষা কি ডাক্তার বলা শক্ত ; হাসপাতাল,—রুগীর খোঁজ নিতে হবে হাসপাতালের টাকায় ; আয়,—অনিমহার বাহু প্রবেশ হবে ; চুক্তিতে পারবেন, পারবেন না আর। ব্যাংক টাকা রাখুন,—আপনার দত্ত বাবু ব্যাংক ফেল পড়বার পর তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আরও গাড়ীতে বেড়াবার এক সেই সঙ্গে আরও বড়ো টোংগের স্ববিধে আপনার বাড়ীর সব চেয়ে বখাটে বীরের নাম ন্যাশালা !

রে আটনকে কীকি দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করে দু'পয়সা গুছিয়েছে :  
পাখার আলো করা সেই মানিককে আপনি বাই মনে করুন,  
নার বাড়ীর লোকেরা মনে করে 'হীরের টুকরো।' আপনার  
মা বলেন : ছাপলা বাই করুক, পয়সা করেছে ত'!

এমন সমাজে 'মামু' কোথায়? মামু ছাড়া সাহিত্য  
বে কিসের ওপর? সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না;  
জর ভেতর থেকেই উঠে দাঁড়ায়। যেসমাজে অমামু হচ্ছে  
ত, সেসমাজে সেদেশে অমামুভিক সাহিত্য হতে বাধ্য;  
তাই হচ্ছে!

সাহিত্য সবক্ষেপে সেদিন বাঙালী লেখক বা বলেছেন সিনেমা সবক্ষেপে  
একই কথা। 'বাংলা ছবি কেন ভালো হয় না?'—এ প্রশ্ন ব্যাধি  
বুঝি, তারা রূপালী পর্দায় বাংলা ছবি দেখে-দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে  
তবেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কেবল মাত্র রূপালী পর্দায় ছবি না  
সেই সঙ্গে রূপালী পর্দার অন্তরালে বা হয় তাও যদি দেখতে  
না, তা হলে তারা প্রশ্ন না করে, বরং এই বস্তুবাই জ্ঞাপন  
না যে, বাংলা ছবি কি করে ভালো হবে?

ভগবান সব কিছুই জানেন; কিন্তু তিনিও বোধ হয় বাংলা ছবি  
করে ভালো হবে তা জানেন না! আজকের বাংলা ছবিতে  
গীর রুবিব আছে; কিন্তু রুবিবের বিনিময়ে 'কট' আজ আছে,  
নেই। বাংলা ছবির রসদ আজ অবাঙালীর হাতে; তার  
স্বাধিকারকে যে আসীন সে কী 'জাত' এ প্রশ্ন তোলা আজ আর  
ক; পৃথিবী জুড়ে তারা এক জাত; একই রকম বস্তুত্ব।

Exploiter! ওই কথার কোনও প্রতিশব্দ নেই বাঙালীর;  
কারণ বাঙালী কোন দিন Exploiter নয়; বাঙালী চিরকালই  
loited! অপহারকের বৃত্তি নয় বাঙালীর; অপহৃত  
রই গৌরব তার। রাজনীতি থেকে ইতিহাসের সকল ক্ষেত্রে  
চিরকাল মই হয়েছে অবাঙালীর স্বর্গরোহণে। সব চেয়ে  
ভারতীয় নেতা থেকে সব চেয়ে অস্বাভাবিক অভিনেতা পর্যন্ত  
এক বাংলা দেশ সবক্ষেপে এক উচ্ছিন্ন প্রদেশ। তাদের  
গত বস্তুত্বের হলো: If Bengal dies only then  
India।

বাংলা ছবির বাজারের গদীতে তাই আসীন ধূপটাদ  
ওয়ালা! নামে এবং বেনামে বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসার চাবি কাঠি  
এদেরই কবলে। কখনও প্রোডিউসার; কখনও ডিস্ট্রিবিউটার;  
ও এন্ট্রিবিটর! কখনও যুগপৎ এক সঙ্গেই সব কটি স্পর্শে  
ত যুগ্মত্বমান গ্রাহস্পর্শ। এরা বাংলা ছবিকে ভালোবাসে ঠিক  
ত, যেমন মুরগী পুথতে ভালোবাসে মুরগীমান।

ঐ নৈব প্রোডিউসাররা আসলে কী চিহ্ন, তা' বুঝে রিপ্রেজেন্টে  
পারলে তাই নিজেই একরানা 'ছবি' হয়। পুরাকালে পাত্র-  
সুপাই সাত্রী, অমাত্য-পারিষদ নিয়ে, সভা আলো করে বসতেন  
। এ যুগে ধূপটাদ আগরওয়ালারা এয়ারকন্ডিশন ও ঘরে  
পাশে গদীতে পা নাচার; ছবি শানায়; ঘরের রুবিব পান  
দেরই আদর করে ডাকে গম্বুজ কী বাক্স। বাংলা ফিল্মের  
সাথেই সেই কিন্তু মোসাহেব আছে। তারা আদরের ডাক  
বগদ হয়; কোনও কোনও গোপাল ভাঁড় গম্বুজ কী বাক্স  
ফিল্ম প্রণত হয়ে বলে; তছর, মা-বাপ!

ধূপটাদ আগরওয়াল!—কোট, প্যাট জুতো নিয়ে গোট  
মামুখটার ওজন তিনশো পাউণ্ড। দু'পাশে সর্বদাই দু'জন রক্ষিত।  
থাকে। কী যে করে তা ওই জানে। ধূপটাদের শুধু নিজের  
বুদ্ধিতে চলে না, পরের বুদ্ধিও ধার করে; এদের প্রত্যেকেরই  
একজন করে Friend, 'Philosopher' এবং misguide আছে;  
তারাই হচ্ছে বাংলা ছায়াচিত্রাংশের আসল শনি!

ধূপটাদ প্রথম জীবনে বেগনী ছিলো; যুদ্ধের বাজারে লাগ  
হয়ে গেছে। ইংরেজি জানে না কিন্তু মাতৃভাষা ভুলতে চায়।  
প্রায়ের লোকেরা যেমন সব কথা বাংলায় বলে কিন্তু বউ-এর  
কথা উল্টেই বলে: আমার Wife,—এরাও তেমনি মাঝে মাঝেই  
ইংরেজির চোরাবালিতে হঠাৎ পা দিয়ে বসে। ডাক্তারকে  
ডেকে বলে: আমার Wife-এর History আছে! শুনে ডাক্তারের  
চোখ কপালে ওঠে, খুঁতনি হলে পড়ে। History আছে?  
কী বলছেন?—ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করে। আজ্ঞে হ্যাঁ, যা  
বলছি তাই; মাঝে মাঝেই ভ্রমি যায়;—ধূপটাদ জবাব করে।  
ও: তাই বলুন, হিষ্টোরি আছে!—ডাক্তারের চোখ কপাল থেকে  
নামে একক্ষণে। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ধূপটাদ আবার  
ইংরেজি ঝাড়ে: আজ্ঞে হ্যাঁ; একটা ইন্টারজেকশন দিতে হবে!  
ডাক্তারের চোখ কপালে কিরো যায়: ইন্টারজেকশন? হ্যাঁ, ধূপটাদ  
সমান তোড়ে সমঝায়; ওই যে ছুট-... 'অঃ' ডাক্তার এবারেও  
ধাক্কা সামলায়: ইজেকশন?

এই ইন্টারজেকশনরাই (i) বাংলা ছবির পেছনে বসে কলকাতা  
নাড়ে। ফুটবল খেলার মাঠে অফসাইডের বাণী বাজলে এদের  
মোল্লাস চীৎকার গগন বিদীর্ণ করে: স্হাইসাইড! স্হাইসাইড!

আজকে যার টাকা আছে পৃথিবীটা তারই; তবুও কোনও  
কোনও ক্ষেত্রে টাকাই সব নয়। হলিউডে টাকা থাকলে ফিন্যান্সিয়ার  
হতে বাধ্য নেই; ফিল্ম প্রোডিউসার হতে আছে। সেখানে প্রযোজনা  
সাম্প্রতিক ব্যাপার; হরধনুতে শর যোজনার চেয়েও অনেক শক্ত।  
প্রোডিউসার হলো হলিউডে সেই ব্যক্তি যে বিশেষ ধরনের ছবির  
জল্পে বিশেষ ধরনের কাহিনী, বিশেষ ধরনের কাহিনীকে বৈশিষ্ট্য  
দিতে সক্ষম এমন পরিচালক থেকে আরম্ভ করে ছান-কাল-পাঞ্জ  
পাত্রী নির্বাচন সব কিছু করবার জল্পে শেষ স্বাক্ষর দেবার একমাত্র  
অধিকারী। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ সাফল্য আছে এই  
অধিকারের পেছনে।

টলিউডে বিচিত্র পরিস্থিতি! এখানে যার টাকা তার পিসিমার  
গল্প নিয়ে, তাকে হিরো এবং তার পরতারিণি বছরের রক্ষিতাকে  
ঘোড়শীর ভূমিকায় নামিয়ে যে ছবি করতে রাজী আছে, সেই ছবির  
পরিচালক হতে পারে। কাউকে না পাওয়া গেলে প্রোডিউসারেরই  
বা পরিচালক হতে দ্বিধা কোথায়? ডাক্তারেরই দ্বিধা থাকে  
অপারেশন করতে; নাপিতের ক্ষুর দিয়ে ফোড়া কাটতে এতটুকু ভয়  
নেই।

এই পরিস্থিতির ফলেই উদ্ভব ধূপটাদ আগরওয়ালদের।  
পরিচালনা থেকে প্রচারণা পর্যন্ত সব কিছু সবক্ষেপে ধূপটাদের অভিমতই  
গ্রাহ্য। এরও আগে কাহিনী নির্বাচনেও এর ভালো লগায় দামেই  
কহিনীর দাম। শুধু ধূপটাদের ভালো লাগলেই হলো না; অন্তরঙ্গ  
পারিষদেরও খুসী হওয়া চাই! বিজ্ঞাপন-সচিব এসেছেন ব্রক

দেখাতে, কেমন হয়েছে। ধূপচাঁদ দেখে বজেন : বাঃ বেশ ! আবেশে যখন প্রচারকর্তা প্রায় চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন তখনই ধূপচাঁদের সাগত জিজ্ঞাসা : একে কী ব্লক্ বোলেরে ? আজ্ঞে, হাফটোন,—জবাব আসে। 'এ্যা ? বড়মড় করে উঠে বসেন ধূপচাঁদ : হাফটোন ?' পোয়সা দেবো পুরো,—হাফটোন কেন ? নিয়ে যাও : ফলটোন করে নিয়ে এসো।—যাও !

যেতেই হয় প্রচার-সচিবকে ! বাংলা ছবির প্রচার-সচিবের অনেক কাজ যে ! শুধু 'ব্লক্' সামলানোই তার চাল না ; অনেক ব্লক্-তেওকে সামলাতে হয় যে তাকে সেই সঙ্গে ; সেই একই সঙ্গে !

বাংলা ছবি কেন ভালো হয় না, এবারে সেই গুট বহুস্তর আরও ভেতরে প্রবেশ করা যাক ! সেই বহুস্তর সঙ্গে যার পরিচয় নেই বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির, আসল আয়ত্তর বর্ণপরিচয়ই হয় নি তার এখনও ; তাই সে চোঁচায় ভালো ছবি চাই বলে।

ভালো সাহিত্যের মত ভালো ছবিও সৃষ্টি করতে হয় যে ! যেখানে সমাজ স্তম্ভ নয় ; স্বাভাবিক নয়, সেসমাজের সাহিত্যে প্রেরণচিত চিত্রবান স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠস্বর কিছুদিনের জন্তে অশ্রুত থাকতে বাধ্য !

বাংলা ছবি সম্পর্কেও সেই একই বক্তব্য। ছবি ভালো করবার জন্তে কতগুলো কণ্ঠশান দরকার হয় ; শুধু এয়ার কণ্ঠশাও হাউস হলেই হয় না। বাংলা ছবির চরম দুর্বলতা নয় ; চরম 'দুর্ভাবহা'র জন্তে যারা দায়ী তারা থাকে পদার অন্তরালে ; তাই তাদের কথা জানে না সাধারণ, যারা বাংলা ছবি খারাপ হলে গাল পাড়ে পরিচালককে, কাহিনীকারকে ; অভিনেতৃবর্গকে।

তারা জানে 'না যে বাংলা ছায়াচিত্রশিল্প তিন চাকার গাড়ী। তার একটি চাকা জোরে চলে ; বাকী এক চাকা ঘরটায় ; আরেক চাকা অচল। যে-চাকা জোরে চলে তার নাম এল্লিবিটর অর্থাৎ যারা ছবি দেখায় তাদের প্রেক্ষাগৃহে ; ঘরটানো চাকা হচ্ছে মিডলম্যান বা দালাল, তাদের বলে ডিট্রিবিউটর ; তারা, ছবির মালিক আর ছবিবয়ের মালিকের মধ্যে, অব্যাহতি কিন্তু অপরিহার্য সৈতু। আর ছবি যারা তৈরী করে, তাদের আমরা প্রযোজক আখ্যা দিয়েছি অনর্থকই, তারা ছায়াছবি তৈরী করে শুধু ছায়ার পেছন-পেছন ঘুরে হররাণ হবার জন্তেই।

প্রেক্ষাগৃহের যে মালিক তার হাউস চালাবার জন্তে যদি খরচা হয় সপ্তাহে দু'হাজার টাকা, ত' সে তার হাউসের জন্তে ভাড়া বাবদ ধরে বসে আছে পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু এ তো গোলা শুধু খরচা, লাভ ? তাই ছবি দেখাবার আগে সে সর্ভ ঠিক করে নেয় ডিট্রিবিউটরের সঙ্গে, প্রযোজকের সঙ্গে করে না, কারণ বাংলা ছবির প্রোডিউসার ছবি হয়ে বাবার পর, ছবির আর কেউ নয় ! ডিট্রিবিউটরের সঙ্গে এল্লিবিটর সর্ভ করে নেয় যে ছবির সাপ্তাহিক বিক্রীর অর্ধেক আংশ তার। অর্থাৎ ছবির বিক্রীর অংক যখন সপ্তাহে পাঁড়াচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা, তখন এল্লিবিটর পাচ্ছে সাত হাজার, যখন দশ হাজার টাকা, তখন পাঁচ হাজার, কিন্তু যখন ছবির বিক্রী নেমে এসেছে সপ্তাহে পাঁচ হাজার তখন কিন্তু পুরোটাই তার প্রাপ্য ; কারণ ? কারণ, সে আগেই কড়ার করে নিয়েছে যে তার হাউস চালাবার জন্তে ন্যূনতম খরচ হচ্ছে সপ্তাহে পাঁচ হাজার। যখন পাঁচ হাজার টাকার কম হচ্ছে বিক্রী, তখন

প্রেক্ষাগৃহের মালিক ছবি দেখাচ্ছে না আর এবং শুধু তাই নয় ছবির প্রিন্ট আটকে রেখে দিচ্ছে, খামতিটুকু পকেটে এলে তখনই ছাড়ছে প্রিন্ট ; তার আগে নয়।

ডিট্রিবিউটর যে টাকাটা হাতে পাচ্ছে তার থেকে সে আগেই সরিয়ে রাখছে প্রযোজককে সে যদি অগ্নিশ দিয়ে থাকে কিছু তা' ; এবং তার খাটনীর পারিশ্রমিক বাবদ কমিশন, প্রাস প্রিন্টের খরচা, আর পাবলিশিটির গৌজামিল। এই বিজ্ঞাপন বাবদ টাকার যে হিসেব দেখায় ডিট্রিবিউটর প্রোডিউসারকে, সেটা অনেকটা সার্বজনীন পূজার হিসাব পরীক্ষার দেখানো 'মিসলেনীয়াস'-ব্যয়ের মতো ; অর্থাৎ যেটুকু মেলবার তা মিলিয়ে দেবার পর, সে হিসেব কোনও দিনই আর মিলবার মতো নয়, তাইই গৌজামিল হল পাবলিশিটি এক্সপেন্স অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়।

এর পরেও যদি প্রোডিউসারের পকেটে আসে কিছু তাহলে তাকে বলতেই হবে প্রোডিউসারের কুঠী অসম্ভব জুতের। প্রায়ই অবশ্য আসে না। দুধের বাসতি থেকে চুপটুকু নিয়ে নেয় প্রেক্ষাগৃহের মালিক ; অল্প একটু দুধ আর বেশীটা জল, পায় ডিট্রিবিউটর ; বালতিটা পড়ে থাকে প্রযোজকের জন্ত ; কেন ? বোধ হয় প্রযোজকের সেই কর্ম সম্পন্ন করবার কারণে, ইংরেজিতে থাকে বলে গিয়ে, ইয়ে, kick the bucket !

বাংলা ছবির ডিট্রিবিউটরের ঘরে গিয়ে ঢুকুন ; দেখবেন গদি আগলে বসে আছে ধূপচাঁদ আগরওয়ালা। যারা এই ছায়াচিত্রের প্রথম বক্তৃৎ ছিলো, থাকে বলে পায়েনীয়র, তারা বসে আছে ধূপচাঁদের পায়ের কাছে। জোড়স্তু হয় আছে। ধূপচাঁদ চাইলে গলবস্ত্র হয়ে বসতেও তারা রাজী ! কল্লদেশ অনেকদিনই মুক্ত হয়েছে ধূপচাঁদের কুপায় ; তাই শেঠজীর সামনে মাথা কামিয়ে গলার কাছা দিয়ে বসতেও তাদের আপত্তি কোথায় ?

ধূপচাঁদ আগরওয়ালা হরতো সত্ত্ব কিরে এসেছে বিলেত থেকে উড়োজাহাজে। উপবিত্ত কুপাশ্রায়ী দলের সকলের উৎকণ্ঠা দুই করলেন শারীরিক কুশলবার্তা জ্ঞাপনে ; কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করল বিলেত দেশটা কেমন দেখলেন ? বিজ্ঞের মতো ধূপচাঁদ উত্তর দিলেন : বড় ভাঙ্কর কী বাস্ত,—ছোট ছোট লেডকা পর্যন্ত কী সোন্দর ইংরেজি বলে বিলেতে ? সত্যিই ত ! সাহেবদের ছেলোমো বিলেতে 'সোন্দর' ইংরেজি বলে,—এই চেয়ে আশ্চর্যের আর কু'ভারবে কী হতে পারে ?

আবার কেউ হয়ত গায়ে পড়ে প্রশ্ন করেছে ; মোটোতে নতুন ইংরেজি ছবিটা দেখেছেন ? কেমন লাগলো ?

ধূপচাঁদ তেড়ে উঠলেন ! আরে ! তোরা ! তোরা !—আ বোলো না ; পুরোনো ছবি শালা, বিলকুল বেওক্ক বনেছি তোমাদের কথা শুনে—

একজন কণ্ঠ প্রতিবাদ করেন : এ দেশে ত' এর আগে শুধু আসে নি—

ধূপচাঁদ : না, না, কে বললে আসে নি ; ছবির সুরুতে দেখলাম সেই সিংহ চিরাচ্ছে ! আগে একটা ছবিতো দেখাছিল ছবির সুরুতেই একটা সিংহ ডেকে উঠলো ; তখনই বুকল দেখা ছবি আর বসলাম না, চলে এলাম—

কুন ! মোটো গোভাইন বাবায়ের ট্রেড মার্ক সিংহ দেখে

৭দ বুঝে নিয়েছিল যে ছবিটা পুরোনো ! এদেরই হাতে বাংলা তৈরীর রসদ এবং এদেরই পায়ে ছবির কর্মীদের রুখির ঢালা ; ৥ ছবি যে রসিকদের জন্তে তৈরী হয় না তার জন্তে আক্ষেপ লাভ আছে কিছু ?

ছবি নিয়ে গ্যাংসাল বা ফাটকা খেলে ধুপটান আগরওয়ালা । গাঙ্গে বলে গ্রহ খাৰাপ ! লাগলে বলে সোবই হুম্মানজীর কুশা ! ই বলে । ক্যাপিটলিষ্টরা মানুষকে বিশ্বাস করে না ; তাদের ১ এখন সুপারম্যানের ওপর । আর সুপারম্যানেরই ইংরেজি জগা-খিচুড়ী অনুবাদ পাড়ায় : হুম্মান ! বাদর থেকে ইংরেজিলাম একদিন ; আজ আবার হিউম্যান থেকে হুম্মান । দিকে এগিয়ে চলেছি ; জয় হোক এডলিউসনের !

### চার

কিন্তু সব ক্রমেরই ব্যতিক্রম আছে । ব্যক্তি আছে বই কি স্বাধীন বাংলা ছায়াচিত্র রাজ্যের ; সেই ব্যক্তি হচ্ছেন ভারতীয় ছায়াচিত্র জগতের প্রথম পুরুষ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, — দিক দিয়ে First Person Singular । রঙ্গমঞ্চের জগতে বাবু বললেই বোঝায় সরকার সাহেব তথা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার । সাহেব আখ্যা শুকে যেমন মানায় কিন্তু ওয়ার্ডে কাউকে তেমন মানায় না । একথা নির্মম সত্য যে এজ্যাক্সর ত্র সাহেব হলেন তিনি ; বাকী সবাই এর-ওর তার সাহেব ।

শিশির ভাড়াড়ী, মোহনবাগান আর নিউ থিয়েটার্স,—এই তিন । কাছ থেকে বাঙালী বত পেয়েছে আর বত দিয়েছে এমন আর ২ কাছ থেকে পায়নি এবং দেয়ও নি ।

রোমান সাম্রাজ্যের যে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত লিখে গেছেন গীবন, থিয়েটার্সের উপান-পতনের ইতিহাস নয় তার চেয়ে কম উত্তেজক । 'কথাটা ব্যবহার করে আইন লঙ্ঘন করলাম কি না জানি নে ; অপলাপ করবার অপরাধ এখন আর করলাম না নিশ্চয়ই । এক অযোধ্যা,—দুইই হয়তো এক্ষেত্রে আজও আছে ; কিন্তু 'ম' এবং সে 'অযোধ্যা' আজ আর এর কোথাও নেই ।

ভারতবর্ষের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ : র কি ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার হবেন, এই ছিল স্বাভাবিক সর্বোত্তম প্রস্তাব । সেই সহজ, স্বাভাবিক, নিশ্চিততার, তার পথ পরিচাণ করে দেশের মাটিতে ছায়াচিত্র ক-জাটচালা তুলবেন কোনদিন, এ বোধ হয় সাহেবের রও অজ্ঞাত ছিলো । তাতে সাহেবের লোকদান হয়েছে । তার হিসেব এখনও খতিয়ে দেখার সময় হয় নি, কিন্তু হয়েছে আমাদের অভাবিত । আরেকজন শ্রীর এন-এন, ৥ শ্রীর বীরেন্দ্রনাথ হল, বি, এন, সরকার, 'অল্পতম' হতেন ; 'প্রক' হতেন না ; বিশিষ্ট হতেন কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতেন না ; আরও বিদ্বৎ হতেন কিন্তু অধিত্য হতেন না । বীরেন্দ্রনাথ আজ নিজেই একদিন টিউট । নিউথিয়েটার্স মানেই টিউট । কিয় ইন্ডাস্ট্রি মানে 'সাহেব' ।

তার প্রতি অনুসরণের ৫ অভিযোগ আজ বেশী ! বাদর

অভিযোগ করবার মতো কারণ আছে তাঁরা সংখ্যায় মাত্র 'কতিপয়' । বাদর অভিযোগ করবার এতটুকু কারণ নেই তারা কিন্তু এই সুরোপে সবচেয়ে উচ্চগ্রামে গলা বোঁগ করেছে ! অবশ্য মতুন কিছু করছেন না ; উভয় তরফই সেই পুরাতন 'প্রবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করছেন ; হাতী কানায় পড়লে হারা আরও বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করে, তারা কেউ হাতী নয় কোন দিন, চিরকাল তারা ব্যা ।

কিন্তু অনেকদিন আগে না জেনেই সাহেব একদিন এর জবাব দিয়েছিলেন ; আন্তর্জাতিক বিলিয়ার্ড খেলায় ভারতের ভূতপূর্ব প্রতিনিধি মিঃ বেগ একসময়ে নিউথিয়েটার্সে কাঙ্ক্ষ করতেন । একদিন আলোপ পরিহাসের টেবিলে বসে সাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : 'তব, ব্র্যাক সোয়ানদের বাচ্চারাও কি সব সময়ই ব্র্যাক হয় ? সাহেব হেসে জবাব দিয়াছিলেন । "Of course ! if there is no scandal in the family !"

সত্যিই তাই ; নিউথিয়েটার্সের ছবি একদিন যা হতো, আজ আর যে তেমন হয় না প্রত্যেক বাব, তার কারণ নিউথিয়েটার্সের কর্মীদের স্ব্যাণ্ডল নয়, স্ব্যাণ্ডলের চেয়েও বেশী ; আত্মকলহের পরিণাম হয়েছে more than scandal । পরস্পরকে দাবাবার, সত্যিকারের যোগ্যকে তাড়াবার এবং অকারণ দেরী করে ছবির ব্যয় বিপুল করবার কুতিথে এরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও লজ্জা দিতে পারে ; বি, এন সরকার বত বড়ই হন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুলনায় আর কতটুকু ?

নিউথিয়েটার্সকে হারা তুলে ধরেছিলো, নিউথিয়েটার্সকে ছুঁবিচ্ছে তারা । নিউথিয়েটার্সের সীলে যে হাতির চোঁহারা আছে সে হাতী নয় ; এরা হচ্ছে শেতহস্তী, white elephant । একদিন এসেছিলো ছুঁচের মতো, তারপর একদিন নাম করেছে, গাড়ী করেছে, বাড়ী করেছে, তারপর বেরিয়ে গেছে ফাল হয়ে ; ফালি ফালি করে বেথে গেছে হাবার আগে । তাই হয় ! হরি ঘোঁষের গোয়ালে যে সব গরু মানুষ হয়, তারা মানুষ হবার পর দুধ দেয় না আর, কিন্তু 'চাঁট' দেয় সাম্বাতিক !

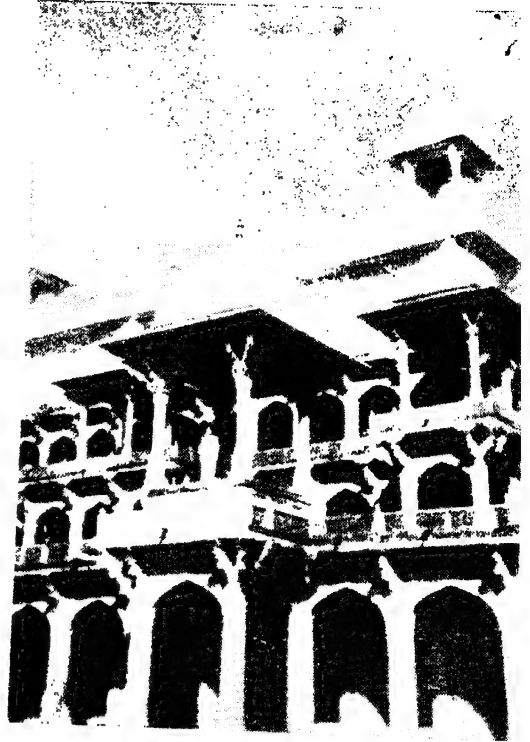
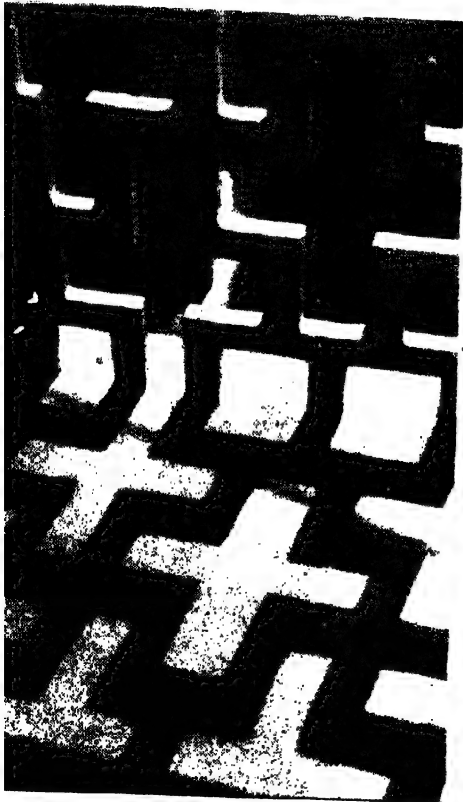
রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিউথিয়েটার্সের তুলনা হাস্যাত্মক করতে পারে কোনও কোনও 'উ'চুক'র । তাতে কিছু যায় আসে না । নিউথিয়েটার্স সত্য-সত্যই একদিন সাম্রাজ্য ছিলো । বি, এন, সরকার ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট । আসন্ন হিমচল তার বিস্তার ছিলো । মনসবদার, সেনা, সেনাপতি পলাতক, ব্যতিক্রম ছিলো না কিছুই । রোমান সাম্রাজ্য টেকে নি, নিউথিয়েটার্সও সূর্য পাটে বসেছে ।

দুঃখ করে লাভ নেই, কেন বি, এন, সরকার রোধ করতে পারছেন না সময়ের গতিকে । কেন ব্যবসাদারের মত গণেশ উন্টে করতে পারছেন না আত্মরক্ষা, এ প্রশ্ন করা যায় কিন্তু উত্তর হয় না এর ; হরিশ্চন্দ্র কেন শাইলক হতে পারে না তার জবাব পূরণও নেই ; সেক্সপীয়রও না । বীরেন্দ্রনাথ সরকার বিশ্বাস করে ঠকছেন ; ঠাক্কেব কাউকে বিশ্বাস না করেও তার চেয়ে বেশী কিছু করে যেতে পারেন নি ; ঠাক্কেব পণ্ডিত সে টিকে ছিলো, কিন্তু নামে মাত্রই টিকে ছিলো, তাই রাজা হাবার সঙ্গে সগেই রাজ্য গেছে । সাহেব শুধু ব্যবসা করতে এলে, ব্যবসাও একদিন যেতো এবং



[ উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অনন্যনিত  
ছবি ফেরৎ দেওয়া হয় না । ]

ডিন ৭  
পিন ১১১



সিকান্দ্রা (আগ্রা)  
—অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিকারী  
—শিব মুখোপাধ্যায়





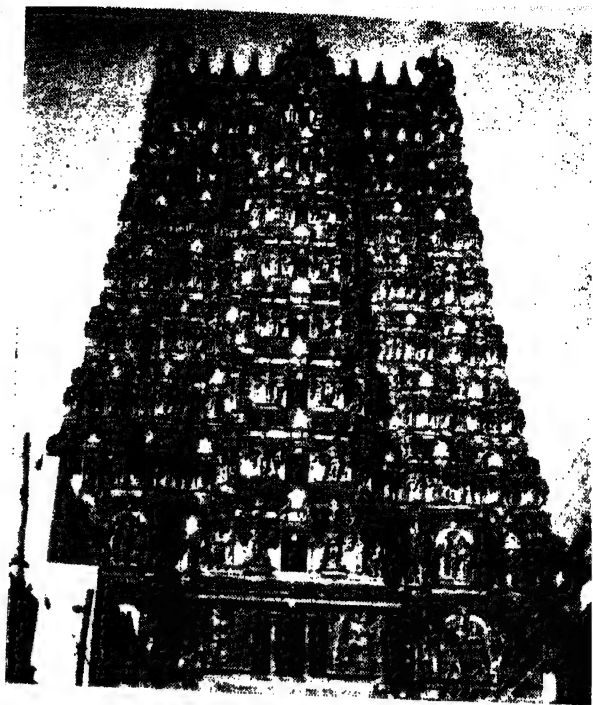




সাঁওতালী নৃত্য

# মীনাকী মন্দির (মাহুরা)

—প্রনালি পোথ



## বোকা

—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়



নিউ থিয়েটার্সও হত না। নিউ থিয়েটার্স হয়ত একদিন যেতে পারে কিন্তু কিয় ইণ্ডাস্ট্রি টিকে গেছে আজ। টলিউড পেয়ে গেছে পাঁড়ার আরগা।

ভুললে চলবে না যে নীতিন বোসের মত ক্যামেরাম্যান তার জন্ম, বুদ্ধি, এবং বিকাশ এই নিউ থিয়েটার্সেই; বাঘিনী আর সিংহীতে এখানে এক ঘাটে জল খেয়েছে। উমাশর্মা আর চন্দ্রাবতী দুইই একান্ত ভাবে নিউ থিয়েটার্সেরই। মঞ্চ থেকে পর্দায় নব জন্ম দিয়েছে দুর্গাদাসকে এই হাতীর ষ্ট্যাম্পট; সর্বশ্রেষ্ঠ 'টাইপ'-চারিত্রাভিনেতা ইন্স মুখজের আবির্ভাব করেছে সম্ভব। চন্দ্র-স্বর্গা একসঙ্গে এক আকাশে বিরাজ করেছে; পঙ্কজ মল্লিক আর রাই বড়াল। রাজকুমারের নির্দাসন নয়; 'মুক্তি' সম্ভব করেছে প্রেমদেব বড়ুয়ার,—এই নিউ থিয়েটার্সই। একবার নয়, দু'বার ডাবি জিতছে একই জীবন শুধু এক নিউ থিয়েটার্সই, 'সেনদাসে' আর 'উদয়ের পথে'তে।

নিউ থিয়েটার্স যদি ভাগ্যের বিশুল বিপর্যয়ে একদিন আর না থাকে, তবুও ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি থাকবে। কল্লোলের কলম যদি আজ খেমে যায় তবুও বাংলা সাহিত্যের প্রাণ কল্লোলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে তার কথা। সেই তার জিত!

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিবন্দী যত কোম্পানী আজ ছবি করছে, হতবার করছে, আর হারিয়ে দিচ্ছে বি, এন, সরকারকে তত বারই পতিকারের জিত হচ্ছে সাহেবের। ততবার তিনি প্রাণ ভরে হাসছেন। বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে যারা হারিয়ে দিচ্ছে তারাই; হাসছেন কন তিনি চেয়ে গিয়েও, ভাবছে কেবল।

মৃত্যুশয্যা শায়িত স্রোণের মুখেও এমন হাসি দেখে হয়ত এমন দবাক হয়েছিলেন অজ্ঞান!

## পাঁচ

সেই হচ্ছে সত্যিকারের সিনেমা জগৎ বার কাছে সেক্সপীরের যে স্নেহ গ্র্যাপীল আজও অনেক বড়। এত বড় মিডিয়াম রও সিনেমা যে আজও শিল্পের পর্নায় উঠতে পারে নি তার 'agedy' এইখানেই। উর্বশী মেনকা রম্ভারা দেহ বিক্রয় করে ভিতালয়ে; সিনেমায় করে দেহ প্রদর্শন। আটের নামে তাই না দেখানোই হয়েছে এখনও পৃথক চলচ্চিত্রের কাজ; আসল টের বেলায় তাই সর্বদাই অষ্টরম্ভা। যে সব মেয়ে এখানে আজ সছে তারা প্রায় কেউই পতিতা নয়; কিন্তু তারা প্রায় সবাই পতিতা; এবং পুরো সত্যের চেয়ে যে সব অর্ধসত্য অনেক গাঢ়ক, তেমনি পতিতার ইতিহাস আরও মর্মস্পিক।

ভ্রমের থেকে যে সব মেয়েরা সিনেমাতে আসছে তাদের জীবনের গানই হয়েছে ববি ঠাকুরের কবিতার একটি বহু বিখ্যাত পদ: জঙ্গসার মিছে সব। সমাজ এবং সসোকে ভাসিয়ে দিয়ে। সিনেমার শ্রোতে ভেসে পড়ে তারা বৃথতে পারে কী মিথ্যার স্নেহে তারা ভেসেছে; কিন্তু তখন আর ঘরে কোর যায় না; কেঁদে বলা যায়: সে যে মিথ্যা কতধর? তখন শুনে কি বোঝনি ঠাকুর? ঠাকুর বুঝেছেন; কিন্তু বুঝলে কি হবে, ববি ঠাকুরে ঠাকুর, কিছু না পারুক তবু চুরি করতে পারে; সত্যিকারের ঠাকুর, সে হয় মাটির নয় পাথরের। তাঁর কিছুই র উপায় রাখিনি আমরা।

গীতার চেয়ে বেশন অনেক জটিল গীতার ব্যাখ্যা, ভেদসি ফিল্মের চেয়ে অনেক বেশি সর্বদাশে হচ্ছে ফিল্ম ম্যাগাজিন। আমাদের দেশে আজকে জর্নালিজম বস্তুটাই ক্যাপিটলের পায়ে বিক্রীত। খবর কাগজ দেশের স্বতন্ত্র জিত আজ করছে কোন ক্ষতিপূরণ দিয়েই তার যা আর শুকোবার নয়। খবর কাগজ যদি গোদ হয় তবে ফিল্মের কাগজ সেই গোদের গুণর বিব ফোড়া! এমনি জর্নালিষ্ট আর ফিল্ম জর্নালিষ্ট তফাৎ হচ্ছে একজন বিক্রীত, অপর জন বিক্রুত।

আজকের সাংবাদিকদের খুব স্রবিধে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের স্রব্দ এবং বিবেক এই দুটি বস্তুই জায়া-বাদ দিতে পেরেছেন এমন অঙ্গাঙ্গাসে যেমন সহজে শল্য চিকিৎসক বোগীর শরীর থেকে বরবার করে এ্যাপেণ্ডিক্স হু চিজ সাংবাদিকদের জন্ম এবং বিবেকের গুণর আবার বুদ্ধি বস্তুটাইও মগাজে নেই। জাহাঙ্গীরবাবো মাহুয়ের যা হয় জাহাঙ্গীরবাবো মাহুয়ের ফিল্ম-ম্যাগাজিনের হয়েছে তার চেয়ে চেয়ে বিপর্যয়।

এখন সেই কথাতেই আসা হাক!

বাংলা ছবি ভয়ের ব্যাপার; তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে বাংলা ছবির কাগজ। ফিল্ম-বাজ্যের নবাবের সিংহবার হচ্ছে ফিল্ম-ম্যাগাজিন। মলাট থেকে মলাট ছবিতে ছবিতে ছয়লাট সিনেমার কাগজের পাঠক হচ্ছে আট থেকে আটশী; ভুল বললাম, পাঠক নয়; পাঠিকা নয়; দর্শক। সিনেমার কাগজে পাঠ্যবস্তু কিছু থাকে না; অপাঠ্য বস্তুও নয়; সিনেমা-কাগজে থাকে শুধু ছবি। প্রায়ই মেয়েদের গা-পোলা ছবি; ছেলেদেরও থাকে; ল্যাট পয়ে এন্ড্রাসাইজ করার উত্তেজক চিত্র। তাই নয়নাশংকরণ করে সবাই। ছবিগুলির pose থেকে বোঝা যায় এর পেছনে আছে স্র্চিস্তান্ত purpose। আবার বুদ্ধিগণিকার ছবি ছেপে আবার বুদ্ধিবিনতার কৃতজ্ঞতা ভাঙন হতে পেয়েছে এই সব কাগজ! এদের জন্ম হ'ক!

এই সব কাগজ পড়েই ইচ্ছল-পরীকার প্রদ্র-পাত্র, 'উত্তম' শব্দের বিপরীত কি?—এর উত্তরে ছেলোয়া চোখ-কান বুঁজে লিখে আসে 'স্র্চিরা'! অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির উল্লেখ লিখিত হয়, 'মহল'! এই সব কাগজ পড়েই ছেলেদের জীবনের আদর্শ হয় না বিভ্রাসাগর; ব্রপ্ন দেখে পাগড়ী সাফাল হবার। এই সব কাগজেই ছাত্রাচিত্রের নায়িকা কেমন আদর্শ গৃহকর্তী, তাই জেনে বিমুগ্ধ হয় তারা; পুজার, ঘর থেকে বান্ধাব-এর জন্তে তাঁদের প্রাণ কেমন করে কান; বই পড়াই যে তাদের একমাত্র নেশা,—পেশা যাই হ'ক, তারও স্র্চি বিবরণে এই সব কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠা অঙ্গুত!

এই সব কাগজেই তরুণ-তরুণীরা ভীড় করে আসে ছবি তোলাবার জন্তে; ছবি তুলিয়ে ছাপাতে পারলেই যে বাজী মাং, সে কথা বোঝায় ওই কাগজই। বোঝায় যে বাংলা দেশের চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয় ওই সব ছবির মধ্যে থেকেই। তাই film magazine-এর dark-room থেকেই এদের জীবন অঙ্ককার হতে শুরু হয়। সেখানে যে pose এরা ছবি তোলাবে বাধ্য হয়, এরা বলতে মেয়েরা, তাতে তাদের বৃথতে বাকী থাকে না এই যে, জর্মন সিলভার যেমন জর্মন নয়, তেমনি Paris picture শুধু প্যারিসে নয়, পৃথিবীর কোন না কোনও জায়গার কোন না কোনও সময়ে জৈতী চাকুই।

মীনাঙ্কী মন্দির ( মাছুরা )

— প্রনীল ঘোষ



২৭

গীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়



নিউ থিয়েটার্সও হত না। নিউ থিয়েটার্স বৃহত্তর একদিন যেতে পারে কিন্তু কিম্বা ইণ্ডাস্ট্রি টিকে গেছে আশ। টলিউড পেরে গেছে পাড়াবার আয়গা।

তুলসি চলবে না যে নীতিন বোসের মত ক্যামেরাম্যান তার জন্ম, বুদ্ধি, এবং বিকাশ এই নিউ থিয়েটার্সেই; বাখিনি আর সিহীতে এখানে এক বাটে জল খেয়েছে। উমানন্দী আর চন্দ্রাবতী দুইই একান্ত ভাবে নিউ থিয়েটার্সেই। মক থেকে পদ্যই নব জন্ম দিয়েছে দুর্গাশাসকে এই হাতীর ট্যাম্পট; সর্বশ্রেষ্ঠ 'টাইপ' চরিত্রাভিনেতা ইন্স মুখার্জির আবির্ভাব করেছে সম্ভব। চন্দ্রাবতী একসঙ্গে এক কাশাশে বিরাজ করেছে; পঙ্কজ মল্লিক আর রাই বড়াল। রাজকুমারের নির্দামন নয়; 'মুক্তি' সম্ভব করেছে প্রদম্বেশ বদুহার,— এই নিউ থিয়েটার্সই। একবার নয়, দু'বার ডাবি জিতেছে একই জীবনে শুধু এক নিউ থিয়েটার্সই, 'সেবদাস' আর 'উদয়ের পাখি'তে।

নিউ থিয়েটার্স যদি ভাগ্যের বিশুল বিপরীতে একদিন আর না থাকে, তবুও কিম্বা ইণ্ডাস্ট্রি থাকবে। কল্লোলের কলম যদি আজ খেমে যায় তবুও বাংলা সাহিত্যের প্রাণ কল্লোলের সঙ্গে উড়িয়ে থাকবে তার দখ। সেই তার জিত!

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বত কোম্পানী আজ ছবি করতে, তৈরি করছে, আর হারিয়ে দিচ্ছে বি. এন. সরকারকে তত বারই সত্যিকারের জিত হচ্ছে সাংঘেবের। ততবার তিনি প্রাণ ভরে গিয়েছেন। বিরহল হয়ে যাক্‌ই বাবা হারিয়ে দিচ্ছে তারাই; হাসছেন জন তিনি তেরে গিয়েও, ভাবছে কেবল।

মৃত্যু-শয্যার শাসিত রোগের মুখেও এমনি হাসি দেখে হতত এমনি বাক হতেছিলেন কতুন!

## পাঁচ

সেই হচ্ছে সত্যিকারের সিনেমা ভগ্নও বার কাছে সেক্সপীরের সঙ্গে সের গ্রাঙ্গীল আজও অনেক বড়। এত বড় মিডিয়াম হতে সিনেমা যে আজও শিল্পের পর্যায়ে উঠতে পারে নি তার tragedy এইখানেই। উর্ধ্বী মেনকা বস্ত্রা বেক বিক্রয় করে স্তিতাক্ষে; সিনেমায় করে দেখ প্রলম্বন। আটের নামে তাই লা দেখানোই হয়েছে এখনও পৃথক চলচ্চিত্রের কাজ; আসল আটের বেলায় তাই সর্বশেষ অষ্টরঙ্গ! যে সব মেরে এখানে আজ আসছে তারা প্রায় কেউই পতিতা নয়; কিন্তু তারা প্রায় সবাই অপতিতা; এবং পূর্বা সন্তোর চেয়ে যে সব অর্ধসত্য অনেক রাস্তাক, তেমনি পতিতার ইতিহাস আরও মর্যাদিক।

ভ্রমের থেকে যে সব মেয়ে সিনেমাতো আসছে তাদের জীবনের গানই হয়েছে রবি ঠাকুরের কবিতার একটি বহু বিখ্যাত পদ: রাজস্বাসের মিছে সত। সমাজ এবং সমস্যাতে ভাসিয়ে দিয়ে রা সিনেমার স্রোতে ভেসে পড়ে তারা বুঝতে পারে কি মিথ্যার ছানে তারা ভেসেছে; কিন্তু তখন আর যবে কেবা যায় না; কেঁসে বলা যায়: সে যে মিথ্যা কতবু? তখন শুনে কি বোঝনি ঠাকুর? ঠাকুর বুঝেছেন; কিন্তু বুঝলে কি হবে, তাঁর বন্ধুনে ঠাকুর, কিছু না পাশক তবু চুরি করতে পারে; সত্যিকারের ঠাকুর, সে হয় মাটির নয় পাখরের। তাঁর কিছুই আর উপায় বাখিনি আবার।

সীতার চেয়ে যেমন অনেক ভীল সীতার বাখ্যা, তেমনি ফিল্মের চেয়ে অনেক বেশি সর্বশেষ হচ্ছে ফিল্ম ম্যাগাজিন। আমাদের দেশে আজকে জর্নালিস্টিক বস্তুটাই ক্যান্টিনের পায়ে বিক্রীত। খবর কাগজ দেশের বত কতি আজ কহছে কোন কতিপূরণ দিয়েই তার যা আর শুকোবার নয়। খবর কাগজ যদি গোদ হয় তবে ফিল্মের কাগজ সেই গোদের গুণের বিষ ফোড়া! এমনি জর্নালিষ্ট আর ফিল্ম জর্নালিষ্ট তকাত হচ্ছে একজন বিক্রীত, অপর জন বিক্রুত।

আজকের সাংবাদিকদের খুব সবিধে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের দের হস্তর এবং বিবেক এই দুটি বস্তুই জায়া বাদ দিতে পেরেছেন এমন অল্যাসে যেমন সহজে শূন্য চিত্রিকংকর সৌগীর শরীর থেকে বয়বার করে এ্যাংশপিকস। চিত্র সাংবাদিকদের জন্ম এবং বিবেকের গুণর আবার বৃদ্ধি বস্তুটাও মগ্গাজে নেই। জাহাশূর্যবোলে মানুষের বা হয় জাহাশূর্যশর্তনাতার ফিল্ম-ম্যাগাজিনের হয়েছে তার চেয়ে তেরে বিপন্ন।

এখন সেই কথাতেই আসা থাক!

বালা ছবি ভরের ব্যাপার; তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে বাংলা ছবির কাগজ। ফিল্ম-মাজের নবকর সিহতার হচ্ছে ফিল্ম-ম্যাগাজিন। মলাট থেকে মলাট ছবিতে ছবিতে ছললট সিনেমার কাগজের পাঠক হচ্ছে আট থেকে আটশী; তুল বললাম, পাঠক নয়; পাঠিকা নয়; বর্শক। সিনেমার কাগজে পাঠক কিছু থাকে না; অপাঠা বস্তুও নয়; সিনেমা-কাগজে থাকে শুধু ছবি। প্রাইই মেয়েদের গা-খোলা ছবি; ছেলেরেও থাকে; ল্যাটপে এক্সসাইজ করার উত্তেজক চিত্র। তাই নরনারাকরণ করে সবাই। ছবিগুলির pose থেকে বোকা যায় এর পেছনে আছে সূচিস্তত purpose। ছোলাবুদ্ধগণিকার ছবি ছোপে আবার বুদ্ধবিনতার কৃতজ্ঞতা ভাঙন হতে পেয়েছে এই সব কাগজ। এদের জয় হ'ক!

এই সব কাগজে পড়েই ইচ্ছল-শরীরকার প্রদ্র-পরে, 'উত্তম' দ্বন্দ্ব বিপরীত কি?—এর উত্তরে ছেলেরা ঢোখকান বুঁজে লিখে আট 'সূচিয়া'। অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির উল্লেখ লিখিত হয়, 'যহল' এই সব কাগজে পড়েই ছেলেরের জীবনের আদর্শ হয় না বিভালাগর, যন্ত্র দেখে পাগড়ী মাফাল তবার। এই সব কাগজেই হারাজিনো নারিকারা কেমন আদর্শ পৃথকত। তাই তেনে বিবুদ্ধ হয় তারা; পুজার ঘর থেকে রাস্তাবর-এর জন্মে তাদের প্রাণ কেমন করে কীতে; বই পড়াই যে তাদের একমাত্র নেশা,—শোনা বাট হ'ক, তারও সচি বিবরণ এই সব কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠা অস্তুত!

এই সব কাগজেই তরুণ-তরুণীরা ভীড় করে আসে ছবি তোলাবার জন্মে; ছবি তুলিতে ছাপাতে পারলেই যে বাকী মাং, সে কথার বোঝায় ওই কাগজই। বোঝায় যে বাংলা দেশের চিত্রকপ্তেন নায়ক-নারিকা নির্বাচিত হয় ওই সব ছবির মধ্যে থেকেই। তাঁর film magazine-এর dark-room থেকেই এরর জীক অঙ্ককার হতে মুক্ত হয়। সেখানে যে poseএ এরা ছবি তোলা বাবা হয়, এরা বলতে মেয়েরা, তাতে তাদের বুঝতে বাকী থাকে, এই যে, জর্জন সিলভার যেমন জর্জন নয়, তেমনি Paris picture শুধু প্যারিসে নয়, পৃথিবীর কোন না কোনও জায়গার কোন না কোনও সময় সেই —

সেই dark-room থেকে যাদের যাত্রা হলো শুরু, তাঁদের টুডিওর অন্দর মহল পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রবেশপত্র পেতেই কতজনকে কত অন্তায় মন্তল জোগাতে হয় তাই না আছে ইতিহাস, না আছে census; না আছে তার ওপর কোনও censor! যেসব মেয়ে এদেশে আজ কোনও রকম, কাল কসতে বাধ্য হয় তাদের সবাইই আমাদের এক শ্রেণীর সোকেব ধারণা সাম্প্রতিক বিকৃত। ধরে নেব তারা যে এসব মেয়ে বিক্রীত হতেই আসে। তারই ফলে নার্স কিংবা স্কুল মিস্ট্রেস : অথবা টাইপিষ্ট কিংবা টেলিফোনের মেয়ে কাক্স সবাইই প্রচার ভাব অল্প : এই অপ্রচার মধ্যে এ দেশের মেয়েরা এম-এ হয় কিন্তু চাকরী করতে গেলেই এম-এর নামে তাদের মূল্য হয় না ; এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে চাকরী করতে আসার দাম দিতে হয় তাদের তবুও ! চাকরী করতে আসা এই সব মেয়েদের সবাইই যদি এই ধারণা হয় তাহলে ফিল্মে নামতে আসা ভদ্রবরের তরুণ-তরুণীদের সম্পর্কে কী ধারণা হয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না ! অথচ মজা হচ্ছে এই, তরুণী মাত্রেরই বিশ্বাস হ'লো যে এখানে একবার চুকতে পারলে অর্থ এবং যশ দুইই হাত বাড়িয়ে আছে তাদের লুফে নেবার জন্যে। তরুণ মাত্রেরই আশা হচ্ছে যে একটা চান্স পেলেই তারা সবাই হয় দুর্গাদাস, না হয় অশোককুমার !

এই অজুত ধারণার জন্ম দিয়েছে ফিল্ম-পত্রিকা ; আর একে লালন করেছে সবচেয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের নীতিবোধকে যেমন করে অস্বীকার করতে

উৎসাহিত করেছে তাকে বলতে দ্বিধা নেই, দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আসলে অস্বীকার্য এক অভিজ্ঞতা। এটির বোমারু mass হত্যা দ্রুত কবলেও তার অনেক আগেই মাসিক অপমৃত্যু ঘটির ম্যাসাকার করে গেলো এই সেকেণ্ড ওয়ার্ড ওয়ার, — আসলে যে ঘটনা হচ্ছে উইদাউট এ second !

এই যুদ্ধে যে চুল কাটছে সেলুন ; আর যে beware of pickpockets নিশানার ঠিক নাচে গাড়িয়েই পকেট কাটছে ভীতের মধ্যে, তাদের দু'জনেরই লক্ষ্য, ফিল্মটির হবার দিকে। লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী মেথাজে আছতি দেবার উদ্দেশ্যে যারা সবুজ পোকার মত আগুনের দিকে এগুচ্ছে তাদের উৎসাহের উৎস হচ্ছে বিশ শতাব্দীর ট্রাজিডীর তিনটি মূল কেন্দ্র : সিনেমা, খবর কাগজ ও রেডিও। রেডিও একমাত্র সরকারেরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে, খবর কাগজকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়ে এবং সিনেমার ওপর কোন রকম শিক্ষার সর্ব আরোপ না করে আমাদের ত্রাহম্পর্শ দোষে নিজেরাই দোষী।

ফিল্ম-পত্রিকার ছাপা ছবি এবং চিত্রতারকারদের জীবনী পড়ে দেশ-বুদ্ধ ছেলেমেয়ে ভূমিষ্ট হবার পর মার চেয়ে সিনেমার দরদ দেখছে বেশী। তাই ফিল্মপত্রিকাই হচ্ছে একমাত্র পাঠ্য ; বায়স্কোপই হচ্ছে একমাত্র ধাবার জায়গা এবং চিত্রতারকা হওয়াই জীবনের একমাত্র বাসনা।

[ ক্রমশঃ ]

## হেমন্ত

### আশরাফ সিদ্দিকী

পাতায়-পাতায় পড়ে মিশির শিশির  
শীতের মেঘব বায়ু বহে ঝির-ঝির  
সোনায়ুখী কল্যাণ কোলে বহুমতী বলে, 'বুম্বুম'—  
সব নিয়বুম !

ক'টি বাগিচা—

অজ্ঞানের পত্র নিয়ে মাঠে-মাঠে ছোট্ট উদ্ভবাস :  
...জাগো জাগো সাত ভাই চম্পায়া সব  
সোনা-বোন পাকল যে ডেকে হরষাণ ।  
ভাছমতী মাঠে-মাঠে শোনো আজ ইমন-কল্যাণ !'

জ্ঞান যুখে হাসি টানে ছুখী দিগন্ত—  
আর বার হেমন্ত উদয় ।



# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু



দিগ্ভাষাণ্ড মাঠের ফসলের ভিতর চাষীদের কেমন দিবা-  
গা-ঘর। ছিমছাম বাড়িগুলো। বাড়ির মধ্যে চুপছি। আপেল-  
গাছ দরজার ধারে, কল ফলে আছে। উঠানের প্রান্তে আড়রের  
মাটা। কাবুলে অশ্ব গুপ্তর বাড়ি যেমন দেখেছিলাম। গরু-ছাগল  
বাঁধা আছে ওমিকটায়। উঠানের অর্ধেকখানি নিয়ে আলুর ক্ষেত।  
রাফুসে সাইজের আলু—কয়েকটা তুলে ওঁরা আমাদের দেখানেন।

বাড়ির কর্তার নাম রহমৎ। দাড়ি-গোঁচ মুখ ঢাকা। চার  
ছেলে, ছ'টা গাট, আট বকরি। অ্যাঙ্কবেট্রাজের চাল ঘরের, গরম  
না লাগে সেজন্ত চালের নিচে কাঠের পাটাতন। তার নিচে  
নম্রানার টালোরা টাঙিয়ে বাতায় করেছে। সামনের দিকে দুই কুঠুরি  
পাশাপাশি, পিছনে দরদালানের মতো টানা লম্বা ঘর। কয়েকটা  
বাড়িতে চুকলাম, সবই এক ধাঁচের। ঘরে-ঘরে বিদ্যুতের বাতি,  
ঈশ্বরের সময় ঘর গরম করবার বৈদ্যুতিক সবুজাম। রেডিও,  
গ্রামোফোন, আলনা, ছোট খাট। মেজের কার্পেট বিছানো। মনে  
গাংবেন, চাষীর বাড়ি চুকেছেন। আড়রের খোলা কলানো দেয়ালে।  
হয়েক বকম তাবের বাজনা—রহমৎ বসছেন, বাজনা শুধু না একটু।  
ভিন আলগেরার মতন পোশাক মেয়েদের, মাথায় শুড়না, কাঁখে-কাঁধ  
দেয়ে দাঁড়াল এসে কয়েকটি—মরীং ইঙ্গিত পেলেই লেগে পড়েন  
হীতবাং। এরা বুড়ো রহমতের যা গতিক, উনিও বোশ হয় নৃত্য শুক  
হবে সেবেন নাতনীর বয়সি মেয়েগুলোর সঙ্গে। কিছু সময় কোথা  
গজনা স্তনবার? বেরিয়ে পড়তে হবে এখনই। বেশ খানিকটা দূরে  
লনিন-কোলথোজ—সেইটে সেবে তবে বাসায় ফেরা।

বোর পড়ে এসেছে, বেশ শীত ধরেছে এখন। ওধারে রান্নাঘর—  
দুদুর দৈকা-পোড়ার জন্তে। ঘাঁটে দিয়ে বেগেছে, বড় বড় লাল-লক্ক  
কোতে দিয়েছে। বাইরে বড় এক তক্তাপোষ—আমরা আসব  
জনেই বের করে দিয়েছে বোশ হয়। বীরেন সেন মশায়ের কুঝিকখেও  
২সাহ। কোথায় নাকি চাষবাস আছে তাঁর। গোটা কয়েক লক্ক  
য়ে নিলেন; বড় আকারের টমাটো ফলে আছে—পাঁচটা-ছ'টার  
ধর পঁড়াবে—তারও বীজ জোগাড় করলেন। মস্তোর বাজারেও  
গাংবুরি করেছেন বীজের জন্ত। দেশে এসে এই সমস্ত ফসাবেন।  
দগাম, বেশ হবে। নাম সেবেন 'লনিনলক্ক' 'ষ্ট্যালিন-টমাটো'—  
ড়ি কুড়ি কিনবে লোকে।

অনেক পথ ছুটে লনিন-কোলথোজে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার  
য়ে গেছে। কোলথোজের এই অফিস তক্তাটে অন্ধকার বোরবার  
ন নেই, আলোয় আলোয় দিনমান। লনিন-ষ্ট্যালিনের অতিকার  
ানালি মূর্তি সামনে। অপরাপ সাজানো বাগান। কোন  
ত্র-তুলা ব্যক্তির প্রমোদশালায় এসে পড়েছি, মনে হয়। তাই বটে।  
দাঘ দিচ্ছে, কোন সনে কত মুনাকা পিটেছে। বেড়েই চলেছে।  
১৫০ অঙ্কে আঠার মিলিয়ান, ১১৫৪ অঙ্কে বক্ত্রিশে উঠেছে। মেয়ে

অমিকবীর একজনকে দেখলাম। নাম হালিমা। বারোটা মেডেল  
আর 'অর্ডার অব লেনিন' পেয়েছে তুলো-চাষের জন্ত। স্ত্রীম  
সোবিয়তের ডেপুটি। সগর্বে হালিমা আমাদের এটা-সেটা দেখিয়ে  
বেড়াচ্ছে।

কিওয়ারগাটেন ইকুলে গেলাম। ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বাচ্চারা  
খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দিকে আফ্রাদ করে।  
কাবুলিওরালার ধরনে জোকো-শরা চাষীর দল—লম্বা দাড়ি, মাথা  
কামানো, পায়ে বৃটজুতা, পাঠানের মতো দশাসই চেয়ার। কোল-  
থোজের নিজস্ব অনেক বকম মেশিন—এই রাড্রিবেলা মাঠের মধ্যে  
উজ্জল আলো জ্বলে সেই সমস্ত চালিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ানক আগুয়াজ,  
কানে তাল লেগে যায়। টেনেটেনে তারপর খাওয়াতে নিয়ে চলল,  
না খাইয়ে ছাড়বে না। সহসা বিবম ত্রঃস্বাব্দ পেলাম।  
রেডিওর ভারতীয় খবর দিচ্ছে—আমাদেরই জন্ত দিল্লি ট্রেন ধরেছে—  
যদি আঃমেদ কিনোয়াই মারা গেছেন। আর একদিন, লিয়াকত  
আলির হত্যার খবর পেয়েছিলাম এমনি পথের উপর—কাশ্মীরের  
পথে বানিয়ান গিরিশঙ্করের ভিতর। শুক হয়ে পড়িয়ে বইলাম  
ক্ষণকাল। কিছু ভাল লাগছে না।



তাজিক স্ত্রীম-সোবিয়তের সখানা-অহুঠানে বক্তৃতা

পারেন সিন। ঠোরা বেক্সলেন, আমি ছুটি নিয়েছি এ বেলোটা।  
দ এই বাগানবাড়িতে আছি—বাগানটা ঘুরে ঘুরে একটু দেখি।  
র লোক এসে আমার অভিমত চাইল তাজিকিস্তান ও এই  
টা উৎসব সম্পর্কে। সোবিয়তের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান টাসের নাম  
না জানেন? অতএব লিখতে হল দু'চার ছর। বিকাল-বেলা  
দুই গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চা খাওয়াবেন, ওখানেও কথাগুলো  
ল মূল্য হয় না। এক টিলে দুই পাখী—এই যা লিখেছি, ওখানে  
গ পড়ে টাসের লোকের কাছে দিয়ে দেব।

প্রেসিডেন্টের আয়োজন হলের ভিতরে। সোবিয়তে প্রথম আজ  
মে শাল-পারাবি চাপিয়ে বাঙালি পোশাকে হাজির হয়েছি।  
১২ টানেশ এই পোষাকে ঘুরেছি, কিন্তু দারুন ঠাণ্ডার ভয়ে এখানে  
বাং হয়ে ওঠ নি। গোড়ায় যেমনধারা হয় থাকে—নতুন ব্যবহার  
কর্তন। গণতন্ত্র চালু হবার আগে পাকিস্তানে ছিল সাফুল্যো  
টা ইকুল বোল জন মাষ্টার—এখন মাষ্টারই হলেন সতের হাজার।  
জার রয়েছে দু'শ। জারের আমলে ছ'টা সিদ্ধ-ক্যাটরীতে  
টমারি বত সিদ্ধ হত, এখন যে কোন একটি ক্যাটরির উৎপাদন  
ই। ইচ্ছে করলেই সোবিয়ত-সমবায় থেকে আমরা আলোচনা হয়ে  
ত পারি, কিন্তু এত সুখ-সম্পদ পাচ্ছি—আলোচনা হতে বাবো কেন?  
ক'টা গণতন্ত্র একাবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে—এমন  
গণিত অতি দ্রুত উন্নতি সেই জ্ঞাত। কোন প্রতিবেশীর ক্ষতি  
তে চাইনে আমরা। প্রয়োজন নেই। নিজেদের যা আছে,  
ই ভোগ করবার লোক মেলে না।

এক কোতুহল আমাদের মনে মনে। প্রেসিডেন্টকে কথাটা  
জায়া করা হল। পচিশ-ত্রিশ বছর আগেও তখনতে পাই, মোল্লাদের

দোদও-প্রতাপ—তাদের কড়া শাসনে বোরখা তুলে একটুকু বাইরে  
তাকাবার জো ছিল না মেয়েদের। পায়ে পায়ে বিধিনিষেধ।  
মোল্লারা ঠাণ্ডা হলেন কি, করে?

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে বাই নি। আছেন  
ঠোরা এখনও—কুস্তুরে যে কোন মসজিদে যান, দেখতে  
পাবেন। কিন্তু রয়েছে এ ধর্মীর এলাকাটুকুর মধ্যেই।  
রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন ষোগাযোগ নেই। এই ধর্মীর মানুষদের;  
শিক্ষা ব্যাপারে পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্ব, জনচিত্তকর সকল  
কাজকর্ম সরকার নিজের কাঁধে নিয়েছেন। মোল্লারা এমনভাবে জন-  
সাধারণ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ অত শত বোঝে  
না। যেখান থেকে উপকার পায়, সেখানে তাদের গভীরত—সেখানে  
ভালবাসা। ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এখন—তোমার যেমন  
খুশি ধর্মচর্চা করে, একেবারে না করলেও রক্তচক্ষুর শাসানি নেই।

কবি তুবসুন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা করলেন। ১৯৪৭ অব্দে আমি  
ভারতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যবশে ষট্কে ভারত দেখেছি। ভারত  
সম্পর্কে বিস্তারিত কবিতা আছে আমার। দুই রকমের কবিতা—  
ভারতের পুরানো গাথা নিয়ে; এবং আমার ভারত-ভ্রমণ। ভারতের  
প্রতি হৃদয়ভরা প্রীতি সেই থেকে। আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল;  
পার্বত্য 'নদীয়ার মতো প্রেথর। একা আমি নই, তাজিক দেশের  
হাজার হাজার মানুষ ভারতকে চেনে রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ্র  
প্রভৃতির লেখায়; বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে যারা আসছেন তাদের  
নাচে গানে। এমন চেনা-জানার মধ্য দিয়ে আমাদের উভয় দেশ  
প্রীতির বীধনে বাঁধা পড়ুক। আমরা চাই মুখ-চন্দ্রের আলোর মতো  
সুখসমৃদ্ধি লাভ করুক সমস্ত ভুবন—কোনখানে কেউ বাদ থাকবে  
না। আমাদের তাজিকিদের মধ্যে একটা চলিত উপমা—আমার ও  
প্রিয়তমার প্রীতি দুই চোখের মতো; দু'চোখ পরস্পরকে দেখে না,  
কিন্তু দুই চোখ মিলে জগৎ দেখে।

‘প্রত্যাবর্তন’ নামে নিজের এক কবিতা পড়লেন তুবসুন। নাম  
লিখে একটা করে কবিতার বই দিলেন প্রতিজনকে। আমি দু'চার  
কথা বললাম। হীরেন মুখুজে আশ্চর্য এক বক্তৃতা করলেন—  
‘রাশিয়ার চিঠি’র জবাব দিয়ে বক্তৃতা শুধু: এখানে না এসে এ জয়ের  
তীর্থভ্রমণ অশুণ থেকে যেত...

সন্ধ্যা হয়ে আসে। উৎসবের শেষ, তাজিকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছি  
কাল সকালবেলা। অনেকেই বাজার ঘুরতে বেক্সলেন। আমি  
ছুটেছি ফেরদৌসি লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে একটা পাক না দিয়ে  
গেলে পাঠকেরা যে আমার জ্যাস্ত পুঁতে ফেলবেন।

পুরো নাম তাজিক জাণ্ডাল ফেরদৌসি লাইব্রেরি। দশম-  
একাদশ শতকের খোরসান কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির নামে।  
খোরসান জায়গাটা এই তাজিক গণতন্ত্রের ভিতরে। সামনে বাগান,  
অজস্র ফুল। প্রাচীন তাজিক পদ্ধতির বাড়ি—তাজিকি লেখক  
কবি শিল্পী ও জানীপুণ্ডাদের মৃত্তিতে সাজানো। ষ্ট্যালিন-লেনিনের  
মৃত্তি তো আছেই।

লাইব্রেরির ডিরেক্টর ঘরে। দশ লাখের মতো বই খবরের কাগজ  
ইত্যাদি বাদ দিয়ে। আড়াই হাজার বইয়ের লেনদেন হয় প্রতিদিন;  
বারো শো লোক পড়ে। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ অব্দে।

প্রথমে একজিভিসন-হল। নানান পুঁথিপত্র ঠাসা। আগে



তাজিকিস্তানের ষ্ট্যালিন যৌথখানায় (কোলখোজ)

চাঞ্চিকিয়ানে একটা লাইব্রেরিও ছিল না। এখন ন-শ'র বেশি। এইটো কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

আর একটা খুব বড় হল—তার অপরূপ অলঙ্কার। 'মাতৃভূমি' নামে দেয়াল-চিত্র—তাত্ত্বিকিস্তানের নানা দৃশ্য দেয়ালে এটো রেখেছে। দ্বার্টারের কম বয়সি ছেলেমেয়েদের শপড়বার ঘর এটা। পাঠ-গ্রন্থপুটে ছাত্রছাত্রীরা খিসিস বানাচ্ছে অমনি আর একটা হল। নিঃশব্দ—হুঁচ পড়ে গেলে তার শব্দ পাওয়া যাবে। গাথারণের পাঠাগার একটা—যারা কারখানার কর্মিক কিবা অপিসে চাকর করবে, তারা এখানে এসে বসে। মোটমোট পাঁচটা পড়বার ঘর এমনি।

স্থানীয় ঐতিহাসিক বিভাগ। একটা বই দেখলাম—কিতাব দজান আল-বুলদান। আরব পরিভ্রাজক ইয়াকুত-আল-খামাডির চনা। বহু দেশ তাঁর জানা ছিল সমস্ত বর্ণালুপকিক সাঙ্কিয়েছেন। কতাব-আল-ইবের—আরবের নামজাদা ঐতিহাসিক (চৌদ্দ শতক) যিন খালফুনের রচনা, সময়ক্রম অনুসারে বিভিন্ন আরব-খলিফাদের গাথার বৃত্তান্ত। পনের শতকের বই তাজকিরাত-উশ শুয়াযাও—গাথারিক কবির সম্পর্কে নানা বিবরণ। সালীর বোজ্ঞানের (সতের তকের পাণ্ডুলিপি) ফোটাগ্রাফিক কপি। হাজার বছর আগেকার দলকীর কবিতার পাণ্ডুলিপি; বোল শতকের শাহনামার পাণ্ডুলিপি। মুানো তাত্ত্বিক ও উজ্জবিক পাণ্ডুলিপি—সমস্ত আরবি হরফ। গাথারি হরফ তুলে নিয়ে এখন ককীয় হরফ চালু হচ্ছে। বোহাট্টারে গাথা বিস্তার কাবসি বই আছে। ভারতের শাহীনতা-সংগ্রামের অনেক বই দেখলাম। সাত তলা জুড়ে বই সাজানো আছে। লনিন-লাইব্রেরির মতোই নিচু ছাত বইয়ের ঘরগুলো।

### ১৫

ষ্টানিনাবাদ এরোডোমে যাত্রীরা সব প্রেনের অপেক্ষায় আছে। গড়িওয়ালা গ্রামা চাবীরা—হাতে মোটা লাঠি। আবার এদের চোখে দীন পোশাকের লোক দেখছি। হরদম তবু আকাশে লাচল। তুরসুন বিদায়-বক্তৃতা করলেন। কবি লোক—ভাষা দাবেগময়। বক্তুরা, তোমাদের মহৎ দেশের শুল্কর মানুষদের জন্তু দামাদের ভালবাসা নিয়ে যাও। প্রেনে চললে তোমরা মন্থোর—দেখা ছাড়িয়ে আরও কত কত দূরে! প্রেনের পাখায় লেখা, ঐ দেখ, গাঙ্কি। শান্তিময় দেশের উপর পাখা বিস্তার করে উড়ে যাবে প্রেন, গাখায় নিচে মানুষদের শান্ত ঘরগৃহস্থালী। সারা জগতের সমস্ত গাঙ্কিবের শান্তির উপরে স্থিরলক্য হোক।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। জনালয় কমে আসছে। নদী—বাধে দ্বী শ্রোত। দিগ্‌ব্যাপ্ত ফসলের ক্ষেত মাঝে মাঝে। তারপরে লুভুমি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উঠছি—অনেক উঁচু। ভারি জা—মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠছি দন। পাহাড়ের উপর জায়গায় জায়গায় বিস্তার গাঙ্কিপালা। মর্জলা ভূমিতে ওরা বিশেষ ধরনের জঙ্গল বানায়—সেই সব গাঙ্কি যতো এই পাহাড়ে।

পাহাড় ছাড়িয়ে আরও কত দেশ পেরিয়ে বড় নদী নজরে লো! শিরদরিয়া। তারই কিনার ধরে প্রেন উড়ছে। শহর লো যার ঐ। আর কি—তাসখন্দে এসে পড়েছি আবার। নতুন

প্রেন এসে আমাদের এখান থেকে মন্থোর নিয়ে যাবে। জাঙ্ককের দিনটা এইখানে স্থিতি। সেই হোটোলে নাকি? এক এক তলায় একটা কল ও এক পায়খানা। সে কথা মনে পড়ে আতঙ্ক লাগে। এয়ারপোর্টে সবগুলিই প্রায় চেনা মুখ, অভাবনার জন্তু—এঁরাই এসে ছিলেন আগের বারে। আর এসেছে অতি-শুল্কর সেই দোভাষি তক্কী। হাসিয়ানা, হাসিয়ানা—নামটা সবাই ভেবে নিচ্ছি; হাসতে হাসতে সে সংশোধন করে দেয়—উঁহ, হাসিয়াং। আর বশটা হল দোভা মন্থর—অতএব দোভা মন্থর হাসিয়াং নাম ষাঁড়াল পূর্বোপরি।

কাল রাত্রে তেজাসি গোলামালে পড়েছিলেন। সে গল্প শোনেননি বুকি? ছুটোছুটিতে চোখে অন্ধকার দেখছি, কীক কখন যে হুদণ্ড জমিয়ে একটু রসাসাপ করব? সেই যে দলনেতা তেজাসি, বুড়া মাহুদ—শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না—সারাদিন ধরে অনেক রকম আত্মনিগ্রহের সন্ধন করেন, কিন্তু থানা-টেবিলে থাঙ্ক-বক্তৃতালাব সামনে আর কোন হুঁস থাকে না। ডিনারে বসে বিষয় প্রমাণ তিনটে আমিষ কাটলেট সেবনের পর জানা গেল নিরামিষ কাটলেটও উত্তম হয়েছে; তখন এর উপরে দুটো নিরামিষ কাটলেটও চাপান দিয়ে দিলেন। ফলে রাত দেড়টায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। জ্ঞান মজুমদার ডাক্তার মশায়ের ডাক পড়েছে। কনকনে শীতে হি-হি করতে করতে জ্ঞান মজুমদার বোগী দেখতে ছুটলেন। ব্যাপার গুরুতর বটে! উদরের ভাব-মাচনের জন্তু বার বার বাইরে বেরনোর তাগিদ—কিন্তু বিশদ হয়েছে, ভোর বেলায় হওনা হবার তাড়ায় এখন থেকেই লোকে বর্ণা দিয়ে আছে। বারবার দরজা ছেঁড়ে দিতে চায় না—নেতার খাতিরেও নয়। তেজাসি অতএব



কোলখোজের এক কৃষক (সেলিমোভ) পরিবারের সঙ্গে

ডপান চাইলেন—উপ্তো বুধে ওরা ঐ নিশিরায়ে তুরতুর করে চা নিয়ে আনল। ইত্যাদি, ইত্যাদি! এরাগুলো গিয়েও তাঁর কাগ ডনি—খোঁজ নিচ্ছিলেন, ঐ ষ্ট্যালিনাবাদ থেকে কাবুলে সোজা পাড়ি বার উপায় আছে কিনা। বেড়ানোর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, দেশে বসে পারলে বেঁচে যান। ভয়েরও ব্যাপার—আমরা টিক দিয়ে ভাবছি। তাসবন্দে গিয়ে আবার যদি বাতের কাণ্ড করে দেন, এতগুলি একটি শৌচাশানা নিয়ে বিবম মুশকিল ব? সেবারে পনের জন আমরা দিশা করতে পারিনি, এবারে ছি তো পঁচিশ।

ছায়া-মোড়া পথ। সেবারে আনাগোনা করছি, চারিদিক শূন্য চেনা লাগছে। গাড়ি চলল—কিন্তু সেই হোটেলের দিকে যাব নয়। রেলরাস্তার তলা দিয়ে যাচ্ছি, এ তলাটে এসেছি ল মালুম হয় না। তাই বটে। শহর ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। জা আর শিচ-দেওয়া নয়—পাথরে বটে কিন্তু উঁচুনিচু। অনেক অনেক ঘর, এরাগুলো থেকে মাইল পঁচিলেক হবে। গাড়ি তার পরে ক নিল খুলো-ভরা এক গ্রামপথে। বাংলা দেশেরই এক গ্রাম যেন। গব্যান্ত্র মাঠ—কোথাও ফসল ফলেছে, ফসল কেটে নিয়েছে কোথাও। টর এদিক-ওদিক—হাস-মুখবি ঘুঘুছে, গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। স্তার ধারের নয়ানজুলি দিয়ে জলধারা বয়ে যাচ্ছে কলকল বেগে। ৫ বাংলা-বাড়িতে নিয়ে তুলল। গোলাপ-বাগানে উঠান ভরে আছে। চারিদিকে গাছপালায় সমারোহ।

গোটা তিনেক বাড়ি কম্পাউন্ডের ভিতরে। আমাদের পনের দশ কাটারবেরের ডীন এসে পৌঁছেছেন। ছোট বাড়িটার দের তুলল। বড় দোতলা বাড়িতে আমরা। দামি দামি আসবাব-স্বারে পরিপাটি লাঞ্ছানা গোছানো। কোন নবাব-খামিরের গানবাড়ি যেন। উঠানে পা দিতে না দিতে বড় টেবিল ডিনার নিয়ে ফেলেছে। উপরের ঘর নেবো না আমরা। সিঁড়ি যে মালপত্র নিজের তুলতে হবে, কুলি নেই। তা ছাড়া রাতি টার এখন থেকে বওনা, সমস্ত আবার নামিয়ে আনো সেই ধর। নিচের ঘরে থাকলে রামেলা কম হবে। ঘর উপরের হোক চের হোক, ফেলনা কোনটাই নয়। বার নেভা এবং ডেপুটিনেতাকে দুটো ঘর দিল কোন লাটসাহেব তা পান না। অন্তত পক্ষে স্তিম-বাংলার খবিলেট হরেন্দ্রকুমার তো ভাবতেই পারতেন না রকম সাজসজ্জা। ঘরের লাগোয়া বসবার ঘর, সেখানে গিয়ে ডালে চোখের মশি ছুটো ছিটক বেরিয়ে আসে। সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলেও সব মাহুকের খাতির সমান নয়। নেভা ডেপুটিনেতার দশ অপর দশজনের কারাকটা বিবম দুটুকু লাগে। কড়া লোচনাও হত এই নিয়ে। খবর নিয়ে জানলাম, এটা হল কর্মিক-প্যাস (Workers' Palace) এই কিছুদিন আগে বানিয়েছে। ড ইউনিয়ানের চিঠি নিয়ে কর্মিকরা দিন কয়েক থাকে এসে যান, কুর্জিকার্তি করে যায়। তাদের মধ্যেও শ্রেণীগত রকমকম আছে, বুঝেও পারছেন। নইলে বাছা বাছা কয়েকটা ঘরের অন্ত ঘর কেন?

কাজিতে লেপ হুড়ি দিয়েছি। গড়মড় উঠে দেখি, বেলা পড়ে গছে। কোন দিকে কেউ নেই—কী মুশকিল, বাড়িতে আছি লা একটি প্রাণী মনে হচ্ছে। উঁহ, বেরিয়ে এসে রাও সাহেবকে

পেলায়। মাহাজের এডভোকেট—কানে খাটো বলে সব সময়ে ছিপির মতো মস্ত কানে দিয়ে বেড়ান। গৈয়ো রাস্তায় বেঙ্গলাম তাঁকে নিয়ে। পথ ছেড়ে মাঠে নেমেছি; মাঠের প্রান্তে চাবীদের ঘরবাড়ি—কোথাকুনি-পাড়ি দিচ্ছি সেইমতো। এক বাড়ির সামনে এলাম। কৌতুহলে পাড়ান্থ উঁকি-খুকি দিচ্ছে। এক মাহুবায়ি গিল্লি কোথায় ছিল—তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভ্যর্থনা করে।

উজ্জবিকি ভাষা এবং এতগুলো রাস্তায় ভাষার নিকট সম্পর্ক ফারসির সঙ্গে। ফারসিতেও বিবম দিগগজ আমি। তবু কিন্তু দু পাচটা কথা দিগি বৃকতে পারি। এবং কথা না বুঝলেও হু-চোখে যে আন্তরিক সমাদর ফুটে উঠেছে, সেটা বৃকতে আটকায় না। ছিমছাম ঘরবাড়ি, মেজের গালিচা পাতা। কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। খুলো-মাখা পোশাকে ডাবডেবে চোখ মেলে তারা এগিয়ে এলো। কাছে ডাকছি হাতের ইসারায়। হাত বাড়িয়ে ছিল একটি, দিয়েই আবার সরিয়ে নেয় লজ্জায়। বড়টি গটমট করে বীরোচিত ভাবে এসে ষাঁড়ায়। দেশদেখি ছোটটিও তখন এগোয়। হাত ধরে একটুকু হাত মলে দিলাম দুজন, গালে আঙুল দুইয়ে আদর করলাম। গিল্লি ওদিকে চায়ের জোগাড় কবতে চায়, ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে বলছে। নানা করে ঘাড় নেড়ে আমরা সব পড়লাম। এদিক-ওদিক আরও খানিকটা চকোর মেয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

এক বা হু-জন কেন চব, আরও কেউ কেউ আছেন বাস্তিতে। হীরেন মুখুজে ঘর থেকে বেরলেন। বিবম বিবস্ত। গিয়েছে পুরা সকালে কনজাভেটরিতে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কলেজে। তিনি এক চেয়ারে বসে আর এক চেয়ারে পা তুলে ক্লাস্তিতে একটু চোখ বুজেছিলেন, তদ্রূপ একটু এসেছিল বোধ হয়। কিন্তু যাবার সময় একবার ডেকে যাবে না, একেমন কথা?

দ্রোকোভকে পেরে গেলাম—আমাদেরই এক দোভাষি, মস্তো থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। শোন হে, আমরাও যেতে চাই কনজাব-ভেটরিতে, গাড়ির জোগাড় দেখ। তেভা সিং নেমে আসছেন। সিঁড়ি থেকে বলছেন, এখন কোথায় বাবে গো? ওরা পাঁচটার ফিরবে, আমায় বলে গেছে। যেতে যেতেই তো পাঁচটা বাজবে। মিছে কষ্টভোগ। ভা হোক, আমরা মরীয়া। গাড়ি দু-তিনটা কিমিয়ে রয়েছে উঠানে—কষ্ট করে চড়ে বসা। এই কষ্টে নাযাজ হলে বিদেশে আসা কেন? ঘরে বসে থেকেই বা কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? রাও মশায়ের খোঁজ নেওয়া হল। দাবায় বসে গেছেন তিনি টুশি-পাড়িওয়ালা প্রবণ এক উজ্জবিকির সঙ্গে। দাবা-খেলায় কথা লাগে না। একে কানে কম শোনেন তায় চালের ভাবনায় একেবারে বন্ধকলা হয়ে গেছেন, কানের ঘন্টা আপাতত কাজ হবে না। রাও মশায়কে নড়ানো গেল না।

বাতির অদূরে যেখান থেকে কাঁচা রাস্তা শুরু, মোড়ের উপর দুটো পুলিশ। কি হে দ্রোকোভ ভায়া, পুলিশ পাহারায় রেখেছ কেন আমাদের? পাড়ারী ভায়রা—কেউ যদি কোন বদ্ মতলবে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, সেজন্ত এই বিশেষ বন্দোবস্ত। শহর হলে এ সব লাগত না। কনজাবভেটরির সামনে শেকজান ঘিরে পাড়াল। উঁহ, আলাপ-পরিচয় পেরে, গান-কনসার্ট শুনে আসিসে, হয়তো বা সারা হয়ে গেল এককণ।

এইমাত্র সেদিন—১৯৩৫-এ কনজাবভেটরির প্রতিষ্ঠা।



সাক্ষাৎশ্রুতি। যবে এসে দেখি, বহুতা সেরে এসে মজুমদার  
প্রায় অধোর নিদ্রায় মগ্ন। ঘুম হচ্ছে না আমার, বিছানায়  
পাশ-পাশ করছি। ছেঁড়া-ছেঁড়া নানান স্বপ্ন। রাত সেড়টায়  
রি সেন চুকে পড়লেন ও ঘর থেকে। আর কি, উঠে পড়ুন  
আরে। তিনি তৈরি। স্রবিধা হয়েছে—তাড়াহড়োর মধ্যে  
মানোর ক্ষুর ইত্যাদি ষ্টালিনবাদ ফেলে এসেছেন। অতএব  
স্বকমারির দায় থেকে বেঁচে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা হয়েছে।  
সবাই উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড বাজটা গলদ্বন্দ্ব হয়ে বাইরের  
দাণ্ডায় এনে ফেলি। ঐ রাত্রি একটু চায়েরও জোগাড় হয়েছে।  
নিক শীত, পশমি কাপড়ে আশাদমস্তক ঢাকা, বাইরে এসে  
ঠিকঠক করে কাঁপছি। কর্ভাদের হৃৎকণ্ঠ অন এসেছেন বিহার  
ত। আর দেখি হাসিয়াং মেয়েটা উঠে পড়ে অব যবে তার ঘরে  
ধর-তদারক করে বেড়াচ্ছে। খানদানি ঘরের রূপসী যুবতী মেয়ে—  
ক্রবেলা বাড়ি যায় নি, প্রায়ময় মধ্যে বিদেশিদের খিদমতে পড়ে  
ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাড়ির লোক এতে কিছু বলবে  
? ঘনপশ্ম চোখ দুটি তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল :  
বলবে ? এটা যে কোন আলোচনার বিষয়, এরা ভাবতে পারে না।  
৫ এই ভাসবন্দের ব্যাপারই তো—ছেলে-হারাবার ভয়ে মা

বোঁধা খুল পথে ছুটেছেন সেই সোবে পাখর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁকে  
যেয়ে ফেলল।

উজ্জবেকিছানের গ্রাম পেরিয়ে শহরের কিনারা ধরে মোটরের  
কাফেলা চলল। চারিদিক নিশ্চিন্তি, আকাশে ভারি হলছে আর  
রাষ্ট্রের ধারে আলো। ৪১ং—কলকাতার শহরে নয়, ভারতের  
ভিতরেও নয়—আরও দূরে পাকিস্তানের ভিতর আমার চিরকালের  
গ্রামে মন উড়ে চলে গেল, যেখানে হুমুছে আমার চিরকালের  
প্রতিবেশীরা। সে আকাশে ঠিক এমনিভাবে তারকা? তা  
কি করে হবে? অনেক ঘরাক সেখানে ও এখানকার সময়ে।  
সন্ধ্যাতারা সেখানে হয়তো উঁকিঝুকি দিচ্ছে বাঁশবনের আড়ালে।

ঘুম চোখ ভেঙে আসছে। প্রেনে উঠে পড়ে বাঁচা গেল।  
আর কামেলা নেই, সারারাত চলবে, রোদটোদ উঠলে কোণখাসে  
নামিয়ে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে নেবে। শীতও নেই এখন, চলবার সময়  
প্রেনের ভিতরটা গরম করে রাখে। কখন টেনে চোখ বুঁজে পড়া  
গেল। প্রেন ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে আমাদের। সেদিন হিসাব  
হচ্ছিল, যা প্রোগ্রাম আছে পুরোপুরি সমাধা হয়ে গেলে হাজার  
পঁচিশের মাইল অর্ধাং পৃথিবীটা একবার বেড় দেওয়া হয়ে যাবে।

[ ক্রমশঃ ]

### সুরেজ খাল এলাকায় ঔষধ্য কি ক আছে ?

বেশ কয়েকটি মনোরম দর্শনীয় স্থান ছড়িয়ে রয়েছে সুরেজ খাল  
কায়। খালটির পশ্চিম প্রবেশ-পথই হচ্ছে ঐতিহাসিক পোর্ট  
ন। ৭১০ একর স্থান জুড়ে আছে এই বিরাট বন্দরটি।  
নকার বাসিন্দা প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার। তার ভেতর ২৫  
হই ইউরোপীয় বা খেতকার। বন্দরের গায়েই রয়েছে ১৮০ ফুট  
একটি লাইট-হাউজ। ১০ লক্ষ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের আলো  
ায় করে এ স্থির ঠাঁড়িয়ে। সমুদ্রগামীরা এই আলোর নিশানা  
তে পায় ২০ মাইল পথ দূর থেকেও। বন্দরে ঢুকেই নজরে পড়বে  
চার—কার্গিলান্ড স্ট্র লেসপেসের একটি প্রান্তরমুখি। বিখ্যাত ফরাসী  
নীহার কার্গিলান্ডের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে বহু দিন।  
ই সক্রিয় তত্ত্বাবধানে এ খালটি কাটা হয়েছিল প্রায় শত  
র পূর্বে।

এখান থেকে একটু বাম দিকে তাকালেই দেখা যাবে—কেমন  
গড়ে উঠেছে নয়া সহর পোর্ট কুয়াদ। সুরেজ খাল কোম্পানীর  
ধানাটিও অবস্থিত এইখানেই। ডান দিকে ঘুরলে চোখে পড়বে  
র খাল কোম্পানীর মনোরম অফিস-ভবন—বার ছাদের শোভা  
করছে, তিন ডিনটে সবজি রঙের গম্বুজ।

পোর্ট সৈয়দ থেকে কাঁটার পথান্ত বরাবর খাল বয়ে গেছে—  
দিক থেকে দক্ষিণ দিকে। পাশাপাশি চলেছে, দেখা যাবে,  
পথ, রেলপথ, এসব। যাওয়ার পথে ডানদিকেই পড়ে মেনজাসে  
আর বামদিকে জলাভূমি ও মরাটিকার দেশ। এই কাঁটার সেতু  
নাট নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এর সঙ্গে বহু  
হাসিক স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। কাঁটার একদে পালাষ্টাইন  
য়ের প্রধান ট্রেনার। খালের এদিক থেকে ওদিকে যেতে কি  
জগৎকে কবীর সাহায্য নিতে হয়।

ইসমাইলিয়াও একটি মনোরম সহর সুরেজ এলাকার। খাল  
কোম্পানীর নৌ-চলাচল ও পুর্ন বিভাগের প্রায় আড়াই হাজার লোক  
এই সহরের বাসিন্দা। ইসমাইলিয়া থেকেই খালটি যেয়ে চুকছে  
লেক তিমসাদ—কুমীরে ভরা এই লেকেরই জলরাশি। খালের  
সবচেয়ে সুন্দর ও দর্শনীয় স্থান হচ্ছে ইসমাইলিয়া ও বিটার লেকের  
মাক্কামাখি অংশটি। লেক তিমসা পার হয়ে যেয়েই জাহাজ সব  
আবার চুকে মূল খালে, গেবেল মেরিয়ামের নিকট। গেবেল  
মেরিয়ামের উপরিভাগেই স্থাপিত আছে একটি মেৎকার স্মৃতিসৌধ।  
মহাযুদ্ধের সময় খাল প্রতিরক্ষায় যারা আত্মত্যাগ দিয়েছিল, এ তাদের  
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও কয়েক মাইল এগিয়ে গেলে মিলে  
যাবে শেখ আবদেকের পবিত্র সমাধি। শেষের বিভিন্ন অংশ থেকে  
কত যাত্রী এখানে এসে মিলিত হয় বারে বারে। মহাযুদ্ধের প্রথম  
দিকে তুর্কীরা আক্রমণ চালিয়েছিল সুরেজের উপর। দেখতে দেখতে  
চলে যাবে তৌসুম ও সিরাপিয়াম। চারিদিকে তখন বিস্তৃত  
কৃষি-জমি ও সুন্দর তালকুজ। চলবার পথে চোখে পড়বে,  
লুপ্ত মিশরীয় সভ্যতার বহু চিহ্ন ও পরিচয়। এখানে সুরপ্রাচীন  
মিশরের ফেরাওদের (রাজা) নিখিঁত খালের রেখাও খুঁজে পাওয়া  
যায়।

খালের পূর্বে প্রবেশ-পথের মুখে ঠাঁড়িয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ সুরেজ  
বন্দর। এই বন্দর-সহরটির পাশেই রয়েছে সুউচ্চ আটকা পর্বতমালা।  
খালের সর্বশেষ প্রান্ত হচ্ছে পোর্ট তেউফিক। সুরেজের সঙ্গে  
রেলপথেরও যোগাযোগ রয়েছে এর। খাল কোম্পানীর বিভিন্ন দপ্তর  
পোতাশ্রয় ও ডক, সকলই রয়েছে এখানে। পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-মুখে  
দেখতে পাওয়া যায় একটি সমর-স্মৃতিসৌধ—ভারতীয় হল-বাহিনীর  
পৌরোধর প্রতি সন্মানেরই এ নিদর্শন।

## নৃপেন্দ্রনাথ সেন

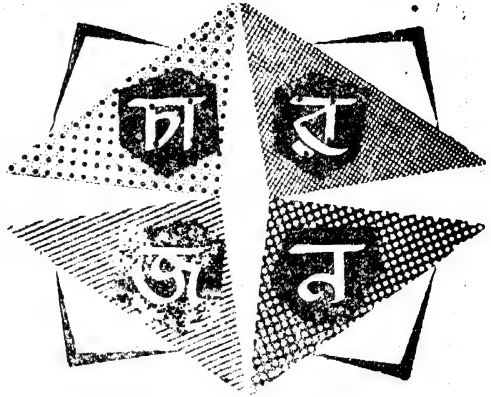
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের প্রতিষ্ঠাপনা অধ্যাপক)

আধুনিক যুগের সঙ্গে ঐকান্তিক নিষ্ঠার হাত ধরিত মেলোতে পারেন তাঁর সাফল্য ও উন্নতি যে কল্পনাতীত, বিশ্ববিখ্যাত নীতিদের আনন্দময় জীবনীসাহিত্য তাঁর জীবন্ত প্রমাণ। বেশির ভাগে যেতে হবে না, বিশ্ববিখ্যাতদের সমস্তোচ্চ নৈকট্যে যাবারও প্রয়োজন হবে না, বরং আনন্দিত অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসবার সুযোগ বাধ্যদের হয়, সেই সুপ্রিয় শিক্ষক বা অধ্যাপকদের অনেকেই জীবন-দাহিনী প্রমাণ করে, চেষ্টা আর নিষ্ঠা থাকলে শতবিধ বাধা-বিপত্তি ঘড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে বাধ্য, আপাত দুর্দিনের অস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি হিঁদে সাফল্য আর উন্নতির আশাবাদী আলো-বিজ্ঞান দলজ্ঞাবাহী, অপ্রতিরোধ্য।

ছাত্রপ্রিয় সফলতম অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ সেনের জীবন-কথা দ্রুততম একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন তিনি, হয় তো তাই তিনি সত্যিকারের 'মাতঙ্গ', যা' নাকি বর্তমান মনুষ্যসমাজে দূর্লভ হতে পেরেছেন। পুষ্পাস্ত্রিত ছাত্রজীবনের সত্যগ্য তাঁর ছিল না, হয় তো জীবনে তাই ছাত্রকামারুণ্য করে তোলায় মহান ত্রুটি দীক্ষিত হয়েছেন। উপযুক্ত বিশেষত দৃষ্টি দাতার প্রতি তাই তাঁর সত্যমুদ্রিত অস্বপ্নাঙ্গ অপরিসংখ্য। ছাত্ররাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তাঁর আনন্দের সঙ্গী, তাঁর শিক্ষক-জীবনের পার্থক্যতা।

চট্টগ্রামে কোয়েপাড়া গ্রামে ১৮৯৫ সালের ১লা ডিসেম্বর নৃপেন্দ্রনাথ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা স্বর্গত রজনীকান্ত সন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি লাভ করেন নৃপেন্দ্রনাথ। গণিতশাস্ত্রেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে সম্মানে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি, এস, সি পাশ করেন এবং বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষাখোঁর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পকাশ টাকা হিসাবে 'বাবরানাথ ঠাকুর' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে এই একটি কলেজ থেকে এম, এস, সি পরীক্ষায় Mixed Mathematicsএ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলা সরকারের মাসিক একশো টাকা গবেষণাবৃত্তি পান। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে ভারতসরকার ১৯১৯ সালের প্রথমই তাঁকে 'ইন্ডিয়ান সিভিল গার্ডিস' মনোনীত করেন। কিন্তু পরিবারে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী না থাকায় দক্ষ তা প্রত্যাখ্যাত হয়। আবার ১৯১৯ সালে Hydrodynamicsএ তাঁর রিসার্চের কথা জানতে পরে Punjab Drainage Board তাঁকে Irrigation Research Fellowর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রিসার্চের কাজ ব্যাপ্ত হবার আশঙ্কায় তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

১৯২১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের দ্রুততম অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে Nebular Hypothesis বিষয়ক গবেষণার জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ 'প্রমিটার



রাটার বৃত্তি' লাভ করেন। ঐ বছরেই Hydrodynamicsএ গবেষণার জন্যে তিনি অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান—ডি, এস-সি (ডক্টর অব সায়েন্স)। তাঁর মৌলিক গবেষণা S. r Gilbert Walker, Sc, D. F. R. S. প্রমুখ পদার্থবিদগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই গবেষণার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিখ্যাত মোটর স্বর্ণপদক দান করেন। নদীতে বান ডাকা (bores in rivers) এবং cycloneএর গতি-স্থিতি বিষয়টি ছিল তাঁর গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র চর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আর এই বিষয়ের আন্দোলন, গবেষণা ও শিক্ষাশাসনে উষ্টর সেনকে অস্বতম বিশেষজ্ঞ বলা হয়। আরো





উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা দেশের সমসাময়িক আর কোন বিজ্ঞানীই এত অল্প সময়ে মধ্যে ডি. এস-সি উপাধি পান নি। বিজ্ঞানজগতে তাঁর এই দান যে বাংলার গৌরবের বিষয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অতঃপর তিনি Calcutta Mathematical Societyর সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন এবং পরে তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তবু তাই নয়, তিনি Calcutta Mathematical Societyর Bulletinএরও সম্পাদক হন এবং তাঁরই উজোগে 'সোসাইটি'র স্বতন্ত্র জরন্থী পালিত হয়। ১৯২৮ সালে পৃথিবীর প্রথিতযশা গণিতজ্ঞদের রচনার সমৃদ্ধ 'Comm moration Volume' সম্পাদনা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু নির্লোভ মানুষ ডক্টর সেন তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর শিক্ষার্থীরা স্বয়ং বেতনের চাকুরীতেই থেকে যান।

শিক্ষক হিসেবে ছাত্রমণ্ডলে ডক্টর সেনের জনপ্রিয়তা শিক্ষক-সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁর শিক্ষাদানের রীতি সকলের চাইতে পৃথক। খুব কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে ব্যক্ত করেন তাঁর ছাত্রদের কাছে। পুরানো পদ্ধতি অবলম্বন না করে তিনি সব সময়েই নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে গণিত-শাস্ত্রে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি আরো কাজ করবেন, তৈরী করবেন সভ্যকারের ছাত্র, বারা গণিতশাস্ত্রে দেশের সুনামকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

দেব-কামলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে তাদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করার কথা অল্প যে ক'জন শিক্ষাত্রতী ভেবেছেন, ডক্টর সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও বিশিষ্ট। বহু শিক্ষাত্রতী এবং বিশেষত প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক সারদাপ্রসন্ন দাস, আই, ই, এস-এর অল্পবয়সে সুপাঠ্য একটি গণিতগ্রন্থের অভাব দূর করার জন্তে তিনি গ্রন্থরচনার প্রবৃত্ত হন ১৯৩৫ সালে। এ ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্তে রচিত তাঁর প্রথম পুস্তক 'পাঠ্যগণিত' ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলে ব্যপ্ত সমাদৃত হয়। এর পর তিনি তাঁর বিখ্যাত 'বীজগণিত', 'সহজ জ্যামিতি', 'ত্রিকোণমিতি' প্রভৃতি বইগুলি লেখেন। এগুলি আজ বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুলেই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আর এই পুস্তকগুলো মৌলিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গণিতের কঠিন নিয়মগুলো খুব সহজ ও সরল ভাবে লেখার ফলে এগুলো ছাত্রদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে না, বরং গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাদের আকর্ষণ শক্তিকেই জাগিয়ে তোলে। বা হোক, ভবিষ্যতে ডিগ্রী-কোর্সের জন্তেও তিনি এরকম করেকটা বই লিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু গণিতশাস্ত্রেই নয়, ডক্টর সেন ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যও ব্যপ্ত পারদর্শী। ইংরাজী ভাষার ওপর তাঁর ব্যপ্ত দখল আছে, আর সংস্কৃতে তিনি অনেক সময় পণ্ডিতদেরও হার মানান। আরো উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সাধু তারাগচন্দ্র পরমহংসদেব প্রভিষ্ঠিত মাসিক 'সম্মত-সাবী' পত্রিকায় সম্পাদক।

ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও সাংসারিক ব্যাপারে বিস্তৃত থাকার বলে তিনি বাইরের কাজে জেঘন জলো জমে

মনোবোগ দিতে পারছেন না। কিন্তু তবুও তাঁর চেষ্টার শেষ নেই, কাজে এতটুকু স্ফূর্তি নেই। বর্তমান বয়সে তাঁর যাট বছর, কিন্তু পরিশ্রম করেন পঁচিশ বছরের কর্মী যুবকের মতো। জ্ঞান-আচরণ ও জ্ঞান-বিতরণে তিনি নিজেকে সবসময়েই ব্যাপৃত রাখেন, আর তাতে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু শুধু জ্ঞান ও পণ্ডিত হিসেবেই নয়, ব্যক্তি-মাণুষ্য হিসেবেও তিনি অনেক বড়। সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক আর খুবই চিঠিভাষী তিনি। কোন সময়েই এতটুকু বিরক্তিবোধ করতে দেখা যায় না তাঁকে। উপরন্তু কোন বন্ধু অসুস্থতার ও ব্যর্থপন্থা তাঁর পরিচিত ভাবনকে মলিন করতে পারে নি, বরং গভোপকার করতে পারলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। অসুস্থকালান্তর, পরোপকার, আত্মিকতা, গভীর কর্মনিষ্ঠা আর আশ্রয়ের প্রতি অবচলিত মনোভাব প্রভৃতি গুণাবলী এই প্রখ্যাতনামা গণিতজ্ঞের জীবনকে করে তুলেছে আরো সুন্দর, আরো মহান।

## ডাঃ প্রতাপসুন্দর বসু

কলকাতার অন্ততম খ্যাতিমান চিকিৎসক

বাংলাত কোর্টের উকীল ছোট জাগুলিয়ার স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু' নিজে তো উকীল ছিলেনই, উপরন্তু তাঁর পরিবারের প্রায় আরেকটি ছিলেন আইনজীবী। জন্মস্ট্রেই নতুন নতুন আইনজীবীতে ভর্তি হচ্ছিল বসুপরিবার ও তাঁর আত্মীয়বর্গ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল অমৃতলালের পুত্র প্রতাপসুন্দরের ক্ষেত্রে। তাপসুন্দর হলেন ডাক্তার। সত্য-মিথ্যা মায়াজালের আকর্ষণ ভেদ করে তিনি স্বলেন রুগ্ন-আর্ত-পীড়িত মানবের প্রতি সেবাত্ত গ্রহণের পথ। আইনের কুহকী পাঁচো তার তিনি দেবেন না মানুষকে লড়িয়ে বেতে, অসুস্থ প্রাণে তিনি করবেন সুস্থতার সন্ধার একজন জনসেবী চিকিৎসকের ততক্ষণ এটো।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এই অক্টোবর ডাঃ বসুর জন্ম। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করেন ডাঃ বসু। এর পর একটা দোটোনার আকর্ষণ। প্রথমে পার্শ্ববিজ্ঞান অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়তে শুরু করেন—ছেড়ে মিলেন, চুকলেন আর্ক-জিকর (তৎকালীন কারমাইকেল) মেডিক্যাল কলেজে। কিছুকাল পড়ার পর মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে অর্ধশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়া শুরু করলেন—হঠাৎ আইনজ্ঞ হবার তিরোহিত বাসনা এক বার মনের একটি কোণে উকিঝুকি মেয়ে গিয়েছিল এই সময়টতেই। কিন্তু মানুষকে সেবা করার ব্রত গ্রহণ করেছে যে তরুণ পথিক—কোনো আকর্ষণই আর তার পথ কোথাকে পারবে না—শত শত মেহে ব্যাধি দূর করে আবার তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার যে দেবতার জীবন্ত আশীর্বাদেই অল্প থাকুক! শেষে ডাক্তারী পড়তে লাগলেন তাপসুন্দর। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এম, বি-ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এম-ডি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন প্রতাপসুন্দর। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই আর-জিকরে নানা বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছেন তাপসুন্দর। বর্তমানে ওখানে ইনি জ্যাম্যমান চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক—আসরে





শ্রীতাপসকুমার বসু

গান। চিকিৎসকজীবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান  
রত্নের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে গুরু ও সঙ্গরূপে  
য়ে ডাঃ বসু বিশেষ গণিত। ডাঃ এম. এন. বসুর কথাও ডাঃ বসু  
শেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করেন। ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখিনি আলোচনা  
ল আজকের দিনের বেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ডাঃ বসু  
নিয়েলেন যে, এট শাস্ত্রের মতো উন্নতি হওয়া উচিত ততটা কিন্তু  
নি। তা ছাড়া যেখানে মানুষের জীবনের প্রস্তুত স্থানে ব্যবসায়িক  
নোহুতি ছেড়ে একটা আন্তরিকতার স্বর আনা উচিত নয় কি?  
মানুষের দেশে হাসপাতাল ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সময় মত 'রেড'  
ওয়া যায় না—তার উপর ঠিক আশঙ্করূপ সহ্যক্ষমতারও মাঝে  
ঝে অস্ত্রের অনুভূত হয় বৈ কি। তার পর ওষুধ-পথও ঠিক  
ময় মত পাওয়া যায় না—এক-একটির দামও আবার হয় তো  
'টাকা দশ টাকা। ঐ অল্পের টাকা দিয়ে ওষুধ কেনার ক্ষমতা  
ভালা দেশে ক'জনের আছে বলুন তো? তার পর আমার মনে হয়,  
থানেক রোগীর ঠিক মত সেবার অন্তর্বিধে আছে সেখানে রোগী  
ওয়ার প্রয়োজন কি? তবে সাধ্যমুখ্যায় মূল্যের কিছু কিছু ওষুধ  
কি রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা যায়, তবে হয়তো হ'  
ক্কেই কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল ডাঃ বসু সেবাজ্ঞে লিপ্ত।  
ষ দিনে হরেক রকমের নানা চরিত্রের রোগীর সাক্ষাৎ এসেছেন  
টাঃ বসু। তাদের কেন্দ্র করে এর জীবনে কত বার ঘটে গেছে  
ত রকমের ঘটনা। সব এক সঙ্গে মনে থাকার কথাও নয়—  
ভুলি মনে পড়ে সেগুলিও একসঙ্গে আপনাদের সামনে তুলে ধরাও  
সম্ভব—তাইই মধ্যে থেকে কতগুলি ঘটনা তুলে ধরি যা ডাঃ  
বসু সেদিন বললেন তাঁর চিকিৎসক-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে—

এমন দেখা পেছে জীবন অসুখ, আমি হাতে ঢাকা গুঁজে দিচ্ছে বোঁক  
খবর নিচ্ছে, অথচ নিজের একবারও জ্বীক দেখছে না—এর থেকেও  
আশঙ্ক, মায়ের অসুখে ছেলের প্রথম মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয় তার  
আগ্রহ মা কবে মারা যাবেন সেই তারিখটি জানতে, বাবার অসুখে  
ছেলে তিত্তিবিরক্ত হয়ে বলছে—আর কত দিন করে যাব রে বাবা—  
অর্থাৎ সেও তার পিতৃদেবের আরোগ্যপ্রার্থী নয়—মরণপ্রার্থী। অবশ্য  
হ্যাঁ, এও যেমন একটা দিক—আবার এর বিপরীত দিকও আছে।  
বাপ-মায়ের বা জীবন অসুখে এমন লোকও আছে যার একটি কামনা  
রোগী বা রোগিণীর আরোগ্যলাভ, এমন কি প্রয়োজন হলে সব  
কিছুর বিনিময়েও।

ছাত্রজীবনে শেলাধুলায় প্রতি বৎস্রে অমুদ্রাগ ছিল তাপসকুমারের।  
বর্তমানে অল্প কিছু বিষয়ে না লিখলেও চিকিৎসা-সজ্জাত্ত বিষয়াদি  
নিম্নে পর-পত্রিকায় লিখে থাকেন ডাঃ তাপসকুমার বসু।

শুক্রবারের সকাল। নটা বাজে-বাজে। অপেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ  
ডাঃ বসুর দর্শনার্থী রোগী-রোগিণীতে, এর পর আর আটকে রাখা যায়  
না ডাঃ বসুকে—আমার থেকেও তাঁর সঙ্গে ঐ সব বিধানার্থীদের  
সাক্ষাতের প্রয়োজনের মূল্য অনেক বেশী। নিতে হয় বিদায়।  
দরজার চৌকাঠ পার হব-হব, কানে এসে মুহূর্ত হাসির সঙ্গে ডাঃ বসুর  
কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকালাম, আমাকেই বলছেন ডাঃ বসু—রাশি রাশি  
বই পড়ে গালা গালা ডিগ্রী নিয়ে কোনও লাভ হবে না—সত্যিকারের  
লাভ হবে তখনই যখন জীবনে আসে জনগণের আশীর্বাদরূপী  
সার্থকতার মঙ্গলা।

### অধ্যাপক শ্রীদেবজ্যোতি বসু

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে কলিকাতা শহরে দেবজ্যোতি বসুজন্ম  
লভ্য হয়। তাঁতার আদিবাসন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ  
মহকুমায়। তাঁর বয়স যখন ৬ বছর তখন তাঁর পিতা অশ্বিনীকুমার  
বসু ভাষ্যব্যবিত্তা শিক্ষার চত্ৰা ইংলণ্ডে যান। কয়েক বৎসরের মধ্যেই  
চিকিৎসক এবং ভাষ্যব্যবিত্তাবিশারদ বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।  
লণ্ডনে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি প্রচুর  
টাকা উপার্জন করেন এবং এখান থেকে পরিবারবর্গকে লণ্ডনে নিয়ে  
গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এমন সময়ে  
বাংলা প্রথম মহাব্যুৎসব লণ্ডনে যাত্রা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকেও সেই  
হয়ে রণক্ষেত্রে যেতে হয়। কারবার নষ্ট হয়ে যায়। এর পর থেকে  
আবার ব্যবসায় ভ্রমিয়ে তোলার অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন কি  
আর সে রকম সফল হতে পারেন নি; দেশেও আর আসেন নি।  
গত বৎসর ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে লাগলেন তাঁর মা। তাঁ  
ছিলেন তিন ভাই এক বোন। মা সিলেট সরকারী বালি  
বিদ্যালয়ে চাকরি নিলেন। দেবজ্যোতি বাবু ১৯২৩ সালে সি  
রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মুর্শাবাদী  
কলেজে আই, এস, সিতে ঢুকলেন। পরীক্ষার আগে চক্ষুর  
আক্রান্ত হয়ে দুই বৎসর ভুগলেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গবাসী ক  
থেকে আই, এস, সি পাশ করেন। তার পর ডব্লিউ হলেন  
কলেজে বি, এস, সি, রাসে। কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল। এবং

হয়তঃ রক্ত পড়ার ব্যাপার হতে লাগল। ঠিক সময়ে বি. এস. সি. দিতে পারলেন না।

বি. এস. সি. পড়ার সময়েই তিনি বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচারা নানিবেশ করেন এবং যুগবানী সাহিত্য ত্রৈ প্রতীতি করেন। এই ছেই তিনি প্রথম সাপ্তাহিক যুগবানী প্রকাশ করেন। ১৩২ সালের ৭ই জাম্বুয়ারী তিনি সাশোষিত ফোক্তদারী আইনে গুতার হলেন। তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বহরমপুর দলিবিরে। সেখান থেকে তিনি বি-এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার হুমতি চাইলেন। গভর্ণমেণ্ট জানালেন। সাগাল পরীক্ষা দিতে ওয়া হবে না। আইসি দিতে আপত্তি নাই। পরীক্ষার তখন ৮ মাস মায় বাকী। তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা লেন এক অনার্স সহ পাশ করেন। সেটা ১১৩৩ সাল। ১১৩৪ লের ২১শে জুলাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বঙ্গা জুর্গে। সেই দিন রি মাতৃবিয়োগ হয়। বঙ্গ থেকে তিনি আইনে, অস্ত্র ও মধ্য যীক্ষা পাশ করেন। ১১৩৬ সালে যখন বঙ্গা জুর্গে উঠে যায়, তখন কে পাঠানো হয় আব্রামবাগের গোঘাটে। সেখানে কয়েক মাস স্তরীণ থাকার পর বঙ্গী হন সম্বাশে। সেখান থেকে ১১৩৮ সালে লিকাতার অন্তরীণ হন।

সেই বছরের শেষের দিকে গান্ধীজি কলিকাতায় আসেন এক ডবার্ণ পার্কে শব্দেস্ত্র বস্ত্রের বাড়িতে অবস্থান করেন। এক দল ক্ত রাজবন্দী গান্ধীজির সঙ্গে দগা করে অস্ত্র রাজবন্দীদের মুক্তি ক মুক্ত রাজবন্দীদের কর্মসংস্থানের ক্ষত তাঁর সাহায্য প্রার্থনা রেন। আর কয়েক জন মুক্ত রাজবন্দীকে সঙ্গে নিয়ে



শ্রীমদগান্ধীজি-বর্ষ

সভাব্যক্তিকে বলেন যে, গান্ধীজি রাজবন্দীদের সবকে বাড়ে ধারাপ ধারণা নিয়ে না যান। তাঁর দ্বিত্ত তিনি গান্ধীজির সঙ্গে বা লাং বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আগের রাজবন্দী দলের আবদন-নিবেদনে সভাব্যক্তের খুদী হন নি, তিনি তাঁকে গান্ধীজির কাছে পৌছে দিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল। গান্ধীজি বলেছিলেন—তোমাদের মত কর্মী পেলে আমি আলৌকিক কাণ্ড করতে পারতাম।

১১৩১ সালে তিনি আনন্দবাজার পরিবার সাব-এডিটরের পদে নিযুক্ত হন। তিন মাসের মধ্য সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁকে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখারূপে নিভের কাছে টেনে নেন। ১১৪০ সালে মখনলাল সেন যখন আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে চলে আসেন। মখন সেন "ভারত" বের করলে তিনি তাতে যোগ দেন। ১১৪২ সালে ভারত বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্তর হয়ে পড়েন এবং তাঁকে মর্ধারণ রিভিউ এবং প্রবাসীর নোটস এবং বিবিধ প্রসঙ্গ লেখার ভার দেন। তিনি এই কাজ এত সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের টাইল সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল। ১১৪৩ সালে ডাঃ কালিদাস নাগ যখন এসিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী, তখন তিনি তাঁকে সেখানে ডেক নেন এবং তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেকা ইণ্ডিক্স এবং অজ্ঞাত বই এর পাবলিকেশন অফিসার নিযুক্ত হন। ১১৪৫ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেক্টর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এসিয়াটিক সোসাইটির চাকরী ছেড়ে দিয়ে তাঁর দপ্তর হন। ১১৪৬ সালে ভারত আবার বের হয় এবং আগের তিনি সেখানে যান। বছর তিনেক বাদে ভারত আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১১৪৯ সালে তিনি আবার সাপ্তাহিক যুগবানী বার করেন। তখন থেকে এটি পত্রিকা সাফল্যের সঙ্গে চলেছে এবং বর্তমানে বাংলার সংবাদপত্রসমূহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

১১৫০ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই "বিভ্রালাভীর বহস্ত্র" প্রকাশ করেন। এই বই সাং ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গীয় বিধান সভায় যখন সেন এই বইটিকে আমেরিকার বিখ্যাত বই টমকাকার বুটের সঙ্গে তুলনা করেন। বইটির বাংলা, হিন্দি এবং তামিল ভাষায় গুস্তকাব্যের প্রকাশিত হয় এবং ওড়িয়া, মাগধী ও স্কজরাটি পত্রিকায় উহার বহু অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা ট্রাম আন্দোলনের পর তদন্ত কমিশনি নিযুক্ত হলে তিনি সেই কমিশনের সচনে উপস্থিত হন। সেখানে জেরায় এবং সওয়ালে ট্রাম কোম্পানীকে তিনি একেবারে পুণ্ডিত করে দেন এবং কমিশন রায় দেন যে, কোম্পানী ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে নাই। বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রকাশ আদালতে তাঁর বৃত্তিবর্ণণ সওয়ালের ক্ষত তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

প্রেস কমিশন কলিকাতায় এলে তিনি নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র-সমূহের প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে কমিশনের সামনে উপস্থিত হন এবং সাক্ষ্য দেন। সাময়িক পত্রের অন্ত্রবিধায় কথা এক তাঁর প্রতিকারের লবী সেখানে খুব জোরের সঙ্গে জানিয়ে আসেন।

গ কমিশন কলিকাতায় এলে নিখিল যুগ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন কমিটির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি যান এবং ডাঃ বেনার সাগা এবং তিনি বাংলার দাবীর কথা জ্ঞানের সঙ্গে দেন। কমিশনের নিকট তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, ১৪টি বা আঞ্চলিক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে; তাদের ক্ষেত্রে সারা ভারতে ১৪টি প্রদেশ গঠন করলে এবং নিজস্ব প্রদেশ অস্তিত্ব হবে বলে তাকে ভেঙ্গে ছোট্ট নটে প্রদেশ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন। শেষ পর্যন্ত য় তাই হয়েছে।

১৯৫১ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রথম থেকেই তিনি কলিকাতার জন সমস্যার খোঁজ খান চালা দেন ও পর নির্দেশ করেন। বিধায়কদের দায়িত্ব সন্মুখ নাগরিক সমিতির দলটিকে কর্পোরেশনের মধ্যে ন গুণ কার্যকরী করে তুলেছিলেন, এমন সময়ে এল বঙ্গবিরতার মুক্তি আন্দোলন। দেশের লোক ভেঙে বলল যে, নির্বাচিত স্ত প্রতিনিধিগ যেন তাঁদের আসন ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন! খাই এবং উদ্ভিগার অনেক পরতাগ করলেন কিন্তু সারা লায় করলেন একমাত্র এই মাথুখটি। তিনি প্রমাণ করলেন দেশের ডাকে যেমন তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব করতে এগিয়ে যত্নেন, তেমনি বাংলার দেশের ডাকে সে পথ ছেড়ে চলে আসতেও ন সর্বদা প্রস্তুত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন নতুন কাঠিনে পুনর্গঠিত হল, ন তিনি তার বৃহত্তম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বিশাল ভোটাদিকো বিদ্যালয় সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হলেন। উচ্চ শিক্ষার উন্নতির া তিনি সেখানে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করতেন।

এত কাজের মধ্যেও তিনি কিছু নিজের আসল কাজ রাখতেন। া দিনের জন্তেও ছাড়তেন নি। গোব্যাটে অস্ত্রাণ থাকার সময়ে নি বাক্তনীতিতে এম, এ এবং আইনের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন। র পরে অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ইতিহাস, দর্শন এবং াজ্ঞীতে এম, এ পাশ করেন। তাঁর লেখাপড়া শেষ হয়েছে কিনা কথা কেউ জিজ্ঞাস্য করলে তিনি জবাব দেন—“আমি তো ছাত্র। া জীবনই তো আমি পড়ব আর পড়া দেব”। বছর তিনেক তিনি হাইকোর্টের স্যাডলেকোট হিসাবে প্রায়টিস করতেন। নক দিন ধরে তিনি দৈনিক বহুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে া আছেন এবং নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন।

তাঁর হবি কি? ভ্রমণ করলে একটি মাত্র জবাবই পাওয়া া—পড়া এবং লেখা। সারা ভারতে তাঁর স্রষ্টা তাঁর ালাল লাইব্রেরী।

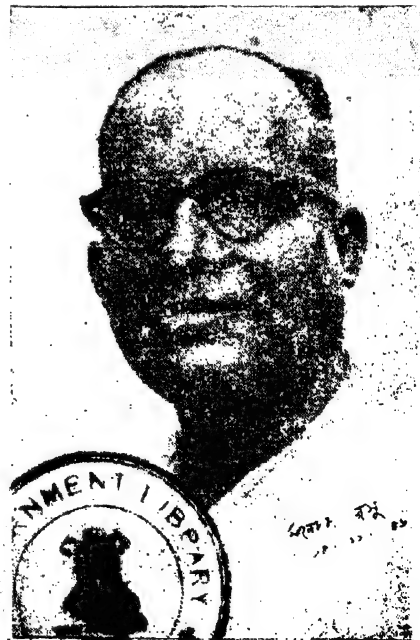
### মনোজ বসু

বর্তমান বাঙলার অষ্টম খ্যাতিলাল সাহিত্যশিল্পী

মুন্সিপালুর দপ্তরের সেরেস্তার একজন প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ াম:১১) ছিলেন বশোর জেলার ডোডাভাড়ার পরলোকগত ালাল বসু। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন বলেই নিজেকে তিনি বলা বা আসামীরানই কিংবা গুজরাত থেকেই হিসেবনিকেশে

মিশিয়ে দেন নি, নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যের সেবার। এই সাহিত্য-প্রীতি তাঁর পৈত্রিক। পিতৃদেবের লেখা ‘মহাভারত’ অনেক দিন বর্তমান ছিল—বামসালের সাহিত্যচর্চা বিশদর্শনগুলি ধরে রাখত সেদিনকার পত্র-পত্রকার। হয় তো কোনো এক সন্ধ্যায় একটু স্বস্তির নিখোঁস ফেল পুস্তকে বলতেন—‘অমুকর এই বইটা নিয়ে এস তো বাবা’—শেষের দরজা পরিবে সব সে বালককে প্রবেশপত্র পেয়েছে। বাবার সাংলাপের দিকে, তার দৃষ্টি পড়ে। চেষ্টা করে তার থেকে কিছু গুরুত্ব উপলব্ধি করতে। করেও। সে দুব্বতে পারবে বাবার সমস্ত বাক্যাংশের মধ্যে ‘অমুকর’ কথায় জোর আছে সব চেয়ে বেশী। লেখকই এখানে মুখ্য, লেখা গৌণ। বালকের মনে ছাপা হয়ে যাব বাবার এই কথাটি। কে যেন বার বার বলে ‘তোমাকে ঐ লেখকই হতে হবে’—‘তোমার লেখক হতে হবে’—‘লেখক হতে হবে’—বামসালের সেই স্বপ্ন আজ পরিপূর্ণ বাস্তবে হয়েছে রূপায়িত, ছোট্ট চারাগাছটি আজ হয়েছে মহাকুহ আর সেদিনকার ডোডাভাড়ার সেই বালকটি আজকের অষ্টম খ্যাতিলাল সাহিত্যিক সাহিত্যিকমী মনোজ বসু।

বাঙলা ১৩৮৮ সালের ১ই জ্যৈষ্ঠ (ইং জুলাই ১৯১১) স্বগ্রামে জন্ম হয় মনোজ বসুর। জনক-জননীর একমাত্র পুত্র ও সর্বশেষ সন্তান। আট বছর বয়সে বাবাকে হারান—লেখা তখনই শুরু হয়েছে। গ্রামাঙ্গুলে সন্তান জীবীর ছাত্র তখন—লেখা পাঠ্যের ালেন কলিকাতার তৎকালীন কোন এক বিখ্যাত মাসিক-পত্রের কাগালয়ে। মনে অদম্য আশা, অপরিণাম কোতুলক, কল্লনা-ঘরা কত রঙীন স্বপ্ন—সময়ান লেখা ফেরৎ এস।



মনোজ বসু

দীর্ঘ ব্যাপ্তিধর্ম প্রথম ব্যাপ্তি কিত্ত ব্যাপ্তিই হোল তাঁর প্রথম দ্বার। সামনের দিকে দৌড়তে গেলে দু-এক পা পিছনে আসতে । বাইসাইকেল চালানো হয় প্যাডেলটা সামনের দিকে চালিয়ে ছে সেই চালনা আরম্ভ হয় প্যাডেলকে দু-এক পা পিছনে চালিয়ে। ব্যক্তি পিছনে ফিরতে জানে না, সামনের দিকে বাওয়ায় মর্মান্বিত করে সে অনুভব করবে? অগ্রগমনের অধিকার আছে তারই, পিছনে ফিরতে জানে। লেখা ফেরৎ এলো মনোজ বসুর। জেদ দ বেড়ে, এল আরও একাগ্রতা, এল গভীর তন্ময়তা, এল নৈর্বাণিত নিষ্ঠা—এরাই নিয়ে যেতে লাগল মনোজ বসুর সাধনার গীটলোকে।

এদিকে পড়াশুনা চলছে। কলকাতার রিপণ স্কুল থেকে দিলেন বশিষ্ঠা পরীক্ষা। ভর্তি হলেন বাগেরহাট কলেজে। বাঙালী শর তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি? শাসকের চম্পবেশে বারা দ্বিষ্ট, শোষকের রূপটিও তাদের প্রকট হয়ে উঠেছে। সোনার ত তাগ করে তুলেছে আশান, মুষ্টিমেয় কয়েক জন রাজভক্ত মেয়ে ছাড়া সারা দেশ জুড়ে সেদিন চলছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সারা বাঙালীই সেই প্রতিবাদের প্রথম বাণী। শুধু তাই নয়, বাঙালীই দেন সারা ভারতকে পরিচালিত করছে বুদ্ধিবলে ও দেখায়। পাঁচ লর প্রভাব তখনও অশ্লষ্ট হয়নি। অ-বাঙালীর মধ্যে সবে বির্ভাব হয়েছে বাহু ব্যাধিষ্ঠার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর, ব তখনও ঠিক তিনি জাতির জনকও লাভ করেননি—বাঁদশ দিত্যের তেজে ভাগ্যগগনে জ্বলজ্বল করে সেদিন জ্বলছেন মান যুগের বান্দ্যকি কবিওক্ত রবীন্দ্রনাথ। গুটনের সর্বসঙ্গে দেন হয়তো বিনামার নাগপাশ জড়িয়ে দিচ্ছেন—প্রেসিডেন্সী লজের কুঠী ছাত্র অভিজাতবংশীর সুভাষচন্দ্র বসু। পায়লেন নিজেকে সরিয়ে রাখতে মনোজ বসু—পড়া স্নাতে চলতেই গিয়ে এলেন দেশের কাজে—যোগ দিলেন স্বেচ্ছাসেবকের ৭, গ্রামে গ্রামে বেচতে লাগলেন খন্ডর, মাঠে ঘাটে দিতে গলেন বক্তৃতা। এই ভাবেই একদিন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ লেন মনোজ বসু—সাউথ সাবর্বাণ কলেজ (বর্তমানের আন্ততাব দ্ব) থেকে—বি-এ পড়ার সময় এর সহপাঠী ছিলেন আজকের নয় আর এক জন কীর্তিমান সাহিত্যিক, ‘কল্লাল যুগের’ অজ্ঞাতম গপ্রতিষ্ঠাতা, অকবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও দেব বসুর সঙ্গে কল্লাল প্রসঙ্গে সমানভাবেই ধীর নাম ধনীয়)। তারপর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন মনোজ। ওকালতি শুরু করলেন, তবে হাইকোর্টে নয়—সাহিত্যের কোর্টে ন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ নিয়ে নয়—মামুষের পক্ষ নিয়ে, রচনা লেন কত কবিতা, কত গল্প, কত উপাঙ্গ। সাতটা টিউশানী

একসঙ্গে করেছেন মনোজ বসু—দীর্ঘ দিন শিক্ষকতাও করেছেন সাউথ সাবর্বাণ স্কুলে।

একটু পিছিয়ে, বাই। লেখা চলছে। সব জায়গা থেকেই যখন লেখা ফেরৎ আসে সেই সময়ে স্নেহময়ী জননীর মত ‘বিচিত্রা’ এগিয়ে এল, কোলে তুলে নিল তার রণক্লান্ত সন্তানকে, মুছিয়ে দিলে তার দেহের ক্লান্তি, রক্তক্ষয়ী বীরের মুখে ফোটে দীপ্ত হাসি। বাঙলার পত্র-পত্রিকাগুলির ইতিহাস যেদিন রচিত হবে সেদিন ওল্পের অধ্যাতের উপেক্ষিতের অজ্ঞাতম বসু হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে দক্ষ সাহিত্যিক আদর্শ সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। বিচিত্রায় বেরোত লেখার পর লেখা, প্রবাসীও ছাপল। গল্পের নাম বাব। যে গল্প পড়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্যের একজন পথনির্দেশক—দিকপাল সাহিত্যশিল্পী বিজুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাদরে আলিঙ্গন করে যিনি উৎসাহিত করেছিলেন নবাগত আগন্তুককে।

লোকশিল্পের প্রতিও অসম্ভব আকর্ষণ মনোজ বসুর, বাঙলার আনাচকানিতে তিনি ঘুরেছেন, সুতর্গম পথ মাইলের পর মাইল বেটেছেন—স্বাধিকার করেছেন হয় তো একটা শিবালয়—সুপ্রাচীন ভগ্নপ্রায়। ব্রহ্মচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুস্বর্য দত্তকে লোকনৃত্যের অনেক চর্চা দিয়েছিলেন মনোজ বসু। মহাচীন ও মহাক্ষণও সাধবে আশ্রয় করে সম্মান জ্ঞানিয়েছে বাঙলার সাহিত্যিককে। এই হুই মহাদেশ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন মাসিক বহুমতীতেই প্রকাশিত ‘চীন লেখে এলাম’ এ ও মাসিক বহুমতীতেই করে রাখছেন, ‘সোবিয়েতের দেশে দেশে’তে।

বৈপ্লবিক মনোজ বসুর রচনায় তাঁর নিজের জীবনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভুলি নাই, সৈনিক, বাঁশের কল্লা প্রভৃতিতে। গান্ধীবাদকে কেন্দ্র করে লেখা নবীন যাত্রা। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত হয়েছে ‘পৃথিবী কাদের’। তাঁর ‘নববীণ’ ও ‘রায়রামাধের দেউল’ গল্পগুলি ভোলবার নয়।

আজ লোকের ধারে চিত্তহারা বাড়িতে বাস করলেও ঘরের মধ্যে মোজকের, বারান্দা ও জানালা হালফাসানের হলেও মনোজ বসুর মন এখনো ডোঙাভাঙার দ্বিতিতে ভরা। মনে মনে এখনও মনোজ বসু পল্লীজননীর জামল স্নেহের পেয়ে থাকেন আশ্বাস—তাই তো বাঙলা ছোটগল্পে তাঁর স্থান অটল, যে গল্পের মাধ্যমে তিনি শুনিতে থাকেন সরল প্রেমের সুমিষ্ট কাহিনী, যেখানে তিনি অধিত্য, তিনি অনন্তসাধারণ।

মাসিক বহুমতীর পক্ষ থেকে সর্বকল্ল্য কল্যাণ দাশগুপ্ত, কল্যাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেন্দ্রকুমার গোষাামী লিখিত।]

## ... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্বর্গত ভবানীচরণ লাহা মহাপন্থের সঙ্গ্রহ-শালায় একটি কক্ষের আলোকচিত্র বৃত্তিত হয়েছে। স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন লাহা মহাপন্থের সৌভাগ্য প্রাপ্ত।

# ঢাকা/আনা/সাই

জ্যোতির্ময় রায়

## তৃতীয় অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

। কি বিত্ত, কি খবর—তারপর ভোলাহাম—[ এগিয়ে কোঁচের  
সে সিগারেটের টিন খোলে ] নে ধরা—[ হ'জনকে দের, নিজেও  
হকটা ধরায় । ]

বিত্ত কেঁচে পা তুলে আঁরাম করে এগিয়ে এসে বসে । )

। একটু জমিয়ে গল্প করা যাক ।—[ এ'গয়ে সেটাব টেবিলে  
সে ] দাদা তোমার—নাশকে আঁজ-কাল তুমি বলতে কেমন  
মটকিয়ে যা'র বে, বিত্ত ।

। যা বাজছে বকিস না—কি বকছিলি বল ।

। সকাল থেকে তোমার সাথে কতো লোক দেখা করতে  
হাসছে—আ'র ম্যানেজার—সন্তি, ম্যানেজার কিছ—

এমন সময় ম্যানেজারকে দেখা যায় বেরিয়ে আসতে পাশের  
র থেকে । ম্যানেজারকে দেখে ভোলা হকটা টেবিল থেকে  
পড়ায় এবং যেগানটায় বসেছিলো সেখানটা মুছেও দেয় । বিত্ত  
না পা'টা টিপে ধরে নামিয়ে দেয় । মুগাক একটু কেসে  
বটে একটা জো'র টান দেয় । ম্যানেজার কাছে একটু এগিয়ে  
। ভোলা চোক গেলে । )

জার । মর্নি ।

। মর্নি ।

জার । আপনাব জাদার ইন-ল মি: সেন এসেছিলেন ।

। [ সবিস্ময়ে ] মি: সেন !

জার । ঠ্যা, আমি পরে কোনো একদিন আসতে বলেছি ।

। [ হেসে ] বেশ করেছেন ।

। ম্যানেজার চলে যায় । )

এই, ম্যানেজারকে দেখে তুই ওভারে ঠাড়িয়ে উঠলি বে ?

। [ বিব্রত অবস্থায় ] না ঠাড়িয়ে উঠিনি, এই একটু—

। [ ব্যস্তের স্বরে ] উঠে ঠাড়ালাম ।

। [ বিত্তকে ] আর তোরই বা পা নাচানোটা খেমে গেল  
কেন ? আ'র মালিক হতে অভ্যাস দরকার—আমারই তো  
গলাটা কেমন শুকিয়ে ওঠে—আ'র তাছাড়া লোকটাও তো দেখতে  
হবে । স্তর টি এন-এর নাতি । তোদের বৌদির কিছ পরোয়া  
নই—খাসা মানিয়ে নিয়েছে । দেখলে মনে হবে, জীবনভর  
লাখ লাখ টাকার ওপরই বসে আছে ।

। তা হবে না, তুমি উঠলে দাদা, একতলা থেকে সাততলার—  
বৌদি উঠেছেন পাঁচ থেকে সাত ।

। তা বা বলেছি [ একটু খেমে হেসে ওঠে ] আমার কিছ

ভাগি হাসি পাচ্ছে একটা কথা ভেবে—ম্যানেজারকে ডিঙাতে  
না পেরে মি: সেনের মতো ব্যক্তি দেখা না করেই চলে গেল ।  
দেখ বিত্ত, লডায়ের সময় বাড়ির সামনে ব্যাকল ওয়াল দিতে  
সেবেছি ?

বিত্ত । সেবেছি ।

মুগাক । টাকাও তেমনি ব্যাকল ওয়াল ঠাঁড় করায় । আর যত বেশী  
পারচোঁজ পাওয়ার, অর্থাৎ যত বেশী কেনার ক্ষমতা তার সামনে  
তত বেশী ব্যাকল ওয়াল ঠাঁড়িয়ে যায় । এই দেখ না, আগে কেউ  
যদি এসে ডাকতো মুগাক বাবু বাড়ী আছেন, নেই বলতে হলেও  
আমাকেই নাক বাড়াতো হতো । আর এখন ? মি: সেনকেও  
কিরে যেতে হয়—

( এমন সময় রচনা অপিস-কামরার আগের দরজা দিয়ে বেরিয়ে  
আসে । পরনে দামী পাশা'র শো'র । )

বিত্ত । ( ঠাঁড়িয়ে উঠে ) আশ্রন বৌদি বসুন ।

রচনা । তোমার বসো, আমি বাগানে মালির কাজটা একবার  
দেখে আসি ।

( রচনা কঠিন দিয়ে বেরিয়ে যায় । অফিস-দর থেকে এগিয়ে  
আসে ম্যানেজার । )

ম্যানেজার । সকাল থেকে কতকেই দেখা করতে এসেছিলো, তাদের  
আমি পরে আসার জন্যে টাইম দিয়ে দিয়েছি । কিন্তু হুটো পা'টি  
অপেক্ষা করছে—এই পাবলিক সার্ভিস সক্রান্ত, তাই এসে  
বিকিউজ করিনি । আপনাব এখন এ সবে'র সঙ্গে একটু  
যোগাযোগ রাখাই বোধ হয় ভালো ।

মুগাক । নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

ম্যানেজার । আপনি অফিস-কক্ষে আসবেন, না এখানে নিচে  
আসবো ?

মুগাক । এখানেই নিয়ে আসুন ।

( ম্যানেজার চলে যায় । মুগাক একটা সিগারেট ধরিয়ে এক  
প্রস্তত হয়ে বসে । ম্যানেজার সঙ্গে নিয়ে ফেরে একজন মধ্যবয়সী  
এবং ছুটি যুবককে । পোষাক-আসাকে সমাজসেবীর ধরণ-ধারণ । )  
মুগাক । বসুন ।

( সবাই বসে । ম্যানেজার ঠাঁড়িয়ে থাকে, তাকে লক্ষ্য কর  
মুগাক বলে বসুন । )

ম্যানেজার । ঠিক আছে ।

মুগাক । [ আগতদের ] বলুন ।

প্রধান ব্যক্তি । আপনি কাগজে পড়েছেন নিশ্চয়ই, ২৪ পরগণা  
এক্সপ্লো গ্রামে হুড়িক দেখা দিয়েছে—কি অবস্থা চোখে  
দেখলে আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না । মহা

ধনী ব্যক্তির। সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত সাহায্য করছেন—আপনার মতো ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু করবেন। এ আশা নিয়েই এসেছি।

মৃগাঙ্ক। আমি মতাপ্রাণ নই, তবু দুর্ভিক্ষ যখন লেগেছে, তখন কিছু করতে হবে বৈ কি। বেশ, কতো দেবো বলুন? এক লাখ—দু'লাখ—

( আগত ব্যক্তির। নিজেরদের মধ্যে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে ম্যানেজারের দিকে তাকায়, ম্যানেজারও তাদের দিকে তাকায়। )  
প্রধান ব্যক্তি। সে আপনার দয়া, হৃৎখণ্ডারিজের চেহারা আপনি দেখেছেন, তাই বোধ হয় বুক দিয়ে এতখানি এগিয়ে আসছেন, আপনি সত্যিই মহৎ।

মৃগাঙ্ক। বেশ তাই হবে—তিন লাখই দেওয়া যাবে।

ম্যানেজার। [ বাধা দেবার ভাণ নিয়ে ] কিন্তু—

মৃগাঙ্ক। [ হাত তুলে তাকে থামিয়ে, আগতদের লক্ষ্য করে ]

তবে কি না একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে আপনাকে।  
প্রধান ব্যক্তি। নিশ্চয়ই, কি বলুন? টাকাগুলো সত্যিকারের প্রয়োজনে খরচ হবে, এই তো?

মৃগাঙ্ক। তা তো হতেই হবে, সে কথা নয়—টাকাটা নেবার সময় প্রমাণসহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে যে, দুর্ভিক্ষ আর হবে না।

( আগতরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। ম্যানেজার একটু মুখ টিপে হাসে। )

প্রধান ব্যক্তি। এ প্রতিশ্রুতি আমি কি করে দেব বলুন? দুর্ভিক্ষ হওয়া-না-হওয়াটা তো আমাদের হাতে নয়?

মৃগাঙ্ক। তবে বুকে বার ককন, দুর্ভিক্ষও আপনাকে খেঁকট বন্ধ হয়ে যাবে। চাঁদার জন্তে আপনাদেরও আর ঘুরে মরতে হবে না।

দুর্ভিক্ষ তৈরী কলটা চালু থাকবে, আর আমরা চাঁদা দিয়ে দিয়ে, শেষ পরিস্থিতি আর এককন দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে দাঁড়াবো, এই কি আপনি চান?

প্রাঃ ব্যক্তি। না তা চাইনি। বেশ অত না দিয়ে না হয় আপনি অল্প করেই কিছু দিন।

মৃগাঙ্ক। না! অল্পটল নয়, দিলে আমি বেশীই দেবো, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি চাই।

প্রাঃ ব্যক্তি। তা তো সম্ভব নয়?

মৃগাঙ্ক। তবে আসতে পারেন—সম্ভব।

( সবাই উঠে এগিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক আর বিত্তর দুই-বিনিময় হয়—মৃগাঙ্ক হাসে। আগতরা এগিয়ে যায় বাইরে যাওয়ার দরজার কাছে, প্রধান ব্যক্তি বলে— )

প্রধান ব্যক্তি [ চাপা কণ্ঠে ] পাগল!

( সবাই মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক উঠে পায়েচাষী করে। ম্যানেজার অফিস-ঘরের দরজার দাঁড়ানো চাপরাশীকে ইঙ্গিত করে। সে আরও জনতাদের যুবককে পাঠিয়ে দেয়। )

মৃগাঙ্ক। বসুন।

( মৃগাঙ্ককে দাঁড়ানো দেখে তারও দাঁড়িয়েই থাকে। )

মৃগাঙ্ক। বসুন?

১ম যুবক। আমরা এসেছি সহরের সবচেয়ে বড় সামাজিক সম্মেলন

ত্রক থেকে, আপনাকে আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে—আর কিছু আর্থিক সাহায্যও আশা করি।

মৃগাঙ্ক। বেশ, সবচেয়ে মোটা চাঁদা যা পেয়েছেন, তার ডবলই দেবো, কিন্তু কথা দিচ্ছে হবে, আমিই হবো উৎসবের সভাপতি আর মণ্ডপে কেবলমাত্র আমার ঢোকার পথটায় থাকবে ম্যাটিং—

[ যুবকরা কথাগুলো শুনে হাসে ]

হাসছেন কেন আপনারা—এই তো করে থাকেন, আমি নিজে চেয়ে ফেললাম বেশ হাসির কথা মনে হচ্ছে, না?

১ম যুবক। [ হাসতে হাসতে ] না ঠিক তা নয়।

মৃগাঙ্ক। তবে হঠাৎ-বড়লোক বলে—জম্ম-বড়লোক বা ধীরে-ধীরে বেড়ে-গো বড়লোক ছাড়া, চটজলদী এতখানি মেনে নিতে একটু বাধে না! তা বেশ, সরে যাবার জন্তে সময় ছেড়ে দিচ্ছি, আসবেন পরে।

২য় যুবক। কিন্তু আমাদের যে সভাপতি ঠিক হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক। আমাদের যেদিন ঠিক করবেন, সেদিন আসবেন, এখন যেতে পারেন।

( সবাই বিবর্তি-পূর্ব দুই নিক্ষেপ করে বেরিয়ে যায়। বিত্ত হা-হা করে হেসে ওঠে। ম্যানেজার ক্র ক্র করে তাকায় তার দিকে। মৃগাঙ্কও হাসতে হাসতে কৌতবে ওপর গা ছেড়ে বসে পড়ে। )

মৃগাঙ্ক। কেমন হচ্ছে রে বিত্ত?

বিত্ত। বহুৎ আচ্ছা দাদা! খাড়া নাকের উপর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, এই তো চাহ, ঐ বাস্তব মালিক ব্যটাকেও ঠিক এমনি করে সমঝে দেবে।

মৃগাঙ্ক। নিশ্চয়ই—( ম্যানেজারকে ) এ্যাটর্নির কাছ থেকে মানহানির চিঠিটা ওর কাছে চলে গেছে তো?

ম্যানেজার। গেছে।

মৃগাঙ্ক। ঠিক আছে। আপনি আর বসে বসে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন? আপনার ঘরে যান।

ম্যানেজার। না আমি বরং একবার দেখে আসি মিসেস চ্যাটার্জির যদি কোন দরকার থাকে।

( ম্যানেজার চলে যায় )

ভোলা। [ গোংসাহ ] এবার তোমার জ্যাঠাখতের সাথে একবার মোলাকাংটা দেবে এসা দাদা!

বিত্ত। অ—সেই যে সেই [ নাক টেনে ] তোমাকে না কি বিত্তি খাও কি না জিজ্ঞেস করেছিলো?

মৃগাঙ্ক। [ গম্ভীর মুখে ] হঁ, সেই ঠিক মনে করিয়েছিল ভোলা। [ একবার নাক টেনে ] বিত্তি খাও—না, জবাবটা দিতে আজই যেতে হবে একবার।

( মৃগাঙ্ক সিগারেটের টিন হাতে উঠে দাঁড়ায় )

মৃগাঙ্ক। উঠি যে বিত্ত, একটু কাজ আছে ওপরে।

বিত্ত। [ হাত তুলে ] ঐ আমরাও উঠি। চানের আগে আ একবার একটু পড়িয়ে নিই গে—এ ছাড়া খাটনির কার আর কিছু তো রাখনি—চল বে ভোলা!

( মৃগাঙ্ক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। ভোলা-বিত্ত চলে যায় তাদের ঘরে )

[ ১৭০ পৃষ্ঠার জীবন ]

( স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র বার

## দশম পরিচ্ছেদ

দৈনিক জীবন, ও কণ্ঠা সুস্বাদের বিবাহ

১৮৮৪ সালটা যেন আমাদের জন্য কত বিশেষ ব্যাপার লইয়া আসিতেছিল। এই বৎসর ৮ই জানুয়ারী আচার্য্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় করিলেন। তুমি শ্রাব্দের সময় কলিকাতায় উপস্থিত হলে, এবং সেখানকার শোকমিশ্রিত ভক্তির অপূর্ব দৃশ্য খিয়াছিলে।

কিছুকাল পরে ভাগলপুর সমাজের উৎসব উপস্থিত হইল।  
 এখন আমার বাওয়া সম্ভব ছিল না। তুমিই আমার প্রতিনিধি  
 ইয়া তথায় গমন করিলে। বিধানচক্র তখন দেড় বৎসরের।  
 গঠকে লইয়া গেলে। সে সময় তুমি কিরূপ বাকুল হইয়া  
 পাণ্যাদিক আহাৰ অ্যেষণ করিতে, ও আমার সহিত কিরূপ  
 গগ অনুরভ করিতে, নিয়ের পত্রাংশুলিতে তাহা দেখিতে  
 পাই। "(২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪) - আজকার উপাসনার  
 বি, - ধ্যানে ঈশ্বরকে ভাল করে দেখা যায়; আর নিষ্ঠুর  
 নহন। তোমরা কেমন? তোমার উপাসনা কেমন হয় জানিতে  
 চিনা করি। তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। মন ভাল।"  
 (২১শে) - তোমার কার্ড পাইলাম। উপাসনা ভাল। -  
 আজকার উপাসনার সার, - শিশু হইয়া মার নিকটে বাওয়া।  
 গোমার উপাসনা ভাল মনিয়া শুণী হইলাম। আমার বেশ উপকার  
 হইতেছে। এ শাড়ার সব ডাব দেখিয়া বড় ভাল মনে হয়। আমাদের  
 স্থিতিপূর্বও তাই হবে।" বাস্তবিক এ উৎসবে গিয়া তোমার অনেক  
 পকার হইয়াছিল। কলিকাতায় বা বড় বড় স্থানের বড় বড় উৎসবের  
 পকার একরূপ; আবার ছোট ছোট মণ্ডলী মিলিয়া যে উৎসব করেন,  
 বাহাতে সেই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রত্যেকে অনুরভ করেন যে এই উৎসবে  
 আমারও কিছু দিবার আছে, সে উৎসবের উপকার অল্পরূপ।  
 মি এ উৎসবে গিয়া বিশেষ ভাবে নিজের জ্ঞাত কিছু পাইয়াছিলে।  
 ইহা এ আজ্ঞা মনে আসিল যে ভাগলপুরের পাড়ার মতন  
 কিপুবেও যুদ্ধর পাড়া রচনা করিবে। উৎসবের প্রধান দিনে  
 গিহিতেছে, - "(২৪শে) পটী-প্রাণ! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন  
 দিব, তাবিয়া পাই না। কেন না, মা তোরা দ্বারা আমাকে যে কত  
 খী করিলেন তাহা বলিতে পারি না। একদিকে তোমার শরীরের  
 জ জল করিয়া অর্ধ উপার্জন, আর একদিকে আমার আজকার  
 জ তোমাকে প্রশ্রিয় করিতে দেখিয়া আমার যেমন কষ্ট হয়,  
 জ উৎসবে আমার তার সমান সমান সুখ হইল। সমস্ত উপাসনার  
 দয় তোমাকে পাশে অনুরভ করিতেছিলাম। তোমার সঙ্গে যোগ  
 ডিতেছে বড় সুখের কথা। আজ বিবাহ হইতেছে যে তোমারও  
 পাসনা ভাল হইয়াছে।"

এইরূপে নানা বিধির মধ্য দিয়া দেবতা তোমাকে গড়িতে গিয়েছেন। কিছুকাল পরে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসারথাসিনীর

বিবাহ অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল। এ ব্যাপারে তোমাকে ও আমাকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ব্রহ্মবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সুসারবাসিনীকে বিজ্ঞানাসের জ্ঞত কিছুকাল কলিকাতায় রাখিয়াছিলে। বেথুন কলেজে নিতে পারিলে হয় তো সুসারের ভাল বিজ্ঞাপিক্ষা হইত। কিন্তু সেখানকার বায় অনেক, আর বন্ধুরাও কেহ পরামর্শ দিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে বাকিপুর ফিরাইয়া আনিতে হইল। এখানকার বালিকা বিজ্ঞালয়ের তখনকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; ভাল পড়া হইত না। তাই কত্থাকে বাটীতেই শিক্ষা নিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র স্বর তাঁহার শিক্ষকের কাজ করিতেন। ইনি সচরিত্র, অতিশয় নম্রপ্রকৃতি, আমায়ই হাতের গড়া ছেলে। আমার চক্ষের উপর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর প্রাতঃকালের উপাসনায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন; সপ্তাহে সপ্তাহে যে “চরিত্র গঠনী” সভা হইত, ইনি তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন। ইহাকে তুমিও খুব ভাল করিয়া চিনিতে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণের বড় বারান্দায় বসিয়া সকলের সম্মুখে বৃন্দাবনচন্দ্রে পড়াইতেন, সুসারও শান্তভাবে পাঠ শিক্ষা করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যে মস্তাব থাকিবার সম্ভাবনা, উহাদের উভয়ের মধ্যে তাহা জন্মিয়াছিল।

এইরূপে শ্রমের বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি যোবান শ্রান্ত হইলে তাঁহার বিবাহের বিষয়ে মনে চিন্তা আসিতে লাগিল কিন্তু পাত্রের জন্ম অন্বেষণ করিতে হইল না। শ্রমসারকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তোমার কাছে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম লিখিয়া দিলেন। কঙ্কার মনের ভাব অবগত হইয়া বিধাতার ইচ্ছিত বৃষ্টিয়া আমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করিলাম। কঙ্কা আপনা হইতে বর মনোনীত করিলেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তি আর কি হইতে পারে ?

কিন্তু ইহাতে আত্মীয়গণের, বিশেষতঃ হিন্দুসামাজিক পরিবারের খণ্ডগচ্ছ ইহবার কথা। তুমি কুলীন কায়স্থ পরিবারের কল্প প্রতাপাদিত্যের কন্যায় স্বামীর গৃহিণী। প্রস্তাবিত বর মৌলি সঙ্গোপ-বংশজাত। কিরূপে এমন বর কল্প পাত্র করিবে? এমন নয় যে বর ধনী বা বিলাত ফেরত। কিন্তু তুমি ধন, জ্ঞান, কৃতিত্ব কিছুই দেখিলে না। কল্পার মত বুদ্ধি ও বিধাতার ইচ্ছা বুদ্ধি। এ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলে, তাই সকলের নিন্দা প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাতিয়া লইবার লক্ষ্য প্রস্তুত হইলে। এখানে নারীদের মধ্যেই অধিক আন্দোলন ও তোলপাড় হয়; সে সকল তোমাকেই অধিক স্পর্শ করিবার কথা। তুমি সে সকল সহিবার প্রস্তুত হইলে। প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিবার কালে দেশে থাকিতেই আমার পার্শ্বে ঈড়াইয়া সকল সামাজিক বিরোধ সহ করিয়াছ। এখন ব্রাহ্মসমাজের জীবনের প্রথম গুরুতর অহুতান উপস্থিত হইয়াছে। এবারও তুমি প্রতিকূলতা, এবারও তুমি তেমনই ঈড় পড়ি।

বিষয় ফল দেখিয়া ব্রাহ্মবন্ধুবাও অনেকে বলেন যে, এ বিবাহের ইচ্ছা ঠিক বুঝা হয় নাই; এবং তুমি ও আমি উভয়েই ভুল করিয়াছিলাম। দেবি, তুমিও আমাকে কেন, আমিও ক'চিনি। এ বিষয়ে তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা না বুঝিয়া অগ্রসর হও নাই, আমিও হই নাই। ফলাফল তাঁহারই ছিল, এখনও বলি, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

৭শে মে ১৮৮৪ সালে স্বপ্নারের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্বে ব আয়োজন হইতেছিল, তখন দেখিলাম, সমস্ত দিন তুমি মত পরিশ্রম করিতে। আবার রাগে কিংবা প্রাতঃকালে সর্বাপ্রাণের স্থানে আসিতে। মেয়ী-প্রকৃতি ও মার্খী-প্রকৃতি যেন ত মিশ্রিত হইয়াছিল। বিবাহের লুচি তুমি নিজে চাছিলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় শরীরের শ্রুতি: তোমার স্নিগ্ধ আকর্ষণ হইল। তুমি একজন মহিলাকে, "মিদি, ৫ মিনিট নিদ্রা যাও।" এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তৃত উয়নের পাশেই শয়ন করিলে। অল্পক্ষণ পরেই আগ্রহিত এবং বলিলে, "আঃ বাঁচিলাম।" আবার পূর্বের মত কাজ লাগিলে।

বাহের পর জী-আচারের দিনে তুমি কি করিলে? অল্প বস্ত্র কিংবা দানশামগ্রী না দিয়া তুমি বরকন্ডাকে গেকুয়া ও দিয়া সাজাইলে। কারণ, গেকুয়াই তোমার চক্ষে সর্বাপেক্ষা বস্ত্র, ও একতন্ত্রী তোমার বিচারে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট বাস্তব। পর আশীর্বাদ করিবার সময় পুস্ত্রীরা একত্রিত হইলে সকলের দণ্ডায়মান হইয়া তুমি বরকন্ডার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। বৈরাগ্য এবং প্রার্থনা ভিন্ন তোমার কোনও কাজ হইত এ বিবাহও হইল না। এক্ষণ প্রার্থনায় কাহারও কাহারও হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে তখন প্রার্থনা করিবার সময় কিন্তু যখন কর্তব্য মনে হইত, তুমি কাহারও কথাই হটিয়া না।

তবিন পর্যন্ত বাকিপূরে আমরা একঘরে হই নাই। সামাজিক ন সকলের সঙ্গে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হইত। এখন হইতে উঠিয়া গেল। শেষ নিমন্ত্রণের দিনটা এখনও মনে আছে। বন্ধু আমাকে বড় ভালবাসিতেন। ভালবাসার খাতিরে কও নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আঁটারের সময় স্বহস্ত প্রকোষ্ঠে আসন পড়িল। তাই দেখিয়া স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় এই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ অপমান করা হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলাম।

ই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাকিপূরে বাহিরের লোকদের মধ্যে পাজের প্রতিবে সহানুভূতি ছিল তাহা চলিয়া যাইতে লাগিল। একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের চার দিনে ৫০০ প্রদান ও সর্ববিধ সংগ্রহ পতিত্যাগ করিলেন, ও বলিলেন, করে, প্রকাশ বাবুকে horse-whip করি। আমাদের দর বাবুবা বলিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি ভয়ানক মূর্খ। যখন ঘরে কন্ডার বিবাহ কেন দিল? যদি রাঙার ঘর হইত, ইলেকও না হয় বুঝিতাম।"

কিন্তু এই প্রকার, এ দিকে মাতাঠাকুরাণী ক্রুদ্ধ হইয়া কনিষ্ঠ

প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। দেশেও মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। তাই প্রবোধচন্দ্র মাতার কথায় চলিয়া গিয়াছিলেন, বটে, কিন্তু বিবাহের সময় আবার উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইল। ক্রমশঃ আন্দোলন নিরস্ত হইল। আমরা আবার দৈনিক ব্রত ও সাধনগুলি লইয়া জীবন বাপন করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে নয়্যাটোলাতে আমাদের নিজের বাটা হইল। ১৫ই নবেম্বর তুমি গৃহ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করিলে। দোতালার সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটিকে ঠাকুর ঘর বলিয়া নিশ্চিত করিলে। যতদিন পৃথক দেওয়াল প্রস্তুত না হইল, ততদিন ঐ উপায়ের ঘরেই উপাসনা হইত। শরনের কষ্ট হইত, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতে না। এখানে আসার পর হইতে পরীক্ষা সমুদয় ব্রাহ্ম-শরিবারগুলির বিশেষ ভার তোমার উপর পড়িল। সকলের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের খোঁজ লইতে। প্রচার আশ্রমের সংবাদও তুমি লইতে। তাঁহার বলিতেন না, স্ত্রীরা নিজেই তাঁহাদের ভাণ্ডারে গিয়া দেখিতে, কিসের অভাব আছে। যাচা জানিতে পারিতে, আমার কাছে বলিতে, ও আপনার ভাণ্ডার হইতে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রেরণ করিতে। প্রয়োজন মত প্রতিবেদীদিগকেও আপনার ভাণ্ডার হইতে বস্ত্র যোগাইতে। তাঁহার প্রতাপণ করিলেও আনন্দে গ্রহণ করিতে কিন্তু নিজে চাহিতে না, অথবা নিজের অভাব হইলে কাহারকেও জানিতে দিতে না।

দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন বিকণ তপস্যাময় ছিল, তাহা কি তুমি মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাভ্যাগের পূর্বে তুমি আমার সহিত সমুদয়ের মাতৃভোগ পাঠ করিতে। তারপর তুমি বহুস্ত উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অত্যন্ত উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জগ্ন অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে। তার পরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহাৰ করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেই রন্ধন করিতে হইত; পাচক ভাষ্করের জগ্ন সকল সময় অর্ধে কুলাইয়া উঠিতে পারিতে না। ইহারই মধ্যে কোনও সময়ে প্রতিবেদী হই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহাৰ পরিচ্ছদ তুমি সর্বদা নিজেই দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির আহাৰের আয়োজন হইত এবং সন্ধ্যার পূর্বেই ছোটদের আহাৰ করা হইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তারপর আমরা দুজনে নাম গান করিতাম। নূতন যে কোন সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহাৰাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত। ইহা ভিন্ন স্নানের বিশেষ নিয়ম ছিল। ১৮৮৫ সালের ২০শে এপ্রিলের দৈনিকে তাহা লেখা আছে। "কিছুদিন পূর্বে হইতে সমাধিতে চিত্তে স্নানাহার করিতে শিখিতেছিলাম। অতঃপূর্ব হইতে নূতন প্রবেশ। প্রাতঃকাল হইতে প্রস্তুত হইয়া বেলা ১২টার সময় সজ্জীক স্নানগৃহে প্রবেশ করিলাম; ঈশার অভিব্যেকের বিষয় পাঠ করিলাম। নবসংহিতার স্নানপদ্ধতি পাঠ করিলাম। জলের ধারে পুত ও নূতন বস্ত্র ছিল। বিধানান্বিত পাজের সঙ্গীত আশপনি ও জী স্নান করিলাম। প্রার্থনার পর নব বস্ত্র পরিধান



ঝিলাম। তাহার পর স্বপাকে আহার করিবার জন্ত গৃহান্তরে গমন  
ঝিলাম। পাকগৃহে গিয়া দেখি, গৃহিণী আমার মনের মত সামগ্রী-  
লৈ যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বপাক্র এত মিষ্ট কখনই লাগে  
ই। স্নান করিবার পূর্বেই হইতে আহার কল্পার শেষ পর্যন্ত এক  
গমনার নানা অঙ্গ সম্ভোগ করিলাম। অপরান্তে শুভার শান্তি-  
চেন পাঠ করিলাম। প্রত্যহ কিছু একত্রে স্নান ও একত্রে পাক  
খা ও আহার হইত না। কিন্তু আমরা দুই জনে ক্রমে মিলিত  
সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম এই দৈনিকে তাহার আভাস  
ওয়া যায়।

এইরূপে চলিতে লাগিলাম। শরীরের সঙ্গে সঙ্গামও চলিতে  
গিল। এক দিনকার দৈনিকে লেখা আছে, “আড়াই বৎসরের পর  
শরীর পশু দেখিয়া মনে হয়, বৃষ্টি পশু কখনই বাইবে না। তাই  
গবতী তদ্রূপ জন্তু প্রার্থনা করিলাম। এক দিন তোমাকে ও  
মাতে এই প্রসঙ্গ হইতছিল যে পরলোকে ভালবাসা কি আকারে  
কিবে? আমি বলিলাম, আমরা যে পশু অবলম্বন করিয়াছি  
হাই পরলোকের ভালবাসা স্থায়ী করিবার উপায়। শরীরের সম্বন্ধ  
গা না করিলে ভালবাসা স্থায়ী কি না তাহা কিরূপে বুঝিবে?  
না আমাদের সমুদ্রের অবস্থায় চক্ষের ভালবাসা থাকিবে।  
বশুর দৃষ্টি যখন থাকিবে না তখন কেবল আত্মার ভালবাসা  
কিবে।

কলা সন্সারের বিবাহের পর আত্মীয়গণ ত্যাগ করিয়াছিলেন,  
না আবার তাঁহারা অনুভূল হইতে লাগিলেন। বড়দাদা মহাশয়  
কমসা করিবার অভিপ্রায়ে বাঁকিপুরে আসিলেন। মাতারীকুণ্ডালীও  
রিয়া আসিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ভাই পরেশ চিকিৎসা  
বহুতে লাগিলেন। তুমি সেবার নিযুক্ত রহিলে।

এই সময়ে একদিন আমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া সংসারের  
সিক আয়বায়ের এট্রিমেন্ট প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমার শ্রম  
থিয়া তুমি বলিলে, “আমাকে এ কাজ দিয়া কি বিশ্বাস করিতে পার  
?” আমি বলিলাম, “পারি, কিন্তু পাছে গোলমাল হয় তাই  
মাকে এত দিন দিই নাই।” অতঃপর সমুদ্র অর্থব্যয়ের ভার  
আমারই হইল। প্রথমে তুমিও লইতে ভীত হইয়াছিলে। আমি  
শ্রাস দিলাম। তুমি সেই যে অর্থব্যয়ের ভার লইলে শেষ পাঁড়া  
জন্তু অন্ন বদনে সে ভার বহন করিয়াছিলে। একদিনের তরেও  
মাকে ভাবিতে দাও নাই। আয়বায়ের কোন বিশৃঙ্খলাও ঘটে  
ই। অনটন পড়িলে আমাকে কোনও দিন বিরক্ত করিতে না,  
বা প্রাণান্তেও বাজার হইতে ধারে জব্বাদি আনিতে না। ইহাতে  
শিখিলাম, নারীকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি সে  
হাসের উপযুক্ত হইতে পারেন। সংসারের কঠিন দুর্ভাবনা হইতে  
মাকে মুক্তি দিবার জন্ত তুমি এই ভার আপনি লইলে। যখনই  
মাকে রাজকীয় কার্যভারে অধিক প্রতীড়িত দেখিতে, প্রায়ই  
ভেত, কবে আমার সেই ক্রমতা হইবে, যে এ সকল বিষয়েও  
মাকে আমি সাহায্য করিতে পারিব।

২১শে জুলাই সংবাদ আসিল আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে  
যুক্ত হইয়াছি, এবং মতিহারী জেলায় আমার প্রথম কর্মস্থান নির্দিষ্ট  
হাছে। সংবাদ তখন অভাবনীয় মনে হইয়াছিল। তুমিও  
নিতো না, আমিও জানিতাম না যে আমাদের আবার মতিহারী

বাইতে হইবে। বড়দাদা মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভ হইলেন, এবং বাইতে  
অনুমতি দিলেন।

৪ঠা আগষ্ট প্রচারশ্রমে আমাদের বিদায় দিবার উপাসনা হইল।  
সন্ধ্যার সময় নয়াটোলার বাটীতে শেষ উপাসনা করা গেল। শ্রীযুক্ত  
শুকপ্রসাদ সেন মহাশয় অবাচিতরূপে আসিয়া উপাসনার বোণ  
দিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম, তুমি কয়েক দিন পরে  
আসিও, আমি আগে গিয়া সেখানকার সব ঠিক করি।” কিন্তু  
তুমি সঙ্গেই বাইতে চাহিলে। এই আগষ্ট আমরা বাঁকিপুর পরিত্যাগ  
করিয়া চলিলাম।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

মতিহারীতে দ্বিতীয় বাণ ও বিশ্বাসের পরীক্ষা।

মতিহারীতে আসিয়াই এক পরীক্ষা দিতে হইল। নূতন বাসা  
করিতে হইল। বাঁকিপুরে ও দেশে টাকা পাঠাইতে হইল।  
মাসের শেষে টাকা কম হইয়া আসিল। কিন্তু বাজারে খণ করা  
অনুচিত। সুতরাং আহারের বসাদ কমানিয়া আনিতে হইল। এ  
হিসাবে চলিয়া আগষ্ট মাস হো শেষ হইতহই, সেপ্টেম্বরের ১লা পর্যন্ত  
নির্দিষ্ট কাটিয়া বাইত। কিন্তু দেবান্ড ১লা সেপ্টেম্বর দুটির দিন পড়িল,  
তাই সে দিন বেতন পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর এক বেলায়  
আহার কোনরূপে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় টাকা আসিল,  
কিন্তু তাহা হো তখনও দেবালয়ে উৎসর্গ কর; হয় নাই; তাই  
স্পর্শ করা বাইতে পারে না। ৪টি সন্তান, আপনারা দুজন;  
আহারের সামগ্রীর মধ্যে ১/২ সের দুধ, ২টি ভুট্টা, ও কয়েকটি  
পদ্মচাকা। ছোট ছেলে বিধান যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন  
তাহাকে পদ্মচাকা আহার করিতে দিলে। দেখি, তুমি অনশনে  
কাটাইলে; স্বামীকে আখ্যানি ভুট্টা খাইতে দিলে; অজ্ঞা ছেল  
মেয়েদের একটু একটু দুধ দিয়া কোনরূপে ব্যক্তি অভিযুক্ত  
করাইলে। তোমার দৈর্ঘ্য ও সতিযুতা দেখিয়া অস্বাক হইয়া গেলাম।  
সকালে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া পদ্মচাকল ঘর সাঁজাইয়া উপাসনা  
করা গেল; তারপর বাজার হইতে জব্বাদি আনা হইল। ঈশ্বরে  
জয়কীর্তি বর্ধিত হইল। তাহার উপরে যে প্রাণ-মন দিয়া নির্ভর করে  
তাহার সকল দুঃখ পূরে যায়, তিনি তাহাকে সকল পরীক্ষা হইতে  
উত্তীর্ণ করেন।

প্রথমে মতিহারী গিয়া বাসার জন্ত কিছু কষ্ট হইতেছিল।  
তোমার নিজের যে বাড়ী সেখানে ছিল তাহাতে—বাবু বা  
করিতেছিলেন। তিনি সে বাড়ী আর ভাগ করিতে চাহিলেন না।  
সামান্য দাম দিতে চাহিলেন। আমি এভাবে বিস্তর করিতে ইচ্ছা  
ছিলাম না। তুমি বলিলে, বাহা সেন, তাহাই লও। তোমা  
জয় হইল। বাড়ী বিক্রয় করা হইল; শ্রদ্ধেয় প্রচারক অন্তত  
বঙ্গ মহাশয় সপরিবারে এই সময় মতিহারী আইসেন এবং দীর্ঘক  
সেখানে বাস করেন। তোমার সেবার কাঁহারা দুজনই মোহি  
হইয়া যান। একদিন একগানা প্লেট এক জনার হাত হই  
পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্লেটখানি অতি সুন্দর ছিল; তোমার  
গেল, কিন্তু তুমি চুঁ ই কোন শকই করিলে না। কাঁহারা দেখিলে  
অস্বাক হইয়া গেলেন।

বাঁকিপুরে থাকিতেই তোমার পরসেবার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল।

খন মতিহারীতে তারা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। অপরের মধ্যে সহায়ত্ব প্রকাশ করিতে, অপরের দুঃখ দূর করিতে, আমার মন ব্যস্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৬ সালে হরিগুপ্ত রুদ্রাচর্য একটী যুবক স্ত্রীবিয়োগে অতিশয় কাতর ও উদ্ব্যস্ত হইয়া বড়াইতেছিলেন। আশ্রয় ও শান্তি পাইবার আশায় তিনি যশোবে মতিহারী আগমন করেন। তাঁহার চিত্ত অতিশয় বিকল হইয়াছিল। রাজ্যে স্বপ্ন দেখিয়া কাদিয়া উঠিতেন। একদিন হঠাৎ গিয়া বাইতে উত্তত হইলেন; ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুমি সামান্য দিতে লাগিলে। তোমার আশ্রয় মধ্যে এক প্রকার শক্তি ছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তুমি অধিক বাহিরে আসিতে না, কিন্তু মনে একটা ভালবাসার ভাবে ব্যবহার করিতে, বাহ্যিক সকলের হয় না। আমার মেহের গুণে হরিগুপ্ত তোমাকে মা বলিতে লাগিলেন, এবং আমাদের পরিবারে ৩৪ বৎসর বাস করিয়া গেলেন। তিনি এখনও আমাকে ভোলে নাই।

এই সময়ে একটী বন্ধু বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মিঃ—র সহিত তোমার বিবাহ কল্পা সম্বন্ধিনীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। যোজিনী তখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু তিনি বিবাহ করিতেও স্তুত, এই ভাবে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তুমি অপর একটী স্ত্রীর নাম করিয়া বলিলে, “সরোজিনীর জন্ম অপেক্ষা কেন?—সে বিবাহ দাও না কেন? উভয়েই আমার কষ্টের তুল্য বস্তু।”—তারপর আমার সরোজিনী।” তোমার উত্তর প্রস্তাবকারী দুঃখে লিখিলাম। বধা সময়ে মিঃ—র সহিত ঐ কষ্টের বিবাহ হইয়া গেল। ঐ কল্পা তোমার সহিত সাংসারিক কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাকে আপনার কষ্টা পোষণা অধিক মনে করিলে। নতুবা এমন বিলাতক্ষেত্র পাত্রটিকে তে পাইয়া কি এমন নিঃসঙ্কোচে কেহ ছাড়িয়া দিতে পারে? আমার এই নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া একজন সন্তানের বন্ধু লিখাছিলেন, “আমি দেখিয়াছি, অধোরকামিনী বধাধর্মী প্রত্যাগ করিয়াছেন! অস্ত্র নারী তাহা পায়েন না; আপনার গুণা রাখিয়া তবে অপরকে ভালবাসেন”।

১৮৮৬ সালের মে মাসে বাকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হইতেছিল। আমাদের নয়াটোলার বাটীই উৎসবের বাড়ীনিবাস হইয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মতিহারী হইতে বাকিপুর আসিতে তখন ষাট লাগিত। উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিল, আমরা চললাম। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহাকে মা আসিল পাঠের ব্যাঘাত হইবে, তাই তাঁহাকে রাখিয়া দিতে হইল। বামণ ঠাকুর খুব বিবাসভাজন ছিলেন, তাঁহার র সুবোধচন্দ্রের ভার দিয়া আসিলাম।

বাকিপুরের উৎসবে অনেক লোক হইয়াছিল। বেশ ধুমধাম হইয়া উৎসব সম্পন্ন করা গেল। নয়াটোলার বাড়ীতরা লোক। সঙ্গে ভগবানের নাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ অনুভব করিতেছিলেন। উৎসবের শেষ দিনে খ্রিষ্টানের পর সকলে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মতিহারী হইতে ডায়ে সংবাদ আসিল, ডায়ে কলোরা হইয়াছে। কি করিবে? যদি সে দিনই বিকালের রওনা হও, তাহা হইলে তার পরদিন প্রাতঃকালে মতিহারী

পৌছিতে পার; হয় তো সম্মানকে জীবিত দেখিতে পাও। উৎসব শেষ হইতে রাত্রি ৮টা কি ১টা হইবে, তাহার পর যাত্রা করিলে সে রাত্রি মোকামায় থাকিতে হইবে। পরের দিন সকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় মতিহারী পৌছিতে পার। অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই তুমি মোমাংসা করিলে উৎসব শেষ করিয়াই যাইবে। তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে এই মোমাংসা করিতে যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলে, মা জগজ্জননী মায়াব খেলা খেলিয়া সে বিশ্বাসকে যেন আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উৎসবের শেষ অংশ আরম্ভ হইল, ক্রমে উৎসব শেষ হইল। আমরা রাত্রির ট্রেনে রওনা হইলাম। মোকামায় শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ পাশ মহাশয়ের বাটীতে বাড়িবাস করিলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া সকলে মিলিয়া ভগবানের আর্চনা করিলাম। তারপর সেখানে হইতে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মতিহারী ট্রেনে পৌছিলাম।

ট্রেনে আমাদের বাড়ীর বেতারা আসিয়াছিল, আমার জন্ম টমটম ও তোমার জন্ম পালকী আনিয়াছিল। ট্রেন হইতে নামিয়াই আমি টমটমে বসিলাম, তুমি পালকীতে আরোহণ করিলে। একজন “কাহার” আমার কাছে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবোধ কেমন আছেন? সে বলিল, ভালই আছেন। তুমি ঘুরে ছিলে, তাহাদের সে উত্তর শুনিতে পাইলে না, তাহারাও তোমার কাছে গিয়া বলিল না।

এদিকে আমার টমটম আগেই গিয়া বাড়ীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র ঘরের নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লড়াই বাহিরের ঘরে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া অনুগ্রহ করিল, ও ডাক্তার বাবু কি কি ঔষধ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিলাম, কলোরা হয় নাই, উদরাময় হইয়াছিল। বন্ধু যত্ন বাবু আশঙ্কিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও ঐক্লপ টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন।

আমি যখন সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে বহির্দ্বারের নীচের ঘরে কথা কহিতেছি, সেই সময় বেতারা তোমার পালকী একেবারে ভিতর বাটীতে লইয়া গেল। আমার বা সুবোধের সঙ্গে তোমার দেখা হইল না। মা জগজ্জননীর মায়াব খেলা চলিতে লাগিল। আমাদের অল্পপস্থিতির সময় বাড়ীতে নুতন চূপকাম করা হইয়াছিল। বাড়ীটিতে প্রবেশ করিয়াই সব যেন তোমার কাছে একটু নুতন নুতন দেখাইতেছিল। তার উপরে বামণ ঠাকুরের আচরণে তোমার আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি একাকিনী স্নেহভাজন সুবোধচন্দ্রকে লইয়া এক কয়েক দিন বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এখন তোমাকে দেখিয়া এতদিনের ক্ষম্ভ আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল কাদিতেই লাগিলেন। তুমি তখন পৌড়িয়া সুবোধচন্দ্রের শয়নগৃহে গেলে, দেখিলে শয্যা শূন্য। তখন তোমার মতন জননী আর কি করিতে পারেন? শয়নকক্ষের পার্শ্বেই উপাসনার ঘর; ছুটিয়া সেখানে গেলে, ও মা জগজ্জননীর চরণে বেননার অঞ্জলি ফেলিলে। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে আসিয়া দেখিলে সুবোধচন্দ্র ঠাড়াইয়া আছেন। বলিতে এতক্ষণ লাগিল, কিন্তু এ সমুদয় অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটিল; এই সময়টুকুর মধ্যে তোমার মনের উপর দিয়া কি তুফান ঝড় বহিয়া গেল, ও তোমার বিশ্বাসের

লোক ভাষার মধ্যে কেমন উজ্জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল! বাধচক্র বলিলেন যে, তিনিও তোমার পুঁচাং পুঁচাং উপরের ঘরে সিঁচেছিলেন, কিন্তু তুমি উপাসনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল বলিয়া হাকে দেখিতে পাও নাই। তুমি মা জগন্নাথের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লে, তোমার বিশ্বাস আমাদেরও বিশ্বাস বাকিল।

কয়েক মাস হইতে তোমার শরীর অসুস্থ হইতেছিল। বাবু বৈষ্ণবের জন্ত তোমাকে মোকামায় শ্রীযুক্ত অশুভকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের গীতে পাঠাইয়া দিলাম। মতিহারীতে আমি ও সুবোধচন্দ্র ইলাম। আমাকে এভাবে একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে তুমি তিশয় কুণ্ঠিত হইতেছিলে। কিন্তু চিকিৎসকের আদেশে অগত্য হইতে হইল। সে বার আমার উপর অনেক চাপ পড়িতে লাগিল। চন কর্ণ, অনেক ঝটুনি; আবার তুমিও কাছে ছিলে না, তাই সারের সব কাজ কর্ণও আমাকেই দেখিতে হইত। ডিপার্টমেন্টাল রীকার জন্ত প্রস্তুত হইতে সময় পাইতেছিলাম না। তোমার সুস্থতা ও ধর্মজীবনের সাধন-ভজনগুলির জন্তও এ বিষয়ে কিছু বাধা ইয়াছিল। তাই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। মি এ সংবাদ শুনিয়া পত্র আমাকে লিখিয়াছিলে,—“দুঃখ করিও ; কারণ আমরা তো ফলবানী নই। তোমার যে এই বয়সে এই ঠ, তা তো না দেখিতেছেন। আমাদের কাজ তাঁর কথা শোনা।” আমি বিশ্বাস করি যে সাধামত তাঁর কথা শুনিয়াছি। আবার পড়িতে গবে। ভাবিতেছি যে আমি নাই, তোমার বড় কষ্ট হইবে। দুঃখ ই যে, আমি তোমার বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারি না। সারের ভারও তোমায় বইতে হয়। তাই বা কি করিব? ইহার দ্যও মার ইচ্ছা দেখিতে ইচ্ছা করে। যে কয় দিন এখানে থাকিব, ইহার কাজ করিলেই খালাম।”

এই সময়ে আমার ভাতা প্রবোধচন্দ্র বাঁকিপুর্বেই কাজ রিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে তুমি তাঁহারও ইহার পত্নীর সাহায্যের জন্ত একাকিনী মোকামা হইতে বাঁকিপুর্বে লয়া গেল। পুত্র সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রকে মোকামাতেই রাখিয়া লে। বাঁকিপুর্বে যাইতে হইবে এ মীমাংসা কিরূপে করিলে? আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নয়। আমার অপেক্ষাও ইহার আদেশ দিক মাননীয় সেই পরমগুরু কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা রিলে। যাত্রা করিবার পূর্বে আমাকে পত্রে লিখিয়াছিলে, বাঁকিপুর্বে ইব কি না, এখনও ঠিক করি নাই। উপাসনার পর ঠিক হইবে।” মিও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতাম। এইরূপে তুমি ধীনভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে শিখিতেছিলে। কিপুর্বে যাইবার সময় তোমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মোকামায় গাড়িতে চড়া, কিপুর্বে গাড়ী হইতে নামা, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা, সব তুমিই রিলে, তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় নাই।

তুমি বাঁকিপুর্বে গিয়া প্রবোধচন্দ্রকে ও পত্নীকে সাহায্য দান করিলে, তাঁহাদিগকে মতিহারীতে আসিতে অনুরোধ করিলে। বাঁকিপুর্বে খানে যেখানে উপাসনা করিলে ও আহার করিলে বহুগণ সুখী হন, মি তাই করিলে। তুমি এইরূপে একাকিনী স্বামী ও সন্তানগণকে ডিয়া আসাতে সকলে আশ্চর্য হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, যেন র সকল হইতে ভিন্ন। আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার

হয়তো মনে আছে। আমি লিখিয়াছিলাম, “এমনি ক’রে শিখিতে হইবে। একবারে আসক্তি মহাশব্দকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন হইবে যে আর কাহারও জন্ত মন কেমন করিবে না। এবার কিছু সঞ্চয় করিয়া আসিতে হইবে; এবার যে তুমি বাস্তবে, আমি ঘরে। তোমার কাছে বসিয়া আমি নানা কথা শুনিব ও শিখিব। শিখাইবার উপযুক্ত হইয়া আসিবে।”

তুমি সুস্থ হইয়া মতিহারী ফিরিয়া আসিবার কিছু পরেই তোমার ও আমার জন্ত আর একটি পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল। হিন্দু সমাজের আত্মীয়গণের প্রভাবে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছিল। তাই কতক স্থানবাসিনীর সঞ্চকেও তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া পড়িতেছিলেন। আমরা ইহার লক্ষণগুলি দেখিতে-ছিলাম, আর আপনাদের জন্ত ও কতক জন্ত পরম জননীর নিরাপদ চরণ আরও ভাল করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলাম। ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃন্দাবনচন্দ্র পত্র লিখিলেন যে তিনি স্থলগতক পরিচয় করিবেন। তোমার সেদিনকার বিশ্বাস ও গাভীবাণীভাব আমার এখনও মনে আছে। কতক সর্বোজ্ঞতার অসুখের সময় যেমন আমাকে উপাসনাগৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলে, সেদিনও বেলা তিনটার সময় তুমি ডাকিয়া লইয়া গেলে। দুজনে খুব প্রাণীনা করিলাম।

বৃন্দাবনচন্দ্র আর একবার দেখা দিলেন। মনটা একবার একটু ফিরিয়াছিল, কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না। এখন তিনি আসিলেন, তখন কয়েক দিন গৃহে একটু আনন্দ-উৎসব হইল। বাহ্যতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মনটা আরও কোমল হয়, শরীর সুস্থ হয়, তাই করিবার জন্ত তাঁহাকে লইয়া দার্জিলিং ভ্রমণে চলিলাম। পথে কসিয়ঙে প্রান্তর প্রাপ্তচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে মিষ্ট উপাসনা সম্ভাগ করিলাম। পাহাড়ে গিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের কি উপকার হইল, জানি না, কিন্তু তুমি অনেক উপকার লাভ করিলে। বনের মধ্যে বনদেবীকে লঙ্কায়িত দেখিয়া তোমার মন খুলিয়া গেল। যখন বেড়াইতে যাইতে, ছেলোমাল্লুয়ের মতন পথে পথে কত কি কুড়াইতে। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে ছিলেন এক দিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল। তোমার ইচ্ছা ছিল, সকলের সঙ্গে ঈটিয়া যাইবে। যখন গৃহ হইতে যাত্রা করা হয় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অজ্ঞাত গুরুজনগণ মীমাংসা করিলেন, নারীর পক্ষে পদযাত্রা যাওয়া অবিদেয়। তাই তোমাকে ডাণ্ডিতে বাইতে হইল। তাঁহাদের এই আদেশ পালন করিতে গি তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তুমি ডাণ্ডিতে চড়িয়া কিছুদূর গি পরে ঈটিয়া চলিলে। মহর্ষির উজ্জল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাকে প্রতিজ্ঞার প্রতি সন্তোষ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আমাদের তোমাদের রাখিয়া কিছু আগেই মতিহারী চলিয়া আসিতে হইল তোমরা ২২শে জুন ফিরিয়া আসিলে। ইহার পরও কিছুক বৃন্দাবনচন্দ্র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পর যে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়া গেলেন, আর আসিলেন না।

অক্টোবর মাসে আমি আবার বাঁকিপুর্বে বদলী হইলাম।

অক্টোবর আমার মতিহারী ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। মতিহারীর উপাসনাতেও সকলে যোগ দিলেন।

## ছাদশ পরিচ্ছেদ

বাঁকিপুরে ভিত্তির বার

বাঁকিপুরে আসিয়া তুমি ১২ই অক্টোবর ১৮৮৭ হইতে আশ্মিকা সমাজের কাজ আরম্ভ করিলে। একদিকে যেমন সেবা চলিতে লাগিল, অপর দিকে সাধন ও উপাসনাও পূর্ণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। তোমার বাটার উপাসনার ও উপাসনালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। প্রদেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তোমার নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করিবার জন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে “মৈত্রেয়ী” নাম দিয়াছিলেন। যখন তোমার বিষয়ে কিছু বলিতে হইত, তোমাকে ঐ নামে উল্লেখ করিতেন। সঙ্গারের কোনও কার্যের জন্ত কোন দিন তোমার উপাসনা বন্ধ হইত না। কেবলমাত্র আচার্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা তোমার ধর্ম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বৎসর প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে তুল নাই। সময় বুঝিয়া ছোট ছোট প্রার্থনা করিতে, কিন্তু স্পষ্টভাবে করিতে; কেহ শুনিতে পাইল না, এমন কখনই হইত না। প্রদেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় একদিন বলিলেন, “বিধানমণ্ডলী এখনও ভাঙে নাই, ভিন্ন আকার লইয়াছে মাত্র।” কলিকাতায় ঐ সময়ে বিধানমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছিলেন না। সকলেই স্ব স্ব প্রাণন হইতে চাহিতেছিলেন। এমন সময়ে বাঁকিপুরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে একটি ঘনিষ্ঠ দল আছে; পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক; সহোদর সহোদরার মত ব্যবহার। ইহা দেখিয়া তিনি বাঁকিপুরের মণ্ডলীকে স্বীকার করিলেন।

১৮৮৮ সালের ২৪শে মে আবার বাঁকিপুরের উৎসব উপস্থিত হইল। অনেক লোক আগমন করিয়াছিলেন। প্রদেয় উমানাথ চন্দ্র মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে এই তাহার প্রথম পরিচয়। তোমার উপাসনার গৃহ দেখিয়া, সেই গৃহ কি স্নন্দররূপে সাজান, তাহা দেখিয়া, স্নেহের উপাসনার যোগদান দেখিয়া, অনেক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তোমার দোষ ক্রটি দেখাইতেও ছাড়িলেন না। বলিলেন, অনেক জিনিষ পত্র তাহার যত্ন হয় না। তোমার দোষ দেখিলে আমার কি হইত তাহা তো জানই। সেই দিনও অত্যন্ত স্নেহাভূত হইলাম। প্রকৃত পক্ষেই তৈজস পত্রে তোমার কোন যত্ন ছিল না। উমানাথ বাবুর কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি চেষ্টা করিতে লাগিলে। কিন্তু স্বেচ্ছা যত্ন করিলে সঙ্গারের সব বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার হয় ও কিছু অপচয় না হয়, সেপন যত্ন করিতে পারিতে না। যখন ক্রমান্বয়ে একাকী ঘরকন্না করিতে, ধর্মের কোন দার ধারিত না, যখন অল্প ব্যয়ে চালাইতে, ও সর্বদা সঙ্গারের দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে; এখন আর তাহা হইবার নয়। এখন যদি তোমাকে সৌভাগ্য করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো তোমার মৈত্রেয়ীর বিটুকু পলায়ন করিত। সুতরাং তুমি মৈত্রেয়ীই रहিলে।

কেহ কেহ নিজের উপাসনাগৃহ ভিন্ন অল্পদূর উপাসনা করিয়া হইতে পারে না। তোমার তেমন ছিল না। নিজের ঘরে ছোট উপাসনাগৃহটি যেমন তোমার ঠিক লাগিত, তেমনই সঙ্গার তাই বন্ধীদের বাটার উপাসনালয়ে গিয়াও সুখী হইতে।

১৮৮৭ সালের ২৪শে মে আবার বাঁকিপুরের উৎসব উপস্থিত হইল। অনেক লোক আগমন করিয়াছিলেন। প্রদেয় উমানাথ চন্দ্র মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে এই তাহার প্রথম পরিচয়। তোমার উপাসনার গৃহ দেখিয়া, সেই গৃহ কি স্নন্দররূপে সাজান, তাহা দেখিয়া, স্নেহের উপাসনার যোগদান দেখিয়া, অনেক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তোমার দোষ ক্রটি দেখাইতেও ছাড়িলেন না। বলিলেন, অনেক জিনিষ পত্র তাহার যত্ন হয় না। তোমার দোষ দেখিলে আমার কি হইত তাহা তো জানই। সেই দিনও অত্যন্ত স্নেহাভূত হইলাম। প্রকৃত পক্ষেই তৈজস পত্রে তোমার কোন যত্ন ছিল না। উমানাথ বাবুর কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি চেষ্টা করিতে লাগিলে। কিন্তু স্বেচ্ছা যত্ন করিলে সঙ্গারের সব বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার হয় ও কিছু অপচয় না হয়, সেপন যত্ন করিতে পারিতে না। যখন ক্রমান্বয়ে একাকী ঘরকন্না করিতে, ধর্মের কোন দার ধারিত না, যখন অল্প ব্যয়ে চালাইতে, ও সর্বদা সঙ্গারের দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে; এখন আর তাহা হইবার নয়। এখন যদি তোমাকে সৌভাগ্য করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো তোমার মৈত্রেয়ীর বিটুকু পলায়ন করিত। সুতরাং তুমি মৈত্রেয়ীই रहিলে।

এইরূপ লেখা আছে—“অতঃপ্রাতে খালের ধারে বজী বাবু, তাহার স্ত্রী, অঘোর ও আমি—হাত মুখ না ধুইয়া উপাসনা করিলাম। উপাসনা বড় ভাল। প্রার্থনা—উপাসনার সময় বাটারে আসিয়া পত্র পাইলাম যে, departmental পরীক্ষায় পাস হইয়াছি। সংবাদ পাইয়াই উপাসনার ঘরে গিয়া সাতীকে প্রণাম করিয়া সুখী হইলাম। সে যেন এখনও কালকার কথা মনে হইতেছে। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে উপাসনার গৃহে গমন করিলাম। যেমন করিয়া কোথা হইতে তুমিও আমার চিরসঙ্গিনীরূপে আমার পার্শ্বে আসিয়া সাতীকে প্রণিপাত করিলে, এবং তদগতচিত্তে তুমিও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলে। এই পরিণত বয়সে শক্ত আইন পুস্তকের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। ধর্মপথে থাকিয়া উত্তীর্ণ হওয়া ততোধিক কঠিন। কেবল তোমার দিল-দরদী সাহায্যকারী ছিল বলিয়া অমন ফললাভ হইল। উপাসনার ঘরটিও সার্থক হইল। খালি মেজের উপর এমন করিয়া হাত পা ছড়াইয়া আর কোনও ক্রীড়ার ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দিয়াছেন কি না, জানি না। যাহা, উপাসনালয়! তোমাতে ভাল মনে বসিয়া আমরা কখনই বঞ্চিত হই নাই।

এই সময়ে অনুভব করিতে লাগিলে যে, ভগবানের জন্ত কিছু সুখ ও স্বার্থ ভাণ্ডা না করিলে তাহার প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় হয় না। শুদ্ধতার পথও সহজ হয় না। আমার ঠাট্টা আগুনের দৈনিকে লেখা আছে, “অতঃ এক নূতন ব্যাপার হইয়া গেল। গৃহীতী কয়েকদিন হইতে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছিলেন; অতঃ মাথার কেশ দান করিলেন, আগনার কেশ আপনি কর্তন করিলেন।” সেদিন খুব স্নন্দর উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনার পর একজন ভগিনীকে তোমার কেশ কর্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে। তিনি অস্বীকার করিলেন। তাহার পর কণ্ঠকে অনুরোধ করিলে, তিনিও অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অনুরোধে আপনার কেশ আপনি ছেদন করিয়া বৈরাগিনী হইলেন।

এইরূপে তুমি একে একে আসক্তির সমুদয় বস্তুগুলিকে বিসম্বন্ধন দিতে লাগিলে। অলঙ্কার ও মূল্যবান বসন পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছিল। শেষে বহিল কেবল স্বামী-ধন। এই স্বামী-ধনকেও প্রার্থনাপূর্বক ভগবানের শ্রীকরে অর্পণ করিলে। স্বামীর প্রতি মনের ভাব পরিবর্তিত করিয়া দিলে। তিনি আসক্তির বস্তু থাকিবেন না, কেবল ধর্মপথের সহায় হইবেন, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলে। আসক্তি থাকিলে নারীর পক্ষে স্বামী ধর্মপথের সহায় না হইয়া মাঝখানের অন্তরালরূপ হন। তোমার পক্ষে ভগবানের ও তোমার মাঝখানে আর স্বামী রহিলেন না।

আচার্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে প্রতি বৎসর ৮ই জ্যৈষ্ঠারীতে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা ও হবিষ্যার আহার নিজেও করিতে, আমারও সহায়তা করিতে; এবারও ঐ দিনে (১৮৮১ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠারী) শেষ বার্দ্ধক্যে বাতস্তোত্র পাঠ হইল, নাম গান করা হইল, ও অতি প্রত্যবে উপাসনা আরম্ভ হইল। প্রদেয় উমানাথ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সে দিন তোমার অভিধি ছিলেন। তিনি বারান্দায় বসিয়া উপাসনার যোগদান করিলেন। বাহিরে কেন বসিলেন জানি না; বোধ হয় তোমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না,

কিন্তু আহারের সময়ে, তিনিও বসিয়া বসিলেন, হবিষ্যার অন্ন অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং, তোমার নিজের আশ ত তাঁহাকে আহার করাইলে, এবং এইরূপ তাঁহাকে চিরাগতির দায় করিয়া লইলে।

তুমি যখন নিষ্ঠাপূর্বক হরিগুণ গান করিতে, সকলেই যোগ করিয়া স্বগী হইতেন। তোমার উপাসনার গৃহে সকলেরই হইত। ত্রাঙ্ক কি অত্রাঙ্ক, যিনিই হউন, ধর্ম্মশিপায় হইলেই। তোমার উপাসনার গৃহে অবগুষ্ঠন ছিল না। বাহার যত কুদৃষ্টি, সেও স্থান পাইত। তোমার বিখাস ছিল, উপাসনার এত উচ্চ স্থান যে এখানে কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে। তবে বাহার চকল ততাদের লজ্জা বক্ষার্থে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া দিতে।

এই সময়ে একটি বাক্সালী খুঁটান-পরিবারের সঙ্গে তোমার প্রীয়াতা হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন পূর্ববাসী খুঁটান দানাপুরে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু শয়ের সন্দরী কন্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বিন্দুবাসিনী জন্ম হইতে খুঁটান, কারণ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় এই খুঁটান হইয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে তোমার আলাপ ক্রমশঃ সম্ভাব হইল। তুমি যাহা করিতে তাহা পূর্ণমাত্রায়ই র্তে। যখন আলাপ হইল, তখন আর কেহ বসিতে রিত না যে তাঁহার খুঁটান আর তুমি ব্রাহ্ম। একত্রে আহার, রূপ বস্ত্র পরিধান, তাঁহাদের মত ভ্রমণ, মেয়েদের সঙ্গে একত্রে ন, উৎসবে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, গিরজায় গমন, এ সকলই হইতে গল। ইহাদের সহিত আলাপ হওয়াতে তোমার সাহস বাড়িয়া গ। ইহাদের আচার-ব্যবহারে কেমন অবদোদশ্যতা ভাব! দের অনুরোধে একজন নবাগত ইংরেজ পাদরীর সহিত সাক্ষাৎ র্তে গিয়াছিল। পাদরী সাহেবের আয় অল্প, কিন্তু তাঁহার গিটি-এমন পরিচ্ছন্ন, তাঁহার স্ত্রীর গুণে সামান্য বস্ত্রগুলিও এমন রয়া সাজান যে তাহা দেখিয়া তোমার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। রী সাহেবের ও তাঁহার মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া অত্যন্ত টি হইল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তোমাকে একটু বিপন্ন তে হইয়াছিল। বিলাতেব নিয়মানুসারে অতি ভদ্র সেই পাদরী হব তোমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিজন ও বিদায় কালে কন্যাও করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। তুমি কখনও ৮ পুরুষের হস্ত স্পর্শ কর নাই, কিন্তু কি করবে? পাদরী হব তো আমাদের দেশের আচার ব্যবহার জানেন না; তিনি সভাবে নারীর সম্মান করিতে আসিলেন, তুমিও ভগবানকে মরণ রয়া শেক-হাও করিলে। ইহার পরে তুমি বিলক্ষণ সাবধান যাছিল; এরূপ স্থলে দূর হইতে প্রথমেই নমস্কার করিতে, হ বাড়াইবার আর অবকাশ থাকিত না।

এইরূপে চক্রবর্তীদের সহিত এমন আশ্রয়তা হইল যে, অবসর হলেই তুমি তাঁহাদের বাটীতে যাইতে, তাঁহারাও তোমার বাটীতে সিতেন। শেষে চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর সাধনা নর জন্ম তুমি মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে ও াচিত ভাবে তাঁহার পুত্রকল্যাণের শিক্ষার্থে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য রিয়াছিল। একদিন ইহাদের সঙ্গে ব্যবহারে তোমার ভালবাসা

ও বৈধা খুব পরীক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা দানাপুর গিয়াছিলাম, সঙ্গে অনেক ছিলেন। সেখানে গঙ্গান্নান ও উপাসনা হইল। চক্রবর্তীর আমাদের আসিবার কথা আগে জানিতেন না। আমাদেরিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বৈকালের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তুমি তাঁহাতে সম্মত হইলে না, কারণ অনেকগুলি ভদ্রকন্যা তোমার সঙ্গে ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের গায়ে অলঙ্কার ছিল। ফিরিয়া বাইবার পথ তত নিরাপদ ছিল না। তাই শীঘ্র প্রত্যাগমন করাট স্থির করিলে। মিসেস চক্রবর্তী তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তোমাকে আমার সম্মুখে অনেক শক্ত কথা বলিলেন। ভগবানের কৃপায় তুমি শান্তভাবে সমুদয় সহ করিলে। তোমার সন্তোষতা দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য হইয়া অবশেষে আরও আপনার লোক হইয়া গেলেন।

এই সময় পশ্চিমদেশীয় আর একটি খুঁটান-পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। মাঘোৎসবের সময় একদিন একজন হিন্দুস্থানী খুঁটান ভয়লোক আমাদের উপাসনাস্থানে আসিলেন ও হিন্দীভাষায় অতি সুলব প্রার্থনা করিলেন ও উপদেশ দিলেন। ইহার নাম মিঃ ইউনস। ইনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই ইহাকে সকলে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিতেন। ইনি ও ইহার স্ত্রী তোমার বন্ধু হইলেন। মিসেস ইউনসকে লইয়া একত্রে আহার করা তোমার পক্ষে আনন্দের কার্য্য হইল। ইউনসের হিন্দি প্রার্থনা তোমার বড় ভাল লাগিত। ইহাদের গৃহ তোমার গৃহের অতি নিকটে ছিল; কোনও স্রব্যাদি আসিলে পণ্ডিতজী ভাগ পাইতেন। ইউনসের সাহায্যার্থ নিজ বাটার বাহিরের ঘর ছাড়িয়া দিলে, সেখানে ইউনস নাইট হুল (নৈশ বিতালয়) খুলিলেন। অনেকগুলি শ্রমজীবী বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তুমি আশ্রন আয় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলে। আপনার বাটীতে তাঁহাদের স্থান নিদিার প্রস্তাবও করিয়াছিলে। কিন্তু মিসেস ইউনস রাজি হইলেন না।

একজন ব্রাহ্মবন্ধু এই সময়ে একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তুমি বিধবা বিবাহের যোর বিরোধী ছিলে। কিন্তু এ বিবাহে আমাকেই আচার্য্যের কাজ করিতে হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। তুমি শুনিয়া প্রথমে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিলে। কিন্তু যখন শুনিলে যে, এ বিবাহে সাহায্য করিবার আর কেহই নাই, তখন অনুমতি দিলে ও স্বয়ঃ সমুদয় ভার আপনার মস্তকে লইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিবাহবাটীতে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য নির্বাহ করিলে, তাহার পর বরকল্লার জন্ম প্রার্থনাও করিলে। বিরুদ্ধ মত থাকিলে যে আর মাহুষের প্রতি ভালবাসা থাকে না, ঈশ্বরকৃপায় তুমি এই মানবীয় ভাবের অতীত স্থানে উপনীত হইয়াছিলে। এই বরকল্লাকে চিরাগিন নিজ পুত্রকল্যাণ মত দেখিয়াছ। ইহাদের সম্ভানের পীড়া হইলে রাত্রি জাগরণ অর্থাভাব হইলে তাহা দূর করা, এ সকলই অতি সহজে ও সুরু ভাবে করিয়াছ। কত বার আপনার বাটীতে স্থান দিয়াছ; একত্রে আহার, উপাসনার তো কথাই নাই। কেহ জানিতেও পারে নাই যে, ইহাদের বিবাহের তুমি এত বিরোধী ছিলে।

এই সময়ে পরম বন্ধু কশীন্দ্রের পত্নী জগন্নাথিনী পীড়িত হই

চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের জন্ম ঝিকিপুরে তোমার বাটীতে  
 শাসিলেন। তাঁহাকে তুমি অতি আদর করিয়া সেবা করিতে  
 গাশিলে। কিছুদিন পরে কলীন্দ্রমোহন স্বয়ং আসিলেন। এই  
 সময়ের একটি রহস্য মনে পড়িল। গোপন করিবার ইচ্ছা  
 নাই, তাই লিখিতেছি। জগত্তারিণী আমার আপনায় ভগিনী  
 হইলেন, কিন্তু বিবাহের পূর্বে ও বিবাহের পরেও তাঁহার শিক্ষার  
 গাহায্য করিতাম, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে একটা সন্ধ হইয়াছিল।  
 জগত্তারিণীর পীড়াতে আমারও কিছু সেবা করা উচিত, এই ভাবিয়া  
 নজ্জ ও কিছু সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি  
 মসৃষ্ট হইয়াছিল। তখন এইরূপ, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়া-  
 ছিলে যে বতই ভালবাসার বস্ত্র বাড়ে, ততই মলয়ের ক্ষমতা  
 বাড়ে। তখন তুমি বাধা দিলে তোমারই পরিব্রাজক বাড়িতে  
 গাশিল।

ইহার মধ্যে আবাব তাঁহার কষ্টা বুঝালিনার ভয়ানক রোগ

উপস্থিত হইল। চিকিৎসক নিরাশ হইলেন। আর একজন  
 চিকিৎসককে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকা হইল। তিনি অনেক আশা  
 দিলেন, তাহাতে প্রথম চিকিৎসক যিগুণ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা  
 আরম্ভ করিলেন, 'এ কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন।  
 বলিলেন, বাটা পরিবর্তন করিয়া বড় বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে।  
 তখনই তুমি প্রস্তত হইলে। আপনায় বাড়ী ঘর ছাড়িলে। নতুন  
 বাড়ীতে যাইবামাত্র কলার রোগ আবাব হইতে লাগিল, কিন্তু তোমার  
 শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তবু তোমার সেবার  
 ক্রটি হয় নাই। কোথায় শোণের জল, কোথায় কলিকাতার মাগুর  
 মাছ, তোমার কাছে কিছুই অসাধ্য বহিল না। নিজ হস্তে যোগীর  
 মলমূত্র পরিষ্কার করিতে। এইরূপ ছয় মাস কাল অসুস্থ শরীরে  
 সেবার নিযুক্ত ছিলে। "পারি না" এক কথা এক দিনের তরেও বল  
 নাই। কষ্টা আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু ভগিনী জগত্তারিণীর  
 রোগ নির্মূল হইল না। [ ক্রমশঃ ]

## নিশীথে

### ঐতিহ্যভূষণ বাগচী

কত দিন কত রাত্রি আগে

চাঁদ একা জেগেছিলো রাত্রে,

খেমেছিলো কোন বাতায়নে !

কিসের ইসারা ছিল তার নয়নে !

নিশীথে শেকালিকা দল

তখনো স্বপ্নে,

নূরের জড়িমা তার ভেঙে ভাঙেনি ;

বাতাসে অচঞ্চল, রসধন টলমল,

বুস্তে বুস্তে তারা স্বপ্নে পড়েনি।

হে চপল চুল-চুল চুল চরণ,

ক্ষণিকের প্রেম নিল, প্রাণ নিল তোমার শরণ !

বিরল আলোকবস্ত্রি, হে দূর তারকা !

বহ সান্দী ক্ষণিক মিলনে, এই পলাতকা,

এই ভীকু ভবু মুহূর্ত থাক অনন্ত সীমায়।

রস দিয়ে, তনু দিয়ে, দিয়ে রঙ, মনের কামনা,

মাটি বারে গড়ে দিনে দিনে—সে রহে উন্নয়ন।

মৃত্তিকার নাগবন্ধে সহস্র শিকড়ে থাকি বাঁধা—

মন তবু মেলে পাখা ; পিছে বর ধরিত্রীর কাঁদা।

জানালার চাঁদ-জাগা রাত্রে

যত বন, উপবন, শিলাহত স্বপ্নার ধারে,

কঙ্কর বন্ধের ঘন অরণ্যানী পারে,

বনবিটপীর নিত্য ছায়া ছাঁকা পথে

কত পান, কত পঙ্ক এসেছিলো ভেসে একদিন...

কত দিন কত রাত্রি আগে

নগরীর নাট্যশালা ছাড়ি,

কত দূর পাহাড়ের ওঠানামা পারে

কার আঁপি উৎসুক চেয়েছিলো কারে ?

অধরের উত্তরোল বক্তৃতিসু তটে,

অধীর উদ্গীর কার স্বপ্নের পটে,

ফুটেছিলো কি বর্ণিল উজ্জ্বল অভাষ

কামনায় ছেঁতে-বাওয়া অবশ্য-আকাশ।

নিদ্রাতীন ভীকু বিহঙ্গম,

মহয়া পলাশ আর দেবদারু-বনে

উদাস হাওয়ার এলোমেলা আলাপনে,

রঙীন পাখর ফুল স্বপ্নার গানে

ক্লান্ত দুটি আঁপি মেলি মধ্যরাত্রে,

স্বপ্নরাত্রে, চেয়েছিলো মৌরে।

অরণ্যানী অচেতন ছিল নিদ্রাঘোরে।

সে নিশীথে আর কারো পড়েছিল মনে

চাঁদ ছিল খেমে যবে একা বাতায়নে ?

যে আমারে চেয়েছিল, বৈধিছিল বাসনা মায়ার,

সে চাঁদ কি ছিল তার সীমন্ত-সীমায় ?

হুঁ-নয়ন তন্ময়ন, ইতস্তত কুন্তলের ভার,

খোলা জানালার চাঁদ, আর খোলা স্বপ্নের দ্বার।

বনানীর পাহাড়ের স্বপ্নার গান,

যত মোর আকিঞ্চন—উত্তরোল প্রাণ

মিলেছিলো তারি স্বপ্ন সাথে,

আর চাঁদ জেগেছিলো রাত্রে।

রোমাঞ্চকর বটে! কিন্তু মড়াইয়ের এই বিগত একটা বছরের সকল কৃষ্ণান্ত অমূল্য নয় খুব।

গড়ায় কাজে জড় বাধা দূর করার সুদীর্ঘ আছে বিজ্ঞানের। সে বাধা উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে সময় লাগে না। ছ আর একটা বাধাও আছে। যা জড় নয়, কিন্তু অনেক বেশি টোল, অনেক দুর্ভেদ্য। শতাব্দী কালের সঞ্চার আর অজ্ঞতায় য় ভিৎ নড়ে না। যুগ-যুগান্তের অবিধাস আর অকৃত্য গুতে লো পড়ে না। অনাগত কালের আশ্বাসে তার বাঁধন টলে না।

এই জীবন্ত মানুষদের অস্বপ্নপূর্ণ আঁধার তপস্যা উদ্‌ঘাপনের মত না নেই কারোই। ওদের সেই সম্মিলিত তমিস্র-প্রাচীর বিনীর্ণার মত ছোট একখানি বিশ্বাসের প্রদীপ ছাড়ে পারে এত আলো টি বিজ্ঞানের আগুনে। সে প্রদীপ অস্ত্রের স্পর্শ-পিপায়। জ্ঞানের নয়। কিন্তু এই স্রস্রের স্পর্শ থেকে আজীবন বঞ্চিত ওরা।

মড়াইয়ের ধারে ধারে, পাভাড়ের গায়ে গায়ে, ঘন জঙ্গলের কাঁকে কে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যে ভনবসতি গলুড় উঠছিল তাব সখ্যা কম। প্রায় সেডশ' গাম। প্রায় হাজার পনের নারী-পুরুষ। মন্তলা ছিল ছাড়া ছাড়া, মানুষগুলোরও অস্তিত্বের আড়ম্বর ছিল না। সাঁওতাল বটে, কিন্তু শহর বা আশ শহরের বান্দালী-বৈধা ওতালদের সঙ্গে তাদের তফাৎ অনেক। তাদের হাবভাব, চালচলন, ইনীতিতে সমতলভূমির নবম কমনার্যতার ছোঁয়া লাগেনি য়ন।

কিছু একটা হবে এখানে, অনেক দিন ধরেই তারা তার আভাস ছ। তোড়জোড় দেখছে। সাক্ষ্যসংগ্রাম দেখছে। মাতঙ্গর মড়াইদের মুখে রূপকথা শোনার মত শুনছেও কিছু কিছু। কিন্তু ক বুঝে না। যারা বলছে রূপকথা তারাও না, যারা শুনছে াও না। তাই হঠাৎ একটা প্রলয় দেখল যেন তারা। আর কুট-বৃক্স। এর থেকে সৃষ্টির হৃদয় ওরা পাবে কেমন করে? সখল তারই আঁচ লাগল মনে। কানাকানি শুরু হল নিজেদের। ছোট থেকে বড় হতে লাগল কানাকানির গতি। বিষয়। জিজ্ঞাসা ছাড়াও কু প্রতীবাদের ছাপ পড়তে লাগল মুখে।

বিজ্ঞানের আসল দৃষ্টির ওরা সামনাসামনি পায় না। ও না। কিন্তু তাদের চোচামুণ্ডের সাক্ষ্য পেতে লাগল। তে লাগল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলো তারাই। কারণ, চালু করতে হলে ওদের চাই। ওদের বিশ্বাস চাই আর গভর। মড়াইয়ের কাছ থেকে ওদের সগানো চাই।

কিন্তু এই সৃষ্টিমাহাত্ম্য ওদের বোঝানো পাকা কারিগরের পক্ষেও াধ প্রায়।

—যারা মড়াই তোমাদের কুলে কুলে কুলে উঠবে, কৈশে উঠবে। য় চোখ বার মড়াইয়ের জলে সব ডুবে যাবে। আশপাশ থেকে, গছ থেকে ভাড়াভাড়া সব সবতে লাগো তোমরা।

—তোমাদের জায়গা-জমি ঘরবাড়ি?

কিছু ভাবনা নেই। সরকার দেবে। ক্ষতিপূরণ দেবে। নতুন ঘরবাড়ি তোলার খরচ দেবে। দেবে কেন, সিদ্ধেই। তোমরা গে যাও। দূরে গিয়ে গ্রাম বসো, ঘর-বাড়ি তোলো। আর সে এসে মড়াই ঈশ্বর কাক্স লাগা।



## প ত্র ত পা

আন্তোষ মুখোপাধ্যায়

হস্তায় টাকা পাবে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে। বার গভর আছে সেই এসে।

জলের কথাই হাদের মন ভিজছিল তারাও বিগড়ে গেল আবার।

ঘড় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!

ঘর-বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে!

এ প্রস্তাবের সঙ্গে ওদের আশয় নেই কোন। সৃষ্টির ইতিহাস থেকে অদৃষ্ট ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এই মর্ত্যভূমির দিক্-বিদিকে। অবশ্য মর্ত্যভূমি বলতে যেটুকু ওরা বোঝে তার গতি খুব বড় নয়। কিন্তু তাদের সেই পৌরাণিক অভ্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকে তারা শুনে আসছে এই ঘর-ছাড়ানি দেশখোয়ানি বিবিলিপি কথ। সৃষ্টি থেকে বনজঙ্গলের বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে মাটিকে বাসের উপযোগী করেছে নম্বকি তারা। কিন্তু বাঘাবর জীবনের অভিশাপ লেগা ওদের কপালে সেই আদি যুগ থেকে। সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানে না, কিন্তু বিশ্বাস করে। তাই বসতি ভাঙ্গের আভাস মাত্র অসহিষ্ণু ক্ষোভে প্রায় হিংস্র হয়ে ওঠে ওদের মূর্তি।

এই বিক্ষোভের আর একটা কারণ আছে। আর সেটাই বোধ করি সব থেকে বড় কারণ।

অবিশ্বাস।

সভা মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস। বনের হিংস্র বাঘ-ভালুককে তারা ভয় করে না। কিন্তু এই সভ্যতাকে করে।

তাদের এই নিকষকালে দেহের ভিতরে কোথাও এতটুকু কালোয় আভাস মাত্র ছিল না। ওদের ওই কালো বুকের মধ্যেই ছিল খোলা আকাশের বস্ত্র সরলতা। কিন্তু সেই শাল বিশ্বাসের ওপর মাতল চড়িয়ে চড়িয়ে সেটা বাঁকরা করে দিয়েছে এই সভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষ। হিংস্র নরখন্ড মেলে একদা যারা সর্বথ গ্রাস করতে চেয়েছিল। যারা সর্বথ গ্রাস করতে গিয়েছিল।

পূর্বপুরুষদের সেই রক্ত-বরা দিনের কথা ওরা আজও জেনেনি। ওরা কোন দিন ভুলবে না বোধ হয়।

নিজেদের শক্তিসামর্থ্য দিয়েই একদিন ভরা প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিল তারা। কারো প্রত্যাশার বসে থাকেনি কোন দিন।



পরদেশী শাসন ব্যবস্থা। তাদের চাষের জমির ওপর আশী হাজার টাকা মাসুল ধার্য করেছিল সেদিনের রাজপ্রতিনিধি পণ্টেকট।

সেইখানেই শেষ নয়।

কোথা থেকে এলো তারপর এই সভা মণ্ডলের দল। তাদের লোভন্য দৃষ্টির অর্থ তখন হুবাংগা ওদের কাছে। ওরা সয়ল, ওরা কুটিলতা বোঝে না, তার মাশুলও দিতে হবে বই কি! মহাজনের খলে নিয়ে বন্ধুর নামাবলী পরে আগমন ঘটতে লাগল তাদের। প্রলোভনের সামগ্রীতে তাদের আড়ত ভরা। সেই যুগকারে ওরা গলা বাঁধিয়ে দেবে না তো দেবে কারা?

—হুগ চাই? নাও না গো, তোমাদের জন্তেই তো। তবে বড় দামী জিনিস—আচ্ছা এক গাড়ি ধানের বদলেই নিয়ে যাও ওই হুণের চাউটা—কিন্তু বাপু পরের বারে আর অত সম্ভায় পাছনি, এক কলসী ঘি দিতে হবে এর পর।

—কি চাই, এই একজোড়া পায়রা? বদলে দেবে কি, ওই একজোড়া বলদ মাত্র? আচ্ছা, নিয়ে যাও ভাই, নিয়ে যাও।

নিষ্ঠুরতার মাত্রা বাড়তে লাগল।

ঘি মাশার পাত্রটা তলায় ফুটো কি না, সেবের বাটখারা পাঁচ-সেরী হয়ে গেল কি না, সে ওদের কে বলে দেবে?

কিন্তু এ-ও তাদের যথাসর্ব্ব নয়, যথাসর্ব্ব চাই যে।

—কি চাই ভাই, টাকা? ধার নেবে? খুব ভালো, খুব ভালো, দরকার হলে নেবে বই কি টাকা ধার—ওই জন্তেই তো টাকা।

এই শেষের টুকুর জন্তেই বসে ছিল যেন।

বাঘে ছুঁলে আঠের ঘা। কিন্তু এই মহাজনেরা ছুঁলে কত ঘা? কশ-কশ ধরে সে ঘা আর শুকায় না।

—বশ টাকা ধার নেবে? তাহলে পনের টাকা লিখতে হবে।

টাকা শুভেতে এসেছে? কত টাকা দেবে? পনের? দাঁও, আর সেই সঙ্গে হুদটাও দিও। হুদ কেন? এই যে পনের টাকায় টিপসই দিয়েছে ভাই। আসল দেবে, হুদ দেবে না?

না দিলে আদালত আছে। আর সে দিনের সেই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এই জীবন্তলোর কাছ থেকে টাকা কি করে আদায় করতে হয়, সে ওরা ভালই জানে।

পঁচিশ টাকা এক বার যে ধার নিলে, এই মর্ত্য জীবনে সে আর তার ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারল না। তার ছেলেও না, তার ছেলেও না। এই করে ওদের জমি গেল, বাড়ি ঘর, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া, খালাবাটি সব গেল। নিজেরাও বাঁধা পড়তে লাগল তার পর। বাঁধা পড়তে লাগল চির দাসত্বের শিকলে। দুর্ভিক্ষ জার হতাশা হল জীবনের সঙ্গী। অগ্রা কাজ করে ঋণ পরিশোধ করতে তারও উপায় নেই—মহাজন সঙ্গে সঙ্গে নাকে দড়ি পরিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। আর সেখানে তাদের পরাজয়ের পান্ডারানা লেখাই আছে।

পালাবে?

পালাবে কোথায়?

কত দূরে?

বাড়তেই লাগল এই দাসের সখ্যা। আবর্তিত হতে থাকল দাসের মর্ম্মহেঁড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এমন দিনে খষর এল, অদূরে 'লোহার বোড়া' চলার রাস্তা

বসাচ্ছে সাগা চামড়ার সাহেবরা। অর্থাৎ, রেলপথের মাটির কাজ শুরু হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মহাজনদের বেঁড়ি পায়ে পড়েনি এমন ব্যাটা ছিল, মজুরি খেটে কৌচড় ভরে টাকা নিয়ে আসতে লাগল তারা। শিশু, নারী, শ্রদ্ধা স্বকলৈ। সাড়া পড়ে গেল একটা। জম-কাতর নয় তারা।—চল, চল, চল তোরা সব—ঋণ গুণবি তো সবাই চল এবার।

কিন্তু ঋণ পরিশোধ হলে মহাজনদের চলবে কেন? ঋণদায়ে আত্মবিক্রীত ক্রীতদাসেরা চলে গেলে এ দিকের কেতমজুরী কবে কে? মহাজনদের শিকল হিংস হয়ে উঠল আরো।

ওদের এত কালের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর ফুলিঙ্গ দাবানলের মত অলে উঠেছিল তার পর।

ওরা প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করেছিল সেই স্বৈত-শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ রক্তের অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়।

ওরা মরেছিল। আর মেরেছিল। ওরা বন্ধ দিয়েছিল। আর রক্তপান করেছিল।

'রাক্ষসী' বাটের নীচে কপট দাবোপার দেহ উপদেবতা-প্রধান সূর্য্যদেব 'জমছিম বোঙ্গার' উদ্দেশ্যে বলিদান দিয়ে বক্তৃতাশপ শুরু করেছিল তারা। 'রাখসা খানের বট', এই একশ' বছরেও নব-রক্তে ভেজা শিকড় কি তার শুকিয়েছে?

এক লক্ষো কাঁপিয়ে পাড়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে তার পর। পরাজিতও হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? নিলেটো ভুতুর পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুক থেকে মুছেবে কোন দিন? সভ্যতার বুক থেকে এই বিজেতী কালো মানুষদের পায়ের দাগও মিলাবে না কোন দিন।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে ওরা। ইতিহাসের সেটা স্থল অধ্যায়। পরাজিত হয়েছে ওদের অধিনায়ক নেতা সিহু আর কাহু। জাতির উপাশ্র দেবতা 'মার্যা বুক'র আবির্ভাব ঘটতেছিল না কি তাদের মধ্যে। তারা নিজেরাই সেদিন প্রচার করেছিল এক কথা। অন্ধবিধারীর বুক বিপ্লবের আগুন জ্বালতে হলে এই বজ-নির্ধোষ ছাড়া আর গতি ছিল না কিছু। প্রাণ দিয়েছে সেই 'মার্যা বুক'-প্রতীক সিহু কাহুও। কিন্তু এই নিরক্ষর মানুষদের বুক দেবতার আবির্ভাব সত্যিই কি ঘটেনি সেদিন? দুর্ভাগ্যবীর বিনাশ সাধনে যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব মানুষের বেশে—সে তবে কী—? সে তবে আর কেমন করে হয়?

সেই শতাব্দী কালের আবির্ভাবের দ্বারা আজও তাদের ধমনীতে বইছে।

হঠাৎ একটা সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ একটা জাগরণ এলো। হঠাৎ একটা আলোড়ন এলো। ছাড়া-ছাড়া গ্রামগুলো একটা মিলিত স্বার্থের সন্মুখো এক সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল যেন। স্বার্থে নয় ঠিক; আশঙ্কায়। আশঙ্কায় আর উত্তেজনে।

সমবেত উচ্ছ্বসের কথাটা শুনে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেল যেন সকলে। তার পর একটু করে সচেতন হতে লাগল তারা। কোন প্রস্তাব নয়, কোন দৃষ্টিপন নয়—সরকারের নোটিশ জারী হয়েছে একেবারে। কড়, কঠিন, বাস্তব। মুগ্ধের ঘায়ে হুম ভাঙানোর মত।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতি গাঁয়ের 'মাঝি' আর 'পারাগিক'রা উৎসবে ব্যসনে রোগে শোকে মাঝি গাঁয়ের মাথা। পারাগিক তার



প্রধান সহকারী। একদা তারাই ছিল গায়ের হর্গ-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সে প্রতিপত্তি অনেকটাই স্থিতিত। তাই যোগ্য স্থানে পোনেই নিজেদের অস্তিত্ব কড়ায় গলুয় জ্ঞাপিত করে থাকে তারা। কিন্তু এমন একটা গুরুতর ব্যাপারের তাদ্রা খেয়ে কেবোরে যেন হকচকিয়ে গেল। পদমর্যাদাধী মুখোঁস খসিয়ে নিজেদের খ্যাতি অর্থাৎ, বিভিন্ন গায়ের মুকরিরদের মধ্যে একটা সাংযোগ স্থাপনের যা ছোটোছুট শুরু করে দিল তারা।

ঝড় যখন আসে শুধু তখনই মিতালি হয় বেধ হয় বনস্পতির স্রব্দ ভুজ্জ তৃণলতায়ও। এই ঢালা উচ্ছন্ন সম্ভাবনার আঁচ লাগল তারা এক দলের গায়ে—যারা এদের দলগত নয় ঠিক। যারা শিক্ষিত বা আধা-শিক্ষিত। যারা ভদ্রলোক এক আধা-ভদ্রলোক। বস্ত্র পরিবেশ ছুড়ে এককম গৃহস্থ-বসতিও একেবারে কম নয়! তবু থেকে মুকরিরদের শলাপারামর্শ দিতে লাগল তারা। একত্র বাসের ফলে এদের ওরা সম্মত করে না, অবিশ্বাস করে না। বা বলল, একসঙ্গে কণে পীড়াও তোমরা, কিছুতে বাস্তবীতে ছেড়ে তে রাজি হয়ে না।

বোঝ সাড়পরে মিটিং হতে লাগল এর পর। আজ এই হাটে, ল ওই হাটে। বিপত্তে দেব না আমাদের মড়াই, মড়াইকে আমরা সবাদি, ভক্তি করি—মড়াই বাদলে অধর হবে আমাদের। উপকার হবে মড়াই বেঁচে? তোমরা কেউ কাজ কোরো, কেউ তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিও না। কিন্তু দিন ছে।

যে রাজশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পুরুষেরা অস্ত্র ধরেছিল এক দিন, ব থেকে দিন অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক বদলেছে। ন ওদের অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিজ্ঞান দুর্গমকে অনেকটাই ম করে আনার ফলে ওদের সেই অটুট বিজ্ঞানতার সুযোগ-বণেও অনেকটাই দটে গেছে। ওরা রাজনীতি বোঝে না, রাজনীতির অমোঘ গতি উপলব্ধি করে গানিকটা।

তাঁই গায়ের মারি মাতরদেরা চিন্তিত। চিন্তিত সকলেই। হবে? ভাল হবে কি মন্দ হবে? গা ছেড়ে যাব না বলছি, ম না গিয়ে পারব কেমন করে? বাধা দেব কিন্তু কেমন করে? আর চিন্তিত পাগল সর্দার।

পাগল বলতে পারে না, বলে পাগড় সর্দার। সর্দার পদবী নয় ছু। ওটা অমানি চলে আসছে। মারি নয়, মুকরি নয়, গণিকও নয়—তবু সর্দার।

‘মারি বুক’ প্রতীক সেই সিঁহ কাঁহুর ডান হাত ছিল নাকি র কোন পূর্ব-পুরুষ। সেই পুরুষের বংশধর। ওপরওলার রীতি চর! সেই তমসাজ্জর অন্ধ বিশ্বাসের যুগেও ছুটি মাহুরের বুক গছিল যেন চেতনারূপী হৃৎসেনা। আজকের এই কর্তব্য-বিমুঢ় লাড়নের মধ্যেও একটা শুভ চেতনা বার বার উকি-ঝুঁকি দিতে লি যে মাহুরটির অস্ত্রস্তলে সে এই পাগল সর্দার।

ভাবছে পাগল সর্দার। ...ভাবছেই।

ওরা বলছে জল হবে। ওরা বলছে জলের অভাব ঘুচবে। হবে না কে জানে? ঘুচবে কি না কে জানে? ...কিন্তু চেষ্টা হবে। চেষ্টাটা যদি না হয় তা’হলে? মাটি খাখী করছে, তাই করবে। ঠর নাচে আগুন জ্বলে, তাই জ্বলতে থাকবে। মাটির দানায়

হুড়িক লেগে আছে, তাই লেগে থাকবে। মাটির কাটলে উপোস বাসা বেগেছে, তাই বাসা থাকবে। তা’হলে? তা’হলে?

তা’হলে কিছু করা দরকার। কিছু না করলে কিছু হবে কি করে? সেই কিছুই তো করতে চাইছে বাবুরা। সেই কিছুই চেষ্টাই করতে চাইছে। তবে আর বাধা দেবে কেন? কি লাভ হবে বাধা দিয়ে। কি পাবে তারা? আজ পাবে না। না, কাল পাবে না, কোন দিনই কিছু পাবে না। ভরসা তো শুধু স্বর্ণগার জল। কিন্তু সে ভরসা কতটুকু তা’তো বছরের পর বছর হাড়ে হাড়ে বুঝছে। তবে আর তারা কেন দেবে বাধা?

অগ্রগতদের ডেকে এই কথাই বললে পাগল সর্দার।

এই সাদাসিধে কথাটিই বোকাগেল। দলছাড়া স্বতন্ত্র মানুষ পাগল সর্দার। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই তারা ছেলে-ছোকরার দল। একদা ডাকসাইটে শিকারী ছিল মাহুরটা। শিকারে বেরোনো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে। প্রৌঢ় ছাড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা’ বাড়িয়েছে। কিন্তু শিকার করা ছেড়েছে তার অনেক আগেই। অসময়ে ছেড়ে দিয়েছে এই একমাত্র বিলাস। তবু তার শিকারের গল্প তরুণ উত্তমীদের মুখে মুখে কেবো আজও। তারা দেখেনি। কিন্তু শুনেছে। শুনে আসছে।

হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল প্রায় সর্বত্র।

পাগল সর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে ঘুরে সরে যেতে রাজি হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিল আরো অনেকে—মাথার ওপর ঘাদের বয়স্ক অভিভাবক নেই বিশেষ করে তারা। শুধু তাই নয়, পাগল সর্দার এদের নিয়ে মড়াই বিপার কাজে লাগতেও নাকি রাজি হয়েছে।

ভিটে-মাটি ছাড়তে রাজি না হলেও জোর করে ছাড়ানো হবে হয়ত, এই ক’দিনে প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে সেটা। কিন্তু তা’বলে ওদের সঙ্গে গিয়ে কাজে লাগা! কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, মারির অগ্রহণিত না নিয়ে!

পাগল সর্দার বেইমান! পাগল সর্দার বিশ্বাসঘাতক! পাগল সর্দার অধ্যমিক!

বস্তুচকু মাতরদেরা এলো কৈফিয়ৎ নিতে। পাগল সর্দার কৈফিয়ৎ দিল। তারা বলল, ননী বাঁধলে অনেক ক্ষতি হবে, অনেক লোক মারা পড়বে। ও বলল, অনেক লাভ হবে, অনেক লোক বাঁচবে।

রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে গেল তারা। মারির পঙ্কাজি বৈঠক বসে অবিলম্বে। একঘরে করা হল পাগল সর্দারকে। কাপড় চাশমা তেল সব বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

কিন্তু এই করে পাগল সর্দারকে এঁটে ওঠা যাবে না। এ বোঝে মাতরদেরা। সরকারের কাছ থেকে সহই পাবে সে। অর্থাৎ বেশি পাবে। আর শায়েস্তাই বা করবে কি করে, সে একা এক দল জোয়ান মরদ আছে তার দিকে।

মারির বিষম রাগ পাগল সর্দারের ওপর। এই ব্যাপারে নানা অনেক আগে থেকেই। কারণও আছে বিশেষ। ও লোক জল ঘরের শান্তি মান-সম্মত সবই নষ্ট হচ্ছে তার।

অশান্তির কারণ তার নিজের সন্তান হোপুন আর পাগল সর্দার মেয়ে চাকমণি।

মরদের মত মরদ ছেলে। অমন ছেলের গর্বে বাপের ছাতি ফুলে ওঠার কথা।' কিন্তু তাকেও ডুক করেছে লোকটা। আর তার মেয়েটা। ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। 'ছাড়ই কুড়ী।' ফুলমণি। স্বামী ছেড়ে পালালো মেয়ে ফুলমণি। পরপুরুষের সঙ্গে 'আপাসির' হয়ে গেছে ফুলমণি। অর্থাৎ, নিকুদেশ হয়ে গেছে। 'আপাসির কুড়ী'—বরছাড়া মেয়ে। ওরা বলে, ঘর ছাড়া মেয়ে সবুজ বুলবুল, হাজার বকম ডাকে। ঘর ছাড়া মেয়ে ময়না পাখী, মাথায় কেবল বাহার। সেই ঘর ছাড়া ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। যত গোলযোগ, যত আপত্তি, যত বাধা এইখানে। এ সব ঘর ওদের সমাজে হয়। আর মাঁঝির ছেলে হয়ে কি না হোপুন ওই মেয়ের পিতাশে বসে আছে।

এক কালে পাগল সর্দার শ্রাস্তার পাখি ছিল সকলের। গাঁয়ের মাঁঝি না হোক অল্প বয়সেই 'জগমাঁঝি' যে হোত কোন সন্দেহ নেই। কাকে বলে জগমাঁঝি? এক কথায়, গাঁয়ের যুবক-যুবতীদের সর্দার। গ্রামে যাতে লজ্জার কোন কারণ না ঘটে, স্তন্যময়ের হানি না হয় সেটা দেখার গুরুদায়িত্ব জগমাঁঝির। ছেলেমেয়েরা তাই জগমাঁঝির কথায় ওঠে বসে, সর্দার তাকে সম্বল্ট রাখে।

কিন্তু বার ঘরে অমন কলঙ্ক সে আর জগমাঁঝি হবে কেমন করে? উটে সমাজচ্যুত হয়েছিল। নেহাৎ পাগল সর্দার বলেই অল্পের ওপর গিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। 'জনজ্ঞাতি' হল আবার, সমাজে উঠল। কিন্তু ওদের সমাজে 'ছাড়োয়া' পুরুষের 'পরেও লোকে সম্বল্ট নয় তেমন। ছাড়োয়া মানে স্ত্রী-পরিত্যক্ত। বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দেয় না এদের সঙ্গে। কুমারী মেয়েরাও চায় না এদের ঘরবী হতে। বলে, ছাড়োয়া পুরুষ চাখা হাতা, কে জানে কয় দিন! কিন্তু সব নিয়মেরই আবার ব্যতিক্রম আছে। পাগল সর্দার সেই মৃত্তমান ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম বলেই সমাজের বন্ধনশীল মুকুন্দেরা সহ্য করতে পারে না ওকে, বরশাস্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারত পাগল সর্দার। ছাড়োয়া হওয়া সম্বন্ধে। কুমারী মেয়েই পেত। তালুক দেওয়া মেয়ের সন্ধান করতে হত না। শুধু তাই নয়, যে লোকের ঘরে এত বড় কলঙ্ক, সমাজে উঠলেও আজীবন তার মাথা নীচু করেই থাকার কথা। কিন্তু পাগল সর্দারের বেলায় নকলে যেন সেটা ভুলেই গেছে। জগমাঁঝি না হলেও সামন্ত ছেলে-মেয়েগুলো তার কথায় ওঠে-বসে। লোকটা বাছ জানে না তো কী? 'তানু না তো কী? আগের দিনে ডান-এর নাগাল গেলে মারপিট করে একবারে শেষ করে সিত তারা।' কিন্তু এখন সেটা করতে গলে হাকিমের বিচারে উর্টে তাদেরই জেল হয়ে বাবে। হাকিমরা সব বোকে, কিন্তু ডান বোকে না।

তবু সবই সহ্য হত মাঁঝির। সবই ক্ষমা করত, যদি না নিজের অমন ছেলেটার এমন সর্বনাশ করত ওই লোকটা আর তার ছাত্র মেয়েটা। বাপ-ছেলের এই নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। ফুলকে মনে মনে ভয়ই করে সে। জোয়ান ছেলে, কালো পাখের দাঁদা বুকচিড়ানো ছেলে—কথা বেশি বলে না, মরা চোখে মুখের ক্রমে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু তাইতেই অসম্ভব লাগে কেমন। নিশ্চয় হয় ওর চোখ, তত বেশি অসম্ভব।

বিয়ে এত দিনে হয়েই যেত। চাঁদমণিকে এত দিনে কবে এনে ফুলত হোপুন। কিন্তু কেন যে সেটা হয়নি সেটাই

মাঁঝির বিষয়। কেন মত দেয়নি পাগল সর্দার। মাঁঝির মত নেই বলে? কিন্তু কার মতামতের দার ধারে হোপুন! বিয়ে তো একরকম ঠিকঠাক হয়েই আছে। পাগল সর্দার নাকি বলেছে, ছোমার বাপ এসে আমাকে বলুক, ষথাবিধি মর্দাদা দিক—তারপর হুবে বিয়ে। ওদের সমাজে মেয়ের বাপেরই মর্দাদা বেশি। কিন্তু প্রচণ্ড সাহস আর সৈমাক লোকটার! আরো বলেছে। বলেছে, মত না দিলেও হবে বিয়ে, কিন্তু সবুর করো, অত তাড়া কিসের—নিজের তাহ'লে আলাদা ঘরবাড়ি তোলো, জোতজমা করো—বোজগারপাতি করো।

সবুর করেই আছে হোপুন। এর বেলায় ছেলের অসীম ধৈর্য। ছেলের বাপ নিজে গিয়ে না বলুক, পরোক্ষ মত দিতেই হয়েছে। গাঁয়ের মাঁঝি সে, প্রধান কর্তা ব্যক্তি, নিজের ঘর নিয়ে গণ্ডগোল হোক একটা, কথা বলুক পাঁচজনে সেটা চায় না। কিন্তু তবু বিধিমা্ত আজও মেয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার। মাঁঝির ধারণা, কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে এর পিছনেও। নইলে এভাবে ওই সোমন্ত মেয়ে আগলে বসে আছে কেন? হোপুনের হাতে যা হোক করে মেয়ে গছাতুঁ পারলে গাঁয়ের যে কোন লোক বর্তে যেত।

কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এই লোকটাকেই এক দিন বেয়াই বলে ডাকতে হবে মাঁঝিকে। কুটুস্থিতা করতে হবে।

মড়াই বাঁধা নিয়ে এত বড় স্বযোগ সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে একটু আশাশিত হয়ে উঠল মাঁঝি। হয়তো এই স্বযোগে সব বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এ স্বযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে না মাঁঝি, ছেড়ে কথা কইবে না।

যা দেবার স্ববর্ণ মুহূর্তও বটে।

অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তায় ছেলে বড়ো, নারী, পুরুষ সবাই তখন বিচলিত। সকলের মনেই সংশয়। সকলের মনেই ভয়। এরই মধ্যে এক জন সরকারের দলে গিয়ে হাত মেলালো, সেটা সহ করা কারো পক্ষেই সহজ নয়। সহকর্মীদের কেউ ধম্বাট ভাঙলে যেমন হয়, তেমনি নির্মম হয়ে উঠল সকলের মনের অবস্থা। ওরা বাধা দিচ্ছে সরকারকে। কিন্তু সে বাধাটা যেন প্রথম ফুটো করে দিলে পাগল সর্দার।

প্রতিশোধ চাই! নির্মম প্রতিশোধ!

ধমনীর রক্ত ওজের টগবগ করে ওঠে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেও পারছে না। একদল ছেলে বিয়ে আছে ওকে। অনেকেই গিয়ে ভিড়েছে ওর দলে। শুধু দলে ভেড়ি নয়। বাঁধের কাজেও লেগে গেছে দস্তর মত। সপ্তাহে মোটা পয়সা বোজগার করছে। তবু চাই প্রতিশোধ! ওরা মন শাণায় আর অস্ত্র শাণায় আর স্বযোগ খোঁজে।

ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাবল গাঙ্গুলির।

ছক মত কাজ এগোচ্ছে না। ষাষতীয় সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে না। প্রথম প্রথম গায়ে মাখেনি। বিস্কোভ একটু আঁধাটু দেখা দেবে জানতই। নিজের ভালো যদি বুঝতে শিখত ওরা, তাহলে এত কাল ভুগতো না। সরকারী পরোয়ানায় জোরেই এসব ছোটখাট বাণাবিধ নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে।

কিন্তু না ওরা এসে কাজে লাগছে, না জায়গা জমি ছেড়ে নড়ছে সকলে।

অবশ্য বাইরে থেকেও হাজারে হাজারে মঙ্গল চালান হয়ে  
যাবে এখানে। কিন্তু সবার আগে স্থানীয় লোকেরই দরকার।  
জল সাফ করে কুলি-কামিনের বসতিতে একটা ব্যবস্থা হলে  
বাইরে থেকে যথেষ্ট লোক চালান নিয়ে আসা যায়। দশ  
মাইল এদিক-ওদিক থেকে যারা আসছে তাদের সংখ্যাও খুব কম  
। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তা'ছাড়া ঠিক  
য়ে কাজও করতে পারছে না তারা, হামলায় ভয়ে তটস্থ আছে।  
গাঁয়ের মুন্সিবদের প্রথমে ডাকা হল, বোঝানো হল, প্রলোভনও  
নো হল অনেক। সরকারী নোটিসের প্রকৃতিও বাদ গেল  
তারপর, কর্মচারীদের ওপর আস্থা না রেখে বাদল গাঙ্গুলি  
গেল তাদের দরজায় দরজায়। স্থানীয় ভ্রমলোকদের অহুয়ো  
মধ্যস্থতা করত। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়ে উঠছে না।  
মামুষটা নির্ভর নয় খুব। কিন্তু একটা যান্ত্রিক ষোঁকে কাজ  
যায় যেন। কাজের বেলায় তার আপস নেই কারো সঙ্গে,  
র সঙ্গে। তাই ওদের এই অব্যবস্থা বিরক্তির কারণ হয়ে  
ছে। কাজে বাধা পড়লে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ওড়ানোর  
সঙ্গে ওদেরও নিঃশেষ করে দিতে পারে হয়ত! সম্ভব নয়  
ই মেজাজ চড়ছে আরো বেশি।

এমন দিনে দলবল সহ পাগল সর্দারের আগমনে বাদল  
লি ঠাণ্ডা হল কিছুটা। ভাবল, এই করে আস্তে আস্তে  
লই বসীভূত হবে। আসা মাত্র মোটা মজুরিতে বাহাল করে  
সর্দারকে এবং তার অধীনে আর সকলকে।  
কিন্তু সেদিন লোকটাকে দেখেখি বাদল গাঙ্গুলি, তার আসাটাই  
করে দেখেছে। দু'দিন না যেতে লোকটাকেও দেখল ভালো করে।  
দিন দুপুর।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাজ করছে মাত্র শ'দেড়েক লোক।  
৫ বারের পাহাড়-উলানো পাথরগুলো নাচে গড়িয়ে বেলা হচ্ছে।  
তারাও আসেন। তদবীথ-তদারক করছেন, মাপজোখ  
ছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় সারি সারি কোয়ারটার হবে  
সর, রাস্তা তৈরি হবে—তার পর আসল কাজ।

দূরে 'দূরে ঝাঁক বেধে এসে দাঁড়াল প্রায় তিন চারশ' গ্রাম্য-  
। চিংকার চেঁচামেচি হটগোল শুরু করে দিল তারা দূর  
ই। কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না খুব। কি অস্ত্র আছে  
কাজে জানে না বলেই বোধ হয়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল  
কের সকলে।

ওদের বিজ্ঞোভূতু উপলব্ধি করছে বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু চিংকার  
কি যে ওরা শাসাচ্ছে কিছুই বুঝছে না! ওদের নিজস্ব ভাষা  
না। কেবল পাগল সর্দারের নামটাই কানে আসতে লাগল  
বার। বায়নাকুলারে চোখ লাগলো বাদল গাঙ্গুলি। না,  
নেই কারো সঙ্গে।

এক জন এসে জানালো, পাগল সর্দারকে পেলে ওরা ছিঁড়ে  
, সেই কথাই বলছে।

অদূরে বেধানটায় পাগল সর্দার কাজ করছে দলবল নিয়ে, বাদল  
লি পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। কোদাল-শাবল-গাঁইতি  
; তারাও দাঁড়িয়ে আছে চূপ-চাপ। দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুনছে।  
ওদিকের চেঁচামেচি বাড়াচ্ছে।

হঠাৎ বাদল গাঙ্গুলি দেখল, এসেই এক জন ঠক্ করে হাতের  
কোদাল ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বিজ্ঞোভকারীদের  
দিকে। অনেকটাই এগিয়ে গেল। তার পর বেশ উঁচু একটা পাথরের  
ওপর উঠে দাঁড়াল সে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মতই।  
হোপুন—!

প্রতিপক্ষের চেঁচামেচিতে আস্তে আস্তে একটা ছেদ পড়ে গেল  
যেন। কিছু একটা বিষয়ের কারণ ঘটল যেন তাদের। ক্রমশঃ  
একেবারেই চূপ করে গেল তারা। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ—নিজস্বের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে  
লাগল তারা। তার পর ফিরে চলল।

হোপুন আস্তে আস্তে দলে ফিরে এলো আবার। কোদাল তুলে নিল।  
দলের এক জন বাদল গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।  
হোপুনকে এই দলের মধ্যে দেখে অবাক হয়েছিল তারা। গাঁয়ের খোদ  
মুন্সিবর ছেলে হোপুন। তাই ফিরে গেল। এবারে মুন্সিবদের  
বৈক্য বসবে, পরামর্শ হবে, তার পর যা হয় ঠিক করা হবে।

বাদল গাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করে দেখল মুন্সিবর ছেলে হোপুনকে।  
পরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমরা কি করবে?

হোপুন খানিক চয়ে থেকে ক্ষুদ্র জবাব দিল, কামি—  
অর্থাৎ, কাজ করবে।

—কিন্তু ওরা যে তোমাদের ভয় দেখিয়ে গেল?

আবার একটু চূপ করে থেকে হোপুন সাদাসিধে জবাব দিল,  
কুদলে কোরে উদের মাথা কুপিয়ে ঢুব—

দলের কমবয়সী জোয়ানারা সব হেসে উঠল। বাদল গাঙ্গুলির  
চোখ পড়ল সর্দারের ওপর। সর্দার চেয়ে চেয়ে হোপুনকেই দেখছে।  
তার কালো চোখে স্নেহ বরষছে। কিন্তু এ কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া  
চলে না বাদল গাঙ্গুলির। এই লোকগুলো ফিরে গেলে কি হবে  
কে জানে? সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, সর্দার কি করবে তোমরা?

পাগল সর্দার বাংলাটা আর একটু ভালো রপ্ত করেছে। হেসে  
পান্টা প্রশ্ন করল, কেন, তোর ডর সেগেছে?

এরকম বাক্যালোপে অভ্যস্ত নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি  
কিন্তু এ তার কেতাহুরস্ত আপিসের পরিবেশ নয়। ধারণা লাগে  
না। বরং এ পরিবেশে এই যেন ভালো। বলল, তোমরা ফিরে  
গেলেই তো ওরা তোমাদের ধরবে আবার।

কিন্তু সে আর কোদাল দিয়ে ওদের মাথা কুপিয়ে দেবে বলল না  
বলল, ধবে তো বুক চিতাতে ঢুব।

বুক চিতিয়েই দিয়েছিল পাগল সর্দার।

ওই ঘটনার পরে এক মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে প্রকা  
বিক্ষোভ আর কিছু দেখা যায়নি। বরং অনেকেই এসে যোগ  
দিয়েছে আরো। প্রতিদিনই নতুন লোক আসছে কিছু কিছু  
মড়াই-সলগ জন-বসতিও একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে  
ভ্রমলোক আধা-ভ্রমলোকেরা যুগে যে পরামর্শই দিক, মগজ তাতে  
পরিষ্কার। ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্স নিয়ে তারাষ্ট সবার আগে সরে যাচ্ছে  
ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ের মুন্সিবরা সব ভেবে সারা! আত্মবল বাধাধরা শায়  
আর সংস্কারগত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু এ সমস্যা  
সমাধানই বা কি, বিধানই বা কি? আর, তাদের বিধান মানবেই বা  
কারা? যে যার আত্মীয়-পরিজনকেই সামলাতে পারছে না, অন্তরে

বোঝাবে কি করে? বংশগত নিদারুণ দারিদ্র্যের মাঝে কি করে ঠেকাবে এই কাঁচা-টাকার আকর্ষণ? তারা বিধান দিতে পারে, টাকা দিতে পারে না।

সে বরং পারে ওই পাগল সর্দার। কাছে গিয়ে পাঁড়ালেই ব্যবস্থা কবে দিতে পারে। দিচ্ছে ও। একটা ঘর বসতি ছাড়ে তো পাঁচটা ঘর দুর্বল হয়ে পড়ে মনে মনে। ঘরে-ফিরে আবার সকল রাগ গিয়ে পড়ে ওই পাগল সর্দারের ওপর। নিজে সাত তাড়াতাড়ি সর্দারী না করে গায়ের মাঁষি মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে বা হোক কিছু ঠিক করলেই তো হত!

কিন্তু পাগল সর্দারের নাগাল আর পাবে কেমন করে তারা? অনেক আগেই ঘর ছেড়ে মেয়ে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় উঠে চলে গেছে সে। নতুন করে ঘর বেঁচেছে। সেই এলাকার ওদের প্রতাপ খাটবে না। গায়ের ঘর-বাড়ি ছেড়ে ঝাঝি মড়াইয়ের কাজে গিয়ে লেগেছে, তারাই ও এলাকার গিয়ে দল ভারী করেছে।

মনে মনে কিছুটা আশঙ্ক হয়েছিল বাবল গাঙ্গুলিও। পরিবর্তনের গতিটা ধীর বলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারায় নি। সেই দল-বেঁধে চড়াও করার ব্যাপারটাও তুলেই গেছে। আর তেমন গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলেও মনে হয় নি।

কিন্তু আবারও এক দিন থমকে যেতে হল তাকে। নিজে উপস্থিত ছিল না। লোকমুখে আভ্যোপাশিত শুনল।

পাঁচসাত জন মাত্র লোক নিয়ে কিছু দূরে একটা জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল ডাকটস্‌ম্যান নরেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, পাগল সর্দারও সেই পাঁচসাত জনের এক জন। এখানকার সব মাটি, সব পাথর চেনে সে।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হতে পারে কেউ ভাবেনি। তীরধ্বজ আক্রমণ নিয়ে প্রায় জন পচিশেক লোক অস্বাভাবিক পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কখন তাদের লক্ষ্য করেছে, কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খোয়াল করে নি।

এদিকের সম্বল মাত্র গোটাটুককে কোশাল, শাবল। নরেন চৌধুরীর গলায় একটা ক্যামেরা আর তার সহকারীর হাতে নোট বই, কিত্তে, পেন্সিল।

ওই কালো মাঝুনের অটুট সঙ্কর আর প্রতীহিসার একটা হিম শ্মশে সহসা যেন একেবারে স্থির হয়ে গেল সকলে। বোবা-মুত্থার ছায়া পড়ল একটা। তার পরেই সচেতন হয়ে পাগল সর্দারকে ঘিরে পাঁড়াল তার সেই পাঁচসাত জন সঙ্গী। নিজেকে ভাবায় চিংকার করে ভিজ্জালা করল, কি চার ওরা?

দূর থেকে তারা জবাব দিলে, পাগল সর্দারকে চায়—তাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিলে কাউকে কিছু বলবে না, বাকি সকলকে ফিরে যেতে হবে। আর যদি বাধা দেয় তো তীর মেয়ে সকলেরই কলঙ্ক ছুঁড়ে দেবে।

কালঘাম ছুটছে নরেন চৌধুরীর আর তার সহকারীর। পালাবার পথ নেই। পরিত্রাণও বোধ হয় নেই আর। হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষিপ্ত পাগল সর্দার সঙ্গীদের ঠোলে চিংকার করে কি বলতে বলতে প্রায় অশ্রু-শিশি পা' এগিয়ে গিয়ে পাঁড়াল বুক টান করে। তার পর ওদের এই প্রায় দুর্ভাষা ভাষার উদ্ভাসের মত বা বলতে লাগল তার মর্খা—  
কত তীর মারবি মার! আমার কলঙ্ক ছুঁতে করে সব রক্ত ভাইকে দে! কিন্তু আরো অনেক, অনেক রক্ত খাবে মড়াই,

তোদের সকলের রক্ত খাবে—তোদের গ্রামসকলকে কেটে মড়াটিকে রক্ত দেওয়া হবে—এত রক্ত খেয়ে মড়াইয়ের জল ভালো হবে খুব—কত তীর মারবি মার, কত কলঙ্ক ছুঁতে করবি কর!—

পাহাড় পাহাড় যেন গম-গম করতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্তের জঙ্গল বিমূর্ত হয়ে রইল কালাঙ্কর ঘোরে মত যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও। তার পরেই সচেতন হল। ধমকে তীর লাগানোই আছে। একপা'ছু'পা করে এগোতে লাগল তারা। চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ ভ্রলোক দু'টির দিকে। অর্থাৎ, নরেন চৌধুরী আর তার সঙ্গীর দিকে। যাদের আক্রমণ করেছে তাদের নান্দী-নন্দর চেনে ওরা, বোঝে। কিন্তু এই এদেরই ঠিক চেনে না, ঠিক বোঝে না—তাই বিশ্বাসও নেই, কোন মুহূর্তে কি করে ফেলবে!

কথায় আছে, পরমায়ুর জোয় থাকলে স্বয়ং ভগবান এসে বুদ্ধি যোগান। উত্তেজনার বশেই নরেন চৌধুরী ছুঁচোর পা দ্রুত এগিয়ে এসে গলায়-খালানো ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগানো। কেন লাগানো, কি হবে ছবি নিয়ে, সত্যি ছবি নেবে কিনা নিজেও জানে না।

অকস্মাৎ হকচকিয়ে গিয়ে লোকগুলো পিছু হটল খানিকটা। আর বিমূর্ত নেত্রে নরেনও ক্যামেরা নাখালো চোখ থেকে। মাত্র মুহূর্তের জঙ্গল। তার পরেই বিদ্রোহ-কলকের মত একটা চকিত উপলব্ধির বশে আবার ক্যামেরা তুলে নিল চোখে—এগিয়ে গেল আরো পাঁচসাত-দশ পা।

ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্বিগুণ শিখনে সরে গেল ওরা। ভাবল, আগন্তুর মধ্যে পেলোই বাস্তব থেকে লোকটা চুপ্ত অস্ত্র চাড়ায়ে। গলায় ঝোলানো ওই কালো বাস্তবটার ভয়েই এতকণ তারা কাছ আসতে পারছিল না। এদিকেও প্রাণের দায় বড় দায়। মুহূর্তে ওদের দুর্বলতার কারণটা বুঝে নিয়েছে সকলে। চিংকার চোমিচি তর্জন-গর্জন করে উঠল সবাই একসঙ্গে।—দে কড়া দে, দে শিশুদের আঙুলে সব কটার মাথার খুলি উড়িয়ে!

নরেন চৌধুরী চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে পাথরে পাথরে গেল যেতে এগিয়ে চলল, হাঁক-ডাক ছেড়ে অস্ত্রস্বরণ করল অথচরের।

বেগতিক দেখে ছুটছাট সরে পড়ল সামনের ক্ষুদ্র বাহিনীটি।

ওরা বন্ধ, দুঃস্থ!—কিন্তু তেমনি অস্ত্র আর তেমনি সরলও। এলাকায় ফেরামাত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। যে যাব কাজ ফেলে এসে জড় হতে লাগল। এরকম একটা ব্যাপারে জটলা হবে না তো কি!

শুনল বাবল গাঙ্গুলিও। তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে কলগুজব বন্ধ হল ওদের। কিন্তু যে দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, তার অর্থ স্পষ্ট। আমাদের কি সত্যি আশ্রয় দিতে পেরেছে তুমি? সত্যি কি আমরা নিরাপদ?

আবার এরকম একটা বিষয় সম্ভাবনা কল্পনাও করেনি বাবল গাঙ্গুলি। জটলার মধ্যে শুধু পাগল সর্দারই বিচলিত হয় নি মনে হল। আর চেনে হোপুনকে। মূর্তির মত এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেও!

বাবল গাঙ্গুলি তাদের কিছু বলা বা আশ্বাস দেবার আগেই আর একটা মূর্তির আকির্ভাব খটল সেখানে।

নারীমূর্তি। নিকষ কালো। স্বল্প আচ্ছাদন বিদীর্ণ করে সারা অঙ্গের উদ্ভত যৌবন উপহ্ন পড়তে চাইছে।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমাণি।

নির্মিষেব নেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাপকে দেখে নিল আগে। কোথাও এতটুকু আঁচড় লেগেছে কিনা তাই দেখল। তার পর

পূনের দিকে এক বলক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাড়া বালায় ল গাঙ্গুলিকে বলল, হেই বাবু, উই উকে ধর, উর বাপ ডাকু হচ্ছে—‘রনথ’ করছে—উকে বল বাপের থানে খেয়ে নেবারণ তে—ইখানে সঙটো হয়ে দেখতে লেগেছে কি—!

—চাঁদমণি! গরজে উঠল পাগল সর্দার।

তোপনের মুখে ওপর আর এক পশলা আঙুন ছড়িয়ে যেমন গছিল তেমনি ভ্রমদাম পা ফেল প্রস্থান করল চাঁদমণি।

নির্ধাক্ষ ঝাড়িয়ে রইল বিলত-জাণী ফেরত চিক ইঞ্জিনিয়ার ল গাঙ্গুলি।

ডামের কাজ এগোলেও তার মস্তুর গতিই হয়ত পরোক্ষে টু আশার কারণ হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। হয়ত বা শেষ স্ত সকলকেই যেতে হবে না, অনেকেই হয়ত বা থেকে যেতে হবে। অস্তত কিছু দূরে বসতি যাদের আশা তাদেরই বেশি। কিন্তন তবে যাব জগা এই এত দূর থেকেও সরতে হবে! ওই তো ফিতের পাড়ে আছে শুকনো মড়াই, তাকে আর ক’হাজার-গুণ কোলাবে বাপ। জন্তু এত বাড়াবাড়ি লোমাদের? অতএব, অসন্তোষের স্কুলিঙ্গটুকু হয়ে যাগো আর শেষ পর্যন্ত দেখা কি হয়—যোল আনা চাইছে, ক’আনা বাখা যায়। তাই একটা কিছু করো, একটা কিছু র ডাম ওগালাদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের ভিতরের আলা।

কি করবে?

কেন পাগল সর্দারকে দেখছ না? তার বিশ্বাসঘাতকতা ছি না? জাতিব্রোহিতা দেখছ না?

কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল। দ্বিতীয় বারের এই ঘটনার কতব্য স্থির করে ফেলল গাঙ্গুলি। হুঁচকার মাস পরে যাত, সব কাজ বাস্তব করে সে-দিকেই আগে মন দিল।

ছেটিখাট একটা হিল ব্লাডিং দেখেছিল এখানকার লোক। কু ধানের রূপ দেখেই স্তব্ধ হয়েছিল। আর এক বার তাই থেবে তারা। তার থেকে অনেক বেশি দেখবে।

দিন স্থির হল। সপ্তাহ চারেক পরের একটা দিন। শহর থেকে লেস এলো, মিলিটারী এলো, কর্মচারী এলো। সর্বত্র ঘোষণা করা, চারি দিকে বাট্ট করা হল ওই দিনটির কথা। ঘোষণার ডগ্গবে হকচকিয়ে গেল দূরের গ্রামবাসীরাও। বিস্তৃত একটা ও ধরে বিপদের লাল নিশানা পড়ল সারি সারি।

সরে যেতে হবে। ওই দিনের আগে এই গণ্ডি থেকে সকলকে সরতে হবে। নয়তো গুড়িয়ে ছাড়ু হয়ে যাবে সব, আর ছ পর্যন্ত থাকবে না। হিল ব্লাডিং হবে সেদিন এক বার যা হয়ে ছে তার দশ গুণ হবে। ওই দিনের আগে যে সরবে না সে মরবে। বধারিত মৃত্যু।

একটা ত্রাস সঞ্চার করতে চেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। তাই ৭। ওই নির্দিষ্ট দিনটা যেন মগজে বসে গেল সকলের। সমা-হে ওই দিনের বিভীষিকা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

শিথিল হয়ে গেল মাটির বাঁধন। যারা সরতে চায়নি, নড়তে যনি, এবারে তারা সরতে লাগল, নড়তে লাগল। কি হক...না জানি হবে সেদিন! তুমি সরছ কেন, তুমি তো লাল শির বাইরে। বাইরে হলেও কাছাকাছি তো বটে! বিপদ ল কি আর ফিতে মেপে আসবে!

তারপর সেই দিন...

সমস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করে দেখা গেল, জীবনের চিহ্ন দূরের কথা, যে পেরেছে ঘরের ইটমাটিও তুলে নিয়ে গেছে।

সকাল থেকেই নিশেধ উত্তজনা। একটা গুমোট স্তব্ধতা। সমাজ ছাড়া হয়ে যারা ডামের কাজ এলে লেগেছে তারাও থমকে গেছে যেন। নির্দেশ মত পাহাড়ে পাহাড়ে একের পর এক গর্ত করে চলেছে তারা। তার পর গুই সব গর্তের মধ্যে কি সব গুঁজে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। পুরু ফিতের মত কি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটার সঙ্গে আর একটা। ফিতের আর এক মাথা এসে থেমেছে মড়াইয়ের ধার ধরে আধ মাইল দূরের একটা তাঁবুর মধ্যে। ওখান থেকেই যা কিছু করা হবে। ওখান থেকেই পালাবার জঙ্গে গাড়ি মজুত রেখেছে বাবুরা।

বিকেল হতেই ছুটি হয়ে গেল সকলের। সন্ধ্যা পেরুলো। স্বাক্ষি হল।

আকাশ-বাতাসের সমস্ত স্তব্ধতা একটানা একটা যান্ত্রিক আর্তনাদে খান-খান হয়ে গেল যেন।

সাইরেশ বাজছে। অনভ্যস্ত কানে শব্দটা একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগল।

একটানা ষিগুণ স্তব্ধতা তার পর। আধ ঘণ্টার ওপর কেটে গেল প্রায়। যেন আধ যুগ কেটে গেল।

তার পর বহুক্ষর কৌশে উঠল বৃষ্টি!

ঘোষণার আড়ঘরে অত্যুক্তি ছিল না খুব। ভোর না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগল দেখতে। সেই বিরাট ধ্বংসের সামনে একেবারে বোবা হয়ে গেল সকলে। তাদের ‘বোদ্ধা’ অর্থাৎ উপদেষ্টা পর্বতসেবই হল তাদের ‘মায়া বুদ্ধ’। এই উপদেষ্টার উপাসনা করে আসছে আজন্ম কাল। পর্বতসেবের আসল নাম ‘লিটা’ অর্থাৎ শয়তান—যে তাদের আদি নারী-পুরুষ ‘শিলচু বুড়ী’ আর ‘শিলচু হারাম’কে সর্বপ্রথম হাড়িয়া খাইয়ে তাদের মধ্যে পাপ ঢুকিয়েছিল, লজ্জা-ভয় ঢুকিয়েছিল। সেই লিটা যেন আজ নিজের দেহ থেকে সহস্র সহস্র অতিকাশ পাখর খুলে খুলে পায়ের নীচের মড়াইকে মেরেছে কিন্তু আক্রোশে। পাখরে পাখরে মড়াই ছেয়ে গেছে ঢেকে গেছে।

বধার্থ অহুমান করেছিল চিক ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

ওদের বাস্তব আগলে থাকার আশা একেবারে নিমূল হওয়ার পর আন্তে আন্তে বিকোভের স্কুলিঙ্গও নিবেছে। এত বড় এক ভাঙনে পরেই যেন একটা গঠনের ছন্দ দেখা যেতে লাগল ধীরে ধীরে। বহুক্ষর আসছে বাইরে থেকে। রোজই আসছে।

...এত সব হচ্ছে যখন, কিছু একটা হবেই বোধ হয়। ভিত্ত বাইরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যারা, মলিন মুখে তারাও এসে উঁকি দিতে লাগল। কর্মপ্রত্যাশী। একরোখা হলেও দারিদ্র্যের সীম পরিমীমা নেই মাহুযগুলোর। রোখ গেছে, এখন দারিদ্র্যটাই বসে মনে মনে হাসলেও পাগল সর্দার নিরাশ করল না কাউকে সকলকেই হুঁহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নিল। যে এলো তাকে সবই সহজ হয়ে গেল। মাঝি পারাণিকরা পর্বত নতুন করে পুরানো সমাজেরই হাল ধরল আবার। [ক্রমশঃ]

# মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু

## প্রাণত্যাগ ঘটক

সুবিনয় নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে থাকে কত সময়ে। কিছুতেই যেন ভেবে পায় না, কোথা থেকে এসেছে তার এই ভাব-পরিবর্তন। কেনই বা এসেছে এই অদ্ভুত অমূর্ত্য। নিজের কাছে নিজেকে মনে হয় এক বিময়। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। কিছু যেন গোপনতা, কিছু লুকোচুরি, কিছুটা আশ্চর্য্যতা। সুবিনয় কি যেন লুকিয়ে রাখছে। গোপন করে, কারও কাছে প্রকাশ করে না। তার জামার এক পকেটে কি যেন সে লুকিয়ে রেখেছে। এক মহামূল্যের পুরাতন—দুপ্রাণ্য একটি ডাকটিকিট—সম্মানসেনের আমলের একটি দুলভ বর্ণমূদ্রা—কয়লার স্তূপ থেকে পাওয়া যেন এক টুকরো হীরে। বাই হোক, সেই দুমূল্যকে সুবিনয় যেন পকেটে লুকিয়ে রেখে কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে। পাছে হারিয়ে যায় অসাবধানে, সেই আশঙ্কায় থাকে। এই ভয় আর আশঙ্কায় সুবিনয় যেন সর্বাঙ্গ অস্থমনা। এমন কি তার বাবা আর মা—তারাও লক্ষ্য করেছেন ছেলের এই অদ্ভুতপূর্ণ পরিবর্তন। ছেলে যেন কত দূরে স'রে গেছে। ছেলের নাগাল পাওয়া যায় না। কত সময়ে বাবা আর মা বিরক্ত হন, বিরক্ত বোধ করেন।

সুবিনয় যেখানেই থাকে, বাড়ীতে কিবা কলেজে, পার্কে, খেলার মাঠে, রাস্তায়—সব সময়েই যেন সে আনমনা। যা দেখছে, যা করছে, যা শুনেছে—তাতে যেন তার মন নেই। মন প'ড়ে আছে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেও তার গাথে যেন সে দেখছে অন্য এক পৃথিবীকে। সুবিনয়ের কাছে তারা থাকেন, তারা বিরক্ত হ'লেও, সুবিনয়ের কাছে তার নিজের এই গুপ্তবৃত্তি যেন কত সুখের, কত শান্তির, আর কত নিশ্চিন্তের। তার উদাস মুখে কি এক মূলাবান সম্পদ অধিকারের নিশ্চিন্ত হাসি। শুধু অধিকারের আনন্দ নয়, সেই মহামূল্যকে হারা করার আশঙ্কাসহ তার ভাবভঙ্গীতে। সত্যিই যেন এক অদ্ভুত প্রাচীর বেরা দুর্গের মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছে নিজের মিস্ত্রীকে।

কলেজের ক্লাশ-ঘরে সেই প্রথম যেন সুবিনয় বুঝতে পারলো। সত্যিই যেন সে দিন দিন বড় বেশী আনমনা হয়ে পড়ছে। তার আর চোখের বলগা আর যেন ধর রাখতে পারছে না। আশ্চর্য্য হয়ে গেছে।

সেদিন ভুগোলের ক্লাশ চলেছে তখন। পার্কে স্ট্রাটের এক মিশনারী কলেজের একটি প্রশস্ত কক্ষ—সারি সারি বেষ্টিতে ছেলেরা একাগ্র হয়ে শুনেছে মিস ডরোথীর লেকচার। কলেজের শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কড়া প্রকৃতির মানুষ হিসাবে মিস ডরোথীর মধ্যেই দুর্নাম ছিল। ক্লাশের মধ্যে গোলমাল, গল্প করা, কথা বলা—এ সব আনপেই পছন্দ করেন না। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন মিস ডরোথী। টেবিলের 'পরে রয়েছে একটি দ্রোব। দুই পৃথিবীর মানচিত্র ছড়িয়ে আছে মানুষের তৈরী ঐ রঙীন পৃথিবীতে। দ্রোবটিকে এক আঙুলের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠ দিচ্ছেন মিস ডরোথী। পৃথিবীর বুক ছড়িয়ে আছে আঙ্গুরের ছনিয়া—জল আর স্থল। জলের কোন রঙ নেই, নীল আকাশের ছায়া পড়েছে, তাই জলের রঙ নীল। স্থলভূমিতে কেবল রঙের বাহার। এক এক দেশ এক এক রঙের। কেউ সবুজ, কেউ হলুদ, কেউ ধূসর, কেউ লাল।

মিস ডরোথীর একটি আঙুলের সঙ্কেতে ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে মানুষের সৃষ্টি ঐ রঙীন পৃথিবী। ঘুরে চলেছে কত দেশ, কত মরুভূমি, পার্বত্য অঞ্চল, নদী আর সমুদ্র। ঘুরে চলেছে ধীরে ধীরে; ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসছে।

মোটাকাদের চশমা মিস ডরোথীর চোখে। চশমার কাছে ঘুরের আর কাছের দেখার পার্থক্যেখা। মিস ডরোথীর মুখে কুন্দন ফুটে আছে। কপালে বয়স দেখা, বেশ কয়েকটি বলিরেখা ফুটে উঠেছে। কণ্ঠস্বর যেন তাঁর প্রকৃতির মতই অতি বেশী কক'ল। মিস ডরোথী বললেন,—পৃথিবী যেন তার কোমরে বেঁটে জড়িয়েছে। এই বেণ্টের কি নাম দেওয়া যেতে পারে? এমন একটা কিছু জিওগ্রাফিকাল নাম। সুবিনয় তুমিই এই নামকরণ কর'। জাট টেল এ নেম্।

ছাত্র সুবিনয় তখন ক্লাশ ঘরের আনন্দের বাইরে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। আকাশ দেখছে না কলেজ প্রাঙ্গণের শিমুলগাছের ঘন লাল ফুল দেখছে কে জানে। মিস ডরোথীর প্রশ্ন যেন তার কানে যায় না। সে তখন দেখছে ভো দেখছেই। হয়তো অজ্ঞানের কুরাশা দেখছে। মূর্ত্তা মূর্ত্তা কুরাশা। বরক'টাণ্ডা, হিম-স্নিগ্ধ কুরাশা। গভীর, গভীর ঘন-কুরাশা। আকাশছোঁয়া গাছের চূড়োর আর ঘুরের ঘরবাড়ীর শীর্ষে কুরাশার পর্না পড়ছে। এলোদেলো আর ঠাণ্ডা বাতাসে কখনও কখনও কীলছে ঐ

শার জুপ। গাছের আর ম্যানশনের কানে কানে যেন ফিস-সারে কি কথা বলছে ঐ কুয়াশাকুণ্ডলী।

কক শকট একটু তুলে মিস ডরোথী আবার বললেন,—  
বনয়, আকাশে পৃথিবী নেই। গ্রাবটা আম্মর সামনে রয়েছে,  
টেবিলের ওপর।

লক্ষ্য, অপরিসীম লক্ষ্য আর ভয়ে যেন ক্রমেক অধীর হয়ে  
লো স্থবিনয়। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখলো মিস  
রাখীকে। তাঁর মোটা কাচের চশমার চোখ রাখলো। লক্ষ্য  
রলো, ডরোথীর আঙুল ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর কোন্ ভাগে।  
নালায় বাইরে তাকিয়ে থাকলেও, চোখের দৃষ্টি কোন এক  
পানার আবদ্ধ থাকলেও, স্থবিনয় হঠাৎ মিস ডরোথীর প্রশ্ন  
নে শুনেছে। সলজায় সে উঠে গাঁড়ালো। বললে,—  
ফারেষ্টর, অফরেখা।

—খ্যাঙ্ক ইউ। কর্কশ সুরে বললেন মিস ডরোথী। সঠিক  
৪২ তিনেও একটু প্রসন্ন হ'লেন না।

ব'লে পড়লো স্থবিনয়। প্রসন্ন উত্তর বখাখথ দিয়েও অসন্তুষ্ট  
জা পেয়েছে সে। এখন যেন তার মুখে তবু আর নেই, শুধু লক্ষ্য।  
মনোবোশী হওয়ার লক্ষ্য।

আবার বীরে বীরে ঘুরতে থাকে পৃথিবী। মিস ডরোথী অঙ্গুলি  
হাতে দেখিয়ে যেন আর বলেন,—কোথাও ধূ-ধু মরুভূমি, কোথাও  
জল আর কল। কোথাও হীমপুঞ্জ, কোথাও তটরেখা, কোথাও  
মঠশৈল, কোথাও মাসের পর মাস শুধু মনস্থল, কোথাও শৈলশিরা,  
ক্রমেকত আর কোথাও আগ্নেয়গিরি।

চোখের আর মনের ওপর আধিপত্য চলে না। স্থবিনয় আবার  
নলার বাইরে চোখ ফেরায়,—তার অবাধ্য মন আবার যেন ছুটতে  
কে ঐ ভেসে-বাওয়া কুয়াশার সপ্তভিঙ্গার পিছনে। কোন্ অদৃষ্ট  
ক থেকে যেন ভেসে আসছে মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি কুয়াশা—  
র অকুপণ দান কে জানে! স্থবিনয় আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়,  
বায় পেতে থাকে। দেখতে থাকে, হিমঠাণ্ডা কুহেলিকা কত  
স্ত, কত শ্রদ্ধ, কত নীরব। রাশি রাশি মুঠো মুঠো কুয়াশা—  
দর মধ্যে যেন এক অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধন। একে অস্ত্রের বুকে জড়িয়ে  
ঢেছে ভাবের তুফানে। মনের কথা বলাবলি করছে কানে কানে।  
সঙ্গে স্নিগ্ধ আর নীরব হাসি। মুঠো মুঠো কুয়াশা যেন মুঠো মুঠো  
শক্তির স্তম্ভ প্রতীক।

পৃথিবীর লেশ-বিশেষের মানুষ 'শান্তি শান্তি' রবে তবে কেন  
মন চোচামেচি করছে? কুয়াশা দেখতে দেখতে, আশন মনে, অল্প  
কটু হাসলো স্থবিনয়। ব্যঙ্গের হাসি হাসলো যেন। মানুষ  
মনই অন্ধ। এমন কোমল শীতল অফুরন্ত মধুর শান্তি থাকতে,  
জ্বলন্ত আবার চোচায় কেন শান্তির আহ্বানে। আবার একটু মুচকি  
সলো স্থবিনয়। সেই ব্যঙ্গ আর বিজ্ঞপের চাপা হাসি।

মিস ডরোথী হঠাৎ চশমার মধ্যে থেকে লক্ষ্য ক'রেছেন।  
খা বললেন তিনি, কাচের কি এক বাসন ভেঙ্গে খান খান হয়ে  
ড়লো যেন। মিস ডরোথী বললেন,—স্থবিনয়, হোয়াট মেকসু  
ড লাক? হাসছো কেন অকারণে?

—নাথিং।

উঠে গাঁড়িয়ে বললে স্থবিনয়। সেই ব্যঙ্গ আর বিজ্ঞপের হাসি

চাপতে গিয়ে আরও একটু হেসে ফেললে। বললে,—নাথিং। হাসছি  
অকারণেই। ফরনাথিং!

—ডোট লাফ, হেসো না আর। আমি যখন পড়া বলবো,  
অন্তত ততক্ষণ।

—অলরাইট। আমি চেষ্টা ক'রবো, যেন না হাসি। আই  
বেগ ইণ্ডর পার্ডন। আমাকে ক্ষমা করুন সিস্টার।

কথার শেষে স্থবিনয় ব'লে পড়লো। জানলার বাইরে চোখ  
ফেরাতেই একবার যেন চমকে উঠলো। পকেটে কি লুকিয়ে রেখেছে  
অনেক দামের, হঠাৎ আবার যেন মনে পড়লো। পাছে কেউ দেখতে  
পায়, কেউ জানতে পারে তার লুকানো মাণিক কেমন, সেই আশঙ্কায়  
অস্থির হয়ে উঠলো। হুটুং প্রাণটাকেই হুগিয়ে তোলবার বেল কেউ  
উখুক করতে না পারে। স্থবিনয়কে যেন কেউ না জানতে পারে, তার  
লুকানো অস্ত্রহাট কেউ যেন না দেখতে পায়।

জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে সকলের চোখকে ঝাঁক দিয়ে একবার  
যেন সে তার মুখপকেটে চোখ রাখলো। অত্যন্ত সন্তর্পণে দেখলো  
যেন, আছে না নেই। আছে না হারিরে গেছে তার ভোলাধর্মের  
অসাবধান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢা ঢা ঢা ঢা শব্দে কলেজের শেব ঘণ্টা ধ্বনিত  
হয়ে উঠলো অনেক দূর। ঘড়ির কাঁটার ইলারায় ঘণ্টা বাজে কলেজের।  
অজ্ঞানের শীতের দিনের বিরামবিহীন নীরবতার হঠাৎ পূর্ণচ্ছন্দ  
পড়লো। নিশ্চুপ কলেজ ছুটির আনন্দে কলগুঞ্জন তুললো।  
দিনশেষে বাসায় ফেরার কালে যেমন পাখীর কাকলী শোনা যায় গাছে  
গাছে, কলেজেও সেই কলকাকলী। কোন বাধা নেই আর,  
ঘণ্টাপ্রহারীর শাসন আর মানতে হবে না এমন কুয়াশার মিষ্টি  
দিনটিতে।

কলেজের বাইরে বেরিয়ে স্থবিনয় স্বস্তির বাস ফেললে যেন।  
চেনা-চেনা মুখের বন্ধুদের দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে।  
ক্লাবঘরের জনতা থেকে পার্ক স্ট্রীটের কলরোলে হারিয়ে গেল স্থবিনয়।  
ফুটপাথ ধ'রে বীরে বীরে এগিয়ে চললো। হোটেল, পোষাকের  
লোকান, নীলামঘর, আর মোটরের গ্যারেজ দেখতে দেখতে এগিয়ে  
চললো।

দিনের আলো পার্ক স্ট্রীটে। স্নান আর ধূসর আলো। মুঠো  
মুঠো কুয়াশা যেন কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে আকাশের সূর্য্যকে  
কত কোমল আর কত স্নিগ্ধ; হিমের হাওয়া-ঝরনা ঐ মুঠো  
মুঠো কুয়াশা—আকাশ থেকে নেমেছে এই পৃথিবীতে  
কুঁচবরণ কস্তুর মেঘবরণ এলোচুলের মত ছড়িয়ে আছে  
মহামন্দ হাওয়ার থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে কুয়াশা-কুন্তল।

ফুটপাথ ধ'রে চলতে চলতে পার্ক স্ট্রীটের কোলাহলকে উপস  
করে পাশ ফিরে গাঁড়ালো স্থবিনয়—একটা মোটর গ্যারেজের টি  
সামনে। গ্যারেজের কাঁচঘরে উজ্জল রঙের যেন এক প্রদর্শনী  
উলস চোখের শূন্য দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করে। কত রঙবের  
মোটরগাড়ী কাঁচঘরে, এই মেঘলা-মিলন দিনেও উগ্রপালিশে চিকি  
করছে। রঙীন গাড়ীগুলোকে দেখতে দেখতে মনে মনে হাস  
স্থবিনয়। কঠোরকঠিন বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের মিলন—নি  
যাকে রঙের বাহার-বিভাসে সন্মর ক'রে তোলার কি ব্যর্থ চেষ্টা  
স্থবিনয় গাড়ীর নামগোত্র পড়তে চেষ্টা করে। মনে মনে আঙুল



থাকে—উল্লসি,—কনগাল,—হাডলন,—ভি, এইট ফোর্ড,—  
সিটরন।

হঠাৎ কানে কানে কে যেন কথা বললে। ফিস-ফিস কথায়  
যেন নম্রমষ্টি স্বর। কুয়াশার কাঁপা-কাঁপা ভয়ভীক কথা। স্তবিনয়  
আবার চলতে থাকে বাসার দিকে। আবার দু'চোখের বিস্তীর্ণ  
চাঁটনিতে ধরা পড়ে আকাশ থেকে নেমে আসা কুয়াশার বর্ণা।  
বাশি-বাশি কুয়াশা নামতে যেন নীরব চরণে।

বৃক-পকেটে হাত ছোঁয়ায় স্তবিনয়। হঠাৎ যেন মনে পড়েছে  
তার। হাতের পরশে সেপে-নেয় একবার। সেই পরশপাথর আছে  
না নেই। কুয়াশা দেখার অসাবধানে সেই ভুলত মগিরত্ব আছে না  
হারিয়ে গেছে। বস্তির খাস ফেললো স্তবিনয়। পথচলা থামলো  
না আর। কুয়াশার পদ্ম সরিয়ে সরিয়ে বাসার পথে এগিয়ে  
চললো! ঠাণ্ডা বাতাসে যেন নীত-নীত করছে অজ্ঞানের এই  
হিমাত বিকালে।

পাক স্ট্রীটের বুক থেকে ময়রা স্ট্রীট—এক নম্বর, দু' নম্বর তিন  
নম্বরে বাসা পেরিয়েই স্তবিনয়ের ঘববাড়ী। বাস্তা থেকে দেখতে  
পাওয়া যায়, তার স্নেহময়ী মা, সোতলার এক জানলায় পীড়িয়ে  
জাকিয়ে আছেন পথের দিকে। স্তবিনয় বাস্তা থেকে দেখতে  
পায়, তার মা যেন কেমন বিমর্ষ বিষম। চোখ যেন তাঁর আঁকুল  
আঁকীকা।

মুক্ত আকাশের তলা থেকে, কুয়াশার তিমস্পর্শ থেকে, তার  
দেওরালের ঘরের মধ্যে যেতেই মা বললেন,—আজ তোমার জন্তে  
আমি নিজে হাতে পুড়ি তৈরী করেছি। পুড়ি আর কড়াই-  
তটির কচুরী।

কেমন যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে স্তবিনয়। হাতের বই-খাতা  
একটা সোঁকায় ছুঁড়ে ফেল দিয়ে খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে  
যায়। পুড়ি-এর বেকারীটা তুলে নিতে যাবে, এমন সময়ে মা  
চৈতিলে উঠলেন। বললেন,—তোমার সেই বন্ধ-অভ্যাস! বাও  
কুখ-হাত ধুয়ে এসো, তারপর—

—ডাক পিওন আসেনি আজ? আমার কোন চিঠি?

কথা বলতে বলতে স্তবিনয় বেসিনের দিকে এগোয়। কলের  
ছিপি ঘুরিয়ে দিয়ে চূপচাপ পীড়িয়ে থাকে। মুখ হাত ধুয়ে তোয়ালেয়  
হাত মুছতে মুছতে টেবিলের ধারে বসলো। গরম হুণের পেয়লা  
টেবিলে বসিয়ে দিয়ে মা বললেন,—ডাক-বাক্সে চিঠি আছে কি না  
দেখে এসে না কেন?

—দেখে এসেছি। বাবার নামে দু'খানা চিঠি আছে। আমার  
চিঠি নেই।

কথা বলতে বলতে স্তবিনয়ের মুখে যেন হতাশা ফুটলো।  
তাহালায় ভিজ় হাত মুছতে মুছতে খাবারের টেবিলে এসে বসলো।  
খাবারের প্লেট টেবিলের পরে বসিয়ে দিতে নিতে মা  
বললেন,—কিছু ফেলবে না। সব খেয়ে ফেলতে হবে লক্ষ্মী  
হুণের মত। আজ আবার উনি তোমার জন্তে ডাক্তারকে  
বলে নিয়ে ফিরবেন বলেছেন। ডাঃ বোসকে আনবেন, কোট  
বলবে কোবার পথে।

—কেন?

একমুখ পুড়ি, তত্ত্ব কথা বললে স্তবিনয়।

মা কঠোর দুঃখকল্প স্বর ফুটিয়ে বললেন,—কেন আবার!  
তোমার জন্তে। তুমি যে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে!

—কি আবার হয়ে গেলাম আমি?

স্তবিনয় অবাক হয়ে কথা বলে। হাতের চামচটা বেকারীতে  
রেখে নিয়ে বলল,—আমার কিছু হয় নি, আমি ঠিক আছি।

—শরীর তোমার ঠিক যাচ্ছে না স্তব, তা না হ'লে  
তোমার হঠাৎ এই মতিগতি কেন? আমি তো কিছুই ভেবে  
ঠাওরতে পারছি না।

—ঠিক আছি আমি। বললে স্তবিনয়। উই-কমের খোলা  
জানলা থেকে আকাশে চোখ ফিরিয়ে বলল,—আমার শরীর ঠিক  
যাচ্ছে কি না আমি জানতে পারবো না, তোমরা জানতে পারবে?

নীল আকাশ নয়, কুয়াশা-ঢাকা শুভ আকাশ। রাজহাঁসের  
ডানার মত সাদা কুয়াশা। অকল্যাণ্ড স্কোয়ারের গাছে গাছে মুঠো  
মুঠো কুয়াশা। উই-কমের জানলা থেকে দেখা যায় অকল্যাণ্ড  
স্কোয়ারে গাছের সারি, জল-পুকুরের তীরে তীরে পীড়িয়ে আছে  
অবিশ্রান্ত প্রহরীর মত। মাথায় কুয়াশার হেলমেট পরেছে।

স্তবিনয় দেখতে পায়, আকাশের কুয়াশার ডেঁট তাদের বাসা-বাড়ীর  
সামনের বাস-বিছানো লান এসে মিশেছে। লাল আর হলুদ রঙের  
ডালিয়া ফুলের আশে-পাশে ছাই রঙ কুয়াশা।

আবার কথা বললেন মা। স্তিমিত বসে বললেন,—কি যে  
তোমার হয়েছে! এ যে বেসিনের কলটা খুলে রেখে এসে, আর বন্ধ  
করলে না—এত ভুল কেন তোমার? শরীর ঠিক থাকলে এমন মন  
হয় কারও?

তসে ফেললো স্তবিনয়। বললেন,—দুঃখ কর মা! সত্যিই  
আমি ভুলে গেছি।

—দেখা যাক ডাক্তার কি বলেন।

মা বললেন হতাশ স্বরে। একটু থেমে আবার বললেন,—  
কচুরীগুলো যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, খাবে না আকাশ দেখবে ব'সে ব'সে?

—আকাশ নয়, কুয়াশা দেখছি। তুমিও দেখো না। দেখা, এ  
আমাদের বাগানে চাঁপা গাছের চূড়ায় কেমন মেঘের মত একরান  
কুয়াশা।

—পুড়িও দাখি বসছে! কচুরী জুড়িয়ে যাচ্ছে! দুধ ঠাণ্ডা হয়ে  
গেল আর তুমি এখন চাঁপাগাছ দেখছো!?

মা বললেন ঈষৎ রাগের স্বরে। প্রতিবাদের ভঙ্গীতে। কিং  
যাকে বলছেন তার কানে পৌঁছয় না কথা। স্তবিনয় যেন শুনেতেই  
পায় না।

কুয়াশা ঘন হয়ে উঠছে দেখতে দেখতে। মুঠো মুঠো কুয়াশা  
জমাট বাঁধে। যা কিছু অশুদ্ধ, বত কিছু কুশী, তাদের লুকিয়ে  
ফেলেছে এই কুশখটিকা।

বাস্তায় মোটর গাড়ীর হর্ণ বাজলো হঠাৎ। চেনা-চেনা স্বর যেন  
ব্রেক-কবার শব্দ এলো।

ঘরের খোলা-জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন মা। থানিক চূপ  
চাপ দেখতে দেখতে বললেন,—এ উনি ফিরেছেন। সঙ্গে ডাক্তার  
এসেছেন দেখছি।

কে কার কথা শোন। স্তবিনয় তখনও কুয়াশার জাল দেখছে  
অকল্যাণ্ড স্কোয়ারের গাছগুলি অক্লান্ত প্রহরীর মত পীড়িয়ে আছে



ওদের মাথায় কুয়াশার হেলমেট। দিন-শেষে পাখীরা বাসায় ফিরছে স্বীকে স্বীকে। কোয়াস গান ধরেছে যেন পাখীর দল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাঁপাগাছের চুড়া কেঁপে উঠলো,—ঘুরের জানলার পদা দুলে উঠলো। অজ্ঞানের সন্ধ্যা, বাতাস ভরীতে, ভীষতে ভীষতে আসে কোথা থেকে। ঘরের কোণে কোণে কালিমা ছড়ায়। টেবিল আর দেহাজের তলে তলে আঁধার ছড়ায়।

ডাক পড়লো স্বনিয়মের। বাবা কোট থেকে ফিরেই ডাকলেন ছেলেকে। আদালতের একজন নামজাদা আইনজ্ঞ, যেমন কড়া প্রকৃতি, তেমনি বিচারের কাজে বিচক্ষণ। ব্যাবিটরদের মধ্যে তাঁর নামডাক খ্যেট। ছেলের সুখ আর শান্তির জন্তে সব কিছু করতে তিনি প্রস্তুত।

স্বনিয়ম বাবার ঘরে গিয়ে দেখলো, ডাক্তার এসেছেন। ব'সে আছেন একটি সোফায়। বাবা মুখে চিন্তা ফুটিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। মা কখন এসে একটি সোফা অধিকার করেছেন। মাও যেন হুচিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছেন। গালে হাত দিয়ে তিনি ব'সে আছেন।

ছেলেকে সামনে দেখে বাবা বললেন,—ডাক্তার, এই আমার ছেলে। নাম স্বনিয়ম। সেট ফেল্ডিয়াসের ছাত্র।

ডাক্তারের চোখ-মুখে যেন বিজ্ঞতা। পৃথিবীর সকল রকম অসুস্থতার প্রতিকার যেন তাঁর নখদর্পণে। মানবদলের সকল তত্ত্ব আর তথ্য তিনি যেন কেনে ফেলছেন। স্বনিয়মের হাত ধরে বিজ্ঞতাসি হেসে বললেন,—কি হয়েছে তোমার?

—কিছুই নয়। স্বনিয়ম সামান্য বিরক্তির সুরে কথা বলল। বলল,—কি আর হবে?

—ক্ষিধা হয় না ভাল?

—না না, কে বললে আপনাকে? খুব সুখী হয়। খাটা পাই তাই খাই।

—বুকে কোন বেদনা? ডাক্তার রোগীর হাত ধরে কথা বলেন। হৃদয়ের স্পন্দনগতি পরীক্ষা করেন।

—না, কোন বেদনা নেই বুকে।

স্বনিয়ম কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন তার মন নেই। সে একবার ডাক্তারের চোখের অচঞ্চল তারা দুটো লক্ষ্য করে। একবার বাবার আদালতের কালো পোষাক লক্ষ্য করে। একবার মাকে লক্ষ্য করে। মা গালে হাত দিয়ে আছেন এখনও। তারপর লক্ষ্য করে ঘরের আসবাবের তলায় তলায় আঁধারের জড়তা।

ঔষধিকোণ কানে ঠেকালেন ডাক্তার। বললেন,—দেখি জামাটা তোলা একবার। বুকা পরীক্ষা করবো।

জামা তুললো স্বনিয়ম। ডাক্তার রোগীর বুকে-পিঠে যন্ত্র রেখে রেখে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা চালিয়ে কেমন এক অস্বস্তির খাস ফেললেন। রোগীর বুকে যেন ডিক্টোফোন কথা বলছে! হৃদয়ের স্পন্দন সহজ স্বাভাবিক।

উঠে ঝাঁপালেন ডাক্তার। পকেট থেকে ফাউন্টেন পেনের মত টর্ক বের করে আলিয়ে ধরলেন, রোগীর ঠিক মুখের কাছে। বললেন,—ঈ কর!

স্বনিয়ম ঈ করলো। ডাক্তার বললেন,—আ কর'।

রোগী যেন ইচ্ছা করেই জেটি কাটলো ডাক্তারকে। ডাক্তার দাঁ কুঁচকে আবার বললেন,—উজ্জ, হ'ল না। আমি যেমন করছি ঠিক এই ভাবে—আ-আ-আ-আ-আ—

আবার জেটি কাটলো স্বনিয়ম। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর নকল করলো যেন। কিন্তু ডাক্তার তার মুখে কোন 'যোগের সন্ধান' পেলেন না! না পেয়ে যেন হতাশ হয়ে পড়লেন।

স্বনিয়ম একবার জানালার বাইরে তাকায়। সাঁঝের আঁধার, মুঠো মুঠো কুয়াশা কোথায় গেল! ইচ্ছা হয় জানলার কাছে ছুটে যায়! দেখে আসে অকলাগু কোয়ারের মাথা-উঁচু গাছের সারি। কুয়াশার হেলমেট, আর বোধ হয় দেখা যাবে না অন্ধকারে।

ডাক্তার ভেবে ভেবে বললেন,—চোখের দোষ নয়তো? চোখে ঝাপসা দেখা কখনও কখনও? মাথা ধরে?

হেসে ফেললো স্বনিয়ম। হাসি চেপে বললো,—কখনও ধরেনি, এখন ধ'রছে মাথা। আগনার কথা শুনে শুনে।

টেবিলের 'পরে ছিল কি একখানি বই। স্বনিয়মেরই পাঠ্যপুস্তক হয়তো। ডাক্তার বইখানি চোখের কাছে তুলে ধরলেন। বললেন,—আচ্ছা এই পাতার এই প্যারাটা পড়তো।

স্বনিয়ম বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকলো,—

"ষষ্ঠ আশংকা এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিজ্ঞাসাগর খাটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বালাজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে বাঁধাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখনও পুষ্পস্ত প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা—

ডাক্তার চিন্তিত হয়ে বললেন,—খাক, আর পড়তে হবে না।

স্বনিয়ম বললো,—আমি যাচ্ছি মা! আবার হবে যাচ্ছি!

ডাক্তার বললেন,—হ্যাঁ, তুমি যাও। তুমি যেতে পারো।

বাবার আদালতের কালো পোষাকের দিকে একবার লক্ষ্য করলো স্বনিয়ম। মায়েব বিখারিত চোখের দিকে একবার। আর একবার ডাক্তারকে দেখলো! তাঁর চোখের অচঞ্চল তারা দেখলো।

—কি বুঝলেন ডাক্তার?

বাবা কথা বললেন ক্রান্ত কণ্ঠে। আদালতে সাবা দিন কথা বলে ব'লে কথার সুর যেন কেমন ঝিমানে!

মা বললেন,—আপনার রোগী যখন ঘরে আর নেই, তখন আর খোলাখুলি বলতে দোষ কি? কি অসুস্থ বসুন তো?

ডাক্তার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। কিশোর এক রোগীকে দেখতে দেখতে এই বীভৎস দিনেও তাঁর কপালে ঘাম ফুটেছে কপালে কয়েকটা রেখা ফুটেছে। ডাক্তার কি বলতে গিয়ে থেটে গেলেন। যদি ভুল বলা হয়!

বাবা বললেন,—ডাক্তার, আমি আমার ছেলের জন্তে সব করতে পারি। যা বলবেন আপনি। এনি থিং ইউ সান্তেষ্ট চেন্জে পাঠাবো কোথাও? কিছুদিন হাত-বদলের পর যা শরীরটা—

ডাক্তার বললেন,—হ্যাঁ তা পাঠাতে পারেন, তবে ভেমন কো

যোগ জে' কিছুই দেখতে পেলাম না। চোখে উল্লাস চাউনি দেখে চেয়েছিলো, আই ডিফেকটিভ, তা'ও নয়।

হা বললেন,—একটা কিছু টনিক খেতে দেওয়া যায় না স্ববিক্রে ?

ডাক্তার বললেন,—তা ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। কডলিভার অয়েল দিতে পারেন। খুব ভাল দেশী শার্কের লিভার অয়েলও দিতে পারেন।

হা হুৎ বিকৃত করলেন। বললেন,—না না, স্ত্রি আমার এমনিই থাক। কডলিভার খেতে পারবে না সে।

স্ববিক্রের ঘরে গিয়ে ঘরের আলো জালিয়ে দেয়। এক পাশে পড়ার টেবিল, আর এক পাশে খাট-বিছানা। চেয়ারের ওপর লজ্জার কাগজখানা চোখে পড়লো। কাগজের প্রথম পাতার মাথার লেখা 'হুয়েজ ক্যান্সেল উইল বি ডাশনালাইজড', কলোনেল ন্যাসের উক্তি ক'রেছেন ল্যাবলপত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে।

ঘরের দরজা তেজিয়ে দিয়ে, পকেট থেকে কি বেস বের ক'রলো স্ববিক্র। এক টুকরো কাগজ, একখানি চিরটুকু, একটি চিঠি। স্ববিক্রের দৃষ্টিতে আরে একবার পড়লো সেই চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা—

আশা করি আমার এই চিঠিটা পেয়েও তুমি খুব খুশী হবে। তোমার জন্যে একখানা ক্যাসে আমি নজা তুলছি। ফুল আর

প্রকাশ্যে। কদিন খ'বে কি জীবন কুরাশা জমছে, দেখতে পেরেছো ? তুমি যেন কোন দিন আমাকে চিঠি দিও না। আমাদের বাসার 'প্রেম' কথাটি একেবারে বে-আইনী। চিঠি যদি কারও হাতে পড়ে আমাকে আর বাঁচতে হবে না। আজ এই পর্যন্ত, পরে আবার তোমাকে চিঠি দেবো। কিন্তু দোহাই, তুমি যেন কোন দিন দিও না, আশার বলছি।

ইতি—কে বলতো ?

চিঠি আবার রেখে দেয় স্ববিক্র। যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেয়। তারপর ঘরের বিজলী-আলোটা নিষিয়ে দিয়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। জানলা খুলে দিয়ে বিছানার ওরে পড়লো। খোলা জানলার বাইরে দেখলো কুরাশা, রাস্তার আলোর চতুর্দিকে কুরাশা। ঘরের জানলার বাগা ভেদ ক'রে হিম্মত কুরাশা আসছে, আকাশের মেঘের মত। স্ববিক্রের মুখে-চোখে কুরাশার ঠাট্টা স্পর্শ লাগছে। কুরাশা যেন তার কানে কানে কথা বলছে। হুটো হুটো কুরাশা, বলছে,—এসো আমরা তোমাকে গল্প শোনাযো। খুব মিষ্টি এক গল্প। খুব মিষ্টি আর খুব মজার এক গল্প। স্থলর একটি ফুলের গল্প। ফুলকোটার গল্প নয়, একটি ফুঁড়ি থেকে একটি ফুলের জন্মকথা নয়, একটি কোটাফুলের পালঙ্কি বন্ধ হওয়ার গল্প। ফুঁড়ি থেকে ফুলের গল্প নয়, ফুল থেকে একটি বীজ হওয়ার গল্প। কল্প কথা নয়, আত্ম-সমাধির গল্পকথা।\*

[ \* আকাশবাণী, কলকাতা, সাহিত্যবাসরে পঠিত। ]

## “তয়োন্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।”

শ্রীঅনন্তকুমার দাশগুপ্ত

নরেন্দ্র—সেব। চাই সমাধি নির্বিকল্প।

শ্রীরামকৃষ্ণ— ছিঃ নরেন,—এত হীমবুদ্ধি তুই !

সমাধি নির্বিকল্প নহে তোর তরে।

তুই হবি কর্মযোগী মহাবীর।

মগ্ন হ'বে সমাধিতে পড়ে থাক।

জড়বৎ অকর্মণ্য হইবে, নাহি সাজে তোরে।

তুই হবি মহা মহীক্ষহ—বোখিঙ্গম,

লক্ষ লক্ষ জন লজ্জিবে পরম শাস্তি তব ছায়ে।

তুই হবি বারিধারা তৃষিতের ক্ষয় তৃষিতে ;

ধর্মতৃষাতুর লজ্জিবে অনন্ত তৃণ্ডি

তব ধর্মাদেশে। প্রচারিবি তুই

ধর্মের অমোঘ বাণী দেশ-দেশান্তরে।

ধর্মের বথার্ধ ভাষ্য “বত মত তত পথ”

প্রচারিবি তুই আমার ইচ্ছাতে।

অথগুর ধাম হ'তে আসিগ্ন যখন

ইঙ্গিত করিগ্ন তোরে চলিতে আমার সাথে

মর্ত্যধামে। ভুলে গেলি তুই সেই কথা ?

যুগে যুগে অবতীর্ণ হুই আর তুই।

আমি যে শ্রীরামচন্দ্র, তুই হইয়মান,

আমি যে শ্রীকৃষ্ণ আর তুই যে অর্জুন।

করিতে হইবে তোকে অসাধ্য-সাধন,

তাজ বুধা আশা সমাধির।

নরেন্দ্র—

কিন্তু, কিন্তু দেব ! মানে না আমার মন।

“ভূমৈব স্তব্ধং নান্দ্র স্তব্ধমস্তি” আমি চাই

ভূমানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান লভি, মগ্ন হ'য়ে সমাধিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—

( বিরক্ত ভাবে ) পুনঃ পুনঃ সেই কথা ?

আজ্ঞা। পূরিবে বাসনা তোয় ;

দিনেকের তরে লজ্জিবি সমাধি নির্বিকল্প।

তারপর চাবিকাঠি রহিবে আমার

সাথে। বাবি কোথা ?

চলিতে হইবে তোকে আমার নির্দেশে।

# আশ্বিন-ঝড়

( প্রাচীর 'Ode to the West Wind' কবিতার অনুবাদ )

হে ভয়াল প্রভঞ্জন, আশ্বিনের অশান্ত নিশ্বাস,  
যে অদৃশ্য সংগ হ'তে বিশীর্ণ পত্ররা আড়োঁ উড়ে,  
পলাতক প্রেত সম এড়াইয়া ওঝার-সকাশ,

দীপ্ত, কৃষ্ণ, বিবর্ণ, বজ্রাত কয়-অরে  
মহামারী-বিধ্বস্ত জনতা : জানি আজি ঝড়,  
জ্জেরণ করিছ তুমি জাঁখার তুহিনশয্যা 'পরে

বীজের ফলাকা, যেথা তারা যবে শীতভর  
করবে শবের মতো স্পন্দন—সহোদরা তব  
নীলাক্ষি বাসন্তী নহে যত দিন সেথা অগ্রসর

ঘাড়াইয়া জয়-ভেরী, বর্ণে-গকে ভরাব উৎসব  
( বিস্তারি মুহুরৎ যেন লক্ষ পাখি আকাশে ওড়ালে )  
ধাবৎ না সুর হয়, গিরি-বন ভাগে অভিনব :

সর্বত্র গমন তব হে হৃদ'ম, শব্দা নাহি কোনো,  
হে শ্রুতি, হে বিনাশক, শোভা, ওরে, শোভা ।

তুল নভ আন্দোলনে, তে তুমি যে তটিনী-বক্ষেতে  
খণ্ড খণ্ড মেঘ অরে, যেন জীর্ণ পত্র পৃথিবীর,  
স্বর্গ আশ্রয় সমুদ্রের কম্পিত গ্রন্থিল শাখা হ'তে—

বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ দূত খেয়ে চলে : তব রাশুনীড়  
নীল সমতল তার ভরি রাখে মেঘ পত্র দল,  
মনে হয়, ওরা যেন দীপ্তকেশ রক্ত বিধাতার !

অই দূরে নিখসয় অতিক্রীণ আলোক সপল  
সেথা হ'তে স্বর হয়ে যে মধ্য রেখাটি বিস্তারিয়া  
আসন্ন বড়ের জটা ওড়ে । তুমি এক শোকোচ্ছল

মহাশীত ওগো বান্ধবী, সমগ্র বাস্পীয় শক্তি দিয়া  
মৃত-বৎসরের লাগি সমাধি করিলে বিরচন  
সমাপ্তির রাতে এই, মুহূর্তেই পড়িবে ঝরিয়া

দীর্ণ করি এবে তার কঠিনায়িত যে আবরণ  
কালান্তক বৃষ্টি, অগ্নি এবং তুফান : ওগো প্রভঞ্জন !

হে তুমি যে জাগায়েছ ভাসি দিয়া নিদ্রা-স্বপনে  
ভূ-মধ্যসাগরটিতে এত দিন ছিল যে শায়িত,  
অতি শান্ত স্বচ্ছতোয়া তটিনীকূলের কলরবে

লাভাদীপটির পাশে—আবর্ত যেথায় সমাহিত,  
হেরিয়া অতীত স্বপ্ন—মিনারেরা নভ স্পর্শি রয়  
কত বার আপনাতে আপনি সে হয়েছে স্পন্দিত ।

বকে নীল শৈবালের, কুসুমের স্তব্ধ-সঞ্চয়  
ইন্দ্রিয়ের বিবশতা অমিত সে মাধুর্য পরশ ।  
মহাসিদ্ধ অতলান্তিক বত হোক অসীম হৃদয়

তাঁহারও শাসক তুমি । শুনেছি সে সিদ্ধন্ত দেশে  
সমুদ্র-উদ্ভিদে আর ক্রোড়ান্ত বনেতে অতীব বিক্ষিত  
পল্লব সঞ্চার হয়—যাও সেথা ভৈরব ছরবে,

গভীর আস্থানে তব সিদ্ধন্ত ভয়-সচকিত  
টুটে যায় অকস্মাৎ তল্লা তার বহু আশাসিত ।

মতি আমি শুধুপত্র কেমনে বহিবে প্রভঞ্জন ;  
নহি লণ্ণ বারিবার উড়াবে কেমনে সাথে সাথে ।  
উর্মি নহি, কঙ্কশাস করিতে করিতে সমুদ্র

দার্থ যে তবুও ধল্ল তোমার প্রসঙ্গ দৃষ্টিপাতে  
'ঝড়-কল্প' এই আখ্যা হে হৃদ'ম, তবু যেবা পার ।  
এবে কৈশোরও নহ—কোথা লণ্ণ-চাক্ষু্য আমাতে,

সহচর হ'তে নারি ঝড় তব আকাশ-বাতায়,  
তোমার পবন-গতি জিনিব যা অবহেলা ভবে  
সে আশ্রয় করনা-বস্ত । নহিলে কি করিতাম হায়,

সকলক আতি এই জীবনের চরম প্রহরে ?  
জাগাও জাগাও ঝড়, মেঘ, পত্র, তরঙ্গের সম  
জীবন-কটকে মোর রক্ত বান ! বাঁচাও আমারে !

হুর্দিন শৃঙ্খল লয়ে চািছে বন্দীর নতি মম,  
আমি না ঝড়ের মতো গর্ভদীপ্ত, নিবিষ্ট ও অশান্ততম ?

অরণ্যানী বীণা সম বীণা তুমি করহ আমারে :  
কোন ক্ষতি মানিব না সব মোর যায় করে হাক !  
জাণ্ডক ছদয়ে আজি কলরোল দীপক-খংকারে

একটি শারদতান দোহার অন্তর জুড়ে বাক  
মধুর গন্তীর । হে ত্রাস-সম্বরারি মহাবল,  
মোর মাঝে শক্তি ধরো, আমাতে শান্ততা গোপ পাক !

দিগবিসিকে বিস্তারিয়ে মোর পঙ্ক ভাবনার দল  
বিবর্ণপত্রের মতো, অচিরেই নব জন্ম আশে !  
আর এই কবিতার মন্ত্র নিয়ে হে তুমি প্রবল,

ছড়াও আমার বাণী আজি সর্ব নরের নিবাসে  
অনিবাণ কুণ্ড হ'তে যেন ভয়, আগ্নেয়-কবিকা  
অনাগত ধরণীর হও তুমি মোর কাব্যবাসে

ভবিষ্যের জয়নাদ ! এই শীত জানি গো ঝটিকা,  
আসিয়াছে রচিতেই বসন্তের আগমনী-লিখা ।

অনুবাদক : জীবনকৃষ্ণ দাঁ

## চিত্রলেখা



[ উপভাস ]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মণ

বিংশ পরিচ্ছেদ

চিত্রলেখার ব্যবহারে কুমারগিরি আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার কাছে আসবার জন্ত নর্তকীর যখন আগ্রহ ছিল, সে সময় ণীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং নর্তকীই তার প্রতি ঠা হয়েছিল। তাহলে এখন নর্তকীর ভেতর-এ পরিবর্তন কেন? নর্তকীর ব্যবহারের চাইতে তার নিজের ব্যবহার যোগীর বেশী র্য্য বোধ হচ্ছিল। নটীর কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্ত এক দিন পাশ্রাণ চোঁটা করছিল। তবে এখন সে তাকে গ্রহণ করল? এ কি তার নিজের ওপর অবিখ্যাস দূর করবার প্রচেষ্টা? জীবনের ক্ষেত্র তো শুধু জয়লাভের জন্ত, পথজয়ের প্লাবন তাকে করত পাবে না। হয়ত যোগী তার নিজের দুর্বলতা জানিতে ছিলেন আর সেই দুর্বলতাকে দূর করবার জন্তই সে নর্তকীকে করতে চোঁটা করেছিল, কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারে নি। মসাকলোর রূপও বড় অদ্ভুত! নিজের কাছে তো তার পরাজয়, তা ছাড়া এক জন নটীর কাছে তাকে হার মানতে হয়—নিজের পরাজয়ে সে দুঃখ পায়, কিন্তু নটীর কাছে পরাজয়ে দুঃখের তার কোথায় হয়। যোগী বলে ওঠে, “না, নর্তকী চিত্রলেখাকে ধানভেই হবে! কিন্তু কি উপায়?” “আজ্ঞা, সে আমাকে ভালবাসতে পারে না? হয়ত সে আর এক জনকে ভালবাসে। যদি সে সেনাপতি বীজগুপ্তকে আর না ভালবাসে তাহলে এ

সম্ভব হলেও হতে পারে...না, তখন সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অতএব, সেনাপতিক নর্তকীর জীবন থেকে সরাতে হবে।”

প্রায় দু'মাস হ'ল যোগীর আশ্রমে চিত্রলেখা এসেছে। যোগীর সংগে যে ঘটনা ঘটেছে তারও প্রায় এক মাস হ'ল। এর ভেতর সে নিজেকে সমস্ত বেখেঁচে-একটুও দুর্বলতা সে প্রকাশ করে নি। সে মনে করেছিল যে, নর্তকীকে কাছে রেখে সে ভোগ-বাসনাকে জয় করবে কিন্তু বেশী দিন সে টিক থাকতে পারলে না। এক বার যে আশ্রম আসে উঠেছে সে তো আত্মতৃষ্টি চাইবেই! সে আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলে না।

সে দিন রাতে চিত্রলেখাকে কাছে ডেকে বলে, “নর্তকী! এক মাস হয়ে গেছে। নিজেকে উপরে উঠাবার চোঁটা করেছে। এখন আমার মনে হয় যে আমি দুর্বলতাকে জয় করেছে!”

নর্তকী শুধু হাসে, “বোধ হয়।”

যোগী টোট কামড়াতে কামড়াতে বলে, “সুনলাম যে অর্ঘ্য বীজগুপ্ত কানী গেছেন। তাঁর সংগে অর্ঘ্য যুভাজয় ও তাঁর কস্তা যশোধরাও গেছেন।”

নর্তকী চমকিয়ে উঠে বলে, “কি বললেন, যশোধরাও বীজগুপ্তের সংগে গিয়েছে?”

“এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে! তুমি তো বীজগুপ্তকে বলেই দিয়েছ যে সে যেন যশোধরাকে বিবাহ করে ও গাইদ্যধর্ম পালন করে—হ্যাঁ, এ তুমি ঠিকই করেছ। তুমিই বল যে যশোধরাকে বিবাহ করা কি বীজগুপ্তের উচিত নয়?”

“আমি জানি না। আর দয়া করে বীজগুপ্ত সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে বলবেন না!”

“কেন বলব না! তুমি তাকে ভালবাস বলে! বীজগুপ্ত অজ্ঞ এক জন নারীকে ভালবাসে এ তুমি সহ করতে পারছ না, তাই না? তবে তাকে ভ্যাগাই বা করলে কেন? তুমি কি মনে কর যে স্ত্রীলোকেরাই সব কিছু করতে পারে, পুরুষের কিছু করার কোন অধিকার নেই, তুমি কি চাও যে সে তোমার দাস হয়ে থাকুক—কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়।”

যোগীর স্বরে প্রতিহিংসার এক তীব্র বাগ। যে নারীর কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন তাকে পরাজিত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে চিত্রলেখা বলে, “আমি যা কিছু করেছি সবই বীজগুপ্তের মংগলের জন্ত। সমাজের দুষ্টিতে আমি তাকে নীচে নামিয়ে আনছিলাম, তাকে পরিত্যাগ করে আমি তাকে ওপরে উঠাবার চোঁটামাত্র করেছি।”

“তা কি করে মেনে নিব? এতে তুমি নিজেকে প্রবকনা করছ। যে সময় তুমি বীজগুপ্তকে পরিত্যাগ করেছিলে তখন আমার সংগে প্রেম ছাই ছিল তোমার লক্ষ্য!” নর্তকী আসবার পর নিজের গুরুত্ব পুনরুত্থান তেজ ও স্বষ্টি যোগী হারিয়ে ফেলেছিল। সে সব শক্তি যেন সে আবার ফিরে পেল। তুমি বীজগুপ্তকে প্রবকনা করতে পার, কিন্তু আমাকে পার না। বাসনার উত্তমত্তায় তুমি পবিত্র প্রেমকে অস্বীকার করেছ, মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়েছ। বীজগুপ্তের জীবন নষ্ট করে দিয়ে তুমি আমার কাছে চলে এসে! ওদিকে বীজগুপ্ত এক সাধারণ নটীর জন্ত তার গাইদ্য জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিলে। কিন্তু কেন—শুধু সে তোমাকে ভালবাসত বলে—প্রেমের পবিত্রতা অনুভব করেছিল বলে?”

নর্তকী চিৎকার করে ওঠে, "চুপ কর! আর শুনতে চাই না।"

যোগী নর্তকীর দিকে তাকিয়ে হাসে, "চুপ করব, এতেই এক চঞ্চল হয়ে উঠলে, এখনও তো সব বলি নি। আমি সব বলব এবং তোমাকে সব শুনতে হবে। তুমি যা কিছু বুঝেছ তার প্রতিদানও পেরেছ। তুমি ভাবছ যে বীজগুপ্ত এখনও তোমাকে ভালবাসে, হয়ত এও ভাবছ যে সে এখানে যখন ফিরে আসবে তখন তার কাছে গেলে সে তোমাকে গ্রহণ করবে। যদি তাই মনে কর তাহলে তুমি ভুল করছ। তোমার বিশ্বের প্রভাব দূর করবার মত সে পেরে গেছে। তুমি তাকে নিঃশেষ করবার কোন চেষ্টাই চাট কর নি, কিন্তু যশোধরা তাকে বাঁচিয়েছে। এখন যে সে তোমাকে নিয়ে বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ করবে এতে দ্বন্দ্ব আশ্চর্য্য কি?"

"যোগী, তুমি এসব সত্যি বলছ? বীজগুপ্ত যশোধরাকে বিবাহ করেছে? না যোগী, এ একেবারে অসম্ভব!"

যোগীর গম্ভীর ভাবে কিন্তু অন্তঃস্বল-শশী—তীক্ষ্ণ ব্যাণ্ড করে বলে, ও; হ্যাঁ, অসম্ভব! কেন? কামনার উদ্ভূত হয়ে বীজগুপ্তের পবিত্র প্রমকে অস্বীকার করে তোমার আমার কাছে ছুটে আসা যদি সম্ভব হয় তাহলে বীজগুপ্তের এক স্বর্গীয় প্রতিমার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কেন সম্ভব হবে না? ও মিথ্যা! হৃদয় ও নিজের ওপর অটল বিশ্বাস। আমার কথায় তোমার আশঙ্কা হচ্ছে না, না? তাহলে বাও, নব-বন্দিত আজ সকালেই সে গেছে, অভিনন্দন দিয়ে এসে। বাও, নিজের চোখেই নিজের প্রমিককে না—নিজের দাসকে দেখে এসে যে সে কেমন অপর এক রীতির সঙ্গে প্রণয়লীলায় মগ্ন।"

নর্তকী উঠে দাঁড়ায়, "কি বললে, তারা এসে গেছে?" তার সমস্ত বীরী কাঁপতে থাকে, চোখের বিষমতা ছেয়ে যায়। পাটলিপুত্রের কে তাকিয়ে বলে, "তিনি ফিরে এসেছেন? যোগী তোমার কাছে নতি করছি, এক বার বল যে যা বলেছ সব মিথ্যা!"

"কি বলব... যে... সব মিথ্যা। কিন্তু সত্যকে মিথ্যা বলব করে? বেশ তোমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় নিজেই গিয়ে হয় দেখে এসো।"

"না! সব শেষ হয়ে গেছে—আমার যাবার আর প্রয়োজনই। আমার সর্বস্ব আজ হারিয়ে গেছে।"

যোগী চিত্রলেখার কাছে সবে এসে বলে, "শেষ হয়ে গেছে? খবরতে কোন কিছু কি কখনও শেষ হয়ে যায়—একটির শেষ ন আর একটির আরম্ভ। শেষ হয়ে যাবে কি করে, চিত্রলেখা!" গীর স্বর পূর্ণাঙ্গাঙ্গা অনেক কোমল এবং সুস্থ কম্পন। "তুমি না যে আমি তোমাকে ভালবাসি। আর তুমি আমাকে ভাল বাসলেও যুগা কর না। তুমি আমার জীবনে আসতে চাও, দিন আসতে পার নি শুধু বীজগুপ্তের জন্ত। তুমি তাকে দুঃখ ঘছ কিছু সেও তোমাকে কম দুঃখ দেয় নি। সে এখন একটা দূর পেয়ে গেছে, তোমাকেও একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। লেখা! আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি।" যোগী সজোরে কীর হাত চেপে ধরে।

নর্তকীও বিনা বাধায় নিজের হাত যোগীর হাতের মধ্যে দিয়ে। যোগী বলে যায়, "হ্রেম-শুধু হ্রেম-এখন হ্রেমই আমার

ধর্ম। তুমি আমার জীবনে এসেছ, তুমি আমাকে প্রেমমগ্নে দীক্ষা দিতে এসেছ। এসো—আমরা দু'জনা এক হয়ে বাই—"

দু'জনার অর্থ মিলে যায়—নর্তকী কোন আপত্তি করে না।

যোগী পাগলের মত বকে যেতে থাকে—"এসো, এতে কত সুখ, কত স্পন্দন, কত অনুরূপিত। আমার প্রাণেশ্বরী, আজ সব উজাড় করে তোমাকে অর্পণ করব। আজ তোমার যৌবনের অন্তল সাগরে ডুবে যেতে চাই।" যোগীর চোখ বন্ধ, নর্তকীরও চোখ বন্ধ। দু'জনা পরস্পরকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে নেয়। চিত্রলেখা বলে ওঠে, "তবে তাই হ'ক।"

\* \* \* \*

প্রাতঃকালে চিত্রলেখার ঘুম ভাঙে কিন্তু সে তখনও জেবে চলেছে বীজগুপ্ত আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, না তা কখনও হতে পারে না। সে এই চিন্তা একেবারে সছ করতে পারে না। তার জগত অন্ধকার, নিজের ওপর তার ভারী রাগ হয়। কিন্তু বীজগুপ্তকে সে ত্যাগই বা করতে গেল কেন?

যোগীর তখনও ঘুম ভাঙে নি। তার চেহারা একেবারে বিকৃত হয়ে উঠেছে, যে কামনা এক মুহূর্তে তার সঞ্চয় ব্রতকে ভেঙ্গে দিয়েছে সেই কামনা তার তেজস্বীপুত্র চেহারা একেবারে মলিন করে দিয়েছে। নর্তকী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে যোগীকে দেখতে থাকে, চোখ সে কেঁপে ওঠে। বেশীক্ষণ সেখানে থাকবার তার সাহস হ'ল না, সে বাইরে চলে আসে। যে ব্যক্তির সঙ্গে সে সারা রাত ভোগ-বিলাস করলে তার মুখের চেহারা তার কাছে অত ভয়ানক লাগছে কেন? নর্তকীর খুব আশ্চর্য লাগে।

বিশালদেব উপাসনা শেষ করে চিত্রলেখাকে দেখে নমস্কার করে, "দেবীকে আজ এত অশুভ মনে হচ্ছে কেন?"

"সারা রাত ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি!" চিত্রলেখা হেসে বলে, "সেই সব ভয়াবহ স্বপ্নের জন্তই বোধ হয় আমাকে এত কষ্ট দেখাচ্ছে।"

"আচ্ছা, আজ এখনও পর্যন্ত গুরুদেব কুটিরের বাইরে এসেন না কেন?"

"তিনি এখনও সমাধিস্থ।"

"সমাধিস্থ?" বিশালদেব আশ্চর্য্য হয়ে বলে, "আজ এ প্রথম বার গুরুদেব জীবনের নিয়ম ভগ্ন করলেন।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, "দেবী চিত্রলেখা! কাল রাত্রের স্বপ্নে আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারি?"

"শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, সেই সব স্বপ্ন আমার বিগত জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত।"

"গত জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত। দেখি, আপনি যদি বলেন যে আধ্য বীজগুপ্তের বোঁজ করে আসি—তিনি হয়ত এত দিন কি এসেছেন।"

"হ্যাঁ, তিনি এসে গেছেন, তা' আমি জানি। কিন্তু তাতে হবে? তার আসা বা না-আসায় আমার কি লাভ?"

"দেবি, তুমি সত্যি বড় অদ্ভূত! তোমাকে বোকা বড় কান্না এই সেদিন তুমি এখন থেকে বীজগুপ্তের কাছে যেতে চাইছি আর আজ—"

নর্তকীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, সেদিন যেতে চাইছি।"

হ আজ আর চাই না। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তোমার ঐশ্বর্য্য কেন ?”

বিশালদেব মাথা নত করে বীরে উত্তর দেয়, “ঠিক বলছ ব, কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য দেখানোর হ'ল নিজের গুরুদেবের জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ। এবং আমার পক্ষে খুবই উচিত ও স্বাভাবিক। তুমি বেশ জানো যে, তোমার এখানে আসতে এখানকার মূৰ্খ শাস্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ আশ্রম এমনই এক স্থান যেনে এক জন অপরের উচিত ও অপ্রচলিত কার্যের যে শুধু সোচনা করতে পারে তা নয়, সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করবার কারণও তার আছে। “আমি কিন্তু একথা মানতে রাজী নাই।” বেশ। কিন্তু তবুও আজ আৰ্য্য বীজগুপ্তের গৃহে যাব শুধু তার গুরুভাই শ্বেতাকের সঙ্গে দেখা করতে। আমি আর এক বার মাকে অল্পকোষ জানাচ্ছি যে তুমি এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে। আমাদের মুক্তি দাও, আমাদের দয়া করে।”

নর্তকী হেসে বলে, “দয়া! কার ওপর দয়া করবার কথা বলছ? নির্ভীরের কাছে দয়ার প্রত্যাশা করো—সত্যারক্তাকে দিয়ে শ করতে চাও? তুমি ভুল করছো, বিশালদেব।”

খিত্রহরে বিশালদেব নগর থেকে ফিরে আসে, চিত্রলেখা তারই ক্ষা করছিল। এত কিছু বলবার পরও, সিদ্ধান্ত ঠিক করে বার পরও বীজগুপ্ত সম্বন্ধে নর্তকী জানতে চায়। কুটীরের বাইরে ছেঁদে নীচে নর্তকী শুয়েছিল, বিশালদেবকে দেখতে পেয়েই ভাঙি উঠে বসে।

বিশালদেব সোজা চিত্রলেখার কাছে এসে দাঁড়ায়, “দেবী চিত্রলেখা, নেই, আমি আৰ্য্য বীজগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিনি, শুধু আৰ্য্যাকের সঙ্গে দেখা করেই চলে এসেছি। আমি বেশীক্ষণ সেখানে ও নি। কারণ শ্বেতাক আৰ্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যাচ্ছিল। তার আমিও আৰ্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহ পর্য্যন্ত গেলাম। এর পর সে ভেতর গেল আর আমিও ফিরে এলাম।”

নর্তকী জিজ্ঞেস করে, “শ্বেতাক আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস।?”

“হ্যাঁ, এই তোমার শরীর কেমন আছে, তুমি ভাল আজ তো! ভাঙি ছিল, তা না হলে এখানে এক বার আসত! হ্যাঁ, একটা কথা। তোমার হয়ত আশ্চর্য্য লাগবে যে শ্বেতাক রাকে ভালবাসে, সে তাকে বিয়েও করতে চায়।”

কি? শ্বেতাক যশোধরাকে বিয়ে করতে চায়? আমার তো ন ছিল যে বীজগুপ্তের সঙ্গে যশোধরার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।”

তুমি কেমন করে ভেবে নিলে যে বীজগুপ্তের সঙ্গে যশোধরার হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, শ্বেতাক অবশ্য বলছিল যে যশোধরা গুপ্তের প্রতি আকৃষ্ট—কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস যে বীজগুপ্ত রাকে কখনই বিয়ে করবে না। কারণ তোমাকে সে ভুলতে হ'ল।”

ধন্যবাদ। বিশালদেব, তোমাকে যে কতু কথা বলছি তার জন্ত ক ক্ষমা কোর। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব, তুমি কর।”

চিত্রলেখা সোজা কুটীরের ভেতর চলে যায়, তার এই পরিবর্তনের

কোন অর্থই বিশালদেব খুঁজে পায় না—সে বলে ওঠে, “কি বিচিত্র এই নারী!”

কুমারগিরি শুয়ে শুয়ে চিত্রলেখার কথা ভাবছিল। তাকে দেখতেই পাগলের মত বলে ওঠে—“এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, আমার রাণী! এসো, কাছে এসো।” কিন্তু নর্তকীর চোখের দিকে তাকাতোই তার এই পাগলামী এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল। নর্তকীর চোখ জ্বলছিল—যুগা, ক্ষোভ ও দুর্গাভিষেক মেশান তার দৃষ্টি—সে বরষ বয়ে বলে ওঠে, “ইতর, নীচ, মিথ্যাবাদী! আমাকে ছোঁবে না!”

যোগী সঙ্গে দাঁড়ায়। নর্তকী বলে, “তুমি একটা—একটা কামোদ্ভূত পশু আমাকে প্ররঞ্জন করেছে। আমাকে ধিগ্যা কথা বলে নিজের বাসনা চরিতার্থ করেছে। তোমার সমস্ত তপস্বী শিফল হয়ে যাবে এবং যুগ যুগ তোমাকে নারকীর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমি এখান থেকে যাচ্ছি আর তুমি আমাকে আটকাতে এসো না।”

যোগী সাহস নিয়ে বলে, “আমি যা কিছু করেছি সে সবই তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে!”

“বাসনার নগণ্য কাঁট! তুমি প্রেমের কি জানো? তুমি নিজের জন্ত বেঁচে আছ—তোমার কেন্দ্র হ'ল আমিহ ও স্বার্থ—তুমি ভালবাসার কি জানো? প্রেমের অর্থ হ'ল নিজেকে বলি দেওয়া, আত্মত্যাগ, আমিহ স্বার্থকে ভুলে যাওয়া। তোমার জ্ঞান, তোমার তপস্বী, তোমার সাধনা তোমার আরাধনা সব ভুল, সব মিথ্যা; সত্য-পথ থেকে তুমি অনেক দূরে। নিজের তৃষ্ণার জন্ত, গাহ'ন্য জীবনের বাধা এড়াবার জন্ত ভীষণ মত সন্ন্যাসীর এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, সমস্ত জগতকে প্ররঞ্জন করেছে, নিজের বাসনা তৃপ্ত করবার জন্ত আমাকে প্ররঞ্জন করেছে, তবুও তুমি প্রেমের দোহাই দিচ্ছ—লজ্জা করে না, ইতর, পাষণ্ড, প্ররঞ্জন!”

যোগী এ অপমান সহ্য করতে পারে না, সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, “যাও নর্তকী, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছ। তুমি আমাকে পরাজিত করেছিলে, আমিও তোমাকে পরাজিত করেছি। কারণ পরাজয় বলে কোন জিনিষ আমার জীবনে নেই। তুমি কি বলতে চাইছ! প্রথমে নিজেকে দেখবার চেষ্টা কর, নিজের মুখেও যে পশুত্বের ছাপ আছে তা'তো দেখতে পাবে না। এখনি এখান থেকে চলে যাও কিন্তু বাবার সময় নিজের অভিশাপও সঙ্গে করে নিয়ে যাও!” আবেগে যোগী কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে যায়।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

আৰ্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহ থেকে ফিরে এসে শ্বেতাক সেনাপতি বীজগুপ্তকে বলে, “আজ যোগী কুমারগিরির শিবা বিশালদেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বলল যে, দেবী চিত্রলেখা ভাল আছেন।”

বীজগুপ্ত কোন উত্তর দেয় না।

শ্বেতাক আবার জিজ্ঞেস করে, “এক বার প্রতুষ্টার সঙ্গে দেখা করা কি উচিত নয়?”

সেনাপতি বলে, “না, তার কোন প্রয়োজন নেই।”

শ্বেতাক দেখলে যে চিত্রলেখা সম্বন্ধে বীজগুপ্তের কোন আগ্রহ নেই, সে কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

পাটিলপুরে এসে বীজগুপ্তের উদ্বিগ্নতা তো কমলো না বরং বেড়েই। তার হৃদয়ে দুই বিরুদ্ধ ভাবের তুমুল যুদ্ধ চলছিল—হুই মো তার সামনে। চিত্রলেখা চলে যাবার পর তার জীবন বারে শূণ্য হয়ে গিয়েছিল, সেই শূণ্যতা তার পক্ষে সহ্য করা যে হয়ে উঠেছিল। সেই শূণ্যতাকে পূর্ণ করবার জন্য যশোধরা জীবনে এসে দাঁড়ায়। এখন সে যশোধরাকে পেতে চায়, তাকে করতে চায়। কিন্তু এক বার এই যশোধরাকে সে অস্বীকার ছ, এখন তার জন্তে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে ভিক্ষা চাওয়া পক্ষে পরাজয় এবং তার আত্মা এ পরাজয়কে স্বীকার করতে নয়।

বীজগুপ্ত মৌর্য-সাম্রাজ্যের সেনাবিভাগের এক জন সদস্য। লগ্নে ফিরে আসবার পর রাজ-কার্যে তার মন লাগে না। তার কিছুই ভাল লাগে না। সে গৃহের বাইরে যাওয়া ছেড়ে দেয়। র বিশাল জনবর, উৎসব, কোলাহল আমোদ-প্রমোদ বৃশ্চিকের গকে দংশন করে।

যাঃ খেতাক তার কাছে চিত্রলেখার প্রসঙ্গ তুলে তার আরও চকল করে দেয়। সেদিন রাতে তার ঘুম আসে না। খা ত্রপে আছে, আনন্দে আছে। আর সে দুঃখী। কত, কত ভাল! পরাজয় হ'ক, ক্ষতি নেই। যশোধরাকে করতেই হবে। জীবনের শূণ্যতা দূর করে জীবনকে উপভোগ ই হবে।

জিহ্মপ্তের স্বপ্নে ও ভাবে চিত্রলেখার প্রতি এই ঔনসৌজ্য খেতাক খম দেখলে। সে প্রভুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কথা ই পারে নি। সেও রাতে ঘুমতে পারে না।

কালো অন্ধার দিন অপেক্ষা বীজগুপ্ত আজ যেন বেশী প্রসন্ন। সে বে সেলছে যে আর্ধ্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যশোধরাকে বিয়ে করার নিয়ে যাবে। আজ বহু দিন পারে সেনাশক্তির মুখে স্বাভাবিক থা যায়। জলপান করতে বসে দাসীকে বলে, “খেতাক !, তাকে একুণি এক বার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।”

তাক এসে দাঁড়ায়। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যে সে গভীর সমতা সমাধানে ব্যস্ত। “খেতাক, তোমার শরীর কি ই?”

খা নীচু করে খেতাক উত্তর দেয়, “না প্রভু, শরীর তো লই আছে, কিন্তু মনের অবস্থা স্বাভাবিক নেই।”

ফন, কি হয়েছে?”

ভু, আপনি আমাকে অনেক দয়া করেছেন—আপনিই আমার দরতে পারেন।”

তাক, “তুমি তো জানই যে তুমি আমার ভাই-এর মতন। ছায়া বা কিছু সম্ভব তোমার জন্ত তা করতে আমি সর্দা।”

মি তো জানি এবং সেই জন্তই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে রছি। প্রভু! আমি আর্ধ্য মৃত্যুঞ্জয়ের কস্তা যশোধরার ন করতে চাই।”

গুপ্ত চমকিয়ে ওঠে, তার মনে হ'ল যেন শ'খানেক বিচ্ছে তার শরীরে জল ছুটিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে র দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, “কি বললে? যশোধরার

পাণিগ্রহণ করতে চাও? তা তাতে আমার সাহায্যের কি প্রয়োজন?”

“আর্ধ্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে প্রভু যদি এটা প্রস্তাব করেন।”

“খেতাক, তুমি জানো যে আর্ধ্য মৃত্যুঞ্জয় আমার সঙ্গে তাঁর কস্তার বিবাহ দেবার ঠিক করেছিলেন—আমি সে সময়ে চিত্রলেখার জন্তে সে প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলাম। তুমি এও জানো যে, চিত্রলেখা আমার জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, এবং যশোধরার প্রতি এখন আমি বেশ আগ্রহ।”

“সব জানি প্রভু! কিন্তু এ কথা মনে হয় নি যে প্রভুর মনে যশোধরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবার বাসনা জাগবে।”

“না খেতাক—তুমি বা বলছ তা সম্ভব নয়। আমি যশোধরাকে ভালবাসি—আজ রাতেই যশোধরাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি—...খেতাক, তুমি কি আমাকে দিয়ে—কি করতে চাও। এত বেদনা, এত দুঃখ, এত নিরাশা কি আমার জন্ত পথ্যাপ্ত নয়? তুমি কি চাও যে আমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিই? না খেতাক—এটুকু জেনে রাখো যে, আমি যশোধরাকে বিয়ে করব।”

খেতাকের চোখে জল ভরে আসে। বীজগুপ্তের সামনে হাত-জোড় করে বলে, “প্রভু! আমাকে ক্ষমা কোর। আমি অপরাধ করেছি, নিজের গুণের কোন অধিকার ছিল না, আমাকে ক্ষমা কোর। প্রভু, তোমার মন অনেক উচু, তোমার হৃদয় অনেক বিশাল, তুমি আমার আশ্রয়, আমাকে ক্ষমা করে দিও।”

সেনাশক্তি চিংকার করে বলে ওঠে, “আমি পাগল হয়ে যাব, খেতাক! যাও এখান থেকে চলে যাও, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, তোমার কাছে মিনতি করছি তুমি এখান থেকে চলে যাও।”

খেতাক চলে যায়।

সেনাশক্তি এক বার বলে, “হায় যে ভাগ্য!” আবার বলে, “না খেতাক, এ কখনই হ'তে পারে না—আমি যশোধরাকে বিয়ে করব—আমি নিশ্চয় বিয়ে করব। ত্রপে থাকবার অধিকার কি আমার নেই? আমি একুণি যাব। আমার সিদ্ধান্তকে কেউ এখন বাধা দিতে পারে না”—দাসীকে বলে, “একুণি আমি বাইরে যাব, রথ আনতে বল।”

আবার ভাবে, “কিন্তু খেতাক! সে কোন অধিকারে যশোধরাকে ভালবেসেছে? সে কি জানে না যে আমি যশোধরার প্রতি আগ্রহ?”—এক গেলস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে খায়—“কিন্তু এতে খেতাকের কি অপরাধ! কোন নারীকে ভালবাসা তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে যুবক, রক্ত-মাংসে গড়া তার শরীর, প্রকৃতিগত ইচ্ছা যে তার থাকবে এতে আশ্চর্য কি? সে জানবেই বা কি করে চিত্রলেখার প্রতি আমার আর কোন আসক্তি নেই?”

বীজগুপ্তের বিচারধারা বদলিয়ে যায়। “চিত্রলেখার এই আমার কোন আসক্তি নেই—সত্যি কি ভাট? আমি কি এত দুঃখ যে এক বার এক জন নারীকে ভালবেসে এখন আবার অপর এ নারীকে ভালবাসছি। সত্যি প্রেম কি স্থায়ী হয় না?”

সে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। সে কিছুতেই মানা পারে না যে প্রেম স্থায়ী—যদিও এর সত্যতা সে কিছুটা উপলব্ধ করতে পারছিল—না, প্রেম অস্থায়ী হ'তে পারে না। তবে আ

সব কেন করতে চলেছি? চিত্রলেখার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জ? না।" চিত্রলেখা সহজে কোন বিদ্রোহধারণা তার মনে হল না।

রথ ঘাটে এসে পৌঁছলে সে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহের দিকে বণ্ণা হয়। কিন্তু তার চিন্তার গ্রাণ্ড ছিল হয় না—“সংঘের অর্থ কি এই—খিঁচিতে নিজের চিন্তাই কি সব? তাহলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ রাখায়? প্রত্যেক প্রাণী নিজের জন্ত ভীত থাকে, স্বার্থবোধে বাই কাজ করে। কিন্তু তাহলে আমার এবং পৃথিবীর অন্যান্য পিণীদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? যশোধরার সঙ্গে আমার বিয়ের বিধি কি হবে? এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—সে ব্যক্তি আর কেউ নয় আমার প্রিয়, আমার ভাইএর সমান,—যেতাক! আর সত্যি কি যশোধরাকে ভালবাসতে পারব? যখন নিজের দুঃখ করবার জন্তে যশোধরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চলেছি। কিন্তু র? না, তাকে বিয়ে করবার আমার কোন অধিকার নেই। তাকের জীবন নষ্ট করবার কোন অধিকার আমার নেই। এখন বনে সাফল্য বা স্ত্রণ পাই বা না পাই আপন পথে অটল থাকাই আমার কর্তব্য। আপন স্ত্রণের জন্ত অপরের স্ত্রণ অপহরণ করা পুরুষতা, শুদ্ধ কাপুরুষতা নয়, নীচতা। আমাদের ভাগ্যে স্ত্রণ ও খ দুই আসবে—আমাদের কর্তব্য হ'ল যে দুইএর ভিতরই সাহসের গৈ জীবনকে উপভোগ করা।”

মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে রথ পৌঁছলে বীজগুপ্ত ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিলে অপেক্ষা করতে থাকে। আধ্যাশ্রেষ্ঠ বাইরে এসে বীজগুপ্তকে খ বলে, “আরে, আধ্যা বীজগুপ্ত যে! কি সৌভাগ্য আমার। কুশল তো? তার পর হঠাৎ এই বুদ্ধকে মনে পড়ল।”

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বীজগুপ্ত বলে, “আধ্যাশ্রেষ্ঠ! আজ আমি পনার কন্ডার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।”

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলেন, “উত্তম! অতি উত্তম!”

বীজগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ের হাসির অর্থ বুঝতে পারে, সেও হাসে। আধ্যা, আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই—সব কথা তো মেই বলেছি। আমার প্রস্তাব হ'ল যে যেতাকের সঙ্গে যদি পনার কন্ডার বিবাহ দেন। যেতাক কুসীন, স্তম্ভ, স্বাস্থ্যবান, এবং শিক্ষিত—বাস্তবিক সে আপনার কন্ডার উপযুক্ত পাত্র—এই হ'ল আমার চেয়েও উপযুক্ত।”

মৃত্যুঞ্জয় অনুমান করেছিলেন যে, বীজগুপ্ত যশোধরার সঙ্গে তার জর বিয়ের প্রস্তাব করবে—যেতাকের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে ক্ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বলেন, “আধ্যাশ্রেষ্ঠ! যেতাক উপযুক্ত পাত্র সত্য! কিন্তু সে ধনী নয়। দরহায় তার সঙ্গে আমার কন্ডার বিবাহের কথা আমি চিন্তাই তে পারি না।”

“কিন্তু আধ্যা! আপনার তো অতুল ঐর্ধ্য, আপনার কন্ডা ত আপনার আর কোন সম্ভানও নেই।”

“আমার সম্পত্তিতে আমার কন্ডার কোন অধিকার নেই, সবার অধিকারী হবে আমার দত্তকপুত্র। আচ্ছা, আধ্যাশ্রেষ্ঠ, আপনি নিজে কেন যশোধরাকে বিয়ে করছেন না?”

“আমি ঠিক করেছি যে বিয়ে করব না। তাহলে যেতাকের কি আপনার কন্ডার বিবাহ একেবারে অসম্ভব?”

“হ্যাঁ, আধ্যা! যেতাক উপযুক্ত ও কুসীন পাত্র হলেও বন্ধকণ সে নির্ধন ওতক্ষণ তার সঙ্গে আমি যশোধরার বিবাহ দিতে পারি না।”

“আচ্ছা, আধ্যাশ্রেষ্ঠ! আমি যেতাককে আমার দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করছি, সে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। বলুন, এখন আপনার কোন অমত নেই?”

“না, আধ্যা বীজগুপ্ত! সে অসম্ভব! তোমার এখন বয়সই বা কত? এমনও হ'তে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে তুমি বিয়ে করবে, তখন তোমার পুত্রই হবে তোমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।”

“আপনি ঠিক বলেছেন আধ্যাশ্রেষ্ঠ! যদিও এখন আমি ঠিক করেছি, যে বিয়ে করব না কিন্তু মানুষের মনের পরিবর্তন হ'তে কতক্ষণ? কিন্তু আমার ইচ্ছে যে যশোধরা ও যেতাকের বিবাহ হয়ে যায়, এ বিবাহে ওরা দু'জনই স্ত্রণী হবে। এর জন্ত আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আধ্যা! আমি আমার সম্পত্তি যেতাককে দান করে দেব।”

“বীজগুপ্ত! তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি কি করতে যাচ্ছ। তোমার চিত্ত এখন বড় চঞ্চল।”

“আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমার সম্পত্তি আমি যেতাককে দান করে দেব। শুধু থাকল সেনাপতির পদবী—এ পদবী ত্যাগ করতে গেলে সম্রাটের আজ্ঞার প্রয়োজন, আজই আমি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করে ফেলব। এখন নিশ্চয় আপনার কোন আপত্তি নেই?”

“কিন্তু এখনও ভেবে দেখ। আর এক বার ভাল করে ভেবে দেখ—এক বার আপন প্রস্তাব স্বীকৃত হয়ে গেলে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না।”

প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বীজগুপ্ত বলে, “আধ্যা মৃত্যুঞ্জয়! আমি যা বলেছি সে আমার শেষ কথা—আমি সেই ব্যক্তি, যে কথা ফিরিয়ে নিতে জানে না।”

“তাহলে তোমার প্রস্তাব স্বীকৃত হ'ল।” মৃত্যুঞ্জয় কম্পিত স্বরে বলেন।

বীজগুপ্ত উঠে দাঁড়ায়, “তাহলে আমি এখন যাচ্ছি। দানপত্র এবং পদবীর জন্ত রাজাজ্ঞার ব্যবস্থা আজই হয়ে যাবে। বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নেই। বিবাহের দিন আপনি ঠিক করে ফেলুন!”

“আধ্যা বীজগুপ্ত! আমি সারা জীবন পৃথিবীকে দেখেছি। আমি বলছি যে আপনি মানুষ নন, দেবতা!” মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

গৃহে ফিরে এসে বীজগুপ্ত যেতাকের ঘরে গিয়ে দেখে যে, যেতাক ঘুমচ্ছে—বালিশের ওয়াড় ভিজে গেছে, তার চোখের জল তখনও শুকিয়ে যায় নি। কাছে গিয়ে যেতাককে ডাকে—যেতাক ঘড়কড় করে উঠে বলে, “প্রভু! কি আজ্ঞা প্রভু?”

“সেনাপতি যেতাক, তুমি আজ থেকে আমাকে আর প্রভু বলে সম্বোধন করবে না।”

বিফারিত মেয়ে যেতাক বলে, “এ আপনি কি বলছেন?”

“আমি ঠিকই বলছি। শোন! আজ আমি আধ্যা মৃত্যুঞ্জয়ের



ছে তাঁর কন্ঠার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন—তিনি খয়ে আপত্তি জানান। সেই আপত্তিকে দূর করবার জন্য আমি ধর্ম সমস্ত সম্পত্তি ও পদবী তোমার নামে দান করে দিয়েছি। ধর্ম বশোধার সঙ্গে তোমার বিয়ে দ্বিতীয় তাঁর আর কোন পত্তি নেই।”

কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে যেতাক বিমূঢ়ের মত ঠাঁড়িয়ে বীজগুপ্তের ক তাকিয়ে থাকে—তার পর বলে, “না, প্রভু, এ কিছুতেই হ’তে রে না, আমি অপরাধী, আমি পাপী, আমাকে ক্ষমা করুন। মি চলে যাচ্ছি। আমি আপনার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। পনি আমার মত নরাধমকে দয়া করবেন না—আমি আপনার দান স্বীকার করার যোগ্য নই”—বীজগুপ্তের পায়ে সে লুট্টে পড়ে।

বীজগুপ্ত যেতাককে উঠিয়ে নিয়ে বলে, “বা হবার ছিল তাই ছে। এখনও তোমার দ্বন্দে আমার জ্ঞান যদি স্নেহ থাকে তাহলে মি বা কিছু কবেছি স্বীকার করো। পৃথিবীর চোখে আমাকে গোবান্দী প্রমাণ কোর না। আমি এই ঐশ্বর্যকে বহু দিন ভোগ হছি, এখন এতে আমার কোন লিপ্সা নেই। এ ঐশ্বর্যকে এখন মি উপভোগ কর। তোমার কাছে আমার শুধু প্রার্থনা যে তুমি দান দান অস্বীকার করবে না। চলো, দানপত্র ও পদবীর জ্ঞান রাজ্য বারস্তা করতে হবে।”

### স্বাভিংশ পরিলেখন

চিত্রলেখা ফিরে আসে বটে কিন্তু বীজগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে। বীজগুপ্তের সঙ্গে দেখা করবার সাহস তার নেই। তার হয় যে বীজগুপ্তের কাছে সে অপরাধিনী।

তার গৃহে অতুল ঐশ্বর্য, তারই মারখান সে সাধনা করতে দেয়। সাধনার মধ্যে সে স্বপ্নের আশ্রয় পেতে চায়, সে দম্বে অল্পশোভার আশ্রয় দত্ত হতে চায়। নিজের জীবনকে বৃথা করে। রাত-দিন কাঁদা ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই।

সে বীজগুপ্তকে ভালবাসত, তার ভালবাসা যে কত গভীর এত-র বিচ্ছেদে সে অনুভব করতে পারে। কিন্তু তার কোন মধ্যমা। কারণ কুমারগিরির পাগলামী এবং নিজের মৃত্যুর জ্ঞান এক ই মুহূর্তে সে যৌরীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে এখনও গুপ্তকে ভালবাসে, তাকে প্রবন্ধনা করতে চায় না। সে রাগ করেছে এবং সেই অপরাধের পরিণামস্বরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ অসহায় জলাই তার একমাত্র কর্তব্য। বেদনার আগাতে বতই জর্জরিত হয় ততই সে আনন্দ পায়, সুখ পায়। সে বতই ততই শান্তি পায়।

এমনি ভাবে এক মাস কেটে যায়। এক দিন সে বসে বসে ছে, দানী এসে বলে, “আর্য্য যেতাক আপনার সঙ্গে দেখা ত চান।”

নর্তকী চমকিয়ে ঠাঁড়িয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে যে, বীজগুপ্ত তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। “কোথায় সে? আমি এখনই যাচ্ছি।” অভিধিগৃহে বসে যেতাক চিত্রলেখার প্রতীক্ষা করছিল। নীকে দেখে তার খুব আশ্চর্য লাগে। মুখে তার সে জ্যোতি, অল্পম মেশ্রা বিকৃত হয়ে গেছে। তাকে চেনাও যায় না।

“দেবি! তোমার এ কি চেহারা হয়েছে?”

“কেন, বেশ ভালই তো আছি!”

কিছুক্ষণ চ’জনাই চূপ করে থাকে। নর্তকী জিজ্ঞেস করে, “আর্য্য বীজগুপ্ত তো ভাল আছেন?”

“হ্যাঁ, এমনি তিনি ভাল আছেন, তবে তার এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।”

“পরিবর্তন হয়েছে?” চিত্রলেখার কৌতূহল হয়, “কি রকম পরিবর্তন? তিনি কি বিবাহ করেছেন?”

শুধু হাসি হেসে যেতাক বলে, “না তিনি বিয়ে করেন নি, বিয়ে তো আমি করতে চলেছি। সেনাপতি মৃত্যুর পরে কস্তা বশোধার সঙ্গে আমার বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণ করবার জ্ঞান আমি এসেছি। কিন্তু আর্য্য বীজগুপ্ত এক মহান ত্যাগ করেছেন—তিনি রাহুব নন, দেবতা! সেনাপতি মৃত্যুর পরে তাঁর কস্তার বিবাহ আমার সঙ্গে দিতে রাজী ছিলেন না, কারণ আমি গবী। আর্য্য বীজগুপ্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও পদবী আমাকে দান করে দিয়েছেন। পাটলিপুত্র ছেড়ে তিনি কোথাও বাইরে চলে যাবেন—শুধু আমার বিয়ে পর্য্যন্ত এখানে আছেন।”

নর্তকীর চোখে জল ভরে আসে, “বীজগুপ্ত এই সব করে ফেলেছে? যেতাক! এই অদ্ভুত ত্যাগের জ্ঞান দানী হলম আমি। তবুও আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার বিয়ে কবে?”

“আগামী সপ্তাহের রবিবার দিন ১০০ সোমবারে প্রীতিভোজ সেদিন সম্রাট এবং রাজ্যের অস্ত্রাঙ্ক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সেনাপতিগণ আসবেন। দেবি! প্রীতিভোজের দিন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে।”

নর্তকী বলে, “যেতাক! আমাকে ক্ষমা কোর। আমি অল্প কোন দিন বাব, প্রীতিভোজের দিন যেতে পারব না। আমি এখন অল্প এক জীবন গ্রহণ করেছি। এ উৎসব আমার বাওরা উচিত হবে না।”

“দেবি! তুমি এক দিন আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করেছিলে এ আমার একান্ত অনুরোধ।”

“আমাকে ক্ষমা কোর! যেতাক! তুমি জানো যে আমার সিদ্ধান্তের কখনও পরিবর্তন হয় না। হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার ভালবাসা আছে বৈ কি, কিন্তু বড় বোনের ভালবাসা! আমি অল্প আর এক দিন খাব।”

“যেমন তোমার ইচ্ছে! কিন্তু একটা কথা। সোমবার রাতে আর্য্য বীজগুপ্ত দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করবেন।”

“বীজগুপ্ত সেই রাতেই চলে যাবে।” নর্তকী ইতস্তত করে কি পরক্ষণেই দূর হয়ে বলে, “কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায় আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না।”

যেতাক বলে, “আচ্ছা, তাহলে আমি এবার চলি।”

যেতাকের বিয়ে হয়ে যায়। প্রীতিভোজের দিন সম্রাটের সম্রাজ্ঞা মাল্য অভিধিরা আসেন। সেদিন বীজগুপ্ত সবাই অভ্যর্থনা করছিল। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলে, কিন্তু মনে অসহ বেদনা। নর্তকী চিত্রলেখার অল্পপত্তি তার একটুও লাগে না। পাটলিপুত্র ছাড়বার আগে শেষ বারের মত এক চিত্রলেখাকে দেখবার ইচ্ছে, কিন্তু নর্তকী শেষ পর্য্যন্ত আসে না।

জন সমাপ্ত হলে সম্রাট খেতাককে অভিনন্দন দিলেন এবং সনাপতি বলে অভিহিত করলেন। তার পর বীজগুপ্তকে কাছে উঠে দাঁড়ালেন, অত্যাগত অতিথির সবাই সম্রাটের উঠবার চেষ্টা দাঁড়ায়। বনের চারি দিক নিশ্চুত, সম্রাট বলেন, “বীজগুপ্ত, তুমিই এক মহান ব্যক্তি। তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি ! আজ ভারতবর্ষের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তোমার সামনে নত করছে।” এই বলে বীজগুপ্তের সামনে এসে চন্দ্রগুপ্ত মাথা নত করে দাঁড়ালেন। সবাইর মাথা নত হায়, নারীদের ভিতর থেকে অশ্রুত ক্রন্দনের শব্দ শোনা যায়। ষ্ট সম্রাটের সামনে মাথা হেঁট করে বলে, “মহারাজ, আমি এর সম্পূর্ণ অযোগ্য, আজ আমি দেশপরিচয় হারা করছি উৎসাহের নত—আপনি আমার শুধু আলীদার কন্যন ও বিদায়

ই বলে বীজগুপ্ত ফটকের দিকে এগিয়ে যায়। অতিথির দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে—মানবান দিয়ে বীজগুপ্ত চলেছে। মুখে এক দৈব হাসি—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই হাতজোড় দাঁড়িয়ে—ঐশ্বর্য ও শক্তির ঐ ভীড় থেকে শান্তি ও ত্যাগের নিয়ে বীজগুপ্ত বেঁধিয়ে পড়ে।

ইরে বীজগুপ্তের সেরকের দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে সবাই ওষ্ঠ, মুহূর্তের জন্ত বীজগুপ্ত থমকে দাঁড়ায়, প্রত্যেককে ভাল করে বলে, “খেতাককে আমারই মত মনে কোর এবং আমাকে র চোঁটা কোর।”

হয়েক জন সেবক একসঙ্গে বলে, “আমরা আপনার সঙ্গে

বীজগুপ্ত গম্ভীর স্বরে বলে, “না, তোমরা সবাই এখানে থাকবে, আমার সঙ্গে যাবে না।”

বীজগুপ্ত এগিয়ে চলে। অধিকারির প্রায় শেষ—নগরের চারি দিক । এক উৎসাহের মত বীজগুপ্ত এগিয়ে চলেছে। পরিধানে সাধারণ বস্ত্র, সংগে সামান্য কিছু মুদ্রা। সে আরও এগিয়ে শুধু পায়ের শব্দ শোনা যায়—সে আর এক বার পিছন ফিরে য়, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—

কিছুদূর এগিয়ে গেলে সেই অন্ধকারে হঠাৎ এক আবছা মূর্তিকে য় থাকতে দেখে—মূর্তিটি আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা, বীজগুপ্ত ওঠে, জিজ্ঞেস করে, “কে তুমি? প্রভু আমার প্রাণের !, আমাকে ক্ষমা কর।” বলেই সেই মূর্তিটি বীজগুপ্তের পায়ে য় পড়ে।

বীজগুপ্ত কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, “কে? চিত্রলেখা? তুমি আমার নর অভিষাপ, তুমি এখানে কেন এসেছ, চলে যাও, আমার থেকে চলে যাও—এখন সব শেষ হয়ে গেছে, তুমি কেন এসেছ, যাও...”

প্রাণের দেবতার কাছ থেকে শেষ চরণ-ধূলি পাবার জন্ত। দারের মত মনের দেবতাকে এক বার পূজা করবার জন্ত ! মাথা উঠে দাঁড়ায়, “নাথ! আমি তোমার জীবনকে নষ্ট করেছি, আমি তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা নাও, শান্তি দাও, আমাকে ত্যাগিয়ে দাও—শুধু আমাকে ক্ষমা না।”

বীজগুপ্তের সমস্ত শরীর কঁপে ওঠে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, “চিত্রলেখা, এখন সব শেষ হয়ে গেছে।, তুমিই সব শেষ করে দিয়েছ—আমাকে ছেড়ে দিয়ে, আমার সমস্ত আশা ভেঙে দিয়ে তুমি যোগী কুমারগিরির আশ্রমে চলে গিয়েছিলে।, এখন আমাকে আবার বিচলিত করতে কেন এসেছ? এখন আমার কাছে কিছুই নেই—জ্বলে উজ্জ্বল নেই, কাছে কোন ঐশ্বর্য নেই, আমাকে যেতে দাও।”

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের হাত ধরে ফেলে, “না, আমি তোমাকে অন্তত—আজকের জন্তও যেতে দেব না। এক দিন তোমাকে আমার অতিথি হয়ে থাকতে হবে, যদি যেতে হয় কাল বেণ।”

বীজগুপ্ত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, “আমার সামনে থেকে সরে যাও নর্তকী। আমাকে তুমি আটকাতে পার না। নিজেই তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ, এখন শুধু তার পরিণাম দেখ—আমাকে যেতে দাও।”

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে, “আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না—তোমাকে আমার সঙ্গে আমার গৃহ পর্যন্ত যেতে হবে। প্রভু, তোমার স্বপ্নে আমার জন্ত কি একটুও স্থান নেই? বল, চুপ করে থাকলে কেন?”.....চিত্রলেখা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দে।

বীজগুপ্ত নিজেকে আর সঞ্চরণ করতে পারে না, সে বলে, “যদি প্রেমই মরে যেতে তাহলে এ অতুল ঐশ্বর্যই বা ছাড়বে কেন? চিত্রলেখা, আমি চেয়েছিলাম যে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা যেন মরে যায়। কিন্তু তা হ'ল না, তা' হবেও না।” চিত্রলেখাকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করতে চায়।

কিন্তু চিত্রলেখা সরে দাঁড়ায়, “না, আমার দেবতা! আমার শরীরকে স্পর্শ করবেন না। আমি অপবিত্রা, পতিতা, পাপিনী! চলুন, আমার গৃহে চলুন, সেখানে আমাকে পবিত্র করে দিন—আমাকে শাস্তি দিয়ে আমাকে পবিত্র করে তুলুন।”

“চলো!” বীজগুপ্ত বলে, “চলো চিত্রলেখা, পৃথিবীতে শুধু তোমার কথাই অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমাকে বহু অধঃপতনে নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও। শুধু কথা দাও যে কাল তুমি আমাকে আটকাবে না।”

“হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।”

গৃহে পৌঁছিয়ে বীজগুপ্তের শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে চিত্রলেখা বলে, “নাথ, তুমি শুয়ে পড়, কাল সকালে কথাবার্তা হবে, কেমন?” এই বলে সে চলে যায়। বীজগুপ্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সকালে বীজগুপ্তের কাছে এসে বলে, “স্বামী! আপনি আমার চরণ-ধূলি দিন।”

“কিন্তু কেন?”

“আমি নিজেকে পবিত্র করছি। স্বামী, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি, রাগে-ক্রোধে আমি যোগী কুমারগিরির বাসনার উপাদান হয়ে যে দেহকে উপভোগ করতে দিয়েছি সেই দেহকে আমি পবিত্র করতে চাই।”

চিত্রলেখা সমস্ত ঘটনা বীজগুপ্তকে বলে, “এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে, কেন আপনার কাছে বাইনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।”

বীজগুপ্ত হেসে বলে, “বাস, শুধু এক জন্ত। চিত্রলেখা! তুমি খুব ভুল করেছ। তুমি আমাকে বুঝতেই ভুল করেছ। তুমি

। কাছে ক্ষমা চাইছ, কিন্তু কেন? • ভালবাসা হ'ল ত্যাগ, ও তদ্ব্যবস্থা। প্রেমের জগতে কোন অপরাধ হয় না, কী কিসের? কিন্তু আমার মুখ থেকে তখনসেই যদি তোমার হয় তো আমি বলছি যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।”

জ্বলন্ত বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে, “নাথ, আমাকে আবার গ্রহণ কর।”

সে কি করে সম্ভব? দেবী চিত্রলেখা! আমি যে আজ ভিখারী, সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছি—এখন এ কি করে?

নাথ, আমার তো ঐশ্বর্য আছে, আর আমি তো তোমার! ঐশ্বর্যও তোমার, তবে তুমি নির্ধন হ'লে কি করে? ক ভিখারী কেন বলছ?

তোমার সম্পত্তি, তোমার ঐশ্বর্য, সে তো আমার কোন কাজ না! আমি গ্রহণ করবার জন্ত তো ঐশ্বর্য পরিত্যাগ ন, ঐশ্বর্যকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করবার জন্তই সব ত্যাগ করছি; আমি তোমাকে ভিখারীরূপে স্বীকার করতে।

জ্বলন্তা উঠে দাঁড়ায়, “তাহলে তাই হ'ক—পৃথিবীতে আমরা ভিখারীর মত বেঁচেয়ে পড়ি। শ্রেমট হ'ক আমাদের ব একমাত্র অবলম্বন। দেবতা! আজই আমি সমস্ত দান করে দিচ্ছি—চলুন, আজ রাতেই হুঁজনা একসঙ্গে পাথেয় করে এক অজানা পথের দিকে রওনা হই।”

দার মুখগুণ আনন্দে উরসিত, চোখে অপূর্ণ দীপ্তি, অন্তরে তৃপ্তি অনুভূতি।

জগুপ্ত চিত্রলেখাকে চুম্বন করে, “আমরা হুঁজনা কত সুখী!”

### উপসংহার

। ক বছর পর।

হাপ্রভু রত্নাশ্বর বলেন, “বংস খেতাক! তোমার বিবাহ হয়ে এখন তুমি এক জন গৃহস্থ। আচ্ছা, এখন বল যে বীজগুপ্ত ও গিরি এ হুঁজনার মধ্যে কে পাপী?”

রত্নাশ্বরের সামনে মাথা নত করে খেতাক উত্তর দেয়, “মহাপ্রভু, দেবতা! পৃথিবীতে তিনি ত্যাগের প্রতিমূর্তি, বিশাল তাঁর জ্ঞান দিকে কুমারগিরি পশু। সে নিজের জন্ত জীবিত, তে তার জীবনের কোন দাম নেই। জীবনের নিয়ম লক্ষ্যন দ চলছে, নিজের স্বপ্নের জন্ত সে পার্শ্বিক বাধার সম্মুখীন হ'তে। কুমারগিরি পাপী।”

“বংস বিশালদেব! তুমি যোগীর দীক্ষা নিয়েছ, নিজের ও এখন একজন যোগী। তুমি বল যে তোমার মতে কুমারগিরি ও বীজগুপ্তের মধ্যে কে পাপী?”

বিশালদেব উত্তর দেয়, “মহাপ্রভু, যোগী কুমারগিরি অজ্ঞেয়। আমিওকে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞয় করেছেন, এবং সাংসারিক জগতের অনেক উচ্চে তাঁর অবস্থান। তাঁর সাধনা, জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে। অপর দিকে বীজগুপ্ত বাসনার দাস—সংসারের দ্বিগত ভোগ-বিলাস তার জীবন। সে পাপী—পাপময় জগতের সে এক প্রধান অংশ।”

রত্নাশ্বর বলেন, “দেখ, তোমরা হুঁজন বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর ছিলে—তাই পাপ সম্বন্ধে তোমাদের হুঁজনার ধারণাও বিভিন্ন হয়ে গেছে। তোমাদের বিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন যেতে পার। বাবার পূর্বে আনার শেষ বাণী শুনে যাও।”

“পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্যের অপর নাম পাপ। প্রত্যেক মানুষ এক বিশেষ মনঃপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়—প্রত্যেক মানুষ এই সংসার-রূপী বংগমকে অভিনয় করতে আসে। আপন স্বভাবের বীজভূত হয়ে আপনার কথারই সে পুনরাবৃত্তি করে যায়—এই হ'ল মানুষের জীবন। যার যে রকম স্বভাব সে সেই রকম কাজ করে এবং স্বভাব হ'ল প্রকৃতিগত। মানুষ নিজের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে না, কারণ সে পরিবর্তিত দাস—সে নিত্যন্ত অসহায়। তাহলে দেখছ, পাপ ও পুণ্য এ দু'এক কোন অর্থ নেই।”

“মানুষের ভিতর আনিচ্ছবাধ প্রধান। প্রত্যেক মানুষ চায় সুখ। শুধু সুখের কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। কেউ অর্থের ভিতর সুখ পায়, কেউ সুরার ভিতর সুখকে খুঁজে পায়, ব্যভিচারের ভিতর কেউ প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়, আবার কেউ ত্যাগের ভিতর সুখ পায় কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি সুখ চায়; পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায় এমন কোন কাজ মানুষ করে না যাঁতে সে দুঃখে পায়—মানুষের স্বভাবই হ'ল এই রকম এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈষম্য আছে।

“এইজ্ঞা পৃথিবীতে পাপের ঠিক পরিভাষা নেই—কখনও থাকতে পারে না। আমরা পাপও করি না, পুণ্যও করি না, আমরা শুধু তাই করি, যা আমাদের করতে হয়।”

রত্নাশ্বর উঠে দাঁড়ায়, “এ হ'ল আমার নিজের মত, তোমরা এর সঙ্গে একমত হও বা না হও আমি তোমাদের আমার মত স্বীকার করতে বাধ্য করছি না এবং বাধ্য করতেও পারি না। যাও—আলীকর্দ করি, তোমরা যেন সুখী হও।”

. সমাপ্ত

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]





মোড়ো বিকেলটা যখন পাখীর ভীত ডানার চকল হয়ে উঠেছে,

মেঘগুলো যখন বৃকের নিভৃত ইচ্ছার মত এসোমেসো আর লাল, সরমার নিরঙ্কট আয়েসী জীবনের পালে যে দুর্বল হাওয়া লাগল, তা অবশ্য ওট বড়ের নয়। যে কাব্য-গ্রন্থে তখনো নদীর জলকল্লোল বাজছে আর ফরাসী স্রোতা-কল্পের আশ্বাদ ছুট স্বগঠিত আঁড়ালের মধ্যে ধরে ছুট চোখের দৃষ্টিকে জানলার বন্ধের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে সে নিঃশব্দে বসেছিল, ভাবছিল মাহেন্দ্রালয়ে নিখুঁত বেশভূষায় প্রিয়ব্রতের আবির্ভাব হলে কি হয়? ঠিক সেই সময় চাকর এসে খবর দিল যে খোঁড়াতে আছে একটি লোক নিকোকার সাজানো ড্রিং-রুমে এসে বসেছে, আর উঠছে না।

কঠিন বাস্তবে ফিরে এসে সরমা ধমক দিল, “উঠছে না কি হু? তাড়িয়ে দে। একা না পারিস, হরি সিকেও ডাক। কাপড় কেমন? ড্রলোকের ঢেলে?”

চাকর জানাল যে লোকটির পরিচ্ছন্ন রীতিমত অপরিচ্ছন্ন এবং গাফায় নির্বিলম্ব আসন সংগ্রহ করেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সরমা বিরক্ত হল। এ গৃহে সে-ই সর্বময়ী কত্রী, মৃত পিতা-অর্ধসঙ্গতি রেখে গেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি দূর করবার এক দূরসম্পর্কীয়া পিসিমা এখানে নামমাত্র উপস্থিত আছেন, ২ ধর্মকর্ম ও রক্ষণাদি নিয়েই থাকেন। স্তরব্য এই উদ্ভট-ব শাস্তিভঙ্গকারীর ব্যবস্থা সরমাকেই করতে হয়। স্তরব্য তত কাব্যগ্রন্থ এবং প্রিয়ব্রতের চিন্তাকে টেবলের উপর জমা সরমা নিচে গেল। বড়ের বেগ তখন বাড়ছে।

ছুরিত পদে বাইরের ঘরে ঢুক লোকটির কাছে গিয়ে সে ত হল। গৃহস্থের শাস্তিভঙ্গ করার মত হৃদ্যন্ত চেহারা টির মোটেই নয়। গাত্র-বর্ণগৌর, তবে শীর্ণ মুখে ব্যক্তির আচ্ছাদ। রুক্ষ চুলগুলো এত দীর্ঘ যে তার কতকগুলো মুখ য়ে প্রায় ঢেকে এসে পড়েছে। গায়ে একটা তেলচিটে বালামি কোট। লোকটি সোফার মধ্যে যেন কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে র আছে।

সরমা প্রথমে স্বাভাবিক কণ্ঠে ডাকল, “তুনছেন?” তার পর র উচ্চ করল, কিন্তু কিছুই ফল হল না, লোকটি নির্বিলম্ব ৫ লাগল। চাকর জনতে চাইল ঠেলে তুলে দেবে কিনা। টিকে অন্তান্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সরমা বলল, “ধাক, আর বীরব দেখিয়ে কাজ নেই।” এতক্ষণ তুলতে সাহস হয় নি, আমাকে ডেকে এনে সাহস বেড়েছে নয়? আমি একটু ঘুরে

আসছি। ফিরে এসেও যদি দেখি লোকটি যায় নি; তখন ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে লোকটির ওপর একটু নজর রাখিস। এখন কাউকে বিশ্বাস নেই।” এই লোকটিও কোনো মন্তব্যে এসেছে কিনা কে জানে।

অনতিকাল পরেই সে বেগকোটটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। বড়ের বিকেলে আর সকলের মত গৃহের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকা তার সম্ভাব্য নয়। কিছু দূর হাঁটবার পরই বৃষ্টি নামল এবং তখনও সে কোনো ট্রাম বা বাস-এ উঠে বসল না। বেগকোটটা খুলে নিল মাত্র। যখন বৃষ্টি থেমে হাওয়ায় শুঁড়ো-শুঁড়ো জল ভাসছে, কেবল তখনই একটা ভঙ্গগোছের রেক্সারীর বসে কফির অর্ডার দিল। কোনো প্রিয়ব্রতের অভাবে কোনো আধুনিকার একটি বিশেষ বিকালও যে নষ্ট হতে পারে না, এটা দেখানোই বোধ হয় তার উদ্দেশ্য।

মাথায় নীল বড়ের বিশেষ টুপিটির তলায় কাঁধের উপর সরমার অক্ষত নরম চুল আলগা এসো গোঁপার শাসনে স্থগীকৃত হয়ে আছে। তার দীর্ঘায়ত ছাটি চোখ কুমারী-জীবনের নিচ্ছন্ন পথের সিকে রহস্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ও যখন কফির পেয়ালার রঙিন পুরস্কৃত ছুটি চোটে ডোবাল ও বুঝতে পারল রেক্সারীর সব কয়টি পুরুষের দৃষ্টি তার রহস্যময় দেহে আবদ্ধ। বেগকোটের কলারের মধ্যে হাঙ্গি লুকিয়ে অর্ধবৃত্ত পেয়ালার নামিয়ে রেখে সে উঠে পাঁজাল এবং দাম চুকিয়ে দিয়ে পথে নেমে এল। বর্ষণাক্ত হাওয়ায় তখন একটি শিথল উৎফুল্লতা। এই বার সে একটি বাস-এর দ্বিতলে উঠে বসল।

যখন বাড়ি ফিরল, তখন আলোক-সম্ভ্রম নগরী নটিনীর রূপ ধরেছে। এইবার আবার সে ফ্রান্সের সুরম্য উপত্যকার ফিরে বাবে। সদর দরজার সে চাকরকে প্রসন্ন করল, “সেই আপদটা বিদায় হয়েছে ত?”

চাকর স্যবিনয়ে জানাল, “না দিদিমণি, এখনো ঘুমুচ্ছে।” “বলিস কি রে, এ যে কুস্কর্ণের ঘুম!” সরমা বিম্বিত কণ্ঠে বলল, “চুখোর নয় ত? চ’ দেখি।”

বেগকোটটা চাকরের হাতে দিয়ে সরমা ড্রিং-রুমে প্রবেশ করল। লোকটি ঠিক সেই ভাবেই চেয়ারের আশ্রয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। তবে এতক্ষণের বিশ্রামের পর তার মুখটাকে আর একটু সজীব বলে মনে হল। পোষাক চোস্ত খোপহরস্ত না হলেও লোকটিকে অনাহারী মনে হয় না। সব-কিছু জড়িয়ে সে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত চেয়ারে বসে আছে, অর্থাৎ অর্ধশায়িত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সরমার আশ্রয়ে চাকর ঈষৎ ধাক্কা দিতেই লোকটি এবার উঠে বসল এবং কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে রইল। তার পর পাড়িয়ে উঠতে গিয়াই অমূল্য শব্দ করে আবার বসে পড়ল।

সরমা প্রসন্ন করল, “কে আপনি? কি হয়েছে আপনার?” সে অপরাধীর মত অপ্ৰতিভ কণ্ঠে বা বলল, তার মর্মান্ব হচ্ছে এই যে, বড়ের সময় একটি বড় সাইনবোর্ড স্থানচ্যুত হয়ে তার পায়ের বুজাঙ্কটে পড়ে। কিছু বরফ দিয়ে যজ্ঞা কমলে সে পাশেই এই বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে এখানে ঢুক পড়ে এবং চেয়ারে বসেই নিত্রান্তিত হয়। এখন একটা রিক্সা ডেকে দিলে সে চলে যেতে পারে।

সরমা বলল, “কই জুতোটা থুগুন, দেখি আপনার পায়ের অবস্থা।”



বা  
লশে  
ইচ্ছা  
আবার  
বক্ত

অপক্লপ ও অনিন্দ্য

অপর্যাপ্ত অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের বে  
উচ্ছসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
মিথ্য ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাজেয় প্রসাধনী।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম. এল. বহু রয়াও কোং প্রাইভেট লি  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

লক্ষ্মীবিলাস বালি অভুলনীয়

সেইটি আশ্চর্য্য হয়ে সরমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমার কথায় সন্দেহ করছেন? তাহলে দেখুন।

এই বলে সে জুতা খোলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। একটা যন্ত্রণামূলক শব্দ করল। কিন্তু তবুও জুতা ধরে প্রাণপণে ঠোকা করতে লাগল। তার শব্দর মুখ বন্ধোজ্ঞাসে লাল হয়ে উঠল।

সরমা বলল, “থাক থাক, ও খুলবে না।”

সেইটি বিষত হয়ে প্রশ্ন করল, “তাহলে কি করে আমি প্রমাণ করব যে আমি মিথ্যা বলিনি?”

সরমা মুহূর্তে উত্তর দিল, “প্রমাণ আপনাকে করতে হবে না, আমি সন্দেহ করেও বসিনি। বুকের দেখা দরকার আপনার বাড়ি গেলার মত অবস্থা আছে কি না। মধু, বাত, দেখে আয় ডাক্তার। বুকের ছেঁদে কি না? যদি থাকেন, ডেকে আনিব।”

সেইটি বাধা দিতে গেল, কিন্তু চাকর গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করতে চলে গেল। সরমা একটি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি, থাকেন কোথায়?”

“আমার নাম প্রদীপ, প্রদীপ সেন। থাকি গ্রামবাজারের একটা ঘরে।”

“গ্রামবাজারে! অত দূরে এই বাত্রে এই পা নিয়ে যাবেন কি? তবে যে রিক্স ডাকতে বলছিলেন? রিক্স করে গ্রামবাজারে যাবেন নাকি? তাহলে ত কাল ভোরে পৌঁছবেন।”

সরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। হয়ত বোঝার পরে বলল, “করতে লাগল যে সেইটি পাগল কি না। বড়ো সঙ্কায় উদ্ভ্রত বনেলে আবির্ভাব হল কি না এক জন অপ্রকৃতিস্থ অদ্ভুত ব!”

প্রদীপ মুখ নামিয়ে বসে বইল। মনে হল তার চোঁটের পাশে মাঝে একটা হাসি কাঁপছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পড়লেন এবং কয়েক জুতা খুলে আবিষ্কার করলেন যে, বুড়ো আঙুলটি ত হয়ে লাল হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর অচিন্তিত অভিমত পলক বোঝাতে চেষ্টা করে তাকালেন। তিনি তাঁর অচিন্তিত অভিমত পলক বোঝাতে চেষ্টা করে তাকালেন। তিনি তাঁর অচিন্তিত অভিমত পলক বোঝাতে চেষ্টা করে তাকালেন।

তখন প্রদীপ বলল, “এখন বুঝতে পারছেন যে আমি মিথ্যা কথা নি। তবে এখানে থেকে আমি আপনাকে ভোগাতে চাই না। লেজিলার, আপনার চাকরকে একটা রিক্স ডেকে আনতে বলুন। রুটে পৌঁছে রিক্সওয়ালার আমাকে বাস-এ ভুলে দেবে।”

প্রিয়ব্রত এখানে এসে না, সরমা ভাবছিল, তার পরিবর্তে যাঁড় ল এই হাস্যময়। একটু প্রশ্রয় দিলে যাঁড় থেকে নামতে কষ্টকর হবে। অথচ এই অবস্থায় রুট হওয়াও বিসদৃশ। সব মুন্সিরের কথা এই যে, বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই।

মনের দিগন্ত থেকে সোনালী উপত্যকা মিলিয়ে গেছে, তাকাল পূর্বের কলকাতা সহরের বড়ের চিহ্নমাত্র নেই। সে দেখল, প্রদীপ মুখ নামিয়ে বসে আছে, যোগী দুর্বল শরীরটা নর দিকে বেকে রয়েছে আর বড় বড় চুলগুলো মুখের উপর ছড়িয়ে ছেঁে।

সরমা পাঁড়িয়ে উঠে চাকরকে আদেশ দিল, “পাশের ঘরে গোসলের উপর একটা বিছানা পেতে দে। আর কিছু গরম ছুখ

আর পাউন্ডটি এনে দে।” এই বলে সে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

জানাহার সেরে ফ্রিড শরীরে জানালার ধারে সরমা পাঁড়াল। তখনো জলো হাওয়া লিচ্ছে। মনে একটা মেঘকার আমেজ ঘনিয়ে এসে, গোলমপের গন্ধের মত। বড়ের পর জীবনের চেহারাটা যেন সাময়িক ভাবে বদলে যায়। চিবাচরিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। কিছুক্ষণ অজ্ঞমনস্ক ভাবে পাঁড়িয়ে থেকে সরমা আলমারী থেকে একটি বই নিয়ে বিছানায় এসে। বইটি একটি বিলাতি পত্রপুস্তক, কোনো স্ত্রী তার নারী-স্বদের অনেক অভিযোগ তার স্বামীকে শুনিচ্ছে।

হঠাৎ নিচে থেকে একটা আঁঠু চিৎকার ভেসে এসে। সরমার চকিতে মনে পড়ে গেল যে, একজন অপরিচিত লোক বাড়িতে রয়েছে, সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞাতকুলশীল। সরমা সিঁড়ির কাছে গিয়ে পাঁড়াল। নিচে কি হচ্ছে কে জানে। বাত তখন প্রায় এগারটা। পাড়া নিশ্চয়ই হয়ে এসেছে। এবার একটা গোড়ানির শব্দ হতে লাগল। সরমা টর্কটা বের করে সেটা ছেলে নিচে নেমে এসে।

নিচে এসে সে বুঝতে পারল, যে-ঘরে সেইটি লোকটিকে শুতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘর থেকেই শব্দ আসছে। সে দরজায় টোকা দিয়ে প্রশ্ন করল, “আসতে পারি?”

“বন্ধুদে।” ভিতর থেকে প্রদীপ উত্তর দিল। তারপর সরমা ঘরে ঢুকলে ফাঁপ কণ্ঠে টেনে টেনে বলল, “আপনারই ঘর-বাড়ি, আপনাকে অধুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে? আমার চিৎকার শুনে নেমে এলেন বুঝি? আমি দেখেছি চোঁটের যন্ত্রণা কম থাকে। কিন্তু আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো বদলে ভারী লজ্জিত বোধ করছি।”

“বন্ধুদে একজন কাঁরাচ্ছে আর নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করব, এই রকম লোক ঠাওরালেন নাকি? যাক সে কথা। আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন এবার।” এই বলে সরমা ঘরে যে একটিমাত্র ভাড়া চেয়ার ছিল সেটিতে চেপে বসে পড়ল।

তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, তার মুখটা যেন রক্তশূন্য। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, “আপনার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?”

পাঁতে পাঁত চেপে যাঁড় নেড়ে প্রদীপ জানাল যে, সত্যি তার অপরিমিত যন্ত্রণা হচ্ছে।

সরমা উঠে পাঁড়িয়ে বলল, “আমি সারিডন আনছি, আমার কাছে আছে।”

এই বলে সে আবার উপরে গেল এবং অনতিবিলম্বেই একটি ট্যাবলেট ও এক গ্লাস জল নিয়ে নেমে এসে।

প্রদীপ দ্রষ্ট কণ্ঠে বলল, “কিন্তু গোটা পাঁচটা এত যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি কি উঠতে পারব?”

“ওঁটার দরকার নেই, আমি মুখে দিয়ে দিচ্ছি।” এই বলে সরমা কাছে এসে বসে বলল, “এ কড়ন।” বড়িটা মুখে ফেলে দিয়ে চিন্তিত ভাবে বলল, “জল পি কি করে? পাঁড়ান একটা চামুচে নিয়ে আসি।” তারপর আবার উপরে চলে গেল। ধীরে ধীরে কয়েক চামচ জল মুখে দেবার পর প্রদীপ প্রশ্রয় হাতে বলল, “আপনার চাকরটা গেল কোথায়?”

“তার এখন নাক ডাকছে।”

“আমাকে নিয়ে কি হাস্যমাই পোয়াতে হল আপনাকে?”

এই অতি সত্য কথাটার কি বা উত্তর দেবে সরমা? তাই সে ক্ষে বসে রইল। নেহাৎ বিশদে পড়ে ভারি বাড়িতে অতিথি ছ, নইলে এই ক্ষান্তবর্ণ নিভৃত রাত্রিটা আরো মনোরম, আরো মজ ভাবে কাটাত। কিন্তু রাত্রি এখনও ত অনাবিকৃত, সরমা স চেপে ভাবল, এই তুচ্ছ লোকটির সঙ্গে সেই আবেগে স্পন্দিত রাত্রির মূল্যবান মুহূর্তগুলির অপব্যয় করবার কোনো দঙ্গত উপস্থিত হয় নি। বড়ের সময় পথে এক অপরিচিত পথিকের কিছু আঘাত লেগেছে মাত্র। পায়ের আঙুলে একটু আঘাতে জি এতটা বিচলিত হয় তার রাস্তায় বেরনো কেন? সে স-রায়ের সেই লোকপ্রসিদ্ধ নন্দলালের মত বাড়িতে বসে দই পারত!

আশনি শুয়ে পড়ুন গে, অসময়ে ঘুমিয়ে আবার শরীর খারাপ সারিডন খাওয়া হয়েছে, শীঘ্রই কমে যাবে। চলুন, উঠুন।” বলল।

স্বা অগ্রহাতিশয্যে সরমা উঠে দাঁড়াল। বলল, “তাহলে।” নিন। বাদে কোনো প্রয়োজন হলে ডাকতে সজ্ঞাচর না।”

একটু দাঁড়ান, প্রদীপ বলল, “কাল সকালে আমাকে তালে যাবার অনুমতি দিয়ে যান।”

ক পলক ভেবে সরমা উত্তর দিল, “আপনি হাসপাতালে যাবেন, আমার অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। বর ডাক্তারবাবুর রামশ করে দেখবেন। হয়ত তাঁর অনুমতির দরকার থাকতে।” এই বলে সরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

মার ডাক্তার যদি আমাকে এখানে আরো পাঁচ-সাত দিন রেখে দেন?” প্রদীপ যেন অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল। গকবেন।” নিশ্চিত্ত ভাবে এই বলে সরমা দরজার বাইরে গড়াল।

গহলে আর একটা কথা আছে, শুনে যান।” প্রদীপ প্রায় করে উঠল।

মা ঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল, তার কষ্ট করে কিছু রুচতাও এসে গিয়েছিল, “দেখুন, আমি বক হীন ভাবে থাকি, মাঝরাতিরে এমন চোঁচামিচি করবেন? বলছিলেন, বলুন।”

দীপ অন্তস্ত্র দমে গিয়ে বলল, “তাহলে আমার এই ব্যাগটা র কাছে রেখে দিন। এখানেই থাকি, আর হাসপাতালেই যাবার আগে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব।”

ই বলে সে বালিশের তলা থেকে একটি মানিবাগ বের করে দিকে তুলে ধরল।

মা প্রথমটা বিমিত্ত হল, তারপর বিধার মধ্যে পড়ল। ত লোকটি এই ভাবে কোনো পাঁচ খেলছে না ত। তারপর সে ভাবল, কতই বা থাকবে। পাঁচ-দশ টাকা হারাবার ভয়ে লোকটা চিহ্নিত হয়েছে। সে যেন স্নেহের বয়েই প্রশ্ন “কেন এ ভাবে আমাকে জড়াতে চাইছেন? কত আছে

“কি জানি! হয়ত হাজারখানেক আছে। কিছু কম-বেশী হতে পারে।” প্রদীপ তাজিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল। হয়ত স্নেহটা তার কানে গেছে, মনে গেছে।

প্রদীপ আবার বলল, “এটা আমার কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছি না। এই নিন। আমি একটু ঘুমবার চেষ্টা করি। আপনার সারিডনে কাজ হয়েছে।”

সরমা যন্ত্রচালিতার মত ব্যাগটা নিয়ে সেটি খুলে টাকা গুণতে গেল।

প্রদীপ অস্থির ভাবে বলল, “ও পরে দেখবেন এখন। যান, যান, বিশ্রাম করুন গে। আমাকে নিয়েই সাবা রাত কাটিয়ে দেন নাকি?”

কথাগুলো প্রদীপ এমনি সাধারণ ভাবেই বলেছিল, কিন্তু সরমার সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। লোকটার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কোনো বক্ত নেই নাকি? না যন্ত্রণায় অর্ধ রাত্রি তা হারিয়ে ফেলেছে। সে ব্যাগটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেল। একটু পরেই সে প্রদীপের ঘরে আলো নেবাবার শব্দ শুনতে পেল। নিজের ঘরে সে শুণে দেখল, হাজার টাকার কিছু বেশী আছে।

এইবার আর একটা দৃষ্টিস্তা তার মনকে অধিকার করল। লোকটা এই টাকা কোথাও থেকে সরিয়ে আনেনি ত! এখন বেগতিক দেখে সেইটিই তাকে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিত্ত হতে চায় হয়ত। হয়ত এগুলির কতকগুলিতে বিশেষ চিহ্ন আছে। কিংবা হয়ত অস্ত্র কোথাও নথর লেখা আছে। শেষ রাত্রেই হয়ত পুলিশে বাড়ি ভরে যাবে, আর হাতে-নাতে ধরা পড়বে সরমা। তার ইচ্ছা করল ব্যাগটা প্রদীপকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। তাই সে আবার নেমে এসে প্রদীপের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াল।

তার পদশব্দ নির্জ্ঞান রাত্রে শুনতে এবং চিনতে পেরেই হয়ত প্রদীপ বলল, “আবার এলেন কেন? রাত্রে কি ঘুমবার ইচ্ছা নেই? এ আপনাকে আমি ভারী মুস্থিলে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে। যদি আর কিছু বলবার থাকে কাল সকালে বলবেন। আজ এখন বিশ্রাম নিনগে।”

সরমা দরজার হাত দিয়ে দেখল, তা ভিতর থেকে বন্ধ। অগত্যা সে উপরে নিজের ঘরে চিহ্নিত মনে ফিরে এল। ব্যাগটা ভরপুর রেখে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে সে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। রাত্রি গভীর হয়েছে, পথে একটি পথচারীরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত কাল সকালেই পাড়টটা লাল পাগড়ীতে ভরে যাবে। তখন সরমা মুখ লুকাবে কোথায়? মুখ দেখাবে কেমন করে? লোকটাকে তখনি একটা ট্যাক্সিতে তুলে ট্যাক্সি-থরচ দিয়েও বাড় থেকে নামাতে পারলে লোকমান ছিল না।

সরমার মনে বৈকালী ঝড়ের ও ফদাশী কাব্যের সব কিছু মাধুর্য ফুরিয়ে গেল। একটা নিদারুণ অস্বস্তি তার চেতনার সমস্ত কেন্দ্রে কেন্দ্রে মোড় দিতে লাগল। অথচ চেহারাও ভাবে-ভরীতে লোকটিকে ভয়লোক বলেই মনে হয়। প্রশস্ত কপালে বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে। হয়ত সরমার এসব দৃষ্টিস্তা সম্পূর্ণ অমূলক। এক জন আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে একটু আগের চিন্তার জন্য সরমা রীতিমত লজ্জিত বোধ করল। অর্ধরাত্রি তখন অতীত হয়েছে। সরমা স্নান শরী বিছানার এপিল দিল। কুমার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার কান

বাজতে লাগল প্রাণীপের কথাগুলো, “সারা রাত আজ আমাকে নিরুই কাটাবেন নাকি?”

পরদিন সরমার ঘুম ভাঙতে কিছু বিলম্বই হয়ে গেল। শরৎকালের সকালে বাতাসে একটি স্বভাব উৎকলিত, রক্তে একটি মধুর উত্তেজনা বোধ করা যায়। বিছানায় উঠে বসে জানলার বাইরে রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সরমা ঠিক করল, আজকের সকালে সে আর প্রিয়ভ্রতের জন্য অপেক্ষা করবে না, চা খেয়ে নিজেই তার সন্ধান বেরিয়ে পড়বে। তার পর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আজকের দিনটি কাটবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পূর্বে এই শরৎকালেই রাজারা দিখিয়ে বেরুতেন, আজ সরমা বাবে কোনো সুসাহসিক অভিযানে।

কিছুক্ষণ পরে গরম চায়ের পটটি টেবলে তার সামনে নামিয়ে দিয়ে চাকর জানাল যে, কালকের সেই বাবুটির সকাল থেকে খর হয়েছে।

শেরালায় চা ঢালতে ভুলে গিয়ে সরমা বলে উঠল, “তার মানসেই সেটিক হয়েছে। মানে, বেশ কিছু দিন ভোগাবে। খর কি বেশী হয়েছে নাকি রে?”

চাকর ভানাল, সে তা পরীক্ষা করে দেখেনি। বাবুটি চুপচাপ শুয়ে আছেন। শুধু এক কাপ চা খেয়েছেন, আর কিছুই খান নি।

সরমার মন থেকে সকালের সমস্ত মাধুর্য নিশেষে মুছে গেল। এমন ক্যান্দা! ডাক্তার ডাকতে হবে, প্রয়োজন হলে পেনিসিলিন ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পথ্যর ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাস্যামা বাড়িতে পুং রেখে ফুটি করতে বেরুনা চলে না।

সরমা নিচে গিয়ে দেখল, প্রাণী চোখ বুজ শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে দেখল ঈহং গরম হয়েছে। প্রাণী তাকিয়ে একটু হেসে বলল, “ও কিছু না, ব্যাখার জন্ত হয়েছে।”

“বুঝছি, পেনিসিলিন দিতে হবে। কিন্তু একটা কথা ঠিক উত্তর দেবেন?” সরমা প্রশ্ন করল।

“সস্তব হলে দেব।” প্রাণী ক্রিষ্ট কণ্ঠে বলল।

“ওটাকা আপনি কোথা থেকে পেলেন?”

“কাছে রাখতে ভয় হচ্ছে বুঝি?” প্রাণী আবার হাসল। সে হাসি শরৎপ্রভাতের শেফালি ফুলের মতই ম্লান। বললে, “ও আমার নিজের সম্পত্তি, নিজের বোজগার করা। আমার রিসার্চের জন্য জমানো টাকা। যদি বিশ্বাস না হয়, আমার কাছে দিয়ে বান আর একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলুন।”

“ট্যাক্সি নিয়ে কি করবেন?” সরমা লজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

“আপনাকে এই সব অনর্থক হাস্যামা থেকে মুক্তি দিয়ে বাব। করা করে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলুন আপনার চাকরকে।”

প্রাণী ব্যগ্র কণ্ঠে বলল।

“আপনি একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন ত, আমি সব ব্যবস্থা করছি।” এই বলে সরমা বাইরে এসে চাকরকে বলল ডাক্তার ডাকতে।

তার পর ডাক্তারকে চুকে দেখল, প্রিয়ভ্রত বসে আছে, সঙ্গে আরো

অনেকে। তাকে দেখে তারা কলরব করে উঠল। বলল, “সরমাকে আর পাঁচ মিনিটও সময় দেওয়া হবে না, তৎক্ষণাত তাদের সঙ্গে তাকে বেরুতে হবে।”

সাক বলল, তার ক্ষেত্রে অসম্ভব, কারণ বাড়িতে দগী।

“কার অসুখ করেছে, পিসিমার?” অনেকে জানতে চাইল।

“না।”

“কোনো আত্মীয় এসেছেন?”

“তাও না।”

“তবে কার জন্তে আমাদের তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবে সরমা?” প্রিয়ভ্রত প্রশ্ন করল। মনে হল তার কণ্ঠের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং হস্ত বা প্রচ্ছন্ন ক্ষুব্ধতা।

“বা বা, আর গিন্নিমা করিস না, কাপড়টা বদলে আর। আমরা তোকে না নিয়ে কিছুতেই যাব না। রক্তপ্রসাদের অমন বাগান-বাড়ীটা পাওয়া গেছে, আর খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা সেখানে চলে গেছে। এখন তোকে ছেড়ে আমরা নড়ব ভেবেছিলাম?” এক জন বাবুবা বলল।

সরমা এক বার প্রিয়ভ্রতের দিকে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা, আমি আসছি।” এই বলে ভিতরে চলে গেল।

চাকর তখনো ডাক্তারকে নিয়ে ফেরেনি। অবস্থা বাড়ির পুরনো ডাক্তার। অবস্থা বুঝে ঠিকই ব্যবস্থা করবেন। সে শুধু পিসিমাকে বলে গেল, রুগীর পথ্যর ব্যবস্থা করতে। ক্ষেত্রবসে সে অভ্যস্ত তারই সহচর-সহচরী এসেছে ছুটি ব ডাক নিয়ে, এই শরৎকালের সকালে, শরীরে যখন একটি মিষ্ট উত্তেজনা। তাছাড়া সঙ্গে থাকবে সর্বজন প্রিয়ভ্রত। পরবছরায় আজকের দিনটি খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। বাড়ির পুরনো চাকর রইল, পিসিমা রইল, ডাক্তারবাবু আসছেন। কাজেই রুগীর কাছে তার কর্তব্যে ত্রুটি কোথায়? আগের দিনের কতো খোওয়া বাতাস আজ নির্মল, সজীব। নিজের উপর কর্তব্যে অবহেলা সরমা কেমন করে করবে? সে তৎপরতার সঙ্গে সাজসজ্জা করে নেমে এল।

প্রমোদ-রাস্তা সরমা বখন সন্ধ্যার বাড়ি কিয়ল, তখন তার শরীর অবসর কিন্তু মনে একটি বিরহিতের খুশীর হাওয়া বইছে। প্রথমে সে গিয়ে হান করে নিল। তার পর চাকরকে ডেকে প্রশ্ন করল, “লোকটি কেমন আছে?” চাকর জানাল যে, লোকটি বিকেলেই চলে গেছে।

“হেঁটে গেছেন?”

“আজ্ঞে না। একটা রিক্সা ডেকে দিলাম।”

“খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল ত?”

চাকর বাড়ি নেড়ে জানাল যে, সরমার অনুমান অপ্রাণ্ড।

তার পরই সরমার মনে পড়ল যে, লোকটির অনেকগুলো টাকা সরমার কাছে জমা রয়ে গেল। হস্ত আবার আসতে পারে।

“কোনো ঠিকানা রেখে গেছে?”

“আজ্ঞে না।”

ঝড়ের হাওয়া ঠিকানা না রেখে এমনি সহসাই বিদায় নেয়। কিন্তু সে মনের প্রান্তে কিছু কি রেখে যায়? সরমা অজমজব ভাবে বসে রইল।



দেখুন!

অর্ধেকটি  
সানলাইট  
সাবানেই এ সব  
কাচ হয়েছে!

সানলাইটের ফেনার অপরিস্রবত্বই এর কারণ!

সানলাইট  
সাবান

দিয়ে কাচলে কাপড়ওয়াসা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

S. 242-X52 BG

ভারত প্রকৃত



# বিবেকানন্দ

## স্টোত্র

সুশ্রী মিত্র

৩৮

নির্ঘিটারে কোনোকিছু মানা  
নরেনের ধাত্তেই লেখে না।  
বিশ্বনাথ দত্ত তাই লেখে,  
ছেলেবেলা থেকে,  
নরেনের মোহমুক্ত শাখারিত মন  
পরিপূর্ণ মহিমায় বেড়ে ওঠে যাতে  
তারই সিকে সচেষ্টি হন।

প্রচলিত নীতিবোধ দিয়ে  
বিধি আয় নিষেধের দড়িগড়ি নিয়ে  
কোনোদিন বাধেননি তাকে।  
স্বাধীন হিসেবি বুদ্ধিটাকে  
বিচারের সুবিস্তারিত মার্গে  
নির্ভয়ে দিয়েছেন ছেড়ে।  
স্বদত্ত পোষণ কোরে তার  
চিন্তাশক্তি বেননিকো কেড়ে।  
স্বাধীন বিস্তার পেয়ে  
সজীব বিবেকবুদ্ধি তার  
আনন্দে বেড়ে ওঠে

অসংখ্য ভালপালা নেড়ে।

তাহাড়াও তর্ক কোরে তার  
কেড়ে যায় বুদ্ধির ধার।

কত দিন নরেনের কাছে  
যুক্তির প্রবল আঘাতে  
বিশ্বনাথ মেনেছেন হার।  
সানন্দে পোছু হটেছেন,  
মনে মনে গর্জ পেয়েছেন  
ত্রিলোকসম্রাটী এই  
পাণ্ডিপুরা তর্কবোকাটার!

তাই দেখি এই—

কেউ কিছু বোঝাতে গেলেই  
সশব্দে কুবে ওঠে নরেনের মন;  
কিছুতেই নেবে না তা'  
যুক্তি না বলে যতক্ষণ।  
তাই যদি বলো—চাপাগাছে  
ত্রুদতি ওৎ পেতে থাকে,  
চাপাগাছে মাটা বেঁধে  
মাঝবাত্তে দেখে নেবে তাকে।  
যদি বলো—ছুঁলে জ্বাত যায়,  
এমন কি ছ'কো ছুঁলে  
মেনেছে যা যায়,  
নরেন তা বেশি কোরে ছোঁবে।  
ছ'কো থেকে সশব্দে টেনে নেবে যোঁয়া;  
ট্রাম যায় বাস যায়,  
দেখে নেবে জ্বাত যায় কি না।

৩৯

সকলে যে বোটা দাও তর্ক করি বোলে,  
বলো দেখি আহম্বক 'তর্ক' মানোটা কি?  
তর্ক' মানে গলাবাঁজি নয়,  
যুক্তির জালস টেনে বুদ্ধির চাষ।  
ছাগোলের মত কিংবা তোমাদের মত বুদ্ধি হোলো  
যাই পাবে তাই খেয়ে পেট হড়কাবে।  
যুক্তি দিয়ে মাঝা টেনে বুদ্ধিখানা চালা রাখি তাই।  
তাতে যদি ইই নাস্তিক,  
তবু তা'তে খুশি হবো আমি।  
তা-বোলে ছটাক-মাথা তোমাদের মত  
তেরিণ কোটি ঐ দেবতার পায়ে  
নির্ঘিটারে মাথা কুটে মাথা ফাটাবো না।

For

It is better

That mankind should become atheist

• “বিশ্ব লক্ষ দেবতাকে অন্ধ বিশ্বাস করার চেয়ে যুক্তিকে  
অগ্রসরণ কোরে নাস্তিক হওয়া ও ভালো।”

—Practical Vedanta ( ৩৩৭ )

By following reason  
Than blindly believe  
In two hundred millions of gods\*...

আর তা'ছাড়া,  
বুদ্ধির বেড়াটা যদি না দি',  
মিথোটা যে সত্যের অভিনয় কোরে  
চুরি কোরে নিয়ে যাবে সত্য-সীতাকেই !  
সত্য উদ্ধার হবে ঠিকই,  
কিন্তু সে কি সোজা কথা নাকি ?  
কত কাঠ, কত খড় লাগবে বলতো ?  
তাই আমি বোলি আহমক,  
আগে-ভাগে বুদ্ধির বেড়াটাকে পাকা কোরে নাও ।  
তাতে যদি হও নাস্তিক  
তবু বুদ্ধি বেঁচে আছে তুমি

"I would rather see  
Every one of you  
Rank atheists  
Than superstitious fools,  
For the atheist is alive,  
And you can make  
Something out of him.  
But  
If superstition enters  
The brain is gone"....

'বিখাসে মিলয়ে বস্ত' তা আমিও জানি  
পুরানো nonsense নিয়ে জ্যাঠামি কোরো না ।  
বিশ্বাসের ছাতি পেলে আমিও তো বাঁচি ।  
কিন্তু বিনা লোহার কাঠিতে  
ছাতাটা কি খুলে রাখা যায় ?  
মাথায় কি তুলে রাখা যায় ?

আমি তাই  
যুক্তির লোহার কাঠি চাই ;  
মাথার ওপরে ঐ বিশ্বাস যে খাড়া কোরে রাখে ।  
বুদ্ধির সোনার কাঠি চাই ;  
তন্ত্রাত্তর মনটাকে যে সজাগ রাখে ।  
তাতে যদি তোমরা আমাকে  
'গৌয়ার-গোবিন্দ' বোলে বদনাম করো,  
তাহোলে সত্যিই তোমরা কল্পনার পাত্র কিনা বলো ?

\* "আমি বাক্য চাই তোমরা ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত  
আহমক হোয়ো না ; কেন না নাস্তিক তবুও বেঁচে আছে, তার দ্বারা  
কছু হবার আশা আছে । কিন্তু কুসংস্কার একবার যদি ঢোকে,  
যে মাথাটা একবারে নির্বাক হোয়ে যায় ।"

—Lectures From Colombo to Almora ( ১১১ পৃঃ )

৪০

'কায়েতের ছেলে' ঐ  
বুদ্ধিবাদী নবোদ্যোত  
'ধানসিদ্ধ সপ্তধি'  
অতীন্দ্রিয় অমৃত্যুতিকেও  
একদিনে মানেনি হঠাৎ ।  
নিঃশব্দে মেনে নেবে সব,  
নরেন কি সেই-গর্দভ ?

বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রেখে,  
যুক্তির শেষ ধাপে উঠে যদি দেখে  
হৃদয়ের অমৃত্যুতিকে যুক্তির পানে,  
তবেই সে নির্ভয়ে মেনে নিতে পারে ।  
একেই তো ইন্দ্রিয় করে প্রতারণা,  
তার ওপরে মাছুষের বশের বাসনা  
জেনে শুনে তুচ্ছকে প্রত্যাখ্যে দেয়,  
তিলসটাকে ভাল কোরে আনন্দ পায় !  
প্রেমাক্ষ ডেকে আনে তেল দিয়ে চোখে,  
মুছাতে সমাধির সাইনবোর্ড চোকে !  
পরকে ঠকাতে গিয়ে চোখে ছানি পড়ে,  
মুছিত হোতে হোতে মুগীরোগ ধরে ।  
ধর্মের হাটে এই চোর কৌশলে  
নিজেরই পকেট কেটে লালবাতি জ্বলে !

"Never mistake  
Hysterical trances  
For the real thing.

It is a terrible thing  
To claim this inspiration falsely,  
To mistake instinct  
For inspiration."\*

আমার তো মনে হয় সেই কারণেই  
যুক্তিকে কোনোদিন ঠগেনি নরেন ।  
সত্যাক্ষরী ঐ বিবেকী হৃদয়  
যুক্তিরই মাধ্যমে সত্যকে চায় ।

"Stick to your reason  
Until you reach something higher,  
And you will know it to be higher

\* "স্বাধীনতার রোগের তাড়নায় মুছাবিশেষকে খবরদার না  
বোলে ফুল কোরো না । অনেক মিষ্টিমিষ্টি সমাধি হোলে  
বোলে দাবী কোরে থাকে, সহজাত প্রবৃত্তিকে সমাধি অবস্থা বোলে  
ফুল কোরে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা ।"

—Inspired Talks. ( পৃঃ ১৫

Because  
It will not jar with reason...  
Real inspiration never contradicts reason,  
But fulfils it.\*

সত্য বতই হোক যুক্তির পারে,  
যুক্তিই সে কথাটা বলে দিতে পারে।

"We must follow reason  
As far as it leads,  
And when reason fails  
Reason itself will show us  
The way to the highest plane...  
All religion is going beyond reason  
But  
The reason is the only guide to get there."†

যুক্তিকে মেনে যদি থাকে, তাই সই।  
লাভ যদি নাই হয়, লোকসান নেই।—

"first hear,  
Then reason  
And find out all  
That reason can give...  
Let the flood of reason  
Flow over it,  
Then take what remains.  
If nothing remains,  
Thank God  
You have escaped a superstition."‡

৪১

তাই দেখি নরেনকে ঠাকুর বধন  
বোঝেন—“তুই হলি নরনারায়ণ,”

\* “যতদিন না যুক্তি-বিচারের অতীত কোনো তত্ত্বলাভ  
করছে, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিকে ধরে থাকো। আর ঐ  
অবস্থায় পৌঁছালে তুমি তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে নিতে পারবে, কারণ  
অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধিতা করবে না। আসল উদ্দী  
না কখনো যুক্তির বিরোধিতা করে না বরং পূর্ণতা এনে দেয়।”

—Inspired Talks. (পৃ: ১০৬) Raja Yoga (পৃ: ১১)

† “আমরা যুক্তিকেই অমুসরণ করে বতব্রূর যেতে পারি  
নো, তারপর বধন আর যুক্তিতে কলোবে না তখন ঐ যুক্তিই  
আমাদের চরম অবস্থার পৌঁছাবার রাজ্যটা বাতলে দেবে।

—Raj Yoga (পৃ: ১৬)

‡ ধর্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তি-বিচারের বাইরে যাওয়া, কিন্তু তার  
কোনো যুক্তি-বিচারের ভেতর দিয়েই।”

—Inspired Talks (পৃ: ১০৬)

‡ “প্রথমে শোনো, তারপর সেসবকে বিচার কর—বিচারের ব্যা

অন্তবড় সোজনীয় পরিচয়টাকে  
এক ফুঁয়ে বেমানাম কেনে দিলে তাকে!

কেশব ও নরেনের প্রসঙ্গে কের  
ঠাকুর বলেন যেই—“এই কেশবের  
খ্যাতির মূল্যে আছে বেশকি গুরু,  
সেরকম আঠারোটা শক্তি আছে তোর।  
কেশবের জ্ঞানালোক দীপশিখা হোসে,  
তোার জ্ঞান সূর্যের মত বলা চলে।”

এত বড় প্রশংসা শুনে তার মন  
খুশিতে ফেনিয়ে উঠে করেনি হজম।  
নরবৎ নরেন কি ও-কথায় ভেজে?  
“আরে ছি-ছি বলেন কি, লোকে হাসবে যে?  
কোথায় কেশব আর কোথায় নরেন!  
বলুন কি যুক্তিতে ও-কথা বলেন?  
পাঁচজনে শোনে যদি বলবে কি তারা?  
একথা কি বলে কেউ উদ্ভাস ছাড়া?”

—“উদ্ভাস হবে কেন? মা যে দেখালেন,  
অন্তএব যা বলেছি তা ঠিকই নরেন।”

অমনি ক’কিয়ে ওঠে নরেন্দ্রনাথ,—  
“মার নামে বাজেকথা—একি উৎপাত!”  
সশব্দে ছুঁড়ে মারে যুক্তির বাণ,—  
“ওটা হোলো আপনার মাথার ব্যারাম।  
মাথার খেলালে লোকে শোনে কত বাণী,  
তাইবোলে ও-কথা কি মেনে নেবো আমি?”

—“কি বলি? মা আমায় দেখালেন যে যে।  
মার কথা কখনো কি ভুলে হতে পারে?”

তবুও নরেন্দ্র কি ছেড়ে কথা কয়?—  
“মাথাটা গরম হলে ও-অমন হয়।  
ইঞ্জির তাপ বুঝে সেই ঈশ্বরতালে  
যুক্তিকে স্নান কোরে বাজেকথা বলে।  
ও-দেশের দর্শনে আছে এ-খবর,  
আমাদের ইঞ্জির পাকা জোড়ের।  
তাছাড়া কাজকে যদি কেউ বেশি ভাবে,  
জাহোলে তো কথা নেই, আরোষ্ট ঠকাবে।

কতব্রূর জ্ঞানতে পারা যায় তা দেখ; তার ওপর দিয়ে বিচারের বজা  
বইয়ে নাও—তারপর বাকি যা থাকে তাকে গ্রহণ করো। যদি  
কিছুই না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ নাও যে তুমি একটা  
কুসংস্কার এড়ালে।”

—Inspired Talks (পৃ: ১০৭)

আমাকে যে আপনার ভালো লগে তাই  
গলদটা সেইখানে, মা দেখান ছাই !”

যুক্তির কথা শুনে ঠাকুর ভাবেন—  
“সত্যাকরূপ ঐ শুদ্ধ নরেন  
মিথো তো বোলবে না, ও যে তার  
তবে যা দেখেছি—সে কি মাথার খোঁচ  
এই ভেবে দুটে যান মার মন্দিরে,  
“নরেন যা বলে তাই সত্যি মা কি রে”

মা বলেন—“বাক্যকথা তিনিসুনি ওর,  
একদিন সবকথা মেনে নেবে তোরা।”

৪২

বে-কথা বোঝাতে গিয়ে এত কথা বলা,  
সেটা হোসো নরেনের চোখ চেয়ে চলা।  
যুক্তির রাস টেনে বুদ্ধির বথে  
সতর্ক যেতে চায় সত্যের পাথে।  
দড়িকে ও সাপ ভেবে কোরবে না গোল,  
সাপকেও দড়ি ভেবে খাবে না ছোবল।  
সব কিছু মেনে নেবে, যদি নিজে বোঝে।  
অবতার গুরুকেও মানেনি সহজে।  
প্রথমে তো মানেই না অবতারবাদ,  
তবু যদি মানেন তা ও ঠাকুরকে বাদ !  
—“কেউ কেউ বলে ন্যাক আমি ঈশ্বর ?  
আচ্ছা নরেন তোর ধারণা কি বল ?”

—“বলুক যে যার খুশি, বোলি না তা’ আমি,  
এখনো বুঝিনি যেটা কি কোরে তা’ মানি ?” •

• নরেন। উনি—( ঠাকুর ) আমায় বলছিলেন—‘কেউ কেউ  
আমায় ঈশ্বর বলে।’

আমি বললাম—‘হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার বতর্কণ সত্য  
বলে না বোধ হয়, ততর্কণ বলবো না।’

তিনি বললেন—‘অনেকে যা বলবে তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম।’

## শুভ-দিনে মাসিক বঙ্গমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূলের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীর কাছে  
সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্ভাব্য বোঝা বহনের সামিল  
হয়ে পড়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য,  
স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখলেও চলে না। কারও  
উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-  
বার্ষিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতার আপনি ‘মাসিক  
বঙ্গমতী’ উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার  
দিলে, সারা বছর ধরে তার বৃত্তি বহন করতে পারে একমাত্র

যাকে অত পরীক্ষা ‘দিনে আর রোতে’,  
একদিন তাকেই সে নেবে মাথা পেতে।  
যুক্তির বেনোজ্ঞ সবে গেলে পর  
বোলবে—‘আমার গুরু ভুবনেশ্বর।  
শাস্ত্রের মর্মটা বুঝে নিতে হোসো  
ঐরামকৃষ্ণটিকে পড়ে ভালো কোরে।  
বেদের ভাষা তিনি, আগে বোঝো একে।  
ইনিই সত্যযুগ এনেছেন ডেকে।  
একটা জীবনে তাঁর এই ভারতের  
ধর্মজীবন পাবে সারা কল্লের।  
বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু  
যোগ করো, রামকৃষ্ণ হয়নাকা তবু।  
কি বোঝে ? অবতার ? একেবারে হারা !  
ভগবান ? তাও নয়, উনি তারও বাবা !” •

[ ক্রমশঃ ।

আমি বললাম—‘নিজে ঠিক না বুঝলে অল্প লোকের কথা শুনবো  
না।’ —ঐরামকৃষ্ণকথামৃত ( ৪র্থ ভাগ-৩৮৭ পৃঃ )।

• “ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে  
আমার সন্দেহমাত্র নেই।

দাদা, বেদ-বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ  
পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না।

He was the living commentary to the vedas  
and to their aim. He had lived in one life the  
whole cycle of the national religious existence in  
India. ভগবান ঐকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য  
প্রভৃতি একত্রে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most  
perfect.” ( পূজাবলী, ১ম, ৩৩৪ )

শিষ্য : আপনি তাঁকে ( ঐরামকৃষ্ণদেবকে ) অবতার বলে  
মানেন কি ?

স্বামিজী : তোর অবতার কথার মানোটা কি বল ?

শিষ্য : কেন ? যেমন জীৱাম, ঐকৃষ্ণ, জীগোৱাদ, বুদ্ধ, ঈশ  
ইত্যাদি পুরুষের স্তায় পুরুষ।

স্বামিজী : তুই ধর্মের নাম করলি, আমি ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণকে  
তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা—জানি  
—স্বামিশিষ্য-সংবাদ (উত্তরকাণ্ড)। ২২পৃঃ

‘মাসিক বঙ্গমতী’। এই উপহারের জন্য সুদৃষ্ট আবরণের ব্যবস্থা  
আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস  
প্রাপ্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের  
আমাদের পাঠক-পাঠিকা স্তেনে থুঁলী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়ে  
শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এক  
করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে  
এই বিষয়ে যে কোন স্খাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ  
মাসিক বঙ্গমতী। কলিকাতা।

# জাতীয়তায় রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অজয়েন্দুরায় রায়

সকলেই বুঝলেন অপ্রত্যাশিত ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। নিজের আত্মীয়-স্বজন কাছে এলে ছাড়তে চান না মোটেই। এমন কি, দূরের আপনার জনকেও আনাতে বলেন। শয্যাপার্শ্বে সর্বদা জন্মই আছেন হুঁচকার জন। কেবল বলেন নিজের কথা। সে সব কথা তাঁর ছোটবেলাকার।

ডাক্তার তখনও নিত্য আসেন। বলেন রোগীর ঘরে এত লোক থাকা ভাল নয়। কে শোনে সে কথা।

আপনার জন যারা, মনে করেন সেয়ে উঠবেন, রোগ যাবে, আবার আগেকার দিনের মত মানুষ হবেন, লিখবেন সর্বদার জন্ম। কিন্তু তার লক্ষণ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে যেন বেশি বেশি গল্প বলতে লাগলেন ভগিনীদের ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে।

তাই এক দিন বললেন—হী গা, তুমি আমার কী ক'রে গেলে? এই যে সব ছোট ছোট মা-মরা ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে গেলে, তাদেরই বা কী ক'রে গেলে? তারা যে একটাও লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'লো না, কী হবে তাদের?

যুখে কথা নাই রামেন্দুসুন্দরের। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চ'লেছে ইন্দ্রপ্রভা দেবীর।

একটা উত্তর দিয়ে কথার শেষ করলেন। জ্ঞাথো, এত দিন পরে তুমি ঠিক করলে সব ব্যবস্থা করার লোক আমি। আমি কী জানো ত। আমি জানি তুমি রাজবাণী, তোমার কোন অনুবিধা হবে না। বিধান যা আছে তার খণ্ডন হবে না, হবার নয়।

সকলেই বললেন—আপনি স্বামীর আশীর্বাদ পেলেন; এখন শুকে আর কিছু বলা উচিত নয়।

বুদ্ধিমতী মহিলা তখন চুপ হ'য়ে গেলেন।

বেলা দুটোর পর। শুয়ে আছেন রামেন্দুসুন্দর। আশপাশে ব'সে রয়েছেন ভগিনীরা, আরও সব আপনার জন। তিনি ঘলে চলেছেন সব আগেকার দিনের কথা, কথার মাঝে এক বার বললেন—আমাকে বেশী বকতে দেখলে আমার শাসনকর্ত্তা এসে গুড়বেন, আমাকে শাসন করবেন।

কে শাসনকর্ত্তা আপনার বাবুদাদা?

কেন, জানো না তোমরা? আমার ভাই দুর্গাদাস। সকলেই মনে দেন উঠলেন।

আবার চললো নানা কথা। কথা চলতে চলতে বললেন—আমাদের বাড়ীর পাশেই বাড়ী। তোমরা সকলেই চেন দেবেশ্রকে। সেটি খুব ভাল। আমাকে তার নিজের বড় দাদার মতই মনে করে। কিন্তু শ্রদ্ধাও করে। তার কথা বলি শোন। ভাল ভাবেই পাস ক'রলো সেটি এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ব্রজ রায় মশায়ের এ একটি ছেলে। মনে কলাম এ ছেলেই মা বাপের দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু একবার কলকাতা কে বাড়ী এসে জানতে পারলাম দেখি থিয়েটার করে। দুঃখ লা। ওর বাবাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম, রাজকী মশায়, বিন কি থিয়েটার করে? তাঁর কাছে জানতে পারলাম কথাটা ঠিক। রাজকী মশায় নিরীহ ভালো মানুষ। ছেলেকে তিনি মতিও দেন নি, নিবেশও করেন নি। আমিই তাঁকে

ব'লেছিলাম, নিবেশ ক'রে দেবেন তাকে থিয়েটারে যেতে। কেন জানো? আমি দেখেছি এ সবো যাহাই রোগ দেয়, সংসর্গের প্রভাব এড়াতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত মদ খেতে ধরে। তার পরিণতি ত'জানো? বড় লোকদের কথা বাদ দাও—কিন্তু ওটা হ'য়ে দাঁড়ায় কাঙালের ঘোড়া রোগ। ভাল ছেলেটার পরকাল নষ্ট হবে ব'লেই নিবেশ করেছিলাম। ভাল ছেলে, আমার কথা অমান্য করে নি। আমার নিজের তিন্ত অভিজ্ঞতা ছিল। একটা সখের থিয়েটারের দলে চুকে, যাদের বংশে কেও কোন দিন মদ খায়নি, তারাও মদ খয়েছিল। আমি কিন্তু একটা মানুষকে দেখেছি, মনোমোহন পাড়েকে। তিনি থিয়েটারের ব্যবসায় ক'রে প্রচুর টাকা উপার্জন ক'রেছিলেন। মিশতে হ'তো তাঁকে চরিত্রহীন অভিনেতাদের সঙ্গে, ভট্টচরিত্রাদের সাথেও। কিন্তু অতৃত তাঁর ছিল মনের বল। এই সব লোকের সম্পর্কে থেকেও এক দিনও মত্তপান করেন নি। শুনেছিলাম দেবিন বাধা পেয়ে খুব দুঃখিত হ'য়েছিল। লোক লাগিয়েছিল আমার সম্মতি আদায় ক'রবার জন্ত। আমরা ভাইরাও তার জন্ত সুপারিশ ক'রে মত আদায় ক'রতে পারিনি। বাধ্য হ'য়ে দেবিনকে থিয়েটার ছাড়তে হ'য়েছিল।

কিছুদিন পরের কথা। লর্ড কাঞ্জুন বাঙলা দেশকে হুঁ ভাগ করায় তখন জোর স্বদেশী আন্দোলন চ'লছে। আমি এখানকার প্রথান পাণ্ডা ছিলাম, তোমরা ত সকলেই জানো। দেবেশ্র সব কাজেই আমার অনুগামী, সাহায্যকারী ছিল। সেও আন্দোলনে মেতে গিয়েছিল। আমার আদেশ পালনে সে ছিল অকুণ্ঠ। এক দিন খুব ভোরে, তখনও আমি বিজানায়। কানে এলো মধুর কণ্ঠে এক টহলের সুরে গান। সবটা মনে নেই—শুনলাম বাড়ীর বাইরে “মা যে তোদের দীন দুখিনী, তুলে শীর্ণ হতে দুখানি, ডাকছে বাহু বাহা ব'লে দিতে তোদের স্নেহকোড়। এখানো ভাতেনি কি রে তোদের ঘূমের ঘোর।” শব্দা ছেড়ে নেমে এলাম নিচে, দরজা খুলে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সবই অপরিচিত মুখ। ওদের মধ্যে চিনলাম মাত্র তিন জনকে। কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, কান্দী বাড়ী। একজন মহকুমা হাকিম, গোপিকামোহন ঘোষ এবং বাড়ী কান্দী জিবথর পাড়ায় আর দেবেশ্র। ওরা আমাকে সকলেই প্রণাম ক'রে গাইতে গাইতে চ'ললো। সঙ্গে সঙ্গে বাজবাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আজও যেন কানে বাজছে সেই মধুর সুর। বৈকালে দেবেশ্রকে ডেকে পাঠালাম। জিজ্ঞেস ক'রলাম—সকালে বাবা গান গাইতে গাইতে এসেছিল ওরা সব কে? দেবিন বললে—ওরা সব কান্দীর। অনেকই এন্ট্রান্স পাস ক'রে চাকরির আশায় ব'সে আছে। আদ্য নাট্য সমাজ ব'লে একটা থিয়েটারের দল আছে, সেই দলের মেথার ওরা। জিজ্ঞেস ক'রলাম, তুমি যে থিয়েটার ক'রতে, এ দলেই না কি? উত্তর দিলে সসন্মোদে হী—বাহুদাদা!

ওদের মধ্যে মদ খায় না কেও?

না, আদ্য নাট্য সমাজের কড়া নিয়ম। যদি কেউ মদ খেয়ে ঠেঙে নামে, তা হ'লে তাকে দল থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়।

এমন উপাহার দেখাচ্ছেই পাঠো?

হী, আপনি চিনে—কপালের উপস্থিতি বুঝাযায়, ডাক নাম পটা, তা ছাড়া এই জেমোরই লালিত্য বাবু। নাচতে, গাইতে, ক্রিমেল পাট ক'রতে ওর মত এখানে কেউ নেই। একদিন মদ খেয়ে টেজে নামার বহিষ্কার করা হয়েছিল।

আর ?

আর হতীন বাবু মোজ্জার। জেলখানার কাছে বাড়ী। খুব ভাল এগার। হরিশ্চন্দ্রের পাট ক'রে খুব নাম করেছিলেন। মদ খেয়ে টেজে নামার তাঁকেও বহিষ্কার করা হয়।

খুব খুশী হ'লাম ওদের ঐ রকম কড়াফি ব্যবহার কথা শুনে। জিজ্ঞেস ক'রলাম, তুমি কি ঐ দলেই থিয়েটার ক'রতে? উত্তর পেলাম, হী বাবুলা! ব'ললাম অমুমতি দিলাম তোমাকে ঐ দলে থাকবার থিয়েটার ক'রবার। থিয়েটার ক'রতে ত দেখে নাই, তবে প্রাইট সবেল থিয়েটারে দেখতে পাট, কয়েক জন মাতালের সংস্পর্শ এসে হারা ডালো তারাও মদ খরে। তাকে আর একটা কথা বলেছিলাম, তোমাদের দলের সকলকে ব'লবে তারা যেন বর্তমান আলোচনে আমাকে সাভাষা করে। তখন দেবেশ্চন্দ্র খুশী দেখে কে। ডাবে গলগল হয়ে ব'লেছিল আপনার সাহচর্য পাওয়া ত আশীর্বাদ। ওরা সকলেই আপনার অভ্যগামী, আপনার কাছে সহযোগিতা ক'রতে পেলেন পজ হবে। পেরেছিলামও আমি ওদের সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

রামেশ্চন্দ্রের আশীর্বাদে সেই সেবন বাবু দরিদ্র হ'লেও কান্দীর মধ্যে এক জন বিশিষ্ট হোক। তিনি কান্দী রাজ ইন্সলের প্রাক্তন শিক্ষক। আমাদেরও শিক্ষক, ইন্সলেরও, বাড়িরও। অর্ন্ত শিক্ষক ব'ল খ্যাতিও তাঁর যথেষ্ট। কান্দীর সর্বপ্রথম সংবাদপত্র কান্দীবাক্যের সম্পাদক। দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেও কাগজ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্ববক্তাও একজন। বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন বুদ্ধ হব নি। তাঁর হাতে খড়ি সাহিত্য সাধনার ব'লতে গেলে রামেশ্চন্দ্রের কাছেই। পেরেছিলেন তাঁর অনাবিল স্নেহ জনস্বাস। ত্রিবেদী মহাপুত্রের নাম ক'রতে তাঁর যুথথানা চ'রে উঠে প্রকৃত উজ্জল।

রামেশ্চন্দ্র বাবুর কথা শেষ হ'লে আমাকে বললেন—আমরা ত জনভায় না দেখিনেব এত সব কথা!

তা হ'লে আরও কিছু শোন। ঐ সেবন গিরে উপস্থিত হলো আমার কাছে কলকাতায়। যখনই কলকাতা যেতা, উঠতো আমার কাছেই। সে বাবে বললো—বাবুলা, ঠিকঠিক তাঁত চালু ক'রবার ইচ্ছা আছে দেশে। এখানে দেখতে শেলে সুবিধা হয়। ওখানি কার মিস্ত্রী নিয়ে তাঁর তৈরি ক'রবে। সেই তাঁতে শিশি সূতোয় কাপড় বোনার। দেশের লোককে সেই কাপড় প'রবার জন্ত অত্যাচার ক'রবে, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। শুনে খুব খুশী হলাম। তখন থেকে সঙ্গে নিয়ে গাটী ক'রে ঠিকি তাঁতে দেখানো দেখানো



সকল টেশনাল ও  
উৎসাহগণের পাওয়া যায়

কবিতা রায় বলেন

নিয়মিত ব্যবহারে যুথ আরো  
হৃন্দর ও লাভগাময় হবে। ব্রণ  
ও মলিনতা উঠে গিয়ে বক  
কনগীয় ও উজ্জ্বল করবে।

মম মাতাভো গন্ধে ভরপুর!

পরিবেশক:-  
জি, দত্ত এণ্ড কোং

১০, বনবিহ দেন, কলিকাতা-১



উচ্চাঙ্গের ডেসক্রীম

কলকাতা সহরে কাপড় বোনা হয় জানা ছিল গিরে সব দেখলাম। খুব ভালভাবেই দেখে নিলে সব। বাসায় ফিরে আমার একজন ছাত্র জগদিন্দ্র বার, শ্রীরামপুরে বাড়ী, ক্রাশনাল কলেজে অধ্যাপকতা করেন, ডাকলাম তাঁকে। বললাম তাঁকে, দেবেশ্বকে শ্রীরামপুরে যে ঠকঠকি তাঁতের বড় কারখানা আছে, আর ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বোনার কারখানা আছে সেই সব ভাল করে দেখাবার ভার নিতে হবে তোমাকে। আর বললুম্বী কটন মিলটাও দেখাবে ভিতরে মুকে সব ভাল ভাবে। জগদিন্দ্র রাজি হলেন আর দেবেশ্বকে তাঁর বাড়ীর টিকানা জানিয়ে দিয়ে যেতে বললেন। তিন দিন জগদিন্দ্রের বাড়ীতে থেকে সব দেখে শুনে ফিরে এল, গাতে একটা পিতলের মাকু। জগদিন্দ্রের নিজে বরা সে মাকু। জগদিন্দ্র একজন স্বদেশীর পাণ্ডা। বাড়ীতে ঠকঠকি তাঁত আছে। ভাইপোদের নিয়ে নিজেস্বাই কাপড় বোনেন। খুব উৎসাহী এসব কাজে। দেবেশ্ব জগদিন্দ্রের প্রশংসা করলে শতমুখে। ওর ভাইপোদেরও খুব প্রশংসা করলো। মাকুটি পিতলের ঢালাই করা। উপহার দিয়েছেন জগদিন্দ্র ওকে। সব দেখে শুনে আমাকে বললো—বাবুলাল, তাঁত আমি করাবো, কাপড়ও বোনাবো, তবে টাকা পাষা কোথায়, গোড়ার দিক সেই এক সমস্যা। লিখে দিলাম একখানা পত্র, আমার বইএর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে ৫০০ টাকা দিবার জন্য আমার নামে খরচ লিখে। টাকা নিয়ে এল সে। আমি বললাম, ও টাকা আমি তোমাকে দিলাম, প্রথম প্রথম কিছু লোকসান হবে। আনাড়ি মিস্ত্রী তাঁত তৈরী করতে কাঠ কিছু লোকসান করবেই। সেই লোকসানটা পুথিরে নেবে এই টাকায়। পারের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে, দেবেশ্ব বাড়ী ফিরে এসে কান্দীর মোহন বাগানের একজন মুসলমান মিস্ত্রীকে দিয়ে তাঁত করিয়েছে। হিন্দু মিস্ত্রীকে কেউ সাহস করেনি, ওর কথা শুনে তাঁত করতে। শেষে সেই মুসলমানকে সব বুঝিয়ে দেখিয়ে তিনিয়ে তাঁত করালে। নলি আর মাকু করতে পারেনি ওখানে কেও। দারচাটা থেকে মাকু আর নলি আনিয়ে কারখানা খুললে ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বোনার। সুনলাম, দুখানা তাঁত নষ্ট হওয়ার পর ঠিক মত তাঁত তৈরী করতে পারেনি সেই মিস্ত্রী। তার পর হুঁ চার জন হিন্দু মিস্ত্রীও তাঁত তৈরী করতে শিখেনি। বাড়ী এসে দেখলাম দেবেশ্বের কারখানা। দেখে খুসী হলাম। অধ্যবসায় ওর খুব। আমাকে দিয়েছিল সে এক জোড়া হুতি ৩০নং হুতোরা। বলেছিল আশীর্বাদ করুন বাবুলাল যেন দেশজবনীর কাজ করতে উদ্যোগ না থাকি কোন দিন। প্রাণ খুলে তাকে করেছিলাম আশীর্বাদ। দেবেশ্বের কারখানার কাপড় আমি কিনতামও অনেক। দেশের দুর্গতির কথা শুনে—দেবেশ্বের কাপড় আমি কিনতাম, কান্দীর কুঞ্জ দাস বলে এক তাঁতি এসে তার নিজে হাতে বোনা হুতি শাড়ি আমাকে দেখালে। ভাল লাগলো কাপড়গুলো। দামও দেবেশ্বের হুতি শাড়ীর চেয়ে কিছু সস্তা। খুশী হয়ে থানকয়েক কিনলাম। সেবনকে ডাকিয়ে কাপড় দেখিয়ে বললাম কুঞ্জ দাসের কাছ থেকে কিনেছি। ওর দামও সস্তা। তুমি এমন সস্তা দিতে পারো না কেন? সেবন কাপড় দেখে বললে—বাবুলাল, ঐ কাপড় মোলাই করিয়ে এসে ডাকবেন আমাকে। তখনই দেখাবো সস্তা দিতে পারে

কেন। বিম্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তার মানে? সে বললে এখন আমি কিছু বলবো না বাবুলাল, ধূরে আসার পর সব বলবো। আর কিছু না বলে কাপড় সব বুইয়ে আনিবে ওকে ডাকলাম। এসে বললে, এই বার দেখুন আপনি সস্তা দিতে পারে কেন। বুঝতে না পেয়ে বললাম, তোমার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলো। তখন ও বললে—কী জানো? বাবুলাল, শঠতা আর প্রতারণায় দেশ ছেয়ে গেছে। পাতলা শানার কাপড় বোনা। হুতো লাগে কম। ঠুকে বোনে না, তাতে সমস্ত লাগে কম। এ কাপড় আপনার পরা চলবে না। ওর বহর কত কমে গিয়েছে দেখুন। বিম্বিত হলাম, ঠিকই ত ৪৫ ইঞ্চি বহর, খোলাই করে দাঁড়িয়েছে ৪০ ইঞ্চি। সত্যিই ত পরা চলবে না ও ধুতি। সেবনের মুখের কথাগুলো মধুরে গিয়ে বিধলো। ভাবলাম হায় রে দেশের মানুষ! কীকি দিতে পারলে আর কিছু চায় না যে জাতি, সে জাতি উঠবে কেমন করে? আশীর্বাদ করলাম দেবেশ্বকে প্রাণ খুলে।

দেবেশ্ব বেশ ভালো ভাবেই তাঁতের কাজ চালাচ্ছিল, তার কারখানায় তৈরী তাঁত টেএা, গুজলিখা, সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু তাঁতি কিনে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল ভাল কাপড়, হুতি, মাড়ি, জামার কাপড় তৈরী করতো। তবে দেবেশ্বের কারখানায় যে সব তাঁতি কাপড় বুনতো তারা সব টাকা নিয়ে ক্রমশঃ সরে পড়তে লাগলো। অনেক ক্ষতি স্বীকার করে কাপড় বোনান বন্ধ করতে হয়েছিল ওকে। সেখানো ত দেশের লোকের মতিগতি কেমন ধরা! জাতি উঠবে কেমন করে!

তার পর সুনলাম, পশ্চিম দেশ থেকে এক জন এসে জিয়াগঞ্জ স্ট্রাইক তৈরীর এক ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য গেলাম সলবলে জিয়াগঞ্জ। তাঁর কারখানা দেখে খুবই খুসী হলাম। তখনি সব ভাল ভাবে জানিয়ে দেশনেতা স্বরেন্দ্রনাথ বানার্জিকে তার করে দিলাম। তিনিও এসে হাজির। বললেন স্বরেন্দ্রনাথ—কী পুরস্কার চাও? কারখানার মালিক জঙ্গলী সা বললেন—আপনার একখানা সার্টিফিকেট। তৎক্ষণাৎ তিনি লিখে দিলেন। আজও হয়তো আছে তাঁদের কাছে।

তখন একটা তরঙ্গ উঠেছিল সারা বাংলা দেশে। এখন আর তেমন স্পন্দন দেখতে পাইনে।

তার ছোট বোন—আমার মা বললেন—সে তরঙ্গ ত তুলেছিলেন আপনিই।

খুব হেসে জবাব দিলেন—আমার একবার সাধ্য কি? তবে আমিও এক জন পালকীর বাহক ছিলাম।

যাক, এবার আর একটা গল্প বলি শোন তোমরা। একটা মেয়ে পোড়স ছিল আমাদের বাড়ীতে! তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না; সে তোমাদের খুব আপনার জন।

কে বাবুলাল?

আচ্ছা লোক তোমরা ত! আগে থেকে গল্পের ওগ কাটতে আছে? ওতে রসভঙ্গ হয়; গল্প জমে না। শোনো গল্পটা। আমার তখন ছয় বছর, হুঁদীন অন্তর এক দিন ছয়। পালি ছয়। এতো কুইনাইন খেয়েও ছয় বন্ধ হয় না। তখন একটা মেয়ে এসে আমাকে গৃধ দিলে। খাবার ওগৃধ নয়, হলদে রঙা জাকড়ার বাগা ওগৃধ। বললে—এইটা শোঁকো। এক বার ময়, কাছে রাখো



আজ সারা সিন-বাত মাঝে মাঝে শুকতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম—কেন? সে বললো—এই নিয়ম। এটা শোকার পর কাল সকালে এইটা তেমাখা পথে ফেলে দিয়ে আসবে। যে ডিকুবে পূর্ব-দিন থেকে তার হবে স্বপ্ন, আর তোমার স্বপ্ন হাবে ভেঙে। বয়স তখন আমার কম। তা হলেও কথাটা ভালো লাগনি আমার। আমি বললাম—না, তা হ'তে দেবো না। একাজ তুমি করবে পাবে না। স্বপ্নান্তি, মাঝামাঝি!

এমন সময় মা এসে হাজির। তিনি বললেন—ছেলে ত ঠিকই ব'লেছে। তুই কেন থোকসের মত কথা ব'লছিস? সেই থেকে তার নাম মিলাম আমি থোকস। শেষে মা অনেক ক'রে আমার স্বপ্ন সারালেন। আচ্ছা, এবার বলা দেখি তোমরা এই থোকসটি কে?

আমার মশাম মা সতী দেবী বললেন—বসন্তে পেরেছি বাবুলাদা, ও আমাদের কেঠমা। হেসে আশ্বিন রামেশ্বরন্দর।

সতী দেবী আচার্যদেবের ভগিনী, মাত্র দু বছরের ছোট।

চুগাদাস বাবু এসে বললেন—তোমরা আজ চব্বিশ পহর ক'রবে না কি? বাবুলাদকে কি আজ ছাড়ান দেবে না?

এই দেখ আমার মাঠার মশার এসেছেন। ওরা কেউ কিছুই বলেনি, কেবল নীরব শোতা।

হাসির বোল উলো তখন।

এক এক দিন সন্ধ্যায়ও মিটিং বসতো।

রামেশ্বর বাবু জিজ্ঞেস করলেন—এখন ত আমার তেমন ঘুম হয় না, শেষালের ডাক শুনেই পাঠ না কেন

অনেকে বললেন—ডাক ত'?

যখন ডাকবে আমাকে শুনিয়ে দিও ত।

আপনার কি খুব ভাল লাগে শেষালের ডাক বাবুলাদা?

লাগবে না কেন, ওরা যে প্রহরী। আমাদের দেখার মধ্যে ঐ যে একমাত্র বস্তু ভক্ত। ওরা না বস্তু না পোশা। বাতীর আনাচে-কানাচেই থাকে ধূর্ত জ্ঞানোয়ার। খুব ছোটবেলার যেতাম মায়ের সঙ্গে শিবভোগে দিতে। আমি দক্ষিণ কালীতলা গিয়ে শিবভোগে দেখে আসতাম। একটা কথা শুনে তোমাদের চক্ষু স্থির হবে। বাবুলাদার রাজারা নিত্য শিবভোগে দিতেন। আশ্চর্য্য, তারা এসে বেশ আনন্দ ক'রে খেয়েও যেত। আরও আশ্চর্য্য হবে তোমরা, যে দিন ঠুঁদের সম্পত্তি সব নীলাম হ'য়ে গেল, সে দিন একটা শিবও এসে ভোগ খেলে না। বনের পশু শেয়াল, সেও কেমন বোকে দেখছে? সাথে কি আর লোকে তাদের শিব-মা বলে! ওরা যে প্রহরী, তিন ঘণ্টা অন্তর ডেকে মাছুবকে সজাগ ক'রে দেয়। শুধু ওরা প্রহরই জানিয়ে দেয় না, ওরা চৌর-ডাকাতেরও প্রহরী। তুমি যেন আমাকে ডাক শুনিয়ে দিও সতী।

বিশ্বয়-আকুল গোধ তুলে সকলে শোনেন জ্ঞানতপস্বীর কথা।

হুঁচার দিন পরের কথা।

ভয়ানক অশ্রুতে কাতর রামেশ্বরন্দর। সুস্থ হ'য়ে থাকতে পারছেন না। ছটকট করছেন সর্বক্ষণ। গরমও থাকে বলতে হয়। উপরে সারা ছাতে, মেঝেতে জল ঢালা চলছে দস্তর মত। দেয়ালেও জল ছিটান চলছে। তাতে কি আর গরম যায়! কবিরাজ এসে বললেন—কচি কলার পাতা দিয়ে বিছানা মুড়ে দিন, তাহ'লে অনেক

ঠাণ্ডা পাবেন। কবিরাজের কথা মতো কলার আত্মবি পাতা দিয়ে বিছানা ঢেকে দেওয়া হ'লো। কলার কচি পাতার উপর শুয়ে বললেন রামেশ্বরন্দর—এবার আমি শকুন্তলা হ'লাম। খুশী ধরে না তখন তাঁর।

গুরুদেব বাতীতেই থাকেন। তিনি অনেক ছোট রামেশ্বরন্দরের চেয়ে। দেখা হ'লেই বলেন—গুরুদেব, দয়া কই আপনার? গুরুদেব চলে যান নত মস্তকে!

সেই গল্প আবার সকালে বিকালে চলে ভগিনীদের কাছে। সেদিনও চলেছে। বললেন—কী মধুর, যখন সব করে শত শত লোক রক্ত স্রাব নাম ধরে চাৎকার করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি আমি—“বাবা রক্তদেবের নামে প্রীতি পূর্ব ক'রে একবার হরি হরি বলে”; আরও জোরে শত শত লোক এক সঙ্গে ব'লে উঠে—“বোল, বোলো শিব ও-ও।”—রক্তদেব যে এখানকার জাগ্রত দেবতা গো! তাঁর সবকে আমি কতো কথা লিখেছি, শোনো নি তোমরা?

সকলেই চুপচাপ। কোন উত্তর নাই।

তখন আবার ব'লতে লাগলেন—এ ঠাকুর রক্তদেব বাবা নয়, ইনি হ'লেন বৃহদেব। বৃহস্পতি, কিন্তু এ'রই পুত্রো হ'চ্ছে শত শত বৎসর ধ'রে রক্তদেব ব'লে। শুধু এখানেই নয়, গোটা বাড়লার এমন কতো বৃহস্পতি পরিণত হ'য়েছে হিন্দুর দেবমূর্তিতে। আগে-কার কালের অনেক রীতিনীতি পাওয়া যায় এই সব পুজোর মধ্যে। তোমরা হয়তো জানো না, ঐ মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় হোমতলার যে রাস্তা ধরে, তার ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। চিরদিন চলে আসছে একই পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া। সাধারণ যাবেই সেই রাস্তা ধরেই। হয়তো এক বছরের মধ্যে কারো বাড়ী উঠেছে নূন রাস্তায়; তা হ'লেও ওরা যাবে সেই বাড়ী ভেদ করেই। বাধা দেবার উপায় নেই গৃহস্থারীরা। বাধা দিলে ঘটবে বিভাট। হয়তো এই বাধা দেওয়ার ফলে হ'য়ে যাবে রক্তান্তি। তাদের মনে তখন কী এক অদ্ভুত উদ্ভাবনা।

এটা কি ভাল বাবুলাদা?

এটাকে আমাদের দেশের লোকের স্বভাবই বলে, আর সন্ধ্যাই বলে, তাই। ওর মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। অজ্ঞ সন্ধ্যায়ে দেশ ভরে আছে। একে আমি বলি অজ্ঞ সংস্কারের মূর্তি। আমি সন্ন্যাসীদেরকে মানি না, এই কথাই এত দিন শুনে এসেছি তোমরা। কিন্তু এখন এক নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখছি—তিনি ভারতকে চিনি দিয়েয়েছেন সারা ভগবতের কাছে। আমি চাই ঠিক ঐ রকমই সন্ন্যাসী—যিনি বলেন—ভাতি আমাদের ভাতের ইড়িতে। যিনি বলেন—আমরা পূজো করে চলেছি কৃষ্ণস্বায়ের। যিনি বলেন—মাছুবকে আমরা ভালবাসতে শিখিনি। যিনি বলেন—হাড়ী, ডোম, মেথর, যুদ্ধোৎসাহ আমার ভাই, আমার রক্ত! এই ভারতই আমার তীর্থক্ষেত্র। কী স্বন্দর তাঁর সব কথা বলা দিকি। এই, ঠিক এইই চেয়েছিলাম আমি। সন্ন্যাসীদের কাজই ত এই। যিনি জালিয়ে ছাই মেখে গাঁজার দম দেবেন, আর যি আটা ডালসে প্রাজ ক'রবেন, ওসব ঠিক মতো না গেলে গুড়ীর চৌদ্ধপুঙ্কবের নরকবাসের স্বাবস্থা ক'রবেন, সে রকম সন্ন্যাসীকে আমি কোনো দিন দেখতে পারি না। ওরা সব সমাজের আবজ্ঞনা। ওরা সব

এক একটা দুর্ভিক্ষান শরতীন। ভাবের আবেগে বলে চ'লেছেন আচাৰ্য্যদেব তাঁর জ্যোতি-মণ্ডলীর কাছে ভগ্নের নিকট যেমন উল্লসিত ক'রে দিয়ে।

কিছুক্ষণ ধেম্বে বলতে লাগলেন আবার—একুস্ত সন্ন্যাসী ধীর, তাঁদেরকে গ্রহা করি আমি, আমি কেন সারা জগতের লোক। জাতি ভেদ তুলিয়ে দেখেন তাঁরা, ভাবতক গড়ে তুলবেন নতুন ক'রে, তাঁদেরই হারা ভারত হবে আবার সেই সোনার ভারত। জাগিয়ে তুলবেন জাতিকে, মাড়িয়ে তুলবেন জাতিকে। এটার কতবেন জোয়ার বাগী, কালোবাসার বাগী। ব'লবেন—ওবে জাভ, ওবে মৃত, জাতিভেদের পাণ থেকে মুক্ত কর যোরা সকলকে, তাই বলে জাতিজন সে সকলকে, ভালবেসে আপনাদের ক'রে নে সকলকে। কোথায় থাকবে তখন টায়েজ। পথ পাবে না এদেশ ছেড়ে পালান্তে। আসবে, আসবে এক দিন ঠিক এট রকম এক জন মানুষ, ধীর বাবা আমার ভারত হবে বাণীন। তখন কুড়ে কুড়ে আবার গেছে উঠবে পাখী। আবার বেলঘনিতে মুখের হবে তপোবন। নতুন নতুন টুকল গড়ে উঠবে সারা দেশে। রাজ্য তৈরী হবে লতন থেকে দূর গ্রামে মানুষের সুবিধা জন্ম। অসত্য হ'য়ে পড়ে থাকবে না কোনো গ্রাম। মারা যাবে না মানুষ চিকিৎসার অভাবে। মৃগা করবে না মানুষ মানুষকে। স্মৃতি হবে মধু সারা দেশে। মধুময় হবে আমার ভারতের পথের ধূলি পথান্ত। সেই মধু বিসিয়ে দেবে এট ভারতেরই মানুষ সারা জগতে। কবে, কবে সেদিন দেখাও? অধীর প্রতীক্ষার হয়েছি, অধীর প্রতীক্ষার হয়েছি—সে দিনের জন্য। তখন তাঁর হুট চোখ সজল। উজ্জ্বলের সঙ্গে বলে চলেছেন তাঁর জীবনের স্বপ্ন। ভাবের আবেগে কী মধুর সে উক্তি, সে কণ্ঠস্বর!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—আর একটা কথা বলি শোন। আমার এট সোনার ভারতের শিক্ষা জানো? হরিনাম লিখে, দুর্গা-কাম লিখে সে কাগজে আর অজায়, অসঙ্গত কিছু লিখবে না মানুষ। তাই চিঠি লিখতে হ'লে, ব্যবসায়ের তার হিসাবপত্র লিখবার আগেই ক্রমে খ্রীষ্টীয় শরণ, খ্রীষ্টদুর্গা সহায় এমনি হারা দেবদেবীর নাম। পাড়ি পাল্লা ধ'রেই প্রথমট এক—এক না বলে বলে রাম—রাম। তার অর্থ রাম-ই উদ্ধারণ ক'রে চিত্ত স্তব্ধ করার পর আর অজায় ক'রে না, গ্রন্থককে ঠিকাবে না ওজনে কম দিয়ে। এই শিক্ষাই জিয়েছিল এক দিন ভারত, আমার ভজনী লক্ষ্মী ভারতবর্ষ। এরই নাম ধর্মের ভয়। ধর্মভয়ট মানুষকে অস্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ঐ যে তোমরা তিলক বাটো, ওর মানে কী জানো? যতক্ষণ বিকৃতি তোমার শরীরে থাকবে ততক্ষণ তুমি সেই। ততক্ষণ তুমি ঐব তিন—তোমার উপাত্ত তেরটা অভিন্ন। শক্তির উপাসক বারা মুকা ধারণ করে সলাটে রক্তচক্ষুের তিলক, কি সিন্ধুর তিলক। এখন সে আর শক্তি অর্থাৎ কালী, তারা, দুর্গা অভিন্ন। কথা ব'লবে ঐ তিলক, এ কথা ব'লবে তুলসী মাল্য, রক্তাক্ত লা।

ভক্ত্যার এসে পড়ায় কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

ভক্ত্যার প্রশ্ন করলেন—আপনি কি কলকাতা বেতে চান কিস্যার জন্য?

একটু হেসে ব'ললেন চামেলস্বন্দর—আমার কৰ্মক্ষেত্র ত কলকাতাই; কণ্ঠস্থান ব'লেও চলে। আমার নিকটতম আত্মীয় বলতে বারা ভাগ্য ত সব কলকাতাতেই। দেখুন, এখন আপনাদের বা অভিজ্ঞ।

আমি বলছি এই জন্য যে এখানে তেমন ভাল হোমিওপ্যাথ নেই। আপনারা একটা দিন দেখে বাওয়ারই ব্যস্থা করুন।

ন' রাজার এক প্রিয় বন্ধু, এক রকম সন্ন্যাসীই তিনি। বললেন—রামেন্দ্র বাবু এ দিনটা ঠিক হয়নি, ব্যাঘাত হ'তে পারে।

আমরা বললাম—আপনি মিথ্যে ক'রে আনুন না কেন?

তিনি গিয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবুকে। তিনি ত শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

রামেন্দ্র বাবু দ্বী ইন্দ্রপ্রস্তা দেবী—গোহাছ নিয়ে বাত। হু' তিন মণ তেঁতুল নেবার জন্য ঠিক ক'রে রেখেছেন। বাঁধা ছাঁদা করবার সময় ডাকলেন, এত তেঁতুল নেবো কিনা, একবার জিজ্ঞাসা করি না আমাকে। শুধলেন—ঐ গা, তিন মণ তেঁতুল কী ছাড়িয়ে রেখেছি। এখন কিছু ছালকাই হবে, নেবো ত?

থাকতে হ'লে গেতে হবে ত।

একে একে পড়শীরা সব এলো দেখা করতে, ইতর ভয় সক্ষেই। তাঁদের কাছে বিপর নিয়ে বললেন—আমাদের এ জায়গাটা ছিল দেওঘরের মত স্বাধিকার স্থান। এখন দেখছি ম্যালেরিয়াতে ঘিরে ফেলেছে।

অনেকে প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ এ রকম ম্যালেরিয়া হওয়ার কারণ কি?

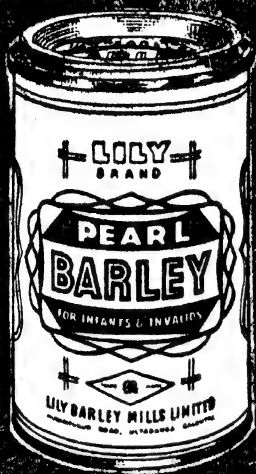
ঐ যে গঙ্গার এধার দিয়ে ট্রেন হ'য়েছে। তার জন্য উঁচু রাস্তা ক'রতে হয়েছে। চৌরিগাছার ওপানটার বেশের রাস্তা কত উঁচু দেখছেন ত? ও জায়গাটা ছিল ঝাঁক। ঐ দিক দিয়ে হিন্দল বিলের জল বের হ'য়ে গিয়ে পড়তো গঙ্গায়। এখন অনেক বাধা পায় কিনা। জল নিকাশ হয় না। বন্ধ জলেই জমে মশা। আর ঐ মশাই ত ম্যালেরিয়ার বাহক। জল জ'মে থাকতেই ম্যালেরিয়ার ছেয়ে গিয়েছে দেশ।

গৃহ-দেবতা নারায়ণ। নারায়ণের মণ্ডপে উঠবার সামর্থ্য নাই রামেন্দ্রস্বন্দরের। উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ব'ললেন গিয়ে পালকিতে।

কী আশ্চর্য্য। এত শাস্তি-সন্তান, বাগ-বজ্র, আরাধনা ক'রে যে মেঘ দেখা যায়নি আকাশে, আজ প্রকৃতি দেবী যেন মধু বর্ষণ ক'রতে লাগলেন। মূলধারের আরম্ভ হ'লো বৃষ্টি।

এ ঘটনা সব সময়েই দেখা যেত। বৃষ্টির অভাব হ'লেই গ্রামের চাষীরা ব'লতো—একবার আমাদের বড় বাবুকে তানাল হয় না? আজ মনে হ'লো আকাশ-বাতাস যেন হোঁচল ক'রে কী এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। সাধারণ লোকের চোখও সজল।

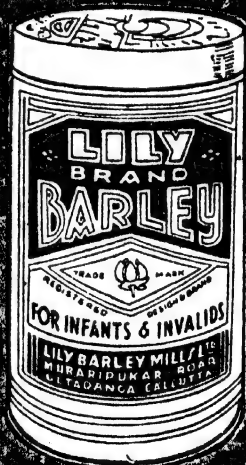
[ ক্রমশঃ ]



প্রোটিন ও আধুনিক  
মতে অনুমোদিত

লিলি  
বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত  
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়



লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ  
কলিকতা-৪

# কপালী পদীর কমহিনী

[কম্বাসী শিল্পদ্বারার বিপ্লব এসেছিলেন একসঙ্গে তেরো-মারী-রোমও তে তুলু লোতরেক্। ইং-১৮৬৪ অব্দে দক্ষিণ-কম্বাসীতে জন্মগ্রহণ করেন লোতরেক্, এক সম্ভ্রান্ত্র ধনী পরিবারে। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর শিল্প-পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব-জীবনের দুর্ঘটনার শিল্পীর শারীরিক দোষ শিল্পীকে নিষ্কর্মে সাধনার পথ দেখায়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অর্থাৎ ডেগাস্, রেনোয়ার্, ম্যান্টে প্রভৃতির সমপর্যায়ে স্থান লাভ করেছিলেন লোতরেক্। শিল্পীর অসামান্য কাজের মধ্যে প্রাচীরপত্রে (Poster) বিজ্ঞপ্তিরূপে ছবির ব্যবহারের প্রথম প্রচলন উল্লেখযোগ্য। লোতরেকের জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনি দুঃখময়। গত সংখ্যায় কাহিনীটির প্রথম প্রকাশ এবং আগামী কয়েকটি সংখ্যা পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার। এই সঙ্গে আমরা লোতরেকের আঁকিত কয়েকখানি বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি মুদ্রিত করছি।—স]

স্মৃতি ডি-গ্যাস্‌রোমের পেছনে ছায়াঘেরা বারান্দায় কাউন্টস ও টুলো লোতরেক মজিত হেনরীকে লক্ষ্য করছিলেন। হেনরী প্রতিদিনই শুরবেলায় এই সময় ঘুমায়। একটা হাত হেনরীর কের ওপর আর একটা হাত পাশে ঝুলছিল। খাস-প্রখাসের তালে তালে তার আঙ্গুর রক্তিম হুটটা কাঁপছিল। ঘুমোবার ঠিক আগেই সে যে হুটটা পড়ছিল সেটা খোলা অবস্থায় একটা সেমেনেড গ্লাসের পাশে পড়ে ছিল।

সে আবার বাড়ি ঘিরেছে! পৃথিবীতে তার নাস্তী অভিবান শেষ হয়েছে। বেচারা রিবি (তিনি নামেই তাকে ডাকতেন) তার ব্যর্থতায় নিজেও হারান। তবে হুং-কিছুটা কমেছে। সেখালে মনে কিছুটা সুখী তৃপ্ত হেন। সকালে সে বাগানের পিথিতে বেড়ায়—প্রচুর সময় আচ্ছন্ন থাকে গভীর রাত।



শিল্পী তুলু লোতরেক্

অপরাহ্নে তারা গাড়ি করে দুয়ে দুয়ে ভ্রমণ করে আসে। এইখানে ভীষন ঘাপনের একঘেরেমি বা বন্ধুদের অভাব সত্ত্বেও কেন অল্পযোগ্য 'নেই। মন্টমার্টের নাম যুগে জানে না। সে আবার পেয়েছে—ক্ষত-বিস্তৃত হয়ে গেছে বার বার। বেশ আশ্চর্যচরিত হয়ে উঠেছে তাই।

বোধ হয়, ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সে। এই আশ্চর্যমণ্ডলের মধ্যে যা কিছু শাস্তি। পরের বছর বোধ হয় সে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবে। গ্রন্থটি হবে তার রক্ষাকবচ। আর কোন দিক থেকে প্রত্যাঘাত আসবে না।

ষট্টিশকটে হেনরীকে হুম থেকে চমকে উঠতে দেখে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। আগামে ঘুমিয়েছে ত' ? আঁটিটি ঠিক করতে করতে হাসলেন তিনি।

একটা মাছি হুম ভাঙিয়ে দিল, সে-ও তেজে বলল, আশ্চর্য, জগতে এত বাহুগা থাকতে মাছিয়া আমার

## মূলী রুজ

মূল লেখক : পিয়ের লা মুর



লোভেরকৃ অঙ্কিত মে বেলফোর্টের চিত্র

লোভেরকৃ অঙ্কিত  
ক্রীমটো ওইলবার্টের চিত্রনর্তকী—মূল! রজ হোটেল  
ক্যান ক্যান নাচ

নাকের ওগায় কি করে ঠিক লাগে করে! অবশ্য  
ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ। ক'টা বাজল এখন?

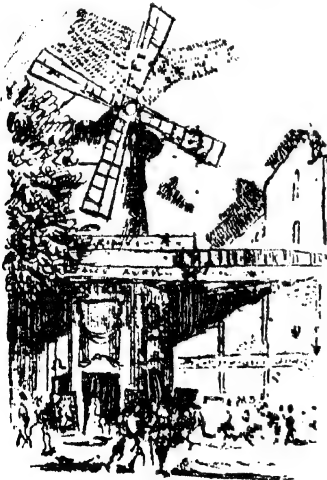
কিছুক্ষণ পড়ার ভাগ কবল কিছু তার চোখ  
আকাশের নীলে ঘরে বেড়াচ্ছিল। হেলান দিয়ে বসল  
আবার। আকাশের গায়ের ঐ মেঘটা কি নতুন  
অতিথি, না ঐখানেই সারাক্ষণ ছিল?

এ্যাটেলিয়ারে সেদিন সকালে তাকে যেন কিসে  
ভর করেছিল। অসংখ্য বার উত্তরহীন ঐ একই  
প্রশ্ন ফিরে ফিরে মনে আসতে লাগল। কি জন্তে সে  
করমোনের বিক্রেতা স্পর্ষিত উপেক্ষা দেখাল। সে  
বুঝতে পারে না, এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাও তার  
বুদ্ধির অত্যন্ত। নৈরাশ্রের চরম মুহূর্তে, অবসাদের

লোভেরকৃ নিজের আঁকা  
নিজের ছবি

শেষ সীমান্তে হয়তো আশঙ্ক্যবোধ হয়ে আমরা এমন  
কিছু বলি যা আমরা বলতে চাই না।

সারা রাত ত্রেদারিবি সেই মেয়েটির কথা কানে  
বেজেছে, আপনার মত যদি আমার মুখের চেহারা  
হতো, আর ঐ রকম বিশ্রী ছোট পা থাকত, তাহলে  
কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। এ্যাটেলিয়ারে  
প্রবেশের সময় সে অন্তত্ব বোধ কবছিল আর কেন  
বা সেই সকালে সেখানে গিয়েছিলো তাও অবোধ  
...এখনও যেন এ্যাভিসিনথ-এর তিক্ততা টোটে লেগে  
আছে। চোখ হ'টো তার ছালা করছিল, শির  
উপশিরাগুলো যেন হুতোর মতো, তার শিথিল ছি  
মাংসপেশীকে জড়িয়েছিল।



মূল! রজ হোটেল



লোভেরকৃ অঙ্কিত সার্কাসের দৃশ্য

করমোদ তার ইচ্ছার সামনে এসে পড়িয়ে অভ্যস্ত মন্থ্য হয়েছিল—বাঃ বেশ। দেখতে পাচ্ছি খুব চোটা করছে তুমি। যদিও চিত্রশিল্পে পূর্ণ ভাব তোমার নেই, প্রতিকারও অভাব, তবে সকলেরই ত আর সব বকম ক্ষমতা থাকে না ?

অল্প দিন হ'লে সে নিশ্চয় ছবি এঁকে যেতো। কিন্তু সেদিন সকালে পারলো না নিরুত্তর থাকতে। বুকের মধ্যে আঙুল কলচিল। উত্তর বিরাগে আত্মসারা হ'য়ে পড়ল। চিত্রশিল্পের জ্ঞান, সূত্র চিত্র এবং নগচিত্র সবকিছু তার সমস্ত কথা করমোদের সুখের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

পাঁচ মিনিটের ভিত্তে কি কোঁড়ক! সে চীৎকার করছিল, অনুযোগ করছিল চামির কোয়ারা তুলে ১০০ বেশ মতাব দৃষ্ট করেছিল। সে যে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই মঠ করছে, এ বিষয়ে অবশ্য সচেতন ছিল। বৃকতে পাতছিল এ তার শিল্পজীবনের আত্মকথ্য—তবে তখন সে গ্রাহ্য করেনি এক বিন্দু। কেপামির দমকা হাঁড়য়ার চরম উচ্ছ্বাসে সে তখন কেটে পড়ছিল।

ফিরে দেখল, রূপের ট্রে তাতে নিয়ে জোসেফ আসছে। ম্যাডাম লা কাউন্টেস, একটা গাড়ি এসে দরজার পিড়িয়েছে।

তিনি ট্রে থেকে কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লেন—উজ্জ্বলিত, হয়ে বলে উঠলেন আর, এ-এ অ্যাঞ্জেলিক।

হেনরীও কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লো ম্যাডাম লা ব্যারোণ আঁত্র জুনেটনাকে। দরজার দিকে অগ্রসর হতে তার মনে পড়ল অ্যাঞ্জেলিক মা-এর স্থলজীবনের সাথী। নারবনে স্ন্যাকব্রেড হাট কনভেন্টে সহপাঠিনী ছিলেন তারা। তার মায়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুটির সঙ্গে এক জন নেভি অফিসারের বিয়ে হয়। তার পরই তিনি ম্যাটিনিক না ম্যাডাগাসকার কোথায় যেন চলে যান।

সিঁড়ির সামনে একটা পুরনো ধরণের বোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। গাড়ির ফুটম্যান লাফিয়ে পড়ে দরজা খুলে দিল, ফুটবোর্ডটা মাটিতে নামিয়ে দিল।

গাড়ির ভেতরে অবগুণ্ঠনের অস্পষ্ট খুঁশু আওয়াজ। গাড়ির দরজার সামনে একটি কালো রঙের সাপের নত সাবধানী যণা বার করে এগিয়ে এলো একজোড়া পিঁপার। শোকবসনাবৃত একটি স্থলজী মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখা গেল। তিনি পর যুগ্মে কাউন্টসের হাছবন্ধনে কায়ার ভেঙে পড়লেন।

এ্যাডেস।

অ্যাঞ্জেলিক।

এই মহিলা দুটির সঙ্গীতির আলিঙ্গন এমন নাটকীয় যে, হেনরী গাড়ির দরজায় ঠাব একটা মেয়ের নিশ্চয় আবির্ভাব সন্দেহ করল না। মেয়েটি তরুণী—আঠারো বৎসরের। তাৎও অল্প শাক-পরিচ্ছন্ন। সাবধান গোড়ালি পথ্য ঝট তুলে গাড়ি থেকে অবতরণ করল সে।

আমার মেয়ে, ডেনিস; পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যারোনেস। তারপর কায়ার অক্ষত কণ্ঠস্বর হ'য়ে হাতবাগের মধ্যে থেকে ক্রমাল জ্বলে লাগলেন।

ডেনিস বখারোতি সৌজ্ঞ দেখালে। কাউন্টস তার আরক্ত লাল চুপনের টিপ এঁকে দিলেন।

কর্তাখানেক পরে হেনরী ব্যারোনেসের কাছ থেকে তাঁদের পূর্ববৃত্তি

বংশাঙ্কমিক ইতিহাস, জুনেটনিক পরিবারের কুড়ি বছরের দৃশ্য-অভ্যুদ্যানের ইতিবৃত্ত সব একে একে তুললো। ব্যারোনেস হাত্তরীম বক্তা।

এখন আমার স্বামী মারা গেছেন, চোখে তল এসে পড়ল তাঁর। ডেনিস আর আমি বয়সে গেলে পৃথিবীতে একরকম এক। তারপর আত্মসংবরণ করে কল্যাণ দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, তুমি যদি এখন একটু পিয়ানো বাজাতে বাচলে ম'সিয়ে ডি টুলো লোভিয়েক তনতেন। হেনরী বললেন, ও খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে।

ডিমাইস পিয়ান বাজাল। বেশ সুবেলা সুন্দর হাত। সোকার বসে হেনরী তাকে লক্ষ্য করছিল। পিয়ানো বাজান শেষ হতে সে হেনরীর পাশে এসে বসল। দশ মিনিটের লাগল না তাদের বসিষ্ঠ হতে। যেন কত কালের পরিচিত বন্ধু! ডাকনাম ধরেই ছ'জনে ছুঁতনকে সন্ধান করতে লাগল।

ঐ গায়ের মধ্যে দিয়ে কখনো গেছে? হেনরী ভিত্তাসা করলো, পরিবেশটা ভারি সুন্দর, তাই না?

কোথাও প্রায় বাওয়া হয় নি। ফলসাম তো অল্প দিন হলো এখানে এসেছি। চল না দুজনে একটু ঘুরে আসি। শোভা-জায় অবশ্য যেখানে কি ঠিক হবে?—জোখের পাতায় কম্পিত ইশারা করে বললো, মায়েরের কাছ থেকে একটু দূরে বাওয়া যাবে। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের যে অন্তরঙ্গ সখ্য তাতে আমরা ত একরকম ভাইবোন বললেই হয়।

তারপর থেকে হলো সৈনন্দিন নতুন নিয়ম। প্রত্যেক সন্ধ্যায় জুনেটনকে আগন্তন ম্যালোবোমের কাছ আর হেনরী আর ডেনিস দু'য়ে গ্রামাঞ্চলে কোথাও বেড়িয়ে আসতো, যখন তাদের মায়েরা গল্পগুজবে মগ্ন থাকতেন।

ডেনিসের আবির্ভাবে হেনরীর নির্জন গ্রাম্যবনের একঘেয়েমী অনেকটা কোট গেল। আর যে নাগাসঙ্গর প্রভাব সে জীবনে অনুভব করেই অবাচিত তাই মাধুর্য-পাত করে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো। তার দুখনির্বা ছবির আবার আনন্দে উজ্জ্বল হ'লো। তাছাড়া তার জ্ঞাতত যৌবনের উত্তেজনায় সেবা দিল একটা শিল্প অবলোপ।

ডেনিস, তারই মতো অভিজ্ঞাত। তাদের ঐতিহ্য, সন্ধ্যার ও রীতিনীতি একই ধরণের। তার ফলে দু'জনের মধ্যে দৃঢ়তা হয়েছিল নিবিড়। হেনরী যে বকম বোনের অস্তিত্ব কল্পনা করতো ডেনিস যেন ঠিক তাইই প্রতিমূর্তি।

অক্টোবরে প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাক্ষা জমশে বাধ্যত ঘটলো। হেনরী তখন শুক করেছে ডেনিসের ছবি আঁকতে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ডেনিস এসে কচাঘেরা বারান্দায় কাউন্টসের সঙ্গে দেখা করে যেত ওপরে ঠুঁড়িওতে। তার মা নীচে বসে গল্প করতেন।

হেনরী, দরজার কাছ থেকেই সে ডাক দিত, তোমার বিখ্যাত ছবি কতখু এগোল? সিঁড়িভাড়ার শ্রমে ইশাখতো সে। ইতিমধ্যে খোলা হ'য়ে যেত সোফটো।

আয়নার সামনে পিড়িয়ে হাত দিয়ে ঠিক করে নিত চুল তারপর মলে ড্যাঙ-এ গিয়ে নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় কাঁড়াত।

মজা জুটুক করে হেনরী নির্দেশ দিত মাথাটা একটু নীচু... না না অত না... বেশ। ডান কাঁধ একটু নামাও... ঠিক হয়েছে। এই অবস্থায় একটু বসো।

ডেনিস পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে পনের মিনিট বিশ্রাম নিতো। চারের ভর্তে ঘটা বাজাত হেনরী। গল্পে হাসিতে তারা উদ্বেগিত হয়ে উঠত। বাইবে বৃষ্টিধারা শাসির পায়ে জলতরঙ্গের সুর বাজতে থাকত। বৃষ্টি হোক, বাতাস গর্জন করুক, এই ছোট ঘরে বন্দী থাকা মন্দ কি! বথন পাশে আছে ডেনিস...

নিজের অজান্তেই হেনরী নিজেকে কুবাণের মত ভাবতে থাকে, সে বেন কৈতের আয়ে অবসর জীবন যাপন করছে, লক্ষ্য করছে তাকে কে কাঁকি সিঁছে, প্রজ্ঞাদের দোরে দোরে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে পাকা খানের কৈতের পাশ দিয়ে।

একটি কল্পিত বধূর পৌনঃপুনিক চিন্তায় তার মন ডেনিসের দিকে ছুটে যেত। ডেনিসকে আর শুধু বিরক্তিকর গ্রীষ্মদিনের পক্ষে শক্তিদায়িনী সাথী বলে মনে হ'ত না—আর একটু বেশী কিছু বোধ হ'ত। তার চিরজীবনের সঙ্গিনীরূপে বধূবেশে কল্পনা করতো তাকে কিন্তু মনোভাবের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হলো।

ডেনিস যে তাকে পছন্দ করে, সে বিষয়ে হেনরী নিশ্চিত ছিল। তবে সে কি প্রেমে কোন দিন রূপান্তরিত হবে? তা' না হোক, অন্তত তাকে স্বামিরূপে সে কি গ্রহণ করতে পারে? সত্যি সে পঙ্কু, কুংসিত, তবে এ-ও ত ঠিক, কত নারীই ত' পঙ্কু পাণিগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক যুদ্ধের পর কত মেয়েরাই তো স্বৈচ্ছায় পঙ্কুদের বিয়ে করে। ডেনিস কি তাদের মতো নিঃস্বার্থ তাগী চরিত্রের মেয়ে? না সে সাধারণ মেয়েদের মতই শুধু চায় স্বস্তি মুখ আর স্থায়ী স্বাস্থ্য!

সে কি বুঝবে ভালবাসা শুধু রোমাঞ্চকর উত্তেজনা নয়, আরো গভীরতম অর্থ তার। সে কি বুঝবে স্থায়ী সুখ শুধু দুটো লম্বা লম্বা স্বাভাবিক পা আর স্বন্দর দেহের ওপর নির্ভর করে না?

আজ রাতে তাকে স্বন্দর দেখাছিল! কাঁধ দুটো সোজা সাতিনের মত বোধ হচ্ছিল। হুটোখের তাবায় (মামবাসির শিখার আলো) জলজল করছিল। ঠিক তাকে যে ভাবে দেখছে সেই ভাবে যদি আঁকতে পারত!

চুলায় থাক ছবি আঁকা। ডেনিসকে চুখনে শিহরিত করতে চায় সে, চায়... হ্যাঁ, ডেনিস তারই—একান্ত ক'ব তার। সে ডেনিসের মন জানে তার প্রেমের প্রমাণ সে পেয়েছে। হ্যাঁ, প্রমাণই বলা চলে।

সে যে ভাবে সম্বন্ধ আদরে তার হাত হাতের মুঠায় তুলে নিয়েছে। যে ভাবে হেনরীকে বলেছে তোমার মতো ভালো লোক এর আগে কখনও দেখিনি। তার মতো অভিজাত মেয়ে একথা বলত না যদি না ভাষাভিযুক্ত কিছু বলার প্রয়োজন হতো।

এ-বিষয়ে কিছু না বলে সে মৌন হয়ে থাকবে? আর ফিরে এসে মূর্খের মত দেখবে ডেনিস আর এক জনের বাহুল্য হয়ে গেছে? শুধু মুখ ফুটে বলার লজ্জা এড়াতে সে এ-রকম অবস্থা হতে দেবে না। না কিছুতেই না।

হেনরীর মা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। হেনরী কাচের গ্লাসে কিছু শ্যাম্পান ঢেলে নিল। স্বন্দর একটা আমেজ সারা দেহে ব্যাপ্ত হলো। ছড়ি হাতে নিয়ে সে বথন চলতে শুরু করল তখন পারের জলার ঘরের যেখানটা কাঁপছে মনে হলো।

ডয়িংকমে কফিশানের জন্ত তারা উপস্থিত হ'লো। হেনরীর গায়ের কাছে ঝুক পড়ে ডেনিস বলল, সিজার ফ্যাংকস-এর প্রিন্সিড পিয়ানোয় বাজাব? তুমি ওটা খুব পছন্দ কর—মনে আছে প্রথম দিন ঐ সুর আমি বাজিয়েছিলাম।

ডেনিস পিয়ানো বাজাতে লাগলো। হেনরী গিয়ে তার পাশেই বসলো। পেছনে ডেনিসের মা অনর্গল কথা বলছিলেন। এই একমাত্র সময়... চলো ঠুঁড়িওতে যাই, কিস-ফিস করে হেনরী বললে।

এখন?

হ্যাঁ, এখন, চাপা স্বরে সে বললে খুব দরকার আছে।

আলো না নিবিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিল। শ্যাম্পান তার হস্তে এনে দিয়েছিল উদ্বেগল উত্তেজনা। সে ছাড়া ডেনিসকে আর কেউ বিয়ে করতে পারে না। এই ঠুঁড়িওতেই সে ডেনিসকে একথা বলতে পারে। এইখানেই ত' তাদের জীবনের চঞ্চল সুখের মুহূর্তগুলি কেটেছে। কিন্তু বলবে কি, প্রাপ্তিও বুকের মধ্যে যা সুখ হয় উঠেছে।

কি দেখাতে আবার আনলে এখানে, ডেনিস জিজ্ঞাসা করে।

এসো, সোফায় এসে বসো।

ডেনিস বসলো। হেনরী তাকে সোফায় প্রায় একপ্রান্তবর্তী করে খুব কাছ ঘেঁসে বসলো।

তোমায় একটা কথা বলতে চাই, হেনরী একটু দ্রুত আর মৃদু স্বরে বলল, আমি আশা করি না তুমি আমার ভালোবাসা, তবে সারা জীবন আমি তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করবো। আমার বিশ্বাস, আমাকে বিয়ে করলে তোমায় অল্পশোচনা বরাত হবে না। তোমায় আমি সুখী করব। দেখো, তুমি যা চাও আমি তাই করবো। তুমি যেখানে বলবে সেখানে যাবো, যা বলবে তাই করবো। আরেগভরে সে ডেনিসের একটি হাত চুখন করল।

ডেনিস একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। বাথা-বিমুদ হয়ে গিয়েছিল সে। মুখে ফুটে উঠেছিল বিষয়, সমবেদনা আর কৌতুকের মিশ্রভাব।

কিন্তু, হেনরী, আমি ত' তোমায় ভালবাসি না? আমি কোন দিনই ভাবিনি যে তুমি...

বুঝেছি, হেনরী মাথা নেড়ে জানায়, তোমার মা'কে আগে বল আমার উচিত। তবে তাঁকে বলার আগে আমি চেষ্টাছিলাম...

না না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না! সে তার বিমুদ ভাব কাটিয়ে উঠেছিল। কঠোর উঠল উঁচু পদ্যায়, তুমি কিছুই বুঝা পারলে না। আমি তোমায় ভালই বাসি না। এ ভক্ত আমি স'ি ছ'বত। তবে উগায় নেই। আমার হাতটা ছেড়ে দাও।

দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল। তার সমস্ত মন শ্যাম্পানের উত্তেজন ঘূর্ণীর মত ঘুরছিল। আমি ত' বলিনি তুমি আমার ভালোবাসা বলেছি পছন্দ কর। পছন্দ কর না, বল? মনে করে দেখো গৌ তুমি আমার হাত তুলে নিয়ে বলেছিনে...

তুমি একদম পাগল! হাতটা ছেড়ে দাও, আমার কষ্ট হচ্ছে—তুমি-যা করেছ। এতে মনে ক'রার কিছু নেই। তবে জানি মিছি, কোন দিন তোমায় আমি ভালবাসি নি, বাসতে পারবও না এ আমার পক্ষে অসম্ভব।

এবার হেনরীকে দেখে ডেনিস ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে কুল হুকতে পারছে। তার লেখ দুটো শাহত অন্তর মত আর

বলে হ'য়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটো উঠছে খরখর করে কেঁপে।  
শ্পের মুখ অলোয় তার কদাকার মূর্তি আরো কুংসিত দানবের  
গা মনে হচ্ছিল।

কেন, অসম্ভব কেন? কেন বল? তার মুখ চাইয়ের মত সাদা  
হ' গেল। মূর্তি পাণের মত তার লিকলিকে আঙুলগুলো ডেনিসের  
বক্ষে আরো চেপে বসল। বোধ হয়, আমি পঙ্ক বলে, না? তাই  
বল? আমি পঙ্ক শুধু সেই জন্তে?

হুংখের সঙ্গে এবার রাগ হলো ডেনিসের। ভুলে গেল তার  
সের ভয়। হুঁ কোঁটা বড় বড় অক্ষর পিছনে তার চোখ দুটো  
তে লাগল।

হ্যাঁ! চিংকার করে সে জানাল.. হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি পঙ্ক বলে  
হ' তা ছাড়া তুমি শুধু পঙ্ক নয়, কুংসিত, তোমার মতো কদাকার  
ক আমি জীবনে দেখিনি..

তার কথা শেষ হ'লো না। বেশ ঠোঁট টান দিয়ে ডেনিসকে  
র কাছে টেনে আনল হেনরী। তার বিবর্ণ ঠাণ্ডা ঠোঁটের ওপর  
জর উত্তপ্ত ঠোঁট চেপে ধরলো। খেমে গেল সময় প্রবাহ। বাঁকা  
কর মতো ডেনিসের শিরদাঁড়ার স্পর্শ পেল সে, তার উঁচু বুকের  
। অল্পভব করল তার সার্চের ওপর। ডেনিসের খালাস নাখের দাগ  
। গেল তার হুঁ হাতে।

একটা প্রাণপণ ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল ডেনিস।  
দার দিকে দ্রুত ছুটে গেল। দরকার পাল্লায় এক হাত রেখে ফিরে  
গেল। হেনরী বোঝানে ছিল সেখান থেকে একটুও নড়েনি।  
কার ওপর স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে ছিল। ক্রোধের কালো কালো  
। গুলো মিলিয়ে গেছে মুখ থেকে।

তুমি একটা নীচ, মুখ্য, জানোয়ার। কোন মেয়েই তোমাকে  
ন দিন বিয়ে করবে না। কোন দিন নয়, সুনয়ত পাছ?

ক্রোধের আভিলম্বো আঘাত করবার নিষ্ঠর প্রবৃত্তিতে তার  
টা ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁটটা উঠছে কেঁপে-কেঁপে। সে তার  
গুলোর পুনরাবৃত্তি করল। যেন প্রতিটি কথা পেয়েকের মত  
খ দিয়ে বেতে চায়।

ডেনিস চলে গেলো। হেনরী তাকালো না এক বার। শুধু  
স্টিপাতা সিঁড়ির ওপর মুহু পদশব্দ, আর নিচের ঘরে উত্তেজনা-  
কণ্ঠস্বর সুনতে পেল। তার পর একটা মুহু ঘন্টারিনির সঙ্গে সঙ্গে  
তে পেলো বালুময় পথের ওপর গাড়ীর চাকার আর্দ্রবর। ঘরের  
। একটা বিকট শব্দটা শুধু হাঁ করে রইল।

আর বাইরে, অজস্রময়ী রাত্রি।

কয়েক মুহূর্ত যেন হেনরীর অল্পভব শক্তি অসাড় হ'য়ে রইল।  
হুঁ ভাবতে পারছে না সে। যন্ত্রাঙ্গিকের মত ছড়িটা তুলে  
। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি থেকে সে মা-কে দেখতে  
ল। কারার গ্রেসের পাশে আঙনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে  
হল। হাত দু'টি কোলের ওপর ধরা রয়েছে। মুখের বোঝার  
উপ দেখে বোধ হয় যেন পাখের গড়া মূর্তি।

সে গিরে কাছেই বসল। ছড়িটা মাটিতে রেখে ত্রুয়ট-কোটটা  
সে জড়াতে লাগল। কিছুকাল হুঁজনের কেউ কথা বলতে  
ল না।

তুমি সব বুঝতে পাছ, মা, আমি মূর্খের পবিত্রয়ী দিয়েছি।

আঙনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে গেল সে। তাকে আরো  
গভীর ভাবে বোঝা উচিত ছিল, আমি জানি। তবে আমি যেন  
বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি ডেনিস অস্ত্র মেয়ের মতন নয়। আমার  
বিশ্বাস এত দৃঢ় হয়েছিল যে আমি মনে করেছিলাম, ডেনিস আমার  
ভালোবাসতে পারে। তুমি ত' জান না মা, পঙ্ক হ'লে এই ভাবে  
নিজেকে ভোলান কত সহজ। একটু একটু করে নিজেকে কম  
কুংসিত মনে হতে থাকে, খোঁড়া বলে আর বোধ হয় না। নিজেকে  
একটা খুঁড়ির চলা যুবকের মত মনে হয়। পঙ্ক বামন বলে নিজেকে  
ভাবতে আরম্ভ চায় না।

উঃ, চুপ কর হেনরী, ওরকম করে আর বলো না।

কিন্তু আমি ত' তাই মা, তাই নয় কি? নিজের প্রতি  
একটা ফুলে ঠোঁট রাগে সে বলতে লাগল, সত্যকথাটার ওপর আমার  
এমনি ভাবে হোটট খেয়ে পড়ি। এ যেন অনেকটা সাপের মাথার  
পা দেওয়া। সেইজন্মে আমি ঠিক করেছি—পূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে  
তাকিয়ে সে বলল, যাবো।

সে দেখতে পেলো মায়ের ঠোঁট বেদনায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে, হাত  
দুটো নিশপিস করছে উপায়হীন উত্তেজনায়।

তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্তে ক্ষমা কোর মা! এখান থেকে  
চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আজ রাতে যা ঘটল এ রকম হওয়া  
অবশ্যস্বাভাবিক। মটমটোতে গিয়ে আমি মনের মতো নতুন জীবন  
আরম্ভ করতে পারি। আর ওখান থাকলে অস্ত্রত: তোমাকে আর  
দুঃখ দেব না, যেমন আজ রাতে ছিলুম।

হুঁ কোঁটা অস্ত্র তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তোমার  
মটমটোরে বড় একলা মনে হবে, হেনরী!

পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই তা হবে মা।

মাটি থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে হেনরী মায়ের দিকে সরে এলো।  
মা, কোঁদো না তুমি। আমাদের হুঁজনেরই দৈর্ঘ্য দরকার। তুমি ত  
জানো অস্ত্র কোন পথ নেই। তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে  
আসব.. নত হ'য়ে মাকে সে ছোট একটা চুমু খেল। এ কথা তুলে  
না, তার পর মুহূর্তে বললো, যা কিছু ঘটুক না এ কথা তুলে না  
আমি তোমার ভালবাসি। সারা জীবন সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসব।

হেনরীকে ঘরে রাখবার চেষ্টা করলেন না তিনি। হেনরী ঠিকই  
বলেছে। এ ছাড়া সমস্তার অস্ত্র মীমাংসা নেই। তিনি নির্বাক দৃষ্টিতে  
দেখলেন, পঙ্ক দেহটাকে টেনে নিয়ে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে।  
তার ছড়ির বিলোময়ন ঠক-ঠক শব্দ আর তার পরেই শব্দ কঙ্কর  
দরজা দেওয়ার আওয়াজ সুনতে গেলেন। তার ব্যাখ্যাতর দৃষ্টি আবার  
কারার গ্রেসের বহিমান শিখার দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল।

সে চলে গেল। এবার আর সহজে ফিরবে না সে। হুঁজোর  
কঠিন আঘাত থেকে তিনি পুরকে আড়াল করে রাখতে পারবেন না।  
এ প্রকটো আত্মময়। কিন্তু ওর কি হবে? পঙ্কতা, কুরূপ, প্রেমের  
জন্তে বৃত্তক হ্রদ আর এক অশ্রিচিত বাসনা নিয়ে ও কি করবে?  
শুধু একটি কথা তিনি জানেন, সে তার সন্তান এবং পৃথিবীর চার দিক  
থেকে তার ওপর অসংখ্য আঘাত এসে পড়বে। আর তিনি তাকে  
ত্যাগ করবেন না কোন দিন—অপেক্ষা করবেন চিরকাল যত দিন না  
তার জীবনের অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হয়। [ ক্রমশ: ]

অনুবাদ—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও জামায়েতদার দে।





স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত  
লাইফবয় সাবান দিয়ে  
চান করে -

— এতে দৈনন্দিনের \* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!

\* যে সর সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে  
আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু  
থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের  
অত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে  
স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেরই লাইফবয় সাবান  
দিয়ে নিজ ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের  
স্বাস্থ্য অক্ষত রাখেন। লাইফবয় সাবান  
সেই স্বরূপে তাজা ভার এনে দেয়।

মধ্যে থেকে তিন জন প্রতিনিধি হয়ে থাকে। মধ্যে নেমে বাক এবং লালফোঁজের লোকদের বলে-কয়ে বৃষ্টিয়ে-সুষ্টিয়ে উপরে নিয়ে আসুক আশ্বাসমণ্ডন করার জন্তে। নইলে বাচ্চাগুলো তো মরবেই, তাছাড়া থাকে মুখও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে খাদ চিরকালের মতো বৃষ্টিয়ে দেওয়া হবে—ইহুদের মতো পাচে মরবে ওরা।

মেয়েরা যে তিন জনকে পাঠাবার জন্তে ঠিক করলো, তারা হলো : নীলুশা ক্রামারেকো ; ভায়ভারা জ্যোতোভা—সবচেয়ে কমবয়সী সে ; এবং মারিয়া মৈসেয়েভা—তার সাইট্রিশ বছর রয়েস আর পাঁচ সন্তানের মা সে। ওরা তিনজন জার্মানদের বলে-কয়ে বুড়ো খনি-শ্রমিক কোজলভকে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করলে। তা নইলে তারা হয়তো খনির তলাকার গলিযুঁজির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবে শেষ কালে। বুড়ো তাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে, সাবাত্ত হলো।

জার্মানরা থাকে মাথায় একটা কপিকল খাড়া করে তা থেকে লোহার তার ফুলিয়ে দিলো—আর তার সঙ্গে বাঁধলো একটা যেমন তেমন কয়লাভোলা লোহার বালতি। এমন করে থাকে নামবার অভিনব খাঁচা তৈরি হলো।

মেয়ে তিন জনকে থাকে মুখে নিয়ে আসা হলো। তাদের পেছনে সারা গ্রামের মেয়েমাছর আর ছেলেপুলেরা কীদতে-কীদতে আসছিলো। ওরাও কীদছিলো—চোখের জল মুহূর্তে মুহূর্তেই ওরা ওদের ছেলেপুলে, আত্মজন, আপন গ্রাম আর পবিত্র ঘরালোকের কাছে বিদায় নিচ্ছিলো।

চার দিক থেকেই কান্নাকাতি মেয়েলি কণ্ঠ ওদের ডেকে ডেকে নানান কথা বলছিলো। বলছিলো—নীলুশকা, ভারকা ইগনাত্তি-য়েভেনা, তোমাদের ওপরে ভরসা করেই ইইলাম আমরা। ওদেরকে ভালো করে বৃষ্টিয়ে বোলো গো তোমরা। বোলো তাদের—তার কবি কথা না শোনে তবে ঐ মুখপোড়া নাখসীগুলো সবাইকে গুলী করে মারবে—বাচ্চাগুলোর ঘাড় ঘুচে মারবে ঘুগীছানার মতো।

এরা তিন জন কীদতে কীদতেই জবাব দিচ্ছিলো—তা কি আর আমরা জানি না? আমরা শেষ পর্যন্ত দেখবো—দরকার হলে ঐ শাগলাগুলোর চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে উপরে তুলে আনবো। ওদের চোখ খুলে বার করবো আমরা। ওদের বৃষ্টিয়ে বোবো যে ওদের একগুঁয়েমির জন্তে কতকগুলো নিরপরাধ প্রাণ নষ্ট হতে চলেছে!

বুড়ো কোজলভ তার খনি-লঠনটি দোলাতে দোলাতে আর হাঁড়িতে খোঁড়তে একটু ক্রতই চলবার চেষ্টা করছিলো। ১৯০৬ খনে থাকে ছাদ ধসে পড়ে তার ডান পাটা ভুঁড়িয়ে গেছিলো।

খনি তার মাত্র আঠাশ বছর বয়েস। কিন্তু তার পরও কোন দিনের মত সে তার পেশা ছাড়েনি—বলতে কি, থাকে নেমে কয়লা কাটাই মত তার কাছে পবিত্র কর্তব্য আর জীবনের পরম আনন্দ বলে মনে হতো। খনির কাছে আসতেই তার মনে এমন একটা ভাব আসতো, ধর্মিক লোকদের আসে খুঁটাসের সময় গীর্জায় হুকতে গিয়ে।

ই, সে একটু ক্রতই চলতে চেষ্টা করছিলো। বাতে ঐ নির্বোধ মেয়ে-মুখগুলোর মড়াকারা তার ঐ পবিত্র মানসিক আবহাওয়াটি নষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু ঐ সমবেত ক্রন্দন-কলারোল ছাড়িয়ে যেতে পারছিলো না সে কিছুতেই, ওদের কান্নার সুরে সে বেনে ঐই বৃত্ত

খনির ধ্বংসভূতের শোকই ভ্রুণতে পাচ্ছিলো, আর তার নিজের বার বার করে মনে হচ্ছিলো যেন সে সমাধিক্ষেত্রে এসেছে, যেমনটি সেই শরতের বিষণ্ণ অপরাক্তে তার জ্বর কফিনের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলো।

জার্মানরা থাকে মুখে গোল হয়ে কাঁড়িয়ে গল্প-গুজব হাসিঠাট্টা করছিলো আর এমন নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ফুকছিলো যেন এট সমস্ত ধ্বংস এবং মৃত্যু আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে, তারা এর কিছুই জানে না।

কেবল এক জন সৈন্ত, মোটাসোটা, মুখে বস্তুর দাগ, চওড়া চাবাড়ে হাত, সেই শুধু নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে আর বিষণ্ণমুখে তাকিয়েছিলো থাকে ধ্বংসভূতের পানে।

—মনে হচ্ছে যেন ওই কেবল একটুখানি অনুভব করছে এই ধ্বংসলীলা। বুড়ো কোজলভ ভাবলো—কে জানে, হয়তো ও এক দিন কাজ করতো এই রকম একটা থাকে—কে জানে, হয়তো ও ছিলো...

লোহার বালতিটার মধ্যে বুড়োই উঠলো সবাই আগে। নীলুশকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—“ওলেকা, আমার বাচ্চা, আমার সেনা বে”—

বছর চারেকের একটি মেয়ে চীৎকার শুনে ওর দিকে মুখভঙ্গি করে তাকালো, যেন সে মায়ের এই অশোভন চোঁচামেচির জন্তে নীরব ভ্রমণা করছে তাকে।

“আমি পারবো না, আমি পারবো না যেতে! আমার হাত-পা কাঁপছে”—কৈদে উঠলো নীলুশকা—“ওরা আমাদেরকেও গুলী করে মেয়ে ফেলবে—অন্ধকারে ওরা চিনতে পারবে না। আমরা মারা পড়বো সেখানে আর তোমরাও মরবে এখানে—”

জার্মানরা ওকে ধাক্কা মেয়ে বালতির মধ্যে ঢেঁলে দিলে, কিন্তু ও বালতির গায়ে পা আটকে ফেললো। বুড়ো তাড়াতাড়িতে ওকে ধরতে চেয়ে টাল সামলাতে পারলো না,—পড়ে গেলো আর মাথাটা সজোরে বালতির কানায় ঝুঁকে গেলো। জার্মানরা হেসে গড়িয়ে পড়লো—যেন এমন হাসির নাটক আর কোথাও দেখেনি। কোজলভ রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠলো—“উঠে পড়ো—ধোপানীর গাথা! তোমায় যেতে হবে থাকে মধ্যে—জার্মানিতে নয়। এমন হাউমাইট করে মরছো কেন?”

ভায়ভারা আলগোছে লাকিয়ে উঠলো বালতির মধ্যে। তার পর জলভরা চোখে এক বার ক্রন্দনরতা নারী আর শিশুদের দিকে চেয়ে জোর করে কৃষ্টির ভঙ্গি টেনে এনে বললো—“ভাবনা কোরো না, মেয়েরা! দেখো, আমি মন্ত্র পড়ে বশ করে সবাইকে উপরে এনে হাজির করবো খনি—”

মারিয়া ইগনাত্তিয়েভনা বালতির কানায় একখানা গোলা পা তুলে দিয়ে গোড়াতে গোড়াতে বললো—“ভারকা, আমার হাতখানা ধর! আমি চাই না জার্মানরা আমাকে স্পর্শ করুক—”

বালতিটি ছেড়ে দেওয়া হলো। মারিয়া টাল সামলাতে না পেরে বালতির কানায় হুতুতুড়িয়ে পড়লো দেখে ভারকা তাড়াতাড়ি তার কোমর জড়িয়ে ধরলো হুঁহাতে—

“তোমার ব্রাউজের নীচে কী নিয়েছো, পিসি!” একটু অবাক হয়ে সে বললো।

মারিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে জার্মান কর্পোরাটাকে খেঁকিয়ে

ঠাঙ্গো—“বলি, ধী করে দেখছো কি অনায়াহে! আমরা সবাই তো উঠছি—এবার নামিয়ে দাও না ডাকরা—”

২

কর্ণোরালাটা যেন তার কথা বুকেই নামাবার সঙ্কেত করলো—বালতিটি নামতে শুরু করলো। প্রথমে কয়েক বার ওটা খাদের দেয়ালে আঁটা কালো ছাংলাপড়া তক্তার গায়ে এত ছোঁরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়লো যে ওরা কেউ আর শাড়িয়ে ছিলো না। তারপর আস্তে আস্তে নামলো বালতিটি। ক্রমে ক্রমে ওরা হারিয়ে গেলো নিকষ আঁধারের মধ্যে। খাদের তলা থেকে কনকনে ঠাণ্ডা আর ভিক্রে ভাপসা বাতাস উঠছিলো—এবং বালতিটি যতই নীচে নামতে লাগলো—ততই ঠাণ্ডাও যেমন বাড়তে লাগলো, ভয়ও সেই সঙ্গে!

মেয়েরা চুপ করেই ছিলো। যা কিছু তাদের আপন এবং প্রিয়-সবার থেকে তারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই দেড়শো ফুট কালো অন্ধকারের স্তর দ্বারা—এই বিচিত্র বোধটাই ওদের মুক করে রেখেছিলো। সমবেত ক্রন্দনবোলের সেই ধ্বনি তখনো যেন তাদের কানে বাজছিলো। তবু তারা চুপ করে এই সুগভীর অন্ধ স্তরতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো। তাদের চিন্তা এবার ফিরলো এই অন্ধকারের বাসিন্দাদের প্রতি। ওরা এখানে রয়েছে তিন দিন হলো। তিন দিন ধরে এই নিশ্চিন্ন অন্ধকারের মধ্যে বসে ওরা করেছে কী?—ওরা কী ভাবছেই বা?—ওরা কী রকম অমুভব করছে?—ওরা অপেক্ষা করছে কিসের জন্তে?—কিসের আশায়? ওরাই বা কেমন লোক—ছেলোমাহুঁষ না বয়স্ক, শীর্ণ না সবল? ওরা ওখানে বসে কিসের স্বপ্ন দেখছে?—শোক করছে কাদের জন্তে?—এমন ভাবে বেঁচে থাকার শক্তিই বা ওরা কেমন করে পাচ্ছে?—কোথায় তার উৎস?—

বুড়ো হঠাৎ তার হাতের আলোটা ঘুরিয়ে ফেললো এক টুকরো শাদা পাথরের গায়ে এবং ফিসফিসিয়ে বললো—“এই যে, খাদের তলা আর মাত্র নব্বই ফিট দূরে!—তোমাদের মধ্যে একজন বরং ঠেচিয়ে বসো আমরা কারা, নইলে ছেলেরা হয়তো গুলী ছুঁড়তে পারে—” কথাটি ওদেরও মনে ধরলো।

“ভয় পেও না, ছেলেরা, আমরা আসছি, আমরা!”—ভারভার চীৎকার করে বললো। “আমরা তোমাদেরই লোক, কশ!”—গলা সপ্তমে তুলে চেঁচালো নীশুশা।

“শো—নো, ছে—লে—রা, সুনতে পা—ছো, ছে—লে—রা, গুলী কো—রো না, আম—রা—আ—আ—গুলী কো—রো—না—আ—আ—” শিঙে কঁকাকার মতন শব্দ পাঠালো মারিয়া ইগনতিয়েভনা!

খাদের ভলসেধে জুঁজুন টমিগানধারী সাত্তীকে দেখতে পেলো ওরা। তারা অতিক্রমে বুড়ো আর তার সজিনীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো—প্রথমে চোখ কুঁচকে, হাত আঁড়াল দিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর তাকাতে না পেরে পেছন ফিরে পাঁড়ালো। বুড়োর হাতের তারের জালতিঘেরা ছোট আলোটি, বার কীণ হলদে শিখাটি একটি ছোট শিশুর কড়ে আঙুলের চেয়ে বড় হবে না—তাই যেন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো জৈষ্ঠত্বপূর্ণের তীক্ষ্ণ রোজের মতনই। অন্ধকার থেকে থেকে এমনই চোখের লশা হয়েছে তাদের।

## ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম

আপনার আমার কাছে অজানা

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস

দেবেশ দাশের

## রক্তরাগ ৪।।০

“রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি” এই অভিযোগের প্রথম প্রতিবাদ প্রেমে পড়ে বেকার দেবল দেবদাস হল না, হল সৈনিক। মিলিটারি মেসের, ক্যান্সি ড্রেস বল নাচের, নেতাজীর স্বাধীনতা যুদ্ধের, কোঁ মাশালের মধ্যে দিয়ে বিকশিত ব্যক্তিতে দেবল দিল্লীর লাল কেল্লায় বন্দ হল। যুদ্ধ ও প্রেম দুয়েতেই তার হার হয়েছে, কিন্তু হার মানে নি সে ভারতীয় উপমহাদেশে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ, ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি

স্বাধীনতার বার্ষিক দিবস :৫ই আগষ্ট বেরিয়েছে

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী

১৩, হারিসন রোড, কলিকাতা—৭

রাজোয়ারা (রম্যরচনা) “বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যে অভিব্যক্তি মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে” (দেশ) এত রচনা নয়, তপস্বী (অল ইণ্ডিয়া রেডিও)

রাজসী (রম্যরচনা) “পড়ে মনে হ’লো যখন এই বাঙ্গালী ভ্রম যার এ হেন সম্পদ ও মানবিকতার গৌরবময় ইতিহাস আছে। সাহিত্যিক রম্যতা ও ঐতিহাসিক তথ্যের অমৃত রসায়নে দীপ্ত একটি সাধনা।” (ভারতবর্ষ)

রোম থেকে রমনা (ছোট গল্প) “নিঃসন্দেহ প্রমথ পোলাম যে ভারতীয় ছোট গল্প পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ হয়ে উঠছে” (শ্রীব্রজগোপালাচারীর পক্ষে তামিল ভ্রমুবাদের ভূমিকা)। “বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে।” (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

অর্ধেক মানবী তুমি (কাটুন চিত্রিত উপন্যাস) “বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গ উপন্যাস।” (যুগান্তর)। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। (বন্ধুসভা) “একটি আবিষ্কার।” (অমৃতবাজার)

ইয়ারোপা (ভ্রমণ) রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধিত; “ইয়ারোপা লন্ডনে সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু ইয়ারোপা শব্দ মনে হয়েছে মনশ্চকুত তা দেখছি” (প্রবাসী) শ্রীব্রজশেখর বসু পরিবর্তিত পঞ্চম সংস্করণ।

প্রমরাণ (কবিতা) “অপরূপ ছন্দের স্বাক্ষর, রসের বৈচিত্র্য ও ভাব্য মাধুর্য—আধুনিক বাংলায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি” (দেশ)

★। সকল সম্ভাব্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ★

তাদের মধ্যে এক জন মারিয়াকে নামতে সাহায্য করবার জন্তে কাঁধ এগিয়ে দিলো। কিন্তু নিজের শক্তির সম্পর্কে বোধ হয় পুরোনো ধারণাটাই রয়ে গিয়েছিলো তার। কারণ, মারিয়া তার বরষপূর তার ওর কাঁধে ছেড়ে দিতেই সে বেটাল হয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়লো। অস্ত্র সৈনিকটি হাসতে লাগলো—বললো—“কি ভানিয়া? আগের মতই গায়ের জোর যে আর নেই, তা বুঝি তুলে বসে আছো—হে—হে—”

তার যুবক না প্রৌঢ় তা তাদের চেতারা দেখে কিছুই মালুম হইছিলো না। মুখে ঘন দাড়ি চাপ বেঁধে উঠেছে—কথা বলছিলো তার। বুড়ো মানুষের মতো আন্তে আন্তে—চলছিলো তার। অন্ধ মানুষের মতো সন্তর্পণে।

যে মারিয়াকে নামতে সাহায্য করেছিলো সে ভরসা করে বলে ফেললো—“তা, মুখে দেবার মতো কিছু বোধ হয় আনোনি কেউ সঙ্গে করে’, হাঙ্গা?”

অস্ত্র জন তক্ষুণি তেড়ে উঠলো—“তা নিয়ে তোমার ভাবনা কেন? কিছু যদি এনেই থাকে তো দেবে কমরেড ক্যাপটেনের হাতে—তোমার হাতে নয়। তিনিই সবাইকে ভাগ করে দেবেন—”

মেয়েরা শুধু একদুটে লালকোঁজের লোকদের দিকে তাকিয়েছিলো। বুড়ো কোজলভ হাতের আলোটি উঁচু করে এক বার ছাটটা দেখে নিয়ে নিজের কানেই বললো সন্তুষ্ট ভাবে—“না, ঠিকই আছে এখনো! লোকগুলো কাজটা খারাপ করেনি নেহাৎ—”

এক জন সৈনিক ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—অস্ত্র জন হইলো পাহায্য।

কিছুদূর এগিয়ে ওরা দেখলো—খাদের দিকে মুখ করে দুটো মেশিনগান বসানো রয়েছে। সেটা ছাড়িয়ে একটু গিয়েই বুড়ো কোজলভ হঠাৎ থেমে পড়ে আলোটা উঁচু করে ধরলো। বিধার সুরে বললো—“ওরা কি বুঝেছে?”

“না, ওরা বেঁচে নেই!”—সৈনিকটি বললো ধীরে ধীরে!

বুড়ো আলোটা ঘুরিয়ে ফেললো এদের উপর। সৈনিকের দ্যাকট এবং ওভারকোটপরা মৃতিগুলো পাশাপাশি খুব গায়ে গায়ে চপে শোয়ানো ছিলো যেন গরম হবার জন্তেই। তাদের মাথা, ক, কাঁধ হাত—নোরা বাগুজ আর ছেঁড়া তাকড়ায় জড়ানো, নাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে চটচটে বিবর্ণ হয়ে রয়েছে। পাথরের মত নিশ্রুণ ওরা ভেতরে বসে—সারা মুখে লাড়ির আগাছার ভরা—

“ওঃ! ভগবান!” ওদের দিকে চেয়েই মেয়েরা অক্ষুটে শিউরে উঠলো আর দ্রুত হস্তে নিজদের বুকে ক্রশ আঁকতে লাগলো।

“চলে এস! চলে এস! এখানে ঝাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ!”—সৈনিক তড়ান দিল কিন্তু বুড়ো এবং তার সঙ্গিনীরা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। ওরা একদুটে মৃতদেহগুলির দিকে চেয়ে বইলো বিভীষিকা-রূক্ষরিত দৃষ্টিতে—পচনধরা দুর্গন্ধ ওদের নাকে লাগছিলো। অবশেষে পাথর ওরা চলেতে শুরু করলো। একটা বাক ঘুরতেই কার অক্ষুট হাড্ডানি কানে লাগলো ওদের।

“আমরা এসে গেছি?”—বুড়ো জানতে চাইলো।

“না। এটা আমাদের হাসপাতাল।”—উত্তর দিলো সৈনিক।

বুড়ো হাতের আলোটা কিরিয়ে দেখলো—তিন জন আহত

সৈনিক তক্তার উপর শুয়ে আছে। এক জনের পাশে ঝাঁড়িয়ে তাকে টিনের মগ থেকে জল খাওয়াচ্ছিলো। অস্ত্র এক লাল সৈনিক আর দুজন আহত একেবারে নিশ্চল হয়ে ছিলো।

পর্যিচর্যাকারী সৈনিকটি এবার ঘুরে ঝাঁড়িয়ে ভিগেস করলো—“এরা কারা, আসছেই বা কোথেকে?” মেয়েদের ভীত দৃষ্টি নিশ্চল চ’তনের দিকে নিবন্ধ হয়েছে দেখে সে যেন সান্থনার সুরেই বললো—“হ্যাঁ, ওদের সব কিছু কষ্টই আর ঘটায়ুয়ের মধ্যে বুটে যাবে খন!”

যে আহত সৈনিক জল খাচ্ছিল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললো সে—“ওঃ! মা গো! এখন যদি একটুখানি গরম কপির কোল পোতাম!”

তারভায়া স্তোভোতা এবার একটুখানি তিক্ত হেসে বললো—“আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।”

“কী রকম প্রতিনিধি? জামাঘাসের কাছ থেকে বুঝি, জ্যাঁ?”—চোখ পাকিয়ে ভিগেস করলো সৈনিক নাসটি।

সাত্রী সৈনিকটি এবার বাধা দিলো—“খাক ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হবে না। যা বলার আছে দলপতির কাছেরই বোলো খন—”

“ঠাকুদা, দয়া করে আলোটি একবার দেখাবে?”—আহত সৈনিকটি কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলো। একটা বুকফাটা গোড়ানি চপে সে নিজেকে কোনো ক্রমে খাড়া করে বসালো, তার পর কোটটা সরিয়ে ফেলে পাঞ্জাবী বার করলো। একখানা পা তার হাঁটুর উপর থেকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

নৌশা ক্রামারকো গড়িয়ে উঠলো তা দেখে।

“দাছ, আলোটা একটু এদিকটায় ধরো”—শান্তকণ্ঠে বললো আহত সৈনিক।

ভালো করে দেখবার জন্তে দু’হাতে ভর দিয়ে সে আরো উঁচু হয়ে উঠতে চাইলো। এমন শান্ত আর নির্গুস্ত দৃষ্টি আর অবহেলার ভঙ্গি নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তার অর্হত প্রত্যঙ্গটি, যেন ওটা অস্ত্র কিছু—যেন এঁ পড়ে ফলে ওটা দুর্গন্ধ রসকরা বিবর্ণ কালচে থকথকে মাংস কোনো পিনই কোনো কালেই তার এই পরিচিত প্রিয় এবং স্বপ্নর দেহের জীবন্ত অংশ ছিলো না!

“নাও, এবার দেখো, তোমরাই দেখো কী হালটা করেছে আমরা”—খানিকটা ভৎসনার সুরে সে বললো—“দেখছো, পোকা হয়েছে ওর মধ্যে, ঐ দেখো সব নড়ে বেড়াচ্ছে কিলবিল করে”—আমি তখনই বলেছিলাম ক্যাপটেনকে যে আমরা নাচে টেনে এনে কোনো লাভ নেই। উপরে থাকলে আমি তো কতগুলো হাতবোমা গেলাতে পারতাম নাংসী রাকসদের—তার পর—মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো একটা গুলী অন্তত থাকতো—

গায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সে ঝিড়িঝিড় করতে লাগলো—“দেখো, দেখো, শালারা কী কুত্তিতে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে দেখো!” “মা গো!”—হঠাৎ সারা শরীর খাড়া দিয়ে শিউরে উঠে হাত মুখ ঢাকলো নৌশা!

সাত্রী আহত সৈনিককে একটু ধমকের সুরে বললো—“দেখো, খালি তোমাকেই টেনে নামানো হয়নি নীচে—এদের দু’জনকে ধরে মোট চোদ্দ জন”—

নৌশা এবার বলে উঠলো—“কিন্তু, কেন মিছিমিছি তোমরা এখানে পড়ে থেকে এমন বই পাচ্ছে? তোমরা উপরে উঠে এসে,

কিছু না হোক অন্তত ঘাটাগুলো ধুয়ে ওধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতো ওরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে—

“ক'রা? জায়াগ'রা?” আহত লোকটি বিজ্ঞপের কণ্ঠে বললো—  
“ওই রাকসদের চেয়ে ব'র এখানে এই কুমিশোকাগুলো আমার খেয়ে ফেলুক—সে অনেক স্ত্রুথের মূত্ৰ হ'বে আমার কাঁছে”—

“ওসব কথাবার্তা আর নয়”—সাদী তাড়া লাগলো—“চলে এস”।

“একটুখানি দাঁড়াও!” বলে মারিয়া ইগনাতিয়েভনা এক টুকরো কুটি তার ব্লাউজের ভিতর থেকে টেনে ব'র করলো। কিন্তু আহত লোকটির দিকে তা বাড়িয়ে ধরতেই সাদী বন্দুক তুলে ধরলো।

“খেতে নিবেখ আছে!” সে বললো কঠোর কণ্ঠে—“এই স্বাস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকটা কুটির টুকরো দলপতির হাত দিয়ে ভাগ হয়—এটাই আইন। তোমরা চলে এস—অনর্থক হান্সামা করছো!”

ওরা এগিয়ে চললো। সৈনিকদের আড্ডার কাছাকাছি এসে একটা বাক ঘুরতেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ওরা থমকে গেলো। ঐ অপ্রত্যাশিত শব্দটি গানের—কেউ যেন খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বিদ্যদ য'রা স্তবে একটা অজানা গানের দীঘ চরণ গেয়ে চলেছে—

ওদের থামতে দেখে পথপ্রদর্শক গভীর ভাবে বললো—“আমাদের মৈত্রিক বল বজায় রাখবার জন্তে ঐ গানটা গাওয়া হচ্ছে। আজ ক'দিন ডিনাদের বদলে ঐ সঙ্গীতটাই পরিবেশন করা হচ্ছে। আমাদের দলপতি আমাদের এটা শেখাচ্ছেন গত তিন দিন ধরে। জারের আমলে জেসে থাকবার সময় তাঁর বাবা নাকি এই গানটা বানিয়েছিলেন—

গায়কের একক কণ্ঠ এবার আরো স্পষ্ট শোনা গেলো—

“শত্রুও পারবে না উপহাস করতে

তোমার এ অস্ত্রিম বাত্রায়—

আমরাও এসেছি—তো পাশাপাশি মরতে  
বীরোচিত গৌরব মাত্রায়—

নীলুশকা এবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সবাইকে ডেকে বললো—“শোনো, আমার বুদ্ধি মতো কাজ করো। আমরা আগের যেতে দাও—কারণ কারাকাতা জুড়তে, কেঁদে হাট বসাতে আমার মতন তোমরা পেয়ে উঠবে না। এদের ভাব সাব দেখে তো মনে হচ্ছে—জায়াগ'রা আমাদের বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে খুঁচিরে ঘেরে ফেললেও শেখ হয় এরা ভ্রমকপও করবে না”—

কুড়া হঠাৎ রাগে গিস্গিস্ করতে

করতে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো—  
“হারামজাদি! নচ্ছার মাগিরা! তোরা বুকি এয়েচিস্ ওদের দল ডাঙাতে, কেমন? শালীদেরই আগে গুলী করে মারা উচিত।”

মারিয়া ইগনাতিয়েভনা নীলুশাকে ঠেল সযিয়ে এগোলো—

“সবো দেখি এবার আমার বলতে দাও—

ঘাঁটির মুখে যে সাদীটি দাঁড়িয়েছিলো সে হঠাৎ বন্দুক তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—“খানো! মাখার উপর হাত তোলো!”—

“আমরা—মেয়েরা আসছি—” মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে সে বেশ ভারিক্কি চালেই বললো—“তোমাদের দলপতি কোথায়? আমার তার কাছে নিয়ে চলো—”

**অলংকার, না**  
*কিছু বাক্যে!*

**এস, সি, সরকার ও কোং**  
*সুদর্শনশিল্পী ও মণিকার*  
১২৫ বি. বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২  
মাথা ১৬৭ বি. বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২  
ফোন: ৬৪-২৪৫৩

মুদ্রের কামের  
সার্থক সঙ্গীত,  
আমর কাপের আশ্রয়  
সার্থক আমাদের  
তৈরী অনেকের  
অনুগ্রহ  
শিল্পী-মুদ্রায়।

অন্ধকারের মধ্যে একটা শান্ত কণ্ঠ শোন। গেলো—“কী ব্যাপার খানে ?”

বুড়ার হাতের আলোটা গিয়ে পড়লো এক দল সৈনিকের পাশে। সবাই প্রায় এদিক-ওদিক ছড়াছড়ি হয়ে শুয়েছিলো—তার তাদের মাথখানে এক জন দীর্ঘকায় লোক বসেছিলো। তার শব্দে বাপানী রঙের দাড়ি কয়লার ওড়ায় কালো হয়ে গেছে। তার মতই আর সবারও হাত-পা-মুখ কয়লার ধুলোয় কালো কুতের মতন দেখাচ্ছিলো; কেবল তাদের শাদা দাঁত আর চোখগুলো সেই কালোর মধ্যে অত্যন্ত বেশি রকম ঝকঝক করছিলো।

বুড়ো কোজলভ ওদের দিকে চেয়ে বইলো কেনন একটা মিশ্র ভাবাবেগের অনুভূতির সঙ্গে—শ্রদ্ধা, বিষয়, অবিশ্বাস, স্নেহ আর কল্পনা সব মেশামেশি হয়ে গেছে তার চেতনায়। এই নাকি সে সব সৈনিকরা তাদের বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে আর সাধা দনেংস অঞ্চল জুড়ে। সে বেন এমন বীর সৈনিকদের দেখবার আশা করেছিলো অল্পকালে—আঁট সাঁট কুবান জ্যাকেট আর টুকটুক লাল পাখামা পরা—কোমরে বুলছে রূপোর হাতল দেয়া তরবারি—উঁচু কসাক টুপি বা চুমকি বসানো শিরদ্বারের তলায় একগুচ্ছ চুল উঠত ভাবে নেমে এসেছে, রূপালের উপর—এমনি তরো একটা কিছু। তার তার বদলে সে দেখতে শেলো কর্মের অভিব্যক্তি আঁকা কতকগুলি স্রমিকের মুখ—তার এক তার সঙ্গী সব খনিমজুরদের মতই—সেই হাত পা, সেই কয়লার ধুলো মাখা কালো কালো মুখ!—এবং তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেই বুদ্ধ ঋনিস্রমিক বেন অনুভব করলো—মাতৃভূমির এই সব বীর সম্মানের আত্মসমর্পণের চেয়ে শ্রেয় মনে করে যে তিক্ত ভাগ্য বরণ করে নিয়েছে—সে ভাগ্য আজ এই-মুহূর্ত থেকে তারও ভাগ্যবিধি হয়ে উঠছে।—

“কমবেদ দলপতি” মারিয়া ইগনাতিয়েভনা ওদিকে বলতে শুরু করেছে “আমরা আপনাদের কাছে একটা বিষয়ে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি—”

দলপতি উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে অল্প সৈনিকরাও সবাই দাড়িয়ে পড়লো তাদের সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ভরা কয়লামাখা শীর্ণ মুখগুলির দিকে চেয়ে মেয়েদের হঠাৎ মনে হলো বেন তাদের জাইরা, স্বামীরা তাদের সমুখ এসে দাঁড়িয়েছে দিনের কর্মীবসানে কয়লামাখা ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে ধুকতে, ধুকতে এবার দাড়ির পানে কিরবে বৃষ্টি.....

দলপতি একটু স্তান হেসে শুধালেন—“তা, প্রতিনিধিরা কি জন্ত আসছেন ?”

“কাগটা খুব সোজা!” মারিয়া বললো—“জার্মানরা সমস্ত মেয়ে আর শিশুদের জড়ো করে এনে হুকুম করলো যে মেয়েদের মধ্যে থেকে জন নীচে নেমে যাক আর সৈনিকদের বৃষ্টিতে বসুক আত্মসমর্পণ করবে। নইলে, তারা আমাদের বাচ্চা-কাচা শুদ্ধ গুলী করে মরে ফেলবে।—”

“ব্যাপারটা তা’হলে এই!” দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন—“তা, আপনারা এখন আমাদের কী করতে বলেন ?”

মারিয়া সোজা দলপতির মুখের দিকে চাইলো। তারপর শেছন হয়ে জন্ত হুকুম মেয়েকে নীচু গলায় বললো—“এখন কী বলি, সোজা তা বাছারা !”

ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মারিয়া বার করলো কয়েকখানা ফটি আর কতকগুলো সিদ্ধ আলু আর বীট আর খানকসের বিছুট।

লালফোজের বীর সৈনিকেরা হঠাৎ চোখ নামিয়ে অল্প দিকে ফিরে দাঁড়ালো—খাবারগুলোই দিকে চাইতেও বেন তাদের লক্ষ্য করছিলো—বার আবির্ভাব এমনই অপ্রত্যাশিত অচিন্ত্যানী—বা এমনি শব্দর অথচ প্রলুব্ধকারী। তারা বেন ওগুলোই দিকে চাইতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেছে—ওগুলোর মধ্যেই তো রয়েছে তাদের জীবন! দলপতিই কেবল এ ঠাণ্ডা আলু আর ফটিগুলোর দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে বইলেন।

মারিয়া একটা ফমালের উপর ওগুলো ধরে এক বার নত হয়ে অভিবাদন করলো দলপতিকে, তারপর তাঁর সামনে নামিয়ে রাখলো। অক্ষুট কণ্ঠে বললো—“বলছি বলে মাগ করবেন—আমাদের মেয়েরা আপনার কাছে এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে আপনাদের দিয়ে যাবার জন্তে! আমি আরো আনতে পারতাম, কিন্তু ভয় ছিলো পাছে জার্মানরা সার্চ করে দেখে।”

“মারিয়া” নীমুশা ক্রামারেকো বললো কিসুফিসিয়ে—“এ আহত লোকটিকে যখন দেখলাম—দেখলাম তাকে জ্বালন্তে থেয়ে থেলছে এ পোকাগুলো—যখন শুনলাম তার কথা—তার পর থেকে আমি সব কিছুই ভুলে গেছি—”

ভারভারা জোতোভা এবার হাসিমুখে লালফোজের সৈনিকদের দিকে ফিরে বললো—“দেখ-শুনেন মনে হচ্ছে প্রতিনিধিরা এমনিই একটু বেড়াতে এসেছেন তা’হলে—”

সৈনিকরা তার প্রণোদিত মুখখানির দিকে বার বার তাকাচ্ছিলো। একজন সাহস করে বলে ফেললো—“আমাদের সাথে এখানেই থেকে যাও গো মেয়ে, আর আমাদের বিয়ে কর’রে ফ্যালো।—”

ভারভারা চটপট উত্তর দিলো—“হ্যা, একখানা কথা’র মতো কথা বলেছো বটে! এই অবহাতেও একটা বৌ পুষতে পারো তুমি তা’হলে, ঐ্যা ?”

সবাই হেসে উঠলো।

ওরা আসবার পর প্রায় দু’ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দলপতি বুড়ো কোজলভের সঙ্গে একান্তে বসে আলাপ করছিলেন। ভারভারার পাশে একজন তরুণ সৈনিক কনুইতে ভর দিয়ে শুয়েছিলো। এ আধো-অন্ধকারের মধ্যেও কয়লার আন্তরগণের আড়াল থেকেও ভারভারা তার কচি মুখের বিবর্ণ শীর্ণতা লক্ষ্য করতে পারছিলেন। শিশুদের মতন মুখ ধী করে সে একদৃষ্টে ভারভারার মুখের পানে তাকিয়েছিলো...তার মরগুস্ত্র গ্রীবার দিকে চাইছিলেন। ভারভারার মন কারুণ্যে ভরে উঠেছিলো। সে ওর কাছে সরে বসে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো স্নেহে। সৈনিকটি হঠাৎ ভাড়া গলায় বলে উঠলো—“কেন, কেন তোমরা আমাদেরই মন চঞ্চল করে দেবার জন্তে এসেছো এখানে? মেয়েমানুষ...ফটি...সব কিছু যে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে নৃশংসারের কথা—”

ভারভারা চকিতে দু’হাত দিয়ে তার গলা জুড়িয়ে ধরে চুমু খেলো তাকে, তার পর বর বর করে কঁদে ফেললো।

আর সবাই শুক মুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন ব্যাপারটা। কেউ হাসলো না, ঠাট্টা-তামাসা করলো না এ নিয়ে—একটা কথাও ভাড়লো না এ সুগভীর স্তব্ধতা।

অবশেষে মারিয়া উঠি পাড়ে বললো—“এবার আমাদের যাবার সময় হলো, কি বলো কোজলভ?”

“আমি তোমাদের খাদের মুখ পৰ্বন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবো”—বুড়ো বললো—“আমি উপরে যাচ্ছি না—সেখানে আমার করার কিছুই নেই।”

নীযুশা অবাক হয়ে বললো—“সে কি! তুমি কি এখানে উপোস করে মরবে ঠাকুর্দা?”

বুড়ো চটে গিয়ে বললো—“তো তাদের কি? মরি যদি আমার নিজের দেশবাসীদের সঙ্গেই মরবো—আর যেখানে যে খাদে আমি সারা জীবন কাজ করেছি—”

এমন দূঢ় কর্তে সে কথাগুলো বললো—ওরা বুঝলো তর্ক করে কোনো ফল হবে না।

দলপতি এবার মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—“মাসেরা যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন একজ্ঞে। আমার তো মনে হয় জার্মানরা শুধু আপনাদের ভয় দেখিয়েই দালালি করতে পারিয়েছিলো। আপনাদের ছেলে-মেয়েদের বলবেন আমাদের কথা। তারা যেন তাদের ছেলেদেরও বলতে পারে যে আমাদের সোকেরা জানে কী করে মরতে হয়।”

এক জন সৈনিক হঠাৎ বললো—“ওদের সঙ্গে একটা চিঠি পাঠাবার সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, কমরেড? যুদ্ধ বাধবার পর আমাদের পরিবারের কাছে শেষ বার্তা—”

দলপতি বললেন—“না। ওরা ওঁরাবার পর জার্মানরা নিশ্চয় ওদের সার্চ করবে।”

মেয়েরা কীদতে কীদতে বিলায় নিলো যেমন কীদতে কীদতে এসেছিলো। কিন্তু সে বার তাদের ছেলে-মেয়ে আর নিরাপত্তার শঙ্কার আর এবারে যেন তাদের আপন জন স্বামী পুত্র ভাই-বন্ধুদের মৃত্যুগ্রাসে বেধে যাবার শোক...

কিন্তু আরো শোক অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্তে। জার্মানরা যখন তাদের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হতে দেখলো—সারা গ্রাম ছুড়ে নিদর্শন রেখে গেলো তাদের অন্ধ প্রতিহিংসার—মৃত্যু আর অগ্নিস্ফোরকের মধ্যে...

হতভাগিনী নারীদের অশ্রুধারার আরো সিক্ত হয়ে উঠলো দনেৎসের রক্তসিক্ত মৃত্যুধ্বংস মাটি...

৩

সে রাতে জার্মানরা দু’তিন বার খাদের মধ্যে ঘোঁয়া-বোমা ফেললো। দলপতি কোস্তিংসিন আদেশ দিলেন সমস্ত বাড়ি চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে কয়লার চাউড় চাপিয়ে। সাজীরা গ্যাস-মুখোস পরে পাঃগায় ঝাঁড়ালো। সৈনিক নাগুটি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কোস্তিংসিনের কাছে এলো। খবর দিলো আহতরা কেউ আর বেঁচে নেই!

“ধোঁয়ায় নয়; তারা এমনিই মরেছে।”

কোস্তিংসিনের হাতটা ঠাউরে নিয়ে সেখানে এক টুকরো কুটি শুঁজ দিয়ে সে বললো—“মিনায়েভ কিছুতেই খেলো না এটা। বললো—দলপতিকে ফিরিয়ে দিয়ে ওটুকু। আমার আর কোনো রকম দরকার নেই এখন—আজ্ঞার পেট ভরবে তবু—”

নিঃশব্দে দলপতি কুটিটুকু আভারসাকে হুকিয়ে রাখলেন। সেটাই এখন দলের খাজভাণ্ডারের কাজ করছিলো।

ঘটার পর ঘটা কেটে চললো মৃত্যুমহুৱতায়। বুড়োর আনা আলোটি বার কয়েক দলদল করে নিবে গেলো—তেল নেই! ক্যাপটেন তাঁর বিজলীবাতিটি কয়েক মুহূর্তের জন্তে আললেন—কিন্তু তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের সন্ধ্যার মধ্যে বাতির রক্তভাণ্ডার যেন একটা পৈশাচিক ইঙ্গিতে দীপ্ত বার করে হাসছিলো।

কোস্তিংসিন মারিয়া ইগনাতিয়েভনার খাবারগুলো ভাগ করে দিলেন দশ জনের মধ্যে। এক টুকরো কুটি আর একটা করে আলুসহ পেলো সবাই।

কোজলভকে ডেকে বললেন তিনি—“ঠাকুর্দা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে রয়ে যাবার জন্তে আকশোষ করছো?”

বুড়ো শান্তকণ্ঠে বললো—“না। কেন করতে বাবো? আমার আত্মার পরম শান্তির স্থান যে এখানেই!”

অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেলো—“ঠাকুর্দা, চুপ করে থেকে আর পারা বাচ্ছে না—একটা মজার গল্প বলো না শুনি—”

অল্প অনেকে সমর্থন করলো সে কথা।

বুড়ো একটু গলাখাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলো—“তা তোমারা কী করতে শুনি—কী কাজ কাম?”

“সব রকম, সব রকম কাজের লোক পাবে আমাদের মধ্যে ঠাকুর্দা—” একটা কণ্ঠ টেঁচিয়ে বললো।

ফোন : ৩৪-৪১০২

Gv

বিবাহে ষোড়শ

দানের আনন্দ একান্তভাবে


আপনার; আপনাকে

সেবা করার আনন্দ

আমাদের।

**গিণি ভবন** মৃজন কুশলী  
মাফার ও সর্গদর্শী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২





“আমি যুদ্ধের আগে একটা শিক্ষক-শিক্ষণালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়াতাম”—বলে ক্যাপটেন কোস্তিৎসিন হো-হো করে হেসে উঠলেন।

“আমরা চার জনে ফিটার ছিলাম, আমি আর আমার তিন ভাইও—”

“আর মজার কথা ঠাকুরদাঁ, আমাদের চার জনেরই এক নাম—আমরা চার ইভান !”

“সার্জেট লামিন ছিলো—কম্পোজিটর—আর গ্যাভ্রিলোভ আমাদের নাম—সে বোধ হয় এখানেই আছে, নাকি ?”

“এখানেই আছি ।”—একটা গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেলো—“আমার ডাক্তারি ফুরিয়েছে—”

“গ্যাভ্রিলোভ ছিলো একটা যন্ত্রপাতির দোকানে—”

“আর ঐ যে মুখিন ও ছিলো নাপিত, কুজিন কাজ করতো হাস্যরসিক কারখানায়—”

“এই ক’জনই—বাস্ !”

“তাই’লে তোমাদের মধ্যে খনির শ্রমিক কেউ নেই—এমন কেউ নেই যে মাটির নীচে কাজ করতো ?”—বুড়া বললো এবার।

“আমরা সবাই এখন মাটির নীচে কাজ করছি—সবাই খনি-শ্রমিক ।”—একটা কণ্ঠ শোনা গেলো।

“কখাটা কে বললো ?”—বুড়া শুধালো—সেই ফিটার ম’শায় না কি ?”

“তিনিই স্বয়ং ।”

একটা হালকা ক্লান্ত হাসির তরঙ্গ উঠলো।

বুড়া কোজলভ এবার তার গল্প শুরু করলো। বুড়া মানুষদের এমন স্বভাব—নিজের জীবনের, যৌবনকালের ছোটখাট খুঁটিনাটি চিনাও ফলাও করে বর্ণনা করতে ভালবাসে—আর কোথাও বাগা পালো বা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বুড়া শুরু করলো তার খনির কথা দিয়ে, তারপর সেখান থেকে আরেক বিকল্পে আন্দোলনের জগতে ছেলে যাবার কথা, প্রথম সমুদ্রে জার্মানদের হাতে বন্দী হবার কথা—গল্প এগিয়ে চললো চুপচুপ করে।

হঠাৎ একজন জিগেস করলো—“আজ্ঞা ঠাকুরদাঁ, ওরা খেতে ভাল কী রকম ?”

“খাওয়া ? এটাকে খাওয়া বলাও দিনে একপোটাও ভূমির আর তার সঙ্গে এমন জলবৎ তরল এক ঝোল যে তুমি তার মধ্যে কিংবা বাটির তলার ‘বার্লিন’ দেবতে পারবে। এক ফোঁটা চর্বিও—খালি গরম জল ।”

“ঐ রকম একটু গরম জল পেলেও এখন আমার চলতো !”

“মেকুলোভ ! আমার আদেশ মনে আছে ?”—ক্যাপটেনের কণ্ঠ শোনা গেলো।—“খাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও নয়—”

“কিন্তু আমি খালি গরম জলের কথা বলছিলাম। সে তো নয়, কমরেড ক্যাপটেন !” কণ্ঠ কঠে অস্বাভাবিক করলো লোভ ।

বুড়া আবার শুরু করলো তার কাহিনী। জার্মানদের হাত ক’বার পালিয়েছে, ক’বার বন্দী হয়েছিল, আবার মুক্তি পেয়েছে। তার পর বিশ্বেষণে বেগ দিয়েছে গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, বন্দের সংগঠিত করেছে কোন অভ্যুত্থানের জন্তে। আর তার

খনিকে সে এমনি ভালবাসতো এমন পথিক মনে করতো কয়লার কাজকে যে যখন সে ফিরে এসেছে দূর দেশ থেকে কি কোনও বিপদসঙ্কুল অভিযান থেকে—উষ্ম ও শব্দাকুল স্ত্রীর কাছে না গিয়ে সে আগে গিয়ে বসে থাকতো কয়লার খানের ধারে—তার হুঁচোখ জলে ভরে আসতো তার প্রিয় স্থানে ফিরে আসার আনন্দে। অস্ত্রের কাছে খবর পেয়ে তার বোঁ যখন তাকে আবিষ্কার করতো সেখানে সেই অবস্থায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে অস্বাভাবিক করতো—মিনসের বৃকের মধ্যে হৃদয় বলে পলাতন নেই, তার বদলে আছে এক চাউড় কয়লা !—....

সবাই হাসতে লাগলো।

বুড়ার গল্প শেষ হলে দলপতি সবাইকে ডেকে বললেন—“এসো তোমাদের র্যাশন নিয়ে যাও—”

কেউ আসে না দেখে ক্যাপটেন আবার ঠাকুরদাঁকে ডেকে কই, কেউ আসছে না কেন ?”

খানিকটা নিস্তব্ধতার পর তিন চার দিক থেকে প্রায় একসঙ্গে শোনা গেলো—“ঠাকুরদাঁকে আগে দিন কমরেড ক্যাপটেন—কই বাও না ঠাকুরদাঁ, তোমার ভাগ নাও—”

বুড়া কোজলভ এটী সমস্ত ক্ষুধিত সৈনিকদের এমন নিঃস্বার্থ প্রীতি দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। জীবনে সে অনেক দেখেছে—দেখেছে কেমন করে বৃত্তান্ত জনতা এক টুকরো রুটির জন্য কামড়া কামড়ি করে—কিন্তু এ দুঃসংসারের তার বাকী ছিলো বোধ হয়।

কথায় কথায় এটি অল্পকণ থেকে মুস্তিলাভের প্রসঙ্গ এসে পড়েছিলো। কোস্তিৎসিন হঠাৎ উঁচু গলায় বললেন—“না, কমরেডরা, আমরা এখন থেকে বেরোবোই বেরোবো। ওদের সাধ্য হবে না আমাদের এখান থেকে বাঁচতে—ওরা কিছুতেই পারবে না আমাদের কাজ থেকে ছিনিয়ে নিতে ঐ স্বাধীনতা পৃথিবীর সম্পদ—তার আকাশ বাতাস—তার সবুজ ঘাস আর রঙীন ফুল—ওরা পারবে না কিছুতেই—”

তার কথা শেষ না হতেই আচমকা সেই কয়লাখোলের মধ্যে দেয়াল ছাঁদ সব কিছুই গুমগুম করে কঁপে দুলে উঠলো। কাটা কয়লার থামগুলো কটকট করে উঠলো, চড়চড় করে ফেট গেলো জায়গায় জায়গায়—হড়হড় করে কয়লার চাউড় ধ্বসে পড়লো কয়েক স্থানে। মনে হলো যেন চার দিকের সব কিছুই তুলে-তুলে ফুলে-ফুলে উঠছে—আবার যেন সব চূপসে এলো—মাছবুড়লোকে মাটির সঙ্গে শিবে ফেলতে চাইলো। বহু বছর ধরে যে হস্ত কয়লার ধূলোর আশ্রয় পড়ে এসেছিলো কয়লাখনির দেয়াল ছাতে থামগুলোর গায়—হঠাৎ নাড়া পেয়ে সেই কালো ধূলা এমন ভাবে বাতাস ভরে তুললো যে কয়েক নিমেষের মত মনে হলো—আর নিশ্বাস নেওয়া বাবে না কিছুতেই !

কালো কালো শাপাঙ্গ করত করত কে যেন রক্ত কঁয়াসকঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—“শালা জার্মানরা আমাদের দুখ ধ্বংস করেছে—এবার সব শেষ—”

সঙ্গে সঙ্গে কোস্তিৎসিনের আবগকশীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শোনা গেলো—“না না, কমরেডরা, ওরা শাপাঙ্গ বা না আমাদের মাটির তলার পুঁতে রাখতে। আমরা বেরোবোই, বেরিয়ে যাবোই—এখন থেকে। তখনতো আমরা বেরোবোই !”



একরম অস্বাভাবিক বেপরোয়া সফর যেন লোকগুলোকে ঘরিয়ার করে তুললো। হঠাৎ কাশতে কাশতে ফ্লাকস্‌ কণ্ঠের আশ্রয় শক্তিতে তারা চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে—আমরা বেরোবো, কমরেড ক্যাপটেন আমরা উপরে উঠবো। আমরা এখান থেকে মুক্তি চাই এবং তা আমরা পাবোই—”

8

দু'জন সৈনিককে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালেন কোন্‌ভিসিন। বুড়ো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। এগোনো সত্টিই কষ্টকর ছিলো। কারণ বিক্ষোভের ফলে কহলার চাঙড় খসে পড়েছিলো, তো বটেই, কয়েক কান্দুগায় ছাদও নেমে এসেছিলো, তবু তারি মধ্যে দিয়ে কোন্‌ভিসিন সন্তর্পণে এবং অভ্যস্ত সাতসের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

খাদের তলদেশে ওরা সাত্তী দু'জনকে দেখতে পেলো—রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে তখনো একটু একটু গরম রয়েছে তা—চূর্ণবিচূর্ণ টিমিগানগুলো তখনও বৃকের কাছে ধরা রয়েছে তাদের।

কহলার চাঙড় দিয়ে ঢেকে ওরা সমাধি দিলো দু'জনকে।

“চার ইভানের মধ্যে আর তিন ইভান রইলো”—একজন সনিম্বাসে বললো।

ওদিকে বুড়ো কোন্‌ভিসিন অনেকক্ষণ হাবং ঐ বিধ্বস্ত কয়লাভূপের মধ্যে ক্ষিপ্ত হাতপায়ে কাঠবিড়ালির মতন বেড়াচ্ছিলো। একবার এদিকে একবার ওদিকে, একোকে একোশে এটা দেখছে সেটা নাড়ছে, আর নিজের মনে গজরাচ্ছে—

“এই হলো সাক্ষ্য শহতানের কীতি! বহলার খাদ উড়িয়ে দে—কেউ কখনো এমন কাণ্ড শুনেছে কোথাও! এতো ছোট্ট একটা শিশুর মাথায় মুণ্ডুর মাঝার মতনই—”

নড়াচড়া করতে করতে বুড়ো ক্রমে কোন দিকে সরে গেলো তার আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সৈনিকরা তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো।

—“ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা! কোথায় গেলে তে? ফিরে এসো—ক্যাপটেন ডাকছেন”—কিন্তু কোন সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

“কী হলো তে?” একজন শব্দিত করে বললো। “বুড়ো মানুষ শেষকালে কোথাও চাপাটাপা—তো—ঠাকুর্দা—আম্মা! কোথায় তুমি—উ—ই?”

“ওহ কোথায় তোমরা?”—কোন্‌ভিসিনের গলা শোনা গেলো—“হাতডাতে হাতডাতে তিনি এসে পড়লেন—তুনলেন সাত্তীদেব মুক্তার কথা।

“ইভান কোয়েনকড, যে মেয়েদের সঙ্গে চিঠি পাঠাতে চেয়েছিলো—বললেন ক্যাপটেন। নিশ্চিন্তা থামুক করতে লাগলো। অবশেষে ক্যাপটেন আবার বললেন—“কৈ আমাদের বুড়ো দাদু কোথায় গেলেন—?”

“অনেকক্ষণ থেকেই তো তার কোনো পাতা পাচ্ছি না চেঁচিয়ে ডেকেছিও বার কয়েক।” বং টিমিগানটা একবার চালাই তাহলে হয়তো শব্দ শুনতে পাবে—”

“না, দেখা হাঙ্”—ক্যাপটেন বললেন।



উৎসবের দিনে



কে. হোডের

মুবাশিত  
প্রসাধন সামগ্রী

কে. হোড এন্ড কোং

কলিকাতা-১৪

তার সবাই চুপচাপ বসে রইলো। তিনজনই উপর পানে খাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণ একটা আলোকবস্ত্র খুঁজে পাবার বুখাই চেষ্টা করছিলো।—অন্ধকারের কালিমা যেন নীরবে নিছিয় এক দুর্ভেদ্য !...

“জামাধার আমাদের জ্যাক্সে কবর দিয়ে গেলো, কমরেড দলপতি !”—একজন আর থাকতে না পেরে বলে ফেললো।

কোস্তিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে আত্মপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—“ওটা কী কথা ! জানো না আমাদের কবর দেয়া যায় না ? দেখো না, আমরাই ওদের কত জনকে কবর দিয়েছি, আরো কত জনকে দেবো !”—

“হঁ, সে কাজ করতে পারলে খুশি হবো”—একজন বললো।

“বলতেই হবে সে কথা”—অন্তর্জনের স্বাকৃতি।

কিন্তু কোস্তিৎসিন স্পষ্টই ধরতে পারলেন—ওদের কণ্ঠস্বরে বিশ্লেষিত আশ্বাস আভাস নেই। খালি বলতে হয় তাই বলছে।

দূর হঠাৎ ব্রহ্মর কবর কয়লা বরে পড়বার শব্দ শোনা গেলো। আবার শুকতা।

“ইদুর বোধ হয়।”—বললো একজন।

মৃত্যুর মতন শুক অন্ধকারের সমুদ্রে ওরা যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। কথা বলবার ইচ্ছা নেই কারো। যে কঠিন মৃত্যু বিভীষিকাময় রূপ ধরে সমুদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে—তারি ধ্যানে মগ্ন চেতনা। জামল ধরিত্রীর আলোবাতাসের সন্তান জীবনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে এমন ভিত্তরঙ্গ নারকী অন্ধকারে তৃষ্ণার জল নেই, নিশ্বাসের বাতাস নেই, আহার নেই, তিলেতিলে শুকিয়ে দমবদ্ধ হয়ে মরা—এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর “মাঝঘের জীবনে কী হতে পারে ?”

আবার সেই ব্রহ্মর শব্দ। কান পেতে অন্তর্জন বললো—“উহঁ ! এ ইদুর নয় ! ঠাকুরদাঁ না হয়ে যায় না !”

“তোমরা কোথায় গো !”—দূর থেকে কোজলভের গলা শোনা গেলো।

বুড়োর দ্রুত উত্তেজিত নিশ্বাসের শব্দ শুনে ওরা দূর থেকেই দূরতে পারছিলো যে একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। ওদের দৃষ্টিগোচর সঙ্গ সঙ্গ কী এক অজানিত আনন্দের প্রত্যাশায় উজ্জ্বল নৃত্য শুরু করলো।

“কই তোমরা ? কোন্‌খানে” কোজলভের অধীর কণ্ঠ শোনা গেলো। “তোমাদের সঙ্গে এখানে রয়ে” গিয়ে দেখছি খুব ভালই হয়েছে, এবার চটপট করে দলপতির কাছে ফিরে চলো তো বাবারা ! আমি একটা বেসোবার উপায় খুঁজে পেরেছি।”

“আমি এখানেই আছি” কোস্তিৎসিন শাস্তকণ্ঠে বললেন।

“বাপারটা হচ্ছে, তাইলে শুধু কবরেড দলপতি ! যেই আমি প্রধানটার পৌছলাম এক বলক ভিজে বাতাস যেন পায়ে লাগলো আমার। আমি সেটা অনুসরণ করে চললাম—এবং শেষ পর্যন্ত বাপারটা যে কী তা বুঝতে পারলাম। বিকোরণের ফলে খাদের মুখ থেকে গিয়ে পরলা থাক পর্যন্ত একেবারে বৃষ্টি গেছে। কিন্তু পরলা একটা ঝাঁকাই আছে। সেখান থেকে শ’ পাঁচেক গজ অবধি একটা নালি কাটা আছে—আর সেই নালির মুখটা আবার একটা হাট খাদের মুখে গিয়ে পৌছেছে—সেটাই বার হবার রাস্তা। এখন আমাদের ঐ পরলা থাকে পৌছতে হবে যেমন করে হোক। বিকোরণের ফলে পরলা থাকে একটা ফাটল ধরেছে—সেখান থেকে

ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিলো। আমি পরলা থাকে ওঁরবার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় বাট ফুট উঠেছিলাম—কিন্তু তারপর আর সিঁড়ির ধাপগুলো নেই—উড়ে গেছে ঐ সঙ্গে। আমাদের কাজ হবে এখন—ঐ সিঁড়ির মাথায় গোটা দশক, ধাপ লাগানো, কিছু কয়লার চাউড় সরিয়ে ফেলা আর ঐ ফাটল বরাবর ফুট ছয়েক কয়লার স্তর কেটে পথ করে নেয়া। তাইলে আমরা পরলা থাকে উঠতে পারবো।।...”

কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। অবশেষে কোস্তিৎসিন বললেন—“বলিনি, আমি বলিনি তোমাদের যে আমাদের জ্যাক্স কবর দিতে ওরা পারবে না !...”

—শাস্তকণ্ঠেই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করলেন তিনি, যদিও তাঁর বুক প্রচণ্ডবেগে ধড়াস্ ধড়াস্ করছিলো।—

সৈনিকদের একজন হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কঁদে ফেললো—

“সত্যি, সত্যিই তাইলে আমরা আবার সূর্যের মুখ দেখতে পাবো ?”

“আপনি কি করে জানতেন এসব, কমরেড ক্যাপটেন ?”

অনেক জন স্তম্ভিতকণ্ঠে বললো—“আমি তো ভাবছিলাম আপনি কেবল আমাদের সাহস দেবার জন্মেই ওস্তাদে বলছেন !”

বুড়োই এবার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো—“আমিই বলেছিলাম ক্যাপটেনকে—পরলা থাকের ঐ পথের কথা। আমিই তাঁকে আশা দিয়েছিলাম। তিনি শুধু আগাকে মুগ্ধ বদ্ধ রাখতে বলে ছিলেন।

“মরতে কেউই চায় না, রাজার হোক”—কঁদে ফেলো সৈনিকটি লজ্জিত সুরে বললো। কোস্তিৎসিন উর্ধ্বে পড়ে বললেন—“আমি এখন একবার নিজে দেখতে যাবো বাপারটা ঠাকুরদাঁকে নিয়ে। তোমরা এখানে থাকো। কেউ যদি এসে পড়ে—এসবকে একটা কথাও নয়। বুঝলে ?”

একলা হবার পর একজন বললো—“সত্যিই তবে আমরা আবার সূর্যের মুখ দেখবো ? একথা ভাবতেও যে গায়ে ঝাঁটা দিচ্ছে !”

বীরত্ব খুঁই ভাল কথা, কিন্তু মরতে কেউই চায় না !—অন্তর্জন গজগজ করতে লাগলো। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার জন্য সে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না।

৫

অন্তঃপর কোস্তিৎসিনের দল যে কাজে যে ভাবে নামলো—পৃথিবীতে আর কখনো কোনো কাজ বোধ হয় এতখানি হুসসাধি অথচ এতখানি মারাত্মক রকম মূল্যবান হয়ে ওঠেনি ; কাজটুকু বিশেষ কিছু নয়। দিনের আলোয় একজন স্রষ্টা লোকের পক্ষে বা কয়েক ঘণ্টার কাজ মাত্র—ওদের দশজনের কাছে তা যুগযুগেও সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছিলো না। রুদ্ধ বাতাস আর অতল অন্ধ কারের নির্মমতার ওদের চেতনাকে নিষ্ক্রিয় করে আনাছিলো প্রতি মুহূর্তে। কারের মধ্যে আর ক্ষণস্থায়ী বিশ্বাসের মধ্যেও ফিস্‌ ফিস্‌ তাদের সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে, দুঃসহ তৃষ্ণা অপমৃত্যুর কঠিন আভাস ঘনিষে আনছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু, এখনই মুক্তির একটা পথ চোখে পড়ার পরই যেন ওরা ওদের অবস্থার পৈশাচিক ভয়াবহ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছিলো। তাই হনো হয়ে উঠেছে ওরা মুক্তির আশায়। বার্য মুক্তির

যেনার প্রথমেই বেশি লক্ষ্যবশত করেছিলো, তাইই অতি দ্রুতই ক্লান্ত ও শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু যারা অতটা সিত হতে পারেনি—তারাই যেন অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে কান্না র যাচ্ছে তবু। কেউ কেউ দশ মিনিট কুজের পরেই অবসর। বসে পড়ে—হাত-পা এলিয়ে আসে—টোথের উপর নাচে দশ মৃত্যুর ছায়া—আবার যখন অতিক্রমে উঠে পড়ে, তখন মনে—এ যেন ওর দেহ নয়, অন্য কারো মৃতদেহ টেনে চলেছে নিজের শক্তির জোরেই। সবারই এই রকম দশা—তবে কারো পাঁচ-দশ মিনিট—কারো বা বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা—পর পর—এই বা তফাৎ!

“আলো আলো আলো—এক বসন্ত আলো! আলো নইলে র পারছি না—”

“জল—জল—এক চুমুক জল যদি পোতাম।—”

একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পারতাম যদি। আর পারছি না—”

—মাঝে মাঝে এক একটা তীব্র চাঁৎকার আছড়ে পড়ে কালো লার কক্ষ হেয়ালে দেয়ালে। ক্যাপটেন কোস্তিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে যান সেদিকে। দমা-দেওয়া যন্ত্রের মত তিনি ছোটোছুট ছেঁন এগাব থেকে এগাবে। যার যেখানে দরকার, সেখানেই জ্বর হচ্ছেন তিনি। অন্ধকারও লোকগুলোর মুখ দেখতে ছেন যেন। বাকে যেমন দরকার—কাউকে গায়ে হাত বুলিয়ে—টকে দুটো সাহস দেওয়া কথা বলে—কাউকে ধমকে ঠেলে ছেন তিনি সবাইকে। অমন কোমলপ্রাণ লোকটি যেন এত তরে উঠেছেন নির্দম—কিন্তু বহুপশুর মত। তিনি খুব ভাবাবেষ্ট বৃকতে পারছিলেন—এই সময়ে যদি তিনি সামান্ততম বতাবও দেখান—তবে সবসমুদ্র মরতে হবে!

ওদের মধ্যে কুজিন যার নাম, সে আর উঠতে পারছিলেন না। পটেনকে মর্যাদা হয়ে বললো—“আমাকে বা খুশি করুন কমরেড, যার আর শক্তি নেই উঠবার—”

ক্যাপটেন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—“আমি তোমাকে ওঠালোই।”

“কি করে? শুনি?”—কুজিনের কণী কণ্ঠে যেন প্রচল্ল প!—“আমায় গুলী করবেন? তাই করুন! এই মুহূর্তে। চেষ্টা আর কামা নেই কিছু আমার কাছে—”

“না, গুলী করবো না!” কোস্তিৎসিন বললেন—“তোমার খুশি হয় তো শুয়ে থাকো। পথ করে ফেলার পর আমরা থাকে টেনে উপরে তুলবো। কিন্তু দিনের আলোয় ফিরে যাবার তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইবে না। আমি মায় ‘অযোগ্য’ বলে ফেরৎ পাঠাবো আর তোমার নাম শুনলে ফেলবো—”

শাপাস্ত করতে করতে কুজিন কোনোক্রমে নিজেকে টেনে নিয়ে লা কাজে। এক বার কেবল কোস্তিৎসিনের ধৈর্যচ্যুতি ছিলো।—

সার্জেন্ট লাদিন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছড়ে খবর পেয়ে ক্যাপটেন দন সেখানে। ডেকে সাড়া নেই। বেয়াড়া রকম আঘাত। রক্তক্ষরণের ফলে খুবই দুর্বল ছিল লাদিন। অজ্ঞান হয়ে। চোখে-মুখে ক্যাপটেনের স্নায়ব শেখ ঢোক জলটুকু রে দিতে জ্ঞান ফিরলো।

ক্যাপটেনের কণ্ঠ শুনে সার্জেন্ট তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অতিক্রমে

# বহুম্র

## আরোগ্য হয়

প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুম্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর শমুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকা ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গীণ অবস্থায় কারবান্ডল, ফোঁড়া, চোখে ছানি পড়া এবং অন্ত্রাচ্ছাদিততা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ানি মতে দুর্লভ ডেযজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার ক’রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অধিক সেরে গেছে বলে মনে হবে। পাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিবেদন নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জুজ লিখুন। ৫০টি বাটকার এক শিশির দাম ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নিয় ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোষ্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

নজকে উঁচু করে তুললো। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে ললে—“কমরেড কোস্তিৎসিন! আমার আর বেশি দেয়ি নেই। এক কাজ করুন। আমায় গুলী করে ঘেরে লোকগুলোকে আমার দেহটা—”

“চূপ করো!” কোস্তিৎসিন চীৎকার করে উঠলেন।

“কিন্তু কমরেড কাপাটেন, এতটুকু ওরা অন্তত মুক্তি পেতে পারতো! না খেয়ে আর ওরা কাজ করতে পারছে না—পারবে না শব্দ করতে—”

“চূপ!—কাপাটেন গর্জন করে উঠলেন—আমার হুকুম, প করো!”

সার্জেন্টের প্রস্তাবের বীভৎসতা তাঁর লৌহমনের রক্ত-রন্ধেও ভীষিকার শিহর জাগিয়ে তুলেছিলো। হৃৎশব্দ করে সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি।

লাদিনও তাঁর পেছন পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গেলো—হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা টানতে টানতে।

আর এক জন ব্যক্তি চরকিবাজির মতন ঘুরছিলো সবখানে—আমাদের বুড়ো কোজলভ। সবাই ভাল করেই জানতো—ডো না থাকলে এ কাজ একপাও এগোতো কি না সম্ভব! হরের মতন অনায়াস গতিতে বুড়ো চলাফেরা করছিলো—যার খানে বা কিছু দরকার এনে হাজির করছিলো সঙ্গে সঙ্গে। পের ছেনি আর হাতুড়ি বোঁগাড় করলো কোথেকে সেই জানে। গাছার সিঁড়ির জন্তে লোহার শিকগুলো কোথেকে খুঁজে পেতে জির করছিলো। চারদিক থেকে কেবলি শোনা বাচ্ছিলো বর নাম—“হেই ঠাকুর্দা!” “ঠাকুর্দা কোথা গেলে?” “ঠাকুর্দা কবার এদিকে এসো না!”

কাজ শেষ হয়ে আসছিলো। সবচেয়ে দুর্বলরাও এমন কিছু ছেড়ে দেওয়া কুঁজন আর লাদিনও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। মন সময় উপর থেকে চীৎকার শোনা গেলো—“শেষ ধাপটা গানো হয়ে গেছে!”

আশার আনন্দে সবাই যেন মাতাল হয়ে গেলো। কোস্তিৎসিন কিছু দরকারী মালপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সবাইকে ভাগ করে দিলেন। পর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“কমরেডরা! এবার উপরে ওঠার সময় এসেছে। মনে রেখো, পরে এখানে যুদ্ধ চলছে—তোমাদের কর্তব্য ফুরায় নি!—আমরা সেছিলাম সাতাশ জন, আট জন ফিরে চলেছি। বারো এখানে বনিক্রায় আছুর বইলো, তাদের নাম আমাদের খুতিপটে অমর হয়ে কুক!”

এবার যাত্রা শুরু হলো।

শ্রান্তরাও দুর্বল শরীর নিয়েও ঐ নড়বড়ে সত্তর ফুট সিঁড়ি ঘেরে হবার শক্তি পেলো ওরা কেবল মানসিক উত্তেজনার জোরেই। পরলাক পর্বন্ত উঠতে প্রথম হ’জনের হ’ বঁটা লেগে গেলো প্রায়। বাকী হলো হ’ জন—কোস্তিৎসিন আর কোজলভ।

কি করে যে ব্যাপারটা ঘটলো—তা কেউ ঠাহর করতে পারেনি দ্বাংকারে। একটা নিষ্ঠুর হৃৎকটা ছাড়া আর কী! নইলে পরলাক কয়েক জনের মধ্যে এসে হঠাৎ ঠাকুর্দার হাত কসকে যে কেন?

“ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা!”—এক সঙ্গে অনেকগুলি শক্তির বর চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে একটা অস্পষ্ট ভারী ‘ধপ’ শব্দই কেবল উত্তর দিলো সে ডাকে।

মুক্তির আনন্দ যেন বিধান হয়ে গেলো সবাব কাছে। নিত্যাধীনরা স্তম্ভ অশাখরা চোখও ছলছলিয়ে এলো সবাব।

৬

ওরা যখন খোলা মাটিতে এসে পৌঁছলো তখন রাত্রি। ঝিক-ঝিক করে বেশ আরামদায়ক বুড়ি পড়ছিলো। জানা আর টুপি খুসে সবাই চূপচাপ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো সেই বুড়িঘারার মধ্যে—সত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মাটিমায়েব সন্তান নির্বিড় আশ্রয়ে অল্পতব করতে চাইলো মাতা বসুমতীকে। প্রাণপণে ত্রাণ নিলো ভিজ মাটির আর বাতাসের। ঘাসের ভিজ ডাঁটাগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে পেলো অপর্যুপলক শিহরণ, বুড়ির ছোট ছোট ফোঁটাগুলি যেন কোমল তপ্ত করস্পর্শের মতো তাদের সর্বাঙ্গে আদর করে বাচ্ছিলো—আর ওরা চূপ করে শুনছিলো তাদের ছন্দোবদ্ধ নুপুর নিকণ। খনির অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে এই রাত্রির অন্ধকারও ওদের কাছে বসুমতী মনে হচ্ছিলো—তাকিয়ে ছিলো তারা একদৃষ্টি পূর্বদিগন্তের পানে—যেখানে এই প্রিয় মাটির জননী-জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, শুচিতা পদদলিত কলঙ্কিত। আরো গভীরতর উত্তেজনার সঙ্গে তারা তাকিয়ে রইলো পূর্বে—সেখানে আর কয়েক ঘটাব মধ্যেই তাদের সকলের অন্তরের অন্তরতম কামনার মূর্তি পরিগ্রহ করে উঠবে সূর্য!

“দেখো, যেন রাইফেলগুলো ভিজ না যায়!”—কোস্তিৎসিন বললেন।

মাকে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল—সে চোঁচাতে চোঁচাতে ফিরে এলো—ওরে, জার্মানরা নেই, তারা তিন দিন আগে ভেগেছে, ওঠো ওঠো, শীগগির চলো। আমাদের জন্তে খাবার বাঁধা হচ্ছে, খড় বিছিয়ে বিছানা ঠেঠরি হচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে বাঁচো। আজ ছাব্বিশে। আমরা তাহ’লে বারো দিন আটকে রয়েছি।—গায়ের লোকরা বললো—তারা নাকি আমাদের আশ্রায় জন্তে লুকিয়ে প্রার্থনা করছিলো গির্জায়। ভেবেছিল আমরা সাবড়ে গেছি!—কিন্তু জার্মানরা শোধ নিতে ছাড়েনি। শুধু আমাদের খাদ ধরিয়ে দিয়েই কান্ড হয়নি তারা—বাড়ী জালিয়ে দিয়েছে, লুণ্ঠপাট করেছে, বেগড়ক বতকগুলো বালককে গুলী করে মেরেছে—

এক নিশ্বাসে সে বলে গেলো কথাগুলো।

বে বাড়ীতে তারা আশ্রয় নিলো, বেশ গরম তার ঘরটা। হ’জন বুড়ী আর এক জন বুড়ো ওদের খাবার দাবার আর গরম জল এনে দিলো। কিন্তু তারা নির্বাক, আনন্দ করছে না ওদের মুক্তিতে! কেন?—জানা গেলো, ওদের দুটি ভেরো চোন্দো বছরের নাভিকে জার্মানরা সামান্য অসুস্থ্যেতে গুলী করে মেরেছে ওদের চোখের সামনেই। আর—ওদের ছোট মেয়েটাকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে কী যে করেছে, সন্ধান পাওয়া যায়নি।—

খেয়ে দেয়ে ওরা ভিজভিজ গরম খড়ের ‘পরে জড়াজড়ি করে

য় পড়লো, কোস্তিংসিন টমিগান কোলে নিয়ে পাহারায় বসলেন।  
ধানে ছ'দিন ছ'রাত বিশ্রাম নেবার সঙ্কল্প করলেন তিনি।

রাত ফিকে হ'য়ে আসছিলো। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে  
রছিল কোস্তিংসিন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ক্রীণ শব্দ কানে এলো।  
ইহুর নয়। শব্দটা একই সঙ্গে কাছ ও গমনে হচ্ছে আবার দূরেও  
ন হচ্ছে। কেউ যেন ছোট্ট একটা হাতুড়ি দিয়ে দুর্বল ভাবে অঘট  
টানা যা মেরে চলেছে পাতলা কিছুতে। একবার মনে হলো  
৪ মাটির তলায় যে কাজ হচ্ছিলো তারি হাতুড়ির শব্দ বৃষ্টি তখনো  
নে বাজছে! কি জানি! মনে এলো কোমলভের কথা!  
হা! “আমার হৃদয়টি পাথর হয়ে গেছে বোধ হয়—” ভাবছিলেন  
নি—“আর কোনো ভালবাসা করণা সহানুভূতির স্থান রইলো না  
মানে—!”

ভোর হয়ে এসেছে। এক জন বুড়ী খালি পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে  
এটা-ওটা খটখাট করছে। একটা মুরগী ডেকে উঠলো কঁকরু-কঁক  
। বুড়ী একটা বড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে কী বললো অফুটে।  
হার সেই বিচিত্র শব্দ।

কোস্তিংসিন থাকতে না পেরে বললেন—“একটা শব্দ শুনে  
ছা বুড়িমা? কী ওটা! কিণে যেন ঠুকঠুক করে যা মারছে  
থায়। নাকি আমার মনের হুল?”

বারান্দা থেকে বুড়িমার শাস্ত উত্তর এলো—“ওটা এখানে হচ্ছে।  
র ডিম ফুটে বাজা বেরোবার সময় হয়েছে। বাজাগুলো ভেতর  
৪ ডিমের খোলা ঠোকরাচ্ছে হেঁট দিয়ে—”

মুক্তির প্রয়াস! অন্ধকার থেকে আলোর আসবার আকৃতি!  
কোস্তিংসিনের ওষ্ঠাধরে একটি ক্রীণ হাসির রেখা ফুটলো।

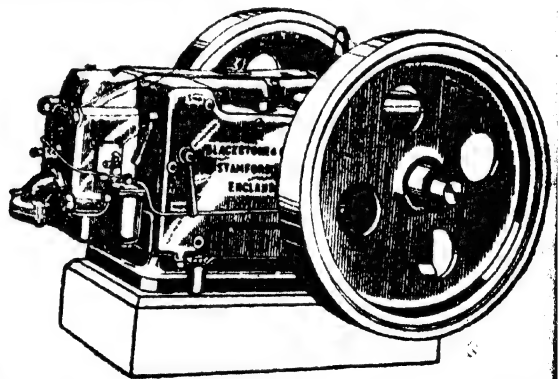
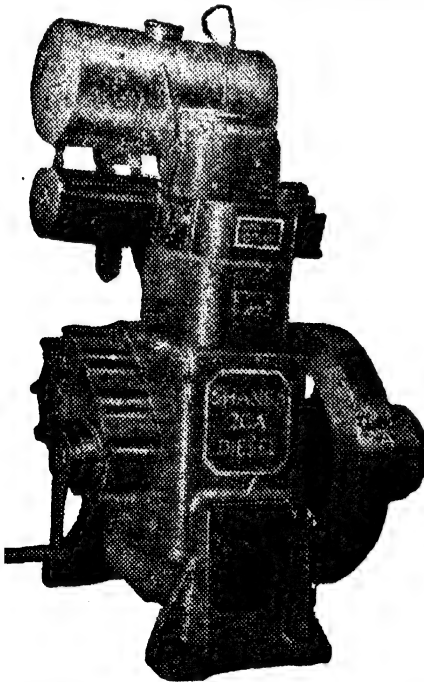
ঘুমন্ত মাহুয়গুলোর দিকে এক বার চেয়ে দেখলেন তিনি সন্মুখে।  
মড়ার মতন ঘুমুচ্ছে ওরা—নড়াচড়া নেই, পাশফেরাও নেই।  
বুকগুলো একতালে ওঠানামা করছে। টেবিলের উপর রাখা  
এক টুকরো ভাঙা জায়নার উপর সোনালি রোদ একফালি এসে  
ঠিকরে পড়েছে—ঠিকরে পড়েছে কুজিনের তোবড়ানো গালের  
দাড়ির আগাছার মধ্যে। হঠাৎ এই অসহায় সন্ধ্যাগুলোর  
প্রতি একটা উদ্দাম প্রীতি ও বৈহ উত্থালপাখাল হয়ে জেগে  
উঠলো অন্তরে তাঁর। মনে হলো জীবনে কখনো কারো প্রতি  
এমন উত্থাল বৈহ আর প্রীতির আতপ্ত পরশ পাননি তিনি  
অন্তরে!...

খোঁচা খোঁচা দাড়ি-জাগা কয়লামাথা কালো বিবর্ণশীর্ণ মুখগুলির  
দিকে কঠিনতম মূর্তার বিভীষিকা... নীরবতম অন্ধকারের কালিমাও  
মুছে দিতে পারে না অনশ্বর জীবনের অনিবার্ণ স্ক্লিপসকে...

তাঁর গাল বেয়ে বড় বড় অশ্রুর কঁোটা ঝরে পড়তে লাগলো—  
মুছে ফেলবার জগ্রে হাত তুললেন না তিনি। একফালি শীর্ণ রোদ  
কোন দ্বিগ্ন দিয়ে চুরি করে এসে মুক্তাভ করে তুললো একটি  
অশ্রুবিন্দুকে...

হৃষ উঠেছে... নতুন দিনের... হৃষ!...

অনুবাদিকা—মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়।



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল ও কৃষিকাষ্য শেষের অন্ন ও প্রাণ এবং  
আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিট্টার, ব্রাকস্টোন  
ভিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং সেট, শাস্ত্রসূ ভিজেল ইঞ্জিন  
শাস্ত্রসূ পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও কার্যক্ষম।

এজেন্টস্ :-

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রাট, দ্বিতল কলিকাতা-১

ফোন ৪-২২-৫২৭৫

বঃ জঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডারনামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।



## বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“বাংলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে—এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের কসলের ক্ষেত দিয়েছে ছুবিষে, তার জন্তে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অল্পের আর কোন উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলা দেশের সব চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণন, অক্ষমতার প্রাণন, ধন-হীনতার প্রাণন। এদেশের ধনীরা স্বর্ণগন্ত, মধ্যবিত্তেরা চিংড়িশস্তার মধ্য, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের যেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে বারা সক্ষম, তারা বহুশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অল্পের বহু বিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জরী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জন-সংখ্যা মাথা গুণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুগুণ মানুষের যুগে আমরা বিবল। হয়ে অল্প দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যানগীন উদ্দেশ্যের দেশে কেবল যে অল্পের টানটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের উদ্বোধ্য থাকে না। প্রভুরূপ-প্রত্যাশী জীবিকার সর্পিণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিধেয় কটকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিলে। বড়কে ছোট করতে চাই, এক-খানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে সব প্রযুক্তি ভাঙন ধরাযার সহায়, সেইগুলিই প্রবল হয়, গড়ে তোলবার শক্তি কেবলি ষোঁটা খেয়ে খেয়ে মরে।

দেশে মিলে অল্প উৎপাদন করবার যে ব্যস্তিক প্রণালী, তাকে আশ্রয় করতে না পারলে যন্ত্রযন্ত্রের কহুইয়ের থাকা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেচি। বাহিরের লোক অল্পের ক্ষত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালীকে কেবল কোণ ঠেসা করছে। বহু-কাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ—গারী সজবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ভাইনে-বারে কেবলি গানের যান্ত্রা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি গিটটিচি পরিকার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালী শুণ্ড কৃষিজীবী এবং মসিজীবী ছিল না; ছিল সে জীবী, মড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে।

তাঁত বস্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘন, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরও বড় যন্ত্রের দানব তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে নিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার নিকে তাকিয়ে কেবলি মাটি চাব করে মরছি—যুত্বার চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসলো।

তখন থেকে বাংলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম চালানায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড় বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবু-ডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্তে বারা দায়িক ত্যাগ উপরে চোখ তুলে ভক্তিজনের বলে, জীব দিয়েচেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহাের পথ তৈরী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ্ড ভাগুরে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আশ্রয় করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকতে পারবো।

এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাস্তরে সমুদ্রমস্তনের মত সে বিষও উল্কার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ শুঁড়ি মেয়ে আসছে। তাছাড়া অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ কারখানার অজান্তে উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠলো। কিন্তু একান্ত প্রকৃতিবদ্ধ শক্তি-সম্পদকে লোব দেবো না, লোব দেবো মানুষের বিপক্ষে। খেজুর গাছ, তাল গাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না? যন্ত্রের বিধাতা যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিধাতাটাকে সজ্ঞারে ওপড়াতে লেগেছে কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে স্রষ্টা তান মারেনি; উর্গে, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বিজনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্রগম করে দিয়ে লোভের কারখানাকেই সে গুটিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অশবাসারে সব চেয়ে তার বাধা ঘটেছে কৌনখানে? যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অশুচি ছিল সেখানেই। একদিন জ্বারের সান্নাধ্যকালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মত অক্ষম। তারা মুখাত ছিল চাবী। সেই চাবের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মত অজ্ঞকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বিজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত তখন যন্ত্র-যন্ত্র ও কর্মী আনতে হচ্ছে যন্ত্র-দক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তার ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত ঘুটো এবং তার মন না চলে স্রুত গতিতে, না চলে নিপুণ ভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলা দেশের মন এক অজ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোধাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের বার্থতা ঘটেছিল, আবার যে কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হ'তে হবে—সক্ষম হ'তে হবে, মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃণাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলা দেশে কাপড় ও নুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসার বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি; তাই সেগুলি চলেছে নানা বাধায় ভিতর

দিয়ে মন্দির গমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দশ অসামর্থের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অল্প প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ সর্বপ্রথমে কে-ইংরেজী বিজ্ঞা গ্রহণ করেছে, সে হ'ল পুঁথির বিজ্ঞা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিজ্ঞার সুসারে মানুষ জরী হয়, যুরোপের সেই বিজ্ঞাই সব শেষে বাংলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা যুরোপের বৃহৎশক্তি গুরুর কাছে থেকে প্রথম হাতেখড়ি নিয়েছি, কিন্তু যুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কি ক'রে মার বাঁচানো যায়—সেই বিজ্ঞার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হ'ল হাতিয়ার বিজ্ঞার পাঠ। এই জ্ঞানে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল গেরিয়ে পড়লো।

বোম্বাই প্রদেশে একথা বললে ক্ষতি হয় না, যে, চরখা ধরো। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বস্ত্রার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে এই কলের চরখায়। নইলে একটি মাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলা দেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সত্য হয়, তাহ'লে তার জবিন্দা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহৎশক্তি গুরুর কাছে যে-বিজ্ঞা লাভ করেছি, তাকে পূর্তি দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে লীক্ষা নিয়ে। যত্নকে নিন্দা ক'রে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তাহ'লে যে-মুদ্রাধ্বজের সাতায়ে সেই নিন্দা রটাই, তাকে সূত্র বিগল্বন দিয়ে হাতে-পেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এক কথা মানবো যে, মুদ্রাধ্বজের অপকৃপাত দাক্ষিণ্যে, অপাঠ্য এবং কৃপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয়, তবে আর কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেই সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

—বিধভারতীর সৌজ্ঞেয়।

## ছাতা

আজ কাল সময়ে-অসময়ে বৃষ্টির ষে-রকম অসহনীয় উৎপাত আস্ত হয়েচে, তাতে ছাতার প্রয়োজনীয়তা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। পূজোর পর বীরা ভেবেছিলেন, ছাতা বইবার দায় থেকে বাঁচা গেল, তাঁদের আবার ছাতা কাঁধে করতে হচ্ছে, ছাতা সারাতে হচ্ছে, কেউ কেউ বা নতুন ছাতা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

জুতার মত ছাতাও একটি অপরিহার্য বস্তু। এই ছাতা আবিষ্কার ক'রতে "উনিশ পিপে নশ" উড়েছিল কি না তা বলা যায় না, তবে আবিষ্কারকর্তা যে "চামার কুলপতি"র মত এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের মাত্রগণ্য পণ্ডিত জ্ঞানীরা হয়ত প্রথমে বৃষ্টি এবং বৌয়ের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্ত আকাশজোড়া চন্দ্রাতপ নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত এক জন সাধারণ কারিগর ছাতা আবিষ্কার করে ধরা রক্ষে করেছিলেন।

প্রাকৃতিক চর্যোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রামে মানুষ অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে এবং ছাতা আবিষ্কারও যে সেই চেষ্টার অভ্যন্তর ফল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিম্নোক্ত ও ব্যাবলনের সহৃদয় যুগে ছাতার প্রচলন ছিল।

প্রাচীন গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য, ভারত, চীন এবং মিশরের অবিবাসীরা ছাতার ব্যবহার জানত। কিন্তু ছাতা আবিষ্কারের প্রথম অবস্থার সাধারণ তা ব্যবহার করতে পেত না, ছাতা ব্যবহৃত হ'ত কেবল রাজত্বরূপে—অর্থাৎ রাজা-বাদশাহেরই ছাতার উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল। ছাতা ছিল তখন রাজার মর্যাদার চোতক।

খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে আসীরিয় রাজাদের প্রাসাদে অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায়, ক্রীতদাসেরা রাজত্ববৃন্দের মস্তকের উপর বৃহদাকার ছত্রসমূহ ধারণ ক'রে আছে। যুদ্ধের সময়ও রাজত্ব ব্যবহারের প্রমাণ এই সব চিত্র থেকে পাওয়া যায়। আঙ্কটেক সম্রাটগণও বৃহদাকার রাজত্ব ব্যবহার করতেন। তাঁদের নির্দেশে একসঙ্গে চার জন সমান্তর ব্যক্তি পালাক্রমে আঙ্কটেক সম্রাটদের মস্তকের উপর রাজত্ব ধারণ করতেন। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের যুগের তো কথাই নেই।

এই সমস্ত প্রাচীন রাজত্ব একটা দেখবার জিনিষ ছিল। বেশমের আচ্ছাদনের উপর নানা রকমের কারুকার্য করা থাকত। সোনার জরি এবং মুক্তোর কাঁদর দিয়ে শোভিত এই সমস্ত ছাতা সত্যি একটা দেখবার জিনিষ ছিল। রাজত্বের বাটগুলিও ছিল অতিশয় মূল্যবান। সাধারণত দেওলি গজদন্ত-নির্মিত হত এবং তাতে সোনার কারু-করা থাকত।

পারস্যের খলিফা, মোগল সম্রাট, বর্মী রাজা, তুর্কী বে, গ্রীসের পুরোহিত ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ বৃষ্টি অথবা বৌদ্ধ থেকে আত্মরক্ষার এবং রাজ-মর্যাদা প্রচারের জন্ত এই সমস্ত রাজত্ব ব্যবহার করতেন, তখনও পণ্যস্ত্রাণের রাজ্য বহু উপাধির মধ্যে "চতুর্বিংশ ছত্রপতি" উপাধিটি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে ছত্রপতি শিবাজীর নাম কে না জানেন?

সাধারণের মধ্যে ছাতার প্রচলন হতে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল। যে ছত্র রাজ-মর্যাদার প্রতীক, তা যদি সাধারণ ব্যবহার করে, তবে রাজাকে আর কে মানবে? কিন্তু যেমন করেই হ'ক, পাত্কার মত ছাতা ব্যবহারের অধিকারও জনসাধারণ পেয়েছিল, তবে ভিন্ন আকারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটেনে প্রথম ছাতার প্রবর্তন হয়; ভারতবর্ষ থেকে যে সব পর্যটক বৃটেনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁরাই ছাতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের দেখাদেখি বৃটেনে ছাতা ব্যবহার শুরু হয়। বেন জনসনের "দি ডেভিল ইজ এ্যান গ্যাস" নামক নাটকে (১৬৭০ সাল) ছাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে হুথিনার পতিত এক মহিলার অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—And there she lay, flat spread as an umbrella."

ইউরোপের প্রথম যুগের ছাতাগুলি ছিল চীনা প্যাটার্নের। খুব পাতলা বেশমী কাপড় দিয়ে এই সমস্ত ছাতা তৈরী করা হত। এই ছাতার ভাঁজ থাকত অনেক এবং খোলা ও বন্ধ করা ছিল এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তখনকার দিনে ছাতা ছিল মেয়েদের ব্যবহারের জিনিষ। মেয়েদের স্কলর তত্ত্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদকে বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্ত তারা ছাতা ব্যবহার করতো। পুরুষদের পক্ষে ছাতা নিয়ে চলা লজ্জার ব্যাপার ছিল।

ইংলণ্ডের লোকে জোঁশাস হানওয়াকে ছাতার আবিষ্কার কর্তা লে মনে করে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হ'লে বলা উচিত যে, তিনি ছাতা আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে ছাতার প্রচলন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি চীন পর্যটন করে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে শিখে আসেন ছাতা নির্মাণের কৌশল।

কেবলমাত্র রাজারা ছাতা ব্যবহার করবেন, এ কেমন কথা! তিনি জনসাধারণের মধ্যে ছাতার প্রচলনের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজে কতকগুলি ছাতা প্রস্তুত করলেন। ছেলে-বুড়ো সকলের ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে তিনি লগুনের পাখে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘরে বেড়াতে লাগলেন। খ্রিষ্ট বছর ধরে তিনি চালিয়ে গেলেন তাঁর অভিধান। তাঁর একাগ্রতা ও অটুট সঙ্কল্পের কাছে সকল ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি নিস্কর হয়ে গেল এবং ক্রমে-ক্রমে লোকে ছাতা ব্যবহার করা শুরু করল।

অবশ্য বর্তমানে আমরা যে ধরণের ছাতা ব্যবহার করি, প্রথম অবস্থায় ছাতার রূপ সে রকম ছিল না। তখনকার দিনের ছাতাগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় ও বেচশ ধরণের এবং সেগুলি খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারটা রীতিমত বিরক্তিকর ছিল। ইংলণ্ডে ছাতা এখন সভ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছাতা রাণী মেরী এবং মিঃ চেম্বারলেনের খুব প্রিয়বস্তু ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সভ্যসমাজের পক্ষে ছাতা অপরিহার্য। তাই তাকে ক্রমশঃ যতদূর সম্ভব সৌধীন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যত কায়দা বাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছাতার প্রধান অসুবিধা হল খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারটি এবং ভিজে ছাতা নিয়ে ট্রামেবাসে চলাফেরা। এই দুটি বিষয়ে এখনও কোনও অগ্রগতি হয় নি। ধীরে ছাতা নির্মূল্য করেন, তাঁদের এ বিষয়ে একটু সচেতন হওয়া দরকার।

### ভারতবর্ষে বিদেশী মাল কাটতির বহর ( ১৩৩৮ )

সহযোগী 'পল্লীবাসী' ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত বিদেশী মাল গাইতি হয় তাহার একটা কিরিস্তি দিয়াছেন—

প্রতি বৎসর আমরা বিদেশী সূচ কিনি ৫০ লক্ষ টাকার আর ৩টা সূতা কিনি ২১০ কোটি টাকার। আমাদের মা, বোনদের দ্বারা চিহ্ন সিঁথির সিঁথুরটুকু বজায় রাখিতে তাঁরা বিদেশকে সন প্রতি বৎসর একুশ লক্ষ টাকা।

বিলাস ও বাবুগিরির জন্য ব্যয়

সাবান	১০	লক্ষ	টাকার
সুগন্ধি তৈল	১৬	"	"
স্নো	১৪	"	"
পাউডার	১২	"	"
এসেন্স	১৫	"	"
মাথার ফিতে	৮১০	"	"
চুম্বের কাঁটা	১৫	"	"
সেপটিনিন	৩১	"	"
ভাল	২১	"	"
চূদের কাগ	৩১	"	"
চুখ তাল	২১	"	"

পুঁতির মালা ও বুটায়ুজা

বিদেশী চুড়ী

লজ্জেল্লস

বিশুট ও কের্ক

নেশার বহর

সিগারেট

সিগার

চুফটের মসলা

চুফটের সরঞ্জাম

বিদেশী বাসনকোসন

চীনা বাসন

এনামেল

এলুমিনিয়াম

চায়ের বাসন

অস্বাস্থ্য বিদেশী জিনিষ

কাপড়

বাসুণ

বোতাম

চিক্কী

জুতার ফিতা

কাপড় কাচা সাবান

কাগজ

চিনি

ছাতা

ছাতার সরঞ্জাম

ছায়িকেনের কাচ

টোভ

টর্চ

ব্রাটপেপার

চিঠির কাগজ ও থাম

কলশেমিল

মোট পেমিল

মোট

কলম

ছুরী

কাঁচি

জুতার কালি

গঁদ

শাঁক

কড়ি

জমাট দুধ

হয়লিকস্ ইত্যাদি

বিদেশী শিশুখাত

গুড়

লেসবোনা সূতা

তাল

লোহার সিঁদুক

দিশি বোতল

১৭ লক্ষ টাকা

১৭ " "

২৭ " "

৫৭ " "

২ কোটি টাকার

৬ লক্ষ টাকার

৬০ " "

৪১০ " "

৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার

৪১০ লক্ষ টাকার

২১০ " "

১১০ " "

৬২ কোটি টাকার

৫ লক্ষ টাকার

৩২ " "

২৬ " "

১৬৪ " "

১১০ কোটি টাকার

৩ " "

১৮ " ২০ লক্ষ টাকার

১০ লক্ষ টাকার

৫১ " "

২০ " "

১১ " "

১০ " "

৩১ " "

৩৬ " "

১১ " "

২১ " "

৬১ " "

১০ " "

৩৪ " "

১০ " "

১৭ " "

২১ " "

২১ " "

১ " "

১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার

১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার

২৫ লক্ষ টাকার

৩০ " "

১১ কোটি টাকার

৩০ লক্ষ টাকার

৩৬ " "



## টুকিতাকি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন কারবাইড এ্যাণ্ড কারবন পোর্শেবিশন স্বভাবজ গ্যাস, বাতাস এবং আমোনিয়া হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক নতুন তরল রাসায়নিক যৌগিক তৈয়ারী করিয়াছেন। ফটিকের গ্রায় স্বচ্ছ এই তরল পদার্থটির নাম আক্লোনাইট্রাইল (Acrylonitrile)। ভূগর্ভে পেট্রলের দ্বানকালে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বভাবজ গ্যাস (Natural Gas) পেট্রলের পরিবর্তে বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস সাধারণতঃ হালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। \*\* ইউনিয়ন কারবাইডের দ্বিতীয় তত্ত্ব ডাইনেল (Dyne) আক্লোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী করা হয়। ডাইনেল তত্ত্ব পেজা তুলার জায় নরম, কিন্তু খুবই দৃঢ়। দর্পপ্রকার বস্তুর বয়ন এই তত্ত্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিলাদের পশুলামে (Fur) নির্মিত কোটের নকল কোটগুলিতে ডাইনেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। \*\* আক্লোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী কৃত্রিম রবার জুতার সোল, পেট্রোল সরবরাহের হোস এবং শিল্পে ব্যবহৃত হয় বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই দ্রব্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। আক্লোনাইট্রাইলের সহিত কয়েক প্রকার প্রাণিক মেশান হইলে, নতুন প্রাণিক পদার্থটি 'লক' বা ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারে। ইহা আবহ ও সূক্ষ্ম হয় বলিয়া বেশী দিন টিকে। \*\* এই বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে এই পদার্থ নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সন্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত খেলাধুলার উন্নয়নের জন্ত মোট ১,৫৫,০০৭ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন (ক্রীড়া) শিক্ষণ শিবির স্থাপনের জন্ত ৫৫,৮০৪, মঞ্জুর করা হইয়াছে। \*\* ভারতীয় চিনিকল সমিতির হিসাবে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে যে মরশুম শেষ হইয়াছে সেই মরশুমে ভারত মোট ১৮,৫১,৭৮৪ টন চিনি উৎপন্ন হয়। পূর্ববর্তী মরশুমে মোট উৎপাদন ছিল ১৫,৮৮,৪০০ টন। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন চিনি কল হইতে ১,৫৫,০০ টন চিনি চালান করা হইবে। গত বৎসর একই সময় ১,২৮,০০০ টন চিনি চালান করা হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসান্তিক মরশুমে মোট ১৫,১১,৮০০ টন চিনি (গত মরশুমে ১১,০১,০০০ টন) চালান হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে চিনি কলগুলিতে মোট ১,৭৭,৫০০ টন চিনি মজুদ ছিল। গত মরশুমে একই তারিখে মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল ৫,৩৬,৩০০ টন? \*\* ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী সম্প্রতি ডর্সেটের অন্তর্গত সোয়ানজ ও লুলওয়ার্থ কোডের অনতিদূরে সমুদ্রতলে জরীপকার্য চালান। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সমন্বিত 'সিসলিস' নামক ব্রিটিশ জাহাজ হইতে উক্ত জরীপকার্য চালানো হয়। জরীপের উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রতলের ১০,০০০ ফুট গভীরে অবস্থিত শিলা প্রস্তরাদির প্রকৃতি নিরূপণ করা। \*\* ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী গত ২০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে তৈলের অন্তিম নিরূপক শিলাবিস্তার আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব মিডল্যাণ্ডস অঞ্চলে কিছু কিছু তৈল উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। \*\* হায়দরাবাদের সবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ কলটি স্থাপিত হইবে ভারত সরকার তাহা স্থাপন করার দায়িত্ব জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপর অর্পণ

করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা সরকারী সন্থা হইবে। ইকুর ছিবাড়া হইতে এই কলে কাগজ প্রস্তুত হইবে। এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার জন্ত কর্পোরেশন হইতে বিদেশী কার্যের কারিগরী সাহায্য গ্রহণ করিবেন। \*\* ভারত সরকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁতীরা যাহাতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে এবং তাহাদের কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে, সে জন্তই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্ত ভারত সরকার মাত্রাজ সরকারকে ১৪.৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন। \*\* ১৯৫৬-৫৭ সালে আনুমানিক ৪৭,১৭,০০০ একর জমিতে আখ-চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ববর্তী মরশুমে আখ-চাষ জমির পরিমাণ ছিল ৪০,৩০,০০০ একর। \*\* ভারত সরকারের আমন্ত্রণ এবং কোর্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বস্ত্র শিল্প অভিজ্ঞ তিন জন আমেরিকানের একটি দল জুই ভারত পরিভ্রমণে আসিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁতশিল্পের বণ্টানি বাণিজ্য কি করিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে গুদামর্শ দিবার জন্তই তাহারা আসিতেছেন। \*\* ১৯৫৪ সালে ভারত মোট সাবানের কারখানা ছিল ৫৩টি এবং তাহাতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৬৪২০। তাহাদের বেতন ও মজুরী হিসাবে দেওয়া হইয়াছে ১,২৫ কোটি টাকা। এই সব কারখানায় ১৫,৮৫ কোটি টাকা মূল্যের মোট ৭৮,৭৭৭ টন সাবান উৎপন্ন হইয়াছে। \*\* যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম ও বাণিজ্য দপ্তরের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার কারখানা শ্রমিকগণ প্রতি ঘণ্টার দুই ডলারেরও বেশী মজুরী হিসাবে পাইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর মজুরীর হার এতট উঠেনাই। এই দপ্তরের রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ২০ লক্ষের নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেখানে চাকুরী জীবীর সংখ্যা ৬০.৬ কোটিরও বেশী। \*\* কাগড়ের কল, সূতা-কাটা কল, পাইপের কারখানা তারের গড়ির কারখানা প্রভৃতি কতকগুলি মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণ করিয়া উদ্যোগদিককে স্থায়ীভাবে কর্মে নিযুক্ত করিবার সুবিধা স্থিতির জন্ত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 'মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও ১৬, ৭৪, ০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হইতে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি শিল্পসংস্থাকে ঋণ দেওয়া হইবে।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন

সময় গ্রাণ্ডে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিংস সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

# ছোটদের আসর



## কাঠের খেলনা-শিল্প

নির্মল দত্ত

তোমরা অনেক রকমের খেলনা দেখেছো হয়তো। আমাদের দেশী, অর্থে বাঙলার কাঠের খেলনা যে বাংলা দেশের কুটির মেলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, তা কি জানো? শিশুদের কাছে এর সমাদর টে। বিভিন্ন মেলা-উৎসবে আজও কাঠের খেলনা বিক্রী হয়ে থাকে। এককালে কাঠের খেলনার প্রধান বাজার ছিল পূর্ববঙ্গের লক্ষ্মীসরগুলা এবং বিক্রীও হত যশেট। সচর অপেক্ষা লাক্ষ্মীসরগুলায় এর বাজার ছিল প্রাধান্য। কিন্তু লোকের আর্থিক রহস্যের সাথে সাথে বিশেষ করে প্রাচীন বা সেলুলয়েডের খেলনার পাশক প্রসারের ফলে কাঠের খেলনার চাহিদাও গিয়েছে কমে।



বিক্রীর জন্তে প্রদর্শন

তার ওপর প্রাচীন বা সেলুলয়েডের খেলনা দামেও সস্তা। ফলে, কাঠের খেলনা-শিল্পীদের শুধু অর্থসঙ্কটই দেখা দিয়েছে তা নয়, এই শিল্পটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতেও চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, নলীয়া; দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালোর, মহীশূর ও মাদ্রাজ; উত্তরাঞ্চলের কাশী প্রভৃতি বহু স্থানেই কাঠের খেলনা তৈরী হয়ে থাকে। এর মধ্যে কাশীর কাঠের খেলনারই খ্যাতি বেশী। এককালে ঢাকাত্তেও আত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠের খেলনা তৈরী হত। কুটির-শিল্পে এই খেলনা একটি বিশিষ্ট স্থানও অধিকার করে ছিল এবং বহু ব্যক্তি এই শিল্পটি থেকে জীবিকানির্ভর করত। বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় কাঠের খেলনার একটি বিশিষ্ট স্থানও ছিল।

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু কাঠের খেলনা-শিল্পী পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। এই সকল উদ্বাস্ত-শিল্পীরা কলকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং কাঠের খেলনা তৈরী করে নিজেদের জীবিকানির্ভর করছেন। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এই সব শিল্পীদের এই বৃত্তি থেকে সঠিক জীবিকার ব্যবস্থা হয় না। অনেককে এইজন্মে এই কাজ ছেড়েও দিতে হয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই খেলনার বাজার খুব ভাল নয়। এর ওপর কাশীর কাঠের খেলনাও কলকাতার বাজারে আমদানী হয়ে থাকে। উদ্বাস্ত-শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরাও আছেন। এঁদের উভয়ের মারফৎ যে কাঠের খেলনা তৈরী হয় তা সকল সময়েই যে বিক্রী হয় তাও নয়। কোন বিশেষ মেলা-উৎসবের জন্তে নির্মাতাদের বিক্রীর জন্তে অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমানে কাঠের খেলনা উন্নততর যন্ত্রপাতির দ্বারাও তৈরী হচ্ছে। হাতে কুঁদে তৈরী খেলনার চেয়ে এগুলির পড়তা খরচ অনেক কম হয়। ফলে, হাতে-কুঁদে গীরা খেলনা তৈরী করেন, তাঁরা প্রতিযোগিতায় অবিধা করতে পারছেন না। অনেকের এই খেলনা তৈরীই একমাত্র বৃত্তি। এই কাজ ছেড়ে জীবিকার জন্তে অন্য কিছুও করতে পারেন নি। এঁদের পক্ষে এই কাঠের খেলনা তৈরী করে অন্নসংস্থান করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এবার কাঠের খেলনা তৈরীর প্রধানী সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা যাক। শিমূল ও পিটুলি গাছের কাঠ থেকে এই সব খেলনা তৈরী করতে হয়। প্রধানত ছোট-বড় কাঠখণ্ড থেকে কুঁদে ও কেটে খেলনাগুলি তৈরী হয়ে থাকে। কুঁদে তৈরী করার জন্তে বজ্র সাহায্যে নির্মিত খেলনার চেয়ে এগুলি টেকসইও হয় অনেক বেশী। শিমূল ও পিটুলি গাছের কাঠ নরম হওয়ায় খেলনা তৈরী করতে বিশেষ সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। যে সব খেলনা তৈরী হয় তার মধ্যে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, উট প্রভৃতি বিভিন্ন পশু, বিভিন্ন পাখী, পুরুষ ও নারী প্রভৃতির বিভিন্ন মূর্তিই প্রধান। এগুলি নানান আকারেরও হয়ে থাকে।

যে সাইজ বা যে আকারের খেলনা তৈরী হবে, আলাদা করে, সেই ধরনের একটা কাঠের টুকরো প্রথমে কেটে নিতে হবে। তার পর সেই কাঠকে কুঁদে ও কেটে খেলনার আকার নিয়ে আসতে হয়। এই ভাবে প্রয়োজনীয় খেলনার আকার হয়ে গেলে, এগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয় এবং কাঠের গায়ে (খেলনার আকার তৈরী হবার পর) কোন ছিঁদ্রাদি থাকলে তা পুঁচি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। চুতার মিত্রারা কাঠের জিনিষ তৈরী করতে

নব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে, কার্ঠের খেলনা তৈরী করতে ঠিক সেই যন্ত্রপাতিই প্রয়োজন হয়।

খেলনাগুলো রোঁদে শুকিয়ে নিয়ে বং লাগাতে হয়। রোঁদে কার্ঠের রসটা ম'রে যায় বলে রোঁদে দেওয়ার নিয়ম। রোঁদে হয়ে গেলে মাটির পুতুল বং করার মত এরুণ্ড রং করতে হয়। মে এক রঙা করে নিতে হয়। এক রঙা হ'য়ে গেলে খেলনার জ্ঞতা অমুখারী চোখ, মুখ, গায়ের বং প্রভৃতি চিত্রিত ক'রে তোলা। তার ওপর বং যাতে খেলনার গায়ে ঠিকমত লাগে তার জন্তে তার বার্মিশও খেলনার গায়ে লাগানো হয়ে থাকে। খেলনা গা করতে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও কাজ করে থাকেন। অর্থাৎ বরা কার্ঠ কেটে ও কুঁদে পুতুল বা খেলনার আকারটা করে দেন, মেয়েরা খেলনাগুলো শুকোবার পর পুটি প্রভৃতি লাগিয়ে এক রঙা করেন। উভয়ে এক সাথে কাজ করার ফলে এতে শ্রম লাভের নয় পড়তা খরচটাও কম হয়। আবার কার্ঠ কেটে ও কুঁদে বীরা নাটা তৈরী করেন, তাঁরাই যে সব সময় পুতুলের বং করতে পারেন নয়। বীরা মাটির পুতুল বং ক'রে থাকেন, তাঁদের দ্বারাও কার্ঠের না বং করা হয়ে থাকে।

কার্ঠের খেলনা তৈরী করে শিল্পীরা পাবিত্রমিক বাবদ যা পেয়ে দেন তার একটা বিশেষণ নীচে দেওয়া গেল :—যদি থাকে একটা তৈরী করতে হবে একটু বড় ধরণের। এই হাতী, তৈরী



কার্ঠের খেলনা শিশুদের কাছে কম প্রিয় নয়

করতে কাঠ লাগে প্রায় ১২ টাকা, বং লাগে প্রায় ১২ টাকার মত। আর হাতী বং চিত্রিত করতে মজুরি বাবদ লাগে প্রায় ১০ আনা। এই মোট খরচ আড়াই টাকা। হাতীটি বিক্রী হ'তে পারে মোট ৩০ সাড়ে তিন টাকা। হাতীটি তৈরী করতে পুরো একটি দিন সময় লাগে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, খেলনা শিল্পীরা মোটামুটিভাবে পারিত্রমিক বাবদ দৈনিক এক টাকা রোজগার করতে পারেন। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে, আর্থিক দিক থেকে শিল্পীদের কি অবস্থা!

পশ্চিম বাংলার এই খেলনা-শিল্পীদের তথা শিল্পীদের উন্নতিবিধান করতে হলে এই সব শিল্পীদের সরকারী আর্থিক সাহায্য ও স্বল্প দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে খেলনা তৈরীর ব্যবস্থা হলে পড়তা খরচ ও শ্রম অনেক কম পড়তে পারে। শুধু কুঁদে-খেলনা তৈরীর প্রণালীকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে। পশ্চিম বাংলার বাইরে কি ধরণের খেলনা চলে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ও সেই ধরণের খেলনা তৈরী করে সেই সব অঞ্চলে বিক্রীর জন্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবের প্রসারভাষ্যতাতে হবে।

দ্বিতীয় পক্ষেবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কুটির-শিল্পের বিশেষ উন্নতি বিধান করা হবে, যাতে কুটির-শিল্পের মারফৎ অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। কার্ঠের খেলনা-শিল্পটিও সেই অ্রযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই বিষয়েও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

## মত্যা কাহিনী

### শ্রীকালাপদ কোণ্ডার

রাণীখেত। আধুনিক যন্ত্রসজ্জার ভারবাহী রাণীখেত নয়— ১৮৬১ সালের রাণীখেত।

এশান্ত পর্বতশ্রেণীপাতাকা। বৃক্ষলতাগুণ্ডে আচ্ছাদিত ভগ্নাভিভূজবিরল স্থান। উন্নত, মহান্ হিমালয়ের অন্তর্গত ছোট একটা পাহাড়। পাতের আর সবুজ পাতার সঙ্গে অসিত পর্বতের গভী মিতালি। ছোটো ছোটো দু'একটি কুটির—পাহাড়ী লোকেদের বাসস্থান।



বড় করার আগে

ইজিনিয়ারীং অফিসের সেকেন্ড ক্লাস এক যুবক। কতো জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল তার ঠিক নেই। মির্জাপুর, গোরখপুর নাপুর... এবারে রাণীখোত। সরকারী কাজের রীতিই এই। দলির পর বদলি—উপায় নেই। নৈনিতাল থেকে উত্তরে হল রাণীখোত। ওখানে সেনানিবাস হবে। বন-জঙ্গল কেটে জায়গাটি দস্তারের উপযোগী করে তুলবার জন্য তাঁকে যেতেই হল।

কিন্তু হাতে কাজ খুবই কম। কি করা যায়? নিকটে হিমালয় পাহাড়ের আহবান—শান্ত, শুক, গভীর অথচ সুন্দর। প্রকৃতির নবজ্ঞানবস্তুগত রূপ। মুগ্ধ যুবক বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন হাড থেকে পাহাড়ে।

আচ্ছা, এখানে কোন সাধুটাধু থাকেন কি?—স্বভাব-ধার্মিক বকটি এই প্রশ্ন তুললেন। খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে এ প্রশ্নোপাধা। ছেলেবেলায় এই যুবকটি পদ্মাসন করে নদী তীরে সে থাকতেন। এই সেই যুবক। বহু স্ববি পদরঞ্জে ধন্য, সাধনার গর্ভস্থি নগরাজ হিমালয় তাঁরই সমুখে।

ভূতাত্ত্বিক উত্তর দিল, আছেন। আমাদেরই বাড়ীর পাশে পাহাড়। ই পাহাড়ের গুহার কতো সাধুই তো থাকেন। আমাদের রোগে চারা দেন ওষুধ; ক্ষুধায় দেন অন্ন।

কৌতূহল উদ্দীপিত হল। স্থির হল সাধু দর্শনের দিন। যুবকটিকে পাহাড়ের পথ দেখিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল ভূতাত্ত্বিক।...এগিয়ে ললেন যুবক। গন্তব্যস্থলে বখন পৌঁছলেন তখন শরীর আর ন দুইই ক্রান্ত! গুহার নিকট বসে পড়লেন তিনি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন যুবক। এ কি? এই নির্জন অপরিচিত স্থানে কে তাঁকে নাম ধরে ডাকছে?—আশ্চর্য। তাঁর সমুখে গাড়িয়ে এক সন্ন্যাসী। কেমন করে তিনি তাঁর নাম জানলেন? আকাশে তখন ‘হু’ একটি নক্ষত্র উঠতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার সেই আলো-আঁধারেরে সন্যাসীবদন সন্ন্যাসীর দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন যুবক। কিন্তু মনে তৎপরতা সংশয় এল—না, না এ সন্ন্যাসী নয়, এ ভণ্ড, বৃক্ষক, দস্যু।

সন্ন্যাসী যুবকটির পিতার নাম উচ্চারণ করলেন। আর বললেন, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তো ভণ্ড নই, বৃক্ষক নই।

আবার সেই বিহ্বল করা স্বর। আবার বিস্ময়। কেমন করে মনের কথা জানলেন ইনি? যুবক উত্তর দিলেন, না, মনে পড়ছে না। কখনই দেখিনি আপনাকে। চিনি না, জানি না। কে আপনি?

—কে আমি? এসো দেখবে। এসো গুহার মধ্যে। চিনবে, জানবে।—যুবকটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন বিরাট সেই সন্ন্যাসী যুবক। বললেন, চিনতে পারছো এই আসন? এই বস্তু, কমণ্ডলু, এই ধূনী, এই বাঘছাল? আসনি স্বখনও এখানে?

—না আসি নি। জানি না।

সন্ন্যাসী তখন স্পর্শ করলেন যুবকটির মস্তক। সারা শরীরে বন ভড়িং প্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেলো। তিনি চিনতে পারলেন, এই তাঁর পূর্ব জন্মের সাধনার আসন, এই ধূনী, দণ্ড কমণ্ডলু সকলি চাই। তাঁর আঁত পরিচিত এই গুহা। আর সমুখেরই তাঁর চিত্রাঙ্কিত, চিত্র-পরিচিত গুরুদেব। যুবকটির বর্তমান জন্মের আর পূর্বজন্মের স্মৃতি মিশে সব একাকার হয়ে গেল।

অবীর জানলেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম লুটিয়ে পড়লেন যুবক। তারপর গুরুর নিকট থেকে ক্রিয়ামার্গে দীক্ষা লাভ করলেন তিনি। লুণ্ডপ্রায় যোগধর্মের পুনরুদ্ধার ও প্রচারের এক নবতম অধ্যায়ের সূচনা হল।

—তোমাকে এই ভগ্নেই এখানে আনা হয়েছিলো। সাত দিন পরে আবার তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

সাত দিন পরে সত্যিই তাঁকে পূর্ববঙ্গস্থল দানাপুরে ফিরে যেতে হয়েছিলো।

তোমরা চেনো এই মহাপুরুষদের!—এই তরুণ হলেন “কাশীবাবা” যোগাবতার শ্রীশ্রী শামাচরণ লাতিড়ী, আর এই সন্ন্যাসী তাঁর গুরুদেব ব্রাহ্মক বাবা বা বাবাজী মহারাজ! এঁদেরই কৃপায় ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপ আজ দেবদুর্ভাগ্য ক্রিয়ামার্গ লাভে ধন্য হয়ে উঠছে।

## “রামধনু”

সন্ধ্যা বসাক

তোমরা সকলেই নিশ্চয় ‘রামধনু’ দেখেছ। কিন্তু এই রামধনু কি; বা কেন ওঁটো এটা কি তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না? বাই চোক আজ তোমাদের এই রামধনু সহজেই কিছু বলব।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত শুনে থাকবে যে সূর্যরশ্মি সাতটা রঙের সমিশ্রণে গঠিত। এই রঙগুলির নাম হল, বেগুনী, বননীল, নীল, হরিৎ, পীত, নারঙ্গ আর লোহিত। সূর্য্যের এই সাতটা রঙকে ত্রিফলক কাচ ‘প্রিজমের’ ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

অনেকে হয়ত এটাও লক্ষ্য করে থাকবে যে, বৃষ্টি হওয়ার কিছু আগে বা পরেই সাধারণত ‘রামধনু’ দেখা যায়। এটা হয় কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে, বায়ুমণ্ডলের ভাসমান জলকণাগুলি এখানে ত্রিফলক কাচ ‘প্রিজমের’ কাজ করে। সূর্য্যের জলকণাগুলির আকার বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টির আগে বা পরে, এই জলকণাগুলি আকারে বেশ বড় থাকে। সেই জগ্গেই ‘রামধনু’ এই সময়টোতে দেখতে পাওয়া যায়। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেটা হল এই যে, সূর্য্য দিগন্ত থেকে খুব উঁচুতে থাকলে, ‘রামধনু’ দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক ‘রামধনু’ কেন দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের ভাসমান জলকণাগুলিতে প্রবেশ করে প্রতিসরিত ও বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। প্রতিসরণ কি? তুমি জলের মধ্যে একটা লাঠি বাঁকা ভাবে ডোবায়ে দেখবে যে, ওটা জলের মধ্যে প্রবেশ করছে, সেখান থেকে জলের ভিতরের আলোটুকু উপর দিকে বেঁকে আছে বলে মনে হবে। এটা হয় কেন? এখানেও আলোকের সেই প্রতিসরণ।

জল আর বায়ু হচ্ছে ভিন্নতর মাধ্যম। আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে প্রবেশ করে। আর মাধ্যম হুটোর ঘনত্বও সমান নয়। সেজন্য মাধ্যমে যেখানে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে, অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করে অঙ্গ সরলরেখার গমন করে এলেই আলোকের প্রতিসরণ বলে। রামধনুর বসান্তেও আলোকরশ্মি জলকণার মধ্যে ঠিক এই ভাবেই

প্রতিসরিত হয়। আলোকরশ্মির বিশ্লেষণের কারণ এই যে, সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক ভাবে জলবিন্দুর উপর পড়লে সূর্য্যরশ্মিতে যে সাতটা রঙ আছে, তাদের মধ্যে লাল আলোর পথ সব থেকে কম ও বেগুনি আলোর পথ সব থেকে বেশী পরিবর্তিত হয়। প্রতিসরণ ও বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলি জলবিন্দুর ভিতর পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। দেখা যাক পূর্ণ প্রতিফলন কি?

যখনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পড়ে, যখন আলোকরশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে, প্রতিফলিত হয়। আলোকরশ্মির এই প্রত্যাবর্তনকেই পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

এই পূর্ণ প্রতিফলনের পর সূর্য্যরশ্মি আবার বাতুতে ফিরে আসে এবং ফিরে আসবার সময় জলবিন্দুতে আবার প্রতিসরিত ও বিচ্ছুরিত হয়। সূর্য্যরশ্মি জলবিন্দুতে পূর্ণ প্রতিফলিত হলে, এতে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে রঙগুলি আছে তাদের ক্রমবিক্রাস উল্টে যায়।

জলবিন্দুগুলি থেকে প্রতিফলিত রশ্মি এবং সূর্য্য থেকে আগত রশ্মির সঙ্গে একটা কোণ উৎপন্ন করলে রামধনু দেখা যায়। আর যে বিন্দুগুলি এই কোণ উৎপন্ন করে তারা একটা বৃত্তের উপর সাজান থাকে বলে 'রামধনু' বৃত্তাকার।

## শিল্প-বিচার

### শ্রীমুখারামী পোদ্দামী

বহুদিন আগের কথা। পাকিস্তানে হু'জন চিত্রকর ছিল।

তারা হু'জনেই এত ভাল ছবি আঁকতে পারত যে, কোন জন। শ্রেষ্ঠ তা কেউই হির করতে পারত না। এক বার দেশের লোকেরা, নকশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল,—কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সাব্যস্ত করার জন্য।

এই অভিজ্ঞ ব্যক্তির দল, হু'জন চিত্রকরকেই ডেকে বললেন, ওনলাম তোমরা খুব ভাল ছবি আঁকতে পার। আজ্ঞা, সাত দিন মর দেওরা গেল—হু'জনেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দাও। মরা ছবি দেখে ঠিক করব তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। জী ত? বুঝতেই পারহ শু পুরস্কারই নয় উপরন্তু বশ এক দ্বাও পারে।

চিত্রকরের রাজী হয়ে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে তারা হু'জনে ওয়া-খাওয়া ভুলে, মন-প্রাণ ঢেলে ছবি আঁকতে লুঙ্ক করল। জনেরই শ্রেষ্ঠ হবার সমান ইচ্ছা.....

ক্রমে এক-দুই করে সাত দিন কেটে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে এক প্রাস্তরে তাদের হু'জনের আঁকা দু'খানা ছবি রে আসা হ'ল। লোকে-লোকারণা।

এক চিত্রকর এঁকেছেন, একটি আঙ্গুর গাছ। তাকে সুপক ফলের থলো ঝুলছে। শুনে মনে হচ্ছে এটা ত সাধারণ ছবি। কিন্তু নয়। ছবিটা দেখতে এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে, যনের ধাতুলা এনে আঁকা অঙ্গুর ফল ঠোকরতে লাগল; কারণ তাদের হে গাছ আঁকা ফলগুলো জীবন্ত মনে হয়েছিল। এই দৃষ্ট দেখে এই ভাবল এই ছবিখানার চিত্রকরই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কোন হু নেই এতে।

তারপর এল অন্য চিত্রকরটির ছবি দেখাবার পালা। অভিজ্ঞ অগ্রসর হবার আগেই প্রথম চিত্রকরটি দৌড়ে গেল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ছবিখানা দেখবার জন্য। ভালভাবে দেখবার জন্য, ছবির সামনে টালানো অতি হু'জ পর্দাখানা সরাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এ কি। পর্দা যে এক চুলও নড়ে না। পরে বোঝা গেল—আসল ব্যাপার হচ্ছে ছবির ওপরের পর্দাটা মোটেই আসল পর্দা নয়। ওটা হচ্ছে আঁকা পর্দা। কিন্তু এত হু'জর ভাবে আঁকা হয়েছে যে মনে হচ্ছিল যেন ছবির ওপরে ঝালাছে একটি পূর্ণ সত্যিকারের পর্দা।

দর্শকরা বিম্বয়ে লুঙ্ক। এও কি সম্ভব। অভিজ্ঞ বিচারকদেরও মনের অবস্থা ওঁখব চ। বিচার কয়েকটি, কিছুক্ষণের জন্য হু'জের ধী বন্ধ করতাই ভুলেই গেলেন।

যেন কিছুক্ষণ বাদে সখিং ফিরে এলে, বিচার করা সাব্যস্ত করলেন যে দ্বিতীয় চিত্রকরটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রথম চিত্রকর ভুলিয়েছেন যনের পাখিকে কিন্তু দ্বিতীয় জন ভুলিয়েছেন মাথুকে। মাথুহ হচ্ছে সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ জীবকে যে চিত্রকর চিত্র দিয়ে ভোলাতে পারে—সে যে কত উচ্চরের চিত্রকর তা মা বললেও যোধ হয় সকলে বুঝতে পারবে। অতঃপর দ্বিতীয় চিত্রকরটিই শ্রেষ্ঠ বলে তার দেশের লোকের কাছে গণ্য হ'ল। স্বার্থ বিচার হয়েছিল, কি বল?

ঔৎসর্গিক...

প্রিয় মিষ্টে



জলযোগের

কাটি, কেক ও পেস্ট্রী

পরম সুখিকর



জলযোগ (বেকারি বিভাগ) লি:

লেক-হাউস, গড়িয়াহাট হাউস, চন্দ্রানুপুর, পাক-স্বাস, ভাবনা



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ডি. এচ. লরেন্স

পল দেখল ডয়েস, শক্ত হাতে পাইপটা ধরে ছাই সাধ করছে, ভাব দেখে মনে হয় যেন ওর বিজ্ঞতার সীমা নেই।

‘কত বয়স হ’ল তোমার?’

ডয়েস ওর চোখে চোখ রেখে বলল, ‘উনচল্লিশ।’

ওর পিঙ্গল ছুটি চোখে বার্তার আগা, সে যেন করজোড়ে জীবনে র প্রতিষ্ঠাপাতের স্তম্ভে ভিক্ষা চাইছে। তার অন্তরের টিকে আবার নিজের জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দেবে এমন বন্ধু চার কেউ আছে? কে তাকে দেবে আপন স্নেহের উষ্ণতা, তাকে শেখাবে বলিষ্ঠ পলকেপের গোপন মন্ত্র? পলের মন হুঁচকায় উঠল। বলল, ‘তুমি ভেব না। এখনও তোমার বকমের কিছু ক্ষতি হয়নি। আবার জীবনের গোড়া থেকে হবে নাও দেখি।’

ডয়েসের চোখ স্বকমকিয়ে উঠল। সে বলল, ‘না, আমার। এখনও শুকিয়ে যাচ্ছি। চলবার বেগ এখনও অনেকটাই আছে।’

পল হেসে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ। এখনও আমাদের মন কানার র তরা। আবার আমরা জীবনের পথে পথে ছুটে চলতে।’

এবার চোখাচোখি হ’ল দু’জনার। এক বার চুপি-বিনিময় করেই চোখ নামিয়ে নিল। দু’জনার মনের উজ্জ্বল আবেগ ধরা পড়ল তাঁর কাছেই। তারপর তারা মদের গ্লাসে চুপক বসল। এক টোনে নিয়ে ডয়েস বলল, ‘খুব খাঁটি কথা বলেছ এবার।’

তারপর বানিককণ চুপচাপ। পরে পল বলল, ‘তুমি যেখান ছেড়ে এসেছিলে সেইখান থেকেই অনার্যাসে আবার তুল পাবে। আমি কিছু অস্বস্থি দেখি না।’

ডয়েস হঠাৎ বৃকতে পারল না, বলল, ‘তার নামে তুমি কি

‘হ্যাঁ, বলাহি তোমার ভাড়া। বয় আবার জোড়া দিয়ে নগণ্য কেন।’

ডয়েস হাত মুখ লুকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর মুখ তুলে অদ্ভুত এক ধরণের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। বলল, ‘না, তা হয় না।’

—‘কেন? তুমি নিজে চাও না, তাই বলে?’

—‘তাই হবে।’

দু’জনে নীরবে পাইপ টানতে লাগল। ডয়েস দীর্ঘক্ষণ পাইপটাকে কামড়াচ্ছিল। পল বলল, ‘তুমি কি তাহলে বলতে চাও ওকে তুমি আর চাও না?’

ডয়েস মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে একটা ছবির দিকে চেয়ে বসে রইল। বলল, ‘আমি কিছুই জানি না।’

পল বলল, ‘কিন্তু আমার বিশ্বাস ও তোমাকে ফিরে চায়।’

‘ও, তোমার বিশ্বাস!’ ডয়েস যেন দূর থেকে বিজ্ঞপ করে উঠল।

‘হ্যাঁ। কারণ ও সত্যি সত্যিই কোন দিন আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি—ওর মনে অনেকটা স্বাধীনতা জুড়ে ছিলো তুমি। সেই জন্তেই ও কোন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবে রাজী হয় নি।’

ডয়েস নিঃশব্দে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে, মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। পল বলে চলল, ‘সব মেয়েই এম’ন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে। তারা পাগলের মত কুঁকে পড়ে আমার দিকে, কিন্তু আমার হয়ে থাকতে চায় না। স্বাভাবিকভাবেই আমার হয়ে গেছে, আমার কাছে এলো সে তোমারই।’

তখন ডয়েসের মথেকার বিজয়ী পুরুষটি গর্বেই হাসি হাসল। খুশিতে তার পায়ের পাটি যেন বকমক করে উঠল। বলল, ‘এখন মনে হচ্ছে আমি হয়ত বোকামিই করেছিলাম।’

‘হ্যাঁ, একটু-আটটু নয়, বেশ বড় বকমের বোকামি।’

‘হবে! কিন্তু তাহলে বলতে হয়, তুমি আমার চেয়ে বড় বোকামি ছিলে।’ ওর কথায় এক দিকে ক্ষুণ্ণতা, অন্য দিকে আত্মপ্রসার।

পল বলল, ‘তুমি তাই মনে কর বৃথা?’

আবার দু’জনে চুপচাপ। তারপর পল বলল, ‘বাক বা হবার হ’ল। কাল থেকে আমি ত’ কেটে পড়ছি।’

ডয়েস বলল, ‘বৃকতে পারছি তোমার মতলব।’

এর পর আর কোন কথা হ’ল না দু’জনে। দু’জনারই মনে আবার খুন চেপে উঠবার উপক্রম বেশা দিল। এক জন অন্য জনকে প্রায় এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল।

একই ঘরে বৃমোত দু’জনে। সেদিন রাতে শুতে গিয়ে ডয়েসকে মনে হ’ল ভারী চিন্তামগ্ন। পায়জামা খুলে শুধু সাট গায়ে বিছানার ধারে বসে সে তার নিজের পা ছুটো পর্যবেক্ষণ করছিল। পল জিজ্ঞাসা করল, ‘শুঁত লাগছে না তোমার?’

ডয়েস জবাব দিল, ‘আমি পাংলোকে দেখছি।’

পল বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলল, ‘পায়ের আবার কি হ’ল? ঠিকই ত’ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।’

—‘বাইরে থেকে তাই দেখার বটে। ভিতরে কিন্তু এখনও জল রয়েছে।’

—‘ভাতের কী হ’ল?’

—‘দেখই না এসে।’

# সুন্দর কেশগুচ্ছের গোপন কথা



সুন্দর কেশগুচ্ছ লাভ করতে হলে শুধু কেশের  
যত্ন নিলেই হবে না সঙ্গে সঙ্গে ভাল তেলটিও  
বেছে নিতে হবে।

ক্যালকেমিকো'র ক্যাস্টরল নিয়মিত ব্যবহারে কেশের  
জীবদ্ধি করে, কেশগুচ্ছ বাড়ায় এবং কেশপতন  
নিবারণ করে।

এই মনোরম গন্ধযুক্ত আদর্শ কেশ তৈল পরিশ্রুত  
ক্যাস্টর অয়েল থেকে প্রস্তুত এবং কেশের ঐশ্বর্য  
বাড়াতে অদ্বিতীয়।

৫ ও ১০ আউন্স স্ফুট আকারে পাওয়া যায়।

## ক্যাস্টরল

অতুলনীয় কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫, পশ্চিমা রোড, কলিকাতা-২২

বিচিত্র ধরণের  
নানা কবরী চিত্র  
সম্বলিত পুস্তিকা  
“কেশবতী” চিঠি  
লিখলে বিনামূল্যে  
পাবেন।

অনিচ্ছাসহেও পলকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হ'ল। গিরে খতে হ'ল ডয়েসের পা। ছন্দর গড়ন পায়ের, যেন সোনালী লোমে ওরা ছুটি পা।

ডয়েস পায়ের গোছটা দেখিয়ে বলল, 'এই দিকে কয়ে দেখ। এ দিকে সব হল।'

'কোথায়?'

ডয়েস আঙুল দাবিয়ে পা টিপল। পায়ের চামড়ায় ছোট ছোট দাগের ছবি হয়ে আবার আছে আছে তা মিলিয়ে গেল। পল রেখে গেল, 'ও কিছু নয়।'

— 'তুমি নিজের হাতে পরখ কর।'

পল তাই করল। তেমনটা পড়ল পায়ের। বলল, 'তাই ত?'

— 'একোবারে নই হয়ে গেছে শরীরটা, নয়?'

— 'না, না, এ আর তেমন কি হয়েছে?'

— 'পায়ের এমনশারা হল হলে মাছখটার আর হইল কি?'

পল বলল, 'কেন? এতে কী আর হ'ল? আমারও ত' বুক ঝিল, তাতে কী এমন হয়েছে?' বলে শুয়ে পড়ল গিরে বিছানার।

ডয়েস বলল, 'এ ত' যা হবার হয়েছে। এখন শরীরের বাকী দগাগুলো ঠিক মত থাকলে বাচি।' বলে বাতি নিবিয়ে দিল।

সকালে বুড়ি হচ্ছিল। পল তার জিনিসপত্র ব্যাগে ভর্তি করল।

ক্লের রূপ তখন ধূসর, বিকৃত, ভয়ঙ্কর। পল যেন ক্রমেই জীবনের স্ব স্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে বিবাকী হতে চলেছে। এতেই তার একটা দৈনন্দিক উদ্ভাস।

ষ্টেনে দু'জনেই গেল একসঙ্গে। ক্লার ট্রেন থেকে নেমে দুট বিকেলে সোভানুজি এসে গাঁড়াল তাদের সামনে। পরনে একটা ঐ কোট, আর শক্ত কাপড়ের টুপি। ওর এই অদ্ভুত শাস্ত্র উপাস্ত খ এরা দু'জনেই মনে মনে ওর উপর বিতর্কণ হয়ে উঠল। পল গনের বেড়ার ধারে ওর কর্মসূচী করল। ডয়েস গাঁড়িয়ে বইল পালের পায়ের ঠেস দিয়ে, গাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বুড়ির জন্তে গরকোটের সবগুলো বোতাম সে গলা পর্যন্ত এটে দিয়েছে। মুখ শ, চালচলন সাদাসিধে হলেও ওই মতো একটু যেন অভিজ্ঞতার ণ। পায়ের তখনও সম্পূর্ণ বল পায়নি, তাই কঠোরভাবে এসে সামনে গাল। ক্লার বললে, 'কই, এখনও ত' ঠিক সেরে ওঠ নি দেখছি।'

ডয়েস বলল, 'নয় কেন? চমৎকার আছি আমি এখানে।'

এর পর তিন জনের কারও মুখেই কথা জোগাল না। দু'টি পুরুষ ার সামনে পড়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। পল বলল, 'এখন কি জানুজি বাড়ি যাবে, না অন্য কোথাও যাবে?'

ডয়েস বলল, 'চলো, বাড়িতেই কেয়া থাক।'

হাস্ত্যার পল বইল এক পাশে, মাঝখানে ডয়েস, ক্লার ওপাশে। চলতে চলতে নেহাৎ মাঝুলি কথাবার্তা হ'ল খানিকটা। হাঙ্গরার য় বসবার ঘর। সামনেই একটু দূরে উদ্ভাল সমুদ্রতীরের াস্ত গজ্জন।

পল বড় চেয়ারটা ডয়েসের দিকে ফিরিয়ে দিল। বলল, 'বস হুমি।'

ডয়েস বলল, 'আমার চেয়ার চাই না।'

পল শুনলো না, আবার বলল, 'তুমি বস এখানে।'

ক্লার নিজের জিনিষপত্র খুলে কোঁচের উপর সাজিয়ে রাখল।

দেখে মনে হয় ও একটু যেন ক্লার। চেয়ারে বসল, তাও কেনই খালগোছে, কোনও ভাব একশাল হবার ভোগাই যেন সে দিতে চায় না। পল নীচে ছুটলা বাড়িওয়ালীকে খবর দিতে।

ডয়েসই কথা বলল প্রথম। বলল, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়। আগনের কাছে এসে বোস না কেন।'

ক্লার জবাব দিল, 'না, না, বেশ গরম লাগছে আমার।'

জানাল দিয়ে চেয়ে চেয়ে সে বাইরের বৃষ্টি আর সমুদ্রের রূপ রেখেতে লাগল। তারপর ক্লের করল, 'তুমি ফিরে যাচ্ছ কবে?'

'বোধ হয় কাল। যরগুলো কাল পর্যন্ত ভাড়া-করা হয়েছে কি না; তাই আমাকে থাকতে বলেছে ও। ও নিজে অবশ্য আজ রাতেই ফিরে যাচ্ছে।'

'তুমি যোগ হয় সোমকোটেই যাবে?'

'হ্যাঁ, তাই ত' ভাবছি।'

'পায়ের জোর পেরেছে? কাজ করতে পারবে ত?'

'কাজে লাগব বলই ত' যাচ্ছি।'

'কাজ ঠিক হয়ে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। সোমবার থেকে গিয়ে লাগতে হবে।'

'তোমাকে দেখে ত' খুব স্বস্তি-সবল বলে মনে হয় না?'

'কেন? কি দেখে বলছ?'

ক্লার এ কথাব কোন জবাব না দিয়ে, জানাল দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বইল। তারপর ভিজ্জেন করল, 'ঠিক ঠিক সব চালাতে পারবে?'

'পারব না কেন? পারতেই হবে।'

পল ফিরে এসে দেখল ওরা চুপচাপ বসে আছে। বলল, 'আমি চারটে বুড়ির গাড়িতে বেরছি।'

কেউ কোন জবাব দিল না।

পল ক্লারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার জুতো-জোড়া খুলে ফেল এবার। আমার চট আছে এক জোড়া, তাই পরো।'

ক্লার বলল, 'ধন্যবাদ। আমার জুতো কিন্তু ভেজে নি।'

পল চট-জোড়া বের করে রাখল ওর পায়ের কাছে। ক্লার অজুতবে জাগতে লাগল পলের চট-জোড়ার কথা।

এবার পল গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। দু'টি পুরুষই অজ্ঞ নিরুপায় দিশেতার। দু'জনাই চোখে বিহবল চুটি। ডয়েস তবু অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছে; সে নির্বিকার, কিন্তু পল ক্রমশই নিজের মনের তার আরও চড়া স্বরে বেঁধে নিচ্ছে। ক্লার মনে হ'ল পলকে এত ক্ষুদ্র, এত সাধারণ করে সে আর কোন দিন দেখে নি। ও যেন নিজেকে এক কোণে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। ও হাঁটছে, চড়ছে, জিনিসপত্র গোছাইচ্ছ করছে—কিন্তু সর্বদাই কেমন একটা অস্বাভাবিক ধরনে। নিজেকে ঢেকে রাখতে ওর চেষ্টার যেন অন্ত নেই। পলের অজ্ঞাতসারে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লার মনে হ'ল লোকটার মধ্যে গভীরতা নেই, তাই চিরকাল ও এক দিকে কিংবা অন্য দিকে হেলে পড়ে। এক দিক দিয়ে ওর স্বভাবের তুলনা নেই, এমন আবেগ-ভরা মন ক'জনায় থাকে? সময়ে সময়ে খুশি হলে ওর জীবনের পূর্ণপাত্র থেকে ও ক্লারকে যে অঙ্গুলি ভরে দিয়েছে সে কথা ক্লার জানেনি। কিন্তু



খন ওর কুসুমতা বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে, ওকে মাহু বসে  
না করতেই ইচ্ছে হয় না। তার চেয়ে ডব্বের মধ্যে পুষ্কমালি  
বি অনেক বেশী। আর যাই হোক, ডব্বের কোন দিন ওর মত  
লজা নয়, যে শিক খেতেই বাহাস আশ্রয় সেই দিকেই ঢলে-  
গ ওর স্বভাব নয়। পালের দোষ হল এই যে, ওর কোন ভারকেন্দ্র  
ই, ও বেন সর্বদা নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করে বেড়ায়, দেখে মনে  
ও বড় চপল, তারি ঘিষাচারী। ওর উপর ভর দিয়ে ঠাড়াতে  
যে না কোন মেয়ে—কখন পা ফসকে যায় তার কিংকর্তা  
!। ক্লাস ভেবে পায় না ও এমন ওটিভটি হয়ে নিজেকে ছোট  
রে রাখতে চায় কেন। মনে মনে তার রাগ হয়। ডব্বের হাজার  
ও একটা পুষ্ক মাহু, হেরে গেলেও তার মানতে তার লজা  
!। কিন্তু পল যে কী ধরনের, পরাক্রান্ত হয়েও কোন দিন  
স্বীকার করবে না। সরে সরে বাবে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে,  
হকে মুছে ফেলতে চাইবে, তবু তার স্বীকার করে নেবে না।  
তার উপর খোঁচা ধরে যায় ক্লাস। তবু চেয়ে থাকে ওর দিকেই।  
হতে থাকে বেন এই লোকটির হাতেই তাদের তিন জনের  
বিধানের ভার। কেন, কেন ছোট হয়েও এত শক্তমান ?  
! কেনে ক্লাসের চোখ বেটে জল আসতে থাকে।  
ক্লাস ভাবে, আজকাল পুষ্ক মাহুদের সে ভাল ক'রে বুঝতে  
ছে। আগে ওদের কথা ভেবে যেমন ভয় হ'ত, এখন আর তা  
!। এখন নিজের শক্তিতে তার বিশ্বাস ভাঙছে। আগে  
পুষ্করা বুঝি শুধু নিজের নিয়ে মত থাকে। সে ধারণা

কেটে বাঙালিতে এখন সে হাঁক ছেড়ে বেঁচেছে। জীবনে অনেক  
কিছু শিখে নিয়েছে সে—যার বেশী শেখবার আকাঙ্ক্ষা তার নেই।  
তার জীবনপাত্র কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। নিজের উপর এর  
বেশী বোঝা চাপারার সামর্থ্য তার নেই। এখন পল যদি বিদায়  
নিয়ে চলে যায়, তা'হলে খুব বেশী দুঃখ তার হবে না।

বাঙালি-বাঙালীর সময় বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না। তবু  
ক্লাসের বুঝতে বাকী রইল না, পল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তাদের  
গতী থেকে। ক্লাসকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে যাতে সে ইচ্ছে করলে  
তার স্বামীর কাছে কিংরে যেতে পারে। এতেই ক্লাসের রাগ হ'ল  
বেশী। লোকটার ঘন এত ছোট সে জানত না। নিজের মতটুকু  
নেবার সব নিয়ে এখন সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছে। রাগে  
তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। একটা বাঘের জন্তেও মনে  
পড়ল না যে তার নিজের কামনাও এতে পরিত্যক্ত হয়েছ, আর মনে  
মনে নিজেকে সে চেয়েছে বেন পল তাকে ফিরিয়ে দেয়।

পালের মনটা বেন পাকানো কাগজের মত বিস্কৃত হয়ে উঠেছে ;  
নিজের দুর্বল একাকী পীড়ন করছে তাকে। এতদিন মা ছিলেন  
তার প্রাণের প্রহরী। মায়ের দিকেই ছিল তার প্রাণের টান।  
দু'জনে বেন একযোগে পৃথিবীর পথে ভ্রমণ করছিলেন। এখন মা  
নেই, পালের জীবনে তাই ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে  
মৃত্যুর টানে সে আস্তে আস্তে জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য  
হচ্ছে। সাহাব্যের তার বড় প্রয়োজন, কিন্তু নিজে থেকে কে তাকে  
সাহাব্য করতে আসবে ? মৃত্যুর এই দুর্বীর আকর্ষণে মায়ের পথ



## পিউরিটি বার্লি শিশুদের এত প্রিয় কেন ?

কারণ পিউরিটি বার্লি

- ১) খাটি গরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুরা খুব সহজেই  
দুধ হজম করতে পারে।
- ২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে  
ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বালিশস্ত্রের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।
- ৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীলকরী কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাটি ও  
টাইট থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

## পিউরিটি

ভারত এট বার্লিন ফার্মাক

য়ে পারে তাকে চলে যেতে হয়, সেই ডয়ে পল আজকাল সর্বদা চেতন হয়ে থাকে, ছোটখাটো জিনিসগুলি আগের মত আর তাকে বঁধে রাখতে পারে না। পল জানে, ক্লারা তার উপর নির্ভর করতে পারে না। ক্লারা তাকে কামনা করে, কিন্তু তাকে বুঝতে চায় না। পল চায় তার বাইরের খোলোসটাকে, তার ভিতরের যে মাছুষটা জ্ঞান আকুলিকুলি করছে, তার সঙ্গে ক্লারার কোন পরিচয় নেই, রিচর করতে সে চায়ও না। এত ভাব ক্লারা সইতেই পারবে না। গ্লারার উপর নিজের বেদনার বোকা চাপাতে ছিঁচা হয় বলেই পল কুচিঁত হয়ে থাকে। সে জানে, যে-যুটি দিয়ে জীবনকে সে আঁকড়ে রেখেছিল, সে-যুটি তাব শিথিল হয়ে এসেছে, তাকে ধরে রাখবার হুঁই নেই, সে যেন চাষার মত অবাস্তব, এই প্রতিদিনকার ক্ষান্তে বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই তার নেই। সেই জন্তেই তার লজ্জা। সেই জন্তেই নিজেকে সে আড়াল করে রাখতে চায়। এই বলে সে হার মানে নি। এত সহজে জীবনকে ছেড়ে বার ইচ্ছে তার নেই। অথচ মৃত্যুকেও সে ভয় করে না। হুঁই তাকে সাচারা করতে আশ্রুক আর না আশ্রুক, সে একাই ধ ধরে এগিয়ে চলে।

ডয়েস এক সময়ে গভাতে গভাতে জীবনের প্রান্তে গিয়ে পড়েছিল, তখন তার মন কঁপে উঠেছিল তখন। মৃত্যুর কিনারা থেকে ফিরে এসেছে ভয় পেয়ে, সব অসম্মান শিরোধার্য করে, যে তাকে। এক মুঠা দিতে চেষ্টা, তার কাছ থেকেই হাত পেতে নিতে তার বাধে নি। অবশ্য এর মধ্যেও এক ধরণের পৌরুষ আছে। তা তা দেখেছিল। দেখেছিল হেরে গিয়ে হার স্বীকার করতেও জা পায়নি। হুঁহাত মেলে সাহায্য চাইতেও কুঠা বোধ করেনি দিন। সেই সাহায্যটুকু ওকে দিতে পারবে ক্লারা, এ তার ঘাতীত নয়।

দেখতে দেখতে বেলা বাজল তিনটে। পল আবার ক্লারাকে গিয়ে ল, 'আমি চারটে কুড়ির গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি কি সেই সঙ্গে য, না পরে আসবে ?'

ক্লারা বলল, 'জানি না।'

পল বলল, 'আমাকে নটিংহামে সওয়া সাতটার সময় বাবার সঙ্গে আসতে হবে।'

ক্লারা বলল, 'তা'হলে আমি পরেই যাব।'

ডয়েস যেন এতকণ খাড়া হয়ে বসে স্তনছিল, এবার নড়েচড়ে বসল। সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে হইল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে হইল ঘরের দিকে।

পল বলল, 'কোণের টেবিলে বই আছে দু'-একখানা। আমার পড়া হয়ে গেছে, তুমি পড়তে পার।'

চারটে বাজতে পল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'পরে আবার দেখা করব তোমাদের সঙ্গে।'

ডয়েস বলল, 'তা ত' করবেই। তার তোমার টাষাটা—সেটা একদিন ফেরত দিতে পারব—দেখা যাক কী হয়।'

পল হেসে বলল, 'তার জন্তে আমি নিজে থেকেই এসে তাগির দেব, দেখো।' তাৎপর্য ক্লারাকে বিদায় সঙ্কল্প জানাতে গেল পল। ক্লারা ক্রমবর্ধন করে শেষ বাতের মত চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। থোবা দু'টি চোখে নিজের দীনতার স্বীকৃতি।

পল চলে গেল। স্বামি-স্ত্রী দুজনে ঘরে এসে বসল। ডয়েস বলল, 'এমনি দিনে কেউ ঘর ছেড়ে বেরায় ? যা জল-বাদা হয়েছে আজ।'

ক্লারা সম্ভিস্ত 'হু' দিয়ে স্বামীর কথা মর্থন করল। সন্ধ্যা পৃথক নানা বিখরে 'গল্প হ'ল হু'জনার। বাড়িওয়ালী চা দিয়ে গেলেন। ডয়েসকে না ডাকতেই সে চেয়ার নিয়ে উঠে এলো টেবিলের ধারে, সে আজ একধারে স্বামী এবং গৃহকর্তা। টেবিলে বসে উৎসুক নেত্রে নিজের পেয়ালাটির ভাঙা প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্লারা খাবার সাজিয়ে দিল ওকে, একবার ভিজ্জেন করল না কী সে খায়, কী সে খেতে চায়। সে যে জী, খাবার সাজিয়ে দেওয়াটা যেন তার নিত্যকার ব্যাপার।

চায়ের পর ডয়েস আবার গিয়ে বসল জানালার ধারে। তখন ছ'টা বেজেছে। বাইরে সব অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে। বলল, 'দেখো, এখনও বৃষ্টি খামবার নাম নেই।'

'তাই তো।' ক্লারা বলল উত্তরে।

ডয়েস পরের কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করল। বলল, 'তা'হলে—আজ রাতে তুমি আর যাচ্ছ না ত ?'

ক্লারা জবাব দিল না। ডয়েসের আবুলতা বাড়তে লাগল। বলল, 'এতো বৃষ্টিতে আমি অন্তত পথে বেরুই না।'

ক্লারার মুখ ফুটল। ভিজ্জেন করল, 'তুমি কি চাও আমি থেকে বাই ?'

ডয়েসের সারা শরীর কঁপে উঠল যেন। বলল, 'হ্যাঁ, চাই।'

ডয়েস সামনের দিকে চেয়ে বসেছিল। ক্লারা উঠে আস্তে আস্তে ওর কাছে গেল। ডয়েসও মুখ ফিরিয়ে অনেক ইতস্তত করে পাড়ল এসে ওর সামনে। ক্লারার হাত দুটি পেছনের দিকে; পাড়িয়ে সে অপলক চোখে ডয়েসকে দেখতে লাগল। তার চোখে কী যেন নাম-না-জানা রহস্য। বলল, 'সত্যি তুমি আমাকে চাও বাস্কাটার ?'

ডয়েসের গলা কঁপে গেল। ভারী গলায় সে বলল, 'তুমি ফিরে আসতে চাও আমার কাছে ?'

ক্লারার গলা থেকে বেরল শুধু একটা আন্তরিকতার স্বর। হুঁহাত মেলে সে কাঁপিয়ে পড়ল ডয়েসের বুকে। ডয়েস ওর কাঁধে মাথা রেখে নিজের বুকে আঁকড়ে রাখল ওকে। ক্লারা ওর কানে গুঞ্জন করে উঠল, 'এবার তুমি নাও আমাকে। নাও, ওগা নাও।' ওর ঘন কানো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্লারার সঙ্গে হারবার উপক্রম

**টোলএও কোম্পানির**

**দাদ ও কার্ডের মলম**

**ক্রিউটা-টোন**

**নিম্ন মলম**

পোড়া বেনজিন ও  
চর্মরোগের জন্য

রোগ-সীলক ও  
স্বপ্নঘনিষ্ঠ

ব্রহ্মানগর • কলিকাতা-৩৫

# আসছে! এই ডবল ঢাকনা

## দেওয়া নতুন টিন

### ডালডাকে সম্মুখ খাঁটী

### ও তাজা রাখে



- **বিসুদ্ধ ও তাজা** ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন— কারণ টিনে বায়ু-রোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
- **বিসুদ্ধ ও তাজা** ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসে বাইরের ঢাকনাটি ডালডাকে সব দাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- ▶ **খুলতেও কি সুবিধে** খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
- ▶ **পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে**— ডাল টিনি মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো নিজাই খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ এবং ১০ পাউণ্ড ৩ টিনে পাওয়া যায়  
 • এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

**ডাল ডা মার্কা বনস্বতি**

ওয়েস ওকে টেনে নিল, আবার নিল, ছল-ছল চোখে  
লল, "আবার তুমি এসে আমার কাছে?"

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রা স্বামীর সঙ্গে দেখিত কিরল। এর পর তার সঙ্গে  
আর দেখা হয়নি বললেও চলে। মোরেল আবার আগের  
এক বে বিপদ তার উপর দিয়ে গেছে তাতেও তার কোন  
নি হয়নি। বাপ আর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।  
কেনই এইটুকু চায় যেন বড় বকমের কোন অভাব তাদের  
না বোধ করতে হয়। বাড়িতে সবার চালাবার লোক  
নই। তাছাড়া বাড়টাকে খুব কাঁকা-কাঁকা ঢেকে। সেইজন্তে  
টিং-ছাটাই বাসা করে চলে গেল। মোরেল বেটীউড়ে এক  
গড়িতে গিয়ে শান্তানা গাড়ল।

সেইর সব স্বপ্ন যেন চুম্বার হয়ে গেছে। ছবি আঁকতে ইচ্ছে  
না। মায়ের মৃত্যুর দিন যে ছবিটি আঁকেছিল, সেই তার  
ছবি। ছবিটি আঁকে তৃপ্তি হয়েছিল তার। এখন কাজে  
জারীর কথা মনেও পড়ে না। বাড়িতে এসে তুলি হাতে  
নিত্যও বিরক্তি লাগে। আঁবনে আর কিছুই তার রইল না।  
হাজেই সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোই এখন তার  
। মাকে মাঝে মদের দোকানে যায়, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের  
হঁচকে করে। কিন্তু এতে তার শ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।

এইর পরিত্যক্ত-সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুস্তা করে, "মেয়েদের দেখলেই  
বেঁচে কথা বলে, তবু তার কালো চোখে একটা তীব্র আলো,  
দী একটা জিনিস সে অনবরত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চারি দিকের পৃথিবীই যেন বদলে গেছে। সব কিছু নিরর্থক  
মনে হয়। কেন এই লোকগুলো হান্ধা দিয়ে হেঁটে চলেছে,  
পথের ছাঁধের সারি সাড়ি বাড়ি মাথা ভুলে উঠেছে, কেন  
জগতটাই শূন্য, কাঁকা হয়ে রইল না, এই সব বস্তুপুঞ্জ কার  
মাজে লাগছে, এই নিয়ে মাথা ঝামাতে তার ভাল লাগে।  
ছবি বারো আসে, তারা গুর সঙ্গে গল্পগুস্তা করে। পল শব্দগুলো  
ন, জবাবও দেয়। কিন্তু এই আওয়াজগুলো কোন দিন যদি না  
ত তাইলে কার কী ক্ষতি হ'ত পল জেবে পায় না।

নিজেকে সে কিরে পায়; হয় যখন একা থাকে নয়ত যখন  
খানার কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়। কারখানার  
নয় কথা ভুলে বেতে হয়, চৈতন্যের এক বিশৃঙ্খল তার অবশিষ্ট  
না। কিন্তু এই বিরতি স্থায়ী হবার নয়। সেবে তার  
লাগে, চার পাশের সব জিনিস যেন অশ্রু-ধোঁয়ার মত হয়ে  
ছে। প্রথম বেশির শিশির পড়তে আরম্ভ করল পল দেখল  
। কুরানার বুক মুক্তার মত বিনু-বিনু শিশিরকাণ্ড। এক  
র এই দৃশ্য তার বুক ভুলে উঠতে চাইত। কিন্তু আজ এদের  
ও তার কাছে হারিয়ে গেছে। আর কয়েক দুই পেরেই  
শরৎকালি শুকিয়ে যাবে, তাদের জায়গার জেগে থাকবে শুষ্ক  
জল শূন্যতা। বড় বড় ঝাঁপড়াগুলো অনবরত বাওয়া-আসা  
ছে—রাত্রের বেলা আলো-হালোয় কলমল। পল ভাবতে  
ক, আশ্চর্য! কেন এরা একবার আসছে একবার যাচ্ছে?  
নরকার এদের বাওয়া-আসার? এগুলো না থাকলেই বা কী

তবু রাত্রির পাঁচ অকারণটিকেই পল সত্য বলে অনুভব করতে  
পারে। এ যেন সব কিছু যোগে দিগন্ত জুড়ে এসে পীড়ার, এর  
বুকে কী সুগভীর শান্তি। এর হাতে আশ্রয়কে ভুলে দেওয়া কিছু  
কঠিন নয়, এই সব জেবে কঠিন পথ। হঠাৎ এক টুকরো কাগজ  
তার পায়ের কাছে উড়ে আসে, আবার বাতানে উড়ে চলে যায়।  
পল ধমকে পাড়িয়ে পড়ে, তার মুঠি আপনা থেকেই পাকিয়ে ওঠে,  
তীব্র বেগনার লাহনে আশ্রয়মস্তক জগতে থাকে। চোখে ভেসে  
ওঠে সেই পরিচিত ঘরটি, তার মায়ের ছবি, সেই ছুটি নীল চোখ।  
নিজের অভ্যন্তরেই কখন যে সে মায়ের কথা ভাবতে শুরু করেছিল।  
এই কাগজের টুকরোটি তার সুখের ভেতর দিয়ে মনে করিয়ে দিল,  
মা আর নেই। কিন্তু এই ত' সে মায়ের সঙ্গে কয়েক দুই কাটিয়ে  
এল। কোন মায়ামাত্র বলে দুইদুইগুলোকে কি যবে রাখা যায় না?  
মনে মনে চাইতে লাগল সপ্নের স্রোত যেন রক্ত হর হর, যেন  
মায়ের সঙ্গ কিরে পাওয়া আবার তার ভাগ্যে ঘটবে।

দিন কেটে বেতে থাকে। সপ্তাহগুলো গড়িয়ে চলে। সব  
কিছু যেন জেগের আশ্রয়ে পুড়ে একাকার হয়ে গেছে, তাদের স্বভাব  
সভা বলে কিছু নেই। একটা দিন অবিকল আর একটা দিনের  
মত। একটা সপ্তাহ ঠিক আর একটা সপ্তাহের মত। একটা  
জায়গার সঙ্গে অন্য একটা জায়গার কী তফাৎ তাও আর তার  
চেতনার ধরা পড়ে না। একটা ছবি যেন সেপে-পুঁছে একাকার  
হয়ে গেছে, কোন একটা রেখাকে আলাদা করে ধরা অসম্ভব!  
মাকে মাঝে একসঙ্গে অনেককাল অবধি তার চেতনা লুপ্ত হয়ে থাকে,  
তখন কি করে যে কাটিয়েছে তাও তার মনে থাকে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পল বাসার ফিরে এলো একটু স্নেহ করে।  
ঘরের আগুন জ্বল-জ্বল জ্বলছে; অস্ত্র সবাই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে।  
পল আরও কিছু করলো আগুন চাপিয়ে টেবিলের দিকে একবার চেয়ে  
দ্বির করল, রাগে আর খাবার-দাবার দরকার নেই। তার পর বদল  
এল হাভলওয়ালা চেয়ারটাতে। চারি দিক নিস্তব্ধ। পলের  
চেতনাও অবলুপ্ত-প্রায়। তবু তার মধ্যে বেগল চিমনি দিয়ে খোঁয়া  
উঠছে। একটু পরে ছুটি ইঁহর বেরিয়ে এল কঠিন টুকরোগুলো নিয়ে  
কামড়া কামড়ি শুরু করল। পল সব কিছু দেখছে, দেখেও সে যেন  
এ হাফো নেই, সে যেন বহু দূরে। ক্রমে গিঞ্জের ঘড়িতে ছুটো  
যাঙ্গল। অনেক ঘুরে ষট-খটো-খটো আগুলাজ করে একটা রেলপাড়ি  
চলে গেল। পাড়িগুলো গেল অবশ্য খুব দূর দিয়ে নয়—বরাবর যে পথ  
দিয়ে যায় সেই পথেই গেল। কিন্তু পল নিজেই যে আশ্রয় বহু দূরে?  
হাত বাড়তে লাগল। ইঁহর ছুটো বহুদূর তার চিট-জোঁড়ার  
উপর দিয়ে লাকিয়ে যাচ্ছে। পলের ক্রন্দনও নেই। হাত ভুলে  
ইঁহরগুলোকে তাড়ায়ে, সেটুকু ক্ষমতাও যেন নেই তার। সে যে কিছু  
ভাবছিল তাও নয়। তবু এমনি ভাবে থেকেই যেন একটু স্বস্তি বোধ  
করছিল। কোন কিছু জানতে হলে, ব্যতীত হলে, তার অনেক  
অনুবিধা। এরই মধ্যে থেকে থেকে আর একটা চিন্তা মনের দোরে  
এলে হানা দিচ্ছিল, আর এক একবার বিভ্র-বিড় করে সে ব'কে  
উঠছিল, 'এ কি। এ আমি বকছি কী?'

তার পরে সেই আশ্রয়-বস্ত্র অবস্থার মধ্যেই উত্তর আগছিল,  
'নিজেকে ভিলে ভিলে হত্যা করছ তুমি।' [ আগামী বারে শেষ হবে।  
অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধরেশ তর্কচাৰ্য্য ]

# সিরোলিন

কেবল যে 'কাশি  
থামিয়ে দেয়' তা নয়  
—একেবারে জড় থেকে  
দূর করে



সিরোলিন কাশির বীজাণু-  
গুলোকে ধ্বংস করে



কাশি হ'লেই বিপদ। কাশতে শুরু  
করলে বুঝবেন, আপনার গলা  
ও ফুসফুসের কোমল ঝিল্লীতে প্রদাহ  
হয়েছে, ফুলে উঠেছে। কাজেই,  
আপনার এমন ওষুধ চাই যা শুধু  
'কাশি থামিয়ে দেয়' না, একেবারে  
জড় থেকে দূর করে।

সিরোলিন দু'টি উপায়ে কাশির  
গোড়ায় ঘা দেয়। প্রথমতঃ বীজাণু-  
গুলোকে ধ্বংস করে, রোগ আর  
বাড়তে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, বুকের  
জমাট স্লেম্মা সহজে বা'র করে দিয়ে  
খুব শীগ্গির সত্যিকার আরাম  
দেয়। সিরোলিন-এ এফিড্রিন নেই।

## নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ

বাড়ীর সবাই নির্ভয়ে সিরোলিন খেতে পারে —  
ছোটদেরও খাওয়ারো যায়, কেননা সিরোলিন-এ  
ক্ষতিকারক কোন ওষুধ বা মাদকদ্রব্য নেই।  
এর মিষ্টি গন্ধ ছোটদের খুব প্রিয়। সব সময়ে  
বাড়ীতে এক শিশি রাখবেন।



**সিরোলিন**  
'কণ্ঠ'



# বিজ্ঞান বাণী\*

পঞ্চম মিশ্র

দ্বিত্ববর্ষে প্রথম পরমাণুচুল্লী নির্মাণ করার সুবাদ পত্রিকা  
মারফৎ আপনাদের নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে  
কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

১০ ডিটেনের পরমাণু শক্তি বিদ্যক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ  
প্রস্তুত ইউরেনিয়াম—২৩৫এ তে সমৃদ্ধ ধাতু, এই পরমাণু  
ব্যবহার করা হয়। এই ইউরেনিয়াম ধাতু অ্যালুমিনিয়ামের  
মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয় একটি বিশেষ ধরণের  
ধাতু। ঐ মিশ্র ধাতুর (এক সেন্টিমিটারের গড়ে প্রায়  
কম্পাশ চওড়া) নিশ্চিত পাত, কার্বন কাঠামোর বসিয়ে  
। ডুবিয়ে দেওয়া হয় জলে। জলের এখানে দু'টি  
—পরমাণুচুল্লীর প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং বিজ্জ্বলিত নিউট্রন  
ধামা রাখার হাত থেকে কণ্ঠরত বিজ্ঞানীদের রক্ষা করা।  
পরমাণুচুল্লীকে কার্যকরী করার জন্য ৩ কিলোগ্রামের সামান্য  
বেশী ইউরেনিয়াম—২৩৫ প্রয়োজন হয়। যে

নিয়াম এতে ব্যবহার করা হয় তাতে শতকরা  
থেকে ২০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ২৩৫ থাকে। এই পরমাণু  
চালানোর শক্তির উপরই নির্ভর করবে, পরমাণু চালানীর উপর  
। উচ্চতা কতোখানি রাখতে হবে। ঠাণ্ডা রাখার জন্য সর্বদাই  
। সঞ্চালন প্রয়োজন। পরমাণুচুল্লীর আলানী, জলের মধ্যে  
নি থাকে বলে এই চুল্লীকে 'হুইমিং পুল' শ্রেণীর চুল্লী বলে।  
ইং পুল শ্রেণীর চুল্লীর বিশেষ সুবিধে এই যে, শতকরা ২ ভাগ  
তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে একে যদি ফেলে রাখা হয় তাহলেও বিশেষ  
। হয় না। বেশী শক্তি সঞ্চালিত হলেই জল তাড়াতাড়ি গরম  
চুল্লীর আলানীর গ্রেটের গায়ে বাষ্প সৃষ্টি করে সমস্ত  
দুগ্ধকেই মন্দীভূত করে দেয়, জল ফোটায় সঙ্গেই তেজবিক্রমকারী  
ক্ষয় বায় বন্ধ হয়ে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কার্যকরী পরমাণু  
নির্মাণ, আমাদের জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয়  
।। পরমাণুচুল্লী নির্মাণ করতে খরচ পাড়ছে ২৫ থেকে ৩০  
। টাকা মতো। ভারতীয় পরমাণুবিজ্ঞানীদের প্রথম সাফল্য  
ধর মিশ্র তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বহু দিন ধরেই বিজ্ঞানীরা সূর্যশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য  
আশ্রয় চেষ্টা করছেন। পরীক্ষার ফলাফল নানা দিক দিয়ে  
আশার সঞ্চার করলেও নিয়মিত ভাবে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার  
মতো সৌরশক্তি সংগ্রহের কোন কেন্দ্র আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয় নি।  
সম্প্রতি সুবাসে প্রকাশ যে, আর্জেন্টিনার আগুয়াট সনতলভূমিতে  
পৃথিবীর সর্বপ্রথম সৌরবিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা  
হচ্ছে। এই স্থানে পতিত সৌররশ্মির প্রাচুর্য্য এবং প্রস্থতা  
সোভিয়েট অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হওয়ার জন্য, বিজ্ঞানীরা  
এই স্থানটিকেই পছন্দ করেছেন। সৌরবিদ্যুৎ শক্তির বেশি  
হবে বৃত্তাকার, এই বৃত্তের ব্যাস প্রায় ১৪০০ গজ। সূর্যরশ্মি  
সংগ্রহকারী আয়নাতে বাতে ধূলাবালি না পড়ে তাই সমস্ত অঞ্চলটি  
গাছপালা দিয়ে ঢাকা থাকবে। অঞ্চলটির কেন্দ্রে অবস্থিত প্রায়  
১৩০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ বাষ্পীয় বয়লারের সাহায্যে ঘোরান হবে।  
বাষ্পীয় বয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্প সূর্যরশ্মির দ্বারাষ্ট গরম  
করা হবে। প্রতি ঘণ্টায় বাষ্প প্রস্তুত হবে প্রায় ১১ টন এবং  
এর চাপ হবে ৩০ আটমসফিয়ারের কাছাকাছি। বাষ্প প্রস্তুত  
হওয়ার পর পাইপের সাহায্যে যাত্রা করবে ১২০০ কিলোগ্রামের  
একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের টারবাইনের দিকে।

এই সৌরবিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্রে কার্যকরী আয়োজন কি হবে,  
তার সামান্য পরিচয় এখানে দিচ্ছি। স্তম্ভের চতুর্দিকে প্রায় ২৩টা  
গোলাকার রেলপথ থাকবে এবং তাতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেনসমূহ বহন  
করবে প্রায় ১২১৩ খানা বড় আয়না। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে  
তার আলো পড়বে এসে ফটোসেলের উপর, ফটোসেল স্বয়ংক্রিয়  
ট্রেনের সুইচ দেবে টেনে এবং তৎক্ষণাত্ গাড়ীগুলি চলতে আরম্ভ  
করবে। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে আয়নাগুলি সর্বদাই সূর্যের দিকে  
মুখ করে থাকবে এবং তাদের সকলের প্রতিফলিত কেন্দ্রীভূত আলো  
পড়বে তলাকার ঐ বাষ্পীয় বয়লারের উপর। সমস্ত আয়নাগুলিতে  
মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার স্কোয়ার ফুট স্থানের সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত  
হবে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, কেবলমাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে  
লেখবার জন্যই নয়, কৃষিশিল্পে ব্যবহারের জন্য সৌরবিদ্যুৎএর এই  
কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এই শক্তি দিয়ে নীচু জমির মাটির  
তলাকার জল কৃষিক্ষেত্রে সেচন করা হবে। বিজ্ঞানীরা আশা  
করেন, জলসেচনের ফলে ঐ অঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার একর জমিকে  
কৃষিবোধ্য করা সম্ভব হবে। সমস্ত পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন  
সোভিয়েট দেশের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর পাণ্ডুরার ইনজিনিয়ারিং  
ইনস্টিটিউট—তাঁরা আশা করেন, এই বিদ্যুৎ শক্তি সাধারণ  
নাগরিকদের বাস করার জন্য সুখকর পরিবেশ রচনারও সহায়তা  
করবে।

গভীর সমুদ্রে শ্রোতের গতিবেগ নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা এক  
কঠিন সমস্যা। সম্প্রতি জাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফি  
বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. সোয়ালো সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে নির্দিষ্ট ভাবে  
শ্রোতের গতিবেগ নির্ধারণকল্পে এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন  
বলে জানা গিয়াছে। একটি বিশেষ ভাবে নির্মিত ক্যারেন্ট মিটার  
নির্দিষ্ট উপায়ে জলমধ্যে সংস্থাপনের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে শ্রোতের  
গতিবেগ নির্ধারণ করা হয়।

পরমাণুকে কি আপনি দেখতে চান? এত দিন স্বপ্নের দ্বারা থাকার পরমাণুর আপনা ছবি তোলা, বেত, কিছু এখন সব পুঁই পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে। পেনসিলভানিয়া ষ্টেট ইন্সটিটিউটের পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক আরউইন শুলার, পদার্থের মৌলিক পরমাণুর সংস্থাপন পরীক্ষণ করবার জন্য একটি শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেছেন। বস্তুটি সম্পূর্ণ ভাবে দ্বারা প্রস্তুত এবং এ প্রতি সেন্টিমিটারে ৫০ লক্ষ ভোল্ট ফিল্ড এতে কাজ করে। দুটো খারমস্ বোতল, একটার মধ্যে টিকে রাখলে যেমন দেখায়, শক্তিশালী বস্তুটি ঠিক সেই রকম ত। নিম্ন উত্তাপে কাজ করবার জন্য এই মাইক্রোস্কোপে তরল সারবরাহ করার ব্যবস্থাও আছে। বাতাস-শূন্য স্থানে থাকে ট্যাক্সটোন তার, এবং যে বস্তুটির পরমাণুর সংস্থাপন পরীক্ষণ হবে তা অবস্থান করে এ তারটির ডগায়। ডগাটির উপরিভাগের গিয়ে পরে একটি উল্ভাবী পর্দার। হিলিয়ামের সহায়তায় এ বী পর্দার উপর বস্তুটির পরমাণু কাঠামোর ছায়ায় সৃষ্টি ঘটে।

### ফ্রেডারিক সডি

বিশ শতাব্দীর অন্তিম শ্রেষ্ঠ রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রেডারিক সডি ৭১ বছর বয়সে গত ২১শে সেপ্টেম্বর ইলঙ্গে ব্রাইটনের গাভালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গভীর প্রকৃতির সঙ্গে আমরা চিরমরণীয় বিজ্ঞানীর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি। বিজ্ঞানী সডি, ১৮৭৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, সাসেক্সের ইস্টবার্গে প্রত্ন করেন। তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছিল সাসেক্স, লস এবং সার্সশেবে অক্সফোর্ডের শিক্ষায়ত্তগুলিতে। ছাত্রজীবন শু করে ফ্রেডারিক সডি, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে নষ্ট্রেটরের পদ গ্রহণ করেন।

ম্যাকগিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরই সডির বিজ্ঞান যণার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসে, এখানেই তিনি বী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডের সহকর্মী হবার সুযোগ পান। বেকারেল এবং মাদাম কুরির আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়তা ও ত্রিক্রিয় পদার্থ সমূহ তখন বিজ্ঞান-জগতে এক বিরাট লাড়নের সৃষ্টি করেছে, পরমাণুর অখণ্ডতার বিষয়ে সকলের া জেগেছে প্রশ্ন,—রাদারফোর্ড ও সডি এক ষোগে এই নবাবিস্কৃত ায়ের গবেষণায় মনোযোগ দিলেন। উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মান পরমাণু যুগের সেই অতি লৈশবে প্রমাণিত হলো যে, ত্রিক্রিয় পদার্থ সমূহ সর্বদাই আলকা বস্তু, বিটায়মি প্রভৃতি ছুরণ করে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

এর পরই বিজ্ঞানী সডির নাম সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে পড়লো। ছুদিনের মধ্যেই তিনি রাদারফোর্ডের সঙ্গ পরিত্যাগ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সার উইলিয়াম রামসেজের সঙ্গে বরণ করবার জন্য লণ্ডন চলে আসেন। এইখানেই তিনি পদার্থের ত্রিক্রিয়তা থেকে হিলিয়াম পরমাণু আবিষ্কার করেন যার ফলে না বায় যে আলকা কথা এবং হিলিয়াম পরমাণু তিরন বস্তু।

লণ্ডনে আসার পর সডির সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে একটি হক প্রকাশের ব্যাপারে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের সামান্য নামালিঙ্গ হয়। যাই হোক, পরে রাদারফোর্ডের বই প্রকাশিত না ওয়া পর্যন্ত সডি তাঁর বই প্রকাশ করেন নি।

মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর গুণন বিচার এবং গুণাগুণ সমূহের সমবাবহার বিবেচনা করে তাদের সকলকে একটি বিশেষ নক্সায় সাজান হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের আবিষ্কারের কিছু দিন পরে দেখা গেল, ঐ নক্সার মধ্যে এদের সাজাবার কোন স্থান নেই। উপরন্তু মৌলিক পদার্থ সমূহের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সমবাবহার হওয়ার জন্য তাদের পৃথক করাও সম্ভব নয়। এই সমস্ত সমাধানের জন্য বিজ্ঞানী সডি 'আইসোটোপের মতবাদ' সৃষ্টি করলেন। পরমাণু কোজে একই শক্তি সমন্বিত পদার্থগুলির পরমাণু কোজের পর পৃথক হওয়া সম্ভব ঐ নক্সা অথবা পিরিওডিক টেবল এর মধ্যে একই স্থানে বসান হলো। এই অসাধারণ কাজের জন্য বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সডি ১৯২১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে এবং ১৯১৩ সালে ফ্রেডারিক সডি বথাক্রমে ট্রান্সগো এবং এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব এবং পদার্থ-রসায়নের দী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সডি, বিজ্ঞান শিক্ষার ও বিজ্ঞান চেতনার প্রসারেও খুব উৎসাহী ছিলেন। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা কালীন তিনি তাঁর বক্তৃতাবলী সকলন করে 'বিজ্ঞান ও জীবন' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ব্রাইটনের উপকণ্ঠে এই বিজ্ঞানীর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অন্ত্যন্ত নির্বিবাদী এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।



Rs. 165/-

**Tissot**  
SEASTAR

See this fine watch at

রায় কাকিন এণ্ড কোং

৪, ডালহৌসী স্টোর, কলিকাতা-১

Official OMEGA-TISSOT Dealer

1/1/1





## কোন এক ছেঁড়া ডায়রির ক'টি পাতা

উমা মিত্র

“আমি চক্কর দে, আমি স্নহের পিরানী”

খোলা জানলার দখি হাওয়ার পরশের সঙ্গে বেতারে ভেসে আসা  
এই ববীজ-সলীতটির বেন অদ্ভুত মিল আছে। গানটি শুনেতে শুনেতে  
সিঁটাই মন ভেসে চলে যায় কোন স্নহের। কোন অজানা স্নহের বেন  
হাতছানি দেয় মনের গভীর কপরে। আজ আমার মনে এ কিসের  
হেঁরাচ সেগেছে? এ কি স্বপ্ন! না সত্য? এ কি আনন্দ না  
দুঃখ? এ কি অদ্ভুত অমুষ্কৃতি আমার মনে-প্রাণে এক সাদা জাগিয়ে  
দেলেছে? এক অপূর্ণ রোমাঞ্চকর পরিবেশের স্মৃতি করছে? এক  
নতুন প্রাণের আলোড়ন আনছে আমার অন্তরের গভীর তলদেশে!

আজকের দিন আমার মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার জীবনের আর  
একটি স্মরণীয় দিনের কথা। সেদিনের সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশ  
মাগে কখনও হটেনি আমার জীবনে, পরেও কোন দিন যটবে কি না  
সেহ! সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে ছিল কোন এক অসীম  
স্নহের আকুল করা আহ্বান। যে বসন্ত কোন দিন চোখে দেখিনি  
কথা পরেও কোন দিন দেখব না, কিন্তু যার স্মৃতি প্রতিটি মর্মর  
স্নহের জড়িত, সেই বসন্ত অমুষ্কৃতি করার মধ্যে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ আছে  
নি। সেই অমুষ্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু এক  
পূর্ণ প্রাণশপননে ধনিত হয়ে ওঠে। তাই আজ যে রোমাঞ্চকর  
পরিবেশের বর্ণনা করতে চলেছি সেই মর্মর প্রস্তুতে অতীত স্নহের  
স্মৃতি জড়িত নালন্দা আমার মনে-প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছে নতুন  
দিনের আলোড়ন!

ইতিহাসের ছাত্রী আমি, শুধু তাই না, অতীত ইতিহাসের প্রতি  
কর্ণণ আমার বশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। প্রবেশিকা  
প্রাণ দিতে যাবার আগে ইতিহাসের মণিকোঠায় ভাল ভাবে  
মারার পর থেকেই এক প্রবল আকর্ষণ ছিল ইতিহাস-  
সিঁদ্ধ হানগুলো ঘুরে দেখে উপলব্ধি করব। দেখব সেই সব  
প্রাণা যেখানে দেশের কত জানী গুণী ব্যক্তি একবার থেকে  
দুবার—আজ বীরা কালের কপালতলে বিলীন হয়ে গেছেন, তাঁদের

সেই সব বাসস্থানের সঙ্গে আজকের এই দিনের কোন মিল  
খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

আমার অনেক দিনের স্বপ্ন বিধাতা পুঙ্খ এক দিন সত্যে পরিণত  
করলেন। সত্যিই একদিন পাড়ি জমালার অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-  
বিজড়িত স্থান নালন্দার উদ্দেশে। নিজেদের বাড়ীর গাড়ী করেই  
যাত্রা করেছিলাম তখন, যখন স্নহ্যসেব ভাল ভাবে পৃথিবী দেবীর  
কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন নি। আমাদের গন্তব্য স্থানের কাছে  
গাড়ী যতই এগিয়ে যেতে লাগল মন ততই পিছিরে পড়তে  
লাগল। অতীতে স্নহ্য অতীতে ই পথ দিয়ে আগেও কত বার হাওরা-  
আসা করেছি কিন্তু আজ কেবলই মনে তোতে লাগল, শুধু আমি নয়,  
কত হাজার হু হাজার বছর আগেও হয়ত কত ছাত্র এইখান দিয়ে  
তাদের শিকার স্থান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্তে  
দলে দলে চলে গিয়েছিল।

গাড়ী যখন গন্তব্য স্থানে গিয়ে থামল, তখন আমার মন চলে  
গেছে ইতিহাসের শেষ করে আসা পাতাগুলোর মধ্যে। যার ওপর  
লেখা আছে নালন্দার পুরান ইতিহাস, যার ওপর লেখা আছে নালন্দা  
ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আমাদেরই মতন ছাত্রেরা কত  
পর্যায় শিক্ষা লাভ করেছে।

ঘরে ঘরে টিকিট করে ভেতরে থিয়েট্রিকলাম। আমাদের মতন  
ছাত্রেরা অনেক দর্পকেরই ভীড় জমেছিল সেদিন। ভেতরে প্রবেশ  
করতেই হুঁট বলর তৎক্ষণাৎ চোখ এড়াল না। একটি হচ্ছে  
হাজার বছর আগেকার মানুষদের হাতের কাংসাজি, আর এক  
হচ্ছে হাজার বছর পরের মানুষদের নিজেদের পুরাণ স্মৃতি বজায়  
রাখার এক প্রাণবন্ত চেষ্টা আর অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে  
পরিচিত হবার জন্তে ধরিত্রীর কোল থেকে টেনে তোলার  
এক আকুল প্রয়াস! মানুষের জীবনে কৌতূহলের অন্ত  
নেই। মানুষ জানতে চায় মানুষের কথা। দেবতা বা  
অতিমানবের আলৌকিক কাহিনী শুনে এই আকাঙ্ক্ষার  
তৃপ্তি হয় না। মানুষ জানতে চায় তাদেরই মতন বারা একদিন  
পৃথিবীর কোলে বাস করে, কালের কপালতলে মিলিয়ে গেছে, সেই  
সব মানুষের মর্মকথা। সেই জন্তেই ত পুরান ফেল-আসা দিনের  
ফেল-আসা মানুষের মর্মকথা জানবার প্রয়াসেই নালন্দাকে পৃথিবীর  
কোল থেকে তুলে আনার চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশের পক্ষে  
সব চেয়ে লজ্জার বিষয় হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসলুপ্তকে  
লোকচক্ষুর সামনে যিনি প্রথম তুলে ধরেন তিনি ভারতবাসী নন।  
অর্থাভাবে যদিও ধননৈক্য বদ্ধ রয়েছে তবু মৃতটুকু মাত্র ধনন  
করা হয়েছে মৃতটুকু দেখতে কিছুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়।

ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে ক্রমশ এগিয়ে চললাম। ছাত্রদের  
পড়বার সুব্যবস্থা আজও বিজ্ঞান রয়েছে। চারি দিকে ছাত্রদের  
পড়বার ঘর—একই মাগের আর একই ধাঁচের তৈরী। তখনকার  
দিনেও রৌদ্রতপ্ত ইটের সাহায্যে ভিত্তিটাকে খুব দৃঢ় করা হয়েছে।  
প্রতিটি ছাত্রের ঘরে একটি করে কুলুপি আর সেওয়ারের গায়ে পুঁখি  
রাখবার সুব্যবস্থা। অধ্যাপকের থাকবার ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত  
বড়। বিরাট বিরাট রান্নাঘরের চার পাশে ঘরগুলি সার বেঁধে তৈরী  
করা হয়েছে। রান্নাঘরের উত্তনগুলোতে পোড়া দাগ এখনও মিলিয়ে  
যায় নি। তারা যে আমাদেরই মতন রক্তমাংসের মানুষ ছিল, উন্নতির  
কালির দাগগুলো যেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান।  
চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সৌ্য, শান্ত দেহব্যবহারী



বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের চেহারা। তারা তাঁদের এই নির্জন স্থানের পবিত্র বিদ্যালয়টিকে আরো পবিত্র এবং সুন্দর করে রেখেছেন গম্বুজ সজ্জিত স্নোকের উচ্চারণে। দিনের কাছ আরম্ভ করার আগে তাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁদের গুরুদেব গৌতম বুদ্ধের মন্দিরে। বুদ্ধদেবের মন্দিরটি অপরূপ কাঙ্ক্ষার্থে খচিত। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর খোদাই করা মূর্তিগুলি হাজার বছর আগেকার শিল্পের এক নিদর্শনস্বরূপ এখনও বিজ্ঞমান।

এখানে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির তিনটি স্তর। প্রতি বার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হবার পর, মুসলমানদের ভেঙ্গে ফেলার জন্তেই হোক, কিংবা বিহারের ভূমিকম্পের জন্তে ভেঙ্গে যাবার ফলেই হোক, এক একবার নালন্দা যখন ধ্বংসে পরিণত হয়েছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকে ধেমে থাকতে দিতে চান নি। আবার তাঁরা সেই ধ্বংসভূমিকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্রকে। আবার হরত তাঁরা বাধা পেয়েছেন, আবার ধ্বংসভূমে পরিণত হয়েছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু বাধা পেয়ে ধামধাম পজ্ঞ ভগবান মাহ্ময়কে সন্তুষ্টি করেন নি, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার জন্তেই তার সন্তি, কাজেই আবার পুরান

ধ্বংসের উপর ভিত্তি করেই আবার গড়ে তোলা হোল শিক্ষাকেন্দ্রকে। প্রতিবার একই ধাঁচে তৈরী করলেন তাঁরা তিনটি স্তর। কোন কোন জায়গায় পাঁচটা স্তরও দেখতে পাওয়া যায়! সবসময় নাকি সাত বার তৈরী করা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে।

মহাবাজ হর্ষবর্দনের রাজত্বকালে যে স্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—যে স্থান ছাত্রদের কলধনিতো মুখরিত থাকত—সদাসর্বদা, যে স্থানে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রেরা আসত ভারতবর্ষের তত্ত্বকথা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে, যে স্থানে সদাসর্বদা এক সৌম্য পরিবেশের স্রষ্টি হোত দেখানে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই—কিন্তু সেখানকার প্রতিটি ইট, পাথর নিশ্চয়পভাবে এখনও আছে হাজার বছরের ধূলায় জীর্ণ হওয়া ইতিহাসকে। ধ্বংসভূমির ইট-পাথরগুলি পর্যাপ্ত যেন বহন করে আনছে হাজার বছর আগেকার সৌম্য, শান্ত, গম্ভীর পরিবেশটিকে। যারা চলে গেছে এখানে এলে তাদের দেখা মিলবে মা ঠিক, কিন্তু এখানে এলে বিগত দিনের পরিবেশকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারা যাবে। মনে হবে এদেরও একদিন প্রাণ ছিল—এখানেও একদিন নানা জানী-গুণী পণ্ডিতরা এসে আলোচনা করতেন তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। স্বপ্নর চীন থেকে হউয়েন সান

## মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিরাচ্ছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিনি জোয়ার গহনা নির্মাতা ও রত্ন-কলকর  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



একদিন এখানে এসেছিলেন শিখলাভ করতে। সেদিন নালন্দার ধ্বংসস্থপের কাছে কতকগুলি ছিলাম তার ঘড়ি ধরে নির্দেশ করি নি, আর সেই ভাবে সময় নির্দেশ করবার মতন মনের অবস্থাও আমাদের ছিল না। শুধু জোর করে ঐটুকুই বলতে পারি, বতরুল ছিলাম এক অপূর্ণ, রোমানকবর, মধুর আনন্দধারক ভাবের আবেশে তুলিয়ে গিয়েছিলাম। এরকম দিন আর জীবনে কোন দিন আসবে কি না জানি না, যদি আসে তবে মনে করব আমার নালন্দা দেখার দিনটিকে।

## প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে স্বাবলম্বিনী নারী

রেখা বসু

‘পিতা রক্ষতি কৌমারে

ভর্তা রক্ষতি যৌবনে

পুত্রাঃ রক্ষন্তি স্ববিরে

ন ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহিতি।’

সৌভাগ্যের বিষয়, ‘মহুসাহিত্য’র এ উপদেশ আজকাল আর মানা হয় না। বাংলা-নিষেধের সমস্ত আগল খুলে ফেলে আজ আমাদের মেয়েরা কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—আজ তারা মুক্ত, স্বাবলম্বিনী। সারা জীবন পুরুষের ঘাড়ে ভর দিয়ে জীবন-বাণের প্রতি এই যে ভূগা, স্বার্থপর পুরুষদের নিলজ্জা কোথ-রাজানিকে তুচ্ছ করে, কঠোরতম কাজকে সবলে আঁকড়ে ধরায় এই যে উদ্ভাটনা—এ’ আজকের নয়। এর মূল রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধসভ্যতার আর বৈদিক যুগে। তখন থেকেই মেয়েরা নানা রকম কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। হয়ত ওদের আরেই চলেছে—অন্ত উপাঞ্জনফমহীন বিরাট সাগর!

মাটি খুঁড়ে মহাজোনারাতে যে বিরাট সভ্যতা আবিস্কৃত হয়েছে, পণ্ডিতদের মতে তা’ আত্মমায়িক খৃঃপূঃ চার হাজার বৎসর আগের। এখানে ভগ্নস্থপের মধ্যে পাওয়া গেছে, ব্রোঞ্জের তৈরী একটি নর নর্তনশীল নারীমূর্তি। নাচ যে তখন অনেক মেয়ের পেশা ছিল, এ থেকে তা অস্বাভাবিক বোধ হয় খুব অসম্ভব হ’বে না। কারণ নটী-সম্প্রদায়ের কাকর না হলে এ রকম মূর্তি নিশ্চয়ই সে যুগে নির্মাদ হ’ত।

স্বদেশের যুগেও নারীকর্মী ছিল অজস্র। এরা অধিকাংশই ছিল ধরনশিল্পে পারদর্শিনী। এদের প্রধান কাজ ছিল, নানা রকম সলাইয়ের কাজ, মাদুর প্রস্তুত প্রভৃতি। এর পরবর্তী যুগেও Later Vedic Civilization) মেয়েরা স্ট্রাশিল্ল রতের কাজ ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকত। উপনিষদের যুগে ‘উপাখ্যায়’ প্রভৃতি পুস্তকের সম্বন্ধে সাংখ্যে ঘটে আমাদের। স্ত্রীরা শিক্ষিকারাও সে যুগে ছিলেন এ রকম প্রমাণ এগুলো। এ ছাড়া বৈদিক যুগে শিক্ষিকারা নাচ-গানও শেখাতেন, এর প্রমাণও আছে।

বৌদ্ধযুগেও পুরুষদের পাশে থেকে হাটে-বাটে-মাঠে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন ভিক্ষুণীরা। অবশ্য এর জন্তে বেতন নেননি তাঁরা। ঘরোয়াদের অস্তিত্বও ছিল এ সময়। এরা নিজেরাই, ধান বুনত, গুটিত এবং রোদে শুকিয়ে নিত। আবার কেউ কেউ ভিক্ষাবধান করত তাঁর ক্ষেতের। তুলা থেকে সূতা প্রস্তুতও ওরাই করত। এমন কি গান কোন ক্ষেত্রে শ্রমণ রক্ষার ভারও থাকত মেয়েদের ওপর।

‘ধর্ম পদটিকার’ একটি মেয়ে বাছুরের উল্লেখ আছে। সে নাকি তার অজস্র সহচরীসহ লোমহর্ষক খেলা দেখাত। দশ বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে শূন্য তুলে দিত পা ছুঁটো। আবার দশটির অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে নিজেকে আচ্ছাদ্য ভাবে সামলে নাচ-গান করত। এরকম খেলা দেখিয়ে মেয়েটি ব্রাহ্মণ্য করত অজস্র।

ভরগপোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকলে পতিতাবৃত্তিই বেছে নিতে হ’ত মেয়েদের।

পাণিনিও (খৃঃপূঃ ৫ম বা ৬ম শতাব্দী?) ঠর ব্যাকরণে এমন কতকগুলো কথা’র উল্লেখ করেছেন যা থেকে নারী কর্মীদেরও সন্ধান পেতে পারি আমরা। ঠর ব্যবহৃত ‘শান্তীকী’ কথা’র অর্থ—বর্শাধারিণী। মনে হয় সে যুগে বা তারও আগে মেয়েরা রাজার দেহ-রক্ষার কাজে নিযুক্তা থাকত। ‘নর্তকী’ কথাটা তখন বোঝানো হ’ত নটী বা এ্যাকট্রেসকে (Actress.) ‘তারিকা’ বোঝাত পরিচারিকাদের। ‘উপাখ্যায়’ও ছিলেন তখন। গল্প চরিয়েও হয়ত জীবিকা নির্বাহ হ’ত অনেকের। এদের বলা হ’ত ‘গাবপতি’। ‘জীবিকা প্রাপ্তা’ বা ‘প্রাপ্তজীবিকা’ কথা দুটি দিচ্ছে নারী কর্মীদের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত।

মৌর্যযুগে নারীকর্মীর ছড়াছড়ি। রাজার দেহরক্ষার ভার সে নারীদের ওপর থাকত—এ’ কথা মেগাস্থিনিস বলে গেছেন তাঁর ‘Ta Indika’ নামক পুস্তকে। রাজা শিকারে বেরলেও ওরা ঘিরে রাখত ঠকে। রথ, হাতী, ঘোড়া এই তিনটিই বাহন ছিল ওদের। এ’ ছাড়া দৈম্য বাহিনীতেও মেয়েরা বোগ দিত—এ’ কথাও বলে গেছেন মেগাস্থিনিস। তবে মৌর্য যুগের কথা এ নয়। মৌর্য ভারতের কিংবদন্তী ছিল এটি। অনেক কাল আগে Dionysos নামে এক বিদেশী রাজা ভারত জয় করে ভারত থেকেই কিছু সাখাক নারীদৈম্য সংগে করে নিয়েছিলেন। দৈম্যদের পুরোভাগে থাকত এরা। শত্রুদৈম্য মেয়েদের দেখে কৌতুক ভরে অনেকটা এগিয়ে আসত বোকার মত। এই কাকে অজ্ঞাত দৈম্যরা ওদের ঘিরে ধরে নষ্ট করে ফেলত। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও মেয়েদের দান নেহাৎ কম ছিল না সে সময়ে। এ ছাড়া জীবাশিত পাণ্ড্য (Pandoe) দেশেরও উল্লেখ করেছেন তিনি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও নারীকর্মীর উল্লেখ আছে। বিধবা স্ত্রী (অন্তঃব অসহায়), অঙ্গবিকল স্ত্রী, অবিবাহিতা স্ত্রী, পতিতাদের ধাত্রী, বুদ্ধা রাজপরিচারিকা ও দেবতার পূজাকার্য্য হ’তে নিযুক্ত বা অব্যগ্যা দেবদাসী (এও এক ধরনের জীবিকা), দণ্ডিতা স্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা মেঘের লোম, কার্পাস তুলা শণ ও রেশম থেকে সূতা তৈরী করাত রাজ কক্ষচারীদিগকে নিদেশ দিয়ে গেছেন কৌটিল্য। ওদের বেতন দেওয়া হ’বে কাজের গুণানুসারে। ধাত্রী বাড়ীর বাইরে আসতে চান না অথচ কাজ করে যেতে চান, রাজকক্ষচারী দাসী দিয়ে তাঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন তুলা প্রভৃতি। বাড়ীতে বসেই সূতা তৈরী করবেন ওরা। প্রোথিতভর্জীদের জীবিকানির্বাহের এ ছিল সেরা উপায়। এ ছাড়া গুপ্তদের কাজও করত মেয়েরা। অসহায় বিধবা মেয়েরাই এ কাজ করত বেশী। অজ্ঞপূরে রাণী এক রাজপুত্রদের উপর কড়া পাহারা দেওয়া থেকে প্রত্যেক অমাত্য, সম্মুখা এবং সাধারণ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের



## তুষার-স্নিগ্ধ এই ক্রীম আপনার মুখপট্রী লাবণ্যময় রাখবে

মুখের সব দাগ মিলিয়ে দিয়ে  
ত্বক্ মসৃণ ও মোলায়েম করে

সবসময় যাতে আপনার মুখশ্রী কমনীয় থাকে তার জন্তে তুষার-  
স্নিগ্ধ পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করুন। রোজ  
সকালে হালকা হাতে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মুখে মাখুন  
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মিলিয়ে যাবে... অথচ আশ্চর্যভাবে  
মুখের সব জঁটা ঢেকে দেবে—রেশমের মতো মসৃণ  
স্ববসাময় স্বাভাবিক মুখশ্রী ফুটিয়ে তুলবে।



**পণ্ডস**  
ভ্যানিশিং ক্রীম

এর ওপর পাউডার ভালোভাবে বসে !

পাউডার লাগাবার বা বেক-আপ করার আগে পণ্ডস ভ্যানিশিং  
ক্রীম ব্যবহার করতে কখনো ভুলবেন না—এই ক্রীম চটচটে নয়।  
এতে মুখের শ্রী মসৃণ ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠবে।  
তুষার-স্নিগ্ধ পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে সারাদিন ধরে মুখশ্রী  
লাবণ্যময় থাকুক।

বিনামূল্যে প্রদান পুস্তিকা ! আমাদের প্রদান পুস্তিকা 'লাভলিয়া'র উইথ পণ্ডস' বিনামূল্যে পাঠানো  
হয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়ানোর সুপারাক্ষিত সব কৌশল এতে পাবেন। এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন—

জি পি ও বক্স নং ১৬১২, বোম্বাই ১

বিবরণ পর্যন্ত এদের রাখতে হত। চৌর-ডাকাত ধরবার কাজেও এদের সাহায্য দেওয়া হ'ত। শত্রুরাজার সেনাপতি প্রভৃতিকে ভুলিয়ে ইত্যা করার কাজেও এদেরকে লাগানোর কথা কোটিল্য বলেছেন। এ'ছাড়া দেব-দেবীর পট পরসার বিনিময়ে লোককে দেখিয়েও জীবিকা নির্বাহ করত অনেকে। এদের বলা হ'ত 'কৌশিকদ্রী'। বাধ হয় এমনকার বেদনীদের মত ছিল এরা। এ'ছাড়া নাচ গানও পেশা ছিল অনেকের।

মৌর্যযুগ পতিতাদের সংখ্যাও ছিল অল্প। এমন কি, রাজা রাজদরবারে বেছে বেছে নিয়োগ করতেন ওদের। এর জন্তে মোটা বেতনও দেওয়া হ'ত ওদের। (এক হাজার থেকে তিন হাজার পণ পর্যন্ত)। গণিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার পরিচর্যা নিযুক্ত থাকত। বুদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হত রাজার পাকশালায়। রঙ্গোপজীবীদের (Actresses) কথাও আছে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। গণিকাদেরও পরিচারিকা ছিল। এদের বলা হত—রূপদাসী। ওদের কাজ ছিল ফুলের মালা তৈরী করা।

রাজার প্রহরীদের মধ্যে নারীরাও ছিল। যুম থেকে উঠলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাত সশস্ত্র নারী-বাহিনী। এ ছাড়া আধুনিক যুগের নার্সের (Nurse) কাজও করত মেয়েরা। যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারদের সংগে আহত সৈনিকদের জন্তে ওরা নিয়ে যেত খাদ্য আর পানীয়। ক্রান্ত সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়াও ছিল ওদের অঙ্গতম প্রধান কাজ।

'মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকেও নারী-কর্মীর কথা আছে। প্রথমত: 'এ্যাকট্রেস' (Actress) বোঝাতে গিয়ে 'নটী' কথাটি ব্যবহার করেছেন তিনি। রাজার সশস্ত্র দেহরক্ষীগীর কথাও আছে ওতে। দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভেই বিদ্যক বলেছে:

'বাণাসনন্তাভির্বিবনীভিঃ বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃত্তঃ ইত এব আগচ্ছতি প্রিয় বয়সতঃ।' (অর্থাৎ তীর ধমুকে হাতে, বুনো ফুলের মালা-পরা যবন মেয়েদের দ্বারা প্রিয় বয়সত (রাজা) এদিকে আসছেন)

উত্তানপালিকা এবং চোটা অর্থাৎ পরিচারিকার কথাও আছে নাটকটিতে।

অশোক-লিপিতেও উল্লেখ রয়েছে নারীকর্মীর। বৌদ্ধ ভিক্ষুগীরা ভিক্ষুদের মতই রাজ্যের নানা স্থানে প্রচার করতেন অশোকের 'বর্ধ'। 'বর্ধমহামাত্রদের মতই ছিল স্ত্রী-অধক্ষ মহামাত্র। রাজনিমিত্ত বিহারে এ'রা থাকতেন। রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীদের দানশীলা করে তোলাই এঁদের প্রধান কাজগুলির একটি।

রামায়ণ ও মহাভারতেও পরিচারিকাদের কথা আছে। বিশেষ করে মহাভারতের 'বিরাট পর্বে' আছে:

'লোকসমাজে 'সৈরিকী' নামে স্ত্রীরা বেতন ছাড়া দাসী ভাবে থাকে।' এ থেকেই কি অনুমান করা যায় না যে, বেতন না নিয়েও সকাল কাজ করত মেয়েরা?

গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগেও শাসন কার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত মেয়েরা। গুপ্তযুগের পরবর্তী কালেও কাম্বীর, উড়িয়া, অন্ধ প্রভৃতি দেশের শাসনকার্যে রাণীরাই চালাতেন। বগনাদায় প্রদেশপাল এবং গ্রাম-মুখ্যও হ'তেন মেয়েরা।

(Advanced History of India ক্রমঃ)

মেয়েরা যে নানিরূপক রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হ'ত এ' কথা 'মহাসাহিত্যও আছে। ১ম অধ্যায়ের ১২৪ নং শ্লোকে আছে:

'রাজকর্মণ যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রযোজনস্ত চ।

প্রত্যহঃ কল্মষেধবৃত্তিঃ স্থানকর্মামুকুপতঃ ॥'

(অর্থাৎ রাজকর্মে নিযুক্ত স্ত্রীগণের এবং অজ্ঞাত ভৃত্যগণের পণ ও কর্মমুসারে প্রত্যহ (রাজা) বেতন নির্ধারণ (ও প্রদান) করিবেন। অনুবাদ:—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন) ১২৬ নং শ্লোকেও আছে:

'পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব রাজনৌদকধূপনৈঃ।

বেধাভরণ-সংস্কারাঃ পুশ্চেন্দ্রঃ স সমাহিতাঃ।'

(অর্থাৎ গৃহ চর দ্বারা পরীক্ষিত বেশ ও অভরণ বিধে সন্তত স্ত্রীসকল বাস্তব উদক এবং ধূপন (গন্ধদ্রব্যাদি?) দ্বারা ইহার (রাজার) পরিচর্যা করিবে।' অনুবাদ: অধ্যাপক সেন।)

'মুসলমানী যুগেও নারী কর্মীদের উল্লেখ পাঠ অনেক জায়গায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বীর রমণী রিজিয়া—এ'কথা তো সবাই জানেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালবাম্পতি বলতান ঘিয়াসউদ্দিনের হারমে মেয়েদের শিক্ষার জন্তে শিক্ষয়িত্রী রাখা হ'ত।

বিজয়নগরেও মেয়েরা নিযুক্ত হ'তেন রাজকাৰ্য্যে। পর্যটক হ্যামিঞ্জ এ'সবকে এক চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। মল্লযুদ্ধ থেকে জ্যোতিষী, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি নানা কাজেই দক্ষ ছিল মেয়েরা। রাজ্যের দৈনিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার কাজও ওরা করত। সংগীতজ্ঞাদেরও বেতনের বিনিময়ে রাখা হ'ত রাজদরবারে। এমন কি, বিচারকের পদে পর্যন্ত নিযুক্ত হ'ত মেয়েরা। রাজপ্রাসাদের পাহারা দেবার কাজেও থাকত মেয়ে-প্রহরী।

মোগল যুগেও অভাব ছিল না স্বাভাবিক নারীর। আকবরের সময়েই দু'জন শাসনকর্ত্রীর নাম জ্ঞানি আমরা,—তুর্গাবতী আর চাঁদ বিবি। তা'ছাড়া—শাহজাদীশেখ লেখা-পড়া শেখাবার জন্তে 'আতুন' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ করা হ'ত তখন। এমন কি, মোগলদরবারে বাকশাহের কাছে বেতনভোগী মহিলারা পাঠ করে শোনাতেন চৈনিকিনী স্ববাদলিপি।

এ ছাড়া সে যুগে নর্তকী, সংগীতজ্ঞা এবং পরিচারিকাদের সংখ্যাও যে যথেষ্ট ছিল আশা করি সে আর বলে দিতে হবে না।

## চিকিৎসকের বিপত্তি

### পুষ্প দেবী

সেই যে কথায় আছে না, ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়? তাই হয়েছে। এই 'ত' সেদিন সকালে উঠেই দেখি, ডইং-স্কমে

এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, রাংবাহার আমায় পাঠিয়েছেন। পূর্ণিমা থেকে আসছি আমি, ওনলুম আপনারা দু'জনেই অনস্থ।

কথাটা সত্যি, ওঁর এ্যালুমেন আর ডায়বেটিস। আর আমার গল্ড-ব্রাডার আর গ্যাস্ট্রিক-আলসার। এই বিপরীতধর্মী দু'টি অনস্থ নিয়ে দু'জনে আজন্ম ভুগছি। শুনেছি, বিয়ের সময় নাকি আমাদের রাজঘোঁটক মিল হয়েছিল। তার লক্ষণ শুধু এইটিকেই পাওয়া 'বার। অনস্থ যাদের সন্ত হয় তারা অনেক সময়ই অনস্থের

কথা আলোচনা করতে ভালবাসেন, কিন্তু পুন্যোনা রোগী মাত্রই বিরক্ত হয়ে ওঠেন সেই বিরক্তিকর ও কষ্টকর অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে করে। বাবু মনের রাগ মনেই চেপে মুখে ভঙ্গিমা বজায় রেখে বসলেন। দেখলুম ভ্রমলোক অন্তান্ত কেতা-দ্রবুত। একটু পরেই কথা প্রসঙ্গে বললেন, দেখুন আমাদের বার আনা অশ্রুখই মন-গড়া, সর্বলা মনে করতে হবে আমাদের কিছু অশ্রুখ নেই। বলি পোটের যন্ত্রণা কিছুতেই সে তা মনে থাকতে দেয় না। জোয়ানে-মুগে খান সেবে যাবে।

পরদিন বাবা এলেন। দু'-একটা কথা বলার পর বলি—অমল বাবু বলে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। বাবা বলেন তাই নাকি? সর্বনাশ করেছে, বেজায় বাজ্ঞে বকে ভ্রমলোক ত্তোদের পাগল করে ছাড়বে, মাথার গোলমালের জ্ঞত ওর চাকরী গেছে। সরকারী ডাক্তার ছিল পূর্ণিয়ার। মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

এর পর প্রতিদিন ঠিক দুপুর দু'টোর সময় অত্যন্ত মিহি সুরে গলার আওয়াজ পাই “মিষ্টার মুখাজ্জি আছেন কি?” ভাল এক আলা হয়েছি। রোজই বলি, না উনি বাড়ী নেই এটার ফেরেন অফিস থেকে। তবু রোজই সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। আমার স্বামী অবস্থি বলেন, বাঁচা গেছে দুর্ভাগটা ত্তোমার ওপর দিয়েই যায়, সারাদিন খাটুনির পর কাঁহাতক আর পাগলের সঙ্গে বকা যায়?

প্রথমত অমল বাবু আমার নষ্টবাস্য উদ্ধারে তৎপর হলেন, যখন দেখলেন মুগ আর জোয়ানে কোনো ফল আমি স্বীকার করছি

না। তখন বললেন “দেখুন মিসেস মুখাজ্জি, ও বিবরে মেমসাহেবেরা অদ্বুত বুদ্ধিমতী, আমি দেখেছি ১০০ বছর এক মেমসাহেবের সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, তার স্বামী তখন অফিসে। আমার কাছে তার রোগের বাস্তবায়ন কথা সব বললে কিন্তু সেই স্বামীর লক্ষ্য পেলে ব্যাকট হাতে করে টেনিস খেলতে আরম্ভ করলে। কে বলবে অশ্রুখ করেছে। আর আপনি যদি রোজ এই হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে পড়ে থাকেন মিঃ মুখাজ্জির মনের অবস্থা কি হয় বলুন দেখি?” না দেখে সেই মেমটিকে ধস্তবাস্ত না দিয়ে পারি না। ১০০ বছরে ছুটোছুটি করে টেনিস খেলা সহজ নয়। কিন্তু আমি যে এরকম যন্ত্রণা চেপে ওর উদ্ধাসিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারব তা জো ভাগ্য হয় না।

এর পর থেকে নানা কথায় তিনি আমার আনন্দিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কারণগুলি সব সময় আমার পক্ষে আনন্দকর হয়ে ওঠে না। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন আমি মূল ভীষণ ভালবাসি। সেই দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন কখনো গন্ধরাজ কখনও মাধবীলতার গুচ্ছ বা বা হোক কিছু ফুল তিনি প্রায়ই নিয়ে আসতেন। এক দিন ছাতে ঝাড়িয়ে আছি, দেখি আমার দেওর ও তার এক বন্ধু গেট দিয়ে ঢুকল। লেটার বস্ত্রের ওপর একটা ফুলতুল্য অ্যাটিগেনোসের লতা দেখে দু'জনে ঐ কথা হল জানি না। তার পর সেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন সেটা মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু বুলুয় পরদিন। অমল বাবু এসেই বললেন, কাল কত কষ্ট করে বে আপনায় জন্তে ঐ ফুলটুকু সংগ্রহ



## চর্ম মসৃণ রাখিতে—

ক্যালকেমিকোর “তুহিনা” আন্তর্জাতিক।  
নিয়মিত ব্যবহারে চর্মের রক্ষতা দূর  
করে চর্ম মসৃণ, পরিষ্কার ও নরম রাখে  
এবং বর্ণ উজ্জ্বল করে।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কলিকাতা - ২২

করেছিলুম তা আপনি খারগাই করতে পারবেন না মিসেস মুখার্জী ! কই সেই ফুল দেখছি না ত আপনার ঘরে—তখন বঙ্গলুম সেই ফুলই সঙ্গতি লাভ করেছে বঙ্গযুগলের হাতে—হেসে বলি, “সত্যি ভারি চমৎকার ফুল ! আমার এক বন্ধু এসেছিল সে নিয়ে গেল”—ভ্রু কুঁচকে জান হেসে অমল বাবু বললেন “এ কিছু ভারী অজ্ঞায় ?” আমি মনে মনে বললুম কিছু লেটারবক্সের ওপর ফুল রাখার কি দরকার ছিল ? থাক ভাগ্যে দেখেছিলুম নইলে আজ মহামুখিলে পড়তে হত।”

এর পরদিন এসে আমার ছোট্ট মেয়ে তপুকে বলল, আজ একটা তোমার ম্যাজিক দেখাব। একমাত্র ভরসা ছোট্ট চাকর রামদীন সকাল থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে অথচ সন্ধ্যাই ছেলেটা অতি ভাল ছিল, কেন যে হঠাৎ এমন হুমতি হল তার বুঝতে পারি না—আর ঠিক চোখে না দেখে মালুমকে চোর বলতেও ইচ্ছা করে না। তাই সন্ধ্যা হারান পার্কারটা একটু খুঁজে দেখতে বলতেই তার কেমন খারগা হল আমি তাকে সন্দেহ করছি। আমারও অত সখের দামী কলমটা হারিয়ে মেজাজটা ভাল ছিল না। কাজেই সামান্য কথার পর বন্ধন বলেছি “কলমটার কি ডানা গজাবে যে ঘর থেকে উড়ে গেল ?” বাস আর বায় কোথা ? সঙ্গে সঙ্গে রামদীন বলল—“হামারা তলব দে দিঞ্জিরে হাম মুহুকমে বায়গা।” তারপর অনেক বোঝানার পরও সে রইল না—কাজেই সংসারের কাজ তো অনেকই ছিল তার ওপর কলম খোজার দরগা সোফামেটির কভার খোলা বিছানার তোষক উমট-পাণ্টে দেখা ইত্যাদি হাল্লামায় কাজ আরও যথেষ্ট বেড়েইছিল। কাজেই সময়ও ছিল না, অমল বাবুর কাছে বসার। ভাগ্যে তপুটা ছিল তাকে বসিয়ে আমি কাজ সারতে গেলুম। বিছানা ঠিক করছি এমন সময় তপু ছুটতে ছুটতে হাঙ্গির। তার হাতে আমার সন্ধ্যা হারানিধি “পার্কার কিংকিট-ওয়ান”—তপু বললে ‘মজা দেখাবার জন্তে অমল বাবু কলমটা কাল নিয়ে গিয়েছিলেন আমার চোখ বৃদ্ধিতে বলে আমার মাথার দ্বিবেশ কলমটা গুঁজে দিয়ে বলছেন, মাথায় তোমার ওটা কি ধরনের ক্লিপ ? ও মা হাত দিয়ে দেখি তোমার কলম ? দেখ দেখি শুধু শুধু রামদীনটা চলে গেল—ও কিছু মা আমাদের খুব ভালবাসত—মনে আছে তোমার সে বার যন্ত্রণার সময় সারারাত ঘুমোর নি আর সেই ব্লাক আউটের রাতে বাপীর জন্তে ডাক্তার বাবুর বাড়ী গেছলো অজ্ঞ কেউ হলে পারতো না—”

তার বাক্যশ্রোতে বাধা দিয়ে বলি, “শুধু কি তাই ? এমন লোক আর পাব না—। অথচ বিনা অপরাধে ছেলের চুরির অপরাধ মাথায় নিয়ে গেল।” বত ভারি অমল বাবুর ওপর রাগটা প্রবল হয়ে ওঠে। অথচ ভ্রুলোক অত্যন্ত আপা করে ডাই-ক্লেম বসে আছেন আমার খুসী করেছেন মজা দেখিয়ে মনে করে।

এরও চেয়ে বিরক্তিকর ঘটনা ঘটলো এর পর। দীর্ঘ দিন কার্ডিাক এজমায় উনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। নলিনী বাবু এসে বলেন, হিমোগ্রোটিন ইনজেকশান দিতে হবে। তখন বৃদ্ধের শরীর, হিমোগ্রোটিন পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক কষ্টে বোগাঞ্চ করা হয়। এমন সময় অমল বাবুর আবির্ভাব। টেবিলের ওপর বৃদ্ধের শিশিটি দেখেই হঠাৎ বেন বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, খুব চড়া গলার ভাকেন “মিসেস মুখার্জী”—আমি অবাক

হয়ে ভাকাই, দেখি ভ্রুলোকের চোখ লাল, মাথার শিরা কুটে উঠেছে। সেটাল টেবিলের কাচের ওপর এক প্রবল ঘুসি মেয়ে তিনি বলেন, “এই আমি বলে যাচ্ছি—এই ইজেকশান মি: মুখার্জীকে দিলে, তার পর জ্বাঘ ঘটায় বেশী তিনি বাচবেন না। বাচতে পারেন না। এখনও বলছি, সাবধান ! এখনও বলছি, নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনবেন না।” অত্যন্ত বিব্রত হয়ে আমি বলি, “এ ইজেকশান তো তপুকেও এক বার দেওয়া হয়েছিল।” বাধা দিয়ে অমল বাবু বলে ওঠেন, “তপু ডায়বেটিস ছিল ? তপু হাট ডায়েন্স ছিল ? ছিল কিউনির দোষ ? আমার যা বলার তা বললুম, এবার আপনার কর্তব্য আপনার কাছে।” তিনি সবগে প্রস্থান করেন। বৃষ্টি সবই পাগলের কাণ্ড, তবু মন সায় দেয় না। কেউ মঙ্গল হবে বললে যদি বা সে কাজ না করি, অমঙ্গল হবে বললে করতে সাহস হয় না। বিকেলে বাড়ীর ডাক্তার ভৌমিক এলে বলি, “আচ্ছা ও ইজেকশানটা এখন থাক, ভালই ত’ আছেন”—ভৌমিক সব শুনে হেসে উঠে বলে, “তবে নলিনী বাবুকে আনবার কি দরকার ছিল ? আচ্ছা কাণ্ড পাগলের।”

এর পর হঠাৎ একদিন উনি কলেজ থেকে ফিরলেন ১০ঃ অর নিয়ে। সর্দি নেই, কাশি নেই হঠাৎ অন্তটা টেম্পারেচার দেখে ডাক্তার ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে রক্ত নিয়ে গেলেন কিন্তু অমল ডাক্তার এসে হৈঁচৈৎ বাধালেন। তিনি জোর গলায় প্রমাণ করলেন, অসুখটা প্রেগ, নিমোনিয়া, ইন্টিসিলাস এমন কি টি, বি-ও হলে হতে পারে। তবু ম্যালেরিয়া কখনো নয়। সেদিন ঊর্বর খুব বেশী, রোগের যাতনার চেয়ে পাগলের প্রলাপ কম অসহ্য নয়—অথচ ডাক্তার এই দাবী নিয়ে তিনি গ্যাট হয়ে রুগীর মাথার কাছে বসে আছেন। তাঁর আইন অসুখ্যায়ী সব করতে হবে, অজ্ঞ ডাক্তারদের নির্দেশ মানার উপায় নেই।

ঊর্বর খুব ঘাম হতে লাগল, বোধ হয় জ্বরটা ছাড়বে—তখন বড় মেয়েকে বললুম, “মস্তি, তোমার বাবার গাটা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে জামাটা বরলে দাও।” সে বেচারী যেতেই অমল বাবু হুকুর ছাড়লেন, “মিসেস মুখার্জী আপনি কখন, মিস্ মুখার্জীর এ কাজ নয়। শুধু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসতেই যথেষ্ট হয় না প্রাকটিকাল হন একটু।” আমি তখন ঊর্বরই জন্তে বেলানা ছাড়ছিলাম—এক জন ভ্রুলোক শোবার ঘরে বসে, সে সময় মেয়ের সেবাটাই যে শোভন হবে মনে করে কুঠায় নিজে না গিয়ে মস্তিকে পাঠিয়েছিলাম মস্তি বেচারী খতমত খেয়ে কিরো আসে। আমিই জ্বামা বরলে দিই।

দীর্ঘ সাত দিন বাদে প্রচুর কুইনাইন ইনজেকশানের পর সেদিন অত্যন্ত দুর্বল শরীরে উনি অফিস গেছেন। একেই শরীর ভাল নয়। আর লো ব্লাডপ্রেশার, এর জন্ত মাথা ঘোরায় প্রায়ই কষ্ট পান। কাজেই মনটা আমার বেশ চিন্তাগ্রস্ত। তিনটে বাজলো, বাঘে বাঘে ছাদে গিয়ে ঝাঁড়াই ঊর্বর কোবার আশায়। এমন সময় সিঁড়িতে জুতো পরা পায়ের আওয়াজ। যদিও ঊর্বর পায়ের পরিচিত শব্দ নয় তবুও আশায় এগিয়ে বাই, দেখি অমল ডাক্তার আসছেন। আমার দেখেই হেসে বললেন “বলুন ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ?” আমি সবিস্ময়ে বলি “কই ডেকে পাঠাইনি তো ?” বলেন—“তাতে লজ্জার কি আছে ? এ ডাক্তার অধিকার তো আপনার প্রচুরই আছে। হাদে

দেখলাম পাড়িয়েও আছে আমার প্রতীকার, তবে অবীকার করে লাভ  
কী? বলেই টেবিলে রাখা ঠর জন্মে কমলা লেবুর রসটা এক চুমুকে  
খেয়ে কেলে বলেন "আচ্ছা কি করে জানলেন আমি লেবুর রস খেতে  
ভালোবাসি?" এবার আর নিজেকে দমন করার ভগ্নতা রাখার চেষ্টা  
কটকট হয়ে ওঠে—তুপুরে বাড়ীতে চাকর-বাকির কেউ নেই আর  
কমলালেবুও ঘরে নেই যে ঠর জন্মে রস করে রাখবে। হয়তো রাগে  
মুখটা লাল হয়ে উঠে থাকবে। পকেট থেকে একটা ব্লাক প্রিন্সের  
কুঁড়ি বার করে অমল বাবু বলেন "দেখুন কি শশুর ফুল—রাং কালো  
হলে কি হবে, স্নগন্ধে নিজের পরিচয় লুকানো নেই, তাই আমি এই  
ফুলটিই সব চেয়ে ভালোবাসি।" ব্লাক প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর বা আমার  
কার রাং-এর তিনি উপমা দিতে চান বুঝতে না পারলেও আমি বেগে  
উঠে বলি—"দেখুন ঠিক মাধার ফুল শুভ্রে ডায়ং ক্রমে বসে আপনার  
সঙ্গে গল্প করার মত মনের অবস্থা আমার নয়। বিশ্বাস করুন,  
আপনাকে ডেকেও আমি কোনও দিন পাঠাইনি। আমার স্বামী  
অসুস্থ"—

বাধা দিয়ে অমল বাবু বলেন—"ও কিছু নয়—মিঃ মুখার্জী  
বড় বাড়াবাড়ি করেন—অসুস্থ নিয়ে; সহ শক্তি ওর মোটেই  
নেই।" এবার আমার সহের সীমা অতিক্রম করে আমি হাত  
জোড় করে বলি "ধামবেন আপনি? নেহাৎ আমার বাড়ী নইলে  
আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারলে আমি স্ত্রী হতুম।  
যথেষ্ট হয়েছে, অন্ততঃ আমার স্বামীকে চেনবার জন্মে আপনার  
প্রয়োজন হবে না আমার।"

এবার আমার আরও অবাক করে অমল বাবু বলেন, "কেন  
সে কী আপনিও জানেন না? নইলে নলিনী বাবু বলার পরও  
আমার কথা শুনে আপনি কি হিমোগ্রোটিন বন্ধ করেন নি?  
আমি আসলে অত খুশী হয়ে ওঠেন কেন আপনি? আমি কি  
আজ্ঞা বৃদ্ধি না? কি দারুণ বিষাস নির্ভরতা আপনার আমার  
ওপর? দেখুন তো পিসীমা বলতে অজ্ঞান—অন্তটা রেহ পাবের ছেলেকে  
দোয়া কি সহজ? আমি অবাক হয়ে যাই মিসেস মুখার্জী আপনার  
মত একজন অদ্বুত বুদ্ধিমতী ধৈর্যশালিনী মহিলার জীবন এভাবে—"

এবার আমার চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আমি বলি, "চূপ  
করুন, এসব মাহুস আজ্ঞা লোকের বাড়ীতে আসে কি করে!  
বাঁচা যান আপনি—সত্যিই মাথা আপনার একেবারে ধারাপ।"  
কটমট করে আমার দিকে চেয়ে অমল বাবু বলেন "আমারও ডের  
কাজ আছে, এভাবে বাড়ীতে ডাকিয়ে অপমান করবার কি দরকার  
ছিল আপনার?" এমন সময় উনি এসে পৌঁছান। আমি হাত জোড়  
করে বলি, "আপনি আজ বাড়ী যান বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।  
আর কখনও এ বাড়ীতে না এসে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।"

ওর হাত থেকে পোটফেলিও নিয়ে আমি টেবিলে বেখে এসে  
দেখি অমল বাবু দিবা শান্ত হয়ে জাঁকিয়ে বসে ঠেকে বসছেন  
"অদ্বুত অসম্ভব সহ আপনার মিষ্টার মুখার্জী, এই দীর্ঘকাল ধরী  
নিয়ে কাটিয়ে এনুম আপনার মত ধৈর্য ও সহ কোন ধরীর আমি  
দেখিনি—মিসেস মুখার্জী—মিঃ মুখার্জীকে কিছু বিন্দু পানীর এসমরে  
দিলে ভালো হয়।"

আত্মনিক অলঙ্কার জিনিস!



**জে.সি.মজুমদার**  
এণ্ড সন্স  
জুয়েলাস  
১৮৫/২. বহুবাজার স্ট্রীট • কলি ১২  
ফোন- ৩৪ ১৪৩৭



আমাদের আদার প্রতিফলন কল্লি মগজ • ফোন-৭৯



# কেল্লাকুর্ট দেঙ্গ

(উপভাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৬

রজন অবাক হয়ে গেল।

মালা যে এমন ছট করে এসে হাজির হবে, তা সে ভাবতেও পারে নি। হাসতে হাসতে বললে এসো।

বলেই সে মালার মুখের দিকে একবার তাকালে। দেখলে, সে হেঁট মুখে ঠাঁড়িয়ে আছে শুধু। মুখে কথা নেই, হাসি নেই।

বেমালার সঙ্গে তার এত পরিচয়—মুখজো-পুকুরে বেমালার সঙ্গে তার নিত্য দেখা হতো,—এ বেন সে মালা নয়।

রজন বললে, তোমাদের বাড়িতে এলাম অতিথি হয়ে। আর তুমি কি না—

মালা জবাব দিলে না। ঢলঢলে চোখ দু'টি একবার রজনের দিকে তুলে ধরলে।

রজনকেই কথা বলতে হ'লো। বললে, অতিথিকে আমরা কি বলি জানো?

মালা তখনও কথা বলছে না। রজন বললে, অতিথিকে আমরা নারায়ণ বলি।

বলেই আবার কি বেন সে বলতে বাচ্ছিল, কিন্তু মালার মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলবার উৎসাহ তার হঠাৎ বেন কমে গেল।

—এ কি! মালা চুপ করে আছে কেন?

রজন এমিক-ওমিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। কেউ কি পাড়িয়ে দেখছে নাকি?

কিন্তু দেখবার মধ্যে তো বাড়িতে একমাত্র মালার না ছাড়া আর কেউ নেই?

রজন বললে, কি হ'লো তোমার? মালা! কথা বলছো না কেন?

কথা কেন যে সে বলছে না তা সে নিজেই জানে না। কখনো সে বলতে এসেছিল, এত চট করে সে কথা বলাও যায় না। বলতে এসেছিল তার বাবার কথা। বলতে এসেছিল—

পাক ভাসের অবস্থা ধারণা হয়ে গিয়েছে বলেই কি তার বাবাকে সবদিক অপমান করতে হুজিৎ হ'লো না দেবু

চাটতো? খুনী অপবাদ দিয়ে কেল-হাজতে পুরে রাখলে তার বাবার মত একজন নিরীহ ভাল মানুষকে? এতটুকু বিচারবুদ্ধি ধীর নেই, তাঁরই পূর্ববধু হয়ে তাঁরই বাড়িতে সে বাবে কেমন করে?

এই সব কথা রজনকে বলবার ভক্তই সে এসেছিল। বলতে এসেছিল—লাঞ্ছিত অপমানিত তার বাবা কিবে এসে যদি বলে—বিনা পোষে খে-লোক তাকে এই রকম ভাবে অপমান করতে পারলে, আজ আবার তারই কাছে মাথা হেঁট করে তার একমাত্র কন্যাকে তার হাতে তুলে নিতে পারবে না। যদি বলে, মেয়ে তার চিবকুমারী থাকবে, তাও ভালো, তবু...তবু...

মালা আর ভাবতে পধ্যস্ত পারলে না। তার বাবার মুখখানা মনে পড়তেই হুঁচোখ তার জলে ডব্বে এলো। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি সে তার বাবার মান-সন্মান আত্মমর্যাদার কথা একটি বার ভেবেও দেখবে না?

রজন উঠে ঠাঁড়ালো। ডাকলে, মালা!

মালা মুখ তুলে তাকাতোও পারলে না।

রজন এগিয়ে আসছিল মালার দিকে। এবার সে না তাকিয়ে পারলে না।

কিন্তু এ কি? তুমি কীদছো মালা?

রজন বললে, কেন? কি হয়েছে?

মালা আঁচল দিয়ে তার চোখ দু'টো মুছে বেলে।

রজন বললে, কীদে না, হি! এই তো আমি কিবে এসেছি।

রজন ভাবলে বুঝি সে তারই জন্তে কীদছে। তাই আবার বললে, কীদো না মালা, চুপ কর। কথা বল। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কেন আসনি।

মালা মনে মনেই বললে, ছাই বুঝেছো।

কিন্তু মুখ ফুটে তখনও পধ্যস্ত একটি কথাও সে বলছে না দেখে রজন বললে, কথা যদি তুমি না বল মালা, তাহ'লে আমি বুঝবো—

আমার এখানে আসা তুমি পছন্দ করছো না।

কবাবের জন্ত রজন একটু অপেক্ষা করলে। এ...তাকিয়ে





অস্বাভ

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রইলো মালার মুখের পানে। তার পর বললে, তাহ'লে আমি বাই ?

এতক্ষণ পরে মালা কথা বললে, হ্যা, বাও।

রজন বিষয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। চোখের সম্মুখে বজ্রপাত হ'লেও বুকে সে এতটা বিমিত হ'তো না।

ভুল শুনলে না তো ?

রজন আবার জিজ্ঞাসা করলে, যাব ?

মাথাটা একটু কাৎ করে মালা বললে, হ'।

লজ্জায় রজনের মাথা কাটা গেল। মুখ দিয়ে সে আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলে না। কোটাটা ছিল খাটের এক পাশে পড়ে। তাড়াতাড়ি সেটা সে তুলে নিলে। ছুতো পায়ে দিয়ে মনে হলো যেন সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।—ছি, ছি, এমন করে বৃদ্ধাশিবের কথা শুনে এখানে আসা তারা উচিত হয়নি।

কিন্তু মালা তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে কেন ? সে তাকে চলে যেতেই বা বললে কেন ? তাহ'লে এত দিন ধরে মালা সবক্ষে যে কথা সে ভেবেছে—সব ভুল, সব মিথ্যা ?

রজন কোথাও পঁড়ালো না, মার সঙ্গে একটি বার দেখাও ক'রে গেল না। এক পা এক পা ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে উঠানটা পার হচ্ছে, হঠাৎ তার কানে এলো মালার কণ্ঠস্বর। মার সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি চলছে।

রজনকে পঁড়াতে হ'লো।

মালাকে রজনের ঘরে ঢুকতে দেখে খুশী হয়েছিল তার মা। কাকন ভেবেছিল এক বার আড়ালে গিয়ে শোনে তাদের কথাবার্তা, কিন্তু না, মালা যদি টের পায়, লজ্জায় সে হয়ত ভাল করে কথাই বলবে না রজনের সঙ্গে। তার চেয়ে কাজ নেই সেখানে গিয়ে। কাকন তার ঘরে ফিরে এসে বসে বসে পান সাজছিল।

হঠাৎ সিঁড়ির ওপর ছুতোর শব্দ পেয়ে উঠে পঁড়ালো। মনে হ'লো, ছুতো পায়ে দিয়ে কে যেন নেনে যাচ্ছে।

কাকন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে, জানলার কাছটিকে একা চুপ করে পঁড়িয়ে আছে মালা। রজন নেই।

কাকন বললে, মালা, কি হলো ? এমন করে একা পঁড়িয়ে আছিস যে ?

মালা কথা বলছে না দেখে মা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গেল সে ? রজন ?

মালা বললে, বাড়ী।

কাকন যেন আকাশ থেকে পড়লো।—বাড়ী গেল ? কেন ?

মালা বললে, আমি বললাম যেতে।

—তুই যেতে বললি।

মালা চীৎকার করে উঠলো, হ্যা, হ্যা, বললাম।

কাকনও কম চীৎকার করলে না। বললে, কেন ? কেন ? কেন যেতে বললি ? তুই কি পাগল হয়ে গেছিস ?

মালা এবার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, আমি পাগল কেন হ মা, পাগল হয়েছো তোমরা।

কাকন বললো, এ কী বলছিস মালা ! আমরা পাগল হয়েছি ?

—হ্যা, হয়েছি।

মালা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মা তার হাতখানা চেষ্টা ধরলে। বললে, বল, কি হয়েছে বলে যা।

মালা বললে, কিছুই হয়নি মা, হাত ছাড়ো।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মালা বললে, আমি অবাধ হয়ে যাচ্ছি—তোমরা আমার বাবার কথা কেউ একটি বার ভেবেও দেখছো না।

কাকন বললে, কি আর বলবো তোকে ! তোর বাবার কথা আমরা ভাবছি না ? শুনলি না, কাল তোর শিবু জ্যেষ্ঠা কি বললো ?

মালা বললে, সব শুনেছি, সব জানি। তবু বলছি, বাবার কথা তোমরা কেউ ভাবছো না। তুমি শুধু আমার বিয়ের দ্বন্দ্ব দেখে উঠেছো।

—কেনেচ্ছি কি সাথে ! বয়েসটা কত হলো সেমিকে খেয়াল আছে ?

মালা বললে, আছে, আছে। খুব আছে।

কাকন বললে, তা যদি আছে তো রজনকে বাড়ী যেতে বললি কেন ?

মালা বললে, বাড়ী যেতে বলবো না ত'কি বলবো—তুমি একেবারে বিয়ে করে বাড়ী যাও ?

—ফাক্সলামি করিসু নি। করতো কি না দেখতিস।

—তা যদি সে করতে পারতো, তাহ'লে এর পরেও পারবে না, তুমি ভেবো না।—আমি চললাম।

মালা চলে যাচ্ছিল, কাকন বললে, বাগনে মালা, শোন।

মালা ফিরে পঁড়ালো।—কি শুনবো ? বল।

—তোর বাবার কথা কি বলছিল বল।

—বলছিলাম—এই যে বাবাকে খুনী ব'লে ধরে নিয়ে গেল, এই যে এত দিন ধরে জেলে পুবে রাখলে, এর পেছনে কে আছে বল দেখি ?

কাকন বললে, মুখপোড়া পুলিশ আছে, আরাক কে থাকবে ?

মালা বললে, না, না মা, তুমি কিছু জান না। পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তার পেছনে আছে—একুশি যাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম, তার বাবা।

কথাটা কাকন এত দিন তলিয়ে বুঝেনি। এতক্ষণ পরে মনে হলো যেন মালা যা বলছে তা সত্যি। কিন্তু তাই বলে বুঝা একটা ঝগড়াকাটি করে রজনের মতন পাড় তো হাতছাড়া করাও চলে না। কাকন একটু থেমে কি যেন ভেবে বললে, রজন ফিরে যখন এলো তখন সবই তো চুকবুক গেল।

মালা বললে, না মা, চুকে যায়নি। ছেলে ফিরে এলো, ছেলের বাপের দুঃখ-কষ্ট ভাবনা-চিন্তা চুকবুক গেল সত্যি, কিন্তু খনের অপবাদ দিয়ে ছেলে চুকিয়ে এত বড় অপমান বাক করলে, সে কি ভুলতে পারবে এই কলঙ্কের কথা ? না—লোকে ভুলবে ? বল সত্যি কি না ?

কাকনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না।

মালা বললে, আচ্ছা তুমিই বল মা, বাবা যখন মুখপানি শুকনো করে এসে পঁড়ায়ে, তখন কি বলে সামান্য দেবে তাকে ? কি বলবে ? বলবে—তা হোকগে। তুমি এখন গরীব হয়ে গেছ, এখন যদি তোমার মুখে কেউ লাথি মারে তো মারুক।

কাকন বললে, আমি বুঝেছি। তুই চুপ কর মা, চুপ কর। মালা কিন্তু চুপ করলে না, আবার বলে যেতে লাগলো, বাবা এসে দেখবে হয়ত তাঁর হেঁট মাথা আরও যাতে হেঁট হয়, আমরা তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমরা দুই মারেরি করে তুমিই ছেলেকে

নিরে খেই খেই করে নাচছি। আমার ওপর বাবার কি ধারণা হবে একবার ভেবে তাকো? আমি মেয়ে হয়ে জন্মছি বলেই কি—

কথাটা মাসাকে শেব করতে দিলে না কাকুন। বললে, তাহ'লে কি হবে তাই বল। ও আপনায় ছেলে কিংবা পেয়ে আনন্দে মেতে থাকবে, তোর বাবার কথা কি তার মনে থাকবে? দেবু চাটুজোর মত লোক কি তোর বাবার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে?

মালা বললে, তা যদি না চায় তো বিয়ে হবে না।

কাকুন বললে, ও মা, সে কি কথা। তোর বিয়ে হবে না আর রজন অস্ত্র জারগার বিয়ে করবে?

মালা বললে, তা যদি সে করতে পারে মা, তাহ'লে তার হাতে তুমি মেয়ে দিয়েই বা কি করবে?

তাও তো সত্যি!

কাকুন বললে, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না মা, আমার মাথার ভেতরটা কেমন খেল করছে। তোর শিবু জ্যোতাও তো এখনও এলো না। সে এলেওনা তাকে এই সব কথা বলে দেখতাম সে কি বলে। চাকরটাকে একবার পাঠাও তোর বাড়ী?

মালা বললে, সে কি আর বাড়ীতে আছে? আজ মাঘলার দিন—হুমি তুলে বাছ মা?

কাকুনের মনে পড়লো—বুদ্ধাশিষ্যকে কলকাতা পাঠিয়েছিল ব্যাবিষ্টার আনবার জন্ত। রজন্যের সঙ্গে দেখা হতেই ফিরে এলো।

কাকুন বললে, তাহ'লে তোর শিবুজ্যোতা আজই তো বলবে—রজন ফিরে এসেছে।

মালা বললে, না। বোধ হয় বলবে না।

কাকুন বললে, না বললে তো ছাড়বে না তোর বাবাকে!

—আজ না ছাড়ুক, এক দিন ছাড়তেই হবে।

কাকুন বললে, তোর শিবুজ্যোতা রজনকে ছেড়ে নিতে বারণ করে গিয়েছিল। কি করবা বল, এখনও পথ আছে।

কথাটা মালা বুঝতে পারলে না। বললে, কি আবার করবে? সে তো চলে গেছে।

কাকুন বললে, না যাবনি। যাবে কেমন করে? কাল থেকে আমি যে বাইরের দজ্জায় তালী বন্ধ করেছি।

—চাকরটা খুলে দেবে।

কাকুন বললে, পারবে না। চাবি আমার কাছে।

—দিদিমণি!

তাকিয়ে কেবলে হিন্দুস্থানী চাকর এসে কাঁড়িয়েছে।

কাকুন বললে, কি রে, কি বলছিল?

—না মা, আপনাকে নয়, দিদিমণিকে।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, আনাকে বলছিল? কি বলবি?

—নতুন বাবু চাবি মাগছে। আমি বললাম—চাবি মা'জির কাছে। বাবু বললে, না তুই দিদিমণিকে বল। মাকে বলিস না।

মালা মুখ টিপে একটু হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। মা'র মুখের পানে তাকিয়ে বললে, বিয়ে দাও না চাবিটা।

কাকুন বললে, আমি চললাম নীচে। তুই থাম দেখি।

কাকুন ঘর থেকে বেদিয়ে গেল।

মালা ডাকতে লাগলো, মা! মা!

কাকুন ফিরেও তাকালে না। জবাবও দিলে না। [ক্রমশঃ]

## শুভ বিবাহে

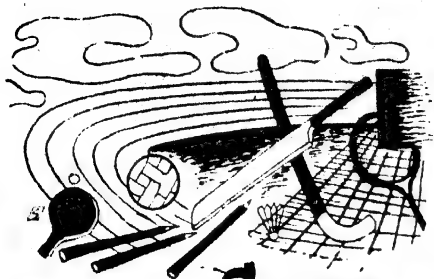
শুভ বিবাহে কিংবা যে  
কোনও শুভ কাজে যৌতুক  
দেবার মত আধুনিক  
মনোরম ডিজাইনের খাটি  
গিনি সোনার গহনা ও  
সাঁজা গ্রহ রত্ন প্রচুর  
পরিমাণে মজুত আছে।  
ফোন : ৩৪-৪৯৮২

## অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস

মাসিক বহুমতী ও বর্ষা বিজ্ঞি

৮৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা ২২

দণ্ড মানসম



# খেলাধুলা •

## অলিম্পিক প্রসঙ্গ

আর কয়েক দিন বাদেই অলিম্পিকের আসর শুরু হবে। অলিম্পিকের প্রস্তুতিপর্বে এ লেখাই আবার শেষ লেখা। দ্বাবার ১৯৩০ সালে এ পর্য্যালোচনা শুরু হবে সবাদপত্র, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা।

যোড়প অলিম্পিকের জন্ম নগর নির্মাণ, টেডিয়ানের উন্নতি সাধন, গাণি: টাক, সাইকেল কোর্স, ফুটবল পুলা প্রভৃতি নির্মাণ খাতে ধবত হয়েছিল আধুনিক চার কোর্ট টাঙ্ক। মেলবোর্ণের পুয়ানো ক্রিকেট টেডিয়ামই অলিম্পিকের প্রধান অস্থান কেন্দ্র। অলিম্পিকের মন্ত্র সেট পুয়ানো টেডিয়ামে স্থাপন করা হয়েছে। এক তদার পরিবর্তে সে টেডিয়ামে তিন ভাগের পরিণত হয়েছে। এ টেডিয়ামে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার দর্শকের স্থান সন্ধান হবে।

ফুটবল, ডাটভি, সাইক্লিং, ফুটবল ও হকি খেলার প্রাথমিক খেলাগুলি অলিম্পিক পার্কে অস্থাপিত হবে। ঠীল ক্রিকেট আছাদিত ফুটবল পুলায় প্যালারোতে আধুনিক সাতো পাঁচ হাজার দর্শকের স্থান সন্ধান হবে।

হকি মাঠের চারি দিকের পাড়ের উপর প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের স্থান সন্ধান হবে। তবে কিছু দর্শক বাতে আবার বসে খেলা দেখতে পাবেন, তাব জন্ত প্যালারি নির্মাণ হয়েছে।

অলিম্পিক অস্থানের অঙ্গ হিসাবে যোড়প অলিম্পিকের সময় মেলবোর্ণে চিহ্নস্তম্ভ, ভৈলটিয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক প্রদর্শনী খেলা হবে। এ ছাড়া অর্কেস্ট্রা এবং সঙ্গীত, নৃত্যের আয়োজন হয়েছে।

মেলবোর্ণের যোড়প অলিম্পিকের উদ্বোধন অস্থানের জন্ত ডিউক অব এডিনবরা রাজকীয় আহ্বানবলে অস্ট্রেলিয়া অভিযুখে যাত্রা করেছে। ২০তম নভেম্বর মেলবোর্ণের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠে অলিম্পিক অস্থানের উদ্বোধন করবেন।

দেশ-বিদেশের গ্র্যান্ডস্টাট, খেলোয়াড়, কুটুম্বোদ্ধ, সাতাক মেলবোর্ণে অলিম্পিক অস্থান কালে বাতে নিজ নিজ দেশের খুটিনাটি রবাদ জানতে পারেন, সেজন্ত বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে মেলবোর্ণে জীবদগুপ সমবরাহের আয়োজন হয়েছে।

নভেম্বর মাসের দু' তারিখে গ্রীস দেশের ঐতিহাসিক "অলিম্পাস" শিখরে পাহাড়ে পাড়িয়ে প্রাচীন সোয়াকে সুরক্ষিত গ্রীক তত্ত্বগী রাষ্ট্র অলিম্পিক কনালের জন্ত স্থাপত্য থেকে জতনী করতে সাহায্য

বে অগ্নি সংগ্রহ হয়েছে, কোরাটাস স্থপার কঠলেশন বিমানবোলে পুতারি অস্ট্রেলিয়ার অভিযুখে। অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নিশিখা এখন কিয়ছে অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ডলোন্দের হাতে হাতে। এ মশাল অস্ট্রেলিয়ার তিন হাজার মাইল পূর্ব অতিক্রম করে নির্দিষ্ট দিনে অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত গ্র্যান্ডলোন্দের পূণ্য ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করবেন।

## ফুটবল

আই, এক, এ, শীত—দীর্ঘ দিন বাদে আই, এক, এ, শীত পর্য্যালোচনা করার মত সময় নেই। কারণ এ খবর পুয়ানো হয়ে গেছে। তবুও অল্পের মধ্যে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল আই, এক, এ, শীত বিজয় করে বিশ্বকুট জয়ের গৌরব অর্জন করল। আই, এক, এ, শীতের কাইতালে এবার ছিল একাদশ অভিযান। অপর দিক এরিয়ার্স দলের শীত কাইতাল খেলার তৃতীয় পদক্ষেপ। মোহনবাগান ও এরিয়ার্স ক্লাবের পিছনে ছোট এক ইতিহাস আছে। দীর্ঘ ১৬ বৎসর আগে ১৯৪০ সালে দুই দলের ফাইনাল খেলার এরিয়ার্স ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে শীতবিজয়ী হয়। সে দিনের সেই খেলা স্মরণ করে এবারের ক্রীড়ামোদীর এই খেলা দেখতে বেশ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫৬ সালের আই এক এ শীত ফাইনাল খেলা বেধে গেছে এক ব্যর্থ যুতি। ফাইনাল খেলাটি এত নিম্নস্তরে হওয়ার কারণ অসুস্থান করলে দেখা যায়, মাঠের অবস্থা, অস্বাভাবিক মেলের তেজ, কয়েক দিন অবিশ্রান্ত কুটীর ফলে মাঠের যে অবস্থা হয়েছিল তাতে স্বাভাবিক খেলা আশা করাই বুখ। তিনটের সময় ইতিপূর্বে কখনও ফাইনাল খেলা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত খেলার মোহনবাগান দল ৪-০ গোলে এরিয়ার্স দলকে পরাজিত করেছে।

## আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

নিখিল ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ২-১ গোলে পরাজিত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃতার ট্রফি লাভ করেছে।

এবার উত্তরকালের কাইতাল খেলার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে জড়ীতিকর ঘটনা ঘটেছে, তা সভাই মনকে পীড়া দেয়। অথবা ফাউল করার জন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধী খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ ত্যাগ করার নির্দেশ দেন, কিন্তু খেলোয়াড় মাঠ থেকে বাহির না হওয়ার জন্ত রেফারী খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ আচরণের জন্ত টীমকে "ক্লাচড" করে দেওয়া হয়।

ছাত্র-খেলোয়াড়ের এ মনোভাব কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়।

## ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার ১ উইকেটে পরাজয় বাকার করে মাত্রাজে অস্থাপিত প্রথম টেস্ট খেলার এক ইনিংস ৫ রাশে ভারতকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেস্ট—প্রথম টেস্ট মাঠে অস্ট্রেলিয়ার তিন জন সেরা খেলোয়াড় মিলার, ডেভিডসন ও আর্চবের অস্থাপিতভাবে এক ইনিংস ও ৫ রাশে জয়লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক বিনাউড ও লিওওয়ার্ডের প্রশংসনীয় বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আশাঞ্জন ব্যাট করতে পাবেন নি।

এ টেস্টে ফাট খেলার বাদ দিয়ে শুধু ৭ এক দুই খেলার



ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা  
ও বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না । ]

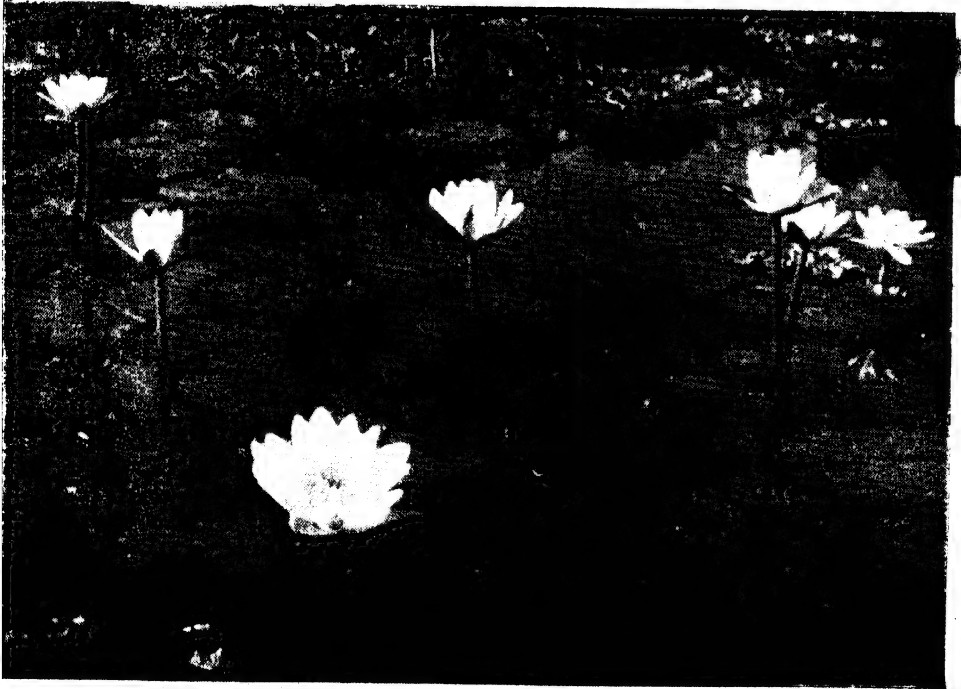
পার্বতী ( তাজোর )

—ভবশ ভট্টাচার্য্য



পদ্মপুকুর

—শ্রীযোগোপাল সেন



ব্রোবোন পার্ক ( দার্জিলিং )

— স্বপনকুমার ঘোষাল



ঐশ্বের দিনে

— অরুণকুমার চক্রবর্তী



জম্মাষ্টমীর দিনে

— মদন মজুমদার

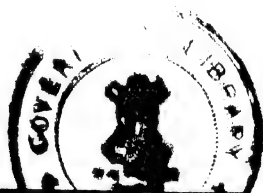




কে শিকারী ?  
—সন্তোষ ভট্টাচার্য



পাখির বাস।  
—শঙ্কর দত্ত



মর্ত্যক:  
—হুমায়ুন কবীর



খান শুকানো

—সুনীল কান্দা



দিয়ে দল গঠন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝে পাওয়া যায় নি। এ টেটে পরাক্রম একমাত্র ফাষ্ট বোশার না গ্রহণ করারই ফল। তার উপর প্রবীণ খেলোয়াড় অধিকারীর কাছ থেকে কিছু আশা করা যে অসম্ভব তা কতৃপক্ষের বোকা উচিত ছিল। বিনাউড ও লিগুওয়ালের মারাত্মক বোলিং অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের প্রধান কারণ হলেও অধিনায়ক জনসনের ৭৩ রাণ উল্লেখযোগ্য।

ভারত—১ম ইনিংস—১৬১ (ভি, মঞ্জেরকার ৪১, উম্রিগড় ৩১, মানকড় ২৭, পি, রায় ১৩, কৃপাল সিং ১৩, বিনাউড ৭২ রাণে ৭ উইঃ, ক্রফোর্ড ৫২ রাণে ৩ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩১১ (জনসন ৭৩, ক্রেগ ৪০, বার্ক ৩৫, ক্রফোর্ড ৩৪, হার্ভে ৩৭, ম্যাকডোনাল্ড ২১, ম্যাকে ২১, মানকড় ১০ রাণে ৪ উইঃ, গুপ্তে ৮১ রাণে ৩ উইঃ, গোলাম আমেদ ৬৭ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৫৩ (রামচাঁদ ২৮, উম্রিগড় ২৫, কৃপাল সিং নট আউট ২০, মঞ্জেরকার ১৬, লিগুওয়াল ৪৩ রাণে ৭ উইঃ)।

### অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও পাঁচ রাণে বিজয়ী

দ্বিতীয় টেটে—বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেটে অমীমাসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এ খেলায় অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব সর্বজন-বিস্তৃত। বোম্বাই টেটে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন ও সহ-অধিনায়ক কিথ মিলার খেলতে পারেন নি। এ ছাড়া উইকেট-কিপার ল্যাংলে ও আঘান ক্রেগ ও টেকস খেলোয়াড় রন আর্চার অসুস্থ থাকার খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। খেলার সময় ডেভিডসন এবং ক্রফোর্ড অঘাত পান। এত বাধা-বিশিষ্ট সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা নিজ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন। শেষ পর্যন্ত খেলাটি অমীমাসিত ভাবে শেষ হয়।

ভারত—১ম ইনিংস—২৫১ (রামচাঁদ ১০১, মঞ্জেরকার ৫৫, অধিকারী ৩৩, পি, রায় ৩১, ম্যাকে ২৭ রাণে ৩টি, ক্রফোর্ড ২৮ রাণে ৩টি, বিনাউড ৫৪ রাণে ২ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৫২৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) (বার্ক ১৬১, হার্ভে ১৪০, বার্ক ৮৩, লিগুওয়াল নট আউট ৪৮, রাশারফোর্ড ৩০, কন ম্যাকে, ২৬, গুপ্তে ১১৫ রাণে ৩টি, জেব প্যাটেল ১১১ রাণে ১ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস—২৫০ (৫ উইঃ) (পি, রায় ৭১, উম্রিগড় ১৮, মঞ্জেরকার ৩০, অধিকারী নট আউট ২২, বিনাউড ১৮ রাণে ১ উইঃ, রাশারফোর্ড ১১ রাণে ১ উইঃ)।

তৃতীয় টেটে—ইডেন উডানের তৃতীয় টেটে ম্যাচে বেশ উৎসাহ ও ঈর্ষানুগ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এ টেটে ম্যাচকে ক্রিকেট খেলার পান অঙ্গশিরে 'লোকোবির গেম' বলে আখ্যাত করা যায়। কারণ, কান দলই তাদের কোন ইনিংসে দু'শ রাণ করতে সমর্থ হয় নাই।

অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ১৭৭ রাণে শেষ হলে, ভারতীয় ল ব্যাট করতে নামে। ১৫৬ রাণে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া দলকে ১৮১ রাণের মাধ্যমে খেলার সমাপ্তি ঘাষণা করতে হয়। কারণ ল্যাংলে অসুস্থ ছিলেন। তৃতীয় দিনের লোটির এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যাতে অনেক ক্রীড়ামোদি পাশা করেছিলেন এ টেটে ভারতীয় দলের জয়লাভ অবশ্যস্বাভাবিক।

পর পর ছুটি টেটে মানকড় ও রায় ওশেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে সুবিধা করতে না পারার অনেকে মনে করেছিলেন, ভারতীয় দলে নতুন আশাপ্রদ না হওয়া দলের অবস্থা এখন এক বিপর্যয়মুখী। তৃতীয় টেটে তরুণ খেলোয়াড় নরী কণ্টাস্টের রায় এর সংগে পার্থক্য হয়। এই প্রথম ছুটি মোটামুটি ভালই খেলেছেন বলতে পারা যায় নরী কণ্টাস্টার মানকড়ের উটো সংস্করণ বলা যায়। ইনি বই হাতে ব্যাট করেন ও ডান হাতে বল করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের নিরাক্ষণ ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় দল এ টেটে ম্যাচ ১৪ রাণে পরাজিত হয়েছে। এই জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া দুই খ্যাতিমান বোলার বিনাউড ও বার্কের কৃতিত্ব বেশী।

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১৭৭ (বার্ক ৫৮, ক্রেগ ৩৬, গোলাম আমেদ ৪১ রাণে ৭ উইঃ; মানকড় ৩৬ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—১ম ইনিংস—১৩৬ (মঞ্জেরকার ৩৩, কণ্টাস্ট ২২, বিনাউড ৫২ রাণে ৬ উইঃ; লিগুওয়াল ৩২ রাণে ৩ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—১৮১ (১ উইঃ ডিক্লেঃ) (হার্ভে ৩১, লিগুওয়াল ২৮, ম্যাকে ২৭, বার্ক ২২, বিনাউড ২১, মানকড় ৪১ রাণে ৪ উইঃ; গোলাম আমেদ ৮১ রাণে ৩ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৩৬ (পি, রায় ২৪, কণ্টাস্ট ২০, উম্রিগড় ২৮, মানকড় ২৪, মঞ্জেরকার ২২, বিনাউড ৫৩ রাণে ৫ উইঃ; বার্ক ৩৭ রাণে ৪ উইঃ)।

[ অস্ট্রেলিয়া ১৪ রাণে বিজয়ী ]

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"**



প্রতি প্যাকেট  
২৪ টি  
বড় প্রাচুর্য

- কপ্পে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সেকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

**আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে**

**আর্য বেকারী অ্যাণ্ড কন্সল্টেশনারী**

**কলিকাতা - ২২**



### ভারতীয় সঙ্গীত

সঙ্গীত একটি বিজ্ঞা, এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা নামে পরিচিত, আমি বাল্যকাল হইতে বিস্তৃত সঙ্গীতের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কারণ, আমাদের বাড়িতে বাণেশ্বরস্বরায় সঙ্গীতের আলোচনা ও সাধনা চলিয়া আসিতেছে প্রায় ১২৫০ খৃঃ-অঃ হইতে। আমরা শিতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বরী সঙ্গীতকেশরী ও হারায়ন চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলাভূগত বিরূপুর সেই জগৎ সঙ্গীতের পীঠস্থান। আমিও জানিয়া আসিয়াছি “ক্লাসিক্যাল” বা প্রাচীন, শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিন্দুস্থানী ঐশ্বর বা তন্ত্রমন্ত্রের ধারার, বাহা, প্রভৃতিকেই বুঝায়। সঙ্গীতের বিষয়গত গ্রন্থাদি কিছু হস্ত অস্থায়ীসনের ফলে আজ আমার সুদূর সরল একান্ত বিশ্বাস, আশ্চিৎসক প্রতিপন্ন হইতেছে। আমি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা, দুইজ্যোৎস্নাও, জেনোভা, চীন বা পিকিএ এবং আরও বহু স্থানে করিয়াছি। বর্তমানে আলোচনা করি, বিশ্বাস ততই হারাই। জোনবাপী এই দৃঢ় সংকল্পটিকে ক্রমান্বয়ে বলিয়া বজ্রন করিতেও অস্তরে বড়ই ব্যথা অনুভব করি।

তাবিয়া দেখিতেছি ক্রমান্বয়ে ধারণার মূলোচ্ছেদই কর্তব্য। দেশের বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত অস্থায়ীসনকারী আজও ক্রমান্বয়ে ধারণা অসম্বোধে ও বিনা বিশ্বাস অস্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আশ্রয় ধারণার মূলোচ্ছেদ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করা প্রত্যেক সঙ্গীতস্নাতকের কর্তব্য ও তাহা জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করাও কর্তব্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও তাহার ইতিহাস এ দেশের সকলেই জানেন, উত্তার বৃত্তান্ত পরিচয় জনস্বত্বক। প্রাচীন বা শাস্ত্র এই দুইটির ভাবের কিছু ব্যাখ্যার প্রকার মনে করি। প্রাচীন বলিতে আমরা প্রাগৈতিহাসিক বা পৌরাণিক কাল বা যুগ বুঝি। শাস্ত্র বলিতে আজকাল নানারূপ অর্থ হইতেছে। যে কোন পদ্ধতি বা ব্যাকরণ, কিন্তু শাস্ত্র শব্দের সাংখ্যিক অর্থ হইতেছে শাসন বা অনুষ্ঠান। বাহা দেবতা বা নিঃস্বার্থ প্রবর্তিত। যেমন—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শনাদি। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন কোন সঙ্গীত-বিষয়ক নিয়ন্ত্রক বুদ্ধি-বিশিষ্ট গ্রন্থ পাই না, যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আমরা ‘ভারতের নাট্যশাস্ত্র’ নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাই। তাহা বর্তমান সময় হইতে চৌদ্দ শত কি সাতো চৌদ্দ শত বৎসরের

কিছু পূর্বে লিখিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাহাই অনুমান করেন। এই গ্রন্থে সেই কালের অভিনয়কলায় বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা এবং সঙ্গীতের (গীত, বাহা, নৃত্য) নিত্যকাল স্থল বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার আর সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহার মোটেই চলে না। সে গ্রন্থের ক্রমকাল মাত্র ১৪ কি ১৫ বৎসর বলিয়া মনে হয়, তাহাকে কি করিয়া শাস্ত্র মনে করিব? এই গ্রন্থটির বচন্যতা ভরত। কিন্তু এই ভরতটি কে? একদেবদেবতা ভরতঃ সঙ্গীতঃ মার্গসঙ্গীতঃ। অপসংগোভিত গন্ধর্ভঃ সঙ্করাগ্রহে প্রযুক্তবান।” (সঙ্গীতপারিজাত) এই শ্লোকে যে স্বর্ষি ভরতের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি কি সেই ভরত? নিশ্চয় নয়। তাহা হইলে দেখা যাউতেছে যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নয়। এবং উহা পদ্ধতি নির্ণায়ক সঙ্গীতশাস্ত্র নয়। তার পর আমরা মতঙ্গ, কোহল, দত্তিল, পার্শ্বদেব, শাক্তদেব, নারদ, সোমনাথ, অহোবল, দামোদর প্রভৃতির যে গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা ক্রমশঃ আধুনিকতর ও আধুনিকতম। নারদ—কিন্তু কোন্ নারদ তাহা জানি না। কোন কোন গ্রন্থকার বর্ণিত রাগ-রাগিণী ও মতবাদ পরম্পরের মধ্যে বিরোধ যুক্ত। কোন কোন গ্রন্থে আমরা ক্রমমত, শিবমত, নারদমত, ভরতমত, চন্মুগমত, কল্লিনাথমত ইত্যাদি কতকগুলি মতের উল্লেখ পাই। কিন্তু ঐ মতের কোন বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা তদ্বিষয়ক জ্ঞাপক তাহার কিছু সন্ধান কোন গ্রন্থেই পাই না। কোন কোন গ্রন্থে মতগুলির সামান্য কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু ভূগণের বিষয়, সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন চিত্রমাত্র ইঙ্গিত নাই। অতএব দেখিতে গেলে ঐগুলি ব্যর্থতঃ আমাদের কোন উপকারে আসে না। মুসলমান রাজত্বের কিছু আগে, হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে এমন একটা সময় গিয়াছে বা যুগ গিয়াছে, যখন দেবতা বা স্বর্ষি-প্রবর্তিত ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব এবং বিবিধ তথ্যের সন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র কবি-বিশ্বাস্যতার বশবর্তী হইয়া সংস্কৃত ভাষায় সুশ্লীল ও কবিত্ব-সম্পন্ন কতিপয় সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি সঙ্গীত ব্যুৎপত্তি ও ক্রিয়াসিদ্ধির সম্যক উপলব্ধিহীন হইয়াও গত্যন্তগতিক রীতিতে কতকগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ স্বতঃস্ফূর্ত সারল্য বশতঃ নিজের নিজের সঙ্গীতে সম্যক জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতেও কুচিত হেনি। কারণ, তাঁহারা সত্যপ্রিয়। আবার অনেকেই তলানীস্থান প্রচলিত সঙ্গীতের (বাহার সঙ্গিত স্বর্ষি প্রবর্তিত সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক নাই) তর্জিত বা অব্যোহ বৃত্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রসূত নানা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাহার সমাধান করা অসম্ভব। তাঁহারা যে সকল বিধি-নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ-ক্রেত্রে প্রয়োগ করিবার কোন প্রণালীর সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় না। এক কোন গ্রন্থের সহিত কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যার কার্য্যোগ্যবোধী অর্থ-সামঞ্জস্য দেখা যায় না। সাময়িকের উল্লেখ বেদাদি গ্রন্থ অনেক পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু উহার গাতিবার পদ্ধতি আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত। কাশীধামে শ্রীশ্রীজগদগুরু ও ৩৬বিদ্যনাথভট্টর মন্দিরে যে বেদপাঠ হয়, তাহা গীতপদব্যাচ নয়। গাতিবার কোন শৃঙ্খলাযুক্ত পদ্ধতিও বড় একটা দেখা যায় না। বর্তমানে বাহা বা বেদপাঠ করেন, তাঁহারা পাঠ কালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও স্বর সহযোগে বাহা উচ্চারণ করেন, তাহা হ্রস্ববহু পাঠ হইতে পারে, কিন্তু গীত নয়। মার্গসঙ্গীতের

নাম অনেক স্থানেই শুনা যায়। কিন্তু তাহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করিলে মাত্র কয়েকটি শ্রোকের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, মার্সীর সঙ্গীত মর্ত্য লোকবাসিগণের শুনিবার সৌভাগ্য কখন ঘটে নাই এবং ঘটবার সম্ভাবনাও নাই। একটি শ্রোকের উল্লেখ করিতেছি। “মার্সদেদী বিভাগেন সঙ্গীতঃ বিবিধঃ মতঃ। স্বর্ণে মার্গাশ্রিতঃ দেশাশ্রিতঃ তৃতলরজ্জকঃ।” (সঙ্গীতভাষ্য) দেখা যায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আজও লোকচক্ষুর আগোচর। আমরা কোন বিশেষ ঠিক মত সন্ধান পাই না। প্রাচীন সঙ্গীতের চির মধুর করনার মোহভালও ছিন্ন করিতে পারি না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রথম সৃচনা করেন প্রধানত সঙ্গীতসাধক “আমীর খসরু” (পারস্ত দেবী) মহম্মদ টোগলগের সময় (খৃঃ অবঃ ১২৫৬ আন্দাজ)। ইনি সম্রাট আলাউদ্দিনের মন্ত্রী ও সেনাপতির কাজ করিতেন। ইহাদের পর আজ প্রায় ২০০ শত বৎসর আর কোন সঙ্গীতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিতে পাই না। ইতিহাসে দেখা যায়, গৌড়ালিয়রের রাজা মানসিংহের একান্ত যত্নে রূপদ গানের বিশেষ মধ্যক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল। এবং শুনা যায়, হরিদাস স্বামী শিবা “রামতনু পাড়ে” বা তানসেন প্রথমে রাজা মানসিংহের দরবারে ছিলেন। এবং এখান হইতেই তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে আহৃত হন। আরও দেখা যায়, সম্রাট আকবর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্দ্ৰা তানসেন কর্তৃক যে রাগসঙ্গীত প্রবর্তিত ও লিপিবদ্ধ হয়, সেইগুলিকে অধুনা পণ্ডিতগণ কিছু রূপান্তর করিয়া সেই ধরনের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বহিরা আনিতেছেন। কিন্তু ইহাবও বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রকৃত ভারতীয় সঙ্গীতের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সঙ্গীতের আলো অতি কীণভাবে দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রাচীন লিখিত শাস্ত্র নিশ্চয় আছে, আজ আমাদের অজ্ঞতা ও সর্কার মনের অজ্ঞতার আজ তাহা লুপ্ত। সাধনার প্রয়োজন আজ শুধু লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধারে।

আরও একটি কথা বলিতে চাই। আজ-কাল দেখা যায় এক শ্রেণীর লোক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য সঙ্গীত-জগতে আর একটি নূতন শিবির গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষ এবং মেহনতি জনতা নাকি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝে না এবং শুনিতেও চাহে না। সেই জন্য তাঁহারা আধুনিক সুরের বিকল্পে অন্য কোন সুরে জনসাধারণের, সাধারণ হৃৎ-হৃদ্পাশ এবং তৎসঙ্গে গণজাগরণের গীত গাহিয়া থাকেন। তাহাকে চারণ গীত বলা যায়। আমিও স্বীকার করি তাহার প্রয়োজন আছে ও থাকিবেও। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে মৃত হইয়াছে বা যাইবে। আমি ভোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন দিনই মৃত্যু হইবে না। হইতে পারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জনসাধারণ বুঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাহা জনসাধারণের দোষ নহে। কারণ পূর্ব-পূর্ব সঙ্গীতজ্ঞরা ইহা প্রচারে কৃপণতা করিতেন এবং রাজা, বাদশাহ মহলে তাঁহারা নিজ নিজ জীবন সুখনিদ্রার কাটাওয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের কাঠামো ওর জন্য কিছুটা দারী। জনসাধারণ উদ্বোধন জন্য উদ্বোধন খাটিয়া এই মহান বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র অনুশীলন করিতে পারে না। এহে জাতি, জনগণ। সজ্জনরা, জ্ঞানীরা, পণ্ডিত ইহা

লালিত পালিত হইতেছে ধর্মীর প্রাশনে এবং বৃষ্টিমেষ সঙ্গীত  
বিশ্বাসীদের মধ্যে। সাধারণ জনতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করেন,  
কারণ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রতেই বুঝা যায়। যত ভেঁট,  
তানসেন, বৈজুবাগেরা, চুলী, ইত্যাদি। ইহা প্রচারের ও প্রসারের  
চেঁচা প্রত্যাকের করা উচিত।—ডাঃ শ্রীকালীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# ଆର୍ଥବି

মাফি বেডিও ও মেটো গোয়েন্দা মোহাৰ-এৰ যুক্ত শ্ৰেণীৰ এগৰটি সঙ্গীত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়েছে। প্ৰতিযোগিতাৰ তাৰিখ ৬ই ফেব্ৰুৱাৰী, ১৯৭৭। এদিন 'এম-জি-এ'ৰ 'হাই নোটাউটি' ছবিটি বোম্বাই ও কলকাতাৰ একসঙ্গে মুক্তি পাবে। মাফি মেটো সঙ্গীত প্ৰতিযোগিতাৰ গায়কসকলৰ মध्ये যিনি প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবেন, তিনি ২৫০০ টাকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবেন; আৰু গায়কসকলৰ মध्ये যিনি প্ৰথম হবেন তিনি ২০০০ টাকা অৰ্জন কৰিবেন। প্ৰতিযোগিতাৰ স্কালফ প্ৰকাশিত হ'বাত এক বছৰেৰে

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-কয় :- ৮/২, এসম্প্রানেড ইস্ট, কলিকাতা - ১

মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের পাঁচটি ভারতীয় ছায়াচিত্রে একটি করে দেশাধ্য সঙ্গীত গাইবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। গায়ক-গায়িকারা এই ভাবে তাঁদের পুরস্কারের টাকা লাভ করবেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু গায়ক-গায়িকাদের দংড়াপ্ত ১৫ই ডিসেম্বর সকালের মধ্যেই বোম্বাই-এর মেট্রো সিনেমার ম্যানেজারের হাতে আদা চাই। \* \* \* আলী আকবর কলেজ অব মিউজিকের উদ্যোগে ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের সাহায্যকল্পে একটি সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে যোগদান করবেন : আলী আকবর খাঁ, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, পান্নালাল ঘোষ, বাহাদুর খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিষকুমার, কণ্ঠে মহারাজ, মহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি। \* \* \* ৭ই হইতে ১১ই ডিসেম্বর অবধি দক্ষিণ-কলিকাতার ইন্দিরা সিনেমা হলে পাটনাবাসী সাথ ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন হইতেছে, এক আশা করা বাইতেছে, এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য বিখ্যাত শিল্পিগণ অংশ গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনের উদ্যোগী তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলন পক্ষে উহার প্রেসিডেন্ট ডাঃ নয়ন দত্ত কারশোয়ার আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত সন্বাদ পরিবেশন করিয়া বলেন, সাধারণের মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তাঁহারাই ইচ্ছা হয় যে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৪০ সালে সজ্জা উত্তর হয়। সজ্জার সম্পাদক শ্রীমদেব বানার্জি জানান যে, "সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এতে ফ্যাকাল্টি অব মিউজিক এবং আই-মিউজ পরীক্ষা দিবার জন্য এই তানসেন দ্বিত্বিক কলেজটিকে (তানসেন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) অনুমোদন করিয়াছেন।" তিনি বলেন, পাটনাবাসী সম্মেলনে তিনটি অধিবেশন সাগরাগ্রি একটি সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি ও একটি সকালে হইবে। বাহির হইতে যেসব শিল্পী আসিবেন তন্মধ্যে আছেন পণ্ডিত ভদ্রারাম ঠাকুর, প্রঃ ভীমসেন যোশী, প্রঃ সোহন সিং, প্রঃ গুলাম সাদিক হুসেন, পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ, শ্রীমতী মানিক বর্মা, শ্রীমতী সখ্যজী বাণে, কুমারী লীলা গাডকার (নৃত্য), বৃন্দা আলিউদ্দিন খান, ওঃ ফিরায়ে খান, ওঃ আলি আকবর খান, ওঃ শান্তাপ্রসাদ, প্রঃ আন্তোভাভ ভট্টাচার্য, প্রঃ নিশিৎ বানার্জি, প্রঃ ইমামাং খান এবং প্রঃ গুলাম জাফর খান। সজ্জার পক্ষ হইতে শ্রীকানাইলাল বসু হুণ্ড করিয়া বলেন যে, প্রখ্যাত শিল্পিগণ বাবদ এই ধরনের সম্মেলন উদ্যোগীদের অত্যন্ত ব্যয়াদিকা বহন করিতে হয় বলিয়া এই সব

সম্মেলন জনসাধারণের পক্ষে সুলভ করা যায় না। ইগার উপায় নির্ধারণে উদ্যোগীদের একটি ফেডারেশন গঠন করা যায় কি না তৎসম্পর্কে তিনি সচিষ্ট সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলেন।

## রেকর্ড-পরিচয়

পূজ্য অনেকগুলি রেকর্ড প্রকাশের পর স্বভাবতই কিছুটা অবকাশ চাই, তবু সম্প্রতি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' যে দু'খানি বিশিষ্ট রেকর্ড প্রকাশ করেছেন, তার বিষয় আমরা জানাচ্ছি :

N 87538—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও বৃন্দা আলি আকবর খাঁ-এর নাম পৃথিবী বিখ্যাত। এই দু'জন শ্রেষ্ঠ বাদ্যী, সেতার ও স্বরোচর বাদ্য 'সিন্ধু-ভৈরবী' এবং 'সারাং' পরিবেশন করেছেন একটি রেকর্ডের দুইটি দিকে। N 80119—মহো প্রত্যাগতা, ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতি-নিধির অজন্তমা কুমারী নীরা চট্টোপাধ্যায় দু'খানি শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। প্রথমখানি 'ওর্জরী-টোরী', দ্বিতীয়খানি 'হুমরী'। এমনি শ্রেষ্ঠ রেকর্ড উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রিয়দের সংগ্রহে রাখবার উপযুক্ত। 'অবপালী' N 82721—N 82723 স্বয়ংক্রিয় সেট রেকর্ড

বৃক্ষজন্তুর মায়ক হিসেবে সম্প্রতি 'অবপালী' নামে একটি চমৎকার সেট বেরিয়েছে। মাত্র ৪ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ'লেও সেটি গানে ও সঙ্গীত এমনি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা সকলেরই ভালো লাগবে। রচয়িতা মুহাম্মদমোহন সেন যে আঙ্গিকে এই নাটিকাটি রচনা করেছেন, সেটা রেডিও-নাটকের মতো এবং যেতে-তে রেকর্ড-নাটকও কেবল শ্রাণ-দর্শনীয় নয়, তাই শ্রুত্বের মূখের ভাবানিতে গল্পটির বর্ণনা এবং মাঝে মাঝে চরিত্রচিত্রে, সঙ্গীত ও সঙ্গীত প্রবেশ বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। প্রাচীন বৈশাখীতে বাস করতেন রাজনটী অবপালী, স্বয়ং মহারাজ তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত, রূপ-বোনে উজ্জ্বল, ঐশ্বর্য-সম্পন্ন বিহঙ্গ এই নর্তকীর জীবন ও বৃক্ষের শান্ত পশ্চিম প্রভাব কি পরিমাণে কার্যকরী হয়েছিল, তারই চমৎকার বিবরণ এই চিত্রাকর্ষক নাটিকা 'অবপালী'। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন :—শ্রীমতী উৎপলা সেন (অবপালী), কুমারী আনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (গুডা), সমবেত সঙ্গীতে :—ভদ্রগ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ঝলা মিশ্র ও অজ্ঞাত। সঙ্গীত :—বাণী চক্রবর্তী (অবপালী), গীতালি বসু (গুডা), চন্দ্রশেখর দে (মহারাজ), পশ্চিম মিত্র (আনন্দ) ও বৃক্ষজন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় (বৃক্ষধার)।

## বেতারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

২রা কার্তিক—বীরেন্দ্র মিত্র—টুরি। ৩রা—চরণকুমার বসু—গীটার, যমু রায়চৌধুরী—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ৪ঠা—এ দপায়—কপদ, পান্নালাল ভট্টাচার্য—আধুনিক। ৫ই—চিরয়ী মুখোপাধ্যায়—খেয়াল, মহম্মদ সাদিকুদ্দিন—সারঙ্গী। ৬ই—নতীনাথ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক। ৭ই—সুবিনর রায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ৮ই—অখিলবসু ঘোষ—আধুনিক। ৯ই—অশোক সরকার—রবীন্দ্র সঙ্গীত, কমা গুপ্ত—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ১০ই—আলি আহম্মদ খাঁ—সেতার। ১১ই—কাজী আমিনুজ্জ—গীটার। অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ১২শে—হুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—অজ্ঞাতপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত, সত্যেন্দ্র বোবাল—খেয়াল। ১৩শে—ভানুলকুমার মিত্র—আধুনিক গীত, হিরেশ্বর পণ্ডিত—টুরি। ১৪শে—মজিব হোসেন ও সজ্জার—পান্নাই, সাধারানী দেবী—কীর্তন।

সাঁত শিখিবল একমাত্র বিজ্ঞানযোগ্য পুস্তক  
**বায়ুচাপের কথা**  
প্রথম খণ্ড  
২১।০  
২য় ও ৩য় খণ্ড  
১৮।০  
ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু লেখক  
ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু লেখক

বিজ্ঞানিক উপায়ে সঁত শিখিবল পুস্তক  
পঞ্চম খণ্ড  
**দৌড়ইবার প্রকৃত পদ্ধতি**  
সাঁত শিক্ষক  
ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু লেখক  
ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু লেখক

## আমার কথা (২২)

## অধ্যাপক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র

বলতে চলেছি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন খুঁড়োশিল্পী অধ্যাপক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের জীবনের কয়েকটি কথা। রাধিকামোহন শিল্পী, বড় অর্পূর বৈচিত্র্যে ঘেরা তাঁর জীবন। জন্মেছেন জমিদারবাংশে, পাশ করলেন আইন, হলেন দর্শনের অধ্যাপক, জনসেবা করলেন পৌরসভার কর্মপরিচালক-রূপে, খ্যাতি অর্জন করলেন স্বদেশবাদক হিসেবে। বাঙালেশের রাজসাহী জেলা। তার মধ্যে তালুক গ্রাম। সেই গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার, জেলাবার্ডের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও স্বদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীতরুণমোহন মৈত্রের কৃতী পুত্র রাধিকামোহন জন্মগ্রহণ করলেন ১৯১৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখটিতে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তের শ' তেইশ সালের বসন্তের প্রথম দিবস থেকে রাধিকামোহনের জীবনটোর সূত্রপাত। কেটে গেল শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর। রাজসাহী থেকে বিএ পাশ করে দর্শনশাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হলেন আইন পরীক্ষাতেও। ১৯৪০-৪১ রাজসাহী কলেজে দর্শনশাস্ত্রে পাঠ দিতেন আইনের ছাত্র রাধিকামোহন। আইন পাশ করার পর রাজসাহী পৌরসভার কর্মপরিচালনার (Commissioner) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাধিকামোহন (১৯৪৩-৪৭)। কিছুকাল ঐ পৌরসভার শিক্ষাবিভাগের সচিবরূপেও দেখা গিয়েছিল রাধিকামোহনকে।

সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকামোহনের সঙ্কে এখনও পর্যন্ত একটি কথাও বলা হয় নি। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ কোন ঘটনাকেন্দ্রিক নয় বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠাও নয়—ছেলেবেলা থেকে। পিতামহ ৬৯লিত-মোহন মৈত্র নিজের বাজাতেন তবলা—সেই সময় বাড়িতে বহু বেতনভুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ থাকতেন। তাঁদের মাথাই অগতম ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। ১৯২৯-৩৪ পর্যন্ত রাধিকামোহন গ্রহণ করেন ঐ শিষ্যত্ব। ঐ সময় থা সাহেবের তিরোধান ঘটলে তখন থেকে ১৯৪৮ খৃঃ পর্যন্ত রাধিকামোহন শিক্ষালভ করেছেন ওস্তাদ দ্বারী খাঁর কাছে থেকে। মামা স্বর্গীয় হদনমোহন রায় সেতার শিখা করতেন ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর কাছে—রাধিকামোহন অনুধাবন করে যেতেন সেই শিক্ষাগান পর্ব। নিখিল বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মিলনীর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তোপে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ছাঁটিতেই প্রথম হলেন রাধিকামোহন (১৯৩৪)। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখের সহযোগিতায় এঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ‘বন্ধার’। ‘বন্ধার’ এর নাম আজ আব কারোই অজানা নেই। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী দশকের উপমহাদী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্রের নেতৃত্বে এক সরকারী সাংস্কৃতিক অভিযানে রাধিকামোহন চীনে গান। আজ রাধিকা-মোহনের ছাত্রদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দামপুত্র ও শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষের নাম অনার্যাসে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা ছাড়া নিখিল বঙ্গোপাধ্যায়, পাটনার সেতারী অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীগণ নামে মাঝে পাঠ নিয়ে থাকেন

রাধিকামোহনের কাছ থেকে। সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে অধ্যয়নও সমভাবেই বজায় রেখেছেন শ্রীমৈত্র। ইনি বর্তমানে ‘Psychology of Music’ এবং ‘Esthetics of music’ বিষয়ে গবেষণা করছেন। সম্মল হটক এঁর শ্রম স্বীকার।

আজকের দিনের সঙ্গীতের সঙ্কে রাধিকামোহন বলেন যে, এই বিরাট শিল্পের প্রতি আজ আকর্ষণ হচ্ছে দলদলিয়ার। অগাধ জায়গায় বহুবে একটি করে সঙ্গীতাবিবেশন বসে, কিন্তু এখানে দেখুন বছরে কতগুলি হয়—বলা হয় আমরা এতে করে সঙ্গীতের প্রচার করছি এবং তা তাকে ভালবাসি বলেই—এটো খাঁটি মিথ্যা কথা—ভালবাসি বলে নয় রেযারেসিস খাটিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালয় সঙ্কে অধ্যাপক মৈত্রের অভিমত যে, এ ব্যবস্থা স্বল্পদায়ী মোটেই নয়। সঙ্গীত একটি বিরাট শাস্ত্র। চার বছরে তা শেখানো অসম্ভব আর গণ্ডীধরা বিদ্যাদরা পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে কখনও এ জিনিস পরিপূর্ণ ভাবে শেখানো সম্ভব নয়। তবে না কেন? শিক্ষার্থী দেখবেন ডিক্রাই পাবে কিন্তু শিল্পী হবে না। টোলের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত—বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্র

—যার কয়েকটি ছোট ছোট শিক্ষাকেন্দ্র হোক প্রতিষ্ঠিত তাঁরা বছর বছর বাবের বাবের ব্যয়লেন যোগ্যতা অনুসারে তাদের পাঠ্যক্রম পরীক্ষা দিতে। একেক জনকে যত দিন করে দরকার হয় শিক্ষা দিতে হবে, তার মধ্যে জানতে হবে পূর্ণতা, তবেই তো শিক্ষালানে সার্থকতা। ছাত্রদেরও দিতে হবে স্বাধীনতা। তার ধীর কাছে শিখতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছে তাদের শিক্ষা দিতে দেওয়া হোক অনেক গুরু মনে করেন ‘বে তাঁর



শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র

রাগ-রাগিনী বুঝি তাঁর ছাত্র মেয়ে দিলে—এ হতে পারে না, যদি এঁর মারে কিন্তু গুরু দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা সে বা বুদ্ধিমানই হোক তা কেমন করে মারবে? সরকারের সহায়ত্বিত আশা খুবই কম। তাঁরা চান যে তাঁদের গুরু সঙ্গীতশাস্ত্র চলুক জিজ্ঞাসা করি, চীনে গিয়ে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন অধ্যাপক রাধিকামোহনের কাছ থেকে উত্তর আসে—ওদের সঙ্গী আমাদের মত উন্নত নয়, ওখানকার সঙ্গীত দুই ভাগে বিভক্ত প্রাচীন ও আধুনিক। শেষেরটি হুবহু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে নিঃসৃত। তাতে বিমুগ্ধ নেই। অক্রেট্রার অবশ্য ওরা আমায় থেকে এগিয়েই আছে।

আবার মাহুলী কথাবার্তা। বরোয়া আলোপ-মালোপ তারপর বিদ্যেবর পালা। নমস্কারান্তে শিল্পীরা তিলজলাহু থেকে ঘেরিয়ে আসেন। সেভেল ক্রসি বন্ধ। পাঁজাতে হয় কিছুক্ষণ বধাসময়ে ছাড়পত্র পাওয়া যায়। বীরে বীরে সেভেল ক্রসি হয়ে এগোতে থাকি শহর কলকাতার দক্ষিণ থেকে উত্তরে দিয়ে অপর্যাপ্ত আভাস একটু একটু করে হচ্ছে অনুভূত। কর্ণাভেসে আসছে কোনো দূরগামী ট্রেনের হুইসেলের হুতীর শব্দ।

# সাহিত্য পরিচয়

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি অধিবেশন সম্প্রতি আগ্রায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবার আগে “যুগান্তর” পত্রিকার প্রত্যক্ষদর্শী ঠাকুর রিণোটার বা লিখেছেন, তাই উদ্ধৃত করে আরম্ভ করছি। লিখেছেন : “গত কয়েক বছর ধারতাই দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালীদের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সাহিত্যের ভাগটুকু ক্রমেই ক্রীণ হয়ে আসছে এবং সম্মেলনের অংশটুকু বড় হচ্ছে। এটাকে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের বাঙ্গালীদের মিলনের একটা অবসর বলে গণ্য করলে অবশ্য কোন খেদ থাকে না। কিন্তু সাহিত্য সম্মেলনের নামে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তার সঙ্গে আধুনিক কালের বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণকে যুক্ত করার জন্য উত্তোক্তাদের পক্ষ থেকে যে আরও বেশী চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন, এটা সম্মেলনে পা দিয়েই অনুভব করা যায়। আর একটা জিনিষ যা চোখে লাগে তা হল, সম্মেলনের পিছনে যেন একটা ‘সিরিয়াসনেসের’ অভাব, কেমন যেন এটা গাছাড়া ভাব। যেন আসতে হয় তাই আসা। প্রথম দিন সকালে যখন অধিবেশনের উদ্বোধন হল, তখন প্রতিনিধিদের অনেককেই সেখানে দেখা গেল না। তাঁদের মধ্যে অনেককেই বেরিয়েছেন ‘সাইটিংয়ের’ অর্থাৎ উঠবা স্থানগুলো খুঁজতে।”

চমৎকার সম্মেলন! সাহিত্য সম্মেলন হিসেবে আরও চমৎকার! সম্মেলনে ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় বলে কিছু বাঙালী ভ্রমলোক গুরা-বদলের জন্য দেশ ঘুরে আসেন। ধারা প্রতিনিধি যার বান, তাঁদের মুখেই আমরা একথা শুনেছি। তাঁরা নিজেরাই বলেন : “এমনি তো চেয়ে যাওয়া হয় না, কয়েক দিন একটু ঘুরে এসে হাবু”। অথচ এককালে প্রবাসী বাঙালীর এই সাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর সৌরভের অনুষ্ঠান ছিল। এখন সেই সম্মেলন হাল হতাশ সাহিত্যপ্রেমিকের বাৎসরিক গুলজারের ব্যাপার হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গতি ও প্রকৃতি, নবীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিপুল জটিলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণত কোন খোঁজখবর করার, অথবা চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ হয় না, এবং ধারা বহুমুখের যুগেই বাস করছেন, আধুনিকতার তত্ত্বাবহুলত বিষয়ভাব পোষণ করেন, তাঁরাই প্রধানত সক্রিয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে হান। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বাদের বিভিন্ন দানে সব দিক দিয়ে ঐক্যমণ্ডিত হয়ে চলে, অনেক ক্ষুদ্রজাতির ভিতর দিয়ে, সেই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর এই সম্মেলনের কোন যোগাযোগ নেই। অথচ সম্মেলনের

তের হাত নাম ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’ এবং প্রতি বছরই তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাড়ম্বরে। সাহিত্যের ‘vested-interest’ এর এরকম হাতকর বাস্তবের বাঙালীর মর্গদাবুতি করবে বলে আমাদের ধারণা নেই। শ্রীকুমারকালিদাস প্রমুখ ‘ডক্টর’সভাপতিরা ব্যাঙ্গোচ্চারণে উদ্বোধনে আজও হস্ত কাম্প চালাতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির কোন ‘serious’ সম্মেলনে তাঁদের অমৃতবাণী যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত জটিকটু মনে হয়। ‘ডক্টরদের’ diagnosis একেবারে ভুল। যেমন শ্রীকুমারের শ্রীমুখের সাহিত্যরচন, তেমনি শ্রীকালিদাসের সাংস্কৃতিক কথামৃত! শ্রীকুমারের মার্কিট ফরোয়ার্ড-রকপই সাহিত্যবিচার (অধুনা কংগ্রেস) “প্রবাসী” বাঙালীদের মনে যেসবেরই সঞ্চার করে থাকে, “বঙ্গীর” বাঙালীদের মনে তা বীতিমত বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য-বিচার আর ইলেকশন-প্রশংসাপাণ্ডা যে এক নয়, একথা শ্রীকুমার বাবু আর কবে বুঝবেন? আর সাহিত্য-সম্মেলনের উত্তোক্তারাই বা কবে বুঝবেন যে সম্মেলনের নামে সাহিত্যের এই ‘গ্র্যাণ্ড সার্কাস’ বাঙালীর মর্গদাবুতি করবে, বৃদ্ধি করবে না?

## বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশকের কাহিনী

‘পেঙ্গুইন’ কোম্পানীর বইয়ের কথা জানেন না বা পোনেননি, এমন কোন শিক্ষিত লোক আজ পৃথিবীর কোন দেশে আছেন কি না সন্দেহ! এই বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশকরা সম্প্রতি “Penguin story” নাম দিয়ে তাঁদের প্রকাশন-ব্যবসারের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। সহজবোধ্য সরল ভাষায় এই ছোট বইখানির মধ্যে বিরাট একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাহিনী যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রত্যেক প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীর অবশ্য পাঠ্য বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশ প্রকাশন-ব্যবসারের ক্রমোন্নতি খুবই আশাশ্রয়। সম্প্রতি অনেকে এই ব্যবসারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কি ভাবে একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়, কি ভাবে পাণ্ডুলিপি স্তর থেকে মুদ্রণের ‘কাইজাল’ স্তর পর্যন্ত একটি বই সবচেয়ে বিস্তৃত পরিদর্শনা করতে হয়, এত কথা আমাদের দেশের প্রকাশকরা বিশেষ চিন্তা করেন না। কিন্তু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এবং চিন্তায় পর্যাণ্ড খোঁজাক তাঁরা পেঙ্গুইনের এই কাহিনী থেকে পেতে পারেন। সামান্য মূল্যের এই অতি মূল্যবান ছোট বইখানি আমরা তাই বাঙালী প্রকাশকদের পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

## পূর্ব-পাকিস্তানে বঙ্গভাষার সমাদর

সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের রাজস্ব-বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাভাষার সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র লেখা হবে। রাজস্বমন্ত্রী জনাব মামুদ আলী বলেছেন যে, অল্পবর্তীকালে কাইলে ও চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে চিঠিপত্র লেখার সময় অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিপ্যন্ত হবে। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তে বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেকে গৌরববোধ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিক দিয়ে এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছেন, লজ্জার কথা!

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### শিল্পচর্চা

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু এখনও পূর্বের মতই নিরলস সাধনায় আত্মমগ্ন। রেখার রূপ আর বাগের গান গেয়ে চলেছেন অবিরত। বর্তমানে যখন আমাদের শিল্পধারায় পিকাসো, মাতিশ, ডালী, হেনরী মুর আর এগুটনকে অনুকরণ করবার অক্ষম প্রচেষ্টা চলেছে, তখন 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থ প্রকাশ করে আচার্য্য নন্দলাল আমাদের দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, চিত্রাঙ্কনের রীতি নীতি, পদ্ধতি আর ছবি আঁকার জ্ঞান প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের পরিচয় পাওয়া যাবে, এমন ধরণের বই বাঙালী ভাষায় ছিল না। 'শিল্পচর্চা' সেই প্রকট অভাব পূরণ করলো এই দিনে। আচার্য্য নন্দলাল শিল্পজগতে বিশেষ এক ধারায় সজ্জিত করলেও, তিনি নিজে চিত্রকলাই দেখী প্রথা আর পদ্ধতি পালন করেছেন। অর্থাৎ ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন দেশীয় শিল্প পরীক্ষার কখনও মত্ত হন নি। শিল্পচর্চা গ্রন্থটিও যেন বাঙালী দেশের বিশেষ শিল্পধারার পরিচয় বহন করেছে। শিল্পী মাঝেই আঁকেন, কিন্তু ভবিষ্যতের শিল্পীদের জগৎকে আর ভাবতে বসেন। বহু চিত্রে শোভিত 'শিল্পচর্চা'য় সেই চিন্তা আর নিকনির্দেশের সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পানুষ্ঠানীদের কাছে শুধু নয়, প্রত্যেকের কাছেই এই মূল্যবান গ্রন্থ সমাদৃত হবে। বিশ্বনাথী গ্রন্থালয়। ২ বহুমুদ্রণ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রিট। কলিকাতা মূল্য পঁচ টাকা ও সাড়ে ছ' টাকা।

### রূপযানী

শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কে বাঙালীর যে ক'খানি 'প্রামাণিক' বই আছে তাদের অধিকাংশই বড় বেশী গুলুভার এবং লম্বাচা আদর্শেই নয়। শিল্পসমালোচক বা 'আর্ট ক্রিটিক' যে ক'জন আছেন, তাঁরা আবার অজ্ঞের লেখা থেকে ভরি ভরি উদ্ভূত (uation) না তুলে কোন কথাই বলতে পারেন না। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ব্যতীত শিল্প বিষয়ে সহজ কথায় ক'কেও কিছু বলতেই শোনা যায় না। কিন্তু প্রবন্ধের কথা, বর্তমানে কয়েক জন সত্যিকার শিল্পসমালোচকের দেখা মিলছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রমাপদ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যে গল্প এবং উপন্যাস রচনার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মন্দির এবং মৃতিভাস্থল্যের পটভূমিকার রচনা করেছেন এই মূল্যবান গ্রন্থ। চিত্তাকর্ষক ভাবামুখ্য, অপূর্ণ বাচনভঙ্গীর সঙ্গে তিনি একত্র করেছেন

সাধারণ লোকের কাছে ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস তাঁরা এখনও ছাড়তে পারেননি। যারা চিঠিপত্র লেখেন, তাঁরা কি বাঙালী নন? যদি তা না হন, তাহলে বাংলাদেশের সরকারী দফতরে চাকরি করতে চলে কি বাংলা ভাষা জানবার প্রয়োজন হয় না? বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারেও তো পরীক্ষা নেওয়া উচিত তা হলে? এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বেশী সচেতন ও অবহিত হবেন আশা করি। ইংরেজী ভাষা তুলে দিয়ে হিন্দীভাষা চালু করার পক্ষপাতী আমরা নই, অনেকেরই নন। কিন্তু বঙ্গীয় সরকারের সঙ্গে বাঙালী জনসাধারণের পত্রের আশানুপ্রাণন সব সময় বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

বহুবিধ অজ্ঞাত তথ্য—বা অনেকেই জ্ঞানেন না। পাকা সমালোচকের মত কঠিন দৃষ্টিকোণে না দেখে শিল্পিমনের দরদভরা সত্যভুক্তির সঙ্গে লেখক 'রূপযানী'র রূপ দিয়েছেন। বহু দৃষ্টাপা ছবি এই বইটির অন্ততম প্রধান আকর্ষণ। মনোহর প্রচ্ছদ। 'রূপযানী' উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী গ্রন্থালয়। ১৪৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

### দশকুমার চরিত

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারের কাজে দেশনেতাদের ক'কেও ক'কেও কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। এই প্রচারের কাজে শুনেছি, একটি সরকারী সমিতিও গঠিত হয়েছে। ফল কি হবে এখনই বলা না গেলেও একটি কথা সহজেই বলা যায়, সরকারী এই প্রচেষ্টায় দেশবাসী যদি জেগে না ওঠে, তবে কি ফল 'হবে সমিতি গঠনে আর অর্থব্যয়ে? বাঙালী সাহিত্য কিছু দিনে দিনে আত্মপৃষ্ঠে ইয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের অমুবাদ কাজে। রূপকেশ রাজা মহাকবি দশকুমার 'দশকুমারচরিত' মাসিক বহুমুদ্রণ পাঠক-পাঠিকা অপরিচিত নয়। কিছুকাল আগে ধারাবাহিক পাঠ করেছেন তাঁরা। সমাজের বিকারগ্রস্ত অব্যোগতি দেখে অধীর হয়েই যেন দণ্ডী দশকুমার 'চরিত' রচনা করেছিলেন। হীন সমাজ-ব্যবস্থার মূলে যেন আঘাত হেনেছেন কবি; প্রতিবিধান উদ্ভূত হয়েছেন। দণ্ডীর চিত্র-সরল ভাষা-নৈপুণ্যের বসিক সংস্করণ এই আলোচ্য গ্রন্থ। অমুবাদের কাজে প্রবোধকন্যায় ঠাকুর যে পরিমাণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, তজ্জন্ম তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্থী। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। শ্রীনিবাস প্রেস। ৫৭, ইন্ড বিল্ডাস রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

### গ্রাম্যপ্রসাদের কয়েকটি রচনা

গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবেশ অতুল গুণ্ড বলছেন, "গ্রাম্যপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের গৌরব ও তাঁর একাগ্র নিরলস কর্মজীবন দেশের গৌরবের বস্তু। শক্তি ও কর্মোত্তমের মধ্যাচ্ছে স্বাধীন ভারতবর্ষ এই দেশকর্মী রাজবলিদশায় মৃত্যুর শোক দেশের মনে অনিবার্য রয়েছে। গ্রাম্যপ্রসাদের জীবনের স্পর্শ যাতে আছে, দেশের লোকের তা প্রতি এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের গতির বেগে স্পন্দমান।" গ্রন্থমতে সন্নিবেশিত হয়েছে, 'বহুমুদ্রণ', 'শরণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র', 'পঞ্চাশে বহুমুদ্রণ', 'শিক্ষা-সম্প্রদায়', 'দিল্লীর অভিবারণ', 'কটকের অভিবারণ'



‘হামী প্রণবানন্দী’, ‘একখানি চিঠি’ এবং ‘বাঙলার রঙ্গালয়’। বহুগুলি লেখার তত্ত্বাধী করেছেন অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী। এম. সি. সবকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

#### EIGHT YEARS OF D. V. C.

সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং সংগ্রাহক হিসাবে শ্রীঅমল গোস্বামীর নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত। বর্তমানে তিনি দামোদর ভাণ্ডারী কর্পোরেশনের প্রচার অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত। ডি, ভি, সি কোথায়, এবং কি ধরনের—তারই পরিচায়ক আলোচ্য ইংরাজী পুস্তিকাটি। বহু বকমের তথ্য আর তত্ত্ব সম্বলিত। শুধু লেখার মন ভরে না, তাই আছে পাতায় পাতায় নানারকমের ছবি। জরুরীকালে নেতৃত্ব থেকে কলীকামিনী—সকলেরই সচিচ্চ পরিচয় পাওয়া বাবে। একখানি প্রচার পুস্তিকা যে কি পরিমাণ হৃদয়গ্রাহী হ’তে পারে, শ্রী তোম অল্পাত্ম পরিশ্রমে তাই-ই প্রমাণ করেছেন তাঁর স্বভাব-সুলভ সম্পাদনা কৃতিত্ব। প্রকাশক দামোদর ভাণ্ডারী কর্পোরেশন।

#### ভারতের সাধক

ভারতবর্ষের সাধক আর সাধনার কথা পৃথিবীর সকল দেশেই বিখ্যাত। এই সাধুখ্যাত দেশে আসল এবং নকল সাধু যে কত আছেন তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। আসল সাধুদের মধ্যে সাধনমার্গে যে কে কতটা উন্নত, আমরা কেউ জানতে পারি না। বাই তোক, সাধু যত আছেন তত আছে সাধকসম্প্রদায়। নানা সাধুর (মুনি ?) নানা মত। আবার যত মত তত পথ। অনেক সম্ভাবনীয় শুধু যে গান্ধী নই হয় তা নয়, অনেক সাধুতে ধর্মকেও বিনষ্ট হ’তে দেখা গেছে দেশে-বিদেশে। তবুও অল্পচরায় যে বাই জ্ঞান, সাধুই কোন আর তত্ত্বই কোন, ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থ সর্বশ্রী আচার্য্য রামানন্দ, মহেশ্বরন সরস্বতী, ভক্ত সাহু, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, দ্বাদশনাস বাবাজী, ভোলানাথ গিরি, প্রভু ভগবতু, সত্যদাস বাবাজী প্রভৃতি বিভিন্ন সাধকদের জীবন এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে একেবারে পৃথক আলোচনা আছে। সাধকজীবনের অন্তর্গত তথ্যাদির নির্ণয়ে লেখক যে মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিচার ও ক্রিয়ানিষ্ঠার সঙ্গে মিলেছে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি। রাইটার্স’ সিণ্ডিকেট, ১, বর্ধমান স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

#### ব্যালেরিনা

বিশ্বেশ্বর পটভূমিতে গল্প এবং উপজাত্য রচনার খ্যাতি অর্জন করেছেন সুবীরজ্ঞন মুখোপাধ্যায়। ‘ব্যালেরিনা’ তাঁর সত্ত্ব প্রকাশিত পুস্তক। নায়ক সুশোভন সংছাত্র, হঠাৎ প্রেমপড়লো এক জ্বর-জ্বর সঙ্গে। তার নাম গিজলা। প্রথম আলাপ থেকে ক্রমেই নির্ভরতা হয় পরস্পরে। উপজাত্যও জ’মে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সত্ত্ব নিজের আদর্শ অনুসরণ রাখতে গিজলা ত্যাগ ক’রে যায় সুশোভনকে ছাড়ে নিয়ে একজন ইংরেজকে। সুশোভনের লেখাপড়ার উজ্জ্বল পড়ে। শেষ কালে এক হোটেলের তাকে কাজ নিতে হয়। ‘ব্যালেরিনা’র অনেক চমকপ্রদ ঘটনা আছে। বিলেতে গেলো স্বাভাবিকের সুবিধা-অসুবিধার কথাও অনেক আছে। লেখকের অল্প ভাবায় উপজাত্যটি বেশ সুসংগঠিত হয়েছে। ডি, এম, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। মূল্য তিন টাকা।

#### ভববুরের চিঠি

‘দৈনিক বহুমতী’র প্রাক্তন সম্পাদক ঔপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নূতন পরিচয় দেবার প্রয়াস করবে না। ভববুরের চিঠির রচনাগুলি প্রাধান্য: ‘মাসিক বহুমতীতে’ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সময় এবং সেই সময়ই পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কারছিল। রচনাগুলি সম্পাদককে পত্রিকার লেখা। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম—সব কিছুই এসেছে আলোচনার মধ্যে, অথচ এমন সরস ও জীবন্ত রচনা বিংশ বঙ্গলং-অভ্যুত্থিত হবে না। এই গ্রন্থের শেখাংশে ‘সুভাষচন্দ্র’ সহজে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের বহুকেই অপূর্ণ স্মৃতিচিত্র স্থান পেয়েছে—যা পাঠককে মুগ্ধ করে। এক কথায়—সাংস্রতিক কালে প্রকাশিত বাঙলা বই-এর মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলেই গণ্য হবে আশা করা যায়। ছাপা বাঁধাট ভাঙে। শ্রীহরদা মুন্ডার আঁকা প্রচ্ছদটি অভিনব। দ্যানন্দাল পাবলিশার্স। বিক্রয়-কেন্দ্র পুণ্ডিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি—৬। দাম ২।০

#### তুমি যেয়ো না

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা বারি দেবীর রচনার সঙ্গে মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। বহুমতী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখিকার গল্পগুলির পুস্তকাকার ‘তুমি যেয়ো না’ লেখিকা বিয়োগান্ত গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। সমাজের বৃহৎ সমস্যা নয়, সাধারণ কতকগুলি সমস্যাতে কেন্দ্র ক’রে, ঘরোয়া কাহিনীর পরিবেশে লেখিকা গল্প পরিবেশন করেন। গল্পগুলির মধ্যে স্নায়ু-প্রক্টি, ভ্রান্তপথিক, দরবারী কানাদা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। লেখিকার ভাষানৈপুণ্য দক্ষতার পরিচায়ক। ক্যালকাতা বুক স্টোর লিঃ। ৮১, হাবিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

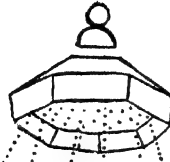
#### ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ

ক্রিকেট খেলা নাকি সাধারণের খেলা নয়, লর্ডস গেম। শীত পড়তে না পড়তে প্রায় সকল বাড়ীর শিশু এবং কিশোররা আজকাল ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে মাঠের দিকে ছোটে। বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম তাদের মুখে মুখে ফেরে। বাই হোক, যে কোন খেলাই যে খেলতে হ’লে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, আশা করি তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বিখ্যাত খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের লেখা ‘ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ’ সেই কারণেই শিশু এবং কিশোরদের পক্ষে মূল্যবান গ্রন্থ। অমুদ্রিত ‘পরীক্ষিত’ তৈরীকৃতদের কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানিতে প্রচুর ছবি আছে শিক্ষানির্দেশের প্রয়োজনে। আর্ট গ্রাউ সেটার্স পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নেই।

#### বিদেশী রূপকথা

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা ইন্দিরা দেবীর ‘বিদেশী রূপকথা’র ভিন্ন ভিন্ন দেশের পনেরোটি রূপকথার গল্প আছে। গল্পগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিপূর্বে বহুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বাঙলা শিশুসাহিত্যে সব কিছুকে ‘জাকামির’ সঙ্গে ব্যস্ত করার একটা রেওয়াজ প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ফলে শিশুসাহিত্যের হালের চাল প্রায় ভাঙতে বসেছে। রূপকথার গল্প লেখার ক্ষমতা প্রয়োজন হয় বিশেষ এক ভাবাজ্ঞানের এবং কবিত্বনাট্যিত অদ্ভুতের—যা বিরল হলেও এই গ্রন্থের লেখিকা তাদের থেকে বঞ্চিত নয়। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। অশোক পুস্তকালয়, ৬৩, হাবিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।





নিম্ন তৈল থেকে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে  
প্রস্তুত সুগন্ধি  
মার্গো সোপের প্রচুর  
ফেনা যেমন  
নির্মলকর তেমনি  
জীবাণুনাশক।  
মার্গো সোপ দেহের  
কাস্তি উজ্জ্বল করে।  
কোমল স্বকের  
পক্ষেও ব্যবহার করা  
সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্নানের সময়

ব্যবহার করতে ভুলবেন না



**মার্গো**  
**সোপ**

ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কোম্পানি লিমিটেড  
কলিকাতা ২০





## রঙ্গ পট

### মঞ্চ-পর্দা ও যাত্রার কথা

যাত্রাসম্রাট পি. সি. সরকার

বাংলা রঙ্গমঞ্চের গোড়ার কথা থেকে শুরু হোক। যে সময় পাবলিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে—তখনকার যুগের এক শ্রেণীর দর্শক সারা রাত থিয়েটার দেখা এবং ভোরে পদ্মানদীতে ইলিশ মাছ নিয়ে ঘরে ফিরে আসার প্রোগ্রাম করে থিয়েটার দেখতে যেতেন। থিয়েটারের পোস্তলা অথবা তেতলায় জেনানা-সিটে ঝাঁক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বসে “প্রে” দেখতেন, ডুপ-সিন পড়ার পর জেনানা-বহলের তথাকথিত গীতী বলুন আর ‘কি’ই বলুন, তাঁদের ক্ষাস্যবিনিমিত কণ্ঠে “ওগো হাটখোলায় যুথুজ্যো বাড়ীর কাছিনী —গো—” এখনও যেন কানে ভাসছে। সেই পাবলিক থিয়েটারের প্রথম পর্দায় সেই গল্পমান ও ইলিশ মাছের যুগে কতরা অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের কতরা মাছের ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে নাটকীয় রঙ্গমঞ্চকে সজীবিত করতেন। এর সঙ্গে সিনসিনারীতে দর্শকদের আকর্ষণ করার মতন আয়োজন পর্য্যাপ্ত পেছন দরজা দিয়ে ম্যাজিকের কলাকৌশল খানিকটা নিয়ে আসা হয়েছিল। সলমা-চুমকির কাজকরা ভেলভেটের পোষাক, সুটোহীয়ে বসানো মাথার ডাক, চকচকে পাশপকরা তরোয়াল কোথায়ও বা জীবন্ত অথচ অস্পষ্ট নায়িকার মঞ্চ আঙ্গুপ্রকাশ, উড়ন্ত উর্বরী, ডুবন্ত শ্রেয়িকা প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক ও লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখে দর্শকগণ্টী মুগ্ধ হয়ে বলতেন—“পরশা উত্তল হয়েছে।” মাইকেল যুগ, গিরিশচন্দ্রের যুগ, অমৃতলালের যুগ পায় হয়ে রবীন্দ্রোত্তর ও শিশির ভাষ্যের যুগ এসে থিয়েটারী আর্টে বা পরিবর্তন ঘটে গেল তা কেউ ভাবতেই পারে নি। কিন্তু কি পরিবর্তন হল? চুমকিলাগারো ভেলভেটের পোষাক ‘অথাত’ রূপে বর্জিত হলো, বোলারে বাঁধা ক্যানডাসে জাঁকাল আল্পা বাঁধা সিনের বদলে সেটিন, বিলজি ট্রেন এবং কোথাও কোথাও রঙীন সিন বর্জন করে শ্রেয় ষিঙ সলুজ রয়েছে পর্দা শিঙে টাঙিয়ে—অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। বিগড় সমাজের মার্জিত রূচির সঙ্গে ভাল বেখে নাট্যকারকে সলাপ ভেরী করতে হল—বিবরণ্য খিঁচিখিঁচি শোভন ও সভ্যতার আদর্শে রূপায়িত করতে হল।

এ তো গেল রঙ্গমঞ্চের কথা। ছায়াচিত্রের বয়স অপেক্ষাকৃত কম বটে—কিন্তু ‘ডেপোমি’তে চলচ্চিত্র থিয়েটারকে হার মানিয়েছে। কিন্তু কলারসিকদের চাপে পড়ে বাংলাদেশের ক্ষিমে ডেপোমি বাড়তে পার নি যেমনি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে হিন্দী ফিল্মে। সারা ভারতের মধ্যে বাংলার কলিঙ্গ একটা বিশেষ রূপ আছে। হৃদয়সবোধ, শালীনতা এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে চিত্তাঙ্গীল বাঙ্গালীজাতি আজও অগ্রগামী। তাই আজ যুগ্ম রঙ্গমঞ্চ অথবা ফিল্মে আমরা যেটুকু আনন্দ পাই তার দাম অনেক।

ঠিক এই কথা ম্যাজিক সম্পর্কে প্রসঙ্গত এসে পড়ে। মোগল আমলে অথবা এদেশে ইংরেজ আসার যুগ-সন্ধিক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রাবিহীন যে সমিশ্রিত চেহারা ছিল এবং আনন্দ পরিবেশনের ব্যাপারে তখনকার যাত্রাবিহীনতা যে পথ। বেছে নিয়েছিলেন, আজ তার চিহ্নমাত্র নাই। এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ যে যুগে থিয়েটার ‘পাবলিক’ সেবেল গারে এঁটে আনন্দ পরিবেশন করছিল ঠিক সেই যুগেও ম্যাজিকের চেহারা বা ছিল তার সঙ্গেও এই বিশ শতকের পঞ্চাশোত্তর যুগের ম্যাজিকের চেহারা বিরাট ব্যবধান আছে। ঐ যুগেও মড়ার মাথা, চণ্ডালের হাড় দেখিয়ে লোককে আতঙ্কিত করা হতো এবং ভুতের কাণ্ডকারখানার ভূমিতায় লোককে স্তম্ভিত করার অপচেষ্টাই চলত। তথাকথিত ঐ চণ্ডালের হাড় পরবর্তীকালে কাঠের অথবা ধাতুনির্মিত ‘ম্যাজিক ওয়াগে’ রূপান্তরিত হলো এবং যাত্রাবিহীন ‘ম্যাজিসিয়ান’ এই আখ্যায়—এই উপাধিতে ঘৃষিত হয়ে ‘টাইল কোর্ট’ এবং তদুপযোগী উঁচু কানায়ওয়ালা ‘হাট’ পরে ঠেঙে এলেন। পেছনে থাকত কালোপর্দা এবং পুরনো কাল পোষাক—এই ছিল ম্যাজিকী পরিচিতি!

বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও ম্যাজিক মঞ্চ ও পর্দার সাথে তাল বেখে চলতে পারে নাই। তার অনেক কারণ আছে। পাদশ্রীপকে সামনে রেখে নটনটীদের অভিনয়কৌশল দেখাতে হয় আর ম্যাজিসিয়ানকেও একই ভাবে তাঁর ম্যাজিক দেখানোর ব্যাপারে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়। নাটকের কোন নট বা কোন নটী একক ভাবে বোল আনা রঙ্গের অবতারণা করতে পারে না—তাদের যৌথ চেষ্টা পারস্পরিক সহযোগিতা আনন্দকে ছুটিয়ে তোলে। এই ব্যাপারে ম্যাজিসিয়ান একা—নিঃসঙ্গ! এ তথ্য সাংঘাতিক। নাটকের পূর্ণতা হচ্ছে—সমবেত ভাবে নাটকীয় বিষয়বস্তুকে পরিবেশনে। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানের দায়িত্ব অনেক বেশী। বা অলীক—বা হুজুহাড়া সেই সব বিষয়বস্তুকে সলাপের জোরে খাড়া রাখতে হয়—তার সঙ্গে ম্যাজিকের মূল সিক্রেট হাতে অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁস না হয় তার জন্ত সতর্ক থাকতে হয়। ম্যাজিকের রঙ্গপাতি ব্যবহারের যে নিয়ম পদ্ধতি আছে তার ধারাবাহিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সর্বদা মনকে জাগিয়ে রাখতে হয়। এর পর সব চাইতে কঠিন পর্য্যায় ‘প্যাটার’ বা গল্প রচনা আঙ্গিকভঙ্গী পরিমাণম্যাজিক চলাকের এক সময়জ্ঞান, একটু উনিশ-বিশ হলেই সব পণ্ড। ঠিক এই সমস্ত ব্যাপারে নাটকের অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোন ধার ধারেন না। তাহাড়া নাটকের মহড়ার শুরুতে প্রবেশক ও পরিচালক মহাশয়রা সব কিছু করে নেন, ম্যাজিক হুজু বা কিছু কাজ বা কিছু পরিকল্পনা ও প্রবেশনা হুজুতঃ একা ম্যাজিসিয়ানকেই করে নিতে হয়। তাঁর সহকারীরা আজাবাহক মাত্র—পরিচালক একজন যাত্রাবিহীন।

অনেকের মতে থিয়েটার ও সিনেমার প্রতি লোকের আকর্ষণের প্রধান হেতু—এ দুই-এ বোন আবেদন আছে—ম্যাজিকে তাঁর যথেষ্টই অভাব। এ ছাড়া থিয়েটার ও সিনেমা দেখে ছেলেমেয়েরা প্রেম শেখে। “বাগদার ডাকু” হয়। ম্যাজিকে এসব শেখার ‘চাল’ কই? তাই ম্যাজিক—নিরামিদ বাহুবিন্দা এক পোশে পড়ে থাকে—আর থিয়েটার ও কিম্বা আর্ট সাড়বরে, সমস্ত সোনার রথে চলে—রাজধানীর দিকে রওনা হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগ—থিয়েটার ও কিম্বের এই জয়যাত্রা ম্যাজিকী আর্টের দৃষ্টিকোণে পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। বিদগ্ধ সমাজকে নিজের দলে টানবার জন্য ‘ইন্ডুজাল’ পাততে হয়েছে। বহু চিন্তা বহু গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে ম্যাজিকের নবরূপের পরি-কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। আজকের ম্যাজিকের ‘শো’-তে কাল পদ্মা এবং কাল পোষাককে বিদায় দেওয়া হয়েছে। আজকের ম্যাজিকে ‘ওরাও’ অপরিহার্য বলে একে বস্ত্র করার তেমন প্রয়োজন আর নেই। বিজ্ঞান ও স্বস্বাভিমান কলাবিন্দাকে ম্যাজিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ শক্তি, রজন বস্মি, বিচিত্র রং-এর স্টেট সিন, আধুনিক কৃতিজ্ঞানসম্পন্ন সাজপোষাক চমৎকার ও স্বপ্নাব্যবহার সঙ্গীত এবং চটলনয়না সদাশান্তময়ী মহিলা শিল্পী-দের সহায়তা ও মঞ্চাবতরণ ম্যাজিকে প্রাণের জোয়ার এনে দিয়েছে। ম্যাজিকের ‘শো’ আর নাট্যাঙ্গার অভিনয় কলার মধ্যে এত কাল যে ব্যবধান ছিল আজ তা অনেকখানি সংকুচিত হয়েছে। আজকের ম্যাজিসিয়ান আর পথের মানারী নয়—বিদগ্ধ সমাজের দরবারে তাঁর ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু তবুও বলবো ম্যাজিক এ দেশে অপোজনের হয়ে আছে।

ভারত সরকার সঙ্গীত নৃত্যানাট্য আকাদেমী সৃষ্টি করে শিল্পীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সম্মানিত করছেন। এই আকাদেমীতে ম্যাজিক স্থান পায়নি। ভারতে অসংখ্য গুহাবিন্দা আছে—বার জন্ত সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ “The Land of Mystery” বা ‘বাহুবিন্দার দেশ’ নামে পরিচিত। ম্যাজিকের সমগোত্রীয় অথবা এককালে যে সমস্ত গুহাবিন্দা বাহুবিন্দার অন্তর্ভুক্ত ছিল—যেমন জ্যোতিষ বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা বা ইন্দ্রবোধ্য পাঠ, ইন্দ্রাকর দেখে মানুষের চরিত্রপাঠ প্রভৃতি বিষয়গুলি একত্র করে একটি নতুন ‘আকাদেমী’ সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? সাংস্কৃতিক ধারা ধারক ও বাহক—তারা কি এ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন?

### ফলস্রু

এত দিন আমাদের ধারণা ছিল যে, লোকে পরস্পর খরচ করে ছবি তৈরী করেন পরস্পর পাষারই আশার কিন্তু এখন দেখছি যে না—লোকে পরস্পর খরচ করে ছবি তৈরী করে পরস্পর খরচ করবার জন্তে—আর তা আবার নিজেকে নারিকা মাজিরেই—অজ্ঞাত: বহুকাল বাদে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে অমিতা দেবী তো সেই কথাই প্রমাণ করলেন ফলস্রু ছায়াচিত্রে দেখিকা, প্রাণোজিকা ও নারিকারূপে দেখা দিয়ে। যেমনই নিষ্কণ্ট ছবি তেমনই ব্যর্থ পরিচালনা—সোনার সোহাগা একেবারে কোনো কুশলীর মধ্যেই (লেখিকা ও পরিচালক) এতটুকু নাট্যবোনের আভাস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনিছি, কাকর টোঁটের সঙ্গে কাকর মিলছে না। সঙ্গীতীদের মঠের স্টেট দেখে যেন হচ্ছে যেন কোনো জঙ্গ-ব্যায়িটার বা

মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীর ডইং রুমের স্টেট দেখছি, দেবানন্দ চরিত্রটি সৃষ্টি করার কোন ভাংপর্ষই তো দেখছি না—অমন কাঠের পুতুলের ভূমিকার বরীন মজুমদারকে নামানোর কি প্রয়োজন ছিল? জাহাজে যে চাঁদ দেখানো হয়েছে ও রকম হাতে পাওয়া চাঁদ বোধ হয় পাকিস্তান সরকারও ভাবতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, শেষ দৃশ্যটা আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি—কয়েক জন বাহক একটি যন্ত্রদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মণিকর্ণিকার দিকে—এর অর্থ জলের মত স্বচ্ছ—বর্তমানে আমাদের টেলিউড তথা বাজলার ছায়াছবি যে কোন দিকে যাচ্ছে ও তার কি গতি হচ্ছে, তারই বোধ হয় কিছুটা আভাস অমিতা দেবী দিয়ে রাখলেন। অভিনয়মাংশে প্রত্যেকেই কাজ চালিয়ে নিয়েছেন তবে তারই মধ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সম্ভবতঃ সিংহ ও শিখা বাগ। ছবিটা এত পত্তন্যোতা না, যদি অমিতা দেবী নিজে না নারিকা হতেন। প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল পুস্তকা প্রণয়নে ও স্তোত্র সংকলক প্রমথ কুমার প্রশংসার দাবী করতে পারেন। আরও শুনিছি যে, এই মহানায়িকাটি বন্ধিমচন্দ্রের জীবনী তুলতে যাচ্ছেন—ঋষির উপজ্ঞানগুলি উপসহার করেছেন দামোদর, চিত্রসংহার করেছেন ছায়ালালবের দল, এতবার জীবনী সংগ্রহ করবেন অমিতা দেবী। গ্রহটাই খাবার। হায় বন্ধিমচন্দ্র।

### মা

বহু প্রতীক্ষিত ‘মা’ মুক্তিলাভ করেছে। একটি দম্পতির সুখী পরিবার। ঘনিরে আসে হৃদয়োগের কালোমেঘ। স্ত্রী হারিয়ে

## শততম রজনীর গৌরবদীপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক  
পুরস্কৃত ও নাট্য্যামদৌ জনগণের প্রীতিধন্য

# আরোগ্য নিকেতন

উপজ্ঞান ও নাট্য্যরূপ—তারাসঙ্কর

• রূপায়নে •

নীতিশ • বসন্ত • সম্ভোষ • বিমান • নবদ্বীপ

কালী ব্যানার্জী • অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিগুপ্তা • কমলা বারিয়া • তপতী • পূর্ণিমা

মেনকা • চিত্রিতা • জয়শ্রী

বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬১ টায়

রবি ও ছুটির দিন ৩৩ ৬১ টায়

বি-শ্ব-রূ-পা

কেলে তার ছাটি পা, মোটা ব্যাকসিঙ্গেট, বামী শিক্ষিত তরুণ, বিস্তারিত। ভাগ্যক্ষেত্রের হয় পরিবর্তন—শ্যালী আসে সঙ্গারে—বামীর মন একটু একটু করে আকৃষ্ট হয় তার দিকে, ত্রী সবই যোঝে আর অব্যক্ত ক্ষণের গুমের গুমের মূর্বে—চরম পরিণতি হ'ল ত্রীর বিধবানে মৃত্যুতে। কে দিলে এই বিধ—বা তার নাগালের বাইরে ছিল—কবিকা ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে মাতৃ-স্নেহেই বীর কাছে মগ্ন হইয়াছিল, মা বলতে সে বাকি চিনে ছিল—তার সেই শাওড়াই তাকে বিধ দিয়ে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। এই গল্প। অলকা দেবীর লেখা। আমরা কখনও এ লেখিকার নামই শুনিনি। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে। কিন্তু কোন্ গল্পের বা কার গল্পের, তার কোন জবাব নেই কেন? গল্পে বাস্তবতা কোথায়? প্রাচ্যদেশে কি ঠিক এ ঘটনা ঘটে থাকে? বার বার দেখছি চন্দ্রা দেবী গৃহদেবতার পানপায়ে বার বার কামনা করেছেন সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের। অথচ ঘটে যাচ্ছে সর্বাঙ্গীন অমঙ্গল—এতে যেন পৌত্তলিকতার আসারই পরিচালক প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (ঠিক এই মর্মেই আমাদের জটিকা পাঠিকা শ্রীমুক্তা দেবদত্তা রায়ের একটি চিঠি আমবা পয়েছি, তাঁকে ধন্যবাদ।) পরিচালনা খুব পরিচ্ছন্ন একথা অনস্বীকার্য। গানগুলি বিশেষ করে প্রথমটি ছব্বই রবীন্দ্রনুরের অল্পকরণ। অশোকের মত শিক্ষিত বিচক্ষণ ছেলে রাস্তায় এমন অসতর্ক হয়ে গাড়ী চালাবে কেন? হাজার হাজার বামী-ত্রীতো গাড়ী চালিয়ে বেয়েয় কিন্তু ততগুলোই ছুঁটনা কি ঠিক ঘটে থাকে—চৈতন্য আসবার পরও কবিকা কি বুঝতে পারছে না যে তার পা নেই, হাত দিয়ে অল্পভব করবে কেন?—কণাকে অশোক যখন অমিতার আসার খবর দিচ্ছে—প্রশ্ন এই—অশোক সে সবাদ তখন পেলে কি করে—আসা থেকেই তো তার মা কণারই সন্ধানে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন—অমিতার বিষয়ে তো কোনও কথা তখনও হয় নি। অমিতা গান গাইছে অশোক বাড়ী এসে তা শুনতে পেরে উৎফুল্ল হচ্ছে—পাঠ দেখা যাচ্ছে যে অশোক যখন উৎফুল্ল হচ্ছে সে সময় যন্ত্রঙ্গীত চলছে, গান তখন বন্ধ। অভিনয়শে- চন্দ্রা দেবী, অক্ষতী মুখোপাধ্যায় ও বিনতা রায় সত্যিই যথেষ্ট প্রতিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অসিতবরণ ও শিশির বটব্যালও লক্ষ্য রেখেছেন নিজস্বের সুনাম।

### দানের মর্যাদা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্প আগেকার দিনের গল্প সন্দেহ হই। সরস্বতীর খুঁটিনাটি মান-অভিমান ছাড়া প্রভাবতীর মত আর কিছুই পাওয়া যায় না। সমগ্র গল্পের মধ্যে বৈদ্যবনের স্মৃতি কই? বঙ্গবোধের অভিনব বা কোথায়? কো-রায়বাহুর প্রসঙ্গ মৈত্রী টাকার লোভে বিলম্বিত-ক্লান্ত হইলে যুগ্মের বিয়ে দিলেন গ্রাম্য জমিদার অমরনাথ হুরীর মেয়ে উবার সঙ্গে—উবা একেবারে ভিন্ন পরিবেশে পড়ল—এখানে ইক বঙ্গ ব্যাপার সব, পদে পদে ঠেকে উবা, ব্যাপার শুনে অমরনাথও ভেঙে পড়েন—মনে শশুর জাগে এই নাস্তিক-বাস্তব উষ্মজাত সন্তান তো তাঁর ধর্মজীবনের একতরু অংশও

গ্রহণ করবে না—তিনি উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিজের বড় মেয়ে বালব্রিধা উমার নামে দিয়ে যান। এই নিয়ে রায়বাহুরের সঙ্গে বাধল প্রচণ্ড বিমোহ—ইতোমধ্যে উবার নবজাত সন্তানকে দেখতে গিয়ে অমরনাথ হলেন অপমানিত। উবার মনও বিকল হয় বাবার উপর। উমার নামে হয় মকদ্দমা, তার হয় রায়বাহুরের—দেবার দ্বারা আত্মহত্যার রায়বাহুর উত্তোষী হলে উমা জানতে পারে সে খবর—উমা মিটিয়ে দেয় সমস্ত দেনা। সপরিবারে রায়বাহুর যান অন্ততপ্ত হয়ে কমা চাইতে, ততকণে উমা চলে গেছে বুলাবনে। এমি মধ্যে আছে সন্তা—যুগ্মের বোন ও মনীষ অধ্যাপক—অমরনাথের অমুগত ও যুগ্মেরও বন্ধ। প্রকাশ আদালতে উমার প্রতি মনীষের স্নেহে অপর পক্ষ কুৎসিত ইঙ্গিত করলে সন্তাই নিজেকে মনীষের বাগদত্তা ত্রী বলে প্রকাশ করে তাকে বাঁচায় অপমানের হাতে থেকে, মনীষও ত্রী বলে তাকে স্বীকার করে নেয়। অভিনয়ের ছবি বিশ্বাস, কালু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, চন্দ্রা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার, প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, শুক্লা সেন, নিভাননী দেবী ও শান্তা দেবীর অভিনয়ও ভাল লাগলো। রেখা মল্লিক একটু কেটে-কেটে কথা বললে ভালো হয়—তিনি যেন একটু এক নিঃশ্বাসে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। অন্ত্যান্তাশে আছেন জীবন বসু, বীরেন সেন, অমর মল্লিক, নুপতি চট্টোপাধ্যায়, তারাকুমার ভাট্টা, ডাঃ হরেন, শ্রীতি মজুমদার ও কয়ালী প্রভৃতি। পরিচালক হুশীল মজুমদার কিন্তু বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি এই ছবিতে।

### রূপপট প্রসঙ্গে

'পূর্ববধূ'র সাফল্যের পর উত্তমমালাকে দেখা যাবে 'সুরের পরশ' কথাচিত্রে। এরও কাহিনী ও পরিচালনার বধ্যক্রমে সলিল সেনগুপ্ত ও চিত্র বসুকে দেখা যাবে। রূপায়ণে থাকছেন, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, নীতীষ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন বসু, বাবুয়া, মাসা সিন্ধা, যমুনা সিংহ, অপর্ণা দেবী ও রেখা রায়। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন অমুগম বটক ১০০-ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা তথ্য পাওয়া যাবে সুরচন্দ্র ছবিচিত্রে। ছবিটির পরিচালনার ভার পেয়েছেন বীরেন পাল। ছবিতে বিলায়েৎ খাঁ, পান্নালাল ঘোষ, হীরাবাই, ইমরৎ হোসেন খাঁ, নিখিল ঘোষ তা ছাড়া নবাগত ডাঃ আর বি মুখোপাধ্যায়, শিখা মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার আমীর প্রভৃতি শিল্পীদের দেখা যাবে। ১০০-চলচ্চিত্রের সাফল্যের পর চলচ্চিত্র মহলে খ্যাতিমান সাহিত্যিক আন্ততাব মুখোপাধ্যায়ের নাম আর অজানা নেই। আন্ততাবের নবতম উপন্যাস 'পঞ্চতপা' মাসিক বঙ্গবতীতে গত সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ 'পঞ্চতপা'ও দেখা যাবে চলচ্চিত্রাকারে 'চলচ্চিত্র' খ্যাত অসিত সেনেরই পরিচালনায়। জাতির প্রগতির পথে বাঁধের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা নিয়েই রচিত হয়েছে ঐ কাহিনী। সঙ্গীতে ভি-বালসারার সহযোগিতায় নির্মল ভট্টাচার্যকে দেখা যাবে। রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্তাল, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, অক্ষতী মুখোপাধ্যায়, শুক্লা সেন প্রভৃতি। নীহার গুপ্তের 'নৃপু' গল্পটি

পরিচালনা করছেন দিলীপ নাগ। জি কে মেহতার চিত্রগ্রহণের সাহায্যে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, জীবন বসু, ভাস্কর্য্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনিল, শুনীল, সন্ধ্যারাগী, শিপ্রা মিত্র, জয়ন্তী সেন, সীলা পাল প্রভৃতি শিল্পীদের পর্দার বকে দেখা যাবে।—মাসিক বহুমুখীতেই কিছুকাল আগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যাত্রা হোল শুদ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই কাহিনীই বিশিষ্ট চিত্র সম্পাদক সম্ভোষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় চিত্রাকারে গৃহীত হচ্ছে। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণে আছেন পাহাড়ী সান্ত্বাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজন ভট্টাচার্য ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

### শুক্রবারের বেতারনাট্য

২য় কার্তিক—অজ্ঞাতমা, কাহিনী—হরিনাবায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপ—মদ্যু চৌধুরী, পরিচালনা—ঐশ্বর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, হরিরচণ মুখোপাধ্যায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দুলাল সেনগুপ্ত, মোহনলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীনকুমার ঘোষ, অমরেশ ঘোষ, তপ্ত মিত্র, অর্ণব দেবী, আরতি

মেত্র, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়। \* \* ১ই কার্তিক—অধিকার, কাহিনী—বিশিষ্টর মুখোপাধ্যায়, নাট্যরূপ ও পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট। রূপায়ণে—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ঐশ্বরি চৌধুরী, দুলাল মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, ব্রজতী মুখোপাধ্যায়, রত্না গোস্বামী ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। \* \* ১৬ই কার্তিক—কালরাত্রি, কাহিনী ও নাট্যরূপ—তারানন্দর, পরিচালক—শৈলজানন্দ। রূপায়ণে—নির্মল চক্রবর্তী, প্রমোদকুমার চক্রবর্তী, তপ্ত রায়, চন্দন রায়, অনাদি গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেণু বিশ্বাস, লিলি গুহ, শান্তা ঘোষ, লীলাবতী দেবী (কমলা), নীলিমা সান্ত্বাল ও প্রেমোত্তম বসু। \* \* ২৩ই কার্তিক—বিস্ময় ছেলে, কাহিনী—শরৎচন্দ্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—ঐশ্বর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—সম্ভোষ সিংহ, প্রদীপকুমার, জ্যোতিষর বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সুরবলচন্দ্র বসু, শান্তি সেন, মঞ্জু দে, অর্ণব দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, বেলারাগী দেবী। \* \* ৩০ই কার্তিক—এই দিনকার নাট্যাঙ্কনান রবীন্দ্রভারতীতে অল্পপ্রতি 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটিই বেতার মাধ্যমে শোনানো হয়। অঙ্কনানটি প্রযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন সান্ত্বাল সেনগুপ্ত। গ্রন্থিকের মর্ষণ লাভ করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট। অংশ গ্রহণ করবেন দেবপ্রত বিশ্বাস চন্দ্রময় চট্টোপাধ্যায় অনীতা মজুমদার, পূর্ববী চট্টোপাধ্যায়, পূর্ববী সরকার ও মীরা রায় প্রমুখ শিল্পিবর্গ।



হুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার

গিনি  
ম্যানসন

জুয়েলাস

প্ৰধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—'গিনিমান' \* ফোন—৪৬১৪৭২

শাখাসমূহ :

ফরুদ বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মাট, বাঙ্গীগঞ্জ

বিঃ দ্রঃ—আগামী ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বে অধীন সুল কাইনাল পরীক্ষাতে যে ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাকে গিনি ম্যানসনের তরফ হইতে হীরক খচিত স্বর্ণাঙ্কুর দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

## মিশর আক্রমণ—

আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথেই সুরেজ খাল সমস্তার সমাধান হইবে, এই আশা জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাসী বখন শক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গত ৩১শে অক্টোবর (১৯৫৬) ভোর সাড়ে চারিটার (জি, এম, টি) বুটিন ও ফরাসী বাহিনী সুরেজ খাল অঞ্চলে সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ করে। ইহার দুই দিন পূর্বে ২১শে অক্টোবর মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে ইসরাইল। ইহার কয়েক দিন আগে গত ২২শে অক্টোবর হুজরানি ফরাসী বিমান আকাশপথে একখানি বাত্মোহী বিমান আটক করিয়া ঐ বিমান হইতে ৫ জন বিদ্রোহী আলজিরীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে। বিদ্রোহীদের পাচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়ত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু ঐ ঘটনায় এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ সামরিক অভিযানের মধ্যে উহার বৃত্ত অস্তিত্ব বিলাপ করা যায়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যান্ডে বিপুল বিক্ষোভের স্ফূর্তি সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি বখন আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সময় মিশর উড়ন্ত বিমান নামাইয়া আলজিরিয়ার ৫ জন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পোল্যান্ডের বিক্ষোভ প্রশমিত হইতে না হইতেই হাঙ্গেরিতে রাশিয়া ও কুম্মুনিজমের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় বন বিক্ষোভ। ব্যাপকতা ও গভীরতায় এই বিক্ষোভ পোল্যান্ডের বিক্ষোভকে ছাড়িয়া যায় এবং উহা পরিণত হয় রুশ সৈন্যদের হাঙ্গেরীগানদের তীব্র সংঘর্ষে। পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে ক্রান্ত বখন রাশিয়াকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, সাধারণ মানুষ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বখন ব্যাপ্ত, আলজিরিয়ার প্রাচীনেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ফ্রান্সের প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির প্রত্যাবর্তন বখন প্রবল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছিল, সুরেজ সমস্তা মিশরের প্রতি বুটেন ও ফ্রান্সের গভীর অসন্তোষ বখন তীব্রতর, সময় ইসরাইল মিশরকে আক্রমণ করিয়া বসিল। উহাকেই দ্রুত অঙ্কুরিত করিয়া বুটেন ও ফ্রান্স সাইপ্রাসের খাঁটি হইতে মিশরের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিল-সামরিক অভিযান।

গত ১১শে অক্টোবর (১৯৫৬) সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাইয়া এবং উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গত ২৩শে অক্টোবর ৮২টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দুইটি ঘটনা এবং সুরেজ খাল সমস্তা সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ পথে সীমান্তের আশা বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এই ধারণাই বিশ্ববাসীর মনে সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা মর্যাদিকার পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পোল্যান্ডে বিক্ষোভ, হাঙ্গেরিতে প্রতি-বিদ্রোহ, সিঙ্গাপুরের হাঙ্গামা, জর্ডানের সাধারণ নির্বাচনে মিশর সমর্থনকারীদের জয়লাভ সমস্তই মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সম্মুখে স্তান হইয়া গিয়াছে। মিশর সুরেজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার পর হইতে বুটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি যে নিরুদ্ধ থায়া ছিল না, তাহা আজ ভালভাবেই বুঝা বাইতেছে। বুটেন ও ফ্রান্স আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা সম্বন্ধে একটা স্ববেগে খুঁজিতেছিল। ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়া এই স্ববেগে সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্সের উচ্চনীতিতেই যে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এইরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আরব-ইসরাইল সীমান্ত সংঘর্ষ নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) ইসরাইল মিশরের উপর যে হান্না দিয়াছে তাহা পূর্বাধিক সামরিক আক্রমণ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইসরাইল স্বতন্ত্র হইয়াই মিশর আক্রমণ করিয়াছে এবং এইরূপ আক্রমণের পক্ষে যুক্তিও তাহার আছে। রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এরূপ মনে হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ইসরাইলের সহিত মিশরের সীমান্ত সংঘর্ষগুলি দিনাই-উপরীপের মিশরীয় ফেদাইম (কম্যাণ্ডো) বাটালি়ন হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে। এইগুলিকে ধ্বংস করাই ইসরাইলের উদ্দেশ্য। আরব রাষ্ট্রগুলি পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে যে, ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাহার সঙ্গ করিবে না। কম্মুনিষ্ট দেশ হইতে মিশরের অস্তিত্ব প্রাপ্তিতে আরব রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক চারিদিক হইতে প্রবল ভাবে আক্রান্ত হওয়া আশঙ্কা ইসরাইলের মনে জাগ্রত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইসরাইলে একদল লোক আছে বাহারি আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত 'প্রভেটিট ওয়ার' বা প্রতিবেশাঙ্ক যুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। গত নভেম্বর (১৯৫৫) মাসে মি: ডেভিড বেন গুরিয়ন বখন প্রধান মন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন তখন হইতেই প্রতিবেশাঙ্ক যুদ্ধের সমর্থকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়বার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। আরব রাষ্ট্রগুলির ইসরাইল আক্রমণের আশঙ্কা অমূলক ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আরব রাষ্ট্রগুলির উপর মিশরের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল নাসেরের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইসরাইলকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহার রেতুখে আরব রাষ্ট্রগুলি সজ্জবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও ইসরাইল উপেক্ষা করিতে পারে নাই। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) জর্ডানে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে মিশর সমর্থকরাই জয়লাভ করে। অতঃপর মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে সম্মিলিত সামরিক কমান্ড গঠনের জন্য এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই শোষণ ঘটনাই

**সবাই  
জানেন -**

শীলকরা প্যাকেটে  
পাওয়া যায় বলে  
**ব্রুক বন্ড চা**  
নির্ভেজাল ও একেবারে  
খাঁটি থাকে

দামের তুলনায়  
**ব্রুক বন্ড চা**  
অনেক বেশী কার্য  
ভালো চা পাবেন

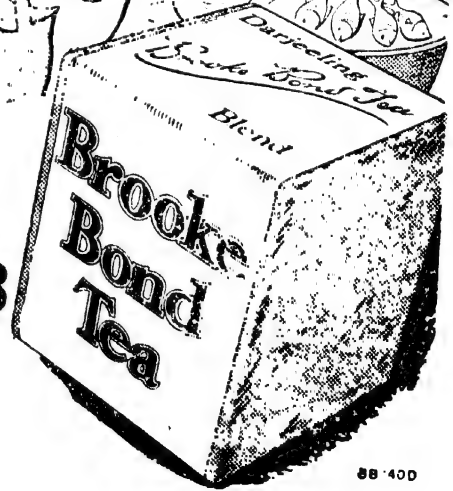
বোজ  
২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট  
**ব্রুক বন্ড চা**  
লোকে কেনেন



এই জনাই  
অন্য যে কোন  
মার্কা চায়ের চেয়ে

**ব্রুক বন্ড  
চা**

বেশী লোকে খান !





তড়িৎ গতিতে মিশর আক্রমণ করিতে ইসরাইলকে প্ররোচিত করিয়াছে, এইরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষতঃ সময়টাও সব দিক দিয়াই যে এই আক্রমণের অমূল্য হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। সুরেজ খাল লইয়া মিশর বিজিত। মিশর ও সিরিয়াকে অন্ত্র সরবরাহকারী কম্যুনিষ্টরা পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সমস্তা লইয়া বিজিত। মিশরের উপর ক্রুদ্ধ বুটেন ও ফ্রান্স ইসরাইলের মিশর আক্রমণকে সহায়ত্বের দৃষ্টিতে দেখিবে, সকলের পক্ষেই এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক।

ইসরাইলের মিশর আক্রমণের পক্ষে উল্লিখিত উৎকৃষ্ট যুক্তি সত্ত্বেও উহার মূলে বুটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনা বহিরাছে, এই সন্দেহ অনেকের মনেই না জাগিয়া পারে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দাখণ্য পরিষদের জরুরী অধিবেশনে (২য় নবেম্বর) রুশ প্রতিনিধি ডঃ সফোলভ স্পষ্টই অভিযোগ করেন যে, "the Anglo-French aggressor was pre planned and Israel had been used as the tool of Britain and French..."

বুটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এই অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা অসম্ভব নয়। কিন্তু কতকগুলি ঘটনা হইতে ইহা অনুমান করা হইতে পারে। সুরেজ খাল সমস্তা সমাধানের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়া হইয়া বাইতেছে দেখিয়া ফরাসী মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ মলে তাঁহানিগকে দারুণ কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করিতে অমুরোধ করিয়া বলেন যে, ঠিকই এমন এক ঘটনা ঘটিবে বাহার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিত হইবে। কূটনৈতিক গোপনতা রক্ষার প্রয়োজনে ইহার তিরিক্ত আর কিছু বলিতে তিনি অস্বীকার করেন। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনেও বলিয়াছেন যে, বুটেন ও ফ্রান্সের অনেক হাতের টাচ আছে। এই হাতের পাঁচ যে ইসরাইল তাহা পরে বৃষ্টিতে পারা য়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী গত ১৬ই অক্টোবর দাপ্তরিক ভাবে প্যারীতে গিয়াছিলেন। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে মঃ পিনে হঠাৎ লণ্ডনে বাইয়া উপনীত হন। এই দুইটি আকস্মিক দাপ্তরিক কার্যের কি কারণ ঘটয়াছিল? ২১শে অক্টোবর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব হইতে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, পশ্চিম এশিয়ার অবস্থা দ্রুতর এবং তথায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইসরাইল কর্তৃক মিশর আক্রমণের ১৫ মিনিট পূর্বে এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ইসরাইল কর্তৃক মিশর আক্রমণের পর বুটেন ও ফ্রান্স রেকর্ড তড়িৎ গতিতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহা বিবেচনা করিলেও ইহা অনুমান করিতে পারা যায় যে, পরের বিক্রেতে সামরিক অভিযান আরম্ভ করিবার অজুহাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বুটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণের জন্ত ইসরাইলকে প্ররোচিত করিয়াছে।

মিশরের বিক্রেতে ইসরাইলের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরেই রাশী প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিমানযোগে লণ্ডনে উপনীত হন। ৩০শে অক্টোবর প্রাতে বৃটিশ গবর্নমেন্ট ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া উভয় দেশের একযোগে মিশর ও ইসরাইলের নিকট চরমপত্র প্রদান করেন। এই চরমপত্রে (১) ১২ ঘণ্টার মধ্যে স্থলপথ, জলপথ ও

বিমানপথে আক্রমণ বন্ধ করিবার, (২) মিশর ও ইসরাইলের সৈন্য-বাহিনীকে সুরেজ খাল হইতে ১০ মাইল দূরে অপসারিত করিবার এবং (৩) পোর্ট সৈয়দ, ইসমাইলিয়া ও সুরেজের গুরুত্বপূর্ণ ষাঁটগুলিকে ইসরাইলী বাহিনীর দখলে ছাড়িয়া দিতে মিশর সরকারকে রাজী হইবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত চরমপত্রে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে উভয় গবর্নমেন্ট বা তাহাদের কোন এক গবর্নমেন্ট সম্মত না হইলে এই সকল দাবী পূরণে রাজী করাইবার জন্ত বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী প্রয়োজনীয় যেকোন শক্তিপ্রয়োগে হস্তক্ষেপ করিবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধ বিরতির এই দাবী মিশর যদি গ্রহণ করে, তবে ইসরাইল গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। বলা বাহুল্য, মিশর গবর্নমেন্ট উক্ত চরমপত্রের দাবী অগ্রাহ্য করেন। ইহার পর ৩১শে অক্টোবর মিশরে কোনরূপ বলপ্রয়োগ না করিবার বা বলপ্রয়োগের ভয় নাই দিবার জন্ত সমস্ত রাষ্ট্রে অমুরোধ জানাইয়া নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে বুটেন ও ফ্রান্স ভোট প্রদান করে। মিশরে অবিলম্বে যুদ্ধ থামাইয়া ইসরাইলী বাহিনীকে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পিছনে সরিয়া বাইতে নির্দেশ দিয়া নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিল, বুটেন ও ফ্রান্স তাহাতেও ভোট প্রদান করে। রাশিয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আর একটি তাৎপৰ্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ম ভোট দানে বিরত ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন ও রুশ প্রস্তাবে ভোট প্রদানের অব্যবহিত পরেই সম্মিলিত বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী মিশর আক্রমণ করে। নবম্বরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নবম্বরের পার্লামেন্টে বলেন (৩১শে অক্টোবর) যে, এদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় মিশরে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যের অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

সুরেজ খালের উপর বুটেন ও ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্তই যে ইসরাইলকে দিয়া মিশর আক্রমণ করান হইয়াছে, উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বৃষ্টিতে পারা যায়। ইসরাইলের আক্রমণের ফলে সুরেজ খাল বিপন্ন হইয়াছে, এই যুক্তিটার সারবস্তা স্বীকার করা অসম্ভব। তাই যদি হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন ও রুশ প্রস্তাবে বুটেন ও ফ্রান্স ভোট প্রদান করিল কেন? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত। বুটেন ও ফ্রান্স সেপথে বাধা সৃষ্টি করিল কেন? বিতীয়তঃ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য ইসরাইলকে আক্রমণ না করিয়া আক্রমণ করিয়াছে মিশরকে। ১৯৫০ সালের ত্রিপক্ষীয় যোগদান আনব-ইসরাইল যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘিত হইলে উহা নিরোধের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বা উহার বাহিরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার ভোট প্রয়োগের আশঙ্কা করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভোট প্রয়োগের কোন আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। বলা রাশিয়া ব্যবস্থা গ্রহণেরই পক্ষপাতী। বুটেন ও ফ্রান্সই বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইসরাইলীয় চুক্তি অনুযায়ী বুটেন সুরেজ অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইতে অধিকারী এই যুক্তিও টিকিতে পারে না। এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, যথাপ্রয়োজ বাহিরের কোন রাষ্ট্র দ্বারা তুচ্ছ কিংবা কোন আরব রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলেই শুধু এই চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ বাহিনী



সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে অধিকারী। ইসরাইল যথাপ্রাচ্যে বাহ্যের কোন রাষ্ট্র নয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বলপ্রয়োগে সুয়েজ অঞ্চল দখলের জন্য ব্রুটন ও ফ্রান্স অনেক পুর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এ ব্যাপারে আমেরিকার সম্মতি কতখানি ছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যে, পরোক্ষ সমর্থন দিয়াছে অবস্থা দেখিয়া এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের পুর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছিলেন, যে পক্ষই আক্রান্ত হউক আমেরিকা তাহাকেই সাহায্য করিবে। কিন্তু মিশরের উপর ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এক বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, মিশরের যুদ্ধে আমেরিকা অংশ গ্রহণ করিবে না। ইহার অর্থ আক্রমণকারীদিগকেই পরোক্ষভাবে সাহায্য করা।

মিশর আক্রমণ সমগ্র ভাবে ব্রিটিশ জাতি সমর্থন করে নাই, একথা সত্য। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে বিশ্ববাসী বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মনে এই আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, যে কোন শক্তিশালী পাশ্চাত্য রাষ্ট্র তাহাদের উপর যে কোন সিদ্ধান্ত বলপ্রয়োগে চাপাইয়া দিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা মোটেই আশঙ্ক হইবার মত নহে। ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী মিশর আক্রমণ করে। ২৯ নবেম্বর সুয়েজ খাল

এলাকায় ব্রুটন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের সামরিক অভিযানে গভীর উবেগ প্রকাশ করিয়া এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাইয়া উপাধিপতি মার্কিন প্রস্তাব ৬৪—এ ভোটে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। ব্রুটন, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, আট্রেলিয়া ও ইসরাইল বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বেলজিয়াম, কানাডা, কুওস, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভোট দেয় নাই। ৩রা নবেম্বর ব্রুটন ও ফ্রান্স কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কল্ডস সভায় বলেন যে, মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে, মিশর ও ইসরাইলের এই বাহিনীকে মানিয়া লইতে হইবে এবং যতদিন না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠিত হইতেছে ততদিন যুদ্ধশাসন দেশদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব। মিশর ও ইসরাইল উভয়কেই সম্মতি দিতে হইবে, এই সর্তে ব্রুটন যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে সুয়েজ খাল দখল করা এই সর্তে তিনটিম উদ্দেশ্য।

গত ৪ঠা নবেম্বর মিশরে যুদ্ধ বিরতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাহিনী নিয়োগের জন্য উপাধিপতি কানাডার প্রস্তাব গণ্যমান্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই নবেম্বর ব্রুটন ও

— কিন্তু —

কিছুটা নিরেন্স করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বারা বিকৃত সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিন্তাচরিত কলাইনপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোনদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নিষিদ্ধ অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০-১৭৩৮-১৭৩৯-১৭৪০-১৭৪১-১৭৪২-১৭৪৩-১৭৪৪-১৭৪৫-১৭৪৬-১৭৪৭-১৭৪৮-১৭৪৯-১৭৫০-১৭৫১-১৭৫২-১৭৫৩-১৭৫৪-১৭৫৫-১৭৫৬-১৭৫৭-১৭৫৮-১৭৫৯-১৭৬০-১৭৬১-১৭৬২-১৭৬৩-১৭৬৪-১৭৬৫-১৭৬৬-১৭৬৭-১৭৬৮-১৭৬৯-১৭৭০-১৭৭১-১৭৭২-১৭৭৩-১৭৭৪-১৭৭৫-১৭৭৬-১৭৭৭-১৭৭৮-১৭৭৯-১৭৮০-১৭৮১-১৭৮২-১৭৮৩-১৭৮৪-১৭৮৫-১৭৮৬-১৭৮৭-১৭৮৮-১৭৮৯-১৭৯০-১৭৯১-১৭৯২-১৭৯৩-১৭৯৪-১৭৯৫-১৭৯৬-১৭৯৭-১৭৯৮-১৭৯৯-১৮০০-১৮০১-১৮০২-১৮০৩-১৮০৪-১৮০৫-১৮০৬-১৮০৭-১৮০৮-১৮০৯-১৮১০-১৮১১-১৮১২-১৮১৩-১৮১৪-১৮১৫-১৮১৬-১৮১৭-১৮১৮-১৮১৯-১৮২০-১৮২১-১৮২২-১৮২৩-১৮২৪-১৮২৫-১৮২৬-১৮২৭-১৮২৮-১৮২৯-১৮৩০-১৮৩১-১৮৩২-১৮৩৩-১৮৩৪-১৮৩৫-১৮৩৬-১৮৩৭-১৮৩৮-১৮৩৯-১৮৪০-১৮৪১-১৮৪২-১৮৪৩-১৮৪৪-১৮৪৫-১৮৪৬-১৮৪৭-১৮৪৮-১৮৪৯-১৮৫০-১৮৫১-১৮৫২-১৮৫৩-১৮৫৪-১৮৫৫-১৮৫৬-১৮৫৭-১৮৫৮-১৮৫৯-১৮৬০-১৮৬১-১৮৬২-১৮৬৩-১৮৬৪-১৮৬৫-১৮৬৬-১৮৬৭-১৮৬৮-১৮৬৯-১৮৭০-১৮৭১-১৮৭২-১৮৭৩-১৮৭৪-১৮৭৫-১৮৭৬-১৮৭৭-১৮৭৮-১৮৭৯-১৮৮০-১৮৮১-১৮৮২-১৮৮৩-১৮৮৪-১৮৮৫-১৮৮৬-১৮৮৭-১৮৮৮-১৮৮৯-১৮৯০-১৮৯১-১৮৯২-১৮৯৩-১৮৯৪-১৮৯৫-১৮৯৬-১৮৯৭-১৮৯৮-১৮৯৯-১৯০০-১৯০১-১৯০২-১৯০৩-১৯০৪-১৯০৫-১৯০৬-১৯০৭-১৯০৮-১৯০৯-১৯১০-১৯১১-১৯১২-১৯১৩-১৯১৪-১৯১৫-১৯১৬-১৯১৭-১৯১৮-১৯১৯-১৯২০-১৯২১-১৯২২-১৯২৩-১৯২৪-১৯২৫-১৯২৬-১৯২৭-১৯২৮-১৯২৯-১৯৩০-১৯৩১-১৯৩২-১৯৩৩-১৯৩৪-১৯৩৫-১৯৩৬-১৯৩৭-১৯৩৮-১৯৩৯-১৯৪০-১৯৪১-১৯৪২-১৯৪৩-১৯৪৪-১৯৪৫-১৯৪৬-১৯৪৭-১৯৪৮-১৯৪৯-১৯৫০-১৯৫১-১৯৫২-১৯৫৩-১৯৫৪-১৯৫৫-১৯৫৬-১৯৫৭-১৯৫৮-১৯৫৯-১৯৬০-১৯৬১-১৯৬২-১৯৬৩-১৯৬৪-১৯৬৫-১৯৬৬-১৯৬৭-১৯৬৮-১৯৬৯-১৯৭০-১৯৭১-১৯৭২-১৯৭৩-১৯৭৪-১৯৭৫-১৯৭৬-১৯৭৭-১৯৭৮-১৯৭৯-১৯৮০-১৯৮১-১৯৮২-১৯৮৩-১৯৮৪-১৯৮৫-১৯৮৬-১৯৮৭-১৯৮৮-১৯৮৯-১৯৯০-১৯৯১-১৯৯২-১৯৯৩-১৯৯৪-১৯৯৫-১৯৯৬-১৯৯৭-১৯৯৮-১৯৯৯-২০০০-২০০১-২০০২-২০০৩-২০০৪-২০০৫-২০০৬-২০০৭-২০০৮-২০০৯-২০১০-২০১১-২০১২-২০১৩-২০১৪-২০১৫-২০১৬-২০১৭-২০১৮-২০১৯-২০২০-২০২১-২০২২-২০২৩-২০২৪-২০২৫-২০২৬-২০২৭-২০২৮-২০২৯-২০৩০-২০৩১-২০৩২-২০৩৩-২০৩৪-২০৩৫-২০৩৬-২০৩৭-২০৩৮-২০৩৯-২০৪০-২০৪১-২০৪২-২০৪৩-২০৪৪-২০৪৫-২০৪৬-২০৪৭-২০৪৮-২০৪৯-২০৫০-২০৫১-২০৫২-২০৫৩-২০৫৪-২০৫৫-২০৫৬-২০৫৭-২০৫৮-২০৫৯-২০৬০-২০৬১-২০৬২-২০৬৩-২০৬৪-২০৬৫-২০৬৬-২০৬৭-২০৬৮-২০৬৯-২০৭০-২০৭১-২০৭২-২০৭৩-২০৭৪-২০৭৫-২০৭৬-২০৭৭-২০৭৮-২০৭৯-২০৮০-২০৮১-২০৮২-২০৮৩-২০৮৪-২০৮৫-২০৮৬-২০৮৭-২০৮৮-২০৮৯-২০৯০-২০৯১-২০৯২-২০৯৩-২০৯৪-২০৯৫-২০৯৬-২০৯৭-২০৯৮-২০৯৯-২১০০-২১০১-২১০২-২১০৩-২১০৪-২১০৫-২১০৬-২১০৭-২১০৮-২১০৯-২১১০-২১১১-২১১২-২১১৩-২১১৪-২১১৫-২১১৬-২১১৭-২১১৮-২১১৯-২১২০-২১২১-২১২২-২১২৩-২১২৪-২১২৫-২১২৬-২১২৭-২১২৮-২১২৯-২১৩০-২১৩১-২১৩২-২১৩৩-২১৩৪-২১৩৫-২১৩৬-২১৩৭-২১৩৮-২১৩৯-২১৪০-২১৪১-২১৪২-২১৪৩-২১৪৪-২১৪৫-২১৪৬-২১৪৭-২১৪৮-২১৪৯-২১৫০-২১৫১-২১৫২-২১৫৩-২১৫৪-২১৫৫-২১৫৬-২১৫৭-২১৫৮-২১৫৯-২১৬০-২১৬১-২১৬২-২১৬৩-২১৬৪-২১৬৫-২১৬৬-২১৬৭-২১৬৮-২১৬৯-২১৭০-২১৭১-২১৭২-২১৭৩-২১৭৪-২১৭৫-২১৭৬-২১৭৭-২১৭৮-২১৭৯-২১৮০-২১৮১-২১৮২-২১৮৩-২১৮৪-২১৮৫-২১৮৬-২১৮৭-২১৮৮-২১৮৯-২১৯০-২১৯১-২১৯২-২১৯৩-২১৯৪-২১৯৫-২১৯৬-২১৯৭-২১৯৮-২১৯৯-২২০০-২২০১-২২০২-২২০৩-২২০৪-২২০৫-২২০৬-২২০৭-২২০৮-২২০৯-২২১০-২২১১-২২১২-২২১৩-২২১৪-২২১৫-২২১৬-২২১৭-২২১৮-২২১৯-২২২০-২২২১-২২২২-২২২৩-২২২৪-২২২৫-২২২৬-২২২৭-২২২৮-২২২৯-২২৩০-২২৩১-২২৩২-২২৩৩-২২৩৪-২২৩৫-২২৩৬-২২৩৭-২২৩৮-২২৩৯-২২৪০-২২৪১-২২৪২-২২৪৩-২২৪৪-২২৪৫-২২৪৬-২২৪৭-২২৪৮-২২৪৯-২২৫০-২২৫১-২২৫২-২২৫৩-২২৫৪-২২৫৫-২২৫৬-২২৫৭-২২৫৮-২২৫৯-২২৬০-২২৬১-২২৬২-২২৬৩-২২৬৪-২২৬৫-২২৬৬-২২৬৭-২২৬৮-২২৬৯-২২৭০-২২৭১-২২৭২-২২৭৩-২২৭৪-২২৭৫-২২৭৬-২২৭৭-২২৭৮-২২৭৯-২২৮০-২২৮১-২২৮২-২২৮৩-২২৮৪-২২৮৫-২২৮৬-২২৮৭-২২৮৮-২২৮৯-২২৯০-২২৯১-২২৯২-২২৯৩-২২৯৪-২২৯৫-২২৯৬-২২৯৭-২২৯৮-২২৯৯-২৩০০-২৩০১-২৩০২-২৩০৩-২৩০৪-২৩০৫-২৩০৬-২৩০৭-২৩০৮-২৩০৯-২৩১০-২৩১১-২৩১২-২৩১৩-২৩১৪-২৩১৫-২৩১৬-২৩১৭-২৩১৮-২৩১৯-২৩২০-২৩২১-২৩২২-২৩২৩-২৩২৪-২৩২৫-২৩২৬-২৩২৭-২৩২৮-২৩২৯-২৩৩০-২৩৩১-২৩৩২-২৩৩৩-২৩৩৪-২৩৩৫-২৩৩৬-২৩৩৭-২৩৩৮-২৩৩৯-২৩৪০-২৩৪১-২৩৪২-২৩৪৩-২৩৪৪-২৩৪৫-২৩৪৬-২৩৪৭-২৩৪৮-২৩৪৯-২৩৫০-২৩৫১-২৩৫২-২৩৫৩-২৩৫৪-২৩৫৫-২৩৫৬-২৩৫৭-২৩৫৮-২৩৫৯-২৩৬০-২৩৬১-২৩৬২-২৩৬৩-২৩৬৪-২৩৬৫-২৩৬৬-২৩৬৭-২৩৬৮-২৩৬৯-২৩৭০-২৩৭১-২৩৭২-২৩৭৩-২৩৭৪-২৩৭৫-২৩৭৬-২৩৭৭-২৩৭৮-২৩৭৯-২৩৮০-২৩৮১-২৩৮২-২৩৮৩-২৩৮৪-২৩৮৫-২৩৮৬-২৩৮৭-২৩৮৮-২৩৮৯-২৩৯০-২৩৯১-২৩৯২-২৩৯৩-২৩৯৪-২৩৯৫-২৩৯৬-২৩৯৭-২৩৯৮-২৩৯৯-২৪০০-২৪০১-২৪০২-২৪০৩-২৪০৪-২৪০৫-২৪০৬-২৪০৭-২৪০৮-২৪০৯-২৪১০-২৪১১-২৪১২-২৪১৩-২৪১৪-২৪১৫-২৪১৬-২৪১৭-২৪১৮-২৪১৯-২৪২০-২৪২১-২৪২২-২৪২৩-২৪২৪-২৪২৫-২৪২৬-২৪২৭-২৪২৮-২৪২৯-২৪৩০-২৪৩১-২৪৩২-২৪৩৩-২৪৩৪-২৪৩৫-২৪৩৬-২৪৩৭-২৪৩৮-২৪৩৯-২৪৪০-২৪৪১-২৪৪২-২৪৪৩-২৪৪৪-২৪৪৫-২৪৪৬-২৪৪৭-২৪৪৮-২৪৪৯-২৪৫০-২৪৫১-২৪৫২-২৪৫৩-২৪৫৪-২৪৫৫-২৪৫৬-২৪৫৭-২৪৫৮-২৪৫৯-২৪৬০-২৪৬১-২৪৬২-২৪৬৩-২৪৬৪-২৪৬৫-২৪৬৬-২৪৬৭-২৪৬৮-২৪৬৯-২৪৭০-২৪৭১-২৪৭২-২৪৭৩-২৪৭৪-২৪৭৫-২৪৭৬-২৪৭৭-২৪৭৮-২৪৭৯-২৪৮০-২৪৮১-২৪৮২-২৪৮৩-২৪৮৪-২৪৮৫-২৪৮৬-২৪৮৭-২৪৮৮-২৪৮৯-২৪৯০-২৪৯১-২৪৯২-২৪৯৩-২৪৯৪-২৪৯৫-২৪৯৬-২৪৯৭-২৪৯৮-২৪৯৯-২৫০০-২৫০১-২৫০২-২৫০৩-২৫০৪-২৫০৫-২৫০৬-২৫০৭-২৫০৮-২৫০৯-২৫১০-২৫১১-২৫১২-২৫১৩-২৫১৪-২৫১৫-২৫১৬-২৫১৭-২৫১৮-২৫১৯-২৫২০-২৫২১-২৫২২-২৫২৩-২৫২৪-২৫২৫-২৫২৬-২৫২৭-২৫২৮-২৫২৯-২৫৩০-২৫৩১-২৫৩২-২৫৩৩-২৫৩৪-২৫৩৫-২৫৩৬-২৫৩৭-২৫৩৮-২৫৩৯-২৫৪০-২৫৪১-২৫৪২-২৫৪৩-২৫৪৪-২৫৪৫-২৫৪৬-২৫৪৭-২৫৪৮-২৫৪৯-২৫৫০-২৫৫১-২৫৫২-২৫৫৩-২৫৫৪-২৫৫৫-২৫৫৬-২৫৫৭-২৫৫৮-২৫৫৯-২৫৬০-২৫৬১-২৫৬২-২৫৬৩-২৫৬৪-২৫৬৫-২৫৬৬-২৫৬৭-২৫৬৮-২৫৬৯-২৫৭০-২৫৭১-২৫৭২-২৫৭৩-২৫৭৪-২৫৭৫-২৫৭৬-২৫৭৭-২৫৭৮-২৫৭৯-২৫৮০-২৫৮১-২৫৮২-২৫৮৩-২৫৮৪-২৫৮৫-২৫৮৬-২৫৮৭-২৫৮৮-২৫৮৯-২৫৯০-২৫৯১-২৫৯২-২৫৯৩-২৫৯৪-২৫৯৫-২৫৯৬-২৫৯৭-২৫৯৮-২৫৯৯-২৬০০-২৬০১-২৬০২-২৬০৩-২৬০৪-২৬০৫-২৬০৬-২৬০৭-২৬০৮-২৬০৯-২৬১০-২৬১১-২৬১২-২৬১৩-২৬১৪-২৬১৫-২৬১৬-২৬১৭-২৬১৮-২৬১৯-২৬২০-২৬২১-২৬২২-২৬২৩-২৬২৪-২৬২৫-২৬২৬-২৬২৭-২৬২৮-২৬২৯-২৬৩০-২৬৩১-২৬৩২-২৬৩৩-২৬৩৪-২৬৩৫-২৬৩৬-২৬৩৭-২৬৩৮-২৬৩৯-২৬৪০-২৬৪১-২৬৪২-২৬৪৩-২৬৪৪-২৬৪৫-২৬৪৬-২৬৪৭-২৬৪৮-২৬৪৯-২৬৫০-২৬৫১-২৬৫২-২৬৫৩-২৬৫৪-২৬৫৫-২৬৫৬-২৬৫৭-২৬৫৮-২৬৫৯-২৬৬০-২৬৬১-২৬৬২-২৬৬৩-২৬৬৪-২৬৬৫-২৬৬৬-২৬৬৭-২৬৬৮-২৬৬৯-২৬৭০-২৬৭১-২৬৭২-২৬৭৩-২৬৭৪-২৬৭৫-২৬৭৬-২৬৭৭-২৬৭৮-২৬৭৯-২৬৮০-২৬৮১-২৬৮২-২৬৮৩-২৬৮৪-২৬৮৫-২৬৮৬-২৬৮৭-২৬৮৮-২৬৮৯-২৬৯০-২৬৯১-২৬৯২-২৬৯৩-২৬৯৪-২৬৯৫-২৬৯৬-২৬৯৭-২৬৯৮-২৬৯৯-২৭০০-২৭০১-২৭০২-২৭০৩-২৭০৪-২৭০৫-২৭০৬-২৭০৭-২৭০৮-২৭০৯-২৭১০-২৭১১-২৭১২-২৭১৩-২৭১৪-২৭১৫-২৭১৬-২৭১৭-২৭১৮-২৭১৯-২৭২০-২৭২১-২৭২২-২৭২৩-২৭২৪-২৭২৫-২৭২৬-২৭২৭-২৭২৮-২৭২৯-২৭৩০-২৭৩১-২৭৩২-২৭৩৩-২৭৩৪-২৭৩৫-২৭৩৬-২৭৩৭-২৭৩৮-২৭৩৯-২৭৪০-২৭৪১-২৭৪২-২৭৪৩-২৭৪৪-২৭৪৫-২৭৪৬-২৭৪৭-২৭৪৮-২৭৪৯-২৭৫০-২৭৫১-২৭৫২-২৭৫৩-২৭৫৪-২৭৫৫-২৭৫৬-২৭৫৭-২৭৫৮-২৭৫৯-২৭৬০-২৭৬১-২৭৬২-২৭৬৩-২৭৬৪-২৭৬৫-২৭৬৬-২৭৬৭-২৭৬৮-২৭৬৯-২৭৭০-২৭৭১-২৭৭২-২৭৭৩-২৭৭৪-২৭৭৫-২৭৭৬-২৭৭৭-২৭৭৮-২৭৭৯-২৭৮০-২৭৮১-২৭৮২-২৭৮৩-২৭৮৪-২৭৮৫-২৭৮৬-২৭৮৭-২৭৮৮-২৭৮৯-২৭৯০-২৭৯১-২৭৯২-২৭৯৩-২৭৯৪-২৭৯৫-২৭৯৬-২৭৯৭-২৭৯৮-২৭৯৯-২৮০০-২৮০১-২৮০২-২৮০৩-২৮০৪-২৮০৫-২৮০৬-২৮০৭-২৮০৮-২৮০৯-২৮১০-২৮১১-২৮১২-২৮১৩-২৮১৪-২৮১৫-২৮১৬-২৮১৭-২৮১৮-২৮১৯-২৮২০-২৮২১-২৮২২-২৮২৩-২৮২৪-২৮২৫-২৮২৬-২৮২৭-২৮২৮-২৮২৯-২৮৩০-২৮৩১-২৮৩২-২৮৩৩-২৮৩৪-২৮৩৫-২৮৩৬-২৮৩৭-২৮৩৮-২৮৩৯-২৮৪০-২৮৪১-২৮৪২-২৮৪৩-২৮৪৪-২৮৪৫-২৮৪৬-২৮৪৭-২৮৪৮-২৮৪৯-২৮৫০-২৮৫১-২৮৫২-২৮৫৩-২৮৫৪-২৮৫৫-২৮৫৬-২৮৫৭-২৮৫৮-২৮৫৯-২৮৬০-২৮৬১-২৮৬২-২৮৬৩-২৮৬৪-২৮৬৫-২৮৬৬-২৮৬৭-২৮৬৮-২৮৬৯-২৮৭০-২৮৭১-২৮৭২-২৮৭৩-২৮৭৪-২৮৭৫-২৮৭৬-২৮৭৭-২৮৭৮-২৮৭৯-২৮৮০-২৮৮১-২৮৮২-২৮৮৩-২৮৮৪-২৮৮৫-২৮৮৬-২৮৮৭-২৮৮৮-২৮৮৯-২৮৯০-২৮৯১-২৮৯২-২৮৯৩-২৮৯৪-২৮৯৫-২৮৯৬-২৮৯৭-২৮৯৮-২৮৯৯-২৯০০-২৯০১-২৯০২-২৯০৩-২৯০৪-২৯০৫-২৯০

ক্রান্ত দাবী করে যে, সুরেজ খাল অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী প্যারান্ট বাহিনী অবতরণ করিয়াছে এবং বৃটিশ বাহিনী পোর্ট সৈয়দ বিমান ঘাঁটি দখল করিয়াছে। ঐ দিনই অর্থাৎ ৭ই নবেম্বর মঙ্গলবার রাতে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ বুলগানিন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রীকে এক বাণী প্রেরণ করিয়া তঁাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ পশ্চিম ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে রাশিয়া বন্ধপরিষদ। মিশরের যুদ্ধ অস্ত্র দেশেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে, এই হুঁসিয়ারীও উক্ত বাণীতে আছে। এই সতর্ক বাণীতে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আধুনিক মারণাস্ত্র নৌ ও বিমান-যোগে প্রেরণ করা চলিতে পারে না, রকেটের সাহায্যেই প্রেরণ করা চলে। রাশিয়ার এই সতর্ক বাণীর জন্মেই ইউক, অথবা ইঙ্গ-ফরাসী প্যারান্ট বাহিনী মিশরে অবতরণ করিয়াছে বলিয়াই ইউক, বুধবার ২৩-২১ মিনিটের (জি এম টি) সময় (ভারতীয় সময় ভোর ৫-২১ মিনিট) বৃটিশ ও ফরাসী গবর্নমেন্ট তঁাহাদের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসী গবর্নমেন্টের জনৈক মুখপাত্র ৭ই নবেম্বর ঘোষণা করেন যে, সুরেজ খাল এলাকার অবিকাশ অঞ্চল দখল করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বুটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধ হওয়ার পর যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেওয়া হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বীপকণ্ঠে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পর মিশর হইতে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিয়া এশিয়া-আফ্রিকা রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর উপস্থাপিত প্রস্তাব ৭ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশুল ভোটাদিষ্টে গৃহীত হইয়াছে। ঐ দিনই আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিশরে আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করাটাই বড় কথা নয়। প্রধান প্রশ্ন হইল বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল মিশর ত্যাগ করিবে কি না? যদি তাহারা মিশর ত্যাগ না করে তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তথা আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী কি করিবে? আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদল স্থান না পাইলে মিশর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণ করা হইবে না বলিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ত্রার এটর্নী ইডেন বাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য গ্রহণ করা হয় কিবা গ্রহণ করা না হইলেও মিশরে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য থাকিয়াই যায় তবে যুদ্ধ বিবর্তির দরজা কাঁড়াইবে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর জয়লাভ। এই জয়লাভ হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের দ্বারা। পররাজ্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। সুরেজ খাল বুটেন ও ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। সুরেজ অঞ্চল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুশ-মার্কিন যুক্তবাহিনী নিয়োগের যে প্রস্তাব মিশরা করিয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে রাজী হয় নাই। বরং হুঁসিয়ারী দিয়াছে যে, রাশিয়া ঐরূপ কোন চেষ্টা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বুটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সমস্ত হস্তক্ষেপ করিবে। মিশর রুশযুদ্ধ বিমানসমূহ অবতরণ করিয়াছে বলিয়া ফরাসী প্রক্টর মন্ত্রী মঃ পিনে ৮ই নবেম্বর স্বীকার করিয়াছেন। হঠাৎ মার্কিন ফল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে সতর্ক থাকিতে এবং

সেনাপতিদ্বিগকে দেশরক্ষার প্রস্তুতি বৃদ্ধি করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা কি সিরিয়ার রুশযুদ্ধ বিমানসমূহ অবতরণের পাপটী জবাব? রুশ গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, মিশর হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত না হইলে রুশ নাগরিকদের বেচ্ছাসেবকরূপে মিশরের দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানে বাধা দেওয়া হইবে না। মার্কিন রাষ্ট্র-দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, আমেরিকা যে কোন অবস্থাতেই মিশরে রুশ বেচ্ছাসেবক প্রেরণে বাধা দিবে। মিশরে যদি বুটেন ও ফ্রান্সের বলপ্রয়োগের নীতি সাক্ষ্যলাভ করে, তবে যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অস্ত্রাস্ত্র দুর্বল দেশের উপর বলপ্রয়োগে কুচিত হইবে না। এই ধরণের যুদ্ধ আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্বাধীনতা হারাষ্টবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বীপকণ্ঠ ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মিশরে যদি রুশ বেচ্ছাসেবকবাহিনী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ করিবে। ফলে, উহা বিশ্বসংগ্রামের ক্ষুদ্র সংস্করণে অথবা বিশ্বসংগ্রামের মহড়ায় পরিণত হইতে পারে। উহা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বসংগ্রামে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। হয় দুর্বল রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা হারাষ্টবে, না হয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এই আশঙ্কাই সৃষ্টি করিয়াছে।

### পোল্যান্ড ও হাজেরী—

সুরেজ সমস্তা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্মনীতি, প্রতিটি পাদক্ষেপের প্রতি বিশ্বাসীরা একাগ্র দৃষ্টি বখন নিবদ্ধ, সেই সময় গত অক্টোবর মাসের শেষার্ধ্বে প্রথমে পোল্যান্ডে এবং তারপর হাজেরীতে ডিষ্ট্যান্সিনজেশন বা ট্যালিনবাদ অবসানের নীতির পরিণতি সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখে এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে। ট্যালিনবাদ অবসানের অর্থ কি, উহার অবসান কি পদ্ধতিতে হইবে সে-সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার ট্যালিনোত্তর নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ট্যালিনবাদ অবসানের পক্ষে ইহা যে এক কঠিন সমস্যা, একথা অনস্বীকার্য। ট্যালিনবাদের শক্তিও দুর্বল। পোল্যান্ড ও হাজেরীর ভিতরে এবং পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজম বিরোধী শক্তিগুলিও যথেষ্ট প্রবল। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পোল্যান্ড ও হাজেরীতে ট্যালিনবাদ অবসানের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের কারণ কি এবং উহার স্বাভাবিক স্বরূপই বা কি তাহা বাহির হইতে বৃথিত পাঠ্য অসম্ভব বলিয়াই মনে নাই। কমিউনিজম বিরোধী বিক্ষোভ কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত, কতখানি পোল্যান্ড ও হাজেরীর বাহিরের কমিউনিজম বিরোধী শক্তিগুলির প্ররোচনা ও সাহায্যের ফল তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ট্যালিনবাদের অপ্রতিহত শাসনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের যে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোন চেষ্টা যে করা হয় নাই পোজানানের হাল্কা মার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎশিল্পকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের অভাব সৃষ্ট হওয়ার জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কমিউনিজম-বিরোধী শক্তিগুলি এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ মনে করাও

...শিশির সিক্ত

প্রভাতের

যতো তাজো



ইউ-ডি

রেনোয়ার

প্যারিস

ভারতে একমাত্র সরবরাহকারী

লাক্শ্মে

-টাইম একটো শিল্পোদ্যম

পূর্ব স্বাভাবিক। ট্যালিনবার গণতান্ত্রিকরণের বিরোধী। ট্যালিনবার অবসানের প্ররোণ একদিকে যেমন উহার প্রবল বিরোধিতার সন্ধানী হইয়াছিল, আর একদিকে তেমনি কম্যুনিজমবিরোধী শক্তিশালী ট্যালিনবার অবসানের প্ররোচনাকেই কম্যুনিজমবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের সুযোগে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতেই পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

পোল্যাণ্ডে ট্যালিনবার বিরোধী গণবিপ্লবের পরিণতিরূপ মিঃ গোল্লক পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪১ সালের পূর্বে তিনিই ছিলেন পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারী। যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর মত তিনিও ট্যালিনবারের বিরোধিতা করিবার হুসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পোল্যাণ্ড তাহার নিজের পথই গ্রহণ করিবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে-প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। ইহার পরিণামে ১৯৪১ সালে তাহাকে পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারীর পদ হইতে হুতা করা হয়। দুই বৎসর পর তিনি গ্রেকজার হন এবং চারি বৎসর কাল তাঁহাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁহাকে যে হত্যা করা হয় নাই ইহা তাঁহার পরম দোভাগ্য, বোধ হয় পোল্যাণ্ডেরও দোভাগ্য। পোল্যাণ্ডে ট্যালিনবার-বিরোধী বিপ্লবের আর একটি প্রধান ফল মার্শাল রকোসোভস্কীর পদচ্যুতি। ১৯৪১ সাল হইতে তিনিই পোল্যাণ্ডের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সাত বৎসর পূর্বে পোল্যাণ্ডের দেশরক্ষা মন্ত্রী এবং পোল সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য ট্যালিন তাহাকে প্রেরণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি পোল্যাণ্ডের সহকারী প্রধান মন্ত্রী হন এবং পলিট ব্যুরোর সর্বময় কর্তার পদে নির্বাচিত হন। জাতিতে তিনি পোল হইলেও তাঁহাকে পোল্যাণ্ডে রক্ষার এজেন্ট বলিয়াই গণ্য করা হইত। পোল্যাণ্ডের তৃতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের পর মিঃ গোল্লকর বেতার বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি তত্ত্ব পোল্যাণ্ডের কৃষি ও শিল্পনীতিরই কঠোর সমালোচনা করেন নাই, তত্ত্ব শোভনানের হাস্যাম্বাসাদেশের প্রতি সহ্যহুত্বিই প্রকাশ করেন নাই, তিনি বলেন যুগোস্লাভিয়া কিংবা রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার ভাষা নানা প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদে থাকিতে পারে। তিনি এই বক্তৃতার সমান ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক দাবী করেন। উল্লিখিত তিনটি ঘটনার তাৎপর্য এবং প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক।

কম্যুনিজম বিরোধীদের দৃষ্টিতে মিঃ গোল্লক 'kerensky in reverse' রূপেই প্রতিভািত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাহার মনে লক্ষ্য ছিল যে, মিঃ গোল্লক কমতার প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতি বিশ্বের পথ প্রশস্ত হইবে। পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোতে মার্শাল রকোসোভস্কী স্থান না পাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। মত উক্ত দুইটি কারণেই গত ১৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) শুক্রবার, পলিট ব্যুরোর সমস্ত নির্বাচনের জন্য পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকার সময় মিঃ ক্রুশেভ, মিঃ মলট,

মিঃ মিকোয়ান এবং মিঃ কাগানভিচ আকস্মিকভাবে ওঠারশব্দে আসিয়া উপস্থিত হন। এমন কি এরূপ কথাও শোনা যায় যে, মরা পলিট ব্যুরো হইতে রকোসোভস্কীকে বাদ দেওয়া হইলে রুশ সৈন্য আমদানী করা হইবে, মিঃ ক্রুশেভ এইরূপ হুমকীও দিয়াছেন। পোল্যাণ্ডে রুশ সৈন্য প্রেরণের হুমকিও শোনা যায়। মিঃ ক্রুশেভ প্রত্নিত রুশ নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তৎক্ষণাৎ অধিবেশন বন্ধ রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একদল প্রতিনিধি রুশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের পর যে ইচ্ছাচার প্রচার করা হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বহুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এবং খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হইয়াছে। ইচ্ছাচারের আরও বলা হইয়াছে যে, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে গভীরতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির একদল প্রতিনিধি যাত্রা হইবেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ওয়ারশ হইতে ১৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের বার্ষিক ভ্রমবৃত্তি ডিনিয় বন্দরে একটি রুশ ক্রুজার এবং তিনটি ডেস্ট্রয়ার আসিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছে।

কখনোতবুদ্ধ সত্যই যদি ট্যালিনবার অবসানের পক্ষপাতী হ'ন, তাহা হইলে মিঃ গোল্লকর প্রতি তাঁহাদের বিপক্ষ মান্যতাবের কোন কারণ থাকিতে পারে না এবং ট্যালিনবারের প্রতিনিধি রকোসোভস্কীকে পলিট ব্যুরো হইতে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করিবারও কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ট্যালিনবার বর্জনের পরিণতিতে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এবং পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রুশ নেতৃবৃন্দ চিন্তিত না হইয়া পারেন নাই। পোল্যাণ্ড রাশিয়ার তাঁবোদার অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে চায়। এ সম্পর্কে পোল্যাণ্ডের সকলেই এমমত হইলেও এই মর্মেত্বের আশ্রয়ে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কম্যুনিজম ও কম্যুনিজম বিরোধী মতবাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ট্যালিনবার বর্জনের ব্যবস্থায় কোনটি প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা তখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ কম্যুনিজম বিরোধী ধারার শিকড় যে পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের গভীরতর প্রদেশে নিহিত একথা বিবেচনা করিলে পোল্যাণ্ডের ট্যালিনবার বিরোধী এবং রুশ বিরোধী আন্দোলন কম্যুনিজম বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। এ দিক দিয়া পোল শ্রমিকরা যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহার শিল্প ব্যবস্থায় কম্যুনিষ্ট আমলাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী হইলেও আবার ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা তাহার চায় না। এই জন্যই কম্যুনিজম বিরোধীরা পোল্যাণ্ডে কোন অধিধা করিতে পারে নাই। এই দিক দিয়া মিঃ গোল্লকও যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন একথাও অনুস্মার্য। রকোসোভস্কী পদচ্যুত এবং মিঃ গোল্লক পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বপদ লাভ করিলেও রুশ নেতৃবৃন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন পোল্যাণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করিয়াছে কম্যুনিষ্টরা, কম্যুনিজম বিরোধীরা নয়। কিন্তু হাঙ্গেরীতে ঘটনায়ে উহার ঠিক বিপরীত।

পোল্যাণ্ডের সর্বট পার হইতে না হইতেই হাঙ্গেরীতে আদত হয় ব্যাপক এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের প্রথম হইতেই



“মুখের মাঝে চাইনি মনঃপ্রাণে  
 বাজিছে বুকে মূলের মতো ধ্বনি।  
 আমার মতো শুধু কলহাতি  
 কামান চাক অস্ত্রই জীবন্ত”

মকল মনঃপ্রাণে. মনঃপ্রাণে  
 দেবকুমার মানবের কলহাতি  
 বুদ্ধি জ্বলিত নিঃশব্দে মায়ায়  
 কবিতা।



 **জিবাকুমুম**

বেঙ্গালী-  
 সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জিবাকুমুম হাউস, ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১৭, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রিট, মাদ্রাজ-১

৫৭১৩৪৫.৫৭

ষ্ট্যালিনবাদ-বিরোধী এবং কম্যুনিজম-বিরোধী দুইটি ধারা বেশ সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির মতই ষ্ট্যালিনবাদ বিরোধী ধারার সহিত হাত মিলাইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের বিরোধিতা বখানাদাই করিয়াছে এবং বর্তমান পর্যন্ত পারিষাদে বাকোসনিক পার্টির কর্তার আসনে রাখিয়াছিল। পোলায়ও কাবখানাগুলিকে কর্তৃহাণীনে আনিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়া ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের স্বদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি অল্পরূপ কোন আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই। উগাই হইয়াছিল হাঙ্গেরীর স্বাধীন ষ্ট্যালিনবাদের অবশুজ্ঞাবাহী পরিণতি। তথাপি ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৬) ষ্ট্যালিনবাদ-বিরোধী এবং কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন একই সঙ্গে চলিয়া এখন এক অবস্থা সৃষ্টি করে যে, সল্টগ্রাণের জন্য ইমরে নজেকে (Imre Nagy) কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হয়। উহার একমাত্র ফল হইল এই যে, কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন প্রবল ভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। উহা সম্ভব হইল কেন এবং কি রূপে তাহা না জানিলে হাঙ্গেরীর পরবর্তী ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যঃ বুলগারিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ক্রীনেচকর নিকট হাঙ্গেরীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। উহা গোপনীয় ব্যাপার। কাজেই সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া উঠা খুবই কঠিন।

২৩শে অক্টোবর বুধপক্ষে যে শোভাযাত্রা বাতির করা হয় উহার উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন নেতাদের ভুল ও ক্ষতিকর নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। তদানীন্তন পার্টি-সম্পাদক জেরো (Gero) উহাকে প্রতিবিপ্লবীদের কাজ বলিয়া বেতার বক্তৃতায় অভিহিত করেন এবং হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা পুলিশ নিঃস্র শোভাযাত্রাকারীদের উপর গুলী চালায়। ফল অবস্থা আরও বারিহে চলিয়া যায়। আন্দোলনের কম্যুনিজম বিরোধী অংশ প্রাথ্য লাভ করে, আরম্ভ হয় কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের আক্রমণাত্মক কার্য। তাহাদের সমস্ত আক্রমণ কম্যুনিষ্টদের উপর বাইয়া পড়ে এবং নির্বিরোধী কম্যুনিষ্ট হত্যা আরম্ভ হয়। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ইমরে নজে (Nagy) যে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পোলায়ও গোসুলকা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে রুশ সৈন্য অপসারণের দাবী করিয়াছিলেন। নজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া সামরিক আইন জারী করিলেন এবং আন্দোলন দমনের জন্য রুশ সৈন্য আহ্বান করিলেন। ইহার অবশুজ্ঞাবাহী ফল হইল যে, জনগণের জাতীয়তা-বোধে তীব্র আঘাত লাগিল এবং কম্যুনিজম বিরোধীরা উহার পূর্ণ প্রয়োগ গ্রহণ করিল। জনগণের বিক্ষোভকে পরিচালিত করা হইল শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই নয়, নজে সরকারের বিরুদ্ধেও। এই সময় হইতে হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যায়, কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন শুধু রুসবৎ এবং যথেষ্ট 'শক্তিশালী' ছিল না, উহাদের শক্তি ত্রয়শঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই শক্তির মূল উৎস বোধ্য তাহা শুধু ঘটনার গতিধারা হইতেই

অনুমান করা হইতে পারে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে পূর্ব-ইউরোপকে মুক্ত করিতে উৎসুক তাহা অজানা নয়। কিন্তু ইহার মত তাহারা কি কি করিয়াছে তাহা অবশ্য জানিবার উপায় নাই। চীনের স্বাধীন সর্ববরাহ প্রতিষ্ঠান 'সিনহুয়া'র স্বাধীনতা ৩১শে অক্টোবর জানান যে, "নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সকল ক্যাসিটরি বিদেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিম জার্মানীতে পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা অষ্ট্রা-সীমান্ত দিয়া দলে দলে হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিতেছে। প্রতি-বিপ্লবীরা জেলে হানা দিয়া চোরগুণা ডাকাতে প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিতেছে।" পশ্চিমী শক্তিবর্গ সাহায্য করিয়া থাকিলে তাহা গোপনই করিয়াছে। বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্বমুদ্র বাধিবার আশঙ্কা না থাকিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি করিতেন, তাহা বলা কঠিন। মিঃ ডালেস বলিয়াছিলেন, (২৭শে অক্টোবর) হাঙ্গেরীর 'বিশ্বোচ্চা'র মাফিক সাহায্যের উপর ভরসা রাখিতে পারে।

২৭শে অক্টোবর ইমরে নজে এক নতুন গবর্ণমেন্ট গঠন করেন। এই গবর্ণমেন্ট গঠনের পর এক বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, নতুন গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবার পর লড়াই চলিবার আর কোন সম্ভব কারণ নাই। এখন বাঁহারা হাঙ্গারী চালাইতেছেন তাহারা পুঁজিবাদীদের চর, তাঁহারা পুঁজিবাদী শাসন চান। কিন্তু ইহার পর হইতেই নজে কম্যুনিজম বিরোধী আন্দোলনের প্রাবল্যে ভাসিয়া চলিতে আরম্ভ করেন এবং তিনি 'Kerensky in reverse'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ৩০শে অক্টোবর তিনি আবার এক নতুন মন্ত্রিদল গঠন করেন। উহাতে পেজেন্টস পার্টি ও মল হোন্ডার্স পার্টির প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহারাও মিলিত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। ইহার পরদিনই নজে সরকারের পদত্যাগ দাবী করিয়া পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ৩০শে অক্টোবর মধ্যে হইতে ঘোষণা করা হয় যে, হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া ও পোলায়ও হইতে সোভিয়েট সরকার সৈন্য অপসারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে একপক্ষীয় আলোচনা দ্বারা সৈন্য অপসারণ করা যায় না। কারণ, ওয়াশিংটন চুক্তি অনুযায়ী ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল দেশের সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন। ৩১শে অক্টোবর হইতে রুশ সৈন্য হাঙ্গেরী ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। এই জরুরীতে উৎসাহিত হইয়া কম্যুনিজম বিরোধীরা নজের উপর এমন চাপ দিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া ওয়াশিংটন চুক্তি একতরফা বাতিল করিয়া দিলেন। ঘোষণা করিলেন, হাঙ্গেরীর নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও চিয়াং সরকার এই চতুষশক্তির নিকট আবেদন জানাইলেন। অতঃপর ৩রা নবেম্বর কম্যুনিষ্টদের বাদ দিয়া শুধু পোজেন্টস পার্টি ও মল হোন্ডার্স পার্টির সমস্ত লইয়া তিনি নতুন গবর্ণমেন্ট গঠন করেন এবং এই গবর্ণমেন্টে বিদ্রোহীদের নেতা গানেটার হইলেন দেশরক্ষা মন্ত্রী। এই ভাবে নজে হাঙ্গেরীতে কম্যুনিজম বিরোধী গবর্ণমেন্ট গঠনের সহায় হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন আর একটি ঘটনামোহনের আবর্তিত হইল। ১লা নবেম্বর জনোস কাহারের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অল্পমধ্যে রুশ-বাহিনী হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করে, নজেও তাঁহার অত্যাশ্রয় স্বাধীনপক্ষে প্রেক্ষণ্য করা হয়। রুশ-বাহিনীর আক্রমণ

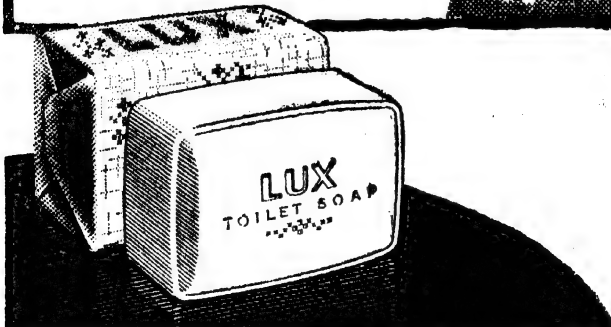
তপ্তী ঘোষ

সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন

লাক্স  
টয়লেট সাবান

“আমার নতে শুভ্রতম বিশুদ্ধতম সাবান”

আপনি এঁর কথা বিশ্বাস করুন: লাক্স টয়লেট সাবানের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় এবং সেইজন্মেই এই সাবানটি আপনার হৃদয় জয় করে। আর লাক্সের ফেণা! সবার মত নয় ও সুবাসন। এই ফেণা হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে—এমন দেয় একটি তাজা স্বরূপে যে তা পুনঃ সংস্কারের ভাব বড় সাইজের সাবান নিতে ফুটাবেন না।



LTS. 486-X52 BG

চিত্র - তারকা দেব  
সৌন্দর্য  
সাবান

ভারতে প্রস্তুত

প্রতিবিলম্বীরা বিধস্ত হয়। তবে এখনও প্রতিবিলম্বীদের সহিত ছোট-খাটো সংঘর্ষ চলিতেছে।

হাস্কেরীতে বাহা ঘটয়ছিল 'তাঁতা কমানিষ্ট' এবং কমানিষ্টের বিরোধীদের মধ্যে লড়াই। কমানিষ্টের বিরোধীদের শক্তি দেখিয়া এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাহারা পশ্চিমী-শক্তিবর্গের পক্ষের সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু এই লড়াইয়ের পরিণামের সহিত পূর্ব-ইউরোপের কমানিষ্ট রাজ্যগুলির ভবিষ্যতেই শুধু নয়, এই অঞ্চলে সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীনতার ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা গৌরবের ভবিষ্যৎও উহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, একথা অস্বীকার করা যায় না। পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে বাহা ঘটয়ছে তাহার ফলে রাশিয়ায় ট্যালিনবাদ বিরোধীগণকে নূতন সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ট্যালিনবাদীরা এই সকল ঘটনার জন্য ট্যালিনবাদ বন্ধনের নীতিকেই দায়ী করিবে। উহার ফলে রাশিয়ায় আবার ট্যালিনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে কমানিষ্টের বিরোধিতাকে যদি প্রসারিত করিতে পারা যায় তবেই রাশিয়ায় ট্যালিনবাদ অবসানের সমর্থকরা শক্তিশালী হইবেন। পূর্ব ইউরোপের কমানিষ্ট দেশগুলির সমস্তা শুধু রাজনৈতিকই নয়, অর্থনৈতিক বটে। পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর মূলে রহিয়াছে ব্যবহার্য পণ্যের অভাব। রাশিয়া এই অভাব পূরণ করিতে পারে নাই। ব্যবহার্য পণ্যের অভাব বারনৈতিক অসন্তোষকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। কমানিষ্টের বিরোধীরা গ্রহণ করিয়াছিল উহারই সুযোগ।

### মার্কিন নির্বাচন—

সম্রাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল তাহাতে মিঃ আইসেনহাওয়ার বিপুল ভোটাধিক্যে পুনরায়

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি যে জয়লাভ করিবেন, এসম্পর্কে কোন সন্দেহ কাহারও ছিল না। মিঃ আইসেনহাওয়ার পাইয়াছেন ২ কোটি ৩১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০ ভোট। তাহার ডেমোক্রাটিক প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ট্রিভেনশন পাইয়াছেন ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৮২০ ভোট। ১৯০০ সালে উইলিয়ম ম্যাককিনলে তাহার দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্টশিপের যুচনায় নিহত হওয়ার পর মিঃ আইসেনহাওয়ারই প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হইলেন। ১৯৫২ সালে কোরিয়া যুদ্ধের মধ্যে তিনি প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পূর্বে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্বাচিত হইলে সম্মানজনক সশস্ত্র কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। এবারের নির্বাচন হইয়াছে মিশরের যুদ্ধের মধ্যে। নির্বাচনের প্রাক্কালেই মিশরের সহট দেগা দেয় এবং প্রেঃ আইসেনহাওয়ার আমেরিকাকে বুটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধাচোজ্ঞ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মিঃ আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা রিপাবলিকান দল কি সিনেট কি প্রতিিনি পরিষদ কোনটাহেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে ডেমোক্রাটিক দল। ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। দুই বৎসর পূর্বে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রাটিকরাই সিনেটে ও প্রতিিনি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে গত দুই বৎসর শাসনকার্য পরিচালনার কোন অসুবিধা হয় নাই। ডেমোক্রাটিক দল হইতে একজন ভারতীয় জজ সিলীম সি সৌদ কালিকোর্ণিয়ার একজন কোর্টপটিকে পরাজিত করিয়া প্রতিিনি পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই নবেম্বর, ১৯৫৩।

### তোমার ছাদার দর্শনে

#### রত্নাবলী সেনগুপ্ত

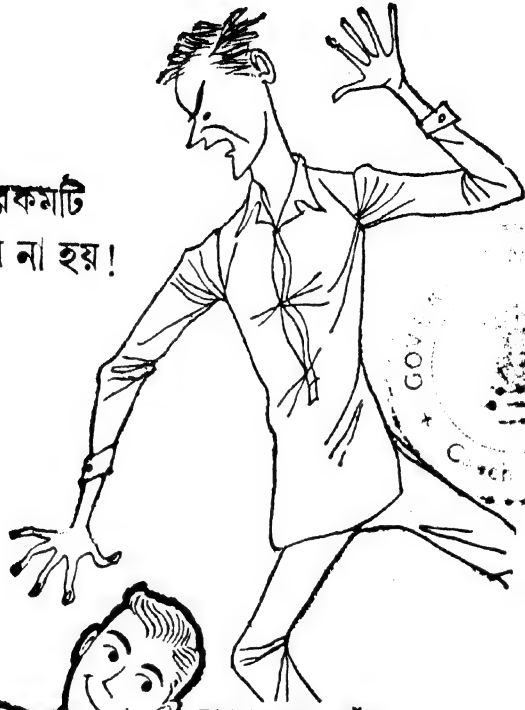


যাইরে নামাল হাওয়ার  
তুলনা মাতন  
ছদয়ে প্রেক্ষিপিত, এলোমেলো  
দিশাহারা কড়,  
যদিও কিছুণিত  
কামনার সে উত্তপ্ত মন  
তথাপি দাবারি অলে  
মনোবনে ওঠে মর্ষর।

আমিও অস্থির আজ  
হেমন্তের হিমাক্ত বাতাসে,  
তুমি নেই  
তোমারই তো প্রতিবিম্ব  
হৃতির উল্লসে শুধু ভাসে,—  
আজ এই সাতরঙা দিনের ল্পর্শে  
অস্থির—অস্থির আমি  
তোমার ছাদার ল্পর্শে।



এ রকমটি  
যেন না হয়!



আপনার নতুন সাট  
মাতে কুঁচকে খাটো না  
হয় তার জন্তে

● SANFORIZED ●

স্যানফোরাইজড  
ছাপ দেখে নিন

সাধারণ কাপড়ের তৈরী হ'লে ভালো সাট  
কুঁচকে খাটো হয়ে যেতে পারে, আর  
তা একটুখানি খাটো হ'লেই  
বরবাদ! কিন্তু এই খাটো হওয়ার  
বদলি আপনাকে পোছাতে  
হয় না যদি আপনি পোশাক কেনবার সময়  
স্যানফোরাইজড ছাপ দেখে কেঁদে।

স্যানফোরাইজড ছাপ দেখা কাপড়  
আপে থেকেই সম্পূর্ণ বাণী করে দেওয়া  
হয়। তাই সূর্য বার কাটাও পূবেও  
কুঁচকে মাগের চোরে খাটো হয় না।

সব সময়েই স্যানফোরাইজড ছাপ  
দেখে কিসুন।

স্যানফোরাইজড সার্ভিস 'পারিস্কার', নেতাজী হত্যার রোড,  
মেয়িন স্ট্রাইড, বোম্বাই—২

মেডিও পিলোন থেকে প্রচারিত 'স্যানফোরাইজড'-কে-মেহমান' শুধু—  
ছবিবার হপুর ১২-৪৪এ ৩১-মিটারে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০এ ৪১-মিটারে

## টাকা আনা পাই

[ ৪৮ পৃষ্ঠার পর ]

( রচনা ও ম্যানেজার কথা বলতে বলতে কথিত্ব দিয়ে ঢোকে )

রচনা—আপনি ঠিকই বলেছেন, ক'দিন ধরে আমিও লক্ষ্য করছি, অভাবের যে লাহন উনি ভোগ করেছেন, তা থেকে একটা প্রতিশোধের স্পৃহা ওর ভেতর জমেছে।

ম্যানেজার—সেটা হওয়া খুবই বাস্তবিক, তবে এখন তো আর উনি একজন সাধারণ লোক—‘হি বিলগঙ্গু ঠু আপার মোট সোসাইটি,’ নানা লোক এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে না চাটরে তাদেরই একজন করে ঠেকে থাকতে হবে। এই ভোলা, বিত্ত, বাসের উনি ছাড়তে পারছেন না আজ আর তারা কেউ নয় ঠর, হতেও পারে না। সাধারণ লোক এখন আপনা থেকেই ঠর কাছ থেকে দূরে সরে বাবে—ওরাও থাকবে না, আবার এদেরও উনি চাইছেন না, তবে সমাজে থাকবেন ক’কে নিয়ে—মান্ন মাষ্ট হাত এ সোসাইটি অব হিজ ওন, উঁচুতলার সমাজই আজ আপনাদের সমাজ, এটা উনি না বুঝলেও আপনাকে তা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।

রচনা। [ চিন্তিত মুখে ] কিন্তু কি করে বোঝানো যায়, সেখানেই ভাবনা। এসব যুক্তি দেখাতে গেলে হয়তো বা কেপেই উঠবেন। ম্যানেজার। না না, আমি আপনাকে যে ভাবে খোঁজাখুঁজি বললাম, তা ঠর কাছে বলাই চলে না। এটা একটু ট্যান্টুলি ম্যানেজ করতে হবে।

রচনা। [ সাগ্রহে ] বেশ তো আপনি বলুন না, কি ভাবে কি করা যায় ?

ম্যানেজার। আমি অবশি মতলব একটা ছিন্ন করে দেখছি, ভরসা দেন তো বলি।

রচনা। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবেন বই কি। এবিষয়ে আপনার সাহায্য না পেলে আমি তো ভাবতেই পারছি না কি করে কি করবো।

ম্যানেজার। আমার ভীমটা হলো, একদিন খুব বড় বকরের একটা পাটির ব্যবস্থা করা। তাতে চশ মোট সোসাইটির—আই মীন, সহরের সমস্ত ধনী মানী লোকদের ডেকে আপনাদের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। অবশি খবরটা কিন্তু এক সন্ধ্যায়—এই ধরন, আটল, হাজায়ে গিয়ে কাঁড়াবে।

রচনা। [ একটু ভেবে নিয়ে ] ও খবরের কথা আপনি ভাববেন না। আপনার এ আইডিয়া আমার তো খুব ভালো লাগছে। এক রাতে বাড়ী বসে সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে বাবে।

ম্যানেজার। [ সোৎসাহে ] হ্যাঁ, সোসাইটির সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগাক বাবুর জড়তাটা একবার কেটে গেলে তিনি নিজেই দেখবেন ভোলা-বিত্তকে আর আঁকড়ে থাকতে চাইবেন না।

রচনা। অবশি বিত্ত-ভোলায় কথা আলাদা—ওদের কাছে আমরা নানারকমে কৃতজ্ঞ।

ম্যানেজার। [ সামলে নিয়ে ] না না, বিত্ত-ভোলা বলতে আমি মুগাক বাবুর এই গুটিয়ে থাকার কথাটাই মীন করছি। এখন প্রধান সমস্যা হলো মুগাক বাবুর মত—

রচনা। [ চিন্তিত মুখে ] মত না হয় নেওয়া গেল—কিন্তু আমি ভাবছি, এত বড় ব্যাপার ‘ম্যানেজ’ করবে কে, আমি তো এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি—ভরসা একমাত্র আপনি।

ম্যানেজার। আপনি যদি মুগাক বাবুকে রাজি করতে পারেন তাহলে ‘ম্যানেজ’ করবার জন্তে ভাবতে হবে না। আমার দ্বী এসব বিষয়ে একেবারে এক্সপার্ট, তাঁকে এনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখবেন সব ঠিক হয়ে বাবে।

রচনা। ও, তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হুচ—ঠর মতের জন্তে আপনি ভাববেন না। আজ রাতেই আমি ঠকে বুঝিয়ে সুরিয়ে রাজি করে রাখবো। সত্যি একা-একা একেবারে হাপিয়ে উঠছি, নিজেদের অসুখায়া মেলামেশা করবার জন্তে দশ জনকে না পেলে কি সময় কাটতে চায়—মিসেস চৌধুরীকে কাল সকালেই আপনি নিয়ে আসুন।

ম্যানেজার। ওহ, ত্যয়র।

রচনা। আচ্ছা, তাহলে এই কথা রইলো, আমি বাই এখন।

( ম্যানেজার সাহেবী কৈতায় মাথা মুড় মুড়িয়ে সদম্মান সম্মতি জানায়, রচনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। )

ম্যানেজার। [ সাক্ষ্যের ভূমি নিয়ে ] বাক, এ ব্যাপারটা উৎরে গেলে খানিকটা অস্বস্ত—[ একটা হাতে মুঠোর আনার তলী করে। ] [ জয়শঃ। ]

## শুধু কথা !

শমিতা গুপ্ত

কথার মালা সাজিয়ে এত আনন্দ পাও মনে ?

তাই ত অকারণ

কথার ভালো জড়িয়ে ফেলে হানলে

আঘাত প্রাণে।

তোমার কাছে কথা শুধুই কথা

তাক্ক অনেক মূল্য দিয়ে শুধুই পেলাম ব্যথা।

ভাবার মায়া-ডোরে, তুমি বাঁধলে মোরে,

ভাবার মায়া কাটবে যখন, রহিব শূন্যতা।

দোহাই তোমার একটু চূপ করো,

জ্বলন্তানি একটু মেলে ধরা,

নীরবতার মাঝেই আছে গভীরতা

সেটা কেন বুঝতে নাহি পারো ?

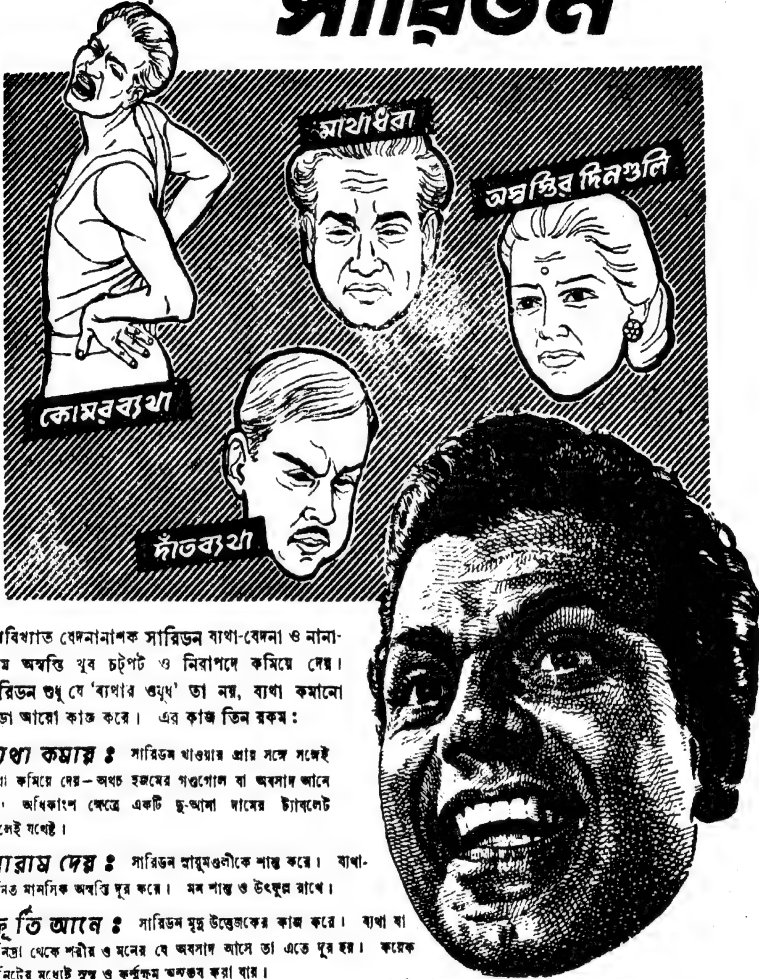
চমকলাগা শব্দ চয়ন করে

আর কড় দিন তুলিয়ে রাখবে মোরে !

এসব ঘাবড়ীয় ব্যথা

৭১. ১৯৬৬

# সারিডন

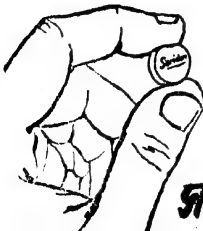


বিষবিখ্যাত বেগনানাপক সারিডন বাথা-বেগনা ও নানা-রকম অসহ্য খুব চটপট ও নিরাপদে কমিয়ে দেয়। সারিডন শুধু যে 'বাথার গুথ' তা নয়, বাথা কমানো ছাড়া আরো কাজ করে। এর কাজ তিন রকম :

**বাথা কমান :** সারিডন খাওয়ার ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাথা কমিয়ে দেয়—অথচ হৃৎসের গড়গোল বা অবসাদ আসে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি ছু-আনা ঘাসের ট্যাবলেট খেলেই যথেষ্ট।

**আরাম দেয় :** সারিডন হাড়গুলোকে শান্ত করে। বাথা-হীনত মাসিক অসহ্য দূর করে। মস শান্ত ও উৎফুল্ল রাখে।

**স্মৃতি আনে :** সারিডন মূত্র উদ্বেজকের কাজ করে। বাথা যা ছিন্তা থেকে শরীর ও মনের যে অবসাদ আসে তা এতে দূর হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মূত্র ও কর্তব্যকম অসহ্য করা যায়।



সারিডন যে এমন চমৎকার কাজ করে তার কারণ, এতে যেসব রসদী, বাহ্যে সেগুলো একটি আরেকটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিয়ে মিলিতভাবে কাজ করে। যনে রাখবেন, সারিডনের তেজের কোনরূপ মারক পদার্থ নেই।

- \* দু-আনায় একটি ট্যাবলেট
- \* একবারে একটি ট্যাবলেট খেতে হয়
- \* এতে অ্যাসপিরিন নেই (অ্যাসেটিল স্যালিসাইলিক এসিড)

**সারিডন খেলেই বুঝতে পারবেন, কত উপকারী!**



# রাজাঘর রাজাঘর

উদয়ভাসু

ভোর-রাত তজ্জা নেমেছে চোখে। গভীর সুখমিত্রা নয়,  
যুগের আমোজ।

আলো জাগার আশায় এক মুক্ত জানলার ধারে বেন প্রতীকার  
বসেছিলেন চন্দ্রকান্ত। বিনিময়র রাজি যাপন করবেন, এই ছিল  
প্রতীক্ষা। রাত্রির শেষাংশে সেই অব্যাহত ঘুম নামলো চোখে। স্নান  
জার অবসানে নিজের অজান্তেই বেন কখন তন্দ্রাজ্বর হয়ে পড়লেন।  
চিন্তা আর তন্দ্রার ঘনমুখে, প্রথমারই জয় হয়। চন্দ্রকান্ত চোখ  
মেলতেই দেখলেন আকাশের এক প্রান্তে বেন আলোর চিকণ। সাদা  
আর লাল রঙ বেন ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। অদৃশ্য শিল্পী  
বেন এই দুই রঙের রেখা টেনেছে আকাশের পটভূমিতে। কিংবা  
কাঁথা বেন তাঁর ছুঁড়ে, কাঁচা রক্তের চিহ্ন দেখা দিয়েছে আকাশের  
মুকে। দিনের প্রথম আলো পূর্ব-দিক দিয়ে, দেখে কেমন শিউরে  
উঠলেন চন্দ্রকান্ত। আলোর রূপালী স্বর্ণা, দেখে কোথায় উৎস  
হবেন। আলোর বসন্তাঙ্গব দেখে বেন ভরাত হয়ে পড়লেন।  
শিউরে শিউরে উঠলেন। রাতে বেন কি এক বিস্তীর্ণ হৃৎস্পন্দ দেখেছেন।  
রক্তের নাটক দেখেছেন বেন! বীভৎস দৃশ্য!

পাখী ডাকছে গাছে গাছে। কাক আর শালিক। ঘুম-ভাঙা  
মাক ডাকছে। তাদের আপন ভাবার প্রার্থনার গান গাইছে বেন  
ক সবে। ঈশ্বরের শান্তিব্রহ্ম হাসির মত, থেকে থেকে আলো ফুটেছে  
ভরাটে। আসমান দীপ্তির তীরে ভ্রমরের গুঞ্জন ভাসছে। আধ-  
পটা গন্ধবাজের ফুঁড়িতে চুমা খায় কালো-ডুমুর; সুখ আর আনন্দে  
গাড়ি ছড়ায় ফুল। ভোরের হাওয়ার গন্ধ ছড়ায়। মাহুকের মত  
কঁপে নেই ফুলের, তাই ব্রগন্ধ বিতরণ করে বেন।

আসমানের তীর থেকে এক বলক বাতাস উড়ে আসে। কনক-  
পার সৌরভ ভাসিয়ে আনে। আলো ফুটলো, পাখী ডাকলো—  
ল ফুটলো—তবুও খুঁচী হ'লেন না চন্দ্রকান্ত! চোখে ভরাত দৃষ্টি  
হয়। পলাতকের মত ভয়ে ভয়ে দেখছেন ইতি-উত্তি। কোথায়  
জয় মিলাবে এই দিনের আলোয়, তাইই সন্ধান করছেন সত্তরে।

এমন সময়ে মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট কলবোল শুনলেন বেন কানে।  
ফুল মাহুকের মত বুদ্ধ করতে চলেছে। মনকণ্ঠে চিংকার করছে  
ক থেকে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কেঁপে উঠছে বেন কলধরনিত।

মিলনের আলোকপরিধি ধীরে ধীরে বহিতারতন ও উজ্জলতর  
ত থাকে। কক্ষের জানলা থেকে দেখা যায়, খরশ্রোত আমোদগরের  
আশিষ্টে বেন লালের আভা। আমোদগর গতিশীল, দূর থেকে  
ধা ধায় না। নদীতীরের বাসিন্দাটির ধবলিখরে আলোর  
প্রভা।

চন্দ্রকান্ত সহসা দেখলেন, এক গগনচুম্বী তালগাছের শীর্ষ দুলে  
উঠলো। গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যায়। চন্দ্রকান্ত দেখেন,  
গাছের চূড়া থেকে এক জোড়া শকুনি উড়লো। তাদের চাঁকলো গাছটি  
হুলছে। চন্দ্রকান্ত স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, শকুনি দু'টি উড়তে  
উড়তে নদীর তীরে নামলো। হয়তো তৃষ্ণার কাতর হয়েছ, নদীর  
জল পান করবে তাই। চন্দ্রকান্ত আবার দেখলেন, আমোদগরের তীরে  
একটি শবদেহ পড়ে আছে। কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে  
কে জানে! ব্রাহ্মণের স্মরণে আসে কাল রাত্রির ঘটনা! চৌধুরাণীর  
পত্রপুটার মাঝিদের একজন হয়তো, মৃত অবস্থায় নদীর চড়ায়  
আটকেছে। ম্যানেটের বন্দুকের বারুদের আল্লা সঙ্করতে পারে নি  
আর। শকুনিদের মোছুর চলেবে আজ, এ দেখক যিবে। বাই হোক,  
চন্দ্রকান্ত আরও বেন ভীত হ'লেন। মনুষ্যকণ্ঠের চিংকার বেন  
নিকটতর হয়।

কক্ষের এক দুয়ারে মুহূঃ করাঘাত হয়। চমক লাগে বেন।  
চন্দ্রকান্ত অফুটবরে সাড়া দেন। বলেন,—ক'ব? কে তুমি?

—আমি রাজকুমারী বিজ্ঞাবাসিনী।

জমিদারপুত্রীর কথায় মিলি স্মর, কিন্তু বেন ঈর্ষ্য ভীত বৃষ্ঠ!  
দুয়ারে আবার করাঘাত পড়ে। পূর্ণাশোকা অধিক জোরালো  
আঘাত।

অগত্যা চন্দ্রকান্ত বন্ধ দ্বারের অর্গল মোচন করলেন। দ্বার মুক্ত  
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, এক দৈবী সৃষ্টি বেন। লজ্জানব্র, কিন্তু  
বেন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। ব্রাহ্মণ দেখলেন ভোরের আলো-জাঁথ'রে, রমণী  
সুন্দরী বটে। সৌন্দর্যের সকল সুলক্ষণ বেন ঐ দৈবীসৃষ্টিতে একত্র  
দেখা যায়। রাজকুমারীর পরিধানে লাল পাড় পটবস্ত্র। মাথায় অন্ন  
গুঠন। আলুলায়িত কেশরাশি তৈলহীন ও কৃষ্ণ। বিশাল চকুর  
দৃষ্টিতে বেন বিশেষ উদ্বিগ্ন।

—কিছু বক্তব্য আছে কি?

চন্দ্রকান্ত বিষয় থেকে বেন মুক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—  
এত কলবোল কেন? কাদের এই চিংকারধ্বনি?

বিজ্ঞাবাসিনী গুঠন টানলেন আরও। নীমস্ত থেকে কপালে।  
বললেন,—আপনি অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করুন। বিপদের  
আশঙ্কা, তাই এত অসুযোগ। চৌধুরীমশাইয়ের লেঠেলরা এসেছে  
আনন্দকুমারীর খোঁজে। তাদের প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত। কথা  
বলতে বলতে ক্রোধে খেমে আবার বললেন,—হয়তো এই ভগ্নপূরী  
তল্লাস করতে চায়।

বন্ধ ঘন স্পন্দিত হ'তে থাকে চন্দ্রকান্ত। আসন্ন বিপদের

আপনার কিংকর্ষ্য স্থির করতে পারেন না। বিচলিত হইবে বললেন,—আমার তো সম্ভ বিপদ। আপনি বিপন্ন হোন, এই প্রার্থনা জানাই।

নির্মিতম নয়নে তাকিয়ে আছেন রাজকুমারী। উদ্বেগের উপশম হয় যেন; যুগ হাসির সঙ্গে বিদ্যাবাসিনী বলেন,—আমার আর বিপদ কি? আমি তো সর্দাহারা। যুগকে ভয় করি না। হুঃ পাই আনন্দকুমারীর কথা ভেবে। সে সভাই আপনাকে—

—বিদায়। বললেন চন্দ্রকান্ত। কথার শেষে আর একবার যেন দেখলেন রাজকুমারীকে। বললেন,—হয়তো আর সাক্ষাৎ হবে না কখনও। অনাগত ভবিষ্যতে কি দশা হবে জানি না। বিদায়!

বিদ্যাবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। অপলক চোখে চেরে থাকেন। ব্রাহ্মণ বিদায়কালে দেখলেন, রাজকুমারী চক্ষু অজস্র। হলাহল আঁখিপ্ৰস্র। বস্ত্রাঙ্কলে চোখ ঢাকলেন বিদ্যাবাসিনী।

আসমানের ঘাটে পৌঁছে চতুর্দিক একবার নিরীক্ষণ করেন চন্দ্রকান্ত। পরমুহূর্তেই আসমানের জলে ঝাঁপ দিলেন। নীধির জল আলোড়িত হয়ে ওঠে সশব্দে। নীধির তীর থেকে কলসোভী পার্বীর ঝাঁক সভয়ে উড় পালায়। এক ঝাঁক শালিক ডাকতে ডাকতে উড়লো আকাশে।

কুমারীর গুরুপুত্রী সমুখে এক ক্ষুদ্র জনতা জমায়েৎ হয়েছে। তারা যেন ক্রুক, ক্ষিপ্ত। অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত। কারও হাতে তৈলাস্ত্র লাঠি, কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে ভদ্র। প্রথম সূর্যালোকের রূপালী কিরণে অস্ত্রসমূহ আলোকচ্ছটা ছড়ায়।

আঁচলে চোখ মুছে মুছে চোখ হুঁটি বোর লাল হয়ে ওঠে। বিদ্যাবাসিনী এত বিপদেও ধৈর্যহারা হন না। শুধু অজ্ঞপাত হয় তাঁর। অব্যথা ক্রন্দনের বেগে যেন সামলাতে পারেন না কোন মতে। আবার চোখ মুছলেন। তারপর বীরে দ্বিতলে গেলেন। সোপানশ্রেণী অতিক্রমণের ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে দ্বিতলের ছাদে গিয়ে দেখা দিলেন জনতাকে। ফটক তোরণের একদিকে একা পাঠান প্রহরী, অল্পদিকে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন কুম্ভকার মাস্তুল। তাদের হাতে হাতে উদ্যত অস্ত্র। তাদের কণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু ভাষা বোঝা যায় না এত দূর থেকে।

পাঠান প্রহরী, বন্ধু উঁচিয়ে আছে। সাক্ষাৎ জানিয়ে দিয়েছে প্রহরী, জনতা আর এক পা এগোলেই বন্ধু লাগবে সে।

গৃহের ছাদে গৃহকর্ত্তীকে দেখে জনতা আবার চিৎকার করলো। প্রহরী দৃষ্টি

ফিরিয়ে দেখলো জমিদারনন্দিনীকে। বিদ্যাবাসিনী সঙ্গেতে ডাকলেন প্রহরীকে। ডোরের হাওয়ার রাজকুমারী ক্রক এলো চুলের রাশি উড়ছে কুম্ভপতাকার মত।

পাঠান ছুটে ছুটে আসে। আরবী ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে আসে যেন। পর পর কটা কুর্নিশ হুঁকে বসে,—বন্দগী বেগমসাহেবা! হুকুম দেন, কাকেরের বাচ্চা কটাকে বন্ধুকের তোপে বেহেশতে পাঠিয়ে দিই।

শুধুনে ঢাকা মাথা সোলালেন জমিদারনী। অসম্মতি জানা লেন। বললেন,—না, বন্ধু নামিয়ে রাখো। ওদের আসতে দাও। আমিই কথা বলবো ওদের সঙ্গে।

—বরখিলাপি বরদাস্ত করবো না বেগমসাহেবা!

সৌহ শিরদ্বাণে লুকানো মুখ থেকে কথা ভেসে আসে পাঠান প্রহরীর।

—ওদের বস্তব্য আগে শুনতে দাও। ওদের বাধা দিও না তুমি।

ছাদ থেকে কথা বলেন বিদ্যাবাসিনী। মনিবালী হুকুমের স্বরে কথা বলেন না, বরং বিনম্র স্বরে বলেন।—বিপদে পড়েছে ওরা, তাই এসেছে। ওদের মেয়ে যে ছারিয়ে গেছে!

আবার কুর্নিশ হুঁকতে থাকে প্রহরী। একবার, দু'বার, তিনবার। টাট, ঘোড়ার মত ছুটে ছুটে এগোয় কটকের দিকে। তার নাগরার নাল খটাখট শব্দ তোলে।

একদল বাগদী। মিশ্র কালো রঙ, শেখীবহল বলিষ্ঠ আকৃতি। মাথায় বাবরি চুল। খাটো কাপড় এঁটে বাঁধা। কোমরে কোমরে লাল গামছা জড়ানো। বাঙলা দেশের লড়াইয়ের জাতের মধ্যে বাগদীদের নামডাক খুব। বন্ধুকের বাকল আর কামানের তোপকেও ভয় করেন না। সামনাসামনি লড়াতে পারে, আবার গুপ্তযুদ্ধেও ওয়াকিবহাল। বাঙলার নবাবরা পর্বত তাদের সাহায্য চান মধ্যে মধ্যে। মাইনে দিয়ে পোষণ, শত্রুদের সারোস্তা করতেন।

ওদের দলকে দল এগিয়ে আসে দ্রুত পদক্ষেপে। ছাদের 'পরে



সর্বস্বটি সম্মত  
সুন্দর এলক্সার

একমাত্র  
গিরি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকারক

জুরেলোজ  
কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স  
১৬৭ বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রতিমার মত এ নারীমূর্তিকে দেখে হাতের অঙ্গ নামিয়ে নেয় সমুদ্রে। বন্ধিদের চুড়া দেখে বেন, চোখে চোখে দৃষ্টি উঠিয়ে আছে তেমনি।

রাজকুমারী মিহি মিহি হুয়ে বলেন,—তোমরা কি আনন্দকুমারীর খোঁজে এসেছো ?

দলের সকলে একই সঙ্গে বলে,—হাঁ হজুরণী !

—রাতে সে ঘরে ফিরে যায় নি ?

—না। আমাদের মশাইয়ের মেয়েকে ফিরিয়ে দেন, আর আমরা কিছু বলতে চাই না। ভালর ভালর ফিরে বাই।

দলের একজন বললে উচ্চকণ্ঠে। বললে,—মশাই তো ঘরে নাই, বাগিচা করতে গেছেন গ্রামের বাইরে। ঠাকরুণ আমাদের কেঁদে কেঁদে হরষা হচ্ছেন।

চোখ ফুলহলিয়ে ওঠে রাজকুমারী। কি উদ্ভল সেবেন, ভাবতে পায়েন না। বুক দুহুহুরিয়ে ওঠে। কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। ভোয়ের আবছা আলোর অন্ধকার দেখতে থাকেন। কত কষ্টে বেন কথা বললেন। বললেন,—তোমাদের মেয়ে তো রাতের কোয়ার গেছে এখান থেকে। প্রথম প্রহরেই চলে গেছে। তার পর—

—তার পর হজুরণী ? তার পর কোথায় গেলো মেয়ে ? ঘরে তো ফেরে নাই !

—তার পর কোথায় গেল জানি না তো !

বিদ্যাবাসিনী হতাপ হুয়ে বললেন। মিথ্যাকথনে অনভ্যন্ত-ভিনি, তবুও বাকীটুকু চেপে গেলেন না আমার অছিলায়।

—কি উপায় হবে হজুরণী ? শুমন খুলে না তো কেউ ?

—তোমরা নদীতে খোঁজাখুঁজি কর, হয়তো সন্ধান পাবে।

আনন্দের নৌকা বাবে কোথায় ?

দলকে দল নিরাশার ভেঙ্গে পড়লো বেন। ওদের মিশ কালো শরীরে হলুদ রঙের কাঁচা রৌদ্র ছড়িয়েছে। রাজকন্ডা দেখলেন, ওদের মুখে মুখে বেন হতাশা। অবিবাসের চাউনি বেন চোখে চোখে।

কেউ বললে,—আমরা ঘরে ঘরে তল্লাস চালাবো, অল্পমতি দেন।

কেউ বললে,—বাবে আর কোথায়, আছে এই ভূতের বাসার।

কেউ বললে,—ডানা তো আর গজায় নাই যে উড়ে পালাবে।

হুংখের হাসি হাসলেন বিদ্যাবাসিনী। ক্ষণেক ভেবে বললেন,—ভাল কথা, আপত্তি নাই আমার। তবে তোমাদের এখানে তল্লাস করাই সার হবে, আগে ভাগে জানিয়ে দিই। তার চেয়ে নদীতে বদ্বি খোঁজ করতে হয়তো আনন্দের সন্ধান মিলতো। নৌকা বাবে কোথায় ! নৌকার মাল্লাবাই বা বাবে কোথায় ?

দলের চাই বললে,—আগে আপনার চৌহদ্দীটা একবার দেখে দিই, তার পর নদীতে বাবো আমরা। আপনি অল্পমতি দেন হজুরণী।

—বেশ কথা। তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমনই হোক। দেখো সেন, কোথাও বদ্বি দেখা পাও তোমাদের মেয়ের।

রাজকুমারী কথার শেষে ছাদ ত্যাগ করলেন। একবার বেন বন্ধির দৃষ্টি হানলেন জনতার প্রতি। পরিচায়িকা এক পাশে শুকর পাড়িয়েছিল। তারও মুখে বিরক্তি। মনিবনৌকে অমূল্য দলো সে। চাপা গলায় কথা বলে নিজের মনে। বলে,—মেয়ের নাই গড়িয়েছিল, তাই উড়ে পালিয়েছে। খুঁজে মর' এখন বর তর

ক'বে। সাহেবের বুক থেকে কি আর ফিনিয়ে আনতে পারবে তোমাদের মেয়েকে !

তিরস্বাসের হুয়ে বিদ্যাবাসিনী বললেন,—সাবধান বশোনা, মুখে কুলপ এঁটে থাকবি। মুখ থেকে ভোর ঘেন কথা না খসে। রক্ষে থাকবে না তবে !

বশোনা মুখ ধিঁচিয়ে বলে,—আমাকে কেটে ফেলাও কথা বেরবে না মুখ থেকে। আমার বলার দায়টা কি তাই শুনি। চল' তুমি ঘরে চল' বো। বলা কি বার, ওদের কার মনে কি আছে !

দলের সকলে নয়। দলপতির সঙ্গে আরও জনা পাঁচ ছয় এক-তলার ঘরে ঘরে হানা দেয় আর বেরিয়ে আসে বার্থ মনে। একতলা থেকে দোতলার ওঠে হুপশাণিয়ে। এ ঘরে সে ঘরে তল্লাসী চালায়। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। তল্লাসপোষ 'তোলা-পাড়া করে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বশোনা। মনে মনে গাল পাড়ে। গজ্ঞারত থাকে রাগে। তার পর এক সময়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—ভোজবাজী তো আর নয় ! তাহুমতীর খেলাও নয় যে তোমাদের মেয়ে আর অন্তগুলো মাঝিকে লুকিয়ে ফেলবে আমরা আঁচলের তলায়।

দলপতি বললে,—আমাদের মা ঠাকরুণ যেমন হুকুম দিয়েছেন, আমরা কি করতে পারি ! ঠাকরুণ যে কান্নাকাটি ক'রতে লেগেছেন মেয়ের বিহনে। মশাই শুনলে হয়তো আর বাঁচবেন না। দম আটকেই মারা যাবেন।

বশোনা তবুও একটু নরম হয় না এমনই নিমম সে। ভৎসনার হুয়ে কথা বলে। রাগের হুয়ে বলে,—আমাদের জমিলাগী বললে, তোমরা তো কানই দিলে না তাঁর কথায়। নদীতে এতক্ষণ দেখলে হয়তো খোঁজ পেতে মেয়ের।

—আমাদের নদী তো আর খালবিল নয় যে এক লহমায় দেখতে পাবো ! কোথা থেকে কোথায় ছুটেছে নদী ! নামোদের সঙ্গে বাগ হয়েছে, মা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

কথার শেষে দলপতি কপালে যুক্তকর ঠেকালো। অবশু মা গঙ্গার উদ্দেশে হয়তো প্রণাম জানালো। নদীমাতৃক দেশের মানুষ, তাই নদীকে মাতৃজ্ঞান করে।

ঘরের মোকের রোদ প'ড়েছে, ত্রিকোণ আর চতুর্কোণ আকারে। পূর্বের গবাক্ষপথে সুবীকরণ এসেছে হলুদ রঙের। বিদ্যাবাসিনী পাড়িয়ে থাকেন পারাশরুতির মত। জলে ভারী আঁখিপল্লব। অপলক তাকিয়ে আছেন রাজকন্ডা। তাঁর মুখে আর বুক সোনার প্রলেপ ঘেন, কাঁচা রোদের নিম্বেজ আলো। কুলগ্রাবী আমোদরকেই দেখছেন হয়তো। নদীর জলের গতি ধরা পড়ে না চোখে, দূর থেকে। ব'য়ে চলছে, না গতি হারিয়েছে। আর একবার আঁচলে চোখ মুছলেন রাজকুমারী—কারায় লাল চোখ। যখন তখন জল করছে চোখ থেকে—চৌধুরাণীর হুংখে। স্নেহের হাতে না জানি তার কত হেনসু হব। হেফাজতে থাকবে কি না কে জানে। রক্ষণাবেক্ষণ হবে না হয়তো তার। দিনকতক থাকবে হয়তো ভোগের স্রুখে, তারপর পুরানো শোবাকের মত বাতিল হয়ে বাবে। কে হাঁই দেবে তখন ! ঘরে আশ্রয় পাবে না সমাজের শাসনে, পরেও আশ্রয় দেবে না। কেঁদে কেঁদে মরতে হবে তখন ধর্মীর ঘরের মেয়েকে। রূপের ডালি আনন্দকুমারী। সেই রূপই তার শত্রু হয়ে পাড়ালো।

তুলনা করাটা কোন কাজের কথা নয়  
আর বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি থাকেই

তবুও

যেমন বারনার্ড শ'র লেখার কথায় বলে না

“Not to have read shaw is to be behind  
the times  
as far as he has always been before  
them.”

তেমনি.....

আপনি যদি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাক্যে একটি “বিশেষ সূচী” বই” বলেছেন; ডাঃ কালিদাস নাগ বাক্যে ‘A very welcome book’ বলে সাধর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; শ্রীঅরুণেশ্বর বসু বার ‘অনেক পাঠক হবে’ বলে আশা করেছেন; শ্রীঅরুণেশ্বর বসু বার ‘সার্থক রচনা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে ‘বলার ঢং, বলার ভাষা, বলার বিষয়’কে...যোগলাই বা মজলিসী বলেছেন’; শ্রীনরেন্দ্র দেব বাক্যে ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরব্য উপজ্ঞানের মত চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকবে চিরদিন...’ বলে বিশ্বাস করেছেন; শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যা ‘বুদ্ধির দীপ্তি ও কৌতুকের ছটায়... বলমূল করছে আর বাক্যে রমণীয় রচনা হিসাবে...নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্যতার পর্বায়ে পড়ে’ বলেছেন, তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সেই অতিনব রম্যরচনা ‘পরিক্রমা’ বইখানি আপনি যদি না পড়েন, বঙ্গসাহিত্যের বিপুল অগ্রগতির সংবাদ আপনার কাছে থেকে যাবে অজ্ঞাত।

বিখ্যাত দার্শনিক লাওৎসে একদিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে লোকের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি জলে মাছদের খেলা করতে দেখে বললেন “মাছগুলো জলের মধ্যে কি সুখেই না আছে।” তাতে তার বন্ধু তলুপি জবাব দিলেন যে, “তুমি তো আর মাছ নও যে তুমি জানবে মাছেরা জলের মধ্যে সুখে আছে কি না?” তাতে লাওৎসে জবাব দিলেন, “তুমি তো আর আমি নও, যে জানবে, যে মাছেরা জলের মধ্যে সুখে আছে কি নেই, আমি তা জানতেই পারি না”।



ডন  
অ্যাডম্যানের  
ক্রিকেট  
খেলায়  
অ, আ, ক, খ  
দায়—৪

তেমনি

অপরের মুখে আর্ট স্ট্রাক লেটার্জ কব্জক প্রকাশিত এমিল জোন্সার  
বহি—৩১০, রেণীর প্রেম—৪৯, স্বপনচরিত্রী—২৫০, বৈদেহী—৩১০  
ব্যারনার দ্যা দে স্যা গীয়ারের—পল ও ডিভিনি—৩, যোপাসার—  
যোপাসার একাদশ—৩১০—এগুলি সম্বন্ধে আপনি কত লোকের কাছে  
কত প্রশংসাই শুনেছেন, কিন্তু বইগুলি যে সত্যি কত ভাল তা আপনি  
মিজে বক্তব্য না পড়ছেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না।

ইজিপ্তের লোকেরা বলে SHOKR  
সুইডেনের লোকেরা বলে TACK  
কিনল্যান্ডের লোকেরা বলে KIITOS  
ইটালিয়ানরা বলে GRAZIE  
গ্রীকরা বলে EFCHAREESTO  
ফরাসীরা বলে SPASSIVA  
করাগীরা বলে MERCI  
উচ্চারণ বিভিন্ন হলেও সব কথাগুলোর  
মানেই হচ্ছে ‘ধন্যবাদ’।

বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখতে গেলে  
বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা মন দিয়ে পড়তে হয়  
কিন্তু

বিষয়বস্তু কিরোর ‘Secrets of the  
hands’র রমণীয় বাংলা অনুবাদ।

‘হাতের গোপন কথা’—৩

আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তবে  
শুধু যে হাতের সব রেখাগুলিই আপনার  
জানা হয়ে যাবে তা নয়, ভবিষ্যতে কি  
হবে তাও বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

দ্রষ্টা বিদ্যুৎ অগ্নি... ..

মারী স্টোপের-

বিবাহিত প্রেম-৪,

Marie Stopes-এর বিবাহিত

Married Love-এর বাংলা অনুবাদ

এই বইতে লেটার্জ পাবলিশার্স  
কলকাতা হাউস, কলকাতা-১।

রূপের আগুন যখন নিবে যাবে, তখন ? ফুল আর কল নর রসালো গাছ যখন শুকিয়ে যাবে। চৌধুরীমশাইয়ের টাকার আশুপল কে পাবে কে জানে ? মেয়ের অভাবে তিনি কি আর বেঁচে থাকবেন ? তাঁর একমাত্র মেয়ে, যেন চোখের মণি।

—বোঁ ! হঠাৎ কথা বললে যশোদা। শব্দহীন পক্ষক্ষেপে কখন ঘরে এসেছে পরিচারিকা। শুধু কণ্ঠে বললে,—কি হবে বোঁ ? ম্যাও সামলাবে কে ? অমন সমস্ত মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে গেল।

বিদ্যাবাসিনী যেন পাশাপাশি পরিণত হয়েছেন। কথা নেই মুখে, মেন বাক্যহারা। চোখের পলক পড়ছে না তাঁর। ভোয়ের শিঙ হাওদায় শুধু স্পন্দকেশ উড়ছে। মুখের লাল অধর যেন বর্ধহীন মনে হয়। চোখের কোলে কালিমা দেখা দিয়েছে।

—কথা কও না কেন বোঁ ? আবার কথা বললে পরিচারিকা। বললে,—নদীতে চৌধুরীর মেয়ের নৌকা কি দেখতে পাও ? চোখে পড়ছে ?

জমিদারকন্ডার নিম্পলক চাউনি অমুসরণ করে যশোদা। সেও দেখলো দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যতটুকু দেখা যায়। পরিচারিকার চোখে পড়লো নদীর বুকে কয়েকখানি গহনা নৌকা, এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। জেলেরা মাছ ধরতে বেরিয়েছে রাত থাকতে। জাল ফেলছে জলে। হ্রের হাট-বাঁজারে চালান দেবে, আমোদেবের মাছ।

—চৌধুরীমশাই মান্দারগে থাকলেও একটা কিছু বিহিত কর্তে পারতেন। কোতোয়ালের সাহায্য পেতেন। রাজকুমারীর কথার যেন কাঁপা-কাঁপা হয়।

হতাশ হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—তাঁর আসতে আসতে এখন এক পক্ষ। তদিনে পগার পেরিয়ে যাবে চোর। তখন কি আর নাগাল পাওয়া যাবে !

—কি জানি কি হবে শেষ পর্যন্ত। বিদ্যাবাসিনী ফিসফিস বললেন। অদৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যেন কথা বলছেন। বললেন,—চন্দ্রকান্ত কি রেহাই পাবেন ? তিনিও যে ছিলেন জ্ঞানবানের সঙ্গে, একই নৌকায়।

কথার শেষে রাজকন্ডা পলাক ভাঙ্গ করলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঘরের ছুরারের কাছে গিয়ে বললেন,—কাটা কাপড় একখানা লাও যশো, পাটের কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

—সে কি কথা ! পুজোর জোগাড় আছে যে। ফুল বাজবে, নিষিদ্ধ সাজাবে। এখনও কিছুই জো হ'ল না। পরিচারিকা বাকী কাজের তালিকা পেশ করে মুখে। বলে,—রান করতে দীঘিতে যেতে হবে না ? চলন বাটতে হবে, দুর্কী বাটতে হবে, ফুলের রান্না পাঁচতে হবে—

—না যশোদা, পারবে না আমি। শরীরে কুলাবে না।

—কি আবার পারবে না ? পরিচারিকা। তখনো অবাক চোখে। বললে,—সেবদেবীকে উপোস রাখবে ?

—ঈ, তাই থাকবেন।

—অবাক করলে যে বোঁ !

—আমি পারি না আর বুঝার ঘরে বেড়। অধীর হ'ল হ।

—চন্দ্রকান্ত পালক আর পুজার আসতে পারবেন, কেমন রান্না হয়

না। এখন ভালয় ভালয় তিনি ঘরে ফিরতে পারেন তো বেঁচে যান। কথা বলতে বলতে শ্বাস নেয় পরিচারিকা। আবার বলে,—নিজস্বীয় মত চূর্ণচাপ বসে থাকবে তুমি ?

কণি হাসির দেখা দেখা দেয় রাজকন্ডার মুখে। বললেন,—পুঁথি নকলের কাজ করবে আমি, যাতে দুর্দশ কড়ি ঘরে আসবে।

—পুজো-পারগণ সেবে তোমার কাজ কর' না, আমি বলতে আসবো না। নারায়ণের মাথার তুলসী পড়বে না, আচাৰ্য্য করলে বোঁ।

কথার হতাশার ধনি ফুটলো যেন। বিদ্যাবাসিনী বললেন,—তুমি নদীর জলে শালগ্রামকে দিয়ে এসো যশোদা। কাজ নেই আমাদের নারায়ণ প্রতিষ্ঠায়।

—অমঙ্গল হবে যে বোঁ ! তোমার ষোড়ামীর অকল্যাণ হয় যদি।

আবার অল্প একটু হাসলেন রাজকুমারী। স্নেহের হাসি হাসলেন যেন। বললেন,—তাই যদি হয়, আমি আর কি করতে পারি ? অমঙ্গলের আর বাকী আছে কি ?

—দয়ামায়া নেই তোমার। সেবদেবীকে ভয় কর'না ?

—না, কিছুই আর নাই। সব অলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার কপালটাই যে পোড়া যশোদা। ধানিক খেমে রাজকন্ডা আবার বললেন,—আমার কথা রাখো। নদীতে দিয়ে এসো পাৰাণের সেবতাকে।

—তখনো না কথা, আমি আর কি বলবো ! আমরা একেই দুর্ঘমাহুৎ ! হুকুমের দাসী আমরা, বা হুকুম করবে তাই তখনো হবে।

কথা বলতে বলতে যশোদা একখানি ধোয়া শাড়ী এগিয়ে দেয় রাজকন্ডার হাতে। সূতোর কাপড়, তাঁতের লালপাড় শাড়ী। ফরাসডালার তাঁতবস্ত্র।

পটবস্ত্র ছেড়ে সূতোর কাপড় পরেন বিদ্যাবাসিনী। শুভ্র শাড়ীতে আরও যেন বিবর্ণ দেখার তাঁকে। মুখের মালিন্য যেন প্রকট হয়ে ওঠে। রাজকুমারী বললেন,—নদী থেকে হ্রে এসো ভাড়াভাড়ি। তোমাকে একবার বেগের শোকানে বেতে হবে। কালি আর কলম কিনে আনতে হবে। তুলট কাগজ আনতে হবে।

—মুখে জল দেবে না তুমি ? কিছু দাঁতে কাটবে না ?

—জাগে তুই হ্রে জ্বর যশো, ভায়পয়। কচি হয় না কিছু বাই।

—সত্যি সত্যিই বাই তবে, নারায়ণকে দিয়ে আসি আমোদেবের জলে ? জেবেচিড়ে দেখো এখনও।

—ঈ গো ঈ। ভাবনার কিছু নাই আর। তুমি কিন্তু ঘাবে আর আসবে।

—হুকুমের দাসী আমি। যেমন হুকুম করবে তেমন কর'বো আমি। কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা। চোখে তার ফ্রোয়ের চাউনি। লম্বা পদক্ষেপ।

সেহয়নে যেন অবসন্নতা। রাজকুমারী পাগড়ে বসে পড়লেন। হাত্ত বেহ যেন অবশ হয়ে পড়ছে ক্রমেই। কি এক চাপা কষ্ট যেন গমের গমের উঠছে বক্ষমাখে। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটিয়ে নীরবে বসে থাকেন বিদ্যাবাসিনী। এ জীবনে তিনি অনেক কিছুই ব্যতিরিক্ত। বারী, সঙ্গায়, মুখ, শাড়ি—কিছুই তাঁর নেই



এখন। বাঘের মত প্রতাপশালী হুই ভাই আছেন, বুঝা না আছেন—কিন্তু তাঁদের আদর-বড় থেকে তিনি বঞ্চিত। কুকুমারের দুর্ভাবহারে হুই ভাই হয়তো রুগ্ন হয়েছেন রাজকন্ডার প্রতি। বুঝা না আছেন, রাজমাতা বিলাসবাসিনী—তিনিই বা আর কত কাল বেঁচে থাকবেন?

আনন্দকুমারীর কথা যেন কানে ভাসছে এখনও। তার তোক্রোণীশু কথার ধরণ; ভয়ের খালাই নেই। যা মন চায় বলে। যা মন চায় করে। মুক্ত বিহঙ্গের মতই স্বাধীন যেন সে। কার্পণ্য নেই মনে, হুটো হুটো টাকা খরচা করে। তারও ভাগ্য পুষ্পো। বেগম হসর গেল চৌধুরানী, পথহারার মত নিরুদ্দেশ। আর হয়তো কখনও তার খা মিলবে না।

বিজ্ঞাবাসিনীর দ্বন্দ্ব মনে কত কি চিন্তার উল্লস হয়। প্রায় বিনিময়র রাত কেটেছে, তাই যেন তন্দ্রা নামে। চোখে খালা ধরে থেকে থেকে। চোখ মেলে তাকাতোও কষ্ট হয়। তবুও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রাজকুমারী। গবাক্ষের বাইরে, আকাশে চোখ। বিজ্ঞাবাসিনীর চাউনিতে ধরা পড়ে আকাশের উড়ন্ত পাখী। চিল আর শকুনি পাক খাচ্ছে আকাশে!

মাগিরের একজনের ভাসমান মৃতদেহ আমোদনের চড়ায় আঁকছে। চিল আর শকুনিদের মধ্যে তাই যেন মোড়ব লেগেছে। বিবলবসতি, অজ্ঞান্যাব দেশে যত গড়ে স্তম্ভাহ নরমাস। গোটা একটা মহাব্যস্ত। শিবাল আর কুকুরদের তাড়া খেয়ে খেয়ে উড়ে পালার কাক, চিল, শকুনি। ডানায় উড়িয়ে উড়ে পালার, আবার আসে দেখতে ন দেখতে। গলিতশবের আদার ভুলতে পারে না যেন।

চমক শিউরে ওঠেন রাজকন্ডা। আকাশচাটী পাখীদের চোখে চোখে যেন দেখতে পেরেছেন উগ্র সোভের খল দৃষ্টি। আকাশে উড়ছে, কিন্তু চোখ রয়েছে মাটিতে।

একা থাকতে কত সময়ে ভয় হয়। খাঁস রোধ হতে থাকে যেন শূন্যতার চাপে। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে পালকে এলিয়ে পড়ছেন বিজ্ঞাবাসিনী। চৌধুরানীর হুঁপে যেন ঘরের আল গবে শতাবে।

ম্যানেটের বজরায় আনন্দকুমারী। বজরা আমোদর পেরিয়ে দামোদরের জল ছুঁয়েছে তখন। অরণ্যে রোদন কেউ শুনত পায় না। অথৈ জলের মাঝেও কাঁদলে কারও কানে বাগ না সেই কারার সুর। দিনের আলো নজরে পড়তেই চৌধুরানীর চোখে জল দেখা দিয়েছে। হতাশায় ভেঙে পড়েছে যেন। ইনিরে-বিনিরে কাঁদছে কখন থেকে। বজরা ধীরে ধীরে এগিয়ে-চলেছে গঙ্গানদীর দিকে। দামোদরের মাঝকাঁড়িয়া ধীরে এগিয়ে চলেছে। সারা রাত কত প্রেম জ্বলিয়েছে ম্যানেট। সান্দ্রনা দিয়েছে কত। এ দেশের ভাষা জানে না ম্যানেট, তাই ইলাহ আর ইদিকে কত

বুজিয়েছে। তবুও তিলমাত্র ধূসি হ'ল না চৌধুরানী। ম্যানেট রত বার তার কাছে এগিয়ে যায় তত বার প্রত্যাখ্যান করে অনিচ্ছায়। হাতের আঘাতে সবিয়ে দেয় নিশ্চৈক্যে। লাথি মার ক'বার। ম্যানেট রাগ করে না ক্ষণেকের তরেও, বন্ধু হাসে। নির্লজ্জ বেহাওয়ার মত তো হো শক হাঙ্গ। এক মজার খেলায় যেন মেতে উঠেছে ম্যানেট। খেলার বাবে বাবাই তার হয় তার, কিন্তু পরাজয়ের ধ্যান নেই যেন। হেবেই যেন আনন্দ পায়।

তাজা ফলের ডালি এগিয়ে ধরেছিল ম্যানেট। অনাহারে রাত কাটাতে চায়নি সে। তার প্রেমসীকে অভুক্ত রাখতে চায়নি। দুধের পাত্র এগিয়ে দিয়েছিল, মুখে তোলেনি চৌধুরানী। মাছের সেকারী দিয়েছিল—সিদ্ধ মাছ আর লবণ। ফিরেও দেখেনি বদিক-কন্ডা। ব্যাঙ্গা শোনাতে চেয়েছিল ম্যানেট, তর্কপাত করেনি আনন্দকুমারী। মুক আর বহিরের অভিনয় ক'রেছে যেন রাতের জাঁগারে।

শেষ রাতে নিজা এসেছিল চোখে। ভয় আর উত্তেজনায় কাঁপল হয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল চৌধুরানী মেয়ে, বজরার বন্ধ ঘরে। তখন অলস্ত লঠনটা কাছ এগিয়ে নিয়েছিল ম্যানেট। সেই লঠনের আলোর কবক্ষণ যে বৃক্ষ প্রিয়ারকে দেখেছে ম্যানেট, কেউ জানে না। স্পর্শ করেনি, শুধু দেখেছে চোখের ভূপ্তিতে। স্পর্শ নয়, শুধু মাত্র দর্শন। মনের চোখে দেখা! দেখতে দেখতে স্বর্গলাভ হয় যেন। সজীব সৌন্দর্য—রাশি রাশি টাটকা ফলের মত। জড়পদার্থ নয়, রক্তমাসের জীবন্ত নারীমূর্তি। স্বন্দর প্রকৃতির মত বাবা নয়, কথা আর গান আছে সেই অনিন্দ্য স্নেহের বৃকে। কণ্ঠে। দুইই নয়, ভাবাভরা চোখ আছে। গতিহীন নয়, চলায় আছে ছন্দ। বিরল গন্ধ নয়,—রঙে রূপে রসে সিক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা যেন।

সেই লুপ্তকাব্যকে উদ্ধার করতে চায় ম্যানেট। মুকমুখে কথা ফোটাতে চায়। রক্তকণ্ঠে গানের সুর ভাগাতে চায়।

কিন্তু কে জাগে কে! আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। গভীর রাতের গভীর ঘুমে ডুবে যায় যেন। সাড় থাকে



SENCO JEWELLERS PRIVATE LTD.

নিপুণ ও অভিজাত স্বর্ণজিন্সী

**সেনাকো জুয়েলার্স প্রাইভেট লি:**

হাউজিং-১০৬, আপার চিংপুর রোড • কলিকাতা-১  
 ব্রাঞ্চ-১৬৮, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১১  
 নতুন অফিস: কলিকাতা, বি.বি. ৩৬৬১ • টেলিগ্রাম: ১৬৮১

না তার, মনে পড়ে না জলে ডেমে চলছে সে। রাতের নদীর কুশল ঠাণ্ডা বাতাসে নিত্যই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কালরাত্রি—খেলার থাকে না চৌধুরাণীর। ভুলে যায় বেন, অতীতকে মুছে কেলতে হবে তাকে। এমন শুধু অজানা ভবিষ্যৎ সমুখে। অন্ধকারের গর্ভে লুকানো না-জানা ভবিষ্যৎ।

শেষ রাতে স্পর্শ করলে ম্যানেট। সন্ধ্যার ভিত্তিহীন বাঁধ ভেঙে ফেললে।

বাহুধাখার তুলিষ্ট বর্কিয়ে গাছ জড়িয়ে থ'রলো লতাকে। আকাশে তখন শুকতারা ঝলছে মিট মিট। জলেভাসা বজ্রার সঙ্গে সঙ্গে বেন চলছে এই দু'র আকাশের শুকতারা আর শুভ্রা পক্ষের তরুণ চাঁদ। সোনার একটি বিপ্লু আর একটি গোলক।

চৌধুরাণীকে বুকে টেনে নেয় ম্যানেট। লঠনটা এক ফুঁরে নিবিষে দিয়ে ম্যানেটও হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে উগ্র নেশায়। পাছে হারিয়ে যায় আবার, তাই বাহুপাশ বেন শিথিল হয় না ম্যানেটের।

চোখ মেলেতেই আবার যে কে সেই। আগে গুটার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব দ্বিগত আনন্দকুমারী। বশ মানছে না কিছুতেই, অব্যাহতা করছে কথার কথায়। ইনিরে বিনিয়ে ঝাঁকছে শেষে, নিরুপায়ের স্বত। অশেষে বোনের মত মাকদরিরার কায়া—কারও কানে যায় না।

সেই কারার ধনি, এত দূরে থেকেও বেন অন্ধরের কানে গুনতে পেরেছেন একমাত্র বিদ্যাবাসিনী। হৈহা হারিয়েছেন তিনি, অরের জালা ধ'রছে বেন তাঁর কোমল আসে। চোখ ঝলছে থেকে থেকে, তাই বল বরছে বখন তখন। শাভীর জ্বাল ভিলে গেছে।

—তোমার কথাই পালন করেছি বৌ, মদল অমদল তোমায়। কতকাল পরে কিরে আসে পরিচায়িকা। আশোনের ডুব দিয়ে এসেছে। তাই সিক্তকেশ। অবগাহনের বানে বেন বশোণার ককতা বুয়ে পড়ে। তোমার পাতার এখন জলের আভাষ।

কথা শুনে উঠে বসলেন, বিদ্যাবাসিনী। বীজস্প'রের মত শূন্য হৃদয়ে দেখলেন একবার। বললেন,—হী তাই। তোমার কোন অপরাধ নেই। মদল অমদল আবার।

—নদীর তীরে মরা মানুষ উঠেছে, ভাসতে ভাসতে এসেছে কোথা থেকে। আবার কথা বললে পরিচায়িকা। জিহ্বা চুল হুহুতে হুহুতে হললে,—ভাগাড়ের বত শহুনি উড়ে আসছে বাঁকে বাঁকে।

শুনে বেন একবার চমকলেন রাজকুমারী। বুখে তাঁর রোহিৎকো, তাই হুই ফুর্ক বেকে উঠলো। শুভ্রাঙ্গল বুখ, আরও বেন লাল হয়ে চঠেছে হৃদয়ের আলোয়। পরিচায়িকার কথা শেষ হ'লে কাতরকণ্ঠে কললেন,—কাল রাতে যে খণ্ডবুত হয়েছি নদীতে। আনন্দ্যর মাঝিরা বৈরছে হরতো কেউ কেউ। আমি বেন ঘুমের হাফে মাফে ভুলেছি লুকের গুহ জয় আওরাজ। রাতে ভেবেছিলাম বশ দেখছি। দেখে দেখছি।

—গাঁয়ের মানুষ জড় হ'রছে শবটায় আশপাশে। পরিচায়িকা শা-বললে ভিলে চুল হুহুতে হুহুতে। বললে,—চৌধুরী মশাইয়ের পলী লেটলরাও গিরে হালির হয়েছে। মাছ আর হাঙর হয়তো রয়েছে, তাই শব ক্রোদা হচ্ছে না।

—রাত নাহু আর হালিরে আনন্দ্য। কলকল লকল। এক

দিনের আলোর পকীভোজন চ'ললজ। শান্তে আছে, আনন্দ্যের দেহনাশের পর দেহাংশ গান করতে হয় পকী আর মীনকে। আনন্দ্য আনতি দিতে হয় অগ্নিকে।

বেগরাবিশ শব, বুখে এখন আগুন দেবে কে! শেষকাজ করবে কে! তাই হয়তো শেষকৃত্যের কাজে লেগেছে কুহুর আর শিয়াল। কাক চিল আর শহুনি।

—কি হবে কে জানে!

আপন মনে কথা বললেন বিদ্যাবাসিনী। দীর্ঘবাস কেললেন। কোথায় বেন ঝিক-ঝিক আগুন ঝলছে কুকের ফোলে, তাই হু-হুতাপ করছেন। চোখে শূন্য চাউনি ফুটে আছে।

—আমার গলা টা ক'রছে। মাথাখ জল প'ড়েছে কি জ্ব। পেছনের চুলে গামছার কাপটা দেয় পরিচায়িকা। লম্বা চিড়িরে। জল ঝাড়ে আর কথা বলে; বললে,—বৌ, তুমি খাওতো খাই নয়তো খাই এখন কিপেতেষ্টায় অ'লতে অ'লতে সেই বেণের দোকানে, কাগজকলম কিনতে।

কয়েক হুহুত নীরব থেকে রাজকুমারী বললেন,—আমিও খাই, তুমিও খাও। কিছু দাও, খেয়ে জল খাই এক ঘটি।

খুশীর হাসি হাসলো বশোরা। বললে,—লক্ষী মেয়ে, আমি এসে দিই জল-খাবার।

—তুমার আমারও ক'ল শুকিয়েছে।

রাজকুমারী কথা বলতে বলতে আবার বললেন পালঙে। পা হু'ড়ে বসলেন। স্নান শরীর, পায়ে বেন বল নেই; সর্ব অঙ্গ অবশ বেন। শান্ত চোখে ঘুমের বোর। ঘরের মেঝের দৃষ্টি আবদ্ধ। কি এক অজানা ভয়ে বস্পশন বেন ভ্রত। ভোরের আবহা আলোর কাকে দেখেছেন বিদ্যাবাসিনী, মানসস্থিতি বেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। সমাজের শাসনের ভয়ে মনের করনবিলাস খেয়ে যায় মধ্য পক্ষে। চক্রাকৃতকে দেখেছিলেন রাজকুমারী। হু'টো কথাও বলেছিলেন। তাঁরই চিন্তা বারে বারে উদয় হয় বেন। কখনও বিরক্তি আসে, আনন্দ্যকৃত্তে কখনও বা প্রসন্নতা।

কুমার কখনও সমাহার করেন নি। একটা মিঠকথা, ভাও করেন নি। স্বামীর বেহ প্রেম ক'কে বলে, বিদ্যাবাসিনী জানেন না। খরবাতাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, বসন্তসমীপের বায় মেলেনি কখনও। তাই দিনে দিনে রাজকুমারী বেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন; মনের শূন্য অন্ধুতি বেন লুপ্ত হয়ে গেছে। কতকাল পরে, আজ এতদিনে ফেলে উঠেছে বেন হৃদয় বন। শুক উতানে সহসা ফুলের সমাবোধ বেন।

কোথা থেকে বড়ের মত উড়ে আসে আনন্দকুমারী। হৃতিমতী বজা বেন সে। কড়ের দাপটে বেন তছনছ হয়ে যায় সব কিছু। বিদ্যাবাসিনীর মনের শান্তি নষ্ট হয়।

—কল মিঠি বা খুশী খাও।

কথা বলতে বলতে পরিচায়িকা পালঙ নাগিয়ে দেয় বয়ের মেঝের। বলে,—পালঙ থেকে নেমে এসো বৌ। বা মন চায় বুখে লাও।

রাজকুমারী দেখলেন পায়ে আচার্য্য প্রচুর। বললেন,—আসে তুমি নাও বশো, তোমার বা খুশী তুলে নাও।

—জা হয় না বৌ; তুমি আসে খাও, এঁটো কীটা স্বা থাকবে

আনন্দ্যক কিত।



ডিটামিন যুক্ত

কোলে



বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই প্রচন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
আইডলট সিং, কলিকাতা-১



শুষ্কিকর স্বাদ সন্মাদ

খিমেরাকট

মেরী

পেটিটবুরো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেপ্টা

ক্রীমক্রাকার

কয়েম

শোট

জিগারনাট

হাউসথোল্ড

সল্‌জী

যার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সল্ট ক্রাকার

এছতি

আরও অনেক রকম।

জলের খাট বসিয়ে বেশ আর বলে বশোলা। আসন পেতে দেয় একখানি। খানিক খেমে আবার বলে,—তুমি তো আর অজ্ঞাত কুজাতের মেয়ে নও। তোমার এঁটো খেতে আর দোষ কি!

—না, তা হয় না। কথা বলতে বলতে পালাও থেকে নেমে আসনে বসলেন বিদ্যাবাসিনী। আলুপাতিত রুক্ষ চুলের এলো খোঁপা জড়াতে জড়াতে বললেন,—তুমিও ব্রাহ্মণী, বদেসেও ছোট নও, তবে?

তৈলহীন কেশ, এলো চুলের খোঁপা থাকে না মাথায়। খঁসে পড়লো আবার পিঠের প'রে। রাক্কুমারী বললেন,—আঁচল পাঠো দেখি।

পরিচরিকা আঁচল মেলে ধরলো ছ'হাতে। বললে,—বতই হোক বা, তোমরা সম্রাট ঘরের, হাতাতের ঘর নয়তো। তোমাদের নজরই আলোনা।

আঁচল পড়লো কদমা আর নারকেলের ছাঁচ। বড় পাকের মিষ্টি। ভাম আর লিচু কয়েকটা।

হাসি কুটেছে যশোদার তৈলজন্তু মুখে। কেমন ছট্টিচিলে কথা বলে যেন। বললে,—তোমাদের ঘরে কত ভালমন্দ খাওয়া, আমি কি আর জানি কিছু। সামাজ্য বা জানি, তোমার তরে তৈরী করি। তোমাদের সোনা-দানা খাওয়া মুখ। রাজার মেয়ে তুমি!

বিদ্যাবাসিনীর তুঙ্গ বঁকে উঠলো শ্রলেক। বাজাকে মনে পড়লো হয়তো, পতিচারিকার কথায়। স্বর্গগত রাজা, রাজকল্লার ছেলেকেলায় দেখা সেই সন্ততি। রাজা এখন কথা বলতেন, তখন সত্যিই যেন সিংহাসনের মত শোনাতে। বিনা অস্ত্রে বাঘের সঙ্গে না কি লড়াইয়ে জিতেছিলেন রাজা। রাক্কুমারীর বেশ মনে পড়ে, রাজার জায়ের নিরভাগে বাঘের খাবার চিহ্ন ছিল। স্ততচিহ্ন।

ব্রাহ্ম হাঙ্গি হাঙ্গলেন রাক্কুমারী। বললেন,—রাজা একটা গোটা পাঠা একাই খেতেন। প্রতিদিন আট থেকে দশ সের দুধ। পক্ষাণ ব্যঞ্জে ভাত খেতেন প্রতাহ। রাজমাতা নিজে রাজার রাজ্য রাঁধতেন। রাজার মা আমার খুব দড় ছিল। আমিষ নিরামিষ কিছু তার অভ্যাস ছিল না। মিষ্টিও খুব ভাল পাক করতেন। মায়ের হাতের মনোহরা, তার স্বাদ ভুলে গেছি এখন।

মেয়ের খেলাপাতি গোঁড়াতে ব'সেছিলেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। এ বেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের হাতের স্পর্শমাখা পুতুলের রাশি, তাদের সাজশয্যা। রাজকল্লার পুতুলের সাজ সোনা-জহরভের, হাতীর পীতের খাটে কিংবাশের বিজানা। যুক্তার আলর খাটের ছতবীতে। শোড়ামাটির পুতুলের আদর-কর কত।

গল্পার ব্রাহ্ম সের এসেছেন বিলাসবাসিনী।

বন্ধুচাপের বোগিনী, তাই মাথায় জল পড়তেই চক্ষু যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। নিজের মহলে আছেন তাই আর লজ্জার বালাই নেই। মটকার খান কাণ্ড আলুপাতি হয়ে আছে। মেয়ের খেলার স্তুতি ফেলে ছড়িয়ে যেন খেলতে বসেছেন কিশোরীর মত। একজন দাসী এগিয়ে দিচ্ছে এটা সেটা। ভাম একজন দাসী

হাতীর পীতের খাট পরিচায় করছে অতি সাবধানে। অলঙ্করণ আছে অনেক, তাই অতি সাবধানে মোচামুচি করছে।

বিলাসবাসিনী আঁজ বেন বেশ খুশী খুশী। না বলতেই মুখে জল দিয়েছেন পুতুল, ঘর থেকে এসে। কতদিন মুখে পান তোলেন নি, আজ ছাঁচা পান খেয়েছেন। বাড়িরে আছে হাসিমাখা গুঁড়াঘর। শোড়ামাটির পুতুলের মুখে চুমা খেলেন রাজমাতা। বেশ নিজের মেয়ের গালে চুমা খেলেন। সাজানো পুতুলকে কোলে ভট্টরে রেখে বললেন,—আমার মেয়ে পুতুলের চেয়েও দেখতে মিষ্টি। কুমারবাড়ীর প্রতিমা হার মেনে হার আমার বিদ্যার মনের কাছে।

—রাজকল্ল আসছেন, তুমি দোকমুখে। রাজবাড়ীতে কাণাপাখো চলছে কাগ থেকে।

একজন দাসী কথা বললে ভয় ভেঙে। তথের কথা, আনন্দের কথা, তাই বললে নিশ্চিন্তায়। কথাটি সত্য না মিথ্যা, ব্যাকিয়ে নেয় বেন একবার।

রাজা মুখে হাসি কুটলো। রাজমাতা শকহীন হাসি কোটালেন মুখে। বললেন,—তোদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। মা ভগবতীর কাছে প্রার্থনা জানা তোরা, যেন আমার মেয়ে আমার কাছে আবার ফিরে আস। কথার শেষে কিছুক্ষণ খেমে থাকলেন কেন কে জানে? আবার কথা বললেন,—আমার কানিশঙ্কর বাবে বিদ্যাকে আনতে। আমার পা ছুঁয়ে লগ্ন ক'রে গেছে আজ।

দাসীদের একজন বললে,—কুমারবাড়ীদুরকে আসতে দেখে আমার তো ভয়ে মরি। সামনাসামনি দেখতে পাট নি কখনও, আজ দেখেছি। মাহুঘের মত মাহুঘ দেখেছি, মনে মনে পেতাম জানিয়েছি।

হাঙ্গি হাসি মুখ রাজমাতার। শিত সতল হাসি বেন। বললেন,—কানিশঙ্কর শত হু চোক। মাঝরাগে যাওয়াই কি মুখের কথা! কানী বললে যে এই বাবদ অনেক বোগাডম্বর করতে হবে! অনেক লোকলঙ্কর সঙ্গে নিতে হবে। বজ্রার বাবে আসবে। হাঁটা পথেই না কি বিশদ বেষী।

অশান্তির আন্তর থিকথিক অলবে, অশান্তির কাঁটা বিঁধবে বখন ভবন। লোকেরার স্মৃথ থাকবে না! খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটবে না। মুখের হাসি মিলিয়ে বাবে! এই সকল কিছুতে পূর্ণিচ্ছে না টানলে কাঙ্ক্ষকর্মে মন বসবে না। হুস্তিতা পুখে রেখে বহুদলে কাজ করা চলে না। অন্ততঃ কুমারবাড়ীদুর তাই চান। এক কাজ শেষ না ক'রে অন্য কাজে যেন হাত দিতে পারেন না।

টাকা দিয়ে টাকা খাটানোর কাজে নেমেছেন কানিশঙ্কর। শুধু টাকা খাটানো নয়, মাখা খাটানোর কাজ। মাল কিনে মাল বিক্রী করতে হবে চড়া লামে,—কানিশঙ্করের একটি চোখ এখন ওজনের মানসুণের ভীয়ে, অন্য একটি চোখ টাকার আছে। ককাকান্তির তুলচুক না হয় হিসাবে। এই দুকহ কাজে অত চিন্তায় অবকাশ নেই। বাগিচার কাজে শুধু লক্ষ্যের চিন্তা।

কানিশঙ্কর এখন বন্ধুপরিচয়। একবার শেষ চোঁটা কল্লবন, যদি উদ্ধার করা যায় রাক্কুমারী বিদ্যাবাসিনীকে।

দক্ষিণদ্বীপ বৈকুণ্ঠনার কদাসে বসেছিলেন কুমারবাড়ীদুর।

দাক্ষিণ্য দিতে আসকের সুপ্রভাতে, প্রান্তরশ শেব হয়ে গেছে, তাই একটু বিশ্রামে বসেছিলেন কালীশঙ্কর। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কুমারের এক পাশে বুদ্ধ লালভাই, আলবোলায় তামাক খেতে খেতে তিনি হাতপরিচাল করছেন কথায় কথায়। মজার মজার কথা বলছেন যত। কুমারবাহাদুর অট্টহাসি হাসছেন থেকে থেকে।

লালাভাই বলছেন,—আসবপানের সুখ তুমি কোথা থেকে পাবে কুমারবাহাদুর! তোমরা তো কমলবনের ভেকের মত।

—কেন? কেন? সহস্র প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর।  
সাঁখ ২ ব-ছেন।

ভক্ত শঙ্করে হাত বলাতে থাকেন লালভাই। পাকি পোকের প্রাণ থেকে যে ছাড়তে থাকেন। কুমারের আগ্রহ বাতে উজ্জ্বল হ'তে হ'ত। তাই নীরব হয়ে থাকেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—কেন তা তো বললেন না লালভাই! আমরা ভেক হ'তে এই কেন?

লালাভাই বললেন,—ঈ ঈ তোমরা ভেক তার আমরা ভ্রমর।

—তথ্য! কিন্তু কি কারণে এই ভ্রোভেন তাই শুনি?

লালাভাই হাসলেন, কোঁচুঠা হাসি। বললেন,—আসবের নেশার মজা তুমি তো জানো না কুমারবাহাদুর। কথায় সে, বনভূমি থেকে আইল যে ভ্রমর, সে পাইল কমলবাস, আর দিয়া নিটে বিরাজমান যে ভেক, সে তো গন্ধটুকুও পাইল না।

কালীশঙ্কর আবার অট্টহাসি ধরলেন। বৈঠকখানা গয়গিয় উঠলো বেন। অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন কুমার। লালভাইয়ের মুক্তি বেন খণ্ডন করতে পারলেন না।

—হজুর সেলাম!

ঘরে কার ছায়া! দেখা যায় না, শুধু তার কথা শোনা যায় মাত্র।

কালীশঙ্কর হাসি খামিয়ে বললেন,—কে? কামতার না কি?

—জী-হী। হজুরের গোলাম।

—কামতার খাঁ! কালীশঙ্কর ডাকলেন।

—জী-হজুর!

—আমি কাল খান্দারশে যাত্রা করবো কামতার। সেই বাবরে কিছু কথা আছে তেঁয়ার সহ। শলা-পরামর্শ আছে। তরোয়াল খেলা জানা আছে, না তুলেছো?

—পরদা হওয়ার পর থেকে হজুর আজও ঐ তরোয়াল ধরেই খেলা করছি। কার গর্দান চাই, হকুম দেন?

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে কামতার খাঁ। অপেক্ষা কর সদরে, আমি লালভাইয়ের সঙ্গে উত্তরণে দু'টা রসলাপ করি।

—যো হকুম হজুর।

সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয় কামতার খাঁ। সেলাম জানাতে জানাতে কক্‌ ত্যাগ করে। কামতার কুমারবাহাদুরের দেহরক্ষী। কুমারের শৈশব থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গী আছে। বুদ্ধবত্তার পরিদর্শন কামতার, ওরবারিষ্মে ওজাদ। কত লোকের জান নিয়েছে, সে নিজেই জানে না!

কামতারের ছায়া অদৃশ্য হয়। রসলাপে আবার মগ্ন হ'লেন কালীশঙ্কর। লালভাইকে বললেন,—আর এক কলকে তামাক দি লালভাই!

—তা দিক। তামা দিক বা তামাকই দিক, আখা কিসে?

আবার হাসলেন কালীশঙ্কর। লালভাইয়ের মজার মজা কথা শুনে। হৃদয়বৃত্তি বৈঠকখানা বেন বেগে উঠলো ছায়া।

[ক্রমশঃ]

## জীবন-দর্শন

### বিভা সরকার

জীবন-দর্শনে বাসি কথিত হই জীবন দর্শন

নিরীক্ষণ নিত্য মনে মনে

শৈশব কৈশোর গেল বেগম উন্নয়ন

ধন কি কামদে?

শিশু কটক ছিল, দুটি স্নেহ ভবক ভবক

বৌবনের তরোয়ালে প্রভাতের প্রথম আলোকে

ভূমির বনে বনে বাজিল ভৈরবী

কি বলিব? অপূর্ণ সে ছবি!

আশাবরী তানে, দুর্গা মোর উঠিল গগনে

ধরবার বহিল কি মধ্যাহ্নের ভাপে?

বৃত্তিকার করাপাতা কাঁপে?

কুমুদিত কুমুদ মোর হল কি বহু?

মানস অভিধি পরে বৈরাগ্যের চীকা

সেও ভ্রান্তি মারা-মরাচিকা।

কোটে স্থল—কুল করে আলো অন্ধকার

জীবন-দেবতা মোর বেলা সে তোমার।

চরে দেখি, পূর্ণ বহুবর্তী

হৃদয় স্থিতি প্রসঙ্গের অপূর্ণ মাতনে

বিশ্ব-মন্দোহরা।

উৎসাহী হইতে হইবে। সরকার যাহা পারিলেই তাহা করিতেছে, এই চেষ্টায় সহিত সহযোগিতা করিয়া দেশবাসীকে সরকারের প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল করিতে হইবে।” —বর্ধমানবাসী।

### খিনিমিনি

“ষিষ্ঠীগ্রন্থ: চালা করিতে ৩০ খানি বাঁশের দাম ৪৫ টাকা, দড়ি ২১০ টাকা ৪৭১০ টাকা পড়িবে। ৮ জন মজুর যত্নে হই মিলে এই চালা করিয়া দিবে সুতরাং মজুর ৮ টাকা বা ১০ টাকা একুশে ৫৭১০, টিন আনা ও বাঁশ আনার খরচা ধরিলে গাড়ী ভাড়া ১০০ সর্বসাকুল্যে ৬৭১০ টাকায় এই চালা নিশ্চিত হইবে। যাঁহাতে প্রকৃত খরচা ৬৭১০ টাকা সরকারী হিসাবে সে কাজের জন্য ৩৩০০ টাকা এন্ট্রিমেট করা হইল কেন? প্রাণে আছে টিকাদার দ্বারা এ কাজ করা অভিপ্রেত নয়, কিন্তু কহায় দ্বারা করান হইবে তাহা বলা হয় নাই? গহারা এই ঘরে বাস করিবে তাহাদের হাতে ৩৩০০ টাকা নগদ দিলে তাহারা অনেকে ঐ টাকায় চালা ছাড়াও নিজের ঘর করিয়া লইতে পারিবে। এখন যিনি ফুট হিসাবে বাঁশ সরবরাহের টেন্ডার চাওয়ার ব্যাপারটা আর যোলাটে নাই। বাঁশের যিনি ফুট কেহ দিবে হয়ত আট আনা কেহ হয়ত সত্তোচ করিয়া ১৮০ আনা দর দিবে এবং তাহাই ‘ড্যাম টাপ’ বলিয়া গৃহীত হইবে। যে সকল নাসরিকের বাঁশের বাড় আছে তাহারা ৭৮৮ করিয়া বাঁশের দাম চাহিলে এই হিসাবে তাহাও পাইবেন। সেদিন কমিশনার মহাশয়কে সমস্ত হিসাব বিলদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং বরাদ্দ নত টাকা ও টিন বিধিসূচ্য চারটি পরিবারকে দিতে অল্পরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অস্থায়ী আঙ্গুঠান নিশ্চয় পথিকেরনার ১.৮৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলা হইয়াছে। এই ভাবে কাজ হইলে ৮৫০ লক্ষ টাকাই দুর্নীতিপরায়ণ ও বনকাখারদের পকেটে ঢুকিবে। এই অপব্যয় রোধ করিবে কে?”

—বীরভূম বাণী।

### ধূলা খাইব কেন?

“শ্রীত আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সহরের রাস্তাগুলিতে ধূলায় রাস্তাও লাল হইয়াছে। কার্তিক মাসেই ধূলায় রাস্তা রাস্তায় ঢালাচল করা ছিল হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় ভুল দেওয়ার ব্যবস্থা এখন হইতেই লক্ষ্য করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটি তো এখন খাস সরকারের মিলচলনাধীনে। অতীতের পৌরকার্য পথচালনা করার অজুহাতে সরকার মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধূলাই যদি হইতে হয় তবে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ সুদৃষ্টপূর্ণে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না।” —সেবক (আগরতলা)।

### সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকো

“এলা নভেম্বর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল আংশিক ভাবেও ক্ষয়ক্ষতি শঙ্কু হইয়াছে। যদিও বাংলার পূর্ণ দাবী গণতান্ত্রিক লড়াই পরিচালিত কংগ্রেস সরকার মানিয়া লন নাই, তবুও যে শত্রুই আসিয়াছে, তাহা সংগ্রাম করিয়াই আসিয়াছে। বাঙ্গালীর আত্মদান ও নির্যাভলনলক্ষ অঞ্চল বহুজন্মের দিনে মানভূম কলসেবক সহ এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন।

আমরা লোকসেবক সবকে ঐক্যবলে ঐতিহাসিক বঙ্গ অভিজ্ঞানের সাক্ষ্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। ইহার সহিত কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতাব্যবস্থা পুনরায় নবরূপে রাখিয়া বাঙ্গালীর শ্রেণী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অল্পরোধ করিতেছি। বাঙ্গালীর এই ক্ষত শত প্রলয়ঙ্কর বজ্র ও প্রাবৃটে মুছিয়া বাইবে না।”

—দামোদর (বর্ধমান)

### পাকিস্থানের জাগরণ

“আজ সমগ্র পাকিস্থানেই ইংরাজ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে দাঙ্গা দিগন্তে দিগন্তে উঠিতেছে। যে সকল মুসলিম লীগের নেতা ইংরাজকে ইসলামের বন্ধু বলিয়া চিন্তাশিষ্য প্রচার করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকেই মত বদলাইতে হইতেছে। পাকিস্থানের এই নব্য জাগরণ অন্ধকারে আলোর মতই কুটিয়া উঠিতেছে। ইংরাজের তাঁবের নেতাদের প্রভাব এত দিনে চূর্ণ হইল। ইহা ভগবানের অভিপ্রেত। কিন্তু কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই আজ আর একা থাকিতে পারিবে না, সেজন্য পাকিস্থানকেও তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর সহিত হাত মিলাইতেই হইবে। শর্যতান ইংরাজ যে কপট বন্ধু মুখোশ পরিয়াছিল, মিশরে আজ নিলক্ষ ভাবে তাহা ধরা পড়িয়াছে। এ সময় পাকিস্থান যদি ভুলপথ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে মিশবকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয়, ভারতও তাহাকে বরক জড়াইয়া লইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত শক্তি বিশেষ এমন দুর্বল হইয়া উঠিবে যাহাতে ইংরাজ ও ফরাসী তো দুয়ের কথা, দুর্বলের উপর অত্যাচার চালাইয়া বিশ্বশান্তি ব্যাহত করিতে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সাহসী হবে না। মিশরের এই বিপদ দেখিয়া আমাদের ভুল বুঝাবুঝির ঘরোয়া বিরোধ অচিরে আপোষে মিটাইয়া ফেলাই উচিত।”

—পদ্মাবাসী (কালনা)।

### বস্ত্রার পরে

“বস্ত্রার যে নির্ধম অত্যাচার সংঘটিত হইয়া গেল, তাহা ভুলিতে চাওয়া, চোখের জল মুছিয়া গৃহস্থ আবার উঠিয়া পাড়াইয়াছে। আশ্রয়ের আশায় দু’টি উদয়র সংস্থানের চেষ্টায়। শুধু উদয়র নয়, কৃষিজীবী অঞ্চলের সব কিছুর সংস্থান হয় কৃষিকর্ম হইতে। সেই কৃষিকর্মের প্রধান উপাদান সকল প্রকার বীজই এই বস্ত্রার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীজ চাই অথচ উপযুক্ত পরিমাণ বীজ নাই—সরবরাহ দিতে পারা হইতেছে না—আলুর বীজ সামান্য পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। রবিশস্ত্রের বীজ কিছুই এখনও দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া শুনিতেছি। কতকগুলি রবিশস্ত্রের বীজের প্রয়োজন এখনই। বিলম্ব হইলে ঐ সকল ফসল এতদঞ্চলে হইবে না, বা খুবই কম হইবে। আশা করি সরকার এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া বখাকর্জব্য সম্বর ব্যবস্থা করিবেন।” —মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

### পূজার পর

“পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বজ্রা লক্ষ লক্ষ মানুষের অধর্মানীর হৃৎকণ্ড ও হৃৎকণ্ডের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও সহস্র সহস্র মানুষ বস্ত্রার প্রকাশে গৃহহীন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে একশ ব্যাপক জ্বালা ও ভয়াবহ বজ্রার কথা ইতিপূর্বে শুনিতে

—হুই।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা.....১৫০

### জুয়া খেলার আধিক্য

"জুয়া এখন সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমবা ইতিপূর্বেও কয়েক বার লিখিয়া কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে পুলিশ বতৃপক্ষের সহিত আলোচনা আলোচনার জানিয়াছি যে, জুয়া খেলা বন্ধ করা বা জুয়াড়ীকে ধরিয়া চালান দেওয়া বা মোকদ্দমা দায়ের করা সাধারণ পুলিশ আইনে নাই। সেহা তথাহা ইহার তেমন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারেন না। জুয়ার যেমন ভয়াবহ প্রসার হইতেছে তাহা যে কোন আইনে হয় সেইরকম আইন প্রণয়ন সংশোধন বা প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করিয়া উহার দমনে সর্বশক্তি প্রয়োগের সময় নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, ইচ্ছা এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, সাধারণ গ্রামা নিবন্ধক চানী মজুর পর্যন্ত উহাতে সর্ববাস্তু হইতেছে। সহর ইহার প্রতিবিদানে তৎপর হইতে মাননীয় মহকুমাবাদ্য তথা পুলিশ বর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—নাগায়ণ (বাঁধ)

### অসমীয়াভাষী 'অফিসার'দের পৃথক সংস্কৃতি ?

"করিমগঞ্জ Assamese Officers Cultural Association কাছাড়ের জেলা ও লায়রা জজ শ্রী এস. কে. দত্তকে সাক্ষিট হাউসে এক চা-চক্রে আপায়ািত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সংবাদটি জিবিধ কারণে আমাদের (এক নিশ্চয়ই অজ্ঞান অনেকেও) বিস্ময় লক্ষ্য করিয়াছে। প্রথমতঃ অসমীয়াভাষী সরকারী কৰ্মচারীদের পৃথক সাংস্কৃতিক সমিতি গঠন, দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ অসমীয়াভাষী জজ বাহাদুরের সরকারী কার্যোপলক্ষে পড়িমাণ কালে উক্ত সমিতি কর্তৃক তাঁহার স্থানীয় সাক্ষিট হাউসে চা-চক্রে আমন্ত্রণ এবং জজ মহোদয়ের তাহাতে সম্মতিদান—সমগ্র ব্যাপারটি কেমন বৈদৃশ্য প্রকটিত হইল কি ?

সরকারী কৰ্মচারীদের বেসরকারী সমিতি নিজ প্রয়োজনে 'সাক্ষিট হাউস' ব্যবহার করিবার অধিকার কি না এবং বিভিন্ন উক্তপক্ষে অধিষ্ঠিত সরকারী কৰ্মচারী সমন্বয়ে গঠিত কোন সংস্থা কর্তৃক বিবিধ স্বাধীনস্বিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ হইতে (সবাদে বৈরুপ প্রকাশ) অর্থাদি গ্রহণ করাও সমীচীন কি না তাহাও এখানে বিবেচ্য।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

### দীঘার সঙ্কট

সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় রায়নগর থানার দীঘা স্বাস্থ্য নিবাসটির অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং প্রোতাহ বৈরুপ বিদেশীয় লোকের সমাগম ঘটতেছে তাহাতে শীঘ্রই একটি মহানগরীতে পরিণত হইবে মনে হয়। পাশ্চানিবাস, অতি আধুনিক ধরনের হোটেল ও বৈদ্যুতিক আলো এবং নলকূপ আদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন বাকী সাধা-সাধনের অনেকটা অন্তবিধা দূর হইয়াছে। নগর পরিকল্পনার কেন্দ্র করিয়া সমুদ্রসৈকতে বালুকারাশির উপর এক সুন্দর গীচ রাস্তার নির্মাণকার্য চলিয়াছে এবং দীঘা উন্নয়ন জন্ত সরকারী উজোগ আরোহন বিপুল ভাবে নিয়োজিত হইতেছে জানা যায়।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক ঐক্যবাসিনী দীঘার সমুদ্রতীর যে ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে দীঘার কি অবস্থা পীড়াটবে তাহাই চিন্তার বিষয়। সমুদ্রতীরে যে সকল সুউচ্চ বালিঘাড়ি তিল বাৎসরিক কালের মধ্যে তাহার অধিক লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও কর্তৃপক্ষ ক্ষয় নিবারণের জন্য ঐ বালিঘাড়ির পার্শ্বেও সমুদ্রতীরে কিছু স্থান জুড়িয়া বহু ঝাউ চারা রোপণ করিয়াছিলেন তাহাও এবৎসর অনেক স্থানে সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়াছে এবং বিয়া চতুল আদিও উৎপাটিত হইয়া সাগরগর্ভে লীন হইয়াছে। পর্যটকগণের চক্ষে এই ক্ষয়ক্ষ অথবা সত্যি দীঘার ভবিষ্যৎ অশুভস্বিত দেখে এক সন্দেহের উত্তেজিত করিয়াছে। প্রকৃতির সম্পদ—দীঘার অল্পময় সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের উজ্জ্বলিত তরঙ্গমালা ও শ্যাম বনানীর শোভা উপভোগের জন্য সর্বাধিক দীঘার শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস বচনায় মাহুৰ অগ্রণী হইলেও সমুদ্রের ক্ষয় নিবারণে মাহুৰের শক্তি কতটুকু! —দীঘার (কাঁথি)

### শোক-সংবাদ

ডাঃ ইন্দুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ ইন্দুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ২৮এ কাছিক, ৩৩ বছর বয়সে শোকান্তর গমন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি বাস্তবতা-অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। শিখ ইতিহাস ও আধুনিক বাঙালার ইতিহাসে এর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও র‍্যাডেমিক কাউন্সিলেরও ইনি অন্ততম সদস্য ছিলেন।

### জ্ঞান মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, গত মঙ্গলবার ২৭এ কাছিক মাত্র ৪৭ বছর বয়সে কলকাতার এক নার্সিং-হোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এম-এস-সি পদবীধার রসায়নে ইনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন ও মেঘনাদ সাহা এর শিষ্যে পরিণত হন। হিম্মত রায়ের প্রচেষ্টায় ইনি প্রথমে চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব লাভ করেন, পরে পরিচালনভার গ্রহণ করেন। 'বুলা', 'কিসমৎ', 'শতরং' এবং আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছায়াচিত্র এর প্রতিভার পরিচায়ক ও মুহুর্তকালে 'সিঁতারো সে আগে' নামক চিত্রের পরিচালনকাব্যে লিপ্ত ছিলেন। অকালে এর তিরোধান চিত্রজগতের পক্ষে এক অগুরবীয় ক্ষতি। বহুতে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন জ্ঞান মুখোপাধ্যায়।

### আত্ম বহু

বর্ষায়ান হস্তরাসাভিনেতা শ্রীঅত্ম বহু গত ২৩এ আধিম (২ই অক্টোবর) পঞ্চমীর দিন বাহান্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। অসংখ্য চিত্রে অভিনয় করে দর্শক-সাধারণের ভক্ত হইয়া লাভে সক্ষম হয়েছিলেন আত্ম বহু। মাকেও ইনি বহু দায় দেখা দিয়েছেন। তাঁর অভিনীত কয়েকটি ছবি এখনও মুক্তি দিম গুণে।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক





## শারদীয়া পত্র-পত্রিকার হিসাব

‘আখিন’ সংখ্যা মাসিক বসন্তমতীর পাঠক-পাত্রিকার চিঠিতে শারদীয়া পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত করিতা। ছোট গল্প, উপহাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির তালিকা এবং সেগুলি সৃষ্টিতে কি পরিমাণ কাগজ ও সময় প্রয়োজন হয়েছে তাও লেখা হয়েছে। গবেষককে সোনও বিখ-বিভাগে হেকিমি (‘ডাক্তারি’ যদি না জুটে) উপাধি দেওয়া বিধেয়। কিন্তু একটা ভুলের তুল শোধরানো দরকার। এতো লেখালেখি ও ছাপাছাপির ভগ্ন কি পরিমাণ কালী ব্যয় হয়েছে সেটা তো গবেষক বলেন নি? আমরা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিষয়টি তেজস করে যে রেকর্ডে গেয়েছি তা জানাচ্ছি। তবল কালী বা খরচ হয়েছে লেখকের কলমে, তার দ্বারা স্রুজ খাল গ্রান অনা চলাতে পারত অর্থাৎ তার পরিমাণ তিরিশ লক্ষ চুপশী রাজার গ্যালন এক ছাপার কালী বা ব্যয় হয়েছে তা বিচারে দিলে তিন বার পৃথিবী থেকে চাঁদে বাওয়ার রাস্তাটি কালো কুচুচে করে দেওয়া চলত। এর দামটা রাজারে কোনও দালালকে ভিজ্ঞাসা করলেই পাবেন। নমস্কারান্তে ইতি। বিনয় সরকার, লালকিয়া।

## পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকার এক জন নিয়মিত পাঠক। সে হিসেবে হু-একটা লেখা সহজে মন্তব্য করতে সাহসী হলাম। ‘বৃগপুঙ্কব বিজ্ঞাসাগর’ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি। উদাহরণ্য ‘রাজার রাজার’ আমার ভালো লাগছে। (অবশ্য নাম পরিবর্তন আমি সমর্থন করতে পারি নি।) পড়ে মনে হচ্ছে যেন শেষ হয়ে আসছে। তাই কি? বই কবে বেরাবে? ‘বিবেকানন্দ স্তোত্র’ লেখাটা মোতুন ধরলো। এখন পর্যন্ত যে ‘একঘের’ লাগছে না সেক্ষেত্রে লেখক (না কবি।) সুরমি মিত্রকে ধন্যবাদ। ইতি সৌমেন বসু। পি ২৮৪ দরগা রোড কলিকাতা ১৭।

পরমপুঙ্কব রামতুক কবে শেষ হইবে দয়া করিয়া জানাইবেন কি? ‘রাজার রাজার’ শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। বই শেষ হইয়া আসিতেছে ততই যেন উদয়ভাষ্যর ভাবায়, বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক বর্ণনার স্বপ্নের মেশা ধরিতা বাইতেছে। ‘বিবেকানন্দ স্তোত্র’ জীবনীসাহিত্যে একটি বিষয়কর নৃষ্টি। জড়-বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তুলনামূলক বিচার প্রণিধান-মোক্ষ; যেমন সমস, তেমনি সৃষ্টিসমত। আত্মা, নীলকণ্ঠের কণ্ঠ

কি নীল অপথকে বিযোজন্য করিতে? অবশ্য সাহিত্যের morality ভিন্ন। ঠিক ঠিক বিযোজন্য করিতে পারিল পাঠকে তাহাই অমৃত পরিবেশন করে। সেই দিক হইতে নীলকণ্ঠের বৃণাটীন কণ্ঠ উৎকর্ষিত পাঠকের অকণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। ‘অজ ও প্রত্যহ’ই তিনি তাহা পরিবেশন করিতে পারেন।—মীর সেন (কলিকাতা)।

[পরমপুঙ্কব শ্রীশ্রীরামতুক আগামী পৌষ সংখ্যায় শেষ হবে।—স]

## রাজার রাজার উপস্থানের জনপ্রিয়তা

অমুগ্রহ পূর্ণক মাসিক বসন্তমতীর পুণাতন সংখ্যাগুলি পাঠাইবেন। আপনাদের পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত অনবদ্য ও অতুলনীয় উপস্থান ‘রাজার রাজার’ যে সংখ্যা হইতে প্রথম আদৃত হয় সেই সংখ্যা হইতে বর্তমান সংখ্যা পর্যন্ত ভি.শি. যোগে পাঠাইতে অমুগ্রহ করি। আমি আপনাদের পত্রিকার এক জন গ্রাহক হইতে চাই।—ডাঃ এস. এন. দে। মেডিক্যাল অফিসার। স্তর ড্যানিয়েল হামিলটন এজেন্ট। রাঙ্গাবেলিয়া, ২৪ পরগণা।

[পুণাতন সংখ্যাগুলি বর্তমানে আর পাওয়া যাবে না। আপনি বর্তমান সংখ্যা থেকে গ্রাহক হইতে পারবেন। বসন্তমতীর প্রচার বিভাগ আপনার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবেন।—স]

## রামেন্দ্র-স্মৃতি কথা প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাসিক বসন্তমতীর অবদান যে কতখানি, সে কথা সন্দেহই জানেন। কিন্তু তার সম্পাদক যে সাহিত্যিকের সাহিত্য ভাবনাকেও কতখানি এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সে কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। শুধু মাসিক বসন্তমতীর সম্পাদকরূপে নয়, সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেই তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তার জন্তে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েও যদি ক্ষান্ত হই, তবে তাঁর কন্মজাহনের একটা বিশেষ সত্য ঘটনাকেই গোপন করে রাখা হবে। সেইটুকু বলার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সাহিত্যসেবা শ্রুতীকালের চলো, নিরবচ্ছিন্ন নয়। মাঝখানে লেখার অভ্যাস এক বসন্ত হুইয়ে গিয়েছিল। মনে হ’ত শুধু ছ’চোখ ভরে দেখে যাওয়াই বৃষ্টি আমাদের কাজ। মাসিক বসন্তমতীর বর্তমান সম্পাদক এসে আবার আমাদের জাগিয়ে দিলেন। তাঁর কল গোটাকতক গল্প এক আয়ো কিছু শিবার কাহিনী লেখা হয়ে গেল। এ কথা মানতেই হবে, তিনি জানেন কী ভাবে মানুষকে লেখার মেশা মাজিয়ে তুলতে হয়। আচাধ্য রামেন্দ্র হলের আমাদের সঙ্গে লালারদার-তার কাছেই আমার বাধ্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে, এক

ওনেই তিনি ধরে বসলেম রামেন্দ্রশঙ্করের জীবনের কিছু কথা আমাকে লিখতেই হবে। সহসা আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নি, কিন্তু পথে, এখানে-সেখানে, সভা-সমিতিতে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হোত, আমাকে দিয়ে রামেন্দ্র-কথা লেখানোর তাগিদ তাঁর লেগেই থাকতো। তিনি যে কী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমাকে এ কাজে বসিয়ে দিতেন, ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাঁই আর এ কথাও সত্যি যে তাঁরই চাপে আমার "ধরে বাটরে রামেন্দ্রশঙ্কর" গ্রন্থখানি লেখা শেষ হয়েছে। এর মূল কারণ তিনি—তাই আজ তাঁকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।  
ইতি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথায় ঝার (লালগোলাজ)

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending subscription for M. Basumati Hd. Master. Hindu girls' High School. Kalna.

হুয় মাসের সভাক চালা সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। ভাদ্র মাস হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন।—মেজর জে. কে. বার। মেডিকেল ক্লাক হেড কোয়ার্টার। বোম্বাই এরিয়া। বোম্বাই ৫।

গ্রাহিকা শ্রীমতী হুয় মাসের সভাক হুয় মাসের টাকা পাঠাইলাম।—হুয় দাশগুপ্তা (৫১৩১)

বার্ষিক মূল্য বাবদ সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। আশ্বিন মাস হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন।—মালতী সেনগুপ্তা (৪১১১)

Sending by M. O. a sum of Rupees fifteen only in payment of subscription for one year.—Mrs. K. R. Sarkar (27173)

Sending Rupees eight and annas two only for M. Basumati.—Sm. L. Debi. P. 66, Tala Park. Cal.

Sending Rupees fifteen only for the annual subscription of Monthly Basumati.—Sm. Telottama Das-Mahapatra. P. O. Jamirapal-arh, Midnapur. W. Bengal.

I am sending half yearly subscription for M. Basumati—Gouri Biswas (49961)

Annual subscription of Basumati to be sent to President Common Room—Tata College. Chaibasa.

Sending herewith Rupees seven and annas eight only for half yearly subscription.—Bharkana Dutta, C/o. Sri B. M. Dutta. Saran-watipur Tea Estate, Prassamanagar. Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক মূল্য পাঠাইলাম। নিম্নমিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী প্রীতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (৫১১৬০)

আমার গ্রাহকমূল্যের আগামী বাৎসরিক মূল্য পাঠাইলাম। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন।—করুনা বসু (২১১১)

Remitting herewith Rupees seven and annas eight only for the month Kartic to Chaitra. please acknowledge.—Sm. Radharani Mitra. C/o. J. P. Mitra. 27. A. Indra Biswas Rd. Cal-37.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চালা পনেরো টাকা পাঠাইলাম। শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিবেন।—শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদার। (৫১৩১৩)

রুজ পনেরো টাকা পাঠাইলাম। এক বৎসরের জন্য মাসিক বসুমতী পত্রিকা পাঠাইবেন।—Chairman, Common Room. P. K. College, Contai.

মাসিক বসুমতীর চালা বৎসর সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। বর্ধমান পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী। C/o. P. K. Chakrabarti. A. S. M., Mandarhill Station. Bhagalpur.

Sending Rupees fifteen as my annual subs.—Pusparani Pait (57211)

Sending subscription for M. Basumati.—Mrs. Madhuridhara Deb C/o. Dr. B C. Deb. Cent. Water & Power Research Station. Poona-1.

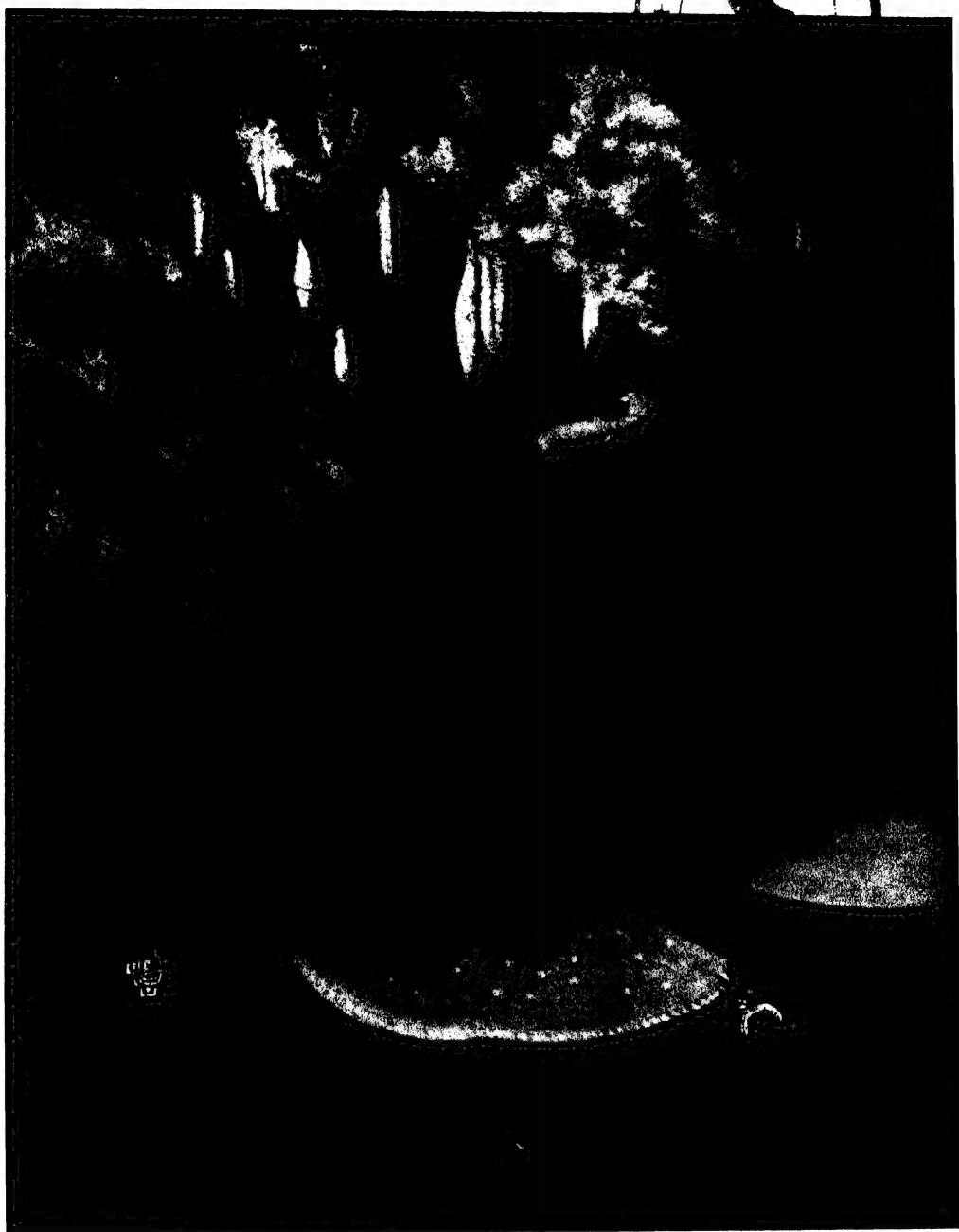
My subscription for the half year, current please acknowledge.—S. Ratān Singh. Tooraa T. E. Dalsingpra. Jalpaiguri Dist.

বার্ষিক চালা সাত টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাণিত করিবেন।—শ্রীমতী নীহারিকা বসু। (৪১১৩২)

Sending one year's subscription with effect from Aashwin 1956.—Sm. Suparna Debi. C/o. G. Bagchi. Saharanpur.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চালা পনেরো টাকা পাঠাইলাম।—সবিতা চক্রবর্তী (৪৮১৬৭)

Sending Rupees fifteen and annas ten only for Government of Tripura. Office of the Block Development Offices. Kailasphar.



মাসিক বসন্ত  
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

( জলরঙ )

রাজকণা  
—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত





৩৫শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেব। “এর ভেতর কে আছেন, আমার বাবা জানতেন। আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্বপন দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন,—আমি তোমার ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বললেন—ঠাকুর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন কোরে তোমার সেবা কোরবো? রঘুবীর বললেন,—“তা হয়ে যাবে।” এর ভেতর তিনিই রয়েছেন।”

“এর ভেতর কে একটা আছে, সেই আমাকে নিয়ে এই সব করছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হতো। আমি পূজা না করলে শাস্ত হতাম না। সিধি—স্বদের মা, আমার পা পূজা করতো—কুল চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথার পা দিয়ে বললে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।”

“ঈশ্বর কোটি অবতারাদি না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ সাধনার জোরে সমাধি হই, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজের মাহুয় হয়ে আসেন—যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্ত! এর ভিতর একজন আছে—তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন কোরে আছি।”

“এর ভেতর তিনিই আছেন। নিজে থেকে মা, স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। কামিনীকানন ত্যাগ এ কি আমার কণ্ঠ! ত্রী

সন্তোষ বপ্তেও হলো না। চারিদিকে কামিনীকানন, ঐহিক লো চারিদিকে—এর ভেতর এমন অবস্থা। সমাধি ভাব লেগেই রয়েছে।

“সেদিন হরিশ কাছে ছিল,—দেখলাম খেলাটি (শরীর) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এলো। এসে বললে—আমি যুগে যুগে অবতার তখন ভাবলাম,—বুঝি আমি মানের খেলালে ঐ সব কথা বলছি তারপর চূপ করে থেকে দেখলাম, তখন দেখি আবার বলছে—শক্তি আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।—দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব—জন্ম সঙ্কল্পের ঐশ্বর্য।”

“আর দেখলাম—তিনি আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন, এ ব্যক্তি! তবে একটা রেখা মাত্র আছে সন্তোষের জন্ত।”

“এই ব্যাঘ্ররাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ—বাসের সকা ভক্তি, তার ব্যাঘ্ররাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।”

“শরীরটা কিছুদিন থাকতো তো লোকদের চৈতন্য হতো, যা রাখবে না। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে কেলে! একে কলিতে ধান জপ নাই।”

“মনে করছি—চৈতন্য হোক সকলকে বলবো না। কলিতে পা বোঁ—সেই সব পাণ এসে পড়ে।”

“তিনি ভক্তের জন্ত দেহ ধারণ কোরে যখন আসেন, তখন সঙ্গ ভক্তেরাও আসে—কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিঃরঙ্গ, কেউ রসদ্বার।

# গণিতের রাজ্যে

মুরারি বোষ

নাট্যিক প্রবর দিনেরো (১৯১৩-১৯৮৪) একবার মহামুখিলে পড়েছিলেন। গণিতজ্ঞ অয়লারের (১৭৩৩-১৭৮৩) সঙ্গে রাশিয়ার রাজসভায় তাকে এক তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছিল। আসলে যুদ্ধটা যুদ্ধ নয়—যুক্তিহীন একটা ভাওতা মাত্র। কিন্তু ঘটনাতাই দিনেরো কাত হয়ে গিয়েছিলেন। বীজগণিতের একটা অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা সামনে রেখে অয়লার বলেছিলেন যে, এটা যদি সত্য হয়, তা হলে প্রমাণিত হবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। দিনেরো পালিয়ে গিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ রাজসভা ছেড়ে। কয়েক দিন বাদে রাশিয়া পরিভ্রমণ করে ফ্রান্সে গিয়ে বাঁচলেন। এ এক মজার ঘটনা। আসলে অয়লার কোনো সমস্যা বা প্রবন্ধই তুলে ধরেন নি। একটা কুয়ো কাঁকা আঙুল্যে দিনেরোকৈ ঠকিয়ে দিলেন। দিনেরো বীজগণিত জানতেন না। জানলে পুরে অয়লারের সাহসই হতো না। বীজগণিতের উদাহরণ তুলে জামাই-ঠাকানা প্রায় দেওয়া। আজকের বিজ্ঞান আর অর্থনীতির জগতে আমাদের অবস্থা অনেকটা দিনেরোর মতনই। অবশ্য আমাদের সমস্যা বা প্রবন্ধ আছে কি নেই—তা নয়। আসল সমস্যা থেকে পরে বেঁচে থাকার। নানান প্রবন্ধের উত্তর চাইতে গিরে বিশেষজ্ঞদের কাছে অনেক সময়ে যে উত্তর পেয়ে থাকি, তাতে আমাদের অঙ্ককার মনে কোনো আলোকপাত করে না।

যদি প্রশ্ন করা হয় : দেশের অর্থের লোক হ'লে পোট ভরে খেতে পার না কেন? উত্তরে হয়তো সংখ্যাতত্ত্বের এক হিসেব দেওয়া হোল। বলা হোল : কেন পাবে না। আমাদের জাতীয় আর গড়ে এত। এতে দেখা যায়, গড়পড়তা প্রতিটি মানুষের হ'লে না খাবার মতো অবস্থা নয়। জোর গলায় ঘোষণা করা হলো এই উত্তর। এই উত্তর শুনে আপনার আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হবে? সংখ্যাতত্ত্ব হোক বা গণিতের কায়দা-কানুন হলো, এ সব অজানা থাকলে তখন হয়তো দিনেরোর মতই পালিয়ে বাঁচতে হবে।

সংখ্যার রাজ্যে আমরা বাস করছি। তাই গণিতের জ্ঞান অপরিসর্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে। আমাদের চলেতে কিনতে সংখ্যা, গণনা আর পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনের তাগিদেই এই পরিমাপের ভাষা (Language of Size) আয়ত্ত করতে হয়। গতানুগতিক ভাবে বাজার হিসেব করার মত দেখা নয়। আরেকটু বিশেষজ্ঞ হওয়া। কেন না : "The modern Diderot has got to learn the language of size in selfdefence, because no society is safe in the hands of its clever people." (L. Hogben : Mathematics for the million) ঢালাক জাকের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা কই।

সকালে ঘুম জেড়ে উঠেই খবরের কাগজে খুঁজবো—বোলিং রেকর্ড, টেনিসের চার্ট, কিংবা লীগ খেলার পয়েন্ট। বাজার

হিসেব ছাড়াও, চাকরের মাইনে, গোপার পাওনা, কিয়ের কামাই, বাচ্চা ছেলেরা দৈনিক গুজন, ইন্ডিগোরেশের প্রিমিয়াম, ব্যাঙ্কের হারী আমানতের সুদ, রেলের টাইম টেবল, ওভারটাইম খাটার পাওনা, বেকারীর সংখ্যাতত্ত্ব, উৎপাদন বৃদ্ধির হার, এবারের ন্যাউ বেকর্ড, বেডিওতে খবর বলার সময়, বার্ষিক জমা-বৃত্তা হার, এ রকম সাহস-সংগে। অমলে সংখ্যা ভিন্ন কাটিলে আমাদের প্রতিনিয়ত চলতে হচ্ছে। এতো হিসেব রাখতে হতো না আমাদের পূর্বপুরুষদের। আজ আমাদের না রাখলে চলে না, কেন না হিসেবের আশত ভুতই আমাদের বাড়ি চেপে রয়েছে। এডমণ্ড বার্ক তাই সাথে বলেছিলেন : "The Age of Chivalry has gone. That of sophists, economists and calculators has succeeded and the glory of Europe is extinguished for ever...." হিসেবের রাজ্যে ইউরোপের আজ সব গর্ব-দর্প চূর্ণ হয়েছে, এতটা হাহাকাড় কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা করি না। সংখ্যা, গণনা আর হিসেব পরিমাপ, এ সব স্বাভাবিক বলেই মনে নিয়েছি। তাই অবাধ লাগে ইতিহাসের পুরোনো পাতায় যখন দেখি সেট অগাষ্টিন বলেছেন : "The good Christians should beware of mathematicians and all those who make empty prophecies. The danger already exists that the mathematicians have made a covenant with the devil to darken the spirit and to confine man in the bonds of hell."

এতটা সাবধান-বাগী উদ্ধারিত হলেও সংখ্যা, গণনা আর গণিতের বিকাশ অব্যাহত রয়ে গেল, আসলে মোহযুক্ত বৃদ্ধির পথই হলো গণিতের পথ। ইতিহাসে দেখা গেছে এই সোভাবুদ্ধির বাস্তব চলার অনেক বিপদ। এ বিপদ কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওকেও মুক্তি দেয়নি, রোমান আইনজেরা তো সামাজিক অস্থানই বেঁধে দিয়েছিলেন : "To learn the art of Geometry and to take part in public exercises, an art as damnable as mathematics, are forbidden". এর উল্টোটাও দেখি। গ্রীক ইতিহাসের স্বর্ণযুগে প্লেটোর একাডেমীর প্রবেশ পথের খোদাই : "Let no man without the knowledge of Geometry enter this place." গণিতের প্রতি এই মমতা, মোহযুক্ত বৃদ্ধির এতখানি সম্মানই যুগে যুগে জরী হয়ে এসেছে। সাধু অগাষ্টিন বা রোমান আইনজেরা এখানে পরাজিত।

## গণিতের ভাষা

আজকে বিজ্ঞানের জগতে গণিতের রাণীর আসন (Queen of the Sciences)। বিজ্ঞানের ভাষাই হল গণিতের ভাষা। গণিতের ভাষার বিজ্ঞান বিচার ব্যক্ত করা হয়। দুটো কারণে গণিতের এই প্রাধান্য। এক—গণিতের ভাষায় অল্প কথায় অনেক কিছুই বলা চলে। দুই—এ ভাষার সাবলীলতা। অনেক অবাধ্য দুর্বোধ্য জ্ঞান কেবল গাণিতিক ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায়—জটিলে যায় না।

অল্পকথায় অনেক কিছু বলা মানে প্রতীকের সাহায্যে বলা। গণিতের ভাষা হোল প্রতীক-সর্বস্ব। অজ্ঞান উদাহরণ দেওয়া যায়।

যদি বলি: "সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর বর্গের যোগফল অতিভুজের বর্গের সমান।"—একথা অর্থ বুঝতে গেলে প্রতীকী শব্দগুলির অর্থ ভেঙে নিতে হবে—সমকোণ, ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ, অতিভুজ, বর্গ। এগুলো হচ্ছে গাণিতিক শব্দ। কিংবা যদি বলি এভাবেই ২১১০ ফুট উঁচু—এখানে '২১১০ ফুট উঁচু' এই শব্দটিতে একটা বিশেষ ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়াসম্ভাত জ্ঞানের সমাবেশ রয়েছে। বিশেষ কোন কর্মের সাহায্যে যদি ওপরের দিকে এভারেজের দৈর্ঘ্য মাপতে পারি, তবে এই ২১১০ ফুটের সন্ধান পাব। বিশেষ স্থানে বিশেষ ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা এই সত্যে উপনীত। ২১১০ ফুট, এটা একটা গাণিতিক শব্দ ও প্রতীক। বিজ্ঞানের ব্যক্তব্য প্রকাশ করতে হলে এই গাণিতিক শব্দগুলো একান্ত অপরিহার্য। এই শব্দগুলোর সম্মত ও অসীম। এরা বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্ভব সাবলীল রেখেছে—বহু দুর্বোধ্য চিন্তা সরল হয়েছে গণিতের ভাষায়।

### গণিত ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব, অনেক থিয়োরী আবিস্কৃত হবার আগেই গণিত তার প্রকাশের রাস্তা তৈরী রাখে। বিজ্ঞানীর মনে কোন 'হাইপথিসিস' বা 'থিয়োরী' উদ্ভব হলে, গণিত তাকে সংগে সংগেই পৌছে দেয় হাজারো মনের দুঃস্বপ্ন। বহু ক্ষেত্রেই এই উদাহরণ দেখা গেছে। রীমানীয় জ্যামিতি (Riemannian Geometry) যদি আবিস্কৃত না হতো কিংবা 'থিয়োরী অব ইনভারিয়ান্স' যদি অজ্ঞাত থাকতো, তাহলে আইন-ষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতা-বাদ' বা 'মহাকর্ষের প্রকল্প' এতদিন অপ্রকাশিত ও দুর্বোধ্যই থেকে যেত।

ম্যাট্রিক্স গণিতে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান (Quantum mechanics) প্রকাশ। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান তত্ত্ব প্রকাশ করার আগে 'হাইসেনবার্গের ম্যাট্রিক্স (Matrix) তত্ত্ব' জানা ছিল না। তিনি নিজেই গণিতের ভাষা সজ্জা করে পৃথিবীকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান কথা জানানেন। আসলে তাঁর ঐ নতুন তৈরী করা ভাষা ম্যাট্রিক্সেরই একটা রূপ। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics) গণিতেরই বিশিষ্ট শাখা। আধুনিক সভ্যতার বহু উপকরণ এই যন্ত্রবিজ্ঞানের দান। জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতির ভাষায় যন্ত্রবিজ্ঞান গ্রথিত। বিজ্ঞানের সমস্ত প্রযুক্তি (Applied) আর বিশুদ্ধ (Pure) তত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় হলো গণিত। ডারউইনের ভাষায়: "Every new body of discovery is mathematical in form because there is no other guidance we can have." তাই বিজ্ঞানের জগতে তার বাণীর আসন।

### উপকরণ ও ধর্ম

বিজ্ঞান চিন্তা প্রকাশে গণিতের এই কার্যকারিতার সন্ধান পাওয়া বাবে গণিতের উপকরণে। সংখ্যা ও প্রতীক গাণিতিক ভাষার প্রধান উপকরণ। সংখ্যা ও প্রতীকের ছুটি বিরাট গুণ বা ধর্ম আছে। বস্তু-নিরপেক্ষতা (Abstraction) আর সর্বসীকরণ (Generalisation)। স্বাভাবিক ভাবেই গণিতের ভাষাতেও বস্তু-নিরপেক্ষতা

ও সর্বসীকরণ দুয়েরই সাক্ষাৎ মিলবে। সাক্ষাৎ মিলবে আরো এক ধর্মের। গণিতের কাঠামো হলো যুক্তিবিজ্ঞান। সংখ্যা, প্রতীক ও যুক্তিবিজ্ঞান গ্রথিত হলো গণিতের রাজ্য। প্রতীক ও যুক্তি-বিজ্ঞানযোগে, গণিতের রাজ্যে বাড়তি আকর্ষণ হলো গণিতে 'সম্ভাব্যতার বিস্তার'। গাণিতিক ভাষার এও আরেকটা ধর্ম। বস্তু নিরপেক্ষতা, সর্বসীকরণ আর সম্ভাব্যতার বিস্তার (Extension of Possibilities) এই তিনের সমাবেশে গণিতের ভাষা হয়েছে অপরিমীম সাবলীল।

### বস্তু-নিরপেক্ষতা

সংখ্যাকে আমরা পাই কি ভাবে? সাধারণত কোনো পরিমাপ বোঝাতে গিয়ে। বস্তু-জগতের প্রত্যেক সম্পর্কের সংবাদ বয়ে আনে এই সংখ্যারা। যেমন, আমরা বলি, ৫ সের চাল, কিংবা ১ ডজন কমলা লেবু, কি ১০ হাত ধুতী। এখানে চাল, কমলা লেবু, ধুতীর সঙ্গে তাদের পরিমাপগত সংখ্যার উদ্ভূতি দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাগুলো বস্তু-জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। তবু এই সংখ্যারা বস্তু সম্পৃক্ত হয়েও বস্তু-অতীত ধারণা বহন করে। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা স্বতন্ত্র, একক।

১ থেকে ১ পর্যন্ত এই নটা সংখ্যার প্রত্যেককে আমরা বস্তু-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে কল্পনা করতে পারি। শুধু ৫ বলতে বস্তু-জগতের কোন কিছুই আমরা বুঝি না—বুঝি কেবল বস্তু-নিরপেক্ষ এক প্রতীক মাত্র। তা ৫ মণ চাল হতে পারে, ৫ হাত কাপড় হতে পারে, কিংবা বিকেল ৫টা হতে পারে অথবা ৫ ডিগ্রী উত্তাপ হতে পারে—কী না পারে! পৃথিবীতে পরিমাপের যন্ত্রগুলি ইউনিট আছে প্রত্যেকের সংগে যুক্ত হতে পারে। যুক্ত হতে পারে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর ধারণার সংগেও। সংখ্যাতীত উপায়ে এরা ভাব প্রকাশ করে। সেজন্ত এদের বস্তু-নিরপেক্ষ রূপটাই প্রধান। আবার এই বস্তু-স্বাতন্ত্র্য আরো কয়েক মাত্রা চাড়েছে বীজগণিতে—সেখানে সংখ্যার রাজত্ব নেই। সংখ্যার ধারণার (Idea of a number) রাজত্ব। X, Y, Z সেখানে সংখ্যার বদলে ব্যবহার করা সংখ্যার পরিবর্ত (Substitute) মাত্র। বলা হয় যে কোনো একটা সংখ্যা ধর্ম থাকে—এই যে কোনো একটা সংখ্যা কোনো একটা অঙ্কের দিয়ে প্রকাশ করা হয়।  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ : উদ্ভূত এই সূত্রটা আমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রত্যেক সংখ্যার বদলে বদানো চলে। সমান চিহ্নে বা দিকের অঙ্কটার a ও b এর পরিবর্তে আমরা যে কোন ছুটি সংখ্যা কল্পনা করে নিয়ে গাণিতিক যুক্তি সাজিয়ে ডান দিকের অঙ্কে ফিরে আসতে পারি। এখানে গাণিতিক ক্রিয়ার বস্তু-জগতের অস্তিত্বের লেশমাত্র নেই। সম্পূর্ণ বস্তু-নিরপেক্ষ রাস্তার ও চিন্তা এই গণিতের অগ্রগতি ও পরিণতি। পাটিগণিতের চারটি সূত্র (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগে) এই বস্তুনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত রয়েছে বস্তুর অতীত এই একক স্বাতন্ত্র্য গণিতের প্রধান আশ্রয়। আ স্বাতন্ত্র্যের মূল্যেই বস্তু জগতের ওপর গণিতের অগাধ লবল। কার বস্তু জগতেরই এক দিকের মুখ্য পরিচয় গণিতের ভাষাতে ব্যক্ত হয়।

### সর্বসীকরণ ও সম্ভাব্যতার বিস্তার

আমরা জানি বীজগণিতের সূত্র ও নিয়মাবলী সাধারণত পাটিগণিতের পক্ষেও প্রযোজ্য। বীজগণিতে যে কোন একটা সংখ্যা

বলে কোন একটা অঙ্কের ব্যবহার (যথা X, Y, Z) গণিতের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। এই কার্যকারিতাই (Effectiveness) সরলীকরণের প্রসার ঘটিয়েছে বীজগণিতে। পাটিগণিত থেকে বীজগণিতে ব্যাপকতার প্রসার বেশী। বীজগণিতের গাণিতিক সূত্র ও নিয়মাবলী সংখ্যা ছাড়াও অজ্ঞবস্তুর ওপর প্রয়োগ করা যায়। পাটিগণিতেও সরলীকরণের যথেষ্ট উদাহরণ আছে। একটা ছোট উপাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। খুব সাধারণ নিয়ম:  $e$  আর  $o$  আলাদা দুটো সংখ্যা। এই সংখ্যা দুটোর যোগে:  $e + o = c$  একটা আলাদা সংখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ধরা যাক আমরা এখানে কেবল যোগফলটাই জানি। আর জানি  $o$  সংখ্যাটি। এখন মাত্রে সংখ্যাটিকে ( $e$ ) জানবার দরকার পড়লো যার সঙ্গে  $o$  যোগ করলে যোগফল  $c$  হবে। পাটিগণিতের প্রাথমিক জ্ঞানে আমরা চট করে বলে দিতে পারি সংখ্যাটি কত? এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি ( $c - o = e$ ) তখনই পা বখন আমরা ধনাত্মক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঋণাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের ব্যবহার কোরবো। ঋণাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের ব্যবহার ধনাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে ক্রমাগত অমূল্যদের ফলে বিভিন্ন প্রস্তাবনা থেকে নতুন নতুন সিদ্ধান্তভিত্তিক নিয়মের উদ্ভব হচ্ছে। তাতে কিন্তু অনেক সময়ে পুরনো প্রস্তাবনা আর তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। সূত্রের ক্ষেত্রে আবার বর্ধিত হয়। ফলে গণিতের বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্রের যেমন ব্যাপক প্রসার বাড়ছে তেমনই তার ঘটছে Generalisation.

সংখ্যা ও প্রতীকের সাধারণ সমাবেশে গণিতের প্রস্তাবনা (Premise) গঠিত। যুক্তিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রস্তাবনার কাঠামোয় উপরিতল (super structure) নির্মিত হল গণিতের সিদ্ধান্তে। উপরিতল গঠনের উপকরণ হল সংখ্যা, প্রতীক ও যুক্তির অববোহ (Sequence of Logic)। গণিতের শিল্পকর্মে অজ্ঞপ্র কথার, অপরিমেয় চিন্তার সহিত রূপ ব্যক্ত। গণিতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল চিন্তার এই মিতব্যয়িতা: ইকোনমি অব থট। গণিতজ্ঞ সটনের ভাষায়: "Mathematics is economy in thought carried to extremes, it is devoid of all the emotions and associations which affects most other acts of thinking." (Mathematics in Action: P. G. Sutton). গণিতের চিন্তার কোনো ভাবাবেগ বা মনস্করণের স্থান নেই। শিল্পের কমন্নিয়তা গণিতের প্রস্তাবনাটিকে ভাঙিয়ে পরাজিত। তবু শিল্পসৃষ্টি ও রসবিচারের মহত্তম মানদণ্ড গণিতেও বর্তমান। তাই গণিত ও শিল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ্য।

### গণিত ও শিল্প

গণিতের মস্ত বড় অবিষে তার Sequence বা অববোহ। শিল্প নির্দিষ্ট 'ধাপে পা ফেলে ফেলে তার নিশ্চিত অগ্রগতি। গণিতের নষ্ট সোপানের ধাপ পূর্ব আঙ্গিক মতই নিখুঁত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক শিল্পকলার তা চলে না। শিল্প ও শিল্পের প্রভেদ এখানেই। কবি কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্য চিত্তামৃত' যদি সত্যি সেদিন হারিয়ে যেত, তা হলে চিত্তমূর্তিই

তার অক্ষর সৌন্দর্য ও মাধুর্য থেকেই আমরা বঞ্চিত হতুম। নতুন করে 'চৈতন্য চিত্তামৃত' লেখা কি কোনোদিন সম্ভব হতো? কিন্তু নিউটনের ক্যালকুলাস যদি পৃথিবী জানবার আগেই হারিয়ে যেত—যদি নিউটনের সেই প্রিয় বুকুরটার হঠাৎকারিতায় ক্যালকুলাসের সমস্ত প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত আগুনেই পুড়ে যেত, তবে অসম্ভব সেদিন না হোক আর একদিন এই ক্যালকুলাসের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটতোই। অপর কোন মনীষার প্রাজ্ঞতায়। নিউটন বা লেবিন্সের অনেক আগেই ক্যালকুলাসের ধারণা আরো একজন গণিতের মাথায় এসেছিল। তিনি হলেন আর্বিমিডিস। দেকার্তের আলোক না পেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই ক্যাটনীয় জ্যামিতির উদ্ভাবনা করতে পেয়েছিলেন যমট সাহেব। তখন দেকার্তের নামেই আনালিটিক জ্যামিতির উদ্ভাবনা জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই, এর উল্টোটাই দেখবো। শিল্প সৃষ্টির 'ড্রপিক্ট' হয় না। দেশে দেশে এত অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটছে, কিন্তু মূল্যের বস তাতে অক্ষর থাকে কি? স্পেন্সিয়ার কি রবীন্দ্রনাথের না হোক, অসম্ভব ভাষ্যচন্দ্রের 'ড্রপিক্ট'ও আর জন্মাবে না। বরঞ্চ নবরূপায়ণে নতুন অনাশ্রয়িত রসের আবির্ভাব ঘটে অনেক সময়ে। শিল্পে নবজাতীয়রূপ হল অবনী ঠাকুরের তুলিকায়। তবু অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারার একক সূত্র। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি দ্বিতীয় কলাবিকাশ নয়—অধিতীয়, অনন্তরূপীয় ও অন্তরূপীয়। তাই শিল্পের সঙ্গে সমাজের যোগ, তা কোনো এক বিশেষ যুগের মধ্যেই প্রত্যেক ভাবে সীমাবদ্ধ। কারণ নতুন শিল্প আগেকার যন্ত্রাটের স্থান অন্যায়সে দখল করে বসে। এ হল যুগের দাবী।

কিন্তু গণিতের রাজ্যে তা হবার নয়। গণিতের প্রত্যেকটি বিকশিত সৃষ্টি চিরকালের জন্তে সমাজের চলমান রথের সারথি হবে। গণিতের এক একটা আবিষ্কার বা এক একটা সিদ্ধান্ত আবিষ্কার ধারায় নিখুঁত যুক্তির সোপান গড়ে তোলে। এক এক ধাপ পেরিয়ে তবে শীর্ষদেশে আধোহরণ সম্ভব। মাত্রে কোন ধাপ হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে তাকে গড়ে নিতেই হবে। ডিঙিয়ে বা লাফিয়ে ওপরে ওঠা চলবে না। ওঠার সময়ে প্রত্যেকটি ধাপের সঙ্গে আমাদের যোগ হবে প্রত্যক্ষ। গণিতের সঙ্গে বিজ্ঞান এবং বুদ্ধির যুক্তির সরাসরি যোগ রয়েছে। দেকার্তের গাণিতিক মন দর্শনে সন্দেহবাদের (Philosophic Doubt) স্রষ্টা। নিউটনের মেকানিক্স জড়বাদের ভিত্তি-প্রস্তর দৃঢ় করেছে; সমাজের সঙ্গে গাণিতিক চিন্তার যোগাযোগ শিল্পের থেকেও প্রত্যক্ষ। লিওনার্দোর 'লাঠ সাপার' হারানোর ক্ষতির থেকে ইউক্লিডের প্রতিপাত সাময়িক ভাবে তুলে ধাক্কার ক্ষতি সমাজের একদিনও সইবে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাযোগ দৃঢ়তর। খুঁট জন্মাবার কবে সেই তিনশো বছর আগে ইউক্লিডের জন্ম। তবু ইউক্লিড আজকের জীবনে অপরিহার্য। আসলে আমাদের এই সিদ্ধি ভেঙে ভেঙে ওপরে ওঠার জীবনে ইউক্লিড অপরিহার্য একটি ধাপ।

এই হল গণিত ও শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপকরণগত বৈশিষ্ট্য। আজকের প্রাঙ্গণে আর এক বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ মেলে। সাহিত্য ও শিল্পে জাতীয় চেতনার ছাপ স্পষ্টতর। গণিতের বেলায় তা হবার নয়। গণিতের সৃষ্টি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বাইরে ও উর্ধ্বে। এখানে



বৃহৎ পৃথিবীর সামগ্রিক প্রয়োজন গণিতের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। স্থিতপ্রজ্ঞ গণিতজ্ঞের মানসে জাতীয় চেতনা কোনো সীমারেখা টানে না। বুদ্ধির মুক্তির প্রত্যক্ষ উপকরণে তার সৃষ্টির আঙ্গিক গড়ে ওঠে। আসলে সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক মানসিক অগ্রগতির ছাপ থাকে গণিতজ্ঞের সৃষ্টিগুণ মানসিক প্রতিক্রিয়ায়।

শিল্পের সঙ্গে তফাৎটা বড় হলো গণিতের সঙ্গে শিল্প-চেতনার মিলও অনেকখানি। মুক্ত চিন্তার রাস্তা বাতলে দেওয়াই কেবল বিস্তৃত গণিতের কাজ নয়। বুদ্ধির মুক্তি ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল চেতনার (Creative endeavour) সঞ্চার গণিতের দ্বারাও সম্ভব। শিল্পই কেবল মানুষের বিচিত্র সৃষ্টির অধিকারী নয়। শিল্পজ্ঞান সৃষ্টির জটিলতার ভ্রমার খোলে সত্য, কিন্তু গাণিতিক মনেও উচ্চাঙ্গের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল মানসে গণিতের মোহমুক্ত আবেদন নতুন সৃষ্টির অনবদ্য গভীরতায়ও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। কেপলার ও নিউটনের উল্লেখ্য তে। রয়েছে। আরো এক বিষয়কর উল্লেখ্য হল লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী এই মানুষটির সৃষ্টির বিচিত্র সন্টার আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। এরা কেবলমাত্র পুরোনো পৃথিবীর নিবৃত্তিমাত্র নাগণাশ থেকে আমাদের মুক্ত করলেন তা নয়, মুক্তবুদ্ধির বৈপ্লবিক চেতনার আমাদের যাত্রাপথ উজ্জ্বল করে তুললেন।

মতঃ শিল্পের যে উপকরণ-বৈচিত্র্যে পৃথিবীতে নব নব ধারণার বিকাশ ঘটে, তার উৎসমুখের সন্ধান মোহমুক্ত বুদ্ধির ভ্রমারেখাই সম্ভব। বুদ্ধির এই মুক্তি একান্ত গণিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উজ্জ্বলহর পথে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল—কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের রাস্তা ধরে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে যাত্রা করা আর চলবে না। অস্বাভাবিক সত্যের সন্ধান একমাত্র গণিতের রাজ্যেই মেলে। এই সত্যসন্ধানের পন্থাতেই গণিতের স্বরূপ নিহিত।

প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রয়োজনে গণিতের উদ্ভব ও বিকাশ। ব্যবসায়-বাণিজ্যগত প্রয়োজন, গৃহ-নির্মাণে, সেতুবন্ধনে, দিন-রাত্রি-সপ্তাহ-মাস-বর্ষ গণনায় আর আমাদের প্রতিদিনের অসংখ্য কর্মপ্রচেষ্টার অন্তর্গত জটিলতার মুক্তি-সাধনে গাণিতিক সমাধান উদ্ভাবিত। গণিতের এই উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যেই গণিতের স্বরূপ গঠিত।

### গণিতের সংজ্ঞা

সূর্যের আলোর স্বরূপটা বোঝাতে গিয়ে আমরা যদি কেবল রামধনুর সাতটা রঙের কথাই বলি, তবে কিন্তু অনেক কথাই না বলা থেকে যায়। আসলে ঐ সাতটা রঙ ছাড়াও এমন অনেক আলোকসম্পদ সূর্যের দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ে যা আমাদের চোখে সরাসরি ধরা পড়ে না। এ অনেকটা অন্ধ-হস্তি জায়ের বৃত্তির মতই। তবু কাজলো গোছের একটা ধারণা আমাদের গড়ে নিতে হয়। এর সাহায্যে সব না হোক অনেক জটিলতা থেকেই সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায়। গণিতের সংজ্ঞা নিরূপণে আমাদের অনেকটা সেই পথ ধরতে হবে। অতএব বেজামিন পিয়াস' (১৮০১—১৮৮০) কথিত সংজ্ঞার কথাই ধরা যাক: "Mathematics is the Science of drawing conclusions from

given premises."—প্রস্তাবনা থেকে সিদ্ধান্তে আগমনের উপায় হলো গণিত।

সহজবুদ্ধিতে যে ধারণা সঠিক বলে মনে হয়—সব সময়ে তা অভ্রান্ত নয়। সূক্ষ্ম বিচারে সকল সময়ে এ ভ্রান্তি ধরা পড়ে। গণিতের রাজ্যে অস্বাভাবিক কোনো ভ্রান্তির স্থান নেই। এর কারণ গণিতের আশ্রয় হলো বুদ্ধিবৃত্তি। সংখ্যা থেকেই গণিতের শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু সংখ্যাই গণিতের শেষ কথা হয়ে ওঠে না। সংখ্যা বা প্রতীকের সাহায্যে কোনো প্রস্তাবনা (Premise) গঠন করে বুদ্ধির পথ বেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই গণিতের লক্ষ্য। প্রস্তাবনা থেকে সিদ্ধান্ত—মানুষের পথটা হলো বিস্তৃত চিন্তা—এখানে সহজবুদ্ধির (Common Sense) স্থান নেই। তবু গণিতের স্বরূপে আসতে গিয়ে অপ্রকৃষ্ট থেকে যায় তার আসল অর্থ। পৃথিবী ছাড়া যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব নির্মাণ সম্ভব নয়—পাথির প্রয়োজনেও উপলব্ধি তার উদ্ভাবনা, তখন গণিতের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বস্তুত্বগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ, সাল্লাব ও বিরোধের স্বরূপটাকে বোঝা দরকার।

### গণিত ও বস্তুজগৎ

বস্তুজগতের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না বিস্তৃত গণিতের (Pure Mathematics) চিন্তা নির্মাণে। এ তবু গণিতের বস্তুত্বীনতা নয়। আসলে বস্তুজগতের সঠিক ধারণা নির্মাণেই বস্তুর অতীত জগতে গণিতের পরিক্রমা। বস্তুজগতের সাক্ষ্য যখনই অস্বীকৃত হয়েছে গণিতের রাজ্যে কিংবা গণিতের রাজ্য যখন বিচ্যুত হয়েছে বাস্তব জগতে তার নির্দিষ্ট কেন্দ্র-বিন্দু থেকে, ইতিহাস তখনই তার নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। মানুষের সমাজে, সভ্যতার চিন্তার বন্ধায়ে ও বুদ্ধির অন্ধতায় নিদারুণ অভিপাণ বর্ষিত হয়েছে। আসলে গণিতের সাফল্য তার স্রষ্টা-নির্মাণে। এই স্রষ্টা-জগৎসংগেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অগ্রগতি। আজকের সূক্ষ্ম-সবল সমাজ গঠনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। বিস্তৃত গণিতের রাজ্য প্রযুক্ত হয় সমাজ বিকাশের সহজ নিয়ন্ত্রণে।

সংখ্যাভেদে অপরিহার্য হিসাব বর্তমান সভ্যতার বাধুনি, বিজ্ঞানের প্রয়োগ আধুনিক জীবনের ভিত্তি—এ সমস্তই সম্ভব বস্তুজগতের সঙ্গে গণিতের সাহায্যে। গণিতের সঙ্গে বস্তুজগতের বিরোধটা কেবল গণিতের যুক্তি নির্মাণ পদ্ধতিতে। গাণিতিক যুক্তি নির্মাণে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু বস্তুজগতের ঐতিহ্য-আশ্রয় হলো গণিতের যুক্তি বিজ্ঞান। এই স্রষ্টা-যখন আমরা হারাই—সভ্যতার তখনই অধঃপতন। মহাযুগব্যাপী ভারত ইতিহাসে অনগ্রসরতা—ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রাক-বিবর্ধন যুগের অন্ধকার এই অসম্ভব স্বাক্ষর। গণিতের তাই অপর এক যোগাযোগ হল 'সভ্যতার দর্পণ' (Mirror of Civilization)।

### Ref:

Hyman Levy: The Universe of Science  
L. Hogben: Mathematics for the Million  
Morris Klein: Mathematics in Western Culture  
Eric Bell: Math. the Queen of Sciences  
গগন বন্দ্যোপাধ্যায়: গণিতের কথা। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।

# অধ্যাপক

অজিতকুমার ভাড়াড়ী

নাট্যের মধ্যে একটা দ্ব্যামার আছে। প্রথম অঙ্গাপিতের কাছে এই নামে পরিচিত হবার সময় মনের কোণে একটা ক্ষীণ আত্মপ্রসাদের বিস্মক খেল যায়। সে আত্মপ্রসাদ বৃদ্ধিভাবীর মননশীলতার অহমিকা-প্রসূত হয়তো বা অর্থের কৌশলের কাছে হার স্বীকার করার যে দ্ব্যনি মনের মধ্যে থেকে থেকে একটা আত্মকরী ছায়ায় সঞ্চিত করে—পরিচয়ের মাধ্যমে সেই দ্ব্যনি স্থলনের একটা সুযোগ তবু তো পাওয়া যায়!

একদিকে প্রাকৃত সমাজ যেখানে আর্থিক মান সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি আর একদিকে পড়াশোনার মূল্য সংশয়ী উদ্ভ্রম ছাত্রসমাজ, তারা প্রশ্ন তোলে—সাহিত্যপাঠের সার্থকতা সন্দেহে, পাঠ্যস্তর জীবনের পথে চলার জন্তে বর্তমান শিক্ষার সার্থকতা সন্দেহে তাদের জিজ্ঞাসা। ব্যবহারিক উপযোগিতা আর অর্থনৈতিক উদ্বেগের ছায়া তাদের মুখে চোখে। তার থেকে এড়ানোর উপায় কোথায়? তাই যুক্তি খুঁজি শিক্ষা বেত্রবতীর তটে। তাই বন্ধনা-বিহার চলে সোনার এপিশিফিডিয়নের রম্য উজ্জানে,—যেখানে জীবনের জটিলতা অনেক সহজ হয়ে গেছে, সেখানে জানা-না-জানার প্রদোষের ছায়ার বহত খোঁজে সমতাপীড়িত মন। মাঝে মাঝে ক্লাসে সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই, মনের দুয়ার খুলে যায়, কাব্যের সৌন্দর্য্যার্থ কণিকের জন্ত ধরা দেয়, অভিনেতার জীবন আমাদের। রঙ্গমঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করে, সে তুলে যায় তার সামাজিক পরিস্থিতি, অভিনেতা আর অভিনেতা চরিত্র এক হয়ে যায় অস্বাভাবিক, আনন্দে বেগনায়। বনিকা নামে, পাশ্চাত্যদেশের লোকো একে একে নিয়ে আসে। প্রশংসার গুঞ্জন স্তিমিত হয়ে আসে।

তারপরে যেখানে বনিকা ওঠে, সেখানে শুধু নিরঙ্কর অন্ধকার, শুধু অভাব দৈহিক, শুধু চাওয়া আর চাওয়া। সমাজে স্বীকৃতি নেই। সেখানে অধ্যাপক স্থল-মার্টিনের পরিবর্তিত স্বরূপ; মনের উল্লেখে কনিষ্ঠ কেরানীর সমগোত্রীয়, স্থল আর কলেজের পে ধাপে সোনার পদকে মোড়া পথে গৌরবের শিখর থেকে মনে মনে ছিল জীবনটা বোধ হয় শুধু সাক্ষ্যের মালা গাঁথা! তাই শর স্থল কুড়াতে অভ্যস্ত মন বিরাট ধাক্কা খেল যখন দেখল এ সমাজে গুণের মর্যাদা নেই, যোগ্যতার স্বীকৃতি নেই, শুধু শুধু আর্থিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে কৃতৃত্বের বিচার। মাথার নিম্নের মতো শুধু একটা কথা মনে পড়ে গেল—‘ফিলিস্টাইন’।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অধ্যাপক-গোষ্ঠী। সমাজের উৎসবের লক্ষ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ বড় ক্ষীণ; বস্তুতঃ না থাকলেই। ‘ছুরে থেকে দোলে শিলির যেমন শিরায় ফুলের অঙ্গুরী।’ তিনিয়ত যেখানে রচির স্থলতা, ধনের দল্ল, রাজনীতির বিব্রাণ হানতে থাকে, স্থল সংবেদনশীল মনের পক্ষে, সেখানে অস্বাভাবিক একমাত্র বাঁচবার পথ। হয়তো সুনীল দত্তের ‘পাখীর’ পলারনী মনোভাব এতে প্রকাশ পায়। কিন্তু এছাড়া আর অধ্যাপকের গত্যন্তর কি? আত্ম-গরিমা প্রচারের জয়চাক্রে দৈনিক দিনানিত করার মতো স্থল চর সর্বস্ব নেই।

রাজনীতি আজ মানুষের জীবনে এক বৈধী জারগা বুড়ে বসছে যে, সমাজ-জীবনের অস্ত্র সব দিক তার তাবোদারি করা ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পায় না। রাজনীতির দীর্ঘে আছেন ধারা তাঁরাই শিক্ষাসংস্কৃতির বর্ধার হয়ে বসেছেন। যে ভারসাম্য (Justice) গোটা সমাজজীবনের মূলস্থলে বলে মেনে নিয়েছেন, তা আজ বিলুপ্ত, তাই শিক্ষাসংস্কৃতি আর রাজনীতির মধ্যে সীমারেখা খুঁজে পাওয়া দুঃস্থ, রাষ্ট্রশাসনের সন্ধান আর মর্যাদার আকর্ষণে নিস্ত্রস্ত হয়ে গেছে অধ্যাপনার গৌরব, শক্তির মার্ককতা আর অর্থের কৌশল নিরন্তর পরিহাস করে অধ্যাপনার সালামটা জীবন। তার সরলতা, নিষ্ঠার চেয়ে বড় হয়ে চোখে পড়ে তার বেশের নিড়াধরতা—দৈন্তের নামাস্তর, জীবনের মূল্যায়ন বদলে গেছে। আগেকার দিনে শিক্ষকের দক্ষিণা হয়তো গোড়ানীয় ছিল না কিন্তু সমাজে তাঁর দান স্বীকৃত হতো। তাঁর ত্যাগ, তাঁর সরলতা অর্থের দৈন্তের চেয়ে মনের ঐশ্বর্য্যের গৌরবে অনেক বেশী প্রোক্ষল ছিল, যে সব ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে যেতো—ভবিষ্যৎ-জীবনে কৃতী পুত্রবর স্থান নিজে—তার মূল্য কঠে তাঁর দান স্বীকার করতো। শেষ জীবন পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর দান স্বীকার করতো। কালে-ভয়ে কখনো পুরোনো অধ্যাপক প্রাকৃত ছাত্রদের বাড়ীতে পাল্পণ করলে রীতিমত সাদা পড়ে যেত অভাবনার ব্যাপারে।

আজকে অধ্যাপনার না আছে সম্মান, না আছে দক্ষিণা, মোটা মাইনের সোভ ছেড়ে দেওয়া হয়তো কিছু নয়, কিন্তু তার অবদান যদি সমাজে স্বীকৃতি না পায়, যদি প্রাণী সম্মানটুকু বন্ধনার এসে ঠেকে, তবে কি নিয়ে আর অধ্যাপকের সাধনা? এই বার্থতার বেদনা (frustration) আজ অধ্যাপকের জীবনে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে—তার নিজের বৃত্তির প্রতি আস্থার মূল্যই ধরেছে ভাঙন, তার মধ্যে যে আনন্দের স্রব বাজছে—যে সঙ্গরে সে নিজে যিগরস্ত—সেই সশয়-যিগা নিয়ে বাইরের বিবের ওদাসীজ, অরহেলা কি করে জয় করবে?

মাঝে মাঝে মনে অস্বস্তি জাগে। মাঝারি ছাত্রের স্পর্শে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে চিন্তার ধার যায় কমে, মৌলিকতা বিসর্জন দিতে হয়। ছাত্রেরা চায় না জানতে, চায় পরীক্ষা পাশ করতে, তাই পাশ করানোর পাশে বসে হয়ে থাকে। নিছক বস্তুতঃ পরীক্ষার জন্তে না হলে নয়—তার বাইরে কিছু পড়বার, জানবার বা শোনার দরকার নেই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মানেতেও এর ফেরের চোখে পড়ে না। বহুমনের জানলা হলে দিয়ে উল্লার দিগন্তের অভাস দেওয়ার মতোই অধ্যাপনার আসল সার্থকতা। শুধু পুঁথিগত বিজ্ঞে পরিবেশনের মতোই কি সব শেষ হয়ে যায়? পুঁথির বাইরে যে বিরাট জীবন—তার স্বরূপ, তার বহুত মানুষের মনে যে অস্বস্তি জাগায়, তার সন্ধান কি ক্লাসের চার দেওয়ালের মধ্যে নিষিদ্ধ? পড়াশোনার বাইরে যে জগৎ যে জীবন, তার স্বপ্ন দেখা আর দেখানোর অবকাশ কতটুকু মেলে? গণিতের সংখ্যা দিয়া মার্কা মারা বোল নব্বইই তার পরিচয়ের শুক আর শেষ। উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে বুদ্ধির যে অস্বস্তি, বোধের যে উৎকর্ষ, তার অভাব দেখি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জীবনে। অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান হিসেবে উচ্চশিক্ষার মূল্য, কাজেই নিষ্ঠা নেই, আগ্রহ নেই, জানবার কৌতুহল নেই, ক্লাসে বার বার অস্বস্তি করি—আত্মহীন সত্তা (soulless entity), এসব অস্তিত্ব আছে, প্রশ্ন নেই—

যে প্রাণের আগুনে আগুন হলে উঠে অধ্যাপকের মনে—আসে উদ্দীপনা—নতুন করে জানা আর জানাবার আগ্রহ যদি প্রাণে প্রাণে সঞ্চার না হোল, তবে নিত্য এই মাঝারিমানার সঙ্গে আপোষ করে থাকা যায় কি করে? আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বলেন—ক্লাসকে যদি মৌলিকতা প্রকাশের মুখ্য স্থান মনে করো, ভুল করবে। কিন্তু দিনের বিরাট অংশ যেখানে কাটে সেখানে কাজ আর প্রাণের মধ্যে যোগ না রইলো যদি, তবে সে অস্তিত্বের জের টেনে চলে কত দিন? জীবিকা আর জীবনের এই জরাসন্ধ-ভাগ আত্মহত্যার নামান্তর ছাড়া আর কি?

পড়বে কি? পড়ানোর চেয়ে চিন্তার প্রয়োজন? ভাবামুসরণের চেয়ে ভাবসজ্জনের প্রয়োজন বেশী। তা নাহলে অধ্যাপক তো তথ্যের ভাববাহী পুরুষ। সে কল্পনার জারিত হয়ে তথ্য তত্ত্ব হয়ে উঠে, তার ভিত্তে অবসর তার চেয়ে বড় স্বস্তির প্রয়োজন, ক্লাস, টিউটোরিয়াল, সাপ্তাহিক উত্তর-পত্র পরীক্ষা—এর মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার অবসর কই? গ্রীষ্মের বন্ধে বড় ছুটি মেলে, 'তা কাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখে, অত্যন্ত নির্গোধ সাধারণ মানের খাতার পর খাতা দেখা, মনটা যেমন রাস্তা হয়ে পড়ে তেমনি হয় বিশ্বাস। কেরানীর খাতা লেখা আর আমাদের অধ্যাপনার মধ্যে যে রকম বীধা ব্যতিক্রমতা, সে বৈচিত্র্যহীনতা মূলতঃ এক, নতুন নতুন

আলোয় স্বজনধর্মী কল্পনার লীলা-বিলাস বা অদীত বিষয়কে আত্মসাৎ করে আবার নতুন করে তার ব্যাখ্যা, সে সবের ক্ষেত্রে নেই, সময় নেই, স্বযোগ নেই। যে মনের আবহাওয়ায় চিন্তাগুলো দানা বাঁধে, ব্যস্ততা আর ক্লাসে পড়ানোর ভিত্তে নোট করতে করতেই সে আবহাওয়া কেটে যায়।

তবু মাঝে মাঝে একটা উদার প্রসঙ্গতা জীবনের সব দৈন্য-ক্লান্তির উপর স্বপ্নাঙ্কন বুলিয়ে দেয়। আশা-উদ্দীপনা আর শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মেশা তরুণ ছন্দয়ের ছোঁয়া লাগে মনে। বনভোজনে, ঐতিহাসিক ভূখণ্ডগাটনে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাবধানের ঘোমটা খসে যায়, হাসি ভ্রূঙ্গোড়, ছুটোছুটি মাতামাতি সমস্ত গাছীঘোর আবরণ সরিয়ে দেয়। মনে হয় আমরা এক গোষ্ঠীর এক পরিবারের। ঘুচে যায় অপরিচয়ের ব্যবধান, ভুলে যাউ বয়সের দূরত্ব। আর এক আলোয় এদের চিনি, জানি, বহু ছন্দয়ের ধারা স্নানে অমৃভব করি, অমৃত তৃপ্তির আনন্দ, ভাবি—

“এই যে দেখা এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।

এই ভালো আজ এই সংগমে কাঁরাগাসির গন্ধাবহনায় চেউ দিয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভেঙেছি, নিয়েছি বিদায়।”  
বহু ছন্দয় নশিত এ জীবন হয় সার্থক।

## চৌ-এন-লাই

সৈয়দ হোসেন হালিম

অবাক ক'রেছো  
সারা পৃথিবীকে তুমি,  
অবাক ক'রেছো  
যুদ্ধ-পাশায় শকুনে মিত্র করি'  
যারা বার-বার হারাতে চেয়েছে  
শাস্তি-যুগিঠিরে;  
অবাক ক'রেছো  
যারা ভুলে ঘরা-ক্রৌপনীর বীধা রাধি'  
কুন্ত-সভা-মাঝে  
চেয়েছিলো তার লক্ষ্যকে হরিবারে।

অবাক ক'রেছো  
মানুষকে যারা মানুষ ভাবেনি কভু—  
ভেবেছে শুধুই যুদ্ধজয়ের অণু-পরিচয় ছোট,  
লোকালয়ে যারা বসাতে চেয়েছে নর-হৃৎকের খেলা,  
তুমি বলে দিলে : মানুষ নহেক অতোটুকু—অতো ছোট।

কতদিন আর অগ্নি-আগরে ত্যাগশ্রমের সেনা  
মানুষের মহা-মহুযাখে প্যাঁচবে নির্বাসন ?  
কতোদিন আর অজায় রণে জরী হবে তুমি বলা ?  
বাধবে-ই কুরুক্ষেত্র, শাস্তি আসবে ফের।

ধরা-ক্রৌপনীর লজ্জ-বন্ধক, পার্থ-রথের রথী,  
শাস্তির লাগি' সারাটি জনম তব এই অভিধান ;  
তাহার গর্বা নহে কোঁটীনের কুত্ৰ ভুখণ্ডটি—  
তোমার গর্বা শাস্তিকামী সারা লোক দুনিয়ার।



# পত্র

প্যারীচরণ সরকারের চিঠি

এডুকেশন গেজেট অফিস

১৬ই জুন, ১৮৬৮

মাজবর এচ. এল. হারিসন,

বঙ্গালী গবর্ণমেন্টের জুনিয়ার সেক্রেটারী মহাশয় সমীপে  
মহাশয়,

আপনার ২৭০০ নং ২রা তারিখের (১৩ই তারিখে প্রাপ্ত) পত্রপাঠে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে দুইটানা বিষয়ক, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত মন্ত্রিত্বিত প্রবন্ধটি মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রীতিকর হইয়াছে অবগত হইয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।

২। যদিও কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নাই, তথাপি আমার নিজের প্রতি কর্তব্যানুযায়ী লেপ্টনান্ট গবর্ণর মহাশয়ের গোচরার্থে আমি নিম্নলিখিত বিষয় নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

৩। যখন আমি সেই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করি তখন আমার মনে ধারণা ছিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট, জ্ঞানভাণ্ডার পেশার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও চন্দ্রিকা পত্রসমূহে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যে বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ নিঃসূল এবং নিজের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসন্ধানে আমার মনে ঐ ধারণা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। আমি দুহুর্ন্তের জন্তও ভাবি নাই যে, আমি দেশীয় জনসাধারণের মনে ভীতি বা ভয় উৎপাদন করিতেছি। কারণ এডুকেশন গেজেটে বাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তদনুযায়ী অধিকতর ভীতিপ্রদ সংবাদ পূর্বে হইতেই লোকমুখে ও সাধারণের প্রসিদ্ধাজন ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে দেশময় প্রচারিত হইতেছিল।

৫। যে নিয়মে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এডুকেশন গেজেট প্রতিলিপিত হইয়া থাকে, আমি সেই নিয়মাবলী পাঠ করিয়া সেগুলির মধ্যে আমার দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখিতে পাই নাই, বাহা সাময়িক ঘটনা সমূহের উপর আমার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধকত্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এবং যে নিয়মটিকে সেই নিয়মাবলীর প্রধানগুলিয়া আপনার পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিয়মটিও মদীয় প্রবন্ধে ভঙ্গ করা হয় নাই, কারণ উহা বিনা অনুসন্ধানে পত্র করি নাই।

৬। বৎকালে ঐ প্রবন্ধটি লিখিত হয়, তখন অনেকেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ঐ দুইটানা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্ত একটি 'কমিশন' অচিরে নিযুক্ত হইবে। সেই কারণে আমার মনে সন্দেহ এই ধারণা জন্মে যে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষগণের সরকারী রিপোর্টকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ বা সর্বপ্রকারে সন্তোষকর বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

৭। গবর্ণমেন্ট যে উদ্দেশ্যে এডুকেশন গেজেট পত্রকে সাহায্য করেন, তাহার প্রতিকূলগামী হইতে পারে, এরূপ কোন প্রবন্ধ আমি ঐ পত্রে স্থান দিব, এরূপ অভিপ্রায় কখনই আমার ছিল না, এবং আমি ওরূপ প্রবন্ধ কখনও পত্র করি নাই। কিন্তু সেই বিষয়েই বর্তমান স্থলে আমার কাব্য দৃষ্টিগত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার প্রতীতি শুদ্ধিয়াছে যে, কোন প্রকাশ্য পত্র পরিচালন কার্যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতরূপ কোন না কোন অসন্তোষকর কারণ উপস্থিত হইতে পারে এবং সকল সময়েই উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে দুঃস্বপ্ন হইবে। সেইজন্ম আমি বিহিত সম্মান পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছি যে, মাননীয় লেপ্টনান্ট গবর্ণর মহাশয় অল্পগ্রহ-পূর্বক আমাকে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন কার্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

ভবদীয় একান্ত আজ্ঞাবহ সেবক

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার

[ নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'প্যারীচরণ সরকার' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ]

প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ, এডুকেশন গেজেট, পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন এবং প্রায় দু'বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হজস্‌ন প্রাইট সাহেবের প্রস্তাবে সরকারী ব্যয়ে এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমে কোন প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হ'ত না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সরকার ঐ পত্রিকাটিকে সরকারী মুদ্রণপত্ররূপে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু স্থির হয় যে, সম্পাদকের ওপরেই প্রবন্ধ নির্বাচন ও অভ্যন্তর বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের গোড়া থেকে এডুকেশন গেজেট পরিবর্তিত আকারে ও নতুন নিয়মে পরিচালিত হ'তে থাকে। প্যারীচরণ সরকার ঐ পত্রিকার প্রথম বঙ্গালী সম্পাদক হ'ন এবং তাঁর স্তূর্ত পরিচালনা গুণে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় ও গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রায় দু'বছর পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের (Eastern Bengal Railways) জামনগর ষ্টেশনের কাছে এক দুইটনার ফলে অনেক লোক মারা যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মৃত ও আহতদের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তা অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে, কর্তৃপক্ষের বিবরণ সত্য নয়। প্যারী বাবু ঐ সংবাদে সত্যতা নির্ধারণের জন্তে ঘটনাস্থলে গিয়ে সরজমিনে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারও ঐ বিশ্বাস জন্মে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুধু যে হতাহতের সংখ্যা গোপন করেছেন তা নয়, স্থানীয় কর্মচারীরাও আহতদের সম্পর্কে অভ্যন্তর উদ্দাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঐই অনুসন্ধানের এক বিবরণ ১২৭৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। সেই সংবাদ প্রকাশিত হ'লে

তৎকালীন ছোটলট স্তার উইলিয়াম গ্রে অসন্তুষ্ট হয়ে প্যারী বাবুকে এক চিঠি পাঠান। তার উত্তরে প্যারী বাবু উপস্থিত চিঠি দেন।

প্যারী বাবুর আত্মসম্মান-জ্ঞান কত প্রখর ছিল এবং তিনি কতদূর স্বাধীনচেতা ছিলেন, এই চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আর্টকিনসন সাহেব তাঁকে পরতাগ না করার ভিত্তি বিশেষ অনুরোধ জানান, কিন্তু প্যারী বাবু আর তাতে স্বীকৃত হন নি। অতঃপর ডুনেব মুখোপাধ্যায় এ কার্যভার গ্রহণ করেন।

### রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখের চিঠি

রেভারেন্ড জে. লং সমীপে :—

মহাশয়, দেশের এই অংশে নীল চাব সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাবের পতিচ্যক 'নীলদর্পণ' নাটকের সহিত আপনাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়া সম্ভ্রুতি যে বিবৃতি আপনি দিয়াছেন, আমরা (নিম্নবাক্য-কারিগণ) তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।

এদেশীর সাহিত্যের উন্নতি এবং শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে দেশীয় লোকদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য আপনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশীয় সংবাদপত্র মাধ্যমে আপনাদের যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মনোভাব শাসনকর্তাদিগের এবং স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের নিকট পৌছাইয়া দিবার যে আশ্রয় চেষ্টা আপনি করিয়াছেন, তাহাতে স্থানাসনের কাজ কম প্রশস্ত হয় নাই।

বর্তমানে ভারত গবর্নমেন্ট যে ভাবে গঠিত রহিয়াছে, তাহাতে শাসনব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যে ভাবেই দেশবাসীর মনোভাব এবং মতামত প্রকাশিত হউক না কেন, সে সম্বন্ধে অবহিত হইবার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা জানাইতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য দেশের জনসাধারণের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্তি একান্ত প্রয়োজন এবং দেশী সংবাদপত্রগুলি যে সকল সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, তাহার প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা নিতান্ত মূর্থতা বলিয়া আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

মহাশয়, 'নীলদর্পণ'র অনুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার ব্যাপারে আপনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সুদূর ধারণার সম্পূর্ণ একা রহিয়াছে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রকাশিত মতামত সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগকে অবহিত করিবার গুরুত্বের প্রতি আমরা বরাবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সেইজন্যই এই প্রশংসনীয় উত্তমের ফলে সংবাদপত্রে যে তিক্ত ব্যক্তিগত বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি।

আমরা দৃঢ়তার সহিত একথা জানাইতে পারি যে, নীল চাব সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব 'নীলদর্পণ' সঠিক ভাবে প্রতিকলিত হইয়াছে। আমরা ইহা জানি যে, আসল নাটকে দ্রীলোকদিগের এবং অজ্ঞাত চরিত্রের দ্বন্দ্ব দিয়া এমন অনেক কথা বলানো হইয়াছে, বাহা যাক্ষিত রুচির লোকদিগের কর্ণে পীড়াদায়ক হইতে পারে।

কিন্তু যে সমাজের চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেই সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং ভাবাবস্থা এই অংশগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের অতি প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থিয়ার সকলেই অত্যন্ত স্নায়সত্ত্ব ভাবে অতি মূল্যবান মনে করেন। কথাসাহিত্যের অংশবিশেষের মধ্যে মধ্যে অমাব্যক্ত কথাব্যক্তি থাকার জন্য তাহা যদি মনন করা হয়, তাহা হইলে আমাদের অশঙ্ক্য আছে যে, সেই প্রাচীন গ্রন্থগুলিও জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে চিরকালের জন্য দূরে রাখিতে হইবে। এই একই মানদণ্ডে বিচার করিলে ইউরোপের আধুনিক ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক লেখকদিগের রচনারও সেই দশা হইবে। আমাদেরই কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, আপনাদের এই প্রচেষ্টার যে প্রকাশ নিশ্চয় হইতেছে, তাহা শুধু স্বার্থার্থী এবং কুচক্রীদিগের অপচেষ্টার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"এ দেশের লোকদিগের মনোভাব নীলদর্পণের মধ্যে প্রতিকলিত হয় নাই" এবং "যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বইয়ের বক্তব্য ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এদেশের লোক তারিফ করে না" ইত্যাদি যে সকল ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা তৎক্ষণাৎ চূর্ণিত। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা আমাদের মতামত আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কিছু হইতে পারে না এবং আমরা একান্ত ভাবে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই চিঠি সেই মতান্তরিক ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে।

ইতি—

আপনাদের একান্ত বশবর্ত ভূতাগণ

রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত

রাজা কালীচরণ বাহাদুর

রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ

বাবু রমানাথ ঠাকুর এবং কলিকাতার আরও ৪০ জন ভারতীয়।

[ রেভারেন্ড জেমস লংকে লেখা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ ]

শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" নামক গ্রন্থে 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন—"একদিকে যখন ইতিপূর্বে কমিশন ও পেট্রিয়ারের সহিত বিবাদ প্রচুতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা বাহায়ে বঙ্গসমাজে তুলল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে, তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়দাণী' লো সেই নীল গৌরজে কই ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।"

মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং রেভারেন্ড জেমস লং নিজের নামে ইহা প্রকাশ করেন। তখন আন্দোলনের ডেট গিয়ে উলঙেও পৌছয়। 'হরকরা' ও অন্যান্য কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দেশী সংবাদপত্র এই গ্রন্থটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে থাকে। নীলকরণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মুখপাত্র পাঁড় করিয়ে ১৮৬১ সালের ১১ জুলাই লং সাহেবের নামে নালিশ করেন। লং সাহেব তাঁর জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বিশেষবশে একান্ত করেন নি। তিনি বঙ্গকল থেকে যেমন দেখে

সংবাদপত্র আর দেশীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থের মর্মাণ গবর্ণমেন্টকে জানিয়ে আগছেন, নীলদর্পণের অল্পবাদও সেই ভাবে করেছেন। কিন্তু ভোরেও লং বিচারে 'ইংলিশমান' ও 'হরকরা' সম্পাদক ও নীলকরণের মানহানি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ এ টাকা জমা দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ৪৩ জন কলিকাতাবাসীর লং সাহেবকে লেখা চিঠিখানিতে 'নীলদর্পণ' সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে।

### রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিঠি

মহাশয়—

আপনার পত্র পাওয়া পবম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি পবম উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্ত যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এতদ্ব্যতন বিশেষ বাঞ্ছিত হইয়াছি। জগন্নাথের মন্দিরকে কথা মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতাত্মসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদায়ের স্ত্রী, তবে আপনি অল্পমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুণ্ডিকাঠ, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাজি মহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব বাহারা ভদ্রাক বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কি না?

কোণারকর মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্তি স্থাপিত আছে। আমার বোধ হয় তদৃষ্টান্তেই পূর্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণ বশতঃ এই অশ্বমূর্তি উত্তর-পূর্ব দ্বারে স্থায়ী থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাতেই জয়াবিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্তি নাই, উহাতে এইরূপ বোধহয় যে, পূর্বে উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মূর্তি স্থাপিত ছিল। আমার অল্পভাবাত্মসারে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের দ্বারবর্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্তি আছে, উহাই এক্ষণে জয়াবিজয়ার মূর্তি সিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুলে প্রতি বাসন বৎসরেই কি লাক্ষ্মীর মূর্তি সনাতিত হইয়া থাকে? কিন্তু আমি শুনিয়াছি উক্ত দ্বারে ১০৬০ বৎসর অন্তর স্পন্দিত হয়। আপনি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্ত পুরী ও মন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্তির বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে, জগন্নাথের করমুগল দিককে বিস্তৃত অথবা সমুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই শস্যটির সন্দেহন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় উল্লিখিত বিস্তৃত ইতি—

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

২

মহাশয়—

তিনি দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাপন করিয়া থাকিলাম আপনার ১ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরী

ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুজ্জণ কার্য স্থগিত ছিল। অতঃপর কোণারকের প্রথম শোভনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হয় এক মাস মধ্যে মুজ্জণকার্য সমাধা হইবে। ইতিমধ্যে আপনি কোণারকের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম 'অল্পমান' হইয়াছিল তাহা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরে ভ্রমি বলিয়া তাহা পড়িয়া যায়; এই এক্ষণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আবুল ফজল এবং জগমোহনের অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শোভোক্ত ঘটনাটি ভ্রমি না বলিলে খটিতে পারিত না। ইংরাজি প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নিশ্চিত নহে। নীলাজি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব পূর্ব অটালিকার ভায়ে ভূমি দৃঢ় হইলে বর্তমান মন্দির নিশ্চিত হয়, স্তম্ভরূপ বসিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাক্ষ্মীর নরসিংহ বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। এবং তাঁহার সময় হাটীর সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ নির্দেশের মূল মাঙ্গলা পাঞ্জী এবং তৎকালে মাঙ্গলা পাঞ্জী অবস্থা বিখ্যাসমোহ্য। আপনি মাঙ্গলা পাঞ্জীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইবে। এ অংশ দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ এ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই, স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই, অপর স্থানে কর্তিত হইয়াছে, স্তম্ভরূপ সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই।

মানিকতলা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

২২শে নভেম্বর

[ \* রাজেন্দ্রলালের চিঠি দুটি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ৩য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত ]

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাংলা পত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পুরীকুলের হেড মাষ্টার কীরোরদাস রায়কে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। 'উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল এগুলি লিখিয়াছিলেন।' রাজেন্দ্রলালের পত্রাবলী নানা জ্ঞাতব্য ও আকর্ষণীয় তথ্যে পূর্ণ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রকে লেখা একটি ইংরেজী পত্রে তিনি তামাকের উল্লেখ কোন্ সংস্কৃত কাব্যে (কুলার্ণব তন্ত্র) প্রথম করা হয়, কৃষি বিষয়ে সাক্ষ্যে কি নিবন্ধ আছে, স্মৃতি ও তন্ত্রে কৃষির নিয়মাবলী সম্বন্ধিত যে দীর্ঘ আলোচনা আছে, সেই সব তথ্য সরবরাহ করেছেন।

## মখুন্দান দত্তের চিঠি

12, Ruedes Chantiers, Versailles  
France,—26th January, 1865.

প্রিয় গৌর,

তোমার প্রীতি ও ক্ষমতাপূর্ণ পত্র পাঠাচ্ছি। ইহা পুরানো দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বাবা ও আমি যদিও গুলবাঘের মত গৌরবান্বিত—আমাদের মধ্যে এখনও সেই একই ক্ষমতা পুঙ্খ মুখ কহিতেছে। প্রিয় বন্ধু, তাই নহে কি? তোমাকে অনুরোধ করি, যখনই কোন 'রাইসেল' তোমার বন্ধুর সম্মুখে অসম্মানজনক কিছু বলিবে, নীরব ঘুমায়ে সন্নিহিত তাহাকে প্রত্যাহ্বান করিও। আমি নিরর্থক নহি, পাগলও নহি—ইংলণ্ডে যেমন বলিয়া থাকে—'আগে জান কোনটা কি।' যুরোপে আসিয়া আমার আচরণ, রুচি, ধারণা, এমন কি আকৃতিরও কতখানি পরিবর্তন হইয়াছে, তুমি কল্পনাই করিতে পারিবে না। বন্ধু, বোধ হইতেছে, সে দিন খুব দূরে নহে, যেদিন তুমি নিজেই তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবে। আমি আর পূর্বের দ্বারা অসাবধান, অবিরোধ, আবেগময় নহি। তাহার পরিবর্তে আমি এখন একজন শাস্ত্রমণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তি—যে ছদ্ম যুরোপীয় এবং অনেকগুলি এইশত ভাষার বন্ধুদের সহিত পত্র আদান-প্রদান করিতে পারে। তুমি ধারণাই করিতে পারিবে না আমার কেমন চমৎকার দাড়িগৌরব গড়াইয়াছে। শীঘ্রই আমার একটি ফটো পাঠাইয়া দিব। অবশ্য এখনো আমি তেমনই বোফিষ্টিক আছি, লানট ত ইহা আমার স্বভাব। আমি একটু কবি-প্রকৃতির মানুষ এবং এত কল্পনাবৃত্তির আভিষা মানুষকে সাময়িক ভগ্নতে হ্রাসযুক্ত করিয়া ফেলে। আমার মনে নান' স্বপ্ন, উচ্চাভিলাষ—ভ্রমের বাসনা। কিন্তু ক্রমশঃই আমি বিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছি। এত আশুপ্রচেষ্টা করিয়া। সৌন্দর্য-প্রতিম পুণ্ডিত বন্ধুর নিকট বাস্তবিক জ্ঞান কতটা নিকটই বা স্নায়বিক কথা খুলিয়া বলিব? শোকে আমার নিশ্বাস করিবে, আমার সম্মুখে মিথ্যা রটনা করিবে, বিশেষতঃ আমি যখন বহু দূরে, সেখান হইতে আত্মশুদ্ধ সমর্থন করিতে পারিব না—ইহাতে আমার অন্তস্তত্ত্ব বিরক্তি বোধ হয়। সত্য যেন মিথ্যাকে ভ্রুণটির সন্নিহিত নির্ধাক করিয়া দেয়। বন্ধু, যেমন উচিত তেমন ভাবেই এই কাপুরুষোচিত ঈর্ষার প্রতিবাদ করিও।

কবে দেশে ফিরিব জানিতে চাহিয়াছ? মাঘ চ্যাটার্জী এবং দিগম্বর মিত্র কর্তৃক যদি নিরর্থকভাবে উপেক্ষিত না হইতাম, এই মাসেই আমি বাবে বোগ দিতে পারিতাম। কিন্তু এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে হৃদয় আমাকে এক বৎসর কিংবা তাহারও বেশি অপেক্ষা করিতে হইতে পারে।

আমার প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর আমাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবে, আমার প্রতি কিরূপ জয়ন্ত ব্যবহার করা হইয়াছে। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই ইহা লইয়া আমি আর আলোচনা করিতে চাহি না। মাসের পর মাস আমি ফ্রান্সে নোঙরবদ্ধ জাহাজের দ্বারা অচল হইয়া আছি; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এত দুঃখের মধ্যেও ইতালীয়, জার্মান ও ফরাসী এই তিনটি প্রধান সাহিত্যসমৃদ্ধ এবং শিক্ষণীয়

ভাষা শিখিবার মত মানসিক বল ও ঈর্ষা অটুট ছিল। জান গৌর, প্রধান যুরোপীয় ভাষার জ্ঞানলাভ করিবার গৌরব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশাল এবং সমৃদ্ধ রাজ্য জয়ের সমতুল্য। যদি প্রত্যাবর্তন-কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা রাখি, আমার শিক্ষিত বন্ধুদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সেই সকল ভাষার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব। মাতৃভাষার প্রীতিবোধসম্পন্ন ও অমূল্যজন করিবার মত সাধনা আর কিছুই নাই। তোমার কি মনে হয়, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স, জার্মানী বা ইতালীয় এখন কবি ও প্রাবন্ধিকের প্রয়োজন? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, মিশনের দ্বারা স্বদেশ এবং মাতৃভাষার ভগ্ন কিছু করিবার মহৎ উচ্চাভিলাষ যেন আমাদের দেশের বীমানসেও উৎসাহিত করে। আমাদের মধ্যে যদি কেহ মৃত্যুর পর নাম রাখিয়া বাইতে উদ্ভীৰ্ব হয় এবং পশুর মত বিশ্বস্তির গর্ভে কলীন হইতে না চায়, তাহা হইলে তাঁহাকে মাতৃভাষার সাধনার আত্মনিরোগ করিতে হইবে। ইহাষ্ট তাঁহার প্রকৃত অধিকারের ক্ষেত্র—স্বার্থ উপাদান। যুরোপীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা ভাল, ইহা আমাদেরিগকে পৃথিবীর স্তম্ভ দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়া তুলিবে, কিন্তু আমরা যখন বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কিছু বলিব, তাহা যেন মাতৃভাষাতেই বলিতে পারি। বাঁহারা নিজদের মৌন চিন্তার অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যেন মাতৃভাষার শরণাগত হন। বাঁহারা নিজদের কৃষ্ণকায় মেকলে, কালিহিল, থাকারে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তোমার কাছে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তৃতা। একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা সেরকম কিছুই নহেন। যে ব্যক্তির নিজের ভাষার উপর অধিকার নাই, তাঁহার শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইবার প্রবন্ধনাথ আমি বিজ্ঞার দিই।

তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের ভগ্ন ভূমিত। আশঙ্কা হইতেছে তোমার বাবা মায়ের ভ্রাতৃ স্নেহ তাহাকে মানুষ হইতে দিবে না। অবশ্য একথা মনে করিও না যে, আমি তাঁহাদের মনোভাবের প্রতি তোমার পুত্রোচিত শ্রদ্ধাকে নিন্দা করিতেছি।

তুমি আমার ভগ্নবন্ধের ঠিকানা দিয়া চিঠি লিখিয়াছ। এই ভগ্নবন্ধ কি আমার ভগ্নভূমির নদীতীরস্থ ভগ্নবন্ধ? সম্প্রতি আমি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের কাব্য পাঠ করিতেছি এবং তাঁহার ভক্তকবিতা কয়েকটি সনেটও লিখিয়াছি। সেগুলির মধ্যে একটি এই রূপোত্তম নদীকেই উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। সেইটি এবং আরো একটি কবিতা তোমাকে পাঠাইলাম। আমার কয়েকজন যুরোপীয় বন্ধু দ্বিতীয়টি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কবিতাটি তাঁহাদের অনুবাদ করিয়া দিতেছি। জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে অনুগ্রহ করিয়া সনেটগুলির প্রতিলিপি বন্ধুঈ এবং বাঁহারাধ্যয়কে পাঠাইও এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইও। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, সনেট অর্থাৎ "চতুর্দশপদী" কবিতা আমাদের ভাষাতেও সম্ভব হইবে। অদূর ভবিষ্যতে চতুর্দশপদী কবিতার একখানি গ্রন্থ রচনা করিব আশা আছে। আমি আর একটা কবিতা পাঠাইলাম, এইজন্য এইটুকু আত্মম্বাধা করিতে পারি যে মৃত্যুর পর দিন হইতে আজ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র রায় এমন মার্জিত প্রশংসা করনই লাভ করেন নাই। আমাদের ভগ্ন নানা ভাবে কবিতা পাঠাইলাম। আমার ইচ্ছা যে, তুমি রাসেন্দ্রকে এইগুলি

সেখাও, কারণ সে উত্তম বিচারক। কবিতার এই নূতন ঠাইল সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। প্রিয় বন্ধু, একথা বিশ্বাস করিও যে, আমাদের বাংলা অতি চমৎকার ভাষা—অতীব শুধু প্রতিভাবান পুরুষের—যিনি এই ভাষাকে মার্জিত করিয়া তুলিবেন। আমাদের মত বাহ্যার শৈশবেব জটিল শিকার ভক্ত এই ভাষা অল্পই জানি এবং ইচ্ছাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, তাহার বিরম জ্ঞাত। ইচ্ছা কিংবা ইচ্ছার মধ্যে মজতী ভাষার উপাশন আছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, বাংলা ভাষার চর্যার আত্মনিয়োগ করি, কিন্তু তুমি ত জান নাহিচিন্তা করি হানন করিবার মত লক্ষ্যই আমার নাই এবং জীবিত। নির্বাচনের উপযোগী প্রকৃত কালের মত আমি কিছুই করি না। আমি অতি নবিতা, চর্য্যে এত গণিত যে চিরদিন নবিতা থাকিতে চাই না। আমাদের দেশে অর্থ ছাড়া লক্ষ্য পাটবার কোন উপায় নাই। তোমার অর্থ থাকিলেই তুমি স্বতন্ত্র, যদি না থাকে কেহই তোমাকে আয়ল দিবে না। ভাষা হিসাবে আমরা জ্ঞাতও নিকট। আমাদের মধ্যে কাহারা বড়মানুষ? চোরবাগান আর বড়বাড়ার ‘কেউ মন’-রা? রোজগার করিও বন্ধু, টাকা রোজগার করিও। যদি আমার প্রতিভা থাকে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু না করিয়া থাকি, সে আমার প্রতিভা বিশ্বাসের পক্ষে পূর্ণ আর্থিক সম্ভবিতাই অভাবে, এক আমি বহুটুকু করিতে পারিহা। দেশকে তাকা লইয়া সমস্ত থাকিতে হইবে।

বাক্য, শিলাস্তরের আসা বাক্য। আইন শিকার ভক্ত যদি সত্য সত্যই এবং গভীরভাবে যুরোপে আসিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, আট হইতে দশ ভাষার টাকার মধ্যেই সব সন্ধান হইবে। অল্প যদি সব কিছু তোমার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি পারিবে না। কিন্তু আশা করি, আমি তোমার অনেক উপকার করিতে পারিব। তুমি সত্যই আগ্রহাশিত, এ কথা জানাইলে আমি তোমাকে নীচ পর পাঠাইব। তাহা যে কোন গাইডের মত মূল্যবান হইবে।

প্রতি ডাকে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছ। কিন্তু বন্ধু, দাখ করিলে আমাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে চারখানি চিঠি লিখিতে হবে, তাহা দেখিয়াছ কি? আমি অলস নহি, তাহা ছাড়া স্বাধীন বা তোমার পাঠাইব? বাহা হউক, পুরাতন বন্ধুকে আমি কেবারে বিমুত হইব না মাঝে মাঝে তাহাকে সন্ধান করিব। আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সকলকে আমার কথা মনে করাইয়া দেব আর আমার কার্যকলাপের কথা বলিবে।

রাজেন্দ্র পুত্রের ভ্রম উপলক্ষে তাকে আমার অভিনন্দন নাইতেছি। ছোট ছেলের যেন তাহার বাবার মত বড় হইয়া। তোমার পরের চিঠিতে কোচবিহারের হতভাগ্য মহারাজা ও লোকামোহন ঠাকুরের সন্ধান চাই। রৈলোকামোহন ঠাকুরের বহু বীণাভর হইয়াছে শুনিয়াছি। তাঁহার হতভাগিনী মরণ ভ্রম হইতেছে। হয়ত সেই হতভাগিনী এতদিনে মরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ঈশ্বরকে বন্দবান, মিসেস ডিও ছোটরা ভালই আছে। আগামী মাসে লণ্ডনে ফিরিব আশা করি। কাজেই আগের ঠিকানাতেই মত চিঠি লিখিও। ইতি—

তোমার চিরায়ত্ত  
মাইকেল এম এল বসু

[ নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মুদ্রাবতি' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অংশ ]

গৌরীশ বসাককে লেখা মুদ্রাবতীর এই চিঠি থেকে শুধু তাঁর ফ্রান্স প্রবাসের কথাই নয়, তাঁর চিন্তাধারা এবং আদর্শের পরিবর্তনের কথাও জানা যায়। যিনি প্রথম বয়স থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে মহাকবি হবার উত্কালাঙ্কায় বিচোর থাকতেন এবং ইংলণ্ড যেতে না পারলে জীবন ব্যর্থ বলে মনে করতেন, তিনিই পরে মাতৃভাষার প্রতি কতখানি অধরক্ত হ'ল, এই চিঠিতেই তার স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই চিঠিতে মুদ্রাবতীর লিপ্যবলি রৈলোকামোহন চক্রবর্তী সম্পর্কে যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাও লক্ষ্যীয়। রাজেন্দ্র এবং বতীয়ে হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বতীয়েমোহন ঠাকুর।

### মুদ্রাবতীর মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

২৮শে মার্চ, ১৮৭২

হুজু

পরমপ্রণাম্য

শ্রীযুক্ত মাইকেল মুদ্রাবতীর বক্তৃতা মহাশয় মহোদয়ের—  
জাই,

তুমি যন্ত্রণীত হেফটের বধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরম্পর সত্যার্থ সম্বন্ধের এবং বাংলা প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ, আমি কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিমুত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনকালে প্রবলতর আশা প্রাণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিজ্ঞার সঞ্চিত করিতাম, তোমার মুঠাভুই তৎসমুদয়ের উত্তরক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরম্পর কত কথাই হইত—কত পরামর্শ হইত, কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে স্মরণ কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আশা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আচরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা স্বর্ধনপূর্বক বাঙ্গালার অস্থিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল স্মরণ ইংরেজী পত্র রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতে জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেই কাব্য মেঘনাদ বধ, বীরসেনা, ব্রজসেনা অথবা হেক্টর বধ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরেজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রসিদ্ধি হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত পরিমাণ তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধগত ছিল। তুমি ত্রিমুখ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিপ্রসঙ্গ সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজী ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সম্ভব হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সম্ভব হয়। তুমি



অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্মজ্ঞ হইয়াছিলে, বৈয়াকরণ ইংরাজিগণের সম্ভাব্য করিতেছে, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সম্বন্ধে সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। কল্যাতঃ তোমার প্রণীত যে কবিতা ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্বল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিখ্যাত হইয়া নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থ আর তোমার মেঘনাদ বধ প্রভৃতি বাঙ্গালী গ্রন্থে কত অন্তর। তোমার বাঙ্গালী কাব্যগুলি তোমাকে এতদেবীয় শিক্ষিত মনের মুখবন্ধ, তাহানিগের গৌরববন্ধ, এবং তাহানিগের পথপ্রদর্শক-বন্ধ কথিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক জীবন বিন্দুশীল এবং তোমার কবিত্বশক্তি চিত্ত-প্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

তলীর জীতদের মুখোপাধায়

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-মুতি' থেকে উদ্ধৃত]

মধুসূদন তাঁর হৃদয়-বধ কাব্য জুড়ের মুখোপাধায়কে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ-পত্র পড়ে জুড়ের এই চিঠিখান লেখেন।

### রাজনারায়ণ বসুর চিঠি

১

দেওঘর, ৪ আশ্বিন, ১২১০

মাননীয় জীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

সবিরল নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্নত মাতৃক; তাহা অল্প মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দগত বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাতকরত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিজ্ঞানরূপ দেশের লোক সাধারণতঃ লোক; কেহ কাহাও কথা শুনে না। ভাষানিগে বসে আনা মুখিল। "Irritable vates trition" আশা অল্পবোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে, যথা উপবীপ, প্রাণালী, যোজক, অমুজান, উমুজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে চুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে, তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় চুক নাই কিন্তু পরে চুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা কথিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্বারা ভাবী গ্রন্থ-কর্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সুরোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারে না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার ঠাঁড়িয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা হইবে? English Channel একটি

উপসাগরের নাম; Channel শব্দ কেবলমাত্র জল হইবার রাজ্য ব্যতী, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখনও খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জন্মিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্তে এখন "হুলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোক বিভাড়াবহুচক (pedantic) মনে করিবে।

ইতি—

কল্যাণ

রাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে, তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালী অভিধানে উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

২

মাক্জের্ট্রীল জীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কুমার দেব বাহাদুর, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপে—  
সবিরল নিবেদন,

অন্ত Bengal Academy of Literature পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম স্টিওয়ার্ড সাহেব পরিষদের কার্য বাঙ্গালী ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য—আমার এই মত বণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালী ভাষায় প্রকৃত রূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য, তাহা হইলে সেই মত ঘোষণা করা কর্তব্য যে, কোন গবর্ণমেন্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি ইহা ব্যতীত ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সংবাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অন্যায় প্রেরিত করিবেন। কেবল বাঙ্গালী ভাষায় পরিষদের কার্য সম্পাদিত হইবে—এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতগুলি সমস্যা ছাড়িয়া যাইবে বটে কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে বাঙ্গালী কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালী পারেন না, তাহার বাঙ্গালী লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্ত কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য কেবল বাঙ্গালী ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অমূল্যলব্ধ করিলে সে খ্যাতি লোভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহ্যল।\*

কল্যাণ

রাজনারায়ণ বসু

[\* শ্রী রাজনারায়ণের চিঠি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র চতুর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

উনিশ শতকের অষ্টম দশকে কলিকাতা "সারস্বত সম্মিলন সমাজ" বাংলা পরিভাষা রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করে

জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থ ঠাকুর এই সমাজের প্রাণধারণ ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ততঃ সম্পাদক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান নামের পরিভাষা রচনা করে সমাজ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসু সেই পুস্তিকাটি দেখে এই পত্রটি লেখেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার" এর সভাপতির উদ্দেশ্যে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথমে এই নামে অভিহিত হ'ত। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই ১৮৯৩)। সভার কার্য বিবরণ ও প্রবন্ধ প্রকৃতি ইংরেজীতে লেখা হ'ত। রাজনারায়ণ বসু সভার কাজ বলসার সম্পাদন করার অমরোধ জানিয়ে এই পত্র পাঠান।

### গৌরদাস বসাকের চিঠি

কলিকাতা, খিদিরপুর

১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৫

প্রিয় মধু,

অনেক বৎসর পর তোমার চিঠি লিখিতেছি। দুই জনের মধ্যে এই দূরীণ নীরতা আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুতর এবং অনিচ্ছাকৃত ক্রটি বলিয়া মনে করি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কতবার আমি তোমার কথা ভাবিয়াছি। আমার সেই চিন্তা গীরবতার সমাধি হইয়াছে, স্থির পথ পায় নাই। কারণ আমি আমার ঠিকানা জানিতাম না এবং তুমি কোথায় ও কি ভাবে আছ তাহার বিলুপ্তিও জানিতাম না। প্রত্যেকের নিকট তোমার বাদ লইতে চেষ্টা করিয়া বার্ষ হইয়াছে। তুমি কোথায় থাক এবং কি কর, কেহই বলিতে পারে নাই। অসুখে এই ভুলোক আমার এই দূর পত্রটি তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব লইয়া আমার কৃতার্ব করিয়াছেন। কিভাবে ব্যাপারটি ঘটিয়াছে তাহার নিকট তুমিও এবং ইনি যে তোমার লজ্জা কষ্ট স্বীকার করেন, সেজন্য ইহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইও।

চিঠির ঠিকানা ও তারিখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে, যে স্থান হইতে আমি চিঠি লিখিতেছি, সেই স্থানেই তোমার শৈশব এবং জন্ম—না, বরং বলা উচিত তোমার যৌবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি কোথা হইতে এবং কি লজ্জা এখানে আসিয়াছি, তাহা এই চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তোমার হইতে চাহি না। ইহার পূর্বে এইভাবেই তোমার চিঠি লিখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু আমার উপাশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমিই হইলাম। তুমি হয়ত মনে করিবে বিশ্বস্তির লজ্জা কিন্তু তাহা নহে, আমার ঠিকানা না জানিবার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। কোন চিঠি আমি তোমার ভুলিতে পারি না, কারণ তোমার প্রতি আমার ইচ্ছা আমার গভীর ভালবাসা বহিয়াছে। সেই ভালবাসা আমার ও বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার ওজ্জ্বল্য নাই বটে কিন্তু অগ্নি ও আলোয়মান। আবার সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তোলা, হইল দেখিবে সময় ও দূরত্ব তোমাকে তোমার ঘরবাড়ি, পুত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিলেও প্রীতির উত্তাপে সেই অগ্নি শিখা বিগুণ তেজে উঠিবে। আমার অজ্ঞাতা কর্তৃক হইলেও সুস্বিকৃত, কিন্তু নিজেকে সোমস্কৃত বলিতে পার না। নিজেকে তুমি যতখানি

জান, ঠিক ততখানি আমাকে এবং আমার ঘরবাড়ি, আত্মীয় স্বজন সব কিছুকে। ইচ্ছা করিলেই যে কোন মুহূর্তে তুমি আমার চিঠি লিখিতে পারিতে কিন্তু তাহা তুমি কর নাই। আমি মৃত না জীবিত তাহাও কখনও জানিবার চেষ্টাও কর নাই। কিন্তু এখন আর সেবারোপের সময় নাই, অতীত অতীতই। এবং আজ যখন আমরা পরস্পরকে কলনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইতেছি তখন বগড়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। আজ আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ এবং মন ভাবাবেগে অভিভূত। আশা করি, এই পৃথিবীতেই আবার আমরা মিলিতে পারিব। এখনও সব শেষ হয় নাই। তাহাই বেন হয়। ঈশ্বর কল্পন বেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

তোমার মুখের কথা শুনিবার প্রত্যাশায় আমি যে তীব্র উদ্বেগ এবং বহুশালায়ক অস্থিরতা ভোগ করিতেছি তাহা আমি তোমার নিকট ভাষ্য বাক্য করিতে পারিব না। তোমার স্বাস্থ্য এবং মুখের আনন্দদায়ক সংবাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বর্ণগতা হইয়াছেন। তাহার আত্মার শান্তি হউক।

বড়ই দুঃখিত যে, তোমার অর্ধাঙ্গ তোমার পিতার পরিবারের কোন সুসংবাদই তোমাকে দিতে পারিলাম না। তুমি বহু পূর্বেই হয়ত শুনিয়াছ যে, তোমার পিতা-মাতা উভয়েই মারা গিয়াছেন এবং তোমার ধর্মভ্রাতার পুত্রগণ তাঁহাদের সম্পত্তি লইয়া মাঝামাঝি করিতেছে। তোমার দুই বিমাতা এখনো জীবিত কিন্তু তোমার লোভী ও স্বার্থপর আত্মীয়েরা তোমার পিতার সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের প্রায় বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে। সময় থাকিতে ফিরিয়া আসিলে সকল যে-আইনী দাবীদারদের বার্ষ করিয়া তুমি তোমাদের জমিদারীর মালিক হইতে পার এবং স্বর্নশা মাগলা হইতে পরিবারকে রক্ষা করিতে পার। তুমি কি করিবে? বর্তমানে তুমি কি কর? আশাকরি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আমার আছে এবং তুমিও উত্তর দিতে দেয় করিবে না। তোমার নিবটেই শুনিয়াছিলাম, তুমি বিবাহ করিয়াছ। ক্রমবর্ধমান এবং আনন্দপূর্ণ সাংসারিক পরিবেশে সুখেই আছ, আশাকরি!

তোমারই একান্ত—

গৌরদাস বসাক

[ নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুসূতি'তে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ ]

গৌরদাস বসাকের এই চিঠির প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম "মধুসূতি"তে লিখাছেন— "১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মধুসূতনের পিতা স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুসংবাদ কেহই তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন নাই। মধুসূতনের পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। মধুসূতনও ইহলোকে নাই, এই অলীক ধারণায় আত্মীয়েরা তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবার একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। রেভারেন্ড কে, এম, ব্যানার্জী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাজাজ্জ ভ্রমণে গান; গৌরদাস এই সুযোগে মধুসূতনের পিতার মৃত্যু, বৈয়দিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিবৃত করিয়া, ...পত্রখানি 'কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়'র হস্তে প্রদান করিয়া মধুসূতন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া জানিবার নিমিত্ত অমরোধ করিলেন। কৃষ্ণ

মোহনও তাঁহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া প্রবাসী মধুসূদনকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে প্রবিক্রান্ত হইলেন।

### গিরিশচন্দ্র ঘোষের চিঠি

কলিকাতা, ২রা আগষ্ট, ১৮৭৭

প্রিয়বন্ধু,—

ক্রমেই গোলমাল পেকে উঠছে। আমাদের পথে পথে সৈন্ত টহল দেবে, ভলান্টিয়ারদেরও খবরদারি শেষ থাকবে না। আসিবে মহরমকে ওরা বোমা বা শেল মনে করেছে। এই বোমা বা শেল যদি ফাটে, তাই ওদের দুঃস্বপ্নের শেষ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বারাকপুরের সৈন্তদলের যখন হাতাত্যার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তখন এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বাড়িগার্ডরা একটু চকল হলেও সাথায় মাত্র ৩শ। আমাদের কর্ণেল গোল্ডী ছুটিতে বস্ত্রপূর গিয়েছিলেন, সেখানে বেচারাকে মেরে ফেলেছে স্তন্যন্তে পেলাম। সুবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে এক অমূল্য মিত্র হারালাম। শরতান বিদ্রোহীদের উপর দশ হাজার বজাঘাত চোক। একথা সত্য কেউ বলতে পারে না, যাগা প্রকৃত বিধাসী সৈন্ত, তারাত কত নীগণির তাদের উপরি-ওয়াল অফিসারদের গুলী করবে এবং নিরস্ত্র পাখণ্ডের দলে ভিড়ে যাবে। আশা করি, তোমার ও ছোট্ট ঠেশানে কোন ভয়ের কারণ নেই।

অনেক আয়োজন ও পাণ্টা আয়োজনের পর আমাদের কলন হচ্ছে। মনে হচ্ছে; বাবা এখানে কাঁকাকে লিখেছেন যে, উৎসবের সব খরচটা (আমাদের অংশ বাদে) তিনি গোপনে কাকার হাতে দেবেন। কাকার অরণ্য এতে কোন অংশ নাই। দেখ, তাহ'লে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের সব মতলব কাঁসিয়ে দিলেন ১০০ কাজেই বুঝতে পারছ, আইরিশ ক্যাপ্টেনের পিস্তলের সামনে ঝাঁড়িয়ে—“Night thoughts”—এর লেখক যেমন নাচ নেচেছিলেন, আমাদের আনন্দ প্রায় তেমনই ঝাঁড়াবে। কিন্তু আমি ও গ্রাছই করিনে। আমার চণ্ডীর খুব স্বর—মনে হচ্ছে, কার্তিক ঘোষের বাত্মা আর স্তন্যন্তে পেলাম না।

তোমার গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[ ভীমব্রথনাথ ঘোষ প্রণীত “The life of Girish Chandra Ghose” নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ ]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাই ভীমব্রথনাথ ঘোষকে এই চিঠি লেখেন। ভীমব্রথনাথ ঘোষ সে সময় বালেশ্বর এবং ভদ্রকের ডেপুটি কালেক্টর। গিরিশচন্দ্র তাঁর ভাইকে যখন এই চিঠি লেখেন, সে সময় হরিশচন্দ্র নৃনাথপাণ্ডার “হিন্দু পেট রুটের” সম্পাদক।

এই চিঠিতে গিরিশচন্দ্র কর্ণেল গোষ্ঠীর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। কর্ণেল গোষ্ঠী সে সময় অডিটার জেনারেল। তিনি দেশীয় কর্মচারীদের ঘৃণা করতেন না, বরং তাদের শুভাৰ্থী ছিলেন। কর্মকর্তাই ছিল তাঁর প্রাণসংসার মাপকাঠি। এই উদার-স্বভাব রাজসুত্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কানপুর বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হ'ল।

সিপাহী বিদ্রোহের সুবাদে কলিকাতার বিদেশী অধিবাসীরা যে

কতদূর সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রের এই চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে ইংরেজরা দেশীয় লোকদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জগত গবর্ণমেন্টকে চাপ দিতে থাকেন। মুলসমানদের মহরম এসে পড়ায় তাঁরা আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী তাঁর “Power of Presentation” বলে গবর্ণর জেনারেলের কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব করেন যে, মহরমের আগেই যেন দেশীয় লোকদের নিঃস্ত্র করা হয়। গিরিশচন্দ্র এবং হিন্দু পেট রুটের সম্পাদক হরিশচন্দ্র এর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংও সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। বিদ্রোহের সময় গিরিশচন্দ্র “হিন্দু পেট রুট” ভলান্টিয়ারদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।

### মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

কবির স্বস্তি-লিখিত তিলোত্তমা কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানি উপহার পাইবার পর কি ভাবে হস্তগত দিলে যথাযথ হইবে জানি না। আমি পূর্বম যত্নে এটিকে আমার প্রত্যাগারে রক্ষা করিব। কারণ ইহা আমাদের সাহিত্যে এক মহান যুগের মারক। এই পাণ্ডুলিপি খানিতেই সেই পরম স্মরণীয় বন্দী হইয়া আছে, যখন সর্বপ্রথম মিত্রাক্ষরের বন্দীদশা চোটেইয়া বাংলা কবিতা উজ্জ্বলিত হইয়া আপন মহান রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। একদা এই কাব্য তাহার যথাযথ মর্যাদা পাইবে এবং স্বমহিমাতেই আগামী যুগের বসিকল্পিত প্রজ্ঞার আসন অধিকার করিবে। আমার বিশ্ব বিশ্বাস যে, যদি আমার বংশধারা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে একদা আমার বংশধরগণ এই কথা ভাবিয়া গর্বাধা করিবে যে, তাহাদের মাতৃভাষার অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপিখানি সর্বপ্রথম কবির আপন হস্তাক্ষর বহন করিতেছে—তাহা তাহাদেরই অধিকারে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারাও তাহাদের এই পূর্বপুরুষকে এই কথা ভাবিয়া আরও সম্মান করিবে যে, এই ব্যক্তি এমনই ভাগ্যবান ছিলেন যে, কবি স্বয়ং তাঁহাকে এমনই অমূল্য একটি উপহার প্রদানের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কাহ্নমোহনাব্যক্ত প্রার্থনা করি—আপনি নীর্থজন লাভ করি অপরিমেয় রচনা-সম্পদে আমাদের মাতৃভূমির সাহিত্যকে অলঙ্কার করিতে থাকুন।

ইতি—

বংশাবদ

জে এম ঠাকুর

২২ মে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ

মধুসূদন “তিলোত্তমা” কাব্যের পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। এই পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মধুসূদনের স্বহস্তে লেখা অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের সেই পাণ্ডুলিপি শ্রী যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে যে চিঠি লেখেন, তার কিছু অংশ নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধুসূতি’তে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অঙ্গবাদ এখানে দেখা হ'ল।

## কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

দার্জিলিং,

৭ জুলাই ১৮৮২

ভক্তিতাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রশংসা পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনাদের সেই পুণ্যতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন 'ব্রহ্মানন্দ' নাম। যদি ব্রহ্মোক্তে আনন্দ হয় তদনুশীল্য অধিক ধন মানুষের ভোগ্য আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাত্মনে ধনী করিয়াছেন, বিশূল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরও অধিক শান্তি ও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; ইহা কি পুরাময় পদার্থ। সে সুখ দেখিলে কি চুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্রাণিত হয় এক পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। \* \*

[ অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি আশীর্ব্বাদাকাজনী দেবেশ্বনাথ ঠাকুর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ] শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মহর্ষি দেবেশ্বনাথের সঙ্গে মতান্তর হওয়ার কেশবচন্দ্র ভারত বীর ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও কাজ নিয়ে দু'জনের মধ্যে এক সময় খানিকটা তিক্ততার সঞ্চিত হয়। কিন্তু দেবেশ্বনাথ বরাবর কেশবচন্দ্রকে স্নেহ ও সম্মান করতেন। কেশবচন্দ্রের অন্তরেও তাঁর পবিত্র মর্যাদা রক্ষিত ছিল। এই চিঠির মধ্যে সেই প্রকার ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

## দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

১

মহাশয়,—

বঙ্গা ঠান্ডানারমান। গঙ্গাভীরে, ঘর সমীরে, বসন্ত সুখঃ বিজনাথঃ। আপনার শরীরাদির ভাবগতি কিরূপ? একটু নিভৃত হইবার ইচ্ছা হয় কি? গাছগাছালির শ্রিঙ্ক ছায়ায় ঠাণ্ডা হইবার ইচ্ছা হয় কি? বিস্তৃত এবং বক্রায়মান গঙ্গা দর্শনের ইচ্ছা হয় কি? গঙ্গার নৌকা ছন্দন কখন এমনি ভাবে অবস্থিত করে যে, যেন

এক প্রসারিত কুচিত রূপার পাতে কোন বারিগর নৌকাটিকে বসাইয়া রাখিয়াছে। যে গঙ্গা প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, বিপ্রহর কালে, রাত্রিকালে, অপরাহ্ন কালে, সকল কালেই রমণীয়। যে গঙ্গার সমীরণে শরীর গতঃস্থ হয়। যে গঙ্গার দর্শনে শরীরের পাপ ও নয়নের তাপ দূরীভূত হয়। যে গঙ্গা প্রেমস্তু। যে গঙ্গা বিশালা। যে গঙ্গায় তীর-তট অজগামী তপনদেবকে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া উজ্জল হয়। এবজুতা যে গঙ্গা, ইহা 'ব্রহ্মসাধন'কারীর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, ইহা যেন আমি ও তাকে দেখিতেছি। কিন্তু এই মানস প্রত্যেক হবে চান্দ্র্য প্রত্যেকে পরিণত হইবে, ইহাই এক্ষণে ভিজ্ঞাত।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

২

দীন হিজের রাজদর্শন না ঘটবার কারণ।

টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা

না যত কোন ভাল।

বিভাবুকি কিছুই কিছুনা

খালি ডেরে ঘি ঢালা।

ইচ্ছা সমক তব দরশনে

কিন্তু পাথের নাস্তি।

পায়ে শিল্পী মন উড়ু উড়ু

এক দৈবের শাস্তি।

শান্তিনিকেতন ১৭ ফাল্গুন

৩

প্রীতিভাজনেষু,—

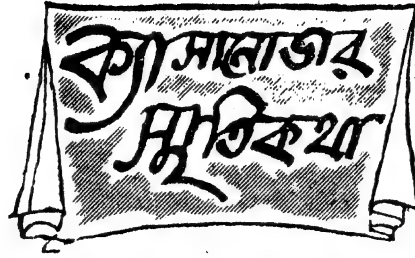
আপনার দ্বিতীয় পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনাকে ইহা বলা বাহুল্য যে, বিবাহের পাত্রনির্বাচনের বন্ধিপাথর—প্রেম, জন্তরী-জ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাকনের যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অমুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অমুমোদিত, তাহা সর্ব্বথা অতুষ্ঠাতব্য। আইন রক্ষার্থে বাহা আবশ্যক তাহা দেশকালপাত্র-বিবেচনা-মতে অতুষ্ঠাতব্য। কিন্তু এটাও দেখা উচিত যে, আইন যদি বর'কে জোর করিয়া বলাইতে চায় "আমি চিন্তা নহি", তবে আইনের সেই বলগত কথার জোয়ালে ঝাড় শাতিয়া দেওয়া প্রথম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের দ্বারা অত বড় একটা মাল্লিক অতুষ্ঠানে অমন দ্বারা একটা কাপুরুষোচিত নীচ স্বীকার করা যবের পক্ষে কোন ক্রমেই খোতা পায় না—যাবার বাখী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[ রাজনাগর্য বসুকে লেখা এই পত্রগুলি 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' বই খণ্ড থেকে উদ্ধৃত ]

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

ই অষ্টমাস্য দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধুবান্ধবী কাছে মাছিকতা দকা করা যেন এক দুর্বিষহ বোঝা বহনের সামিল হইয়া উঠে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, ইহা আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও পক্ষপত্তন, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ বিবাহে কিংবা বিবাহ-বিক্রিতে, মর্যতো কারও কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার যুষ্টি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত বসুমতী আবেশের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রথম ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর তার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা তেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রহ-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিবরে যে-কোন জাতবোর জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



[আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইটালী নয়। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত আর সংস্কৃতির পীঠস্থান, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালীর তিনিশ শহরে জন্মগ্রহণ করেন ক্যাসানোভা, ইং ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে। এই বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিকথা পৃথিবীর সাহিত্যে বিশেষ এক স্থান দখল করে আছে, যদিও একদা দেশে দেশে ক্যাসানোভার স্মৃতিকথাকে অশ্লীলসাহিত্যরূপে গণ্য করা হয়। ১৮শ শতাব্দী যেন স্মৃতিকথার যুগ। ব্রেঙ্কি জা লোটেটিন, ফলো, মাদাম রোলাণ্ড; ডুন্নশ এবং ছামিল্টন প্রভৃতি বিখ্যাতদের আত্মস্মৃতি এই সময়েই লিখিত হয়। ক্যাসানোভার জীবনও খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। ত্যাগ নয়, ভোগ। পানপানের শেষ বিলুটুকু পর্যন্ত পান করাই ক্যাসানোভার আদর্শ। একের পর এক নারীর সাহচর্য পাওয়ার মধ্যেই ক্যাসানোভার ভোগের তৃপ্তি। পৃথিবীর বহু দেশে তিনি ঘুরেছিলেন। যথা, রোম, টুরিন, নেপলস, জেনোয়া, ত্রিয়েস্ট, করফু, কন্সটানটিনোপল, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ, পিটার্সবার্গ, বেলিন, ভিয়েনা এবং ওয়ারশ। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। যেমন, ফ্রেডারিক (২য়); ক্যাথারিন দি গ্রেট; পোপ বেনিডিক্ট (১৪শ); ভর্ক (৩য়); মার্কুই ডে পম্পাদোর প্রভৃতি। ভবিষ্যতের বহু সাহিত্যিক ক্যাসানোভার ভক্ত হয়েছিলেন। ফ্রান্সে দুইগু তথ্যে অল্পতম। ক্যাসানোভার স্মৃতিকথার অংশবিশেষকে বাতিল করার তিনি যোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। পৃথিবীখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক হাভেলক এলিশ এই স্মৃতিকথাকে অশ্লীল সাহিত্য হিসাবে ধার্য করতে পারেন নি। এলিশ বলেছেন: "Casanova has been described as a psychological type of instability. That is to view him superficially....Casanova chose to live. A crude and barbarous choice it seems to us." ক্যাসানোভা নিজে বলেছিলেন তাঁর আত্মস্মৃতি প্রসঙ্গে: "My story is that of a bachelor whose chief business in life was to cultivate the pleasures of the senses." ইঙ্গিতসম্বলিত ক্যাসানোভার অভিজ্ঞতা ছিল বহুবিক—ভবিষ্যতের নয়নারীর কাছে যাদের মূল্য খুবই কার্যকরী হয়েছিল। হাভেলক এলিশ আরও বলেছেন: "He sought his pleasure in the pleasure, and not in the complaisance of the women he loved, and they seemed to have gratefully and tenderly recognized his skill in the art of love making. Casanova loved many women...." আনন্দের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার ফরলেশহীন আত্মবিবরণের এই বিখ্যাত স্মৃতিকথা এ যাবৎ বাঙালি ভাষায় অপ্রকাশিত ছিল। মাসিক বরষভীর প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এই আত্মস্মৃতি বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক]

### প্রথম অধ্যায়

বেটিনা—বেটিনা—হাস্তমুখরা লীলাচকল কিশোরী।

ওকে ঘিরেই সেদিনের সেই অপরিশ্রুত কিশোরীর মনে প্রথম স্বপ্ন নেমে এসেছিলো—জেগে উঠেছিলো সুপ্ত অমৃতভূতি—কায়নার রক্ত গোলাপের স্পর্শে—তার পাগড়ির পেলবতায়—তার কীটার তাঁর বন্ধারে।

স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে—বেটিনার খুশিভরা দুটি চোখ—ভোবের আলোর সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে, আমার ঘুম ভাঙার আগেই। স্বপ্ন হয় আমার চুলের পরিচর্যা—কি ভালোই না বাসে আমার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে! শুধু তাই? আমার মূখ হাত দুইয়ে চুল আঁচড়ে দেবে—সাব্বিরে গুলিয়ে আদরে আদরে ভরে তুলেও যেন আশ মেটে না ওর। কিন্তু—সেদিনের সেই কিশোরীটি সহজ হতে পারতো না কিছুতেই ওর ওই নির্দোষ আদরের অত্যাচারে—কি এক অদ্বিতীয় অশ্রুতি আর উত্তেজনার ভরে উঠতো ওর দেহ মন।

বীরে বীরে সরে যায় বিশ্বস্তির ববনিকা। পিছনের পটভূমি মিলে গেছে নিকষ কালো অন্ধকারে—একটি আলোর বিলুপ্ত দেখা যায় না। শুধু পাদশ্রীপের আলোর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—বছর আটকের একটি ছেলে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর মূখ।

ভয়ে, যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে আঁচি নাক থেকে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে। বৃদ্ধ দিদিমা মাঝিরা ফাল্গুনী কাঁপা কাঁপা হাতে ঠাণ্ডা জলের কাপটা নিয়ে চোখে মুখে। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা গেল না রক্ত ঝরা। শেতে আমাকে নিয়ে দিদিমা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। একটা গণ্ডোলায় চড়িয়ে নিয়ে এলো ঘুরনাতে। ঘুরানা হলো ভেনিসের খুব কাছে ছোট্টো একটা বীপের মতো। ওখানে নেমে একটু ঠাঁটবার পরই পৌছলাম—একটা ভাড়া কুঁড়েঘরের সামনে। টুলের উপর একটু বড়ী বসেছিলো কালো রঙের একটা বিড়াল কোলে নিয়ে—চার পায়ে আরও অনেকগুলো বিড়াল। বড়ীকে দেখেই আমার ধারণা হোলো নিশ্চয়ই ও একটা ডাইনী! দিদিমা চাশা গলার ওর সঙ্গে কি দূর

কথাবার্তা বলে ওর হাতে একটি রূপার টাক। গুঁজে দিলেন। তখন বুড়ী আমাকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল—অনেক সাহস আর আশ্বাস দিলে, আমার অস্থব্ধ নিশ্চয়ই সারিয়ে দেবে। ছোটো নীচু খুণারী মত ঘর—আমাকে শুইয়ে ফেলে বুড়ী শ্রুত করলে ওর বাড়ুকুক তুচ্ছতাক আরও কত অল্পস্রব রকমের প্রক্রিয়া। আর বার বার আমাকে সাবধান করতে লাগলো যা দেখছি, শুনছি, এসব যেন কখনও কারো কাছে না বলি, তাহলে অস্থব্ধ তো সারবেই না—রক্ত বয়ে বয়ে মরেই যেতে পারি একেবারে। বাই হোক, বাড়ী ফিরে অসীম ক্লান্তি আর দুর্বলতায় বিছানায় শুতে না শুতে ঘুম চলে পড়লাম। ভোরবেলা আমাকে কাপড় জামা পরাতে এসে দিদিমার মুখেও সেই একই কথা, কালকের কথা যেন কারো কাছে না বলি, তাহলেই কপালে অনেক শাস্তিভোগ আছে। ভয় দেখানোর প্রয়োজন ছিল না—এমনিতেই দিদিমার কথা না শোনার মত সাহস তখন আমার মোটেই ছিল না। কেমন যেন বোকাটে, গোবোচারা, ভালোমাত্র ধরণের ছিলাম—সবাই দূর থেকে কল্পণাই করতো, কাছে এসে মিশতে চাইতো না।

কিন্তু মাঝে মাঝে সেই বোকাটে মাথাতেও হুট্‌হুট্‌ খেলে যেতো। বাবার টেবিলে রাখা বড় একখণ্ড ক্ষতিকর উপর আমার ভারী লোভ ছিলো। বাবার ভারী সখের জিনিষ সেটি। একদিন বাবার ঘুমের সুরোগে ওটি পকেটস্থ করলাম। ঘুম থেকে উঠে সেটি না দেখে বাবা খোঁজ করতে করতে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। ছোটো ভাই ক্রীসোয়ার দেখাদেখি আমিও বললাম, জানি না। কিন্তু বাবার সঙ্গে আমাদেরই উপর। তজ্জাসীর কীকে কায়দা করে সেটি ক্রীসোয়ার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম—বেচার টেরও পেল না—অখচ ঘরা পড়ার ফলে যথেষ্ট মার খেলো। কিন্তু কী যে দুর্বৃত্তি আমার! কয়েকবছর পরে নিজেই ক্রীসোয়ার কাছে একদিন বলে ফেলি সেই হাত সাবাইয়ের কাহিনী—আশ্চর্য্য! সেই থেকে আজও ক্রীসোয়া আমাকে কমা করেনি, সুরোগ পেলেই প্রতিশোধ নিয়েছে।

এর কিছুদিন পরই বাবার মৃত্যু হয়, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। মা বাবার সঙ্গ জীবনে নিবিড় ভাবে কোনো দিনই পেলাম না। এক বছর বয়স থেকেই দিদিমার কাছে আমাকে রেখে ওঁরা থাকতেন লগুনে। হুজনারই পেশা ছিলো অভিনয়। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মা ছেড়ে দিলেন অভিনয়জীবন—ফিরিয়ে দিলেন রূপযুক্ত অসংখ্য পাণ্ডিত্যবোধকে। মায়ের সঙ্কট অর্থে আমার শিক্ষা শুরু হোলো।

শিশুবন্ধু, অভিভাবক আবে প্রিয়ানী আর মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন পাতয়াতে। তখন আমার বয়স নয় বছর। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো একটি বুড়ার বাড়ি-হাউসে আর শিক্ষার ভার নিলে ডাঃ গাংসি—ছাত্রবয়সে বহুরের প্রিয়দর্শন তরুণ রাজক। অসাধারণ মেধা আর পড়াশোনার দ্রুত উন্নতির ফলে প্রথম থেকেই শিক্ষকের সবটুকু ব্রহ্ম আদায় করে নিয়েছিলাম। এমন কি পরে আমার সহপাঠীদের পরীক্ষা নেবার ভারও আমি পেরেছিলাম।

কিন্তু বোর্ডিং আমার দূরবস্থা চরমে উঠেছিলো। প্রথম রাতেই তো বাবার টেবিলে কাঠের চামচ দেখে চৈরিয়ে উঠলাম

আমার রূপার চামচটা দেবার জন্তে। বলা হোলো এখানে সবাই যা করে তাইই করতে হবে। মস্ত একটা কাঠের গামলায় ন্যূন চালা থাকতো। সবাই তাই থেকে কাঠের চামচ ডুবিয়ে খেতো। বার হাত বত দ্রুত চলতো তার ভাগেই ভক্ত বৈধী ভুটতো। ঐ ন্যূনের সঙ্গে একটুকরো নোনা কড় মাছ আর একটি করে আপেল—বাস! বাতের খাওয়া ছিলো আরও চমৎকার! জলের দ্বারের বসলে জুটেছিলো মাটির ভাঁড়।

নোরা বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে মস্ত মস্ত ইহুদের লাফালাফির শব্দ শুনে কাঁটা হয়ে বুকে বাসিস ঢেগে জেগে থাকতাম। সকালে পড়তে গিয়ে ঘুম চলে আসতো দুই চোখ। ক্ষিপের জ্বালায় শেখটার চুরি করেও খেতাম—রাগাঘর থেকে উড়ে যেত তাকের উপর সাজানো হেরি আর সসঙ্গ। পড়াশোনার উন্নতির জন্তে সহপাঠীদের হিসে তো ছিলোই—তার শিককের কাছে নালিস করলে—কিন্তু ফল হলো উল্টো—দিনের পর দিন আমার এই অবস্থা দেখে বিচলিত হোয়ে ডাঃ গাংসি নিজের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এলেন—আমার অভিভাবকদের অন্তর্মতি নিয়ে।

ইতিমধ্যে আমার উপর পক্ষপাতিত্বের ফলে অনেকগুলি ছাত্রই ছেড়ে দিয়েছিলো—এবার উনি নিজেই একটা স্থল খোলার ঠিক করলেন—আর ইতিমধ্যে আমাকে উজাড় করে দিতে লাগলেন নিজের অধীত সমস্ত বিত্তা—এমন কি বেহালা বাজানো শুরু।

বোর্ডিং-এ কয়েকটি দিনের নিদ্রাঙ্গণ অভিজ্ঞতার পর এতদিনে সত্যিকারের আশ্রয় মিললো এঁদের ছোটো পরিবারে। পরিচর হোলো স্বল্পভাবী বাবা—আর পুত্রগর্ভাশ্রিতা মায়ের সঙ্গে—আরও পেলাম—উপজ্ঞাসের নেশা লাগা, রোমাসের স্বপ্ন বিভোর বেটিনা—ডাঃ গাংসির কনিষ্ঠকে।

আমি যে বেটিনার চেয়ে তিন বছরের ছোটো—ওর আশ্রয় ওর ঘনিষ্ঠতার আড়ালে যে আর কোনো অর্থে থাকতে পারে না, একথা মনে হলোই কোথায় যেন বা লাগতো—আলা হবে উঠতো সমস্ত মনে। বিছানায় পাশাপাশি বসে বেটিনা যখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মাসলগুলি টিপে বলতো, আমি দিন দিন বলিষ্ঠ হয়ে উঠছি, তখন কি এক বিচিত্র অমুভূতির তীজতার আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। কিন্তু কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকতাম, কেমন যেন ভয় হোতো পাছে বেটিনা টের পায় আমার এই অমুভূতির স্বীকৃতিম আভাস।—আলতো ভাবে আড়লগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ও যখন বলতো কী নরম, মস্ত পামর চামড়া—শিরশিরিয়ে উঠতো সারা দেহো—আর অঙ্গে উঠতো সারা মন। কেন? কেন? আমিই বা পারি না কেন ওর মত সহজ হোতো?—ওর মত অবলীলায় ওর কাছে এগোতে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরামও পেতাম এই ভেবে যে, আমার মনের এই ক্ষোভ, এই জ্বালায় কথা ও জানতে পারিনি।

কাপড় জামা পরা শেষ হলো ভারী মিষ্টি করে আমার চুমা খেতো—আদর করে বলতো—‘আমার ছোটো খোকা’—আর ঐ চুমাগুলি ওকেই ফিরিয়ে দেবার জন্তে হটকট করে উঠতো আমার মন।

আরও কিছু দিন পরে—যখন আরও খানিকটা সাহসী হয়ে উঠেছি তখন বেটিনা আমাকে লাজুক বলে ঠাটা করলেই আমি গুণ

চুমুগলি ফিরিয়ে দিতাম আরও গভীর আরও মধুর আবেগে—যেই মনে চোতো অনেকটা এসিয়েছি, অমনি খেমে যেতাম—কি যেন খুঁজছি, এমনি ভাবে সরে আসতাম—আর বেটিনাও তখন চলে যেতো ঘর থেকে। আর ও চলে গেলেই প্রচণ্ড ঘিঙ্কারে জর্জরিত করতাম নিজেকে—কেন সাড়া দিলাম না? ক্ষুদ্র কামনাকে এমন জোর করে রুদ্ধ করলাম কেন?—কেন?

অথচ বেটিনা কত সহজ—কত স্বাভাবিক। ও যা কিছু করে কেমন অনায়াসেই করে—ওকে তো এমন কঠিন প্রয়াসে নিজেকে সংযত করতে হয় না?

শুরতের প্রথম দিকেই ডাঃ গাংসি আরও তিন জন ছাত্র পেলেন। তাদের মধ্যে কড়িয়ানীরই বয়স হবে বছর পনেরো। মাসখানেকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম কড়িয়ানী আর বেটিনার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই দেখে আমার মনে যে একটা অদ্ভুত কতৃভূতি হলো সেটা ভালো কোনো বোঝার ক্ষমতা সেদিন ছিল না। কিন্তু পরে বিশ্লেষণ করে দেখেছি সেটা না ছিলো হিংসা—না ছিলো কিতৃষ্ণ—ছিলো শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা। সেটা সংযত করে রাখাও সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিছুতেই আমি ধারণা করতে পারছিলাম না যে, কড়িয়ানী—একটা নূর্য, বংশমধ্যাশীন, স্থূল প্রকৃতির চাবার ছেলে—আমার চেয়েও বেটিনার বেশী প্রিয় হোলো—শুধু একটু বয়স বেশীর দাবীতে? আমার সমস্ত পৌরুষের অভিমান কোথায় যেন যা লাগলো—মনে হোলো আমি অনেক বোগা, আমার স্থান অনেক উচ্চত—বেটিনাকে স্পষ্টই ঘৃণা করতাম—বদিও অবচেতন মনে ওকেই তখন ভালোবাসি।

কিন্তু অবচেতন মনের সে প্রেম গুপ্ত থাকে নি—বেটিনার ভীষণ দুঃখিত তা ধরা পড়েছিলো—ধরা পড়েছিলো ভোরে এসে আমার চুল আঁচড়ে দেবার সময়—ধরা পড়েছিলো আমার নীরব উপেক্ষায়।

আমি চলে দিতাম ওর উজ্জত হাত দু'টি—মধুভরা ঠোঁট দু'খানিতেও নিশ্চয় না কোনো প্রতিশ্রুতি। বেটিনা নিজেই একদিন জিজ্ঞাসা করলে, আমার এমন ব্যবহারের কারণ কি?

আমি বললাম কিছু না। আমার উত্তর শুনে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে হেসে বেটিনা বলল, আমি নাকি কড়িয়ানীকে হিংসা করি—কি করণীর ভরা স্বর? রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল—প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে জানালাম কড়িয়ানীর মত ছেলেই ওর মত মেয়ের উপশ্লব্দ? ওদের বোগা ওরাই—বেটিনা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু সেদিন মনে মনে বেটিনা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলো—চেয়েছিলো আমাকে টের পাওয়ার হিসার ভালো কি? আরও চেয়েছিলো—আমার চোখে আড়াল দিয়ে আমাকেই বুঝিয়ে দিতে যে, বাইরে ঘৃণার আবরণের আড়ালে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে যে আছে সে—বেটিনাই।

একদিন সকালে ডাঃ গাংসি যখন উপাসনায় গেছেন, তখন বেটিনা এসে আমার বিছানার ধারটিতে ঝাঁড়ালো। ওর হাতে এক জোড়া সাদা পশমের হোজা। আমার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেটিনা বলল, মোজা জোড়া আমার জন্তে ও বুনছে, পায়ে ঠিক

না হলে আবার বুন দেবে। সেদিন গোড়া থেকেই আমার মন কেমন যেন লুক্ক ছোঁয়ে উঠেছিলো—সাতস করে একটু বেশী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম, ফলে কথা কাটাকাটি হতে হতে শেখটার যগড়ায় ঝাঁড়ালো। বেটিনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—আর আমি চুপ করে বসে রইলাম, মনের মধ্যে বড় বইতে লাগলো চিন্তায়।

সে যে কী যন্ত্রণালায়ক অবস্থা! মনে হলো আমি বৃষ্টি অসম্মান ঘটিয়েছি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এঁদের কাছে—সুযোগ নিয়েছি এঁদের অতিথ্যেতার! ভাবতে ভাবতে মনে হোলো আমার এত বড় অজ্ঞায়ের একমাত্র প্রতিকার হোলো—বেটিনাকে বিয়ে করা—অবশ্য ও যদি রাজী হয় আমার মত অযোগ্যকে বিয়ে করতে।

সমস্ত দিন রাত মনের উপর চোপে রইলো এক পাষণ্ডভার। তার উপর যখন বেটিনা আমার ঘরে আমার কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলে তখন যেন আমার ত্র্যশ্বের আর সীমা রইলো না।

প্রথমটা মনে হোলো ঠিকই করেছে বেটিনা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে—কড়িয়ানীর সঙ্গে ওর যে ব্যবহার তা যদি আমার মনে জমন ছালা না ধরাতো, তবে হয়তো আমার এই বেলনা রূপান্তরিত হতো প্রকৃত প্রেমে।

চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা। ক্রমাগত এই একই চিন্তার ফলে আমার বিশ্বাস হোলো আমার সঙ্গে বেটিনার এই যে নিষ্ঠুর কৌতুক, সঘই ওর ইচ্ছাকৃত—এখন নিশ্চয়ই ও অদ্ভুতগুণ তাই আর কাছে আসতে পারে না সন্কোচে, বিধায়। ভেবেই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। তখন ঠিক করলাম একটা চিঠি লিখবো ওকে, যাতে কেটে যায় ওর এই সন্কোচ, আমার আগের মত সহজ হয়ে উঠবে পায়ে ও। লিখলাম চিঠি—স্বস্তি কথায়—তবে যাতে ওর অভিমান আঘাত না লাগে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম।

আমার নিজের ধারণা যে চিঠিটা রীতিমত উদ্‌চলকের হয়েছিল। একথাও মনে হোলো যে এমন একখানা চিঠি পেয়ে এবার বেটিনা নিশ্চয়ই অবাক হবে যে কেমন করে আমাকে তার কড়িয়ানীকে একই পর্ধ্যায়ে বেলার কথা ও দুহুর্ন্তের জন্তেও ভাবতে পেরেছিলো।

চিঠিটা পাবার আশংকটা পরই বেটিনা জানালে পশমি ভোরে ও আসবে আমার কাছে—আবার আগের মতো।

বুখা—বুখা—বুখাই অপেক্ষা!

রাগে ছুঁখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু পর্ধ্যান্তই। গাবার টেবিলে বসে বেটিনা যখন বললো আমাকে প্রতিবেশী ডাঃ অলিভার বাড়িতে কদিন পরেই একটা বল নারী পাটি আছে—তাতে যোগ দেবার জন্তে ও আমাকে মেয়েদের পোষাে সাজিয়ে দিতে চায় নিজের হাতে—আমি সাজবো তো?—ও ওই বলার ভঙ্গীটুকুতেই আমার সমস্ত ক্ষোভ শান্ত হয়ে গেলো, সবটাকে উৎসাহিত হতে দেখে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। আর মনে হোলো এই সুযোগে পরস্পরের মধ্যে একটা মিটমিট হওর আস্তব নয়।

ডাঃ গাংসির ধখাপিতা যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বৃদ্ধ ভ্রাতৃের তাঁর গ্রামের বাড়ীতেই থাকতেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে এলো যে তিনি বৃত্তাশ্রমায়; ডাঃ গাংসি আর তাঁর বাবাকে



জন্ত অল্পবোধ জানিয়ে গাড়ী পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ সময় ওদের দেখে একটু আনন্দ পেতে চান।

আমার মনে হোলো এও একটা প্রযোগ। আসলে আমার নিজেরই আর ধৈর্য থাকছিল না করে সেই বল নাচের ব্যত আসবে তার আশার বসে থাকায়।

বেটিনাকে আমি বললাম ঘরের দরজা খুলে রাখবো রাতে। সবাই শুতে গেলে ও যেন আসে আমার কাছে। একতলার একটি ঘরেই ছোটো পাটিশান দিয়ে একদিকে বেটিনা আর অন্ধদিকে ওর বাবা শুতেন। অল্প একটা ঘরে ঐ তিন জন ছাত্র শুতো। তাই কোনো বাধাই ছিল না বেটিনার আসার—আর আমার আশার পথে।

সেদিন রাতে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু বাবাঝার দিকের একটা দরজা এমন ভাবে ভেজিয়ে রেখেছিলাম যাতে বেটিনা এসে আস্তে একটু ঠেসলেই খুলে যায়। মনের ঢাকলো কাপড় জামা না বললেই এক ফুরে আলোটা নিখিরে শুয়ে পড়লাম। আর দুহুর্ন্তগুলি কাটতে লাগলো অধীর প্রতীক্ষায়।

কিন্তু বড়োতে বেজে গেল পূর্ণপূর্ণ এক—হুই—তিন—চার; প্রহর গুণে গুণে শেষ হয়ে এলো বিনিস্ত রাত। প্রতীক্ষার আকুলতা তখন বলে উঠেছে যাবতীয় তীর ঘোবে। তখন আমার শিলাহা বা অবস্থা। বাইরে তখন হিমের রাতে বইছে তুষার ঝড়—আর অপমানের আলার দেহের সমস্ত রক্ত তখন টগবগ করে ফুটেছে।

পারলাম না শেষ অবধি ধৈর্য ধরতে। তখনও সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক বাকী, ডাবলাম নিজেই যাবো নীচে দেখাবো কি ব্যাপার। পাছে ফুকুরটা হুম ভেঙে যায়, টেঁচিয়ে ওঠে, এই ভয়ে জুতা খুলে পা টিপে এসে পাঁড়লাম একতলার বেটিনার ঘরের সামনে। ও যদি বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে দরজা তো খোলাই থাকবে এই জেবে এগিয়ে গিয়ে দরজার হাত দিয়ে সেখানকার দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। তাহলে নিশ্চয়ই বেটিনা ঘুমাবে। ভীষণ ইচ্ছা হোলো দরজাটা ঠেসতে—কিন্তু ফুকুরটা যদি জেগে ওঠে? একটা ভয়ে, দরজাটা একবার আমার সমস্ত শরীরটা কঁপে উঠলো—যদি ঢাকুরটা হঠাৎ আমাকে এই অবস্থার দেখে ফেলে!—কি ভাববে সে?—ভাববে কি আমি পাগল হয়ে গেছি? না, শেষ অবধি প্রাণশূণ্য চেষ্টার নিজেকে সন্তুষ্ট করলাম—কিরে বাওরাই ভালো—এমন ভাবে সবার সামনে নিজেকে ধরা দিতে পারবো না।

সবে বাবার জন্তে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম ঘরের ভিতর থেকে। নিশ্চয়ই ও বাইরে আসছে—আবার বেন গ্লাস কিরে এলো—এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে—

খুলে গেল দরজা—বেরিয়ে এলো বেটিনা নয়—কর্ডিয়ানী—আমাকে সামনে দেখেই প্রথমটা চমকে উঠলো, পরকালেই আমার পিঠের উপর সজোরে এমন লাথি মারলো যে আমি ছিটকে গিয়ে ছিলাম বাইরে—তুষারপাতের মধ্যে। আর কর্ডিয়ানী দ্রুতপদে বন্ধ গেল ওদের তিন জনের সেই নির্দিষ্ট ঘরটাতে, আর ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

আমিও উঠে পড়লাম ঝেঁড়ঝেঁড়—পাঙ্গলের মত ছুটে গেলাম নিজের ঘরের দিকে, এর সমস্ত শোখ ওর উপর তুলতে।

কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। সিঁগবিসিক্ জ্ঞান হারিয়ে

সজোরে এক লাথি মারলাম দরজার—দরজা খুললো না। শুধু ফুকুরটা আচমকা শব্দ জেগে উঠে তারঘরে চাঁৎকার জুড়ে দিলে। ছুটে পাগিয়ে এলাম উপরে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কবলের তলার ঢুক বাগিসে যুব ওঁজ পড়ে রইলাম। অসহ্য যন্ত্রণার আর অপমানের বেলনায় আমি তখন অর্ধমৃত;

এমন শোচনীয় ভাবে প্রতারণিত, লাঞ্চিত, পরাজিত হ'তে হোলো? স্বদীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেলো মনের আগুন জ্বলে জ্বলে। চরম প্রতিশোধ নেবার জন্ত স্থির প্রতিজ্ঞা করলাম। উঃ! শেষে জয়ী হোলো কর্ডিয়ানী। আর আমি কি না তার কক্ষণ, তার উপহাসের পাত্র হলাম?—সে যে কী কষ্টকর, কী জ্বালাভরা অল্পজীবিত; সে সময় ওদের হৃদয়কেই বিষ খাওয়াতে পারতাম একটুও ঘিবা না করে। প্রতিশোধ নেবার জন্তে পাগল তখন আমি। কত উপায়ই না মাথায় এলো—একবার ডাবলাম দিট জানিয়ে সব কীট গর দাদাকে।

সবই কেবল অপরিণত দুর্বল মনের ভীক চিন্তা। মাত্র বাবো বছর বয়স তখন আমি। এসব বিষয়ে না ছিলো কোনো ধারণা, না ছিলো কোনো অভিজ্ঞতা—কোথায় পাবো পরিণত মনের সেই ধৈর্য, সেই সর্বম যাতে আত্মসম্মত বজায় রেখে 'বীরের মত প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

যনের এই উগ্রত অবস্থায় হঠাৎ কানে গেলো বেটিনার মারের তীব্র আর্দনা—বেটিনা নাকি মারা যাচ্ছে। রাগের আলার মনে হলো আমার সঙ্গে একটা বোকাগড়া হবার আগেই ও মরে যাবে? তখন উঠে পড়ে এক ছুটে নীচে নেমে এলাম। বাবার খাটের উপর বেটিনা শুয়ে আছে—প্রবল শ্বাসবিক্রম আক্ষেপে ছটকট করছে, অর্ধ-আবৃত অবস্থা, একবার এশাশ একবার ওপাশ করছে—স্রেপ ধরতে গেলো এমন ভাবে লাথি, ঘূঁবি ছুড়ছে যে, কাছে এগোয় কার সাধ্য!

চূপ করে গাঁড়ির দেখতে লাগলাম—সেদিনের সেই অপরিণত বয়সের সরল বুদ্ধিতে এই দুর্কাভিনয়কে যে কি বলবো বুঝতে পারলাম না—তখনও মনের ভেতর কাঁটার মত বিধে আছে গত রাতের স্মৃতি।

অবশ্য মনে মনে আশ্চর্য্য হলাম নিজের এই আত্মসংযমে! যে হৃদয়ের একজনকে অপমানিত আর অজ্ঞানকে খুন করবার জন্তে আমার হাত নিস্পিশ করছে, তাদের হৃদয়কেই হাতের এত কাছে পেয়েও নীরব দর্পকের মত চূপ করে গাঁড়ির থাকতে পারলাম তো!

প্রায় ঘণ্টাখানেক গুণ্ডাখণ্ড করার পর বেটিনা ঘুমিয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন ডাঃ অলিভো। একজন খাত্তিকে সঙ্গে নিয়ে। খাত্তিটি সব দেখে শুনে বললে এ চিকিৎসিরা ছাড়া আর কিছুই নয়—কিন্তু ডাঃ অলিভো সেকথা মানলেন না—সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। আর আমি দু'জনের মস্তব্য শুনলাম আর মনে মনে খুব হাসলাম। আমি তো জানি, অন্ততঃ আমার ধারণা ছিলো তাই, যে আমিই একমাত্র জানি এ রোগের মূল কারণটি কি?

গত রাতের অনিত্রা আর ক্লান্তি তো আছেই তার উপর আমার কাছে কাড়িয়াসীর ধরা পড়ে যাওয়ার আভাসই কি কম? বার জটাই



হোকগে থাক ওর এই অবস্থা—আমি আপাতত ডাঃ গাংসির না আমা অবধি প্রতিশোধটা হুলতুবি রাখলাম। আমার ধারণা ছিলো না যে এমন ভীষণ হিষ্টিরিয়ার ফিটের ভান বেটিনা করতে পারে এমন মিথুঁত ভাবে। ওকে দেখলে ধারণা করা যায় না অত জোর আছে ওর।

ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় বেটিনার ঘরের ভিতর দিয়ে আমাদের আসতে হোলো। যেতে গিয়ে দেখি ওর বিছানার উপর ছোটো পকেট বইটা পড়ে আছে। চট করে তুলে নিলাম—কি লেখা আছে পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর সঙ্গে দেখি একটুকরো কাগজও রয়েছে, তাতে কভিড্যানীর হাতের লেখা মনে হলো—সোজা তুলে নিয়ে ঘরে চলে এলাম। নিশ্চয় অবসরে বসে পড়তে হবে।

অবাক হলাম আমি অতটুকু মেয়ের অত সাহস দেখে। সহজেই তো মায়ের চোখে ঐ কাগজের টুকরোটা পড়তে পারতো। আর তিনি নিজে না পড়তে পেরে সোজা নিয়ে যেতেন ফেলের কাছে পড়ে দেবার জন্তে। আমার মনে হলো নিশ্চয়ই বেটিনার মাথার ঠিক ছিল না, কিন্তু চিঠিটা পড়ে আমার মাথার ঠিক ছিলো কি?

“বখন ভোমার বাবা এখানে থাকবেন না তখন তো আমি ইচ্ছ করলেই যখন হোক আসতে পারি। তুমি যত্নের দরজাটা খুলে রেখো, তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পারে না। রাতে খাবার পর আমি এই ছোটো ঘরটায় লুকিয়ে থাকবো”—

মুহূর্তের ভক্ত ভক্তিত হোয়ে পর মুহূর্তেই হেসে উঠেছিলাম—ইশ কি বোকাই না বনেছি আমি। হাক ভালোবাসার নেশা থেকে রেহাই পেলাম। সারা ভীবনের মত শিক্ষা হলো ভেবে নিজেকেই নিজে গল্পবাদ দিলাম। এমন কি এত দূরও মনে হলো যে, বেটিনা ঠিকই করেছে কভিড্যানীকে ছেড়ে নিয়ে—হাজার হোলও ওর বয়স পনেরো আর আমি তো নিতান্তই একটা বালক। সেই সঙ্গে একথাও মনে হোলো যে আমাকে লাগি মাবার প্রতিশোধ আমি কভিড্যানীর উপর তুলেবোই।

দুপুরবেলা অসম্ভব ঠাণ্ডার জন্তে রান্নাঘরের টেবিলে সবাই মিলে খেতে বসেছিলাম। এমন সময় আবার বেটিনার কিট শুরু হোলো। সবাই ছুটলো ওর পরিচর্যায়—আমি ছাড়া। ঘরে শুধে খাওয়া দাওয়া সেরে আমি সোজা উঠে এলাম ঘরে পড়তে বসবার জন্ত।

রাতে খাবার সময় দেখতাম ওরা বেটিনার বিছানাটা রান্নাঘরেই টেনে এনেছে বাতে সব সময় যা ওকে দেখা শোনা করতে পারেন। তা ছাড়া সাধারণত উনি রান্না ঘরেই শুতেন। একবে আমি নজরও দিলাম না, এমন কি রাতে, আর পরদিন সকালে আবার বখন বেটিনার হিষ্টিরিয়ার চাঁককার শুনলাম তখনও তাতে কান দিলাম না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ডাঃ গাংসি ফিরে এলেন। মনে ওর ছিলো বৈকি কভিড্যানীর—তাই এবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি করবো ঠিক করেছি—আমি কলমকটা ছুঁইটা নিয়ে ওকে এমন ভাড়া করলাম যে ও ছুটে পালিয়ে গেলো।

না—ওদের কুৎসা রটিয়ে বেড়াবার কোনো ইচ্ছাই আর আমার ছিল না—সে প্রচণ্ড বিষেব তখন শান্ত হয়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের পড়ানোর মাঝখানে হঠাৎ এসে যা ডাকলেন ডাঃ গাংসিকে। অনেক ভূমিকা করার পর বললেন

যে, ওর বিশ্বাস বেটিনার এই অনুরোধের মূল হলো ওর উপর ডাইনীর দৃষ্টি পড়া—আর ডাইনী যে কে, তাও জানেন।

—হতে পারে, কিন্তু মা তুল করছো না তো? কাকে সলহ করছো তুমি?”

—“পুরানো বিটাকে। হাতে হাতে প্রমাণও পেয়েছি আমি”—

—“কি রকম?”

—“আমার ঘরের দরজার দুটো বাঁটকে ক্রশ চিহ্নের মত করে পথটা এমন ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম যে, ঢুকতে হলে বাঁটা দুটোকে সোজা করে তবে ঢুকতে হবে। কিন্তু বিটা ওই দেখে আর ঢুকো না, সব গিয়ে অস্ত্র দরজা দিয়ে এলো—তবে? ডাইনীই যদি না হবে তবে বাঁটা সোজা করে এলো নাই বা কেন?”

—“তার কোনো মানে নেই মা—আচ্ছা ডাকো তো ওকে?”—যি আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন,—“যে দরজা দিয়ে যোজ্য ঢোকো, সে দরজা দিয়ে আজ তুমি কোকিন কেন?”

—“আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না তো।”

—“দরজার উপর সেট এণ্ড্রের ক্রশ চিহ্ন কি দেখনি?”

—“কি রকম ক্রশ সেটা?”

—“না—বোকার ভান করিস না”—ধমকে উঠলেন মা—“গত বৃহস্পতিবার রাতে কোথায় শুয়েছিলি?”

—“আমার বোনখির বাড়ি—তার ছেলে হলো কি না”—

—“সে আমার খুব জানা আছে কোথায় গিয়েছিলি, আসলে তুমি একটা ডাইনী, মেয়েটার উপর তোহই দৃষ্টি লেগেছে”—

বিটা একথায় ক্ষেপে গিয়ে ওর মুখে থুতু ছুঁড়লো। রাগে শিশাহা হয়ে মা ছুটলেন লাঠি আনতে। ডাঃ গাংসি তাড়াতাড়ি উঠে মাকে থামাতে গেলেন, তারপর বিটার দিকে এগোবার আগেই সে উচ্ছ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রাণপণ চেষ্টার প্রতিবেশীকে ডাকতে শুরু করলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে এনে হায়ে কিছু টাকা শুজি দিয়ে তবে ঠাণ্ডা করা গেল।

এই সব কাণ্ডকারখানা আর কেসেকারীর পর ডাঃ গাংসি নিজের ধর্মবাজকের পরিচ্ছন্ন পরে বেটিনার কাছে গিয়ে পাঁড়াজে তাকে ঝেড়ে দেবার জন্তে। সত্যিই যদি কোনো দুই আত্মা ভর কোর থাকে ওর উপরে। এই সব নতুন নতুন আত্মত ব্যাপার কিন্তু সেহি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো—যদিও বেটিনার উপর ভুলে ভর হয়েছে ভাবতে খুবই মজা লাগছিলো।

বিছানায় ঘায়ে আমরা বখন গেলাম তখন বেটিনার নিঃশব্দ পড়ছে কি না বোকাই বাচ্ছিল না। বাজক দাদার বাড়ফুরে কিছু মাত্র উন্নতি দেখা গেল না। ডাঃ অলিভো এই সব এসে পড়েছিলেন। ঐ সব ব্যাপার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আর থাকার প্রয়োজন আছে কি না? বলা হলো যদি বিশ্বাস থাকে তবে থাকতে পারেন। বলা বাহুল্য উ বিলার নিলেন, বলে গেলেন টেব্রামেটের বাইরে কোনো অলোবি ব্যাপারই তিনি বিশ্বাস করেন না।

কাজ সেরে ডাঃ গাংসি বখন নিজের ঘরে চলে গেলেন সে সময় বেটিনার কাছে আমি ছাড়া কোনো মিতারও ছিলো না। সেই সুরোধে চট করে বিছানার কাছে গিয়ে মুখের উপর কঁকে ফিশফিশ করে কললাম—“ভয় পেও না,

হোয়ে সেবে ওঠে। আমি মুখবন্ধ করেই আছি। কাজকে কোনো কথা বলে দেবো না। কোনো ভয় নেই তোমার—

বেটিনা ধীরে ধীরে মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলো। একটি কথাও বললে না। কিন্তু সে রাতে ও ভালোই ছিলো, আর ঘিট হয়নি।

মনে করেছিলাম আমি বুঝি ওকে সারিয়েই তুললাম। কিন্তু পরদিন আবার ফিট শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক আর লটিন ভাষায় অনর্গল অসলগ প্রলাপ। নিশ্চয়ই ওকে কোনো থারাপ আশ্রয় পেরেছে, এ বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহ রইলো না। মা বেরিয়ে গেলেন আর ঘণ্টাখানেক পরে এক অত্যন্ত কুৎসিত ডজলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি নাকি পাহাড়ার বিখ্যাত বোজা—ফাদার প্রেসেরো তাঁ'ভডোলোটে।

বোজাকে দেখেই বেটিনা চাংকার করে হেসে উঠলো। পরক্ষণেই অপ্রাণ্য ভাষায় অনর্গল গালি দিতে লাগলো তাঁকে। বারা পাকিয়েছিলো সবাই ভাবলে যাক, এতক্ষণে টাকা খরচ করা সার্থক হলো, রোগ ঠিক ধরা পড়েছে—ও কোনো চুষ্ট আশ্রা ছাড়া কিছুই নয়, নইলে বোজাকে জমন করে গালাগাল দেবার সাহস কি মানুষের হয়?

মূর্খ পরচর্চাকারী, ইতর ইত্যাদি বিশেষণে অভিযুক্ত হতে হতে হঠাৎ ফাদার প্রেসেরো তাঁর হাতের কাঠের ক্রশ দণ্ডটা নিয়ে বেটিনাকে মারতে শুরু করলেন। বললেন বেটিনা নয় এ মার খাচ্ছে ওর ভিতরের শরতান আশ্রাটা। হঠাৎ একসময় থেমে গেলেন মারতে মারতে—বেই দেখলেন ওর মাথাটা তাক করে বেটিনা ঘরে রাখা প্রেসেরোর ভায়গাটা তুলে ধরেছে—আর তারদ্বারা গালি দিচ্ছে—“গাথা কোথাকার—কথার হারতে না পেরে মারতে এসেছো? আমার খাড়ে কোনো শরতানই চাপেনি—অসভ্য, ছোটলোক, চাষা ভদ্র ব্যবহার করতে না পারো তো দু'ব হয়ে যাও”—

চেয়ে দেখলাম ডাঃ গাংসির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেটিনার বোজার তাঁতে কিছুই এসে যায়নি। নিরাপদ দু'ব্ব রেখে তিনি ততক্ষণে ভূত ছাড়া মন্ত্র পড়া শুরু করেছেন। শেষে এক সময় এই ছুষ্ট আশ্রাকে তার নাম বলতে আদেশ করলেন—

—“আমার নাম বেটিনা।”

—“না। সে নাম হলো খুষ্টধর্মে দীক্ষিতা একটি বালিকার”—

—“তা হলো শরতানটাও হলো একটি বালিকা—যে খুষ্টধর্মে

দীক্ষিতা হয়নি। শোনো—মূর্খ বোজা এতকু জানো না যে, শরতানের

গোনা লিলভের নেই? তোমার বন্ধন বিশ্বাস যে আমার মুখ

শরতানটাই কথা বলছে, তবে তার প্রস্নের যদি ঠিক ঠিক

দু'ব্ব দাঁও তবেই শরতানটা বেরিয়ে আসবে—

—“বেশ, আমি কথা দিচ্ছি—”

—“তুমি কি নিজেকে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান মনে কর?”

—“না, তবে আমি নিজেকে তোমার চেয়ে শক্তিশালী মনে করি

কাজে যে, আমি ঈশ্বরের নাম করেছি আর এই পবিত্র পরিচ্ছদ

দ্বিহ তাই—”

—“বেশ, বেশী শক্তিশালী যদি তবে আমার এই সত্যি কথাগুলো

খামাতে পায়ো কিনা দেখি—তোমার বত গরু'সব তো এ

টি নিয়ে—দিনে দশবার তো ওটা আঁচড়াচ্ছে। আমাকে এর

দেহ ছেড়ে বার করবার জন্তে ঐ দাড়ির একটা চুলও কি ছিঁড়তে পারবে, উঁহ অভখানি ত্যাগ তোমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আচ্ছা ঐ দাড়িটা যদি আমিও কাটালো, তবে আমি ঠিক বেরিয়ে যাবো—”

—“মিথ্যাবাদী, কি শাস্তি করি তোমার জাথ—”

—“আমি একটুও মানিনা তোমাকে—”

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেটিনা এমন উদ্দাম হাসিতে কেটে পড়লো যে, থাকতে না পেরে আমিও হেসে উঠলাম। রাজা তৎক্ষণাৎ ডাঃ গাংসির দিকে ফিরে বললেন, আমার মত অবিশ্বাসীরা থাকে চলবে না ঘরে। একথা সত্যি স্বীকার করেই বেরিয়ে এলাম। আর সেই মুহূর্তেই দেখলাম বেটিনা বোজার প্রসারিত হাতখানির উপর সজোরে থুতু ছুঁড়লো, এ দৃশ্যে কি আনন্দই না পেলাম!

সেদিন ফাদার প্রেসেরো খেতে বসে অনর্গল বাজে কথা বকে গেলেন। পরে বেটিনাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্তে ওর ঘরে ঢুকলেন। ওকে দেখেই বেটিনা গ্রাসে ভরা কালা রঙের কি একটা তরল পদার্থ ছুঁড়ে মারলো ওর মুখে। ঠিক পাশেই কড়িয়ানী পাকিয়েছিলো, তার গায়েও বেশ খানিকটা লাগলো। আর এইসব দেখে আমি একেবারে খুঁততে কেটে পড়লাম। এবার বিদায় নিলেন ফাদার প্রেসেরো। বাবার আগে বলে গেলেন অজ্ঞ বোজা ডাকডে —কারণ দেখাই যাচ্ছে ঈশ্বর চান না যে ওর শরতানের মুক্তি ঘটে।

উনি চলে যাওয়ার পর থেকেই বেটিনা স্বাভাবিক শব্দ হোয়ে উঠলো, এমন কি, রাতে আমাদের সঙ্গে শেতেও বললো। মাকে বাবাকে বাববার আশ্বাস দিলে এখন আর কোনো কষ্ট নেই, বেশ শব্দ বোথ করছে। আমার দিকে ফিরে বললে ভোবে আসবে আবার আমার চুল আঁচড়ে দিতে। আর রাতে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে মেয়েদের পোষাকে নাচের জলসার বাবার জন্ত। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপত্তি করলাম, কয় দেহে বিশ্রামের প্রয়োজনই বেশী ওর। কিছু না বলে সকাল সকাল উঠে ও শুতে চলে গেল। একটু পরে আমরাও উঠলাম। ঘরে গিরে শোবার আয়োজন করছি, দেখি, একটুকরো কাগজ পড়ে আছে, তুলে নিলাম—লেখা আছে—

“হয় আমাকে নিজের হাতে তোমাকে সাজিয়ে দিতে দেবে আর নাচের জলসার আমার সঙ্গে আসবে—নইলে বা দেখাবো তাকে তোমাকে কীভাবে হইবেই—”

চিঠিখানা নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ডাঃ গাংসির ঘুমিয়ে পড়ার পর উঠে এসে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলাম—

“ভালোবাসি তোমাকে—ভালোবাসি সহোদরা বোনের মতই।

বেটিনা, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, আমি চাই সব ভুলে যেতে। একটা চিঠি এইসঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছি—জানি ফিরে গেলে তুমি কত নিশ্চিন্ত, কত খুশী হবে। এ চিঠি পকেট বইয়ের সঙ্গে বিছানার ফেলে গিয়ে কতখানি বিপদে ক'কি নিয়েছিলে বলো তো? ফিরিয়ে দিলাম—

এইসঙ্গে প্রমাণও দিলাম না কি—আমি তোমার বন্ধু—”

[ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

# ফলো-বিলাস

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

প্রীতবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পূর্বাকালে—ভগবান স্বয়ং একদা ভুবনগুলি ও জীবসমূহ সৃষ্টি করে দেখলেন—তার হাতে আর কাল নেই। কী যে করবেন, ভাবতে ভাবতে দীর্ঘকাল তার কেটে যায়। ৬৫

সিবাঙ্গুটি দিয়ে তিনি দেখতে পান,—মর্ত্যালোকে, মহাব্যোম নিরালম্বের মত দূরছে, সরলভাবে তারা যোগ-সাধনা করছে, ধনানি সম্ভোগ তাদের নেই; তারা পায় নি। ৬৬

নয়ন মূর্তিত করে তিনি রইলেন। সদর হল এক মায়াময় সমাধান। মহাব্যসের বিড়তি লাভের জন্ত ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ফেললেন—“দন্ত”কে; সম্ভাবনার যিনি আধার। ৬৭

সৃষ্টি হলো “দন্ত”র;—কৃষ্ণগুরু ও হুঁখানি পুস্তক তার হাতে; শূভ কমণ্ডলু, পানিতে পূণ্যসলিল; নিজের হৃদয়ের মত কুটিল... শূল, দণ্ড, কৃষ্ণাঙ্গিন ও খনিজ তার সাথে; ৬৮

কর্ণে,—শূল শব্দজ্ঞের জাল; একগাছিও চুল নেই মাথার; দন্তকে, কৃষ্ণের মুকুট; মুকুটের মূলে খেতপুশের আনন্দ। ৬৯

ব্রহ্মার সম্মুখে উঠে পড়ালেন “দন্ত”, কাঠের মত শুষ্ক গ্রীবা, অপচপল ওষ্ঠ, সমাধিলীন চক্ষু, মণিবন্ধে রক্তাক্ষের বলয়। ব্রহ্মলোকেও তিনি গুচি-বাহু-গ্রস্ত। যুৎ-পরিপূর্ণ একটি পাত্র বহন করে, অস্ত্রের সম্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে তিনি উঠে পড়ালেন।

মৌন তার মুখ; কিন্তু তার হৃদয়ের কণ্ঠ আকাঙ্ক্ষার কথাগুলিকে যেন প্রকাশ করে দিতে লাগল তার নেত্রাকলসর জ্বলুটির সেকাপ হুঙ্কার। ব্রহ্মা কর্তৃক উপস্থিত হয়েই তিনি চেয়ে বসলেন ব্রহ্মার আসন। ৭০—৭২

অল-ভূষণের মত তার এই সাহস, এই স্তম্ভন শত্রুজয় বল, বসীকৃত করে ফেলল উপস্থিত বরেন্দ্রদের। সপ্তর্ষির দল কৃতান্তালি হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ৭৩

আত্ম-শীলার মোহনীয়তার যিনি সৃষ্টি করেন বিশ্ব, সেই-হেন পর-মেষ্ট্র ব্রহ্মাও—আলোপিত হয়ে উঠলেন,—গৌরবে, বিম্বয়ে, হর্ষে। ৭৪ “দন্ত”র তীব্রাতিতীত নিয়মে সম্পূর্ণ অভিজুত হয়ে পড়লেন অগস্ত্য। অতিবিম্বয়ে, স্বল্প-তপস্তার লঙ্কার পৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়ে গেল বশিষ্ঠের। ৭৫

“কৌণ্ড” যুনি, যিনি নিজের অভিসরল যুনিজ্ঞের আবেষ্টনীর মধ্যে বিরাজ করেন, তিনিও সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। অনাড়ম্বর আত্ম-তপস্যায় অনাদর ঘটল “নারদের”। ৭৬

হাঁটুর মাথার মুখ গুঁজে বসে রইলেন “জমদগ্নি”। ব্রহ্ম হয়ে উঠলেন “বিশ্বামিত্র”। ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন “গালব”। ভেঙ্গে পড়লেন “ভৃশ্ণু”। ৭৭

চতুর্মুখ বিক্ষারিত করে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন “দন্ত”কে। সূচিরোপিত দন্তের তখন ব্রহ্মার আসন-কমলটির উপরেই স্থির-নিবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কোণ-কটাক; শূলগ্রাধিতের মত তিনি নিম্পন্দ, গৌরবে ক্ষীত তার গাত্র। ৭৮

চতুর্মুখে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন দন্তকে। বৃষতে পারলেন “দন্ত” দাবী করছেন তাঁরি আসন। তারপরে দশন দীপ্তির বিকাশ প্রীতিতে স্ব-বাহন হসকে যেন বিহসিত করেই, ব্রহ্মা বললেন— ৭৯ “পুত্র, আমার কোলে এসে বোসো। তোমার বখেট গুণের গৌরবও যথেষ্ট। সেই গৌরবের নিয়মও বড় বিচিত্র। তুমি উপযুক্ত হয়েই উঠেছ।” ৮০

বিশ্বপ্রসারি বাণী শুনে শঙ্কানী হলেন দন্ত। হবেনই না কেন। তার উপর তখন অভিসন্ধিত হয়েছে ব্রহ্মার মুষ্টি কল্যাণ-বারি। তিনি তখন কঠোরহৃৎ, সসকোচে, কোনক্রমে উপবেশ করলেন ব্রহ্মার উৎসঙ্গে। ৮১

দন্ত বললেন— “উঠে-স্বরে কথা বলবেন না। অবজ্ঞাই বলতে হয়, তাহলে হস্ত-পদ্ম দিয়ে মুখের এই ঈটিকে আচ্ছাদি করে রাখুন; রেখে কথা বলুন। আপনাদের মুখের বাতাসে আছে, যেন আমার গায়ে না লাগে।” ৮২

দন্তের অতুলনীয় গুচিতা লক্ষ্য করে দ্বিবৎ হাসলেন ব্রহ্মা তারপরে কব-পদ্মের পাণ্ডিগুলিকে দ্বিবৎ কাঁপাতে কাঁপ বললেন— “ভূমি “দন্ত”। দন্তই বটে। এখন উত্থান কর।” রয়েছেন অখিলা পৃথিবী আর তার ঐ মেখলা—সমস্ত সাগর, সপরিধা। বৎস, সেখানে অবতরণ কর।

উপভোগ কর তথাকার ভোগ। স্বর্গের দেবতারাও জানেন না সেই ভোগরাশি।” ৮৩-৮৪।

সাদরে “দন্ত”কে বিদায় দিলেন ব্রহ্মা। বিসজ্জিত হয়ে তখন কঠে শিলা বন্ধন করে, অবতরণ করলেন পৃথিবীতে, সাগরে ভাসমান এই পৃথিবীতে। ৮৫

দন্তের আবির্ভাব হল মর্ত্যালোকে। তার পরে কানিন-ক

নগর-নগরী পরিভ্রমণ করতে করতে “দম্ভ” নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন “গোড়ে” এক দিগ্বিদিকে পাঠালেন নিজের জয়ধ্বজ। ৮৩

বঙ্গগণ,—বাহ্যীকদের বচনে রয়েছে দম্ভ, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যদের, ব্রত ও নিয়মে রয়েছে দম্ভ, কাশ্মীরীদের রাজ্যশাসনে রয়েছে দম্ভ ; কিন্তু সৌভায়দের সর্বত্রই দম্ভ। ৮৭

এরাই “দম্ভের” সহায়। ধীর কাছ থেকে হোক, বা ঘেঁষিক থেকেই হোক, প্রতিগ্রহ-লব্ধ বা প্রাক-লব্ধ সৈন্যবলবণ পুড়িয়ে, এরাই প্রতি প্রভাতে রচনা করেন ভাস্ক-তিলক। ৮৮

তারপরে এই পৃথিবীতে, প্রাণীদের সম্মুখ, সববিভাগ করে দিয়ে স্বষ্টিতে দম্ভ নিত্য-নিবাস করতে লাগলেন মাননীয় জ্ঞানবীশদের যুগে। ৮৯

“দম্ভ” স্বয়ং প্রথম-প্রবেশ করেছিলেন গুরুদের হৃদয়ে, বালকদের হৃদয়ে, তপস্বীদের হৃদয়ে, নিয়োগ-কর্তাদের কুটিল হৃদয়ে, নীক্ষিতদের হৃদয়ে। ৯০

তারপরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন,—গণক, চিকিৎসক, সেবক, বণিক, স্বর্ণকারদের হৃদয়ে ; প্রবেশ করেছিলেন নট, ভট, গায়ক, বক্তা ও চরদের হৃদয়ে। ৯১

নানান বিকারের মধ্য দিয়ে, আংশিক ভাবে “দম্ভ” প্রবেশ করেছিলেন সমস্ত জন্তুদের হৃদয়ে। তারপরে তিনি প্রবেশ করলেন পক্ষী ও বৃক্ষের অন্তরে। ৯২

তীর্থে তীর্থে বক-তপস্বী একপায়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তপস্বী করে, মন্ত্রের প্রতি তার লোভ; নড়েও না চড়েও না। তার মাথায় দম্ভ প্রবেশ করেন পক্ষীদের অন্তরে। ৯৩

বিপুল-ভট্টা-বজ্র গরী ঐ বৃক্ষেরা, যারা হিমে, রৌদ্রে ও ঝঞ্ঝায় ধ্বংস হয়েও কেবলমাত্র জল-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বিকাশের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় দম্ভের প্রকাশ। ৯৪

অন্তঃপ্রবেশ, বঙ্গগণ, দম্ভ আমাদের বিচারের বস্তু। তিনি সর্বগত হইবে সকলের হৃদয়ে। এই বহু-বিধা দম্ভকে তোমরা বিশেষ করে মনে রেখো। একে জানলেই বিফল হবে মায়ারীদের মারা। ৯৫

ঐ যে কল্পবৃক্ষের কাহিনী তোমরা শুনেছ, জোঁকোর-চক্রের সামনে তিনিও দম্ভের একটি বিকার-মাত্র। পুরাকালে বামন-পুন্ড্রই শ্রীহরি ভ্রমণ করেছিলেন ত্রৈলোক্য,—এ কথা তো আজ কারো কাছে বিদিত নেই। ৯৬

ইতি দম্ভাখ্যান-নামক প্রথম সর্গ

### দ্বিতীয় সর্গ

“লোভ”—লোভ যে কে, সে কথা সর্বদা আমাদের বিশেষ ভাবে মনে করা প্রয়োজন। সংসারে দেখা যায়, ধীরা লুপ্ত, তীরাই ভ্রান্ত ভয়ের বস্তু। “লোভ” থাকে একবার আকর্ষণ করেছেন তাঁর হৃদয়েই পারে না কার্যকার্যের বিচার। ১

মারা, বিনম্র, বিজয়, অপলাপ ও চিন্ত-বিক্ষেপ,—এইগুলির মধ্যে সে সমস্ত কুটুং বা কাপট্যের আমরা খেলা দেখিয়ে থাকি, নর মূল কার্য হচ্ছন সর্বত্র-চোর ঐ লোভ। সঙ্কর-হৃদয়ের তিনি ঐ। ২

যাযা শাস্ত্রিক, সাধিকতাই ধীরের ঐশ্বর্য, তাঁরা বখন একসা

সম্মুখ, প্রোশাঙ্কিত ও তপস্বীর দাক্ষিণ্যে জর করে ফেললেন লোভকে, তখন বিপদ ঘটল লোভের। নিরুপায় হয়ে তিনি তখন প্রবেশ করলেন “কুপে”। সেই কুপে—এই কিরাটদের (বৈশ্যজাতি) কুটিল হৃদয়। ৩

বঙ্গগণ, জেনে রেখো—এই বৈশ্যেরাই, এই বণিকেরাই দিবস-চোর ; সানন্দে লুট করেন জনসাধারণকে। বহু পথ লুণ্ঠনের। ক্রয়, বিক্রয়, কূটনীতি, তৃণা-লাবণ, জ্ঞানবাক্য, স্তম্ভ-আদায়—এইগুলিই হল-পথ। ৩ (ক)

কূট-মায়ার কানান খেলা খেলে সারাদিন জনসাধারণের ধন হরণ করে বৈজ্ঞবিক ঘরে ফিরে আসেন, সংসার-স্বচরাবৎ তিনি কিছু অতিক্রমই ছাড়েন—তিনটি কড়ি। ৪

বণিকের অসীম অম্বরাগ—আখ্যাতিকা শ্রবণে। ইনি সর্বদাই দৌড়ান ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনেতে। দান-ধর্মের ত্রিসীমাত্ত তিনি মাদান না। পালান। যেন কালসাপ তাঁকে ধংশেছে। ৫

দানশীতে, পিতৃদেবসে, সন্তানান্তিতে, চন্দ্র-সুর্বের গ্রহণে তিনি দান করেন, বহুক্ষণ ধরে ; কিন্তু দান ? এক কপর্দকও তিনি করেন না। ৬

ঐ বৃষি ভিষিরীরা এসে ধরল, সচকিত নয়নে তাই এগিকে ওদিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে, মাথায় চানর ঘড়ি দিয়ে কুটিল-চরণ চোরের মত তিনি অলিগলি দিয়ে পালান। ৮

কথা কইলে উত্তর দেন না, বিক্রীর সময় শঠ-বণিক মৌনী হয়ে থাকে। কিন্তু বেই দেখলেন, গচ্ছিত রাখবার জন্ত কিছু দ্রব্য হাতে নিয়ে কোনো নরবর উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর সঙ্গে ও সে কী তাঁর কথা বলবার যটা ! ৯

বণিক তখন গা নাড়া দিয়ে উপান করেন, নত হয়ে নমস্কার করেন, কুণ্ডল প্রদান করেন, বদবার আসনখানি এগিয়ে দেন। নিঃক্ষেপ-পাণি পুষ্কটিকে দেখেই, ভাবান্তর হয়, ধর্মের কথা আঙড়াক্তে থাকেন। ১০

কেউ যদি তাঁর কাছে কিছু বন্ধ রাখতে এসে বলেন—

“আর ভাই, সকালেই চলে যাকি। তোমার কাছেই সব রেখে গেলুম। ভ্রাতা পড়তে কতক্ষণ ? আজ এখন কি করি বল”। ১১

তখন কুসুমের মত বিকসিত হয়ে ওঠে বণিকের চক্ষু, বদনের রসমক অভিনয় করে ওঠে মিথ্যা খেল। পুনঃ পুনঃ এ পাশ ও পাশ দেখতে দেখতে, কাজের মধ্যে হঠাৎ চোখ সোঁথিয়ে দিয়ে তিনি বলে ফেলেন—১২

“তোমারি ভাই এ ঘরবাড়ী ; কিন্তু চিরটা কাল জ্ঞানসরকা করা কঠিন। দেশ কালের অবস্থা বড় মন্দ। তা, তুমি ভাই সাধু পুঙ্খ, তা হলেও আমি তোমার দাস হয়েই রইলুম। ১৩

ভ্রাতার কথা বলছ, কিন্তু ভাই দেবীট দ্বিভা নন, তিনি প্রশস্তব। গচ্ছিত ধনের মূল সাধনই করে থাকেন। ধীরা এ কাজের কাজী, তাঁদের মুখেই এ সব কথা শোনা। তাঁরা ঠেকে লিখেছেন কি না। তুমিও তো তাই জানো। ১৪

কিছুদিন আগে আমারি এক বন্ধু—ভ্রাতার আশঙ্কার কিছু বন্ধক রেখে গেলেন। আমি যাবে হুহু সেটিকে কৌশলে খাটিয়ে খুঁটিয়ে আবার বাড়িয়ে দিই। তারপর বন্ধু এসেন, আর নিলেন। ১৫

বৃক্ষে, বঙ্গগণ, ইত্যাদি একাত্তর নানান অসম্ভব বর্ণনা

ক'রে নিভৃত সেই পাশে—মোটাবুড়িরে কাছ থেকে গ্রহণ করেন সোনালীনা। নাচতে থাকে তাঁর মনের মত। ১৬

বন্ধু কী ভ্রম তিহি ভাঙান। ক্রম-বিক্রমস্লে অনন্ত করেন লাভ। মূলধন আত্মে ধন বেড়ে ওঠে। তিনি তখন উপহাস করতে থাকেন ধনাধিনাথ কুহেলকে। ১৭

এই সমস্ত কাহ্নে বণিকদের ধনকুন্তলি সর্বদাই থাকে পূর্ণ, কিন্তু সম্ভোগ করবে কে? বালবিধবাদের দুঃখফল স্তনতটের মত সেই ধনকুন্তলি বুথাই পড়ে থাকে। ১৮

দান নেই, উপভোগ নেই। হিবণ্যরক্ষা করতে করতেই, এই বেবিধবার দল নিরবকাশ জীবনযাপন করে যান। সমসার জীর্ণ হস্তিরে কীরা ধ্বংসার্শ মহামুখিক ডাকাত। ১৯

এই ধর্মধামে এক নিশিগর্প ছিলেন। তাঁর নাম “স্বরপতি”। বাক্যগোথরা যেমন গুণধন পাহারা দেয়, তিনিও তেমনি আঁকড়ে থাকতেন নিজের বিশুল ধনরাশি। কুটিল। ছোবল মারতে মহা-গুস্তার। মাথায় শোভা পেত বিকট এক কাপড়ের পাগড়ী,— উৎকট তার বেটীনা; সাপের বিরাট ফোয়ার মত। ২০

বিক ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ দৈবযোগে তাঁর ধনরাশি নষ্ট হয়ে যায়। বিদেশে নিবন হয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে উণাও হয়ে গেল সম্ভোগ্য। কী ক'রন? নিজের দেশে তিনি অতি সম্মত ফিরে এলেন। তাঁকে যে পৌছতেই হবে তাঁর মহাপ্রাণ মহাজন বন্ধুটির কাছে। ২১

কিন্তু কোথায় সেই মহাজন? শক্তি হয়ে উঠলেন। শেষে এক দেশবাসীকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, “মহাশয়, বলতে পারেন মহাজনটি গেলেন কোথায়?”

তখন উত্তরে শুনলেন—

“সখ, তাঁর আজ বিভূতি—অজ্ঞ-প্রকারের। “খটক-মুখ”—মুদ্রায় তিনি চুটি মুঠি বন্ধ ক'রে এখন বাঁসে থাকেন। মৃগমদ, চন্দন, নবাস্তক, কপূর, মরিচ ও স্তম্ভারীর ব্যবসা কৈদে তিনি এখন মুহূর্ত মুহূর্তে গুণছেন কোটি কোটি মুদ্রা। ২২—২৩

তাঁর ‘বর-ভরন’ মেকুর মত বিশাল, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে চিত্রের ছড়াছড়ি। চমকাচ্ছে। আমাদের এই দেশে “পূরপতি” বলে এক বৈভবশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁকেও হার মানিয়েছেন এই মহাজন। সুখে বসবাস করছেন।” ২৪

পথিকের কথা শুনে অতুল বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে বঁকে পড়ল পূরপতির মুণ্ড। অবিলম্বে তিনি উপস্থিত হয়ে গেলেন মহাজনের বরভবনে। বাগা পোস্তন দ্বারে। নিমন্ত্রিতভের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বাতাসে উড়তে লাগল তাঁর মলিন জীর্ণবাস। ২৫

তুঙ্গ ভ্রমের চিলেকুরীতে বসেছিলেন মহাজন। জানালার জালিকাজের কীক দিয়ে বণিক তাঁকে দেখতে পান। চিনতে পারেন পূরপতিকে। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যেন বম বন্ধ হয়ে আসে, হাতে পায়ে ঝিল ধরে যায়, যেন যজ্ঞপাত হয় মাথায়। ২৬

পূরপতি তখন বীরে বীরে কোনক্রমে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেলেন। নির্জন অবসর বুধে, নিজের পরিচয় দিয়ে প্রার্থনা করলেন—নিজের গচ্ছিত প্রবান। ২৭

মহাজনের চোখ কিছু অন্ধমিকে চেয়ে হইল। চোখের মাথার বঁকে উঠল ভ্রু; শেষে হাতের পাতা কাঁপাতে কাঁপাতে বললেন—

“জীবিকার সাহান নেই, ঠগ মিথ্যাবাদী পাপ আবার কোথা থেকে এসে ছুটল। কে তুই, কোথা থেকে এসেছিস? কার কাছ থেকে এসেছিস? কোনোদিন তোকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। কী আবার তোর সঙ্গে কথা হল? আশ্চর্য ব্যাপার, কোথায়, কখন, বল, কার কোন জিনিষ আমার কাছে রেখে গেছিস? তাখো একবার, উঃ কী কষ্ট, যোর কলি। এতটুকুও কোথাও হুইট নেই। আমার কাছে এসে বলে কি না, গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দাও! আশ্চর্য, জগৎ জানে।—‘হরগুস্তে’র বংশে আমার জন্ম। এই বংশে বন্ধকীতমস্রকের কারবার ভাবতেও পারা যায় না। তার উপর বলে কি না আমি চোর, সত্যের অপলাপ করেছি! যোর মহাপাতকের স্পর্শ।

না, না। তাহলেও, বীর মহান তাঁরা প্রত্যাখ্যান ক'রে দূর করে দেন না সেই পাপকেও, যে দয়া করে মহতের সত্যতা-সম্বন্ধে মিথ্যা দোষাতোপ করে। বলা কত তারিখ, সে তারিখে কী লেখাপড়া হয়েছিল, বলে। এবার নিজেই তাখো। আমি বুদ্ধ হয়েছি, ছেলের হাতে সমস্ত ভার হস্ত কবেছি; আমার সমস্ত ব্যাপারই লেখাপড়ার মধ্যে থাকে। ২৮—৩২

বাক্যবাণে বিনষ্ট হয়ে গেল পূরপতির বৈধী, ধারণা, অধ্যবসায়। বিভাড়িত, বিস্মিত হয়ে তিনি তখন দৌড়লেন মহাজনের পুত্রের নিকটে। ৩৩

বাপও জানেন, ছেলেও জানেন, পিতাই সব কিছু দলিলাদি সম্পাদন করেন। অতএব পূরপতি একবার পিতার কাছে, একবার পুত্রের কাছে অনেকক্ষণ ধরে কন্যকের মত চালাচালি করে ফিরতে লাগলেন। ৩৪

শেষে রাজস্বারে উপস্থিত হলেন, অভিযোগ করলেন প্রবাস থেকে ফির এসে তিনি তাঁর গচ্ছিত ধন ফিরে চান। কিন্তু মহাজন! তিনি রাজকোপ সহ্য করতে প্রস্তুত হলেন, রূপের একটি চাকতিও তার হাত থেকে কিছু যসল না। যজ্ঞগা শব্দে বহুবিধ প্রয়োগ হল, রাজস্বার্য পরিপীড়নের অভাব হল না। কিন্তু মহাজনের এক কথা—“আমার হাতে গচ্ছিত একটি জিনিষ নেই, একটি বণাও না।” ৩৫—৩৬

এই রকমেরই হয় যখন কোণা জলের বিরাট পিপাসা। বীর স্বভাববুদ্ধ তাঁদের। একগাছি তুণের মত তাঁরা বিসর্জন দেন দেহ, কিন্তু লক্ষীর কড়ির একটি লনাও তাঁরা ছাড়েন না। ৩৭

সে আজ অনেক মুগের কথা।

[ ক্রমশঃ

[ মাসিক বন্ধুভাষ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]

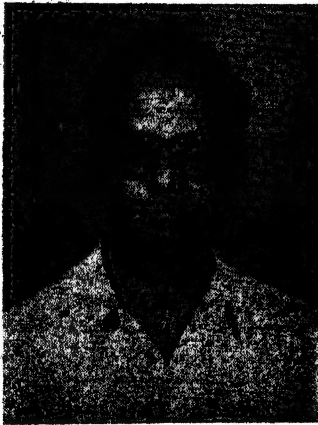


শ্রীশুশীলকুমার দে

[ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ]

“দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনই আমার একমাত্র কাম্য।

যত দিন বেঁচে থাকবো তত দিন জন-কল্যাণ কার্যে আত্ম-নিয়োগ করাই আমার জীবনের মূল মন্ত্র। সমাজ ও জাতির কল্যাণকর কার্য করেই আমি আনন্দ পাই, তাই যখনই এ কাজের ভক্ত আমার আহ্বান আসে, আমি তখনই তা গ্রহণ করি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আমি জনসমাজের সেবা-ব্রতই গ্রহণ করবো।” এ কথা কয়টি আমাকে বললেন কলকাতার রাজভবনে বসে যেদিন আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম—পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উন্নয়ন কমিশনার এবং বর্তমানে নিউ ইয়র্ক্‌স রাষ্ট্রসভ্যের সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীশুশীলকুমার দে, আই-সি-এস। নিরঙ্কর, সদালাপী এ মানুষটির ব্যবহার সত্যিই ছদ্মবেশ না কেটে পাত্রে না। জীবনে কর্তব্য করে বাওয়াই যেন তাঁর একমাত্র কাম্য। আমি যেদিন তাঁর জীবনের ঘটনাবলী জানতে চাইলাম, তিনি অমনি আমাকে দেশ ও জাতির সেবার কথাটাই বিশেষ করে বললেন।



শ্রীশুশীলকুমার দে

১৯০৭ সালে কলকাতা মহানগরীতে শুশীলকুমারের জন্ম হয়। কলকাতার স্কুল ও কলেজেই তাঁর শিক্ষা। ১৯২৭ সালে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চলে যান বিলেতে উচ্চ শিক্ষালাভের আশায়। বিলেতে গিয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে লণ্ডন স্কুল অফ একোনমিকস পাঠ এবং গবেষণা করেন। কিন্তু দেশের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রাতিযোগিতা করেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শাসন বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন কিন্তু দেশের ও জাতির জনকল্যাণকর কার্যে আত্ম-নিয়োগ করাটাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সে ব্রত উদ্‌ঘাপনের জন্তে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেষ্ট। শ্রী দে যখন নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখনই পল্লী উন্নয়নের ভক্ত নদীতা জিলায় সমবায়ের ভিত্তিতে একটি কার্খ গঠন করেন। সেই সময় ভারতে এই প্রকার কার্খ ছিল অতি বিরল।

তাঁর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শুশীলকুমার বাঙ্গালা দেশের অসামরিক লোকদের রক্ষার এবং বিমান আক্রমণে সাবধানতা অবলম্বন বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করে জনসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরীরা এ. আর. পি'র কন্ট্রোলার নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে শ্রী দে দুর্ভিক্ষ-ব্যবলিত বাঙ্গালায় সাহায্য ও পুনর্বাসিত বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। বাঙ্গালায় এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে জীবন বিসর্জন দেয়। জনসাধারণের অপরিমীম দুঃখ-তর্দশায় শ্রী দে সেদিন এগিয়ে আসেন বাঙ্গালা সরকারের আহ্বানে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলে বাঙ্গালার সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ স্বীকৃত হন। তারপর একে একে চিকিৎসা, জনসাহায্য এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারীর গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শ্রী দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, বন, মৎস্য এবং সেচ বিভাগের সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত শ্রী দে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনারের কার্য গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শুশীলকুমারের অবদান সামান্য নয়। তাঁঃই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দান করে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কার্য অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত হয়। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র জগতে শ্রী দেব এই অসামান্য সাফল্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শুধু সরকারী ও জনহিতকর কার্যের মধ্যেই শ্রী দেব কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ নেই। লেখক হিসেবেও তিনি এরই ভেতর একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সমূহের উপর তিনি বহু মৌলিক প্রবন্ধ এবং পুস্তিক রচনা করেছেন এবং সহযোগিতা, পরিকল্পনা এবং শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়ন বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিত্বরূপ শ্রী দে পশ্চিম-ইউরোপের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

শ্রী দেবসংসদেব প্রতিনিধিত্ব ১৯৫১ সালে কৃষি এবং সমসাময়িক মনোবৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেন। তার পর ১৯৫৩ সালে নেভার অস্ট্রিয়ার আন্তর্জাতিক কাউন্সিলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব সেবে গমন করেন। তিনি বহু বার পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করে ভারতের মহালা ত্রিভুজিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনের যে মার্কিং যুদ্ধবাহুর বিভিন্ন স্থান এবং জাপান পরিদর্শন করেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির সমাজতন্ত্র বিভাগের চাকরি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালের প্রিন্স মার্শে তিনি ডেপুটি ডিরেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণ করেন।

শ্রী দেব এগনও কর্মক্ষম। তিনি রাষ্ট্রসংসদে হ'য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং খনও করে চলেছেন। তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা ও কর্মকলাপতা মনোবৈজ্ঞানিক হ'য়ে জনমানবের সেবায়। তিনি আজীবন এই শব্দভাষ্যে কাটিয়ে দেবেন, এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

### শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

[কতিমান কর্মীপুত্র। বৃক-কোম্পানীর স্বাধিকারী]

সার কলকাতার গ্রন্থাগার বসতে কলেজ স্ট্রীটকেই বোকার। কলেজ স্ট্রীট, বক্সি চ্যাটার্জী স্ট্রীট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ লন ও ক্রিয়াক্ষম হারিসন রোড। অসংখ্য জনমানবের ভিত্তি আগা-গাওয়া, গুণা-বস, বোঝা-খবরের বিরাম নেই। সাহিত্যিক, বিজ্ঞান, পরিবেশক, ক্রোডা, ছাত্র কেউই এখানকার আগন্তুক নয় বরং প্রতি-দনের অতিথি। বক্সি চ্যাটার্জী স্ট্রীটের কথা বরা হাক। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হল, মজাবোধি, টুডেস হল প্রভৃতি বিনোদনকারী আসা-বাওয়ার দৌধগুলি সর্বদাই কোলাহলে মুগ্ধ। এরই পাশাপাশি অবস্থিত বাড়িগুলির মধ্যেই আছে আর একটি বাড়ি, যেখানে বেথা বাবে 'বৃক-কোম্পানী'র সাইনবোর্ড। বৃক-কোম্পানীর ভিতর দিকের একটি কক্ষ। এক্ষেত্রে বসে বোঝাই বাবে না—যে কোন এক্ষেত্রে বসে আছি, শান্ত, নিস্তক, কোলাহল শূন্য। কাজ করার চমৎকার জায়গায়। সেই কক্ষ বসে আলাপ করছি শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। বৃক-কোম্পানীর স্বাধিকারীর সঙ্গে, একটি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ অসামান্য দৃঢ়তাসম্পন্ন কর্মীর সঙ্গে।

বাহ্যিক বাহ্যিক বর্জিত, অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার, সমালোচী নিরহকারী শ্রী মিত্রের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। পিতৃদেব স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র সরকারী উকীল ছিলেন ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি হ'ল একটা উদাহরণ বা তাঁর পুত্রের কাছে পেলুম, তা তো ভাবাই যায় না। সারা দিনের মধ্যে কোর্টে বাবার সময় গাড়ীতে পড়তেন দেবেন্দ্রনাথ ছাত্র-জীবনে বা-বা পড়ে এসেছেন বা কর্মজীবনে যে সব আইন-শ্রদ্ধে বাঁচতে হয়েছে তার কোন বইতে কোন পৃষ্ঠায় কোন লাইনে কোন কথাটি লেখা রয়েছে, কোন টাইপে তা ছাপা, কতটা জায়গা এ লেখাটি নিয়েছে, তা যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় তিনি মুহূর্তমাত্র চিন্তা না

করে বসে গিতে পারতেন! এ বেন তাঁর কাছে জলের মত বহু। কিছুই নয় বেন। ঝাঁর এঁর সহপাঠী পর্যায়বৃত্ত ছিলেন তাঁরাও ভবিষ্যতে আপন-আপন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করে গেছেন, সার্বজনীন আইনজ্ঞা বোমকেশ চক্রবর্তী, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা পৌরসভার কোষাধ্যক্ষ গুণরীকাক মুখোপাধ্যায় মহাশয় গণের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন, ৭ই আষাঢ় ১২৯৬ সালে গিরীন্দ্রনাথের জন্ম হ'ল মাহুলাসরে পিপলন গ্রামে। মাতামহের অপরিণীত স্নেহের মধ্যে জীবননাট্য শুরু। সমগ্র বর্ধমান অঞ্চলে মাতামহ বৈকুণ্ঠনাথ বোষ একজন সার্বজনীন ব্যক্তি ছিলেন। 'বারোশ' ছিয়াত্তরের মস্তুরে দৈনিক এক হাজার লোককে এগারো মাস বাব অন্ন দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১০৮ বছর বয়সে একদিন গঙ্গার তীরে জপ করতে করতে পরলোক গমন করেন বৈকুণ্ঠনাথ। আজও তাঁর প্রভাব অমলিন দীপ্তিতে বিরাজ করছে দৌহিত্র গিরীন্দ্রনাথের মধ্যে। স্কুলের পাঠ গিরীন্দ্রনাথ নিলেন পৌর বিদ্যালয় থেকে। তারপর যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, এখানে অসুস্থতা বশতঃ পর পর দু'বার আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না গিরীন্দ্রনাথের। মন গেল ভেঙে, কলেজী শিক্ষার ওইখানেই ইতি। শুধু হ'ল জীবনের শিক্ষা। এর কিছু পরেই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সোড়ার ব্যবসারে যোগ দেন গিরীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে টেকে না। তারপর এক সন্ন্যাসী বন্ধুকে সন্ন্যাসের পথ থেকে ঘুরিয়ে এনে একটি কর্মের মধ্যে তাঁকে ডুবির রাখার উদ্দেশ্যে বৃক-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে।



শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র



আজ আটত্রিশ বছরে পড়েছে বুক-কোম্পানী। দিনেকের জন্তেও স্থানচ্যুত হয়নি। এই ঘরটিতেই তার প্রথম দিনের বাতায় স্বক হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গিরীন্দ্রনাথ আর এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে গেলেন। আজও বুক-কোম্পানী মানেই গিরীন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ মানেই বুক-কোম্পানী। সারা দিন এখানেই পাওয়া বাবে গিরীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি, তাঁর থাকিছু জৈবিক সঞ্চয় সকলই নিরোজিত হচ্ছে এরই কল্যাণে। গিরীন্দ্রনাথের জীবনীই আজ রূপান্তরিত হয়েছে বুক-কোম্পানীর জীবনীতে আর বুক-কোম্পানীর থাকিছু পরিচয় তা পাওয়া বাবে গিরীন্দ্রনাথেরই পরিচিতিতে।

পাঁচ বছরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বুক-কোম্পানীর নাম সারা বিশ্বে। বাঙালীর প্রতিষ্ঠানের এই গৌরবে প্রত্যেক বাঙালীরাই অংশ আছে। লীগ অফ নেশনস্-এ প্রকাশিত পুস্তকসমূহের সমগ্র প্রাচ্যে সোল এক্সট ছিলেন বুক-কোম্পানী। ভারতে মার্কিন মুদ্রকের এক-এডেভিস কোম্পানীরও এক্সট এরই ছিলেন। বুক-কোম্পানী নিজেও বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যেই ওকেনবার্গের বুক (পুনর্মুদ্রণ), ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের “মিলিটারী সিস্টেম অফ দি মারহাটাস এবং ফরেন বারোগ্রাফিকস্ অফ শিবাজী,” সতীশ মিত্রের রিকভারী প্লান ফর বেঙ্গল, জাহ্নবী ভৌমিকের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শতাব্দ্যের চট্টোপাধ্যায়ের তুলসীদাস, ‘লঃ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুসমাজের ইতিহাস প্রভৃতির নাম প্রাধান্যবোধ্য।

বক্তার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্ততম পরিচালকের পর বর্তমানে অলঙ্কৃত করছেন গিরীন্দ্রনাথ। জাশানাস ব্যাকেরও পরিচালকের পর অলঙ্কৃত হয়েছে গিরীন্দ্রনাথের দ্বারায়।

সুখ পুস্তক নিয়ে বুক কোম্পানীর কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ নয়। ব্রিটিশের যুগে এটি একটি ছিল তার মুখোশ, সে মুখোশের অন্তরালে গ্রন্থ-ব্যাপারী ছাড়া লুকিয়ে ছিল আরেকটি মুখ। সে মুখ লেশকর্মী। বহু পলাতক বিপ্লবী বাসের মাথার নাম হাজার হাজার টাকা তাঁরা অকুতোভয়ে গিরীন্দ্রনাথের পক্ষপটে কাটিয়ে গেছেন বাসের পর মাস। কত বৈপ্লবিক নিষিদ্ধ গ্রন্থ গিরীন্দ্রনাথ নিজের জিম্মায় রাখতেন। এ জন্তে বহু বার তাঁর উপর সার্চের আদেশ এসেছে।

এখানকার দৈনিক সাক্ষা আড্ডাটিও সেদিন কম বিখ্যাত ছিল না। হেন সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী ছিলেন না, বিনি উপস্থিত হতেন না এই আসরে। এখানে দেখা যেত বিপিনচন্দ্র পাল, অকুতোভয় মুখোপাধ্যায়, রাগলালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আইন কলেজের অধ্যাপক সতীশ বাগচী, জাতীয় গ্রন্থালায় তদ্বাবধায়ক সুরেন্দ্রনাথ কুমার (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভাগনা) প্রভৃতি সুবিদ্বানকে। এখানে পঞ্চমূলি পড়েছে কবিকঙ্কর রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, অহাছা পান্ডী, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতপুঙ্খবদের। প্রতিদিন অধ্যাহ্নে সেবা দিতেন শরৎচন্দ্র। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গিরীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত মৃত্যুর পরে মিত্র পরলোক গমন করার পর শরৎচন্দ্র জীবনে আর এখানে পাল্পর্শ করেন নি।

বুক কোম্পানীর পূর্ণগৌরব আজ লুপ্তপ্রায়, হারিয়ে গেছে অতীতের সেই কলহলে দিনগুলো, মিলিয়ে গেছে সেদিনকার

প্রাণচাক্ষু্য কিছ্র এখনও বর্তমান এর কর্ণধার সত্তরের পানপ্রোভে, হয়তো আজই সন্ধ্যায়, মনে ভেসে উঠবে তাঁর হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি আর হয়তো সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে পড়বে মূবের বিখ্যাত কবিতা ‘লাইট অফ দি আদার ডেস্’-এর অংশবিশেষ—

‘হুস লাইটস্ আর ডেড

হুস গাল্লীগুস আর ডেড

ঘাও অল বাট দি ডিপার্টেড’।

## ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ

[ কলকাতা মেডিকেল কলেজের সাক্ষাৎকার অধ্যাপক ]

“আর্জ মানবতার সেবাই আমার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছি ছাত্রজীবন থেকে এবং আজও পর্যন্ত আর্জি করব সেবাই করে চলেছি এবং বহু দিন বাঁচব এ মহান ব্রত পালন করে যাবো।”

উপরে এ মন্তব্যটি করলেন সেদিন কলকাতা মেডিকেল কলেজের শল্য-বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ এম. বি. এফ. আর, সি, এস। ডাঃ ঘোষ মেডিকেল কলেজের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাক্ষর। কর্মে অবিস্মৃতিত, সদা হান্তময়। অমায়িক ডব্লিউ ঘোষ সর্বদাই রোগীদের কল্যাণ কামনায় উদ্বিগ্ন। হাসপাতালের কর্মের মধ্যেই তিনি যেন নিজেই হারিয়ে ফেলেছেন। বহুস তাঁর এখনও পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে নি। এরই ভেতর সাক্ষর হিসেবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। ভারতের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ‘ব্রেন টিউমার’ অপারেশন করে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁর পূর্বে আর কোন ভারতীয় হাসপাতালে ‘ব্রেন টিউমার’ অপারেশন হয় নি। এখানও অপারেশন করে তিনি বহু ছাত্রবোধ্য রোগীকে রোগমুক্ত করেছেন এবং অনেকের জীবন বক্ষা করেছেন এবং এখনও করছেন। এদিক দিয়ে ডাঃ ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য।

ডাঃ ঘোষের ডাক্তার হওয়ার মূলেও রয়েছে এক বিমম্বকর ঘটনা। কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার আবেদন করেন। কিন্তু এর পূর্বেই ডাঃ ঘোষের পরমাধ্য পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করার তিনি ঋতিশি বি, এস, সি, ক্লাসে ভর্তি হন—কেন না, মেডিকেল লাইনে পড়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য। তিনি তাঁর পিতার মাতুল লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিংহের সহিত দেখা করতে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চান। লর্ড সিংহই তাঁকে অহুপ্রেরণা দেন মেডিকেল লাইনে পড়তে। শুধু অহুপ্রেরণাই নয়, তাঁকে মেডিকেল লাইনে পড়বার জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কেন না, এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশ ও জনসেবা করার প্রচুর সুযোগ থাকে এ মনে করে। তাঁর উপদেশ ও অহুপ্রেরণায় ডাঃ ঘোষ উদ্বুদ্ধ হয়ে মেডিকেল কলেজেই ভর্তি হলেন এসে। ডাঃ ঘোষের আর বি, এস, সি, পড়া হলো না।

এ ঘটনাটির সঙ্গে আর্জি মানবতার সেবার প্রেরণা আর একটি ঘটনা জড়িয়ে আছে ডাঃ ঘোষের জীবনে। সেটি হলো তিনি যখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ডাঃ ঘোষ বিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেসার বৈজ্ঞানিক হয়ে গমন করলেন। সে সময় একটি লোক কল হুবে



ধার। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে লোকটিকে উদ্ধার করে তার জীবন রক্ষা করেন। একজন ভারতীয় জীবন-রক্ষা সমিতি তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন এবং বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর একটি সভায় তাঁকে তাহা প্রদান করেন। পদকপ্রাপ্তি চাড়াও তিনি লোকটির জীবনদান করে যে প্রেরণা পেলেন, পরবর্তী জীবনে তাঁর সেই প্রেরণা হ'লে পাশেই এবং আজও পর্যন্ত তিনি সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কাজ করে চলেছেন অর্ধ মানবতার সেবায়।

মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দীতে ডাঃ ঘোষ ১১-৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় বৃক্‌গোপাল ঘোষ ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বাল্যকাল থেকেই ডাঃ ঘোষকে পিতার সঙ্গে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। ১৯২৩ সালে বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ডাঃ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় তাঁর পিতা ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমার এস. ডি. ও। বৃক্‌গোপাল বাবু ছিলেন বিষ্ণুপুর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্ভোক্তা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি চলে এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। ১৯২৫ সালে এ কলেজ থেকেই আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন। কিন্তু এসময় তাঁর জীবনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। বিষ্ণুপুরের সদর মহকুমা হাকিম থাকাকালে তাঁর পিতা বৃক্‌গোপাল ঘোষ পরলোক গমন করেন। আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার পর তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হ'বার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজে পড়া বায়সাধ্য মনে করে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এস, সি ক্লাসে ভর্তি হলেন। এরই ভেতর একদিন মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁর ভর্তি হবার আবেদন মঞ্জুর হ'য়ে এলো। ডাঃ ঘোষ মহা সমস্যায় পড়লেন। পিতার মৃত্যু হয়েছে, সংসারের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নয় যে দীর্ঘ দিন মেডিকেল কলেজের পাঠ তিনি চালিয়ে যেতে পারেন। এ অবস্থায় কোন কিছু ঠিক না করতে পেরে তিনি তাঁর পিতৃদেবের মাতুল স্বর্গতঃ চর্চ সত্যেন্দ্র-প্রসাদ সিংহের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর কাছে কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাইলেন।

লর্ড সিংহ তাঁকে ডাক্তারী পড়ার উৎসাহ দিলেন, কেন না, উহাতে তিনি স্বাধীন ব্যবসা করতে সক্ষম হবেন। শুধু উৎসাহই নয়, তিনি আর্থিক আনুকূল্য করবেন বলে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লর্ড সিংহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। লর্ড সিংহের আর্থিক আনুকূল্যেই ডাঃ ঘোষ মেডিকেল লাইনে পড়তে সুরোপ পেয়েছিলেন একথা আজও তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১৯৩১ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি হাউস সাধন হন। তার পর বেশকিছু মেডিকেল সার্ভিস গ্রহণ করে বিভিন্ন জিলায় হাসপাতালে কাজ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি মেডিকেল কলেজের রেসিডেন্ট সাধন হন। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সার্জারীর শিক্ষকের কার্য করেন। তারপর চলে যান চট্টগ্রামে ১৯৪৩ সালে—সার্জারীর শিক্ষক হিসেবে। সেখানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমানেই এস, কে, হাসপাতাল) প্রথম ভারতীয় রেসিডেন্ট সাধন হিসেবে



কুমারকান্তি ঘোষ

যোগদান করেন। এভাবে সার্জন হিসেবে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং এফ, আর, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৫০ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে আর.এম.ও. হয়ে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সার্জারীর সহকারী-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে তিনি ১৯৫৪ সালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ ঘোষ আধুনিক কালের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সার্জন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তিনি একনিষ্ঠভাবে মানবতার সেবা করে চলেছেন। তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে মানবসেবার আয়োজন করে দেশের ও সমাজের কল্যাণ কলন, এ প্রাণনাই কবি।

### সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ বসু

[ 'রবিবাসর' সম্পাদক ]

বাংলা দেশে সাহিত্যিকের অভাব নেই, কিন্তু ছোট-বড়-মাঝ

সব শ্রেণীর সাহিত্যিকের মধ্যে সমভাবে সমাদৃত, সমদলগত স্বাধীনতার উদ্ভিষ্ট অজাতশত্রু সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মানুষ'বিশেষ বিরল। সেই বিরল গোষ্ঠীর মধ্যমণি হিসাবে গণ্য 'রবিবাসর' নামক বিখ্যাত সাহিত্যসভার সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি সাহিত্য সাধনায় যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সাহিত্যিকদের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেয়ে কম নয়। সে হিসাবে তিনি স্রোত জলধর নরেন্দ্রনাথের উত্তর সাধক এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পবিত্রাণের উপযুক্ত পূর্বসূরী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হ'তে শুরু করে বাংলাদেশের গণ লতাকাঁড়ালের সকল সাহিত্যিকেরই তিনি আপন জন। বিবিধ এই যে, পরস্পর বিবদমান দলের প্রত্যেক সদস্যের ক'তিনি সমাদর পান, তাঁদের কেবল সাহিত্য সাধনার নয়, ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখের সন্ধান নেন।

'রবিবাসর' বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের সাহিত্যসভার ইতি অগ্রদূত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হ'তে বাংলা



নরেন্দ্রনাথ বহু

খ্যাত মনীষী ও সাহিত্যসাহক বহু খাতনামা ব্যক্তি এই সভার ত্রুপদ গ্রহণ করে এই সাহিত্যসভাকে গৌরবাধিত করেছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সনাতন সংস্থা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকার অনেকে চেষ্টা করে আসতে পারেন নি। তবু ১৩৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্বিতীয় ২৭ বৎসর কাল রবিবারের পরিচালিত হচ্ছে। কোন একটি সাহিত্যসভার এত দীর্ঘ জীবন লাভও বাংলা দেশে ইতিপূর্বে হয় নি। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে বার ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও ঠার বলে—তিনি নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ বিশ বৎসরেরও বেশি বয়সের সম্পাদনার কাজ অতি সূত্রে পরিচালনা করছেন। জ্ঞানার্থে আহ্বানে শান্তিনিকেতনে রবিবারের অঙ্কঠান, শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির অঙ্কঠানিক সম্বন্ধনা-উৎসব এত নরেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের স্বর্গীয় ঘটনা। রবিবারের মিথি পরিচর আছে এমন বহু মনীষী নরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক চরিত্রের বিবরণে বহু প্রসঙ্গে বলেছেন। স্বর্গত সর্বাধ্যক্ষ জলধর এবং বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে নূতন জন্ম সকল সময়েই একথা বীকার করেন—যে ‘রবিবার’ বেন জলধরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিন্তু ‘রবিবার’ তার একমাত্র পরিচর নয়। এখানে তার কল্যাণ সন্দেশ উল্লেখ করছি।

১৯১৭ সালে ৪ঠা চৈত্র তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫

সালের খরসৌ আন্দোলনে বালক বয়সেই বোগদান করেন। মাত্র বোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা প্রার্থীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ ‘ছাত্রসংঘ’ নামক ছাত্রের ছাত্রদের উপযোগী মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিনা অল্পমতিতে পত্রিকা প্রকাশের জন্য কৃত্যাত কিসেফোর্ডের আদালতে তিনি অভিযুক্ত হন। এবং ‘ছাত্রসংঘ’ প্রকাশ বন্ধ হয়। ইণ্ডিয়ান সার্বাল এসোসিয়েশনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে অধ্যয়নকালে ১৯০১ সালে তিনি ‘বিজ্ঞান-দর্পণ’ নামক একখানি বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান-অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবনের আরম্ভ হলেও সাহিত্যসেবায় তাঁর উৎসাহ বরাবরই নিন্তা নূতন পথে ধাবিত হয়েছে। ‘গল্পহরী’ পত্রিকায় রসরচনা লিখে তিনি তল্পদিনেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৩২৭ সালে ‘বড় অবতার’ নামে তাঁর সচিত্র রসরচনার বই বের হয়—ছবি আঁকলেন শিল্পী বতীজ্জুমাংব সেন—পরন্তুরামের ‘গড্ডলিকা’ প্রভৃতি গ্রন্থে যিনি ‘নায়ক’ নামে ব্যক্তিচিত্র আঁকছেন। ‘বড়-অবতার’ ‘গড্ডলিকা’ প্রকাশের পাঁচ বৎসর আগে বেরিয়ে রসিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ১৩৩০ সালে নরেন্দ্রনাথ ‘বাঁশরী’ নামে একটি বৃহৎ আকারের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। তিনিই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অধুনাত্য প্রবেশকুমার সাত্তাল প্রমুখ বহু সাহিত্যিক ‘বাঁশরী’তে লেখা শুরু করেন। ১৩৩২ সালে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘মানসকমল’ প্রকাশিত হয়। এর বহু গল্প নানা ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর সম্পাদিত ‘ব্রহ্মপ্রবাস শরৎচন্দ্র’ এবং ‘জলধর সেনের আত্মজীবনী’ বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। ১৩৫০ সালে খুলনার দৌলতপুরে ‘বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন’ের তৃতীয় অধিবেশনে নরেন্দ্রনাথ ‘কথাসাহিত্য’ শাখার সভাপতিত্ব করেন। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সম্ভব কার্গনির্বাহক সমিতিতে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা এসোস সমিতি, হাওড়া পারিজাত সমাজ ও বোম্বাই-এর বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বোগ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতি অমায়িক ও সাদাগামী। এই নিরভিমান জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিককে সম্প্রতি পর পর স্ত্রীবিয়োগ ও জাঙ্কুবিয়োগের গভীর বেদনায় মুহমান করে ফেলেছে। বয়সের ভারে বহু অস্থির হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখের হাসি ঠিকই আছে। এই বয়সেও পূর্ণ উজ্জয়ে তিনি ‘মুষ্টি-কথা’ লিখছেন, মনীষীদের জীবনী আলোচনা করছেন আর নিরমিত ভাবে সাহিত্য-সভার বোগদানও করছেন। ভগবান তাঁকে সুস্থ ও শতায়ু কনন।

[ মাসিক বহুমতীর পক্ষ থেকে সর্গদ্বী রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শতাব্দী সামন্ত, ও কল্যাণাক বাল্যাপাধ্যায় লিখিত। ]

## —আগামী সংখ্যায়—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপ্রকাশিত পত্রগুলি

এবং

একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথম অংশ

## যুদ্ধের সময়কার কথা বলছি।

যোড়ার গাড়ীচালকের আসন থেকে নেমে এসে একজন কান্নের পাশে গৌড়া বিড়িটা টেনে নিয়ে ফুকবার চেষ্টা করতে-করতে বলছে : জানিস সেলিম ?—একটা ছোবি এসেছে শহরে, সে বোড়ো জোব্বর ছোবি রে ! নাচ-গানের ! লেবিন পাবলিক শোশল্ কেরছে না একেবারে—

যার কর্ণগোচর করবার জন্তে কথাগুলো বলা সে বিড়ি বাঁধছিলো একমনে। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতেই সে মুখ না তুলেই বললো এবারে : জানি ; জানি দোস্ত ! নাচ-গানের হাই-ক্লাস পিকচার ! লেবিন mass-এ লিচ্ছে না একেবারে !

বাংলা ছবি না লাগলেই mass-এ নেয় না।

এদেশে কে যে mass আর কারা যে জাঁতলেকচুয়াল, কে বলবে ? গাড়োয়ান আর বিড়িভলা,—তাদেরও আকর্ষণ : ছোবি mass-এ লিচ্ছে না !

বাংলা ছবি কেন লোকে নেবে, এ-প্রশ্ন কিন্তু কেউ করে না !

বাংলা ছবির প্রোডিউসাররা গ্যাংবাডিন পরে ; গাড়ী চড়ে ; গোল্ডফ্রেকের চিন থেকে বিড়ি কৌকে। বানের জলের সঙ্গে আসে ; বানের জলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। টাকা এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঝোঁপার করে নি ; তাই টাকা চলে গেলে এরা মাথার হাত দিয়ে বসে পড়ে না ; পরের মাথার হাত বুলিয়ে আবার টাকা করবার 'বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—এই বিশ্বাসে ফিরে যায়। পড়ে থাকে এসিষ্টেটরা ; পড়ে থাকে সামান্য মাইনের মিস্ত্রী-কুলীরা ; পড়ে থাকে Crowd-Scene-এ গা দেখানোর জন্তে সুপারের বোলের আশায় সেই সব মেয়েরা, যারা সারা দিন অতুত থাকবার পর শোনে, পাঁচ টাকার পেমেট, তাও আজ নয়, কাল ! কালও নয় ; সে টাকার পেমেট কেবে তারা পাবে, বলতে পারেন শুধু 'মহাকাল'।

এই সব প্রয়োজকদের টাকা শেষ হয় ; ছবি শেষ হয় না।

ছবি শেষ হয় না, কারণ ছবি তৈরী করতে এরা আসে না। এরা আসে আনন্দ করতে। যদ আর মেয়েমানুষ ; লক্ষ্য এরাই ; ছবিটা উপলক্ষ্য মাত্র ! তাই যারা পড়বার জন্তেই থেকে যায় শুধু চলচ্চিত্র-শিল্পের কর্মীরা, সামান্য মাইনে বাদের একমাত্র সখল।

সামান্য মাইনে সখল এই সব সহকারীরা প্রায়ই শহরে থাকবার সাহস করে না ; থাকে শহরতলীতে। এদেরই কেউ কেউ যখন সারা মাস কাজ করবার পর মাইনে না পেয়ে আটের-বি বাস ঘরে, যাদবপুরের রাস্তার তখন হরত তাদরই কেউ কেউ ঘোবনের স্বপ্ন সেক্সপীর আওড়ায় : T. B. or not T. B. that is the Question !

## সাত

এতক্ষণ নীরস তত্ত্বকথা শুনিযেছি, এবারে একটি সরস গল্প বলি। এ-গল্প হাসির কি কান্নার বলা শক্ত। এ-গল্প গোবিন্দলালের গল্প ; 'কৃষ্ণকান্তের উইলার' গোবিন্দলাল নয় ; ফিল্ম-কোম্পানীর সহকারী পরিচালক গোবিন্দ ঢোলের জীবনের গল্প। যদিও গল্প বলছি তবুও ঠিক গল্প নয়। যেমন বিভাগগণের ভুবন এবং তার মানসীর গল্প গল্প হলেও, ত্রিভুবনে তার চেয়ে নির্মম সত্য আর নেই কিছু, তেমনি গোবিন্দলালের গল্প একজনের সত্য ঘটনা। না ; ঘটনা নয় ঘটনা।



নীলকণ্ঠ

এবং কোনও একজনেরও নয় ; এ-ঘটনা ফিল্ম লাইনে সমস্ত বিভাগের সহকারীদেরই মর্ষজ্ঞ বদন্যার বিরস অভিজ্ঞতা ; তিস্ত সঞ্চয়।

গোবিন্দলালের এ-বাত্তা আর রক্ষে নেই।

শেষ ভরসা ছিলো ট্রাম ট্রাইক, তাও তেমন জুতের হলো না জমতে না জমতেই মিটে গেলো। এমন কি গোবিন্দ তার ট্রাম থেকে শেষ ব্যাং-এর আধুলিটা দিয়ে বলেছিলো ট্রাইকলোদের পূজার বজীর দিন পর্যন্ত অন্তত যদি দোকান-টোকান বন্ধ না রাখলে পারো তাহলে ভাবনে আর তোমাদের বুলিতে কিছু দিচ্ছি না। এই বারের এই আধুলিটাই আমার শেষ দান (শেষ কথাটা বললে গিয়ে গোবিন্দ যেন স্তব্ব হয়ে লাইনটা গেয়েও দিলো)।

যারা ট্রাইক করতে বেরিয়েছিলো, তারা অবাক হয়ে শুনছিলো তবে বতই অবাক হোক আধুলিটা নিতে তাদের ভুল হয় নি এবং একবার আধুলিটা দেওয়া হয়ে গেলে তারা আর পোকান বিবে করে কাপড়ের পোকান কেন বন্ধ রাখতে হবে, সে নিয়ে পাড়ি পাড়িয়ে ভাবটা সময়ের অপব্যয় মনে করে এগিয়ে পড়েছে : ট্রাম ভাড়া বাড়ানো চলবে না ! চলবে না !

এই চলাবে না কথাটা গোবিন্দর ভাবি মনে ধরেছে।

সত্যিই আর চলবে না। কী করে চলবে ! মুদির দোকানে পাওয়া যেতো ; এখন রাস্তান ! তখন শুধু বউ ছিলো ; এখন বউ চারটি ছেলেমেয়ে। সখলের মধ্যে ফিল্ম কোম্পানীর একটি চাকর ফিল্ম কোম্পানীর আখার অতুত ব্যবস্থা। বহুত্রে তিনবার মাইনে বাকী ন'বারের মধ্যে তিনবার মাইনে বাকী থাকে ; এ বছর ও

brought forward হয়। বাকী ছ'বার আজ দু'টাকা কাল চার টাকা করে (ববীজনাথের সেই : সে কি এলো, সে কি এলো না, বোঝা গেলো না) মাইনেটা শেষ পর্যন্ত পুরো আদায় হয় কি না মনে থাকে না! এর ওপরেও আছে; ঐতিহ্যের 'এহ বাছ'র মতো তার আর ইয়ত্তা নেই। টুডিওতে প্রায়ই গোবিন্দকে ম্যানেজ করতে হয়। গোবিন্দ হচ্ছে সহকারী; তাই ম্যানেজ করাটাই তার একমাত্র কাজ। এই ম্যানেজ করার ইতিহাস-ভূগোল দুইই আছে। টুডিওতে গোবিন্দর যিনি শ্রব অর্থাৎ যিনি একাধারে পরিচালক এবং প্রযোজক তার টাকা সব সময়ে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছয় না। তার আবার কারণ আছে। প্রযোজক-পরিচালক যেখান থেকে টাকা আনেন তার সেই ডিষ্ট্রিক্টের আবার একা নন, তার পার্টনার আছে। পার্টনারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। কাজেই একটা গুই কখন হয়ে যায়, কিন্তু আরেকটা গুই কখনই হতে চায় না। ডিষ্ট্রিক্টের প্রায়ই বলে : ভেরি সরি। আজকের দিনটা চলিয়ে নিন; সোমবার ফাঠ' আওয়ার ডেস্কিনিট (এসব ক্ষেত্রে মাকের দিনটা প্রায়ই হোববার পড়তে দেখা যায়); সোমবার ফাঠ' আওয়ার মানেই মঙ্গলবার সেট আওয়ারে বেস্পতিবারের একটি পোষ্টডেটেড ঢেক পাওয়া; যেটি জমা দেবার আগে ডিষ্ট্রিক্টের একবার ফোন করে যেন জেনে নেওয়া হয় যে, জমা দেওয়া হবে কিনা, কারণ ঢেক বার বার ফেরত যাওয়াটা প্রেক্ষিত লাগে। অতএব গোবিন্দর 'শ্রব'কেও কিংবে এসে গোবিন্দকে বাধ্য করেই বলতে হয় : গোবিন্দ, আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নিতে হবে। অনেক সময়েই অবস্থা বলতেও হয় না; যুগ লেখাই গোবিন্দকে আঁচ করে নিতে হয়। গোবিন্দ তারপরেও ঝাড়িয়ে থাকলে 'শ্রব' রুষ্ট হন। এত বড় একটা আত্ম বর্জ্যতার ভার অল্প কালুর ওপর না দিয়ে তার ওপর দেওয়া সহ্যও কেন গোবিন্দ নিজেকে এখনও কৃতার্থবোধ করছে না। প্রোডিউসার-ডিরেক্টরের সাথে সেই রক্তিম জিজ্ঞাসা। এবং গোবিন্দকে এগিয়ে পড়তেই হয়।

পাঁচ টাকার একটা রোসের মেয়েকে আসছে ছবিতে নারিকার রোল নির্বাচন—এই আশাস বাণীতে ভুলিয়ে, খাবারজ্বালকে এখনও হিসেব হয়নি বলে ধমকে, ড্রেস এবং সেটের টুকটাকি আলোয়ারকে 'কাল সকালেই বাছ'র প্রতিশ্রুতিতে নিরস্ত করে, তার কথা বলবার সময় দেয় না গোবিন্দ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ফিল্ম কোম্পানীর এসিষ্টেন্টর চাকরীর লাহানা ছোট গল্পে ক্রম হবার পাত্র নয়; আধুনিক বালা বইয়ের মতো ওপরে পাকানীচে কীকা, আঠারো লাইনে এক পাতা, পরিচ্ছেদ সূত্রতে গল্পপাতা খালি শেষে ১ পাতা সূত্রে ছোট গল্পকে ফুলিয়ে কাঁপিয়ে ফেলো। আটপা পাতার উপভাস নয় এই লাহনার ইতিহাস।

একবারে বাকি গিয়ে বলে থান ইট; স্থল মিত্রের অভিধান।

তাই এতো সবের পরেও ডিরেক্টরের দশ বছরের ছেলেকে রাতের লায় অরটা একটু দেখিয়ে দিতেই হয়। এবং সেখানে উপস্থিত জমা মাত্রই ছাত্রের সোজা প্রশ্ন : তোমাদের রাতে আবার শুটি হচ্ছে বুঝি! গোবিন্দর অবাক উত্তর : কই না!—হ্যাঁ আছে; মি জ্বানো না। মাঠারকে ছাত্র সন্ধান করে (বাবার এসিষ্টেন্টর মশাই হলে ঠিকই তুমি কলাই নিরম কি না!) : এই ত'

বাবা গাড়ী করে জ্বানারীকে নিয়ে গেলো; মাকে বাবার সময় বলে গেলো—তুচি আছে; কিরতে দেবি হবে। অগত্যা গোবিন্দকে বলতেই হয় : হ্যাঁ! হ্যাঁ! একটু বাকী ছিলো কিনা! ও তুমি বড় হ'লে বুকে; ওকে বলে প্যাচ শট!

এসব ভাবনা চুলোয় বাক; এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা গোবিন্দর : সামনে দুর্গাপূজা। এই মুহূর্তে বাব ওপর গোবিন্দর সব চেয়ে রাগ হয় তিনি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। কী দরকার ছিলো তাঁর মাকে অকালে জাগাবার! তিনি ত' না হয় চোখ উপড়ে একরকম বেঁচে গেছেন। এখনকার এই পূজা বাজারের দুশ্চিন্তা তাকে করতে হয় নি। হাট উপড়ে ফেললেও এ বাজারে কেউ এক পরমা উপদ্রু হস্ত করবে না। ওদিকে বাড়িতে দিনের পর দিন উপোস করে কাটাও; কাঁতে কাঠি গোঁজো; তবুও পূজা বাজার করা চাই-ই। তুমি নিজের ভাত কিছু যদি না কিনতে পারো, ছেলেমেয়েদের গায়ে জুতু : ওঠা চাই; না উঠলে তোমার বউ-এর সঙ্গে ওঠা-বসা ঘব করা অসম্ভব; পাড়ায় বেরুনা লজ্জাকর। বুড়ো বাপ টিকে থাকলে তোমাকে একথা শুনতে হতোই যে তিনি পূজার সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে উজাড় করে দিতেন; উজাড় করে যে দিতেন একথা কে অস্বীকার করবে? উজাড় করে না দিলে আজ তাঁর ছেলেই এ হাস হবে কেন!

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো গোবিন্দ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে। ঘুম থেকে উঠ দেখলো, বউ খবর-কাগজ পড়ছে। খবর-কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বউ জিজ্ঞেস করল : এবারে পূজায় তাহলে কাপড় কেনা হচ্ছে না?

বোধ হয় না—গোবিন্দর স্বর প্রতি সময়েই যা হয়, বউএর সামনে তেমন মিথিয়ে পড়া নয় কিন্তু।

আমি জানতাম!—গোবিন্দপ্রিয়া বললো : কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে টাকা রেখেছিলাম, সেগুলোও যদি তুমি না নিতে ত' পূজা-বাজার আমি চালিয়ে দিতাম। আজ বিয়ের পর এই ক'বছর তোমার কত টাকা দিয়েছি জানো? নিজে ত' ঝিয়ের অর্থম ছেঁড়া কাপড় পরে চালাচ্ছি; তার জন্তে তোমার কিছু বলেছি কোনদিন? কিন্তু ছেলে-মেয়ে? সারা বছর এই দিনটার মুখ চেয়ে তারা বসে আছে; তাদের কী বলব?

আ-হা-হা—গোবিন্দ যতটা সম্ভব বাঘের মুখে পড়েও চেঁচিয়ে ওঠে : তুমি বুঝবে না; শুনবে না; শুধু শুধু চোঁচাবে। পূজার কাপড় কেনা হবে না, টাকার অভাবে নয়; কোকানপাট বন্ধ থাকবে বলে।

'কেন'? ছোট প্রশ্ন ও-তরকের। আর কেন? ট্রাম ট্রাইক চলেছে না? তাদের লোকেরা নিজে আমার বললে, কোকান পাট সমস্ত বন্ধ করিয়ে দেবে—

তাই নাকি?

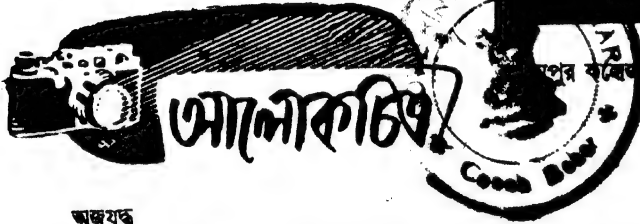
তবে আর কী বলছি! এবারে একটু আগে থেকেই, এখনই কাপড়-চোপড়গুলো কিনে রাখবো ভেবেছিলাম; নাম কম থাকতে-থাকতেই সারুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই ট্রাইকই তার দলা সারলো। একদমে কথা বলে গোবিন্দ একমুখে তার স্বীক



অজ্ঞতার পথে  
—হুমাত পাইন

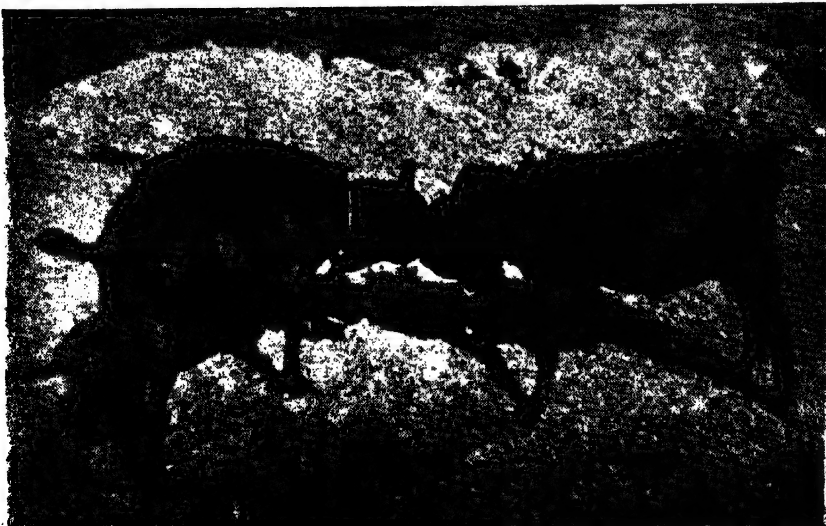


—চন্দন চক্রবর্তী



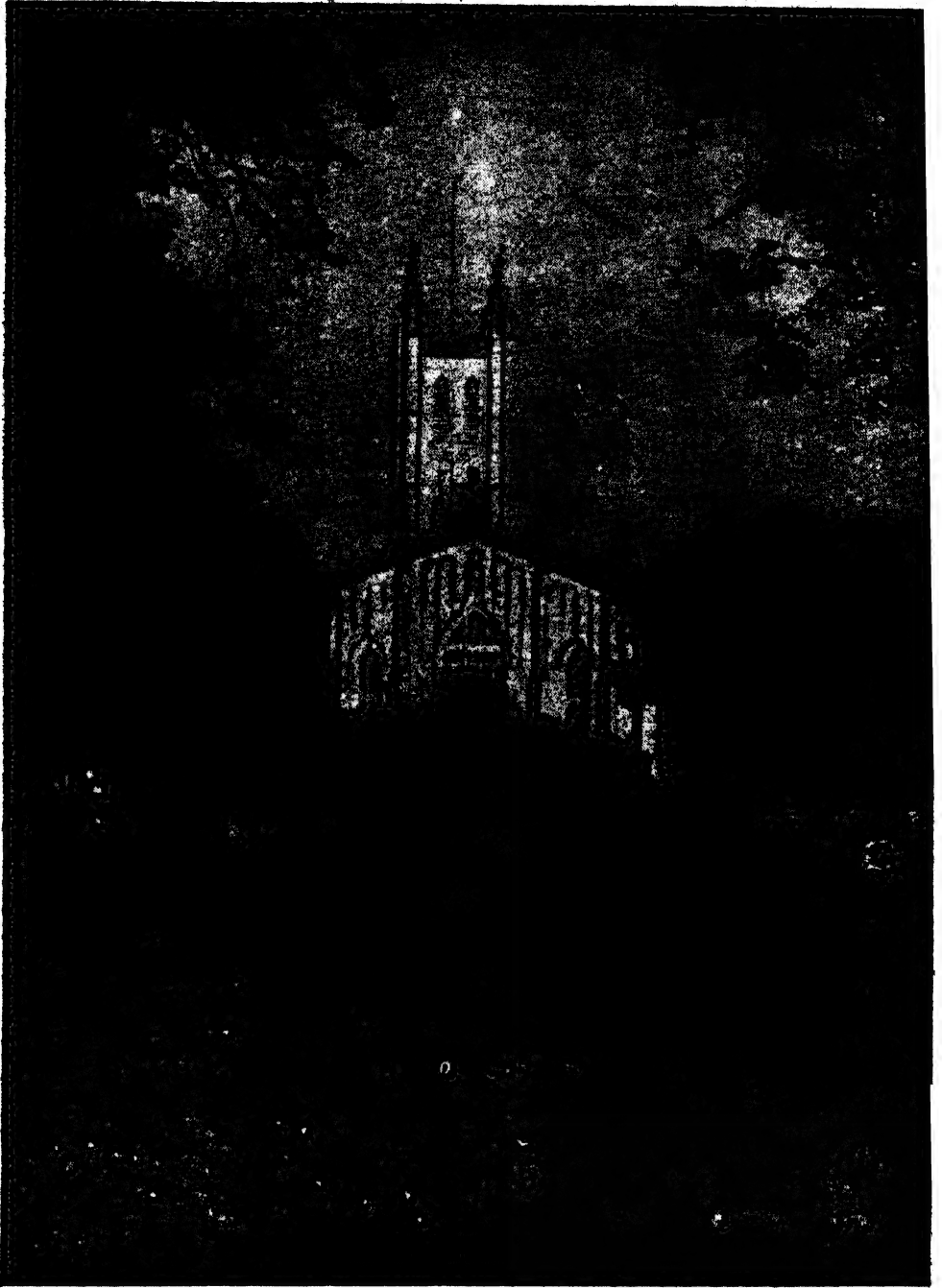
অজয়ক

—তৃপ্তিশেখর দত্ত রায়



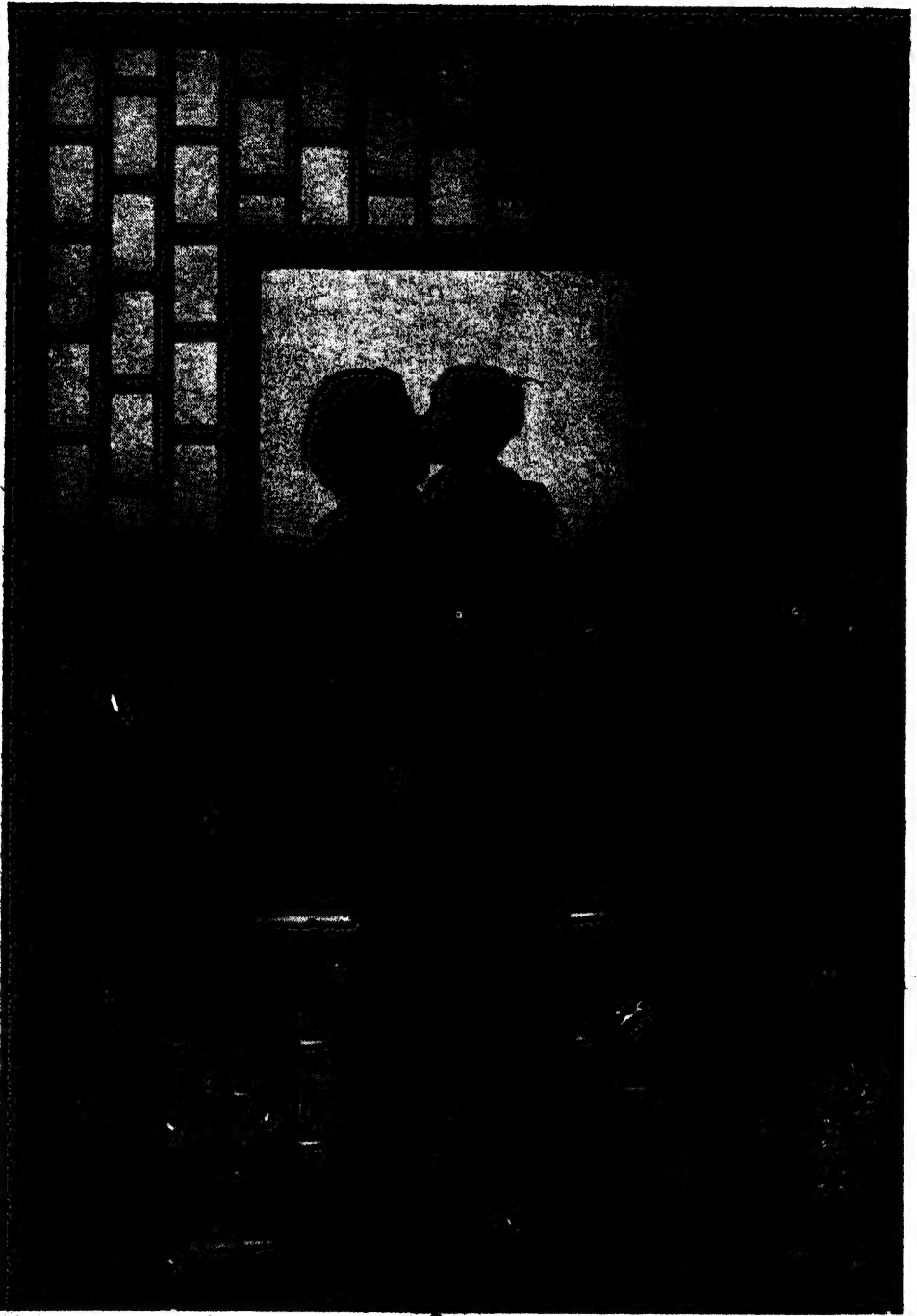


श्रीमेश्वरम् ( बाघाजि )



क्याथिड्रल (मल्लाह, कलिकाता)

—वाथनलाल कर्मा



দুই বোকা ( দিল্লী )

—পবিত্র মিত্র



মুখের দিকে তাকায়; লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু সেখানে বাংলা ছবির নাবিকার নর, স্নাকারিকার মতোই কোনও এক্সপ্রেশন নেই।

কিন্তু ট্রাটিক হচ্ছে ত' ট্রামভাড়া কমানোর জন্তে; তাতে কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকবে কেন?

সে কথা কে বলে? ওকে বলে চাপ দেওয়া; কাপড়ের দোকান বন্ধ করে, বাস! লোক গভর্মেন্টকে বাধ্য করাবে ট্রাম কোম্পানীকে শাসেস্তা করতে। তবে যতই ককক যতীর্ষ দিন দোকান খোলাতে না পারলে সরকারেরও সাংঘাতিক বিপদ আছে; এত বড়ো পুঙ্খ, সে ত' আর কাপড়ের জন্তে আটকে থাকতে পারে না?

তাগলে যতীর্ষ পথন্ত কোন উপায়ই নেই?

তাই ত' দেখছি।

দেখো; আমি তোমার চা নিয়ে আসি।

গোবিন্দ খবর-কাগজ দেখতে বসলো। প্রথম পাতার প্রথম খবর: কোলকাতা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন প্রত্যাহার!

এর পর আর খাটে বসে থাকা হয় না। ফুটপাথে মাথায় হাত নিয়ে বসে পড়বার আগে শেষ চোঁট করে দেখবার মহৎ উদ্দেশ্যে গোবিন্দ তার পনের দিন ভোর পাঁচটার বেয়িয়ে পড়ে 'স্বপ্নের' বাড়ির দিকে। সদ্য ট্রাবার এবং কাক-পক্ষী ট্রের পাবার আগেই। কারণ, কাক পক্ষীতে ট্রের পাবার আগেই 'স্বপ্ন' কেমন করে না জানি ট্রের পান যে পাওনার আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় এমন আর হেথা নয়, হেথা নয়, তত্ত্ব কোথা অস্ত্র কেনোখানে! বাস! তারপর সারাদিন তার 'স্বপ্নের' পাতা কে পায়। আজ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় তার খাড়া হয়ে যাওয়া চুলে গোবিন্দ তা' ভালো করেই জানে। 'স্বপ্ন'-এর বাড়ী পৌঁছে শুনলো তিনি ঘুমোচ্ছেন। হাক! নিশ্চয়ই হওয়া গেলো তবু; স্বপ্ন বাড়ী আছে। গোবিন্দও বাইরের ঘরের চোয়ার একটু গা হেঁসলো। এবং সেই তার কাস হলো। ঘুম থেকে উঠে শুনলো 'স্বপ্ন' বেয়িয়ে গেছেন। 'স্বপ্নের' ছেলে বললো: বাবা তাকে ঘুম থেকে তুলতে বারণ করেছিলেন; গোবিন্দ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এই জন্তে। গোবিন্দ যেন আপিসে দেখা করে। তার বুকেতে পেয়েছেন গোবিন্দ কি জন্তে এসেছে।

বৃহতে যখন পেরেছেন গোবিন্দও তখন হাড়ে হাড়ে বুকেতে পারলো, স্বপ্ন আর যেখানেই থাকাই আপিসে নেই। কাজেই বেলা তিনটে নাগাদ হাইকোট পাড়ার এক মিষ্টির দোকান গিয়ে তারকে গোবিন্দ ঠিকই পাকড়াও করলো। 'স্বপ্নের' একটা গুণ হচ্ছে, গোবিন্দ যতবারই লক্ষ্য করেছে, স্বপ্ন কোনও অবস্থাতেই, কিছুতেই অপ্রেতিভ হন না। তাই গোবিন্দকে দেখেই স্বপ্ন সারথী অভ্যর্থনা জানাতে কিছুমাত্র কষ্টের করেন না; আপিসে বলে এসেছিলাম তুমি যেসেই এখানে পাঠিয়ে দিতে; বালেনি কিছু? গোবিন্দ থানা কিছুই না বলে চুপসে গিয়ে বসে পড়ে; সামনে যে আসন পায় তাতেই।

নাও, নাও থাও কিছু;—স্বপ্ন সদয় হ'ন। গোবিন্দ খায় বটে কিন্তু খেতে খেতে ক'কড়ে যায়; এর পরের অণ্যায় তার মুখহু। স্বপ্ন পান চিবুতে চিবুতে মুক-বধির হুজায় ভিক্সেস করেন: কত? তিন টাকা বায়ো আনা ফিল হয়েছে মোট।

গোবিন্দ, আমার কাছে এখন বুজো নেই—ওটা দিয়ে এসো। স্বপ্ন মোটে ষাঁড়ানই না। রাস্তায় নেমে ভিক্সেস করেন: তোমার কত দরবার? আছে। দেউশো!—গোবিন্দর গলা দিয়ে কোনও বকমে এটুকু বোঝায়। করে দরকার?—আজই; না হলে বাড়ী চুকতে পারবো না।—এসো, দেখি কত দূর কি করা যায়?—স্বপ্নের মুখে মার্জিত শুনে যদিও গোবিন্দ তেমন ভরসা পায় না, তবু এগোয়।

স্বপ্নের পেছন-পেছন সারাদিন। প্রথমে স্বপ্ন বড়ো ট্যান্ডী করে বেরুলেন বেবী ট্যান্ডী ধরবার জন্তে। বেবী ট্যান্ডী যখন পাওয়া গেলো তখন বড়ো ট্যান্ডীতে ভাড়া উঠেছে তিন টাকা কত যেন; গোবিন্দ বিমুগ্ধ। কিন্তু স্বপ্ন কিকর্তব্যবিমুগ্ধ নন মোটেই। গোবিন্দ বতক্ষেপে ভাবছে তার কাছে চার আনা; স্বপ্নের কাছে কিছুই নেই; এবারে তাহলে?—ততক্ষেপে স্বপ্ন বেবী ট্যান্ডীওলাকে বড়ো ট্যান্ডীর ভাড়া চুকিয়ে দিতে বলে সীটে বসেছেন। সারাদিন এ-আপিস ও-আপিস। রাত এগারোটায় বাড়ী পৌঁছলেন যখন তখন সাতগো টাকা চার আনা উঠেছে ভাড়া। স্বপ্ন ওপরে উঠে গেলেন গোবিন্দকে নিয়ে, বার করলেন একটা থলি। দেখে গোবিন্দের গড়ে প্রাণ এলো। থলিটা খুলে ধরতেই প্রাণ আবার উড়ে গেলো; থলিটা আগের মতোই ছুটতে করতে লাগলো। থলিতে শুধু দু'পয়সা এক পয়সা! স্বপ্ন বললেন ওর থেকে গুণে ট্যান্ডীর ভাড়া নিয়ে আসতে। গুণে শেষ করতে পয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। নীচে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখে মীটারে ভাড়া উঠেছে আরো বেশ কিছু।

অন্ত:পরে স্বপ্ন একটা শেড়শ' টাকার চেক লিখে গোবিন্দর হাতে দিয়ে বললেন: এটা জমা দিও না। তবে?—গোবিন্দর অন্তিম ভিক্সাস! স্বপ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে: ওটা এখন তোমার কাছে রেখে দাও; পঞ্চমীর দিন সকালে আমার কাছে এসো; টাকা এখান থেকেই পাবে; ওটা ফেরত দিয়ে দিও তখন।

গোবিন্দ রাত একটার বাড়ী পৌঁছে স্ত্রীকে জানালো; টাকা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত চেক ভাঙবার চেষ্টাও করবে না ঠিক করে নিয়েছে সে। স্বপ্নের কাছেও আর যাবে না। গোবিন্দ তার কিকর্তব্য এত দিনে জেনেছে। তার মুখে এখন বৃদ্ধের প্রশান্তি! গোবিন্দর বউ ঘাবড়ে গেছে। গোবিন্দর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি ত'? নাঃ! দু'সে কি যা-তা ভাবছে! গোবিন্দর মাথা খারাপই ত' ছিলো বরাবর; মাথা তাহলে ঠিক হয়ে যায়নি ত' হঠাৎ। মুখ দেখে মনে হয় যেন ব্যাংকে কি সিলুকেও নয়; টাকাটি ট্যাকেই গোঁজা আছে, বললেই বার করে দেবে। অথচ একদিনের বাজারও পুর্বানো কাগজ বেচে; হার করে; বাকী রেখে চালায়ে হচ্ছে! তবুও গোবিন্দর মুখে নেই কোনও দুশ্চিন্তা! নেই এতটুকু ভয়ের আভাস! এমন কি এতটুকু ভাড়াহুড়ো, ছুটেছুটিও এতটুকু পথন্ত নেই টাকা জোগাড়ের! তাহলে?

পঞ্চমীর দিন বিকেল বেলায় গোবিন্দ বেরুলো বউ ছেলেসেই সমেত। রাস্তায়ও গোবিন্দর সেই এক ভাব। গোবিন্দর বউ আ' থাকতে পারলো না।

কী গো! কোথায় যাচ্ছ? বাজার ত' এদিকে নয়?

না; গোবিন্দর ছোট জবাব। ঠিক আছে. এসো।

সামনেই চার্চের ছোট গেট। সটান গোবিন্দ তার ডেওয়ে পারদা বাবা সেখানে কোথ বুঁজেই ট্রের পাচ্ছেন সব।

তাহলে বীত ভোম্বাদের প্রেম কয়েতেন ?

না।

তবে ? খুঁজিও খুঁজিও হইতে আস মাই !

হ্যাঁ।

তবে কেন বলছ বীত প্রেম না করেছেন ?

এবারে গোবিন্দ ব্যাপারটা খোলসা করে; খোলসা করে বলতে বাধ্য হয়; বীতের প্রেমে নয়; পূজা-বাজারের হাত থেকে বীচবার জন্মেই আসা। আমাদের পূজা না করলেও চলে কিন্তু পূজা-বাজার না করলে অচল। তারপর গোবিন্দ বুকের মধ্যে দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে : তবে আমাদের এই ধর্মাত্মের টেম্পোরারী মাত্র। ডিসেম্বরে বীতকে ভালোবাসার আশাও কম নয়। তখন আবার বড় সিনের বাজার; কাছেই আবার কেঁচে গণ্ডু! তখন আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হওয়া।

কিন্তু ও কি ? গোবিন্দ বলতে বলতেই দেখে, পাদরী বাবা ঢলে পড়েছেন চেয়ারে; আর খাড়া নেই। কী বেন বলছেন!—কান পেতে তনলো গোবিন্দলাল; বুকের ওপর কান পেতে।

তনলো, তিনি বলছেন : আমেন! আমেন! আমেন!—ইহলোক সেই বুঝি পাদরী বাবার শেষ কথা।

## আট

গোবিন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাসটুকু পড়বার পরও যারা এক নিছক গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দেবে, তাদের অবগতির জন্মে উদ্ধার করে দিচ্ছি এখানে একখানা চিঠি। এই চিঠিটা লিখেছেন ভারত-বিখ্যাত এক পথিচালকের সৈনিক পর্বত সহকারী ছিলেন, বর্তমানে নিজ পরিচালনা করছেন এমন একজন ভূতপূর্ণ সহকারী পরিচালক। চিঠিটা লেখা কিশোরগঞ্জের পয়লা নম্বরের একজন প্রচারবিধকে। চিঠিটা যেমন বানানো নয়, তেমনি এর একটি লাইনও অদলবদল করা হয়নি। হুবহু তুলে দিলাম :

‘হু—না’.

আপনার হু’খানা চিঠিই পেয়েছি। এখানে এই একাকী এক অল্প হু’খানা মধ্যে ওখানকার কোন চিঠি এলেই খুব ভালো লাগে। যে কাজটার কথা লিখেছেন—আমি গিয়ে বেন সেটা পাই,—একটু লক্ষ্য রাখবেন। টাকা পরসার ব্যাপারে আপনি বা করবেন তাতে আমার কোনও আপত্তি হবে না। কারণ কাজ পাওয়াটাই এখন আমার কাছে বড়ো কথা। আমার যেতে বাধ্য হয় আরো ৭৮ দিন হবে।

এরকম ঘোরপ্যাচের পাল্টার জীবনে কখনো পড়িনি। এক দলের ওপর এডিটিং শেষ করে বসে আছি। Re-recording ঠিকী আছে; সে যে Producer হবে শেষ করবেন ভগবান জানেন! কিংবা ভগবানও জানেন না মিঃ ‘বি’-এর সঙ্গে এজন্য ঠিক করে এত রকম প্রোডিউসার দেখলাম; কিন্তু এমনটি আর খুঁজি কখনো। কোট-প্যাট জুতো নিয়ে গোটা মাদুরটার ওজন যে খুব বেশী হলে ৫৫ পাউণ্ড। অথচ সর্বত্র সর্বদা হুঁজুন কিনা থাকে হু’পালে। কী যে করে তা ঐ জানে।

এ তো পেলো কুপোল। লোকটার ইতিহাস সবচেয়ে শুধু এইটুকু

বলতে পারি যে, স্বাধীন দিশিষ্ট করতে হলে সবই বাবুর মতো লোকও হালে পাশি পেতেই না; আর তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে সে ফ্রেড সাহেবকেও মাথা চুলকোতে হতো, এ আমি হলক করেই বলতে পারি। এই তো হচ্ছে আমাদের প্রোডিউসার।

মিঃ বি, এখান থেকে চলে বাবার পর Marine Drive থেকে দাশর যে বাড়ীতে আমরা এসে উঠলাম—সে বাড়ীটা এক কাঠা জমির ওপর দাঁড়িয়ে। বাড়ীটা সত্যিই কেউ তৈরি করেছিলো—না কোন এক সময়ে ব্যাডের ছাঁতার মতো আপনিই মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে তা! বাস্তবিকই একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদেরই জোরালো গবেষণার বিষয় হতে পারে। বাড়ীটার shape কোনও জ্যামিতিক চৌহদ্দের মধ্যে আনতে হলে Euclid সাহেবকে ডাকার দরকার। সমস্ত বাড়ীটার আগাশাচ্ছতলা বগল-কুঁচকিতে মিলিয়ে প্রায় ছ’সাত ঘর ভাড়াট। এরই মধ্যে দুটো খুণ্ডিতে আমি আর সতীক ‘বিজ’ থাকি। এখানে পশ্চিমে ভিক্টর বাজারে film co-র অফিস খুলেছিলেন। তারপর অফিস উঠে যায়; চোরাপাচার থেকে কেনা নাগকোল ছোরাটা বের করা furniture সমেত ঘর হু’খানা পশ্চিমতীর হেফাজতেই থেকে যায়। আমার ঘরটার কথাই বলি।

সাধারণতঃ স্বাভাবিক ঘরের সীমাবদ্ধতা ৪টি সরলরেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু এর আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে ৭টি সরল এবং ২টি বক্র রেখায়।  $৮' \times ২' \times ৪৮' \times ৮' \times ১২' \dots$  অনেকটা এই রকম। বিলিয়ার্ড টেবলের চারদিকে যেমন গর্ত থাকে, ঘরের মেঝের চারদিকে তেমনি অনেকগুলো গর্ত আছে। ইদুর আর ছুঁচোর underground highway! দেওয়ালের সর্বত্র relief ম্যাপের নবীর মতো উইপোকার বর্ষতপ্তপত্তার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানা পেতে শোয়া একটা বিচিত্র অনুভূতি! নব-বিবাহিতের ফুলশয্যাতেও এত কাণ্ড কারখানা করতে হয় না। ঘরের মেঝেতে আমার ছোট বিছানা পাততে হলে বেটুকু ভারগার প্রয়োজন তার জন্ত ঘরের আলিঙ্গনপাখা, গলিত কভারওলা কার্ণিচারগুলো কাউকে ঠাঁড় করিয়ে, কাউকে পাশ ফিরিয়ে, হাঁটু গাড়িয়ে, উপড় করিয়ে হু’খানা বরতে হয় তবে। অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় সব বেন বিচিত্র যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। এত কাণ্ড কারখানা করে শোবার পরেও শান্তি নেই; ঘুমের ঘোরে যদি বেকায়দার কোথাও পা বা হাতের ধাক্কা লাগে তবে ধ্যানরত ক্রুদ্ধ শ্বির মতো যে কোনও একটা চেয়ার বা টেবল আপনার ওপর কাঁপিয়ে পড়তে পারে। আপনি আলো নিবিয়ে শোবার একটু পরই দেখতে পাবেন, আপনার বুকের ওপর মাকড়শা আর আরশোলার হাড়-হুঁ খেলছে; ছুঁচো বেকারী কাজ করছে। দেওয়াল থেকে একজোড়া টিকটিকি ল্যাজ খামড়া মেয়ে বলে উঠছে : বাহবা! বহুং আচ্ছা! এ সবের পরেও যদি আপনার চোখের পাতা ঘুমে ঢুলে আসে তাহলে শুধি তু আবার খুলে বাবে ভগবৎ নামকীর্তন শুনে : রামনাম সাত ছার! (chorus) বাড়ীর কাছেই শ্রাশন। পাঁচ মিনিট অন্তর রামনাম শ্রবণ করিয়ে দেয়। জীবন অনিত্য।

এর পর আজ পনেরো দিন থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি; বিরামবিহীন বৃষ্টি! বৃষ্টির জলো হাওয়ায় বদল হয়ে ছাতাটার বাঁট ফুলে গেছে; ছাতা আর খোলা যায় না। তা না থাক! হু’খা ছিলো না। হঠাৎ পরত দিন বিকেল পাঁচটার আমাদের এই ঐতিহাসিক বাড়ীটার

অর্থেক ধরে গেলে। আমাদের বাথরুমের দেওয়ালে তিন ইঞ্চি কাঁক। corporation-এর লোক এসে নিরাপদ জায়গায় উঠে যেতে বলেছে। তিন দিন পারখানা-খান বন্ধ। আমার ঘরে আমাদের মাল-পত্রের সমেত আমি আর সতীক 'বিজ' রাত কাটাচ্ছি। করে যে এ রাত শেষ হবে!—ইতি 'অ'। গোবাই।

বেঙ্গলগতে একদল লোক উড়োজাহাজে বাঁধা বদলাতে যায়; এয়ারকণ্ডিশনও ঘরে ঘুমায়; মদ খায়; মেয়েমানুষ রাখে নগদ মূল্য না দিয়ে; মাননীয় রাজ্যপালের বাড়িতে জলসা করে; ক্রিকেট খেলার নামে body parade; সে জোয়ারই আরেক দলের লোক কেমন করে বেঁচে মরে আছে,—এ চিঠি তার স্বাক্ষর নয় শুধু—বল্লাভ দলিল!

### অয়

সুহৃদমণ্ডিকে একথা কল্পনা করাও কি সম্ভব যে মোহনবাগানের পোলে খেলছে মারা, ব্যাক সাভার, হাক কে পাল, সেটারে রক্তন সেন কি গুহ? ভাষা অসম্ভব। কিন্তু এমনটা ভাবা শুধু দুঃস্থ নয়, হাস্যকরও। অথচ বাংলা ছবির রাজ্যে এই হাস্যকর পরিস্থিতিই এত স্বাভাবিক যে তার উল্লেখ করাটাই হাস্যকর; আসল ব্যাপারটা সর্বজনগ্রাহ্য। যিনি গল্প লিপ্যন্তে পাবেন তিনি তন পরিচালক; যিনি পরিচালনায় পারদর্শী তিনি গল্পলেখক এবং চিত্রনাট্যকার ত' বটেই, কখনও কখনও প্রধান ভূমিকাভিনেতাও বটে। চিত্র-সম্পাদক অথবা আলোক-চিত্রকর হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ নাম করতে পারলেই আর পরিচালক হতে কিছুমাত্র আপত্তি ওঠারই কথা নয়। এমন কি, কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা সঞ্চল করে পরিচালনা করতে এগিয়ে আসার মহৎ দৃষ্টান্ত বিরল নয় এরাজে। শুধু এগিয়ে আসা নয়, কখনও কখনও তার আকর্ষণমূলকবিশিষ্ট ইদানীং আমাদের দৃষ্টির অগোচর নেই। আর প্রোডিউসার-পরিচালক? সে বার টাকা আছে সেই হতে পারে; বার টাকা নেই তারই বা হতে বাণ কোথায়?

এই সব কথা তুলতে গেলেই স্তন্যে হয় কেন চার্লি চ্যাপলিন কি একাধারে সব নয়? যেমন নাকি এদেশে যেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে না তারই সাহসী, 'রবীন্দ্রনাথ'। বাংলা ভাষা-চিত্রশিল্পের সঙ্গে তার অস্বকাল থেকে জড়িত বীরেন গাঙ্গুলী বার আরও পরিচিত নাম হলো ডি-জি;—একবার হাত ভেঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন। কেন কে জানে, তাঁকে অজ্ঞান না করেই তাঁর হাতের ভাঙ্গা হাড় জোড়া হচ্ছিলো। যিনি জুড়ছিলেন তিনি আজকালকার হাসপাতালের ডাক্তার নন; তাই সহানুভূতির সঙ্গে ক্লিনিক করছিলেন, আশনার খুব কষ্ট হচ্ছে মি: ডি-জি? আজ্ঞে না! হাস্যগমক ডি-জি 'ডায়ালগ' বলেন কীর্ত্তে-কীর্ত্তে: এ আর এমন কি কষ্ট? আমাকে বাংলা দেশের কিনা-টুডিওতে কাজ করতে হয় যে বোজ; তার তুলনায় এ আর এমন কি?

ঠিক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বক্তৃতা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরেছেন সম্মান-উপাধি। তবুও 'বে' বাঙালী নয়, সে বুঝবে না রবীন্দ্রনাথ একটা গোটা দেশ এবং জাতের জন্তে কি মহাব্য-অসহ্য কষ্ট এক-জীবনে করে গেছেন। কোন পক্ষকুণ্ড থেকে হাত ধরে

তাকে জগতসভার কোন আসনে বসিয়ে গেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন কোন পৃথিবীতে তাঁর একক প্রচেষ্টায় এ-বাংলা ভাষা কাকুর মাতৃভাষা না হলে বাঙালী কাকুর স্বজাতি না হলে স্বয়ংসম করা অসম্ভব।

ঠিক যেমন সম্ভব নয় কলকাতার কোনও কিংমুড়ির সঙ্গে দীর্ঘকালের প্রত্যাক পরিচয় না থাকলে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সেই অবিশ্রাম অসম্ভব অলৌকিক 'সত্য ঘটনা'; অর্থাৎ অসংখ্য বার ছবির গডডলিকা-চ্যুত হয়ে কোনও ছবি যখন সত্যি-সত্যি 'ছবি' হয়ে ওঠে, যখন সে জীবন্ত মানুষের মতো কথা কয়; গান গায়, হাসায়, কাঁদায়, আমাদের দিনরাত্রির সম্বন্ধে করে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, পারিপার্শ্বিকে বিমূর্ত, আনন্দের তুরীয়লোকের আবরণকে হঠাৎ উন্মোচিত, তখন সেই অলৌকিক অথচ অলৌকিক নয় এই অকৃতপূর্ণ অভিজ্ঞতায় কলকাতার কিনা টুডিওর সঙ্গে প্রত্যাকভাবে জড়িত কাকুর পক্ষে ছাড়া হস্তবাক হওয়া শক্ত। তাই, বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' যত বড় 'স্টাইল' হ'ক বাংলা ছায়াচিত্রের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' শুধু 'স্টাইল' নয়, এমনই এক বিশ্বয় বৃদ্ধিতে বার বাবা চলে না।

তবুও গণমানসে 'মা'য়ের ওপরে আজ সিনেমার জায়গা। স্বর্গের চেয়ে অনেক গরীয়সী ছায়াচিত্রগৃহ। ঘরের রমণীর চেয়ে অনেক রমণীয় আজ 'কিনা'টীর। আবালবৃদ্ধগণিকার ধ্যান-জ্ঞানে আবালবৃদ্ধবনিতার আজ ঘুম নেই ঘরে ঘরে। বিয়ের শিড়ে থেকে পুজার মণ্ডপ পর্যন্ত এদের আসন আজ সর্বত্র। 'বালা'দের 'দেবী' বানিয়েই নিস্তার নেই। 'দেবী'দের মুখচোখও আজ 'বালা'দেরই মুখের আদলে গড়ে তবুই তৃপ্তি। পুজার মন্ত্র নয়; সিনেমার গান। আরতির নয় কাঁদার, ঘটা নয়। লাউড স্পীকার সহযোগে বেকর্ড। বারোয়ারী পুজা নয়। বারনারী বন্দনা। বা দেবী সর্গভূতেষু নয়। বা 'বালা' 'দেবী' রূপেণ সংস্থিত। তালিস্তৈঃ। তালিস্তৈঃ; তালিস্তৈঃ, তালি, তালি।

চট করে বললে বিশ্বাস করা হয়ত শক্ত হয়, যে পৃথিবীতে আজকে আমাদের বাস সে হলো বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। শুধু ভারতবর্ষই ভাঙ্গ হয় নি, সারা দুনিয়াটারই অস্পষ্ট বিভাগ হয়ে গেছে। একটি দুনিয়া হৃৎস্পন্দনের, দুদিনের, বাস্তবের; আরেকটি দুনিয়া স্বপ্নের, রঙীন, আবাস্তবের, আরব্যোপাখ্যাসের পাতা থেকে তুলে নেওয়া। একটি পৃথিবীতে কয়েক জনের বিলাসে বসবাস; আরেক পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অর্থহীন-উপবাস। প্রথম পৃথিবী কার 'স্টাইল', তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। দ্বিতীয় পৃথিবী নিঃশব্দে বিজ্ঞাপনের 'স্টাইল'। এই দ্বিতীয় পৃথিবীই আসলে অস্তিত্ব; এ হলো Film World! ছায়া বিজ্ঞাপন দিতে দিতে এই ছায়াবাস্য আর মায়ামায় নেই; বাস্তবের চেয়েও সত্য বিজ্ঞাপন 'স্টাইল' এই বিশ্ব ওয়াণ্ডে' বাসা-কাঁদা-ভালোবাসা, বেশবাস, আহা-বিহার, কথাবার্তা, হাঁটা-চলা, বাগ-বহুবাগ কিছুই সত্য বলে বিশ্বাস করা শক্ত; এখানে জীবন নেই, পুরোটাটাই আর্ট! Make-believe Art!

রাঙা দিয়ে ছেঁড়া, ফুটো কাটা জামাকাপড় পরে কাউকে আজ চলে যেতে দেখলে যদি আপনি মনে করেন যে, লোকটা গরীব, ভিখারী অথবা পাগল, তাহলে বুঝতে হবে আপনি গতজন্মে ব্যাসকান্তিতে মারা গেছেন; বুঝতে হবে আপনি বিভ্রান্তাগরের আমাদের লোক, পাহাড়ী সাভালের কুণ্ডল নয়; জানা বাবে যে আপনি হচ্ছেন একটি

প্রথম জলের বোকা, ইয়েজিতে বাকে বলে A fool of the first water! কারণ ওই ফুটা-ফাটা, ছেঁড়া-খোঁড়া জামা দারিজ্যের চিহ্ন নয়; Fashion-এর ঝাণ্ডা! ওই জামা-কাপড়ের নাম নাকি : 'বহু দিন হয়ে'। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নতুন জামা-কাপড়ে সর্ব অঙ্গ কৃত্রিম ছেঁড়া-খোঁড়ার জন্ম; বহু দিন হয়ে গেলে জামা-কাপড় যেমন হয়, সেই অবস্থাকে বোঝাবার জন্যেই নতুন অবস্থাতেই ওর এই হাল।

পড়ে হাসবার আগে আপনার গায়ে হাত দিয়ে ভাববার আছে অনেক কিছু। আপনার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আপনি জানেন না মানে-নামানা শাড়ী, নাগিস-হাতা ব্লাউস; অঙ্গভরণে সফারগী কানপাশা; অঙ্গমার্জনাগ চিত্রভাস্করের প্রিয় সাবান; কেশটুলেও কামিনীকৌশলের স্যাটিকিট। গাড়ী, বাড়ী, গয়না, হোটেল, রেক্সার। এ সবেরই নির্বাচনে চিত্রভাস্করের প্রত্যক্ষ এবং অপ্ৰত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; অঙ্গের কট্টকু আবৃত থাকবে এবং কতখানি অনাবৃত, তাও ফিল্মষ্টারের শরীফ-নির্ভর। ড্রেসের বিজ্ঞাপনে বার্গার্ড শ' তথ্য বিখ্যাকবির কলিত স্যাটিকিট ছিলো একদিন পরিহাসের বিষয়; কিন্তু এখন আর সেটা পরিহাস নয়; সত্যি সত্যি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের তলায় ফিল্মষ্টারের লিপিকৃত লিপের সুখটান দিতে পারার আনন্দে অস্পষ্ট স্বাক্ষর সেখাটা আশ্চর্য নয়!

ভয় এতে শুধু সমাজের নয়; ভয় এতে দর্জির; ভয় এতে কাপড়ের মিললার; ভয় আছে জামা-কাপড়ের সোকায়েবও। কিসের ভয়? কিসের আভাব? কোনও এক অন্তঃস্থ হুত্থে যদি ফিল্মষ্টারেরা ছিন্ন করে যে তারা আর জামা-কাপড় পরবে না, তাহ'লেই ত', পর হুত্থেই বিশ্ব-সমাজের নিউডিট কলোনীতে রূপান্তরিত হতে আর বাধা জ্বালায়? কাপড়ওলাদেরও তখন শুধু বিবস্ত্র হয়ে গান গাওয়া; মনে হয় শেষের সেদিন কি ভয়কর? সবাই বিবস্ত্র বে। তুমি আর নিয়ে আসবে কি বস্ত্র?

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; বিজ্ঞাপনের বিষ নিঃশ্বাসে ছড়ায়। বিষ আঁক রক্তে মিশে গেছে। সমুদ্র-মহুনের পর অন্তঃস্থ ও গরল হুই ওঠে। গরল পান করে শিব হন নীলকণ্ঠ। কিন্তু এই জাপানের বিষ নীলকণ্ঠের পক্ষেও পুরো গলাধঃকরণ করা অসম্ভব।

কিথের বিষ কিথের চেহেও কিছু বেশি; এরা শুধু বিষ নয়; এরা চারশো বিশ।

অথচ দেশের বস্ত্র উৎসব, আর হস্তক তরুণী তাদের সকলেই তীর্থযাত্রা টলিউডে। নটীরা সমাজের অঙ্গ; নটও তাই। তবুও সবাইকেই নট-নটী হতে হবে, এমন কোনও কথা পরন্তুরামের মহাভারতেও নেই। সেদিন নটীরা জানতো তাদের সিঙ্গকে কাঙ্কন আছে; নয়লে কটাক। কিন্তু তবুও কোথায় যেন সমাজের সবার সঙ্গে একাসনে বসতে আছে বাধা। তাদের নেশা পয়সার; পেরা ভালোবাসা। তাই তাদের সমাজ অগাধ। আজও নটী আছে। সিনেমার কল্যাণে আজ তারা আর অভিনেত্রী নয় শুধু; তারা সমাজ-নেত্রীও হতে চলেছে। সেদিন ঘরের বউ বেরিয়ে নটী হতো। আজ নটী আসে ছ ঘরের বউ হয়ে।

জানি ভীষণ ছিঃ ছিঃ উঠবে এ কথা পড়বার পর। উঠবেই; উঠবে, কারণ আজকের বিশ্বসমাজের slogan হলো : সবার রঙে বস্ত্র মিশাতে হবে। একথা কাজে সত্যি হবে তুলতে চাইলে, সবার wrong is wrong মিশানো যায় বটে, কিন্তু সবার রঙে বস্ত্র মিশানো যায় না। কিছুতেই যায় না। ঘরের বউ-এর যেমন অভিনয় করবার প্রয়োজন নেই; তেমনি দায় নেই অভিনেত্রীর ঘরের বউ হবার। প্রত্যেকেই প্রয়োজন আজ সমাজে; পতিতাবও। প্রয়োজন নেই শুধু ঘরের বউ-এর অধঃপতিতা হবার; আর প্রয়োজন নেই পতিতাদের হাক-গেরস্থ সাঙ্গবারণ। মিলে আপত্তি নেই; আপত্তি গৌতামিলে।

কিন্তু কেন হলো এমন? আগেও ত' ছবি ছিলো; আগেও ত' ছিলো দুর্গাপস-উমাশঙ্কী-কানন-চন্দ্রা? তখনও তাদের ফ্যান ছিলো তখনও ছিলো সিনেমার দর্শক; তখনও ছিলো সিনেমার কাগজ ফিল্ম-ল্যান্ড, নাট-ঘর, বাতায়ন। কিন্তু আজকের মত পাগলামি ছিলো কি? ৯১৫কের মত পার্ভাসিন? সেদিনও মানুষ মেয়েমানুষ রেখেছে; কিন্তু রক্ততাকে রক্ততার চেয়ে বেশি দাম দেয় নি; জগো! দামেই রূপোপজীবীর দাম হয়েছে। ঘরের বউ ছিলো বাড়ীতে রক্তিতা বাগান-বাড়ীতে। বাড়ী আর বাগান-বাড়ীতে আজ আঁক তকাং নেই। বউ আর মেয়েমানুষ আজ এক। আজ আর মিটা! এও মিসেস নয়, আজ হচ্ছে মিটার এণ্ড মিস্ট্রেস-...

[ ক্রমশঃ ]

### খেলাধুলায় মহিলা

ইরানী খেলার মাঠে মহিলাদের দেখা যায় হামেশাই। দেখা কত মহিলা সোৎসাহে খেলা-দেখার দর্শক হয়ে মাঠে বান। তাদের মতই তাঁদের সমান উত্তেজনা, সমান উৎসাহ, সমান সমান জ্ঞান। শুধু তাই নয়, খেলা দেখার দর্শক হিসাবে মাঠে গিয়েই তারা কাণ্ড থাকেননি। অনেক মহিলা খেলা দেখতেও-মাঠেই বসে ইরানী। কলকাতায় খেলার মাঠে ছাত্রাচিত্রতারকাদের খেলা দেখার ক্ষেত্রে এক মরগীর ঘটনা। দৌড়ে প্রথম হওয়া, দেওয়ার প্রথম হওয়া আজকাল মেয়েদের কাছে কিছুই নয়। স্টেড খেলার মেয়েরা (করনা করতে পারবেন কেউ?) একশো শোকেই নেমেছেন। সম্ভ্রান্ত বড লিয়ার লাইব্রেরীতে (Bodleian Library) একটি বই পাওয়া গেছে। ইং ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ছাপা

এই বইয়ে লেখা আছে : মেয়ে-সাবীরা (Nun) পুরুষ-সাবুদের (Monk) সঙ্গে ক্রিকেটে খেলেছিলেন। ইং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাম্লে (Bramley) এগারো জন চাকরাণী হাম্বলডনে (Hambleton) একটি ক্রিকেটের দল গঠন করেছিল। লেডী বোল্ডউন (Baldwin) ক্রিকেট খেলার সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠিত হোয়াইট হিটার (White Heather) মহিলা ক্রিকেট ক্লাবের অন্যতম সনাতা ছিলেন। বর্তমানের Women's Cricketer Association (মহিলা ক্রিকেট সন্য) ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থার সঙ্গে দু'শো মহিলাদের ক্রিকেট ক্লাব ও ক্লাব যুক্ত আছে। বাঙালী মহিলারা খেলার দর্শক হ'লেও ক্রিকেট খেলার ক্লাব গঠনের কথা কি চিন্তা করতে পারবেন?

# পারম পুরুষ শ্রী শ্রী কামদেব



## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নরেনকে ডাকলেন কাছে। শশী ছিল ঠাড়িসে, তাকে বললেন, 'নিচে যা। কেউ যেন না থাকে ধারে-কাছে। শুধু আমি আর নরেন।'

ঘব ফাঁকা হয়ে গেল। নরেনকে বললেন, 'চার দিক ভালো করে দেখে আয় উঁকি দিয়ে, কেউ যেন না উপরে আসে।'

নরেন দেখে এস। বললে, কেউ নেই।

'বোস আমার কাছটিকে।'

শাঙ্ক হয়ে তন্দ্রায় হয়ে পিপাসায় হয়ে বসল নরেন।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ল নরেনের। বলছে মাঠের মশাইকে, 'আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। কাউকে বলবেন না যেন সে কথা।'

'না। কি বললেন।'

'বললেন আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করব।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি তাঁকে এক কথায় চটিয়ে দিলুম। বললুম, না, তা হবে না। তিনি চূপ করে গেলেন।' স্বপ্নতোক্তির মত বলছে নরেন, 'ওঁকে মানতুম না, ধবতুম না, ওঁর সব কথা উড়িয়ে দিতুম। তিনি বলতেন, ওরে, আমি কুটির উপর থেকে চোঁচিয়ে বলতাম, ওরে কে কোথা আছিস তোরা আয়, তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারি না। মা বলে দিলেন ভক্তেরা সব আসবে। ঠিক ঠিক মিলল। তোরা সব এলি একে-একে।'

কত আগমার জন, চকুর চকু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, এমন ঘনতম অস্তরঙ্গতায় বসেছে নরেন। দয়াময় স্নেহসূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর।

সেই মধুর ভাবের পাগলিনি, বাকে দেখে ঠাকুরের ভয়, তারও প্রতি ঠাকুরের কি করুণা!

থেকে-থেকে চলে আসে ফুট খুলে। কাক বাধানিবেশ মানে না, একেবারে সোজা পোতলার উঠে আসে। উঠে এসেই মায়ের গান ধরে। কি মিষ্টি গল। গান শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়।

আমার সম্মানভাব। মধুর ভাবের পসারিণীকে আমার এখন বড় ভয়।

'ওরে পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে আসতে দিস না।'

নিরঞ্জন লাঠি দিয়ে ভাড়া করে, তবু সরে না পাগলী। কলীপ্রসাদ জো একদিন হাত ধরে হিফকি করে টেনে বামারই ঘেঁষে

এল। আবার কখন থানা থেকে সরে পড়ে চলে এসেছে বাগানে। আবার গান ধরেছে। গান শুনে ঠাকুরের আবার ভাবাবেশ।

এবার আর তড়া নয়, এবার রীতিমত প্রহার।

তবুও নিবৃত্তি নেই। দিগধর বালক হয়ে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর, পাগলীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে।

শশী বললে, 'উপরে উঠলে থাক্কা মেয়ে ফেল দেব।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আসবে আবার চলে যাবে।'

'না, আসবে না।' নিরঞ্জন হুমকে উঠল।

রাখাল দুঃখ করতে লাগল, পাগলের উপর আবার আফালন।

'তোরা মাগ আছে কি না তাই তোরা মন কেমন করে।' নিরঞ্জন গর্জে উঠল, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।'

'কি বাহাদুরি!' রাখালও পালাটা বললে, 'কিন্তু কিগপেস করি ঠাকুর কি শুধু তোরা আমার? শুধু এই ঘরের লোকদের? বাইরের লোকদের নন? তিনি কি শুধু আমাদের এ কয় জনের জন্তেই এসেছেন? আপামর সকলের জন্তে আসেন নি? উনি কি শুধু সঙ্গু? উনি জগদগুণ। সঙ্গুই জগদগুণ। উনি সকলের। পাগলেরও।'

'তাই বলে অম্বথের সময় কেন?' শশী প্রতিবাদ করল: 'উপদ্রব করে কেন?'

'উপদ্রব সবাই করে। আমরা করিনি? গিরিশ বোব করেছি? নরেন-টরেন আগে কি রকম ছিল, কত যন্ত্রণা দিত, কত তর্ক করত। কষ্ট কি আমরাই কিছু কম দিয়েছি? ডাক্তার সরকার কত কি ঠেকে বলেছে। বলেনি? ধরতে গেলে কেউই নির্দোষ নয়, নিরুপদ্রব নয়।'

ঠাকুর বললেন, 'রাখাল, কিছু খাবি?' রাখালের প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্চারিত হয়ে উঠল।

রাখাল বললে, 'খাবো খন।'

পাগলী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে ঠাঁড়াল।

আজ আর কোনো উপদ্রব করল না। শুধু প্রণাম করে চলে গেল।

কিন্তু ঠাণ্ডা থাকবার পাত্র নয় পাগলী। আবার হৈ-ঠে শুরু করে দিয়েছে। আবার গান জুড়েছে। আবার ভাবাবেশে ঠাকুরকে ঝিলি করা।

এখন শুধু মন নিচে নামিয়ে রাখবার প্রয়োজন।

নরেনকে একদিন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোরা কি যেন হয়? এখানে সব আছে না? নাগাল হুতর ডাল, হোলার ডাল, ভেঁকুল পর্বত।'

নরেন বললে, 'সব আছে। আপনি সব অবস্থা ভোগ করে নিচে এসে রয়েছেন।'

'সব অবস্থা ভোগ করে ভক্তের অবস্থায়।' মাষ্টার মশাই বললে।

'কে যেন নিচে টেনে রেখেছে।' বললেন ঠাকুর।

পাগলীকে নিরঞ্জন একদিন একটা খালি ঘরে বন্ধ করে রাখল। যদি এমনিতরো শাস্তিতে শিক্ষা হয়। কতক্ষণ পরে দরজা খুলে দিতেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে। আবার সেই গান।

তখন নিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলীর মাথার চুলগুলি কেটে দিল। তারপর পাগলী আর এল না।

নিরঞ্জনের বা কিছু করা তার মূলে গুরুসেবা।

'সেখ না নিরঞ্জনকে।' বলছেন ঠাকুর, 'কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিয়ের কথায় বলে, বাপ রে, ও বিশালসম্মার দ। নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'

আহা, এই তো চাই! কোনো লেনা-দেনা নেই। যখন ডাক পড়বে তখনই যেতে পারবে।

'লোক বাছা বা বলছ তা ঠিক।' মাষ্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই অশ্রু হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিঃসং বোঝা যাচ্ছে।' বার্য সঙ্গার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর বার্য একবার এসে কেমন আছেন মশাই, জিগগেস করে, তারা বহিঃসং।'

নীলকণ্ঠের গানেই বা কত মধু, কত ভক্তি। কুক্কালীয়ার বুলা-দুতী সেজে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় সকলকে। হাটখোলায় বাবোয়ারি-জঙ্গার ঐক্যবাহ্যগান করবে, ঠাকুর বালকের মত মেতে উঠলেন তিনি বাবন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আয়। লাটু আর দালী, চল আমাদের সঙ্গে।

লোকে লোকারণ্য ভিড়। ভিতরে ঢোকেন এমন সাধ্য নেই। হুতরা বয়ঃ নীলকণ্ঠকে ধরে। বয়ঃ পৌঁছুলো তার কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদের এসেছেন। শোনামাত্র গান ধামাল নীলকণ্ঠ। নিজে গিয়ে ভিড় সরিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে এল গলবে।

ঈরাধার প্রেমে মত্ত হয়ে গান ধরল নীলকণ্ঠ: 'পিরীতি কিরা এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।' ঠাকুর নিজের থেকে বিশ্ব মিটে স্বপ্ন করলেন। গান ভীষণ জমে উঠল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাহজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁকে সমাধিস্থ নীলকণ্ঠ বারে বারে তাঁর পায়ে ধূলো নিতে লাগল। সমাধি করার পর আবার চুপ করে বসে গান শুনেতে লাগলেন। গানে পোস্তার সারা বাবোয়ারিতলা গমগম করতে লাগল।

সেই নীলকণ্ঠ আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে বলছে, 'পিরীতি সাক্ষ্য পৌরাস।'

ওগুলো কি বলছ? আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই চেষ্টায়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

'বাই আপনি বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

'বাপু কে, আমরা আমিই তো খুঁজে কিয়তি, কিন্তু পাই কই?'

'আমরা কি অভিশত বুঝি? নীলকণ্ঠ হাত জোড় করল: 'আমাদের শুধু কৃপা করবেন।'

'কি বলা! তুমি কত লোককে পার করছ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদীপন হচ্ছে।'

'পার করছি বলছেন?' নীলকণ্ঠ হাসল। 'কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজে না ভুবি।'

'যদি জোবো তো, ঐ স্বধা-হুদে।' বললেন ঠাকুর। 'তোমার এখানে আসা, বাকি অনেক কিনা সাধা-সাধনা করে তবে পাওয়া যায়। বেশ, তবে একটা তুমি গান শোন।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর। গান শেষ করে বললেন, 'আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। ভাবছি তোমাদের আবার গান শোনাচ্ছি।'

'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার আজ পুনরাবৃত্তি হল।' ঠাকুরকে আবার প্রশ্নাম করল নীলকণ্ঠ।

নরেন একবার বললেন ঠাকুরকে, 'আমি শান্তি চাই, ঈশ্বর পর্ষভ চাই না।'

আহা, ঈশ্বরই তো শান্তি।

ঠাকুরের পাশটিতে বসে সেই শান্তিই যেন এখন আশ্বাস করছে নরেন।

নরেন তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের নিম্পলক দুই। সর্বদাঃশংসেদী অভয়-আশ্বাসে পরিপূর্ণ। -চেয়ে থাকতে-থাকতে নরেনের মন হল কি একটা আশ্চর্য স্পন্দন তার সমস্ত গেয়ে আলোড়িত হচ্ছে। মনে হল, ঐ টুটি পুণ্যচক্র আভা ছাড়া সংসারে আর তার কোনো অমুভূতি নেই।

হঠাৎ চমক ভাঙল নরেনের। দেখল ঠাকুর কানছেন।

'এ কি, কানছেন কেন?'

'নরেন, আমার বা কিছু ছিল, আমার বখাসবর্ষ, তোকে আশ দিতে দিলুম।' নরেনের একটা হাত ঠাকুরের একখানি হাতের মধ্যে ধরা: 'সিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, কতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজবাজেশ্বর হয়ে গেলি।'

নরেন অমুভব করল এ কান্না আনন্দের নিকর। এ কান্না তার রাজবাজেশ্বরের পুণ্যবারি।

নরেনও কান্দতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরাবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, কিরো বাবি স্বধায়ে।'

নরেন গুরুবলে কলীয়ার হয়ে উঠল। অরমহা ভোগ। ওঠো জাগো বতরুণ পর্ষভ না ঈশ্বরিতমকে অর্জন করতে পারছ ততক্ষণ নিবৃত্ত হয়ে না।

ঠাকুর বললেন, 'তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবে বলে। তুই এই হতভার বার্তাটি পৌছে দে যখন-যবে। পৌছে দে জনে-জনে।'

### একশো চৌষটি

'আমরা গোরার সঙ্গে থেকেও ভাব বুঝতে পারলাম যে।' 'চৈতন্যলীলারও এ আক্ষেপ করেছিল পার্শ্বদেবা, এবারও বুঝি এসেই মনস্তাপ।

ঠাকুর তাই ঠিক করলেন, হাটে থাঁড়ি ভেজে দিয়ে বাকল।

‘এখানকার বা কিছু সব নিজস্ব-স্বরূপ।’ বললেন ঠাকুর।

কিসের নিজস্ব?

জীব মাত্রই জন্মের প্রতিভা। তুমিও তাই ‘তদুপত্যাক্তবান্ধা’ হয়ে ওঠ। ঈশ্বরলাভের জন্মেই মানব-জীবন। তাই এখানে দেখ সেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। ‘আমি বোল টাং করে গোলাম যদি তোরা এক টাং করিস।’ যদি বোল দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহত্বকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে।

‘কৃষ্ণের যতক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবণু তাহার স্বরূপ।’ নরবণু যে তাঁর স্বরূপ এটুকু অন্তত বুঝে যাও। একই অগ্নি বিশ্বত্ববনে প্রাণিত হয়ে রূপে রূপে রূপায়িত, প্রাণে প্রাণে প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। ঠাকুর বললেন, ‘নরলীলার মন কুড়িয়ে আনলেই হয়ে গেল। আরভলা কুম্বপোকা হয়ে গেলেই হয়ে গেল।’

সেই মহত্তম পূর্বমত্তম হয়ে-ওঠাকে দেখ। ‘নরলীলা কেমন জানো?’ আবার বললেন ঠাকুর: ‘যেমন বাড় ছাঁদের জল নল দিয়ে ছড় ছড় করে পড়ছে। সেই সর্পিদানব—তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে।’

তুমি আমি হয়ে ওঠ। অজুঁনকে তাইতো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। ‘মদভাবমাগত’ হও।

‘সকলের চেয়ে গুহ্যতম পূর্বমকথা এবার শোনো।’ শ্রীকৃষ্ণ বললেন অজুঁনকে, ‘তুমি আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর, তাই তোমাকে বলছি এ গোপন কথা। সব ভুলে আমাকে ভাবো, আমার দিকে চোখ ফেরাও, আমাগতপ্রাণ হয়ে ওঠ। তুমি আমার প্রিয়, তাই প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হয়ে উঠতেই হবে। “বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মদভাবমাগতাঃ।” অনেকে শুধু আমার হাত ধরে আমা-সম হয়ে উঠেছে।’

অরুণি পূর খেতকেতুকে বললেন, ‘এই সুবিশাল বটবৃক্ষ দেখছ, এর থেকে একটি ফল আহরণ করো।’

বটফল আহরণ করল খেতকেতু।

‘ভাঙো।’

ভাঙল বটফল।

‘কি দেখছ?’

‘ছোট ছোট বীজকণা।’

‘একটি কণাকে ভাঙো। আরো ভাঙো। কি দেখছ?’

‘এখন আর কিছুই দেখছি না।’

‘যা এখন আর দেখছ না, সেই সুস্বাদু ফল থেকেই উৎপন্ন হয়ে এই মহাবল বটবৃক্ষ বিস্তারিত আছে।’ অরুণি বললেন, ‘বৎস, প্রদাহিত হও। প্রজ্ঞা না থাকলে এই তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য।’

‘কিন্তু সত্যই যদি জগতের মূল হয়, তবে তা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?’ জিগগেস করল খেতকেতু।

অরুণি বললেন, ‘এই মূণ নাও, জলে ফেলে দিয়ে এস। কাল প্রাতঃকালে দেখা কোরো।’

প্রভাতে দেখা করতে এস খেতকেতু। অরুণি বললেন, ‘বৎস, রাত্রে যে মূণ জলে ঢেলে দিয়েছিলে, সেই মূণ নিয়ে এস।’

অনেক অমুগ্ধমান করেণ সে মূণ পাওয়া গেল না। যদিও সে মূণ বিলীনরূপে বিরাজমান। জলপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল খেতকেতু।

অরুণি বললেন, ‘বৎস, এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?’

‘লবণাক্ত।’

‘মধ্যভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?’

‘লবণাক্ত।’

‘অধোভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?’

‘লবণাক্ত।’

‘এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে বোস।’

বসল খেতকেতু। অরুণি বললেন, ‘শোনো, ঐ লবণ জলের মধ্যেই সর্বদা বিস্তারিত ছিল। এই জলের মধ্যে বিস্তারিত থেকেও যেমন তুমি লবণকে দেখতে পাওনি, তেমনি এই দেহমধ্যেই সেই সত্য সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিস্তারিত আছেন।’

আগে মূণ বধন হাতে করে নিয়ে এসেছিলে তখন তাকে স্পর্শ করে জেনেছিলে, চোখ দিয়ে দেখেছিলে। কিন্তু যেই জলে মিশে গেল অমনি চক্ষু আর স্পর্শের বাইরে চলে গেল। তখন সেই মূণকে জানবে কি করে? সেই জানার উপায়ান্তর আছে। সেই উপায়ান্তর হচ্ছে জিহ্বা। তখন তুমি জিহ্বা দিয়ে আদান করে জানবে এই সেই মূণ।

তেমনি জগতের মূল সংরক্ষ এই দেহে বিস্তারিত থাকলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। কিন্তু তাকেও জানবার উপায়ান্তর আছে।

আছে? কি সেই উপায়ান্তর?

অরুণি বললেন, ‘যদি কাজকে চোখ বেঁধে গান্ধারদেশ থেকে নিয়ে এসে তারও চেয়ে নির্জন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয়, তার কি লক্ষ্য হয়? সে দিগ্ভ্রাস্ত হয়ে পূবে কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে কখনো বা পশ্চিমে ছুটোছুটি করতে থাকে। আর এই বলে আত্মনাদ করে, আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে, আর’ দেখে বহুটুকু অবস্থায়ই ফেলে গেছে এখানে। তখন কেউ যদি তার বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলে, এই দিকে গান্ধারদেশ, এই দিকে বাও, তখন সেই আলোকপ্রাপ্ত উপদেশপ্রাপ্ত লোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের কথা জিগগেস করতে-করতে সেই গান্ধারদেশে এসেই উপস্থিত হয়। তেমনি সংসার-প্রবর্তি ব্যক্তি আচার্যবান পুরুষ গুরুকর্তৃক উপদ্রষ্ট হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।’

‘অবতাহাই সেই মাহুঘরতন। যিনি তবণ করে তারণ করেন।’

‘অবতারের ভিতরেই ঈশ্বরের শক্তির বেশি প্রকাশ।’ বললেন ঠাকুর, ‘অবতারের আশ্রিত মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।’

কে একজন ভৃত্য ভক্ত বলল, ‘আজ্ঞে আপনাকে দেখাও ঈশ্বরকে দেখাও তা।’

‘ও কথা আর বোলো না।’ বলে উঠলেন ঠাকুর, ‘গন্ধারাই দে দেউয়ের গলা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অম্বুজ, আমি শঙ্কু মল্লিক বা আমি মহিম চক্রবর্তী, আমি ধনী, আমি বিদ্বান, আমি ত্যাগ করতে হবে। আমি-টিপিকে ভক্তির জলে ভিজি সমঝুমি করে ফেল।’

সেই বার ঠাকুরের বধন হাত ভাঙা, হাতে বাড়-বাঁধা, উত্তরদী পড়ে শোনোচ্ছে মহিমচরণ। ‘ব্রাহ্মণদের দেবতা অগ্নি, হিন্দু দেবতা হুৎহু অর্থাৎ হুৎহুয়মধ্যে, স্বরূপেই মাহুঘের দেবতা প্রতি-আর সদলনী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্র।’ ‘প্রতিমা বন্ধন’

সর্বত্র সমদর্শিনাম্।' সর্বত্র সমদর্শিনাম্—কথা কয়টি শোনামাত্র ঠাকুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই সমাবিষ্কৃত। হাতে সেই বাড় ও ব্যাগেজ বাঁধা। ভক্তেরা নিনিমেবে দেখছে সমদর্শী মহাবাগী।

আকীর্ণপতঙ্গ-পিপীলক ব্রহ্ম। সকলেই তার অবতার। 'তমিহ দৃষ্টে পৃথিবীর'। পরও অবতর, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে। সেই দর্শনেই হৃদয়বন্ধন ভিন্ন, সংশয়জাল ছিন্ন ও করণশি ক্ষয়প্রাপ্ত। 'মোমের বাগানে সবই মোম।'

ভিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছেন ঠাকুর। সিংহ দর্শন করেই সমাবিষ্কৃত।

'ঈশ্বরের বাহনকে দেখেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হল।' বললেন ঠাকুর।

আবার বললেন ঠাকুর 'আমি একবার মিউজিয়ামেও গিয়েছিলুম। দেখলুম ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখ, সঙ্গের গুল কি। তাই সর্বদা যদি সাধুসঙ্গ করো সাধু হয়ে যাবে।'।

উপনিষদের ভাব্যর ঐটিই উপাস্ত্রায়।

'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, ভবনরী পার হতে জানা দরকার।' বললেন ঠাকুর, 'সাঁতার জানা দরকার।'

নৌকো করে ক'জন গঙ্গা পার হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল পণ্ডিত, সর্বদা বিজ্ঞা জাহির করতে ব্যস্ত। পাশের লোককে জিজ্ঞাসে করল, বেঙ্গল জানো? সে বললে, আজ্ঞে না। সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো? আজ্ঞে না। বড়দর্শন? তাও না। এমন সময় কড় উঠল নদীতে। নৌকো প্রায় ডোবে। তখন পাশের লোকটি ভীতব্রজ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসে করলে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত ব্রহ্ম কীচুমাত্র করে বললে, না। পাশের লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'

টায়খিয়েটারে 'বৃষকত্ব' অভিনয় দেখছেন ঠাকুর। গিরিশকে শুধোলেন, 'এ কার থিয়েটার? তোমার, না, তোমাদের?'

গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো, আমার বলা ভালো নয়। কেউ কড় বলে আমি নিজেই এসেছি, নিজেই করেছি।' বললেন ঠাকুর, 'এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্করে লোকের কথা।'

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'জ্যা, ঠিক, ঠিক কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিজ্ঞার দশা কোথাও অবিজ্ঞার।'

নরেন জোর গলায় বললে, 'সবই বিজ্ঞার।'

'জ্যা, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের পক্ষে দুই আছে, জ্ঞানমারা আর অবিজ্ঞামারা। খোসটি আছে বলেই আমিটি আছে। মারা হচ্ছে খোসা, আমি হচ্ছে ব্রহ্ম। মারারূপ ছালাটা আছে বলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব।'

নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, 'জ্ঞান পারেন, তা হলে বৃষ্টি। তবেই বিশ্বাস করি।'

কি বলবেন? কি উত্তরে চাস?

জনক সদর বললেন তিনিই সেই, হৃদয়বশে বাহ্যব্রহ্ম

এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনিই পুরুষোত্তর। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগাক্রমের মধ্যে, এই মুত্যাশয়্যার তরে? বলতে পারেন, তিনিই আদিসের, পুর্বান পুরুষ, সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্ত্রণাধীন? বলতে পারেন তিনিই বেত্তা, তিনিই বেত্ত, তিনিই সেই অব্যয়-অক্ষর? বলতে পারেন, তিনিই ভগবান?

'এখনো তোর জ্ঞান হল না?' নিদারুণ যোগযন্ত্রণার মধ্যে কমল-বিশদ প্রসঙ্গ চোখ মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন, 'এখনো তোর সংশয়? সত্যি সত্যি বলছি, যে বাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'

ধমকে দাঁড়াল নরেন। অপরাধের দ্বানিতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ভুবনমঙ্গল স্বরূপানন্দ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। তোমার চরণে শাশ্বতী স্থিতি দাও। বৈরাগ্যবলসম্পন্ন জ্ঞান দাও। ভয়প্রদা গৃহাসক্তি ছেদন করো।

এই অস্ত্রধা হাথ প্রায় চারপাঁচ বছর আগে শ্রীমাকে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'বখন দেখবে যাব-তাব হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাচ্ছি, তখনই বুঝবে দেহরক্ষার আর বাকি নেই।'

কত দিন থেকেই তো কলকাতায় নানা ভক্তের বাড়িতে অন্ন ছাড়া অন্ত ভোজ্য খাচ্ছেন, বসগায়ের বাড়িতে তো অন্নই খেয়েছেন রীতিমত, আর রাতও কাটিয়েছেন মাঝে মাঝে। তবে দিন কি ঘনিষে এল? তবু খাবারের অগ্রভাগ তো এখনো কাউকে দেননি?

কিন্তু সে বাধ কি হল? নরেনের পেট ব্যাথা হয়েছিল, ক'দিন আসছে না দক্ষিণেশ্বর। কেন আসছে না রে? দক্ষিণেশ্বরে তার উপযুক্ত পথ্য হবে না। কিন্তু বল গে, আমি তাকে ডেকেছি। সকালবেলা তার কাছে লোক পাঠালেন ঠাকুর। নরেনকে আসতে হল।

ঠাকুরের নিজের জন্ত খোল-ভাত তৈরি হয়েছে, তারই অগ্রভাগ নরেনকে খেতে দিলেন। বললেন, 'যা বাকি আছে তাই আমার ভক্তে নিয়ে এস।'

সারদামণি বৃক্সের মধ্যে ধাক্কা পেলেন। বললেন, 'না না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে রেঁধে দিচ্ছি।'

কিন্তু ঠাকুর শোনবার পাত্র নন। বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি? নিয়ে এস যা আছে।'

ঠাকুর কি বলেছিলেন তা যেন মনে থেকে মুছে দিতে চাইলেন শ্রীমা। ভাবলেন, নরেনের সঙ্গে কার কথা! নরেন যেন সব কিছুই বাতীক্রম।

কিন্তু আজ, ১২১৩ সালের প্রাণব সাক্ষাতির দিন না এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? ঠাকুরের মহা-সমাধির দিন কি তবে সমুপস্থিত? একখানি দিশি শাড়ি তুলোতে দিয়েছিলেন ছাদে, খুঁজে পেলেন না। জলের কুঁড়েটা তোলবার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেবন্ধ-সন্তানদের জন্ত খিটুড়ি রাখছেন, তলাটা ধরে গেল।

সারা দিনই ভাববিভার হয়ে আছেন। যন যন সমাধি হচ্ছে। কিছুই খাওয়াবে খাচ্ছে না।



অতুলের নাকীজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। সে এসে নাকী দেখল। মুখ অন্ধকার করে বললে, 'আসো নিবতে আর দেখি নেই।' বিকলের দিকে অবশ্য। আরো খারাপ হল। শ্বাসক্লেণ দেখা মিল। ডাক্তার আর কি করবে, তবু শশী ছুটল ডাক্তারের সন্ধান। যে ডাক্তার দেখছিল শেষ দিকে, তার বাড়ি এখন থেকে সাত মাইল। সাত মাইল পথ প্রায় এক নিশ্বাসে পার করে দিল শশী। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, ডাক্তার বাড়ি নেই।

কোথায়, কত দূর যেতে পারে? কি করে বলব, পেখুন এমিক-সেমিক। এমিক-সেমিক ছুটেছুটি করতে লাগল। আরো এক মাইল ছুটে ধরল ডাক্তারকে। চলুন শীগগির কানীপুর। ডাক্তার বললে, জরুরি কল আছে অজ্ঞাত। এর চেয়েও জরুরি? ডাক্তারের হাত ধরে শশী হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

দেখে-তেনে ডাক্তার বললে, যেমন বলে, ভয় নেই।

সন্ধ্যার দিকে চোখ খুললেন ঠাকুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সারা দিন সেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।'

সারা দিন কিছু মুখে তোলেননি, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু তরল পথ্য নিয়ে এল। কিন্তু গিলতে পারলেন না। অগত্যা ভল দিয়ে মুখ মুছে দিল আন্তে-আন্তে। পায়ের নিচে দিল ক'টা বাগিল ওড়ে। হে আত্মারাম, কি আরাম তোমাকে আমার সিতে পারি?

হরি ও তৎসং—মুখে উচ্চারণ করে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যাহ্নের দিকে আবার সমাধি হল ঠাকুরের। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পাখা করছিল শশী, তার মনে হল, এ সমাধি যেন অল্প রকম। শিশুর মত কান্ডতে লাগল ফুল ফুলে।

গিরিশ আর রামকে খবর পাঠাও।

কোনো ভয় নেই, এল, হরি ও তৎসং কর্তন করি। নরেন ডাকল সবাইকে। ঠাকুরকে ঘিরে বসল। শোক-গদগদ কর্তে কর্তন শুরু হল, হরি ও তৎসং।

রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহুজ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট, স্নেহের বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সবাই আনন্দচকিত হয়ে উঠল। কি খাবেন?

'ভাতের পায়স খাব।'

ভাতের পায়স আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'বসে খাব।'

যে শয্যাবিলীন দুর্বল, সে কি না উঠে বসতে চার! ছেলেরা ধাবধি করে সম্মুখে ঠাকুরকে বসিয়ে দিল বিছানায়।

শশী খাওয়ারতে লাগল ভাতের পায়স।

আত্মব, স্বাভাবিক অনারসে খেতে লাগলেন। গলার বেন খা নেই, বজ্রা নেই। বললেন, 'এত খিদে, যে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁড়ি-কাড়ি খিঁচুড়ি খাই।'

সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন এই খিঁচুড়ি খাবার ইচ্ছে?

ঈমা সকালে যে খিঁচুড়ি রেখেছিলেন, তিনি কি তার গন্ধ পেয়েছেন? আরো কি টের পেয়েছেন, তসাতা ধরে গিয়েছিল তার? উপরের ভাল অংশ সন্ধানের দ্বিগে নিরেকার সেই পোড়ারোড়া নিজে খেয়েছেন ঈমা?

না কি আর সব জবতাদের যেমন বিশেষ প্রিয়ভোজ্য থাকে,

ঠাকুরের তেমনি খিঁচুড়ি। বহুনাথের প্রিয়ভোজ্য বাজভোজ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয়ভোজ্য কীরসর, বৃন্দাবনের প্রিয়ভোজ্য কানিত বা কেশী বাতাস। তেমনি নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাতোণ, শঙ্করপন্থীদের পুত্রিনাভু আর রামকৃষ্ণের খেচরার।

খেতে খানিক স্নেহবোধ করলেন। নরেন বললে, এবার তবে একটু ঘুমুন।

কালী, কালী, কালী,—মুছ স্পষ্ট কর্তে তিন বার উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। জগজ্ঞানকে বরাভর দেবার ইচ্ছায় হু' হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাত তখন একটা বেজে গেছে, ঠাকুরের সর্বস্বত কাঁপল হু-একবার, গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের দুটি নাসাগ্রভাগে এসে স্থির হল। মুখের উপর ভেসে উঠল অগ্নান আনন্দজ্যোতি।

এই সমাধি বৃষ্টি আর ভাঙে না!

হরি ও, হরি ও, আবার সবাই কর্তন শুরু করল। বিগতমেষ আকাশের মত এই বৃষ্টি আবার চক্ষু উন্মীলন করবেন। কত বার গভীর সমাধি থেকে উঠে এসেছেন, এবারও উঠবেন বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুখরের রকে বসিয়ে ঠাকুরের একবার কোটো তোলা হয়েছিল। তাঁর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানমতি, যে মূর্তি ঘরে-ঘরে পটে-পটে বিগাজমান, সেই কোটো। কোটো তোলাতে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। কোটো তোলা শেষ হয়ে বাবার পরেও সমাধি ভাঙে না। কোটোগুলা ভর পেয়ে স্বপ্নপাতি ফেল চম্পট দেয়। তার পর সমাধি ভাঙলে পরে ঠাকুর বললেন, 'দেখবি, কাজে যত্ন-বলে এই ছবিরই পুজা হবে।' সেতাবি পরে তাঁকে দেখানো হলে তিনি তাকে প্রণাম করলেন, পূজা করলেন।

এই বৃষ্টি জাগেন এই বৃষ্টি ওঠেন, সর্বকণ সকলের মনে এই উৎসব।

বুড়ো গোপালকে ডাকল নরেন। বললে, 'একবার রামলালকে ডেকে আনতে পারো?'

লাটুকে নিয়ে বুড়ো গোপাল চলল দক্ষিণেশ্বর।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ লাল হয়ে উঠল। ক্রমে হলদে হল। শেষে নীল হয়ে অন্ধ গেল।

রাতেরই চলে এসেছে রামলাল। বললে, 'ব্রহ্মতালু এখানে গরম আছে। তোমরা একবার কান্ডেনকে খবর দাও।'

ভোর হয়ে গেল, তবু ঠাকুর তখনো ঘুমে।

বাগান থেকে ফুল ফুলল ছেলেরা। দিব্যতত্ত্বর শেষ পূজার আরোহণ করল। ঈশপদে শ্রদ্ধাঘা মিল। গলার পরিবে দিল ফুলের মালা। এ কি, ঈশপদে যে এখানে তাপ! এখানে দিব্যচ্যুতি!

কে খবর দিয়েছে কে জানে, ভোর হতে না হতেই ডাক্তার সরকার এসে হাজির। তিনি দেখে-তেনে বললেন, এ মহাসমাধি ভাঙবার নয়। লীলা সফর করেছেন ঠাকুর।

কান্তন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, এসে যি মালিশ করতে বললে দেখে বখন এখানে তাপ আছে, তখন, বলা যায় না, এ মহাসমাধি ভাঙতেও পারে। বোগশাস্ত্রে বিধি আছে, সমাধিস্থ বৌদ্ধী ব্রীহা-ব ও কলকে যদি কোনো ব্রাহ্মণ গব্যত মালিশ করে তাহলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা। যি আনা হল। শশী ব্রীহাব শব্দ বনে ও বৈকুণ্ঠ সাজাল পারে মালিশ করতে লাগল। তিন ঘণ্টারও উপর মালিশ করা হল একনাগাড়ে। কিন্তু হার, কিছুতেই কিছু হল না।

সমস্ত অববোধ ভেঙে নদীর উচ্চাসের মত স্রীমা ছুটে এলেন। পঙ্কলেন মাটিতে লুটিয়ে। কণ্ঠে শুধু এক বৃকভাঙা আর্তনাদ : আমার কালীমা কোথায় গেলে গো ?

যোগীন আর বাবুরাম ছুটে গেল মার কাছে। গোপালমা এসে মাকে তুলে নিল। মা একবার কঁদে সেই যে চুপ করলেন তাঁর গলার কাণ্ডোজ আর শোনা গেল না।

বাতাসের মুখে খবর ছুটল। নানাধারায় আসতে লাগল জনশ্রোত। ডাক্তার সরকার বললেন, 'এই দিব্যাবস্থা ছবি নেওয়া সরকার। আমি হাট, কলকাতার গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করি।'

উদ্ধব বললে, 'হে অচ্যুত, যোগচর্চা অতি দুশ্চর। মানুষ বাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তাই বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর কিছু নয়, আমাকে ও আমার ভ্রাতৃ জোয়ার কর্ম এই ভাবটিকে সর্বদা মনে রেখে কর্ম করা অভ্যাস করবে। সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে চাড়া আর কাউকে দেখবে না। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-সাঁওতর স্বর্ঘ-মূল্লিঙ্গ ক্রুত-অক্রুত সকলকে যে সমান দেখে সেই পণ্ডিত। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব বস্তুতে মনোভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।'

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মাথায় নিল উদ্ধব। বললে, 'হে অজ্ঞ, হে অজ্ঞ, আপনার সান্নিধ্য শুনেই আমার যোগজাল ছিন্ন হয়েছে। আর কিছু চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার অপায়িনী রতি হোক।'

উদ্ধব, তুমি আমার শ্রিয়ংগম বদরিকায় চলে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থসিক জ্ঞান ও আচমন করে শুচি হও। বহুল পরিধান করে বস্ত্র ফল ভোজন করে অলকানন্দা নশন করে বিবর্তিতকলুষ হয়ে বিরাজ করে। সর্বপ্রকার হৃদয়ভাব ত্যাগ

করে 'মন আমাকে সমর্পণ করে আমারই প্রাপ্ত জ্ঞান মরণ করে।'

বদরিকায় চলে গেল উদ্ধব।

বাসুদেব চলে এলেন প্রভাসে। সেখানে হৃদ্বল একে ভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরামকেও তারা আক্রমণ করলে। বলরাম আর কৃষ্ণের হাতে বাদবদের কেউ আর অবশিষ্ট রইল না।

তখন সমুদ্রবেলাতে বসলেন বলরাম। যোগ অবলম্বন করে পবনাস্বাভে আত্মাসংযুক্ত করে মহম্বলোক ত্যাগ করলেন। বলরামের নির্বাণ দেখে বাসুদেব একটি অশ্বপ-বৃকভাঙা এসে বসলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে নিম্নমুগ্ধ আলোকিত করে বিধুম পাবকের মত বিরাজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ-উত্তর উপর কমলকোষকসন্নিত বামপদতল স্থাপিত। তৃক্ষীভূত সমাহিত মূর্তি।

সেই পদতলকে মৃগ মনে করে ভয়া-বাধ শর ছুঁড়ল। শর বিদ্ধ করল পদতল। ব্যাধ এগিয়ে গিয়ে দেখল চতুর্ভুজ বিভাজমূর্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হে অনঘ উত্তমলোক, বুঝতে পারিনি, আমার এই অন্নপনয়ে পাণ কমা করুন।

'তুমি আমার অভিসম্বিত কাজই করেছ।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'স্বকৃতীদের পদ স্বর্গলোক লাভ করো।'

কৃষ্ণসারথি দাঙ্গক এল রথ নিয়ে। 'রথে চড়ে নয়, আমি লোকান্তিময় ধ্যানমগ্নস নিভ্রনৈত নিয়েই স্বধামে প্রবেশ করব। ভুবনে এই প্রতিষ্ঠিত করে যাব যে মর্ত তম্ব দ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়। আমি কি ব্যাধের খবরশর থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলাম? না, দাঙ্গক, এইটুকু শুধু জেনো যে আমিই সত্য আর সমস্তই আমার দ্বারায়চনা।' [ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। ]

### লুই ব্রেইলি

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে ৪০ মাইল দূরে কুপ্ত্রেন নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লুই ব্রেইলি নামে এক কসরী বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঘোড়ার সার্ক-সজ্জা নিশ্চাতা ছিলেন। যখন লুই-এর বয়স তিন বছর তখন এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

তিনি তাঁর পিতার দোকানে খেলা করছিলেন এবং ছোট ছেলেরা যেমন করে তেমনি ভাবে তাঁর পিতার কাজ অনুকরণ করছিলেন। তিনি ঐ হাতে একটি বীরশূল ও ডান হাতে একটি কাঠের ছোট মুণ্ডর নিয়েছিলেন। তিনি বীরশূলের অগ্রভাগ এক টুকরো চকচকে জমজমাড় গুণের চেপে ধরলেন এবং তাঁর পিতা যেমন করেন তেমনি ভাবে মুণ্ডর দিয়ে বীরশূলের মাথায় যেমনি আঘাত করেছেন অমনি বীরশূলের অগ্রভাগ তাঁর চোখে বিধে যায় ও তিনি বহুবার চাঁচকার ক্রমে মাটিতে পড়ে যান।

কয়েক দিন পরে তাঁর চোখ বিধিতে যায় ও অপর চোখটিও ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিন বৎসর বয়স লুই শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যান।

যখন তিনি বাড়ীর বাইরে যেতে সক্ষম হলেন তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে প্যারিসে নিয়ে এলেন ও অন্ধ শিশুদের এক বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। তখন অন্ধ-শিশুদের ঘোড়াবে লেখা-পড়া শিখান হত তা 'অস্ত্র' অক্ষাঙ্কিত ও তটিল ছিল। কাগজের পাতার ওপর বড় বড় অক্ষর চাপ দিয়ে পিঙ্কন দিকে উঁচু উঁচু লাগ তুলান হত ও শিশুগণ পাতার সেই উঁচু দাঁচের ওপর শিশুদের আঙুল

বুলোতে বলা হত। ইহা বীর, কঠিন ও নিরুৎসাহজনক কাজ ছিল এক মাসের পর মাস চেষ্টা করে লুই ব্রেইলি পড়তে শিখেন। তিনি উনিশ বছর বয়স অতিক্রম করার পূর্বে কেউ একজন তাঁকে ম'সিয়ে বারবিয়ারের কথা বলেন, বারবিয়ার অক্ষরের প্রত্যেক হিসাবে ফুটাক ব্যবহার করতেন। এই পরিকল্পনাটি লুই-এর মনকে আকৃষ্ট করে ও তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। ফুটাকগুলি নানাভাবে সাজিয়ে এমন ভাবে অক্ষর তৈরী করতে হবে যাতে ছোট শিশুবাও অক্ষুণ্ণ-সম্পন্ন আঙুলের দ্বারা সহজে তা বুঝতে পারে।

এই ভাবে একটি অক্ষ-বালকের মনে ব্রেইলি বর্ণমালার উদ্ভব হল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন লুই-এর বয়স ২০ বছর তখন বর্ণমালা সর্বোৎসাহের করে ব্যবহার করা হতে লাগলো।

এক শত বছর পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জনসাধারণ লুই ব্রেইলির সম্মানার্থে এক উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবের সময় ক্ষুদ্র কুপ্ত্রেন গ্রামে লুই-এর একটি প্রস্তরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়, এই প্রামেই লুই শৈশবকালে দৃষ্টিশক্তি হারান।

আবরণ উন্মোচনকালে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। অসংখ্য অন্ধ-লোক মূর্তির পাশদেখে সমবেত হয় ও আবরণ উন্মোচিত হাল তাহা হাত উঁচু করে এগিয়ে যায় বীরে ধীরে এবং অন্ধুতসম্পন্ন আঙুল দিয়ে মূর্তিটির মুখে হাত বুলোতে থাকে। এই তো লুই ব্রেইলি, এই মানুষটি তাদের জন্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

# টাকা/সোনা/সাই

জ্যোতির্ময় রায়

## তৃতীয় অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

[ সময় সন্ধ্যা। রতনার বাপের বাড়ীর ঘর। ঘরে রতনার জ্যাঠামশাই, মা বসে আছেন, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো মিঃ সেন। ]

সুরমা। এই যে অদিকি, তোমার ভদ্রই অপেক্ষা করছি সবাই, এসো—গিয়েছিলো একবার ?

মিঃ সেন। হ্যাঁ আজ সকালেই গিয়েছিলাম। ওঃ কি এলাহী ব্যাপার ! এ তো বিশ্বপতি যোহদের বাড়ীটা কিনেছে, ও বাড়ী তো অপ্যনাবা দেখেছেন।

[ এমন সময় ঘরে এসে ঢুকেন রতনার বাবা অবিনাশ। কথা চলতে থাকে, তিনি এসে পিছনে দাঁড়ান। ]

হ্যাঁ, বাড়ীব চেহেরও বড় খবর হচ্ছে ম্যানেজার, 'নিউজি এপার্টমেন্ট' ম্যানেজার।

[ এমন সময় স্বপ্নাও এসে মার পেছনে দাঁড়ায়। ]

প্রকাশ। এমনি একটা সেদিন কে যেন বলছিল—কত কথাই তো চমকি।

সুরমা। ম্যানেজার ! শোকটা কে ?

অবিনাশ। [ শাস্ত কর্তে ] বচনা, মুগাক ওরা কেনম আছে অদিকি ?

মিঃ সেন। শুনলাম তো ভালোই আছে, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

[ দায় সারা ভাব নিয়ে সুরমাকে ] ম্যানেজার হলো—ঐ যে তর কে পি,র নাকি নিখিলেশ চৌধুরী।

সুরমা। এ্যাঃ তাই নাকি !

প্রকাশ। ও আবার এসে ছুটলো কি করে ?

মিঃ সেন। টাকাটা যেখান থেকে পেয়েছে, সেই অর্গানিজেশনের লোকাল রিক্রেক্টিভিটিভ নিখিলেশের খুব বন্ধু। নিখিলেশ আমেরিকা থেকে কি নাকি বিজনেস ট্রেনিং নিয়ে বসে ছিল তো আজ ক'বছর হলো। মুগাক বাবুকে ডক্সির ডাক্সিরে ঐ বন্ধুই কাণ্ডটি করেছে—বাড়ী কেনা। ব্যবসার টাকা খাটানো। সবকিছুর একসলুট চার্জ নাকি ওর হাতে—অবিশ্বাস্য মুগাক বাবুর পক্ষে সত্যিই অতগুলি টাকার ধাক্কা সামলানো—

প্রকাশ। তা ধাক্কা সামলানোর ব্যাপারে লোকের তো অভাব ছিলো না—তা বলে এর হাতে গিয়ে পড়া তো ঠিক হলো না।  
তর কে, পি, দেয় যে কি অবস্থা তা তো আমি জানি—ঘরে নেই পরসী অথচ চালটি আছে লম্বাই-চণ্ডাই। এ ছোকরা তো ছুটগিনেই সব লুটে-পুটে নেবে।

সুরমা। ( অধীর হয়ে ) নানাদা, এ তো হতে পারে না, ওদের বৃত্ত রাগই আমাদের ওপর থাক, এমন সর্বনাশ দেখলে, আমাদের দুটে যেতেই হবে—আপনি কালট একবার যান, এই ম্যানেজারটাকে আগে তাড়ান দরকার।

প্রকাশ। যেতে তো হবেই।

অবিনাশ। কি দরকার, ওরা যেমন আছে থাক না। ওদের যখন কিছু ছিল না, তখনও খোঁজ নিইনি। আজও না হয় নাই নিলাম।

সুরমা। তুমি চুপ করো।

প্রকাশ। ব্যস কথা বলতে শেখ অবিনাশ ! ওদের কিছু ছিল না বলেই তো হুঁতাবনারও কিছু ছিল না, আজ আছে বলেই সামলানোর কথা ভাবতে হবে না ?

( অবিনাশ ধীরে ধীরে বেগিয়ে যায়। )

স্বপ্না। ( মিঃ সেনের কাছে এগিয়ে এসে ) তা জামাই বাবু, আপনি সেই সকালে উঠে ছুটে গেলেন ভাব করত, আপনার সঙ্গে দেখাই করলে না !

মিঃ সেন। দেখা করলে না তা নয়, আমিই আর ওপরে গেলাম না।

স্বপ্না। ও ! কার্ড পাঠাতে হয় বুঝি ?

মিঃ সেন। কার্ড না পাঠালেও ম্যানেজারকে ডিঙোতে হয়। আর হবেই বা না কেন, সে এখন একটা কেউ-কেটা লোক।

[ এমন সময় বাইরের দিককার দরজা দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢোকে ভৃত্য ]

ভৃত্য। নতুন জামাই বাবু এসে বড় বাবুর খোঁজ করছেন।

প্রকাশ। ( ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ) মুগাক আমাকে খোঁজ করছে ? আমি জানতাম সুরমা, শেষ পর্যন্ত আমাকে দরকার হবেই—আচ্ছা তোমরা সব ভেতরে যাও, আগে ব্যাপারটি আমি বুঝে দেখি। ( ভৃত্যকে ) যা নিয়ে আর এখানে।

[ ভৃত্য বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সুরমা, স্বপ্না অদিকি চলে যায় বাড়ীর ভেতরের দিকে। একটু পরেই ঈশ্বর হালি পদে এসে ঘরে ঢোকে মুগাক। ]

জ্যাঠা। আরে মুগাক, এসো এসো, বসো।

মুগাক। ( বানিকটা ভক্তিত্বকর্মে ) বসছি—আপনি তর আছেন ?

জ্যাঠা। অন্তুমি—তা তুমি ( মুখচোখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যা যে মুগাকের অপ্রকৃতিস্থতা সে বুঝতে পেরেছে ) বসো বসো হির হির বসো, আমি স্বপ্না—ওদের ডেকে দিচ্ছি।

[ ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ ভেতরে চলে যায়। প্রকাশ যে

বেতেই মুগাঙ্ক সহজ ভাবে পারচারাী করতে থাকে—চোখে-মুখে চাপা হাসি। একটু পরেই পদা সরিয়ে কোঁতুলী দৃষ্টিতে উঁকি দেয় স্বপ্না, মুগাঙ্ক তাকিয়ে থাকতে পেরে।]

মুগাঙ্ক। (সহজ স্বরে) কে স্বপ্না, এসো, এগিকে এসো, এমন উঁকি-খুকি মারছো কেন—এসো?

[স্বপ্না একটু বিজ্ঞত ও বিষয়ের ভাব নিয়ে ঢোকে।]

মুগাঙ্ক। তা তোমরা সব ভালো আছ, বাবা ভালো আছেন, বাবা কোথায়?

স্বপ্না। (বিস্মিত ভাবে) ওখানে।

মুগাঙ্ক। এসো, বসো।

স্বপ্না। বসছি—কিন্তু জ্যাঠামশায় বে বললেন—

মুগাঙ্ক। কি বললেন—খুব চটেছেন নাকি?

স্বপ্না। না তো চটেননি, বলছিলেন—

মুগাঙ্ক। ও, চটেননি! বেশ বেশ।

[বলে হাসতে হাসতে মুগাঙ্ক ঘরের অন্ত দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক এমন সময় ঘরে ঢোকে সুরমা, মুগাঙ্ক তখন অন্ত দিকে মুখ ঘুরিয়ে। সুরমা ঘরে ঢুকই চোখের দৃষ্টিতে প্রায় করে স্বপ্নাকে। স্বপ্না মুখভরাতে জানায় সে কিছু বুঝতে পারছে না—ঠিক এমন সময় মুগাঙ্ক ঘুরে পীড়ায়।]

সুরমা। তুমি এসেছো, এত খুশী হলাম!

মুগাঙ্ক। হ্যাঁ অনেক দিন আমাদের দেখেননি তো, রচমাও ভালো আছে।

[সুরমা একটু বিজ্ঞত বোধ করে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অবিনাশ।]

অবিনাশ। এই যে মুগাঙ্ক, এসো এসো, তোমরা সব ভালো আছে? রচমা ভালো আছে?

মুগাঙ্ক। (এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে করতে বলে) রচমা ভালোই আছে।

অবিনাশ। ঠাক ঠাক। তোমরা সুখী হও। তোমাদের মঙ্গল হোক, বসো বসো, পীড়িয়ে কেন?

সুরমা। (অবিনাশকে) হ্যাঁ তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলা, আমি জলখাবারটা নিয়ে আসছি—আর তো স্বপ্না!

[বলে দ্রুত বেরিয়ে যায়, সঙ্গে স্বপ্না]

বিনাশ। হাক বসো বসো। কেমন এবার দেখলে তো বা বলছি ঠিক কি না, ও তোমার পুত্রবকার টুকবকার কিছু না, ভাগ্য—একমাত্র ভাগ্যই হলো সত্য।

মুগাঙ্ক। (হেসে) যে সমাজে একটা বোড়া একজন নগণ্য মাহুকে দাতারানি বহা গণ্যমান্য করে তুলতে পারে, সেখানে ভাগ্যকে মানতে হয় বৈ কি।

বিনাশ। না হে সর্দার, সর্বকালে। পাঁচের তোমার পুত্রবকার, কৃত্তিকেশে একটা দেশ ধরে যেতে থাকলে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে? পাঁচের একটা গ্রহ বেচালে গেলে আর একটাকে ঠেকে দিলে তাকে কখনো?

মুগাঙ্ক। এমন বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়কর জর করতে না পারলেও দাতাবিক জীবনের অনেক ভাগ্যকেই মাহুৎ সমষ্টিগত ভাবে পুত্রবকার দিয়ে জর করেছে এক কয়েক। বহু দিক দিয়ে

প্রকৃতিকে এনেছে আরোহ—জর করেছে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ, পন্যজিত করেছে অসুখ্য রোগ আর মহামারী—তাই ইচ্ছে করলে মাহুৎ আরবজ বাসস্থানের দৈনন্দিন সমতাকেরও সকলের জন্ত অনায়াসে জর করতে পারেন—যার অভাবে অসুখ্য মাহুৎয়ের জীবন ভাগ্যের বিভ্রমনার লাঞ্চিত। এই ধরন না আপনায় মেতে রচনা, আজ হঠাৎ একটা বোড়ার কল্যাণে বড়লোক হয়ে না গেলে, কি হতো তার এবং তার অনাগত সম্ভাবনের ভবিষ্যৎ? হয়তো সেখা যেত একটা জ্বালোকের কয়েকটি রুগ সম্ভান, যাঁদের অভাবে, শিক্ষার অভাবে একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ভাগ্যকে দিচ্ছে বিচার—আপনারা সেখা হয়তো চিনতেও পারতেন না।

অবিনাশ। (পীড়িয়ে উঠে) থামো—থামো মুগাঙ্ক, এসব আর তোমাকে বলতে হবে না—আমি স্বীকার করছি, বিজ্ঞত তব্ব হিসাবে আমার বস্তুব্য বতখানি সত্য, দৈনন্দিন জীবনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, তোমার কথাও অবহেলা করবার মতো নয়।

[এমন সময় সুরমা হুটী ট্রোতে হুঁজুন ভূতোর হাতে বহুবিধ ধাবার সাজিয়ে এনে ঘরে ঢোকে। পেছনে স্বপ্না। ভূত্যা ট্রো টেমিলে রাখে।]

সুরমা। বসো মুগাঙ্ক একটু—

মুগাঙ্ক। অসময়ে তো আমি কিছু খাই না।

অবিনাশ। হঠাৎ আয়োজনটা আমরা করতে পারলেও তোমার চোখে একটু বাধছে না? (নিজের হাতে তুলে) এই সববতটা খেয়ে নাও।

মুগাঙ্ক। আহা হা আপনি কেন—দিন। (সববতটা এক চুয়েকে খেয়ে নেয় এবং বিশেষ করে অবিনাশকে লক্ষ্য করে) আহা আমি জাগি—একদিন আপনাকে এসে নিয়ে যাবো।

অবিনাশ। নিশ্চয়, নিশ্চয় যাবো বৈ কি।

[মুগাঙ্ক সুরমাকে এক রকম অস্বীকার করেই দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সংগে চলে স্বপ্না। দরজার কাছাকাছি গিয়ে, থেমে জিজ্ঞেস করে মুগাঙ্ক স্বপ্নাকে।]

মুগাঙ্ক। জ্যাঠামশায়!

স্বপ্না। (চাপা তিরস্কারের স্বরে) গুরুজনের সঙ্গে এমন একটা পরিহাস না করলেই হতো না?

মুগাঙ্ক। পরিহাস! কি বে বলো!

[এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে মিঃ সেন।]

মিঃ সেন। (মুগাঙ্কের কাছে এগিয়ে এসে) এ কি, আপনি চললেন? মুগাঙ্ক। আস্তে হ্যাঁ।

মিঃ সেন। (অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে মুগাঙ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আকটার জল ওয়ান মট এডমিট, ইউ আর ইয়ালি এ্যান্ একটুম্বলি লাকি পাসন—সত্যি আপনি ভাগ্যবান।

মুগাঙ্ক। না—না ভাগ্য-ট্যাগ নয়—এ যে আপনি বললেন চললেন আর ইকোয়াল। এখানেও ঠিক তাই—স্বযোগ সবার সমান ছিল। (নিজেকে দেখিয়ে) একিজেসি—টিকিট কেনার কুতিত্ব—বলে হা হা করে হেসে ওঠে) চলি—(একটু এগিয়ে গিয়ে কিং) তখনুম আপনি একদিন গিয়েছিলেন, আসবেন আর একদিন।

মিঃ সেল। (বাক্যের অন্তরে) নিশ্চয়ই দশটার পর।

মৃগাঙ্ক। (ব্যঙ্গ-মেশানো বিনয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, তার আগে তো আমি নাহি না।

[বেরিরে যায় মৃগাঙ্ক]

### তৃতীয় দৃশ্য

[মৃগাঙ্কের বাড়ীর লবি। পরের দিন সকাল। ভোলা বিত্ত ছুটে কোঁচে বসে।]

ভোলা। দেখ বিত্ত, এই এ্যাফিনেও পা কুলিয়ে বসটা কি রকম অভ্যাস হলো না রে!

বিত্ত। তা তুলে বসলেই পারিস।

ভোলা। বসবে—বসি। (হুঁপা কোঁচে তুলে উটকো হয়ে বসে) আরাম করেই যখন বসলাম তখন একটা কথা বলি শোন—এই সিগারেটগুলোতে শানার না রে, একটা বিড়ি খেতে হচ্ছে করছে।

বিত্ত। আছে তোর কাছে?

ভোলা। হ্যাঁ আজ কিনেছি।

বিত্ত। দে একটা।

[ভোলা বিড়ি বার করে দেয়। বিত্ত একটা ধরায়। সাহস পেয়ে ভালো নিজে একটা ধরিয়ে হাতের মুঠোর চোপে টানতে থাকে। মন সমর হাই হিলের খুট-খুট শব্দ করে এগিয়ে আসে উগ্র গাধুনিকা তরুণী মিসেস চৌধুরী, নাম মীরা। বিমিত্ত বিরক্তিপূর্ণ হুঁ নিয়ে লোক দুটির দিকে তাকিয়ে দেখে সে। ভোলা বিড়িটা মিমিয়ে নেয়। বিত্ত টানতে থাকে।]

মীরা। (কথা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না এমন ভঙ্গীতে) এই, ম্যানেজার মিঃ চৌধুরীকে ডেকে দাও তো।

বিত্ত। (উঠে ঝাঁড়িয়ে বিরক্তির স্বরে) ঝাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

ভোলা, ম্যানেজারকে ডেকে দে তো।

[বিত্ত কোনো দিকে না তাকিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। ভোলা গিয়ে অফিস-ঘরে ঢোকে। একটু পরেই বেরিয়ে আসে ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজার মুহূর্ত হাসি হেসে এগিয়ে যায় মিসেস চৌধুরীর কাছে। ভোলা চলে যায় নিজের ঘরে।]

মীরা। হ আঁর দেখা স্বাম্—কৌচের ওপর উটকো হয়ে বসে বিড়ি কুকুড়িলো।

ম্যানেজার। হাস্—ওরা বসের পেছারের লোক, একটা বিত্ত, একটা ভোলা—একজন ঠেলাওয়ালো, একজন কাপড়ওয়ালো।

মীরা। ইম্পসিবল। আই ওট টলারেট দীজ নুইসেল!

ম্যানেজার। হীরে ডিয়ার হীরে, এ আবার একটা সমস্তা নাকি! হুঁমিন বাদে টুসকি দিয়ে সরিয়ে দিতে পারবে। তুমি বসো, আমি মিসেস চ্যাটার্জিকে খবর দিচ্ছি।

[ম্যানেজার পা বাড়ায়। মীরা ডাকে—]

মীরা। শোনো, আমি বা করবো তার উপর ম্যানেজারি করতে এসো না—হুঁ-চারদিনের মধ্যে দেখবে সব হাতের মুঠোর নিয়ে এসেছি। আঃ এতগুলো দিন ঘরে ইজনিটো এমন কাটছে, সে ডাই এত ভাল—কার্ট গ্যারান্টি আই গিভ ইউ—এমন ব্যবস্থা আমি করবো হাতে প্রতিটি সন্ধ্যা সোনার টুকরো হয়ে ওঠে—তারপর! তারপর সে দেখতেই পাবে। আচ্ছা বাও—

ম্যানেজার। (খুঁকে পড়ে) মাই ইজ্জিস জীনিয়াস

মীরা। (গালে টোকা দিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, ইয়র ওনলি হোপ—একমাত্র ভরসা।

[ম্যানেজার হুঁপা এগিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে খেমে পড়ে রচনাকে দেখা যায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।]

ম্যানেজার। এই যে মিসেস চ্যাটার্জি, নিজেই এসে গেছেন!

রচনা। (এগিয়ে এসে মিসেস চৌধুরীকে) ওপর থেকে আপনার গাড়ী দেখে নেবে এলাম।

ম্যানেজার। (পরিত্র করাণোর ভঙ্গীতে) মিসেস চ্যাটার্জি—মিসেস চৌধুরী—মাই বোটার থ্রু-কোর্স!

[রচনা ও মীরা হাসে। নমস্কার-বিনিময় হয়।]

রচনা। বসুন, ঠুকে বলে এসেছি, উনিও আসছেন।

ম্যানেজার। আসছেন না, ঐ যে এসে গেছেন।

[সিগারেটের টিন-হাতে এগিয়ে আসে মৃগাঙ্ক।]

রচনা। (পরিত্র করিয়ে দেয়) মিসেস চৌধুরী—মিঃ চ্যাটার্জি।

মৃগাঙ্ক। (নমস্কার-বিনিময় শেষে) আশুন এখানেই বসো বাক।

[সবাই বসে]

ম্যানেজার। ব্যাং—

[ভেতর থেকে ছুটে আসে বেয়ারা।]

চা লাও।

[বেয়ারা চলে যায়।]

(মীরা) মিঃ চ্যাটার্জিকে তুমি বুঝিয়ে বলো, কিভাবে কি করতে চাও।

মৃগাঙ্ক। (মিসেস চৌধুরীকে) আমাকে বুঝিয়ে বলবার কিছু নয়কার নেই, ও-সব আমার মাথার চুকবেও না। মোটামুটি রচনার কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। ভালোই, দেখা বাক—মধ্য আর নীচের তলার লোকগুলোকে তো দেখলাম আঁর চিনলাম, উচ্চতমদের সঙ্গেও পরিচয়টা একবার হয়ে বাক। মীরা। ও ইউ স্পীক সে ইন্টারেস্টিং—আশানি এমন চমৎকার করে বলেন—

[বেয়ারা চুকে চায়ের টেটা রচনার সামনে রেখে চলে যায়।]

রচনা। (চা ঢালতে ঢালতে ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে) নিমন্ত্রিতদের লিষ্টটা একবার ঠুকে দেখান না—(মৃগাঙ্ককে) তুমি দেখ না একবার কাদের সব বলা হবে।

মীরা। এই যে লিষ্ট আমার কাছে। (ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বাক করতে যায়)

মৃগাঙ্ক। ও দেখে আমি কি করবো, অধিকাংশকেই চিনবো না—হুঁ-চারজন হয়তো বেরবে, বাদের নাম শুনেছি মাজ।

মীরা। আপনার কোনো বন্ধু থাকলে নাহগুলো—

মৃগাঙ্ক। আমার বন্ধু বলতে তো হুঁটি। তারা আমার বাড়ীতে থাকে, নিমন্ত্রণ করবার নয়কার নেই।

রচনা। তুমি কি বিত্ত আর ভোলার কথা বলছো?

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ।

মীরা। বিত্ত—এ্যাও ভোলা।

মৃগাঙ্ক। আশানি দেখেছেন ওদের?

মীরা। ঠা লবিতে দেখলাম—তা ওরা তো সোসাইটির এটিকেট,  
আই মিন্ দশজনের সঙ্গে মেলামেশার নিয়মকানুন ঠিক জানে না।  
মৃগাক্ষ। জানে না, শিখে নেবে—পুরো ব্যাপারটাই বাট দিশি বখন  
নয়, তখন শিখতে একদিন সবাইই হয়েছে—জন্ম থেকে যে  
পেয়েছে, তারও বাপঠাকুরা কেউ একজনকে শিখতে হয়েছে  
কোনো দিন।

মীরা। কিন্তু—

ম্যানেজার। (চোখের ইঙ্গিতে তাকে ধামিয়ে) তা বেশ তো,  
ওরা থাকবে—হ্যাঁ এ সব শিখে নিতে কতক্ষণ—তাহলে  
আসছে রবিবারই দিন স্থির হলো।

[ বলে দাঁড়িয়ে ওঠে—অন্ত সকলেও ]

রচনা। (মিসেস চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) আমি এখন থেকেই  
নার্ভাস ফীল করছি, আপনাকে কিন্তু আজ থেকেই এর পেছনে  
লেগে পড়তে হবে।

মীরা। আপনাকে কিছুটা ভাবতে হবে না মিসেস চ্যাটার্জি—  
আই উইল ম্যানেজ অভরিথিং—তাহাড়া আপনাকেও এ দু'দিনের  
মধ্যে এমন শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো যে দেখবেন ইউ ইউরসেলফ  
আর ম্যানেজিং দি হোল শো—আপনাকে সে দিন বা সাতাবো  
(ঘটকা মৃগাক্ষের দিকে মুখ ফিরিয়ে কঁচর নীচু করে) আপনিও  
বার পড়বেন না।

মৃগাক্ষ। আমাকেও সাতাবেন? (হেসে ওঠে)

[ মীরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয় ]

ম্যানেজার। (রচনাকে) চলুন, হলঘরটা কোথায় কি ভাবে  
সাজানো বার একবার দেখা যাক।

রচনা। তুমিও এস না।

মৃগাক্ষ। না তোমরাই যাও। আমি ততক্ষণ বরং ব্রাদারদের নিয়ে  
একটু গল্প জমাই। (গলা ছেড়ে হাঁক দেয়) বিত্ত—

[ ম্যানেজার অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে রচনার দিকে তাকায়। রচনা একটু  
দুচ্ছাচবোধ করে দু'জনে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে যায়।  
দু'জনের মুখে এসে ঢোকে বিত্ত। ]

মৃগাক্ষ। ভোলারাম কোথায়?

বিত্ত। (বসে) এই বাইরে কোথায় না জানি গেল—

মৃগাক্ষ। তা তুই বুঝটা অমন গোমড়া করে জাভিস কেন?

বিত্ত। (একটু চুপ করে থেকে) অনেক দিন তো রাজার হাঙ্গে  
তোমার এখানে থাকলাম দাদা, এখন নিজের কাজে কিরে যেতে  
লাও। ক'দিন আর এভাবে বসে বসে কাটাবো বল তো?

মৃগাক্ষ। (ভাবী গলায়) কথটা মাথায় ঢোকালে কে, শুনি?

বিত্ত। কেউ ঢোকায় নি দাদা, আমি নিজে থেকে বলছি। হাই

বল, তোমার বহু-বাক্য বাড়াবে, তখন কেবলই আমাদের নিয়ে  
মুন্ডিলে পড়বে হবে তোমাকে—তাই আমি ঠিক করেছি, কাদা  
আমরা আমাদের ওখানে ফিরে যাবো।

মৃগাক্ষ। (চটে ওঠে) ঠিক করবার মাসিক তুমি না আমি—বাবা  
দেখি এখান থেকে, পুলিশ দিয়ে পাকড়াও করে এনে আটকে  
রাখাবো—যাবো বললেই যাওয়া হলো আর কি? (সিগারেট-টি  
হাতে উঠে দাঁড়ায়) আমার বাড়ীটা চিড়িয়াখানা, এখানে মাছ  
মানায় না, এই তুমি বলতে চাও? নজ্জার কোথাকার—

[ বলে কুঁচ পদক্ষেপে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। বিত্ত  
সঙ্গ দৃষ্টিতে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাতে মাথা রেখে  
বসে থাকে। এমন সময় মধুকে নিয়ে ব্যস্তভাবে এসে ঢোকে ভোলা। ]

ভোলা। দেখ বিত্ত, ক'কে নিয়ে এসেছি।

বিত্ত। আরে মধু, আর আর।

[ নোংরা পোষাক, অপরিচ্ছন্ন খালি পা নিয়ে কার্পেটের ধার বেঁচে  
এগিয়ে আসে মধু। বিত্তও কোচ-কার্পেটগুলোর ওপরে একবার চোখ  
বুলিয়ে নিয়ে নিজেই উঠে যায় মধুর কাছে। ]

বিত্ত। (ভোলাকে) ওকে কোথায় পেলি?

ভোলা। গেট দিয়ে ঢুকছি, দেখি হ্যাঙ্গ-ক্যাল করে তাকিয়ে আরে  
ভেতরের দিকে। অনেক খুঁজে-পেতে গেটে এসে আটকে গেছে,  
দরওয়ান বৌটো চুকতে দেখিনি।

বিত্ত। (ক্র কুচকে একটু চুপ করে থেকে) বিহুদি' ভালো আছে যে  
মধু?

মধু। হ্যাঁ—মায় তোমার কথা কেবলই কর। কই তুমি তো আর  
আস না আমাগো বাড়ি? (কথা বলে বটে তার চেয়েও অবাক  
বিশ্বাসে তাকিয়ে দেখে এদিক ওদিক) কি সুন্দর, বিত্ত মামা  
তোমরা এইখানেই থাকো না?

[ মধু বিহবল অবস্থায় বিত্তর গা ঘেঁষে তার অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে  
মুঠো করে ধরে বিত্তর খোপদুহন্ত পাঞ্জাবীটা। ]

বিত্ত। (মধুর হাত ছাড়িয়ে, একটু সরে গিয়ে) এং, দিলি তো  
পাঞ্জাবীটা নোংরা করে—

[ অপ্রস্তুত মধু ভীত চোখে তাকায়। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বিত্তর  
খেরাল হয় এই জামাকাপড়ের খাতিরেই মধুকে এতক্ষণ এভাবে সে  
দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ অজ্ঞায় উপলব্ধি করামাত্র মধুকে হ'হাতে  
তুলে সজোরে সে বুকে চেপে ধরে। ]

(আবেগ ভরা কন্ঠ্যকণ্ঠে) মধু, তোর মাকে গিয়ে বলিস, আমি  
তার সেই বিত্তই আছি—আমি তার কাছেই চলে যাবো—আমি  
তার কাছেই চলে যাবো।

[ ক্রমশঃ। ]

শ্রুতি

শ্রুতসম্মত পাবকের মত

জগতের গ্রানি কৃত্রিম নহে

। মহামায়ার গতি সে মূর্ত

শ্রুত কথাসে কৃত্রিম নহে।

—সত্যজ্ঞানী নগু।

# কৈলাকুন্ডি দৈর্ঘ্য

(উপভাস)

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৭

নুজনের মৃত্যুরত্ন যে রকম চাকলা জাগিয়েছিল সারা  
শুলতানপুরে এখন আর সে রকমটি নেই। সবটাই যেন  
ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে।

আসবার কথাই। কারণ—গ্রামের লোক বেকার বসে থাকে না  
বড়-একটা কেউ। আশ-পাশের কলিয়ারীতে অধিকাংশ লোক চাকরি  
করে। এটাই নিয়ে বসে বসে শুলতানি করবার সময় কোথায়?

তবে দক্ষিণপাড়ার কয়েক জন ছেলে-ছোকরা কালকন্ঠ কিছু করে  
না। কয়লার জায়গা-জমি ছিল তাদেরই বেশি। সারফস-রয়েলটির  
টাকা কেউ কেউ মনে পড়ানি। লোকে বলে নাকি তারা সেই টাকা  
ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে আজও খাচ্ছে।

কিছু কথাটা খোঁচ হয় সত্যি নয়।

বসে খেলে কাজের ভাণ্ডারও কুরিয়ে যায়। কলসীর জল গড়াতে  
গড়াতেই শেষ হয়।

তবে বসে-খাওয়া কুঁড়েমির একটা নেশা আছে। এনেশা বার  
ধরেছে, সে আর সহজে তা' পরিভাগ করতে পারে না।

হাব, নারায়ণ, শিবু আর ফটিকে দেখলেই সে-কথা বুঝা যায়।  
টাকা কিছু কিছু পেয়েছিল তাদের বাগ-জোয়ার। সে টাকা কবে  
কুরিয়ে গেছে। তারা এখন আড্ডা মারে পরাশরের জ্যোতিষ-আশ্রমে।

ফটিকে তার বাবা সেদিন বললে, বেবো তুই বাড়ী থেকে।  
বিধবা মেয়ে হে। নোসু মে, বাড়ীতে বসে বসে খাবি।

ফটিক বললে, চাকরির চেষ্টা তো করছি। কোথাও কিছু না  
পেলে কি করবো!

এত লোক চাকরি পাশ আর তুই পাসনে। চাকরি খুঁজবাব সময়  
কোথায় তোরা?—ফটিকের বাবা বললে, পরাশরের ওখানে সারাদিন  
তো আড্ডাই মারিস শুনি।

ফটিক রেগে উঠলো। বললে, বেশ করি। এই বলে সে তার  
বাইকটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

বাবা তার মিথ্যা বলে না।

বাহোবু কিছু বোজগাব করবার কথা ফটিকের বাবা তাকে বলছে

অনেক দিন থেকে। ফটিকের তখন বিয়ে হয়নি। বিয়ের সময়  
ফটিক তখন বললে, চাকরি জোগাড় করতে হ'লে ছুটে বেড়াতে হবে  
বেথানে-সেখানে। আমার একটা বাইক চাই। এই বলে স্বত্তরের  
কাছ থেকে নতুন একটা বাইক সে আদায় করেছে।

সেই বাইকব সম্ভাবতার হাড়ে এত দিন পরে।

শুলতানপুর থেকে আসানসোল! আদালত।

এমন কি সীতাবাস মুখাজকে পুলিশ যেদিন ধরে নিয়ে যায় গ্রাম  
থেকে, সেদিন একমাত্র ফটিকের বাইকটা ছুটছিল সেই ভিল  
গাড়ীটার পিছু-পিছু।

মামলাব দিন যেদিন থাকে, ফটিকে সেদিন আদালতে যেতেই  
হব। আজও সে সেইখানই গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া  
করে। আদালত থেকে ঘিরে এলো। পরাশরের আশ্রমে  
ফিরে এলো নিদারুণ দুঃস্বাদ নিয়ে। বললে, সর্কনাশ হয়েছে

কি সর্কনাশ? কিসের সর্কনাশ?

ফটিক বললে, সীতাবাস মুখাজের ধাঁসী হলো না।

যারা হাসেছিল সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলো—হা হা  
কাজলমি করিসনি! কোণকে একটা উড়ো খবর নিয়ে চলে এলো

ফটিক বললে, বাইকের ধূলা মুছিনি এখনও। ওই দাখল  
আদালত থেকে আসছি।

সত্যি বলছিস?

ফটিক বললে, হাকিম নিজে বলেছে আমি শুনে এলাম।

কি বলেছে?

মুখাজেই যে রজনকে খুন করেছে—তার কোনও প্রমাণ নেই।

তুই নিজের কানে শুনলি?

ফটিক বললে, না ডাউ মিছে বলবো না, যেতে আমার সেবি  
গিয়েছিল। একজন উকিলকে ডিজ্ঞাসা করলাম, সে বললে  
তাঁই হল।

তার যেন একতরফ পরে নিশ্চয় হ'লো। মনে হ'লো ফটিক  
যেন অবিশ্বাস করতে পারলে তারা বাঁচে। বললে, মুখাজে তাহ  
জামিনে খালাস পেয়েছে, তুই জানিস না।

আমি এক জন বললে, এ বাবা তোমার আমার কেসু নয়, পুলিশ-চালানী কেসু, সহজে ছাড়বে না।

ফটিক খুঁজছিল পরাশরকে। এমিক-ওমিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কোথায়?

দাদা আজ-কাল দিবা-রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় ঘরে খিল বন্ধ করে ভেতরেই কাটায়। ভক্তের দল বলে, অতি শুভ কি একটা যোগ অভ্যাস করছেন তিনি। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি আজ-কাল দিবানিদ্দার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন একটুখানি। শীতের আমেজ লেগেছে কয়লাকুঠির দেশে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আহা-রানির পর-লেগ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লে সন্ধ্যার আগে আর উঠতে পারেন না।

সেদিন কিছু উঠলেন।

ফটিকের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল কিনা কে জানে। দরজা খুলে পরাশর বেরিয়ে এলো। মাথার চুল আর দেহের মেদ তই ই বৃদ্ধি পেয়েছে। চোখ দু'টি লাল।

বললে, এই যে, অনেকেই রয়েছিল এখানে। শোন।

সবাই অবহিত হ'লো।

পরাশর বললে, আজ দু'দিন ধরে ক্রমাগত একটা ছবি আমি দেখছি চোখের সামনে। তোদের এই সুলতানপুর গ্রামে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সীতারাম মুখোজর সতীশদ্বী সান্দ্রী স্ত্রী সন্তোষেরবীর আশীর্বাদ লাভ করলে। সার্বিকো যেমন সত্যবানকে কিংব পেয়েছিল সেও যেন তেমনি তার মৃত স্বামীকে কিংব পেলে।

ফটিক বললে, হ'লো তো? আমার কথাটা এখন বিখ্যাস হলো তো তোদের?

পরাশর বললে, তোর আবার কি কথা ফটিক?

ফটিক বললে, আমি আজ আদালতে গিয়েছিলাম। তুনে এলাব সীতারাম মুখোজরকে ছেড়ে দিয়েছে।

পরাশর বললে, দেবেই। মায়ের আশীর্বাদ। জয় মা সন্তোষেরবীরী। জয় বাবা কুসুমধর।

হাত দু'টি ভেঁড় করে পরাশর তার কপালে ঠেকালে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ সে তেমনি ভাবে ঠাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথম শেষ হ'লে বললো সেইখানে। বললে, দেখলি? মাহুব কি করবে রে। মাহুবে কোনও শক্তি নেই। শক্তি সব সেই শক্তিময়ী মায়ের।

ফটিক একতরফ ঠাঁড়িয়েছিল, এবার সে বললো গিরে পরাশরের পায়ের কাছে। বললে, আজ্ঞা দাদা, মুখোজর আর কিছু হবে না তাই'লে? তুমি যে গণনা করে বলেছিলে-কাসি হবে, সে-সব তাই'লে ভুল হয়ে গেল?

পরাশর বললে, হ'লো। হ্যাঁ, সব ভুল হয়ে গেল।

বলেই কি যেন সে ভাবলে। ভেবে বললে, মনে মনে খুব অহঙ্কার হয়েছিল আমার—বুঝতে পারছি। তাই সে অহঙ্কার আমার ধুলোর লুটিয়ে দিলে। মা আমার দর্প চূর্ণ করে দিলে।—কই রে, তোরা যে তামাক-টামাক খাচ্ছিল না কেউ? পচু একবার কল্কেটা সাজ বাবা।

পচু তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তামাক সাজতে বসলো।

পরাশর বললে, শনিবার আর মঙ্গলবার আমার কাছে লোকজন আসে-গণনা করাবার জন্তে। আগামী দু'মাস আমি গণনা করবো না।

পচু চমকে উঠলো।—সে কি দাদাঠাকুর? দু'মাস কারও হাত দেখবে না? কত লোক এসে এসে ফিরে যাবে—

পরাশর বললে, তা হাফু। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

এর ওপর আর কথা চলে না।

শনি মঙ্গলবার আজ-কাল লোকজন কম আসে না। কত দুঃ-দ্বাস্তের গ্রাম থেকে মেরেরা আসে গল্পের গাড়ীতে চড়ে। কত ভাগ্যবিভবিত ধনী আসে ছদ্মবেশে। কত অকালপক হতাশ-প্রেমিক যুবক আসে। কত রকমের কত বিচিত্র মাহুবেবের হয় সমাবেশ।

তারো আসবে আর হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

লোকসানও পরাশরের কম হবে না।

যিনি ঠাঁর সামান্য ভুলের জন্তে এতগুলো টাকা মমতা অনাগ্রাসে পরিত্যাগ করতে পারেন, তিনি যে অসামান্য ব্যক্তি, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

ফটিক এসেছিল সীতারাম মুখোজর খালস পাওয়া নিয়ে পরাশরকে একটু অপ্রস্তুত করবার বাসনা নিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ কি যে তার হ'লো সে নিজেই বুঝতে পারলে না। পরাশরের কাছে এগিরে গিরে তার পায়ের কাছে বসে পড়লো। তার পর হঠাৎ এক সময় তার জান হাতখানা পরাশরের চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, হাত দেখা বন্ধই কর আর বাই কর দাদা, আমার হাতটা তোমাকে দেখে দিতেই হবে।

[ ক্রমশঃ ]

### মৃত ও জীবিত

"It is a common saying that all the land a man requires is three yards. But only a dead man needs three yards. A living man needs not three yards of land, and not a manor, but the entire earth, all of nature, where he can give full play to all the qualities and characteristics of his untrammelled spirit." —Anton Chekov.



# সোবিয়তের দেশে দেশে

( ১৬ )

সেই প্লেন—কাবুল থেকে যেটার হিন্দুকুশ পার হয়েছিল।  
অন্ধ্রজেনের নল রয়েছে, যদিচ অন্ধ্রজেনের গরজ নেই এই  
মোটো অঙ্কলে। হোটেলসও সেই মেয়েটি—সেই কিছু ভাবিচ্ছি এবং ঈশ-  
ভালোও। শুনে পড়লাম চেয়ারটা নিচু করে দিয়ে কবল টেনে গায়ের  
উপর চাপিয়ে। পাইলট যথাবিধ গোড়ায় একটু বস্তুতা ছেড়েছে—  
রাস্তার মধ্যে কোন থামেলা নেই—প্রান্তরাশ কোন এক শহরের  
কিনারে, বেলা হবে যেখানে নামতে। লীমতী হোটেল চাককি  
সাপ্তউইচের জোগান দিয়ে যেতে পারবেন তো—তোকগে বেলা,  
কী আর করা যাবে! মিথ্যা লাগছে, আরামে ঘুম এসে গেল।  
মিষ্ট স্বপ্ন দেখছি। চারিদিকে শুধু অন্ধ্র অবাধ জীবিত—মাছুবের  
সকল হুং-অশান্তি বিলীন হয়ে গেছে। কী ভালো যে লাগে।  
এদের এই আজব দেশের চিন্তা-চেষ্টা এই কদিনে মনের বেন  
খুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে।

শব্দ ভেঙে ভেঙে ভেঙে উঠছি। সবাই ঘুম অচেতন। আলো  
নিবিঘ্নে গিয়েছে, হোটেলের ডান পাশে শুধু একটা কমজোর আলো  
জোনাকির মতন। বই পড়ছে সে একমনে। ঘুমন্ত নভোলোকের  
একটি মাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও  
অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছি। মেশিন  
চালিয়ে দিয়ে তারাও চুলছে কিবা কি করছে, কেবাই জানে!

তার পরে এক সময় আর কিছু জানিনি। অনেক নিচে  
মাটির দেশে কত পাহাড় মাথা তুলে উঠি গিয়েছে, কত শহর  
শীপ উঁচু করে দেখছে, কত নদী ছুটছে পালা দিয়ে তরঙ্গ তরঙ্গ—কিছু  
জানি নে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে, আবার একটু বেন সাড়  
হল। স্বপ্ন দেখছি, বরষে ছোট হয়ে গিয়ে এবার নাগরদোলায়  
চলছি। নীলপুঞ্জের মেলায় হরিহরের তীরে বীশতলা সাফসাকাই  
করে নাগরদোলা বসিয়েছে। মোকম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায়  
চড়ে বেন। ঘুম ভেঙে চোখ মেলামাম। সত্যি তো, কী বিবম  
গোলানি! হুহু করে প্লেন নামছে। জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা  
করি। কুয়াশা আকাশ-কুবন মুছে গিয়েছে। বেলটোলা হলো তো  
নামবার কথা। বাড়ি দেখলাম, পৌনে চারটা। তবে? বা ভেবেছিলাম,  
হয়তো বা তাই—ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে।  
কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামে  
নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের  
মতো প্লেন ডুঁরে পড়ে যাচ্ছে। পরমার্ঘ মিনিটখানেক বড় জোর—  
তারপর হাড়মাসে সবলত্ব তালগোল হয়ে আছি।

চোঁচাবার ইচ্ছে—কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না।  
ঘসু করে আঙুরাছ হেন কালে, ছুমির গারে প্লেন লাগবার সময়  
যেমনটি হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায় নি, বীহে-ব্রহ্মে নামিয়ে

এনেছে। জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। যতদূর ঠাঁহর  
হয়, দিকহীন তেপান্তরের মাঠ। সারথালি আলো দেখা যায় মাঠের  
প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এলো, কথা ছিল না এমন তো!  
থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে আলোর সারির ভিতর  
এসে পড়ল। দৌড়ছে—আর দেখলাম, বেআলো পার হয়েছি,  
সেগুলো নিবছে সঙ্গে সঙ্গে; সামনের দিকে নতুন আলোর সারি  
অলে উঠছে।

ধামল প্লেন। থেমে ঈড়িয়ে গরাজে। দরজা খুলে দিল:  
নামুন, নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মাছুবগুলি  
নেমে যান শুধু।

লঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ  
জাতীয় অল্প ধরনের কেরোসিনের বাতি। প্লেন থামতে চক্ষের  
পলকে মাঠের সমস্ত আলো নিবিঘ্নে দিল, অনেক দূরে শুধু কয়েকটা  
টিমটিমে আলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঈড়িয়ে সর্বশরীরে কাঁপুনি  
ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে।  
প্যারপেটে কালা, বরফ গলে জল ভরে আছে এখানে-ওখানে।  
তারই মধ্যে জুতো ছুবিধে ছুবিধে চলছি। মোজা ভিলে গেছে।  
শীত ঐ ভিলে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরকাঁড়া বেয়ে কনকনিরে  
ব্রজতালু অবধি গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। যাঁচ্ছি কোথায় গো, কেনই বা  
নিযে যাচ্ছে?

পৌছান গেল অবশেষে আলোর ধারে। এয়ার-অফিস।  
বৃত্তান্ত জানা যাচ্ছে এবার। কাজাকিস্তানে জেগে-অঙ্কলের মধ্যে  
নেমে পড়েছি, ভায়গাটার নাম জুশাল! এ ভায়গা ম্যাপে খুঁজে  
পাওয়া দুর্ঘট। এয়ারফিল্ডও তেমনি—দিগবাস্তু পোড়ো মাঠের  
মধ্যে গোটা চারপাঁচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এক লহমা ঐ বে  
আলোর সারি দেখলেন—ডিক্সেলে চালিত বিদ্যুৎ-বানানোর কল  
আছে। প্লেন আসছে খবর হলে আলো জালিয়ে দিয়ে পথ দেখায়;  
নেমে পড়লে নিবিঘ্নে দেয় তাড়াতাড়ি। এখনকার এ আলোগুলো  
কেরোসিনের। হিসাবি গৃহস্থের মতো, তিলকের অপব্যয় ঘাতে  
সর না। লড়াইয়ের সময়টা হাসপাতাল বানিয়েছিল এখানে,  
প্লেন ওঠানামার ব্যবস্থা করেছিল কাজ চালানো গোছের।  
হাসপাতাল চালু নেই, এয়ারফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেশয়ে যদি কাজে  
আসে। যেমন এই আজকে। খোরস্তর কুয়াসা—তার মধ্যে  
উড়তে সাহস করল না। বিবম সাংবাদি এরা—একটু বিপদের  
ভয় থাকলে প্লেন ডুঁরে নামিয়ে ফেলবে (ব্যাপার ভরসা হলে অবশ্য  
আলাদা কথা)। সেজন্তে, দেখুন, আকাশকন্ডে প্লেনের মহা  
মহোৎসব—কিন্তু দুর্ঘটনা একেবারে নেই। কুয়াসা দেখে ওরা  
শ-সেড়ে মাইল উল্টো এসে বিচার-বিবেচনা করে এইখানে এনে  
নামাল।

হাত তিনটের রঙনা হয়েছি। পাকা তিন খণ্ডা চলে এসে এয়ার-অফিসের বাড়িতে দেখছি চারটা। অক্টো ব্রালেন ভো—তিন আর তিনে চা। অতএব খণ্ডা আড়াই হাত এখনো বাকি। নেমে বখন পড়া গেছে, প্রান্তরাশ এখনো। বরুনা হতে অতএব সেই আটটা।

ছোট অফিস-ঘর। ঘর বেশ গরম করে রেখেছে। শক্তির মুখে ছাই দিয়ে আপাতত বোলকন আমার হাজির এই ঘরটুকুর ভিতর। বৈদ্যবৈদ্যি ঠাড়াবার ঠাই হয়েছে। কী মতলব, গুরে বাবা! গাড়িয়েই থাকতে হবে নাকি এই চার চার খণ্ডা?

লোভাবিধী মীরা বলল, ঘুমিয়ে থাকতে হবে। স্নায়ের খাট ও পক্ষি-তোশকের উপরে লেপ-কবল ফুটি দিয়ে। নয়তো এত জ্বরগা থাকতে এইখানে এসে পড়লাম কেন?

বলো কি হে! তেপান্তরের মাঠে এতগুলো খাট-বিছানা ছুটিয়েছ?

মীরা বলে, পিছনের গ্লেনে আর বীরা আসছেন, তাঁদের জন্তেও।

চারের পিপাসা পেয়ে গেল কোন এক বাবুর। চাইলেই বখন এসে যায়, পিপাসার আর সে কি? কিন্তু এই রাতে এই সময়টা সুবিধা হল না। এমনি তো গ্লেনের চলাচল নেই—খানাপিনার ভোগাও সকালের আগে হয়ে উঠবে না। পীতে পীত চেপে বাতটুকু কোন গন্তিকে পিপাসা সামলে থাকুন, কী আর করা যাবে!

পিছনের গ্লেন এসে পড়ল। মাঠে নেমে আবার চলেছি খোঁওয়ার বাড়ির দিকে। আগে পিছে লঠন ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়ি বৈখানটা মিলিটারি-হাসপাতাল ছিল। রোগি সেই, কিন্তু খাটবিছানাগুলো আছে। খান বাটেক—অর্থাৎ প্রভিজনে আমার এক খাটে মাথা এক খাটে পা রাখলেও কতকগুলো বাড়তি থেকো যাবে।

স্নায়ের খাট, ধবধবে তোষক-বালিশ, পরিচ্ছন্ন মোলায়েম কবল—জুতো-জামা খোলায় সবুস সবুস না, গাড়ির পেড়ে আরামে চকু বুজিয়েছি। ঘরটা চার ফনের—বিশেষ-বিভূরে মাঠের মধ্যে একা একঘরে থাকা ঠিক নয়। আলোটা চোখে লাগছে, হাত বাড়িয়ে আলোর জোর কমিয়ে নিবুনিবু করে দিলাম।

ঘুমও এটে আসছে। হেন কালে দরজায় টোকা। আন্তে খুব আস্তে। চোখ মেলেছি কিন্তু সাড়া দিই না। ভেজানো দরজা একটুখানি খুলে গেল। বডিডরের আলোর একফালি এসে পড়েছে। সেই আলোর উপরে লম্বা পা ফেলে এক তরুণী সমুপর্ণে ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকায়, আমার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। শীতের মধ্যেও গা ঘেমে উঠেছে। তারপর আমাকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে এই রকম। সেখানে সাড় মিলল না তো সরে গেল পাবের জনের দিকে। সর্বনাশ! রাত্রিশেষে পুরুষমাহুদের ঘরে কি মতলবে ঢুকেছে ফুটফুটে মেয়েটা?

আশঙ্ক করুন তো কেন? কণপরে দ্রোকোভ হুকে পড়ে আসে বাড়ির দিল। আঙুল দিয়ে দেখায় খ্রিস্টিয়ান্য সোণের খাটের দিকে। তখন মাদুম হল। বা ভেবেছিলাম, সে-সব কিছু নয়—মেয়েটা হল ডাক্তার। খ্রিস্টিয়ান্যের গলার বিচি উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে উলসিলে ব্যথা হয়েছে। কিছু খানটান নি লম্বা থেকো। বরুনা হবার মুখে জ্বা টের পেরেছে। তখন সময় ছিল না, বাসে

পেয়ে এবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির হয়েছে। বাতটুকুও পোহাতে মিল না।

কত রকমে দেখল খ্রিস্টিয়ান্যের গলা—দেখতে চলে যায় বাঁচা গেল বে বাবা! তাই কি অত সহজে ছাড়বে? অল্প খ যন্ত্রপাতি নিয়ে পুনশ্চ এসেছে। ট্রেপটোমাইসিন ও পেনিসিলিন জাতীয় কি কি খেতে দিল, শুকতে দিল। ডিশ্পেনসারি এঁ বাড়িতেই—সাথ মিটিয়ে ডাক্তারি করার বাধা নেই। কোরালে আলোর ঘুম ভেঙে গিয়ে উৎখল করছি সকলে। ভালমাহু খ্রিস্টিয়ান্যের লজ্জার অবধি নেই। বারবার বলেন, আপনাদে কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু আমার কোন হাত নেই। সামান্য একটু ব্যাপার তা এরা মহা-মহোৎসব জমিয়ে তুলল যে একবারে।

তাই দেখা গেল, বোগী না থাক, মাঠের মধ্যে ডাক্তার-হাসপাতাল আছে কিনা। এরাওজামের নিয়ম এটা। যে তল্লাটে বখন নানুত অফিসে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন একটা-দুটো মেয়ে সতৃষ্ণ চোখে দেখছে আপনার দিকে। আপনার রূপমাধুরী দেখছে না—আঘাত আ কি না আসে, নিশ্বাস ঘন হচ্ছে কি না, বমিটমি করে কাহি হয়েছেন কিনা—এই সমস্ত দেখছে ঠাহর করে। তা আমার! স্বদেশের তেলেজলে পুঁই এক-একখানা ইশ্যাতের শরীর নিয়ে গেছি মেয়েগুলো নিশ্বাস ফেল নিঃশ্বাস হয়ে আবার নিজ নিজ টেবিলে বসে পড়ে।

অখ্যাত অজাত জুয়ালির মাঠের বোদ কাচের জানলা দিয়ে আমার বিছানায় পড়েছে, তখন ঘুম ভাঙল। আর দেবি না বরুনা এবারে। মুখ খোঁওয়ার জল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অস্ত্রা ব্যাপার? একজনে সন্ধান দিলেন—পিছন দিকে মাঠের মতো কয়েকটা বালখিয়া ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি প্রান্তঃকৃত্যের ব্যবস্থা ওখাে হওয়া সম্ভব। তাই বটে! কিন্তু নজর করা গেল, ঘরের সঙ্গীর্ঘতা স্থানীয় লোকের মন ওঠে না—পিছনের বিমুক্ত মাঠের উপর নদ পরিচয় চিহ্ন। দিনের আলোর ভাল করে দেখছি—এদিকে তেপান্ত মরুভূমি, ওদিকটার ফল ফলাতে শুক করেছে। মরু-বিজয় করণ করতে এগুচ্ছে—তারই অগ্রকোভন বহুলালিত ক্যাকটাস ও বকমার্গী কীটগাছ।

গরম কোকো ও উৎকৃষ্ট বিমুক্তের ব্যবস্থা করেছে। শীতান্ত সকাপ আঁহা-মরি লাগল। গ্লেন কেমন সহজে ওঠায় নামায় এরা, এয়ারফিল্ড এক হাত পরিমাণ ক্যাকটাসও নেই। মরুপ্রায় ভূমির খানিকটা বারি সাফসাকাই করে নিয়েছে। ওইই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দিবি উপরে উঠে গেলাম। বাড়ি আধবিনসে—বড় বিমানবাঁটি, দুপুরে লাগে সেখানে।

আবল-হুদের পূর্ণতার দিয়ে আছি। অনেককণ ঘরে চলল আধবিনসে আর একবার দেখেছেন আপনাদা। আজকে দেখি আর এক চেহারা। জল জমে চতুর্দিকে পারের পাতা ভূবে বাওয়া মতন কাঁধা হয়েছে। ভূঁয়ে নেমে সেই কাঁধা-জল ছিটকাতে ছিটকাতে গ্লেন চলল। গরুর গাড়ির চেয়ে গ্লেনের যে বেশি অভিজ্ঞতা, এমনি মনে হয় না। সেদিন এখানে এসেছিলাম—তখন খিরাখিরা বৃষ্টি আজ প্রায় বোম। ওভারকোট গ্লেনে রেখে নেমে পড়েছি ঘরে বাথ কি—নানান গাছে ভরা উঠানে ঘুরে ঘুরে বো

পোতাছি সকলে। রেলস্টেশন কাছাকাছি কোথাও, ইন্ডিনের আওরাজ আসছে।

ঘটা সেড়ক পরে বণনা হবার মুখে শোনা গেল, আমাদের প্লেন আগে এসেছে বটে কিন্তু ছাড়বে শিঙেনে। কি কুতান্ধ? না, সেওকে নিয়ে পড়ছে আবার—নামবার সঙ্গে সঙ্গে এত-ডোমের হাসপাতালে নিয়ে পুরেছে। বিছানায় শুইয়ে আলো ফেলে নানান কায়দার পরীক্ষা করছে। পেনিসিলিন কৌড়াফুড়ি করছে মনের স্বখে। ঠরই জন্তে আটকা পড়ে গেলাম আমরা। সেও মশায়ের লজ্জার অবধি নেই। কাতর হয়ে বলছেন, কী বকমারি বলুন তো! এটুকু ব্যাপারে আমাদের দেশে ডাক্তাররা তাকিয়েই ধেঁত না। এত বড় অসুস্থ লাগছে।

প্লেন উড়ল আবার মকো খুণো। মহা-এশিয়ায় ঘোরাঘুরি এত দিনে সারা। বলল, পাঁচ ঘটা লাগবে আবহাওয়া যদি ভাল থাকে। মকোর পথ সেদিন কুয়াসার আচ্ছন্ন ছিল; আজ বোদে হাসছে। বিস্তীর্ণ জঙ্গলদ্বার উপর এসে হোটেল দেখিয়ে দেয়—ভলগা, ভলগা! ক্রমে ক্রমে চলল জাহাজ বেশ বৃকতে পারছি। তারপরে বত এগোষ্ট, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পুরোপুরি কুয়াসার মধ্যে এবার। অনন্ত ক্রমাণ্ড খোঁড়ায় নিশ্চিহ্ন, তার মধ্যে বাহাংসে ভাসছি কটি প্রাণী আমরা। প্লেন বড় হুলাছে। আমরা এ পৃথিবীর বেশির ভাগ খসড়া প্লেনে বসে বসে। যখন কাক্করম থাকে না, ছুটোছুটি নেই, অজ্ঞান অবসরে ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু নাগরদোলায় মতো এমন হুলতে লাগলে লেখা বাবে কেমন করে? এই ভক্ত করে নিচে নামছে, আবার সী করে উঠে বাচ্ছে উপরে—খেলাচ্ছে মাহুরগুলো নিয়ে। দিক্চিহ্ন হীন কুয়াসার উঠাল সমুদ্রে অসত্য মনে হচ্ছে আজ নিজেদের।

### ১৭

মকোর মেট্রোপোল হোটেলে সেই আগের কামরাই দখল করেছে। আজ সকালে তলস্তয়-মিউজিয়াম। সেখান থেকে তারপর তলস্তয়ের বাড়ি। শীত কমে গেছে হঠাৎ, আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে। ঠরা অবাক হয়ে গেছেন—কী অশ্চর্য, অস্ত্র বহুর বরফ পড়ে যে এসময়! দোমাক করে বলি, এবারে পড়বে না, ভালবাসার উষ্ণতা নিয়ে এসেছি আমরা ভারত থেকে। তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে হাবার পর তখন বরফ পড়বে।

বেথানে আছি, শহরের কেন্দ্রদেশ এটা। বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, বিশাল কোয়ার। চচারটে প্রাচীন বাড়িও আছে, যেমন কোয়ারের ওধারে বলসই থিয়েটারের বাড়ি। কিন্তু আগে বৃকতে পারিনি, খুব কাছাকাছি পুরাণো শহরও আছে এই সব বড়-রাষ্টা পিছন করে। সেই আড়ার মধ্যে ঢুকছি। একটা ছোট পুরাণো ধাঁচের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ঘরগুলো ছোট ছোট। প্রতি ঘরের ছাত্ত ভিতর থেকে কতকটা গম্বুজের মতো। তাতে বিচিত্র কাক্করম। ১৮৭০ অব্দে বাড়িটা তৈরি।

চুকেই সকলের আগে ব্রোঞ্জেগড়া তলস্তয়ের আধা-মুর্তি। মূর্তি হয়তো আদর্শই বলা চলে না, তাঁর খানিকটা আদল। কতকগুলো রেখা ছড়িয়ে রয়েছে এবড়োখেবড়া একতাল ধাতুর উপর। শতবার্ষিকী উৎসবের সময় এই বস্তু বানানো হয়েছে, অ্যানিসিমভ

চীনে আমাদের যে উৎসবের নিমন্ত্রণের আশ্বাস দিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব ভাবার তলস্তয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। সংগ্রহে বাংলা বই একখানা মাত্র—আনা কারেনিনা। কিন্তু আমরাই জানা তো বিস্তর অনুবাদ—বিশেষ কাছাকাছি হবে। আধা-বয়স মেয়েটা ঘুরে ঘুরে দেখাছিলেন—তিনি বললেন, আর কেউ তো পাঠান নি কোন বই, পাঠালে আমরা সংগ্রহে বস্তু করে রেখে দেব। ভরসা দিয়ে এলাম, আরি বলব পাঠিয়ে দেবার জন্ত (এক বখারিতী ভুলে গেলাম পরকণ্ঠে)।

বিপ্লবের পরে নতুন আমলে এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। সেনিন বলেছিলেন, তলস্তয় হলেন রুশ-বিপ্লবের মুকুর। স্টালিনও তলস্তয়ের ভক্ত ছিলেন। তাঁদের মূর্তনের মূর্তি পাশের ঘরে। তলস্তয় সবচেয়ে সেনিনের হাতে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু রয়েছে কার্টের ডেসকে। তলস্তয় সম্পর্কে সেনিনের বইয়ের সংগ্রহও আছে।

এক ঘরে তলস্তয়ের ঠাকুরদাও দাদামশায়ের, এবং তাঁর পৈতৃক বাড়ির ছবি। সেই পৈতৃক বাড়ির চিহ্ন নেই, বিক্রি করেছিলেন সেবার্টোপোল গল্পের বই প্রকাশের প্রয়োজনে। তলস্তয়ের বাপ সেনাদলে চুকে নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তলস্তয়ের মার ছবি পাওয়া যায় না—কুমারী বয়সের একটা সিলেট ছবি মাত্র জোগাড় হয়েছে। কতকগুলো পুরানো কৌটা—তাতে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ছবি। কাক্কান-শিখিতালয়ে পড়তেন, তখনকার ছবি। এক অজ্ঞাত সহপাঠী সেই সময়ে তাঁর ছবি এঁকেছিল, সেটা জোগাড় করে রেখেছে। ছোট বয়সে একখানা ক্রুদেশলোয়ার ইস্কুলের পারিতোষিক পেয়েছিলেন; ছাত্র অবস্থায় লিখতেন, নিজের হাতের সেই সব পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপির উপরে ছবিও আঁকতেন আবার; একটা ছোট পত্রিকায় প্রথম যে গল্প বেরিয়েছিল; সাক্ষি-গুড়িয়ে সমস্ত রেখে দিয়েছে।

সিবার্টোপোল-গড়াইয়ের পুর সেটপিসারবার্গে গেলেন তিনি। সাহিত্য-কর্ম শুরু করলেন। নানান জায়গা থেকে অজস্র উৎসাহ পেলেন। যে কাগজগুলো লেখা বেকৃত, তাদের সম্পাদকবর্গের মিলিত ছবি। তলস্তয় দেশ ছেড়ে বেরুলেন, তার পাশপোর্ট।

ফিরে এসে চায়ীনের ইস্কুল বসালেন—সেই ইস্কুলের ছবি। তাদের গদিত শেখাতেন কতকগুলো কার্টের ঘৃটি লোহার তায়ে গাঁথে। এই চায়ীদের উপর কবিতা লিখেছিলেন। শিক্ষা নিয়েও বিস্তর লেখেন এই সময়। সমস্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ককেশাস অঞ্চলে গেলেন, সেখানকার ছবি। তাঁর স্ত্রী সোফিয়ার নয়নাভিরাম এক ছবি। ওয়ার এণ্ড পীস বেথান থেকে লেখা হয়, সেই তল্লাটের ছবি। এ ঘরে আরও বিস্তর ছবি রয়েছে নামজাদা আর্টিষ্টদের আঁকা। -নেপোলিয়ানের আক্রমণের সময়কার—মাহুর দলে দলে মকো ছেড়ে পালাচ্ছে, পাখের ওপরে তাদের বিশপ অবস্থা। উপভাসে অনেক সত্যি মাহুরের নাম দেওয়া হয়েছিল—তাদেরও অনেক ছবি।

পাণ্ডুলিপি দেখতে মজা লাগে—কী কাটাছুটি রে বাবা! আমাদের এই দেখে ছাপাখানার বন্ধুরা বেজার হন, তলস্তয়ের হলে কি করতেন বলুন দিকি আপনারা? ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-উপভাসের রসদ নিজচোখে দেখে সংগ্রহ করবার মানসে একবার ফ্রন্টে চলে গিয়েছিলেন, তার ছবি। এম্বে বিস্তর কাটকুট করতেন, কলশাজকরা পাভার পর পাভা বাতিল করে দিতেন

—সেই সমস্ত কাটা-প্রকের গালা। মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে হিসাবকরন বেরিয়েছিল, সেই মাসিকের সংখ্যাগুলো। আশী বছর বয়সে এক আটটি বছর আঁকা প্রতিভূক্তি। তলস্তয়ের মৃত্যুশয্যা ও মৃত্যুর পথের ছবি। মৃত্যুর পর মুষের যে ছাঁচ তুলে নিয়েছিল। যে সব বন্ধু হামেশাই বাতারা করতেন, তাঁদের সকলের ছবি। যেখানে মারা যান, সেই বাড়ির পুরো মডেল।

চাবিকিছে কুয়াসা, আকাশে মেঘ। কনকনে হাওয়া দিয়েছে, পশমের মোটা জামা ও দেহের ভেল করে হাড়ের মধ্যে কীপুনি ধরে যায়। তা ছাড়া—হাতে সময় কম, ক’টা দিন মস্তকায় থেকে জেনিনগ্রাড সুখো বেরিয়ে পড়ব। তাড়াতাড়ি এর ভিতরে বতকিছু দেখে যাওয়া যায়।

তলস্তয় মিউজিয়াম থেকে তখনই ছুটলাম তলস্তয়ের বাড়ি। পল্লবাস নয়, মস্তো শহরে যে বাড়িটার থাকতেন। কী যত্নে রেখেছে—দেবমন্দিরও লোকে অমন করে রাখে না।

জুতোয় যে পাথর খুলো নিয়ে ঢুকবেন, সে হবে না। এদেশ হলে জুতো খুলতে বলত। ওখানে শীতের দেশ ও সাহেবি পোশাক বলে জুতো খোলা চল না—কাপড়ের জুতো দিয়েচে, আপনায় জুতোর উপরে সেইটা পরে ফিতে এঁটে ঢুকুন। অর্থাৎ জুতোর ময়লা ঐ কাপড়ের জুতোর ভিতরেই থেকে যাচ্ছে।

এক বৃদ্ধা ঘরে ঘরে আমাদের দেখাচ্ছেন। আশী বছরের উপর বয়স—ধবধব চুল, গায়ের রং পরনের কাপড়চোপড় সাদা ধবধবে। পুষ্ট পবিত্র। তাঁকে ধকল দিতে চাইনে—অন্ত লোক যারা আছে, তারা আশুক। তিনি এই বয়সে এগর-ওগর উপর-নিচে করবেন কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে? কিন্তু মানা অনবেন না তিনি। তলস্তয়ের জীবনকাল থেকে আছেন, কত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখা! বিশেষের সমুদ্রগুলোকে দেখিয়ে বুঝিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

হোট ছেলে মারা গিয়েছিল, বাচ্চাও সেই খেলনাগুলো অবধি সাজানো আছে। তলস্তয়ের দু-কোঁটা চোখের জলও জমে আছে নাকি পরিপাটিকপে এই খেলনা সাজানোর মধ্যে?

ভীষণ হাঁটতে পারতেন তলস্তয়। গ্রামের বাড়ি পায়ের হেঁটে চলে যেতেন এখান থেকে। বৃদ্ধা সেকালের সেই ছবিটা দিচ্ছেন—হাঁটবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকু তীরবেগে ছুটতেন তিনি। পোর্কি আসতেন এই বাড়িতে—এসে চূপচাপ কথা শুনতেন ঐ জায়গাটার বসে।

বড় পুরানো বাড়ি, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৮৮২ অব্দে তলস্তয় এখানে এসে উঠলেন। বাড়িটা সেই সময় আগাগোড়া মোহামত হয়। দোতলার ঘরগুলো ছোট ছোট আর বড় নিচু—কোথাল ভেঙে ঘর বড় করলেন, ছাত ভেঙে উঁচু করে তুললেন। খুব সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি—রান্নাঘরের লোক তা বুঝবার জো ছিল না। সকালবেলা জিঠে ঘরবাড়ি সাক করতেন সন্ধ্যাবেলা কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতেন। লেখা-পড়া করতেন বেলা ন’টা থেকে বিকাল চারটা অবধি। সাতটা থেকে বন্ধ-বাঁধবও অল্পবয়সীদের আনাগোনা চলত। লিখবার ঘরে নিচু চেয়ার, দু-পাশে বাতিলান, দোতাল-কলম, যে জুতোজোড়া পরতেন ঘরের মধ্যে। এ সব তো ভালই—রুশকিল ছিল গিরিকি দিয়ে। বড়ঘরের ঘরনী তিনি, আদর্শবাদ ইত্যাদি বেশি আমল

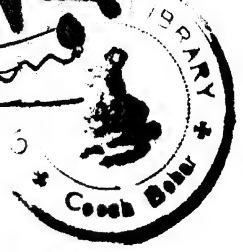
দিতে চাইতেন না। তাঁর ঘর দেখলাম—ঘর দেখেই কর্তা-গিরির মনের বারাক বৃকতে পারা যায়। বড় ছুই ছেলের ঘর দেখছি—কেবোদিনের আলো, খাট-চেয়ার, রকমারি খেলার সরঞ্জাম। শীত আর বসন্ত কালটা তলস্তয় এই বাড়ি থাকতেন। ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে গায়ে চল যেতেন।

১৯০১ অব্দে ছেড়ে যান এই বাড়ি। তারপরে ১৯০১ অব্দে মাত্র দুই বাড়ি থেকে গিয়েছিলেন। বলতেন, মস্তোর লোকে যে কি করে থাকে বৃকতে পারিনে। সেই অশ্রুতিপর বৃদ্ধা বলছেন আমাদের—তাঁর সঙ্গেও তলস্তয়ের কত কথাবার্তা! বলছেন, আর পুরানো স্মৃতিতে কোঁটরগত চোখ দুটো জলজল করে উঠে।

বললেন, আপনারা কিছু লিখে দিয়ে যান—বিশেষ করে আপনি পিলাভিয়েল বখন, তলস্তয়ের স্বগোত্র। বড়ঘরের পর বছর অনেকে লিখে এসেছিলেন। আমি বাংলার লিখলাম। অনেক দুবের তীর্থযাত্রায় এসে বিনত শ্রদ্ধা অঞ্জলি দিচ্ছি—এমনি গোছের কিছু। পাশে ইংরেজি করে দিলাম বাইরের লোকে যাতে বৃকতে পারে।

দিনারের পরে দেখি, ‘আওয়ার’ পাতা হচ্ছে হোটেলের টেলিভিশনে। আওয়ার নিয়ে বিষয় মাতামাতি—অন্ত সমস্ত প্রোগ্রাম বাড়িল করে এই পাতা দেখানো হয়। অনেক লোকে তিন-চার বার দেখেছে (যেমন, আমাদের গোড়াখিলী নীরা) তার পরেও আবার টেলিভিশনে দেখতে চায়। গুটী পাঁচেক বাচ্চা এসে জুটেছে—হোটেলেরই কোন কোন ঘরের তাহা—টেলিভিশন দেখবে কি, আমাদেরই মুখ দেখে দেখে স্থব্ধ হয় না বেন। বড়ও তাকান অমনি,—তাঁরা রেখে ঢেকে শিটাচারসমূহ পছন্দিত্তে। বাচ্চারা অন্ত শত বোঝে না, ক্যালক্যুল করে সোজামুজি থাকিয়ে শুদ্ধর মাহুয দেখে। আঙড়ে হ্যাঁ। বললে বিশ্বাস করবেন না—আমরা অতি-শুদ্ধর এখানকার চোখে। কদম্পর্কে রূপে ছাড়িয়ে গাই। এই এক দেশ, দেহবর্ন নিয়ে যেখানে হেনস্তা নেই। বহু কালারই কদর। তার উপর ভারতীয় হস্তকার্য সোনার সোতাগা হয়েছ। ভারতীয়দের সাত খুন মাপ। বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী বললেন, শাড়ি পরে বেড়ানোর আমাদের বড় সুবিধা—ট্রামে-বাসে পাথ-বাচ্চারে সর্বত্র খাতিব। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ির একটা চেহারা পেলাম জয়া দেবীর মুখে। জারিতসিন গায়ে ওঁদের এক বন্ধু আছে—এক রবিবার গিয়েছিলেন সেখানে। বুড়ি মা, ছেলে, ছেলের বউ আর গোট্টা দুই বাচ্চা। ছেলে আর ছেলের বউ চাকরিবাকরি করে, বাচ্চা দুটো ঠাকুর-মার ভাঙটা। বউ-ছেলে কন্যুনিট—নতুন কালের ধরণ-বারণ তাদের। বুড়ি ওমিকে ছোট এক ঘরে আঁকন রেখেছেন, পূজো-শাক্তা করেন। বজুটি প্রীতি ও প্রেমের হাসি হেসে বলে, মার পুণ্ডের ঘর—আনাচারী আমরা ওমিকে বাবো না। যে-বস্তু এসেদের নব্যদের বাড়িতেও হামেশাই দেখে থাকেন—টেবিলে ঘুরি খেয়ে সেই কাপড়-চোপড়ে মায়ের ঠাকুরঘরে হাঁটেন যেমন আমরা। তাই দেখি, সাধারণ মাহুযের জীবন-যাত্রা মোটামুটি এক—শিক্ষা ও নতুন ব্যবস্থা পরিবর্তনটা কিছু কিপ্র করে, এই মাত্র। বহু লোকই ওদেশে রাজনীতির ঘর ঘরে না—কন্যুনিট সকলকে হতে হবে, তার কোন মানে নেই। [ কলম: ]

# রাজা রাজা



উদয়ভানু

গাওমালায়ণের ঘরে ঘরে মেয়ে হারানোর অন্তত বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। অবিধাত এক ছুঁতানার কথা কানে কানে ভেসে চলেছে কালশৈশবের হাওয়ার মত। কেউ হতাশার শ্বাস ফেলেছে, কেউ টিটকারি কাটছে। কারও মুখে সহানুভূতির করুণ কথা, কারও কণ্ঠে অটহাসি। বিপদের দিনেই নাকি মানুষ চেনা যায়; ধরা যায় কে আসল আর কে নকল। অন্তর কার সালা, কার কালো। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—মাত্র ঐ একটি। চৌধুরী মশাইয়ের গৃহে কান্নার রোল উঠেছে। রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে দিনমানোও যখন মেয়ের সেবা মিললো। না তখন কেউ আর স্থির থাকতে পারে না। বিশেষতঃ চৌধুরীমা যেন কৈদে কৈদে সারা হয়ে গেলেন। ধর্মকথ আর গৃহস্থালী কাজে সঙ্গাঙ্গন মেতে থাকেন চৌধুরীগৃহিণী; সখসাথ বলতে কিছুই তাঁর নেই। তিনিও আজ অপ-তপ তুলে কান্ডতে বসেছেন, শিশুর মত পা ছড়িয়ে। চৌধুরী পালিতজন আর অন্নদাসের এখানে সেখানে ছুটেছে মেয়ের খোঁজে। সিপাই আর পাইকরা ঘোড়া ছুটিয়েছে যেমিকে চোখ যায়। বাগদী লেঠেলরা ছুটেছে দলে দলে। কোমর বেঁধে।

কুল-ছাপানো আমোদদের বালিয়াড়ি ধরে এগিয়ে চলেছিল লেঠেলরা। হাত হাতে শাণানো-অস্ত্র, বলমল করছে ব্রোঞ্ক্রিসে। তীক্ষ্ণধার অস্ত্র গাছ কাটে, মাটিকাটে, মাছুয়ের গলা কাটে—কিন্তু জলের বুক আঘাত করতে পারে না। তাই হয়তো বিজয়ের হাসি হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে আমোদদের বহু-প্রিয় জল। অপেক্ষা নেই, পিছুপানে তাকানো নেই—নদীর গতি যেন বিরামবিহীন। দুই তীরে বৃক্ষমাজি, আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অক্লান্ত দর্শকের মত। শাখাবাহ মেলে কত ডাঁকাডাকি করছে বাতাসনত্র গাছের সারি। এই আতুল আহ্বানেও সাড়া দেয় না আমোদ। দর্শিতা রসিনীর মত হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে যেন। ঘূর্ণাক্ত যেন নর্তকীর বাঘার মতই বৃত্তাকারে ঘূর্ণপাক খায়।

হঠাৎ উল্লাসে টেঁচিয়ে ওঠে লেঠেলরা। অকুল কুল দেখলো যেন। পারাপারহীন অঁধে জলে ভাসতে ভাসতে যেন পারের সমুদ্র বেধা চোখে পড়েছে সহসা।

—জয় মা বন্ধাকালীর জয়।

বহুজনের মিলিত কণ্ঠের সজোর প্রতিধ্বনি ভাসলো আমোদদের তীরে। আকাশমণ্ডল থেকে যেন বাজের শব্দ ভাসলো। ক'জন লেঠেল হাতের অস্ত্র আর লাঠি কেলে দিয়ে একে একে নদীতে ঝাঁপ দিলো সশব্দে। অস্ত্র তীরে একপাল চকাচকী আসর জমিয়েছিল—পাল-পাল মাছুয়ের চাঁকারে উড়ে পালালো জলে জলে।

—জয় মা মনসার জয়।

শক্তির একেক প্রতিমূর্তি; শক্তির উপাসক; পবমানন্দে ডাকছে শক্তির দেবীদের। সম্ভানের দল ডাকছে শক্তিদারিনী মাকে। আকাশের উড়ন্ত কাক-চিল চমকে চমকে উঠছে।

—জয় মা শীতলার জয়।

উদাত্তকণ্ঠ আবার বজ্রপাতের শব্দ তুললো যেন। বালিয়াড়ির ধারে কাছে কশীমনসার ঝাড়। কাঁটাগাছের প্রাকৃতিক বেড়া। হুঁজোড়া হায়না লুকিয়েছিল কশীমনসার ঝোপে। এক জোড়া মর্দা, আর এক জোড়া মাদী। ঠিক মাছুয়ের হাসির মত হা হা ফেসে উঠলো তারা। ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে যেন তাঁদের বেশে ছুটলো চকিতের মধ্যে। গভীর জঙ্গলে মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল সেই অটহাসির স্রব।

বৃকসাঁতের এগিরে চলেছে ক'জন লেঠেল। শ্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। মাঝদরিরায় নৌকাডুবির পর যেন হঠাৎ ভীষণে বেধা দেখতে পেয়েছে।

ঐ যে অগুরে নোডরবিহীন নৌকা ভেসে চলেছে জলের শ্রোতে। আনন্দকুমারীর চিত্রবিচিত্র ও বাহারী পত্রপুটী, চোখে পড়েছে লেঠেলদের। তাই পরিত্রাহি চাঁকার করছে অতিমাত্রা উৎফুল্লতার। শক্তির দেবীদের ডেকে চলেছে একে একে।

মালায়ণের মন্দিরে মন্দিরে আরাধ্যা দেবীরা হয়তো মুচকি হাসে ভক্তদের ব্যর্থ ডাকে। চৌধুরীগৃহ থেকে মল্ল উপচার আজ আজ। পুষ্প, সিন্দূর, বজ্র, মিষ্টান্ন আর প্রণামী আসে। প্রার্থী এই, চৌধুরীকন্ডা যেন বিপদমুক্ত হয়। যেন কিরে আসে ভাল ভালর,—সুস্থ শরীরে, অক্ষত দেহে। পুরোহিতের দল নারায়ণে মাধার তুলসীপত্র চাপার আশায় আশায়।

কিন্তু পত্রপুটী জনশূন্য। নৌকা যদিও ফিললো, নৌকা আরোহীকে মেল না। নৌকার সাজসজ্জা তখনই হয়ে আছে লেঠেলের দল দেখলো, নৌকামধ্যে কারা যেন খণ্ডখণ্ড চালিরয়ে নৌকাগায়ে বন্দুকের বাক্সের কালো লাগ। দম্ভচিহ্ন যেন। সন্ধ্যা মাছুয়ের দল হতাশার ভেঙ্গে পড়ে আবার। বুধাই অম্বশনি নিয়ে তারা। শূন্য পত্রপুটী, আনন্দকুমারী তথ্যে কোথায়! নৌকার গা বাক্সের চিহ্নই বা কেন? কোন্ শব্দের অপকীর্তিতে আহত হ'লো নাগস্বরী পত্রপুটী, কে জানে! চৌধুরীকন্ডা হয়তো আর জীবিত নে

একজন মাঝি, অতি কষ্টে চৌধুরীগৃহে হাতির হয় দিনের পা ফুটে। অব্যর্থ সূত্বার হাত থেকে বেহাই পেয়েছে সে। গা

বেঁচেছে। নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে বর্ষা পেয়েছে। নদীতীরের এক বৃক্ষশীর্ষে উঠে বাত কাটিয়েছে কাঁপতে কাঁপতে।

—মাঠাকুরুণের জয় হোক, আমি তাঁর সাক্ষ্যে চাই।

মাঝি তার আঞ্জি পেশ ক'রলো সদরের জনমাল্লুকে।

—আমাদের মেয়ে গেল কখন? বেঁচে আছে না ম'রে গেছে?

চৌধুরীমশাইয়ের নায়ের আর গমস্তার সোৎসুক প্রশ্ন করেন একে একে। পাইকরা মাঝির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। বলে,— বন্দী থাকো এখন। মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়তো দেখা যাবে তখন। কেউ বললে,—আমাদের হজুরের মেয়েকে তোমরা ভুলধুন ক'রেছো। তাই যদি না হবে তো পাতা মেলে না কেন? যেমন কর তেমনি কল ভোগ কর এখন।

মাঝি বললে কতর সুরে,—আমরা খুন করতে বাঁধা কেন? এমন কথা মুখে আনবেন না আর।

—তবে কার হাতে তুলে দিচ্ছে। তাই তুমি? কে সেই দুইজন?

মাঝি বললে,—মাঠাকুরুণের দেখা পাইতো বলতে পারি সকল কুসৃত। হজুর বধন মাশ্বারপে নাই, তখন হজুরগীকেই বলবো।

নায়ের আর গমস্তার একে অন্তের মুখের দিকে তাকায়। একজন বললেন,—ব্যাটার বত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। সিপাই, স্টার্টার কোমরে দড়ি লাগাও! খামের সঙ্গে বেঁধে রাখো! ব্যাটা খোঁড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়!

চৌকি গিললো মাঝি। চোখে ব্যাথাতুর দৃষ্টি কোটালো। তার কোমরে দড়ি পড়ছে, ভবুও সে কোন রকম আপত্তি জানালো না। বললে,—জান থাকতে বলতে পারবোনি আমি। গোপন কথা কি বললের সমুখে কলো যায়?

—হু'চার বা পড়লেই বাপ বাপ ব'লে বলবি তখন। তাই তোর মুখে আছে দেখছি।

—না মশাই, কোন মতেই বলবোনি। ম'রে বাই যদি তবুও নয়। লম্বা কথাগুলো উড়াই না, তা তো জানেন?

আনন্দকুমারীর পরপুটার একজন মাঝি কিয়দেহ। নায়ের আর গমস্তার বৎপারোনিষ্ঠি অভ্যাসের চালিয়েছে তার 'পরে—অন্ধরে ঢেকে চৌধুরী-মা শুনতে পেয়েছেন দাসীদের মুখে মুখে। চৌধুরী-মা এই আর অন্ধরে থাকতে না পেরে সদরে এসে হাজির হন। মাঝির মত রূপ হয়েছে তাঁর। লাললজ্জা যেন তুলে গেছেন নায়ের দিলে। একজন দাসী সঙ্গে আসে। তার হাতে বাঁশকাটির দাঁড়। চৌধুরীমার সামনে চিক ধ'রলো সে।

মা বললেন,—আমার মেয়ে কোথায়? মাঝির বাঁধন খুলে দাও।

দাসী বললে,—মা বলছেন যে মেয়ে কোথায়? হাতের হাতকড়া কোমরের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক মাঝির।

বুড়াকে যার ভয় নেই, সেই মাঝিও ডুকরে কেঁদে উঠলো হঠাৎ।

তত কাঁদতে বললে,—মেয়েকে হজুরগী ব্লেক ডাকাত ধ'রে নিয়ে গেল। রাতবেলাতে নদীতে সে কি তুলকালাম কাণ্ড। ব্লেক স্তম্ভা গোলাঙলি চালিয়েছিল। আমাদের ক'জন মাঝি বা খেয়ে পড়েছে। আমি পালিয়ে বেঁচেছি।

—কতখপর?

চৌধুরী-মা কম্পিতকণ্ঠে জবাবলেন। কতখবলে কথা বললেন।

মাঝি ইমিকি সিঁকি দেখে বললে,—চক্রকান্ত পণ্ডিত সবই জানেন। তিনিও ছিলেন আমাদের নাওরে।

—চক্রকান্ত পণ্ডিত। আপন মনেই চৌধুরী-মা বললেন,— নৌকার তিনি ছিলেন কেন? কি কারণে?

—তা তো হজুরগী জানি না। সেই পণ্ডিতকে পরে আর দেখি নাই।

চৌধুরী মশাইয়ের দরদারান ইট-চুপের। বাঁধনো উঠান। টালির সিঁড়ি। চুপারের পাখরের মশির-মগুপ। মন্দিরে সারি সারি দেবীমূর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধ গঠিত প্রতিটি মূর্তি। সোনা-জহরতের অলঙ্কারে সাজানো। বেশমের পোষাক।

চৌধুরী-মা একবার মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালেন। অঙ্গশূণ্য ছই চোখে কাতর দৃষ্টি। প্রদীপের আলোর মূর্তিগুলি সজীব দেখায় যেন। চোখে চোখে যেন স্থির চাউনি। চামরের হাওয়ার মূর্তির লাল চৌরী বজ্রাঙ্কল তুলে তুলে উঠছে।

মাঝি বললে,—হজুর এখানে থাকলে একটা বিহিত ক'রতেন। ডাকাতদের ধরাধরি করাতেন। আপনার নায়েরমশাইরা দেখি শুধু বিনা দোষে শাস্তি দিতে পারেন। গাল-মন্দ করতে পারেন। মুখ ছোটাতে পারেন।

চৌধুরী-মা লুটানো আঁচল তুলে সিন্ধু চোখ বুজলেন। বললেন,—দাসী, তোমাদের গমস্তাদের বল' চক্রকান্ত পণ্ডিতের কাছে পাকী পাঠায়ে। তিনি যদি না আসেন আমিই বাবো।

দাসীর মুখ থেকে কথাগুলি শুনে নায়ের-গমস্তার একে একে স্থানভাগ করে।

চৌধুরী-মা আবার কথা বললেন,—দাসী, মাঝিকে সদরে অপেক্ষা করতে বল'। মাঝিকে যেন বকশিশ দেওয়া হয় সদর থেকে। আমি অন্যর থেকে চিড়ে-মুড়ি পাঠাই, মাঝিকে খেতে দেওয়া হোক। গমনোজ্ঞত নায়েরবদের উদ্দেশে পুনরুক্তি করে দাসী। মাঝি ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রশ্রয় করে ভক্তিরে। বলে,—তোমার মেয়ে আগে আশ্রন, তখন বকশিশ বত পায়ে দিও।

চৌধুরী-মার কানে যায় না মাঝির আবেদন। তিনি নীরব পায়ে অন্ধরের দিকে ফিরে চ'লেছেন চোখে আঁচল চেপে। অনেক ভেবেছেন চৌধুরী-মা, কিন্তু ভেবে যেন কোন ফলকিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না। চৌধুরী-মা অন্ধরে থাকেন পক্ষীর আড়ালে, বহির্জগতের কিছুই তিনি জানেন না। জানতে পারেন না।

দাসী বললে,—কি হবে ঠাকরুণ? আর কি খুঁজে ফিলবে আমাদের মেয়েকে? হজুরও এই দুঃসময়ে নেই এখানে।

—আমার গোড়াকপাল।

চৌধুরী-মা কান্নার সুরে বললেন। আবার চোখ বুজলেন আঁচলে।

—মেয়েকে পাওয়া গেলেও তোমাদের সমাজ কি ভাবে ঠাই দেবে? কেমন যেন ভয়াবহ সুরে কথা বললে দাসী। ভয়ে ভয়ে বললে যেন।

চৌধুরী-মার চোখ থেকে দরদরের অশ্রুপাত হয়। তিনি চোখে আঁচল চেপে বললেন,—আর ব'ল না, আর শুনিও না এই সব কথা। আমি জানতে চাই না, শুনতে চাই না। খানিক খেয়ে আমার বললেন,—আমার সোনার মেয়েকে যদি ফিরে পাই, তাই যথেষ্ট।

সমাজের তরুণ আমি করি না। যদি না পাইতো ক্রোধের বাঁপ সেবো আমি। আর বেঁচে থাকবো না। আমার সব সাধ-আজ্ঞার ভূঁতে গেছে। মেয়ে কত কষ্টে আছে কে জানে। বেঁচে আছে না ম'রে গেছে তাই বা কে বলতে পারে!

হাল জন কহাহারে পাখী ব'রে নিয়ে যায়। চৌধুরীর গৃহ থেকে বেরিয়ে রাস্তার নামে রূপার পাতে-মোড়া পাখী। বারো জন বাহক, যেন হাওয়ার উড়িয়ে নিয়ে যায় শূন্য পাখী।

বেসিকে চোখ পড়ে, সেখা বার শুধু জল আর জল। গৈরিকবর্ণা ভাগীরথী।

ম্যানেটের বজরা আমোদর ছেড়ে গঙ্গার পড়েছে। হাল টেনে টেনে কারিল হয়েছে মাঝরা। তবুও কলসের তরে খামে না তারা। বৈতরণীর হাতী যেন, স্বর্গে না পৌঁছে খামে না হয়তো। হাল টিনার কাঁচ-কাঁচ শব্দ শোনা যায় শুধু। বৈশাখের বেলা, মাঝরা ঘামছে তাই। বজরার মাংসলে মাছ-রাঙা পাখী উড়ে এসে বসেছে।

ম্যানেট কাগজ-কলম টেনে নিয়ে কি করছে কে জানে। এককথার দেখে চৌধুরীকে। সাগরে লক্ষ্য করছে যেন। বিস্তীর্ণ জলরাশিতে চোখ রেখে আনন্দকুমারী বসে আছে চূর্ণচাপ। প্রতিবাদ, বাগানন্দ, ভাণ্ডি—কিছুতেই যখন কিছু বল হয়নি, তখন চৌধুরী নীরবতা অবলম্বন করেছে। গাভীরো যেন মুক হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তো দেখছেই। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু অশ্রু জল।

ছবি আঁকছে ম্যানেট। তার মানসপ্রতিমার মূর্তি আঁকছে অন্তরের দরলে। বিবস গণিতের কারবারী ম্যানেট, শিল্পচর্চা করছে আপন প্রেরণায়। বিবসমানা প্রেরণার ছবি আঁকছে অতি সন্তপণে। আনন্দকুমারীর সকল শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে বান-প্রতিবাদের বন্দুকে। উত্তপ্ত ও অলস অঙ্গার যেন হিম হয়ে গেছে সহসা!

ম্যানেটের নীলাভ চোখে শিল্পীর দৃষ্টি ফুটেছে। অর্জুন যেমন মন্তকস্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি, ম্যানেটের চোখে তেমনি কেবল আনন্দকুমারীর আয়তআঁখি। চোখ আঁকছে ম্যানেট; চক্কলান করছে অতি সাবধানে। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছে যেন থেকে থেকে। মানসীকে যদি হারিয়ে ফেলে কখনও, তাই তুলট কাগজের বুক এঁকে রাখছে তার অনিন্দ্য আকৃতি।

চৌধুরী হঠাৎ আঁড়ড়ে পড়লো ম্যানেটের পায়ে। হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কীলতে কীলতে বললে,—আমাকে মুক্তি দাও সায়েব! আমার জন্তে কত কষ্ট পাবেন আমার মা! হয়তো আর বাঁচবেন না। তোমার পায়ে ধ'রছি আমি।

কাগজ-কলম পাশে রেখে দেয় ম্যানেট। শুক হাসি হাসে। বলে,—ভালি, মাই বিলাভেড, আই উইল নট লেট ইউ গো।

কথা বলতে বলতে ম্যানেট হুই বাছর আলিঙ্গনে চৌধুরীকে বক্ষে টেনে নেয়। বুক চেপে ধরে। আনন্দকুমারীর মুখে আর চোখে চুন্ন খায় ঘন ঘন।

চৌধুরী সজল চোখে বললে,—তোমার দেশা কেটে গেলেই তো আমাকে ত্যাগ করে বাবে, তখন আমার কি হবে? ক'লখবে আমাকে? কোথায় বাবা আমি?

—আই উইল ব্যারী ইউ। আমি তোমাকে সচি করবো।

—নাথি করবে! চোখ বড় করে আনন্দকুমারী। বলে,—

আমার সাধি যে হয়ে গেছে? তবে?

—হুদরা সাধি হোবে তোমার। খুশীর হাসি হেসে কথা বলে ম্যানেট। তার বাহুপাশ আরও ঘন দৃঢ় হয়। বলে,—হোয়াই তু ইউ ওয়রী? বাবডাও কেন টুটি?

কেমন যেন হতাশ চোখে তারার চৌধুরী। অনন্তোপায়ের মত কি বলতে যায়, কিন্তু বলতে পাবে না। হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে ওঠে। তার জলভরা চোখ বন্ধ করে। ম্যানেটের বুক মুখ রেখে কীদে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে।

চোখ মেলে তাকায় না চৌধুরী। বলে,—আমি একটু জল খাবো। বড় তৃষ্ণা আমার। বুক শুকিয়ে যায়।

সহজস্বরের কথা শুনে খুশীর তত্ব থাকে না ম্যানেটের। মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। হাসিমুখে বললে,—পানি পিয়েবী?

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় আনন্দকুমারী। তৃষ্ণার কাতর যেন সে। ভয় আর উত্তেজনায় তার কণ্ঠ শুক হয়ে গেছে। মুখ থেকে যেন কথা স'রছে না। এক অব্যক্ত কঠোর বাধা ধ'রেছে বুক। ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছে। চোখে আর মুখে যেন স্নানি ফুটেছে।

কাগজ আর কলম সরিয়ে রেখে উঠে পড়লো ম্যানেট। হাসি ফুটেছে মুখে! চৌধুরীর চোখে পড়লো কাগজের ছবি। দেখে দেখে বুঝলো যে তারই প্রতিচ্ছবি—কত বন্ধে এঁকে চলেছে স্নেহ ডাকাত। ঠিক যেমনকার তেমনি। দেখে যেন বিম্বিত হয় আনন্দকুমারী। একদৃষ্টে দেখে তার নিজের ছবি।

বজরার জানলা থেকে বুক পড়েছে ম্যানেট। হাতে তার জলের পাত্র। নদীর জল তুলছে পাত্র জলে ডুবিয়ে। খুশী হাসি হাসছে থেকে থেকে। জলপূর্ণ পাত্র ধ'রলো সহযাত্রীর সামনে। যেন পুষ্পাণু ধরছে এক দেবীপ্রতিমার সন্মুখে। পাত্র ভস্কিরে।

পাত্র হাতে ধরে চৌধুরী। খানিক পান করে। এক আঁকল জল মুখে আর চোখে ছিটিয়ে নেয়। মুখে কাঁলামা। চোখে একটা ঘমের জড়তা। আদমাদী ঢাকাই শাড়ীর আঁচল চেপে চেপে মুখখা মুছলো ধীরে ধীরে। তারপর বললে,—কোথায় আমাকে নিয়ে চল সায়েব?

ম্যানেট বাজলা ভাষা বাঁধে না। হিন্দুস্থানী আর উর্দু ভাষা বোঝে ঝসামাস্ত। জিজ্ঞাস্ত চোখে চেয়ে বইলো সে। ক'জন হা হেসে উঠলো হঠাৎ, হয়তো সাহেবের দুরবস্থা দেখে।

চৌধুরী আবার বললে,—কোথায় যেতে হবে সায়েব বমপুর্বাতে?

ম্যানেট সন্মুখের তাকিয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছু বলতে প' না। দেশী কথা দুর্বোধ্য ঠেকে তার কানে। বলে,—মাই ডা মাই বিলাভেড!

—তোমার মুখে আন্তন লাগে না কেন! মর'না কেন তুমি চৌধুরী যেন নিরুপায়ের মত কটকথা বলে। মাঝরা জ' হেসে উঠলো তার কথা শুনে। ম্যানেট অবাক চোখে দেখে আ কুমারীকে। দিনের আলোয় তার আসল রূপ যেন দেখতে পে ম্যানেট। যেমন লেগেঠান, তেমনি অপরূক মুখশোভা। কাগজ

চোখ দুটিতে কি গভীর দুঃখ ! কালো পশমের মত রাশি রাশি চুল মাথায় ।

চৌধুরাণী আবার বললে,—একখানা শাড়ী দাও, বাসি কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি । সঙ্গে এনেছো, ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছো, খেতে-পড়তে দাও ।

বজ্রবর মাঝিরের মধ্যে সর্দার মাঝি এগিয়ে আসে । ম্যানেটের কানে কানে কথা বলে । চৌধুরাণীর অবোধ্য কথাগুলি হয়তো বুঝিয়ে দিয়ে যায় ।

কেমন বেনে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে ম্যানেট । মাঝিকে বা বলে তার সান্ন্যাস এই যে,—বজ্রা তীরে লাগাও, আমি সব কিছুই ব্যবস্থা করছি ।

বজ্রবর গতি কিরলো । সোজা চলেছিল, আড়াআড়ি চললো এখন ।

চোখে দূরবীণ তুললো ম্যানেট । নদীর তীরে চোখ রাখলো । দেখলো কি বেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে । তারপর হঠাৎ সোল্লাসে চোঁচিয়ে উঠলো আপন মনে ।

গজাননীর তীরে হয়তো মাঘবের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছে ম্যানেট । বসতি আর ঘরবাড়ী দেখতে পেয়েছে । হাট-বাজার

দেখতে পেয়েছে । দূরবীণে দেখা যায়, পাছের ছাতার ছাতায় বাজার বসেছে । বাজারে মাঘবের ভীড় । বিকিকিনি চলছে ।

—বাজার !

ম্যানেট চোঁচিয়ে কথা বললে, বেন নিজেকে শোনাতেই ।

মাঝির দলও চাংকার করলো সান্ন্যাসে । বজ্রবর হাল টেনে টেনে তায়ও লাঠ হারে আছে । আর বেন পারে না এই গুরুতর বজ্রবর ভার টানতে । এক নাগাড়ে ।

মাঘবের কলরোল কানে আসে । কাকের কা কা শোনা যায় । দূর নিকটে আসে, তীরের কাছাকাছি তরী এগোয় । হাল চলছে না আর ডাকার কাছে । হুঁজন মাঝি লাফিয়ে জলে নামলো । বজ্রবর দড়ি ধরে টানতে টানতে তীরের দিকে চ'ললো ।

চাঁকার ধলি হাতে নিয়ে ম্যানেট তীরে নামলো এক লাফে । একজন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তীর ধরে এগিয়ে চললো দ্রুত পারে । অন্য মাঝিরের চোখের ইশারায় সজাগ থাকতে বসে গেল । বাঁচা থেকে পাখী না উড়ে পালিয়ে যায় ! হাতের শিকার বেন না কসকে যায় ।

—দাহেব বহৎ আচ্ছা আমনী আছে বিবিজান !

[ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

## মাণিক মনোময় : ১৯১০-১৯৫৬

বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ এক ॥

একই বৎসরে জন্ম হুঁজনের  
ছিল না অভিল্যাব ভজন-পূজনের  
গভীর আকুলতা  
ছিল যে কত ব্যথা  
ছিল না অবসর কোকিল-কুজনের ।

পান্তে পদাবলী দুখের দীপাবলী  
ষেসেছি একা-একা নিবিড় তমসায় ।  
গন্তে তুমি প্রিয়  
কামনা কমনীয়  
রচনা ক'রে গেছো অজ্ঞ-বরবায় ।

নীরবে ঘরণের দরোজা খুলে রেখে  
আর্ত বন্ধুকে জানি হে গেছো ডেকে,  
স্নাত্ত সেহ-মন  
কাঁপে যে সারাক্ষণ  
সহসা এ জীবন আঁধারে বাবো ঢেকে ।

॥ দুই ॥

তোমার রচনাকে বিশাল উত্তাল অন্ধ ঢেউ জেবে  
ভীত হুসেহ রাত্রি মহিত ব্যথার অনলস  
একক মন দিয়ে দেখেছি বিমিত :

হে স্বপ্ন গিরিচূড়

তুবারমৌলী !

কুহেলি আবরণে স্তিমিত গভীর,  
অঙ্গ প্রেচ্ছলে প্রেচ্ছা মেধা যায় তীর বংকার  
রক্ত ঘাম-বরা সে তুমি বেননার নিখুম হাহাকার  
স্তব্ধ জনতার  
শপথ ক্ষুণ্ণতার ।

তোমার রচনাকে মুক্ত বৈশাখে শান্ত ফাল্গুনে

চৈত্রে বাউলের নাচের তাল শুনে,

পলাশে কিম্বদন্ত

প্রতিটি দিন বুকে

ছন্দে গেঁথে বাই তারার মশিহার ;

খুঁজেছি অবসান আর্ত কলগনি স্রাস্তি-তমসার ।

তোমার রচনাকে তাইতো ভালোবেসে

কালের কোল ঘেঁবে

ঘূরেছি দেশে-দেশে

সহরে জনপদে দেখেছি মনোময় রাখো নি কোনো ভয় ।

বিজনে বসে থাকো

রূপালী চাঁদে থাকো

পাহাড়ের হিম ঢাকা দিলে কী পরিচয় ।

তোমার রচনাকে খুঁস সন্নিহিতকে দেখেছি মনোময় ।



# জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

কলকাতায় এলেন রামেন্দ্রসুন্দর আত্মীয়-স্বজন আর সব জগিন্দ্রেরকে নিয়ে। এসেই হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ হলো। ত'-টার দিন ভাল থাকার পর আবার রোগের বৃদ্ধি। বৃষবাসু উপায় নেই তাঁকে দেখে কিছুই। সর্বদা গল্পে গুলজার ক'রে রেখেছেন তাঁর ঘর। যেন কিছুই হয়নি। এত বড় বিরাট যুতের প্রদীপ যে নিবতে চ'লেছে, মনেও হয়নি সে কথা কারও।

দুর্গাদাস বাবু এসে বললেন—বাবুশাল আপনার হোমিওপ্যাথি যে কিছুই ক'রতে পারলো না, এখানে একজন এ্যালোপ্যাথকে ডাকাবো?

চারি দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তার পর স্বভাবসিদ্ধ গাভীরোব সঙ্গে মৃত হাসি চেঁসে ব'ললেন—ভাই, মৃত্যু-রোগের কী চিকিৎসা আছে ব'লতে চাও? নিয়তিরই ধর্য্য হয়।

চমকে উঠে দুর্গাদাস বাবু বললেন—কে বললে আপনার মৃত্যুরোগ?

হেসে বললেন—আমাকে সাহস দিতে হবে না ভাই, সবই বুঝি আমি।

স্বরেশচন্দ্র সর্গাদিকারী—তখনকার দিনের একজন নামকরা চিকিৎসক—অনেকরূপ দেখে রামেন্দ্র বাবুকে ব'ললেন—এ কটন যে গ—ব্রাউটস ডিজিজ।

দুর্গাদাস বাবু শুনে মর্মান্বিত হলেন। জানান এ রোগে কারও নিস্তার নাই। ভাবলেন দাদা ঠিকই বলেছেন—এই রোগেই তাঁর মৃত্যু।

ডাক্তার বাবু এসেই দাস্ত ও প্রগ্রাব প্রচুর পরিমাণে করালেন। তখন অনেকটা সুস্থ রামেন্দ্র বাবু। চলতে লাগলো আবার সেই অক্লান্ত পুণ্যতন দিনের শ্রোত অবাধত গতিতে।

দেখো, আমার প্রথম প্রথম জানবার খুব আগ্রহ ছিল। জিজ্ঞেস ক'রতাম মাষ্টারদেরকে, নিজের মাকে; তাঁরা উত্তর দিতে পারতেন না। তখন গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রতাম বাবাকে। তিনি ব'লতেন—ডালো ক'রে পড়ো, নিজেই বুঝতে পারবে সব।

কী জিজ্ঞেস ক'রতেন বাবু দাদা?

গাছের পাতার রঙ সবজি কেন হয়? এমনি ধারা নানা প্রশ্ন।

জানো, আর একটা হাসির কথা বলি—কতো সময়সী ছেলে এসে বলতো—লল, গিয়ে জালি বাগানে খেলা ক'রে আসি। আমি বলতাম, ওখানে বাবো কেন? তখন বন্ধুরা বলতো—ওখানে না গেলে লুকান কোন কাজ ত হবে না। আমি বলতাম—বাবা অতো দূর যেতে যে নিষেধ ক'রেছেন। তা ছাড়া লুকিয়ে কোন কাজ করতে পলে যে পাপ হয়। আমি পারবো না ভাই তোমাদের সঙ্গে যেতে। কী বাগ তখন তাদের। তড়ি দিয়ে তারা বলতো—হুই একের নখেরে ইলারাম। যা—আমাদের সঙ্গে খেলতে আসতে হবে না তোকে, গোপনে কাজ করার নাম পাপ। কে এ বৃদ্ধি দিলে তোকে ইলারাম?

জগিন্দ্রা ব'লতেন—কারা বাবুদাদা, এ সব বন্ধু আপনার বলতেই হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন—ছাড়বিই না বখন শোন—আমার ছোট মামা, অল্পস চৌধুরী, অল্পস পণ্ডিত মশায়ের ভাই শশী, এই সব। আর একটা কথা শুনেছিস হয়তো, তোরদের ভাজের নিশ্চয় মনে আছে,—জিজ্ঞেস কর দেখি। কত সময় অল্পস চৌধুরী রাতে আমার শোবার বিছানায় শুতে থাকতো গুটি গুটি মেয়ে আমি ত'রে। কখনো বা তোরদের ভাজ ডাকতো আমি মনে ক'রে চৌধুরীকে। সে কি হাসি সময়সীদের! সে হাসি আর থাকে না।

আমিও কোন লজ্জা নাই, তোরের কাছে বলতে। আমি কখনো যৌন আনন্দ ক'রতে পাইনি তোরের ভাজের সাথে। জিজ্ঞেস কর না তোরের ভাজকে। একা শুতেই পেতাম না। একজন না একজন পাতারা দিয়েই আছেন। যা না হয় ছোট মা, না হয় চুপি মা—মানে কর্তা যা। খিও কেউ না কেউ এক জন থাকবেই। একা আমি স্ত্রীর গারে হাত দিয়ে শুতে পেতাম না। অনেক রাতে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি গারে হাত দিয়ে চ'লে যেতাম বাইরে। কথা হতো আমাদের পায়খানার ছাদে হুঁজনার। আজকালকার বোমরা এ শাসন মানতে কী? ছাদে দাঁড়িয়ে কেবল কথা কইতে আরম্ভ ক'রেচে, এমন সময় আমার চুপি মা ডাক দিতেন—ও পদ্ম বো—ঐ তাকো, বাম তোমার বৌমাকে ডেকে নিয়ে গেল। শুনে কি আর থাকা যায় সেখানে। আসতে হ'তো ভয়ে ভয়ে লজ্জায় মাথা নামিয়ে। কখন কখন তোরের ভাজকে ব'লতাম—তুতিন শো টাকা মাইনে কী আর হবে না? চলো আমরা এখান থেকে বাই। তখন দেখতাম তোরের ভাজ খুদী হ'য়ে আবার ম্লান হ'য়ে বলতেন—ত'লে ত ডালই হয়, কিন্তু ছোট স্বপ্নর কী ভাববেন! আমার বাবারও যে মাথা কাটা যাবে। তিনি যে তোমার উপর খুব ভরসা রাখেন। আমার দিকে একটু চেয়ে প্রশ্ন করতেন—কী গো, তুমি আমার মন নিচ্ছ, না মন থেকে বলচো? ঠিক করে ব'লো। আমি তখন বলতাম—তোমার কী মনে হয়? উত্তরে বলতেন তোরের ভাজ—আমার এক বরস হ'লো, তোমার মন শোলাম না। আমার হাসি দেখে বুঝতেন—কিছুই বলবো না আর।

তখন ভগিনীরা পেয়ে ব'সতেন রামেন্দ্রসুন্দরকে, জিজ্ঞেস করেন—আপনাকে ব'লতে হবে বাবু দাদা, আপনার কী ভাজকে নিয়ে বাবার মত হ'তো?

হেসে ব'ললেন—আমিও মায়ুষ, রক্ত মাংসের শরীর আমার। ছেলে আসতে চাইতো আমার কোলে আমাক দেখলেই; আমি নিতে পারতাম না লজ্জার, দমন করতে হতো আগ্রহ। বাবা-মা কেউ দেখতে পাবেন এই আশঙ্কার। তার পর সেই ছেলে যখন এক বছরের হয়ে মারা গেল, তখন কী দুঃখ আমার, তাকে একটি দিনের ভক্তও নিতে পারিনি ব'লে। শুবে আমাদের আশ্রয়ের শিকা ছিল, ওরজনকে ভক্তি করা, সমীহ করা। নিজের ছেলেকে নেওয়া পাপ বলে মনে করতাম, নিজের স্ত্রীস কাছ

মিনে বাগ্যস্ত একটা মহাপাণ ব'লেই বিবেচনা করতাম। আমাদের হুঁজুনের কথাবার্তা বসায় যেন পাণ! গুরুজনদের চোখে প'ড়লে লজ্জায় মুখ চাওয়া যেত না। মনে হতো মহাপাণ করে বসেচি।

মধ্যম বাবু এসে পড়ায় সে দিনের মিটি ভঙ্গ হ'লো।

রামেন্দ্র বাবু বললেন—দেখ দুর্গাদাস, তুমি এসেই এরা ভয় পায় কেন বল তো? কাগজ কলমেব সঙ্গে সখ্যক নাই এখন আমার; একটা কাক ত কিছু চাই। না হ'লে বে ইফিয়ে মারা যেতে হবে।

আমি ত কিছু বলি না বাবু দাদা! জিজ্ঞেস করুন ওঁদেরকেই, মিথ্যা গুঁরা ভয় পান কেন জানি না।

কল্যাণটার বড় বড় সব ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে যায়। ওষুধ খান না কারও রামেন্দ্রস্বন্দর। সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধই চলে। ডাক্তারও মনের মত সেই ক্ষেত্র বাবুই। ডাক্তাররা আসেন, দেখেন কিছু 'ভিকিট' নেন না কেউ কোন দিন। গুঁরা বলেন—আমরা এত বড় মানুষের কিছু ক'রতে পারবো, সে ভয়গাত রাখি না। না এ'স পানি না তাই আসতে হয়।

এতো অসুখ রামেন্দ্র বাবুর! অথচ বোঝবার উপায় নাই। বীর, শান্ত মানুষ, সকল সময়েই সেই হাসিমুখী। যেন কিছুই হয় নি। জাতীয়স্বজনের নিয়ে রাত দিন আপনায় কথাতেই মগন! এতো বড় কঠিন রোগ! একদিনও কেউ হতাশার কিছু দেখতে পান নি।

এবার আবার নতুন উপসর্গ, হিজ্জা দেখা গেল! তার শব্দে জাতীয়স্বজন সব জেবে কুল পান না। তখনো রামেন্দ্র বাবু বলেন হাসিমুখে—তোমাদের বোধ হয় শব্দ হ'চ্ছে আমার হিজ্জার শব্দ শুনে? কিন্তু আমার ত কিছুই হয় না। এ না হ'লে হয়তো একজন আমি নৈতিয়ে প'ড়তাম।

হুঁমিন বাগ্যস্তর পর অন্তরেব বেগ ক্রমশঃ বেড়ে গেল। তখন মানুষ কেউ কাছে না থাকলে যন্ত্রণার অস্থির হ'য়ে প'ড়তেন। নিজের জাতীয়স্বজন কেউ নিকটে এলে কিন্তু বেশ শান্ত। আমার মা গৌরী দেবী জিজ্ঞেস ক'রতেন—আপনি অস্থির হ'য়েছিলেন এতক্ষণ!

—না ভাই! পাঁচ জন আরা-উহ ক'রবার লোক থাকলে এই রকম ছেলোমায়বী ক'রবার ইচ্ছা হয়। তোরা কাছে এসেচিস, আর কোন রোগ নাই।

আপনি বোধ হয় আমাদের দেখলে লজ্জায় চুপ ক'রে থাকেন বাবু দাদা।

না ভাই, পাঁচ জন আরা-উহ ক'রবার লোক কাছে থাকলে আমি বেশ ভাল থাকি। তোমাদের দেখলে সব রোগের কথা আমি ভুলে যাই।

দুই-এক দিন পরের কথা। রামেন্দ্রস্বন্দর আর নিজেকে সাবরণ ক'রতে পারলেন না, রোগের যন্ত্রণা তখন অসহনীয় হয়ে পড়ছে। যন্ত্রণার অস্থির হয়ে অত বড় ধীর স্থির মানুষও কীভাবে থাকেন, আর মুখে বলেন, আমার মা বেঁচে থাকতে করুন এমন যন্ত্রণা আমাকে কল্পে কল্পে হয়নি। তিনি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই আমার সব রোগ-যন্ত্রণার উপশম হ'তো। হায়! হায়! আজ আমার সেই মা নেই! ছেলের এত যন্ত্রণা তিনি কখনই দেখতে পারতেন না। সব যন্ত্রণা তাঁর হাতের স্পর্শ পেলেই কোন দিকে চলে যেত। সেদিনও আমার মা ছিলেন। আজ আমি একবারে

একটা বিগট মহাকীহ যেন প্রবল ঝটিকার ভেঙে প'ড়ছে। জাতীয় স্বজন সকলেই বড় বাবুর যন্ত্রণার আতঁনাস শুনে এসে হাজির! কেউ চোখের জল মুছিয়ে দেন, কেউ মাথায় বাতাস দেন। ঘরভর্তি লোক দেখে রামেন্দ্র বাবু নিজেকে সাবরণ ক'রে নিয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'সলেন। যেন কিছুই হয় নি।

বাবু দাদা, এখন কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলেন দুর্গাদাস বাবু বেশ ভাল তো! আমার ত এমন কিছুই হয় নি।

তবে আপনি কীদৃষ্টিসেন কেন বাবু দাদা?

অসুখ-বিস্ময় হ'লে ছেলেরা বাচনা করে না; মায়ের কাছে থাকে মনে প'ড়ে গেল আমার, মনে হ'লো মা যেন কাছে এসে ব'সেচেন। তাই বারনা ক'রছিলাম মায়ের সাথে।

আবার সেই আগেকার দিনের হাসি। বেশ শুষ্ক মানুষের মত ব'লতে লাগলেন—১৩০৪ সালের ডুমিকম্প যখন জেমে রাজবাটা নতুন দালান ভেঙে পড়ে, সেই ভাঙা ইট-কাঁচের ভূপ থেকে অনেক পুরোনো কাগজপত্র পেয়েছিলাম। বাতাবাড়ীর ব্যত্রে পুঙ্ক আগেকার সকলের বেশ ধারাবাহিক একখানা ইতিহাস, আর অনেক দলিলপত্র যা সব পেয়েছিলাম। সেগুলো আমাকে অনেক কি লিখতে সাহায্য ক'রেছিল। যা আমি লিখেছিলাম, তোমরা সব প'ড়েছো। এই দেখ কেমন স্মরণ লেখা একশো বছর আগের। এ কালিও দেখো। মনে হ'চ্ছে ঠিক যেন আজকের লেখা।

কী আছে বাবু দাদা এতে?

হাসতে হাসতে বললেন—ঠাকুরনের কথা, এই পর্যন্ত জেতে রেখো। কালি, কাগজ, লেখা দেখতে ব'লছে একশো বছর আগের অনেক কিছু।

বিছানার শুয়ে ছটকট করেন যন্ত্রণায়। ঘুম আসে না তাঁর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে ঘুম নাই। কী অসহ্য যন্ত্রণা।

দুর্গাদাস বাবু ডেকে আনলেন হাইকোর্টের উকিল যতলা কাঞ্জিলালকে। দুর্গাদাস বাবুর সাপাঠী ছিলেন তিনি। এসে ব'সলেন দ্বিবেদী মশ'য়ের মাথার কাছে। হাত বুলিয়ে দিয়ে লাগলেন তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে। ঘুমিয়ে প'ড়লেন রামেন্দ্র বাবু।

বেরিয়ে গেলেন কাঞ্জিলাল রোগীর ঘর থেকে। বাগ্যস্ত কিছুক পরেই আবার ঘুম ভেঙে গেল। আবার সেই যাতনা, সেই ছটকটানি ডাক্তারেন কাঞ্জিলালকে। তিনি এসে হাত বুলাতেই সব যেন সে যায়, ঘুম আসে। তিনি চলে গেলেই আবার সেই। কাঞ্জিলাল আবার যখন এলেন, তখন রামেন্দ্র বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি টেটে এনে বললেন—এখন আপনাকে হাইকোর্টের কাজ ছেড়ে আমা কাছে ব'সে থাকতে হয় দেখছি।

উকিল বাবু বললেন—সে তো আমার ভাগ্য! আপনায় কী ক'রতে পারলে গুড মনে করবো নিজেকে।

দুই-এক দিন পরের কথা।

ছোট জামাতা শীতল বাবু—হাজী মশাহর জেলার কারবা গ্রামে এসে উপস্থিত হ'লেন খুতবের দর্যাপার্থে। কিছুকণ ব'সে থেকে প্রায় ক'রলেন—বাবা, একজন লোককে দেখলাম, মহম্মেদের তলা ঝাড়িয়ে ব'য়েছেন। হাজার হাজার বললেও ঠিক হবে না; লালক লোক ব'লেই ঠিক হয়। এক জায়গায় এত লোক জীয়ে

দেখিনি। বহুতা করছেন জনতার সামনে। নীরবে গুনছে সবাই।  
কী যে তাঁর আকর্ষণ বলার! নাম শুনেচি গান্ধী।

নাম শুনেই রামেন্দ্রসুন্দরের হুঁ চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।  
সেই মাহুশটিও উদ্দেশ্যে মাথায় হাত ঠেকালেন নমস্কারের ভঙ্গিতে।

বিম্বিত নীতল বাবু জিজ্ঞাস করলেন—কে বাবা ও মাহুশটি?

ভাবগভীর কণ্ঠে বললেন রামেন্দ্রসুন্দর—ভারতের মুক্তিদাতা  
এবার এসেছেন।

কী ক'বে বুঝলেন বাবা?

ওঁর অন্তরে যে অহিংসা! ওঁর অহিংসার ভারতের ভাবগাথা!  
প্রবৃত্ত সাধু যে উনি! সকল মাহুশকে দেখেন প্রেমের চোখ দিয়ে!  
আমি যা চাইছিলাম এতকাল, তিনি যে আমার সেই ভীরনের স্বপ্নের  
সাধু! আর আমার কোনো দুঃখ নাই। বুঝতে পেরেছি ভারতের  
মুক্তি আসন্ন।

এত কথা গান্ধী সহজে আপনি জানলেন কি ক'রে বাবা?

অতি কষ্টে এসে বললেন—একদিন যুদ্ধ ক'রে এলেন উনি  
ইংল্যান্ডের সাথে আফ্রিকায়। সকল মাহুশের মুক্তিই তাঁর কাম্য।  
কী অশ্রুনি ওঁর আশ্রয়ভাগ, ব্রহ্মচর্যা সাধন! অপূর্ণ—অপূর্ণ তাঁর  
আত্মদাস্য। এই ভারতের এক আদর্শ মহামানব গান্ধী! তিনি  
এসেছেন এবার ভারতকে পরাধীনতার গ্রামি থেকে মুক্ত করতে।  
এবার আমার ভারতের মুক্তি আসন্ন নিশ্চিত। তাঁর কথা বলতে  
বলতে হু চোখ জলে পূর্ণ হ'য়ে যায় আর বার বার হাত তোলেন  
মাথায় আচাধ্যকের।

মনে হ'লো যেন এক অপূর্ণ স্বপ্নের আবেশে বিভোর  
রামেন্দ্রসুন্দর! সে স্বপ্ন তাঁর চিরজীবনের কামনার স্বপ্ন, ভারতের  
মুক্তিবিধাতাকে প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন।

সকালের দিকে একটু ভাল থাকেন রামেন্দ্রসুন্দর। একটু বেলা  
হ'তেই অবসাদ এসে দ্বিগে ফেলতো তাঁকে। তখন দেখা যেত তাঁকে  
তন্দ্রাস্থর। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

সকালের দিকে ইংরাজি ও বাঙলা সব কাগজ পড়ে শোনান  
হ'তো তাঁকে। প্রথমে শয্যা থেকে উঠেই বলতেন—গভীর স্তোত্র  
শোনান আমাকে।

ছেলেমেয়ের দল পাঠ করতো শব্দরাচাৰ্য্য-রচিত গঙ্গাস্তোত্র স্তব  
ক'রে। তিনি ব'সে থাকতেন চুপ ক'রে। স্তোত্র আবৃত্তি শুনে  
শুনতে চোখ তাঁর সজল হ'য়ে উঠতো। স্তোত্র পাঠ শোনায় পর  
থবরের কাগজ পড়ে শোনান হ'তো তাঁকে।

কাগজ শুনে শুনে এক দিন সহসা চ'মকে উঠলেন, বললেন  
—আর একবার পড়ো ত ঐ জায়গাটা শুনি। শোনা হ'য়ে গেলে  
ব'ললেন—দুর্গাদাসকে ডাকো ত একবার।

তখন দুর্গাদাস বাবু এসে হাজির। ব'ললেন—তুমি এখনি  
একবার যাও তো জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্রনাথের কাছে। যদি থাকেন  
এখানে, আসতে বলবে একবার আমার কাছে। ব'লবে আমি  
অস্বস্থ, শয্যাশায়ী তাই নিজে যেতে পারলাম না তাঁর কাছে। তাঁকে  
বিশেষ ক'রে বলবে—যেন দয়া করে একবার আসেন।

তখন যেন একটা প্রবল ঝড় বইছে তাঁর অন্তরে। মনে হ'লো  
একে একে রবীন্দ্রনাথের কত দিনের কত সব কথা। একদিন  
কবিত্বক ব'সেছিলেন—অতো অধীর হবেন না স্বাধীনতার জন্য।

বাক্যনি আপনি বিজ্ঞানের সঙ্গীত—বাক্য টেনে আনে স্বাধীনতা,  
আর আমি চারণ—সঙ্গীতে বেশকি জাগিয়ে তুলি। বাগ্মী ধীর  
তাঁরাও ধনি তুলুন দেশের অভ্যন্তরে হাটে-মাঠে-পথে সর্বত্র। সে  
আহবানে এসে ঠাঁড়াক সকলে দেশকে স্বাধীন ক'রবার পণ নিয়ে।  
তখন দেখবেন আবির্ভাব হবে এমন একজন মাহুশের যিনি তাঁর সব  
শক্তি নিয়ে এই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশকে বাধ্য ক'রবেন ভারতকে  
বন্ধন ক'রে চলে যেতে। সেদিন এমন শক্তির কেউ থাকবে না  
যে তাঁকে ধ'রে রাখবে, সঙ্কল্পচ্যুত ক'রবে। সময় এখনও হয়নি।  
উতলা হবেন না আপনি। সেই শুভ মুহূর্ত আসবেই, আর  
বিলম্বও নাই তার। প্রতীক্ষা করুন, উতলা হবেন না।

এ বাগ্মী যেন অহরহ শুনতে পান তিনি। এ যে মহাপুরুষের  
বাগ্মী। সংবাদপত্রে আজ প্রকাশিত চ'য়েছে সেই মহাপুরুষেরই  
ভ্যাগের কথা। বহু লোক যাঁ পাবার জন্য লালায়িত—সেই গৌরব—  
উপাধির গৌরব—অভিজাত্যের অত্যাচার-প্রমত্ত ব্রিটিশের প্রেমস্ব  
“নাইট” উপাধির গৌরব তিনি ত্যাগ ক'রেছেন বৃথা, কোভে,  
বেদনার।

তাঁর মনে হ'লো ভারতের স্বাধীনতা অদ্ব্যগত। তিনি হয়তো  
দেখে যেতে পারবেন না ভারতের সেই পুরুগৌরবে প্রতিষ্ঠা। শুনে  
যাবেন রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সেই স্বাধীনতা আবাহনের স্বমধুর  
বংশী-ধ্বনি! তাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তাঁর  
উপস্থিতির।

দুর্গাদাস বাবু পবিত্র বাবুকে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে,  
তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ী।

দুর্গাদাস বললেন রবীন্দ্রনাথকে—রামেন্দ্র বাবু অত্যন্ত অস্বস্থ,  
শয্যাশায়ী, তিনি একবার আপনাকে বাবার জন্য জম্মুরোধ  
জানিয়েছেন।

ব'লতেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন—রামেন্দ্র বাবু কে?

পবিত্র বাবু বললেন—ত্রিবেদী মহাশয়, শুনতে চান আপনার  
কাছ থেকে নাইটহুড ভ্যাগের—

আর কিছু বলতে হ'লো না। চমকে উঠে ব'ললেন রবীন্দ্রনাথ  
—ত্রিবেদী ম'শায় অস্বস্থ। আমি এখনি যাচ্ছি, খবর দিনশে  
আপনার।

খবর পাওয়া মাত্র রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—সব ছেলেমেয়েদের যেন  
ভাল জামা কাপড় পরান হয়, সিঁড়ি যেন বেশ ভাল ভাবে পরিষ্কার  
ক'রে রাখা হয়।

অল্পক্ষণ পরেই এসে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। চেয়ে দেখলেন তাঁর  
প্রিয় স্ত্রীদের শেষ দিন আগতপ্রায়। সেই চরম মুহূর্তেরই প্রতীক্ষার  
শয্যালগ্ন হ'য়ে রয়েছে এক বিরাট পুরুষ; কেবল চোখ দুটি জল জল  
ক'রে ছাতি দিচ্ছে মাত্র।

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—খবর কী ত্রিবেদী ম'শায়?

ভাবে আত্মতারা ত্রিবেদী ম'শায় উঠে ব'সবার চেষ্টা ক'রতেই তাঁকে  
ধ'রে শুইয়ে দিয়ে ব'ললেন—আপনি অস্বস্থ, দুর্বল, ওঠবার চেষ্টা  
করবেন না। কী আদেশ বলুন।

আপনি নিজের মুখে শুনিতে দিন আমাকে ব্রিটিশের সাথে  
আপনার বিচ্ছেদের কথা।

তখন নিজের মুখে শুনাশোন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাগ্মী।

সে বাণীতে আছে—কেন অল্পবয়সী আপনাকে সম্পূর্ণ নিবন্ধ আমার দেশবাসীর বুকে গুলার আঘাত দিলেন? এ কেননা আমার পক্ষে অসম্ভব। ধীরা পুত্র মতো নৃশংস হ'য়ে নিরস্ত্র মানুষকে গুলী ক'রে হত্যা ক'রে আনন্দে উদ্ভাস হ'তে চলেছে। বাধ করে না, তাঁদের এই বর্বর আচরণের প্রতিবাদে আমি তাঁদের প্রস্তুত সম্মানের ভার বহনে অসমর্থ হ'য়ে বঞ্চিত ক'রতে বাধ্য হ'লাম নাইটহুড। এ আমার পক্ষে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। তার পর প'ড়ে শুভাসেন নাইটহুড ত্যাগ সম্পর্কে তিনি যে পত্র লিখেছেন গভর্ণরকে সেই পত্র।

ভাবাবেগে কীদন্তে কীদন্তে বিছানা থেকে উঠে ব'সে পায়ের ধুলা নিতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের। থামতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। সে কৃত অপূর্ণ, অকৃত, মধ্যশীল! ভাবাবেগে রামেন্দ্রচন্দ্রের তখন মেন নীরোগ পুত্র সবল মানুষ। শাস্তির একটা নিঃশাস ফেলে কণি কণি ব'লে উঠলেন—জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে জেনে গেলাম ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ আসন্ন। আঃ—কী আনন্দ!

তখন রামেন্দ্রচন্দ্রের মুখে সুগভীর প্রশান্তি, চোখে এক অপূর্ণ দীপ্তি। নেতিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণের জন্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের উত্তেজনার উচ্ছ্বাসের আবেগের প্রাবল্যের পর লক্ষণ অবসাদে। কিছু আশ ফটাও লাগেনি সে অবসাদ কাটিয়ে উঠতে। তার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। গায়ের সে চুলকানির বাতনা নাই, কোনও অস্বস্তি নাই। যেন একবারে সম্পূর্ণ নীরোগ।

ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন—আজ আপনাকে এমন প্রফুল্ল দেখাচ্ছে কেন?

খুব হাসির সাথে ব'ললেন—আমার ভারতের সুদিন যে সমাগত।

ডাক্তার তাঁর নাড়ী দেখে গভীর মুখে চ'লে গেলেন নীরবে।

ডাক্তার চ'লে গেলে বাতীর লোক সব একে একে এসে উপস্থিত হলেন রোগীর পাশে। সকলেই বিম্বিত, তাঁকে বহু দিন পূর্বের মত বেশ সুস্থ প্রফুল্ল অবস্থায় দেখতে পেরে।

রামেন্দ্রচন্দ্রের সকলের দিকে একবার চোরে দেখলেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন—নিচে কোম ভদ্রলোক কী আছেন?

তাঁর কথার উত্তরে সকলেই ব'ললেন—আপনাকে দেখতে আসা ভদ্রলোকের ত বিবাহ নাই। সর্ব্বশাই আসছেন অনেকে নিচে থেকেই খবর নিয়ে ফিরে যান।

নিচে ধীরা আছেন এখন, আসতে বসো আমার কাছে।

স্বাধীন সব এসে পাঁড়াতৈই চোখ মেলে একবার চোরে দেখলেন সকলের দিকে। মুখে এক অপূর্ণ প্রশান্তি! ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন সকলেই প্রণাম ক'রে পদবুলি নিয়ে সেই মহাপুরুষের। তার পরই দেখা গেল, মহাসমাধি আসতে আর বিলম্ব নাই সেই বিরাট পুরুষের।

তাঁর জোষ্ঠী কড়া জিজ্ঞেস ক'রলেন—আপনার ভয় হ'চ্ছে কী বাবা?

চোখ মেলে ব'ললেন—ভয়! আমার ভয়?

ধীরে ধীরে আছুর হ'য়ে পড়লেন। ডেকে কেউ আর সাড়া পায় না তাঁর।

ভগিনীরা আন্তরিকতা ডাকেন—বাবু দাদা! জী কেঁদে আকুল। একটা দিন যিনি এতো হাসিখিহাস ক'রে এসেছেন

সকলের সঙ্গে কত তৌতুকের সঙ্গে, সে কত আভ্য নীরব। মহা সমাধিতে সমাচ্ছন্ন! কোন উত্তর নাই, শব্দ প্রঃস্রব।

১৩-৬ সাল, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ স্থমিরে গেলেন সারা ভারতের সাথ আত্মজ্ঞা অপূর্ণ রেখে আচাধ্যায়ে।

নিচেকার ঘরে ব'সে র'য়েছেন বহু সুখী সুপণ্ডিত জন। তাঁদের মধ্য হ'তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ব'লে উঠলেন—বিজ্ঞার জাহাজ একটা ডুবে গেল।

সকলেই ব'ললেন দুর্গাদাস বাবুকে—আজকের রাতটা রেখে কাল সকালে সমারোহ ক'রে নিয়ে বাওরা হবে মৃতদেহ।

দুর্গাদাস বাবু ব'ললেন—আমার দাদার সে মত ছিল না। তিনি আমাকে ব'লে গিয়েছেন, সমারোহ তিনি কোন দিনই ভালবাসেন নি। তাঁর মৃত দেহ নিয়েও যেন কোন সমারোহ করা না হয়। প্রাতিষ্ঠা—শুকরা। বট্টা, এই কথাই তিনি বিশেষ ক'রে বলে গিয়েছেন।

ভবুও বহু ছাত্র, বহু বন্ধু সুখাজন তাঁর বিয়োগ সংবাদ শুনে এসে পড়েছেন পটলডাঙার বাসভবনে। শবাহুগমন ক'রলেন তাঁরা সকলে।

যখন ডুমঠি হন, খুরাপিতামহ ব'লেছিলেন—এ ছেলে একজন দিকপাল হবে। তার পরও তিনি মাঝে মাঝে ব'লতেন ঐ কথাই।

তিন বছর বয়স যখন রামেন্দ্রচন্দ্রের, প্রশ্ন ক'রেছিলেন তাঁর মানুষ করা মাকে—মাটির জন্ম হ'লো কী ক'রে বল ত মা? তখন তাঁর খুরাপিতামহ আনন্দ-গদগদ স্বরে পুনরায় ব'লেছিলেন—দেখ, আমার কথা ঠিক কি না। এ ছেলে একজন দিকপাল হবেই আমি ব'লে রাখলাম? তাঁর সেদিনের বাণী সার্থক হয়েছিল উত্তরকালে।

যুগের প্রশীপ একবার ক্ষণকের জন্ত ছলে উঠে নিয়ে গিয়েছে। বর্ষাকাল, শুক্লানবমীর মহানিশার সমাগমের পূর্ব্বই সব শেষ।

কোথায় গেলেন রাত্রির রামেন্দ্রচন্দ্র! কোথায় গেলেন সাহিত্য-পরিষদের সারথি রামেন্দ্রচন্দ্র! কোথায় গেলেন রিপণ কলেজের প্রাণকেন্দ্র রামেন্দ্রচন্দ্র! কোথায় গেলেন সারা দেশের পৌরব রামেন্দ্রচন্দ্র!!!

দৈনিক পত্রের শুভ্র শুভ্র আচার্য্য জীবনীর বিরোগ-বার্তা! সকলেই ছাড়িয়ে পড়লো সর্ব্বত্র আচার্য্য জীবনীর অমৃতলোক বাতীর সংবাদ।

হাহাকারে ভরে উঠলো সারা দেশ।

মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'লো আচার্য্য দেবের জীবনের বহু কথা, তাঁর বহুবুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ।

অন্ধকারে আছুর হ'য়ে গেল তাঁর ক'লকাতার বাসভবন। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেল জেমো-কান্দী সেই উচ্ছল জ্যোতিকের তির্যধান সংবাদে।

হায়! হায়! হায়! আবার কী জেমো-কান্দীতে আবির্ভাব হবে কোন দিন অমনি এক জন বিরাট মহাপুরুষের! মনীষার দীপ্তিতে যিনি আবার আলোকিত ক'রবেন অন্ধকারাচ্ছন্ন জেমো-কান্দীকে?

কত দিন কত যুগ পরে আসবে সে শুভ দিন, জানি না!!!

## সাঁধনার স্বপ্নাজোৎসবে মিল নেট।

তার থেকে অনেক ছুগ, অনেক বেশি অপরিচিত। পূর্বাপুরি এক অনাবিল সৃষ্টির চব্বিট কল্পনা করেছিল। সৃষ্টির এ বহুলাংশ তাই বলে বম্বার নয় খুব। যে পর্যন্ত হয়েছে, কল্পনার আভাসও নেই। শুকনে মড়াটয়ের একটা দিকে খুঁড়ে খুবলে দগদগে ঘায়ের মত করে চলেছে এরা।

একবারে ভালা থেকে দুই পাঠাডের খানিকটা পথান্ত অতিক্রম এক মাটির দেওয়াল তুলে মড়াটকে হুঁ-আধখানা করে ফেলা হয়েছে। ওই অদূরে পাথরের পাকা দেওয়াল তোলা চলে এটা ভেঙ্গে ফেলা হবে। মাটির দেওয়ালের ওপরে এক বর্ষার জল জমাতে খানিকটা। কিন্তু সেও কল্পনার মনস্কিনী নয়। হাত ছোঁয়ালে গা ঘিন-ঘিন করার মত। কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে, কোথাও পাথর, কোথাও পাঁচ ভাসছে, কোথাও জঙ্গল পচছে, কোথাও বা ভাঙা আটচালার মাথা ভেসে উঠছে কলের ওপরে।

অগ্নি দিকটা খটখটে শুকনো। কাল সেদিকটাতোই হচ্ছে। এদিক দিয়েই নাকি জল যাবে। কিন্তু সেদিকে চেয়েও সাধনার ভিতরটা শুকিয়ে যায় কেমন। যতদূর চোখ যায়, সেই হাঁকরা মাটি, সেই পাথরের কুপ আর সেই জঙ্গলের অবতোথ। বক্ষা, নীরস। ওখান দিয়ে জল চলা দূরের কথা, বাতাস চলাচলের অভাবে যেন দমবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে কতকাল ধরে।

কিন্তু স্বপ্নাথনা না হোক এত বড় বাস্তবেরও আরোহন আছে। উত্তেজনা আছে, বোম্বাক আছে। তার থেকেও বেশি আছে চূর্ণাণ্ডিত্যের বিষয়। এক সঙ্গে কাজ করে প্রায় আট-দশ হাজার লোক। এত উঁচু থেকে খসে খসে দেখায়। ওপারের পাথরে জঙ্গল সাফ করে ফুলি বসতি গড়ে উঠেছে একটা। এ পাড় থেকে সারি সারি বাড়ের ছাতার মত দেখায় ওপরে তাঁবগুলো। সকাল না হতে যে ঘাং সবজীম নিয়ে বেবিয়ে আসে পিল-পিল করে।

মন্ত্রপাতির সমারোহও তেমনি। পাঠাডের ওপর থেকে নয়, সাধনা সেই নীচে নেমে গিয়েই দেখে এসেছে। কড়কড় করে মাটি ফুঁড়ে চলেছে না যেন জমাট-ধীমা মাখনের তাল ফুঁড়ে চলেছে। বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মণের এক একটা পাথর তুলছে না তো যেন এক একখানা পলকা ই-ট তুলছে অবলীলাক্রমে। এরকম অজস্র ব্যাপার।

প্রথম দিনকতক শুক্ক বিষয়ে শুধু দেখেই গেল সাধনা। তারপর একদিন বলে ফেলল, কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা, বিচ্ছিন্নি লাগছে।

অবনী বাবু তার বিচ্ছিন্নি লাগাটাই শুনলেন শুধু। বললেন, আমি তো আগেই জানি, তখন অত করে আসতে বাধ্য করলাম, না শুনলে কি করব। আর ক'টা দিন থাক, কীকমত রেখে আসব'খন তোকে—

—বেশ, আমি কি বললাম আর তুমি কি শুনলে। বললাম, কি দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝি না বলে ভালো লাগছে না—না কীকমত রেখে আসব'খন তোকে। তুমি বললেই আমি গেলাম আর কি।

সকালের হাউও বেল্লবার তোড়জোড় করছিলেন অবনী বাবু। খুব খেয়াল করে শোনেদি আসে। এখানে শুনলেন। মেয়ের



## প ত্র ত পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝছি না?

সাধনা লজ্জা পেয়ে গেল একটু!—এই কি ক'ছ না ক'ছ তোমরা মাথায়ু তাই। পাড়াও, তোমার খাবারটা নিয়ে আসি—  
এস্থান করল। মেয়ের বিচ্ছিন্নি লাগার হেঁচু শুনে অবনী বাবু কি জানি কেন ভালো লাগল না খুব।

সাধনা তার হুঁবরের ক্ষুদ্র গৃহস্থালি বেশ কার্যেদী ভাবে গুছিয়ে নিল। মাসি চিঠিতে তাড়া মিলেন দেরার জন্ত। সাধনা উল্টে আমন্ত্রণ জানালো তাকে, চমৎকার লাগবে মাসিমা, দু'দিন এসে খেয়ে বাও—

বাঁধাধরা আপিস-টাইম বলে কিছু নেই এখানে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ চলেছে। আপিস বা বাবতীর কাজ সপাহাড়ের নীচে। ওপরে শুধু কোয়ার্টার। পাণ্ডে বৈটে ওপরে কতটা রীতিমত পরিভ্রমের ব্যাপার। সারাক্ষণ একটা ইঁ মজুত আছে এই জঙ্গে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা লোক ি ওটা নামা করে ঠিক নেই। পাহাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে এঁ বৈকে পাকা বাস্তা চলে গেছে একমাথা থেকে আর এক মাথা ট্রাকটা অবজ মজুত থাকে মেন কোয়ার্টা স-এ। যে দিকটার হয়ে চোমরা কর্তব্যাক্রমের আবাস, যেখানে গেট-হাউস ইত্যাদি সাধনাদের কোয়ার্টার সেখান থেকে অনেকটা দূরে, অনেকটা বিচ্ছিন্নি লাগার চাকুরীদের জন্ত কিছু দূরে দূরে মাত্র তিন-চারটে কোয়ার্টারই সেখানে, নতুন আরো দু'তিনটে হচ্ছে।

সকালে স্নানাদি সেরে অবনী বাবু মেন কোয়ার্টার আসেন। নীচে নামতে হলে এখান দিয়েই একমাত্র পথ এ থেকে ট্রাকে করে নীচে নেমে যান। আর ওঠেন সেই সড়ক বেদ্বারা এসে টিফিন কোয়ার্টার করে ছুপুরের খাবার নিয়ে যান। ফিরতে একেবারে রাতও হয় প্রায়ই। আফসের পর গেট-হাউস হল ঘরে কৰকর্তাদের মিটিং বসে, নয়তো কিছু না কিছু আফস থাকে।

অথও অবকাশ সাধনার।

দুর্বিবহ লাগার কথা। কাছাকাছি কোয়ার্টার ক'টাতো মেয়েছেলের মামগন্ধও নেই। পাঁচছ'জন করে পুঙ্খবন্দ্যাবী মত করে আছে। কিন্তু সাধনাদের মাসিমা বাড়ির ক'টা বহু

দিলে এরকম অবকাশে অনেকটাই অভ্যস্ত সে। আর অবকাশই বা কোথায়? চোখের খোঁরাকি যেখানে এত অক্লান্ত আর মনের কোঁতুল বায় এত সজাগ, সময় তার আপনি কাটে।

প্রথম প্রথম অবশ্য একলা বোরাকেরা করতে সাহস পেত না খুব। শুভ, নির্জন পরিবেশে দিনে দুপুরেও কেমন লাগত বেন। হাজার হোক অজানা অচেনা জায়গা। কিন্তু সে অস্বস্তি কাটিতে ক'টা দিন আর। আজ এদিকে খানিক দূর উঁকিঝুকি দেয়, কাল ওদিকে। তাছাড়া যে বোরার দুপুরে বাবার খাবার নিতে আসে তার কাছ থেকে শুনেছে, ভয়ের নাকি কোথাও কিছু নেই। সাঁওতালরা সব মাটির মানুষ—ঘরদোর খোলা কেনে রাখলেও কুটোটি সহাবে না। এই মানুষদের খবর বুভাঙ্ক সাধনা ভালই জানত। অবশ্য তখন সাহস বাড়ি।

মেয়েছেলে আছে মেন কোয়ার্টারস-এ। শাড়ীর অভাস পেলেই সাধনা বিনা বিধায় হানা দেয় একবার দু'বার। কিন্তু বয়েস বাই হোক, কর্তাদের পদমর্যাদার সকলেই বিশিষ্ট মহিলা। এঁরা। পাশাপাশি বসবাসের ফলে নিজেরদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলেন একটু আদটু। এই সানসিথে মেয়েটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঠিকই। গভারসিয়ারের মেয়ে তখন কিছুটা আশস্ত হলেন তাঁরা।

—ও, অমুক গভারসিয়ার বাবুর মেয়ে তুমি? জেনারেল কোয়ার্টারে থাকো বুঝি? আর কে আছেন? শুধু বাবা, আর কেউ না? তাহলে তো বড় কষ্ট তোমার—মাঝে মাঝে চলে যানো, গল্পগুজব করা যাচ্ছে—

কেউ না থাকার কষ্টটা সাধনার থেকে এঁদেরই বর বেশি। কিন্তু গভারসিয়ারের মেয়ের কাছে তো আর দুঃখ প্রকাশ করা চলে না। নিজের আকর্ষণে গভারসিয়ারের মেয়ে যদি মাঝে মাঝে আসতে পারত, অপরাপরদের চোখে সেটাই বিসদৃশ ট্রেকবোঝি না, তাই হ'ল ভাববার কথা।

নাকের ডগায় এত বড় এক স্ট্রিট মহড়া চলেছে, কিন্তু সে সবকিছু তুচ্ছ কোঁতুল নেই তাঁদের। সাগ্রহে হয়ত সাধনা বলে উঠেছে, আপনাদের এখান থেকে তো স্বপ্নের দেখা বায় সব কিছু।

জবাব, আর বোলো না, দেখে দেখে চোখ পড়ে গেল। সকাল-সকাল তো ওই দেখছি।

নির্ধাক্ষ নেড়ে চেয়ে থাকে সাধনা। দেখে দেখে চোখ পড়ে বায় করে বুকে ওঠে না। বরং সকাল সন্ধ্যা দেখে শুনে ঈর্ষা হয়। মেন কোয়ার্টারস এর মহিলাদের সঙ্গে যনিষ্ঠতা হল না সাধনার। এই কেটে পড়ল সে। কিন্তু এদিকটার আনা-গোনা বেড়ে গেল।

কোয়ার্টারস থেকে একটা রাস্তা এসেছে পাহাড়ের একেবারে কাছে। দুপুরের নিগ্রিবিচলিতে যে কোন একটা পাথর বেছে নিয়ে লাঞ্ছিত হাত পা ছড়িয়ে। নীচে মড়াই। আর তার ভাবী বন্ধন-জাহ। এত উঁচু থেকে ছবির মত দেখায়। যন্ত্রের কাজ থেকেও মুলিকামিনদের কাজ দেখতে ভালো লাগে বেশি। পুরুষেরা মাটি পাথর লাঞ্ছিত। মেয়েরা সেগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। এটুছু মতোই কোথায় বেন বেশ একটা ছন্দ আছে। মনে মনে সিন করার মত কিছু একটা।

এক একদিন নিজের কাছেই লক্ষ্য পেয়ে বায় সাধনা। তাহলে এই সেরেজলার মত সেও যদি অবশ্যে কাজ সেয়ে যেতে

পারত! ওদের মত, ওদের সঙ্গে। দৃষ্টান্ত কল্পনা করতে চেষ্টা করল। মাথায় মাটির শুড়ি বা পাথরের বোঝা। একা একাই হেসে কুটকুটি তার পর। মা গো মা, কি বেয়াদব সাধ।

সেদিন দুপুরে বোরার বাবার খাবার নিতে এসে কি ভেবে সাধনা বলল, চলো আমিও বাই তোমার সঙ্গে।

টিফিন ক্যারিয়ার ছাড়িয়ে নিজেই সেটা হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। এই পাহাড়ী পরিবেশে কিছুই বেন যেমানান নয়। এই মুক্তির আবাদনটুকুই সব থেকে ভালো লাগে।

অবনী বাবু অবাক হলেন, তুই যে?

—এলাম। রোজ রোজ এই লোকটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, মাঝে মাঝে আমিই তো নিয়ে আসতে পারি তোমার খাবার।

অবনী বাবু কি আর বলবেন। ঘরে আরো পাঁচ-সাত জন লোক আছে। আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেও তারা। এই বৈচিত্র্যটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু বাবার এই খুশির অশিস-ঘর সাধনার একটুও ভালো লাগে নি। বলল, এখানে বসে কাজ করো নাকি তোমরা?

ঘরের কাজ কমই। কিন্তু সেখানা না বলে অবনী বাবু বললেন, হ্যাঁ। তোর শচন্দ্র হচ্ছে না?

—না।

গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট টেমিলের সামনে সমাসীন লোক-ক'টিকে সাধনা দেখে নিল একবার। এখানে এদের সামনে বসে বাবা থাকে কি করে বুঝে উঠছে না। মুখের দিকে তাকালেই বোকা বায় ওদেরও খিঁচ পেয়েছে। বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল, কোথায় বসে থাকে তুমি?

তার সমস্তটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সর্কোবুকে দেখতে লাগল সকলেই। বিব্রতমুখে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে করে কাঁড়িয়ে রইল সাধনা। অবনী বাবু উঠে এক দ্বন্দ্ব জল গাড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। পরে ডাকলেন, আর—

বাইরে পাহাড়ের ছায়ার বড় একটা পাথরের ওপর বসলেন তিনি।—বায় কর কি এনাছিস।

এদিক ওদিক চেয়ে সাধনা ভারী খুশি হয়ে গেল। অমনি এক একখানা পাথরের ওপর গ্যাত হয়ে বসে অনেককেই নিবিষ্টচিত্তে লাক খেতে দেখা গেল। সাধনার ভালো লাগল খুব। নিজে খেয়ে এসেছে বেশিক্ষণ হয়নি, কিন্তু এরকম জায়গায় বসে খাবার লোভেই আর একবার বসে খেতে পারে বোধ হয়। সানসে টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরের ওই ওজলোক্তরা থাকে না বাবা?

—ওদের খাবার এলেই থাকে। কিন্তু তুই যে নেবে এলি, এখন উঠতে কষ্ট হবে না? হেঁটে উঠে কাজ নেই, ট্রাক এসে বলে দেব'খন, তুলে নেবে—

পাহাড়ী রাস্তার ট্রাকে চড়ার লোভ আছে। কিন্তু তাহলে আসাটাই পাত। অক্ষুশি হয়ত ছস করে উঠে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোমার ট্রাক কাজ নেই, পায়ে হেঁটেই খুব উঠতে পারব আমি। তুমি আস্তে সূয়ে খাও বসে, আমি একটু বুকেটুয়ে দেখে আসি। ষাওরা হলো বোরারকে সব রাখতে বোলো, আমি নিয়ে যাব'খন।

অসিল এই জন্তেই আস।

আর কোন কথাই অপেক্ষা না দেখে সাধনা এগিয়ে চলল।  
এখান থেকেও মড়াইয়ের তলদেশে অনেক নীচে। পাথর ভেঙে নামতে  
লাগল। বেশ পরিশ্রমের বাণী। টাল সামলানো দার এক এক  
জায়গায়। 'ওই লোকগুলো তরতর করে নেমে যায় কি করে, ভেবে  
অবাক হয়। ঘেরেগুলো পথস্থ। কিন্তু মড়াইয়ের বুকের ওপর  
গিয়ে সেও আজ গাঁড়াবেই। অতঃপর নেই বলে—কিন্তু অজ্ঞান হতে  
ক'দিন আর।

সত্যিই ক'দিন আর। ফেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে  
ওঠে সাধনা। ধাবার ধাবারটা নিয়ে কতকণে নীচে নেমে আসবে।  
অর্থাৎ, কতকণে তারপর মড়াইয়ের গল্লরে অবতরণ করবে। তার  
ভাবও ভেঙেছে, এখন প্রায় নেমে আসে সেও। তারপর বেশিক  
খুশি পা চালিয়ে দাও, সর্বত্রই দেখার উৎসব।

সাধনা দেখে। আবার তাকেও বাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে  
সকলে। কালার তরঙ্গে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের দিকে আর চোখ  
না যায় কার? তার এই নীরব অথচ সজীব কোঁতলটুকু বেশ  
লাগে ওদের। মেয়েটা হাসে। সাধনাও হাসে। পুরুষেরা কোদাল  
শাবল ধামিয়ে সোজাগুজি নিরীকণ করে। নীরব চোখে সাধনা  
কৈকিয়ত দেয় যেন, ভোমাদের বিরক্ত করতে চাইনে, একটু দেখতি  
থু—

কীকমত সর্দিন আলাপ হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। লোকটাকে  
অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছে সাধনা। মাতব্বর গোছের একজন বেশ  
বোখা যায়। ছোট ছোট অনেকগুলো ব্লিকামিনের দল তার  
আদেশ-নির্দেশমত কাজ করে। মস্ত একটা পাথরের ওপর বসে  
বোধহয় বিশ্রাম করছিল একটু। পাশ কাটাতে গিয়েও সাধনা  
গাঁড়িয়ে পড়ল। ছুই এক মহূর্ত নিরীকণ করে তার মেজাজ বুঝতে  
চেষ্টা করল হয়ত। তারপর বলল, এখানে বসি একটু?

অবাক হয়ে লোকটি চেয়ে বইল কিছুক্ষণ। পরে মাথা নেড়ে  
অনুমতি দিল। 'সংখ্য', বসতে পারবে।

শান্তিষ্ট মেয়েটির মত বসল সাধনা। লোকটি আবার খানিক  
দেখে নিয়ে বলল, : কার বিট বড়ো?

বলল।

একটু ভাবল সে।—উল্ল্য উবাসির বাবু কুড়ী বটেই তু?

—কুড়ী কী? বালাবর বর শুনে সাধনা হেসেই ফেলল।

স্বাবর না দিয়ে লোকটিও হাসল অল্প একটু। পরে সাক্ষিত  
মন্তব্য করল, লোহুন উবাসির বাবু খুব ভালো নোক।

পাসপোর্ট পেল যেন। পাথরে পা ওঠিয়ে বসল সাধনা।—  
তোমার নাম কী?

—পাগড় সর্দার।

অর্থাৎ পাগল সর্দার। সাধনা আবার প্রশ্ন করল, তুমি বুঝ  
এই সব লোকদের সর্দার?

—হে।

—এখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তুমি সব জানো বুঝি?

পাগল সর্দার সর্কোতুকে মাথা নাড়ল, জানে।—

সোৎসাহে আবার কি জিজ্ঞাসা করতে বাহিল সাধনা। ধামতে  
হল। অসহিষ্ণু পদক্ষেপে এদিকে আসছে একটি মেয়ে। সাধনার

দিকে ফিরেও তাকানো না। ভক্তবদ্ধ করে সর্দারকে কি সব বলতে  
লাগল। বিষম রেগে গেছে এবং একটা কিছু নাশিশ জানাচ্ছে,  
এটাই বোঝা গেল। কালো অঙ্গ ঘামে জ্বজ্বব করছে। টানা  
ছুই চোখে খরখর রোষবহি।

পাগল সর্দার গল্লর মুখে ভ্রমে গেল। পরে হঠাৎ তারখরে  
হাঁক পাড়ল, ই হোপ-পুন—

সেই বাজরাই হাঁক শুনে সাধনা চমকে উঠল একেবারে। কাল  
কাল করে দেখতে লাগল দু'জনকেই। দূর থেকে একটা লোক  
এদিকে এগিয়ে আসছে, দেখা গেল।

ওই লোকটাকে আগেও দেখেছে সাধনা। ছোটখাট একটা দল  
পাঠা গোছের হবে। আর এই মেয়েটাকেও দেখেছে। কিন্তু কাজে  
মধ্যে ও তখন অল্প মৃতি দেখেছে এর। মাথার করে প্রায় দেখে হু  
হু' মণ একটা পাথর বয়ে এনে ধুপ করে এই বোহান লোকটার পারের  
কাছে ফেলেছে। সাধনাকে দেখেই সম্ভবত ভাড়া বালায় রসিকতা  
করেছে, সে কেতো বড় 'ধিরি' লিবি লে—তু'র কলিজা খিকে উ 'ধিরি'  
অনেক সরমছে।

মেয়েটার ওই দুই চোখে তখন বিকমিক করে উঠেছিল যা, সেই  
বাগ নয়, আর কিছু। এই হোপুন লোকটার মুখেই শুধু তখন কে  
ভাববিকার দেখেনি সাধনা, নইলে কাছাকাছি বারা ছিল, সত্য  
হেসে উঠেছিল। দৃষ্ট ভঙ্গিতে ছুই কোমরে হাত দিয়ে গাঁড়িয়ে  
মেয়েটা, আর দুখশাশা পীত বার করে হাসছিল। সাধনা  
গাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে ওকে দেখেছে আর পাথরটাকে দেখে  
আর অবাক হয়ে ভেবেছে, ওই অত বড় পাথর মেয়েটা  
অকলীলাক্রমে মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলো কি করে!

হোপুন সামনে এসে গাঁড়াতে পাগল সর্দার কি যেন ক  
তাকে। একবর্ণও বুলল না সাধনা। কিন্তু শুনিই ক্রুদ্ধ নাশি  
মত গজহাত গজহাতে প্রশ্ণান করল মেয়েটা। চলনের  
পায়ে পায়ে সমস্ত অকোশ করে পড়তে লাগল যেন।

নিশ্চয় ছুই চোখ'তুলে হোপুন সর্দারের দিকে তাকালো এক  
সাধনাকেও দেখল। তেমনি অল্পস গতিতে ফিরে চলল তারপর  
পাগল সর্দার বলল, উ আমার বিটি চামদাশি।

আগ্রহ আরো বাড়ল সাধনার। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞাসা  
আগে পাগল সর্দার আবার বলল, আর উ হোপুন, বিটির সমস্ত  
বিরো হুব—জাঁওয়াই কুরব। অর্থাৎ, মেয়ের সঙ্গে বিরো দিয়ে  
জামাই করবে।

শুনতে বেশ মজা লাগছে সাধনার। মেয়েটার এই  
বিরাগ বোম্বাশ খটিত নিশ্চয়।—তোমার মেয়ে এমন বাগ  
এলো আর বাগ করে গেল কেন?

জবাবে পাগল সর্দার বা বলল তার মর্ধাৎ, মেয়েটা ভরান  
কাজ কর্মে মন নেই, কেবল হাসাহাসি ফটনিষ্ট করে। সে  
সর্দার ওকে অস্ত্রের দল থেকে ছাড়িয়ে হোপুনের তত্ত্বাবধানে  
লাগিয়েছে। হোপুনকে সঙ্কলে সমীহ করে, কিন্তু মেয়ে  
পাজী যে তাকেও পরোয়া করে না। তাই হোপুন খুব করে  
ওকে, বাগ করে মেয়ে শুই বাপের কাছে নাশিশ জানাতে এসে  
হোপুনের দলে কাজ করবে না। পাগল সর্দার হোপুনকে  
চুষে হুটি বয়ে চামদাশিকে কাজে লাগাতে বলেদিল।

ভারী জামাইয়ের ওপর দৃষ্টির টান দেখে সাধনা অবাক হল, খুশিও হল। এরকম নিরপেক্ষতা দুর্লভ। দূরের দিকে চেয়ে চাঁদমণিকে খুঁজল একবার। বাপের সাদাসাপটা বিচারের ফলটা কি বকম পাঁড়াল না জানি। কিন্তু এতদূর থেকে সঠিক চোখে পড়ে না।

—শীগগিরই ওদের বিয়ে দেবে বুঝি ?

মনে হল, শোনেই নি। কারণ দূরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বইল পাগল সর্দার ? পরে ক্ষুদ্র জবাব দিল, হুঁ, সৌম্য আসলে হবে।

খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না। সময়ের আর বাকি কি, তা ত বুঝল না। হোপূনের দীর্ঘায়ত পাখুরে মৃতিটি চোখে ভাসল একবার। আর যৌনোচ্ছল চাঁদমণির মৃতিও। হঠাৎ নিজের কাছেই লক্ষ্য পেয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো সাধনা।

এই পাগল সর্দারের সঙ্গেই তার স্বজ্ঞতা বেড়েছে ক্রমশ। সে গভীর ডাকে দিগ্বিদ্য বলে। সাধনার ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে। সর্দারের গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলাপ না হোক জানাশুনা হয়ে গেল বেশ। সর্দারের দিগ্বিদ্য সকলেরই দিগ্বিদ্য। সকলেরই কৌতূহলের পাত্রী। সর্দারের হয়ে চাঁদমণির সঙ্গেও আলাপের চেষ্টা করেছে সাধনা। কিন্তু ঘেরটার বেজার দেমাক। আর মুখেরও আগল নেই। লাতীর অক্সায় সাধনার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছে। তার পর ফিক করে হেসে বলেছে, তু ওজ ওজ মড়াইয়ে মারিস কেনে, তুকে দেখে যে মরলগুলার পেরাণে জুও লাগে।

লাল হয়ে সেই যে ফিরে এসেছে সাধনা আর তার গায়ে কাঁছে ধরনি। আর এড়িয়ে চলে ছোপুনকে। চাঁদমণির ভয়ে কি না কে জানে। তবে শোকটার ওই বসুঁতি আর মরা চাঁটনি দেখেও কেমন লজ্জা লাগে তার। দুখের দিকে তাকালে লোকটা যেন ভেতর দিয়ে দেখতে পায়।

গল্প জম পাগল সর্দারের সঙ্গে ছুটির দিনে আর অবকাশকালে। সর্দারের গল্প, পূর্বপুরুষদের বীরত্বের গল্প, মড়াই-বাঁধা নিয়ে সেই বিকীর বিস্মৃতি—কি হয়েছিল, কি হচ্ছে, কি হবে, সব। দিগ্বিদ্যর এমন প্রোতা পাগল সর্দার আর পাবে কোথায় ? তার সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে বিশ্বাস আর সবচেয়ে বিশ্বাস।

প্রথম যেদিন পাগল সর্দার ওদের বাড়ি এলো, সাধনা খুশিতে থানা। যেন মস্ত গণ্যমান্ত কেউ এসেছে। কোথায় বসাবে, খেতে দেবে—বাবাকেই তড়া দিল তিন বার করে। পাগল তার এগেতে, শীগগির এসো বাবা।

সে চলে যেতে অবনী বাবু বললেন, ওদের সঙ্গেই আজকাল বুঝি জবাব তোর ?

চোখ বড় বড় করে ফেলো সাধনা।—পাগল সর্দার কয় লোক না নাকি। কত বড় একটা সর্দার ও জানো ? ও না থাকলে ওদের মড়াইয়ের কাজ হত কি না সম্ভেহ।

প্রতিবাদ না করে অবনী বাবু মুখটিপে হাসলেন শুধু।

যেদিন সন্ধ্যার একজন অপরিচিতকে সঙ্গে করে অবনী বাবু বাড়ি গেল।—অন্য লোক দেখে সাধনা ভিতরের ঘরে চলে বাচ্ছিল।

বাবু বাধা দিলেন, বাচ্ছিস কোথায়, পাঁড়া—এঁকে জিলি ?

লোকটিকে ভাব একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সাধনা ইহৎ বিস্তৃত মুখে বাবার দিকে তাকালো।

—চিনা'ল নে তো ?—ঘোঁসো তুমি ঘোঁসো, পাড়ির রটলে কেন। আগজ্ঞের দিকে একটা। হেতের চেয়ার ঠেলে দিয়ে অবনী বাবু মেয়েকে বললেন, দেশের চৌধুরী-বাড়ির কথা মনে নেই তোর ?—কি করেই বা থাকবে, তোর বয়েস তখন পাঁচ বছরও নয় বোধ হয়—তোমরা কত বছর হল দেশ ছেড়েচ নরেন ?

নরেন চৌধুরী। ডাফটসুমান। হেসে জবাব দিল, পনের-ষোল বছর হবে বোধ হয়, বছর চোদ্দ বয়েস আমার তখন। সোভাসুজি তাকালো এবার সাধনার দিকে। বলল, না চিনলেও আমার কিছু মনে আছে ঠিক, ফ্রকপরা এতটুকু দেখছি। অবনী বাবুর উদ্দেশ্যে বলল, তা' ছাড়া আপনিও বিশেষ বদলান নি, দেখেই চেনা চেনা লাগছিল।

অবনী বাবু আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।—তুমি না বললে আমি চিনতেই পারতুম না, আজ বলতেই তোমার ছেলেবেলার চেহারাসমূহ মনে পড়ে গেল—অচ্চ, এত দিন দেখছি একবারও মনে হয় নি কিছু।

নবাগতকে লক্ষ্য করে সাধনা এবারে হালকা সুরে বলল, এত দিন একসঙ্গে কাজ করার পর আজ সব পরিচয়টা বেরলো।

জবাব দিলেন অবনী বাবু।—একসঙ্গে কি যে, নরেন হল পাশ করা ইন্টিনিয়ার—ডাফটসুমান—কত বড় চাকরী ! ওর নেহাত চোখ আছে বলেই চিনেছে। আমার মত কতজনকে দেখছে রোজ, মনে করে থাখা সচল নাকি।

সাধনার ভালো লাগল না কথাগুলো। এ বয়সে তার বাবার ওপরে কাজ করে শুনেই বোধ হয়।—না, দেশের চৌধুরী-বাড়িটার কথা তার কিছু মনে নেই। একেও কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। ওপর-অলোদের পরে মনোভাব খুব প্রসন্ন নয় সাধনার। তাদের না দেখুক, তাদের ব্যতিরেকে মেয়েদের চেয়েছে। মাটিতে পা পড়ে না। বাবার সামনে পাগল সর্দারের প্রভাবনত মৃতিটি বহু ভালো লেগেছিল।

ভাবান্তরটুকু নরেন চৌধুরী লক্ষ্য করল।—কি না বলা বার না। সাধনার দিকে চেয়েই বলল, আপনাদের বাবা কিন্তু আমাকে চা খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।

অবনী বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, থ্যাংস সাধনা, তাই তো—একটু চা দে—কার দেখে, নরেনের বোধ হয় কিছুও পেয়েছে—

নরেনই গভীর মুখে জবাব দিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পেয়েছে।

অবনী বাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। সাধনাও হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে এলো। কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভাল ছুঁচর মুহূর্ত।

বড় চাকরী করলেও লোকটা সেমাকী নয় বোধ হয় তেমন। মুখের আলোও ভালোমাত্র ভালোমাত্র ভাব আছে। নামটাও শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনল ? পাগল সর্দার—থ্যাংস পাগল সর্দারের মুখেই শুনেছে। তাকে ছাড়া আর কাকে চেনে সে। মনে পড়তে নীরব প্রার্থন পরিস্ফুট হল মুখে।

অন্য চোখ বড় বড় করে চেয়ারে ঝেড়ে উঠে পাঁড়াল নরেন চৌধুরী। হাত বাড়িয়ে সাধনার হাত থেকে ডিল ছুঁটা নিয়ে



টেবিলের ওপর রাখল নিজেই, ঘসনার একটা সিঁড়ি দখ বাব করে বসে পড়ল আবার।

সান্না হেসে ফেলল।

—হাসছেন কি? এই বোড়ার ডিমের জাবগায় না খেয়েই মারা গেলাম। এগুলো কি—বেসন দিয়ে আশুবেত্তনের কাটলেট। মার্ভেলস—আর এটা মাছের ক্রাই! মাছ পেলেন কোথায়?

তার হাবভাব দেখে সন্ধ্যাচ প্রায় কেটেই গেল সান্নার। হেসে জবাব দিল, চৌবাজার পুখি।

লোকটি ভোজনরসিক বটে। অবনী বাবু নিলেন কি নিলেন না। একাই সে সান্নাকে এক সাড়বরে গ্রেট ছুটি খালি করে ফেলল। পরে বড় একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনায় তা'হলে খাবার কই নেই কিছু?

মিত হাতে অবনী বাবু মাথা নাড়লেন, না—এ বিজ্ঞেটা ও পাকা গিল্লির মত শিখেছে।

—মহাবিজ্ঞে শিখিয়েছেন, আমাদের ভুতু বাবুকে আপনায় কাছে পাঠিয়ে দেব, তাকে একটু আধটু শিখিয়ে দেবেন।

সান্না সর্কোতুকে জিজ্ঞাসা করল, ভুতু বাবু কে?

—ভুতু বাবুকে চেনেন না! ওই যে পাহাড়ের নীচে বার জলখাউণ্ড ঠেল—মো-পাউডার থেকে মাস-ভাত পর্যন্ত সবই নাম মাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। তার ওখান থেকেই তো রোজ আমার খাবার আসে—হু'বেলা ভাত-ডাল-মাস—এর বাইরে কিছু চেয়েছেন কি মশ মাইল দুবে বাতায়তের নাম মাত্র খরচাটা হুজু থবে নেবে—এখানকার বেশির ভাগ লোকেরই ভুতু বাবু ভরসা।

ভুতু বাবুর ঠেল সান্না দেখেছে। নামটাই জানত না। অবনী বাবু ঠাট্টার ছলে বললেন, তোমাদের ভুতু বাবু ছাড়া গতি কি? পাগল সর্দারের সঙ্গে তো আর ভাব হয়নি তোমাদের—তার লোক প্রায়ই বাড়ি বসে সন্টার মাছ পর্যন্ত দিয়ে যায়। শীগগিরই আবার গল্পও বোগাড় করে দেবে বলেছে।

নরেন চৌধুরী সখিম্বরে তাকালো সান্নার দিকে। গোল? গোল কি হবে?

অবনী বাবুই জবাব দিলেন, একটু খাঁটি দুধ না পোয়ে আমার শরীর দিনকে দিন কত খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছেন না?

হাসতে লাগলেন তিনি। নরেন চৌধুরীও। সান্না বলল, বেশ বাও, ওই ভুতু বাবুর হোটেল থেকে হু'বেলা মাস ভাত আপনিয়ে খেও এবার থেকে। হেসে ফেলল, মাগো কি নাম, ভুতু বাবু!

হাসিখুশি আয়োজনপ্রিয় মান্নব নরেন চৌধুরী। পদমধার চাললেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি। দেখছে চেরে চেরে। সেই ক্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে বাইরে মিল নেই বটে। কিন্তু ভিতরে যেন আছে। বলল, না আমাদের ভুতু বাবুর থেকে আপনার পাগল সর্দার অনেক ভালো, মাছের ক্রাই খাওয়ার পরে সে কথা আমি একবাক্যে বলব। মড়াইয়ে ওদের মধ্যে প্রাইই আপনাকে ঘোরাতুরি করতে দেখি, ওরাই আপনার ফ্রেণ্ডসিক বুঝি সব?

—তাই। অবনী বাবু সার দিলেন, তুমি আর ক'জনকে চেনো, ও সকলকে চেনে।

—তিনিই তো। সান্না জোর দিয়ে বলল, ওদের অত অহঙ্কার নেই ভজলোকদের মত, ওরা খুব ভালো।

—সত্যি কথা। নরেন চৌধুরী সমর্থন করল, আর ওই সর্দারটি ভায়ি খাঁটি লোক।

পাগল সর্দারের প্রশংসা শুনে সান্না খুশি হ'ল। বলল, তার মুখে আপনারও খুব স্তখ্যাতি শুনেছিলাম একদিন। প্রথম দিকের মড়াই বাখার গণ্ডগোলার সময় কারা সব আক্রমণ করেছিল ওকে, আপনি নাকি তখন 'ফুটুক' তোলার হস্ত দিয়ে ভর দেখিয়ে তাদের তাড়িয়েছিলেন।

নরেন চৌধুরী হাসতে লাগল।—সে একটা দিন গেছে, বাবল তো শেষে হাস ছেড়ে দিয়ে চলেই বাবে কি না ভাবছিল।

—বাবল কে? সান্না উৎসুক হল।

অবনী বাবু বললেন, বেশ, এখানকার চিকিৎসিনিয়ার বাবল গাঙ্গুলির নাম শুনি নি?

শুনেনা। অনেক শুনেনা। মায়ুগটির প্রতিও বিশেষ একটা সম্রমেশানো কোঁতুল আছে। এতবড় এক দায়িত্ব বার, এত অজুগ লোক কাজ করছে বার নির্দেশে, কতবড় একজন সে না জানি! তাকে দেখিনি, কিন্তু দেখার আগ্রহ অপরিহার্য। তার কাজের গল্প শুনেছে। তার গুরু-গাভীর কথা শুনেছে। বাবাকেও কতদিন হস্তদস্ত হয়ে ছুটে দেখেছে চিকিৎসিনিয়ার ডাকছে শুনে। সেই বাবল গাঙ্গুলিকে কালু-ভুলুর মত শুধু বাবল বললে সান্না চট করে ধরবে কি করে?

অবনী বাবুই বললেন আবার, বাবল গাঙ্গুলি নরেনের খুব বন্ধু জানিসনে বুঝি—সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওরা একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে কাজও করেছে তারপর। উনিই তো চোটচিরি করে নরেনকে নিয়ে এসেছেন এখানে।

ছন্দপতন ঘটল যেন। সান্না নরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—ও মা, তাহলে তাঁর বয়েস কত?

মনে মনে সান্না চোখ দিয়ে কল্পনা করেছিল সেই লোকটিকে, তাতে তার বয়েসের হিসেব কোন সংখ্যাতাই হয় না বোধ হয়। হু'জনকেই হেসে উঠতে দেখে লজ্জা পোয়ে গেল। একটু বাবে নরেন বলল, আপনার নিরাশ হবার কারণ নেই, ও লোকটার আসল বয়েসের কোন গাছ পাখর নেই।

সঠিক বুঝল না সান্না। চেরে রইল। অবনীবাবু প্রশংসাপরিবর্তন করে ফেললেন।—এসব কথা থাক এখন—এ ও সারারাত বসে শুনতে পারে। কিন্তু তুমি সেই থেকে ওকে আপনি আপনি বলছ কি, ও কত ছোট—তুই কি রে সান্না!

এতটুকু ক্রক পরা দেখেছে, আপনি করে বলতে নরেনের কেমন লাগছিল সত্যিই। কিন্তু তুমিও বলে উঠতে পারছিল না চট করে। অবনী বাবুর কথায় এবার সর্কোতুকে তাকালো সান্নার দিকে।

বাবার অমুযোগে বিজ্ঞ হাতে সান্না জবাব দিল, ডাকলে কি করব—বেশ নতুন নতুন লাগছিল শুনতে, তুমি দিলে বোধ হয় সেটুকু পণ্ড করে।

জোর হাসিতে তার ভরে তুলল নরেন চৌধুরী।—বেশ লাগছে সেটুকু আর পণ্ড করি কেন, আপনি—আজ্ঞে করেই বলব তাহলে—

সামান্য টেনে টেনে জবাব দিল, নাঃ, এর পর আর কি করে হয়, বাবা যখন পশু করে দিয়েইছে—

বাবার আগে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আলু-বেগুনের কাটলেট খেতে আবার কবে আসছি ?

—ভারী তো, রোজই আসুন না।

রোজ না হোক, মাঝে মাঝেই এর পর পূর্ণাৰ্ণ ঘটতে লাগল নরেন চৌধুরী। আসলে এই আশাতেই তার প্রথম দিন আগা।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি মেয়ে মড়াইয়ের বৃকে এক দলল কলো মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কে না দেখেছে ?

গুপ্তপ্রস্থি গিরিকঙ্কর মতই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক মেয়েকে অবাধে বিচরণ করতে কে না দেখেছে ?

পাহাড়ী পথের উঁচু নীচুতে দিনের মধ্যে ক'বার করে নারীসেহ-বন্দিনী এক বৌবন-তবলার ঠোঁট নামাই বা কে না দেখেছে ?

এই দেখার খবর শুধু সামান্যই রাখে না। নরেন চৌধুরীও আর সকলের মতই দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক দিন। ওই ফল, নীরস পরিবেশে সে দৃঢ় যেন এক মস্ত যিলকি। অজ্ঞাথর, যোগবৃত্ত পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার ডাকফুসমান নরেন চৌধুরী সাধারণ এক ওভারসিয়ার অবনী বাবুর সঙ্গে এত আগ্রহে পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নিত কি না বলা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন গাছেরও সবুজ পত্রালাতে একটা মিল চোখে পড়ে। সেটা পাতার নয়, সবুজের। বগের মধ্যেও তেমনি বোধকরি মিল আছে পানিকটা। সেটা বয়সের নয়, মনেরও নয়, সজীব তাকুণ্যের। সেমিক থেকে ছুঁজনেই এরা অনেকটা সমগোত্রীয় ছেলেমানুষ।

পরিবেশও অমূল্য। এই পাহাড়ী রুদ্ধতার আর যাই থাক, সাক্ষীর্গতা কম।

অবনী বাবু ঠাট্টা করেন, এবারে বত খুশি ডায়ের গল্প শোন।— সামান্য হুখে আগ্রহ দেখার না কিছু। বরং ঠোট উল্টে বলে, ভারী তো হচ্ছে তার আবার গল্প।

মগেন জবাব দেয়, কি হচ্ছে বুঝলে মেয়েবাই ইঞ্জিনিয়ার হত। সামান্য বলে, মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার হলে ভুতু বাবুৱা রান্নাঘরে চুকত। চুপচাপ শিশুদের ওঠে নরেন, বাপরে বাপ !

এই ভোক্তা-রসিকতার ভিতর দিয়েই এমন অল্প সময়ে এত অজ্ঞরল একজন হয়ে উঠেছে সে। কখনো এসে হাত পা ছড়িয়ে বলে পড়ে এমন, যে মৃতি দেখে চেপে ফেলে সামান্য। নরেন চৌধুরী জ্ঞাত হুখের ইস্যায় জানায়, রসদ কিছু না পড়লে নাড়ী ছেড়ে গেল বলে। কখনো নিজেই আবার হাতে করে নিয়ে আসে কিছু। বিশেষ করে ছুটির দিন। বলে, এটা করো, ওটা রাখে।—

প্রথম প্রথম সামান্য অমুরোগ করেছে, পরে রাগ দেখিয়েছে।—কিছুই করব না, এসব নিয়ে ভুতু বাবুর কাছে যান, যেনে দেবে।

বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন চৌধুরী।—ওই একটা লোককে মাঝে মাঝে আমার খুন করতে সাধ বার।

ভিতরের লাগুয় মোড়া পেতে দেয় সামান্য। নরেন গ্যাট হয়ে বলে খাবার তৈরী করা দেখে তার। আর নীরব প্রতীকার সিগারেট টানে। অবনী বাবুর জন্তে পাঁচবার করে লুকোতে হয় একটা সিগারেট। ইঞ্জিনিয়ার নরেন চৌধুরী লুকাতে না, দেশের

ছেলে নরেন লুকোয়। অজ্ঞলোক আড়াল হলে সামান্যকে তুলিয়ে টিপ্তনীও কাটো তায় উচ্ছে। সামান্য কখনো হাসে, কখনো শাসায়, পাঁড়ান বাবাকে বলছি।

সামান্যর হালকা তর্জন হরত অবনী বাবুই তনে ফেলেন। আবার এসে পাঁড়ান তিনি।—কি বলবি ?

জবাবে সামান্য আবারও হেসেই ফেলে। নয়তো বলে, এই ক'টা খাবার আবার তিন ভাগ হবে বলে নরেন বাবু দুঃখ ক'চ্ছিলেন।

অবনী বাবু হেসে বলেন, তা ওকে দে না বেশি করে—

চলে গেলে নরেন ভুতু কুঁচকে ভাকায় সামান্যর দিকে।—আমাকে কি ভেবেছ তুমি ? আমি রীতিমত উপোস পৰ্ব্ব করতে পারি জানো ?

—জানি।

—জানো কি বকম ? খাবড়েই যায় নরেন।

—মকড়মির পেটে জল ঢাললেই কি আর মকড়মির ঠাণ্ডা হয়। উপোস তো করেই আছেন—

বুধাই যুৎসই একটা জবাব হাতড়ে বেড়ায় নরেন। মানুষটার আর এক অভ্যাস দেখে চেপে কুটিকুট হয় সামান্য। হাতীর দাঁতের কান-কাঠি দিয়ে তার কান শুভ্রভূড়ির আয়স উপভোগ করা। সারাক্ষণ সঙ্গেই থাকে ওই কান-কাঠি। স্পেহাল অর্ডার দিয়ে করানো নাকি ? হাতে যখন সিগারেট নেই, তখন ওটা আছে। সন্তর্পণে কানের খুঁড়ে ঢালায় করে দিয়ে একটু একটু নাড়ে, আর গলা দিয়ে কুড় কুড় করে শব্দ বার করে একটা—আমোজে চোখ বুজে আসে।

সামান্য এ নিয়ে হাসি ঠাটা কম করেনি। শাড়ীর আঁচলের কোণ পাকিয়ে সেটা নিজের কানে গুঁজে দিয়ে অম্লকরণ করেছে তার সামনেই। গলা দিয়ে ওর মত শব্দ বার করতে গিয়ে হেসে গড়িয়েছে।

নরেন বলে, খুব হাসো, অভ্যাগট হলে দেখবে কত মজা !

—কি মজা ?

—একটুখানি কানের তথির করেই দুনিয়াটাকে দার্শনিক চোখে দেখার মজা।

—দার্শনিক চোখে যানো ?

—দর্শন বোঝো ?

হু' চোখ টান করে সামান্য তাকায় তার দিকে।—এই তো আপনাকে দর্শন করছি।

দর্শনতত্ত্ব আর বোঝানো হয় না নরেন চৌধুরী। অজ্ঞাতো নিজেরও সে ছুল দর্শনেরই পাঠ নেয়। সে দর্শনের খাদ ভিন্ন।

কিন্তু ডায়ের কর্পরিবেশে এই মেয়েরই আবার আর এক ধরণের অবিচ্ছিন্ন স্রষ্টা এক বোত্‌হল দেখে নরেন চৌধুরী বিম্বিত হয়েছিল। গঠন-বাস্তবিকতার প্রতি কোন মেয়েরই এ ধরণের আগ্রহ থাকার কথা নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। বুদ্ধির অগম্য কিছু দেখলে না জেনে নেওয়া পর্ব্বত বস্তু নেই। এই বিনীততার পরে সামান্য শুধু পাঁওতালসের এলাকাতো নয়, সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়। ধী করে চেয়ে চেয়ে অতিক্রম বুল-ডাকায়ের মাটি সবানো দেখে, ডেকার দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে সেডেল করার প্রক্রিয়াও নীরস নয় তার চোখে। নিরাপদ হাফমানে পাড়িয়ে দ্রুত দ্রুত ককে হয়েই গিয়ে তিন-পাশ তলা

সন্ধান উঠতে অতিকার এক একটা পাখর তোলা দেখে। ওই দড়ির মত যন্ত্রটা ছিড়ে গেলে কি মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে ভেবে কণ্টকিত হয় মনে মনে। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার পর, বাক্য ছেঁড়েনি। কিন্তু আবার নেমে আসছে ভটা, আবার একটা ফুলবে। প্রত্যেক বারই যৌনমত ভয় হয় তার। চানিং যেদিন করে জল দিয়ে সিমেন্ট বালি আর পাখর-কুচি মেশানোর ব্যাপারটাও যেন এক সর্কোভূক পর্ববেশের বস্ত্র। আর অবাক লাগে, আর্থ-হোয়ার দিয়ে মাটি কোঁড়া দেখে। নদী বন্ধেরও আশি, নববৃষ্টি, একশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে পাখরের স্তর বার করতে হবে। সেই স্তরের ওপর ঠাঁড়াবে পাকা পাখরের দেয়াল। নরেনের মুখে সেই দেয়ালের ফিরিঙ্গি শুনে সাধনার বিষয়ের শেষ নেই। নদী বন্ধের নীচে থাকবে একশ ফুট, ওপরেও প্রায় তাই—ওটরা হ'বে পকাশ বাট ফুটের মত। ওপরের দিকে সেই দেয়ালের ভিতর দিয়ে চলাচলের পথ থাকবে এপার ওপার—স্বপ্নাতি থাকবে অস্ত্র, এক একটা সুইচ টিপলে এক একটা লক সেট উঠবে, নামবে—।

লক গেট কি ?

আগাগোড়া নিটোল দেয়াল দিয়ে জল আটকে বসে থাকলে আর জল পাঁবে কেমন করে লোকে। গেট থাকবে পনের বিশটা। গেট খুলে দিলে জলে জলময় হয়ে বাবে অস্ত্র দিক, আবার গেট ফেলে দিলেই সব বন্ধ।

সাধনার যেন বিশ্বাস হয় না। দেয়ালের এদিকে অবরুদ্ধ হয়ে জল উঠবে পকাশ বাট সত্তর ফুট উঁচুতে। তারপর এক-একটা গেট খুলে দিলে কত জল আছড়ে পড়বে অস্ত্র দিকের শুকনো অতলে—তার মুখে পড়লে একগলে হাজার হাজার হাড়গোড়ও নাকি গুঁড়িয়ে বাবে পলকা খেলনার মতই। নালা কেটে কেটে সেই জল নিয়ে যাও যেখানে খুশি, যেখানে দগরক। শুধু তাই নয়, ওই শুকনো দিকেরই একশরে আবার বিদ্যুৎ তৈরীর ব্যবস্থাও হবে নাকি। জল থেকে বিদ্যুৎ হয় এরকম একটা কথা অবস্ত শোনা ছিল সাধনার। কিন্তু শোনা কথার আর চোখে দেখা রোমাঞ্চে রাত দিনের পার্থক্য।

সাধনা ভাবতে পারে না সবটা। এ যেন এক আজব কারিগরীর কণকথা। স্বপ্ন-সম্ভবের মহড়া। ওরা কাজ করে। সাধনার মনে হয় বিশ্বকর্মার দূত বৃষ্টি ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও মনে হয়। এই গঠন-সমারোহের সর্বপ্রধান যে, এই গঠন-অভিযানের নায়ক যে মানুষ।—চিক ইঞ্জিনিয়ার বাল্ল গাঙ্গুলি। দূর থেকে মাত্র একটিবার তাকে দেখার লোভ যে কত, সে শুধু সাধনাই জানে। হিরো-ওয়ারসিপের যুগ নয় এটা। কিন্তু বড় দুনিয়াও বড় অর্থ আছেই। সাধনার ছোট পরিসরে এত বড় আর কে ?—কলের মানুষ। কলের মতই অধিশ্রান্ত কাজ করে নাকি। পরিচিত জনেরা বলে। তার বাবা, নরেন বাবু এমন কি পাগল সর্দারও প্রায় ওই কথাই বলে। তাদের চোখে দেখা, কাছে দেখা মানুষ। সাদা কথা সাদা অর্থই বলে তারা। কিন্তু শুনে সাধনার সঙ্গম বাড়ে আরো। নৈটিক দৃষ্টি বাড়ে।

এই ডায়ের কাহিনী শুরু থেকে শুনতে বসলে, বিশেষ করে পাগল সর্দারের মত একজনের মুখ থেকে শুনতে বসলে শুনবে বা, এক কথার ভাঙে এ্যাডভেচার বলা যায়। সাধনা তাই শুনেছে। বিশ্বাস করেছে। রোমাঞ্চিত হয়েছে। পাগল সর্দারের এ্যাডভেচারে

অত্যাড়ি খুব না থাকুক, আবহাওয়া স্বজনের মালমশলা কিছু থাকাই স্বাভাবিক। দিদিয়ার বিষয়বিবরণ দুটো বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে তার বলার বোঁকে সেই এ্যাডভেচারের নায়ক বাল্ল গাঙ্গুলি মড ই কোন ছার, সাত সাগরের পারেও শেকল পরাতে পারত। কিন্তু সত্তর বর্ষমানে নিজের অগোচরে এই পাগল সর্দারের মনেই একটুখানি খেদ আছে বোঝা যায়। এখন রাত্তা হয়েছে, কোয়ার্টার হয়েছে, আপিস-ঘর হয়েছে, কিপ-ট্রাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানও এসেছে খানিকটা। বর্ষমানের এই আপিস-আবহাওয়াটাই সর্দারের পছন্দ নয়। পাহাড়ে পাখরে, জলে-জঙ্গলে বিষ উত্তরপের একান্ততার মড়াইয়ের নায়ক ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু সে এ্যাডভেচারের নায়ক আজ আপিসের বড় সাহেব। বড় সাহেব কখার তারপার্শ্ব একটু একটু যেন বুঝতে শিখেছে। তার সাক্ষাতও বড় একটা পায় না আজকাল। হুকুম আসে কাগজে-কলমে পাঁচ হাত ঘুরে। নীরস একটা ছকের মধ্যে পড়ে বাচ্ছে বলেই পাগল সর্দারের কাছেও কলের মানুষের মতই হয়ে উঠেছে বাল্ল গাঙ্গুলি। সাধনা ভাবে, কলের মত কাজ না করলে যন্ত্রণার স্রষ্টার এ্যাডভেচার যে অচল হয়, সে আর বুঝবে কি করে।

কিন্তু নরেনের কথা শুনে সাধনা তটস্থ। তার আগ্রহ দেখে ভাতের সঙ্গে ডাল মাখার মত করেই বলল, বেশ তো চলো না, বাবলের সঙ্গে আলোচন করিয়ে দিচ্ছি আজই—এখন বোধ হয় কোয়ার্টারেই পাওয়া বাবে তাকে।

—আলোচন করিয়ে দেবেন! আমার সঙ্গে ?

বিষয় দেখেই নরেনও অবাক হয় একটু। হেসে বলে, কেন সে বাথ না ভালুক ?

বাথ-ভালুক নয়, তবু শুনেই আড়ষ্টপ্রায়। সামনে 'গিয়ে ছ' পারের ওপর ভর করে সাধনা ঠাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কি না সন্দেহ। হ্যাঁ, আমি বাব তাঁর সঙ্গে আলোচন করতে, আপনি যেন কি ?

এ রকম অনেক সময় অনেক কথা হয়েছে আরো। সাধনা ছেলেমানুষের মতই জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা, আপনিও তো তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, আপনি তাঁর মত চলেন না কেন ?

নরেন হালকা জবাব দেয়, সবাই তো ছুল-বলেছে পড়ে, সবাই প্রাইম মিনিটার হয় না কেন ?

বুঝতে চেষ্টা করে সাধনা বলে, ভিতরে খুব বড় একটা কিছু থাকা দয়কার, না—?

ছন্দগাঙ্গীর্ষে নরেন চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ, হিমালয়ের মত বড় একটা কিছু।

—বাবু, আপনার কেবল ঠাট্টা।

এবারে কিছুটা আত্মরিক ভাবেই বলে নরেন চৌধুরী। পাশ কন্ডার পরেও হাতে-কলমে কত কাজ করেছে, তা ছাড়া যিলেছে গেছে, জায়াগীতে গেছে।

—আপনিও পোনের না কেন ?

—গেলে কি হত ?

—বেশ হত।

কি বেশ হত, আর না গিয়েই বা কতটুকু হয়েছে, সে সবটা সাধনার সুশ্পষ্ট ধারণা নেই কিছু। প্রথম আলোচনের সময় বাবুল মুখে তার বড় চাকরীর কথা বা শুনেছিল, এক দিনের ঘনিষ্ঠত

তার ওপর গেছে। বড় মানে আর কত বড়। তাই সত্যিই ও ভাবছিল, বেশ হত নরেন চৌধুরীও তেমন বড়র মতই বড় একজন হলে। আর বেশ হত, তখনও তার সঙ্গে যদি সহজ আলাপ-পরিচয় থাকত এরকম।

এই সাদাসিধে মনোভাব জ্ঞাপনের ফলে নরেন চৌধুরীর একটু সুর হওয়ার কথা। কিন্তু স্পষ্ট সহজতার একটা হালকা নিকট আছে। বা মনকে বিতরণ করে না; বরং টানে। চেস্টেই জবাব দিল, হুঁতাগা আমার। কিন্তু এখন সেখানি, বারল গাছুলির সঙ্গে তোমার আলাপ করতে না যাওয়াই ভালো।

—কেন? মা থাক, সাধুনার আগ্রহ কখনই।

—তারও মাত্র হুঁটা হাত, হুঁটা পা, একটা মাথা, হুঁটা চোখ—।

—প্রায় আপনায় মতই? নিরীহ অতিথ্যিক।

কুকু কুঁচকে কেলে নরেন চৌধুরী। প্রায় মানে! আমার কি ওগুলো ঠিক ঠিক নেই নাকি?

জল করতে পেরেই সাধুনা খুশি।

ছয়-কোশে নরেন মাটির কাছে হাত এনে বলল, তোমাকে এতটুকু ক্রক পরা দেখেছি জানো?

প্রোফর কৌতুকে সাধুনা কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে। পরে কীরে জিজ্ঞাসা করল, সেই আপনিও হাকপ্যাট পরতেন এখন?

বুহু বুদ্ধ হাসতে থাকে নরেন। হাকপ্যাট তো এখনো পরি।

—আপনার হাকপ্যাটের বয়েস তাহলে পেরোয় নি এখনো।

আমার ক্রকপহার বয়েস অনেককাল গেছে।

আবারো জল। খুশিভরা চোখে চেয়েই থাকে নরেন চৌধুরী।

পরে বলে, জিভের ডগায় যে সরস্বতী ঠাকরোন বসেই আছেন দেখি! লেখাপড়া শিখলে খুব ভালো করতে তুমি।

সাধুনা বর্ষা লজ্জা পেয়ে যায় এবার। লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলে

মাসির বাড়িতেও সে হাল্লাখের পালির বাঁচত। এ ব্যাপারে তার বত লজ্জা তত স্কেত। অবনী বাবুর সামনে নরেন আর একদিনও কি কথায় ওয় লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল। সাধুনা তৎক্ষণাৎ প্রোহান করেছে সেখান থেকেও। কিন্তু বাবা ওমিকে উৎকল্ল মুখে তার হেলেবেলার পড়াশুনার গল্প কৈদে বসেছেন তাও কানে এসেছে। এক এক সময় হিড় হিড় করে টেনে এনে পিঠে স্তম্ভম ফিল বসিয়ে ওর মা পড়তে বসাতেন ওকে। কিন্তু তিনি আড়াল হলেই চুপি চুপি ও উঠে আসত বাবার কাছে। মুখখানা হতটা সম্ভব করত বাবার একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকাত। অর্থাৎ, দেখো তো গাটা গরম টরম লাগছে কি না। নরেন জির বার করে দেখাত বাবাকে—কোন রোগের উপসর্গ যদি বার করা যায়। বোগ ঠিক না হোক, বোগ-সজাবনার উপসর্গ অবনী বাবুও অবধারিত দেখতে পেতেন। পড়া-শুনার অছাশন তার পরেও আর শিখিল না করে উপায় কি। কিন্তু সাধুনাই বিপদ বাঁধতো। আবাব সব তুলে খটখাৎনেকের মধ্যে হুঁচোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত পুকুরে ডুবে উঠে। মায়ের খঞ্জরে পড়তে হত আবাবও। বহি-উন্নিগণ থেকে তখন রেহাই পেতেন না অবনী বাবুও।

আড়াল থেকে স্তনতে স্তনতে সাধুনা লাল হয়ে ওঠে এক-একবার। আবাব রাগও হয় বাবার ওপর। খুব গল্প করা হচ্ছে এখন। তখন অমন আবাব না দিলে ঞাজ এরকম হত।

পরে খেতে বসে নরেন বলে, পড়াশুনার নিবুটি করেছে, বাবার বিজের তোমাকে ডটরেট দেওয়া উচিত।

প্রায় রাগ করেই সাধুনা জবাব দেয়, আর খাওয়ার বিজের আপনাকে মহামহোপাধ্যায় দেওয়া উচিত।

মেঘের কাটলে রোদের বলকের মত রাগের মুখেই হাসি ফুলকে ওঠে আবাব। [ক্রমশঃ।

### ভারতীয় রেলপথের ইতিকথা

ভারতের রেলপথসমূহ দৈর্ঘ্যে ৩৪ হাজার ৭ ম' ৫ হাইল।

ইহা এশিয়ার বৃহত্তম রেলপথ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ।

এই রেলপথের মধ্যে মাত্র ৫ শত ৫০ মাইল ছোট রেলপথ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধীন। বাকী সমস্ত রেলপথের মালিক ও পরিচালক হলেন সরকার। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন রেলপথসমূহের মধ্যে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান সোভিয়েট ইউনিয়নের রেলপথগুলির। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে চীনের স্থান ভারতের পরে, জাপান তারও নিচে।

এ বিষয়ে নীচে একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল :—

ভারত—৩৪,৭০৫ মাইল, জাপান—১২,৪৫৬ মাইল, চীন—১১,০০০ মাইল, ব্রহ্ম—১,৭৮৭ মাইল, পাকিস্তান—৭,৮২ মাইল, বুটেন—১১,১৫১ মাইল, কানাডা—৪১,১৫৮ মাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—২,২৪,৮১৬ মাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৫৩-৫৪)—১৩,৪১৩ মাইল, ফ্রান্স—২৫,৬০০ মাইল, অস্ট্রেলিয়া (১৯৫৩-৫৪)—২৬,৬৩৩ মাইল।

ভারতের আরও অনেক তুলনায় কিন্তু তার রেলপথের দৈর্ঘ্য বখেঁট নয়। এর আরও সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সরকার।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তুই ওরা ম'মার্তের ছোট পোতলার ঘরে সে আবার প্রত্যাবর্তন করল। গভীর অঘাঘসারে মর হ'লো চিত্তাক্রমে। একটা, দুটো, তিনটে ক্যানভাসে একসঙ্গে ছবি আঁকতে লাগলো। বিনাক্ষর শেষ যশি জানলার কাছে মিলিয়ে না বাওয়া পর্যন্ত সে তার ইচ্ছেদের সামনে উপস্থিত থাকতো একনিষ্ঠ সাধকের মতো। ক্রমবর্ধমান বেগ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সে ছবির পর ছবি একে বেতো। ম্যাডাম লুবে সবারপরের আংশ বিশেষ পড়ে পোনাতেন সেই অবসরে।

অপর্যায়ের নির্জনতা মাঝে মাঝে বেরনারায়ক হ'য়ে ওঠে। নির্জনতা কি করণ স্মৃতি দিয়ে গড়া। তমসাহস্র ঘরে স্মৃতিরা যেন চার দিকের স্বেচ্ছাল ডিঙিয়ে এসে চোখের সামনে ভাসতে থাকে, পাকে পাকে ঘিরে ঘরে তার সমস্ত চেতনাকে। স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পেতে, টুপি আর ফোট পরে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অর্ধহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। জনতার মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ অভ্যর্থনের স্তব্ধতার মন ভরে ওঠে। 'ব্লুভার্ড স্কিটিং' ব্রসারি তখন তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে হয়।

প্রায় সন্ধ্যাই সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসে। চোখের ওপর পর্যন্ত টুপিটা নামানো থাকে। চেরারে বসলে তার ছোট পা ছোটো মাটি স্পর্শ করে না, শূন্যে ঝুলতে থাকে। অবগাদ-ব্লাস্ট মনে এইভাবে সে দিনের পর দিন এসে বসে থাকে। তার চিরসঙ্গী ছড়িটা থাকে ঠিক পাশেই। সংসারপায় পড়ে, কাগজের ওপর ছোট ছোট স্কেচ করে, গ্রাসের ভ্রমে নিজের কুৎসিত মুখের ছায়া দেখে সময় কাটিয়ে দেয়। কি ভ্রমে এখানে এসে এই স্তব্ধ প্রতীকা, সে নিজেকে জানে না।

তার মা বলেছিল, সে এখানে নিঃসঙ্গতা অহুত্ব করবে। সত্যিই সে ভাবি একা।

একদিন সে কনিহাক আনতে কলসে তৃত্যকে। পান করল একবার, আরো একবার। আশ্চর্য পরিবর্তন বোধ করলো যেন। বিকৃত পায়ের জন্ত খেন বটল না। অন্তর্হিত হলো সব কষ্টদায়ক চিন্তা। বিকলাপ। কে বিকলাপ? কেন, সে তো একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এই মাত্র নাচছিল। চোখ নিমোদিত করে মেয়েটি তার

রূপালী  
পর্দার  
কমহিনী

মাথা হেনরীর কাঁধের ওপর রেখেছিল। নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছিল আবেগ ভরা হৃদ্যের আলিঙ্গনে।

একটা পোপন পুলকে সে আবিষ্কার করলো সে একজন জাত মন্তপারী। আশ্চর্য পরিমাণে এই তরল উত্তেজনা সে নিখিয়ে পান করতে পারে। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত খুশি হলো সে। কেউ কেউ পাহাড়ের উঁচু চূড়ার আবেগণ করতে পারে,—কেউ বা পারে ছ'কুট উঁচু ঘোড়ায় করে অন্যায়সে লাঞ্ছিত যেতে। আর সে পারে নিখিয়ে অপবাণ্ড পান করতে। তাছাড়া এই মাসকতার জন্ত কাজ হতো। তার সচেতন মনের ভয়ের জড়তা কেটে যেতো। নিঃসঙ্কে রূপবিলাসিনীদের কাছে গিয়ে আসন্নলাভের তৃষ্ণা পেয়ে আসতো সে।

ম'মার্তে কিংব আবার এক বছর পথ তার জীবন এই ভাবে কেটে যাচ্ছিলো। এই সময়ে এক সন্ধ্যার লা মিলিটন কাব্যবর্তে উপস্থিত হ'লে একটা নতুন গানের জন্তে কভার-ডিজাইন আঁকবার কয়মাস শেলো।

সাময়ক্রেয় ওপরে হেনরীর ছবিগুলো। স্মৃতি স্মৃতি লাভ করল।

মু লাঁ। রু ডু

মূল লেখক : পিয়ের লা মুর

হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেট লাতার অসামান্য সাক্ষাৎ লাভ করল। শিল্প-জগৎ এর আসে কখনো গানের বট-এর প্রচ্ছন্নপট নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এবার কিছ্র চেনারীর ছবিগুলো আশ্চর্য আনন্দ সঞ্চার করে দিলো।

‘পতিতাবৃত্তির বহুগুণ প্রাচীন সমস্তার ওপর তিক্ত কিন্তু মহৎ আলোকপাত’—‘ভবিষ্যৎসিংহা’র বিষয়কর অন্তর্দৃষ্টি ও অপরিচিত নিপুণ শিল্পীর অভ্যাস ‘স্পর্শ’ রয়েছে।’

সে নতুন নতুন গানের স্রষ্টা, পরিচায়ক স্রষ্টা অনেক ক্ষেত্রে আঁকতে লাগলো। এবং ‘থেকে’ অতেনা পৃথিক ও তাকে টুপি তুলে অভিনন্দন জানায়। ককসাক্ষর-এর বক্তাকিনীর বখন জানালা থেকে তার সঙ্গে কথা বলে, তখন তারের কণ্ঠে গর্ভিত আনন্দের বেশ তার কানে বাজে-ত থাকে। আশ্চর্য ভাবে’ গুরটোররা তার নাম জেনে নিয়েছিল। সবিনয়ে কাছে এসে ফরমাস নিয়ে যেতো। তার ছবি লোকে আনন্দের সঙ্গে দেখতো। আর অর্থপ্রাপ্তি না ঘটলেও সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলো সে।

শিল্প-ব্যবসায়ীরা তার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। কাকোতে যে সব লোক তার প্রতি এত দিন নজর দেবার সুযোগ পান নি, তারা টেবিলের কাছে বসে এসে বলেন—কমা করবেন, আপনিত ত’ ম’সিয়ে ত তুলো লোকে? আপনায় শেষ ডব্লি-এর জন্তে অভিনন্দন জানাই। অসুখ! সত্যি অসুখ! কি স্থল কাজ, কম বেথা ব্যবহারের কি আকর্ষণ চাহু? কোন ‘পানীর লাগবে কি? আসুন না, আনন্দের সঙ্গে খাওয়া বাক। হ্যাঁ বা বলছিলুম, আমি আপনায় একজন ভক্ত বলতে পারেন। আমি নিজেও একজন শিল্পী—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। হেনরী এখন বেশ সুখী। আগের চেয়ে অনেক, অনেক সুখী।

এক দিন সন্ধ্যায় লা এলিতে বসে সে একটা ক্ষেত করছে, এমন সময় এক অপরিচিত ভক্তলোক তার টেবিলের সামনে এসে ঝাঁড়িয়ে টুপি তুলে অভিনন্দন জানানো।

আমার নাম জিডলার, তিনি বললেন, চার্লস জিডলার। হেনরী ভক্তলোককে লেখে বললেন, আপনায় সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দিত হলাম, তারপর ক্ষেত করতে করতে বললো, আমার নাম জেনো লোকে? আপনিত বসে কিছু পান করবেন নাকি?

আগন্তুক আধাম করে একটা চেয়ারে বসলেন, না বস্তাবাদ আমি মইবার পান করছি। কিছুক্ষণ তাঁর হাত হুটো ধান উন্নয়র কাঁকড়ার হুটা টেবিলের ওপর পড়ে রইলো। একদৃষ্টে তিনি হেনরীর ক্ষেত লা দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, আপনিত ক্যানক্যান হুটা ছবি আঁকতে ভালবাসেন, না? আমারও ঐ ক্যানক্যানের জুতা ছবি পছন্দ হয়। এতে টাকাও আসে প্রচুর।

—ক্যানক্যান টাকা আছে?

—প্রচুর, জিডলার স্বীকৃতি-জ্ঞাপক ভাবে মাথা নেড়ে দিলেন। যে এর থেকে টাকা বোজগার করতে জানা চাই। প্রয়োজন হ’লে হুটা কমান্দালাইজ করতে হবে। তাববেন না, যে সবচেয়ে কথা গুটি তার কিছু আমি জানি না। হুড়ি বহুর প্রায় ঐই লাইনে গুটি। বর্তমানে ‘সারকিউ হিসোডোয়ের’ পরিচালক আমি। পরিচয়ের কার্ড বাড়িয়ে দিলেন হেনরীর দিকে। হেনরী বেশ চমকে উঠলো ভক্তলোকের কথায়, ব্যবহারে। প্যারিসের মধ্যে

সেই রাতেই ম’বার্তের রেগারিও কলকোহালে মধ্য জিডলার তাঁর প্রান হেনরীর কাছে ব্যক্ত করলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি তাঁর বিয়ারের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আর একহাতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলেছিলেন, প্রায় এক বছর ধরে আমি একটা নতুন কিছু সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। বিচিত্র কিছু একটা বা আমাকে প্রচুর টাকা এনে দিতে পারে।

—ক্যানক্যানই কি সেই টাকা এনে দেবে মনে করেন?

—হ্যাঁ, শান্ত সম্মতিতে জিডলার মাথা নেড়ে জানান, ক্যানক্যানই আমাকে লক্ষপতি করবে।

একসঙ্গে তারা পান করলো।

ক্ষত ভদ্রীতে জিডলার তাঁর বিয়ারের গ্লাস টেবিলের একদিকে সরিয়ে রাখলেন। বললেন, আগামী বসন্তকালে প্রদর্শনী আরম্ভ হচ্ছে। হাজার হাজার লোক প্যারিসে জমায়েত হবে। তারা সেখানে করবে কি?

—প্রদর্শনী দেখতে যাবে মনে হয়।

হ্যাঁ, তা ত’ বটেই। তারা যে উঁচু মীনায় তৈরী করছে, তার ওপর উঠবে। বোকার মতো নিগ্রো, চীনাম্যান আর সাংড়ের দিকে ক্যালক্যাস করে দেখবে। দেখবে তাতি আর উট। কিন্তু তা ছাড়া কি করবে? তারা সন্ধ্যা কাটাতে কি ভাবে?

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক’রে অগ্নি সংযোগ না করেই হুখে চেপে ধরলেন।

শেখুন, তিনি বলতে লাগলেন, সাধারণ লোকেরা অসুখ। তারা নিজেরের সমস্তে হুট নর। তারা কৌতুক সৃষ্টি করতে পারেনা। তাদের জন্তে কৌতুক সৃষ্টি করতে হবে। তারা আনন্দ চায়। কৌতুক চায়। আর কৌতুক মানেই মেয়েছেলে। বহি কুড়ি বছর ধরে এ পথে থেকে আমি কিছু শিখে থাকি তা এই। জনসাধারণের পক্ষে মুখামি হ’লেও কথাটা সত্যি। তাই বলছিলাম নাচ অর্থাৎ ক্যানক্যানই একবার তাদের কৌতুক দিতে পারে, আর আমাকে দিতে পারে প্রচুর টাকা।

—কিন্তু কি ক’রে?

—কি ক’রে? বলছি এক এক ক’রে সব। প্রথমে আমি সমস্ত মেয়েদের বার লা এলিতে ক্যানক্যান নাচ করে তাদের টাকা দিয়ে ভাড়া ক’রে আসবো। বিশেষ ক’রে সেই সন্ধ্যার মেয়েটি যে বেশ মজার খোঁপা ধীবে।

—লা ওল?

—তার নামটা আমি ঠিক জানি না, তবে সে মেয়েটি নাচতে পারে বেশ। মনে হয় সে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। তারপর সকলকে পাওয়া গেলে জারগা ঠিক করবে। একটা বার থাকবে সেখানে। আর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।

—প্রদর্শনী? নাচঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

হ্যাঁ, লোক তো আর সারাক্ষণ নাচতে পারে না। অল্প আনন্দও মাঝে মাঝে চাই। নিয়মিত প্রদর্শনী করবে তাই। আর সেটা রকমকর ওপর নয়। মেয়েদের পা লেগতে আর টেলিকোপ ব্যবহার করতে হবে না। নাচঘরের মাঝখানে কোন জারগাত করবো, হাতে সকলেই সহজে দেখতে পার। প্রথমতই লোকেরা বখন

আসতে থাকবে মুকটে গিলবার্ট তাদের গান শোনায়ে। গিলবার্ট-এর নাম শোনেন নি ?

হেনরী মাথা নাড়িলে।

আচ্ছা, শীঘ্রই স্তনতে পাবেন, জিভলার বললেন। আমি তাকে প্রথম আবিষ্কার করি একটা কাকের কনসার্টে। মেয়েটির প্রতিভা আছে। নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্নলিখিত চোখে সে যখন গান করে তখন মাথার চুল ঝাড়া হয়ে ওঠে। তারপর দর্শকদের কয়েকটা নাচ দেখানো হবে—বাতে নাকি তারা মান, বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুফান হ'য়ে যখন পানীর ক্রমাস করতে থাকবে তখন তাদের জন্তে আছে এইটা। আপনি বোধহয় এইচ্যার নামও শোনেন নি ?

হেনরীর প্রত্নতত্ত্বের প্রতীক্ষা না করেই তিনি বলতে লাগলেন, সে একটা ভবন, বোকার মতো ছিল। কিন্তু এখন সে নাচতে আরম্ভ করলে সকলে আনন্দে লাগিয়ে ওঠে। এর পর থাকবে আরো কিছুক্ষণ নাচের ব্যবস্থা। তারপর আক্ৰোবাট দেখানো হবে। চিপোড্রোমে ওটা বেশ চলেছিল। এই দড়ির খেলা মহিলা দর্শকদের জন্তে। জানেন ত' তারা কি ধরনের। তারপর আরো কিছুক্ষণ নাচ—তারপর আরো দু' একটা ক্রীড়াকৌতুক। আর সবশেষে ক্যানকান নাচ। এই নাচ দিয়ে শেষ করার চেয়ে ভালো সমাপ্তি আর নেই, এটা স্বীকার করেন ত' ?

হ্যাঁ, এটা বেশ আকর্ষণীয়, স্বীকার করে হেনরী, অবশ্য পুলিশের দৃষ্টিও আকর্ষণ আকর্ষণ করতে সক্ষম করেছে, একটু হেসে বললো।

জিভলার আসলোনা চেপে যাওয়ার জন্তে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন ; বললেন, আপাতত আমি একটা পরিকল্পনা করছি।

আমি আপনার আশ্রয়বিধানের তারিখ করছি, আর বহালাধা সাহায্যও করব : নাচের কোনখানে তৈরী করবেন ঠিক করেছেন ?

এই ম'মার্চেই।

কিন্তু ভেবেছেন কি, আরো অনেক এ-ধরনের নাচের এখানে আছে ?

সেগুলো আমারই মতো হবে না। আমি আপনাকে জোর ক'রে বলছি, যে নাচের তৈরী করবো, সে রকম একটা স্থানজ্ঞানসিদ্ধির ব্যবহারি কোঠাও নেই। আমার নাচঘরের পরিকল্পনাই ভিন্ন রকম, অস্বাভাব্য। বাড়িটা পর্যন্ত নতুন রকমের হবে। আকৃতি হবে উত্তেজিত মতো। কারণ কি ? শুধু স্বাভাব্য রকমের জন্তে। উত্তেজিত বাইরে লাল রঙ দেওয়া হবে। কেন ? না, প্যারিতে একখানাও লাল রঙের বাড়ি নেই বলে। তাছাড়া লাল রঙ রাঙিয়ে খেলো ভালো ; মেয়েদের স্মরণ ক'রে তোলে আর পুরুষের বৃকে ভাগিয়ে দেয় বাসনার ছালা। আমেরিকা থেকে আনবো বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম। ছেলে দেওয়া হবে রক্তবর্ণ উজ্জ্বল আলো। লম্বাটল দূর থেকে তা দেখা যাবে। কি, মনে মনে এই ছবি দেখতে পাচ্ছেন ?

এই বলে একটু চুপ করে শূন্য এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জিভলার। বোধহয় মনের চোখে দেখতে লাগলেন রাঙির তামস পটভূমিকার রক্তবর্ণ আলোকমালায় ছবি। গ্রাস হাতে নিয়ে অবশিষ্ট পানীরটুকু পান করে ফেললেন।

তারপর সামনেই যখন এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, তিনি বললেন, আর ইন্ডেক ও আমেরিকার ভ্রমণকারীরা যখন প্যারিতে আসছে,

এই সময়, আমার সাত-আট মাস সময় দিন, আমি ক্রাশে রেড নাচঘর তৈরী ক'রে দেবো। আর ক্রাশেই বা বলি কেন, পৃথিবীর মধ্যে জেষ্ঠ হবে তা। আমি এর নামকরণ পর্যন্ত করে রেখেছি। খুব লাগসই নাম। বুঝতে পারছেন কি নাম দেবো এর ?

কনিয়াকের গ্রাসে চুমুক দিতে দিতে হেনরী জানায়, কি নাম হতে পারে আমার ঠিক করনা আসছে না।

—এর নাম দেবো মূল! রক্ত (Red Mill)। নামটা মনে রাখবেন। মূল! রক্ত! মূল! রক্ত!!

মূল! রক্ত খোলবার পর সেটা হেনরীর বাড়ির মতো হ'য়ে উঠলো সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'লো ; বা ধূসি স্বাধীন ভাবে করার কোর বাধা ছিলো না তার। সে ছিল সব নিয়মের ব্যতিক্রম। যখন ধূসি সে পাটি দিতো। ক্যানকান নৃত্যের মেয়েরা তার টেবিল খায়ে বসতো। তাদের প্রণয়-কাহিনী লোলাছলে বলে যেতো তার কাছে বার-বন্ধক সারা মন্তপানের অনিষ্টতা সব্বন্ধে দীর্ঘ বস্তু দিতো তা কাছে। এই ভাবে ৮১ এর আশ্রম বছর কেটে গেল।

তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি, হেনরী বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো। ঠাণ্ডা বয়ফের মতো বাতাস হাড়ে হাড়ে কীপুটি ধরিয়ে দিচ্ছিল। ওভারকোটের ডোলেট কলারটা গলার ওপু ভুলে দিলে। অতি কষ্টে দেহটাকে টানতে টানতে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। হাওয়ার বেগে সামনের দিকে ক'রে পড়ছিলো বার বার। টুপিটা চেপে ধরেছিলো এক হাতে। আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ টুকরো টুকরো ঝোড়ো মেঘের মধ্যে ডুব সাঁতার কেঁদে চলছিল। পথের ধারে একটা গাড়ি থুঁজে ফিরছিল হেনরী সর্বদা কোলাতলপূর্ণ এই লোকালয় এখন জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ হঠাৎ সে মুহূ পলক্ষনি স্তনতে পেলো। কে যেন পিছন দিক থেকে ছুটে আসছে। দেখুন—একটি মেয়ে পাশে এসে রক্তবর্ণে কিস্বি করে বললে দেখুন, দয়া ক'রে আপনি বলবেন আমি আপনাকে সঙ্গে আছি।

পরক্ষণেই অল্প একটা পলক্ষনি শোনা গেল। অন্ধকার খেতে একটা কঠিন হাত মেয়েটির মণিবন্ধ দুট ভাবে চেপে ধরলো। গম্ভী কঠ স্বয় শোনা গেল, তোমার কার্ড দেখাও।

মেয়েটি পা ছুঁড়ে, আঁচড়ে কামড়ে আক্রমণ করল আগন্তুককে পৃথক বর্ষভাবে মেয়েটির হাত মুচড়ে ধরলো। ব্রহ্মার চাঁৎকা করে মেয়েটি কঁকে শড়সো সামনের দিকে।

হাত ছেড়ে দিন, হেনরী প্রতিবাদ করলো, দেখতে পাচ্ছেন ও ওর কঠ হচ্ছে ?

লোকটি হেনরীর দিকে ফিরে তাকালো, বললো, এ মেয়ে একুশি একজনকে প্রলুব্ধ করছিল। এ সব ব্যবসার জন্তে কার্ড ধার ধরকার, জানেন তো ? তাছাড়া আপনিই বা এ ব্যাপারে দায় গলাচ্ছেন কেন ?

কি ক'রে অজ্ঞানলোক প্রলুব্ধ করবে ? সারা সন্ধ্যা ও এ আমার সঙ্গেই আছে। মিথ্যা কথা তার মুখে বতাসাংসারিত হা এলো।

সারা সন্ধ্যা সঙ্গে আছে, প্রতিক্রমির মতো লোকটি ব'লে ও ডকখা আমার কাছে বললেন না। আমি ওকে নিজে লক্ষ্য করছি

সে খামলো, তার কণ্ঠস্বরে এবার পরিবর্তন দেখা গেল, আপনি যদিও তুলো লোকের না?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এভাবে মানুষকে ভালাতন করলে আপনার নামে পুলিশের কাছে নালিশ করব।

পুলিশের কাছে? তা ভালো। কিন্তু আমি নিজেই যে পুলিশ।

তার প্রমাণ কি? পুলিশের গোবাক কই আপনার? আপনার নিদর্শন-পত্র দেখি?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকটি মেয়েটির হাত মুক্ত করে দিল। তারপর কোর্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললো, আমার নাম সার্জেট বলাধাকার প্যাভো, ভাইস ক্যোয়ার্টার কন্ট্রোলার। আমাদের যে ধরনের কাজ, জাতি গোবাক পরন্তে হয় না।

সে হাকসে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। আপনার সম্বন্ধে লাইব্রেরি অনেক কিছু শুনেছি। সকলে বলেন এ অফিসে আপনিই সব চেয়ে বিবেচক কর্মচারী। আপনার মতো কর্মচারী আমাদের আরো দরকার। কিন্তু আমার বিশ্বাস কখন, এ মেয়েটির সম্বন্ধে আপনি তুল করছেন। এ সত্যিই আমার সঙ্গে সারা সন্ধ্যা হয়েছে।

এক কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম।

এই অন্ধকারে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। এইতো এ দিকে এখন একটি মেয়ে দৌড়ে গেলো, তেনারী আঙুল দিয়ে সামনের পথ নির্দেশ করলো। মনে হচ্ছে আপনি তাকেই খুঁজছেন।

যদি সে ক্রম'কর্টার পথ ধরে থাকে তাহলে তার অঙ্গুদরন বুঝা—নিজের মনেই ছদ্মবেশী গোয়েন্দা বলে উঠলো। আপনাকে বিচক্ষণ করার জন্যে ত্রুটিবিশিষ্ট মসিমে তুলো। আমাদের ওপর এই রকম ধরপাকড়ের আবেশ আছে, বুঝলেন না? জনসাধারণের খাফা রক্ষা আর এই সব মেয়ের ওপর চোখ রাখা আমাদের কর্তব্য।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি খুব বুঝতে পারছি আপনার কথা। আচ্ছা, চলি যদিও প্যাভো। মেয়েটিকে ইঙ্গিত করলো, এসো আমরা বাই, সক্রিয় হ'য়ে যাই।

চুপ ক'রে হুঁজনে পথ চলতে লাগলো। পোহন দিকে সার্জেটের দুটি ভীষণ ভীষণ দুটি অমৃতব করত পাচ্ছিল। বলাধাকার ক্রতপনে টুটিছিল হেনরী। পার্শ্বচাষিীর চঞ্চল উদ্যোগনা তার মনে খেদ মিশ্রিত একটি অমৃতভূতি সৃষ্টি করছিলো। কিসের জন্যে সে এই মিথ্যার জাল মনে গেলো?

আপনি কি আর একটু জোরে চলতে পারেন না? দ্বিতীয় বার মনে মনে খেদে অমৃতবোগের কণ্ঠে জানালো সে, আপনার পায়ে কি হচ্ছে? তার কণ্ঠস্বরে সম্মেলনা নেই, বিবক্ষিত নেই, এমন কি স্ফুটনেরও বাস্পটু নেই, শুধু বিশেষ হওয়ার লক্ষণ একটা নীরস বোধ।

মেয়েটির মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়েছিলো হেনরী। এই কি শুধু তার ক্রুদ্ধতার ভাব?—আমি যে ভাবে হাঁটছি তাতে যদি অবস্থিতির মসিমে বাও না তুমি। পুলিশ চল গেছে। আমার সঙ্গে আর কোনো প্রয়োজন কি? আর কেউ অমৃতব করবে না।

আপনি কি এভাবেই ভ্রমোচ্চেন, না কি? একটু পরেই সেই

উদাসীন নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলো সে। আমি একজন লোককে জানতুম, তার হাত মেশিনে কাটা গেছিলো। তবে তার ভাগ্য ভালো ছিল, ইনসিওর কোম্পানী থেকে প্রায় পাঁচ শ' টাকা পেয়েছিলো। পেছনের দিক আবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, দরাক করে তাড়াহাড়ি চলুন।

ক কলার্করের মোড়ে গৌছিলো হেনরী একটা পথের ল্যান্সের নিচে দাঁড়াল।—

ভাখো এখানে এই হোটেল আছে, একটা মহলা বাড়ির দরজার ওপর আলোক, শুভের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে, সারায়ত এটা খোলা থাকে, এর একটা ঘর নিয়ে থাকতে পারো আজ রাত্তিরে। কাছে টাকা আছে তো?

এই প্রথম সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাবার অবসর পেলে। সুন্দরী বলা চলো। সে বতটা বয়স অনুমান করেছিল তার চেয়ে কম মনে হলো। বড় জোর আঠারো কি উনিশ। অন্ধকারে চোখ দুটো বাসের মতো উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছিলো, দিনের বেলায় বোধ হয় ক্রিকে বাসারী রং হবে। হোটেল একটু বড় আর ককশ মনে হ'লো। টুপি-কোটের বালাই ছিলো না তার। আর গাউনের তলায় নয় বলেই সন্দেহ হচ্ছিলো। অস্ত্রবাস বোধ হয় ছিলো না কিছু। একটুও শীতকাতর মনে হচ্ছিলো না তাকে। মোটা বহিঃবাসে তার উঁচু বুকুর গড়ন রেখায় রেখায় পরিষ্কৃত হ'য়ে উঠেছিলো। অনেকটা গ্রীক মূর্তির মতো। তার চেহারা দেখে অন্তত রক্ত, হীন আর সাংঘাতিক চরিত্রের মেয়ে ঠাহর হয়। তাকে দেখলেই মনে একটা উগ্র বাসনা সাপের মতো মনের নিভৃত গহবরে ফণা তুলে ওঠে।

আপনি কি এখানে কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

হ্যাঁ, এই পথেই একটু দূরে আমার টাউও আছে।

আপনার সঙ্গে আমার থাকতে দিন। এই প্রথম মেয়েটির কণ্ঠস্বরে নরম আর মিশ্র মনে হলো। একটা খুশির ভাব তার মনে সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। কোন অমৃতবিশেষ সৃষ্টি করবে না আমি, আর সকাল হ'লেই চলে যাবো।

অর্থনিমীলিত কটাক করলো সে হেনরীর দিকে। এর জন্যে আপনার অর্থব্যয় হবে না, ভয় নেই। সিগারেট আছে আপনার কাছে?

হেনরী তার সোনার সিগারেট কেসটা তার হাতে তুলে দিল। সে কেসটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সম্মেলন হাত বুলিয়ে নিলো একবার। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে হেনরীর হাতে ফেরত দিল।—বাঁটা সোনার তৈরী দেখছি। আমাকে একবার এক ভ্রমলোক এক জোড়া সোনার হুল দিয়েছিল, সেটা হারিয়ে ফেলেছি।—দেশলাই আছে?

হেনরী একটা দেশলাই জ্বালালো। দু'হাতের চোঁটায় গোল ক'রে আগুনের শিখাটিকে ঘিরে অঁকে পড়ল মেয়েটি সিগারেট ধরাতে।

আপনি কি কুৎসিত। দু'য় উল্লিঙ্গরশের কীকে কীকে বললো মেয়েটি। হেনরীর দিকে একদৃষ্টিতে দেখছিল সে। হেনরীর মুখ থেকে রক্তভা মিলিয়ে গেল। চিৎকার করে বললো, চলে বাও, তোমাকে আমার কোন দরকার নেই। চলে বাও আমার কাছ থেকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দরকার আছে। দেশলাই শিখা হুঁ দিয়ে নিখিয়ে



শান্ত কর্তে বললো, আমাকে আপনার দরকার আছে। আপনার চোখ মেটেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

এবার আমাকে যেতে দাও। মেয়েটির কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে হেনরী। আমাকে একলা যেতে দাও, নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো তোমায়।

অন্যায় পদক্ষেপে সে হেনরীর পাশে এগিয়ে এলো। আপনি চটছেন কেন? আমি শুধু ভিজেন্স করছি আপনার ঘরে আমাকে রাস্তারটার ভুলে থাকতে দিতে পারেন কি না? আমি আপনার কিছুই চুরি করবো না। আপনি বিকলাঙ্গ ব'লে আমার মনে করার কিছু নেই। আমি আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করবো।

চাঁদের আলোর সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের মধ্যে শূন্য নিস্তব্ধ পথে হেনরী নিশেধে হাঁটতে লাগলো। মেয়েটিও নাক-মুখ দিয়ে ধূম উল্লিখণ করতে করতে তার পাশে পাশে চলতে লাগলো। আপনার যখন টুডিও আছে তখন মনে হয় আপনি একজন শিল্পী। বাড়ির কাছাকাছি এসে মেয়েটি মন্তব্য করলো। আমি একজন শিল্পীকে জানতাম তিনি বোল রাবার ডিসের ওপর কিউপিডের ছবি এঁকেছিলেন।

ভায়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। গ্যাসের আলোয় হিস্‌হিস্‌ শব্দ হচ্ছিলো। দেয়ালের গায়ে আলোছায়ায় বাঘছালা পাতা যেন।

আপনি কি দরজায় তালো দেন না? হেনরীকে দরজা খুলতে দেখে সে ভিজ্জাসা করলো।

তালো দেবো কোন দুখে? চুরি কববার মতো কিছু ঘরে নেই। এখানে ষাড়াও, আলোটা জ্বালি।

পরিচিত অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে আলো জ্বলে দিল। মৃত ঘরের জীবন ফিরে এলো যেন। দেয়ালের চারিদিকে বিচিত্র রঙের ছবির সারি। ঘরের মাঝখানে একটা আলো গোলাপ ফুলের মতো দেখাচ্ছিল।

মেয়েটির চোখ অলসদৃষ্টিতে চারি দিক ঘুরে এলো। ঘরটা বেশ বড় তো। একি ষ্টোভটা জ্বলেছে যে! আপনি সারাক্ষণ ওটা জ্বেলে রাখেন নাকি?

সে জানালার কাছে গুরে এলো। তারপর নরম কোচের ওপর বসে পোষাক খুলতে শুরু করলো। ঘরে কাকুর অস্তিত্বে যেন ক্রক্ষেপ নেই। হেনরী তাকে লক্ষ্য করছিল। ষোড়া দেশলাই কাঠিটা তখনও তার হুঁআলুলের মধ্যে রয়েছে।

এই মেয়েটিই বোধহয় প্রথম তার টুডিওতে রাস্ত্রিবাশন করবে! —বেশ সুন্দরী দেখতে মেয়েটিকে!

—অমন করে প্যাটপ্যাট করে কি দেখছেন? বিভ্রান্তের মতো উল্লেখ চোখ তুলে এলো মেয়েটি।—কোনো মেয়েকে কাপড় ছাড়তে দেখেন নি এর আগে?

সিগারেটের টুকরোটা মুখ থেকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে বিমর্ষিত করলো। শিল্পী হিসাবে আপনি বেশী কথা বলতে পারেন না। হেনরী উত্তর দিতে অপারগ দেখে সে বলে যেতে লাগলো, যে শিল্পীর কথা বলছিলাম তখন, যিনি বোলের খালার ওপর কিউপিড এঁকেছিলেন, তিনি খুব স্বন্দর কথা বলতেন। ভালো ভালো গল্প বলতে আর হাসি ঠাটা করতে ওস্তাদ ছিলেন।

যে অজান্তে শিল্পী একদিন এই মেয়েটিকে কোঁকুকে আনন্দিত

করেছিল, হেনরী যেন মনে মনে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। কত বার এইভাবে মেয়েটি অপরিচিত ব্যক্তির লোমুপ চোখের সামনে মোড়া খালেছে। কত বিভিন্ন ঘরেই না বিচিত্র শব্দায় এই উনিশ বছরের মেয়েটি শয়ন করেছে!

টেবিলের ওপর ল্যাম্প ঠিক করে নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে সেমিকটা খুলে ফেললো সে।—আলো কি জ্বালা থাকবে!

—না, নি বয়ে দাও।

সে সামনের দিকে ঘুঁক পড়লো। একটা অশূর মনোহরণ ভঙ্গিমায় হাত ঘরিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। অদৃশ্য হয়ে গেল তার মুক্তি, শুধু একটা অস্পষ্ট ছায়া ঘরের নীল অন্ধকারে দেখা যেতে লাগলো।

—আপনার পা দেখতে পাবো বলে ভয় হচ্ছে?

কণ্ঠ ঘরে ঠাটার ঘুর হেনরীকে ক্রুদ্ধ করে তুলল।—বেরিয়ে যাও, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো সে, বেরিয়ে যাও তোমার কাপড়চোপড় নিয়ে, একুণি বেরিয়ে যাও যব থেকে। কোন দরকার নেই তোমাকে। তোমাকে আমি আসতেও বলিনি।

ও! সে যদি লম্বা আর জোয়ান হতো। যদি সার্কেট প্যাটার মতো হাতটা মুচড়ে দিতে পারতো কিংবা কবে একটা চড় মারতে পারতো গালে।

আন্তে আন্তে মেয়েটি বিছানার ওপর পাতা গায়ে দেওয়ার চানরটি তুলে শব্দায় মধ্যে প্রবেশ করলো।—আজো চাঁৎকার করবেন না, নরম হয়ে বললো সে। আপনার চাঁৎকাতে বাড়ির আর সকলের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি শুধু বলেছি যে, আপনি চান না আমি আপনার পায়ের দিকে তাকাই। আপনার পা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? আপনি বিকলাঙ্গ ব'লে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি ত' আগেই বলেছি যদি থাকতে দেন আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। আপনি আমাকে মনে হয় থাকতে দিতেই চান, তাই না?

যখন মেরী সার্কেট ঘুম থেকে উঠলো, তখন তুলো লোব্রেক ঈজেলের সামনে ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত। প্রস্রাভাত, সে বলে উঠল, রাস্ত্রিরে ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?

মেরী উঠে পড়লো। হুঁ হাত দিয়ে হাঁটু ঘিরে বললো। মাথা নেড়ে মুখের ওপর পড়া একগোছা সোনালি চুল মাথার পেছনে সরিয়ে দিয়ে বললো, সিগারেট আছে?

আবার বিস্মত হলো হেনরী। একটু ভয় চ'তে পারে না কেন মেয়েটা? যাক ও তো একুণি চলে যাচ্ছে।—আরাম-কোয়ার কাছে টলতে টলতে সরে এলো সে। ইচ্ছাকৃত হালসের সঙ্গে সিগারেটের সোনার সান্দ্রা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।—এবার উঠে পড়ো। দুপুর হয়ে গছে। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

—দেশলাই আছে?

ধূমপান করতে করতে সে বললো, আপনি এই সব ছবি এঁকেছেন? তার হুঁ চোখ দেয়ালে-টাঙানো ছবির ওপর ঘুরতে লাগলো। এ সব এঁকে কি করেন? বিক্রী করেন?

ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে মাটি থেকে মেয়েটির অন্তর্দ্বার তুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিলো হেনরী। এটা পরে উঠে পড়ো। আমার এখন কাজ করতে হবে।

সে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। ধূমপান করতে লাগলো।

দিনের ধূসর আলো তার মুখে এসে পড়েছে। তার চোখ দু'টি বেশ গাঢ় বাদামী রঙের। যে ভঙ্গিতে সে বসেছিল, সেই ভাবে একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছিলো হেনরীর। ভাবলো, বলে এভাবে বসে থাকতে খানিকক্ষণ। কিন্তু ইচ্ছা সাবরণ ক'রে নিলো।

—ওখানে ওঘরটা কি? সিঁড়ির ওপাশে ব্যালকনির দিকে লক্ষ্য রেখে জিজ্ঞাসা করলো মেরী।

—মানের ঘর।

—মানের ঘর।

চকিত আনন্দে শয্যাভাগ করে উঠে পড়লো মেরী বাথটব দেখে। হেনরী শুনতে পেলো, মেয়েটির আনন্দের অসুট উজ্জ্বল। রেলিং-এর দিকে ছুটে গিয়ে ক'কে পড়লো সে।

—দয়া ক'রে আমার একটু স্থান করতে দিন। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছোট্ট ছেলেব পুঁহল চাওয়ার মতো আগ্রহ। আমি বাথটব ভালো ক'রে পরিষ্কার করে লেবো, কথা দিচ্ছি।

—বেশ। কিন্তু দেবী করো না। হেনরী অসুস্থতি দিলো। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

বাথটবের ভলের উষ্ণতায় নিবিড় বিলাসে স্থান করতে লাগলো সে। আপনি যদি চান, খোসামুদির সুরে বললো, আমি আজ রাত্রিরও আবার আসতে পারি। ভালো হ'য়েই থাকবো আপনার সঙ্গে।

প্রোভেন—চতুর ইঙ্গিত, অজান্তে। গলা শুকিয়ে আসছে, হাড় হিম হ'য়ে যাচ্ছে বেন। ওকে বলো না, ব্যবরণ করে আসতে, তার মনের মধ্যে কে বেন বলতে লাগলো, ও শুধু তোমার ঠিঙিতে থাকতে চায়, ব্যবক্রম ব্যবহার করতে চায় আর চায় টাকা—তার মধ্যে আরেকটা কণ্ঠ, তার বিদ্রোহী আদ্যার কণ্ঠ বলতে লাগলো, আর একটা রাত্রি—শুধু একটা রাত্রি—

তার দ্বন্দ্বপ্পাননের দ্রুততালের সঙ্গে সে দু'টি পরস্পর-বিরোধী কণ্ঠস্বরের মনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলো। চশমা খুলে মুছতে মুছতে সে জানালো, নিজেকে মানিয়ে নাও এখানে। কাঁধ তুলে যে ইঙ্গিত করলো সে, সেটা স্পষ্ট। বললো, আমার কোন আপত্তি নেই।

একটি উজ্জ্বল দ্যুতি মেয়েটির চোখে খেল গেলো। তুমি তোমার নাম পর্বস্ত এখনো বলানি আমার। আমার নাম মেরী। তোমার?

হেনরী।

বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো।

জলে-খোওয়া স্বকল্পকে শাদা হাতটা বাড়িয়ে সে অসুযোগ করল, হেনরী, তোয়ালেটা দেবে আমার?

হেনরীর স্নানের ঘর মেয়েটির শ্রীহীন চটকসার জিনিসে ছেয়ে গেল। তার চিকুণী, কাটা ইত্যাদির সঙ্গে হেনরীর প্রসাধন সামগ্রী গিরে উঠলো সেখানে। সে হেনরীর ত্রাস, নরুণ, দামী সাবান ব্যবহার করতে লাগলো। হেনরী লিপিক্রক মাখা তোয়ালে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হলো। বখন তখন দেখতে পাওতো মেয়ের পূর্ণ বিশুদ্ধ মোজা, কোচের ওপর অঙ্গুষ্ঠাব 'পড়' আছে। হাউজারের গন্ধ নাক এসে লাগলো।

এ সব তার ভালোই লাগতো। এই প্রথম সে মেয়েদের গোপন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হলো। প্রস্তুত পক্ষে প্রসাধনের সময় দেখতে পেলোই মেয়েদের সব থেকে ভালো ক'রে জানা যায়।

এই প্রথম সে একজন গৃহকর্ত্রী পেয়েছে। না—কি তা নয়—আমাকে আবার আসতে বললে, এবার কিন্তু টাকা দিতে হবে, মেয়েটি সকালবেলার স্পষ্ট ভানিয়েছিল।

সে মেরীকে সাধারণ রূপবিন্যাসিনীদের মতো গ্রহণ করেনি। তার প্রেম যে টাকা দিয়ে কিনতে হবে ভাবেনি। ওর দেহই রূপ ব্যবসার একমাত্র মূলধন। ওর দেহ অর্থমূল্যেই ক্রয় করতে হবে, মুক্ত আনন্দে উপভোগ করার জন্তে ও নয়।

—যদি সারা রাত আমার থাকতে হয়, সে হেনরীর চোখে যেন উত্তরটা দেখতে পাচ্ছিলো আর মনে মনে একটা অলক্ষ্য মূল্যলিপির ওপর চোখ বুজিয়ে নিচ্ছিলো, তাহলে দশ স্বাক্ষর মিলেই হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই হেনরী হতাশ হলো, সে চেয়েছিল মেরীকে কাক্ষতে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। তাদের ঈর্ষান্বিত প্রশংসা উপভোগ করে। তার এট করুনা ভেঙে দিলো মেরী। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইনা আমি। শিল্পের সম্বন্ধে তোমাদের কথাব কচকি শুনে আমার লাভ কি? ও সব আমি একটুও বুঝি না।

হেনরীর সঙ্গে একত্রে মূল্য রক্তেও সে যেতে চায় না। ভৃত্যরা পৃথক্ যেখানে তোমার দিকে উপহাসের চোখে চায়, সেখানে আমি যেতে চাইনা।

হেনরী বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়লো। মূল্য রক্তে সন্ধ্যাবাপন একরকম বন্ধ হলো। ছবি আঁকার কাজ খেমে গেলো। পের কোটেলের কাছে বাওয়া বন্ধ করলো, সাংকে যে ছবি এঁকে দেবে বলেছিলো, শেষ করলো না সেটা। জিডলারকে মূল্য রক্তের জন্তে যে বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দেবে বলেছিলো ষাও তুলে গেলো। একটা অদৃষ্ট হাতের গুঁড় সঙ্কেতে তার জীবনের ধারাই যেন পাটে গেলো। তাদের অবৈধ প্রণয়লীলা গোপনতার অন্ধকাবে চলতে লাগলো। তাদের গুপ্তকাহিনীর দৃশ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। অস্তমুখী কোন চিন্তা ছিলো না তাদের। বিলাসী বেশভূষা করতো অলস ভাবে। কোন অপরিচ্ছন্ন স্থানে সেবে নিতো দিনের আহ্বার। ক্রমশঃ বারেই কেটে যেতো দিনের বৈশী ভাগ সময়। ধূমপান করে, মদ খেয়ে, পাশাপাশি চেয়ারে চুপচাপ বসে তারা রাত্রির জন্তে অপেক্ষা করতো। তারপর রাত্রির অন্ধকারে ফিরে আসতো ঠুঁড়িতে।

এই নতুন জীবনের প্রথম সপ্তাহে একশ'বার সে ভেবেছে কি করে সে সন্ত করছে এই মেয়েটাকে, কি ক'রে এর প্রভাবে এ ধরনের জীবনবাণন করছে। কি হলো আমার? সহস্রবার জুঁজু ভাবে আত্মপ্রশ্ন করেছে সে। কিন্তু পরিবর্তন তার পক্ষে ছিল আরো অসম্ভব। মেরীকে অতি আপনার মনে হতো। তার একহারা দীর্ঘ-দেহের প্রতিটি কণার ওপর তারই একান্ত অধিকার। প্রতি রাতেই সে মেরীর নয়নির্জন হাতের পর্শে নতুন ক'রে রোমাঞ্চিত হতো।—কখনো ক্র মোফেটারে গেছে? একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো মেরী। ঐখানে আমি জন্মেছি।

তার কথা শুনে হেনরীর মনে জেগে উঠলো একটা পুষ্টিগন্ধময়  
বস্তুর পরিবেশ আর সেখানকার মূর্তি দারিদ্রের বিবর্ণ অস্তিত্ব।

মেরী তার ছোটবেলার খেলার কথা বলতে লাগলো। ঠাণ্ডা  
ক্ষুধার্ত শনিবারের রাতে যখন তার মা-বাবা অতিরিক্ত মতপানে  
আহারপর্বের কথা বিন্দুত হতো, তার মায়ের হাতের প্রহার,  
পিতার কাছে শাস্তি আর পরকণ্ঠেই আদরের কত কথা সে শ্রবণ  
ক'রে বললো।

—প্রথমে দৌধ করলে বাবা আমাকে উত্তম মধ্যম দিতেন।  
তার পর সিঁদানায় মুগ গুজ যখন কাঁদতুম তখন চুমু খেয়ে আদর  
করতেন, কমা করতে বলতেন।

শ্রুতিকথা বলতে বলতে মারপাথে থেমে যেতো সে। ঘনীর  
শ্রুতি দর্পিত্রের যে বিবেচ্য, সেটরকম ঈশ্বার বক্রদৃষ্টিতে তাকাতো হেনরীর  
দিকে।—তোমাকে এ সব কাহিনী কেন বলছি জানি না। তুমি  
ক্ষুধা কি, কথানা তা অল্পভর করোনি, তুমি আমার কথা বুঝবে না—

হেনরীও এ বিষয়ে নিজে থেকে কোন কথা উপাণন করতো না।  
এক ঘণ্টা বা এক সপ্তাহের মধ্যেই মেরী আবার তাকে বিবাস করতো।  
যৌবন উদ্ভাবের সময় আশ পাশের তরুণদের সঙ্গে তার উজ্জ্বল  
জীবন-যাত্রা কাহিনী নিঃস্বচ্ছ বৃষ্টিগঠন ভাবে বর্ণনা করতো সে।

—একদিন বেস্ট-এর সঙ্গে দেখা হলো। একটা স্বপ্নাঙ্কুর দৃষ্টি তার  
হৃদোন্মে ঘনিষ্ঠে এসো! তাকে দেখতে বার্থা ম্লান ছিলো। মেয়েরা

তো তার কথার পাগল বললেই হয়। স্বতোৎসারিত একটা মিথ্যা  
যোগ করেছিল সে।—আমি কিন্তু তার দিকে একবারও কিংও  
তাকাতুম না। তার পর একটা মেয়ের সঙ্গে ষগড়া করে গ্রাম ছাড়তে  
হলো আমার। তখন থেকে ভবঘুরের জীবন। যেখানে সেখানে  
খাওয়া, পথের বেষ্টির ওপর শোয়া, পুলিশ-কে কাঁকি দেওয়া আর  
বিচিত্র লোকের শয্যাসিন্ধী হওয়া। তার পর এই মর্মার্ভে এলুম,  
তুমি না বাঁচালে সেদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলুম আর কি,  
সেদিন তুমি থেকে খুব উজ্জ্বল বানিয়েছিলে!

এই প্রথম তার কঠোর কৃতজ্ঞতার স্রব ফুটে উঠলো। সে  
হেনরীর দিকে কৌতুক আর বেদনারাম্লিত দৃষ্টিতে দেখছিলো।

—তুমি কুৎসিত আর বিকলাঙ্গ হলেও খুব ভালো।

বসন্তকাল সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মেরীর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা  
গেলো। বজ্রজঙ্ঘ, বারী শীতের আশ্রয় ছেড়ে শীকারের সন্ধানে বেরিয়ে  
আসে, তাদের মতোই চকল হ'য়ে উঠলো সে।

মেরী বোধহয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। শঙ্কিত করনা করে হেনরী।  
সাধমতো তাকে খুশী করতে চেষ্টা করতে লাগলো। তার জন্তে লাল  
ফিত-বাঁধা বাজ্ঞে একটা বোম্বট কিনে আনলো। আনলো মূল্যহীন  
পরিচ্ছদ। সে উদাসীন ভাবে বাজ্ঞের ডালা খুলে টুপিটা পর্যবেক্ষণ  
করলো, তার পর সরিয়ে রাখলো পাশে। [ক্রমশঃ]

অম্বাবাদ—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীমাপ্রসাদ দে।

### কবির প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা

বালাকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখাপড়া  
শিখিতেছিলেন, তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজী রচনার অভ্যাসও  
অবশ্য কথিত্যহীন। এ লেখাগুলি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের রচনা  
নহে। তাঁহার কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক বাংলা রচনা  
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোনটির  
পুনর্মুদ্রণ ও স্থায়িত্ব তিনি চান না। তাঁহার ইংরেজী বেসকল  
রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই প্রোট বয়সের। সেগুলির মধ্যে  
তিনি কোন কোনটি সকাগ্রা লিখিয়াছিলেন, কোনগুলিই বা সর্বপ্রথম  
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় কথিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু  
ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত  
ইংরেজী রচনা নহে। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার কবিতার স্বকৃত  
প্রথম ইংরেজী অম্বাবাদ মার্গা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।  
প্রথম বেগুলি ছাপা হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন বৎসরের কোন মাসের  
মার্গা রিভিউতে ছাপা হইয়াছিল, নাচে তাহার তালিকা দিতেছি।

The Far Off ("সুদূর")—February, 1912.

ইহার হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Sparks from the Anvil ("কবিকা" হইতে)—April, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Infinite Love ("অনন্ত প্রেম")—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Small—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Youth—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Inutile—November, 1912.

Poems ("কবিকা" হইতে)—November, 1913.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

এই শেখোক্ত কবিতাগুলি ১৯১২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত  
ছোট কবিতাগুলির সহিত একই সময়ে অম্বাবাদিত এক একখান  
মূলদ্ব্যাপ কাগজেই লিখিত।

১৯১১ সালের শেষে কিংবা ১৯১২র গোড়ায় আমি কবিকে  
তাঁহার বাংলা কবিতা অম্বাবাদ করিতে অম্বাবোধ করি। তিনি  
অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এক ছাত্রাবস্থায় পর হইতে যে ইংরেজী  
রচনার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটয়াছে, পরিস্রাঙ্গলে তাহার  
জানাইবার জন্ত আমাকে দেখেন :—

"বিদ্যার দিগেছি বারে নয়ন-জ্বলে  
এখন কিরাব তারে কিসের ছলে?"

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিরুত্তর দিল না। তিনি  
"কবিকা" হইতে কতগুলি ছোট কবিতা অম্বাবাদ করিয়া তাঁহাকে  
জোড়াদাকার পৈত্রিক ভবনের হুঁতলায় বৈঠকখানার একটি কামরায়  
আমাকে সেগুলি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এই মর্মে কথ্য বলিলেন,  
"সেইন হো মশায়, এগুলো চলে কি না—আপনি তো অনেক দিন  
ইত্বলমাঠারী করেছেন?" এইরূপ পরিহাস উপভোগ আমার মস্ত  
অন্ত কোন কোন ইত্বলমাঠারের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই অম্বাবাদগুলিই  
মার্গা রিভিউতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার আরও  
অনেক ইংরেজী কবিতা ও গদ্য রচনা মার্গা রিভিউ কাগজে ছাপা  
হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরের রচনা বলিয়া  
তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

# অঘোর প্রকাশ

( স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজগৃহে তীর্থযাত্রা

১৮৮১ সালের ১১ই মার্চের উৎসব আসিল। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর দিন নারীসমাজ হইয়া গেল। উৎসবের 'অমৃষ্টান' আর কিছু ছিল না, তাই তীর্থযাত্রার পরামর্শ হইল। রাজগৃহে তীর্থযাত্রা করা হইবে স্থির হইল। রাজগৃহ কোথায়, তাহা আর কেহ জানিতেন না; আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, রাজগৃহে ২২টি কুণ্ড আছে; প্রায় সকল কুণ্ডেই গরম জল থাকে। স্নান করিতে বড় আরাম। ধান ধারণার 'পক্ষেও অতি মনোহর স্থান। বর্ণনা করিলামাত্র সকলেই এ তীর্থে বাইতে স্বীকার করিলেন। কাজেই আমাকে পথপ্রদর্শক হইতে হইল।

পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাকে তুমি আদর করিয়া "পাণ্ডা ঠাকুর" নাম দিয়াছিল। তোমার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রেরাও "পাণ্ডা ঠাকুর" বলিতেন। তোমার বলাই মিষ্ট লাগিত; কারণ তুমি আমার যাত্রী ছিলে। আর কেহ বাড়িক আর নাই বাড়িক, আমার "বৌরী" যাত্রী সাজিয়া বসিয়া আছেন; তিনি প্রস্তুত। যাত্রাকালে প্রায়ই নারীরা পশাভে পড়িয়া থাকেন, শেষ মুহূর্ত্তে একটা না একটা কিছু পড়িয়া থাকে, তাগা লইতে বিলম্ব হয়, আর পুরুষদের কাছে কথা কহিতে হয়। তুমি কিন্তু সকলের পূর্বেই প্রস্তুত হইতে। গাড়ীতে বসিয়া কতদিন ভিজ্ঞাসা করিবাছ, "কেমন, বিলম্ব হয় নাই তো?" "না, হয় নাই," এ কথা কহিলেই মুখে হাসি ধরিত না।

বখতিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে কতক মেলকাট কতক ভুলী, কতক একা আদি ঘানে বিহার পৌছান গেল। সেখানে এক রাত্রি বাস; ভ্রমণের দিবস শকটারোহণে এবং পালকীতে রাজগৃহ যাত্রা হইল। বাহারী কখনও গরুর গাড়িতে চড়ে নাই, তাহাদেব পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। উপাসনা আহ্বারদির পর যাত্রা হইল, সন্ধ্যার পূর্বে রাজগৃহ গ্রামে উপনীত হওয়া গেল। সেই স্থান হইতে আমাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান প্রায় এক মাইল; প্রস্তরময় ভূমি, অশ্রুকার রজনী। ভক্তেরা নীরবে শাক্যভাবে পূর্ণ হইয়া চলিলেন। তোমরাও কিছু পরে যোগ দিলে। মকছুম-কুণ্ডে বাসস্থান স্থির ছিল; সে কুণ্ডে পদ দ্বোত করিয়া সকলের প্রার্থনা একেবারে দূর হইল। তোমার মনে আছে, রাজ্যে শয়নের সময় কিরণ লাগিতেছিল। ভূমি শয্যা, কেবল মাত্র ঝড়ের উপর শয়ন, কিন্তু সকলেই সুখে নিদ্রা খেলেন। প্রাতে শয্যাভ্যাগ করিবার পূর্বেই পাহাড়ের মধ্যস্থল হইতে সুললিত ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ কার্যতে লাগিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি যে যেখানে পাহাড়ে, তুমিও তাহাদেব মধ্যে একজন। এমন সুস্থ আদর দেখি নাই। সকলেই প্রমুদ, সকলেরই হাস্যমুখ, কেহ যেন আর পাহাড় হইতে নিয়ন্ত্রিত আসতে চাহে না। বেলা হইল, স্নান কার্যতে গিয়া মকছুম-কুণ্ডে কেহ ছাড়িতে চাহে না। ইত্যবসরে শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয়

মস্তক মুগুন করিলেন, বেশ ক্রী হইল। তৎপরে যেখানে মকছুম সাহেব প্রার্থনা করিতেন, উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে, সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া উপাসনা হইল। সকলের মন মুগু হইল। বোধ হয় আট জন প্রার্থনা করিলেন। তোমার প্রার্থনাও অতি স্মর হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয় ভিক্ষায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রবাসগৃহে সামাজিক উপাসনা হইল। চাকর খণ্টা যেন সকলেই প্রমুদ। মেয়েদের কিছুই করিতে হইত না। পানটি পর্যন্ত প্রস্তুত করার ভার অস্ত্রের উপর দিয়া রাখিয়াছিলাম। সোমবার ২৮শে জামুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব বাবু মহাশয় সকলের পদধূলি লইলেন। সেই উচ্চভূমিতে দুই বটা ধরিয়া উপাসনা হইল। তার পর শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু উপাসকদিগের পদচূষন করিতে চাহিলেন, কেহ পদস্পর্শও করিতে দেন নাই। ২৯শে জামুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং ভাই বকীলাস মস্তক মুগুন করিলেন। এ দিনও ভাল উপাসনা হইল। ৩০শে জামুয়ারী ব্রহ্মকুণ্ডে উপাসনা হইল।

রাজগৃহ হইতে কিরিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয় বলিলেন তিনি গয়া গমন করিয়া শাক্যতীর্থের শোষণ পূর্ণ করিবেন। আমার জেলা ছাড়িয়া বাইবার বো নাই, তাই বাইতে পারিলাম না। তুমি একাই গেলে; কিন্তু একা গিয়া তোমার মন খোলে নাই। তখনও আশ্রয় যোগ বুঝতে পারিতাম না। শরীর কিংবা শরীরী আশ্রয় সকল যোগ ভিন্ন আর উপার ছিল না। সুতরাং এ দশা হইয়াছিল।

৬ই আগষ্ট আমরা "পুনপুন" নামক স্থানে গমন করিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, জীবনে এখনও কাম ক্রোধ অভিমান এ তিনটি তিপুই প্রবল বাহ্যে। সেই দিন বুঝিলাম, ব্রত পালন করিলে ক হইবে, যখন প্রোভান আসে, তখন বলিতেই হয়, "সঙ্গ ছাড়েন এখনও ত্রিপুণ্যে।" আমিও বুঝিলাম, তুমিও বুঝিলে। ৮ই আগষ্ট অতি প্রত্যুষে দুজনে যোক্তবর্তী পুনপুন নদীতে স্নান করিলাম, ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুনপুন নদীকে সাক্ষী করিয়া দুজন হাতে হাত রাখিয়া প্রীতিজ্ঞা করিলাম যে; একজনে এ তিনটি লক্ষ্যের সহিত সংগ্রাম করিব। শক্রবা তো একেবারে তিনটি আসে না, এক এক করিয়া আসে। আমরা দুজনে সমবেতরূপে চেষ্টা করিলে, একে একে সকল কষ্টই পরাজয় মানিব।

ইহার পরে মসোটি নামক স্থানে "হাজারী" আশ্রয়নে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। টিকারী রাজের এক সহস্র আশ্রয়ক এখানে আছে বলিয়া এ নাম হইয়াছে। এখানকার একদিনের দৈনিকে লেখা আছে, "প্রাতঃকালে দ্বার সহিত কথোপকথনে মনের শান্তিলাভ ও উদ্বোধন হইল। এখানে সর্বদাই উদ্বোধন হয়। দ্বার মন ভাল হইল, শরীরও ভাল হইবে। ব্রহ্মাণ্ডি নির্বাক হইতে হয়, তাহা হইতে দূর থাকিতে হইবে।" সমস্ত দিন তোমারও অনেক কাজ, আমাকেও বাক্য থাকিতে হইত। শেষ রাত্রিটুকু যেন তোমার কেনা হইল। রাত্রি তিনটার সময় ঘুম ভাঙিল। তারপর কখনও বা উপাসনা, কখনও নাম গান, কখনও বা সদালাপ,

এইরূপে কাটিয়া যাইত। নির্জন কানন পাইলে এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। রাত্রির প্রথম ভাগে তুমি নিকটে আসিতে চাহিতে না, পাছে কোনপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ হয়। শেষ রাত্রিতে তুমিও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত, ভগবানও সচায় হইতেন। লোকে বলে, আমাদের প্রসঙ্গ কখন হইত? কেহ তো জানিত না। সাধ কবে, সকল স্বামি দ্বী এইরূপে সংপ্রসঙ্গ করিয়া স্বামী হইতে শিক্ষা করেন। আর একদিনকার দৈনিকে লেখা আছে, “দ্বী শরীর ও মন ভাল। প্রথম বিপুল বশের পথে আসিয়াছে; এখন ক্রোধ বশীভূত করা চাই। নইলে চলিবে না।” আর একদিন লেখা আছে, “পাপের শেষ রাখিতে নাই; ক্রোধের শেষ এখনও আছে, তাহা নষ্ট হওয়া চাই; আমার ক্রোধ একবারে জয় হইলে দ্বী ক্রোধও চলিয়া যাইবে। এবার তাই করিতে দাও।” ঝাংঝাং তোমাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও হৃদয়ে মনে আছে, যে তোমার বিরূপ ক্রোধের উদয় হইত। শেষকাল পর্যন্ত ক্রোধ ছিল; কিন্তু আমার মত তোমার পূর্বজীবন যে জানে, সে বুঝিতে পারিবে যে, বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তুলনায় অতি সামান্য; ছিল না বলিলেই হয়। পূর্বে ক্রোধভবে কথা বন্ধ হইয়া যাইত; তাহা তো করিয়া অল্পমাত্র কথা বলিতে পারিত। শেষ জীবনে কেহ কথারও এ ভাব দেখে নাই। ইদানীং যে অল্পমাত্র ক্রোধ হইত, তাহা প্রায়ই অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে হইত।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সিমলা গৈল

১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাই পরেশনাথের সঙ্গে তুমি ও আমি সিমলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আগ্রায় তাম্রমহল দর্শন করিলাম ও যমুনাত্তে স্নান করিলাম। অবালা হইতে দুখানি একা করিয়া যাত্রা করিলাম। একখানিতে ডাই পরেশ ও আর একখানিতে আমরা দুজন। আমাদের একা-চালক গিয়া পরেশের একাতে উঠিল। পথে যাঁতে যাঁতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল এইরূপে ত্রিকুণ্ড সাবধির কার্য করিতেন ও অজ্ঞানের সঙ্গে সলাপ করিতেন। যখন কালকার কাছে আসিলাম, তখন পরেশের ঘোড়া রান্স হইয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের একাখানি তখন উকে উঠিতেছিল। এমন সময়ে একটি বৃহৎ চামড়া-বোঝাই গদগদ রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যাইতেছিল। গদগদের আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর ইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা বৃহৎ বাঘ যাইতেছে। যেমন দেখা, আমরা আমাদের একা ঘোড়া ভয় পাইয়া ক্রমেবেগে পশ্চাৎ ফিরাই উঠিয়া চলিল। দুই দিকে গভীর বন, সমুখে নিরুভূমি, অশ্বের অদৃশ্য গতি সামলায় কে? আমার সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাশ টানিয়া রাখিয়াও অশ্বের গতি যোধ করিতে পারিলাম না। রজ্জ্বহস্তে একাঘ উপর শুইয়া পড়িলাম, তবু অশ্ব অদৃশ্য বেগে চালাতে লাগিল। তুমি রাস্তা ভ্রম না পাইয়া আমরা সাহায্য করিতে লাগিলে, তুমিও রাশ টানিতে লাগিলে; অশ্বের গতি দমন হয় না। এই ভাবে কয়েক মিনিট চলিল। আমরা মুখে “হা! হা!” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল, বৃত্তা নিকটবর্তী। এমন সময় একাওরালা

আমাদের সাহায্য করিতে আসিল। অশ্বের গতি যোধ হইল, আরার আন্তে আন্তে উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম।

তারপর দিন অতি প্রভাতে টোঙ্গা গাড়ী আমাদের বাসস্থানে আসিল। পরেশ সমুখে, তুমি ও আমি পশ্চাতে বসিলাম। এইরূপে সিমলা শিবরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। গাড়ীতেই উপাসনা হইল। গাড়ী নাচিতে নাচিতে উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, মনে হইল যেন স্বয়ং শৈলেশ্বরী আমাদের কোলে করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে নিম্ন ভবনে চলিয়াছেন। খুব ভাল উপাসনা হইল। বেলা ৫ টার সময় অশ্বের প্রতাপচক্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম।

সিমলা পাহাড়ে যে কয়দিন ছিলাম, অতি আনন্দে কাটিল। স্বভাবের শোভা দেখিয়া মন প্রশান্ত হইতে লাগিল। কিন্তু শরীর কাহারও ভাল ছিল না। সেখানে থাকিয়া শরীর উপকার পাইতে হইলে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হয় ও ব্যয় করিতে হয়।

বেড়াইতে বাইবার জন্য একদিন বিকশা গাড়ী আনিবার কথা হইল, তুমি তাহাতে সন্মত হইলে না। প্রকৃতি সৌর্য এমন সুন্দর শোভায় প্রকাশের মধ্যে আসিয়াও মিসেট ভাবে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া বেড়াইতে বাইবে, এ তোমার পছন্দ হইল না। তাই আর সকলের সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ও আমাকে বৃত্তান্ত ভাবে বেড়াইতে যাইতে হইত। আমরা দুজনে নূতন এক প্রকার বেশ প্রস্তুত করিলাম। দীর্ঘাকার গেঞ্জা অলবাসা, মস্তকে হিন্দুস্থানী পাগড়ি, হস্তে লম্বা পাহাড়িয়া লাঠি। আমাদেরকে দেখিয়া জব্বানী কি বঙ্গবাসিনী বলিয়া মনে হইত না। অল্পদূর গমন করিয়া সিমলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জেকোর পাহাড় সমুখে দেখা গেল। ভাল পথে উঠিতে হইলে অনেক ব্যয়িত হয়, আর সোজা পথ বন্ধুর প্রস্তরময়, কষ্টকর। কোন্ পথে বাইবে জিজ্ঞাসা করার বলিলে, “সোজা পথেই চল।” যেমন বলা, আমরা অগ্রসর হওয়া। এই ব্যাপারে বুঝিলাম, পুঙ্খ হইলেই হয় না, উৎসাহ উত্তমই সর্বোৎসাহ। অল্পকণ পরে জেকোর সর্বোচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। অনন্ত হিমালী দেখিয়া দুজন পাহাড়ের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। “কি রূপ দেখালি” এই গানটি দুই জনে গুন গুন করে গান করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, মহাবোগ কি! কিন্তু এ আনন্দ অনেককাল ভোগ হইল না। একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকটে আসিয়া হকুম শব্দ করিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। চক্ষু মুদ্রিত রাখিলে কি হইবে? অবশেষে উঠিয়া পলায়ন করিতে হইল। বাবাজী কিন “দর্শন পূর্ণ” ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। “বার দীপার হোম মহারাজ” (অজ্ঞ সময়ে হইবে) এই কথা বলিয়াই প্রস্থ করিলাম। অবতরণ সহজেই হইল। সেইদিনকার দৈনিকে লেখা আছে, “অজ পাহাড় দর্শন। পার্বত্যের দর্শন এই পাহাড় হইতে সহজেই হয়। অনন্ত হিমালী দেখিয়া ঘোরার আনন্দ, আমাদেরও খুব সুখ।” একাকী দর্শনে এরূপ হইত না।

একরাত্রি আমরা সিমলা সমাজের নিকটবর্তী কুঠারে বাস করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে শীতবস্ত্র কম ছিল, তাই কষ্ট হইয়া বসিয়া বসিয়া আসক্তি করিতে লাগিলেন। সত্যি এই কুঠার শীতের প্রখরতা এত অধিক যে, আমাদের “খাটিয়া” ত্যাগ করিতে

ভূমিতে শয্যা করিতে হইল। চিনিতে কয়লা যোগাইতে হইল। কিন্তু রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালের আনন্দ আর ভূমিতে পারি না। যোগের স্থান বটে। সকল বস্তই যেন যোগের সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

এবার ফিরিয়া যে গৃহে আসিলে, আর গৃহিণী হইবার ভক্ত নয়। এবার গৃহের দাসী হইলে। গৃহকে কুটীর করিলে। শ্রদ্ধেয় হরিশ্চন্দ্রের বন্ধু মহাশয় আমাদের গৃহকে “অবোধ-প্রকাশ আশ্রম” নাম দিলেন। হিমালয় বাদে ফলে বর্ষশেষের পূর্বে ৪৫ দিন কিছুক্ষণ ধরিয়া মৌনী হইয়া থাকিতে লাগিলাম। স্নানের পূর্বে উপাসনা পণ্যস্ত নির্বাক হইতে শিখিলাম। বুকিলাম, বল ভাষায় প্রেম ঘন হইতে পারে না। সকল দিন যে সজ্ঞান উপাসনা সরস হয় না কেন, নীরব চিন্তা দ্বারা তাহাও বুঝিতে পারিলাম। উপাসনার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সকলের সঙ্গে যে পারিবারিক উপাসনা হইত, তাহা ছাড়া আবার স্নানের পর ভগবানের নিকট বাইতে আরম্ভ করলাম।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাজগৃহে দ্বিতীয়বার

১৮১০ সালের মাঘোৎসব উপস্থিত হইল। এবার একটু কষ্টের ব্যাপার হইল। কেহই কাহারও সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছিলেন না। এ অবস্থায় ছুঁবেলাই আমাকে উপাসনা করিতে হইল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়েরা কেহই বাকিপূরে ছিলেন না। এরূপ নিষ্কণ্টক অবস্থার মধ্যেও তোমার উৎসাহ থরকি হইল না। তুমি রাজগৃহে রাজ্যের উজ্জ্বল কায়তে লাগিলে। তুমি বলিতে, যদি কেহ না যায়, অবাধ-প্রকাশ বাইবেই বাইবে। তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় রহিল; তোমার উৎসাহে আরও কয়েকটি নারী বাইতে প্রস্তুত হইলেন। এবারকার রাজগৃহ-উৎসবের বিবরণ প্রথানতঃ ভাই যজ্ঞদাসের দৈনিক হইতে তুলিয়া দিতেছি।

“আমরা স্নান, উপাসনা ও আহাতিয়া করিয়া রাজগৃহভিমুখে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলাম। গঙ্গার পাড়িতে যাত্রা। সঙ্কীর্তন করিতে করিতে চলিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকাশ বাবুর সঙ্গে মথুরা দ্বারের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কিছু পরে সকল যাত্রী পৌঁছিলেন। বোশনচৌকি বাস্তব বন্দোবস্ত হইল। রাতে সঙ্কীর্তন ও আলোচনা। মিলনের বিষয় কথা হইল। মিলন কেন হইতেছে না? প্রেমের অভাব। আমরা আপনাদিগকে শত লোব সন্তোষ প্রকাশ্য; আমরা নিজ গুণের পক্ষপাতী, তাই আপনাদিগকে প্রকাশ্য। কেবল গুণ দেখিলে অবশ্যই অন্ধকেও ভালবাসিব। স্নানের মিলবার এই একমাত্র উপায়,—পরস্পরের গুণ দর্শন।”

২৬শে জাম্বুয়ারী রাজগৃহে দ্ব্যম ভাষিতে ভাষিতে সঙ্কীর্তন করিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, মেয়েরা এক একটি উচ্চ স্থানে সম্মুখ দিক দিয়া করিতেছেন। তার পর মথুরা কুণ্ডে দ্রাব্য ভাবে প্রাণভুক্ত হইল। তোমরাও সেই পদ্ধতি করিলে। তারপর স্নানে মথুরা সাহেব নমাজ পড়িতেন, সেইখানে খুব ভাল উপাসনা হইল। এক পার্শ্ব দেবকন্ডার, অল্প পার্শ্ব ভাইয়েরা বসিলেন। তাতে উচ্চ পরিত্যক্তি, সমুদ্রের শতপুর্ণ ক্ষেত্রসমূহ, উপাসনা খুব মিষ্ট হইল। স্বাধীভাগ না করিতে পারিলে ব্রহ্মকৃপা আসে না, কৃপা সিলেই আপনাদের প্রীতি প্রদান হয়, এইভাবে তুমি প্রার্থনা করিলে।

২৮শে জাম্বুয়ারী সন্ধ্যার সময় তোমরা অগ্নিধারা কুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলে। অপূর্ণ বাবু নেতা, কুণ্ডটি চারি কোণ দূরে। ঐ কুণ্ড, ঐ কুণ্ড বসিয়া কুলকন্ডার বনকন্ডার মধ্যে চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ফিরিয়ার সময় শ্রদ্ধেয় অপূর্ণ বাবু বসিলেন, কেহ ক্লান্তির চিহ্ন দেখাটতে পারিবেন না। তুমি বসিলে যদি ব্রহ্মকুণ্ড পা দুইতে পাই, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে আশ্রমে বাইতে পারি। তাহাই হইল। বোল মাইল কটকপূর্ণ পথ চলিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিলে। সকলে আশ্চর্য হইলেন। পথে তোমার উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভ হইয়াছিলেন।

২৯শের বিষয় ভাই যজ্ঞদাস বলিতেছেন, “শেষ রাত্রিতে ৩টা প সময় শয্যা হইতে উঠিয়া মথুরা কুণ্ডের পার্শ্ব একঘণ্টা গান ধারণা। প্রাতঃকালে পূর্বদিনের মত গান গান, নির্জন চিন্তা; তারপর মেঘা মেগডেলীনের তৈল মন্ডনের বিষয়ে প্রসঙ্গ; তৎপরে জগন্নাথসক। তৎপরে যথা সময়ে পাঠাড়ে উপাসনা। জীবন্ত মধুময় উপাসনা। প্রত্যেকে এক একটি স্বরূপের আরাধনা করিলেন। পূজনীয় প্রকাশ বাবু চরিত্রের সমতার ভক্ত প্রার্থনা করিলেন। মথুরা কুণ্ডের জল যেমন এক প্রকার তাপ রক্ষা করিতেছে তেমনই প্রকৃতি চাচিলেন। একেবারে অনেক হাসিও নয়, আবার হাড়িমুখও নয়, অর্থাৎ বাহ্যিক প্রসন্নতা বলে, ভাঙি চাচিলেন। তাহার ভাষা প্রার্থনার বলিলেন, যা ফোড়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন আরাম হইয়া যায়। পাণ লইয়া আসিয়াছেন, যেন শুদ্ধ হইয়া যায়।” মথুরা কুণ্ডের জল স্নান করিলে শরীরে চর্মরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। তুমি পাপরোগ দূর করিতে চাহিলে। পরের দিন প্রার্থনায় তুমি বলিলে, “মা জননী কষ্টী পাথর লইয়া যেন আমাদের মূল্য কথিহা লইতেছেন। আবার যখন আসিব তখন বুদ্ধি কথিয়া দেগিবেন, যাঁটি আছি কি না। যেন যাঁটি থাকিতে পারি। মূল্য যেন না কমে।”

৩১শে জাম্বুয়ারী বিহরে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে নামগানের পর উপাসনা লইল। আহাতিয়াতে খোড়ার গাটতে বখতিয়ারপুর যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে ট্রেনে বাকিপূর আসিলাম। নয়টোলার বাটা ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। কিন্তু ভ্রূপা পাবে ঠাকুর ঘরে বাইতে ভুলিলে না। সকলে মিলিয়া উপাসনার গৃহে গিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রোগে শোকে সন্নি

আমার কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র ও তুমি এক বয়স্কর। ছেলে বেলা হইতে তোমাদের সন্তান ছিল। বয়স্করের বুদ্ধিতে ও নিজ নিজ সংসারের ভার গ্রহণেও সে সন্তান হ্রাস হইয়া যায় নাই। যখন প্রবোধ বাকিপূরে আসিলেন, তখন তুমি তাঁহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলে। তারপর যখন তাঁহার বালিকা-বিজ্ঞানালের কন্ড হইল ও যখন তিনি একটু একটু ডাক্তারী করিতে লাগিলেন, তখন পাছে অমিল হয়, তাই তাঁহাকে ভিন্ন বাসা করিয়া দিলে। আমার মা ছোট ছেলের কাছে থাকিতে ভালবাসিতেন, সন্তানরা তাঁহাকেও খরচপত্র দিয়া প্রবোধচন্দ্রের নিকটেই রাখিলে। হিন্দু সমাজ ইহাতে ভাল বলিলেন না। মনে করিলেন, তুমি ভিন্ন করিয়া দিলে। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র তোমার মন জানিতেন, তোমার অভিপ্রায়ও বুঝিতেন। তিনি

বুঝিতেন যে বড় গাছের ছায়াতে থাকিলে ছোট গাছ বৃদ্ধি পায় না। বড় জাতের সঙ্গে একত্র থাকিতে আপাততঃ ছোট ভাইয়ের আরাম হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কালে আবার সম্ভাবনা লইয়া মনোমালিন্গ ও উপস্থিত হইয়া থাকে। দূরে গেলে যে ক্ষয় হইতে দূরে যাওয়া হয় না, তাহা ভাই প্রবেশও বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও বিপদ হইলেই তোমার নিকট বলিতেন, তুমিও সাধ্যমত সাহায্য করিতে। এইরূপে ৪।৫ বৎসর চলিয়া গেল। তারপর ১৯শে মার্চ ১৮৮১ খ্রিঃ অব্দে প্রবোধের পরলোকগমনের সংবাদ পাইলাম। তুমি সেদিন অসুস্থ ছিলে। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কার পত্র? আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ বাহিরে কান্ন করিতে গেলাম। তাহাতেও সামলাইতে পারিলাম না। তখনই গাড়ী প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের কাছে কিছু কাছ লইয়া গেলাম। উদ্দেশ্য, তাঁহার সঙ্গে কান্নের কথা কহিতে কহিতে মনটাকে সমাধিত করিয়া লইব। অতিক্রম করিতেছি দেখিয়াই তুমি বলিলে যে কিছু একটা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তোমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে প্রবোধের সন্বাদ দিলাম। তোমার মনে ভয়ানক আঘাত লাগিল। মূর্ছা হইল। ডাক্তার ডাকিতে হইল। অনেক যত্নে আবার তোমার সজ্জা হইল। ২৭শে মার্চ প্রবোধচন্দ্রের শব্দ হইল। সে দিন তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা স্মৃতি প্রাণভেনী হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র অকালে ত্রিবেণিতে হইলেন; তাঁহার সাক্ষী স্ত্রী বলিলেন, “ছোট দিদির যদি ঘর ঝাঁট দিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু প্রাচীন সমাজে কুটুম্বদিগের নিকট গিয়া আশ্রমও থাকিতে চাই না।” এই রূপে প্রবোধের স্ত্রীও কল্যাণী তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুমিও সাগরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলে। সকলেই তখন বলিল প্রবোধ তোমার স্নায়ু হইতে দূরে যান নাই। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার বিধবা স্ত্রীও কল্যাণ ভার সম্পূর্ণরূপে তুমিই গ্রহণ করিলে। বাহা আপনাব কল্যায়ের ভগ্ন করিতে পার নাই, তাঁহার কল্যায় এমন সুশিক্ষা দিতে লাগিলে। অবশ্যই পরলোকে এখন প্রবোধের সান্নিধ্য দেখিয়া সুখী হইতেছ।

সংসারের খবর বাড়িতে লাগিল। তোমারই উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি, তোমাকে বড়ই বিরত হইতে হইল। তুমি উপায়াস্তর না দেখিয়া প্রস্তুত করিলে, বাস্তবিক মাকে যে টাকা পাঠান হয়, তাহা হইতে কিছু কমাইয়া দেওয়া হইত। আমি বলিলাম, তাহা করিও না। যথেষ্ট গরিব রক্তিকায় ও ভগবানকে বলিলাম।

কয়েকদিন পরে আমাকে উচ্চ Standard এবং Departmental পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম, “আমাকে কিছু দিনের ভ্রম সংসার হইতে একেবারে ছুটি দাও। তুমি একাই সব সামলাইয়া লও।” তুমি বলিলে, “বেশ।” অর্থাৎ, লোকজন আসিলে তাহাদিগের অভাবনার ভার, কাহারও অসুখ করিলে শুশ্রূষা ও চিকিৎসক ডাকার ভার তোমারই উপর পড়িল। আমাকে একাকী ঝাঁকিপুর হইতে চারি মাইল দূরবর্তী “বুম্‌ডার” নামক স্থানে পাঠাইয়া দিলে। সেখানে গিয়া এক পক্ষ কাল অবস্থিত করিলাম। সংসারের সমুদয় ভারই তুমি লইলে। কাহারও পীড়া হইলেও আমাকে সংবাদ দিতে না। কেবল আহারের সময় আহার পাঠাইয়া দিতে।

তোমার এই সাহায্যের গুণে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলাম। ১৫ই জুন পরীক্ষায় ফল শুনিলে; আনন্দভরে উপাসনার ঘরে গমন করিলে, আর প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দান করিলে।

পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে কাথোপলক্ষে পাটনা জেলার অন্তর্গত হিলসা থানায় বাইতে হইয়াছিল। আমার শরীর শ্রম ছিল না বলিয়া সেবার ভ্রম তুমিও বাইতে প্রস্তুত হইলে। যান তো টমটম; খোলা গাড়ী; তবু তুমি সঙ্গে চলিলে, লজ্জা ভয় তোমাকে বাধা দিতে পারিল না। তুমি আমি ও সুবোধ এক গাড়ীতে চলিলাম। তখন স্তবোধের বয়স্ক্রম চৌদ্দ বৎসর। কাছে কাছে রাখাতে তাঁহার সঙ্গে সযত্ন মিষ্ট হইতে লাগিল। গাছতলায় উপাসনা, কুঁড়ে ঘরে আহার হইতে লাগিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পালীগঞ্জ বাঙ্গালায় ছিলাম; সেখানে তোমার সঙ্গে সংসারের সবজ্ঞান কিছু ছিল না; পদে পদে বিব্রত হইতে হইতেছিল। কিন্তু তুমি কিছুতেই দমিতে না। যে যে উপকরণ পাইতে না, সতস করিয়া, যুদ্ধি খাটাইয়া, অল্প বস্ত্র দিয়া, তাহার কাজ চালাইয়া লইতে। কত অসুবিধার মধ্যে একা তোমার উপর সব ভার ফেলিয়া রাখিয়া আমি আমার কাজ বাহিরে চলিয়া যাইতাম; আর বাসায় ফিরিয়া তাড়িয়া দেখিতাম, তুমি হাসিতেছ। তোমার এ হাসি ছেলেবেলা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। বিপদে অসুবিধায় বন্ধাটে তোমার এই প্রসন্ন ভাবটি কিছুতেই গমিত না। তোমার এইরূপ সব অসুবিধা কাটাইয়া কাজ সমাপন করবার শক্তিটি ছিল বলিয়া আমার সংসারে আমি একটি দিনও অন্ধকার বা ভার বোধ করি নাই। কতবার জেলের সংসারে গিয়া, অসুবিধার স্থলে মুখতার করিবার ব্যাপার দেখিয়া, আমি আশ্চর্য হইয়াছি। ভাবিয়াছি, কই আমাকে তো কখনও এমন কথিত সংসার করিতে হয় নাই! এই স্থান হইতে ফিরিবার সময় কত শ্রান্ত হইয়াছিলে, আমারও শরীর খাণ্ডা ছিল, তবু পথে ধর্মবন্ধ বধীদাসকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিয়া তুবে ঝাঁকিপুরে ফিরিলে।

মার্চ মাসে তোমার গাভীপুরের উৎসবে যাওয়া ঠিক হইল। ভাই নৃত্যাগোশাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার তো কোথাও যাওয়া হয় নাই, জেলা ছাড়িয়া যাইবার ঘো নাই, তুমি আমার হইয়া গাভীপুরে চলিলে, তোমার সঙ্গে শ্রীমন্ত ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার গেলেন। লোকে বলে, ভূপেনের সঙ্গে তুমি গেলে, আমি বলি, ভূপেন তোমার সঙ্গে গেলেন। তোমরা দুইজনই এখন স্বর্গে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কে কার সঙ্গে গেলেন। গাভীপুরে একখানা টেলিগ্রাম দিবার কথা হইল, তুমি বলিলে, তাহাতে প্রয়োজন কি? তোমাকে বিদায় করিয়া দৈনিক এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম,—“শ্রীজ্ঞেয় গাভীপুরের উৎসবে গেলেন। আমাকে ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু আমারই হইয়া গেলেন। বাহা কিছু করিবেন, আমারই প্রতিনিধি হইয়া করিবেন।” এদিকে ১৭ই তারিখে আমার অসুখ করিল, ইন্ড্রাঘোষা, তার পর গলার ভিত্তরে ফোড়া হইল, গলা বন্ধ হইয়া অনেক কষ্ট পাইলাম। তবু তোমার উৎসাহ পাছে ভুল হয় তাই দুদিন সংবাদ দিই নাই। ২০শে তারে সংবাদ দিতে হইল তখনও সেখানকার উৎসব শেষ হয় নাই, স্তবতার ভূপেনকে রাখিয়া তুমি সেইদিনই উপাসনার পথ একাকিনী বেলে চলিয়া আসিলে ও সন্ধ্যার সময় আমার

শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইল। ২১শে ২২শে দুদিন তুমি অনেক সেবা করিলে কিন্তু রোগের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। পরীক্ষা ঘোরতর। ২২শে সমস্ত রাত্রি বহুশায় আমার নিজা হইল না। বৈধ্য দাও, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যার সময় ভয়ানক ছট ফট করিতেছি, তোমার মুখপানে তাকাইয়া দেখি, তোমারও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে, তুমি বলিলে “ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই।” আমি বলিলাম, “প্রয়োজন হয় তো আপনি আসিবেন।” ভাট পরেশ কোথা হইতে ঠিক ৭টার সময় উপস্থিত হইলেন। সেই রাতে গলার ভিতরের ফোড়া কাটিয়া গেল। ২৮শে তারিখে চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এবং চিকিৎসকও তাঁহার প্রতি নির্ভরের জন্ত যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। রোগ তখনও আগ্রাম হইল না। এই এপ্রিল মূখে অন্ত করিতে হইল, তুমি পাকা murexএর মত ঝাঁড়াইয়া সে কার্যে সাহায্য করিলে। ১১ই এপ্রিল কঙ্করবাগের বাগলাশয় নেলাম, সন্দের সন্নিহিত তুমিও চলিলে। এইখানে অবস্থিতিকালে তোমার জননীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিল। এই সংবাদ শ্রবণের পর তুমি বলিলে, “এখন হইতে তুমি আমার মা হও,” আমি বলিলাম, “তথ্যাস্ত।” যেদিন তুমি ঐ সংবাদ শ্রবণ করিলে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বজী বাবুর ছোট সন্তানের মৃত্যু সংবাদ আসিল। কখনই শোকাভূতা জননীর সান্ত্বনার্থে গাড়া করিয়া গমন করিলে, দশে একজন চাপরাসী বই কেহ ছিল না। যখন কর্তব্য উপস্থিত হইত, তখন তুমি লজ্জা, ভয়, নিজের শোক, স্বামীর সেবা সকলই ছুলিয়া বাইতে। রাত্রি আটটার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি দুইটার মধ্য প্রত্যাবর্তন করিলে। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

যখন আমার সেবা করিতে, তুমি কখনও হাসির মত মুখ বুলিয়া পাহা বলিতাম তাহাট করিতে, কখনও বা কতীর মত ধমক দিতে। মন আমি কঙ্করবাগে পীড়িত ও দুর্বল ছিলাম, ডাক্তার পূর্ণ মাত্রার ঔষধ দিতেন না; রাত্রে দুই তিনবার কর্ণজাওয়ার খাওয়াইতে হইত। বালকের মত অসময়ে খুশা লাগিয়াছে বলিয়া আমি পালার করিতাম; তখন শিক্ষিতা মাতার মত বলিতে, “সময় হয় হই, শোও, সময় হইলেই ডাকিয়া আহাির দিব” বলিয়া আশাস দিত; বালকের মত আবার নিদ্রা বাইতাম। এত বহু করিয়াছিলে কিরা রোগ আরাম হইল।

শরীরে শক্তি তখনও পাই নাই; সমস্ত দিনই তোমার সেবা শ্রিতাম, ও প্রকৃতির শোভা দেখিতাম। এই সময় হইতে তোমার লুক্কাইয়া বাইতে বড় ইচ্ছা হইল। খনও তো তাই করিয়া কেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে লুক্কাইয়া থাকেন। প্রেরিত তাহাকে ক্রাশ করেন। তেমনি আমার ইচ্ছা হইল, যে আমি লুক্কাইয়া, তুমি আমার কাঁধে কর। সেখানায়, অন্তের প্রতি আমার কিছু কাঁববার ছিল, আমার অনুবসরবশতঃ তুমিই তাহা হইতেছ।

৪ঠা যে কঙ্করবাগ ত্যাগ করিয়া দীঘাঘাটের ষ্টেশনমাষ্টারের জায় গেলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে ৭ই জুন দুই প্রেহর পরেশের কঙ্কর মৃত্যু সংবাদ তুমি বাঁকিপুর চলিয়া আসি।

আমি পরদিন সকালে গেলাম। তার পর আগষ্ট মাসে

তোমার অগ্রজ উপেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের সংবাদ পাইল। আমার তুমি বলিলে, “আজ হইতে তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিব।” আমি স্বীকার করিলাম। এইরূপে ভ্রাতাকে তোমার সব করিয়া লইয়া তোমার সকল সাথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দেবী

সাত বৎসর হইল, আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সাত বৎসরে এ ব্রত উপস্থাপন করিতে আমার বহু ক্লেশ হইয়াছে, তোমার ততোধিক হইয়াছিল। বাহ্যের কত কালো আমার শরীর মন নিযুক্ত থাকিত, তোমার সে স্মৃতিখা ছিল না। তাই তুমি মাঝে মাঝে স্নান হইতে। আমিও বৃত্তিতে লাগিলাম, এখনও চিঠির শাস্ত্রভাব লাভ হয় নাই। আরও দেখিলাম, সকল সাধনে যেমন, এখানেও তেমনি, অল্প ত্যাগে সিদ্ধি লাভ হয় না। ত্যাগে পূর্ণতা চাই। এবার বুঝিলাম, আলিঙ্গনও ত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে আবদ্ধ থাকিলেও তো জাড়াতেই আবদ্ধ থাকিলাম; শরীর না থাকিলে চুটি আত্মাতে যে যোগ হইবার কথা, শরীর থাকিতে তাহা তো আর হইল না। এই সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে, এমন সময় একদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্মরূপে তুমিও আমার ভাব অন্তরে পাইলেও বৃত্তিলে, শরীরকে আরও লুপ্ত না রাখিলে এ সাধনে সিদ্ধ হইবে না। তোমার ভাবায় সেদিন তুমি বলিলে “অন্ত হইতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল।” আত্মা ও শরীর দুই লইয়া যে সম্বন্ধ ছিল, এখন হইতে তাহা কেবল আত্মা লইয়া থাকিবে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ থাকিয়াও থাকিবে না। গলা পর্যন্ত পরম্পরের শরীর পরম্পরের অঙ্গুষ্ঠ হইল। আমিও দৈনিকে লিখিলাম, “এখন অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল। এমন অবশ করা তোমার শক্তি ধারাই হয়। তুমি যাত্রা করিলে তাহার ভ্রত তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিই। পূর্বে আমি চাহিয়াছিলাম, যে জোর করিয়া দ্বীকে আলাপ করিয়া দিই; শরীর অঙ্গুষ্ঠ রাখি; কিন্তু তখন তাহা হইল না। জোর করিয়া হয় না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।”

সেইদিন হইতে, দেবি। তুমি আমার কাছে দেবী হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব বহিল না। মনে পাড়ে, দেবি। সেই দিনের শেষ আলিঙ্গনের উপাসনার কথা? প্রাতঃকৃত্যের পূর্বে শয়ন করিয়া ওঠে ওঠে মিলিত করিয়া বাই “সত্যম্” বলিলে, অমনি বুঝিলে, সত্যরূপ ভগবানের শক্তি কেমন! এমন ভয়ানক রিপুও সে শক্তির কাছে পরাস্ত হইল। এ উপাসনা আর কেহ শুনিতে পাইল না, কেবল অযোর-প্রকাশ শুনিতে পাইলেন। এইরূপ উপাসনা পূর্বে কখনও করি নাই; আর কেহ করিয়াছে কি না, তাহা জানি না। সাত্মা দিবার জন্ত অযোর-প্রকাশ বলিয়া বাইতেছেন, যদি মুখচূষন করিতে হয়, যদি ওঠে ওঠে মিলিত করিতে হয়, এইরূপেই যেন নবনারী করিতে পারেন।

এখন হইতে তুমি আরও মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলে; দেখিলাম চিত্তের দুর্বলতার কথা পরম্পরকে বলিলে আরও বল পাই। মনের প্রতি কোন দুর্বৃত্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্বে সব বলিতে সাহসী



হইতাম না। এখন হঠাৎ অবশ্যে সব বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম।

এই সময় দৈনিক লিখিয়াছিলাম, “আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখচুষনে স্তব্ধ হয় না, হৃৎকণ্ড হয় না, এতরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে উভাও হইবে।” আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, “দৃষ্টিস্থ বন্ধি কর।” কারণ দেখিলাম, অল্প একটি উন্নততর স্তব্ধ না পাইলে নিম্নতর স্তব্ধ ছাড়িতে পারা যায় না। দর্শনে যে কত স্তব্ধ সত্তর, তাহা সহসা বুঝা যায় না, অভ্যাস ঐ দর্শনানল বন্ধি পাইলে স্পর্শস্থরের লালসা হ্রাস হইতে থাকে। স্পর্শের আনন্দ অপেক্ষা দর্শনের আনন্দ উচ্চ; তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্মৃতির আনন্দ। হামুবেব কখনও কখনও এই তিন অবস্থা পর্যায়ক্রমে লাভ হয়। পরীক্ষার তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিতেছি, স্মৃতিই স্থায়ী অবস্থা, কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। শরৎ যদি আনন্দ হয়, তাহা হইলে দর্শনের আকাজকা থাকে না; সেইরূপ দর্শনের আনন্দ না পাইলে স্পর্শের সংসাগ ছাড়িতে পারা কঠিন হয়।

ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের “আধ্যাত্মিক বিবাহ” অনুষ্ঠান হউক। এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞেব মধ্যে প্রসঙ্গ হইত। ক্রমে এই অনুষ্ঠানটি আমাদের হৃদয়েই প্রাণেব অত্যন্ত ব্যাকুল আকাজকার বিষয় হইল। ১৮১১ সালের ৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু বেশী খারাপ হয়। তখন তুমি বলিয়াছিলে, “তবে বন্ধি আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান হইল না”! ভয় করিয়াছিলে, পাছে দেহভাগ হয় ও পাছে এ সৌক আধ্যাত্মিক বিবাহ কলুষ্টান না হয়। অনেক দিন যাবার সধক স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হইতেছে না, ক্রমাগতই কোন না কোন বাধাত হইতেছে, এমন নারিকার মনের যে অবস্থা হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা হইল। আমি অনেক আশ্বাসবাণী বলিলাম, বলিলাম, “উৎসবের পর রাত্রিতে বিবাহ হইবে, তাহার তো অনেক বিলম্ব আছে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠ।” বিবাহ হইবে বৈ কি? এরূপ কথা কহিতে কহিতে সে দিন অধিরাত্রি নিশ্রা হইল না।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### আধ্যাত্মিক বিবাহ

১৮১১ সালের মাঘোৎসব আসিল। ঝিকিপুরে উৎসব করিয়া ২৪শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ) রাত্রিগৃহ বাত্রা করিলাম। সকলেই তাঁর বাত্রার চলিয়াছেন; কেবল দুইজন যাত্রী, তোমার ও আমার, ভাব আরও গভীর। আমরা দুজনই অনন্ত উৎসবে মিলিত হইতে চাহিতেছিলাম। ভিতরে আত্মা বাহ্য চাহিতেছিল, বাহিরে বন্ধ-বান্ধবগণকে কিরূপে তাহা জানাইব, সেই চিন্তা করিতেছিলাম। মনের এই আনন্দের ও গাভীরের মধ্যে হঠাৎ একটু বাধা হইল; তাহা আমারই পোবে। ২৭শে জানুয়ারী রাত্রিতে বোহার পাশ্বে ভবনে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধেব ভাই অমৃতলাল বহু মহাশয়ের সঙ্গে একটি বিষয় লইয়া আহার তর্ক হয়। তোমার ইচ্ছা ছিল না যে, আমি অন্ত তর্ক করি। শেষে বন্ধন উঠিয়া আসিলাম, তখন আমার মুখ মলিন, মনও বড় খারাপ। আমার মুখ যে অপ্রসন্ন, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, জানি না। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়া বন্ধন প্রার্থনা করি, তোমার সলাহস্বতীপূর্ণ চক্ষু জলে আমার

বন্ধ অভিব্যক্তি হইয়া গেল। তোমার আশ্বাসে আবার বল পাইলাম।

২৫শে আশ্বিনের পব রাত্রিগৃহ বাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় তথায় পৌছিলাম। সেই তর্কের পর হঠাৎ মন ভাল নাট। কোনও রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। ২৬শে সকালে দেখি, কাহারও মনে স্মৃতি নাই, কেহ কাহারও সঙ্গে লইতে চাহিতেছেন না, সকলে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিলেন। রাত্রিগৃহে আসিয়া তো এমন কখনও হয় না। উপাসনা হইল বটে, কিন্তু সাগদিন যেন অন্ধকারে কাটিল। এমিকে দেখি। তুমি বিবাহ অনুষ্ঠানের রক্ত ব্যস্ত; আমিও প্রস্তুত। ২৭শে ভোরে সেই ধর্মশালার এক নিমন্ত্রণ প্রার্থনা করিয়া তোমার মস্তক স্পর্শ করিলাম, এবং শ্রদ্ধকণ্ডের উচ্চ জলে ধৌত করিয়া বহুশেষে ফুব দিয়া মুগুন করিলাম। আমার হাত কাঁপিতেছিল,—কখনও তো কাহারও ক্ষৌরকার্য করি নাই। তোমার মস্তক মুগুন করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ণ আনন্দ হইল; তোমাকে এমন স্তব্ধ আর কখনও দেখি নাই! তোমার বাল্যমুষ্টি, যৌবনের মুষ্টি, কোনও মুষ্টিই ইহার মত নয়। দেব-প্রভা যেন তোমার মুখমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কি চক্ষুই যে তোমাকে দেখিতেছিলাম! শরৎ গিয়া যে ভড়ভাবমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিব, এ দিনের দর্শন যেন তাহারই পূর্বাব্দাস।

নাশিত ডাকিয়া আমারও ক্ষৌরকার্য করা হইল। তার পর উপাসনা। এইবার শ্রদ্ধের অমৃত বাবকে জানাইলাম, যে, অল্প আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ। এতদগণ আমাদের মুণ্ডিত মুষ্টি কেহ দেখেন নাই। এখন দেখিবার, দেখি! মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মন স্তব্ধে বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে স্নান উপাসনা-সভা সজীব হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেব অমৃতবাব মহাশয়েরও মনের সেই ভাব কোথায় চলিয়া গেল। তিনি অনুপ্রাণনে প্রমত্ত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার পরে নবসংহিতা তল্লাসে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ কলুষ্টান সম্পন্ন হইল। সংহিতায় আছে, ৭ দিনের জন্ত এই ব্রত লইবে; আমরা বলিলাম, অনন্ত কালের জন্ত।

শ্রদ্ধেব প্রচারক মহাশয় “ব্রহ্মকল্পার অবতরণ” বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, ভগতে মহাপুরুষ অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু মহানারী অস্তাবধি আসেন নাই। এইবার তাঁহার আগমন হইল। মহানারীর যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তোমাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাকে এ আখ্যা দিলেন। আমি তো আসে তোমার মহানারীর দেখিতে পাই নাই। আমার বোঝাকে আমি নিজেই আদর করিতাম, পূজা করিতাম; আবার অপূর্ণতা দেখিলে মুখ আঁধার করিয়া থাকিতাম। ঘরে থাকিতে বলিয়া বন্ধি তোমায় আগে বন্ধি নাই। তুমি যে মহানারী, তাহা এখন আমাকেও স্বীকার করিতে হইল।

সকালের উপাসনার পর সকলের মনে আমাদিগকে আদর করিবার জন্ত এক আশ্চর্য আবেগ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় তাই অপূর্ণরূপে তোমাকে ও আমাকে পটবস্ত্র পরিধান করাইলেন। উপাসনার পর কল্যাণ-বরের বরণ হইল। “কল্যাণ” কেন, “বরকল্যাণ” কেন নয়, তাহা বুঝিলে তো! যখন শরীরের বিবাহ হইয়াছিল, তখন “বরকল্যাণ” বরণ হইয়াছিল। এখন কনের দিন পড়িল, তিনি বনে পূর্বে গেলেন। কল্যাণ মাত্রে-বরের দ্বায় হইল। তাহারাই দুই জন

মাঝখানে ; চারিপাশে ত্রাণ ও ত্রাণিকা বাতির ডালা হাতে লইয়া হলুধনি ও শঙ্খধনি করিতে করিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আমার মনে যে কি অবস্থা হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এ পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলাম, তলারীরা আত্মা তুমি এখন আমার কাছে বাহা হইয়াছ, তখন মেন তাহাই হইয়া গিয়াছিলে।

এই দিনের অন্ত্যস্তান সম্বন্ধে ভাট বগীদাস তাঁহার দৈনিকে লিখিয়াছিলেন, “উপাসনা স্বর্গের উপাসনা। আজ মহাব্যাপার। ভক্তিজ্ঞান সাধক প্রকাশ বাবু ও তাঁহার ভাৰ্য্যা অঘোরকামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহ হস্তে আবদ্ধ হইলেন। আঁহা, আজ কি মনোহর দেবদুত্ত। বিবাহা আজ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সম্ভানকে বিবাহ নৃত্তে বাঁধিয়া দিলেন। এ বরকন্ডার আর শরীরের সম্বন্ধ নাই। ইহার বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়া আজ নয় বৎসর কাল ইন্দ্ৰিয়কে একেবারে দমন করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাঁহারিগকে অনেক কাদিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরে যে সুখ শান্তি পাইয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনায় সে কামা সে দুঃখ কিছুই নহে। এই ব্যাপার সকলের মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আঁকিয়া দিয়া গেল। এখন প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও অঘোরকামিনীর ৩৬ বৎসর। রাত্রি বরকন্ডার বরণ,—অমরধামের ব্যাপার ; পরে সঙ্গীত। দয়াময়, তোমাকে শ্রদ্ধাবাদ। রাজগৃহ, না স্বর্গ।”

বল তো, ২৭শে জামুয়ারী কেন “স্বর্গের উপাসনা” হইল? কেন সে দিন দেবদুত্ত হইয়াছিল? তুমি যে দেবী, দেবকন্ডা, তাহা সকলেই একবাক্যে কেন স্বীকার করিয়াছিলেন? যদি মানবী থাকিতে, তাহা হইলে মস্তক মুগুন করার পর ভাল দেখাইত না। বিশেষতঃ নারী বধন স্ত্রীশোভিতা, সালঙ্কার, দীর্ঘকেশী হন, তখনই তিনি দেখিতে সুন্দরী হন; কিন্তু আজ যে তোমার কোন অলঙ্কার নাই, তুমি মস্তক মুগুন করিয়াছ, আজ কেন তোমাকে দেখিতে এত সুন্দর লাগিল? আজ তুমি অসংসারী, আজ তুমি সন্ন্যাসিনী, আজ তুমি আত্মাময়ী, তাই তোমার স্বর্গের রূপ। তাই ভাই বগীদাস দেবদুত্ত বলিলেন।

মনে পড়ে, দেবি! ত্রস্তের প্রথম ছয় মাস কেবল কাদিতে কাদিতে কাটায়াছিলে! একাকী শয়ন করিতে, আর চক্ষের

জলে মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইত? কেন, ‘দেবি! আমাকে বলিতে না? বলিলে হয় তো তোমার চক্ষের জলের সঙ্গে আমার অশ্রুবারি মিশ্রিত করিয়া তোমার দুঃখভার লঘু করিতাম। অথবা যাহা করিয়াছিলে, ভাইই করিয়াছিলে। হয় তো তোমার চক্ষের জল দেখিলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইত। আর “বিনা দুঃখে হয় না সাধন,” একথাও তো সত্য। সে দুঃখভার বহন না করিলে আজ কি দশা হইত, বল দেখি? আত্মার বিবাহও হইত না, আর আজ তোমার শরীরে বঞ্চিত হইয়া আমি অন্ধকার দেখিতাম। তাই বলি, ঘোরী, তোমার কষ্ট বুঝা যায় নাই। “অশ্রুসলিল যৌত স্বদয়ে” আমার আত্মার সম্বন্ধ ভিলা করিয়াছিলাম। সেই সলিলই আমাদের অভিষেকের জল হইয়াছিল।

অভিষেকের কথায় মনে হইল, রাজগৃহে প্রত্যহই স্থানের সময় অভিষেক হইত। কিন্তু ২৭শে জামুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তুমি আমাকে বলিলে, “অভিষেক হইবে, কুণ্ডে চল;” সকলে তখনও নিদ্রিত। তখনে ত্রক্ষকুণ্ডে আনন্দমনে গমন করিলাম। সেখানে তোমার চরণে ও মস্তকে আমি অঙ্গাঙ্গি হৈল অর্পণ করিলাম। তুমিও সেইরূপে অর্পণ করিবার পর ত্রক্ষকুণ্ডে উৎস জল দ্বারা আমাদের অভিষেক শেষ হইল। পরিষ্কার জল, আকাশ পরিষ্কার, সময় গম্ভীর। স্বামী স্ত্রীর অভিসেক করিলেন; আমার স্বামী অভিষেকের জন্ত মাথা পাতিয়া দিলেন, স্ত্রী তাঁহার অভিষেক করিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তুমি আমার যাহা ছিলে, আমিও তোমার তাহাই ছিলাম। স্বামী বলিয়া আমার প্রাধান্ত কোনও দিন রাখি নাই। এটুকু অজ্ঞ হইতে আমাদের প্রভেদ।

২৮শে জামুয়ারী—বাবুর বিবাহ ভগিনী মস্তক মুগুন করিলেন; তিনি যুবতী বালবিধবা। এতদিন বৈদব্য-বেশ ধারণ করেন নাই। তোমার এই মূর্তি দেখিয়া তাঁহারও মন প্রস্তুত হইল। তুমি স্বয়ং তাঁহার মস্তক মুগুন করিয়া দিলে। কখনও জৌরকার্য্য কর নাই, দ্বন্দ্ববচন ভরসা করিয়া এ কাণ্ডও সমাধা করিলে। তোমার অমুসরণ করিয়া তিনি তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলেন, এবং আত্মিক বিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারও জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। [ ক্রমশঃ।

## দু’টি কবিতা

প্রভেশকুমার রায়

### শেষ ঘুমে

আকণ্ঠ ফুলের ছুশে ডুবে আছে তুমি,—  
ডুবেছ গভীর ঘুমে ;  
এ-ঘুমের আর শেষ নাই।  
বিবর ফুলের বাসে  
কানে ছায় বিবর স্বপ্ন,  
তোমার পাশেই শু  
নিমিলে যে কেনেই গাই।

### দুলভ

আজ তুমি নাই,—  
তোমারে অন্তর ভরে  
তাই বুঝি পাই।  
কী দুলভ মনে হয়  
অশ্রুর স্বাদ,  
মৃতির সৌভে ভরা  
মধু বিবাহ!



অপকল্প ও অনিন্দ্য

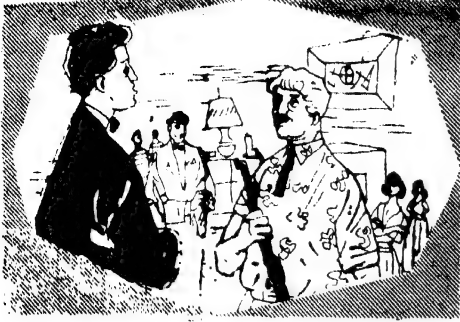
অপরাধী অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছ্বসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তায়ই  
প্রিয় ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাধের প্রসাধনী ।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম. এল. বসু স্ন্যাও কোং প্রাইভেট লি.  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

লক্ষ্মীবিলাস বার্লি অভুলনীয়



৩২

(সীত মোগাসার মূল ফরাসী গল্প La Pour-এর অনুবাদ)

জীবন পর আমার আবার ডেকে গেলাম। আমাদের সমুখে ভূমধ্য সাগরের সলিলরাশির ওপর ছিল না একটুও দোলা—তুই চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে তার ওপর—বিশাল—স্থির। অতিকায় অর্ণবপোতা নক্ষত্রবর্তিত আকাশের দিকে বিশাল কৃষ্ণবর্ণের সর্পের মত ধূসরাশি উর্গণ করছে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চাতে ভারী জাহাজটার প্রপেলারের আঘাতে জলপথের শুভ্রসংকেন বারিরাশি বিদ্যুৎ হয়ে উঠেছে এবং তার ওপর চাঁদের আলো পড়তে মনে হচ্ছে যেন ফুটন্ত চক্করলা।

আমরা ছেঁজন কি আট জন সেখানে ছিলাম—নীরবে তারিফ করছিলাম।—দুটি আমাদের নিবন্ধ হল শূন্য আফ্রিকার দিকে—আমাদের গন্তব্যস্থল। আমাদের ভেতর কমাণ্ডার ‘সিগার’ খাচ্ছিল, সে হঠাৎ খাবার সময়ে বা বলছিল, আবার তা বলতে শুরু করল।

: হ্যাঁ, সেদিন আমি ভয় পেয়েছিলাম। সমুদ্রের আঘাতে আমার জাহাজটা একটা পাগড়ের জঠরে ছ’ঘণ্টা ছিল। সৌভাগ্যবশত বিকেলের দিকে ইংরেজদের একটা করলার জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘকায় একব্যক্তি—মুখটা পুড়ে গিয়েছে—গভীর—মনে হয় যেন অসংখ্য বিপদের ভেতর দিয়ে এসেছে এবং প্রকাশিত অজানা দেশ পরিভ্রমণ করেছে—যেন তাদেরই একজন বারা বিপদের মধ্যে আরও বেশী সাহসী হয়ে ওঠে—এই প্রথমবার কথা বলল।

: তুমি বলছ কমাণ্ডার, যে তুমি ভয় পেয়েছিলে; আমি এটা বিশ্বাস করি না। যে অল্পভূতি তোমার হয়েছিল সেটা এক কথাটাকে ছুঁই তুল করছ। একজন উত্তমশীল মানুষ দারুণ বিপদের সামনেও কখনও ভয় পায় না। সে বিচলিত হয়, উত্তেজিত হয়, অস্থির হয়, কিন্তু ভয়, সেটা অল্প জিনিস।

কমাণ্ডার চেয়ে জবাব দিল: কিস্তর! তোমাকে স্পষ্ট বার দিছি আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। তারপর তামাটে রং-এর লকটি বীরে বীরে বলল: আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও! ভয় সবচেয়ে সাহসী লোকেরাও ভয় পোতে পারে। সেটা হচ্ছে একটা রক্তের জিনিস, সাংঘাতিক অসুস্থিতি, যেন আত্মার বিকৃতি, চিন্তা বা স্বপ্নের এক বীভৎস আকেশ, বার কেবলমাত্র স্মৃতিই বহুবার

সিহরণ জাগার। কিন্তু যে সাহসী, আক্রমণের সামনে, অথবা অনিবার্য মৃত্যুর সমুখে অথবা সমস্ত রক্তম বিপদের সমুখেও তার এসব কিছু হয় না। তা হয় অসাধারণ কোন ঘটনার, অস্পষ্ট বিপদের সমুখে বহুতরম কোন কিছু প্রভাবে। সত্যিকারের ভয় হচ্ছে বহুকাল আগের ভয়ের স্মরণ। যে ভূত বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে রাতে ভূত দেখেছে, সে নিশ্চয়ই এই ভয়ঙ্কর বীভৎস ভয়কে স্তব্ধকর করেছে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম প্রকাশ দিবালোকে, প্রায় দশ বছর আগে। গত শতের সময় ডিসেম্বরের এক রাতে আমি আবার তা অনুভব করেছিলাম।

আমি বহু ঐতিহাসিক কাজ এবং মারাত্মক বিপদের ভেতর দিয়ে এসেছি। প্রায়ই আমি মার খেয়েছি। একবার চোবো আমাকে মৃত বলে ফেলে চলে গিয়েছিল। আমেরিকাতে আমাকে বিস্রোহী বলে কঁাসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছিল যেন শেষ হয়ে গেলাম, পর মুহূর্তেই বিনা অজ্ঞপাতে এবং বিনা অনুরোধে আমি মন স্থির করে নিয়েছি।

কিন্তু ভয়, সেটা ওরকম নয়—ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব দিকের একটা বনের ‘ভেতর’—বিগত শতের সময়কার কথা। আকাশ ছিল অন্ধকার তাই দু’ঘণ্টা আগেই রাত হয়ে গেল। আমার পথ-প্রদর্শক একজন সহরের লোক ছোট একটা পথ দিয়ে, অন্ধবৃত্তাকার বাউ-বাঁধির ভেতর দিয়ে চলেছে—এই বাউ-বাঁধির ভেতর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে গজ্ঞন করতে করতে হাওয়া বইছে।—ওপরে দেখতে গেলাম মেঘগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটছে—পাগলের মত! যেন ভয়ঙ্কর কেনিওকিছুর সামনে থেকে ছুটে পালাচ্ছে। কখনও কখনও সমস্ত অরণ্যাকঙ্গটা যেন প্রচণ্ড ঝড়ের বহুদায় অর্ন্তনাদ করতে করতে লুটিয়ে পড়ছিল। দ্রুত পরিক্ষেপ এবং ভারী পরিচ্ছদ সবও আমার শীত করতে লাগল।

অরণ্য-রক্ষকের বাড়ীতে আমাদের নৈশ-ভোজনের কথা এবং তার বাড়ী আমাদের কাছ থেকে আর বেশী দূরে ছিল না। আমি সেখানে শীকার করতে বাচ্ছিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক কখনও কখনও চোখ তুলে বিড়-বিড় করে বলছিল: বিচ্ছিন্নি আবহাওয়া! তারপর সে আমরা বার বাড়ীতে বাচ্ছিলাম সেই বাড়ীর লোকদের কথা বলল। বাপ, বিনা অহুমতিতে বারা শীকার করে তাদের একজনকে দু’বছর আগে খুন করেছিল এবং সেই দিন থেকে তাকে বিষয় দেখাত—যেন একটা স্মৃতি তাকে উদ্দীপ্ত করত।—তার বিবাহিত ছই পুত্র তার সঙ্গেই থাকত।

অন্ধকার হয়ে এল প্রগাঢ়। আমার সমুখে অথবা চতুর্দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না; বাহি ভেঁরে উঠল বনস্পতির শাখার শাখায় সংঘর্ষের বিরামহীন ধ্বনিতে।—অবশেষে আমি একটা আলো দেখতে গেলাম এবং অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গী এক দরজায় আঘাত করল। জবাবে এল নারী-কণ্ঠের তীব্র চিৎকার। পরে একজন পুরুষের কণ্ঠ স্বর—অবক্ষণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: কে? আমার পথ-প্রদর্শক তার নাম বললে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে এক অবিদ্যমানীয় প্রুত।

এক বৃদ্ধ, শুষ্ককেশ—উদ্ভাসের মত চোখ, বন্ধু-হাতে রক্ত-শালায় মাখখানো ণাড়িরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অপরিদ্রিক

হুঁজন বলিষ্ঠ যুবক কুঠারহস্তে ধার বক্ষা করছে। অন্ধকার কোণে আমি হুঁজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম নতজানু হয়ে রয়েছে—যুগ দেয়ালের দিকে লুকানো—বুদ্ধ তার অস্ত্র দেয়ালের পায়ে ঠেসান দিয়ে রাখল এবং আমার জঙ্গ ধর ঠিক ক'রে দিতে আদেশ দিল। স্ত্রীলোকেরা ছিল একেবারে নিশ্চল।—সে সহসা বলে উঠল : দেখছেন মশাই, আজ রাত থেকে দু'বছর আগে আমি একজন মানুষ খুন করেছিলাম। এই সে বছর সে আমাকে ডাকতে এসেছিল।—আমি তার জঙ্গ অপেক্ষা করছি আজ রাত্রেও। তারপর সে এমন স্বরে বলল যে আমার হাসি পেল—তাই আমরা শান্ত হতে পারিনি।

আমি আমার বখাশাখা তাদের আশস্ত করে বললাম যে, সেই রাত্রেই উপস্থিত হতে পেরেছি বলে এবং কুসংস্কার জনিত ভয়ঙ্কর দৃগ দেখতে পাব বলে আমি খুশী হয়েছি। আমি কয়েকটা গল্প বললাম এবং প্রায় সবাইকেই শান্ত করতে পারলাম।

আজনের কাছে প্রায় অন্ধ এবং গৌণগোলা একটা বুড়ো কুকুর পায়ে ভেতর নাক গুঁজে ঘুমুচ্ছিল। অনেক কুকুর আছে বানের মুখের সঙ্গে মানুষের মুখের অনেকটা সাদৃশ্য থাকে, এই কুকুরটা বেন সেই ধরণের।

বাইরে প্রচণ্ড বড় কুস গৃহখানিকে আঘাত করছিল এবং দরজার ওপর শার্মি-যুক্ত সজ্জা বন্ধুর ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম বিদ্রোহের আলোতে স্তম্ভীকৃত গাছের পাতাগুলি হাওয়ায় এসোমেলো হয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এক প্রচণ্ড ভয় লোকগুলোকে অধিকার করেছে। কথা বলতে বলতে যখন আমি আসছিলাম তখন সবাই উৎকর্ষ হয়ে দ্বিধা কি একটা স্তম্ভিত? যুগ্জনোচিত এই ভয়ে স্তম্ভ হয়ে আমি ঘুমোবার জঙ্গ ব্যবস্থা করে দিতে বললাম।—সহসা বুদ্ধ বক্ষী এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে তার বনুকা আবার তুলে নিল এবং বিমূঢ় ভাবে তোংলাতে তোংলাতে বলল : ওই যে! ওই যে! আমি স্তম্ভে পাজি! স্ত্রীলোক হুঁজন আবার নতজানু হয়ে বসে মুখ ঢেকে রাখল এবং ছেলেরা আবার তাদের কুড়ুল তুলে নিল। আমি যখন আবার তাদের শাস্ত করবার চেষ্টা করতে বাচ্ছিলাম, তখন নিঃশ্রিত কুকুরটা সহসা জেগে উঠল এবং মাথা তুলে, দ্রীঘ প্রসারিত ক'রে তার প্রায় অন্ধ-হয়ে-বাঁধা চোখ দিয়ে আজনের দিকে তাকিয়ে এমন বক্ষণ ভাবে চিৎকার করে উঠল যে, সেদিন সন্ধ্যায় সহরের পথচারীরাও শিউরে উঠল।—সবার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হল। কোনও একটা দৃষ্ট দেখে ভয় পেয়ে সে স্থির হয়ে পড়িয়ে রয়েছে—যেন অজানা অসুস্থ এবং নিঃসন্দেহে বিভৎস কোনও কিছু দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিল। কেন না তার সমস্ত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল।—বিবর্ণ মুখে বক্ষী চিৎকার করে উঠল : ও তাকে বুঝতে পারছে! ও তাকে বুঝতে পাচ্ছে! আমি যখন তাকে খুন করি তখন ও সেখানে ছিল। বিমূঢ় স্ত্রীলোক দুটিও কুকুরের সাথে চিৎকার শুরু করল।

কাঁধের ভেতর দিয়ে শিরশির করে কি একটা বেন ব'য়ে গেল।—এই বিমূঢ় লোকদের ভেতর এই ছানে এবং এই সময়ে

জঙ্গটার এই দৃষ্ট দেখতেও অতি ভয়াবহ ছিল।—তার পর জঙ্গটা এক ঘটা ধরে নিশ্চল হয়ে চিৎকার করল—বেন স্বপ্নের ভেতর স্বপ্নায় সে চিৎকার করছিল। সাংঘাতিক ভয় আমার ভেতর ঢুকল। কিসের ভয়?—তা জানি না—ভয়, এই পৃথিবী।

আমরা নিশ্চল হয়ে বিবর্ণমুখে, উৎকর্ষ হয়ে, কল্পিত-জগদে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার জঙ্গ অপেক্ষা করছিলাম এবং সামান্য একটু শব্দই চমকে উঠছিলাম। কুকুরটা দেয়াল স্তম্ভে স্তম্ভে ঘরের চার দিকে আন্দান করতে করতে ঘূর্ণিত। এই পল্টা আমাদের পাগল ক'রে তুলল। যে সহরে-লোকটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে এক প্রচণ্ড ভয়ের বিকারে কুকুরটার ওপর কাঁপিয়ে পড়ল এবং ছোট্ট একটা উঠানের দিকের দালা খুলে জঙ্গটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিল।—সে তৎক্ষণাৎ চূপ করল এবং আমরা আরও বেশী নিশ্চলতার ভেতর নিমজ্জিত হ'লাম।—হঠাৎ আমরা সবাই চমকে উঠলাম—বাইরের দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে একটা প্রাণী ধীরে ধীরে বনের দিকে গেল—তার পর দরজার কাছে এল—মনে হল ইতস্তত ভাব তাই সে হাঙড়াচ্ছিল—তারপর দু' মিনিট ধরে কিছু শোনা গেল না—এই দু' মিনিট বেন আমাদের চেতনা ছিল না—আবার ফিরে এল দেয়াল ঘেঁষতে—ছোট্ট ছেলেরা যেমন নথ দিয়ে আঁচড়ায় সেও তেমন ভাবে দেয়াল আঁচড়াতে লাগল আস্তে আস্তে—সহসা দরজার শাশিতে একটা সাদা মাথা দেখতে পাওয়া গেল—বস্ত্র পশুর মত দু'টি স্বল্প চোখ তার—বিড়বিড় ক'রে বলার মত একটা কল্প অস্পষ্ট শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

তার পর বাঁহাঘরে এক প্রচণ্ড শব্দ স্তম্ভে পেলাম। বুদ্ধ বক্ষী গুলো ছুঁড়ে—এবং তৎক্ষণাৎ ছেলে দু'টি ছুটে গিয়ে দরজার ওপর শাসিযুক্ত বক্ষী একটা বিরাট টেবিল আর আলমারি দিয়ে বন্ধ করে রাখল।

আমি স্তোমাদের শপথ করে বলতে পারি যে এই অপ্রত্যাশিত বনুকের প্রচণ্ড শব্দে আমার সমস্ত বেহমেন-প্রাণ স্বপ্নায় ভ'য়ে গেল—মনে হচ্ছিল যেন মুচ্ছিত হয়ে পড়েছি—ভয়ে বেন মৃতকল্প।

আমরা সেখানে সকাল পর্যন্ত বইলাম চলন্ত-স্তম্ভিত হয়ে—নড়বার ক্ষমতা ছিল না, এক কথায় এই অনির্বচনীয় উদ্ভটভাৱ ভেতর শব্দ-কাঠ হয়ে গিয়েছিল।—ছাদের কাঁক দিয়ে ভোরের ক্ষণ আলোর রশ্মি দেখতে পেয়ে তব প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করতে সাহস করেছিলাম।

দরজার কাছে, দেয়ালের নীচে বুড়ো কুকুরটা পড়ে রয়েছে—গুলী আঘাতে মুখ বেঁতলে গিয়েছে। কাঁঠের বেড়ার ভলা দিয়ে গর্ত খুঁজে সে উঠান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তামাটে-বয়ের লোকটি একটু খামল, তার পর বলল : সেই রাতে আমার আর কোন বিপদ হয়নি, কিন্তু জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় বৃহৎগুলির যদি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাতে আমি রাজী কেবলমাত্র একটু মিনিট ছাড়া—যখন দরজার ওপর লোম মুখটাকে গুলীবদ্ধ করা হয়েছিল।

# শ র ৭ - স্মৃতি র টুকিটাকি

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[ পূর্বে প্রকাশিত 'টুকিটাকি'র শেষ সংখ্যায় লিখেছিলাম যে, ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসের একদিন, বেলা ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ও আমি কোন একটা ব্যাপারে একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুবই মজার। তখনকার একটি অখ্যাত পত্রিকার ঘটনাটা প্রকাশিত হয়েছিল। আমার স্বাক্ষরে প্রকাশিত হলেও লেখাটা আমার ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই হাতা লিখিত। তবে বেশী অংশ আমার, অল্প অংশ শরৎচন্দ্রের অর্থাৎ দশ আনা, ছ' আনা। তখন বিশ বছর আগে, সাধু ভাষাতেই সবকিছু লেখবার রীতি ছিল। শরৎচন্দ্রও তাই লিখতেন, আমিও তাই লিখতাম। স্মৃত্যায় সেখুণ্ড প্রচলিত সাধু-ভাষাতেই লেখাটি লিখিত এবং লেখাটি যে ছ'জনের মিলিত লেখা, তার প্রমাণ-স্বরূপ, প্রকাশিত 'টুকিটাকি'তে এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের লিখিত একখানি পত্রাংশের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেপে সেই মূল ঘটনাটি হুবহু এখানে প্রকাশ করা গেল। ]

শরৎচন্দ্রের সহিত একদিন

ভোরে উঠিয়া, নিয়মমত খুব খানিকটা বেড়াইয়া, ফিরিবার পথে নিন্তা যেমন করিয়া থাকি, বাজারটা করিয়া আনিলাম। সেদিন আর মাছ না কিনিয়া সেখানেই মাস কিনিলাম। গৃহিণীকে কহিলাম, "আজ শুধু মাসের খোল আর ভাত; শেষ পাতে দই আর সন্দেশ।" গৃহিণী কহিলেন, "আজ না তোমার শরৎ বাবুর বাড়ী নেমন্তন্ন?"

চমকাইয়া উঠিলাম। ঠিকই ত বটে! কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। শরৎ বাবুর বাড়ী নিমন্তন্নই ত বটে!

শরৎ বাবু মানে—উপভাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আগের রবিবার তাঁহার সহিত কোন এক স্থানে আমার দেখা হয় এবং আজ রবিবারে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে খাইবার জন্ত তিনি আমাকে নিমন্তন্ন করিয়া বলেন যে, সকাল-সকালই যেন আমি তথায় গিয়া হাজির হই। নিমন্তরণটা অবস্ত বিশেষ কিছু উপলক্ষে নয় মনাই।

স্মৃত্যায় সাধারণ মাস, দই, সন্দেশ পড়িয়া রহিল। তাড়াতাড়ি হানটা গারিয়া লইয়া ছুটিলাম—'নর্থ পোল' হইতে 'সাউথ পোল,' শরৎ বাবুর গৃহ হইতে বাসীগঞ্জ।

কখন মনোহরপুকুর রোডে তাঁহার নব-নির্মিত বাটিতে গিয়া দাঁড়াইলাম তখন বেলা দশটা হইবে। আমি নিজে তো নিমন্তরণের বা ভুলিয়া গিয়াছিল। সেখানে গিয়া তাঁর হাঙ্ক-ভাব দেখিয়া বিস্ময়, তিনিও সম্ভবত ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই হানটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মনের লজ্জাটা ঢাকিয়া লইয়া কহিলেন, "তা বেশই হয়েছে, চল, আর বোসে দরকার নেই।" সন্দেশও আমি বলিলাম এবং প্রার্থ করিলাম,—"যেতে হবে কোথায়?" তিনি কহিলেন, "আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে pen club-এর খাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার। চলো, ভূমি বাবে আমার গেট হোয়ে।" বাক্য করিতে পারিলাম না। বলিলাম "আপনার সঙ্গে

সেখানে বাবা নিশ্চয়, কিন্তু খাবো আমি এখানেই। এখানে খেয়ে তবে বাবা। কারণ নেমন্তন্নটা আমার এখানেই।"

স্মৃত্যায় সেই ব্যবস্থাই হইল। উভয়েই আহায়ে-বসিলাম। শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"অত পেট ঠেসে খেও না, তা হোলে সেখানে গিয়ে কিছুই খেতে পারবে না। স্নাঘটাও যত বড়, সেখানে আজ খাওয়ার আয়োজনও তত বড়। স্মৃত্যায় সেখানকার কথা মনে রেখে পেটটা একটু খালি রেখো, দোহাই তোমার।" আমি তাঁর এই সত্বপদেশে বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়া কহিলাম, "আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না?" তিনি কহিলেন, "আমিও তোমার মত বোকামী করবো না; আমি এখানেই খাব। তোমার সঙ্গে বোসে—নেহাং দুটি না খেলে নয়, তাই।" আরো বোধ হয় কি যেন বলিলেন, কিন্তু সে কথায় কাণ দিবার মত তখন আমার মন ছিল না। আমি তখন একবাটি দইয়ের মধ্যে দুইটা সন্দেশ চটকাইয়া উহা গলাধঃকরণ করিবার কাজে তন্মগ্ন-চিত্ত। আর দুইটা সন্দেশ রাখিয়া দিয়াছি—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এর জ্ঞাত।

অতঃপর আহায়াস্তে তিনি তাঁহার 'সোকার' কালীকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। কালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার খাওয়া হোয়েছে কালী?" কালী কহিল—"আজ্ঞে, না।" শরৎচন্দ্র কহিলেন—"এখানে গিয়েই একেবারে খাবে খন; সেই ভাল।" স্মৃত্যায় কালীর আর খাওয়া হইল না। আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার যাত্রাটি মন্দ হইতেছে না। উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে পূর্ব, পূর্ব হইতে আবার উত্তর এবং তথা হইতে পশ্চিম। পশ্চিম হইতে আবার পূর্ব ও উত্তর হইলেই আমার সর্বাঙ্গিক পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।

যাহা হউক, পথ নেহাৎ অল্প নয়। গাড়ী দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল আর আমরা নানাপ্রকার গল্প-গাছা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের গাড়ী, গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গলার ধারে যেখানে ইউরোপীয় হোটেল, সেইখানে আসিয়া থামিল। সেই হোটেলেরই আজ Pen Club-এর ভোজের ব্যবস্থা। স্মৃত্যায় উভয়েই গাড়ী হইতে নামিলাম। নামিলাম বটে, কিন্তু বাই কোথা? চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ; অভাবও একটা ব্যাপার, কিন্তু কোনদিকেই কোন সাড়া-শব্দ নাই। শরৎচন্দ্র চতুর্দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কহিলেন—"কই এদের কোঁকেও ত দেখতে পাচ্ছি না।" আমি কহিলাম—"এখানেই ঠিক বটে ত?" শরৎচন্দ্র কহিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। দশবার কোরে কার্ডখানা আমি পড়েছি।" আমি কহিলাম—"ভাল।"—বলিয়া গলার ধারে পায়চারী করিতে করিতে, জাহাজ, নৌকা, ডেউ প্রভৃতি দেখিতে লাগিলাম এবং সময় কাটাইবার জন্ত বোধ হয়, ডেউ গুণিতেও লাগিলাম।

এদিকে শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণের চকে চারিদিকে চাহিয়া Pen club-এর মেম্বরের খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি হোটেলের একটা চাপদাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুলোকে সব আয়া নেই?" সে কহিল;

“বাবু লোক? কোই বাবুলোগ তো নেহি আয়া, হজুর। উধার দেখিয়ে—ওকি বটগাছকা নীচুমে বাবুলোককা সব থানা-শিনা হোগা মালুম হোতা।”—সুতরাং আবার গাড়িতে উঠিয়া এ-পথ, ও-পথ, ঘুরিয়া সেই বটবৃক্ষতলে যাওয়া হইল। সেখানে কতকগুলি কলেক্সের ছাত্র মিলিয়া পিকনিক করিতেছিল। সুতরাং সেখানে হইতে হতাশ হইয়া পুনরায় উইরোপীয় হোটেলের সম্মুখেই আসা হইল। শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কার্টে সময়টা কখন লেখা আছে?” তিনি কহিলেন, “সমস্ত দিনই—বেলা আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।” আমি আমার হাতঘড়িটা দেখিলাম—প্রায় তখন দেড়টা। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “৮টা বেজে গেছে তো?” কহিলাম “কিছু বিলম্ব আছে। উঠুন, ততক্ষণ এদের এই গাছতলার চেয়ারে বসে থাকা যাক!” ধানিকন্ধান বসিয়া থাকার পর শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—“হোটেলের মানোন্নয়ক একবার জিজ্ঞাসা করে এলেই তো সব হাল মালুম হোয়ে যাবে এখন।” বলিয়া তিনি হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “সবই ঠিক; এই হোটেলই বটে, আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্তও বটে, রবিবারও বটে, তবে, কি জানি—এরা সব এলো না কেন?”

আমি কহিলাম, “আমি তো পেট ভরেই থেয়ে এসেছি, আমার জন্তে দুঃখ নেই; কিন্তু আপনার আর কালীর বরাতই—”

শরৎচন্দ্র যেন ইচ্ছা করিয়াই আমার কথাগুলি শুনিতেন চাহিলেন না। তিনি যেন একটু চিন্তিত মনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হোটেলের একটা ‘বয়’কে ডাকিলেন, বলিলেন—“চা খাবার ত সময় হোল, সেটাতে আবার কোন ব্যাঘাত না হয়”—বলিয়া তিনি ‘বয়’কে তিন কাপ চা আনিতে আদেশ দিলেন। আমাদের দু’জনের দু’কাপ আর কালীর এক কাপ। তিন কাপ চায়ের দাম আট আনা হিসাবে দেড় টাকা তিনি ‘বয়ের’ হাতে দিয়া বলিলেন—“জলদি লে আও।” জলদিই আসিল। উভয়ে তখন চা খাইতে খাইতে নানারূপ গল্প করিতে লাগিলাম।

চা-পানান্তে আমার সিগারেটের দরকার, কিন্তু আমার সিগারেট ফুরাইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র ‘বয়’কে সিগারেটের কথা বলিলে সে কহিল—“এক প্যাকেট হজুর নেহি মিলেগা, পঁচাত্তরো এক টান মিলতা হয়।” আমি শরৎচন্দ্রকে কহিলাম—“সিগারেটের আর দরকার নেই। হয়ত আঠারো আনার এক কোঁটো সিগারেট এখানে পাঁচ টাকাই দাম চেয়ে বসবে। কেন না, দু’পয়সা কাপ চা যদি এখানে আট আনা হয়, তাহলে—”

“আরে, তা ত হবেই, এ আর বেকী কি? সায়েবের হোটেল, বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, গলার ধার। ‘canopy’র নীচে, ঢেয়ার, ‘বয়’—আট আনা কাপ, এ আর বেকী কি? তার পর ‘বয়’র দিকে চাহিয়া কহিলেন—“লে আও এক ডিবিয়া।”

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাইপ ও টোব্যাকো ছিল; তিনি অনবরত তাহারই সম্ভাবনায় করিতে লাগিলেন। সিগারেট—শুধু আমারই জন্ত। বাহা হউক, অনতিবিলম্বে ‘বয়’ পঞ্চাশটি Gold flake-এর একটা টান ও তাহার ক্যাশমেমোটি হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল, চায়ের দামের তুলনায় সিগারেটের দাম খুবই কম ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ বাজারের দাম একটাকারি দু’ আনার স্থলে একটাকা চার আনা মাত্র।

অতঃপর শরৎচন্দ্র তাহার ‘পাইপ’ের এবং আমি ‘গোল্ডফ্লেক’ের ধূমপান করিতে করিতে বহুকণ পর্য্যন্ত এ-গাছতলা ও-গাছতলা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কখনো কোন গাছতলায় বসিয়া নানারকম গল্পগুজব করিয়া কাটাইলাম। কখনো বা গলার ধারে দু’জনে পাইচারী করিতে করিতে নানারূপ আবশ্যক ও অনাবশ্যক আলোচনার সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে, pen club-এর বিরাট ভোজ আমরা বিরাট ভাবে উপভোগ করিয়া বেলা ৩টা আশ্চর্য্য সময়ে ফিরবার উদ্দেশ্যে ঘোঁরে উঠিলাম।

আসিতে আসিতে, শিবপুরের পথে একস্থানে শরৎচন্দ্র কালীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কালী! থামো, থামো।” কালী গাড়ী থামাইলে, তিনি কহিলেন—“কেন থামতে বললুম, তুলে বাছি ত! :!.....ওহো! মনে পড়েছে। এক বোতল সোডা এ দোকানটা থেকে নিয়ে এস তো কালী, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।”

মিনিট কয়েক পরে, আবার এক জায়গায় এ ভাবে বলিয়া উঠিলেন—“রাখো—রাখো, কালী—রাখো।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“আবার কি? ‘সোডা’?”

“না। এ যে বুড়ো লোকটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে র’য়েছে। ওকে ডেকে আনো কালী,—এ যে, ওই ভিথিরটা।”

গাড়ী থামাইয়া কালী তাহাকে ডাকিয়া আনিল। ভিথারাই বটে। ছিন্ন মলিন বস্ত্র, জর্বাশীর্ণ দেহ, দুঃখ-কষ্ট ও অনাহারে, বুড়া না হইলেও, বৃদ্ধের ছাপ তাহার সর্ব্বাঙ্গে। মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোঁটেরে প্রাবিষ্ট। শরৎচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি ভিথিরী?”

“আজ্ঞে, না।”

“না? আচ্ছা, কিছু খাবে?”

“কি আর খাব?”

শরৎচন্দ্র তাহার সাতারের থলিয়ার ভিতর হইতে কিছু পুশা-কড়ি বাহির করিয়া হাতে লইলেন। তাহার মধ্যে সিকি, দু’আনি, আনি, পয়সা—সবই ছিল এবং সবগুলি লইয়া আশ্চর্য্য গোটো দুই টাকা হইবে। সেইগুলি হাতে ধরিয়া তিনি আবার তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিছু খেতে চাও ত বল?”

তখন লোকটি হাত পাতিয়া বলিল—“তা দিন বাবু, কিছু খাব।”

লোকটি চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এটা কি রকম হল, দাদা? দানটা কি ঠিক উপযুক্ত পাঠেই করলেন?”

“দেখে বুঝলে না, লোকটা খেতে পায় না?”

“বোধ হয়, তা নয়। লোকটা নেশাখোর বলেই মনে হয়। হয়—নেশা, নয়—জুয়া, নয়ত এ ধরনের আর কিছু; কিন্তু ভিথিরী ও ঘোটেই নয়।”

সামনের পথের দিকে নজর রাখিয়া কালী বলিল—“খুব সম্ভব লোকটা নেশাখোরই হবে।”

নিজের মনের কাছে বোধ হয় ঠিকিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, শরৎচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

হাওড়ার পোল পার হইয়া গাড়ী যখন এ পারে আসিল, তখন শরৎচন্দ্র কহিলেন—“ঘোটে ত এখন সাড়ে তিনটে, দিনের শেষ

হোতে ত এখনো অনেক বাকী, এ সময়টা করা যায় কি ? কিছুতো একটা করতে হবে ।”

আমি বলিলাম—“করবার কাজ ত যথেষ্টই রয়েছে ; আপনি ছুটন দক্ষিণে, আর আমি পাড়ি দি—উত্তরে ।”

“না ; তোমাকে এখন ছাড়া হবে না”—বলিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার গড়িতা আবার একবার দেখিয়া কালীকে কহিলেন—“চলো ‘রঙমহলে’ ।”

‘রঙমহলে’ সেদিন চরিত্রহীনের ম্যাটিনী অভিনয় । সেখানে পৌঁছাইয়া শরৎচন্দ্র কহিলেন—“এখনো ত প্রায় ঘটখানেক ঘেরি, উপেনকে জানানো যাক । কালী গাড়ী লইয়া উপেন বাবুকে আনিতে গেল । উপেন বাবু হেঙ্কন—‘বিচিত্রা’ সম্পাদক উপেক্ষনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের মাতুল । তাঁহাকে ‘বিচিত্রা’ অফিস হইতে আনিবার জন্য গাড়ী চলিয়া বাইবার পরকণ্ঠেই শরৎচন্দ্র বলিলেন—“বড় ভুল হোয়ে গেল ত ? এখানে—”

তাঁহার কথার উপরেই আমি বলিলাম—“আবার কি ভুল হোল ? তবে, আজ ভুলের পর ভুল হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের নয় । আজ ত দেখছি, আমাদের ভুলেরই দিন । পর্যা এপ্রিল যেমন-ওদের “all fools day,” তেমনি আমাদের আজ All fools day ! তা আবার কি ভুল হোল, শুনি ?”

“না, তেমন কিছু নয় । বলছি যে, এখানেই বা একটা ঘটনা বসে থাকি কি ধেরে ? উপেনের ওখানে গেলেই ত হয় ।” সঙ্গে সঙ্গেই একখানা ট্যান্ডি ভাড়া করিয়া উপেন বাবুর বাসায় বাওয়া হইল ।

‘বিচিত্রা’ অফিস এবং উপেন বাবুর বাসা—ফড়িপুকুরে । সেখানে গেলেই তিনি কহিলেন—“এই ত মোটির এল ; তাতে না এসে, ট্যান্ডি ভাড়া দিয়ে পেছন পেছন আসবার কারণ কি ?” কারণ যে কি, তাহা আমি উপেন বাবুকে বুঝাইয়া দিলাম—এক শুধু তাহাই নহে, সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে তাঁহাকে সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিলাম । সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জানাইলেন যে, Pen Club-এর খাওয়াদাওয়া আজ রবিবার নয়, তাহা আগামী রবিবারে । তাঁহার কাছেও নিমন্ত্রণের কার্ড ছিল, দেখা গেল—তাহাই বটে । তখন আমার এত হাসি পাইল যে, তাহা আর বলিবার নয় ; কিন্তু সমস্ত ভিতরেই ভূগিবার পূর্ণ হাসিবার মত অবস্থা তখন আর ছিল না ।

বধ্যসময়ে আবার ‘রঙমহলে’ আসা হইল, ভিতরে আসিয়া দেখা গেল, লোক লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই । বোধ হয়, রঙমহলের ম্যানেজার তখন—খ্রীস্তু সেন । তিনি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া, তিনখানা চেয়ার আনাইলেন এবং তাহা একেবারে আমাদের দিকে পাতিয়া দিলেন ।

অভিনয় শেষ পর্য্যন্তই দেখা হইল, খুব ভালই হইয়াছিল । অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সুদর্শন অভিনেতা শ্রীধারজ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অভিনয় কেমন হইয়াছে । তিনি ‘দিবাকরের’ ভূমিকা লইয়া নামিয়াছিলেন । বাস্তবিকই তাঁহার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল । আমার প্রশংসা তাঁহাকে খুবই উৎসাহ ও আনন্দ দান করিল ।

বাগা হউক, সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর যখন বাটা ফিরিলাম, তখন রাত ১১টা । আরো আধঘণ্টা আগেই বাড়ী পৌঁছাইতে পারিতাম ; কিন্তু আমি ‘বাস’ হইতে বরানগরে না নামিয়া ভূতক্রমে ‘আলমবাজার’ পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিলাম । ফিরতি বাসে আবার বরানগরে আসিয়া নামি । বাগা হউক, সারাদিনের ভুলের মধ্যে ঘুরিয়া গৃহে আসিয়া দেখি, আরও একটা ভুল হইয়া গিয়াছে । Gold Flake-এর সেই কোঁটাটা ভূতক্রমে আমার পকেটস্থ হইয়া আমার গৃহে আগমন করিয়াছে । অবশ্য, ৫০টার মধ্যে গোটাংশ আমার ধারায় খরচ হইয়া গিয়াছিল । স্থির করিলাম, ৪০টি সিগারেট সমেত কোঁটাটি কালই শরৎচন্দ্রকে দিয়া আসিতে হইবে । কিন্তু স্থিরীকৃত কাষাটি পূরদিন সম্পন্ন করা ঘটয়া উঠিল না ; অধিকন্তু তন্মধ্যে হঠাৎ আরো কয়েকটি সেদিন খরচ হইয়া গেল । তাহার পরের তিন দিনও ঘাইবার অবকাশ করিতে পারিলাম না । পঞ্চম দিনে যখন কোঁটাটি পকেটে করিয়া তাঁহার গৃহে গেলাম, তখন তাহাতে ছিল পাঁচটি । তারপর ঘটখানেক ধরিয়া গল্পগাছা করিবার পর, যখন টেবিলের ওপর কোঁটাটি রাখিয়া বাড়ী ফিরিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া ঝাঁড়াইলাম, তখন তন্মধ্যে রহিল—একটি । শরৎচন্দ্র কহিলেন—“ওটা আর ভুলে রেখে বাছ কেন ? ধরিয়ে টানতে টানতে-চলে বাও ।”

আমি কহিলাম—“ঠিকই ত ; ভুলে যাচ্ছিলুম”—বলিয়া শেষ সিগারেটটি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম ।\*

\* গত ১৩৬১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ‘মাসিক বহুমতী’তে ‘শরৎ-স্মৃতির টুকটাকি’ প্রকাশিত হবার পর, আমার বাসা পূর্নি বর্তনের হালায়া-হটগোলে রচনাটির বাকী পাণ্ডুলিপি খোয়া যায় । এ বয়সে নতুন কোরে আবার লেখা যে কতটা কঠিন, তা আমার মত ধীরের বয়স, তাহাই বুঝবেন । অথচ বহু পাঠক-পাটিকার কাছ থেকে বাকীটুকু লেখার জন্য জোর তাগিদ এসেছে সত্যতঃ বৎসরব্যিক কাল পরে আবার ‘শরৎ-স্মৃতির টুকটাকি’ লিখতে বাধ্য হইলাম । আমার অনিচ্ছাকৃত এই দীর্ঘদিনের বিলম্ব পাঠক-পাটিকাগণ ক্ষমা করবেন ।—লেখক ।

### লেখকলেখিকার কর্তব্য

A writer naturally must earn money in order to be able to live and write, but under no circumstances must he live and write in order to earn money... The writer in no wise considers his work a means. It is an end in itself ; so little is it means for him and others that he sacrifices his existence to its existence, when necessary.....The

freedom of the Press consists primarily in not being a trade. The writer who degrades it by making it a material means deserves, as a punishment for this inner slavery, outer slavery—censorship ; or rather his existence is already his punishment.

—KARL MARX



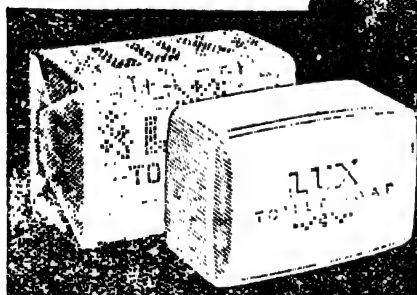
“এর শুভ্রতাই  
এর বিশুদ্ধতাই  
পরিচায়ক”

বলেন অনুভা গুপ্ত

“সেইজন্মেই  
আমি সন্ন্যাসী  
লাক্স টয়লেট  
সাবান

ব্যবহার করে  
থাকি”

লাক্স টয়লেট



অনুভা গুপ্ত বলেন:

“আপনার স্বক  
মহন ও হৃদয়  
মাথতে হলে  
ভালভাবে মেখে  
নিই...”



“লাক্স টয়লেট সাবানের  
সরের মত  
ফেনা—কি  
সৌরভময়”।



“তারপর ধুয়ে মুছে  
ফেলুন—  
আপনি এত  
তাজা অমৃভব  
করবেন।”



“সর্বাসঙ্গীন সৌন্দর্যের  
জন্তে বড় সাইজ  
ব্যবহার করুন  
—যা আমি  
করি।”



টিভি-র কামের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য সাবান

LT3. 479-X52 BO



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ডি. এচ. লরেল

মানব মধ্যে হঠাৎ এক একটা ভাবনার পাখা যেন ঝটপট করে উঠছিল, মনে হচ্ছিল এ পাখি, এ অস্ত্রায়। আবার নিজের মনেই ভানতে ইচ্ছে করছিল, 'কেন? অস্ত্রায় কিসে? কোন দিক দিয়ে অস্ত্রায়?' এর কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু ধ্বংসের পথে নামতে গিয়ে বৃক্কের মধ্যে কোথায় যেন আগুনের হলকা ছোট, পল বাধা পায়, ফিরে আসে।

রাষ্ট্র দিয়ে একটা গরুর গাড়ি গোড়াতে গোড়াতে চলেছিল। হঠাৎ বিজলী বাতির 'মিটারে' কী একটা শব্দ হ'ল, বাতি গেল নিবে। পল নড়ল না, এক দৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে বসে বইল। ইদুরগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে শুধু চিমনির আগুনের লাল আভা।

তারপর আবার বৃক্কের মধ্যে সেই প্রয়োজনের গুরু হ'ল। এবার আগের চেয়েও স্পষ্ট, আগের চেয়েও নিচু হ'ল।

'উনি তো আর বেঁচে নেই। এই যে সারা জীবন উনি সংগ্রাম কর'বে গেলেন, এর কল হ'ল কী?'

এটা পলের 'নৈরাশ্যের কথা'। এই জন্তেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মায়ের পথ ধরে মৃত্যুর দিকেই পা বাড়ায়।

আবার উত্তর আসে, 'তুমি তো বেঁচে আছ।'

—'তাতে ঠর কী হ'ল? উনি তো নেই।'

—'আচ্ছন। তোমার মধ্যে বেঁচে আছেন।'

পল এতে সন্তান পায় না। তার বৃক্কের বোঝা আরও ভারী হয়ে ওঠে। আবার মনের মধ্যে কথা জাগে, 'ঠর জন্তেই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।' ঠর জন্তে? তবু ঠর জন্তে? পলের মন খুঁতখুঁত করতে থাকে। বাঁচবার আগ্রহ জাগি-জাগি করেও জাগে না। আবার কান পেতে থাকে। শোনে, কে যেন বলছে, 'মায়ের জীবনধারণকে ব'রে বেঁচে হবে তোমার। তাঁর কাছ সম্পূর্ণ করতে হবে তোমাকে।'

না, না, না। পল চায় না বেঁচে থাকতে। সব কেলে দিয়ে সে ছুটে চলে যেতে চায়।

বাঁচবার ইচ্ছা বলে, 'কেন? তুমি ছবি আঁকতে পার, তাই আঁকে।' কিংবা বিয়ে করে ছেলেপুলের বাপ হও। এই দু'দিকেই তুমি মায়ের সাধনাকে রূপ দিতে পারো।'

'কিন্তু ছবি আঁকা আর বাঁচা এক কথা নয়।'

'তা'হলে বাঁচো। সত্যিকারের বাঁচার মত বাঁচো।'

খুঁতখুঁতে মন প্রতিশ্রুতি করে। বল, 'বিয়ে ক'র কাকে?'

—'বতদূর সম্ভব ভালো দেখে খুঁজে নাও।'

—'কে? মিরিয়াম?'

পল কান পেতে মনের কথা শোনে, কিন্তু কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারে না।

তার পরে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, সোজা-সুজি চলে যায় শোয়ার ঘরে। শোয়ার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পল সোজা হয়ে কাঁড়ায়, তার হাতের মুঠো পাকিয়ে ওঠে। তার সমস্ত অন্তর নিভে শুধু দু'টি কথা অগ্নিশ্রাবের মত বেরিয়ে আসতে চায়—'মা মগো'। নিজেকে সে স্মরণ করে নেয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে 'যাতে কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়। ও কথা আর সে বলবে না। মৃত্যু-পথের পথিক হতে সে চায় না, চায় না নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে। ভীষনের বাঁহে তার হার হয়েছে এক কথা সে কিছুতেই মনেবে না। মৃত্যুর আগুনের কিছুতেই সে পা বাড়াবে না।

এবার পল শয্যায় এলিয়ে দেয় নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে তার চোখ ভড়িয়ে ধরে, ঘুমের বোলে তাকে আশুনাকে তুলে দিয়ে পল নিশ্চিন্ত হয়।

এমনি করে দিন কাটে। পল যেন জীবন-মরণের গোলায় ডুলাছে। এক একবার মরণের দিকে চলে পড়ে, তার পর আবার নিজেকে টেনে নিয়ে আসে জীবনের দিকে। তার প্রাণের সঙ্গী কেউ নেই। সব চেয়ে দুর্বল এই যে, কোথায়ও তার বাবার নেই, কিছু করার নেই, কিছু বলবার নেই, সে নিজেই যেন নিজের মধ্যে নেই। মাঝে মাঝে পাগলের মত অজ্ঞ মনে রাষ্ট্রা ধরে ছুটে চলে। মাঝে মাঝে সত্যিই সে পাগল হয়ে যায়, পৃথিবী যেন হারিয়ে যায় তার কাছে, তার পর আবার ধরা দেয় চোখের সামনে। পল হাঁপিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মদের দোকানের দরজার সামনে পীড়িয়ে থাকতে গিয়ে মনে হয় সব কিছু যেন হঠাৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। লোকনের পরিচায়িকার মুখখানা, ওখানে গল্পের মজলের দল, এখানে নিজের টেবিলে রাখা দু'টি—সব কিছুই তার চোখে পড়ছে যেন বহু দূর থেকে। তার আর ওদের মধ্যে কী একটা ব্যবধান। ওদের ধরতে-ছুঁতে সে পায় না। এদের কাউকেই সে চায় না, এমন কি মদের দু'টিতেও তার যেন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ মুখ ফিরায়ে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। দরজার চৌকটে পীড়িয়ে সামনের আলোকিত রাষ্ট্রাটির দিকে চেরে থাকে। সে যেন এখানকার কেউ নয়, এই পথের মেজের মধ্যে তার স্থান নেই। কিসে যেন তাকে আলাদা করে রেখেছে। ওখানে বা কিছু প্রতিদিনের ঘটছে, তাদের সঙ্গে কোন যোগ নেই তার। মনে হয় যেন শত চোঁতাতেও রাষ্ট্রা এর আশা-পাঠগুলিকে সে ছুঁতে পায়বে না। তবে কোথায় যাবে সে? কী করবে?

পলের দম আটকে আসে। মনের উদ্বেগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ভয় হয় এই বৃষ্টি বৃক কেটে চৌচির হয়ে যায়।

তারপর আবার নিজেকে ফেরায় পল। বলে, 'না, না, এমন হলে ত' চলেবে না।' ঘরে ফিরে গিয়ে আবার বসে মদের টেবিলে। মাঝে মাঝে মদ খেলে বেশ ভালই লাগে। মাঝে মাঝে ফল হয় খায়াশ। রাত্তা দিয়ে ছুটে চলতে ইচ্ছে হয়। এখানে, ওখানে, সেখানে—কত জায়গায় সে যে ছুটে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। কাজে লাগবার সঙ্কল্প করে পল, কাগজ পেঙ্গিল নিয়ে বসে। কিন্তু দু'এক আঁচড় টানার পরই পেঙ্গিলটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কোন একটা ক্লাবে, যেখানে গিয়ে তাস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলতে পারে, অথবা মদের দোকানের পরিচারিকার সঙ্গে গিয়ে একটু রসিকতা করে আসে। অথচ সেই মেয়েটির দিকে এমনিতে তার চোখও পড়ে না, যে কোন নিষ্ঠাশ্রী জিনিসের যত এই মেয়েটিকে বারবার সে দেখে এসেছে।

এ ক'মাসে পল বেশ শুকিয়ে গিয়েছে, চোরালোর হাড় বেরিয়ে পড়েছে। আরশি দিয়ে নিজের চোখের দিকে চেয়ে দেখবার সাহস হয় না। নিজের দিকে নজর দেবার সময়ও তার নেই। নিজের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াবার উপায়ই শুধু খোঁজে, কিন্তু কাকে অবলম্বন করে সে পাবাবে? কার হাত ধরে সে মুক্তি পাবে? নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মিরিয়ামের কথা মনে পড়ে। হয়তো—এখনও হয়তো—

এমনি সময়ে হঠাৎ এক রবিবারে গিঞ্জের গিয়ে পল মিরিয়ামকে দেখতে পেল সামনে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। সবাই আসিন ছেড়ে

দাঁড়িয়ে স্তোত্র গাইছে। মিরিয়ামও গানে যোগ দিয়েছে। গিঞ্জের বাতিটি তার নীচের টেবের উপর প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে। দেখে পলের মনে হ'ল, ও যেন সত্যি সত্যি আশা করবার মত কিছু খুঁজে পেয়েছে। হয়তো ইহলোকের নয়, পরলোকের আশা—তা'হলেও ও কিছু একটা পেয়েছে। একটু শান্তি, একটু প্রাণের স্পর্শ। ওকে দেখে পলের মন সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ও গান গাইছে, সে গানে স্নদেবের জন্তে কী কল্পণ আকৃতি। পল স্থির করল এবার ওর উপরেই নিজের আশা-ভরসার ভার ছেড়ে দিতে হবে। কতকশে প্রার্থনা শেষ হবে, ওর সঙ্গে দুটি কথা বলে যেতে পারবে, পল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভিড়ের চাপে মিরিয়াম বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পলের একটু আগে আগেই। সামনে একটু দূরে দূরে মিরিয়াম চলেছে, পলের শ্রায় নাগালের মধ্যেই বলা চলে। পল যে ওখানে রয়েছে, মিরিয়াম তা জানে না। পল দেখল ওর কৌকড়ানো কাঁসা চুলের নীচে গলাব অগ্রভাগটি যেমন গোলাপি, তেমনি ইবং আনত। মনে হল তার চেয়ে ও ঢের বেশী বড়, ঢের বেশী শক্তি ওর মনে। এবার থেকে ওর উপর ভর করেই জীবনের পাড়ি জমতে হবে।

গিঞ্জের থেকে বেরিয়ে মিরিয়াম নানা লোকজনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছিল। এ ওর স্বভাব। ভিড়ের মধ্যে ও যেন হারিয়ে যায়, জনতার মধ্যে ওকে মানায় না। পল এগিয়ে গিয়ে ওর হাতের উপর হাত রাখল। মিরিয়াম চমকে উঠল। ভয়ে ওর বড় বড় দুটি কটা চোখ আরও বিস্তারিত হয়ে উঠল, তারপর সামনে পলকে দেখে কোঁড়ালে ভরপুর হয়ে

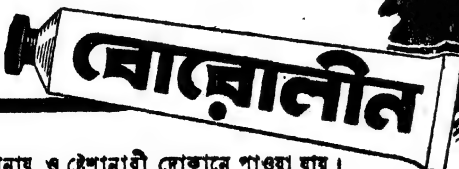
### আপনার মুখের সৌন্দর্য ও লাভ্য বাড়ানো আপনারই হাতে!

টাকা ফুলের মত সৌরভ আর স্বকের পুষ্টি রক্ষার উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে মতুম বোরোলীন।

ঘীরে ঘীরে বোরোলীন মুখে লাগিয়ে দেবার কয়েকমিনিট পরে পরিকার কাপড় দিয়ে মুছে ফেললেই স্বক মশন ও উজ্জল হয়ে উঠবে আর সারাক্ষণ এর স্নিগ্ধ স্রবাস মনকে মাতিয়ে রাখবে।

নিয়মিত ব্যবহারে ত্রন, এবং সব রকম কালচে দাগ উঠে গিয়ে স্বক শুভ্র ও কমণীয় হয় এবং এর হালকা প্রলেপে সজীব থাকে। শীতের দিনে বোরোলীন মুখ ও চোঁট কাটা এবং স্বকের রক্ততার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং মুখস্তীর কোমলতা ও সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

বোরোলীন এক অভিনব, স্বরভিত উচ্চাঙ্গের প্রসাধনী।



সব ভান্ডারখানায় ও টেশানারী দোকানে পাওয়া যায়।

উঠল। পল মিরিয়ামের দৃষ্টির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

মিরিয়ামের কথা জড়িয়ে বাড়িল। সে বলল, ‘আমি—আমি জানতুম না’—

‘আমি কি জানতুম?’ পল বলল। বলে দুবের দিকে চেয়ে রইল। মনের মধ্যে যে আশা জেগে উঠতে চেয়েছিল, সেটা আবার বেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

পল শুধাল, ‘তুমি শহরে কি করছ?’

—‘আমার বোনের বাড়িতে আছি। এইখানে থাকেন ওরা।’

—‘তাই বলা! ক’দিন আছ আর?’

—‘বেশী নয়। ক’দিন অবধি।’

—‘তোমাকে কি এতখানি বাড়ি যেতে হবে?’

মিরিয়াম প্রশ্ন শুনে ওর দিকে চাইল, তারপর মুখখানা নীচু করে বলল, ‘না, এমন কিছু জরুরী কাজ নেই।’

তারা ট্রেট ব্রিজ-এর ট্রাম ধরল। পল বলল, ‘বাত্রে আমার ওখানেই থেও। তারপর তোমাকে পৌছে দিয়ে যাব।’

মিরিয়াম আন্তে আন্তে ধরা গলায় বলল, ‘আচ্ছা।’

গাড়িতে বিশেষ কোন কথা হল না। সেতুর নীচে ট্রেট মরীর জল ফুল ফুলে চলেছে। সামনে যতদূর হুঁচোখ যায় সব অন্ধকার। পলের বাসা শহরের এক প্রান্তে, তার সামনে নদী ভায়ের প্রকাণ্ড মাঠগুলো ধুঁ ধুঁ করছে। গাছপালা বড়ো বেশী নেই। মদীতে জল এখন কানায় কানায়। এই নিঃশব্দ জল-রাশি আর নিগন্তবিসারী অন্ধকারকে একপাশে রেখে হ’জনে চুপি চুপি লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললো।

বাত্রেয় খাবার সাজানো ছিল। পল ঘরে ঢুকে জানালার পর্দা টেনে দিল। টেবিলে ছিল এক গোছা লাল ‘এনিমোন’। মিরিয়াম নীচু হয়ে তার গন্ধ নিতে গেল। আঙুল দিয়ে ফুলগুলোর স্পর্শ নিতে নিতে মিরিয়াম চাইল ওর দিকে। বললো, ‘চমৎকার ফুলগুলো। নয়?’

—‘হ্যাঁ। তুমি কি খাবে? কফি?’

—‘তা’হলে ত’ ভালই হয়।’

—‘তা’হলে বসো একটু।’

পল রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। মিরিয়াম তার টুপি, কোট ইত্যাদি ধুলে বেখে ঘরের জিনিসপত্র দেখে বেড়াতে লাগল। জিনিসপত্র ফলেতে বড়ো বেশী কিছু নেই। কাঁকা কাঁকা লাগে ঘরটাকে। দ্রাবলো টাডানো তার নিজের ফটো, স্নায় ফটো, আর এ্যানির প্রকাণ্ডা ফটো। আঁকার টেবিলে ওটা কি? মিরিয়াম কোঁতুলী হয়ে এগিয়ে গেল। দেখল শুধু কয়েকটা এলোমেলো তুলির টান। লাক্সা, আজকাল ও কী বইটাই পড়ছে? গিয়ে দেখল একটা লাক্সা উপশাস। রকের উপর চিঠিগুলো খুঁজে দেখতে গেল। চিঠিগুলো হয় এ্যানির নয় আর্থারের। নয়ত কোন নাম না জানা লোকের হাতে লেখা। পল যা কিছু নিজের হাতে স্পর্শ করেছে, তত কিছু জিনিস ওর নিজস্ব, সবের মধ্যেই কী যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করে মিরিয়াম, এরা যেন তাকে বেঁধে রাখে। কত দিন হ’ল লাল চলে গেছে তার কাছ থেকে, আজ ওকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হচ্ছে করে, জানতে হচ্ছে হয় ও আজকাল কী করে, কী ভাবে?

কিন্তু তার কোঁতুল পরিভ্রমণ করতে পারে এমন কিছু উপাশন এ ঘরে নেই। সেখা সেখা মিরিয়ামের অশান্তিই শুধু বাড়ি। এ ঘরের সব কিছুই যেন অকারণে আঘাত করতে উজ্জত হয়ে ওঠে, সাদৃশ্যের বাস্পও এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মিরিয়াম পলের আঁকা একটা ছবির বই কুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় পল কফি তৈরী করে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, ‘নতুন কিছু নেই এতে। একটাও তোমার ভাল লাগবে না।’

কফির ট্রেটা টেবিলে রেখে মিরিয়ামের পিছনে গিয়ে পায়ের দোতলা লাগল। মিরিয়াম আন্তে আন্তে পাতা ওলটালে, যেখানে যেটুকু আছে সবটুকু ভাল করে দেখে না নিলে তার তৃপ্তি হবে না।

এবার খেতে বসল দু’জনে।

পল বলল, ‘একটা কথা শুনছিলাম। তুমি নাকি নিজের পায়ে নিজে কাঁড়বার জন্তে তৈরী হচ্ছে?’

মিরিয়াম মুখ নীচু করে বলল, ‘ঠিকই শুনেছ।’

—‘সেটা কি রকম, শুনেতে পারি?’

—‘কি রকম আবার! তিন মাসের জন্তে আউটনের কৃষি-কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছি, তার পর হয়ত ওখানেই একটা শিক্ষারিত্রীর কাজ ছুটে যাবে।’

—‘তাই বল। তা বেশ ত’। তুমি ত’ ব্যববই নিজের মতে চলবার স্বাধীনতা চাইতে।’

—‘হ্যাঁ।’

—‘কিন্তু আমাকে জানাও নি কেন?’

—‘আমি নিজেই ত’ জানলুম গত সপ্তাহে।’

—‘কিন্তু, পল বলল, ‘আমি ত’ শুনেছি মাসখানেক আগে।’

—‘হতে পারে, কিন্তু তখনও কিছু ঠিক হয় নি।’

পল অমুহুরের হয়ে বলল, ‘তা হলেও তুমি যে চেষ্টা করছ, সে-কথাও ত’ কই আমার বল নি।’

মিরিয়াম খেয়ে বাড়িল বেন জোর করে। এ ভঙ্গী পলের পরিচিত। সে জানে মিরিয়ামকে প্রকাশ্যে কোন কিছু করতে বললেই সে এমনধারা সঙ্কচিত হয়ে ওঠে। বলল, ‘তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ, সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে যাওয়াতে?’

—‘হয়েছি বৈকি।’

—‘হ্যাঁ—কিন্তু একটা করলে বাটে তুমি।’ কথাটা এ ভাবে বললেও, মনে মনে কিন্তু পল দুঃখিতই হ’ল।

মিরিয়াম প্রতিবাদ জানাল। সোজা হয়ে বসে বলল, ‘তুমি কিছু একটা নয়—এ তার চেয়েও বড়ো।’

পল মুহু মুহু হাসতে লাগল। মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল, ‘হাসলে যে। এ বড়ো কাজ নয়?’

পল বলল, ‘আমি ত’ অস্বীকার করছি না। এটা বড়ো কাজ নয়, এমন কথা আমি বলতে দাব না। তবে তুমিও দেখবে যে নিজের পায়ে শুধু দিয়ে নিজে দাঁড়ানোটাই সব-কিছু নয়।’

খেতে খেতে মিরিয়ামের গলায় বেন খাবারগুলো আটকে বাড়িল। বলল, ‘জানি। একেই সব কিছু বলে আমি ঘরে রাখি।’



## দৌলখ্য আপনার হাতের চ্যুত্রেয়

এই ক্রীম স্বক কোমল করে  
— মুখশ্রী লাভণ্যময় রাখে

পণ্ড স কোন্ড ক্রীম মেখে নিয়মিত স্বকের যত্ন নিলে স্বক মোলায়েম ও সজীব থাকে। রোজ রাত্তিরে মুখে পণ্ড স কোন্ড ক্রীম লাগিয়ে মালিশ করে বলিয়ে দিন। এই ক্রীম প্রতি লোমকূপে ঢুকে লুকানো ময়লা বের করে দেয়—মুখে কোমল ও বরবরে ভাব আনে। এই ক্রীম স্বক কোমল ও নির্মল করে—মুখশ্রী লাভণ্যময় রাখে।

**পণ্ড স**  
কোন্ড ক্রীম

বিনামূল্যে প্রসাধন পুস্তিকা। আমাদের প্রসাধন পুস্তিকা 'লাভ লিটার উইথ পণ্ড স' বিনামূল্যে পাবার হস্তে লিখুন। চেহারা চমকী করে তুলবার বাসা কোমল এতে আছে। পোষ্ট বক নং ১০১২, লাবাটাই—এই টিকায় লিখুন।



মুখের স্বাভাবিক চেহারা আবার  
ফিরিয়ে আনুন

মুখ খোঁচার সময় স্বকের চকতা—নিবারক স্বাভাবিক তৈলাক্ত অংশটিও ধুয়ে যায়। প্রতিবার মুখ খোঁচার পরই পণ্ড স কোন্ড ক্রীম মেখে তার অভাব পূরণ করুন। এই ক্রীম মুখশ্রী বজায় রাখে—সজীব ও দ্যাবণ্য করে তোলে।

পল বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো? পুরুষ মানুষের কাছে কাজই জীবনে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে, যদিও আমার কাছে তা নয়। কিন্তু মেয়েদের কাছে কাজ শুধু জীবনের একটা অংশ। তাদের সত্যিকারের রূপ এর মধ্যে দিয়ে কোটে না।' মিরিয়াম বলল, 'কেন? পুরুষমানুষই কি তার জীবনের সবটুকু কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে পারে?'

—'হ্যাঁ, প্রায় সবটুকু।'

—'আর মেয়েরা যেটুকু দেয়, সেটুকু তাদের জীবনের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশ, কেমন?'

—'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি।'

তখন রাগে মিরিয়ামের হুঁচোখ বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, 'এ কথা যদি সত্যি হয়, তা'হলে মেয়েদের লজ্জা রাখবার ঠাই নেই।' পল বলল, 'বসন্তের জানি কথাটা সত্যি। তবে সব কথা আমি নাও জানতে পারি।'

খাওয়ার পরে দু'জনে দু'টি চেয়ার নিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসল। মিরিয়ামের পর্দনে ঘন কালো রঙের একটা হাফা পোষাক। তার স্নান রঙ আর সাদাসিধে হাত-পায়ের সঙ্গে ভাষাটাকে বেশ মানিয়েছে বলতে হবে কৌকড়া চুলগুলো এখনও খুলে খুলে উড়ছে, কিন্তু মুখশানা আগের চেয়ে পরিপক, গলাটিও আগের চেয়ে ক্লশ। পলের মনে হল ও যেন বুড়ো হয়ে গেছে, বয়েসে ও যেন দ্বিগুণ হয়ে বড়ো। ওর যৌবনের মুহূর্ত ফুটে উঠে হুঁসিনেই করে গেছে। কেমন একটা কাঠিন্য, একটা নিস্তব্ধ ভাব এসেছে ওর জীবনে। মিরিয়াম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন চলছে তোমার?'

—'বেশ ভালই বলতে হবে।' পল জবাব দিল।

মিরিয়াম ওর দিকে চেয়ে রইল, ও আর কিছু বলে কি না। তার পর গলাটা খাটো করে বলল, 'না।'

মিরিয়ামের হাত দু'টি হাটুর উপর ন্যস্ত। কি একটা অকারণ চাক্ষুষ ওর সারা দেহে, নিজের উপর এক বিন্দু বিশ্বাসও যেন তার নেই। দেখে পলের মন কেঁপে ওঠে। মুখে কাঠিহাসি হাসে। মিরিয়াম নিজের আঙুলগুলি রাখে চোঁটের উপর। পল চেয়ারে ফেলান দিয়ে পড়ে আছে। তার কণ্ঠ, যৌক্তিক, বেনদার্ট সহজিক এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারের গায়ে। হঠাৎ মিরিয়াম মুখ ঝুঁকি আঙুল নামিয়ে নড়ে চড়ে বসল, ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্নানার সঙ্গে ছাড়ছাড়ি হয়ে গেছে তোমার?'

—'হ্যাঁ।'

চেয়ারের গায়ে পলের দেহটা যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে।

মিরিয়াম বলল, 'জানো, আমি ভাবছি আমাদের বিয়ে সেরাটাই বোধ হয় ভালো।'

পল চোখ খুলে চাইল। বহুকাল এমন সচেতন ভাবে চোখ তার নি। মিরিয়ামের কথাগুলোকে আর উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

মিরিয়াম বলল, 'কেন তুমি দেখতে পাও না? জানো না—কেকে কেমন করে নষ্ট করছ তুমি? আজ যদি তোমার দেহ পড়ে—তুমি মরে যাও, তা হলেও আমি জানতে পারব না। আমাদের পরিচয়ের কি মূল্য ছিল তবে?'

—'আর ধরো যদি আমাদের বিয়েই হয়?' পল প্রতিপ্রেরণ করল।

—'তা'হলে আর যাই হোক, তোমাকে এমন করে নষ্ট হয়ে যেতে আমি দেব না। এমন করে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে যত সব মেয়েদের খল্লবে পড়ে—এই দুর্গতি থেকে তোমার বাঁচতে পারব আমি।'

পলের মুখে হাসি ফুটে উঠল, আপন মনে পুনরুক্তি করল, 'খল্লবে পড়েই বটে।'

মিরিয়াম জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করল। পলের হাত-পা আবার অবশ হয়ে এলো। আস্তে আস্তে সে বলল, 'না। আমার বিশ্বাস হয় না। বিয়ে হলো কি হবে?'

মিরিয়াম বলল, 'আমি ত শুধু তোমার কথাই ভাবি।'

—'আমি জানি।' পল বলল, 'কিন্তু আমাকে তুমি এত বেশী ভালবাস যে সর্বদা যেন নিজের গলায় বলিয়ে রাখতে চাও। আমার মন হাপিয়ে ওঠে।'

মিরিয়াম মাথা নীচু করে মুখে আঙুল দিয়ে বসে রইল। তার অন্তর হাপিয়ে ত্রিস্তার কাশ। সে বলল, 'বিয়ে না করে তুমি করবে কি?'

—'জানি না।' পল বলল, 'এমনি করেই চলে যাবে কোন মতে। ভাবছি শীগুগির একবার কোথাও দূর দেশে চলে যাব।'

ওর বুক-ডরা নিরাশা আর এই অকারণ জেদ দেখে মিরিয়াম আর স্থির থাকতে পারল না। আগুনের সামনে ওর পাশটিতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। মিরিয়াম জানে এখন সে ছাড়া পলের আর গতি নেই। এখন সে যদি উঠে গিয়ে ওকে টেনে নিতে পারে, ওর গলায় বাহ মেলে দিয়ে জোর করে বসতে পারে, 'তুমি আমার—তুমি আমারই' তা'হলে পল বিনা আপত্তিতে নিজেকে তার হাতে তুলে দেবে। কিন্তু এত সাহস কি তার আছে? নিজেকে সে অতি সহজেই অন্তর্যের কাছে বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যের উপর নিজের দাবী জানানোর মত জোর কি তার আছে? ওই চেয়ারের গায়ে যে কণ্ঠ দেহটি এলিয়ে আছে, তার কথা এক মুহূর্তের অন্তরে সে তুলতে পারে না। কিন্তু না, এত সাহস তার নেই যে কাছে গিয়ে বাহর বন্ধনে ওকে টেনে নেয়; গিয়ে বলে, 'নাও আমাকে। এই দেহের উপর দাবী শুধু আমার।' কিন্তু মনে মনে চায়। তার নারী স্বপ্নের সমস্ত কামনা সেই ভাবনাগুলোকে ঘিরে জেগে ওঠে। তবু সাহস হয় না, সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। ভয় হয় পল নিজেকে হারত ধরা দেবে না। তার হয় বুঝি বা বড় বেশী কস চাইতে গিয়েছে। পলের কাছে গিয়েই ওর হাত-পা বুজ্ঞ আসে কেন? পল ওর কাছে কী এমন জিনিস চাইবে যে ভাবতে গেলেই ওর দেহ অবশ হয়ে আসে? মনের চাক্ষুষ মিরিয়াম দমন করতে পারে না। তার হাত দু'টি কাঁপতে থাকে। একবার মাথা তুলে তার পলের দিকে। চোখ দু'টি কেঁপে ওঠে, ভালো করে চাইতে পারে না, শুধু চোখের ভাষায় ফুটে ওঠে ভীক, সচকিত মিনতি। পলের হৃদয় কল্পনার দ্রব হয়ে আসতে থাকে। হাত দিয়ে ধরে ওকে ওঠায়, কাছে টেনে এনে আদর করে, চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'সত্যি তুমি চাও আমাকে বিয়ে করতে?'

মিরিয়াম ভাবে; হার, পল তাকে তেঁকে দেয় না কেন? তার

জীবনের সব কিছুই ত' পালের। তবু পল চাত বাড়িয়ে তাকে নিতে আসে না কেন? এতদিন পালের এই নিষ্ঠুর অবস্থে! সে সবে এসেছে, মনে-প্রাণে সে পালের, তবু পল কোন দিন তার উপর দাবী জানায় নি। আবার পল সেই একই হৃদয়হীন অভিনয়ে যেতে উঠেছে। আর কত সহ্য করবে মিরিয়াম? আর সে থাকতে পারল না। হ' হাতে পালের মুখগাণা ধরে এক দৃষ্টে চাইল তার চোখে চোখ রেখে। না, বড় কঠিন পালের হৃদয়, ও যেন অস্ত্র কি চায়। মিরিয়াম মিনতি জানায়, বলে এই সহ্যের সমাধানের ভার তার উপর যেন পল ফেলে না রাখে। এত 'সমতা' তার নেই। কোথায় যেন সে বড় দুর্বল। তার বুক চৌচির হয়ে যেতে চায়, মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি চায় না?'

'না, খুব বেশী চাই না।' জবাব দিতে গিয়ে পালের সব ব্যথা যেন উথলে ওঠে। মিরিয়াম মুখ ফিরিয়ে উপাঙ অস্ত্র বোপ করে। তার পর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে সে পালের মুখ নিজের বুকে চেপে ধরে, আন্তে আন্তে বৃকের দোলায় ওকে দোলাতে থাকে। ওকে পাবার আশা যদি একাছাই না থাকে তাহলেও ওকে অন্ততঃ এটুকু সাধনা দেবার ক্ষমতা তার আছে। পালের চুলে আঙুল ঢালাতে ঢালাতে মিরিয়াম নিজেকে বলিয়ে দেবার বেদনা-ভরা তীব্র আনন্দ তম্বুত করতে থাকে। এইটুকুই শুধু তার পাওয়ার। আর পল বশতে পারে জীবনের খেলায় আরও একবার তার হার হ'ল, ক্ষোভে, বেদনায় তার অন্তর মথিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কারও বাবর

উকতার মধ্যে লালিত হতে সে চায় না, চায় নিজের ভার উজাড় করে ওর চোখে তুলে দিতে। ওর আশ্রয় একান্ত করে চায় বলেই এই আশ্রয়ের ভাণ তার ভাল লাগে না। সে সঙ্কচিত হয়ে সবে আসে। আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, বিয়ে না করে আর কিছু আমরা করতে পারি না?' বাথার ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। মুখে নিকপায়ের ভঙ্গী।

মিরিয়াম আবার আঙুল কামড়াতে শুরু করল। চাপা গলায় বলল, 'না। আমার ত' অস্বস্তি: মনে হয় না।'

বোবা গেল এখানেই তাদের সম্পর্কের শেষ। মিরিয়ামের সাধ্য নেই পলকে ডেকে নেয়, ডেকে নিয়ে ওর সব দাবি তুলে নেয় নিজের হাতে। সে জানে শুধু নিজেকে দিতে, নিজের প্রতিটি মুহূর্তকে সানন্দে সে পালের হাতে তুলে দিতে পারে। কিন্তু পল ত' তা চায় না। পল চায় মিরিয়াম তাকে জোর করে বেঁধে রাখুক, জোর করে এসে হাসতে হাসতে বলুক, 'এই তোমার সামনে এসে শাঁড়ালুম আমি। এবার থামাও তোমার দুরন্তপন। থামাও মরণের বৃকে এই ডানা বটপটিয়ে বেড়ানো। আজ থেকে তুমি আমার হলে।' এমন করে বলে উঠবার সাধ্য মিরিয়ামের নেই। বাস্তবিক কি মিরিয়াম তাকে চায়? সে কি সত্যি সত্যি একটি সঙ্গীর সন্ধান করে? নাকি নিজেকে উৎসর্গ করবার সেই পুরনো আকাঙ্ক্ষাই এখনও ভেগে রয়েছে তার মনে?

পল জানে সে যদি মিরিয়ামকে ছেড়ে চলে যায়, তা'হলে মিরিয়াম কোন দিনই জীবনের আশ্বাস আর পাবে না। কিন্তু ওর



## চর্ম মসৃণ রাখতে—

ক্যালকেমিকোর “তুহিনা” অদ্বিতীয়।  
নিয়মিত ব্যবহারে চর্মের রুক্ষতা দূর  
করে চর্ম মসৃণ, পুরুত্ব ও নরম রাখে  
এবং বর্ণ উজ্জ্বল করে।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কলিকাতা - ২২

কাছে থাকলেও পলের অস্বাভাবিক বসতি হয়, সে হাঁপিয়ে ওঠে, নিজের জীবনের দাবী তাকে অস্বীকার করতে হয়। নিজের জীবনকে যথোচিত মূল্য না দিয়ে ওর জীবনকে সে সরাসরি কবে তুলবে কেনন করে ?

মিরিয়াম স্থির হয়ে বসে আছে। পল একটি সিগারেট ধরাল। খোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পল ভাবছিল মায়ের কথা, মিরিয়ামের কথা আর মনেও ছিল না। হঠাৎ মিরিয়াম চাইল ওর দিকে। এবার মমতায় বললে জাগল পলার বিতৃষ্ণা। ডাবল কী হবে এর জন্তে নিজের জীবনকে ডালি দিয়ে ? এমন যে উদাসীন, মিরিয়ামের কথা একবারও কি সে চিন্তা করে ? স্পষ্টই দেখতে পেল ওর জীবনের কোন শিকড় নেই, চিরকাল ও ভেসে ভেসেই বেড়াবে। অব্যয়, দুঃস্থ শিশুর মত নিজের পায়ে নিজের ও আঘাত করে যাবে। হোক, তবে তাই হোক। ওর পথ নিজেই সে বেছে নিল। আন্তে আন্তে বলল, 'এবার তা'হলে উঠতে হয় আমায়।'

কথার ভরী থেকেই পল ওর বিতৃষ্ণা অহুমান করতে পারল। সে ঘোঁরা ছেড়ে উঠে কাঁড়াল। বলল, 'চলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে।'

মিরিয়াম আয়নার সামনে গিয়ে কাঁড়াল টুপিটা পরে নেবার জন্তে। তার মন তখন নিসারণ কোডে তুলে তুলে উঠছে। কী আকর্ষণ, তার এই বিপুল আত্মত্যাগকে একটুও সম্মান দেবে না পল, একে সে অবজ্ঞার ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মনে হ'ল জীবনের সব কিছু বেন তার শুকিয়ে যেতে বসেছে, সব আলো বয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। একবার টেবিলের ধারে গিয়ে ফুলগুলোর গন্ধ অহুভব করল সে। লাল রক্তের মত 'এনিমোন' ফুল, পলের উপস্থিতিই বটে।

পল বলল, 'তুমি নিয়ে নাও এই ফুলগুলো' বলে ফুলদানী থেকে বের করে দিল জলে-ভেজা এক রাশ ফুল। দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল রান্নাঘরে। মিরিয়াম বসে রইল। তাবপর পল এসে ফুলগুলো ফুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে। পথে কথা বা বলবার পলই কলল, মিরিয়ামের হৃদয় তখন মৃত্যুর আঘাতে অসাড় হয়ে পড়েছে। এবার পলের কাছ থেকে বহু দূরে সে সরে যাচ্ছে। বেসনায় অস্বীকার করে মিরিয়াম গাড়ির মধ্যে বসেই পলের গায়ে গা এলিয়ে দিল। পল সাড়া দিল না। মিরিয়াম ভাবতে লাগল, ও কোন দিকে, কোথায়, ভেসে যাচ্ছে ? না জানি কী দুর্গতি আছে ওর কপালে ? এটুকু খোয়ালও কি ওর নেই যে, মিরিয়ামের জীবনটাকে টিবিদিনের মত ও নষ্ট করে দিতে যাচ্ছে ? ওর জীবনের কোন মূল্য নেই ! শুধু ক্ষণিকের টানে ও ঘুরে বেড়ায়, গভীর কোন বস্তু জুড়ে কোনদিন আকর্ষণ করতে পারে না। বেশ, তবে তাই হোক। মিরিয়ামও দেখবে কী করে ওর জীবন কাটে। একদিন অতৃপ্ত হ'লে ওকে ফিরে আসতেই হবে, সেদিন ফিরে আসবে মিরিয়ামের কাছেই।

পল মিরিয়ামকে তার বোনের বাড়ির দরজায় বেধে কবচবন্দন করে বিদায় নিয়ে হলো। ফিরে আসতে আসতে মনে চল জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও আজ তার হাতিয়ে গেল।—পল ট্রাম থেকে নামল। শহরতলীতে এইই মধ্যে সব নিস্তক। শুধু মাথার উপরে আকাশে ছোট ছোট তারা মিট মিট করে জ্বলছে। নীচে নদীর জলেও একটা নতুন আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, তার বুকে তারার দল তুলে তুলে উঠছে। দিগ্দিগন্ত চেয়ে শুধু নিস্তক নিশীথের বিপুল প্রসার—দিনের বেলায় এর কথা কদাচিৎ মনে পড়ে, তবু সন্ধ্যা হলেই আবার ফিরে আসে, আবার সব ঢেকে ফেলে। এই অন্ধকারটুকুই ত' চিরকালের, এর নিঃশব্দ অতলতায় ডুবে যাওয়াই ত' জীবন। সময়ের বোখ লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু দিগন্তজোড়া এই বিশাল অন্ধকারের কথাই জেগে রয়েছে মনে। আত্মকে বলবে যে মা একদিন ছিলেন, আজ নেই ? হয়ত এখানে নেই, কিন্তু এই মহাজগতের কোথাও না কোথাও তিনি আছেন। যেখানেই থাকুক না কেন, পলের প্রাণ খুঁজে বেড়ায় তাঁকেই। এই মহাবজ্রী যে প্রান্তেই মা নতুন বাসা বেঁধেছেন, সেখানেই যেতে হবে তাকে। কেউ তা'দন ত' জনার বিচ্ছেদ ঘটতে পারবে না। তবু দেখেই অহুভব মনে জেগে থাকে। একেও ত' অস্বীকার করা যায় না। সামান্য একটা মাংসপিণ্ড—গমের পেতে হাবিয়ে-যাওয়া একটা গমের দানাব চোয়ও ছোট। তবু ত' সহ্য হয় না। চারি দিকে নেমে আসতে বিপুল রাত্রি, নেমে আসতে পলকে গ্রাস করবার জ্বলে, তবু নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতেও সে সে পাবতে না। রাত্রির বুকে সব কিছু হাবিয়ে যায়, এই তাবাব মেলা, এই নীপ্তিমান সূর্য্য, এসবও চাপিয়ে ওঠে রাত্রির অন্ধকার। এরা যেন কয়েকটি আলোর কণা, অন্ধকারের হর্নিপাকে সভয়ে ঘরপাক গেয়ে মবতে। এরা সব, আবার পল নিজেকে ক্ষুদ্রাঙ্গপি ক্ষুদ্র, বিপুল শূন্যতা দিয়েই বেন তৈরী এরা, তবু একেবারে বেন শূন্যও নয়। পল আর সহ্য করতে পারে না। আপন মনেই ডেকে ওঠে, 'মা, মাগো !'

এই চ্যমৎ বিরুদ্ধতার মধ্যে মায়ের কথা ভেবেই বেন প্রাণে বল আসে, নতুন করে নিজেকে তুলে ধরতে উঠে হয়। মা তার সামনে নেই, অন্ধকারের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছেন। পলের ইচ্ছে হয়, ডেকে বলে, 'আমাকে তুমি ছুঁয়ে রাখো, মা, ডেকে নাও আমাকে তোমার পাশে।'

না, এত সহজে তার হানবে না সে। জ্ঞাত বেগে পা চালিয়ে পল আলোকোজ্জ্বল নগরীর দিকে বাত্মা করল। তার হাতের মুঠি দুটু সবদল, মুখে দুঃস্থের সস্তর। না, অন্ধকারের পথ ধরে মায়ের উদ্দেশ্য আর সে করবে না। ওই ত' সহরের আলো চোখে এসে লাগছে। জনতার মুহু ওজন দর থেকে ভেসে আসছে। সেই দিকেই, সেই পথ ধরেই, তাকে এগিয়ে—যেতে হবে। পল আরও জোরে পা চালিয়ে দিলো।

অম্বাদক—ক্রীষিণ মুখোপাধ্যায় ও ক্রীষীকেশ ভট্টাচার্য্য



# সবাই ডামেন -



চটপট  
বিলি করা হয় বলে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
এত তাজা থাকে

প্রতি প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
তাকে বেশী বেশী  
ভালো লাগে  
করুন চেষ্টা

বোজ  
২৪, ২০, ৪২৬ প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
বিজি হয়

এই জনোই  
অন্য যে কোন  
মার্ক চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
বেশী লোকে খান!





### ঐতিহাসিক বসু

বেশ কিছুদিন অস্থির ছিল সেহমেন, লেখনী ছিল শ্রান্ত।

অনেক বিশ্রামের পর আজ ফের ডায়েরী লিখতে বসেছি।

পথে দেখা হ'য়েছিল অতুল চম্পটার সঙ্গে। চম্পটা নমস্কার জানিয়ে বললে, বড় শুকিয়ে গেছেন যে! অস্থির হয়েছিল বৃষ্টি?

আমি মাথা কেলিয়ে বললাম, আপনার খবর ভালো তো?

অতুল চম্পটা বললে, ভালো আর কি ক'রে বলি? মেয়েটা বুকে শেল হেনে চলে গেল।

বললাম, আহা! কি হ'য়েছিল?

—এক ছোঁড়ার সঙ্গে অনেক দিন থেকেই লুকিয়ে গুজু-গাজু চলছিল, তারই সঙ্গে চলে গেছে। অবিশিষ্ট রেজেষ্টারী করে বিয়েটা করেছে। কিন্তু কি নেমকহারামী, সেইটে একবার ভাবুন!

বললাম, মনের মতো বর পেয়েছে, ভালোই তো।

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পটা বললে, মেয়েমানুষের আবার মন কি মশাই? বাপকে লুকিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে বেঁধিয়ে বাঁওয়া, এ তো আপনার গিরে একেবারে ইয়ের সামিল হলো।

আমি কি বেন বলতে বাচ্ছিলাম, এমন সময় চম্পটা আবার হুক করলে,—অবিশিষ্ট এত সাহস মেয়ের হতো না, যদি গোপনে ওর মা'র—হানে আমার সহধর্মিণীর আঙ্কার আর উচ্চানি না পেতো।

গুলালেম, গিরে চিঠিপত্র দেয় নি?

চম্পটা বললে,—আজ্ঞে, তা দিয়েছে। জামাই-ছোঁড়া আবার কেতাদম্বর, ম্যাট্রিক কেস কি না! হু'জনার মিলে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে। হু'জনার আশীর্বাদ পাঠো কার্তে ছাড়তেই হবে। নইলে পথে-ঘাটে, রাস্তা-বিরিতে বেগোতে হয়, কোন্ কীকে শেহন থেকে ভাঙ করে মাথা হু' কীক করে দেবে, বলা তো যায় না। জন্মনিটেমিতে ছোঁড়া আবার বোধিসত্ত্বর সাক্ষরদ। বোধিসত্ত্বকে কেমনে হেনে তো? অনাথ চৌধুরীর হেলে।

প্রজাপারমিতার ভাই?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা সবাই এমন প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা করেন কেন কলুন তো? দেখছি তো, এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয়। ওর চাইতে কতো চোখ চেঁহারা আর চমকা কিগারের মেয়ে এই অধমের লকানই আছে। কত চান বলুন না?

ও প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্তে বললাম, দিবাকর দালাল মশায়ের বাগানবাড়ী কি কিমে নিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী?

অতুল চম্পটা হেসে বললে, অনেক খবরই রাখেন না দেখছি।

কতো যে ওলট-পালট হয়ে গেল—রীতিমতো একথানা উপভ্রম।

কৌতুকী হয়ে শুধালেম, কাদের ওলট-পালোট হলো?

কার হলো না বলুন? ভুজঙ্গ চৌধুরী, দিবাকর দালাল, দময়ন্তী দালাল, বাহুল, সানন্দা সান্দা—আর সঙ্গে সঙ্গে এই বেচারা অতুল চম্পটা। সুনবেন নাকি সব ব্যাপার?

বললাম, নিশ্চয়।

চম্পটা বললে, তাহলে মশাই একটু চা-খাওয়াতে হবে যে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে যদি এক আখধানা কেক, আর সিংগেল বা ডবল ডিমের মামলেট—

অনতিদূরে বিনীত চেঁহারা একটা ছোট রেস্তোরাঁ। একটু মাত্র শীর্ণ খন্ডের এক কোণে এক পেয়ালী চা নিয়ে বসে বসে কাল হরণ করছে। চেঁহারা অতুল চম্পটার সমদর্শী, শুধু তার চোখের তারায় নেই অতুল চম্পটার অতুলনীয় শৃগালস্বভাব দৃষ্টি। চম্পটাকে নিয়ে প্রবেশ করে কাদন গ্রহণ করা গেল।

গিন্নী ফেপে রণধর্মিনী হয়েছেন, মেয়ে জামাই নিয়ে ঢকে দুটো মেজাজ কথা শুনিয়েছিলুম বলে।—গলা খাট করে বলল অতুল চম্পটা। মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়া তক্ বাড়ী ফেরার রাস্তা বন্ধ। এক ফোঁটা চা-ও মশাই জ্বিভর ডগায় পড়ে নি।

চম্পটার জন্ত কেক আর ওমলেট-সহ এক পেয়ালী চায়ের ফরমারেস দিলাম। প্রয়োজন হলে পরে আরো ফরমারেস দিতে আপত্তি হবে না, আভাস জানালেম চম্পটাকে।

চম্পটা বললে, কিন্তু আপনি?

রেস্তোরাঁয় আমি পাইনে। আমি শুধু বসে বসে সুনবো।

খেতে খেতে কাহিনী শোনাতে লাগলো অতুল চম্পটা। বললে,

শুনুন তাহলে খুল বলি। দালাল মশাই আমার বলেছিলেন—ভুজঙ্গকে একবার বাগানবাড়ীটা ভালো করে দেখিয়ে দিয়ে, তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো। চৌধুরী মশাইকে তাই বললাম, হজুর, চলুন একবার বাগান বাড়ীটা ভালো করে দেখে তারপর দালাল মশাইয়ের কাছে। চৌধুরী বললেন, চেক সুই করবো আমি, সে চেক হাত পেতে নেবেন দালাল মশাই। দরকার হয়, তিনিই আসবেন আমার বাড়ী। চৌধুরী কখনো দালাল বাড়ীর চোকাঠ মজাবে না। বললাম, তা তো বটেই হজুর। একশো বার। আপনার কাছে উনি আসবেন বই কি। কিন্তু তার আগে হজুর চলুন গোপনে একবার আপনার কাছে বাগান-বাড়ীটা বেশ করে দেখিয়ে আনি। সহজে কি আর রাজী করতে পারি চৌধুরী মশায় কে? মেলাই মেহনৎ করে রাজী করানো গেল। বাগানবাড়ী সুনবো হয়ে গেলুম চৌধুরী মশাইর গাড়ীতে। আমি আর চৌধুরী মশাই। মালীকে আগেই জানানো ছিল। মালী ওদিকে খানাপিনা আরাম আয়েসের তোফা বসাবস্ত করে রেখেছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাগান-বাড়ী আর বাগান দেখাতে লাগলুম। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন চৌধুরী মশাই। বাগানের বাহারগুলো বেশ রংলার করে বোকাতে গেলুম, চৌধুরী বললেন, খামো চম্পটা। বললুম, কেমন, দেখছেন হজুর, বাগানবাড়ীখানা? বেশ পছন্দসই নয়? হজুর বললেন, বেশ আর কোথায় হে চম্পটা? তবে, হাতে শেলে বেশ করে নিতে কতক্ষণ? ভাবলুম বাক, এইবারে পথে এসেছেন। বললুম, আজ্ঞে তা তো বটেই। আপনার হাতে পড়ল ওর চেঁহামাই

পাটে বাবে যে। তাহলে হজুর চলুন একবার দালাল মশাইর ওখানে। কথাবার্তা করে একেবারে—চৌধুরী মশাই গরম হয়ে বললেন, দালাল মশাইকেই একদিন নিয়ে এসো আমার বৈঠকখানায়। বলছি না দালালের চৌকাঠ মাড়াবে না চৌধুরী!—তার পরে ইংলিশেও কি সব কইলেন—ও সৰো মানে বুঝি নে।

শুভালম, তার পর?

বাগানবাড়ীর পশ্চিম ধারে ফোয়ারার পাশে শুধু উঁচু পাথরের চৌকোর ওপর ঈড়িয়ে এক পাথরের তৈরী স্মারী। বললে অতুল চম্পটা। তা, স্মারীই বটে। পাথরে যে অমন রূপ খোদা যায়, ও জিনিষ চোখে না দেখলে আপনায় বিশ্বাস হবে না। ঐ মূর্তি দেখতে গিয়েই চৌধুরী মশায়ের হঠাৎ মতি বদলে গেল।

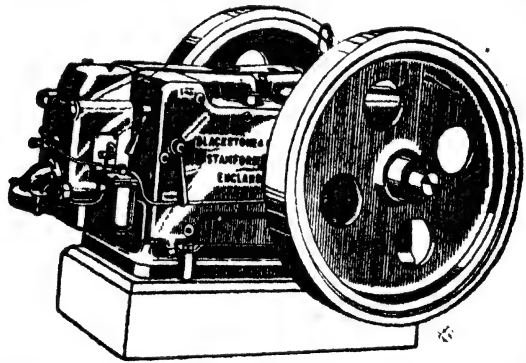
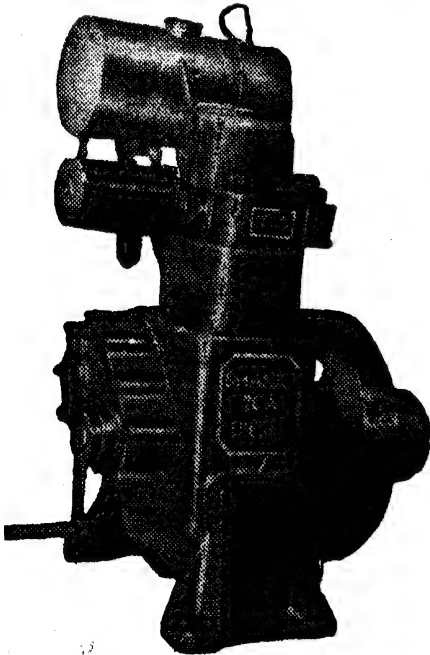
পাথরের মূর্তি দেখে?

আজ্ঞে, পাথরের মূর্তি বলে তাকে চট করে চেনাই যায় না যে! বলিহা বি বাহাছরি খোদাইকারের। আর কি বলবো আপনাকে, লাগবি তো লাগ ঠিক সেই সময় দালাল মশাইর মেয়ে দময়ন্তীও কলেজের মোটা কালো মাষ্টারকে ঐ পাথরে-স্মারী দেখাচ্ছেন।

বললাম, মাষ্টার নয়, প্রকেশ্বর।

চম্পটা বলল, ঐ হলো। দময়ন্তী দেখাচ্ছেন ঈড়িয়ে ঈড়িয়ে, ঠিক এমনি সময় দেখতে গেলেন চৌধুরী মশাই। পেছনেই আমি। ওদিকপানে চোখ পড়তেই হঠাৎ ধমকে ঈড়িয়ে পড়লেন চৌধুরী মশাই—এমন চোখের সামনে লেবছেন ভূত অথবা হেলেন অব ট্রয়!

দেখি হজুরের জ্বর নজর পাড়ে গেছে দময়ন্তী দালালের ওপর—চোখ আর ফেরাচ্ছেন না, পলক পড়ছে না চোখে। বুকলুম এইবারে হজুরের হুকুম হবে—চম্পটা, ওকে আমার চাই। হজুরের নাও চার শুকনো ডাঙার চলতে। কিন্তু ওকে আমি কি করে বাগাবো বলুন? লাখোপতি দালাল মশায়ের সুবেদন নীলমণি। আমার মতো চুনোশূটির নাগালের অনেক উঁচুতে। এতো আর বাস্তবায়নও নয়, বেওয়ারিশও নয়। ডাবলুম বলি, হজুর, ওর চাইতে ঢের ভালো মেয়ে আমার হাতেই রয়েছে। কিন্তু হজুরের চোখের চেহারা দেখে আর ভরসা হলো না। আজ্ঞে আজ্ঞে বললুম, দালাল মশাইর মেয়ে হজুর। দময়ন্তী দালাল। হজুরের চোখের তারা ছুটো অমনি যেন দশ করে নেচে উঠলো। পাথরে-স্মারীর সামনে হজুরের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল দময়ন্তী দালালের সঙ্গে। একবার মরজি হলে হজুর আলাপ জমাতে এক নম্বর। তারপর তিনজনে ঐ মূর্তি দেখতে লাগলেন। আমি পেছনে ঈড়িয়ে। ঐ পাথরের মূর্তিতে নাকি জাস্ত মাহুয় সামনে রেখে দেখে দেখে খোদাই করেছিল শ'দেড়েক বছর আগে মস্ত ওস্তাদ এক বিদেশী খোদাই-কার। অনেক টাকা নিয়ে। টাকা যিনি দিয়েছিলেন—মানে এই বাগানবাড়ীর পত্তনীকার আদি মালিক, মস্ত জমিদার—সোনার মোহরও তাঁর কাছে খোলামকুচি। নাম তাঁর সূর্য্যকিশোর। আর ঐ স্মারীকে নাকি এনেছিলেন বাইরে থেকে। যেমন তার রূপ আর যৌবন—তা ঐ পাথরের মূর্তি দেখলেই বুঝতে পারবেন—তেমনি তার অপ্সরার মতো নাচ আর কিররীর মতো



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল ও কৃষিকাণ্ড দেশের অন্ন ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেচে নিন। লিট্টার, ব্রাকটোম ভিকেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং দেট, হান্ডস ভিকেল ইঞ্জিন হান্ডস পাম্পিং দেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যামিং স্ট্রাট, দিল্লি কলিকাতা—১

ফোন ১-২২-৫৭৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডার্সাবো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের মত প্রস্তুত থাকে।

গান। সূর্য্যকিশোর এই স্তম্ভরীকে নিয়ে যেতে গেলেন। দিনরাত তাকে নিয়ে বাগান-বাড়ীতেই পড়ে থাকেন। মোসাদ্দেকের আসরও জমে, বোতল গোলসও চলে। বিষয়কথ্য দেখাওনা চুলায় গেল। ঘরে সতীসান্নারী সহধর্ম্মিণী কান্দেন কাটেন আর মা কালীর কাছে জোড়ার পর জোড়া পাঠা মানৎ করেন। কিন্তু কাঁদা-কাটা আর মানতে কিছু হলো না। শেষটায় নায়েব মশাইকে পাঠালেন বাগানবাড়ীতে।

তারপর ?

তারপর নায়েব বাগান-বাড়ী গিয়ে মনিবকে বললেন, ছজ্জুর, আপনাকে একবার মহালে বেরোতেই হবে। নইলে আদায়মুদ্রার সব বন্ধ। বিষয় আশয় লাটে উঠবে।

মনিব সূর্য্যকিশোর বললেন—উঠক। কিন্তু নায়েব ঘৃণ্ডস্তার। বুঝিয়ে দিলেন, বিষয় আশয় লাটে উঠলে এই স্তম্ভরীকেও আর রাখা যাবে না। সূর্য্যকিশোর ফেৎপে উঠে বললেন, বিষয় আশয় নীলোমে উঠলেও স্তম্ভরী প্রাণের টানে থাকবে, সে ঝাঁপ এড়াতে পারবে না। নায়েব বললেন, কিন্তু এ হালে তো তাকে রাখতে পারবেন না, ছজ্জুর। স্বর্গের অপ্সরীকে তো আর ঘাঁটে কুড়ুনির হালে রাখলে চলবে না। তাই বলি কি ছজ্জুর, দিন দুয়েকের জন্তে মহালটা হয়ে আসবেন চলুন। তারপর বাগান-বাড়ীতে গিয়ে তো আসবেনই। দৌলান জমিদার তখন স্তম্ভরীর কাছ থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে মহালে বেরোলেন। এই ঝাঁকে তাঁর সতীসান্নারী পত্নী এলেন বাগান বাড়ীতে। এসে স্তম্ভরীকে বললেন,—আমার স্বামী তোমাকে অনেক দিয়েছেন। আমার বত অলঙ্কার আছে তাও সমস্তই তোমাকে দেবো। তার বিনিময়ে তুমি আমার স্বামীকে বিরিয়ে দাও। আমার জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিও না। তুমি আমার ছোট বানেনর মতো। তোমার ছোট হাত ধরে আমি আমার স্বামীকে ভিক্ষা চাইছি।’ বলে বার বার করে বলে ফেললেন সেই পেশাওয়ালী নাচিয়ে-গাইয়ে স্তম্ভরীর হাত ধরে।

স্তম্ভরী ধীরে তাকে শুধু বললে,—বহিন, যা আমি পেয়েছি তার বেশীতে আমার প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামীকে তুমি কিরে পাবে। তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে, একথা গোপন থাকুক।

মহালের কান্দ কোন রকমে তাড়াতাড়ি সেরে বাগান-বাড়ীতে গিয়ে এলেন ভবিষ্যার সূর্য্যকিশোর। এসে দেখেন বললে গেছে আরহাওয়া। সে হাসি নেই স্তম্ভরীর চোখ মুখে, সে প্রাণে নেই চ্চলার ছন্দে। সে আনন্দ নেই সঙ্গীতের মুহুর্নায়।

শুধালেন স্তম্ভরীকে। স্তম্ভরী বললে, আমার কিরে বাবার সময় হয়েছে। আপন যুগুকে গিয়ে বাবা।

মাথায় যেন বজ্রপাত হলো সূর্য্যকিশোরের। তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না! নিজের জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড় করে মিশিয়ে নিয়েছেন স্তম্ভরীকে, যে স্তম্ভরীবিহীন জীবন কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই স্তম্ভরী চলে যাবে তাঁকে ছেড়ে, জীবন জীবন শূন্য করে দিয়ে!

তিনি বললেন, এ অসম্ভব। আমার ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

স্তম্ভরী দৃঢ় কণ্ঠের কণ্ঠে বললে,—আমার যেতেই হবে। আমি যাঁবো। আর আমার এক মুহুর্ন্তও এখানে ভালো লাগছে না।

স্তম্ভরীর এই কণ্ঠের, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপটি আগে কখনো দেখেন নি সূর্য্যকিশোর। নিঃসঙ্গ হয়ে অজ্ঞানত করলেন চলে যাওয়ার সকল থেকে স্তম্ভরীকে কিছুতেই টালানো যাবে না। তখন বললেন—যদি যাবেই, যাবে না কোনো যানা, তবে একটি শেষ প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো।

সেই একটি প্রার্থনা পূরণেরই ফল এই পাথরের তৈরী অপরাধ নারীমূর্ত্তি। স্তম্ভরীকে মডেল করে সেরা পাথর খুঁদে খুঁদে সারা দুনিয়ার অজ্ঞাতম সেরা ভাস্কর করে গেলেন এই অপরাধ শিল্পসৃষ্টি। বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে স্তম্ভরী বলে গেল সূর্য্যকিশোর যেন তাঁর জী এবং শিল্পকৃত্তের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা না করেন। সূর্য্যকিশোর দেখলেন স্তম্ভরীর চোখে জল। তাঁর নিজের চোখও জলে ভরে উঠলো। শুধালেন—আবার কবে দেখা হবে? স্তম্ভরী জবাব দিলে, ইহজীবনে আর দেখা হবে না।

অতুল চম্পটীর মুখে কাঁচিনী স্তনতে স্তনতে মনে হলো অনাথ চৌধুরীর মুখে শোনা প্রজাপারমিতার কবিতা :

“দেখ দিয়ে মোরা দেহের বাসি যে ভালো,

আছে তাই ভালোবাসা—

দেহ আছে, তাই আছে দেহাতীত প্রেম।”

হয়তো সূর্য্যকিশোর আর স্তম্ভরীর দেহগত আকর্ষণ অগ্রসর হয়েছিল দেহাতীত প্রেমে পরিণতির জন্তে, আর দূরে চলে গিয়ে স্তম্ভরী হয়তো শরৎবাবুর এই কথাটাই প্রমাণ করে গেল যে, ছোট প্রেম কাছ চিনিরা রাখে, বড় প্রেম দূরে সরাইয়া দেয়।

স্তম্ভরীর বিদায়ের পর তার মর্ম্মবহুর্ন্ত টা স্থাপিত হলো সেই বেদীর ধারে, যে বেদীর ওপর বসে বহু চিনিরী সন্ধ্যার স্বর্গীয় সঙ্গীতে সূর্য্যকিশোরকে মুগ্ধ করেছে স্তম্ভরী। তারি পাশে বাগান-বাড়ীর ফোয়ারা। ফোয়ারা তো নয়, সে যেন সূর্য্যকিশোরের অক্ষয়ান অক্ষরায়। স্তম্ভরীর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, অথবা নিতে পারেন নি সূর্য্যকিশোর। ইহলোকে তাঁদের আর দেখা হয়নি।

স্তম্ভরীর শেষ অমরোপ রক্ষা করেছিলেন সূর্য্যকিশোর। হয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, কর্তব্যপরায়ণ পিতা। কিন্তু তুলতে পারেন নি স্তম্ভরীকে। স্তম্ভরীকে হারাবার পর আর বেশী বহুর তিনি বাঁচেন নি। যে কয় বছর বেঁচে ছিলেন, বাগান-বাড়ীতে চলে যেতেন অনেক চিনিরী সন্ধ্যায়। গিয়ে নীরবে একা বসতেন শূন্যবেদীতে। তাকিয়ে থাকতেন স্তম্ভরীর মর্ম্মবহুর্ন্তের মুখের পানে; কল্পনার স্তনতেন স্মৃতির সঙ্গীত।

শোনা গেছে, তাঁর যুদ্ধার পর অনেক চিনিরী রাত স্তম্ভরীর মর্ম্মবহুর্ন্তের পাশে এসে পড়াত স্তম্ভরীর বিদেহী মূর্ত্তি, হয়তো বা বিদেহী সূর্য্যকিশোরের দর্শন আশা করে। হয়তো এ সত্য, অথবা হয়তো বার্য্য চেয়েছিলো তুতুড়ে দুর্নাম রটিয়ে বাগান-বাড়ীটির বাজারদর নামাতে, এ ছেন ভজব তাদের রটানো।

বাবার ইচ্ছে এ বাগান বাড়ীটা বিক্রী করে দেন।—বললেন দময়ন্তী দালাল। তাই একবার ভালো করে দেখতে এলাম, অসম্ভব, এ জিনিষ কখনো বিক্রী করা যায়! আমি ভো বাবাকে কিছুতেই দেবো না বেচতে।

খুব ভালো দাম পেলোও নয়!—শুধালেন তুতুদে চৌধুরী, চোখের কোণে এক বলক চৌধুরী-স্মরণকবাসি।

না, খুব মোটা লাভ পেলেও নয়। হুমিয়ার টাকার লাভটাই তো একমাত্র লাভ নয় চৌধুরী মশাই। বললেন দময়ন্তী দালাল। তাছাড়া টাকা বাবার যা আছে তার চাইতে আরো বেশীর প্রয়োজন দেখি নে।

ভুক্ত চৌধুরী বললেন, মায়ুষের আরো বেশীর প্রয়োজন কি কখনো ফুরায় দময়ন্তী দেবী?

দময়ন্তী বললেন, প্রয়োজন ফুরায় চৌধুরী মশাই। যা ফুরায় না, সেটা হচ্ছে খাই, প্রয়োজন নয়।

ভুক্ত চৌধুরী কিছু না বলে একটু হাসলেন। ফিরবার পথে চলতি গাড়ীতে বসে ভুক্ত চৌধুরী চম্পটাকে বললেন, এ বাগানবাড়ী আমার চাই-ই চম্পটি। জোরালো জ্বেরের সুর শুনে আনন্দে গদগদ হলো চম্পটি। সান্নিধ্যে মাথা চুলকে বললে, তাহলে আপনাকে একবার দালাল-বাড়ীতে ছুতোর ধূলা দিতে হবে যে।

ভুক্ত চৌধুরী বললেন, দেবো।

দিলেনও। চম্পটাকে নিয়ে গেলেন একদিন দালাল-ভবন।

কিন্তু এ নিয়ে যাওয়াই শেষকালে আমার কাল হলো। বললে অতুল চম্পটি। চৌধুরী মশাইকে ভেতরে নিয়ে গেলেন দালাল মশাই, বৈকুণ্ঠানায় এক পেয়লা চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন আমার জঙ্গে। এরপর একদিন ওঁরা গেলেন

বাগান-বাড়ীতে। ওঁরা মানে তিন দালাল আর এক চৌধুরী। সেদিন আর আমি রইলুম না সঙ্গে। গেলেন দিনের শুরুতে, ফিরলেন দিনের শেষে।

তার পর?

তার পর দালাল-বাড়ীর চৌকাঠ ঘন ঘন মাড়াতে লাগলেন চৌধুরী মশাই। বুঝলুম, বাগানবাড়ী বেচবেন না দালাল মশাই।

বেচবেন না? বললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম চম্পটীর বলা কাহিনীর নেপথ্যে।

বেচবেন না দালাল মশাই তাঁর বাগানবাড়ী। মেয়ের ইচ্ছে নয়। ভুক্তকে দেখেই আমি বাৎসল্য রস উথলে উঠেছে দালাল-গিন্নী সৌদামিনীর। মা হয়েছিলেন একটু দেবীতে। দময়ন্তী মশাই হলে এক তাঁর প্রথম সন্তান পুত্র হলে, সেই পুত্র আজ ভুক্তের বয়সী হতে পারতো—এ কথা ভেবে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। মাতৃহীন ভুক্ত চৌধুরীও নতুন করে মা পাবার সম্ভাবনা দেখলেন সৌদামিনীতে।

তার পর একদিন বড়ো অনঙ্গ চৌধুরী মশাইকে দর্শন করে এলেন দালাল সন্তা-গিন্নী। বললে অতুল চম্পটি। পুরানো রাগ কোথায় কপ্পুরের মতো উবে গেল। এখন ছু' হাত এক হয়ে যাওয়ার কথাবার্তা একরকম পাকা।

— কিন্তু —

কিছুটা নিরেস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা বা যায়—এমন কোব জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বারা বিকৃষ্ট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিরাচরিত কলাইনুপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোব সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোবদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌন্দর্য সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাম্রমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০.- হুগল-কুমিল্লা এণ্ডিকার-গ্রাম-গিনিয়াট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

গ্রান্ট:

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা-১২

বললাম, দময়ন্তী বিয়ে করতে রাজী হলেন কি-এ ফেল ভুজঙ্গ চৌধুরীকে?

চম্পটা বললে, কুবেরের ঘরপী হতে কোন মেয়ের না সাধ যায় বলুন? জানেন তো, চৌধুরী এমন অনেক দাশপালকে টাঁকে শুভ্রতে পারেন। আর বি-এ ফেল হলে কি হবে, হুজুর যে অনেক বিজ্ঞের জাহাজকে ঠর অফিস-কারখানার মাইনে দিয়ে খাটাচ্ছেন। বিজ্ঞও কিছু কম নয় জানবেন। হুনিয়ার তাজা তাজা খবর ঠর নথিপত্র—বাজারদর বলুন, কাজ-কারবার বলুন, পোলিটিক্স, একানোমি, কি নয়? কাপ্তান ঢের দেখেছি; এমন তুখোড় আর চৌকস দেখি নি। তা ছাড়া ভারী মাত্তক্ত এ দময়ন্তী দালাল। আর দালাল-গিরীও ভুজঙ্গ বলতে অজ্ঞান। হুজুরও মা বলে ডেকেছেন দালাল-গিরীকে। নিজের মা নেই কি না! মনও বুকেছে দময়ন্তীকে ঘরের লক্ষী বানতে।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর অফিসের কেরানী এবং দালাল-ভবনের গ্যারাজের গুপারকার ঘরের সত্ত ভূতপূর্ব ভাড়াটে কবি রাহুল রায় সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীতি ছিল সৌদামিনী দালালের মনে; বেঁচে গেলেন তিনি আশাতীত ভাবে ভুজঙ্গ চৌধুরীকে পেয়ে। সেবা ধনী, দেখতে কার্তিক না হলেও একবারে কুপুফ নর ভুজঙ্গ, ভাবও বেশ জমিয়ে নিয়েছে দময়ন্তীর সঙ্গে। ওর সিকে বুকেছে দময়ন্তীও। বাঁচা গেল রাহুল ছোকরার রাহুগিরি সস্তাবনার হাত থেকে। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন দালাল-গিরী সৌদামিনী।

চম্পটাকে শুধালে, রাহুল রায়ের খবর কি?—কি শুকুশেই যে ইনফুরেজার পড়েছিলেন আর সেরে উঠেছিলেন দময়ন্তী দালালের সখের হোমিওপ্যাথির গুধু থেয়ে। ব্যাস, সেই থেকে ঠর নেক মজরে। তারপর যেই ভুজঙ্গ-দময়ন্তী মিলনের কথাবর্তী হয়ে গেল, অমনি দেখতে দেখতে রাহুল রায়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ। ছিলেন রোগা মাইনের কেরানী, এখন মোটা মাইনের অফিসার না সেক্রেটারী কি বেন হয়েছেন। কোম্পানী থেকে পাওয়া খাসা মালো-প্যাটার্ণ বাড়ী, চাকর-বাকর, কোম্পানীর হাওয়া-গাড়ীতে হাওয়া-আস, সারাবি পোষাক—কোট, পাংলুন, নেকটাই। এখন লখলে তো চিনতেই পায়বন না। সব হয়েছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর লম্বের এক আঁচড়ে, আর ঐ আঁচড়ের পেছনে হয়তো আছে দময়ন্তী দালালের একটি মুখের কথা। এক ইনফুরেজা কি কাণ্ড ঘরে দিয়ে গেল ভেবে দেখুন একবার!

মোটা মাইনের পদের দাবিই সামলাতে পারছেন রাহুল রায়? বলুন আমি।

ছেলেখেলার মতো। বললে চম্পটা। পত্তলেখার একটু বাতিক ল বটে, কিন্তু কোম্পানীর কাজগুলো ছিলো রাহুল বাবুর একেবারে দর্শনে। আজকাল তো পত্ত ফত্তও একেবারে ছেড়ে দিয়ে মেতে গেছেন। তাছাড়া ঐ যে আপনাদের গিয়ে সানন্দা ভাল।

কি হয়েছে তাঁর?

চৌধুরী মশাই ঠকেই এখন রাহুল রায়ের সেক্রেটারী করে রয়েছেন। অবিশি মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বললে অতুল গিটা। একে রাহুল রায় পোঙ্ক কাজের লোক, তার মিল

সান্তালের মতো অমন সেক্রেটারী। সোনায় সোহাগা। মিস সান্তাল কিন্তু বেশ একটু বদলে গেছেন, এইটে মজর করেছি।

কি রকম?

সে দাপট আর দেখতে পাই নে মিস সান্তালের। চৌধুরী মশাই সমীহ করে চলতেন তাঁর সেক্রেটারী মিস সান্তালকে, সেই মিস সান্তাল সমীহ করছেন রাহুল রায়কে! অখচ রাহুল রায় দাপট দূরে থাক মিস সান্তালের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েও কথা বন না। একটু লাভক ধরনের মাহুয কিনা! তাছাড়া—

তাছাড়া যে কি, তা আর বললে না অতুল চম্পটা। মুখে পুরে দিলে শেষ কাটলেটের শেষ আশটুকু। শুধালে ভুজঙ্গ চৌধুরীর খবর।

চম্পটা বললে, ঠকে অনেকখানি আগুতার এনেছিলেন সেক্রেটারী সানন্দা সান্তাল। এবারে দময়ন্তী দালালের আগুতার পুরো এসে গেলেন চৌধুরী মশাই। বললেন, কাপ্তানী অনেক করেছি হে চম্পটা, আর নয়। এবারে পাকপোঙ্ক সান্দারী হতে হবে। বললুম, তা তো হবেই হুজুর। নইলে আমবাই বা কোন শান্তি পাবো? গরীবের গুপার কিন্তু হুজুর দয়া রাখবেন। হুজুর বললেন, দয়া রাখবো বই কি, যদি দয়া পাবার মতো কাজ করো। হেঃ হেঃ হেঃ! বড় রসিয়ে কথা কইতে পারেন হুজুর। কি—না, দয়া পাবার মতো কাজ করো। তবে ই্যা, মস্ত কাজ একটা করেছি বটে। ম—স্ত এক টীপ জমি কিনিয়েছি চৌধুরী মশাইকে। তারি গুপার নয় নগর-পত্তনের এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যবসাকে ব্যবসা, দেশের কাজকে দেশের কাজ, নামকে নাম। এই নগর-পত্তনের ব্যাপারে হুজুর ডান হাত করেছেন রাহুল রায়কে। আর রাহুলের ডান হাত সানন্দা সান্তাল। চৌকস তুখোড় মেয়ে, সে কথা একশোবার বলবো। নইলে অ্যান্ডিন ধরে হুজুরের মতো বাবা কাপ্তান মনিবকে একেবারে—বলে এক চুমুকে পেয়ালায় বাকী আশটুকু অদ্বুত করে ফেলে ডাঁপ্তর নিখাস ফেলে চম্পটা। বললে, বড্ড উবগার করলেন মশাই। তার গুপার অনেক দুগ্ধে মনটা ভারী হয়েছিল, আপনাদের কাছে প্রাণ থুলে খানিকটা হালকা করে নিলুম। নইলে এত কথা আমি মশাই সহজে বলিনে।

বরকে ডেকে রেস্তোরাঁর পাওনা মিটিয়ে দিলাম। কিছুটা খালি হল মশি-বাগ। কিন্তু ভরে উঠলো মন।

হঠাৎ চম্পটা বলে উঠলো—উবগার ঘে করলাম সেই ঋণের খানিকটা অন্ততঃ উপদেশের মাধ্যমে শোণ দেবার উদ্দেশ্যে বোবহর—একটি কথা মশাই বলি আপনাকে, মেয়েজাতকে কোনান্দিন বিশ্বাস করবেন না। হাড়-বজ্জাত।

আমি বললাম, সে কি?

চম্পটা বললে, অ্যান্ডিনের বিশ্বাস ভেঙে আমার চোখে দুসো ঘিরে ভেগে গিয়ে আমার মেয়েটা গিলিল ম্যারেজ করল কিনা ঐ এক বোঝেটে ছোঁড়াকে, বার না আছে ছিঁরি, না আছে চালচলো। বিজলী আর বেতারের মিষ্টিরি।

বললাম, প্রেম অন্ধ।

চম্পটা বললে, আজ্ঞে ই্যা। একটা কথা আছে বটে, শিরীতের হাঁচোখ কানা। কিন্তু পুখব জাতও কম হারামজাহা নয় জানবেন। ঐ শরতান ছোঁড়াও গোপনে গোপনে মেয়েটাকে ফুসলেছে অনেক-



অর্ধেকটি  
সানলাইট  
সাবানেই এ সব  
কাজ হয়েছে !

সানলাইট  
সাবান

দিয়ে কাচলে কামড়চামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

B. 242-X52 BG

ভারত প্রভুত

দিন ধরে। নইলে মেয়ে আমার অমন হট করে ভেগে বাবার মেয়ে নয়।

আমি বললাম, কিছু কিছু হ'মিক থেকেই—

ব্যাকে লাগবাতি আসে কিছু টাকা আমার গাটা গিয়েছিল। বললে অতুল চম্পটা। ঐ কিছুই মশাই আমার মতো ছাপোষা লোকের কাছে বেশ কিছু। তারপর থেকে আমার একটি ফুটো পরমাণু আর ব্যাকমুখো হয় নি। বা কামিয়েছি তাই দিয়ে কিছু জমি জিরেৎ করেছি, আর বেশীর ভাগ সোনা দানা। ঐ সোনা-দানার কিছু গিল্লির গায়ে, কিছু মেয়ের গায়ে, বেশীর ভাগ ছিল এক বাকসোয় তালাবন্ধ। মেয়ে আমার উণাও হবার সময় ঐ বাকসো নিয়ে উণাও হলো। বিয়ের যৌতুক।

তারপর?

তারপর জামাই ছোকরা শুধু মেয়েকে রেখে যৌতুক ফেরৎ দিয়ে গেল—পুরো বাকসো। একমতি সোনাও রাখলে না। আমি বাড়ী নেই, এই কাকের ওর শাশুড়ীকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে গেল শয়তানীর কামানো পরসায় সোনা-দানা সে ঘরে নেবে না, ঘর নাকি তার নোংরা হবে। এ সব হলো, ঐ বোধিসত্ত্ব হোঁড়ার সাগরে, বুলেন কি না? বাপের পরসাকড়িকে যেমন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেছে বোধিসত্ত্ব।

কোথায়?

কোথায় তা জানিনে। গোটা দুনিয়াই ওর যাবার জায়গা। হুজুরের ভারী নেকনজর ওর ওপর। বলেন, এই আঙুলের টুকরোকে আমি কাজে লাগাবো হে চম্পটা। জানিনে কি কাজে লাগাবেন। আচ্ছা, যেতে আজ্ঞা করুন এবারে। অনেক কাজে লাগা বলা হলো। মনে কিছু রাখবেন না যেন।

চলে গেল শৃগালচক্ষু অতুল চম্পটা। মনে হলো কত সোনা-দানার বাকসো নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মরে তার তত আঘাত দিতে পারে নি। বত লিখেছে তার বিজলী ও বেতাবের মিস্তিরি ছোকরা জামাই, পরম দুগায় সে বাকসো ফিরিয়ে দিয়ে।

টিকই বলেছিল অতুল চম্পটা। চমৎকার বাংলা-প্যাটারের গাড়ী, গেটের বৃকে জমকালো নাম-ফলকে জল জল করছে রাহুল গায়ের নাম। ইংরিজি হয়কে, কিন্তু ইংরিজি কায়দায় সংক্ষেপিত র। গারাজে কোলাপসিবল গেটের আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে কুবুকে স্বন্দর্শন গাড়ী। গারাজের ওপরের ঘরে বোধ হয় বাস রে গাড়ীর ডাইভার।

এ বাড়ীতে একটি মাফারি আয়তনের পরিবার অসামান্য বহুল্পে করতে পারে। বাস করছে রাহুল রায় একা। অবশ্য আছে, বাবুটি আছে। তবু একা বোধ করছে রাহুল রায়, এমন কা বোধ করেনি দিবাকর দালালের গারাজের ওপরের ঘরে থেকেও।

বেশ-সুখা বদলেছে রাহুল রায়ের। নেই সেই আধ অপ্রতিভ অসহায় ভাব। মনে হলো কেবাণী রাহুলের সঙ্গে সঙ্গে মরেছে রাহুল, এ রাহুল রায় কবিও নয় কেরাণীও নয়, চৌধুরী কোম্পানীর জল উঁচু পদের কণ্ঠ কণ্ঠারী। কিন্তু না, রাহুল মানে না তা।

এখন আর খাতির বৃকে আবেগ ঢেলে কালীর আঁচড় কেটে

কেটে কথার পর কথা সাজিয়ে কাব্য করিনে ধনপতি বাবু।—বললে রাহুল। এখন রচনা করছি বাস্তব জীবন-কাব্য। মরে নি কবি রাহুল রায়। এবার হয়েছে সত্যিকারের জীবন-কবি। পুঞ্জিত্বকে গালি দিয়ে সর্বহারা-জাগানো যে সব কবিতা লিখেছি, তাতে সর্বহারা কতটা জেগেছে জানি নে, কিন্তু পুঞ্জিবাদের ইমারত থেকে একখানা স্ট্রিও খসেছে বলে মনে হয় না। দুনিয়ার কি উপকার করতে পারতুম আমার গারাজ-ঘরে বসে অমন কবিতা লিখে? কিন্তু এখন? বিরাট বিস্তীর্ণ পোড়ো জমিকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলছি ক্রতবেগে। দেখতে দেখতে সেখানে জেগে উঠবে নতুন জনপদ, যেখানে আশ্রয় পাবে আশ্রয় পাবার যোগ্য দরিদ্র এবং বাস্তহারার দল, দারিদ্র্য এবং বাস্তহারানাটাই ঘরের একমাত্র গুণ নয়, যারা তাদের শ্রম দিয়ে নতুন সম্পদ উৎপন্ন করে তারি অংশ ভোগ করবে আপন যোগ্যতায়। এ জনপদ হবে না দাতব্য লব্ধরখানা। এখানে গড়ে উঠবে নানা বকমের, কুটির শিল্প। স্থাপিত হবে বিজ্ঞানভূমি। বসবে নতুন হাট। কত জীবনের কত দারু এসে মিলবে এইখানে! এই তো জীবন-কাব্য, ধনপতিবাবু। এ কাব্য রচনার ভার আমারি ওপর দিয়েছেন ভূজঙ্গ চৌধুরী।

হঠাৎ এ কোঁক কেন চাপলো ভূজঙ্গ চৌধুরীর মাথায়?

আমার মনে হয় এ জিনিষ হঠাৎ হয়নি ধনপতি বাবু। সম্ভবতঃ এতে মিস্ সাক্ষালের অনেকখানি প্রভাব কাজ করেছে। নিজের জীবনেই তিনি অনুভব করেছেন বাস্তব জীবনের যাবাবর হবার নির্মম বেদনা।

ভূজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী সানন্দা সাক্ষাল?

হ্যাঁ, তিনিই। কৃত্তিক আছে তাঁর, একথা আপনার কাছে বলতে কোনো বাধা দেখি নে। অবশ্য এই জনপদ পরিকল্পনার অঙ্কুর প্রথমে এসেছিল ভূজঙ্গ চৌধুরীরই মনে, কিন্তু সেই অঙ্কুর যে ধীরে ধীরে জলের বৃকে বৃবৃদের মতোই মিলিয়ে যায় নি, পরিণত হতে চলেছে মহীকুহে, এর মূলে মিস্ সাক্ষালের অবদান অনেকখানি। ওঁর ভেতরে প্রাণশক্তির যে কী প্রাচুর্য, অথচ উচ্ছ্বাস-চঞ্চলতার বাহুল্য নেই, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না ধনপতি বাবু।

সানন্দা সাক্ষালের উচ্ছ্বাস অচঞ্চলতার বর্ণনায় উচ্ছ্বাস—চঞ্চল হয়ে উঠলো রাহুল রায়। ওর ভেতরের সেই পুরাতন কবিতা যেন মাথা উঁচিয়ে নিজের জানানি দিতে চাইছে।

চৌধুরী কোম্পানীতে আমি কাজ করছি মিস্ সাক্ষালের আগে থেকে। বলতে লাগলেন রাহুল রায়। মনের পটে আঁজো জল জল করছে সে দিনের ছবি, সানন্দা যেদিন প্রথম এলেন ভূজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী হয়ে। আমরা অফিসের সবাই তখন ভূজঙ্গ চৌধুরীকে জানি, সানন্দা সাক্ষালকে জানিনে। চিন্তিত হলুম সানন্দার জন্তে। রসময় বাবু—আমাদের এক জন সহ-কেরাণী ছিলেন সাহিত্য-সৌখিন সিলখোলা লোক, অবসর বিনোদন করতেন ইংরিজি কবিতা পড়ে। তিনি একটি বিখ্যাত ইংরিজি ছড়া থেকে দীর্ঘদ্ব্যস ফেলে আঙুলে কাম ইন্টু মাই পারলার, সেইড দি স্পাইডার টু দি লাই। এসো গো আমার ঘরে, মাছিকে বললে মাকড়সা। কিন্তু দেখা গেল এ মাছি আলাদা বাতুর, আলাদা ধাতের। মাছি এলো না মাকড়সার আওতায়, মাছির আওতায় এসে অনেক বদলে গেল মাকড়সা। তারপর দেখা গেল সানন্দা-মাছির প্রাণশক্তির বাহুতে ধীর অথচ



দৃঢ়নিশ্চিত গতিতে ভুজঙ্গ-মাকড়সার অসাধারণ পরিবর্তন। উপমাটা বোধ হয় তেমন লাগসই হলে না ধনপতি বাবু। কিন্তু বিনা উপমায় এমন ভিনিষ জো বোঝানো সম্ভব নয়। ভাট্টহুছে উপমা দিয়েও হয়তো ভালো বোঝাতে পারলুম না।

আমি বললাম, বুঝছি আমি। শুধু বুঝছি নয়, অনুভব করেছি। আমি তো দেখেছি সানন্দাকে, আলাপ করেছি তাঁর সঙ্গে।

স্বস্তির নিখাস ফেলে রাহুল রায় বললেন, তাহলে আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। সানন্দার মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা ধনপতি বাবু। সৌভাগ্যবান ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কি যেন কিছুকণ ভাবলেন রাহুল রায়। তারপর ধীরে ধীরে করুণ আঁখিনা স্তরে বললেন, সানন্দা সান্ত্বাল এখন আমার সেক্রেটারী।

বিষয়ের ভান করে বললাম, ভুজঙ্গ চৌধুরীর নয়?

রাহুল রায় বললেন, না। আমার। কথার সুরে মনে হলো যে সানন্দা সান্ত্বালের মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা, সেই সানন্দাকে সেক্রেটারী পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে পারছেন না রাহুল রায়।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর জীবনের ইতিহাসে সানন্দা সান্ত্বালের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে; এখন তাঁর জীবনে এসেছেন দময়ন্তী দালাল। ভুজঙ্গ-জীবন-নাট্যে যে ডুমিকা সানন্দার পক্ষে হয়তো অসম্ভব, সে ডুমিকার পক্ষে হয়তো সানন্দা অব্যবাহিত। ভুজঙ্গ জীবনে সাক্ষ্য হয়েছে সানন্দার যুগ, দময়ন্তী যুগ শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তাই সানন্দা এখন আর ভুজঙ্গের সেক্রেটারী নয়, রাহুলের সেক্রেটারী।

রাহুল রায়ের হয়তো ক্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় নেই, পরিচয় হয় নি ধুজুটী ধারার সঙ্গে, তাই জানে না কমপ্লেক্স আর অবচেতনের রহস্য। কিন্তু আমার মনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভুব দিয়েছে রাহুল রায়ের অবচেতন মনের গহনে। আমি তাই জানি, জানি যে রাহুল, কোথায় তোমার ব্যথা বাজছে, কোথায় তোমার ব্যথা, কোথায় বিধা, কোথায় সংশয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরী আর তাঁর সেক্রেটারী সানন্দা সান্ত্বালকে মনের চোখে এতদিন সমান উঁচুতেই দেখে দেখে অভ্যস্ত রাহুল, সেই অভ্যাসের ঘোর চোখ থেকে এখনো বৃষ্টি কাটেনি। সেই উঁচু সানন্দার পায়ের তলা থেকে হঠাৎ খামখেয়ালে মাটি সরিয়ে নিয়েছে ভুজঙ্গ, আর তেমনই খামখেয়ালী হাতে হঠাৎ ঠেলে উঁচুতে তুলে দিয়েছে নীচু রাহুলকে। ফলে সানন্দা নেমে গেছে রাহুল রায়ের অধীনে, আর রাহুল হয়েছে তার ওপরওয়ালার—ইংরিজিতে বাকে বলে ‘বস’। এই ওপরওয়ালাগিরির লঙ্ঘন সানন্দার চোখে চোখ ফেলতে পারছে না রাহুল রায়। ভাবছে সানন্দার এই অধঃপতনের জন্তে (পরোক্ষ ভাবে) সেই অপরাধী; এই অপরাধ-বোধই একটা কমপ্লেক্স-এর রূপ নিয়েছে রাহুল রায়ের মনে।

একটা প্রশ্ন করবো ধনপতি বাবু। জবাব দেবেন? শুধালে রাহুল রায়। বললাম, দেবো।

এলোমেলো, ছেলেমানুষি প্রশ্ন। শুনে হাসলেন না তো? মনে করবেন না তো কিছু?

ছেলেমানুষি প্রশ্ন শুনে মনে মনে হেসে বললাম, না। রাহুল বললে, গল্পের শ্রেষ্ঠীকতা হৃদয়চারণ বাগানের মালীর ছেলের কাছে। রাজকুমারীর মন জুড়ে থাকে রাখাল ছেলে। এমনটি কি শুধু গল্পেই সম্ভব? বাস্তবে কি এমনটি ঘটে না?

আমি বললাম, এমন হামেশাই ঘটতে পারে রাহুল বাবু। হৃদয় বেসিমেবী, তার গতি তো শুধু সমতলেই আবদ্ধ নয়। নীচে থেকে সে উঁচুদিকেও তাকায়, আর উঁচু থেকেও তাকায় নীচু দিকে। নীচেকার মিটি মিটি প্রলীণ ও কামনা করে আকাশের চাপকে। আকাশের চাপও যে তুলসীতলার ভীক প্রদীপের কাছে হৃদয় চায়ায় না, তাই বা কে জানে? হৃদয় মানে না কোনো বাধা, কোনো কারণ।

আমার কথা শুনে প্রথমে খুশীতে ভরে উঠলো রাহুলের মুখ, তার পরেই আবার বিষম হয়ে উঠলো। বললেন, আমিও তাই ভাবি। কিন্তু হৃদয়ের সব আশার তো পূরণ হয় না জীবনে। তাই তো মানুষ্যের জীবনে এত ট্র্যাগেডি, আর সেই ট্র্যাগেডিকে তবু হাসির মুখোশ পরে তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখতে হয়। চা নিন ধনপতি বাবু।

চেয়ে দেখি চা এসে গেছে। তুলে নিলুম এক পেয়লা। এক পেয়লা তুলে নিলেন রাহুল রায়। চায়ের পেয়লায় চুষক দিয়ে চোখ বুজে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে এলোমেলো ভাবে মনে হলো রাহুল রায়ের হৃদয়-ঘড়ির পেণ্ডুলামে ঢুলে ঢুলে বার বার ধনপতি হুঁছে একটি নাম: দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। সহসা থমকে থমে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল পেণ্ডুলাম। করুণ কান্না স্পন্দিত হতে লাগলো পেণ্ডুলামে। সোনালী বোর্ডের বৃকে লেখা দময়ন্তী রায় থেকে যেখানে “রায়” মুছে গিয়ে সোনালী রং কালো হয়ে গেল, সেখানে কৈন্য এক অদৃষ্ট হাতের পরিচালনায় সালা খড়িতে ধীরে ধীরে লেখা হতে লাগলো চৌধু—

“ধনপতি বাবু!”

রাহুল রায়ের হঠাৎ ডাকে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। রাহুল রায় বললেন, শ্রাণ্ডউইচ নিন একখানা। শুধু চা খেতে নেই। আমার ক্ষণস্থায়ী চোখ-বোজা দিব্যি লক্ষ্য করেন নি রাহুল রায়। শ্রাণ্ডউইচ নিলাম একখানা।

মেয়েদের সাইকোলজি আপনি কেমন বোঝেন ধনপতি বাবু? রাহুল রায়ের প্রশ্ন। গারাজের ওপরের খুপরি থেকে গারাজওয়ালার বাংলাতে এসে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন রাহুল রায়। অথবা মাথা হয়তো আগেও ঘামতো, শুধু বাইরে ছিল না তার প্রকাশ।

বললাম, বুঝিবে।

ঠাটা করছেন? হো হো করে হাসবার চেষ্টা করে বললেন রাহুল রায়। মেয়ে-মনস্তত্ত্বও আমি একজন বিশেষজ্ঞ, বাকে বলে অথরিটি, এইটেই আপন-খুশীতে আপনি মেনে নিয়ে বলতে লাগলেন “বিজ্ঞেন্দ্রলাল আশ্চর্য্য গান লিখে গেছেন: পতিতোদ্ধারিনি গকে। নারীর পতিতোদ্ধারিনি রূপের প্রতীক এই গলা। নারী শ্রদ্ধা করে পুরুষের পেক্ষকে, কিন্তু ভালোবাসে পুরুষের অসহায় রূপ—রোগে শোকে, বিপর্য্যে, হীনতার পাকে, যে ক্ষেত্রে নারী ভূমিকা নিতে পারে উদ্ধারকত্রীর। সেবা, ত্যাগ, মায়া, সহ্যছড়তি দিয়ে পুরুষকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে। বাকে সে উদ্ধার

করে তোলে—যোগ থেকে, হৃৎ থেকে, বা নৈতিক অযোগ্যতা থেকে—তার ওপর আপন অধিকার সে মনে মনে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু—

কিন্তু ?

মনে মনে প্রতিষ্ঠা করা সেই দাবী বাইরে জাহির করে আদায় করতে হয়তো সংকোচ আসে, বিখ্যা-হ্রাস, আসে ক্ষণিক; হয়তো বা মর্যাদা-বোধ পীড়ার পথ বোধ করে। বুক ফাটলেও নাকি মেয়েদের মুখ ফোটে না। তাই নয় কি ধনপতি বাবু ?

সে স্বভাবটা মেয়েদেরই একচেটির নয় রাহুল বাবু। পুরুষদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাই।

রাহুল রায় একটু ভেবে বললেন, হয়তো তাই ধনপতি বাবু। আবার বললেন, হয়তো তাই !

বৃহস্পতি আমাকে রাহুল রায় যে কথা বোঝাতে চাইছেন, সে কথা সোজা ভাষায় সোজাভাবে আমি বলতে তাঁর বাধ্য, তাই ইঙ্গিত, উপমা, রূপকের অবতারণা।

মুখে রূপের চামচ নিয়ে যদি জন্ম নিতুম, বললেন রাহুল রায়, চাহলে আমার জীবনের ইতিহাস আজ অল্প রূপ নিত।

হয়তো তাই রাহুল। তাহলে হয়তো তোমার সেই সোনালী মরনার "রায়" মুছে গিয়ে "চৌধুরী" হতো না।

কিন্তু জন্মাই নি বনেনী বড়লোকের ঘরে। জন্মেছি গরিব মধ্যবিত্ত ঘরে, বললেন রাহুল রায়। সে আমার লজ্জা-র, ধনপতি বাবু; সেজন্ত হৃৎও করি নে। বরং সেই আমার গর্বি, —সেই আমার পৌর। তাঁরী তখন তের ওপর এসে অনারাসে আসীন হতোতে কি পৌরব আছে ! আমি স্রবোগ পেলেই আপন তখন তরী করে নেবো আপন পৌরবে। পা দিয়েছি সেই স্রবোগের ঈড়িতে।

সেই স্রবোগ দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

তিনি দিয়েছেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। আমি এ স্রবোগের দ্ব্যবহার করে এইটে প্রমাণ করবো যে, গরিব পরিবারে জন্মালেই সে হয় হয় না, বোগ্যভার সে ধনী বংশজাতকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ই আমার চ্যালেঞ্জ ধনপতি বাবু।

হয়তো সৌম্যমিনী দাসালের নিদারুণ অবজ্ঞার আঁচ ফুলাতে পারেন নি রাহুল রায়। তাঁকে একদিন আকস্মিক দ্ব্যবহার উদ্দেশ্যেই রাহুল রায়ের এই বোগ্যভার সাধনা। লক্ষ্যভিত্তিক ভুজঙ্গ চৌধুরী চেয়ে তিনি খাট নন, এইটে তিনি প্রমাণ করবেন।

গা, একটা কথা। বললেন রাহুল রায়। এই স্রবোগ, ভুজঙ্গ চৌধুরীর এই দায়িত্ব নিতে হয়তো আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে ছুম। কিন্তু পিছিয়ে যেতে সেন নি সানন্দা সাত্তাল। ভয়সা করেছেন, ভীতভাক্তে বিচার দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন আমার পুরুষের গর্বি। বলছেন, হিঃ ! দায়িত্ব দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে সে চলবে কেন রাহুল বাবু ? ক্যাপিটালিস্টকে বিচার দিয়ে বিতা লিখেছিলেন না ? সেই ক্যাপিটালিস্ট বখন বেড়ে এলো আমার স্রবোগ দিতে, তখন আপনিই কপুরুষের মতো পিছিয়ে গেলে আমার থাকবে আপনাব বিচারের মর্যাদা ? ক্যাপিটালিস্টের এই

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে আপনাকে। আর এতে আমার আশ্রয় সহযোগিতা পাবেন আপনি। সেই অভয়বাণী কাজ করলে আমার ওপরে বাহুমন্ত্রের মতো। আমি মাথা পেতে নিলুম দায়িত্ব, পুষ্টিপতির এই মন্ত চ্যালেঞ্জ।

কেন এই আগ্রহ সানন্দা সাত্তালের ? রাহুল রায় অল্পমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন সানন্দার কেন এই আগ্রহ। হৃদয়ের ব্যাপারে সানন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী দময়ন্তী, তাই দময়ন্তীকে সইতে পারেন না সানন্দা। ভুজঙ্গ চৌধুরী হয়েছেন দময়ন্তী-মশগুল; তাই ভুজঙ্গ চৌধুরী প্রতি সানন্দার কোথ, অভিমান; ভুজঙ্গ চৌধুরীর অবহেলা শেলের মতো বিধেছে তার বুক। তাই ভুজঙ্গের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে রাহুল, সানন্দার এই কামনা।

কিন্তু তুমি কি ভুল কথো নি রাহুল ? প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দময়ন্তীর ওপর সানন্দার বিরূপতা আছে, কিন্তু সে কি ভুজঙ্গ চৌধুরীর জন্তে, না তোমার জন্তে হে রাহুল ?

আপনাকে ফাদার কনফেশন বানাতে চাইনে ধনপতি বাবু, বললেন রাহুল রায়, কিন্তু আরেকটা কথা না বলে পারছি না। সানন্দা সাত্তাল যে আমার কত বড় ভরসা আর প্রেরণা, ঠুঁর ওপর যে আমার কতখানি নির্ভর, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। ভুজঙ্গ চৌধুরী নিদারুণ ব্যাধি দিয়েছে তাঁকে, তাই কর্ম-প্রতিভায় আমি চৌধুরীকে ছাড়িয়ে যেতে পারি—এইটে প্রমাণ করেই তিনি চৌধুরীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। তাই আমার সেক্রেটারী হয়ে তিনি বেন মরিয়্য হয়ে কোমর বেঁধেছেন আমাকে এগিয়ে দেবার কাজে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখতে পাই, বড় উদাস হয়ে পড়েন সানন্দা। বেন আর তাঁর ভালো লাগছে না এ আক্সিসের কাজ, এখানকার মেয়াদ বেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। হয়তো আমার কাজকর্ম গুলিয়ে দিয়েই তিনি একদিন বিদায় নেবেন। সেদিনের কথা ভাবতেও আমি ভয় পাই ধনপতি বাবু। দায়িত্বের কর্মজীবনে কর্ম-প্রতিভাময়ী উৎসাহহানি নারী যে পুরুষের কত বড় শক্তি, মিসু সাত্তালকে দেখে আমি তা বুঝতে পারছি।

আমি বললাম, আপনাব ভয় নেই রাহুল বাবু। আপনাব পাশে থেকে আপনাকে এগিয়ে দেওয়ারকেই তিনি বখন দ্রুত বসে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনাকে কেলে তিনি চলে যাবেন না। এগিয়ে দেবার আর এগিয়ে যাবার তো কোনো শেষ নেই।

মনে পড়ে গেল ৬৮প্রজাপারমিতার কবিতার দুটি লাইন :

"রয়েছে সীমান্তপারে আরো কত অন্তরীণ সীমা,  
লিগন্তের অন্তরালে আরো কত অন্তরীণ পথ।"

রাহুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পাখে। ভাবলাম, ভুজঙ্গদময়ন্তীর মিলন হয়ে গেলে বৎসরময়ে রাহুলের আক্সিসের সেক্রেটারী কুমারী সানন্দা সাত্তাল পরিণত হবে তার জীবনের সেক্রেটারী শ্রীমতী সানন্দা রায়। কিন্তু তখনো কি ভুলতে পারবে রাহুলকে দময়ন্তী, সানন্দাকে ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গকে সানন্দা, আর দময়ন্তীকে রাহুল ? হয়তো পারবে না। আর হয়তো এই ভুলতে না পারাটাই তাদের আরো বেশী ভালো লাগবে।

দেখবার  
দরকার নেই...  
তফাৎটা স্বাদেই  
বুঝতে পারবেন !



একেবারে নতুন টুথপেস্ট !

**কলিনস**

সুপার-  
হোয়াইট



স্বাদেই স্বাস্থ্যমূল্য হাসিতেই  
'সুপার-হোয়াইট'-এর  
পরিচয় !

কাপটি বিশেষভাবে তৈরী—  
অমেক সহজে ও তাড়াতাড়ি খোলা  
ও বন্ধ করা যায়।

এর পেপারমিণ্টের মত শীতল ও  
মনোরম আত্মদাট অপরূপ

এই টুথপেস্টটি বাস্তবিকই নতুন !

পেপারমিণ্টের মত শীতল নতুন আত্মদাট চমৎকার তৃষ্ণা  
অমৃত্যব করবেন !

নতুন ফেনার প্রাচুর্য দাঁতের ফাঁকগুলোকে পরিষ্কার করে,  
লুকানো খাঁজকণা বের করে দেয়... মুখে বেশ স্বাদ  
অবধার অমৃত্যব আনে !

এতে নতুন শক্তিশালী উপাদান থাকায় দাঁত অনেক বেশী  
পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে। সাধারণ সাপ  
টুথপেস্টের চেয়ে 'কলিনস' সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট  
কত বেশী সাধা তুলনা করে দেখুন !

৪  
৪

আজই এই সম্পূর্ণ নতুন 'কলিনস' সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট ব্যবহার

শুরু করুন—এর লোভনীয় সুগন্ধ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রিয় !



### শ্রীচরণদাস ঘোষ

মন্দিরের বিগ্রহ হচ্ছে গোবিন্দজী—কাঠের মূর্তি।

জনশ্রুতি আছে, এই ঠাকুরটি নাকি সেই ঠাকুর যিনি একদা হাপর যুগে বৃন্দাবনে প্রেম বিস্তরণ করতেন—যে চাইতো, তাকেই। অতঃপর কি মনে কোরে এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন—সে কবে, তা কেউ ঠিক কোরে বলতে পারে না। বীরা প্রাচীন, তাঁরা বলেন—বগীর আমলের পরে তো নাই।

বিগ্রহের পূজারী হচ্ছে চন্দন। সে এই গ্রামেরই এক পবিত্র ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। ছেলেটি অবিবাহিত—কুমার। বয়স ষাঁটো—কুড়ি পেরিয়ে একুশ। মুখ প্রশান্ত, গায়ে রঙ কেটে পড়ছে, চেহারা সুশ্রী, আকৃতি সুপুষ্ট—গলায় একগোছা পৈতা, ছোট কোরে চুল ছাঁটা, বড়সড় শিখা—শিখায় বাঁধা ফুল। দেখলেই মনে হয়, ছেলেটি জাত-পূজারীরা ছেলে। মিথোও নয় কথাটা। সাতপুরুষ ধরে এরা এই মন্দিরে ব্রতী, কেউ বলে—চোদ্দপুরুষ।

সন্ধ্যার পর আরতি হয়, তারপর হয় বাসর-রচনা, তারপরই মন্দিরে কপাট পড়ে—শ্রীরাধিকা আসেন।

বাসরের মালা গেঁথে এনে গোবিন্দজীর কণ্ঠে তুলে দেয় তুলসী—এই গ্রামেরই এক মালাকারের কিশোরী কস্তা। এই হচ্ছে ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থাই চিরায়ত। যারস্তার হাতের মালা গোবিন্দজী কণ্ঠে ধারণ করেন না। বাসর অমুঠান—অন্যভাবে কুমুম-কলিকাসম কুমারী-কস্তারই হাতের মালা চাই। এই কুমারী হবে গঙ্গাজলের মত পবিত্র, জবার তার তুচি, সুধার তার নির্দাগ। নির্বাকচনের পরীক্ষায় এই তুলসীই মনোনীত হয়েছ। এই পদে ব্রতী হয়ে থাকবে সে ততদিন, যতদিন না তার বিবাহ হয়, কিংবা চরিত্রে কোনোরূপ কলঙ্ক না পড়ে। গোবিন্দজীর কণ্ঠে মালা তুলে দেবার মত মায়েই সে বটে—একটি শ্রেণপদ্ম যেন ফুটতে-ফুটতে আর ঘোটেনি।

তুলসী আসে। প্রত্যহ আসে। এসে মালা হাতে কোরে দাড়িয়ে থাকে মন্দিরের মুখে। আরতি হয়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তুলসী—অপলকনেত্রী। সেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মন্দিরের ভেতর। নয় ওপর পড়ে, তা সেই-ই জানে আর জানেন সেই মন্দির-রক্ষী, ধনি সকলের মনের খবর রাখেন। আরতি শেষ হয়। তারপর। বীরপদে এগিয়ে যায় বিগ্রহের কাছে—কাঠ আর কাঠ—কাঠে চরী যে মূর্তি—তাঁরই কাছে। দেখে মনে হয়—পা আর উঠছে

না, কত বাধাই না পাচ্ছে সে। কিন্তু যায়, এগিয়ে যায়, প্রত্যহই যায়, গিয়ে মালা পরিবে দিয়ে ফিরে আসে।

এইভাবে দিন কাটে—দিনের পর দিন।

গ্রামথানা পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম। বাড়ী-বাড়ী টোল, বাড়ী-বাড়ী পণ্ডিত। বেদ, বেদান্ত, কাব্য, রস, তর্ক, পুরাণ—সকল শাস্ত্রই বিশ্বর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পুঁটিমাছের মত ইতস্ততঃ সাতার দিচ্ছেন এই গ্রামে। এঁদের ব্য্রহ ভেদ কোরে তুলসী যখন অপরূপ বেশে কোঁতুক-হুঙ্গে অঙ্গ হুলিয়ে সন্ধ্যার পর মালা হাতে কোরে মন্দিরে আসে, তখন পণ্ডিত-ব্রহ্মবরদের কেউ কেউ তাকে শ্রীবৃন্দাবনের সাক্ষাৎ শ্রীমতীই বল্লনা কোরে ফেলেন, এবং সেই বল্লনার আশ্রয়ের ছাঁকটী শ্লোকও নাকি তাঁদের হাত দিয়ে রচিত হয়ে পড়ে। সেক্ষা গোপন থাকে না, জানাজানি হয় তাঁদেরই গৃহ-বৃন্দাবনের শ্রীমতীদের কণ্ঠমহিমায়।

একদিন এক ঘটনা ঘটলো। কুটিল পণ্ডিত ছিলেন এক দিগগজ রসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। তাঁর টোকের স্তম্ভ দিয়েই তুলসীর মন্দিরে আসবার রাস্তা। সেদিন সন্ধ্যার পর যখন সে অসুবে পণ্ডিতমশাই তার মনোহর বেশ ও চলচকল চলভঙ্গী দেখে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাকে ডেকে বলেন, “আমার পুঁথির ওপর তোরা নামে শ্লোক উঠেছে শুনে যা—”

“আমার নামে শ্লোক?”

“হ্যাঁ। তুই যে কে, তা তুই জানিস না! রাধিকা, যে রাধিকা,—বৃন্দাবনের শ্রীমতী! তাই তো তোরা হাতেই মালা নেন ঠাকুর!”

“তাঁহলে, সে শ্লোক আমাকে তো শুনতে নেই পণ্ডিতমশাই! শুন্লে, মাটিতে আমার আর পা পড়বে না!” কথাটা বললে একটু তেমে তুলসী বিদ্রোহের মত ঠিকরে মন্দিরে চলে আসে।

ক্রমে হাসি তার বেড়েই গেল—হেসে কুটিকুটি। কেউ তখন ছিল না, ছিল একা চন্দন। একটু পরেই হবে আরতি, তারপরই বাসর। চন্দন অবাক হয়ে গেল। বললে, “হাসছ যে!”

“হাসবো না! আমি যে রাধিকা, গো, রাধিকা!”

“মানে?”

“বৃন্দাবনের শ্রীমতী।”

চন্দন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তুলসীর মুখের দিকে চেয়েই থাকে। তুলসীর কিন্তু হাসি আর ধামে না। বলে, “কি বোকা গো তুমি! তবুও বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, শ্রীমতী যে গান গাইতো, সেই গানের একটা জায়গা গাই, তা হলেই বুঝতে পারবে।” বলতে-বলতেই তার গলা কঁপে গান বেরুলো—  
“(কবে) অথরে অথর-গিরে পিব মুখমুখা, জনম-জনমের আমার মিটিবে ডুবকুণা—” হঠাৎ ধামলো। তারপর সে চন্দনের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বলে উঠলো, “তুমি এক কাজ করতে পারো, ঠাকুর এক কাজ করতে পারো।”—মন্দিরের ওই কাঠের ঠাকুর—ওই না? তাঁর মতন ঘাড় বেকিরে, পায়ে পা দিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে আমার স্তম্ভে পাঁড়াতে পারো? পাঁড়ো না? একটীবার?”

“যেৎ—”

“যেৎ—কেন? তাঁহলে, আমি কি করি, জানো—নিই ফেলে

এই মালাগাছটা। কোথায় বসে দিকিনি—তোমার গলায়, গো, তোমার গলায়।”

চন্দন ধমক দিয়ে উঠলো—“ছি, তুলসী! ও কথা বলতে নেই—বললে পাপ হয়।”

“পাপ হয়?”—তুলসীর মুখটা একবার একটু বিবর্ণ হয়েই সহসা কঠিন হয়ে উঠলো, তারপরই অবলম্বন হয়ে ঝুলে পড়লো। মুখ দিয়ে পুনরায় অকুট নির্গত হলো—“পাপ হয়!” কিন্তু, সে এক মুহূর্ত। পর মুহূর্তেই আবার সে মুখ তুললো, মুখ তুলে মুখ রাখলো চন্দনের হৃৎকের ওপর। দপদপ করছে তার চোখ, চোখে নীল আঁভা। আবার বলে উঠলো, “কি বললে—পাপ হয়?” গলাটা কঁপে উঠলো, হয়তো কঁপে ফেলবে। ঠিক সেই সময় একদল লোক এসে পড়লো—আরতির সময় হয়েছে। তুলসী মুখ ফিরিয়ে নিলো। কি কথা তখন তার মনে উঠেছিল কে জানে! বোধকরি, জানেন—মন্দিরের ওই অন্তঃগামী।

শুধু অন্তঃগামীই নয়, চন্দনও যেন কিছু জানতে পেরেছিল। তাই পরের দিন সন্ধ্যায় তুলসী আসতেই বললো “দেখো, মাগুয়েরই গলায় যদি মালা দিতে চাও, তা’হলে এইবার বিয়ে করো।”

তুলসী চন্দনের দিকে তাকিয়েছিল, মনে হলো—তার চোখের তারা ছুটো সহসা স্থির হয়ে গেছে, মৃতিটিও পাথর হয়ে গেছে, যে পাথরে গেঁথে গেঁথে উঠেছে সারি সারি হিমালয়, হার

গহ্বরে-গহ্বরে উপবিষ্টা ধ্যানমগ্না, তপস্ভা-মৌনা, প্রেমবিহবলা শত সহস্র, লক্ষ কোটি গিরিকন্ঠা কুমারী উমা।

চন্দন কথাটা আবার শুধিরে বললে, “হার গলায় মালা দেবে, তার হবে তুমি বউ।”

তুলসী এইবার চোখ নামালো, নামিয়ে বললে—“আচ্ছা।”

অন্তঃপর করেকদিনের মধ্যেই জানা গেল, তুলসীর বিয়ে—দিন-দ্বিঘ পর্যন্ত হয়ে গেছে। বিয়ের পরদিন থেকে সে আর মন্দিরে আসবে না।

দেখতে দেখতে বিবাহের দিন এসে পড়লো। আজ এলেই তুলসীর মন্দিরে আসা শেষ হবে। তাই আজ গ্রামের মেয়ে-পুত্র সব লোক কাতার দিয়ে দেখতে এসেছে। দেখতে “এসেছে, ঠাকুরের গলায় তার মালা দেওয়া—মালা দেওয়া এই শেষ দিনটিতে। দেখ-বার মত দৃশ্যই বটে! মন্দিরে ঢোকবামাত্র রূপ যেন তার উৎপলে ওঠে, যৌবন যেন চলকে পড়ে, আবেগে হুটিয়ে পড়ে দেহলতা, আর সেই মধু-মুহূর্তে ঠাকুর যেন হেসে হেসে কাছে এসে ভালোবেসে গলা পেতে নেন সেই মালাটি। দর্শনার্থী হারা, তারা সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়ে—মেয়েরা ঘনঘন চোখ মোছে, অ-পাণ্ডিত পুরুষদের হয় সমাধি, পণ্ডিতের মস্ত হয়ে টেটিয়ে বলে ওঠেন—“গোবিন্দ গোবিন্দ।” এ যেন সেই দৃশ্য, যে দৃশ্যে বৃন্দাবনের এক পরম দৃশ্য ফিরে আসে। সেই দৃশ্য দর্শন করবার আজ শেষ দিন।



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার  
গিনি  
ম্যানসন

জুয়েলার্স

প্ৰধান কার্যালয় :-

২২৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“শিলা” \* ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহ :

বহুবল্লভ বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুহান মার্গ, বাঙ্গীপুৰ

বিঃ দ্রঃ—আগামী ১৯৬৭ সালের গণ্ডিমঙ্গলের মাসামিক শিক্ষা পঞ্চ অধীন বুল কাইনাল পরীক্ষাতে যে ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে গিনি ম্যানসনের তরফ হইতে হীরক খচিত স্বর্ণদ্বীয় ঘাটা পুরস্কৃত করা হইবে।

শেষ দিন।

আজ আর নাট্যমন্দিরে তিল ধরে না—এতো লোক! পণ্ডিত মহল স্থান অধিকার করেছেন অগ্রভাগে। তাঁদের পরিবানে পটবস্ত্র, কণ্ঠে তুলসীর মালা, অঙ্গে তিলকচন্দন, মস্তকে স্তম্ভাট্ট শিখা। পাৰ্শ্বেই—আপন আপন গৃহিণী, শ্রেণীবদ্ধ। পশ্চাতে দণ্ডায়মান জনসাধারণ গ্রামবাসী—আবালবুধবনিতা।

প্রতিদিন তুলসী আসে আয়ত্তির পূর্বেই। কিন্তু আজ আসবে—পরে। আজ সন্ধ্যার তার ‘জানীর্কান’—কাল বিবাহের দিন। ‘জানীর্কানটা’ হয়ে গেলেই সে আসবে—মাথার ধান-দুর্কাগুলো ঝেড়ে ফেলতে বা দেয়ি। \* \* \* আরতি হয়ে গেল। সকলেই অধীর প্রতীকার হস্তার দিকে চেয়ে—এই বৃষ্টি আসে!

এলো তুলসী। এলো এক অন্ধকার বৃষ্টি। মন্দিরে ঝলছে আজ সহস্র বাত, আকাশও মস্ত চাঁদ। এতো আলো! তবুও তাকে বেন দেখা যায় না। কেনোদিকেই সে চাইলো না। মুখ নিচু কোরে সোজা মন্দিরে গিয়ে উঠলো—হাতে চুলছে মালাটি, যে মালা সে এখনই পরিয়ে দেবে তাঁর গলায়, ধীর গলায় প্রত্যহ সে পরিবে দেয়। কাঠের বিগ্রহ—সেই তিনি, সেই ঠাকুর। ঠাকুরের প্রাণ আছে, কি প্রাণ নেই, তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। তাঁর গলায় মালা দেওয়া সাকারণ কি অকাারণ, তা তুমিও বলতে পারো না, আমিও বলতে পারি না। যে পারে, সে পারে। তুলসীও পারে কি, পারে না, তা সেই-ই বলতে পারে।

মন্দিরের রোরাকে উঠেই সে থমকে দাঁড়ালো—স্বস্থখেই চন্দন। তুলসী একটু হাসলো। সেই হাসি বেন ঠিকরে গিয়ে পড়লো ভেতরে—বিগ্রহের মুখে। অগ্নিবিলম্বও হলো না—চোখের পলকে তুলসীর হাত থেকে মালাগাছটা ঠক কোরে পড়ে গেল চন্দনের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যমন্দিরের স্রুতকার পণ্ডিতমহলটিও বেন রবাবের বলের মত লাফিয়ে উঠলেন। বেন অতর্কিতে দেখানে কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়েছে। কুটিল পণ্ডিত ছিলেন স্বস্থখেই, তিনি অগ্নিগোলকের স্রাব এক লাফে মন্দিরের রোরাকে উঠে বসে কণ্ঠে তুলসীকে বলে উঠলেন, “এ তুই কি করলি?”

তুলসী চন্দনের দিকে মুখ কোরে ছিল, ফিরে দাঁড়ালো। হাতাবিক কণ্ঠে বললো, “ঠাকুরের গলায় মালা দিলাম।”

“চন্দনটা তোরা ঠাকুর?”

তুলসীর মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। তারপর মুখের দাঁড় পরিবর্তন কোরে জবাব দিল, “ভালোবাসার কথা—ওকথা আপনারা বুঝবেন না।”

কুটিল পণ্ডিত বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, “আমরা বুঝবো না, বুঝবি তুই! আমরা বুঝি, তুই পণ্ডিত! বলি, কাল তোরা বিয়ের দিন নয়?”

“হ্যাঁ তো।”

“ভবে, এসব কি? বাবুনের ছেলের জাত নিয়ে ওকেই বিয়ে করার কেলি—এই তো তোর মতলব?”

“বিয়ে!”—বিয়ের তুলসীর চোখ ছুটো ডরে উঠলো, বেন সে এক কথা শুনেছে।

কুটিল পণ্ডিত তেমনি কোয়েই বললেন, “ভেকি! কিছুই জানেন না বেন।” তারপর গলায় স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠলেন, “নইলে, তুমি মিলি কেন—গলায় মালা!”

তুলসী মুখ টিপে হাসলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল সে-হাসি—ভীক হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি, কঠিন হয়ে উঠলো মুখ। পরক্ষণেই আবার সেভাবটাও অজ্ঞান হয়ে গেল, বেন তার উত্তত কথা সে চোখের নিম্নে মুচড়ে ভেঙে গুঁড়ো কোরে ফেলেছে। নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রার দাঁড় করিয়ে বললো, “লক্ষীর গলায় আপনারা মালা দেন—সেন তো? তা’হলে লক্ষীকেও আপনারা বিয়ে করেন বৃষ্টি?”

অগ্নিকুণ্ডে ধূম পড়লো। এবার সারা পণ্ডিত মহলটাই বেন বোমার মত ফেটে গেল। সকলেই একসঙ্গে গর্জন কোরে উঠলেন—“তুই পাশিষ্ঠা! তুই পাশিষ্ঠা! আমরা তোরা সমুচিত দণ্ডদান করবো।”

তুলসী তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। তারপর মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে মন্দির থেকে যেমন নেমে আসবে, কুটিল পণ্ডিত বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “পথ রুদ্ধ! তোরা দণ্ড গ্রহণের কথা উপস্থিত”—বলেই নিচে নাট্যমন্দিরে দণ্ডায়মান একজন প্রৌঢ় পণ্ডিতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ইনি পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং এই গ্রামের সমাজপতি—শিরোমণি ঠাকুর।

তিনি একবার চকল হয়েই দণ্ডবাক্য উচ্চারণ করলেন—“রে তুলসী মালাকার! তোরা বিলম্বে অভিব্যক্তি—তুই ভট্টা, ভট্টার কুৎসিত কৌশলে এক ব্রাহ্মণকুমারকে অপহরণ করতে উত্তত হয়েছিল। শাস্ত্রের বিধান মতে ঈদৃশ অপরাধের মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য দণ্ড, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুই নারী, তবিশ্বাস, কিংবৎ লহুদণ্ডই তোরা অর্থে ব্যবস্থা করা হলো। এক্ষেত্রে, প্রবণ কর সেই দণ্ড—মস্তক মুণ্ডন করতঃ মুণ্ডিত মস্তকে বোল নামক একপ্রকার অস্বাভাবিক রাসায়নিক ছদ্ম পরিচয়গ্রহণ করতঃ কুলা নামক বাদ্যনগর বিশেষের বাতাসহকারে গ্রাম হতে অচিরেই চির-নির্বাসন।”

“সাদু, সাদু”—পণ্ডিতমহলে বিকট হইব্বনি উঠলো।

শিরোমণি ঠাকুর গ্রামবাসীদের দিকে ফিরে বললেন, “কাশা করি, এই দণ্ড তোমারাও অঙ্গমোদন করো—”

গ্রামবাসীরা একতরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বেন তাদের স্রুত মুখে দিয়ে মর্দটা স্বর্গে উঠে গেছে, আর স্বগীতা মর্দো নেমে এসেছে। এইবার তাদের চমক ভাঙলো। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় কোরে তাদের ভেতর একজন অগ্রণী হয়ে বললো, “আমরা ভেবেই পাচ্ছি না, যেভাবে, কি আমরা করবো—আপনারা দণ্ডটা অঙ্গমোদন করবো, না, তুলসী দেবীর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবো?”

“তোমরা অর্চরীতান!”—কেনে উঠলেন শিরোমণি ঠাকুর। চক্ষুঃর রক্তবর্ণ কোরে বললেন, “ওই কুলটার পাপ, তা’হলে, তোমাদেরও কিংকিংকিং স্পর্শ করবে!” তার পর তাঁদের গৃহিণীদের দিকে ফিরে বললেন, “তোমাদের কি অভিমত?”

বিতর্ক শূন্য কোরে অপরাহুে মিটে-মিটে হাওয়া ধরলে যেমন তাতে মুহূঃমুহ পোল লাগে, তেমনি ওই কনক-বরণী গৃহিণীদের দলটিও একতরঙ্গ একিক-ওমিক পোল খাছিল। তখনই এটা স্পষ্টই জানা গেল যে, তখনকার কিছু-একটা মন্ত্রণা তাঁদের ভেতর চলছে। শিরোমণি ঠাকুরের কথাটা মুকে ধরে নিলেন তাঁরই গৃহিণী। তিনি কাছাকাছি এগিয়ে এসে হঠাৎ কুঁপিয়ে উঠলেন, তার পর চোখে কাপড় উঠিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলে উঠলেন,—“মন্ত্র বলে আমাদের সকলকে পাথর কোরে দাঁড়।”

পশ্চিমতমহল উদ্ভূত হয়ে উঠলেন। শিরোমণি ঠাকুর বিদ্রাস্তের স্রাব বলে উঠলেন, “কেন—কেন?”

“নইলে, তোমাদের ঘর ছেড়ে ওই কুলাটাই সঙ্গ নিতে হবে!”

“এ্যা—

“ওর পাপ আমাদেরও স্পর্শ করেছে। কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ নয়—পূর্বোপূরি!” বলেই শিরোমণি-গৃহিণী কাতরচক্ষে স্বামীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “কি জানি কেন, তুলসীর ভালোবাসাকে আমরা সকলেই মনে-প্রাণে সমর্থন কোরে ফেলেছি!” অতঃপর একটি যেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, “পাথর যদি না করো, তাহলে আমরা ওর সঙ্গই নিই—”

কথাটা বলেই শিরোমণি-গৃহিণী যেমন সকলকে হাত নেড়ে ডেকে তুলসীর দিকে পা বাড়ানেন, শিরোমণি ঠাকুর ঠাণ্ডা কোরে বলে উঠলেন—“তিষ্ঠ, তিষ্ঠ!” বলেই একটা হাত ছড়িয়ে বোড়া দিয়ে খায় দলের দিকে ফিরে নিয় কণ্ঠে কি-এক দ্রুত পরামর্শ করলেন। তার পর বললেন, “আমরা যদি দণ্ড প্রত্যাশার কবি—”

“তা’ হলে—”

“তা’ হলে, দণ্ড প্রত্যাশারই করলাম।”

“তা’ হলেও, তোমাদের ঘরে আমরা ঢুকতে পারি না।”

“কেন?”—শিরোমণি ঠাকুরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

শিরোমণি-গৃহিণী স্বামীর প্রতি এক সত্যতার দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে বললেন, “সকলকার সমুখে তুলসীকে তোমরা কুলাটা বলেছ, ভুলটা বলেছ। এই অপবাদ আবার সকলকার সমুখে মুখে যদি না যায়, তা’হলে ওর অঙ্গ তো শুচি হবে না। আর ওর অঙ্গ শুচি না হলে আমাদেরও অঙ্গ অশুচি থেকে যাবে। সে-ক্ষেত্রে এই সব অশুচি অঙ্গে ঘরে ফিরে গিয়ে তোমাদের পবিত্র অঙ্গ যে স্পর্শ করবে; তা’ তো হয় না, নাথ!”

শিরোমণি ঠাকুর মস্তবড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কথাটা স্বীকার করলেন। বললেন, “শাস্ত্রসম্মত বাক্য—সেই বাক্যই তুমি বলেছ, স্ত্রীয়ে! এ বাক্য আমরা স্বীকার করি। তা’ হলে—

“উপায় আছে। অহুষ্ঠান আছে একটি—একটি মাত্র, যা সম্পন্ন করলে তুলসীর অপবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।”

“বলো, বলো—

“বে-মালা সকলের সামনে তুলসী চন্দনের গলায় এইমাত্র পরিয়ে দিয়েছে, সেই মালা চন্দনও যদি সকলের সামনে তুলসীর গলায় পরিয়ে দেয়।”

“উপযুক্ত প্রতিবেশক!”—শিরোমণি ঠাকুর তৎক্ষণাৎ চন্দনের দিকে ফিরে স্রব করলেন, “আমরা পূজায় বসে মা-লক্ষ্মীর কণ্ঠে মালাগান করি, সেই মালাগানে এ-অর্থ আসে না যে, আমরা তাঁকে বিবাহ করি, বা তাঁর জাত অপহরণ করি। এই পরম বাক্য এই মাত্র মা-তুলসীর হুখেই প্রকট হয়েছে। তজ্জপ, তুলসী তোমার কণ্ঠে যে মালাগান করেছে, তাতে এটা বোঝায় নি যে, তোমাকে সে বিবাহ করতে চেয়েছে, বা তোমার জাত নেবার অপকৌশল প্রয়োগ করেছে—

“খুবই সত্য কথা, খুবই সত্য কথা—অজ্ঞাত পণ্ডিতরাও একবাক্যে শিরোমণি ঠাকুরের কথা সমর্থন করল।

সহসা শিরোমণি ঠাকুরের চক্ষুর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি অধিকতর উৎসাহে বলে চললেন, “মা-তুলসীর বকে অপার্থিব

ব্রহ্মপ্রেমের উদয় হয়েছে, সেই ব্রহ্ম প্রেমই তোমাকে সে অর্পণ করেছে। ওই মালাগান তারই অহুষ্ঠান।” এইবার পৃথিবীর দিকে একবার ফিরলেন, ফিরে একটি হেসেই আবার চন্দনের দিকে চেয়ে স্রব করলেন, “বৎস চন্দন, বৃন্দাবনের শ্রীমতীর যে প্রেম, সেই প্রেমই তুমি আজ লাভ কোরে দখল হয়েছো। অতএব, সকলের সমুখে তুমিও সেই পরম প্রতি-অহুষ্ঠানটি অবিলম্বেই সম্পন্ন করো। তোমার কণ্ঠের মালাটিও প্রেম-পুস্তলিকা যা তুলসীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে সকলকে জানিয়ে দাও—তুমিও তাকে শ্রীমতী জ্ঞানেই ভালোবাসো!”

পশ্চিম মহলে জোর করতালি পড়লো। কিন্তু, চন্দনের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না—দাক্ষণ লজ্জায় তার মুখখানা শূলে পড়েছে। সে একবার তুলসীর দিকে চাইলো, তার পর সম্মোহিতের স্রাব তার গলায় ঠিক তারই মত ঠক কোরে মালাগাছটা ফেলে দিলে, কেন দিলে তা সে জানে না, যেন দিতে হয় তাই সে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অগণিত গ্রামবাসীরাও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হইধনি কোরে উঠলো—“তুলসী দেবীর জয়!” তখন তাদের মনে কি ভাব এসেছিল, কি-কথা উঠেছিল—তারাই জানে। তবে দেখা গেল, আকাশে চন্দ্রদেবের অঙ্গে কিরণ আর নেই, সবটুকুই কাঁপিয়ে এসে পড়েছে কুটিল পশুভেদে চই চোখে! তিনি তুলসীর হুখোহুখী হয়ে হাত ছুটো জড়ো কোরে কপালে তুললেন, বুঝি বা তিনিও এবার সকলের সামনেই তুলসীকে জানিয়ে দিতে চান—সেই বৃন্দাবনেরই শ্রীমতী।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি প্যাকেট  
২৪ টি  
স্লাইসড ব্রেড

- কল্লো প্রস্তুত
- স্ট্রো সেকা
- হোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সর্বত্র ব্রহ্মা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী  
কলিকতা - ২২

তবে ওর টানাটানা চোখদুটো ভালো,  
চেহারা, বোলতে নেই, বেড়ে জমকালো !”

88

মিথোর তালি মেরে জীবনকে ঢেকে,  
এমিক-ওমিক চেয়ে ভালো ভাল রেখে,  
থাকে যারা সমাজের কানা-গলিটার,  
—এ তাদেরই বাধাবুলি,—তা কি এসেযায় ?  
ওদের কি দেখে, ওরা কতটুকু বোঝে ?  
ওরা শুধু টাকা আর মেয়েছেলে খোঁজে ।  
ইহুর কি বোঝে বসো বাঘের ওজন ?  
বাঘকে বুঝতে হোলো বাঘই প্রয়োজন ।

মুখকে বলা চলে—তেজটা কমাও ?  
পাতাড়কে বলা চলে—মাথাটা নামাও ?  
কামনা বা কামিনীর ধারে না যে ধার,  
তার তেজ হবে না তো তেজ হবে কার ?

জীবন বোলতে যারা সজ্জাগ বোঝে,  
পরের পকেট আর পরদ্বী খোঁজে,  
কি অর্থে কোরবে তারা সত্যের জাঁক ?  
অপ্রিয়-সত্যকে তারা চেপে থাক্ ।

জীবদুখ বাবা, যারা নিকাম,  
সত্যপ্রিয় হয়ে করে সংগ্রাম,  
মনে যার না-পাওয়ার নেই আক্ষোষ,  
সত্যের সাথে যার করে না আপোষ,  
পরের পকেটে যারা রাখ না কো মন,  
সত্যই জীবনের যার মূলধন,  
প্রিয় হোক, নাই হোক সত্য যে চায়,  
সত্যের খাতিরেই সত্যো যে যায়,  
কি আশায় কোরবে সে মিথ্যে চালাকি ?  
সত্য গোপন করা মিথ্যে ছাড়া কি ?

রাতের অন্ধকারে ‘দুঃস্বপ্ন ধারা’  
ত্যাগের কঠিন পথে পা বাড়ায় যারা,  
তাদের অহংবোধ থাক বা না থাক,  
ত্যাগীদের তেজটাকে ভেবো না দেমাক ।

নির্বেশ নৃষকে দেমাকে বলা কি ?  
তেজ ও অহংকার দুটো এক নাকি ?  
দেমাক থাকলে তার পতন হবেই ।  
পতন মানেটা হোলো—সত্যো যে নেই ।

একথাটা বেশ কোরে ভেবো অন্ততঃ,  
নবীন দেমাকে হোলো স্বামিকী কে হোতো ?



শ্রুমাণি মিত্র

৪৩

বেকারগা বুদ্ধির দাসত্ব নয়,  
নরেনের মন-প্রাণ সত্যই চায় ।  
যুক্তির রাস্তাটা পার হোয়ে তবে  
একদিন সত্যই উপনীত হবে ।  
সে হিসেবে নরেনের তর্ক-প্রিয়তা  
হু-দশজনের মতে নয় বাতালতা ।

সমাজের মাথা যারা ভালোবাসে তাকে,  
তবু তারা একথাটা শোনাতে তোমাকে ।  
বুদ্ধির প্রশংসা কোরে নিয়ে শেষে  
একটা ‘কিন্তু’ বোলে সামান্য কেশে,  
গলাটাকে খাটো কোরে সামান্য খেমে,  
সমাস্তুরাল রেখা কপালেতে টেনে  
সবশেষে বোলবে বা সেটা হোলো এই,—  
“অমন গোঁয়ার ছেলে জিন্দুবনে নেই !  
শত্রুও কেউ তাকে বোলবে না বোকা,  
তবে বড় বেরাদপ, ভারী একরোখা,  
ককু-বভাব আর নিদারুণ জ্যাঠা,  
তর্ক তো করে না ও, ছুঁড়ে মারে জ্যাঠা !  
অপ্রিয়-সত্যকে করে না গোপন,  
মুখে শুধু চোখা-চোখা বুড়বচন !  
কাজাকাশি জান কিছু নেই তার,  
হান-কাল-পাত্র সে করে না কেয়ার ।  
যেমন কাঁকালো আর তেমনি দেমাকে,  
অমন অহংকরে দুটো যদি থাকে ।



৪৫

"I have no time to give my manners a finish.  
I have no time to be sweet...  
Every attempt of sweetness  
Makes me a hypocrite...  
—I have to unbreast  
Whatever I have to say,  
Without caring  
If it smarts some  
Or irritates others.  
...I am a singular man my son...  
—Do not try to 'boss' me  
With your nonsense....  
—What do I care about  
What they talk—  
The babies,  
What ?  
I, who have realised the spirit  
And the vanity of all earthly nonsense  
To be swerved from my path  
By babies' prattle ?  
Do I look like that ?" ১

• • •  
এ যদি বিনয় কোর—ভোলে হংকার,

হস্তভাঙ্গা দীনতার লোকদান হবে ।—

"If I have to please the world,  
That will be injuring the world." ২

বাণ্ডন বাস্তব তেজে, স্নিগ্ধতা নয় ।  
চাঁদের আলোয় তাকে চুরিয়ে কি লাভ ?

"I do not believe in humility,...  
I am too old to change now  
Into milk and honey.  
Allow me to remain as I am." ৩

শক্তিমান যদি বলে—“আমি কিছু নই,”  
সেখানে ধর্মীরাই চমক দেয়াক ।

১ “আত্মবিকার-এ পরিপাটি করবার আমার সময় নেই, মন-  
যোগানো কথা বলবারও নহ—এক তা কোরতে গেলেই আমি একটি  
গুণ হোয়ে পোড়বো। ...আমার বক্তব্য না চেপেই বোলে যেতে হবে ;  
রক্ত কে আঘাত পাবে এ বিরক্ত হবে—সে বিষয় গ্রাহ্য কোরলে  
চালবে না। ...বৎস, আমি তোঁছি অসাধারণ প্রকৃতির লোক...  
হামাদের আত্মত্ব দিয়ে আমার চালাবার চেষ্টা কোরো না। ...লোকে  
ক বলে না বলে তাতে আমার কি এসে-যায়—ওরা তো'বোকা ! কি ?  
যদি পরমাশ্বাকে সাক্ষ্য কোরেছি, সমস্ত পাখিও জিনিসের অসাব্যতা  
গণ্য-প্রাণে উপলব্ধি কোরেছি—সেই আমি বিনা সামান্য বালকদের  
আর আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবে ?—আমাকে সৌরভম  
নাও হয় নাকি ?”—Letters of Swami Vivekananda.  
পৃ: ১১২, ৩৬৫, ২২৬, ৩৬৪ । )

২ “যদি আমাকে এগংকে সঙ্কট কোরতে হয়, তাতে জগতের  
নিষ্টাই হবে।”—Letters ( পৃ: ৩৬৫ )

৩ “আমি দীনতার বিশ্বাসী নই। ...আমার পক্ষে এভাবেই আর  
বড়াই হওয়া চল না। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে  
হই।”—Letters ( পৃ: ১১১ )

৩১—১৫

কেউ চাও ভাসিগাছ মাথাটা না তুলে  
মাটিতে লিখে তোঁক মাগবীলতা ?  
কেউ চাও বোদ্ধর নিঃশব্দ হোসে  
চাঁদের আলোর মত যদি বোনে থাকে ?

"Do not try to drag...down into the mire  
With such false nonsense  
As compromise  
And becoming nice and sweet...  
My life is more precious  
Than spending it  
In getting the admiration of the world." ৪

বাধ যদি কোমোদিন পানিয়ার মত  
গান গেয়ে ওঠে আর পাকা কল খাট,  
আন্তর আঁতকে উঠে খুব সম্ভব  
জলে ডুবে প্রাণ দেবে সেই লক্ষ্যায় !

• • •  
তাঁই বোলে বৈষ্ণব না পানিয়ার ধারাপ,  
জলকেও বাপ তুলে দিচ্ছি না গাল,  
আমার কথাটা তোলা—পানিয়ার গান  
সুনেতে না হয় যেন বাধের গলায় ।  
আন্তর তেজ বেন জলেতে না থাকে,  
আন্তরটা স্নাতস্নাতে না-হোলেই হোলে ।

৪৬

তবে,  
শুধু আন্তর কোনা হয়না-কো মানে ।  
আন্তরকে স্তব্ধ দিয়ে  
রান্নাঘরে ডেকে এনে তাকে  
ঊরুনেতে বন্ধী করা চাই ;  
তাবপরই ‘ডাল ভাত,’ তাব আগে নয় ।

তাব আগে আন্তরটা উদ্ভাবের মত  
রুঢ়, কক্ষ, নিদ্রা, ক্রীণা ;  
অকস্মাৎ জীবনের উপকূলে এসে  
মাঝুবেই হাঙ্গামাও আনে ।  
তাব আগে তাব  
লেক্তিহান জীবনটা শুধু মস্ততা,  
স্বর-তালপরই হীন অসহ প্রলাপ !

তাঁই

আন্তরের কাছে সর্বদাই  
আন্তরের দেবতাটি কাছে থাকা চাই,  
কে-দেবতা বৈধে দেবে জীবনের তায়  
শক্তিকে সাহস কোরে ছাড় বোবে ওঠাবে কংকার ।

৪ “আপাধ এবং মন-যোগানোর মত মেকি জিনিস দিয়ে পঙ্ক  
করবার চেষ্টা কোরো না। জগৎ-পৃষ্ঠা হোয়ে জীবন কাটানোর কে  
আমার এ জীবনটার দাম আরও অনেক বেশি ।

—Letters ( পৃ: ১১৩, ১৮৬

যার স্বরে আসীম আকাশে  
আত্মীয়-বিবোধী ঐ আয়র্গত জ্যোতিষ্কের দল,  
বিলোহী পরমাণু বকে কোরে নিয়ে  
একে-ওকে কোনোদিন যামনাকে তেড়ে ।  
যে যার নিজের কাজ কোরে যায় ঠিক,  
আপন কক্ষপথে সোজা টোলে যায় ।

যার স্বরে এই পৃথিবীটা  
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল  
মুখ বুঁজে ছুটে যায় বোজ :  
ভুলেও জানে না ঐ  
'মঙ্গল'র কোনো ক্ষমঙ্গল,  
স্বপ্নাতুর শশাঙ্কের  
কোনোদিন ভাসায় না গুম !

জ্যোতিষ্কের মুকাক্ষ ঐ যে আকাশ,  
জীবনকে তায় আশ্বাস ;  
কর্মস্রাস্ত মাহুসেরা ঝাপ ছাড়ে তাতে ।  
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ভাষায়  
কানে কানে বোলে যায়  
গুজলির রজনীগন্ধাকে,—  
“তোমরা নির্ভয়ে মাথা তোলো ।”  
স্বর্ষ বোজ ঘাড় ধোরে ঘম থেকে উঠে  
ভেসে দায় ভড়তার বেড়া,  
জীবনকে তাপ তায় বিনাশয়সায়,  
স্নাতস্নাতে মনে তায় আসো ।

এখানেও তাই,  
আগুনের দেবতাটি কাছে থাকা চাই,  
জীবন-দেবতা হোয়ে বিশ্ববিধাতার  
সর্বদা পাশে থাকা চাই ।  
না-হোলেই তাঁর  
স্বষ্টির স্রবমাটুকু হুঁদিনেই হবে ছারখার ।

ভয় নেই, কাছেই আছেন  
উন্নত তৈরী কোরে খুব সম্ভব  
চল-ডাল কিন্তে গ্যাছেন ।

### পঞ্চম অধ্যায়

( অবতার-তত্ত্ব )

১

আগুন ও বায়ুনের দৌলতে যারা  
যুগে-যুগে মজা মেরে 'বাড়া-ভাত' খাও, ৫

৫ ঈরামক্কেদের বোলতেন,—“আমি ভাত বেড়ে দিয়েছি, তোরা  
বাড়া-ভাতে বোসে যা ।” অর্থাৎ মাহুসকে আর খেটে-খেটে কর্মলাভ  
করতে হবে না । তিনি নিজে কঠোর তপস্যা কোরে আমাদের  
জৈ আ' সক্ষম কোরে রেখেছেন । এখন একটু কষ্ট কোরে খেতে  
পাসলেই হোলো, অর্থাৎ ধর্ম চাইলেই হোলো ।

মজা এই—অনেকেই জানেনা-কো তারা  
এই যুগ্মাঙ্কার পরিচয়টাও ।  
অন্তঃসংক্ষেপে বোলি তোমাদের  
'নর-নারায়ণ-বাদ' মহাবি ব্যাসের ।—

জীবের দুঃখ দেখে বিষ্ণু স্বয়ং  
নর আর নারায়ণে বিভক্ত হন ।  
অনন্তকাল ধোরে জীব-কল্যাণে  
দুঃখের তপস্যা করেন দুজনে ।  
দুঃখনে অভেদ, তবু দুঃখনের ভাবে  
বিভিন্ন রাগিণীর সন্ধান পায়ে ।  
আকাশ ও সমুদ্র দুজনেই নীল,  
তবুও ও-দুঃখনের যেটুকু অমিল ।  
আকাশ ও সাগরের তফাৎটা এই—  
আকাশের প্রশান্তি সাগরের নেই ।  
কিসের অভাবে যেন সুনীল সাগর  
অনন্তকাল ধোরে তোলো কল্লোল ।  
জানি না কি দৈত্য সে দিগন্তে ঠায়  
সশব্দে মাথা কোটে আকাশের পায় ।  
নীলাকাশ নিশ্চল, তার মনে এই  
অপূর্ণ জীবনের কোলাহল নেই ।  
পূর্ণ-জ্ঞানীর মত স্নিগ্ধ, মধুর ।  
অসীমের নীরবতা তার মূলস্বর ।  
উর্মি-মুখর ঐ সাগরের মত  
নর-ঋষি যুগে-যুগে হন প্রকাশিত ।  
নারায়ণ নীলাকাশ উদ্ভাসদীন,  
অভাব ও হৃদয়ের পরপারে সীন ।

২

পৃথিবীতে জন্মে যেই ধর্মের স্রানি  
ধর্মের নামে শ্রেয় চলে বান্দরামি,  
স্রান হয় বিশ্বের ধর্ম-জীবন,  
তখনই হাজির হন নর-নারায়ণ ।  
এই যুগ্মাঙ্কার মিলিত কৃপায়  
হুমুসু প্রাণ-পাখি ফের গান গায় ।  
ভারতের প্রাণ-পাখি ধর্ম বধন  
বাগবের শেবাশেবি হোয়েছে অখম,  
অমনি এ-ভারতের পুণ্যের গুণে  
এঁদের পেয়েছি জাখা কুকাঙ্কনে ।  
ভারত পুষ্পাঙ্কুরি মুক্তির ধার ;  
যুগে-যুগে তাখা পাই যুগ্মাঙ্কার ।

মহাবি ব্যাস এই যুগ্ম-লীলার  
তথ্য বা দিয়েছেন শোনা এইবার ।

৩

নর-ঋষি মাহুসের শ্রেষ্ঠবিশাশ ।  
পৃথিবীতে রীতিমতো আনে সজ্ঞাস ।

কৃত দীপ্তি দিয়ে গড়া প্রাণ-মন ।  
কোনো কাজে বাধা পোলে তোলে গর্জন ।  
সর্ব আগে তার অজস্রধায়ে  
শক্তির প্রাচুর্য উঁকি-খঁকি মারে ।  
শক্তিমানের যেটা থাকে বেশি-কম,  
প্রভু-শাহা তার নেই একদম ।  
একটি একশো হোয়ে লেগে যায় কাজে ।  
সহাস্রে পা বাড়ায় বিপদের মাঝে ।  
সফলতা-বিকলতা বোঝে না সে অত ।  
কাজের জন্তে কাজ—এই তার ব্রত ।  
যতই দুর্বলতা, মহত্ব থাক,  
কোনোদিন ঢাকে না বা পেটায় না ঢাক ।  
হুনিয়ার কাছ থেকে চায় না আরাম ।  
জীবনটা তার কাছে সদাসংগ্রাম ।  
বহুজনহিতার্থে কেটে যায় দিন ।  
অসত্য যেই জাখে তোলে আশ্রিত ।  
জীবের চোখের জল মুছে দিতে চায় ;  
বাধা পোলে বিধাতারও বিরুদ্ধে যায় ।  
কিবা সে উৎকট তপস্বী কোরে  
বিধির বিধানকেও খুশিমতো গড়ে ।  
ভক্তি বা মুক্তি সে চায়নাকো পেতে ।  
নিজেকে সে নিঃশেষে চায় দিয়ে যেতে ।  
যেখানে আর্তনাদ তুমি তাকে পাবে ।  
পরাধীন নরকেও যেতে হোলে বাবে ।  
নিজেকে সে কোনোদিন রাখে না তফাতে ;  
একাকার হোতে চায় জীবনের সাথে ।  
প্রেমের উদ্যানদা অন্তরে বার,  
চাহিদার ঢের বেশি আমদানি তার ।  
কোনো কিছু করে না সে আশুপিছু ভেবে ।  
যেখানে বা প্রয়োজন তার বেশি দেবে ।  
নিঃস্ব জীবন নিয়ে তার কাছে গেলে,  
দেখবে যা চেয়েছিলে তার বেশি পেলে ।  
ভাবে এক কথা এই—সে তার জীবনে  
কোনো কিছু করেনাকো বিনা গর্জনে ।  
সব কাজে প্রচণ্ড গর্জন তার ।  
ব্রহ্মকৃত্য তেজে তোলে হুকায় ।  
সামান্ত বাধাতেই ফোলায় কেশর,  
মনে হয় ঠিক যেন প্রলয়ের ঝড় ।  
শক্তির তাণ্ডবমূর্তিটা দেখে  
মাছুবের সবচেয়ে ভালো লাগে একে ।  
হৃদয় ও বুদ্ধির বিকাশ এমন,  
নর-ঋষি মাছুবের বোধাতীত নন ।  
এমন প্রকাশ তার ঐশ্বর্যের,  
ভক্তি ও বিশ্বাস জাগে সকলের ।

## ৪

তবুও নরের এই নর-সীলার  
কোথার অপূর্ণতা শোনা এইবার ।

মহর্ষি বেদব্যাস বোলেছেন ঠিক,  
নর তোলা শক্তির রক্ত প্রতীক ।  
শক্তির প্রাচুর্যে গোলযোগ এই—  
স্থান-কাল ও পাত্রের ভেদভেদ নেই ।  
যেখানে যা প্রয়োজন তাই দেওয়া ঠিক ।  
চাহিদার বেশি দিলে হিতে বিপরীত ।  
এক ফোটা গুণের প্রয়োজন যার,  
বিশ ফোটা দেওয়া মানে জানু মারা তার ।  
সংযত শক্তিতে যত কল্যাণ,  
শক্তি অব্যয় হোল তত লোকসান ।  
যে-আশ্রনে র'খে, তার দাচিকাশক্তিই  
একটু বিপথে গেলে দারুণ ক্ষতিই ।  
অতএব সকলের হিতার্থে তাই  
আশ্রনের একজন নিয়ন্তা চাই ।  
নরের সঙ্গে চাই নারায়ণটিকে ।  
নইলে কে রাখবে গু-মহাশক্তিকে ?  
তিনি ঐ শক্তিকে ইচ্ছের জোরে  
ঠিক পথে চালানেন সংযত কোরে ।

## ৫

নিরন্তর তিনি, তাঁর কাছে এই  
নর-ঋষি একদিন মিলিত হবেই ।  
শুদ্ধস্ব তিনি, তাঁর কাছে এসে  
নিজেব সন্তাটাকে জানতে পাবে সে ।  
আত্মার চোখ ফোটে, নিজেকে সে চেনে ।  
নিজেব ঈষ্ট বোলে কায় তাঁকে মেনে ।  
ত্রিভুবনে নর শুধু তাঁরই অমুগত ।  
আনন্দে কাজ করে তাঁর কথামতো ।  
আপাতদৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোধ হয়  
নারায়ণ নিষ্ক্রিয়, আসলে তা নয় ।  
ইক-ডাক নেই তাঁর, তাঁর ইচ্ছাতে  
কর্মের তরঙ্গ ওঠে পৃথিবীতে ।  
কোথেকে একপাল কমীরা এসে  
একরাশ কাজ কোরে সোরে পড়ে পোবে ।  
তাঁকে বোঝা সোজা নয়, মনে হয় সোজা ।  
যখন বুকেছি ভাবি হয়নাকো বোঝা ।  
যতই বুঝতে বাবে তত বোঝা ভার ;  
ঠিক যেন দিগন্ত—নাগালের পার ।  
আজ যদি ভাবো তাঁকে অতি সাধারণ,  
আজ বাদে কাল তুমি পাণ্টাবে মন ।  
মর্ত্যে যে সব চেয়ে বেশি বোঝা তাঁকে,  
নর-ঋষি—তাঁরও মনে সশয় থাকে ।  
দারুণ গুণ্ডাব, নেই কোনো ডেউ,  
তাই তাঁকে বোলা আনা বোঝনাকো কেউ ।  
নরের মতন গুণ রাজ্যগুণ নেই,  
তাই তাঁকে ধরবার নেই কোনো খেই ।

জীবের দুঃখ দেখে কীদে তাঁরও মন,  
তবু তাঁর কাগ্নাতে নেই গর্জন।  
তাকে বোঝা সোজা নয় সেই কারণেই।  
বহিঃপ্রকাশ তাঁর নেইকো কোনোটাই।

তুমি যে আশ্রমে আছো—চান্দিট প্রমাণ।  
কীদলে বৃক্কে পায়—তুমি জয়মাণ।  
বহিঃপ্রকাশ দেবে বোঝাবুঝি তাই ;  
সেটা যার নেই তাকে কি বুঝবে ছাই ?

কোনো কাজে তাড়া নেই, প্রায় নিশ্চল।  
সব কিছু জানা—তাই নেই কোলাহল।  
কোনদিন কতোটুকু দিতে হবে কীকে,  
আগাম যে জানে—তার উদ্বেগ থাকে।  
কে কতটা 'নিত' পারে, করে কখনোদিন,  
তিনি যে জানেন—তাই উজ্জাসজন।  
তিনি যে জানেন কার কিসে কল্যাণ,  
যার পেটে বেটা নয় তাকে তাই জান।  
কার দ্বারা হবে কাজ—তা তিনি বোঝেন।  
তাদেরই করেন কৃপা, তাদেরই বোঝেন।  
বাকি যাণ আসে তারা পায়নাকো মন।  
ভাবে এ'র স্বয়ং প্রসারতা কম।  
প্রতিভাত হন তিনি শুদ্ধমনেই।  
তাই তাকে বোঝে শুধু হুঁচকারজনেই।  
বাসনার ছায়া-ঘেরা মানুষের মন  
বৃক্কে যে যাবে—তার সময় কখন ?

৬

মাঝরাতে আলো হাতে শেত-সার্জন,  
কে তাকে দেখতে পায় ? চায় বা ক'জন ?  
তাঁর আলোতে পথ দেখে বাড়ি চোলে যায়।  
সাহেবের লাঙ্গলখুঁচ থাকে অদেখাই।  
তা না কোরে যদি বোলি—'দেখাও তোমাকে',  
ভেবেছো সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে ?

দেখি তিনি কৃপা কোরে তাঁরই লঠন  
নিজের মুখেতে যেই ধরেন, তখন।  
চিহ্নিত আত্মাই তাঁর কৃপালোকে  
মায়ায় আঁধার ঢেলে দেখে স্তায় ওঁকে।

একবার যে দেখেছে লাঙ্গলখুঁচ তাঁর,  
হুঁসিনের হুঁসিয়াটা চায় না সে আর।  
সার্জন-নারায়ণ এই পৃথিবীতে  
বেজায় বরা জান নর আঁখিকে।  
না। সঙ্গে উপায় আছে ? ডাড়িবে সে তাঁকে ?  
অনন্ত ব্যাকুলতা, তাই পেয়ে থাকে।  
কৃপা কোরে তার কাছে ধরা দিয়ে তার  
মোহ-বুদ্ধি ছেড়ে জান্না মহাসত্তার।

আত্মার আবরণ সোমে যায় বেই,  
নিজেকে ভানতে পারে এক নিমোবেই।  
তখন জীবন তার পূর্ণতা পায়।  
নিজেকে সে নিবেদন করে তাঁর পায়।  
আকাশ ও সমুদ্র এই ভাবে শেষ  
একাকার হোয়ে যায় দিগন্তে এসে।

তার আগে নর-ঋষি শুধু ঋকংকার ;  
শম্ নেই, সুর নেই, স্থিতি নেই তার।  
প্রচণ্ড শক্তির এমনই প্রতাপ,  
একটু বিশপে গেলে জানে সঙ্গাপ।  
নারায়ণ যেই তাকে টেনে জান্না কাছে,  
জগৎ ও সে নিজেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।  
তখন ও-শক্তিটা সুরে বাঁধা শড়ে।  
নারায়ণ যেটা চান্না—নর তাই করে।

৭

কেন করে জানেনাকো, বোঝে না সে অতো ;  
তাঁর কাজে ছুটে যায় উদ্ধার মতো।  
শোয়া-বসা-ওঠা সব তাঁরই ইচ্ছাতে।  
নিজের চিন্তাটুকু বাধে না মনেতে।  
নর যেন ইঞ্জিন—তেজের আগর ;  
কোন পথে যেতে হবে—জানে ডাইভার।  
ধীর হাতে স্টিয়ারিং; তাঁরই ইচ্ছায়  
যুগে যুগে নর-ঋষি পৃথিবী কাঁপায়।  
'কুকুরের বাঁকা লাজ' ও সোজা হয় ফের,  
বিজয় ঘোষিত হয় চির-সন্তোর।  
পৃথিবীতে বয় ফের ধর্মের স্রোত।  
অর্থদ কাছা ধুলে ছায় চন্দ্রট।

এই যুগ্মাচারই দৌলতে ভাই  
যুগে-যুগে মজা মেলে 'বাড়ি-ভাত' খাই।

সারা হোলো সনাতন এই ভারতের  
'নর-নারায়ণ-বাদ'—মহর্ষি ব্যাসের।

সব শেষে এইটুকু অমরোপ ভাই—  
সনাতন মতবাদ ভুলো না দোহাই।  
এতদ্ব মল্লায় মিশে গেলে তবে  
ঠাকুর ও স্বামিজীকে বোঝা সোজা হবে।

[ ক্রমশঃ ]

৬ স্বামিজী বলতেন,—“This world is a dog's curly tail, and people have been striving to straighten it out, but when they let it go, it has curled up again.” Karmayoga ( p. 81 ]

যদি  
এ রকম  
পোশাক চান



( যা এধরনের হবে না )

তাহলে এই মার্কী  
দেখে নিতে  
ভুলবেন না



ছতী কাপড় কিংবা পোশাক কেনার সময়  
সানফোরাইজড ('Sanforized') মার্কী দেখে  
নেবেন। ঝুঁচকে খাটো হওয়ার বামেলা থেকে  
রেহাই পাবার এ হচ্ছে মোক্ষম উপায়।



সানফোরাইজড সান্ডিস, 'পারিজাত', নেতাজী হস্তাষ রোড,  
পেলিস ড্রাইট, গোয়াই



## \* ছোটদের আমর \*

যাক নিয়ে আমাদের গল্প শুরু, তার জন্ম হয়েছিলো এক আশুবা জায়গায়। পুরীতে গেছ কখনো? যদি গিয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয় স্বর্ণধারের ঘাট দেখেছ? বাস্তা থেকে ঠাট-বাধানো সিঁড়ি নেমে গেছে বালির ওপর। অনেকখানি বালি পেরিয়ে তবে ক' সমুদ্রের ধার? যেখানে উড়িয়া মেয়েরা সমুদ্রের জল মাথায় ঠেকিয়ে বালির ওপর চৌকো-চৌকো ঘর আঁকছে? আঁকছে পুরীর স্নানির, আর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা?

সেই বালির ঘাট পেরিয়ে বাও আরো পশ্চিমে। বালির ওপর দিগেই চলে। পা ব'সে ব'সে যাবে, আঙুল আঙুলে চলতে হবে। ঠিক-ঠিক। কিন্তু হাঁটতে বেশ মজা। পায়ে কাঁটা কিংবা কাঁকর কাটবার ভয় নেই। কিছুক ফুটলে লাগে না। যেখানটা সমুদ্রের চূড় এসে বাবে বাবে বালি ভিজিয়ে দিচ্ছে, সেই ভিজে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে আরো আরাম। পা ভেমন বসবে না। যেন সিমেন্ট-খানো বাস্তা। দেখো, হঠাৎ কোনো বড়ো ঢেউ এসে তোমার গায়ে ধম না আছড়ে পড়ে, তোমার কাপড় যেন না ভিজিয়ে দিয়ে যায়! জ্বলকে বিবাস নেই। ভারী খামখেয়ালী। কতখানি এসে? অনেকখানি? এখান থেকে কি সমুদ্রের ধারে সারি সারি হোটেলগুলো মজরে পড়েছে!—পুরী ভিউ হোটেল, ড্যানভিউ হোটেল, রয়াল হোটেল, পুী হোটেল, সীভিউ হোটেল, ভিক্টোরিয়া—? গ্র্যান্ড ত' আগেই আড়ালে পড়েছে। তাহলে হোটেল সব

মিলিয়েছে? শুধু কাশিমবাজারের রাজার বাড়ীটা পূর্ব সীমানায় দেখা যাচ্ছে।

এবার ডান ধারে একতলা একটা বাড়ী পেয়েছ? কি নাম পড়ে তা?—বেনামী। এটা কি বেনামী ক'রে কেনা? কিংবা এরা আর নাম খুঁজে পায় নি? শাস্তিকুঞ্জ, শাস্তিকুটির, আশ্রম, বিজ্ঞান, অবসর, শ্রীনিবেশন সব শেষ হ'য়ে গেছে। এখন এলো বেনামী। ওখানে র'য়ে গেল হরিদাসের মঠ, তেঁটোর গোপীনাথ, চটক পাহাড়।

তোমাকে কিন্তু আর একটু এগোতে হবে। বালির পাহাড় উঠে গেছে একতলা বাড়ীগুলোর সামনেটা ঢেকে। দোতলা বাড়ীর একতলার বাগানের পাঁচিল চাপা দিয়ে। যে বাড়ীর নাম 'সাগরদুর্গ', সে বাড়ীর ছাদ থেকেও সমুদ্রের নীল জল দেখবার উপায় নেই, সামনে দেড়তলা সমান বালির ভূপ। সে বালি সরিয়ে সমুদ্র দেখার চেষ্টা করা মানে অনেক অনেক টাকা খরচ। তার মানে কি একদিন এসব বাড়ী মাটির নীচে চলে যাবে? তার ওপর তবে জল? পাঁচশো বছর পরে নতুন যুগের লোকেরা এসে কাশীর সাধনথের মতন এই সব বাড়ী আবিষ্কার ক'রে বসবে আজকের সভ্যতা কেমন ছিল?

আজই ত এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যাবার বাস্তা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আজই ত বোঝা যাচ্ছে না এর নীচে মাটি আছে, যেখানে ভিত গেঁথে বাড়ী ওঠে, যেখানে ফুলের বাগান হয়, ফুল ফুটতে পারে। যেখানে সবুজ মাঠ আছে, ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি ক'রে খেলবার জগে। তা নয়, খালি মরুভূমির মতন ধুঁধু বালি, হলদে বালি, সোনালী বালি, বেগু বা তেতে ওঠে, হিম পড়ে বা ঠাণ্ডা হয়, ঝড়ে বা আকাশে ওড়ে, বৃষ্টিতে বা ভিজ়ে যায়। এই রাশি রাশি বালির মধ্যে এখানে-ওখানে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সাদা, গোলপী বাড়ীগুলি জেগে থাকে, হাওয়া খাওয়াব জগে সোখান বাঙালীরা যা করে গেছে। আজ স্নানশা-স্বজা খুলে নিয়ে গোলও কেউ দেখবার নেই। কত গেরস্থর বাড়ী, জমিদারের বাড়ী, রাজা-মহারাজার বাড়ী।

শেষ বাড়ীতে এখানো তোমরা পৌঁছানি। শেষ বাড়ীর নাম পাতালপুরী। সেই পাতালপুরী, যার পোতলার বাসান্দা থেকে দিগন্তবিনীল সমুদ্র দেখা যায়, রৌকে গেছে গোল পৃথিবীর মতন গোল হয়ে পুরী শহরের পূর্ব-পশ্চিম দুই কূল ছুঁয়ে— সেখানে আমাদের মীরা জন্মায় নি। সে জন্মেছিলো ঐ বাড়ীর সামনে একতলার আউট হাউসের দক্ষিণ দিকের ঘরে। সেদিন কী বড় সারা রাত ধ'রে, সমুদ্রের সে কি গজ্জন, ঢেউয়ের সে কি আইডানি।

তেমনি বৃষ্টি। তেমনি মেঘ-ডাকা।

ডাক্তার ডাকতে গিয়ে লোক ফেরে না। বাড়ির আলো কঁপে কঁপে ওঠে, হারিকেন দশ-দশ করে। বড়-বালের সেই অন্ধকার রাতে মীরা জন্মায়ে মায়ের কোলে।

তার মা কিন্তু বাঁচলো না। সন্ধ্যা মা, ভোগবেলা ডাক্তার এসে পড়বার আগেই মারা গেল।

মীরাকে তার পিসিমা কোলে তুলে নিলো। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাকে হারানো যে কত বড় কষ্ট, মীরা তা জানলোও না।

# রত্নবেদী

ঐপ্রভাতীকরণ বন্ধ

পৃথিবীতে সে চোখ চাটলো যেন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। গরীবের ঘরে বড়লোকের ঘরে হাতীর হাতীর লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাকে পায় আবারে মানুষ হবার জন্যে। মা যেন পাঁচাড়, সমস্ত বিপদ আঁড়াল করে বাধে। মা যেন ভগবান, প্রথম খাবার মুখে তুলে দেবার জন্যে। বাচ্চ, মাকে ভাবানো যে কতখানি ভাবানো, সেদিন অন্ততঃ মীরা তা বুঝতে পারেনি। কি ক'রে বুঝতে পারবে? তার কি জ্ঞান হয়েছে? পিসিমা এলো তার মা হ'য়ে।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম দেখলে সমুদ্র। গাছ নয়, পাঁচাড় নয়, শতর নয়, গ্রাম নয়, রাস্তা নয়, ঘাট নয়—সুধু নীল সমুদ্র। সমস্তরূপে যে সমুদ্র আঁতড় খেয়ে পড়ছে কুলের ওপর। একবার, এক মুহূর্তের জন্যেও বাব বিশ্রাম নেই।

ছ' বছরের মীরা দেখে—এই সমুদ্রের বুক থেকে রাঙা আভা ছড়িয়ে লাল সূর্য্য ওঠে, আকাশ তখন পরিষ্কার, জল তখন ঘন নীল। একটু একটু ক'রে লাল সূর্য্য ওপরে ওঠে। তখনই খানিকটা চেয়ে চেয়ে দেখা যায়, একটু পরে আর দেখা যায় না চোখ মেলে—বোর কড়া হয়, তখন সমুদ্র হয় সবুজ। বিকেলের দিকে যদি মেঘ করে, সমুদ্র হয় কালো।

তিস্তা বাইয়া আর রাম বাইয়াকে ও চেনে, ওরা লুলিয়া, গোপালপুরে ওদের বাড়ী। তিনখানা কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে পেরেক টুকে ওরা বানায় কাটমারান, অন্ধকার থাকতে কাঠের চামচ বেয়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি মারে। বাবার সময়ে অনেক কষ্ট, ডেউয়ের মালা বাপা দেয়, বাবের বাবে ওরা ডেউ কাটাবার চেষ্টা করে। ডেউয়ের শেষ সারিটা পার হ'য়ে গেলে আর ভয় নেই। সকালের মধ্যেই ওরা অনেক মাছ নিয়ে ফিরবে, পমফেট, ভেটিকি, টিংডি, মার্গিন চক্চকে রূপালি মাছ, সোনালী বালি মাখানো। ওদের নৌকো ডেউয়ের ধাক্কায় উঠে যায়, ওরা জলে নেমে আবার সোজা করে, সহজে নয়, অনেক পরিশ্রম ক'রে; মাছ কিজ জলে পড়ে না, ভাল ভর্তি মাছ শক্ত দড়ি দিয়ে নৌকোর কাছে বাঁধা। তারপর ডাক্তার এসে জলের মাছ জলের দামেই বিক্রি হয়। তিস্তা বাইয়া রাম বাইয়ার ধুতি জোটে না, তেঁঁড়া গেলি ছেঁড়াই থাকে। হোটেলগুলোর পেছনে হুলিয়া-বস্তির খড়ের চাল তেমনি ভেঙে পড়ে, বার ওপারে অনেক দূরে জগন্নাথের মন্দির জগমোহন নিয়ে আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে পীড়িয়ে থাকে।

বাবার হাত ধ'রে ধ'রে মীরা এই সব জায়গা ঘোরে। কখনো হাঁটে, কখনো কোলে চড়ে। কখনো সমুদ্রের বালির ওপর থেকে খিড়ক কুড়িয়ে তোলে। কখনো পায় নাভিশূল। কত বকমের বিড়ক, গেন, খাঁজকাটা, সবুজ, লাল, হলদে।

একটার পর একটা হোটেল তেমনি পীড়িয়ে থাকে। রাত্রে হোটেলগুলোর নীলসবুজ আলো রাস্তার ওপর এসে পড়ে। জলের ধারে জেলেরা জাল শুকোতে বের, তার আঁসটে গন্ধ বাতাস ভাবী ক'রে তোলে।

একদিন কী ভীষণ ঝড় হল সারা রাত ধ'রে। তার পরদিন ভোরে তিস্তা বাইয়া রাম বাইয়া কিছুতেই কাঠমারান নিয়ে যেতে পারলো না, তিনটে ডেউয়ের সার পার হয়ে। কুড়ি বার তারা চেষ্টা করলো, কুড়ি বারই পারলো না। পঞ্চাশটা ডেউ তারা পার হয়, আজ আসে একশোটা।

মীরা দেখেছে হুলিয়াদের জেলেরা কত ছোটবেলা থেকে ডেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে শেখে একখানা কাঠের তক্তাকে নৌকা করে। যে জলে ভালো ক'রে পীড়িতে পারে না, সে ও জলে সাঁতার কাটে। বাবের বাবে ভুব দেখে, ভুব-সাঁতার আর দূর সমুদ্রে সাঁতার সিতে হ'লে আগে চাই। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সাঁতারুরা এখানে এসে হেরে যায়। হেরে যায় তেলুগু জং বাতাসুরের কাছে। রোগা লম্বা জং বাতাসুর চলেই যেন সাঁতারের ভঙ্গীতে। সে যেন ডাক্তার হাওয়ার জল কেটে যাচ্ছে এমন তার সামনে বেকে চলা। জলে নামলে ত' সে মাছ! তিস্তা বাইয়া রাম বাইয়া সেই রকম ক'রে সাঁতার শিখেছে, নৌকা বাইতে শিখেছে এদিক ওদিক চামচ বেয়ে। তবু তারা সেদিন সকালে পারলো না। বাবে বাবে নৌকা উঠে গেল, বাবে বাবে ধাক্কা দিয়ে সবিয়ে দিলে সমুদ্র। তাই তারা পারলো না। পারলো না ত' দুপুরে বেহোল। তখনো না কাকর কথা! মাছ না আনলে চলবে কি করে? মাছ না আনলে ধাবে কি?

বিকলে আবার ঝড় উঠলো। তখনো তারা ফেরনি। রাত্রে সেই ঝড় কত যে বাতুলো, কে তার হিসাব করে? সারা রাত মীরা চমকে চমকে উঠতে, যেমনি সমুদ্রের গল্ফন, তেমনি ঝড়ের শৌ-শৌ, তেমনি ঝড়গাছের কাঁপনি, তেমনি মেঘের ডাক।

পরদিন হু'জনের মৃতদেহ বালিতে ফিরে এলো। হুলিয়ারা বললে, তারা পুরী কোন্ দিকে ঠিক করতে পারেনি। পুরীতে ত' আলো ছিল না অত রাত্রে! মাত্রাজে আছে লাইট-হাউস, সমুদ্র আর আকাশ আলো ক'রে লক্ষবাতীর আলো বাবে বাবে ঘুরছে। সে হল জাহাজের জন্তে। পুরীর সাগরতীরের গরীব হুলিয়াদের নৌকোর জন্যে কোনো ব্যবস্থাই নেই। দিনের বেলা দেখতে পাছ মাঝে মাঝে বাঁশ পোতা আছে, তার মাধ্যম আছে কাগজের নিশান। কিন্তু রাত্রে?

সেদিন থেকে মীরা ব্যবস্থা করলো তাদের বাড়ীর সমুদ্রের দিকের জানালার একটা হাফিকেন রেখে দেবে সারা রাত। বইয়ে পড়েছে কোন্ অরবী দীপপুঞ্জের একটি মেয়ে কবে নাকি এমন করেছে। সে-ও করবে, যাতে তিস্তা বাইয়া রাম বাইয়ার মতন আর কোনো হুলিয়া মারা না যায়।

কিন্তু ওদের ছেলেগুলো কি কম পাঞ্জী নাকি? মীরার তখন আট বছর বয়স। ও গেছে একলা মাছ কিনতে। চার আনার মাছ কিনে আসছে, ওর বয়সী কতকগুলো ছেলে আদ ওর চেয়ে কি বড়ো ক'টা ঘিরে ঘুরছে ওকে, যেতে দেবে না, পরমা কেড়ে নিয়েছে আর কি অসভ্য অসভ্য কথা বলছে! ও বীড়ছে, তবু ছাড়বেই বুনে। জানোয়ারের মতন ঘিরে ধ'রে কি তাদের ভঙ্গী! কাঁ খুলে কি নাচ!—জং জং বগা বং!

ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে পড়লেন, আর ধমক খেওয়া পালালো। তিনি ব'লে দিলেন, খবদার দুপুরবেলা এই এদিকে আসবে না শুকি!

আর বৌগুলো? নাকের দু'দিকে গমনা মাঝখানে নোলায় মতন, অল্পবয়সী কি বুড়ি কি—কি যে আঙাআঙা কথা ব'লিছু বোকা যায় না!

বুড়ির দিনে মীরাদের বাবাশায় উঠছিলো। বসলো, ব'লে

পড়লো। তাই না কথার বলে—বসন্তে পেলো ভতে চার। একটা মেয়ে গুন-গুন করে গান ধরলো। মীরা বললে, বাংলা জানো? সে বললে—কলা তুনা বুঝব।

সিঁদুর পরো না কেন?

সিঁদুর কাম করছি তাই না পরছি।

গান করো না একটা।

গান পরসা লাগব।

কেন, এই ত গান করছিলে।

ও গান নয়, কথা বলছে।

কি মিথোবাদী মা! পান করছে, তবু বলছে কথা।

এই আবগাওয়ার মীরা মাছুর হাতে লাগলো—বেখানে শুধু বালি আর সমুদ্র—এখানে ওখানে বাড়ী। কিছু লোকের আমদানী হয় পরনে আর পুঙ্খের ছুটিতে—কলকাতা শহর থেকে—থুব ঘোরে জ্ঞার সাইকেল-বিক্রয়, ট্যান্ডি, ঘোড়ার গাড়ীতে—মন্দির, বাজার, জুবনেশ্বর, কোণারক—তারপর চলে যায়, থাকে হুলিয়ারা, উড়িয়ারা—বাদের মেয়েরা আশ্চর্য শান্ত, দাঁও বলে না, বলে দিচ্ছ, যাব বলে না বলে দিবে।

পুবীকেই সে মস্ত শহর বলে জানে, যেখানে রাস্তার বালু চুরি যাব বলে ভালো করে আলো জ্বলে না, বাজারের কাছটা একটু সঙ্গরম। রথের সময়ে একটু লোকের আনাগোনা।

সমুদ্র বিরাট বটে, আকাশও এখানে অনেকখানি দেখা যায়, কিন্তু জীবনের কাজ করবার জায়গা যে আরো কতদূর ছড়ানো, ছুনিয়া যে কত বিচিত্র, তা এখান থেকে বোঝাবার উপায় নেই।

চৌধুরীদের যে এবার এসে ওকে নতুন কথা শোনালে—পিসিকে মা বলিসু কেন?

মা বলেই ত চিরকাল জানি।

ভুল জানিসু। তোর মা ম'রে গেছে।

—কেউ ত একথা বলেনি কখনো আমার?

কে বলবে তোকে? আছে কে তোদের? আর বে নতুন বোঁ সছে, তাকে কি বলে ডাকিস?

—নতুন মা বলে।

—দূর, ওকে বুঝি মা বলে? ও ত' সংমা তোর।

মীরা বলে, গল্পে পড়েছি সংমার খুব অত্যাচার করে। এবর মা এবরকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সুয়োবাবীক-সুয়োবাবীদের ছেলেরে ধতে পারে নি। সাতভাই চম্পার গল্প জানি আমি। আমার লুন মা আমাকে কত ষড় করে। কত ভালোবাসে। সে কেন ঠা হয়ে?

আ খেলে বা। আমি কি তোকে মিথো কথা বলতে এসেছি?

এমনি করে সরল মেয়ে মীরাকে সকলে জ্ঞান দিতে শুরু করলো।

ভুলে যায়, সেখানে এই কথা। পাড়ার যে বাড়ীতে বেড়াতে যাব, গিয়ে এই কথা। তাদের বাড়ীতে দেশ থেকে যদি কেউ আসে ও এই কথা বলে। মা নয় সংমা, পিসি তোকে মাছুর কয়েছে, তোর মরে গেছে।

ইতুল তবু সব মেয়ের মা আছে, তবু তারই মা ম'রে গেছে, এ রে মীরার নতুন করে কীলতে ইচ্ছে করলো।

সমুদ্রের ঘাটে গিয়ে সে হুঁশিরে হুঁশিরে কুলে কুলে কীলতে

লাগলো। কেউ সেখানে নেই। সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলো তার মা, এই ত' তার মা। কী হৃদয়ের দেখতে! বললে, পাগলী মেয়ে! আমি মরব কেন? আমি লুকিয়ে আছি। আর একটু বড়ো হলে তোকে দেখা দোব।

জোয়ারের জল বেড়ে বেড়ে হঠাৎ কখন মীরার গায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। ঝপাৎ করে আছাড় দিয়ে পড়লো তার গায়ে প্রকাণ্ড এক ঢেউ। তখনি জল স'রে গেল, কিন্তু জলের ঝাপটার মীরার ঘুম গেল ভেঙে। মুখে ঢুকছে নোণা জল, ঘুমোবার সময়ে ঘুপ ত' খোসাই থাকে অনেকের?

ওদিকে বাড়ীতে সবাই তাকে খুঁজছে।

পাতালপুরী বাড়ীটা কলকাতার এক এটর্নীর। আগে ছিল এক মাড়োয়ারীর। সেই মাড়োয়ারীর মামলা ক'রে অনেক টাকা পাওনা হ'য়ে গেছেলো এটর্নীর। এটর্নী বাড়ীটা এমনি নিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তারা কখনো আসে না। বেশে দিয়েছে মীরার বাবা দে-মশাইকে মাইনে ক'রে—বাড়ীটা দেখাশোনা করবার জন্তে। এরকম কাজকে ইংরেজীতে বলে কেয়ার-টেকারের কাজ—মানে তদারকের কাজ আর কি?

গুণাকার লোকেরা বলে কড়টকাড় বাবু। উড়িয়ার নামে যেমন ড আছে, কথায়ও তেমনি ড। মাড়িকিড়ি পকাড়ি ত তোমরা সবাই শুনেছ। বাংলা দেশের নাম যেমন অমুখার, কথায়ও তেমনি অমুখার ব, বর, ট, স, ট, জ, কত কি। বেহারে সবচেয়েই হ—কাঁহা; হায়, নৈহি, বাহার।

পাতালপুরীর মালিকরা কখনো-সখনো এসে রেলওয়ে শেটেলে গিয়ে ওঠে, ২২ টাকা মাথাপিছু দিন খরচ ক'রে, তবু নিজেদের বাড়ী দেখতে আসে না। যাই হোক, কেয়ার-টেকার বাবুর মাস-মাইনে ঠিক পৌঁছে যায়।

মীরা দেখে বাড়ীর চারিধারে বালির মকড়মি, তারপর সমুদ্র। দেখে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, দেখে সমুদ্রের বুক থেকে নৃ-যোদয়, দেখে সমুদ্রের ওপরে চাঁদের ভেসে-বাওয়া, তারার বিকিমিকি। তার জীবন দিয়ে শুধু সমুদ্র, যে সমুদ্র কখনো স্থির নয়, চিরকাল চকল।

স্থির আছেন শুধু জগৎবন্ধু, রাত তিনটেয় ধীর আরতি, শৃঙ্গার বেশ, দম্ভধামন, বালাভোগ, নানা পূজার আয়োজন। ছাঞ্জার রকম পদের জড়াছড়ি, ভিতরছ, স্থপকার, প্রেহিতারী খুঁটিয়া নানা পদবীর নানা পাণ্ডা। হুতিক, যুদ্ধ, রাজ্যবল, ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে কত পরিবর্তন হ'য়ে গেল, জগন্নাথের রথ ধামালো না, এক ভাবে তার চাকা চললো বছরের পর বছর। এক ভাবে তাঁর সোনার হাত হীরের অলঙ্কার দিয়ে সজ্জা চললো কত যুগ ধ'রে। কত পুরীর রাজা গেল, কত পাণ্ডার বাপ গেল, জগন্নাথের নিত্যপূজার কোনো অঙ্গল-বল হল না। আনন্দবাজারের আনন্দমোয়ার তেমনি ভোগ বিক্রী হয়—বিধবার একাদশীর হাত থেকে রেহাই পায়—মন্দিরে একাদশী চিরদিনের জন্তে-বীণা।

মীরা সমস্ত দেখে। তার বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখেছে, হোটেল একদল ঘর খালি করে চলে যায়, আর একদল আসে। ধারা আসে, যেন সকলেই বড়ো লোক, চাকর-বান্ধনদের বুটো বুটো টাকা বকশিস দিয়ে যায়।



জিটোরিয়া হোটেলের জং বাহারর তাকে কোলে করেছিলো, বলেছিলো, খুকি, তুমি বাবাকে নিয়ে এই হোটেল থেকে।

চারিধারে অনেক ভালো ভালো দেখে ওরও থাকতে ইচ্ছে করছিলো। নীলকণ্ঠ বলে একজন ওর বাবাকে আর তাকে চা টোট আর পোট খেতে দিয়ে গেল। জানে না কত দাম নিলে। ওর কিছু পোটটা খেতে বেশ লাগলো।

কিন্তু হোটেলের চেয়ে ওর নিজের ঘরটা অনেক ভালো এই হিসাবে যে, সেখানে খুব ছুটোছুটি করতে পারা যায়। এখানে এরা ছোট মেয়েদের ছুটতে দেয় কিনা ওর জানা নেই।

ওদের বাড়ী যে রাত ভালো, সেখানে একদিন এক বিপদ ঘটলো। কালীপুজোর পরে পাড়ার সমস্ত বাড়ী খালি হয়ে গেল। ওদের বাড়ীতে ওরা শুধু একলা।

এক রাতে ওদের বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। ডাকাতপড়া কাকে বলে ও জানত না।

ঘরের দরজার প্রথমে জোরে থাকা পড়লো। মীরার বাবা আস্তে বললে—দরনাশ, ডাকাত! ওর মা বললে, খুলে দিয়ে বলো না, যা আছে নিয়ে বাও, প্রাণে মেরো না।

বাবা বললে, সে কথা ওরা শুনবে না। অনেক অত্যাচার করবে। চলো আমরা খিড়কির দরজা খুলে সকলে বেরিয়ে যাই। বাড়ীতুহ্ন সকলে পা টিপেটিপে অন্ধকারে এগিয়ে গেল।

‘বেনামীর’ বাগানে ঢুকে ওর বাবা মালীর ঘরের জানলার কাছে বললে, ধরানন্দ, আমি সেমশাই, দরজা খোলো।

তারপর সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ওরা ঠক্কর করে কাঁপতে লাগলো। মীরা ভাবতে লাগলো, না জানি ডাকাতগুলোর চেহারা কি রকম! কাঁকড়া কাঁকড়া চুল, রাডা চোখ, এতখানি জুলপি আর পাকানো গৌষ, মিশকালো চেহারা—

তখন ও-বাড়ীর দরজায় খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। দরজা ভেঙে পড়ার শব্দও হল। এবার ওরা মশাল ছেলেতে। ঘর খুঁজছে। বাড়ী মেহামত খরচের ভেত্রে আঙঠি কলকাতা থেকে চারশো টাকা মনিঅর্ডার এসেছে। ঠিক ভেঙে সেটা নিয়ে যাবে—বললে মীরার বাবা। আপনোষ করতে লাগলো, ‘আমি কি জবাব দিব বাবুদের?’

ওর মা বললে, আগে প্রাণ, পরে টাকা।

হাতের চুড়িগুলো খুলে ঘরের কোণে রাখো।

কেন?

এখানেও আসতে পারে।

মালীর ঘরে কখনো আসে?

কতকণ ধরে লুঠ করে ওরা মশাল জালিয়ে জানলার পাশ দিয়েই চলে গেল।

একজন বললে, লোকগুলো পালালো কোথায় যে বনমালী? মেরেছেলের হাতের গয়নাগুলো পাওয়া যেত।

বনমালী বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও লুকিয়েছে। কে খুঁজতে যাবে? তোমরা মশাল নিবিয়ে দাও। ঘোষাছেবের বন্ধক আছে, ওলী করতে পারে।

আরে, ঘোষাছেব এখন ঘুমোছে।

কিন্তু ঘোষাছেব ঘুমোন নি। তিনি আগ্রাভূতনে ঘোষাছিলার বারান্দায় বন্ধ হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন।

গড়াম করে এক আওয়াজ হল। কার যেন পড়ে বাওয়ার শব্দ হল। মশাল নিবিয়ে আহত লোককে ওরা তুলতে গেল। তারপর আবার এক আওয়াজ, ঠিক সেই জায়গায়।

সকালবেলায় দেখা গেল, পাভালপুরীর তড়িয়ে-দেওয়া চাকর বনমালী আর দু’জন ডাকাত জখম হয়ে পড়ে আছে।

রক্তে বালি ভেসে যাচ্ছে। পুলিশে ওদের হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সেই রাতে মীরার ঘুম হবার কথা নয়, ডাঙা দরজা মেহামত হয়নি, কোনোরকমে ঠিকিয়ে রাখা হয়েছে।

কিন্তু ও শুনছে ডাকাত আর আসবে না, পুলিশে তাদের দলবলকে ধরে ফেলছে।

অনেক দিন জগন্নাথের ভোগ খাওয়া হয়নি। ওয়া গেল। মহুরো বেসরে! তরকারীর নাম, কি চমৎকার স্বাদ! আসরে মৌরী আর সরষে দিয়ে তৈরি, কিন্তু সে জিনিষ বাড়ীতে হয় না।

ওখান থেকে দুর্গাবাড়ীতে কালীপুজো দেখতে গেল বালুখণ্ড। সেইখানে হুসিয়ারদের বাড়ী, যারা একটু পরমাণ্ডা, তাদের বাড়ীগুলি ভালো, লাল লাল খাম, লাল লাল রক। ওরা গজামাইর পুজো করে, সমুদ্রের ধারে কাঁপড়ের পতাকা তুলে মানত করে—সমুদ্রবান্ধা যেন নিরাপদ হয়।

বাবার কাছে মীরা পুরীর রাজ্যের গল্প শোনে। একজন রাজা বখন মারা যার, তখন তার বড় ছেলে গরীতে বসে। মন্ত্রী এসে বলবে, মহারাজ, একটা মড়া পড়ে আছে। নতুন রাজা হকুম দেবে—দেয়াল ভেঙে ওমিক দিয়ে বার করে নিয়ে যাও।

সঙ্গে যাবে এক ব্রাহ্মণ-শরিবারের ছেলে, সেই হুখারি করবে। সেই ব্রাহ্মণ করবে। রাজার ছেলে নতুন রাজা, বাপের শেষ কাজ করবে না। অথচ এরা বলে সূর্য্যাক্ষ থেকে এসেছে! সূর্য্যাক্ষ বংশের রামচন্দ্র ত’ দশরথের মৃত্যু; সংবাদ পেয়ে অশ্বিচ পালন করেছিলেন। অযোধ্যার ব্যবস্থা উড়িয়ায় এসে উঠে গেল নাকি?

পুরীর মোবের শিংএর খেলনা, বেঙেলা কাল না হয়ে একটু সাদা হয়ে যার, সেগুলোকে দোকানদার বলে, গণ্ডারের খণ্ড, বাইসনের শিং থেকে তৈরি, বেশী দাম। মীরা বলে, বাবা, গণ্ডার আর বাইসন কি বোজ মবছে? গণ্ডার আর বাইসন ক’টাই বা আছে পৃথিবীতে।

ওর বাবা বলে, যাক কথা। পুরীর হরিণের চামড়া, খরগোলের চামড়া, চিত্রাবাঘের চামড়ার জুতো; মণিবাগ, আসন, পুরীর কিছুকোর খেলনা, জাঁতি, কত কি পুরীর স্মৃতি, কত লোক কিনে নিয়ে যায়, কিন্তু মীরাদের ভাগ্যে একটাও জোটে না। ও ভাবে, বখন বড়ো হবে, পরমা হবে, তখন লক্ষ্মীবাগের ঢুকে সব জিনিষ কিনে ফেলবে।

কিন্তু বড় হ’তে আর পরমা হ’তে এত দেরীই হয়। যাও-বা দু’-একটা বাঁশি-চাঁপ পোত রথের সময়ে, তার সংযার পর পর ছুটি ছেলে হওয়াতে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

দু’টো ভাইকে কোলে-কীচে করে পুতুলখেলা তার বন্ধ হয়ে গেল। আর একলা একলা পুতুলখেলা কতই বা চলে!

এ বছরের কালীপুজোর সময়ে তার মাসী এলো একরাশ ছেলের পুতে নিয়ে। দানব থেকে ভোগ নিয়ে এসে খেলো, খালা আনন্দে, জানার গজা আনন্দে, তাকে কি একটা দিয়ে বললে—নে খা। বাবা

কত টাকার কিনলে, চরকা বাজী, ফুলঝুরি, বোম পটিকা; হাউই, রমশাল। একটাও কি তার হাতে দিয়ে বললে, নে ভালো ?

ও যে সাঁতছিয়ে কিছু পায় না, একখাটা কেন যে কেউ বোঝে না ! ওর যে মা নেই, নিষের মা থাকে বলে—এ কথা কেন কেউ মনে করেন না ?

ও কি একটা ফ্যারকের ড়রে শাড়ী পরে চিরকাল কাটাতে ? ন' বছরে পড়লো, ওর যে একটা সায়া সেমিজ নেই, সেদিকে কি কান্নার দেখতে নেই ?

বাবাও ইলানী দেখে না। পিসিও ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে, সেও খেয়াল রাখে না। রান্নাঘরে নতুন মাকে সাহায্য করে আর ভাই ছুটোকে সামলে তার দিন কাটে। তার যে মনে একটুও আনন্দ নেই, এ কথা কেউ বোঝে না ?

তার চলে যেতে ইচ্ছে করে, অনেক দূরে সমুদ্রের ওপারে যদি কোনো দেশ থাকে—সেই দেশে।

এ বাড়ী আর তার ভালো লাগে না। শুধু সমুদ্রের জন্তে মায়া লাগে। সমুদ্র ছেড়ে যেতে মন কেমন করে। কিন্তু 'সমুদ্র ত সব দেশেই আছে, সে ত' পড়েছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। মনের বন্ধন তার এই অশ্রদ্ধা, তখন ওর বাবা বললে, চল খোবাটাকে জম্ভা দিয়ে আসি, আর বাজারটাও অমনি করে আনি। তুই একটা বলি নে, আমাকে একটা দে।

ককির খোবার বাড়ী গিছবকুলের পিছনে। ভক্ত হরিলাসের মাখনার জায়গা, বাঁধানো বেকীর গার দিয়ে বকুল গাছ উঠেছে, ওঁড়ি নেই, শুধু ছাল পড়ে আছে, অশ্রদ্ধ বকুল গাছ পাতার পাতার কুল কুল ভর্তি। মহাপ্রাকৃ জগবজুর পাতনকাঠি পুতেছিলেন ষাটিতে, তাই থেকে গাছ। বাজার লোক এসে বলে, কাটব। ভাই পরদিন সকালেই গাছের ওঁড়ি গেল শুকিয়ে, তমু গাছ রইলো বেঁচে চালায়া বছর।

সেই মাহাত্ম্য দেখবার জন্তে অনেক লোকের ভিড় হয়েছে। জ্ঞার মধ্যে খুব লম্বা চেহারার ফদা ধরনের রোগা রোগা এক ঝলানী-সাহেব—পরনে হাকপ্যাট, গায়ে বৃশ সাট, বরস হয়েছে—

নেই লোকটি তার দ্রাকৈ বলছে—দেখো কি আশ্চর্য্য।

মেয়েটিও খুব লম্বা, আর খুব ফদা। ফিরে বললে—কি আশ্চর্য্য ? ঐ মেয়েটি। কি চমৎকার প্রতিমার মতন যুথ। গরীব ঘরের জন্মে, কিন্তু রূপ দেখো একবার।

সত্যি। ব'লে মেয়েটি মীরাকে কাছে টেনে নিয়ে অবাক হয়ে ক্রমশে লাগলো।

মীরাকে হুতনে কাড়াকাড়ি করে কোলে নিয়ে যে কাণ্ড করতে লাগলো, তাতে শুধু মীরা নয়, মীরার বাবা পর্যন্ত অবাক।

হাকপ্যাট পরা জম্ভালোক পরিচর মিলনে কলকাতার মজ বড় জগজীৱর, মাসে চল্লিশ হাজার টাকা আর। এন, ষায়চৌধুরী।

মীরার বাবাও নামটী শুনেছে মনে হল।

ব্যাপিষ্টায়ের ছেলে হয়নি। ছেলের বড় দরকার। দিন বেন চাটে না। বিবর থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে ছেলের চেয়ে একটি মরে গেলেই ভালো। এমনি সুখী একটা মেয়ে—গাটী বার খসেনের মতন নয়, পূবীর সমুদ্রতীরে কোনো মল্লধ কালো চকুতে হয়ে বার, সেখানে যে মেয়ের এমন উজ্জল রং, না জানি

সে কলকাতার কলের জলে কত হৃদয় হবে, এমনি একটি শান্ত মেয়েকে যদি পাওয়া যায়, চিরজীবনের ভার নেওয়া যায়, তাকে মাল্লধ করা, তার বিয়ে দেওয়া।

প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার মতন। তবু হঠাৎ কোনো জবাব দেওয়া যায় না। গরীবের ঘরে যে মেয়ে দু'বেলা ভালো করে খেতে পায় না, বার লেখাপড়া হচ্ছে না, বিয়ের কথা ত' ভাবাই যায় না, সে যদি এমন ঘরে পড়ে, যেখানে কোনো অভাব নেই, তবে মেয়ের মায়া তাগ করাই ত ভালো।

কিন্তু বাপের প্রশ্ন ত' ? হঠাৎ কি বলতে পারে, নিয়ে যাও আমার মেয়েকে চোখের আড়ালে চিরকালের মতন ?

বললে, বাড়ীতে পরামর্শ করি। পরামর্শ আর কি ? সংমা আগেই বললে, ওর ভালোটাতে ত' আমরা ভাবব। এখানকার কষ্টের চেয়ে স্মৃতি থাকবে।

পিসি বললে, মেয়ে মানেই ত' বিয়ে দিয়ে একদিন পর করে দেওয়া। থাক না বড়লোকের বাড়ী। আমরা ত' যখন খুশি দেখে আসতে পারব।

রেলওয়ে হোটেল, যেখান থেকে সমুদ্র অনেক দূর, বারান্দার বললে দূরে দেখা যায় নীল আকাশে মিলেছে, চক্রতীরের মন্দির উঁচু বালির পাঠাড়ে চুড়া তুলে ঈড়িয়ে, চুরি হাওয়া সোনার গৌলালের মন্দিরে সোনার বৃক্ষমূর্তি, তার পাশে বন্দী বজ্রবাহাত্তর, মহাবীর হুম্মান অব্যোঘার পালিয়ে যাওয়ার শাস্তি পাচ্ছেন—সেইখানে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে মীরার বাবার কথা পাকা হল।

কার্তিক মাস থেকে সমুদ্রের নীলাভ কোকিল মাছ এরা নৌকো নৌকো বোঝাই করে, শ্রুটিকি মাছ তৈরী করার জন্তে বাতাসের আঁসটে গন্ধ। পড়ে রইলো পিছনে। নানা রঙের সিল্ক শাখ আর কড়ি বিছানো বালুশট, তোটার গোপীনাথের বেগু হাতে পশ্চাতন মূর্তি, আশ্রবন, বটগাছের মবি, চটক পাঠাডের বালি, কানপাতিয়া হুম্মান, কোলার মতন পাঁচিল পূবীর মন্দিরের, জগবজুর দীত মাজা, ভিতরোলা আর মান, পথিঘার অজনের মাসীর বাড়ীর সামনে রথ বাসুদার প্রকাণ্ড চতুর্ভাষা, চন্দন সরোবর, আঠারো নানা, ভটিংগাবার মঠ, যেখানে বরিশালের ভক্তরা সবরকম গাছের প্রকাণ্ড বাগান করেছে, ধানকুড়ি থেকে তেলাকুচো শাক যেখানে পাওয়া যায়, মোবের সিংএর খেলনার সোকান, গোঁসাপের আর হরিণের চামড়ার জুতোব সোকান, বাজা আর বালুশাই আর 'পূবীর মূর্তি' লেখা বেকাবি। সব পড়ে রইলো, এদের জন্তে এত মন কেমন তার করবে—বাড়ীর লোকদের চেয়েও বেশী, একথা সে ত' আগে কখনো ভাবতে পারেনি। বাবা, মা, পিসিমা আর ভাই-বোনদের সে দেখতে পারে কলকাতার গেলে। কিন্তু মন্দিরের সামনের অজ্ঞকার চৌরাস্তা, সারা দিন সারা রাত ঘরে সমুদ্রের গর্জন এ ত' কোনো দিন কলকাতার ঘাবে না ?

যেখানে যাচ্ছে সেখানে কেক আর দুগার ডিম, মাসের কোর্দা আর সিক্তের ব্রক ওরা বলছে অনেক পাওয়া বাবে, কিন্তু পাতালপূবীর চারি ধারের সোনালী বালি ত' সেখানে নেই।

নাই থাকুক। তমু তাকে যেতে হল। একপ্রেস ট্রেন খসু খসু শব্দ করে সাকীপোপাল, কুন্দনধর, কটক পাথ হয়ে ক্রমশ: তাকে

ানে নিয়ে গেল পুরী থেকে অনেক অনেক ঘরে। তার জন্মদিন তার হেলেবেলায় খেলায় জগৎ থেকে নতুন অভ্যাস। দেশে।

সকাল বেলায় যেখানে গাড়ী একেবারে থেমে গেল, সেটা যেন কোনো লোকের মস্ত বড়ো বাড়ী। ট্রেনে কোনো নাম লেখা নেই; কিন্তু সকলেই সেখানে নামলো। ট্রেনটাই খালি হয়ে গেল সেখানে। সেটা কিন্তু কলকাতা নয়। তার নাম শুনলো হাওড়া। কলকাতা তবে কোথায়?

ভয় করে দেখলে হাওড়া ভীষণ!

গোপা বায় না, রিক্সা, মোটর, বাসের সংখ্যা। নতুন গাড়ী দেখলো ট্রাম। নতুন নলী দেখলো, গঙ্গা। নতুন জিনিস দেখলো, জাহাজ। নতুন শহর দেখলো, কলকাতা। ওপরে বাড়ীর জানালা সব ক'ত উঁচুতে চলে গেছে, একটা ত চোক্ষতলা!

তার পর কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে এসে পড়লো যেনি পার্কে। চোখের ওপর দিয়ে বায়বোশের ছবির মতন প্রকাণ্ড শহর তার লোকজন বাড়ী ঘর গাড়ী পাখি নিয়ে সরে গেল, এলো বাগানের মাঝখানে শোভা বাড়ী, যেন তোটার গোপীনাথের ছোট বনটি হঠাৎ ফিরে এলো।

ও শুনলো, এটা কলকাতা নয়, বালিগঞ্জ।

এর পরে এলো অনেক সকাল, আর অনেক রাত। যারা ওকে নিয়ে এলো, তারা অনেক কাপড়চোপড় দিলো ওকে, অনেক খাবারের ব্যবস্থা করলো, অনেক খেলনা পুতুল কিনে দিলো, শোবার বিছানা দিলো চমৎকার! বলতে গেলে একটা আলাদা ঘরই দিলো।

সমস্ত বাড়ীর মধ্যে ও যেন একটা নতুন সজ্জা, যেমন খাঁচার মধ্যে জল, জলের ধারে ইলেকট্রিক আলো, ভেতরে নানা বকনের লাল, নীল, সবুজ মাছ, যেমন গাঁড়ে আর খাঁচার লালমোহন, সিঁড়াপুয়ের কাকাভূয়া, কেনারি আর কোকিল, যেমন ফটকে কলকটেরিয়ার আর বিছানার জাপানী কুকুর, যেমন দরজার রঙীন পর্দা আর ঘরে মেহগনির আসবাবপত্র—তেমনি এক শোভা হল মীরা।

কেউ তার খোঁজ নেয় না, কেউ তাকে আদর করে না।

ড্যাডি আর মাম্মি তাকে চারের টেবিলে বলে গুড় মনিং মীরা, মেমসাহেবের কাছে ঠিক পড়াশোনা করছ? আরা তোমাকে ঠিক ঠিক স্নান করিয়ে দিচ্ছে, বেড়াতে নিয়ে বাচ্ছে ত?

ও বলে হ্যাঁ। কখনো বলে, ইয়েস্ মাম্মি, ইয়েস্ ড্যাডি, কোমাইট ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ।

বারিষ্টার সাহেবের অনেক মজ্জল, অনেক কাজ, সময় নেই।

মিসেসের অনেক পার্টি, অনেক এনুজন্মেন্ট, সময় নেই।

তার বাবার পাঁকা চুল তুলতে তুলতে দুপুর বেলা বাক্স-খোঁকসের গল্প শোনা—তার পিসির শেয়ারের গল্প আর নেউলের গল্প বলতে কলকটে—ঘুমপাড়ানো মাসিণিসিকে ডাকা পিঠি চাপড়ে চাপড়ে—মনে করে গলাধ কাছে কাঁরা টেনে ওঠে।

সেখানে দু'খানা শুকনো কুটি, ডে'স ভাজা আর একটু হুসুর ডাল দিয়ে যেমন অমৃত বোধ হ'ত, এখানকার ভিমের পোচ আর ওভালটিন আর জ্যাম-জেলিতে সে খাদ নেই।

সেই ভালোবাসা কোথায়? সেই ভালোবাসা কি পুরীর বাইরে পৃথিবীর কোথাও নেই?

ওয কল্যা তনে লোকজন ছুটে আসে।

এখানে বারান্দার ধারে বসলে রেজিডে পা তুলে দিয়ে সে পাম-গাছগুলো সীজন জাওয়ারিস্তলোর দিকে দেখে না, তার দৃষ্টি চলে যায় সমুদ্রের দিক—যেখানে ডেউয়ের ওপরে সী-গালরা দল বেঁধে সীতার কাটে, মাছ নিয়ে উড়ে যায়; যেখানে হুলিরা-হলে তীরের কাছে তরঙ্গের ওপর হিঁপ ফেলে চক্কল জল থেকে অনায়াসে মাছ টেনে তোলে মিনিটে-মিনিটে; আর হতুবেদীর পিছনে একজন মাছবের ষাওয়ার মতন সৰু পথে পাণ্ডার মস্ত উচ্চারণ—অপবিত্র পবিত্রো বা; যিদের প্রীপঙলা অঙ্ককার মন্দিরে ক্ষণ আলো ছড়িয়ে জগন্নাথ, বলরাম, শ্রভঙ্গার মাথার মণিগুলোকে বকমকে ক'রে তোলে।

মিসেস চৌধুরী সোমন মীরার গাল টিপে বলেন—আপনার মেয়ে? না, আমার পালিতা মেয়ে।

কথাটা শুনে খারাপ লাগলো মীরার। তার সংমাও বলে আমার মেয়ে। 'আমার সত্যিনের মেয়ে' বলে না।

সমস্ত আদর যেন বিব ত'রে গেল মীরার কাছে!

[ ক্রমশ: ]

## নাগানন্দ

(শ্রীহরী রচিত 'নাগানন্দ' নাটকের গল্প)

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কালে দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী এক প্রকার জীব ছিলেন। ইহাদের বলা হইত 'দেবযানি'। বন, হনু, গন্ধর্ব, কিরর, সিদ্ধ প্রভৃতি দশ শ্রেণীর দেবযানির মধ্যে বিজ্ঞানব্রহ্মী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বিজ্ঞানব্রহ্ম জীমূতকেতু বৃদ্ধ হইরাছেন। পুত্র জীমূতবাহনের হাতে রাজ্যত্বার দিয়া তিনি তপস্তা করিতে বনে গেলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিবার সুযোগ না পাইয়া রাজ্যস্বত্বও জীমূতবাহনের ভাল লাগে না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই প্রজাদের মঙ্গলবিধানের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বহু আত্মেরকে সঙ্গে লইয়া পিতামাতার নিকট বনে চলিয়া গেলেন। আত্মের অবশ্য বাধা দিয়া বলিয়াছিল যে এখন তাঁহার বনে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, শুক্লম্বরের সেবা ছাড়াও তো কর্তব্য রহিয়াছে। তাছাড়া জীমূতবাহনের অল্পপছন্দিত সুযোগ লইয়া শত্রু মন্তজ নিশ্চর রাজ্য আক্রমণ করিবে। জীমূতবাহন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজ্যভোগ অপেক্ষা পিতার সেবা কথ্য শতকর শ্রেষ্ঠ। আর, মন্তজ আমার রাজ্য নিয়ে যদি স্বেচছা হয় তাহা তাকে বাধা দেব না। পরের ক্ষম্ব নিজের শরীরও দান করিতে পারি রাজ্য আর বেশী কথা কী?"

অনেক দিন এক জারগার থাকিবার কলে খাত, সমিধ প্রভৃতি ক্রমশ: নিশেষ হইয়া আসিতেছে। স্তবধা জীমূতকেতু পুত্র আশ্রমের অল্প নুতন স্থান খুঁজিয়া বাসির করিতে বলিছে জীমূতবাহন আত্মের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে মলয় পৰ্বতে আসি উপস্থিত হইলেন। চমৎকার জারগা! অবুর সমুদ্র; চারিদিক চন্দনবন হইতে মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। আশ্রম স্থাপন হইয়া উপযুক্ত স্থান।

জীমূতবাহনের ডান চোখ অকারণেই হঠাৎ নাচিতে আরম্ভ করিল। এই শুভলক্ষণের কি ইঙ্গিত হইতে পারে তাহা

ভাবিয়া পাইলেন না। বেড়াইতে বেড়াইতে অপুরে ভগবতী গৌরীর মন্দির দেখিতে পাইয়া তাঁহার সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিতেই বীণার বন্ধাবের সহিত নারীকণ্ঠের মধুর গান শোনা গেল। সিদ্ধরাজকণ্ঠা মলয়বতী যোগ্য স্বামী পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সজীব ভাষা গৌরীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীমূতবাহনের মতো উল্লাসে লোক ও মলয়বতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। মলয়বতীরও জীমূতবাহনের উপর চোখ পড়িতেই মনে হইল, স্বয়ং গৌরীই বৃষ্টি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতেই দুই জনে পরস্পরের প্রতি অমূল্য হইয়া পড়িলেন।

মলয়বতীর পিতা খোঁজ লইয়া দেখিলেন যে, কণ্ঠে গুণে জীমূতবাহনই তাঁহার কস্তার একমাত্র উপযুক্ত বর। তিনি ব্যবসায় মিথ্যাবশ্বকে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। জীমূতকতু সানন্দে এই বিবাহে মত দেওয়াতে জীমূতবাহন ও মলয়বতীর বিবাহ হইয়া গেল।

এদিকে মতঙ্গ জীমূতবাহনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে সংবাদ আসিল। মিথ্যাবশ্ব এখন জীমূতবাহনের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। সে বলিল, “অনুমতি দিন, আমি মতঙ্গকে যুদ্ধে পরাজয় করে আসি।”

জীমূতবাহন কিন্তু অনুমতি দিলেন না। বলিলেন, “অস্ত্রের উপকারের জন্য আমি নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে দান করতে পারি; আর রাজ্যের নাম করে নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহে প্রাণনাশ হতে দেখো, এ কি সম্ভব? রাজ্য আমার চাই না।”

মিথ্যাবশ্ব এরূপ নিবৃত্তিভীর ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না। রাজ্যস্থল ভোগ করিবার লালসা জীমূতবাহনের নাই। আশ্রমের সরল অনাড়ম্বর জীবনই তাঁহার কৃত্তি দেয়।

একদিন মিথ্যাবশ্বের সহিত জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পর্বত, সমুদ্র ও বন মিলিয়া চারি দিকের দৃশ্য রঙ মনোমর হইয়াছে। উজ্জ্বলিত ভাবে জীমূতবাহন মিথ্যাবশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “এ দেখ, মলয় পর্বতের চূড়া শবৎকালের শালা মেঘে ঢাকা হিমালয়ের স্তায় শোভা ধারণ করেছে।”

মিথ্যাবশ্ব কহিল, “ওটা মলয় পর্বতের চূড়া নয়; ওগুলো মৃত প্রাণদের হাড়ের স্তূপ।”

জীমূতবাহন বেদনার কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলো কী! এতগুলো একসঙ্গে কি করে মরলো?”

— “একসঙ্গে মরেনি। প্রতিদিন একটি একটি করে মরেছে। মিত্তানন্দন গরুড় ডানার কাপটায় সমুদ্র তোলপাড় করে নাগদের ঘরে ঘরে খেত। নাগরাজ বাহুবলী দেখলেন এ তো বড়ো মুন্সিল! লুপ্ত জাতি লুপ্ত হতে বসেছে। তখন বাহুবলী গরুড়ের সঙ্গে এই মত করলেন যে, প্রতিদিন পালা করে একটি নাগকে গরুড়ের আহাৰ্য হিসাবে পাঠানো হবে। সেই থেকে গরুড় প্রত্যহ একটি করে নাগ ভক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকে, আর কোনো উপজব্ব করে না।”

এই কাহিনী শুনিয়া জীমূতবাহন বড়ই বিম্মিত হইলেন।

নাগরাজ বাহুবলী সহস্র বসন্ত। তিনি প্রজাদের মৃত্যুর ঘৃণে পাঠাইয়া নিজে নিরাপদে বহিরাছেন। তাহাদের রক্ষার জন্য তিনি কিছু করেন না; এমন কি নিজেকে আহাৰ্যরূপে দান করিয়া নিজ একটি নাগকে পর্বত বাতাইবার চেষ্টা করেন নাই। জীমূতবাহন

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বাহুবলী না করিলেও তিনি তো নিজের দেহ দান করিয়া অন্ততঃ একটি নাগকেও রক্ষা করিতে পারেন!

এমন সময় প্রতীহার আসিয়া সংবাদ দিল, তাহাদের দুই জনকে মহারাজা বিশ্ববশ্ব অবিলম্বে আহ্বান করিয়াছেন। জীমূতবাহন মিথ্যাবশ্বকে বলিলেন, “তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি।”

একান্ত অনিচ্ছায় সহিত মিথ্যাবশ্ব জীমূতবাহনকে একাকী রাখিয়া গেল। বাইবার পূর্বে সাবধান করিয়া বলিল, “এ জায়গটা ভালো নয়; শীগগির চলে আসবেন।”

জীমূতবাহন সমুদ্রের বেলাভূমিতে একা-একা বেড়াইতেছেন। এমন সময় সমুদ্রতীরের নির্জনতা ভেদ করিয়া ক্রীলোকের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, একটি যুবকের পশ্চাতে এক বৃদ্ধা কাদিতে কাদিতে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধার পশ্চাতে বহিয়াছে একজন রাজভৃত্য; তাহার হাতে রক্তবর্ণ বস্ত্র। নিকটে আসিলে জীমূতবাহন শুনিতে পাইলেন বৃদ্ধা বিলাপ করিতেছে, “হায় শম্ভুচূড়, আজ তোমাকে বধ করবে, মা হয়ে তা কেমন করে দেখব?”

শম্ভুচূড় বৃদ্ধাকে সাধনা দিতেছে; কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহাতে প্রবেশ মানেন না। জীমূতবাহনের মন বড়ই বিচলিত হইল। ইহাদের দুয়ের কারণটা জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন।

রাজভৃত্য বলিল, “শম্ভুচূড়, নাগরাজ বাহুবলীর আদেশে আমাকে এই অশ্রয় কাজ করতে হচ্ছে। মার কার্য শুনে আর বিলম্ব করে লাভ নেই। গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এলো। এই রক্তবস্ত্র পরিধান করে তাড়াতাড়ি বংশিলার উপর গিয়ে লাড়ো। দূর থেকে লাল পোষাক দেখে গরুড় তোমাকে আভ্যন্তরীণ ভক্ষ্য বসে চিনে নেবে।”

শম্ভুচূড় ভৃত্যের হাত হইতে রক্তবস্ত্র গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধা পুত্রের মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। শম্ভুচূড়ের বস্ত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা আবার বিলাপ করিতে লাগিল, “তুই আমার একমাত্র পুত্র; তোকে রক্ষা করতে না পারলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? নাগরাজ বাহুবলী যখন তোকে গরুড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তখন আর কে রক্ষা করতে পারবে?”

জীমূতবাহন অকস্মাৎ তাহাদের সমুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “কেন, আমি আছি; আপনাদের ছেলেকে আমি রক্ষা করব।”

বৃদ্ধার মন গরুড়ের আগমন আশঙ্কার পূর্ণ। হঠাৎ অপরিস্রুত ব্যক্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল বৃষ্টি গরুড়ই আসিয়াছে। বৃদ্ধা অকল দিয়া পুত্রকে আহ্বানিত করিয়া জীমূতবাহনের পায়ে কাঁছে লুটাইয়া পড়িয়া কহিতে লাগিল, “নাগরাজ বাহুবলী আজ আমাকেই তোমার ভক্ষ্যরূপে পাঠিয়েছেন; আমাকে বধ করে।”

এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া জীমূতবাহনের চোখ অজস্র হইল। শম্ভুচূড় বৃদ্ধার ইনি গরুড় নন। আত্মকিত দেখিয়াই বৃদ্ধা বার ইনি কোনো মহাপুরুষ। জীমূতবাহন প্রস্তাব করিলেন যে, রক্তবস্ত্র পাইলে তিনি তাহা পরিধান করিয়া বংশিলার উপর গরুড়ের আহাৰ্যরূপে অপেক্ষা করিবেন। ইহাই শম্ভুচূড়কে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়।

কিন্তু এই প্রস্তাবে শম্ভুচূড় কিংবা তাহার মা কেহই স্বীকৃতি দিলেন না। জীমূতবাহনের এতদিনের স্বপ্ন সকল হইবার সুযোগ আসিয়াছে। তিনি পরার্থে দেহ ত্যাগ করিতে ব্যগ্র। তাই ইহাদের সম্মত করাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মাতা-পুত্র বাদ বাদই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। অপরের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের জীবন রক্ষার কথা বুঝা কল্পনাও করিতে পারে না।

গরুড়ের আসিবার সময় আসিল। বধ্যশিলায় আরোহণ করিবার পূর্বে দেবতাকে প্রণাম করিবার জন্ত শম্ভুচূড় ও তাঁহার মা কিছু দূরে এক মন্দিরের উদ্দেশে গমন করিল। ইতিমধ্যে রক্তবর্ণ বস্ত্র লইয়া জীমূতবাহনকে খুঁজিতে খুঁজিতে কধুকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মলয়বতীর মা এই বস্ত্র পাঠাইয়াছেন; বিবাহের পরবর্তী স্ত্রী-আচাৰ্য হিমায়ে এই বস্ত্র জীমূতবাহনকে পরিধান করিতে হইবে।

জীমূতবাহন তো লাল কাপড় পাইয়া খুব খুশী। শম্ভুচূড় আসিবার পূর্বে লাল চিহ্ন ধারণ করিয়া বধ্যশিলায় উপর গিয়া পড়িয়াছিলেন। বধ্যশিলায় স্পর্শ তাঁহার নিকট বড় মধুর মনে হইল। অতি প্রিয়জনের স্পর্শও কখনো এমন শাস্তি দেয় নাই। পরার্থে জীবন দান করিবার স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে। জীমূতবাহন নিজের দেহ দান করিয়া একটি নাগের জীবন রক্ষা করিবেন। এই আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।

বাঁটা কশ্মির করিয়া রক্তশিশির গরুড় আসিয়া উপস্থিত। জীমূতবাহনকে ডাকা নাগ ভাবিয়া গরুড় তাঁহাকে টোটে করিয়া শূজে উঠিল। অমনি স্বর্ণ হইতে পুষ্পরূপে আবৃত হইল এক দুশুভি বাজিতে লাগিল। গরুড় ইহাতে একটু আশ্চর্য হইলেও জীমূতবাহনকে লইয়া মলয় পর্বতে গেল। শাস্তিতে অস্তার করিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান।

জীমূতবাহনের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার শিতামাতা উন্মত্ত হইয়াছেন। মহারাজ বিবাহবস্ত্রও চিত্তিত হইয়া জামাতার সংবাদ লইতে লোক পাঠাইয়াছেন। সকলে মিলিয়া যখন জীমূতবাহনের বিলম্বের কারণ সবকে আলোচনা করিতেছেন, তখন শূজ হইতে একটি রক্তমাখা মণি আসিয়া জীমূতকেতুর পায়ের নিকট পড়িল। জীমূতবাহনের মা মণিট হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এ যে আমার ছেলের মাথার মণি গো।”

মলয়বতী ইহা শুনিয়া কঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কে একজন সাহসী দিয়া বলিল, “তুমি অল্পমানের উপর নির্ভর করে শোক করবেন না। গরুড় প্রত্যাহ নাগ ভক্ষণ করে। এটা বোধ হয় মাগের মাথার মণি।”

এই কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল।

এদিকে শম্ভুচূড় মন্দির হইতে ফিরিয়া দেখিতে পাইল, গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া শূজে উড়িয়া বাইতেছে। অপরের প্রাণের বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ জন্মিল। গরুড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রম বুকাইতে পারিলে জীমূতবাহন মুক্তি পাইতেন, এই আশায় শম্ভুচূড় মলয় পর্বতের পাথে চলিতে লাগিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া জীমূতবাহনের মা বলিলেন, “এ লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেন কোন মূল্যবান বস্তু হারিয়েছে। এর মাথার মণিই বোধ হয় আমাদের।”

জীমূতকেতু আগন্তুককে প্রাণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। জীমূতবাহনের ‘মাতা মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মা, তুমি বিধবা হওনি, বিধবা হওনি; কোনো ভয় নেই।”

মলয়বতীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই এই হাসি মিলাইয়া গেল। জীমূতকেতুর প্রাণের উত্তরে শম্ভুচূড় কহিল, “কোনো মহাপ্রাণ বিজ্ঞানীর নিজের দেহ দান করে গরুড়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন। গরুড়কে বুঝিয়ে যদি নিশ্চয় করা যায় এই স্তম্ভ তাঁর খোঁজে বাজি।”

জীমূতকেতুর হৃদয় কঁপিয়া উঠিল। বিজ্ঞানধরুলে জীমূতবাহন ছাড়া এমন পরহিতরতী আর কে আছে? তিন জনই জীমূতবাহনের অমঙ্গল আশঙ্কায় শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তম পুত্রকে হারাওয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? জীমূতকেতু চিন্তা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। শিতা, মাতা ও বধু চিত্তার আরোহণ করিয়া জীমূতবাহনের অঙ্গুগমন করিবেন।

শম্ভুচূড় সাহসী দিয়া বলিল, “আগে থেকে শোক করে আপনারা জীমূতবাহনের অমঙ্গল ডেকে আনবেন না। গরুড় যখন বুঝতে পারবে যে উনি ‘নাগ’ নন, তখন হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে। সত্যতা চলুন, আমরা অঙ্গুগমন করতে বাই।”

সকলেরই মনে হইল যে কথাটা ঠিক। জীমূতবাহনের অঙ্গুগমন করিতে তাঁহারা শম্ভুচূড়ের অঙ্গুগমন করিলেন।

গরুড়ের এই এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধারাসো টোট দিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া অনেক রক্ত পান করিল, কিন্তু নাগের মুখে বেলনার কোনো চিহ্নই নাই। বধু মনে হইতেছে, এ বেল বড় তৃপ্তি পাইতেছে; গরুড় রক্ত পান করিয়া তাহার উপকারই করিতেছে। এই অস্বস্ত বৈধ দেখিয়া লোকটা কে, তাহা জানিবার জন্ত গরুড়ের বড় কৌতুহল হইল। সে আহার বন্ধ করিল।

জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখনো আমার শিরা থেকে রক্ত বেরে শূজে, এখনো দেখে মাস বয়েছে, তবে তুমি খাওয়া বন্ধ করলে কেন?”

প্রশ্ন শুনিয়া গরুড় আরও আশ্চর্যবোধিত হইল। বলিল, “এতকাল আমি তোমার রক্ত পান করেছি, এখন বৈধে ঘারা তুমি আমার বুকের রক্ত শোষণ করছ। তুমি কে, তা আগে আমাকে বলো।”

—“তুমি দুখার কাতর। ওসব কথা পোমবার সময় বল নাহ। আগে তোমার খাওয়া শেষ করো।”

সহসা শম্ভুচূড় সেখানে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “গরুড়, একে ছেড়ে দাও। বাসুকী আমাকে তোমার আহারের অব পাঠিয়েছেন।” ইনি জীমূতবাহন, নাগ মন। হায়, তুমি কি করলে!

জীমূতবাহনের বড় ক্ষোভ হইল। শম্ভুচূড় আসিয়া তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া দিল।

গরুড় বুঝিতে পারিল, সে কি মহাপাপ করিয়াছে। যে মহাপাপ নিজের প্রাণ দিয়া নাগের জীবন রক্ষা করিতে কৃতসম্বন্ধ, না জানি তাঁহাকে মৃত্যুর কবলে আনিয়া কেলিয়াছে। এই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আগুন পুড়িয়া আত্মহত্যা করা।

দূরে জীমূতকেতুকে আসিতে দেখিয়া শম্ভুচূড় বলিল, “কুম্ভ আপনার শিতামাতা ও মলয়বতী এখানে আসছেন।”

জীমূতবাহন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “শম্ভুচূড়, তোমার উদ্দেশ্যে দিলে শীগগির আমাকে ঢেকে দাও। আমার শরীরের অবস্থা দেখা এখনই প্রাণত্যাগ করবেন।”

জীমূতকেতু নিকটে আসিবার পূর্বেই শম্ভুচূড় তাঁহার কতক

দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। পুরুষ জীবিত দেখিয়া জীমূতবাহনের শিতামাতার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। জীমূতকেতু করিলেন, “আমাকে আলিঙ্গন করো, বাবা! তোমাকে যে জীবিত দেখব, তা ভাবতেও পারি নি।”

পিতাকে আদিগ্ন করিবার জন্ত উঠিতে চেষ্টা করিতেই দেহের আচ্ছাদন সরিয়া গেল এবং দুর্বলতার জন্ত জীমূতবাহন মূহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে কহিলেন, “তুই আমার ছেলের এ কী নশা করলি? এমন স্থল দেহ দায়, তাকে অকারণে আঘাত করবার নিষ্ঠুরতা কী ক’রে সম্ভব?”

গরুড়ের ডানার বাতাসে জ্ঞানলাভ করিয়া জীমূতবাহন বলিলেন, “মা, ওকে কেন দোষ দিচ্ছ? আমার শরীর তো এমনি রক্ত-মাসের শিঙ। এতদিন সত্যকার রূপটা দেখতে পাওনি।”

গরুড় হাতজোড় করিয়া কহিল, “অমূল্যোন্মাদ আমার সর্বাঙ্গ জলে বাজে। পাণ থেকে মুক্তি পাবার উপায় থাকলে বলুন; না হলে আত্মহত্যা ক’রে নিকৃতি পাবো।”

জীমূতবাহন ধীরে ধীরে বলিলেন, “আত্মহত্যা ক’রে কি হবে? জীব-হিংসা ত্যাগ করো, তাহ’লেই তোমার পাণ বাবে।”

গরুড় প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনো কোনো জীবের প্রাণনাশ করিবে না। বোধ করি গরুড়ের এই প্রতিজ্ঞার জন্তই জীমূতবাহন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহার পরই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

জীমূতবাহনের শিতামাতা ও মলমল চিত্তার আরোহণ কী প্রাণ বিসর্জন করিবেন। চিত্তা প্রস্তুত করিতেছে শঙ্খচূড়। আ: পাইলে জীমূতকেতু জীবন কিরিয়া পাইতে পারেন, এই কথা হ’ মনে পড়িতেই গরুড় ইন্দ্রের নিকট ছুটিয়া চলিল। অমৃত দিয়া। জীমূতবাহনের নয়, মৃত নাগদেরও প্রাণ কিরিয়া পাওয়া হইবে অমৃত দিতে অস্বীকার করিলে ইন্দ্রের বিফল হুঙ্কারিতেও সে বি করিবে না।

মলমল চিত্তার আরোহণ করিবার উত্তোগ করিবে দেবী গৌরী স্বয়ং আসিয়া তাঁতাকে নিবৃত্ত করিলেন। কমণ্ডলু হঠাৎ জলসিকন করিবার জীমূতবাহন প্রাণ এক অক্ষত দেহ কিরি পাইলেন। ঠিক সেই সময় গরুড় আকাশ হইতে অমৃতবৃষ্টি করি লাগিল। অমৃতের স্পর্শ পাইয়া মৃত নাগেরা পুনর্জীবন লাভ করি এবং অস্থির অদৃশ্য হইয়া গেল।

জীমূতবাহনকে আশীর্বাদ করিয়া গৌরী কহিলেন, “বৎস, ভগতে কল্যাণ কামনার তুমি যে নিজের দেহ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হওনি এজন্য আমি খুবই তুষ্ট হইয়াছি। এবার তুমি রাজ্যভার গ্রহণ ক্রে প্রজাদের সুখী করো, এই আদেশ করছি।”

জীমূতবাহন দেবীর আদেশ শিরোধার্য করিলেন। নাগদের দ্বয় করিয়া এবং গরুড়কে হিংসার পথ ত্যাগ করাইতে পারিয়া তাঁহা এত দিনের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

## অত্যাণের খুশি

### মণ্টু রাণী মিত্র

এলো আজ অজ্ঞান

মাঠ-মাঠে পাকে ধান

ঘাসে-ঘাসে টুপ-টুপ

শিশিরের বৃষ্টি।

কীত-বুড়ি ওড়ি-বুড়ি

এসে দেব স্তম্ভ-বুড়ি

উত্তরে ছাওয়া তার

দেখি হিম-বৃষ্টি।

মিঠে-মিঠে রোসে আজ

ফুলে-ফুলে উজাস—

শিউলির বৃষ্টি নিয়ে

নেই মিছে কারা।

কেউ আসে, কেউ যায়

আমাদের দুনিয়ায়—

শরতের হীরে হয়

হেমন্তে পান্না।

সোনা ধান, সোনা ধান

আজ রোসে তারি গান

আজ ঘাসে ভাজা রোসে

মবকতী জেলা।

কতো পাখি গান গায়

খুঁটে-খুঁটে ধান খায়

মনে হয় এ পৃথিবী

স্বপ্নে-গড়া জেলা।



## সুস্থ লোকেরা নিয়মিত লাইফবুয় সাবান দিয়ে চান করে

— প্রত্যেক দিনদিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।

★ যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যেক দিন, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকেরাই লাইফবুয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবুয় সাবান পেই স্বরু করে তাজা তাব এনে দেয়।





### বঙ্গে অবাঙালী রোজগারী

ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোক সব প্রদেশে গিয়া অবশ্যে তথ্য সব রকম কাজে প্রযুক্ত হইবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইহাও কিন্তু বাস্তবিক যে, গাঁহার যে প্রদেশের ছায়ী বাসিন্দা, তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় তথাকার সকল রকম কাজ করিবেন। বাংলা দেশে ইহাও ব্যতিক্রম হইতেছে এবং এরূপ অভিযোগও শুনা যাইতেছে যে, অবাঙালীরা এখানে যে সব কাজে প্রযুক্ত হইতেছেন, দল পাকাইয়া তাগ হইতে বাঙালীদিগকে তাড়াইতেছেন। ইহা অবাঞ্ছনীয় এবং এই ভক্ত বাঙালীদিগকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থা একটি সহস্র ভারতীয় জাতি গঠনের অন্তরায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য নাই। কিন্তু বাঙালীরা ভারতীয় জাতি গঠনের কার্যে সাহায্যও চেষ্টা কম উৎসাহও কম্বিত্বতা দেখায় নাই। তাহারও ভারতকে ও জগৎকে কিছু দিয়াছে এবং টিকিয়া থাকিলে জরিয়তেও লিবে। তাহাদের অধঃপতন, বা বিনাশ, বা আত্মসমর্পণ ভারতীয় জাতিকে লজ্জাশালী করিবে না। এই সকল কারণে এই অশ্রীতিকর বিষয়টির আলোচনা বার বার করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে 'সজীবনী' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাংলা দেশে খোপড়া-জানা লোকদের মধ্যে ফেদার লোকের সংখ্যা খুব বেশী। অথচ খশাসক কলিকাতা সিন্ডিনিসিপালিটি পর্যন্ত অবাঙালীকে কোথাগিগিরি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। বাংলার যুটে-মজুর দ্বিষ্টে পায় না। অবাঙালী যুটে-মজুর পর্যন্ত এদেশে রোজগার করিয়া নিজের খরচ চালাইয়া উত্তম অর্থ বাড়ি পাঠাইতেছে।

বাঙালীর হাত হইতে একটার পর আর একটা ব্যবসায় চলিয়া গুরুত্বহে। কলিকাতার পূর্ববঙ্গের সাহসে হস্তে পাঠের ব্যবসায় ছিল। তাহা এখন মাদগ্যারী ও ভাটিয়ার হাতে গিয়াছে। কলিকাতার বাসিন্দা বাঙালীই লবণের ব্যবসায় করিত। তাহাও মাদগ্যারী ও ভাটিয়ার হস্তগত। কলিকাতার ক্ষুদ্র, কনট্রোল, মজুরকরা, দরওয়ান, যুটী, সবই হিন্দুস্থানী। কোরাণীর কার্য সম্পন্নিত বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। আজকাল বাঙালীর অর্ধেক ক্ষুদ্র লটখা সাম্রাজ্যগণ সেই কোরাণীর কার্য হইতেও বাঙালীকে দূরীত্ব দিতেছে। কলিকাতার অবাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক কলিকাতার আপন দেশের ভাষা শিক্ষার করকেটা করিয়া মূল স্থাপন করিয়াছে। এইরূপে ভাটিয়া,

মাদগ্যারী, তামিল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেকগুলি মূল কলিকাতার চলিতেছে।

কলিকাতার অবাঙালীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। বাঙালী দেশেই এই বিশেষণ দেখা যায়। বাঙালীর নানা জিলায় অবাঙালীরা ব্যবসায় করিতেছে। ইহার ভক্ত বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও করিতে পারে না। কলিকাতায় বাঙালী বড় ব্যবসায়ী না থাকিলে মধ্যবঙ্গের ক্ষুদ্র বাঙালী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা কে করিবে?

কলিকাতায় ৬৭ সহস্র শিখ আদিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের একতা শিখিবীর জিনিষ। তাহারা বাঙালীকে অনিবার্য বাড়ি-ভাড়া দেওয়া বাতীত বাঙালীর হাতে এক পয়সাও দেয় না। তাহারা নিজের ভক্ত ভোজনালয় স্থাপন করিয়াছে। নিজের দেশের লোকের দ্বারা দরজীর দোকান স্থাপন করিয়াছে, নিজেরাই স্ত্রীদ্বয়ের কার্য করে। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় মোটর ও ট্যান্ডি চালান। নিজেরাই তাহা মেরামত করে, নিজেরাই মেতামতের কারখানা ও সরঞ্জামের দোকান করিয়াছে। চাউল, ডালের দোকান পর্যন্ত পাঞ্জাবী ও শিখগণ স্থাপন করিয়াছে, কেবল বাধ্য হইয়া বাঙালীর কাছে শাকসব্জী কিনিতে হয়। এইরূপে এই কয়েক সহস্র শিখ কলিকাতায় নিজের সমাজ স্থাপন করিয়া কেবল নিজের সাহায্য করে।

অতঃপর অন্তঃপ্রদেশের লোকেরের কথাও লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতার বড়বাজারে গমন করিলে বহু মাদগ্যারী ও ভাটিয়াকে দেখা যায়। ইহারাও প্রয়োজন নিকাহের ভক্ত সকল রকমের দোকান করিয়াছে। ইহাদের নিজের চাউল ও ডালের দোকান আছে, নিজের হালুটকর আছে, নিজের বাড়িও আছে; স্ত্রীতব্য শিখদের দ্বারা বাঙালীকে বাড়িভাড়াও দিতে হয় না। ইহারা যে সকল ত্রব্যের ব্যবসায় করে তাহার ক্ষেত্র একমাত্র বাঙালী। প্রায় সকল মাদগ্যারী ও ভাটিয়া বহু বৎসর বাঙালীর ঘন সঙ্কর করিয়াও কোনও বাঙালী ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিতে আগ্রহ হয় না।

অর্থাভাবে কলিকাতার বহু ছাত্র সংবাদপত্র বিক্রয় করে এবং ইহা দ্বারা অনেক মেশের খরচ চালায়। এই সকল উত্তমীয়া আত্ম-নির্ভরশীল ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানী কাগজ-ফেরিওয়ালারা রাস্তার মোড়ে কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিতে কি লাহনাই না করিয়াছে। এখনও কলিকাতার বহুস্থানে বাঙালী হকার সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে পারে না, ইহাদের দাপটে।

বোম্বাই কাপাড়ের কলের মালিকগণ ভিন্নরূপে বাঙালীর অর্ধে ও বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনে জোড়পাতি হইয়া, সেই বাঙালীর কয়লা ক্রয় না করিয়া সন্ধ্যা এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা ক্রয় করিতেছেন, তাহা সকলেই জানে।

কলিকাতার অবাঙালী বস্ত্র ব্যবসায়ী বাঙালীর কলে তৈরী কাপড় বিক্রয়ার্থে রাখে না। অথচ এই বাঙালীর বসিয়া তাহারা অল্প প্রদেশের কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রভুত অর্থশালী হইতেছে। এইরূপে নানা ব্যবসায়ের দ্বারা বাঙালীর অর্থ লইবার ভক্তই সকল প্রদেশের লোক উদ্বুদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু বাঙালীর ভক্ত কেহ কিছু করিতে প্রস্তুত নহে; পবর্ষমতও বোম্বাইয়ের লবণ ব্যবসায়ীর সুবিধার ভক্ত বাঙালীর লবণের উপর কর বসাইয়া দিখাচ্ছেন। সকলেই বাঙালীকে দমন করিতেছে, বাঙালীর ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে।

বাঙালীর দ্বারা প্রভুত জিনিষ ক্রয় করিতে 'সজীবনী,' আমাদের মত, বাঙালীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার পর বাঙালীর ছাত্র



ও অশ্রদ্ধা যুবকদিগকে যে অমরোপ করা হইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অমরোপন ও সমর্থন করি।

১১০৫ সালে যখন কলিকাতায় ভারতবর্ষের মিলের কাপড় পাওয়া যাইত না, তখন কলেক্টর স্বোয়ারে কেবল দেশীয় মিলের কাপড়ের দোকান খোলা হয় এবং বহু ছাত্র যুবক তাহাতে সাহায্য করেন। আমাদের মনে হয়, পুনরায় ঐরূপ দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে কেবল বাঙালার কলের কাপড় বিক্রয় হইবে এবং ১১০৫ সালের ছাত্র বিনা লাভে তাহা ছাত্র যুবকগণ পারিশ্রমিক না লইয়া বিক্রয় করিবেন। কলিকাতায় অবাস্তব দোকানে বাঙালার তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় হয় না। তাহাদের সহিত বহু বাঙালীর দোকানও বাঙালার তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রয়ার্থ না রাখিয়া গোদাই ও আহমদাবাদের কলের কাপড় রাখিতেছে। সেজন্য যুবকগণকে অমরোপ করি, তাহারা বাঙালার কাপড় বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। বাঙালীকে যদি বাঙালী না রক্ষা করে তবে কে করিবে?

—স্বর্গত: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

### রত্নের বাজার

দুশ্রাপ্য ও বহুমূল্য চিহ্ন বা গুণ্যাদির বেলার যেমন, মণি-মণিকোব বেলাতেও তেমনি। উহা পথে বা বাজারে চলে কিরা কখনই হয় না। পরন্তু যতই উহা সূক্ষ্মত, ততই বৃদ্ধি হুঁশুলা। পান্না, চুণী বা পদ্মবাগ মণির কথাই ধরা যাক। গত দশ বছর আগেও এদের একটি মূল্য ছিল প্রায় এক হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এক্ষণে সেটাই বিক্রয় করলে দেড় হাজার পাউণ্ডের কম পাওয়া যাবে না। হীরক ছাড়া মহামূল্য মণি বলতে তিনটির নাম নিশ্চয়ই করতে হবে—পদ্মবাগ, পান্না আর নীলকান্ত মণি। পদ্মবাগ ও নীলকান্ত মণির মধ্যে পার্থক্য যেটুকু সে মুখ্যত: ওদের রঙের। এ মণি দুটোকে আলাদা করে দেখবার আর উপায় কি? নীলকান্ত মণি বা নীলার রঙ সাধারণত: হয়ে থাকে নীল। তবে উহার বিচিত্র রঙেরও হ'তে পারে। এর যেটি লাল বা লোহিত বর্ণের হয়ে গেল, সেটিই পদ্মবাগ। পদ্মের মত রাগবিশিষ্ট বলেই এ নামে অভিহিত হয়েছে বোধ হয় এ অমূল্য মণিটি। অবিভিগ্ন এটা ঠিক, রঙের সামান্য পার্থক্যের নক্ষণ মণির মূল্য পার্থক্য হ'তে পারে প্রচুর। যেখানে একটি থেকে অপরটির বাছাই-এর প্রশ্ন থাকে না, সেখানেও মূল্যমানের এ ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। লোহিত বর্ণবিশিষ্ট একটি চুণীর মূল্য সমগোত্রীয় অথচ ভিন্ন বর্ণধারী অপর মণির চেয়ে অন্তত: আট দশ গুণ বেশী। চুণী বা পদ্মবাগের পরেই আসে পান্না বা মরকত মণি। মূল্য বা মর্যাদার দিক থেকে উহা সাধারণত হীরকের পর্যায়ভুক্ত।

মণিসমূহের একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়, সে ওদের কাঠিন্যের দিক থেকে। কোন মণি নৈকতথানি শক্ত অর্থাৎ কোনটি কঠ কাল টিক থাকবে অসুস্থ ভাবে—বিচারের এ মাণকাঠিত এক হ'তে নশ—এ কয়টি শ্রেণিতে ভাগ চলে এদের। সবচেয়ে কঠিন বলেই হীরকের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দশম পংক্তিতে। নবম পংক্তিতে রয়েছে পদ্মবাগ আর নীলকান্ত মণি। পান্না বা মরকত মণি প্রাতি ক্যারেট কণিও হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে, তথানি উহারা উক্ত দুইটি

শ্রেণীতে পড়ে না। তার কারণ আর কিছুই নয়। এ শ্রেণীর মণিগুলো অপেক্ষাকৃত নরম—স্বায়ত্বশক্তি এদের ততখানি নেই। আরও কয়েকটি শ্রেণীতে পীতবর্ণের মণি রয়েছে—ওরাও তেমন শক্ত নয়, অথচ মূল্য যথেষ্ট। এগুলোর এত অধিক মূল্যের কারণ খুঁজলে দেখা যাবে—এদের ভেতরও রয়েছে স্তম্ভ মরকত মণির ওজ্জ্বল্য সম্পদ।

আবার একটি মূল্যবান মণি-শ্রেণী রয়েছে উপল মণি সমূহ নিয়ে। উপলের মধ্যে যেগুলো দেখতে সাধারণত কালো, সেগুলোরই মূল্য অধিক। আজকাল আবার হালকা ধরণের উপল ব্যবহারের একটা ফ্যাশন চলেছে। কিন্তু মূল্যের দিক থেকে অনেকটা নীচেই ওদের স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ ভাবে বৈদ্যুণ্য মণিরই সমাদর খুব বেশী। কালো উপল অপেক্ষাও উহাদের অধিক দাম দেওয়া হয় এবং সেট কারণেই মূল্যবান মণিদের সঙ্গে স্থান নির্ণীত হয়েছে ওদেরও। বলতে কি, একটি স্তম্ভ মরকত মণির বিশিষ্ট বৈদ্যুণ্য মণির মূল্য এক হাজার পাউণ্ডও হয়ে থাকে।

মুক্তা যদিও আসলে কোন মণি নয়, তবু মহামূল্য জহরতের পর্যায়েই ওকে ধরা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করবার বিষয়, উন্নত শ্রেণীর মুক্তা ক্রমেই দুশ্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রাচ্যের ভেতর সবচেয়ে স্তম্ভ মুক্তার সৃষ্টি পায়স উপসাগরে। কিন্তু বিশ্বের এই অংশটির বাসিন্দারা ভেবে দেখেছে, মুক্তা সংগ্রহের চেয়ে তৈল (পেট্রোলিয়াম) ব্যবসায়ই উাদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। মুক্তা দুশ্রাপ্য হ'বার মূলে এটি একটি প্রাচীন কারণ, সন্দেহ নেই। মণিবস্তুর ভেতর গোমোমণি, তুর্মলীন; ফিরোজ বা তুর্নমণি—এগুলোর জনপ্রিয়তাও কম নয়, মূল্যও যথেষ্ট। কৃত্রিম চুণী পাথর বা নীলা তৈরীর অবিভিগ্ন ব্যবস্থা আছে এবং সে মণিগুলো তৈরী হয় প্রধানত শিল্পগত উদ্দেশ্যে। হারযজির নির্মাণকার্যেই কৃত্রিম মণির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। গ্রামোফোনের স্ট্রু তৈরীর ক্ষেত্রেও উাদের ব্যবহার আছে—তবে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায়। আর্টি, ব্রোচ প্রভৃতিতেও ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম নীলা বা পদ্মবাগমণি ব্যবহৃত হয়।

### চাকরীতে উন্নতি করতে চান?

প্রায়শ: আমরা বলে থাকি—কাজ পেতে হলে যেমন, কাজে উন্নতির ভিত্তিও চাই উপরে শক্ত ভিত্তি বা ধরবার লোক। সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থা দেখেও তেই এ ধারণাটি বলবতী হয়েছে আমাদের মনে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু নিবিড় ভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, কথটি সত্য ক্ষেত্রেই বোঝা আনা খাটে না, অল্প দেশে ত নয়ই, আমাদের দেশেও নয়। বড়লয়ের সুপারিশ বা 'ব্যাকিং' যদি থাকলো—সে অব্যাহত ভাঙ্গা কথা, কিন্তু না থাকলেই যে কেউ জীবন-পথে এগিয়ে যেতে পারবে না, এমন কোন ধরাইয়া নিয়ম নেই। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বুদ্ধি প্রার্থনা যদি সত্যি সত্যি থাকলো, তা হ'লে অগ্রগতির পথ, অল্প হোক কি কাল হোক, খুলে যেতে বাধ্য। নিছক কাকা-বাবু কিংবা দাদা-ভগিনীশতির জোরে কাজ পাওয়া বা কাজে উন্নতির চেষ্টার চেয়ে এদিক অমূল্যই বোধ করি বহুলাংশে ক্ষেত্র: সন্মীচীন।

ধরাধরি বা স্থপারিশের দুলভ পথ না খুঁজেও কর্তৃকীয়নে উন্নতির দাবী বহন রাখতে হবে, তার জন্য নিশ্চয়ই কতকগুলো বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন না করলে নয়। পাশ্চাত্যের প্রায় ৫০টি মহানগরীতে চাকরী প্রসঙ্গে একবার একটি সার্ভে করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ আলস্য অব্যোগ্যতা, হামেশা কামাই, কাজে বেচ্ছাকৃত অবহেলা—এ সব দোষদুষ্ট লোকদের কর্তৃত্ব্যত করেছেন। এখন বেকপ কঠিন প্রতিযোগিতার বাজার এবং দেশময় বেকার বিশেষতঃ শিক্ষিত-বেকারে ভর্তি, সে অবস্থায় কথপ্রার্থী কথোন্নতি প্রয়াসীর চরিত্রে এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অক্ষমতা থাকলে কিছুতেই চলতে পারে না। উদীয়মান ও উত্তমশীল কর্মীদের জন্মে এই চাকরীর মাগণীর সিনেও অধিক অর্থোপায়ের পস্থা হিসাবে বিশেষ গুণ গুণ দর্শন মূল বা প্রধান সূত্র নির্দেশ করেছেন। এই সূত্র বা সোপানগুলোর গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এবং কার্যক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলোতে কেন, এ দেশেও উহার বহুল প্রমাণিত বলেই এ হচ্ছে উল্লেখ করতে হচ্ছে পর পর উহাদের।

প্রথম সূত্র:—কর্তৃকীয়নে উন্নতির জন্মে ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনে সর্ব সমর ও সর্বাবস্থায় প্রয়াস নিতে হবে। এগিয়ে যেতে না পারায় একটি প্রধান অন্তরায়ই হচ্ছে আবগক ব্যক্তিত্বের অভাব। অজ্ঞাত কার্যক্ষেত্রে ত বটেই, ইঞ্জিনিয়ারিং জগতেও অপরিহার্য ছয়টি গুণের মধ্যে পড়ছে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি—যাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত থাকতেই হবে কিন্তু সে যেন নিছক স্বার্থপরতা বা আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির নামান্তর না হয়। কীকিকে আমল না দিয়ে আত্মবিশ্বাস সহকারে সকল কাজেই অগ্রণী ভূমিকা লওয়ায় জন্ম থাকতে হবে প্রচুর তাগিদ বা তৎপরতা। বহন যে কাজের দায়িত্বই নিজের উপর থাকবে, সেটাকে এতটুকু কুহক জানা করলে চলবে না। পাত্র কর্তৃপক্ষ বাত ডায়রাণ্ড কর্মীর উপর নির্ভর করে কাজের সুসমাধি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন, সেটাই হ'তে হবে লক্ষ্য। কাজের সময় কাজ ছাড়া অন্য কিছু করা কিংবা কাজে গুরুত্ব নিয়ে কাটানো উন্নতির পরিপন্থী। শুধু যিনি 'বস' বা উপরস্থ তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বা শিষ্টাচার রক্ষা করলেই হবে না, সকল সহকর্মী বিশেষ করে অধীনে থাকা কাজ করবেন, তাঁদের প্রতিও থাকতে হবে ভাল ব্যবহার। এতে এক দিকে যেমন ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, অপর দিকে বিভাগীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলে-মিলে কাজ করার গুণ বা বৈশিষ্ট্যও কর্তৃপক্ষের নজরে না পড়ে পারবে না।

বিভাগীয় সূত্র:—সংগঠনগত অধিক হোক বা অন্তর হোক, যেখানেই চাকরী মিলল—বেতনভূক কর্তৃপক্ষকে আরও কাজ যেতে নিতে হবে। এটি এমন ভাবে করতে হবে, যাতে কাজের জন্ম সত্যি একটা স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ বৃদ্ধি বার। এবং এই পন্থায় কাজ করে গেলে উন্নতির প্রয়াসও সহজতর হয়ে উঠবে। মাসিক বা কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে একটা কথা শোনা যায়—শতকরা প্রায় ১০ জন কর্তৃপক্ষীয়ের দিকে একটি অতিরিক্ত কাজেই অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে। এর জন্য কারণ বাই থাকুক, কাজ এলে কাজকে চলে নেওয়া ঠিক নয়। মজুরি বা বেতন বাড়িয়ে পেতেই বহন হ'বে—ভখন আরও

কাজ চাই—এই কার্যনীতি অমুসরণই সমীচীন। ধারা উপরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁদের কাজটাও উত্তমগী হয়ে ক্রমশঃ জেনে নিতে হবে। অর্থায় প্রয়োজন হলে সে কাজ করতেও আটকাবে না, কর্তৃপক্ষ যেন এ বৃত্ততে পাবেন স্পষ্টই।

তৃতীয় সূত্র:—প্রয়োজন পেতে হলে নিজেকে আগে থেকেই উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত ও কর্তৃক্ষম করে তুলতে হবে। কাজ করতে যেয়ে যে সকল টেকনিক্যাল বিষয় প্রয়োজন হবে জানবার, সেগুলো আয়ত্ত করে নিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি এবং বেশ ভাল রকম। কাজটিকে ভাল ভাবে করে দেখতে হবে কোন অংশটি কঠিন ও সম্পাদনে সময়সাপেক্ষ। এইটিকেই যত্ন ও বুদ্ধি দিয়ে ক্রমে সহজ ও ত্বরান্বিত করার প্রতি সক্রিয় মনোযোগ চাই। কর্তৃপক্ষ এ ধারণা করবার কিছুমাত্র অবকাশও যেন না পান যে, নিম্নত্ব কর্তৃপক্ষের কাজের ব্যোধ্য নয়, কাজ আশাহুতরপ জানেন না। পক্ষান্তরে, প্রত্যেক কর্মীই এই মূলমন্ত্রটি জেনে রাখবেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ তাঁর নিজেরই হাতে।

চতুর্থ সূত্র:—যিনি যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, উন্নতিকামী হলে, উহার সঙ্গে আপনাকে তিনি জড়িত করবেন গুরুপ্রোত ভাবে। টাকা দেওয়ার ব্যাপারে মালিক বা কর্তৃপক্ষগণ সাধারণত খুব হিসেবী সত্য, কিন্তু তাই বলে 'মাসমাহিনা' বা পাই, সে-পরিমাণেই কাজ করি'—এ মনোভাব আঁকড়ে ধাকা ঠিক নয়। প্রত্যেক কাজেরই একটি বিশেষ ধারা আছে, নিজেকে সর্বতোভাবে এর উপযোগী প্রমাণ দিতে হবে। নির্ধারিত কাজ সম্পর্কে যেখান থেকে বাহাই জানা সম্ভব, সকল উৎসাহ ও আগ্রহ থাকতে হবে তা অবিলম্বে জেনে নেওয়ার জন্য। মোটের উপর, নিয়োগকারী-সংস্থায় নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে এবং সেখানে এর পুরস্কারও একদিন না মিলে পারবে না।

পঞ্চম সূত্র:—নিজের মনোভাব বা বক্তব্য স্পষ্ট করে প্রকাশের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে অনেকখানি। কেন না, এর অভাবও চাকরীর ক্ষেত্রে উন্নতি বা অগ্রগমনের পথে বড় রকম বাধা হয়েই পড়ায়। পর লেখা বা যে কোন বিবরণ লেখাই হোক—বক্তব্য বিষয় কতখানি সুস্পষ্ট, স্পষ্ট ও প্রাজ্ঞ হলে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকেই। কাজের অঙ্গ হিসেবে কোথাও কথাবার্তা বা আলোচনা করতে হলেও এই দিকটার নজর চাই পূরোপুরি। স্মরণ ভাষায় লিখিত পত্র ও স্মারক-লিপিসমূহ—যা হাত দিয়ে যেতে পারে সেগুলো বার বার পড়ে উহাদের বিশেষত্ব কোথায়—সঙ্গে সঙ্গেই জেনে নেওয়া ভাল। টেলিফোনে কথাবার্তার কালেও ভব্যতা ও শিষ্টতার দিকে নজর রাখতে হবে। অল্প সময়ের ভিতর সবটা বক্তব্য যেন বুঝান যায় এবং বুঝে নেওয়া চলে—সেটিও নিশ্চয়ই দেখবার।

ষষ্ঠ সূত্র:—বহন যে বিভাগে ও যে বিষয়ে কাজ থাকবে, উহার কি কি ভাবে আরও উন্নতি সম্ভব, সে সম্পর্কে প্রস্তাব করতে হ'বে বুঝামাত্র। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার অধিকারী জানতে পারলে কর্তৃপক্ষের নজর আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না এবং এইখানেও স্বতঃস্ফূর্তই থাকছে কর্মদায়িত্ব বা অর্থোপায় বাড়াবার নিশ্চিত সন্ধান। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব বা স্থপারিশ করতে হলেও সঠিক নানা বিষয়ের পত্তর পড়াচনোর প্রয়োজন কিছুমাত্র অব্যাহত নয়। বক্তব্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বহু বর্ধিত করা যাবে,

এগিয়ে যাবার সাহসও বৃদ্ধি পাবে সেই পরিমাণেই। সুযোগ পেলে 'বস' বা উপরস্থ যিনি, তাঁর কাছে বিভাগীয় প্রদ্র ও সমস্তা কি, জেনে নিতে হবে। তারপরই মীমাংসার পথ খুঁজে বার করবার জন্তে হয়ে উঠতে হবে একান্ত তৎপর।

সপ্তম সূত্র :—আদবকায়া যেমন দ্রবন্ত চাই, তেমনি পোষাক পরিচ্ছদেও ফিটফাট থাকতে হবে, কল্লত যিনি যে পদে আছেন, তার উপযোগী। এ ব্যাপারে কোনপ্রকার গোড়ামির মনোভাব রাখলে চলবে না—প্রয়োজনটাকেই বড় করে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চুল ও পোষাকের অগোছালো সজ্জার জন্তও প্রমোশন বা পদোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রইলো। চাকরী করতে এসে লজ্জা সন্দোহ ও ভয়—এ কয়টি পিছুটানা গুলকে ছাড়তে হবে একবারেই। অপর দিকে যিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক, সে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলাই হবে তাঁর প্রথম লক্ষ্য। আপনাকে প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে দেখবার যেন কোন অবকাশ না থাকে সেখানে।

অষ্টম সূত্র :—যেখানে কাজ করতে হবে, পরিবেশ ও আবহাওয়াটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে আগে থেকেই। হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে, কিছু সংখ্যক সহকর্মী পিছিয়ে পড়লো, আবার কতক জন প্রমোশন পেয়ে গেল চটপট। কি কি কারণে এমনটি হ'তে পারে, বিশ্লেষণ করে বুঝতে জানতে হবে, যেমন করেই হোক। তা হলেও

এগিয়ে যাবার পথগুলো হবে ক্রমশঃ পরিদৃষ্ট এবং কাজ করবার উত্তমও জুটে যাবে মনের ভিতর প্রচুর। উন্নতির প্রতি বাগদে লক্ষ্য আছে, ধীরে সত্যি সত্যি উত্তোঙ্গী—তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেও যথেষ্ট কাজেরই হবে।

নবম সূত্র :—নিজের কাজ সত্যি কিরূপ সন্তোষজনক হচ্ছে, তা যাচাই করে নেওয়ার মনোবৃত্তি না রাখলে চলবে না। এক্ষেপে যেপদে অধিষ্ঠিত, সেপদে কাজ করতে যিধা বা আপত্তি নেই, এতটুকু অযোগ্যতা বা অক্ষমতা নেই, কর্তৃপক্ষকে যেন এইটি স্বীকার করতে হয়। তারপর এও যেন তাঁরা কাজকর্মের কীক্রে বৃদ্ধিতে পাবেন যে, উপরের পদের জন্ত প্রত্যাশা রয়েছে এবং প্রার্থী এর অমুশৃঙ্খল নয় কোন দিক থেকেই।

দশম সূত্র :—প্রমোশনের পথে কোন বাধাই নেই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হবে। অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানই আছে, যেখানে মালিক বা কর্তৃপক্ষ আপনি হয়ত টাকা বাড়িয়ে দিলেন না কিংবা পদোন্নতি ঘোষণা করলেন না। সেখানেই বিশেষ করে প্রার্থী হবার তথ্য সঙ্গত দাবী জানাবার প্রদ্র থাকে। এইট করতে গেলেও বতটা সন্তব উত্তেজনা এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করতে হবে এবং প্রমাণ তুলে ধরতে হবে—নিজে সত্যি কতখানি যোগ্য, সক্ষম ও অধিকারী। এ ভাবে অব্যাহত চেষ্টা, উত্তম ও সফল ধীরে রইলো, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন না হয়ে পারেন না, এইটুকু বলতে পারা যায়।

ঔষধিক তেলস্ফোর জিঞ্জি



ডে.সি.মজুমদার

এও সক্ষম

জুয়েলার্স

১৮৫/২. বণমাজার স্ট্রীট • কলি ১২

ফোন- ৩৪-১৪৩৭



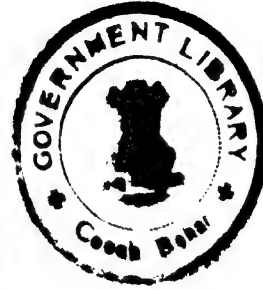
আমাদের আদার প্রতিফলন করিবার জন্য • ফোন-৭৯

## টুকিতাকি

এই বৎসর চীনাধীশায় রপ্তানি বারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে ষাটতিনের বৃদ্ধিশ পূরণ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ব্যবসায় মহলের হিসাব অনুসারে এই বৎসর চীনাধীশায়ের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। আশা করা যায় যে, বজের হিসাবে এই বৎসর ২৫ লক্ষ টন উৎপন্ন হইবে। গত মরশুমে আনুমানিক ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টন বীজ উৎপন্ন হয়। ভারতে সাধারণতঃ ২০ লক্ষ টন (বীজ) খরচ হয়। এই বৎসর আভ্যন্তরীণ খরচের পরিমাণ ২১ লক্ষ টন (বীজ) হইতে পারে। সুতরাং প্রায় ৪ লক্ষ টন বীজ রপ্তানি করা যাইবে। তৈল নিদ্রাশন করা হইলে উক্ত বীজ হইতে প্রায় দেড় লক্ষ টন বাদাম তৈল পাওয়া যাইবে। \* \* \* বর্তমান মরশুমে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ভারতের চিনিকলগুলিতে চিনি উৎপাদন এবং চালানের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ লক্ষ ৫১ হাজার টন এবং ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার টন ছিল। পূর্ব বৎসরে একই সময় পর্যন্ত উক্ত যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টন এবং ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টন ছিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে চিনিকলগুলিতে ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টন চিনি মজুদ ছিল (গত বৎসরে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন)। \* \* \* ভারতে যে সকল রাজ্যে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল রাজ্যে সরকারের সহযোগিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় নারিকেল কমিটি নারিকেল চাষা উৎপাদনের জন্য ২৩টি নাশারী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নারিকেলচারীদের সরবরাহ করিবার জন্য এই সকল নাশারীতে সর্বোচ্চ বার্ষিক ৩,৩২,৫০০ বাছাই নারিকেলচারী উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। নাশারীগুলি মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অন্ধ্র, মহীশূর উড়িষ্যা, বোম্বাই, পশ্চিম বাংলা এবং আসামে স্থাপন করা হইবে। \* \* \* ভারত হইতে বিদেশে তামাক-পাতা রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭ কোটি ২৮ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা (১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড) রপ্তানি হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে তামাক-পাতা রপ্তানি হইতে ভারত প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আলোচ্য বৎসরে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়। আলোচ্য বৎসর ভারতে তামাকের চাষ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে আবাদী জমির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৬০ হাজার একর এবং উৎপাদন ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টন ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে আবাদী জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ হাজার একর এবং ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ছিল। প্রতিভুল আবহাওয়ার জন্যই আবাদী জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। \* \* \* ১৯৫৪-৫৬ সালে ভারতীয় রেলপথগুলিতে প্রতি তের ঘণ্টায়

গড়ে একখানি করিয়া নতুন ইঞ্জিন স্থাপন করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় রেলপথে মোট ৬৬৮টি নতুন ইঞ্জিন চালু করা হয়। তদ্ব্যতী 'অধিক্রান্ত বয়স' (যতদিন চালান উচিত তদপেক্ষা অধিক দিন চালু) ইঞ্জিন বদলী করিবার জন্য ৬৩৬টি নতুন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হইয়াছে। \* \* \* ভারতে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য বৃটিশ যন্ত্রবাজার 'এ সি সি ভিকার্স' এবং 'বাবকক ও উইলকক্স' প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে দুর্গাপুরে একটি সবুজ কারখানা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। এই কোম্পানীর মূলধন হইবে দুই কোটি টাকা। \* \* \* ১৯৫৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টন ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকার কলিকাতা-সোভিয়েট বাণিজ্য এজেন্সির সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা চালাইতেছেন। \* \* \* টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড-এর এক সংবাদ প্রকাশ যে, অক্টোবর মাসে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৭১,৮০০ টন হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫১,৭০০ টন। \* \* \* ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরকারের প্রয়োজনীয় কয়েক শ্রেণীর জব্য কেবলমাত্র কুটিরশিল্প হইতে ক্রয় করা হইবে। \* \* \* ভারতে তৈল নিদ্রাশন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত এবং কি ভাবে শিল্পের উন্নতি করা যায় সেই বিষয়ে সুপ্রাশি করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তৈলবীজ শোধনশিল্প তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখল করিয়াছেন। কমিটির মূল সুপ্রাশিগুলি নিম্নরূপ—(১) যন্ত্রজালিত তেলকলের তুলনায় ঘানিতে আধকতর সাব্যস লোক নিয়োগের সম্ভাবনা আছে। ভারতে সম্ভাব্য মোট উৎপাদিত তৈল নিদ্রাশনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস পাইলেও, ঘানি-শিল্পের সর্বপ্রকার উৎসাহদান প্রয়োজন। (২) কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে তৈলকলগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ভারতে আর কোন বিদ্যুৎজালিত তৈলকল স্থাপন করিতে দেওয়া সম্ভব হইবে না। একমাত্র তিসি ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে তৈলকলগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে তৈল নিদ্রাশনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। \* \* \* এই বৎসর যে মাসে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংস্থা (ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া) স্থাপিত হয়। সংস্থাটি প্রথম পাঁচ মাসে আমদানি ও রপ্তানি খাতে মোট ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদন করে। \* \* \* ভারত সরকার ১৯৫৪-৫৬ সালে কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্পে উৎপন্ন প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা মূল্যের জব্য ক্রয় করেন। উহার পরিমাণ ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৭৪ লক্ষ টাকা ছিল। এই সকল জব্যের মধ্যে হোসিয়ারী জব্য, নারিকেল-ছোঁকড়ার জব্য, কপল, তাল, চামড়ার জব্য ও তাঁবুর সরঞ্জাম ইত্যাদি ছিল। \* \* \* ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে মহিলাদের অর্থ সম্বন্ধ আলোচন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত এই খাতে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

। মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ববিশিষ্ট প্রচারিত সাময়িকপত্র ।।



গৌরের শিশির  
স্নান  
স্নিগ্ধ, অম্ললিত!

পণ্ডু ট্যালকাম পাউডার  
সারাদিন স্বচ্ছন্দে রাখবে

পণ্ডু ট্যালকাম পাউডার ব্যবহার করলে দারুণ গরমের দিনেও  
আপনার স্নিগ্ধ ও সতেজ মনে হবে। এর মনমাতানো গন্ধ  
সারাদিন গায়ে লেগে থাকবে।

পণ্ডু ট্যালকাম পাউডার আপনার কোমল ত্বকের জন্তে  
বিশেষভাবে তৈরী। ঝাঁঝের মুখের কোঁটো দেখে কিনবেন।



পণ্ডু ট্যালকাম পাউডার

## অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীমালতী গুহ-রায়

বাঁকুড়া জেলার অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীকে বিখ্যাত ও তাঁর নাম করে তুলতে এবং বঙ্গ ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ করিতে বঙ্গাব্দ ১২৬০ সালের ৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার দিন রামচন্দ্র দুখোপাধ্যায় ও ভ্রামারদেবীর সঙ্গায়িত্বের প্রথম অমৃতকলরূপে শ্রীশ্রীমাতাশ্রীসারদা দেবীর শুভ আবির্ভাব হয়েছিল।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে সারদা দেবী নিজেকে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, ঠাকুরের সহধর্মিণী ছাড়া তাঁর যেন অন্য কোন পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু কোন একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব অপর একটা বিরাট ব্যক্তিত্বকে কখনই বিলোপ করে ফেলতে পারে না। একদিন না একদিন তার প্রকাশ হয়ই। কাজেই নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে ফেলতে চাইলেও সারদা দেবী তা পারেননি।

একশো বছর অতীত হয়ে গেছে, সারদা দেবীর শুভ আবির্ভাব হয়েছিল। আজ মানুষের সেই সময়কায় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনধারা আর নেই। তাদের সরল বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, তার পরিবর্তে এসেছে নানা জটিলতা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ। কিন্তু এ দশকের যুগেও অসংখ্যের মনে আছে মানুষ সারদা দেবীর মাহাত্ম্যকে। ক্রমে ক্রমে আপন মহিমায় প্রকাশিত হচ্ছেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী।

সারদা দেবীর নবম দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু তো মুছে যায়ই নি বরং দিনে দিনে বেশী করেই ফুটে উঠছে। আজ তাঁর মৃত্যু শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে অশ্রুসিক্তা, সারা বিশ্ব তার পূজার আয়োজন। তাঁর দেবী-আসন পাতা হচ্ছে বিশ্বের হাজারেকালাকে, আর তাঁরই উদ্দেশ্যে বজ্রমুখ উচ্চারিত হচ্ছে, 'ও হ্রীং মর্কটদেবসেবায়রূপিত্যৈ সারদাদেব্যৈ স্বাহা।' শতসহস্র মন্তক দিয়ে পড়ছে ভক্তিরে তাঁকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

সারদা দেবীর জীবনকাহিনী আলোচনা করলে আমরা তার মনের হারিয়েবাওয়া আদর্শ সর্বত্র সম্যক ধারণা করতে পারি।

যদিও সারদা দেবীর জীবনালেখ্য সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা সমুদ্রসামুদ্র নয়, তবু বহুটা আমরা সারদা দেবী সর্বত্র জানতে পারি, তাতে এটুকুই বোঝা যায় যে, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভারতবর্ষীয় যে আদর্শকে জন্মসমাজে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সারদা দেবীর মধ্যে তা সম্পূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগই ভারতীয় আদর্শ। সেই আদর্শের বিকাশ দয়া, ধৃতি ক্ষমা, সত্য ও প্রেমে। সারদা দেবীর মধ্যে এই সব কিছুই আমরা প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

সারদা দেবীকে বর্ষাৰ্ধ ভাবে বুঝতে হলে তাঁর অতি শৈশব থেকে অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভাবে তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণগণ্যে পৌঁছেছিলেন, যে ভাবে জনগণচিতে দেবী-আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তাই আমাদের দেখতে হবে। তবেই আমরা জানতে পারবো যে, অসাধারণগণ্যে পৌঁছাতে হলে ও ঐতিক পারমাধিক মানবজীবনে যা কিছু কামা তা লাভ করতে হলে মানুষকে ছুটাছুটি করতে হয় না, কোন দৈবী রূপার অপেক্ষা করতে হয় না; বিদ্বেষ করে বা বলিষ্ঠ দাবী প্রকাশ করেও নিতে হয় না। মানুষের নিজের মধ্যেই থাকে সব কিছু ক্ষমতা। শুধু তার বিকাশ করার জন্য চাই নিজের অনলস চেষ্টা। আদর্শ অনুযায়ী ফুটে ওঠার জন্য আধ্যাত্মিক চেষ্টা থাকলে হাইয়ের কোন বাধাই তাকে ঠেকাতে পারে না। বরং পারিপার্শ্বিক বাধা-বিঘ্ন আপনা হতেই সরে যেতে থাকে।

সারদা দেবী জন্মেছিলেন এক অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীতে। পাণ্ডিবে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিতা না হলেও অন্তরের যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে তিনি লালিতা-পালিতা হয়েছিলেন, তাতে তাঁর দেবীজন্মানিষ্ঠ স্বভাবের ক্রমবিকাশ যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধার্মিক সদাশয় পিতা, ধর্মপরায়ণা পরমধৃৎকাতরা অতিথিবৎসলা শ্রেয়ময়ী মাতাকে জানোমোষের সঙ্গে সঙ্গে সারদা দেবী দেব-দেবীজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। কষ্টারূপে তিনি তাঁর সাধামত সঙ্গারের কাজ করত নিজ হাতে করে পিতামাতার পরিশ্রম লাঘব করতে সচেষ্ট থাকতেন। শিশু বয়সেই তাঁকে দেখা যেতো উৎসাহের সহিত মাঠ গিয়ে মজুরদের গুড়-মুড়ি দিয়ে আসতে, গলা-জলে জুবে গরুর জন্ত দলদল করে আসতে, গাছ থেকে তুলে তুলে এনে তা দিয়ে পৈতে তৈরী করতে, আবার পঙ্গপাল এসে ধান খেয়ে গেলে জমিতে পড়ে-থাকা ধানগুলি হুড়িয়ে কচি হাতের মুঠি ভরে জয়ে জমা করে রাখতে, এমনি ধারা আরো কত কি! উত্তর জীবনে সেবাময়ী নারীর সেবা কাজ শুরু হয়েছিল যেন এভাবে অতি শৈশব থেকেই।

শৈশব থেকেই অনন্তমূলত গাভীর্ধ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ধর্মপিতা, কঠোরপরায়ণতা ও মাতৃভাব বিকাশের আভাস অত্যন্ত কম বয়স থেকেই পাওয়া যায়। শৈশব-চাপা একদিনের ক্ষণও যেন তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি! খেলাতে বসেও তিনি দায়িত্বশীলা গৃহকর্ত্রী সাজতেই ভালবাসতেন। তিনি হতেন মা। আবার খেলার সাথীরা বগড়া করলে তিনিই মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিতেন। তাঁর নিজস্ব প্রিয় খেলা ছিল মাটির 'কালী' 'লক্ষী' ইত্যাদি মৃদুপুঞ্জা করা। ঘরকন্না বা পুতুলখেলা নয়। ফুল বেলপাতা নিয়ে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তিনি বনন পুঞ্জা করতে বসতেন, তা দেখা একটা উপভোগ্য জিনিষ ছিল। মৃদুই সমুদ্র

ধানস্থ প্রতীমার মত তাঁর নিশ্চল শিল্পমূর্তি সকলের মনে বিষম ও শঙ্কার উজ্জেক না করে পারতো না।

এ-হেন সারদা দেবীর বিয়ে হয়েছিল, দেবীর বরপুত্র যুগাবতার ত্রিঈশ্বরামকৃষ্ণদেবের সাথে। যখন তাঁর বয়স তেইশ আর সারদা দেবীর মাত্র পাঁচ : বিবাহ অনুষ্ঠান বৃথাবার বয়স সারদা দেবীর হয়নি ; কাজেই তিনি কিছু বোঝেনও নি। তাই শশুরবাড়ী কামারপুকুর গিয়ে তিনি নিশ্চল মনে খেজুরতলায় খেজুর কুড়াতে বসতেন। আর লোকেরা এসে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতো। 'এই! মেয়েটিই গদাধরের বো না?' সারদা দেবী তখন চুটে পালতেন।

বিয়ের পর সারদা দেবী নিজ বাবা-মায়ের কাছে জয়রামবাটাতৈই থাকতেন, আর ঠাকুর থাকতেন দক্ষিণেথয়ে। বিয়ের দুই বৎসর পর কি একটা উপলক্ষে ঠাকুরকে জয়রামবাটা আসতে হয়। সারদা দেবীর বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। কিন্তু দিখি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বধূর মতই তিনি খাট ভেগে জল এনে স্বামীর পা ধুইয়ে, নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। তখনকার কুলপ্রথাই তাই ছিল। তারপর পাখা হাতে করে এসে আবার স্বামীকে বাতাস করতে থাকলেন। অতীত দেবতার সেবার স্মরণ পেয়েছেন যেন।

তারপর আবার যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হল, তখন তিনি একটু বড় হয়েছেন। বয়স তখন তাঁর তেরো বৎসর। বলতে গেলে এই-ই ছিল তাঁর প্রথম স্বামি-সাক্ষাৎকার।

তেরো বৎসর বয়স এমন কিছু পরিপক্ব বুদ্ধি হবার বয়স নয়। কিন্তু সারদা দেবী বয়স অনুপাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীর আগমন সংবাদে তার মনে নানা রকম বিতর্ক শুরু হল। সব প্রথম তাঁর ভয় হল, এত দীর্ঘ দিন পর স্বামী তাঁকে চিনতে পারবেন কি না। তিনি শুনেছেন, রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টায় বিশ্ব-দুনিয়া ভুলে বসে রয়েছেন, কাজেই এতদিন পর তাঁকে চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি যখন সাধক, তিনি যখন যোগী, ঈশ্বরপ্রাপ্তিই যখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তখন নিজ সাধনের বিষয় খটার ভয়ে তাঁকে স্বীকার ও বর্ণন করাও কিছুমাত্র বিচির নয়।

কিন্তু পরমহংসদেব ব্রহ্মজ্ঞানী। সর্বজীবো তিনি সমদর্শী। কাজেই তাঁর কি আর আত্মীয় অনাত্মীয়, নিকট দূর সম্পর্ক বা নারী পুরুষের কোন ভেদজ্ঞান আছে? মাতৃভাবের সাধক তিনি, রমণীমাজেই যে তাঁর মা। তাঁকে তাঁর ভয় কিসের? আর তাঁকে তিনি সাধনের বিষয় কি করেই বা মনে করবেন?

## মনের কথা

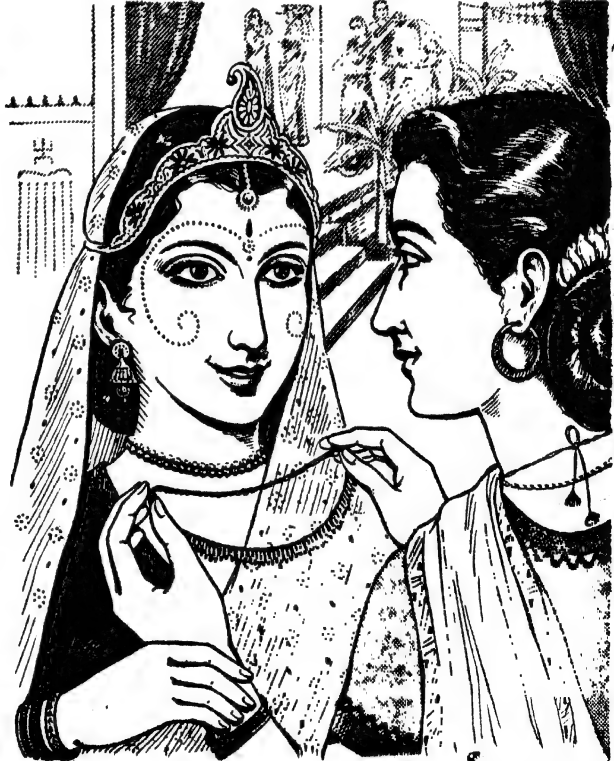
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিরাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

মিনি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলঙ্কার  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



দর্শনমাত্রই সারদা দেবীকে তিনি চিনতে পারলেন। শুধু তাই নয়, পরম স্নেহে তাঁকে গ্রহণও করলেন।

ঠাকুরের প্রথম কাজই হ'ল সারদা দেবীকে আপন আদর্শ মত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। সাধন দিয়ে যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা তিনি অর্জন করেছিলেন, সারদা দেবীর শিক্ষা ব্যাপারে সেই একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা নিয়েই তা সূত্রভাবে সম্পাদন করতে অগ্রসর হ'লেন। ঠাকুর ছিলেন অন্তরদর্শী। যদি জটীক অন্তর দিয়ে গ্রহণ না করে সাধনে বিশ্ব হবার ভয়ে দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাহলেই হয়তো জী তাঁর সাধনপথে বিঘ্ন হতে পারতেন। তা ছাড়া ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশ যতটা কার্যকরী হয়, তা শুদ্ধ মৌখিক উপদেশে হয় না। কাজেই তিনি সারদা দেবীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

গ্রহণ ও বর্জনের সংশয়দোলায় দোলায়মানা ভীকৃ কিশোরী বধু সারদামণি স্বামীর স্নেহে আত্মবলে সর্বান্তঃকরণেই সাড়া দিলেন ও পরমশুভকাজে তাঁর আদর্শে ও শিক্ষায় গড়ে উঠবার জন্য সচেষ্ট হ'লেন। 'কাজ কর, কর্তব্য কর'। 'শরীর কেবল্য কর'। 'কৃপা হলে তুমিও পাবে ভগবানের সাক্ষ্য'। এই ছিল তাঁর প্রতি ঠাকুরের উপদেশবাণী।

কিশোরী বধুকে একটুখানি স্নেহপশ, কিছু উপদেশ ও ভবিষ্যৎ আদর্শের একটা সন্ধান দিয়ে ঠাকুর অল্পদিনেই আবার দক্ষিণেশ্বর চলে গেলেন। সারদা দেবী সন্তোষপ্রাপ্ত স্বামীর উপদেশ ও শিক্ষার বীজটুকু অন্তরে গেঁথে, ভবিষ্যৎ মহান আদর্শের জন্য তৈরী হতে থাকলেন। স্বামীর আহ্বান প্রতীক্য করেই ধৈর্যের সঙ্গে তিনি নিজ পিতৃালয়ে থেকে গেলেন। স্বামীর সঙ্গে যেতে চাইলেন না।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে ঠাকুর কিন্তু নিজ সাধনে এমন মগ্ন হলেন যে, জী, সাংসার, বিশ্বহুনিয়া সবই ভুলে গেলেন। কিশোরী বধু সারদা দেবী এসব কিছুই জানলেন না। তিনি শুধু তাঁর স্বামীর আহ্বান প্রতীক্যই রইলেন। স্বামীর স্নেহে সারদা ব্যবহার তাঁর সব সময় মনে পড়তো; আর তিনি জানতেন তাঁর স্বামীর আহ্বান আসবেই। কাজেই তাঁর দীর্ঘবিরহের সময়টুকু ঐ স্পর্শ পাওয়া স্বামিসন্নিধানরূপ আনন্দমুহুর্তির বস আরাধন করেই কাটতে থাকলো।

তাঁর জীবনে যেন একটা আনন্দের প্রাবন এসে তাঁকে দুইয়ে দিয়ে গেছে। তাই নূতনতর মানুষ হয়ে তিনি স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, জ্ঞাপে মগ্ন হতে মগ্ন হতে লাগলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'সর্ব অবস্থার নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষাই শিক্ষা'। সারদা দেবী সেই শিক্ষাকেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাই হৃদয় কিয়ৎকালে তাঁকে একদিনের তরুণ অধৈর্য হতে দেখা যায়নি।

কিন্তু পরমহংসদেবের ভাবোদ্রাবনার সর্বদা স্বপ্ন ক্রমেই বিকৃত রূপে প্রচারিত হতে হ'তে লব্ধমমবাণী পর্যন্ত পৌছাল যে, তিনি নাকি খোর উমাদ হয়ে গেছেন, সারদা দেবী তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রথমে অবশ্য তিনি সন্ধানটি বিচার করেন নি। কিন্তু ক্রমেই প্রতিবেশিনী গ্রামবাসিনীরা যখন তাঁর প্রতি অমূল্য, মহাভক্তি ও বেদনার ভেঙ্গে পড়তে লাগলেন, তখন তিনি অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সারদা দেবীর বয়স তখন আঠারো বৎসর। বিচার-বুদ্ধির বয়স

হয়েছে। তিনি নিজেই স্থির করলেন, ঘটনা যদি সত্যই হয় তবে এসময় স্বামীর কাছে থাকাই জী হিসাবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর ৬০ মাইল দূর। তিনি কি করে সেখানে যেতে পারেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না। হেঁটে যাওয়া ছাড়া তো কোন উপায়ই নেই, কেন না—পাঠাতে বাওয়া ব্যয়সাধ্য। অল্পপায় হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন এক মনে। কেন না, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, এবং ছুরিলের বল।

ঐকান্তিক প্রার্থনা বিফল গেল না। সারদা দেবীর পিতা কার্যকর জন স্নানার্থী যাত্রীর সন্ধান পেয়ে সারদা দেবীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করলেন। পথের অনভ্যস্ত শাস্তি ও ক্লান্তিতে রাস্তায়ই সারদা দেবীর প্রবল জ্বর হ'ল। কিন্তু তিনি কমে যান নি। জ্বর ছাড়তেই আবার হাঁটা শুরু করলেন। সর্বশ্রমকার পথের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে এসে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন।

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে স্বামীকে কি অবস্থায় যে দেখতে পাবেন, এই চিন্তাটি সারদা দেবীর সারা পথ ধরে মনকে অভিভূত করে রেখেছিল। তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছামাত্রই আর কোন দিকে দৃকপাত না করে সোজা ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লজ্জানীলা সারদা দেবীর কোন সঙ্কোচোবাটুকুও রইল না।

স্বামীর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ দেখে তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু বৃদ্ধিমতী সারদা দেবীর আনন্দের সাথে সাথেই ভয় হ'ল যে, স্বামী তো তাঁকে ডাকেন নি। বিনা আহ্বানে তিনি তাঁর সাধনে বিশ্ব যটাতে এসেছেন ভেবে যদি ঠাকুর অসন্তুষ্ট হ'ন? কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষ্য হবার সাথে সাথেই তিনি যে রকম উৎক্লান্ত ভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন, তাতে সারদা দেবীর স্বয়ং-মন জুড়িয়ে গেল।

অন্তস্থা সীর্ণ ও পথিক্রান্তা জীকে তিনি চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। নহবতঘরে ঠাকুরের মা থাকতেন। প্রথম দেখা-সাক্ষাতের পর শ্রম হলে সারদা দেবী নহবতখানায় গিয়ে থাকতে চাইলে ঠাকুরের কি বাস্তবতা। 'কতদূর থেকে এসেছে! তাতে আবার এ রকম অন্তঃখ। তোমার ডাক্তার দেখাতে হবে যে। নহবতঘরে তো ডাক্তার যেতে পারবে না। তুমি বরং এট ঘরেই থাকো। আমিই নিজ হাতে তোমার সেবা করবো, ওষুণপথ্য দিয়ে তোমায় সারিয়ে তুলবো। আজ যে মথুরই বেঁচে নেই, কে আর তোমায় আদর-বড় করবে?'

রইলেন সারদা দেবী ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুরের কাছে। আর সত্যিই ভোলানাথ সন্ন্যাসী চিকিৎসা-বস্ত্র ব্যবস্থা করে তিনচার দিনেই ধর্মপত্নীকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর সারদা দেবীকে বললেন, 'এবার তো তুমি সুস্থ হয়েছ, এখন তুমি গিয়ে মার কাছে নহবতখানায়ই থাকো।' অল্পগতা সারদা দেবী নহবতখানায় চলে গেলেন। নিয়ে গেলেন সাথে বুকভরা ভূক্তি আর মনভরা আনন্দ। এমন গোবোপস্ব স্বামীর তিনি জী।

কিন্তু সারদা দেবী নহবতঘরে চলে যেতেই ঠাকুরের মনে হল, 'সর্বভুক্তই যদি আমার মা জননী আছেন, তবে শুধু ওতেই কি তিনি নেই? মাটার কাঠামোতে দেব-দেবীর আরাধনা হতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে, আর মানুষের কাঠামোতেই কি হয় না?



সারলাকে কি আমি তবু শেষে সরিয়ে নিলাম? নরনারীতে কি কোন  
অভেদ আছে?

গুরু তোহা সুবীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একদিন  
বলেছিলেন, 'প্রাক দূবে গরিয়ে বেথ যেকামজয়, সে তো অতি সহজ  
কথা। কামনারূপী প্রীকে পাশে বেখে যদি কামনা জর করতে পার,  
তবেই তো আসল কামজয়।' গুরুবাক্য শ্রবণ হতেই তিনি  
সারলা দেবীকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে এসে থাকতে এবং তাঁর  
পাশে এসে শুতে। সারলা দেবী নিজ থেকেই অবাচিত ভাবে  
দক্ষিণাধরে এসেছেন, তিনি তো তাঁকে ডাকেন নি? কাজেই  
গুরুবাক্য প্রবণ করার ভ্রমোগ নিজ থেকেই আজ এসেছে। এখনই  
তাঁর আত্মপরীক্ষার পালা।

[ক্রমশঃ]

এমনি ভাবে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। কিছুদিন থেকে  
সীতা দেবী লক্ষ্য করছেন, লছমীর আর আগেকার মত সহজ সরল  
উচ্ছাস ও হেসে ভেঙ্গে পড়া ভাব নাই। সব সময়ই কেমন যেন  
তাকে অন্তমনস্ক দেখায়। বাড়ী বাবার জন্ম লছমী সর্বদা উদ্বুখ।  
একটা কাজ করতে গেলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। কাজেও আগের  
মত উৎসাহ নাই। দেখে শুনে সীতা দেবী গভীর হয়ে যান।

চা-বাগানের পাশের এক বস্তিতে থাকে বুড়ো জলবাহাদুর ও  
তার ছেলে লালবাহাদুর। শোনা যায়, বুড়ো আগে কোন চা-বাগানে  
কলওয়ালার কাজ করে কিছু পয়সা বোঁজগার করেছিল। তার ছেলে  
লালবাহাদুর কিছুদিন পুটনে কাজ করত। তার পর নানান  
জায়গার ঘুরে সেবার বখন দেশে ফিরে আসে, তখন তার শরীর খুবই

## লছমী

### কণিকা দাস

একটি বেনারী ভাগট চা-বাগান।

বহু দূর থেকে চোখে পড়ে, খালি  
সবুজ চায়ের থোকা থোকা গাছ গড়িয়ে চলে  
গিয়েছে দূর-দূরান্তে। মাঝে মাঝে পুরে  
লাল ছতান ছ'-একটা বাগো ও চায়ের  
কারখানা, চারিদিকে পাহাড় আর মধ্যে কত  
দূর-দূরান্তে নাম-জানা ছোট-বড় চায়ের  
বাগান। মধ্যে মধ্যে বরণার কলোলে রহস্তের  
স্বষ্ট হয়।

এমনিগার একটি চায়ের বাগান কিনল  
সমিন বিখ্যাত এক ইউ, পি, ব্যবসায়ী।  
ব্যবসার সব কিছু তার নখদর্পণে। কিছুদিনের  
মধ্যেই ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল। বাগানের  
ম্যানেজারের পদে ছোট বাগোতে এসে  
তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী।  
তাঁদের ছোট্ট মেয়ে রিণার দেখানোয় জন্ম  
ঠিক হোল এক নারী। এই চায়ের কারখানার  
এক কলওয়ালার মেয়ে সে। প্রথমেই বেঙনী  
উড়নী গায়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাল-আভা গালে  
হাসিখুসী-ভরা মুখখানা দেখে সীতা দেবী এক  
নিমেষে তাকে আপনার করে ফেললেন।  
লছমী রিণাকে নিয়ে বাগানে সারাক্ষণ খেলা  
করে, তাকে ভুলিয়ে রাখে, আবার সন্ধ্যা  
লাগার আগে রিণা লছমীর কোলে বহন  
ঘুমে চলে পড়ে, তখন তাকে সঙ্গর্পণে বিছানার  
গুট্টে দেয়। তার পর সেলায় করে বাড়ীর  
মিকে পাখাড়ায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শ্রেণী এই জায়গাটিতে  
সীতা দেবীর খুবই ভাল লাগছিল। রিণাও  
লছমীর একান্ত অঙ্গগত হয়ে পড়েছিল।



অলংকার, না

কিছু কিছু!

এস.সি.সরকার এং কোং

ফটোশপিং ও ইলেকট্রিক

১২৫ বি. বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২  
মাথা ১৬৭ বি. বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

ফোন ৩৮ ২৪৩৩

হলের কলোরে  
সার্থক সস্তীত,  
আর কাপের আরোমন  
সার্থক ডামারের  
দৈরী ডামারের  
অনুগ্রহ  
শিল্পী সুমময়।

কাহিল হয়েছে। বৃকে কিসের ব্যাধি অনুভব করে। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে অন্তরমন ভাবে চূপচাপ বসে থাকে। দিনের শেষে মেয়ে-কুসুমদ্বয়ের দল সেই পথ দিয়ে বাবার পথে উঁকি মেয়ে দুটুকি হেসে চলে যায়। লালবাহাদুর উদাস নয়নে তাদের পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বুড়ো ওর একমাত্র ভরসার স্থল ছেলের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কিছুদিন যায়—পূর্ণ বিশ্রাম নেবার পর আগেকার ব্যাধি ও দুর্বলতা ভাব দূর হয়ে যায়। শোনা যায় লালবাহাদুরের প্রথম বোবনে উজ্জ্বল স্বভাবের কথা। চা-বাগান অঞ্চলের অনেক মেয়ে ওদের বস্তীর কাছে উঁকিঝুঁকি মারে। এমনি ভাবে যমুনা নামে যে মেয়ে সর্বপ্রথম ওর জীবনে দেখা দেয়, তাকে নিয়ে লালবাহাদুর পালিয়ে যায়। আবার দিনকতক বাদে দু'জনে ফিরে আসে। এমনি ওদের বিয়ের ধারা। প্রথম প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, পরে অভিভাবক তাদের মিলন ঘটায়। যমুনা দু'দিন যেতেই সরে পড়ে তার কাছ থেকে। লালবাহাদুর সন্ধ্যা হলেই নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এর পর দু'দিন যেতেই চম্পাকে সাদি করে। চম্পা এই চা-বাগানেই কুলীর কাজ করত। এই বাস্তা দিয়ে যেতেই ওদের ভাব হয়। চম্পা দিনের শেষে কৰ্ণকান্ড দেখে যেতে যেতে ধমকে লালবাহাদুরের বস্তীর সামনে আসে। লালবাহাদুর তার পটনের অনেক গল্প চম্পার সাথে করে, কিসের আবেশে দু'জনে বিবল হয়ে যায়, তার পর দু'দিন যেতে না যেতেই চম্পার মন বিক্রম হয়ে যায় লালবাহাদুরের ওপর, ডুল ভেঙ্গে যায়। পালিয়ে চলে গিয়ে মুক্তি পায় চম্পা।

বেশ কিছু দিন চূপচাপ থাকে লালবাহাদুর। এর পর বীরে দেখা যায় তার প্রসাধনের চাক্ষুতিকা। মাইল দু'রেক দূরে একটা চা-বাগানে চৌকিদারির কাজের আশা পায়। এমনি যুগুর্ভে একদিন বাড়ী কোয়ার পথে লছমীর সাথে দেখা হোল লালবাহাদুরের। লছমী ওর আগেকার ঘটনা সবই জানে, কিন্তু চোখে-মুখে এমন ছেলেমানুষি ও সরলতা ভরা মুখ দেখে লছমী সহজেই লালবাহাদুরকে বিশ্বাস করে ফেলে। রোজই কাজের শেষে লছমীর সাথে লালবাহাদুরের দেখা হয়। তাই ছুটা পাবার জন্য লছমীর মন-প্রাণ সর্বদা চকল হয়ে ওঠে। বাড়ী কিরবার আশায় মন তার উন্মুখ হয়ে যায়। লছমী লালবাহাদুরের দেখা পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি ব্যস্তির দিকে চলে।

এর পর প্রায় কিছু দিন কেটে যায়। এক দিন দেখা গেল লছমী কাজে অনুপস্থিত। পর-পর প্রায় চার-পাঁচদিন কেটে বাবার পুত্র সীতা দেবী তরুণ বাবুর মারকত কাৰখানার কলওয়ালকে খোঁজ করলেন। কলওয়ালার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, লছমী, লালবাহাদুর নামে এক উজ্জ্বল স্বভাব লোকের সাথে পালিয়ে গিয়েছে। কলওয়াল কেঁদে বলল, ছদ্ম্ব, আসি কিছুদিন রকম লালবাহাদুরের স্বভাব চরিত্রের কথা জানতাম। কত লোকের কাছ কাছ আসে, দু'দিন পরে সবাই সরে পড়ে। আমার ওর হাছে ছদ্ম্ব, লছমী ওর সাথে প্রেম করে সাদি করবে, কিন্তু মারা পড়বে ছদ্ম্ব। লছমী যদি ওকে সাদি করে তাহলে জানব আমার লালবাহাদুর হয়ে গিয়েছে।

এর পর কিছু দিন বেতেই লছমী ও লালবাহাদুর ফিরে এল

লালবাহাদুরের ঘরে। লছমীর মুখে-চোখে বেন-অবের আবেশ। উপায় নাই দেখে এর পর লছমীর সাদি হয়ে গেল লালবাহাদুরের সাথে। লালবাহাদুর দূরের চা-বাগানে চৌকিদারির কাজ শেল।

সকাল বেলা বেশ স্নন্দর বোধ উঠেছে। সীতা দেবী রিণার হাত ধরে বাগানে এসে দাঁড়াতে দেখলেন, সামনে লছমী মহা-অপরায়িত মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। রিণা লছমীকে দেখেই 'ওই যে নানী' বলে ছুটে বাঁপিয়ে পড়ে দু'বাহু বাড়িয়ে লছমীকে আঁকড়িয়ে ধরে। সীতা দেবীর মুখে-চোখে কঠোরভাব এসেও এই দৃশ্য দেখে চূপ করে থাকিয়ে রইলেন। রিণা লছমীর একান্ত অমুগত জেনে লছমী আবার কাজে স্থায়িতবে থেকে গেল, এর পর প্রায় ছয় মাস কোন দিক দিয়ে কেটে গেল। সীতা দেবী লক্ষ্য করলেন, লছমী আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে, ওর মুখের হাসি বেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখেন, লছমীর মুখ-চোখ ফোলা, চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে।

রাত বস্তীর ধার থেকে চাপা কান্নার আওয়াজও পাওয়া যায়। এর পর বুড়ো কলওয়াল কখনও কখনও তরুণ বাবুকে বলে যে, লছমীকে প্রায়ই লালবাহাদুর মারে। বুড়ো বলে যে, লছমী এখনও এসে তাকে নতুন করে সাদি দিতে পারে কিন্তু আর সব মেয়ের মত লছমী তার কথা শোনে না, খালি বসে বসে চূপচাপ মার খায়। সেদিন লালবাহাদুরের নেশাটা খুব জোরালো হয়েছিল। চৌকিদারির ঘটা দিয়ে রাতে ঠিক মত সময়ে রান্না হয়নি জেনে লছমীকে বেজায় মারধোর করল। লছমীকে এত বেশী মেরেছিল সেদিন যে নীল কালশিরা পড়েছিল ওর সারা দেহে।

সকালে কাজে দেবী করে গেল লছমী। সীতা দেবী লছমীকে জিজ্ঞাসা করতই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। গতরাত্রেয় ক্ষতস্থানগুলো দেখা যায় ওর সারা অঙ্গে। সীতা দেবী অনেক বোকাসেন লছমীকে। বললেন, কেন সে এমন ভাবে নিজেকে জেনে-তেনে বিসম্মত করল একজন দুশ্চরিত্র মাতাল লোকের কাছে? লছমীকে তার বাবা বিয়ের আগে কত বায়ন করেছিল, তবুও কেন সে লালবাহাদুরকে সাদি করল? লছমী সবই জানে, সবই বোঝে, তবুও উপায়হীন ভাবে চূপ করে হুচলল চোখে তাকায় সীতা দেবীর পানে।

এর পর রোজই লছমী কাজে আসে। আগের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে, তার বললে চোখে-মুখে কিসের 'আনন্দ' বেন ফুট ওঠে। সীতা দেবী বুঝতে পারেন, লছমী ভাবা সম্ভাবনের মতো। তাই শরীরে বীরে বীরে পরিবর্তন ফুটে ওঠে, কিন্তু লছমী কাজে জোর পায় না। হাত পা ফুলে, দুর্বলতায় হাঁপিয়ে ওঠে। লালবাহাদুরের দুই ক্ষয়রোগ কখন ওর শরীরে অন্তর্ভুক্তি প্রবেশ করেছিল, নিজেও লছমী বুঝত পারেনি। দেখেতেন সীতা দেবী লছমীকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য ছুটা মিলেন। তিনি লছমীকে বললেন—শরীর বখন তার একান্ত ধারণা তখন সম্পূর্ণ ভাল না হওয়া পর্যন্ত আর কাজে আসতে হবে না।

গুণোদ্য লোক বলে ছাড়াতে খুবই মারা হচ্ছিল, তবুও সীতা দেবী বললেন, টাকার বখন দরকার হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও লছমী! বাক্য বড় হ'লে আবার কাজে এসে। যদিও তিনি নিজে ভালভাবেই জানতেন এই সন্তোষক ব্যাধির জন্য ওর প্রিয় কন্যাকে তিনি আর ওর হাতে দিতে পারবেন

না—তবুও সাধনার জন্য তিনি আশ্বাস দিলেন। লছমী ঝিনাকে একটু আদর জানিয়ে লীর্ণনিশাস ফেল চলে যায়। সীতা দেবীও স্নান মুখে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বইলেন।

কাকুন বাস। চা-বাগানের চারিদিকে নেসপাতি গাছে সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে। দূরে চাঁপাগাছে সাদা বড় বড় চাঁপাফুল ফুটে তার গন্ধে চারি দিক ভরে গিয়েছে, পাশের বস্তীর বড় গাছটার লাল থোকা থোকা ফুল ফুটে পাতাগুলো ঢেকে ফেলে গাছটা আসা করে রয়েছে।

ডিতরে দিগন্ত-বিস্তৃত চায়ের বাগান। সকাল হোতেই মেয়ে কুলীর দল রঙ-বেরঙের উড়নী পরে হাসিভরা মুখে শিঠ খুঁড়ি বেঁধে চা পাতি তুলছে। মেঘযুক্ত আকাশ রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছে।

সকাল বেলা তরুণ বাবু চায়ের বাগানে খাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। সীতা দেবী প্রাতঃরাশ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত—হঠাৎ কিসের আশ্চর্যনে তু'জনেই একসঙ্গে চমকিয়ে গেলেন। কলঙালা বুড়ো বুক চাপড়িয়ে কীদন্তে কীদন্তে বলছে, হজুর, কাল রাতে লছমী একটা মরা ছেলে জন্ম দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি ভগবানের কাছে কি দোষ করেছিলাম যে বুড়ো বয়সে ভগবান আমাদের একমাত্র কষ্ট দিলেন? লালবাহাদুরকে সানি করেই আমার লছমী এমন ভাবে মরে গেল হজুর! এই বলে চীৎকার করে মুখ ঢাকা দিয়ে কীদন্তে লাগল। তরুণ বাবু ও সীতা দেবী স্তব্ধ হয়ে বসে বইলেন, আজ সাধনার কোন ভাষাই আর তাদের মুখ দিয়ে বেরোল না।

এর কিছুক্ষণ পর সেই বস্তীর ছেলে-বুড়ো চারি দিকের জনতা লছমীর ঘরে ভেঙ্গে পড়ল। কারখানার একজন কুলী এসে তরুণ বাবুকে বলল, হজুর, বড় বাকস একটা চাই—মাটি রিতে হবে। তরুণ বাবু অজ্ঞানমুগ্ধ ভাবে বললেন, আচ্ছা বড় বাকস লে বাও।

ঘীরে সীতা দেবী বাগান ছেড়ে দূরে বস্তীর দিকে তাকালেন।

দূরের গাছটায় লালফুলগুলো যেন অশ্রুধারার লাল আঙ্গুরের মত সীতা দেবীর চোখে আসা ধরিয়ে দেয়। বাকসের কথা মনে হতেই দু'চোখ বেয়ে সবার অলক্ষ্যে অজ্ঞপ্তারা নেমে আসে, অজ্ঞানমুগ্ধের মত অবাক-বিমগ্নে তাকিয়ে থাকেন দিগন্তের পানে—কিছুদিন আগে তাঁর দুপাটে ভেসে ওঠে কচি কিশোরী মেয়ের বৌবনদীপ্ত একখানা ফুটন্ত ফুলের মত মুখ—চোখের জলের বাপসার দূরের সব কিছু কাছে মিলিয়ে যায়।

## একটি সঙ্গীত

অমিয়া সেন

সারা দিন মেঘ করেছিল। সন্ধ্যার আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। লোকগাল ট্রেনের বাতীরা উজ্জ্বল ট্রেন অভিমুখে ছুটেছে। বাড়ী কিয়তে আজ দেয়ী হয়ে গেল।

শীতের বর্ষা, তার কনকনে হাওয়া দিয়েছে, বাড়ী কিয়তে পারলে বাঁচে সবাই।

অভী যোগ শহরে সন্ধ্যা নিয়ে আসে বিকীর জন্ত, ফেরত-পথে কিছু কিছু সপলা নিয়ে যায়। আজও নিরোছে। খুঁড়িতে রয়েছে কিছু কুচো চিড়ী, পকেটে রয়েছে ছোট বোনের জন্ত দু'পজ লাল রিবণ। গাড়ীতে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখছিল রিবণ দু'টি ভিলেজে নাকি। দুর্গাপদ হুহুরী ওদের গায়ের লোক, সেও এই গাড়ীতে উঠেছে। অভীকে দেখে বললে, “এই যে অভীচন্দ্র, শীত কেমন লাগছে?”

“আর লাগা!” একটা ছেঁড়া হাকসাট আর আধময়লা খন্ডের চাবরে অভীর দেহে শীত বাধা মানছিল না। চোঁঠি হুখানি কালো হয়ে উঠেছে, হাতের আঙুলগুলি যেন আর নিজের আরত্তে নেই। তবু বিবর্ণ চোঁটে হুশীর হাসি হাসল। বললে, “শীত পড়ুক লাগা, নইলে অস্বস্তি বিন্ধুক তবে—”

দুর্গাপদ নিজের ছেঁড়া গরম চাদরখানি দিয়ে বখাসাখ্য হুড়ি হুড়ি দেবার চোঁঠা করতে করতে বললে, “আমরা যে শীত পড়লেও মরি, না পড়লেও মরি, আমাদের আর লাভ কি রে”—চল গাড়ীতে অনেকগুলি আরোহী ফিস-ফাস করে হেসে উঠল। সকলেই পরীষ, নিয় মধ্যবিত্ত। অনেক মরণ দেখেছে, অনেক বার মরে মরে আবার ঘুরে ঘুরে জন্ম নিয়েছে। তাই জীবনের মত মরনের সঙ্গেও ওদের একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভর পায় না, যেমন সহজে কাঁদে তেমন সহজেই হাসে।

ওদের মধ্যেই এক জন বলে উঠল, “তা বা বলেছেন লাগা, এই দেখুন না, হল ট্রাম ধর্মঘট, আমাদেরই প্রাণান্ত দুর্ভোগ, বেশ ভাগ হল, মরছি আমরা। যুক হাল্লামা হুজুং বাই হোক না কেন, প্রথম থাকা বাড়ি নেবার জন্ত আছি আমরা।”

মাথা নেড়ে সায় দিলে দুর্গাপদ, “ঠিক বলেছেন! শীত না

ফোন : ৩৪-৪২০৭

**বিবাহে বৌভূক**

**দানের আনন্দ একান্তভাবে**

**আপনার; আপনাকে**

**সেবা করার আনন্দ**

**আমাদের।**

**গিণি ভবন** নৃত্য রঙ্গমণী

নাট্যরঙ্গ ও স্বপ্নাশ্রয়ী

১০২, ব্রহ্মবাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২

পড়লে মারিতে উৎসাহ বাবা আমরা, কারণ গুরুত্বপূর্ণ জুটবে না। আর লীড পড়লে নিয়ুনিয়া, কারণ লীড নিবারণের মত খাতি-বস্ত কিছুই নেই আমাদের।”

আবার হাসি। সমস্ত হুগ কই যেন এদের কাছে সমুদ্রের একটি ফলোভাস—ডেউ আসে, ভীর ডোবে, আবার গরে যায় ফলরাশি। ফলোভাসিতে পড়ে স্বধাক্ষর। নতুন ঘর ওঠে—প্রত্যাবৃত্ত হুহুওঁর কথা মনে থাকে ন, মায়াজুগ মায়াজুগের কথা কথার কখন ট্রেন এসে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে। গায়ের খাতীয়া নামল।

ঐশেন মিট-মিট করছে একটা লাইটপোষ্ট। দুই লীডজর প্রায়খানির অস্পষ্ট ছায়া।

সেই দিকে তাকিয়ে আগামী দিনের রক্ত বৃক তবে নিখাস নিল মায়াজুগলি। আর একদিনের সংগ্রামের রক্ত শক্তি সক্ষম। অতী ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছে।

সবল দেহ, তরুণ যুবক। পায়ে তার এখনো অনেক জোঁর। ভুবু সে বীরে বীরে ধাঁটছে। অপ্রবর্তীরা ক্রমশঃ যে বাব বাড়ীর পথে অকৃত হল। অতী এসে একটা বাড়ীর হাওয়াঘরের জানালার কাছে দাঁড়াল।—একটু আগেরাজ হল, অস্পষ্ট। টুক করে একখানি মুখ তেমে উঠল জানালায়—সপ্তরশী। উৎকর্ষিত সুর, “এত দেবী যে।”

—“বা বৃষ্টি হল শহরে।”

—“বৃষ্টি? কই এখানে ত’ হয় নি।”

—“শহরে হয়েছে।”

—“খুব বৃষ্টি ভিজছে?”

—“না, তেমন আর কি। তোমার দানাব খবর কি?”

—“কিছু না। ও চাকরী হবে না।”

—“বলছি ওকে, আমার মত বাবা না কর।”

—“তুমি ত ছোটলোক, ওবে ভদ্রের লোক।”

অতী হাসে। অনেকক্ষণ পরে মেঘের কীক দিয়ে তৃতীয়ার টান ভাক দিয়েছে। আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। জানালার কীক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে একখানি শুকুমার হাত, সেই হাতখানি দানাব মত জড়িয়ে গেছে ওর হাতে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি কেটে গেছে প্রিয়জন স্পর্শে। গলার স্বরে উপছে পড়ল তবল পরিহাস—“ছোটলোক? আমি?”

—“নর কেন? আই-এ পাশ করেও তুমি তরকারীর বুড়ি মাথার যে হাটে বাও, তোমার কি মান-সন্মান বোধ আছে? আর আমার লে ম্যাট্রিক পাশ হলেও ভদ্রলোক।”

—“শার তুমি কল্লবতী!” (মেয়েটির নাম বৃকি?)

—“রাজরাজেশ্বরী।”

—“কোন্ রাজ্যের?”

—“বলবো কেন।”

—“বলবে না?”—নরম হাতখানির চাপ পড়ে আঙুল আঙুল।

—“উঃ, হাতখানা গুঁড়িয়ে দেবে নাকি?”

—“না, গুঁড়িয়ে নয়, মিলিয়ে দিতে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা করে আমার মধ্যে।—সারাদিন কত ঘুরে থাকি।”

—“তুমি হুগের কথা।—হলোছলো চোখে মাথা নীচু করে কথা, আরো হুটি টোটে উপছে পড়ে অভিমান।

আঙুল একখানি হাত উচু করল অতী, হুটি ঠাণ্ডা হিমেলজমা

আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল কল্লবতীর একটি কপোল, হুহুগের হললে, “না, মিছে কথা যে নয়, তা তুমিও জানো।” আবার একটু থেমে, “অপেক্ষা করো, আর একটি বছর পিউ শিয়া রাগী আমার।”

কোমল করণরবখানির উপরে একটি উষ্ণ চুখন এঁকে দিয়ে অতী গিছন ফিরলো।

আঁকা-বাকা উঁচু-নীচ পথ। পিছনের হুটি জলভরা জাঁখির জ্যোতিতে আলোকিত আনন্দিত শিলা—

চলতে চলতে বীরে বীরে একটি নিখাস ফেলল অতী। চুখে নয়, প্রত্যাপার গভীরতায়।—চারপাশের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলছে,—শিতকণ্ঠের কলর, কিশোর-কিশোরীর পড়ার ঘর কানে আসছে, রাগার অঙ্গকণ্ড তেমে আসছে কোন কোন বাড়ীর হাওরা থেকে।—একটু থেমে একবার চতুর্দিকে তাকায় অতী, মনে হয়, এই ত সব কেমন ভীষণ। কত ঝড়—কত ছুঁইব গেল এই দেশের উপর দিয়ে, কত লোকের জিটে-মাটি গেল তার মত...এক এক করে বাংলার প্রিয় নেতারা সব চলে গেলেন...ছোট পশ্চিম বাংলা আপনায় চাপে আপনি রুদ্ধশ্বাস—বিবর্ণ। এর মধ্যে আঙুল দলদলি, জনতার স্বার্থ নিয়ে দাবার চাল। আছে রিমিউজীদের প্রতি হানির লোকদের আক্রোশ—বিভূষণ।—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভাবও দেখা যায়।

সব কিছু মিলিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, “আমরা এখনো মরিণ” এই মুমূর্ষু মাটির বৃক, জীর্ণ গৃহকোটারের কীক কীক ভোলায় মন্ডর, আনন্দে বেরনার পুনরায় সমীকৃত হচ্ছে ভীষণ। যে ভীষণ যা ধার কিন্তু কখনো মরে না। পৃথিবীর প্রথম আদি থেকে অস্তকাল অবধি বেঁচে থাকে প্রতিটি প্রভাতকে আরতি কংক জল।

ঘুর থেকে ওকে দেখতে পেয়েছে ছোট বোন কপু। “দৌড়ে এসে হাত ধরল, “এত দেবী কেন দালা?”

চকিতে অতীর মনে পড়ল, পথে আর একজন এই দেবীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু চুপি চুপি। আঙুল তার এমন জোরে জিজ্ঞাসা করার অধিকার জন্মায় নি। কিন্তু সেই অধিকার পাবার জন্য কল্লব অধীর হয়ে আছে। বন্ধা—তার আলারের কল্লবতী, এ নাম ওর নয়, অতীই দিয়েছে। কানে কানে ডাকার এ নাম।

অবুঝ, প্রেমে অধীর! কিন্তু আর একটু অবস্থা ভালো না হলে ত তাকে অতী ঘরে আনতে পারে না! এই মৈস্তের সংসারে কোথায় বসাবে তার রমা রমণীস্বাক?

—সবুর, কল্লব সবুর কর, বৃকের উত্তপ্ত রক্তে অসীম ঐশ্বর্য সন্ধানর কথা কর।

মা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, “ইস, বড্ড দেবী করলি আজ, দ্বিধের নিশ্চর তোমার পেটের নাড়ী হজম হয়ে গেছে। নে, এখন তাড়াতাড়ি কাপড়-কামা ছাড়।”

—“রাগা হয়ে গেছে তোমার?”

—“কখন হয়ে গেছে।”

—“বাবার খাওয়া হয়েছে?”

—“না, তোমার জন্য বসে আছেন।”

—“তবে এক কাজ কর মা, বৃকিতে চিড়ে মাছ আছে, চট করে একটু বাটি-চকড়ি।”

৯. হেলের খিলসন হুখতলী দেখে মা হেসে মাছ নিয়ে বাগানের চলে গেলেন।

পকেট থেকে বিবণ ছুটি বের করে অতী বোনের হাতে দিল।

অশুর আচ্ছাদ আর ধরে না, দৌড়ে চলে গেল মাকে দেখাতে। কিছুক্ষণ সেই মিকে চেয়ে রইল অতী। আট বছরের ছোট বোনটি, হাসিখুশী সুলভ। কত অল্পেতে তুই! এই গীতে একটি হাতকটি ছেঁড়া ফ্রক পরে আছে। ছুটি মোটে ফ্রক ওর। একটি ছেঁড়া একটি আঁত। আঁতটি ফুলের রঙ, ছেঁড়াটি বাড়ীর রঙ। এ বাড়ীতে কারোই ছুটির বেণী কাগড় নেই। অতীত দৈন্ত।

অতী নিজেই বিবিত্ত ওর, এত দৈন্ত তবু কেমন অনায়াসে বেঁচে আছে তারা। বেঁচে থাকে আর ভালোবাসে। এই মসায়, এই পৃথিবী, আর এই জীবন, তবু এত প্রিয়—এত মনোহর। কেন? কী আছে তাই?

কাগড়-ভাষা বদলে রঙাঘরে মায় কাছ গিয়ে বসল অতী। বললে,—“মা গো, কি স্নেহে বেঁচে আছে, এত কষ্ট—” মা চমকে হুখ কেবলেন। হেলের হুখে কী দেখলো কে জানে, সেসে ফেললো। শান্ত সুলভ মমতা স্নিগ্ধ হাসিমাখা হুখখানি আগনের আভায় মতিমাবিত হয়ে উঠেছে। বললেন,—“কী স্নেহে বেঁচে আছে? তোরা বড় হবি, তাই দেখব, সেই আশায়ই ত বেঁচে আছে। আমরা যা পারিনি তোরা তাই করবি।”

অতীর শোনার কুঁচুটি তার বাগানের গারে। সবজীর বাগান।—বারো স্তরে স্তরে নিম্নেমেস চোখে চেয়ে থাকে বাগানের দিকে। হাওরায় গাছগুলি ঢালছে অনাগত দিনের আশায়, সবুজ প্রাণবন্ত। এরা অতীর জীবনের শুধু অবসরন নয়, তার আশা আনন্দ ভালোবাসা।

পথে পথে নিঃসঙ্গ বনন ঘুরছিল, সেই দিনগুলির স্মৃতি কী কষ্টকর। কত কষ্ট তারপরে এই ভূমিটুকু সংগ্রহ করেছে। আজ এট বাগান তাদের আতার জোগায়, বৃদ্ধ বাপকে জোগায় কর্মের প্রেরণা। তাঁর ছবির জীবন চরে উঠেছে অর্ধপূর্ণ। আর মা? মা যেন ধরিত্রীর মত, সব ভার বুকে নিয়ে ঝড়িয়ে আছেন, সত্যি অশুর স্নেহময়ী। জন্ম চতে জন্মান্তরের খেয়া পারাপারের কাণ্ডারী।

সবার শেষে অন্তর নিভতে আছে একটি উজ্জ্বল ধ্বংসাত্মক, কঙ্কার প্রেম। পথ দেখাচ্ছে, আলো দিচ্ছে, দৌরনোদেলিত বুকে জোয়ার আসছে, শক্তির উদ্বোধন করছে প্রাণকেজে।

চারি দিকে অনেক ভাড়চু হযেছে, এখনো হচ্ছে, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে কত ভাড়চু। তবু তা কখনো মানুষকে একেবারে ক্রিয়ে বাবার ইসারা জানায় না। বরং সেখান থেকে অনবরত আগে একটি সলীত—ওঠো আগে,

প্রতিজ্ঞা কর আর জর কর।” কান্ডবর্ণন বাতাসে কেমন যেন একটা মধুর আমেজ।—অতীর হুখ আসছে।—যরখানা যেন সেই ছোটবেলার সোলনা,—আশায় নিরাশায় সেলা দিচ্ছে তাকে—অসীম বৈধব্য অপার সাধনা বুকে নিয়ে মাটি চরেছে মায়ের মত,—হাওরায় তার স্নেহশার্ণ লাগছে গারে।—গাছের পাতায় পাতায় শনশন আওরাক তুলে যেন গাইছে হুখ পাড়ানী গান—ঘুমাও বাছা, ঘুমাও!

## চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্য

প্রভা দাস

বাংলার কাব্যরাজ অগণিত বৈষ্ণব মহাত্মনগণের রচনাক্ষেত্রে মুখবিত। প্রাক-চৈতন্যযুগে পদাবলী-সাহিত্যে ভয়ানক কবিলেও চৈতন্যোত্তর যুগেই ইতার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর মধ্যে জীব্যায় দিব্যোদ্যাক্ত প্রকাশক কবিতা নান্দালী এমনই স্বত্ব ও ভাববিস্তার চইবাছিল যে, বাণ্যাক্ষর লীলাবৈচিত্র্য তাভায়েব কাছে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যোত্তর যুগের মহাত্মনগণ বাণ্যাক্ষর লীলাবসে নিমগ্ন চইহা পূর্ণবাস, ভক্তি সায়, মিলন প্রভৃতি যে বসপর্বাণ্যবই পদাবলী বচনা করিয়া থাকেন না কেন, তাঁহারা যেন শ্রীমতী বালিকার মধ্যে জীব্যোদ্যেবই সাধিক ভাবসমূহ মানসচক্রে সেনিতে পাঠিয়াছিলেন।

চৈতন্যোত্তর যুগের জ্ঞানদাস, গৌরিন্দাস, বাহনেশ্বর প্রমুখ বৈষ্ণব মহাত্মনগণ নানা বসপর্বাণ্যের পদাবলী বচনা করিয়া পদাবলী-সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু সকল পরজন্মই বিভিন্ন বসপর্বাণ্যের পদ বচনায় সমান উৎকর্ষ লাভ করেন নাই। আমরা বৈষ্ণব-গীতি কবিতাকে শুধু কাব্য হিসাবে বিচার করি না, প্রত্যেক মহাত্মন যে সমস্ত ভাববসের পদ বচনা করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাদের সাধনার মধ্যে জীবন্ত চইহা



সর্বকটি সম্মত  
সুন্দর এলেক্সার

একমাত্র  
গিণ্ট সোনার  
নিখুঁত গহণা  
প্রস্তুতকারক

গুণোৎস

**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স**

১৬৭ বি, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উঠিয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে, এই মহাজনগণের মধ্যে যেমন কচিগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, তেমনই প্রতিভার তারতম্যও ছিল। এইজন্যই একজন পদকর্তা এক একটি বিশেষ রসপৰ্য্যায়ের পদাবলী রচনার কবিশক্তির পরাকর্ষ্য দেখাইয়াছেন।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও রায়শেখরের পদাবলীর তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারি, জ্ঞানদাস পূর্বরূপ ও রূপাহরণ, রসোচ্চার ও মাধুর্য্যের বিষয়ক পদে, গোবিন্দদাস—অভিসারোৎকর্ষ পদে এক রায়শেখর অভিসারোৎকর্ষ ও মাধুর্য্যের পদে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের একটি রূপাহরণের পদে শ্রীমতী রাধিকার ব্যাকুলতা চমৎকার ভাবে আশ্রয়প্রকাশ করিয়াছে।

“রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।  
প্রতি অঙ্গ লাগি কঁাদে প্রতি অঙ্গ মোর।  
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কঁাদে।  
পরশ শিরোত্তি লাগি ধির নাহি বাঁধে।”

জ্ঞানদাসের একটি পূর্বরূপের পদও ভাবের গভীরতায় ও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতার অতুলনীয়।

“রূপের পাখারে আঁখি ভূষিয়া রছিল।  
বোনের বনে মন হারাইয়া গেল।  
ঘরে বাইতে পথ মোর হৈল অস্থায়ন।  
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ”।

চৈতন্ত্যের যুগের মহাজনগণের মধ্যে গোবিন্দদাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রধানতঃ বিজ্ঞাপতির পদাকঙ্কস্বরূপ করিলেও অনেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন। ক্রীতদন নৈগুণ্য, নানাবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগে লক্ষ্যচ্যুত অঙ্কনে ও ক্ষমসীতের স্রষ্ট্রিতে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কবি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে আর আছে কি না সন্দেহ! তিনি অভিসারের নানারূপ বচিহ্নের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—বর্ষাভিনাস, দিবাভিনাস, ম্যাভিনাস ইত্যাদি। অভিসারের পটভূমিকায় তিনি লক্ষ্যবৈচিত্র্যের বর্ণনা করিয়াছেন, উহার মধ্যেও তাঁহার কবিত্ব শক্তির নিদর্শন প্রকাশ পায়। গোবিন্দদাসের কয়েকটি অভিসারের পদ উদ্ধৃত হইতেছে যথা—

“মন্দির বাহির কটিন কপাট।  
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।  
তঁহি অতি দূরতর বাসর দোল।  
বারি কি বারই নীল নিচোল।  
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।  
হরি রহ মানস মুরধুনী পার”।  
অথবা—  
“অথর ভরি নব নীরদ কাঁপ।  
কত শত কোটি শব্দে জীউ কাঁপ।  
তঁহি শিচি জায়ত বিজুঝিক জালা।  
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা”।

অথবা—

“মাখি তপন                      তপত পথ বালুক  
আতপ দহন বিধার  
ননিক পুতলি ভদ্র              চরণ কমল জহু  
দিন হিঁ করল অভিসার”।

গোবিন্দদাসের আর একটি অভিসারের পদ বিশেষ প্রসিদ্ধ—

“কটক পাড়ি                      কমলসর পদতল  
মঞ্জীর চারিহি কাঁপি  
গাঙ্গরী বারি                      চারি কবি পিছল  
চলতহি অস্থলি চাপি  
মাধব তুরা অভিসারক লাগি  
চুহতর পঙ্খ                      গমনধনি সাধরে  
মন্দিরে বামিনী জাগি।”

কবিশেখর বোড়শ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের ভায় তিনিও উৎকৃষ্ট অভিসারের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি অভিসারের পদে বর্ষার চিত্র স্বল্প পরিসরে চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

“গগনে অবধন                      মেঘ দাক্ষণ  
সখনে বামিনী ঝলকই।  
হুলিশ পাতন                      শব্দ ঝনঝন  
পবন খরতর বলগই।”

রায়শেখরের আর একটি অভিসারোৎকর্ষের পদও চমৎকার।

“স্বর বর বরিষে সখনে জলধারা।  
দশবিশ সবহঁ তেল আকিয়ারা।  
এ সখি কিয়ে করব পরকার।  
অরজনি বাধরে হরি অভিসার।”

রায়শেখর দুই একটি উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যের পদও রচনা করিয়াছেন। যদিও কবিশেখরের পদাবলী সখ্যায় অল্প, তথাপি তাহা কবিত্ব-সম্পদে ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ।

## বুদ্ধদেবের অভিনবত্ব

[ মজঃকরপুর মহিলা-সমিতিতে ‘বুদ্ধভরতী’ উৎসবে পঠিত ]

উমিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ

যেহে আড়াই হাজার বছর আগে যে মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, তিনি করুণার, প্রেমে, জ্ঞানে ও ভেদে যে কত মহান, কত বিরাট, সে পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তাঁর জোড়া সমগ্র ইতিহাসে মেলে না এবং তাঁর প্রেরিত্ত বর্ণপথ একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। সেটি অপূর্ণ ও অভূতপূর্ণ। বুদ্ধদেবের জীবনী এখানে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারা সকলেই মহারাজকুমার সিদ্ধার্থের বাল্যকাল থেকে বুদ্ধজন্মের পর্বন্ত ইতিহাস ভাল ভাবেই জানেন। তাঁর জীবনের অন্ত্য আলৌকিক ও চিত্তাকর্ষী ঘটনার প্রসঙ্গে আপনারা গুলেছেন। সেগুলি যেমন বিস্ময়কর ও মনোহর, তেমনি মনোহরকর ও চিত্তাকর্ষক।

যদিআলোচনার কথা শুনেতেই হয়তো অনেকে অস্বস্তিবোধ করছেন। ভাবছেন, এই যে এবার শুরু হলো কচকচি—যত নীরস লম্বা লম্বা কথাই বক্তব্য। আমাদের আলোচনা কিন্তু সেদিকে নয়। বুদ্ধদেবের সাধারণ কথাটা আপনারা শুনিতে দিচ্ছি—এতে কোন কচকচি নেই। এইটে শোনার পর আপনারা নিজেরাই বিচার করবেন যে, বুদ্ধদেব কতখানি নতুন জিনিষ। আমাদের সকলের জীবনে প্রত্যাহার প্রতি

কারে এই ধর্ম নির্দেশ মেনে চলা একান্ত দরকার এবং আমরা না জেনেই তার নির্দেশ কতক কতক মেলে চলেছি। এর জন্য কোন ঘটপক্ষে বা মস্ত তত্ত্বের দরকার নেই।

বৌদ্ধধর্ম বিরাট—তার নানা দিক ও নানান ব্যাখ্যা। সেসব বলার সময়ও নেই আর সাধ্যও নেই।

জগতের অপরিণীত ধূম-বেদনাই সিদ্ধার্থকে বিচলিত করে। এই ধূম দূর করার জন্যই তিনি সসার ত্যাগ করে নানা সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ করেন, নানান ধর্মমত অধ্যয়ন করেন কিন্তু তিনি যা চাইছিলেন, তার সন্ধান সেখানে পান নি। অবশেষে তিনি 'বোধিবৃক্ষে'র নিচে কঠোর তপশ্চর্য বসসন—সেইখানে তিনি চারটি সত্যের সন্ধান পেলেন।

প্রথম সত্য—জগৎ বেদনাময়; ক্ষয়গ্রস্ত ধূম, বোগের ধূম, জরার ধূম, মৃত্যুর ধূম। আবার কোন জিনিষ চেয়ে বা আকাঙ্ক্ষা করে না-পাওয়ার ধূম, প্রিয়-বিচ্ছেদের অশ্রুধীন ধূম ইত্যাদি। দ্বিতীয় সত্য—এই ধূমের কারণ তৃষ্ণা। নিজ স্বার্থ ভোগ করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাই তৃষ্ণা। ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে বেদনা আনে।

তৃতীয় সত্য :—ধূম বধন আছে এবং তার কারণও বধন পাওয়া গেছে, তখন সেই ধূম নিরোধের উপায়ও নিশ্চয় আছে। ধূম দূর করার উপায় বিগততৃষ্ণ হওয়া, স্বার্থ ত্যাগ করা। তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই অভাববোধ। অভাব ক্রমশঃই বেড়ে যাবে—

সব অভাব পূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ না হলেই ধূম। মানুষের নিত্য নুতন আকাঙ্ক্ষা তাই নিত্য নুতন ধূম। মানুষের সমগ্র সত্তাই যেন সহস্র অভাবের তাড়নার একটি অচরিতার্থ পিপাসার মতো।

চতুর্থ সত্য—এই বিগততৃষ্ণ হবার বা আকাঙ্ক্ষা দূর করার উপায় বৌদ্ধমতের অষ্টম মার্গ।

হায়াব নিজেই পারে নিজের ধূম দূর করতে। কোনও অলৌকিক শক্তি বা তত্ত্বজিয়ার দরকার হয় না। বুদ্ধদেবের মতে ধূম দমনের পথ বৃদ্ধসাধনের কঠিন পথ নয়, আবার কামবিলাস স্রবের পথও নয়। এ দুই-এর মাঝামাঝি পন্থাই হলো সাধনপথ। কি রকম যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা! কোন বাড়াবাড়ি নেই—সব সময় কঠোরতায় ফল হয় না আর উচ্ছৃঙ্খলতায় তো হয়ই না, তাই ভগবান বুদ্ধ 'মধ্যমপথ' কেই সাধনমার্গ ঠিক করে নিলেন। এই সাধনপথে ৮টি নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাই হলো অষ্টমমার্গ। এই প্রত্যেকটি 'মার্গ'র সঙ্গে 'সম্যক' কথাটি বিশেষণের মতো লাগানো আছে। সম্যক মানে অল্প কথায় বলতে গেলে ঠিক—যথার্থ, ত্রায়সদত-ইংরাজীতে Right এখন ৮টি নিয়ম কি তা শুধুন (১) সম্যক দৃষ্টি (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম্যক বাক্য (৪) সম্যক কায-কর্ম (৫) সম্যক জীবিকা (৬) সম্যক উত্তম (৭) সম্যক স্মৃতি (৮) সম্যক সমাধি, মানবের জীবনে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস থাকে। দরকার, অস্থির মন ও অস্বচ্ছ বিবেচনা নিয়ে জীবন চলে না। তার সঙ্কল্প ও লক্ষ্য হবে স্থির এবং সেই যথার্থ সঙ্কল্প তাকে

স্মৃতিবিহীন

ক্যালকেমিকোর কাস্তা চিত্তাকর্ষক

অল্পপম স্মৃতিনির্ধাস। রুমালে ও

কাস্তা

৬৬৬ ধূমপান

বেশবাসে ব্যবহার করলে

নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে

আমোদিত হয়ে ওঠে।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লিঃ কলিকাতা-২০



পথ দেখাবে। তার বাক্য হবে সধুর, পরোপকারী কিন্তু অসত্য নয়। তার কর্ম হবে পরার্থে—নিজের স্বার্থের জন্য নয়, কর্ম হবে মহান ও কল্যাণময়। অসং উপায়ে সে জীবিকা অর্জন করবে না—ঈগ, জুরাচুবা, চাষ, মল মেয়েমাছুব ইত্যাদি কোন অজ্ঞাত বাবসা সে অবলম্বন করে জীবিকার্জন করবে না। সম্যক উত্তম মনকে এই সব অমূল্যলনের জন্য প্রস্তুত করে। মনের উৎকর্ষ সাধন হয় ও মনকে শাসিত করা যায়। সম্যক বাণ্যামের সঙ্গে সম্যক দৃষ্টির সহায়তা প্রয়োজন। চিন্তাপ্রকৃতি সাক্ষীল না হলে ঠিক পথে চালিত না হলে সম্যক ব্যায়াম বা উত্তম অসম্ভব।

এই ভাবে সাধনা করলে মানব হুঃখমুক্ত হতে পারবে, তবেই তার নিবাণ, সেই হলো সম্যক সমাধি।

প্রত্যেক মার্গটিই বুদ্ধদের নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে গেছেন। বৌদ্ধধর্ম সর্বদে যে সব প্রচলিত নীতি কথা আছে, তা সবই ঐ অষ্টম মার্গের অন্তর্গত। এই অষ্টম মার্গের উপরই বুদ্ধদের সব আস্থা স্থাপন করেন। এই যে হুঃখ পূরীকরণের উপায় বলা হয়েছে এম অমূল্যলন করতে হয় মানবকে অমুক্তমানুষের ধরে। তার পর তার আর পাখির বেদনায় মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেই মহানিবাণ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ আছে কিন্তু ঈশ্বর সন্ধর্ষে বৌদ্ধধর্ম নিবাহু। বৌদ্ধধর্মের নির্দেশ মেনে চললে আদর্শ চরিত্র গঠন হবে এবং সে আদর্শ মানলে হুঃখ পাবে না এবং তাঁর কার্য দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে। আপনারা এখন নিচরই বুদ্ধের পারছেন যে, পৃথিবীর সমাজে বর্তমান ধর্মমত আছে তাদের পথের থেকে বৌদ্ধধর্মপথের কত তফাৎ।

বৌদ্ধধর্ম এমন একটি ধর্মমত যেখানে ধর্মের কোনও গোড়ামি নাই, জাতিভেদ নেই, নেই কোনও কঠোর কড়ুসাধন। এই ধর্মকে এইটি খুব উন্নত বকমের সংস্কৃতি বা culture ও বলা চলে। ভবে দেখুন, প্রকৃতি সংস্কৃতিবলে বা cultured মানুষের যে সব ল খাফা দরকার তা সবই ঐ আটটি পন্থার অমূল্যলন দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে। ঐ গুলিই সংস্কৃতি বা culture এর মূল কথা। এই ক থেকে বৌদ্ধধর্মের অভিনবর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আজকাল বৈদ্যর ভাগ দেশেই রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মের পার সঙ্গ্রহ নেই। রাজনীতিতে তো নেই-ই। আধুনিক রাজ ধর্মের নামে নাক সিটকায়। একদল ধর্মের বা শুনলেই আতঙ্কিত হয় অথবা ধর্মকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু Culture বা সংস্কৃতিকে কেউ বাদ দেয় না। সকলেই যে বার শের Culture এর উন্নতি করতে ব্যস্ত। ধর্মকে বাদ দিয়েছে ; কিন্তু ধর্মবুদ্ধিকে বাদ দিয়ে কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না বড় হতে পারে না। কাহেই আজকালকার দিনে বৌদ্ধধর্মই মাত্র উপযুক্ত ধর্ম। যে ধর্ম মানুষের স্ব-মানোবৃত্তির অমূল্যলন করিয়ে ধর্ম মানুষ গঠন করবে, বার ফলে জাতি ও দেশ হবে আদর্শ।

ধর্মের কথা আজকালকার মানুষ হয়তো ভুলবে না কিন্তু Culture এর কথা ঠিক ভুলবে।

মেয়েদের পক্ষে বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিতাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম উপযুক্ত। আধুনিক শিক্ষিত সমাজেও ধর্মভীত ও ধর্ম বিরাগ যথেষ্ট। তার জন্য প্রবীণাদের কাছে নবীনরা যখননা খান। আর নবীনরা যুগ করেন প্রবীণাদের কুসংস্কারের ধর্ম আচরণের। কিন্তু নবীনরা প্রবীণাদের নিষ্ঠাটুকু, অর্জন করতে পারেন নি, যে নিষ্ঠার বলে সমস্ত দুঃখ কাগ্ধী সমাধান হতে পারে, মনেও কোন বিক্ষোভ জাগে না। প্রবীণরাও আশা করতে পারেন না যে, শিক্ষিতা মেয়েরা কতকগুলি অর্থহীন আচার বিনা প্রতিবাদে পালন করবে, অথবা ছোট ছোট অবাধ বালিকার করণীয় প্রচলিত ব্রতগুলি প্রদ্বার সঙ্গে আচরণ করবে। এ সব আচার ও ব্রত পাণ্ডে শিক্ষিত মনের ভক্তি আনা একটু কষ্টকর। আপনাদের কাছে মাপ চেয়ে একথাটি বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ শিক্ষিত মনে ভক্তির উদ্বেক করতে চলে আরও উন্নততর অর্চনা বিধির প্রয়োজন। সেইজন্য দেখবেন নবীনাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমতকৃষ্ণদেবের পূজারিণীই বেশী। হিন্দু পূজা-অর্চনা বিধি বিশেষ উন্নত ও অতি চমৎকার। কিন্তু ওই প্রথমে যে কথা বলেছি ধর্ম বিঘ্নে ভীতি থাকার দরুন আজকালকার একদল লোক ও মেয়ে ও সব এড়িয়ে যেতে চায়। মেয়েদের আজকাল ঘরে-বাইরে কাঁবে নামতে হচ্ছে। আধুনিক যুগে পুরুষের চেয়ে মেয়ের দায়ব বেশী। তাই তাদের চরিত্র দৃঢ়তর হওয়া দরকার এবং সেইজন্য ঐ অষ্টমমার্গের অমূল্যলনই যোগ্য।

তথাগতের অপূর্ণ ধর্মের বানিকটা আভাস মাত্র আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত করা গেল। এর পর যদি আপনারা কৌতূহলী হয়ে বৌদ্ধধর্ম সন্ধর্ষে আপলাপ আলোচনা করেন, ও তার চর্চা রাখেন তবেই 'বুদ্ধজ্যোতি' উৎসব সার্থক হয়। তা না করে বড়বে একদিন ধূপ-দীপ আলিয়ে সেই মহাপুরুষকে মরণ করলাম, তার পর সারা বছর তাঁর নামও নিলাম না—তাতে কি লাভ? আগামী সপ্তাহ 'বুদ্ধজ্যোতি' সপ্তাহরূপে সারা ভারতে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে বহু রচনা ও বই প্রকাশিত হবে। আপনারা বীর এ বিষয়ে জানতে চান তাঁরা অনায়াসেই জানতে পারবেন ও এ বিষয়ে চর্চা রাখতে পারবেন। এই ভাবে ধর্মচর্চায় দীক্ষা নিতে হবে না, জাত বাবার ভয় নেই, ব্যক্তিগত ধর্মমত থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয় থাকবে না। এই ধর্ম আলোচনা শুধু নিজের মনের সুবৃত্তিগুলিকে উন্নতির পথে চালনা করা ও অপূরকে সেই বিষয়ে সাহায্য করা। ভগবান বুদ্ধের সাধনা ক্ষেত্র—প্রচীর ক্ষেত্র—এই রাজ্য বার জন্ত—এর নামই হলো বিহার (বৌদ্ধ বিহারের অমূল্যলন) সেই তথাগতের চরণস্পর্শে ধর্ম পূণ্যভূমি বিহারে বসে আজকে এই ধর্ম-চর্চার সম্বন্ধটি গ্রহণ করলে মঙ্গ হয় না।

## এ মাসের প্রচলনপট

এই সপ্তাহের প্রচলনে একটি বালিকানর্তকীর আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। ছবিখানি শ্রীকৃষ্ণকুমার বাগচী গৃহীত।



# আসছে! এই ডবল ঢাকনা দেওয়া নতুন টিন ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটি ও তাড়িয়া রাখে



- বিশুদ্ধ ও তাজা ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাড়া অবস্থায় পাবেন—কারণ টিনে বায়ুবোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
- বিশুদ্ধ ও তাজা বাবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ডালডাযে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটি ডালডাকে সবদিকই খুলেবানি ও মাদি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- খুলতেও কি সুলিখে খুলতে আর বাবহার করতে কি সুবিধে!
- পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে—ডাল টিনে মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সহিষ্ণু খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৪ পাঃ এবং ১০ পাউণ্ড টিনে পাওঁৎ বাঁধ  
• এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

**ডালডা মারকা বনস্বতি**



## সেকাল ও একালের অলিম্পিক

যাঃসত্যতার কবাল ছাড়াপাত পড়েছে পৃথিবীর উপর।

মানুষের স্বকুমার বৃত্তিগুলি আন্তঃ আন্তঃ লোণ পেতে বসেছে। প্রকৃতির কোল থেকে পূবে সবে থাকে। হুই হতে চলেছে কলের দানব ফ্রাঙ্কস্টাইন। এই মাসে লোনালেন আশার বাণী ফ্রান্সের ব্যাণ্ড কুবটিন। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলার প্রবর্তন করলেন।

ভারতীয় সাধনার সেট চিরন্তন পথ ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি:। আর প্রতিটি মানুষের কামনা শাস্তিঃ পারাবত উদ্ভূত প্রতিটি রাষ্ট্র, মানুষ সভ্যতাঃ উদ্ভূত তাড়নার নিরুদ্বেগে দুয়ারে দুয়ার।

খুষ্টের জন্ম হওয়ার ১১৬ বছর আগে গ্রীস দেশ যখন একাধিক জাতি ও মলে বিভক্ত হয়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত তখন শাস্তির অমৃত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল 'ডেলফির' দেবায়তন থেকে। ইতিহাসের মসীলিপ্ত পাতায় আছে এর চেয়ে বহু বছর আগে অলিম্পিকের স্রব।

কে যে প্রথম অলিম্পিক অলুঠান প্রবর্তন করেছিলেন এক জন, কিবা দশ জন—কি তাদের নাম, তার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অনেক বকম মতামত প্রচলিত আছে। অনেক বলেন, বেবরাক জিয়াস পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পাবার জন্য ক্রোনাসকে অলিম্পিয়ার মাঠে মল্লযুদ্ধ পরাজিত করেন, সেই থেকে অলিম্পিকের স্রব। আবার আর একদল বলেন, এ্যাপোলো ও এ্যাসিসের মুষ্টিযুদ্ধ অলুঠিত করার সঙ্গেই এই খেলা আরম্ভ। অন্য আর একদল বলেন, হেবাল্লিস গ্রীসের যুদ্ধরত বিভিন্ন দল ও জাতিগুলির ভিতর শান্তি আনার জন্য এই খেলার প্রবর্তন করেন। এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন লাসিসিয়াম ও পাউসেনিয়াম।

এ ছাড়া আরও একটি উপকথা আছে। পিতাবের অভিমত, অলিম্পিয়ার শাসনকর্তা 'ডারেনামাসের' অপূর্ণ মূল্যবোধ। 'গিপো-ভারিয়ার' পাণ্ডিত্যবান হন জাতীয় এক সর্ধার 'পেলোপ'। কিন্তু গেরেনামাসের এক অলুঠ পণ ছিল যে বীর তাঁকে রথের দৌড়ে পরাজিত করবেন তিনিই হবেন তাঁর কস্তার উপযুক্ত স্বামী। ৩৬ জন রথযুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ হিলে। কিন্তু পেলোপের স্ত্রীর কাছে গেরেনামাস পরাজিত হলেন। গেরেনামাসের রথের সারথি মিউটালিসের সাহায্যে রথ অচল করে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করলেন। এই জয়লাভে সন্তুষ্ট করার জন্য পেলোপ 'এ্যালটিসে' এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

অলিম্পিয়ার মাঠের উত্তর দিকে পাইন গাছে ঘেরা দ্বিকোণ

গাছের বাগান। এর নাম 'এ্যালটিস'। জিয়াসের পুত্র ওপিয়াসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পিতার মৃত্যুর মরণার্থে—'এ্যালটিসে'র একটি জায়গায় খেগাও করে দৌড়, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তির প্রতিযোগিতার পর পঞ্চম বার্ষিক ভোজের আয়োজন করেন। পেলোপের স্ত্রীর সন্তানের সম্মুখে এই খেলা হয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর।

গ্রীক-জীবনে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হওয়াই ছিল গ্রীকের পরম কামনা। পুংস্কায়স্বরূপ মিলতো অলিভ পাতার যুক্ত। অলুঠানের শেষে অলিম্পানের মধ্য দিয়ে ফিরতো নিজের দেশে। প্রত্যেকটি সামাজিক অলুঠানে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। খৃঃপূঃ ১১৬ অব্দে এলিসের পাচক বুদ্ধিধারী CORA EBUS সে বার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হন।

অলিম্পিক এগিয়ে এলে দূত ছুটতো—'যুদ্ধ বন্ধ কর, অলিম্পিকের সময় এসেছে' এই বাণী নিয়ে। খেলোয়াড়রা মিছিল করে বনো হোত অলিম্পিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রে। প্রথমত শপথ গ্রহণ ও বাঁটি গ্রীসের মানুষ হিসাবে পরিচয় দান সম্পূর্ণ নয় দেখে—যে তাঁরা বাঁটি গ্রীক রক্তের অধিকারী ও পুত চরিত্রের পুরুষ।

দ্বিতীয় দিনের অলুঠানে ছিল সরপ্রথম রথ চালনা। প্রথম দিনের অলুঠান সমাপ্ত হত পেট্রাথেলন বা পাঁচটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়ে। দৌড়, লাঞ্জন, ডিসকাসপ থো ও জ্যাভেলিন থো এই চারটি বিষয়ে যারা সব চেয়ে বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করতো, তারা জিয়াসের বৈদ্যর সামনে কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতো। তৃতীয় দিন পূর্ণিমা। ধর্ম্মালুঠান। বিকেলে ছোট ভেলেনের দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি। চতুর্থ দিন দৌড়ের প্রতিযোগিতা সকালে। বিকেলে মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি। শেষ দৌড় হোত বদ্বারত সশস্ত্র অবতারণ। যুদ্ধ নিবৃত্তির শেষ দিন যোবণা হয়েছে তারই নিদর্শন-স্বরূপ। পঞ্চম বা শেষ দিন চলতো ভোজ। পরস্পর মেলামেশা। সন্ধ্যার সময় বসতো পুংস্কায় বিতর্কী সভা।

অলিম্পিকে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র ডিমিটারের নারী পুরোহিতের জন্য বিশেষ সম্মান ছিল। নারীদের জন্য পৃথক অলুঠানের ব্যবস্থা ছিল।

এর পর আধুনিক অলিম্পিক অর্থাৎ একালের অলিম্পিক। বার তথাপত্রী সমস্ত কিছুই আছে। ইতিহাসের মসীলিপ্ত পাতায় সম্মানের অধিকারীরা লুপ্ত হয়ে যাবে না। ফ্রান্সের ব্যাণ্ড কুবটিন এগিয়ে এলেন। সাত্যায় করলেন গ্রীসের যুবরাজ কনষ্টান্টাইন। আলেক্সান্ড্রিয়ার গ্রীক বণিক মিলেন ২০ লক্ষ ড্রাক্কা। অতীত এথেন্সের ঠেডিয়ামের ক্ষমতাবশত্বের উপর তৈরী হল নতুন ঠেডিয়াম। চতুর্থ বার্ষিক চক্র ঘুরে চলেছে বর্তমান যুগে।

আধুনিক অলিম্পিকে প্রবর্তন হোল ম্যারাথন রেস। পারসিক বাহিনী ম্যাগাবানের যুদ্ধে পরাজিত হয়, এ সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য ২২ মাইল দৌড়ে আসেন Phidipides। খবর পৌঁছে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এ প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিয়ার পুণ্য কুঞ্জ থেকে খৃঃপূঃলাকে গ্রীক নর্তকীরা মশাল জ্বালিয়ে দেন। এথেন্সের বাসক সেই মশাল পৌঁছে দেন Propyloca থেকে পার্শ্বদর্শন পর্যন্ত। বহু দিন চলে এ অলুঠান তত দিন শিখা জ্বলতে থাকে অলিম্পিকের জন্ম আত্মার প্রতীক হিসাবে।

এথেলস—১৮৯৬

এথেলসের প্রথম অস্থান বাহোটি দেশের থেলোয়াড অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—এ্যাথলেটিকস্, সাইক্লিং, অসিগালনা, জিমনাস্টিকস্, টেনিস, গুলচালনা, সাঁতার, ভারোত্তোলন ও কুস্তি। ম্যারাথন বিজয়ী গ্রীক মেগালক Spiridon Loues যখন ঠোড়ায়মে চোকেন, তখন দুই গজকুমার চললেন তাঁর সঙ্গে। বাট হাজার দশকের আনন্দ-হিল্লালে ফেটে যেতে চার আকাশ। গ্রীক-জীবনের অবদান অলিম্পিকের প্রথম পুনঃ প্রবর্তনে গ্রীক-জীবনের ঐতিহ্যবাহী ম্যারাথনে তিনেক গ্রীকের জয়লাভ। জীবনে সম্মান, শ্রম, অর্থ সবই পেছেন Loues। কিন্তু স্বধার্মিক মেগালসের করে মন ছিলেন, বালিন অলিম্পিকে এ্যাটলিস কুস্তি থেকে একটা অলিভ শাখা উপহার নিয়ে।

প্যারিস—১৯০০

আধুনিক অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা কুর্বাতিনের দেশ। এবার প্রতিযোগিতার বিষয় অনেক বেশী। সীম নদী থেকে মাছ ধরা এক বাউল পর্যন্ত চলে। তেরটি দেশ এবার যোগদান করে। এই অলিম্পিকে মার্কিন এ্যাথলিটদের প্রাধান্য ছিল প্রচুর। Kraenzlein ভরী হন তিনটি বিষয়ে। একজন মার্কিন এ্যাথলিট সর্বপ্রথম Cronching ঠাট ( ঠাট নেওয়ার কৌশল ) এবং হাই-জাম্পে Western স্টোলের কৌশল দেখান।

সেট লুই—১৯০৪

বিজয় যুট্টের প্রাধান্যটি অলিম্পিকে নিয়ে এল দেশে। যুট্টেন এবং ব্রাশ ব্যারভার বহন করতে রাজী নয়। কল ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ। তাই মাত্র আটটি দেশ যোগদান করেছিল। এই অস্থানে সর্বপ্রথম একজন নিগ্রো হার্ডলে জয়ী হন। একজন মাত্র গ্রীক অধিবাসী ভারোত্তোলনে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। এবারকার ম্যারাথনে যে সর্বপ্রথম পৌঁছলো, সে নিজে স্বীকার করে আধ পথ সে মোটরে চড়ে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিউবার একজন ডাক-পিওন সাধারণ যুট্টপায়ে দৌড়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ইতিপূর্বে ক্লাব, কলেজ থেকে প্রতিযোগী আসতো। এই সময় থেকে জাতীয় সংগঠনের প্রবর্তন হয়। ১৯০৬ সালে এথেলস' এক বেসরকারী অলিম্পিক অস্থান হয়।

লণ্ডন—১৯০৮

এ অস্থান হওয়ার কথা ছিল রোমে। ইতালি অক্ষমতা জানাল। ইংলণ্ড এগিয়ে এলো। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অভ্রম বিবরে প্রতিযোগিতা চলল। অনেক খেলোয়াড় ইংলণ্ডের ছায়াই প্রচলিত। তাই বাইশটি দেশের প্রতিযোগী খাড়া সত্ত্বেও জয়লাভ হল ইংলণ্ডের। এর পর থেকেই অলিম্পিক অস্থানের কর্তৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিটির হাতে চলে গেল। ইতালির ম্যারাথন বিজয়ী ভোবাগাকে বাতিল করা হল, কারণ শেষ যুট্টে তাঁকে ঠেলে সীমার পৌঁছে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার ১৯ বছরের ছুদ-ছাত্র ১০৮ সে: ১০০ মিটার জয়লাভ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। মার্কিন ইউভী এখানে তার দশম অলিম্পিক মেডেল লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানগান উপদ্বীপের তিন বার ছায়ায় থো-তে বিজয়ী হন।

ষ্টকহলম—১৯১২

এই অস্থানে সর্বপ্রথম শিল্প প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। ২৩টি দেশ যোগদান করে। দোস্তলা ঠোড়াম, ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফটো ফিনিসের প্রথম প্রবর্তন হয়। যুট্টেন চরম বাধতা প্রদান করে। ফিনল্যান্ডের দীর্ঘ দৌড়ের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর Kobhmainen এবার আত্মপ্রকাশ করেন। রেড ইন্টারন জিম থর্প 'ডেকাথলন' ও পেন্টাথলন বিজয়ী হওয়ার খেতাবদের দ্বিধার কারণ হন। পেশাদারীদের হস্তক্ষেপে তাঁকে এসম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়। ম্যারাথনে একজন প্রতিযোগীর মৃত্যু ঘটে। সাঁতারে মহিলায় যোগদান করেন এইবার। যুক্তিযুক্ত ও কুস্তি বাদ যায়। মর্ডান পেন্টাথলন ও বোডসওয়ার্ডী এখানেই প্রথম প্রবর্তন।

এ্যাটুরার্প—১৯২০

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্ত ১৯১৬ সালে এ অস্থান সম্ভব হয় নি। যুদ্ধবিলম্বিত বেলজিয়ামের এই অস্থানে ২৬টি দেশ থেকে প্রতিযোগী আসে। জাঙ্গারী এবং অস্ট্রিয়াকে বাদ দেওয়া হয়। প্যাজো নুর্বা ১০,০০০ মি: দৌড় ও ক্রসকাণ্ডি রেসে বিজয়ী হন। যুদ্ধের সময় বিবাক্ত গ্যাসে ঈড়িত একজন ফরাসী যুবক ৫০০০ মিটার দৌড়ে জয়ী হয়ে সকলকে বিস্মিত করে। পড়ে গিয়ে আহত না হলে ১০,০০০ মিটারও জেতা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যুক্তির মধ্য দিয়ে Kobhmainen ম্যারাথনে জয়ী হন। ফিনল্যান্ডের জয়। ভারত সর্বপ্রথম এইবার যোগদান করে।

প্যারিস—১৯২৪

৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন রেকর্ড সমস্ত ভেঙ্গে যায়। মার্কিন দেশ বেশী পদক পেলেও জয় জয়কার ফিনল্যান্ডের। মাত্র ছ'ঘণ্টার মধ্যে ১৫০০ মি: ও ৫০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেন প্যাজো নুর্বা। ১০,০০০ মিটার ক্রসকাণ্ডি রেসে বিজয়ী হন। একজন ফিনিস কুস্তিগীর ম্যারাথন জয়লাভ করেন। সাঁতারে প্রধান বিজয়ী হয়েছিলেন জর্নি উইল মিলার ( টারভান খ্যাভ—ফিম )। যুট্টবলে জয়লাভ করে উল্লেসে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভারতের বিজ্ঞানবিদ দিলীপ সিং লং জামে সপ্তম স্থান অধিকার করেন।

আমস্টারডাম—১৯২৮

৪৩টি দেশের চার হাজার প্রতিযোগী। ভিডের জন্ত ফিনিসে প্রতিযোগীরা প্রাচীর টপকে প্রবেশ করেন। মহিলায় সর্বপ্রথম এ্যাথলিট ও দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। ফিনল্যান্ড ও এয়ারও প্রাধা বজায় রাখে। ম্যারাথন জয়ী হন একজন ফরাসী মোটর মেকানিক জাপানের গুডা হপ-ট্রেপজাম্পে বিজয়ী হয়ে প্রাচ্য দেশে প্রতি অর্জন করেন। সাঁতারে একটি মেডেল পায় জাপান। হকি ভারত তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে।

লস এঞ্জেলস—১৯৩২

এত দূর দেশ। আমেরিকায়। মাত্র ৩৭টি দেশের ১৭ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। আফ্রিকার সবাদপত্র বিদে

করণ জাবালা ম্যারাথনে জয়ী হন। মাত্র কয়েকজন প্রতিযোগী পাঠিয়ে আয়ার ৪০০ মিঃ ও জামার খোতে জয়ী হয়। মহিলা-দের অগ্নি চালনার ক্ষুদ্রা জয়ী হয়। নিগ্রো এ্যাথলেটদের জয়-জরকার এবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের হকিমুজ্জট অবিস্মিত থাকে।

বার্লিন—১৯৩৬

বার্লিনের অলিম্পিক সর্ববিধের অতীতক পিছনে কেসে আসে। ৪২টি দেশের ১০০ জন এ্যাথলিট ১৭টি নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করে। সর্বসমেত ৪৮টি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫০০ মিটার দৌড়ে পাঁচ বার নতুন রেকর্ড হয়। ম্যারাথনে নতুন রেকর্ড করেন জাপানের কিচি সন। জেসি ওয়েলসে বেশ ছাড়াও ব্যক্তিগত তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর্থারসঙ্কী নাংসীরা যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো এ্যাথলিটদের আমেরিকার 'কেলে ডাডারের' দল বলে অবজ্ঞা করে। হিটলার জেসি ওয়েলসকে প্রাণ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ৫১টি দেশের ৪০৬১ জন প্রতিযোগী বোগদান করেছিল। এবারেও ভারত হকিতে তার পুন্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

লণ্ডন—১৯৪৮

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্ত ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিক অলিম্পিক বন্ধ থাকে।

যুদ্ধোত্তর নতুন যুগ। অবৈতকার ও মহিলা এ্যাথলিটদের জয়-জরকার। সঙ্গঠনের জট বার্লিন অপেক্ষা বেশী। তাই চোখে পড়ে। বাধীন ভারত এইবার সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা বহন করে যাবার অধিকার পায়। মার্চ পাঠেব সময় রাজ্যের সামনে ভারতীয় পতাকা অবনমিত না করার কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। জাপানী ও জাপানকে অলিম্পিক বোগ দিতে দেওয়া হয় না। নিগ্রো এ্যাথলিটদের জয়-জরকার। ম্যারাথনে জয়ী হয় আর্জেন্টিনার ইলিন-চালক কার্বেরা। কিন্তু সব কিছুই উপায় বড় হয়ে দেখা দেয় দুই সপ্তাহের জন্যে ত্রিশ বছরের ডাচ মহিলা ক্যানি ব্র্যাকাস কোয়েনের কৃতিত্ব। বীলে সমেত চারখানি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতের হাতে হকি ফাইনালে ৪—০ গোলে পরাজিত হয় বুটেন। বুটেন একটি স্বর্ণপদকও লাভ করতে পারেন নি। ফুটবলে ফ্রান্সের কাছে তামত ২—১ গোলে পরাজিত হয়।

হেলসিংকি—১৯৫২

শীতের দেশ। ১১টি দেশের প্রায় ছ হাজার প্রতিযোগী বোগদান করেছিল। শীর্ণবন বাবধানের পর রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম প্রথম করে ২২টি স্বর্ণপদক, ৩০টি রৌপ্যপদক ও ১৭টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। সর্বাপেক্ষা বেশী পদক পায় যুক্তরাষ্ট্র। সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন চেকোস্লোভাকিয়ার দৌড়বার এমিল জেটাপেক। দীর্ঘ হাজার, দশ-হাজার, ও ম্যারাথনে দৌড়ে বিজয়ী হয়ে তিনি 'ইউসমান লোকোমোটিভ' আখ্যা লাভ করেন। জেটাপেক-পত্নী লুনা জেটাপেক বর্ণী ছোঁড়ার মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারেও ভারত হকির পৌরব-বুজু লাভ করে। এ নিয়ে উপর্যুপরি পাঁচ বার।

ভারতীয় কৃতিত্বের কে, ডি, বাদব ভারতীয় হিসাবে লাভ করেন প্রথম ব্রোঞ্জপদক।

মেলবোর্ণ—১৯৫৬

মেলবোর্ণ—একশো ছুড়ি বছরের এক সমৃদ্ধিশালী শহর। গ্রেট-বুটেনের অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করবার জন্ত অষ্ট্রেলিয়ার আসার ৫১ বছর পরে এই শহরটি স্থাপিত হয়। এখন প্রায় পনেরো লক্ষ জনসংখ্যা। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ষ্টেটের রাজধানী।

এই অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে বহুমুখী পাতার গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা করেছে। মেলবোর্ণের অলিম্পিক সমাপ্তির পথে। ভারতবর্ষ ফুটবলে সেমি-ফাইনালে পরাজিত হয়েছে। হকিতে এবারেও ভারত তার বিজয়-যুক্ত লাভ করেছে। জাপানী বারে এর পূর্ণ আলোচনা করার ইচ্ছা বইলো।

একটি করণ কাহিনী

অলিম্পিক-ইতিহাসে একটি গ্রানিমের অধ্যায় জুড়ে আছে। আজ বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়াবিদরা মেনে নিয়েছেন জিম থর্প একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট।

যোগ্যতা ও প্রথম প্রকাশের বীর্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট জিম থর্প। তাঁর শ্রেষ্ঠ সবাই স্বীকার করলেও প্রকৃত যোগ্যতা কোন নথিপত্রে নেই।

শুধুমাত্র আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বেসবল খেলোয়াড় ও ব্রেট ফুটবলার ছিলেন তাই নয়, সমগ্র এ্যাথলিট জগতের তাঁর প্রতিভা ছিল বিম্বহবর।

১৯১২ সালে ষ্টকহলম অলিম্পিকে বোগদান করেন। মোট ৮৪১২ পর্যায়ে থর্প ডেকাথলন বিজয়ী হন এবং পেট্যাথলনে বিজয়ী হয়ে শাস্ত্রবদ্ধে সন্তব করেন। ডেকাথলনে থর্পের কাছাকাছি আজ পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারেনি।

থর্পের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে নরওয়ের রাজা গষ্টভ তাঁকে একটি বিশেষ স্বর্ণ-বর্মুতি উপহার দিয়ে বলেন—তুমি বিশ্বের সেরা এ্যাথলিট। তৎকালীন শক্তিশ্রম রূপ দেশের তদানীন্তন জার থর্পের বীর্যে মুগ্ধ হয়ে একখানা রৌপ্যময় তাইজি জাহাজ উপহার দেন।

থর্প যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে সেখানকার গ্র্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন থর্পকে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে প্রমাণ করার অলিম্পিকের পদক সমেত সমস্ত পূর্বস্বার ক্ষেত্র দিতে হ'ল। অলিম্পিকের সম্মান-তালিকা হতে নাম কাটা গেল।

বিশ বছর বাদে আবার গ্র্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন প্রমাণ করলো থর্প নির্দোষ ব্যক্তি। তিনি যে টাকা নিয়েছিলেন সেটা তাঁর কোন এক আত্মীয়ের দান।

তাঁর প্রাণ্য সম্মান ঠিকিয়ে নেওয়ার থর্প এতটুকু বিম্বিত হননি। মাত্র এক ডলার মজুরীতে রাজ্য খোঁড়ার কাজ করছিলেন, এমন সময় একজন ফিল্ম ডিরেক্টর থর্পকে নিয়ে যান রেড ইণ্ডিয়ান সর্দারের জমিকার জন্ত। বর্ণবৈষম্য অঙ্কিত সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছিল।

থর্পের জীবনের এই করণ কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের মিল আছে। মনে পড়ছে জোহান অব আর্কের কথা। বিচারের অতীত প্রহসন।



অম্বন

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!



# \* বিজ্ঞান বার্তা \*

পঞ্চম মিশ্র

ভারত ভ্রমণের সময় বিজ্ঞানী ক্রোমা শিল্পবিজ্ঞান কেন্দ্রে  
১৯৫৬ সালের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ১৮৫৬

সাল থেকে ১৯৫৬ সাল—সংশোধন শিল্প-বিজ্ঞানের শত বর্ষ পূর্ণ হলো।  
একটি ব্যাপক ভাবে আমি শতবর্ষ পূর্তির কথা বোঝা করলাম,  
কম্পন প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ সালে বিজ্ঞানী পাকিন কর্তৃক সর্বপ্রথম  
সংশোধিত রঙ প্রস্তুতকৃত বর্তমান জৈব শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রদূত  
কলা যেতে পারে। সভ্যতার নানা প্রয়োজনে বহুপ্রকার জৈব  
পদার্থ বায়ুনের প্রয়োজন হয় এবং তাদের প্রধান উৎস ছিল প্রকৃতি।  
কিন্তু ১৮৫৬ সালে ওরশ (বিজ্ঞানী) পাকিন কর্তৃক ঘটনাটিকে প্রথম  
সংশোধিত রঙ 'মড' আবিষ্কার হওয়ার পর উপলব্ধি করা গেল,  
প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ সমূহকে জৈব রসায়ন শিল্প-বিজ্ঞানের  
সহায়তার সংশোধন করে নেওয়া যায়।

গল্পটা একটু খুঁসেই বলি। ঘটনাটিকে দুইটানা ঠিক বলা যায়  
না। যদিও পাকিন তাঁর প্রত্যাশিত ফলাফল পান নি, তাঁর  
পরিকল্পনার মূল সূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বহন করেছিল ব্যর্থতার  
দ্রাবি, তবু সেই অপ্রত্যাশিত ফলাফলই এক নতুন যুগের পথনির্দেশ  
করলো। মাত্র ১৮ বছরের ওরশ বিজ্ঞানী সংশোধনের সহায়তার  
ফুইনাইন সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রস্তুত করেন মূল্যের একটি বেগুনী  
রঙের। ঘটনাটিকে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় একটি জৈব বস্তু  
সর্বপ্রথম গবেষণাগারে প্রস্তুত হলো,—এই দৈবাৎ আবিষ্কার  
বর্তমানকালের সর্বপ্রথম সংশোধন জৈব-শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রদূত।  
ঔষধি-শিল্প, রঙ-শিল্প, প্রান্তিক, রবার ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিল্পই  
সংশোধন বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে অনুসরণ করে ধীরে  
ধীরে গড়ে উঠেছে। সংশোধনের মাধ্যমে এই নতুন  
আবিষ্কারের উদ্ভাবনা কি? বেগুনী রঙ কি আগে ছিল না,  
না পাকিনের পূর্ববর্তী কালের মানুষ এই রঙ ব্যবহার  
করে নি? নিশ্চয়ই ছিল, শুধু পাকিনের সময় কেন—  
অতি প্রাচীন কালেও এই রঙের ব্যবহারের কথা জানা যায়। কিন্তু  
তখন উৎপাদন ছিল অতি কম, তাই প্রাচীন কালে সমস্ত রঙটুকুই  
স্বয়ংক্রিয় থাকতো মহারাজা, সম্রাট অথবা ক্যারাকারের জন্য।  
যদিও পাকিনের যুগে রাজা-মহারাজাদের অসীম প্রভাব অনেক

কমে গেছে, তবু উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ রঙ  
পাওয়া যেত না। তাছাড়া গুণগতগত দিক থেকেও প্রকৃতির দান  
নিখুঁত প্রণীত ছিল।

রসায়ন-বিজ্ঞানের চর্চা এবং শিক্ষার জন্য ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে  
"রয়েল কলেজ অফ কেমিস্ট্রি" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান  
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'জি.বিবের' ছাত্র  
'হুম্যান'। মাত্র ১৫ বছর বয়সে, কিশোর হেনরী উইলিয়াম  
পাকিন 'হুম্যানের' অধীনে রসায়নচর্চা করবার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানে  
যোগদান করলেন। পাকিনের বাবা ছিলেন একজন গৃহনির্মাতা  
এবং তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল কেমেকে স্থপতিবিজ্ঞান পায়দরী  
করবেন, কিন্তু লণ্ডন কুলে পড়ানো করতে করতেই 'হুম্যানের'  
ছাত্র বিজ্ঞানকর্মী টমাস হলের কয়েকটি বক্তৃতা শুনে কিশোর পাকিন  
রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পাকিনের বাবা কোনদিনই  
হলের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করতেন না,—তাঁর সম্পূর্ণ  
সম্মতি নিয়ে ১৮৫৩ সালে কিশোর পাকিন 'রয়েল কলেজ অফ  
কেমিস্ট্রি'তে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করলেন। এর মাত্র তিন  
বছর পরে ১৮৫৬ সালে ঘটনাটিকে প্রথম সংশোধিত জৈব রঙ  
আবিষ্কৃত করে রসায়ন-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার এক নবযুগের সূচনা  
করলো।

'হুম্যানের' তত্ত্বাবধানে পাকিনের রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষা  
শুরু হলো। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম মৌলিক  
গবেষণা শেষ করে ১৮৫৬ সালে কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায়  
প্রকাশ করেন। গবেষণাগারে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও তাঁর মন  
শান্ত হয় না, রাত্রিবেলা অথবা ছুটির দিনেও কাজ করা চাই,  
তাই নিজের বাড়িতে ছোট একটি ব্যক্তিগত গবেষণাগার সাজিয়ে  
নিলেন। 'কলেজ অফ কেমিস্ট্রি' থেকে ফিরে রাত্রিবেলা, রবিবার  
অথবা অসুস্থ অবসর সময় বেশ মনের আনন্দে কাজ করত  
যাবে।

তখনকার দিনে কোন বস্তুর আণবিক কাঠামোর সঠিক পরিচয়  
জানা ছিল না। বস্তুর অণুর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুর অবস্থিতি  
এবং আণবিক ওজন অনুসারেই বস্তুর পরিচয় নির্ধারণ করবার  
চেষ্টা করা হতো। 'হুম্যান'ই পাকিনকে পরামর্শ দিলেন  
'ভ্রাপথাইল্যামিনকে' অক্সিজাইজ করে বোথ হয় ফুইনাইন প্রস্তুত  
করা যাবে। আণবিক কাঠামো বিবরে কোন বিজ্ঞানসম্মত  
চেতনাই তখন সৃষ্টি হয়নি, তাই অনুমান করা গেল 'ভ্রাপথাই-  
ল্যামিনের' ছোট পরমাণু তিনটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে  
একটি ফুইনাইনের অণু এবং একটি জলের অণু সৃষ্টি করবে।  
কিন্তু ভ্রাপথাইল্যামিন প্রস্তুত করা যায় কি করে?—কাছাকাছি আছে  
টলুইডিন, তার সঙ্গে একটা অ্যালাইল দল যোগ করে দাও,—  
তাহলে যে বস্তুটি পাওয়া যাবে তার আণবিক ওজন ভ্রাপথাই-  
ল্যামিনের সমান হবে। অতএব অ্যালাইল টলুইডিন দিয়ে শুরু  
করো কাজ, তাকে অক্সিজাইজ করে পাওয়া যাবে ফুইনাইন।  
ডাইক্লোমেট দিয়ে অক্সিজাইজ তো করা হোল, কিন্তু ফুইনাইনের  
বদলে পাওয়া গেল একটি খুবই রঙের পদার্থ। সেই যুগের জৈব-  
বিজ্ঞানীরা রঙিন পদার্থসমূহকে সর্বদাই পরিচয় করে চলেতেন।  
কোন প্রক্রিয়ার ফলাফল কোন রঙিন পদার্থ উৎপন্ন হলেই  
তাঁরা ধরে নিতেন তাঁদের প্রক্রিয়া সাক্ষ্যমণ্ডিত হয় নি। সকলেরই

হোঁ! ছিল কি করে বৃদ্ধ এবং নির্ধিষ্ঠ আর্থিক ওজন সমর্থিত বিতর্ক পরামর্শসমূহ প্রস্তুত করা যায়। স্মৃত্যু সাশা কুটনাইনের পরিবারে বালাদী বড়ের কোন বৃদ্ধ উৎপাদিত হলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই তা পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু পার্কিনের চিন্তাধারা তাকে এই পথে নিয়ে গেল না। তিনি ঠিক একই ভাবে আর্নলিন অজিতকর করলেন এবং তা থেকে পাওয়া গেল একটি কাল রঙের পদার্থ। কাল পদার্থটি অ্যালকোহলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে, অ্যালকোহল মাৎফং একটি বেগুনী রঙ পৃথক করা যায়। পার্কিন পরীক্ষা করে দেখলেন, নানাপ্রকার কাপড়ে এর দ্বারা রঙ করা চলে—এক ঐ রঙ সহজে উঠে যায় না। আরও ভালো ভাবে পরীক্ষা করার জন্য তিনি রঙীন কাপড়গুলি পার্শ্বের মের্সার পুলাবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবিলম্বে জানা গেল, রঙটি চমৎকার এবং এর দাম যদি কম হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সংশ্লেষিত এই নতুন রঙ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পদ্ধিগণিত হবে। অস্ত্রান্ত জৈব রঙের চেয়ে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী এবং উজ্জ্বলও মনোরম।

একটা কথা বলে বাবী। এই আবিষ্কার কিন্তু 'রয়েল কলেজ অফ কেমিস্ট্রি' তরুণ। যদিও কুটনাইন সংশ্লেষণের পরামর্শ 'ইফমান' দিয়েছিলেন তা কাস্ট্রি সম্পূর্ণ ভাবে করা হয়েছিল পার্কিনের বাড়ীতে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণাগারে। গবেষণার পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল পার্কিনের দুটি মন—একটি বিজ্ঞানী মন অপরটি শিল্পী মন; অনেকবই জানা নেই বিজ্ঞানী হেনরী উইলিয়াম পার্কিন একজন সংখ্য চিত্রশিল্পী ছিলেন। হয়তো এই রঙীন পরামর্শটিকে

বিজ্ঞানী পার্কিন অবলোকা করতেন, কিন্তু এর বিশেষত্ব দ্বারা পড়লো শিল্পী মনের কাছে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীয় বিশ্লেষণ এক শিল্পীর অল্পকৃতির যুগ সফলতার এক অসম্ভব নির্দেশ।

আবিষ্কারের পরবর্তী অধ্যায় হলো সকলের চক্ষু উৎপাদন। পার্কিন এই রঙ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করতে মনস্থ করলেন, কিন্তু বাধা দিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু 'ইফমান'। বিজ্ঞানী গবেষণা করবে, নিত্য নতুন সন্ধান করবে প্রকৃতির অনাবৃত সত্য—তাঁর এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করলেন 'ইফমান'। কিন্তু পার্কিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তাই অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে 'রয়েল কলেজ অফ কেমিস্ট্রি' সঙ্গে সংযোগ ত্যাগ করতে হলো। পার্কিনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন তাঁর বড় ভাই—বাবা তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় তুলে দিলেন ছেলেকে হাতে এই নতুন শিল্প গড়ে তুলবার জন্য। শিল্পগত কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তবু তাঁরা বিপদকে মাথার করে এগিয়ে চললেন এই নতুন পথে।

পাঠকেরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, সেই ১০০ বছর আগের অবস্থাটা ছিল ঠিক কি রকম। আজকের দিনে কোন নতুন শিল্প শুরু করতে চাইলে আপনি ঘরে বসে বিশেষজ্ঞদের সব রকম পরামর্শই পোতে পারেন—উৎপাদনের জন্য কতক খরচার মধ্যেই কিনে ফেলতে পারেন প্রয়োজনীয় সব রকম যন্ত্রপাতি। কিন্তু সেই যুগে সমস্ত কিছুই মাথা খাটিয়ে পার্কিনদের নির্মাণ করতে হয়েছিল। কারখানা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ থেকে শুরু করে উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ—সব কিছুই এক সমস্যা! ফিউমাং নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না,

শুভ বিবাহে

শুভ বিবাহে কিংবা যে  
কোনও শুভ কাজে যৌতুক  
দেবার যত আধুনিক  
মনোরম ডিজাইনের খাটি  
গিনি সোনার গহনা ও  
সাঁচ্চা গ্রহরত্ন প্রচুর  
পরিমাণে মজুত আছে।  
ফোন : ৩৪-৪২৮২

অনুপ্রণা জুয়েলারী হাউস

মানিকপুর ও ধর্মশিল্পী

৮৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

দণ্ড ম্যানসন









আমাদেরও অনেক কাজ  
—জিদিব রায়



ওরা কাজ করে  
—দীর্ঘকালী



মাতৃশিক্ষা

—শানন্দ সুখোপাধ্যায়



"মুখের পাশে চাইবু মরিয়া  
 বাজিল বুকে মুখের মতো বৃথা।  
 আমার মতো শুধু কৈশরিকা  
 নিখামান ঢাক সজ্জা হয়েছিল"

মকল মনে, মর মৃত  
 দেবকুমার মানবর কৈশ-সম্বন্ধ  
 শুধি কবিতা নিশ্চয়ই সাহস  
 কর।




**দেবকুমার**

বেঙ্গাল ট্রেড-

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

দেবকুমার হাউস, ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১৭, আর্যেনিআন ষ্ট্রিট, মাদ্রাজ-১

CHJ.385.34



## ভাটুর গান শ্রীজয়দেব রায়

মানুষ ও প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত 'ভাটুর গান'।

ভাত্র মাসে ভাটুর মূর্তি গড়িয়া হুড়া গাহিয়া ভাটুপূজা করা হয়। মানদুম হইতে পশ্চিমবঙ্গের নানা অংশেও ভাটুপূজা প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে সারা ভাত্র মাস গান গাহিয়া সাধারণত কুমারী মেয়েরা এই পর্ব পালন করে।

পুণ্ডিতেরা অতুমান করেন, ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের 'করম' উৎসব হইতে ভাটুপূজার প্রচলন হইয়াছে। মানদুম ও প্রত্যক্ষ বস্তুর সাঙোড়ালের 'করম'ও বর্ধাক্ষেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই অঞ্চলের বাঙ্গালীরাও শেষ বর্ষার ভাটুপূজা করিয়া থাকে।

অত্যন্ত মেয়েলী পূজার ভায় ইহাতে আয়োজন বিশেষ কিছু



তানসেনের আগরে ভরত নাট্যমেধ একটি ভাটুরায়  
বোম্বাইয়ের শ্রীমতী লীলা পাড়গাকার

লাগে না। মেয়েদেরই পূজা, তাহারাই কুল-কল গিয়া ভাটুর আরাধনা করিয়া থাকে, ভাটুর প্রতিমা দেখিতে অনেকটা নন্দী প্রতিমার জায়। বালিকারা প্রতিনিধি সন্ধ্যায় গিঁড়া, দই, মিষ্টি প্রভৃতি উপচার সাজাইয়া ভাটুপূজা করে।

সকল দৌকিক উৎসবের ভায় ভাটুপূজারও একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। মানদুম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যের রাজধানী ছিল কান্দিপুর। কথিত আছে, সেখানে নীলমণি সিংহ দেববর্মী নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা এক সময়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভক্তেশ্বরী নামে এক বড় আগরের স্তম্ভরী কস্তা ছিল। কস্তা যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের আয়োজন হইল, নানা দেশ হইতে রাজপুত্রেরা রাজকস্তার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে এক রাজপুত্রের সঙ্গে ভক্তেশ্বরীর বিবাহও স্থির হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পূর্বে বর্ষার এক ঘনঘোর দুর্ভোগময়ী বার্মিতে পথের মধ্যে পাণিপ্রার্থী বহুর কলরায় অকাল মৃত্যু ঘটিল। রাজা ভক্তেশ্বরীর অকৃত্রিম বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও সে তার বিবাহ করিল না, বাগদত্ত পতির চিতায় আত্মবিসর্জন দিল। শোকে দুঃখে রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন।

রাজ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মন্ত্রীরা উপদেশ ও সাঙ্ঘন্য বাক্যে রাজার শোক দূর করিতে পারিল না, শেষে তাহার এক অভিসন্ধি করিল। তাহার গিয়া রাজাকে জানাইল, প্রজারা ভক্তেশ্বরীর স্মৃতিরক্ষার জন্য সারা ভাত্র মাস ধরিয়া পূজাশ্রাধান করিবে, রাজাকে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। রাজা তখন হঠাৎ আবার সিংহাসনে বসিয়া এই অল্পস্থানের দৌত্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দেশে ভাটুপূজার প্রচলন হইয়াছে।

ভাটুপূজা নাট খেয়া যে গো, কি কাজ তাদের ভৌবনে।

কান্দিপুরের রাজার পূজা গো সে পূজা করে প্রথমে।

সে মনের মত বর পেয়েছে বা ছিল গো তার মনে।

ভাটু, বলি তোমায়, তোমার চরণ দিবে আমার মরণে।

ভাটুগানের তিনটি ভাগ—প্রথমটিতে ভাত্রমাসের গোড়ার দিকে তাহার আগমনী গান। কুমারীরা ভক্তেশ্বরীর মাটির একটি পুতুল গড়িয়া গান গাহিয়া তাহাকে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করে—

ভাটুর আদর শেষে ভাটু সে যে রাজার মেয়ে

ভাঙে জুনার লো।

ওলো আর লো ভাটু খেতে দিব ভালভাড়া

ফুলের মধু গো।

পূজার আয়োজনের জন্য সব্বদেশের আহ্বান জানাইয়া বালিকারা গাহে—

ভাটু নিজগুণে

দয়া ক'রে এসেছ গো এখানে।

কেহ বারি আনতে চল গো, কেহ বাও ফুল-বাগানে।

(আবার) কেহ বা চন্দন ঘেঁষা নৈবেদ্যের আয়োজনে।

এ সকল আগমনী-গানের অধিকাংশই লক্ষ্য তরল বিষয় লইয়া রচিত। নানাপ্রকার মেয়েলী ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রসতামাসা এ সকল গানে প্রকাশ পাইয়াছে। বালিকাসুলভ চাপল্যে এগুলি পূর্ণ। যেমন,—

বলি ওলো দয়র।

আসছে জামাই নুতন নুতন ক্যাসান কর।

সাবান মেখে ফরসা হয়ে লো বেড়ি হ, ওগো স্বপ্ন।

আসছে ঘোড়ায় চেপে বর, লিয়ে বাবেক্ খন্তর খব।

ভাঙগান উকনীচ বর্ণনির্দেশে সকল ছৌলোকরাই গাহিয়া থাকে। তবে উকবর্ণের বাণিকারা সমবেত কণ্ঠে বহন ছুঁড়া গাছে, তখন কোন বাজ বাজে না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বাণিকারা নাচিয়া নানাপ্রকার বাজের সঙ্গে গান গাছে। একজন গাছে আর বাকী সকলে গোহারিক করে। নানাপ্রকার লোভনীয় সুখাতের তালিকাই তাহাদের গানের বিষয়বস্তু—

কলাপাকা আছটারা গো, বাজার আন কিনে,

আরো কেত বা মিষ্টার আনে, ভুবন মরবার লোকানে।

জিলাপী, খাজা, লেডিকেনি গো, কিনবে যে দেখে শুনে,

ভালো ক'রে পরখিবি, বাসি যেন আনিসু নে।

আগমনী গানের পর সারা মাস ধরিয়া চলে ভাঙর 'মানভঞ্জন' গান। স্বপ্নের মানভঞ্জনের জুড় বাণিকারা ফরমাইস করে—

আনলো কাগজ যত লাগে দাম

সাজাই ভাঙর যান গো, সাজাই ভাঙর যান।

ভাঙ করে মান, মান গেলে সারানিষি,

সোনার কারি এয়ার করব লান।

মানড়মে কাগজ এক কালে খুব দামী জিনিষ ছিল। আর সাধারণ গ্রাম্য বাণিকারা কাগজের ব্যবহার কতই বা করিত! তাই বহুল্প স্রাবকপে কাগজের নামই তাহাদের প্রথম মনে পড়িয়াছে।

প্রিয়সখী ভাঙরাগীর মানভঞ্জনের জুড় বাণিকারা গান ধরে—

ওগো ভাঙ বিধুধি!

ধনি, কিবা অভিমান হয়েছে আমারে বল দেখি।

সুখনিশি ভাগরণে লো, সকলি যে হয় কাকি।

তুমি বহুদিন পরে এলে নিঃশব্দ করে ছিঃ।

কোন কোন দিন, বিশেষতঃ বিসর্জনের পূর্দিন সারারাত্রি ধরিয়া ভাঙগান গীত হয়। তাহাকে বলে 'ভাঙ-জাগরণ'। নানা গাহ ছা ও সাংসারিক খুটিনাটি প্রসঙ্গ অবলম্বনে এ সকল গান রচিত হয়।

ভাঙ-জাগরণের এক বিরাট অংশ ভাঙর বিবাহের গান। প্রচলিত আখ্যানে আছে, বিবাহের পূর্দিনে তাহার অকাল মৃত্যু হয়। তাই সেই করুণমুখিত বাণিকারা বাস্পগগদ কণ্ঠে বহন করে—

ভাঙ আপন তুলে, কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে।

নবীনা প্রেমিকা ভাঙ লো, কেমনে আছ তুলে?

নবীন প্রাণে বঁধুর সনে স্তবরণ করে নে।

বর এসেছে কত শত লো, তোরে দেখিবার ছলে।

বদি বসিক দেখে করবি বিয়ে, মনের মতো নে চিনে।

ভুলমতি কুমারী বাণিকা ও নববিবাহিতা কিশোরী বধূদেরই তো এ সব উল্লেখ, তাহাদের কণ্ঠ বৈশিষ্ট্য বাস্পকচ্ছ থাকে না, অল্পকণ পরেই তাহারা আবার রক্ত-শিহ্নে মতিয়া উঠে। বাঙলা দেশের চিরন্তন সেই তরকারি লড়াই জমিয়া যায়। প্রতি বোশনী বাণিকাদের সঙ্গে নিজদের পূজা লইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। গানের আড়খেই একদল অল্পদলকে আক্রমণ প্রতিআক্রমণ করে। ভাঙকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাণ প্রতিবাদের লড়াই লাগিয়া যায়—

ভাই রে, মনে মনে।

আমার ভাঙর রূপ দেখে ছলিস কেনে!

আমার ভাঙর রূপটি তোদের চোখে লো বল সইবে কেনে!

সুর্ধের আলো দেখলে খেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে।

তেমনি হোয়া ভাঙধনে লো, দেখতে নারল নয়নে।

তোদের ভাঙ, আমার ভাঙ, তচ্ছং লো রাতি-দিনে।

বান্ধব জীবন হইতেও ভাঙ-পৃষ্ঠা বিজিন্ন নয়। সরলা সুখীলা বাণিকারা ছলাকলা জানে না, তাহাদের মনের সকল কথাই ভাঙ-গানের মধ্য দিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে। সমস্তা, ঘটনা স্বেচ্ছা অন্তঃস্ব হইতে বিজিন্ন হইয়া জীবন প্রবাহ বহিতে পারে না, তাই প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বিষয়ের গান পুরাতন গীতিসুজ্ঞে বোজিত হইয়া চলিতেছে।

ভাঙর মন কবেরেছে বিকুলি, মতিমালার মাঝে মাছলী।

ভাঙ আমার খেলাতে বাবে রাজিমগজের ঘটতলা,

খেলেতে খেলতে খেলতে পারে কপিকলের তলাতোলা ॥

ভাঙর আমার বিয়া দেব ইষ্টিসানের বাবুকে,

যাওয়া-আসা ভাঙই হবে, চাপব কলের গাড়ীতে।

এক সেব চালের মাছ কিনলাম তামালতলে ঝাড়িয়ে,

এ মাছ আমার কে খাবে, ভাঙ গেছে চালানে।

ভাঙ আমার শিশু ছিল, কে পাঠাল কলকাতা,

কলকাতার ঐ নোণাজলে ভাঙ হ'ল শ্রামলতা।

তারপর ভাঙ্গ-সংক্রান্তির দিনে ভোরবেলার ভাঙর বিসর্জনে

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা

খুবই আভা-

বিক, কেননা

সবাই জানেন

ডোয়াকিনের

১৮৭৫ সাল

থেকে দীর্ঘ-

দিনের অভি-

জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার অন্তর্লিখন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এসম্প্র্যাভেড ইস্ট, কলিকাতা - ১

গান। আনন্দে হাসিতে উৎফুল্ল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বাপভায়কাত্তর ব্যাভূর  
হইয়া উঠ—

ভাঙ তোমা ধনে,

ভগো বিদায় দিব কেমনে।

বেও না বেও না ভাঙ গো ধরি তব চরণে।

(ভূমি) চলে গেলে আমরা বসো গৃহে রব কেমনে।

দিবানিশি তোমার ঘেরে গো থাকি আনন্দ মনে।

ভূমি চলে গেলে প্রাণ তাজিব, কাজ কি এ ছার জীবনে।

বালিকারা যেন বৃষ্টিতে পারে না কিসের জন্ত সখী ভাঙুরাগী  
এ ভাবে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ  
তাহাদেরও এই ভাবেই অশ্রুচিহ্নিত জীবন-সাব্যার হাত ধরিয়া কানিত্তে  
কানিত্তে পিড়ালের হইতে বিদায়-গ্রহণ করি ত হইবে। সেই আসন্ন বিদায়  
কেননা, সেই রহস্যময় ভয়ভাবনা ভাঙুর ভাসান গানে আভাসিত  
হইয়া আছে। তাহারা ভাঙুরে আশ্রয় করে—

জলে হেল, জলে খেল, জলে তুমার কে আছে?

আপন মনে ভেবে দেখ জলে খণ্ডর ঘর আছে।

ভাঙুর গান আগাগোড়াই তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে  
এই ভাবেই পরিমূর্ত্ত করিয়াছে।

এ গান তো কেবল সখী-বিরহে ব্যাঙ্কলা বালিকাদের গান নয়,  
তাহার মধ্যে আছে বিচ্ছেদ-বেদনাভরা মাতৃহৃদয়ের আকুলতা।  
বাৎসল্যের পরিপূর্ণ কুণ্ডলানি উজ্জ্বল করিয়া এ সকল গান তাহাদের  
হারেবাই রচনা করিয়া দেন। উমাসঙ্গীতের সেই হৈমবতী ধারাই  
বাৎসল্যের রচনের রূপ-মাটিতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে বাৎসল্যের  
উর্ধ্বা করিয়াছে।

উমাসঙ্গীতের মা মেনকা যেমন উমাকে আশ্বাস দিবার নাম করিয়া  
নিজেই নিজেকে আশ্রয় করেন। বালিকা প্রিয়সখীকে বিদায়  
দিতে আশ্বাস দানের মধ্যেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গান ধরে—

বিদায় দিতে মন সরে না ভাঙুর তোমারে।

নিশ্চয় যদি যাবি গো ভুলিস না গো আমারে।

বাছ যদি ভাঙুরগি কেঁদো না গো মনমোহিনী।

আর বৎসর থাকি যদি আনব গো আবার তোরে।



খরোদ বাসনরত্ন হাইস্কুলের ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান এক  
জীব সনে সন্তকে রয়েছেন বেনারসের বিখ্যাত তবলাবাদক  
পণ্ডিত কণ্ঠে স্বাধীন, তানসেনের আসন্ন।

# সাঙ্গীতিক

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এখন সরকারের অঙ্গুগ্রে  
সঙ্গীতের প্রতি এবং সঙ্গীতনায়কদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি  
আকৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও মার্গিসঙ্গীত এখন অল্পশীলনের  
সামগ্রী হইয়াছে—প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত অল্পশীলনে উত্তমোত্তম  
উহার উন্নতি অনিবার্য—চাই কেবল ঐচ্ছিক, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও যত্ন।  
দক্ষিণ-কলিকাতায় ইন্দিরা চিত্রগৃহে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত  
তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বপে তাহার  
ভাষণে কলিকাতার মেয়র অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ভারতের  
স্বাধীনতার পরিশ্রমিত সঙ্গীতের উজ্জল ভবিষ্যৎ বিবৃত করিতে  
গিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। \* \* \* ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধ ওস্তাদ  
আলাউদ্দীন খান স্ববোধে বাজনার সঙ্গে নিখিল ভারত তানসেন  
সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়। তিনি প্রথমে  
সেম-বেহাগ ও পরে ভাঙুর রাগে প্রায় দুই ঘণ্টা বাজান।  
শ্রীমতী বন্দোপাধ্যায় প্রথমে গায়ারাগে একখানি ঝপদ গান  
করেন এবং পরে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহার  
অনুষ্ঠান শেষ করেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বানার্জীর হিম্মত রাগে  
খেয়াল গানখানি উপভোগ্য হইয়াছিল। দবীর খান কিংকি  
রাগে বীণ বাজান। শ্রীপ্রবোধ নন্দী তাঁহার সহিত তবলা সঙ্গত  
করেন। ত্রিহাঙ্গে শাস্ত্রাঙ্গদের তবলা বাজনা আত্ম ভোল  
হওয়া উচিত ছিল। \* \* \* সম্মেলনের তৃতীয় ও চতুর্থ  
অধিবেশনে শ্রোতার উচ্চ স্বরের গীতরস আহরণ করেন।  
ঐ দুটি অধিবেশনে বীরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে  
ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, ওস্তাদনাথ ঠাকুর, কণ্ঠে মহারাজ, আলী  
আকবর খান ও সোহন সিংএর নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের রাগ-  
সঙ্গীতের দিকপাল ওস্তাদনাথ ঠাকুরকে এ বছর এই প্রথম  
সঙ্গীত-সম্মেলনের আসরে দেখা গেল। ওস্তাদনাথ সেদিন  
নট রাগে খেয়াল গেয়েছিলেন। রাগটি প্রাচীন, শুদ্ধ স্বরে বাঁধা  
এর ক্রম অংশটি তিনি ছায়াঘাটে গেয়েছিলেন। ওস্তাদনাথের সঙ্গে  
তবলায় সঙ্গত করেন কানাই গুপ্ত। আলাউদ্দীন খান শুদ্ধ সাবল  
রাগে তাঁর আগাগোড়া শুদ্ধ করেন। তিনি আগাগোড়া অংশটি  
ক্রম দেরে 'গণ্ডোড়া'তে মনোযোগ দেন। এই সময়ে কণ্ঠে মহারাজের  
তবলার সঙ্গে তাঁর স্বরেরে স্তম্ভ প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি  
অপূর্ণ পরিবেশ রচিত হয়। বলা বাহুল্য, দুই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের এই  
সঙ্গীতময় বসিকল্পনাকে বৃদ্ধ করে। আলী আকবর খান স্বরদে  
আঁহার ভৈরো নট ভৈরো, ভৈরবী ভাটিয়ার ও সিদ্ধ ভৈরবী বাক্সির  
শ্রোতাদের তৃপ্ত করেন। আলী আকবরের স্বর স্বীকৃতি নৈপুণ্যের  
সঙ্গে আবেগের একটি স্পন্দর সমন্বয় অল্পকৃত হয়। আত্মতত্ত্ব  
ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্গে তবলার সঙ্গত করেন। \* \* \* নিউইয়র্কে  
৬ই ডিসেম্বর রাড্রে বিখ্যাত ভারতীয় সেতারী শ্রীবিশ্বনাথ  
কাউক্যানন কনসার্ট হলে তাঁহার অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন  
করেন। এখানকার সঙ্গীতময়িক স্বাভাবিক বসনবাস স্বাক্ষরিত



বক্তৃতা আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীচতুরঙ্গাল তবলা ও শ্রীন্দ্র মল্লিক তানপুরায় শ্রী শঙ্করের সঙ্গিত সঙ্গত করেন। \* \* \* গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত-সংমেলনের কার্যকরী পরিবর্ধের উদ্দেশ্যে এক সাংবাদিক সংমেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রী অসিতকুমার ঘোষ ও শ্রী উৎপল হোমরায় সম্মেলনের অগ্রগতির বিবরণ দান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী উৎপল হোমরায় বলেন যে, আগামী ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী রবীন্দ্র ভারতী হলে নিখিল ভারত শিশুসঙ্গীত সংমেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের চারটি বৈঠকে বিভিন্ন স্বাভাব্য সেবা শিশু শিল্পীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবেশন করবে: (ক) কণ্ঠসঙ্গীতে: খেয়াল, তুরি, টপ্পা, তারানা, ধামার, ধ্রুপদ, ভজন, রাগপ্রধান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদী, কীর্তন, পল্লীসঙ্গীত; (খ) নৃত্য: ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, পল্লীনৃত্য; (গ) ব্রহ্মসঙ্গীতে: সেতার, এপ্রাঙ্গ, বেগমসা, বাঁশী, তবলা, গীটার ইত্যাদি। সাংবাদিক সংমেলনটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সফলমণ্ডিত হয়ে ওঠে: জ্ঞানব্রহ্ম ঘোষ, হেমন্তকুমার লাহিড়ী, শ্রীমদেব লাহিড়ী, মহেন্দ্রপ্রভু তেজ, প্রভৃতি। \* \* \* গত বুধবার তানসেন সঙ্গীত-সংঘ পণ্ডিত ওজাননাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে তানসেন সঙ্গীত কলেজে একটি সহরীনা সভার আয়োজন করেন। উক্ত সংঘের সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র দত্ত এবং সম্পাদক শ্রীশৈলেন বানার্জী সভায় বক্তৃতা করেন। সঙ্গীত-সম্মানটিকে সংঘের তরফ হইতে একটি স্বর্ণ-কঙ্করীয় উপহার দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী তাঁর বক্তৃতায় সঙ্গীতের ভাষা কি তা সর্বিজ্ঞেবে বসিয়ে দেন এবং বলেন যে, সঙ্গীতের ভাষা কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাই আরও বর্ধিত। \* \* \* দশর বার্ষিক এটালী সাংস্কৃতিক সংমেলন আগামী ৫ই থেকে ১৩ই জানুয়ারী—এট ন' দিন ধরে চোদ্দটি অধিবেশনে সম্পন্ন হবে। সম্মেলনে প্রায় চার হাজার দর্শকের সম্মুখে হুঁশোর উপর ভারত ও পাকিস্তানের প্রথাগত শিল্পীদের উপস্থিতি করা হবে। সম্মেলনে নৃত্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়ের আয়োজন যেমন করা হচ্ছে, তেমনি কুটিরশিল্প এবং গ্রন্থ প্রদর্শনীরও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হবে। বহু গণিসমাবেশে সম্মেলনটি সার্থক হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। \* \* \* আগামী ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৭, রবীন্দ্র-ভারতী হলে (৫ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭) নিখিল ভারত শিশুসঙ্গীত সংমেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বিবরণস্বীতে—(ক) কণ্ঠসঙ্গীতে—(১) খেয়াল, (২) তুরি, (৩) টপ্পা, (৪) তানবাণা, (৫) ধামার, (৬) ধ্রুপদ, (৭) ভজন, (৮) রাগপ্রধান, (৯) রবীন্দ্রসঙ্গীত, (১০) অতুলপ্রসাদ, (১১) রামপ্রসাদী, (১২) কীর্তন, (১৩) পল্লীসঙ্গীত। (খ) নৃত্য—(১) ভরতনাট্যম, (২) কথাকলি, (৩) কথক, (৪) মণিপুরী, (৫) পল্লীনৃত্য। (গ) ব্রহ্মসঙ্গীতে—(১) সেতার, (২) এপ্রাঙ্গ, (৩) বেহালা, (৪) বাঁশী, (৫) তবলা, (৬) গীটার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্মেলনটিকে সুসংগঠিত করার জন্য জ্ঞানপ্রকাশ থেকে সভাপতি, শ্রীউৎপল হোমরায় ও শ্রীঅসিতকুমার ঘোষকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে এক দক্ষিণাতী কার্যকরী পরিষদ

গঠিত হয়েছে। বহির্বিজ্ঞ ও বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা থেকে কৃতী শিশুশিল্পীরা অধিবেশনের চারটি বৈঠকে যোগদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ জানার জন্য নিখিল ভারত শিশুসঙ্গীত সংমেলন ৪৭, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট যোগাযোগ করতে হবে। \* \* \* গত ১১ই নবেম্বর রবিবার সালকিয়া সঙ্গীত-নৃত্য বিদ্যালয়ের সঙ্গীত উৎসব শাসকিয়া অশোক সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য, নাট্য আকার্গেমিস সঙ্গীত বিভাগের সর্বাধিনায়ক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিদ্যালয়ের কার্যকরী সভায় সভাপতি এবং সম্পাদক, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তার ক্রমোন্নতি এবং কার্যাবলির বিবৃতি দেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, "সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পের সার্থকতা গভীরগতিক শিক্ষা, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী লাভে হয় না। শিল্পীহীনত্ব, সাদা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন। শিল্পীহীন মনুষ্যের কচিকে মার্জিত করে এবং মানুষকে সামাজিক করে তোলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ছোট থেকে বড় হয়ে উঠে স্বচিন্তিত ও গঠনমূলক কার্যে প্রণালী ধার্য। শিল্পীহীন মন ও শিক্ষা সহজেই কেন্দ্রীভূত করে রাখলে চলেবে না। কলকাতার বাহিরে এবং মধ্যস্থলে এর বধ্যাথ প্রচার ও উন্নত প্রণালীর শিক্ষাধারার প্রবর্তন আবশ্যক।" এর পর সঙ্গীতাহুতান হয়। শ্রী এ কানন, শ্রীবলরাম পাঠক, জনাব কোরামতুল্লা খাঁ প্রভৃতির সঙ্গীত সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়।

## রেকর্ড-পরিচয়

### চিহ্নগীতি

এবার নতুন যে সব রেকর্ড বেরিয়েছে, তার মধ্যে আছে 'বুম' চিত্রের গান—"এ কি উত্তোল খুশী হিলোল" এবং "বুম বুম বুম"—প্রথমটি গীতজী কুমারী সঙ্গায় মুখোপাধ্যায় এবং পরেরটি কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের—GE 30345. 'মা' কথাটির গান—"চাঁদ ছিল আকাশ পারে" এবং "বসিছে বাসল অঝোর ধারে"—প্রথমটি শ্রীমতী উৎপলা সেন, পরেরটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া—N 76040. 'দানের মর্ষাদা' চিত্রের গান—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের



নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সংমেলনে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা আসরের বৈঠক। অংশ গ্রহণে আছেন (বাম হইতে দক্ষিণে)—শৈলেননাথ ব্যানার্জী, ওজান দ্বীপ বান, ওজান আলমীনা বান ও প্রবাস সোল দি।

কণ্ঠে 'চাঁদ জগা রাতি' এবং কুমারী আলপনা বন্যোপাখ্যায়ের কণ্ঠে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ'—N 76041. শ্রীমতী উৎপলা সেনের কণ্ঠে 'মুখী বাতাও বনজা' এবং অপরেণ লাহিীর কণ্ঠে 'কানে শচীমাতা'—N 76042. 'মা' চিত্রের আরো দুটি গান—'হে বিজয়ী বীর' সেসেছেন শ্রীমতী সুরপ্রভা সরকার এবং 'আকাশে উঠেছে পূর্ণিমা চাঁদ'—শ্রীমতী অরুণমতী বন্যোপাখ্যায়ের কণ্ঠে—N 76043. অরুণমতী এখন বনামধ্যাত চিত্রভারকা, তিনি একজন সুকণ্ঠী গায়িকা হিসাবেও বহুই স্তম্য অর্জন করেছিলেন—এবারের বেকর্ডে তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল।

### অন্ত্যাহ

বনামধ্যাত প্রবাসী শিল্পী মান্না দে 'একদিন রাতে' চিত্রের কয়েকটি গানে সম্প্রতি বিশেষ চাক্ষুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নতুন গান—'তীর লাভা চেউ' এবং 'তুমি আর ডেকো না'—N 82724. সনৎ সিন্ধের নতুন আধুনিক গান দু'খানি চমৎকার—'তোমার সৌখিনে সিঁদুর' এবং 'নুপুর বাজায় পায়ে'—N 82725. নির্মলেন্দু চৌধুরীর নতুন গান—'তোমার লাগিয়া রে' এবং 'আমার সাধের নাও'—(পরীক্ষিত)—N 82726. লতামঙ্গেশকরের নতুন বাংলা গান—'আকাশ প্রাণে জলে' এবং 'কত নিশি গেছে'—(আধুনিক)—GE 24813. সমরেশ রায়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত—'ওগো আমার চির-অন্ডো' এবং 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে'—GE 24814. শ্রীমতী ইরা মল্লিকার আধুনিক গান—'দোলে মন দোলে রে' এবং 'রূপালী জোহনার'—GE 24815. অমর সিং বস্তালের জগদ্বিগনেটে—'নিউ দিল্লী' চিত্রের দুটি গান—GE 25833.

## আমার কথা (২৩)

### ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

কর্মযুবক কলকাতার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে তার মধ্যাংশ। বিখ্যাতাচার্য ও পোলকীধির অন্তর্ভুক্ত হরলালকার বিপণি। তার উপরে সিসিল হোটেল। পান দিয়ে প্রবেশপথ। সামনেই সিঁড়ি। সোজা ছিনতলা। দেখা বাবে পরিজনবৈষ্ণব এক মধ্যবরসী ভট্টালোককে। কয়েকটা চোখ, মুখে রিক্ত হাসি, হাতে অলস্ত সিঁদুর। দেখা বাবে

মুজা ও চিত্র সহযোগে নাচ শিখিবার পুস্তক  
নাচের ইতিকথা ১ম খণ্ড ২৥০

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য ও শ্রীনেত্রপ্রসাদ বসু প্রণীত

বৈজ্ঞানিক উপায়ে নোড় শিখিবার পুস্তক  
নোড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি ১৥০  
শ্রীপকানন গাঙ্গুলী প্রণীত

ঢাকা ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী

৫ নং ভাটচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এক সঙ্গীতশিল্পীকে, দেখা বাবে বাড়লার অন্ততম ব্যাবিল্লিক সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে।

বালাতে বাড়ী। মাথুলালও সেই অফিসেই। মামার বাড়ীতেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বাড়লা ২৪শে ভাদ্র ১৩২১ সালে ধনঞ্জয় বাবুর জন্ম। ৬শ্রুজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এর বাবা। ব্যাবিল্লিক সঙ্গীতশিল্পী শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য ও শ্রীপাললাল ভট্টাচার্য বৎসক্রেম এর দাদা ও ভাই। শিশু উপনীত হয় বালকবয়সে দুয়ারে। সে বসন্তে শেখে কথা, চমকে শেখে পায়ে সাহায্যে, দেখতে শেখে সে চোখ দিয়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে পূর্ণবয়স দিকে। জীবনের প্রথম প্রভাতেই মুখোমুখি হতে হয় দুইবোনের সঙ্গে, সেই দুইবোনের দমকা হাওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃ পুত্র করেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। সে সময়ে সংসারে বাপের প্রয়োজন ছিল সব থেকে বেশী, তারাই পাড়ি দিল অজানার উদ্দেশ্যে। ফলে সংসার-তরঙ্গী হাতীসংমত একেবারে মার দরিদ্র্যের উত্তাল ঢেউ-এর মুখে, কর্ণধার নেই।—এই পরিবেশে বিকশিত হতে থাকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবন। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে বাল্যেই। বাড়লাদেশের সেই প্রাকৃতিক শোভা, তার পথের মাটিতে মাটিতে মধু, জামল-শোভন আন্তর্য্য সঙ্গীতের রূপ নিয়ে হাতছানি দেয় বালক ধনঞ্জয়কে। বালকের সমস্ত সত্তা নড়ে ওঠে সেই ডাকে, কিন্তু যে বেড়া ডাঙিয়ে সেখানে যেতে হবে সে বেড়া ভর্তি কাঁটা দিয়ে। এগিয়ে আসেন বালকের মা, বালককে পাঠাতে তার অভিষ্টের সন্ধান। কবিব্রতের উক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে—'সাধ থাকে তো সাধ থাকে না।' সেই সঙ্গেই মনে পড়ে তাঁরই আর একটি উক্তি—'আমরা চলি স্রুত পানে কে আমাদের বাঁধবে?'

ধনঞ্জয় পড়ছেন তখন পঞ্চম শ্রেণীতে। তাঁর স্রুত প্রতিভা ও মনের অদম্য বাসনা ধরা পড়ে গেল তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমুখ্যাত-মোহন বন্যোপাখ্যায়ের চোখে। তিনিই ধনঞ্জয়ের সঙ্গীতশিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশিষ্ট মার্গসঙ্গীত-গণনা শ্রীপকানন ঘোষালই ধনঞ্জয় বাবুর প্রথম গুরু। ছ' বছর তিনি ছলেন এর শিষ্য। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। এই সময়ে তাঁর সংগার মুখোমুখি হয় চরম অবস্থার সঙ্গে। রেমিটেন টাইফ কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হলেন ধনঞ্জয়। এই সময়েই তিনি পরিচিত হন পরলোকগত তরুণ চিত্র-পরিচালক কর্মব্যোগী রায়ের সঙ্গে। কর্মব্যোগীর সুপ্রাণিশ পত্র নিয়ে প্রত্যেকটি রেকর্ডিং কোম্পানীতে বান ধনঞ্জয়—সব জায়গা থেকেই আসে প্রত্যাখ্যান। অবশেষে অনেক প্রম বাক্যের পর হিন্দুস্থানের তৎকাল্য ওরিয়েন্টাল মিউজিকাল ভারাইটিস লিমিটেডের সহযোগিতায় প্রথম গান রেকর্ড করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রথম রায়ের লেখা, স্বদেশ দাপ্তরগত স্বর, প্রথম কথাগুলি 'তুমি তুলে যাও মোরে।' বছরখানেক পরে পরিচিত হলেন ভারত রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে। স্বধার গুরু তখন এখানকার কর্মব্যোগীচালক। 'আলোরা' ছায়াচিত্রে কণ্ঠ দিলেন ধনঞ্জয় (মাটির এই খেলাঘরে), শৈলজ্ঞানেশ্বর শহর থেকে দূরে ছায়াচিত্রেও (তুল করে তুই চিলি না তোয় প্রেমের ভাসমায়া)। ঐ বছরেই (১৯৩০) স্বরসাগর হিমালয় দ্বয়ের সঙ্গে বাক্য করেন পুখা। সেখানে একটি ছবিতে নায়ক ভারতকৃষ্ণ গুপ্ত খিলিয়ে বান ধনঞ্জয়-সঙ্গীত একটি পানের গন্ধ।

ভারপর বাংলাদেশে ফিরে এসে চলল ধনজয়ের সাধনা, তমস্বতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, তাঁকে নিয়ে গেল সিদ্ধির দরবারে। এল জনগণের সম্মান, আন্তরিকতা বা তিনি তাঁর বারাদেশের মর্জি পাখের বলে যিবেচনা করেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের পর বহু বার বহু সুযোগ এসেছে বোকাটো বাবা কিন্তু বান নি, কেবলমাত্র কিছুকাল আগে প্রচেষ্টা গ্রহণের বড়ালের ইচ্ছাঘূসারে 'চৈতন্য মহাপ্রভু' চিত্রে পান গাইবার জন্তে তাঁকে বেতে হয় বোকাই। প্রায় দু'শো ছবিতে আঁক পর্বত কঠ দিয়েছেন ধনজয়। প্রদ্যাম্পদ জীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের ইচ্ছাঘূসারে 'লেডিজ সীট' নামক ছায়াচিত্রে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ধনজয় ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অভিনেতা জীঅক্ষণ চৌধুরী। নেত্রাং সবেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন পাশের বাড়ী, খসুরবাড়ী, লেডিজ সীট ও নগরধান ছায়াচিত্রে অভিনেতারূপে।

আজকের দিনে সকল ক্ষেত্রে মতই সঙ্গীত-জগতেও এসেছে নানান ধরনের গলদ। এর থেকে মুক্তি পাবার পথও আছে কিন্তু ধনজয় জানেন না যে, সে পথে যাওয়া কত দিনে সম্ভব হবে? তিনি বলেন—আজকের দিনে শিল্পী ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই—এ এক বিরাট ব্যথা। প্রায় পানরো বজরের শিল্প-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে—এ প্রশ্নের উত্তর দ্বিবিধ। একতর সময়ে মনে হয়, তে ঈশ্বর! আমিই বোধ হয় তোমার সমস্ত স্নেহের একমাত্র অধিকারী—অবার কখনও কখনও মনে হয় বৈ কি যে মানসোন্নয়ন পরিহার করে যে লোকটা সে-ও বোধ হয় আমার চেয়ে স্তম্ভ। প্রচুর যে একটি বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে তার পূর্ণ অধিকারী ধনজয়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সঙ্গীত পরিচালকের পরিচালনার কাজ করেছেন ইনি।



শিল্পীদের মধ্যে ইনি জানালেন, ইনিই একমাত্র জন ঐ বিশেষধর্মের অধিকারী।

তাস খেলতে ভাল লাগে ধনজয়ের। বন্ধন ও ডিটেকটিভ গ্রন্থেও আনন্দ পান ধনজয় ভট্টাচার্য।

প্রথম পরিচয় আমার ভদ্রলোকটির সঙ্গে। নিমেষের মধ্যে করে নিলেন যেন কত পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু! প্রয়োজনার কথোপকথন সমাপ্ত হল বখা নির্ধারিত সময়েই। তারপর চলতে লাগল হাজারো রকমের ঘরোয়া আলোচনা-আলোচনা নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে।

## তুমি : আমি

প্রতিভা রায়

বিরহের মাঝে আমি খুঁজি যে তোমার :

কত ব্যথা, কত অশ্রু পুঞ্জীভূত করে  
তোমার জন্তে আমি করেছি যে ঠাই।  
সে স্থান কোথায় জানি?—আমার অন্তরে।  
তোমাকে পাবো না আমি মধুর মিলনে,  
স্বপ্নের বাঁধনে তুমি দেবে না তো ধরা ;  
তাই জেনে ভেবেছি গো আমি মনে মনে :  
বিরহের মালা নিয়ে হ'ব স্বয়ংস্বরা।

'ব্যথা' শুনে স্মিরমাণ হ'ল বুঝি মন ?  
বেদনাকে ভয় কর—এত ভীক তুমি ?  
দুঃখে শেখোনি বুঝি করিতে বরণ ?  
ধরার উত্তান আছে, আছে মরুভূমি—  
সেই শুষ্ক ভূমি আমি ; তুমি যে নূরের  
ফুলের উত্তানে পানী,—নহে বিরহের।



## ঐক্যপালচন্দ্র নিয়োগী

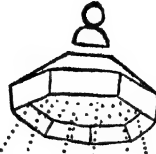
মিশর যুদ্ধের পরে—

অগশের বুটেন এবং ফ্রান্স মিশর হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে সম্মত হইয়াছে এবং গত ৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কাজ আরম্ভও হইয়াছে। মিশর হইতে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী বাহিনীকে অপসারণের কার্য আরম্ভ করা হইয়া গত ২৪শে নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের নির্দেশ মানিয়া বুটেন ও ফ্রান্স মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে রাজী হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ থাকিলে বিশ্বের বিষয় হয় না। এই প্রস্তাবের উপর বৃটিশ ও ফরাসী গবর্নমেন্ট কোন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বিশ্ববাসীকে একথা টাঙ্কায় বৃষ্টিতে দিতে রাজী নহেন। ইহা শুধু তাঁহাদের নিজেদের মত বক্ষার প্রয়াস, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইহার পূর্বেও আর একবার—গত ৭ই নবেম্বর মিশর হইতে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী বাহিনী অপসারণের নির্দেশ দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এক প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব হইতে হটবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বুটেন ও ফ্রান্স উৎসাহে মাটেই কোন আশ্রয় দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডকে গত ২০শে নবেম্বর বুটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের নিকট সাধারণ পরিষদের উক্ত প্রস্তাব তুলিয়া দেয়ার হইতে সৈন্য অপসারণ না করার কৈফিয়ৎ তলব করিতে হয়। ২২শে নবেম্বর বুটেন ফ্রান্স ও ইসরাইল ঘোষণা করে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব মানিয়া কিছু সৈন্য তাহারা মিশর হইতে অপসারণ করিবে। ইহার পূর্বদিন অর্থাৎ ২১শ নবেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড বলেন যে, পোর্টসেইদ হইতে এক ব্যাটেলিয়ন বৃটিশ সৈন্য নতুন হিসাবে অপসারিত করা হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের কৈফিয়ৎ তলবের ইহাই ঘটে গিয়াছিল।

গত ২২শে নবেম্বর বুটেনের লর্ডপ্রিভিসল মিঃ আর এ বাটলার মঙ্গল সভায় ঘোষণা করেন যে, বেশখান্ধ না আত্মত্যাগিক

করার বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত উল্লেখ প্রত্যাশন করিতে সমর্থ হইবে, সেপর্যন্ত সুরেজ খাল অবল হইতে বুটেন তাহারা সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে রাজী নয়। এই প্রসঙ্গ গত ৩রা নবেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এটনী ইডেন যে তিন সপ্তে বৃদ্ধ করিতে রাজী হইয়াছিলেন তাহা স্বতঃই মনে পড়ে। উক্ত সপ্ত তিনটির মধ্যে অন্ততম সপ্ত হইল এই যে, স্বতঃনি না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠিত হইতেছে ততদিন যুযুগল দেশদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সংখ্যক সৈন্য ফরাসী সৈন্য রাখিতে হইবে। স্যার এটনী ইডেনের উক্ত সপ্তটি মিঃ বাটলারের ঘোষণার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড সাধারণ পরিষদে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী সৈন্য অপসারণ সক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনার সময় গত ২৩শে নবেম্বর বলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী এখনই কার্যকরী ভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইবে তখনই বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইবে। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাহারা এই সর্বদাবীর একমাত্র তাৎপর্য এই যে, তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাগা কর্তব্য ছিল এবং যে কর্তব্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ করে নাই, মিশর আক্রমণ করিয়া বুটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হইয়া সেই কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এবং বৃটিশ কমন্স সভায় মিঃ লয়েডের বক্তৃতা হইতে ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

মিশর হইতে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিয়া ২৪শে নবেম্বর সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বরের পূর্বে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। ৩রা ডিসেম্বর কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ লয়েড বলিয়াছেন যে, ইস্রাফরাসী কাছের ফলে একটা আঞ্চলিক যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, “আমরা উত্তর বিস্তারিত করা বন্ধ করিয়াছি।” কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য মিশর আক্রমণকারী ইসরাইলকে আক্রমণ করে নাই, আক্রমণ করিয়াছিল আক্রান্ত মিশরকে। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য আঞ্চলিক যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মিশর আক্রমণ করে নাই, বরং আঞ্চলিক যুদ্ধকেই আরও শক্তিশালী করিয়াছিল। এই আঞ্চলিক যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিয়াই সুরেজ খাল দখলের জন্য তাহারা মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলগানিন যখন বৃটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রীদেরকে সহকর্মী করিয়া দিয়া জানাইলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ পর্যাৱসিত করিতে এবং পুনঃবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে রাশিয়া বন্ধপরিকর, তখন বুটেন ও ফ্রান্স বুঝিতে পারিল, মিশরের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। যখন ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল তখনই যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ লয়েড ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বুটেন ও ফ্রান্সের সামরিক কাৰ্য্যকলাপের ফলে রাশিয়া কতখানি অস্থির প্রবেশ করিয়াছে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত ৮ই নবেম্বর (১৯৫৬) পিটার্স বর্ধিক্রম বৃটিশ কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়া যে মিশরকে ধ্বংস ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, মিশরে বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু একবারটা মোটেই ঠিক নয়।



নিম্ন তৈল থেকে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে  
প্রস্তুত সুগন্ধি  
মার্গো সাপের প্রচুর  
ফেনা যেমন  
নির্মলকর তেমনি  
জীবাণুনাশক।  
মার্গো সাপ দেহের  
কাস্তি উজ্জ্বল করে।  
কোমল স্বকের  
পক্ষেও ব্যবহার করা  
সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্নানের সময়

ব্যবহার করতে হুলেনেন না



**মার্গো**  
**সাপ**

ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কোম্পানি লিমিটেড  
কলিকাতা ২৩



মিশরকে রাশিয়া যে সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ ২১শে অক্টোবর তারিখেই বুটেন পাইয়াছে। বুটিন গরমাস্ট্রি দপ্তরে নতুন রাষ্ট্রদ্রোহী কমান্ডার নবোল ১১শে নবেম্বর একথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বুটেন ও ক্রাপল মিশর আক্রমণের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে রাশিয়া কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে তাহা জানা নয়, এই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া সামরিক শক্তিতে মিশর যেটুকু শক্তিশালী হইয়াছিল তাহা ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বুটেন সৈন্ত অপসারণ করিতে রাজী হইয়াছে কি না, এবিষয়ে আমরা পূর্বেই সন্বেহ প্রকাশ করিয়াছি। বুটেন ও ক্রাপল মিশর হইতে সৈন্ত অপসারণ করিতে রাজী হওয়ার কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিশর হইতে বিদেশী সৈন্ত অপসারিত করা না হইলে রুশ নাগরিকদের বৈজ্ঞানিকগণের মিশরের দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধা দিবে না বলিয়া রুশ গবর্নমেন্ট স্থির করেন। দ্বিতীয়তঃ মিশর আক্রমণ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের মৈত্রীর মধ্যে কটিলে ধরিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়তঃ বাগদাদচুক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবার ঠিকান হয় এক চতুর্থতঃ বুটিন কমনওয়েলথের মধ্যেও ভাঙ্গন ঘরিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। কমনওয়েলথে ভাঙ্গন ধরার আশঙ্কা বুটেন খুব গুরুতর মনে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের কমনওয়েলথ ত্যাগ ভারতীয় জনগণ দাবী করিলেও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু উহার বিরোধী।

নেহরুজীই কমনওয়েলথকে ভাঙ্গনের সুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাগদাদ চুক্তিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য পাকিস্তান বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মতভেদে তীব্র আকার ধারণ করাকে বুটেন বিশেষ ভাবে ভয় করে। মতবিরোধটা বেশীদূর গড়ায়, ইহা অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চায় না। লণ্ডন ও প্যারীতে মার্কিন-বিরোধী প্রবল মনোভাব গড়িয়া উঠে। গত ২৪শে নবেম্বর মিশর হইতে সৈন্ত অপসারণের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমর্থন করে। সৈন্ত অপসারণ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ ভাবে বুটেনের উপর চাপ দিয়াছে, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। প্রো: আইসেনহাওয়ারের সহিত

বুটিন প্রধান মন্ত্রী ত্রায় এটনি ইডেনের সাক্ষাৎকারের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। অথচ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজীর সহিত প্রো: আইসেনহাওয়ারের সাক্ষাৎকারের আরোজন চলিতেছে আমেরিকার পরোক্ষ চাপ, ইঙ্গ-মার্কিন মতভেদ আরও প্রবল হওয়ার আশঙ্কা এবং মিশরে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকবাহিনীর আগমনের আশঙ্কা এই কয়েকটি মিলিত হইয়াই যে বুটেনকে মিশর হইতে সৈন্ত অপসারণে অগ্রপ্রাণিত করিয়াছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তা ছাড়া বুটেনের এই আশাও আছে যে, আন্তর্জাতিক বাহিনী মিশরে উপস্থিত থাকার সময়েই সুরেজ খাল সম্পর্কে কর্তৃক নাসেরের সহিত আলোচনা হইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবী অঙ্গুর্য্য একটা মীমাংসা হইবে। মি: লয়েড তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতায় এই আশাই প্রকাশ করিয়াছেন।

মিশর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিলেও বুটেনকে বাধ্য হইয় পোর্ট সৈয়দ হইতে সৈন্ত অপসারণের হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে ইহার উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। কিং মিশর আক্রমণ করার মূলে বুটেন ও ক্রাপলের কি বি উদ্দেশ্য ছিল এক উহা কতটুকু সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা উপেক্ষার বিষয় নয়। মিশর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হুইট, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রথম উদ্দেশ্য সুরেজ খাল দখল করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মিশরের শাসন ক্ষমতা এবং আরব-জগতের নেতৃত্ব হইতে কর্ণেল নাসেরকে বিচ্যুত করা। এই হুইট প্রধান উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইতে পারিল না সে সন্দেহ বিমত নাই। পোর্ট সৈয়দ দখল করিয়াও বুটেনকে বিস্তৃত হস্তে ধরিতে হইল। কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে অস্ত্র সাহায্য পাইয়া মিশর যে সামরিক শক্তি অর্জন করিয়া ছিল তাহা ধ্বংস করা এবং কর্ণেল নাসেরকে অস্ত্রাহার বরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে দুর্বল প্রতিপন্ন করাও যে মিশর আক্রমণের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। শেবোজ উদ্ভটজী যে সিদ্ধ হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। মিশর আক্রমণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি আরবরাষ্ট্র সমূহের তিক্ত মনোভাব আরও বৃদ্ধিই শুধু করে নাই আরবসমাজকে আরও শক্তিশালী করিয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, মিশরের প্রতি কার্য্যকরী সহায়ত্ব দিতে জাপানের জন্য সিরিয়া ও জর্ডান ইসরাইলকে আক্রমণ করে নাই। কর্ণেল নাসের ইহা চাহেন নাই, না, ইহার অন্য আরও কোন কারণ আছে তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইঙ্গ-বাহিনী আক্রমণের কলে মিশরের সামরিক শক্তি যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তা ছাড়া এই আক্রমণের কলে মিশরের আরও বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। হাজার হাজার মিশরী পুং-হীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বোমা-বর্ষণের কলে গৃহস্থি ধ্বংস হওয়ার এক পোর্ট সৈয়দ হইতেই পাঁচ হাজার নারী ও শিশুকে অপসারিত করা হইয়াছে। মিশরের যে সকল সহরের উপর বোমা-বর্ষিত হইয়াছে সবখানেই এইরূপ দুর্দশা ঘটয়াছে। বুটিন-গবর্নমেন্ট অবশ্য ব্যাপারটাকে অত্যন্ত লুপ্ত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৫৬) কমনওয়েলথের এক প্রস্তাব উক্ত যে মি: বাটলার বলিয়াছেন যে, পোর্ট সৈয়দ সর্বপ্রকার সামরিক আক্রমণের কলে সামরিক ও অসামরিক লোক মিলিয়া মোট ১০০ জন নিহত এবং ৫৪০ জন আহত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন সর্বোচ্চস্তরের প্রত্যাশনায়

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যাল কিংস মেমোর

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

# কী করে পরীক্ষায় ফাস্ট হ'ল গোপাল ?



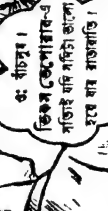
জেনার কী হয়েছে গোপাল ?  
কাল পরীক্ষা—ভার হয়েছে ভা  
সেই পক্ষে সাক্ষি !

না কার !  
সদি হজবেই বলে  
মাথাটা বড় ভার  
হচ্ছে । কিন্তু জবাবে  
পরীক্ষা—কী যে করা !



ভাই বলে পরীক্ষা তো  
আর বড় সাধি যা না, গোপাল !  
এক কথ কবো, আজ যাই হ'লি  
ভালো হবে যাবে । বাজার থেকে  
এক পিঠি ভিকস ডেসপারাব  
খিয়ে নিবে যাও, গোবর আরে  
ওই ওরুটা মুক পানির পিঠি  
মানিগ করে তুবে !

ওঃ ষিচু !  
ভিকস ডেসপারাব-এ  
সত্যিই যদি মদিটা ভালো  
হবে যা হাতকাড়ি !

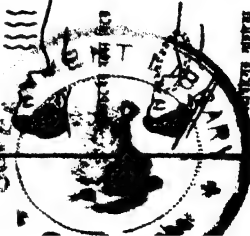


সেই হাতেই গোপাল ভিকস ডেসপারাব কিনে  
নিবে এল । তারপর তুত যাবার আগে এই  
শক্তিশালী ওরুটি ভালো করে মানিগ করল মুক,  
পানায় আর পিঠি । মুক মুক সেবে খেতে  
লাগল তায় সবি ।

## ভিকস ডোগারাব সদি সারায় দু'ভাব

১। মানিগ করব মুক সবে গোপালের পাঠ্যক্রম  
ওপর ওক হল ভিকস ডেসপারাব-এ নিরাম-  
ক্রিয়া । মুকের মাথা ভালো হয়ে গেল, হাঁক তেড়ে  
ফিল সে ।

২। সেই মুক ভিকস ডেসপারাব-এ ভি আরেকটা  
পাঠ পাঠাবারো সাহায্যে সাধি বাত প্রণ করল মুক  
গোপাল । সবি এক ভীষণ ক্ষত ভিকস ডেসপা-  
রাব-এর এই ভি আরেকটা মুক । ভাই বলে গোপালের  
কত ভাল পরিকার হয়ে গেল, বড় ভাল জায় করা মুক  
মুদেদি, কানির ঘর থেকেও ফিল সে ।



পরের দিন গোপালের মাথা  
এতবারে লম্ব হয়ে গেল,  
সদিও অনেক ভালো ।



**সদিব**

**চি**

**চি**

**ভিকস**

**ডোগারাব**

ওরুটি আতর্ভিকত  
ভালো সাধি । হাতকাড়ি  
আমায় সদি ভালো করে  
খিয়েছে—মাথা আমায়  
বেল এতবারে সাধ  
হবে গেছে ।

“ভিকস ডোগারাব” এটি টিউব

যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পোর্ট-সৈরসের অধিনায়ক লোক নিহত হইয়াছে। ইহার অর্থ, পোর্ট-সৈরসের অধিনায়কদের প্রতি ২০ জনে একজন নিহত হইয়াছে। নিহত ও সম্পত্তি ক্ষয় হওয়ার দিক হইতেও মিশরের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। সাময়িক ও এট সকল ক্ষয়ক্ষতি মিশর কর্তৃক সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা অল্পমান করা কঠিন।

আলজেরিয়ার বিদ্রোহীনিগকে মিশর হইতেই কার্যকরী সাহায্য দান করা হইয়া থাকে, ইহা-ই কখনো গবর্নমেন্টের দায়ণ। মিশর বাহাতে আর এইরূপ সাহায্য দিতে না পারে, ইহাও মিশর আক্রমণের অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, ইহা মনে রাখা বাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মিশর আক্রমণের আর একটা উদ্দেশ্য থাকে মারিয়া বৌকে শিখাইবার ব্যবস্থা, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? মিশরের নেতৃত্বে আরব রাষ্ট্রগুলি সম্মত হইতেছিল। ইহাতে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবী বিপর্যয় হইয়া পড়িতেছিল। মিশর আক্রমণ করিয়া বুটেন ও ফ্রান্স অজ্ঞাত আরব রাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদের ভাগ্যে মিশরের অবস্থা ঘটিবে। বুটেন ও ফ্রান্সের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না ইহা স্বীকার করা যায় না। বুটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ নিরপেক্ষ ছোট ছোট শক্তিগুলিকে যে এক নতুন শিক্ষা দিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মিশর ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং পঞ্চাশে লক্ষ বিঘা হইয়াছে। কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্স মনে করে, সুরেজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া মিশর তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে। বুটেন ও ফ্রান্সের ভায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি মনে করে, মারিয়া হস্তক্ষেপ করিয়া বিপর্যয় বাধাইতে চাহিবে না। বৃহৎ আঞ্চলিক সীমার আশঙ্ক থাকিবে এই ভরসা যে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যে কোন অজ্ঞাতে কোন দুর্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিতে পারে। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং বিশ্বজনমন্ডলের নৈতিকশক্তি এই আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চাপে আক্রমণকারী রাষ্ট্র যদি তাহার স্বত্বের প্রায় ফেলিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেও আক্রান্ত দেশের বিপুল ক্ষতি অপরূপ দাবী করিয়া থাকিবে। কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজের ক্ষতি হইয়াছে মনে না করিতে পারে, এইরূপ নীতি অল্পসংখ্যক করাই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আশঙ্ক করা একমাত্র উপায়। ইহাও মিশরের স্বত্বের আর একটি শিক্ষা।

একথা অবশ্য সত্য যে, মিশর আক্রমণ করায় বুটেন ও ফ্রান্সেরও ক্ষয় ক্ষতি হয় নাই। বুটেনের স্বর্ণ ও ডলারের যত্নত তহবিল হ্রাস পাইয়াছে। বুটেন ও ফ্রান্সের শিরগুলিতে উপদান হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অল্পভূত হইতেছে। বুটেনের বস্ত্রশিল্প ও মোটরশিল্প বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সুরেজ খাল বন্ধ হওয়ার ফলে পথে ভলবাই ভাঙ্গা চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর তৈলের তিনটি পাইপ উড়াইয়া দেওয়ার পাইপ ছাড়া বাকী চলাচল দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সৌদি আরব হইতে ফিলিস্তিনে পাইপ গিয়াছে তাহা টিকি আছে। কিন্তু বুটেন ও

ফ্রান্সকে তৈল দেওয়া সৌদি আরব সক্ষম করিয়াছে। ফলে বুটেন ও ফ্রান্স পেট্রলের অভাব দেখা দিয়াছে। বুটেনকে পেট্রল বেশনিঃসৃত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বুটেন ও ফ্রান্সকে তৈল দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে। এই সাহায্য পাইলেও তৈলের অভাব পূরণ হইবে না। মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান বাজার সাময়িক ভাবে হস্তগত হইয়াছে। অসামান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ নৈতিক দিক হইতে সকল প্রকার ক্ষতির তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। মিশর আক্রমণের প্রথম ফল হইয়াছে বুটেন প্রধান মন্ত্রী তার এটেনী ইডেনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়া। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাকে জেমেকারে বাইতে হইয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত বুটেনের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটয়াছে। সিরিয়া ও সৌদি আরব বুটেন ও ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। জর্ডান ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু বুটেনের নিকট হইতে জর্ডান যে সাহায্য পায় তাহা লইয়াই দেখা দিয়াছে প্রধান সমস্যা। আরব রাষ্ট্রগুলি জর্ডানকে একগুণ অর্থ সাহায্য দিতে পারিবে কি না বাহাতে জর্ডানের পক্ষে বুটেন সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইতে পারে, ইহা-ই জর্ডানের এখন প্রধান বিবেচনার বিষয়। কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় মিশরের ক্ষতিই যে বেশী হইয়াছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। এই ক্ষতির দ্বারা মিশর কর্তৃক সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা অল্পমান করা কঠিন। তা ছাড়া সুরেজ খালটিকে পুনরায় জাহাজ চলাচলের উপযোগী করা একটা বৃহৎ সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। মিশর আক্রমণের ফলে প্রথমেই অবরুদ্ধ হইয়াছে সুরেজ খাল। বোমা বর্ষণের ফলে জাহাজভরী হইয়া সুরেজ খাল অবরুদ্ধ হইয়াছে। উহাকে আবার মুক্ত করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই ব্যয় বহন করিবে কে? মিশরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী জেরিত হইয়াছে। উহার ক্ষত ও ব্যয় বড় কম হইবে না। এই ব্যয়ই বা বহন করিবে কে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে যদি এই ব্যয় বহন করিতে হয় তাহা হইলে আক্রমণকারী বুটেন ও ফ্রান্সকেই সাহায্য করা হইবে। বুটেন ও ফ্রান্সের হুমকির জন্য অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রকে খেলারত দিতে হইবে কেন তাহার কোন কারণ নাই। এই ব্যয় বুটেন ও ফ্রান্সেরই বহন করা উচিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই ব্যয় বহনের জন্য বুটেন ও ফ্রান্সকে যদি বাধ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এইরূপ আক্রমণের পথ খোলাই থাকিবে।

পোর্ট-সৈরস হইতে বুটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী অপসারিত হওয়ার পর সুরেজ খাল পরিচালন সংক্রান্ত প্রকল্পটী মীমাংসা করিতে হইবে। সুরেজ খালের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই বুটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সুরেজ খালের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে মিশর কিছুতেই রাজী হইতে না। তবে সুরেজ খালপথে অব্যাহত জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ আলাপ-আলোচনা দ্বারা একটা মীমাংসা করিতে কর্তব্য নাসেরেরও আপত্তি নাই। বুটেন ও ফ্রান্স যদি মনে করে যে এই আক্রমণের ফলে মিশরের বেশ শিক্ষা হইয়াছে এবং সুরেজ খালের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে কর্তব্য নাসের রাজী হইবেন, তাহা



# ଲାବନ୍ଧେ ଟିକିଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଉଜିଆ



ମାଉଜିଆ  
ମାଉଜିଆ

ଲାବନ୍ଧେ — ଉତ୍ତମ ଏକାଠି ଶିଳ୍ପପାଦ୍ୟ

হইলে তাহা ভুল ধারণা। মিশরের উপর চাপ দিবার জন্য মিশরে আন্তর্জাতিক বাহিনীর উপস্থিতিতে মিশরের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করার যে দাবী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড করিয়াছেন, মিশর তাহাতেও রাজী হইবে না। সুরেজ খাল গণিচালন ব্যবস্থার মিশরের সার্কুলেট অধিকার যেমন রক্ষা করিতে হইবে তেমনি ব্যবস্থা করিতে হইবে শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে সুরেজ খাল পথে অব্যাহত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা। ইহা যে সম্ভব ভারতের প্রস্তাব আলোচনা করিলেই তাহা ঘৃণিতে পারা যায়। মিশর আক্রমণের প্রাকালে ভারত একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছিল। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বে মিশর হইতে বিশেষী সৈন্ত অপসারণই শুধু করিলে হইবে না, সুরেজ খাল বন্ধ করার এবং আন্তর্জাতিক বাহিনীর যার কে বহন করিবে তাহারও স্তায়সঙ্গত সমাধান করিতে হইবে।

### হাজেরীতে কি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—

হাজেরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে এখনও শান্ত তাহা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু হাজেরীতে কি ঘটিয়াছে এবং কি ঘটিতেছে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বিশ্ববাসীকে হাজেরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার সুযোগ দিতে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট এক কাগার গবর্নমেন্টের অনিচ্ছা সত্যই অত্যন্ত বিম্বয়কর। হাজেরীর বাহির হইতে কমুনিষ্ট বিরোধীরা উসকানী দিয়াছে এবং বাহির হইতে বহুলোক হাজেরীতে প্রবেশ করিয়া হান্সায়া স্ট্রীট করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন থাকে, ইহার কাহার? ইহার কি হাজেরীভাষ্যকারী উদ্ভাস? হাজেরীতে ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্র কক্ষ গঠনের জন্য বাহিরের কমুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিবর্গের উসকানিতেই কি উহার হাজেরীতে প্রবেশ করিয়া হান্সায়া স্ট্রীট করিয়াছিল? যেকোন শান্ত ও ঐক্য সহনবাহী করিবার অভিলাষ অশ্রদ্ধ সহনবাহী করিবার অভিযোগও উঠিয়াছে। উল্লিখিত অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্ববাসীকে উহা নিঃসংশয়িত ভাবে জানিবার সুযোগ দেওয়া কাগার গবর্নমেন্টের অল্প কণ্টব্য। কিন্তু তাহারা যে নীতিপ্রবণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্ববাসী এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে কিরূপে? হাজেরীর কাগার গবর্নমেন্ট এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, সেগুলিই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যেকোনও হিসাব অনুযায়ী হাজেরীতে নিহতের সংখ্যা পাঁড়াইয়াছে সাত হাজার। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুমান নিহতের সংখ্যা ৬০ হাজার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হাজেরী হইতে হাজার হাজার লোককে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার নির্বাসিত করার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। রুশ গবর্নমেন্ট এবং হাজেরী গবর্নমেন্ট নির্বাসনের অভিযোগ পুনঃ পুনঃ আঁকায় করিয়াছেন। কিন্তু পরে একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, এখন দিল্লী কিছুসংখ্যক লোককে রাশিয়ার নির্বাসিত করা হইয়াছিল বটে, তবে পরে তাহাদিগকে হাজেরীতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। ইহাতে লোকের মনের আশঙ্কা ও সন্দেহ দূর হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইসরে নজে এবং তাঁহার সহযোগীদের সম্পর্কে রুশ গবর্নমেন্ট এবং কাগার গবর্নমেন্টের আচরণও লোকের মনে কম সন্দেহ সৃষ্টি করে নাই।

নজে এবং তাঁহার করেক জন সহযোগী বৃদ্ধাগেজে যুগোস্লাভিয়ার লুতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কাগার গবর্নমেন্টের নিকট আশাস পাওয়াই তিনি এক তাঁহার সহযোগীরা বগুহে ফিরিবার জন্য যুগোস্লাভ লুতাবাস হইতে বাহিরে আসিলে তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই গ্রেফতার সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্যই চমকপ্রদ। একটি সর্বাসে বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত কোয়ালিশন গবর্নমেন্ট গঠন সম্পর্কে মিঃ নজে বলেন মিঃ কাগারের সহিত পার্লামেন্ট ভবনে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন রুশ সৈন্ত সেখানে প্রবেশ করিয়া মিঃ নজে এবং তাঁহার সহযোগীদিগকে গ্রেফতার করে। তাঁহার গ্রেফতার সম্পর্কে যুগোস্লাভিয়ার সর্বাসদপত্র 'বোরবার' বৃদ্ধাগেজে সংবাদদাতা অন্তরকম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গত ২২শে নবেম্বর (১৯৪৬) মিঃ নজে এবং তাঁহার ১১জন সমর্থক ১৫জন মহিলা এবং ১৭জন বালক-বালিকাসহ যুগোস্লাভ লুতাবাস হইতে বাহিরে আসেন এক হাজেরী গবর্নমেন্ট তাঁহাদের জন্য যে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই বাস চড়িয়া তাঁহারা গৃহভিষ্মে রক্তমাংস হন। ঠিক সেই সময়ে একজন রুশ অফিসার লাকাইয়া বাসে উঠেন এবং সোভিয়েট নিরাপত্তা বাহিনী বাসখানিকে ঘিরিয়া ফেলে। অন্তঃপুর বাসখানিকে জোর করিয়া সোভিয়েট কমান্ডান্ট রাতে (Kommandantura) লইয়া বাওয়া হয়। তাঁহাদের সঙ্গে যে দুই জন যুগোস্লাভ কূটনীতিবিদ ছিলেন তাঁহারা ইহাতে আশঙ্কিত করিলে তাঁহাদিগকে বলপ্রয়োগে বাস্তব ফেলিয়া দেওয়া হয়। নজে বেজার অজ্ঞাত স্থানে বাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মধ্য রেডিওর এই ঘোষণা কেহই বিশ্বাস করিবে না। নিজের ইচ্ছার নজে রুমানিয়ার গিরাছেন, বৃদ্ধাগেজে রেডিওর এই এই ঘোষণাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নজে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব সোভিয়েট গবর্নমেন্টে আঁকায় করিলেও কাগার গবর্নমেন্টের বাহিনী কর্তৃক সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আছে। যুগোস্লাভিরা সম্পূর্ণরূপেই কাগার গবর্নমেন্টকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু নজের ব্যাপারে যুগোস্লাভিরাতেও গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে।

হাজেরিয়ানদিগকে অবিলম্বে রাশিয়ার চালান দেওয়া বন্ধ করিতে, সোভিয়েট সৈন্যদের অবিলম্বে হাজেরী ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়া ফিউবার এক প্রস্তাব গত ২১শে নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকসমিতিও হাজেরীতে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ঐ দিনই ভারত, সিন্ধ ও ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকসমিতি বাহাতে হাজেরীর অবস্থা অবগত হইয়া রিপোর্ট দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে হাজেরীতে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য এই প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। হাজেরী গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকেও হাজেরীতে বাইতে দিতে প্রথমে হাজেরী গবর্নমেন্ট সম্মত হন নাই। হাজেরীর অবস্থা সম্বন্ধে কোন তাঁহার সহিত আলোচনা করার প্রস্তাব করা হয়। অবশেষে হাজেরী গবর্নমেন্ট তাঁহাকে হাজেরীতে বাইতে দিতে রাজী হইয়াছেন। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬

এই ঘা,  
আঙুলটা কেটে গেল!

দেখি দেখি, শীগ্গির  
'ডেটল'টা দেখি!



হালি চোখে যদি কখনও একবার দেখতে পেতেন যে আমাদের চারদিকে কত অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে, তবে এতটুকু কাটা-ছড়াও কখনো ভুলে করতেন না। এই অদৃশ্য জীবাণুগুলির বেশিরভাগই আবার রোগের বিষ ছড়ায়। এমন কি, সামান্য একটা আলগিনের খোঁচার মতন ছোট্ট কাটাকেও এরা বিধিয়ে তুলতে পারে। সিলেক্ট ও বাড়ীর সবাইকে এসব বিধাত জীবাণুর হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে 'ডেটল' ব্যবহার করুন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'লে প্রসবের সময় ডাক্তাররা 'ডেটল' ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হ'লে মনে করেন, কেননা প্রসবপথে কোথাও এতটুকু কেটে-ছড়ে গেলে তা বিধিয়ে উঠতে পারে—এহতির শ্রুতিকান্না হয়ে মারাত্মক অবস্থা দেখা দিতে পারে, এমন কি বত্বা হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

অভিসময়র সন্ধ্যাই প্রতিদ্বন্দ্বী করা উল্লা



ডাক্তাররা এই জীবাণুনাশকই ব্যবহার করেন

বাড়ীতে সব সময় 'ডেটল' রাখা বস

ঘাতে ভরকার হ'লেই সবাই হাতের গোড়ায় পার। হাতমুখ ধোয়া কি বাড়ীর ভ্রমিষপন্থর খোয়ামোড়ায় 'ডেটল' ব্যবহার করবেন (রুগীর ঘরে 'ডেটল' ক'রে ছিটিয়ে দেবেন)। ঘরের মেয়ে বা নর্দমায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ বেরুলে 'ডেটল' ছিটিয়ে দেবেন, দইলে অসুখবিশুদ্ধ হতে পারে।



পৌড়বাঁপ খেলাখুলা করবার সময় ছোটদের হাতশেই কেটেছড়ে যায়। কাটা জায়গা 'ডেটল' দিয়ে ধুয়ে নিন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ জীবাণুনাশক—গাছটিও ভালো। হৃদ্ব থাকার ক্ষত্রে হেলসেয়েসের 'ডেটল' ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিন, দেখবেন খুব সহজেই ওদের স্বাস্থ্যরক্ষার 'ডেটল' ব্যবহার করা অভ্যাস হয়ে যাবে।



বাড়ি কামানোর জলে 'ডেটল' মিশিয়ে নিন। কেটে গেলে 'ডেটল'—এর জলে তা আর বিধিয়ে ওঠার ভয় থাকে না। গলা বাধা কি গলা বুসখুসিতে জলে 'ডেটল' মিশিয়ে কুলি করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

বিতামূল্য

“মডার্ন হাইজিন ফর উইমেন” শ্রুতিকারি মত

অ্যান্টিসেপ্টিক (ইউ) লি, ডিপার্টমেন্ট এক বি-৭, পো: বর ০০০, কলিকাতা-১ ট্রিকার টিটি লিমি.





### রঙ্গমহলে 'শেখ-লার'

রঙ্গমহলের প্রগতিশীল কর্তৃপক্ষ হুসাগিড়িক মনোজ বন্দুর লেখা 'শেখ-লার' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সম্প্রতি। 'শেখ-লার' বেশ একটি মিষ্টি ও কোমল-উদ্ভীপক গল্পের নাট্যরূপ। বিবাহ বৈ সমাজের মানুষকে কত উঁচুতে তুলতে এবং কত নিচুতে নামাতে পারে, এই নাটকে প্রধানতঃ সেই ঘটনাই বিবৃত করা হয়েছে। গৌরী নামে কর্মকা গ্রাম্য মেয়ে আর তার সমী কলকাতার কলেজে পড়া বিজ্ঞ। পাত্র দুজনে দেখতে এসে গেরো মেয়েকে পছন্দ করলে না, পছন্দ করলে লহরে মেয়েকে। কিন্তু পাত্রের বন্ধু প্রশান্ত সকল সমস্তর সমাধান করলে ঐ গ্রাম্য কস্তাকে বিয়ে করতে চেরে। কিন্তু বিবাহের পরে বড়লোককারী 'গ্রাম্য' মানুষদের চোঁটা চ'ললে বর বাতে সম্মত না আসতে পারে। বিবাহ হয় বেন বহুবিবাহকারী নিশির সঙ্গে। নাটকের গল্পাংশ খুবই চমকপ্রদ। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নীপক এবং রবীনের। নীপকের অভিনয়ে বাঙলা নাটক সম্পর্কে আশাবিত হ'তে হয়। গোবিন্দর ভূমিকায় জহর বার নরকদের বিবিত করেছেন তাঁর অনন্তসাধারণ নৈপুণ্যে। জীবন মৃত্যু তাঁর চরিত্রের বখাখ রূপ দিয়েছেন। মহিলাদের মধ্যে প্রথমি বোম নাটকটিকে পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে গেছেন মৃত এক অভিনয়কতার। অজ্ঞাত চরিত্রে সত্য, প্রশান্ত, হরিধন, নরিন, অজিত, আদিত্য, গীতা, কেতকী, সন্ধ্যা, তপ্পা, সাবনা, জা প্রভৃতি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'শেখ-লার' অজ্ঞাত সমীক নাটকের ধারাবাহী ব্যক্তার রচিত হয়নি। মঞ্চ কর্তৃপক্ষ মিনার্ভা-অভিনয়ীদের সাক্ষ-পোষকের দিকে এবং মৃত পরি শনার অভিনয়নযোগ্য। নাটকটিকে সর্বোপে নির্ণৃত বলা যায়, তি সহজেই। নরকরাও দেখে আনন্দ পাবেন হীতমত।

### টাকা-আনা-পাই

'পৃথিবীটা কার বস?' বললেই আমরা জানি সকলেই তারবরে কার করবন, 'পৃথিবী টাকার বস।' মধু অপেক্ষা মিষ্টতর কি হ, এ কথা ভাবলেও অনেক নিম্মরই চোঁচবেন, "Money sweeter than honey." আপাতদৃষ্টিতে টাকাকে এরপ

মনে করা একেবারে বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের সত্য মানুষের সাংস্কৃতিক মানসগুণে বিচার করলে, টাকাকে সত্যি কি আমরা এতটা উঁচুতে স্থান দিতে পারি? হয়তো পারি না। কিন্তু সাধারণ মানুষ টাকাকেই শ্রেষ্ঠতম মোক্ষ হিসাবে ধরে নেয়। টাকাই সাধারণ মানুষের ধান-জান, বুদ্ধি-বিকেনা, মোক্ষ-মুক্তি। 'টাকা স্বর্গ, টাকা স্বর্গ, টাকা হি পরমাং তপ।' বাঙলা দেশের অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ লেখক জ্যোতির্ষর বার আবার তাঁর স্বভাববলত বড়লোককে দেখেছেন টাকাকে। একজন অতি নগণ্যজন হঠাৎ রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে গেলে কি বিচিত্র জীবন ধারণ করতে পারে—টাকা-আনা-পাই ছবিতে তারই সম্যক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। গুপের কথা এই, জ্যোতির্ষর বার অজ্ঞাত অনেক পরিচালকের মত শুধু ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না। তাঁর ছবি দেখা মানে কিছু অন্ততঃ শিক্ষা পাওয়া। অপরূপ চরিত্রচিত্রণ, বলিষ্ঠ ও ভোরালা কথোপকথন, সমাজের নরহণকে সাধারণ্যে তুলে ধরা—টাকা-আনা-পাই ছবিতে পরিচালকের সর্বদিকে সমান দৃষ্টি দেখে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই ছবির চমকপ্রদ কাহিনী মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকা প্রতি মাসেই জানতে পারতেন। 'অভিনয়ালে ছবি বিশ্বাস, রবীন্দ্র মজুমদার, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর বার একেক অভিনব চরিত্রের রূপ সৃষ্টি করেছেন তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। অজ্ঞাতীয় মুখোপাধ্যায় এবং বিনতা রায়ও অল্পরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অভিনয়পটুতে। বর্তমানে চটল নারিকার প্রাচুর্য্য হচ্চে অনেক ছবিতে, বার পরিণাম অভিনয় দেখা নয়, চাতুরী আর চটলতা দেখতে বাওয়া নরকদের পক্ষ থেকে। এ ছবিতে অজ্ঞাতীয় ও বিনতার অভিনয় দেখলে দেশের ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। পরিচালক রায় তাঁর মূল রসবোধের সঙ্গে বেশ মিষ্টি কণথায় করেছেন বর্তমান সমাজকে। এই ধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবির একটি চিরকালীন মূল্য আছে—সত্যি টাকা-আনা-পাইয়ের মাধ্যমে বার বিচার চলে না। ছবিটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে।

### মিনার্ভা 'প্রত্যাবর্তন'

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সত্তমুস্ত নাটক 'প্রত্যাবর্তন' গতাহুগতিক পন্থার রচিত মানুষী নাটক নয়—বাস্তে অন্ততঃ একজনও বিকলাঙ্গ নেই। গ্রাম্য-কাহিনীতে নাটকায়ন বিস্তৃত। অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপ্য সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ত জমিদার মহিমারঞ্জন এবং তাঁর বন্ধু জনার্দন যৌবনে অসবর্ণ বিবাহ করেন। মহিমারঞ্জন সাহসের অভাবে বিবাহের কথা গোপন রাখেন। বিবাহিতা ত্রীকে তিনি কাশীতে লুকিয়ে রেখে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর বখন জীব খোঁজে বান, তখন ত্রী মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলের কোন খোঁজই তিনি পান না। তখন থেকে মহিমারঞ্জনের হৃৎপূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনের বহুপাত। অল্পশোচনার লাহে লাহে হ'তে থাকেন। জীব প্রতি তাঁর এই অবিচারের জন্ত বন্ধু জনার্দন, বন্ধুর দুখ পর্বন্ত আর দেখেন না। পকাশোকে পৌছ মহিমারঞ্জন সচরা অনিচ্ছা বোপে আত্মপত্ন হন। তখন চিয়র নামে একজন ভাক্তার আসেন যেকীর দেবা ও চিকিৎসার্দে। এই ভাক্তারের সঙ্গে জনার্দনের একমাত্র কথা হলদ্যুর

ভালবাসা হয়, কিন্তু বিবাহে সম্মতি দিতে পারে না অজ্ঞাত পিতৃ-পরিচয়ের জ্ঞাত। শেষ দৃষ্টে জানা যায়, চিরায় মহিমারঞ্জনই হারানো ছেলে। অভিনয়্যাংশে আছেন একদল নবাগত—বীণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন। ভবন, প্রশান্ত চৌধুরী (নাট্যকার), হারাদন, সলিল, রাধারমণ এবং সুশীলা, লীনা, অশিমা, লীলাবতী ও গীতশ্রী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নাট্যকারের সার্বলী ও সঙ্গীতস্থল নাটকটি দর্শকদের কাছে সত্যিই উপভোগ্য হয়েছে। 'প্রত্যাভর্তন'এর বর্ণাশ্রয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### শিল্পী

এক দরিদ্র প্রায়া মুখশিল্পী বীমান ও সস্ত্রাজ্ঞী জমিদার রায়রায়ান-মন্ডলি অজ্ঞান হ'ল হৃদয়-বিনিময়। রায়রায়ান ছিন্ন করলেন, পরলোকগত বন্ধুপুত্র বিলম্বিত-কবচ সুশীলের সঙ্গে অজ্ঞানার বিয়ে দিতে। শুভ হ'ল সংঘাত, রায়রায়ানের জমিদারত্বলত অত্যাচারের হাত থেকে বীমানকে বাঁচাতে অজ্ঞানই তাকে বাড়া থেকে তড়িয়ে দেয়, বাতে করে বীমান অস্ত্রত: প্রাণে বাঁচে। বীমান দেশে ফিরে শুধু ছবি একে দিন কাটায়—শুভ করে শরীরের প্রতি অত্যাচার। গোপালপুরে চেষ্টা গিয়েও অজ্ঞান মানসিক আলা সহ করতে না পারে উত্তত হয় সমুদ্রের তলে ডুবে আত্মহত্যা করতে। সুশীল জানিতে পারে সব। প্রতিশ্রুতি দেয় বীমানকে সে খুঁজে আনবেই। অবশেষে বহু প্রচেষ্টায় রায়রায়ানের মন টলস—ভগ্নিনী অজ্ঞানার শিকড় ও সুশীলকে নিয়ে পিতাপুত্রী ধ্বন বীমানের বাড়ী পৌছলেন তখন অর্ধাতব বিনা চিকিৎসায় বীমান মৃত। চিত্রগ্রহণ-অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রকর রামানন্দ সেন। তাঁকে ধন্যবাদ! অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন সুরিচা সেন, তাঁকে তিন অংশে দেখা যাচ্ছে—বাণের আয়ুর মেয়ে, প্রেমিকা ও বার্ষ প্রেমিকা। তিনটি অংশই তিনি সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলছেন। প্রেমের প্রথম আশ্বাস এক কিশোরীর মনে কি রকম বেথাপাত করে, সুরিচার অভিনয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুরিচার পরেই দত্তবাদ পাবেন জলদকর্ষ কমল মিত্র। ছোট ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিখারাগীর অভিনয়ও মনে দাগ কাটে। এ ছাড়া পাহাড়ী সস্ত্রাজ্ঞ, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, ভূশন চক্রবর্তী, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, গোকুল মুখোপাধ্যায়, অমরকুমার, মলিনা দেবী, শ্যেণ সেন, গীতা দে প্রভৃতিরকে দেখা যাবে এই চিত্রে। বিখ্যাত শিল্পী রবীন্দ্র মৈত্রও এক শিল্পীর ভূমিকায় রূপ দিয়ে আনন্দ দিতে পেরেছেন দর্শক-সাধারণকে।

### সীথির সিঁদুর

মনোজ আর সুনন্দার হল মন-বিনিময়। কোন কারণে তার শেষদক্ষ হয় না—সুনন্দার বিয়ে হয় এক ধনী অথচ মাতাল লম্পটের সঙ্গে। মনোজের হয় বিবাহ। মনোজ চাকরী নেয় সুনন্দারই স্বামীর অফিসে—একদিন সুনন্দার সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে বাবার পর সুনন্দা স্বামীর অবজ্ঞায় অস্থির হয়ে পূর্বজীবন পেতে চায় ফিরে। মনোজ প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুনন্দা স্বামীকে বলে, মনোজ তাকে অপমান করেছে। তার ফলে মিঃ ঘোষ ক্রোধ ভাঙ্গার অভিযোগ আনেন মনোজের নামে (যে টাকা তিনিই

কুপিয়েছেন মনোজকে দিয়ে) বার ফলে সন্তপ্রসবী ভ্রীকে হাসপাতালে ফেলে রেখেই মনোজ গা-চাকা দেয়। তারপর ঘটনাটকে আবার মিলন, বার ক্রেপে হল মনোজের আশ্রয়দাতার পুত্রের সঙ্গে তারই কস্তার প্রেম, পরে বিবাহ। মোটামুটি এই গল্পের উপাদান, মাথুলি গল্প। কি কাহিনীতে কি পরিচালনার খুব একটা উচ্চদের কৃতিত্ব কোনটাই পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গীতশাস্ত্র খুব খারাপ নয়। তবে অর্থেন্দু সেনের কাজে একটা আভ্যন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সুর পাওয়া যায়। এ ছবি আশাশ্রুত সাফল্যের বাহক না হলেও অর্থেন্দু বাবুর ভবিষ্যতের শুঙ্কল্য সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় বৈ কি। একটা জিনিব চোখে লাগে—মনোজ কথা বলতে বলতে এগিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে অথচ তার কথা বলার লক্ষ এক রকমই থেকে যাচ্ছে। কীশ্ব হরয়ে আসা উচিত নয় কি? ম্যাশ ব্যাক করে মনোজ সুনন্দা প্রসঙ্গে না দেখালেই ভালো হত। জলের দ্রাসে অহুসীলার মুখের পরিকল্পনা প্রকাশ্য হ'ল। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সেখানে বেলগাড়ীতে পুলিশ দেখে রীতিমত ভাবান্তর হওয়া উচিত মনোজের, কিন্তু তা সে হল না—আর হল নাই বখন তখন কি প্রয়োজন হ'ল বেলগাড়ীতে পুলিশ দেখাবার? হোটেল বা মসে হলেই কি তার বাসিন্দারা ছাড়া হবে? অন্ততঃ বাঙলা ছবি তো আজ সেই কথাই বলতে চাইছে। অত দিন পেরিয়ে গেল এক মনোজ ছাড়া কারো বয়স বাড়ল না! বমা প্রথম দৃষ্টে যা শেষ দৃষ্টে তাই। সুনন্দা মনে হল যেন শাড়ীটা ছেড়ে খানটি পরে এল। অহুসীলার নাচ স্থানোপযোগী হয়েছে। কানিঃস্বামি সাতবেক স্বাগত জানাই। কপিশিল্পী শৈলেন গাঙ্গুলীকেও একটি দৃষ্টে দেখা গেল।

### চোর

বাবা-মা বা অভিভাবকের সতর্ক ও সহায়ভূতিশীল দৃষ্টির অভাবে একটি বৃদ্ধমান সর্বহুলসম্পন্ন বালক কি ভাবে অংশপতনের দিকে তিলে তিলে এগোতে থাকে এবং তাতে কতখানি সর্বনাশ হতে পারে তারই সার্থক চিত্রায়ণ চোর! বিচারক মণি সিন্ধের লেখা, সাহিত্যিক প্রবেশ সান্তালের পরিবর্ধন ও কাহিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও অভিনন্দনযোগ্য। মুকুল একটি বালক, লেখাপড়ার ভালো, বুদ্ধি আছে। পূর্ববর্ণনামুখ্যায় অবস্থায় বংশীর পাল্লায় পড়ে বীরে বীরে শেষে চুরি করতে, বংশী নিয়ে বাস তাদের আড্ডায়, তারপর ঘটনাটকে মুকুল তার বন্ধুর মামার বাড়ীতেই বার চুরি করতে, সেখানে বন্ধুর দিদির চাঁৎকারে ধরা গড়বার আশঙ্কায় সর্দার গুলী ছোঁড়ে মুকুলের উদ্দেশ্যে, সেই গুলীতে প্রাণ দেয় বংশী—পুলিশও ছিল ওং পেতে। দলকে দল সকলেই ধরা পড়ে। মুকুলকেও ফিরে পান তার বাবা-মা। দোষক্রটি অবগুই একটু-আধটু আছে যেমন রোল তিরিশ ডাকার পরেই মাষ্টার মশাই পড়া আরম্ভ করলেন, অথচ বোঝা গেল ক্লাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটি না হোক চল্লিশটি ছেলে আছে। অতবধে সেওয়াল-ঘড়ীটা মুকুল পকেটে পুরছে কি করে? বংশী চরিত্রটি সত্যিই সহায়ভূতির উদ্ভেক করে। আমাদের আশ-পাশে কাহিনীর উজ্জীব্য অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে, তারই একটিকে আহরণ করে ও নিজের অভিজ্ঞতা তাতে মিশ্রিত করে রচিত হয়েছে এই কাহিনী। প্রত্যেকটি অভিভাবকের এই ছবি দেখে সতর্ক হওয়া উচিত। এই সব পুত্র ও পেশাদারী ভিখারীদের মুখোদের আড়ালে যে কি জঘন্য

প্রস্তুতি লুকিয়ে আছে তার একটি মনোমুগ্ধ প্রতিচ্ছবিবৃষ্টি উঠেছে এই চিত্রে। তবে ছবিটিকে যদি আর একটি রহস্যময় করা যেত তা'হলে ছবিটি আরো ভালো হত। এ ছবিতে চিত্রশিল্পী অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর চিত্রায়ণ ছবিটিকে সাক্ষ্যের পথে অগ্রগমনে প্রভুত সাহায্য করেছে। অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা ওৎ সবচেয়ে কি বলব? অসুখ অভিনয় করেছে গুম, প্রত্যেকটি মুহূর্ত সে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পরিচালকরা দুই দিন এই শিশু প্রতিভাধরের উপর। গুমে পরেই বস্তাবা পাবেন মাঠের প্রবেশন। দর্শক-চিত্ত জয় করে নিয়েছেন শিশু রায়চৌধুরী প্রথম আবির্ভাবের। প্রেমাত্ত বহুকে দেখা গেল রাস্তা একটি দৃষ্টে। 'ব্লাস্‌বস্ট্রী'তে তাঁকে দেখা গেছে নির্ধিক চরিত্রে। প্রেমাত্তের অভিনয়শক্তি উপলব্ধি করার মত শক্তি কি বাংলাদেশের পরিচালকদের মধ্যে নেই? তা যদি থাকে তাহলে প্রেমাত্তের মত লক্ষ শিল্পী ও রসম জুমিকা পান কেন? 'ত্রায়' ছায়াছবিতে এ'রা ছাড়া দেখা বাবে বিকাশ রায়, জীবন বসু, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বট্যাল, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, বজ্রিত রায়, প্রীতি মজুমদার, সন্ধ্যারানী, হুলা প্রভৃতি আরও বহু শিল্পীকে।

## রূপট প্রসঙ্গে

'রাণী রাসমণি'র অসামান্য সাক্ষ্যের পর পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের আগামী অবদান জীম্মা। এতে জীম্মার বাল্যজীবন খ্যাতনামা ব্যারামবীর বিজয় মল্লিকের কন্যা কুমারী মল্লিকা, কৈশোর জীবন রসমাগর ডাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাসিনী কিশোরী অভিনেত্রী লক্ষী গাঙ্গুলী ও তৎপরবর্তী জীবন জীম্মা অমৃত ও শুভা রূপ দিচ্ছেন, ঠাকুরের ভূমিকায় দেখা দেবেন আবার গুজরাস। অত্যাশ্চর্যে দেখা দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্তাল, নীতাল মুখোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, জীবন বসু, নবগোপাল, তুবন চৌধুরী, চন্দ্রশেখর দে, কাতিক সরকার, শান্তি ভট্টাচার্য, খগেন পাঠক, সরসু দেবী, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, প্রাণতি ঘোষ, ভারতী দেবী, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষী দেবী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ করছেন বিভাশক্তি ঘোষ ও সুর দিচ্ছেন অনিল বাগচী। \* \* \* শরৎচন্দ্রের জীবনের আলোর চিত্ররূপ দিচ্ছেন জীম্মা কানন দেবীর অধিনায়কত্বে জীম্মা পিকচার্স। ক্যামেরা চালাচ্ছেন জি কে মেহতা। সুর দিচ্ছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় এই ছবিতে বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, জীবন বসু, ডাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, সুমিত্রা দেবী, যমুনা সিংহ, মৌলিমা দাস প্রভৃতি শিল্পীদের দেখা বাবে। বহু বছর আগে চলচ্চিত্রের নির্ধিক মুগে এই কাহিনী আর একবার চিত্রায়িত হয়েছিল, তাতে রূপ দিয়েছিলেন নটগুরু শিশিরকুমার, নটশেখর নরেশচন্দ্র, প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্প-নির্দেশক স্বর্গীয় রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সেবাবু) হুগা দেবী প্রভৃতি। \* \* \* সুখ্যাত চিত্রবিদ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার চিত্রায়িত হয়েছে 'সি'হু'ব', জীবন রায়ের 'হর্তের মুক্তি' কাহিনীটির এই চিত্রায়ণের জন্তে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্র কুমার। সঙ্গীত ও ক্যামেরার ভার পড়েছে বখাজের রবীন চট্টোপাধ্যায় ও লক্ষীভাইয়ের উপর। রূপায়ণে পাহাড়ী সান্তাল, কমল মিত্র,

বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, ডাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, সন্ধ্যারানী দেবী, মঞ্জু দে, রাজলক্ষী দেবী ও নবাগতা জীম্মা মনোবা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। \* \* \* যদি বর্ষা তপসীর কাজ চিত্র বসুর পরিচালনার এগিয়ে গেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নটিকেন্তা ঘোষ। রূপ দিচ্ছেন—অজীত চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্তাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নীপক মুখোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায়, শিশির বট্যাল, অমূল্যকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বিজু, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, সন্ধ্যারানী দেবী, রেখা রায়, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। \* \* \* বেশ কিছুকাল পূর্বে জীম্মেসংলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণোত্তর ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের অভ্যয়ের বিয়ে দেখা দিয়েছিল রূপানী পূর্বর বৃকে। বর্তমানে খগেন বাবু ঐ কাহিনীই আবার চিত্রায়িত করছেন পরিচালক সুরকুমার দাসগুপ্তকে দিয়ে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জ্যোতির্ধর রায়। আলোকচিত্র ও সঙ্গীতের বিভাগ ছটির ভার পেয়েছেন বখাজের বিজু চক্রবর্তী ও রবীন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়াদেশে দেখা বাবে—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতি ঘোষ, শোভা সেন, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি শিল্পীকে \* \* \* খ্যতিমান রায়নাগরিক, শৈলেন ঘোষালের সহধর্মিণী জীম্মা লীলা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'দুনমিলন' ছবিটি তোলা হচ্ছে। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, প্রেমাত্ত বসু, অমূল্যকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভ্রাম লাল, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সরসু দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সাবিতা চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি অভিনীত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন মঞ্জু সেন।

## গুজবায়ের বেতারনাট্য

এই অজ্ঞা—গ্রহচক্র। কাহিনী গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা শৈলজ্ঞানন্দ। ভূমিকায় বীরেশ্বর সেন, রামচন্দ্র রায়-চৌধুরী, গল্পাধর সেন, অমরেশ ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, আলো দাসগুপ্তা বস্তু মৈত্র। \* \* \* ১৪ই অজ্ঞা—বিদ্যুৎ। কাহিনী হুসীলচন্দ্র রায়-চৌধুরী, পরিচালনা জীবন ভট্টাচার্য। ভূমিকায়—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হারদ্যন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাবী হালদার, হরিদ্যন মুখোপাধ্যায়, পটীনাথ মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মিত্র, কালীপদ চক্রবর্তী, মীনাকী দত্ত, (বৃন্দ প্রতিভানলিনী), মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা সেন, অমিতা বসু, রমা অধিকারী। \* \* \* ২১ই অজ্ঞা—পাণ্ডুরগৌরব। কাহিনী গিরিশচন্দ্র, পরিচালনা বীরেন্দ্রকুমার। ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মিসির ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর, চন্দ্রশেখর দে, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, হাজরকুমার মৈত্র, যদি ঘোষ, অক্ষয়কুমার স্কট, বি-এন রায়চৌধুরী, সরসুবালা দেবী, উষাবতী দেবী, জবি মুখোপাধ্যায়, তরু দাস, নীপা পালচৌধুরী ও শৈলজ্ঞানন্দ। \* \* \* ২৬ই অজ্ঞা—বিপত্তি। কাহিনী লীলা মজুমদার, পরিচালনা জীবন ভট্টাচার্য। ভূমিকায় প্রেমাত্ত বসু, শিশির বট্যাল, ডাঃ হরেন, সুহারি মুখোপাধ্যায় (বাস্তবাবু), রাঘবদাস পাল, হুসীল দেব, মহিমা সিংহ, কবিতা রায়, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়।



# যন্ত্রণা কমাতে হ'লে সারিডন খান



মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কোমর ব্যথা, গা ব্যথা ও গা ম্যাজমেজানিতে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা, কমিয়ে আরাম পেতে চান তো সারিডন খান। সারিডন সব দেশেই ব্যথা কমাবার বিখ্যাত ওষুধ। এতে আশ্চর্য কাজ হয়। এর কাজ তিন রকমের :

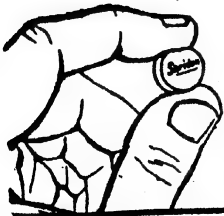
**ব্যথা কমায় :** সারিডন খাওয়ার আর সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম ব্যথা কমায়—অথচ এতে পেটের পণ্ডগোল বা শরীরের অবসাদ আসে না।

**আরাম দেয় :** সারিডন স্নায়ুশুলীকে শান্ত করে, ব্যথাজনিত স্নায়ু উত্তেজনা দূর করে—আরাম দেয় ও উৎসাহ রাখে।

**চাড়া করে :** অসহ্য ব্যথা ও তার ফলে ঘুম না-হওয়ার দরুন যে ক্লান্তি আসে, সারিডন-এর সুস্থ উত্তেজক ভূগে তা দূর হয়। মাঝ কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাঙ্গা হ'রে কাজে হাত দেওয়া যায়।

সারিডন যে এত উপকারী তার কারণ, এর ডেডরকার মূল্যগুলো মিলেমিশে সমবেতভাবে ব্যথা কমাবার কাজ করে।

- একটি বড়ির দাম ২ আনা
- একটি বড়ি পুরো একমাত্রা
- এতে অ্যাস্‌পিরিন (অ্যাসেটিল স্যালিসাইলিক এসিড) নেই



**সারিডন খেলেই উপকার পাবেন।**



# সাহিত্য পরিচয়

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

কিছু দিন ধরে বাঙালী প্রকাশকরা গভীরগতিকতা থেকে হঠাৎ হয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকে যে দৃষ্টি দিয়েছেন তা খুবই আশার কথা। কয়েক জন প্রকাশক সম্প্রতি কয়েকখানি উচ্চমানের প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করে এ সম্বন্ধে পথিকৃত হিসাবে অত্যন্ত প্রকাশক-দেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়েছেন। এর দ্বারা ছোটখাটো অত্যন্ত প্রকাশকরা নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। প্রবন্ধ-সাহিত্য অপেক্ষা গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য বেশী বিক্রীত হয় সত্য, কিন্তু অধুনা এর জন্ম গভর্ণমেন্টও বহুশ্রেণী সচেতন হয়েছেন। অর্থাৎ তারা লাইব্রেরী প্রভৃতিতে যে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, তার মধ্যে কিঞ্চৎ পরিমাণ অর্থ প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রয়ের জন্য সম্প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব প্রকাশকরা উপস্থিত যদি বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজ, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহলে যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তা আশা করা যায়।

## বিগত শারদীয়-সাহিত্যের পরিণতি

মাটির স্বাভাবিক ধর্ম যেমন অক্ষরবর্ষ নয়, তেমনি মগজের ধর্মও বক্ষাণ নয়। কাজেই মগজ বা মাটি কিছু না কিছু প্রসব না করে পারে না। তবে, মাটির দৌরগুণে ভূমিজ ফসলের তারের তারতম্য ঘটে এবং বিলুপ্ত প্রকারভেদে মগজনিঃসৃত ভাব-বিষয়েরও ঘটে থাকে বিভেদ। কিন্তু এই তারতম্য ও বিভেদেরও একটা মাত্রা আছে, সে মাত্রা ছাড়ালে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। বিগত পূজা-সংখ্যার সাহিত্য সম্পর্কে বীরস্বির ভাবে আমরা এবাবৎ বা চিন্তা করছি এবং এ সম্বন্ধে দু'চারখানি কণজ্ঞেও বা আলোচিত

হতে দেখছি, তাতে এটাই আমাদের বহুদল ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মাটি ও মগজ অক্ষর ও বক্ষা না হলেও, তার মধ্যে বিকৃত রূপটিই সমস্ত শারদীয়-সাহিত্যকে কলুষিত করেছে এবং গত বৎসরের ফুলনার তা প্রকাশ শেষেই অপেক্ষাকৃত বেশী তাই। সাহিত্যিক চিত্তগুলি থেকে অধিকাংশ লেখাগুলির মধ্যেই দেখা দিয়েছে খাটি দেশজ মাটির গন্ধের অভাব, আর তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে বীজস, বিকৃত, অপকার্যের চিত্র। কুৎসিত-আসক্তি প্রবণতা শিল্পের অঙ্গ হিসাবে যেন দেখা দিয়েছে অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে। প্রাচীনদের অপেক্ষা নবীনদের মধ্যেই ঘটেছে এর প্রতিযোগিতা। কুষ্ঠরোগী নিয়ে, বারবানিতা নিয়ে আর বস্ত্রবাসী নিয়ে কেউ কেউ দেশাচারের জীর্ণ-দুর্গ-প্রকার ভেদ করে অত্যাধুনিক হবার বার্ষ প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বেশীর মধ্যেই ধরা পড়েছে সাহিত্যিকদের পেশাদারী মন। তাগির যত এসেছে, দান যত নেওয়া হয়েছে, মগজ তত জাব জমায় নি বা মগজ তত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, গভীর চিন্তাপ্রসূত হ'ইর হ'ইর ঘটেছে ব্যাঘাত—বস্ত্রবাদের পরিবর্তে বিস্তরবাদই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। এক এক জনের উত্তনখানেক বা তদপেক্ষাও অধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু ফল হয়েছে মড়ক। এর জন্য অবশ্য আমরা নূতন কাগজওয়ালাদের দোষ কিছু কম দিই না। তাঁদেরও এটা বোঝা উচিত যে, লেখকরা ঐন্দ্রজালিক নন, ট্যাঁকে টাকা জুড়ে দিলেই তাঁদের হাত দিয়ে অবদীলাক্রমে মেশিনের মত গল্প সৃষ্টি হয়ে আসা সম্ভব নয়।

ভাবোন্নত বাঙালীর জীবনে পূজার সময় সকল বিষয়েই যেমন আন্তরিকতা দেখা দেয়, সাহিত্য বিষয়েও এবার তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু তার ফলে গল্প-সাহিত্যের মান যে অবনতি হয়েছে, শিক্ত পাঠক তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### কলকাতার পথ-ঘাট

সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "কলকাতার পথ-ঘাট" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছেন, "অতীত ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকদের সামুদ্রিক দৃষ্টি বহুরক্যে বাবৎই লক্ষ্য করা বাজে। এতদিন তা ছিল উপন্যাসের উপকরণ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে সাহিত্যের ভাবার ইতিহাস বিবৃত করার প্রচেষ্টাও চলছে। এর কল যে শুধু তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, ইতিহাসের শুধু তথ্য রস-সাহিত্যিকের হাতের স্পর্শে সরল কাহিনী বর্ণনার রূপ পাওয়ার কলে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাস-বিবৃদ্ধ পাঠকেরও সেরসের আকর্ষণ

অবহেলা করতে পারছেন না। এমন করে আনন্দের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের শিক্ষার ভিত্তিও পাকা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত "কলকাতার পথ-ঘাট" গ্রন্থে কথাসাহিত্যিক প্রণতোষ ঘটক তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার সেই শ্রেণীর সাহিত্যভাষ্য রূপই প্রকাশ করেছেন। আজব শহর কলকাতার পথ-ঘাটও যেমন অগণিত, তাদের পেছনকার ইতিহাসও ততোধিক কৌতুহলপ্রদ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নির্ভা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিস্তৃতপ্রায় ঘটনাবলী আঁহরণ করেছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন অপরূপ শিল্প-কুশলতার সঙ্গে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি যে দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করেছেন, বিতোক্তাদারী পাঠকমাত্রই তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন।" "দুগাঙ্গর" বলেন, "প্রাচীন দুচারটে দৌধ আর



হ লত প্রাচীন নামাঙ্কিত পথই, এ শহরকে আজও সেই বিলীয়মান ভীতকে আমাদের নিত্য দ্রবণ করিয়ে দিচ্ছে, নিত্য বর্তমান রেখেছে আমাদের চোখে। এই প্রাচীন পদচিহ্ন ও পথচিহ্নের মধ্যে থেকে তিহাসমূল্যে উল্লেখযোগ্য ৩১টি পথের ইতিহাস ১৩খানি প্রাচীন তিহাস বা দলিল বেঁটে প্রাপ্যতঃ খটক উদ্ধার করেছেন এই বইতে। ইতিহাস জানা প্রত্যেক কলকাতাবাসীর তো বটেই, প্রত্যেক ভাষারই উচিত। এ শুধু কৌতুহল চরিতার্থ করবে না, জ্ঞান-প্ৰসাধও কিছু দান করবে। বইখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থখানির বকল প্রচার কামনা করি। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেস : ১৩, ছাটসিন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৬ন টাকা।

### CHOOSING A CAREER

হঠাৎমতি বেকন একলা বলেছিলেন : "They are happy men whose natures sort with their vocations." কিছু বাঙালী জাতির বরাতে যার বা কথ, তা জোটে না সাধারণতঃ। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের প্রায় করলে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের উদ্দেশ্য বা কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। এ এক রকম নোঙরবিহীন নৌকার মত অবস্থা। আমরা হয়তো জানি না, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু নির্দিষ্ট কর্ম আছে—যা আমাদের অন্তরের সঙ্গে কবণীয়। আমরা এই সভ্য জগতে

কিছু একটা করতে চাই বা পাখি, যে-কোন কাজে লাগতে পারি গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কল্পের ইচ্ছায়। আমাদের এই শিঙা-বাহীন দেশে করবার মত কাজও প্রচুর আছে। কিন্তু কে কি করবে তা কেউ জানে না। অভিজ্ঞাবকরা জানান না তাঁদের সম্ভাব্য সম্ভাবিতদের ভবিষ্যতের কাজকর্মের কথা। কাজ কত রকমের বা পেশা কত প্রকারের হ'তে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন অপূর্ণ লিপিকুলতার সঙ্গে। এই ধরণের একখানি বই বাঙালীর অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বইখানির ছাপা বাঁধাই মনোরম। অল্পকোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। লণ্ডন ই. সি. ৪। মূল্য তিন টাকা।

### সরস গল্প

হাসির গল্প লেখার আশাপূর্ণা দেবী সুশরীতিত। তাঁর সত্য প্রকাশিত এই গ্রন্থে আছে কুড়িটি গল্প। লেখিকা বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় হাসি-অঙ্ক বাধা-বেদনার কাহিনী বেশ রসিয়ে বলতে পারেন—তাই হয়তো এই বইয়ের নাম হয়েছে 'সরস গল্প'। গ্রন্থে সন্নিবেশিত ভবিষ্যৎবাণী, শাড়ী-মাহাত্ম্য, ডিরেক্টর রাষ্ট্রদা, জেঁদবী, কামধেনু, সর্ষে আর কৃত ও কল্পকপটি, দিল্লিহিয়া প্রভৃতি গল্প সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সত্যিকার মহিলা লেখিকাদের দেখা মিলছে না আর—বীরা সাহিত্যসেবার পূর্বের মত পুরুষদের সঙ্গে সমান সমান চলতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবীর মত লেখা

উৎসবের দিনে

কে. হোড়ের

মুবাশিত  
প্রমোদন মাছলী

কে. হোড় এও কোং  
কলিকাতা-২৪

# সাহিত্য পরিচয়

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

কিছু দিন ধরে বাতাসার প্রকাশকরা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকে যে দৃষ্টি দিয়েছেন তা খুবই আশার কথা। কয়েক জন প্রকাশক সম্প্রতি কয়েকখানি উচ্চমানের প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করে এ সম্বন্ধে পথিকৃৎ হিসাবে অত্যন্ত প্রকাশক-সেবণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এর দ্বারা ছোটখাটো অত্যন্ত প্রকাশকরা নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। প্রবন্ধ-সাহিত্য অপেক্ষা গল্প-উপন্যাস সাহিত্য বেশী বিক্রীত হয় সত্য, কিন্তু অনুরূপ এর জন্য গভর্ণমেন্টও যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা লাইব্রেরী প্রভৃতিতে যে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, তার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রয়ের জন্য সম্প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব প্রকাশকরা উপস্থিত যদি বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজ, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহলে যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তা আশা করা যায়।

## বিগত শারদীয়-সাহিত্যের পরিণতি

মাটির স্বাভাবিক ধর্ম যেমন অম্লকরক নয়, তেমনি মগজের ধর্মও বন্ধাব নয়। কাজেই মগজ বা মাটি কিছু না কিছু প্রসব না করে পারে না। তবে, মাটির দেবগুণে ভূমিজ কসলের তারের তারতম্য ঘটে এবং ধিলুর প্রকারভেদে মগজনিঃসৃত ভাব-বিষয়েরও ঘটে থাকে বিভেদ। কিন্তু এই তারতম্য ও বিভেদেরও একটা মাত্রা আছে, সে মাত্রা ছাড়লে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। বিগত পূজা-সংখ্যার সাহিত্য সম্পর্কে দীর্ঘস্থির ভাবে আমরা এ-যাবৎ বা চিন্তা করেছি এবং এ সম্বন্ধে দু'চারখানি কাগজেও বা আলোচিত

হতে দেখেছি, তাতে এটাই আমাদের বহুদূর ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মাটি ও মগজ অম্লকরক ও বন্ধাব না হলেও, তার মধ্যে বিকৃত রূপটিই সমস্ত শারদীয়-সাহিত্যকে কলুষিত করেছে এবং গত বৎসরের ফুলসার তা প্রকাশ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী ভাবেই। আন্তর্জাতিক চিত্তগুলি থেকে অধিকাংশ লেখাগুলির মধ্যেই দেখা দিয়েছে খাঁটি দেশজ মাটির গন্ধের অভাব, আর তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে বীজঙ্গ, বিকৃত, অপকারণের চিত্র। কুৎসিত আদর্শ প্রবণতা শিল্পের অঙ্গ হিসাবে যেন দেখা দিয়েছে অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে। প্রাচীনদের অপেক্ষা নবীনদের মধ্যেই ঘটেছে এর প্রতিযোগিতা। কুঠরোগী নিয়ে, বারবনিতা নিয়ে আর বস্তিবাসী নিয়ে কেউ কেউ দেশাচারের জীর্ণ-দুর্গ-প্রকার ভেদ করে অত্যাধুনিক হবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বেশীর মধ্যেই ধরা পড়েছে সাহিত্যিকদের পেশাদারী মন। তাগিদ যত এসেছে, দারিদ্র্য যত নেওয়া হয়েছে, মগজে তত ভাব জন্মায় নি বা মগজ তত গ্রহণ করতে পারেনি। ফল, গভীর চিন্তাপ্রসূত সাহিত্যপ্রকাশে ঘটেছে ব্যাঘাত—বস্তবাদের পরিবর্তে বিস্তারবাদই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। এক এক জনের উদ্ভনখানেক বা তদনুপেক্ষও অধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু ফল হয়েছে মড়ক! এর জন্য অবশ্য আমরা নূতন কাগজওয়ালাদেরও দোষ কিছু কম দিই না। তাঁদেরও এটা বোঝা উচিত যে, লেখকরা ঐচ্ছাসিক নন, ট্যাকে টাকা শুঁজে নিলেই তাঁদের হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মেশিনের মত গল্প সৃষ্টি হয়ে আসা সম্ভব নয়।

ভাবোদ্ভূত বাস্তবীর জীবনে পূজার সময় সকল বিষয়েই যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ দেখা দেয়, সাহিত্য বিষয়েও এবার তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু তার ফলে গল্পসাহিত্যের মান যে অবনমিত হয়েছে, শিক্ষিত পাঠক তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### কলকাতার পথ-ঘাট

সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে “কলকাতার পথ-ঘাট” বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছেন, “অতীত ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকদের সাধারণ দৃষ্টি বহুবাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন তা ছিল উপন্যাসের উপকরণ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে সাহিত্যের ভাবের ইতিহাস বিবৃত করার প্রচেষ্টাও চলছে। এর ফলে যে শুভ তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, ইতিহাসের শুদ্ধ তথ্য রস-সাহিত্যিকের হাতের স্পর্শে রসস কাহিনী বর্ণনার রূপ পাওয়ার কল একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাস-বিবৃত পাঠকেরও সোপানের আকর্ষণ

অবহেলা করতে পারছেন না। এমন করে আনন্দের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের শিক্ষার ভিত্তিও পাকা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত “কলকাতার পথ-ঘাট” গ্রন্থে কথাসাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার সেই জীবীর সাহিত্যভাষ্য রূপটি প্রকাশ করেছেন। আজব শহর কলকাতার পথ-ঘাটও যেমন অগণিত, তাদের পেছনকার ইতিহাসও ততোধিক কৌতূহলপ্রদ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিবৃতপ্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রহণও করেছেন অপূর্ণ শিল্প-কুশলতার সঙ্গে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি যে দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করেছেন, বিজ্ঞানসাহী পাঠকমাত্রই তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন। ‘যুগান্তর’ বলেন, “প্রাচীন হুচায়টে দৌধ আর

শত শত প্রাচীন নামাঙ্কিত পথই, এ শহরকে আজও সেই বিলীরমান অতীতকে আমাদের নিত্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, নিত্য বর্তমান দেখেছে আমাদের চোখে। এই প্রাচীন পথচিহ্ন ও পথচিহ্নের মধ্যে থেকে ইতিহাসমূল্যে উল্লেখযোগ্য ৩১টি পথের ইতিহাস ৭৩খানি প্রাচীন ইতিহাস বা দলিল যেঁটে প্রাপ্যতাব খটক উদ্ধার করেছেন এই বইতে। এ ইতিহাস জানা প্রত্যেক কলকাতাবাসীর তো বটেই, প্রত্যেক বাঙালীরই উচিত। এ শুধু কৌতুহল চরিতার্থ করবে না, জ্ঞান-তৃষ্ণারও কিছু দান করবে। বইখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ইণ্ডিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া প্রেস; ১৩, ছাবিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

### CHOOSING A CAREER

হঠাৎকি বেকন একসা বলেছিলেন : "They are happy men whose natures sort with their vocations."

কিছু বাঙালী জাতির বরাতে যার বা কর্ম, তা জোটে না সাধারণতঃ। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ করলে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের উদ্দেশ্য বা কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। এ এক রকম নোঙরবিহীন নৌকার মত অবস্থা। আমরা হয়তো জানি না, আমাদের প্রত্যেকের জুই কিছু না কিছু নির্দিষ্ট কর্ম আছে—যা আমাদের অন্তরের সঙ্গে করণীয়। আমরা এই সভ্য জগতে

কিছু একটা করতে চাই বা পারি, বেকন কাজ লাগতে পারি প্রাসাদস্থান সঙ্করের ইচ্ছার। আমাদের এই শিল্প-বাণীন দেশে করার মত কাজও প্রচুর আছে। কিন্তু কে কি করবে তা কেউ জানে না। অতিভাবকরা জানেন না তাঁদের সম্ভাব্য সম্ভাব্যতার ভবিষ্যতের কাজকর্মের কথা। কাজ কত রকমের বা পেশা কত প্রকারের হতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন অপূর্ণ লিপিকুলতার সত্ত্বে। এই ধরণের একখানি বই বাঙালীর অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বইখানির ছাপা বাঁধাই মনোহর। অল্পকোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। লণ্ডন ই, সি, ৪। মূল্য তিন টাকা।

### সবল গল্প

হাসিন গল্প লেখার আশাপূর্ণা দেবী সুপরিচিত। তাঁর সর্ব-প্রকাশিত এই গ্রন্থে আছে কুড়িটি গল্প। লেখিকা বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় হাসি-জ্বালা ব্যথা-বেদনার কাহিনী বেশ রসিয়ে বলতে পারেন—তাই হয়তো এই বইয়ের নাম হয়েছে 'সবল গল্প'। গ্রন্থে সম্ভবশিষ্ট ভবিষ্যৎবাণী, লাড়ী-মাহাত্মা, ডিরেক্টর বাহাদুর, জৌহরী, কামধেনু, সর্ষে আর ভূত ও কঙ্কণশাট, দিলদরিদা প্রভৃতি গল্প সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সত্যিকার মহিলা লেখিকাদের দেখা মিলছে না আর—বীরা সাহিত্যসেবার পূর্বের মত পুরুষদের সঙ্গে সমান সমান চলতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবীর মত লেখা



৬৫ম বর্ষের দিনে



ক. হোডের

মুদ্রাস্থিত  
প্রমাধীন সাহিত্য

ক. হোড এণ্ড কোং

কলিকাতা-৪৪

বিলস ব'লেই তাঁর এই জনপ্রিয়তা। বইখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাট বেশ মনোহর। কথাসমৃদ্ধ ভবন। ১৩১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

### কাব্য-কৌতুক

উপভোগ্য ও সারগর্ভ প্রবন্ধ-লেখক কয়েকই হ'ল পাচ্ছেন আমাদের সাহিত্যে। উদ্ভূতকণ্ঠকিত লেখা পড়ে পড়ে প্রবন্ধের পাঠকও লুপ্ত হ'তে ব'সেছে বেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের রচনা-রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য ক'রেই আমরা এই মন্তব্য করছি। লেখক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে এমন স্তম্ভগ্রাহী ও তথ্যসূর্ণ আলোচনা করেছেন সহস্র সয়ল ভাষা ও ভঙ্গিমায বে, পড়তে পড়তে বিম্বিত হ'তে হয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের 'পরে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাবের বে তথ্য তিনি উদ্ভাটিত করেছেন তা খুবই বিম্বরকম। লেখকের বাস্তবিক ও কালিদাস; রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ভ্রামোজ্যাক'; 'পরিশোধ' 'বিদ্যার অভিশাপ' প্রভৃতি লেখার আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য পাঁচ টাকা।

### ছক ও ছবি

জ্যোতিষী-অভিজ্ঞতার কাহিনী গল্প আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন 'ছক ও ছবি' গ্রন্থের লেখক হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য্য। বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্য হিসাবে পরিবেশন করার মধ্যেও যথেষ্ট কুশলতার প্রয়োজন। লেখকের এই লেখাগুলি বড়িও ঠিক গল্প নয়, তবে গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। বাঙলা দেশ গুরুবাহী দেশ; 'দৈবনির্ভরশীলতা' এখনও বাঙালীর মস্তাগত হয়ে আছে। এর ফল শুভ না অশুভ, সে আলোচনা এখানে অবাস্তব। জ্যোতিষীর রাজন্যমাতাকে, প্রত্যক্ষ দর্শনের আন্তরিক অমুড়তির সঙ্গে লেখক মনুষ্যসমাজের অনেক গোপন তথ্য উদ্ভাটিত ক'রে সাহিত্যের উচ্চমানে উঠিয়েছেন। ছক ও ছবির প্রতিটি গল্পই সার্থক রচনা বলা যায়। শাস্ত্রগত আড়ম্বর নেই কোথাও। মিত্র ও ঘোষ। ১০, ভ্রামোচরণ মে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

### সরস গল্প

গ্রন্থের ভূমিকার রস-সাহিত্যিক বিজ্ঞত্ববৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় বলছেন : "গল্পের চেয়ে ক্ষেত্রে মধ্য দিয়েই রস লেখক বেশির ভাগ আত্মপ্রকাশ করেন এবং এই বইখানিতেও এই ধরনের লেখাই বেশী স্থান পেয়েছে। বৃত্তদূর জানা যায়, এইটি তাঁর আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ ধারা বা Forte. এই পুরানো পৃথিবীটা বৈচিত্র্যে চিব-নুতন—সে বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে কোথাও হাসিতে, কোথাও অজ্ঞাতে—সে হাসি-অজ্ঞার রূপও বিচিত্র।" "আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সজ্ঞা-কুমার দে বর্তমান সাহিত্যে পরিচিত, তাঁর এই ধরনের ক্ষেত্র-রচনার কৌশলে। সর্বসম্মত আটপাটি খেঁচ আছে এই সরস গল্পে। প্রত্যেকটি গল্পই স্বত্বপাঠ্য। সো-আন বুকস। ১১৭, কেশববল্লভ সেন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

### মদ-বিনিময়

মধুরবসের মিষ্টি গল্প-লেখার যথেষ্ট খুশি আমাদের করেছেন মদ-বিনিময়ের লেখক সুমধনাথ ঘোষ। আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের কয়েকটি অতি চমৎকার গল্প স্থান পেয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশ, পূর্বব ভারতীয় প্রেম-অভিলাষ, দাম্পত্যস্বপ্ন গল্পগুলির বিষয়বস্তু। প্রতিটি গল্পের আর প্রতিটি চরিত্র লেখকের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পরিচালক। এই সব সৃষ্টি চরিত্রের মাহুতবসের আমরা যেন সকলেই চিনি। আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে তারা। বাদের দিকে আমাদের চোখ পড়ে না তাদের গল্পের মধ্যে হ'বে যেখানে লেখক। বইখানি উপহারের উপযোগী। প্রচ্ছদ স্তম্ভর। মিত্র ও ঘোষ। ১০, ভ্রামোচরণ মে স্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

### মৌনবোধ

পরলোকগতা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে লেখা গল্প কবিতা প্রবন্ধ ও যেতাদের প্রবন্ধ বহুতাবলী সম্প্রতি গুপ্তকাকার প্রকাশিত হয়েছে। কল্যাণী দেবী ঠাকুর-পরিবারের কন্যা, বালাকাল থেকেই তিনি সাহিত্য সাধনা ও শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করে গেছেন। তাঁর গল্পগুলি মতাই প্রকাশের অধিকারী। গল্প বলার মধ্যে অনেক কিছু ব্যক্ত করার কল্যাণী দেবীর দক্ষতার সে চিহ্ন মৌনবোধের বিস্তারিত। তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে ওঠে এক শিল্প আন্তরিকতার সুর। কল্যাণী দেবীর সম্প্রদিত দেবর বিখ্যাত শিল্পী শ্রীমতীস্রনাথ ঠাকুরের 'কল্যাণী-পরিচিতি'ও ভাল লাগবে। ১নং কুইন্স পার্ক থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়। দাম তিন টাকা।

### পৌধুলি বাসর

নবীনা লেখিকাদের মধ্যে রাণু ভৌমিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে গল্প রচনার তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। বর্তমানে এর উপভাস 'পৌধুলি বাসর'ও দেখা দিয়েছে বখোপযোগী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। রাণু ভৌমিকের রচনার মধ্যে একটি জাঙ্গল্যমান কীপ্তির আভাস পাওয়া যায়। এর চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ সৌন্দর্যবৃত্তিত বলা যায়। প্রকাশ করেছেন, শতদ্রুপা প্রকাশনী ৩১ কলেজ রো, দাম তিন টাকা বারো আনা।

### কুমারীকতা

কিছু কালের মধ্যে 'পাতালে এক স্বতুর' লেখক দীপক চৌধুরী কয়েকখানি গল্প-উপভাসও প্রকাশিত হয়েছে। 'শঙ্খবিধ' ও 'কড়-এসো'-র পর 'কুমারীকতা' তাঁর তৃতীয় উপভাস। 'মনে বর্ধ'কে এই উপভাস উৎসর্গ করেছেন গ্রন্থকার। সাধারণ ভাবে আমরা মনের যে বর্ধ বৃদ্ধি, সেই নারী-পুরুষের মিলন-তৃষ্ণা স্বরূপটি ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে। দাঙ্জলি: এর পরিবেশে এই কাহিনী প্রসারিত হয়েছে। এসেছে কয়েকটি পারহাড়া চরিত্র, এসেছে ভালবাসার, ত্যাগের, আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র নিদর্শন। প্রকাশ করেছেন—এম, সি, সরকার অ্যান্ড স (প্রাইভেট) লি., ১৪-খড়ির চাঁটুজো স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫ টাকা।



ডিটামিন মুক্ত

# কোলে KOL বিস্কুট

সাঁরা ওলের বিচার করেন

সাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
আইডেট লি., কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খিনএরাকট

মেরী

পেটিটব্যুরো

নাইস

কলেজ

টেষ্টা

ডেণ্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্টী

মার্শেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

## রাজার রাজ্য

[ ২৪৪ পৃষ্ঠার পর ]

মাকিসর্দার কথা বললে বজ্রহার গলুই থেকে। হাতে তার খেলো হুঁকা। খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, আমার বখন আছি, তখন আর ভর-ভর কেন ?

—ভর ! ব্রান হাতির সঙ্গে বললে ঐধুবাণী। হাতির জের টেনে বললে,—জাত-হারানোর ভয় ! কোথাও যে আমার হুঁই হবে না মাকিসর্দার ! যবেও নেবে না, পবেও নেবে না। মরণ ছাড়া আর আমার গতি নেই। তা তোমরা দাঁও না আমার মুক্তি। আমি গঙ্গার জলে খাঁপ দিই।

মাকিসর্দার ঈশ্বর হাসলো। মুখ থেকে হুঁকা নামিয়ে বললে,—আমরা তো বিবিজ্ঞান মুক্তি দিতে পারি, তবে ঐ তেলেরী সিপাইরা হয়তো বাধা দেবে তোমাকে। ওরা নিমখারামি করবে না কখনও। পোষা কুকুরের সামিল ঐ সিপাইরা।

—একটু বিধ দিতে পারো আমাকে ? এক জিলতে সৈকো-বিধ কিবা একটুখানি আকি ?

আনন্দকুমারী কেমন বেন বন্ধন হুঁরে ভিক্সা চাইলো। দুই হাত পাতলো ভিক্সা-প্রাণীর মত। শিউরে উঠলো মাকিসর্দার। চোখে বেন তার হাসি আর অঙ্গ ফুটলো একই সঙ্গে। বললে,—সাহেব যে বড্ড মাগা পাবে তবে। ঐ ফিরকী সাহেব সত্যিই তোমার প্রেমে পড়েছে বিবিজ্ঞান ! তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাও না।

কাজলকালো চোখ বন্ধ ক'রলো আনন্দকুমারী। চোখে অন্ধকার না আসা দেখলো, কে জানে ! বুক কঁপে উঠলো ধরথবিয়। অজানা ভবিষ্যৎ, অজানা অজ্ঞাতের মাল্লখ, অপরিচিত পরিবেশ—সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখছে ঐধুবাণী। ভাবছে, তার এই পোড়াফক কি রূপ দেখলো ঐ বিদেশী ! রূপ ঈশ্বরের আশীর্বাদ না অভিশাপ ! আনন্দকুমারীর দেহ পেয়েছে ম্যান্টে ; মন পায়নি এখনও। হয়তো কখনও পাবেও না। মন অঙ্গ একজনকে দান করেছে অনেক আগে। আর ভিলবারনের স্থান নেই তার মনে—সবটুকু অধিকার ক'রে আছে কে যেন।

—তোমাদের সাহেব কোথায় চলেছে তাই শুনি ?

ঐধুবাণী মিহি হুঁরে কথা বলে। বজ্রহার জানলো জে ক'রে একটুকরো রোদধূর পড়েছে তার মুখে আর বুক। মাকিসর্দার দেখতে পায়, বিবির বুক বন বন জ্ঞানামা। বাসের গতি কত দ্রুত।

—কাছে নয় বিবিজ্ঞান, যেতে হবে অনেক দূরে। সেই হুতাচ্ছটিগোবিন্দপুরে। হগলী নদী ধ'রে, এই মা গঙ্গার বুক ধ'রে বতে হবে সোজা।

—কত দিনের পথ মাকিসর্দার ? আমার বাবামশাই আছে লখানো।

—হুঁরোজ তো বটে। জোয়ারের ক্ষপেতে আর বাওন লবে না।

—সাহেবের ঘর আছে হুতাচ্ছটিতে ?

—হুতাচ্ছটিতে নয়, গড়ংগোবিন্দপুরে। কোম্পানীর কুঠি আছে। সাহেব সেখানেই থাকে।

—কুঠিতে নিয়ে যাবে আমাকে ?

—হী গো বিবিজ্ঞান ! এমন ডানাকাটা পরীকে পেরেছে বখন।

—সাহেবের কাজ কি ? শেখা কি ?

—সাহেব খাস কোম্পানীর লোক। জরীপের কাজ করে। অঙ্ক কষে, নক্সা কাটে, ছবি আঁকে। তোমার তসবীর একেছে দেখছো না ?

—হী দেখছি। ভালই হয়েছে।

—বেউলে বাজাতে পারে সাহেব। কাল রাতে কত বাজানাই শুনিয়েছে তোমাকে ! শোন নাই ?

—হী শুনেছি।

—ঐ তো সাহেব ফিরে আসছে। পেছনে মাকির মাথার ঝাঁকা। তোমার তরে কত কি সজা ক'রেছে দেখো।

ঐধুবাণী আবার চোপ বন্ধ ক'রলো। চোখ ফিরলো না বাগেরের তরে। একটা বঠকায়র শীর্ষশাস ফেললো। চোখে আঁচল ঢাপলো।

পাটায়নে ঝাঁকা নামিয়ে রাখে মাঝি। বজ্রাখানা একবার সজোরে তুলে উঠলো। চমকে উঠল আনন্দকুমারী। তার চোখে পড়লো সওদার বৃদ্ধিতে কত কি রয়েছে। ক'জোড়া লাড়ী। গামছা। আগারের পাত্র। ভলের কলসী। মাটির বাসন। ঢাল, ডাল, শাক সজী। যি, তেল, দুধ।

ম্যান্ট বসলে—তার লাগাও।

কেমন বেন হুকুমের স্বর তার কথার। মুখে বেন আনন্দের আভাস। খাঁচার পাখী খাঁচাতে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হর বেন। সন্তি না হৃদয়ের শাস ফেলে।

চটের তাঁবু তোলাপাড়া করে সিপাইরা। দড়ি আর খুঁটি। বীশ আর লোহার হাতুড়ী। সন্সার পতনের তোড়জোড় চলে। একজন মাঝি মাটির টাননে আঙন দিতে লেগে যায়। গাছের শুকনো পাতা আর ডালে আঙন বরষা চকমকি ঘরে।

ঐধুবাণীর একটি হাত ধ'রলো ম্যান্টে। হাত ধ'রে উঠলো তাকে। বললে,—জাও, হামরা সাধ চল'। কাম, লেট আস গো টু দি ব্যাক।

নেপা ধরে আছে বেন। আনন্দকুমারীর পা কীপছে, দেহ টলছে। চোখের কালো অঙ্গন কালিমা ছড়িয়েছে মুখে। লজ্জা ভুলে গেছে হয়তো বা। কেমন বেন বেহাষার মত ম্যান্টের হাতে হাত ভিড়িয়ে বজরা থেকে ভারে নামলো টালতে টালতে। ম্যান্টে তার কোমর জড়িয়ে আছে এক হাত।

ভবুও বেন রাগ ধরে ঐধুবাণীর। একের প্রাণী অঙ্গকে অনিচ্ছায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুক ঝাঁকিয়ে থাকে। তারের ভিজে মাটিতে পা পড়তে কাদামাটিতে পা বসে যায়।

ম্যান্টে দুই বাহর ভরে তুলে নেয় ঐধুবাণীকে। বুক তুলে সের একেবারে। কর্দমাক্ত তীর পেশির নিয়ে যায় তাঁবুর ভেতর। আনন্দকুমারীর চিবুকে একটি চুম্বা খেয়ে তাকে পুতুলের যত নামিয়ে রাখে বেন।

—দিসু ইজ মাই ডিমল্যাও।

ম্যান্টে কথার কবির কুটিয়ে বলে।

—তুমি এখন আমার নজরছাড়া হও। আমি নদীতে ক'টা ভুব গিরে নিই।

চৌধুরাণী এক পাশে শরে পাঁড়ার কথা বলতে বলতে।  
বিদ্যুতের কিতা খুলতে থাকে।

ঘর বাঁধছে, বাসা বাঁধছে, তবুও মুখে হাসি ফোটে না চৌধুরাণীর। যুদ্ধের মত বাঁক। ভুরু আর সোজা হয় না। থেকে থেকে কটাক্ষ হানে যেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় ম্যান্টে, হাসতে হাসতে। কাব্য আওড়ায় সুরলে ছন্দে। ম্যান্টের মনে পড়ে কবি রুডেলকে। এই কবি শোনা যায় ত্রিশলীর কাউন্টেশের প্রেম পাড়েছিলেন। রুডেল তাঁকে চেয়েছিলেন মন থেকে। কাউন্টেশ কবি রুডেলকে চেয়েছিলেন কি না জানা যায় না। রুডেল ছিলেন রাজপুত্র, ধনীরা দুশাল। ব্রেইয়ার রাজার ছেলে রুডেল দ্বাদশ শতাব্দীর অল্পতম কবি ছিলেন। ম্যান্টে তাঁরই কবিতা বলে নিজের মনে। আবৃত্তির সুরে বলে যায়,—

"God, who hast made all things  
that come and go  
And hast fashioned me out this love afar,  
Give me power, such as I have not  
in my heart,  
So that in short space I shall see this  
love afar,  
Verily and in a place set to our need,  
Be it room or garden it will alway seem  
to me a palace.  
He speaketh sooth who calls me covetous  
And desirous of this my love afar,  
for no other joy  
would delight me so greatly, as the  
enjoyment of my love afar.  
But she whom I desire is so hostile to me!  
Thus hath my destiny bewitched  
me to love and be unloved."

তাঁরতে এখন আনন্দকুমারী একা। বিদ্যুতের বন্ধন খুলতে খুলতে আবার চোখ ফেটে ভাল আসে। তাঁবুর বাইরে ম্যান্টে কবিতা গাইছে, চুনতে পাওয়া যায়। অর্থ বোকা যায় না কিছুই। চৌধুরাণী কানতে থাকে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে, শিশুর মত। ডাক ছেড়ে কানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুক কঠি বেনে সাদা দেয় না। বাদের ফেলে এসেছে সে, বাদের সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না ইহজীবনে। রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনীকে বেনে চোখের সামনে দেখতে পায় চৌধুরাণী। রাজকুমারী মুখখানি ভেসে ওঠে তার মনোমুগ্ধরে।

তাঁবুর ভেতরে খাটিয়া প'ড়েছে। একজন সিপাই আসে তাঁবুর মধ্যে। শাড়ীর ছুপ রেখে দিয়ে যায় খাটিয়ার। চৌধুরাণীর চোখে আঁচল, তাই দেখতে পায় না।

## এমন দিন কবে হবে ?

যখন ১১ জন বান্ধাজী ছেলে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে represent করবে। ইংলণ্ড যাবে, অস্ট্রেলিয়া যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবে! হয়তো সেদিন খুব সুন্দর নয় !!

১১৭৫৬ তারিখের যুগান্তরের ভাষায় :—

"ক্রিকেট খেলা শেষের পক্ষে বইখানি চমৎকার। এই গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার সমস্ত দিকই বহু ছবির দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন ডন ব্র্যাডম্যান। ট্রোক, বোলিং, ফিল্ডিং, আন্সার্স, রানিং বিট্টেন দি উইকেটস ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। শিক্ষার্থীরা এই বই পাড়ে ক্রিকেট-বাহুরক ডন ব্র্যাডম্যানের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। ছাপা বাণী সুন্দর। বইখানি অনুবাদ করেছেন পরীক্ষিত। অনুবাদও সহজ ও সরল হয়েছে।"

মাসিক বঙ্গমতীর ভাষায় :—

".....যে কোন খেলাই খেলতে হ'লে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, আশা করি কেউ তা অস্বীকার করতে পারবেন না। বিখ্যাত খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের লেখা 'ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ,' সেই কারণেই শিশু এবং কিশোরদের পক্ষে মূল্যবান গ্রন্থ। অনুবাদক পরীক্ষিত অনুবাদের কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানিতে প্রচুর ছবি আছে শিক্ষা নির্দেশের প্রয়োজনে।"

বিখ্যাত জাতীয়তাবাদিক পন্থক গুপ্ত বলেছেন :—

"আমি ভাবি আগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষিত অনুদিত ডন ব্র্যাডম্যানের How to Play Cricket-এর রমণীয় বাংলা অনুবাদ অনুবান করছি।.....এ বইটি প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর পড়া উচিত এবং প্রত্যেক লাইব্রেরীতেও এক কপি করে এ বইটি সংগ্রহ করা উচিত। বইটি বিশেষ শিক্ষণীয়।"

বিখ্যাত ক্রিকেট ক্রিটিক বের্লী সর্বাধিকারী বলেছেন :—

".....ব্র্যাডম্যানের বিষয় বলবার কিছু নেই। অনুবাদটিও হয়েছে স্বচ্ছ সুন্দর। ক্রিকেট ঘাসের প্রিয় প্রত্যেকের এটা পড়া উচিত বিশেষতঃ তরুণ শিক্ষার্থীদের।.....প্রত্যেকের খেলাই এর থেকে ভাল হবে।"

পরীক্ষিত কিন্তু আমাদের এসে বললেন—"মশাই আপনারা খালি তরুণ তরুণ করছেন কেন? শুধু অনুবাদ করে নয়, ওইভাবে খেল সেদিন আমি একটা সেফুরী করলাম। কাগজ দেখেন নি?"

আর অল্প কোন ভারতীয় ভাষার বইটা অনুদিত হয়নি : বান্ধাজী ছেলের' যত তাড়াহাড়ি এ বইটা সংগ্রহ করতে পারে ততই মজল। পরিবর্তিত আকারে বিশেষ বিশেষ মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে বইটি আত্মপ্রকাশ করল।

ডন ব্র্যাডম্যানের  
ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ,—৪—

আর্ট ম্যাগু লেটাস পাবলিশার

জবাকুজুম হাউস, কলিকাতা-১৭

ম্যান্টে গুনতে পায়, কোথা থেকে কৌসকৌসানির শব্দ আসছে।  
অন্ধমানে বোকে, তার প্রিয়তমা কীদছে বিবোগ ব্যাধার! ম্যান্টের  
মত চূড়ার চোখও যেন ছলছলিয়ে গুঠে মুহূর্তের জন্ত।

মান্দারগের ভগ্নপুত্রে সমব্যবী বিদ্যাবাসিনীও থেকে থেকে  
চোখের জল ফেলেন।

ভিজ্জ চুল শুকাতো ব'সেছেন রাজকুমারী। সুখের দিকে পিছু  
কিরে আছেন। ছাদের এক কিনারায় ব'সে আছেন। ভিজ্জ  
চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে পিঠে। কোন কাঁকে আসমানে ডুব দিয়ে  
এসেছেন কে জানে!

রাজকুমারী ভাবছিলেন, হাজার হোক চৌধুরাণীই সুখী। তাঁর  
মত একা নয় সে। দেশী হোক, বিদেশী হোক, প্রেম আর ভালবাসা  
পাবে। অবহেলা সহ করতে হবে না জীবনভোর, পাবে সেবা-বন্দ।  
আদর আর কদর হবে তার। ইংরাজরা নাকি প্রেমে কপট নয়।  
তাদের ভালবাসার না কি ছলচাতুরী নেই।

—বৌ!

কোথা থেকে ডাক পাড়লো পরিচারিকা। বেহের ডাক নয়,  
ডাকলো যেন কর্কশ সুরে। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে।

বাড় ফেরালেন বিদ্যাবাসিনী। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন।  
তপ্ত রৌদ্রে রাজকুমারীর শুভ্র বুথ লাল হয়ে উঠেছে। তৈলহীন  
ছককেশের বোঝা শুকিয়ে গেছে বর্ণন।

—এই নাও তোমার কাগজ-কলম আর তুলোকাশি। যেতে  
আসতে জিত বেরিয়ে গেছে আমার! পরিচারিকা কেমন যেন  
সুন্দর কথ্যগুলি বললে। খানিক থেমে আবার বললে,—সারা  
মান্দারগে তো চি টি প'ড়ে গেছে! কান পাতা দায় হয়ে উঠলো!

—কেন? কি হয়েছে?

সাগ্রহে শুখোলেন রাজকুমারী। কথা বলতে বলতে উঠে  
পাঁড়ালেন।

যশোদা বললে,—আনন্দকুমারীকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই।  
দিকে দিকে লোক ছুটেছে। চন্দ্রকান্তের চতুর্পাঠীতে পাড়ী পাঠিয়েছে  
আনন্দর মা। হনহনিয়ে পাড়ী ছুটেছে, নিজের চোখে দেখছে যে।

একবার যেন শিউরে উঠলেন বিদ্যাবাসিনী। কি যেন বিপদের  
আশঙ্কায়। খানিক নিখর হয়ে থাকতে থাকতে কিসকিসিয়ে বললেন,  
—চন্দ্রকান্ত কি করবেন? তাঁর কাছে পাড়ী ছুটলো কেন?

—দৌড়ায় তিনিও যে ছিলেন আনন্দর সঙ্গে। তিনি না কি  
সবই জানেন।

—তোমাকে কে বললে যশোদা? ভয়ের সুরে প্রশ্ন করলেন  
রাজকুমারী। বললে,—তুমি কোথায় গুনলে এমন কথা?

—দশকন্ধ্যার দোকানে শুনেছি, লোক বলাবলি করছে। পাড়ী  
ছুটেছে স্বচকে দেখে এসেছি।

—তবে কি হবে যশোদা? আমার যে ভয় করছে!

—কি আর হবে! তুমিই বা ভয় পাও কেন? আমি থাকতে  
তোমাকে কোন' আঁচ পোহাতে হবে না, জেনে রাখো।

পটভূমিকা : নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ—তাঁহার প্রথম পরাজয় বরণ ও পতন  
প্রযোজনা খরচ : ৬০০,০০০ ডলার  
দূত্রে নিয়োজিত : ১৫,০০০ ইটালিয়ান সৈন্য ৮০০০ ঘোড়া, ২৮৭৬ কামান  
এই চিত্রনাট্য প্রস্তুত করিতে ৮ জন লেখক এক বৎসর কাল সমানে পরিশ্রম করিয়াছেন।

PARAMOUNT PRESENTS  
AUDREY HEPBURN  
HENRY FONDA  
MEL FERRER  
CASSMAN LOM HOMAKA KBERG  
MILLS

WORLD'S GREATEST NOVEL  
NOW ON THE SCREEN!  
"SUPERB!" —NY Herald-Trib  
"BRILLIANT!" —New York Times

War and Peace  
A PONTI ENTERTAINMENT PRODUCTION

BASED ON THE NOVEL  
"WAR AND PEACE" BY LEV N. TOLSTOY

VISTAVISION

লাইট হাউসে শীঘ্রই মুক্তি লাভ করিবে

পরিবেশক—

PARAMOUNT FILMS OF INDIA LTD.



—আমাকে ধরে যদি টানাটানি করে? চিন্তায় বেন আকুল হয়ে কথা বলেন বিদ্যাবাসিনী। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। ছাদ ত্যাগ করেন ধীর পদক্ষেপে।

পরিচারিকা বললে,—তোমাকে কেন টানাটানি করবে? তোমায় দেখি কি তাই শুনি? আশ্রক না কে আসবে! যেতো মুখ ভোঁতা করবে না আমি?

দাসীর কথায় মন ওঠে না রাজকুমারীর। কেমন বেন ভয়াত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। কিসকিস কথা বললেন। বললেন,—চল বশোদা, এখান থেকে আমরা পালাই। মানে মানে সবে পড়ি।

—কোথায় যাবে গো? আমাদের জমিদার তবে কি আর আমাদের গড়ে মাথা রাখবেন ডেবেছো? আমি বাছা সব করতে পারি, বেইমানী করতে পারি না। যার নিয়ক খেয়ে ইজ্ঞক বেঁচে আছি তার সঙ্গে শত্রুতা করবো কি। ও সব কথা মুখে এনো না তুমি।

—তবে আসমানে ডুবে বাই চিরজন্মের মত। আসমানে আমাকে ঠিক ঠাই দেবে।

—আমার দল সারবে দেখছি তুমি। এমন অলক্ষণে কথাগুলো আর শুনিও না আমাকে। তোমারই বা এত ভয় ডর কেন? তুমি তো আর চৌদুরীর ময়কে চুরি করনি?

—আমার মন বেন আঁতুপাঁকু করছে।

কথা বলতে বলতে আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজকন্তা। তাঁর মুখে-চোখে বেন ভীতিবিহ্বলতা।

তুলট কাগজ, খাগের কলম আর ভূশোকালি নামিয়ে রেখে দিলে বায় পশ্চিচারিকা। স্বর থেকে বেরিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—জানি না বাছা এত শত। জলে ডুবতে যাবে তুমি কোন্ মুখে?

বিজ্ঞন যবে বিরহের দীপ জ্বলেন বেন রাজকন্তা। ভাবেন, আসমানেই তাঁর ঠাই হওয়া উচিত। বেঁচে থাকাই অজ্ঞায়। কত আঘাত আর স্নেহ হেনেছেন জমিদার কুসুমায়। আর সব প্রাণের সমুখে কত অপমান করেছেন। কত কটুকথা শুনিয়েছেন। তাতেও বধন মন ভরেনি তখন একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন গড়-মান্দারশের এই ভরপুরীতে। নজরবন্দী করে রেখেছেন। এত আসমানের চেয়ে আসমানে ডোবাই ভাল। তার ওপর সহস্রাবর জাইরা রাজাবাদশাহ হইবে বধন কুসুমায়ের দাবী মিটালেন না, তখন মরণ-বরণ ছাড়া গতি কি আর।

শিউরে শিউরে উঠলেন বিদ্যাবাসিনী। জলে কাঁপ দেওয়ার ভয়ে নয়, কেমন বেন মৃত্যুভয়ে ভীতা হয়ে পড়েন। বুক দুক-দুক করতে থাকে।

রাজকন্তার ধারণা সত্য নয়। তাঁর এই দুঃখবাহ্য রাজগৃহের সকল শাস্তিও বিনষ্ট হ'তে চ'লোছে। রাজমাতার চোখে ঘুম নেই। রাজাবাহাদুরের আহায়ে-বিহারে মন নেই। কুমারবাহাদুর কানীশদত্তর হৃদয় হ'তে পারছেন না। রাণীমায়েদের মুখে হাসি নেই। রাজ-পুরীতে আর কোন' আনন্দ নেই।

কানীশদত্তর দত্তরমত শলা-পরায়ণ চালিয়েছেন কল্ককে। সদরে পাছে ভানাজানি হয়, তাই অদরের এক গুপ্তককে বসেছেন গোপন আলোচনায়। কঙ্কের মধ্যে কুমারবাহাদুর আছেন। আর আছে কামতার খাঁ। আছে জগমোহন লেটেল।

মধ্যদিনের রূপালী-সুন্দর আকাশে চোখ তুলে, কল্ক কঙ্কের বহু দুয়ারে হেলান দিয়ে পাবাশমুতির মত পীড়িয়ে আছেন মহাশেতা। দীর্ঘ চোখের পলক পড়ছে না। কেমন বেন আশাহতার মত তাকিয়ে আছেন। কশিশব্দে শুনেছেন ঘরের কথা।

জগমোহন বলেছে,—পাঠানটাকে হজুর, ঘাসেল করতে পারলেই কেদা কতে হয়ে যাবে।

কানীশদত্তর বললেন,—সেই তার আমার। আয়েবান আমারও আছে। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ জানবে। আকাশের উড়ন্ত পাখীও আমার টিপ এড়ায় না।

কামতার খাঁ বললে,—তবে জাঁহাপনা, আমাকে আর সঙ্গে লেবেন কেন? আমার তবোয়াল ফাঁকার আবার চলে না!

কানীশদত্তর হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন,—কামতার, তুমিও তবোয়াল চাপাবে, আমরা যদি নাচার হই তখন। আগামী কল্য যাত্রা স্থনিশ্চিত জানবে।

চমকে উঠলো পাবাশমুতি। কেমন বেন বিচলিত হয়ে উঠলেন মহাশেতা। আকাশ থেকে চোখ নামালেন না। চোখের পলক পড়ে না। মহাশেতা স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছেন আকাশে কে জানে।

মহাশেতা দেখছেন, একটি উড়ন্ত চিলকে আক্রমণ করেছে আরেকটি চিল। তারবরে চাঁৎকার করছে চিল দুটি। চরম আক্রমণ চোঁচাতে চোঁচাতে, লড়াই করতে করতে আকাশ থেকে নীচে নেমে পড়ছে দুটিকে একত্রে। মহাশেতা নিশ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। কল্কবাসে। [ক্রন্দন:]

## —আগাম্য সংখ্যায়—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ও

নীরঞ্জননাথ চক্রবর্তী

# সাময়িক প্রেক্ষা

## পাঠসমস্যা কেন ?

“স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ের কথা বলিতে বাইরা একটি অতি বাটী কথা ডাঃ রায় বলিয়াছেন। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধিত করা উভয় প্রতিকারের উপায় নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন, ‘অত্যধিক ভিড়ের এক কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার যত নিশ্চাই আমরা করি না কেন, এখনও আমাদের আরও ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষিকৃষি, ডাক্তার প্রভৃতির প্রয়োজন আছে।’ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। কাজেই এই অবস্থার স্কুল-কলেজে অত্যধিক ভিড়ের নিশ্চা করা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। প্রয়োজন স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ডাঃ রায় বলিয়াছেন, জাপানে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১৫ জন। তুলনামূলক আলোচনা হিসাবে আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা কত, তাহা যদি তিনি উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বাধীন ভারত শিক্ষার স্বতন্ত্র অঙ্গের হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। শিক্ষকদের আর বেতন যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার জটিল জন্ত দায়ী, ডাঃ রায় এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয়েরা বাহাতে আরবজের চিন্তা; হইতে মুক্ত থাকিয়া শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থ হইবে। শিক্ষকদিগকে পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের দায়িত্ব অনেকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা বাহারা রচনা করেন, উহা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব বাহাদের উপর, শিক্ষাব্যবস্থার খবরদারী করিবার দায়িত্বভার বাহাদের উপর অর্পিত, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ‘জটিল বিচ্ছিন্নতা’র জন্ত তাহাৎই দায়ী, ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাস।”

—দৈনিক বনুঘতী।

## পথ চলা দায়

“কলিকাতার ট্রেট বাস সন্ধ্যা গতে ৮ই ডিসেম্বর আমরা যে মন্তব্য করিয়াছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা তাহাৎই পূত্র ধরিয়া ট্রেট বাস সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য জানাইয়াছেন (গত ১১ই ডিসেম্বরের আনন্দবাজারের ‘চিঠিপত্র জনমত’ স্তম্ভে জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে)। সরকারী বক্তব্যে বাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে অভিযোগ অস্বীকার করা হয় নাই, বরং ‘কেন কোন

বাক্সের ট্রেট বাসের সমস্যা সম্বন্ধিত আরও সন্ধ্যা বিরপ মনোভাব পোষণ করা বিময়কর নয়।’—ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। বেন যে ট্রেট বাস ‘সময়’ রাখিতে পারে না, তাহা স্বাক্ষরধারণ অনেক সময় বৃষ্টিতে পারেন না।—বৃষ্টিতে না পারার জন্য অপরাধ বাক্সের নহে, বুঝাইতে না পারার জটিল কর্তৃপক্ষের। আলোচ্য সরকারী বক্তব্যে যে সকল কারণের কথা (মায় লগনের ট্রেট বাসের সঙ্গে তুলনা) উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকার তাহাই স্বাক্ষরধারণকে কি কখনো পূর্বে জানাইয়াছেন? বলা হইয়াছে, প্রাইভেট বাসের চালকরা জরিমানার ভয়ে সময় রক্ষার জন্য অতিরিক্ত জোরে বাস চালায়। কিন্তু ইহা করিলে অন্তরঙ্গ বিপদ হইতে পারে বলিয়া ট্রেট বাসে ‘জরিমানা ব্যবস্থা’ নাই। ভাল, জরিমানার ব্যবস্থার, বিপদ হইলে উহা না থাকায় ট্রেট বাসের দুগুণের উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে কিনা, তাহার তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। নোটিশ না দিয়া রুট বদলের কথা ১ নং রুট সম্পর্কেই মন্তব্যে বলা হইয়াছিল। সরকারী বক্তব্যে নোটিশ না দেওয়ার কথাটি স্বীকৃত হইয়াছে। তবে বলা হইয়াছে যে, নোটিশ না দিয়া এই রুট সরাইয়া আনার ফলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ৫ নং ও ৮বি রুট এখান দিয়া চলিতেছে। বাক্সীদের অন্তর্বিধা কেন ঘটে তাহা সম্যক জানা থাকিলে এই কথা বলা চলিত না যে, নোটিশ না দেওয়ার কারো ক্ষতি হয় নাই। এ সম্পর্কে বক্তব্য নোটিশ না দেওয়ার পূর্বের মতোই টার্মিনাসে মেয়েপুত্রের বাক্সেরা গিয়াছেন, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়াছেন—৫ ও ৮ বিতে ওঠেন নাই ভিড়ের জন্ত। বহু বিশেষ তাহারা জানিলেন, ১নং এ স্থানে আসিবে না, তখন মহিলা ও পুত্র বাক্সীদের হাঁটু গোলা পার্কে আসিতে হয়, ইহাতে বাক্সেরা নিশ্চয় সন্তোষ বোধ করেন না; অহেতুক হারানি মনে করেন। পূর্বে জানিলে তাহা হইত না। যে কোন নম্বরের বাসে উঠিয়া বাইতে পারিলেই হইল ইহা মনে করা তুল। বাক্সেরা যে কিছুটা সন্তোষমতও বাইতে ইচ্ছা করেন, ইহাও স্বীকৃতপক্ষে মনে রাখা দরকার। তারপর ১নং বাসই হার প্রয়োজন ৫ ও ৮বি বাসে তাহা কি করিয়া মিটিবে?”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

চোর। চোর!! চোর!!!

“পশ্চিমবঙ্গের চোর, ডাকাত, নরহত্যা ও অন্যান্য সমাজশত্রুদের বিপদ আসন্ন। স্বাধীন দেশের সমাজপ্রতি পুণিশ তো সর্বদাই তাহাদের শিখরে লাগিয়া আছে, তার উপর উভয়ের শক্তি বৃদ্ধি

করিতে দুইটি অ্যাংলেশিয়ান কুকুরী আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট মোটা মূল্য দিয়া ঐ দুইটি পুলিশ-বান্দরীকে সংগ্রহ করিয়াছেন। উহারা এখন মাজাজে গোয়েন্দাগিরি শিখিবার জন্য পুলিশ-কলেজে ভর্তি হইয়াছে। পাঠকবর্গের মরণ থাকিতে পারে যে, মাজাজে এক রহস্যময় বীজস্য হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিয়া মাজাজ পুলিশের অ্যাংলেশিয়ান কুকুরেরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মাজাজের দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টও দুইটি অ্যাংলেশিয়ানের শরণ লইয়াছেন। তাহারা ইহাদের নামকরণ যে শালীনতা ও স্বকৃতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাহাদিগকে প্রেমসা করিতে হয়। বিদেশী কুকুর দুইটির নাম রাখা হইয়াছে, “শাস্তা” এবং “মিতা”। মাজাজের যে পুলিশ-কলেজে ঐ ছাত্রীদ্বয় পশ্চিমবঙ্গের খুনী ও বন্দ্যদেরসিগকে ধরিবার কায়লা শিখিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের দুই জন ডিটেক্টিভও নাকি শাস্তা ও মিতার সঙ্গে সেই কলেজেই একই ধরনের শিক্ষালাভ করিতেছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রথমে নাকি শাস্তাকে এ রাজ্যের পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। শাস্তার এই নিয়োগ আপাততঃ হইবে “অহারা”, আশা করা যায়, যোগ্যতা দেখাইলে বিশেষনী বুদ্ধবীর্যকে আমাদের সমাজস্বাক্ষর বাহিনীতে পাকা উচ্চ চাকুরী দেওয়া হইবে। ইহার কত মাহিনা পাইবে, গেজেটেড অফিসার হইবে কিনা, তাহা অবশ্য এখনও জানা যায় নাই। বৃটিশ আমলে বিলাত হইতে কোন যেতাস কর্মচারীকে আনা হইলেই তাহাকে নেটিভ অপেক্ষা উচ্চ পদ দেওয়া হইত এবং সাধারণতঃ তাহাদিগকে শ্রেতহস্তী বলা হইত। শাস্তা ও মিতা হস্তিনী না হইলেও স্বাধীন ভারতের ল এণ্ড অর্ডার রক্ষার অফিসার। সুতরাং মধ্যম তাহাদেরও কম নয় এবং তাহারা কুকুর হইলেও বিলাতী কুকুর—এ কথা যেন ভবিষ্যৎ-চোরেরা মনে রাখে।

—যুগান্তর।

### প্রেস কাউন্সিল কি ?

“ডাঃ কেশকায়ের ভাবগতিক দেখিয়া একথা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, ভারত সরকার ‘প্রেস কাউন্সিল’ গঠনের নামে সংবাদপত্রের এক মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে উজ্জত হইয়াছেন। অতীতে বৃটিশ সরকার বারংবার আমাদের জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলিকে সংবাদের স্বত্ব প্রকাশ করিতে বাধ্য করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সম্প্রদায়কেই কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে রাজী হইয়াছেন, তবুও বৃটিশ সরকারের দাপটের সম্মুখে সংবাদের স্বত্ব প্রকাশ করিতে রাজী হন নাই। ডাঃ কেশকায় কি ভুলিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সেই গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যের কথা? তিনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সংবাদের স্বত্ব প্রকাশে সংবাদপত্রকে বাধ্য করিলে স্বাধীন ও নিতীক সংবাদপত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি তো দূরের কথা, তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর হইয়া ওঠে? মুখে গণতন্ত্রের কথা বলিবেন আর সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকারগুলিকে পর্যন্ত পূর্ণদস্ত করিবেন, কথা ও কাজের এত-বড় অমিলকে দেশের লোক কিছুতেই বরণাস্ত করিবে না—তাহা যেন মামনীর মতী ডাঃ কেশকায় মরণ রাখেন।”

—স্বাধীনতা।

### আবার হুমকী

“পণ্ডিত জহরলাল আবার চোরাকারবারীদের ধমকাইয়াছেন, তবে এবার আর ল্যাম্পপোটে কীসি দেওয়ার কথা বলেন নাই। আবার তিনি বলিয়াছেন, চোরাকারবার কিছুতেই তাহারা সন্তুষ্ট করিবেন না। চোরাকারবারীরা আবার মুখ লুকাইয়া হাসিতেছে এবং ভাবিতেছে, ইলেকসন ফাগুে হয়ত এবার সত্যিই আর কয়েকটা টাকা বেশী দিতে হইবে। পণ্ডিতজী দশ বৎসরের মধ্যে একটা উপযুক্ত চোরাকারবার দমন আইন পাশ করিতে পারিলেন না, ডেজাল নিবারণ আইনের নামে এক হাতকর প্রেহসন সৃষ্টি করিলেন! চোরাকারবার এক ডেজাল নিবারণের জন্য সব চেয়ে দক্ষ এক সব চেয়ে শক্তিশালী পুলিশবাহিনী তিনি গঠন করিতে পারাও নাই। তাহাও তিনি করিলেন না। দেশবাসী এবং চোরাকারবারী দুইজনেই তাঁর কথার দাম বুঝিয়া লইয়াছে। গড়ের মাঠের হুমকীতে আর একবার লোক না হাসাইলেও চলিত।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

### সুরাবন্দী সাহেবের স্বপ্নদপ

“পঞ্চম বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদী পরিবর্তন হইয়া সুরাবন্দী সাহেবের ভাগ্যে প্রধানমন্ত্রীর ছুটিলে পর আমরা এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, তাহার অতীতের ইতিহাস বাহাই ইউক না কেন, দেশ বিভাগের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করায় তিনি এখন পাকিস্তানকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করিবেন এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কেও হয়ত উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদের সেই আশা অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। অল্পদিন মধ্যেই সুরাবন্দী সাহেব তাহার স্বপ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে জিগির না তুলিলে তাহার গদী টিকানোই সম্ভব হইবে না, তাই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিতান্ত অকারণে বার বার ভারতকে ‘শত্রুপক্ষ’ বলিয়া অভিহিত করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করিয়া আত্মতৃপ্ত লাভ করিতেছেন। আগওয়ামী লীগ নেতা মোলানা ভাসানী ও তাহাদের সহযোগী বিপাবলিকান বা গণতন্ত্রী দলের অনেক নেতা ও কর্মী যদিও এখন বিশেষ প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন এক ভারতবাসীর বহুত্ব কামন করিতেছেন, তথাপি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আগওয়ামী লীগ সভাপতি সুরাবন্দী সাহেব যে কি উদ্দেশ্যে এই সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত এরূপ অশোভন ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা বৃদ্ধ কঠিন।”

—যুগশক্তি (আসাম)।

### নির্বাকচেন্ন পনের কর্তব্য

“আজ নূতন ভাবে বাঁহারা পৌরসভার সদস্য হিসাবে প্রবেশ করিতে বাইতেছেন, নিজের দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহাদের হসির হইতে আমরা অমুরোধ করি। পৌরসভার সৈন্যদল কার্যে শিখিলতা, লালাকিতার যে দিলেমী এবং রুদ্ধ রুদ্ধে যে প্রদ প্রবেশ করিয়াছে তাহার সমূল উৎপাতনই প্রথম কর্তব্য বলি ধরিয়া লইতে হইবে। নির্বাকচেন্ন জয়লাভ করাটাই বড় কথা না নির্বাকচেন্ন নামিবার পূর্বে ‘সাধারণের কাজে নামিতেছি’ বলিয়া স্বস্তির কাছ বাক্য স্বাধীনবিস্তারের যে শপথ গ্রহণ করা হইয়া

সমষ্টির দ্বাৰ্ধে সেই শপথ অক্ষরে অক্ষরে পাতিত হইতেছে কি না, তাহাই সমস্তের অন্তর দিয়া বিচার করিতে হইবে। বিচারের সেই শক্তিতে সকল সমস্তই উদ্ধৃত হইয়া উঠুন—আরত্রে এইটুকুই আমরা কামনা করি।”  
—বীরভূমের ডাক

### অযোপ্যত্যর উদাহরণ

মিজেনের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকিবার জন্ত কংগ্রেসী শাসকেরা কতই না ছলছুতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। পাকিস্তান হইতে উদ্ধৃত আগমন বন্ধ করিতে তাঁহারা অসমর্থ, কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, তাঁহারা পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না আর ‘সায়রগম্যান’ বিধান দায় বুক চাপড়াইয়া বলেন, একমাত্র ‘ভগবানই জানেন কবে এই অবস্থার অবগান ঘটবে।’ সম্প্রতি তাঁহারা আর একটি নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব সীমান্তে ঢাল এবং তত্ত্বান্ত জিনিষের চোরা কারবার বেশ জাঁকালোভাবে চলিয়া থাকে। ৪৪১ ডিসেম্বর খান্দারদের ছোট কৰ্ত্তা (উপমন্ত্রী) শ্রীকাল্লা রাজ্য সভার বলেন, সীমান্তের চোরাই চালান বন্ধ করা অসম্ভব। সীমান্তের উত্তর পার্শ্বের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাই উহার প্রধান অন্তরায়। তিনি আরও বলেন, এরূপ দেখা গিয়াছে এক পরিবারের ভাঁড়ার ঘর এক রাষ্ট্রে আর রাষ্ট্রার আর এক রাষ্ট্রে পড়িয়াছে। আমরা শুনিলাম, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টায় সময় কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চলে গরু এমনভাবে বাধা ছিল, সেগুলির মূখ ছিল ভারতে আর বাঁট পড়িয়া গিয়াছিল, পাকিস্তানে! ভারত বিভাগের পথিক চুক্তি রক্ষার্থ কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী গরুগুলিকে সেই অবস্থার সম্বন্ধে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কুশল্লা সাহেব ভাঁড়ার ও রাষ্ট্রারদের কথাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলির ভাঁড়ার আছে ভারত এবং রাষ্ট্রারদের রহিয়াছে পাকিস্তানে। কংগ্রেসী শাসকেরা পাকিস্তানের লোকদের কষ্ট দেখিয়া এইরূপ কিছু কিছু ভাঁড়ার রাষ্ট্রারদের তৈরী করিয়াও দিয়াছেন।”  
—হিন্দুবাদী (বাকুড়া)

### বেশন কার্ডে চুর্নীতি

“বর্ধমান সহরে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বেশন কার্ড সংঘে নানারূপ অভিযোগ পাওয়া হইতেছে। বিশেষ করিয়া বাস্তবহারাগণের মধ্যে বেশন কার্ডভুক্তি সংঘে নানারূপ চুর্নীতির কথা শোনা হইতেছে। বাস্তবহারাগণের কয়েকটা সমিতি রহিয়াছে। কোন একটিকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া কখনই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। বিবরটা তলস্তের জন্ত আমরা ডি, আর, ও মহাপ্রবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।”  
—বর্ধমান।

### শোক-সংবাদ

#### সয়োজিনী ঘোষ

ভারত-পুত্রী শ্রীঅরবিন্দের অমুখ্য ও বিশ্রবকর্মী বারীন্দের অমুখ্য হুমায়ী সয়োজিনী ঘোষ ১২ই অগ্রহায়ণ ধোমিওপাখিক কলেজ, হাঙ্গাঙ্গাঙ্গালে ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

### উত্তর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই অগ্রহায়ণ ১৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। প্রমথনাথের পরলোক গমনে বাঙালেশ একজন বহীমান সঙ্গীত-শিল্পীকে হারাল। প্রমথনাথের বীণবাদন ভারতের ও ভারতের বাইরে বহুসংখ্যক শ্রদ্ধা লাভ করত সমর্থ হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে ‘বন্ধার’ তাঁকে ‘ডক্টর অফ মিউজিক’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

### ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসু

বনামবন্ত চিকিৎসক আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকপূর্ণ অধ্যাপক ডাঃ ‘মণীন্দ্রনাথ’ বসু ১৪ই অগ্রহায়ণ ৮৩ বছর বয়সে লোকান্তর গমন করেছেন। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিসি-এম পদবীকার উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে পরলোকগত আরজিকরদের অল্পবয়সে আরজিকর (তলানীন্দ্রনাথ কামরাইকেল) কলেজে স্যানিটারি অধ্যাপকরূপে যোগ দেন ও স্বীয় কর্মদক্ষতার পরে অধ্যাপকের আসন অধিষ্ঠিত করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সভ্য হাড়া মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিনের পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। মোহনবাগান ক্লাবেরও ইনি সভাপতি ছিলেন।

### মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালার অজ্ঞাতম দিকপাল সাহিত্য-শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ভোর সাড়ে চারটের মাত্র ৪৭ বছর বয়সে নীলয়তন সরকার হাসপাতালে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থার থাকার পর পরলোক গমন করেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ বাঙলা-সাহিত্যে এক মর্মান্তিক আঘাত। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি জয় করেছিলেন পাঠকচিত্ত, তাঁর লেখনীর অমূল্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। বাঙালার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব যেমনই আকস্মিক তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত জনতার পক্ষ নিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে সঙ্গ্রামের জন্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রবাহ হয়ে থাকবেন সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিনের জন্তে। তাঁর সাহিত্য ছিল বাস্তবতার ভরপুর। তাঁর পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, অন্তরী মামী, পুতুলনাচের ইতিকথা, জননী, দিবারাত্রির কাব্য প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ-বিশেষ। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

### অনুপম ঘটক

বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী অনুপম ঘটক গত বুধবার ২৬ই অগ্রহায়ণ মাত্র ছোটখাট বছর বয়সে কিছুদিন রোগভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। ‘জাতভাবের ছাত্রজীবন’ প্রণেতা সম্প্রতি পরলোকগত অনুলচন্দ্র ঘটকের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ছাত্রাচিহ্নে কণ্ঠদান করে ইনি খ্যাতিলাভ করার পর সঙ্গীত পরিচালকরূপে দেখা দেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ‘পায়ের ধূলা’ চিত্রে। এর পর বহু চিত্রে ইনি স্বর দেন এক বর্তমানে ইনি একজন বাস্তব-সমস্ত ও সার্থকনামা সুরকারের প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। অনুপম ঘটকের এই অকাল প্রয়াণে বাঙালার চিত্রজগৎ ও সঙ্গীত-জগৎ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ’ল।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাঙ্গার স্ট্রীট, ‘বহুযত্ন’ মোটরী মেসিনে শ্রীভারতকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



## পত্রিকা সমালোচনা

গল্প রচনার চেয়ে, কাব্য রচনার কাজে প্রয়োজন অনেক বেশী নিষ্ঠা, সাধনা ও ধৈর্যের, তপস্যাও বটে। চেষ্টা করলে লোকে বৈজ্ঞানিক হতে পারে, কিন্তু কবি হতে পারে না। কবির ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। 'বিবেকানন্দ স্তোত্রের' লেখক শ্রমণি মিত্র আজ সেই আশীর্বাদে অবিকারী। ও বেন স্বামিজীর জীবনী নয়, ও বেন নুতন এক আলোর আবির্ভাব। ও বেন বিবেকানন্দের স্তোত্র নয়, ও বেন বিশ্বরণ থেকে স্বরণে আনার চেষ্টা।

"স্বামিজীর কথাতেই জানা গেল আজ  
আমরা বাঁধবও নই জাতে পত্তরাজ।"...

যদি বলে—'হুঁ'লে জাত যায়,  
এমন কি হ'কো হুঁ'লে স্নেহে বা যায়,  
নরেন তা বেশি কোরে হেঁ।  
হ'কো থেকে সশব্দে টেনে নেবে ধোঁয়া;  
ট্রাম যায়, বাস যায়,

সেখো নেবে জাত যায় কি না।".....

ট্রাম যায়, বাস যায়, সেখো নেবে জাত যায় কি না।—কবির কি শ্রমের এই উপমাটুকু, কত গভীর এর তাৎপর্য, কি শ্রমের রসপূর্ণ এর ভাবার্থ? ভাবলে যত বেশী ভাল লাগে, তার চেয়ে আশ্চর্য্য হতে হয় বেশী কোরে। কেন না, কবির কি বিশ্বয়কর নিষ্ঠা, কি কঠোর তপস্যা, কি অসাধারণ তাঁর অধ্যবসায়। গল্প ভাষায় বিবেকানন্দের বাণী থেকে তাঁর জীবনবেদ, যে একাধিক গ্রন্থসমূহ মন্বন কোরে অমৃতের হ্রদে হচ্চে রচিত, তার বর্ধা যুগ; একদিন যোগ্য মনীষীদের ঘরাই স্বীকৃত হবে। এর পর আরো বলি,—মহাকবি কেম্বের কলা-বিলাস, প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবার বাহু আর এক রঙ ধরিয়ে দিলো, মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার মনে। কেমন বেন সাড়া পড়ে গেলো একটা।

মুঠো মুঠো কুয়াশা—সত্যিই এক মহামূল্যের মনস্তত্ত্ব। মন থেকে বৃহৎ না কখনো। নীলকণ্ঠের 'অন্ত ও প্রত্যন্ত' আর এক দীপ্ত বাক্যের রেখে বাবে এটুকু অমুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না। কিন্তু বর্ধা মহলে গিয়ে তাঁর কথা কোন কাছ কোরবে কিনা—কে জানে! ভাসিলি এসম্যান-এর, 'দুর্ধ', অমুবাণ্ড মায়।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রম সার্থক হয়েছে। এমন একটা কাহিনীর নির্দোষ ও অমুবাণের জন্ত তাঁকে ক্ষমতা জানাই। 'শি-ল কু-টা-বে', কবিতা, দুপুরে কোলকাতার বাড়ীতে থাকলে কিবা

পথে বেকলে নতুন হয়ে উঠেছে। সত্যিই অনেকেই তখন—  
স্বস্তি স্ব-টেনে টেনে : শি-ল কু-টা-বে—। স্বর্গত মানিক  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস (অসম্পূর্ণ রচনা) 'কুলির বোঁ'—  
এক সেই সঙ্গে মাসিক বহুমতীর সম্পাদকের কাছে লেখা তাঁর  
ব্যক্তিগত পত্রগুলিও মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হ'বে জানতে  
পেবে, আমাদের ভাগ্য এবং সেই সঙ্গে মাসিক বহুমতীর খ্যাতি  
মান সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটককে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে  
পারি না।—শ্রীমত বন্দ্যোপাধ্যায়, শো: বাঁশবাড়ীয়া, জে: হুগলী।

আপনার 'মুঠো মুঠো কুয়াশা' ভালো লেগেছে, কিন্তু তার চেয়ে  
আরো অনেক বেশী ভালো লেগেছে 'বৃগান্তরে' প্রকাশিত আপনার  
মিষ্ট এবং 'মিষ্টিক' সেই ছোটো-গল্পটা—'আলো-আঁধারি'।  
এবারে 'চার জনে' মনোজ বসুকে পেয়ে খুশি হলাম। তাঁর  
সকল জীবনের ভাব ও ভাষা—হুই উল্লেখযোগ্য। 'বিবেকানন্দ-  
স্তোত্রের' কবি শ্রমণি মিত্র শুধু কি কবি? আমার মনে হয়  
সাধকও। এমন উচ্চাঙ্গের লেখা বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশী নেই।  
স্বামিজীর অসংখ্য ভাবময় ব্যক্তিত্বের এমন সূক্ষ্ম, সরস এবং মৌলিক  
বিশ্লেষণ তাঁর কোনো জীবনীকাহ্নই এপর্যন্ত দিতে পারেননি। 'রাজার  
রাজার' 'অন্ত ও প্রত্যন্ত' খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ছি। আপনার  
'পত্রগুলি'ও আর একটা প্রধান আকর্ষণ।—মুহুরা মুখার্জী শ্রীরামপুর।

উপজাতির মধ্যে 'রাজার রাজার' উল্লেখযোগ্য। লেখকের  
স্বাসিক্যাল টাইলটি ভাবি শ্রমের। জীবনের মধ্যে 'বিবেকানন্দ স্তোত্র'  
চমক লাগিয়ে দিয়েছে। বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের নির্ভীক বিশ্লেষণ,  
সূক্ষ্ম ও তত্ত্ববিচার, বাস্তবিকই চমকপ্রদ। লেখকের অকাটা বুদ্ধির  
কাছে পাঠকের কোন প্রশ্নই দাঁড়াতে পারে না। যদিও গতানুগতিক  
মতবাদ ও ধারণার বিরুদ্ধতাই কোরে গেছেন তিনি। বিভাসাগর  
মহাশয়ের জীবন ছিল বাস্তবধর্মী। তথ্যের চাপে বিভাসাগরের  
জীবনী লেখাটা মাঝে মাঝে নীরস লাগে।—অক্ষা সেন। বিভা-  
বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা।

## চার জন

আপনার পত্রিকার আশ্রিত, ১৩৬৩ সংখ্যার আমার অগ্রন্থ  
শ্রীমুকুন্দর সেনের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে পাঠ করিয়া  
সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। উক্ত প্রবন্ধে হুঁচকিটি ভুল উক্তি  
আছে। নিম্নে তাহা উল্লেখ করিতেছি। আপনার পত্রিকা  
আগামী কোন সংখ্যার উক্ত ভুলগুলি সংশোধিত করিয়া দিতে  
সবিশেষ বাঞ্ছিত হইবে। (১) জন্ম—নোয়াখালী সহরে (অনুনা পুং  
পাকিস্তানে)। ২। ইনি করিমপুর জিলা স্কুল হইতে উচ্চ

অধিকার করতঃ প্রবেশিকা ( অর্থাৎ Matriculation Examination ) পাশ করেন। ফরিদপুর অধুনা গু-পাকিস্থানে। ( ৩ ) ইনি বীকড়া Wesleyan Mission College হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া I. A. পাশ করেন। ( ৪ ) ইনি কলিকাতা Presidency College হইতে গণিতে প্রথম (শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া B. A. পাশ করেন। ( ৫ ) ইংলেণ্ডে I. C. S. পরীক্ষায় উচ্চাঙ্গ গণিত শাস্ত্রে ( অর্থাৎ Higher Mathematics ) ইনি সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিলেন। ঐজ্জিতকুমার সেন ৫৫ নং লেক প্রেস। কলিকাতা—২১।

### ‘আধুনিক’র তুল্যপ্রাপ্তি

আমি একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, প্রেরণাট এই “আধুনিক” গল্পটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রেরিত হচ্ছে, সেই গল্পটি আমি পড়লুম ও বাছারে যে “আধুনিক” নামক বই বেরিয়েছে সে বইখানিও পড়লুম। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি মনঃস্ক্রম্ব হলাম, কারণ ধারাবাহিক ভাবে পড়ে যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম—গোটা বইটা পড়ে ততটা নিরাস হলাম। ধারাবাহিকের সঙ্গে এই বইটার অনেক পার্থক্য আছে। এমন কি, প্রতি পরিচ্ছেদেই ঘটনার কমে-বেশী ও ভাবের পার্থক্য আছে। সুতরাং গোটা বইটার ও মাসিক বহুমতীর ঘটনাপঞ্জী তুলে দেওয়া সম্ভব নহে, তবু একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি—বইটাকে নারিকার দেবীর বাণীকে লিখিত চিঠিতেই লেখক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু মাসিক বহুমতীতে দেবীর আশীর্বাদের দিন পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জী আছে। এর কারণ কি? এটা কি লেখকের ইচ্ছাকৃত? আমার মনে হয়—এটা হয়তো অনেক পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বা করবে। মিনতি চন্দ্র, ৫২/১ মল্লাপলেন কলকাতা।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

ঢাকা মনিজর্ডারে পাঠাইলাম। পত্রপার্টমেন্ট পত্রিক পাঠাইবেন।—অমিতা সাক্তাল। অবশ্যক শ্রী এস, সাক্তাল নারকটিয়াগঞ্জ। বিহার।

বাংলাসিক ঢাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—প্রাঞ্জলি দাশগুপ্ত। মোদীনগর। মীরাট।

Sending Rupees fifteen only as subscription for one year, Please enlist me as a new subscriber.—Sm. Aparajita Ghose. Berhampur Main Rd. Mursidabad. West Bengal.

ছয় মাসের টাকা অগ্রিম পাঠাইলাম। দয়া করে প্রতি মাসে বাসমতী মাসিক বহুমতী পাঠাবেন।—সুখমা বসু। এম ৪১১২৮

Sending half yearly subscription for M. Basumati.—Anjali Paul. Berhampur. Mursidabad.

I am sending Rupees seven and annas eight only in advance for supplying me the M. Basumati. Please send regularly.—Anjali Rajumder. The Orissa Road Transport Co. Berhampur, Ganjam.

ছয় মাসের টাকা পাঠাইলাম। আশা করি মাসিক বহুমতী নিয়মিত পাবো।—গৌরী মহম্মদার। C/o. Bata, Berhampur, Ganjam.

I send herewith Rupees fifteen only being annual subscription of M. Basumati.—Hony. Secy. Dimakusi J. S. Club. Darrang. Assam.

Remitted herewith Rupees seven and annas seven only as half yearly subscription of M. Basumati. Please enlist my name.—Mayarani Bhattacharjya (M 50809).

Sending Rupees fifteen only and shall be obliged if you please arrange to send us M. Basumati for a year.—Hony. Secy. Bibhuti Smrity Granthagar. Ghatsila. S. E. Rly.

ঢাকা পাঠাইলাম সাড়ে সাত টাকা। পত্রিকা পাঠাবেন।—নমিতা মিত্র। বামারিয়া। জব্বলপুর।

এই সঙ্গে সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। ছয় মাসের জন্য আমাকে প্রোত্কা করিয়া লইবেন।—শ্রীমাতা দাস। C/o. Power Tools and Appliances Co. Bombay—4

I am sending herewith Rupees seven and annas eight only. Please supply M. Basumati regularly.—Sm. Nirupama Dutt. Katigorah. Cachar.

Sending money for six months. Please supply Magazine.—Beena Dey. Burdwan.

ছয় মাসের টাকা বাবদ সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী চামেলী দেবী। দাঁওতালপুর, জলপাইগুড়ি।

১৩৬৩ সালের শেবারের জন্য টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস (৪৮৩২১)।

Please accept further subscription for six months.—Avarani Debi. 38/102. Meeton Rd. Kanpur.

বার্ষিক টাকা পনেরো টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।—অনীতা মল্লিক। Motibazar, Nagpur—4.

বাৎসরিক টাকা সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Sovona Bose. Govt Engineering College, Jabbalpur—4.

সাড়ে সাত টাকা মনিজর্ডারে পাঠানো হচ্ছে। আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করবেন। শ্রীমতী মালতী মুখোপাধ্যায়। The Mall, Kamptee. Nagpur.

Please arrange to send me M. Basumati. Sending money for one year.—Ashima Sen, Jhajha. E. Rly.



মসিক পটভূমি  
 ১০ প্রতীক ১০০০ ১১

১০০০ ১১

পথের বঁকে

— মৌলভি নূরুজ্জামান







৩৫শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬১]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। “ভগবানকে জানতে গেলে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্ত কঠোর তপস্বী করেছিলেন সেইরূপ তপস্বী করতে হয়। পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতি তার আশ্রয় করতে হয়,—সখীভাব, দাসীভাব মাতৃভাব। তাঁকে নানা রীতিনীতি সেবা করা যায়। প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সন্তোষ করে। কখনও মনে করে ‘তুমি পর আমি অলি’। কখনও ‘তুমি সচ্চিদানন্দ সাগর, আমি মীন’। প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে, ‘আমি তোমার নর্তকী’—আর তাঁর সমুখে নৃত্য-গীত করে। বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকম তাঁর সেবা করতেন।”

“ব্যাঙ্কল হয়ে মাটিতে পড়ে বখন কাঁদতাম,—লোকের জিড় হতো। কিন্তু আমি দেখতাম জীবজন্তু মাছুষ বেন সব পটে জাঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা ভর কিছুই হতো না।”

“বখন পঞ্চবটতে মাটিতে পড়ে পড়ে ডাক্তার,—আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম,—মা! আমার দেখিয়ে দাও, কর্মীর

কর্ম করে বা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে বা পেয়েছে, জানীরা বিচার করে বা জেনেছে—আমার জানিয়ে দাও, আমার দেখিয়ে দাও। আরও কত কি, তা কি বলবো! আহা! কি অবস্থা! পেছে! ঘুম যায়! ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি হুমাই, বোগে বাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।”

“বখন বাইশ, তেইশ, বছর বয়স, (১২৬৪—৬৫ সাল) কালী ঘরে বললে,—তুই কি অন্ধর হতে চাসু? অন্ধর মানে জানি না,—হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম। হলধারী বললে,—অন্ধর মানে জীব, অন্ধর মানে পরমাশ্রা।”

“মুলাধার পদে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দল পদ। বিনি আত্মশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। ‘প্রহরপুঙ্খপাকার আধারপদ বাসিনী।’ ভক্তিবোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হন। কিছু ইনি জাগ্রত না হলে চৈতন্য হয় না, ভগবানদর্শন হয় না। কাহিনীকাকনে মন থাকলে বোগ হয় না।

# সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যিকের মৃত্যু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"His conduct towards his friends, and especially to those who tried to help him, was cavalier. He made a principle of biting the hands that tried to feed him. And the curious thing is that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse."—Richard Church on D. H. Lawrence.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে সূচনাতাই লরেন্স সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি। উদ্ভক্ত আর কিছুই নয়, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, লরেন্সের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিই কিছু সাদৃশ্য ছিল। শিল্পদর্শন না হক, শিল্পের উপকরণে। এবং জীবনেও।

শিল্প এবং জীবনকে ইংল্যান্ডের আর ক'জন সাহিত্যিক অভিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন? লরেন্সের মত? শিল্প এবং জীবনকে বাংলা দেশের আর ক'জন সাহিত্যিক একীভূত করতে পেরেছিলেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত? এবং এই একীকরণের প্রয়াসে লরেন্স অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এতখানি মূল্যই বা আর ক'জনকে দিতে হয়েছে?

সাহিত্য-জীবনে এই একীকরণের পরিণাম দু'জনেরই পক্ষে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনে কারও পক্ষেই হয়নি। যেমন লরেন্সের, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবন এবং মৃত্যু সেই আংশিক অসঙ্গতির প্রমাণ হয়ে বইল। কিন্তু তাঁর জ্ঞাত অক্ষিপ জ্ঞানিয়ে লাভ নেই। কেন না, ব্যক্তি-জীবনের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্বে তাঁর ঈর্ষাভাষী আস্থা ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না।

নির্বীচ্য প্রয়োজের ফলে 'বিপ্লব' কথাটির গুরুত্ব ইদানীং হ্রাস পেয়েছে। অস্বাভাব্য বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকে এক বৈপ্লবিক ঘটনা বলে আখ্যাত করা চলত। সত্যিই বৈপ্লবিক। সাহিত্যের আদর্শ না হক, উপায় এবং উপকরণ সম্পর্কে যেসমস্ত ধারণা এসেলে প্রচলিত ছিল, সর্বপ্রায়ে না হক, অনেকাংশেই তিনি তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। এবং, আদর্শই বা নয় কেন? আদর্শের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশ্বাস ত প্রচলিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ছিল না। সে-কথা তিনি ইতস্ততঃ ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে, ভাষণে, বক্তৃতায়। এ সবই আমরা জানি। কিন্তু স্রোতার খাতিরে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় যে, অন্তত এক্ষেত্রে—আদর্শের ক্ষেত্রে—তাঁর বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি। এমন কি, তাঁর আপন সাহিত্যেও না। সাহিত্যের কোন আদর্শে তাঁর আস্থা ছিল? মনোহরণের আদর্শে অবশ্যই নয়। হিতসাধনকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কতখানি হিত লাভিত হয়েছে, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবার সময় এখন আসেনি। অস্বাভাব্য এইটুকুই বলবার যে, শেষ লক্ষ্য বাই হক, মানবজীবনের এক অজ্ঞাতপরিচয় অংশের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এবং সেই প্রয়াসের সাক্ষ্য প্রায় অকৃতপূর্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাবিধ পূর্বসংস্কার এবং চিন্তাগত নানাবিধ ভাবালুতা সম্পর্কে ধীর বিলম্বমাত্র মোহ ছিল না। সমাজের অবহেলিত মানুষকে নিয়ে তাঁর আগে কি আর কেউ সাহিত্যরচনা করেননি? অনেকেরই করেছেন। এককভাবে ত বাটেই, এমন কি সম্মিলিতভাবেও। ভুলে না যাই, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের আগেই কল্লোল-গোষ্ঠীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য তাতে ম্লান হয় না। হয় না এই কারণে যে, তাঁর অগ্রবর্তী শিল্পীরা যেখানে সাহিত্যের উপকরণ নির্বাচনে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েও বুদ্ধির আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে পারেননি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত; মাহুষ। নীচের তলার মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই তিনি অনন্ত নন। অনন্ত এই কারণে যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় নীচের তলার গিয়ে দেখেছিলেন।

বাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তার কারণ তথাকথিত শিক্ষিত এবং সভ্য সম্প্রদায়ের অসার সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর অপ্রত্যাশিত অন্ত ছিল না। তাদের চিন্তায় যে কতখানি ভ্রান্তি, আচরণে কতখানি কৃত্রিমতা, এবং এ-দুয়ের মধ্যে যে কত বড় অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে, তা তিনি জানতেন। একমাত্র তিনিই বোধ হয় জানতেন যে, শুধু অন্তকেই নয়, নিষেদেরও তারা কাঁকি দিয়ে থাকে, দিতে বাধ্য হয়। কার্নিশের দিকে চোখ দেবার আগে বাড়ির ভিতটাকে যে পাকা করে তুলতে হয়, তা তারা জানে না। কিংবা জানলেও হয়ত ভুলে থাকতে চায়।

এদের নিয়ে কি তিনি লেখেননি? এদের নিয়েও লিখেছেন। এই কাঁপা আভিজাত্য নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। এমন অনেক ছোটগল্প এবং একাধিক উপভাস তাঁর আছে, বিকৃতবুদ্ধি অথবা বিজ্ঞান মাহুষবরাই বার উপজীব্য। এদের তিনি আখ্যাত দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের লক্ষ্য করে তোলেননি। তাঁর কারণ আর অন্য কিছুই নয়, তিনি সিনিক ছিলেন না। সমাজ-শরীরের নানা বিচ্যুতি এবং সমাজ-মানুষের নানা অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু শুধুই অপ্রত্যাশিত ছিল না, বেদনাও ছিল। এবং তারও তীব্রতা বড় সামান্য নয়। স্বপ্নে যেমন নিয়ে আখ্যাত হইত করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেননি। এমন কি, তাঁর অন্ততম স্মরণীয় গল্পের সেই ঠিকদার নায়কটিকেও না, যুদ্ধের বাজারে যে রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল এবং মোটরকর্মের একটি কনট্রাক্ট আদায়ের অভিল্লাষে নিজের জীবক সবে নিয়ে

মিলিটারী অফিসারের গুহার খণ্ডার করতে হারি বাধেনি। কিংবা সেই নিষ্ঠুর চরিত্রটিকেও না, আপন প্রশয়িনীকে যে গণিকালয়ে নিয়ে তুলেছিল। তারা জানত না যে, তাদের মূর্ত্তার পরিণাম মাত্র একটাই হতে পারে এবং সেই পরিণামের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। অন্যায়সে এদের নিয়ে বিক্রয় করা চলত। কিন্তু, বিক্রয় বেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবধর্ম ছিল না, এসবও তিনি করণ্যার পাত্র করে তুলেছেন।

সমাজের যারা উপর-তলার মানুষ, লোভের পাশ্রে যারা মুখ ভুরিয়ে বসে থাকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী তাদের ক্ষমা করেনি। মধ্যস্থানে থেকে যারা উপর-তলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তিনি তাদের করুণা করেছেন। তাঁর মমতা এবং সহানুভূতি শুধু তাদের ক্ষম্যই সঞ্চিত ছিল, যারা নীচের তলার মানুষ, জীবনে বাদের বিড়ম্বনার অন্ত নেই। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সেই বিড়ম্বনার হেতুনির্ণয়ে তাঁর ততটা আগ্রহ ছিল না, বরং তাঁর প্রকৃত রূপচিত্রণে। বলতে বাধা নেই, তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যে ঈষৎ নিয়তিবাদী মনোভাবও পরিস্ফুট হয়েছিল। যেমন “পুতুলনাচের

ইতিকথা”র। এ-বই যে বাংলা-সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়, আর্টের দরবারে উদ্বেগের ভূমিকা সত্যিই হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাহিত্যের সামাজিক উদ্বেগ কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সাম্প্রতিক কালে সে-বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মতামতও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এতসময়েও বৃহত্তে অনুরাগে হয় না যে, সামাজিক দাবির তুলনায় আর্টের আপন দাবিকেই তিনি বড় বলে গণ্য করতেন। তাঁর সাহিত্য অন্তত সেই কথাই বলবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর আপন পছন্দ। কিন্তু জীবন বেহেতু তাঁর প্রেমিককেই সর্বাধিক দুঃখ দেয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে শুধু দুঃখই দিয়েছে। এ নিয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়নি। আক্ষেপের কোনও হেতুও হয়ত ছিল না। কোন না, বিরহের স্বস্তিকে নয়, মিলনের বজ্রাঘাতেই তিনি কাম্য মনে করতেন।

## চলচ্চিত্র

(Newsreel কবিতার অনুবাদ)

সেন্সি ডে লুইস

ও আমার ভাই-বোন সব!

তোমরা চলে এসো এই স্বপ্নবাসরে,

সমস্ত স্বপ্নকে পিছনে ফেলে,

ইতিহাসকে রেখে এসো স্বাভাবিকের ওপাশে।

এ-বাসর বীরের শৌর্যক্ষেত্র, আর অন্তত এই

অন্ধকার তোমাদের অন্ধেত্ত আচ্ছাদন।

বহু লক্ষণের চেয়েও উজ্জ্বল এখানের

জলাশয়ের মাছ, আরও উজ্জ্বল তার নাসিকা;

তাদের কাছে কেবাণী, গুপ্তচর, নাস, চস্তারক,

মাকপুত্র, মহৎ ও পরাজিত সবই

যেন দিব্যস্বপ্নের মত চক্কাকারে আবর্তিত হয়।

এই সাধারণের মাঝে অবগাহন করো;

চেয়ে দেখো তোমার সক্রিয়-জীবন

এতদিন কি চেয়েছে—

রূপালী দেয়ালে ঘূমের ছায়া

ভীষণ ক্লান্ত ভীতিমূর্ত্তি, তোমার পৃথিবীর

কল্লিত-স্বপ্ন সবই এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখানে, এই দেখো, মেঘের গুয়েটার স্বতন্ত্র  
উদ্বোধনের রত; সামাজিক বিবাহে রত  
হেমস্তের টুপি যেন তাদের কুলে উঠেছে;  
বৃষ্টি মোরগের দৌড় শুরু হয়েছে,  
আর মংশশিকারী রাজনীতিক প্রমাণ করছেন  
পৃথিবীর সবই ঠিক আছে!

ওহো, চেয়ে দেখো, এই যুদ্ধবাজ এরোগেনের দিকে!  
শক্তিমদমস্ত উজ্জ্বল বাক গগন-বিদারী শব্দে  
ছুটে কোথায় চলেছে?  
এদের রূপালী ছায়া তোমার  
শান্তি স্বপ্ন কি বারে বারে জেতে দিতে চায়?

চেয়ে দেখো এই অগ্নিবর্ষী কামান,  
তোমার পৃথিবীর গর্ভে  
মৃত্যুর বীজ বপন করেছে!  
অগ্নি-কোরক, ধূম্রস্ববক,  
লৌহবীজ বপনে রত এই মারগান্ড—  
এরা কি স্তব্ধে চলেছে?

না, তারা তোমার স্বপ্নের কাছেই বাসা বেঁধেছে:

তারা বাড়ছে, তোমার স্বপ্নগৃহেই কাছেই বাড়ছে,

তোমার স্বপ্নগৃহ ধূলিসাৎ হবে

একদা রাত্রি দেখবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আকাশ

সব কিছু বহুনির্বোধে ভেঙে পড়েছে,

তখনই কেবল তোমার মনে হবে—

কত দীর্ঘ দিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।

অনুবাদক: মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়।



# মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস

শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-বাহিত্য দুই প্রান্তে বলিয়া শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হইল। গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর, সোমবার এত্নাবে কলিকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাত্র পূর্বাভাসিত তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায় নীত হইয়াছিলেন; পরিবেশ-পরিবর্তনের দৃষ্টি তাঁহাকে সহিতে হয় নাই।

বিভিন্ন গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে তাঁহার জন্মবৎসর সম্পর্কে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও (১৯০৮ এবং ১৯১০ সন) তাঁহার মৃত্যু যে অকাল মৃত্যু তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪ঠা ডিসেম্বর 'ট্রেটসম্যান' সম্পাদকীয় (Obituary) মন্তব্য করিয়াছেন—“...he spent the last years of his life seeking an escape from reality by external means.”—তিনি বয়ের মত কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হন নাই; জীবনের শেষ কয় বৎসর বহির্বিষয়ের সহায়তায় আত্মবিস্মৃতি খোঁজার মধ্যে তাঁহার পলারনী মনোবৃত্তি ছিল। দলগত একটা কারণ দর্শাইয়া 'ট্রেটসম্যান' প্রেসলটাকে ঘূলিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। আজ আমরা সকলেই পোকাহত, সকলেই যেমনাবিষম্ব।

কারণ, মানিক ছিলেন সত্যকার শ্রষ্টা, সত্যকার সাহিত্যশিল্পী। যে কবেই তিনি আবর্তন করুন, তাঁহার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন—সকল অয়নই ছিল সাহিত্য-স্বর্গকে কেন্দ্র করিয়া। সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল এবং প্রাণধারণেরও একমাত্র অবলম্বন ছিল। সাহিত্য-সেবার ভক্ত ছাত্রজীবন অকালে খণ্ডিত করা অবধি এই সাহিত্য-মার্গেই তাঁহার বিচরণ ছিল। অল্প কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই। বি, এসসি, পড়িতে পড়িতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে, ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে মাসিক 'বিক্রী' পত্রিকার তাঁহার সত্তর-চিহ্নিত সর্বপ্রথম গল্প (এবং সর্বপ্রথম রচনাও) “অতসীমামী” প্রকাশিত হওয়া ইতস্ততঃ গল্প-উপভাস-সৃষ্টি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স কতই বা হইবে! ১৯০৮ সনের মেজুন মাসে (১৩১৫, ১৩১৬) জন্ম ঘণিলেও সড়ে কুড়ি বছর। এই সাহিত্যের নেশায় তিনি বৃন্দ ছিলেন। অল্প নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তাহার আঙুন তাঁহার দেহটাকে শুধু পুড়াইয়াছিল, মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রাণ, তাঁহার মাত্র আটাশ বৎসরের সাহিত্য-কর্মের নিঃসীমিত তালিকার মধ্যে মিলিবে।

মানিকের গ্রন্থগুলির এই কালোয়ক্রমিক তালিকা সরলন করিতে সিদ্ধা আমাদের অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। গোড়ার দিকের বইগুলির প্রকাশকেরা গ্রন্থে সন-তারিখ দেন নাই, অনেকগুলি বইও আর চোখে দেখিবার উপায় নাই। পরবর্তী সঙ্করণ বা সাময়িক পত্রে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া কালনির্ণয় করিতে হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত বীকার করিতেছি, আমাদের এই কাজে প্রকাশকেরা বখাসা সহযোগিতা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আশু সজল বর্চসীয়া বিদ্য বৎসর পূর্বকার খাতাপত্র খাঁটিয়া গোড়ার বইগুলি প্রকাশকাল সন্দেশে আমাদের নিঃসন্দেহ করিয়াছেন এবং “সাহিত্যজগৎ”-এর স্বঘাফিকারী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের শেষ বইগুলি সন্দেশে অনেক অজ্ঞাত সংবাদ দিয়াছেন। তারকাচিহ্নিত বইগুলি আমরা চোখে দেখি নাই এবং ওইগুলি সম্পর্কে কোনও তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারি নাই; যেখানে সেখানে বসাইয়া দিয়াছি এই আশায় যে, ভবিষ্যতে কোনও একনিষ্ঠ অন্বেষণী তথ্যগুলি সংশোধন ও পূরণ করিয়া দিবেন। মানিকের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ সন্দেশে বাবতীর সকল-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে তুল লেখা হইয়াছে এবং তাঁহার শেষ গ্রন্থ সন্দেশে কোন কোন দৈনিকপত্র ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ নয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ‘জননী’ ছাপিয়া মানিক সর্বপ্রথম গ্রন্থকার-শ্রেণীভুক্ত হন এবং তাঁহার শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মাটল’ ‘সাহিত্যজগৎ’ হইতে গত আশ্বিন মাসে (১৩৬৩) বাহির হয়। বতদূর জানিয়াছি, তাঁহার দুইখানি বই ছাপা হইতেছে, বেঙ্গল পাবলিশার্স ছাপিতেছেন ‘প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান’ উপভাস। এক শো আটাশ পৃষ্ঠার মত আকার লইয়া এই অগ্রহায়ণ মাসেই বাহির হইবে। এই বইখানির মুদ্রণ শুরু হইয়াছিল দুই বৎসর পূর্বে এবং সম্ভবতঃ এইটাই একটি রূপান্তর আগামী বড়দিন-সংখ্যা কোনও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ডি, এম, লাইব্রেরি ছাপিতেছেন ‘মাটি-বেঁধা মাঘুর’ উপভাস, ইহাও আকারে ছোট এবং ‘মাসিক বহুমুখী’তে অনিঃস্মিত ভাবে প্রকাশিত ‘একটি চাবীর মেয়ে’র রূপান্তর। ইহাও শীঘ্রই বাহির হইবে। শেষ উপভাস ‘শান্তিলতা’র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন ‘সাহিত্যজগৎ’—ইহাও বৎসরমধ্যে মুদ্রিত হইবে। মানিকের গ্রন্থপঞ্জীর খসড়া এইরূপ:—

১। জননী, উপভাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ২৮৪।

২। অতসীমামী, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ আগষ্ট ১৯৩৫, পৃ ২৬৭।

লেখকের নিবেদন: “রচনাকাল অল্পসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। অতসীমামী আমার প্রথম রচনা। তার পর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্টই বোকা বাবে।”

গল্পের নাম: অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিঞ্জার অপমৃত্যু, সর্পিল, গোড়াকপালী, আগস্টক, মাটির সাকী, মহাসময়, আত্মহত্যার অধিকার—মোট দশটি।

৩। দিবারাত্রির কাব্য, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ: ২০৪।

লেখকের নিবেদন: “দিবারাত্রির কাব্য আমার একশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কবেক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বঙ্গভিত্তে প্রকাশ করি।

দ্বিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,—তখন মনে রাখতে হবে, এটি গল্পও নয়, উপজ্ঞাসও নয়, রূপক-কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সৌন্দর্য করে নিলে মানুষের কতগুলি অসুখভিত্তি বা ঝাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

এই “নিবেদন” হইতে অল্পমান হয়, মানিকের জন্ম সন ১১০৮ সন। ১১১০ সন হইলে মানিক ১১৩১ সনে ইহা লেখেন। আমরা ‘বঙ্গজী’র সম্পাদক থাকাকালে, ১১৩৩ সনের শেষে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাই। তাহা হইলে “কয়েক বছর তাকে তোলা” থাকার কথা সত্য হয় না।

শ্রীসজ্জনীকান্ত দাসের ‘আত্মস্মৃতি’ ২য় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠার এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—শ্রীমান মানিক বাল্যোপাখ্যায় একটি গল্প (‘সরোহপ’, আ’খন ১৩৪০) লইয়া (‘বঙ্গজী’র) আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপজ্ঞাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপজ্ঞাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার বতস্ব ধারণা, এই উপজ্ঞাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাভুক ছেলে, কিন্তু “সরোহপ” গল্পেই তাঁহার পোক্ত পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবহৃতচিত্ত মানিক “একটি দিন” নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোট গল্পের আকারে উপজ্ঞাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপজ্ঞাসের সম্ভাবনাকে এমন ভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি “একটি দিন” সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক “একটি দিন”র উপসংহার “একটি সন্ধ্যা” লইয়া উপস্থিত হইলেন। “একটি সন্ধ্যা”তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা “রাত্রি”তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে “রাত্রি”—“দ্বিবারাত্রির কাব্য” হইল। এই উপজ্ঞাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপজ্ঞাসটি ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতার আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ইহার পরবর্তী সংস্করণ ছাপিয়াছেন।

৪। পুতুলনাচের ইতিকথা, উপজ্ঞাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১১৩৬ (?)।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত ৫ম সংস্করণ চলিতেছে।

৫। পুতুলনারীয়ার, উপজ্ঞাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২৮ মে ১১৩৬, পৃ: ২০৮।

বেঙ্গল পাবলিশার্স বর্ত্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। জীবনের জটিলতা, উপজ্ঞাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (?), নবেম্বর ১১৩৬।

৭। প্রাগৈতিহাসিক, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৭ এপ্রিল ১১৩৭, পৃ: ২২৪।

এম, সি সরকার এণ্ড সন্স লি: কর্তৃক প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) চলিতেছে।

গল্পের নাম: প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, বাক্স, প্রকৃতি, কীসি, ভূমিরূপ অক্ষ, চাকরী, মাথার রহস্ত—“অতসীমারী”তে পূর্বে প্রকাশিত “মাটির সাকী”কে বাদ দিয়া মোট নয়টি।

৮। অতৃপ্ত পুত্রাং, উপজ্ঞাস, কাব্যারবী বুক ষ্টল, জুলাই ১১৩৮, পৃ: ২২০।

৯। মিহি ও মোটা কাহিনী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০শে সেপ্টেম্বর ১১৩৮, পৃ: ১৬২।

গল্পের নাম: টিকটিকি, বিপ্লবীক, ছাদা, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজ শিলা, খুঁকী, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি—মোট বায়োটি।

১০। সরোহপ, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৭ আগষ্ট ১১৩৯, পৃ: ১৭৬।

গল্পের নাম: মহাজন, মমতা দি, মহাকাশের ভট্টার জট, শুশুণন, পাক, বিবাক প্রেম, নিকপরিবর্তন, নদীর বিশ্রোহ, মহাবীর ও অচলা ইতিকথা, দুটি ছোট গল্প, সরোহপ—মোট এগারোটি।

১১। সহরতলী—প্রথম পর্ব, উপজ্ঞাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১১ জুলাই ১১৪০, পৃ ২০৮ (?)।

২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১২। সহরতলী দ্বিতীয় পর্ব, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১১৪১ (?), পৃ ১৩৫।

ডি, এম, লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১৩। বৌ, গল্প, এম সি সরকার এণ্ড সন্স লি: (?), ১১৪৩(?) ২য় সংস্করণ, ঐ, ১১৪৬, পৃ ২৬৪।

গল্পের নাম: দোকানীর বৌ, কেয়ানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপ্লবীকের বৌ, তেজী বৌ, কুঠরোগীর বৌ, পুজারীর বৌ, রাজার বৌ, উদারচরিত্র নামের বৌ, ছোটের বৌ, সববিত্তাবিশ্বাসের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ার বৌ—মোট তেরটি।

১৪। সমুদ্রের স্বাদ, গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১১৪৪ পৃ ১৫২।

গল্পের নাম: সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পুজাকমিটা, আশি শুণ্ডা, কাকল, কাতভারী, বিবেক, ট্র্যাঙ্কেডির পর, মালী, সা একটি খেরা—মোট বারোটি।

১৫। ডেজাল গল্প, সিগনেট প্রেস, ১১৪৪, পৃ ১৪৪।

গল্পের নাম: ভয়াকর, রোমান্স, ধনজনগৌরব, মুখের মেয়ে, দিশেহারা হৃদয়ী, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলাস বাস, স্বামিন্দ্রী—মোট এগারোটি।

১৬। দর্শন, উপজ্ঞাস, বুক এস্পোরিয়াম, জুন ১১৪৫ পৃ ৩২০।

প্রথম সংস্করণের শেষে “সমাপ্ত প্রথম ভাগ” লেখা ছিল কিন্তু বেঙ্গল পাবলিশার্সের দ্বিতীয় মুদ্রণে তাহা নাই।

“লেখকের কথা”—প্রায় তিন বছর আগে উপজ্ঞাসটি পাঠ্য একটি মাসিকে ঘাস ঘাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম;

নাম দিয়েছিল। কিছুদিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। আমার বইখানা সম্পূর্ণ করে লিপ্যন্তর নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম—আবার ১৩৫২”

অসম্পূর্ণ লেখাটি পাটনার ‘প্রভাতী’ পত্রিকার বাহির হইয়াছিল।

১৭। সহরবাসের ইতিহাস, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, কেক্রদাসি ১৯৪৬। ২য় সঃ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আবার ১৩৬০, জুন-জুলাই ১৯৫৩, পৃ ১১১।

লেখকের নিবেদন—“কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার [অনন্দবাজার] শারদীয় সংখ্যায় এই উপভাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, যদ্যাহা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাক্রমে ও সব কিছুই করা হয় নি।—এই স্বরূপে বর্ণনাধা সংশোধন করে দিলাম।—আমি ভূমিকা লেখার জন্তই একটা ভূমিকা ছুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। ছাঁচারট বইয়ে ছাঁচার লাইন ভূমিকা হয় তো দিয়েছি।” সহরবাসের ইতিহাসের কপালেই আমার সব চেয়ে বড় ভূমিকা ছুটল।”

১৮। আজ কাল পরন্তর গল্প, গল্প, সংকেত-ভবন, “এপ্রিল-মে ১৯৪৬, পৃ, ১৬০ (?)।

লেখকের নিবেদন—“গল্পগুলির প্রায় সমস্তই এক বছরের মধ্যে লেখা।”

গল্পের নাম—আজ কাল পরন্তর গল্প, হুঃশাসনীয়, নবুনা, বুড়ী, গোপাল শাসন, মঙ্গলা, নেলা, বেড়া, তারপর, স্বার্থপর ও ভীকর লড়াই, শক্রমিত্র, রাবব মালিকর, বাক্যে ঘৃণিত হই, কুপামর দামন্ত, নেড়া, সামন্ত—মোট ষোলটি।

১৯। চিন্তামণি, উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই, ১৯৪৬, পৃ, ১০১।

২০। পরিস্থিতি, গল্প, অগ্রণী বুক ক্লাব, অক্টোবর ১৯৪৬, পৃ, ১৬১।

গল্পের নাম—প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসিপিনি, অমায়িক, পেটবাখা, শিল্পী, কংক্রিট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুলাব, হেঁড়া—মোট ষাটটি।

লেখকের নিবেদন—“প্যানিক” সাড়ে সাত সের চাল ও রিক্সাওয়ালা ছাড়া অল্প গল্পগুলি বছর ধানেকের মধ্যে লেখা। ‘প্যানিক’ যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অল্প হুটি তার পরবর্তী সময়ে। ভূমি দিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বললে যাচ্ছে এইটুকু শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অর্থও সমগ্রতা বা ধারা কল্পনায় গড়তে পেরেছে বলা কঠিন। ২১শে ভাদ্র, ১৩৫৩।”

২১। চিহ্ন, উপভাস, বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির, জাহ্নবির ১৯৪৭, পৃ: ১১৬।

লেখকের কথা—“চিহ্ন বহুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছে। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, এক উপভাস বলা চলেবে কি না আমার জানা নেই। এই ধরনের লেখা, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে-ক্রান্তগতিতে ঘটে চলে, এ ভাবে লেখালেই খোঁজালা হয় বলে মনে করি। মাঘ, ১৩৫৩।”

২২। আবারের ইতিহাস, উপভাস, এম সি, স্বকণর আণ্ড সল লিঃ, ১৯৪৭ (?), পৃ: ৮২।

২৩। হলুদপোড়া, গল্প, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭ (?)। গল্পের নাম—হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিললাইন, জয়ের ইতিহাস, কীদ, ডাড়া-ঘর, অন্ধ ও খাঁধা—মোট দশটি।

২৪। খতিয়ান, গল্প, প্রকাশক ?, ১৯৪৭, পৃ: ১৪১।

গল্পের নাম—খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, গুণ্যমী, কানাই তাঁতি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায় নি কেন, একান্তবতী—মোট দশটি।

২৫। চতুর্ভুজ, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৪৮, পৃ: ৭২ (?)।

২৬। অহিংসা, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৪৮, পৃ: ৩১২ (?)।

২৭। ধরাধা জীবন, উপভাস, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

২৮। প্রতিবন্ধ, উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৯, পৃ: ১১২ (?)।

২৯। ছোটবড়, গল্প, প্রকাশক ?, প্রকাশকাল ?, পৃ, ?। গল্পের নাম—ভুলবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলোমাহুবি, স্থান ও স্থান, ষ্টেশন রোড, পেরাণটা, দীর্ঘ, হারানের নাটকজামাই, ধান, সাখা, গানের, নব আকপনা, বীজ—মোট চৌদ্দটি।

৩০। ছোটবড়পূর্বের বাড়ী, গল্প, ইন্টারকন্টিনেন্টাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৯৪৯, পৃ, ১২।

গল্পের নাম—ছোটবড়পূর্বের বাড়ী, বাগতারা দিয়ে, মেজাজ, প্রাণধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দু জনা দু পয়সা, নীচু চোখে মেয়েলি সমস্তা—মোট আটটি।

৩১। জয়ন্ত, উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুন-জুলাই ১৯৫০, পৃ, ২৫৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই-আগস্ট ১৯৫৪।

৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই-আগস্ট ১৯৫০, পৃ, ১৮০ + ২৩৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে-জুন ১৯৫৩, শ্রীলঙ্গনীল ভট্টাচার্যের ভূমিকা।

গল্পের নাম—প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, সন্ন্যাস, কুঠরোয়ীর বৌ, হলুদপোড়া, সহরের স্বাদ, বিবেক, আকিম, আজ কাল পরন্তর গল্প, বাক্যে ঘৃণিত হই, নবুনা, হুঃশাসনীয়, কংক্রিট, শিল্পী, হারানের নাটকজামাই, টিচার, ছোটবড়পূর্বের বাড়ী—মোট আঠারটি।

৩৩। মানিক-গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ, বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির, জুলাই-আগস্ট ১৯৫০, পৃ, ২৩৬।

ইহাতে আছে জননী, হলুদপোড়া, চতুর্ভুজ, আজ কাল পরন্তর গল্প।

৩৪। পেশা, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৫১, পৃ, ২০০।

৩৫। স্বাধীনতার স্বাদ, উপভাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০ জুন ১৯৫১, পৃ, ২৬১।

লেখকের কথা—“এই উপভাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিন বছর আগে—শেষ হয় ৫৭এর গোড়ার দিকে।”

লেখকের নিবেদনে তুল আছে। “মাসিক বহুমতীতে ‘নগরবাসী’

নামে ইহা প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের বৈশাখ হইতে। শেষ হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।

৩৬। সেনার চেয়ে দামী (১ম খণ্ড—বেকার) উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মেজুন ১৯৫১, পৃ ১১৮।

৩৭। হৃদ্যপতন, উপভাস, নিউ এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১, পৃ, ১৬৬।

৩৮। সেনার চেয়ে দামী (২য় খণ্ড—আপোষ) উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পৃ, ২২৭।

লেখকের কথা—“বিজ্ঞাপিত ডাক নাম ‘মাসিক’ হয়ে গেল ‘আপোষ’।”

৩৯। মানিক-গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ, বহুবলী-সাহিত্য-মন্দির, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫২, পৃ ১০৭ + ৩০ + ৬২।

ইহাতে আছে—অহিংসা, ধর্মাবস্থা জীবন, ছোট-বড়।

৪০। ইতিকথার পরের কথা, উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আগষ্ট ১৯৫২, পৃ ২৬৫।

লেখকের নিবেদন—“এই উপভাসটি ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে। ভার ১৩৫১।”

৪১। পাশাপাশি, উপভাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, পৃ ২০৬।

৪২। সার্বজনীন, উপভাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫২, পৃ, ২৫২।

লেখকের কথা—“এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল স্বাভাবিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গী সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন পতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে [ তার ওপর ]।”

৪৩। আনুগা, উপভাস, ক্যালকাটা বুক শ্রাব।

৪৪। তেইশ বছর আগে পরে, উপভাস, ক্যালকাটা পাবলিশার্স অক্টোবর ১৯৫৩, পৃ, ২৩৬।

৪৫। নাগশাল, উপভাস, সাহিত্য-জগৎ, এপ্রিল ১৯৫৩, পৃ, ১১৬।

৪৬। ফেরিঙা, গল্প, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, মে ১৯৫৩, পৃ, ১৪০।

লেখকের নিবেদন—“গত দু বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলমুহুরের একটা বোঁগা-বোঁগা আছে বলেই আমার বিশ্বাস।—বৈশাখ, ১৩৬০।”

গল্পের নাম—ফেরিঙা, সখি, সখাভাত, সতী, মোড়েল ক্রিস, বাত, ঠাই নাই ঠাই চাই, চুরিচামারী, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কামা, মরব না সন্ধ্যা, এক বাড়িতে—মোট তেরোটি।

৪৭। চালচলন, উপভাস, ডি, এম লাইব্রেরি, জুন-জুলাই ১৯৫৩, পৃ, ১১৩।

৪৮। লাঙ্কলতা, গল্প, রীডার্স কনার, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, পৃ, ১৬০।

লেখকের কথা—“এই সঙ্কলনের অধিকাংশ গল্প তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি

গল্পসঙ্কলনে মূল একটি যুগের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজজীবনে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে, তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাছনীর মনে করি। এই সঙ্কলনেও সেই চেষ্টা করেছি।—কোলাপরা পূর্ণিমা ১৩৬০।”

গল্পের নাম—লাঙ্কলতা, উপদলীয়, এমিক ওমিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহাস্তরিত, গুণা, বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, হুজালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা, নিকলেশ, পাশও—মোট বোলটি।

৪৯। শুভান্ত, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫৪, পৃ, ২৬০।

লেখকের কথা—“কয়েক বছর আগে একটি অজ্ঞাতনামা ছোট ছোট নতুন মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে শুরু করেছিল। কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং স্বধার্মিত আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়। এত দিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি। এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস।”

৫০। হরক, উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, মে ১৯৫৪ পৃ, ২৪৪।

৫১। পরাধীন শ্রম, উপভাস, রীডার্স কনার, মে ১৯৫৫, পৃ, ১৮১।

৫২। ভিক্টোয়া, নাটক।

৫৩। মাটির মানুষ, নাটক।

৫৪। হলুদ নদী সবুজ বন, উপভাস, নিউ এন্ড পাবলিশার্স লি., ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, পৃ, ২৬৮।

লেখকের কথা—“হলুদ নদী সবুজ বন আট দশ মাস আগে বেয়িয়ে বাওয়া উচিত ছিল। আমার শরীর ধারণা, এই লেখে বইটা এত মিন আটক হয়েছিল। দোষ আমার।—”

৫৫। \* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প, গল্প, ইতিহাস অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., জুন ১৯৫৬, পৃ, ২২১।

স্বহস্তের প্রতিলিপিতে “লেখকের কথা”—“গল্প নির্বাচনে কোনটা আগে কোনটা পরে সে বিচার করিনি। গল্পের বিচারে ধারাবাহিকতার হিসাবটাই নিরর্থক। দশজনে আমার যে গল্পকে বইটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।—২৫ বৈশাখ ১৩৬২।”

গল্পের নাম।—বৃহত্তর-মহত্তর, নেকী, চোর, কীসি, ভূমিকম্প, টিকটিকি, বিপত্তী, সিঁড়ি, মহাকালের জটায়ু, জট, হলুদগোষ্ঠী, চুরি চুরি খেলা, কীল, বাঘ মালোকার, প্রাক্‌শরাদী কাহিনী, রক্ত নোমুতা, হারাবের নাভজামাই, ভিক্ষুক, খান, বিবেক, শিরী—মোট কুড়িটি।

৫৬। মানুষ, উপভাস, সাহিত্য-জগৎ, অক্টোবর ১৯৫৬, পৃ, ২১৪।

ইহাই মানিকের জীবিত কালের শেষ মুদ্রিত গ্রন্থ।

প্রকাশিতব্য নতুন তিনখানি উপভাস ধরিয়াও মানিকের

উপজ্ঞাসের সংখ্যা ৪০, নাটক ২, গল্পের বই ১৫, নির্ধাতিত গল্প ২ — মোট ৫৯ খানি বই। গল্পের সংখ্যা ১৭৭।

বাংলা কথাসাহিত্যের বিপুল অঙ্গের মানিকের বখাও স্বাভাবিক নিশ্চয়ের চেষ্টা পশ্চিম ও রসিক জন সমাজ ও অবকাশমত করিয়েন। ইতিমধ্যেই মোহিতলাল তাঁহার 'সাহিত্য-বিভাগ' ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যের উপজ্ঞাসের ধারার এই কাজ কতকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান ভগদীশ ভট্টাচার্য 'শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায়' মানিকের গল্পগুলির যে বহু বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। আরও অনেক মানিক-সাহিত্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র-বৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এখন এখানে বখাও উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কালপ্রবাহে যে সকল উপাদান হারাইয়া গিয়া সমুদ্র কতি হইবার সম্ভাবনা তাহাই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। অনেক কীক ও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গেল, মানিকের প্রতি প্রদাহিত অপেক্ষাকৃত তরুণ কোনও সাহিত্যিক যদি আমাদের ত্রুটিপূর্ণ অগ্রসর হন তাহা হইলে মানিক সম্পর্কিত বাহ্য উপাদান সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে রসিক ব্যক্তির এই সকল উপকরণের সাহায্যে মানিকের বখাও মূল্যবিচারও করিতে পারিবেন। যে পরিশ্রম আমাদের সাথে কুলাইল-না, তাহা যে একান্ত প্রয়োজন তাহার কারণ-স্বরূপ বলিতে পারি—১৩৫০-৫৪ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বহুমতী'তে মানিকের 'মাটি' নামক যে ক্ষুদ্র অথচ গাথাবাহিক গল্পটি বাহির হইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি? অর্থাৎ 'মাটি' প্রকাশিত কোন উপজ্ঞাসে বিবৃত হইয়াছে? ফাল্গুন ১৩৫১ বঙ্গাব্দ হইতে 'একটি চাবীর মেয়ে' নামক যে উপজ্ঞাসখানি এখন পর্যন্ত অনিয়মিত ভাবে 'মাসিক বহুমতী'তে বাহির হইয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ডি এম লাইব্রেরীর প্রকাশিতব্য উপজ্ঞাস 'মাটিরোঁবা মাল্লব'-এর সঙ্গিত তাহার অমিল কতখানি? 'চিন্তামণি' উপজ্ঞাসটি 'পূর্ণাঙ্গ' বাহির হইয়াছিল কি? হইয়া থাকিলে তাহার কি নাম ছিল? মানিকের লেখা 'চাবী' 'মজুর' প্রভৃতি দুই-তিনখানি নাটকের নাম পরম্পরায় শুনিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। এই গুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যিক। শ্রীমান প্রাণতোষ 'বটকের নিকট সবাধ পাটলায়, মানিক 'মাসিক বহুমতী'তে প্রকাশ্য 'একটি চাবীর মেয়ে'র উপসংহার 'কুলির বোঁ'-এর একটি অধ্যায় মাত্র তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অংশ লেখা হইয়াছে কি না? মানিকের বিবিধ গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থে বৃত্তিত গল্পগুলি ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে, বিশেষ করিয়া শারদীয় সংখ্যাসমিতে পুস্তকাকারে অমুদ্রিত আরও অনেক গল্প ছড়াইয়া থাকা সম্ভব। কয়েকটি বনোয়ারী উপজ্ঞাসও মানিকের সহযোগিতা ছিল, সেগুলির সন্ধান লইয়া মানিক-লিখিত অধ্যায়গুলি বাছাই, কথ্যও দরকার। অনেক বার্ষিক ও সাময়িক সম্মেলনগ্রন্থে তাঁহার গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যেমন 'কথাগুচ্ছ', 'কথা-শিল্প', 'আমার প্রিয় গল্প', 'মহামহত্ত্ব', '১৩৫১ (৫২, ৫৩, ৫৪)-র সেরা গল্প', 'আজকের ছোটগল্প' নতুন লেখা প্রভৃতি। এইগুলিতে প্রকাশিত সব গল্প মানিকের গল্পগ্রন্থভুক্ত হইয়াছে কি না? এইরূপ আরও নানা প্রকারে অনিবার্য সমাধান গই এক এখনই ভাব্য হইয়া 'মিসি লিঙ্ক গুলি খুঁজিয়া বাহির

করা প্রয়োজন। প্রবন্ধ-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার লানের পরিমাণও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যিক।

মানিকের জীবনের উপকরণ বঙ্গসাম্রাজ্য। বিবিধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র ও গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থ হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই :

মানিকের পৈতৃক নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালবরিয়া গ্রাম। পিতা জিহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অষ্টাশীতিপয় বৃদ্ধ, মাতা নীলদামস্বরী পূর্বেই গত হইয়াছেন। মানিক ছয় ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ, বোনও চারি জন। বড় ভাইয়ের সন্দেশই কৃতী; উচ্চাকাঙ্ক্ষীজীবী।

পিতা প্রথমে ছিলেন সেটেলমেন্টের কালুনগো, পরে সাব-ডেপুটি কালেক্টর হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি-ব্যাপসে তাহাকে বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। কাজেই মানিক জন্মের পর হইতে কলিকাতা আগমন পর্যন্ত বহু স্থানের ও বহু মাগুণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ সনের মে-জুন মাসে মানিকের জন্ম হয় দুমকার, ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন মেদিনীপুর হইতে, আই, এস সি, পাস করেন বাঁকড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ হইতে ১৯২৮ সনে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এস-সি, পড়িতে পড়িতে সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। বি, এস-সি আর পাস করা হয় নাই। জীবনের এই আকস্মিক গতি পরিবর্তনেই সম্ভবতঃ দাদাদের স্নেহবঞ্চিত হইয়া স্বস্ত্র হইয়া পড়েন। সামান্য কিছুকালের জন্য সামান্য বেতনে (মাসিক আড়াই শো টাকা নয়!) 'বঙ্গী'র সহকারী সম্পাদকের এবং স্থানীয় গণ্যমান্যের চাকরি ইহারই ফল। তাহাকে প্রধানতঃ নিজের সাহিত্য-কর্মের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ১৯৩৮ সনে ময়মনসিংহের কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৬-মাসের জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কস্তা কমলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বরাহনগরে আমরা সাহিত্যিকেরাই এই বিবাহে মোড়লি করিয়াছিলাম। মানিক ছই কস্তা, দুই পুত্রের পিতা, কস্তাটি জ্যেষ্ঠ—বয়স আশা করি পনের।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম ছিল মানিক। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৩৫) তাঁহার সর্ব-প্রথম গল্প 'অন্তসীমারী'র লেখক হিসাবে এই ডাকনামটাই ব্যবহার করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সেই নামটাই স্বায়ী হইয়াছে।

নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা তিনি বঙ্গসাম্রাজ্যে এখানে-ওখানে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'গল্পলেখার গল্প' (জুলাই ১৯৪৮) ১৯৪৫ সনের ১২ই মে প্রকাশিত তাঁহার বৈতরণ-ভাষণ এবং 'ক্যান্টিন-বিরোধী' লেখক ও শিল্পি সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত (জানুয়ারি ১৯৪৯) 'কেন লিখি' পুস্তিকার তাঁহার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'ভেঁশ বহর আগে' পরে' উপজ্ঞাসের গোড়ার নিজের কথা একটু বলিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও আগমনের বাকি কথা তাঁহার গল্প-উপজ্ঞাসগুলি হইতেই আহরণ করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য লেখক ও মূল্যবোধ (তাঁহার লব্ধ্য) বৃত্তিকথাও কম মূল্যবান হইবে না।

মানিক যেভাবে শত্রুতা বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই শত্রুতালহনা ভোগ করিতে হইবে কি না



মানিকের জীবিত দায়িত্ব তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে  
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব-শ্রমবাসীর দায়িত্ব  
গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি, আপাততঃ এই বৎসরে তাঁহাকে  
রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক  
দায়িত্ব পালন করুন। এখন পর্যন্ত বাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন  
মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় নূন নহেন।

তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির তার কতখানি তাহা আমরা দেখাইলাম।  
তারের কথা পণ্ডিত ও রসিকেরা বিচার করিবেন। আমরা শুধু  
এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
অন্ততঃ পক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছ রচনা  
করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা  
দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করিবে।

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

### পৌরাজ্য ভৌমিক

এখানে বলে মা কেউ

রাত্রির নিশক ভাটায়। সংখ্যাহীন পংসিহীন ঢেউ

অস্পষ্ট ইচ্ছার মতো শালা-শালা ফেনা।

আচ্ছন্ন চেতনা মগ্ন এই মন,

জীবনের বস্তু সব সেরা।



বাখা-রাস্তা দীর্ঘখাস ; হাওড়ার হাওড়ায়

শব্দহীন জিজ্ঞাসার মত

কি জানি, কি জানি বলে যায়।

সবুজ—সবুজ বনে, গাছের পাতার।

হাওড়া বয়ে যায় ! হাওড়া বয়ে যায় !

সাহিত্যের বাগা বাখী

হাতে বেঁধে ; জীবনের মৌন পাখি

আর তার আকাংখার ডানা

পাড়ি দিতে অকস্মাৎ হারাল ঠিকানা।

শুধু তার আকাংখার খই খই জলে

বোদ্ধুরে সোনার স্বপ্ন

কত না সবুজ বেশ নিমজ্জিত গভীর অন্তরে !

আঘাতে আঘাতে তরী ভাংগা—ছেঁড়া পাল

ডুবল অনেক রাতে, হল না সকাল।

তবুও কি দুঃসাহসে মন ছুঁয়ে যায়

তার সে নিমগ্ন স্বপ্ন, গভীর ইচ্ছার।

এদিকে চোখেতে জল

হল-হল

অন্ত দিকে সামুদ্রিক আকাংখার স্বাদ।

কে যেন কে যেন বলে এখনও সর্বদা

আছে : কিরে সে আসবেই

তবুও বাতাস বলে, সে নেই, সে নেই !

# কম্বুজ

(অ-প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম অংশ)  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

। লেখকের "একটি চাবীর মেয়ে" মাসিক বহুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকে। এই উপন্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ড লেখার পরিকল্পনা করেন লেখক এবং লেখার প্রথম দ্বিতী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পেশ করেন। লেখকের শেষ অপ্রকাশিত লেখা যথা আকারে বহুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। এই লেখা সম্পর্কে লেখক পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন— "প্রথম খণ্ড ছিল চাবীর মেয়ে রেবতীর কাহিনী। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হল সেই রেবতীই যখন চল কারখানার কুলির বো।"—স]

ছিন্ন চাবীর মেয়ে।  
হল কুলির বো!

স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে এল সহরের বস্তিতে।

একলাই এল। সাথী আর সে পাবে কোথায়। গোবিন্দের আপন জনেরাও আছে দেশের বাড়ীতে, সে একলাই ষাটতে এসেছে সন্তানের কারখানার।

কিছু দিন শহুরে বাড়ীতে কাটল রেবতীর, প্রায় প্রাণান্ত হল গোবিন্দের বাড়ীর মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে—তাদের অকারণ অবহেলা অপমান ও তাড়না সহ্য করতে।

তাকে ছেড়ে একা একা সহরের বস্তির ঘরে দিন কাটাবার বৈধা গোবিন্দেরও ছিল না। সকলের নিশ্চিন্ত তুচ্ছ করে অল্প দিনের মধ্যেই সে রেবতীকে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

একখানা ছোট ঘর।—একটা দরজা এবং নামমাত্র একটি জানালার ঘুপচি।

বস্তি খুব বড়। এলোমেলো ভাবে গায়ে গায়ে লাগানো কাঁচা ঘর, পৃথক পৃথক তিন ফালি উঠান।

ভিন্ন ভিন্ন গোটা চারেক বস্তি গড়ে ওঠাই উচিত ছিল কিন্তু রাসিকের মজি এবং হিসাবটা অল্প রকম হওয়ায় ঠাসাঠাসি, গালাগালাচি করে ঘরগুলি তোলা হয়েছে। একরকম পরিমার্জনের তিন ফালি কঠান থাকলেও, সবটা মিলে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটিনাত্র বস্তি।

প্রথমটা রেবতী সতাই দিশেহারা হয়ে যায়।

এমন গালাগালাচি করে এতটুকু ছোট ছোট ঘরে এত জাতের এত কলহের মানুষ বাস করে! রান্নাবান্না, শোয়া-বসা, ঘুমানো সব কিছু।

স্বামীর কল থেকে মারামারি করে তোলা জল এনে দিন চালানো।

রেবতী কান্ডের ভাবে বলে, একোখা এনে ফেললে মোকে?

গোবিন্দ বলে, আমি বেধা ঢের দিন থেকে আছি।

: হেথায় রইতে পারব নি।

: কোথা বাবে? এই তো তোমার নিজের ঘর।

: আহা মরি, ঘরের কি ছিঁরি! এইটুকু ঘর, একটা জোয়ার

চাই, কিছু সেই—

গোবিন্দ একটু হেসে বলে, এই ঘরের জোড়া সাত টাকা ভাড়া গুণতে হয়।

রেবতী বলে, রান্না করব কোথা? ঘে-ঘরে শোব, সে-ঘরেই আঁথা ছালাব, রাঁথাবাড়া করব?

: তা ছাড়া উপায় কি? আরেকটা ঘর ভাড়া নেবার সাথী আমার নেই।

রেবতী বেগে গিয়ে বগড়ার সুরে বলে, এমন জানলে আসতাম না। গোবিন্দ ঝগড়া করে না, শুধু বলে, কেন, সব বলি নি আমি? কোন কথা লুকিয়েছি?

এক ঘরে বসবাস, এক ঘরে রান্না। ঘর সাফ রাখা, আমার সাথিতে কুলোবে না।

: যে ভাবে পারিস চালিয়ে নে।

: রাগাণাণি করবে না?

: কখনো করেছি রাগাণাণি?

রেবতী চুল খুলতে খুলতে বলে, তা করেনি বটে কিন্তু নতুন অবস্থার মেজাজ তো বিগড়ে যেতে পারে নানা কারণে, সেই ভক্ত বললাম। আমার মেজাজ বিত্তী রকম বিগড়ে গেছে। রাগাণাণি করতে বিধম ইচ্ছা হচ্ছিল। গায়ের জোরে চেপে গেলাম, চূপচাপ রইলাম।

গোবিন্দ বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

রেবতী বলে, শুধু ভাবলে হবে না, ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটা ঘরের খোঁজ কর। ছোট হলে ক্ষতি নেই, রোহাক-টোহাক একটু যেন থাকে, রাঁথা-বাড়া যেন চালানো যায়।

গোবিন্দ একটু বিষমের সঙ্গেই তার দিকে তাকিয়ে বলে, খোঁজ করছি গো করছি। নিজে খোঁজ করছি, পাঁচ-সাত জনাকে বলা আছে, ভাড়াও খোঁজ করছে।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় এসে ঘরকন্না নিয়েই মেতে রইলি? এদিক ওদিক ঘুরতে সাব যায় না? বাত্মহন আছে, চিড়িয়াখানা আছে, গড়ের মাঠ আছে—

রেবতী হেসে বলে, জানি, জানি। কলকাতার ট্রাম-বাসও চলেবে, ড সব দেখার বায়গাও টিকে থাকবে। বেড়াব না তো কি, বেড়ানোর চোট অতিষ্ঠ করে ফুলাব তোমাকে। গোহুগাহ করে নিয়ে বলি?

গোবিন্দ বলে, তুই যে এ রকম ধীর শান্ত হবি, আমি তা ভাবতেও পারি নি।

বেবতী আবার মিঠি করে হাসে।

: গেরস্তা-ঘরের মেয়েরা এমনই হয়। তোমরা ব্যাটাছেলেরা তড়বড় কর, কোন গিকে তাকাও না, রাস্তায় চলতে সাপের লেজ মাড়িয়ে দিয়ে ছোঁবল খেয়ে মরতে বসে—ও রকম হলে কি মেয়েদের চলে?

বস্তিগাসিনী মেয়েছেলেদের সংখ্যা কম নয়। নানা বয়সের মেয়েছেলে।

বাচ্চা মেয়ে, বাড়তি বয়সের মেয়ে, কমবয়সী বোঁ, নানা বয়সের মা, দিদিমা এবং ঠাকুমা।

জনান্দনের ঠাকুমার মা পর্যন্ত আছে। তার বয়সের হিসাব কেউ জানে না। হয়তো একশো পেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ঠিকুজি-কুঠি কোন দিন তৈরী হয়নি, ওসব বন্ধুদের ব্যাপারের ধার ধারত না তার বাপদাদা।

আশ্চর্য্য, এই যে বড়ী এখনো শক্ত আছে, চার বেলা খায় এবং নড়েচড়ে বেড়ায়।

সাঠি ধরে খুব বক্টেই অবন্ত নড়াচড়া করে, একেবারে বঁাকা হয়ে। কিন্তু সে যে জীবন্ত আছে, এটাই আশ্চর্য্য করে দেয় মানুষকে।

বেবতী ঘর গুছিয়ে বসতে না বসতে এই বড়ী এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। কোকুলা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে যায়, গাঁয়ের মেয়ে, হালচাল কিছু জানিস নে এখানকার—সাবধানে থাকিস বাছা, সাবধানে থাকিস। তারপর আসে জনান্দনের বোঁ তারা।

কোলের ছেলেটাকে ঘরে ফেলে আসে। এ ঘর থেকে তার চাঁকর শোনা যায়।

তারা গ্রাহও করে না!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেবতীর সব খবর জেনে নেয়—নিজের নাঁড়ী-নক্সের খবর জানিয়ে দিতে দিতে। আদালতী জেরা যে চলে না হঠাৎ এসে নতুন একটা মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইলে—এই অতি সাধারণ বুদ্ধিটুকুর অভাব দেখা যায় অনেক মানুষের মধ্যে।

তারা ঠেক শিখেছে।

সে নিজের কথা বলে। নিজের কথা বলতে বলতে বেবতীর কথা জেনে নেয়।

গোবিন্দ খাওয়া সেরে কাজে চলে গিয়েছিল। উনানটা বেবতী নেবার নি। নিজের জন্তু সংখর একটা রামা চড়িয়েছিল—আলু-পেরাজের ছেঁচকি!

কাজ সেরে ঘরে ফিরে গোবিন্দও অবন্ত ভাগ পাবে।

ছেঁচকিটা নামিয়ে বেবতী জিজ্ঞাসা করে, কার ছেলে কাঁদছে গো এমন করে?

তারা বলে, মোর মেয়ে কাঁদছে।

বেবতী আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সেই তখন থেকে কাঁদছে—তুমি দিবা বসে আছে?

: ছেলেপিলে কাঁদলে কিছু হয় না।

: মোর কষ্ট লাগছে গো। নিয়ে আসি—আঁা?

: সখ হলে আনো।

কচি মেয়ে, দু'-একটা পাত উঠেছে। জামাটামার চিহ্নও নেই

গারে। কোলে করে নিয়ে এসে বেবতী তাকে তারার কোলে তুলে দেয়, জুঁমের সুরে বলে, মাই দাও।

তারা হাসে। মেয়ের মুখে মাই গুঁজে দিয়ে বলে, নিজের গুণাখানেক হোক, তখন আর এত ব্যস্ত হতে সাধ বাবে না।

: ছেলেমেয়ে এমন করে কাঁদলে মানুষের সয়?

: সওয়ালেই সয়। 'কটা দিন কাজে যাই না, ঘরে আছি। কাজে গেলে কে শুনবে ছেলেমেয়ের চৈচানি? শুনলেই বা শোবাবে কেন?

: কাজ মানে? কিসের কাজ?

: লোকের বাড়ী কাজ। বাবুবা দেওঘর বেড়াতে গেছে, তাই 'কটা দিনের ছুটি মিলেছে। নইলে কি ঘরে রইতাম, না, মেয়ে কাঁদছে কি না কানে শুনতাম?

বেবতীর মুখের ভাব দেখে তারা কথা বলার সুর পালটে দেয়। জাঁচল থেকে একটু সোজাপাতা খুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলে, মানুষটা খাচ্ছে, যা পায় সব এনে দেয়। নেশা-টেশা কিছু নেই—দু'-চারটে বিড়ি শুধু খায়। কিন্তু ও রোজগারে কুলোয় না ভাই—এই জঙ্গাল ক'টার জন্তেই কুলোয় না। এটা তো শুধু মাই টানে—চার পয়সার মিক পাউডার বানিয়ে দিলেই ঢের। বাকী তিনটে পেট পুরে ভাত খায়। নিজে খেতে কিছু না কামালে উপায় কি?

তারার অতি বেশী অন্তরঙ্গতা বেবতীর পছন্দ হয় না।

একাধারে সে যেন শান্তি এবং নন্দ ঠাকুরগুণ হয়ে পাড়িয়েছে!

উপদেশ আর পরামর্শ।

এটা করো ওটা করো—এভাবে চলো, ওভাবে চলো, নইলে ভারি মন্দ হবে, সাবধান!

বেবতীর মন বিগড়ে যায়।

একদিন সে ফুঁসে ওঠে। বলে, এত বেশী বকর-বকর কর কেন বল দিকি? কচি খুকী তো আমি নই? ও-সব আমার জানা আছে।

তারা আহতা হয়। চালের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর নিখাস ফেলে বলে, তোরা ভালর জন্তই বলছিলাম।

বেবতী বলে, তা তো জানি। এত বেশী বকতে নেই। মনটা বিগড়ে যায়।

বস্তিতে বিদেশী মানুষদের ভিড়টা বড় বিষয়কর মনে হয় বেবতীর। ঘরে ঘরে নানা পেশের মেয়ে-পুরুষের ভিড়!

মাস্তাজ বেবোখা উড়িয়া কর্ণাটক এবং আরও অনেক প্রদেশ থেকে সুরু করে পূর্ব-বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম, আসামে—যেথেকে পুরুষ এই বস্তিতে ঠাই নিয়েছে।

উড়িয়া হুন্ডা এবং মাস্তাজী সারদার সঙ্গে বেবতীর ভাব গড়ে ওঠে। হারে ধীরে গড়ে ওঠে।

ভাব-কথার জন্ত কেউ যেন তারা ব্যস্ত নয়। কিন্তু যেটুকু ভাব জমায় তার আন্তরিকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

খুব সংবত—কিন্তু প্রাণখোশা মেলামেলা।

এই সংঘের মানে বেবতী তালায়ে বুঝতে পারে না। তার মোটামুটি একটা ধারণা জন্মায়।

রজা সারদারা মেলামেলায় ব্যাপারে সাবধান এই জন্ত।

# লঙনে কাল যাক্স

— একশ' বছর আগে বিপ্লবের মহাশত্রু কাল' মাক্স' অতি দারিদ্র্যের মধ্যে লগুনে বাস করতেন। বড়ই বিখ্যার কথা এই যে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের রচয়িতা কখনও ভালভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ তরফে পারেন নি। তিনি তাঁর বর্ষমানেক উপেক্ষা করত ভবিষ্যতের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

কাল' মাক্সের নামে ভাবশ্রবণভীর বিগলিত হবার যুগ এটা নয়। তিনি নিজের এই ধরনের ভাবশ্রবণতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি যত্নে করতেন, যে মনন কোন ক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট করে না, তা' বন্ধা নিফল। পার্থিব অস্তিত্বের বাস্তব সত্য হচ্ছে গতিশীলতা এবং পরিবর্তন।

পরন্তুও পরে আসে শীত। ছাংশপট্টের গাছের পাতা সব ঘাট ঘরে। তখন লেখনকার কোন সাত তলা বাড়ীর জানলা দিয়ে নজরে পড়ে সেই বিলার ছাটটা, যেখানে মাক্স' ক্যাটিয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ ক'টা বছর। শীতের অপরাহ্নে মাঝে মাঝে লেখানো যে নীল কুমারীর আন্তরগণ পড়ে তাতে তাড়াক মন রহন্তের চেননায় আঘিষ্ট হবই।

সত্তর বছর আগে মাক্সের বন্ধুরা তাঁর পড়ার ঘরে একখানা পাঁচিটা দেখেছিলেন। টেবল থেকে জানলা পর্যন্ত বিছানো এই শতছিন্ন বিবর্ণ পাঁচিটাখানিকে কয়েক গাছি দড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের শেষ হ'খণ্ড রচনা করবার সময় এই পাঁচিটার উপর তিনি সারাদিন, এমন কি মাঝে মাঝে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পসচারণা করেছেন। কিন্তু তবু তিনি 'ক্যাপিটাল' শেষ করে যেতে পারেন নি।

পড়ার টেবল থেকে জানলা পর্যন্ত এই অস্থির পসচারণার আরও অনেক কারণ অবশ্যই ছিল। যখন তিনি ওই বাড়ীতে প্রথম বাস করতে আসেন, তখন তাঁর সামান্য আসবাবপত্র যা ছিল, তা একখানি ভাঙে করে বয়ে আনার মতও যথেষ্ট নয়। কিন্তু নিজের বুকুর মধ্যে তিনি বয়ে এনেছিলেন ব্যর্থতা, হতাশা এবং তিক্ততার এক মহাসাগর।

লজ্জাকর দারিদ্র্যের মধ্যে প্রসৃত তাঁর মৃত সন্তানদের কথা কেমন করে ভুলবেন তিনি? তারা যে সব মারা গেছে পুষ্টির অভাবে। তাঁর একান্ত বুকুর ধন এডগার তাঁর কোলের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে যে তাঁর আত্মহত্বিতাকে চরম আঘাত হেনে গেছে। শোকের প্রথম মুহূর্তে তিনি ল্যাসালেকে লিখেছিলেন, "বেকন বলে গেছেন যে মহা মানবরা প্রকৃতি এবং বিশ্বের নানা বিবরণের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে থাকেন যে, তাঁদের কাছে কোন বিয়োগবাখাই বড় নয়। আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় সেই ধরণের মহা মানবদের একজন নই।"

অপর দিকে ইউরোপে বিপ্লবের ব্যর্থতা তাঁকে এনে দিয়েছিল ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা। তুম্বা বন্ধুরা তাকে অপমানের একশেষ করে ছেড়েছে। মাক্সের বাধ্যতাবাহী মূলক রচনায় এবং ফ্রেডারিস এঙ্গেলসের সাহায্যে লিখিত পত্রে সেই সব তুম্বা বন্ধুদের নাম পাওয়া বাবে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তখন তাঁর পাশে ছিলেন বোবনের প্রিয়া এবং যিনি ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি জেনি মাক্স'। সেদিনের সেই

অমর্ত্যীর্ণ বেলবাসে সজ্জিত হস্তিত্বের ব্যাকুল গৃহিণী জেনিকে দেখে কেউ টেরই শেত না যে, ইনি সন্ধ্যা প্রীতি কাউন্সিলের লুডউইগ ডন ওয়েইক্যালেনের কত। এবং ডিউক অফ আর্গাইলসের যনিষ্ট আত্মীয়া। জীবনের বিকল্প কড়-বড়। মাক্সের চেয়ে তাঁর পত্নী জেনি মাক্সের উপর দিয়েই বয়ে গেছে বেঞ্জী। অনাহার, অর্জাহার, ধার, সেনা, সন্তানের মৃত্যু, গৃহ থেকে উচ্ছেদ, বেলিফের চোখ রাঙানী—এ সব সইতে হয়েছে জেনিকেই। একবার বাড়ীতে মৃত সন্তান বেঁচে তার সংস্কারের অর্ধ সংগ্রহের জ্ঞাত জেনি গেছেন সেকন্নার কাছে। বাণেশ বাড়ীর শেষ গহনাখানা বাঁধা দিয়ে টাকাও কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু একটু বাদেই পুলিশ এসে চড়াও হল তাঁর বাড়ীতে। গহনার জেনির বাণেশ বাড়ীর যে চিহ্ন জীবা ছিল, সেই চিহ্নের সঙ্গে বিলভের এক ধমক পরিহারের পারিবারিক চিহ্নের মিল থাকার পুলিশ সঙ্গেই ফাটল গহনাটি চোরাই মাল। কারণ, এই ঘটনার কয় দিন আগেই মাক্স সেই ধনিকের গৃহে একটি চুরি অচ্যুত হয়েছিল। এই ব্যাপার মাক্স' বহুদিন আদালতে ছোট্টাছুটি করে তার পুলিশী হাজ্যেত থেকে মুক্তি পান।

জেনি যখন ছাংশপট্ট ডিজায় আসেন, তখন তাঁর আয়ু নিঃশেষিত প্রায়। সারা জীবন হৃৎ হৃদ'শা এবং হৃদ'বৈর মধ্যেই তিনি দিনাতিপাত করেছেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে ক্যান্ডার রোগের হুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েক জন তরুণ বৃটিশ সোসালিষ্ট মাক্সকে বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক বলে অভিনন্দিত করেছেন। তাদের মধ্যে বেলফোর্ট ব্যান্স নামক এক ডক্টরলোক মাক্সের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে মাক্সের নামটা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। হিশুমান নামে অপর এক ডক্টরলোক মাক্সীয় তত্ত্বের ভাব্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ফরারবাকের উপর লেখা মাক্সের একাদশ তত্ত্বের খবর রাখতেন না। সেই তত্ত্ব মাক্স' বলেছেন, "এ পর্যন্ত দার্শনিকরা নানাভাবে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তন সাধন করা।" অর্থাৎ কথা নয়, কাজ চাই।

জীব মৃত্যুর পর মাক্স' মাত্র দু' বছর বেঁচে ছিলেন। পাঁচিটার উপর পসচারণা তখন অনেক কমে এসেছে। কারণ একাগ্রমনে কাজ করার ক্ষমতা তিনি ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলেছেন।

এক সময় তিনি ছাংশপট্টে ছিলে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট। মাক্স' তাঁর প্রাণের বন্ধু এঙ্গেলসের সঙ্গে জ্যাক ট্রু'স ক্যাসলের উল্টো দিকের বাগিচায় বসে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের খসড়া প্রণয়ন করতেন। কথায় কথায় দুই-এক বোতল বিয়ার উড়ে যেত। অবশ্য বিয়ার এবং খাবার দাবারের খরচটা দিতে হত এঙ্গেলসকেই। এঙ্গেলসের নিরমিত মাসোহারী না পেশে মাক্স' পরিবারকে অনেক দিন আগেই এতিমখানার জীবন শেষ করতে হ'ত। কারণ মাক্সের কোন স্ননিষ্ঠি আর ছিল না। নিউ ইয়র্কের এক পত্রিকার লগুন থেকে সংবাদ পাঠিয়ে তিনি মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু পয়সা পেতেন মাত্র। অনেক সময় সেই সব সংবাদ মাক্সের হারে লিখে দিতেন এঙ্গেলস।

মাক্সের জীবিকা অর্জনের ব্যর্থতা নিয়ে এইচ. জি. ওয়েলস প্রচুর

টীকা বিজ্ঞপ্তি করেছেন। বড়ই বিশ্বাস এবং চুপচাপ কথা এই যে, ক্যাপিটাল প্রবাহের ঘটনিতাকে অনেক সময় জামা-কাপড় বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক সময় পাওনাদারের হামলার তাকে বাড়ীতে আটক থাকতে হয়েছে। এঙ্গেলস্ টাকা পাঠিয়ে তাকে পাওনাদারের অবরোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এঙ্গেলসের টাকা না এলে ছাত্র-পুত্র নিয়ে মার্ককে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার তিনি এমন দুঃস্বপ্নের পড়েছিলেন যে, দেড় শিলিং এ নিজের ওয়েস্ট কোটটি বাঁধা রাখতে বাধ্য হন।

যাত্রা চিরকালই তাঁর এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিলেন কিন্তু সেট ফ্রাঙ্ক কখনও ফলপ্রসূ হয় নি। সম্ভবতঃ অন্ধারের অন্ধত্বলে তিনি নিজের সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চয় ছিলেন না। ল্যাসালে প্রবৃদ্ধ অজ্ঞাত যে সমস্ত সমসাময়িক বিপ্লবীরা যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন, মার্ক্স তাঁদের একটি উদাহরণ যে না করতেন, তা নয়। এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে এই উদাহরণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। মার্ক্স ছিলেন অতি জটিল মানুষ। সুস্পষ্ট দৃষ্টি এবং জুংবার বুদ্ধির অকাট্যতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দুইট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর লগুন অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটানোর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘরে ছেলে মেয়ে বউ না থেয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মার্ক্স সেমিক চোখ বুজে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন—এ এক অবিখ্যাত পরিস্থিতি।

তিনি ভাবতেন, নৈতিক সাধুতা দিয়ে আর যাই অর্জন করা যাক না কেন, টাকা অর্জন করা বড় কঠিন। আর এই নৈতিক মণ্ডলেই মার্ক্সের অসাধারণ চারিত্রিক মহত্বের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক পরিবেশের উর্দ্ধে তুলে মার্ক্সকে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি নিজের দুর্দৈবের প্রতি ঘৃণায় দ্রুত কোন স্বসভা ভিক্ষু নন। তিনি যুক্তির মশালবাহী একজন কালদামী। মার্ক্সের এই দিকটা তৎকালীন সহযোগীদের কারও কারও নজরে পড়েছিল, একথা সত্য। তবে সেকালের যে সমস্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মার্ক্সের যোগাযোগ হয়েছিল, তারা তাঁকে 'দাড়াওলা ফ্রককোট-পরা একজন লোক' হিসাবেই দেখেছিল। তারা জানত, 'লোকটার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উঁচু আর যারা তাঁর সঙ্গে মত মেলায় না, তাদের উনি ঝাঙ্কতাই ভাবে গাল দেন।'

এঙ্গেলসের কাছে অবশ্য গোপন ছিল না কিছুই। এই অতি-চতুর, হৃদয়বান জার্মান ভ্রমলোকটি ম্যাকেল্টারে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। মার্ক্সের প্রকৃতি তিনি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন অভিন্নমনস্ক বন্ধু। সন্তর বছর আগে স্থানীয় আধিবাসীরা দেখেছে, লম্বা কৃকেশ এঙ্গেলস্ বটে সুগঠিত মার্ক্সের সঙ্গে জার্মান ভাষার আলাপ-আলোচনা করতে করতে পথ চলেছেন। চলতে চলতে আলোচনার কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেবার জগৎ হঠাৎ হঠাৎ তাঁরা থমকে দাঁড়িয়েছেন। রাজনৈতিক বাস্তবতাদের মধ্য থেকে ইতিহাসের এই মানবিক সরলতাকে এখন খুঁজে বার করার প্রয়োজন।

এই দুই বন্ধু গোড়ায় গোড়ায় টুটেনহাম কোর্ট রোডের যেকোয়ার বসে নিয়মিত বিয়ার খেতেন। তৎকালীন নীতি-বাণীশরা হযত এমন দৃষ্ট দেখে চোখ বুজে থাকতেন কিন্তু একথা কুলালে চলেবে না যে, মার্ক্স ছিলেন রাইনল্যান্ডার এবং এঙ্গেলস

ফ্রয়ের হলে। স্বভাবতই মদ, চুক্তি এবং গাল-গল্পে দুজনেই বেশ ওস্তাদ।

প্রথম দিকে এঙ্গেলস মদ চুক্তির দিকে বেশী ঝুঁকতে পারেন নি। কার্ল, তাঁর পিতা তাঁকে মাত্র সামান্য বেতন ছাড়া আর কোন খরচ দিতেন না। কাজেই বেচারীদের শুধু বিহার খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। কিন্তু দুই বন্ধু গেলসে চুপচাপ মারতে মারতে অনেক সময়ই ভুলে যেতেন, কতখানি গলাধঃকরণ করেছেন। শোনা যায়, কোন কোন দিন রাস্তাঘাটে তাদের মাতলামি করতেও দেখা গেছে।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির মালিক হন এঙ্গেলস। তখন দুই বন্ধু বন্ধু মনের সুরে মদ এবং চুক্তি খাবার সমান সুযোগ লাভ করেন। বাপের সম্পত্তি লাভের পর এঙ্গেলস্ মার্ক্সের দারিদ্র্যও অনেক লাঘব করেছিলেন।

কিন্তু এই বন্ধুত্বের পথ একেবারে নিষ্ফলক ছিল না। মার্ক্সের ব্যবহারে অনেক সময় এঙ্গেলসের মত বৈধবীক মাদুদেরও বৈধবীর বাঁধ ভেঙ্গে যেত। এঙ্গেলস মেরি বার্নস নামী একটি আইরিশ বালিকাকে ভালবাসতেন এবং তাকে বিয়ে না করেও তার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন বাপন করতেন। তাঁদের সেই দাম্পত্য জীবন অতি সুখের হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে যখন হঠাৎ সেই ভদ্র মহিলার মৃত্যু হয়, তখন দুঃখে কাতর হয়ে সমবেদনা লাভের আশায় এঙ্গেলস্ মার্ক্সের কাছে লেখেন, আমি মুক হয়ে গেছি। হতভাগ্য মেয়েটি সমস্ত ছন্দ দিয়ে আমার ভালবেসেছিল।

বিবাহ সম্পর্কে মার্ক্স-দাম্পত্য ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। বিবাহ বন্ধন বিহীন মিলন তাঁরা পছন্দ করতেন না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই মার্ক্স অত্যন্ত নিষ্করণ ভাবে এঙ্গেলসকে যে উত্তর দিলেন, তাতে মেরি বার্নসের মৃত্যুর কথাটা হয়ে গেল নিতান্তই গোঁপ। শুধু তাই নয়, সেই চিঠিতে মার্ক্স নিজের দুঃখ-দুর্দশার এক বিরাট কিবিত্তি দিয়ে বন্ধুর কাছে কিছু অর্থও চেয়ে বসলেন। এই চিঠি নিশ্চয়ই এঙ্গেলসকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি লিখে পাঠালেন যে, আপাততঃ তাঁর কাছে টাকাকাড়ি নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু মার্ক্স নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বেশ কিছুকাল নীরব থেকে শেষে বন্ধুর কাছে ঘুরা চেয়ে এক পত্র লিখলেন। মেরির মৃত্যুতে জেনি (মার্ক্স) এঙ্গেলসকে কোন সমবেদনা জানান নি বলে দুঃখ প্রকাশ করে মার্ক্স লিখলেন, 'মেয়েরা ভারী মজার জীব—খুব বুদ্ধিমতী মেয়েরাও। সকালে মেরির মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার হ্রীর সে কি কারা! তোমার দুঃখে তিনি নিজের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতেই তার মনে হল বেলিকের তাগাদা এবং চোখের সামনে সন্তানদের অনাহারে নির্ভী হতে দেখার চেয়ে বড় দুঃখ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।'

দ্বী মৃত্যুর পর দাম্পত্যে ডিলার মার্ক্সের শেষ কটা দি কেটেছে আরও মধ্যাত্তিক অবস্থার মধ্যে। মার্ক্সের শরীর তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। ক্রমশঃ হয়ে ক্যান্সার। এর উ কস্তা জেনির মৃত্যু এল মধ্যাত্তিক আঘাতরূপে। এই জেনি বিয়ে হয়েছিল চার্লস লঙ্কেটের সঙ্গে। সুখের কথা এই এঙ্গেলসের এক লগার (দুই কস্তা) মৃত্যু তাঁকে দেখে যে হয় নি! এঙ্গেলস ছিল মার্ক্সের আদরের 'টুনি'। টুনি এডো

নামক একটি যুবকের অবিবাহিত পত্নী হবার জন্য দুঃস্বপ্ন করেছিল কিন্তু তাঁর দুর্ভাবহারে শেষ পর্বন্ত আত্মহত্যা করে। লরা বিয়ে করেছিল পল ল্যাকারগকে। দীর্ঘকাল তারা সুখে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে গেলে ভবিষ্যতের উপর আস্থা হারিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে আত্মহত্যা করে।

মার্জের কাঁচিনী যিশুকে ক্রিস্টবিন্দু করার কাঁচিনীরই রূপান্তর বিশেষ। মার্জ ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তাতে আপোষের কোন স্থান নেই। তাঁর জীবিত কালেই

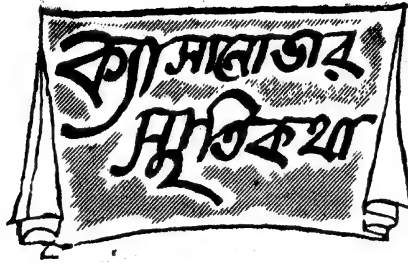
তাঁর তত্ত্বকে সত্যায়নের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। তাই অন্ত্যস্ত তিস্ততার সঙ্গে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, “ঈশ্বরকে বহুবার, আমি মার্ন বাদী নই।”

যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কবরেই সমাধিস্থ করা হয়। শেষ বিদায় বাণীতে এঙ্গেলস্ ঘোষণা করেছিলেন “তাঁর নাম এবং তত্ত্ব যুগ-যুগান্ত বেঁচে থাকবে।” এঙ্গেলস্ এক বিন্দুও মিথ্যা বলেন নি। মার্জের নাম এবং তত্ত্ব এখনও বেঁচে আছে এবং চিরকাল থাকবেও।

## ফিরে এলো

### শ্রীকরণাময় বসু

স্বপ্নের নীল অন্ধকারে  
একটি গানের কলি ডানা মেলে, বন্ধুবারে  
কড়া নাড়ে, সাড়া দেয়, আচ্ছিন্ন,  
কহিলাম, এসো কাছাকাছি।  
আশ-চেনা মুখ তার আঁখি ছলোছলো,  
ইস রায় বলে গেল, পার যদি ভোল ;  
হাওয়ার চমক তুলে চলে গেল উড়ে  
অন্ধকারে নিঃশব্দ স্রুত্রে।  
তার পর খুঁজে ফিরি দেওয়ার বন,  
জোনাকি-প্রদীপ-জ্বলা সজ্জল আবন,  
খুঁজে মরি ছলোছলো মন,  
কোথায় বাগান ?  
অগ্ন শূন্য ফুলের বাগান।  
তার পর ফিরে এলো ঘুম-ঘুম ফুলঘরে  
ফুলের ফাগুন,  
সবুজ ভ্রমর করে গুন গুন গুন,  
আঁখারে ইথারে বাজ অদৃশ নৃপুংর,  
মনে হল ভেসে এল মায়াময় সুর :  
কাল এসো, ফের দেখা দিও,  
ভুলিও না প্রিয়।  
মনে হল একজোড়া ঘন কালো চোখ  
রেখে গেল ভালোবাসা-ভরা ছুটি স্লোক।  
হঠাৎ হাওয়ার এলো-মেলো  
কবে কার গান উড়ে এলো,  
যেন ঘন অন্ধকারে পথহারা পাখি  
হঠাৎ পেয়েছে খুঁজে কবেকার ভালোবাসা,  
জীবনের লড়া-পাতা দিয়ে গাঁথা ছোট এক বাসা :  
শিঙনে এসেছে ফেলে মরুপথ,  
শিঙনে এসেছে রেখে ঝড়ের বৈশাখী।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বন্ধু বই কি !

আজও সে বন্ধুত্বের স্মৃতি সর্গোৎসবে বহন করছি—তিনটি ক্ষতচিহ্নে। সেই রাত্রেই প্রবল জ্বরের আক্রমণে বেটীনা আবার শয্যা নিল। দেখতে দেখতে বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গেল ওর সারা দেহ। সব অভিমান, সব ভয় তুচ্ছ করে সেদিন ওর বিছানার পাশে এসে বসলাম। ওর রোগাক্রান্ত দিনগুলিকে ভরে তুললাম—আশা আর আশ্বাসে, সেবা আর সাহচর্যে—...

সেই সেবার স্বাক্ষর অক্ষয় হোয়ে বইলো আমার দেহে—তিনটি ক্ষতচিহ্ন।

কিন্তু বাক সে কথা, বছরের পর বছর ঢেউএর পর ঢেউএর মত এসে কত পূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেই সব দিনগুলিকে—...

তখন কে-ই বা জানতো একদিন স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে, দাণ্ড্যের পেছনে বোগগ্রস্ত অকালবৃদ্ধা বেটীনা কিরে আসবে শৈশবের সেই গৃহটিতে... আর, আর আমারই এই ছুটি বাহুর আশ্রয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে... কিন্তু সে-ও তো অনেক পরের কথা—

আগেই বলেছি ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলাম—তাই বোলো বছরেই 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী পেলাম। আমি কিন্তু নিজে চেয়েছিলাম চিকিৎসক হোতে। তার বদলে আমাকে জোর করে আইন পড়ানো হোলো। আইন পড়ার উপর আমার আক্সয়ের বিতৃষ্ণ। কিন্তু মা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আমাকে এডভোকেট তৈরী করবেনই। সিলেই হোতো আমাকে আপন রুচিতে চলবার অধিকার—কলে না হোলো এদিক না হোলো ওদিক। সারাজীবনে দুটোর একটাও কাজে লাগতে পারিনি। অবশ্য ও দুটোরই কাজ একই। আইন ঘর গড়ার চেয়ে ঘর ভাঙেই বেশী। আর ডাক্তারী—রোগীকে নিরাময় করার চেয়ে রোগীকে মারেই বেশী।

বাই হোক, এদিকে ছাত্রজীবনের দোষগুলিও বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলাম। সহপাঠীদের কাছে দৈন্ত প্রকাশের ভয়ে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করতাম। সে সময় ভেনিসে ছাত্রদের নানা রকম স্বাধীনতা আর স্বত্ব-সুবিধার ব্যবস্থা ছিলো।

বাহ্যিক আড়ার আর বেশী দিন চললো না। শীগগিরই সর্বস্বাস্থ্য হোলো। তখন জামা-কাপড় অবধি বাঁধা রেখে ঠাঁট বজায় রাখার চেষ্টা চললো—কিন্তু সেই বা ক'দিন। দিশাহারা অবস্থায় সিনিয়াকে লিখলাম টাকা পাঠাতে। কিন্তু টাকার বদলে সিনিয়ানি নিজে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিরে গেলেন। অবশ্য বাবার সঙ্গে ডাঃ গাংসিক বর্থেই যত্নবান্ন রিতে ভোলেননি। ডাঃ গাংসি আমাকে লিলেন অজয় অঙ্গদিক আদীর্কায়। গাছায়তে এই শেষ নয়।

ভবিষ্যতে যখনই এসেছি আতিথ্য নিয়েছি ডাঃ গাংসির মেহের আশ্রয়ে।

সিনিয়ানি যখন মারা গেলেন আমি তখন ভেনিসে। শেষের দিকে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন—আমিও এক দুহুতের জন্তও কাছছাড়া হইনি। সিনিয়াকে বড় ভালবাসতাম। জান হোয়ে অবধি ওই স্নেহের ছায়ায়ই তো গড়ে উঠেছি। কিন্তু মৃত্যুকালে একটি কপর্দকও রেখে যাননি—তার আগেই বা কিছু সঞ্চয় নিশ্চেষ্ট হোয়েছিলো আমার পিছনে। মা তখন ছিলেন সেট পিটাসবার্গে। মাসখানেক পরেই মায়ের চিঠি পেলাম। লিখেছেন, ভবিষ্যতে ভেনিসে তাঁর কিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ভেনিসের বাড়ী বিক্রী করে দিতে চান। এ বিষয়ে আরে গ্রিম্যানীকেও তিনি জানিয়েছেন। আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মতামতসারে চলতে। আসবাবপত্র বিক্রী করে দেবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে আমার লেখাপড়ারও বাতে জট না হয়, সে ব্যবস্থা করার জন্তও তাঁকে জানিয়েছেন।

চিঠি পেয়েই ছুটলাম আরে গ্রিম্যানীর কাছে। জানালাম, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য।

কিন্তু বিচিত্র এই মন! যেই মনে হোলো এখন থেকে আমি গৃহহারা হোলো, এমন কি পুরানো স্মৃতিভড়ানো আসবাবপত্রও বিক্রী হোয়ে যাবে, তখন কি যেন আক্রোশ পাগলামির মত আমার ঘাড়ে চাপলো। নিজেই সব বিক্রী করতে লাগলাম, জ্বরের হস্তগত হবার আগেই। কাপড়-জামা, বাসন-কোশন, সৌখিন টুকটাকি থেকে শুরু করে বিছানা-পত্র, আয়না অবধি। কেমন যেন মনে হোতে লাগলো আমাদেরই অধিকার এই সব পৈত্রিক সম্পত্তিতে, মায়ের কোনো অধিকার নেই তাই থেকে বঞ্চিত করার।

মাস চারেক পর ওয়ার ল' থেকে মায়ের কাবার চিঠি পেলাম। লিখেছেন—'এখানে একজন যখনই তিনি আসেন আমার তোমার কথাই মনে হয়। আমি বছরখানেক আগে তাকে বলেছিলাম, আমার একটি ছেলে আছে—ঈশ্বরের সেবাদ্য নিয়োজিত হবার জন্তেই যেন তার জন্ম, কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা নেই যে তাকে কোনো গিঞ্জায় কাজে লাগাই। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তোমার সবচেয়ে রাগীকে জ্বরে রাখ করবেন, তাঁর মেয়ে 'নেপলস'-এর রাগীকে তোমার বিষয় জানাতে। তাঁর কথা তিনি রেখেছেন, এখন ভেনিস হোয়ে ক্যালাব্রিয়াতে ফেরার পথে তোমাকে সঙ্গে 'নিয়ে যাবেন—ওখানে রাজকের কাছে তোমাকে নিযুক্ত করবেন। তাঁর বর্ণনায় ভবিষ্যতে তুমি অনেক বেশী পদমর্যাদাও পেতে পারো। তাবো তো, মায়ের

কি আনন্দ ছেলেকে ধর্মবাজকরণে দেখতে পেলো? এই সঙ্গে উনিও তোমাকে একটি চিঠি দিচ্ছেন। যত দিন না তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তত দিন আর গ্রিম্যানীট তোমার দেখা-শোনা করবেন..'

চিঠি দু'খানা পেয়ে সত্যিই আনন্দে উজ্জ্বলিত হোয়ে উঠলাম। এবার বিদায়—ভেনিস বিদায়! সামনে স্বর্গোচ্ছল ভবিষ্যৎ! আর যেন এক মুহূর্তও দেরী সহ্য হচ্ছিল না। সেই আনন্দের উত্তেজনায় বেশ ছেড়ে বাওয়ার বেলনা বিন্দুমাত্রও অহুভব করি নি সেদিন।

কিন্তু অপেক্ষা করতেই হলো বেশ কিছু দিন। আর তারই মধ্যে আমার উপর দিয়ে বেশ কিছু বড়-খাণ্টা বয়ে গেল—বিনা অহুমতিতে সব বিক্রী করার ফল, অভিভাবকের অসন্তোষ, নানা চক্ষাণ্ড ইত্যাদি.....

শেষে একদিন আবে গ্রিম্যানী খবর মিলে ধর্মবাজকটি এসে পৌঁছেছেন। তখনি গেলাম তাঁর কাছে। শূন্য নতুন কলঙ্ক—বয়স বছর চৌত্রিশের বেশী নয়। পরিচয়ের পর উনি জানালেন এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি যেন ঠর গলে বোমে গিয়ে দেখা করি। কীর্থিনিট ঘটনা ধরে আমাকে অভ্রম শ্রম করলেন সেদিন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমার উত্তর শুঁকে সঙ্কট করেনি মোটেই—কিন্তু আমার ভারী ভালো লেগেছিলো।

বাই হোক, এই পরিচয়ের দুদিন পরেই আমি বাজা করলাম—পকেটে মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা। কিন্তু সাহসের একটুও অভাব ছিল না মনে। পথে নিজের স্বভাবসেবে আর কয়েকটি ভুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম। কিন্তু পরোয়া না করে হাঁটা পথেই পাড়ি দিলাম। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে এসে পৌঁছলাম চিরগৌরবময়ী নগরী রোমেতে। পকেট শূন্য থাকলেও রোমের সৌন্দর্য আমার মন দিয়েছিলো পূর্ণ করে। কিন্তু চোখের পিপাসা মেটানোর আগেই সোজা গেলাম ধর্মবাজকের বোঁতে। হা হতোহামি! কোথায় তিনি? শুনলাম আগেই চলে গেছেন রোম ছেড়ে, তবে আমার জন্ত নেপলসে পৌঁছবার পাথের আর পথের নির্দেশ বেখে পেছেন। পরদিনই একটা গাড়ী ছাড়বে জেনে প্রথমেই তাইতে বাবার ব্যবস্থা করলাম—রোমের সৌন্দর্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি। ৬ই সেপ্টেম্বর নেপলস পৌঁছলাম—শুধু জানতে পারলাম, তিনি আগেই চলে গেছেন মার্টোরানাতে। আমার সন্ধ্যা কোনো ব্যবস্থা দূরে থাক একটি কথাও কাউকে বলে জাননি। আজও মনে পড়ে সেদিন সেই বিশাল নগরীর মাঝখানে ঝাঁড়িয়ে নিজেকে কি ভাব একাকী অসহায়ই না মনে হোয়েছিল! কিন্তু মনের জোর কিরতেও দেবী হয়নি। ঠিক আছে মার্টোরানা—বেশ মার্টোরানোই সই। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে আমাকে ওখানে পৌঁছতেই হবে—নাই বা থাকলো পাথের..নাই বা হইলো পরিচিত আশ্রয়। মাত্র দু'শো মাইল পথ—গাড়ীতে বাগ্গা? শূন্য পকেটে? সে তো দুরাশা! হাঁটা পথেই আবার পাড়ি জমালাম।

অনেক ঘটনা আর দুর্ঘটনা, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সফরের পর কাশা-ত্রিতাত এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ছোটো একটি গাড়ীতে সোজা মার্টোরানো। পথের অভিজ্ঞতায় তখন সফরও কিছু হোয়েছে বৈ কি!

অবশেষে সেই ধর্মবাজকের খোঁজ মিললো। তাঁর নাম হোলো

বানার্ড জ বানার্ডিস। স্বরের ভিতর ছোটো নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে কি লিখছেন। আমি ঢুকেই প্রচলিত রীতি অনুসারে নতজাহু হোলাম। উনি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে উঠিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। পথের দূরবাহার কথা শুনে ব্যথিত যেমন হোলেন—সব বাধা কাটিয়ে নিরাপদে এসেছি এমন কি কোথাও ধার দেনা কিছুই রাখিনি শুনে তেমনি খুশীও হোলেন।

বাড়ীখানা বেশ বড়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাছাড়া যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি অব্যবস্থা। বিশেষ করে খাওয়া-পাওয়া তো জঘন্য। তেলটা অবধি কটুকুকে ভরা। সেদিনই আবার উপবাসের দিন ছিলো। কিন্তু যাককি শুধু বিচক্ষণ নন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। বাড়ীর বিশৃঙ্খলার অত্যন্ত বিচলিত, আর অশ্রুত হোয়ে উঠলেন। আমাকে নিজের বাড়ীতে তুলে আমার উপকারের বদলে অপকার করলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

আমাকে বললেন, এত দুর্বস্থা সত্ত্বেও ওর একমাত্র সাধুনা যে উনি মঠের সন্ন্যাসীদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে পেয়েছেন। ওদের নির্ধাতনে পনেরোটি বছর শুঁকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হোয়েছে।

পরদিন একটি উপাসনা-সভায় ধর্মবাজকের আসন উনি নিলেন। আমিও ছিলাম সঙ্গে। সেই সভাত শহরের সমস্ত গণ্যমান্ন, বিশিষ্ট ব্যক্তি আর সমস্ত বাজকরাই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার জীবনে আমি ভগ্ন আর ইতরদের এতবড় সমাবেশ আর দেখিনি! মহিলাগণও যেমন বিভৎস নিলজ্ঞ পুষ্যবরাও তেমনি মূর্খ অথচ অশ্লীল, কুংসিতভাবাপন্ন। বাড়ী ঘিরে এসে আমি বললাম যে, আমাকে ক্ষমা করবেন এই জায়াগার জীবন কাটাবার ইচ্ছা আমার আরপেই নেই। আশীর্বাদ করুন, আমি তাই মাথায় নিয়ে বিদায় হই। কিঞ্চিৎ আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি অল্প কোথাও গিয়ে আমার নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য ফেরাতে পারবো।

কিন্তু এই কথাই শুঁর এত মজা লাগলো যে শুনেই সন্ধ্যা হেসে উঠলেন। শুধু তাই নয়, সারারাত ধরেই মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়লেই হেসে উঠতে লাগলেন। কিন্তু সেদিন আমার কথাটা যেন নিলে মাত্র দু'বছর পরেই শুঁকে জীবনের মধ্যপথেই বনিকা টানতে হোতো না। আমাকে এখানে থেকে এনে যে তুল করেছেন সে কথা স্বীকার করলেন। আর শুঁর হাতে কিছু না থাকতে (যদিও তখন শুঁর বাৎসরিক আয় হোলো দু'হাজার ফ্রাঙ্ক) আর আমাকেও কপর্দকহীন ভাবার জন্তে একখানি পরিচয়-পত্র মিলে নেপলসে শুঁর এক বন্ধুর কাছে। আর তাতে নির্দেশ ছিলো আমাকে বাটটি মুন্সে বোবার জন্ত।

১৭৪৩ সাল। ১৬ই সেপ্টেম্বর নেপলস এ পৌঁছলাম। পৌঁছেই প্রথম গেলাম চিঠির মালিকের কাছে। সৌভাগ্য আমার! শুধু টাকা দিয়েই কাঁস হোলেন না তিনি, আমাকে শুঁর হেলের সন্নি করে নিয়ে বাড়ীতেই রাখলেন বাবতায় খরচপত্র শুদ্ধ। ওদের সঙ্গেই দেশজমণে বেরিয়ে আবার এসে পৌঁছলাম রোমে। আমার করবাজ্য রোম!

কিন্তু এবার সেই গৌরবময়ী নগরীতে পথজাহু, হতভম্ব, নিঃ



পথিকের বদলে এসে কাঁড়ালো বেশেভূষার, অর্ধে সামর্থে, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন জন। শুধু অর্ধ নয় কিঞ্চিৎ রত্নেরও অধিকারী তখন আমি, আর সঙ্গে বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরিচয়-পত্র। তাছাড়া আমার চেহারাটার এমন একটা বেনেদীরানার ছাপ ছিলো যাতে সহজেই অস্ত্রের দৃষ্টি আর সন্ধ্যা আকর্ষণ করতাম। আমার ধারণা ছিলো রোম এমন জায়গা যে, এখানে একেবারে নিঃশব্দ অবস্থায় শুরু করলেও শেষে সব সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

রোমের বহু বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত, ব্যক্তিদের নামে আমার কাছে পত্র ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ধর্মযাজক ফাদার জর্জের নামেও ছিলো। স্বয়ং পোপও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভক্তি করতেন। তাছাড়া ছিলো পোপের মন্ত্রিসভার সভ্য—‘কার্ডিনাল একোয়াভাইভার’ নামে। সে সময় তাঁর মত ক্ষমতাশালী রোমে আর বিতরী ছিল না বললেই চলে। পরিচয় পাবার পর আমাকে তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কথাপ্রসঙ্গে যখন শুনলেন যে পোপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার এখনও ঘটেনি, তখন নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দিলেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কাছে আদেশপত্র এলো—পোপের সঙ্গে দেখা করার জন্ত।

মটি ক্যাভেলোতে পৌঁছলাম। আমাকে সোজা উপরে নিয়ে যাওয়া হোলো যেখানে তিনি বসেছিলেন সেইখানে। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ওর পাছকার ক্রশ চিহ্নটিকে চূষন করলাম। আমার পরিচয় নেবার পর তিনি জানালেন আমার নাম তিনি শুনেছেন। তাছাড়া ‘একোয়াভাইভার’ মত বিশিষ্ট একজন কার্ডিনালের আশ্রয় পেয়েছি শুনে আনন্দও প্রকাশ করলেন। মানারকম কথাবার্তার মধ্যে আমার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও তাঁকে বললাম। মাটোরায়োর ধর্মযাজকের কাহিনী শুনে তাঁর সে কি প্রাণখোলা হাসি! আমারও তখন সব জড়তা বা স্কেচ একেবারেই কেটে গিয়েছিলো—খুব সহজ ভাবেই গল্প করতে লাগলাম। আর সে সব শুনে ওঁর এত কৌতুক লাগলো যে আমি প্রায়ই আসলে ওঁর খুব ভালো লাগবে, সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বাস্তবিকই পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্টের মত আনন্দিক, মজা ও মধুর প্রকৃতির লোক খুব কমই ছিলো—তাঁর শত্রুও তাঁর স্বভাবের গুণে তাঁকে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে দ্বিধা করতো না। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইলাম যাতে নিষিদ্ধ বই পড়ার আমার বাধা না থাকে। অনুমতি তখনই মিললো। যদিও উনি বসেছিলেন একেবারে লিখিত অনুমতিপত্র দেবেন—সে কথা কিন্তু পরে ভুলেই গিয়েছিলেন।

আর একবার ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ভিলা মেডিসিতে। আমাকে ডাকলেন সঙ্গে বেড়াবার জন্তে। বেড়াতে বেড়াতে নানারকম গল্প করছিলাম আমরা—সঙ্গে ছিলেন ভেনিসের রাষ্ট্রপতি আর কার্ডিনাল এ্যালবানি।

হঠাৎ একটি লোক এলো। চেহারাটা দেখলে মনে হয় অত্যন্ত মজা সৎ প্রকৃতির লোক। পোপ তাকে কাছে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কি প্রয়োজন। লোকটি বৃদ্ধবয়সে তাঁকে কি জানালো। পোপ শান্ত ভাবে ওর বক্তব্য শুনলেন। পরে বললেন, “তুমি ভালোই করেছে, ঈশ্বরকে ডাকো তিনি সব ঠিক করে দেবেন”—

লোকটি বিষয়-বস্তুর গতিতে চলে গেলো। পোপ আমার ক্ষিরে এসে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন।

—“পরম পিতা, আপনার স্বর্গীয় মহত্বের কাছে ও যে উত্তর পেলো, তাতে কিন্তু ওর মন তৃপ্ত হোতে পারেনি।”

—“কেন পারেনি?”

—“স্বভাবতঃই আপনার কাছে আসার আগেই ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। আপনার কাছে যখন এলো আপনিও তাঁর আবেদন ঈশ্বরের কাছেই জানাতে বললেন—এখন সে বেচারীর অবস্থাটা ভাবুন তো?”

পোপ সশব্দে হেসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আর দু’জন সঙ্গীও। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুতের ভাব দেখালাম না। পোপ হেসে বললেন,—“ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আমি নিজে কিছুই করতে পারি না—”

—“পরম পিতা, যা বলছেন সেটা ঠিকই। কিন্তু সবাই জানে ঈশ্বরের প্রধান মন্ত্রীই হোলেন আপনি। তাহলে ভাবুন তো লোকটির অবস্থা—আপনিও যদি মধ্যস্থতা না করে সোজা ঈশ্বরের কাছে তাকে পুনঃপ্রেরণ করেন তাহলে বেচারী কি করে? এক রোমের ভিক্ষুরা ছাড়া তার গতি নেই। কারণ তিনটা পেলেই ভিক্ষুরা ঈশ্বরের কাছে তার জন্ত কল্যাণ কামনা করবে। আমি কিন্তু আপনার মধ্যস্থতাকেই সব চেয়ে বৃদ্ধি হবো। তাই আমার আবেদন, অনুগ্রহ করে আমাকে আরও বেশী মাংস খাবার অনুমতিপত্র দিন”—

—“তাই হবে বৎস,”—পোপ হেসে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন আর সেই সঙ্গে বসে মিলেন, উপবাসের দিনগুলি কিন্তু আমাকে মানতে হবে।

ভাগ্যক্রমে আমার রচিত কয়েকটি কবিতা কার্ডিনাল এম, সির খুব ভালো লেগেছিলো—ফলে তাঁর প্রাসাদেও আমার দ্বার ছিলো অব্যাহত। সোনার কাজকরা অপরূপ হুন্দর একটি নকশাণী আমাকে উনি উপহার দেন। তাছাড়া আরও অনেক মূল্যবান উপহার পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। এই সব দেখে শুনে আমার বন্ধুরা বলতো, আমার সৌভাগ্যের না কি সীমা থাকবে না। বার চার পাশে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানী-স্বপীরা রয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ তো স্বর্ণোজ্জ্বল। সত্যিই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রোমে আমার পদমর্যাদা আশ্চর্য রকম বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যে সহীলো না বেশী দিন।

একদিন ভোরবেলা। মনে হচ্ছে ক্রীসমাসের দিন ছিলো সেদিনটা—হঠাৎ আমার একজন ডাক্তার বন্ধু বাড়ির মত আমার ঘরে ঢুকেই গায়নের সোফাটাতে বসে পড়লো। একটু জিরিয়ে নিয়ে বললো যে, আমাকে জন্মের মত বিদায় জানাতে এসেছে—কিন্তু বিদায় নেবার আগেও আমার কাছে একটা শেষ পরামর্শ বা উপদেশ চায়। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে—পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আমাকে পড়তে দিলে। চিঠিটা লিখেছে ‘বারবারা’ ওর প্রণয়িনী। লিখেছে যে তাদের প্রণয়ী লীলা গোপন রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব নয়। ওর বাবা ওদের মিলনের প্রচণ্ড বিরোধী—আর বাবার ওই প্রচণ্ড জেদেব বিচ্ছেদ

পাঁড়ানোর মত শাইসও ওঁর নেই। ওঁই বাবরার ঠিক করেছে ও গোপনে রোম ছেড়ে চলে যাবে—যেসিকে ছুঁতোষ বার। একা নিঃস্বল আশ্রয়হীনা হোসেও বিধা করবে না এই নিষ্ঠুর জগতের নরক সখাতের সুখোযুথী হয়ে পাঁড়তে।

—“বসিও সত্যিই তুমি ভয়বশের ছেলে হও তবে কখনই তুমি বাবরাকে পরিত্যাগ করবে না। তার বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেও তোমার তাকে বিয়ে করা উচিত—” আমার মত তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে আলোচনা করার পর ওর মনটা শান্ত হোলো। স্থির ভাবে গুনলো সব। শেষে যাবার সময় জানিয়ে গেল যে, বাবরাকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না।

কয়েক দিন পরই একটি লক্ষ্যার আমি বিহানারা ঠিক করছিলাম—এমন সময় হঠাৎ দরবার পাঁজা ছুটো সজ্জার খুল গেলো, আর ঘরে এসে ঢুকলো একটি তরুণী সন্ন্যাসিনী। উদ্ভেজনার, প্রান্তিতে ঝাঁকতে ঝাঁকতে ঢুকেই আমার পায়ের তলার আছড়ে পড়লো। তখন চিনলাম, ডাক্তারের প্রায়শিনী, ফরাসী শিক্ষকের মেয়ে বাবরা। উদ্ভাসিত কান্নার ভেত্রে পড়ে ও বাবর আমার করুণা ভিক্ষা করতে লাগলো।

লক্ষ্যার আধো অন্ধকারে হুঁতাসিনী তরুণীর অজ্ঞসিত লাবণ্য-চলন সুখান্নার আবেশনে কোন পাবাণ স্বপ্নই স্থির থাকতে পারে না।

—“কিন্তু ব্যাপার কি, ডাক্তারই বা গেল কোথায়?”

—“তাকে পুলিশে ধরছে। হুঁজনে মিলে আসছিলাম। যেই লেখলাম পুলিশের গাড়ীতে ওকে টেনে তুললো, তখন মনে হোলো এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। এখন যদি কোনো নিরাপদ আশ্রয় না পাই তা হলে যে বরাত্তে কি আছে তা ভাবতেও পারি না। সবার প্রথমে আপনার কথা মনে পড়লো—তাই তখন এখানে চলে এলাম—”

—“কিন্তু এখন তো অনেক রাত! কাল ভোরে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?”

—“কিন্তু ভাববেন না। আজ রাতটা আমার আশ্রয় দিন। কাল ভোরে উঠই চলে যাবো—বাবরার অজ্ঞানত্ব বর কৈপে কৈপে উঠতে লাগলো—“আমাকে এই বেশে কেউ চিনতে পারবে না। আমি রোম ছেড়ে চলে যাবো—কোথায় যাবো জানি না—শুধু জানি বন্ধন না বরণ আসে ততক্ষণ আমার চলা ফুরাবে না—”

আমি জোর করে ওকে আমার বিহানার গুইয়ে দিলাম। সপ্তা রাত কাটলো চিন্তায়। ভোরে উঠই ওকে কিছু না জানিয়েই ঘেরিয়ে পড়লাম—ইচ্ছা ছিলো বাবরার বাবার কাছে গিয়ে বুকিয়ে ছকিয়ে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি, বাতে ওকে কমা করে জেঁকে নেন। কিন্তু হোলো না। বাড়ী থেকে বেরোতেই মনে হোলো আমার পোছনেও চর লেগেছে। তাই সে পথে আর না গিয়ে সোজা একটা কাকতে ঢুক এক গ্রাস চকোলেটের জড়ায় দিলাম। কার্ডিভাল একোরাভাইভার বাড়িতে আমি থাকি। এ অবস্থায় যদি আমার বাড়ীতে পুলিশ সার্চ হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত অস্বীকৃত্য, আর অসম্মানজনক ব্যাপার হবে।

বাড়ী ফিরে এলাম। প্রথমেই কাজ হোলো বাবরাকে জোর করে কিছু খাওয়ানো। কিন্তু এক টুকরো বিকিট আর একটু মদ ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। বাই হোক, একটু মদ হলে ধীরে-স্থিরে ওকে পরামর্শ দিলাম যে সব ব্যাপারটাই কার্ডিভাল একোরাভাইভারকে জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা সব চেয়ে ভালো। আপাততঃ তাঁর সহ-লেখা করার অমুমতি চেয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। বাবরার রাজী হোলো। ফরাসী ভাষায় ছোটো কয়েক লাইনে লিখলো—‘মহাশয়, সম্ভ্রান্ত শরীরে মেয়ে আমি। অবস্থা বিপর্যয়ে সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে চলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাক্ষাতে আমার নাম আর পরিচয় জানাবার প্রার্থনা করি। আপনি মহামুভব, আমার এই অমরোগটুকু রাখবেন। আমার আশা আছে, আপনার উদার মহৎ স্তনয় আমার সম্মান বাঁচাবার জন্তে আমার সাহায্য এগিয়ে আসবেন।’

—“কিন্তু লুকিও না, সব কথাই তাঁকে খুলে বোলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি একটা না একটা ব্যবস্থা করবেন।”

চিঠি পাঠিয়ে দেবার পর, কি একটা কাজে আমি বেরিয়েছিলাম, বোধ হয় এক ঘণ্টার বেশী হবে না। ফিরে এসে দেখি, ঘর শূন্য। বাবরা নেই। বাবরার সময় কার্ডিভালের সঙ্গে একত্রেই খেতে বসেছিলাম। সারাক্ষণ একটি কথাও আমি বলিনি—নিঃশব্দেই খেয়ে বাছিলাম। কিন্তু এখার-ওখারের টুকরো কথা থেকে বুঝতে বাকী রইলো না যে, বাবরার ইতিমধ্যেই ওঁর আশ্রয়ে এসে পড়েছে।

পুরো দুদিন কেটে গেলো। কোনো খবরই শেলাম না আর। পরে একোরাভাইভা নিজেই আমাকে জানালেন যে, বাবরারাকে সমস্ত খরচ দিয়ে একটি কনভেন্টে ভর্তি করে দিয়েছেন। বত দিন না ডাক্তার ফিরে আসে, ওকে বিয়ে করার জন্তে প্রস্তুত হয়, তত দিন ও ওখানেই থাকবে।

কিন্তু আমার হুঁজাগো ব্যাপারটা এখানে এসেই থেমে গেল না। যেই ছোট নাটকীয় ব্যাপারটি ঘটছিলো, তাতে নাটকটি ক্ষুদ্র হোলোও তার পাত্র-পাত্রীরা যে কেউই জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত তুচ্ছ ন’ন। অতএব কয়েক দিনের মধ্যেই সারা রোম জানলো যে, আমি নিজের কোনো দুঃখভিক্ষা সাধনের জন্তেই বাবরাকে একটি রাতের আশ্রয় দিয়েছিলাম। অবশ্য এসব গুজবে প্রথমটা আমি কানও দিইনি—কিন্তু মধ্যাহ্নিক ভাবেই দিতে হোলো তখন, যখন লক্ষ্য করলাম কার্ডিভাল একোরাভাইভার দিন-দিন আমার প্রতি কেমন যেন নিশ্চ-এড়িয়ে যাবার মত ব্যবহার করছেন। সত্যিই ব্যথা পেলাম সেদিন।

তার পরই একদিন আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়ে গম্ভীর ভাবে জানালেন—“তাপো, এই বাবরার ভালাকোরাদের ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হোলে উঠছে—শুধু তাই নয়, রীতিমত অসহ্য হোলে উঠছে। সবাই বলাবলি করছে, বাবরার অপর্যায় আর ডাক্তারের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তুমি আর আমি নিজেরের কোনো উদ্বেগ সাধন করছি। যদিও এসব কুংসা বটনাকে আমি আন্তরিক ভাবে মূল্য কব্বি, তবুও খোলাখুলি ভাবে এসব সহ্য করাও আমার ক্ষমতার বাইরে। তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি রোম ছেড়ে চলে যাও। বাতে লোকের মনে বিদ্মোহও সন্দেহ না হয়, তোমার

সন্ধান বাতে অন্ধৰ থাকে, সে ভাৱ আমাৰ। তা ছাড়া আমাৰ  
হৃদয়ত আৰ শ্ৰদ্ধা থেকে তুমি কখনও বঞ্চিত হবো না। হৃৎকোঁৱ  
না। তোমাৰ এই তো দেশ-ভ্রমণৰ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়স।  
বেশ কৰে ভেবে বলা, কোন দেশে তোমাৰ সবচেয়ে বেশী বাবাব ইচ্ছা।  
সারা পৃথিবী জুড়ে আমাৰ বন্ধু, পরিচিত ও অস্বজনের অভাব নেই।  
যেখানেই তুমি যাবে আমি চিঠি দেবো, যাতে কোথাওই তোমাৰ  
কাজকৰ্ম, কিছুই অভাব না হয়। এখন সন্তোষের মধ্যেই তুমি  
যোম ছাড়বার জন্তে তৈরী হও। আজ রাতটা বেশ ভালো কৰে  
চিন্তা কৰে কাল সকালে আমাকে জানিও, কি ঠিক কৰলে।”

চলে এলাম। সমস্ত মনটা তীব্র বায়ৱ টন-টন কৰে উঠলো  
এই আকস্মিক আঘাতে। ফুক, ভাৱাক্ৰান্ত মনে কাটলো নিজস্ব  
রাত—কোনো পথ নেই—কোনো উপায় নেই। সকালবেলা দেখা  
কৰতে বাবাব সময় অবধি কি বলবো, কিছুই ঠিক কৰতে পায়লাম না।  
ভোৱবেলা বাগানে সেক্ৰেটাৱীৰ সঙ্গে উনি বেড়াছিলেন।  
আমাকে দেখেই তাঁকে বিদায় কৰে দিলেন। আমি যথাসাধ্য ঠেকে  
বোকাবাব চেষ্টা কৰলাম, কি হৃৎকোঁৱ বন্ধুত্ব আমাৰ সারা রাত  
কেটেছে। সমবায়ীৰ মতই সব শুনলেন কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুৱানো  
প্রশ্নের পুনৰাবৃত্তি—কোথায় বাবাব ঠিক কৰছি—

—“কনস্তান্তিনোপল্”—হৃৎকোঁৱ, কোভে, হতাশায় চৈতন্য  
উঠলো।

—“কনস্তান্তিনোপল্। সে কি।”

—হ্যাঁ মহাশয়।” “কনস্তান্তিনোপল্”—অজস্র উত্তর  
আমাৰ।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। তাৰ পৰা মুহূৰ্ত্তে উনি বললেন  
—“বন্ধুত্ব, তুমি যে ইম্পাছন বলনি তাই যথেষ্ট। বাক, আমি  
তোমাকে পাশপোর্ট দেবো। তাছাড়া এবাৰ তুমি বন্ধুত্ব লোকৰ  
কাছে বলে বেড়াতে পাবো যে আমি তোমাকে কনস্তান্তিনোপল্  
পাঠাচ্ছি—আমাৰ মনে হয় কেউই তোমাৰ কথা বিশ্বাস কৰবে না—”

হোটলে কিৰে এসে আমাৰ প্রথমই মনে হোলো, হয় আমি  
পাগল, নয়তো কোনো অজ্ঞাত অশরীৰী শক্তি আমাৰ ভাগ্য  
নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। জানি না, এত দেশ থাকতে কেন কনস্তান্তিনোপল  
বললাম—জানি না সেখানে গিৰে আমি কি কৰবো! শুধু আমি  
যে সেখানেই আমি বাবো।

হুদিন পৰা কাৰ্ডিষ্টাৰলৈ কাছ থেকে ভেনিসৰ এন্ট পাশপোর্ট  
এলো, সঙ্গে একটি বন্ধু থাম। ঠিকানা লেখা,  
Osman Bonneval. Pasha of Caramania.  
Constantinople.

আবও একটি মোড়কে সাত শ' মুত্ৰা!

[ কবিতা : ]

অমুবাৱিকা—শান্তা বন্ধু।

## ধূসৰ হৃদয়

শ্ৰীশঙ্কৰকুমাৰ মুখোপাধ্যায়

একটি ধূসৰ হৃদয় সন্ধ্যায় ছায়া মুছে কিৰে,  
তুলে ফেলে নিয়ে যায় বত দেখে ফুল ;  
বুড়ী-মাথা শাদা চুল শোণ নদী গিৰে  
ছড়াতেছে বায়ে বায়ে জীবনের অভিশপ্ত ফুল  
নিভুতে সে দেখে নেয় সজীবের দেয়ায় ফুলক  
সেই কাঁকে এলোমেলো ডানা মেলে উড়ে চলে বক।

কিছু না চেয়ে সে হৃদয় ফলালো ফসল ; আবাব  
হেমন্তের মাঠে মাঠে শিশিরের জলসেচ কৰে  
কাঁড়াল মাটির 'পরে স্থির চোখ নিৰে। বাবাব  
সময় তার চোখ ছুটি জ্বলে গেল ভবে,  
হাৱায়ে কেলেছে আল অবসরের পরম আছাদ  
ম্রিয়মাণ সে ব্যথায় উঁকি দেয় দ্বিতীয় চান ;

মোঠা-পথ ধৰে কাল শুণে চলে অলসের মত  
শাদা কাশফুল শোণ নদী বালুর দগড়  
শুণে আছে যেন শাদা শেকালীৰ বিছানার 'পৰ  
তার ভোঁতা অল্পভুক্তিগুলি মস্ত হয়ে ছোটো বত ;  
বুনে চলে সেই ক্ষেতে অবসাদময় আশা  
তবু সে যে স্থির হয়ে ঝুঁকে থাকে মেটে না শিপাস

হেঁটে চলে থেমে পাড়ে ভাবে আব ভাবে কত কথা  
চেয়ে থাকে দূৰবানী ভাৱভাৱা ৰান্তের আকাশে,  
শুধোবাব কিছু নেই ভাষা তার শুধু নীরবতা  
হৃদয় মননে চেয়ে থাকে ব্যাকুল বাতাসে ;  
তার পরে বীৰে বীৰে জীবনেতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে  
থেমে পাড়ে হেঁটে চলে নদী-তীরে নিরাশ হৃদয়ে ;

ধূসৰ হৃদয় নিয়ে মোরা জীবনের খুঁজি মানে

সব শেষে বলি তাহা বড় গ্রানিময়,

বত আশা জমা রেখে মরণের অভিশানে

প্রমাণিত হয় মোরা নিরাশ নিৰ্ভয় ;

পরম সান্নিধ্য তাই বাঁচিয়া র'ব বত কাল

ফুল মোরা কবি বটে ধরি নাকো বাঁকা পথে হাল।

# শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

তত্ত্ব দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)

[আমাদের ভারত-সাহিত্যে বাঙলা দেশের অন্ততমা সুকৃতা স্বর্গতা তত্ত্ব দত্তর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। অনেকেই লেখিকাকে ইংরাজী ভাষার কবি হিসাবে জানেন, কিন্তু মূল ফরাসী ভাষাতেও কবির পূরা দখল ছিল এবং ঐ ভাষাতে তিনি একধাণি উপভাস রচনা করেন, যার নাম "Le Journal de Mm d' Arvcs" বা "শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী।" এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা Clarisse বই প্রকাশিত হয় ইং ১৮৭১ অব্দে, শ্রীমতী দত্তর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই। গ্রন্থের ভূমিকার লেখা আছে, এই উপভাসের লেখিকা হিসাবেই তত্ত্ব দত্ত ফরাসী সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। এই বই ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রপূর্ণ ভাইসরয় লর্ড লিটনকে উৎসর্গ করেন লেখিকার পিতা গোর্খিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়। অজ্ঞাবাক মূল ফরাসী থেকে এই বিখ্যাত উপভাস মাসিক বসুমতীর জন্ত তর্জমা করেছেন।

কলকাতার জনৈক খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা তত্ত্ব দত্ত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যা অরু এবং কনিষ্ঠা তত্ত্ব তাঁদের পিতার সঙ্গে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে দুই বোন ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষার দক্ষতা অর্জন করেন। কেথি জ ও সেন্ট লিনেনার্ডসে তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তত্ত্ব সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে কলকাতার কয়েকটি সাময়িক পত্রে তত্ত্ব স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামক তৎকালীন পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৭৪ অব্দে যক্ষাক্রান্ত হয়ে অকুর মৃত্যু হয়। দু'বছরের মধ্যে তত্ত্বও ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় দুই বোনের লেখার প্রচুর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অরু এবং তত্ত্ব দু'জনেই স্বসঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন। হ'জনেই ছিলেন অবিবাহিতা। তত্ত্বর মৃত্যুর পর ফরাসী ভাষায় রচিত শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী পুস্তকাবে প্রকাশিত হয়।

তত্ত্বর মৃত্যুকাল ৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৭ অব্দে।—স]

২০শে আগষ্ট ১৮৬০।—আজ আমার জন্মদিন। এখন আমি পঞ্চদশী। পাঁচ বছর বাদেই আমার বয়স হবে কুড়ি। সময় উড়ে চলেছে। আমার মা-মণি আজ বড় ব্যস্ত—আমার খাতিরে বাড়ীতে আজ বিরাট ভোজ হবে। অতি সুখে কয়েকটা বছর যে কনভেন্টে কাটিয়েছি, তা অল্প দিন হল ছেড়ে এসেছি। এখানে পৌঁছেছি গত পরশু। কনভেন্টে সিঁঠবার সবাই আমাকে কিছু উপহার দিয়েছেন। তাঁদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি বাবার সাথে, তাই অভিব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সবাই, বিশেষতঃ ভগিনী ভেরোনিক; আমার পাশে বহুক্ষণ তিনি বেনীর সামনে প্রার্থনা করলেন, তারপর আমার আলিঙ্গন জানিয়ে ছোট একটি রুপোর ক্রুশ দিলেন আমার হাতে।

"এটা তোর স্বপ্নেরই পরিচায়ক, বুঝলি?" আমার গলায় একটি কালো কিতে দিয়ে সেটি বাঁধতে বাঁধতে তিনি বললেন, "অনেক সঙ্কট মুহূর্তে এর কাছে আমি পেয়েছি সাহায্য; তোর প্রয়োজনের সময় তাকেও এ সাহায্য দেবে; সর্বদা তাঁর কথা মরণে রাখিস যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ য়ে; আমি জানি কত কোমল তোর অন্তর, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে কত তোর আস্থা। সব বিপদের মাঝে তিনিই তাকে রক্ষা করবেন, তিনিই তাকে ধন্য করবেন তাঁর আশীর্বে।" ভগিনী ভেরোনিককে ছেড়ে আসার সময় আমি খুব কঁদে-  
লাম। কারণ, বত দিন আমি কনভেন্টে ছিলাম, সব সময় তাঁকে

আমার বড় বোনকেই মত মনে হয়েছিলে।—বসবার ঘরে বাবা আমার জন্য অশ্রু করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই শান্তির প্রবাস ত্যাগ করে এলাম। বাবাকে দেখে যে কী আনন্দ হল! বাড়ী বাবার পথে কত বার যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম! আমার দেখার আনন্দে তাঁর মুখেও হাসির বিরাম ছিল না।

"জারে থুকি", তিনি বললেন, "তুই কত বড় হয়েছিস, কি সুন্দর হয়েছিস; তোর মা তাকে দেখে চিনতেই পারবেন না।"

"আমায় তাহলে ভালই দেখছে?"

"খাসা দেখছে রে থুকি।"

"হাঃ, তুমি শুধুই বানিয়ে বলছ।" শ্রীমতী ল্যমোইন বললেন যে আমার গাল দুটো যেন একটু বেশী লাল, আর আমার গায়ের রং একটু চাপা, কিন্তু জান বাবা, তাঁর রঙ, তিনি গৌর যেন—

"গৌর যেন পাকা গমের..." বাবা হাসতে হাসতে গেয়ে উঠলেন।

"এত হাসের উপমা।"

"সে কি রে, তোদের কনভেন্টে ঘ্রাসে পড়ান হয়?"

"হয় না, তবে সেই ইংরেজ মহিলা, শ্রীমতী বার্থা ক্রিঞ্চ, তাঁর কাছে ত ফরাসী কাব্যের এক সঙ্গলন আছে; তিনিই আমার দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তা কি বলছিলি সেই গৌরবর্ণা সুন্দরীর কথা?"

"ওহো শ্রীমতী ল্যামোইন!" আমি টেবিলে উঠলাম, "সত্যি পাশ, কি সুন্দর তিনি, 'আর কি ফর্সা, কি তাঁর সোনালী চুলের পাশে! তাঁর কথাই তোমার বলব।' বয়সে তিনি শ্রীমতী ল্যামোইনের চেয়ে ছোট্ট, কিন্তু তাঁকেই যেন বড় বলে মনে হয়। খুব ভাল লোক। জান বাবা, যখন শ্রীমতী ল্যামোইন আমার অন্তিমতা ও বেথাপ আচরণ দেখে হাসি-ঠাট্টা করতেন (অবশ্য তাঁর কোনই দোষ ছিল না, কারণ প্রথম প্রথম সত্যি আমি বড় যেমানান ব্যবহার করতাম), তখন ভগিনী ডেবোনিকই ছিলেন আমার সহায় আর তিনিই আমায় শিখিয়ে দিতেন কি ভাবে কি করা দরকার। জান, প্রথম মাসটা তোমার আর মা-মণির কথা ভেবে এত ব্যাকুল হয়ে পড়তাম যে আমার ছোট্ট ঘরটিতে বসে শুধু কীদতায় আর ভগবানকে ডাকতাম; তাই দেখে ভগিনী ডেবোনিক আমায় প্রীতি খুব সবর হয়ে উঠলেন। তাঁর বাবা ও মা হুজনেই মারা গেছেন; আমাকে তাঁদের কথা তিনি বলতেন, আর বলতেন তাঁর ভাইয়ের কথা; যে খুব ছোট্ট বেলাতেই মারা যায়, আর তাঁর এক খুড়তুত ভাইয়ের কথা, যিনি একটা জাহাজের ক্যাপ্তেন ছিলেন এবং সে বার যখন তাঁর জাহাজ ডুবে যায় তখন আর সবার সঙ্গে তিনিও মারা যান; সেই থেকে ভগিনী ডেবোনিক সন্ন্যাস নেন।"

এই ভাবে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। পরদিন সকালে বাড়ী পৌঁছলাম। দেখি, দরজায় মা-মণি আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম।

"মা, মা গো!"

"আর বাছা!"

এত দিনের বিচ্ছেদের পর আমায় দেখে বাবা খুব তৃপ্ত, খুব উৎফুল্ল হয়ে পড়েছেন। মায়ের সঙ্গে আজ আমি রান্নাঘরে বসে আছি দেখে তিনি আমায় বললেন, ও-সব ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে।

"আরও বললেন, 'আজ যে তোরা জন্মদিন!'"

মা আর আমি রান্নাঘরে কিছু বিশেষ রকম রান্নাবান্না আয়োজন করছিলাম। কাছাকাছি ভাল রান্নাঘরের হমিশ মেলা ভার। আজ সন্ধ্যায় অনেকেই আসবেন আমাদের এখানে। পুন্ডারভেন-এর জমিদার-গিন্নী তাঁর দুই ছেলে নিয়ে আসবেন। বড় ছেলে, যে বর্তমান জমিদার, তাঁর বয়স খুবই কম, আর তেরো কাল সন্ধ্যায় বলছিল যে ছোট্ট "রান্নাঘরের মত দেখতে"। সে আমার ছেলে-বোকার বন্ধু ছিল, কিন্তু কনভেন্টে যাবার পর আর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি, তা প্রায় চার বছর হল; আর ছোট্টদের ত কোন কিছু ভুলতে সময় লাগে না।

আমার মা সাজ-গোজ করতে গেলেন। কারণ ছটা বাজে প্রায়, আর আমাদের খাওয়া সাতটায়। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, এলো চলে আমি টেবিলের সামনে বসে আছি।

"সে কি থুকি, কি করছিস এখনো?" আমার চলে হাত বুলিয়ে তিনি তাড়া লাগালেন। "আর সময় নষ্ট করিস না। সত্যি বলতে কি, মার্গারিৎ, তোর এই চুলের রাশি বাঁধতেই ত হুঁশুটা লাগবে।"

এই বলে তিনি আমার কালো চুলের গোছা দুই হাতে তুলে

ধরলেন কতটা বেশ-প্রাচুর্যে গরিত হয়ে। তারপর আমার কপাল চূষন করলেন।

"খুব সুন্দর করে সেজে নে ত; তুই নীল রিবণ পরলে তোর বাবা খুব প্রীত হন।"

"—আর যখন সাদা মসলিন পরি—তাই না?"

"—হ্যাঁ মা!"

তারপর আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। ওই বাঃ! ঘড়িটা বেজে উঠল: সাড়ে ছটা। এইবার থামি।

২১শে আগষ্ট, ১৮৬০।—ওঃ, কাল সন্ধ্যায় কি ভালোই কাটল! আমায় সবাই জানালেন অভিনন্দন, আর আমায় স্বাস্থ্য-কামনা করে প্রত্যেকেই জাম্পেন পান করলেন। নাঃ, স্ত্রু দিয়েই স্ত্রু করা বাক। বসবার ঘরে ঢুক দেখি ইতিমধ্যেই মাশাম গোসরেল আর তাঁর কত্যা উপস্থিত। আমার মার সঙ্গে তাঁরা গল্প করছিলেন। বাবা আমায় কানে কানে বললেন যে বেকুলের নামে আমি পরিচিত তারই মত নাকি সুন্দর লাগছে আমায়। শ্রীমতী গোসরেল সাগরে আমার হাত ধরলেন।

"এই তো, থুকি এসেছে," সে বলল, "কত বড় হয়ে গেছে, না মা?"

শ্রীমতী যোকোবী গোসরেল সারা দেশে সুন্দরী বলে খ্যাত আমার চেয়ে বয়সে বড়; বোধ হয় ছাফিস হচ্ছে; নির্ধ তত্ত্ব ঈশ্বর লাগতে সোনালী চুলগুলি মাথার চার পাশে আলোক-মণ্ডলেন মত শোভা পায়; হালকা নীল অথচ অতি প্রাণের চোখ দুটি উন্নত টিকোল নাক; ঠোঁট দুটি যেন একটু বেশী পাতলা, আর ঠাঁতগুলি সুবিস্তৃত, স্ফটিক। মুখে হাসি লেগেই আছে; বাবা বললেন দস্তকটি দেখানোই তার উদ্দেশ্য; আমার বাপু তা মনে হয় না। হাসি না পেলে কি হাসা সম্ভব? তা ছাড়া বাবা ত আমার সঙ্গে এমন মন্তব্য হামেশাই করেন। শ্রীমতী গোসরেলের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল আর শুনলাম পুন্ডারভেন জমিদার-গিন্নী ও তাঁর ছোট্ট ছেলে গান্ধ এ এসেছেন। আমার তাঁদের কাছে গেলেন ও জমিদার-গিন্নীকে সোফায় বসিয়ে দিলেন।

"কই মার্গারিৎ কই?" সহাস্য শব্দে বেরিয়ে এল।

ইঙ্গিতে মা আমায় তাঁদের কাছে ডাকলেন; উঠে গেলাম জমিদার-গিন্নী আমার দুই হাত চেপে ধরে পাশে নিয়ে বসালে বহুকণ চেয়ে বইলেন আমার দিকে।

"কি সুন্দর, কি জমায়িক!" বলে ওঠ দিয়ে আমার ললাট করলেন তিনি। হালকা স্বরে তাঁর পর বলে চললেন, "বুঝলি বা প্রাসাদে তুই এত ঘন ঘন আসতিস আমার ছানোয়া ও গান্ধর? যে তুই-তোকারি করেই তোর সাথে কথা বলতে আমি আসছিলাম। নিজের সন্তান মনে করেই তোকে আজ দেখতে এল ছানোয়াকে দেখলে তুই বোধ হয় চিনতেই পারবি না?"

"না, বোধ হয় না; তখন আমি ত নেহাৎ শিশু ছিলাম।"

"এখন আমার তুই কি হয়েছিস থুকি?" মধুর হাসি ছা তিনি বলেই চললেন, "এই ত সবে পনের বছর হল; আমার ছানো হল তেইশ বছর।"

আবার সেই দরজা খুলে গেল, "ওই দেখ কে এল; কি ওকে দেখতে না?" মাতৃহৃদয় গর্বের সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন

—“হ্যাঁ।”

কথাটা আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, কারণ তার পেছনে অতি বড় সত্য ছিল। অপরূপ সে সৌন্দর্য। স্বদীর্ঘ চেহারা, অনেক হরত একহারায়ে বলবেন; মাথার চুলগুলি কালো, কৌকড়ান, কাঁধ অধি লম্বিত। দিবি আয়ত গভীর ছুটি চোখ; ললাটে আভিজাত্য; স্তম্ভিত টোটার ওপর স্বল্প গৌণের বেথা; গানের রঙটা অনেকটা মেয়েলি ধরনের সাদা, বা দেখে বোঝা যায় কোনও সম্ভ্রান্ত কন্যেই তার জন্ম। ইগারার তার মা তাকে কাছে ডাকলেন।

“এই দেখে ছানোয়া, এই যে মার্গরিৎ। কত বড় হয়ে গেছে না?”

আমার লে সজ্জ্ব অভিবান জানাল। জমিদার-গিন্নী তাকে নিজের পাশেই বসালেন।

“নাও বাছারা, করমর্দন কর,” মুহূর্তে তিনি বললেন, “এমন দিন ছিল যখন তোমরা বিনা বিধায় পরস্পরকে আশ্রিত করতে।”

আমি লাল হয়ে উঠলাম। তিনি আমার হাতটা নিয়ে জমিদারের হাতে দিতে সে হেসে বলল, “মা’শি, তুমি যে সজ্জ্বেরই মত বাৎসল্য ও মাধুর্য গড়া, তাই খেয়াল করনি যে শ্রীমতী গোস্বেরল আমাদের লক্ষ্য করছেন।”

“দেখছে, দেখুক!” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি ত কিছু অজ্ঞায় করছি না।”—আমি হাতটা সরিয়ে নিতে তিনি একটু বেন চেঁচিয়েই উঠলেন, তার পর আমার শিরচূষন করলেন; আমার মাথার হাত বুলিয়ে তিনি হেলের দিকে ফিরে বললেন, “ভাবি চমৎকার দেখতে মা আমার, তাই না?”

“হ্যাঁ মা,” সে পাণ্টা জবাব দিল, “কিন্তু তোমার চেয়েও কি বেশী?”

২২শে আগষ্ট। আজ সকালে বাবা আর আমি বনে গিয়েছিলাম;

সেখানে জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তুঁত আর জলী বেরি খেতে খেতে মুখ আমার ফলের রসে রঙীন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ঘোড়ার খয়ের লক্ষ তনে দেখি ওরা আসছে। আমি পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, কারণ এমন আলুখালু চুল ও বেঙনে মুখে ত কারো সামনে যাওয়া চলে না। কিন্তু বাবা আমার হাত ধরে ফেরালেন। দুটো মিতে তার চোখ ভরে উঠল।

“এই দেখে ছানোয়া, জলী এই গেরো মেয়েটাকে দেখ,” হাসিতে তিনি ফেটে পড়লেন।

“না, জেনেরাল, বরং বলুন বনপরি।” ঘনিষ্ঠ তার স্বর।

আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবে কি ও বলতে চায় যে এই অবিস্মৃত বংশেই আমি বেশী শ্রমের লাগি?—দুপুর অবধি আমরা গল্প করে বাড়ী ফিরলাম। জমিদার জানতে চাইল কবে আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাব।

“দিন পনের আগের নয়,” বাবাই আমার হয়ে উত্তর দিলেন। “বুকে ছানোয়া,” আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, “এত দিন ও আমাদের কাছছাড়া হয়ে থাকায় এখন এক দণ্ডও ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারছি না। তবে যদি তোমার মা বলেন ত দু’তিন সপ্তাহের মধ্যেই ও তোমাদের ওখানে যাবে।”

এই প্রতিক্রিয়া পেয়ে ও ভারী স্থবী হল। যাবার সময় তাই বলে গেল যে, তার মা সর্বদাই আমার পথ চেয়ে বসে থাকবেন সাগ্রহে।

[ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথীজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়।

## বুদ্ধ শরৎ গচ্ছামি

চণ্ডী সেনগুপ্ত

পৃথিবীর বসতা আবিলতা, বসতা মলিনতা তুল

সব মুছে গেল তোমার পরশে স্বর্ষিক,

আলোর দিশারী প্রেমবস্ত্রের পাখাশে ফোটালে সুল

স্বর্ষ তোমার জ্যোতিতে তুচ্ছ নির্নিবন্ধ।

সৌম্য, তোমার জ্ঞানের দীপ্তি তাবর

শাশ্বত চির অনন্ত অবিনশ্বর

বাঁচার মন্ত্রে জাগালে জগৎ চিসর

দিগন্ত আরও বাগী-মুখরিত অক্ষর।

গোপন হিংসা কপট দীর্ঘবাস

মোছালে কবির মিথ্যার নাগপাশ

ছিঁড়ে ফেলে দিলে। ত্যাসের মহিমা ছড়ালে জগতময়

বাজির শেষে স্বর্ষ উঠল। সত্যের হোল জ্বর।

তবীর সেবতা তোমার পরশে পবিত্র হোল জ্বর

স্বিচ্ছ তোমার শরণ মাগিল দিক-দিগন্ত বধ।

# ফল্সা-বিলাস



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]  
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সে আজ অনেক যুগের কথা—

তুফানার্ঘ একদা বিতারী হ'য়ে নিখিল সম্পদের নিকেতন  
তার বালাবন্ধু বিজ্ঞান-পুত্র ধনাধিনাথ কুবেরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে  
বলেছিলেন— ৩৮

“সখে, পূর্ণ তোমার বৈভব। দেবদৈত্যের নিখিল ঐশ্বর্য তুমি জয়  
ক'রে বসে আছ। তোমার বৈভব স্তম্ভনদের দান করে পরমানন্দ,  
শত্রুদের দান করে শোক। কিন্তু তোমার মত ধনাধিনাথ বন্ধু  
থাকতেও আমি নিঃশ্ব, বল কুটুম্বের ভারে আমি আর্স্ত। যে মিত্র  
দুঃখে দুখী সখে সখী, দু পক্ষ স্বাধীন বলেই সম্ভব হয় যেখানে মৈত্রীর  
বিশ প্রশংসা করে সেই মিত্রকে। ৩৯-৪০

যশোক্ষেত্রে বীর যথাযোগ্য আদর প্রবৃত্ত বিস্তরণ করে থাকেন,  
বীরের বৈভব উপলব্ধিকা হয়ে পীড়ায় প্রার্থীদের, আমার মতে,  
অভিজ্ঞাত-বংশজন্মাদের মধ্যে তাঁরাই মহৎ। এবং তাঁদের দ্রী সৌভাগ্য  
সুস্থদের উপভোগ্য। ৪১

তোমার ঐ কৌবের ধন... যেটিকে তুমি সবচেয়ে রক্ষা ক'রে রেখেছ,  
স্নেহ-বুদ্ধির পুণ্য বলে যেটি আজ সত্যই সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে... সেই  
ধন যেমন সম্পদে বিপদে ত্রাণস্বরূপ হয়ে পীড়ায়, মিত্রও তেমনি সর্বত্র  
রক্ষিত হ'লে বা স্নেহে পুষ্ট হ'লে ত্রাণ-স্বরূপ হয়ে ওঠে।” ৪২

দৈত্যচাৰ্য নিঃশব্দে যখন কুবেরকে এই কথাগুলি বললেন কুবেরের  
তখন মনে হল... স্নেহ ও লোভ... দুটিতে মিলে যেন তাঁকে শ্রেষ্ঠার  
ক'রে ফেলেছে। বসে বসে কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন, তার পরে  
বললেন—

“তোমায় আমি জানি, তুমি আমার বালাবন্ধু; আমার উপরে  
তোমার স্নেহের আত্মাত্মিকতা আমার অবদিত নয়। কিন্তু বন্ধু,  
দুঃখের বিষয়, বহুটুকাল আমি বাঁচব ততটুকাল বিশ্বাক্ষিত ধনের  
বা গচ্ছিত দ্রব্যাদির এতটুকুও পরিভাগ্য করার মালিক আমি  
নই। ৪৪

সেহাৰ্থী বন্ধু-বান্ধব নানান কার্য-সূত্রে মিত্র হয়ে ওঠে। অনেক  
পত্নী পাওয়া যায়, সম্ভান-সম্ভতিও পাওয়া যায়, জগতে তারা সুলভ,  
কিন্তু বন্ধু, ত্রিভুবনে ধনী একমাত্র হলুত। ৪৫

অর্থের দান-স্বরূপ করা একটি অতিসাহসের ব্যাপার; অতি  
দুঃস্ব, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। শরীরটিকেও মানুষ দান করতে রাজী হয়,  
কিন্তু এক কথা বিত্ত কখনও সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়।” ৪৬

ঐশ্বের যিনি রাজা, সেই কুবের প্রত্যাখ্যান করলেন তাকে।

আশায় জগাঙ্গল দিয়ে ভয়মুখ, লজ্জাবদ্ধ, উত্তেজনা উৎসে  
বুদ্ধি তাঁর কাঁপছে, প্রস্থান করলেন তুফ। ৪৭

গৃহে ফিরে এলেন। ভাবতে লাগলেন। সহযোগীদের সঙ্গে  
পরামর্শ করলেন। তার পরে মহাযোগী স্থির করলেন, মায়াবলে  
হরণ করবেন কুবেরের অশ্বৈর্য ধনত্রয়। এবং প্রবেশ করলেন ধনেশের  
হৃদয়ে। ৪৮

বিজ্ঞান-পুত্র কুবের। তাঁর মধ্যে যেই তুফানার আবিষ্টি হল,  
অমনি ঘটে গেল এক অসম্ভব কাণ্ড! কুবের সমস্ত কিছুই ত্যাগ  
করতে লাগলেন। অদ্ভুত ত্যাগ! তুফ-সংকীর্ণিত ব্রাহ্মণদের হস্তে  
তিনি সম্প্রদান করে গিলেন... বিত্ত।

নিখিল কৌবের ধন হরণ ক'রে যখন প্রস্থান করলেন দানবাচার্য  
তখন জ্ঞান হল ধনাধিনাথের। তিনি প্রশংসিত করলেন... মায়ার  
খেলা। শোকে মুহুমান হয়ে পড়লেন। ৫০

আস্থান করলেন “দুঃখ” “দুঃখ” “দুঃখ” “দুঃখ” একত্ব  
দ্বিবা নিধিদের। লগাটে হস্ত হস্ত ক'রে তাঁদের সঙ্গে বসে বসে  
চিন্তা করতে লাগলেন। তুফের বিকৃতি কী অদ্ভুত! তারপরে  
উক নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বললেন— ৫১

“হলনায় ভুলেছি। আমি প্রতারণিত হয়েছি, বিশ্বাসঘাতক।  
যে আমার মর্যজ সুস্থ সেই... তুফই আমাকে বঞ্ছন করেছে।  
সে মায়ারী, অতিলোভী, দুর্ভৃত; দৈত্যদের আশ্রয়ে থেকে সে  
আজ হুঁকর। ৫২।

যার আমি এখন ত্রাণ-হীন। এক মুহূর্তে তুফের মত লজ্জা  
হয়ে গেছি। কার কাছে আমি এই দুঃখের কথা কই? কী  
করি? কোথায় বা বাই? ৫৩

যার ধন নেই, তাঁকে স্বজনেরা ত্যাগ করে; যার জনক  
নেই, তাঁকে পরাস্ত হতে হয়। পরাস্ত হলে শরীরকে আশ্রয় করে  
দারিদ্র... তার নিখিল বিকৃতি নিয়ে। মহাভার সে বিকার। ৫৪

যারা দেহী তাদের প্রিয়জন চলে গেল, ধর্মলতার আলবাল  
গুলিই কেবল ভাঙে; কিন্তু জীবদশার বানের ধনরাশি উদ্ধার  
হয়ে যায়, তাদের সব যায়। ৫৫

বিদ্যান সৌভাগ্যবান, মানী, বিজ্ঞতকীর্তি, কুলোন্নত, সুখ...  
বিত্ত থাকলে সবই হয়; কিন্তু বিত্তহীন হলে সন্তপণও অসম্ভব  
হয়ে যায়।” ৫৬

বলাতে বলতে ঐশ্বর্য-বিবাহের দুইবিধ যন্ত্রণায় যেন জ্বলতে লাগলেন কুবের। আগনে থাক হয়ে যেতে লাগল তাঁর অন্তর। পার্শ্বচরদের সঙ্গে স্ত্রীর পরামর্শ করে তিনি তখন শরণ নিলেন সহায়কর্তা মহেশ্বরের। ৫৭

মহেশ্বর বিশ্বশরণ্য। পূর্ব থেকেই কুবেরের সঙ্গে তিনি সখ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর কাছে যখন কুবের নিবেদন করলেন ঘটনা, তখন শুক্রাচার্যের কাছে দূত পাঠালেন মহেশ্বর। ৫৮

দূত-মুখে আহ্বান পাওয়া মাত্রই শুক্রাচার্য, শক্রজয়ী বিক্রমে সহসা উপস্থিত হয়ে গেলেন মহেশ্বরের পুরোভাগে। ধন-প্রভায় তরলবর্ণ তাঁর দেহ। মুকুটে অঞ্জলি রচনা করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। পূরজিৎ তাঁকে বললেন— ৫৯

“নিখিল প্রাণী যে ধনের ভিত্তিয়ার মিতময় কুবের রক্ষা করেন, পালন করেন সেই ধন। আপনিও কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি তাঁকে সম্মতি বঞ্চনা করেছেন। যে মানুষ কৃতজ্ঞ, সেও কখনো প্রোহচারণ করেন না মিতের। ৬০

অকৃতজ্ঞেরাই বশোধর্মকে গণনার মধ্যে আনে না, ফির্জ্জনে দেয় স্থিতিস্থাপকতা, তারাই দেখা যায় প্রকৃত বঞ্চনা করে। কিন্তু, কুবের আপনার ব্রিহৎ স্তম্ভ, আপনাকে ভালবাসেন, তাঁকে বঞ্চনা করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নি। ৬১

আপনি শোভনপ্রজ্ঞ। এই যে কীটটি আপনি অমুঠান হয়েছেন, এক কাজ কি আপনার প্রাতঃসম্বন্ধ হয়েছে? আপনার ব্রত-ধাণ্য হয়েছে, না, আপনার কুলামরূপ হয়েছে? বধ থেকে যে শশস্তির উদয় হয়, এক্ষেত্রে সেইটিই হয়েছে পরাশু। ৬২

এটি কি নীতিশাস্ত্রসম্মত শোভন অভ্যাস, না, শাস্তির বাক্য? শুক্রজনের কি এই হেন উপদেশ দিয়ে থাকেন? এটি আপনার সহজাত বুদ্ধিবৈভব? আপনার এই বন্ধকতা শাশ্বত। ৬৩

ধনসম্পৎ কারই বা না প্রিয় হয়? ধনের দৌলতে কারই না হৃদয় বিমোহিত হয়? কিন্তু ধারা মশোখনসোভী তাঁরা ধনও ভুলেও দ্রুততির মাধ্যমে আকাজকা করেন না অর্থ। ৬৪

লোভ মল-সদৃশ। অমল আপনার ভুক্ত-বংশ। সেই বিমল গুকে অমরোষ করছি, মলিন করবেন না। শুভ রাজহাসসদেয় শত্রু ছ লোভের মেঘ। ৬৫

অনন্ত কীটিকে বিসর্জন দিয়ে যে ব্যক্তি বাতাস-ব্যাকুল একগাছি র মত ধন-সম্পত্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, আপনিই বলুন, ঘূর্তনের ৭ সে কেমনধারা ঘূর্ত? ৬৬

সামু আচরণে জলাঞ্জলি দিয়ে, ফুটিল ঘূর্ণির বধীভূত হয়ে যে-মাহুধ ক বঞ্চনা করে, সে নিজেকেই ঠাকায়। নিজের সমগ্র পুণ্যভাগ হ বঞ্চিত হয় সেই ঘূর্তবৃক্ষি মনুষ্য। ৬৭

ধানের কলঙ্ক পড়ে যশে, তাঁদের ঘরে কিশলয়ের মত বভাবীলা লক্ষ্মী দেবী বন্ধিনী হয়ে থাকলেও, অপবাদ-বিবৃদ্ধের আমোদে মুহুঁতা হয়েই থাকেন। ৬৮

ধারা সজ্জন তাঁদের শুভ বশঃ বিমল কটিক-বর্ণনের মত; কল্লিষ্ট জনতার নিঃখাসে নিঃখাসে মলিন হয় সেই হুতর। ৬৯

আপনি

পোয়েছে এই অসমঞ্জস্য মস্তিষ্কতম কথা। আপা করি, পাবের ধম ফিরিয়ে দিয়ে আপনি বিস্মৃত করবেন সেই কথা। ৭০

বহুজ্ঞে প্রেক্ষালিত করে ফেলুন অপবাদ-ধূলিধূসর আপনার অদান বশঃ। আমার কথা রাখুন। পাবের ধন হলে দিন। ৭১

ত্রিভুবন-গুরু দেবদেব মহেশ্বর সাহস্রন এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ করা সত্ত্বেও, পাবের ধনে নিবদ্ধ হয়ে রইল শুক্রাচার্যের ডুকা। কৃতাজ্ঞা-করণটু তিনি বললেন— ৭২

“ভগবন্, অমরেশ্বরের কীরটি-শিখরে বিস্ত্রাণ্ডি লাভ করে আপনার শাসন। হে সমুদ্রারি, যে মানুষ মোহবশতঃ সেই শাসন লঙ্ঘন করতে চায়, তার দুর্গতি অবশস্তাবী। ৭৩

ভগবন্, যে মানুষ নির্ধন হয়ে পড়ে, যার গুকে দ্রীপত্রপরিজন অবসর হয়ে পড়ে দৈন্ত, তার কি বঞ্চনা? ধনসংগ্রহ বিষয়ে কার্ণা-কার্ণি বিচার থাকতে পারে? ৭৪

আমি চিরদিন জেনে এসেছি, ধননাথ কুবের আমার বন্ধু, বিপদে পড়লে তিনিই হবেন ভ্রাণ-কর্তা। আমার হৃদয়ে তাই প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল স্তম্ভানু আশাবদ্ধ। ৭৫

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, নির্লজ্জ হয়ে তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম; কিন্তু সহসা উজ্জিস্ত হয়ে ওঠে বন্ধুর প্রতিবেশস্ত্র, ছিন্ন হয়ে যায় আমার আশা। ৭৬

তিনি আমাকে অশ্রু প্রহার করেছেন, নিরিয় দহন করেছেন, নির্বিষ মৃত্যু দিয়েছেন। তিনিই শত্রু, মোহাঙ্কর হয়ে তিনিই আমার ভেতে দিয়েছেন আশা। ৭৭

সেই হেতু, তিনি আমার শত্রু। শত্রুকে বঞ্চনা করা পাপ নয়, পুণ্য। যে বিজ্ঞ, অপবাদের ভয় তার থাকে না। ছল করে আমি সভাই উপাঞ্জন করেছি ধন। সার্থক হয়েছে। ৭৮

আপনি আমাকে আদেশ দিলেও এক কথা ধনভক্ত আমার ত্যাগ করা উচিত নয়। ধনই...মুখ্যতম জীবন; ধন-ত্যাগের অর্থই হচ্ছে জীবনের হানি। ৭৯

এই ধারায় যখন সজ্জায়ণ করতে লাগলেন দৈত্যগুরু শুক্র, তখন তাঁকে বার বার বহু বার মিমতি জানালেন মহেশ্বর। কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবশেষে তিনি ধারণ করলেন রোষণ-মুর্ছি। বিরূপ হয়ে উঠল তাঁর আকির। সহসা...তিনি মুখ-ব্যাদান করে গ্রাস করে ফেললেন শুক্রক। ৮০

বৎসগণ, ত্রিগুণস্বরের যিনি শত্রু, তাঁর জঠরের মধ্যে, আক্রোশে তখন চীৎকার করতে লাগলেন শুক্র। প্রলয়ায়ির মত বিপুল-ভাষণ সেই জঠর। সেই জঠরে নিদারুণ ভাবে সিদ্ধ হয়ে যেতে লাগল শুক্রের দেহ। ৮১

শুক্রের কাছে মুহূর্তই প্রভোচনা পৌঁতে লাগল বিরপাক্ষের— “ধনত্যাগ কর, ধনত্যাগ কর।” কিন্তু শুক্র কেবলি বলতে লাগলেন— “ভগবন্, মিনন হই তাও স্বীকার কিন্তু ধননাথের ধন একটুও ত্যাগ করব না।” ৮২

নিঃশ্বাস শুদ্ধিত করলেন মহাদেব।

গভীরাঘোর জঠরের মধ্যে বিরকাল সহস্র জ্বালায় উজ্জ্বল জ্বলে উঠল অগ্নি।



দেবেদেব তাঁকে বললেন—

“ওরে দুঃখী-দুঃখী, ত্যাগ কর পরের ধন। নরত প্রলয় ঘটে বাবে  
চার অস্তিত্বের—এই জঠর-মহাসমুদ্রের বাড়বানলে।” ৮৪

প্রথর তাপে তখন কাটতে শুরু হয়ে গেছে স্তব্ধের অস্থি, প্রবাহ  
বঠছে চরিত্র। তবু তখনও তিনি সোচ্ছাদে বললেন—

“এখানে মরণ আমার পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ।  
ধনের একটি কণিকা কিন্তু আমি ছাড়ছি না।” ৮৫

জঠরাধারে পুনরীর ঘোরতর জ্বলে উঠল কালানল। জ্বলতে  
জ্বলতে স্তব্ধের আত্মর লেশমাত্র ধ্বন আর কেবল বাকি, তখন তিনি  
স্বব গান করে উঠলেন—দেবীর। ৮৬।

স্তোত্রপদে আরাধিতা হলেন গৌরী দেবী;

গৌরীর প্রণয়ে প্রসাদিত হলেন কল;

তীর বাক্যে ধৃতিলাভ করলেন স্তব্ধ;

এবং স্তব্ধাধার-পথে নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন তিনি। ৮৭।

অন্তঃপ্রবণ, স্নেহে রেখে,—এই রকমেরই দশা হয় স্বভাব-  
লুক্কদের। এরা তীব্র বাতনা সইতে হয় সইবে, কিন্তু এক কথাও  
ছাড়বে না ধন, অধমেরা যেমন ছাড়তে পারে না তাদের সহজাত  
কোটিলা। ৮৮

এই ‘সোভ’ থেকেই সমুপিতা হন ‘মায়ী’। তিনি কপট কলাবতী,  
কুটিল বস্তিনী: তিনি বাস করেন লুক্কদের, অর্থাৎ অর্থ-গৃহ্যদের,  
শিকারীদের বা কামীদের ছনয়ে ছনয়ে।

যে সোভী নয়, সে প্রতারণা করে না। ৮৯

ইতি সোভবর্ণনং নাম বিতায়: সর্গ: ।

### তৃতীয় সর্গ

“কাম”,—যেহেতু তিনি কমনীর,—কী জানি কেমন করে  
বিপুল একটি সম্মোহ তিনি সৃষ্টি, করে ফেলেন! কেবল  
মায়ুর্গ্য দিয়েই—সহসা তিনি হরণ করে নেন জীবন বিবের  
মত। ১

এই পৃথিবীর কাম-মগ্নিত মহিমাবিশত নায়কগণ বর্ণ, করে  
বাঁধা পড়ে যান অবলাদের শৃঙ্খলে। তাঁরা যেন মলকরা হস্তীর দল,  
বাদের দান-জলে গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসে ভোমরার দল, তোলে  
ছক্কায়ের স্বকায়। ২

এই কবীরে,—ইন্দিয়ার্ণ বীর চূরি হয়ে গেছে—স্ত্যাক কী না  
সহ করতে হয় কামবশিত হয়ে! সইতে হয় পদাবাত, তীক্ষ্ণ  
অক্লেশের ঘটন, শৃঙ্খল-সংসোধ। ৩

নিতানুতন সৌরীন অপ-খেলার কোঁশলে মল্লযাতি বন্দী হয়ে  
পড়েন, ভুঙ্কর ভঙ্গি তিনি চিনতে শেখেন, পাগল হয়ে যান, বিবর-  
সম্বন্ধে বিবশ হয়ে পড়েন; কলি-ময়ুরের মত তিনি নাচতে থাকেন  
জীরত্বের ভূড়িতে। ৪

এই সব সরল মূঢ়গুলির হৃদয় হরণ করে ফেলেন জীরত্বেরা।  
অমুরজকে তাঁরা আকর্ষণ করেন,—

মায়ার তুলিয়ে,

মোহ-দিল্লো-যেরা তিমিরময়ী রজনীতে

রক্তশোষিত পিশাচিকাদের মত। ৫

এই জীরত্বেরা—

অমুরাঙ্গী হরিণদের গলার কাঁস,

হৃদয়-হস্তীর বন্ধন-ডোর,

বিলাস-বাসনের নব-বস্ত্রী।

এঁদের অনামিকার নীচে পড়লে—মল্লযোব যুক্তি নেই। ৬

যে কিতাত্মা সশারের মায়া জানেন,

“শবর” ও “বিচিতি” নামের মায়ানিশুণ হুটি দৈত্যের মায়ার  
যিনি জানেন।

তিনিও জানেন না “বোবিং”দের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা প্রেমসীসের  
মায়ী। ৭

জীলাকদের আচার-ব্যবহার চরিত্র বড় বিচিৎ! তাঁদের হৃদয়ের  
সম্ভাবগুলি বজ্রশিলার মত কঠিন; অথচ ফুলের মত ফুরফুরে তাঁদের  
দেহ।

কার না অন্তর্মোহ জন্মান এঁরা! ৮

বীরা ভালাবাসেন, তাঁদের উপর বিরক্তিতার দেখিয়ে বেড়ান এই  
নারীরা; বীরা নম্র, তাঁদের কাছে হয়ে ওঠেন ফেনিলোচ্ছল; বীরা  
বিরক্ত হয়েছেন তাঁদের উপর ফলাতে থাকেন অমুরাগিণীর  
অভিনয়। মুখে সদাই লেগে থাকে শঠতার ভাষা; আশঙ্কা করেন  
সম্ভাব। ৯

এই পৃথিবীতে এমন কি কোনো প্রভু জন্মেছেন—বীর গৃহে নেই  
এমন একটি পত্নী, বীর দেহটি নয় বিলাস-কুটিল, থাকে বহুলোকে না  
দেখেছে, ঘৈর্ষের বিনি ধ্বংস-স্বজ্ঞা নন? ১০

কাম-মদের বিকল্প-মাধ্যমে স্বামীর দল বিক্লিত হয়ে যান, জ্ঞান  
হারান, বোবা যেন যান। আবার তাঁদের মুখের উপরেই জীর দল  
ছুড়ে-মারেন ঘরের বত জ্ঞান। ১১

“ক্রোচা”র বকম দেখ। আধো-আধো স্বরে প্রেমের কথা বলেন;  
বতিবিত্তার সব কিছুই যেন তাঁর কাছে অজানা, অপরিস্কট; যেন তিনি  
স্বভাবমুগ্ধ। গোবেচারী স্বামীর কাছে ভিক্ষা চান—

“আকাশের চাঁদ ধরে আমার কপালে টিপ দিয়ে দাও।” ১২

“চপলা”র চলনার অন্ত নেই। বলবেন “তীর্থদর্শনে বাছি,”  
কিন্তু চলবেন সেখানে যেখানে মনের মত বিহার চলে। তন্তঃপর খির  
দেহে তিনি ফিরে আসবেন, প্রেমের একটু বিলাস দেখিয়ে জয় করে  
ফেলবেন স্বামীর মন আর মুগ্ধ স্বামীটি হুঁ হাতে টিপে দিতে থাকবেন  
সেই চপলারই দুখানি লীচরণ। ১৩

হ্রী বহুদুগ। ঐ তাঁর স্বভাব

কড়িকে—চোখের ভাবায়,

অন্তকে—মুখের ভাবায়,

অপরকে—দেহের ভাবায়,

আর জনকে—বস্তির ভাবায়,

তিনি খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান। ১৪

নিজের পতির কাছে তিনি চপলকুসুমী,

পরের গাছটিতে—ভুজী,

স্বভাবে তিনি—মাতঙ্গী।

ভোমরার মত গুনগুনিরে বিখ্যার সৃষ্টি করেন, বিজয় ঘটা  
এই কুটিল-ভুজঙ্গী কৌণ পুরুষের নিজের হয়? ১৫

[ ক্রমশঃ ]



# উটরোগ

(নাটক)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী বলভাচার্যের গৃহের সম্মুখ

শঙ্কর মিশ্র। ও বলভাচার্য! বলভাচার্য! বাড়ি আছে হে? ও প্রধান মন্ত্রী মশায়!

বলভাচার্য। (বেরিয়ে এসে হাসি মুখে) কি আদেশ প্রধান রাজবৈজ্ঞানিক মশায়? কিছু গোলাগুলি ছাড়বার মতলব আছে না কি? শঙ্করবটিকা কিবা মিশ্রগুলি? তার পর, প্রধান মন্ত্রী মশায় বলে ডাকটা কি বাঙ্গ ক'রেই ছিল!

শঙ্কর মিশ্র। ক্ষেপেছ! রাজো মহারাজ স্বর্ধপাল আর মহারাজী চন্দ্রশীলা পরেই তোমার স্থান। তোমাকে নিয়ে বাঙ্গও করতে পারিনে, রঙ্গও করতে পারিনে। শোন। কাল দস্তভাঙ্গকে ডাকিয়ে, কাল থেকে সেই মহারাজার চিকিৎসা করবে।

বলভাচার্য। (উদ্ভিন্ন ভাবে) কেন তুমি? তুমি ছেড়ে দিলে না কি?

শঙ্কর মিশ্র। শোন কথা। ধরলাম কবে, যে ছেড়ে সিলাম? আজ ছ'মাস চিকিৎসা করছি; রোগ ধরতে পারলাম না।

বলভাচার্য। কেন?

শঙ্কর মিশ্র। এ এক অশুভ রোগ! আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিবিত কোনো ব্যাধি নয়। লক্ষণ দেখে নিদান করতে পারলাম না।

বলভাচার্য। কি লক্ষণ বল ত?

শঙ্কর মিশ্র। লক্ষণ প্রধানত তিনটে। ডান পায়ের একটা পির টন-টন করে, বাঁ চোপটা থেকে থেকে জ্বা ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। আর সেই সময়ে বুক ধড়কড় করে। দিন দিন কি বকম কুশ হয়ে যাচ্ছেন তা ত' দেখতেই পাচ্ছি, মেজাজ অসম্ভব খিটখিটে হয়েছে।

বলভাচার্য। তুমি হাতে হার মানলে, দস্তভাঙ্গ তা পারবে?

শঙ্কর মিশ্র। 'না পারলেও আমার কাছে ত তার হার মানতে হবে না? আর তা ছাড়া, কিছু বলা যায় না ভাই! বনবেড়াল যে

ইদুর ধরতে পারলে না, কার্ঠবেড়াল কখনো কখনো তা ধরে দেয়। আর, দস্তভাঙ্গ যে কার্ঠবেড়াল নয়, তা তুমিও জান, আমিও জানি। বাই। রোগীরা অপেক্ষা করছে।

বলভাচার্য। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

### দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের অন্তর মহলের প্রায়োদ-কক্ষ, স্বর্ধপাল, চন্দ্রশীলা, নর্তকী সুনন্দা ও গায়িকা চিত্রা—সুনন্দা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রশীলা। চমৎকার নেচেছ সুনন্দা! (স্বর্ধপালের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) সুনন্দা কি আর একটা নাচ নাচবে মহারাজ?

স্বর্ধপাল। না।

চন্দ্রশীলা। কেন মহারাজ! সুনন্দা ত' প্রোথিতভঙ্কর নাচটা চমৎকার নাচলে? এবার না হয় তোমার সেই প্রিয় নাচ 'নবাহুবাগিনী' নাচটা নাচুক।

স্বর্ধপাল। না।

চন্দ্রশীলা। আচ্ছা সুনন্দা, তুমি না হয় ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নাও, চিত্রা, একটা গান ধর। দেখ, সেই গানটা—দুখ-বাখা আজ কর সার।

চিত্রা। (করজোড়ে মাথা নত করে) যথাদেশ মহারাজ! (বীণা হাতে নিয়ে)।

গান

দুখ-বাখা আজ কর সার!

ফুলের রাসিতে ফুলের হাসিতে

ভুলে যাও বত বাতনায়।

হুয়াশার তরী লভিয়াছে তীর,

মক-মাঝে বহে স্রবময় নীর,

বিসল আকাশে শশী-তারার হাসে

তোমার নবীন ভরসায়!

হুয়াশার তরী—

স্বর্ধপাল। থামাও তোমার হুয়াশার তরী! (গান থেমে গেল)

চন্দ্রশীলা। (উদ্ভিন্ন করে) কেন মহারাজ? ভাল লাগল না?

স্বর্ধপাল। না, ভাল লাগল না। সুনন্দার তাল কাটছিল,

চিত্রার সুর কাটছে। কি ক'রে ভাল লাগবে? (সুনন্দা ও চিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করে) না, না, না—তোমাদের কিছু কাটেনি—

কাটছিল বা, তা আমার নিজের তাল আর নিজের সুর। যদি কোনো দিন সে-সব হৃক্স হয়, আবার তোমাদের গান শুনব, নাচ দেখব। এখন তোমরা আসতে পার।

সুনন্দা ও চিত্রা। (অভিবাদন পূর্বক) মহারাজার জয় হোক! মহারাজীর জয় হোক! [প্রস্থান।]

স্বর্ধপাল। জগতের সমস্ত পদার্থে অক্লিষ্ট ধ'রে গেছে, ধরে নি শুধু একটিমাত্র পদার্থে। কি সে পদার্থ, অজ্ঞান করতে পার মহারাজী?

চন্দ্রশীলা। (একটু নীরবে অবস্থান করে) কুপানামকে ডাকিয়ে পাঠাব মহারাজ?

স্বর্ধপাল। (প্রহণ কালের রৌদ্রের মত ক্রিকে হাসি হেসে) তাহ'লে দেখছি অজ্ঞান করতে ভুল করো নি। ঠিক তাই। একমাত্র যে পদার্থে এখনও অক্লিষ্ট ধরে নি, তা হচ্ছে মহারাজী

চন্দ্রশীলার শ্রীমুখের হাসি। যেদিন তাতেও অল্পচি ধরবে, সেদিন বুঝব—

চন্দ্রশীল। ( আর্ত কণ্ঠে ) মহারাজ !

স্বর্ধপাল। ( শ্রিতবুখে ) কি, বল ?

চন্দ্রশীল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর।

স্বর্ধপাল। ( শ্রিতবুখে ) প্রসঙ্গ না হয় বন্ধ করলাম, কিন্তু বা অনিবার্য তা ত' বন্ধ করতে পারব না ? তাই বা অনিবার্য নয়, তা বন্ধ করেছি।

চন্দ্রশীল। কি সে মহারাজ ?

স্বর্ধপাল। রাজবৈত শব্দর মিশ্রের চিকিৎসা। আজ আর রাজি সেড প্রহরে সেবনীয় মহাসোম-অব্রিষ্ট পান করতে হবে না।

চন্দ্রশীল। ( উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ) শব্দর মিশ্রের মতো বিচক্ষণ চিকিৎসক তোমার রাজ্যে ত' বিচার কেউ নেই মহারাজ ! শব্দর মিশ্রের চিকিৎসা তুমি বন্ধ করলে ?

স্বর্ধপাল। আমি বন্ধ করলাম বললে একটু ভুল বলা হয়। খানিকটা তিনি বন্ধ করলেন, খানিকটা করলার আমি। শব্দর মিশ্র বাঁটা মালুয। যে ব্যাধি তিনি হ'মাসে আযোগ্য করতে পারলেন না, তাকে আর বেশি জড়িয়ে রেখে অপারের পথ আটক করতে চান না।

চন্দ্রশীল। কোনো চিকিৎসককে তাঁর স্থানে তিনি মনোনীত করেছেন ?

স্বর্ধপাল। হ্যাঁ, দত্তভাষুকে মনোনীত করেছেন।

চন্দ্রশীল। দত্তভাষু ? দত্তভাষু ত বয়স বেশি নয় ?

স্বর্ধপাল। তা নয়, কিন্তু শব্দর মিশ্র বললেন, বয়স বেশি না হলেও দত্তভাষুর প্রতিভা আছে। তিনি বলছিলেন, হ'মাসে যে রোগের তিনি নিগান করতে পারলেন না, তার চিকিৎসা ক'রে চললে ব্যাপারটা হবে দেবতার নাম না জেনে জপ করার মতো, ভাতে পুরো ফল পাওয়া যাবে না। দেবতা হয়ত কিছু কিছু ইসারা ইঙ্গিত করতে পারেন, কিন্তু স্বরূপ দেখাবেন না। শব্দর মিশ্র বলছিলেন, বুদ্ধের কানে ব্যাধির যে কথা শোনা গেল না, প্রৌঢ়ের কানে তা হয়ত শোনা যেতে পারে।

চন্দ্রশীল। ( প্রফুল্ল মুখে ) আমারও তাই মনে হয়। চিকিৎসকের পরিবর্তনে রোগ ধরাও পড়বে, সেবেও বাবে।

স্বর্ধপাল। সেটা কামনা কোরো, আশা কোরো না। কিন্তু রূপানাথকে ডাকিয়ে পাঠাবার কথা কেন বলছিলে ?

চন্দ্রশীল। রূপানাথকে নিয়ে একটু সতরকে বসুন না, অল্প মনস্ক হ'তে পারবেন।

স্বর্ধপাল। সতরকে বসলে অল্পমনস্ক হ'তে পারব কিনা জানিনে, কিন্তু অল্পমনস্ক হ'লে সতরকে বসলে ভুল চালে মাত হব। রূপানাথের কাছে হার বরণাঙ্ক করতে পারব না। তার চেয়ে এল, তোমার সঙ্গে এক হাত বসি। তোমার কাছে হারলেও জিৎ হবে।

চন্দ্রশীল। কিন্তু আমাকে ত আপনি এগারো চালে হাত করেন। আমার কাছে আপনার হার কেমন ক'রে হবে মহারাজ ?

স্বর্ধপাল। কষ্টের সতরকে হবে কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু জীবনের সতরকে তুমি আমাকে চাল মাত করেছ, পাঁড়ো ( অঙ্গুলিতে

গুণে ) পাঁচটি বলের সাহায্যে। ( অঙ্গুলিতে গুণে গুণে ) তোমার হাসিতে দাবা, বাক্যে ব'ড়ে, দৃষ্টিতে ষোড়, ভঙ্গীতে গজ আর গতিতে নৌকা। তুমি যখন তোমার বন্ধ দৃষ্টিতে আড়াই ঘরের ষোড়ার চাল মাত, তখন মাত কাছে পাড়িয়ে হাসে।

চন্দ্রশীল। ( সানন্দে উৎফুল্ল মুখে ) মহারাজ ! জাবার বহু দিন পরে তোমার কথাবার্তায় রহস্ত-কৌতুক ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। লক্ষণ শুভ।

স্বর্ধপাল। বাইরের লক্ষণ দিয়ে সব সময়ে বিচার করা চলে না চন্দ্রা ;—যর, তৈলহীন দীপের উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ওঠা শুভ লক্ষণ নয় ! ( সহাস্তে ) চিন্তিত হয়ো না মহারাজি, আমার জীবনপ্রাণী তৈলহীন হয়েছে, সে কথা হয়ত বলছিলাম।

( পরিচারিকার প্রবেশ )

পরিচারিকা। ( উভয়কে নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে ) মহারাজ ! কবিরাজ দত্তভাষু মশায় দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন।

চন্দ্রশীল। ( উৎফুল্ল মুখে ) কথা হ'তে হ'তেই এসেছেন ! এ কি শুভ লক্ষণ মহারাজ !

স্বর্ধপাল। ( পরিচারিকার প্রতি ) কোথায় আছেন তিনি ?

পরিচারিকা। তৃতীয় দর্শনগারের পূর্বদিকের অলিন্দে অপেক্ষা করছেন।

স্বর্ধপাল। ( চন্দ্রশীলার প্রতি ) স্নান বোধ করছি। এইখানেই ডেকে পাঠাই, কি বল চন্দ্রা ?

চন্দ্রশীল। নিশ্চয় মহারাজ, নিশ্চয়। ( পরিচারিকার প্রতি ) এইখানেই কবিরাজ মশায়কে ডেকে আন জানকী।

পরিচারিকা। স্বধাদেশ মহারাজী ! [ অতিবাহনান্তে প্রস্থান।

চন্দ্রশীল। দত্তভাষুর চিকিৎসা নিখল হবে না মহারাজ ! এবার তুমি সেরে উঠবে !

স্বর্ধপাল। তাহ'লে এরাভ্যে তোমার পরেই আমি সকলের চেয়ে বেশি খুসি হব।

চন্দ্রশীল। দত্তভাষুর চিকিৎসা কেন নিখল হবে না জানো একটা চমৎকার যোগাযোগ হয়েছে। আর তিন দিন পরে পূর্ণিম তিথিতে তোমার কল্যাণে চন্দ্রেরী পাহাড় বাবা কল্পনাথের পূজা দেওয়া হবে। দত্তভাষুর চিকিৎসা তিন দিন পরে আরম্ভ করবে ওষুধের সঙ্গে দৈবশক্তির যোগ হবে।

স্বর্ধপাল। কিন্তু চন্দ্রেরী পাহাড় ত অতিশয় দুর্গম স্থান, পঞ্চাধার থেকে পচিশ ক্রোশের কম নয়, তিন দিন পরে পূজা কি ক'রে সম্ভব চন্দ্রা ?

চন্দ্রশীল। তোমাকে জানাইনি মহারাজ, পর পর তিন দি চন্দ্রেরী পাহাড়ের স্বর্ণ দেখে আজ চার দিন হ'ল চৈতমলকে বা কল্পনাথের পূজা দিতে পাঠিয়েছি।

স্বর্ধপাল। চৈতমলকে পাঠিয়েছ ?—সে ত একটি বুদ্ধির টেঁকি

চন্দ্রশীল। তা হোক মহারাজ, ভারি বাঁটা মালুয,—প্রাণ দিয়ে সে পূর্ণিমার দিনে পূজা দেবে।

স্বর্ধপাল। এই ভরাবহ পথে সে একা গেল না-কি ?

চন্দ্রশীল। না, মহারাজ, পাঁচসাত জনে দল বেঁধে সঙ্গে অর্ধও যথেষ্ট দিয়ে দিয়েছি।

স্বর্ধপাল। নদী-মালা-জলের পথ। পথ চিনে সে যেতে পারবে ত ?

চন্দ্রশীলা। তা পারবে। আর আগে বার দুই সে রক্তনাথের মন্দিরে গেছে। চন্দ্রদ্বীপ পাহাড়ের অঞ্চলে কিছু দূরে দুই ওসের জন তিনেকের আত্মীয়-বাড়ি আছে। সে সব জায়গায় কিছু কাল কাটির সিংহগড়ে ফিরতে মাস তিনেক পরে সেই চৈত্র বৈশাখ মাস হবে। তারা এসে দেখবে, তুমি সেয়ে গিয়েছ।

( পরিচারিকার প্রবেশ )

পরিচারিকা। কবিবাজ মশায় এসেছেন মহারাজি !

চন্দ্রশীলা। পাঠিয়ে দে।

( দত্তভাষুর প্রবেশ )

দত্তভাষু। ( নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে ) জয় হোক মহারাজি, মহারাজের।

স্বর্ধপাল। কল্যাণ হোক। তারপর ১০০ কি অভিশ্রাব দত্তভাষু ?

দত্তভাষু। মহারাজকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলা ছাড়া উপস্থিত ত' বিতায় কোনও অভিশ্রাব নেই।

স্বর্ধপাল। পারবে সুস্থ ক'রে তুলতে ?

দত্তভাষু। আপনার নাড়ীর কাছ থেকে সবদা পাবার আগে সে কথা বললে হঠকারিতা হবে মহারাজ ! তবে বাইরে থেকে বস্ত্রটুকু লক্ষ্য করছি, সুস্থ ক'রে তুলতে না পারার ত' কোনও কারণ দেখাচ্ছে।

স্বর্ধপাল। তবু ভাল। বৈজ্ঞ হাল ছাড়লে, রোগীর নাড়ী ছাড়ে। কিন্তু বাইরের লক্ষণের উপর বিচার ক'রেই বা কাজ কি ? নাড়ী পরীক্ষা করেই দেখ না ?

দত্তভাষু। এখন দেখব না মহারাজ ! আপনি প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন, রাাত্রি এক প্রহরের পর আমি আসব, তার পর তিন দণ্ড ধ'রে আপনার নাড়ী পরীক্ষা করব।

স্বর্ধপাল। ( বিস্মিত কণ্ঠে ) তিন দণ্ড ধ'রে ! এত দীর্ঘ কাল ?

দত্তভাষু। তার চেয়েও বেশি সময় লাগলে বিস্মিত হবেন না মহারাজ ! আমার গুরুদেব ( কপালে যুক্তকর স্পর্শ ক'রে ) বৈজ্ঞরাজ জীর্ঘসার শাস্ত্রী মশায় বলতেন, নাড়ী ঠিক বেন নবোলা বধু—সাধারণ সাধ্যসাধনার বৃথ হরত খোলে ; কিন্তু মন খোলে সাধ্যসাধনার পরাকাষ্ঠার। আর মন না ধুলে, মনের কথা শোনা যায় না।

চন্দ্রশীলা। মনের কথা শুনে আপনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন কবিবাজ মশায় ! মহারাজ সুস্থ হ'য়ে উঠলে আমি আমার কণ্ঠের এই যুক্তমালা আপনার দ্বার কণ্ঠে কৃপিয়ে দোব।

দত্তভাষু। ( করজোড়ে ) অত লোভ দেখাবেন না মহারাজি, চিকিৎসার্থে হারাব। মহারাজ সেয়ে উঠলে আপনার কণ্ঠের প্রসঙ্গ নাকাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

স্বর্ধপাল। আজ রাত্রে আমার নাড়ী যদি তোমার কানে জেতের অবস্থার ঠিক সংবাদ দেয়, তা হ'লে সে পুরস্কার তুমি কত মনে আশা কর ?

দত্তভাষু। ( একটু চিন্তা ক'রে ) মাস তিনেকের মধ্যে। এমন ত' শীতের মাঝামাঝি, সে অবস্থার বসন্তের শেষে মহারাজ রোগমুক্ত হবেন।

স্বর্ধপাল। তা হ'লে কত দিনে উপকার আরম্ভ হবে ?

দত্তভাষু। দিন দশেকের মধ্যে।

স্বর্ধপাল। তা যদি না হয় ?

দত্তভাষু। তা হ'লে অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে মহারাজকে একাদশ দিনের দিন শতর মিশ্রর হাতে প্রতারণা করব। নিজের হাতে রেখে সময় নষ্ট করব না। কিন্তু এ অন্তত আলোচনার প্রয়োজন কি মহারাজ ? আপনাকে আমি অতি অবস্থা নিয়ামর করব। অমুমতি যদি দেন তাহ'লে এখন আসি।

স্বর্ধপাল। এস।

দত্তভাষু। জয় হোক মহারাজি, জয় হোক মহারাজার !

[ প্রস্থান। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

—গ্রাম্যপথ

( মাধার বৌচকা ও গলে লাঠি নিয়ে সাত জন পথিকের প্রবেশ। খালি গা, কাঁধে গামছা, কাপড় গুটিয়ে পরা। )

সকলে। ( উচ্চকণ্ঠে ) জয় বাবা রুদ্রনাথ ! রাজাকে ভাল কর বাবা ! জয় হোক মহারাজি চন্দ্রশীলার।

জীবন সি। ( কপালের ঘাম মুছে ) নদী ত পেরোনো গেল,— কিন্তু কি গরম যে বাবা ! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যাচ্ছে ! কি মাস এটা বল দিকিদি টোডর ?

টোডর সি। কি মাস ? ঈশ্বর, বলছি। চোত সক্রান্তি ত' এই দিন পাচেক গেল, দুর্গাপুরে মাসির বাড়িতে। ( জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ) তা হলে ?

জীবন সি। ( ৩য় পথিক বলবন্ত রাওর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ) তা হ'লে ?

বলবন্ত রাও। ( ৪র্থ পথিক পূরণ দাসের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ) তা হ'লে ?

পূরণ দাস। তাহ'লে ভাই হ'বে।

চৈতন্য। ( সহাস্রে ) একেবারে পাড়ারগেরে ভূত তুই ! ক'টি মাল্লার হিসেব—তাৎ ঠিক জানিসনে ! আরে ভাই মাস কি চোত সক্রান্তির পরে হয় ?—ভাই মাস ত' পোষ সক্রান্তির পর হয়। তা হ'লে ভাই মাস কি ক'রে হবে ?

পূরণ দাস। তবে ?

চৈতন্য। তা হ'লে মাঘ মাস হবে না ?

বলবন্ত রাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত' হবে। চোত-সক্রান্তির পরের মাস মাঘ মাসই বটে।

জয়রাম সি। ওঃ, তাই এত গরম !

পূরণ দাস। ওঃ, তাই এত গরম !

জীবন সি। ওঃ, তাই এত গরম !

চৈতন্য। ( বয়েস সকলের বড় ) বাবা সব !

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

চৈতন্য। জিভিভা ত এখনও তিন ক্রোশ পথ, একটু ব'সে জিরিয়ে নাও এখানে।

সকলে। ( সম্বন্ধে ) ঠিক, ঠিক, ঠিক। একটু জিরিয়ে নাও

এখানে। (সাত জন এক লাইনে ব'সে এক ভাবে সাতখানা গামছা নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল)

জীবন সি। বাবার সময়ে নদীটার ত' এত জল ছিল না চৈত খুড়ো? কি নাম বলেছিলে বটে? জুলে গেছি।

চৈতমল। তামসী।

জীবন সি। উঃ! যেমনি নাম তেমনি নদী! তামসী মানে ত' বাঘ, চৈত খুড়ো?

চৈতমল। দূর যুথু! তামসী মানে সিংহ।

জীবন সি। হাঁ হাঁ সিংহ। ওই হ'ল, সিংহ বলতে বাঘ বলেছি।

স্বনস্বর রাও। সিংহই বটে! জল ত' হাঁটু ভোর, কিন্তু কি শ্রোত রে বাবা! যেন সিংহ গরজাচ্ছে!

পূর্ণদাস। খুড়ো!

চৈতমল। বল?

পূর্ণদাস। গাঁ থেকে সাত জন বেরিয়েছিলাম, নদী পার হ'য়েও সাত জনই আছি ত?

চৈতমল। সবাই ত আমরা সাতার জানি—তবে আর বাব কোথায়?

পূর্ণদাস। কেন কুমীরের পেটে?

বলবন্ত রাও। এই দেখ, ভাবালে!

স্বনস্বর রাও। কেন, কুমীর ওনদীতে আছে না কি?

পূর্ণদাস। আহা! স্নকের মতো কথা শোন! ওনদী কি পাহাড় যে, কুমীর থাকবে না, ভালুক থাকবে? সঙ্গেই থেকে কাজ নেই, একবার গুণে কেলা বাক!

চৈতমল। তা বেশ ত' গুণে ফেল।

পূর্ণদাস। আমরা অন্ত গুণতে জানিনে, আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনি গুন।

চৈতমল। (কাঁধে গামছা কেলে উঠে পাঁড়িয়ে) তাহ'ল বাবা সব, উঠে প'ড়ে এক দিক হ'য়ে পাঁড়াও, আমি একে একে গুণি।

(সকলে উঠে এক দিক হ'য়ে পাঁড়াল)

চৈতমল। (এক এক জনকে হাত ধ'রে অপর দিকে সরিয়ে দিয়ে দিয়ে) রামে রাম, হুইয়ে লো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছ, ঐ! সাত সাত কই? সাত সাত? (চিৎকার ক'রে) ওরে, সাত সাত কোথায় আছিস রে? ওরে সাড়া দে না রে? (ইতস্ততঃ দৃষ্টি সকলান)।

পূর্ণদাস। আর সাড়া দিয়েছে! কুমীরের পেটে গেছে!

স্বনস্বর রাও। ওরে, কে গেলি রে? কার ইস্তিরীর সন্ধান হ'ল রে?

জীবন সি। ওরে, গীয়ে ফিরে গিয়ে তার ইস্তিরীর কাছে কি ক'রে খুঁজ দেখাবো রে!

বলবন্ত রাও। (ক্রন্দনের সুরে) ওরে বাবা!

টোডর সি। ওরে মা!

পূর্ণদাস। ভ্যা—

অরবাম সি। অ্যা—

জীবন সি। খুড়ো! (ক্রন্দনের সুরে)

চৈতমল। বল! (ক্রন্দনের সুরে)

জীবন সি। বলি কি, বাবা ক্রন্দনাথের নাম ক'রে আর একবার গুণে ফেল। প্রথম বারের গোণার ভুলও ভ' হতে পারে।

চৈতমল। আমি আর গুণব না বাবা! আমি গুণলে আবার সেই হ'য়ে ছয় হবে। ভাব চেয়ে এবার ভূমি গোণো।

জীবন সি। আমি গুণব? আচ্ছা! তা হ'লে পাঁড়াও সব একবার হ'য়ে। (সকলের তথাকরণ)

জীবন সি। জয় বাবা ক্রন্দনাথ! (এক এক জনকে হাত ধ'রে টেনে টেনে অল্প দিকে সরিয়ে) রামে রাম, হুইয়ে লো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়—

পূর্ণদাস। ভ্যা—

অরবাম সি। অ্যা—

চৈতমল। হায়, হায়! হায়, হায়!

সকলে। (এক শ্রেণীতে ব'সে প'ড়ে এক ছন্দে মাথা নাড়তে নাড়তে) হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়!

(হরদংরাম নামক জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ)

হরদংরাম। (সকৌতুহলে অবলোকন ক'রে) এ কি! ব্যাণার কি তোমাদের?

পূর্ণদাস। আর বলেন কেন মশায়! মহারাজা পূর্ণদাসের কল্যাণের জন্তে বাবা ক্রন্দনাথের পুজো দিতে সাত জনে বেরিয়েছিলাম, বাবার দর্শন ক'রে পুজো দিয়ে মাসির বাড়ি কাটিয়ে সিংহগড় কিরছি। তামসী পেরিয়ে এ পারে এসে গুণে দেখা গেল ছ জন! অথচ বেরোবার সময় পাকা লোককে গিরে গুণিয়ে নিয়েছিলাম সাত জন! হায় হায়! হায় হায়!

সকলে। (মাথা নীচু ক'রে নাড়তে নাড়তে) হায়, হায়, হায়, হায়!

হরদংরাম। (সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি গুণে নিয়ে) কি ক'রে জানলে ছ জন?

পূর্ণদাস। গুণে মশায়, গুণে। ভ'জন গুণেছে; তার মধ্যে (চৈতমলকে দেখিয়ে) উনি ত পণ্ডিত মানুষ।

চৈতমল। অবাক হ'য়ে তাকাজেন রে? বিশ্বাস করছেন না বুঝি? একবার স্বচক্ষে দেখবেন?

হরদংরাম। কই দেখাও দেখি?

চৈতমল। (উঠে পাঁড়িয়ে) বাবা সব, উঠে পাঁড়িয়ে এক ধারে হও। (সকলে উঠে পাঁড়িয়ে এক ধারে হ'ল)

চৈতমল। (পূর্বের মত এক এক জনকে হাত ধ'রে অপর দিকে সরিয়ে) রামে রাম, হুইয়ে লো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়,—তবে?

পূর্ণদাস। তবে?

অরবাম সি। তবে?

হরদংরাম। তাই ত'। তা হ'লে সাতমা মানুষ এ কোথায়?

পূর্ণদাস। কেন, কুমীরের পেটে।

হরদংরাম। কিন্তু তামসীতে কুমীর? তা হ'তেও পাঁচ এটা তরুণক ত'?

পূর্ণদাস। আজে না, কুকণক।

হরদংরাম। তা হ'লে ঠিকই হয়েছে। 'কুকণকে তিন।

বৃহদ্রক ব্লেস। বিল থেকে তামসীতে বেড়াতে আসেন। এখানে পেট ভরে মাছ খেয়ে ব্লেসায় ফিরে যান।

সকলে। (মাথা নাড়তে নাড়তে) হায় হায়, হায় হায়, হায়, হায়, হায় হায় !

পূরণদাস। (ক্রন্দনের স্বরে) বৃহদ্রককে কে বটে মশায় ?

হরদংরাম। নেকড়ে নয়, নরক অর্থাৎ কুমীর। বৃহদ্রক মানে কুমীরের সন্ধার। বৃহৎ আর নরক, এই দুইয়ের সন্ধি ক'রে হয়েছে বৃহদ্রক। তোমরা বুঝবে না, (চৈতন্যের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনি ত' পণ্ডিত মানুষ, আপনি নিশ্চয় বুঝছেন ?

চৈতন্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের মত বুঝি কিন্তু তা হ'লে ত' সরনাশ হ'রে গেছে মশায় ?

হরদংরাম। না, এখানে হরত' সরনাশ হয়নি। বৃহদ্রক অক্ষত দেখে মানুষকে গিলে পাঁচ দণ্ড পেটে ভিঁইয়ে রেখে নরম করেন। তারপর চিবিয়ে খান। তোমরা কতক্ষণ পার হয়েছে ?

পূরণদাস। এক দণ্ডও হবে না।

হরদংরাম। তা হ'লে তোমাদের সাতমা সঙ্গী এখনও বৃহদ্রকের পেটে অক্ষত দেখে আছে। বৃহদ্রক সর্বাংশ দেবতা, পঞ্চ যুজ্জার পূজা দিলে নিশ্চয় উগরে যাবেন। দেবে পঞ্চযুজ্জার পূজা ?

পূরণদাস। নিশ্চয় দোবো। কিন্তু পূজার উপকরণ কুল কেলপাতা চন্দন এসব এই নদীর চরে কেমন ক'রে পাব মশায় ?

হরদংরাম। বৃহদ্রক জলাশয়ের ভিত্তি দেবতা, শুকনো পুজোই পছন্দ করেন। পাঁচটি যুজ্জা আমার হাতে দিয়ে মস্ত পড়, সাতমা লোক এসে হাজির হ'লে তারপর পঞ্চযুজ্জা তামসীর গর্ভে নিবেদন করলেই হবে।

চৈতন্য। এখন দিচ্ছি। (হরদংরামের হাতে অর্ঘ্য দিয়ে) পড়ান মস্ত।

হরদংরাম। সকলে পিছন ফিরে পাঁড়াও।

সকলে। পাঁড়িয়েছি।

হরদংরাম। আচ্ছা, এবার সকলে চোখ বোজ।

সকলে। বুজোছি।

হরদংরাম। আচ্ছা, এবার মস্ত পড়। বল ওঁ।

সকলে। ওঁ।

হরদংরাম। কুমীর কুমীর !

সকলে। কুমীর কুমীর !

হরদংরাম। মহাকুমীর !

সকলে। মহাকুমীর !

হরদংরাম। কুত্তীর !

সকলে। কুত্তীর !

হরদংরাম। তামসীবাসী !

সকলে। তামসীবাসী !

হরদংরাম। তীক্ষ্ণদণ্ডী !

সকলে। তীক্ষ্ণদণ্ডী !

হরদংরাম। বিশালোদর !

সকলে। বিশালোদর !

হরদংরাম। প্রসীদ বৃহদ্রকেশ !

সকলে। প্রসীদ বৃহদ্রকেশ !

হরদংরাম। এবার প্রার্থনা কর। বল, হে বাবা বৃহদ্রকেশ !

সকলে। হে বাবা বৃহদ্রকেশ !

হরদংরাম। গপ্ ক'রে গিলেছ, খপ্ ক'রে ওগরাও।

সকলে। গপ্ ক'রে গিলেছ, খপ্ ক'রে ওগরাও।

হরদংরাম। (উল্লসিত কণ্ঠে) উগরেছেন, উগরেছেন !

সাতমা লোক তোমাদের মধ্যে এসে ভিড়েছেন, চোখ খুলে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ।

সকলে। (চোখ খুলে ফিরে দেখে) কই, কই ? কই, নেই ত' !

হরদংরাম। এই ত' বাবার মতিমা ! বাবা যাকে ওগরালেন সেও তা বুঝতে পারলে না, আর কাকে ওগরালেন তোমরাও তা ধরতে পারলে না।

চৈতন্য। কিন্তু—কিন্তু—

হরদংরাম। কিন্তু গুণতিতে সাত জন হ'লেই ভ হবে ?

চৈতন্য। আলবাৎ হবে।

বনবরদাও। তামাম হবে।

জীবন সিং। বিলকুল হবে।

হরদংরাম। তা হ'লে প্রমাণ দিই ?

জীবন সিং। দিন।

হরদংরাম। (চৈতন্যের প্রতি) আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কাছে প্রমাণ দিই ?

চৈতন্য। তাই দিন।

হরদংরাম। (মাটি থেকে সাতটি ঢেলা কুড়িয়ে চৈতন্যকে সম্বোধন করে) আমি একটি একটি ক'রে আপনার বা হাতে ঢেলাগুলো দিই আর আপনি গুনুন ! (তথাকরণ)

চৈতন্য। রামে রাম, দুইয়ে দো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়, সাতে সাত।

হরদংরাম। সাতটি ঢেলা হ'ল ত' ?

চৈতন্য। আজ্ঞে, হ'ল।

হরদংরাম। এখন একটি একটি ঢেলা এক এক জনের মাথায় রাখুন। যদি সাতটি ঢেলা সাতটি মাথায় জায়গা পায় তা হ'লে সাত জনকেই ত' আপনারা পেলেন ?

চৈতন্য। তা হ'লে পেলাম বই কি। (বনবরদার দিকে চেয়ে) কি হে বনবর, ঠিক ক'রে বোঝো, তা হ'লে পেলাম ত' ?

বনবরদাও। নিশ্চয় পেলাম।

চৈতন্য। তোমরা কি বল ?

সকলে। নিশ্চয় পেলাম, নিশ্চয় পেলাম !

হরদংরাম। আচ্ছা তা হ'লে একটা করে ঢেলা এক এক জনের মাথায় রাখুন।

চৈতন্য। (সকলের মাথায় ঢেলা রেখে হাতে একটা রয়ে গেল। আতর্কণ্ঠে) এটা ? এটার মাথা ভ' পেলাম না ?

পূরণদাস। ভ্যাঁ—

জয়রাম সিং। অ্যাঁ—

হরদংরাম। (ধমক দিয়ে) টেঁচিও না, বিপদ হবে। (চৈতন্যের প্রতি) ওটার মাথা পেলেন না ?

চৈতন্য। না, পেলাম না ! পেলে ঢেলা হাতে থাকবে কেন ?

হরদংরাম। এই পান (চৈতন্যের হাত থেকে ঢেলাটি নিয়ে তার মাথায় স্থাপন)

# গান

( অপ্রকাশিত )

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

শৃঙ্খল-ভাঙা সুর বাজে পায়ে

বন্ বনা বন্ বন্

সর্বহারার বন্দী-শিবিরে

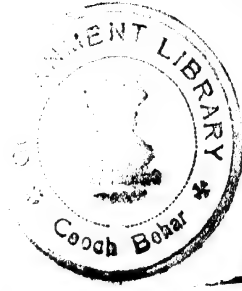
ধ্বংসের গর্জন।

দিকে দিকে জাগে প্রস্তুত জনসৈন্য

পালাবে কোথায় ? রাস্তা তো নেই অশ্রু

হাড়ে-রচা এই খোঁয়াড় তোমার জন্ত

হে শত্রু চুষমণ !



যুগান্ত-জোড়া জড়রাত্রির শেষে

দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,

রুদ্ধ মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে

নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো।

চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়িয়ে দস্ত

পতাকা উড়াই : মিলিত জয়সুভ্য

মুক্তির বড়ে শত্রুরা হতভয়।

আমরা কঠিন পণ।

১২, ৭, '৪৪

চৈতমল। ( বিষয়-বিস্ফারিত নেত্রে এক মুহূর্ত অবস্থান করে )

আরে তাও ত' বটে !

হরদ্বারাম। তা, হ'লে সাতটা মাথা ঠিক মিলেছে ত ?

চৈতমল। এক শ বার।

জয়রাম। হাজার বার।

পুরণদাস। লক্ষ বার।

সকলে। ( উল্লসিত কণ্ঠে ) হায় হায়, হায় হায় !

জীবন সিং। জয় বাবা কদরনাথ !

হরদ্বারাম। চূপ চূপ ! খবরদার ও নাম ধ'রে চেঁচিও না।

জীবন সিং। কেন ?

হরদ্বারাম। কতনাথের সঙ্গে বৃহন্নক্ষের জোর আঁকচ। বৃহন্নক্ষ

জোয়ার ওগর এক কোণ দৌড়তে পারে। জয় বাবা কদরনাথ তুললে

তেড়ে এসে ধ'রে নিয়ে যাবে।

চৈতমল। তবে ? তবে ত' সরে পড়াই ভাল ?

হরদ্বারাম। ভাড়াভাড়ি।

( বাস্তব হ'য়ে সকলে নানা ভঙ্গিমহকারে এগিয়ে চলল )

জীবন সিং। জয় বাবা কদরনাথ—

চৈতমল। ( সজোরে ) খবরদার !

টোডর সিং। ( সর্বাঙ্গেরা ছুঁলকায় টোডর সিং লাঠি ঠক্ঠক

ক'রে লেগে লেগে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এ

হরদ্বারামের দিকে হাত বাড়িয়ে ) মশায় পেসাদ ? গুজোর পেসাদ

হরদ্বারাম। ( সতর্কভাবে ) আরে পেসাদ ! প্রাণ বাঁচাও আগে

তার পর পেসাদ।

টোডর সিং। ওরে বাবা রে ! জয় বাবা—খবরদার !

[ কতকটা বেগে এগোল। ]

[ ক্রমশঃ ]

# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

[ আমার স্মৃতিচিত্র যে একে রাখবার উপযোগী, এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি। যে জীবনে অপরকে শোনাবার মতো কোনো সাক্ষ্য নেই, ঘটনা-বাহুল্য নেই, সে জীবন শুধু পুরনো বলেই হয় তো কোনো মুহূর্তে অপ্রাণতোষ ঘটকের খেলায় হরেক্—দেখি। পরীক্ষা করে।

প্রাচীন দলিল-পত্র বেঁটে গবেষণা করা প্রাণতোষের একটি প্রিয় কার্য, সম্ভবত এই কারণেই পরিমল গোস্বামী রূপ প্রাচীন গ্রন্থখানাও তাঁর একবার উটে দেখবার বাসনা হয়েছে; উদ্বেগ : যদি কিছু মেলে।

এই জর্ণ পাতাগুলো শুধু তাঁর অমরোষেই মেলে ধরছি, অন্য কোনো কারণে নয়। এর ইতিহাস-মূল্য কিছুই নেই, আমি শুধু পিছনে ফিরে বা কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে গেরেছি তারই সাহায্যে কিছু কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করব মাত্র— অপ্রাণতোষ ঘটকের প্রতি আমার প্রীতি স্মরণ করে এবং সে ছবি অন্তত আমার কাছে ভাল লাগলেই আমার দায়িত্ব শেষ হল মনে করব।—লেখক ]

## প্রথম পর্ব

আমাদের বাড়ি ছিল পাবনা জেলার সাতবেড়ে নামক গ্রামে।

এই গ্রামটি একটি বন্দর, পদ্মা নদীর উপর অবস্থিত। পাবনা জেলার মানচিত্রে পাবনা থেকে পদ্মা নদীকে অনুসরণ করে পূর্ব দিকে আসতে নদী বেষ্টানে প্রথম বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠের উপর সেই গ্রামখানি; গ্রামের পশ্চিম এবং দক্ষিণে পদ্মা। পশ্চিম দিকে ঈমার ঘাট। ঈমার গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পাটনা যায়, এই পথে।

তুনেছি, এখন আমার পরিচিত সে গ্রাম আর নেই, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম সরে গেছে দূরে।

খুব ছেলেবেলার স্মৃতি কিছু কিছু মনে পড়ে। ১১০০ কিংবা ১১০১ সাল হবে, প্রথম ক্রিকেট খেলার উত্তেজনা। সবাই দলে দলে খেলা দেখতে বাঞ্ছে, আমিও কার কোলে উঠে খেলা দেখছি। শৈশবের এমন সব টুকরো এক-একটা ছবি অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। তখন আমার বয়স দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে।

আমাদের বাড়িতে একটি পাঠশালা বসত, খুব ছোট্টা আসত সেখানে। আমার জ্যেষ্ঠামশাই ছিলেন পাঁচ টাকা বেতনের পোষ্ট-মাষ্টার, তিনিই সকালে ডাকঘরের কাজ শেষ করে এসে এই ছুল চালাতেন। সব সুর করে পড়ানো হত। সব পাঠই চিৎকার করে পড়ত সবাই। সার বেয়ে গাড়িয়ে ইংরেজী প্রতিশব্দ মুখস্থ করত।

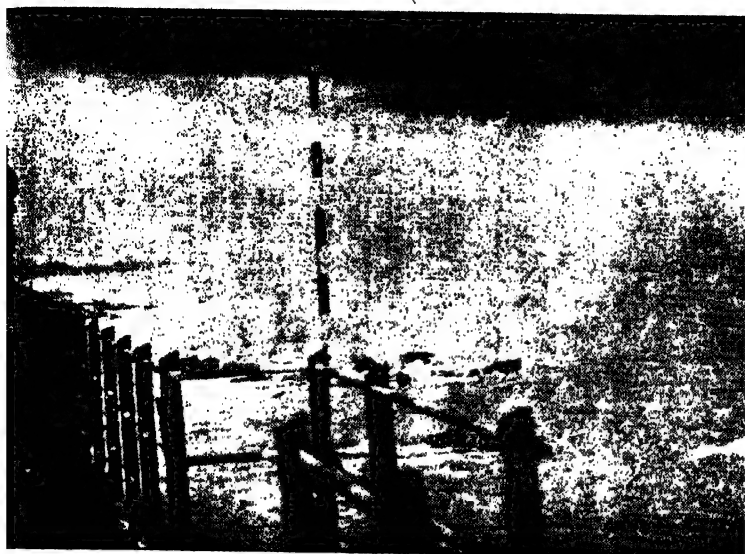
বগলে হাত দিয়ে আর্থপিট—বগল, ইত্যাদি সুর করে বলত। দূর থেকে তুনেই আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল! তখন আমার বয়স চার থেকে পাঁচ।

এখানে চারপাঁচ বছরের ছেলেরা পড়ত। সৌখীন পাঠশালা, বেতন দিতে হত না। আরও একটু দূরে চার আনা বেতনের একটি পাঠশালা ছিল, সেখানে মাসখানেক আমি পড়েছি। আর এক ছিল মাইনর স্কুল, পরে সেখানেই ভর্তি হয়েছিলাম। স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে ছিল সে স্কুল।

আমাদের দেশে কলাপাতার আঁচড় কেটে তার উপর কলম বুলিয়ে প্রথম লেখার পূরূপাত হত, কিন্তু আমি কখনো কলাপাতার নিজে লিখি নি, অন্তরে জন্ম আঁচড় কেটে দিয়েছি।

আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামী সিরাজগঞ্জ মহকুমার পোতাভিরা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। আরগাতি সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত। পিতার হাতেই প্রথম শিক্ষা আমার। তাঁর শেখাবার ধরন ছিল স্বতন্ত্র। তিনি অক্ষর পরিচয়ের আগে গল্প পড়াতে শেখাতেন এবং প্রথমেই কাগজে লিখতে গিতেন। গল্প পড়তে পড়তেই অক্ষর পরিচয় হয়ে যেত আকার ইকার ইত্যাদি সমেত। এতে পড়া শেখা বেত খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ইংরেজী বাংলা দুইই এইভাবে শেখা। জ্যেষ্ঠা মশাইয়ের হাতের লেখা ছিল ইংরেজী কপিষ্টকের মতন। বাবার লেখা আরও সুন্দর ছিল।





সত্ৰবন্ধের ব্রিজ

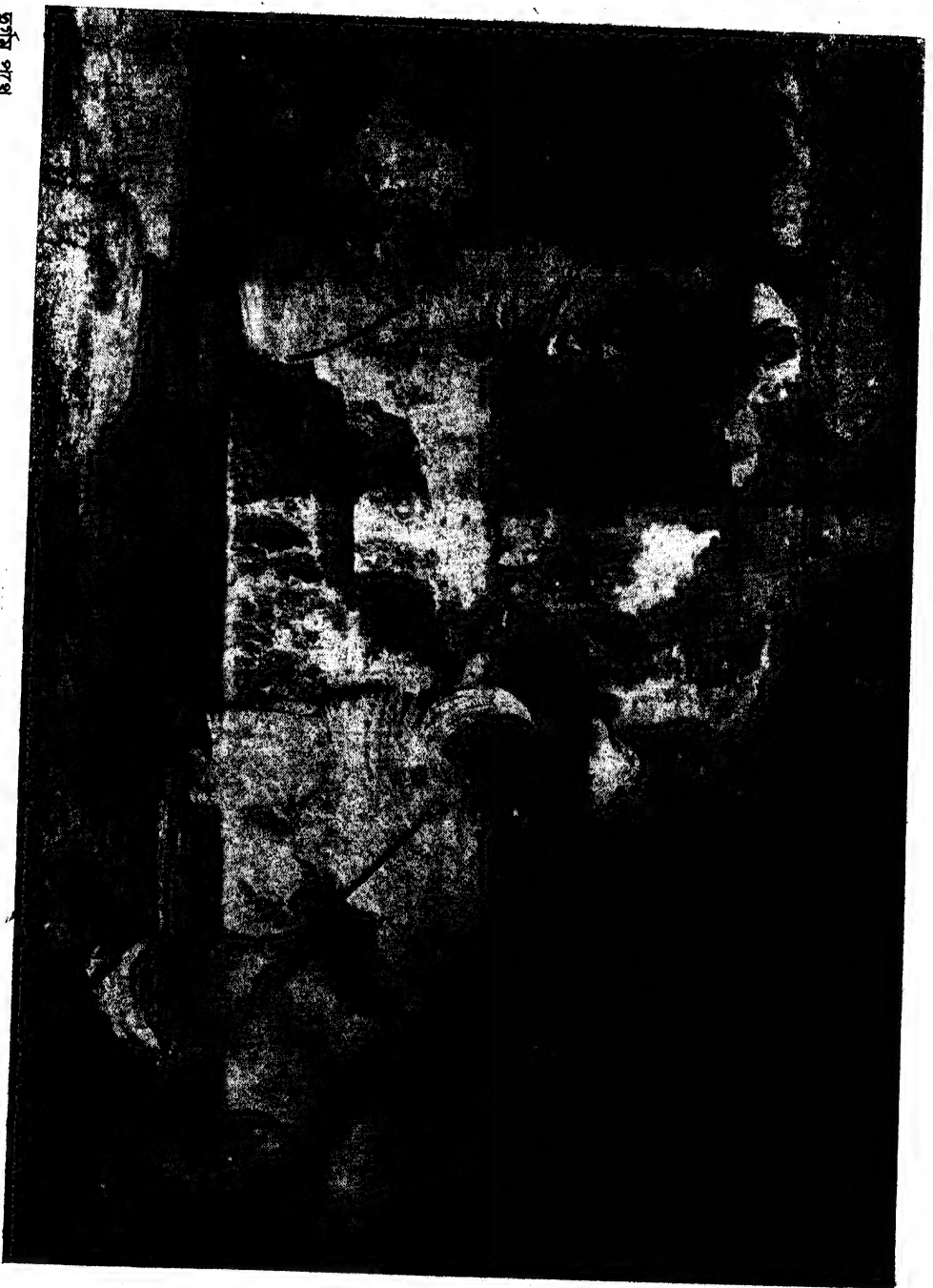
—মানবচন্দ্র শিল্প

মা আর মেয়ে

—রমেশচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



ହାରି ମାତ୍ର



—ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ—



LIBRARY

— 1944 May 1

1944



আহ্লাদে আটখানা

—শ্রী ভক্তেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসে আয়ত হয়েছিল। বাবা ভাল রকম জানতেন, অতএব সে দিকেও বোঁক পড়েছিল আমার।

আমার অক্ষর পরিচয়ের পর থেকেই বাড়িতে সেকালের বাবতীয় সাময়িক পত্র কত যে দেখেছি নানা আকারের সব। জন্মভূমি, স্বাধী, সখা ও স্বাধী, বঙ্গদর্শন, বঙ্গভাষা, সমালোচনী, সাধনা, প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি, উপরন্তু মিশনারি কাগজ মহিলা-বান্ধব আসত নিয়মিত। বেশ মনে পড়ে এক মিশনারি মেম মাসে মাসে আসতেন আমাদের বাড়িতে এবং গান গেয়ে শোনাতেন। তাঁর নাম ছিল মিস এ কিং। একটি গানের হুট হুট আমার এখনও মনে আছে—“প্রভু তোমায় ছাড়ি আমি কোথায় যাব, কেন গুণনিধি আর কোথা পাব।”

মাসিকপত্রগুলির চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অল্প বয়সের পরিবেশে আমার প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ, বই আর ছবি। আর মনে পড়ে মোটা বোর্ডের চোগার প্যাকেটে বিলত থেকে একদিন এলো রতীন ছবির সব প্রতিলিপি, ল্যাণ্ডসিয়ারের আঁকা; বোম্বাই থেকে একবার এলো রবি বর্ষার কয়েকখানি বড় রতীন ছবি। এই সব ছবি আর ছোটদের ইংরেজী বই অথবা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নমুনা পৃষ্ঠা সম্বলিত ফোল্ডারের কয়েকটি রতীন ছবি আমাকে একেবারে উন্মাদ করে তুলল। হঠাৎ রতীন ছবির উপর এক হৃদয়ময় আকর্ষণ জেগে উঠল, যার হাত থেকে আমি সহজে মুক্তি পেলাম না। ঝোপের মধ্যে বাসায়-বসা পাখী ও তার ডিমের রতীন ছবি ছিল একখানা ইংরেজী বইতে। কতদিন সেইটে দেখে দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি। বাজারে কাপড়ের দোকান থেকে বিলতি কাপড়-আঁটা রতীন ছবি চেয়ে নিয়েছি কত। তাবপর যে দিন বাজারের একটি দোকানে জলছবি নামক

এক অতি আশ্চর্য রতীন ছবি ও তার ব্যবহার বিধি আবিষ্কার করলাম সেদিন যেন আমার চোখে এক নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হল।

জলছবির দাম জানতাম না, ভীষণ ঠকতাম পরে বুঝতে পেরেছিলাম। একটি ডালে ছোট ছুটি পাখী, তার প্রত্যেকটা এক পংসা। মাঝখানে কেটে আলাদা বিক্রি হ'ত। যে দাম চাইত তাই দিতাম, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পরসার দিক দিয়ে ঠকলেও আনন্দের দিক থেকে আদৌ ঠকিনি।

স্কোঠামশাইয়ের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় ডাকঘরে বাওয়া ছিল আমার একটা বিশেষ আনন্দ। সন্ধ্যায় দিকে ডাক আসত, সকালে ডাক রওনা হত। ডাক-হরকরা অনেকগুলো ঘুড়-বঁধা একটি বয়স হাতে নিয়ে কমকম কমক-কমক করতে করতে ছুটে আসত, মেলব্যাগ পিঠে নিয়ে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে শশিভূষণ বাগচীর বাড়িতে ছিল ডাকঘর। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত যেতাম, বিশেষ করে শীতকালে। ডাক নিয়মিত সময়ে আসত না। পাচটার আসবার কথা, কখনো নটা-দশটার আসত। চার মাইল দূরে মুজা-নগর সাব পোষ্ট অফিস থেকে আসত এক ঘন্টার বেশি লাগা উচিত নয়। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটি পথে কোনো আড়ডায় বসে নেপা-টেশা করে খেয়াল মত আসত এবং ডাকঘরের কাছাকাছি এসে থুব জোর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটত।

আমার কাজ ছিল চিঠিতে ছাপমারা এবং পরদিন সকালে সীলমোহরের তারিখ বদলানো ও ব্যাগে পোঁরার আগে ডাকবান্ধ খুলে সব চিঠির ঠিকানা লাল কালীতে ইংরেজী করা ও ছাপমারা। ইংরেজীতে নাম থাম দেখা থুব ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল,



হৃদয় ক'রে ভেঙে পড়ল পাঁচ

আমার কাজ খুব নিখুঁত হত এবং পোষ্টমাস্টার ও পোষ্টম্যান উভয়েই এ বিষয়ে আমার উপর সদয় ছিলেন।

হঠাৎ একদিন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে আবিষ্কার করলাম অনেক ছানেকি জলছবি বিক্রি হয়। এবং বারো শীট মাত্র ছ' আনা! তখনি অর্ডার দিলাম, বধাসময়ে ভিঃ পিঃ এলো। ছবির কত যে বিবরণ-বৈচিত্র্য! কত যে আনিয়েছিলাম পর পর। এক একটি শীটে চম্পিত পকাশখানা ছবি থেকে চারখানা পর্যন্ত। ভারতীয় দেবদেবীর চরিত্র ছিল, তার প্রত্যেকটির নিচে নাম লেখা—কালী, তারা, মহাবীজা ইত্যাদি।

ডাকে আরও নানা জিনিস আনাযাম। নিজের নামে এত জিনিস আসছে এর মধ্যে একটা গর্ভ ছিল, বোম্বাক ছিল। শীতকালে সন্ধ্যার ডাকঘর আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করত। এই একমাত্র উপলক্ষ ভিন্ন এত যাত্রা গ্রামের পথে চলার অভিজ্ঞতা ছিল না। যাত্রা হাজার হাজার জোনাকি, অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামের কালো আকাশের বুক সহস্র নক্ষত্র। লপ্-লপ্ করছে। তারই মধ্যে দিয়ে, গ্রামে-তৈরি চার দিকে কাচঘেরা লঠনের মুহূর্ত আলোতে জ্যোত্স্নাশাইরের সঙ্গে বাড়িতে কিরছি, আমার নামে-আসা প্যাকেট চিঠিপত্র হাতে নিয়ে। এর মধ্যকার বহুতরুণ বোম্বাকের আনন্দকুঁচ প্রকাশ করি এমন ভাণা আমার জানা নেই।

একবার ফলকাতা থেকে ডি, পি, ডাকে জলছবি এলো—খুব ছোট ছোট সিকি দু'আনি আয়ুসি আকারের ছবিতে ভরা। এই ছবিগুলো থেকে রবীন্দ্রনাথের নদী কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কইরের মাঠিনে অনেক ছবি লাগিয়ে ঢিলাম। জার্মানির কোন্ শহরে তৈরি সেই জলছবি, তার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টপট প্রাণী সব মিলবে কেন, কিন্তু বতটু মিসল—চবাচবি, কজপ, বাটার সিঁড়ি, উক্তসোধ ইত্যাদি—বেশ দেখতে হয়েছিল। নদী বই আকারে ঘেরায় প্রথম। রবীন্দ্রনাথ এই বই খানবারো একটি প্যাকেটে বাবার নামে পাঠিয়েছিলেন। বাবা আমাদের দুই ভাইকে সবটাই মুগ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন নিজে পড়ে পড়ে। দু'রকম ছন্দে পড়া যায়—দু'রকমই শিখেছিলাম। এই কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগত, হিমগুহা থেকে ঘেরিয়ে নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে। পদ্মানদীর উপরে বাড়ি—আমার বালক মনে নদী কবিতা কত যে কল্পনা জাগিয়ে তুলত। আমি নিজেরই ঘনে সেই নদীর সঙ্গে পর্বত থেকে ঘেরিয়ে দু'ঘরের সমস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর চলা আমার সমস্ত সম্ভার সঙ্গে মিশে আমার মনকে আজও চলার মতো দীক্ষিত করে রেখেছে।



ইলিশ মাছ ধরা শত শত পাল-তোলা নৌকা

আমাদের বাড়ির কাছেই কলুদের বাড়ি। ঘানিতে সববে গিয়ে কি ভাবে তেল বেরায় তা দেখতে খুব ভাল লাগত। একটা বলদ ঘানি ঘোরাত, ঘানির যে অংশটি গোন্ধের কাখে, তার উপর চাপ রাখার দরকার হয় সববে চাপ পড়ার জন্য। কলুদের সেই ঘানিতে অজ্ঞাত ছেলেদের সঙ্গে আমাদেরও কত বার বসতে হয়েছিল আরও কিছু চাপ বৃদ্ধির জন্য, যদিও সে চাপ সববে থেকে তেল বের করার পক্ষে কতখানি কার্যকর ছিল তা আমার জানা নেই। মোটকথা অনেক দিন ঘানিতে পাক খেয়েছি। গুটী সববের টাটকা তেলের গন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে থাকত, সে গন্ধ আজও টাটকা আছে আমার মনের নাকে।

কলুরা উঠে গেল কিছুদিন পরে, এলো সেখানে এক কুমোরের পরিবার। তাদের বৃহৎ গোষ্ঠী। তারা নতুন সব ঘর তুলে বেশ জঁকিয়ে বসল সেখানে। হাঁড়ি, কলসী, মালাসা, সরা প্রভৃতি দিনরাত তৈরি হচ্ছে, রোদে শুকোচ্ছে, রুটির মতন অংশ দিয়ে হাঁড়ির তলা কাঠের হাতায় পিটে ফোড়া হচ্ছে, হাতুড়ির মতো যন্ত্রে শিটিয়ে শিটিয়ে কাঁচা হাড়ি বা কলসীর গায়ে নল্লার ছাপ আঁকা হচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তার পর রোদে শুকানো হাড়ি কলসী পোড়ারবার পালা। প্রত্যেকটি ষাণ দিনের পর দিন বসে দেখেছি। সব মুগ্ধ হয়ে আছে।

আর মনে পড়ে কলের গানের কথা। পরস্য নিয়ে নিয়ে জামান ব্যবসারীরা কলের গান শুনিতে বেড়াত। গানের লাইনও অনেকগুলোর মুগ্ধ আছে। "তোরা মিশি নিবি মিশি নিবি ও বোয়েরা" বা "পারে আলতা পথে কাদা" বা "সৈ লো তোরা খবর চমৎকার"—ইত্যাদি।

একদিন আমার দাদা (জ্যেষ্ঠত্ব ভাই) মলিনীরজন, বয়সে আমার চেয়ে বছরতিনেক বড়—ছুটে এসে আমাকে বললেন, টাকেন্দার আসছে। তাঁর মুখে আতঙ্ক। বললেন শীগগির পালাবি তো চল—দু'জনে ছুটে পালিয়ে গিয়ে এক ঝোপের মধ্যে এক বেলা কাটালাম। টাকেন্দার যে কেন ভয়ের তখন জানতাম না। তারপর একদিন টাকে নিতে হল, অবশ্য দাদাই আগে নিলেন, আমি একা পালিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। টাকে উঠেছে কি না তখন দেখতে আসত টাকেন্দার, টাকে উঠলে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটত। আমাদের বাড়ি থেকে সম্ভবত সবার জন্য চার আনা দেওয়া হয়েছিল। টাকেন্দার খুব খুশি।

মাইনের স্কুলে ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলাম। যথুনাথ সাহা-চৌধুরী নামক এক ধনী ব্যক্তির দেউড়ি পায় হয়ে প্রকাণ্ড বাড়িমা জুড়ে আটচালা খড়ের ঘর, তাইতে স্কুল বসত। স্কুল-ঘরটি সম্পূর্ণ খোলা, ভিতরেও ক্লাসে ক্লাসে কোনো দেয় চিহ্ন নেই, শুধু তিন দিকে বেঁকি ও এক দিকে শিক্ষকের চেয়ার টেবিল। এটি ভাবে এক একটি ক্লাস সাজানো। প্রথম বই বা একটু একটু মনে আছে সে হচ্ছে ক্রাফিস ডেকের গল্প, কাক ও কোকিল কবিতা, বর্গসূত্রীত। ক্লাস টু থেকে শ্রীতে প্রমোশন পেয়েছিলাম তৃতীয় হয়ে। পুরস্কার পেয়েছিলাম চরিত্রগঠন ও একখানি বাংলা অভিধান। ক্লাসে প্রতিদিন ইংরেজী ও বাংলা হাতের লেখা লিখতে হত। -আর জন্য কাগজ বা কেনা হত তা খুব শক্ত ছিল মনে আছে। এক দিন্দা চার পরস্য কিংবা কম। বালী কাগজ নামে কিঞ্চিৎ লালচে আভাযুক্ত কাগজ

খুব চলতি ছিল। জে বি ডি বড়ি বা গুড়ো কালি, অথবা হু পয়সা নামের দোয়াত স্নান তৈরি কালী কিনতাম। এ কালীর গন্ধ, কাগজের গন্ধ আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। যরণ করলে সেই ছেড়ে আসা দেশেরে বহুতে ফিরে গিয়ে সেই কালের মধ্যে বাস করতে থাকি।

কালী অনেক সময় বাড়িতেও তৈরি করে নিতাম। অনেকেই বাড়িতে তৈরি করত। মিশ কালো উজ্জ্বল কালী। হুচার পরসা খরচে এক বোতল। কলম ময়ূরের পালকের। এক পরসায় একটি। নলখাগড়ার কলমেও বেশ লেখা যেত। বদেঈ আলোচনের যুগ সেটি, তার কল গ্রামের উৎসাহী এক কুমার ছাত্র কাচের দোয়াতের অঙ্ককরণে মাটির দোয়াত তৈরি করেছিল। যে দোয়াত ওটালে কালী পড়ত না, সেই রকম। কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কালী দেখা যেত না, সেজন্য খুব জনপ্রিয় হয়নি।

দুপুরে পড়ায় আমার মন ছিল না। হাতের লেখা খাতায় এক পৃষ্ঠা বাংলা ও এক পৃষ্ঠা ইংরেজী, তাও প্রতিদিন লিখতাম না। ওটি বাধ্যতামূলক বলেই ভাল লাগত না। সেজন্য ক্লাসে যেত পড়ত হাতে। শনিভূষণ দাস ছিলেন হেড পণ্ডিত। তিনি একটু সিন্স ছিলেন, তাঁর ক্লাসে বেতের ব্যবহার একটু বেশি হত।

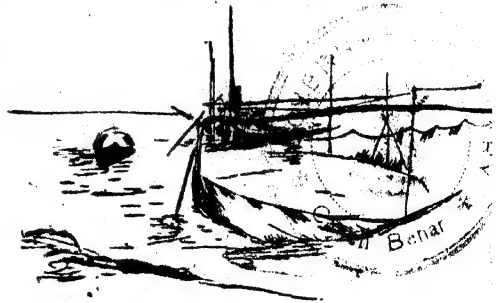
আর একজনের নাম মনে পড়ে—বোগেন্দ্রকুমার কাক্সিলাল। তিনি ছিল শেখাতন। সবার নাম মনে নেই, কিন্তু চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। সহপাঠীদের সবার নাম ও চেহারা কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেও তাদের স্মৃতি আজও অম্লান।

সমস্ত দিন স্কুলে থাকা আসৌ ভাল লাগত না। ক্লাসের পড়া কানে যেত কনাচিৎ। যাত্রিক নিয়মে তখনকার দিনেব এই পাঠ ব্যবস্থা অত্যন্ত শীড়ানায়ক ছিল আমার কাছে। হয়তো বা সবার কাছেই তাই ছিল। তাই স্কুলের পরিবেশ অল্প ভাবে উপভোগ করার জন্য আমরা কয়েক জন বাসক অনেক আগে যেতাম স্কুলে। নানা রকম খেলা আবিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, একখানা ইতিহাসের বইতে বঙ্গ বিহার উড়িয়া আসাম মিলিয়ে একখানা ম্যাপ ছিল, তা থেকে জায়গার নাম খুঁজে বের করতে বলতাম একজনকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা বের করতে না পারলে তার হার হত। সে আবার আমাকে ঐ ভাবে ঠকবার চেষ্টা করত। ছোট ছোট অক্ষরে শত শত নাম, তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা শক্ত। কিন্তু কিছু দিন পরে সব আমাদের এমন জানা হয়ে গেল যে, কোনো জায়গার নাম বের করতে এক সেকেন্ডের বেশি পেরি হত না।

একদিন সবার আগে গিয়েছি স্কুলে। আমাদের ক্লাসটি ছিল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। বর্ষাকাল। যেখানে একা বসে মাটির দিকে চেয়ে দেখি, দীর্ঘ এক সারি পিঁপড়ে চলছে অবিরাম গতিতে ছুটে। তার পর হঠাৎ দেখি তাদের পাশে বসে রয়েছে একটি যেটে রঙের ব্যাঙ। মাটির সঙ্গে এমন মিলিয়েছিল যে আগে দেখতে পাইনি। পিঁপড়ের চলা দেখতে আমার ভাল লাগত। একা বসে বসে কতদিন দেখেছি এক ভেবেছি কি করে ওরা কোনো খাবার জিনিসের সন্ধান পেলে অন্ধকে খবর দিয়ে ডেকে আনে। আবিষ্কার করেছে ওরা পথ চলার সময়, এমন কিছু চিহ্ন বা গন্ধ লেখে যায় যাতে সবাই ঠিক সেই একই পথে চলে আসে। এটি

সত্য কিনা পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে পথের উপর আঙুল ঘষে দিয়েছি। তখন দেখেছি ওদের গতি ঠিক সেইখানে এসে থেমে যায় এবং সবাই উদ্ভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ভাঙা পথের এপারের সঙ্গে ওপারের বোগ স্থাপন করে। তাই একা আমি সেদিনের সেই ঘনসন্নিবিষ্ট পিঁপড়ে সন্দের পথের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, লাইনের মাঝখানে একটু ঝাঁক পেলেই হচ্ছে দেব, আর স্নান হয়ে দেখছিলাম ওদের শালা শালা ডিম হুখে নিয়ে ছুটে চলার দৃশ্য। কিন্তু ওদের পাশে একটি ব্যাঙকে আমারই মতো নির্বিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম। এমন তো কখনো দেখিনি। ওর উদ্দেশ্য কি? সে যুগে অবশ্য পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণার কথা কেউ ভেবেছেন কি না জানি না, ভাবলেও বাংলায় স্নান এক পদ্ধতিগত পিঁপড়ার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ ছিলেন না অবশ্যই। এর সম্ভাবনার কথাও যদি সে বয়সে আমার কল্পনা করার ক্ষমতা থাকত তা হলে অস্তুত সেদিন সেই ব্যাঙটিকে আমি বিভ্রান্তির সম্মান দিতাম। আমি নিজেও যে ওদের চলার দৃষ্টের মধ্যে কোনো কিছু রীতি আবিষ্কার করে, জানাবার মতো বা পাঁচ জনকে জানাবার মতো কিছু করছি এ রকম কোনো কল্পনাও আমার মনে ছিল না; আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু মজা দেখা অথবা শিশুসুলভ কৌতুক চরিতার্থ করা। আমার স্বভাবের সঙ্গে এ ধরনের কাজ বেশ মিলত। নাওয়া-খাওয়া বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, পড়াশোনার মন বসত না, সমস্ত বছরের পড়া তিন-চার দিনে পড়ে শেষ করে রাখতাম, তার পরে আর ঐ একই পাঠ ভাল লাগত না। অল্প শাস্ত্রকে কোনো শিক্ষকই আকর্ষণ করে তুলতে পারেননি তখন, তাই ওতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাই হোক হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখে আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। দেখি সেই নির্বিষ্ট পিঁপড়ের সারির মধ্যে সহসা আধ-ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা একেবারে ঝাঁক এবং পিঁপড়ের অবিরাম গতি সহসা বিপর্যস্ত। চোঁপকে বিচলিত করতে পারছিলাম না। যে জিনিসটি আমি নিজে করব বলে অপেক্ষা করে বসে আছি, তা হঠাৎ নিজে থেকে হল কি করে। অথচ ব্যাঙ আমারই মতো নির্বিচলিত ভ্রষ্টা। বরঞ্চ আমি যেটুকু উদ্বেগ করেছি ব্যাঙ তাও করেনি, তাকে এক চুল নড়তে দেখিনি।

কি ব্যাপার ভাবছি। ইতিমধ্যে বিভ্রান্ত পিঁপড়েরা পথ ঠিক



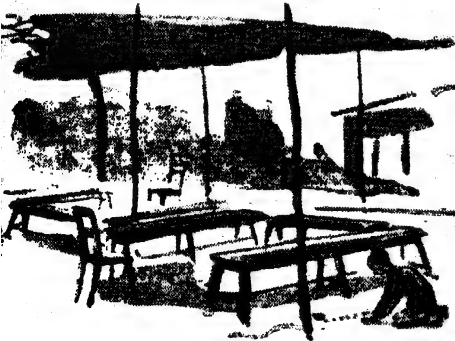
পিত্তের খরা জাল



ক'রে নিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান আমি এ সম্ভা সমাধানের কোনো পথই পাইছি না। ভাবতে ভাবতেই দেখি, আবার কোন বাহুদ্বয়ে সেই এতই জায়গার আশ ইঞ্চি স্থান মূল! ব্যাঙ পূর্ববৎ নির্ধিকার। বৃদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা পাইছি না, রহস্য ভেদ করা অসাধ্য বোধ হচ্ছে। অথচ সে বয়েসে একটি ব্যাঙের কাছে পরাজিত হওয়াও অসম্ভব।

অন্তঃপ্রবল মনোবোগ আরও ঘনীভূত ক'রে ব্যাঙের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম মাথা নিচু ক'রে। রহস্য ভেদ হল। ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে চকিতে একটি জিত বের করে কতকগুলো পিপড়েকে তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল। ক্রিয়াটি এমন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রে গতিতে ঘটছিল যে হঠাৎ লেগে বোঝবার উপায় নেই। এতটুকু নাড়ে, তড়িৎ গতিতে একটি সূত্র কাটির মতো লম্বা জিত বের করতে পারে, এ তথ্য আমার জানা ছিল না। মনে হয় গাঁয়ের কোনো লোকেই জানা ছিল না।

আমার মনে এই ঘটনা ছাপ এঁকে গেছে। এমনি ভাবে বসে তুচ্ছ হোক, জীবনে বা কিছু নতুন জেনেছি তাই আমার কাছে পরম বিময় বলে মনে হয়েছে। দিনের পর দিন তা নিয়ে ভেবেছি এবং সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। এককালে আমার বহু বন্ধু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শ্রীশোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যর কাছে বখন তাঁর বালাকালের রোমাঞ্চকর সব তথ্য আবিষ্কারের কথা শুনছিলাম, তখন আমার বালাজীবনের এ ঘটনাটিও তাঁকে না বলে পারিনি। আমি বখন বি-এ পড়ি তখন বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য বিষয়ে একখানি বই (Discovery, The spirit and service of Science) ছিল আমাদের ইংরেজী টেক্সট বুক। তাইতো প্রথম কীট নিয়ে গবেষণার শৈশব কথা পড়ে বিম্মিত হয়েছিলাম। ফারব দিনের পর দিন কীটদের ব্যবহার লক্ষ্য করছেন পথের ধারে বসে, আর তা দেখে গ্রাম্য মেয়েরা তাঁকে পাগল ভেবে কত কল্যাণ প্রকাশ করছে! এ ঘটনা পড়বার সময় আরও একবার আমার সেই সেদিনের অতি তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন কোঁতুহলী বালক-মনের সেই পিপড়ের দর্শনের দিনগুলির কথা মনে এসেছিল, ভাল লেগেছিল ভাবতে। এই সময়েই আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে আর এক বিময় ভাগিয়েছিল। একটি পতঙ্গ (মথ ভাতিয়) এসে বসেছিল আমাদের বাড়ির বাইরের একটি কাঠ-রাখা ঘরের বেড়ায়। মাটির রঙের পতঙ্গ, কিন্তু তার



ব্যাঙ দর্শন

পিঠে সম্পূর্ণ একটি মাছের মূর্তি আঁকা। ছুটি পাখা গুটিয়ে বসলে অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায় মাছের মুখের। ঘন কালো রেখার মূর্তি। চোখ নাক মুখ অবিকল মাছের, চোখে তারা নেই শুধু আউটলাইন। আমি শিশুকাল থেকেই ছবি আঁকার অভ্যস্ত ছিলাম, কাজেই আমার দেখায় কোনো ভুল ছিল না। পতঙ্গটি একবেলা বসে ছিল, এবং আমি অনেককে তা দেখিয়েছিলাম। এই অদ্ভুত ছবির কথা শ্রবণ বহর ধ'রে বলে আসছি কোঁতুহলী জনকে। আমি তিনতীয় আর একটি দেখিনি। পতঙ্গবিদেয় নিশ্চয় এরকম দৃশ্য দেখে থাকবেন।

বাধাসীন দিগন্তের ঘেরা খোলা আকাশের সীমাহীন বিস্তার, শত্ৰুক্ষেত্রের সবুজ সমুদ্রে কখনো বেঙিন, কখনো হলুদ ফুলের ঢেউ, কখনো অবিরাম সবুজ আর সবুজ, এমন পরিবেশে কোথায়ও নিক্রমিক স্থির রাখতে পারতাম না। মাঠে মাঠে, নদীর ধারে ধারে অকারণ ঘুরে বেড়াতাম। নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাড়িতে বকুনি খেতাম নিয়মিত। ছুটির দিনগুলো এক নিশ্বাসে কেটে যেত। ফুলে যেতে হবে করনার মন খারাপ হত।

নদীর যোগাযোগ্য সমুদ্রের সঙ্গে। সে কোন্ এক অজ্ঞাত হিমগুহা থেকে বেরিয়ে অবিরাম গতিতে চলেছে সেই লক্ষ্য। কোথায়ও তার ছেদ নেই। তার সঙ্গে কত দেশের সম্পর্ক। এক বিরাট অন্তল অসীম সমুদ্রের কোলে গিয়ে তার ব্যক্তাংশ। এই ছবিটি 'নদী' কবিতায় সঙ্গে আমার মনে শিশুকাল থেকে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই নদী আমাকে এমন টানত। তাই মনে হত একমাত্র নদীই আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে আমার মন ছুটে চলত অজানা দেশে। ওকে আমি চিনি, ওর আরন্ত থেকে শেষ পর্যন্ত আমি চিনি।

বন্ধ কোনো কিছু আমার প্রকৃতি বিচ্যোয়ী ছিল। বা কিছু নিয়মিত তার সঙ্গে আমার জন্মবিরোধ। এবং বা কিছু নিবিড় তার প্রতি আমার আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি। নদীর মধ্যে দেখতাম এই নিয়ম ভাঙা গতি। সে যে কি রোমাঞ্চ! বর্ষার পদ্মা। উদ্ভাস্ত জলরাশি প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে চলেছে। কত ভাঙা গাছের ডাল, কত পাতা, খড় কুটো পাক খেয়ে খেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে। গেরুয়া-রাঙা জল। পাকে পাকে ফুলে ফুলে উঠছে, মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে পড়ছে আর কলকল শব্দ ভেদ ক'রে তার আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। আবার পাড় কাটল দেখা দিল, প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে পাড়ের অংশ নিচে বসে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হুড়হুড় ক'রে ভেঙে পড়ল শ্রোতবর উপর। কোনো কাটল সিকি মাইল জুড়ে। কখন ভেঙে পড়বে ঠিক নেই। তারই ধারে ধারে ছিল আমার গতি। কখনো এক লাঞ্চে কাটলের ওপারে যাই, আবার এক লাঞ্চে ফিরে আসছি। ওপারে বাবার পর যদি সে কাটলে-বিচ্ছিন্ন পাড় আমাকে স্তম্ভ তলিয়ে যেত। যারিন কেন, আজ ভাবলে চমকে উঠি। খোলা আর মৃত্যু-যাক্ষাণে একটি সূত্র তার। সেই তারের উপর গাঁত তখন কি রোমাঞ্চ। কিন্তু সমস্ত জীবনটাই তো এঁ ডাবে কাটল।

বর্ষার নদী-বে কত ভাবে দেখেছি। তার দুর্দমনীয় শক্তি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। তার প্রত্যেকটি কলধ্বনি, প্রত্যেকটি অনবর্ত, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এক দিন ভোর বেলা ঘেঁষে-উঠি ভয়াবহ চিন্তে শুনি পদ্মার অতি



শ্রবণ গর্জন। বাড়ি থেকে হাঁটা পথে অসুস্থ হ' সাত মিনিটের দূরত্ব ছিল বর্ষার পন্থার শেষ সীমা। শীতের পন্থার ত্রান করতে যেতাম আশ মাইল দৌটে। নদী তত দূরই ছিল আগের দিনও। কিন্তু হঠাৎ এ কি হল। এমন গর্জন তো ভরা বর্ষাতেও আমাদের বাড়ি থেকে কখনো শোনা যায় নি—এমন ভয়ঙ্কর শ্রবণ গর্জন। সবাই ভীত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আরও আগে বাসের ঘুম ভেঙেছে, তারা নদীর ধার থেকে উত্তেজিত ভাবে ক্রিয়ে এসে খবর দিল, গ্রাম বোধ হয় গেল। বর্ষার মুখে হঠাৎ এক দিনে জল এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে যে, কেউ তার জন্ত আগে থাকতে প্রস্তুত থাকতে পারে নি। পন্থার এ রকম ব্যবহার এই প্রথম। গ্রাম-সীমান্তের ঢালু পাড় থেকে বে নদী পূর্ব দিন সিকি মাইল দূরে ছিল, সে নদী এখন প্রায় হুকুলহারা। নদী ক্ষেপে গেছে। ছুটে গিয়ে দেখি, অসম্ভব কাণ্ড! নদীর ঢালু পাড় কোথায় অদৃশ্য। সেখানে নৌকা বাঁধা ছিল, তা নেই। পাড়ের উপর কাঠের ব্যবসারী ছিল, তার শাল কাঠগুলো সাজানো থাকত, তারও একটা অংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। লোকেরা প্রকাণ্ড একটা বীল এনে জলে ডুবিয়ে ঐ পাড়ের না, সবাইই মুখে-চোখে ভয়ের ছাপ। আমি মৃত্ত বিবিয়ে পন্থার সেই সর্বশালা হুঁত দেখছি; গর্জনে কারো কথা কানে আসছে না। সবাই শুধু চেয়ে আছে আর কি হবে, কি হবে, বলে অস্থির হচ্ছে। সোভাগ্যের বিষয়, গ্রামের উপর সেবারে আর আক্রমণ হয় নি, গ্রাম রক্ষা পোয়ে গেল।

সাধারণত বর্ষার প্রথম জল এসে নদী বনন কানার-কানার পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারই মুখে ইলিশ মাছ ধরার মরশুম। ঝড়-বুড়ি তখন কম, ঝড়ের কাল ভৈরবের শেষেই শেষ হয়ে যায়। তার পর মাছ ধরার কাল। তখন শত শত নৌকা একত্র শ্রোতের সঙ্গে জলে জাল নাড়িয়ে ভেসে চলে। নৌকায় মাছ হুঁজন লোক। একজন হাল ধ'রে বসে আছে, আর একজন জাল ধ'রে। ইলিশ মাছ জালে আটকা পড়লেই হাতের দড়ি কেঁপে ওঠে, বোঝা যায়। তখন জাল টেনে তুলতে হয়। তখন যে মাছ ধরা পড়ল, সেটিকে নৌকায় রেখে আবার জাল ফেলতে হয়। একসঙ্গে ছুটো-তিনটেও ধরা পড়ে কখনো। এই ভাবে হুঁতিন মাইল শ্রোতে ভেসে গিয়ে নৌকা ফেরাতে হয়। তখন শ্রোতের বিপরীত মুখে উজিরে আসতে হয়। কিন্তু স্মরণে এই যে, এই মরশুমে বাতাস বয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তাই নৌকা ক্রিয়ে আসবার সময় পাল তুলে দিলেই কাজ হয়। একসঙ্গে হুঁতিন শ' পাল-তোলা নৌকা জলের বুকে কেঁদা তুলে উজিরে আসে। কোনো পাল শালা, কোনোটা নীল, কোনোটা লাল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। এই ভাবে এসে, আবার পাল গুটিয়ে মাছ ধরতে ধরতে যায়, আবার আসে। ছবির মতো দেখার বনন বিচিত্র রঙীন পাল তুলে অতগুলো নৌকা এক সঙ্গে ক্রিয়ে আসে। এদের নৌকায় উঠে এদের সঙ্গে মাছ ধরা দেখেছি কতবার সেই বর্ষার পন্থার বিপজ্জনক বুকে।

বর্ষাকালে আর শুনেছি দু'গাভ ডোঁড়া কামানের ধ্বনি গুড়ম গুড়ম, পর পর ছুটি আগুয়াজ, গভীর এবং জোবাসো, কিন্তু সে যে কিসের আগুয়াজ তা কেউ বলতে পারত না। মিন বাত শোনা যেত।

এই নদীর আর এক রূপ শীতকালে। তখন জল বহুদূর সরে গিয়েছে, তীরভূমির বিস্তীর্ণ বাসুর বুকে হাজার হাজার জলতরঙ্গ

জাঁকা। কাদাখোঁগা পাখী জলের ধারে ধারে কানার খোঁচা দিয়ে ফিৎফে। ছোট ছোট ছেলেরা এখানে সেখানে ছাতার আকারের কাঠামোর বাঁধা জাল অপভীর জলে ফেল দূরে দড়ি ধ'রে বসে আছে, এক বাঁক খরসোলা মাছ তার উপর দিয়ে সঁতার কেটে যাবার সময় এক হেঁচকা টানে তাদের ডাঙার তুলে ফেলবে। মাথার উপরে অল্প গাউচিল উড়ছে। দূরে নদীর মাঝখানে এখানে সেখানে জল এত কম যে সে সব জারগার ঝিমার আটকাবার ভয়ে নিশানা পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কত চরভূমি জল থেকে মাথা বের করেছে। কীর্ণ নদীর ওপারের বাস্তুট দেখা যাচ্ছে—বহুদূর বিস্তীর্ণ সে বাস্তুভূমি পায় হয়ে দিগন্তে ঘননীল গাছের সারি—লাকালয়ের নিশানা। গাছের ঘন সবুজ দূর থেকে এমনি নীল দেখায়। এপার থেকে যেরা নৌকা বাত্রী বোঝাই ক'রে ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। নদী পারেরই ফরিদপুর জেলার সীমানা। সেখান থেকে দক্ষিণে ছ'সাত মাইল হাঁটলে ইষ্টার্প বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের পাশা ট্রেশন। সেখান থেকে পূর্ব দিকে প্রথমে কালুখানি, তারপর বেলগাছি, তারপর রাজবাড়ি তারপর পাঁচুরিয়া-জংশন, তার পর গোয়ালন্দ। পরে নূরনগর নামক একটি ট্রেশন হয়—রাজবাড়ির আগে।

কীর্ণ পন্থার বুকে ঝিমার চলেছে জল মাপতে মাপতে 'এ পানি তল মিলে না'—ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায় অনেক সময়। নির্বেশ নীল আকাশের নিচে প্রশান্ত নীলাভ নদী, জল এখন স্বচ্ছ, গ্রামের শেষে তারে তারে বতদূর দেখা যায় সবুজ ক্ষেতের হলুদ ফুলে ছাওয়া। চারদিকে কি অপরূপ উল্লাস করা আলো ছাওয়া। এমনি দিনে কতদিন নৌকায় চড়ে কালুখালি ঘাটে নেমে, সেখান থেকে পালকীতে গিয়েছি রতনদিয়া গ্রামে—আমার মামাবাড়িতে। সে সব আজ স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

১১০৬ কিংবা ৭ সাল হবে, সেই সময়ে খিহেটাবের প্রসার হয়েছিল



এ দিকে—এ পথে

সুদূর পল্লীতেও। বালককালে দেখেছি খিচুড়ীর সাতবেড়ের সলঙ্গ নিশ্চতপূর গ্রামে। পালা ছিল হিম্মতপুর, মনে আছে আজও। আর মনে আছে উপসীনে খোড়ার চড়া শিবজী মূর্তি। সেই স্ক্রীন ছবি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই বেন।

পদ্মা নদীর ধারে ধারে আপন মনে হরে বেড়ানোর বে কি আনন্দ হস্ততা প্রকাশের ভাষা নেই। কখনো ওপারের ট্রেন চলার শব্দে, কখনো ট্রিমার বাগদার দৃষ্ট মন উগাও করে বের অদেখা অচেনা দেশ দেশান্তরে।

ট্রিমারের চেহারা ও নাম মনে আছে। প্রথমে যে ট্রিমারের নাম আমি ট্রিমার ঘাটে পাড়িয়ে দেখেছি এবং আজও মনে আছে সে হচ্ছে ডাক্তারিস্তান। প্রাকাণ্ড ট্রিমার, পোর্টের দুধারে দুই চাকা বা প্রোপেলার। সেই চাকার আবরণের উপর অর্ধচন্দ্রাকার নামটি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। এ কিসের নাম, এর অর্থ কি, এ সব তখন সম্পূর্ণ হৃদযোধ্য ছিল। শিশুকালের কথা। কিছুদিনের মধ্যেই এরকম চওড়া ট্রিমার চলা বন্ধ হল, তার বদলে দেখা দিল লম্বা ট্রিমার—পিছনে তার চাকা। সুনলাম এ ধরনের ট্রিমার খুব অল্পজলে যেতে পারে—তাই পদ্মায় চলার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। বর্ষা চলে গেলে পদ্মায় বৃকে বহু চড়া ভাগে, ভাল কয়ে বার, তখন ভারী ট্রিমার চলতে পারে না। অদৃষ্ট চড়ায় আটকে বাওয়া কত ট্রিমার দেখেছি। দুদিন তিন দিন পল্লভ আটকে থেকেছে কোনো কোনোটা। আটকা পড়লে প্রাণপণে বাঁশি বাজাতে থাকে—উপটোদিকে চাকা ঘুরিয়ে হাঁসকীস করতে থাকে, কখনো বা অল্প ট্রিমার সে পথে গেলে সে দড়ি বেঁধে তাকে টানতে থাকে।

সোয়ালন্দ ও পাটনার মধ্যে এই ট্রিমার বাতায়ন করত। পরে যে সব লম্বা ও হালকা ট্রিমার দেখা দিল তাদের নাম সবই মনে আছে। মিনার্ভা, জুপিটার, রোহিনী, মহাইল, নেশচুন প্রভৃতি। পদ্মায় উপরে ছিল সুরেশ ভৌমিকের বাড়ি। আমার সমবয়সী ছিল সে। সে ছিল ট্রিমার-উদ্যাদ। রাতদিন সে ট্রিমারের বগ্ন দেখত, হৃদয় থেকে ট্রিমারের বাঁশি শুনে বলে দিতে পারত কোন্ ট্রিমার যাচ্ছে। উত্তান বা ভারিতে কবে কোন্ ট্রিমার সাতবেড়ে পার হবে তা সে সুখই ক'রে রাখত। ক্রমে আমারও ঘনিষ্ঠতা হল এ সব ট্রিমারের সঙ্গে। একে একে সবগুলোতেই চড়লাম। ১১১৭ সালে সব চ'ড়তি এ লাইনের ট্রিমারে।

১১০৫—৬ সালের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঊ পল্লীগ্রামেও বিস্তৃত হয়েছে। দেশী কাপড় কিনেছে অনেকে। বেশ পথে 'মায়ের দেওরা যেটা কাপড়' গান গেয়ে কিম্বদন্তি গ্রামের মহাবীরা, তার মধ্যে আমিও সারাদিন ঘুরছি বেশ মনে পড়ে। উদ্ভক্ত, কেন এ আন্দোলন, তা বোঝবার মত বয়স নয়, শুধু এর ব্যাকার বোমাক আর উগ্রাননাটা অমৃভব করছি। সাতবেড়ে কাণ্ড বন্ধ। ছোটো বাজার ছিল, নাম বড় গোলা, ছোট গোলা। গোলায় বিদেশী বর্জন সম্পর্কে একটি সভা হয়েছিল, এবং সে সভায় আমি কিছু বসেছিলাম—সেই ঘটনার একটি অস্পষ্ট ছবি মনে ভাগে। ন বা কিছু পরে আমি প্রথম বিড়ি দেখি সাতবেড়ে গ্রামে। কি পর দৃষ্টিতে যে দেখেছিলাম বিড়িকে। এই সময়কার একটি ঘটনা আমার খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে হুসে মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক রীতির প্রচলন। বাইরে থেকে এসেছিল না কে এসে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে রেড মাস্টার

আমাদের সবাইকে ডেকে বসেছিলেন, মুসলমান ছেলেরা সবাই টুপি পরে আসবে, তারা শিক্ষকে দেখলে হাত তুলে সালাম জানাবে, হিন্দু ছেলেরা হাত তুলে নমস্কার জানাবে। এই আপাতনির্বোধ রীতিটি খুব অল্প দিনের মধ্যেই চালু হল এবং মুসলমান ছেলেরা উপরন্তু শুক্রবার বিকালে নমাজ পরার নির্দেশ ও ছুটি গেল। বহুকাল পরে বৃকতে পেরেছি হিন্দু মুসলমানকে সম্পূর্ণ পৃথক করার মতলব ছিল এর পিছনে, এবং তা তখন থেকেই এইভাবে যোগ্য পথে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে শত্রুতা ছিল না, থাকা উচিত বলে কারো মনেও হয়নি, কিন্তু সরল গ্রামবাসীর মনে তার বীজ বপন করা হল এই ভাবে।

অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামে সাইকেল এলো একখানা। এক ডাক্তার এসেছিলেন তাইতে চড়ে বাইরে থেকে। বহু লোকের ভিত্তি জমেছিল হুচাকার গাড়ি দেখতে। সেই ডাক্তারের অভিমানবধ বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো সংশয় ছিল না।

তখনকার দিনে সুদূর পল্লীতে সদস্যবাহী ছিল খুবই সরল। বাবা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন সে সময়। সাতার খরচ মাসে পাঁচ টাকার বেশি হত না। দৈনিক বাজার খরচ সর্বোচ্চ এক আনা। চাল দু' টাকা আড়াই টাকা মণ। মাছের সময় এক পরসায় মাছ দু' বেলার পক্ষে যথেষ্ট। ইলিশের মরশুমে একটা মাঝারি ইলিশ এক পরসা। একবার মাছের কোনো দামই ছিল না, সেবারে মাছের শুধু ডিম খাওয়া হত মাছ বাজ দিয়ে। তবে ইলিশের এমন প্রাচুর্য আর কখনো দেখিনি। কাঁচা লুকা এক পরসায় তিন সের, লাউ এক পরসায় দু'টো-তিনটে, দুধ এক পরসা দু'পরসা সের। দিম্বাখন সব সময়ে বাড়িতে তৈরি হ'ত, বেশি দরকার হ'লে যোগেদের কাছ থেকে কেনা হ'ত আট আনা থেকে এক টাকা সের।

এই ছিল বাজারের সাধারণ অবস্থা। এ সময় নিজে আনক দিন বাজার করছি তাই মনে আছে। ইলিশ মাছের সময় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নদীর ধারে বিদেশী পাইকরদের চালা উঠত। তারা প্রতিদিন প্রচুর ইলিশ কিনে বসত কাটতে। প্রকাণ্ড ঝকঝকে ধারালো বীট, ডান-হাতের বুড়ো আঙুলে পাট জড়ানো। মাছের বুড়ো বাদে সবটা মাছ তেরছা ভাবে চাকাচাকা ক'রে কেটে বাছে এক জন, আর এক জন তাতে হুণ মেখে মেখে জালাতে সাঝাচ্ছে। ডিম থাকলে তা হুণ মেখে পৃথক জায়গায় রাখছে। মাছের বুড়োগুলো শুধু তারা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি ক'রে দিত। জায়গাটা আমাদের বাড়ির অনেকটা কাছে এবং বুড়ো খুব ভোরবেলা পাওয়া যেত বলে কিনতে যেতাম মাঝে মাঝে। এক পরসায় কিনলেই দু'বেলা। এক পরসায় সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৬টি বুড়ো কিনেছি অনেক দিন। সেদিন বাড়িতে শুধু বুড়োর কোল, আর চচ্চড়ি।

শীতের দিনে যখন ইলিশ কমে আসত তখন অল্পাধিক মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কোনো মাছ ওজন দরে বিক্রি নয়। ভোরবেলা পদ্মা নদীর ধারে থরা জালে মাছ থরা আরম্ভ হয়। নৌকো এক জায়গায় বেঁধে, প্রকাণ্ড ত্রিকোণাকার বাঁশের স্ক্রেনে বাঁধা জাল ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছুকাল পরে তার একটি কোণের উপর উঠে পাড়ালে মাছপ্রজ্ঞ জাল উঠে আসে জল ছেড়ে। ছোট ছোট সুবাহ সব মাছ। তখন এখান থেকে কত বার মাছ কিনেছি। সকালে কয়েক বহু মিলে পাতন করতে করতে পদ্মায় ধাবে যেতাম, দুধ বুতে,

বোম পোয়াতে আর মাছ কিনতে। ডাঙা থেকে খরাজালের দূরত্ব বারো-চৌদ্দ হাত। বড় কুমারের মতো বয়সেও এক পরগা বা হুঁ পরগা বেঁধে ছুড়ে দিতাম নৌকোর উপরে, জেলেরা পরগা পুলে রেখে দেই কাপড়ে মাছ বেঁধে ছুড়ে দিত ডাঙায়। শিরেল মাছ (পেট পিঙ্গলবর্ণ, তাই থেকে নাম) বাঁশপাতা মাছ, খরসোলা প্রভৃতি পাঁচমিশেলি মাছ, অল্পত ভাল খেতে। যে কোনো বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা, আতা, কলা প্রভৃতি ফল ও বাড়ি-সলগ্ন ক্ষেতে বেগুন, লক, সিম, লাউ, কুমড়োর ছড়াছড়ি। দূর দূর গ্রাম থেকে মুসলমান বিক্রেতার শাকসব্জী, তরিতরকারী হুধ বাজারে বয়ে নেওয়ার পথে বাড়ির দরজার দরজার বিক্রি করতে করতে যেত। পছন্দমতো মাছ কিনতেই শুধু বাজারে বাওয়া। গ্রামে তখনও ব্রাহ্মণ বাড়িতে প্রকাশ্যে পেঁয়াজ খাওয়া চালু নয়, সবাই বাজার থেকে ও জিনিসটি ঢেকে ঢুক বাড়িতে আনত। আমি পেঁয়াজকলি বা পেঁয়াজ প্রকাশ্যে আনতাম, অথচ তার জন্ত কেউ কোনোদিন কিছু বলছে মনে পড়ে না। আমরা ছিলাম বৈষ্ণব—আমার মা শাক্ত পরিবারের। বাড়িতে মাছ-শাসনই প্রবল ছিল।

আমাদের বাড়ি ও আরও দু'একখানি বাড়ি ভিন্ন সর্বত্র মেয়েদের চিরাচরিত গ্রাম্য সাজ। একখানি শাড়ী মাত্র স্বল, না সেমিজ-ব্লাউস না জুতা। বডিস সেমিজ প্রচলিত হয়েছিল তখন গ্রামেও, এক তার ব্যবহার অন্ততঃ আমাদের গ্রামে হুতিনটি বাড়িতে আবদ্ধ ছিল। মেয়েদের জুতা পরা একেবারে অচল ছিল। আমার বোনরা স্কুলে বাবার পর থেকে মেয়েদের জুতা প্রচলিত হল আমাদের বাড়িতে।

গ্রামে দলাদলি ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। রাড়ি বারেন্দ্র দলাদলিই বেশি ছিল। কেউ কারো বাড়িতে থাকে না, আবার দেখতাম মাঝে মাঝে একসঙ্গে খাওয়াও হত। বাবা বিদেশে থাকতেন এবং নিজের পড়াশোনা নিয়ে স্বতন্ত্র থাকতেন, কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে কখনো তাঁকে যেতে দেখিনি। সাতবেড়ে গ্রাম হিন্দুপ্রধান ছিল, তার কারণ এটি ছিল একটি বিশিষ্ট বন্দর এবং ব্যবসার কেন্দ্র। তাই ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় ছিল এখানে বেশি। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় গ্রামে প্রাক্‌স্টেট মাত্র দুজন—একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের, এঁরা মৎস্য ব্যবসায়ী—এঁদের মধ্যে সবাই অবস্থা ভাল এবং তখন শিক্ষাক্ষেত্রে এঁরা এগিয়ে আসছেন। এঁদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে হালগার ছিলেন এম-এ, কৃষকগণের সরকারী স্কুলে ও কলেজ অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। আর একজন ছিলেন আমার বাবা। তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন ১৮৯৭ সালে। আর একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তিনি বার-এটল হয়েছিলেন, অতঃপর গ্রামের সমাজ থেকে চ্যুত ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি হুঁ একবার এসেছেন গ্রামে মনে পড়ে।

গ্রামে শ্রুতির দিনেব নদী ও মাঠের আবহাওয়া বর্ণনা করেছি, কিন্তু ঘুরে কির মন-কেবলি ছুটে বার সেই কালের মধ্যে সেই দায়িত্বহীন প্রকৃতির কোলে লালিত শৈশবে। লিখতে লিখতে লেখা যেমে পেছে কত বার, বৈষ্ণব মন আঁর্ত হয়ে উঠেছে সেই চলে বাওয়া দিনগুলির জন্ত। সেই উদার নিলাকাশ, ওপারে ধূ ধূ করা শালা বলুড়, মোনালি যোমে সমস্ত বন্ধ নদীটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নৌকা চলেছে ঘুরে কাছে। সওদাগরি প্রকাণ্ড এক একটা নৌকা ডবল পাশ তুলে দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। কোনো কোনো নৌকা গুন টেনে নিয়ে চলেছে মাঝিরা। আকাশের পাঁচের চিল উড়ছে, মাছবাড়া বসে আছে খরাজালের বাঁশের উপর। জলে মাঝে মাঝে হল ক'রে শুকু মাথা তুলে ডুব বাড়ে। এরই মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতাম। মনে হত এমন মন্থর ভাবে, হাঙ্কা ভাবে, ভেসে চলি এপার থেকে ওপারে, তারপর আরও দূরে—আরও দূরে। আমি একা ঘর ছাড়া বাসক পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধন নেই, সমস্ত আকাশ, বাতাস, শতক্ষেতের গছ, পল্লী-জীবন, পল্লীর মাটি, সব যেন মিলে মিলে একাকার হয়ে একটি গানের সুরের মতো আমার মনে বাসতে থাকত অবিরাম, আমার মাথা একটা অল্পত মাসকতার সিমসিম করত।

গ্রামের ভিতরে বন্ধন, নদীর ধারে এসে উদ্গার করা মুষ্টির স্বাদ। মন ওপারের অল্পত রেলগাড়ির এতিন উদগিরিত ধোঁয়ার চিহ্ন ঘরে অজানা দেশের স্বপ্ন গড়ে তুলত। মনে হত ছুটে চলে বাই দূর দূরান্তে—অবিরাম শুধু ছুটে বাই।

সেদিনের সব তুচ্ছ আজ বড় হয়ে উঠেছে। এক দিনের একটি সামান্য ঘটনা মনে এসে। প্রথম স্কুলে গিয়েছি—সেই সময়কার। আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে প্রায় দশ মিনিট লাগত স্কুলে যেতে। পথের মাঝামাঝি জায়গার একটা বাঁকের ধারে একটি বাড়ি ছিল। কার বাড়ি মনে নেই, তখনও জানতাম কি না তাও এখন আর মনে পড়ে না। সেই বাড়ির একটি নিচোলা স্বাক্ষরের বউ কলসী কাঁধে জল নিয়ে কিরছিল পল্লা থেকে। আমি বই হাতে স্কুল থেকে কিরছি একা। বোঁটি আমার দিকে সরেছে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন্ বাড়ির?

তখন আমি নিতান্তই শিশু। কোন্ বাড়ির আমি, এ প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দিতে হয় জানতাম না; আমি শুধু প্রশ্নপথে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—এ দিকে, এ পথে গেলে একটা বাড়ি পাওয়া যায়, সেখানকার ছেলে। সে যদি আমার বাবার নাম বা আমার নাম জিজ্ঞাসা করত তা হলে বলতে পারতাম, কিন্তু তুমি কোন্ বাড়ির ছেলে এই যোবা প্রশ্নের সোজা উত্তর কি? সেই বয়েসে তা আমার মাথায় আসনি। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম এবং নিজেই খুবই চোটে মনে হয়েছিল এজন্য। পরে স্মরণকার ঘটনাটা মনে পড়েছে এবং কেন প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি এজন্য নিজের উপর ভাষণ বাগ হয়েছে।

আজ এ ঘটনাটা হঠাৎ মনে এসে। আজ তো এর উত্তর জানি কিন্তু আজ সে কোথায়? যদি সে বোঁটি আজ বেঁচেও থাকে, তবে তার বয়স সত্তর পার হয়েছ নিশ্চয়। আজ সে ছবির, একটিও তার গাঁত নেই, চামড়া শীর্ণ, হাতে হরিনামের মাগ। আজ যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারি তবে কাছে গিয়ে তার চেহারা দেখে চমকে উঠব। তাকে বলব, আমি তোমার সেদিনের প্রশ্নের আজ উত্তর দিতে এসেছি। কিন্তু সে বলবে সে উত্তর তার আজ আর কেনো প্রয়োজন নেই, কোনো দিনই ছিল না। কিংবা এত কথা বলারও তার দরকার হবে না, আমার কথা তার বখির জীবনযাত্রার থানকা খেয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে কির আসবে, মর্মে প্রবেশ করবে না।

[অবসর]

# পত্র

[ মাসিক বহুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলী ]

১০, ৮, '৪৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ঊর্ধ্বাধিপুর্ণ চিঠিখানি পেয়ে বৎসরোনাড়ি গুণী হয়েছি। এমন আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ কোনদিন আমাকে লিখতে আহ্বান জানায়নি। বহুমতীতে লিখবো বৈ কি, নিশ্চয়ই লিখবো। বহুমতী যে কি বিরাট প্রতিষ্ঠান তা আমার অভ্যাস নেই। বহুমতী না থাকলে বাঙলা দেশের বহু গুণী সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে লুপ্ত হয়ে যেতেন। বহুমতী থেকে প্রকাশিত সত্তা মূল্যের বইগুলি না পড়লে আমাদের মত দরিদ্র দেশে পাঠকপাঠিকা সৃষ্টি হ'তে পারতো না। আমি লোকহৃদে তুলেছি ও খচকে দেখেছি, মাসিক বহুমতীর উন্নতির জন্য আপনি কি অপরিমিত পরিশ্রম করছেন। এই পত্রিকাটি আমার মনে হয়, খুব শীঘ্রই বাঙালীর দ্বার জয় করতে পারবে। আমার পরিচিত বহু বিশিষ্ট সহযোগী সাহিত্যিকও এই একই কথা বলেন। আপনি যে পথ ধরেছেন সেই পথে এগিয়ে চললে বাঙলা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহায্য অবশ্যই পাবেন। আপনি তো নিজেও কলম ধরেছেন। সাহিত্যিকরা কি ধরনের সেক্টিয়েন্টাল হ'তে পারেন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত আবার একটি উপন্যাস লিখতে অর্ডার করেছেন, কিন্তু তখনকার মন আর চোখ এখন আর নেই। সেট পারিপার্শ্বিককে হারিয়েছি বহুকাল আগে। এখন আমি শহরের বাসিন্দা। বাস্তবিক কলকাতার সম্পর্কে এসে গ্রামীন সরলতাকে প্রায় ভুলতে বসছি। তবুও হলপ করছি, আপনাকে এমন লেখা দেব যে আপনি অবশ্যই গুণী হবেন। বহুমতীর বিরাট পাঠকগোষ্ঠী, আমি নিজেও তাই আপনাদের লেখা সেওয়ার আগে বেশ সাত-পাঁচ ভাবছি। অন্তর থেকে কামনা করি, আপনার মঙ্গল হোক। শীঘ্র একদিন আসছি। ইতি

প্রীতিপ্রার্থী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২

১৫. ১০. '৪৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার দপ্তরে এসে শুনলাম, সেই মাত্র নাকি আপনি বেরিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান গুণেচ্ছা ও প্রীতি জানাতে এসেছিলাম; এসে শুনলাম, আপনি নাকি শিশিরকুমার ভাট্টার কাছে গেছেন। শীঘ্রই মারেক দিন আসছি। 'চিচ্ছুর প্রেক' যদি বেশী ঠেড়ী থাকে, মজবাবে লেখে দিতে পারি। তাকে হয়তো সুবিধা হবে। বহুমতীর প্রকাশকাল বিভাগ থেকে কয়েকটি প্রত্নাবলী নিয়ে গেলাম। মজবুদ জন লেখকের লেখা প্রায় বিস্তৃত হয়েছি। বহুমতী, প্রকাশকাল আয় দামোদর প্রত্নাবলী আজ নিয়েছি। পরে আরও কয়েক জনের বই নিতে চাই। আশা করি, অবত করবেন না।

কিছু টাকার প্রয়োজন, অন্তত: আজ পাওয়া গেলে বিশেষ উপকারে লাগতো। আপনার কথামত আমি আমার মাত্রা কমিয়েছি, কিন্তু একেবারে ছাড়তে পারছি না। কি যে এক বৎ অভ্যাস পাড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর একটু-আধটু না চললে সারা দিনের স্নান যেন কিছুতেই মোচন হয় না। লিখতেও কসতে পারি না। আপনি সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, এই বিশেষ অবস্থায় লেখা চলে কি না? বিশ্বাস করুন, না খেয়ে আমি লিখতেই পারি না। মনের একাগ্রতা আনতে পারি না। তবে ভাল জিনিষ সকল সময়ে মেলে না। ব্যয় অল্পপাতে আমার আর খুবই অল্প। এই দু-থেকে চাকরী নিয়েছিলাম সরকারী। সেই চাকরী আমার কাল হয়েছিল। চাকরী পাওয়ার পর থেকেই বৎ অভ্যাসটা আয়ত্ত করতে হয়। এ সব অতি গোপন কথা, ক'কেও যেন বলে ফেলবেন না ঘৃণাক্রমেও। আশা করি, কুশল। ইতি—

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

২০, ১২, ৪৬

প্রিয়বরেষু,

ভাই, একটা দিন দেবী হয়ে গেল, সেজন্ত কমা চাইছি। বুধবার বিকেলের বসলে আজ শুক্রবার সকালে পাঠ্যলাম। কারণটা এই যে বুধবার লেখা শেষ হ'লেও কিছুতে মন উঠলো না। উপন্যাসের আরম্ভটা ভাল হওয়া দরকার, তাই আবার পোড়া থেকে লিখে দিলাম। লেখার আরম্ভ নিয়ে চিরকাল আমি ব্যস্ত হই। একবার আরম্ভ করতে পারলে আর কিছু ভাবনার থাকে না। ভাল বিস্তার করার কাজই শক্ত, ভাল গুটানোর কাজটা আর এমন কিছু নয়। এবারের উপন্যাসের আশট কিছু কম হবে, তাতে যদিও কিছু আসবে যাবে না। বাকের পটভূমিকায় এই উপন্যাস তাই পূর্ণ পুচনা এতেই পাঠকেরা পাবেন। পূর্বের বার পুঁথিরে দেবো, এখন থেকেই কথা দিচ্ছি। সেদিন কবি-বন্ধু বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা হ'ল। আপনার মত আমিও তাঁর লেখার খুব ভক্ত। তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করলেন। আমিও সারি দিলুম। আগামী সোম কিংবা মঙ্গলবার আসছি। আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

Tallygunge Place

17.1.47

প্রিয়বরেষু,

বেশ একটু আশাত লেগেছে। কোন এক পুস্তক জানতে পাইলাম, পুস্তক লেখার বহুমতীর কোন কোন লেখক তাঁদের লেখ

এক শো টাকা পেয়েছেন দক্ষিণ। আর আমি আমার 'টিচার' গল্পের জন্য দক্ষিণ বা মজুরি পেয়েছি পঞ্চাশ টাকা। আমার এ অভিমান খুব কম, সমমানের জন্য কোন দিন কাতরাই না। তবে কয়েকজন লেখকের তুলনায় অর্ধেক বনে গিয়ে, বিশেষতঃ বহুমতী এবং আপনার কাছে, একটু অসন্তুষ্টি বোধ করছি। এ আমার অভিযোগ নয়, অস্বাভাবিক। আমি বেশ ভালভাবেই জানি, আপনার কাছে বিচারের তারতম্য হয় না বা হবে না। তবে কি তুল তুলেছি? এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা হবে। আমি আগামী কাল আবার আসছি আপনার অফিস-টাইমের মধ্যে। মাসিক বহুমতী নিয়মিত পাচ্ছি জানবেন। এমন অদ্ভুত সময় ইতিপূর্বে অন্য কোন পত্রিকায় দেখিনি! সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পের মিলন করেছেন আপনি, তাই এত সন্দেহ হয়েছে কাগজ। তা ছাড়া আপনি তো দেখছি সকল দলের সাহিত্যিককে একত্র করেছেন। এমন প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে। কুশল আশা করছি। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখক ঠিকই ভেবেছিলেন, কোন' এক বিখ্যাত লেখকের লেখার দরশন এক শত টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু লেখাটি ছিল দীর্ঘতম রচনা! সেই বছরের শারদীয়া দৈনিক বহুমতীতে প্রকাশিত বৃহত্তম গল্প। তাই দক্ষিণার এই তারতম্য।—স]

টালীগঞ্জ এস  
(তারিখ নেই)

প্রিয়বরেন্দ্র,

বরিশালে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। সেখানে নিরলায় বেশ ভালভাবে লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সাধারণ সভা, কলেজের সভা ইত্যাদি সব বড় বড় সভা ছাড়াও কত যে সজ্জা সমিতি আর ক্লাবের আসরে গিয়ে সাহিত্যের কথা বলতে হয়েছে! তা ছাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থেকে অন্তান্ত বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির বাড়ী কয়েক মিনিটের জন্য পদাধীনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়। এখানে একটি দুর্ঘটনার সম্মুখে পড়তে হয়, সেটা জানাই আপনাকে। এখানে এক আসরে জনৈক মহিলা আমাকে সঙ্গেপনে ডেকে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম সেরে উঠতেই দেখি তাঁর চোখ দু'টি অঙ্গ-সজ্জা। কারণের কারণ জানতে চাওবার বললেন, এ না কি তাঁর আনন্দের অঙ্গ। আমার লেখার প্রথম থেকে তিনি আমার প্রত্যেকটি রচনা পড়ছেন। আমি তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে ব'লেছি, আপনার মত পাঠিকা বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে সৃষ্টি হোক।

আমার জন্য যে কোন কাগজ আটকে থাকবে এত বড় স্পর্ধা কেন কোনদিন না হয়, প্রার্থনা করি। আপনারদের যে অসুবিধার সৃষ্টি করলাম তার শুকন বৃক্ক কত দূর যে দূষিত হয়ে আছি তা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার আরও দু'খিন হল, বরিশাল থেকে ফিরে দু'দিন চোঁটা করেও এক লাইন লিখতে পারিনি। কাল বিকলের দিকে লেখার চোঁটা দু'খিন বেখে খালের ধার দিয়ে বেশ অনেকটা পথ বেঁটে গিয়ে,

এক নির্জন জায়গার বহুকণ চুপচাপ বসেছিলাম। ফিরে এসেই লিখতে বসছি। এখনও লিখে চলেছি। এখন প্রায় রাত তিনটে। এক কাঁকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনাকে এই চিঠিখানি লিখছি।

ভবিষ্যতে আর কখনও এমনটি হবে না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অন্ততঃ একটা মাসের লেখার কিস্তী আপনারদের হাতে বেকী থাকবেই। আগামী মঙ্গল কিংবা বুধবার আসছি। আশা করি 'চিহ্ন' দপ্তরীর খল্পে গিয়েছে।

ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Tallygunge Place

৪. ২. ৪৭.

প্রিয়বরেন্দ্র,

চিঠি পেলাম এই মাত্র। লেখাটা কিছুতেই হল না। কসরত করে হয়ও না সাধারণতঃ। আপনি তো লেখেন, নিশ্চয়ই বুঝবেন এই ন বর্ষো ন তত্বে অবস্থা। কাল রবিবার, ছুটি আছে, সোমবার বাস ঠাইকের দরশন হয়তো সব কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। আমি সভা করতে বাচ্ছি। সোমবার কিংবা সোমী হলে মঙ্গলবার ফিরবোই। লেখাও শেষ ক'রে ফিরবো। ভরসা করছি বিশেষ অসুবিধে হবে না। সময়মত খেয়াল ক'রে লেখা না দেওয়ার জন্য লজ্জা বোধ করছি। আপনার ওপর এ সত্যই অত্যাচার করা। ভবিষ্যতে আর এ অপরাধে অপরাধী হবো না। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড  
আলমবাজার  
কলিকাতা-৩৫  
১৮, ৮, ৫০

প্রিয়বরেন্দ্র,

শারদীয়া বহুমতীতে লেখার জন্য আপনার সোনার জলে লেখা কার্ড বখাসময়েই পেয়েছি। জবাব দিতে বিলম্বের জন্য কিছু বেন মনে করবেন না। আপনি বোধ হয় বর্তমান বাঙলা দেশের বয়ঃকনিষ্ঠ সম্পাদক, শুধু মাত্র সেই কারণেই এ বছরের পুজার লেখা সর্ব্বাঙ্গে আপনাকেই দেবো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আমার গল্পটি পৌঁছে দিয়ে আসবো। আশা করি অসুবিধা হবে না। মধ্যে মধ্যে কুশল জানাবেন। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গু—কোথার বেন আপনার সাহিত্যের কিছু নমুনা পড়লাম। আপনারদের কয়েক জনের লেখা পড়লে ভবিষ্যৎ বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে আশা রক্ষা করা যায়।

186A, Gopal Lal Tagore Rd.  
Cal-35  
27. 6. 51.

আলমবাজার  
২৪, ৮, ৫১

প্রিয়বরে,

এবার সবার আগে আপনার কাছ থেকে শারদীয়া লেখার আমন্ত্রণ পেলাম। শরীরটা কিছুদিন ধরে খুবই বেয়াড়ানা করছে। এবার যে সবার আগে আপনাকে লেখা দেবো তাতে কোন সন্দেহ নেই জানবেন। গল্প তো নিশ্চয়ই দেবো।

সব মনে আছে। 'ভেঙ্কাল' আমার এক রাত্তিরে লেখা। ঠিক ঐ ধরনের লেখা লিখতে বেন আর সাহস হয় না। আপনার প্রস্তাব আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। 'কল্লোল-যুগ' সম্পর্কিত লেখার প্রথম কিস্তী নিয়েই একেবারে হাজির হবো। শুধু একটা কিস্তী নিয়ে নয়, বেশ অনেকটা লেখা। কোন কারণেই কোন মাসে লেখা বন্ধ রেখে যাতে পাঠকসমাজ ও আপনার কাছে অপরাধী হতে না হয়, তার জন্য আগে থেকে প্রস্তত থাকবো। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্য-সাধনার কত যে অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন, তার কিছু কিছু আপনি তো জানেন! কেবল দারিদ্র্য নয়—সে তো হিসাবের মধ্যে ধরে নিয়ে নেমে নেওয়াই হয়েছে। সংযোগিতারও অভাব বটে। পয়সাওয়া কাগজওয়া আমাকে এবার এক রকম বরকট করেছেন। আপনার মত কিছু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাই বন্ধা এ ব্যাটার! বাই হোক, শীঘ্রি একদিন আসছি। আশা করি কুশল। ইতি—

ঐতিকামী  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[ লেখক কল্লোল-যুগ সম্পর্কে মাসিক বহুমতীতে ধারাবাহিক লিখতে সম্মত হয়েছিলেন। কিছু কিছু প্রস্তুতির পরিচয়ও দেখিয়েছিলেন আমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখার আদ্য আশ্বনিয়োগ করেন না।—স ]

186/A, Gopal Lal Tagore Rd.  
Calcutta-35.  
9. 8. 51

প্রিয়বরে,

তুলিনি একেবারেই। মনে আছে ঠিক। আসছি আমি বঙ্গদ্রোহে। সেহটা কিছুকাল বাবু বড় প্রকটা করছে। গিয়ে যেম কবি বুদ্ধবাসের এক খণ্ড গ্রন্থাবলী পাই, ব্যবস্থা করবেন। কুশল ভো? ইতি—

ঐতিকামী  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরে,

সোমবার ২৭শে নিশ্চয়ই আসছি। জাশা করি দেখা হবে। এই সঙ্গে আমার সজ্জা-প্রকাশিত বইয়ের কয়েক কপি পাঠালাম। সমালোচনা আপনি নিজে করলে বাধিত হবো। কাগজে সমালোচনার্থে বই দিতে ভয় করে। আমার ভিন্ন মতের জন্য অনেকে আমার সাহিত্যের প্রতিও বিগণভাজন হয়ে আছেন। একজন কৃত্তিকর সমালোচনা লিখতেও তাঁরা পেছপাও হন না। বোলা তিনটে নাগাণ বাবো। ইতি

ঐতিকামী  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরে,

আপানার চিঠি পেয়ে খুবই খুশী হলাম। কাতিক মাসের বহুমতীতে লেখাটা দিতে পারবো কি না বুঝতে পারছি না। দু'খানা বই পুজার আগেই বেয়োবার কথা ছিল—নানা কারণে আটকে যায়। প্রকাশকেরা দু'জনেই হঠাৎ একসঙ্গে বই দু'খানা তাড়াহুড়ো করে বার করার জন্য উত্তেজিত হয়েছেন। এদিকে পারিবারিক ব্যাপারও একটু বিস্তৃত আছি। অগ্রহায়ণের বহুমতীর জন্য নিশ্চয় সময়মত লেখা দিয়ে আসবো। পুজো কেমন কাটলো জানাবেন কি? জাশা করি ভাল আছেন। ইতি

ঐতিকামী  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরে,

আমার গল্পের প্রথম চেয়েছিলাম, পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। জাশা করি গল্পের শেষাংশের প্রফ পেয়েছেন। একটু কষ্ট দেবো। মাসিক বহুমতীতে 'মাটি' নামে আমার একটি উপন্যাস আরম্ভ হয়েছিল। বোধ হয় শেষ করিনি। আমার কাছে হুটু কিস্তীর ফাইল মাত্র আছে। পৌষ ১৩৫৩ এবং বৈশাখ ১৩৫৪। পৌষের কিস্তিতে 'পূর্বানুবর্তি' লেখা আছে, অর্থাৎ আগের বেরিয়েছে উপন্যাসটা। এখন অনুবর্তে এই, কষ্ট করে যদি বাকী কিস্তীগুলির ফাইল কপি আমাকে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ উপকৃত হবো। আমি বড়ই ব্যস্ত। জুনের প্রথমেই একদিন 'বাছি'। গল্প করা বাবো! জাশা করি ভাল আছেন। ইতি

ঐতিকামী  
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরে,

এই আবেশের মধ্যে সন্তব করা গেল না। আর দিন সাতেক সময় চাই। জাশা করি অনুবিধা হবে না। লেখা নিয়ে আসছি

কেনা সাড়ে তিন থেকে চারটের মধ্যে। জনল্যাম ঐ সময়ে আপনার দেখা করার কোন অসুবিধা নেই। কুশল তো? ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

আলমবাজার

২৪, ৩, ৫০

প্রিয়বন্ধু,

সোমবার বিকালে যাবো, স্থির করেছিলাম—কিন্তু উদরটা দুপুরের দিকে বিস্ত্রোহ করে বসলেন। প্রায় লড়াই করে বিস্ত্রোহ ধামাতে হয়েছে। ছুটারদিনের মধ্যেই বাচ্ছি। প্রক পাঠালাম। ক্রমশঃ চলুক। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

আলমবাজার

২৪, ৩, ৫০

প্রিয়বন্ধু,

যাবো যাবো করে যেতে পারছি না। এলা বৈশাখ বই বার করার জন্য প্রেসের সঙ্গে পাঞ্জা দিচ্ছিলাম। অল্প কাজেও খুব খেটেছি; সব কাজ অব্যক্ত আজও কুড়িয়ে যায়নি। আগামী বুধবার বিকালের দিকে যাবো। আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

আলমবাজার

১৭, ৮, ৫০

প্রিয়বন্ধু,

সবাই মিলে এত বেশী ভালবাসলে আর উপায় কি? সমস্ত কাজকর্ম চিত্তাভারনা বন্ধ করে কোমর বেঁধে শারদীয়ার আসরে নামলাম। শেষ যুগুস্ত পর্যন্ত লিখবো। আপনার লেখাটি কাল পাবেন। দেখা হ'লে অনেক কথা হবে। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

আলমবাজার

২৬, ৮, ৫০

প্রিয়বন্ধু,

শরীরটা খুবই বেয়াপসি করছে। মাঝে মাঝে দিন বেশ করে ভুগলাম। তাই জন্য সব কাজের হিসাব ওলট পালট হয়ে গেছে। আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই পন্ন দেখো। কুশল আশা করি। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

আলমবাজার

২৮, ১, ৫০

প্রিয়বন্ধু,

কি ঘাপার? লোক পাঠালেন না কেন? আপনার দাবী অল্পসরেই এবার কেন পন্ন লিখছি না তার কারণ গল্পাকারে দু'খানা

কুলক্যাপের বদলে তিনখানা লিখে রেখেছি। নাম দিয়েছি—“সাহিত্যের কানমলা”। সাহিত্য সত্যিই এবার আমাকে কান মলে নতুন শিক্ষা দিয়েছে। আপনারদের কি এখনও আর সময় আছে? সম্ভবতঃ ছাণা শেষ। ভবুও পত্রপাঠ আমাকে একটু জানাবেন। আপনি বলার ফলে যে লেখা লিখে তৈরী করেছি সেটি আপনাকে না জানিয়ে অন্তর্য দিতেও পারছি না। কুশল জানাবেন।

ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

প্রিয়বন্ধু,

আজ বেরোবো ভেবেছিলাম, সব গোলমাল হয়ে গেল। লেখা তৈরী হয়েই আছে। পাঠাতে বিলম্ব হওয়ার কারণ—এই সংখ্যার বন্ধুত্বের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রক যে চার পাঁচখানা নতুন লেখা গ্লিপ দিয়েছিলাম, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে লেখাটা পাঠাতে অসুবিধে বোধ করছি। যে ছেলেটি আমার কাছে আসে তার হাতে এবারের লেখার ফাইলটি পাঠালে উপকৃত হবো। প্রেসকে একটু ব'লে রাখবেন যে আমার লেখা ছাপা হলেই বেন ডাকে একটা ফাইল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শীঘ্র আসছি। আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

প্রিয়বন্ধু,

২১, ১, ৫৪

বেরোবো স্থির করি—শারদীক আর পারিবারিক কারণে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। প্রক যে কাণ্ড করেছি প্রেস সেটাকে অত্যাচার বলতে পারে। তাড়াতাড়ি লিখে ঘবামাজা সংশোধন না করেই প্রথমে কপিটা দিয়েছিলাম—তাই এই প্রকের দুঃস্বপ্ন। এ রকম আর কখনও হবে না—প্রেসকে এই অভয় দেবেন আমার পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে একদিন যাবো। ঠাা ভাল কথা, আমার গ্রন্থাবলী বাজারে কেমন বিকোচ্ছে জানাবেন কি? আপনার কথাগ্রহণীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু ভাল না হ'লে সে বিপদ আপনারদের। সেদিন রাস্তায় লেখা হ'তেই আপনাকে দু'বাহু বিস্তারে জড়িয়ে ধরেছিলাম তাই হয়তো কেউ কেউ মনঃস্বপ্ন হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে বেন কিছুতেই ভুল কথাকে পানি না এত দুঃসময়েও। আপনার লেখা গেলেই তাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমাদের আরও অনেক পত্র বেন লেখক, বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সেই সকল চিঠি একতাই ব্যক্তিগত, যে জন্য প্রকাশ করা হ'ল না। এতব্যতীত লেখকের যত্নের প্রায় দুই বছর পূর্ণ থেকে লেখক এমন সব চিঠি দিতে থাকেন যা থেকে অসুস্থান করা যায় লেখকের মনের স্থিরতা নানা কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। সেই সকল চিঠি নানা কারণে প্রকাশ করা হ'ল না।—স]

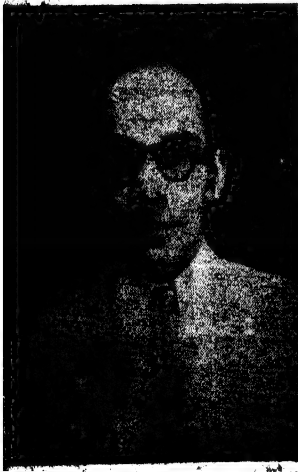


## শ্রীহরেন মুখোপাধ্যায় এম-পি

[ লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ]

বাংলা দেশের যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়ার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন, শ্রীহরেন মুখার্জী তাঁদের অন্তর্গত। ইনি আই-এ থেকে এম-এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে শিক্ষক মহলকে এতদধীন অভিভূত করেছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মি: ষ্টার্লিং মন্তব্য করেছিলেন, “গত ১৪ বছরের চাকুরীজীবনে হীরেনের মত মেধাবী এবং চরিত্রবান ছাত্র খিত্যটি দেখি নাই।” বি-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ইনি সর্বপ্রথম ইতিহাসে ঈশান ঘলার হন।

মাকারী লোহার চোহরা হীরেন বাবুর মাথায় মস্ত টাক। ১১-১১ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা বগীর শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী পেশায় আইনজীবী হলেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে রাজনৈতিক জীবনে এসে মিলিত হন। হীরেন বাবু ছাত্রজীবনে নিজের জন্ম কোন রাজনৈতিক



শ্রীহরেন মুখোপাধ্যায়

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নি। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা কলেজী শিক্ষা শেষ করে ভারতের অবহেলিত ইতিহাসের গবেষণায় জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু জীবনের পথ এমনই বিচিত্র এবং জটিল যে, হীরেন বাবুর মত শান্ত নিরীহ গ্র্যাক্যাডেমিক মানুষটি পিতার চেষ্টা ও প্রভাব রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

লোকসভার কন্যাসিঁ

দলের ভেদটি সীতার শ্রী মুখার্জী অলকোর্ডের বিপ্লিট এক ব্যাখিটারী পাপ। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে তিনি শিক্ষারত গ্রহণ করেন এবং অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস এবং রাজনীতির সিনিয়র লেকচারার নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে তিনি বিপণ কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডেই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাই এখানে অধ্যাপনার কীকে কীকে রাজনীতিও চর্চা করতে থাকেন। '৩৮-৩৯ সালে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারী হিসাবেও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন। তখন থেকে শুরু হয় তাঁর পুরোদস্তুর রাজনৈতিক জীবন। ১৯৪০ সালে ইনি নি: ভা: ছাত্র সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কিছুকাল ইনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। বর্তমানে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র কর্মী-ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সমস্ত শ্রীমুখার্জী শুধু রাজনীতির মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। লেখক, বক্তা এবং সাংবাদিক হিসাবেও তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করেছেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত আইন ঘটিত সাপ্তাহিক “ক্যালকাতা উইকলি নোটস” এর সম্পাদনা করেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং রাজনীতির উপর ইংরাজি এবং বাংলায় ইনি প্রায় এক ডজন বই লিখেছেন। এ ছাড়া ইনি বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক শ্রীমুখার্জী সৈয়দ আব্দুল দস্তুর সঙ্গে একযোগে “আধুনিক বাংলা কবিতা” নামে একখানি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীতারানাথের বন্যোপাধ্যায়ের “মহাস্তর” নামক উপন্যাসখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন।

১৯৪৮ সালে এবং ১৯৪৯ সালে তিনি রাজনৈতিক কারণে দু'বার বিনী বিচারে আটক ছিলেন।

দুটি সন্তানের জনক শ্রীমুখার্জী বাস করেন ধর্মতলা স্ট্রীটের ছোট একটি ফ্ল্যাটে। তাঁর অতিথিবৎসল আকর্ষণীয় পত্নী শ্রীমতী বিজা মুখার্জী বাস মৈমনসিংহের মেয়ে। এ পর্যন্ত তাঁর কথায় পূর্ববঙ্গের টান বায়নি। বাংলা ভাগ হবার আগে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি পরিবারের মধ্যে এমন বৈবাহিক মিলন ঘটল কি ভাবে, সেই নিত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী মুখার্জী সলজ্ঞ হেসে বললেন যে, হীরেন বাবুদের সব ভাই-ই নাকি পূর্ববঙ্গে বিবাহ করেছেন।

দিল্লীর রাজনীতি তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে হীরেন বাবুর সঙ্গে বহুদক্ষ কথো হল। তিনি মনে করেন যে, বাঙালীর শিক্ষা এবং সমাজ-জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন না এলে বাঙালীর পক্ষে সরকারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। পার্লামেন্টে অধিকাংশ বাঙালী সদস্য মুখ খোলেন না কেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখার্জী বলেন যে স্পষ্ট করে নিজের বক্তব্য ইংরাজী অথবা হিন্দীতে বলার অভাব না থাকলে পার্লামেন্টে যোগ্যতা করা শক্ত। তিনি বলেন যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলে এখনও ইংরাজী ভাষা এবং বক্তব্য বিশিষ্টত্ব মাথায়। সে কথা অল্প কয়েক বাঙালী ছাত্ররা যদি





দিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার যে একটি Export Credit Committee নিযুক্ত করেন, তিনি ভারত সনদ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এসময় এক কথাও বলা প্রয়োজন যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার সচরঞ্চী শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায়ের নিকট বহুলাংশে অধী। ডায়োসেন কলেজে পাঠ্যাবস্থায় প্রতিমা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত রায় পরিণয়পুত্রে আবদ্ধ হন। তদবধি শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার জীবন নিকট হাতে প্রতি কার্যে উৎসাহ, উদ্বীর্ণনা ও অমুপ্রেরণা লাভ করে উন্নতির ধাপেধাপে অগ্রসর হন। শ্রীযুক্তা রায় নিজের একজন উৎসাহী সমাজসেবিকা। বর্তমানে তিনি জ্যোতিষ্মতী সেবাভবন নামে একটি আবাসিক শিশু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। এই প্রতিষ্ঠানে থেকে প্রায় এক শত শিশু শিক্ষা ও নানা বকম কারিগরী কার্যে লক্ষ্যতা অর্জন করেছে।

এই কর্মজীবনের ব্যস্ততা ও সাফল্যের মধ্যে দেশের অন্ত্যস্ত গঠনমূলক কার্যেও শ্রীযুক্ত রায়ের সমান উৎসাহ। নানারূপ সামাজিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ তৎপর। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি বিকম ও এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক; এবং ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বস্তুতঃ, সর্ব বিষয়ে সর্ব গুণের এমন অপরূপ সময় নিত্য বিরল।

কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি দ্বী ও একমাত্র সন্তান কল্যাণীয়া যুঁটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় বার ইউরোপ পরিভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইটজার ও ইউরোপের অন্ত্যস্ত দেশ ভ্রমণ করে অগাধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফেরেন। এই অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান দেশবাসীর কল্যাণে বর্তমানে নিয়োজিত। বাংলা দেশ এখন নানা দিকে দরিদ্র। রাজনীতিকক্ষেত্রে নেতার অভাব, ব্যবসায় লগতে রাজ্যসীমার অনগ্রগতি এবং দেশ-বিভাগের ফলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তার বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত রায়ের মত একজন ব্যক্তি যে কোন দেশ ও জাতীয় যৌবর। মনে মুক্তহস্ত, সামাজিকতায় অকুণ্ঠচিত, দৌরাত্ম ও শিষ্টাচারে সর্বদা এই কর্মচারী দীর্ঘজীবন লাভ করে বাংলা ও বাঙ্গালীর আশীর্বাদ।

### কথামিত্রী প্রবোধকুমার সাহা

[ জীবন-পরিচিতি ]

বাংলা সাহিত্যে প্রবোধকুমার সাহা নিজেকে অপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর বিষম-বৈচিত্র্য, সাবলীল বর্ণনা ভাষা ও মনোভঙ্গির জোরে। স্বপ্নাবেষের দক্ষিণে তাঁর সাহিত্যে আমরা একটি স্বপ্নের অন্তরঙ্গ পরিবেশ। ১৯০৭ সালে কলকাতার প্রবোধকুমারের জন্ম হয়। তাঁদের আদিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের কবিরপুর। কলকাতার স্ট্রীট চার্ক স্কুল ও সিটি কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। হেলেবেলায় কবিতার খাতা ভরিয়ে নান। হিজিবিজি লিখতেন সেই হিজিবিজির মধ্যেই এক একটা এমন চমকলাগান কথা যেত যে, পরে নিজেই বিষয় বোধ করতেন। সেকালে কবিতার এই ছাড়া আর কিছু পড়বার হুকুম ছিল না তাঁদের। বাংলার শিক্ষকের কৃপায় ক্লাসে একবার একবার হাতেলের

মাসিক পত্রিকা বেশ হল। মাসের মশাই হকুম করলেন প্রত্যেক ছাত্রকে তাতে কুড়ি লাইনের মধ্যে একটা রচনা লিখতে হবে এবং তাতে সবচেয়ে দামী মনের কথা থাকবে। সবচেয়ে ভাল লেখার পুরস্কার হিসাবে প্রবোধকুমারকে পরের মাসই এই পত্রিকার সম্পাদক করে দেওয়া হল। সাহিত্য-জীবনে এই ছিল তাঁর প্রথম পুরস্কার।

খুব অল্প বয়স থেকেই প্রবোধকুমার রীতিমত কবিতা লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিগুন রামপ্রসাদের গান ভালবাসতেন। প্রবোধকুমারও লুকিয়ে লুকিয়ে চোঁটা কবিতেন রামপ্রসাদের মত ক্রামসঙ্গীত লিখতে। কুলের বৃদ্ধ পণ্ডিত মশাই হঠাৎ মারা গেলে তাঁর শোকসভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে কিছু লিখে পড়বার দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপর। অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি শোক-গাথা রচনা করে তিনি সেটা সভায় পাঠ করলেন এবং আশাহীত সুরাতিও অর্জন করলেন। গর্বের তাঁর বুক ভরে উঠল। কিন্তু বরীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে আরম্ভ করার পর তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস কেটে গেল। ভাবলেন আর যাই হোক, কবিতা লেখার অপচোঁটা আর কোন দিন করবেন না এবং মনে মনে কামনাও করলেন বরীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেন কেউ কবিতা না লেখে।

দেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাইরে যখন নানা গণ্ডগোল চলছে, প্রবোধকুমার তখন কতকগুলো গল্পের বই এনে ঘরে বসে পড়তে থাকেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঠতো—এটা ওরকম না হয়ে, এরকম হল কেন? গল্পগুলো পড়তে অনেক সময় হয়তো ভাল লাগত, কিন্তু কেমন একটা অভাব বোধ করতেন। ফলে লেখকরা তাঁদের গল্প যেখানে শেষ করতেন, প্রবোধকুমারের বন্ধনা আঁকত হত সেখান থেকে। এমন করতে করতেই একদিন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মনেও কিছু কথা আছে, তাঁরও কিছু লেখার আছে।

গোপনে তিনিও এবার লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কি লেখেন তাই জানবার জন্য বাড়ীর লোকেরও কৌতূহলের আর সীমা নেই। তাঁর মা একদিন জিগোস করলেন, কাগজ-কলম নিয়ে হিজিবিজি কি করিস? প্রবোধকুমার জবাব দিলেন, একটা গল্প লিখছি। গল্প? মা তো একেবারে ভয়েই অস্থির। ছোটো বৃষ্টি এখা উদ্ভূত গেল। অন্তঃস্ব পয়সিনই তিনি গেলেন আনন্দময়ীত লায়। ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে জানালেন— ছেলের অর্থাৎ দাও মা!



প্রবোধকুমার সাহা

সকালকাল পাছে

তিনি লিখতে বসেন এইজন্য নানা কষ্ট-করমাসে তাঁকে বাস্তব রাখা হত। রাজ্যে পাঁচ ছাগল-কলম নিয়ে বসেন, এই ছাগল বড় বৌদি চমকতো বলতেন, চুটো হারিকেনের চিমনিট ভেঙে গেছে।

কিন্তু লিখতে যে তাঁকে চলেই। কারণ, লেখার নেশা একবার বাক পেলেই আর কি তার না লিখে উপায় আছে? অন্তঃকরণে বাক পেলে বাক একটু কমলে তিনি চলে যেতেন নারকেলডাঙা পেরিয়ে শিয়ালদার রেল-পথে উপর। সেখানে একটা সাঁকোর শান-বাঁধানো জায়গায় একা বসে লিখতেন বা লেখার কথা ভাবতেন।

প্রবোধকুমার নিজে কিছু কোন দিন কোন লেখা নিয়ে সম্পাদক অথবা প্রকাশকের কাছে যান নি। কারণ, ছাপার অক্ষরে নাম বার করার জন্য কোন দৈন্ত বীকার করতে তিনি রাজী ছিলেন না।

তবে সম্পাদকদের নামে তিনি ডাক লেখা পাঠাতেন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে। লেখা অমনোনিত হলে তা ফেরত পাবার জন্য ডাকটিকিটও সংগে দিই। আর লেখা পাঠাবার পরদিন থেকেই অধীর অসহ আগ্রহ নিয়ে বাবা-দাদা ঠাঁড়িয়ে থাকতেন পথের মিকে ডাকিয়ে, কখন ডাকপিওন আসবে। কথা নিয়মে লেখাটি ফেরৎ এলে সকলের অগোচরে সেটা লুকিয়ে ফেলতেন। তিন চার মাস পরে চমকতো জন্মান লেখাগুলোই আশ্রয় ধরিয়ে দিয়ে তার সামনে চূপ করে বসে থাকতেন। যে-সব মেয়ে পুরুষকে অন্তঃস্থ, অন্তঃস্থ আগ্রহে বকের দন্ধ দিয়ে গড়েছেন, তারা, সবাই চোখের সামনে আঙুলে পুড়ে ছাই হয়ে থাকে, সে দুঃ নেহাৎ মন্দও লাগতো না!

কিন্তু তাই বলে লেখা পাঠানরও বিমো ছিল না। লেখা পাঠান আর তা ফেরত আসে। অনেক লেখা আবার টিকিট দেওয়া থাকলেও ফেরত আসে না। কিন্তু একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। পিওন এসে একখানা মাসিকপত্র তাঁর হাতে দিয়ে গেল। পত্রিকাটির নাম তিনি কোন দিন শোনে ন। কিন্তু খুলে দেখেন তাতে তাঁর একটা গল্প ছাপা হয়েছে। সমস্ত শবীর বিম-বিম করে উঠলো তাঁর উত্তেজনা, বাস্তবত্ব কাঁপতে আরম্ভ করলেন তিনি। কোন দিন এই পত্রিকার লেখা পাঠাননি, অথচ কেমন করে তাঁর গল্প ছাপা হল? তাঁকে গৌরব এনে দিল বটে, কিন্তু বোকা বানিয়ে দিল।

তখন মনে পড়ল, তাঁর এক বন্ধু কাছে গোটো তিন-চার লেখা বহুখানেক আগে তাঁর বাড়ীর লোকদের পড়তে দিয়েছিলেন, গল্পগুলোর কথা তার পর ভুলেও গিয়েছিলেন। এ লেখাটি তাই একটি। প্রবোধকুমারের জীবন নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সমাজ ও সংসারের চিরচরিত কুসংস্কারের নীতিব বিরুদ্ধে তিনি আত্মীয় বিদ্বেষী। কলে আচার-বন্ধু থেকে অনেক আঘাত, উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। অপরিণাম দুঃখ-কষ্ট ও হৃদয়ের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবন কাটে, অনাহার উপবাস একটা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি।

প্রথম জীবনে সমাজ চাকরি করতেন প্রবোধকুমার। ভারত সরকারের অধীনে সীমান্ত সৈন্য বিভাগে চাকরি করেছেন তিনি, ছগলী ডাক বিভাগে সহকারী পোষ্টমাস্টারও ছিলেন।

দুর্গম দেশে নানা দুর্বোধ্য দুঃসাহসিক কাল, শিকার ও পার্শ্বভাষা অভিযানে, সমস্ত রকম ব্যাঘাত, খেলাধুলা, নৌকাচালনা ও বন্দুক ব্যবহারও প্রবোধকুমার আত্মীয় অগ্রণী। একাধিক বার সমুদ্রযাত্রা ও চার বার সমগ্র ভারতবর্ষ ও নেপাল পরিভ্রমণ করেছেন তিনি।

দেশ ভ্রমণের নেশা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলার সমুদ্রপথে বহু আমেরিকা পাড়ি মিতে গিয়ে তিনি বর্ষা পুন্নিশের হাতে বরা পড়েন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই বিশাল পটভূমিকার প্রবোধকুমারের সাহিত্য বিচিত্র ও স্বরস্বাদী হয়ে ওঠে। ক্রমে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও ল্-প্রবন্ধ রচনাতেও অপরিণাম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ভ্রমণ কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাংলা সাহিত্যের একটি অমর স্বাক্ষর। 'বাংলা দেশের বহুবিখ্যাত সাহিত্যিকের মত প্রবোধকুমারকে সাংবাদিক জীবন বাপন করতে হয়েছে। এছাড়া একাধিক পত্রিকার সম্পাদকতাও তিনি করেছেন। কিশোর বয়সে প্রবোধকুমার স্বয়ং একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে নিজের হাতে পথে পথে ফেরি করেছেন। অধুনাবৃ্ত্ত 'বঙ্গদেশ' ও 'বিজলী' মাসিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনার প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগও তিনি সম্পাদনা করেছেন।

### শশিভূষণ চৌধুরী

[অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা, ভূতপূর্ব হাজার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

বয়সে এই অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর আগরতলায় (ত্রিপুরা) মাতুলদ্বারা জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলা স্কুলে তাঁর পড়াশুনার সূত্রপাত এবং ১৯২১ সালে এ স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ইতিহাসে ভালো নম্বর পাওয়ায় ইতিহাস-অধ্যয়নে তাঁর অগ্রগতি বৃদ্ধি পায় এবং তখনই তাঁর ঐতিহাসিক হবার সংকল্প জাগে। ১৯২৩ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসে অনার্স সহ কলকাতায় স্ট্রিট চার্চ কলেজে বি, এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। অনার্স পরীক্ষার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইতিহাস নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়তে শুরু করেন এবং ১৯২৭ সালে এম,

এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে তিনি প্রথিত-বশা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্বন্ধে সাংসারিক স্বযোগ লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেন, তার মূলে ডাঃ মজুমদারের অগ্রপ্রেরণা



শশিভূষণ চৌধুরী

ও উৎসাহ কর্তব্য। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন, রমেশ বাবুর মতো আদর্শ ঐতিহাসিক ও শিক্ষকের সংস্পর্শে আসা, তাঁর ছাত্র হওয়া, সৌভাগ্যের বিষয়; গর্বেরও যে, তা বলাই বাহুল্য।

এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁকে তিন বৎসরের জন্য গবেষণাবৃত্তি প্রদান করে এবং তিনি প্রাচীন ভারতের ভূগোল এবং জাতিসমূহ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কাহমাইকেল অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গবেষণায় তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। এ সময় তিনি *Indian Antiquary*, *Indian Historical Quarterly*, *Calcutta Review* প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ করায় তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি কাজ করেন। কিন্তু ‘গবেষণার কথা তাঁর মন থেকে কখনো মুছে যায়নি।

১৯৪৬ সালে তিনি তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করেন এবং ঐ বৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী ‘ডক্টরেট’ অর্জন করেন। অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইতিহাস বিভাগের ‘রীডার’ নিযুক্ত করেন, কিন্তু দেশবিভাগে ও অজ্ঞাত নানা কারণে তাঁকে চাকুরীতে ইচ্ছা দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এখানে এসে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে শিক্ষাবিভাগে কার্যগ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ণ সাত বৎসর তিনি উক্ত কলেজে বিশেষ কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করে আসছেন।

ছাত্রজীবনে যেমন তিনি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, কর্মজীবনে তেমনি তিনি আরেক জনের সংস্পর্শে এসে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। তিনি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান ইতিহাস-অধ্যাপক ও অধুনা বায়বপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনন্দনচন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত সরকারের সংস্পর্শে এসে তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার নানা দিক খুলে যায়। ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের ‘বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস’ রচনার পরিকল্পনায় তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহযোগিতায় তাঁদের সহকারী নিযুক্ত হন। এসময় ব্রিটিশ আমলের শেষভাগের ইতিহাসের বহু অব্যবহৃত ঐতিহাসিক উপাদান ও গুরুত্বপূর্ণ পড়বার সুযোগ পান। ডঃ চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করবার মতো বহু উপকরণ এখনো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। যে সমস্ত কাগজপত্র পড়বার সুযোগ তিনি পেয়েছেন, জুথের বিবর, তার সদ্যবহারও তিনি করেছেন। তারই প্রভাব হিসাবে খেরিয়েছে তাঁর সাম্প্রতিকতম মনন-ভাবের গ্রন্থটি *Civil Disturbances during the British rule in India*। তাঁর প্রধান সহকারী সুনন্দনচন্দ্র সরকার এর একটি সুন্দর প্রারম্ভিক লিখে দিয়েছেন।

ডঃ চৌধুরীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দু’টি। কিন্তু এই উল্লেখ্য বকয়ের মূল্যবান প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ *Ethnic Settlements in Ancient India* বছর ধূই হলো

বুদ্ধিত বৃত্তি লাভ করেছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশীয় এবং জাৰ্মানীর বহু বিজ্ঞানজ্ঞের প্রোথাত ভারততত্ত্ববিদ কিংকল প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতবর্গ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থের। প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসী এবং বহিরাগত জাতিসমূহ, বারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের সম্পর্কে সুন্দর একটি বিবরণ পাওয়া যায় এই বইতে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মোটামুটি একটি ভৌগোলিক চিত্রও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ভারততত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ডঃ চৌধুরীর এই গ্রন্থ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডঃ চৌধুরীর অপর গ্রন্থ *Civil Disturbances during the British rule in India* গ্রন্থে তিনি সাধারণ অপ্রকাশিত বিভিন্ন দলিল-পত্রাদিতে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের আগেও ব্রিটিশ-বিরোধী জনবিক্ষোভ বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্রোহ-বহির্বে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে থেকে ধুময়িত হচ্ছিল, বিশেষতঃ বাংলাদেশ, দক্ষিণাভ্যন্তর ও বোম্বাইয়ে, এই তথ্যাবিকার ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডঃ চৌধুরীর অজ্ঞাতম দান বলে স্বীকৃত হবে। ব্রিটিশ শাসনের একটা দিক খুলে বাতায়তে এই বই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বারা গবেষণা করবেন ভবিষ্যতে, এই বই তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। এ দু’টি বই ছাড়া *Indian Historical Quarterly*, *Calcutta Review*, *Journal of Bihar Orissa Research Society*, ইতিহাস প্রভৃতি বিশেষ পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

ছাত্রবৎসল ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ চৌধুরীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি বলেন, আদর্শ ছাত্র তৈরী করা। তিনি বলেন, ছাত্ররাই তো আমার গৌরব! ছাত্রদের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি দেখলে আমাদের কত আনন্দ হয়। এ শুধু তাঁর হৃদয়ের কথা নয়, বাহাই তাঁর ছাত্র হবার গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁরা তা জানেন, অমুভব করেছেন। বস্তুত, নিরঙ্কর, অমায়িক, সশালাগী এমন শিক্ষক আজকাল দুর্লভ। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র শশিভূষণ চৌধুরী, তাই হয়তো প্রাচীন ভারতের শিক্ষকের আদর্শকে তিনি রূপ দেবার জন্যে সচেষ্ট এবং প্রাণ-ঢালা অধ্যাপনা কাঁকে বলে, তাও তাঁর কাছে বারা পড়েছেন, তাঁদের তা জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ডঃ চৌধুরী প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন। আগামী-দিনের ছাত্রদের স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান ও সচেতন করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বর্তমান পাঠ্যক্রমে না থাকার উল্লেখ করেন সচক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের আন্তঃপরিবর্তন হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেন।

[ মাসিক বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে সর্বস্বীকৃত নীল শোণ, কল্যাণ দাসস্বপ্ন ও সত্যেন্দ্র কল সঙ্গৃহীতঃ ]



অপকল্প ও অনিচ্ছা



অপর্যাপ্ত অলকদামের শিখরে শিখরে

স্থির অকল যৌবনের যে

উচ্ছলিত রূপ-তরাঙ্গমা—ভায়ই

স্বপ্ন ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিন্যাস—

সত্যের প্রতিজ্ঞা-সম্পন্ন এবং

অপর্যাপ্ত প্রেমধনী ।

# লক্ষ্মীবিন্যাস

তৈল

এস. এস. বসু স্ট্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

লক্ষ্মীবিন্যাস হাউস, কলিকাতা-১

লক্ষ্মীবিন্যাস বালি অনুলনীয়



# পত্র প্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৪

হোটেলের মালিক ভূত বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সাধনার।

আলাপের পরামর্শ দিয়েছিল পাগল-সর্দার। দিদিয়ার অল্পবয়স মত একটা ছুতো গোঁক সংগ্রহ করতে না পেরে একেবারে অকর্ণ্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। বেচারীর সময় কম, খোঁজ করে কখন! মড়াইয়ের হাড়-ভাড়া খাটুনির পর রাতে হাড়িয়া টেনে ছুঁতির কোলে ঢলে পড়ে। শুধু ও নয়। দলকে দল। মেয়ে-পুত্র সন্তান। আর মড়াইয়ের দ্বারা কাজ করে না, অর্থাৎ বাবুর সময় আছে, গায়গতরে প্রায় স্থির, তারা। তবু এদের অনেককেই বলে রেখেছে সর্দার। সপ্তাহের ছুটির দিনে নিজের যতটা সম্ভব খোঁজবর করে। কিন্তু পছন্দমত পেরে ওঠে না। নিজের বেয়ে চান্দমণিকেও বলেছিল। পাঁচ জায়গায় ঘোরে, পাঁচ ঘরের খবর রাখে। যদি কোন সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু হতজ্ঞাডি মেয়ে এমন জবাব দিয়েছিল যে, হাতের কাছে গেলে আছা করে ছুঁখা কুশিয়ে দিত। গছীর মুখে বলেছে, গোন্ধটোঁকুর খবর সে বাধে না, তবে তার সন্ধান একটা বলদ আছে বটে, হলে সেটাই নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। আঙুল দিয়ে ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়েই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

তৃতীয় লোকটি হোপুন।

এদিকে দেখা হলেই সাধনা জিজ্ঞাসা করে, আমার গোঁক কি ল সর্দার?

সর্দার মুখে আশাস দেয় বটে, গোঁকর মত গোঁক পেলেই এনে দেবে। কিন্তু মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

পরের এক ছুটির দিনের সকালে উঠেই হঠাৎ গোঁকর কথা আর ভূত বাবুর কথা একসঙ্গেই মনে হল তার। এত দিন মনে হয়নি ল নিজের ওপরেই কষ্ট হল সে। সময় নষ্ট না করে সোজা ল এলো দিদিয়ার কাছে।

ভূত বাবু গোঁক যোগাড় করে দেবে। সাধনা অবাক।

ভূত বাবু চলে না কেনে আমার সঙ্গে, উঠিক দিবে। পাগল-পুত্র নিঃশব্দ প্রায়।

সাধনা হুঁকিয়ে পড়ল একটু। সকালের দিকটায় রান্নাবান্নার ব্যয়। ছুটির দিনে নরনের এখানে বাওয়া বরাদ্দ বলে কিছু বেশিই ব্যয় থাকে। কিন্তু তারই ভয় এত আগ্রহ

নিরে লোকটি এসেছে, কোথায় মন সরল না। ওদিকে এই রোদে নীচে নামবে শুনলে বাবুর কাছেও বকুনি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু কি আর করা বাবে? চুপি চুপি রান্নাবর বন্ধ করে চলে এলো সে। বাবা আপিসের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছেন, টের নাও পেতে পারেন।

—শীগগির পা চালিয়ে চলে, চট করে ঘুরে আসতে হবে।

কিন্তু ভূত বাবুর আপ্যায়ন এড়িয়ে চট করে ঘুরে আসাটা অত সহজ নয় জানত না।

কালো বেঁটেখাটো গোলমুখি মানুষ। হাত-পা চোখ-মুখ সবতেই ফুলো-ফুলো একটু গোলমুখি ভাব রয়েছে। বছর পয়তালিশ বয়েস, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, গায়ে বগল-হেঁড়ো আধময়লা নেটের গেঞ্জি।

সর্দারের সঙ্গে সাধনাকে দেখেই হাঁটুর কাপড় বতটা সম্ভব টেনে নমিয়ে ভূত বাবু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল হুঁহাত জুড়ে।—আশুন, আশুন, কি সৌভাগ্য, বসুন। কস্তে ময়লা বাধান এনে একটা বেকি ভালো করে বেচে-বুছে মিল। বসুন, এইখেনটায় বসুন।

তাব ব্যস্ততায় আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে সাধনা বসে বসল।

প্রবেশ-পথের ধুলো-বাগির ওপরেই সর্দার বসে পড়ল। দেয়াল-সীলগ হাঁকোর মুখ থেকে কান্ডেটা তুলে নিয়ে ভূত বাবু তার হাতে মিল। নাও, তামাক খাও।

কষ্টচিন্তে সর্দার হুঁহাতে কান্ডে বাগিয়ে ধরে মুখে ঠেকালো। ভূত বাবু সখিনয়ে এবা সহস্রো সাধনার সামনে এসে দাঁড়াল।—আপনি এলেন, পরম সৌভাগ্য আমার। আপনি তো আমাদের ওভারসিয়ার বাবুর মেয়ে—চিনি চিনি, সন্তানকে চিনি আমি এখানকার। আর আপনাকে তো সবাই চেনে, এই ডামের যন্ত্র-তন্ত্র আপনার মত অত আর কে ঘোরে—বড় ভালো লাগে দেখতে।

লজ্জায় আর গরমে সাধনা রাঙিয়ে উঠেছে প্রায়। তামাকের কন্ডের পাগল-সর্দারের নিবিষ্টতা দেখে মনে হল, কি জন্তে এসেছে তাই বোধ হয় ভুলে গেছে ও। তেমে বলল, আপনার কাছে কিন্তু একটা কাজের জন্ত এসেছি আমি। সর্দার বলল, আপনি ছাড়া আর কেউ যোগাড় করে দিতে পারবে না।

অমায়িক হাসিতে ভূত বাবুর গোল মুখ ভরে উঠল প্রায়। ওরা আমাকে জানে যে—দরকার হলে এই রাজ্যে এই ভূতই বাবের দ্বন্দ্বও যোগাড় করে দিতে পারে। আপনি সে জন্ত কিছু ভাববেন না, আগে একটু চা হোক।

—না, না, এখন আর চা নয়।

হাত জোড় করে কেলস ভূত বাবু। মা লজ্জা শুধু-মুখে ফিরে গেলে ভূতর পোকানে ঘুঁ চরবে—এই, শীগগির চা দে না এখানে—সর্দারকেও একটু দিস। কর্মচারীকে জ্ঞাপন দিয়ে ভূত বাবু একটা টুল টেনে বসল।

নিরুপায়! সাধনা ভূত বাবুর হোটেল আর দোকান পূর্ববন্ধনে মন দিল। ছুটো ছাপরা ঘর। মাঝে দরজা। বেখানে তার বসেছে সেটাকে হোটেল এবং রেস্টোঁর। বলা চলে। তিন-চারটে তেলচিটে বেকি পাভা। সামনে ততোধিক মলিন একটা কাচের আলমারিতে কিছু খাবার সাজানো। কোণের মিকে মস্ত একটা মাটির উছনে বড় এক হাড়ি ভাত চড়ানো হয়েছে। ওদিকের

ঘরটার মণিহারী এবং মশলাপাতির দোকান। দেয়ালের দিকে একটা খাটটার ওপর বিছানা গোটানো। একজন ছোকরা চাকর বিবর্ণ ছুটে ছোট চাকের গ্রাসে কেটলি থেকে চা ঢালায় ব্যবস্থা করছে। ওই গ্রাসে চা খেতে হবে ভেবেই সাধনার অবস্থা কাহিল। আমতা-আমতা করে বলেই ফেলল, গেলাস ছুটে। একটু গরম জলে ধুয়ে নিলে হ'ত—।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! টুল ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভুতু বাবু। ওরে এই বাটা মুখ-খু-গরম জলে গেলাস না ধুয়েই ভুই চা ঢালছিস? শীগগির ধুয়ে নে ভালো করে। আচ্ছা, পাঁড়া—

তাড়াতাড়ি এক টুকরো সাবান এনে নিজের গ্রাস ছুটে ধুয়ে রঙ ফেরালো। পরে গরম জলে আর এক প্রস্থ ধুয়ে বলল, নে এইবার ঢাল চা—একটু জ্ঞানগম্যি যদি থাকত, যেন ওর মতই কেউ থাকে?

সন্ধ্যাট সন্ধ্যাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাধনা। চায়ের গ্রাস এলো। আর একটা গেল পাগল-সর্দারের হাতে। কয়েকখান্নে রেখে দিয়ে সাগ্রহেই চায়ের প্রতীক্ষা করছিল সে।

ভুতু বাবু টুলে ফিরে এসে সর্বিনয়ে বলল, একটু মিষ্টি বা নোনতা কিছু দিই?

সাধনা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, না না, এখন আর কিছু না—

গ্রাস খোরার ব্যাপার থেকেই ভুতু বাবু বুকে নিয়েছে আর কিছু চলেবে না। তাই জোর করল না। ওই চাকরটার ওপরেই ক্রুদ্ধ হল মনে মনে। দিলে বাটা লোকানের প্রেক্ষিতাই নষ্ট করে। অথচ এরই মধ্যে মনে মনে কত কথাই না ভেবে ফেলেছে। জেটসম্যান' তার লোকানে অনেক আসে। কিন্তু 'লেডি'র পদার্পণ এই প্রথম। দেখানো যদি কিছু কিছু মহিলার সমাগম হয় এমন করে, তাহলে পদার্পণ আড়ালে টেবিল আর বেকি ফেলে একটা ক্যাবিনের মত করা যায় কি না ভাবছিল। কানের টানে মাথা আসে। মালিকীদের টানে রেস্তোরাঁ জমে উঠতে কতক্ষণ!

—বেশ চা। ভুতু বাবুকে খুশি করার ভাঙেই বলল সাধনা।

খুশিই হল। লজ্জাবিনয় খুশির হাসি। একটুখানি ভালো জিনিস সংগ্রহ করার জন্য খেটে খেটে হরষাণ হতে হয় আমাকে। আমার পরিবার তো সারাক্ষণই বলে, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, তুমি আশ্রম খোলো। আমি বলি, এ-ও তো আশ্রমই, নেহাত ছুটে। পরসী নিতে হয় বলেই নেওয়া।

হাসি চেপে সাধনা জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আপনার বাড়ি বুঝি?

—বাড়ি এখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। সপ্তাহে কি পনের দিন অন্তর হট করে এক-আধ দিন ঘুরে আসি। আগলে এই আমার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে—এক পা নড়ার উপায় আছে? দেখলেন তো, একটু কথা বলছি আপনার সঙ্গে অমনি গরম জলে গেলাস না ধুয়েই চা ঢালতে বসে গেল ঝাঁপটায়।

গ্রাস খোরার ব্যাপারে লোকটি বেশ আতঙ্কিত হয়েছে বুঝে সাধনা অপ্রস্তুত হল একটু। পাগল-সর্দার ওমিকের তার কোন চেনা লোকের সঙ্গে গরম গরম করেছে। ডেকে বলল, আমরা কি জন্ত এসেছি এখানে বললে না তো সর্দার?

ভুতু বাবু বাধা দিলে, আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না, যে করেই

আমর, এসেছেন যখন, পেয়েই গেলেন—এই ভুতুর কাছে কেউ কখনো না শোনেনি। চাঁটুকু খেয়ে নিন আগ-আর একটু চা দিক?

বাকি চাঁটুকু তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে গ্রাসটা সরিয়ে রাখল সাধনা। না, আর না। আতিথেয়তা প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে গোড়া থেকেই আছেন বুঝি?

জাঁকিয়ে বলল ভুতু বাবু। ছুটির দিনে দোকানের খুচরো থাকে থাকেই না প্রায়। ঢালা অবকাশ। জবাব দিল, একেবারে গোড়া থেকে। হিল ব্রাউনিং এর পর নগলা পাঁচশ টাকার এ জারগা ডেকে নিতে সকলে চেমেছে। বলেছে, শুকনো পাখর ধুয়ে জল খেতে হবে—এখানে নাকি আবার ব্যবসা হয়! উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। ভুতুর হোটেল না থাকলে কি যে হ'ত, এখন সকলেই বুঝছে সেটা।

অর্থাৎ, এই হোটেল বিচনে এখানে ডায়ের পরিকল্পনাটাই ব্যবহৃত বলেও অত্যাধিক হবে না। এর ওপর সাধনা উসকে দিল আরো। নবীন বাবুর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি—তার ছ'বেলার খাবারও তো আপনার এখান থেকেই হচ্ছে।

খুশিতে ভুতু বাবুর গোলাকার দেহ হলে উঠল বেন। আমাদের ডাকটসম্যান নবীন চৌধুরী সাহেব? বলেছেন বুঝি?—অতি মহাশয় ব্যক্তি, খুব শ্রদ্ধা করেন আমাদের।

পাছে চেপে ফেলল, সেই ভয়ে মুখ বুজে থাকে সাধনা।

ভুতু বাবু বলে গেলেন, শুধু খাওয়া! প্রথম দিকে এই ডায়ের দেখতে এসে বিপাকে পড়ে কত গণ্যমান্ত লোক রাজ্য কাটিয়েছে এই হোটেল-খরে টিক নেই! দোকানপাট গুটিয়ে বাড়িভাড়া তদন্তের শোয়ার জারগা করে দিতে হয়েছে এই ভুতুকেই। বলাতে তো পারিনে, না ভেনে-শুনে এসেছ যখন রাতভোর থাকো ওই আকাশের নীচে পাথরের ওপর বসে!

নিজের বদামত্যায় নিজেই গলে গলে পড়তে লাগল ভুতু বাবু। বেশ লাগছে সাধনার। কিন্তু আর বসে চলে না। বাড়ির কথা মনে হতেই এবারে বেশি ছেড়ে উঠে পাঁড়ালো।—অনেক দেবী হয়ে গেল সর্দার আমি চললাম কিন্তু—

তাড়া খেয়ে সর্দার গাজোপান করল। কাছে এসে সাধনা জিজ্ঞাসা করল, ভুতু বাবু 'ডাংরা' মিলায়ে দিবে তো?

তার ধারণা আগমনের উদ্দেশ্য সাধনা এতক্ষণে নিশ্চয় ব্যব করেছে। কিন্তু ভুতু বাবুর স্বেগাল দুই চোখ সেই অবলা ঘোঁড়ার মতই হয়ে উঠল প্রায়। ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে খেদ জিজ্ঞাসা করল, ডাংরা—মানে আপনার কি গোক চাই নাকি?

সাধনা মাথা নাড়ল, তাই বটে।

সর্দার জোর দিয়ে বলল, সিঁদুরার 'বেজার' দরকার, তু একটা 'বেশ ডাংরা' লিয়ে আয়, সিঁদুরা কিনে লিবে। আমি সিঁদুরার বুলেছি ভুতু বাবু টিক মিলায়ে দিবে।

ভাবমায় পড়ল ভুতু বাবু। এখানে হোটেল কেনে বসার ল থেকে গোপনে এক প্রকাণ্ড অনেককে অনেক কিছুই সংগ্রহ করতে হয়েছে তাকে। হস্তেও। কিন্তু তা বল গোক। বোঝা দত্ত জিজ্ঞাসা করল, গোক কি হবে?



—বাবার জন্তে সব সময় ঠিক মত দুধ পাইনে, তাই ভাবছিলাম বাড়িতে একটা গোক রাখতে পারলে সুবিধে হত।

ভাবতে লাগল ভুতু বাবু। একটু আগে নিজের মুখে যে বড়াই করেছে তাতে আর পারব না বলা সাজে না। তার থেকেও বড় কথা, যে এসেছে তাকে নিরাশ করতেও মন সরে না। তাছাড়া, পারলে দু'শরসা লাভের দিকটাও ফেলনা নয়। কিন্তু বা এমন শক্ত কাজ, গোক কি এ রাজ্যে নেই নাকি? বলল, আচ্ছা দেখি, এখানে তো আর পাওঘা বাবে না, সেই শহর থেকে আনতে হবে—কিন্তু খরচ তো একটু বেশি পড়ে বাবে?

সান্দনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, খুব বেশি?

—গেরছ বাড়ি থেকে শেয়ে গেলে তত বেশি পড়বে না—আচ্ছা সে বা হয় হবে, খোঁজ পেলে আপনাদের বাবার সঙ্গে না হয় কথা বলব'ন।

যান্ত হয়ে বাধা দিল সান্দনা, বাবার সঙ্গে কোন কথা বলতে হবে না, পেলে আমাদের জানাবেন, সদ'রকে দিয়ে খবর দিলেই হবে। আচ্ছা, আমি যাই আজ, কেমন?

চড়াইয়ের পথে যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ভুতু বাবু ঠাড়ির ঠাড়িয়ে দেখল। দিনগত পারস্পরিক মধ্যে আত্মকের বৈচিত্র্যটুকু নিঃশব্দে রোমন্থন করতে লাগল।

পাগলসদ'র তার নিজের কাজে চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তা ধরে সান্দনা একাই উঠে আসছে হু-হু-হু করে। এত দেবী হয়ে বাবে, কে জানত! সদ'রের ওপরেই তার রাগ হচ্ছে এখন। একটু যদি সময়ের জ্ঞান থাকত। নরেন বাবু একত্বপূর্ণ এসে গেছে নিশ্চয়। —বাবার বহুনির হাত থেকেও রেহাই নেই আজ।

চড়াইয়ের পথে তাড়াছড়ি করে উঠতে গেলে হাঁক ধরে বাবেই। জার ওপর কড়া বোদ। সান্দনার সমস্ত মুখ তেতে উঠেছে।

শিহনে গাড়ির শব্দে ফিরে তাকালো সান্দনা। জিপ আসছে একটা। পথ ছেড়ে এক পাশ ধরে চলতে লাগল সান্দনা। জিপ পাশ কাটিয়ে গেল। চালক এবং তার পাশে আর একজনকে। —হু, ওকে যদি তুলে নিত...এখনো কতটা পথ—

বিশ-পচিশ হাত এগিয়ে গিয়ে ব্যাচ করে থেমে গেল জিপটা। চালকের আসনের লোক ব'কে শিহনে দিকে তাকালো। নীল সান্দনা চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে বোঝা যায়।

সান্দনা ভড়ক গেল। কি সর্গনাশ! ওর মনের কথা শুনেছে নাকি! কাছাকাছি হতে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওপরে কখনো আসেন?

নিজের অজান্তেই সান্দনার পা থেকে গেল। হাঁ না কিছুই বল না।

এর অব্যাহত। কায়ল, এ রাস্তা ধরে ওপরে ছাড়া আর কোথায়? আশ্রন, আমরায় বাচ্চি, রোদে আর হেঁটে কষ্ট করবেন না?

চল পাশের লোকটি আসন ছেড়ে উপকে শিহনে গিয়ে বসল। পা গাড়িত বয়েদেব পকে শিহনে গিয়ে বসার থেকে সামনে বসে কলসি বোঝে হয়।

সান্দনা বিমত মুখে ঠাড়িয়ে রইল তবু। বগতে চাইছে,

আপনারা বান, আমি হেঁটেই বাব। কিন্তু বলা হল না। লোকটি আবার ডাকল, আশ্রন, আমরা তো যাচ্ছি ওপরে।

খিা কাটিয়ে উঠেই বসল সান্দনা। মককগে, পাহাড়ের মাথার উঠে তো নেমেই পড়বে। আপন না আছে না-ই আছে।

পাহাড়ী রাস্তার এক-বৈকে জিপ চলল আবার। বাকের মাথায় ভরলোককে এক একবার মুকতে হচ্ছে তার দিকে। কিন্তু নীল চশমায় চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ড করা যাচ্ছে না। সান্দনা আড়চোখে বাব কতক দেখে নিল তাকে। শিহনের লোকটির দিকেও তাকালো একবার। না, কখনো দেখেছে বলে মনে হল না।

কিন্তু কি মনে হতে একবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্দনা।

—চাক ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলী নয় তো! সেও তো জিপে ঘুরে বেড়ায় শুনেছে! সান্দনা ঘেমে উঠল একেবারে। ছাড় না ফিরিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখল আবার। চকচকে চেহার, বকবক বেশবাস, হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, দু'হাতের আঙুলে একটা করে হীরের আঙুটি। নীল চশমা সম্বোধন আর চোখোচোখি হয়ে গেল। সান্দনা কাঠ হয়ে বসে রইল অত দিক ঘেঁষে। আর দু'তিনটে বাক পেলেই মেন্ কোয়ার্টারস্। নামতে পারলে বাঁচে এখন।

কিন্তু জিপ মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে যেতেই সান্দনা অকুটবরে বলল, আমি এখানে নেমে যাই—

নীল চশমা ফিরে তাকালো আবার। কিন্তু রাস্তাটা বৈকে গেছে বলেই সামনের দিকে লক্ষ্য করতে হল ততক্ষণি।—আপনি অবনী বাবুর মেয়ে তো?

মাথা নাড়ল, তাই বটে।

—পৌছে দিচ্ছি।

সান্দনা চূপ আবার। ষ্টয়ারিং-দরা দুই হাতের হীরের আঙুটি থেকে আলো ঠিকরে বেরচ্ছে। ইচ্ছে করছে, ঘুরে বসে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নেয়। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতো পারছে না।

দেবসোড়ার জিপ থামতে বাইরের ঘর থেকে নরেন চৌধুরী গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সান্দনাকে পাড়ি থেকে নামতে দেখে বিমত নোড়ে দরজার কাছে এগিয়ে এলো সে।

—নমস্কার মিঃ চৌধুরী, ভালো তো?

—নমস্কার, কি আশ্চর্য, আপনি কোথেকে?

সহাস্তে জবাব এলো, আপনাদের মেন্ কোয়ার্টারস্-এই বাচ্চিলাম, ইনি রোদে কষ্ট করে উঠে আসছেন দেখে পৌছে দিলাম। চলি, কেমন—?

জিপ ঘুরিয়ে নিল।—প্রত্যাবর্তন। সান্দনা একত্বপূর্ণ সহহ হল বেন। সাংগে জিজ্ঞাসা করল, কে এঁরা?

নরেন অবাক, তুমি চেন না?

—না তো।

—চেন না, অথচ পাড়ি চেপে চলে এসে?

—পাহাড় তেকে উঠে আসছি দেখে পাড়ি ধামিয়ে ডাকলেন তো কি করব? বলুন না কে?

—কনস্টেবল বোবাচকলাদার—একজন বর্ষীয় বোবা, শিহনের জন বিজেন চাকলাদার।



সাহসী মহা অশ্রুজল। একেবারে বেন বোকা বনে গেছে।  
বলেই ফেলল, খোং ছাই।

নরেন চৌধুরী নিরীক্ষণ করে দেখছিল তাকে।—তুমি কে  
জেবছিলে?

সাহসী আবারও লজ্জা পেল একটু। কে ভেবেছিল বললে  
একুশ ঠাটা শুধু হবে। কিন্তু গাড়ীতে আসার আনন্দটাই মিছি-  
মিছি মাটি হল। কে না কে, না ভেনেই একেবারে কিনা কাঠ  
হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ! কিন্তু আশ্চর্য, ওকে বিশ্রুটিক চেনে।

এতক্ষণ বাদে বাড়ি কোয়ার কথাটা মনে হতেই সচকিত হল।  
সিঁড়ির কাছ থেকেই ভিতর দিকে উঁকি দিল একবার। পরে প্রায়  
ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

—ভিতরে। যাও এক হাত হবোঁন আজ।

ছোট মেয়ের মতই ভয়ে ভয়ে সাহসী জিজ্ঞাসা করল, খুব বেগে  
গেছে বুঝি?

—খু-উ-ব। তোমার মাসিমা না কারা সব এসেছেন—সেই  
থেকে সকলে অস্থির তোমার ভক্ত।

—মাসিমা! যুদ্ধের বিমূঢ়-বিশ্বস্তাব কাটিয়ে নরেনের গায়ের  
ওপর দিয়েই ছুটল ভিতরের দিকে। বাবার বন্ধুর ভয় ভাবনা  
রসাতলে গেল।

নরেন গিয়ে চেয়ারে বসল আবার।—অল্পমন্ডল। ভিতরের  
হৈছরোড় কানে আসছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি কানে লেগে  
আছে কনট্রাস্টের ঘোষ-চাকলাদারের ভিগের ঘড়-ঘড় শব্দটা।

সত্যিই মাসিমা!

সঙ্গে মাসতুত ভাই আর বোনও। ছুটে গিয়ে সাহসী গলা ভড়িয়ে  
ধরল মাসির। আচমকা আক্রান্ত হয়ে অবস্থা সড়িন তাঁর। বললেন,  
খুব দরল বুঝেছি, ছাড়—এতক্ষণ ছিল কোথায় তুই?

জবাব না দিয়ে উৎফুল্ল আনন্দে সাহসী মাসিকে ছেড়ে  
ভাই-বোনকে নিয়ে টানা-চোঁচা করল এক প্রস্থ। তার  
কাণ্ড দেখে অবনী বাবুরও হাসি চাপা দায় হচ্ছে। কিন্তু হাসলে  
আর শাসন করা হয় না। বললেন, এই চনচনে বোদে সকাল থেকে  
কোথার টো-টো করে ঘুরছিল তুমি?

মাসির কোল বেঁধে বসে এই সব অপ্রিয় প্রশ্ন একেবারে  
বাতিল করে দিতে চাইল সাহসী।—কোথাও না, যাও। দেখলে  
মাসিমা, কোথায় তুমি এলে না বাবা আমাকে বন্ধুর কিছির খুঁজছে!

অর্থাৎ, মাসি বখন এসেছে, বাই করে থাকি আর বকাবন্ধির  
প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু মাসিমাই উল্টো সুর ধরলেন।—  
ঠ্যা রে, তুই নাকি দিন-রাত কাঠকাটা বোদে আর হিমের মধ্যে  
ঘুরে ঘুরে বেড়াস, অশ্রু-বিশ্রুত হয়ে তখন?

সাহসী তাচ্ছিল্য করে জবাব দিল, ঠ্যা, অশ্রুত হলেই হল—।  
অবনী বাবু বললেন, আমি বলে বলে হযরাত হয়ে গেছি,  
আপনি ওকে নিয়ে যান এবার—বিশেষ কিছুই নেও একটা কিছু  
বাখিরে কিন্তু ফেলবে আমাকে।

যদি বোনমি'র দিকে চেয়ে চেয়ে অশ্রু-বিশ্রুতের কোন  
সড়াবনার কথা মনেও হল না মাসির। বরং ফর্সা রঙের ওপর  
এক পোঁচ কটি ভাসলের ছোঁপ পেগেছে। চোখে-মুখে হাসিতে  
শুশুকিত দাঁড়াল অমায় প্রাচুর্যের হাঁদ এসেছে একটা।

প্রশ্ন একেবারে জেতেই সাহসী বলল, তুমি সত্যি সত্যি এত  
শীগগির চলে আসবে মাসিমা, আমি একবারও ভাবিনি।

মাসিমা জবাব দিলেন, অত করে আসতে লিখেছিল তাহলে  
অমনি বুঝি? কি দিয়ে কি করছিল সেই থেকে ভাবছি—।  
কিন্তু তোর বাবা যে থেকে নিয়ে যেতে বললে তুমি?

আবার সেই কথাই এসে পড়তে সাহসী হতান নরেন তাকাল।  
তার বাবার দিকে।—তুমি যাও না বাবা ওঘরে, নরেন বাবু একলা  
বসে আছেন মুখ বুজে, গল্প করোগে।

সকরণ অনুয়ে সকলে হেসে উঠতে উৎফুল্লমুখে নিচ্ছেই উঠে  
পাঁড়াল সে। পাঁড়াল, আমিই ডেকে আনছি ভক্তলোককে, লজ্জার  
আসতে পারছে না, তুমি না থাকলে এতক্ষণে।

কথা শেষ না করেই চলে গেল এবং পরক্ষণে প্রায় জোর করেই  
নরেন চৌধুরীকে এ ঘরে নিয়ে এলো। তড়বড় করে বলে গেল, এই  
আমার মাসিমা—এই মাসতুত বোন—বোনের বিয়ের ভাবনার  
মাসির চোখে ঘুম নেই—আর এই হল মাসতুত ভাই—খুব ভালো  
ছেলে, ক্লাসে একদিনও পড়া পারে না।

বাড়িতে পরিচয় করেই মাসিমা একে দেখেছেন। অবনী বাবু  
আলাপও করিয়ে দিয়েছেন। এবার অন্তরঙ্গতাটুকু চোখে পড়ল  
মাসির। পড়ল বলেই কয়েক নিমেষ নিরীক্ষণ করে দেখলেন  
তাকে। নরেন হাসছে মুখ চিপ।

—খুব পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, বোন আর ভাই দেখাবোঁন  
পরে তোকে—এঁকে একটা কিছু পেতে বসতে দে।

তততকে যেকের ওপরেই সমাসীন সকলে। নরেন চৌধুরীও  
থাকী ট্রাউজার টেনে অবনী বাবুর কাছাকাছি পা গুটিয়ে বসে পড়ল।  
পরে মাসির দিকে চেয়ে হেসে বলল, আপনি আসায় সাহসীর আনন্দ  
বোধ হয় লড়াই থেকেও শোনা যাচ্ছে।

—যাবেই তো। সাহসীর পরিচয় করানো শেষ হয়নি এখনো—  
তুমি একদিন রাগ করে আমাকে, বাবাকে, মাকে, দাডকে সকলকে  
নিয়ে কি একটা গাল দিয়েছিলে না মাসিমা—পঞ্চতপার গুটি!  
এই দেখো মূর্তমান পঞ্চতপা। খুশিভরা ছই চোখ নরেনের মুখের  
ওপর সবুজ হল।—বুঝলেন না তো? মাথার ওপর নরেনের ভাপ,  
চারদিকে পৃথিবীর ভাপ—এই পাঁচ তাপের মধ্যে বসে—এই!  
মেহদগু সোজা করে ছুঁ চোখ বুজ বোগাসনের একটা নমুনা দেখাতে  
গিয়ে হেসে ফেলল। পরক্ষণে গভীর হয়ে বলল, শুধু ইনি নয়,  
মাসিমা, এদের টীক ইন্ডিনীয়ার থেকে শুরু করে পাগল-সর্দার পর্যন্ত  
সকলই তাই—সাহসীর চোটে এই পাহাড়ী মরুভূমির ওপর দিয়েও  
তরতর করে বাহাঙ্ক চলাবে দেখোঁন।

আর এক প্রশ্ন হাসি।

অবনী বাবু বললেন, নে খুব হয়েছে এখন, বোলা কত হল খেবর।  
আছে, খাওয়া-পাওয়া নেই আজ?

তড়াক করে উঠে পাঁড়াল সাহসী। সত্যিই একেবারে ফুল  
বসেছিল। কিন্তু নরেন মাঝখানে কোড়ন কাটল আবার। নিরীহ  
মুখেই অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, সাহসীর খাওয়া হয়েছে?—যায়ে  
বন্ধুনি খাওয়া? সকাল থেকে এ পরজ কোথায় ঘুরছিল—

সাহসী তর্জন করে উঠল, ভালো হয়ে না কিন্তু। বরং খেতে  
অত প্রয়াস করল সে।

মাসতুত বোন আর ভাইও অসুস্থ পড়ল। উঠেন মাসিমাও, কিন্তু ছেলের প্রাণ কোতুলক বশতই উঠলেন না। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গ্রামের কথা, বাড়ির কথা, চাকরীর কথাও ছুঁচ্যারটে।

রান্নার কাঁকে কাঁকে সাধনা এক-একবার আসছে এখরে। শেষে বাবাকে জানে পাঠিয়ে মাসির রান্নার প্রশংসা পক্ষস্থল হল সে। বলল, আমার রান্নাতেই ওই, মাসিমার হাতের রান্না খেলে একেবারে জোপদীর শোক উথলে উঠবে আপনাদের।

মাসি হেসে ফেলেও প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, মেয়ের কথাই ছিঁরি দেখো!

নরেন টিপ্তনী কটিল, এ কথা বলে আসলে রান্নার বাপাচারটা আপনায় ওপর চাপাতে চাইছে বোধ হয়।

সাধনা চাক বা না চাক, যে দু'দিন ছিলেন রান্নার ভার তিনিই নিলেন আর নরেনও বধাবিধি দু'দিনই নিমন্ত্রিত হল। হৈচৈয়ের মধ্যে কটিল সে দিনটা। পরদিনও প্রায় তাই। আশিস-ক্ষেরতা নরেন চৌধুরীকে বাহন করে, বলতে গেলে সাধনাই মহা উৎসাহে মাসি এবং ভাই-বোনদের ডায়ের কার্খকলাপ দেখাল শোনাল এবং বোঝাল। পাহাড়-পাহাড়ে ওঠা-নামা করিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিল সকলের।

কিন্তু পরদিন রাতিতে সাধনার আনন্দ-প্রাচুর্যে একটা ছেদ পড়ে গেল বেন হঠাৎ।

একটু আগে সকলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নরেন চলে গেছে। হাতের নাম মাত্র রান্না সেয়ে নেবার জন্ত সাধনা রান্নাঘরে ঢুকছে। ওমিকের ঘর থেকে বাবা এবং মাসির কথাবার্তা কানে এলো। ইতিমধ্যে সাংসারিক আলাপনের অবকাশ বড় পেয়ে ওঠেন নি মাসি। পরের দিন তাঁর চলে যাওয়ার কথা। তাই অবনী বাবুর সঙ্গে ছুটো কথাবার্তা কইতে বসেছেন।

জড়াজড়ো করে হাতের কাজ শেষ করছিল সাধনা। আর জাবছিল, কাল মাসির যাওয়া বন্ধ করতে হবে। কাল বেন, পরশুও যেতে দেবে না।

ওদিক থেকে মাসির একটা সাদাসিধে মন্তব্য কানে এলো।—  
ছেলেটি বেশ, দাঁকি হাসিখুশি, একেবারে আপনায় জনের মত।

—খুব ভালো, ভারী ভালো। অবনী বাবু বললেন।—এই বললে কত বড় চাকরী করে, একটুও অহঙ্কার নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।

—কিন্তু ওরা চৌধুরী না কি সুনাম, বায়ুন তো?

—বায়ুন...? কি জানি।— তারলেন একটু, বায়ুন নয় বোধ হয়...।

কঠোর বলল গেল মাসির। একটু চুপ করে থেকে ঈশ্বর উল্লেখ করলেন, কেন জগতে যে বাস করছে তোমরাই জানো মানুষ।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে একেবারে অস্ত্র প্রসঙ্গ তুললেন তিনি।—তুমি তো আপাতত এখানেই থাকবে বোকা বাজে, কিন্তু এখানে বসেই তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে মনে করো নাকি?

বিজ্ঞ মুখে অবনী বাবু বললেন, তাই তো ভাবছি।

—কিছুই ভাবছ না। জাবলে আর এমন নিশ্চিন্তে কাটানো

পারতে না। ভালো চাপ তো মেয়েকে কালই আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, আমি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি। আর...এখানে এসব আমার ভালও লাগছে না।

কি ভালো লাগছে না, সেটা অবনী বাবুর বোধগম্য হল না ঠিক। চেষ্টাও করলেন না ব্যতীতে। চিন্তিত মুখে বললেন, ও কি যাবে এখন আপনাই বলে দেখুন না।

এদিকে সাধনার হাতের কাজ থেমে গেছে। দুই ডফর মাঝে কুঞ্ঝ-বেধা পড়েছে। দুই চোপ শূন্যের মধ্যে এক একবার ঘুরে এসে থেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ সমস্ত ভিতরটাই যেন তিক্ত হয়ে গেল তার। মাসতুত বোনের একটু-আধটু চপল ইঙ্গিতের তাৎপর্যও স্পষ্ট হল এতক্ষণে। মনে হল, মড়াইয়ের এই উদুপ্ত মুস্তির মধ্যে মাসিকে মানায় না, মাসতুত বোনকে মানায় না। তারা ভিন্ন গভীর মানুষ, তার মধ্যে নিয়ে পুরতে চাইছে ওকেও। ওর এই মুক্তি কেড়ে নিতে এসেছে। নরেন বাবুর প্রসঙ্গে কই তার তো কোন দিন কিছু মনে হয়নি। জেদী মেয়ের মত নিজের অধর নিজেই দংশন করতে লাগল একলা ঝাড়িয়ে।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর মাসি কথা পাড়লেন। কাল দুপুরেই কিন্তু যাচ্ছি রে সাধনা, তুইও এবার বাবি তো আমার সঙ্গে?

সাধনা প্রস্ততই ছিল। একরাশ বিষয় প্রকাশ করে কেল। আমি! তুমি বলা কি মাসিমা, আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?

—তোমার বাবাকে তুই চিরকাল আগলে রাখবি ভেবেছিস নাকি?

—ভেবেছি মানে? রাখবই তো।

—ভগবান কল্লন, রাখিস'ন। এখন তো চল, তোমার বাবাই নিয়ে যেতে বলেছে।

সাধনা বাবার দিকে একটা জুঁজু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, আমাকে বলে দেখুক একবার।

কিছু বলা দূরে থাক, মেয়ের কথাই বাপকে হাসতে দেখে অসহ্য হলেন মাসি। আদর দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছে। বললেন, বেশ, তোমাদের ভালো তোমরা বোকা, আমি আর কিছুতে নেই।

এখানে সাধনাকে প্রথম দেখেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ওকে নড়ানো যাবে না এখান থেকে। এ ক'মাসে ওর চেহারা নয় শুধু, ভেতরস্থল বেন বসলে গেছে।

পরদিন মাসি চলে গেলেন।

আর দু'টো দিন থাকার জন্ত সাধনা মৌখিক অসুযোগ করতে পারল না একবার। উটে বেন স্বস্তির মত লাগছে।—এত দিন এত আদরে কাটিয়েছে মাসির কাছে, ভারী অন্ততস্ত মনে হতে লাগল নিজেকে। কিন্তু বাহা হুই তা হুই। হুই বলেই স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে এত অস্বস্তিও।

মাসি যাওয়ার পরেও ক'টা দিন গুম হয়ে কাটালো সাধনা। অকারণ বিরক্তিতে মন ঘুরে রইল। আগের মত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর ছাড়িয়ে দেওয়ার বতঃসূত্র আনন্দে ব্যাখ্যাত হটতে লাগল।

কিন্তু ঈগিরিই এই ওমেট অসহিষ্ণুতা কেটে গেল আবার। কটিল পাগলপদারি আর কুহু বাবুর কল্লনে। অপ্রত্যাশিত

বৈচিত্র্যে মাঝের এই ক'টা দিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন।  
নিজেকে ফিরে পেল সাধুনা।

সেও ছুটির দিন। তার বিগত ক'টা দিনের আচরণে মনে মনে  
বিশ্রিত হচ্ছিল নরেন চৌধুরী। অবনী বাবুর সামনেই হাক্কা ভাবে  
বলেছিল, মাসি চলে গেলেন বলে একেবারে যে মুখড়ে পড়লে  
দেখছি—।

সাধুনা ফস্ করে জবাব দিয়েছে, আনন্দে হাততালি দেব?

—ও বাবা! তা তুমিও তো গেলেই পাখত মাসির সঙ্গে—

দিন কতক না হয় তোমার ডাম স্পারভিশ্যান বন্ধই থাকত।

আগে এ ধরনের ঠাট্টায় অনেক হেসেছে সাধুনা। কিন্তু  
এই লোকের সব্বন্ধেই বিচ্ছিন্নি ভাবে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে  
তাকে। আগের মত হাসতে পারা সহজ নয়। পাগলও না।

এমন সময় দরাক্ গলায় ঠাঁক শোনা গেল বাইরে।—দিসিয়া!  
ই দিসিয়া—!

সাধুনা বাইরে এসে দাঁড়াতেই উল্লসিত পাগল-সর্দার বলে উঠল।  
দিসিয়া, ভূত বাবু ভারী লিয়ে আদলো—আরা: ডারা—ভাগে ডারা  
—নাওয়া ডারা—নাওয়া ভোয়া দিবে—!

আনন্দাভিগায়ে অনেকগুলি চূর্ণধা শব্দ বলে ফেলল পাগল-  
সর্দার। অর্থাৎ, ওই গোক নিয়ে আসছে ভূত বাবু, রাত্তা গোক,  
খাসা গোক, নতুন গাইয়ের নতুন দুধ পাবে গো তুমি!

অবুরে বাকের মুখে চোখ পড়তেই সাধুনাও সম্পূর্ণক বলে উঠল,  
ও মা ভাই তো!

শব্দ বারো বছরের একটা গ্রামা ছেলে দড়ি ধরে টানতে টানতে  
নিরে আসছে গোকটাকে। রাত্তা গোকট বটে। পিছনে একটা  
খড়ের বাছুর বুক করে থপ থপ চরণে আসছে গোলাকৃতি  
ভূত বাবু।

এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সাধুনা।—শীগগির এসো বাবা, কি  
সুন্দর গোক এনেছে দেখে যাও—।

তক্ষণি বাইরে চলে এলো আবার। গোকটাকে অভ্যর্থনা করে  
আনার আগ্রহেই এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু খুব কাছে যেতে  
সাহস হল না চট করে। কাছাকাছি গিয়ে থমকে পঁড়াল।  
তারপর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।

এত পরিশ্রম সার্থক হল যেন ভূত বাবুর। ঘাম-দরদর মুখে  
একগাল হেসে বলল, ভূতুর অসাধা কম নেই মালম্মী, দেখলেন  
তো? পছন্দ হয়েছে?

হাসিমুখে ছুই চোখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে থমকে  
গেল সাধুনা।—আ হা, ওর বাছুরটা মরে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, তাতে কি, এটাকে কাছে পেলেই ও খুশি, ভারী ভালো  
গোক। নামও খাসা, সুন্দরী।

ওদিকে নরেন চৌধুরী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে  
অবনী বাবু। মেয়ে গোক আনায়ে করে করে শেষে সত্যিই এনে  
হাজির করবে এতটা ভাবেন নি বোধ হয়। ক্যাল-ক্যাল করে  
দেখতে লাগলেন তিনি।

কমসলগ খড়ের বাছুর মাটিতে নামিয়ে দু'জনেরই উদ্দেশে  
বিনয়ান্বিত হল ভূত বাবু। পরে সিঁড়ির ছায়ায় থপ করে বসে পড়ে  
অম যুহতে যুহতে বলল, মালম্মী নিজে গিয়ে বলে আসতে সেই

থেকে খুঁজছি—তা গোকর মত গোকট পেয়ে গেলাম বটে সাক্ষাৎ  
যেন ভগবতী আশ্রয় করেছেন ওর মধ্যে।

নরেন হাসছে। অবনী বাবু চুপ। এই নতুন কামেলায় বিরক্ত  
হয়েছেন বোঝা যায়। টাকা কত গুণতে হবে সেটাও ভাবছেন।

জিজ্ঞাসা করতে হল না। ভূত বাবু বলল, অনেক বাক্যকি  
করে একশ পঁচিশে রাক্তি করিয়েছি, দিতে কি চায়—সব প্রথম  
বিয়ান, এখন তো জীবনভার তুধ দেবে। প্রসন্ন বলল সাধুনার  
দিকে চেয়ে বলল, খুব সম্ভাব্য পোষ গোছেন মালম্মী।

কিন্তু মালম্মী তখন শঙ্কিত নেত্র বাবার মুখভাব পর্যবেক্ষণ  
রত। খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। একশ পঁচিশ বেশি হল কি কম হল  
সাধুনার ধারণা নেই। শুধু মনে হল একশ পঁচিশ অনেকগুলো টাকা।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই বোধ হয় কিছু আর বললেন না  
অবনী বাবু। টাকা আনতে ভিতরে চলে গেলেন। উৎফুল্ল আনন্দে  
সাধুনা এবার গোকটার কাছে গিয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই  
গোক নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ভয় বিশেষ নেই। চিনলে  
ছ'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবু এই মুহুর্তে ওর গায়ে-পায়ে একটুখানি  
হাত দেবার লোভ সামান্য কি করে। গোকটা একটু-আধটু নড়ে চড়ে  
শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর গায়ে-পায়ে-কপালে হাল্ক বলিয়ে দিতে  
লাগল সাধুনা। নরেনকে বলল, কি ঠাঁও চাইনি দেখেছেন?

নরেন আর ঘাই হোক, গোকর সমঝনা নয়। তবু ভালই  
লাগছে। একে খুশি করার জগ্গেই গোকটার বেশ কাছে গিয়েই  
দাঁড়াল সে-ও। হাত বাড়িয়ে একটা আদর করতে গেল তার পর।

কিন্তু কামেলা বাড়ছে দেখেই হোক বা বেশ তাপায়ন পছন্দ নয়  
বলেই হোক, হঠাৎ সিং নোড অসন্তোষ জ্ঞাপন করে উঠল গাভীকন্না।

—বা বা! এক লাফে ছায় হাত তিনেক সরে এলো নরেন  
চৌধুরী।

ঝিল-ঝিল করে হেসে উঠল সাধুনা। হাসতে লাগল পাগল-  
সর্দার আর ভূত বাবুও।

সাধুনা টিপ্পনী কাটলো, দেখলেন, ও লোক চেনে।

পাঁচটা জবাব দিল নরেন চৌধুরী, চিনবেই তো, মালম্মীর সঙ্গে  
সাক্ষাৎ ভগবতীর আর তফাৎ কতটুকু?

পাগল-সর্দার ব্যল না।—কিন্তু শ্রায় চার আঙুল জিত বার করে  
ফেলল ভূত বাবু। নিকুপায় বোঝের অভিযুক্তি সাধুনার চোখে।

পথথরচা সমেত টাকা তুলে নিয়ে ভূত বাবু প্রস্থান করতে  
অবনী বাবু এবার বললেন, মাসির সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দিলেই ভালো  
হ'ত দেখছি—তুই একেও গিয়ে ধরেছিলি গোকর জগ্গে?

এখন কোন জবাব দেবে, এত বোকা নয় সাধুনা। নিরীহ মুখে  
দাঁড়িয়ে রইল। পরে ইশারায় নরেনকে বলল, বাবাকে নিয়ে ঘরে  
যান না।

তাঁরা আড়াল হতে পাগল-সর্দারকে তাড়া দিল, ওর ঘর ঠিক  
না করে দিয়ে যেতে পাবে না কিন্তু সর্দার।

সর্দার এক পায়ে প্রস্তুত। বলল, হে, আখুনি ছব—

ঘর এক রকম ঠিক করেই রেখেছিল সাধুনা। পিছনের দিকে  
ছাপরা-ঘরের মত আছে একটা। হয়ত চাকর বাকর থাকার জগ্গ  
করা হয়েছিল। গৃহসলগ হলেও বিচ্ছিন্ন, পাশের সড় রাস্তা দিয়ে  
আলাদা প্রবেশ-পথও আছে।

গোয়ালদায়ে পরিণত হল ওটাই। সদরীর খুঁটি পুঁতে দিল। তারপর পয়সা চেয়ে নিয়ে বাড়ি টব বালতি খোল তুবি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলো। নতুন আলয়ে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হল সুন্দরীর। যে ছোকার গুরু টেনে নিয়ে এসেছিল, গোন্ধর জন্তে অবনী বাবু তাকেই বহাল করলেন। হুঁবেলা দুটায় দেবে, গোয়াল দর পরিভার করবে, চরাতে নিয়ে যাবে। সাধনার মতে কিছুই দরকার ছিল না, সে নিজেই পারে সব। কিন্তু এখন এ সব নিয়ে বাবার কথার ওপর কথা কটলে নির্বাণ বকুনি আছে কপালে। পরে ভেবে দেখল, লোক একজন দরকারও, গোন্ধর খাবার দাবার তো আর সে বয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু অদৃষ্টে বকুনি আছেই। প্রথম দিন কতক প্রায় আশা-নিজাই ঘটে গেল তার। কাঁক বুকে ছোকরাটাও কাঁকি নিতে শুরু করল। কিন্তু সাধনা ওর পরোয়া করে ভারী। চরাতে নিয়ে বাগদার সময়েও সে সজেই থাকে। তার নির্দেশ মত কিছু দূরে পিছনের দিকের একটা খোলামেলা জায়গায় খুঁটিতে বাঁধা হয় গোন্ধটাকে। বাস খুব নেই। কাজেই জাবনার জালতিও আনতে হয় সঙ্গে। ভতলোকের বিশেষ আনাগোণা নেই এদিকটার। গ্রাম্য পথচারীরা শুধু এই পথে পাগড় ডিঙিয়ে দাভারাত করে। সন্ধ্যা এমনিতেই কম, সেটা আরো গেল। ছোকরাটা সময় মত না এলে গোন্ধ আর বালতি নিয়ে এক একদিন নিজেই সে বেরিয়ে পড়ে।

কলে জল ধাঁটাও বাড়ছে, রোদের ধকলও বাড়ে। অবনী বাবু রীতিমত রেগে গিয়ে বলেন, একটু শরীর খারাপ হয়েছে কি ডাকে আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব এখান থেকে।

দু'চার দিন সমীহ করে চলে সাধনা। তারপর যেই কে সেই। আবার একদিন বকুনি যায়।

কিন্তু অদৃষ্ট ষড়যনায় ব্যাপারটা ঘটল উল্টো বকম। অবনী বাবু হঠাৎ নিজেই পড়লেন অস্থখে। দিন দুই সর্দি এবং অরভাব, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী।

সাধনা শাসন করল, নিশ্চর ঠাণ্ডা লাগিয়ে আর রোদ লাগিয়ে অস্থখটিকে এনেছ।

অবনী বাবু আর বললেন কি। হেসে ফেলেন।

কিন্তু ভোগালে বেশ। অর সহজে ছাড়তে চায় না। এ সব কাজে বেশি দিন ছুটি নিয়ে বসে থাকারও চলে না। আবার না নিয়েই বা উপায় কি?

সরকারী ডাক্তার রোজ এসে দেখে যান। নরেন নিয়ে আসে সঙ্গে করে। ওষুধপত্রও এনে দেয়। বাবার মুখেই সাধনা শুনেছে, দুটিছাটা বেশি চাইলে চীক ইঞ্জিনিয়ারের নাকি মেজাজ বিগড়ায়। কিন্তু নরেন থাকতে এ ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাতে হল না কিছু। সেয়ে উঠলেন। কিন্তু বেশ কাঁহিল তখনো। বিকেলের দিকে সেদিন সাধনাকে বললেন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসলে না না—একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। নরেনের উদ্দেশ্য হলেন, ওর সুন্দরী পৃষ্ঠ সমর মত দেখা না গেলে একেবারে অস্থখ হয়ে আছে, খালি ডাকে।

নরেন আর এক প্রহর বড় চড়ালো।—ডাক্তারের কাজও একদিন আর বন্ধ বললেই চলে। একবার স্পারডাইজ করে আসবে দেখা তাই হলো—।

—বাবা না, যান। বাঁক দেখার সাধনা, তার থেকে সুন্দরীকে নিয়ে বেরব আমি।

নরেনের চোখে চোখ পড়তেই মা-লক্ষ্মী আর ভগবতীর ঠাঁটটা মনে পড়ে বোধ হয়। তার চোখে আবার সেই ঠাঁটাই আভাস দেখে ভাড়াভাড়ি সরে পড়ে।

দশ-পনের দিন নয়, সাধনার মনে হল যেন এক যুগ পরে বেরিয়েছে। পাগড় থেকে নেমে নিরিবিগি গাঁয়ের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

কিন্তু নরেন অত ঠাঁটায় অভ্যস্ত নয়। বার বার ফেরার তাড়া দিতে লাগল। অগত্যা প্রত্যাঘর্ষনের পথ ধরে সাধনা বলল, আপনি এক নম্বরের কুডে, মোটেই হাঁটতে চান না।

—এটোতে বাড়ি পৌঁছে বাবার কাছে ভাড়া খেতে হবে দেখ'খন। সাধনা হাতা ভাবেই জবাব দিল, হাট বলুক, অস্থখ করার কথা বাবা আর মুখেও আনবে না, খুব হুঁচক হয়ে গেছে।

তাকে বাগাবার জন্তেই নরেন ঠাস দিল, ঠব এট ছোটখাট অস্থখটায় তোমার তাহলে কিছুটা সুবিধেই হয়েছে বলে।

কিন্তু সাধনার মেজাজ অল্পবকম এখন। বাগ-বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। শুধু বলল, ঠা! হয়েচে, আপনার যেমন বসি! ফেরার পথে ভূত বাবুর হোটেলের পাশ কাটানো গেল না। নত অভিবাদন জ্ঞাপন করে একগাল হেসে পথসোধ করে ঠাঁড়াল। নরেনের দিকে চেয়ে সরিনয়ে বলল, একটু বসবেন না স্যার, একটুখানি চা—কাল সরে ফ্রেশ মাল এনেছি—

গম্ভীর মুখে নরেন চৌধুরী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাতে থেমে গেল। সাধনা একা থাকলে টেনে এনেই বসাতো। কিন্তু এই হোমরা-চোমরা মাল্ভবগুলোর দাত বয়ে চলতে হয় ভূত বাবুকে।

নিশ্চয় প্রত্যাখ্যানে লোকটার জন্ত কেমন মায়ী চল সাধনার। মিষ্টি করে বলল, আজ দেবী হয়ে গেছে, আর একদিন এসে খাব, কেমন? আপনার গোন্ধ কিন্তু চমৎকার হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, একবারটি গিয়ে দেখে এলেন না ভো?

ভূত বাবু হেসে বিগলিত।—খুব ভালো হয়েছে? আমি ভাবছিলাম কেমন না জানি! হল। সবাই বলে আর জন্মে ভূত খালি ভালো খোঁজার তপস্বী করেছিল। হাক, নিশ্চিন্তি হলাম, হোটেল ছেড়ে এক দণ্ড নড়তে পারিনি তো, তবু নিশ্চর বাব।

দু'দশ পা এগিয়েই নরেন চৌধুরী মস্তব্য করল, ব্যাটা ঘু।

সাধনা বলল, খুব ভালো লোক। কি মনে পড়তেই হেসে সারা তারপর।—সেদিন বলছিল, আপনি 'নাকি খুব ঘেহ করেন ওকে—অতি মহাশয় ব্যক্তি আপনি।

নরেনও হেসে ফেলল। বলল, ব্যাটা বাস্তব-যু, তোমার গোন্ধর একশ পঁচিশ টাকার অন্তত পঁচিশ টাকা ওর গহ্বরে গেছে।

—কখনো না, আপনি মিছিমিছি বাড়িয়ে বলেন, বেশ ভালো লোক।

সেকথার আর জবাব না দিয়ে সামনের চড়াইয়ের বাস্টাটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল নরেন চৌধুরী।—টাকাটাও যদি ছাই আসত এখন।

তবেই কি মনে পড়ে বার সাধনার। উৎফুল্ল মুখে বলে, ওটো বোম্বাচালারার না কি কট্টারমের জিপটা এনেও তো হল—

ভুজ কুঁচকে নরেন তাকালো একবার ওর দিকে।—এলেও সঙ্গে আমাকে দেখে নিরাশ হয়ে জিপ আর থামাতো না।

—খেং, আপনার খালি ইয়ে! তেমনি চেসেই বলল, কি না জানি ঠোরা ভেবে গেলেন সেদিন, হঠাৎ এমন ঘাবড়ে গেলাম যে একটা কথাও বেকল না মুখ দিয়ে।

—সেটাও ওদের খুব অপছন্দ হয়নি বোধ হয়?

—ফের! ভুলটি করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সাধনা।

জিপ বা ট্রাক কিছুই নয়। মাঝামাঝি পথে ছুটি নারীমূর্তি। পাহাড়ের ধার-ঘেঁষা একটা বড় পাথরে সমাসীন। দৃষ্টি মড়াইয়ের দিকে। আবহা অন্ধকারে দূর থেকে ঠিক ঠাণ্ডা হল না। কাছে আসতে নোনা গেল। নরেন চৌধুরী অন্ধুটকণ্ঠে বলে উঠল, এই সেরেছে!

বয়সী মহিলাটিকে সাধনাও চেনে। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জী। সঙ্গে মেয়েটি সাধনারই সমবয়সী হতে পারে, কিছু বড়ও হতে পারে।

কাছাকাছি হতে হুজনেরই চোখ পড়ল এমিকে। মহিলা দাঁড়িয়ে সামনে বলে উঠলেন, আপনার কোয়াটারেই যাব ভাবছিলাম মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গেই দেখা—। সাধনার দিকে কটাক্ষপাত করে নিয়ে আবার বললেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি? কত দূর গেলেন? আমি নিচে নামলে আর একবারে উঠতেই পারিনে, ইগিয়ে পড়ি।

নরেন দাঁড়িয়ে সবিনয়ে হাসতে লাগল শুধু।

—কই রে বর্ণা এদিকে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। আমার মেয়ে বর্ণা এম-এ পড়ে কলকাতায়—ছুটিতে এসেছে।—ইনি এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্টরমানান নরেন চৌধুরী—এঁর কাছেই যাব বলছিলাম তোকে।

যথার্থি নমস্কার-বিনিময়। সাধনা মেয়েটিকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। ছিপছিপে, চকচকে। চশমার নিচে স্বকরকে চকিত দৃষ্টি।

বর্ণা কাকেই জিজ্ঞাসা করল, আর ইনি?

—ও, এই—আমাদের এখানকার একজন ওভারসিয়ারের মেয়ে—কি নাম যেন তোমার?

—সাধনা।

মেয়েটি এম, এ পড়ে শুনে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। হুঁহাত তুলে মিষ্টি চেসে ওকেও যে নমস্কার জানাবে ভাবেনি। তাড়াহাড়ি হাসি টেনে কোন প্রকারে প্রতি-নমস্কার করল সাধনা।

—কাল বিকালে আপনাকে চায়ের কথা বলতে আপনার কোয়াটারে যাকিলাম মিঃ চৌধুরী! মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, আসতে হবে—মিঃ গাঙ্গুলিও কথা দিয়েছেন আসবেন।

শুনেই নরেন চৌধুরী হতাশার ভঙ্গি করল একটা। কাল? কি দুর্ভাগ্য, কাল যে এক বিশেষ কাজে আটকে আছি।

—সে কি! না, না—সকাল দিকে আশ্রন তাললে, তখন তো আর কাজ নেই? মোলায়েম আশুবিক্ত।

—আর বলেন কেন, কাজ একেবারে সেই রাত পর্যন্ত। তাতে কি, আর একদিন হবে'খন। বর্ণা দেবীর তো ছুটি আছেই এখনো, যে কোন দিন গিয়ে চড়াও হবে। চলি, নমস্কার, নমস্কার! আপনি

বসুন, একেবারে অন্তটা ঠঠা কারো হাটের পক্ষেই ভালো নয় খুব। এসো সাধনা—

অপেক্ষা না করে হাটতে শুরু করে দিল ওরা। খানিকটা এগোবার পর সাধনার বোবা মুখ খুলল। চাক ইঞ্জিনিয়ার, ওঁর বাড়িতে চায়ের নেমস্তন্ত্রে যাবেন কাল?

—নেমস্তন্ত্র হলে আর যাবে না কেন?

—আর আপনি যাবেন না? বিশ্বয় এবং হতাশা।

—কি করে বাই, শুনে তো কাজ আছে।

—ছাই কাজ, কি এমন কাজ শুনি?

—প্রথম কাজ, রায় মশায় কেমন আছেন না আছেন খবর নেওয়া, দ্বিতীয়, তোমার সঙ্গে আজ্ঞা দেওয়া—কাল আর বেকনো হবে না, বাড়ি বসেই আজ্ঞা দিতে হবে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারী! পা খেমে গেল সাধনার। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না বোধ হয়। আপনি তাহলে মিছে কথা বলে এলেন ওঁকে?

—কেন এগুলো কাজ নয়? পীড়ালে কেন, এসো।

—কি বাছোতাই লোক আপনি! পীড়ান, দেখা হলে বলে দেব। নেমস্তন্ত্র নিলেন না কেন?

—নিলে কি হত?

—আমি শুনেতে পেতাম সব।

নরেন হেসে বলল, সেটা নেমস্তন্ত্রে না গিয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক ঠিক শুনিয়ে দিতে পারি।

—ছাই পারেন, আপনি একটি মিথ্যে কথা জাহাজ। দেখা হোক না, ঠিক বলব আমি—ভ্রমমহিলা অত করে বললেন।

জেনারেল কোয়ার্টারের বাঁকা পথে পা বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী সন্ধিগু জবাব দিল, ভ্রমমহিলা মনে মনে খুশি হয়েছেন।

—কেন?

—মাথাটি তোমার নীরেট না হলে বুঝতে, চায়ের উদ্দেশ্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করানো। এতলা একজনকে নেমস্তন্ত্র করলে সবদিকটা বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই আমাকে বলা। এখন সব দিক বজায় রইল, বাবল এসেই প্রথমে জানাবেন, মিঃ চৌধুরীকে অত করে বললাম, তিনি আসতে পারলেন না—বাস, নরেন চৌধুরীকে দরকার ওখানেই শেষ—তার পর অথগু অবকাশ। কিন্তু স্মরণে হবে না—মেয়ে জাতটাকেই এখন কি চোখে দেখে লোকটা, জানলে আর এগোতেন না মহিলা।

আভিজাত্যের এ দিকটা সাধনার জানা নেই খুব। বাড়ি ফিরিয়ে ধী করে সে চেয়েই রইল নরেনের মুখের দিকে। শেষের কথাগুলো ভালো করে কানেই গেল না বোধ হয়।

এই মতলব?

বাড়ি ফিরে কাকের কীকে কীকেও বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছে সাধনা। ভারী মজা লাগছে ভাবতে! হাতের কাজ তুলে পাটির প্রহসনটা সকৌতুকে করনা করতে চেষ্টা করছে এক একবার। কিন্তু মাহুটাকে তো চোখেই দেখেনি, পারবে কি করে। মেয়েটা তেমন সুন্দরী না হলেও বেশ কিন্তু। আবার একটা বিপরীত অনুভূতিও লাগছে থেকে থেকে। এত কালের এত বড় এক অনুভূতি! আশাপ দূর করতে বসেছে যে মাহুত—তার সঙ্গে ওই মেয়ে।

নাঃ। সেও আবার কেমন লাগছে যেন।

[অবসান]

# **অঘোর প্রকাশ**

(স্বগয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

চতুর্থ খণ্ড—সেবাধিনী

উনবিংশ পল্লিচ্ছেদ

সেবার উত্তোগ

রাতিসুহ হইতে ঝিকপূর কিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িয়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহধানি দেখিয়া বলিলেন, “এই তো তাঁর! গয়া-কাশী যুরিয়া আসিলাম, এমন তাঁর তো আর কোথাও দেখি নাই।” রাওজী প্রায়তঃকালে উপাসনার বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূর্বে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রাত্রা আরম্ভ করিয়া তুমাকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিল, যে আহার প্রস্তুত হইলে তৎপ্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে বোড়ার গাড়িতে প্রয়াসি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্বাদ করিতে করিতে আহার করিলেন। তাঁহার সম্ভাব্য দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সফলতা ও আর্দ্র মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সন্দেহ হইত না।

আধ্যাত্মিক বিবাহের পর নানা ভাব স্রগরে লইয়া আমরা আপনার কার্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি করিবে কি? দেবকন্ডা স্বর্গের ঘন লাভ করিয়াছ, কি রূপ তাহা অপরকে দিবে, পরম্পরে এ আলোচনা করিতে লাগিলাম। বাহা লাভ করিলে, অন্তে যদি তাহার অংশ না পায়, তোমার পাণ্ডা তো সার্থক হয় না। ভাবিতে ভাবিতে তোমার “পরিবারের” পূত্রপাত হইল। তখন জানিতাম না যে, উহার নাম “পরিবার” হইবে।

মোকামার ভাই অপূর্বকৃষ্ণের বাড়ীকে তুমি আপনার বাটী মনে করিতে। তেমনি দানাপুরের ভাই বটীঙ্গদের বাড়ীটো তোমার নিজের বাড়ী ছিল। তুমি ভাই অপূর্বকৃষ্ণের বাড়ীকে পূর্বের ও ভাই বটীঙ্গদের বাড়ীকে পশ্চিমের ঘর বলিতে। এইবার তুমি একবার তোমার পূর্বের ঘরে গিয়া দেখিলে, যে সেখানে খেলাত বাবুর কন্ডা হুতুমারীর লেখাপড়া হইতেছে না। পশ্চিমের ঘরেও সেই অবস্থা; ভাই বটীঙ্গদের কন্ডার ক, খ, গেখা হইয়াছে মাত্র। নারীর অজ্ঞানতা তোমার এত ভরানক বোধ হইত, যে তাহা দেখিয়া কখনও তুমি স্থির থাকিতে পারিত না। গরীব ব্রাহ্মণদের পক্ষে কলিকাতার কন্ডাদের রাখিয়া লেখাপড়া সেখান এক প্রকার অসম্ভব। তুমি বুঝিলে, এ মেয়ে হুটির জ্ঞানাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। তুমি বলিলে, থাকিপুরে নিজ বাটীতে বোড়ি থুগিলে। তাহাই হইল।

২১শে মার্চ (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮১১) বোড়ি স্থাপিত হইল। এই-ই কন্ডাকে লইয়া নিজে শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করিলে। কিন্তু অতি কঠিন কাজ। এ তো আর গৃহস্থালী নয়, রায়াবালা নয়, শিশুভাষ্যার বা আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতেই ইহার সমুদয়

প্রণালী অবগত হইবে। ভিন্ন পরিবারের কন্ডাদের একত্র রাখিতে হইলে কি কোশলে রাখিতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দিন কয়েক পরিশ্রম করিয়াই বুঝিলে, যে এই কাজটি সম্মারূপে সম্পন্ন করিবার জন্য হৃদয়মনের আরও বিকাশ ও চরিত্রের আরও বিশেষ সাধন প্রয়োজন। তাই স্থির করিলে, কিছু কালের জন্য লন্ডো নগরীস্থিত Miss Thoburnএর প্রতিষ্ঠিত Women's Collegeএ বাইবে এবং সেখানে ছাত্রীরূপে শাসনাবধীন থাকিয়া কন্ডাদের কিরূপে চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা করিবে; আর যদি সম্ভব হয়, কিছু ইংরাজীও পাঠ করিবে।

কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা একজন বয়স্ক সন্তানবতী গৃহিণীর পক্ষে সহজ নয়। তুমি স্বামীর পরম সন্তান, পাঁচ সন্তানের মাতা, অনেক দাস-দাসীর উপরে কর্তা। তোমাকে এ সকল ছাড়িয়া অপরের কন্ডার শিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়মাবধীন হইয়া চলিতে হইবে; সেখানে স্বদেশবাসী অপর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে থাকিতে পাইবে না, হয়তো ব্রাহ্মসমাজেও যাইতে পাইবে না; এ সকল জানিয়া স্তনিয়াও উন্মাদিনীর মত দূরদেশে চলিলে। বাইবার সঙ্কল্প করিবার সময় তোমার গৃহের তত্তাবধান কে করিবে, সেজন্য তোমার আশঙ্কা হইল না। কোথা হইতে এত খরচ আসিবে, তাহারও ভাবনা করিলে না। গৃহে দ্বিতীয় এমন কোনও বয়স্ক নারী ছিলেন না, যিনি তোমার অল্পপঙ্খিত সন্তানদিগের আহ্বারাদির তত্তাবধান করিতে পারেন। মাসিক আয়ে তখনই বৃদ্ধল ভাবে ব্যয় নির্বাহ হইত না, তোমাকে বিদেশে সভ্য মেমসিগের মধ্যে থাকিতে হইলে কত খরচ হইবে, ও সে খরচ কোথা হইতে আসিবে, তার জন্যও একটুমাত্র চিন্তিত হইলে না। কোনও বাধা তোমার বাধা দিতে পারিল না। তোমার এ যাত্রার প্রস্তাব স্তনিয়া কেহ হাসিলেন, কেহ আশ্চর্য হইলেন। বাহারা জানিছেন তোমার উদ্দেশ্য কি, তাঁহারা সম্পূর্ণ সহায়ত্ব দিতে দেখাইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সহায়ত্ব দিবার দ্বারা এবং কার্যতঃ তোমার এই সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ বিশ্রিত জীবনে যে তুমি নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতে, যে তুমি কি রাজধানীতে, কি গ্রামে, কি কার্যক্ষেত্রে, কি উৎসবে, নিরন্তর আমার ছায়ার মত সঙ্গে ছিলে, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিতে না, সেই তুমি আজ কত দিনের জন্য কত দূরদেশে চলিলে। বনের পাখী অনেক দিন পোষা পাখী হইলে সে কত প্রিয় হয়। তুমি পরের মেয়ে আমাদের ঘরে আসিয়া আপনার গুণে সকলকে মোহিত করিয়াছিলে। তোমাকে দূরদেশে পাঠান আমার পক্ষে কত কঠিন ছিল, তাহা তুমি জানিতে। কিন্তু এখন তুমি আর তধু আমার নও। আমার জন্য তোমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলাম না; উড়িষ্যা দিয়া, উড়িতে দিয়া আক্ষেপ করিলাম না; উড়িতে গিয়া তুমিও আক্ষেপ করিলে না। যে,

এই কি আমরা সেই হৃদয়, বাহারা বিহার লইতে হইলে পূর্বে নিরাশাস হইয়া ক্রন্দন করিতাম? এবার কজ্জল কোথার গেল? এককথাপাতেই ইহাও সম্ভব হইল। হাসিমুখে আমরা বিহার লইলাম।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮১১ তুমি লক্ষ্যে যাত্রা করিলে। সে দিন প্রাতঃকালে খুব ভাল উপাসনা হইল; প্রায় দামোদের নূতন একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। আমি আরা পৃথক্ তোমাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে তোমাদের দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সেখানে হইতে বিদায় লইলাম। প্রভের ভাই অমৃতলাল বর মহাশয় তোমাদের সঙ্গে লইয়া লক্ষ্যে পৃথক্ যাইবেন; এই স্থির ছিল। সকলে তোমার প্রশংসা করিলেন। আমি কি করিলাম তাহা অবশ্যই তোমার মনে আছে; তোমার মস্তকে চুষন করিলাম। পিতা যেমন অবাধে সকলের সম্মুখে কস্তার মস্তক চুষন করেন, আমিও তেমনি করিলাম। সকলের সম্মুখে কুলবধূর মস্তক চুষন, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সকলেই বিমিত্র হইলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিতেন না। এই পবিত্র চুষনে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। এরূপ যে করিতে হইবে তাহা পূর্বে ভাবি নাই, করনাও করি নাই। যেমন মনে হইল, তোমাকে ইঙ্গিত করিলাম, তুমিও মাথা বাড়াইয়া দিলে, আমি পবিত্র চুষনে স্তম্ভী হইলাম। আর দুইবার সকলের সম্মুখে চুষন করিয়াছি। যখন দেহভাগ করিলে, তখন একবার মস্তক চুষন করিলাম, আর শেষ শয্যা গল্গাতীরে অগ্নি দিবার পূর্বে ললাট চুষন করিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তোমার চক্ষেও জল আসে নাই, আমিও আক্ষেপ করি নাই। তোমাদের গাড়ী হ হ করিয়া চলিয়া গেল, আমরা ঘরে ফিরিলাম। তোমার অচুপস্থিতিতে ভাই বটীদাস তোমার বালিকাবিভাগের ভার লইলেন। গোট খগোলে উঠিয়া গেল।

### বিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যে কলেজে দৈনিক জীবন

লক্ষ্যে কলেজে যখন তুমি উপস্থিত হইলে, তখন গ্রীষ্মকাল। সকালে স্কুল হইত। প্রাতঃকালের কিছু পূর্বে ছুটি পাইতে। আহাৰাদি বোডিং-এর ভূতেরা প্রস্তুত করিত। সকল মেয়েরা একত্র আহাৰ করিতে বসিত। বাসন তোমাদিগকেই মাজিতে হইত। আলো আলিবার তেল প্রত্যেককেই ক্রয় করিতে হইত। রান্নার জন্য গরম জল চাহিলে তার জন্য হুঁপস অতিরিক্ত দিতে হইত। তুমি নিজের ঘরে আগুনের বাল্যবস্ত্র করিয়া জল বসাইয়া রাখিয়া অল্প কাছ করিতে বাইতে। গরম হইলে তাহা রান্নার জন্য ব্যবহার করিত। সেখানে তোমার দৈনিক কাছ এইরূপ ছিল,—৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত উপাসনা। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে খাওয়া, রক্ত পরিধান ও ঘর পরিষ্কার করা। ৬টা হইতে ১০টা পর্যন্ত স্কুল। ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে রান্না, আহাৰ ও বিশ্রাম। ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত পাঠ। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে আহাৰ। ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত নানপাঠ ও গান। ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত পাঠ। ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে গাল ও শরন।

মিস খোবর্ষ তোমাকে অন্ত্যস্ত ছাত্রীয় মতন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। তুমি কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নিয়মের অধীন হইয়াই চলিতে। তোমার সঙ্গে লিঙ্কটী তাঁহার অভিশয় বন্ধ হইল। তিনি তোমাকে ছাত্রীয় মতন না দেখিয়া আপনায় ভগিনীর মতন দেখিতে লাগিলেন। তোমার পার্শ্বে আসিয়া একাসনে বসিতেন। যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, মিসেস রায় এ সকল নিয়মের অধীন নহেন, ততই তুমি নির্ভারিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে লাগিলে। ইহাতে তোমারও উপকার হইতে লাগিল। তুমি বাল্যাবস্থা হইতে কোনও কাজ যখনও নিয়মাবধীন হইয়া কর নাই, কেহ নিয়মের কথা বলেও নাই, এ বিভাগে সকলই নিয়ম। নিয়ম যদি পালন করিতে না শিখিতে তাহা হইলে সেখানে হয়তো অত দীর্ঘকাল থাকিতেই পারিতেন না; জীবনের মহাপ্রভের জন্য বাহা শিখিয়া আসিয়াছিল, তাহা আর শিবিবার অবকাশ হইত না। তোমার পরিবারের কস্তারও নিয়ম পালনে সক্ষম হইত না। এই বিষয়ে লক্ষ্যে হইতে পরে তুমি লিখিয়াছিলে, “বাধ্যতা যে কি, বাল্যকালে তাহা কেহ শেখায় নাই। গোপনে সেই ভক্ত নিজেই বস্তু পাইয়াছি। বাধ্যতাতে যে এত স্বর্থ, তাহা জানিতাম না। মনে হইত, বাধ্য হইয়া চলিতে হইলে কেবল দুঃখসাগরে ডাসিতে হইবে। এখন দেখিতেছি সে আমার কুল। এই এক নূতন জিনিষ দেখিতেছি, বাহ্যকে তিন্ত বসিয়াছিলাম, সেই হইল মিষ্ট, আর বাহ্যকে মিষ্ট বসিয়াছিলাম, এখন তাহাকে তিন্ত বসিয়া পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।”

তুমি সেখানে গিয়াই এমন উৎসাহের সহিত নিজের কাজে নিযুক্ত হইলে এবং সেই উৎসাহে ও উন্নত আকাজকতা তোমার পত্রগুলি এমন পূর্ণ থাকিত, যে তোমার পত্র পড়া আমার ও আমার বন্ধুদের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইল। প্রথম প্রথম আমাদের ভয় হইয়াছিল যে খুঁদাদের মধ্যে থাকিয়া তোমার নিজ ধর্ম সাধন করিতে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার যোগদান করিতে, কিছু বাধা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তোমার পত্রে সে ভয় দূর হইল। শনিবারে লক্ষ্যে পৌছিয়াছিল; রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্বয়ং উদারহৃদয়া মিস খোবর্ষ তোমাদের সমাজে যাইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। তুমি তোমাদের ঘরের এক পার্শ্বে শালু দিয়া একটি ছোট দেবালয় করিয়া লইয়াছিলে। লাল রঙের আশ্চর্য্য একটু ঘর দেখিয়া মিস খোবর্ষ বিজ্ঞাসা করিলেন, “উহা কি?” তুমি বলিলে “Prayer room।” সেম সাহেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সকল মেয়েদের বলিয়া দিলেন, “মিসেস রায় যখন prayer করিবেন, কেহ বেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।”

উৎসাহের সহিত তুমি পড়িতে লাগিলে। হিন্দী ও ইংরাজী শিখিতে লাগিলে। প্রতিদিন স্কুলের ও বাড়ীর পাঠে প্রায় ১৪ বলা অতিবাহিত করিতে। এ আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল। এই পাঠের চাপে তোমার চিরশত্রু নিদ্রা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তুমি বেন নূতন বোবন ফিরিয়া পাইলে। ভাই বস্তু বসিয়াছিলেন, “এ বয়সে বিভাগের বিভাগিষ্কার চেষ্টা করিয়া লাভ কি?” আরও অনেকে এরূপ বলিতেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গেই জল্প করিয়া দিলে।

জ্ঞান যে তুমি আমা অপেক্ষা খাট ছিলে, তাহা আমার ভাল



লাগিত না। আমি অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে ও জগৎকে দেখাইতে সাধ হইত। অন্ততঃ সমান সমান শ্রেণীতে দেখিতে ইচ্ছা ছিল। সে সাধ পূর্ণ মাত্রায় মিটে নাই, তাই ভগবান যখন তোমার শিক্ষার ভার লইলেন। আমার সুখের সীমা রহিল না। সকলে পূর্বে মনে করিতেন, যে আমিই বৃষ্টি তোমাকে লইয়া বাইতেছি, এখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তোমার নিজের বাইবার শক্তি আছে। বিলক্ষণ শক্তি আছে। এ তোমার প্রশংসা নয়, মায়ের প্রশংসা বাড়িল। তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হইল।

এপ্রিল মাসের মধ্যেই তোমার একখানি ইংরাজী পুস্তক শেষ হইল। এই সময়ে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার শিরোনাম ইংরাজীতে লিখিলে। মার্চ মাসে একজন ইংরেজ ও তাঁহার পত্নী তোমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তুমি নির্ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলে; করিয়া তোমার নিজের খুব আনন্দ হইল।

মিসু ধোবর্ণ বলিলেন, তোমাকে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া খেলিতে হইবে। তুমি প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলে। শেষে বুঝিলে শরীরের জন্য ইহাও প্রয়োজন। তিনিও তোমার মত মাথায় কামাল বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে খেলিতেন। এইরূপে তুমি খেলাও শিখিলে। করিয়া আসিলে তোমার পরিবারের বালিকাদের সঙ্গে এমন উৎসাহে খেলিতে যে, তাহারা তোমাকে আপনাদের একজন মনে করিত এবং প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

দূরে না নিকটে?

১৮১১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে তুমি লিখিলে “এ জগৎ একটি প্রকাণ্ড বাঙ্গালা; তাহার এক কামরায় তুমি, অল্প কামরায় আমি।” কোথায় দূরতা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিবে, তাহা না করিয়া এত নৈকট্য অনুভব করিবে কীভাবে? যদি এই নৈকট্য প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বিচ্ছেদের কষ্ট শূন্য হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। লক্ষ্য গিয়া এই লাভ হইল, যে মৃত্যু তোমার পক্ষে সম্ভব হইল, পরকালে বিশ্বাস সহজ হইল।

অনেক সময় আমি প্রার্থনার বলিতাম, যে আমি একটি আশ্চর্য্যকে ফিরাইতে পারিলাম না! তাই তুমি একদিন তোমার পত্রে সাক্ষ্য দিলে, “দুঃখ করিও না, অন্ততঃ একজনকে মায়ের ঘরে পৌঁছে দিলে।” এ কি কম কথা! ত্রীর মত সাক্ষ্য আর নাই। তুমি যে এ সকল কথা দূর দেশ হইতে লিখিবে, তাহা জানিতাম না। তুমি যে একদূর গিয়া মনের শক্তি রক্ষা করিতে পারিবে, আমার নিজের দৃষ্টিও অল্প এক ভাইয়ের একটি কন্ডার তার গ্রহণ করিয়া সমাহিত চিত্তে নয় মাস কাল অতিবাহিত করিতে পারিবে, তাহা পূর্বে কেহ মনেও করে নাই। নিশ্চয়ই শাস্ত্রের আলয় যিনি তাঁহাকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

আর এক পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, তুমি যেন পরলোকে গিয়াছ, সেখানে গিয়া আমাদের ব্যবহার দেখিতেছ, দেখিয়া বুঝিতেছ যে আমি নির্দল ব্রহ্মচর্য্য লইয়া থাকিতে পারি; আর তোমার সন্ধানের দ্বার কবিত্তে পারি। লক্ষ্য থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিয়াছিলে,

একেবারে চিরকালের মত গেছে অজ্ঞান হইলেও আমাদের যোগ কাটিয়া বাইবে না, বয়ঃ বাড়িবে। বাহা তুমি ভাবিতে, আমিও তাহাই ভাবিতাম। তোমার পত্র পাঠ করিয়া—বাবু বলিলেন, ইহাতে তাঁহার অর্থে বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে। কুড়ি বৎসর হইল তাঁহার জীবন পরলোক হইয়াছে। পরলোকের বিষয় তখনও তাঁহার নিকট অন্ধকার। তোমাতে আমাতে যে ব্যবহার হইতেছিল তাহাতে তাঁহার পরলোকগতা দ্বীপ সঙ্গে সন্ধ পরিহার হইতেছিল। আহা কত ভাল কথা! বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ হইতে পারে, যে, একজনের মৃত দ্বীপে নিকটবর্তী করিয়া দিলে।

এই সময়ে একদিন তোমার মনে কি এক ভাব হইল, তুমি আমার জন্মতিথি করিতে চাহিলে। আমি বলিলাম, “একাত্তরে কিছু নই, তুমি আমি যুক্ত হইলে তবে ত জীবনের মূল্য বুঝা যায়। যে দিন আমাদের আশ্বার বিবাহ হইল, সেইদিন আমাদের দুজনার ষষ্ঠাংশ জন্মতিথি।” তখন হইতে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের তারিখকেই জন্মতিথি বলিয়া স্বীকার করিলে ও করিলাম। যত দিন গেছে ছিলে, তত দিন ঐ তারিখে খুব উৎসব করিতে।

আর একদিন তুমি লিখিলে, “নৈশ, মনে হইতেছিল আরও খাটী বিশ্বাসী না হইলে জগৎ আমাদের বিশ্বাস করিবে না। হাড়ের পরমাণু সকল যেন এখনও সেই খাটী সত্য বলিতে পারেন না। কবে আমার হাড় বলিবে, ‘সত্যম্ সত্যম্?’” যে দিন তাই হইবে, জগৎকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জননি, সেই দিন আনিয়া দাও, এই প্রার্থনা আজ ছিল। মায়ের কার্যের জন্ত\* যে কাহারও নিকট টান্ধিকা কর নাই, তুমিয়া স্তম্ভী হইলাম। কিন্তু ইচ্ছাও করে, মায়ের সেবার জন্ত ভাই যেন সকলেই ধন মন প্রাণ দান করেন। আহা, কবে আমি তোমার হইতে পারিব? এখনও, প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। সত্যই বলিয়াছ, এবার যেন দূর নিকট হইয়াছে; এ যদি না হইত, বিশেষ কষ্ট হইত। আর তো দূর নাই! প্রতিদিন ৪ টায় সময় যখন নাম জপ করি, আশ্চর্য্য লীলা দেখি; তোমার নিকটে বসে সত্যই যেন নাম করিতেছি। মনে হয় না যে, তুমি দূরে। এইরূপে যখনই তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, তখনই মার কোলে দেখিতে পাই। পূর্বে দেখিতে ইচ্ছা হইলে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হইত, তার চেয়ে এখন কিছু কম বুঝিতে পারি না। বড়ই সুখ হয়। আমার বড়ই ভাবনা হইত, তুমি আগে যদি চলে যাও, আমি কি ‘করে থাকিব?’ হা বুঝি আমার সেই কাতর ভাব লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবিত থাকিতেই দূরকে নিকট করিয়া দিলেন। আর কখনও যে তোমা হতে আমাকে দূরে থাকিতে হইবে না, এই যখন ভাবি কত যে সুখ হয়, অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। কঠিন সাধনের সমস্ত কষ্ট তখন সুখে পরিণত হয়। তুমি জান, তোমা হইতে দূরে থাকিবার কথা হইলেই কত কষ্ট হইত। তা বেশ হইয়াছে, আমার সাধ মিটিয়াছে। আর এখন কথার নয়, এখন কার্যে পরিণত হইল। আর দুঃখ নাই, আর আমাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব। এ বড়ই সুখের সন্বাদ। যদি



একজন লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলাম,—সে জন কে? জানী ধার্মিক পুরুষ, আর আমি ক্ষুদ্র একটি প্রাণী,—তবে তাহা অপেক্ষা আমার আর স্তূথ কি হইতে পারে? এর চেয়ে সংসারে আর ভাল জিনিষ তুমি কি দিতে পারিতে? এখন ভাবি আমি বড়ই চতুর। যদি সংসারের স্তূথ তোমার নিকট চাহিতাম, এ অমূল্য চিরযোগ্য পাইতাম না। মার কৃপা ভাবিলে, প্রকাশ, আমার প্রাণ আর স্থির থাকে না, ঢেঁকে জল আর ধরে না। কেন তিনি এত ভালবাসেন জিজ্ঞাসা করিলে হাসেন, উত্তর দেন না; তারপরে বলেন, 'হইয়াছে কি? আরও বাসিব'। প্রকাশ! আমাদের একি হইল? লোকে যে পাগল বলিবে! আমিও সর্বদা ব্যস্ত, বাহাতে আমার অমনোযোগে মার কার্য বন্ধ না হয়।"

আর একদিনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "তোমার ঘোরী প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পিছুপাও হইবে না। তোমার ঘোরী কিছু জানে না। প্রকাশ! তুমি বাচা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু যেন ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা বিবাহিত হইয়া\* একটি হইয়াছি। আর কি এমন কোন কাজ মা সেবেন বা আমরা পারিব না? না পারি করিতে করিতে তো বাঁচতে পারিব? মা! তো আমাদের এমন কঠিন মা নন, যে যা না পারিব তাই সেবেন। তিনি জানেন যে, আমরা কতদূর পারিব। যদি আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করািতে ইচ্ছা হয়, অবগত পারিব। প্রকাশ! তোমার ঘোরীর সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার ঘোরী তোমার মার কার্য যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতে পারে, আজ এই আশীর্বাদ কর। তোমার শাশু পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন, যখন ভাবি, তখন যে কি স্তূথ পাই, তোমাকে কি বলিব। আর বলিতে ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা হয়, বা আমি ভাবি, সকলই তুমি ব্যথিয়া লও। বলিতে অনেক সময় লাগে। বড়ই নিকট হইতেছি ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই? তোমার সহিত কথা বলিয়া বড়ই আরাম পাই; উঠিতে ইচ্ছা করে না। যখন আমি বাটা বাবই তুমি আমার সঙ্গে খুব অনেকক্ষণ কথা বলিও। কেমন? চিরদিনই আমরা এইরূপে কথা বলিব, কেমন? তোমার ঐ কথাটি বড় ভাল লাগিল, যে এত দূরে, তবুও আমি যেন তোমার মন হৃদয় খাইতে বারণ করিতেছি, আর তুমি তাহা তুলিলে। অনন্তকাল এইরূপ পরস্পরকে বারণ করিব, আর উভয়ের কথামত উভয়ে চলিব। দেখ দেখি কি স্তূথ! আমরা কি ঠিকিয়াছি? না! এ স্তূথ যে অমূল্য। মা শেষ জীবনে বড়ই সুখী করিলেন। আমরা এখন প্রাণ দিয়া বাহাতে মার সেবা করিয়া, মার নাম জয়মুক্ত করিয়া মাকে স্তূথী করিতে পারি তাই করি।"

তুমি ওরা জুনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "আমি যে কি লিখিব, তাহা ভাবি না। যেমন উপাসনার সময় বা মনে আসে তাই বলি, তেমনি তোমার পত্র লিখিবার সময় বা মনে আসে তাহাই লিখি।"

\* আধ্যাত্মিক বিবাহ অঙ্কুরানের পর।

তোমার কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমি এই সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্যে হইতে কিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে কি?" তুমি বলিলে, "না আমার এখন বাটা বাইবার ইচ্ছা হয় নাই, কারণ আমি যে কার্য করিতে আসিয়াছি তাহার এখন বিলম্ব আছে। কেবল তো দু'খানি কেতাব পড়িতেছি।"

১৩ই জুন লিখিয়াছি, "এখন রাত্রি ১০টা। দানাপুরের সেই নদীর ধারের বারান্দায় আমার মন চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে যে তোমরা উপাসনা করিতেছ।"

আর একদিন লিখিলে, "উপাসনার সময় সেই ঘরখানি, আর সেই লোকগুলি যেন আমার চারিদিকে থাকেন। আমি যেন ঠিক তোমার বামদিকে বসিয়া উপাসনা করি। ভাগ্যে উপাসনা শিখাইলে, নইলে আজকের দিনে কি অবস্থা হইত বল দেখি? উপাসনার পর মনে হইতেছিল, এইরূপে উপাসনা শিক্ষা দেওয়া সকল স্বামীর উচিত।" এই উপাসনার গুণে দূর নিকট হইল, শুধু তাই নয়, সংবাদ না পাইলেও ব্যস্ততা চলিয়া গিয়াছিল। ৬ই, ৭ই আগষ্টের পত্র তুমি চাই পাইলে, এবং লিখিলে, "পত্র না পাইলেও মার নিকট সংবাদ পাই, স্তূথের আমার মন কেমন করে না। হয়তো তুমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পার না যে, আমি এ কি বলিতেছি। আমিও যখন নিজের অবস্থার কথা ভাবি, নিজেই আশ্চর্য হই। তোমার কোন দোষ নাই। মা মধ্যে মধ্যে আমাকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া এইরূপ করেন। আমিও এখন সেখানে হইয়াছি, পত্র না পাইলে আর ব্যস্ত হই না। এমন কি আজ পাঁচ মাসের মধ্যে কোন দিনও মেমকে জিজ্ঞাসাও করি নাই আমার পত্র আসিয়াছে কি না? অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তোমার আশীর্বাদে ও মার কৃপায় সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত হইতে দি না। পূর্বে দুইদিন পত্র না পাইলে আহা! নিজা ত্যাগ করিয়া তার দিয়াছি; আর আজ এ কি পবিত্রন!"

পূর্বে দোষ করিলে আমার মুখ ভারি দেখিতে, দেখিয়া তোমার মন অস্থির হইত। এখন আবার মা মুখ ভার করিয়ে লাগিলেন। একটি বেশী কথা বলিলে অমনি প্রথর দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকাইতেন। তোমার ভালই হইল; এখান দিকে মা, আজ দিকে ছেলে, দানখানে তুমি। একদিন সময়ে গিয়া—সবকে অনেকক্ষণ কথা করিয়াছিলে। যতগুলি কথা বলা হইল তাহা না বলিলেও হইত, কিন্তু পূর্বে অভ্যাসে পরিচালিত হইয়া অনেক কথা বলিলে। তখন মা কিছু বলিলেন না; ক্রটিতে আসিয়া শয়ন করিলে, কিন্তু কোন মধ্যে আরাম নাই। জিজ্ঞাসা করিলে "কি হইয়াছে?" মা ভারী বলিলেন, "তোমাকে বলিয়াছি, ওজন করিয়া কথা বলি কেন বেওজনে কথা বলিলে?" তৎপর দিবস প্রার্থনা করিলে, অনাবস্তক কথা বলিব না।

### ষাণ্মাস পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যে কলেজে প্রথম ছয় মাস

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে তুমি লক্ষ্যে গিয়াছিলে। যে :  
আম্বের ভাই অনন্তলাল বসু মহাশয় তোমাদের দেখিতে বাম ও  
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এত

আশাতীত কল লাভ করিয়াছে, কিন্তু শরীর বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। অল্পসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে আমি সেপ্টেম্বর মাসে বাইতে চাছিলাম। তুমি একেবারে নবম্বর মাসে (তোমার কিরবার সময়) বাইতে বলিলে। তোমার কথাই থাকিল। আমার আর বাওয়া হইল না। তোমার তপস্যা চলিতে লাগিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সকলেই দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল, আমার তপস্বিনী লক্ষ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মে মাস শেষ হইল, আর বাকিপুরের উৎসবও শেষ হইল। তুমি দুই হইতে সে উপাসনা সম্বোধন করিলে। তোমার উপাসনা সম্বোধনের কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। ইহারও তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসব ও সেবা করিলেন। ইহারও অনুভব করিলেন যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে এক বাসকেট লিচি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি লিখিলে, "লিচি সন্ধ্যার সময় আসিল; খুলিয়া দেখি, লিচি ও পাতা, যেন এখন পাড়া হইয়াছে। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ও তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া ফুলের দলগুলি মেঝে ও টায়ার, দাস-দাসী আছেন, সকলকেই একটি হইতে ২টি, ৪টি, ৬টি করিয়া দিয়াছি। সকলেই বড়ই সুখী হইয়া ধন্যবাদ দিলেন। বড় ভাল মিষ্টি লিচি। যেম দেখিয়া যে কি সুখী হইলেন বলিতে পারি না। পাতা দেখিয়া বলিলেন, 'এই কি ইহার পাতা? ইহার গাছ কত বড় হয়?' আমি একটি গাছ দেখাইয়া বলিলাম 'এক বড়।' আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন 'এমন লাল ও সুন্দর লিচি যখন হয় না। তোমার বড় রাখিয়াছ?' আমি বলিলাম 'হ্যাঁ'। লিচি উপাসনার সময় উৎসর্গ করিয়া তোমার দান বলিয়া আমরা জেনে দুইটি খাইলাম; বড়ই মিষ্টি।' এই সময়ে তোমার জ্ঞানের আহারের কষ্ট হইত, তোমার তো কথাই নাই। কিন্তু তোমার মন অবিকলিত থাকিত। ১৬ই জুন নূতন জাম্র পাওয়া আমাদের সময় উৎসর্গ করিলে, মেয়েরা খাইল। কিন্তু আমি দুই দিয়া তোমার কোনও ভাল বস্তু গ্রহণে রুচি হইত না, তাই জাম্র খাইলেন না।

জুলাই মাসে-অতিশয় গ্রীষ্ম বশত: ও বৃষ্টির অভাবে সকলের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। মুহু মুহু হাসিয়া বিভ্রান্তির কব্জী বলিলেন, 'মিসেস মায় সমুখে 'বড় গরম পড়িয়াছে, বাপু, রে বাপ, জল হয় না কেন' সকল কথা বিবারণ যো নাই।' অভিযোগ করা তুমি ভালবাসিতে তাই এমন বিচারতী মিসু খোবর্ণও তোমাকে শুনাইয়া অভিযোগ রূপে সঙ্কচিত হইতেন।

কল্যাণ ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় তুমি প্রার্থনা করিতে। সেখানকার সন্ন্যাসান করিতেন। ১৩ই জুলাই সোমবার ডায়রিতে লিখিয়াছ 'কাল ভুবন বাবুর বাটতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার ১০/০ আনা সন্ধ্যার ৬টা আর কিনিতে বলিলেন। আমি স্বীকার লাম এবং আম কিনিয়া সমাজে গেলাম, মূল্য কিরে বিবারণ দিবার পক্ষি। পথে বাইতে বাইতে এবং সমাজে উপাসনার সময় এক ব্যক্ত করিয়া তুলিল যে, কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারি না। অবশেষে বলিলাম, 'আচ্ছা আম লইব না', তখন আমাকে উপাসনা করিতে দিল।' কথের এক বিদ্যোৎপাদি অনেক তোমার উপাসনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

এক দিন মিসু খোবর্ণ একটি টা-পার্ট দিয়াছিলেন। তাহাতে তোমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহাঙ্গারদির পর মেয়েরা বলিল যে, টা-পার্টের কোনও খাচ-বস্তুতে গো-মাংস ছিল। অজ্ঞাতসারে একপ অনভ্যস্ত বস্তু আহাঙ্গার করিয়াছ জানিয়াও তুমি আপনাকে স্বপণ করিলে, ও বলিলে, 'তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

১ই আগষ্ট ১৮১১ সাল, বাকিপুরে সুরোধের একটু জটিল রকমের অর হয়। সেই রাতে তুমিও একপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলে; তবে পরিষ্কার বুদ্ধিতে পার নাই যে, কাহার অসুখ করিল। সেই দিনকার রাতে তোমার সর্বাঙ্গ দিলাম। তুমি ডায়রিতে লিখিলে, 'কাল সুরোধের অরের কথা শুনিয়া নির্ভর আরও বাড়িয়া গেল।' তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম, 'তুমিও প্রস্তুত রহিলে। ১০ই বৈকালে বাকিপুরের চিকিৎসকগণ টেলিগ্রাফ করিয়া তোমাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাতে উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি হইতে একবারে ১৭ ডিগ্রিতে ঠাড়াইল। ভাবনা হইল, কিন্তু ঐখ্য ধরিলাম। শেষ রাতে সুরোধের জ্ঞান হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম 'সুরোধ, তোমার কি মাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়? তাঁহাকে কি তার দিয়া আনাইব?' একটু হাসিয়া মাতার অল্পরূপ ধৈর্যের পরিচয় দিলেন; বলিলেন, 'না; অনেক ক্ষতি হইবে।' তোমার ১২ই আগষ্টের দৈনিকে তুমি লিখিয়া রাখিয়াছ, 'মা আমাকে আরও নিশ্চিন্ত কর; চিন্তা করিতে আমাকে একটুও সময় দিও না। এখন রাত্রি আটটা; সুরোধের অসুখের কথা মনে হইয়া একটু মন কেমন হইল।' এই 'একটু মন কেমন হইল' কথার মধ্যে যে কত বীর্য লুক্কায়িত আছে, তাহা যে তোমাকে জানিত, সেই বুদ্ধিতে পারিত। সত্যজিনী যখন যুযু, তখনও তোমার বীর্যের পরিচয় দিয়াছিলে, এবারও দিলে। তুমি যে কীদান্তে জান, তাহা কেহ বুদ্ধিতে পারিত না। মনের ভিতর যে ভয়ানক তোলপাড় হইতেছিল, তাহা তোমার ১৩ই আগষ্টের দৈনিক পড়িলে বুদ্ধিতে পারা যায়।—'মা, তোমাতে আমাকে জীবিত রাখ, নইলে এ পরীক্ষায় কেমনে উত্তীর্ণ হইব? দিন দিন যে পরীক্ষা বন করিতেছে। কৃপা করিয়া মনে বল দান কর।' এমন পরীক্ষার মধ্যেও আমাকে সাবধান করিতে তুলিলেন না। বলিলে, 'এ সময় লোকে কর্তব্য তুলিয়া যায়, তুমি যেন তুলিও না।' ডাক্তার বাবুয়া বলিলেন, 'মায়ের মতন কেহই বস্তু করিতে পারে না, মাকে আনাও।' তুমি ১৪ই দৈনিকে লিখিলে, 'মা, তোমার মত বড় আর কেহই তো করিতে পারে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই বস্তু দেখাও।—সুরোধের অসুখের সর্বাঙ্গে মার কোলে লুকাইলাম; বড়ই আশায়।—১১টার ফুলে সুরোধের অসুখ সর্বাঙ্গ পাইলাম। বাটা আসিয়া আহাঙ্গারের পূর্বে আবার উপাসনা করিলাম। মাও হাসিয়া কুটু কুটু, আমিও খুব হাসিলাম।' তৎপর পরদিনে শুনিলাম সুরোধের অসুখ বাড়িয়াছে, মনটা কিছু চক্কল হইল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে খাটা বিধান করিয়া আসিল। মামুঘ মাদ্রেই এইরূপে পরীক্ষিত হয়। তাহা না হইলে নরজ্যেষ্ঠ আশ্রয় সন্ধান কেন বলিবেন 'শিতা, শিতা, আমাকে ছাড়িলে কেন?' শিতা যে শুষ্ক নিজের মুখ মাঝে মাঝে লুকাইয়া কেমনে তাহা নয়; জীবের মঙ্গল হইবে বলিয়া আত্মীয়-বন্ধনদ্বিপকেও মাঝে মাঝে লুক্কায়িত করেন। সুরোধের অসুখ সর্বাঙ্গ পাইলে ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবারে; বুধবারে মিস খোবর্ণ পাহাড়ে চলিয়া

গেলেন। তিনিই সেখানে মানুষের মধ্যে তোমার একমাত্র আশ্রয়, বন্ধু ও নির্ভর্যের স্থান ছিলেন। তুমি বলিলে, “মেয়ের উপর একটু নির্ভর করিয়াছিলাম, তাই মা আর সইতে পারিলেন না, সরাইয়া লইলেন বেশ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”

কয়েক দিন পরে আমার পেটের অন্ত্র হইয়াছিল; সবাদ শুনিয়া তুমি বলিলে, “মা এ কি রকম বার বার?” মা বলিলেন “আমি আছি, ভয় কি? ভাবনা কি? তুমি আপনার কাজ করিয়া যাও।” তুমি অমনি ভাল মেয়ের মত তথাক্ত বলিয়া পড়িতে বসিলে; আর একটি বারও ভাবনা আসিল না।

প্রবোধের পত্নী থাকিলে তোমার অল্পপছন্দিতো তোমার সম্ভানদিগের ভার লইয়াছিলেন। তিনিও এ সময়ে দারুণ ক্ষয়কালে শয্যাশায়ী হইলেন; তোমার মনে ভাবনা হইল, কিন্তু “শির দিয়া তো বোনা ক্যা?” এই বলিয়া ধৈর্যধারণ করিলে। দিন কয়, কাজ বেশী, শিখিতে হইবে অনেক, মা তাই আর অবকাশ দিলেন না। তুমিও তোমার কর্তব্য তুলিলে না।

২৮শ আগষ্ট বর্ষাকাল, সেই বিশেষে তোমার পেটের অন্ত্র হইল। অত্যন্ত বাতনা হইতে লাগিল, তবুও কর্তব্য তুলিলে না। বিভ্রান্তদের পাঠ দিয়া নিজ কক্ষে আসিলে। শয্যা লয়ন করিলে, আরাম হইল না, বেড়ান বেন ভাল বোধ হইতে লাগিল। একটু জল পান করিলে, তাহাতে আরাম হইয়াছে বোধ হইল, কিন্তু গেল না। তারপর উপবেশন করিলে। আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলে, ‘এখনই যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে দেহভাগ করিতে কি প্রস্তুত? কাহারও জন্ত কোন আসক্তি আছে কি না?’ মন বলিল, ‘কোনও আসক্তি নাই, এখনই প্রয়াণ করিতে প্রস্তুত। অমনি বেদনা কমিতে লাগিল, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সুস্থ বেন পলায়ন করিল। তার পরেই স্নান এবং শীতল বস্ত্রের উপাদান। তখন তোমার অবস্থা দেখিয়া বত মা হাসেন ততই তুমি হাসিলে। হাসির সঙ্গী আমি, আমাকেও হাসের অংশ দিলে; আমিও হাসিলাম। এমন দিন ছিল যখন আমি-সর্বত্র অথবা জ্বরেই কাতর হইয়া পড়িতেন। কত আবদার করিতেন; কাহারও দেবা ভাল লাগিত না; একটু সামান্য মাথা ধরিলে স্বামীর আরও ভিন্ন হন উঠিত না। আজ তাঁহার এ দশা কেন হইল, কেমনে হইল? সকলই ভগবৎকৃপা। আমি বাহার জন্ত কাঁদিয়াছি, তাহাই তুমি পাইলে। অনাসক্ত হইয়া পরম ধামে বাহিব্যর জন্ত প্রস্তুত হইলে।

মিস খোবর্গের পাছাড়ে ব্যস্তার পর নতুন একজন কতী নিযুক্ত হইলেন। তোমার ভয় হইয়াছিল, না জানি নতুন কতী কেমন ব্যবহার করিবেন। বাহার কৃপায় মিস খোবর্গ বন্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় নতুন কতীও তোমার পরম বন্ধু ও সহায় হইলেন। এমন কি, রবিবারে তুমি পত্র লিখিতে না, সে বিবরণও অনুসন্ধান করিলেন, এবং রবিবারেও পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি ক্রীতদাসপাশাল দেখিতে চাহিলে, অমনি অনুমতি দিলেন। শুধু তাহা নয়, মিস ডাক্তারকে পত্র লিখিলেন, বেন তোমার প্রতি যত্নের ক্রটি না হয়। ইনি তোমাকে এমন ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তোমাকে নিজের জীবনের কথা সব বলিতেন। একদিন খাবার ঘরে মেয়েদের একটি মিটিং হইয়াছিল। সকলের সম্মুখে তিনি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। তুমি

ডাক্তার, তিনি খুঁটান, মেয়েরাও অধিকাংশ খুঁটান, তবু তোমাকে এই অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, যে সকল মেয়েরা কিছু দোষ করেন, তাঁহাদের নিকট মিসেস রায় মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেন, এবং শিক্ষা দেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তুমি এই উচ্চ আদেশ গ্রহণ করিয়া অবাক হইলে। মায়ের লীলা অনুভব করিলে। মেয়েরা তোমাকে বড়ই আদর করিলেন। পরদিন প্রাতে কতী আবার বলিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে তুমি মেয়েদের ধর্মোপদেশ দিলে তাঁহাদের উপকার হইবে। তুমি বলিলে, তাঁহারা যেমন ছাত্রী, তুমিও তেমনি ছাত্রী, উপদেশ কি দিবে? তিনি বলিলেন, “না, মেয়েরা তোমার ভয় করে, এবং ভালবাসে। তুমি মধ্যে মধ্যে একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেও অনেক উপকার হইবে।” এই সময় তুমার যে শক্তির পূর্ণাভাস পাওয়া গেল, পরজীবনে তাহার আরও বিকাশ হইয়াছিল। অসীম কৌনও লোককে কিছু বলিতে হইলে এমনি করিয়া বলিতে, যে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিত না। আর একদিন ঐ কতী তোমার সঙ্গে খুঁটি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন ও স্বীকার করিলেন, ডাক্তার ও খুঁটান ধর্মে বিভ্রান্ততা অরহি।

## জ্যোতিষশাস্ত্র পরিচ্ছেদ

### পত্রত্যাগ

আমি দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ, যে পৃথিবীর ভালবাসা স্পৃহাশায়ী; শরীর না থাকিলে কিছুদিন পরে উড়িয়া যায়। তাই সজ্ঞ করিয়াছিলাম, শরীরের উপর ভালবাসার ভিত্তি স্থাপন করিব না। প্রথম বয়সে এ ভুল করিয়াছিলাম, তুমিও করিয়াছিলে; তাই চকুর আড়াল হইলেই চকুর জলে পথ দেখিতে পাইতাম, না, আবার নানা কাণ্ডের মধ্যে যে জল আর থাকিত না। এ অটালিকা পাক নয়। কোন দিন অল্প বড়ই পড়িয়া যাইতে পারে, তাই বেছাখুঁকি হজনে পরামর্শ করিয়া এই অটালিকা ভাঙিতে লাগিলাম। কপের আকর্ষণ ছাড়িলাম, পরশপরের প্রতি চরিত্র ও সদৃশের জন্ত যে আশ্রয় তাই শেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দেখিলাম শরীরের ভোগ থাকিলে গুণের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তাই শরীরের ভোগ ছাড়িতে হইল। তখনও স্পর্শ-সুখ রহিল। সে অবস্থায় প্রথম প্রথম মনে হইত এই তো স্বর্গে আছি। কিছুকাল পরেই বুঝিলাম এ স্পর্শ-সুখও বন্ধন। তখন কি প্রতিজ্ঞা করিলাম, তা তো জানই। যে প্রতিজ্ঞা বন্ধা করিতে তুমিও পারিলে, আমাকেও সাহায্য করিলে তোমার গুণ বুঝিলাম। তাবিল্যম এইবার যদি শরীরের মৃত্যু হয়, দর্শন-সুখ তখনও রহিল। রাত্রিতে কি দর্শনই হইয়াছিল, আপনার দ্বীকে সকলেই দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু বৈরাগ্য কালে দেখিতে পায়? মস্তক হ্রুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান দেখিয়া বসে দেবকন্ডা বলিয়া বধন ভ্রম হইতেছিল, তখন দর্শন-সুখের উচ্চ সীমা দেখিতেছিলাম! কিন্তু ইহাও শব্দ জমি নয়। এ দেশের মাটি বালি মিশ্রিত “বলবর” জমির মত, ইহাও ভিত্তি স্থাপনের অনুপযুক্ত। ঈশ্বর তাই দর্শন-সুখও আমাদের বঞ্চিত করিলেন। এখন তুমি আমি দূরে দূরে। চক্ষুর দর্শনও নাই, কণ্ঠের শুনি না। এ অবস্থা হইতে পরলোকের বৈশিষ্ট্য কি প্রভেদ? কিন্তু এখনও যে একটি

বাকি রহিয়াছে। পরলোকে গেলে কেহ কখনও তো পত্র লেখে না। আমাদের এষকৃত-পরলোকে এখনও তো পত্র লেখা চলিতেছে। দেখিলাম, অনেক দিন ধরিয়া কেবল পত্রাঙ্গিত্তেই শুধু সন্তোষ করিতেছি। পাগলের মত পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম। একবার, দুইবার, কতবারই পত্র পড়ি; কত কথাই লিখি, কত পরামর্শ দি, কত আশ্বাস বচন বলি, কত লোককে তোমার পত্রগুলি পড়িয়া শোনাই। এমন সময়ে একবার ডাকের গোলমালে পত্র পাইতে দেয়ী হইল। এইবার বুঝিলাম, এ ভূমিটাও ছাড়িতে হইবে। পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দেখিতে হইবে, পত্রের উপরে উঠিতে পারিয়াছি কি না। এত পারিয়াছি, ইহা কি পারিব না? জীবন দেবতার নিকট হইতে আবার ত্যাগের আহ্বান আসিল। আবার অযোর-প্রকাশ বলিলেন, “এক্সন্ত!” ১১শে সেপ্টেম্বর আমি পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে চিঠি লিখিলাম; তুমি ২০শে সে চিঠি পাইলে।

আমি যে সময়ে এইরূপ পত্র বন্ধ করিবার প্রেরণা মনে পাইয়াছিলাম, ও সে প্রেরণার অধীন হইতে সংগ্রাম করিতেছিলাম, সে সময়ে তোমার মনে কি ভাব চলিতেছিল, তাহা তোমার ঐ তারিখের লিপিত পত্রে জানা যায়। তুমি লিখিলে, “আজ তোমার পত্র এখনো পাই নাই। পাইব কি না জানি না। পাই বা না পাই, আমি তোমাকে এখনই দেখিতেছি। এমন স্রবিশা তো আর নাই। বড় ভাল পথে আমাকে আনিয়াছ। আমার বড়ই সাধ ছিল কি না, যে তোমা হইতে দূরে কোন দিন থাকিব না; মা আমার সে প্রার্থের প্রার্থনা বৃষ্টি শুনিয়াছিলেন; তাই তোমাকে এই স্থলর পথে বাইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন বেলা ৩টা। হয়তো তুমি রাজকর্মে ব্যস্ত। আমি সেই ব্যস্ততার পাশে বসিয়া তোমার সহিত কত কথা কহিতেছি, ও কত সুখী হইতেছি। মনে হইতেছে যে, তোমার মুখখানি ষায়ে লাল হইয়াছে। কেন এমন হইতেছে জানি না। আজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, দেখিব বলিয়া বসিয়াছি। এই যে তুমি, তুমি তো দূরে নও। পরলোকে গেলেও আমরা এইরূপে মার কোলে একে অজ্ঞকে দেখিব; সেই অভ্যাস মা পূর্বে হইতেই করিয়া দিতেছেন।”

এই পত্র লিখিবার পরই বৃষ্টি আমার মনের ব্যাকুলতা তোমার মনে গিয়া লাগিল। নতুবা সে দিনের দৈনিকে কেন লিখিলে,— “মা, আমার মন কেন এমন করিতেছে অযোর-প্রকাশের জন্ত? আমি জানি।” দেবি, আকুল হইবে, ইহা আশ্চর্য কি? হৃৎজনই আকুল হইতেছিলাম। হৃৎজনই মানুষ; হৃৎজনই দেবজীবন। এইবার জন্ত সংগ্রাম করিতেছিলাম; মানবস্থ বৃষ্টি দেবস্থ তোমার মনে আসে না। তাই আমি তোমার কাছে পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া, তারপর লিখিয়াছিলাম—“আমার তো বড় শক্ত বোধ হইতেছে। তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন কাজই তো পারি না; কথা তো তুমি জান। যদি কেহ বলে, এত মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এ কি কথা, তবে বলি, তোমার তো কিছু অভ্যাস নাই। সে সকল সংগ্রামে কত পরিমাণে তোমার সহায়তা হইয়াছিল। তাহা তুমি জান, আমি জানি, আর অন্তরীক্ষা জানেন। সম্মানী মঙ্গলবার ২২শে তারিখে আমি বেহার বাইব। পত্র লেখা দেখা তোমার হাতে রহিল।”

বখন আমি এই পত্রখানি লিখিতেছিলাম, তখনই হয়তো তোমারও মন আকুল হইতেছিল। ২০শে এই পত্র পাইয়া তোমার মনের ভাব কি হইয়াছিল, তাহা তোমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছ। ডায়েরীতে বাহা কিছু লিখিতে আমার সঙ্গে আলাপের আকারে লিখিতে। “বাটাতে আসিয়া তোমার ১১শে তারিখের পত্রখানি পাইলাম। পাঠ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া গেলাম। কেন এত চক্ষের জল, জানি না; বৃষ্টি আসক্তিতে টান পড়িল বলিয়া। পত্রের যে এত আসক্তি আছে তাহা জানিতাম না। কোনও রকমে অনেক বার পড়িলাম। পড়িতে বড় ভাল লাগিল। পরে স্নান করিতে গেলাম; আঙ্গুর স্নান বড় ভাল হইল। চক্ষের জলের সহিত স্নান করিলাম। বত বার আসক্তিতে বাধা লাগিয়াছে, তত বারই এইরূপ চক্ষের জলে স্নান করিতে হইয়াছে। আজও তাহা হইল। পরে আবার উপাসনার গেলাম, প্রার্থনা বড় ভাল হইল। চক্ষের যেন বড় দয়দ; সে খুব জল ঢালিতে লাগিল। উপাসনা হইতে উঠিয়া তোমাকে ডাকে পত্র লিখিলাম। কত চক্ষের জল যে পড়িল! অনেক সময় ঐ জলে লেখা নষ্ট করিল। সে কথা তোমাকে প্রাণে প্রাণে বলিলাম, কিন্তু লিখিলাম না; আমার চক্ষের জল দেখিলে পাছে তোমার ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়। পরে আহার করিলাম। আহারের পর আবার পত্র লিখিলাম। ৩টা পর্যন্ত লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় নাই বলিয়া পারিলাম না। আজ পত্রখানি যাওয়া চাই, নহিলে তুমি ষাণ্মসমে পাইবে না, বাহিরে চলিয়া যাইবে। ৩টার ১০ মিনিট আগে কুঠিতে গেলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, যেন অন্ধকারের পর আশার প্রদীপ হ্রদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। কুঠিতে গিয়া দেখি, কেহ কোথাও নাই। Hall room এ একাকী বসিয়া মার কোলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৩টা বাজিল, অমনি কর্ত্তী বাহিরে আসিলেন। পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া Mceting এ গেলাম। বাহা শুনিতে লাগিলাম সকলের ভিতরেই তোমাকে মনে হইতে লাগিল। সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত ৩ মিনিটের জন্তও তুমি আমার হ্রদয় হইতে দূরে থাক নাই। বাটা আসিয়া কিছু কাজ করিলাম ও পাঠ করিলাম। কিন্তু হ্রদয় কেমন উল্লাস হইয়া গিয়াছে। বার বার বলের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এইরূপে ৬টা বাজিল। আজ রবিবার, সমাজে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম; ৭টা বাজিতে চলিল, গাড়ী আসিল না। এই ৬ মাস ২০ দিনের মধ্যে আজ কেবল সমাজে যাইতে পারিলাম না। কি করিবে? এখানে আমি অধীন, নিজে কিছু করিবার বো নাই। চুপ করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিল, তাই খানিকক্ষণ বেড়াইয়া, যেমন ৭টা বাজিল, অমনি মেয়েদের ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরেই উপাসনায়া বসিলাম। কি মধুর যে উপাসনা হইল, বলিতে পারি না। বোধ হয় সকলেরই ভাল লাগিল। প্রার্থনা হইল,—মা, তুমি বাহা দিব তাহা যেন বহন করিতে পারি; কেবল এই ভিক্ষা চাই, অযোর-প্রকাশের হ্রদয় হইতে ঐ পাদপদ্ম এক মিনিটের জন্তও সরাইও না; তাহেই তোমার সন্তানের সাধ পূর্ণ হইবে। আশীর্বাদ কর, তোমার সন্তানের এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”

আমাকে ডাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহার কিয়দংশ এই—

“১১শের পত্রখানি পাঠ করিয়া যে কি মনে হইল তাহা আর বলিতে হইবে না। তোমারও যে দশা আমারও তাই। পত্র পাঠ করিয়া নাইতে গেলাম। প্রাণ ভরিয়া মার কাছে প্রার্থনা করিলাম, বলের জন্ত। প্রকাশ, আমি তোমার অপেক্ষা আরও দুর্বল, তা কি জান না? অথবা প্রকাশ কি পারিবে? কি জানি? ভয়ে যে প্রাণ কাঁপিতেছে—আশা আমার মা, আর আমার চিরসঙ্গী। আজ বিশেষ আশীর্বাদ কর। আর তো পত্র লিখলে না; না লিখিলে, তাতে কি? হৃদয়ের ভারে ধবধব পাইব। সেই তার আমার জন্ত আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিবে। ভয় কি প্রকাশ? এখন যে আমরা দু'য়ে এক; আমরা দু'টি এক হইয়াছি বলিয়া মা আমাদের এত কঠিন হইতে কঠিনতর পরীক্ষায় ফেলিতেছেন। কেমন, হুং নাই, কিন্তু ভয় যেন না পাই; ‘পারিব না’ যেন না বলি। কিসের ভয়? প্রাণের আলাপ তো কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না; যে ভাবে যেখানে থাকিব সেইখানেই আমরা একত্র থাকিব। পত্র ডাকঘরে দেয়ী করিত, এখন ভালই হইল, যখন তখন দুই জনে বসিয়া কত গল্প করিব, কত আলাপ করিব। ভোর ৪টা হইতে ৫টা দুই জনে বসিয়া নাম করিব। সমস্ত দিন নানান কাছের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া হুঁজুন হুঁজুনকে দেখিব আর কত সুখী হইব। আবার সন্ধ্যা ৬টার সময়ে হুঁজুনে মার কাছে বসিয়া মার কথা বলিব।”

পত্র লেখা বন্ধ হইল, তুমি আপনার মনের ভাব দৈনিক পুস্তকে

লিখিতে লাগিলে, আমিও আমার খাতায় লিখিতাম, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইত না। তুমি লিখিলে, “কত দিন তুমি পত্র লিখিবে না, তাহা আমাকে বলিও না। আমিও যে কত দিন লিখিব না তাহাও বলিব না; কিন্তু কোন বিষয় তিন্তরূপে করিতে তোমারও ইচ্ছা নয়, মারও ইচ্ছা নয়, যখন ইচ্ছা হইবে, মন সায় দিবে, বিবেক সায় দিবে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি পত্র লিখিতে পার, আমিও পারি। সে কবে, কখন, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। দেখ, মা এ আবার কি জীলা আরম্ভ করিলেন! বাই কখন, চরণ তো কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।”

এ সংগ্রামের মধ্যেও নিজের কর্তব্য তুলিলে না। ১১টার সময় বিভ্রাট হয় হইতে ফিরিলে; ঘরে আসিয়া আন্তর আলিলে, ঘর ঠিক করিলে; জল গরম হইলে স্নান করিলে। যোগযুক্ত স্নান হইল। সমস্ত কাজ-কর্ম-পাঠ সকলের ভিতর এ দাস মিশিয়া গেল। সর্বদাই যেন তোমার চক্ষের উপর রহিল। স্নানের পর আমার জন্তও প্রার্থনা করিলে। দিলদরদী কি না, তাই আমার দরদ বাহাতে বার পিতার নিকট সে জন্ত নিবেদন করিলে। যখন উপাসনা করিতে ছিলে, দিব্য চক্ষে আমাকেও উপাসনা করিতে দেখিলে। হুঁজনার চক্ষের জল এক হইয়া মায়ের পদ ধৌত করিল। মা যে দিন স্পর্শ-সুখ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সে দিনও ঐরূপ মিলিত অশ্রুতে মাতৃপুণ্য হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ।



উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম

পরিবেশক—

জি. দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



বোরোলীন

সকল স্টেশন ও  
ডাক্তারখানায়  
পাওয়া যায়।

# বাপানী পদীর বমহিনী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

এখন থেকে মেরী ঘেন একটু দূরে দূরে থাকতে লাগলো। হেনরীর প্রতি আর মনোযোগ নেই। হেনরী যা চায় তার উদ্দেশ্য করে সে। বাইরে বেড়াতে যাবার কথা হ'লে সারা দিন বাড়িতে থাকে। বাড়ি ফিরে হেনরীকে পরিশ্রান্ত দেখলে দূরে কোন বারে বাগ্‌য়ার জন্তে জেন ধরে। হেনরীর কুৎসিত পায়ের দিকে ইচ্ছা ক'রে তাকিয়ে থাকে। নানা কাজে হেনরীকে দূরে দূরে পাঠায়। তার মন্থরতার জন্তে ঘন ঘন বিরক্তি প্রকাশ করে।

বিকলাঙ্গ বললে হেনরী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে, মেরী এ কথা ভালো করেই জানতো। এই শব্দটাকে প্রয়োগ করতো তাই তৎক্ষণাৎ অস্ত্রের মতো। হেনরীর মুখের রেখায় বেথায় বেথন আর প্রত্যাভাস দেখবার অভিপ্রায়ে।

দু' জনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ হতে লাগলো। মেরীর ক্রুদ্ধ মেজাজের বীভৎস অভিব্যক্তি লক্ষ্য ক'রে হেনরী বিম্মন-বিমুগ্ধ হ'য়ে যেতো। চীৎকার করে, বিকৃত অলীল মুখভঙ্গি

করে বগড়া করতে লাগলো। তার বিকট আর্তনাদ সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতো। আশে-পাশের ঘরের দরজা খুলে যেতো। অস্ত্রাস্ত্র ভাঙাটেরা সিঁড়ির কাছে জমায়েত হ'য়ে তার কর্কশ কণ্ঠস্বরের রুচতা শুনতো। ঘরের মধ্যে ব'সে ম্যাডাম লুবে ক্রমালে চোখ মুছতেন।

যখন সে বুকতো হেনরী তার ধৈর্যের শেষ সীমান্তে উপস্থিত হয়েছে। তখন কাছে সরে এসে ক্রমা চাইতো, মিষ্টি কথায় পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করতো। মায়াবিনীর মতো কথার জাল মন্ত্রে ঠাণ্ডা করতো হেনরীকে। হেনরী তার বিরক্তি-বিদ্বেষ ভুলে ক্রমা করতো আবার। তার পর কিছুদিন মেরী আবার শান্ত হতো। হাসি-খুশিতে দিন কাটিয়ে দিতো।

এই রকম একটি অল্পতম দিনের মধ্যদুগ্ধে হেনরী ছবি আঁকবে ব'লে মেরীকে দাঁড়াতে বললো। আনন্দের সঙ্গে মেরী রাজি হলো।

—আমার ছবি? স্বন্দর করে আঁকবে?

—হ্যাঁ, তুমি যদি চাও ছবিটা তোমাকে দিতে পারি।

মেরী তাড়াতাড়ি ওপরে গেলো। স্বানের ঘরে চুকে অনেকক্ষণ ধ'বে সাম্রসজ্জা, কেশবিন্যাস করলো। কালো ভেলভেটের পোষাক প'রে উপস্থিত হলো সে। তার পোষাকের ডান কাঁধের ওপর শুভ্র পালকের গুচ্ছ বেশ স্বন্দর দেখাচ্ছিল।

তার স্বাভাবিক লাবণ্যটুকু ঢেকে গিয়েছিলো। তার স্বন্দর চেহারার নীরস মডেলে রূপান্তরিত হয়েছিল।

—এই এক্ষণ ধ'রে চূপচাপ ব'সে থাকা বড় বিজ্ঞী; একটু পরে সে বলেছিলো। তুমি কি একটু তাড়াতাড়ি আঁকতে পারো না? তার পর হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠলো, তোমায় মডেলের জন্তে কত টাকা দিতে হয়?

—পেশালারী মডেল আমি সচরাচর গ্রহণ করি না। তবে সাধারণত সকালের জন্তে তিন ত্র্যাক আর সারা দিনের জন্তে পাঁচ ত্র্যাক দিই।

—তাহলে আমাকেও তোমার টাকা দেওয়া উচিত।

আমি তোমাকে ছবিটা দেবো বলেছি, সেটা কি যথেষ্ট নয়?

## মূল। রুজ

মূল লেখক : পিয়ের লা মুর

হেনরী স্নান ভাবে জিজ্ঞাসা করলো। আর তা ছাড়া টাকা তো আমি তোমাকে প্রতিদিনই দিই।

সে মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তবাব দিলো, সে তো তোমার সঙ্গে থাকার জন্তে। পাঁচ ক্রান্তে তোমার সঙ্গে সারা দিন কাটাতে, এমন মেয়ে তুমি বেশি খুঁজে পাবে না। যদি আমাকে মডেল হ'তে হয়, তাহলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। অস্তুত তিন ক্রান্ত।

—মডেল হ'তে হ'লে তিন-চার ঘণ্টা বসতে হয়। তুমি তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্তে দাঁড়িয়েছ।

মেরী মডেলের ঠাণ্ড থেকে নেমে এসে বললো, বেশি টাকা না দিলে আমি দাঁড়াতে পারবো না। সে ঘরের মধ্যে ঘরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তার পর ব্যাগের মধ্যে থেকে সিগারেট নিয়ে ছবিটা পরীক্ষা করতে লাগলো।—কই, এ তো আমার মতো দেখতে হয় নি! আমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর। আমার মনে হয়, তুমি ভালো আঁকতে পারো না। সেই যে শিল্পী কোলের ডিসে ছবি এঁকেছিল, সে কিন্তু খাটী....

—আঃ, সরে যাও। কথাগুলো ক্রুদ্ধ হেনরীর মুখ থেকে সজ্ঞারে বেরিয়ে এসেছিলো। আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি সেই শিল্পীর কাছে যাও, যেখানে বৃষ্টি যাও, চুলোয় যাও। আমার কিছু বাই-আসে না।

—আমায় তা বলে আজকের জন্তে তিন ক্রান্ত দিতে হবে। মডেলের জন্তে আমাকে প্রয়োজন না হ'লে অবশ্য তোমাকে আর টাকা দিতে হবে না। তবে আজকের জন্তে তোমার কাছে আমি টাকা পাই।

অভিজ্ঞতা থেকে হেনরী বুঝেছিলো, যুক্তি দিয়ে মেরীকে বাথানো পণ্ডশ্রম মাত্র। সে তিনটি কপোলা মুদ্রা বার করে ছুঁড়ে দিয়েছিল মেরীর দিকে। শূন্য পথেই সে লুফে নিয়ে বডিচের মধ্যে মুদ্রা কয়টি পূরে ফেললো। তার পর দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ঘণ্টাখানেক পরে মেরী অস্তুত হতে ফিরে এলো। মুখে হাসির ইসারা টেনে বললো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হেনরীর হাঁটুর ওপর খুঁতনিটা রেখে, পায়ের কাছে বসে বলতে লাগলো, তোমার সঙ্গে আমি বগড়া করতে চাই না। শুধু এই ছোট ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি মাঝে মাঝে বাইরে যেতে পাই, তাহলে বাঁচি।

—একটা পঙ্গুর সঙ্গে সববাসে কোন কৌতুক নেই, তাই না? হেনরী বেদনাবিদ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে বলেছিলো। আমি বুঝতে পারি। তা বেশ তো, তুমি তোমার বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেতে পারো।

মেরী লাক্ষ্যে উঠেছিল অল্পমতি পেয়ে। ওপরে গিয়ে হেনরীর দেওয়া টুপিটা পরে নিয়েছিল। হেনরী ব্যাখ্যাত ভাবে শ্রণ করছিল, এর আগে মেরী কোন দিন এ টুপি ব্যবহার করে নি। আমি খুব তাড়াহুড়ো দিচ্ছি। আর তাখো, এর পর খুব ভালো হবো আমি, দরজা থেকে সে বলেছিলো,—সত্যিকারের ভালো।

হেনরী কোন জবাব দেয় নি। সিঁড়িতে মেরীর আনন্সিত পদধ্বনি শুনেতে পেয়েছিলো। যেন মুক্ত-বিহঙ্গিনীর পাখা কাপটানোর শব্দ।

এর পর থেকে মেরী দুপুরের একটু আগে ঘুম থেকে উঠতো।

তাড়াহুড়ো সাজসজ্জা সারতো। তারপর হেনরীর বাছ থেকে দৈনিক বরাদ্দ অর্থ হস্তগত করে বেরিয়ে পড়তো। ফিরতো সন্ধ্যার শেষে। তখন তার গাল দুটো আরক্ত আপেলের মতো, চোখ দুটো অপরিসীম আনন্দের উজ্জ্বল চক্কে রুজ্জো।

পোষাক ছাড়তে ছাড়তে সে কি ভাবে অসুস্থ বোনের রোগ-শযায় কি সেবা করে এসেছে, তার একটা মিথ্যা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করতো। কিন্তু বৃদ্ধির অভাবে নিজের মিথ্যার জালে অল্প-কণেই ধরা পড়তো। তারপর মেলায় যাওয়া, সাঁতার দেখার জন্তে কি ভিড় হয়েছিল, সব একে একে বলে ফেলতো।

তার এলোমেলো কথার সার সঙ্কলন করে হেনরী বুঝতে পারতো মেরী নতুন করে ভীষন উপভোগ করছে। পুরোন পরিচিতদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বোনের কাছে যাচ্ছে। তার দেওয়া টাকা খরচ করছে হুঁহাতে। তাই তার প্রতি বিশ্বাসের ভাণ করতে লাগলো সে।

সে ছবি আঁকতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, ছবি আঁকায় আর তার কচি নেই। মূল্যবস্তুর বিজ্ঞাপনের জন্তে পরীক্ষামূলক ছবি আঁকতে গিয়ে কয়েকটা অর্ধসমাপ্ত রেখার টান দিয়ে থেমে গেলো।

সে আবার কাক্ষেতে যেতে লাগলো। সেখানে তার বন্ধুরা আগের মতোই ছবির ব্যবসায়ী আর সমালোচকের সন্ধ্যা আলোচনায় ব্যস্ত। যা তা করে সময় কাটাতে লাগলো সে; কিন্তু সময় কাটানো কি কঠিন ব্যাপার! ভবঘুরের মতো আবার বেড়াতে লাগলো। সে আবার মূল্যবস্তুর বাতায়ন আরম্ভ করলো। জিজ্ঞাসার তার টেবিলে এসে পোষ্টার আঁকবার জন্তে অল্পবোধ করতে লাগলো। মাসিমে তুলো কখন পোষ্টার এঁকে দেবেন বলুন? দেখুন প্রায় আবেশে টেবিল খালি।

এই ভাবে দিন কাটাতে লাগলো।

মেরী ক্রমশ রাত করে ফিরতে আরম্ভ করলো। তীক্ষ্ণ বিষাদ-রিষ্ট মুখে ঘরে ঘরে স্নান হ'য়ে। অপরাহ্নে যে সাঁতার কাটার রঙ্গস্থলে কাটিয়ে আসে, কণ্ঠে সেখানকার অ্যাক্টিভানের সুর, গায় বিস্ট্রসের তীব্র গন্ধ। কোথায় গিয়েছিলো জিজ্ঞাসা করলে সে উদ্ধত হ'য়ে ওঠে। না জিজ্ঞাসা করলে কল্পিত কাহিনী বলে হেনরীকে বিশ্বাসিত করতে প্রস্তুত হয়।

—আসবার পথে আজ এক ভদ্রলোক আমার পিছু নিয়েছিলো। বেশ সুশ্রী চেহারা। আমাকে চোখের ইসারা করছিল। তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিলো।

কিংবা হেনরীর পায়ের সন্ধ্যা নিষ্ঠুর ভাবে বিক্রপ করতো। আরো টাকা দাবী করতে লাগলো।—দশ ক্রান্তে আমার কুলোয় না। আমাকে এখন কুড়ি ক্রান্ত করে দিতে হবে।

এক সপ্তাহ পরে ত্রিশ ক্রান্তে রহা হলো। তারপর পঞ্চাশ। তার সর্বদা অর্থের প্রয়োজন দেখে হেনরী বুঝতে পারলো, মেরী আবার তার পূর্ণপ্রণয়ী বেবট-এর সঙ্গে মিলেছে।

প্রতীক্ষার বেদনার সঙ্গে ঈর্ষার জ্বালা মিশলো। যা তার কোন দিন ছিল না, তা হারিয়ে এই বুধা বেদনা কেন? মেরী কি সাধারণের সম্পত্তি নয়? তার কোন প্রণয়ী আছে কি না, এতে কি বাই-আসে? যুক্তি দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিলো সে, কিন্তু পারেনি।







উপশমিত-প্রায়। পূর্ববাসনা আর নেই। তাদের এই অর্থে প্রণয়লীলার একটা পরিসমাপ্তি চাইছিলো সে। চাইছিলো বিচ্ছেদের শেষ মুহূর্ত যেন স্থল্লর হয়। এবার সে অবিরতার করলো যে কোন রকম সাংসারিক রেহস্যবন্ধই ছিল করা কি কঠিন। সে সম্বন্ধ বসুধাতী অগভীর হোক। মেয়ের শোকাব পরিচ্ছদ, তার কয়েকটি জিনিসপত্র, তার প্রাশ্বনের সাজসরঞ্জাম তার ঘরে, মামনের ঘরে অতি পরিচিত সামগ্রীর মতো ছড়ানো রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে মেয়ের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রশ্ন।

মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে! সে তাকে ভাগ্য করছে। সে মুহূর্তে মেয়ের আয়ের পথ বন্ধ হবে বেবায়ও তাকে ভাগ্য করে বাবে সেই মুহূর্তে। গৃহহীন অর্থহীন মেয়ী আবার অসহায় হয়ে পড়বে। ভালোবাসবার কেউ থাকবে না তার। সে কি করবে তখন? সে শিক্ষিতা নয়, স্বতন্ত্র তার পূর্বজীবনে আবার ফিরে যেতে হবে তাকে। অন্ধকার কানাগলিতে, পথে-শাটে আবার সেই দেহবিলাসিনীর নির্মম আত্মহত্যার জীবন।—তারপর সেট ল্যাজারে দেহ-ব্যবসার জন্তে প্রয়োজনীয় কার্ড, রুপবিলাসিনীর নোংরা ঘর, সবসময়ে আন্তর্ভুক্ত আত্মবিলুপ্তি।

সেপ্টেম্বরের এক অপরাহ্নে হেনরী তার পরিকল্পনার কথা জানালো।—মেয়ী! ধীরে ধীরে শ্রম করলো সে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের মধ্যে এখন আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। বলো তোমার জিনিষপত্রের কোথায় পাঠিয়ে দেবো?

ঠিক বুঝতে না পেরে মেয়ী তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তার মানে—তুমি আমাকে ঢাল বেতে বসছো?

হেনরী তার কোঁচের পকেট থেকে একটা খাম টেনে বার করলো। দেখ তোমার জন্তে একটা উপহার এনেছি।

হেনরী বলতে বলতে খেমে গেল। মেয়ীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। গভীর আশঙ্কায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে। তার হৃৎকম্পন অসম বিপদের গভীরতা সবটুকু বুঝতে পারেনি। তবে তার দেহ মস্তিষ্কের চেয়ে অল্পভুক্তিপ্রবণ। সে যেন সমস্ত দেহ দিয়ে এই বিপদের অঙ্কুর করছিল। মুহূর্তে জন্মের মতো কৈশোরে উঠছিলো সে।

—তুমি বরং একটু বসো, মেয়ী হেনরী শান্ত ভাবে বলেছিলো।

—কিন্তু আমি—আমি কি করেছি? কথা আটকে যাচ্ছিলো তার মুখে। তোমার সঙ্গে তো ভালো হয়েই আছি। তুমি যা চাও সবই তো করছি। আসাবাপন পরিহার করছি। তোমার ছবি আঁকার জন্তে নয় হয়ে পাঁড়াতো বান্ধি আছি—

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সে কুন্তলসে অনেক কথা বললো। কথার ক্রমে শুকনো ট্রাটটা জিত দিয়ে চোট ভিজিয়ে নিলো। হেনরী বুঝতে পারছিলো মেয়ীর মন এই অবিচারের অল্পভুক্তিতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। প্রাণপণে নিজেকে এই পরিবেশে যানিয়ে নিয়ে বধ্যাঙ্গ্য কর্তব্য পালনের পরিবর্তে এই অপ্রত্যাশিত শাস্তি।

—না, তোমার কোন গোল নেই। হেনরী সন্ধানের কণ্ঠে বলেছিলো, তুমি বেশ ভালো হয়েই ছিলে। তবে কি জানো, আমি আর—

এইবার মেয়ী বুঝতে পেরেছিল। হেনরী তার ভিজে চোখের মধ্যে তার প্রাণ পেলো।

—কিন্তু সে কি বলবে!—হেনরীর উপস্থিতি বিমূঢ় হয়ে মেয়ী বলে উঠেছিলো।—সে কি বলবে, যখন জানবে আমাকে তোমার আর দরকার নেই?

সে একবার ওপর দিকে তাকালো, তারপর অমরোষের ভঙ্গিমায় সঙ্কল্প ভাবে তার ঠাকে ঝুঁকে পড়লো।

—হেনরী, দয়া করে আমার তড়িয়ে না, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো—

বেদনার সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো। দুটো ফুলের মতো চোখের জলে ভাসছিল যেন।

হেনরীর হাঁটুর কাছে নত হয়ে বসেছিলো সে। তার হাত মূর্তার মধ্যে তুলে নিয়ে বার বার চুম্বন করছিলো।

—ও রকম করো না মেয়ী! হেনরী চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই চীনতার দৃশ্য সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ঘটনাক্রমে পরেই যে ঘটনা ঘটলো হেনরী তা কোন দিন বিস্মৃত হয়নি। বিশস্ত বেশে, চোখের জলে সিক্ত হয়ে হেনরীকে কোঁচের ওপর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলো। অনেক অশ্রুধার বিনয় করছিলো। অজ্ঞ-ভাড়া কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলো যে, সে রাগী করতে, মডেল হাতে, জামা কাশড় ঘরদোর সমস্ত পরিষ্কার করতে রাজি আছে।

এক হাত চোখের ওপর রেখে হেনরী ইজলের সামনে মাথা নীচু করে বসে রইলো। মেয়ী হেনরীকে ম্যামান হু বেরীর কথা মন্বয় করিয়ে দিলো। এই মেয়েটির কাহিনী হেনরী পড়েছিলো। সেও মেয়ীর মতো স্নানরী ছিলো। এসেছিলো বস্ত্র থেকে। সেও নির্দয় আশ্রয়দাতার সামনে নত হয়ে বসেছিলো। চুম্বন করেছিলো তার হাত। স্মৃতিভিদ্ধা চেয়েছিলো।

মেয়ী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে উঠলো।—আমি তোমায় ঘৃণা করি বুঝলে? তোমাকে চিরদিনই ঘৃণা করেছি, ঘৃণা করেছি তোমায় ঐ কুৎসিত মুখ আর পা। তুমি একটা বামন পশু। ভালো করে হাঁটতেও পারো না। তোমাকে দেখার দিন থেকে তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে যখন ভালবাসি বলেছি তখন ভেতরে ভেতরে আরো বেশী ঘৃণা করেছি। তোমার স্পর্শে আমার সারা শরীর সঞ্চিত হয়ে ওঠে। বেবায় না বললে আমি কখনো তোমার কাছে ফিরে আসতাম না। সে জোর করে আমার।—

বিকৃত মুখভঙ্গি করে হেনরীর কাছে সরে এসে বললো, আ একটা কথা, তুমি খোঁড়া বলে আমি খুশী। স্তনতে পেয়েছি, আমি খুশি হয়েছি যে তুমি পশু।

মেয়ী বিকৃত-মস্তক মেয়ের মতো কথা বলছিলো। হেন প্রথমে তার এই দুর্গবহারে কৃতজ্ঞতাই বোধ করছিলো। বিচ্ছিন্ন অনায়াসে সম্বন্ধ করে আনছিলো বলে। প্রত্যেকটি অপমান সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কম দূরতর হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সে পুণ্ড্র ভয় দেখালো। সাদৃশ্য প্যাণ্ডোর কথা বললো। জানালো, যে কথা বললে হাতে প্যাণ্ডো এসে তাকে সেটল্যাজারে ধরে নিয়ে তার ব্যবস্থা করবে।

এইবার সে ছেননা ফিরে পেলো যেন। কোঁচের ওপর পড়লো। পরাভিত্ত, শ্রান্ত হয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো কশ্চিৎ হাতে রাউলের বোতাম এঁটে নিলো।

—আমার সব ভিনিসপত্তর আমার বোনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। সেখান থেকে আমি নিয়ে নেবো।

হেনরী ঘিরে ঘিরে তার পাশে এসে বসলো। তার হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো, তুমি কি বেব্যাট-এর কাছে ফিরে যাবে?

মেরী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। কিছুক্ষণের জন্তে তার মুখ বেন অসহ্য যন্ত্রণায় একটা মুখোসের মতো দেখাচ্ছিলো।

—তার কাছে যাবো না, সে আর একজন মেয়েকে ভালোবাসে। আমার কাছে সে শুধু টাকা চায়—

—যে তোমাকে ভালোবাসে না, তাকে ভালোবাসা বড় দৃষ্ট, তাই না? সুদূরত্রে হেনরী বলেছিলেন। তুমি আর আমি দু'জনেই তা জানি। কিছুদিন পরে আবার একা থাকার অভ্যাস হ'য়ে যাবে—(একথা সত্য নয়, সাধনা মাত্র। একা থাকার পক্ষেই সম্ভব নয়)—একদিন কেউ তোমার প্রতি সদয় হ'তে পারে—

মেরী শুনছিলেন না। তার কানে একটা কথাও গেলো না। যন্ত্রের মতো চুল ঠিক করে নিলো। হাত দিয়ে মুখে ফেললো চোখের জল। শিশুহুলভ এই ভঙ্গিমা হেনরীর হৃদয় স্পর্শ করলো। তারপর উঠে হেনরীর হাত থেকে থাম তুলে নিলো। কোন ভাবাদ আনালো না। যন্ত্রের মতো ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। হেনরী তার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শুনেতে শেলো।

ঠিক কি এক রকম নিশ্চিন্ততায় ভরে উঠলো। কয়েকটি ঘড়ির মধ্যে তির্যক সূর্যের আলোর উড়ছিলো। মেরীর গুঁড়িভারের গন্ধ এখনো ঘরের বাতাসে রয়েছে। হেনরী তার কলসের সামনে গিয়ে বসলো। স্বক করলো ছবি আঁকতে।

\* \* \*

ছবিটা দেখেছ? ছবিটা দেখেছ? চার দিকে এক রব। সকাল দায় মুহূর্মহর শব্দে চার দিকে একথা শোনাচ্ছিলো—রাত্রিবেলায় বা সহরে বিপুল কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

কি দেখার কথা বলছো?

ঐ পোষ্টারটা। একটু মেয়ে কানকান নাচের ছবি—

এ বেন একটা বিব্রোহ!

একটা মহৎ সৃষ্টি!

একটা মাটারপিস।

একটু আকর্ষক কিন্তু অসাধারণ! সমস্ত প্যারিস চমৎকৃত ছিলো। সমস্ত প্যারিস সেই সঙ্গে পেয়েছিলো আকর্ষকতার স্পর্শ। সমস্ত প্যারিসে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। সর্বত্র পোষ্টার। একে অগ্রাহ্য করা বা নিষৃত হওয়া যায় না। প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক প্রাচীরে এই পোষ্টার আঁটা। লোকেরা ভিড় করে এসে দেখে। বানবাহনের চলাচলে বাধা পড়ছে। পুলিশ পথ করেছে সরে যাওয়ার চেষ্টা। ভয় দেখাচ্ছে, তিরস্কার করে। অস্বাভাবিক ভিড়ের মধ্যে লোকেরা বকের মতো গলা বাড়িয়ে ঘরের গারে লেখা চিত্রশিল্পীর স্বাক্ষরিত নাম পড়তে চেষ্টা করছে।

শব্দে এই আলোচনা চলতে লাগলো। কেউ কেউ একে সৃষ্টি বলে ঘোষণা করলো। পথপ্রান্ত থেকে এই সৃষ্টি বেনে গওয়ার জন্তে দাবী জানালো। কেউ কেউ পোষ্টারকে যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ হতে পারে তার প্রথম উদাহরণ। সমাজপতি ও নীতিবিশেষ দল বলতে

লাগলো প্যারিস যুবকদের এতে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েরা পথ চলতে এই সব পোষ্টার দেখে লজ্জায় আরম্ভ হ'য়ে ওঠে। অপর দিকে একদল শিল্পী ও সমালোচক স্বতঃপ্রসূত হয়ে পোষ্টারটির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলো।

বেশ উঁচুদরের নীতিসম্পন্ন শিল্প।

উৎসাহিত নীতিবাদের প্রতি ব্যঙ্গ বলা চলে।

এই পোষ্টার প্রকাশের সঙ্গে লিখোগ্রাফির নতুন যুগের সূচনা হ'ল, উচ্চ দরের শিল্পে পরিণত হ'ল। ম'সিয়ে তু তুলো লোকে শিল্পকে নিয়ে এসেছিল প্রাকৃতিক রাজত্ব।

সবচেয়ে হতবাক বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলো হেনরী নিজেকে। পাহাড়ের খাতে মুড়ি ছুঁড়ে বিপুল হিমশিলা-প্রপাত ঘটাতে মানুষ যেমন বিমূঢ় হয়ে যায়, সেও তেমনি বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলো।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না এত উৎসাহের ঠিক কারণ কি? হেনরী তার শিল্প-ব্যবসায়ী বন্ধু মরিস জয়ান্টকে বলেছিলেন।

তোমার ছবি সকলের মনে একটা দাক্ষা দিয়েছে, এ কথা নিশ্চয় মানো?

সে ছেড়ে দাঁড়। পোষ্টারের কাজই তাই। আমি চেয়েছিলুম ভিড়লোক সাহায্য করতে; যাতে করে বেশী লোক মূল্যে হাফির হয়। এর মধ্যে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কেন, কি হ'ল?

আমি আর ছবি আঁকবার অবসর পাচ্ছি না। লোকেরা যে কি কোরে আমার ঠিকানা পায় কে জানে? দলে দলে সব দেখা করতে আসছে। সকলেই পোষ্টার একে দিতে বলে। প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবসায়ী সব ওরা। থিয়েটারের অধ্যক্ষ, অভিনেত্রী, আরো কত লোক। প্রত্যেক দিন সকালে মাঠাম লুবে একতড়া নিমন্ত্রণের দিবে যান। বাসের কাছ থেকে চিঠি আসে তাদের নাম সাত জন্মে শুনি।

—তুমি সে চিঠি নিয়ে কি করো?

—কেন, ঠোঁট আলবার জন্তে তাঁকেই ফেরত দিই। নইলে সেগুলো নিয়ে কি করবো?

—কয়েকটা খুলে দেখা মন্দ কি? কয়েক জনের আমন্ত্রণ তুমি গ্রহণ করতে পারো। এতো বাজে লোকের সঙ্গে না মিশে, কয়েক জন কচিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে আসা তো ভালো। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ভঙ্গলোকের সঙ্গে না মিশে গোটাকতক বার্ধ লোকের সঙ্গে দিন কাটিয়ে লাভ কি? আমি তোমাকে নাতার্সার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মিসু নাতার্সা প্যারিসের মধ্যে একজন স্তম্ভরী আর বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি তোমাকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

—আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি মূল্যেই খুব স্বখে আছি। সকলেই এখনো আমার চেনে আর আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে তুলেছিলুম, যে নতুন মেয়েটি আঁজকাল নাচছে, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। তার নাম জেন এ্যাভিল—...

কিছুদিন পরে মরিস তাকে নাতার্সা-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এখন থেকে হেনরী বেন নতুন করে তার

আত্ম-মর্ধ্যাণ আবিষ্কার করলো। সেও এই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত, অঙ্গভূত একজন। খোঁড়া? খোঁড়া তাকি হ'য়েছে? তার পরিচয় এখন—দুঃসাহসী তরুণ শিল্পী লোহক। সে এখন বিখ্যাত, স্বনামধন্য। প্যারীর সমস্ত ঘরের দরজা তার কাছে উন্মুক্ত। সে যে-কোন জায়গায় যেতে পারে, আলাপ করতে পারে যে-কোন লোকের সঙ্গে। যেখানে খুশি সে যেতে পারে। সর্বত্র সমান প্রবেশাধিকার। সকলেই তাকে অম্লসন্ধান করছে।

তার পর পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত প্যারীতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব। সব দুরার তার কাছে উন্মুক্ত। সর্বত্রই সে যেত। রাতে সে বেশি সময় পেত না ছবি আঁকবার, সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারতো না, শুধু সব কিছু দেখা সম্ভব হ'য়ে উঠতো না। সারা দিন ছবি আঁকতো বলে, রাত্তিরে তাকে নানা কাজে ভ্রগে থাকতে হতো, আর রাতে ঘুমোবার অবসর পেত না বলে অপরাধ মতপান করতো।

এই পাঁচ বছরের বিনিময় রজনীর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'বে শরীয় কিছই দেখতে পেত না।

বার...মেয়ের দল—স্বন্দরী তরুণী। স্বচ্ছ বসনে নিটোল শ্রোণী, আর মুখের ওপর আরক্ত হাসির ইঙ্গিত—বৃদ্ধ তরুণী, প্যারীতে উৎসব-বিনীশে জোনাকীর মতো মেয়েরা। অসখ্য অভিনেত্রী। রঙ্গমঞ্চের সাজঘর। নীল, লাল, সবুজ চারি দিকে রঙের ফোয়ারা। চারি দিকের আসবাবপত্রের ওপর, পর্দার ওপর বিভিন্ন রঙের বাহার। সাজঘরের রঙের কাচপাত্রের পাশে দোমড়ানো তোয়ালে.....

টুকুরে টুকুরে অসখ্য স্মৃতি মনের কোণে ভিড় করে।

নাতাসী-পরিবারের এক ভোজসভায় সে একটা বিচিত্র রঙের জ্যাকেট আর ইউনিয়ন জ্যাকেট তৈরী ওয়েষ্ট কোট পরে গিয়েছিলো। সেও অনেক ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিল। এই সব ভোজসভায় সে বীদরের মাংস পরিবেশন করতো, চিড়ি মাছ খাওয়াতো অতিথি অভাগতদের।

আরো নানা রকমের অজুত কাণ্ড করবার নেশা পেয়ে বসেছিলো তাকে। তবু নিঃসঙ্গ জীবনের অন্তর্দর্শ তার মধ্যে নিয়ে এসেছিল তিস্ত কাঠিন্য। অপরাধ মতপানে মগ্ন হ'য়ে রইলো সে। তার গোলপা দস্তানা, রক্তবর্ণ জামা, আর বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপরের কাপড় দিয়ে তৈরী সবুজ জ্যাকেট সর্বত্র প্রসিদ্ধ হলো।

এই হলো তার পাঁচ বছরের কান্ডিনী। এখন সে তার গাড়ি-খোঁড়া বিক্রি ক'রে দিলো। কৌতুকক্লান্ত মন ফ্রান্সের বেশি আর ঘুরে বেড়াতে প্রস্তুত নয়। গানের জলসায় হাসির খোঁরাক জোগাতে মন তার নাগাজ। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে এখনো থাকে, সে শুধু অস্ত কিছু কাজ নেই ব'লে। সে এখন এক জায়গা থেকে অল্প জায়গায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সুযোগ পেলে ব'সে ব'সে গাড়ির মধ্যেই ঘুমাতো।

এখনো সে নিঃসঙ্গ। ভালো ক'রেই এখন সে জানে যে কোন মেয়েই কোন দিন তাকে ভালোবাসবে না। তাদের স্বন্দর মুখের হাসি তার উদ্দেশ্যে নয়, তার শিল্পখ্যাতির উদ্দেশ্যে। তার বয়স এখন মাত্র ত্রিশ বছর, কিন্তু দেখতে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের মতন। তার বাস্তু ক্রমে ভেঙে বাঁকিলো। আসকার তুলনায় অর্ধেক সময়ও সে ছবি আঁকতে পারতো না। মদের পাত্র তুলে পান করত গেলে হাত কাঁপতে থাকে। অল্প হাত দিয়ে চেপে ধরতে

হয় কম্পিত মণিবন্ধ। মত্তপানে তার পদ্ম পায়ের কোন সাহায্য হয় না বরং সাংঘাতিক আঘাত পায় মাঝে মাঝে। এই ভাবে আরো কত দিন চলেবে? সে জানে না, জানতেও চায় না।—

সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, জেন এড্রিল বলেছিল। সে তার ফারের টুপি চেয়ারের পেছনে রাখলো। হাতের দস্তানা খুলতে লাগলো।

—তুমি কি খাবে? আমাকে বেশ কিছু বোল ক্রীট খেতে হবে। পোয়াজ আমি খেতে পারি না। আজ রাত্তিরে আমি—আচ্ছা ডিম আর কফি খাই বরং। আর তুমি—তুমি কি খাবে? তার স্বচ্ছ অবগুষ্ঠন সরিয়ে হেনরীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কি নেবে?

হেনরী স্বয়ংস করলো ভৃত্যকে জেন যা খেতে চাইলো। নিজের জন্তে শুধু ব্রাণ্ডি আনতে বললো। ফারের কাঁজ-করা কোটের বোতাম খুলতে লাগলো সে।

—পাঁড়াও, হাত দিয়ে জেন ভৃত্যকে খামতে ইঙ্গিত করলো।

হেনরী, তোমার কিছু খাওয়া উচিত। কি হাড়সার চেয়ার হয়েছে দেখেছ? তুমি আজকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছো। ওয়েটারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলো, ওর জন্তে ডিম নিয়ে এসো।

আর হুটো ব্রাণ্ডি, হেনরী যোগ করে দিলো। তারপর বললো এখন বল তো কি জন্তে পোষ্টার চাইছ? আমি তোমায় বলছি এখন আর ও-সব আঁকি না।

সিগারেটের লাক্স খুলে একটা সিগারেট মুখে দিলো। কম্পি হাতে আগুন ধরালো।

জেন তার হাতের ইয়ং কাঁপা লক্ষ্য করলো।—হেনরী, তোমার মদ খাওয়া একরকম বন্ধ করা উচিত; এভাবে চলা তোমার জঁ নয়। তুমি কি করতে চাইছ? খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ আর মদ খেয়ে বাছ!

—আ—তুমিও! আমি দশ মিনিট কোথাও স্থির বসতে পারি না।—কেউ না কেউ এসে উপদেশ আওড়াতে থাকে আমি তোমায় পছন্দ করি, তুমি স্বন্দর ব'লে। আমাদের বা অনেক দিনের। কিন্তু তুমি মদ খাবার কথা নিয়ে আমায় দিলে, তোমার ঐ মুক্তির মতো দাঁত শুঁড়িয়ে দেবো ক হ্যাঁ, পোষ্টারের কথা কি বলছিলে। তোমার নতুন পোষ্টার দরকার? পুরোনো যেটা আছে সেটাই যথেষ্ট।

—না, না যথেষ্ট নয়।

হাতের ওপর চিবুক রেখে ছলছল চোখে সে হেনরীর তাকিয়ে রইলো।

—আমি বসন্তকালে লগুনে বাছি। প্যালেসে আ প্রোগ্রাম শুরু হবে যে মাসে। এমন একটা পোষ্টার চাই বা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। তুমি সকলের জন্তে পোষ্টার তৈরী দিয়েছ—আমার জন্তেই শুধু কিছুই করেনি।

—না কিছু করিনি বই কি। বারেটা পোষ্ট্রেট আর ড্রিং ক'রে দিইনি তোমায়?

—পোষ্ট্রেটে কি হবে আমার! পোষ্টার দরকার। কথা রাখো। এই লগুনের সাক্ষ্যের ওপর সব কিছু নির্ভ

আমার। যদি দেখানে জমিতে পারি তাহলে পরের বছর নিউ ইয়র্ক পাড়ি দেবার সব ব্যবস্থা কর' দেবে মানেজার। তাছাড়া দেখেছি তোমার পোষ্টারে ভাগ্য খুলে যায়। গিলবার্টের কথা তাবো। তুমি প্রথমে তার জন্তে পোষ্টার একে না দিলে সে এতো বড় হতো ভেবেছ? লো ফ্লোর, মে মিলটন আর ঐ ব্রেট আইরিশ মেয়েটা :—মে বেলফোর্ট—ওরা কেউ সফল হতো ভেবেছ? বেলফোর্ট তো শুধু একটা কালো পোষাক প'রে বেড়াল হাতে রক্তক্ষের ওপর এসে চিৎকার করে, একটা কালো পুঁথি বেড়াল আছে আমার! ও কি হাসছ কেন?

এক সময়ে খুশিতে হেনরীর চোখ আধা-নিম্নীলিত হয়ে এলো। বললো, জেন তুমি গত কয়েক বছর খুব দূরে দূরে ঘুরেছ না? বছর পাঁচ-ছয় আগে তুমি মুল্লান্তে নাচতে। আর এখন উনত্রিশ বছর বয়সেই বিখ্যাত তারকা হয়ে উঠেছ।

খাবার প্লেট থেকে চকিতে মুখ তুলে জেন বললো, আমার উনত্রিশ বছর নয় তো। পচিশ বছর। গত চার বছর ধরে আমার বয়স পচিশ বছর চলছে—আরও কিছুদিন আমার ঐ বয়স চলবে!

তারা দু'জনে অনেক দিনের বন্ধু। নানারকম হাডা গল্প-গুজব করতে লাগলো। মুল্লান্ত আর কোলির গল্প ক্যান্সিনো স্ত প্যারিস গল্প অজান্তে গীতি প্রতিষ্ঠানের গল্প যেখানে জেন আগে নাচতো, সেই সব পুরান অনেক কাহিনী শ্রবণ করতে লাগলো।

জেন সিগারেট ধরালো। নিশেধে ধূমপান করতে লাগলো। হেনরী নব্বুয়েতের কণ্ঠে বললো, তুমি এভাবে কনিয়াক খেয়ে নিজেকে নষ্ট করছো কেন?

—আবার জেন! অপ্রগলভ ভাবে হেনরী বলে উঠলো, আমি পানি, আমি একটু বেশি পান করছি। কিন্তু তুমি বা আর কেউ আমার দক্ষা করতে পারবে না। আমিও ছাড়তে পারবো না। আমি চেষ্টা যে করি না তা নয়, কিন্তু পারি না।

চিন্তাশ্রিত ভাবে জেন-নিচের চোঁট কামড়ে ধরেছিলো। হেনরীর হৃদয়টা কুংসিত মুখ, নিশ্চল গাল আর মোটা চোঁটের কথবর্তা শব্দ ছিল।

—তুমি বড় নিঃসঙ্গ, না?—জেন বললো চার দিনের কোলালর মল্লগও হেনরী তার কণ্ঠস্বরে সমবেদনার স্বর শুনতে পেলো। না বলো না। আমি জানি তুমি বড় একা। তোমার মুখেই যি চিহ্ন রয়েছে। আমার ইচ্ছা করে আমি—

তার চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে উঠলো। একদৃষ্টিতে চেয়ে লা কিছুক্ষণ। তার ছোট লাল চোঁট অস্পষ্ট কথায় কৈপে লা বেন। মিরিয়াম! রুদ্ধভাবে বলে উঠলো সে, আহা আমার কথা আগে মনে আসেনি কেন?

—কি কিসকিস করছ?

—ও কিছু নয়। একটা কথা ভাবছিলুম।

কিছু দিন পরে জেন তাকে মজুন পোষাক কেনবার জন্তে নে নিয়ে গিয়েছিলো। একজন পোষাক-পরা দরওয়ান দরজা

খুলে গিলো। তারা একটা ছোট গোল, কাপের্ট পাতা, আয়না বসানো ঘরে প্রবেশ করলো।

—ম্যাদময়জেল হায়েম যদি বাস্ত না থাকেন তা হলে এক-বার দয়া করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। জেন একজন ভদ্রলোককে বললো।

হেনরী অন্তর্কণে সোফার ওপর গিয়ে বসলো। গজগজ করছিলো অপমান মনে। কালো পোষাকপরা একটু অসাধারণ রকমের একটি মেয়ে চুকলো। মেয়েটি একটু লম্বা। সজ্জ স্বাস্থ্য আছে চলাফেরার মধ্যে। তাকে দেখে হেনরীর মেরী শার্পেটের কথা মনে পড়লো। তার চক-চক কালো চুলের মাথখানে সঁখি কাটা। ঘাড়ের কাছে বাঁধা এক গুচ্ছ চুলের মধ্যে তার স্বভাবো হাতীর দাঁতের মতো সাদা মুখখানা স্তম্ভর দেখাচ্ছিল। কিন্তু সব থেকে আকর্ষণীয় হলো তার চোখ দুটি। ঠিক কালো নয়, অনেকটা কফির মতো রং, তবে আয়ত আর উজ্জ্বল। চোখের বড় বড় বীকা রেখা মুখখানাকে ডাবপ্রবণ ক'রে তুলেছে।

—কি খবর জেন? অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার স্বরে সন্দোহান করলো সে।

—মিরিয়াম, ইনি হলেন ম'সিয়ে তুলো লুভ্রেক।

মেয়েটি হেনরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, আপনাদের চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। তার হাসির কীক তুখের মতো স্তম্ভর সাদা দাঁতগুলো দেখতে পেলো হেনরী। সে বললো, কিন্তু ছবি দেখবার সুযোগ পাইনি। যা ভিড় হয়েছিলো।

তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। হেনরী মেয়েটির চোখে সমবেদনা বা ব্যঙ্গের চিহ্ন দেখতে পায়নি। সেখানে শুধু নিভাস্ত প্রশংসার আভাস ছিলো।

—আমি সে জন্তে অন্ততঃ দুঃখিত। আহা, আমি যদি জানতে পারতুম। হেনরী সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, তাতে আর কি লাভ হতো! সে হয়তো কোন বিস্তারী ব্যক্তির সজ্জিনী হয়ে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলো। নিশ্চয় তার কোন প্রেমাস্পদ আছে—

—আচ্ছা, ওকে কেমন লাগলো। প্রেস ভেনকোমের পথ দিয়ে আসতে আসতে জেন হেনরীকে জিজ্ঞাসা করলো।

—কিছুই ভাবিনি। তবে বেশ স্তম্ভর মেয়ে মনে হলো। তার সখ্যে কি মনে হলো জেনে তোমার লাভ কি? হেনরী চোখ তুলে জেনের দিকে তাকালো। তার মুখে হাসিমাখা ক্রুট, বললো, কি বলতে চাও? এবার তোমার মাথায় কি মতলব খেলছে ঠিক করে বলোতো?

—বেশ বলছি। তোমাকে দোকান নিয়ে গেছলুম তার কারণ হাতে তোমাদের দু'জনের দেখা হয়। আমার মনে হয় তোমরা দু'জনে যনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারো। ও তোমার খুব ভক্ত।

—কি করে জানলে তুমি?

[ক্রমশঃ।

অজুবাদক—কল্যাণ দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ দে।

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



অস্থান

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

REF. 144-220 200

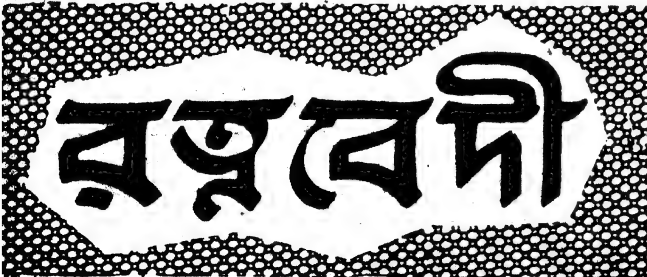


# হৃদয়ের আঁশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনেক টাকা থাকার একটা ভালো লাগা ভাব আছে।  
কলকাতার রাজ্য দিয়ে যখন মীরাদের—এখন মীরাদেরই বলতে হবে—রাজহাসের মতন সাগা মোটর গাড়ীটা চলে যায়—রাজ্যের তখন হেটে চলেছে কত লোক, মেয়েরা পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে আগত পাবে লাল হরের জুতো পরে কত মানুষের ভিড়ে ট্রামে বাসে বিপজ্জনকভাবে কাঁচ হয়ে কত কারা বুলছে, কত কারা কোনো গতিকে একটা পা তুলে গাড়ীবার জন্তে ছুটেছে, গরুর গাড়ীর মাঝখান দিয়ে ইঁদুনি বিকশ, আর সাইকেল, কেউ তাদের গ্রাহও করে না; ট্যান্ডি ট্যান্ডি বলে কেউ চোঁচাচ্ছে, ট্যান্ডি খামছেও না। আর গুনের গাড়ী নিঃশব্দে হাড়ের মত উড়ে যায়, কোথায় বালিগঞ্জ আর কোথায় পরেশনাথের মন্দির! রাস্তা লোক ঘামে, হাঁকায়—গুরা চলে সীটে ঠেদান দিয়ে আরামে। ময়দান, বর্ষতলা আর সাঁকুলার বোড আর শিয়ালদা ঠেদন, চৌরাস্তার মোড় আর অদৃশ্য মানুষের মাথা যেন সিনেমার ছবির মতন গাড়ীর বক্বককে কাচের ওদিকে সামনে আসে আর মিলিয়ে যায়, মনে ছাপ রাখে না। ভালো মোটরে চড়ে কি আরাম আর আরাম। তাই বা ক'জন জানে বলা? ষ্টেট বাসে চড়ে সেটা আশ্চর্য করতে চায়।

কিন্তু গাড়ীতে চড়ে কত দূর মীরা গেল, বরুতে পারলো না, কলকাতা শহর কোন পর্যন্ত! 'বিরিট' কথাটা সে শিখেছে।



ঐশ্বর্যভাষ্কর বহু

'বহানধরী' সে শুনেছে, ভুল করনা করত পাবে না কত কল।  
এ শহর! কলকাতার মাগ দেখলো, এক দিকে গলা হ'য়ে গেছে,  
এক দিকে লবণতুল। সেই তুর বুজিয়ে কবে শহর বেড়ে যাবে, খাল  
বুজিয়ে ধানক্ষেত চাপা দিয়ে। কে জানে সে কবেকার কথা!

কিছু পরেশনাথ মন্দির—ববিবারের বিকেলে লাল নীল হলদে  
সবুজ বেগুনী কমলা ধূসর সাত রঙের টুকরো টুকরো কাচ প্রতিটি  
খামে, দেয়ালে, মেঝের, সেখানে গোখুরির সোনালী আলো ঝাঁকা হয়ে  
এসে পড়েছে, ধূসর গন্ধ, সোনালী মুগ্ধি, শিথিল ভিতরটা যেন কোনো  
স্বপ্নপুরী। এখান থেকে বসে দেখা যায়, লুপে কোয়ারার ঠাণ্ডা জল,  
লাল মাছের গোল চৌবাচ্চা, পাখর দিয়ে বাঁধানো গুহুর, কারা  
গড়েছিলো এমন দেবমন্দির, রঙ নিয়ে তারা যেন খেলা করছে,  
বিকেলের সোনালী আলোকে মধ্যস্থ রঙীন ক'রে দিতে পারে যে ঘর,  
এমন ঘর তৈরী করেছে, বিকেলের সোনালী আলোকে পৃথিবী রঙীন  
ক'রে দিতে পারে যে ঘর, এমন ঘর তৈরী করেছে কত দিনের কত  
পরিশ্রম, জলের মতন কত টাকা খরচ ক'রে। কে? কোন্ এক  
ব্যতীয়াস।

ড্যাডি ও মামুদি ওদিকে বেড়াচ্ছে, মীরার সঙ্গে দেখা হল একজন  
চন্দ্রমা-পরা রোগা ভদ্রলোকের। তিনি বললেন, খুকু, জানো তুমি  
পরেশনাথ কে ছিলেন?

মীরা বললো মাদোয়ারাদের গুল।

তিনি হেসে বললেন, সব মাদোয়ারাদের নয়, মাদোয়ারের  
মেবারের যে সব লোকের জৈন বর্ধ, তাদের গুল। দেবতাও বলতে  
পারো। সব মাদোয়ারী জৈন নয়, গুনের মধ্যে তিনুও আছে  
অনেকে, বারা দুর্গা কালী মহাদেব কৃষ্ণ মানে। জৈনদের মধ্যে  
আবার দু'দল, খেতাখরী, আর দিগধরী। এদের মিছিল তুমি  
দেখেছ?

মীরা বললে, না তো!

পরের সপ্তাহেই গুনের মিছিল আসবে। এদেরটা আসবে বিড়ন  
স্ট্রীট দিয়ে, বেলগাছিরাস্ট্রীট বাবে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে। গিড়ন কোয়ারের  
দক্ষিণে কোনো বাড়ীতে উঠলে তুমি দু'টেই দেখতে পাবে।

—সেদিন এরা সমস্ত মন্দির চূড়া থেকে ফটক পর্যন্ত আলোর  
মালায় ঢেকে দেবে। সেদিন সওদাগর তার ভাতার খুঁলে দেবে আর  
মিছিল, পরেশনাথের মিছিল, সোনাল, রূপায়, ঐশ্বর্যে সে এক রাজ  
শোভাবাত্রী। অথচ বীর জন্তে এত আড়ম্বর, তাঁর গারে এক টুকরো  
কাপড় পর্যন্ত থাকত না, তিনি খালি গারে দীর্ঘ দিন তপস্যা করেছেন  
এক গহন বনে-ঢাকা দুর্গম পাহাড়। তাঁর  
নামে সেই পাহাড়—পরেশনাথ পাহাড়।  
শুনতে বেশ ভালো লাগছিলো মীরার।  
বললে, তিনি এখনো আছেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, এখনো কি  
থাকেন? কবে তিনি শ্বর্গে গেছেন। তিনি  
এসেছিলেন চার হাজার বছর আগে।

চার হাজার? মীরার চোখ কপালে  
গুটে।

হ্যাঁ। বুদ্ধদেবের চেয়েও আগে।

আচ্ছা, আপনি এত খবর জানলেন  
কি করে?—মীরা হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলল।

কৌতুক চাপতে পারে না। তোমরাও চাপতে পারতে না এমন অবস্থায়। না-তানাকে কে না জানতে চায়?

তিনি বললেন, আমি যে লেখক। লেখকদের সব খবর জানতে হয়।

আপনি কি কি বই লিখেছেন?—আবার মীরার ছেলেমাছুরী এয়।

তোমাদের জন্তে লিখেছি—একখানা লিখেছি “হবিত হুড়াতে”।

ও, পড়েছি পড়েছি, কী চমৎকার ছবি, কী সুন্দর ছড়া—

হবিত হুড়াতে

এসেছি পড়াতে

হেসেই গড়াতে

মাটিতে।

আপনি তো বেশ মজা! আপনি কত বই লেখেন, কত পর্যা পান!

এইখানে ভক্তলোকের মুখ গভীর হ'য়ে ওঠে। বলেন, না খুকু, পর্যা আমরা তেমন পাই না। আমরা শুধু খেটেই বাই। তোমাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্তে আমরা কত পরিশ্রম ক'রেও আমাদের নিজেকে ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারি না। সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না।

এ নাকি হয়? মীরা ভাবে। লেখকের ছেলেমেয়েরা কিবের আলাব খুলোয় লুটাপুটি দিয়ে কাঁদছে, আর তাঁরই রঙীন বই কাঁড়াঝড়ি ক'রে নিয়ে ছেলেমেয়ে পড়ছে কত ঘরে, এ নাকি কখনো হ'তে পারে। কী যে অসম্ভব কথা বলেন ভক্তলোক! অথচ ঠাট্টা উনি করছেন না, চশমার কাচের আড়ালে ঠর চোখ চুলচুল করছে।

কিন্তু নামটা কি? নাম ত' মনে পড়ছে না! বইটা তার আছে। আগাগোড়া মুখস্থও করেছে, কিন্তু নামটা ত' মনে রাখেনি! কী লজ্জার কথা! এখন ত' ভিগ্যাস করাও যায় না, আপনার নামটা কি বলুন ত'! একটু একটু মনে পড়ছে—ব্রজমাধব কি যেন।

ড্যাভি মাম্মি ডাকাডাকি করছে—মীরা, কাবু হিরার। মেক্‌ চৌ।

কামি ড্যাভি ব'লে মীরা উঠতে বাচ্ছে, ভক্তলোক বললেন, তুমি ইংরিজ বলে কেন? শেখবার জন্তে যদি হয়, ভালো। কিন্তু মাতৃভাষার চেয়ে ভালোবাসো না ওভাবাক। হিন্দুস্থানের লোক হাজারাই সাহেব সাদুখ, সাহেব সে এ জন্মে হবে না, সাহেব যেমন হাজার বাঙালী সাকলো এ জন্মে বাঙালী হয় না। বাঙালী যেমসাব চিরদিন বাঙালী যেমসাবই থাকে, কোনো কালে খাঁটি যেম কতে পারে না।

মীরা বললে, আপনার কথা আমার মনে থাকবে। লেখকদের হুংবের কথাও মনে রাখব।

লেখকদের হুংবের কথা তোমার মনে রাখতে হবে না হোট মেয়েটি, লেখকদের ভাগ্যের কথা মনে রেখো, তারা অমর। অমর হয় কারা? খুব বড় দাড়া, বড় বৈজ্ঞানিক, বেশনভা, ত্যাসী, সাধু—সেই সব মহামানবদের সঙ্গে লেখকদের নাম থাকে কত দিন পর্যন্ত দেখে দেখে। গায়কদের নাম লোকে জুলে যায়, শিল্পীর নামও ভোলে, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, বড়ো ডাক্তার, বড়ো কবলারী, কবি, কপটিগতি, সকলকেই ভোলে, কিন্তু লেখকের নাম

থাকে ইতিহাসে, সাহুকের মনে, থাকে তার রচনা, যে রচনা মনে না। এত কথা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমার বই যদি তোমার ভালো লাগে আমি জানি, তুমি আমার নাম মনে রাখবার চেষ্টা করবে, যে নরমটা এখন মনে আনতে পারছ না।

মীরা যেতে যেতে বলে, আপনি কি করে জানলেন আমি মনে আনতে পারছি না?

আমরা সব জানতে পারি।

ততকণে মোটরে কোর কোর হর্ষ বাজছে একটানা, ওরা গাড়ীতে উঠে ব'সে আছে।

মিসেস চৌধুরী রাগ ক'রে বললে, তার সঙ্গে এত কথা হচ্ছিল? আমার ডেকে এলাম, তবু খেয়াল নেই?

মীরা বললো, তুমি সেদিন যে বইটা আমার কিনে দিলে, হবিত হুড়াতে সেটা উনি লিখেছেন।

সত্যি? মাম্মির চোখ বড়ো হ'য়ে উঠলো। বলতে হয়, আলাপ করতাম।

মিষ্টার চৌধুরী বরা চুকট মুখে দিয়ে টীয়ারিং হুইল ধ'রে বললো, আমিও সেদিন বইখানা দেখাছিলাম উন্টপাণ্টে, বেড়ে লিখেছে বাচ্চাদের ভজ্ঞে।

গাড়ী চলছে চলছে, ট্রাম বাস পুলিশ পার হ'য়ে নির্জন রাস্তা দিয়ে ফুলের গন্ধ দিয়ে আবার নতুন নতুন বাড়ীর পল্লী দিয়ে, আলোর আলো বাজারের দোকানের ধার দিয়ে, মাহুচ চাপা দিতে দিতে বৈকে গিয়ে, লাল আলোর সামনে কাঁড়িয়ে থেকে, মীয়ার বললে হর্ষ দিয়ে, হেড লাইট খেলে কমিয়ে নিবিয়ে শৌ শৌ শৌ—ঘর এসে যায়। গাড়ীর গমিতে ট্রেন দিয়ে ও তো ঘুমিয়ে পড়লো। রংবেরঙের পাখরংবানো কাচবানো সোনার পাতমাড়া সিংহাসন সমেত পরেশনাথের মন্দির আর কোথায় পরেশনাথ পাঠাড় চার হাজার ফুট উঁচু চার হাজার বছর আগেকার গল্প নিয়ে আসে স্বপ্নের মধ্যে। এক ভারপার বাচ্চারা সন্ধ্যার পর খেলা করে, আর এক ভারপার বাব ডাকে সন্ধ্যার পর—চার হাজার বছর আগে যেদিন দেখে শুধু আদিবাসীরা রাজত্ব করত, আর কোনো ভাত ছিল না। সেদিন কি নিবিড় অরণ্য ঐ পরেশনাথ পাঠাড়, কি বটিন তপস্যা পরেশনাথের—বারখা করতে বলেছেন লেখক-ভক্তলোক—সংগ্রেব মথো সমস্ত মনে পড়লো মীরার সব কথাগুলি, যেন স্তনতে পেলে নিজের কানে।

ঘুম যখন ভাঙলো, দেখে গাশপ ডকে কোলে ক'রে নিয়ে বারান্দা পার হ'য়ে ডিক্রিকমের হেলানো সোফায় বসিয়ে দিলে। মাম্মি বললেন, যেসিনে সাবান দিয়ে মুখটা বুয়ে ধুয়ো। মুগীর ঠুঁ আর লুচি আসছে, একো ডাইনিং রুমে। গরম গরম বাও।

মুগীর ঠুঁ, তার ডাইনোজো এর ছাও পার নি। নামও শোনেনি পোপেরাজার। শ্রাণ্ডউইচ আর কেক যে এত রকমের হয়, ক'জন জানে পুহিতে। লাল রক্তর বাড়ী বাঁচ হোটেলের সামনে শুটকি মাছ শুকানোর কথা তার মনে পড়লো। কত দিনের বাসি ক'রে কত দেশের লোক কৃত্ত ক'রে খায় সেই শুটকি মাছ। গরম চিকেন ঠুঁ কি তাদের ভালো লাগবে? ভালো লাগলে ভাগেরা বিএভাড়া লুচি?



গরম সূতিও মীয়ার থালা গিরে পিস্তে চায় না, তাই তাই-বোনদের মতন সেশের কত ছেলেমেয়ে সকালে একখানি মাত্র আটার রুটি খেয়ে কিংয়ে ছটকুট করছে। হাওয়া-ভরা এমন গরির আর পালকের বাগিশের বিছানার ওরে মনে হয়—বিছানা ব'লে মীয়ারই কিছু ছিল না। তক্তাগোবের ওপর মাছুর, তাও ছেঁড়া আর তেল চিটিচিটি বালিশ, বার তুলো বেয়িয়ে বাছে। সেখানেও ত' ঘুম হ'ত, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত আগুয়াকে। এখানেও ঘুম হয় ক্লাস্ত-শরীরে। পুরীতে ঘুম ভাঙতো না, এখানে ঘাব্বাতে কত বার ঘুম ভেঙে যায় কত দিন!

পরেদশাখের মিছিল দেখা ওর হয়েছিলো। ঐশ্বর্য্য বাকে বলে, রূপোর মন্দির, রূপোর সিঁড়ি, সোনার পাতমোড়া হাতী, আর একেবারে খাটি সোনার মন্দিরে সোনার পরেশনাথ। কত না বেশমী ধ্বজা, কত না বিচিত্র বাজনা, কত না রতীন হাতী, ঘোড়া, গাড়া, কত না লোকের ভিড়!

গরম প'ড়ে গেল শহরে। এ গরম পুরীতে নেই। ঘরে-ঘরে পাখা ঘুরছে, জানলায়-জানলায় খুসখুস টাঙানো, গ্রাস গ্রাস রেজিকারেটেরের ঠাণ্ডা লেমন সোয়াস, সাধা স্নগন্ধ আইসক্রীম, গরম আর যায় না। সাহেব বললে—চলো দার্জিলিং।

বিছানাপত্র কিছুই বাঁধা হল না, বাসনকোশন কিছুই নেওয়া হল না, শুধু স্যুটকেস-ভর্তি গরম স্যুট। মীরা ভাবলো এই গরমে গরম-স্যুট! আর বিদেশে বাওয়া, অথচ সসার পাতবার কিছুই নেই, বিছানা পর্যন্ত না। পুরীতেও তো সে কত লোককে আসতে দেখেছে, কত মালপত্র বেড়ি লাগেজ নিয়ে। এ বেনে বাড়ী হাত-পা।

গেনে উঠে সে দেখলে, কলকাতা শহর ক'কে বলে। গঙ্গা নদীর ধারে ধারে বাড়ী বাড়ী বাড়ী কত ধূং অবধি, তার পর সব কাপ-সা, বোঁরা—কাচ দিয়ে শুধু দেখা যায়, আকাশ-আকাশ—গাখীরা, বেসব পাখীরা অনেক উঁচুতে উঠে আসে, তারা নিশ্চয় এই রকম দেখে। রোদর পর্যন্ত এখানে হাড়া হ'য়ে গেছে।

আধ ঘণ্টাও হয়নি, ওরা এসে বাগডোং-রায় নামলো। এখান থেকে ট্যাক্সিতে উঠতে হবে। শিলিগুড়ি হ'য়ে কাট রোড ধ'রে ওরা চললো, আশ্চর্য্য সে পথ। এই প্রথম ও পাহাড় দেখলো, সেই পাহাড়ের বৃকে বৃকে, মাধার মাধার, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, উঁচু থেকে আরো উঁচুতে, হাজার রকমের ফুল, হাজার রকমের পাতা, অসংখ্য বর্ণা, ঔশন, চা-বাগান, মেঘ, কুয়াসা, ফগ—এত কখনো মানুষ একসঙ্গে দেখতে পারে?

ড্যাভি বলেন—এ দেখা বাছে নীচে চম্পান্থরি চা-বাগান আমায় বন্ধুর।

কোথায় চম্পান্থরি? ফগ ত' সব ঢেকে দিলে। চম্পান্থরি হারিয়ে গেল চম্পান্থরি।

পথে উঠতে উঠতে ও টের পাচ্ছে, ঐশ্বের দেশ নীচে প'ড়ে রইলো, একে-ল-শীতের রাজ্য। বৃষ্টিভেজা দোক-মেশানো এক রকম ঠাণ্ডা, এক রকম শীত, কুয়াসা বা মিষ্টি—এমন জল-হাওয়া—ও বুঝলো, শুধু হিমালয়েরই সন্ধ্যা—নীচে বত শীতই পড়ুক, এমন আরামের শীত পাওয়ার উপায় নেই। পাইন, বেবলাক আর পপুলার গাছের কঁকে কঁকে ডালিয়া, জিনিয়া, রডোডেন্ড্রন আর ক্রিশ্বেদ্রিমাসের আড়ালে আড়ালে লাল, নীল, হলদে কাঠের অসংখ্য বাড়ী ফগের কাপড়ায় বারে বারে বা চোখের সামনে থেকে মুছে বাছে, বারে বারে স্পষ্ট

হ'য়ে ফুটে—এ শুধু দার্জিলিং-এর নিজস্ব। গরীবরা এখানে কোথায়? ভালো ভালো গরম স্যুটপরা বাঙালী সাহেব, লাল নীল ওভারকোটপরা বাঙালী মেমসাব, পাঞ্জাবী মেমসাব, কুকুর, ঘোড়া মশতলা উঁচুতে একটা বাড়ী পাঁচতলা নীচে পনের বাড়ী, এই ত' দার্জিলিং! সমস্ত শহর পার হ'য়ে নীল সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, তার একেবারে ওপারে আকাশের গায়ে গা ঠেকিয়ে সিগারেট-বাক্সর বাতায় মতন চকচকে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

হোটেলের বররা ধবধবে সাধা চাদর পেতে বিছানা ক'রে দিলে, জানলায় কাঁচা রতীন পর্দা দিয়ে গেল, বাথরুমে নতুন ধাতমাজা, নতুন সাবান—মীরা বুঝলো—তাই লোকে শুধু হাতে এখানে আসে!

রোদর এত মিষ্টি হয় দার্জিলিং না এলে বোকা যায় না। ফগ এত আশ্চর্য্য হয় দার্জিলিং না এলে জানা যায় না। এই দেখছ, থাকে থাকে সাজানো লাল নীল হলদে—রামধনু রঙের হাজার গুণা কাঠের বাসো। ঢেবী পপুলার দেবদারু গাছের ঘন সবুজ পাতায় কঁকে কঁকে বিকমিক বিকমিক করছে, দেখতে দেখতে কোথা থেকে আকাশছোঁয়া ফগের বাজ্ব এলো—মুছে গেল সমস্ত ছবি—জলছবি বললেই ভালো হয়—মনে হলে তোমার সামনে তিন হাত দূরে আর কিছু নেই, শুধু মাটি থেকে উঠে গেছে আকাশ, কিংবা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—পাঁচ সাত মিনিট বাবেই আবার বলমল ক'রে ফুটে উঠলো জলছবি শহর দার্জিলিং যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি। মিনিটে মিনিটে ঘটা ঘটার সারাদিন ধ'রে পৃথিবীর স্টেটে এই ছবি মুছে মুছে দেওয়া খেলা!

মীয়ার মনে পড়লো পথে উঠতে উঠতে কোথায় দেখে এসেছে পাগলা বোরা বর্ণা পাথর থেকে পাথরে, নীচে থেকে নীচে কোথায় নেমে যাচ্ছে পাগলের মতন—তিস্তা মহানন্দা কি সব নাম নদী কোথায় প'ড়ে রইলো নীচে—কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপের চূড়া দেখতে দেখতে সেই বর্ণার কথা মনে পড়ে।

এখানে তার সঙ্গী ভুটলো বড়লোকের ছেলেমেয়ে—যারা শুধু চীজ আর চকোলেট খেয়ে মাছুর। ভাত ডাল কাক বলে জানে না। যারা ইয়েরলী ফুলে মেমেদের কাছ পড়ে। যারা কাঠের পুতুল নিয়ে খেলা করে না—রেলগাড়ী, ষ্টেশন, লাইন সারা ঘরে পেতে সিগভাল ডাউন ক'রে মজা দেখে। যাদের একটা কারকোটের নামে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-জামা হ'য়ে যায়।

টাইগার হিলে যেদিন বাবার কথা হল, মীয়ার মাম্মি বললে—বাক্সটাকে রেখে গেলে হয়। মীরা শুনেই বললে, সেটি হচ্ছে না। স একলা থাকতে পারবে না। মীরা জানে, আকার করলে এরা খুসি হয়। রাত তিনটের সময়ে ট্যাক্সি এলো, ওরা সব উঠে বসলো। চাখিখারে কাচ তোলা, গায়ে আলষ্টার বাগ, তবু বেন ঠাণ্ডা লাগে। এইজন্তই বৃষ্টি মাম্মি বাগ করছিলো। গরম জলের বাগ দস্তানানোড়া হাতে সবাই ধরে রইলো। তবুও ঠাণ্ডা। ঘুমন্ত দার্জিলিং-এর ইলেক্ট্রিক আলোর সাজানো নির্জন রাস্তা দিয়ে ওদের গাড়ী চললো; কখনো নীচে নেমে গিরে কখনো উঁচুতে উঠে, কখনো ধীরে বেকে, কখনো ডাইনে। এলো কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠে বুর ষ্টেশনে। সেইখানে টাইগার ছিল। পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে



ঘুরে ঘুরে গাড়ী উঠতে লাগলো। ভবনটা চারিদিক অন্ধকার, ওরা বন্ধন ওপরে পৌছলো। ইতিমধ্যেই ভিড় লেগে গেছে। কত লোক এসে হাজির হয়েছে স্বর্ঘ্যোদয় দেখবার লোভে। মীরা জেবেছিলো চিমালয়ের পিছন থেকে স্বর্ঘ্য উঠবে। সেই দিকে চেয়ে ও বোকার মতন বসছিলো। ওর ডাড়া বললে, স্বর্ঘ্য কোন্ দিকে ওঠে মীরা?

পূৰ্বদিকে।

চিমালয় কোন্ দিকে?

উত্তর দিকে।

তবে ওদিকে স্বর্ঘ্য উঠবে কেন? স্বর্ঘ্য উঠবে পূৰ্বদিকে বালায় দিশন্তে।

তবে যে বলে এভারেটে স্বর্ঘ্যোদয়?

তিব্বতের এভারেটে 'আলো' এসে পড়বে বাংলা দেশের স্বর্ঘ্যের।

তাই হ'ল। পূৰ্বদিক-এর আকাশ অনেক নীচে। সেখানে লাল আভা ভাগতেই এভারেটের বরফ রাঙা হয়ে উঠলো, যেন রাঙা একটি ছুঁয়া। ওদিকে যেই স্বর্ঘ্য দেখা গেছে, অমনি টকটকে রাঙা হয়ে সোনালী-স্বচ্ছকে সোনালী, তারপর আস্তে আস্তে কমলা, হলসে, রূপালী সাদা। ঠিক স্বর্ঘ্যোদয়ের মুখটিতেই কত কাণ্ড, মুহূর্তে মুহূর্তে ঝবলে অদ্ভুত একটা ব্যাপার। স্বর্ঘ্য উঠে গেলে আর কিছু না। আহা রে, কত লোক এখন আসছে! আর দেখবে কি? স্বর্ঘ্যও উঠে গেছে। এইটুকু দেখবার জন্তে যারা রাত জেগে এসে বসে আছে, গাড়ীতে খরচ করে পায়ে হেটে কষ্ট করে উঠছে হাজার হুট, তাদেরই পরিশ্রম সার্থক হল। টাইগার হিল থেকে স্বর্ঘ্যোদয়, সমুদ্রে স্বর্ঘ্যোদয়, দুটোই তার দেখা গেল, জীবনের স্বর্ঘ্যোদয় হবার আগেই। এখন ত কিছুই ঠিক নেই যে, কি হবে আর কোথায় থাকবে!

এমন যে দাঙ্গালি তাও মীরা ডাডির ভালো লাগলো না, বললে—কলকাতার হালের এড়িয়ে যেতে চাই, দেখি তারা সবাই এখানে এসেছে। হুবেলা দেখা হচ্ছে, ভালো লাগছে না।

মীরা যদিও ভালো লাগছিলো, কিন্তু তার তো কিছু বলবার উপায় নেই! জোর করে বুঝি কোথাও থাকা যায়? এক একদিনে প্রায় একশো টাকা খরচ হচ্ছে না মাউন্ট এভারেটে হোটেল, পথের খরচায়?

বন্ধন তখনো ওরা শিলং যাচ্ছে তখন ওর এই ভেবে ভালো লাগলো, তবু ত' আর একটা নতুন দেশ দেখা হবে। এই অল্প বয়সে কে এ সব দেশ দেখতে পায়? পরাবের ছেলেরা হয়ত জীবনেই দেখতে পায় না।

বাংলাদেশের থেকে গোঁহাটি আকাশপথে। যেন এবাড়ী থেকে ওবাড়ী। শিলং দাঙ্গালি-এর কণ নেই, এখানে রাস্তার হাঁটতে বকী উঁচু-নীচ করতে হয় না, এখানকার লোক, এখানকার ফুল, শিলং পাহাড়, অজস্র বর্ণা মন তুলিয়ে দেয়। ফুলের ঝু এখানে চোখ ঝলসানো, খাসিরা বাজার/আপসের মতন স্বন্দর। টাইগার হিলের নীচে সিঞ্চল লোক ও ভালো করে দেখতে পায়নি, বৃহৎস্কাণ্ড না, এখানকার লোকের ধারে অনেক বসতে পেরেছে, এখানকার কেবল ট্রেস এ অনেক হাঁটতে পেয়েছে।

আর একটা অদ্ভুত সুযোগ এলো, বাও ভাবতেও পারেনি আসবে

বলে। চেরাপুঞ্জির নেবস্তর। শিলং থেকে অজস্র ঘুরে অনেক উঁচুতে চেরাপুঞ্জি পাহাড়, যেখানে দক্ষিণ সমুদ্রের সমস্ত মেঘ গিরে জড়ো হচ্ছে আর বৃষ্টিবরা দিন শেষ হ'তে দিচ্ছে না, তার পরে সেই মেঘ ফিরে এসে বাংলা দেশে বর্ষা আনে। সেই চেরাপুঞ্জির পথ মুবলধারে বৃষ্টি আর ফগে ঝাপসা, গাড়ীর কাচ খালি কালো হয়ে আসছে, কিছুতে পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে না, এখানে পাহাড় ওখানে খালি—পঞ্চাশ তলা সমান নীচু—ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলতে হয়—পাহাড়ী ডাইভার গান গাইতে গাইতে গাড়ী চালায়, প্রত্যেকটি বাক তার মুখস্থ। সেই বিপজ্জনক পথে বাতীর প্রাণ হাতে করে যেন যায়, শেষ নেই শেষ নেই। নীচে মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়া ভাঙা মোটর দেখা যায়—আরোহীরা যার নিশ্চিহ্ন, হঠাৎ সামনে থেকে কোনো গাড়ী আসে—এই চেরাপুঞ্জির রাস্তা! কনকনে ঠাণ্ডা, শনশন বাতাস, ঝমঝম বৃষ্টি, দুর্ভেজ কুরাসা।

চেরাপুঞ্জিতে এসেও বাবা যায় না, চেরাপুঞ্জিও এসেছি। পোষ্টাক্সিটা কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে ভিজছে, ছোট গ্রাম কুরাসা আর বৃষ্টিতে ঢাকা, মাথার ওপর গুজ মেঘের মেলা, মসমাই ঝলস চোখশো কিট নীচে ব'রে পড়ছে, কোথায় তা কি দেখবার যো আছে? কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! বৃষ্টির মধ্যেই চেরাপুঞ্জি।

শিলং ছেড়ে ওরা ফিরতে পায়নি শিলেটের পথে, এখন যে পাকিস্তান। মামির কাছে গল্প তুলনা খাসিরা, জয়ন্তিয়া, গারো হিলের অসংখ্য ডেউ পায় হয়ে, পাহাড় আর জঙ্গল, বর্ণা আর মালভূমি, নদী আর সাঁকো—বিশেষ করে ডাউকি নদী—নীল আর বেগুনী আর সবুজের অফুরন্ত শোভা দেখে রমণীর স্বর্ঘ্য উপত্যকার—ঠাণ্ডা থেকে গরম দেশে নেমে মনে হয় যেন জর এলো গারো—ঐহট—শিলেট—নদীতে স্রীমার চলছে শিলেট চূর্ণ নিয়ে—সেখান থেকে আগরতলা, ত্রিপুরা—বাজার প্রাসাদ কুজবন, মালক কি চমৎকার রূপকথার মতন।

তারপর চাঁপপুর—সেখান থেকে স্রীমার, যেখান পল্লী গোয়ালন্দ। দেশ দেখতে হবে। কিন্তু কোথায় ট্রেন আর স্রীমার, আর কোথায় এরোপ্লেন? তুলনা হয়?

এই ওর প্রথম এরোপ্লেন খারাপ লাগলো। পদ্মার বুক জিৎ স্রীমার চললো না।

এন রায়চৌধুরী বাব-এটল ট্যাবলেটমারা বেবিপার্কের নির্ঝর বাগান-বাড়ীতে আবার ও ফিরে এলো। আবার লরেটোর বা এসে কাঁড়াতে লাগলো, আবার ব্রক প'রে ওদের নিয়মিত ফুল হ্র করতে হ'লো।

বাগিগঞ্জ সাহু'লার বোড, রিচি বোড, হাঙ্গরা বোড, লেক বো নিউ আলিপুর, ক্যালকাটা ক্লাব, কাপী, গ্রেটইষ্টার্প, মেট্রো, লার্ট হাউস, নিউ মার্কেট এই হ'লো ওর গতিবিধি। ভবানীপুর ও রাসবিহারী এডিনিউএর দোকানের সঙ্গেই ওর পরিচয়। উজ্জের আসল কলকাতা রইলো, মন্ট্রমেটের ওপারে, চোরবাগান, হাল বাগান, দাঙ্গিপাড়ী, বাগবাজার, পটলভাঙ্গা, বামাপুতুর, হাটখোঁ গোয়াবাগান, বাহুড়বাগান, শোভাবাজার, রাজাবাজার, পুরানো ঝ আর অসংখ্য গলি আর ট্রামলাইন আর বাজার আর সারি র সিনেমা থিয়েটার নিয়ে—তার কথা কানে আসে কিন্তু চোখে হয় না। লক লক মাহুদের ভিড়ে প্রাচীন কালের ইতিহাস দেখ

ভালিয়ে গেছে, কিন্তু তারমাজার লেখা হীরাম আর ঠেঁট বাসে বাহুদ  
তোলা বাতী দেখে অমুহূমানে কণ্ঠে পায়ে কী কাণ্ড এগিকে হচ্ছে।

গুজোর সময়ে সে দেখতে পেলো বহু আসলো বহু  
উৎসব বহু ঠেঁট হৈ ঐ ভামবাজারের দিকেই। এই এন,  
হারচৌধুরী ঐ বাগবাজারের দিক থেকেই এসেছে। সেখানে  
নাকি পৈত্রিক-বাড়িতে একারবতী পরিবার, কত গোল, কত  
হুগোৎসব। সেখানে আছেন শ্রীশ্রীরাগোগোবিন্দজীউ নিত্যসেবা নিয়ে।  
আর আছে গলার ঘাট কাছের।

একদিন হীরাম যেতে পেরেছিলো। বিজয়ার দিন। প্রথম  
করতে হ'লো কত লোককে, কড়িকেই সে চেনে না। সবাই বলে,  
এই মেয়েটাকে বুঝি মাহুদ করা হচ্ছে? তা ভালো। আমাদের  
একটাকে নিলে হ'ত। কত টাকা রাখা হ'লো আর আছে?

চল্লিশ হাজার ত' রাখতেই হবে আল্লাদা ক'রে। নিয়েছি বহন।  
হীরাম মামুদির উত্তরে সকলে অবাক। গালে হাত দেয়।

তারলে তো আমাদের একটা ছেলেমেয়েকে গছিয়ে দিলে হ'ত।  
হার, হার, এ বুঝি কেন হ'লো না কাকুর।

হরিণ যেমন ক'রে বনের দিকে, নদীর জলের দিকে, আকাশের  
দিকে দেখে—তেমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মীর কলকাতা লহর, কলকাতার  
সমাজ, কলকাতার ছুজুগ, কলকাতার আমোদ-প্রমোদ লক্ষ্য করতে  
লাগলো। বাংলা দেশের প্রাণ, ভারতবর্ষের লক্ষ্য—কলকাতা লহর।

গোলের আগের দিন ওর মামুদির সঙ্গে এসে এ-বাড়িতে থাকতে  
হয়েছিলো। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাগোগোবিন্দজীউয়ের গুজোর পালা এ

মহান ওদের বাড়ি পড়েছে। সকাল থেকে দেখে কী কাণ্ড, গোলনার  
মহান কাপ মেখে চলছেন আর সাগা বাড়ীর মেয়ে-পুত্র আরিষ, কুতুম,

শাপ, পিতৃকারী নিয়ে কি হলুদুল বাধালা। রঙে রঙে সারা বাড়ী  
জ্বলে গেল, ছোটরা, এড়ারা, বুড়ারা কেউ না সাজতে বাকী রাখলো

না, তবু মীর আর তার মামুদি এক পাশে স'রে বইলো। এ নাকি  
মহানভা। এ নাকি বীণাবাদী! তবু বহন ছোট মেওয়ার-নন্দর

মহান মীরাম মামুদির পায়ে ভণ্ডো ভণ্ডো গোলাপী আর লাল কাপ  
ধিয়ে গিয়ে গেল, তখন তাকে মিষ্টি হাসি হাসতেই হল, আর

কান্না করতেই হল, এক ডিশ খাবার খাওরতেই হবে।

আনন্দের এমন ছল্লাড যেন সমুদ্রের ঢেউএর মতন। এ থেকে  
ক'রে থাকা যায়? মীরামের বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

অন্যায়িক চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া—কোনো বৈচিত্র্য  
হ, ঠেঁটের কথা নেই, জোরে হাসি নেই, আহ তবু

মামাহুদবিয়ান। [ ক্রন্দন ]

## একটি বিচার কাহিনী

বিজনকুমার ঘোষ

সম্রাট ওকতর।

জমিদারের কর্তব্যীদের সঙ্গে চরের প্রজাদের বিবাদ মেয়েছে  
সে ভেসে-ওঠা জমির দখল নিয়ে। প্রজারা বলে আমাদের,

জমিদার বলে আমাদের।

সম্রাট জট পাখিরে উঠল আঙে আঙে।

কোন দলই জয়লাভ পায় নয়। ক্রমে লক্ষ্য-লক্ষ্য প্রকাশিত।

ইতিমধ্যে ২০০০ বিচারের মত এখন পৌঁছল কলকাতা থেকে  
বাবুদশার (সেকালে শিলাইগুহের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে বাবুদশার  
কলে ডাকত) আসছেন।

অমনি কুসুমদেব যেন সব উত্তেজনা নিয়ে গেল। লাঠি বাঁধ  
বাড়ীতে পড়ে রইল। হু'ললই কখনোই খালে অপেক্ষা করতে লাগল  
কর কথা টিক।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইগুহে এসে পদ্মার ঘাটে চড়েই কাটাডেল  
অধিকাংশ সময়। সুতরাং ঘাটেই বিচার-সভা বসল। প্রজারা  
আর কর্তব্যচারীরা পদ্মার কিনারে সার বেধে পাড়াল। আর রবীন্দ্রনাথ  
ঘাটের বাগানদার তৈয়ারে বসলেন।

এক জন বৃদ্ধ মুসলমান এগিয়ে এসে শাপাটটা বুকের দ্বি  
কর্তব্যচারীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, তার একটা চমৎকার  
উদাহরণ দিলেন, "কর্তব্যচারী হল দুখের লাড়ি, কেটে কেললেই গেল।  
কিন্তু আমরা হলো আপনার বুকের লোম। আমাদের কেললে  
কি করে?"

তখন রবীন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বুকের লোমের দিকে রাই দিয়েও দুখের লাড়ি তিনি অকুর  
রাখলেন।

## দ্বিব্যবৃষ্টির খেলা

বাহুদর এ, সি সরকার

বৈষ্ণবানার চারিদিকে লক্ষ্য নিয়ে অর্থাৎ লক্ষ্য-পরিবৃত্ত  
অবস্থায় যে সব খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে

যেহা যায়, তাদের অন্ততম হচ্ছে আলোচ্য 'দ্বিব্যবৃষ্টির খেলা'।

এই খেলার বাহুদরের অল্পপাখিতর সময় যতই মনোহারক যে  
কোনও একটি বিশেষ জিনিষ মনোনিয়ন করেন লক্ষ্যকরের। যেমন

মরা টেবিল, তৈয়ার, ফুলদানী, পিড়ানো, চায়ের কাপ এমনি ধারা  
কোনও কিছু। এর পরে বাহুদর প্রবেশ করেন যতই মনো। এর

পরে বাহুদরের সহকারী একটি কাটির সাহায্যে যতই ভিতরকার  
বিভিন্ন জিনিষ স্পর্শ করতে থাকে। এই কাটি লক্ষ্যকরের নির্দিষ্ট

জিনিষটি স্পর্শ করা যাক বাহুদর চিংকার করে ওঠেন 'হয়েছে  
হয়েছে। এইটি আপনার মনোনীত জিনিষ।' ব্যাপার

যেহে তো লক্ষ্যকরা হয়ে যায় হতভম্ব। অনেক বার অনেক  
আসলে এই খেলা দেখিয়েছি ছেলে-বোলায়—বাহাবাও পেয়েছি

প্রায় এই খেলার মৌলতে।

এবার শোন খেলাটার মূল কৌশল : খেলাটা মেখে বহু কটির  
কল মনে হয় আসলে কিন্তু ভুল কঠিন নয় এ। খুঁই লক্ষ্য এবং

কল-কৌশল। আর অভ্যাসেই এ আয়ত্তে আসবে।

যতই মনো বাহুদর থাকেন না বাট, তার সহকারী কিন্তু সেখানে  
উপস্থিত থাকে বহাল ভবিষ্যতে। এই কারণে লক্ষ্যকরের মনোনীত

জিনিষ সবচেয়ে বাহুদরের কোন জান না থাকলেও বাহুদরের সহকারী  
তা জানে খুব ভালভাবেই। এক বিশেষ সংস্কৃতির সাহায্যে সহকারী  
বাহুদরকে এই নির্দিষ্ট জিনিষের কথা জানিয়ে দেয়। কাটির  
সহকারী বিভিন্ন জিনিষ স্পর্শ করলে সকলে বাহুদরকে অবাক করে

করে সন্ধ্যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট জিনিসের কোনো লেভার বা হাত কোমরে বাখে। এই সঙ্কট থেকে সহজেই বাত্বক বুকে নেয় যে এইটিই দর্শকের মনোনির্ভর জিনিস।

পুরস্কার দেওয়া হয় তিনি জনকে। তবেই বাবু এই তিনজনদের মনে একজন। তবেই বাবু পুরস্কারটি পান তাঁর “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” এক আদর্শ দু’খানি বইয়ের প্রচেষ্টার জন্যে।

## একখানি বিখ্যাত বইয়ের জন্মকথা

### বতীজ্ঞান পাণ্ডা

এক জন ভজ্ঞানোক্তের একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল। তিনি কয়েকজন কী, বহু পুরানো সব খবরের কাগজ বেঁটে বেঁটে দেখতেন। দেখতেন আর তা থেকে আলাদা খাতার অনেক কিছু লিখতেন। এ কাজে আলাস ছিল না তাঁর। এটি ছিল তাঁর জীবনের বড়ন কাহ।

সমুদ্রের তলার জুড়ে দু’বরাহা যেমন করে বড় বেঁজে, পুরানো খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে তলিয়ে গিয়ে তিনিও তেমনি করে সন্ধান করতেন মহামূল্যবান সব জিনিসের।

বহু পুরাতন খবরের কাগজ ত্যাগ করে কথা, দু’চার বছর আগেকার কাগজও পাওয়া যায় না বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে। লাইব্রেরিতে প্রায়ই পুরানো খবরের কাগজ রাখা হয় না, কারণ, এগুলি কেউই পড়তে চান না। পুরানো খবরের কাগজ আবার পড়বে কে! তাই এসব বিক্রী করে দেওয়া হয়।

তাঁর এত পুরানো খবরের কাগজ তিনি পেতেন কোথায়?

খুব পুরানো সংবাদপত্র পাওয়া যায় কোন কোন লাইব্রেরিতে ও কোন কোন লোকের নিজের গ্রন্থাগারে।

তিনি সেই সব জায়গায় গিয়ে রাশি রাশি পুরানো খবর চুকে নিতেন তাঁর নিজের খাতায়।

তাঁর এই নেশার জন্মে তাঁকে খরচও করতে হতো কিছু কিছু প্রায়ই, যদিও তিনি পরসাগুহালা লোক ছিলেন না। কিন্তু, নেশা এমনই জিনিস।

দৈবাৎ যদি খবর পেতেন যে, কোন পুরানো বইয়ের দোকানে পুরাতন খবরের কাগজের ফাইল পাওয়া যাবে, তিনি তৎক্ষণাত্ তা সংগ্রহ করতেন। অথবা যদি জানতে পারতেন যে, কোন দূরবর্তী জায়গায় কোন গ্রন্থাগারে আছে পুরানো সংবাদপত্রের ফাইল, নিজের পরসাগু খরচ করে তিনি তখনই সেখানে যেতেন তা দেখতে।

এই রকম করে অনেক দিন ধরে অনেক পুরানো খবর সংগ্রহ করার পর, আলাদা আলাদা বিষয় অনুসারে খবরগুলি শ্রেণীবদ্ধ করে বই আকারে বার করলেন। বইটির নাম দিলেন “সংবাদপত্রে সেকালের কথা।” এ বই পড়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা খুব স্তুত্যাতি করলেন।

এই বইয়ের সংকলনকারীর নাম ভোমরা জান কি? ইনি হলেন বতীজ্ঞান পাণ্ডা বাবু। ইংরেজী ১৯৫২ সালের দ্বিতীয়

## গল্প হ’লেও সত্যি

### শ্রীহলাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরে বরষার ক’রে বৃষ্টি পড়ছে, চারি দিক কর্মমাক্ত। বাত্বার বেহুবার উপায় নাই। হাঙ্গলে সে বার দাঙ্গল শীত পড়ছে।

ভাই হুই ভাই ঘরের মধ্যে উল্লুনের পাশে বসে আঙুন শোচছে।

হঠাৎ ভায়া দেখলে, উল্লুনের খানিকটা উপরেই এরাটা সার্ট বসছে ও গরম হোয়া ওর ভেতরে চুকছে আর সার্টটা বার বার কুলে-কুলে উঠছে। এই দৃশ্য দেখেই তাঁদের হুই ভাইয়ের মনে “বেলুন” তৈরী করনা আগে। প্রথমে হুই ভাই মিলে নানা রকম সাইজের কাগজের বেলুন তৈরী ক’রে পরীক্ষা ক’রতে লাগলেন। পরে বড় বড় বেলুন নিয়ে খোলা জায়গায় পরীক্ষা ক’রতে শুরু করলেন এবং সে পরীক্ষাও সফল হ’ল। শেষে ১৮৮৩ সালের জুন মাসে ভায়া টেক ক’রলে যে, এবারে ছাদের কঠোর সাধনার কলাকল জনসাধারণকে নির্ভয়ে জানানো যেতে পারে।

জুলাইয়ের ছোট একটি সহর “এনানো”। ১৮৮৩ সালের এই জুন। বেশ গরম প’ড়ে গেছে। ছোট সহরটিতে আজ কর্ণাটকালী স্থিতিত হ’য়ে এসেছে। ১০-সবাই তলস মধ্যাহ্নে সহরের বড় মাঠের দিকে চলেছে, মনে বিপুল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ নিয়ে ক্রমে-ক্রমে বিস্তার লোক মাঠে জড়ো হ’ল। মাঝখানে কাপড়ের তৈরী বিরাট একটা গোলা। তলার একটা লোহার বড়ি বাধা, তা ভিতরে স্থিতিত আঙুন ধুমায়িত। উল এবং খড়্ সেই আঙুনে উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ’ল। গল-গল ক’রে হোয়া উঠতে লাগল, বেগতে-বেগতে গোলাটা ফুলে উঠল।

...চারি দিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই শুষ্ক জনতা চঞ্চল হ’য়ে উঠল। বেলুন উপরে উঠছে। ক্রমশঃ উপরে উঠছে। আগুনি লোক লোক নিশ্বাসে দেখতে লাগল কেমন ক’রে সেই বেলুন একটু একটু ক’রে উপরে উঠে ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

...বেলুনটি সাত হাজার ফুট পর্যন্ত উপরে উঠেছিল, তার পর দশ মিনিট পরে যেখান থেকে উঠেছিল তার থেকে সেড় মাইল দূর মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দাবানলের মত এই খবর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা ও থেকে দলে দলে লোক এসে এই হুই ভাইয়ের গলার জরমাল্য পরিদিয়ে গেল।

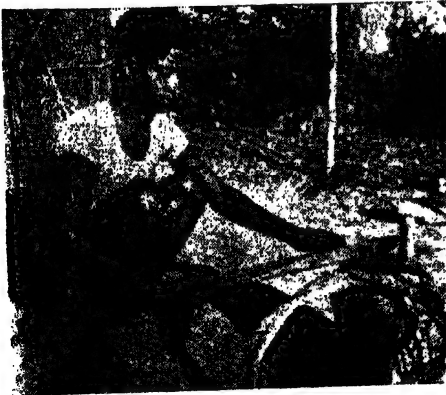
এই হুই ভাই কে জান? এরা হচ্ছেন বিখ্যাত কবী বৈষ্ণব বোসের ম’সোল কীরে এক এটোনে ম’সোল কীরে।

# শীতের সুখাদ্য নলেন গুড়

ক্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ-রায়

“গুণ দেখে অভিধান-কর্তা গুণধাম।  
খেজুর গাছেরে দিলে ‘হরিপ্রিয়া’ নাম।  
গুড়ের নিগুড় গুণ কি কহিব আর?  
সুখাসে আমোদ করে মধুর আগার।  
নুতন খেজুর গুড়ে দেবতার সঙ্ক।  
নাম শুনে জল সরে নোলা লক্ লক্।  
এপ্রকার সুখসেব্য আর নাকি আছে।  
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে।  
স্নাতে মন সুখদ ‘পরডা’ গুড় পেলে।  
অকৃতির কৃতি হয় লুচি দিয়ে খেলে।  
‘ভেক্সলের পাটালি’ যে খায় একবার।  
কখনও সে ভুলিতে না পারে তার তার।  
নুতন নলেন গুড় মণ্ডা মনোহর।  
পায়স পায়ুর সম অতি প্রেমকর।  
দেখ হে খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।  
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে।  
কার্তের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।  
মানবে শিখান প্রভু করুণা-কৌশল।”

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা কবিতা হইতে উপরিলিখিত  
কর লাইন উদ্ধৃত করিলাম। বহু কবি খেজুর গুড় সম্বন্ধে বহু  
কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু অত সুন্দর ও সরল কবিতা খুব কমই চোখে  
পড়িয়াছে। খেজুর গুড় বিশেষ করিয়া নলেন গুড় শীতের এই  
কর মাস অতি উপাদেয় সুখাত। খেজুর গুড় সকলেরই প্রিয়।  
সকলেরই প্রিয় এবং ভাল জিনিষ বলেই হয়ত খুব অল্প সময়ের  
জন্তে পাওয়া যায় এবং কয়েক দিনের জন্ত ব্যবসাতাও মন্দ চলে  
না। যরগুণী ফুলের মত এই ব্যবসাকে যরগুণী ব্যবসা বলা



ভালের পূর্বে ‘শিউলি’ একখানি ‘চাচদা’ বিলটে করে ধার করছে

যেতে পারে। কারণ, শীতকাল ব্যতীত খেজুর গুড় হয় না, পাওয়া  
যায় না, এবং বেশী দিন থাকেও না। আর মাস এই গুড় পাওয়া  
যায় না বলে এই কর মাস খেজুর গুড়কে কেন্দ্র করে ব্যবসাতাও চলে  
বেশ। অনেক জায়গায় অস্থায়ী হাটও বসে খেজুর গুড়ের। এই  
সব অস্থায়ী হাটে কেনা-বেচা মন্দ হয় না অল্প দিনের জন্তে।

হাটবাজার হতে কিনে এনে আমরা খাই কিন্তু অনেকেরই হয়ত  
জানি না কেমন করে তৈরী হয় এই গুড়। তাইই একটা মোটামুটি  
সচিত্র বিবরণ এখানে দিতে চেষ্টা করছি।

সহরের রাস্তায় কেবিরওয়ালারা হৈকে যায় “রস চাই—খেজুর  
রস”—কিন্তু পল্লীগামের টাটকা রস ঝারা একবার খেয়েছেন তাঁরা  
কোন আশ্বাসই পাবেন না, তৃপ্তি পাবেন না—সহরের ঐ কেনা রস  
খেয়ে। শীতকালে রস খাওয়া নিয়ে বেশ একটা ধূম পড়ে যায়—  
বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে। এই রস হতেই খেজুর গুড় প্রস্তুত হয়।  
খেজুর গুড় খুব সহজপ্রাপ্য অথচ আমাদের সকলের প্রিয়। বাংলা  
দেশের বাইরেও এর প্রচলন দেখা যায়। শীতকালে আমরা বাঙ্গালীরা  
খেজুর গুড় ছাড়া অন্য গুড় বড় একটা খাই না। খেজুর রসের মতই  
খেজুর গুড় সুস্বাদু। কিন্তু গুড় প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বা ঝারা রস  
হতে গুড় করে তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না—চিন্তাও করি না  
কোন দিন। সেই সব কথাই আলোচনা করব এখন।

ঝারা রস সংগ্রহ করে গুড় করে, তাদের বলে ‘শিউলি’।  
অল্প অল্প শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘শিউলি’ গাছ বড়তে আরম্ভ  
করে। অর্থাৎ গাছের গলার কাছ হ’তে খানিকটা পর্যন্ত  
পাতাগুলি কেটে পরিষ্কার করে, চোটে একটি কাঠি গুঁজে দেয়।  
এই কাঠিটাকে ‘নলি’ বলে। গাছ বড়বার সময় অর্থাৎ পরিষ্কার  
করার সময় ‘ঝুড়োমারা দা’ এবং পরে চাঁচবার সময় ‘চাঁচদা’ নামে  
একরকম দা ব্যবহার করে। এই দায়ের ধার নষ্ট হয়ে গেলে



এক জন ‘শিউলি’ গাছ কেটে ভাঁড় বা টিলি বাঁধছে এক মনে

বালি দিয়ে ধার দেওয়া হয়। যে কার্টের জিনিসটার উপর ধার দেওয়া হয় তার নাম 'বিলেট'। এই 'বিলেট'ের ওপর বালি ছিটিয়ে দা' যবে ধার দেয়। গাছের গলার কাছে পরিষ্কার করে যে 'নলি' গুঁজে দেয় সেই 'নলি' দিয়ে 'কোটা কোটা' রস পড়তে শুরু করে। সেই 'নলি'র নীচে ঠিলি বা ভাঁড় রাখা থাকে। এক কোটা এক কোটা করে ক্রমশঃ ভাঁড় রসে ভর্তি হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে এই রস চুরি হয় বলে ভাঁড়ের মধ্যে ধূতরার ফল ইত্যাদি দিয়ে বাধে শিউলিয়া। গ্রামাঞ্চলে এই সব রস খেয়ে অনেক বিপদে পড়ে যায়। শিউলিয়া যখন কাজে বার হয় অর্থাৎ গাছ বাঁধতে বা গাছ চীটে ঠিলি বাঁধতে ওঠে সেই সময় কতকগুলি জিনিস ব্যবহার করে। যেমন—'হু'রকমের দা,' ঠোঙা, মড়া, পাওটা, গলানী, নলি প্রভৃতি। কোমরে একটু পাতার তৈরী ঠোঙা থাকে, সেই ঠোঙার মধ্যে থাকে দা', নলি প্রভৃতি। গাছে উঠে সার উপর পা দিয়ে ঝাঁড়ায় তাকে 'পাওটা' বলে। এই 'পাওটা' বিচালি দিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে পাকিয়ে তৈরী করে। ঐ পাওটা গাছের গায়ে বেঁধে তার ওপর পা দিয়ে ঝাঁড়িয়ে থাকে। যে দড়িটি কোমরের সঙ্গে গাছে বাঁধে তাকে 'দড়া' বলে। ভাঁড়ে বা ঠিলির গলায় যে দড়ি বেঁধে গাছের সঙ্গে ঠিলি বোধান হয় তাকে 'গলানি' বলে। অনেক সময় শিউলিয়া এই 'গলানি' ব্যবহার না করে গাছের পাতা ছিঁড়ে ঠিলি বাঁধে। রাত থাকতে খুব ভোরে উঠে বিভিন্ন গাছ হতে ঠিলিগুলি খুলে এনে একত্র করে। যেখানে রস জাগ দিয়ে গুড় হয় সেই জায়গাটাকে বলে 'বান'। সেই 'বানের' ধারেই 'শিউলিয়া' খেজুরপাতা, তালপাতা প্রভৃতি দিয়ে কুড়ে করে শীতকালটা সেখানেই কোন রকমে কাটিয়ে দেয়। পরীক্ষকের সকালে ছেলে-বুড়োর ভাঁড় জমে এই সব 'বানে' রসের সোভে, আন্তনপোয়ামও চলে সেই সঙ্গে আরও চলে নানানতর যুথরোচক গরু আলাচনা।

'বানে' রসভর্তি ঠিলিগুলি এনে মাটির পাত্রে ঢেলে শিউলিয়া জাল দিতে শুরু করে। পাশাপাশি হাতিনটি মাটির পাত্র থাকে।



গুড় জাল দিচ্ছে 'শিউলি', এ-পাশে একটু 'রস' পাবার আশায় ছেলের দল জড়ো হয়েছে 'বানে'

একটি হাতার মত জিনিস দিয়ে রস জাল দিতে শুরু করে এবং গাধ উঠলে সেই হাতা দিয়ে গাধ ফেলে দেয়। এই হাতাকে শিউলিয়া 'গুড়' বলে। শিউলিয়া রস বসে 'গুড়' দিয়ে রস নাড়ে, একটি পাত্র হ'তে আর একটি পাত্রে তোলে এবং অবস্থা, প্রয়োজন ও চাহিদামত গুড় করে। গুড় তিন রকমের—সার গুড়, মাত বা বোলা গুড় এবং পাটালি গুড়। 'বানে' যখন গুড় জাল দেওয়া হয় তখন গাছে চারিদিক আমোদিত হয়ে ওঠে। মাত বা বোলা গুড় প্রয়োজন হলে শিউলিয়া অবস্থা বুঝে ঠিলিতে ঢালে আর সার গুড় প্রয়োজন হলে আর একটু ঘন হলে ঠিলিতে ঢালে। পাটালি গুড়ের প্রয়োজন হলে ঘন না হওয়া পর্যন্ত অবস্থা বুঝে শিউলিয়া 'বোজ-কাঠি' দিয়ে বাঁটতে থাকে। অনেককাল ধরে বাঁটার পর সময় বুঝে কাপড়ে বা চাটাইয়ে ঢেলে পাটালি গুড় তৈরী করে। জাল দেওয়ার পাত্রের গায়ে যে গুড় লেগে থাকে সেই গুড় 'কিম্বুক' দিয়ে চীটে নেয়। এই ভাবে গুড় প্রস্তুত করে নিজেরা হাটে বা পাড়ায় পাড়ায় খুচরো বিক্রয় করে আবার অনেক সময় দালালরাও কিনে নিয়ে যায়। শিউলিয়া সারা বৎসর বসে থাকে এই কয়েক মাসের আশায়। এই কয়েক মাস শিউলিয়া পরিশ্রম করে, কষ্ট করে গুড় প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রী করে সামান্য কিছু অর্থ পায় বটে কিন্তু আমানেরও কম আনন্দ দেখে না। এই ব্যবসায়ী ছোট হলেও চাহিদা আছে মরুমতী ব্যবসা বলে।

একটি মরুমতীতে অর্থাৎ আশিন মাসের মাঝামাঝি হ'তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কয় মাসে দেখা গেছে, গড়পড়তা এক একটি খেজুর গাছে 'হু' মণ রস পাওয়া যায় এবং সেই রস হতে আন্দাজ দশ সের গুড় হয়।



অনেক পরিষ্কার বাজারে পাটালি গুড়ের দর কষাকষি করছে



# বিবেকানন্দ স্টোত্র

সুমণি মিত্র

৮

ধূলোর ধূসর এই মল্ল-পৃথিবীতে  
যুক্তির ঢাকি-কাঠি নিয়ে  
ভগবান সত্যি আসেন  
আমাদের মতো এই এতটুকু হোয়ে ।

তঁার এই অবতার-সীলা  
অবিকল মানুষের মতো,  
তাই তঁাকে চিনে ওঠা দায় ।  
'সেই কুখ্য, তৃষ্ণা, রোগ,  
কখনো বা ভয়...' ১

ঠিক এই আমাদেরই মতো ।  
'ব্রহ্মপরাংপর রাম'  
'দশরথজী কি বেটা' তাই ; ২  
'যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই রামকৃষ্ণদেব  
শ্রেয় 'পরমহংস মশাই' ৩

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাসূত ।

২। 'অবতার' যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না ; গোপনে আসে, হুঁ-চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে । রাম যে পূর্বজন্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন ঋষি কেবল জানতো । অজ্ঞাত ঋষিরা বোলেছিল,—'হে রাম, আমরা তোমাকে পূর্বজন্মের ব্যাটা বোলে জানি ।'  
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাসূত । ২য় ভাগ । ২২পৃঃ ।

৩। যমিও ঠাকুর নিজের স্বরূপ প্রকাশ কোরে বোলেছিলেন—  
'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইলানী রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্তে অবতীর্ণ হোয়েছে' ভাগবেও সে-দুগুণে লোক তঁাকে 'পরমহংস মশাই' বোলেই জানতে ।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মাহুবা তদ্ব্যাক্রান্তম্ ।  
পন্ন ভাবমজানন্তো মম তৃত্বমহেশ্বরম্ ।" ৪

অবতার-কল্প বার, নিত্যসিদ্ধ মহামারা বখী  
পৃথিবীর কুসুকেতে ধবংসে বার্য মুহু করে,  
অতটুকু দেহের ভেতরে  
অসীম চৈতন্য দেখে  
প্রাণভোরে হাতজোড় করে ;  
মনটাকে নভজাহ্ন করে  
নিজেকে ফুলের মত নিবেদন করে তাঁর পায় ।  
অমনি প্রচণ্ড 'সল'  
বাতারাত্তি 'পল' হোয়ে বার্য ।  
ঠিক ওরই জাতভাই নরেন্দ্রনাথ  
বিবেকানন্দ হোরে পৃথিবী কাঁপায় !

৯

এ ভারী মজার,

"Whenever this world of ours,  
On account of growth,  
On account of added circumstances,  
Requires a new adjustment,  
A wave of power comes,...  
God understands human failings  
And becomes man  
To do good to humanity." ৫

যখন ধর্মের গ্রানি পুণীড়িত হোয়ে  
সনাতন সভ্যতার কঠরোধ করে,

৪। "আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হোলেও মানুষের দেহ আশ্রয় করি বোলে মূঢ়গণ আমার (আকাশ-কল্প) পরমাত্মতত্ত্ব না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে ।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রাজযোগ । শ্লোক ১১ ।

৫। আগে 'সেট পল'-এর নাম ছিলো 'সল' । জোরান বয়েসে 'সল' এত প্রচণ্ড তেজী ছিলেন যে, বীতর শিষ্য 'ষ্ট্রিকেন'কে পাখর ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেঁতলে মেরে কেসেছিলেন ; এমন কি, বীতর সম্প্রদায়কেও মেরে কেসবার ছোটা কোরেছিলেন । কিছু হঠাৎ একদিন ভগবৎদর্শন হোয়ে 'সল' একেবারে বদলে গেলেন । সেই থেকে তাঁর নাম হোলো 'পল' । এই মহাত্মাও মহাপণ্ডিত 'সেটপল' যদি খুটানখবর না আসতেন, তাহলে খুটানখবর বহু কাল আগেই জগৎ থেকে লুপ্ত হোরে যেতো ।

৬। 'যখন আমাদের এই পৃথিবীতে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং নোতুন নোতুন অবস্থাক্রমের দরশন নোতুন নোতুন সামাজিক শক্তি-সামন্ততের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ এসে থাকে,... My Master (পৃঃ ১) 'ভগবান মানুষের দুর্বলতা বোয়েন আর তারই কল্যাণের জন্তে মাহুয়রূপে অবতীর্ণ হন ।' Bhakti-yoga (৪৬ পৃঃ)

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-বুদ্ধ সেই বায়বীশ  
ত্রিগুণাশ্রিতা তাঁর মহাশক্তি আজর কোরে  
'ব্রহ্ম' কিংবা 'কামারপুত্রে'  
অকস্মাৎ দেখান হন।  
নিত্যবুদ্ধ আত্মা ঐ 'নিত্য-সিদ্ধ' গণ,  
পার্শ্ব কিংবা স্বামিনী, সেটপল  
এই সারথির হাতে বহুৎ হোয়ে  
কুরুক্ষেত্রে ধ্বংসে স্তব্ধ হোয়ে শোনে,—

"বদা বদা হি ধর্মস্তা দানির্ভবতি ভারত !  
অভ্যুপানমধর্মস্তা তদাশ্বানং স্তজাম্যহম্ ।  
পরিভ্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ হৃঙ্করাম্ ।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।" ৭

তবু প্রসন্ন ভাগে,—  
উনবিংশ শতাব্দীতে কেন  
কোলকাতার কুরুক্ষেত্রে  
'পাকব্রহ্ম' মহাশক্তি ৮ বাজে ?

১০

জবাট্টা শোনো তবে  
'নিত্য-সিদ্ধ' স্বামিনীরই যুগে,  
'অবতার-কল' বিনি  
নিত্যবুদ্ধ আত্মা ঐ  
অবতীর্ণ হন যুগে যুগে ।—

"To-day,  
Man requires  
One more adjustment  
On the spiritual plane ;  
To-day,  
When material ideas  
Are at the height of their glory and power,  
To-day,  
When man is likely to forget his divine nature,  
Through his growing dependance on matter,  
And is likely to be reduced  
To a mere money-making machine,  
An adjustment is necessary ;

৭। "হে ভারত ! যখন ধর্মের গ্রানি ও অধর্মের অভ্যুপান হয়,  
তখন আমি নিজেকে সজ্ঞন কোরি। সাধুদের রক্ষা, পাণ্ডিদের  
হৃঙ্করনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্তে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই"  
—ঐমন্তগবদগীতা ৪র্থ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক।

৮। কুরুক্ষেত্রে ধ্বংসে ঐক্য এই নিবল্যখে ফুৎকার  
দিয়েছিলেন। 'পাকব্রহ্ম' নামক দৈত্যকে বধ কোরে এই লক্ষ লাভ  
কোরেছিলেন বলে এর নাম 'পাকব্রহ্ম'।

The voice has spoken,  
And the power is coming  
To drive away  
The clouds of gathering materialism.  
The power has been set in motion  
Which, at no distant date,  
Will bring unto mankind  
Once more  
The memory of its real nature,...

Now, my brothers,  
If you do not see the hand,  
The finger of Providence,  
It is because  
You are blind,  
Born blind indeed." ৯

১১

'আঠারো-ছোত্রিশ' শালে  
কর্তব্য-বিমূঢ় এই সংসার-বিকৃত শতাব্দীকে ১০  
প্রকৃতির প্রসববেদনা  
নিরুপায় হোয়ে  
নাড়ি ছিঁড়ে ছুঁড়ে মিলে একটি শিল্পকে।

৯। "আজ-কাল আবার আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্বয়ের প্রয়োজন  
হোয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেখাছি জড়ভাবগুলোই দারুণ গৌরব ও  
শক্তির অধিকারী ; আজ-কাল লোকে ক্রমাগত জড়ের ওপর নির্ভর  
কোয়ে কোয়ে নিজের ব্রহ্মভাব ভুলে গিয়ে অর্ধোপার্জক স্ববিধেয়ে  
পরিণত হোতে বসেছে, এখন আর একবার সম্বয়ের প্রয়োজন হোয়ে  
পোড়েছে। সেই বাণী উচ্চারিত হোয়েছে,—সেই শক্তি আসছে, যা  
এই ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেথকে অপসারিত কোরবে। সেই  
শক্তির খেলা আরম্ভ হোয়ে গ্যাছে, যা অজ্ঞানদের মধ্যেই হাল্কাবকে  
তার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"—My Master  
( পৃ: ১২ )।

"এখন যদি তোমরা বিধাতার মঙ্গল-হস্ত দেখতে না পাও, তবে  
তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মাক।"—Lectures From Colombo  
to Almora ( পৃ: ১৮৭ )।

১০। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০০—১৮৭৫)  
ঐতিহাসিকেরা 'সংসার-যুগ' বোলে উল্লেখ কোরেছেন। সংসার-যুগের  
প্রবর্তক রাজা রামমোহন ছাড়া, তাঁর পরবর্তী সংসারকণণ সকলে  
কলসনীয় অহুসরণ কোরে এতই শক্তিকর কোরেছিলেন যে, কোয়ে  
কিছু গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অহুসরণ ধর্মমত প্রচার  
পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অহুসরণ এবং প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের মজ্জা  
অকাষণ অভিশাপবর্ণ—পরবর্তী কালের শক্তিশীল সংসারকণের  
একমাত্র পেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

রাজধানী থেকে বহুদর  
আড়ম্বরহীন ঐ 'কামারপুকুরে'  
বাঁশ-বটু-খেজুরের ছায়ায় মাহুঘ  
সেদিনের পল্লীজীবন  
আত্মকে প্রাণ থেকে ছেড়ে  
ছুটে যায়নিকো ঐ আপাতমধুর  
বিজাতীয় সভ্যতার মরীচিকা-মোহে।  
বিশ্বাসের স্থান-ছায়াতে  
পদ্মাসনে বোসেছিলো পূর্ণকাম হোসে।

এইখানে ঠাকুর এসেন।  
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে  
'সত্যযুগ' ১১ ভূমিষ্ঠ হোলেন।  
শতাব্দিনিতে তাঁর জন্মবার্তা বিবোধিত হোলো;  
মৃত্যুবার্তা বিবোধিত হোলো  
'সম্মেহ-যুগের', ১২  
তাল-কানা, হাল-ভাল্লা, খান-টানা 'সম্মেহ-যুগের'।

১২

ওধু তাই নয়,  
'নিরাকার-বাদী গোপীদেব' ১৩  
অন্তঃস্থ হৃদয়  
এতদিনে হোলো পূর্ণকাম।  
এতদিনে ভুবনেশ্বর  
তাদের ব্যাকুল ডাকে সাড়া দিয়েছেন;

১১। স্বামিজী বলতেন,—“বেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব।...তিনি বেদিন থেকে জন্মেছেন, সেই দিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেহে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নিধনের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর কোরে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাসভজন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, খৃস্টান-হিন্দু ইত্যাদি সব চ'লে গেল। ঐ যে ভেদভেদের লড়াই ছিলো, তা অস্ত্র যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বজ্র সব একাকার।”

—পত্রাবলী (১ম ভাগ। পৃ: ৪৭ ও ২য় ভাগ। পৃ: ৪৩)

১২। এখানে 'সম্মেহ-যুগ'কেই আমি 'সম্মেহ-যুগ' বলে উল্লেখ করেছি। কেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারের আবেগে পড়ে কোন্ পথে যাবো, আমরা ঠিক কোরে উঠতে পারি নি, পাঁচাত্তরের প্রথম আলোতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো; সত্য জাতীয় দিগ্ভ্রম উপস্থিত হোসেছিলো; প্রেমের পর প্রেম এক সম্মেহের পর সম্মেহ পূজীভূত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনটাকে একেবারে বিভ্রান্ত কোরে দিয়েছিলো। জাতীয় জীবনের এই পশরাজ্যের মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতীর্ণ হোসেছিলেন।

১৩। “এক মতে আছে বশোদাদি গোপীগণ পূর্ণরূপে নিরাকার-বাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি না হওয়াতে ব্রহ্মাবন-লীলায় প্রকৃষ্ট ল'য়ে আনন্দ।”—এ হোলো ঠাকুরের কথা। ‘পদ্মপুরাণে’  
‘কথার নথির পেরেছি।—

প্রেমের বাঁধনে আজ অনাদি অসীম  
খেচ্ছায় ধরা নিয়েছেন।

‘গলাই’কে বিবে  
‘বালালীলা,’ স্বক হয কামারপুকুরে।  
গ্রামবাসিনীরা  
নন্দ ও শান্তভীর চোখে ধুলো দিয়ে  
গলায়ের কাছে এসে ভাগবত-পাঠ শুনে যায়।  
মনে করে কাজ আছে, আসবে না,

তবু

অসীম আনন্দ যেন  
হাত ধোরে টেনে নিয়ে যায়!  
শ্রোতৃবিশ্নীর মত ছুটে এসে তাই  
মহাসত্তায় ওরা মিশে বেতে চায়।

১৩

‘লাহ’দের ‘প্রসন্নময়ী’ ১৪  
অপূর্ব প্রেমোদ্যমিতার  
ধর্মার্থ, গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবানে  
একাকার কোরে দিয়ে অজ্ঞানবন্দনে  
অন্যকে নেড়ে-চেড়ে  
খুশিমতো আশ্বাস করে।  
বেমাশ্রম বোলে বসে তাই,—  
“বলতো গলাই,  
সময়ে-সময়ে তোকে কেন  
ঠাকুরের মতো মনে হয়?  
হ্যাঁয়ে সত্যিই।”  
‘শ্রুতভাবে আশ্রমীলা’ পাছে কীস হয়  
পাণ্ডার অস্ত্র কথা তোলে।  
তাতে কি আজ্ঞা-জ্ঞানী ভোলে?  
—“সে বাই বোলিস,  
তুই যে মাহুঘ নাস  
এটা নিশ্চিত।”

“ব্রহ্মানন্দে পূর্ণাহং তেনানন্দেন তুষ্টবীঃ।

তথাপি শূন্যমাত্মনং যন্তে কৃষ্ণতং বিনা।”

আমিও ঐ কামারপুকুরবাসিনীদের নিরাকার-বাদী গোপী বোলতে চেষ্টেছি। ঠাকুরকে অবতার বোলে, কোন্ যুক্তিতে ওদের সাধারণ জীব মনে কোরতে পারি বোলন? অবতারের বালা-লীলা আশ্বাস করার অধিকার ধরা পেলো, তাদের খেলো ভাবলে ঠাকুরের অবতারকে বিশ্বাস নেই বোলতে হবে। এখন রামকৃষ্ণকে যদি কোনোক্রমে রাম কিংবা কৃষ্ণ ভাবতে পারেন, তাহোলে আপনারাও বহুদকে ওদের গোপী বোলে গ্রহণ কোরতে পারবেন আশা করি।

১৪। কামারপুকুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বর্দাস লাহার বিবদা

১৫। নেয়ে।



নইলে ওদুয়ের তেলেকে  
দেবীর নৈবেদ্য দিয়ে গুজো করে কেউ ?  
'বিশালাক্ষী' ১৫ ভেবে কেউ  
গল-বস্ত্রে প্রণিপাত করে ?

১৪

আর ঐ 'চিহ্ন শাখারি'ও ১৬  
কৃষ্ণকান্তবিরহিণী  
প্রসন্নের সমগোত্রীয়।  
একদিন গদাইকে ধোরে  
অতদীক্ষুসের হারে  
সজ্জিত কোরে,  
একটাড়া মিষ্ট নিয়ে কিনা  
গোপীভজনবল্লভ কৃষ্ণকিশোরের স্তব করে !  
সত্যোজ্ঞাত সিদ্ধার্থকে দেখে  
মহাশুবি 'অসিতের' ১৭ মতো  
অসহ আনন্দ-বেগনার  
চিনিবাস হাহাকার করে,—  
"বীচবো না বেশি দিন,  
মোরে যাবো কবে।

১৫। কামারপুকুর থেকে হু'মাইল তফাতে আছড়ে। আছড়ে  
'বিশালাক্ষী' দেবীর মন্দির। দেবীর গুজো নিয়ে চোলেছেন  
প্রসন্নময়ী। গদাই তাঁর সঙ্গী হোলো। কাঁকা মাঠ দিয়ে বেতে  
বেতে গদাধর 'বিশালাক্ষী' দেবীর মহিমাকীর্তন কোরতে কোরতে  
হঠাৎ সমাবিষ্ক হোয়ে গেল। প্রসন্নময়ীর মনে হোলো,  
বে'বিশালাক্ষী'কে দেখতে চোলেছি, তিনিই আগবাড়িয়ে  
আসেননি তো ?—ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো ?" গদাধরের কানে  
দেবীস্বর শোনাতে লাগলেন তিনি। নিঃসঙ্কেটে ওর পায়ের ধুলো  
নিলেন, দেবীর নৈবেদ্য খেতে দিলেন গদাইকে। তাঁর হৃদবিস্ময়,  
গদাধরের মুখ দিয়ে মা'ই সব খেলেন।

১৬। ঠাকুরের বাল্যলীলার আর একজন অন্তরঙ্গ এই চিহ্ন  
শাখারি। এঁর আসল নাম হোলো জিনিবাস শাখারি। ইনি  
ঠাকুরের চরে বয়েসে অনেক বড়ো হোলো ঠাকুরকে দেবতাস্ত্রানে  
ভক্তি ও গুজো কোরতেন। ঠাকুর এঁকে চিনিবাসদাদা বোলে  
ডাকতেন।

১৭। অশ্বঘোষের 'বৃক্ষচরিত্রে' মহর্ষি অসিতের এই হাহাকার  
লিপিবদ্ধ আছে। সিদ্ধার্থের জন্মের পর মহর্ষি অসিত তাঁকে  
দেখতে এসেছিলেন। সত্যোজ্ঞাত শিশুকে দেখে তাঁর চোখ অজস্র  
হওয়াতে রাজা শুকোমন অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হোয়ে প্রশ্ন  
কোরেছিলেন,—"বাব জন্ম জ্যোতির্ধর, তাকে দেখে আপনার হৃ-চোখে  
অজ্ঞ সঞ্চিত হোলো কেন ?" উত্তরে মহর্ষি বোলেছিলেন,—"আমি  
স্বয়ং বঞ্চিত হোলাম বোলে কাঁদছি, অজ্ঞ কারণে নয়। আমার  
পরলোক যাত্রার দিন বনিয়ে এসেছে, এমন সময়ে কিনা ভগবান  
তথাগত জন্মলেন। এঁর ধর্ম ব্রহ্ম কোরতে পারবো না বোলে  
জিনিবাসকেও আমি বিপত্তি বোলে মনে কোরছি,—ভাই কাঁদছি।"

মর্ত্যে ভোমার কত লীলাখেলা হবে !

—সেলীলা দেখবে কত লোক !

দেখতে পারো না শুধু আমি।

ভা-সে-বাই-হোক,

তবু যে একটুখানি

চিন্তে দিয়েছে। তুমি

এইটাই পাবের পাথের।"

তাই আজ চিহ্ন শাখারি  
সমস্তা-সম্মূল এই বীভৎস সঙ্গার,  
কেন জানি তুচ্ছ মনে হয়!

গদাইকে কাঁধে তুলে  
দুর্ব্বহ জীবনকে তার  
একেবারে হাকা মনে হয় !

"আচ্ছা গদাই,

তুমি যে আমার বনো চিনিবাসদাদা,  
তাহোলে তো আমি চিহ্ন নই,  
তাহোলে তো আমি 'বলরাম'।"

প্রেমোদ্রত জীবাত্মার  
কি মধুর নিষ্পাপ প্রলাপ !

• • •  
বারা বলে ওটা পাগলামি,  
গোলাবোগ তাদেরই মাথার !  
'বাদুলী' ভাবনা বস্ত্র-নীতি বদি মানি,  
প্রলাপ কি সত্যের দৈশব নয় ?

১৫

কে বোলেছে চিহ্ন বোকারাম ?

আসলে তো সেই বুদ্ধিমান।

আমরাই বোকা !

বোধাতীত ভগবান

ছটাকে-বুদ্ধি দিয়ে

আমাদের বোকা বানালেন !

স্বামিজীর মত বিদ্বান,

ভেবে দেখো, এ কথাটা কি খেদে বলেন,—

"He is fooling us with little brains."

প্রসন্ন বা চিনিবাস স্বচ্ছন্দে বোটা বোলে গ্যালো,

অনেক স্বপ্নের পর শেষে,

জীবনের শেষ-বাগে এসে

খিবেকানন্দ কিনা তাইতেই দাগা বোলালেন।—

১৮। "ভগবান আমাদের ছটাকে-বুদ্ধি দিয়ে বোকা বানিয়ে  
Letters ( ৩: ২১৫ )

“ও হ্রীং ঋতং যমচলো গুণজিগ্গৎনভাঃ  
ন-স্তশিবঃ সৰুগণ্য তব পাদপদ্যম্  
মো-হন্যং বহুকৃতং ন ভজ্যে যত্নোহহং  
তমাশ্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো । ১।

ভক্তিভগবৎ ভজনং ভবভেদকারি  
গচ্ছন্ত্যঃ স্তবপুলাঃ গমনায় তথ্যং ।  
বক্তে দ্বিগুতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ  
তমাশ্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো । ২।

ভেদভরতি তরসা হৃদি তুণ্ডতৃণাঃ  
বা-গে কৃতে স্বতপথে হৃদি রামকৃষ্ণে ।  
ম-স্ত্যামৃতং তব পদং মরশোমিনাপং  
তমাশ্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো । ৩।

কৃত্যং কবোতি কলুষং কুহকাস্তকারি  
কাল-স্ত শিবঃ স্তবমল্যং তব নাম নাথ ।  
ব-স্মাদহং ভ্রমরণো জগদেকগম্য  
তমাশ্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো । ৪।

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ে বস্তু প্রেমপ্রবাহঃ  
লোকান্তীতোহ্যপ্যহং ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।  
ত্রৈলোক্যোহ্যপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ  
ভক্ত্যা জ্ঞানং কৃতবরবপুঃ সীতয়া বা হি রামঃ । ৫

স্বকীকৃত্য প্রেময়কলিতবাহবোণং মহাশুভং  
হিবা রাজিঃ প্রকৃতিসংজ্ঞামকৃতামিমিশ্রাম্ ।  
গীতং শাস্ত্রং মধুরমপি যঃ সিংহনামঃ জগজ্জ  
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্থানীয়ম্” ৬। ১১১

১১। “ও হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণ্য  
দোহর গুণের দ্বারা স্তবের বোণ্য। যেহেতু আমি তোমার  
জাননিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা  
করিছি না, সেই হেতু হে দীনবন্ধু! তুমিই আমার আশ্রয়। ১।  
সার্বভৌমকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য এক ভজন—এতলো  
কসেই সেই মহান ব্রহ্মপ্রাপ্তি হোয়ে থাকে। কিন্তু একথা  
ন বোললেও আমার স্বপ্নে কিছুমাত্র প্রতিভাত হোচ্ছে না। অতএব  
দীনবন্ধু! তুমিই আমার আশ্রয়। ২। হে রামকৃষ্ণ! সত্যের  
স্বরূপ তোমাতে যে অমূল্য হয়, তোমাকে পেয়েই তার  
কামনা পূর্ণ হয়, হতভাগ্য সে শীতলই রাজ্যভগবৎ অতিক্রম  
করে। মরণশীল এই নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার ঐ পাদপদ্ম  
দৃষ্টি তরলকে নাশ করে তার। অতএব হে দীনবন্ধু! তুমিই  
আমার আশ্রয়। ৩।

হে প্রভু! তোমার মাদারূপকারী মঙ্গলর এবং অতি পবিত্র  
নাম (‘ক-বাহ ভক্তে অর্থাৎ রামকৃষ্ণ’) পাপকও পুণ্য করে

১৬

নিজেকে ইঙ্গিত কোরে ‘প্রথিত পুরুষ’  
ঐ শোনো কি কথা বলেন,—

“মহাবলীলা কেন জানো?  
মাছুষের মুখে তাঁর কথা শোনা যায়,  
শোনা যায় তাঁর গুণগান,  
মাছুষের কাছে এসে তাই  
বসাবাসন কোরে বান।  
যদিও সর্বত্র ভগবান,  
তবু বিনা অবতারে  
জীবের মেটে না প্রয়োজন,  
ভক্তের ভরে নাকো প্রাণ।  
অর্থ বিনাশ করা ছাড়া  
ভক্তকে দিতে হয় সাড়া।  
ভক্তেরই ডাকে তিনি চোদোপো’ হোয়ে  
পৃথিবীতে লীলা কোরে বান।

নরকপে কাছে পেলে  
তবে তো ভক্তের  
পরিপূর্ণ হয় মনস্কাম।  
অনাদি অনন্তকে তাই  
ভক্তেরই স্তবার্থে  
ছোটো হোতে হয়।  
হৃদয়ের সূর্য কি চোখে কাক সয়?  
সূর্যোদয়ের ঐ শিশু-সূর্য কি  
মাছুষের চোখ কলসায়?  
বরং ভূমি তার চোখে।  
হৃৎচোখ ছুড়ায় যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে।  
সূর্যোদয়ের ঐ সূর্য যেমন  
নিজেকে নরম কোরে রাখে,  
ভক্তের ধাতে সয় রাতে,  
অনাদি অসীম তাই  
ঐশ্বর্য-রহিত হোয়ে  
অবতীর্ণ হন মর্ত্যলোকে।

ভায়। হে জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য! যেহেতু আমি নিরাশ্রয়,  
সেই হেতু হে দীনবন্ধু! তুমিই আমার আশ্রয়। ৪।

যাঁর প্রেমপ্রোত চণ্ডাল পৃথক অপ্রতিহতবগ, অর্থাৎ চণ্ডালকেও  
যিনি প্রেমদ্বারা কোরতে কুণ্ঠিত হননি, যিনি অমায়িক-স্বভাব হোলেও  
লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেননি, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই  
ত্রিলোকেও যাঁর মহিমার তুলনা নেই, যিনি সীতার পরম প্রেমাস্পদ,  
যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠসেহ ভক্তিধরুপিনী সীতার দ্বারা  
আবৃত। ৫। বেকক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভীষণ প্রলয়তুল্য ছফকার  
স্বরূপ কোরে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের যৌবনর অদ্বৈতমিশ্রণ অজান-  
রজনীকে ঘুর কোরে দিয়ে, শাস্ত্র ও মধুর গীত অর্থাৎ গীতশাস্ত্র  
সিংহনামে গজ্ঞান কোরে বোলছিলেন—সেই বিখ্যাত পুরুষই ইদানীং  
রামকৃষ্ণপে অবতীর্ণ হোয়েছেন। ৬। —শ্রীরামকৃষ্ণভোজাশি।

কে বোলেছে অবতার শুধু দশজন ?  
চরিত্র অবতার আছে 'ভাগবতে'।

সর্বশাস্ত্রময়ী ঐ গীতা মতে

ব্রহ্ম স্বয়ং

প্রয়োজন অনুসারে

অসংখ্য অবতারে

যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

'ধর্মে বেই জমে গ্রানি

তখন নিজেই আমি

নররূপে কোরি হে স্বজন।'

স্বাপনের শেষপাদে

একথা সিহ্নাদে

বোলেছেন কৃষ্ণ স্বয়ং।

যদি বলা—রোগ-শোক যার

ক্ষিদে-তেষ্টা আমাদেরই মতো,

কি কোরে বলবে অবতার ?

তবে একথাটা শুনে রাখো,—

পঞ্চভূতের এই কীদে

স্বয়ং ব্রহ্ম পোড়ে কীদে।

সীতার বিরহে রাম

কৈদেছেন কত !

নারায়ণ বরাহাবতারে

নিজের স্বরূপ তুলে

ছানা-পোনা খাওয়াতেই রত !

শিবের ত্রিশূলহস্ত হোলে

তবেই স্বধামে যান ঢোলে।

অবতার চিনে ওঠা দায়।

নিজেকে চাকেন তিনি নিজেরই মায়ার !"

১৭

সম্বেদ-বাদীকে তাঁর পাণ্ডা প্রশ্ন এই—

"কি কোরে জানলে তুমি অবতার নেই ?

কামনা-মলিন জীব কি বুঝবে তাঁকে ?

কাম আর কাঞ্চন নিয়ে যারা থাকে,

তারা কি বুঝবে তাঁর দাম ?

'ব্রহ্মপরাংপর রাম'

তাঁকে কে বুঝেছে বলো সেটা ?

বারো জন স্ববি ছাড়া

সকলে বোলেছে তাঁকে

শ্রেয় 'দশরথজী কি বেটা'।

কে তাঁকে বুঝেছে বলো তপস্বাবিনা ?

নররূপে নরবৎ নরদীপা কি না।

তাই বোলে আমাদের এই

অন্তত বুদ্ধি নিয়ে অবতার নেই,

—এ কথাটা জোর কোরে বলা ঠিক নয়।

তাঁকে যে চিনতে হয় তপস্বাবলে।

বড় মাছ চাও যদি চার ফ্যালো জলে।

মাখন চাও তো ছুধ মছন করো,

যেতী বাটো, তার পর হাত রাঙা কোরো,

সিদ্ধি সিদ্ধি বোলে চ্যাচালে কি হবে ?

সিদ্ধিটা কিনে এনে বেটে খেতে হবে।"

সংক্ষেপে তার মানে শ্রেয়—

'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই' প্রথিত পুরুষ'

'ইদানীং রামকৃষ্ণদেব'।

[ ক্রমশঃ

## ● মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য ●

### ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজি: ডাকে ..... ২৪

বাণাসিক " " ..... ১২

বিচ্ছিন্ন প্রাতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ) ..... ২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে

গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ

মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা

উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সভাক ..... ১৫

" বাণাসিক সভাক ..... ৭।

প্রাতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রাতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ..... ১৫

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ ..... ২১

বাণাসিক " " " " ..... ১০

বিচ্ছিন্ন প্রাতি সংখ্যা " " " " ..... ১৫

## অক্ষন ও প্রাক্ষণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমালতী গুহ-রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর সারদা দেবী। দীর্ঘ বিরহের পর স্বামীকে কাছে এসেছেন। তাঁর কাছে এ পরীক্ষা কিছু কম কঠিন ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সদস্যমানে উত্তরাণী হয়েছিলেন তিনি এতে। দীর্ঘ ৭৮ মাস পৃথক্ স্বামী-স্ত্রী একই ঘরে একই শয্যায় রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা হতে থাকলো সারদা দেবীর ঠাকুরের ঘন ঘন ভাবসমাধি ও ঈশ্বরোপলব্ধির অল্পকৃতি দেখে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, সারদা দেবীর এতে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কেন না—তাঁর ভাবসমাধি প্রায়ই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় আর সারদা দেবী ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করে অপরের সাহায্য নেন। এমন কি, রাতের পর রাত জেগে কাটান। কাজেই সারদা দেবীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় তিনি একে আবার নববস্ত্র-ঘরেই পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘ ৭৮ মাস জীবন সঙ্গে একত্রে বসবাস করে ঠাকুরের দুইটি মহান উদ্দেশ্য সাধন হল। একটি হচ্ছে স্বামীকে অল্পক্ষণ কাছে রাখার দক্ষ জীবন তৃপ্তি সাধন এবং তাঁর স্বামী সাধনে কি ভাবে পরিতোষিত করেছেন তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সর্বজীবের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর নিজেরই ঠিক মত হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা। এ দুইই তাঁর সার্থক হ'ল।

এবার ঠাকুরের চোঁটা হল তেরো বৎসর বয়সে সারদা দেবীকে তিনি যে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, তা শেষ করা। কাজেই তিনি সারদা দেবীর শিক্ষার ভার নিজ হাতে তুলে নিলেন। পূর্ব-জীবন ছোটো-খাটো কাজ থেকে সরাজের মোলায়েমতা, আবার খাটো চলা থেকে ঠাকুরসেবা, জনসেবা—সব। বাড়ীর কে যেন, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, পনের বাড়ী গিয়ে বাড়ী কখন কি ভাবে চলেতে হয়, অতিথির সেবা, মেজাজ

পূর্বাধিষিত ভক্ত বহুদূর সম্ভানজ্ঞানে পরিচর্যা, কিছুই বাদ দিলে না। এমন কি, হিসাবী হয়ে টাকার ব্যবহার কি ভাবে করতে হয়, গৌলান্দিক না দিয়ে হিসেব কি করে পরিচর্যা ভাবে রাখতে হয় তা-ও। তার পর বোঝালেন ঈশ্বর-সংবাদ। কল্পণ যেমন জন্মে চলে বেড়ায় কিন্তু মন থাকে তার ভাঙ্গার দিকে, যেখানে তার ডিরাখা থাকে তেমনি নিখুঁত ভাবে রাগা, ভাঁড়ার রাখা ও সংসার-সেবা কীকে কীকে মন বেন পড়ে থাকে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে। ঈশ্বরের কাছে ঘটা নাড়া, মজ পড়া, কিছুই নয়, শুধু পবিত্র অন্তরখানিই সব সব কাজের কীকেই যদি মনটিকে ঈশ্বরের প্রতি ফেল রাখা যায় তবে কাজকর্মের অবসরে যখনই একটু নিবিড় হয়ে বসে যায়, শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির মতই তা দগ করে জ্বলে ওঠে। তাঁর আনন্দপূর্ণ পাওয়া যায়। আরো একটি বড় কথা, সেটি হচ্ছে ভগবানকে পেতে হলে অহংশূন্য হতে হবে। ছুঁতে সূতো পরাতে হলে যেমন সামান্য একটু রোঁয়া থাকলে ছুঁতে সূতো টোকে না, তেমনি বিন্দুমাত্র অহং থাকলেও ঈশ্বরলাভ হয় না। নিজেকে কপূরের মত নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দিতে হবে, কিছুই আপনায় বলে রাখলে চলবে না। এই ছিল ঠাকুরের জীবন প্রতি শিক্ষার বাণী।

তাঁর এ বাণী সারদা দেবীর জীবনে কি ভাবে সফল হয়েছিল, ক্রমশঃ তাঁর জীবনালোচনায় আমরা তা জানবো। ঠাকুরের উপদেশ যে নীরস ছিল না, তার প্রমাণ মা নিজস্বশ্রুতি বলতেন, 'এ কালে ক্ষমার মধ্যে আনন্দের যেন পূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকতো। বীর, স্থির, উন্নতসে অন্তর যেন সব সময়ই পূর্ণ থাকতো।'

শুধু কঠোর কর্তব্য ও ঈশ্বরোপাসনায় ঠেলে দিলে পাছে সারদা দেবীর জীবন নীরস ও তিক্ত হয়ে ওঠে, তাই পরমহংসসেব মেয়ে, প্রেমে, তাঁর সুখ-সুবিধা ও অভাবের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সারদা দেবীর আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক বা ব্যক্তিগত তৃষ্ণা—কোনটাই তাঁর নজর এড়াতো না। জীবন প্রতি যেটুকু কর্তব্য তা স্বাভাবিক পালন করে ঠাকুর সারদা দেবীর কাছ থেকে তাঁর কর্তব্যগুলিও পূরোপুরি আদায় করে নিতেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করলেই পুষ্ট শস্য হয়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ছিলেন মহান আধার, কাজেই ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ-বাণী তাঁর অন্তরের মহান বৃত্তিগুলিকে এমননি ভাবে পুষ্ট হতে সাহায্য করেছিল।

অবগুণ্টিতা সরলা গ্রাম্যবধূ সারদা দেবীর মধ্যে ভবিষ্যৎ-জ্ঞেয় ঠাকুর যেন কল্যাণময়ী, জ্ঞানদাত্রী, মুক্তিদাত্রীর রূপ দেখতে পেরেছিলেন। তাই প্রায়ই ঠাকুরের মুখে শোনো যেতো, 'ও সারদা, সরস্বতী, এবার নিজরূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।'

সারদা দেবীর অন্তরচালা সেবা পেয়ে ঠাকুর গরম তৃপ্তি ছিলেন। তিনি বলতেন, 'এমন করে সেবা কি আর কেউ পারতো?' কিন্তু জীবন সেবা নিয়ে যে তিনি তাঁকে গভীর করেছিলেন, তা নয়। আদর্শ কর্তব্যপারায়ণ স্বামীর মতই জীবন প্রতি কর্তব্যপারায়ণ ছিলেন তিনি। একা ঘরে থাকলে পাছে সারদা দেবী ভয় পান, তাই একজন ব্রাহ্মসাক্ষী তাঁর কাছে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কখনো সেই ব্রাহ্মসাক্ষী না থাকলে ঠাকুর নিজের ঘরের দরজাটি খুলে রাখতেন ও মাঝে মাঝে অন্তর দেবার জন্য গুলার শব্দ করতেন। আবার ছোট্ট ঘড়টুকুতে সারা দিনরাত বন্দী থাকলে পাছে স্বাস্থ্য ও মন খারাপ হয়, তাই কাছাকাছি বাড়ীতে দুপুর বেড়াবার ও গল্প করবার

ব্যবহাও করে দিতেন। বলতেন 'বুনো পাখী—নইলে খাঁচার থেকে বেতে পারে।'

ঠাকুরের ভ্রাতৃপুত্রী লক্ষ্মীর সঙ্গে মা একত্র থাকতেন। প্রসাদ বণ্টন করার সময় ঠাকুরের তা লক্ষ্য থাকতো। তিনি কৌতুক করে বলতেন 'ওরে খাঁচার শুক-শারী রয়েছে, ওদের ছুটি ছোলা-টোলা ফল-মূল দিসু।' সকলে ভাবতো, সত্যিই বুঝি পোষা পাখীই রয়েছে। কিন্তু ঝাঁরা বুঝতেন, তাঁরা ঠাকুরের ইঙ্গিত অল্পসারে সারদা দেবীকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। সারদা দেবী এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, ঠাকুরের সজ্জা দৃষ্টি না থাকলে কত দিন হয় তো তাঁকে উপবাসেই কাটাত হত।

সারদা দেবী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে স্বামিসেবা, ভক্তসেবা করতেন। তাঁর পরিশ্রম অত্যধিক হয়ে উঠলে ঠাকুরের নজর এড়াতে না। ভক্তরা ধ্যান করতেন, তাদের গিয়ে তিনি বলতেন 'ওরে তোরা ঝাঁর ধ্যান করছিল, তাঁর যে কটি বেলায়ও লোক নেই।'

দ্বীলোকদের অলঙ্কার কত প্রিয় হয়, তাও ঠাকুর জানতেন। তাই সারদা দেবীকে কিছু অলঙ্কার গড়িয়ে দেবার ব্যবহাও করেছিলেন। কিন্তু শিখামহলে এই অলঙ্কার ব্যবহার নিয়ে নানা রকম সমালোচনা মার কানে বেতে তিনি সব খুলে ফেলেন। সে কথা আবার

ঠাকুরের কানে গেলে, তিনি বলেছিলেন 'সব কিছু ছেড়েছড়ে কত কষ্ট করেই ও যে এখানে রয়েছে এরা সব বোঝে না, তাই এসব বলে। এয়োদ্ধার লক্ষণ হচ্ছে অলঙ্কার, তা-ও পরবে না?'

সারদা দেবীর অন্তর্ভুক্ত করলে এমন কি মাথা ধরলেও ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার সাধন-ভজনে শৈথিল্য দেখলে বিরক্ত হতেন। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি জল ঢেলে সারদা দেবীর ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন।

ঠাকুর খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর কৌতুক বা রঙ্গরস কারুক হাঙ্গা করে তুলতো না। তিনি সরসতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ঈশ্বর-উপলব্ধির পথেই নিয়ে যেতেন। সারদা দেবীর অন্ত তাঁর কোন ব্যস্ততা বা ভাড়াভড়া ছিল না। কেন না, সারদা দেবী যে কত বড় শক্তির আধার, এ তিনি খুব ভাল করেই জানতেন।

একমাত্র দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া সারদা দেবীর সঙ্গে ব্যবহায়ে ঠাকুর যে স্বামিপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন তাঁর সম্যাসী-জীবনে, তা সচরাচর সংসারী জীবনেও বড় একটা চোখে পড়ে না!

পতিপ্রোমে তৃপ্তা স্ত্রী পতির আদর্শকেই নিজ আদর্শে রূপান্তরিত করে, পতিকে সর্বান্তঃকরণেই সাহায্য করে গেছেন। সারদা দেবী ভগবান রামকৃষ্ণের আপন স্ত্রী। তাঁর ব্যক্তিগত নিজস্ব বলে কোন কিছুই ছিল না। এমন কি, কোন কামনা-প্রার্থনাও নয়। যখনই

## মনের কথা

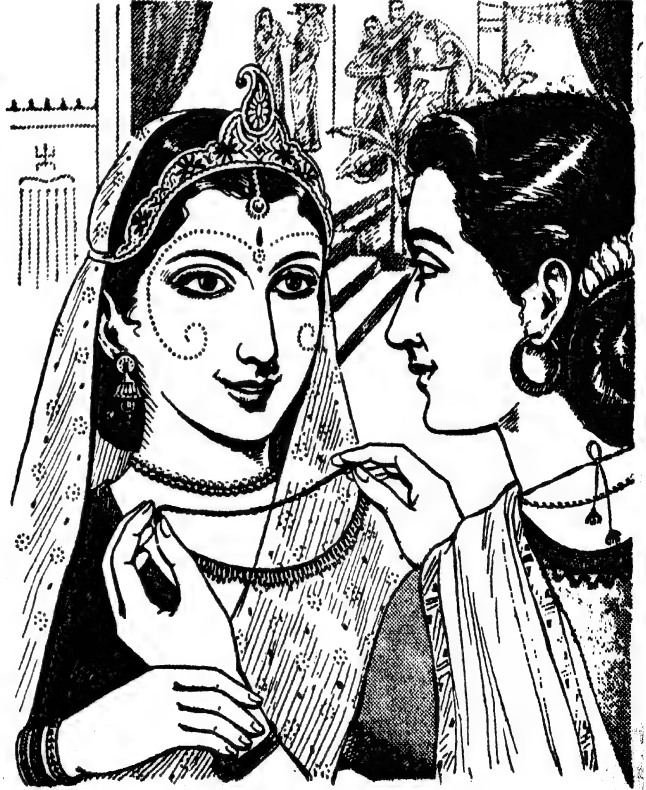
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিরাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দারিদ্ৰ্যবোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

মিনি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভরসারী  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



প্রার্থনা করতেন, বলতেন 'ভগবান, আমাকে চাঁদের মত শুভ্র নির্মল কর। চাঁদের যেটুকু কলঙ্ক আছে আমাতে যেন তা-ও না থাকে।'

সায়রা দেবী যখন দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সর্ব প্রথমে প্রশ্ন করেছিলেন 'তুমি কি আমাকে সঙ্গারপথে টেনে নিতে এসেছ?'

দীপ্তকণ্ঠ সায়রা দেবী উত্তর দিয়েছিলেন 'না তো! আমি তোমাকে তোমার ঈষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।'

এই মহীয়সী নারী যদি তাঁকে প্রকৃতই তাঁর ঈষ্টপথ সাহায্য না করে সঙ্গারপথে টানতে থাকতেন, তবে হয়তো ঠাকুরের পরমহংসদেব হওয়া হত না। উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধগতিতে বাধাহীন ভাবে তাঁর মন সহজ বহুদল সাবলীল গতিতে বিচরণ করতে বাধা পেতো। এই মহীয়সী নারীর আত্মতাগ ও অটুট সংঘমেই তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের সহজ উর্দ্ধগতি কোথাও বিলুপ্তও রুদ্ধ হয়নি। ঠাকুর সায়রা দেবীর অপূর্ণ সংঘম মুগ্ধ হয়ে নিঃশ্বাসে বলেছেন, 'ও যদি এমন না হ'ত তবে আমার সিদ্ধির পথে অন্তরায় হতো। ওর জন্তই আমার সব সম্ভব হয়েছে।'

দক্ষিণেশ্বর আসার কিছু দিন পর সায়রা দেবী একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বল তো—আমি তোমার কে?'

ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন 'তুমি? তুমি আমার বিজ্ঞানময়ী জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী।' বলেই আবার বিজ্ঞা অবিজ্ঞার অর্থ বিশ্লেষণ করতে বসলেন। কিন্তু সায়রা দেবী অন্তশত বোধেননি, মন দিয়ে স্বামীর পরসেবাই করতে লাগলেন।

পরসেবা অন্তে সায়রা দেবী যখন উঠে দাঁড়ালেন, ঠাকুর চিপ কর সায়রা দেবীকে প্রণাম করে বসলেন। বিজ্ঞানপিণী জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকে যেন তিনি তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলেন।

অনভ্যন্ত সায়রা দেবীর সারা অন্তর যেন সঙ্কোচে ছিঃ ছিঃ করে উঠলো। বললেন, 'তুমি এ কি করলে? আমি যে তোমার শ্রীচরণের দাসী।'

মধুর কণ্ঠে ঠাকুর উত্তর দিলেন 'দাসী কেন গো? তুমি যে আমার আনন্দময়ী। তুমি আর মন্দিরে ঐ বৌদ্ধিতা মা আর আমার নহবতঘরের গর্ভধারিণী মায়েতে যে কোন প্রভেদ নেই। তোমরা যে অভিন্না।'

মন্দিরের দেবী মা আর নহবতের গর্ভধারিণী মায়েতে যেন সায়রা দেবীর সাথে কোন তফাৎ নেই, তাই দেখাতে ঠাকুর ঠিক করতেন কালীপূজা করবেন। প্রতিবৎসরই কালীমন্দিরে কালীপূজা হয়। কিন্তু এ পূজার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পূজা হবে তাঁর নিজ ঘরে আর কলাহারিণী কালীপূজার দিন। দেবীমূর্তি হবেন তাঁর বিবাহিতা ধর্মপত্নী বোড়শীকুপিণী সায়রা দেবী। ধীর প্রায়ের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, বৌদ্ধিতা মা গর্ভধারিণী মা ও তাঁর মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখেন না, সবাই তাঁর অভিন্না মা। আজ তাই পরীক্ষা হবে। মাতৃভাবে স্নান কর্তৃক করে তাঁর মধ্যে তিনি দেবী ও বিশ্বমাতৃ আবাহন করবেন।

পূজার যথাচিত সমস্ত উপকরণ দিয়েই জীবন্ত প্রতিমার পূজা হল। এমন কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে আত্মোৎসর্গীকৃত প্রণাম পর্যন্ত। বসে বসেইলেন জীবন্ত বোড়শীদেবী অনড় অটল সমাধি হয়ে। পরিষের বন পরিবর্তনেও লক্ষ্যশীলা বোড়শীদেবীর হ'ল

রইলো না। অন্তরের অন্তস্থল হতে যেন ভগবাতা ও দেবীভূতা হবার শক্তি অর্জন করতে থাকলেন, পরম শক্তিমান দেবীশক্তিসম্পন্ন মানবদেহী ভগবান স্বামীর পূজার অর্ঘ্য থেকে।

তৎপরাতিতে ভক্তির উচ্চািরিত 'ইহ ঙগজ্জ' 'ইহ তিষ্ঠ' আবাহিত ঐশী শক্তি, দেবী শক্তি প্রকৃতই যেন সায়রা দেবীর মধ্যে আবিস্কৃত হয়ে ও অধিষ্ঠান করে উত্তরজীবনের জ্ঞাতা তাঁকে অসীম শক্তির উৎস করে তুলেছিলো। তাই অপর্যাপ্ত ব্যবহারেও তাঁকে দেউলে হতে হয়নি। এই মাতৃ বা বিশ্বজননীত্ব তাঁকে মহিমাযিতা শ্রীশ্রীমারূপে ফুটিয়ে তুলেছিল। তুলিয়ে দিয়েছিল সর্বজনগতের জাতিভেদ, ভৌগোলিক সীমারেখা, ধনী, নির্ধনী সব কিছুর ভেদ।

ঠাকুর পূজার শেষে প্রার্থনা করলেন, যেন সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী কালিকা তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়ে তার মধ্যেই বিরাজমান থাকেন। আর তাঁর দ্বারা যেন বিশ্বের সমস্ত কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ করান। মনোরমা ভায়া। তাঁর চাট না, তিনি চাটলেন মনোবৃত্তি অনুসারিণী ভায়া। তাঁদের বিবাহ দৈহিক না হয়ে যেন আত্মিক হয়। আত্মানন্দেই যেন তাঁরা পূর্ণ থাকেন। সায়রা দেবী যেন সম্পূর্ণ তাঁর ভাবেই ভাবিতা থাকেন।

ঠাকুরের এই প্রার্থনার মধ্যেও পাখির স্বাধীনতার লেশ মাত্র ছিল না। নিজের জন্ত কোন ভিকা পধ্যন্ত নয়। জগতের সর্ব কল্যাণ বিধান সম্পূর্ণ করার জন্তই আপনায় ধর্মপত্নীর মধ্যে মায়ের ঐশীশক্তি বিকাশের প্রার্থনা করলেন তিনি। হলও তাই। সায়রা দেবী মানবদেহী দেবী হলেই গড়ে উঠলেন। পরমপুঙ্কব শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের ভাবেই তিনি ভাবিতা হলেন। জগতের কল্যাণ বিধানই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল।

পূজা অন্তে পরমহংসদেব তাঁর নিজের সমস্ত সাধন-ভজনের ফল, বেশ, বাস, সাধনসিদ্ধির সব কিছু উপচার দেবীরূপে আবাহিত। স্ত্রীর পায়ে অর্পণ করে অঞ্জলি দিলেন। তাই থেকে যেন শক্তিময়ী দেবীঅশক্ততা সায়রা দেবী সর্বশক্তিময়ী দেবীবেই আরোহণ করলেন। কোটি কোটি কণ্ঠে আজ দেবীশক্তি, দেবীবল্লভ। ভবিষ্যৎপ্রতী ভগবান রামকৃষ্ণ ঐক্যে নিজ পূজা করে গেছেন আজ ঘরে ঘরে তাঁরই পূজার আয়োজন স্রবণ, মনন ভজন ও ধ্যান। শত শত পাণী তাপী তাঁরই নাম স্রবণে উচ্চার পেয়ে যাচ্ছে। সাধ্য নেই আমরা কুস্তবুদ্ধি, সেই মহিমাময়ী দেবীর গুণ বর্ণনা করি। তবে পরমহংসদেবপূজিতা দেবী সায়রা সধকে যথেষ্ট প্রচার না থাকায় এক তিনি নিজেকে আদৈক জীবন অবগুপ্ততা ও লোকচকুর অগোচরে লুকিয়ে রাখায়, তাঁর লীলা সন্ধ্যা ভাবে প্রকাশ হয়নি। তাই বিশদ ভাবে অনেকেরই তাঁর সধকে কিছু জানা নেই। তাঁর সরল অনাড়ম্বর অশ্রু গভীর ও উদার ভাবসমৃদ্ধ জীবনারশ থেকে মামুষের অনেক অমূল্য শিক্ষাই পাবার আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যে ভাবে জগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে, তেমনি সায়রা দেবীর বাণী ও শিক্ষা যদি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবেই উজ্জ্বল বিলাসে ভেসে যাওয়া ভারতীয় নারী তার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজে পাবে। কেন না, দেশব থেকে বার্ষিক পর্যন্ত সায়রা দেবীর গোটা ভাবনটাই একটি প্রকাণ্ড শিক্ষার আধার।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, রামকৃষ্ণদেবকে পণ্ডিতসমাজ, জ্ঞানী, গুণী ও সুধীসমাজ তগবান বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সারদা দেবী—দেবী কেন?

ঠাকুরের মত পণ্ডিতসমাজ দ্বারা স্বীকৃত না হলেও সারদা দেবীকে ঠাকুর মিস্ত্রীই দেবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, অর্চনা করেছিলেন, তাই-ই সারদা দেবীর দেবী হবার যথেষ্ট কারণ। সারদা দেবী তো শুধু ঠাকুরের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করে বা তাঁর কামজয়ের উপাশান হিসেবে পূজিতা হয়েই দেবীপদবাচ্য হ'ন নি। দেবতার মত নিষ্পাপ, নিষ্পেদ ভক্তিমান ভক্তিমতী পিতামাতার ঘরে দৈবমায়ায় তাঁর জন্ম, মরদেহী দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, নিরন্তর কক্ষে তাঁর সময় অতিবাহিত, অসামান্য স্নেহছায়ায় সর্বত্রই আশ্রয়দানে তিনি অভ্যস্তা, সর্ব অবস্থায় নিরহংকারে প্রতিষ্ঠিতা, বিচিত্র মনোভাবসম্পন্ন অগণিত নরনারীর অন্তরে মাতৃস্নেহস্থল-বিকিরণে মহিমাধিতা, অসীম ধৈর্যশালিনী, অসীম ক্রেশহংগী সর্ব প্রাণী হস্তাবধনী, এই মহীয়সী নারী প্রকৃতই দৈবশক্তিময়ী ছিলেন। তাই তিনি দেবী।

অগণিত ভক্তবৃন্দে তিনি যে বকম আধ্যাত্মিক সাহায্য করেছেন তা কখনো মাপুষে সম্ভবে না। তাই তিনি দেবী। দীন দরিদ্রের কুটীরে জন্ম নিয়ে ঐশ্বর্যবিলাসকে তিনি যে ভাবে অবহেলায় যোগ্য মনে

করতেন, বিবাহিতা হয়েও স্বামীর প্রতি নিজ অধিকারকে শত হস্তে যে ভাবে বিলিয়ে দিতে পারতেন তা একমাত্র দেবীতেই সম্ভব, মানুষে নয়। তাই তিনি দেবী। তাঁর দেবীশক্তির প্রকাশে তাঁর ভক্তরা যখন তাঁকে প্রকৃত দেবীরই আসনে বসিয়েছিলেন, দেবীজ্ঞানেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে শুরু করেছিল, তখন তিনি অবিচলিত ভাবেই তাদের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের যেন দেবীর মতই সর্বাস্তুরূপে আশীর্বাদ করতেন, কারুর কোন দোষত্রুটি জ্ঞাত্য বা বা পাপ তিনি গ্রহণ করতেন না। অন্তর তাঁর সদা ক্ষমাময় ছিল, তাই তিনি দেবী।

অলৌকিক দর্শন লাভ করে বহুপুঞ্জিত দেবতার স্ত্রী হয়ে এক নিজেও স্বয়ং দেবীভাবে পূজিতা হয়ে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন অথচ আত্মপ্রকাশকে সর্বপ্রথমে লুকিয়ে রাখতে। বিন্দুমাত্র আত্মকীর্তি বা অহংবোধ এক দিনের জন্তও তাঁর মধ্যে দানা বাঁধেনি, যা নাকি পার্থিব মানুষের পক্ষে এক বকম অসম্ভব—তাই তিনি দেবী।

তাঁর অতিশৈশব পাঁচ বৎসর বয়স থেকে দেখাবসান পর্যন্ত যতই খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাঁর দেবীত্ব যেন ক্রমেই প্রস্ফুটিত হয়ে শতদল-পদ্মের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। নিম্নক বিবর্তনিক বিব-সন্দেহপ্রবণ বিষেও তিলমাত্র সন্দেহের যেন অবকাশ থাকে না। তাই সারদা দেবী—দেবী।

### — কিস্ত —

কিছুটা নিরেন্স করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা বা হান্স—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বামী নিকট সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলানৈপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোর সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোনদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নিষ্পিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



অসম্ভার চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাম্রমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০, - হুগলী-কুমারী এলিকার-গ্রাম-গিনিমার

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

গ্রাম:

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ • কলিকাতা-১২



দেবীকে আমরা বিভূক্ত, চতুর্ভূজ, সিংহবাহিনী বরাভয়লায়িনী, সহায়কর্তা প্রভৃতি নানারূপে পূজা করলেও তাঁকে আমরা আরাধন করি কন্ডারূপে, মাতুরূপে। আমরা তাঁকে চাই ধনদাত্রী, জ্ঞানদাত্রী, জ্ঞানকর্তা, ভক্তিদায়িনী শোক-দুঃখবিনাশিনী বুদ্ধিদায়িনীরূপে। সারলা দেবীর মধ্যে আমরা প্রায় সবই পাই। এই দেবীজ্ঞানোচিত গুণবিকাশ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টিতে ঘরা পড়েছিল বলেই তিনি তাঁকে দেবীভাবে অর্জন করেছিলেন। সেই বোড়ী মা'ই শ্রীভগবতীর মত মাতুরূপে কোটি কোটি ভক্তসন্তানের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাবের বড় উদ্ভিগ্নছিলেন।

কাজেই সারলা দেবীর মরসেহে মর্ত্যে আগমন হলেও তাঁকে দেবী বলেই আমাদের জানতে হবে, মানতে হবে। তাঁর জীবনচরিত্র বহুই আলোচনা করা বাবে, ততই তাঁর দৈবলীলা আমাদের চোখে ফুটে উঠবে।

এমন এক দিন ছিল, যখন শুণু ঠাকুরের দ্বী বলেই তাঁর পরিচয় ছিল। মাহুঘ তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন মূল্য দেয়নি, ইতিহাসেও তাঁর কোন স্থান হয়নি। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না। সারলা দেবীর দেবী-মাহাত্ম্য তাই ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে। কোটি কোটি লোকের অন্তরে আজ তিনি সোনার আসন বিস্তিয়েছেন।

কথা হতে পারে যে, যিনি দেবী তিনি তো সহজেই দৈবমায়ার নিজের প্রেতঃ প্রমাণ করতে পারতেন, তা না করে তাঁকে দেখা যায়, অতি সাধারণ অবস্থার মধ্যে থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সারলা দেবী, দেবী হলে এ কি করে সম্ভব?

নরলীলার ভগবানের অবতারকে মাহুঘের আচরণই করতে হয়। বরাহ-অবতারে স্বয়ং নারায়ণ বরাহ-জীবনেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। অবতার হলেও মানবদেহ ধারণ করলে সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, ব্যাধি সব কিছুই মাহুঘের মত ভোগ করতে হয়। কাজেই অবতারকে সহজে জেনার উপায় থাকে না। এমন কি, তাঁরা নিজেরাও নিজস্বের স্বরূপে জ্ঞাত থাকেন কি না, তাও বুঝবার উপায় থাকে না। সময়ে সময়ে বিদ্যাচমকের মত তাদের লীলার কিছু কিছু প্রকাশ পাওয়া যায় মাত্র।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা জগতে আসেন, যে শিক্ষার ধারা নিজস্বের জীবনদর্শন দিয়ে প্রবর্তন করতে চান, তাঁদের নিজস্বের প্রকৃত স্বরূপ সর্বদার জ্ঞত মরসে থাকলে তা হতে পারে না। কাজেই সাধারণ মাহুঘের মতই তাঁদের চলন-বলন, জীবন ধারণ সব কিছুই হয় বটে, কিন্তু তবু সাধারণ মাহুঘের সঙ্গে তাঁদের একটা তফাৎ থাকে। তাঁরা ইচ্ছামাত্রই যেকোন বিষয়ে যেমন নিষিদ্ধ হতে পারেন, তেমন আবার ইচ্ছামাত্রই মনকে তা থেকে তুলেও নিতে পারেন। বা সাধারণ মাহুঘ পারে না।

সারলা দেবীকে তাঁর এক ভক্ত একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—“মা, ভোঁদার কি আপন বরূপ মনে পড়ে?”

মা বললেন, “হ্যাঁ বাবা, পড়ে। তখনি ভাবি, এ কি করছি? এ কি করছি? কিন্তু আবার কলসার হৃদয়ে এসে যায়, সব তুলে পাই। এ একটা দ্বারা বই তো নয়?”

সাধারণ আর দেবমাহুঘে তফাৎ হচ্ছে এই যে, সাধারণ মাহুঘের বই নিজের, আর দেবমাহুঘের বই পরের। তাঁদের ব্যক্তিগত

কিছুই থাকে না। তাঁরা পরীকষের ঘরে জ্ঞান, রাজা-রাজাধিরাজের সম্মান পান। মান, ঐশ্বর্য তাঁদের পায়ে লুটোপুটি ধায়। কিন্তু কোন দিকেই তাঁদের ক্রম্পণ নেই। যে উদ্দেশ্য সাধনের জ্ঞত তাঁরা মরসেহে অবতীর্ণ হন, তা তাঁরা ভোলেন না। শ্রীশ্রীমা সারলা দেবীকেও দরিদ্রত্বের সামান্য প্রামাণ্যমণী হয়ে জন্মেও যে অপর্যাগত সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে দেখি, তিনি যদি সাধারণ মাহুঘই হতেন, তবে কখনই এ রকম নির্দিকার থাকতে পারতেন না।

আবার নিজের দেবী বা অতিমানবত্ব সন্দেহ যে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না তাও নয়। কিন্তু সাধারণত্বের মধ্যেই তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। সাধারণ মাহুঘও নিজস্বের সঙ্গে-মিলিয়েই মাকে গ্রহণ করতো, তারা তাঁকে বুঝতে পারতো না।

ভক্তসন্তানদের লক্ষনের মধ্য দিয়ে যখন সারলা দেবীর দেবীত্ব ঘরা পড়তো তখনই মাত্র তিনি স্বীকার করতেন, নইলে তিনি আত্মগোপন করবার প্রয়াসই সর্বদা পেতেন। কখনো কখনো হঠাৎ বলে কোন্‌ দু'চারটি কথাও তাঁর দেবীত্বরূপের প্রকাশ পাওয়া যেতো। তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়।

একবার সারলা দেবী ঠাকুরের ভ্রাতৃশূত্র শিবুর সঙ্গে কামারপুতুর থেকে জয়রামবাটা বাবার পথে শিবুর এক অলৌকিক দর্শন হয়। যে সারলা দেবীকে একবার কালীরূপে আবার খুড়ীরূপে দেখতে পায়। প্রথমে সে তার নিজ চোখের ভ্রম বলেই মনে করে। কিন্তু বাবে বাবে ঐ কালীভূক্তি দেখতে গেলে শুধু পেয়ে সারলা দেবীকে প্রশ্ন করে ‘খুড়ী, খুড়ী, সত্যি করে বলতো, তুমি কে?’ সারলা দেবী তার প্রশ্নকে নানা ভাবে এড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন নি। শিবু নাহোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে শিবু বা দেখেছে তিনি তাই-ই। এ প্রশ্নে মনে পড়ে মথুর বাবুও ঠাকুর সবচেঁ ঠিক এই রকমই এক অলৌকিক দর্শন পেয়ে ঠাকুরকে দেখজানেন ভক্তি করতেন। ঠাকুর যখন একদিন কালীঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন মথুর বাবু তাঁকে একবার ঠাকুর ও একবার কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনিও প্রথমে দৃষ্টিভ্রমই মনে করেছিলেন কিন্তু পরে বিধাঙ্গ করতে বাধ্য হ'ন। কাজেই শিবুর এই দর্শন থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সারলা দেবী ঠাকুর অভিন্ন ছিলেন এক তাঁরা দু'জনই দেবমানব-মানবী ছিলেন।

কোলোডেলোর মাঠে যে লব্ধবস্পতি মায় অরুণে তপস্বী করে তাঁকে নিরাপদে লক্ষিপথর পৌঁছে দিয়েছিলেন, তায়ও শোনা যায় সারলা দেবীকে প্রথম কালীরূপেই দর্শন করেছিল।

সারলা দেবীর আবালায়গিনী ভাঙ্গপিনী আবার সারলা দেবীকে চতুর্ভূজরূপে দর্শন করেন। আর মা যখন গান করতেন, তখন তিনি ঠাকুরের কণ্ঠের সুরতে পেতেন। তাঁর এই হতেই ধারণা জন্মেছিল, ঠাকুর আর মা অভিন্ন। যোগীন-মাও সারলা দেবী ও ঠাকুরকে অভিন্নজ্ঞানে পূজা করতেন। দ্বাদী তদ্ব্যনল একবার মাকে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ‘মা—ঠাকুর যদি ভগবান, তবে আপনি কে মা?’ মা বলেছিলেন ‘কেন? আমি তগবতী’।

মাহুঘ এমন ভক্তদের অভিজ্ঞতাগ্রহণত বটমাতুলি আলোচনা



করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, যা সারদা দেবী সাধারণ মানবী ন'ন—দেবী। একবার কোরালপাড়া আস্রমে যা নিজে হাতেই ঠাকুরের ছবির পাশে বেলীর উপরে নিজের ছাঁব রেখে নিজেই পূজা করেছিলেন। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি আর ঠাকুর যে আভর তাই তিনি জানিয়ে দিলেন। ঠাকুরের জীবনোত্তেও আমরা দেখ, নিজের ছবিকে বেদীতে রেখে তিনি নিজেই খুঁটা খুঁটা ফুল দিয়ে পূজা করেছিলেন। হয়তো বা জনগণের ভাবব্যং পূজাহ সূচক হয়েছিল, ঠাকুর ও সারদা দেবীর আত্মপূজার মধ্য দিয়ে।

আত্মবিরূপের চকিত দর্শন সারদা দেবী নিজের পেতেন বলেই তিনি জীবিতাবস্থায় নিজেই পূজার বেদীতে নিজের ছাঁব বাসিয়ে পূজা করতেন। রামনাদের রামেশ্বর-মন্দির দর্শনকালে সারদা দেবীর একটি স্বগত্যোক্তিও তাঁর ভগবতীস্বরূপের আভাস দেয়।

রামনাদের রাজার শিবমন্দিরে সর্বসাধারণের পূজার অধিকার ছিল না। সারদা দেবী ও স্বামী সারদানন্দ ঐ মন্দির দর্শনের অহুমতি পেয়ে পূজা দিতে বান। শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসে সারদা দেবী হঠাৎকুল ভাবে বলে ওঠেন, 'আহা তোমার যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনই রয়েছ গো, একটুও বদলাও নি।' সারদানন্দ ঐ স্বগত্যোক্তি শুনে সেয়েছিলেন এবং অর্ধও বৃকতে সেয়েছিলেন।

লঙ্কাবিক্রয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরে মনোরম পরিবেশযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করে শিবপ্রতিষ্ঠা করা মনস্থ করেন। হহুমানের উপর শিবলিঙ্গ সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু হহুমান কিরে আসতে অত্যন্ত দেরী করায় এবং শুভলগ্ন উদ্ভূর্ণ হবার আশঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত হন। সীতা দেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বিব্রত দেখে নিজেই মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে দেন। আর শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃত চিন্তে তাই পূজা করত থাকেন। ঠিক এই সময় হহুমান শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করে কিরে আসেন। ভক্ত হহুমানের আনাত শিবলিঙ্গটিও শ্রীরামচন্দ্র পাশাপাশি স্থাপন করে পূজা করেন। অত্যাধি সেই পাশাপাশি দুই শিবেরই মন্দির আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে ভগবতী-বিশেষ বলে আমরা জানি। সারদা দেবীও যে ভগবতী ছিলেন, তাঁরই পরিচয় তাঁর স্বগত্যোক্তি। অর্থাৎ তিনিই যে রামেশ্বর শিব বহুস্তে গড়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতারূপে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা। 'তোমার যেমন গড়েছিলাম ঠিক তেমন রয়েছ গো, একটুও বদলাওনি।'

সারা গুলি বুলের গুলতর অস্ত্রের সময় ভগিনী নিবেদিতা বখন তাঁর আরোগ্য কামনার গীঞ্জায় বসে মেরীকে খান করছিলেন, বাবে বাবেই মেরীর স্থানে সারদা দেবীর মূর্তি তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। প্রশান্ত পরিত্র সারদা দেবীর মূর্তি ছাড়া তিনি খ্যানে মেরীকে কোন মতেই মরণ করতে অপারগ হয়ে সারদা দেবীকে মেরীর মধ্যে মিলিয়ে দেন। এই থেকে নিবেদিতারও ধারণা হয়, দেবী

ও সারদা দেবী অভিন্ন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, সারদা দেবী যে শুধু তাঁর নিজস্বীয় অকৃতকৃতের স্বরূপেই ভগবতীর আসন বিছিয়েছিলেন, তা নয়। নিবেদিতার মত পাশ্চাত্যদেশীরা স্বমাজ্জিতা অশিক্ষিতা মহিলায় ক্রমশঃ নিঃসন্দেহে দেবীর আসন পেয়েছিলেন। কাজেই সারদা দেবী—দেবী। [ক্রমশঃ]

## মঙ্গলকাব্যে নারী

শ্রীমতী কণা দেবী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল,

হেমমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের সামাজিক-জীবনে

এক কালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, এছাড়া পাঠ করলেই তা ধরা পড়ে। শুধু দেবদেবীর মহিমা বা অসৌকিকত্বই এখানে বড় হয়ে ওঠেনি, তৎকালীন সমাজের শিক্ষা ও সঙ্কান্তর প্রায় পূর্ণ পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি এই সব পুস্তকে। এই কাব্য-কাহিনী নারীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, দেব এবং গুণ সবই কেন আমাদের আভি-পরিচিত জগতের বাস্তব-বিষয়। মনসামঙ্গলের নারীকা বেহলা, নৃত্যগীত-গটায়নী অশিক্ষিতা নারী। কালকে জয় করে মৃত স্বামীর জীবন লাভের জন্য বেহলার কুসুসাধন-এক সাহিত্য-জগতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। এই অসামান্য নারী-চরিত্রই আবার অতিসাধারণ বাড়ালী-ঘরের বধু বা কস্তায় চরিত্রের মত সরল সৌন্দর্যে বেলা। বেহলা শুধু নাচুনীই ছিলেন না, তিনি বুদ্ধদেও নিপুণা ছিলেন। সাতালি পাহাড়ে লোহার বাসরঘরে সূখায় কাতর লালিন্দরের জন্য বেহলার বন্ধন, ভারী শুল্কর হয়ে ফুটে উঠেছে কবির বর্ণনায়।

‘মঙ্গল মাল্য ছিল মাল্যলি-হাঁড়ি,

তিন নারিকেল দিয়ে সাজার ঠেঙড়ি।’

বরণডালার চাল, আর নারিকেলের জল, মঙ্গলহাঁড়িতে পুরে, দোতের



সর্বস্বটি সম্মত  
সুন্দর এলক্সার  
একমাত্র  
নির্দিষ্ট সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকারক

কুঞ্জলাল  
কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স  
১০৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসি।" চরিত্রবান্ পুরুষের উপবৃত্ত কথা। কিন্তু দেবী নির্বাক। কালকেতু ভারী চটে গিয়ে দেবীকে বলে, "তুমি যে হ'ও নিজের মান রক্ষার্থে এই স্থান পরিত্যাগ কর।" দেবী কথা কন না। তখন ওট দুট্টা (?) নারীকে হত্যা করতে, সূর্যাসাকী করে বীর ধনুকে মার ধোড়ে; কিন্তু শব ছোড়ার শক্তি নেই। কালকেতুর অঙ্গ রোমান্থিত, চক্ষে আনন্দের অশ্রু; হতবুদ্ধি হ'য়ে ঝাঁড়িয়ে রইল। স্বামীর এই ভাব দেখে বীরনারী ফুলরা ভয় পাননি। নিজের সমসার-জীবনের বাধা দূর করার জন্য বীরের বোণা সহধর্মিণীর মত এগিয়ে এল সে। স্বামীকে বলে "—আমাকে ধর্মবীণ লাও, আমি একে শেব করে ফেলছি।" হায়, ধনু ছাড়িয়ে নিতে পারল না। তখন দেবী সদয়া হয়ে বললেন— "আমি চণ্ডী আউল্যাম তোকে দিতে বর।

লহ বর, কালকেতু, ত্যজ ধনুঃশ্বর।"

হুঃখিনি ফুলরার গর্ভ করার মত ধন-ঐর্ষ্য কিছুই নেই। আছে শুধু সরলতা আর স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম। এই হুটি জিনিষ নিয়েই ফুলরার চরিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এক অধ্যায়ে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্ততম নারীক হছেন খুননা। উজ্জ্বল-নগরের ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী—প্রথম লহনা, দ্বিতীয়া খুননা। খুননার বিয়ের পর থেকেই লহনা তাকে বিষ-চক্ষু দেখেন, তাতে ইচ্ছন যোগায় দাসী দুর্ভলা। খুননাকে বিয়ে করার পরেই ধনপতিকে ক্রোধপলঙ্কে বিশেষে বেতে হল। লহনা নানারূপ কন্দী ক'রে সতীনকে

কষ্ট দিতে থাকে। একদিন হারিয়ে-বাওয়া ছাগল-পালকে বনের মধ্যে খোঁজার সময় খুননা দেবী চণ্ডীর দয়া লাভ করেন। দীর্ঘদিন পরে ধনপতি বাড়ি ফিরলেন; খুননার চুপেখের নিশি ভোর হল। সতীন যে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, সে সব ভুল খুননা এই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। ধনপতি খুননার গুপেখের পরিচয় কিছুই পান নি। জানতেও পারেন নি তার প্রতি লহনার কঠোর অবিচার-অন্ত্যচারের কথা। তিনি লহনাকে বললেন,—"আজ অনেক বন্ধু ও আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ আমার ঘরে; খুননাকে রাগা করতে বল।" ঈর্ষা-কাতর লহনা বললেন—"খুননা কোন কাজের মেয়ে নয়, সে কী রাখবে?"

সদাগর স্তনলেন না তাঁর কথা। খুননাও কোন কথা কন বলে, স্বন্দর বেশে সেজে রান্নাঘরে ঢুকলেন ও রন্ধনবিদ্যার এমন নৈপুণ্য দেখালেন যে, সবাই সে রান্না খেয়ে উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেন। লহনার বুক জ্বলো ওঠে হিংসায়; কিন্তু উপায় কি? তিনি স্পষ্টই বুঝলেন, এখন খুননার বরাত খুলেছে। দীর্ঘদিন পরে ধনপতির সঙ্গে লয়ন কক্ষে খুননার সাক্ষাৎ। প্রথমে তিনি কথা বলেন নি। ধনপতি ভাবলেন—অভিমান। তার পর তিনি কথা কইলেন—লহনা যে তাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, সে কথা চোখের জলে ভেসে, খুননা জানালেন স্বামীকে। সদাগর লজ্জিত ও মর্ষাহত হ'য়ে বসে রইলেন। এবার লহনার কথা বলা যাক। স্বন্দরী তক্ষনী, নব বিবাহিতা সপত্নী ঘরে, স্বামী আবার প্রবাসে; একেত্রে সাধারণ নারীর মতই খুননার প্রতি বিষমভাবাপন্ন হওয়া লহনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। লহনার চরিত্র তাই এমিকে

## শুভ বিবাহে

শুভ বিবাহে কিংবা যে কোনও শুভ কাজে যৌতুক দেবার মত আধুনিক মনোরম ডিজাইনের খাট গিনি সোনার গহনা ও সঁজা গ্রহ রত্ন প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।  
ফোন : ৩৪-৪৯৮২

# অনুপ্রণা জুয়েলারী হাউস

মানিকগঞ্জ ও ধর্মশিল্পী  
৮৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা ১২  
দ্রুত ম্যানুয়াল

জীবন্ত, আবার অন্ত দিকে সম্ভানহীনা লহনার স্মৃতি মাতৃ, খুলনার ছেলে শ্রীমন্তকে করেছে ভাগ্যবান। লহনা প্রথমে জনমনে ঘৃণার উল্লেখ করলেও পরবর্তী জীবনে তিনি শাস্ত্র, সুন্দর ও কোমল স্বভাবের নারী। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে নারীর স্মৃতি মাতৃ। আর খুলনা ছিলেন ভক্তিমতী—তাই স্বামি-পুত্রের সব ভাল-মন্দকে একাগ্র ভাবে সঁপে দিয়েছিলেন চণ্ডীর পদতলে। আরাধ্য দেবতার প্রতি তাঁর আত্মনিবেদনের সাধনার চিত্রখানি খুলনার চরিত্রকে করেছে মরণীয় ও বরণীয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, ময়নাকণ্ডের রাজা বৃদ্ধ কর্ণসেনেবু সঙ্গে ঘটনাক্রমে বিবাহ হ'ল সুন্দরী রজাবতীর। সব বাধা-বিঘ্ন জয় করে ধর্মঠাকুরের পূজাধিগী রজাবতী বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করেছিলেন আনন্দিত মনে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় এক মহাবীর পুত্রও পেলেন রজাবতী। এই ছেলেটী লাউসেন।

মঙ্গলকাব্যের নায়িকার সংসার ও সমাজ-জীবনে যে প্রতিষ্ঠান লাভ করেছেন, তার মূলে ছিল ধর্ম-বিশ্বাস, আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতা সম্পাদনের চেষ্টা ও অকুণ্ঠ স্বামি-প্রেম। এই গুণগুলিই তাঁদের সাধারণ মানবী থেকে কিছুটা অসাধারণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে স্বয়ং দুর্গাই নায়িকারূপে অবতীর্ণ। তাঁর সীলায় দেব থেকে মানবত্বের রূপটী সমন্বিত প্রকাশ পেয়েছে। এই সব মঙ্গলকাব্যে কোথাও মানবী, কোথাও বা দেবীমূর্তিতে ধারা নায়িকা-রূপে প্রকাশিতা, তাঁরা আমাদের অতি-পরিচিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সংসারের বাইরে হারিয়ে যান নি কখনো। সাধারণ মানুষের জীবন-বাহারী সীমার মধ্যে ধরা দিয়েছেন সর্বদা; মঙ্গলকাব্যগুলি তাই বাঙালীর অন্তরের স্বীকৃতিই লাভ করেছিল এবং এক কালের ইতিহাস ও সেই সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যও হয়েছিল নিশ্চয়ই। আজও তাদের সেই মূল্য উভয় ক্ষেত্রেই অতি উচ্চ।

## সাধী মালবী ঠাকুর

মিথ্যে হয়নি সেদিন রজনীর স্বপ্ন। শুধু আভরণের ঐশ্বর্য নিয়েই আসেনি ছন্দা, হৃদয়ের ঐশ্বর্য নিয়েও এসেছিল। তিন শ' টাকার 'কেরানী'-জীবনের অবস্থিত অভাবের রাজ্যে ধন-দাস্তার লগ্নিত-লাবণ্য নিয়ে অগোছালা সংসারটাকে লক্ষ্মীভূতে ভরে তুলেছিল সে। প্রথম মাসেই ব্যাঙ্কের কাছে একটা লিষ্ট পেয়ে গেলো রজন, ন'বছরের চাকরিতে এমন লিষ্ট কোন দিন কল্পনাই করত পারেনি সে। কাছে এসে তার গলার উপর দিয়ে নরম নিটোল হাত হ'লানি বাড়িরে দিয়ে মুখ চেপে হেসে ছন্দা বললো, আমি ঘরে এলাম, তাই লিষ্ট পেলে। এতকাল আমাকে তোমার খাটের সন্ধান উচিত। সঙ্গে সঙ্গে রজন তার মুখখানি ছন্দার চোটে পূর্ণ এগিয়ে আনতেই ছন্দা ছুটে দূরে সরে গিয়ে ঝড়ালো। বললো, এমন খাওয়া আমি চাই না। তারপর এক ছুটে সোজা রান্নাঘরে হেসে-বস। রজনও আর অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি রাশিস থেকে একটু সন্ধ্যা উত্তরে কিরে আগতেই অমনি যুঝেগো। এই বুধি তোমার পাঁচটার ছুটি? তোমার কি লিষ্ট বলে কিছু নেই? উত্তরে ছোট করে রজন বললো:

এত কালের অভ্যাস, এক দিনেই কি যায়? এবার থেকে ঠিক শুধরে যাবে দেখো।

বন্ধুবান্ধবেরা শুনে হেসেছে, ত্রৈলোক্য বলে ব্যঙ্গ করেছে, কিন্তু ভ্রক্ষেপ করেনি রজন। ভেবেছে এমন যার স্ত্রী তার যে ত্রৈলোক্য হয়েও সুখ। স্ত্রীহীন স'সারে এত কাল কাক-শকুন উড়ে বেড়াতো, যাবের মেঘের সঙ্গে পথের পার্থক্য ছিল না এতটুকুও। শোড়া সিগারেট আর দেশলাই-এর কাঠিতে সারা মেকেটা আঁস্কাবুড় হয়ে উঠেছিল। খাঁট দেবার লোক ছিল না। শাসন করে একথা বলবার এমন কেউ ছিল না। লজ্জায় সেদিন থেকে সিগারেট ছাড়লো সে।

এক সময় কাঁকে দিয়ে লুকিয়ে সিগারেট এনে তার হাতে তুলে দিল ছন্দা। সেটী সঙ্গে সঙ্গে কড়া হকুম। সকালে চা খেয়ে একটা, খেয়ে উঠে আপিসে বেরোবার পথে একটা, আর বিকালে একটা। অনুময়ের সুরে অনুবোধ তুলে গরুচ্ছে রজন। অন্তত: আর দুটো বাড়িয়ে দাও, দুপুরে আপিসের কাজের ফাঁকে একটা আর রাতে খেয়ে উঠে একটা।

চোখের কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে ছন্দা বললো, রাতে সিগারেট খেয়ে তুমি কিছুতেই আমার কাছে শুতে আসতে পারবে না। এই বলে রাখছি, তিনটির বেশী আর একটাও সিগারেট পাবে না তুমি। কিন্তু ছন্দা যত সহজে আটন বেঁধে দিল, রজন তত সহজে নেশা ছাড়তে পারলো না। প্রথম প্রথম ছন্দাকে লুকিয়েই স্বপ্ন তখন সিগারেট টেনে নিত, বন্ধুদের আতিথেয় সিগারেটের অভাব হতো না। কিন্তু ছন্দার নাক বড় সাজাতিক! একদিন ধরা পড়ে গিয়ে রজন একেবারে নাস্তানাবুদ। গিয়ে কেবল ছন্দার পাশে শুয়েছিল, ঠেলে তুলে দিল তাকে ছন্দা। যে আমার কথা রাখে না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যাও, আর কাককে নিয়ে থাকো গো। কিন্তু ছন্দার মত আর কে আছে, কে এত নিবিড় করে তাকে ভালবাসবে? কে এমন মধুর সুরে জীবনবীণাখানি বেঁধে দেবে তার?

এক দিন অব্যবহিত ভাবে ছন্দাকে আশ্চর্য করে দিল রজন। বন্ধুরা বললো, এ তোঁর বাড়ীবাড়ি। সংসারে বিয়ে সকলেই করে, কিন্তু তোর মত এমন কেও বউকে ভয় করে চলে না, খুব দেখালি বা হোক! রজন চটলো না, বললো, সব সংসারে কি ছন্দা আছে? তা নেই। যত দিন বাছে ছন্দাকে নতুন করে চিনছি। চিনতে হলে, নিজেকেও চেনাতে হয়, তাতে তোদের কি আসে-যায়?

কিন্তু বন্ধুদের সে রাগ থাকলেও খুসী হল ছন্দা। রজনকে বললো, তুমি যে কত বড়, তাই ভাবি। সাগরে ছন্দাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার অধরে জোর করে চূষন এঁকে দিয়ে রজন বললো, বড়র সঙ্গে থেকে থেকেই তো মাদুর বড় হয়। উত্তরে ছন্দা আর কোন কথাই জবাব দিতে পারলো না। শুধু কেমন একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তিতে রজনকে বুকখানির মধ্যে নীরবে মিশে রটল। এভাবে পরশা বাঁচিয়ে খুব ঘটা করে ছন্দার জন্মদিনের উৎসব রচনা করলো রজন। ছন্দার যেখানে বসত বন্ধু ছিল, সকলজকই নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ত্র করে এলো। কিন্তু ছন্দার কাছে বাপাঘরা যেন লগ্নি কেমন লাগলো। বললো, এখন কি তার জীবন যে, ঘটা করে

পালন করতে হবে রজনকে! শিতহাস্তে রজন বললো, তোমার একটা জন্মদিন গেলে আর যে তা ফিরে আসবে না। ছন্দা মুখে বাধা দিয়েছে, কিন্তু মনে মনে খুসী হয়েছে ঠিকই। এই উপলক্ষে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ও মিষ্টিবুধ করতে পারব।

হতে পারে তার স্বামী ব্যাকের একজন সাধারণ কেরানী, কিন্তু কেরানীর স্ত্রী হয়ে সমাজে কি ছন্দার কোন স্থান নেই? সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেতকী, রমা, রেবা আরও অনেকে এসে পৌঁছালো। কেতকী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনালো, রেবা আত্মতৃপ্তিতে জমাল, এই করে সময়টা বেশ কাটানো গেল। সব কিছুই মধ্য দিয়ে ছন্দার নারীত্বই মহীয়সী হয়ে উঠল। রজনকে পুরস্কারও কি তাতে কম বিজয়ী হোল? উপহারে ঘর ভরে উঠল ছন্দার। তার মধ্য থেকে একটাকে হাতে তুলে নিয়ে হাসির তরঙ্গে যুগথানাকে উজ্জ্বল করে রজন বললো, কেতকী কিন্তু খুব ঠাট্টা করেছে তোমাকে, যাই বলো। ছন্দা তাকিয়ে দেখলো, কাগজের ব্যালু মোড়ক করা ছোট একটা ডাল-পুতুল, শুইয়ে দিলে চোখ বুজে থাকে, ঠাণ্ড করালে ফাঁটকের মতো চোখ ছুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে স্বর্ণকর্ণে মা বলে ডাকে। রজনকে নতুন করে আর কিছু বলতে হোল না, বিহবল চোখ দুটিকে তুলে ধরতে গিয়ে লজ্জার ঠোঁট দুটি একবার কৈশে উঠল ছন্দার। ছুটে কোথাও এক দিকে পালাতে চাচ্ছিলো সে, কিন্তু পায়ল না, শিখন দিক থেকে তার শাড়ীর একটা পাশ মাকর্ষণ করে তেমনি হাসতে হাসতেই রজন বললো, এত লজ্জাই বা কিসে? এই তো সবে তিন মাস, আর ছয় মাস পরে থোকনকে কোলে নিয়ে, কেতকীকে জোর গলায় বলে আসতে পারবে। দেখ, তোর ডাল-পুতুলের সঙ্গে মিলিয়ে, কে বেশী সুন্দর? ছন্দা হাও বা ঠাঁড়াতো, পড়ি কি মরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। রজন ভয়েই অস্থির, এ অবস্থায় আছাড় খেলে অনর্থ ব্যথিয়ে বসবে।

কিন্তু কে জানতো যে, অদৃষ্টে সেই অনর্থই লেখা আছে। দু'দিন ধরে বাধা উঠল, হাসপাতালে গিয়ে ছন্দাকে ভর্তি করে দিয়ে এলো

রজন, প্রথম বার ভয় করে বৈ কি! ছন্দার চোখের জল সজ্জ করতে পারলো না রজন, সাহস দিয়ে বললো, ভয় কি? পাশের বেডগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, সবাই এখানে তোমার মত। কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু ছন্দার কষ্ট কি রজন এতটুকুও বুঝলো? কোন পুরুষেই বোঝে না। নীরবে নিজেই বাধা সজ্জ করে নিয়ে একদিন নির্বিবাদের এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ছন্দা। সুন্দর একটি থোকনের মা হয়েছিলো সে, নীরবেই মায়ী কাটিয়ে চলে গেল ছন্দা, সেই সঙ্গে থোকনও। পিতৃত্বের অধিকারী হতেও ছেলেকে কোলে পেলো না রজন। ছন্দার বাকি কান্না রজনই কাঁদলো। তার পর চোখের জল এক সময় শুকিয়ে গেল, বছর ঘুরে গেলো দেখতে দেখতে। যে ঘরখানিতে একদিন কুসুমসজ্জা রচনা করেছিলো ছন্দা, ধীরে ধীরে আবার তা আবারনার ভরে উঠল। আত্মীয় স্বজনরা ধরে বসলো; এবারে দেখে শুনে আবার ভুই বিয়ে কর। সারা জীবন সত্যিই তো আর একা-একা কাটাতে পারবিনে? বরসটাই বা কি হয়েছে? কিন্তু ছন্দাকে কি তুলে যাওয়া এতই সহজ? যে প্রেম সে ছন্দাকে দিয়েছে, সে প্রেম কি নতুন করে আবার কাউকে দেওয়া যায়, না দিতে পারবে সে? জীবনটা কি শেষ পর্যন্ত তবু একটা অভিন্ন হয়ে ঠাঁড়াবে? দিন কতক বাইরে কোথাও ঘুরে আসা বাক, বা হয় হবে। ছন্দা চলে গিয়ে জীবনটা শ্মশান হয়ে ঠাঁড়িয়েছে। আর কাউকে পাশে না পেলে সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে যাবে রজন! সসারে একা-একা কাটাবই কি কাটে? বিয়ে করলেই আবার বাস্তব হয়ে গেল রজন। এত কাল নতুন একটা নারীর জন্ত সেই শুধু প্রতীক্ষা করেনি। একটি পুরুষকেও কামনা করে প্রতীক্ষা করছিলো বৃষ্টি সাধনা। কিন্তু এ কার জন্ত? রামচন্দ্রে যে জীবনে একমাত্র সীতাকেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে একালের রজন ও একালের সাধনা। ভাবতে গিয়ে নিজের মনে একবার হাসলো রজন, বিয়ের শাঁখ বৃষ্টি আবার বেজে উঠল। বাইরে কি মনে, বোকা গেল না।

## রোববার

মিতা সেন

বকুল গাছের মত স্বকণ্ঠ গুন-গুন মন,  
অথবা লেন-বেন চুকে গেলে শূন্য দরবার।  
বেন অনেক বিরহের পর একটি চুবন—  
অনেক বর্ষাক্ত দিন কেটে গেলে এই রোববার।

সময়ের ঘণ্টা আজ ফিরে গেল বুধা ভোপ দেগে,  
একটু মাসের গন্ধ বাজারের পাখে; কাঁকা-কাঁকা ট্রাম।  
অহল্যা বুকের থেকে, মনে হয় উঠেছি যে বেগে  
তুলে গেছি সব সুখ, সব কাজ, পরিচিত সব নাম-ধাম।

হৃদয়ে কাকের ডাক; যি-গলা হোসের নীল-নীল ছায়া;  
একটি তুলোর ঘুম, অথবা ম্যাচিনীর আগুনের ছবি,  
বিক্রমে লোকের জলে ভেসে-ওঠা ঘনি-বুধ মায়ী  
হুছে গেলে, আর সব দিনে-মনে হবে মিথ্যে যে সবই।

# টাকা/আনা/পাই

জ্যোতির্ময় রায়

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের একেবারে সামনে পারাশেট-ঘেরা চওড়া বারান্দা। বারান্দায় বেতের একটা গোল টেবিলের দু'পাশে দু'টো সিঁঙ্গাপুরী বেতের চেয়ার। বারান্দার পেছনে মঞ্চের এপাশ ওপাশ চল-বাওয়া হলঘরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এই বারান্দা ও বাগানের দিকে তার তিন ফুট দেওয়ালের ওপর বাকী পুরো অংশটাই ঘষাকাচের প্যানেল বসান ফ্রেম। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘষাকাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে বহু নর-নারীর ছায়া-মূর্তির ঘোরাক্রোশ, চাপা আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে চাপা কলগুঞ্জন। বারান্দার এক পাশ দিয়ে এসে ঢোকে ম্যানেজার এবং উৎসব-লক্ষ্যায় সজ্জিত রচনা।]

রচনা। (চুকেই চিঙ্কিত মুখে) এই ভাবে ডাকলেন, কি হয়েছে বলুন তো? কোন বড় রকমের ভুল-ত্রুটি হয়নি তো?

ম্যানেজার। (সরলতা দেখে মুহূর্তে) না না, ত্রুটি কিছু হয়নি। বরং সব লোকজন এসে গেছে, তাই আপনাকে ডাকলাম জিজ্ঞাস করতে, ব্যবস্থা কেমন হয়েছে, পাটি কেমন লাগছে?

রচনা। চমৎকার! আমার কি ভাল বে লাগছে—(হেসে) এই সঙ্গে নার্ভাসনেসটাও কম নেই। এক এক জনের সঙ্গে আপনি পরিচয় করিয়ে দেন আর তদুপী একবার শেরীর পুঁচকে পাত্তরটি যখন মুখে ভুলে ধরতে হয়, তখন বুক চিপ-চিপ করে। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব—আমি তো বাবা চোঁটে চুঁইয়েই নাথিয়ে রাখি।

ম্যানেজার। (বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে) রীয়াসি ইউ আর লুকিং এন্ডহুইজিট টু ডে—আপনাকে যে কি অশ্রু দেখাচ্ছে।

রচনা। (বিস্ত্রত ভাবে হেসে) কি বে বলেন—চলুন, ঠেকে অনেককণ দেখছি না—সেখি উনি কোথায়।

[কোন উক্তরের অপেক্ষা না করে রচনা পা বাড়ায়। নিছকসবুও ম্যানেজার এগোয়। উভয়ে বেরিয়ে যায় উন্টো ঠিক দিয়ে মুহূর্তে পরেই মীরা শ্রেটি নামে একটি তরুণীকে নিয়ে দ্রুত এসে ঢোকে সেখানে।]

মীরা। পোন শ্রেটি, (উন্টো দিকে আঙুল দেখিয়ে) ওখানেই গবেট হুঁটে আছে, ও হুঁটোকে এনে এমন নাভেহাল করে ছাড়াবে যেন এখান থেকে পালিয়ে বাঁচে—আমার আর ঠাড়াবার সময় নেই, যুগাঙ্গ বাবুকে বেখে এসেছি ওখানে। (আলতো হাতে একটু শাক্সা দিয়ে) বা হুই বা—

শ্রেটি। (হাসতে হাসতে) ঠিক আছে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।

[শ্রেটি চলে যায়, মীরা বেসিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই বাস্ত পায়ের বেরিয়ে যায়। একটু পরেই ভোলা-বিত্তকে নিয়ে নিষ্ক্রমণের পথ দিয়েই এসে ঢোকে শ্রেটি। ভোলার বিগলিত হাতে প্রেসটিঙ্কের আন্ত একটা কাগজের বাটি, বিত্ত যেন বেশ একটু বিরক্ত।]

বিত্ত। হ্যাঁ, কি বলবেন বলুন?

শ্রেটি। (অভিমানের ভঙ্গিতে) বা বে, আমি কেন আপনাদের কাজের কথা বলতে ডেকেছি—আপনি যেন কেমন ইয়ে—(বলে হেসে গাড়িয়ে পড়ে)

ভোলা। (শ্রেটির দিক থেকে মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে) সত্যি বিত্ত, তুই যেন কেমন ইয়ে—

বিত্ত। (কটমট করে একবার ভোলার দিকে তাকিয়ে, শ্রেটিকে) বেশ, কাজের কথা না থাকে তো আপনি গুর সঙ্গে বসে রসিকতা করুন, আমি বাছি।

[বিত্ত বেরিয়ে যায়। শ্রেটি জঘ হওয়ার ভাবটা সামলে নিতে চেষ্টা করে।]

ভোলা। (পেসটিঙ্কে একটা কামড় দিয়ে) আপনি বুঝি ডেকেছেন বলে একটু গল্প করতে?

শ্রেটি। (নিজেকে পুরো সামলে নিয়ে) সত্যি তাই। আপনি বেশ ভাল, আপনার বন্ধুটা ভারী ইয়ে—চলুন ওখানটার বসে একটু গল্প করি।

[ভোলা আর শ্রেটি হুঁটো চেয়ারে গিয়ে বসে] আপনাকে দেখেই আমার হাত ভাল লেগেছে—আপনি সত্যিই ছাণ্ডসম।

ভোলা। (ব্যস্ত না পেরে) হুনসম, হুনসম—

শ্রেটি। আপনি বুঝি ইরিক্সা জানেন না?

ভোলা। (সোৎসাহে) বিত্ত জানে।

শ্রেটি। ছাণ্ডসম মানে স্পন্দর।

[ভোলার মুখ দিয়ে আর বাক্য সরে না। ক্রীম-চকোলেট শুধু প্রেসটিঙ্ক ধরা হাতেই গাল রেখে সে স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থার তাড়ার শ্রেটির দিকে।]

আ-হা-হা—আপনার গালে যে চকোলেটগুলো লেগে গেল।

[এমন সময় লোকজনের আসার শব্দ পেরে]

চলুন ওখানটার—তপকিন দিয়ে আপনার মুখ আমি মুছে দিচ্ছি।

[ভোলাকে নিয়ে শ্রেটি বেরিয়ে যায়, ঢোকে এসে তিনটি হসজ্জিতা বক্সি।]

# দেখুন! মাত্র অর্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাটা যায়!



**সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !**

ফেনার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়ালীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অর্ধেকটী সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাটা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার দরুনই প্রতিটি  
ময়লার কণা ধুয়ে হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**

শ্রদ্ধা। মিসেস চৌধুরী যুগাক বাবুকে কি বকম আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখেছো ?

শ্রীতীরা। সত্যি ভাই, মীরাদি'র ভাবটা যেন উনি ছাড়লেই আর কেউ হেঁ। মেরে নিয়ে বাবে।

শ্রদ্ধা। হবে না—যে অবস্থায় পড়েছিল তার ওপর পেয়েছে টাকা—ওরালা এত বড় একটা আনাড়ীকে, ছাড়বে কোন্ প্রাণে বল ?

শ্রীতীরা। বা ছাড়বে না তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে ভাই ? তার চেয়ে চল না ভাল-মন্দ ছু-একটা খাবারের সঙ্গে আরও ছু-এক বাটি ফরাসী মধু খেয়ে নেওয়া যাক—বহুরে ক'টা দিনই বা এমন জোটে ! চল চল—

শ্রীতীরা। তুমি তো; আহ ওই তালে—চল—

[ তিন জনেই উঠে দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু সময়ের মধ্যে বারান্দা খালি থাকে। শুধু চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় হলের ভেতরকার ছায়ামূর্তি, কানে ভেসে আসে তাদের হাসি আর কথাবার্তা, পেছনে চাপা আবহ সঙ্গীত। ধীরে সেই আবহ সঙ্গীত একটু উচ্চ শ্রমে ওঠে, সেই সঙ্গে বারান্দার এসে ঢোকে যুগাক আর মীরা। মীরার হাতে ভ্রাস্পেনের গ্রাস। ]

মীরা। ( মদ্যাস দৃষ্টি তুলে ) আর একটা সিগ ?

যুগাক। না, এই শ্রদ্ধা, তুলে বাবেন না—[ মীরা ভ্রাস্পেন-গ্রাসটা টেবিলে রেখে প্যারাপেটের দিকে এগিয়ে যায়, যুগাক তার অনুসরণ করে। ]

মীরা। হোরটি এ প্রেক্ষাপট নাইট !

যুগাক। ( প্যারাপেটে হেলান দিয়ে ) মীরায়াল প্রেক্ষাপট—এমন রাত আমি জীবনে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

মীরা। ( আরও কাছ বেঁবে ) উঃ, আপনাকে এক এক কোরে মহিলাদের হাত ছাড়িয়ে এখানে এনে ফেলতে কি কাণ্ডটাই না করতে হল ! ( মুহূর্ত দৃষ্টি তুলে ) আপনার মত ছাণ্ডসম পুরুষদের নিয়ে এই তো বিপদ !

যুগাক। ( বিম্ব-বিফারিত চোখে ) ছাণ্ডসম—আমি—আমি সুপুরুষ—( উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে )

মীরা। ( টেট বাকিয়ে ) ইস, এ কথা যেন আপনি কোন দিন আর কোন মেয়ের কাছ থেকে শোনেননি !

যুগাক। ( গভীর মুখে ) না শুনিনি। ( বক্র হেসে ) কারণ হয়তো গোড়া কপালের ছাই দিয়ে এরূপ ঢাকা ছিল।

মীরা। ( আবহাওয়ার স্বরে ) অ প্রীত, ডোক বি সিরিয়স। ( ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সুবুত সিগারেটটা-কেন বার কোরে ) নিন একটা সিগারেট ধরান।

যুগাক। ( সিগারেটটা হাতে নিয়ে সন্ধির ) আপনার ব্যাগে সিগারেট—আপনি সিগারেট খান ?

মীরা। ( খিল খিল কোরে হেসে ওঠে ) আপনি যেন কি—সুমন, এই 'মিডল ক্লাস সাইনেস'গুলো ছাড়ুন তো, নইলে জীবনের অন্তে—ক বাঁদ যিসু করবেন।

যুগাক। ( স্নেহের স্বরে অনেকটা আপন মনে ) মিডল ক্লাস সেন্স—ব্যবস্থাপনুলত লজ্জা—তা ঠিক, টাকার ঢাকা জুড়ে দিতে পারলে সব কিছুকেই সাধারণের নাকের ওপর দিয়ে ঢালিয়ে নেওয়া যায়—

মীরা। এই তো আপনার লোভ, থেকে থেকেই ভারী সিরিয়স হোয়ে ওঠেন।

যুগাক। ( হেসে ) না না সিরিয়স কোথায় বলুন কি করতে হবে—? আপনার বোকা উচিত, অনভ্যাসের কৌটার একটু অশক্তি হয় বৈ কি। ( জব্যগুণ-প্রভাবিত মুহূর্তদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে ) নইলে আপনার সঙ্গেকে ভারী কথার ভরাডুবি করার মত মূর্খ তো আমি নই ! সত্যি আমার অভিজ্ঞতার নারী হিসেবে আপনি এক বিষয় ! ( একটু থেমে ) বেশ ভাল লাগছে—একটা কবিতা শুনবেন ?

মীরা। নিশ্চয়ই। ( আবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকায় যুগাকের দিকে )

“দোলে রে দোহুল দোলে

ভাগুর ছুটি নয়ন ঢোলে

দোলে রে তিন্দোলাতে

স্বপ্ন কুসুমশয়ন শোলে।

চলে আর কুজবনে

স্বপনের গুজরণে

স্বপনের দায়রা তালে

নাচবে চপল ছুন চরলে।

হারি রা ধূসীর নেশায়

আজ আসে না তজ্রা চোখে।

( তুড়ির সঙ্গে ) পুলকে লোলন চাপা

মূলন কলায় চন্দ্রালোকে

আমারে চাই বিলাতে

সুরেতে সুর মিলাতে

টানা চোখের—

[ তাল কেটে যায় যুগাকের। শুদ্ধ হোয়ে যায় সে। চোখ পড়ে এক পাশে দাঁড়ানো রচনার বেদনাবিহ্ন পাখরের মূর্তির মত নিশ্চাপ মুখ। যুগাকের দৃষ্টি অনুসরণ করেই মীরাও ঘুরে দাঁড়ায়—রচনার মূর্তি ততক্ষণ সরে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে। ]

### দ্বিতীয় দৃষ্ট

[ যুগাকের বাড়ীর লবী। সময় সন্ধ্যা। যুগাক ও মীরা সুখোমুখী বসে। ]

মীরা। আজকে একটা লঙ-গ—লঙ-গ ড্রাইভ সিতে হবে।

যুগাক। সে আর একটা বেশী কথা কি—কোথায় বাবে বল ?

[ ঠিক এমনি সময় হিলের লক তুলে অপ্রত্যাশিত ইচ্ছাকৃত শোবাকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে রচনা। বিম্বিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে যুগাক। ]

রচনা। আমি একটু বেয়োগছি।

যুগাক। কোথায়—কায় সঙ্গে ?

রচনা। লক একটা ঠিক কোরে নেওয়া বাবে—অ, মিঃ চৌধুরী তো বোধ হয় অকিসই রয়েছেন ? আচ্ছা—

[ রচনা গিরে অকিসে ঢোকে। ]

মীরা। ( যুগাকের মুখভাব লক্ষ্য কোরে ) কীকিন জেলাস—হিসে হচ্ছে ? পোত হলে একটু ছাড়তেও হয়—দিস ইজ ঠিক



লাইক। নাও চলো—লজ্জা গড়াইডের কথাটা মাথা থেকে উবে যায় নি তো?

মৃগাঙ্ক। (নিজেকে সামলে নিয়ে) না তা বারনি। রাইট—

অ—চলো—

[হুঁজুনে বেরিয়ে যায়। রচনা অক্লিস্থর থেকে বেরিয়ে ম্যানেক্সারের অপেক্ষার একটু পারচরী করছে—এমন সময় উপটৌ দিক থেকে বিত্ত এগিয়ে আসে।]

বিত্ত। বৌদি?

রচনা। (ঘূরে পাড়িয়ে) ডাকছ আমাকে?

বিত্ত। হ্যাঁ।

রচনা। (কাছে এগিয়ে) কিছু বলবে?

বিত্ত। (বেগনাতরা দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকায় রচনার চোখের দিকে, তারপর এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে স্থিতির সঙ্গে) আপনিও বেরোচ্ছেন?

রচনা। (সজল চোখে জমাট মুখ নিয়ে) কাল রাতে তোমার দাদা ক'টার ফিরেছিলেন বিত্ত?

বিত্ত। বায়োটার।

রচনা। আমি তারও পরে ফিরব।

[রচনা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় অক্লিস্থরের দরজার সামনে। ম্যানেক্সার এগিয়ে আসে, হুঁজুনে বেরিয়ে যায়। বিত্ত এসে অস্থির ভাবে পারচরী করতে থাকে। ভোলা ঢোকে। কিন্তু বিত্তের মুখভাব লক্ষ্য করে প্রথমটার কথা বলতে ভরসা পায় না।]

ভোলা। (একটু স্থিতির পর) কি হয়েছে যে বিত্ত, তুই এমন কোরে ঘুরছিস কেন?

বিত্ত। কি আর হবে, সর্বনাশ চুকেছে বাড়ীতে—টাকার রোগ বাদে হাড়ে-মাংসে, তারা যখন এ বাড়ীতে চুকেছে তখনই জানি এ রোগ ছড়াবে। দিনের পর দিন ম্যানেক্সারের বোটা দাদাকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে—শেষ পর্যন্ত আজ বৌদিও কিনা, যে নাকি দাদার 'জন্তে' বস্তুতে এসে উঠতে পারে—না না আমি ঠিকই বুঝছি, দাদার ওপর রাগ কোরেই সে বেরিয়ে গেল।

ভোলা। সত্যি যে, ক'দিনের মধ্যে বাড়ীর সবকিছু কেমন যেন বদলে গেল—দাদা কেমন বদলে গেছে দেখেছিল? সামনে দিয়ে চলে গেলে তাকেও যেন চিনতে পারে না।

বিত্ত। দু'দিন আগে আর পিছে, টাকা হলে লোকের জাত বদলাবেই—আর এক দল লোক আছে, যারা সেই জাতের পেছনে জাত দেয়, যেমন তুই—

ভোলা। (কান-কান হোয়ে) ও কি বে, তুই আবার আমাকে নিয়ে পড়লি কেন?

বিত্ত। বা বা! হাঁদা কোথাকার, গালে চকোলেট মাখবে বা।

[আলোর ইঙ্গিতে সময় পরিবর্তন। রাত প্রায় একটা বাজে। ঈশ্বর খলিতপারে অস্থির ভাবে একা লবীতে পারচরী করছে মৃগাঙ্ক। এমন সময় ঢোকে এসে রচনা। মৃগাঙ্কের অন্তিমকে অস্বীকার কোরে এগিয়ে যাবার জন্তে পা বাড়ায় সে।]

মৃগাঙ্ক। পাড়াত—

[রচনা তাকিয়ে থাকে]

কোথার গিরেছিলে? (জবাব না পেয়ে) আমি কি জিজ্ঞেস করেছি তুমিও পেরেছ? এত রাত অবধি কোথার ছিলে?

রচনা। (শান্ত কণ্ঠে) রাগ করেছে?

মৃগাঙ্ক। আমার কথায় জবাব দাও, এত রাত অবধি কোথার ছিলে?

রচনা। কি করছিলাম? (আঙুলে পীতে পীত চপে) সব কথা কি বলা যায়—তুমিই বলো?

মৃগাঙ্ক। (চোঁচিয়ে ওঠে, পাশের টেবিলে চাপড় মেরে) বলতে হবে তোমাকে।

রচনা। 'শাউই'—বতো পারো চোঁচাও—কিন্তু আমি বলবো না—বলতে পারবো না।

মৃগাঙ্ক। বলতে হবে, না বললে চারকে তোমার শিঠির চামড়া আমি ছাড়িয়ে নেবো।

রচনা। বাঃ, চমৎকার! বস্তির ঘরে কাঁধে একটু জোরে চাপ দিয়েছিলে, আমি ভয় পেয়েছিলাম বলে লজ্জার মাথা নীচু করে বার বার করে বোকাতে চেয়েছিলে, তুমি আমার পায়ে হাত দিতে আস নি। বস্তুতে বা সম্ভব হয়নি, প্রাসাদে পাড়িয়ে, উঁচুতলার লোকদের সঙ্গে মিশে আজ তাই সম্ভব হচ্ছে! চালিয়াৎ সমাজের চুড়ার যখন উঠেছে, তখন তার সবটুকু মেনে নাও, সেখানে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার সংস্কারটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কেন!—জানাবার মতো কিছু থাকলে তোমাকে জানাবো। এখন তুমি খুব সুস্থ নও, শুয়ে পড়গে।

[রচনা মৃগাঙ্কের হাত ধরে এগিয়ে যাবার সাহায্য করতে যায়, মৃগাঙ্ক ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দেয়।]

মৃগাঙ্ক। অ—তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ, না? কিন্তু তুমি কেনো, ভুল করেও আমার বা মানায়, জী হয়ে তোমার তা মানায় না।

রচনা। অজ্ঞান বা, তা কাউকেই মানায় না—সেখানে জীপুরুষ বলে কোনো কথা নেই।

[বলে ঘর পরদক্ষেপে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। নীচে পাড়িয়ে থাকে জ্ঞক মৃগাঙ্ক। আলো নিবে যায়। সময় পরিবর্তন। শবের দিন রাত্রি।]

[করিডোর দিয়ে বাইরে যাবার পোষাকে এগিয়ে আসে রচনা, সঙ্গে মিঃ চৌহুরী। লবীর মাঝামাঝি এসে থমকে পাড়ায় রচনা, কি একটু ভেবে নিয়ে বসে পড়ে একটা কোঁচে।]

ম্যানেক্সার। (হাতখড়টা দেখে নিয়ে হেসে) দলটা পর্বত তো বাগানেই কাটালেন—আবার বসলেন যে?

রচনা। না, আজ আর বেরোবো না। আহন, এখানেই একটু বসে থাক।

ম্যানেক্সার। বেশ তো, বেরোতে ইচ্ছে না হয়, বেরোবেন না। একটু বললে আমি এখানেই তো সব ব্যবস্থা করতে পারি—হোটেলের ওই হটগেল আমারও ভালো লাগে না।

রচনা। না থাক, আপনাদের ও-সব ব্যবস্থা আমার ভালো লাগে না। কয়েক দিন থেবে তো দেখলাম, আমার কেমন যেন বাজে নয় না।

ম্যানেক্সার। বেশ তো, ভালো না লাগলে থাকেন কেন? কিন্তু আবার কি মনে হয় মিসেস জাটাজি, জানেন? আপনার বয়স হয় আমার সজই তেমন ভালো লাগে না।

রচনা। না—না, ও-কথা বলছেন কেন? ভালোই যদি না লাগবে, তবে আপনাদের সঙ্গে এতো ঘুরে বেড়াই কেন?

ম্যানেজার। আমার কিন্তু স্বপ্নের মতো কেটে যায়, যতটুকু সময় আপনাদের সঙ্গে থাকি। আপনাদের আনন্দ, দুঃখ, রাগ প্রভৃতি 'হুড়'ই যেন আশ্চর্য হৃদয়! এই যে আপনাকে আজ একটু 'পেল' আর অল্পমত লাগছে, তাও আমি সন্ধ্যা থেকে অবাক হয়ে দেখছি।

রচনা। সত্যি?

ম্যানেজার। সত্যি—শুধু আজ নয়, প্রথম দিন থেকেই মনে মনে যুগাঙ্ক বাবুর পছন্দকে আমি তারিফ না করে থাকতে পারি নি। তারপরে ক'দিন আপনাদের সঙ্গে মিশে যুক্ত হয়েছি—আপনাদের কম্প্যানি—'ওহ ইট'ই হেভেনলি!'

রচনা। কেন, মিসেস চৌধুরী?

ম্যানেজার। ও দোজ ভেনু লেডিস—আপনাদের সঙ্গে ওর তুলনা?

রচনা। সত্যি, আপনারা এত হৃদয় করে বলেন—বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছা হয়।

ম্যানেজার। (আবেগ ভরে রচনার কৌচের হাতলে রাখা হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে) আপনি বিশ্বাস করুন—আই এ্যাম টেলিং ট্রু।

[ঠিক এমনই সময় বিস্ত তার ঘরের দিক থেকে এগিয়ে এসে পঁড়ায়। ম্যানেজার হাত টেনে নেয়, রচনা তেমনি বসে থাকে।]

ম্যানেজার। (বিস্ময়ে) এখানে—কি চাই তোমার?

বিস্ত। তা আপনাকে বলবো কেন?

ম্যানেজার। ওয়েল—

বিস্ত। বৌদি?

রচনা। কিছু বলবে?

বিস্ত। হ্যাঁ, একটু এদিকে আসতে হবে।

[রচনা উঠে পঁড়ায়]

ম্যানেজার। (উঠে পঁড়িয়ে) আপনি বাবেন কেন—আপনি কথা বলুন, ততক্ষণ আমি একটু অফিসঘরে বসছি।

[উঠে দ্রুত অফিসঘরে চলে যায়]

বিস্ত। (দ্বির দৃষ্টিতে রচনার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখে দেখা যায় জল) বৌদি, তুমি দাম্যাক বাঁচাও। রাগ করে এভাবে সব ভেঙ্গে দিও না তুমি।

রচনা। (চোখ তুলে সন্ধ্যা সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিস্তর হৃদয়ের দিকে) বিস্ত, সত্যি তুমি আমাদের বন্ধু—আপাদের-বিপদে এমন বন্ধু আর কোন দিন কেউ হয়তো হবে না—তোমার কাছে কিছুই লুকবো না—একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি যে বৌদিকে বস্তুতে দেখেছিলে, সে আজও বললার নি।

বিস্ত। তুমি বলতে পারো না বৌদি, সে আমি জানি—আমি জানি, তাই যদি না জানতাম, তবে ঠিক জেনো, তোমাকে যে বললো, তার মাথা ফাটিয়ে আমি জেলে চলে যেতাম।

রচনা। (হেসে ফেলে) তুমি যাও বিস্ত। কিছু ভেবো না।

[বিস্ত আঙুলে আঙুল চলে যায়। রচনা বসে।]

রচনা। বোয়ারা—

[ছুটে আসে বোয়ারা]

ম্যানেজার সাবকো বোলাও—

বোয়ারা। জী—

[চলে যায়। ম্যানেজার ফিরে এসে বসে]

ম্যানেজার। কি ব্যাপার কি?

রচনা। কিছু না—এই ওর নিজের একটু কথা ছিলো।

ম্যানেজার। তা যাই বলুন মিসেস চ্যাটার্জি—ডোন্ট মাইণ্ড আপনাদের এই বিস্ত লোকটা একটু ইম্পাটিনেন্ট উদ্ভূত স্বভাবের।

রচনা। কিন্তু তবু বলবো, সমাজের ছাঁদের উপর দিয়ে বড় চালে যারা চলে, তাদের চেয়ে ফুটো চালের তলায় বড় মাছের বেশী জোটে—মাছবটা কিন্তু বড় খাঁটি।

ম্যানেজার। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না—অবকোস—

রচনা। না, ওর কথা আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। তবে সত্যি আপনাকে বলবার মতো দু-একটা কথা আমার আছে, যা পরিষ্কার করেই বলবো।

[একটু সময় চুপ করে থাকে। এমন সময় যুগাঙ্ক ও মীরা বাইরের দরজা দিয়ে এসে এক পা ঢুকেই থমকে পঁড়িয়ে পড়ে। রচনা ও মিঃ চৌধুরী এমন ভাবে বসা, যাতে তাদের এ প্রবেশ টের পায় না। যুগাঙ্ক এক পা এগোতে যায়, মীরা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে এমন ভঙ্গিতে তাকে টেনে নিয়ে একটু পাশে সরে পঁড়ায়, যাতে বোঝা যায় এদের কথাবার্তা শোনাটাই উদ্দেশ্য।]

ম্যানেজার। কই কি বলবেন বলছিলেন, বলুন?

রচনা। হ্যাঁ বলবো বই কি, বলছি। আজ্ঞা মিঃ চৌধুরী, আপনারা তো ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন?

ম্যানেজার। হ্যাঁ।

রচনা। আমাদেরও লভ-ম্যারেজ। আজ আপনাদের কাছে মিসেস চৌধুরী 'ভেনু' লেডি, আমার স্বামীর চোখে তিনি অপূর্ণ, অদ্বুত! মিসেস চৌধুরীর চোখে তিনিও হয়তো তাই—আবার আপনাদের চোখে আমার মধ্যে পেতে চান্ধে এক নতুন অপূর্ণতাকে—আজ ওরা হ'লন, আর আমরা দু'জন যদি নতুন করে মনের সম্পর্ক পাতাই তো তাও একদিন পুরনো হবে—তারপর? বলুন—আমার এগ্রেমন্টের জবাব দিন।

ম্যানেজার। বলছেন এখন, আপনিই বলুন।

রচনা। বেশ আমিই বলছি আমার নতুনের খোঁজে ছোটো, এই তো—তবে এই ছোটোর শেষ কোথায়? কোনো একদিন কোথাও গিয়ে তো থামতে হবে—সেদিন হয়তো দেখা যাবে, সমস্ত জীবনটা নতুনের খোঁজেই কেটে গেছে। জীবন গড়বার আর সময় হয়ে ওঠেনি—আর তাছাড়া আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী! বিবাহিত জীবনে ভালোবাসাটা মস্ত একটা কথা হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কথা তো নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য কর্তব্য—সেগুলোকেও স্বীকার করতে হবে নাকি? বলুন?

ম্যানেজার। হবে বই কি।

রচনা। অব্যক্তি, শুধু নতুনের খোঁজে না হয়ে যদি অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, সে হলো আলাদা কথা। কিন্তু আজ আপনি, আমি, আমার স্বামী, মিসেস চৌধুরী—মহুয়াঘের কোন অনিবার্য কারণে আমাদের জীবনকে ভাঙতে চলেছি—এর উত্তর

আমাকে দিতে পারেন?—কই চুপ করে বইলেন কেন? আমার কথার উত্তর দিন?

মান্নেজার। (নীচু মাথা আঁতে তুলে) আমার কোনো উত্তর নেই মিসেস চ্যাটার্জি—(উঠে দাঁড়ায়) আপনি আমার কমা করুন। [বলে মাথা নীচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। রচনা ছুই হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। এগিয়ে আসে যুগাক, পেছনে বিব্রত মীরা। রচনা মুখ তুলে তাকায়]

মীরা। (কি বলবে স্থির করতে না পেরে মুখে চেঁচাকৃত হাসি টেনে) দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলাম—আপনি তো রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন—আমি তো—

যুগাক। (বাধা দিয়ে জমট মুখে) তুমি যাও মীরা—আমাদের অভ্যয়ের সব দায় একা তোমার ওপরেই আমি চাপাচ্ছি না, তবু বলবো, ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আর কোনো বাগাযোগ না থাকলেই আমি খুদী হবো। তোমাদের জীবনের এই সর্ব্বনেশে সহজতার মধ্যে জড়িয়ে এ ক'দিন ধরে আমার ভেতরেও চলছিলো একটা প্রচণ্ড সংঘাত—যাও তুমি, যাও মীরা।

মীরা। (নিজের অসম্মান ঢাকতে কাঁধ ঝাঁকুনির সঙ্গে মুখ ঝাঁকিয়ে) 'ষ্টেজ'—

[বলে বেশিক দিয়ে ঢুকেছিলো সেই পাখেই বেরিয়ে যায়। যুগাক এসে মাথায় হাত রাখাে রচনার। ছ'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে রচনা।]

যুগাক। (মাথায় হাত বুলিয়ে) না—না আজ আর কান্না নয় রচনা! আজ আমাদের সত্যিকারের হাস্যবার দিন—কই? কথা শোন—

[রচনা নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মোছে।]

যুগাক। (পূর্বেকার মতো গলা ছেড়ে হাঁক দেয়) বিত্ত—বিত্ত—ভোলা— [বিত্ত ও ভোলা ছুটে আসে]

আর অনেক দিন পরে আবার সবাই মিলে একটু বস। হাক—উঃ, ক'দিন বাড়ীর আবহাওয়াটাই কি হয়ে গিয়েছিলো!

বিত্ত। সজ্জি দালা—হাক—হাক ওসব তুলে যাও। উঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে—আর তো ভোলা, কান মলে তোর ঘুমটা একটু ছাড়িয়ে দি—

ভোলা। (চোখ বগড়ে) আমার আবার ঘুম পেল কোথায়?

[এমন সময় দারোয়ান বাস্ত ভাবে বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকে]  
দারোয়ান। (সোলাম জানিয়ে দ্রুত বলে চলে) আমাদের কোনো কস্তুর নাট হজুর—হামি গেট খুলে একটু দেশওয়ারী ভাইয়ের সাথে দুটো কথা বলছি আর এই মেয়ে লোকটা একদম অন্ধরে চলিয়ে আসছে। হামি এই দরজা পর কুখে আপনে কো—বিত্ত। কে মেয়েলোক—কই—?

[‘বিত্ত রে’—‘বিত্ত’ বলে করুণ আর্তনাদের সঙ্গে দারোয়ানের পাশ দিয়ে এসে ঢুকে পড়ে বিগুদি']

এ কি বিগুদি! [ছুটে এগিয়ে যায় তার কাছে]



উৎসবের দিনে



ক. হোড়ের

মুবাশিত  
প্রমাধীন মাছসী

ক. হোড় ১৩ কোঃ

কলিকতা-১৪

বিগুদি'। পেইটের কাছে বইসা দুই থকা কানডাসি বিত্ত, দেখা পাই না—একটু খোলা পাটরা পাগলের মতো ছুইটা আইয়া পড়িসি। মধুরে বৃষ্টি আর বাঁচাইতে পারলাম না যে—

রচনা। কেন, কেন মধুর কি হয়েছে ?

বিগুদি'। মধুর ওপর মায়ের দয়া অটল গো, সারা গায় আর তিল ক্যালনের জাগয়া নাই। পোলাটা যন্ত্রণায় কি ছটকট করতে আসে যে বিত্ত, তরে কি কহু—ভরে বস্তির লোক পর্যন্ত পলাইয়া গাসে।

বিত্ত। অস্থির হয়ে না বিগুদি, চলো—

মৃগাক্ষ। ঠাঁড়া বিত্ত (দারোয়ানকে) যা, গাড়ী বার করতে বল—  
[ দারোয়ান চলে যায়। ]

আমিও বাবো।

বিত্ত। না দাদা, তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আর গাড়ীরও দরকার নেই। আমরা এমনি চলে যেতে পারবো।

মৃগাক্ষ। না—না, অন্ততঃ গাড়ীটা তো পৌঁছে গিয়ে আমুক। মধু একটু ভালো ঠলেই কিরে আসিস কিছ।

বিত্ত। না দাদা, এ অমুখোশ আর আমাকে করো না। আমার জায়গা বস্তি—আত্মীয়-বন্ধু সবাই সেখানে—আজ বিগুদি'কে দিয়ে খুব ভালো করেই বুঝলাম আমার আপনায় জনের ডাক তোমার ওই গোট পায় হরে ভেতরে ঢুকতে পারে না দাদা—(রচনা ও মৃগাক্ষকে প্রণাম করে) চলি দাদা—বাছি বৌদি! হাতে হাতে আসবো দেখা করতে।

রচনা। নিশ্চয়ই আসবে।

মৃগাক্ষ। যে রোগের সেবা করতে বাছিস, একটু সাবধানে থাকিস বিত্ত।

[ বিগুদি'র হাত ধরে বেরিয়ে বার বিত্ত। ]

রচনা। ঠাঁড়া বিত্ত, আমি বাবো না ?

[ চটপট প্রণাম সেরে বেরিয়ে যায়। রচনা ও মৃগাক্ষ তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। ]

মৃগাক্ষ। আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু আজ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

রচনা। বন্ধুর চেয়েও বড়।

### তৃতীয় দৃশ্য

[ সময় সকাল। রাস্তা। রাস্তার পাশে বড় একটা দোকান। হু-হু আনার ঠেলা ঠেলে এক পাশ দিয়ে ঢোকে বিত্ত আর বিগুদি'। ঠেলার জিনিসপত্রের উপর কাগজের ঠোঙার বড় একটা প্যাকেট। বিত্তকে দেখলে আজ আর চেনা যায় না। মাথার চুলগুলো প্রায় ধরে গেছে বললেই হয়, কালো রং, মুখময় বসন্তের দাগ। ঝাঁ

চোখটা গলে গিয়ে অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। তাকে দেখলে বোকা যায়, এখনও সে বেশ দুর্বল। ]

বিগুদি'। এই শরীর লইয়া তরে বাইতে দিতে তো আমার তো মন সরে না—

বিত্ত। না সরলে তো চলবে না বিগুদি', ভালো একা আর কতো সামসাবে বলো ? আর তাছাড়া আজ না হোক কাল, কাজে তো বেদোতে হবেই।

বিগুদি'। মধুরেও বাখতে পারলাম না, তরও এই সর্বনাশ করলাম। আইচ্ছা, তর মৃগাক্ষ বাবু তো আর একটা খবরও নিল না যে !

বিত্ত। আমাদের নতুন বস্তির ঠিকানা সে তো জানে না ?

বিগুদি'। কয় দিন ধাবং কেবলই ভাবি—একবার ভালোরে পাঠাইয়া একটু খবর দিলে হয় না ? তরে তো খুবই ভালোবাসে তর দাদায়।

বিত্ত। না বিগুদি', অমন কাজও করে না। দাদা বৌদি মাদুঘও খুব ভালো, আমাকে ভালোও বাসে খুবই—কিন্তু আজ ওরা যেখানে—সেখানে বসে আমাদের মত লোককে চাকরের মত ভালোবাসার চেয়ে আর বেশী কিছু করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

[ ঠোঙার প্যাকেটটা বিগুদি'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ]

ঠোঙাগুলো দোকানে বন্ধিয়ে দিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও বিগুদি'। বিগুদি'। (চোখের জল মুছে, ঠোঙাগুলো হাতে নিয়ে) তুইও কিছ আইজ বেশী ঘরিস না।

[ উল্টো দিক দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় বিগুদি'। বিত্ত ঠেলার থাকা দিয়ে এগুতে বাবে এমন সময় দেখতে পায় দোকান থেকে বেরোচ্ছে মৃগাক্ষ আর রচনা, পেছনে একটা প্যাকেট-হাতে দোকানের ভৃত্য। ]

বিত্ত। (সবিস্ময়ে আপন মনে) দাদা—বৌদি—(ঠেলাটা এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের সামনে, তার দিকে কেউ লক্ষ্যও করে না।) কিছু কিনবেন ?

মৃগাক্ষ। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুকের দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ে। বলে, পেছনের ভৃত্যকে)—গাড়ীতে রেখে এসো। (রচনার দিকে ফিরে একটু হেসে) আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। কেমন বিত্তর চোখায়ার সঙ্গে মিলে না লোকটার ? (বিত্তকে) না, কিছু লাগবে না।

[ রচনা ও মৃগাক্ষ গাড়ীর দিকে চলে যায়। বিত্ত জ্বল হর্ষে কিছুক্ষণ ঠাঁড়ায়, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বিত্ত ভান হাতেই আঙুলে চোখের জলটা মুছে নিয়ে দুর্বল হাতে ঠেলাটা ধাক্কা দিয়ে ঠাক দেয়— ]

বিত্ত। লে-লে বাবু ছে' আনা—হুনিয়াকা খেল ছে' আনা—হুনিয়াকা খেল ছে' আনা—

য-ব-নি-ক'।

... এসেছে প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বেণুজ মর্তের পদমহাস্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি-  
সমিতির প্রবেশদ্বারের শীর্ষভাগের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

দেখবার  
দরকার নেই...  
তফাৎটা স্বাদেই  
বুঝতে পারবেন !



একেবারে নতুন টুথপেস্ট !

**কলিনস** **সুপার-হোয়াইট**



ক্যাসোয়াল হাসিভেই  
'সুপার-হোয়াইট'-এর  
পরিচয় !

কাপটি বিশেষ ভাবে তৈরী—  
অনেক সহজে ও তাড়াতাড়ি খোলা  
ও বন্ধ করা যায় ।

এর পেপারমিটের মত শীতল ও  
মনোরম আশ্বাদটি অপূর্ব

এই টুথপেস্টটি বাস্তবিকই নতুন !

পেপারমিটের মত শীতল নতুন আশ্বাদে চমৎকার তৃপ্তি  
অসম্ভব করবেন !

নতুন ফেনার আচুর্নক হাতের ফাঁকগুলোকে পরিষ্কার করে,  
লুকানো খাঁজকণা বের করে দেয়... মুখে বেশ স্বচ্ছ  
স্বরস্বরে অনুভূতি আনে ।

এতে নতুন শক্তিশালী উপাদান থাকায় দাঁত অনেক বেশী  
পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে । সাধারণ সাধা  
টুথপেস্টের চেয়ে 'কলিনস' সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট  
কত বেশী সাধা তুলনা করে দেখুন !

আজই এই সম্পূর্ণ নতুন 'কলিনস' সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট ব্যবহার

শুরু করুন—এর লোভনীয় স্বগন্ধ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রিয় !



প্রফুল্ল রায়

এ বছর আজ প্রথম ত-দিকে রঙনা হলো ম্যাকলীন।

অনেক দূর থেকে কতকগুলো সাদা পায়রাব মত মনে হয়েছিল। এখন বোকা যাচ্ছে পরিষ্কার। পায়রা নয়, রাশি রাশি তাঁবু।

অকলটার নাম ভাতারমারীর বিল। বর্ষার সময় কিনারা থাকে না, চিহ্ন পাওয়া যায় না দিকচক্রের। দূরের কাকন নদী থেকে কেনার কেনার গর্জে আসে কাকল-জলের বজা। এখন পৌষের দিন। ভাতারমারীর বিল থেকে কবে একদিন বর্ষার বোবন সবে গিয়েছে। অন্তরযুক্তের মত চিরন্তনলিতে বজালের আত্মপ্রকাশ। মাঝে মাঝে ছলছল খাল। হিজলের ডালে পান্নারতের হাছরাডা। চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে শোলাবন, বেত-মোত্রা। লাটাশরের জলল উদ্‌ঘাম হয়ে উঠেছে।

ভারই পাশে পাশে রাশি রাশি তাঁবু। কণায় গৃহস্থালী। সাদা বর্ষা ভেসেছে কাকনে, কাকন থেকে রূপসার, রূপসা থেকে সিন্ধাবতীতে। এ ঘাট থেকে সে ঘাটে। নাম না জানা বন্দর থেকে বেনামী-নিষ্কলমে। বর্ষার পর শরৎ। তারপর সোনালী ক্ষেত্র পাড়ি দিয়ে এক কাক সামুদ্রিক পাহারীর মত বায়বরদের। এসেছে এই বিলে। তাঁবু কেলোছে। আবার কাকল-মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়ে নতুন বর্ষার নিমন্ত্রণ আসবে। বত দিন না আসে, তত দিন এই বিলেই নোঙর ফেল পাগবে।

হু' বছর ধরে দেখেছে ম্যাকলীন। এর ব্যতিক্রম নেই।

পায়ের দীতে সবুজ ঘাসের মাছুর। বতুর চলা বাত বতুর সন্ধ্যা হুতানো বার। তাঁবুতলায় কাছাকাছি এসে একবার পেছন ফিরে তাকালো ম্যাকলীন। অনেক, অনেক দূর চারের চূড়ান্ত।

আকাশ হুঁড়ে উঠে গিয়েছে। তার ওপরে পৌষের দরম বোনে বলমল করছে চারের ক্রশটা। একটা স্থির লাইট-হাউসের মত, একটা উজ্জল শপথের মত মনে হলো ক্রশটাকে। এই দেশের আকাশে আকাশে তুলে ধরতে হবে এই দিবিজরী চূড়া। চার্চ, ক্যাথিড্রাল আর ক্রিস্চ্যানিটি। কত সাগরিক ব্যবধান ডিঙিয়ে সে এসেছে এই দেশের মাটিতে। তার পাতালীকোনে ধরে এনেছে একটি পবিত্র সম্রাট, একটি অকলুর নিদেশ। বেশাসের পূণ্য নামবীজ ফসলের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে এ দেশের মনে মনে। হু' বছরেই বুঝতে পেরেছে ম্যাকলীন, এ দেশের মন বড় উর্বর। ক্রিস্চ্যানিটির ফসল সকল হয়ে উঠবে। এ বিশ্বাস তার অকম্পিত। অনড়।

পাশাপাশি আসছিল ডিক। কয়েক বছর আগে ব্যাপটাইজড হয়েছিল। ধবধবে সাদা সারপ্রিস্, নিরপেক্ষ ভাবে সমান করে ছাঁটা চুল, মন্থন কামানো মুখ। কপাল, বুক আর বাহুদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদৃশ্য রঙের ক্রশ আঁকছিল ডিক। ঘন ঘন।

কৌণিক দৃষ্টিতে একবার তাকালো ম্যাকলীন। এই ক'বছরে সমস্ত দেহ-মনে ক্রিস্চ্যানিটির রঙ পাকাপাকি ধরিয়ে নেবার জন্য অনেকগুলি মন্ত্রস্তম্ভ শিখে ফেলেছে ডিক। কিন্তু গায়ের রঙটা সাম্প্রতিক রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। নিকব সুখখানা তাই সব সময় মেঘময়। মনে মনে হাসির ঢেউ ওঠে ম্যাকলীনের।

ম্যাকলীন ডাকলো; "ডিক"—

"ইয়াস্ ফাদার"—

"বর্ণপরিচয় আর স্টেটগুটো এনেছ কোলার?"

"না।" ডিকের পিজল চোখ হুঁটো নিবিকার দেখালো।

"কেন?"

"এই নোরা লোকগুলোকে, এই ডার্ট সোয়াইনগুলোকে, লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে? এরা হিদেন। ব্র্যাক বীটস"—

"ডার্ট সোয়াইন্স ব্র্যাক বীটস"—কত থেকে বিশ্বাস ঠিকরে বেগলো ম্যাকলীনের। চোখ হুঁটো ছুরির কলার মত এসে বিধলো ডিকের চামড়ায়। কয়েকটি মাত্র বহুত। তার পরেই প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলো ম্যাকলীন। ব্র্যাক বীটস! সোয়াইন্স! হোলি বাইবেলের চমৎকার পাঠ আরম্ভ করেছে তো ডিক।

আশ্চর্য। কয়েক বছর আগেও লোকটার নাম নির্ধম ভাবেই ছিল ইঙ্গিস মুখ। সে খবর কানে এসেছে ম্যাকলীনের। ইঙ্গিস মুখ থেকে ডিক যোজাঘিও। নামের বিবর্তনের সঙ্গে আতর্ষ জন্মান্বয়। সহসা চমকে উঠলো ম্যাকলীন। ক্রিস্চ্যানিটির ডাইসে এ কোন আজব প্রাণী আবার গেলো। বেশাসের শিক্তা তো এ নয়। বাইবেলের লীলা তো আলাদা। বিকর্ণ নয় আমন্ত্রণ। ব্র্যাক বীটস! সোয়াইন্স! শব্দ ক'টি মনোর মধ্যে বিক্ষোভের মত কেটে পড়লো। গভীর হলো ম্যাকলীন। ভয়ঙ্কর হলো তার গলা, "তোমার গায়ের রঙ তো মিলুক হোয়াইট! তাই না? এরা না তোমার দেশের লোক? বাবু, তোমাকে যা বলছি, তাই করো। একুশি চার্চ গিয়ে বর্ণপরিচয় আর স্টেটগুটো নিয়ে এসো। যাও, এ্যাট ওয়াশ"—

কয়েক বছর আগের ইঞ্জিব্ মুখ। এখন ডিক প্রোফারিও। ভাব-বীভরনের দেহটার বর্ণ ফল ঠিক বোঝা গেল না। তবু মনে হলো, পিজল চোখে রাশি হুঁটো জোঁকি হ'য়ে কিছুকি দিয়ে বক

ছুটে। কিন্তু ম্যাকলীনের নিষ্ঠুর নির্দেশকে অণমান করার সাহস তার নেই। অনিচ্ছুক পা দুটো ধুধু চাচের দিকে চালিয়ে নিল ডিক্। আর, একটু পরেই ঘাসের মাছের শান্ত দুটি পা ফেলে ফেলে বাঁধাবন্ধের তাঁবুঘরের কাছে চলে এলো ম্যাকলীন।

পৌষের রোদে আশ্চর্য আমোদের আমেজ আছে। খালা কম, শ্রীতি বেশী। পৃথ্বী আকাশের চক্রপথে অনেকটা পাড়ি জমিয়েছে। কিশোর দিন। রোদের আলোতে ঝলমল করছে ম্যাকলীনের সাগা সারপিস্টা। ম্যাকলীন ডাকলো, “রাজা সাহেব—”

“তু আসছিক সাহেব! তু—” অজস্র মাছের বেরিয়ে এলো তাঁবুঘরো থেকে। অসংখ্য। হিসাবের লেখাজোখা নেই। কালো কালো পাখর-শেলী বাঁধাবন্ধ। মাছের ভাবকের পালক গৌড়া। কোমরে বকবকে ছুরি। দুই কণ্ঠাহির মধ্যে ইমলি পাখীর সাগা হাড় ঝুলছে। মেয়েদের স্তন্যম দেহে কামনা-লাল শাড়ী। তুল ধোঁপার চার পাশে শালের মঞ্জরী। মশিবকে কুঁচিলা সাশের হাড়ের বলয়।

গুত্র হাসিতে মুখখানা ভরে গেল তরুণ মিশনারীর। ম্যাকলীনের। ছ’ বছরের পরিচয়। নিবিড় অন্তরঙ্গতা হয়েছে বেদেরের সঙ্গে। এবার বাঁধাবন্ধের রাজ্যে এই প্রথম পদক্ষেপ ম্যাকলীনের। ম্যাকলীন বললো, “তোমরা কেমন আছো রাজা সাহেব? কী রে আন্তর? এই মহাবাং। এই গহর?” অজস্র নাম ফুটলো মুখে, অজস্র মুখের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে এলো ম্যাকলীনের সম্মুখে দুইটি।

চার পাশ থেকে নিবিড় হয়ে এসেছে বাঁধাবন্ধের। একখানা জলচৌকি এনে দিয়েছে রাজা সাহেব। রাজা সাহেব এসের দলনারক। তার ধূসর রঙের চুল, কপালের রেখাময় আঁকবুঁকিতে বহু বছরের ঝড়-কুকান আঁকা রয়েছে। জলচৌকিতে বসে চার দিকে আবার ডাকলো ম্যাকলীন। আচমকা একটি মুখের ওপর তার দুইটি হির

হলো। এ মুখ এই বেদেরের তাঁবুতে অপরাজিতার মত ফুটে উঠলো কেমন করে? আকর্ষণ চোখ। দ্বারত ক্রুরেখা। রাশি রাশি মেঘের মত তরঙ্গিত চুল। এত সমুদ্রের ব্যবধান ডিঙিয়ে, প্রোভ ইয়ার্ডের মাটি সরিয়ে কেমন করে এই মুখখানায় নেমে এলো আগনীস? আশ্চর্য। ঐ মুখের ওপর দিয়ে ছায়া-মিছিলের মত আঁক একটা জীবন বয়ে গেল।

আর একটা জীবন। আর একটা অতীত। ম্যাকলীনের মনে পড়লো। সে জীবনটাই ফুলের মত উদ্ভাস; সে অতীত সমুদ্রের মত উত্তাল। মিশনারীর শান্ত ভূমিকার নেপথ্যে একটা নির্বাক বজ্রার মত সেই অপরূপ পচিশটা বছর। স্বপ্নের মত। স্বপ্নবাদ একটা অবিধানের মত।

গ্রাসগো হুনিভাসিটি। ম্যাকলীনের মনে পড়লো; সে দিন পাশে ছিল আগনীস। সামনে ছিল বিশাল পৃথিবীর নিখুঁত। একই

ইয়ারের শিকারী তারা। আগনীসের সাহচর্য মনে হতো, কোনো ঝড়ের রাতে তারা দু’জনে এ্যাটল্যান্টিকে ভাসিয়ে দিতে পারে পণ্ডোলা। সাহাবার ওপর দিয়ে লাঠি, হাউন্ড, ট্রাপেরদার তাদের পক্ষে একবারেই অবাঞ্ছন্য নয়। মেক্‌বেরা ছোট পৃথিবীটুকু তারা হেঁটে পরিক্রমা করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এক মেক্‌ থেকে জীবনের আর এক প্রান্তে পৌছানো হতো না। জীবনের বিশ্বব্যবস্থায় এসে আগনীস হুছে গেল। হুছে গেল এক মক্কা মক্কাভাসে। মাত্র কয়েক দিনের ইয়লো ফিভার। তার পরেই আগাষ্টাইন সেমেটেরি। সবুজ ঘাস আর সাগা মাটির নীচে হারিয়ে গেল আগনীস নামে একটি স্বপ্ন। তার চান্দা-চান্দা চোখ, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল রাশি রাশি আগুনের শিখা হয়ে বৃকের মধ্যে হৃদয় নামক প্রদেশটিতে, স্মৃতি নামে একটি কাচঘরে জেগে রইলো ম্যাকলীনের। অহরহ। খালা ছড়াতে লাগলো নির্বিরাম।

তার পর? তার পর কী আশ্চর্য ভাবেই না জীবনটা আবর্তিত হয়ে গেল ম্যাকলীনের! কোথায়, কোন এক অতীতের মমুচকে মিথ্যা হয়ে গেল গ্রাসগো হুনিভাসিটির সেই গুন্-গুন্ স্বপ্ন। হুনিভাসিটি থেকে। চার্চের অলটার। ফিজিয়ার ছাত্র ছিল ম্যাকলীন। আগনীসের সঙ্গে সঙ্গে তার দুইটির সামনে থেকে হুছে গেল রূপময় পৃথিবীটা। ম্যাটার নামে বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক শব্দ এক রাশ কুয়াশার মত মনে হয়েছিল ম্যাকলীনের।

পায়ের নীচে যেন পৃথিবীর আশ্রয় নেই। বিরালবের মত ইথারে ভাসছিল ম্যাকলীন। একটা নিরাপদ বন্দর চাই। চাই কঠিন মাটির বিশ্বাসযোগ্য নির্ভর। সরাসরি সে চলে এসেছিল ক্যাথিড্রালে। হোলি বাইবেল, ভার্জিন মেরী, বেশাস—অন্তিমাবের গস্পেলের দুর্গে আশ্রয় নিল ম্যাকলীন। আশ্রয় পেল মিশনারীর সহজ মিনচোয়, গুত্র সারপিসে। চার পাশে একটা ধূসর বৈরাগ্য


ফোন : ৩৪-৪৯০২

Gv

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** পূজনীয় রুশনী  
মাগিকার ও অগনিপী

১০২, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



ড্রাক ৪-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩  
(রাজা বিনোয় স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)



টেনে আনলো ম্যাকলীন, তুলে দিল নির্ধর্মের খাড়া দেওয়াল। এ দুর্গে আগুনসি নামে একটি স্থানা নির্বিচ্ছিন্ন। তবু অনেক তুরাং-স্বাং-স্বাং স্বাং কী আশ্চর্য ভাবেই না চার দিকের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে! ম্যাকলীনের জলভরা চোখে ধরধর ছায়া ফেলেছে এক-মাথা সোনালী চুল, টানা টানা দুটি অপরূপ চোখ। আর তখনই, তখনই ঘুরে কোন চ্যাপেল থেকে গভীর কণ্ঠ ভেসে এসেছে। কোন জ্যাজিম্যান হস্ত আবৃত্তি করছেন বাইবেলের কোন পবিত্র প্যারাবল্। হুহুর্তে চার দিক থেকে আবার দেওয়ালগুলো উঠে গিয়ে কোন দূরান্তে সরিয়ে দিয়েছে সোনালী চুল, টানা-টানা চোখ, আপেলপাল টোটে।

তারও পর! দীক্ষার অধ্যায় শেষ করে ইগুয়ায় এসেছে ম্যাকলীন। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্বত বিশাল ভারতবর্ষ। এর আশ্রয় বেশাসের বাণীকে প্রোথিত করতে হবে। আকাশের দিকে দিকে তুলে গিয়ে হবে দিগ্বিজয়ী ক্রশ। ক্রুশিফিক্সানের মহিমা দিয়ে, বীজের রক্তদানের ইতিহাস দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে এই আইডোল্যাট্রির দেশকে। বিচিত্র আবেগে ক্রুশিগুটা বেগুনের মত ফুলে ফুলে উঠেছে ম্যাকলীনের।

কিছু দিন ছিল বিলাসপুরে। সেখান থেকে অগ্ন্যনাকুলমের এক চার্চ। তার পর বাইরা দেশ। আশ্চর্য সমতলের দেশ। স্বপ্নের মত। সুন্দরতম একটি গানের কলির মত। গ্রীন আর গ্রীন। ভাল-সুপারীর পাতার/পাতায় বাতাসের মর্মর। আদিগন্ত ধানবন। কবুতরের চোখের মত জল। নির্ধাৎ প্রান্তর। আকাশের তৃষ্ণাবোধ। পর্বাত একটানা। অব্যবহিত। হুহু হয়ে দেখতে দেখতে কোন অন্তস্ত্র জ্যোৎস্নার রাতে কত এ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ভেসে আসতো একটি হুথ, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল, টানা টানা চোখ, দূরায়ত ক্রলোথ। ভেসে আসতো একটি স্বপ্নময় কবিতার একটি মধুরতম ক্রলোথ। “আই কেট দি প্রেজেন্স অব হার বাই ইটস ‘শেল অব নাইট—’ চরণ, ‘আই কেট দি প্রেজেন্স অব হার বাই ইটস ‘শেল অব নাইট—’

বিলারমান কোন সৌরভের মত তন্ময়তা সবে বাবার সঙ্গে সঙ্গ মনের মধ্য থেকে প্রচণ্ড গর্জন শোনা গিয়েছে। রাশি রাশি তর্জনী তুলে তাকে শাসন করেছে একটি নির্মম নিদেহ। একটি মিষ্ট বোধগ। মিশনারীর শুভ জীবনে নারী নামে কোন কলক-বিলুপ্ত অস্তিত্ব নির্বিচ্ছিন্ন। ক্রিস্চ্যানিটির মহিমা ছড়িয়ে দেবার মিলিয়ে দেবার জন্ত তাকে পাঠানো হয়েছে। দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবে সে বেশাসের সৌরভ। আর তাইই তন্ময় কি না নারী মনে একটি কর্ণব শব্দের সঞ্চার।

‘আই কেট দি প্রেজেন্স অব হার—কথাগুলো রীতিমত অপরিহার্য। এর আবৃত্তি অপরাধের। কিন্তু চেতনার মধ্যে সেই কলকটা বিশেষ ক্রিয়া করে না। আশ্চর্য এই দেশ! আকাশের জলসী মেঘে মেঘে, বিলের শাপলা ফুলে, বাসের কলকে শিশিরের কীমার বার বার সেই হুথখানা ছায়া ফেলে। বার বার বিমনা হয়ে বার ম্যাকলীন। ঘুরে ঘুরে একটা নির্বিচ্ছিন্ন ভাবনা রঙে রঙে মেমোরী মাহের মত পিছলে পিছলে আসে। ইচ্ছায়। এই চার্চ সেন মাকে মাকে তাকে অস্ত্রোপাশের মত জড়িয়ে ধরে। আর তখনই এখান থেকে সেনারী হ’তে ইচ্ছা হয়।

বাবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল ম্যাকলীন। ‘অপলক’ চোখে। বেদসের সকলকেই সে জানে। কিন্তু এই মেয়েটিকে সে

কোন দিনই দেখেনি। সেই হুথ, সেই চোখ, সেই চুল, সেই আদলে মেয়েটি যেন আর এক আগুনসি। শুধু গাহের রঙটাই কালো। আগুনসি যেন কোন রক্তনীপঙ্কা। আর এই মেয়েটি একটি কুক্কলি। তা ছাড়া প্রতিটি স্ত্রীম আছে আগুনসির স্মৃতি ধরে রেখেছে মেয়েটি।

রপদুগ্ধ গলার ম্যাকলীন বললো, “একে রাজা সাহেব, একে তো আগে আর দেখিনি তোমার দলে?”

রাজা সাহেব বললো, “উ হামাগো শখিনী। উহাক ই-বহর দলে আনলেক। আর লো শখি! ইদিকে আর।”

শান্ত পরক্কেপে কাছে এসে পাঁড়ালো শখিনী। রাজা সাহেব আবার বললো, “ই হামাগো সাহেব আছেক। যোমের কাতিক (যোমান ক্যাথলিক)। তুয়াক কইছিলেক, কাদার বীজ আর মাদার মেয়ী! মনে আছেক?”

“ই।” গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের মাথাটা দোললো শখিনী।

“কাদার বীজ, মাদার মেয়ী।” চার পাশ থেকে বেদেরা সোরগোল তুলল।

রাজা সাহেব বলতে লাগলো; “তুয়াক কইছিলেক, কপালে কানে আর বুকে আতুল ঠেকাবেক।” ক্রশ জাঁকার প্রেক্ষিটা দেখিয়ে দিলে রাজা সাহেব, “ঐ সাহেব উই সব শিখাই দিলেক হামাগো। তুয়ার মনে নাই হামার কথাগুলো?”

“ই, আছেক তো।” অপরূপ মধুর শোনালো মেয়েটির কণ্ঠ। আর চোখের মণি হুটো কী এক দুর্গোণা আনলে চকচক করে উঠলো! রূপালী মাছের আঁশের মত। শখিনী হাসলো।

“তো সাহেবের দেখাই সে না তুয়ার সাপখেলোটা। জবর খুশী হবেক।” খুশী খুশী গলার বললো, রাজা সাহেব।

“দিবক।”

একটু পরেই সাপের ঝাঁপি এলো। একটি মেয়ে পেটফুলো একটা বাঁসীতে পৌ দিরে চলে। ভুগভুগি বাজাতে থাকে আর এক জন। অজন্ত নাগকন্তা। ঝাঁপি থেকে একটা শব্দহুড় বের করে আনলো শখিনী। কদার সাপা একটি শাঁখের চির। সঁ করে সাপটা লেজের মাথার ডর দিয়ে পাঁড়ালো। শখিনী হাতের পিঠি নাচাতে থাকে অভ্যস্ত কৌশলে। আর সাপের কণাটা তীব্র আক্রোশে হুলতে হুলতে আহুড় পড়ে যাটিতে।

রাজা সাহেব বললো, “একবারে আনকার। পরশ দিন ঐ বিলের পাড়ে ঘরছেক বিহান বেলায়; তাই এত জেজ।”

সাপের নাচের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে মিলিয়ে চলছে শখিনীর ক্রীড়ক। সমস্ত দেহের ওপর দিয়ে তরঙ্গিত হয়ে বাছে উদ্ভাসিত বৌবন।

শখিনীর পাশে এসে বসেছে আন্তরজান, গহরবিবি আর আসমানী। আন্তরজান তীব্র মিষ্ট গলার গান তুলে নিল,—

‘চান রাজা তোমার অ গ কেহুনতরো ঘর,

কেহুনতরো কারিগবে বানাইলো বাসর,

তোমার মনে নাই কী রাজা বিবহারির ডর।’

গহরবিবি আর আসমানী টেনে টেনে গানের বেশ বুনে চলে:

হার বিবহারির পেয়া।



# ন্যাশনাল - একো রেডিও

কিনলে সব চেয়ে কম খরচায়

সেরা কাজ পাবেন



এই জনপ্রিয় রেডিও সেটগুলির বিশেষ বিশেষ সুবিধেগুলো একবার যাচাই করে দেখলেই আপনি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন যে ন্যাশনাল-একো দামের তুলনায় অতি চমৎকার রেডিও।

ন্যাশনাল-একো বিক্রেতার দোকানে গিয়ে এই সেটগুলি দেখুন ও বাজিয়ে শুুন। যেমন গড়ন, তেমনি চমৎকার কাজ—পছন্দ আপনার হবেই। আজই একটি সেট কিনুন এবং দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্নে রেডিও শোনার আনন্দ উপভোগ করুন!



**মডেল ২৪১ :** এর জুড়ি নেই। ৫-ভালভ, ২-ব্যাণ্ডের এই সেটটির সার্কিট একেবারে নিম্নলিখিত। এতে এসব বিশেষত্ব আছে :

**ব্যাণ্ড :** ভারতের সমস্ত স্টেশন পাওয়া যায়। মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড—৫৬৪—১৮৭ মিটার। শর্ট ওয়েভ ব্যাণ্ড—১২, ২৫, ৩১, ৪১, ৪৯, ৬০ ও ৮০—৯০ মিটার।

**লাউডস্পীকার :** মন্ত বড়—৭" x ৪" সাইজের

**ক্যাবিনেট :** হুম্বার প্রাণ্টিকের তৈরি—খুব বড়—১১" x ৯" x ৬"

মডেল ইউ-২৪১ এসি বা ডিসি কারেন্টে চলে; মডেল বি-২৪১ ড্রাই ব্যাটারিতে চলে (৪ ভালভ)।

**নীট দাম—১৯৫৭ টাকা**

স্থানীয় কর অন্তর্ভুক্ত

**মডেল ২৭০ :** হুম্বার মেহগনি কাঠের ক্যাবিনেটে চমৎকার রেডিও সেট। ৫-ভালভ, ৩-ব্যাণ্ডের এই সেটে প্রশস্ত টিউনিং স্কেল থাকায় টিউনিং ঠিক করা খুব সহজ। গ্রামোফোন পিক-আপ করার সকেটও আছে।

**ব্যাণ্ড :** মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড—৫৭৫—১৮০ মিটার। শর্ট ওয়েভ

ব্যাণ্ড—১০৫—৩৯ মিটার এবং ৩১.৫—১০.৫ মিটার।

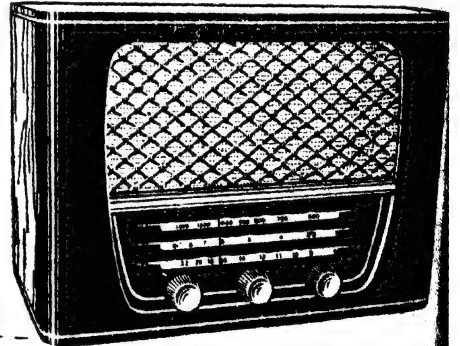
**লাউডস্পীকার :** বেশ বড় ৬½" পি. এম

**ক্যাবিনেট :** ১৬" x ৭½" x ১২½"

মডেল এ-২৭০ এসি কারেন্টে চলে; মডেল ইউ-২৭০ এসি বা ডিসির জন্য।

**নীট দাম—২৮৫৭ টাকা**

স্থানীয় কর অন্তর্ভুক্ত



ন্যাশনাল-একো বিক্রেতা সানন্দে আপনাকে বাজিয়ে

শোনাবেন—কোন খরচা নেই। ১২ মাসের গ্যারান্টি।



**জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ**

অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪ • ৩ ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩ • ১/১৮ মাইল রোড, মাদ্রাজ • ৩৬/৭৯ সিলভার  
হুবিলা পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • বোগধিয়ান কলোনি, চান্নীচক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'র পেছনে, দিল্লী

‘হুজুর! দেখো কান্দে এ যে সোনার বেঙ্কলা,  
কাইলা কাইলা পদ্মের চক্ষু হইছে ফুলা ফুলা,  
মনসার কানে কে গো দিছে সোয়া সের ধুলা।’

হায় বিবহরির দোয়া!

সাপ নাচাতে নাচাতে কেমন বেন বিমনা হয়ে গিয়েছিল শম্মিনী।  
নিজের অজান্তে অব্যাহত দুইটা এসে স্থির হয়েচে একলোড়া চোখের  
ওপর। কী আশ্চর্য নীল মণি! সমুদ্রের মত গভীর। রাশি রাশি  
সোনালী চুল উড়ছে পৌষের বাতাসে। খণ্ডের মত খাড়া নাক।  
হৃদয়ও, দেহ। এমন অপূর্ণ পুরুষ কোন দিনই দেখে নি শম্মিনী।  
কোন এক মনোহর স্বপ্নের মধ্য থেকে নেমে এসেছে মামুষটা।  
চোখের পলক বন্দী হয়ে রয়েছে তার। মনে হচ্ছে, চোখের পলক  
পড়লেই এই হৃদয়ে মামুষটা একটা বুড়ের মত বাতাসে  
নিরাকার হয়ে যাবে।

বিবহরি! সেই হিদের শয়তানীর নাম! বেদেনীদের গান  
থেকে শব্দটা ছিটকে এসে প্রথমে আহত করছে ম্যাকলীনের।  
বার বার। ‘হায় বিবহরির দোয়া’ সহসা একটা আশ্চর্য ভাবনায়  
মনটা প্রাবল্য হলে ম্যাকলীনের। ঐ প্যাগান উইচটার কারাবুপ  
থেকে, তার উইচকাট থেকে ক্রিস্চ্যানিটির প্রসার দিগন্তে কী যুক্তি  
লেখা যায় না এই অল্পবয়সী নাগকল্লকে? এই স্তম্ভকর বাবাবরীকে?  
‘কাদার’—পাসেই মেঘ ডাকলো। মেঘ নয়, ডিক এসে  
পাড়িয়েছে। কাঁধে শার্ক স্কিনের অতিকার কোলা। এই মাত্র  
দুয়ের চার্চ থেকে এসেছে। মাথার ওপর পৌষালী ছপার খবর।  
এতটা পথ আগতে আসতে শরীরের বর্শিণ রঙে বাম ফুটেছে  
কলারার মত। সুখানা এই পৌষের বকবকে দুপুরেও নিবিড়  
মধ্যম মনে হচ্ছে ডিকের।

চমকে ডিকের দিকে তাকালো ম্যাকলীন; “ও তুমি?  
পরিচিত আর স্টেটগুলো নিয়ে এসেছ?”

“ইয়াশ্, কাদার—”

ইতিমধ্যে সাপ নাচানো শেষ হয়েছে। শব্দচূড় সাপটাকে বর্শিণ  
বন্দী করলো আতরজান।

ম্যাকলীনের গলা থেকে বিস্ম বিস্ম বিষয় বরলো। সে বিষয়ের  
ক খুঁসি খুসুবে মেশানো; “বিউটিফুল চার্মিং—বড় সুন্দর  
আ সাহেব—হাউ নাইস্—”

স্বপ্নের মামুষটির মুখে অভিনন্দন। মধুর হাসি মুখমর, মসলিনের  
চুড়ি দিয়ে পড়লো শম্মিনীর। স্বরাবাদ দেহটি বেয়ে বেয়ে একটি  
শিথিল তরঙ্গিত হয়ে গেল তার। এক সময় একটা তাঁবুর  
দ্বিগলি গেল শম্মিনী।

ম্যাকলীন বললো, “তোমাদের জন্ত বই নিয়ে এসেছি রাজা  
হয়। তোমরা লেখাপড়া শিখবে।”

‘হু হু’ হা হে শম্মিনী, ইদিকে আর। লিখাটা শিখবিক—  
যা সাহেবের সোঁসাহ চাঁকরে বিলভুমি চকিত হয়ে উঠলো।

আবার এলো শম্মিনী। এককণ তার দিকে হুঁটি নিম্পলক  
স্থির করে রেখেছিল ডিক। মনের মধ্য থেকে একটা  
কর মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ডান গাল বা পাসের নীতিমন্ত্র,  
কর হয়ে গিয়েছিল মিলিয়েনামের বাসী। অলঙ্কর বাইবেলের  
কলকল্ল রক্তে রক্তে বিষ সঞ্চার করছিল। আর দুইটা চোখ

দিয়ে শম্মিনীর ক্রীড় লেহন করছিল ডিক। মেঘচুলে, বিদ্যুৎ-  
চোখে, যুক্তাদ্বিতের কারাগারে পৃথিবীর সমস্ত রূপ যে সঞ্চিত হয়ে  
থাকে, আগে কী তা জানতো ডিক!

সূর্য এখন অভয়ও। আলাদার। বিলভুমিতে ছড়িয়ে পড়েছে  
বকবকে বোদ, সবুজ শিখার মত অলঙ্কর লাটাবন, রক্তপলাশের  
সারি।

এক সময় ম্যাকলীন বললো, “বইগুলো বিলিয়ে দাও ডিক”—  
তার পরেই অতসীল চোখ দুটো পাখীর মত উড়িয়ে দিল সে।  
শম্মিনীর দিকে। ফিস-ফিস গলায় বললো, “আবার আসবো।  
আবার আসবো।”

মাথা দোলালো শম্মিনী। আর তারই পাশে হুঁ টুকরো  
রক্তভর অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগলো ডিকের চোখ দুটো।

দূরের ঐ ধূধু চার্চ থেকে এই বেদেদের সাংসার। দূরময়  
পথটুকু একটু একটু করে হ্রস্ব হয়ে এলো ম্যাকলীনের পায়ের  
নীচে। রক্তপাশের মত স্বধন সূর্য ওঠে সকালে তখন বের হয়ে  
আসে, আবার মোহন বেলাশেষের সোনা সারা গায়ে মেখে চার্চ  
ফেরে ম্যাকলীন। রোজ রোজ নিয়মিত। একটা অবিচ্ছিন্ন।  
তন্ত্রার মধ্য দিয়ে ক্রিয়িত হয়ে যায় সমস্তটা দিন। আর এই  
তন্ত্রার মধ্যে স্বপ্ন হয়ে মিশে থাকে শম্মিনী। শম্মিনী নয়  
আগুনী। এ্যাটলান্টিকের ওপারের সেই রক্তনীলগা এই সমস্তলের  
দেশ এসে কুকলি হয়ে ফুটেছে। সাপ নাচিয়ে বাঁশী বাজিয়ে  
বাজিয়ে, রহানি গানে গানে সারাটা দিন মধুর করে দেয় শম্মিনী।  
কোন কোন দিন ওদের সঙ্গে দল বেঁধে সাপ ধরতে বের হয়  
ম্যাকলীন। বের হয় জড়িগুটি বর্শিণ নিয়ে কোন মহাজনের উঠানে  
বিধ তুলতে। সারপ্রিন্সটা এক পাশে ছুঁড়ে বিলের জলে বর্শিণে  
পড়ে কখনো। শম্মিনী হয় সজ্জিনী। রায়ে চার্চে ফিরে বীজ  
জপতে মনে থাকে না, ভুল হয়ে যায় হোলি বাইবেলের কোন  
নিদিষ্ট অধ্যায়ে মনটাকে গুচিমান করিয়ে নিতে। সারা দিনের  
অবসার একটি নিবিড় ঘুমের ডেই এসে ঘুরে নিয়ে যায়। স্বরাবাদ  
বুড়ির মত দেহ-মনের ওপর খুব-খুব করে বরতে থাকে শম্মিনী।

চার্চের বাড়িতে এখন হুঁটা। ঢা ঢা শব্দ করে সকালের  
বোবাণ শেষ হলো। এর মধ্যেই উঠে পড়েছে ম্যাকলীন। জানালায়  
কাঁক দিয়ে চোখ দুটো ভাতারমারীর বিলের দিকে ছড়িয়ে দিল সে।  
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নিবিড় কুয়াশার স্তর স্থির হয়ে রয়েছে।  
অস্পষ্ট কয়েকটা সাদা বিলুর মত দেখাচ্ছে বেদেদের তাঁবুগুলো।  
ধূধু আকাশে কিছু বাবাঘর পাখী এইই মধ্যে চক্র দিতে  
বেরিয়েছে। আর বন কুয়াশার চার পাশ দিয়ে সূর্যের রক্তরেখা  
কিনিকি দিয়ে বেরতে শুরু করেছে।

জানালায় পাশ থেকে দেওয়ালের সামনে এসে পাড়ালো  
ম্যাকলীন। ব্রাকেট থেকে সারপ্রিন্সটা নিয়ে গায়ে তুলল। এই  
সকাল বেদেদের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে  
নামতে ম্যাকলীন ডাকলো; “ডিক, ছালা ডিক—”

নীচের একখানা ঘরে দড়ির খাটটার তরে ছিল ডিক।  
পেশোয়ারী কবলের ঢাল দিয়ে পৌষের সকালের সঙ্গে যুক্ত করছিল  
সে। বিশাল দেহটি পিণ্ডাকার করে কবলের মধ্যে একটি নিটোল  
ঘুমের সাধনা করছিল, আর সেই ঘুমের ওপর একটি পেশোয়ারী

লুপ্তাতলুপ্ত টেনে টেনে একটি স্বপ্নের বৃত্ত আঁকছিল। সে স্বপ্নের নাম শখিনী। সেই নাগমতী বেদের মেয়ে। সেদিনের সেই দেখার পর থেকে স্তম্ভপিশুর বাজনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে শখিনী। বুকের প্রতিটি পৃষ্ঠ-বুকের সঙ্গে তার অল্পভব্ব একটি। ছালায় মত সারা দেহে, সারা চেতনায় বেন ছড়িয়ে পড়ে। অথচ—অথচ, তার পর আর একবারও দেখা হলো না। এই শয়তান পাঁচটা তাকে ওদিকে যেতেই দেয় না। নানা অছিলায়, নানা অজুহাতে তাকে পাঠিয়ে দেয় দূরের কোন বন্দরে কী গ্রামান্তরে। আর নিজে—একটা অখুঁটান গালাগালি মনের মধ্যে কুণ্ডলিত হয়ে উঠলো ডিকের হিংস্র উৎকণ্ঠায়, কপালের রগ দু'টো দপ দপ করতে শুরু করেছে।

ম্যাকলীন একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যগ্র গলার সে ডাকলো; “ডিক, হালো চাপ, আর কত ঘুমবে? বোধ উঠে পেল যে!”

কব্বলের মধ্যে নিঃসাড় পড়ে রইলো ডিক। কিছুতেই সে উঠবে না। দাঁতের ওপর দাঁত চোপে বসলো তার। আরো বারকয়েক ডাকাডাকি করলো ম্যাকলীন। ডিক নিকুন্তর। একেবারেই নিশ্চল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই খাটিয়ার কাছে এসে প্রচণ্ড উৎসাহে কব্বলটা তুলে নিল ম্যাকলীন। সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্যা-খোলা তারের মত সাঁ করে উঠে বসলো ডিক। চোখ দু'টোতে তার যাতনের সিলিক।

ম্যাকলীনের নীল চোখে কৌতুকের আলো অলসে; “সান ইজ

আপ মাই বয়। উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। মিশনারীর এত ঘুম বে-আইনি। বাক, আজ বাজীতপুরের হাটে বাবে। মথি, লুক, বোতানের বসমাচারগুলো বিলিয়ে এসো। ভালো কাজ হচ্ছে না, সিরাঙ্গদীঘার চার্চ থেকে বড় পাত্রী চাপ দিয়েছেন। আরো ক্রিস্চান চাই। আরো ব্যাপটাইজড করতে হবে। বী আপ! আমি এ বেদেরের কাছে থাকো।”

তিন বছর ধরে ব্যাপটাইজড হয়েছে ডিক। এই তিন বছরের সমস্ত শিক্ষা দিয়ে নিজেকে সহত করেছে সে। অবাভাবিক গভীর শোনালো তার কণ্ঠ, “আমার অন্তর করেছে ফাটার! আমি আজ বেকতে পারবো না অন্তর।”

“ইজ ইট। তবে এক কাজ করো, একটা গল্পর পাড়ী করে চলে যাও। তুমি মিশ নারী। সবই তো বোকা। প্রীজি বন্ধ রাখলে কী চলে। আমাদের জীবন এরই দ্রুত ডেডিকেটেড—অপরূপ গসপেলের মত শোনালো ম্যাকলীনের কণ্ঠ।

খানিকটা সময় পিট পিট করে তাকিয়ে রইলো ডিক। তার পথ বিরক্ত গলার বললো, “মিশনারী হলেও মানুষ তো আমি! আই গ্রাম নো মেশিন”—

“আচ্ছা এক কাজ করো, তুমি বয় বেদেরের তাঁবুতে যাও। ওদের পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দিও। আমিই বাজীতপুরে বাজি। তোমার বখন অন্তর, সামনেই যাও।”



হুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার

গিনি  
ম্যানসন

জুয়েলাস

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এন্ডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিম্যান” \* কোন—৪৬-১৪৭২

শাখাগুলি :

বছাবুর বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ

বিঃ দ্রঃ—আগামী ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বাণ্যমিক শিক্ষা পর্বৎ জবীন হুসু কাইমাল পরীক্ষাতে যে ছাত্রী এখন হার অধিকার করিবে তাহাকে গিনি ম্যানসনের ডকর হইতে হীরক ব্যক্তি বর্গীকরণ দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।

আজ্ঞে আজ্ঞে দড়ির খাটিয়া থেকে নীচে নেমে এলো ডিক। চোখ দু'টো একটা কুন্ডলী খুঁতে মশাল হয়ে অলছে তার। এক সময় ম্যাকলীন বর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হুটী নিকব চৌঁটের কাঁক দিয়ে একটি খুঁশির শিবকে কাঁপাতে কাঁপাতে মুক্তি মিল ডিক। তার পর নিজেকে তারিক করতে লাগলো; “আচ্ছা বুদ্ধি খেলছে তো মাথায়! এই অশ্রু আমার আর কোন দিনই ভালো হ'বে না। বাও, বাজীতপুর আর গিরিগঞ্জ করে তুমি মরো পাত্রী সাহেব! আর আমি”— ডিকের স্বগতটুকু চারটে দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে রইলো।

হু' পাশে অব্যবস্ত্র প্রান্তর। ফলসিক্ত। তার ওপরে কুয়াশা ঘন হচ্ছে। নিবিড় হচ্ছে। পৌষের বাতাস কামঠের দাঁতের মত নিষ্ঠুর। শরীরের অনাবৃত অংশে অংশে নির্মম ভাবে বসছে শীতের দাঁত। চার পাশে ধূপছায়া সন্ধ্যা। মাথখানে জেলাবোর্ডের অসমান পথ। চড়াই-উৎরাইএ পোল খেতে খেতে এগিয়ে গিয়েছে। সারসিস্টটাকে আরো ঘনিষ্ঠ করে শরীরের ওপর চেপে ধরল ম্যাকলীন। আকাশে কৃষ্ণা পক্ষমীর ক্ষয়িত চাঁদ দেখা দিয়েছে। পাণ্ডুর স্রোতস্রার ভৌতিক দেখাচ্ছে পৌষালী সন্ধ্যা। কোথায়ও মাথা তুলেছে নলশাগড়ার কোপ, কোথায়ও বেণাবন। পানের বরজের মধ্য থেকে উদ্ধার মত ছুটে গেল একটা শিরাল। হিজলের ডাল থেকে কর্কশ শব্দ করে উঠল একটা কাল পেঁচা—নিম্-নিম্-নিম্—

কোন দিকে এক বিন্দু রূপাত নেই ম্যাকলীনের। এই মাত্র বাজীতপুরের বন্দর থেকে কিয়ৎ সে। এখনও চার্ভে গিয়ে পৌছায়নি। আকাশে রাশি রাশি তারার অস্ত্র বাসর। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেথলেহেমের সেই অনিবার্য ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করতে লাগলো ম্যাকলীন। মানবপুত্র কবে এই কলুবিতে পৃথিবীকে স্পর্শ করেছিলেন। সর্বপাশের বেণাশ। নিজের বিন্দু বিন্দু রক্তের স্রাব দিয়ে পৃথিবীকে গবিত্র করে দিয়েছিলেন। একটা বিচিত্র অল্পভূতিকে সমস্ত জায়গুলা পরিপূর্ণ করে গেল ম্যাকলীনের। বেথলেহেমের সেই স্নিগ্ধ প্রৌপ হাজার হাজার বছর ধরে লাইটহাউসের মত ভর্তি মাথাকে আলো দেখাচ্ছে, সত্যের দিগন্ত নির্দেশ করে চলেছে। এই মাত্র বাজীতপুরের বন্দর থেকে প্রীতি শেষ করে কিয়ৎ ম্যাকলীন। এখনও হুংপিণ্ডের বাজনার রিমঝিম করে বাজছে সেই কথাগুলো, “এ জলপ্রলয় আসিল, এ পৃথিবী বসাতলে বাইল হে পাশাচারীর সুত্রগণ—আইস, আইস আমি তোমাদের আলোকময় দীপা দিব।” ম্যাকলীনের সমস্ত ডেলুজ, সমস্ত সংহারের মধ্যে একটি প্রাণের অঙ্গীকারে পৃথিবী নিশ্চিন্ত, মাথুব নির্ভর। সে প্রাণের নাম বেণাশ। তখনই গুরে গিয়েছিল তত্ত্ব মিশনারী।

সহসা এই সপ্তর্ষির তারার মালায় উঁকি মিল একটি বুথ। স্বাভাবিকতার অকরে অকরে লেখা হলো একটি নাম। আগনীস। জ্যোতির্বিজ্ঞানিক পাণ্ডি দিয়ে, অগাষ্টাইন সেমিট্রির সমাখিতল থেকে বর্ত এসেছে ইণ্ডিয়ার আকাশে। একটি বুথ, একটি নাম। আগনীস। আগনীস নয় শখিনী। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপার থেকে কল্যাণদা এসে এপারের হাটতে কুক্ষকলি হয়ে ফুটেছে। মনের প্রাণে ভাঙা থেকে সরে গেলেন মানবপুত্র। এক রাশ বেঁচার দৃষ্টিতে মিলিয়ে গেল হোলি বাইবেল। সপ্তর্ষির বাসনে শখিনীকে সন্ধান করতে করতে এগিয়ে চললো ম্যাকলীন।

বিশাল একটা শিমূল গাছের ছায়াতল দিয়ে জেলাবোর্ডের সড়কটা বাক দিয়ে চলে গিয়েছে চার্ভের দিকে। বাকের কাছাকাছি আসতেই চমকে উঠলো ম্যাকলীন। একটি নারীমূর্তি শিমুলের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ গলায় ম্যাকলীন টেঁচিয়ে উঠলো, “হ হুজ দেহার?—কে?”

শিল-শিল হাসির শব্দ। রাশি রাশি কলতরঙ্গ একসঙ্গে বেজে উঠল বেন। “হামি রে সাহেব, হামি। হুই এক পহর বেলা থাকতে তুর লেগে খাড়া আছিক চেখার। তুর দেখাই নাই। হুই শরতান কালা সাহেবটারে তু পাঠাছিক। উ বড় শরতান। বড় বখিল।”

শখিনী। সমস্ত দেহ-মন থেকে চমকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল ম্যাকলীনের। একটা মধুর আবহাওয়া চেতনাটা ভরে গেল; “তুমি। এত রাতে এখানে এসেছ কেন? খবর দিলেই তো আমি যেতাম। দরকার আছে বুদ্ধি?”

“হু” গলাটা গাঢ় শোনালো শখিনীর। ম্যাকলীনের বকের কাছে আরো নিবিড় হ'রে এলো সে। নয়ানজুলি থেকে বেনে-বউ ফুলের বনজ গন্ধ ভেসে আসছে, পৌষের কৃষ্ণা পক্ষমী আরো রহস্যময়, তারাদের চোখে চোখে কী এক খুঁশী-খুঁশী ইঙ্গিত। ম্যাকলীনের তরুণ রক্তে ঝড় ভেঙে পড়ছে। আকাশে ক্ষয়িত চাঁদ, শিমুলের নির্জন ছায়াতলে এক বয়ালী বাঘাবরী। শখিনীর উত্তাল নিঃশ্বাস এসে পড়ছে বকে। ধরা-ধরা গলায় শখিনী বললো; “তু কেনে বাইল নাই সাহেব? তু না গেলে হামার পরাখটা কেয়ুন জানি করেক।”

ফিস্-ফিস্ গলায় ম্যাকলীন বললো, “বাজীতপুরে গেছিলাম। প্রীতি করতে হবে তো। তা ছাড়া ডিকের অশ্রু ছিল। তাই তোমাদের ওখানেই পাঠিয়েছিলাম।”

“হামি কিছুক গুনতে চাই না। তু রোজ রোজ হামাদের উপানে বাবিক। তুরে দেইখে হামি মজছিক। তু না গেলে হামি গলায় দড়ি দিবক। উ কালা সাহেবটা বড় শরতান, হামার দিকে খালি ডাব ডাব কইয়া তাকাইয়া থাকেক। একবার তো হাত ধরলক।” শখিনীর কণ্ঠে রাশি রাশি অভিযোগ।

“ইজ ইট। রাসকল।” গর্জন করে উঠলো ম্যাকলীন; “আমি ঝাউও লকে একেবারে খুন করে ফেলব।” ম্যাকলীনের দেহমন থেকে এই বৃহত্তে মিশনারী মুছে গিয়েছে। ব্যগ্র হাতে শখিনীর মণিবন্ধ তুলে নিল ম্যাকলীন। আর, আর একটা ক্যাশা বাতাসের মত সাগা সারসিস্টার ওপর, বকের মধ্যে ছায়ার নামক প্রবেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাগমতী বেদের মেয়ে।

পৌষালী বাতাসের মত অস্পষ্ট গলা। শখিনী বললো, “উরে আর খুন করতে হবেক নাই। তু হামারে কৃণাক লিয়া চলেক। হামরা বর বাবিক, ছানাপাণো হবেক। তু আর হামি। হামি আর তু থাকবিক। আর কেহ না। বাজী তো? হামার বড় সাথ, যবেব—”

“বর।” আর্দ্রাব করে উঠল তরুণ মিশনারী। যবের বগকে, দেহের কোষের সত্ত্ব বঙ্গনাকে চুম্বন করে দিয়েই তো সে রাস

বিষয় হচ্ছে "পরিবার" চিত্রের তথ্য।



সবিতা

চ্যাটার্জী লাক্স টয়লেট সাবান দিয়ে তাঁর ত্বকের লাভণ্য রক্ষা করেন "এই সাবানটি এত আশ্চর্য্যরকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

আপনার প্রিয় অভ্যস্ত চিত্রতারকাদের মতই সবিতা চ্যাটার্জী নির্ভর করেন লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর। লাক্সের সরের মত কোয়ার রাশি তাঁর ত্বকে ধের লাভণ্যময় মন্থণতা, এর ফলের মত সৌরভ এঁকে দীর্ঘকাল মুগ্ধকৃত্ত্বল রাখে। এই সৌন্দর্য সাবানটির আশ্চর্য্য শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক—আর সেইজন্ডেই এই সাবানটি অনেক সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে এত প্রিয়। আপনিও এঁদের অনুসরণ করুন—লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকে মন্থণ ও লাভণ্যময় করে তুলুন।



লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র তারকা দেবী সৌন্দর্য সাবান

LTS, 495-X82 BG

এসেছে চার্চের চ্যাপেলে। মাথার ওপর তুলে নিয়েছে খ্রীচিএর পতাকা। শিউরে উঠলো ম্যাকলীন। বৃকের মধ্যে কোন অলঙ্কার যিশুধর থেকে অটোহাসি উঠলো জুড়াসের। আবার উচ্চারণ করলো ম্যাকলীন; “ধর!”

“তুই কী হলেক সাহেব!” খানিকটা চুপচাপ। তার পরেই শখিনী বললো, “বুঝছি, তু ঘর চাসু নাই। তুও বেদে। বেশ, ঘর না বাঁধবিক তো হামাদের দলে আয়। তুই না পেলে হামার জান গ্রাঘ হই যাবেক সাহেব।” অপূর্ব আবেদন! মধুর আশ্বাসমণণ।

তবু শিলীভূত একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো ম্যাকলীন। এক মেলতে শখিনী, আর এক মেলতে চার্চ। দুটি দৃশ্যের মাঝখানে বিষুরোধার দাঁড়িয়ে মনটা ঘূর্ণপাক খেতে লাগলো ম্যাকলীনের। এক দিকে দুর্বার আকর্ষণ, আর এক দিকে একটি নির্ভর তর্জনী তুলে রেখেছে মানবপুত্রের ক্রুদ্ধ নির্দেশ।

“কালার”—বাইবেলের কালসাপ পাশেই হিস্-হিস্ করে উঠলো যেন। চমকে তাকালো ম্যাকলীন। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ডিক। আবার আবিষ্কার করলো ম্যাকলীন, তার বৃকের ওপর নিষিদ্ধ আবেশে শখিনী এখনও তার মাথাটা রেখে দিয়েছে। সালা সারপ্রিসের ওপর রাশি রাশি কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে। ত্রস্ত শখিনীকে বৃকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ম্যাকলীন। তার পর খরখর গলায় বললো, “তুমি যাও এখন।”

আকাশে কুক্ষা পঞ্চমীর ক্ষয়িত চাঁদ। নীচে বিবর্ণ জোৎস্না। আশুর্ভ হিমাক্ত গলায় ডিক বললো, “রাত্রি সময়টা বড় খারাপ। আপনি সেদিন সেট মাথার গম্বুপেল ব্যাখ্যা করছিলেন ফাদার। অন্ধকারে যিশুর সব মেয়েছেলের মূর্তি ধরে না কী আসে?”

এতক্ষণে অনেকটা ধাতব্ব হয়েছ শখিনী, প্রথমে একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এবারে সে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, “এই যে সাহেব, এই শরতানটা হামার লগে বেসরম কাম করতে চাইছিলেন।”

কিছুই যেন গুনতে পাচ্ছে না ম্যাকলীন। জলে-ডোবা মাল্লুয় যেমন অন্তরে তলিয়ে যেতে যেতে অল্পভব করে, তার কান, নাক কেটে তোরিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোন শব্দ, কোন গন্ধ যেমন তার ইঞ্জিরের কাছে কোন আবেদন আসে না, ঠিক তেমনি ম্যাকলীন একটি ভয়াল আতঙ্কের অন্তলস্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলো। অতীন্দ্রিয় কোন ভয় চার পাশ থেকে রাশি রাশি রোমশ বাহু দিয়ে ক্রমপিণ্ডটাকে যেন একটু একটু করে চাপ দিয়ে চলেছে। একেবারে কির্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই রোমশ খাবার বন্ধন থেকে আর নিস্তার নেই। অকুট গলায় ম্যাকলীন বললো, “তুমি যাও শখিনী।”

এক বৃহত্ত অলঙ্কার করলো শখিনী। তার পর কালো একটা বিন্যস্তের চকিত রেখা টেনে ভাতারবারীর বিলের দিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এক সময় দু’জনে পাশাপাশি চলেতে শুরু করলো। ডিক আর ম্যাকলীন। টেনে টেনে, আশুর্ভ ব্যবের ডানায় কথাগুলোকে মুক্তি দিল ডিক, “কালার, বাই বলুন, ওদেশের এই কাশি গাল’গুলো কিশব হয়ে জিপসি মেয়েরা ভাবী ভালো। ভেরী টাপ। এদের মধ্যে খ্রীচিএ লাভ অনেক দিক থেকেই আছে।”

ছোটবেলার কিছুদিন একটা মিশনারী স্কুলে পড়েছিল ডিক। তাই ইয়েজী ভাবাটায় সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কিছু কিছু।

তা ছাড়া স্বয়ং বীণ বে ভাবার অভয় দান করেছেন, সেই পরিচয় ভাবার প্রতি আন্তরিক প্রভা আছে ডিকের। সে অল্পপ্রাণিত হয়ে বললো, “বাই বলুন ফাদার, মেয়েছেলেবা হলো প্রেরণ। তা চাচেই হোক আর সঙ্গারেই হোক। ওরা থাকলে কাজ করার এনাঙ্কি দু’গুণ, তিনগুণ বেশী পাওয়া যায়। আপনি যখন একটা এক্সপ্লোশন সেট করলেন, তখন বুঝলেন কি না। আমরা তো আর কেউ বীণ নই, ঝেঁ—ঝেঁ। যেহাসু ঐ একটাই ভয়াব্র! তাই বলছিলাম, খ্রীচি যেমন চলছে, তেমনি চলুক। আমরা আমাদের মত একটু কৃতি, ঐ একটু রিক্রিয়েশন—”

কথাগুলো ম্যাকলীনের মুখের ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া আঁকে, তাই লক্ষ্য করতে লাগলো ডিক। আতঁনাদ করে উঠলো ম্যাকলীন, “হোয়াটু ডু ইউ মীন, ইউ ডেভিল!”

এবার কোন জবাব দিল না ডিক। শুধু, থিক্-থিক্ করে গোয়স্থানের শিয়ালের মত ভেসে উঠলো। তার দাঁতগুলো আশুর্ভ সালা মনে হলো ম্যাকলীনের। মনে হলো, প্রেক্ষব-যুগের কোন অর্ধমানব শিকার ধরার অস্ত্র গ্রাস মেলেছে। চমকে উঠলো ম্যাকলীন। শিউরে উঠলো।

দু’জন এগিয়ে যেতে লাগলো। একজনের পদক্ষেপে দ্বিবিজয়ের সাক্ষেত। আর একজনের পদক্ষেপে ধর-ধর। অসঙ্গল। অনিয়মিত।

শীতের পবনায়ু শেষ হলো। শেষ মাঘের কুয়াশা সরে গেল দিগন্ত থেকে। বসন্ত দিন এলো। এলো তিব-তিব বাতাসের সজল, এলো মোমাঙ্কি-গুন-গুন বিকেল। রামধনুর সাত রঙ এনে ফুলে ফুলে ফাগ ছড়িয়ে দিল চৈতী হাওয়া।

অনেক দিন পর আঙ্গ দোতলা থেকে নীচের বাগানে নেমে এসেছে ম্যাকলীন। সেই বিজ্ঞান্দির ত্র্যক্রিতাকে মনে পড়লো তাব। শখিনী, আকাশে ক্ষয়িত চাঁদ, বেনেঘট ফুলের সৌরভ—সব ঠিথিরে কী একটা বিপর্যয় যেন ঘটে গিয়েছিল সেদিন। তারপর বাইবেলের কালসাপের মত ডিকের আবির্ভাব। সেদিন চার্চে ফিরে দোতলার নিভুতে নির্বাসন খুঁজে নিয়েছিল ম্যাকলীন। চাওটে পদওয়ালের কাবাগারে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেরেছে সেদিনের কলুপিত বিজ্ঞান্দির একটু একটু করে, ভিলে ভিলে। ছেটুকু না হলে দৈহ থেকে প্রাণ উধাও হবে, সেটুকু মাত্র আত্মা’সে গ্রহণ করেছে। শরীরাটা ভয়ানক দুর্বল। মাথার মধ্যে বৌবৌ ঘূর্ণপাক। বাগানের কাকব-পখে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে লাগলো ম্যাকলীন। রাশি রাশি ফুল ফুটেছে। রঙে রঙে আলো হয়ে গিয়েছে চার্চের প্রাঙ্গণ। বসন্ত এসেছে। সোনালী চুলের মধ্যে খেলা করে বাচ্ছে লক্ষ্মি বাতাস। সারা দেহ ভরে বসন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো ম্যাকলীন। বড় ভালো লাগছে এই চৈতী দিন। ভালো লাগছে এই আলো, এই বাতাস, এই ফুল, এই রঙ। মরতমী বড়ের মত মনের আকাশ থেকে বৃহে গিয়েছে শখিনী নামে একটি দুর্বিপাক। নারী নামে একটি দুর্ঘটনা হয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে চৈতন্যটা। এত দিন কল্‌ভার ঘরের বাইরে যে বিশাল পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, তার কোন খবরই নেই নি ম্যাকলীন। এত দিন নিজেকে ক্ষয়িত করে করে, নিজেকে বিনু বিনু নিঃশেষ করে, মনের মধ্যে নারী কাহনায় শব্দভর জীব্যগুটিকেও সে

পুড়িয়ে ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার এই আত্মত্যাগের বহুতলসিত্তে নিজেকে শাসন করার; চেতনাকে প্রহার করার প্রহার আর কাউকে সে কাছে ভিড়তে দেয় নি। ম্যাকলীন ভারতে লাগলো, কবে শীত এসেছিল, কবে চলে গিয়েছে। আবার কবে একদিন বসন্ত এসেছে। প্রসন্ন চোখে চারদিকে চনমন করে তাকাতো লাগলো ম্যাকলীন।

চার্চের ফটক পেরিয়ে শিব দিতে দিতে সামনের প্রাঙ্গণে ঢুকলো ডিক। আর ঢুকেই ম্যাকলীনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ভূত দর্শন হলো বেন তার। শিব নিয়ে গেল ঠোট থেকে, থমকে পিড়িয়ে পড়লো ডিক।

এত দিন চার্চের কোন খবরই রাখে নি ম্যাকলীন। ডিকের গতিবিধি, খ্রীষ্টি কেমন চলছে—সেদিকে কণামাত্র মনোযোগ ছিল না তার। আজ এতদিনের প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সে ফিরে পেয়েছে হারানো সিংহাসন। এতদিন ডিকের জগৎবিদহি নেবার সাহস তার হতো না। খুশীমতো চলাফেরা করতো ডিক। আজ প্রায়শ্চিত্তের কণা কণা শক্তি ভরিয়ে নিজেকে তুর্জয় করে তুলেছে ম্যাকলীন। স্থির গলায় সে ডাকলো, “ডিক, এদিকে এসো।”

গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে পিড়ালো ডিক; “ইয়াস্ ফাদার, এখন কেমন কাল করছেন?”

এবার ম্যাকলীনের জিজ্ঞাসাটা সরাসরি, “খ্রীষ্টি কেমন চলছে ডিক? আমি তো এক মাসে কোন খবর নিই নি। আশা করি, কাজ ভালই চলছে। সব ভাবই তো তোমার ওপর ছিল।” আশ্চর্য উজ্জল চোখে তাকালো ম্যাকলীন।

বিধায় হুললো ডিকের কণ্ঠ, “ইয়াস্ ফাদার! তবে, মানে, এই আর কি—”

“হোয়াইট ম্যাটার? কী ব্যাপার? চার্চের কাজ কেমন চলছে, জিজ্ঞাসা করেছি। তা তুমি ইতস্ততঃ করছো কেন? তরুণ মিশনারীর গলা কঠোর হলো “আমি এ মাসের কাজকর্মের সব হিসাব চাই। আমাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে, এ ক’মাস যা করেছে, তার সমস্ত কিছু। বী রেডি।”

এই ক’টা মাস! ডিকের মেরুরণ বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করলো বেন। এই ক’টা মাস সে যা করেছে, তা ভাবতেও কোন মিশনারী আত্মহত্যা করে বসবে নিখাং। সে ভাবনা এই চার্চের পবিত্র প্রাঙ্গণে একান্ত বিজাতীয় সহজলভ্য নারী-মাস আর পটাই, দুই নিষিদ্ধ বসে এই ক’টা মাসের জীবনকে বান করিয়ে দিয়েছে ডিক। প্রতিদিন রত্নসিন্ধুর সন্ধান দিয়েছে বেঙ্গলের তাঁবুতে। তারপর, তারপরের ইতিহাস সে আর সেই শখিনীই জানে শুধু। আর জানে নিষিদ্ধ কোন নির্জন রাত্রি। দিনের পর দিন স্তন্যমাচার নিয়ে বেরিয়েছে ডিক। আর অনিবার্য নিয়মে একেবারে এসে থেমেছে বেঙ্গলের তাঁবুতে। ম্যাকলীন নির্ধারিত নিয়েছে দোস্তলার নির্জনতার। অতএব মন্থপন্থম স্তবোগ এসে গিয়েছে খাবার মধ্যে। শখিনীকে সে প্রতিজ্ঞা দিয়েছে, এই ভাসমান জীবন থেকে ভাঙি নিয়ে কোথাও, কোন ব্যঙ্গীষটের হায়াতলে ঘর বাঁধবে। নাগমণ্ডীর স্বপ্নকে, ঘরের কাছাকাছি চরিতার্থ করবে।

ডিক বলতো, “তোমাকে ঘর দেব, সব দেব। আমি তোমার দেশের মানুষ। আর এই সাহেব সাত সপ্তাহের পাড়ি দিয়ে রসছে।

তাও আবার চলে গিয়েছে। ওদের পীরিত করলে খালি ঠকতে হয় শখিনী।”

শখিনী চমকে উঠেছিল, বেন স্নানগুলোর ওপর সাপের হোঁকল পড়েছে তার; “চলে গেলক উই সাহেব। হামার কাছে আর একবারও আসসক নাই।”

“তবেই বোধ, কী পীরিত করত তোমাকে! চল, চল, এই বিলের দিকে বাই আমরা। কেমন?”

প্রথম প্রথম ভূতরস্তুর মত ডিকের পেছনে ছায়া হ’য়ে জলস্রবণ করত শখিনী। কয়েক বার চার্চে এসে ম্যাকলীনকেও সন্ধান করে গিয়েছে সে। কিন্তু দোস্তলার সেই নির্ধারিত, সেই ছোট ঘরের চারটে দেওয়াল বাইরের পৃথিবীকে বার বার প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শখিনীর কোন খবরই পৌঁছায় নি ম্যাকলীনের কানে। তার পর একটু একটু করে একটা পিছল পাথে ডিকের লালসার নিজেকে সমর্পণ করেছে শখিনী। স্বপ্নের খ্রীষ্টকে ঢেলে দিয়েছে রত্নের গ্রাসে। অন্ধকার রাত্রিতে তাদের সেই কুশী কামের বাসর লেখতে দেখতে শিউর উঠেছে অকোণের সমুদ্র। চমকে উঠেছে ফান্টোনীশতবিভা-ভঙ্গা—

এই ক’টা মাসের এই ইতিহাস। কালো শরীরটা বেয়ে বেয়ে কালগাম ছুটলো ডিকের। ম্যাকলীনের চোখের সামনে পিড়িতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে, একজোড়া বল্লম সরাসরি স্থাপিতও এসে বিঁধে গিয়েছে। অনেক দিন আগের সেই রাত্রিতে

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**  
**আর্যার “স্লাইসড ব্রেড”**



প্রতি গাউন্ড  
২৪ টি  
কুড় আকারের

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

- কলমে প্রস্তুত
- ক্রীমে সঁকা
- যেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী

কলিকতা - ২৯



ম্যাকলীনের বুকের ওপর শখিনীকে আবিষ্কার করেছিল ডিক। সেদিন এই তরুণ ফাদারকে শুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারতো সে। কিন্তু এই ক'মাসের প্রায়শ্চিত্ত তাকে দুঃখ করে তুলেছে। এ ম্যাকলীন আলাদা। এর দৃষ্টিতে মশাল, কীণ সেহে বজ্রের আভাস। আর দাঁড়াতে পারলো না ডিক। একটা আহত কুকুরের মত সেখান থেকে পালিয়ে গেল সে। পালিয়ে বাঁচলো। এই ক'মাসের দিক্কার, এই ক'মাসের রানি একটি রক্তমাংসের সেহে এত শক্তি সঞ্চার করে, তা কী কখনও আগে কখনো ছিল ডিক।

আরো কয়েকটা মাস ম্যাকলীনের দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে পালিয়ে কাটিয়ে বিল ডিক। পোহাতি তাই মাথায় নিয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফেরে নিখম রাত্তিরে। চার পাশের পৃথিবী তখন একটি নিটোল ঘূমের অতলাস্তে তলিয়ে যায়।

আশ্চর্য নিষ্পৃহ হয়ে গিয়েছে ম্যাকলীন। ব্যাপারটা বুঝেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যায়। একটা নির্বেশের চূর্ণে নিজেকে আশ্রয় দিয়েছে সে। এই ক'মাসের নির্বাসন, তার মধ্যে একটা নিরিবিলির কামনা রচনা করেছে। এ সব আর ভালো লাগে না তার। মাঝে মাঝে ছোট একটা টাট্টু নিয়ে বাকীতপূরের বন্ধরে যায়, কখনও বা কমলাঘাটের গায়ে, কোন ক্ষুদ্র বাসাইলের ওদিকে কোন গ্রামান্তরে। তার দৃষ্টিকে, তার মনকে বেয়েইর তাঁবু থেকে একবারেই সরিয়ে এনেছে ম্যাকলীন। একান্ত নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছে সে। এত দিন পর তরুণ মিশনারীর রক্তে রক্ত চার্চের দিগ্বিকর হয়েছে। একটা স্বরাপাতার মত উড়ে গিয়েছে আগুন। আগুনীর আদলমাথা কে এক বেদের মেয়ে? তুঙ্গ নামও আজ আর মনে আসে না ম্যাকলীনের। বেদেরের গৃহস্থালীর দিকে আর যায় না সে। বন্ধরে কী গল্পে খীচি শেষ করে সরাসরি চার্চ ফেরে। তারপর সমস্ত চেতনাকে একাগ্র করে বাইবেলের পাতায় ডুবিয়ে দেয়। শাবুকের মত একটি নিভৃত কোঠারে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে ম্যাকলীন। একটা বেতাবেও ফাদার সাধারণ একটা ব্যাপটাইজন্ড নিগার্ডের চোখে হতমান হলো, তার একটা ভয়ঙ্কর দুর্বলতা ধরা পড়লো; এই আলা, এই দাহন তাকে গুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে এত দিন।

বসন্তের পর গ্রীষ্মের আকাশে আগুনের বুড়ি হয়ে সময় উড়ে গেল। এখন সময় এসেছে বর্ষার মেঘে মেঘে নিরুজ্জ্বলের পূর্ণাবৃত্ত হয়ে। আবার মাস। আকাশে কাজল মেঘ।

একদিন সিরাজনীবার ক্যাথিড্রাল থেকে বড় পাজী মঙ্গোপার্ক হলেন। মস্ত রেভারেন্ড তিনি। এই অঞ্চলের সমস্ত চার্চগুলো তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই পরামর্শে চালিত হয়। ফাদারটি ভারী গভীর। একলোড়া চামবগৌক সেই গাভীকে আরো মহালা নিয়েছে। ছ'কুঁ লখা চোঁরা। খাস আয়ারল্যান্ড থেকে এখানে এসেছেন বিশ বছর আগে। এদেশের স্বংস্পন্দনের প্রতিটি খবর তিনি রাখেন।

অলটারের সামনে এসে বেতের চেয়ারে বসলেন মঙ্গোপার্ক। পাশে ম্যাকলীন। মঙ্গোপার্ক বললেন "তারপর চাপ, তোমার কোনো খবর কী? আলোকময় ক'জনকে লোকা দিতে পারলে

এ ক'মাসে? ছ'সাত মাস এদিকের কোন খবর রাখতে পারি নি।"

"বোনী না ফাদার! দশ জন।" মাথাটা নীচের দিকে নেমে গেল ম্যাকলীনের।

"মাত্র দশ জন!" প্রায় আর্ন্তদান করে উঠলেন রেভারেন্ড মঙ্গোপার্ক। "সাত মাসে দশ জন! এই হারে ব্যাপটাইজন্ড হ'লে আর একটা ডেলাজ এসে যাবে শুধু এই অঞ্চলটুকুতে খীচি শেষ হ'তে। অসম্ভব, এখান থেকে চার্চ তুলে দিতে হবে দেখছি।"

চূপচাপ বসে রইলো ম্যাকলীন। একেবারেই নিরুত্তর।

এক সময় আবার মঙ্গোপার্ক বললেন, "সেই ডিক কোথায়?"

"কোথায়ও হয়তো বেরিয়েছে।" ম্যাকলীনের জবাবটা অত্যন্ত নিষ্পৃহ।

"তা জানো না তুমি?" কয়েক সেকেন্ড গুটি পিট করে ম্যাকলীনকে লক্ষ্য করলেন মঙ্গোপার্ক। তারপরেই গুলবাঘের মত গর্জন করে উঠলেন, "ইট ইজ চার্চ" মাই বয়। কড়া ডিসপ্লিন আমি চাই। একটু এদিক-ওদিক হ'লে চলবে না। তোমার না পোয়ালে সোজা হোমে ফিরে যাও। চার্চের লোকের খবর তুমি রাখবে না তো, রাখবে কে? চার্চ ওয়ার্ল্ডস এফিসিয়েন্ট ফেলো।"

চমকে উঠলো ম্যাকলীন। উত্তেজনায় চামরগৌক থেকে কয়েক গাছা পুই পুই তুলে ফেললেন পাজী মঙ্গোপার্ক।

পরের দিন সকাল থেকে বুড়ি স্তব্ব হলো, অবিহায়। যত্নহীন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকলীন। কাচের শাসীর ওপায়ে স্বরস্বর বুড়ির চিক। তারও ওপায়ে বেদেরের সাগা তাঁবুগুলো কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। সামনে দুর্বাভা মাঠ। সবুজ ঘাসের কঁকে কঁকে মাথা তুলে দিয়েছে রাশি রাশি চোরকাটা। তাদের কঁক দিয়ে সাগা জল খল খল খেলা করে চলেছে। বিশাল একটা কবন্ধের মত পড়ে রয়েছে ও পাশের পাকুড় গাছটা। হুটো মরা কাকের ছানা ভেসে চলেছে নয়ানজুলির খরশোতে। আর একটা মহাপ্রলয়ের সূচনা যেন।

নীচের অলটারে বসে বীডস্ জপছেন মঙ্গোপার্ক। কাল সারা রাত ডিককে নিয়ে পড়েছিলেন। তাকে শাসিয়ে, ধমকিয়ে, কখনও চামরগৌকের কয়েক গাছাকে নিমূল করে সারাটা রাত কাটিয়েছেন। সেই ধমক, সেই শাসন থেকে একটিমাত্র মৌন বক্তব্য আবিষ্কার করা গিয়েছে। প্রয়োজন হ'লে এই চার্চ তিনি বন্ধ করে দেবেন।

চুপুপের দিকে বর্ষা থামলো। থমথমে আকাশটা বিশাল একখানা সীসার পাতের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সামনের প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলো ম্যাকলীন। আচমকা গুরুগুরু মেঘ ডেকে উঠলো। চমকে আকাশের দিকে তাকাতে সে। কিন্তু সেখানে এতটুকু মেঘের কারসাজি নেই। সহসা তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে প্রসারিত হলো। বেদেরের তাঁবু বেগিকে, সেদিক থেকে ভৈরব গর্জনে কষাডবন, নাট্যরোপ দলিত করতে করতে ছুটে আসছে অজস্র মাদ্রব। আকাশের দিকে দিকে উঠে বাসছে এতদু কোলাহল। এই চার্চের দিকেই ছুটে আসছে ভায়, আসছে



নিৰ্মম পদক্ষেপে। পৃথিৱীটা যেন টলমল কৰে কাঁপছে। স্পষ্ট খেকে স্পষ্টতৰ হাছে মাহুৰগুলো। নয়ানজুলি ডিঙিয়ে, বিল সাঁতৰে হাৰু কৰে ছুটে আসছে। কালো কালো বিন্দু মত নিগন্তে ফুটে উঠছে মাহুৰগুলো। এয়াই কী তৰে আৰ একটা ডেলুজৰ মেসেঞ্জাৰ! আৰ এক ক্লেয়ৰ বাৰ্তাবাহী! চমকে উঠলো ম্যাকলীন।

নীচের অলটাৰ খেকে বেরিয়ে এসেছেন মঙ্গোপার্ক। অমন জবরদস্ত রেভারেণ্ড ফাদাৰ পৰ্বন্ত একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন, “কী ব্যাপাৰ ম্যাকলীন? এই নিগাৰ্ডগুলো এমন ছুটে আসছে কেন? এই চাৰ্চের দিকেই আসছে যেন।” চামরগোঁফকে সোহাগ কৰতে তুলে গেলেন মঙ্গোপার্ক।

“ইয়াশ কাশাৰ”—নিৰ্বিকার জবাব এলো ম্যাকলীনের।

পাশের একটি ঘৰ খেকে ছুটে এসেছে ডিক। মঙ্গোপার্কের লগে একটা নিরাপন্ন ব্যবধান রেখে পাড়িয়েছে।

একটু পৰেই সেই ভৈৰব জনতার বজা এসে আছড়ে পড়লো চাৰ্চের শ্রোণে। চমকে উঠলো ম্যাকলীন। সকলের সামনে রাজা সাহেব আৰ শখিনী। তাদের পেছনে কাতার দিৱে পাড়িয়েছে বাবাববেরা। আৰ অন্তৰ্জ জোড়া ক্ৰু চোখ কাঁপিয়ে পড়েছে ডিকের ওপৰ।

রাতিমত সোৱগোল। চামরগোঁফে তা’ দিয়ে গৰ্জন কৰে উঠলেন মঙ্গোপার্ক। অনেকটা আত্মস্থ হয়েছেন তিনি; “ইপ

নয়েজ। চূপ কৰো। ইউ ডাট ব্ৰ্যাকিজ—”বুহুৰ্ত্তে শুক হলো সেই ভৈৰব মাহুৰগুলো।

সেই বিভ্রান্তির ৱাক্ৰিটার পৰ আবার চোখাচোখি। শখিনী আৰ ম্যাকলীন। আগনীসকে আবার মনে পড়লো ম্যাকলীনের। এটিলাটিংকৰ ওপাৰেৰ ৱজনীগছা এ দেশের মাটিতে কৃষ্ণকলি হয়ে ফুটেছে। শখিনীৰ দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনের মধ্যে কোথায় যেন স্ক্যাপা মাতন লাগলো। অসহ আবেগকে সংযত কৰতে অন্ত দিকে মুখ ফেৰালো তৰুণ মিশনারী।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শখিনী। সোনালী চুল, নীল চোখ, হৃৎ দেহ—সব মিলিয়ে একটি স্নিগ্ধ স্বপ্নের মত দৃষ্টিটা ভৰে বাছে তার। সহসা উজ্জ্বলিত গলায় শখিনী বলে উঠলো, “তু বলে ইখান খেকে চাইলে গেছিলিক সাহেব? উই কালা সাহেব হামারে বললক। হামি তিন দিন তুৰ খোজো আসছিক ইখানে।” ঘন অভিমানে কঠ আছন্ন হয়ে এলো শখিনীৰ। শিহৰণ বইছে তার ব্ৰাহ্মতে ব্ৰাহ্মতে।

“কই আমি তো কোথায়ও বাই নি।” বিমিত গলায় বললো ম্যাকলীন।

“তবে যে কালা সাহেব হামারে বললক?”

“চূপ কৰক শয়তানী!” গৰ্জে উঠলো রাজা সাহেব। তার পৰেই সামনের দিকে তাকালো সে, হামরা উই সব কিছু তনবক

## সুৰতি বিহীন

ক্যালকেমিকোর কান্তা চিত্তাকৰ্ষক

অল্পপম সুৰতিনিৰ্বাস। ৰুমালে ও

### কান্তা

অল্পপম সুৰতি

বেশবাসে ব্যবহার করলে

নরনারীর চিত্ত মধুর সুগন্ধে

আমোদিত হয়ে ওঠে।



দিকালকাটা কেমিক্যাল কোং. লি: কলিকাতা-২৯



নাই। কানার বীণার নাম লিখে হামাদের ঘরের মাইয়ার ইচ্ছা লিবেক। উ সব চলবেক নাই। সিধা কথাটা বললক আমি। তু দেখ সাহেব, শখিনীর ইচ্ছা কুন সাহেব লিছেক! উয়ার প্যাটের ছোয়ার কী হবেক? ই শখিনী বলেক না তুই, কুন সাহেব তুর সরম মারলেক!”

গুটি গুটি পায়ের পেছন দিকে সরতে শুরু করেছে ডিক। অল্প জোড়া চোখ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই শুরু হয়ে পাড়িয়ে পড়লো সে। সমস্ত শিহাবেখার মধ্য দিয়ে বরখ-ধারা নামছে তার। হায়াগুলো আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। তার সামনে রাশি রাশি ঘুগড়রা চোখ। মাথাটা বনু বনু করে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। মরা সাপের নির্ভাব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

সহসা আকাশ থেকে সরাসরি একটা বজ্র ব্রহ্মতালুর ওপর বেন এসে পড়েছে মলোপার্কের। কয়েক মিনিট সময় লাগলো তাঁর আশ্রয় হতে। তারপরেই সচেতন সত্তার ফিরে গর্জে উঠলেন মলোপার্ক, “গেট আউট—ইল সল অব ডেভিল, ইউ হেল—বাইরে ভাগো। নইলে খুন করে ফেলবো। ইউ ইজ চার্চ।” হাততে হাততে, রাগের বাকলে বাকলে বেন আগুন ধরে গেল মলোপার্কের।

এবার নির্ধম ব্যঙ্গ করলো রাজা সাহেবের কণ্ঠ থেকে। “কানার বীণা আর হাদার মেয়ীর নাম লিখে হামাদের জাত লিবেক, ইচ্ছা লিবেক, আর বলবেক ভাগো! উয়ার প্যাটের ছোয়ার কী হবেক তু বলেক আগে। তারপর হামরা ভাগিক। উ সব শরতানি উখানে চলবেক নাই। ধমের নামে বজ্রাতি। হামরা সব মাহুব-তলাকে বলে দিবক। শখি বলেক না, কুন সাহেব তুর ইচ্ছা লিবেক? হামরা একবার দেখবক।”

চামরগৌরব প্রান্ত ছুটো টানতে টানতে অনেকটা প্রসারিত করে ফেলছেন মলোপার্ক। চোখ দুটো তাঁর টকটকে লাল, আর সেই লালের মধ্যে দুটি নীল মণি চক্ৰাকারে পাক খেয়ে চলেছে।

চার দিকে একবার চমকন করে তাকালো শখিনী। একবার তাঁর চোখ দুটো এসে পড়লো ডিকের ওপর। চোখ নয়, দুটো বলন্ত শলাকা এসে বেন বিঁধলো ডিকের চামড়ায়। অলঙ্কার ধারণার ফুঁকড়ে গেল ডিক রোজারিও। তারপরেই দৃষ্টিটা কোমল হলো শখিনীর। বিনীত হলো। মধুর প্রার্থনার এসে স্থির হলো ম্যাকলীনের হৃদয়ের ওপর। বিস-বিস গলার শখিনী বললো, ই সাহেব হামার মান-ইচ্ছা, সরম-ভরম বেবাক লিছেক। ই, ই সাহেব।”

চমকে উঠলো ম্যাকলীন। পিড়িরে উঠলো ডিক, একটা শখ-পায়ের ছোলা বেন এসে পড়েছে চেতনার। আকাশ থেকে একটার পর একটা অল্প নীহারিকা খসে খসে সমস্ত মাহুবগুলোকে বেন জ্বলতে দিয়েছে! কথা বলতে তুলে গিয়েছে রাজা সাহেব। চোখের নিখুঁত নিখর হয়ে গিয়েছে বেদনের।

বসে কী শখিনী! এই বহুতে একটা ডেলুজ যদি এসে পড়তো, হেরে নীচে গুঁথিবিটা যদি জুমিকপে ওলটপালট হয়ে যেত, তবুও

এতখানি বিষয়ের কিছু ছিল না মলোপার্কের। আকস্মিক প্রহারে চামরগৌরবকে সোহাগ করতেও তুলে গেলেন তিনি। অনেকটা সময় লাগল তাঁর ধাতু হ’তে। এক সময় ভাড়া-ভাড়া গলার আত্ননাশ করে উঠলেন মলোপার্ক, “ইজ, ইউ শো? হোয়াট হেল! ও বেশাস।”

কিছু একটা বলতে চাইলো ম্যাকলীন। কিন্তু রাশি রাশি রোমশ খাবা বেন তার কণ্ঠলীকে চেপে ধরেছে। শরীরের সমস্ত পেশীর তলা থেকে আন্দোলিত হতে হতে একটা প্রতিবাদ বার বার গলার দরজার আঘাত খেয়ে খেয়ে ফিরে গেল। একটি শব্দও মুক্তি পেলো না ম্যাকলীনের কণ্ঠে।

আবার গর্জন করে উঠলেন মলোপার্ক, “হোয়াট হরিবল! ইউ ডেভিল, ক্রিস্চ্যানিটি ডিভেল্‌স ইউ। মিশনারী নামের তুমি কলর। আজই, এ্যাট ওয়াল তুমি চার্চ থেকে জাহাজে গিয়ে উঠবে। সোজা ইল্যাও। বেশী দিন এদেশে তোমাকে রাখলে ক্রিস্চ্যানিটি বিপর হবে। তর সেফটি অব বেশাস ইউ মাষ্ট লিভ দিস কাটিং। শুনেছো তো বেদেরা কী বলেছে, কানার বীণা আর ভার্জিন মেয়ীর নামে মিশনারীরা নারীর সন্ধানে যায়। চার্চের অজ্ঞাতারে পাড়িয়ে এই ডাউট আলোচনা করতে হচ্ছে। বাই নো মোর!”

আরো একটা চমকের প্রহার অপেক্ষা করছিল মলোপার্কের জ্ঞত। একবার শখিনীর হৃদয়ের দিকে তাকালো ম্যাকলীন। অনেক, অনেক দিন পরে আগুনীসকে মনে পড়লো। সেদিনের রজনীগন্ধা আজ মাটির কুঙ্কলি হয়ে ফুটেছে। আগুনীস থেকে শখিনী। আশ্চর্য একটা জঘান্তর! আশ্চর্য পরিবার গলার ম্যাকলীন বললো, “আমি চার্চ ছেড়ে দিয়ে বাছি। এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো। এ অবস্থায় চলে গেলে ক্রিস্চ্যানিটির ওপর অবিশ্বাস এসে বড়ো হবে। টু সেভ ক্রিস্চ্যানিটি এদের সঙ্গে আমি চলে বাছি কানার।”

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। মলোপার্কের শূন্যদৃষ্টির সামনে থেকে কখন বেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাষাঘরের। ম্যাকলীনও চলে গিয়েছে তাদের সঙ্গে। এক পাশে দুটো হাঁটুর মধ্যে দুখানা গুঁড়ক বসে আছে ডিক। ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে সে। ডিকের দিকে একবার তাকালেন মলোপার্ক। তার পর চক্ৰাকার দৃষ্টিটাকে ভাটারমারীর বিলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তার ওপর কী এক উত্তেজনার চামরগৌরব থেকে কয়েক গাছা পট পট উপড়ে আনলেন। আশ্চর্য, এতটুকু ব্যথা বোধ হলো না তাঁর!

রাজা সাহেবের সঙ্গে তীব্রত চলে গিয়েছে বেদেরা। একটা শিয়াল গাছের ছায়াতলে এসে পড়লো ম্যাকলীন আর শখিনী। শখিনী বললো, “মিছা কথা কইছিক বলে কী গৌসা হলিক সাহেব! কী আর করবক আমি, হামরা ইখান থেকে উল্যা বাবক। মিছা কথাটা না বললে তুরে কী পেতাষ সাহেব? তু গৌসা হবিক না, তবে আমি গলার দড়ি দিবক।”

অপরূপ দৃষ্টিতে ম্যাকলীনের হৃদয়ের দিকে তাকালো শখিনী। এ দৃষ্টি মনকে বিবশ করে নেয়। চেতনার হৃদয়ের শিকল ছাড়ায়।

## সবাই ডামেন -

সীল করা প্যাকেট  
পাওয়া যায় বলে  
**ব্রুক বণ্ড**  
নির্ভেজাল ও একেবারে  
খাঁটি থাকে

প্রতি প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড**  
অনেক বেশী বেশ  
ভালো  
বৈতরী করা যায়

বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কাঁচিতি  
সব চেয়ে বেশী



এই জন্যই অন্য  
যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে

**ব্রুক বণ্ড**  
**চা**

বেশী লোকে খান !



### শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান

যেসব ভারতীয় ব্যবসাদার বাংলা বিচার প্রভুত্বিতে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ জিনিষের কারবার করেন, তাঁহাদের 'ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন' নামক একটি সমিতি আছে। বাঙালী ছাড়া অন্য কোন কোন প্রদেশের লোকও ইহার সভা। শ্রীযুক্ত এস সি ঘোষ অল্পদিন আগে পর্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। এখন তিনি কোল জাশনাল চেম্বার অব কমার্সের অন্ততম অনারারী সেক্রেটারী। তিনি শবরের কাগজে প্রকাশের জন্য একজন সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছেন, নীচে তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বাংলা দেশে অবাঙালীদের আলাদা বণিক-সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন :—

Some of the representatives of our non-Bengalee friends claim that Bengal is their province of adoption and they are in fact sailing in the same boat with the children of this province. Had this been the fact Bengal would have no cause to clamour. But the facts unfold a different tale. Let me cite the case of Indian commercial associations in Calcutta. Here we find that every community of India who trade in Bengal has its own separate Association, a position which would not have arisen if there were a real identity of interest.

একটি সমিতির একটি কর্তৃক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

In April this year, when the whole of Bengal strongly opposed the legislative measure of the Government of India which sought to impose a duty on imported salt, to support chiefly the salt industry at Aden a non-Bengalee commercial organization of Calcutta earned the singular distinction of lending the weight of their port to the measure. This measure is sending the poor consumers of Bengal to the tune of Rs. 40 lakhs annually.

মাই এসিয়েটেলার মিলের মালিকদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

It can never be disputed that Bengal is the best market for piece-goods manufactured in the textile mills of the Bombay Presidency and in fact these mills owe their prosperity to the patriotism of Bengal. But what is the attitude of these mills towards Bengal? They practically keep their doors closed against the Bengalee apprentices presumably out of a fear that such training may help in future to promote a large cotton textile industry in this Province. If my mill-owner friends would like to rebut my charges, let them agree to entertain at least 2 Bengalee apprentices in each of their mills and I shall most gladly withdraw my accusation.

Further I would enquire of the non-Bengalee mill-owners if it is not a fact that none of them have got any Bengalee agents in Calcutta? As far as my information goes there is none, and here again I would put the crucial question whether they are prepared to appoint as their agents men of this province. Economically Bengal is now bled white as much by non-Indians as by the non-Bengalees.

অবাঙালীদের সওদাগরী হৌস সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

While we freely make it a grievance against the Clive Street non-Indian firms that almost all the departmental heads are Europeans, we fail to see or rather we pretend to ignore that the non-Bengalee commercial communities are no less but rather worse offenders in this respect.

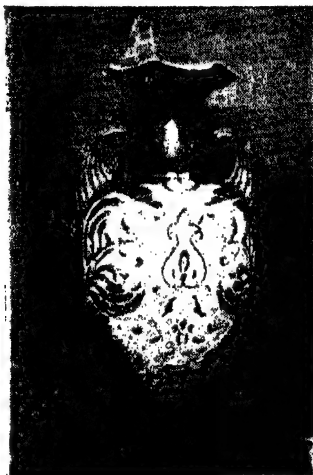
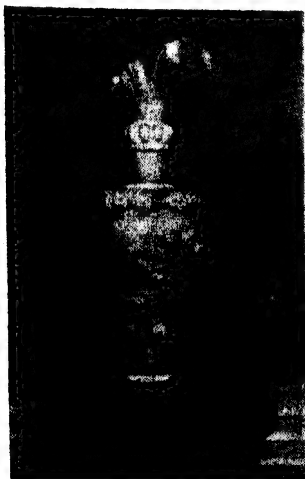
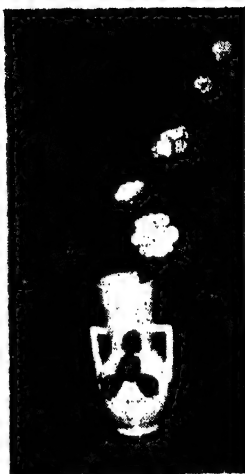
অবাঙালী ব্যবসাদারদের প্রতি তাঁহার আহ্বান এই :—

I appeal to my non-Indian and non-Bengalee brethren not to be perturbed over the present public feeling against them—Personally I am not one of those who would bar out from Bengal talent and capital from outside, whether from other Indian provinces or from across the seas. I only wish them to transcend their present outlook. I desire them to give the best out of them to Bengal, if they will. But when working in this province, they must work in partnership and co-operation with the Bengalees. In short, they must give a complete Bengalee complexion to their activities and to their organizations from A to Z. I must say that the remedy lies in their hands.

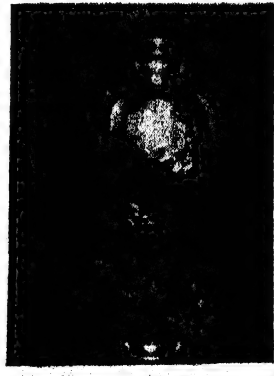
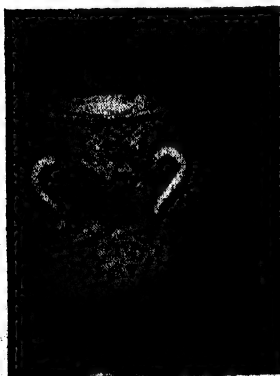
—সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## কাচের ফুলদানি

কাচ ভস্ম হ'লেও অস্ত্রাঙ্ক ধাতুর তুলনায় কাচের বাসনপত্রের মূল্য আজও কমেনি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে। ফুল আমাদের জীবনে যেমন অপরিহার্য, ফুলদানি বিনা তেমনি আমাদের ঘর ঘেন মানায় না। টেবিল কিংবা ডেসি-টেবিলের ধারে একটি ফুলদানিতে কিছু টটকা ফুল—অনেকের ঘরেই আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান সংখ্যায় কতকগুলি বিদেশী ফুলদানির আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছি। আমাদের দেশী কাচের ফুলদানি অপেক্ষা এগুলি যে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক তা আর লিখে জানাতে হবে না। এখানে উল্লেখ করলে অস্ত্রায় হবে না যে, দেশী ফুলদানি তৈরীর শিল্প এখানে তত উন্নত হয় না। কারণ, হয়তো কাচ-শিল্পের প্রসিদ্ধি বর্ধার শিল্প-দৃষ্টির অভাব। ফুলদানির চিত্রসমূহ শ্রীমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে।



## বিদেশী ফুলদানি



## চা-শিল্পের ঐতিহ্য ও অগ্রগতি

আজকের দিনে যেমন বৃদ্ধ থেকে সামান্য শিশুর নিকটও চা-এর নাম অজানা নয়, অর্ধ শতাব্দী আগেও অল্প সেনে যেমনই হোক, ভারতবর্ষে অস্তিত্ব এমনি ছিল না। আমরা জানি, চা-এর আদি জন্মস্থান চীনদেশে, ভারতে বার্বার শিল্প হিসাবে এর সূচনা—মাত্র এক শত বছর কাল। এক্ষণে সহর থেকে গ্রাম অবধি ধনী-দরিদ্র প্রায় সকলের ঘরেই এর অতিমাত্রা সমাধার—পানীয় হিসাবে এইটি জলের তায়ই একরূপ অপরিহার্য। স্নানি অপনোদন, যমে স্তুতি কিরিয়ে আনা এবং কাজে মেজাজ ও আনন্দ সৃষ্টির জন্যে অমৃত্যু এক কাপ চা যেন এ যুগে না হলেই নয়। কথার আবার বলাও হয়ে থাকে—“হাতে নাহিক মামকতা পোষ কিন্তু পানে করে চিত্ত পরিতোষ।”

সহ্যচীনে চা-চাষের প্রচলন সত্যি কবে থেকে হয়, আজ তার সঠিক হিসাব খুঁজে হরত পাওয়া যাবে না। তবে ইতিহাস পর্যালোচনার দেখা যাচ্ছে, চীন থেকে শীতপ্রধান ইন্দো-চীনে পানীয় হিসাবে এইটি চালু হয় সম্ভবত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। পোড়োতেই এ কিন্তু সে দেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি, ইহা তখন ছিল ধন্যতা ব্যক্তি ও রাজা-বান্ধাদের একটি বিলাসিতার ব্যাপার—উচ্চমহলে অভিনব দৃষ্টান্ত্য জিনিসরূপে পরিগণিত। ভারতভূমি চীনের কাছাকাছি হলেও চীন থেকে এইটি এখানে সরাসরি এল না, এসেছে ইউরোপ দ্বারা ইংরেজের হাত ধরে। তবে এ ব্যাপারে চীনের মধ্যস্থতা যেটুকু পাবার, সে না দিয়ে উপায় নেই।

ইন্দো-চীনে চা চাষে বাজার সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস পায়, তার মূলগত কৃতিত্ব ইংরেজ বণিকের নয়। ওলন্দাজ বণিকরাই দ্বিতীয় চার্লস-এর শাসন আমলে এইটি সে দেশে নিয়ে গেলো বলে আমরা জানতে পারি। প্রাচ্য থেকে বিশেষতঃ চীন থেকে অতীতে প্রীত্যে অনেক জিনিসই আমদানী হয়ে যায়—কাগজ, মুদ্রণযন্ত্র, গোলা-বাক্স এসব। কিন্তু পানীয় হিসাবে চা গিয়ে পৌঁছে সে দেশের অভ্যন্তরে বহু পরে এবং বেশ ধীরে ধীরে। এর জায়সজ্জত কারণ খুঁজবার চেষ্টা আজ বৃথা, তবে প্রাচ্যভূমির এই চা-সম্পদ এক্ষণে চাহিদা মিটিয়ে চলেছে শুধু ইন্দো-চীনে নয়, সারা দুনিয়ায়ই।

ডাচ বণিকরা যখন ফিলিপের বাজারে চা নিয়ে হাজির করল, তখন এর মূল্য ছিল খুবই চড়া। রাণী আনি অবন্ত চা-পানটাকে একটা কাপান হিসাবে প্রচলন করেন এবং সেই থেকে ইন্দো-চীনে এইটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে সত্যি কিন্তু তাতেই এর দাম কমে গেল না অমৃত্যু উল্লেখ করার মতো। দাম কমলো বেশী রকম ঠিক তখনই, যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চা-এর বাজারে প্রবেশ করল এবং ভেঙ্গে দিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এত কালের একচেটিয়াগিরি। ব্রিটিশ বণিকরা শুধু এইটুকু কাজ শেষ করেই থামলো না—তারা ক্রমেই খুঁজতে লাগলো, কি করে এই চমৎকার পানীয়টি সম্ভার জনসাধারণ বিশেষ ভাবে স্নিকিমক্সের সহজলভ্য করে তোলা যায়। বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্র তার জোসেফ ব্যাক্স-এর সঙ্গে তারা পরামর্শও চালালো—ব্রিটিশ ভারতে যদি চা-উৎপাদন সম্ভব হয়। কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের অনুরোধে তার জোসেফ ব্যাক্স চা-চাষ সম্পর্কে বেশ পর্যাপ্ত একটি মূল্যবান রিপোর্ট প্রদান করেন।

এ সকলেরই লক্ষ্য ছিল—চা-এর বাজারে যে একচেটিয়া আধিপত্য চলে আসছিল, উৎপাদক হিসাবে চীনের এবং বৈদেশিক চা-চালানকারী হিসাবে ওলন্দাজদের, তা নষ্ট করে দেওয়া।

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের প্রচেষ্টার সাফল্যলাভ করলো বটে, কিন্তু এ শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার তাদেরও বজায় রইল না। আসামে তখনই প্রথম প্রেরী চা উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসামের চা-ব্যবসায়গুলো চলে গেলো নবগঠিত আসাম কোম্পানীর হাতে। সেই সময় থেকে উক্ত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পর্যন্ত একমাত্র আসাম কোম্পানীই চা উৎপাদন করে মোটামুটি ১০ কোটি পাউণ্ড। ভারতীয় চা সঙ্গে সঙ্গে ইন্দো-চীনের বাজার ছেয়ে ফেলতে থাকে এবং প্রায় সকল ইংরেজের নিকটই এইটি একটি মনোহারী অত্যাশ্চর্য পানীয় হয়ে দাঁড়ায়।

চা-উৎপাদনের জন্যে উচ্চ অথচ আর্দ্র-জলবায়ুর প্রয়োজন হয়, ফলে পৃথিবীর সব দেশে বা একই দেশের সকল অঞ্চলে চা-শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চা-উৎপাদনকারী প্রধান দেশ হিসাবে চীনের পরই এখন ভারত, সিংহল, পাকিস্তান, জাভা ও জাপানের নামই উল্লেখযোগ্য। ফরমোসা, টাঙ্গানিকা, কেশাস পাছাড়, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানেও বেশ কিছু পরিমাণে চা অবস্থি জন্ম থাকে। জল পাঁড়তে না পারবে, এমন চালু জমিই চা-চাষের পক্ষে ভাল বলে দেখা যায়। ভারতের মধ্যে ও আসামের পার্বত্যপ্রান্তে, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্গুর ও পাঞ্জাবের পার্বত্যভূমিতে প্রচুর চা উৎপাদন হয়। এর ভেতরও আবার লক্ষ্য করবার—গোটা ভারতের উৎপন্ন চা-এর প্রায় অর্ধাংশই জন্মে থাকে একমাত্র আসাম রাজ্যে। তার পরই অবন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজের স্থান।

চা-উৎপাদনে চীনের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে চলেও রপ্তানী-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারত ও সিংহলের পরে এর স্থান। জাপান, জাভা ও পাকিস্তান থেকেও কিছু পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। ভারতের চা রপ্তানী হয় ইন্দো-চীনে, ফিলিপ, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায়। বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর বিশেষ চা-এর উৎপাদন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার এবং সেই সঙ্গে চা-এর মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের বহু চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চা-এর একটি বাজার সৃষ্টি হওয়ার এবং সরকারী সাহায্যও এগিয়ে এলো বলে সে হ্রগতি থানিকটা সামলে নেওয়া গেছে। আমেরিকার চা-এর চাহিদা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচুরব্যয় চালাচ্ছে সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়াও।

ভারতে ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৩৭৩ একর জমির উপর ৬,৬০০ টি চা-বাগান রয়েছে এবং এতে কাজ করছে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ নিয়মিত কর্মী। এ শিল্পে এখানে প্রায় ১১৩ কোটি টাকা মূলধন খাটিয়ে—এক ‘বেলী’ তাগেরই মালিক এখন পর্যন্ত বিলম্বী বণিকরাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতীয় পুঁজি এই প্রচেষ্টার খাটানো হচ্ছে অবন্ত পূর্বের চেয়ে বেশী। সরকারী মহলে প্রয়োজন অনুযায়ী চা-শিল্প নিয়ন্ত্রণের একটি নিয়ে আলোচনা-আলোচনার কথাও সভ্যত্ব শোনা যায়।

ভারত চা-শিল্পের আজ যে অগ্রগতি, কার্যতঃ এর মূলেপাত বিপ্লব শতাব্দীর মধ্যভাগেই বলা চলে। প্রথমটার এ শিল্প গড়ে উঠে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এবং তারপর অল্প দিকে এর প্রসার লক্ষ্য করা যায়। চা-এর বাজার সব সময় একরূপ থাকে না, উঠতি-পড়তি এর খুব বৈশিষ্ট্য। গত বর্ষেই (১৯৫৬ সাল) চা-এর বাজার উঠতি-পড়তি গেছে একটু অতিমাত্রায়। অবশ্য এর কতকগুলো অনিবার্য কারণও যে না ছিল, তা নয়। অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং রপ্তানী বরাদ্দ ও রপ্তানী শুদ্ধের ভুলই এর অবস্থা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে উঠে। সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে সুয়েজখাল প্রসঙ্গে যে আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, চা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া তা অনস্বীকার্য।

ভারতের একটি প্রধান শিল্প-সম্পদ হচ্ছে চা, এই সম্পদে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এদেশের চা-বাগান সমূহের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। এদের সুপারিশের উপর এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বহুল পরিমাণে, ইহা নিশ্চিত। দেশ-বিভাগের পরিণতিতে শ্রীহট জেলায় বেশ কতকগুলো চা-বাগিচা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—চা পূর্বে ছিল ভারতেরই সম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে চা-এর উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাবনি, বরঞ্চ পূর্বাশ্রয়কে অনেক বেড়েছে ও বাড়ছে—এইটাই আশায় কথা। মিশর, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, উত্তর-আমেরিকা ও ক্রিস্টীয় ভারতীয় চা-এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং ইহার ফলে চা-খাতে অঙ্কিত হচ্ছে বিশ্বের পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতের অভ্যন্তরেও চা-এর চাহিদা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থায়ই এইটুকু কমবারও কিছুমাত্র কারণ নেই। যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে চায়ের দরকার, কক্ষে-কক্ষে চা-টি চাই আগে-ভাগে, এ বেন এখন অনেকটা আমাদের সুখ-দুঃখের সকল সময়েই সাথী।

ভারতের কৃষি ও শিল্প-জীবনে চা-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাকার করা যায় না। চা-শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সকল দেশেই সন্নিহিত আরও কয়েকটি শিল্পের প্রসার হয়ে চলেছে, এইটিও লক্ষ্যনীয়। শুধু মংগল কেন, কয়লা, সিমেন্ট, সার, চা-বাগানের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক আন্তর্জাতিক শিল্পের উন্নতির মূলে রয়েছে এই চা। বলতে কি, একমাত্র ব্রাইউড থেকেই আজ এই ভারতে তৈরী হয় প্রায় ৩০ লক্ষ চা-এর সেটি।

ভারতে চা-শিল্পের অগ্রগতির যে সর্বশেষ স'খ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, একমাত্র ১৯৫৫-৫৬ সালেই ভারত থেকে বহির্বিদেশে চা রপ্তানী হয় প্রায় ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতের অভ্যন্তরেও উক্ত বৎসরে প্রায় ২১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহার হয়েছে। আগোচ্য সমগ্র একমাত্র চা-খাতেই ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে প্রায় ১০১ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে ভারতের বাগান সমূহে চা উৎপাদন হয় ৬৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মতো এবং বিধে উৎপন্ন চা-এর পরিমাণ ১৪০ কোটি পাউণ্ড।

চা-এর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চা-শিল্পের অগ্রগতিও সন্নিহিত সব কয়টি দেশেই হয়ে চলেছে, ইহা নিশ্চিত। বিধে চা-এর নতুন বাজার খুলি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে, এ স্বভাবতই আশা

করা চলে। সন্তোষ সরকারী দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের অভাব না হলে এবং প্রকৃতি যদি বিকটে না পড়ায়, তা হ'লে চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হবার কিছু নাই।

## টুকিটাকি

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত চা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৬'১৭ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২১'১৫ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছাইয়াছে। \*\* বাগানদীতে সমবার পদ্ধতিতে দিশাশলাই কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ২,৫৫,৭০০ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। \*\* লোকসভায় এক প্রস্তাব লিখিত জবাবে বাণিজ্য-সচিব শ্রীমোহরজী দেশাই জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে মোট ১৭,৩৬,৭১,২০৭ টাকা মূল্যের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী ১,০৩ লক্ষ টাকার লেন-দেন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা সিমেন্ট, হাল্কা সোডা অ্যাস, কৃত্রিম সোডা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, চিলির নাইট্রেট এবং জিপসাম আমদানীর জন্য চুক্তি করিয়াছে। আমদানী-চুক্তি অনুযায়ী পণ্য-গ্রব্যের মোট দাম ৮,৭৪,১৫,৭৬৫ টাকা। সংস্থা মোট ৮,৬১,৭৫,৪৪২ টাকা মূল্যের ব্লকস্টোন-আকর, ম্যানানীজ আকর, ককি, জুতা এবং হস্ত-শিল্পজাত প্রবাদি রপ্তানীর চুক্তি করিয়াছে। \*\* মাকিশ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বর্তমানে যে পরীক্ষা

**It times the  
Olympic Games!**



**Ω**  
**OMEGA**  
*Seamaster*

No other watch, today, brings with it such a record for precision. This is backed by a world-guarantee of satisfactory service.

**রায় কাজিম এণ্ড কো**  
৪ন ভলহোসী কোয়ার,  
কলিকাতা-১

**Official OMEGA Dealer**



চলিতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভবিষ্যতে পশুপক্ষী পরিষেয় বন্দীদি (সোয়েটার ইত্যাদি) কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। মেঘের গায়েই পশু-কীট নিরোধক ক্ষমতা অর্জন করিবে। মাকিণ পরীক্ষাগারে মেঘের গায়ে কীটের বায়বনিক ডাই-এলডিন প্রয়োগ করা হইতেছে। ডাই-এলডিন ডিউটি'র সমপরিমাণে রাশায়নিক। গবেষণাগার মনে করেন যে, এই পদ্ধতিতে মেঘের গায়ে ডাই-এলডিন প্রয়োগ করা হইলে, মেঘের গায়ে হইতে ছাঁটাইয়ের পূর্বেই পশু-কীট নিরোধক ক্ষমতা অর্জন করিবে। \* \* পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণপুরে অবস্থিত হিন্দুস্থান কেবল কোম্পানীর মালিক হইলেন ভারত সরকার। ট্রাক টেলিফোন লাইনের জন্য ব্যবস্তু বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক তার (কো-অ্যাক্সিয়েল কেবল) প্রস্তুতির জন্য এই কারখানাটি সম্প্রতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতে একমাত্র এই কারখানাতেই টেলিফোন 'কেবল' (অর্থাৎ টেলিফোন ব্যবস্থায় মাটির নিচে যে মোটা বৈজ্ঞানিক তার ব্যবস্তু হয়) তৈয়ারী হইয়া থাকে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কারখানার উৎপাদন শুরু হইয়াছে। ট্রাক টেলিফোনের কো-অ্যাক্সিয়েল কেবল প্রস্তুতির যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ১৯৪৮ সালে এই বিশেষ কেবলের উৎপাদনই আরম্ভ করা যাইবে। পূর্বা উৎপাদন শুরু হইলে এখানে (প্রতি বৎসরে) ৩০০ মাইল কো-অ্যাক্সিয়েল ট্রাক কেবল প্রস্তুত করা যাইবে। তখন ডাক ও তার বিভাগ মাটির নিচে 'কেবল' স্থাপন করিয়া ভারতের বড় বড় সহরগুলির মধ্যে ট্রাক টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। \* \* ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মাকিণ শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৫০ সালে শ্রমিকদের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে নারী-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ শতাংশ। ১৯৫০ সালে উহা ২১.৮ শতাংশে পৌছে। অবিবাহিতা নারী-শ্রমিকদের হিসাব ছিল ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রতি পাঁচজনে দুইজন, ১৯৫০ সালে ছিল প্রতি দুইজনে একজন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় শ্রমিকগণ এক্ষণে বেশী বয়সে কাজ আরম্ভ করিতেছে। অবসর গ্রহণের পর তাহারা পূর্ণাঙ্গক বৈধ দিন বাঁচিয়া থাকেন। পিতা-পিতামহের তুলনায় আজিকার শ্রমিকগণ সপ্তাহে ১৫ হইতে ২০ ঘণ্টা বৈধ অবসর ভোগ করে। শ্রমিক-পরিবার-পিছু গড় আয়

১৯১৮ সালে ছিল ১,৫১৩ ডলার। উহা ১৯৫০ সালে ৪,৭০০ ডলার হইয়াছে। \* \* ভারতের প্রায় তিন হাজার মাইলব্যাপী উপকূলবোধ্য ধরিয়া যে মাছ ধরার ব্যবসায় চালু আছে, তাহা হইতে ভারতের জাতীয় আয় প্রায় ২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পঁচাত্তর হাজার নৌকা ইত্যাদি এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ দীঘর নিযুক্ত আছে। \* \* ১৯৫৫-৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে মোট ২,৪৩,৭১,১৬০ টাকা বরাদ্দ করেন। \* \* পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা নিরোধক বিল পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত এই বিল বলবৎ থাকিবে। \* \* নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে নূতন প্রজাতির টোম্যাটো 'ফ্রি' করা হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে পুসা কবি। ফলটি গাঢ় লাল বর্ণের মাঝারি সাইজের (এক পাউণ্ডে ৭টা হইতে ১টা) এবং মৃদু স্বাদযুক্ত। শরৎ-শীতকালীন ফল হিসাবে চাষ করা হইলে, 'পুসা কবি'র ফল, বোপনের ৬০ দিনের মধ্যে পাওয়া থাকে। বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন ফল পাকিতে প্রায় চার মাস সময় লাগে। \* \* নয়াদিল্লীর পরীক্ষাগারে এই জাতের টোম্যাটোর ফল একরূপে প্রতি ৪৮ ১/২ মণ হইতে দেখা গিয়াছে। কোয়াখাতুর, ইন্দোর এবং জয়পুরে ইহার ফলন স্থানীয় টোম্যাটো অপেক্ষা যথাক্রমে ৫৭, ৪৭ ও ২৫ শতাংশ বেশী হইতে দেখা গিয়াছে। 'পুসা কবি' টোম্যাটো ভাইরাস ব্যটি রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। অতিবৃষ্টির পর মাটি ভিঁসা থাকিলেও ইহার বেশী ক্ষতি হয় না। পার্শ্বাঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় গ্রীষ্মকালে পুসা কবির চাষ করা যাইতে পারে। নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার হইতে পুসা কবির বীজ পাওয়া যাইবে। \* \* ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে ইক্ষু ফলনের দ্বিতীয় পূর্ণাভাসে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে ইক্ষু-চাষ জমির পরিমাণ ১৪.৭ শতাংশ এবং ইক্ষু উৎপাদন ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। হিসাবে দেখা যায়, গত বৎসরের (১৯৫৫-৫৬) পূর্ণাভাসে যেখানে ইক্ষুচাষ জমির পরিমাণ ছিল ৩১,৪৫,০০০ একর এবং উৎপাদন ছিল ৫,০৪,৫৫,০০০ টন, সেখানে চলতি বৎসরের পূর্ণাভাসে দেখা যায়, ইক্ষুচাষ জমির পরিমাণ হইতেছে ৪৫,৩২,০০০ একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৫,৮১,১৪,০০০ টন ইক্ষু। \* \* প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নার্সারী স্থল স্থাপনের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহকে ও কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬,৫১,৮১২, টাকা দান করিয়াছেন। \* \* চলতি বৎসরের নবেম্বর মাসে মোট ১,২৩,১৭৬ জন বেকার হিসাবে নিজেদের নাম চাহুরি-বিনিয়ম কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। \* \* ভারতে যে সকল রাজ্যে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল রাজ্যে সরকারের সহযোগিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় নারিকেল-চারার উৎপাদনের জন্য ২৩টি নার্সারী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নারিকেল-চারাদের সমন্বয় করিবার জন্য এই সকল নার্সারীতে সর্বোচ্চ বার্ষিক ৩,৩২,০০০ বাছাই নারিকেল-চারার উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে।

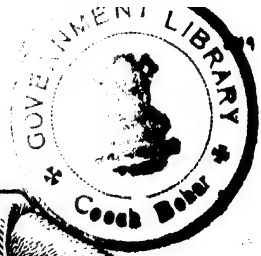
## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের শাণতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রান্তে ২-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিংস সেণ্টার  
৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯





**সুস্থ লোকেরা নিয়মিত  
লাইফবুয় সাবান দিয়ে চান করে**

— প্রত্যেক দিনদিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাত করে দেয়।

\* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,  
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের  
প্রত্যেকেরই লেগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকেরা এই  
লাইফবুয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত  
রাখেন। লাইফবুয় সাবান সেই স্বরস্বরে তাজা ভাব এনে দেয়।



# পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামচন্দ্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো পঁয়ষাট্টি

আমাকে দেখ।

চিন্তনমুখরাশিতে চিন্তকেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। চঞ্চল চিন্তনমুখিতরঙ্গ আর নেই। নিশ্চলমুখসমুদ্র নিশ্চেষ্ট ও মৃদু। আমি সর্বদা একাবস্থ। আমাতে হুঃ কি করে সম্ভব? আমি আনন্দমগ্ন, আমি অখণ্ডবোধ। আমি পরাংপর, ঘনচিহ্নপ্রকাশ। সেখ যেমন আকাশকে ছোঁয় না, আমিও তেমনি সংসারহুঃখের বাইরে।

বে হুঁহাসাকে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সঙ্গহ করে? তেমনি আমি বে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপ্রকাশ কেবলশিব তাতে কার সঙ্গর? সেখ আমাকে। আমি নিত্যকৃতি, নির্মলস্রাব্য, আমি নিত্যসুখশান্ত, আমার থেকেই সমস্ত মহামোহ দূরীকৃত, আমিই বৈরাগ্যবাহিনী অখিলতত্ত্ব।

চীসে বাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানির লোক এল ফোটো দিতে। আসতে আসতে বিকেল করে ফেলল। সকালের দিকে ঠাকুরের দিব্য দেহে, হরিপাদপঙ্কজ-পরাগ-শবির দেহে, যে জ্যোতির্ধর শিশু ছিল তা তখন হ্রান হয়ে গিয়েছে। পীতবস্ত্রে সাজানো হল। নিচে নামানো হল খাটে করে। ভক্ত ও সন্তানেরা জ্বাল সন্নিহিত হতে, নরেন্দ্রের কীধে হাত দিয়ে রাম দস্ত। ফোটো তোলা হল হুঁখানা।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে ডাক্তার সরকারের, বেদিন প্রথম ছিল ভ্রামপুরুষের বাড়িতে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে সঙ্গারী নর পালপদে ভক্তি রেখে সঙ্গার করে, সেই ধন্ত, সেই বীরপুরুষ।' 'কাক নাথার হু' মণ বোকা আছে, আর ও দিকে বর বাচ্ছে দিয়ে। নাথার বোকা তবু বর দেখছে। খুব শক্তি না দেয় কি এ সম্ভব?'

সেখ, আমি বইটাই কিছু পড়িনি, কিন্তু মার নাম করি বলে মর মবাই যানো। বখন পঞ্চদশীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে মৃত, কলহুম মা, আমি কিছু জানি না, তুই শুধু আমাকে দেখিয়ে কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, জানিরা বিচার যা কেনেছে, যা বোগ করে যা দেখেছে। আমার কিছু নেই, আমার শুধু ভক্তি। তাকে ভালোবাসি এই অখণ্ড অবিকার। এই করেই সেখ তোর অভরণ—আমার পরমপদ।'

ডাক্তার বলেছিল আর আরদের, 'বই পড়লে এর এত জ্ঞান হত।'

ঠাকুরেরও সেই কথা 'আমাকে মনে করে বই না পড়ে মুখি হইয়া না। কিন্তু পড়ার রেব শোনা জানো। শোনার রেব

দেখ। কান্ধীর বিষয় পড়া, কান্ধীর বিষয় শোনা আর কান্ধী দেখা অনেক তফাৎ।' আবার বললেন, 'যারা নিজে দাবা খেলে তারা চাল তত বোঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপরচাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। তারা নিজে খেলেছে তাই তারা নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু নিজে খেলে না, তাই উপরচাল ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।'

চার দিকে শোকের পাখার ছলে উঠেছে। সব চেয়ে কাঁদছে বেশি শশী।

ডাক্তারের মনে পড়ল একবার ঠাকুর বলেছিলেন, শোকের মতই এই ঈশ্বর। যদি কাক পুরুষোক হয় সেদিন কি আর সে শোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি শোকের সামনে জাঁক করে বেড়াতে পারে, না, সুখসজ্জাগ করতে পারে? তেমনি যদি ঈশ্বরে সত্যি-সত্যি ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান ভালো লাগে, তা হলে কি আর ইন্দ্রিয়ভোগে মন যায়?'

মহেন্দ্র মুখুজে বললে, 'সংসারে কি শুধু দারিদ্র্যই হুঃখ? এ দিকে ছয় রিপু, তারপরে বোগ শোক।'

'আবার মানসভ্রম।' বললেন ঠাকুর, 'টাকা থাকলেই বা কি হবে। জয়গোপাল সেন কত টাকা করেছে, কিন্তু বিবম হুঃখ ছেলেরা মানে না। বা হোক, তুমি তো একটা ধরছ—নিরাকার। বা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই সম্ভব। সাকারও সম্ভব।'

'আর জেনো, তিনি চৈতন্যরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন।'

'তিনি চেতনরও চেতনহিত।'

'এখন ঐ ভাবেই থাকো, টেনে-টেনে ভাব ফলাবার দরকার নেই। ক্রমে জ্ঞানতে পারবে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। যাকে জড় বলছ তাও চৈতন্যেরই আবরণ।'

তাই ঠাকুর বখন সার্বজন্য-এসোসিয়েশন বা বিজ্ঞানসভার যাবার জন্তে ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিল, 'কি সর্বনাশ! তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'কেন কেন?'

'ঈশ্বরের নানা আশ্চর্য কাণ্ড দেখে।'

'তা বটে।' গভীরমুখে বললেন ঠাকুর।

ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ডাক্তার। ভাবছে, 'আমার কি এখানে প্রোভাৎ হবার সময় আসেদি?'

হঠাৎ তার একটি অস্বাভাবিক ভাবের ফলে অজ্ঞান হইয়া

কাছে। একবার একনাগাড়ে তিন রাত তাঁর কাছে বাসও করেছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার কিছু দেরি হবে, এখনো তোমার একটু ভোগ আছে কপালে। এখন কিছু হবে না। বখন ডাকাতি পড়ে, তখন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ কিছু করতে পারে না। একটু খেমে গেলে তবে পুলিশ এসে খেপ্তার করে।'।

ডাক্তার ভাবছে, তার ডাকাতি কি শেষ হয়নি এখনো? এখনো কি সেই হয়নি পরোয়ানা?

ঠাকুরের তিরোধানের ক'মাস পরে, বব্রুজ একদিন পাগলের মত ছুটে ছুটে বরানগর মঠে এসে উপস্থিত। পরনে আধখানা মোটে কাপড়। আর আধখানা কোথায় গেল কে জানে?

'তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল?'

'আসবার সময় কাপড় ঘরে টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিড়ে গেল। নাও আধখানা। তবু তোমার শরর থেকে যে করে পারি আসব বেরিয়ে—'

'কে সে?'

'আর কে? মদ আর তার সঙ্গিনী অবিভা।'

'কি করে এলে?'

'শ্রদ্ধে পায়ে হেঁটে। ছুটে-ছুটে। বাই গলামান করে আসি গে। আর সসারে কিরব না।'

রামলালও কানছে অঝোরে। কি কথা ভাবছে কে জানে! কত কথাই ভাবছে!

ঠাকুর বখন চিকিৎসার জন্তে চলে বান কলকাতা, তখন রামলাল বলেছিল, অপানার জন্তে বড় মন কেমন করবে। ঠাকুর বললেন, মনে করবি যে কাউন্ডলার গেছি আবার আসব। বাব কোথায়? সর্বদাই আছি আমি দক্ষিণেশ্বরে।

মনে পড়ছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ বারান্দার দেয়ালে কাঠকল্যা দিয়ে আঁকা ঠাকুরের ছবিটি। একটি টবের উপর পদ্মকুলের গাছ, আর সেই ফুলের উপরে একটি পাখি। কাশীপুরের বাড়িতেও ছোট একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে বালির উপর একটি গাছ এঁকেছেন আর গাছের ডালে-বসা একটি পাখি। পাখিটা এমন জীবন্ত বেন এখনি উড়ে বাবে।

'ছেলেবেলার কত ছবি আঁকতাম।' বলতেন সবাইকে : 'পোটোদেরও তাক লেগে যেত।'

শত্ৰু মল্লিকের বাগানে কে একজন এসেছে, হিপ্পনটিকজম্ জানে। ঠাকুর শুনে শুধালেন, সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে মস্তুর গুণে লোককে অজ্ঞান করে তাকে দিয়ে ইচ্ছে যতো কাজ করানো। ঠাকুর তাকে বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি তো অনেককে করে, কই আমার একবার ঐ রকম করো না? পারলে না, লোকটা ঠাকুরকে পারল না অজ্ঞান করতে। ঠাকুর বললেন, কে জানে বাপু, মার ইচ্ছে নয় যে আমি অজ্ঞান হই।

সেই সে-বার আলমবাজারে শিবু আচার্যি পাঁচালি শুনে গিয়েছিল রামলাল। আসলে ভারি মজার ব্যাপার, একত্যাড়া কলার বাড়ি ও পঞ্চাশ টাকার নোট খোলানো। তার মানে, যে ভালো করতে পারবে, সে পঞ্চাশ টাকা পাবে আর বারটা সবুজের খাড়াপ হবে, সে পাবে ঐ কলার বাড়ি। গান শুনে এসে ঠাকুরকে

বললে রামলাল, কি মজার গান! 'এমন অমূল্য জিরামনাম কে শুনেলে আমার কেরা?' ঠাকুর হু-ধ করে বললেন, আচ্চা, আমি শুনেতে পেলুম না!

ক'দিন পরেই শিবু আচার্যি হাজির দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন, আচ্চা, সেই গানটা গাও না। রামলাল শুনে কত প্রশংসা করলে। শিবু গান ধরল। হু'চক্কর জলে ভেসে গেলেন ঠাকুর, রামলালকে বললেন, গানটা লিখে নে। শিবুকে বললেন, আচ্চা, কত লোককে গান শোনাচ্ছে, চার-পাঁচ ঘণ্টা গাইছে একভাবে, তোমার গলা খারাপ হয় না এ কি কম কথা! বার বার দশ জন আনন্দ পায় আর বার আকর্ষণশক্তি বেশি, তার হ্রদয়ে যেন শক্তি বিরাজ করছে।'

একদিন শিবু আচার্যি চারখানি নৌকা নিয়ে হাজির। ওপারে ভক্তকালিতে তার শতুরবাড়িতে নিয়ে যাবে। সে কি হুমধাম করে বাওয়া হল সে বার! এক নৌকায় ঠাকুর, নরেন, রামলাল আর রামলাল আরেক নৌকায় অক্ষয় মহিম আর মাঠারমশাই। নিশান টাঙানো হল নৌকায়। শিঙে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে বাতী। পারে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কান্ন হাতে ফুলের মালা, কান্ন হাতে বা ঘমিভরা বাতীমা। ঠাকুরের গলার মালা দিলে, হরিবোলা হরিবোলা বলে বাতীমাছড়ি ছড়িয়ে মিল চাই দিকে। টলমল টলমল করতে করতে ঠাকুর নামলেন নৌকা থেকে।

কি হচ্ছে এখনে? এক দিকে কীর্তন অন্য দিকে পণ্ডিতদের আলোচনা। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কসিরে মিল সে কি তর্ক পণ্ডিতদের মধ্যে! সবচেয়ে দুঃখ জনকর সামাধ্যায়ী তার জিভের আগে কেউ টিকতে পাচ্ছে না। যে বা বলছে সব কেটে দিচ্ছে। কিছু মানছে না কিছু রাখছে না। অনেককণ হুপটা ছিলেন ঠাকুর, পরে রামলালকে বললেন, চলতো যে একটু বাই বাব। বাইরে গিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে বললেন, মা, শালা তাকে তর্ক করছে। কান্ন কথাই নিচ্ছে না ধরছে না। ভারি তর্ক পণ্ডিত। তুই ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দে দিকিনি। ভাড়াভা ক্রির এসে ঠাকুর সামাধ্যায়ীর ডান হাঁটুটা ধপ করে ধরে বললেন, হ্যাঁ গা, কি বলছিলে বলো না। সামাধ্যায়ী আমতা-আমতা করে বললে, কই, কিছু তো বলিনি। সে কি গো, এতকণ যে দুর্দান্ত তর্ক করছিলে! সামাধ্যায়ী হেসে বললে, ও আমি তামাসা করছিলাম!

বখন খেয়েদেয়ে দুপুরে শুতেন কত তাঁর পায়ে বুলিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ পরেই বলতেন, বা, এইবার একটু গা নে গো বা। মাহুদ-বালিশ নিয়ে একটু শুভুম, তারপর দপ্তরবা চিলে-ছাতে বেতুম রসিকের সঙ্গে গল্প করতে। কামারপুর রসিকলাল সরকার মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের জোগান তখন থাকত সেই চিলে-কোঠার। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ডাক ওরে রামদেলো, শালা, ঐগগির আর, আমি বাইরে বাব। গায়ে মত থাকতুম কখনো ঠিকঠিক শুনেতে পেতুম না। বখন পড়িমরিছট মারতুম। বলতেন, শালা রসকের ওপর ভালবাসা, গল্প করবে তো মাহুদ-বালিশ তুলতেও সময় পারমি কত তামাক সেজে দিয়েছি। ঠাকুরের বাব বুদ্ধি

আগড়পাড়ার বিবনাথ কবরের চিকিৎসা করছে। 'হ্যাঁ গা, তামুক খেল কি হয়? 'বায়ু কমে'। বললে বিবনাথ। তবে যখন তামাক খানেন তখন চিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরী দিয়ে খাবেন। ওরকম করে কত বার সেজে দিয়েছি।

কত ডাকা-আনা করেছি লরেনকে। ওরে রামলাল, একবারটি লরেনের গরুর লিয়ে আয়। এই জাখ এক মাড়োয়ারি ভক্ত এসে কাশাক-কিম্বদন্তি খেতে দিয়ে গেছে। বা এগুলো পৌছে দিয়ে আর লরেনকে!

আবার কবে আসবি? নরেনকে জিজ্ঞাস করলেন ঠাকুর। বৃষবার আসবি। কটায়? তিনটায়। সেই বৃষবার এসেছে, আর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা কইবেন কি, বাবে বাবে বাইরের দিকে ডাকছেন। চঠাং, বলা-কওয়া নেই, চিটখতো পায়ে দিয়ে হন হন করে কটকের দিকে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। এ কি, নরেন ঠাড়িয়ে। কি যে, কখন এসি, বাইরে ঠাড়িয়ে আভিস কেন? নরেন বললে, এখন সবে চুটো, অনেক আগে এসে পড়েছি। সত্যাকার ভক্ত ঠাড়িয়ে আছি, তিনটে বাকলে যাব। ঠাকুরও ঠাড়িয়ে বঠলেন। কটকের সামনে চুঁকনের ঠাড়িয়ে-ঠাড়িয়ে কথা। যখন ঠিক তিনটে বাকলে তখন নিয়ে এলেন ঘরে।

কত দিনের কত কথা ভিড় করছে মনের মধ্যে।

মনে পড়ছে কাপ্তেনকে। কুতুর কাপ্তেন। কোন একটা কুতুর দক্ষিণের সামনে চাতালে বসে থাকত। ঠাকুর তাকে কাপ্তেন-কাপ্তেন করে ডাকতেন। ডাকলেই সে এসে ঠাকুরের পায়ে গড়াগড়ি দেত, ঠাকুরের চাতের নুচিসংল পেলো দারুণ খুশি। ঠাকুর বললেন, জাখ এত যে কুতুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না? পলার ধানে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর আর জুড়ি নেই। এ কাপ্তেনটা শাপভর হয়ে জন্মেছে। ওর পূর্বজন্মের সংস্কার বা ছিল তাই এখানে এসে কবচে। বধ হয়ে গেল।

সিঁটার নিবেদিতা শ্রীমায় সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখল, ব্যক্তিত্ব গোকার সিঁটার উপর একটা কুতুর শুয়ে আছে। নিবেদিতা দাঁত ফোড় করে কুতুরটিকে বললে, 'ভক্তবর, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি জগন্নাথার পাশপাশ প্রণাম করতে এসেছি। আমার পথ রোধ করে থেকো না। আমি জানি, তুমি হৃদ্যবেশী মহাভক্ত, পূর্ব-পূর্ব জন্মে অনেক স্তুতি ছিল, কিন্তু কি কারণে কে জানে এবার কুতুর-কি ধারণ করেছে। মায়ের পরধূলি পড়েছে এ সিঁড়িতে, পড়েছে কত সন্ধান ভক্তের, তাই তুমি এ মহাতীর্থ ছাড়ছ না। আমিও ভক্তের সত্যীর্থ, আমাকে একটু পথ করে দাও।' কুতুর লোর ছাড়ল না, শুধু একটু পাশ দিল-নিবেদিতাকে।

ঠাকুর যখন করতক হলেন, তখন সকলের পিছনে ঠাড়িয়ে রামাল ভাবতে লাগল, সকলের তো এক রকম হল, আমার কি কিছু পামি? বওয়াই সার হবে? এই কথা যেমনি মনে হওয়া ঠাকুর তুমি পিছন কিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কি যে রামলাল, অত ভাবছিস কি? আঁব আঁব।' এই বলে রামলালকে টেনে এনে তাঁর সামনে বসে কবালেন, তার গায়ের চামর খুলে দিলেন। তার বুক হাত তে বুলতে বললেন, 'ভাখ দিকিনি এইবার।' রামলাল দেখল দ্বৈতিক অশাখি আলোতে তরে গিয়েছে।

আর নরেন কি ভাবছে?

ভাবছে তার গুরু দায়িষের কথা। বলে গেলেন বাবার আগে, তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তোরা হাতে আর সব ছেলেরের ভাব দিয়ে গেলাম। দেখিস ওদের, ছাড়িস নে।

বাক্সে, আহায়াতে, ঠাকুর যখন খানিক স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, স্থানিস, আজ সাবানিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর ছিলাম, তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। তখন নরেন বলে উঠল, 'ভগবান তো সর্বভূতেই আছেন, ভুবনজোড়া তাঁর খেলার মাঠ—'

তখন ঠাকুর বললেন, 'ওরে, তোরা বেলান্তের ঈশ্বর নয়। তিনি চিম্বরও বটেন আবার চিম্বরও বটেন। লীলার সেই চিম্বরের জমাট রূপ। দেখছি তিনি স্বপক্ণ বালকুণ হরে আপনমনে ধুলোখেলা করছেন। নরীম মেঘের মত বড়, জ্যোতিতে সব দিক আলো, রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। পথ দিয়ে বত লোক যাচ্ছে তাঁদের গায়ে ধুলো দিয়ে আনল। কেউ পাল দিয়ে গেল ভ্রুক্লেপ নেই। কেউ আদর করে কোলে করতে এস, অমনি কোঁদো। আবার কেউ আনমনে চলে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো চেহু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে রূপা।'

বিকেল পাঁচটায় শুরু হল শোভাযাত্রা। গলায় ফুলের মালা, শ্রীপায়সে সন্ধান গুণ, চললেন ঠাকুর নারায়ণী দেহে আনন্দকমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে। প্রোম্বাংবাকুল হয়ে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল, কেউ একটু খাট ছুঁতে পারে কিনা। কেউ একটু পায়ে কিনা কাঁধ দিতে। সে চমৎকার, তোমাতে দুটা হুবাশা বতি দাও, দাও পাশপাশ-পাশা-বিলাসভক্তি। শতবর্ষ তুমি ভক্তদ্বয়ের বাস করবে, আমার দ্বন্দ্ব তোমার বাসের খোঁগা করে তোলা।

খোল-কবতাল সংকীর্তন চল আগ-আগে। সঙ্গে নিশান, ঠাকুর, ত্রিলূল। সমস্ত ঘরের প্রতীক। বৈকুণ্ঠের বৃষ্টি, বৃষ্টানের ক্রশ, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র। চললেন সর্বধর্মসম্মত—সর্বধর্ম একীকরণ মন্ত্রের উদ্গাতা। বত মত তত পথ তো বটেই, বত মত এক পথ।

জ্ঞান শব্দ, ভক্তিতে গোঁহাঙ্গ, বৈরাগ্য বৃদ্ধ, আত্মবলিগানে বীণগুট, ঠগারো রত্নময়। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিরোধ। তুমি সেই সর্বগ্রামী। সেই সর্বাঙ্গ। এক ঈশ্বর। এক পৃথিবী। এক মায়াবের সত্য। হে এক, তোমাকে অনন্ত চকুতে দেখতে লাও।

রাম দত্ত লাটকে বললেন, 'তুই বাগানে এখন কিছুকণ থেকে বা। পরে হাস খাশানে।'

লাটু তাই থেকে গেল। শোভাযাত্রার সঙ্গে গেল না। হরহাড়া শিশুর মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ঠাকুরের মিরাকুল বা বিজুতি যদি কিছু দেখতে চাও তো লাটু মহারাজকে দেখ।' বলেছিল অজুলা। 'ঠাকুর যে বলছেন ওরে লেটো, তোরা বুধ দিয়ে বেদকোলা ফুটে বেরাবে, ঠিক তাই কলছে।'

'দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলিঙ্গা করে রাখলে শুকিয়ে যাবে', বললেন লাটু, 'বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গজার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকায় না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি তাহলে বিষয়বাস্তবে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারে না, জগৎ আর মিরদলপ লাগবে না।' আবার বললেন, 'দেখো পলার

জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মণ জল থাকলেও তারটা বোকা যায় না, তেমনি ভগবানের সঙ্গারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোকা বলে মনে হয় না। সংসারকে মনে হয় আনন্দের নিকেতন। 'যে থাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকো লাগ, উল্টা জলে মহলি চলে বহি যায় গজবাজ।'

সব তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে নিশ্চয় থাকে। ঠাকুরের সেই গল্প মনে পড়ল।

একজন লোক অনেক মেহনত করে পাচাড়ের উপর একখানি কুঁড়েঘর করেছিল। একদিন তারি বড় উঠল। টলমল করতে লাগল ঘর। লোকটি তখন কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল, হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি যেন না পড়ে। পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফসি ঠাওয়াল। হুমুমান তো পবনদেবের ছেলে, তার নাম করে দোহাট দিলে। বাবা, এ হুমুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙে না। কিন্তু তখনও ঘর পড়ে-পড়ে। তখন অসুপায় হয়ে লোকটি বললে, বাবা, এ লক্ষ্মণের ঘর। তবুও বায়ণ মানছে না বড়। বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর। তবুও না। ঘর যখন সত্যি ভাঙতে শুরু করেছে, যখন আর উপায় নেই, তখন লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, বা শালার ঘর।

কিছুই কববার নেই। তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে তাঁর ইচ্ছার বাচ্ছে।

আবার সবই তাঁর কুপা।

দাবোয়ান হুমুস্ত সিংএর সঙ্গে এক ভারী পাঞ্জাবী কুস্তি লড়তে এসেছে। পাঞ্জাবী লোকটা ভীষণ জোয়ান, দিন গনেনো ধরে খুব

কসরৎ ঢালায় আর খি ছুঁষ হাসে খুব খেতে লাগল। তাঁর চোরা দেখে সবাই সাবাস্ত করলে তারই জিৎ হবে। হুমুস্ত সিংএর কোনো আয়োজন নেই, শুধু নীরবে ঝাড়িয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ চাইলে। ঠাকুর বললেন, খাওয়া কমাতে হবে, কসরৎ কমাতে হবে, আর দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। মহাবীরজীর কুপা হলে সব বিপদ নিরস্ত হবে। লোকে ভাবলে এ কি সর্বদেবে বিধান, খাওয়া দাওয়া কমাতে লড়বে কি করে? কিন্তু ঠাকুরের উপর হুমুস্তের অটুট বিশ্বাস, তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে। জয় মহাবীরের জয়! কুস্তিতে হুমুস্তের জয় হল।

আর সে কুপার কোনো কার্যকারণ নেই।

একদিন দুপুরবেলার লাটুকে নিয়ে ঠাকুর চললেন ভালতলায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বীড়ষের বাড়ি। চল, একবার তাকে প্লাস্টা দেখিয়ে আসি, এমন ডাকসাইটে ডাক্তার। অনেককণ ধরে দুর্গাচরণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলে, কিন্তু কি যে অসুখ, বলতে পারল না। ঠাকুর তাকে যত বাব বললেন, হ্যাঁ গা, রোগ সারবে তো? দুর্গাচরণ তত বলে, ওখুটা আগে খেয়ে দেখুন। বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর লাটুকে বললেন, রোগ সারবে কিনা তার খোঁজ নেই, বলে ওখুটা খেয়ে দেখুন। খাব না ওর ওখু। তবে সেখানে গেলেন কেন? ওরে তুই জানিস না, ও লুকিয়েলুকিয়ে বেত দক্ষিণেশ্বর। কত বার গিয়েছে, একবার আমার না গেলে কি ভালো দেখায়? ও তো নিজেকে খেতে ডাকল না ওর বাড়ি, না ডাকুক, আমি নিজেই উত্তোগী হয়ে গেলাম। কত দিন বাড়ি

## এখন! আপনার শিশুর সর্দির যন্ত্রনা তাড়িয়ে দিন!

সর্দি বিপজ্জনক হওয়ার আগেই এই ভাল  
জোয়ালা মলমটি মালিশ করুন!



সঙ্গে সঙ্গে ২ ভাবে সর্দির সঙ্গে লড়াই করে  
১। ভিকস্ ভেপোরাব  
২। ভিকস্ ভেপোরাবে  
ত্বকের  
ভিতর  
প্রবেশ করে  
আরামপ্রদ  
দ্রুত আনমন করে  
৩। ভিকস্ ভেপোরাবে  
র ত্বক  
ওষধের  
গন্ধ শুকলে নাকের  
ও গলার  
সর্দির  
যন্ত্রণা দূর হয়।

**ভিকস্**  
ভেপোরাব



"ভিকস্ ভেপোরাব" একটা ট্রেডমার্ক

দশটা-এগোটাটির সময় গিয়ে 'হুদে, হুদে' করে ডাকত। ওর গলা শুনে বুঝতে পারতুম, হুদেকে বলতুম, ওরে দোর খুলে দে, কলকাতা থেকে দুর্গাচরণ এসেছে। হুদয় দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটি কথাও বলত না। চুপচাপ বসে থাকত অনেকক্ষণ। ঠাকুর বললেন, 'কি চোখে আমাকে দেখেছিল তুই ওই জানে।'

রোজ সকালে ঘুম ভাঙতেই 'হু' চোখের উপর হাতচাপা দিয়ে ঠাকুরকে ডাকত লাটু। ঠাকুর এসে পাঁড়াতে তবে চোখ খুলত। দিনের প্রথম দর্শন দিনমাণি নয়, দিনের প্রথম দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখন কোথায় দেখব তোমাকে ?

লাটু ছুটল কাশীপুর স্মরণে। চন্দনকাঠের চিতা জ্বলছে। চিরজীব শর্মা গান গাইছে—শোকাক্রান্তের কণ্ঠে: 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক তব ইচ্ছা। পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর স্বপ্ন দেখে রদময়ি অবাক হয়েছি। হাসিবি না কাঁদিবি তাই বসে ভাবিবেছি।'

কিন্তু প্রেমলিত চিতার পাশে পাখা হাতে কে বসে? আশুতক হাওয়া করছে এ কে উম্মাদ ?

উম্মাদ নয়, গুরুতপ্রাপ্ত শশিভূষণ। প্রভুর সেবাকালে অহরহ পাখা করেছে, এখনো দেহরক্ষা করার অন্তেও চলছে সেই সেবাকাজ। সেহে নেই বলে বার্য ভাবছে ঠাকুর তিরোহিত, তারাই শশীকে উম্মাদ বলবে কিন্তু শশী সর্বকালে সর্বঘণ্টে তার ইষ্টকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে অগ্নিতে আর রামকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই, তাই সেই সত্যজ্ঞী সেই সত্যধ্যানী।

চিতা নিবে গেল, তবুও শশীর পাখার বিরাম নেই।

লাটু তুলল তার হাত ধরে। নয়নে আর শরৎ নিজেদের কি প্রবেশ দেবে তা জানে না, শশীকে প্রবেশ দিতে লাগল।

ঠাকুরের সব ভদ্রাঙ্গি একত্র করে একটি তামার কলসীতে রাখল শশী। মাথায় করে নিয়ে চলল। কাশীপুরের বাড়িতে কিরে ঠাকুরের শয্যাহানে রাখল। আবার বসল পাখা করতে।

কে বলে তিনি নেই ?

আমি আছি। আশুতক দম্ব হলেও আমি উড়ে বাই না, জলে মর হলেও আমি ধুয়ে বাই না। আমি অজ্ঞেয়, অদাহ, অক্লান্ত, অশোষ্য। আমি নিত্য সর্বব্যাপী স্থির অচল ও সনাতন। আমিই প্রাণীর গতি ও প্রতিপালক। আমিই প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাস স্থল ও কৃতাকৃতির সাথী। আমিই প্রভূপকার নিরপেক্ষ হিতকারী। জ্ঞানী ও সহর্ভা। আধার ও প্রলয়ভাণ্ড। আমিই অক্ষরকারণ।

আমাকে দেখ।

'নাভ্যন্তো বিমুখত মে।' আমার বিভূতির অন্ত নেই। বা কিছু জ্যেষ্ঠ বা কিছু পরম-প্রধান তাই আমি। প্রকাশকদের মধ্যে আমি মরীচিমালী সূর্য, পুত্রোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে কার্তিক আর জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। পর্বতের মধ্যে মেঘ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে সুধাংক। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, অষ্টবস্তুর মধ্যে অচল, সর্বভূতে অভিব্যক্ত চেতনা। বুদ্ধের মধ্যে অম্বশ্ব, স্বাবরের মধ্যে হিমালয়, শব্দের মধ্যে ওঁকার। দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল। অশ্বের মধ্যে উটেক:প্রভা, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মাহুদের মধ্যে নরশক্তি। আবুদের মধ্যে বজ্র, বেহুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে

বাসুকি। স্বজন-শক্তির মধ্যে কাম, নিরামকের মধ্যে বম, সংখ্যাকারিকের মধ্যে কাল। পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড়, মন্তের মধ্যে মকর। নাগের মধ্যে অনন্ত, জলাদেবের মধ্যে বক্ষণ, দৈত্যের মধ্যে প্রজ্ঞাদ। বেগবানের মধ্যে বায়ু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, শত্রুপাণিদের মধ্যে রামচন্দ্র। অক্ষরের মধ্যে অকার, সমাসের মধ্যে বহুবচস, বিভার মধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা। সমস্ত সৃষ্টির আমিই আদি, আমিই মধ্য, আমিই শেষ, ক্ষণ-রূপে আমিই অক্ষণ কাল, আমিই সর্বকর্মের ফলদাতা। অপহারীদের মধ্যে মৃত্যু, ভারীকালের উৎকর্ষ, বিতণ্ডার মধ্যে বিচার। নারীর মধ্যে কীর্তি, স্ত্রী, বাণী, শ্রুতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ছেলের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ছেলের মধ্যে অক্ষ, তেজস্বীর মধ্যে তেজ, বিজয়ীর মধ্যে বিজয়, উত্তোগীর মধ্যে অধ্যবসায়। স্বাগতের মধ্যে কুক, পাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন, যুনির মধ্যে বাস, কবির মধ্যে কৃত্তাকাশ। আমিই শাসকের দণ্ড, জ্রীসূয়ের নীতি, গুহ্য বিষয়ের মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান। বা কিছু বীজস্বরূপ তাই আমি। সমস্তই আমার সত্তায় সম্ভাবিত। সবই মদান্বক। আমার বিভূতির এত কথা জেনেই বা তোমাদের কি দরকার? এইমাত্র জেনে রাখো, আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত করে আছি।

'জয় জয় পরমা নিকৃতি হে নমি নমি

জয় জয় পরমা নিরুতি হে নমি নমি।

অজ্ঞশ্রাবণপ্রাপন হে নমি নমি

পাপকালনপাবন হে নমি নমি।

সব ভয় ভয় ভাবনার

চরমা আবুতি হে নমি নমি।

### একশো ছেষাট্টি

মাঠাকুর হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর সপরিবারে দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এ ঘর আর ও ঘর।'

কাঙ্ক সাধ্য নেই যাকে খান কাপড় এগিয়ে দেয়। নিজ হাতেই মা কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে স্নান করে নিয়েছেন।

লোকনিম্মা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর ভ্রাতৃপক্ষিতা সোনার বালা পরে, পেড়ে কাপড় পরে, এ কি কথা! তা হলে মানতে হয় দেশাচার। আবার খুলতে যাচ্ছেন বালা, আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। এবার একেবারে মাঠাকুরের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিগেসে করো, ও সব শাস্ত্র জানে।'

গৌরীকে কোথায় পাব? সে তো এখন বৃন্দাবনে।

ঠাকুরের তিরোধানের খবর শেয়ে গৌরীমা তো কেঁদে আঁতুল! ভূতপাত্তা দেখভাগ করতে উভত হল। অমনি চোখ জেরে দেখল, সামনে ঠাকুর পাড়িয়ে। তুই মরবি নাকি? ঠাকুর ঘরক দিয়ে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গৌরীমা উঠে পাঁড়াল। ঠাকুর অদৃষ্ট হয়ে গেছেন। গৌরীমা বুঝতে পারল, তার দেহভাগ্য ঠাকুরের ইচ্ছে নয়। এখনো অনেক বৃষ্টি তার কাজ বাকি।

'কি করে বসেই না।' কাশীপুরে একদিন যা দেখলেন

ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। হুই চোখ কি বেন বলি-বলি করছে।

‘হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? সব এই করবে?’ নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

‘আমি যেমনামুখ, আমি কি করতে পারি?’

‘না, না, তোমার অনেক কিছু করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকাকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।’ নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর, ‘এ আর কি করেছে? তোমার অনেক অনেক কাজ বাকি। দায় কি শুধু আমাধই? দায় তোমারও।’

এখন, ঠাকুর অপ্রকট হবার পর, মার ইচ্ছা হল আমিও চলে বাই। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, ‘জগতে মাতৃভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তোমাকে বেধে গিয়েছি। তুমি থাকো।’

এনিক মায়ের সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়া বেধেছে ঠাকুরের ভ্রাতৃহি নিয়ে। কালীপুরের বাড়ির ভাড়া টানবার আর সঙ্গতি নেই সন্তানদের, তবে ঠাকুরের পুতাহিঁপুর্ণ কলসীটি কোথায় রাখা হবে? বহু দিন এ বাড়ির মেয়াদ আছে তত দিন না হয় এখানেই সে কলসীর পূজা না হবে—তারপর?

রাম দত্ত আর তার দলের লোকদের ইচ্ছা—কলসী কীকুড়গাছিতে তার বোগোত্তানে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়। কিছুতেই তা হতে দেব না। শশী আর নিরঞ্জন কুশে পাঁড়াল। পলাতীয়ে জমি কিনব? নিজের, আর সেখানে সমাহিত করব পুতাহিঁ। কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা কই? নিজের একটা বাড়ি পঞ্চ নেই যেখানে এ সম্পদ আগলাতে পারি। সন্ন্যাসী ভক্তরা যুক্তি করতে বলল। ভাব্রকলসী রাম বাবুকেই নেওয়া হোক কিন্তু তার আগে পুতাহিঁভয়ের অধিকাংশ সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দেখো, রাম বাবু বেন জানতে না পারে।

তাই হল। বেশির ভাগ পুতাহিঁভয় সরিয়ে নেওয়া হল কলসী থেকে। রাখা হল একটা আলাদা কোঠায়। সে কোঠাটি লুকিয়ে রাখা হল বলরাম বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেই হবে নিতাপূজা।

মায়ের কানে গেল এই ঝগড়ার কথা। গোলাপমাকে বললেন দুঃখ করে, ‘এমন সোনার মাছই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।’

এত কথার দরকার কি। বললে নরেন, ‘আমাদের দেখই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক।’

পুতাহিঁর খানিকটা হামালদিলেতে চূর্ণ করা হল। সেই চূর্ণ ভাগ করে নিল সন্ন্যাসী-সন্ধানরা। জিহবার স্পর্শ করল সকলে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন একজিণে শ্রাবণ, তার কিছু দিন পরে, জমাইটের দিনে, অধির কলসী নিয়ে বাওয়া হল বোগোত্তানে কে আর নেবে, শশীই মাথা পাতল। বখাতিত পূজা হল কলসীর। তার পর তাকে বধন মাটির নিচে পোতা হল, উপরে মাটি কেসে ছবুখ করতে লাগল, তখন শশী তাঁর বন্ধার আর্তনাদ করে উঠল, ‘ওগো ঠাকুরের গায়ে যে বড্ড লাগছে।’

নবীন ভ্রামল ঘাসের উপর দিয়ে ধেঁটে গেলে ঠাকুরের যেমন হত। ওগো, বাড়িরো না, বাড়িরো না, বৃকে। ভীষণ বাজছে।

বটে শটে কাঠে শিলার সর্বজ টেঙত।

একটি ভক্ত ঘেরে এসেছে দলিৎপন্থ। উত্তর দিকের দরজার একটু ঝাঁক করে দেখে, একলা ঘরে ঠাকুর তক্তপোলের উপর বসে পশ্চিম দিকের দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর ছবির সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে হাসছেন, কথা কইছেন। ভিতরে ঢুক তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত ঘটতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর জানতে পেরেছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, বললেন, ‘দেয়ালের এই সব ছবি চৈতন্যময়, তাই এদের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার ঘরে যে গোবিন্দের শট আছে তাকে ছবি মনে কোবনি, তার সঙ্গে কথা কোরো—তাকে চিন্ময় ভাবতে ভাবতে একদিন ঠিক তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেই দিনই সার্থক হবে তোমার পূজা, তোমার ভোগরাগ।’

গোবিন্দ মানে জানো তো? যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ তিনিই গোবিন্দ। বৃন্দাবনে গুরু চরিয়ে বেড়াতেন যে গোবিন্দ সেই তিনিই জীবের ইন্দ্রিয়ের রাখাল। সকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন, সেই মন গোবিন্দ-পাদনবাড়িতে জন্ম থাকে। গোবিন্দই মনোরথের সারথি।

মনকে নিগৃহীত করে। মন নিগৃহীত না হলে অভয় লাভ অসম্ভব। মন নিগৃহীত হলেই দুঃখ ক্ষয়, প্রবোধ ও পরাশ্রয়। ধীরে ধীরে মন নিগ্রহ করে। কৃশাগ্রের মুখে বিন্দুবিন্দু করে জল তুলে সমুদ্র সেঁচে ফেল। কামেই চিন্তের বিক্ষেপ। কামভোগে কেবল দুঃখ, এই বোধে বৈরাগ্যাবলে উদীপ্ত হও। আত্মনাস্থবিরেকই উপসেব্য।

মনের সম্মুখই শম। কর্ণেইয়ের সম্মুখই দম। সকলই ব্রহ্ম, এ জেনে ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি সংযত হয়, তখন যে অবস্থা তাই বর। প্রতিকারের চেষ্টা না করে চিন্তা আর বিলাপ না করে দুঃখ সঙ্ক করাই তিতিক। নিগৃহীত মন আবার যদি বিঘ্নাভিঘ্ন হয় তাকে প্রত্যাহত করাই উপরতি। শুক ও বেলাভাবকো আভিক্য-বুদ্ধিই লক্ষ্য। পরমগুরু পরমেশ্বর একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

বলরামকে ঠাকুর বললেন, ‘আমার ইচ্ছে হু’খানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি, বোশী ধূনি ঘেলে বসে আয়ে: আরেকটি ছবি, বোশী গাঁজার কলকে মুখে নিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে অলে উঠছে। এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন শোলায় আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়।’

একটা থেকে আরেকটা।

অরুদ্রতী পাতিভ্রম্যের প্রতীকস্বরূপ। তাই নবোঢ়াকে অরুদ্রতী নক্ষত্র দেখানো হয়। সে নক্ষত্র অত্যন্ত ছোট, সহজে চোখে পড়ে না। স্তরতঃ স্বামী নিকটের একটি স্থল উজ্জল তারার দিকে সঙ্কত করে বলে, ‘এ দেখ অরুদ্রতী। বধন বধুর দৃষ্টি তাতে স্থির হয়, একাগ্র হয়, তখন স্বামী বললে, না, না, ওটা নয়, ওর কাছে ঐ যে ছোট তারটি আছে এটিই অরুদ্রতী।

এতিমা দেখছ, তারপর দেখ সেই নিম্প্রতীককে। বনোবৃদ্ধি অহঙ্কারচিত্ত দেখছ, তারপর দেখ এই আপনাকে। আত্মসাক্ষ্যকর করো।

‘কি চাই জানবার আগে কে চায় নির্ণয় করে। অধিষ্ট বন্ধ অধেষক ব্যক্তি কি আলাদা?’

তাই নিজেকে কোটাও, নিজে হও। নিজেকে জানো। নিজের জালাই সত্য, নিজেকে জানাই সাধুত্ব। নিজের তাপিনে নিজের



অধুনা হইতে গঠিত। অজ্ঞকে নকল করে নয়, নিজে অবিকল থেকে।

শিবের কোলে কালী বসে, এই ক্ষেমদ্বারী ছবিটি ঠাকুরকে দিয়েছিল শ্রুতেশ মিত্তির। ঠাকুর বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে। মা, এই ঘরে থাকো, আর মন্দিরে গিয়ে খেও।' ওরে রামলাল, কালীপূজার দিন মায় ছবিটি মার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সেদিন অনেক কিছু ধাবে।'

ভবনাথ এনে দিয়েছিল নবদীপের গৌরাজ-কর্তনের ছবি। বনুনাগুলির ছবিটি এনে দিয়েছিল রাখাল। 'বা, রাখালের কি পছন্দ।' রাখিকা কোমরে হাত দিয়ে বেন বাঁশরী কাড়তে বাচ্ছে।' যেতপাখরের বৃক্ষমূর্তি দিয়েছিল পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী। নেপালের বিখ্যাত উপাধ্যায় দিয়েছিল গণপতি মূর্তি। কেশবস্বত্র দিয়েছিল বীতথুস্তের ছবি, মহেন্দ্রলাল দিয়েছিল বোড়শী আর বশোদাগোপাল। শিকদারপাড়ার পাটৌ দিয়েছিল পাবাগী অহল্যা, রামলক্ষণ-বিধামিত্র।

সব কিছু সজীব। সর্বত্র উদীপন।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্মমন্দিরের বৈদীর সামনে ঠাকুর প্রণাম করলেন। বললেন, 'নরেন বলে, সমাজ-মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়? উদীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে। সেখানে তাঁর কথা সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। সেখানেই সকল ভীষণের উপস্থিতি। এক জন, জানো তো, বাবলা গাছ দেখেই ভাবাবিষ্ট হয়েছিল, কেন না ঐ কাঠে বাগ্যাকান্তের বাগানের জন্তে কুড়ুলের কাঠ হয়। একজননের এমন গুরুভক্তি, গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই ভাবে বিভোর। মেঘ দেখে, নীলবসন দেখে রাখিকার ব্যাকুলতা।'

নন্দনবাগানে সরসলা কালীশ্বর মিত্রের বাড়িতেই এই ব্রাহ্মমন্দির। সন্নিহিত সে উৎসবে উপস্থিত আছেন বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেগম্ম পাঠের পর উপাসনা হচ্ছে। তারপরে প্রার্থনা। স্নেহের প্রার্থনা।

অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে বাও। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে। মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। হে চিরপ্রকাশ। একবার আমার হয়ে প্রকাশ পাও, আমারই তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ করো। হে রক্ত, হে ভরস্বর, তোমার এসবস্বরের বৃথ আমাকে দেখাও, সে-বৃথের অভয়লাবণ্যে আমাকে বাঁচাও, আমাকে উজ্জীবিত করো।

ঠাকুর খুব খুশি। বলছেন, 'অশ্বখই সত্য, কল হ'দিনের জন্তে। গাছ কে দেখে, সব কল কুড়োতেই ব্যস্ত। অস্তর শুভ না হলে বিশ্বাস হয় না। যার ঠিক বিশ্বাস, তাইই ঠিক দর্শন। তবে কি না দূসারী লোকদের ঈশ্বরাত্মরূপ কণিক—বেন তপ্ত সোহার জ্বলের ছিটে, জল বতকল থাকে।'

এক শিশুসেপাই এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমরা হরময় মারশিট করছি, সরকারি ছকুমে ওলী করে লোক মারছি, আমরা কি রকম থাকব?'

ঠাকুর ভাবে দেখলেন, একটা ঢেঁকি ঘাস ভানছে। বললেন, 'ঢেঁকি ঘাস অনেক ঘাস নাড়ে, অনেক উঁচুনিচু ওঠে, পড়ের উত্তর অনেক ঘাস ভানে, অনেক কাজ করে কিন্তু হু'পানের হুটো

কাঠি ছুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তেমনি মন রেখে কাজ করো।'

কালীপুর বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ছেলেরা। নরেন, নিরঞ্জন আর কালী। কালীই বেশি ওস্তাদ। নরেন, নিরঞ্জন একটি মাছ গাঁথতে বস সময় নেয়, তার মধ্যে কালী প্রায় চার-পাঁচটি ধরে ফেলে। ঠাকুরের কান গেল এ সংবাদ। ছেলেরা তিন ডেকে পাঠালেন।

কালীকে বললেন, 'তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।'

'কেন জীবহত্যা?' নরেন বললে।

'হ্যাঁ, জীবহত্যা।'

'সে কি? নাহয় হস্তি ন হস্ততে। আত্মা কাউকে মারতেও পারে না, নিজেকেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায়?'

'পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়।' বললেন ঠাকুর, 'আহাযের লোভ দেখিয়ে বঁড়িশ লুকিয়ে রাখা আর অতিথিবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাতে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অস্ত্রকেও মারে না—এ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান বার হয়েছে, সে তো আত্মস্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তি হবে কেন? বতকণ ঐ হত্যাবৃত্তি আছে ততকণ সে আত্মস্বরূপ হয়নি, সুতরাং তার আত্মজ্ঞানও হয়নি। তাই জেনে রাখ, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে পা আর পড়ে না বেতালে।'

প্ররাগে এসেছেন মা-ঠাকুর। ঠিক করলেন ত্রিবেণী-সঙ্গে স্নানকালে কেশদাম বিসর্জন দেবেন। কাউকে সে কথা প্রকাশ করলেন না, লক্ষ্মীকেও না। স্নানের দিন খুব প্রত্যুষে মা স্নানতে পেলেন, কে যেন লক্ষ্মীকে ডাকছে। 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।' বেনাবিষ্ট গভীর কণ্ঠস্বর। মা চকল হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। দেখলেন, ঠাকুর হুই হাত দিয়ে দরজা ঘরে ঠাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পলক স্থির হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মায়ের প্রশ্ন অধীর হয়ে উঠল। কেন, কেন ঠাকুরের এই কাতরতা? সহসা মনে হল, তাঁর কেশদাম জলাঞ্জলি দেওয়া ঠাকুরের ইচ্ছে নয়।

কালীধামে এসেছেন শ্রীমা। মুক্তিকার কালী নয়, স্রবর্ণের কালী।

কালীতে এক গুরু তার শিষ্যকে এক ডোলা মাটি আনতে বললে। শিষ্য সারা কালী ঘুরে ঘুরে গুরুর কাছে ফিরে এল দিনান্তে। বললে, গুরুদেব, আমি হতভাগ্য, আপনায় আদেশ পালন করতে পারলুম না। কোথাও একটু মাটি নেই।

এ কি অসম্ভব কথা! গুরু ক্রুদ্ধ হল। সারা কালী ঘুরে এক ডোলা মাটি গেলে না তুমি?

বিনয় বচনে শিষ্য বললে, না গুরুদেব। অরপূর্ণায় সোনার কালী, এখানে মাটির ছিটোকাটাও নেই—সমস্তই সোনা।

গুরু ভজিত হয়ে গেল। শিষ্য তাকে ছাড়িয়ে সাধন-ভূমির কত উঁচুতে উঠে গেছে।

বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন শ্রীমা, আর দেখছেন, অনানি-লিঙ্গ কোথায়, ঠাকুর সামনে এসে ঠাঁড়িয়েছেন। বস জল ঢালছেন সব ঠাকুরের পায়ে পড়ছে। হাতপা কাঁপতে লাগল শ্রীমায়, ভাড়াভাড়ি বাগার কিরলেন। এক ভাড়াভাড়ি কিরলে কেন বা?





ডিটামিন যুগ

কোলে  
H  
বিপ্লুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

আঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিপ্লুট

কোলে বিপ্লুট কোম্পানী  
আইডেট লি., কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খিনএরারকট

যেরী

গেটিটব্যুরো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ডেপ্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

শ্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

মার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

অফ্রিতি

আরও অনেক রকম।

কে একজন জিপসোগে করল। মা বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

আরেক দিন মা নারায়ণ দেখলেন। বৃন্দাবনে শেঠদেব মন্দিরে যেমন দেখেছেন তেমনি। শুধু নারায়ণ নয়, নারায়ণের পাশে ঠাকুর। ঠাকুর হাতজোড় করে পীড়িরে আছেন। ঠাকুর হাতজোড় করে পীড়িরে কেন? 'ঠাকুর কথা ছেড়ে দাও।' বললেন মা। 'সকলের কাছেই তাঁর দীনভাব—ঐ ঠাকুর বিশেষত্ব। এবার যে বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন করে লীলা করলেন।'

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একজোড়া মোজা দিল। নতুন মোজা পরে ঠাকুর ছোট্ট ছেলের মত আছাদে আটখানা। ছটকো গোপাল এসেছে নর্শন করতে, আনন্দময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে, আমাকে আজ মোজা পরিয়ে কেমন বাবু সাজিয়েছে ভাখ।'

গোপাল হাসছে।

'ভূই বড় হাসছিস যে?'

'মোজা পরে তো বেশ সেজেছেন।' বললে ছটকো গোপাল, 'এদিকে পরনের কাপড়খানার যে ঠিক নেই।'

ঠাকুরের কাপড়খানা এসোমেলা হয়েছিল। তিনি নির্লিপ্তের মত বললেন, 'তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তো!'

কাপড়খানা ঠিকঠাক পরিয়ে দিল গোপাল। একেবারে শিশু। সানন্দ স্বর্নানন্দ শিশুর মতই হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

কামায়পুকুরে একদিন রত্নাবতার ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গেলেন মা। দেখলেন, ঠাকুর ঘুমুচ্ছে। মা একবার ভাবলেন ভাতাভেন না ঘুম; আবার ভাবলেন ঘুম না ভাঙালে খেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'জানো গা, এক ঘুম দেখে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোক লালা-শালা। তারা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা তারা পাবে না।'

তাদের অগ্রনুভূতি নিবেদিতা। মাকে একটি জাম্বাণ-সিলাভারের কাঁটো দিয়েছে, তাতে মা ঠাকুরের কেশ রেখেছেন। বলেন, 'নিত্য-জুজার সময় যখন এই কাঁটোটির দিকে তাকাই, নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা আমার বলেছিল, 'মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু হইলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

কোয়ালপাড়াতো খুব করে ভুগছেন জীমা। বেহুঁশ হয়ে বন্ধনাতোই অসামান্য হয়ে পড়ছেন। হুঁশ হয়ে যখনই ঠাকুরকে দেখ করছেন তখনই নর্শন পাচ্ছেন।

সেই স্ববীকেশ থেকে এক সাধু লিখেছে মাকে, মা তুমি লেখিলে, সময়ে ঠাকুরের নর্শন পাবে, কই তা হল? চিঠি পেয়ে বললেন, 'এক লিখে দাও তুমি স্ববীকেশে গিয়েছ বলে তুমি তোমার জন্মে সেখানে এসিয়ে থাকেনি। সাধু হয়েছো ইমানকে ডাকবে না তো কি করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেন।'

'আপনাকে নর্শন করছে অথচ আপনার উপর বিশ্বাসভক্তি নেই, তাদের কি কিছুই হবে না?' একজন জিপসোগে করল মাকে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে নাই বা মানসেক, নর্শনের কল যাবে না? পরের জন্মে তাদের সাধনভজনে বড়িগতি হবে।'

কেউ কেউ বা অশরীরী অবস্থাতেও উদ্ধার পায়।

গোপালের মার বাড়িতে ঠাকুর আর বাখাল গেছে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণে। গজার ধারের বাগানবাড়ির নিচের ঘরটিতে থাকে গোপালের মা। কি রাস্তাকৃত আয়োজন করেছে কে জানে, তার রান্না তখনো শেষ হয়নি। উপরের ঘরটি খুলে দিয়ে অতিথিদের বিজ্ঞান করতে বললে। ঠাকুরের পাশে তারিয়া টেস দিয়ে রাখাল চোখ বুজে শুয়ে রইল। খানিক পরে শুনতে পেল, কে বেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইছে। বলছে, 'আপনি এখানে আসাতে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বাইরে এই দুপুরের রোদে পীড়িরে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে আমাদের।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কারা?'

'আমরা প্রোতাস্তা। পাশের চটকলে কাজ করতুম, অপবাত্তে প্রাণ গিয়েছে। সন্ধ্যায় হয়নি এখনো। এই বাগানে ঘরে বেড়াই আর এই খালি ঘরে থাকি।'

'আহা, তোমাদের এত কষ্ট! এবুনি চলে যাচ্ছি আমি।' ঠাকুর উঠে পড়লেন।

রাখাল চোখ চেয়ে দেখল পাশে ঠাকুর নেই। ছুটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ধরল। এ কি, নেমে যাচ্ছেন কেন? কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এতক্ষণ?

'ওরে, এই ঘরটিতে ভূত থাকে। তারা বলছিল, তাদের কষ্ট হচ্ছে বাইরে থাকতে। তাই নেমে যাচ্ছি। খবরদার, এ কথা বেন বলিসনে বামনিকে।'

'আপনাকে দেখেও কি ওদের উদ্ধার হবে না?'

'হবে। এখানকার টান চলে গেলেই উঠে যাবে উপরে।'

এখানকার টান কি যে-সে টান। ঠাকুর ছুড়া কাটলেন:

রাগী টানেন কোল পানে

রাখাল টানে বন পানে

রাই টানেন চোখের টানে

বল জাম পাঁড়াই কোথা?

'সসারে থাক কিন্তু আসক্তির গোড়া কেটে।' বললেন ঠাকুর, 'আসক্তি পুষে রাখলে এতবি কি করে? নোড়র না ভুলে পাঁড় টেনে গেলে নৌকা এক হাতও এগোয় না।'

'তবে কি সসার থেকে দরমায়্য যেহ-ভালোবাসা ভুল দেব?'

'তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে, একে বলেছে? সসারের সবাইকে আপনার জন মনে না করে ভগবৎজন বলে ভাবতে শেখ। তারই ভক্ত মনের জঞ্জাল আগে সাক করো। মনের জঞ্জাল খুলেই চোখের দৃষ্টি কুটবে। তখন দেখতে পাবে এ সসারও তাঁরই রচনা। বার বা পেটে সব তার জন্মে তেমন ধারাবের ব্যবস্থা।'

যেখানে থাকো না কেন, স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই। তুমি ছাড়া কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না।

ঈশ্বর বৃত্ত হয়ে থাকে। সব সময়ে তাঁর কথা ভাবো। তাঁর নাম করো। পুণ্যতীর্থ, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান,

নদীসন্ধ্যা, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিদ্যমূল্য, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, নিজ গৃহ অথবা যে স্থানে মন প্রশান্ত হয়, প্রসন্ন হয়, সেখানেই নাম করো। অতঃপর বাচিচায়েই বা দরকার কি। যখনই মনে পড়বে তখনই নাম করবে। উঠতে বসতে চলতে কিরিতে যেতে শুতে—যখন তখন। নাম করতে করতে মনের জঞ্জাল সাফ হবে। দেখা দেবে পবিত্রতা। পবিত্রতাই চিরতৃষ্ণারমণিত কৈলাসধাম। নাম করতে করতে চিন্তবৃত্তির নিরোধ হবে। চিন্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিন্তকে একতান বা একাগ্র করার নামই যোগ। বুদ্ধির সমস্ত মুগ বেষে দিয়ে একটি মাত্র মুগ খুলে রাখার নাম যোগ। আর সব মুগ বেষে দিয়ে ঈশ্বরের মুখটি খুলে রাখো। দেখ কি রকম বেগ কি রকম শক্তি!

চিন্তে বাসনা থাকতে যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমার চিন্তা তোমারই অধীন হবে, তুমি চিন্তের অধীন হবে না, এইটাই যোগের লক্ষণ। সর্বদিকে নিরুদ্ধ, শুধু একদিকে একাগ্র। ঈশ্বরে তীক্ষ্ণভাবনার নামই যোগ। সে অভিজ্ঞতার জন্মে প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া।

নিশ্চিন্তপুরুষ হয়ে যাও।

বর্ষার রাত, অবিদ্রাম বুড়ি হচ্ছে, ঝড়ও চলেছে ছুনিবার, এক গোয়ালার ঘরের দেয়ালের ধারে ছেঁচলার আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধদেব। জানলা দিয়ে গোয়ালার দেখলে, গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, 'সন্ন্যাসী, ওখানেই থাকো, এ তোমার ঠিক জায়গা।' তারপরে গান ধরল গোয়ালার, আমার গরুবাছুর ঘরে আনা হয়েছে, স্থল্লর আন্তন ছলছে, আমার দ্বী নিরাপদে আছে, শিশুরা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, হে মেঘ, তুমি আজ যত ধূশি বর্ষাও সারা রাত।' বাইরে থেকে বৃদ্ধদেব বললেন, 'আমার চিন্তা সংবত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয় সকল কুড়িয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সঙ্গারমেঘ, যত পারো বর্ষণ করো সারাতীবন।'

এই হচ্ছে নিশ্চিন্তপুরুষ।

একটি আসনে বসো ও ধ্যান করো।

বে অবস্থায় যুগে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা হয়, তাই আসন। এ ছাড়া অঙ্গ আসন সুখাসন নয়, সুখনাশন। শুধু শুকতাই মৌন নয়। বাক্য ও মন বাক্য না পেয়ে নিবর্তিত হয় তাই মৌন। সমরস ব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতা। নইলে শুধু শারীরিক ঋজুতাই সমতা নয়। নাসাগ্রনিবন্ধ দুইই যোগদুই নয়। জ্ঞানময় দুইতে সকলই ব্রহ্মময় দেখাই যোগদুই। ব্রহ্মই আমি, এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাই ধ্যান। নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিন্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি।

বিষয় আর কিছুই নয়, হুটি মাত্র অক্ষর : হ আর রি।

কি বুজছ? সুখ? হার হার সুখ কি খোঁজবার বস্তু?

এমন একটা জিনিস চাই বাক্য ধরে বাঁচতে পারি। যে আমাকে অন্তরীণ আশা দেবে অতলগভীর আশ্বাস দেবে, অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দেবে। নিজের মধ্যে এত আমি অনিশ্চিত, সে আমাকে অকল্পিত নিশ্চরতা দেবে। কে সে?—এই হুটি মাত্র অক্ষর।

বাথাল ঠাকুরকে বললে, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছু দিন থাকে।'

নরেন্দ্রেরও সেই কথা :—'আপনি ইচ্ছে করলেই মার ইচ্ছে হবে।'

'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না।' বললেন

ঠাকুর, 'এখন আর মার আর আমার ইচ্ছার মধ্যে ভেদ বুঝে পাচ্ছি না।' পরে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে ছুটো! একটি মা পূর্ণ ও আর একটা ছেলে—অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিল, ছেলেরই এখন অস্থখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মাঝুর হয়ে ভক্ত সঙ্গে আসে, তার সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাড়িলের দল এল, নাচল, চলে গেল, কেউ চিনলে কেউ চিনলে না। জীবের জন্তেই এই শরীর ধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।' ঠাকুর তাকালেন নরেন্দ্রের দিকে। জিগগেস করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয়?'

নরেন্দ্র বললে, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাসী।'

ঠাকুর নিজের বৃকে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখছি বা কিছু আছে, সব এখান থেকেই।'

তুমিই সব। তুমিই সমস্ত ঘব-ঘোরা পরিপক্ব বৃটি। তুমি সব ঘরে সব ঘাটে সব পথে সব স্তরে। সব দুষ্টিকোণে। তুমি আন্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্যবাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত। তুমি অভেদবাদীর এক, প্রভেদবাদীর বহু, বৈতবাদীর দুই। তুমি কি নও? তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্রী, সংসারী, ব্রহ্মচারী। তুমি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত। তুমিই আমার একমাত্র। সার তুমি, বস্তু তুমি, প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ঘর-বাড়ি, মাঠ-আকাশ, সাগর-পর্বত। আমার সমস্ত ভালোবাসা, স্তবজ্যোতি কখন-কর্তন সব তোমার। তুমি দুর্গলের বল, দুঃখীর দরদী, দরিদ্রের ধনবত্ত। তুমি নিরাকুল শান্তি, নিরাময় ক্ষমা, নিরঞ্জন সাধনা। তুমি মধুর, সর্বতোমধুর।

অধরঃ মধুরঃ বদনঃ মধুরঃ

নয়নঃ মধুরঃ হাসিতঃ মধুরঃ।

হৃদয়ঃ মধুরঃ গমনঃ মধুরঃ

মধুরাধিপত্যেরখিলঃ মধুরঃ।

বচনঃ মধুরঃ চরিতঃ মধুরঃ

বসনঃ মধুরঃ বলিতঃ মধুরঃ।

চলিতঃ মধুরঃ ভ্রমিতঃ মধুরঃ

মধুরাধিপত্যেরখিলঃ মধুরঃ।

বেণুমধুরো বেণুমধুরো

পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরো।

নৃত্যঃ মধুরঃ সখ্যঃ মধুরঃ

মধুরাধিপত্যেরখিলঃ মধুরঃ।

গীতঃ মধুরঃ গীতঃ মধুরঃ

ভুক্তঃ মধুরঃ স্বপ্নঃ মধুরঃ।

রূপঃ মধুরঃ তিলকঃ মধুরঃ

মধুরাধিপত্যেরখিলঃ মধুরঃ।

# সোবিয়তের দেশেদেশে

মনোজ বসু

১৮

বাচ্চাদের এক ইন্সুল। ঠিক শহরে নয়—মফোর বাইরে শহরতলীতে। ১১২৭ অর্ধে প্রতিষ্ঠা। বাড়িটা আরও পুরানো—প্রাক-বিপ্লব আমলের। আগে শুধুই ছেলেরা পড়ত; এই সেপ্টেম্বর জর্জীয় মাস দুই আগে থেকে মেয়েদেরও নিচ্ছে। হাই-ইন্সুল, দশম শ্রেণী অবধি। শিক্ষক পঞ্চাশ জন; ছাত্রছাত্রী ছাত্রদের বেশি। পুরুষ শিক্ষক এগারো জন, বাদ বাকি মেয়ে। সবাই ইনিং নিয়ে এসেছেন। চল্লিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন এমন শিক্ষক দাছেন; আবার এমনও আছেন বঁদের অভিজ্ঞতা মাত্র ছুঁমাসের।

ডিরেক্টর মশায় ভারি ক্রিমাঙ্ক—পাকা চুল, পাকা গৌফ, বুকের উপর মেডেল ঝুলছে। পথ দেখিয়ে তিনি নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে দেওলায় উঠে লম্বা করিডর পার হয়ে বাড়ি। দেয়ালের মাথা হুড়ে শিক্ষা-নেতাদের ছবি। সিঁড়ির মুখে বখারীতি আবক্ষ লেনিন। ট্যালিন।

শিক্ষক কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। যৌথ-চেঠায় বিশাঙ্গী গার—হেলেপুলে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই শিক্ষা সকলের আগে। গল ল্যাবরেটরি আছে; সিনেমা-ছবি দেখানোর যন্ত্র এবং শিক্ষা গ্যাসের প্রয়োজনীয় আরও নানা রকমের যন্ত্রপাতি। ড্রই শেখানোর স্তায় ব্যবস্থা। গানের ক্লাসও আছে। প্রত্যেক বিভাগের আলাদা ইন্ট্রি—ভূগোল-বিভাগে দু'হাজার বই; ইতিহাসে তিন হাজার বেশি। অথচ মনে রাখবেন, এমন কিছু নামজাদা প্রতিষ্ঠান নয়—শহরতলীর ছোটখাট ইন্সুল মাত্র।

পরমা সেপ্টেম্বর থেকে ডেসে-সাজা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে মের দিকটার জোর দেওয়া হচ্ছে—প্রথম থেকে দশম শ্রেণী অবধি রিলিফি পাঠ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কাগজ, দাঁ ও প্রিন্সিপাল দিয়ে নানা জিনিষ বানায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গঠের কাজ, তৃতীয় শ্রেণীতে ধাতুর কাজ। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে ৫ তিন শ্রেণীর বাবতীয় উপকরণ মিলিয়ে কাজ করবে। এমনি পথে থাপে চলন। ঊর্জার বেল-ইন্ট্রি চালানো অবধি। দশম শ্রেণীতে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে শেখায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্র বাকিছু ছেলেমেয়েরা বইয়ে পায়, সমস্ত হাতে-কলমে ধানোর ব্যবস্থা আছে ইন্সুলে।

সেপ্টেম্বর থেকে মে অবধি শিক্ষার মরসুম। গীতের ছুটি ৩১ সেবর থেকে ১৩ জাছরায়। বসন্তের ছুটি ২৫ মার্চ থেকে ৫ জুন। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষার বালাই নেই, চার ও এমনি প্রোমোশন পায়। পরীক্ষা জুনের শেষাংশে—১ মাস আগে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। দ্বয়কমের পরীক্ষা—লেখার হ ক্ষেপে। পঠ্য বই সর্বত্র এক রকম। বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য বইয়ের ব্যাপ্ত হয়—যে গণতন্ত্রে যেটা বাস্তবতা, সেখানে সেই ভাষায় বই

পড়ানো হয়। প্রোগ্রাম সর্বত্র এক, পরীক্ষা ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যেক গণতন্ত্রে শিক্ষা-দপ্তর আছে, শিক্ষা-কমিশন আছে; তাঁরা সেই গণতন্ত্রের শিক্ষা-নীতির নিয়ামক। প্রোমোশনের পর তিন মাস লম্বা ছুটি। ছাত্রদের বাধ্য স্বত্বকে কর্তার ভারি সজাগ। প্রত্যেক ইন্সুলে আলাদা চিকিৎসা-কেন্দ্র, ডাক্তার, নার্স, শিশুদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল। স্বাস্থ্যের কারণে যে ছেলের বাইরে হাবার দরকার, এই ছুটির মধ্যে তার ব্যবস্থা করা হয়। ইন্সুল থেকেও দল বেঁধে পাঠানো হয় শিক্ষার জন্য।

লেনিন বলেছিলেন, শিক্ষকরাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পাবেন। বিস্তার আইন হয়েচে শিক্ষকদের সুখ-সুবিধার জন্য। একটা আইন ১৯৪৮ অবধের—দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পুনর্বাঁসনের হিড়িক পড়ে গেছে। এই আইনে ইঞ্জিনিয়ারের সমান মাইনে পাবেন শিক্ষকরা। সর্বনিম্ন মাইনে আট-শ' রুবল। এই যে ডিরেক্টর মশায় আমাদের হুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, ইনি পান ২১০০ রুবল। ডিরেক্টর আবার অঙ্কের মাষ্টারও বটে, বারো ঘণ্টা কাজ সপ্তাহে। এমন আছেন—এইন্সুলে দু'ঘণ্টা ও ইন্সুলে দু'ঘণ্টা পড়ান। মাইনে ৩৫০০ রুবল। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী বঁারা পড়ান, তাঁদের খাটনি চার ঘণ্টা দিনে; পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী বঁারা পড়ান, তাঁদের তিন ঘণ্টা। পাঁচ বছর কাজ হলে মাইনের উপর দশ পারসেন্ট বেশি পাবেন; দশ বছর হলে কুড়ি পারসেন্ট। পঁচিশ বছরের বেশি কাজ হলে ত্রিশ পারসেন্ট বেশি মাইনে, তা ছাড়া পেনসন চল্লিশ পারসেন্ট পরিমাণ। পেনসনের টাকা কাজ করলে পাবেন, না করলেও পাবেন। পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য বাড়তি পাওনা। বঁারা ক্লাসটিচার, তাঁরা ঐ বাবদ মাইনের উপর সাড়ে-বারো পারসেন্ট অতিরিক্ত পান। কোন দিন যদি নিয়মিত তিন-চার ঘণ্টার বেশি পড়তে হয়, তার জন্যও টাকা পাবেন। মক্খল হলে বিনা খরচে বাসস্থান, কল্যা ইত্যাদি। কোন শিক্ষক নিজ সঙ্গারের জন্য যদি জমি চাষ করতে চান, সরকার জমির ট্যাক্স মাপ করে দেবে। প্রাইভেট-ট্রাশিনি করবার আইনও বাধা নেই, যদিও ছাত্রদের কথাটি তার প্রয়োজন বটে। পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা-দপ্তরে কাজের রিপোর্ট বার, দশ বছর ভাল কাজ হলে শিক্ষক সরকারি মেডেল পান। ত্রিশ বছরে অর্ডার অব লেনিন। আমাদের এই ডিরেক্টর মশায়ের তেতাগ্লিশ বছর কাজ হয়েছে, অর্ডার অব লেনিন পেয়েছেন তিনি, সর্বগ্রে সেই নিদর্শন জামার সেটে বেখেছেন। এ ছাড়া গুল বুকে গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট প্রতি বছরের উৎসবে শিক্ষকদের উপাধি দান করেন।

যদিবারে ছুটি। মে মিস (১ মে) ও বিপ্লব দিবসে (৭ নবেম্বর) ইন্সুল বন্ধ থাকে। বজরার ছুটি নেই।

লেনিন স্তালিনের জন্ম ও মৃত্যুদিন আমরা স্মরণ করি, কিন্তু ইহুদের ছুটি নয়। পর্যালোচনা মিনিটে শিরিয়ড—নিচু তিন ক্লাসে চার শিরিয়ড করে হয় যোজ্ঞ। চতুর্থ শ্রেণীর সপ্তাহে আরও দুটো শিরিয়ড বেশি। ছেলেমেয়ের একই রকম পাঠ্যপুঁটি। পরীক্ষা নেবার জন্ত ডিরেক্টর মশায়ের তত্ত্বাবধানে কমিশন বসানো হয়, শিক্ষকেরা তার মধ্যে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ঘরে ঢুকলাম। সাত বছরের ছোট্ট ছাত্ররা ধবধবে পোশাক পরে লেখাপড়া করছে। বৈষ্ণবে বসেছে ছাত্রন করে। বই নেড়েচেড়ে দেখি—ছবিই কেবল, লেখা বৎসামাত্র। অধ্যাপক গুপ্ত দেশ থেকে কিছু ছবি এনেছেন—ছেলেমেয়েদের দিলেন। তারাও পাগল ছবি দিল ভারতের অদেখা বাচ্চা বন্ধুদের নাম করে।

ভূগোলের ঘর। ছবিতে ঠাসা—পাহাড়, অরণ্য, আবুদরিয়া নদী; বালুতে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে—তার ছবি। এর মধ্যে স্তালিন, লেনিনের ছবিও আছে। বড় বড় ম্যাপ টাঙানো, নানা রকমের গাছ টবে। সামুদ্রিক গাছ-পালা। সমুদ্রের তলদেশ—ছেলেরা বানিয়ে রেখেছে। তিন রকমের ফিশ প্রোজেক্টর। বিশাল ব্রাকবোর্ডের পাশে পদ্ম গোটানো থাকে, ফিশ দেখানোর সময় মলে দেয়। আমাদেরও দেখাবে একটু। কালো পদ্ম চক্ষের পলকে জানলাগুলো ঢেকে দিল, সাদা পদ্ম ব্রাকবোর্ড। নানান দেশের ছবি দেখছি। ভারতেরও। হুগুন গিরিসঙ্কট, নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল সেচনের নানা রকম ব্যবস্থা।

জীবতত্ত্বের ঘর। কঙ্কাল, কতরকমের মডেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মডেল। পোকামাকড়, কত বিচিত্র ধরনের পাখী। পাশেই জীবন্ত প্রাণীর ঘর। রকমারি পাখি, খরখোস, মুরগি, রঙিন মাছ। সামান্য একটা ইহুদের জন্ত কী বিপুল বিচিত্র অয়োজন।

এই একটা জায়গার নয়, সারা সোবিয়ত দেশ জুড়ে এমনি ব্যাপার। শিক্ষার ব্যাপকতা দেখে তাক্সব হতে হয়। শিচ্ছে-পড়া দেশগুলো সত্ত্ব ঘুরে আসছি—পশ্চিম-প্রাচ্য বছর আগেও

যেখানে শতকরা দেড় জন ইহুদের মাত্র শিক্ষা-পরিচয় ছিল। তাও স্মরণ করে কেরানোর স্মরণ পড়ত মাত্র। আর এখন যে তল্লাটাই গিয়েছে, নিরক্ষরতা একেবারে নেই। যাবতীয় শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে—শিক্ষার প্রথম পর্বে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু শিখতে হয় না। মাতৃভাষা বত দরিদ্রই হোক, রাষ্ট্রের কাছে তার সর্বোচ্চ সম্মান; মাতৃভাষাকে তুলে ধরবার জন্ত প্রত্যেকটি গণতন্ত্র এবং সোবিয়ত রাষ্ট্র সকল চেষ্টা করছে। কয়েকটি ভাষার লিপি পর্যন্ত ছিল না, সেখানে লিপির ব্যবস্থা হয়েছে। ভাষা দুর্বল বলে বিলুপ্ত ঘটানোর চেষ্টা হয় নি।

শিক্ষা মানে কয়েকটা পাশ

করা নয়—শিক্ষার উদ্দেশ্য, ওরা বোঝে, জীবনকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। আটোঁসাতো ক্লাসের ঘরে থানকয়েক বইয়ের মধ্যে নিময় থাকা নয়। তিন স্তরের শিক্ষা। তিন বছর অবধি নাসারি। তিন থেকে সাত কিশোরগার্টেন। সাত থেকে সাতের ইহুদ। আজকে যার একটা দেখে এলাম।

লাথ লাথ ছেলে-মেয়ে নাসারিতে পড়ে। দুনিয়ার ছয় ভাগের এক হল সোবিয়ত দেশ—এই বিশাল দেশের সকল জুকে নাসারি ছড়ানো। নাসারির মধ্যে শিশু-কোরক ফুল হয়ে ওঠে। মা কাক্সকর্মে বাচ্ছে, নাসারিতে বাচ্চা রেখে যায়। নাসারি তা হলে হল দ্বিতীয়-মা। এই দ্বিতীয়-মা দিনের বেলা কাজের সময়ের; আসল মা রাতে ঘুমানো। দ্বিতীয়-মা দেখে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে শিশুর, সে হাসিকুটিতে থাকে। বা স্বভাবক্রমে শেখা যায়, তাই শুধু শেখায় নাসারিতে। এখানেই শেষ নয়—নাসারির কর্মীরা বাড়ি গিয়ে দেখে, বাচ্চা কেমন অবস্থায় থাকে। বাচ্চা সবকিছু উপদেশ দেয়, যথাযথ ব্যবস্থা করে আসে। এখানকার মা শিশুরে উঠবেন—কনকনে হিম, বরফগুড়ি পড়ছে, তাইই মধ্যে খোলা জায়গায় বাচ্চাদের রেখে দিয়েছে। একটু বড়রা—গোলাপ ফুলের মতো লাল—দেখতে পাবেন, মাটির উপর জাপটে বসে খেলাধুলোয় মেতে আছে।

রঙের খেলা নাসারিতে। ঘরের দেয়ালে নানা রং; কেলনায় বিচিত্র রঙের বাহার। রং দেখতে দেখতে জীবনও বড়িন হয়ে ওঠে নাকি। বাকি আমরা বলি পড়ানো—নাসারিকর্মীরা তা করে না কখনো। কথা বলে তারা শিশুদের সঙ্গে—গল্প করে, হাসায়। ছোট্টা শিশু গভীর মনমরা ছিল, দু-পাঁচ দিনে তারা হাসিকুটি ছোট্টাছুটিতে মেতে ওঠে। গ্রীষ্মের সময়টা নাসারিগুলো গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গা-বদলের ফলে বাচ্চারা স্বাস্থ্যে ভরে ওঠে।

তারপরে কিশোরগার্টেন। সবাইকে এক ছাঁচে ফেলে শিক্ষাদান নয়। বয়স, মনের গঠন, স্বাভাবিক প্রবণতা সকল দিক লক্ষ্য রাখা



মস্কো-নদীর পাশে দূরতে বেরিয়েছি

হয় প্রতিটি শিশুর। মানুষ তারা, এক প্যাটার্নের পড়ুল নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাদের—এই হল শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। পড়া হয়, এই স্তরে, দিনের মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট। চল্লিশের বেশি কখনো নয়। ঐশ্বের সময় শিশুদের গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে মাটি গাছপালা পাখি ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের কমিটি আছে—তারা এসে দেখাতানা করেন, উপদেশাদি দেন।

এরই পরে ইন্সুল। যেমন একটার আন্তঃসেছি। ইন্সুলের নাম নেই, শুধু নম্বর দিয়ে পরিচয়। অর্থাৎ সবই এক ধাঁচের। আমি বেশি মাইনে দেবো, আমার ছেলেপেলে ভাল শিক্ষা পাবে—এরকম ব্যবস্থা হতে পারবে না। জায়গা হিসাব করে ইন্সুল—এই চৌহদ্দির ভিতরের সব ছেলেমেয়ে অল্পক নম্বর ইন্সুল পড়বে। অভিভাবকের পদ-প্রতিষ্ঠা বেরকমই হোক, শিশুদের মধ্যে বাছবিচার নেই। চাকরানির ছেলে আর অধ্যাপিকার ছেলে একই সঙ্গে একই শিক্ষা পাবে। মাস্টার মশায়রা প্রতি বছর হিসাব নিয়ে দেখবেন, তাঁদের এলাকার সাত বছরের উপর সব ছেলেমেয়ে ইন্সুলে আছে কিনা। প্রতিটি শিশু ইন্সুলে আসবে—বদি না আসে, তার জন্ত দায়ী হবেন শুধু অভিভাবক নয়, সেই এলাকার ইন্সুল-কর্তৃপক্ষও। সমস্ত সরকারি ইন্সুল, খচপত্র সরকারের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত অভিভাবকের এক পরস্যা বার নেই। শিক্ষকেরা সকলেই ট্রেনিং-পাওয়া; তার জন্ত বিরাট ব্যবস্থা, বিপুল অর্থব্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে—সাধারণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে মেধাশালী। বাদের মেধা নেই, তাদের অস্বস্থ বলে ধরা হয়। তাদের শিক্ষার জন্ত পৃথক আয়োজন। কোন ছাত্র পিছিয়ে পড়লে তার দায়িত্ব ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের উপরও পড়বে। অভিভাবকও দায়ী হবেন, কেন তিনি শিশু-মনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি।

বিভিন্ন গণতন্ত্রের জীবনরীতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তার ফারাক। এই সমস্ত বিচারবিবেচনা করে শিক্ষানীতি ঠিক করা হয়। বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিরোধ সমগ্র সোবিয়েতে শিক্ষার কাঠামো এক—একই পদ্ধতির খানিকটা রকমকমের। আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশুনোর আরম্ভ—চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে রুশ-ভাষাটা শিখতে হবে। তার পরের বছর বিদেশি ভাষা শিখতে হবে একটা—ইংরেজি, ফরাসি বা জার্মান। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রদের বছরে তিরিশ ঘণ্টা শিখতে হবে বরক-শরিফার, পুরানো পাঠ্যবই মেরামত, ইন্সুলের ইলেকট্রিক কাজকর্ম ইত্যাদি হাতের খাটনির ব্যাপারে। পরস্যা ঠাটানোর জন্ত নয়, ছাত্র বাতে কোন কাজ হীন মনে না করে। ইন্সুলের মধ্যেই ছাত্র মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈনিক শ্রম করবে, নিজের কাজ বখাসমস্তব নিজে করবে—এই অভিজ্ঞার। রোমাক্কর অপরাধমূলক বই ছেলেমেয়েদের পড়তে দেওয়া হয় না, সাধারণ সিনেমা-হাউসে ঢুকতে দেওয়া হয় না—ছোটদের জন্ত বিস্তার সিনেমা-থিয়েটার আছে, দলে দলে তারা যায় সেখানে।

ইন্সুলের মধ্যেই বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষণ-ক্ষেত্র আছে, ছাত্রেরা তার কোন একটিতে বোগ দেয়। সাহিত্য, জুগোল, ইতিহাস, জ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা, নাটক, সঙ্গীত, দলিত-কলা, কলাধারা, বেহচ্চী ইত্যাদি। এরমি, রায়স্বায় কলে সন্তর বছর

বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তির সময় ছাত্র কোন এক বৃত্তি সম্পর্কে মন ঠিক করে ফেলেছে। এবং দশ বছরের চর্চার ফলে ঐ সম্পর্কে শিখেছেও অনেক কিছু।

১৯

ব্রাজে সার্কাস দেখতে গিয়েছি। সোবিয়েতের ভুবনখ্যাত সার্কাস—যার কিছু নমুনা এই সেসিন এদেশে দেখিয়ে গেল। সার্কাসের কঁকে কঁকে রাউন্ডেরা এসে দেশপ্রেম ও শান্তির কথা বলে যাচ্ছে। আমেরিকার অন্তঃসম্মান নিয়ে ঠাট্টা-কিন্দ্রপ করছে খুব। নিত্যসেরও ছাড়ছে না। ক'টি রাউন্ড এলো একবার। একজনে বিস্তার কবল জমিয়েছে—তারা তাদা নোট বের করে বন্ধুর দেখাচ্ছে। মোটর কিনবে। বন্ধুরা শিষ্ট চাপড়ে সাবাস দিল। খানিক পরে পুনশ্চ এই রাউন্ড-দলের আবির্ভাব। মোটর কেনবার মায়খটার গলায় নম্বর ঝোলানো—সাধের উপরের এক সংখ্যা। বন্ধুর অভিনন্দন করছে, কিনে ফেলেছে তবে—এই বৃষ্টি তোমার মোটরের নম্বর? উঁহ, এটা হল কিউয়ের নম্বর। অর্থাৎ এর আগে আরও লক্ষাধিক লোক মোটরের জন্ত নাম রেজিষ্ট্রি করে বসে আছে। তাদের হয়ে গেলে তবে এর পালা। চাহিদা অনুযায়ী জিনিষ সরবরাহ হচ্ছে না, তাই নিয়ে ব্যস্তবিদ্রপ।

পরদিন বিপ্রব-মিউজিয়ামে গোলাম। অপর নাম লেনিন-মিউজিয়াম—১৯৩২ অব্দে প্রতিষ্ঠা। লেনিনজীবনের আদর্শ নিদর্শনগুলো অধ্যায়ে অধ্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছে। ভদ্রাতীরের গায়ে শিশু জন্ম—সেই বাড়ির ছবি ও মেডেল। বাবা মা ও পরিজনদের ছবি। বাড়িপ্রস্থ বিপ্রবী—বড় ভাইয়ের কীসি হল জারের হত্যাকাণ্ডের জন্ত, তাঁর ছবি রয়েছে। ইন্সুলের পাঠ্যবইগুলো; সোনার মেডেল পেলেন ভাল পড়াশুনোর জন্ত। কাকান দুনিভার্সিটিতে পড়বার সময় স্তালিনের সঙ্গে পরিচয়—সেখানে বিপ্রবচো জেল। তারপরে নির্বাসন। ফেলসিয়েভে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্স-সোসিয়াটিতে বোগদান। পড়াশুনোর বড় ভাল—টপাটপ পাশ করে যাচ্ছেন। পৌরাগ্রাডে শুণ্ড মার্ক্স সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতিতে সে সব বই পড়া হত, তার পরিপূর্ণ সংগ্রহ। নিজে সেই সময় অনেক মার্কসীর বইয়ের তর্জমা করেছিলেন, তা-ও রয়েছে। পিটার্সবার্গে কন্সুনিষ্ট দল গড়লেন তিনি, কর্মিকদের ইউনিয়নগুলো সম্মিলিত করলেন। তখনকার সহকর্মীদের ছবি।

পিটার্সবার্গ জেলে ১৯৩৩ নম্বরের কামরার চোদ্দ মাস আটক রইলেন। এই কামরার বসে তাঁর অনেক রচনা। দুখ দিয়ে লিখতেন আইনের বইয়ের লাইনের কঁকে কঁকে। আগুনে ধরে সেই লেখা পড়া হত। তার পরে তিন বছর সাইবেরিয়ার এক কুড়ুঘরে নির্বাসন। রেল-লাইন আড়াই শ' মাইল সেখান থেকে। সেখানেও বিস্তার লিখলেন। যে টেবিল-চেয়ার বসে লেখাপড়া করতেন, সাদামাঠা ভারী সেই আসবাবগুলো এতদূরে নিয়ে এসেছে।

প্রথম মার্কসীর কাগজ বের করলেন—সার্কাস। লেখার লেখার আন্তর বেরবে—সেজ্ঞ এই নামকরণ। কাগজকে কেজ করে পাঠের কাজকর্ম চলল। লেনিনের বইও ছাপা হতে দেখতে লাগল, বিপ্রবী লেনিনের নাম বেশবিশেষ ছড়িয়ে গেল।

পার্টীর বিভিন্ন কংগ্রেসের বাবতীর কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপি।  
দাবাখেলার টেবিল—তার তলায় চোরাসোপ্তা খোপ বানিয়ে  
সেখানে এই কাগজপত্র রাখা হত। পুলিশ অনেকবার এসে  
তলতল করে খুঁজেছে। এঁরা তো দাবাখেলার ময় সেই টেবিলের  
মধ্যে এমন বস্তু, বুঝবে তারা কেমন করে?

১৯০৫ অব্দ। বৃহস্পতি নবরাতীর রক্তে জ্বরের অঙ্গন একদিন  
হাড়া হয়ে গেল। সেই ভয়াবহ ছবি দেখুন মিউজিয়ামের দেয়ালে।  
বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে গেল। জ্বরতন্ত্র উৎসবে বাক, জমিদারি  
ধ্বংস হোক—সর্বত্র এই বুলি। পার্টীর তৃতীয় কংগ্রেস হল এই বছরের  
এপ্রিলে। একটা বাড়ির মডেল বানিয়ে রেখেছে—নেতারা নিরীহ  
ভালমানুষ হয়ে সেখানে বসবাস করেন: মাটির নিচে ছাপাখানা, দড়ি  
দিয়ে উঠানামা করতে হয়। আড়াই বছর একাকীকরণে ছাপাখানার  
কাগজকর্ম চলছে, তারপরে পুলিশ ধরে ফেলে। ১৯০৩ অব্দে  
সেনিন যে বাস ব্যবহার করতেন, সেটা রয়েছে।

নানা জারগার শল্ল অত্যাধিন। ব্যারিকেড দিয়ে পথ ঘিরেছে,  
তার ছবি কয়েকটা। দলারলি; মেনশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা  
করল। আয়োজন ব্যর্থ। অনেককে ধরল। দুজন কর্মীর সঙ্গে  
সেনিন কিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। একটুও দমনে নি তিনি;  
বললেন, বুহন্তের প্রেরণ।

জালিনকেও ধরল এই সময়। সাত বাব ধরেছে তাঁকে।  
ছ'বার নির্ধারন দেয়, তার মধ্যে পাঁচ বাব জালিন পালিয়ে বান।

১৯১২ অব্দে সেনিন প্রাগে তৃতীয় কংগ্রেস ডাকলেন।  
বিত্রোহ—সেনা নদীর তীরে কর্মীদের উপর গুলী করা হচ্ছে,  
তার ছবি। প্রাভলা কাগজ বেলস কর্মীদের টাকায়। অনেক  
নির্ধাতন হয়েছে কাগজের উপর, অনেক বার নাম পালাটতে হয়েছে।  
পোলাণ্ড থেকে সেনিন এই কাগজে লিখতেন। কর্মিকরা  
মহোৎসাহে প্রাভলা পড়ছে, তার ছবি।

প্রথমমহামুখ (১৯১৪) বাধল। সেনিন যুদ্ধের বিপক্ষে  
লিখতেন, বিপ্লবের স্বপক্ষে। লিখলেন, মরক্কো যদি জারদের বিরুদ্ধে  
আর ভারত যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে, আমরা তাদের সমর্থন করব।

১৯১৭। কৃষক-কর্মিক এক হয়েছে। এপ্রিল মাসে সেনিন  
পেট্রোগ্রাড কিলেন। সেনিন রিপোর্ট দিলেন (এপ্রিল থিসিস)।  
বহুস্ত লেখা তার কাপি। বেলট্রেশনে সেনিন বহুস্ত করছেন  
(যে, ১৯১৭), সেই বিরাট ছবি। সেনিনের গুভায়কোট,  
লাট্রি, টিনের যে মগটা তিনি ব্যবহার করতেন। নানা রকম  
ছদ্মবেশ ধরতেন বহুস্তপীর মতন, সেই সমস্ত ছবি। বিপ্লবে প্রধান  
নেতৃক সেনিনের। বিপ্লবের পর শান্তি-বোঝা—লাভল বার, জমি  
ভার—জমাজমির বোল আনা মালিক চারী। যে কলমে বোঝা  
লিখলেন, সেটা পরম বড় রেখেছে।

একতলা দেয় এখানে মিউজিয়ামের দোতলায় উঠি।

সমাজতান্ত্রিক নবরাষ্ট্রকে চারিদিক থেকে পিষে মারতে চায়।  
শেষরক্ষার মহানৈতা সেনিন। সেনিনের হত্যার যড়যন্ত্র।  
মন্সভার কর্মীদের মধ্যে বহুস্ত করছেন, একটা মেয়ে  
চার বার গুলী করল। দুটো তার মধ্যে বিঁধল। কোট কুটো  
হয়ে চুকেছিল, সেই কোট রাখা আছে। সর্বপ্রান্ত থেকে উদ্বেগ  
জানিয়ে হাজার হাজার চিঠি আর টেলিগ্রাম আসছে। তিন সপ্তাহ  
পরে সেনিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট—ভাল  
হয়ে গেছেন তিনি।

ক্রেমসিনে সেনিনের পড়ার ঘরের ছবি। বই আর বই।  
দেয়াল-ঝোড়া ম্যাপ! দুটো টেলিফোন। বাতিলন ও বাতি—  
বিদ্রোহের সরবরাহ তখন অত্যন্ত কম। বাইরের লোক এসে  
বসবে পলি-জাঁটা চোয়ান; নিষেধ স্তম্ভ বেতের চোয়ান। ঘুমপান  
নিষেধ—সেনিন ঘুমপান করতেন না। সেনিনের গায়ের শীতের  
কোট, পায়ের বৃত্তুতা, নানা পোশাক। অস্ত্র পাণ্ডুলিপি।

বোগশবার সেনিন বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই ছবি।

অবশেষে আমাদের হৃদয়কে নিয়ে বসাল। সিনেমা-ছবি  
সেখানে। মাত্র কুড়ি মিনিটের ছবি। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ চার  
বছরে একটু আদুট তুলে রেখেছিল। নানা অপ্রত্যাশিত সেনিন এখানে  
ওখানে যাচ্ছেন। ১৯২২ অব্দে তাঁর সর্বশেষ বহুস্ত। জীবন্ত  
সেনিনকে ছবিতে দেখলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেতে পেলাম।

সন্ধ্যার আবার আজ বলসই-খিয়েটোরে। নৃতানাটা আজকে  
—ঘুমন্ত রূপী (Sleeping Beauty)। রাজকন্তার জন্ম হল,  
রাজবাড়িতে আনন্দোৎসব। নানান ধরনের নাচগান। ডাইনি  
এলা, ডাইনিব পাড়ি টেনে নিয়ে আসছে ভরজ্বর রকমের মুখোশ-পরা  
কয়েকটা আজব জানোয়ার। আর সঙ্গী হয়ে আসছে কালো কালো  
লেজওয়ালা এক দলল জীব। রাজকন্তা মায়া বাবে হুঁচ বিঁধে—  
ডাইনি খবরটা জানিয়ে উদ্ধাম নৃত্য নাচতে নাচতে চলে গেল।  
রাজপুরী স্তম্ভিত। তারপরেই এলা দয়াবতী পরী। সে বলে,  
মৃত্যু নয়—হুঁচ বিঁধে রাজকন্তা একশ বছর পড়ে পড়ে ঘুমে।  
আসবে তারপরে রাজপুত্র—চুখন দেবে কস্তার কপোলে। ঘুম  
ভেঙে অমনি পুরীহুজ আগ্রস্ত হবে। রাজা হুকুম দিলেন, রাজবাড়িতে  
হুঁচ নিয়ে আসবে না কেউ কখনো...

নাটের এই হল প্রথম অঙ্ক। রূপকথা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে।  
নৃত্য আর আলোয় আলোয় গল্প বুনো যাচ্ছে। তিন চারশ' এক  
এসে নাচছে এক এক সময়। কী খেলা আলোর! ছিল মনোহর  
ফুলবাগান, রং-বেরঙের ফুল হাসছিল—ডাইনি আসার সঙ্গে  
লাল মেখে আকাশ ঢেকে গেল, চারিদিকে উৎকট বিভৎসতা, যেন দ  
বন্ধ হয়ে আসছে এত বড় প্রেক্ষাগৃহের। [ক্রমশঃ]

## নদী ও সময়

“সদায় ধায় নদীর ঢেউ  
রাখিতে তার পায়ে না কেউ;  
সময় ধায় তাহারি প্রায়;  
কাহানো বুঝে চাহে না, হার।

চলিছে দিন, চলিছে রাত;  
ধরিতে তার কাহার হাত?  
ধরিতে তার, সে পারে ভাই,  
আলস্ত হার শরীরে নাই।

—মনোজ্ঞানন্দ বসু।



## \* বিজ্ঞান বাৰ্তা \*

পঞ্চদশ মিশ্র

একটা সাবান চোখে পড়েছিল—‘প্রমথনাথ রায় ট্রাষ্ট,’ বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার সম্ভারসংগ্ৰহের জন্ত ২ লক্ষ টাকা দান করেছেন। সংবাদটি খুবই আশাএবং—এই দানই ভিত্তি স্থাপন করলো এক মহা সম্ভাবনাপূর্ণ বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরের। বিজ্ঞান গবেষণার জন্ত আবারিক গবেষণা-মন্দিরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি—কারণ নির্দিষ্ট নিয়মমাক্ষিক সময় ব্যয় করে আর যে কাজই হোক না কেন, বিজ্ঞান গবেষণা হয় না। প্রয়োজনবোধে একাকিক্রমে ১০০—১৫০ ঘণ্টাও গবেষককে গবেষণাগারে কাটাতে হতে পারে। কিন্তু সহজে অল্পবিধার কথা ভেবে দেখুন,—গবেষক থাকেন দমলমে আর গবেষণাগার বাদবপুর্বে; বাতায়ন করতেই তাঁর পান্না ৩ ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীর কাছেই গবেষণাগার থাকলে, যে কোন গবেষকই অল্পেই সকাল ৭টায় কাজ শুরু করে, দুপুরে বাড়ীতে আহ্বার করে,—যা ৮-৯টা পর্য্যন্ত কাজ করতে পারেন।

পঞ্চদশ মিশ্র নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আদর্শ বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হতে পারে। কারণ এর দু’টি প্রধান সুবিধা আছে—প্রথমটি এর প্রতিষ্ঠা এক নির্জন শান্ত আশ্রমিক পরিবেশ এবং দ্বিতীয়টি হলো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের উপস্থিতি। এই রাজবেটিক পাওয়া দুধর,—বর্থন পাওয়া গেছে তখন তাই পরিপূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানচাৰ্যের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পড়ে উর্ধ্ব বিশ্বভারতী বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির একদিন যে সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করবে, ভারতের প্রত্যেক বিজ্ঞানকর্মীই এ আশা মনে পোষণ করে। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন তা ‘প্রমথনাথ রায় ট্রাষ্ট’র বিশাল দান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। বছর দুই আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে, নেহেরুজী তাঁর ভাষণে দেশের সর্বত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং আশা করা যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে,—বিজ্ঞানচাৰ্যের পরিচালনায় এক নতুন বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ভারত সরকারের সহযোগিতার কোন অভাব হবে না।

কিছু দিন আগেই বৃহস্পতি গ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার বাৰ্তার কথা আপনাদের পমবেলন করেছিলাম—এবার আবার গ্রহাভর থেকে

নতুন আর এক বেতার বাৰ্তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। ১৯৫০ সালের ৬ই জুন আমেরিকার দৌ-বিভাগের গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানিবৃন্দ সূত্র গ্রহ থেকে প্রচারিত এই বেতার বাৰ্তা ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। ৬ই জুনের কিছুদিন আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সূত্র গ্রহ থেকে প্রেরিত অন্ত্যন্ত দুর্বল এই বেতার তরঙ্গ দৌ-বিভাগীয় গবেষণা-মন্দিরের তিন জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্রবণ এবং বিশ্লেষণ করেন। বিজ্ঞানীজনের নাম স্বাক্ষর টিমোথি পি ম্যাককালক; করনেল এইচ মেয়ার; এবং রাসেল এম স্লোয়ানাকার। তাঁরা একটি ৫০ ফুট রেডিওটেলিস্কোপ এবং বিশেষ ভাবে নিশ্চিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন। প্রায় দশ হাজার মেগাসাইকেল গুয়েভ ব্যাণ্ডে সূত্র গ্রহের এই বেতার তরঙ্গ ধরা পড়েছিল।

এই বেতার তরঙ্গের কারণাকারণ নির্ণয়কল্পে বিজ্ঞানীরা আশ্রাণ চেষ্টা করছেন। গত ২২শে জুন সূত্রগ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল—তাই বিজ্ঞানীরা তাকে নানা ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। স্কোপল এখনও প্রকাশিত হয়নি—তবু আশা করা যায়, এই বেতার তরঙ্গের কিছুটা পরিচয় বিজ্ঞানীদের এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হঠাৎ পাওয়া যেতে পারে।

অল্পবিধাটি কি জানেন? সূত্রগ্রহকে একটি সাদা মেঘ কল্পনের মতো মুড়ে রেখেছে, তাই তাঁর ভেতরে কি আছে না আছে তা টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় না। বাই হোক, দেখা তো গেল না—তাহলে ঐ গ্রহের ভেতর থেকে বেতার তরঙ্গের আমলনানী হলো কি করে? বর্তমানে ঐ গ্রহ বিষয়ে যা তথ্য মাহু্য সূত্রগ্রহ করেছে তাঁর থেকে মোটামুটি বলা যায় সূত্রগ্রহে শ্রেণীর বসবাস অসম্ভব। ঐ গ্রহের উপরিভাগের উত্তাপই প্রায় ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এছাড়াও জানা গিয়েছে, সূত্রগ্রহ উপরিভাগের মেঘে জলীয় বাষ্প অথবা অক্সিজেন নেই। তাহলে সূত্র থেকে কে বেতার বাৰ্তা পাঠান?—জানবার জন্ত আমরা উদ্ভ্রীত হয়ে রইশাম।

একাধারে অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ এই দু’য়ের কাছই এক যন্ত্রের সাহায্যে চলবে। একই যন্ত্র অনায়াসে সূত্রকে আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে এবং প্রয়োজন হলে দূরের বস্তুও আপনাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকবে না।

নিউ জার্সি, এডমাণ্ড সায়াটফিক কর্পোরেশন একটি ছোট পকেট মাইক্রোস্কোপযুক্ত টেলিস্কোপ বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেছেন। আকারে এটি মাত্র একটি ফাউন্টেন পেনের মতো এবং এর দ্বারা সূত্র যে কোন বস্তুকে ৫০ গুণ বড় করে দেখা চলে। দূরের জিনিষকেও এ সূত্র যন্ত্রটি ১০ ভাগের ১ ভাগ কাছে এনে দেবে! এই সূত্র যন্ত্রটি,—বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের যন্ত্রবিজ্ঞানী; গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানী, ও কর্মীদের নানা ভাবে করবেন-সাহায্য। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রাচীক, কাঠ, কাপড় ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্ত এবং উৎপাদন শিল্পের যন্ত্রপাতির কোন দূরবর্তী অঞ্চল দৃষ্টিগোচর করার জন্ত এই যন্ত্রটি বিজ্ঞানকর্মীদের নিকট মনে হয় এক মূল্যবান সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

ভার্তিনিয়ার ফোটি বেলভয়েরের যন্ত্রবিজ্ঞানের গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানিবৃন্দ আলোকমর্মানচিত্র প্রস্তুত এবং জরিপ করার জন্ত এক নতুন ধরনের পাণ্ডা উদ্ভাবন করেছেন, সাধারণ ভাবে এই গাফীটি



চওড়া হলো। ৭ফুট বিশ্বে দু'জন লোক মিলে মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যেই এই ভ্যানগাড়িকে খুলে একে প্রায় ১৪ফুট চাওড়া করে নেওয়া যেতে পারে। একে গুটিয়ে ছোট করে নেবার প্রয়োজন হলেও ঐ একই ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়া যাবে। সম্পূর্ণভাবে খোলা,—চওড়া এই গাড়ীতে জায়গা পাওয়া যাবে প্রায় ২০০ কোয়ার্টার ফুট। ওজনও খুব বেশী নয়—এই সমস্ত কাঠামোটি একটি আড়াই টন ট্রাকের উপর বসান থাকবে। ওজন কম করার জন্য কাঠামোটি বিশেষ ভাবে নির্মিত লোহার দণ্ডের উপর অ্যালুমিনিয়ামের পাত দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। ছাতের এবং দেওয়ালের সংযোগের মাঝে দেওয়া হয়েছে খুব হালকা অথচ শক্ত ধরনের কাঠ। এই গাড়ী চলন্ত সোকান স্থাপনের খুবই উপযোগী। যে কোন মেলায় অথবা বিশেষ জনসমাবেশে আপনি এর সাহায্যে কাপড় খোয়া, চুল কাটা এমন কি রোগ চিকিৎসার জন্য অল্পশ্রমে ডাক্তারখানাও স্থাপন করতে পারবেন। এই গাড়ীর মধ্যে পাঁচ তোলা, এক্সরের ছবি তোলা, এমন কি অপারেশন পর্যন্ত করা চলতে পারে।

### আরনেষ্ট রাবারফোর্ড

বিশ্ববিশিষ্ট ইংরাজ বিজ্ঞানী আরনেষ্ট রাবারফোর্ড ১৮৭১ সালে নিউজিল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং বিজ্ঞানস্নেহ শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি সহকারে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নিউজিল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৮৯৪ সালে ব্যাচিলর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষার জন্য তাঁকে চুবুকের গুণাগুণের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করতে হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে তিনি কেমব্রিজ খ্যাতিনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. জে. টমসনের গবেষণাগারে কাজ আরম্ভ করেন এবং এখানে তিন বছর থাকার পর বিজ্ঞানী টমসনের সুপারিশ অনুযায়ী, মনট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ পান। এখানেই রাবারফোর্ড, বিজ্ঞানী শির্ডির সঙ্গে একযোগে তেজস্ক্রিয় পরমাণুবিষয়ক গবেষণা সমূহ সম্পন্ন করেছিলেন।

১৯০৭ সালে অধ্যাপক রাবারফোর্ড ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে

যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে জলের মধ্যে সাবমেরিনের অবস্থিতি নির্ণয়কল্পেও তিনি, তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্তা সমাধানে সহায়তা করেন। ১৯১১ সালে রাবারফোর্ড আলফা কণার দ্বারা আঘাত করে নাইট্রোজেনকে কৃত্রিম উপায়ে ভেঙে হাইড্রোজেন পান।

ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার মাত্র ১ বছর পরেই ১৯০৮ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে অতুলনীয় অবদানের জন্য অধ্যাপক আরনেষ্ট রাবারফোর্ডকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিদারণ এবং তেজস্ক্রিয় বস্তু বিষয়ক গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞানী রাবারফোর্ডকে এই মহাসম্মান দেওয়া হয়। পূর্বে পরমাণুই মৌলিক পদার্থের সর্বশেষ কণারূপে বিবেচিত হতো, কিন্তু রাবারফোর্ডের গবেষণার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, পরমাণু অবিনাশ্য অথবা পদার্থের সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম কণা নয়, এটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অল্প কণা সমূহের সমন্বয়ে গঠিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহের বেলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই কণাগুলির সমন্বয় দুর্বল এবং অস্থায়ী হওয়ায় জন্ম তাদের পরমাণু ভার পরিভাগ করে অল্প কয়েক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর দ্বারা রূপ পরিগ্রহণ করতে চেষ্টা করে। তাঁর গবেষণার দ্বারাই পরমাণু কাঠামোর স্বরূপ উন্মোচিত হলো। ১৯১৯ সালে বিজ্ঞানী রাবারফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞান ক্যাডেডিস্ অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনের পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত হন এবং একসঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রয়েল ইনস্টিটিউশন এই উভয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

বিজ্ঞানী রাবারফোর্ডকে নোবেল পুরস্কার ছাড়া আরও নান্য ভাবে দেশ-বিদেশ থেকে সম্মানিত করা হয়। ১৯০৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি ব্যারনের পদমর্যাদা লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ১৯শে অক্টোবর ৬৬ বছর বয়সে কেমব্রিজে এই মহাবিজ্ঞানী লোকান্তর ঘটে।

### কোন মাসে কি খেতে হয় ?

পাঠক-সাঠিকার স্বরণে আসতে পারে, কিছু কাল পূর্বে আমরা পূর্ব-বাংলার একটি প্রচলিত ছড়া মাসিক বহুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করি। সেই ছড়ার কোন মাসে কি খেতে হয় তাইই তালিকা আমরা পড়েছি। নিম্নে উদ্ধৃত ছড়াটি পশ্চিম-বাংলার অতি পরিচিত, বিশেষতঃ মহিলা-মহলে। ছড়াটি এই—

চৈত্রে জীকল মিঠা খেয়েছিলেন রায় ;  
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোল মাছে আম ।  
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আবারে কাঁটাল ;  
শ্রাবণেতে ধৈর্য, ভাত্রে পাকা তাল ।  
আশ্বিনেতে নারিকেল, কার্তিকেতে ওল ;  
অগ্রহাণে নব-অন্ন চিঙ্গড়ি মাছের কোল ।  
পৌষ মাসে মূল্য-মুড়ি খেতে লাগে মিঠা ;  
ঘন আউটা হুয়ের সাথে বাসি পোড়া পিঠা ।  
মাঘেতে মকর মিঠা তেলে ভাজা নীম ;  
ফালগুনে বিগুণ মিঠা বার্তাকুতে নিম ।



নীলকণ্ঠ

দশ

কীদার অন্তরালে কি ষট্কে পদ। সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে তা' দেখাতে গিয়ে একটা ভয় কিছুতেই বাচ্ছে না। কেবলি মনে আছে, ইহুত এই সব কথা শাসনকর্তাদের কানে গেলে তাঁরা হঠাৎ বলে দিতে পারেন : 'টলিউডে যখন এত গোলমাল তখন ভারতবর্ষে কিয়দ গুলিই বন্ধ করে দাও! বিচিত্র নয়; এদেশটা ভারতবর্ষ, এদেশের ঐক্যবাহিনী নাম জহরলাল নেহেরু। শুধু জহরলাল তবু একরকম। জহরলালের সঙ্গে পায়ালার জুটেই সর্বনাশ করছে। জহরলাল-জালালরা কাপড়ের দোকান করলে ঠিক আছে; জহরলাল-জালালরা কাপড়ের দোকান না চালিয়ে দেশ চালাতে গেলেই ভয়।

এদের গিয়ে যদি বলেন : সেন্দূসে পাওরা গেছে দেশে গুত বছরে ক্রাইম বেড়ে গেছে সাম্প্রতিক,—তাহলে জহরলাল-জালালরা তার জবাবে বলেন : সেন্দূস নেওয়া বন্ধ করে দাও যথেকে। যদি এদের বলেন : জহরলাল বলেছিলেন দেশের রক্তের গেলে কোলোকারীনের ধরে ধরে সবচেয়ে কাছের শাসনাগ্রে স্থলিয়ে দেবেন, তার কী হল? দশ বছর পরে আজও একজন ক্রাইম-বিশেষজ্ঞ ল্যান্সপোর্টে কীসী বেতে চাই না ত? সঙ্গে সঙ্গে জহরলাল-পায়ালারদের জবাব পাবেন : সে এক কাজ করা যাক; ভারতবর্ষের রাজ্যের পার্কে যেখানে ল্যান্সপোর্ট আছে সব তুলে নেওয়া যাক!

ভক্তার ডেকে অগ্রথ সারানো নয়; কবীকে গুড়িয়ে ঝালো না। ছায়াচিত্রের বিলুপ্ত কোনও জেহাদ ঘোষণা কোনও দিনই

কাঙ্ক্ষার কর্তব্য নয়; অজ্ঞ বা প্রত্যাহ কখনই নয়। ছবি এখনও শিল্পের পর্দার ওঠেনি; যেদিন শিল্পের শিল্পমোহর পাবে সে সেদিন সাহিত্য-সঙ্গীত-অঙ্কন সমস্ত শিল্পের সম্মিলিত প্রভাবের চেয়েও তার একার বস্তব্যে শুধু বাহু নয়, জোরও থাকবে অনেক বেশি। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় একশো বছরে যা না করতে পারে, একজন ভালো পরিচালক একটা ছবিতে ষট্কেতে পারে সেই অর্থটন। তেমন ছবি দেশে আনতে পারে সামাজিক বিপ্লব। গান শুনতে, বই পড়তে, জীকা বুঝতেও ভালোমত দরকার হয়; ছবি দেখতে এসে শুধু চোখ আর কান খোলা রাখলেই হলো! না রাখলেও তেমন ছবি অন্ধ ও বধির সমাজের চোখ এবং কান দুইই খুলে দেবার ক্ষমতা রাখে। এখনও ছায়াবাজি করে বাজি বলেই এসব কথা ভারতে পারছি না; ছায়াবাজির কোনও সম্ভাবনা নেই; ছায়াচিত্রের আছে। ছায়া-চিত্রের মধ্যে গোপন আছে বিচিত্র সম্ভাবনা; বিশুল ভবিষ্যৎ; বিপ্লবের স্থূলিক।

ছবি দেখতে হলে চোখ-কান খোলা রাখলেই চলে; অশিক্ষিত লোকেরও ছবি দেখতে বাধা নেই। কিন্তু অশিক্ষিত লোকের ছবি দেখতে নিশ্চয়ই আছে। এই 'উন্টা বুয়লি রাম' রাজ্যের দেশে সবট উন্টা। এখানে যারা ছবি দেখতে আসে তাদের কান্নার চোখ-কান থাকলেও, যারা ছবি তৈরী করে তাদের চোখ-কান-বিবেক বুদ্ধি-বিতা কিছুই বালাই নেই। চোখের বদলে একজোড়া গগলুস; কানের জায়গায় কাটার দাগ; বিবেক নেই—আছে শুধু পেট; বুদ্ধির পরিবর্তে একজোড়া গিঃ এবং বিতা বলতে চুরি বিতা মহা বিতা যদি না পড়ে ধরা!

এদেশের রাজনীতিতে যা সব দুর্নীতিতেই তাই। যেমন একদিন জেলে গিয়েছিলো মাত্র এই গোরব সম্বল করে আজ যারা দেশের গদীতে আসীন, তারা গদীতে বসে অন্ধদের জেলে পাঠাতে বিন্দুমাত্র ঘিণা করেন না; ঠিক তেমনি ব্যক্তার অধিকারী ছিলো যারা একদিন তারা আজ কিং-প্রোভিউয়ার হয়ে পৃথিবীর বক্তক জানী এবং গুণীকে মনে করছে অনধিকারী। পরন্তুয়ার একুশ বার নিষ্ক্রিয় করেছিলেন মহা ভারতবর্ষ; বারফোশের লোকেরা একুশ নয়, দেশের বিবেক-বিতা, বুদ্ধি, বাহ্য, কুচি সৌন্দর্য প্রভৃতির গুণের বাইশ কোশ দেবার কান্নে আজ অগ্রণী। তাদের ঠেকার কে?

## এগারো

বালা দেশের একজন গোপাল ভাঁড় একবার বলেন যে তিনি নাকি চীনা ভাষায় কথা বলতে পারেন; সেই সময় কোলকাতায় চীনা সাম্প্রতিক দল উপস্থিত থাকায় সেই দলেরই একজন চৈনিকের মাঝে ভাঁড়কে তার চীনা সলাশের সাক্ষা প্রমাণ দিতে বলা হলো। সকলকে অবাক করে সেই বাঙালী গোপাল ভাঁড় সত্যি সত্যি যেন কি সব আউড় গোলা বা হঠাৎ কানে যেন চীনা ভাষার মতই শোনায়! চৈনিক প্রতিিনিধি কিন্তু মিটিমিটি হাসে; অথচ যথেষ্ট কিছু বলে না। সবাই মিলে তাকে চেপে ধরলো এই বলে যে, তাকে বলতেই হবে যে গোপাল ভাঁড় বা বললো তা' সত্যিই চৈনিক না বাঙালী ভাষাতত্ত্ববিদের মতই কোনও গুল দেবার প্রচেষ্টা? অবশেষে বললো সেই চৈনিক প্রতিিনিধি; খোলাসা করেই বললো তার চৈনিক হাসির রহস্য কি! সে বললো, ভুললোকা যা বলেছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ চৈনিক ঘটে ছিল।

অর্থ হচ্ছে না; কোন সম্পূর্ণ সেটেল পাওয়া যাচ্ছে না বার মানে হয়। বাঙালী ভাঁড়কে চেপে ধরতে সে স্বীকার করলো যে বেশিক্রম ট্রাট ছুড়ে বস্তু জুতার দোকান আছে চীনাদের সেই সব দোকানের নামগুলোই সে পর পর বলে গেছে।

বাংলা ছবিও তাই। পর পর তোলা শটে চিত্র হয় বটে কিন্তু সব ছড়িয়ে আজও চলচ্চিত্র হয় না কিছুতেই। চলচ্চিত্র প্রযোজনায় ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যেই ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু ব্যাপার ছবি তোলার ক্ষেত্রে কি সংখ্যা কি গুণের দিক থেকে ভারতবর্ষ আজও অধিতীয়। আমাদের কোনও ছবি বিদেশে দেখাবার জন্তে নিয়ে গেলে আমরা উল্লসিত হই; কিন্তু এ আমাদের অকারণ পুলক; কারণ আমরা জানি না বলেই উল্লসিত হই; জানলে লজ্জিত হতাম। বিদেশের লোক আমাদের ছবি দেখার ভালো ছবি বলে নয়; ভারতীয় ছবি তারা দেখায় এই জন্তে যে, ঐতিহাসিক কালেও যে পৃথিবীতে চলচ্চিত্র নামক বস্তুর অস্তিত্ব ছিলো তারই প্রমাণ দিতে। এ আমাদের গৌরব নয়; এ আমাদের দ্রাবি।

ভারতবর্ষ যে আজও ছবির মত ছবি তৈরি হয় না, তার কারণ চলচ্চিত্র এখানে আজও ব্যবসা নয়; বরং মতো বা ফটিকার মতো বাজী ধরার ব্যাপার। এ্যাডভেঞ্চার নয় মিস এ্যাডভেঞ্চার! courage নয় মিস ক্যারেন্স। সবাক চিত্রর নামে 'অবাক জলপান'!

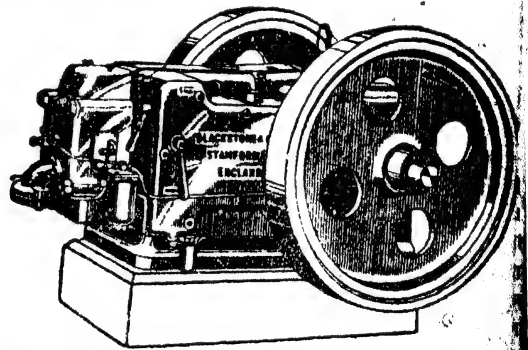
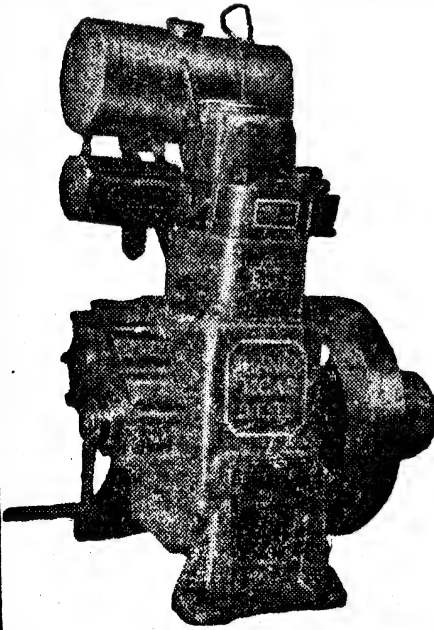
ভারতবর্ষের মাটিতে যে চলচ্চিত্রের চারা জন্মেই মরে বার তার জন্তে দোষ মাটির নয়; জল-হাওয়ার নয়; দোষ মানুষের।

চলচ্চিত্রের কারখানার বার কাজ করে তারা একে মনে করে মজা মারবার জায়গা। কর্মী বারা তারা এখানে কাজ পায় না; অপকর্ম করবার জন্তে বারা এখানে আসে তারাই এখানে বাজায় করে। মদের সঙ্গে মেয়েদের নিয়ে আমাদের রঙ্গপন্নী হচ্ছে টলিউড। নশাবতীর সত্য নয়; শেষ নয় কড়ি অবতারাে। দলের পরে আছে একাদশ। কড়ির পরেও ভেঙে অবতারাে। তারাই চলচ্চিত্র পরিচালক; প্রযোজক; পরিবেশক; প্রদর্শক এবং দর্শক।

### বারো

ইথেল ম্যানিন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছেলেমাছরী **Confessions & Impressions**-এ বলেছেন: Men like good food, good clothes & women who are not good. কিন্তু-এর বারা ভাগ্যবিধাতা, তারাও ভালো ছবি করতে আসে না; তারা চায় ভালো খাবার; ভালো পরবার; এবং সেই সব মেয়ের সঙ্গ বারা ভালো নয়। তাই ভালো ছবি এখানে হয় না; ভালো মেয়েরাও এখানে ভালো থাকে না; মন্দ মেয়েদের জন্তেই ভালো রোসের ব্যবস্থা।

সেই সব মেয়েরা বারা প্রথম নামতে আসে ছবিতে, তারা পরে অন্তরালে কি ঘটছে, পুরো না জানলেও জানে যে এখানে মেয়েদের মান বজায় রেখে বড়ো হওয়া বড়ো লজ্জা। তবুও তারা বলে: আমি যদি ভালো থাকি, আমার মন্য করবে কে? কিন্তু কখনোই হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে সবাই ভালো; মানুষ অথবা মেয়েমাছরী



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শির ও কৃষিকাষা দেশের অন্ন ও প্রাণ এ আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেড়ে নিন। **লিট্টার, ব্রাকটো ডিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং মোট, তান্ডল ডিজেল ইঞ্জিন, তান্ডল পাম্পিং মোট** বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস:—

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কো**

১৩৮ নং ক্যামিং স্ট্রিট, দিল্লী কলিকাতা—১

ফোন ১—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—ঈম ইঞ্জিন, বালার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডার্নামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকে।

মশ হয় নিজের ইচ্ছে নয়, পেটের দ্বারা ! পৃথিবীতে পাশ একটাই ;  
লাজিয়া । Poverty is Crime ! মধ্যযুগে জীবন তাই আগা-  
পোড়া উত্তরভারতের Crime & Punishment !

সব জায়গাতেই যেমন জাতভেদ আছে ; আগে যেমন ব্রাহ্মণ-শূদ্র  
ছিলো, আজকে বড় আর ছোট লোক, ধনী আর নির্ধন ; তেমনি  
বজ্রাতদের মধ্যেও আছে জাতভেদ । ফিখা লাইনে কান্নার নজর  
কেবল মাত্র Extra-দের দিকে ; কান্নার Extra-Ordinary-দের  
ওপরই শুধু ; কান্নার Extra থেকে Extra-Ordinary কিছুতেই  
আপত্তি নেই । তাঁরাই এলাইনের অবতারণা ।

যারা ভিটিম হয়ে আসে, তারাও জাতে আলাদা-আলাদা ।  
Extra-র রোলের জন্তে যারা আসে, তারাও জানে আলাদা-  
অথবা পরত ; 'বলি' তাদের হতেই হবে । আর যারা আসে, বড়ো  
দর থেকে তারা আসে গ্রাম্যদের জন্তে, শিল্পের জন্তে, কিছুতেই  
তাদের কিছু এসে যায় না । শুধু চাঁপপুরের মেয়েমানুষেরা টলিউডে  
এসে ভেবে অবাক হয় ; অবাক হয়ে ভাবে : চাঁপপুর থেকে নিউ  
আলিপুর আর এমন কী দূর ?

পেটের দ্বারা এখানে যারা আসে, তাদের জন্তে দুঃখ হয় কিন্তু  
লজা হয় না । দুঃখ হয়, কারণ পেটের দ্বারা যারা আসে, তাদের  
কাছে বা পাবার তা আদার করে নিয়ে তাদের দিয়ে বিশেষ কিছু  
আর হবে না জানিয়ে দেওয়াই এখনকার বৈশিষ্ট্য ; তাই তাদের  
জাত বার, কিন্তু পেট ভরে না । কিন্তু তাদের স্বামীসন্তানসংসার  
সব আছে এবং বাকি বলে সন্তিকারের অভাব তা নেই, তারা কোন  
আকর্ষণে এখানে আসে, বোঝা শক্ত ; বোঝানো দুঃখ । শুধু  
এখানেই শেষ নয় ; স্বামীর এখন স্ত্রী ফিল্মটার হলে খুশী হয় ;  
হুসিত হয় না । বেসব মেয়েরা কিন্তু করতে আসে, তারা সংসার  
না চাইলেও একটি স্বামী চায় । স্বামীর প্রয়োজন হয় অপরিহার্য ;  
প্রয়োজন অপরিহার্য হয় তার কারণ এখানে বেনাট মেয়েরা নাচতে  
আসে, তা বোমটার আড়ালেই জমে ভালো । স্বামীরও চায় তাদের  
স্ত্রীরা ফিল্মটার হ'ক ; চায় তার কারণ তাতে স্বামীর কিছু না করে  
অথবা নামেমাত্র কিছু করেই Comfort-এ বাস করা চলে । স্বামীর  
একটা রোজগারে আজকের কলকাতার ভালো বাসা অসম্ভব ;  
তাই স্ত্রীকে পর্দার অভিনয় করতে হয় ভালোবাসার ; ভালো বাসার  
জন্তে সেলামি বোগাতে গিয়ে একে-ওকে-তাকে ভালোবাসার আক্কেল  
সেলামি হয় অবশ্যতঃ ।

### তেরো

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হলেও প্রসঙ্গান্তরে যেতে হচ্ছে অতঃপর ।  
এ্যামেচার থিয়েটার বসে আরেক উৎপাত কলকাতাকে পেয়ে বসেছে  
বিত্তীয় মহাহুঙ্কার পর থেকে । সৌধীন অভিনয়ের আসর আগেও  
ছিলো ; কিন্তু আজকের এ্যামেচার থিয়েটার সে বস্তু নয় । সখের  
স্বপ্ন ; সখের অভিনয় চলে এখানে ; অস্বপ্নের মহড়া । এ্যামেচার  
থিয়েটার শুনে প্রথমতঃ হাস্যস্বরণ করা সহজ নয় ; কারণ এখানে  
প্রোকেন্ডানাল থিয়েটারেই ত'বে অভিনয় হয় তা অন্ততঃ এ্যামেচারিশ ।  
তাই এসেছে এ্যামেচার থিয়েটারের আলাদা অস্তিত্ব বাহ্যিক হাজ ।  
এখন অভিনেতা বরাই এ্যামেচার । কিন্তু সে কথা এখন থাক ।

এই সৌধীন অভিনয়ের আসরে গ্রীষ্মকম নেই ; আছে ডার্ককম ।  
সেখানে আসে কতগুলি খেতে-না-পাওয়া হাফ-গেরব্ব মেয়ে । এই  
সব মেয়েরা না ঘরের না বাইরের । এরা সেই : 'ঘাটেও নছে,  
পারেও নছে' যে জন আছে মাথানো, সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয়  
তারে' । এরাও সন্ধ্যা হতে না হতেই ভানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে  
বেরিয়ে পড়ে ধর্মতলায়, বেটিক স্ট্রীটে, সেটাল এভিনিউ ধরে,  
শোয়ালায়, গুয়েলিংটন কোয়ারে, কোথায় নয় ! অস্থিরসার কণ  
তলু এরা আস্তে আস্তে হাটে সন্ধ্যাজনক পদক্ষেপে নয়, নিঃসন্দেহ  
অপেক্ষায় : 'সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে' !

এদেরই মধ্যে যাদের জৌলুয বংকিঞ্চিৎ বেশি ; যাদের চক্ষু-  
লজ্জার বদলে চোখে গগলস্ গুঠে রাত হলে তবুই, তারা পাখে না  
বাড়ির থেকে সৌধীন থিয়েটারে রিসার্চাল দিতে যায় ; এই ভাবে যে  
'যাত্রা' আরম্ভ তা শেষ হয় রিক্স অথবা গাড়ীতে হোটেলের কেবিনে ;  
ক' ঘটীর আমাদের জন্তে ভাড়া দেওয়া Empty room-এ, গোপন  
চিকিৎসালয়ে ; আন সাকসেসফুল এবং ; অশ্রুত্ব্যুত । পাবলিক  
সেপ অথবা গভর্নমেন্ট সেপার কোনটাই এখানে এখনও উত্তম-দণ্ড নয় ।

ম্যাসাজ হোম আইনের জোরে বন্ধ হয়েছে ; কিন্তু কোন আইনে  
আপাত নিরীহ এই সব অভিনয়ের আসর বন্ধ হবে ? এগুলি যে কুষ্টি,  
সঙ্কতি, শিল্পচর্চায় বাহন । তাই আইন বত কড়া আইনের কীক  
ততই মিটে । মিটে-কড়া তামাকের মতই এর গন্ধে তুরতুর করছে  
আজকের Evening in Calcutta, বেকলকাতায় অতি স্বল্প  
সংখ্যক লোক স্বপ্ন দেখে বাটারগাইয়ের ; আর অসংখ্য লোক দুঃস্বপ্ন  
দেখে ব্রেড এবং বাটারের । আসল কথা আইন বতই কড়া হ'ক ;  
হাতকড়া হ'ক বতই ভয়ের, পেটে খেতে এবং পরতে কাপড় না পেলে  
দুর্নীতি দূর হয় না ; আগ্রহ হয় না নীতিবোধ । বেসব মেয়েরা  
এই ভাবে 'বলি' হতে বাধ্য হয়, তারা সখের জন্তেও নয়, স্রবের জন্তেও  
নয়, বাধ্য হয় পরসার জন্তে । সেই পরসার বদলে নদী পরসার চালু  
হতে পারে ; তাতে নতুন সমাজের পত্তন হয় না । পুরানো অথবা  
নদী পরসার বতকণ না সকলের হাতে আসছে, ততক্ষণ এ-পাশ বন্ধ  
হবার নয় ।

ম্যাসাজ হোমের মেয়েরা যেমন জানে যে সেখানে কোনও গর্দভই  
ম্যাসাজ করতে যায় না ; তেমনি এই সব সৌধীন রঙ্গমঞ্চের যারা  
রিসার্চাল দিতে আসে সেই সব মেয়েরা জানে তাদের কিসের জন্তে  
নিয়ে আসা । তাই তারা রিসার্চালের পরেই বাড়ী পৌঁছে দেবার  
লোক কে তা জানে । শুধু বাস মাথে বিলাতালো । এক টাকার  
কমে সে যাবে না । অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্ববর্তি বাসো আনার বেশি  
উঠবে না । অতঃপর বিলাতালো রাজি হয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই  
বলে : ঠা ! বারো আনাই হোপা ; লেগিন পর্দা নেই লাগার গা ।  
অতঃপর এক টাকাই দিতে হয় । পর্দা না দিলে পর্দার অন্তরালে  
নাটক জমবে কখন ?

### চৌদ্দ

এই সৌধীন রঙ্গমঞ্চেরই বিকল্প হচ্ছে আজকের জলাসা, যার  
আরেক নাম দেখা যেতে পারে মঞ্চরঙ্গ । পুলিশের হেড  
কোয়ার্টার্স লালবাজার, ম্যালেসিয়ার ডিপো হচ্ছে মফস্বলের  
কুচুপানাপুকুর ; পাগলোর—কাকে ; সাহিত্যের—কলেজ স্ট্রীট ;

আর বজাতির পীঠস্থান হচ্ছে বারারোরা পূজামণ্ডপের এই সব জলসামগ্রি। রক-বগা ছেলেদের ওপর নজর পড়েছে পুলিশের, দরকার ছিলো না। কারণ জাহাঙ্গীর অভাবে ল্যাট বাড়ি থেকে রক আপনি বিদায় নিচ্ছে, রক এমনি উঠে বাচ্ছে, এমনি উঠে বাবেও। কিন্তু নরক বাড়ছে, নরক বাড়বে। এই সব নাচ গানের জলসার সেই সব নরক গুলজার। ম্যাসাজ হোমে যেমন সায়েন্টিক ম্যাসাজের জন্তে কেউ যেত না, এ্যামেচার থিয়েটার যেমন থিয়েটারের জন্তে নয়, কলকাতার Bār গুলি যেমন বেশির ভাগই বায়নারী সংগ্রহের ওয়েটিক্রম মাত্র, ঠিক তেমনি এই সব বারারোরা পূজা পূজার জন্তে নরক, জলসাগুলি নয় নাচগানের জন্তে। এই সব জলসার আরোজন 'দান্য'দের সঙ্গে 'দিদি'-দের দেখা হওয়ার প্রয়োজনই।

তাই, দক্ষিণ-কলকাতার যেখানে একটা বড়ো পূজার আরোজন হচ্ছে যেখানে এর অলিতে গলিতে সার্বজনীন পূজার লাল শালু, শুধু দুর্গাপূজার নয়, সরস্বতী, কালী, এমন কি বিশ্বকর্মা পূজাও ক্রমশঃ বিশ্ব-অকর্মাদের কুশার সার্বজনীন পূজার রূপান্তরিত হলো বলে। সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীর পাঁচালীই এখনও শুধু বাকী।

তাই, এই সব পূজার সাবেক কালের মূর্তি আজকে অচল! আজকের দুর্গা-মূর্তি দেখে অনেককণ ভাবতে হয়, ইনি মা দুর্গা? না,—দুর্গাবাদী যেটো? দশচক্রে ভগবান ভূত নয় আর, দেশের চক্রান্তে ভগবতী অচ্যুত! এই সব পূজার যন্ত্রিতে পুরোহিত জেক বোধন নয়, কিছুটাই, কালোবাজারী অথবা কংগ্রেসী কাউকে দিয়ে লাড়বর উদ্বোধন। মন্ত্রের বলে মাইকে পান, এই ছুনিয়ার বাবু সবি হয়। সব সত্যি! সেদিনের মতো আজও পূজা তিন দিন, কিন্তু ভাসান্ সাত দিন! এ দুর্গা প্রতিমার ভাসান্ নয় যে, এ হচ্ছে জেমিনীর ভাসান্—সবটাই Show। কথা তাও নয়, এ যোগ্য হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক অবিভীয় পার্শ্বার্মান।

বাসের উচিত চীরা করে মার দেওয়া, তাদেরই আমরা চীরা দিই ভরে। আজকের ভারতবর্ষে ভয়ের যে শেষ নেই! কালো-বাজারীর ভয় বাটপাড়কে, কংগ্রেসীর ভয় ইলেকশনকে, খবর কাগজের ভয় বিজ্ঞাপনকে, ভয়লোকের ভয় শুণাক,—যে কুস্তকর্ষর অকালে নিজা ভয় করেছে ভয়লোকবরাই,—গান্ধার্যিক দাঙ্গার, আর সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে।

### পালেনো

মাসিক বসুমতীর পাতার 'অন্ত ও প্রত্যাহ' পড়তে-পড়তে কোনও কোনও পাঠক ইতোমধ্যেই বিচলিত হয়েছেন; প্রশ্ন করেছেন : আসল জাহাঙ্গীর এতে কোনও কাজ হবে কি না কে জানে? তার জন্তে চিন্তা নেই। কারণ আসল জাহাঙ্গীর 'টিসিউড' নয়। আসল জাহাঙ্গীর মালিক হচ্ছেন আপনাবাই। আপনাবাই বিচলিত হলোই অস্ত্রারতনে যা পড়বে। আপনাবাই যদি প্রতিবাদ করেন তবেই

লেখার কাজ কাজের লেখা হবে উঠবে। কারণ 'অন্ত ও প্রত্যাহ' পূজা নয় : উপভাস নয়; নেহাৎই রম্য রচনা! এর উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু সার্থকতা আছে। সে সার্থকতা, আপনাবাই যদি বিচলিত হন তবেই সার্থক। কারণ এ লেখার উদ্দেশ্য আরম্ভ বিতরণে অন্তর্নিহিত নয়; এলেখার সার্থকতা উন্নততা বিতাড়নই!

সমাজের বহু অঙ্গ আজ লিক্ করছে তা' পবলিক প্রোটেষ্টের অভাবেই। 'কেন এমন হবে?'—এ জিজ্ঞাসা নেই বলেই এর জবাবও নেই। লেখার বাজারে চালু কাগজ বা ছাপে তাই লেখা : নামকরা প্রকাশক বা বার করেন তাই বই : লাইব্রেরীতে যে বই রাখা হয় তাই পাঠ্য। সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও নেই, সমালোচনাও অসম্ভব। সমালোচনা অসম্ভব, কারণ সব কাগজেরই মুখবন্ধ বিজ্ঞাপনে। সিনেমার বেলাতেও তাই। ছবির সমালোচনা আরও যে কারণে অসম্ভব, সে শুধু বিজ্ঞাপন নয়, বাংলা ছবি এখনও কোনও শিক্ষিত বাঙালী বাধ্য না হলে দেখে না; আলোচনার অব্যোধ্য মনে করে; সমালোচনা করা পূরুর কথা।

এরই বিরুদ্ধে এখন কেউ কিছু বলে তখন আপনাবাই, 'বাং, বেশ লিখেছে', এই বলেই আপনাবাদের কর্তব্য শেষ করেন। বাজে ছবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না; কখনও বলেন না যে এমনটা হওয়া উচিত নয়; বরং উল্টোটাই করেন। যে-ছবি চলা উচিত নয় সেই ছবি সপ্তাহের পর সপ্তাহ সপরিবারে দেখে দেখে রক্তজরতী হবার পর জানতে চান : এমন ছবি জরুলোকে দেখে কেমন করে?

আপনাবাই ভাবেন কী হবে প্রতিবাদ করে? কে ওনবে আপনাবাদের কথা? তার কলে প্রবোজক নিশ্চিত হয়; আমরা বতই চাংকার করি ততই তারা Box office-record দেখিয়ে নিরস্ত করে। টাকা বোঝে প্রবোজক; art বোঝে না। তাই যে ছবির রক্তজরতী হয় সেই পথিচালকেরই বিরুদ্ধেজরতী। বই সাত দিনে সঞ্চরণ হলে তবেই ভালো বই-বখন তখন তার জন্তে দায়ী কে? লেখক? প্রকাশক? না পাঠক? ঠক কে? ঠক বাছতে গী কাজে কাজেই উজাড়।

সনাতন ভারতবর্ষের বানী ছিলো : সত্যম্। শিবম্। ব্রহ্মস্বম্। কংগ্রেসী ভারতবর্ষের সোপান হচ্ছে; অশিব। অসত্য। অস্বপন। এর বিরুদ্ধে একজনদেরও বক্তব্য শোনা গেলে এই মাটিতেই সোনা কলত। একে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে নিয়েছেন বলেই যিথো নবর বেচে খবর কাগজের, অব্যোধ্য লোকের প্রোগ্রামের আরোজর করে আকাশবাণীর, বাজে লেখার তেজাল সঞ্চরণ করে বলে পুস্তক প্রকাশকের, এক লেখার অব্যোধ্য ছবিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখাতে পারার আনন্দে টলিউডের জরবারা অব্যাহত।

এরই কলে বাংলার স্থপতিচালক নেই একজনও। shoe-পরিচালক আছে;—বাটা। সেই বাটার জুতো বাসের প্রাণ্য তাদের নিজে জয়মালা। আপনাবাই 'ত' ভালো ছবির পয়স শক; চম প্রতিবন্ধক।

[কলকাতা]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]



## ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকের ফলাফল

পনের দিন ধরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করে স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে মোটামুটি এবারের অলিম্পিকের ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবারের অলিম্পিকে সোভিয়েট রাশিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে।

### এ্যাথলেটিক্স

১০০ মিটার—রুশ পার্ভার দৌড়ে আমেরিকার প্রায় একচেটিয়া অধিকার। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী বব মরো এবারের অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড করবেন, এটাই অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রবল বাতাসের প্রতিবন্ধকতার তা সম্ভব হয়নি। মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে এবারেও অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনেকেই আশা করেছিলেন মার্লিন ম্যাথুজ হবে প্রথম। যেটি কাথবার্ট প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পুরুষ—১ম—বব মরো (ইউ.এস.এ) ১০'৫ সেকেন্ড। ২য়—থানে বেকার (ইউ.এস.এ) ১০'৮ সেকেন্ড। ৩য়—হেক হোগান (অস্ট্রেলিয়া) ১০'৬ সেকেন্ড। ৪র্থ—ইরা হুর্ডিসন ১০'৮ সেকেন্ড।

মহিলা—১ম—বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া) ১১'৫ সেকেন্ড। ২য়—ক্রিস্টাভানিক (জার্মানি) ১১'৭ সেকেন্ড। ৩য়—মার্লিন ম্যাথুজ (অস্ট্রেলিয়া) ১১'৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—ইদাবেলি ডেনিয়ল (আমেরিকা)।

২০০ মিটার—বব মরো দু'শো মিটারে নতুন রেকর্ডে জেমি হরলের রেকর্ড ত্রান হয়ে গেছে। দু'শো মিটারেই আমেরিকার প্রজ্ঞরকার। মেয়েদের দু'শো মিটার দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য। বেটি কাথবার্ট দু'শো মিটারেও প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

পুরুষ—বব মরো (ইউ.এস.এ) ২০'৬ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—এডিও ট্যানকিন্ড (ইউ.এস.এ) ২০'৭ সেকেন্ড। ৩য়—থানে বেকার (ইউ.এস.এ) ২০'৯ সেকেন্ড। ৪র্থ—মাইকেল হুর্ডিসন (হিউস্টন) ২১'০ সেকেন্ড।

৪০০ মিটার—এবারের দৌড়ের ক্লাসিক খানিকটা অপ্রত্যাশিত। হারেকর্ড সৃষ্টিকারী সোভিট প্রথম স্থান অধিকার করবেন এ ন সুনিশ্চিত। আমেরিকার এক অপ্রত্যাশিত তরুণ ছাত্র চার্লস হুইটন অধিকার করেছেন খেঁড়িল।

১ম—চার্লস হুইটন (ইউ.এস.এ) ৪'৭'৭ সেকেন্ড। ২য়—কল

হাস (জার্মানি) ৪'৬'৮ সেকেন্ড। ৩য়—আর্নিস্টান ইগনটিয়েভ (রাশিয়া) ৪'৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—ভি হেলটেল (ফিনল্যান্ড) ৪'৭ সেকেন্ড। ৫ম—সোভিট জোল (ইউ.এস.এ) ৪'৮'১ সেকেন্ড।

৮০০ মিটার—বেলজিয়ামের দৌড়বীর বজার মোয়েল বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী। এবারের অলিম্পিকে তিনি কোন স্থান লাভ করেন নি। নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করে প্রথম স্থান লাভ করেছেন আমেরিকার এ্যাথলিট টম কোটন। মোয়েলের পূর্বে কোটনই ছিলেন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী।

১ম—টম কোটন (ইউ.এস.এ) ১ মি: ৪'৭'৭ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ডেরেক জনসন (ব্রুটন) ১ মি: ৪'৭'৮ সেকেন্ড। ৩য়—এ বরসেন (নরওয়ে) ১ মি: ৪'৮'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—আর্নল্ড সোবল (ইউ.এস.এ) ১ মি: ৪'৮'৩ সেকেন্ড।

১৫০০—চারশো মিটার দৌড়ে চার জন দৌড়বীর অলিম্পিকের রেকর্ড ত্রান করে দিলেও পনের শ' মিটার দৌড়ে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

১ম—রোনাল্ড ডিলানী (আয়ারল্যান্ড) ৩ মি: ৪১'২ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ওয়াশটার রিশেনহাইন (জার্মানি) ৩ মি: ৪২ সেকেন্ড। ৩য়—জন ল্যাণ্ডি (অস্ট্রেলিয়া) ৩ মি: ৪২ সেকেন্ড। ৪র্থ—লাসলো টাবারী (হাঙ্গেরি) ৩ মি: ৪২'৪ সেকেন্ড। ৫ম—ব্রায়ান হিউসন (ব্রুটন) ৩ মি: ৪২'৬ সেকেন্ড। ৬ষ্ঠ—এম. জাগোয়ার্স (চেকোস্লোভাকিয়া) ৩ মি: ৪২'৬ সেকেন্ড।

৫০০০ মিটার—দু'র পার্ভার দৌড়ে এবার রাশিয়ার দৌড়বীররা সাক্ষ্য অর্জন করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী, এবারে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে তিন জন দৌড়বীর গত অলিম্পিকের রেকর্ড ত্রান করে দিয়েছেন।

১ম—ড্রাভিমির কুটস (রাশিয়া) ১৩ মি: ৩১'৭ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—গার্ডন শিরি (ব্রুটন) ১৩ মি: ৫০'৬ সেকেন্ড। ৩য়—ডেরেক ইবটসন (ব্রুটন) ১৩ মি: ৫৪'৪ সেকেন্ড।

১০০০০ মিটার—একই অলিম্পিকে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব খুব বেশী জনের ভাগ্যে হয়নি। ফিনল্যান্ডের কোলম্যান, চেকোস্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক ও এবার ড্রাভিমির কুটস। শুধু কুটসই নয়, এবারের প্রতিযোগিতার প্রথম পাঁচ জন জেটোপেকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

১ম—ড্রাভিমির কুটস (রাশিয়া) ২৮ মি: ৪৫'৬ সেকেন্ড। ২য়—জে কোভাল (হাঙ্গেরি) ২৮ মি: ৫২'৪ সেকেন্ড। ৩য়—এলেন লরেল (অস্ট্রেলিয়া) ২৮ মি: ৫২'৪ সেকেন্ড। ৪র্থ—কে কাকিভোগোরাক (পোল্যান্ড) ২৯ মি: ৫২'৪ সেকেন্ড।

ম্যারাথন—ম্যারাথন দৌড়ের ইতিবৃত্ত গত বারে আলোচনা করেছি। এবারে যিনি অলিম্পিকে ম্যারাথনে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, তিনি ক্রালের এক প্রবীণ দৌড়বীর। নাম এলান সিমো।

১ম—এলান সিমো (ক্রাল) ২ ঘ: ২৫ মি: ২২ সেকেন্ড। ২য়—ক্রাল মিহালিক (হুগোভাভিয়া) ২ ঘ: ২৬ মি: ৩২ সেকেন্ড। ৩য়—জিকো কার্ডোনেন (ফিনল্যান্ড) ২ ঘ: ২৭ মি: ৪৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—চার্লস হুইটন (কোরিয়া) ২ ঘ: ২৮ মি: ৪৫ সেকেন্ড। ৫ম—জোসিফাকী কাওরাসিয়া (জাপান) ২ ঘ: ২৯ মি: ১১ সেকেন্ড। ৬ষ্ঠ—এমিল জেটোপেক (চেকোস্লোভাকিয়া) ২ ঘ: ২৯ মি: ৩৪ সেকেন্ড।

৪×১০০ মিটার রিলে—পুরুষদের রিলে যেসে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন আমেরিকার চার জন শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর। বিশ বছর আগে জেসি ওয়েল যে টীম রেকর্ড করেছিলেন এরা তা স্থান করে নিলেন। মহিলা বিভাগে অষ্ট্রেলিয়া দৌড়-পটায়সীরা নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপি করেছেন।

পুরুষ—১ম—ইউ, এস, এ ৩৯'৫ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড) ২য়—সোভিয়েট রাশিয়া ৩৯'৮ সেকেন্ড। ৩য়—জার্মানী ৪০'৩ সেকেন্ড। ৪র্থ—ইটালী ৪০'৪ সেকেন্ড।

মহিলা—১ম—অষ্ট্রেলিয়া ৪৪'৫ সেকেন্ড। ২য়—বুটেন ৪৪'৭ সেকেন্ড। ৩য়—আমেরিকা ৪৪'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—রাশিয়া ৪৫'৬ সেকেন্ড।

৪×৪০০ মিটার রিলে—এতেও আমেরিকার দৌড়বীররা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

১ম—আমেরিকা ৩ মিনিট ৪'৮ সেকেন্ড। ২য়—অষ্ট্রেলিয়া ৩ মিনিট ৬'২ সেকেন্ড। ৩য়—বুটেন ৩ মিনিট ৭'২ সেকেন্ড। ৪র্থ—জার্মানী ৩ মিনিট ৮'২ সেকেন্ড।

৮০ মিটার হার্ডলস—মেয়েদের হার্ডলসে অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস শার্লি ডিলহ্যান্টি কৃতিত্ব সর্কাসেপকা বেশী। সন্তানের জননী ডিলহ্যান্টি এবারের মেলবোর্ণ হার্ডলস এবং রিলে দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

১ম—শার্লি ট্রিকলাণ্ড ডিলহ্যান্টি (অষ্ট্রেলিয়া) ১০'৭ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড) ২য়—সিসেলা কেলার (জার্মানী) ১১ সেকেন্ড। ৩য়—নমা থোহার (অষ্ট্রেলিয়া) ১১ সেকেন্ড। ৪র্থ—গালিনা বরদুভা (রাশিয়া)।

৩০০০ মিটার টিপল চেম্প—ক্রিশ ভাসার স্বর্ণপদক লাভ করার দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর বুটেন এ্যাথলেটিকসে স্বর্ণপদক লাভ করল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বু' ভ্রান্সকে অপর প্রতিযোগী নরওয়ের লারসেনকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে প্রথমে প্রতিযোগিতা থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়। ভ্রাসার আপত্তি জানাতে জুরীদের বিচারে ভ্রাসার প্রথম স্থান লাভ করেন।

১ম—ক্রিশ ভাসার (বুটেন) ৮ মিনিট ৪১'২ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—সান্তোর রোজেনাই (হাঙ্গেরী) ৮ মিনিট ৪৩'৬ সেকেন্ড। ৩য়—ই. লারসেন (নরওয়ে) ৮ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। ৪র্থ—হাইন্স লোকার (জার্মানী) ৪৪'৪ সেকেন্ড।

২০০০ মিটার ভ্রমণ—বিশ হাজার মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতা এবারের অলিম্পিকের নতুন প্রতিযোগিতা। এই বিবরে তিনটি স্থানেই অধিকারী রাশিয়ার বথাক্রমে—লিওনিও স্পিরিগ, আন্টোনাস মাইকেলস, ব্রোউ আরক।

৫০০০ মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতার বিবরে খ্যাতিমান এ্যাথলীট নননী, বোকা কেউই প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি। ১ম—নরমান বিড (নিউজিল্যান্ড) ৪৮ মিনিট ৩০ সেকেন্ড। ২য়—ই. মার্কিন স্কোভ (রাশিয়া) ৪৮ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। ৩য়—জন ইলান গ্রেন (সুইডেন) ৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ২ সেকেন্ড।

১১০ মিটার হার্ডলস—এ প্রথম তিনটি পুরুষের লাভ হয়েছে আমেরিকার। চতুর্থ, পুরুষের পেরেছে জার্মানী। ১ম—লী ক্যালহাউন (ইউ, এস, এ) ১৩'৫ সেকেন্ড (নতুন

অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—জ্যাক ডেভিস (ইউ, এস, এ) ১৩'৫ সেকেন্ড। ৩য়—জোয়েল শাকল (ইউ, এস, এ) ১৪'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—মার্টিন লোয়ার (জার্মানী) ১৪'৭ সেকেন্ড।

৪০০ মিটার হার্ডলস—এ প্রথম তিনটি স্থান আমেরিকার তিন জন এ্যাথলীট অধিকার করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বল্প পাল্লার দৌড়ের মত হার্ডলে আমেরিকার প্রাধান্যই বেশী।

১ম—গ্রেন ডেভিস (ইউ, এস, এ) ৫০'১ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—এ ডি সাদার্ন (ইউ, এস, এ) ৫০'৮ সেকেন্ড। ৩য়—জে ক্যালব্রথ (ইউ, এস, এ) ৫১'৬ সেকেন্ড। ৪র্থ—ইউরী স্লিটবেক (রাশিয়া) ৫১'৭ সেকেন্ড।

হাই জাম্প—উচ্চ লাফের স্বর্ণপদক লাভ করেছেন আমেরিকার নিরোএ এ্যাথলীট চার্লস ডুমাস। ডুমাস মেলবোর্ণে ক্রীতি অন্নের জন্য ৭ ফুট অতিক্রম করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গত জুন মাসে ৭ ফুট লাফের বিশ্ব-এ্যাথলীটে এক নতুন অধ্যায় স্থানা করেছিলেন।

মেয়েদের হাই জাম্পে বুটেনবাসীর অনেকেই আশা করেছিলেন খেলমা হপকিন্স স্বর্ণপদক লাভ করবেন। কিন্তু আমেরিকার উইলার্ডেড ম্যাকডেনিয়েল এবারে নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

পুরুষ—১ম চার্লস ডুমাস (ইউ, এস, এ) ৬ ফুট ১১'১ ইঞ্চি (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—চার্লস পোটার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬ ফুট ১০'১ ইঞ্চি। ৩য়—ইগোর ক্রাসকভ (রাশিয়া) ৬ ফুট ৭'১ ইঞ্চি। ৪র্থ—কেনেথ মার্স (কানাডা)।

মহিলা ১ম—উইলার্ডেড ম্যাকডেনিয়েল ৫ ফুট ৯'১ ইঞ্চি। ২য়—খেলমা হপকিন্স ৫ ফুট ৫'১ ইঞ্চি। ৩য়—মেরিরা পিসারেডো (রাশিয়া) ৫ ফুট ৫'১ ইঞ্চি।

লংজাম্পে মাত্র ১বার আমেরিকা স্বর্ণপদক হারিয়েছে গত বার অলিম্পিকের মধ্যে। সোটা ৩৬ বছর আগে এ্যাথলিটরাপের অলিম্পিকে এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমেরিকার বরই উঠে স্বর্ণপদক। মেয়েদের মধ্যে পোল্যান্ডের এলিজাবেথ ক্রিজোসি প্রথমস্থান অধিকার করেছেন।

পুরুষ—১ম—গ্রেগরি বেল (ইউ, এস, এ) ২৫ ফুট ৮'১ ইঞ্চি। ২য়—জন বেনেট (ইউ, এস, এ) ২৫ ফুট ২'১ ইঞ্চি। ৩য়—ভেলকামা (ফিনল্যান্ড) ২৪ ফুট ৬'১ ইঞ্চি। ৪র্থ—ডিমিট্রি বগ্ডারে (রাশিয়া) ২৪ ফুট ৪'১ ইঞ্চি।

মহিলা—এলিজাবেথ ক্রিজোসিনিকা (পোল্যান্ড) ২০ ফুট ৯'১ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—উইলি হোয়াইট (ইউ, এস, ১৯ ফুট ১১'১ ইঞ্চি। ৩য়—নাদেয়ালা ভালচিভিলি (রাশিয়া) ১৯ ফুট ১১'১ ইঞ্চি। ৪র্থ—এরিকা রিফ (রাশিয়া) ১৯ ফুট ৩'১ ইঞ্চি।

হপ ট্রিপ ও জাম্প—ব্রেন্সিলের ক্রীতিমান জাম্পার ১৯৫২ স বিজয়ী এড্রিমির ডি সিলজ এবারেও হপ ট্রিপের স্বর্ণপদক করেছেন।

১ম—এ. ডি, সিলজা (ব্রেন্সিল) ৫৩ ফুট ১'১ ইঞ্চি (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ডি, আয়ার নারসন (আইসল্যান্ড) ৫৩ ফুট ২য়—ডি, ক্রিয়ার (রাশিয়া) ৫২ ফুট ৬'১ ইঞ্চি। ৪র্থ—জর্জ ই. (ইউ, এস, এ) ৫২ ফুট ১'১ ইঞ্চি।



পোলভার্ট—একমাত্র বিবর বার বর্ষপদক আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশ পার্যনি, বারটি অলিম্পিকে আমেরিকারই আধিপত্য। এবারও পোলভার্টের বর্ষ ও যৌগ্যপদক গিরেছে আমেরিকার ঘরে।

১ম—বল রিচার্ডস (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ১১ই ই: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—বর গাটওয়ার্ডি (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ১০ই ই:। ৩য়—জর্জস রাউবানীস (এস) ১৪ ফু ৯ ই:। ৪র্থ—জর্জ ম্যাটস (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ৩ই ই:।

ডিসকাস থো—ডিসকাস ছোঁড়ার দুরত্বের এ্যাথলীট গার্ডিয়েন লাভ করেছেন দ্বিতীয় স্থান। অনেকই আশা করেছিলেন তাঁর উত্থর। কিন্তু আমেরিকার অন্ত একজন এ্যাথলীট প্রথম স্থান অধিকার করার সৌরব অর্জন করেন। হেলসিং অলিম্পিকে রাশিয়ার মেয়েরাই ডিসকাসের পুরস্কারগুলো অধিকার করেছিল। নীনা পনোমারেভা এবার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন, তার কারণ মানসিক প্রতিক্রিয়া তার সাফল্যকে প্রতিহত করেছে। কিছুদিন আগে লণ্ডনে টুপি চুরির অভিযোগে অভিযুক্তা ছিলেন তিনি।

পুরুষ—জালফ্রেড ওটার (ইউ, এস, এ) ১৮৪ ফু ১০ই ই: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—করচুন গার্ডিয়েন (ইউ, এস, এ) ১৭৯ ফু ১ই ই:। ৩য়—ডেমমণ্ড কোভ (ইউ, এস, এ) ১৭৮ ফু ৬ই ই:। ৪র্থ—মার্ক কারাম (বুটেন) দুরত্ব ১৭৮ ফু ৩ই ই:।

মহিলা—ওগলা কিকোটোভা (চেকোস্লোভাকিয়া) ১৭৬ ফু ১ই ই: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—ইরিনা বেসিলিয়ারভা (রাশিয়া) ১৭২ ফু ৪ই ই:। ৩য়—নীনা পনোমারেভা (রাশিয়া) ১৭০ ফু ৮ই ই:। ৪র্থ—জলিন ব্রাউন (ইউ, এস, এ) ১৬৮ ফু ৬ই ই:।

বর্ষা ছোঁড়া—এবারের বর্ষা ছোঁড়ার পুরুষদের বিভাগে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মেয়েদের মধ্যে রাশিয়ার এক তরুণী বর্ষপদক লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

পুরুষ—১ম—এডিল ডেনিয়েলসন (নরওয়ে) ২৮১ ফু ২ই ই: (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড)। ২য়—জে সিতলো (পোল্যান্ড) ২৭২ ফু ৪ই ই:। ৩য়—ভিটর জি বুলেভো (রাশিয়া) ২৬০ ফু ৬ই ই:। ৪র্থ—লর্বার্ট কোশেল (জার্মানী) ২৪৫ ফুট।

মহিলা—১ম—ইলেনা আরানোজেন (রাশিয়া) ১৭৬ ফু ৮ ই: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—মার্লিন জারেল (চিনি) ১৬৫ ফু ৬ই ই:। ৩য়—এল, কোলিয়েভা (রাশিয়া) ১৬৪ ফু ১১ই ই:।

ডানা জোটাগে (চেকোস্লোভাকিয়া) ১৬০ ফু ১০ই ই:।  
শোহার বল ছোঁড়া—এতও আমেরিকার প্রতিপত্তি। ১২টি অলিম্পিকের ১০টিতে বর্ষপদক লাভ করেছে। বিশ্বের সর্বপ্রথম শক্তিশালী প্যাঁরা ও'ব্রায়েন এবারও বর্ষপদক লাভ করেন। মহিলাদের নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরুষ—১ম—প্যারী ও'ব্রায়েন (ইউ, এস, এ) ৬০ ফু ১১ ই:। ২য়—বিল নাইভার (ইউ, এস, এ) ৫৯ ফু ৭ই ই:। ৩য়—জিবি গিল (চেকোস্লোভাকিয়া) ৫৭ ফু ১০ই ই:।

মহিলা—১ম—তারারা টাইকেভিচ (রাশিয়া) ৫৪ ফু ৫ ই: (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড)। ২য়—গ্যালিনা জিবিনা (রাশিয়া) ৫৪ ফু ২ই ই:। ৩য়—মেবিনা ওয়ার্ণার (জার্মানী) ৫১ ফু ২ই ই:।

হামার থো—এবারের হামার থো-তে প্রথম ছয় জন আগের অলিম্পিক রেকর্ড স্থান করে দিয়েছে। গতবারের বর্ষপদক বিজয়ী এবার পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন।

১ম—হারল্ড কলোনী (ইউ, এস, এ) ২০৭ ফু ৩ই ই: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—মিখাইল ক্রিভনাসভ (রাশিয়া) ২০৬ ফু ৯ই ই:। ৩য়—এনাটলী সামন্তভেভ (রাশিয়া) ২০৫ ফু ৩ ই:। ৪র্থ—এলবার্ট হল (ইউ, এস, এ) ২০৩ ফু ৩ ই:। ৫ম—জোসেফ সারমত (হাঙ্গেরী) ১৯৯ ফু ১ই ই:।

ডেকাথলন—অলিম্পিকে ডেকাথলন বিজয়ী হওয়া একটি বিশেষ সম্মান। কারণ এই প্রতিযোগিতায় এ্যাথলীটদের সর্ববিধের পারদর্শী হতে হয়। এবারের বর্ষমুহূর্ত লাভ করেছেন আমেরিকার ২২ বছরের নিগ্রো এ্যাথলীট মিটন ক্যাথল।

১ম—মিটন ক্যাথল (ইউ, এস, এ) ৭১৩৭ পয়েন্ট। ২য়—বাকের জনসন (ইউ, এস, এ) ৭৫৮৭ পয়েন্ট। ৩য়—ভ্যাগিলি কুজনেসভ (রাশিয়া) ৭১৫৫ পয়েন্ট।

পেন্টাথলন—আগে এই প্রতিযোগিতা ছিল এ্যাথলেটিকসের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেও—সর্বপ্রথম কালে অধ চালনা, ফেলিং, রাইফেল চালনা, নীতার ও দৌড় এই পাঁচটি বিষয় নিয়েই হুইডেনের লাস' হল পর পর হ'বার পেন্টাথলনে বর্ষপদক লাভ করলেন।

১ম—লার্স' হল (সুইডেন) ৫১১২ পয়েন্ট। ২য়—ওলাভি ব্যাকেলেন (ফিনল্যান্ড) ৫১০৬ পয়েন্ট। ৩য়—ভেলো কোর হেলেন (ফিনল্যান্ড) ৫৮৬৭ পয়েন্ট। ৪র্থ—ইগোর নভিকোভ (রাশিয়া)।

হকি—ভারতের হকি দল এবার নিয়ে পর পর হ'বার অলিম্পিক হকির বর্ষপদক লাভ করলো। এবারের অলিম্পিকে অস্ট্রােল দেশের হকি খেলোয়াড়রা উন্নতি করেছেন প্রচুর। তাই ভারতকে এবারের হকিমুহূর্ত লাভ করতে একটু বেগ পেতে হয়েছে। সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে ভারত একটিমাত্র গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শুধু বলা যায়, ভারতীয় খেলোয়াড়দের আরও বেশী অম্মূলীন করতে হবে এ সম্মান বজায় রাখার জন্য।

ফুটবল—এবার ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়রা অবতই ভাল খেলেছেন। মূল প্রতিযোগিতার 'বায়' শেষে কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে ভারতীয় দল সর্বপ্রথম অলিম্পিক ফুটবলে জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলো, সেমি ফাইনালে ভারত হুগোভাভিয়া দলের সঙ্গে ৪—১ গোলে পরাজিত হয়েছে। এবারের ফুটবলের বর্ষপদক লাভ যটোই রাশিয়ার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী দল হাঙ্গেরী, জেক্সিক প্রভৃতি বেশ গ্রহণ করেনি।

হানাতার বশতঃ এবারের সত এইখানেই খেলাধুলার আয়োজনা শেষ হোল।



# এসে গেছে! এই ডবল ঢাকনা দেওয়া নতুন টিন ডালডাকে সম্মুর্ণ খাঁটী ও তাড়ায় রাখে



- **বিসুদ্ধ ও তাজা** ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
- **বিসুদ্ধ ও তাজা** ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটি ডালডাকে সব দাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- **খুলতেও কি পুবিধে** খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
- **পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে**—জল টিনে মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাউন্ড, ১ পাউন্ড, ২ পাউন্ড, ৫ পাউন্ড এবং ১০ পাউন্ড টিন পাওয়া যায়  
\* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

**ডালডা মার্কা বনস্বতী**



## সঙ্গীত-রাজ্যের সম্রাট-চতুর্দয়

[উক্তাদের সঙ্গীত চির-অবিম্বলীয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলেও সেগুলি অমল হয় না। সেগুলি চিরকালের। তাহা হইলেও অতীতের সেই অমর সঙ্গীত-রচয়িতাগণ সঙ্গীতাম্রমাগী ব্যক্তিগণের নিকট পবিত্র নাম মাত্রে পূর্বাবসিত হইয়াছেন। লোকে কেবল শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের মরণ করিয়া থাকেন।

নিজে কম জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত-রচয়িতা ও নাট্যকারের সন্নিপাত পড়িতে দেখিয়া হইল। তাঁহার বৃত্তীয় সন্তান, অষ্টাবল ও উনিশ শতকে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে সঙ্গীতাম্রমাগী ও সুখী সমাজে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আসন এখনও দেখিয়া হইয়া থাকে।]

### ব্যাচ

জোহান সেবাস্টিয়ান ব্যাচ ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ইসেন্ডাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত ধর্মসঙ্গীতগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর কাল কতকটা অনাদৃত ছিল, কিন্তু তাহার পর সেগুলি আবার রচয়িতাকে স্বাভাবিক্যে স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্যাচ সাধা জীবন তাঁহার সময়ের সঙ্গীতগুলির উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে অরগ্যান-বাদক ও অরগ্যান-বাদকমণ্ডলীর প্রতিভাশালী পরিচালক বলিয়া প্রশংসা করিত। কিন্তু তাঁহার নিজের রচিত নব ভাবের সঙ্গীতগুলি গীর্জায় কর্তৃপক্ষ পছন্দ করিতেন না। সেজন্য ব্যাচ বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইলেও সে সময় স্বাভাবিক্যে পূরকারে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি যে একজন প্রতিভাশালী সঙ্গীত রচয়িতা, তাঁহার মৃত্যুর পর কথা বহুকাল লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। ব্যাচ বিশেষ গাভরাঙ্গীর ছিলেন; তবে নিজেকে সঙ্গীতচর্চার উৎসর্গ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছিলেন।

মাত্র ১০ বৎসর বয়সে ব্যাচ সঙ্গীতবিজ্ঞান পারদর্শিতার পথিচর হইল। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অবস্থান করেন। ব্যাচের ভ্রাতা গীর্জার অরগ্যান-বাদক ছিলেন। তাঁর ব্যাচকে অনেক মূল্যবান ধর্মসঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিতে দেখিয়া হইত না। বালক ব্যাচ সেগুলি চুরি করিয়া টানের

আঙ্গোর নকল করিয়া লয়। তাহার পর ঐ নিষিদ্ধ সঙ্গীতগুলি ব্যাচ গীর্জার অরগানে বাজাইয়া আরম্ভ করে।

তাঁহার দুই ভ্রাতা গর্ভে ২০টি সন্তানের জন্ম হয়। সে জন্ম বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাঠিতে হয়। তিনি জার্মানীর বহু রাজদরবারে কাজ করেন। শেষে তিনি লিপজিগের সেন্ট টমাস গীর্জার বাদক-মণ্ডলপতির কার্য গ্রহণ করেন। ঐ কাজ তিনি ২৭ বৎসর চালাইয়া যান। সেই সময় তিনি বিবিধ সুরার সুরার ধর্মসঙ্গীত, নাট্যকাব্যে লিখিত সঙ্গীত-গুচ্ছ, গীতি-কাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। ঐ সকলে তিনি অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহা ছাড়া অধ্যাপকের জন্ত তাঁহাকে বিবাহ-বাসরে ও অন্যান্য অমুঠানে সঙ্গীত পরিবেশনও করিতে হইত।

জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অন্ধ হইয়া যান। চক্ষুতে অন্ত্রোপচার ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। দুঃখ-দৈন্য-জর্জরিত শেব অবস্থায় তিনি একখানি ধর্মমূলক গীতি-কাব্য রচনা করেন। চক্ষুর অভাবে তাহা অন্তকে দিয়া লিখাইতে হয়। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি অন্ধ অবস্থায়ই দুর্বল হস্তে সেই ধর্মসঙ্গীতের একটি নূতন শিরোনামা যোজনা করেন—“দয়ালু প্রভু, তোমার সিংহাসন তলে এই উপহার; আমি বাইতেছি।” ব্যাচের ধর্মভাবই তাঁহার চরিত্রের মহত্ব।

### ওয়ারগনার

রিচার্ড ওয়ারগনার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর লিপজিগ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন তুলের বালক মাত্র, সে সময়ই সের্পিয়ায়ের বিদ্রোহান্ত নাটকের অনুকরণে একখানি নাটক লিখলেন। কিন্তু উৎসাহের আধিক্যে প্রথম অঙ্কেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার জীবনান্ত ঘটান। ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহভঙ্গের ঐকান্তন সঙ্গীত শুনে। সেই সময় হইতে তিনি সঙ্গীতচর্চার মনোনিবেশ করেন।

সে সময় ইটালীয় প্রেধার অপেরাই প্রচলিত ছিল। ওয়ারগনার সে রীতি অগ্রাহ্য করিয়া উগ্র ধরণের নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনও মধুর ছিল না। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী তাঁহার গোলমালে মনোভাব ও কর্মনার মহত্ব বুঝিতে পারিতেন না। পরে ওয়ারগনার অল্প স্ত্রী গ্রহণ করিয়া শান্তি পান। ওয়ারগনার অর্থলোভী ছিলেন এবং পুষ্ঠপাশবাদের বৈধে শোষণ করিতেন। শেষে রাজনৈতিক বিষয়ে অবিমুখ্যাকারিতার জন্য তাঁহাকে হুইজারল্যাণ্ডে ১২ বৎসর কাল নির্বাসন ভোগ করিতে হয়।

এই দুঃসময়ে বিখ্যাত লেখক ফ্রাঙ্ক লিট তাঁহার একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ওয়ারগনার নিজ অল্পস্বত্ব পথেই চলিতে থাকেন। ভ্রাতা মৃত্যুর পর ওয়ারগনার লিটের কন্যাকে বিবাহ করেন। জীবনের শেষ দিকে ওয়ারগনার পূর্ণ সাক্ষ্যলাভ করেন। তাঁহার পুস্তকগুলি সুবিসমাবে প্রকাশ পাঠিতে থাকে। ইউরোপের সর্বত্র ওয়ারগনারের মতবাদ আত্ম হইতে থাকে। ওয়ারগনার যেন অমুকোপা পাঠিয়া বই লিখিতে থাকেন। পর পর পাঁচখানি বই তাঁহাকে সম্রাটের শিরোমণি প্রদান করে। ওয়ারগনার সমাজকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত জয় করেন।

ওয়ারগনার সে সময়ের সঙ্গীত-সম্রাট ছিলেন। তিনি নূতন সঙ্গীতধারা প্রবর্তনের জন্য অমর উৎসাহ লইয়া বই লিখিয়া যান। তাঁহার জীবনে এক বিলক দারুণ হতাশা ও কণায় দিকে বিষটি

সাফল্য। কখনও প্রবল দারিদ্র্য, আবার কখনও অতিরিক্ত বিলাসিতা। তিনি কখনও পান সমাজের উপহাস, আবার কখনও সার্বজনীন প্রশংসা। গুয়াগনার তাঁহার উগ্রভাবের নাটকনাটিকাগুলি সমাজের ভিত্তিনিক্ষার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরিবেশন করিয়া যান। শেষ পর্যন্ত অপরাধবনে ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে।

### মোজার্ট

উলফগ্যাং আমেডিয়াস মোজার্ট ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সল্জগ্রহণ করেন। ৫ বৎসর বয়সেই তিনি অতি নিপুণ হস্তে সঙ্গত করিতে পারিতেন। এত অল্প বয়সে সঙ্গতে এরূপ অসামান্য শক্তির পরিচয় খুব কম দেখা যায়। ৬ বৎসর বয়সের মোজার্টকে লইয়া তাঁহার পিতা ইউরোপে তাঁহার এই অত্যাস্ফর্য শক্তির পরিচয় দিতে বাহির হন। শ্রোতৃ-মণ্ডলী অবাক হইয়া বালকের সঙ্গত ক্ষমতা দর্শন করিত। ভিয়েনার সম্রাট তাঁহাকে “কুদে বাতুকর” বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদে সঙ্গত করিবার অনুমতি দেন।

১৪ বৎসর বয়সে মোজার্ট পোপকে গান গাহিয়া শুনান। পোপ বালকের ক্ষমতায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছু পরে মোজার্ট স্রালসুয়ের আর্ক বিশপের সঙ্গীতশিল্পীর চাকরী পান। কিন্তু এইখানেই তাঁহার সাফল্যের শেষ। ইহার পর ৩৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সম্মানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

প্রথম ভালবাসার ব্যর্থ হইয়া মোজার্ট সেই বশেরই এক কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। উভয়েই সমান নম্র ও সরল ছিলেন; কলে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হইয়াছিল। মোজার্ট এই সময় অনেক নাটিকা লিখেন; কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক “ডন জিওভান্নি”ও আর্থিক দিকে তেমন সাফল্য আনিতে পারে নাই; তবে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটিকা বলিয়া সুবী সমাজে সমাদৃত হয়।

মোজার্টের কবিশ্রুতি মৃত্যুতেও স্নান হয় নাই। একদিন একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কোন মৃত ব্যক্তির আত্মার শাস্তি কামনায় কবিতা লিখিবার অনুরোধ করে। এই কার্যে আগ্রহের হইবার সময় তিনি ক্রমশঃই ভাল ভাবে বুঝিতে পারেন যে, এই কবিতা তাঁহার মৃত্যুর ঘটনা করিতেছে, এই কবিতা শেষ করিবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

### হেডন

ফ্রান্স জোসেফ হেডন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সে তিনি স্বগৃহ ছাড়িয়া কোন দূর সম্পর্কের আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১ বৎসর কাল তিনি ভিয়েনার এক কনসার্ট পাটিতে গায়করূপে কাজ করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অর্থভাবে ঘুচে না। নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি সঙ্গীতশিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। চূর্তাগ্য তাঁহার সরল চিত্তকে কখনও নীরস করিতে পারে নাই। ঘটনাক্রমে তিনি প্রিন্স ইষ্টারহোজির গৃহশোষকতা লাভ করেন।

৩০ বৎসর কাল এই ভাবে কাটাইয়া তিনি সঙ্গীতশিল্পে নূতন জ্ঞান অর্জন ও লেখনিক পূর্ণতা প্রদান করিতে সমর্থ হন। ঐক্যতান বাস্তব বিভিন্ন ব্যবহার ও ঐক্যতান সঙ্গীত রচনার খুঁটিনাট্য ব্যাপারে তিনি পায়দরিতা লাভ করেন। তাহাতে তিনি অশেষ সুখপ্রাপ্তি অর্জন করেন। মোজার্ট ও বীথোভেন—তাঁহার দুই জন বিশিষ্ট ছাত্র তাঁহার এই নবীন কলাকর্ষণ একা করেন।

চূর্তাগ্যক্রমে তাঁহার স্ত্রী কলহপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু হেডন তাহাতে নিরুৎসাহ হন নাই। জীবন ব্যবহার ভাল না থাকিলেও তিনি তাঁহার গায়কত্বের মধ্যে পঙ্গলি নামে এক কোমলপ্রাণী সমরদারকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন।

হেডনের প্রতিভা শেষে বৃদ্ধ বয়সে সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছিল। তাহা হইলেও তিনি কোন দিন সরলতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। ভিয়েনার তাঁহার “ফ্রিট” নামক অনুপ্রেরণামূলক গীতিনাটিকার অভিনয়কালে “আলোকের আবির্ভাব হইক” কথাটির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক পূর্ণাঙ্গলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শ্রোতৃমণ্ডলী বিশ্বম্ বিমুগ্ধ হইয়া উপরের দিকে হেডনের আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। হেডন সঙ্গল নেড়ে আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলেন, ঐদিক হইতে আসিয়াছে।

হেডন সরল গ্রাম্যবালক মাত্র ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই গান গাহিতে ভালবাসিতেন। জীবিত কালেই তিনি খ্যাতি ও প্রচা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার বিরাট দীর্ঘ কয় শতাব্দী পরে লোকে প্রকৃত জন্মদগ্ন করিতে পারে। হেডন নিজে সঙ্গল প্রকৃতির থাকায় সেইরূপই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কোন নূতন গ্রাম্যসঙ্গীত শুনা ইউরোপের সম্রাটদের প্রশংসা অপেক্ষা কম আনন্দঘন ছিল না। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে গ্রাম্য লোক সঞ্চীর ও পূর্বত উপত্যকার সঙ্গীত লোকের মনে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিত। তিনি সঙ্গীতশিল্পীদের পিতারূপে অমরত্ব লাভ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, দীর্ঘ জীবনের শেষে তিনি সে অমরত্ব লাভ করেন।

### সঙ্গীত-বস্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা  
খুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়াকিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি বস্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন্ বস্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার  
জ্ঞত লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এলফ্র্যাংকট ইন্সট, কলিকাতা - ১

# সাংস্কৃতিক

কলকাতায় এবং শহরতলীর নাচ-গান-বাঁজনার জলসা এ বছরেও বেশ জমে উঠেছে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাঙলা দেশে যেমন সন্ধ্যাবেলায় সমীর লক্ষ্য করা যায়, তেমনিটা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য জলসাসভার মধ্যে এটালী কালচারণ কনকারেশন বা কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নাম ও আয়োজনের কথা সর্বপ্রথমে বলা প্রয়োজন। বার্গসঙ্গীত, বরীজসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নৃত্য (ভারত নাট্যম ও কথক) ও শিশুদের সাংস্কৃতিক আসর ও আলোচনা এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাক্রমে পরিবেশিত হয়। শিল্পী দেবজন্ত মুখোপাধ্যায় পরিকল্পিত অনিন্দ্য ও অপূর্ণ মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারে শীতের মরুতমে আসর জমিয়েছেন বহু চণী ও জ্ঞানী শিল্পিবৃন্দ। এই জলসার প্রধান সম্পাদক অমূল্য রায়চৌধুরীর নজর ছিল সর্বদিকে, বেজন্ত সম্মেলনের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে সকল দিকে। বিভিন্ন দিনের অঙ্কঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী অমর ভট্টাচার্য, আলাউদ্দীন খাঁ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আলি আকবর খাঁ, উমাশঙ্কর, ঝরলক্ষ্মীশের রায়চৌধুরী, বড় গোলাম আলী, হীরাবাদি, বিনায়ক ঈর্ষক, ওজারনাথ ঠাকুর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিরকণা চৌধুরী, আয়তি লাহা হায়, নিখিল যোব প্রভৃতি আরও নেক স্থানীয় ও বাইরের শিল্পী। সম্মেলনের অন্ততম দুই প্রধান কার্য ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অভিনীত মাইকেল মধুসূদন ঠাকুরাণির এবং 'সাংস্কৃতিকী' নামক একটি সভ্যতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের জালসা নৃত্যাভিনয়। সাংস্কৃতিকীর স্রষ্টা সঙ্গীত ও নৃত্য ইবেশনায করেণি প্রতিভার নর্ভকীর দেখা মিলেছে। এদের তাকেই নৃত্যপটুৎ দর্শকদের বিমিত ক'রেছে। সাংস্কৃতিকী যে কালের সাংস্কৃতিকার দিকে বসেই দৃষ্টি নিয়েছেন সেজন্য আমরা গান জানাই। প্রতীপ গুহ-ঠাকুরতার দলের এই সাংস্কৃতিকী যৌতের উন্নতির পথে এগিয়ে বাক, আমাদের এই প্রার্থনা। \* \* \* কাতার শহরতলীতে যে সব সঙ্গীত-সম্মেলন হয় তদ্ব্যয্যে বেলেঘাটা

অঞ্চলের 'মিউজিক কালচারাল এসোসিয়েশনের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সত্যিই এক অভিনব কলাসম্মেলনের পরিচয় দিয়েছে। তিন দিনব্যাপী অঙ্কঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী ভরুণচন্দ্র চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কুমুদমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাট্যবানু), হীরাবাদি, দবীর খাঁ, গোপাল ব্রজবাসী, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, বড় গোলাম আলী, অমরেশ চৌধুরী, সত্যনাথ, উৎপলা, শ্রামল মিত্র, আন্ননা বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্শ্বলাল বসু, পূর্ববী দত্ত, সখা রায়চৌধুরী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, বাণী লোধ, ডলি ভট্টাচার্য, চন্দ্রমালা লাহিড়ী, পুষ্প চক্রবর্তী, শ্রাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। \* \* \* মিলনচক্রের ১২শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জাহ্নবীর দক্ষিণ কলিকাতার ইন্দিরা সিনেমা হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। তাহাতে কর্তৃসঙ্গীতে বড় গোলাম আলী খান, আমীর খান, সলামত আলী, নজাকৎ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, হীরাবাদি বরোদেকার, কালিদাস সান্ডাল, গুচিমিত্র মিত্র, মাদুরী মাটু, প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে ও বিলায়েৎ হোসেন খান, ইমরৎ খান, আলী আকবর খান, ডি জি বোগ, রামরায় পরসৎওয়ার, ইকবাল খান, আমীর হোসেন, শান্তপ্রসাদ, কানাই দত্ত প্রভৃতি এবং কথক নৃত্যে শঙ্কু মহারাজ, রোশন কুমারী বোগলান করিতেছেন। \* \* \* ১২ই জাহ্নবীর, শনিবার সকাল ৮-৩০ মিঃ এ রবীন্দ্র ভারতী হলে নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ১২ই ও ১৩ই জাহ্নবীর সকাল ও সন্ধ্যায় চারিটি বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের নিয়মিত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন—কুমারী রূপা জমানী, বোম্বাই; কুমারী বিশাখা গান্ধী, সোরাট্র; জীমান অনিল গান্ধী, সোরাট্র; জীমান জগদীশ, গুজরাট; জীমান বতীন্দ্র, গুজরাট; কুমারী জ্যোতিকা প্যাটেল, নাগপুর; জীমান প্রকাশ মিশ্র, বেনারস; জীমান গৌতম এইচ ভাট্টা, কলকাতা; সমবেত পরীনুতা—বিহার ও উড়িষ্যা; কুমারী হৈমন্তী শূকলা, কলিকাতা; জীমান সুরজ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা; জীমান সুপ্রকাশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; জীমান বাণী লাহিড়ী, কলিকাতা; কুমারী ব্রজতী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; কুমারী কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; কুমারী অনিন্দা রায়চৌধুরী, কলিকাতা; কুমারী বীপালি রায়, কলিকাতা; জীমান গৌতম মিশ্র (কলিকাতা) প্রভৃতি।

মুদ্রা ও চিত্র সহযোগে নাচ শিখিবার পুস্তক

১৮৮৯ ইতিকথা ১ম খণ্ড ২৥০

শ্রীপোপী ভট্টাচার্য ও শ্রীদেবপ্রসাদ বসু প্রণীত

বঙ্গান্নিক উপায়ে দৌড় শিখিবার পুস্তক

গোড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি ১৥০

শ্রীপদানন গাঙ্গুলী প্রণীত

চাকা ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী

৫ নং ভায়াচরণ মে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

## রেকর্ড পরিচয়

শীতের মরুতমে গানের আসর জমে উঠেছে। অসিতে-গলিতে জলসা, ইচ্ছল-কলোজে জলসা। গান যিনি চান তিনি তা পাচ্ছেনই, যিনি চান না তিনিও নিষ্কার পাচ্ছেন না। এবার আবার আসন্ন নির্বাচনের ঘুম পড়ছে, মহড়ার পাড়া গরম এবং নির্বাচনী বক্তৃতায় সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্কঠানে গান-বাঁজনাও এসে পড়ছে। তালাই, যে তরফেই হোক, জনসাধারণ বিনাভেৎ হরিনামের মতো যদি কিছুকণ নির্দোষ গান-বাঁজনার আনন্দ পায়, সেটা সব দিক দিয়েই ভালো। কিন্তু ধীরে ধীরে কইনে বান না, ভীষণ উপবাসী থাকবে না। ভীষণে ভক্তও বাসে বাসে নতুন গানের পন্থা বের হচ্ছে। "হিক ব্যাটল কয়েন" ও "কলকিত" বেকর্ডের জালিকার প্রথম প্রদর্শন

সব গানও বেবোর, বা সত্যি সঙ্গ্রহ করে রাখবার মতো এক নিত্য-নতুন প্রতিভার সাক্ষ্য যতো না মেলে, প্রতিষ্ঠাবানদের নতুন নতুন সৃষ্টির কিছু কমতি নেই। এখানে আমরা নতুন প্রকাশিত রেকর্ডের বিবরণ দিচ্ছি।

### হিজ মাস্টার্স ভয়েস

স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র দেব সার্বক শিষ্য ও উত্তরসাধক তলীর ভাতৃপুত্র মান্না দে বোঝাই-এর চিত্তজগত গানে গানে মাংগ করেছেন। বাংলা গানে তাঁর সর্বাধুনিক দান—“তীর ভাঙ্গা ঢেউ” এবং “তুমি আর ডেকো না” সত্যি উপভোগ্য হয়েছে।—N 82724. সনৎ সিংহের নতুন আধুনিক গান—“তোমার সিঁথিতে সিঁদুর” এবং “নুপুর বাজারে পারে” স্বর-লালিত্যে ও কঠমাধুর্যে চমৎকার। স্বর দিয়েছেন সিলীপ সরকার।—N 82725. পরম্পরাগত বাংলার প্রাণের জিনিষ। নির্মলেসু চৌধুরী তাতে মিশিয়ে থাকেন অন্তরের দরদ, তাই তো বিদেশে ধরেও তিনি অশেষ বশ অর্জন করে এসেছেন। তাঁর নতুন গান—“তোমার লাগিয়া রে” এবং “আমার সাধের নাও”।—N 82726.

### কলহিয়া

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে বাংলা গান, স্বরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্ভব করেছেন এবং সত্যিনাথ মুখোপাধ্যায়ও সেই হৃদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, এবার ফলও হয়েছে আশাতীত সুন্দর। গান দুটি—“আকাশ-প্রলীপ জলে” এবং “কত নিশি গেছে”—সবাইই ভালো লাগবে।—GE 24813. রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড উপহার দিয়েছেন সমরেশ রায়। গান দুটি—“গুণো আমার চিব-অচেনা” এবং “মোর স্বপনভরীর কে তুই নেবে”।—GE 24814. ইরা মজুমদার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই শুধু বশবিনী নন, আধুনিক গানেও তাঁর বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নতুন আধুনিক গান—“লোলে ঘন লোলে রে” এবং “রূপালী জ্যোত্স্নার” অশ্রু মাধুর্যমণ্ডিত।—GE 24815. “শিল্পী” কথাটিরই গানগুলি গেয়েছেন গীতঞ্জী কুমারী সঙ্গীত মুখোপাধ্যায়—“নুপুরের গুঞ্জন” এবং “তুমি যে আমার”।—GE 30346. গায়ত্রী বসু—“কমবয় কমবয়” এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য—“বুঝে রে তুমি বিহনে”।—GE 30347. ‘বুম্’ বাণীটিরই গান—“এ কি উত্তরোল” এবং “বুম্ বুম্ বুম্” গেয়েছেন যথাক্রমে—গীতঞ্জী কুমারী সঙ্গীত মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।—GE 30345. ‘নিউ দিল্লী’ চিত্রের গান—“চিঁচি বরবি” এবং “তুম্ সঙ্গীত” ব্লাইওনেট বাজিয়েছেন—অমর সিং বড়া।—GE 25833.

### আমার কথা (২৪)

#### বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

গল্প-প্রবাসী কৃতী বাঙালী সন্তানদের মধ্যে পথম প্রজন্মের সঙ্গীতরচক হতে হয় পরলোকগত বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নাম। সংস্কৃতির প্রতি অশ্রুনির অম্বরূপ এঁর মধ্যে ছিল পরিপূর্ণরূপে বিস্তারিত। পিতার উচ্চ আদর্শের বেশ পূরনেরও বাজিয়ে তোলে। তারাত পিতার আদর্শকে খোঁজে নেবার চেষ্টা করে। সকলও হয় জীবনের পথ চলার

ক্ষেত্রে। স্বরশিল্পী জীবীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—বীরেন্দ্রচন্দ্রেরই এক পুত্র। বংশের গৌরববর্ধক। বংশস্বর্ধার প্রতি পূর্ণমাত্রায় প্রদানীল। আপন সাধনায় আত্মহারা।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বীরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় কলকাতা সহরের আহিরীটোলা অঞ্চলে। বালাশিক্ষা গয়ায়। প্রবেশিকা অবধি। তারপর কলকাতায় এসে মিত্র ইনস্টিটিউশান (মেন) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হন উত্তীর্ণ। সেট পলস্ থেকে আই-এস-সি। বিভাগাগর থেকে বি-এ। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় এম-এ ও আইনশাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ। সেব অবধি এম-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠল না। তবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। সঙ্গীতের প্রতি অম্বরূপ বীরেন্দ্রচন্দ্রের একলার নয়। বাড়ির সকলেরই ছিল। গুচ্ছজনদের সঙ্গীতপ্রীতি শৈশব থেকে প্রভাব বিস্তার করে বীরেন্দ্রচন্দ্রের মনে। আপন মনে বালক গান শুনে যায়। আত্মমগ্ন হয়ে যায় সঙ্গীতের স্বরবন্ধারে। প্রবল হয়ে ওঠে সঙ্গীতের আকর্ষণ। বাড়ীতে আপত্তির প্রাবল্য ছিল না—তা হলেও একেবারে জীবনের প্রারম্ভে সামনে পড়ে আছে বিভাগয়ের—মহাবিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ। হু’ নৌকায় পা দিয়ে যে সব একাকার হয়ে বাবে—এই মর্মে একটু আপত্তি বাড়ী থেকে উঠেছিল। কিন্তু এই সমস্ত আপত্তি নিফল হয়ে গেল একজনের প্রতিবাদে। দৃষ্ট প্রতিবাদ। তিনিই বললেন, নিষ্ঠা থাকলে হু’টো কাজই (অধ্যয়ন ও সঙ্গীতচর্চা) একসঙ্গে চলতে পারে। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং নৃপেন্দ্রচন্দ্র। বীরেন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন গয়ায় দেশবরণ্য স্বরসাধক হুম্মান দাসের কাছে। বীরেন্দ্রচন্দ্রের বয়স তখন আট। তখন থেকেই হুম্মান দাসের কাছে লাভ করতে থাকলেন হুঁদী-ধ্রুপদ-খেয়াল-টরা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা। বত দিন ওস্তাদজী জীবিত ছিলেন তত দিন বীরেন্দ্রচন্দ্রকে তিনি লাম



বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

করে গেছেন তাঁর শিক্ষা। হুম্মান দাস সবচেয়ে কিছু বলা এখানে আবশ্যক। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তখন হুম্মান রাজপুতানার নিজগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পিতার সঙ্গে। নানা দেশ ঘুরে তাঁরা গয়ায় আসেন। প্রথা অনুযায়ী গয়ায় স্তব্ধ দানের সময় পাণ্ডুরা কিছু দানের পরিবর্তে গয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করতে তাঁদের অনুরোধ করে। তাঁরা রাজী হন। এবং স্তব্ধ দানের জায়গায় এই সত্যে তাঁরা বদ্ধ হন। সেই থেকে তাঁদের গয়ায় বাস। স্বা-সমীতে হুম্মান দাস জীবনে প্রচুর ছাত্র পেয়েছেন, কিন্তু কঠিনসমীতে সারা জীবনে জন পাঁচেকের বেশী পান নি। বলা বাহুল্য, বীরেন্দ্র-চন্দ্রই তাঁর শেষ ছাত্র। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জীবনের একটি শতাব্দী ও আরও একটি বৎসর অতিক্রম করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন হুম্মান দাস। মৃত্যুকালে বীরেন্দ্রচন্দ্রকে বলে পেলেন—আমার ইচ্ছা—জীবনে তুমি আর বিত্তীয় ব্যস্তির শিখার গ্রন্থ না কর—আমি যা দিয়ে গেলুম এই নিয়েই চর্চা কর, সারা জীবনে তুমি শূন্যতা অনুভব করুনও করবে না। স্তব্ধ অস্তিত্ব আদেশের পূর্ণ মর্যাদা দিতে শিখা বিদ্যুতের কার্পণ্য করেন নি।

ফিরে আসা বাক আবার বীরেন্দ্রচন্দ্র। ওকালতি শুরু করলেন। ভালো লাগল না—মনের খোঁরাক পেলেন না বীরেন্দ্রচন্দ্র এই সত্য-নিষ্ঠার মায়াজালের মধ্যে। যুদ্ধ লেগে গেছে। ভারতবর্ষের ঐক্যবান জীবনধারাকে ক্রমশঃ ছাড়খার করে দিচ্ছে বিত্তীয় মহাযুদ্ধ। আকাশে-বাতাসে শুষ্ক মৃত্যুর সঙ্কেত, ধ্বংসের হাতছানি, প্রলয়ের ঐক্যভাষ্য। ছেড়ে দিলেন ওকালতি। ঠিক এমনই সময়ে ১৯৪১ খৃঃ দেবকীকুমার বসু এঁকে আহ্বান করলেন ‘স্বরণসে শ্রবণ দেশ হামারা’ চিত্রে কঠিনদের জন্তে। এর পর দেবকীকুমারের ‘মেঘদূত’ চিত্রেও কঠিনদের জন্তে আহ্বান এলো। সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন সঙ্গীতি পরলোকগত অল্পম যতক। তখনকার দিনের আর একজন খ্যাতিময়ী গায়িকা স্বর্গীয়া শৈল দেবীকেও আহ্বান করা হয়েছিল কঠিনদের জন্তে। কিন্তু এই ছবির চিত্রগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পর আরও কিছু কাল বাবে দেবকী বোসেরই পরিচালনার এই ছবির পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। এবারে কমল দাসগুপ্ত পেলেন সঙ্গীত পরিচালনার ভার। কঠিনেরই ছিলেন জগন্নাথ বসু। অর্থাৎ আপনারা যে মেঘদূত দেখেছিলেন তাতে জগন্নাথ বসুরই গায়ী ভূমিকাভিলা, বীরেন্দ্রচন্দ্রের শোনে নি। কয়েকটি গায়কিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র। তার মধ্যে কঠিন দেবী অভিনীত পথ বেঁচে দিল (পরিচালনা প্রমোদে ফিল্ম), হিন্দী রাজলক্ষ্মী হিন্দী বনফুল, (এই ছবিটির নির্মাণের মূলে ছিলেন যুগলবো এন-টি-পি-এন-রায় ও কানন দেবী), দ্ব্যাজ সুখোপাধ্যায়ের অলকানন্দা (পরিচালক রতন চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেবেক চিত্রে দেবকী বাবুর অনুবোধে বীরেন্দ্রচন্দ্র স্বরারোপ করেন। আনুমানিক ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান সঙ্গীতের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে যান হিন্দুস্থান বার্কডে। সেই থেকে বার্কডে-সঙ্গীতে বীরেন্দ্রচন্দ্রের পরিচিতি। আজ সববি বীরেন্দ্রচন্দ্রের গাওরা প্রায় সত্তর-আশীখানি বার্কডে বাজারে গাওয়া যায়। নানা সঙ্গীতসম্মানে ও উপস্থিত প্রোত্বেষকে পরিভূষিত

দান করেছেন বীরেন্দ্রচন্দ্র তাঁর গান শুনিতে। অমৃতানন্দিতে বীরেন্দ্রচন্দ্রের বোগদানের মূলে ছিলেন বিখ্যাত ব্যাটলি বগীয়া নিমাই বোসের ভাইশো বালী জাঙ্গারের যুগ্মসঙ্গীতসম্মানে বিশেষ পরিচিত শব্দ বহু (ননী বাবু) মহাশয়। ঠনি নিজে রাজ্যতেন এপ্রাজ। বীরেন্দ্রচন্দ্রের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ঠনি বীরেন্দ্রচন্দ্রকে তুলে ধরলেন জনসাধারণের সামনে। শিল্পীর শিরোদেশে ঝরে পড়ল বিখ্যাতার আশীর্বাদ।

আজকের সঙ্গীত-জগতে নানারকম গানের হেতু প্রাণ কহার তিনি বলেন, সেদিন যা ছিল সাধনার বস্ত্র, আজ তা ব্যবসার সামগ্রীতে পরিণত। তাই সেদিনকার শিল্পীদের যে ঔদার্য ছিল আজকের শিল্পীদের মধ্যে তা লেশমাত্র নেই। আজকের দিনে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি মনের আন্তরিকতাকেও অবলম্বন করে দিয়েছে; নবীন শিল্পীদের এ জগতে প্রবেশ সবচেয়ে জিজ্ঞাসা কহার উত্তর আসে তাদের বাধা প্রচুর। এখন শুধর মাননগে তাদের আগমন হয় না সুপ্রাণিদের প্রাবল্যই তাদের এ জগতের প্রতিষ্ঠালাভের প্রধান সহায়ক। তবে এর উল্টো দিকও আছে, এখন শেখার সুরিষে ঢের বেশী, তখন কেউ দয়া করে শেখাতে রাজী না হলে শেখার সুরিষে কোনমতেই সম্ভব হত না। বর্তমানে সঙ্গীতের নানা বিভাগের মহাবিশ্বালায়ের সৃষ্টি হয়েছে, স্তব্ধা শিক্ষালাভের অনুরোধ বহুলাংশে এখন দূরীভূত হয়েছে। যোগাযোগের সঙ্গে এখন কাজী নজরুল সঙ্গীত সেই সময় তিনি বীরেন্দ্রচন্দ্রকে আহ্বান করেন নানা অপ্রচলিত রাগে গানে সুর দেবার জন্তে। বীরেন্দ্রচন্দ্র এগিয়ে এলেন। নজরুলের কথা ও বীরেন্দ্রচন্দ্রের সুর। সে জিনিষের তুলনা হয় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও পদাবলী কঠিনেরও যথেষ্ট তত্ত্ব-প্রদা আছে বীরেন্দ্রচন্দ্রের। বাড়ীতে নিয়মিত শিক্ষা দান করে থাকেন বীরেন্দ্রচন্দ্র। বীরেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জীবিতাস দাশগুপ্ত, জীমতী কুমা বসু (বর্তমানে দত্ত), জীনিবাপদ সুখোপাধ্যায় ও অপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী জীমতী সিন্ধা মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। বর্তমানে বীরেন্দ্রচন্দ্রের একটি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা আছে—এই গ্রন্থে আজকের দিনের সঙ্গীত-জগতে গলাদ ও তা অতিক্রম কহার পথ নিয়ে পের একটি ‘অচিহ্নিত চিত্র কুটিলে’ তোলার আশা আছে শিল্পী বীরেন্দ্রচন্দ্রের।

জিজ্ঞাসা করি, বর্তমান দিনের সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারকরে, কার কার অবদান আপনি বিশেষ ভাবে মরণ করেন—বীরেন্দ্রচন্দ্র বলেন, রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি—স্বরজিগিরি মাধ্যমে কথার মহিমায় সঙ্গীত-শাস্ত্রকে তিনি কোথা থেকে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভেবে দেখুন। এই প্রসঙ্গে আর এক জনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সঙ্গীতের জগতেই থাকে বিখ্যাত। পাঠিয়েছিলেন এই পাখি মরজগতে, সারা পৃথিবীর মাথখানে দেশীর সঙ্গীতকে যিনি বাসিয়ে গেছেন সীর্ঘহানে, আমাদের সঙ্গীতের গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি পেতেছে বীর কুপার—সঙ্গীতক্ষেত্রে আজও যিনি একক, অবিভীত, অনন্তসাধারণ— তাঁর নাম সঙ্গীতনায়ক রাজা তার শৌর্যমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশিল্পবিভাগার ‘মিউজিক (অজান), এক, আর, এস, এল (লগুন)।

উদ্দেশ্য যাঁদের সাধু, দর্শক তাঁদের সহায়—সাধুবাদে মুখরিত

ভারতীয় নিবেদিত  
রবীন্দ্রনাথের

# কাল্পিত্তা

সংলাপ পরিচালনা সহীত  
গ্রেসেজ মিত্র তপন সিংহ রবি শঙ্কর

ছায়াবাণী রিলিজ



রূপবাণী : অরুণা : ভারতী-তে চলিতেছে !





নবজন্ম

পল্লীগ্রামে একটি সাধারণ পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্প। মিথ্যা সন্ধে ও যুক্তিহীন আশঙ্কা শুধু নিজেকেই নৈরস, সারাটি পরিবারকে কতখানি কতিগ্রস্ত করে, তারই একটি ইঙ্গিত পাওয়া বাবে 'নবজন্ম' ছবিতে। দেবকী বসু পরিচালিত 'নবজন্ম'-এর কাহিনী রচনা করেছেন স্বনামধন্য লেখিকা আশাপুর্ণা দেবী। শশধর এক বৈশিষ্ট্য গৃহস্থ, সসারের তার স্ত্রী বাসন্তী, বোন সুধামুখী, ভগিনীপতি গৌরাজ, ভাগিনা বাবল ও মা বর্ভমান। গৌরাজ গাইরে লোক, প্রাণখোলা আত্মা, বাসন্তীর মনের সঙ্গে পাওয়া যায় তার মনের ঝিল। পরস্পরের মধ্যে ভাই-বোনের মত একটি নির্ভল মেহ বর্তমান। শশধর সন্ধিচিন্তিত, ইচ্ছন জোগায় তার মা। সসারের দ্বন্দ্ব নিত্য কলহের ভাবে বিগুণ্ডলায় অবির হযে ওঠে বাসন্তীর মন। রনান্নায়নের মেলায় গ্রামগুচ্ছ লোক জাচ্ছে, বাসন্তীকে যেতে দেবে। শশধর, পাচ্ছে তার ছীকে অন্তে কেউ দেখে ফেল। হাঁপিয়ে ওঠে। বাসন্তী, গৌরাজ বাসন্তী হয় তাকে মেলা দেখাতে নিয়ে যেতে-ভবে। বক্রাকালে শশধর ধরে ফেলে। প্রহার করতে যায় বাসন্তীকে, বাবা দেব গৌরাজ, শেষে শশধর পড়ে যায়, শশধর নিহত হয়ে গেলে গৌরাজ ভয়ে পালায়। তারপর অনেক ঘটনা, গায় কিরে আসে গৌরাজ—শশধর ততক্ষণ বুঝতে পেরেছে নিজের ল, বাসন্তী তখনও রোগশয্যায় শাহিতা, ভোয়ের আবির্ভাবের ল বাসন্তী ওঠে সেরে। তারপর মধুরেণ সমাপ্ত। নগরজীবন গল্পে সম্পূর্ণ বর্জিত—তাতে ছবির গৌরব বা বস্তু্য কিছুমাত্র থব হয় নি। খুব উঁচুসরের বা বিশেষ বকরের কিছু না হলেও ফলস্বর্কে অনারাসে 'ভাল ছবি' আখ্যা দেওয়া যায়। তবে ছবির যে দেখতে পাচ্ছি, শশধর সত্যের স্বরূপ চিনতে পারলে, কিন্তু য় মায়ের কি হল, তিনি কি করু'র যে উবে গেলেন? ছবির শেষে উপস্থিতির যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যে যিধবা জমিদার-বাড়ীতে গৌরাজ অভিধি হল সেখানে জমিদার-বহুর সামনে জলি মেয়ের পূর্বব্ব করা, আড়ি পাতা ও ঐ জাতীয় রসিকতা গাঅ অসোক্ত।

পরিচালক অভিনেত্রীদের ভঙ্গসজ্জার দিকও বর্জিত পরিচালন দৃষ্টি নি। পরীক্ষাক্ষণ ভাবের বলে না দিলে ভাবের প্রমোই যায়

না—এ বেন পরীগ্রামে শিকনিক করতে গিয়ে কোন অভিজাতবংশীর শহরে হাছিল হাতে একটি বলসী নিয়ে পাড়িয়ে পড়লেন প্রেক ছবি তোলাবার জন্তেই। অভিনয়শে প্রাণভরা অভিনন্দন পাবেন জহর গল্পোপাখ্যায় ও অভিত বন্দ্যোপাখ্যায় তাঁদের মর্যস্পর্শী অভিনয়ের জন্তে। নায়ক উত্তমকুমারও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অক্ষততা মুখোপাখ্যায়, সারিত্রী চট্টোপাখ্যায়, মিতা চট্টোপাখ্যায়, নিতাননী দেবী, তুলসী লাহিড়ী, জুপেন চক্রবর্তী প্রভৃতিরকেও ভালো লাগবে।

## কাবুলিওয়াল

বহদিন বাসে আশাতীত আনন্দের খোরাক নিয়ে দেখা দিল কাবুলিওয়াল। এ কাহিনী বেন কালি দিয়ে বা কলম দিয়ে লেখা নয়। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সের 'মধ্যে বহটুকু পিতৃহের অধিকারী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সবটুকুই বেন উজাড় করে তার রস নিয়ে দিয়ে সেই পিতৃহ রস দিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরদত্ত শক্তির পরিচয় দিতে যাওয়া দৃষ্টতারই নামান্তর। তাঁর সেই অসামান্য শক্তির পরিচায়ক কয়েক পাতার মধ্যে চিশিষ্য কাবুলিওয়ালকে পর্দার মধ্যে সকলের সামনে নতুন করে তুলে ধরলেন তপন সিংহ, তাতে রস জোগালেন চারুচন্দ্র, অতিরিক্ত সলাপ দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—আর তাকে জীবন্ত করে তুললেন কয়েক জন শক্তিশালী শিল্পী। শ্বরের স্বভাবে তাকে ভরিয়ে তুললেন রবিশঙ্কর, সমস্ত কাহিনীটিকে আলোকচিত্রে ধ'রে রাখলেন অনিল বন্দ্যোপাখ্যায়। এই কাহিনীর বিশ্ববস্তুর নিখালনই তো অপরূক মণ্ডিত—যে কাবুলিওয়াল বলাতে বাজালী চিরদিনই বোঝে এক করুণ রুক্ষতার হিং-বিক্রোতা, টাকা ধার দিয়ে যারা বাজালীর বুক ছুরি ঢালাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে, 'লুবি দেও, লুবি দেও' শব্দে যারা হুংপিও পর্বন্ত কীপিয়ে তোলে, তাদেরই মধ্যে কবিশঙ্কর খুঁজে পেলেন 'রহমৎকে। মিনির সঙ্গে রহমতেরই পরিচয় হল—অন্ত কোন প্রদেশের লোকের সঙ্গে হ'ল না—হ'ল কাবুলের রহমতেরই। এই রহমৎ মিনির মধ্যেই দেখতে পেল তার মেয়ে রাহেমাৎকে। মিনিকে যেওয়া 'সে সওয়া করতে দেয় না' মিনিকে 'খোখী তুমি স্বত্তরবাড়ী ধাবে?' বলে মিনিকে সে আরও আপন করে নেয়—রহমৎকে দেখে কবিশঙ্কর মনে কাবুলিওয়াল। বলে মনে হয় না, মনে হয় 'মেয়ের বাপ'। যা তিনি নিজে। সেখানে আর কোন ভ্রোভেল-নেই, সেখানে উভয়েরই পিতা।

'কাবুলিওয়াল' কাহিনী কারোই অপরিচিত নয়। কাহিনী সবচেয়ে আর বিস্তারিত বলার কিছু নেই। এ ছবি রঙ্গ সমাজে যে সবিশেষ সমাদর লাভ করবে এ বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। তবে ১২৯১ সালের ঘটনার মধ্যে আঃ ১৩৪৫ সালে লেখা 'বর বাহর বর বোসে' গানটি দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল, এ হাদোপবোধী গান কবিশঙ্করই লেখা তার আগেও হয় নি কি? সেই গানগুলি তো পাওরানো যেত। রকের উপর এ জাতীয় বিজিরাহুটানের বেওয়াজ পর্য্যাপ্তি বছর আগে ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সলাপ এত হ্রসিপুণ হয়েছে তা সত্যিই বিশ্ববর, অভিনয়শে অবিরমণীর কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখে গেলেন ছবি বিখাল। শিল্পাচার্য পদমেজনারাধর প্রসোদী সিং ঠাকুর অসামান্য কল্পতার পরিচয়



দিয়েছে এই ছবিতে, তাকে প্রাণভরা অভিনয় জানাই।  
দাশমোহন ভট্টাচার্য, মধু দে, জীবন বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়,  
করালী দেবী, বীরাজ দাস, অতুলকুমার, দেবী নিয়োগী প্রভৃতির  
অভিনয় ভাল হয়েছে। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
মর্মস্পর্শী অভিনয় দর্শকমনে বখেঁচ পরিমাণে রেখাপাত করে

## রক্তপট প্রসঙ্গে

বাঙলা-সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য-ভ্রমতে নজরুল ইসলাম  
নিজেই একটি অধ্যায়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে সাহিত্য-ভ্রমতে  
একটি পরিবর্তনশীল সময়ে আবির্ভূত হয়ে বাঙলার কাব্যে নতুন  
করলেন এক নতুন ধারা। বিঘাতার ইচ্ছার  
সেই চিরগঠনোন্মুখ লেখনী আজ পনেরো  
বছর প্রায় শুষ্ক হয়ে গেছে। সশরীরে  
নজরুলকে দেখেও যেন মনে হয় তিনি নেই।  
যেমে গেছে আজ সেই লেখনীর অশাস্ত  
গতিবেগ। আজ হিমালয়কে নতলির হতে  
কেউ আশেপাশ জানাচ্ছে না। শ্রামি মায়ের  
কোলে বসে শ্রামের নাম জপ করারও বাসনা  
কারোর মধ্যেই জাগছে না। বাঙলা ও  
বাঙালীর পক্ষে এ বড় করুণ মর্যাদিক  
আঘাত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায়  
দু' হাজার ফুটের মধ্যে কবির একটি প্রমাণ্য  
জীবনীচিত্র তুলতে মনস্থ করেছেন। এতে  
কবিকেও দেখা যাবে। কবির পরিজন-  
বর্গকেও দেখা যাবে। সরকারের এই  
প্রচেষ্টায় দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হবেন।  
এই উত্তম সর্কার্দীন ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক  
কামনা করি। \* \* সাহিত্যের দরবারে  
সম্ভাবকুমার ঘোষের নাম সুপরিচিত।  
তার 'কিছু গোয়ালার গলি'র নামও অপরিচিত  
নয়। এই কাহিনীর চিত্রায়ণে একটি প্রতিষ্ঠান  
হাত লাগিয়েছেন। \* \* অভিনেতার খ্যাতি  
অর্জন করার অনেক আগেই লেখকের খ্যাতি-  
লাভে সমর্থ হয়েছিলেন বিকাশ রায়। তারই  
রচিত ও পরিচালিত 'তানিটোহিরাম'এ  
বেশতো পাণ্ডুরা যাবে পাহাড়ী সাজাল, অনিত-  
বরণ, রবীন মল্লিকার, ভাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়,  
বাবলা-খ্যাত নীরেন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যামঙ্গী  
দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপস্বী ঘোষ এবং  
অন্য বিকাশ রায়কে। \* \* গোলকালারে  
গৃহীত পূর্ণ সৈধ্য শিল্পচিত্র 'বর্ণনপূরী'র মুক্তি  
আসল। কুমার সরকারের পরিচালনার এতে  
অভিনয় করেছেন—শ্রীমান বিজু, শ্রীমান  
ভান্ডল, শ্রীমান অলোক, অমলি দেবী, অনীতা  
ভট্টাচার্য, সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপী  
গাঙ্গুলী, বিভাবতী দেবীও একটি বিশেষ

ভূমিকায় উৎকল বসু। সঙ্গীত পরিচালক ও চিত্রকল্প  
লেখা যাবে যথাক্রমে নচিকেরা ঘোষ ও নিমাই রায়কে। \* \*  
প্রবীণ পরিচালক কলী বর্ষার আগামী নিবেদন 'ইন্ডিয়ান'।  
নচিকেরা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনার দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস,  
জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, জহর  
রায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান বিজু, দীপ্তি রায়, তপস্বী ঘোষ,  
বেণুকা রায়, অপরূপা দেবী প্রমুখ শিল্পীদের। \* \* দেবকী বসুর ভাগন  
কুমার ঘোষ পরিচালনা করছেন 'ভাঙন' ছায়াচিত্রটি। এতে রূপ  
দিয়েছেন—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, মধু দে,  
প্রণতি ঘোষ, অরুণভাট্টা মুখোপাধ্যায়, তারতী দেবী, নবাপ্রভা শীলা

## শুভমুক্তি শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারী !

মিলনের মধুরাতে মধুমালতীর জীবনে এলো ঝড়, তারপর ?

কাবেরী বসুর শেষ অভিনীত



হুমিকালম্ কাবেরী অডি-বসন্ত জয়ন্তী-নীতিশ-অমর-নমিতা-ভান্ডল ও ক.সি. মে  
ভান্ডল  
পরিচালনা  
অমলি  
এম. এমিড  
যমুনোদ্ধার • নীরেন নাথিড়ী • কমল দাসগুপ্ত • সন্ধ্যা • প্রভুনা • এ. কমানন

— একযোগে —

বন্ধু : বীণ : অঞ্জন : আলোছাত্রা

বোধ প্রভৃতি। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন অনিল বাগচী। \* \* বেণু দাস পরিচালিত 'শ্রীমতীর সংসার' অচিরেই বোধ হয় মুক্তিলাভ করছে। অভিনয়গণ আছেন—বীরাজ ভট্টাচার্য, বিমানবন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, নবাগত পার্বতী চৌধুরী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গুণ্ডা রায়, নবাগত শ্রীতি দাস ইত্যাদি। একটি বিশেষ ধরনের ডুমিকার দেখা যাবে বাঙলার এক অসামান্য শক্তিময়ী অভিনেত্রী চণ্ডাবতী দেবীকে।

### সুন্দরার বেতার নাট্য

৬ই পৌষ—অম্বপালী। কাহিনী মুবারি সেন, প্রযোজনা ও পরিচালনা এইচ-এম-ভি। ১৩ই পৌষ—নাইন আশ। কাহিনী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সরল গুহ। রূপদানে শৈলজানন্দ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, জয়ন্ত চৌধুরী, সুরধীর সরকার ও অমৃতা গুপ্তা। ২০শে পৌষ—রূপকথা। কাহিনী ও পরিচালনা শৈলজানন্দ, নাট্যরূপ অনিল চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ বোষ, প্রমোদকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্র বোষ ও শোভা সেন। ২৭শে পৌষ—বঙ্গীকরণ, কাহিনী কালিকানন্দ অবস্থান, নাট্যরূপ—কিত্তি মুখোপাধ্যায়, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপদানে মিহির ভট্টাচার্য, পবিত্র মিত্র, প্রমোদ বসু, প্যারিজাত বসু, রঞ্জন বোষ, অজিত সেন, নিত্যানন্দ বসু, পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, মধু মুখোপাধ্যায়, শ্রামল বোষ, নমিতা দেবী ও তপস্বী বোষ। আগামী ২১শে পৌষ থেকে ৫ই মাঘ পর্যন্ত বেতার-সপ্তাহ পালিত হবে। এই সাতটি দিন সাতটি নাটকের অভিনয় হবে। আগামী সন্ধ্যায় এই বেতারসপ্তাহের বিস্তৃত আলোচনা থাকবে।

### চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

উদীয়মানা শিল্পী শ্রীমতী সুরা সেন

শ্রীরমেশকৃষ্ণ গোস্বামী

একঘেয়ে জীবন-যাত্রা থেকে মুক্তি চেয়েছিলুম এবং সে মুক্তির পথও পেলুম এক দিন ঘটনাক্রমে। বললেন উদীয়মানা শিল্পী শ্রীমতী সুরা সেন। অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের কন্যা ও বধূ হিনি। কথা শুনে আমি বিশ্ব প্রকাশ না করে গাথলুম না।

শ্রীমতী সুরা হরতো বুঝলেন আমি কি ভাবছি। তাই তাঁর পাশেকার কবায়ী রেশ টেনে বলতে থাকেন—সত্যিই, মুক্তিই চেরেছিলুম আমি। জীবনের একঘেয়েমি আমার মোটেই ভাল পাইছিল না, পরিবর্তনের দাবী সে জন্মেই উদগ্রহ হয়ে উঠছিল দিন দিন। পূর্বেই বললুম—মুক্তির পথ এসে জুটলো ঘটনাক্রমে এবং পথের দিক দিয়েই সিনেমা-জগতে আমি এসে পড়লুম। বলতে কি, লাইনে আসবো পূর্বে এরূপ কোন কল্পনা বা পরিকল্পনাই আমার মনে না—এ ছিল সত্যি আমার স্বপ্নেরও বাইরে।

এ ঘটনাক্রমে কি জানতে-চাইলুম আমি, অল্পকাল বিশ্ব-আগ্রহের মত। কোনরূপ বিধা না করেই শ্রীমতী সেন বললেন—আমি জীবনের একটা পরিবর্তনের পথ খুঁজে চলেছি, এমনি একটি বড় এক পাটিতে মধু বাবু (বনামধ্যত পরিচালক মধু বসু)



শ্রীমতী সুরা সেন

সঙ্গে হ'লো আমার দেখা। তিনিই আমাকে সিনেমায় যোগদানের পরামর্শ দিলেন এবং প্রেরণাও জোগালেন নানা ভাবে। জীবনের একঘেয়েমি থেকে এমনি আমি অব্যাহতি খুঁজে পেলুম।

শ্রীমতী সুরা এ লাইনে এসেছেন খুব বেশী দিন নয়। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের প্রতি তাঁর মমত্ব ও দরদ অত্যন্ত গভীর বলেই নাম ছড়িয়ে পড়েছে এরই ভেতর। পর্দায় তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন মধু বোসের 'সুতলায়' ছবিতে। বিখ্যাত পরিচালক হুশীল মজুমদারের 'দানের মর্যাদা' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ডুমিকার ইনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সিনেমা সম্পর্কে শ্রীমতী সুরার ধ্যান ও ধারণা লম্বকে জানাবো বলেই সেদিন গেছলুম বালীগঞ্জে তাঁর বাসভবনে। আলোচনা চলায় হু'জনায়—আমার বা জানাবার জেনে নিলুম এরই ভেতর থেকে।

আমার একটি প্রশ্নের উপর শ্রীমতী সেন বললেন—সিনেমা লাইনেই আসবো ধারণা না থাকলেও নাচের প্রতি আমার বৌক ছিল বরাবর। স্কুল ও কলেজ-জীবনে বহু শো'তেই আমি নেমেছি এবং প্রংশসাও জুটেছিল কম নয়। আই. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার 'বে' হয়ে এবং আমি পুরোপুরি সঙ্গারী হ'য়ে পড়ি।

—ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্তন এসেছে কি?

নিঃসঙ্কোচে উত্তর করলেন শ্রীমতী সুরা—না, আসেনি। আসবার কারণ ছিল কোথায়? চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে ছিল না বটে, কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগ বলতে পারি বহুদিনকার। আমার দাদা শ্রীঅসিত সেন একজন কিশোর ডিরেক্টর এবং আমার বাম্পী নিজেও একজন চিত্রপ্রযোজক। এ সকল কারণে সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমার কেনে পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

—আপনার বিশেষ কোন Hobby বা খেলা আছে কি?

—বিশেষ Hobby বা খেলা বলতে আমার যেটাই আছে সেটি একটু বিচিত্র ধরণের। নিজ হাতে রান্না করে লোক খাওয়ান—এটি আমার খুব ভাল লাগে এবং এটিকেই আমার বিশেষ হবি বলতে পারেন। খেলাধুলার ভেতর ফুটবল খেলাটাই আমি বিশেষ পছন্দ করি। সাধারণ খেলা খুঁসির ভেতর বই পড়াও আমার একটা অভ্যাস। বই-এর ভেতর ভ্রমণ কাহিনী, ডিটেকটিভ এ সবই আমার বিশেষ ভাল লাগে। ভাল বই হলেই আমি পড়ে থাকি। সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ার অভ্যাসও আমার রয়েছে। মাসিক বঙ্গবন্ধু আমি খুব ভালবাসি। অপর দিকে পোষাক পরিচ্ছদের বেলায় রুচি-সম্মত জমকাল পোষাকই আমার পছন্দ, এটুকু বলতে পারি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামতই বা কি?—জ্ঞানতে চাইলুম আমি।

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন শ্রীমতী গুরা—প্রথমতই চাই হয় চেহারা মানানসই গঠন কাঠামো। সে সঙ্গে অবশিষ্ট চাই অভিনয় দক্ষতা, কণ্ঠস্বর, আত্মবিশ্বাস ও চেষ্টা। প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠাবর্তী শিল্পী হ'তে হলে একটু গুণের সমাবেশ না হলেই নয়। সর্বোপরি চাই একনিষ্ঠ সাধনা ও শিল্পের প্রতি অপরিসীম দরদ, এ বোধ হয়

না বললেও চলে। শিল্পীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও কড়া নজর রাখা অত্যাবশ্যক। স্বাস্থ্য নষ্ট হ'লে না থাকলে আর সকল গুণ থেকেও কিছু হয় না—অর্জিত সাফল্য স্বাস্থ্যের মর্যাদা থেকে আপনি বঞ্চিত হন।

—চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী, বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এ প্রশ্নটির উত্তরদান কালেও শ্রীমতী সেনের কণ্ঠ দেখলুম বেশ জোরালো, তিনি স্পষ্ট বললেন—শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে আকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য করে যোগদান করা উচিত। বর্তমানে এ লাইনের আবহাওয়া খুবই চমৎকার। অক্সিস ও অভ্যাস আরম্ভ করলে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে এখানেই বা আপত্তি উঠবে কেন? এ আপত্তি উঠা নিশ্চয়ই উচিত হতে পারে না। আমার মনে হয়, যত বেশী শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়ে এ লাইনে আসবে ততই চলচ্চিত্রের উন্নতি।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি এইমাত্র জানতে চাইলুম—আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য কি?

সহজ গলায় উত্তর করলেন শ্রীমতী গুরা—শিল্পী আমি, শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই আমার এখনকার মত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছলে তবেই চরম লক্ষ্যের কথা ভাববো।

## বেশীর ডাগ প্রসূতিকেই পিউরিটি বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

১) সন্তান প্রসবের পর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়ে মায়ের দুধ বাড়তে সাহায্য করে।

২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বার্লিশস্যের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।

৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীল করা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাটি ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

# পিউরিটি

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী



PVI-1

PTY 272

বিনামূল্যে “মায়েরদেব জানবার কথা” পুস্তিকাটির জন্য লিখুন :—

আর্টল্যান্ডিস (ইন্ড) লি., ডিপার্টমেন্ট, এক-কিপি ১ পোঃ বক্স ৩৩৩, কলিকাতা-১.

# সাহিত্য পরিষদ

দিল্লীতে এশীয় লেখক-সম্মেলন

বড়দিনের প্রাক্কালে এবার দিল্লীতে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্যিক-সম্মেলনের আয়োজন হয়ে গেল। এই অভিনব অমূল্যের উদ্দেশ্য ছিলেন ভারতেরই কয়েক জন সাহিত্যিক। সমগ্র এশিয়ার ১৪টি দেশের প্রায় দু'শো সাহিত্যিক এই অমূল্যে যোগদান করেন। এশিয়ার বাইরের কয়েকটি দেশ থেকেও কিছু উৎসাহী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তিনি তাঁর ভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য সখ্যে বলেন যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লেখক ও জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রী, ঐতিহ্য ও সহতি স্থাপনই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তিনি বর্তমান বিস্ময় বিশ্বের সমুদ্রস্রোতের উদ্দেশ্যে লেখকগণকে শান্তি ও শুভচ্ছার বাণী প্রচারের দ্বারা তাঁদের প্রভাব প্রয়োগ করার আহ্বান জানান এবং ভাষাগত পার্থক্যের গভীর বিধ্বস্ত করার উপায় সম্পর্কে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক অধিকতর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার হুঁকি প্রদর্শন করেন।

এই সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি চিন্তাশীল মনোবীরাও এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা, লেখকদের আদর্শ এবং এশিয়ার নব-জাগরণে সাহিত্যিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্য নানা ভাবে হুঁকির দ্বারা ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে চীনের মাও তুং, ত্রুঙ্গের য়িয়েন পে-ফিট, কোরিয়ার হাল মূল ইয়া, ইরানের সৌদি নকিল, সিংহলের আনন্দ গুরুজী, তিয়েথনামের তু যো, সাইবেরিয়ার সোকরোশেভ আনোতোলি, পাকিস্তানের হিলেন বটলবি প্রভৃতিগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন আলোচনা করেন, তেমনি সর্ব এশিয়ার মানসিক ঐক্যের উপায় সখ্যেও চিন্তা করেন। এই শেবোক্ত চিন্তাকে কাব্যিকরী করার জন্য একটি কর্ম-পরিষদ গঠিত হয়। এই কর্ম-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন সিংহলের আনন্দ গুরুজী, সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন ভারতের মুলুকাবজ আনন্দ এবং সহ সভাপতিমণ্ডলী ও সদস্যগোষ্ঠীর মধ্যে বহু দেশের এক এক জন প্রতিনিধির নাম সংগৃহীত হয়।

এই সম্মেলনের প্রাক্ত ও পূর্ণাল অধিবেশনের পূর্বে চারটি অধিবেশন চারটি বিষয়, যথা : 'একনায়ক শাসিত সমাজ বা অত্যাচারের সমাজকে লেখকগণের দায়িত্ব', 'সংস্কৃতি বিনিময়', 'এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' এবং 'লেখক ও তার দেশ' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত ও গৃহীত হয়। এই আলোচনার বোপ দেন

হালদার। অজ্ঞাত ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন বঙ্গচরী, মুলুকাবজ আনন্দ, গঙ্গাধর গ্যাডগিল ও প্রকাশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

সর্বশেষ সমাপ্তি অধিবেশনের দিন এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কেন্দ্র প্রস্তাব করতে হলে, এক দেশের অধিবাসীকে অন্য দেশের বৈশিষ্ট্যমূলক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তিই হ'ল এই। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, আমরা, অর্থাৎ এশিয়ার সাহিত্যিকরা, আশা করি এশিয়ার সকল দেশের লোকেরাও এই আদর্শ পূরণের জন্য বহুশীল হবেন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য একে অন্তরে সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ বন্ধ করে চলবেন। এ ছাড়া সমস্ত লেখকই যে এক গোষ্ঠীভুক্ত এই ধারণায় তাঁদের উৎসাহ হতে হবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, সাহিত্যিকদের এই সম্মেলন জগত এশিয়ার নব-জাগরণের প্রতীক। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য এশিয়ার সাহিত্যিক-গোষ্ঠী মিলিত হয়েছেন।

এই শেষ অধিবেশনের দিন সভাপতি ছিলেন চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা মাও তুং। ঐ দিন এই সম্মেলনের মধ্যে থেকেই বিশ্বলেখক সম্মেলনের উদ্ভব ঘটে, এবং ইতালীয় প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ কার্লো লেভি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এবং ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। উক্ত দিন কার্তে বিশ্ব-খটনাবলীর সঙ্গে সাহিত্যের বোপ সখ্যে বন্ধতা দেন। গোজকোত্রের প্রতিনিধি ডাঃ জনসন, হাঙ্গেরীর মিঃ টমাস এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ক্লাড ক্রিষ্টমসনও নিজের নিজের বক্তব্য বলেন।

সর্বপ্রথমই এই সম্মেলনের কথা বলতে গিয়ে আমরা এটিকে 'অভিনব' আখ্যায় আখ্যাত করেছি এই কারণে যে, এশিয়ার এ ধরনের সম্মেলন এই প্রথম এবং একত্রে এতগুলি দেশের গভীর জ্ঞানী ও সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ ভারতের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের। কিন্তু বর্তমান সময়ে নলগত রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে পর্যাপ্ত এমন ভাবে কলুষিত করেছে যে, এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিরাট সাংস্কৃতিক অমূল্যের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং শুভবুদ্ধির অভাবে সভাপতি নির্বাচন প্রকৃতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি আলোচন আচরণ করেন। এ সম্পর্কে এই সম্মেলনে নলগত বাধার উর্ধ্বে থেকে তাঁদের স্পষ্ট কণ্ঠ করে বাবার জন্ম চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন, সেইগুলিই এখানে উদ্ধৃত করে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করব। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্যিকদের এই সহতি যেন শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীত্ব পর্য্যবসিত না হয়। সাহিত্যিকরা সরকারের সহযোগিতা হিসাবে সমাজ-প্রাণিত রাজনীতি থেকে ভ্রান্ত বন্ধ

টীকায় পক্ষে সম্ভব নয়, হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু সাহিত্যকে নিহত রাক্ষসীতির হাতিয়ার করে তুললে তা'তে সাহিত্যেরও ক্ষতি হবে, মানুষেরও ক্ষতি হবে। সাহিত্য সর্বমানবের আনন্দ,

কলাপ ও উন্নতির জন্ত—মতবাদের বেড়া তুলে তাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করলে, সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### হিন্দু আইনে বিবাহ

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত বিশ্ববিজ্ঞান-সংগ্রহমালা বাড়লা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট উপাদান। এই গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু আইনে বিবাহ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানের বিবাহ এবং বিবাহের আইন সম্পর্কে নানা তত্ত্ব-বিতর্ক রয়েছে আমাদের দিল্লীর বিধানসভায়। বাড়লা দেশে শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় বহু রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। দশ-সংস্কার ছাড়া এখানে চালু আছে শৈববিবাহ, কৃষ্ণবদল, সাতা-বিবাহ, পাণ-বদল ইত্যাদি। লেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় দেশীয় শাস্ত্রসমূহ থেকে নজীর তুলে বিবাহ এবং বিবাহ-আইন বিষয়ে অনেক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। বৈধ আর অবৈধ বিবাহ, আধ্য-অনাধ্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সপিণ্ড বিবাহ, সগোত্র-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ কিছুই এ দেশে অপ্রচলিত নেই। লেখকের হালকা ভাষায় লেখা শাস্ত্রীয় ও আইনগত দুই বিষয়ের এই আলোচনা আমাদের প্রত্যেকের জানা কর্তব্য। বিশ্বভারতী। ৬৩ স্বরকাননা ঠাকুর লেন। কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

### স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সহজেই 'পরমপুরুষ' আখ্যা দিতে পারি। ধর্মের দোহাই না তুলেও বলা যায়, এমন মহাপুরুষ হয়তো মাত্র বাড়লা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষকে মিস মেয়ের আঁকা ছবিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকা। স্বামী বিবেকানন্দ এই আয়োজিত কলঙ্ক মোচনের কাজে নেমেছিলেন—ভারতবর্ষকে জগৎচোখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের আসন সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'হোমোপাথার' সঙ্গে গুরু শিবকে তুলনা করেন। গুরু বলেন, 'নরেন্দ্র লোকশিক্ষা দেবে।' স্বামীজির রচনা ও চিঠি আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ। তাঁর রচিত বাড়লা গণভাষা আন্তর্জাতিক অতুলনীয়; 'উদ্বোধন' স্বামীজির বাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে দেশবাসীর ধর্মবোধ অর্জন করেন। 'সীতার' মত এই দুর্লভ গ্রন্থ আমাদের ঘরে ঘরে ঠাই পাবে অতি অবশ্য। ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন কার্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

### রোগীলিপি প্রস্তুত ও ঔষধ নির্বাচন প্রশালী

রোগ-লক্ষণ ও রোগীলিপি সম্পর্কে তথ্যবহুল বই হয়তো এই প্রথম বাড়লায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ডাঃ বিজয়কুমার বসু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি ইতিপূর্বে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই

কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ই সর্বপ্রধান কথা। যে লক্ষণগুলি মানুষটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সত্য বেশী সাহায্য করে, তাহার তত বেশী মূল্যবান। মন সমগ্র মানুষটিকে প্রভাবিত করে। মানুষের 'মনুষ্য' তাহার মনেই থাকে। মানুষের মনই তাহার ভাল মন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।" অর্থাৎ এক কথায় মানসিক চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথির মায়াম—যার বিশ্লেষণে বর্থাৎ চিকিৎসার কাজ করা যায়। লক্ষণের মূল নির্ণয় এবং রোগটির দেখার সন্ধে গ্রন্থের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। ১এ, ইন্ডিয়া রোড। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

### কড়ির বাঁপি

বিষয়-বৈচিত্র্য বর্তমান বাড়লা সাহিত্যের প্রধানতম আকর্ষণ। চিত্রাচারিত ধারায় লেখা গল্প আর উপস্থাপন আধুনিক বাড়লা সাহিত্যের উপজীব্য নয়। বর্তমানের অধিকাংশ লেখক-লেখিকাই এই পথে এগিয়ে চলেছেন। রুদ্ধস্বাক্ষরকে বসে লেখা আর জনগণের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে থেকে লেখার পার্থক্য অনেক বেশী। 'কড়ির বাঁপি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আর ভাষার অভিনবচে গল্প আর উপস্থাপন বনোয় নিজের আসন করেমী করেছেন সাহিত্য-সরবারে। লেখকের লেখার উৎকর্ষ অতুলনীয়, ভাষা-মাদুরী প্রায় অনন্তসাধারণ। বানিয়ে গল্প বলার সেই চিরকালের রীতিকে পরিহার করে তিনি যে বিভিন্ন রসস্ট্রীর নৈশুণ্য দেখিয়ে চলেছেন, তা মতাই উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই লেখকের স্তন্যম অক্ষয় রেখেছে। প্রচ্ছদপট মনোরম। ক্যালকাটা বুক স্টোর। ৮১, হারিসন রোড। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

### রুদিন

মহাবিপ্লবের আগে রাশিয়ার চেহারা ছিল অন্ধ। চরম দুর্গতি তখন রুশবাসীদের। জারের দোপদও প্রতাপে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয়। এক দিকে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী কেবল বিলাসিতায় মগ্ন, অন্ধ দিকে শিক্ষিত অধঃশিক্ষিত মানুষ তাদের জীবনযাত্রার অবাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই পায় না। প্রাক-বিপ্লবের যুগের লেখক আই, এস, তুর্গেনিভ 'রুদিন' উপন্যাসে রাশিয়ার সেই কদর্য রূপকে রূপায়িত করেছিলেন। তুর্গেনিভের কাব্যবর্ণনা ভাষা, গল্পের পরিবেশ রচনার অপূর্ণ দক্ষতা রুদিনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। ভবঘুরে রুদিনের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। মন আর মস্তিষ্ক তার দুই উর্ধ্ব, কিন্তু তার চিন্তা-জগতের দার প্রায় রুদ্ধ বললেই হয়। তুর্গেনিভের অন্ততম বিখ্যাত এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূবাদ করার অনুরোধকৃত বিমল বসু কর্তৃক

হুসিয়ারা দেখিয়েছেন। আমাদের আব্দুল-সাহিত্যে কবির অন্ততঃ বিশিষ্ট সংযোজন। কে, গাঙ্গুলী এও কোং প্রাইভেট লিঃ। ৮বি, লালবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

### জলধর সেনের আত্মজীবনী

বর্গত জলধর সেন ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় 'দাদা'। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছাড়া সম্পাদকীয় জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোটগল্প এক সময়ে দেশের পাঠক-পাঠিকার সাগ্রহে পড়তেন। তাঁর অবিস্মৃত সাহিত্যামুরাগের ও স্মৃতির ব্যবহারের ফলে লেখকত্ব ও স্রষ্টাবৃত্ত তাঁর প্রতি স্বভাবই আকৃষ্ট হ'তেন। পরিশিষ্টে ত্রিহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলছেন, "বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে জলধর বাবু একটি স্বতন্ত্র আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ গান্ধীর্যের সারসৌর্য প্রেমের ও নিষ্ঠার আদর্শ। সে-আদর্শের প্রয়োজন আজ আমরা সাহিত্যিকরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থে মাত্র দেড় শত পৃষ্ঠার মধ্যে জলধর সেন মহাশয় তাঁর অভ্যাস্তর্ঘ্য আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৩১, বহুবাজার স্ট্রিট। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

## শারদীয়া সংখ্যা

সন্তোষকুমার দে

বাংলা দেশের সব চেয়ে বড়ো পার্বণ শারদীয়া পূজা। আগে পূজাটাই বুখা ছিল—মহা-আড়থরে দেবীর আরাধনা হত, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে নিমন্ত্রণের ভোজ বসতো, আর ছিল গান, বাজা, ঢগ, কথকতা কত কি! পূজা-বাড়ির ধুম-ধাম গ্রামকে গ্রাম মাতিয়ে তুলত।

নগরকেত্রিক সভ্যতার স্বরূপেও এ ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তখনও পূজার ছুটিতে লোকে দেশে যেত, অন্তত এই কয়েকটি দিন সবাই একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ ঘটত। কিন্তু ক্রমে সে চরিত্র্যরও পরিবর্তন ঘটে গেল। বারা পারেন ছুটি পেলেই ছুটে গুলান পাছাড়ে, সাগরে বা বন-বাগাড়ে। আর বারা বাইরে না গিঁ তাঁরা নিজের নাচেন, অপরকেও নাচান—পাড়ার-পাড়ার বেশা-হুপি করে বারোয়ারী পূজার মণ্ডপে মাইকে হিন্দি-ফিল্মী-সঙ্গীত প্রজাবার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। মা বড় লোকের পূজা-মণ্ডপ হুড়ে বারোয়ারী পার্ক কি পথিপার্শ্বে কেমন আরামে আসর জমিয়েছেন! কথা অবাস্তব কিন্তু সাধারণ মানুষের নিজস্বের শেষ নেই; যবের ছিঁরে বেললেই ভিড়, গুজামণ্ডপের এক মাইল দূর থেকে মাইকের দ্রুতবে কানপাতা দায়, আং মাইলের কাছাকাছি এসে পড়লেই জ্বালসবকদের আঁদর আপায়ন—দড়ি-ধেরা পথ ভুল করলেই লাড়ি হাটান দেবে। অথচ আশিস-আশালত সব বন্ধ, যাবেনই বা কিবার? প্রবাসে ঘরে বা ঘরে বসে এই সময়টা কাটাবার দাওরাইও তখন কাছাই রয়েছে, ছোট-বড় মোটা-সক সচিত্র-অচিত্র যে যেমন। দেশের শারদীয়া সংখ্যা! দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ত্রৈ, বাৎসরিক, বার্ষিক, সাময়িক, অসাময়িক সব বাংলা, ইরাদি। হিবি কাগজেরও 'বিশবাক্ষ' বেরছে—কোনটা কেউ কোনটা

### অনুব্রজিতা

আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে যে ক'জন তরুণ সাহিত্যসাবীরের অবদানে, তাঁদের মধ্যে বারোজননাথ দাসের নাম করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি একটি ঘরোয়া কাহিনীর গল্পকণ দিয়েছেন। এক চরিত্র সৃষ্টিতে ও সজলাপ বোজনায় সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ঘরোয়া গল্পের সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে, এতে কোন প্রকার সমস্তার আভাস বা বিশেষ কোনকিছুর প্রতি ইর্ষান্বিত কটাক্ষপাতের আভাস মোটেই পাওয়া যায় না। বইটির যথাযোগ্য সমানর লাভ কামনা করি। লেখক বারোজননাথ দাস। ২৩৮বি রাসবিহারী এডিনিউ। কলকাতা। দাম চার টাকা।

### কবিতায় শতশ্লোকী গীতা

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ডুমিকা। বর্ষাসময়েই প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ যে সমানর লাভ করেছে, তা তার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশই জানিয়ে দিচ্ছে। লেখিকাকে আমরা এ জন্য জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর শ্রম সফল হয়েছে, এ আনন্দের কথা। লেখিকা শ্রীমতী পুষ্প দেবী কর্তৃক ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

পড়বেন, ছোটদের, মেয়েদের, যুবকদের, চিত্রামোদীদের সব স্বকম লোকের জন্যই শারদীয়া সংখ্যা আছে, দামও চার আনা থেকে চার টাকা, বার যেমন চাই।

আখিন ও গার্ভিক সংখ্যা মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে এবারের শারদীয়া সংখ্যাগুলির রচনা (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) বিষয়ে চমৎকার ট্রেন্সি বেরিয়েছে। সভাই, শারদীয়ার সাহিত্য প্রবাহ বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিতে ভাগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ তরঙ্গ বোধিবে কে? বোধ করে লোকসান বই লাভই বা কি? লেখকেরা হু'পরসা পাচ্ছেন, প্রকাশকেরাও না পাচ্ছেন এমন নয়—নইলে বছর বছর শারদীয়ার সংখ্যা বাড়ছে কেন? স্নতবাং শারদীয়া সংখ্যার প্রচার চাই।

দেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলা সাহিত্য আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, শুণ্ড পত্র-পত্রিকা নয়। তুনি—সপ্তাহে সংস্করণ শেষ হয়, এমন বইও হামেশাই বাজারে বেরুচ্ছে। বাংলা সাহিত্য চটপট উন্নতি করছে, এ সবই অতি আনন্দের কথা, কিন্তু তলিয়ে বুঝলে আভ্যন্তর কারণও আছে। আমাদের আজকের আলোচনা শারদীয়া সংখ্যাতাই সীমিত থাকছে।

শারদীয়া সংখ্যার এই প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে বিশ পঁচিশ বছরের বেশি পুরোনো নয়। আট আনা বারো আনা দামের শারদীয়া সংখ্যা আজ তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার বিকী হচ্ছে, তার প্রধান আকর্ষণ থাকে—অন্তর্গত গল্প এবং অন্তত একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস। এবার একটি পূজাসংখ্যার তিনখানি উপন্যাসও ছাপা হয়েছে। বিরাট কলেবর পূজাসংখ্যার উত্তর পুরতে অনেক অপরিস্রব রচনাও ছাপা হয়। বান্ধব অতিজ্ঞাত বাল্লের আছে তাঁরা আসেন, কোম ভালো

উপভাস তাড়াহুড়া করে লেখা সম্ভব নয়, এমন কি একবার লিখেও সব সময় পাণ্ডুলিপি তৈরী হয় না, হুই তিন বারও লিখতে হয়। শোনা যায়, হোমিওয়ে তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপভাসের পাণ্ডুলিপি ২৮ বার লিখে তবে সেটা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের শারদীয়া সংখ্যার উপভাসের 'কণি' অধিকাংশ কেন্দ্রেই লেখকের কাছ থেকে কিছু কিছু করে পাওয়া যায় এবং তা ছাপা চলতে থাকে। পূর্ব পরিচ্ছেদের নামকের নাম রাম পরবর্তী পরিচ্ছেদে পালাটে শ্রাম হয়ে গেলেও শোধরাবার সময় ও সুযোগ পাওয়া দুহুর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে উপভাসের উৎকর্ষের দায় ভগবানের ঘাড়ে চাপানো ছাড়া গত্যন্তর কি? বা হোক করে শারদীয়া সংখ্যার বেকুবের পর পুস্তকাকারে সংশোধন, সম্মার্জন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করা চলে, করা হয়েছে থাকে, কিন্তু সেখানেও এখন এমনই তাড়া ও প্রতিযোগিতার মুখে রেবারেবি চলছে যে, কোন খ্যাতনামা উপভাসিকের উপভাস শারদীয় বেকুদ্রে—খোঁপা প্রকাশ হওয়া মাত্রই প্রকাশক তার দ্বারে হাজির—পুস্তকাকারে প্রকাশের অমুমতি চাইতে। উৎসাহী প্রকাশক শারদীয়া সংখ্যা বাজারে বেকুবের সংগে-সংগেই তার কাজও শুরু করতে চান। লোহা গরম থাকতে-থাকতে যা দেওয়ার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী আর কি! যেন খোলা ছুড়ালে ধই ফুটেবে না, শারদীয় উপভাসের নামটা গরম থাকতে-থাকতে ধই বাজারে ছাড়লে কাটবে ভালো।

লেখক অনেক সময় অসহায় হ'য়ে পড়েন, পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় গুরু দেখতে পেলেন না, বই বেকুল—এমন ঘটনাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এর দাওয়াই একমাত্র আছে পাঠকের হাতে। 'গরম-গ্রাম' হীক শুনেই ভিড় না জমিয়ে যদি পাঠক রস বিচার করতে চান এবং বিচার করে গ্রহণ করেন তবে অনেক আবর্জনা পরিষ্কার হয়, অনেক আগাছা জন্মাবার আগেই জমি কঠিন হয়ে ওঠে। পাঠকরা যদি সচেতন হন তবে লেখক বাধ্য হন সাবধান হয় লিখতে, লিখে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করতে। প্রাচী লেখক যেমন রসস্বপ্ন করেন তেমনই বোঝা গ্রহীতাও সে রসকে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। মোক্ষা কথা হচ্ছে, এখন বিস্তর সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের তৈরী হতে হবে তা যেন নিছক সাময়িক উৎসাহ আড়ম্বরে পরিসমাপ্ত না হয়। যেন সাহিত্য-সাধনা ব্রত হিসাবে গ্রহণের নিষ্ঠা আমরা না হারাই। তার জন্য অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ, অপরিণত গদ্য-উপভাস ও কাব্যকুণ্ডল প্রকাশ সংঘ হোক।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রকাশনার দিন নিয়ে। বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে বাংলাদেশ পুনঃপুনঃ সর্বভারতীয় মুদ্রণবিচারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং সরকারী স্বীকৃতির দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পত্র-পত্রিকার চেহারা দেখে সে গৌরব বোধ করা সব সময় সম্ভব হয় না। মুদ্রণ-পারিপাট্যের অভাব এবং প্রচার ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের অধিকাংশ শারদীয়া পত্রিকাই অতি সাধারণ স্তরের মধ্যে গণ্য হবে। প্রচার-সংখ্যার বিচারে দক্ষিণ-ভারতীয় সাময়িক পত্রিকাগুলি সর্বভারতের পথপ্রদর্শক। সেখানে একটি শিশু-মাসিকের প্রচার-সংখ্যা হুই লক্ষেরও বেশি, বহু সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে। আর ওদের বর্ণাঢ্য মুদ্রণও বিস্ময়কর! দুটো-তিনটি রূপ আমি 'কলকি' এবং 'আনন্দ বিকাতন' সাপ্তাহিক পত্রিকা দুটির এবারের দীপাবলী বিশেষ সংখ্যাগুলি দেখতে অমুরোষ করি। এদের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে রঙ্গিন বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও খুবই বেশি। এবছরের 'আনন্দবিকাতন'-এর দীপাবলী বিশেষ সংখ্যায় রঙ্গিন বিজ্ঞাপন ৮২টি, 'কলকি'-তে ১৫০টি। এই বিজ্ঞাপনগুলিতেই বই স্বকল্পকে হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রত্যেক ফর্মাই হুই বা তিন রঙে ছাপা। এর সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত শারদীয়া সংখ্যাগুলির মুদ্রণের কথা তুলনা করুন। আবার বোম্বাই-এর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বাবিকীর মুদ্রণ-পারিপাট্যের কথাও ভাবুন। আমরা কোথায়?

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার—হিন্দি সাংবাদিকতার মুদ্রণ-পারিপাট্য বাংলাকে ছাড়িয়ে বাচ্ছে। ইংরাজি 'রিডার্স ডাইজেস্ট' ভারতীয় সংস্করণ (লণ্ডনে ছাপা,—তবে প্রস্তাব হচ্ছে শ্রীহুই ভারতে এবং কলকাতাতেই এটি ছাপা হবে) যে অক্সফোর্ড টেব্রার অল্প দিনে তাদের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তা থেকে আমাদের সাময়িক পত্রিকার প্রকাশকেরা শিক্ষা নিতে পারেন। হিন্দি পত্রিকা ওই পথে বাড়া শুরু করেছে। 'নবনীত'-তো অতি সক্ষম অমুদ্রণ, 'রূপপ্রভাত' প্রভৃতি আরো কেউ কেউ এ পথে চলছেন।

প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রণ-পারিপাট্যের দিকেও বাংলা সাময়িক পত্রিকা তথা শারদীয়া সংখ্যার প্রকাশকেরা বহু নিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপযুক্ত বাহন করে তুলুন, ধই আবেশন জানাই।

### রাযারশে বাঙলা দেশ

বাঙলা দেশ কত দিনের কে জানে। অজ্ঞাত ভারতীয় শাস্ত্রের মত রাযারশেও অবোধাকাতের লক্ষ্য সর্গ বা অঘোরের ১৭ সংখ্যক স্রোকে বিখ্যাত জাতিসত্ত্বের সঙ্গে বাঙলা দেশের নাম উল্লেখ আছে।

স্রোকেটি এই—

রাযিকা: সিদ্ধাসারীরা: সৌদারী দক্ষিণাধা:।

কাল-মসবা-কুন্তা: সর্বা: কাশিকোশা:।





## শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

### ১৯৫৬ সালের হিসাব-নিকাশ :—

জেনেভা মনোভাব বা Spirit of Geneva আশাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ হইয়াছে এই আশাবাদের ধ্বংসকল্পের মধ্যে। যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলির মধ্যে ১৯৫৫ সালেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাটিয়াছিল, সৃষ্টি করিয়াছিল বিশ্বশান্তি সম্পর্কে সুদৃঢ় আশা। ১৯৫৬ সালের বেসকল ঘটনার মধ্যে এই আশার সমাপ্তি রচিত হইয়াছে এবং বেসকল কারণে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে ১৯৫৭ সাল আরম্ভ হইয়াছে সেসবকে আলোচনা করিবার পূর্বে যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলির পটভূমিকা সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৭ সাল হইতেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং কোরিয়া যুদ্ধের চর্যোগের মধ্যে ১৯৫২ সাল সর্বাপেক্ষা সফটপূর্ণ বৎসররূপে কাটিয়াছে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির মধ্যে এই সফট কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি শান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করে। এই আশাকে অক্ষুণ্ণ করে ১৯৫৫ সালের বাস্‌ সন্মেলন এবং জেনেভার অল্পপ্রতি যুদ্ধ চারিরাষ্ট্র-প্রধানের সন্মেলন। শান্তির দিকে আন্তর্জাতিক সন্ধিযাত্রার যে অগ্রগতি ১৯৫৩ সালে সৃষ্টি হয় ১৯৫৫ সালে তাহা এমন এক স্তরে পৌঁছে যে, আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা বহুল পরিমাণে হইবে, ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভে এই আশাই বিশ্ববাসীর মনে জাগ্রত হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধের ঘটনাক্রমে এই আশাকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। কিন্তু মর্যেজবাল সাম্রাজ্য এবং উহাকে উপলব্ধ করিয়া বুটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ প্রদর্শন করিয়া দিল যে, বিশ্বশান্তির এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল চোরবাগির আশঙ্কাজনক ভিত্তির উপরে।

ফ্রান্সের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হওয়ার একটা গুণকণ বসিয়া গণ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৫৭ সালের ৩১শে আগস্ট মালয় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, এই মর্মে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিকল্প এক মালয়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যে মীমাংসা হওয়াও যে ১৯৫৬ সাল সম্পর্কে একটা গুণকণ বসানো করে ইহা মনে করিলেও ভুল

হইবে না। একথাও অবশ্য সত্য যে, বেসকল সাম্রাজ্য আন্তর্জাতিক মন কথাকথির কারণ সেগুলির একটিরও মীমাংসা হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত বাগদাদ চুক্তি নূতন আর একটি সামরিক জোট যেমন সৃষ্টি করে তেমনি অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই মিশরের নেতৃত্বে উহার বিরোধী হইয়া উঠে। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অল্পসল্প ও মূলধন সরবরাহে পশ্চিমী শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার সূত্র করার আন্তর্জাতিক মনকথাকথির নূতন আর একটি কারণের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নাই। তথাপি ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে উহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। বরং কেক্সারিয়া (১৯৫৬) মাসের মাঝামাঝি রাশিয়ার ট্যালিনবাদের অবদান ঘোষিত হওয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই অনেকে মনে হইয়াছিল। ফ্রান্সও অবশেষে ২রা মার্চ (১৯৫৬) করাচী-অধিকৃত মরক্কোকে স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু জর্ডানকে বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করাইবার জন্য বুটেন যে কৌশল অবলম্বন করে তাহার পরিণামে বাগদাদ চুক্তির বিচ্ছেদ জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ এবং দাঙ্গাহামা সৃষ্টি হয়। উহারই পরিণামে জর্ডানের রাজা ২রা মার্চ আরব লিজিয়নের সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ হইতে ব্রিটিশ জেনারেল জন গ্রাভ ওয়কে গ্রাভ পাশাকে অপসারণ করেন। মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বুটেনের এই কূটনৈতিক পরাজয় ১৯৫৬ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতে ইরানের শাহ ও রাণীর আগমন আন্তর্জাতিক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইত নয়। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড, মাথিণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালস এবং করাচী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ শিনোর ভারতে আগমন এবং নেহরুজীর সহিত আলোচনার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ করাচীতে সিয়াটো সন্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়াই তাহার নেহরুজীর সহিত আলোচনা করেন, একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যিক। এপ্রিল মাসের (১৯৫৬) মাঝামাঝি তেহরানে বাগদাদচুক্তি পরিষদের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন শেষ হওয়ার দুই দিন পরেই (২১শে এপ্রিল) জেদায় মিশর, সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর ৬ই মে মিশর ও জর্ডানের মধ্যে এক বিশপক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সকল চুক্তি বাগদাদ চুক্তি বিরোধী এবং মধ্যপ্রাচ্যে বুটেনের প্রভাব বিলোপের সূচক। কমিনকম্পের বিলোপ এবং রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন এবং রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের বিলাত ভ্রমণ (এপ্রিল, ১৯৫৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি আশাপ্রদ ঘটনা। ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা জেনেভার মনোভাবকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং তার ঐক্যে রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন আশার সঞ্চার হয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভার চারি বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানের সন্মেলন বিশ্বশান্তি সম্পর্কে যে আশার সঞ্চার করে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে রুশনেতৃত্বের বিলাত ভ্রমণ সেই আশাকে যেন সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করে। অতঃপর করেক দ্বন্দ্ব পরেই যে এই আশা ভরত্বপে পরিণত হইবে, এই আশা ঐ সময় কালক্রমে মনে হার পায়ে নাই। নিম্নোক্ত

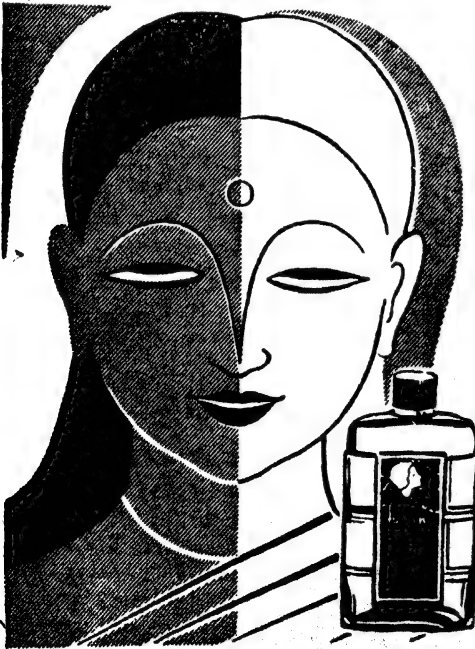


বাণীসভা আলোচনা বার্ষিকতার পর্বাধিসিত হওয়া এবং আলজেরিয়ার বিদ্রোহের আন্তন ব্যাপকতর হওয়া এক তথ্যের ক্রান্তের নমন-নীতির ভাবিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু নৈরাত্ত সফর করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মার্কিন টিটোর রাশিয়া ভ্রমণ এবং উহারই প্রেক্ষিতে রূপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভের পদত্যাগ বিশ্বশান্তির অমুকুল অবস্থাই সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পূর্বে ক্রান্তের প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনো মন্সো গিয়াছিলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এই ধারণা লইয়াই মঃ মলে মন্সো হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ক্রান্তের প্রধান মন্ত্রী উ মু বংসরের মাঝামাঝি প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিভাগ করেন। উহা এক সামরিক এবং যোরা বাপার মাত্র। উহা দ্বারা অঙ্গদেশের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। পাকিস্তানে আর এক দফা প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তন হয়। চৌধুরী মহম্মদ আলীর স্থানে মিঃ মুহাম্মদ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ এবং সামরিক জোটে যোগদান সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতি অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। সিংহলে সাধারণ নির্বাচনে ইউনাইটেড নেশন্সাল পার্টির পরাজয় এবং মিঃ বন্দরনায়কের দলের জয়লাভ পশ্চিমী শক্তিবর্গকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি সমর্থক রাষ্ট্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। জুন মাসের মাঝামাঝি সুরেজ খান অকল হইতে শেষ বৃটিশ সৈন্ত অপসারণ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কর্ণেল নাসের তাঁহার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতা দ্বারা ইতিপূর্বেই

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সুরেজখান হইতে বৃটিশ সৈন্তের অপসারণ যেমন তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ বিজয় তেমনি শেষ বৃটিশ সৈন্ত অপসারিত হওয়ার পরেই, ২৩শে জুন, মিশরে গণভোট গৃহীত হয়। এই গণভোটে কর্ণেল নাসের মিশরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং মিশরের শাসনতন্ত্র অমুকুল হইল। লগুন কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সস্বেলন এবং পোল্যান্ডের শিল্প প্রধান সহর পোলানো ব্যাপক ও গুরুতর গ্রামিক হাঙ্গামার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিনেহু বখন কমনওয়েলথ সস্বেলন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময় ত্রিগুনিতে মার্কিন টিটো এবং কর্ণেল নাসেরের সহিত তাঁহার এক বৈঠক হয়। এই সময় পর্যন্ত নিরপেক্ষ নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছিল। নিরপেক্ষ নীতির এই প্রসারের কল অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের কাছে উহা যেন অসম্ভব বোধ হইতেছিল। তিনি নিরপেক্ষ নীতিকে অস্বপ্নদৃশ্যতার পরিচায়ক বলিয়াই শুধু অভিহিত করেন নাই, উহাকে দুর্নীতি দোষে দুষ্ট বলিয়াও অভিহিত করেন।

নিরপেক্ষ নীতি বখন ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছিল এবং এশিয়া-আফ্রিকা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত বখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছিল সেই সময় মিশর কর্তৃক সুরেজখান কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতির মোড় আকস্মিক ভাবে ঘুরাইয়া দিলেন। ২৬শে



## শ্রীতে চকের কোমলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা।

ক্যালকেমিকোর সৌন্দর্যবর্ধক সৃষ্টি বিউটি মিশ; "তুহিনা" শুধু শ্রীতের রক্ষা ও অজান্ত মলিনতা থেকে ঝককে রক্ষা করে তাই নয়, ইহাকে সুবাসময়িত ও লাভণ্যময় করে। আধুনিক রূপচর্চায় বিশেষতঃ শ্রীতের রক্ষণের তুহিনা অপরিহার্য অঙ্গরূপ।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কলিকাতা - ২২

জুলাই (১৯৫৬) কর্ণেল নাসের সুরেজখাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুটেন ও ক্রাঞ্চ সামরিক তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দেয়। বলপ্রয়োগে সুরেজ খাল দখল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে নাই। মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে প্রথম সুরেজ সম্মেলন, যেজিস মিশনের বার্ষিক কার্যের সফর, দ্বিতীয় সুরেজ সম্মেলন এবং খাল ব্যবহারকারীদের সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ভিত্তির দিয়া একদিকে যেমন সুরেজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হয়, আর এক দিকে তেমনি বুটেন ও ক্রাঞ্চ নিরাপত্তা পরিষদে সুরেজ সমস্তা উপস্থাপন করে। তাহাদের উপস্থাপিত প্রস্তাবের যে অংশে সুরেজ খাল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার পরিকল্পনা ছিল, রাশিয়া এই অংশটিতে ভেটো প্রদান করে। তথাপি আলাপ আলোচনার পক্ষে সুরেজ সমস্তার সমাধান হইবে এইরূপ একটা আশা সকলেই করিতেছিলেন। সেই সময় আকস্মিক ভাবে বুটেন ও ক্রাঞ্চ মিশর আক্রমণ করে।

ইতিপূর্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যান্ডে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ঐ সময়েই (২২শে অক্টোবর) ক্রাঞ্চ উড়ন্ত বিমান আটক করিয়া আলজেরিয়ার ৫ জন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করে। ইহার কয়েক দিন পরেই ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে ইসরাইল। বুটেন ও ক্রাঞ্চের প্রেরোচনাতেই যে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছিল, সে সত্বে কোন সন্দেহের অবকাশ আর নাই। ইসরাইলের মিশর আক্রমণ উপলক্ষ করিয়া ৩১শে অক্টোবর (১৯৫৬) বুটেন ও ক্রাঞ্চ মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আরম্ভ করে। ওরিকে পোল্যান্ডের সঙ্কট পার হইতে না হইতেই হাঙ্গেরীতে আরম্ভ হয় ব্যাপক ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। কিন্তু বুটেন ও ক্রাঞ্চের মিশর আক্রমণের মধ্যে হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার ব্যাপ্তগোষ্ঠী মিশর আক্রমণে বর্তটা বিচলিত হইয়াছিল হাঙ্গেরীর ঘটনার ততটা বিচলিত হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গও তেমনি হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে বেরূপ বিচলিত হইয়াছে, মিশর আক্রান্ত হওয়ার সেরূপ বিচলিত হয় নাই। ইহার কারণ হইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। পোল্যান্ডে বিক্ষোভ, হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লব, সিঙ্গাপুরের হাঙ্গামা, জর্ডানের সাধারণ নির্বাচনে মিশরের সমর্থনকারীদের জয়লাভ সমস্তই ব্রিটিশ ও ক্রাঞ্চের মিশর আক্রমণের সমুখে লান হইয়া গিয়াছিল। ১১শে অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাইয়া উত্তর দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩শে অক্টোবর ৮২টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিশর আক্রান্ত হওয়ার এই দুই ঘটনাও কোন গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সুরেজ সমস্তা এখন আলাপ-আলোচনার ভাবে সেই সময় ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লন্ডনের সৌদি আরব সফরও ১৯৫৬ সালের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মিশর আক্রমণ করিয়া বুটেন ও ক্রাঞ্চ জয়লাভ করিলেও আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হইয়া তাহানিগকে পোর্ট সৈয়দ হইতে পূর্ব অঙ্গসাগরের হীনজা বীকার করিতে হইয়াছে। তাহানিগকে

রিক হস্তে ফিরিতে হইলেও মিশর আক্রমণ করিয়া তাহারা বিশ্ব শান্তির আশাকেই ধ্বংস করিয়াছে। আমরা বিশ্বশান্তি বলিতে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম এড়ানোকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্বসংগ্রাম না বাধিয়াও যে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হইতে পারে বুটেন ও ক্রাঞ্চ মিশর আক্রমণ করিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। সুরেজ সঙ্কটের সময়েই ইথিওপিয়ায় সম্রাট ভারতে আগমন করেন। দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার ভারতে আগমন তিব্বত ও চীনের বাহিরে তাহাদের প্রথম পদাধীন। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাইয়ের ভারত ও অজ্ঞাত প্রতিবেশী দেশ ভ্রমণ ১৯৫৬ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতের প্রধান মন্ত্রী জিন্নাহর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎকার। জাপান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থান পাইয়াছে; কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন তাহার জায়া আসন হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে মিঃ আইসেনহাওয়ারের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে বিষয়ক কিছু নাই। উহা তাহার ব্যক্তিগত জয়লাভ। কারণ, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে তাহার দলের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই।

১৯৫৬ সালে বুটেন ও ক্রাঞ্চের মিশর আক্রমণের মধ্যে বিশ্ব শান্তির আশা শুধু বিনষ্টই হয় নাই, বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের ফলে বিশ্বশান্তির আশা আবার জাগ্রত হইবে বলিয়া ধাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। নেহরুজী দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে না করিতেই মিঃ ডালস মধ্যপ্রাচ্যে সত্বে আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। নুতন বৎসর ১৯৫৭ সালের প্রথমেই এই জাহুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের মার্কিন কংগ্রেসের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। মার্কিন বিমান বাহিনীর সেক্রেটারী মিঃ কোয়ারলস গত ৭ই জাহুয়ারী ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবে না, ইহা মনে করিলে বিপজ্জনক ভুল করা হইবে। সোভিয়েট ও পূর্ব জাহাঙ্গীরী কম্যুনিষ্ট পার্টিস্বর একটি ঘোষণার জানাইয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ব-কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বৌদ্ধভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ১৯৫৭ সালের শুরুতেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুধু তীব্রতর হইয়া উঠে নাই, উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কাও দেখা গিয়াছে। বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধির মধ্যে আরম্ভ হইল ১৯৫৭ সাল। কি অবস্থার মধ্যে এই বৎসর শেষ হইবে, ভালো অল্পমান করা কঠিন।

### নেহরু-আইক সাক্ষাৎকার—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিন্নাহরলাল নেহরু মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ফিরিবার পথে তিনি কানাডা, বুটেন ও পশ্চিম জার্মানীতেও গিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিন্নাহর এই দ্বিতীয় বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে তিনি এখন প্রথম আমন্ত্রিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বান তখন মিঃ ট্রুম্যান ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আইসেনহাওয়ার তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। তাহার হাত হইতেই জিন্নাহর

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী উপাধিপ্রাপ্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং আইসেনহাওয়ারের সহিত এই তীহার প্রথম সাক্ষাৎকার একথা বলা চলে না। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট রূপে আইসেনহাওয়ারের সহিত তীহার এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব যে অনেক বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৯৪১ সালে ব্রিটেনের আমেরিকা গমনের সহিত তীহার দ্বিতীয় বার আমেরিকা গমনের পার্থক্য লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। গত জুলাই মাসে (১৯৫৬) প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় ঐ সময় নেহরুরা আমেরিকা বাওয়া হয় নাই। কিন্তু গত জুলাই মাসের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধ নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি এত সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বৃটেন ও ফ্রান্সের যুক্তায়োজন হইতেই শুধু আমেরিকাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণও তীহার সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মিশর আক্রমণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রায় একরূপ একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। হাঙ্গেরীর ব্যাপারেও ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গীর কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে, একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গভীর পার্থক্যও রহিয়াছে। এই পার্থক্য নিরপেক্ষতা নীতি, সামরিক জোট প্রভৃতি সম্পর্ক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমানিষ্ট টীকে আসন দান, পূর্ব ইউরোপকে মুক্ত করা এবং সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কেও উভয়ের মতভেদ অত্যন্ত গভীর।

নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও এই সাক্ষাৎকারের ফল বিষয়ক কিছুই হইবে, ইহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। নেহরুরা সহিত আলোচনার ফলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন সাধন করিবেন, এইরূপ অসম্ভব প্রত্যাশা কেহই করেন নাই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রভাবে ব্রিটেন নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করিবেন, এতখানি দুঃশাস্ত ও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। একথা যদি স্বরণ রাখা যায়, তাহা হইলে আইক-নেহরু আলোচনার ফলাফল অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার হইলেও আমাদের নিরাশ হইবার বা উৎসাহিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই আলোচনার ফলে কোনও ভারত-মার্কিন যুক্ত শাস্ত্রিকগণ গড়িয়া উঠিয়াছে কি না, সেসবকে কিছুই অগ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের মধ্যেই শুধু উহা পরিলক্ষিত হইবে। নেহরু-আইক আলোচনার জন্ত কোন কার্যসূচী সত্যই নির্ধারিত হইয়াছিল কি না, সেসবকে নিশ্চয় করিয়া কিছুই অগ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তীহার সমগ্র বিধ পরিমিত সক্ষেই আলোচনা করিয়াছেন, একথা নিঃসন্দেহে আমরা বলিতে পারি। বিধ পরিমিতভাবে কমানিষ্ট টীকের স্থান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একথা অনস্বীকার্য। নেহরুরা মার্কিন রাজ্যের প্রজাতিগণ টীকের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জে এন লাইনের ভারত আসন ও নেহরুরা সহিত তীহার

# বহুমুদ্র

## আরোগ্য হয়

প্রভাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুদ্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর শমুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকা ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করারক্ত প্রস্রাব এবং চুলকামি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গী অবস্থার কারণে বালক, ক্রোড়ী, চোখে ছানি পড়া এবং অস্বাভাবিক জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ুনানি মতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার ক’রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রভাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অর্ধেক শেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া লাগার সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিবেদন নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্ত লিখুন। ৫০টি বাটিকার এক শিশির লায় ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নিয় ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B.M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

আলোচনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। নেহরুজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে মিঃ চৌ এন লাই আবার ভারতে আসেন এবং নেহরুজী সহিত আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি মস্কো গিয়াছেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

১৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) নেহরুজী ওয়াশিংটনে পৌছেন। ১৭ই ডিসেম্বর মার্কিন গৃহযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত গোটসবার্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্নীভবনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর মধ্যে নিম্নোক্ত আলোচনা আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের এই নিম্নোক্ত আলোচনা চলিয়াছিল বার ঘণ্টা কাল। দুই রাষ্ট্র-প্রধানের মধ্যে এইরূপ একান্তে আলোচনা এই প্রথম কি না এবং ফ্রজেন্ট ও চার্লিলের মধ্যে আলোচনার সহিত উহার তুলনা চলিতে পারে কি না, সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা এখানে নিম্নব্যোক্ত। গোটসবার্গের আলোচনা এত নিম্নোক্ত হইয়াছে এবং উহা এত গোপন রাখা হইয়াছে যে, উহার সম্পর্কে আমাদের কোতূহল সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইবার নহে। গোটসবার্গের আলোচনা সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়াও অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নেহরুজীর নিরপেক্ষ নীতির ব্যক্তি মানিয়া লইয়াছেন কি? রাশিয়ার যে পরিবর্তন চলিতেছে তাহার গতিবেগ বন্ধিত করিবার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ কমানিবার জন্য নেহরুজী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি? করিয়া থাকিলে তিনি কি ভাবে উত্তরে সাড়া দিয়াছেন? কর্মমোদা সমস্ত সমাধানের জন্য নেহরুজী কি কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন? করিয়া থাকিলে তাহার কল কি হইয়াছে? ভারত কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সমর্থক নয়, একথা তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে বুঝাইতে পারিয়াছেন কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর শুধু কল দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। নেহরুজী ও প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ১৮ই ডিসেম্বর গোটসবার্গ হইতে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করেন। ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুজী বলেন যে, ওয়াশিংটনে আসার পূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি তাঁহার নিকট বেরূপ কঠোর মনে হইয়াছিল, আইকের সহিত আলোচনার পর এখন তিনি বুঝিয়াছেন যে, উহা সেরূপ কঠোর বা অপরিসর্তুনীয় নহে। টেলিভিশন বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের মানবতা বোধ এবং আন্তর্জাতিক ঙ্গাণ্যে বিশ্বের রাজনীতিকদের মধ্যে প্রেঃ আসন প্রদান করিয়াছে। এই জাতীয় উক্তি হইতে গোটসবার্গ আলোচনার ফলাফল কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটনেও নেহরুজীকে মধ্যে আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর একটি যুক্তি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। এই যুক্তি বিবৃতিতে বলা কা হইয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, ওয়াশিংটন আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে মধ্যে তাঁহাদের মতৈক্য (broad area of agreement) হইয়াছে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়া বা broad area of agreement-এর অর্থ বহু বিষয়ে মতৈক্য হওয়া নয়, একথা নিম্নোক্তে বলিতে পারা যায়। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, একই সাধারণ মতি তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্যক্ত করিয়াছেন একই প্রকার অভিমত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা অস্বীকার বাস্তব হইয়াছে।

আর কিছুই নয়। গোটসবার্গে এক ওয়াশিংটনে দীর্ঘ আলোচনা সম্বন্ধে কোন বিষয়েই কোন সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়ার উদ্দেশ্যে কার্যে পরিণত করার জন্য কোন বোধ কর্মপন্থাও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়া সম্বন্ধে নেহরুজী সামরিক জোটের ব্যক্তি যে মানিয়া লন নাই— একথা নিম্নোক্তে বলা যায়। ২০শে ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতায় নেহরুজী বলেন, যুদ্ধ বাধিলেই উহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা সম্বন্ধে সারা দুনিয়ার সামরিক ষাঁটি গডিবার প্রয়োজন করে না। তিনি সামরিক চুক্তিবও নিষ্পত্ত করেন। নেহরুজীকে আলোচনা যে সাক্ষ্য মণ্ডিত হইয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইম্মিগ্রেশনবিধায়া কি কল পাওয়া তাহাই প্রশ্ন।

এই সাক্ষ্যকারের কলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির সুযোগ যে সৃষ্টি হইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। নেহরুজী যে আধা-কম্যুনিষ্ট নহেন, একথাও আমেরিকার অধিবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতের পক্ষে মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়ত হইয়াছে। কিন্তু উহার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে তাহা কে জানে? কাম্যদীর সম্পর্কে মার্কিন গবর্নমেন্টের নীতির কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি? কার্যক্ষেত্রে ছাড়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে না, এই আশ্বাস যদি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার দিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও বিশ্বের যুদ্ধের মত উহার ব্যতিক্রম ঘটবার আশঙ্কা তাহাতে রোধ হয় নাই। কর্মমোদা সমস্ত সমাধানের জন্য কোন প্রস্তাব নেহরুজী আইকের নিকট উপস্থাপন করিয়াছিলেন কি? অনেকে মনে করেন যে, চিয়াংকাইশেককে চীনের ভাইসু-প্রেসিডেন্ট এবং ফরমোসার গবর্নর নিযুক্ত করিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন কর্মমোদা সমস্তার সমাধান করিতে চায়। তাঁহান লাই সতাই এমন কোন প্রস্তাব প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য নেহরুজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। হাঙ্গেরিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকগণকে যাইতে দিতে রাশিয়া ও হাঙ্গেরী গবর্নমেন্টকে অনুরোধিত করিবার জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নেহরুজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি? নেহরুজী তাহাতে স্বাক্ষর হইয়াছেন কি? বুটেন ও ক্রাসের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও গ্রহণযোগ্য রূপে ফরমো-সমস্তার মীমাংসা মানিয়া লইতে কর্ণেল নাসেরকে অনুরোধিত করিবার জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নেহরুজীকে স্বাক্ষর করাইতে পারিয়াছেন কি? এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ দেশগুলি সম্পর্কে মার্কিন নীতি পরিবর্তন সাধন করিতে নেহরুজী প্রেঃ আইসেনহাওয়ারকে অনুরোধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে দুইভাজীর এক বোধ শান্তিকর্তৃ গঠনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নেহরুজীকে আলোচনার সাক্ষ্য বা অসাক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে। জবিয়া ঘটনাকালী দিবে তাহার সাক্ষ্য।

আইসেনহাওয়ারের পত্রিকল্পনা :—

গত ২ই জানুয়ারী (১৯৫৭) মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের এক অভিজ্ঞ যুক্ত অভিমত প্রেঃ আইসেনহাওয়ার

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন সৈন্তবাহিনী নিয়োগের ক্ষমতা দাবী করিয়াছেন। মিশর যুদ্ধে বিশ্বশান্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নেহরু-আইক আলোচনা এখন নতুন আশার সন্ধান করিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সময় নেহরুজী এই সাফাফারের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে না করিতেই প্রে: আইসেনহাওয়ারের এই পরিকল্পনা যে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশর যখন বুটেন ও ক্রাস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তখন মিশরকে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিন সৈন্ত নিয়োগের কল্পনাও তিনি করেন নাই। আন্তর্জাতিক চাপে মিশর হইতে বুটেন ও ক্রাসী সৈন্ত অপসারিত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ক্ষয় হওয়ার দরদ উৎখলিয়া উঠিবার কারণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রে: আইসেনহাওয়ার তাহার উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে নেহরুজীর নিকট ব্যক্তিগত পর দিয়াছেন। ঐ পত্রের বিবরণ সম্প্রদায়। তিনি প্রেক্ষাপটে বাহা বলিয়াছেন তাহাইই ভিত্তিতে আলোচনা করা হুড়া আর উপায় নাই। একথা অবশ্য সত্য যে তিনি শুধু মার্কিন সৈন্তবাহিনী নিয়োগের ক্ষমতাই চাহেন নাই, দীর্ঘকালের শেষে 'পুনর্গঠন'র মত অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতাও চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিকল্পনার মূল কথা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সৈন্ত নিয়োগের ক্ষমতা।

মার্কিন কংগ্রেসের নিকট ক্ষমতা দাবী করিয়া প্রে: আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কমান্ডিট আক্রমণের সম্ভাবনা গোধ কবাই তাহার প্রস্তাবের প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে তিনি রাশিয়াকেও আশ্বাস দিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে বা বিশ্বের অন্ত কোথাও সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসকগণ প্রথমে আক্রমণ না করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে এ পর্যন্ত যে আক্রমণ ঘটিয়াছে তাহা রাশিয়ার দিক হইতে হয় নাই, কিবা কোন কমান্ডিট দেশের অনুপ্রবেশপাতও হয় নাই। আক্রমণ করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রইই মিশ্রশক্তি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যে সবক্ষে প্রে: আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনার মূলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে এতদিন ছিল বুটেন ও ক্রাসের প্রভাবাধীন অঞ্চল। সুয়েজ সড়কের কল এই প্রভাবের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই লুপ্ত স্থান পূর্ণ করিতে চায়। ইহাতে বুটেন ও ক্রাসের লুপ্ত প্রভাব কতক পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, বুটেন ও ক্রাসের মনে এই আশাও জাগিয়াছে। এইজন্যই এই পরিকল্পনা বুটেন ও ক্রাসের গভীর উল্লাস সৃষ্টি করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমস্যা তিনটি। আরব-ইসরাইল বিরোধ, আরব উদ্বাস্ত সমস্যা এবং সুয়েজ খাল সমস্যা। প্রে: আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা এই তিনটি সমস্যার একটিরও সমাধান করিবে না, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রে সাময়িক সাহায্য চাহিলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্ত প্রেরণ করিবে। ইহাতে বাগদাদ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি সন্তুষ্ট হইলেও এই হুজির বিবোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি হইবে।

## সোনালী চন্দ্র-স্মৃতি ২১

চল চিত্রের আরও অনেকগুলির প্রতি বহুতর সতর্কবারী তাকে করে তুলেছিলো প্রায় উদ্ভাস।

একটি অপরূপ স্মরণ নিশাপ তরুণীর কামনা বাসনার কথা; যার আত্মা শূন্যলিত ছিলো এক রমণীর কাছে, আর যার কামনা ধাবিত হতো এক স্ত্রী যুবকের দিকে।

১৩৬২ সালের প্রে: প্রে:

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিচয় ৩

ববীন্দ্রনাথকেও যে প্রে: অতিভূত করেছিল:

ব্যারনার দ্যা দে স্যা পীয়ারের

পল ও ভিজিনি ৩

ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-প্লেয়ার

ডন ব্র্যাডম্যানের—

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ,—৪

ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তরেখাবিদ

কিরোর—

হাতের গোপন কথা — ৩

এমিল জোলা

বাহু ৩।০ নৈদেহী ৩।০

(১৩৬২ সালের প্রে: অস্থাব প্রে:)

রৌর প্রেম ৪, স্বপনচারিণী ২৬০

মোপাসার:

মোপাসার একাদশ — ৩।০

দুটি বিধুয় আগ্রা—

মারী টোপের-

বিবাহিত প্রেম-৪,

Marie stopes-এর দ্বিধাবিহীন

Married love-এর দ্বিধাবিহীন

৩০০ মাস্টার মাস্টার মাস্টার  
৩০০ মাস্টার মাস্টার মাস্টার

মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রে যদি আমেরিকার অপ্রীতিভাজন হল কমতা লব্ধ করিতে চায় তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠিত গবর্নমেন্ট আমেরিকার সামরিক সাহায্য চাহিতে পারিবে। তাহা হইলে এই রাষ্ট্রে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট বাহিনী নিয়োগের সম্ভবই অবস্থা পাইয়াইবে। কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রে আমেরিকা যদি তাহার অন্তিমপ্রান্ত গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার বাধা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে হাঙ্গেরীর ব্যাপারে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সহজ হইবে না।

### তার এটনী ইডেনের পদত্যাগ—

তার এটনী ইডেন গত ১ই জানুয়ারী বুটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার এই পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ভরসাঘ্যের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি ইহা সকলেই জানেন যে, সুরেন্দ্র সমত্ৰা তাঁহার পদত্যাগের অব্যবহিত কারণ। সুরেন্দ্র সমত্ৰা সমাধানের জন্য বেশপা তিনি গ্রহণ করেন, তাহা বুটেনের পক্ষে ফলাফলকর তো হয়ই নাই, বরং বৈফল্য হইয়াছে, তাহা দীর্ঘকালেও সুদূর হওয়া কঠিন হইবে। তার এটনী ইডেন পদত্যাগ করাতেই যে এই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সহজ হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি পদত্যাগ না করিতেও পারিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যদি বুটেন প্রধান মন্ত্রীর পদ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সুরেন্দ্রের ব্যাপারে বুটেনের প্রতি প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের অসন্তোষ দূর হইত কি না, তাহাতে সন্দেহ সন্দেহ আছে।

১৯৩০ সালে কঠিন অগ্রোপচার এবং পরবর্তী অরতোগ তার এটনীর স্বাক্ষরকে আঘাত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে চার্লিস পদত্যাগ করিলে তিনিই প্রধান মন্ত্রী হন। ইহার পরই মে মাসে (১৯৫৫) বুটেন সাধারণ নির্বাচন হয় এবং রক্ষণশীল দল জয়লাভ করার তার এটনীর প্রধান মন্ত্রিত্বেই

মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু উহার পর হইতেই পদত্যাগ করিবার জন্য রক্ষণশীল দলের একটি চক্র হইতে তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইতে থাকে। বস্তুতঃ গত বৎসর এই সময়েই তাঁহার পদত্যাগের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। এই সময় ১০নং ডাউমিং স্ট্রীট হইতে ঘোষণা করা হয় যে, তার এটনী ইডেনের পদত্যাগ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই। হয়ত তিনি আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বুটেন প্রধানমন্ত্রীর পদেই থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সুরেন্দ্র সমত্ৰা সম্পর্কে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার পদত্যাগকে ঘরাবিত করিয়াছে।

তার এটনী ইডেন পদত্যাগ করার ১০ই জানুয়ারী (১৯৫৬) মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলান বুটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইডেন মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেঞ্জার। সকলেই যখন আশা করিতেছিলেন, মিঃ আর এ বাটলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন সেই সময় মিঃ ম্যাকমিলানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার অনেককেই হয়ত বিস্মিত করিবে। কিন্তু বুটেন দ্বারা অনুমোদিত যে এই নিয়োগ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইডেন মন্ত্রিসভায় মিঃ বাটলার সুরেন্দ্র সমত্ৰা সমাধানের জন্য সশস্ত্র অভিযানের বিরোধী ছিলেন। মিঃ ম্যাকমিলান ছিলেন উহার গোঁড়া সমর্থক। সুরেন্দ্রের ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করা যে ভুল হইয়াছে, মিঃ বাটলারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া বুটেন একথা স্বীকার করিতে চায় না। তার উইনষ্টন চার্চিল এবং মাক্স ইন্স অব সেলিসবেরীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ইংলণ্ডের রাণী মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উভয়েই বুটেনের সুরেন্দ্র নীতির সমর্থক। এই নীতি যে অব্যাহত থাকিবে মিঃ ম্যাকমিলানের নিয়োগে তাহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই সুরেন্দ্র নীতি বুটেনের যেমন গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তেমনি মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তার এটনী ইডেনের রাজনৈতিক জীবনেও বনিকা টানিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্র সমত্ৰার সমাধান বুটেনের অভিপ্রায় অনুমোদিত যে হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ সন্দেহ আছে। ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৭।

## তুমি আমার চেনা

স্মৃতিতা শুধু

“তোমার স্মৃতি মনে হল তোমার আমি চিনি,  
কবে বেন কোন এক সাবে,  
অনেক লোকের ভিড়ের মাঝে,  
সেখিলাম কোথায় বেন তোমার ও বুঝানি;  
জাই ত দেখে মনে হল তোমার আমি চিনি।  
মনের কত ছুরায় খুলে সেখি আমি চেয়ে,  
কত লোকের বাওয়া-আসা,  
কত হাসি, ভালোবাসা,  
কত হুখ, হুখা আছে স্মৃতির কোঠা ছেয়ে;  
মনের কত ছুরায় খুলে সেখি আমি চেয়ে।

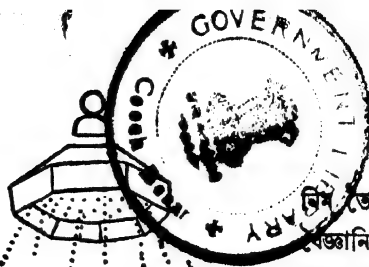
স্মৃতির তাহে লাগল আঘাত বাজল বিনিক্ত বিন,  
আমার মনের গোপন কোণে,  
বা ছিল ঢাকা সবতলে,  
আজকে তাহা হল বাহির বাজল ব্যথার বীণ।  
স্মৃতির তাহে লাগল আঘাত বাজল বিনিক্ত বিন।  
সেদিন আমি গিরেহিলাম তাঁকে দেখার আগে,  
অনুরাগে লাজবাতা বুখ,  
আনন্দেতে কাঁপছিল বুক,  
দেখি তাঁকে স্বপন-মগন পাঁড়িরে তোমার পাশে;  
বখন আমি গিরেহিলাম তাকে দেখার আগে।

আজ বুঝি কেন তোমার লাগছে এত চেনা,

বা ছিল মোর কল্পনাতে,

আনন্দে জীবন তুমিই তা’তে,

তোমার কাছে মিলে তাহার আমার প্রেমের সেনা;



বিশিষ্ট ডেল থেকে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে  
প্রস্তুত হুগুন্ডি  
মার্গো সোপের প্রচুর  
ফেনা যেমন  
নির্মলকর তেমনি  
জীবাণুনাশক।  
মার্গো সোপ দেহের  
কাস্তি উজ্জল করে।  
কোমল স্বকের  
পক্ষেও ব্যবহার করা  
সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্নানের সময়  
ব্যবহার করতে ছলবেন না



**মার্গো**  
**সোপ**

ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কোম্পানি লিমিটেড  
কলিকাতা ২২



# বাজায় বাজায়



উদয়ভাসু

চতুষ্পাঠী যেন জনশূন্য, এমনই স্তব্ধতা সেখানে। ছাত্রশিবায়ের

পাঠ, হুড়া আর আবৃত্তি আজ আর শোনা যায় না। আধা-ভাষার শাস্ত্রমন্ত্রের গুঞ্জন যেন থেমে গেছে চিরদিনের মত। মণ্ডপ-বেদীতে অধ্যক্ষের মৃগচর্মের আসন শূন্য রয়েছে। বৈদ্যুতিন রীতির ব্যক্তিক্রম হয়। ব্রহ্মচারীরা বড়রিপুকে জয় করেছে, তবুও তাদের মুখে মুখে আজ যেন ভয় আর দৃষ্টান্তা ফুটেছে। কারও মুখে কথা নেই। চতুষ্পাঠীর পুণ্যতীর্থরাজ: কি কারণে যেন অপবিত্র হয়েছে, মাহাত্ম্য হারিয়েছে। চতুষ্পাঠীর চতুঃসীমার অদৃষ্ট-শাপের ছায়ানুভা চলেছে যেন। পুঁথিপাল্লি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে অশ্রুজের মত। কি এক অনাচারের ফলে শিব্যজ্ঞান হারিয়ে ছাত্রদল যেন বুক হয়ে গেছে। অন্তর অসহনীয়। অন্তরকে কখনও সহ্য করবে না, প্রেরণ সেবে না, অন্তর্যের প্রতিবাদ করবে প্রতি পদে পদে—এই মহৎ শিক্ষা দান করেছেন স্বয়ং চন্দ্রকান্ত। শিব্যদের কানে কানে কি উল্লাস কণ্ঠেই না এই বাণী তুলিয়েছেন কত দিন! হতাশার ধ্বনি অশ্রুতে উচ্চারণ করে ছাত্রদের কেউ কেউ। জ্ঞানের সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ব্রহ্মগানের অপমাল্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। সরলমতি নাবালক ব্রহ্মচারীর দল সারা রাত জেগে বসে থাকতে পারে না। যে যেখানে ছিল সে সেখানে থেকেই নিজার অচেতন হয়। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত নাবালকের দল বিনিময়্যার রাত্রি যাপন করেছে। জমে বসে থেকেছে। কান পেতে শুনেছে যেন বত্রির পদধ্বনি। পুনঃ রাত্তে কত কত বার চমকে উঠেছে তারা। বৈশাখ-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে গাছের পাতার পাতার স্পর্শক শুনে চমকে উঠেছে। নিম্ননিবু নীপের সলতে এগিরে দিয়ে ঝর-মুখে গিয়ে দেখে এসেছে কত বার। কিন্তু প্রতি বারই ফিরে আসতে হয়েছে ব্যর্থমনে। বার জন্ম এই আকুল প্রতীক্ষা, তিনি কোথায়? একটা কালপেচা তেঁতুলগাছের মগডালে বসে টেঁচিয়েছে রাতভোর, হয়তো শিকার মেলেনি তাই। একদল মৌনজনকে মনের খুঁশিতে যেন ব্যঙ্গ করেছে অকস্মে মুখ লুকিয়ে।

তারপর কখন কাক ডেকেছে, বত্রি আর দিনের সন্ধিরহুর্ন্তে। আকাশের পূর্বভাগে রক্তচন্দনের ডেউ নাচিরে সপ্তঅববাহী সূর্য্যের উদয় হয়েছে। তখন এক দমকা হাওয়ার মত অকস্মাৎ এসে পড়েন চন্দ্রকান্ত। ঘুম-জড়ানে চোখে দেখতে দেখতে যেন বিবাস হয় না ছাত্রদের। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে তারা— এই উদভবক, ভয়জনক ও সপাহাতমর চন্দ্রকান্ত যেন কেমন ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে। চন্দ্রকান্ত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে। চন্দ্রকান্ত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে। চন্দ্রকান্ত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে।

তাকিয়ে আপন ককে প্রবেশ করলেন। মৃত্যুভয়ে যেন আত্মগোপন করলেন। তাঁর বেশবাস যেন অবিকল। উত্তরীয় নেই দেখে।

বারা অপেক্ষার রাত জেগে বসেছিল ঠায়, তারা উঠলো একে একে। দীর্ঘবাস ফেললো কেউ কেউ। জাগরণের ছালায় তখন চোখ ঝলছে। ক্রান্তসেহ টলছে ঘুমের ঘোরে। ভোরের হাওয়ার আবার যেন ঘুম আসছে চোখে চোখে।

দিনের আলো দিকে দিকে। আঁধারে-টাকা পৃথিবীর স্তম্ভর আর কুঞ্জী রূপ আবার দেখা দিয়েছে। খোল আর করতালের ধ্বনিছন্দ ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। কীর্তনীয়ার দল বেরিয়েছে পথে। হরির গুণগান গাইতে বেরিয়েছে এই পুণ্যক্ষেত্রে।

‘মা দিবা সান্দী!’ আর ঘুম নয়, দিবানিত্রা ত্যাগ করাই প্রেরণ, নয়তো অধ্যাষ আয়ুক্য হবে। কি এক বিতৃষ্ণায় কেউ কেউ কপালের মঙ্গলতিলক মুছে ফেললো। এই চতুষ্পাঠীর হাওয়া যেন বিধিয়ে উঠেছে। প্রার্থনার বসতে চায় না কেউ। প্রার্থনা সঙ্গীতের কথা যেন আজ আর মনে পড়ে না কারও। সময় অতিবাহিত হয়ে বার অঘট।

পুকুরতীরে চললো ছাত্ররা দলে দলে। নিমের দাঁতন হাতে। অন্ত দিন গান গাইতে গাইতে স্নানস্নাত্যার বায়, আজ চললো নীরবে। শোকের শোভাভাত্রায় চলেছে যেন।

—ইন্দ্রজিৎ!

মেঘজড়ীর কণ্ঠে কে ডাকলো কোথা থেকে। অতি পরিচিত কণ্ঠ, তবুও যেন বিবাস হয় না। বাকে আত্মান, সে দেখে ইন্দ্রজিৎ দিগিক। স্বকর্ণে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—ইন্দ্রজিৎ, ব্যস্ততা না থাকে তো একবার আইস। কিছু কথা আছে গোপনীয়।

কক্ষকক্ষের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়। শিব্যদের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত ইন্দ্রজিৎ। পড়ুয়াদের মধ্যে জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রকান্তর অবসর সময়ে ইন্দ্রজিৎ পাঠ দেয়, পাঠ নেয়। চতুষ্পাঠীর অন্তঃস্থ ছাত্র তাকে মাষ্ট্র করে বসে। সে নাকি সঙ্গীতশাস্ত্রী।

—যা বুদ্ধিই আছে, নিকটে আইস। একটা কথা আছে।

আবার কথা বললেন চন্দ্রকান্ত। ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ইন্দ্রজিৎ সসম্মানে দেখা দেয়। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

—ভক্তমঙ্গল! চন্দ্রকান্ত শ্রিত হেসে বলেন। শিব্যের কপাল স্পর্শ করেন। বলেন,—ইন্দ্রজিৎ, তুমি এই চতুষ্পাঠীর পরিচালনভার লও, আমি কার্যকারণে মান্যারণ ত্যাগ করবো কিছুকালের নিমিত্ত।



—আমার সামর্থ্য কি? চতুপাঠী পরিচালনার মত দক্ষতা নাই আমার।

ভোজের সজ্জাফটা ফুলের মাধুরী-গন্ধভরা বাতাসে ইন্দ্রজিতের বিনয় কথা ভেসে যায়। নতমস্তকে কথা বলে সে।

মিত হাসি ফুটলো চন্দ্রকান্তর অধরপ্রান্তে। এক-রাশ ধূপ জ্বলছে তাঁর এক পাশে। চন্দন দগ্ধ হচ্ছে, তারই পুঙ্খপুঙ্খ ধূমরেখা চন্দ্রকান্তর আশ-পাশে। পুঁথির রাশি ছড়িয়ে আছে ভূমিতে। চন্দ্রকান্ত কি সব বাঁধাছাঁদার কাজ করছেন। হাতের কাজে বিরত হয়ে বললেন,—আমি জানি তোমার সামর্থ্য কতটা। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী তুমি, শিক্ষাদানের কাজেও তুমি সুদক্ষ। আমার আদেশ আশা করি অমান্য হবে না।

—বখাচ্চা। আপনার স্থানত্যাগের কি কারণ? গম্ভ্যবাহুল্যই বা কোথায়?

বিজ্ঞা বিনয় দান করে। ইন্দ্রজিত বিনয়বানত স্বরে একেকটি প্রশ্ন করলো। ভূমিতে চোখ রেখে কথা বলে।

চন্দ্রকান্ত কি এক আবেগে খানিক ঈষৎ চঞ্চল হন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—আমি তীর্থদর্শনে যাবো পদব্রজে। বঙ্গদেশ পরিক্রমা শেষ হওয়ার পর যাবো উত্তরকান্ধী। ততঃপর কোথায় বাই, কিছুই ঠিক নাই।

কত কালের জন্ত আপনার অমুপস্থিতি?

—তার কোন' স্থিরতা নাই। যদি আর না আসি, তাতেই বা বাধা কি?

অনুনা পদব্রজে বাওয়া যে খুবই বিপজ্জনক, তা আপনার অজ্ঞাত নয়, আশা করি।

মুহু হাসলেন চন্দ্রকান্ত। সহাস্তে বললেন,—রথ শকট কোথায় পাই? নৌকার পাথেয় আমার নাই। পদব্রজে বাওয়া ছাড়া উপায় কি? আমি সহায়সম্বলহীন।

—বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যে। ভয়ে ভয়ে যেন কথা বলে ইন্দ্রজিত। বলে,—বঙ্গদেশে মহাশয়ের নাম কারও আজ্ঞান্য নয়, তাই মনে করি কোন' অমুবিধা হবে না।

আবার অল্প হাসলেন চন্দ্রকান্ত। হাসির জের টেনে বললেন,—আমি পণ্ডিতসম্মত নয়। বাই হোক, আমার বাত্মার সময় সন্নিকটে। তুমি এই চতুপাঠীর স্তন্যম অক্ষয় রাখিও। জ্ঞানপথে থাকিও, বাধ্যবিধিকে উপেক্ষা করিও, কর্তব্যপালনে ক্রটি করিও না। শত বিপদেও মিথ্যার আশ্রয় লইও না।

চোখ হলহল করে ইন্দ্রজিতের। নতমস্তকে, তাই তার অঙ্গসজ্জা চোখ আর নজরে পড়ে না। বাস্পকণ্ড স্বরে কথা বলে—আজ আমাদের অনধ্যায় আর অরঞ্জন দিন।

—তথ্য ইন্দ্রজিত। তোমার মঙ্গল হোক। বেশ কিছু হুজুপ্য পুঁথি আমার পাঠাগারে আছে, তাদের সবচেয়ে রক্ষা করিও। কীটমট্ট না হয় যেন।

—বখাচ্চা মহাশয়।

তৃপ্তির হাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—বাও, তোমার কাজে যাও। আমার বাত্মার সময় নিকটে। জ্ঞানসমর অতিক্রান্ত হ'লে বাত্মা বাধ্যপ্রাপ্ত হবে।

আবার প্রণাম করে ইন্দ্রজিত। অধ্যাক্ষের পদস্বর্শ করে।

চন্দ্রকান্ত তার কপালে হাত রাখেন। বলেন,—মঙ্গলমস্ত। তুমি শিক্ষিত, দীক্ষিত, তোমার কোন' ভয় আর চিন্তার কারণ নাই।

হলহল চোখে পূর্ণকূটার ভাগ্য করলো ইন্দ্রজিত। আসন্ন বিয়োগ-বিরহের কাতর অমুভূতি তার মনে। বিবশ পায়ে পুরুষতীরে চললো সে। ব্রান সেয়ে এখনই কিরতে হবে। বিদায় দিতে হবে আচার্য্যকে। ততঃপর শিক্ষাদানের কাজে বসতে হবে। কর্তব্য অনেক, তাই পা চালালো ইন্দ্রজিত। নিজের মনকে শোনাতেই যেন কিসকিসিরে বললে,—‘যদিও আমার গুরু আনবাড়ী যায়, তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ যায়।’

হাস্তেগড়া চতুপাঠী, ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে মান্দারনের বাইরে। লজ্জা আর ভয়ে সঙ্কোচ আসে চন্দ্রকান্তর মনে। এখানে থাকলে বিপদ অনিবার্য। আনন্দকুমারীর আত্মীয়-স্বজন সহজে নিস্তার দেবে না। কোতোয়াল থেকে ডাক আসবে, পেয়াদা আসবে। তারপর সমাজে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। ফুলের মত পবিত্র চরিত্রে কালির দাগ পড়বে। চতুপাঠীর নামে হুনামি রটবে। আসল সত্য কেউ জানতে চাইবে না, মিথ্যা কলর সত্যে পরিণত হবে লোকের মুখে মুখে।

অরের আলো ধ'রেছে যেন চন্দ্রকান্তর বুক। অশ্রুতির কীটা বিঁধছে থেকে থেকে। চন্দ্রকান্ত ভাবলেন পথ দুর্গম। বিপদে আত্মরক্ষার উপায় কি? বৌদ্ধতাত্ত্বিকদের শাশিত অজ্ঞাবাস কখনে হবে, নয়তো অপবাতে মৃত্যু অবশ্যজারী। অস্ত্রধরে প্রবেশ করলেন চন্দ্রকান্ত। একটি ধারালো তরবারি সঙ্গে নিতে হবে।

লুপ্ত জন্তুর হিঁসে চোখের মত শত্রুর আঁধার লুকিয়ে থাকবে বনে বাগাড়ে, অতর্কিতে আক্রমণ করবে। বিপত কয়েক দিন ধ'রে হত্যা উৎসবের রক্তে লাল হয়ে আছে পঞ্চপ্রান্তর। গুপ্তযাত্রীর দল গুল পেতে ব'সে আছে যেখানে-সেখানে। গভীর ঘনরজনীতে শোনা যায় অস্ত্রের স্বনবনা। তরবারি-যুদ্ধ চলেছে জ্যোৎস্না রাতের সোনালী আলোয়। রাজ্যজয়ের নেশায় এই হানাহানি নয়, ধর্মের বৈবিত্য কিন্তু হয়ে উঠেছে হিন্দু, মুসলমান আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বাঙাল আর বিহারের মঠ, মন্দির আর মসজিদের দাহপর্ব চলেছে যেন স্বাপত্য আর শিল্পশোভা ভরে অঙ্গারে ব'রে পড়ছে। মাহুমুহি ফুলুভিত, বুদ্ধমূর্তি পদদলিত হয়েছে। বর্ষাস্ত্রয়ের কীল গলায় জড়ায় নয়তো বিধর্মীর পাওনা গ্রহণ কর।

একটি তীক্ষ্ণধার তরবারি একখানি পুঁথির মধ্যে রেখে বৈ ফেললেন চন্দ্রকান্ত। স্বপ্নছবি মত গভীরতের দুর্ঘটনা চোখে ভাসছে যখন তখন। আনন্দকুমারীর বর্ণভূষা, সেহালকার, পোষাক পরিচ্ছদ, কেশ-বিজ্ঞাস সবই একে একে মনে পড়ে। কি হুঃসায় চৌধুরীকৃত্তার। সমাজকে ভয় করে না, মানুষকে পরোয়া করে না বনাকলের সর্পভীতি পর্যন্ত তার নেই।

—ঠাকুরমশাই!

এক শিথলকণ্ঠের কাতর-কথা এক টুকরো কাব্যছন্দের মত উঠলো চতুপাঠীর হৃদয়ে।

—কে? চমকে উঠে গাড়া দিলেন চন্দ্রকান্ত। বাবের এসে দেখলেন যতগুণে সারি সারি পল্লভূঁড়ি ফুটেছে বেদে।

সাবি বসেছে সহপাঠী শিশুর দল। সন্তোষাত। অনাবৃত দেহ, হৃতির বস্ত্র পছন্দে। উপবাসী, প্রার্থনার গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকতে হবে, অথচ সময় বঁচে গেছে কখন।

—গান হবে না ঠাকুরমশাই?

পাখীর কাকলীর মত মিষ্ট কথা বেন। এক কোঁচুহলী শিশু বেন সকলের পক্ষ থেকে কথা বলছে। যুক্তকরে বঁসে আছে অজ্ঞানতা, সরল চাউনিতে বেন ভক্তির আভাস।

—ইঞ্জিনিং, তোমাদের ইঞ্জিনাই গান গাওয়াবে, পাঠ দেবে।

একসঙ্গে অনেক শিশু, কথা নয়, গান গাইলো বেন। বললে,—না না, ইঞ্জিনাই নয়, তুমি আমাদের গান গাওয়াবে, পাঠ দেবে।

—আমি যে গ্রাম ছেড়ে যাবো এখনই। বহু দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

—আমরাও যাবো।

মিস্ত্রিকণ্ঠের কথা শুনে কান্তর হাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। কথাকারদের আকুল সুরের প্রতিধ্বনি ছুটলো স্বতাসে। চন্দ্রকান্ত দেখলেন, প্রত্যেকের চোখে বেন মুগ্ধ-চক্কল-জন্ম-দুঃখ। মিষ্ট হাসির রেখা ফুটেছে কচিৎসে। বাক্যহারার মত ঝাঁড়িয়ে থাকেন চন্দ্রকান্ত। কথা খুঁজে মেলে না বেন।

জৈতুল গাছের হর্বুস-সত্ত পাতা ক'রে পড়ছে মণ্ডপে। বটের কুরি খসে পড়ছে। ডিরাপাখীর তাঁক বটকল ঘূঁজতে এসেছে আহার্যলোভে। তবু ঘুঁই উড়ছে বাতাসে। কনকটাপার পাশড়ি। চতুঃপাঠীর আড়িনার বোনের ঝিগিমিলি ছড়িয়েছে।

—পথে বিশপ অনেক। চন্দ্রকান্ত হেসে হেসে বললেন। প্রতিটি শিশুর মুখে দুটি বুলিয়ে বললেন,—এই কষ্টকর বাতায় তোমাদের মত কোমল শরীর পাঠ হয়ে যাবে।

কি বলতে বার শিশু-পাল, কিন্তু কথা ধেমো বার। কাঁকে দেখে বেন ভীত হয় তারা। হৃদয়ের হয়ে বসে সকলে। ভয়ে বেন বুক হয়ে বার।

মান-পেয়ে কিরে এসেছে ইঞ্জিনিং। বেনীর এক পাশে ঝাঁড়িয়ে গান ধরে সুরেল হলে। প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে থাকে। শিশুদের পেছনে এসে বসে সকল ছাত্র। ইঞ্জিনিংয়ের সুরে সুর মিলার। ঐক্যভাষে গান ধরে সকলে। গাছের পাখীও বেন সঙ্গে সঙ্গে গান গায়।

ভক্তজনগণ গায়কদের চোখ এড়িয়ে চন্দ্রকান্ত বীরে বীরে চতুঃপাঠী জ্ঞাপ করেন। তাঁর হাতে এক নাতিবৃহৎ পুলিশ। পুঁথি পান-পাত্র আর পরিষের। দ্রুতপদে চলতে থাকেন অধ্যক্ষ। ঘরা পড়ার ভয়ে চোখ যেমন পথ চলে তাড়াতাড়ি। অনেক দূরে গিয়েও গান শোনা যায় মিহিসুরে। প্রার্থনার গান নয়, বেন বিহার-সঙ্গীত গাইছে শিবদল। চন্দ্রকান্ত একবার শিছু কিরে দেখলেন। চতুঃপাঠীর মস্তপশীর্ষ চোখে পড়লো। মাটিব প্রাচীরে দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাঁর। আবার চলতে থাকেন। বিভীষিকার নিষাৎ ধমকম করছে বেন। কখনও চন্দ্রকান্ত ভয়ে বেন আড়ষ্ট হ'য়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর পক্ষে পড়ে, পরিপার্শ্বে বাসের বনে কে এমন ঘ্যান বঁসেছে। “পাখির কল কিছু বিবৃত হ'য়ে বেন ঘ্যান করছেন। ধমকে ঝাঁড়িয়ে উঠলেন। ঘ্যানীর ঘ্যান-গভীর নৃত্তি চিনতে পারেন চন্দ্রকান্ত। বহু আশ্চর্য নৃত্তি। বাউলার জাম্বোয়র এক বহুনা, পক্ষের ধারে

আজর পেয়েছে অন্যায়ের। কোন্ এক বৌদ্ধমঠ ধ্বংস আর নষ্ট হয়েছে কে জানে! মঠের আরাধ্য মূর্তিকে ভুল করতে পারেনি আক্রমণকারীরা। সজ্জারাম পুড়িয়ে দিয়েছে শুধু।

আর কালবিলম্ব করেন না চন্দ্রকান্ত। তাঁর গতি দ্রুত হয় ষাঁটাপথে বৌদ্ধভেজ জঙ্গে লাগে না! পথ বুকছায়াছন্ন। আকাশ-শাশী গাছের সারি পথের দুই পাশে। আময়ুক আর বাঁশের বন। সবুখে চোখ বার, পথের সর্শিল বিস্তার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। দুই এক পাকা গৃহের প্রাচীর আর পরিধা দেখা যায়। কুললী স্থপতির কার্যকলাপের চিহ্ন প্রাচীরে। চলতে চলতে আবার সময়ে ধামলেন চন্দ্রকান্ত। বাঁশবাড় চক্কল হয় কেন এমন! চন্দ্রকান্ত দেখলেন, একটা ষাঁটাপ বস্ত্র হয়ে পালিয়ে গেল বাঁশবন থেকে। তার কুলচোখে হিংস্রতা। মাছুবের পশপক্ষে শিকার ফেলে পালিয়েছে। পাছের প'রে পাখীর বাসার হানা দিয়েছিল, কটা চিলের ছানাকে মেয়েছে টুটি কায়ড়ে।

গ্রামের মায়া বেন তাগ ক'রতে পারেন না চন্দ্রকান্ত। পথ চপতে চপতে কেবলই এখানে সেখানে দেখছেন। শুণ্ডযাতী শঙ্কর ভয়ে নির্ভয়ে চলতে পারছেন না।

বহুজনের পক্ষমনি শোনা বার শিছুপানে। এক দল মাছুব বেন তড়িৎগতিতে আসছে। আক্রমণকারী শঙ্করল হয়তো। বাঁশবন লুকানো ছাড়া পতি নেই, অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে যদি বন্ধা পাওয়া যায়। একজন মাত্র একজনের সঙ্গে হাতাহাতি-যুদ্ধ চালাতে পারে, একজন বহুজনের আক্রমণ বোধ করতে পারে না।

—ঠাকুরমশাই!

পথের বীকে ডাকের প্রতিধ্বনি আহ্বাদ ধায়। বিশদ-ভীক কঠোর বেন আহ্বানকারীর। মরণের ভয় পেয়ে মাছুব বে-সুরে চৌচায়। দুর্ঘটনার পড়েছে, তাই হয়তো শিছু ডাকছে।

পাশেই বনাঞ্চলের ঝাঁকে এক সজ্জারাম। সাড়া দিতে ভয় হয় চন্দ্রকান্তর। তিনি পথ চলা খামিয়ে অপেক্ষার থাকেন।

সজ্জারামে বুকের ষীল আর হকল গাইছে ভক্তজন। এক সুর, এক তান, এক কথা। চন্দ্রকান্তর কানে বার শুদ্ধমন্ত্রের একেক উক্তি। গানের কলির মত ভেসে আসে বেন। মুক্তিপথের পথের, মোক্ষলাভের মহামন্ত্র, বুদ্ধপ্রাপ্তির স্তোত্রগান গাইছে ভক্তরা। তারা বলছে,—পাণ্ডা ম হানে!

মনে মনে ঐ উক্তি বকভাবার ধ্রুপদর করেন চন্দ্রকান্ত। পালি আর প্রাকৃততে তাঁর জ্ঞানের অভাব নেই। মন্ত্র শুনে ঈশ্বর হাসলেন তিনি। প্রাণীকে হত্যা করবে না,—মুখে ষীল আঙড়ার কিন্তু কাজে কি করে বৌদ্ধতাত্ত্বিকরা। ষীলের অপমান করে। বিশ্বাসীর রক্তপাত করে।

তারা বলছে,—ন চ দিন্নমাদিরে।

বা ভোমাকে দেওয়া হয়নি তা বেন তুমি গ্রহণ করবে না। চন্দ্রকান্ত মনে মনে ভাবলেন, হিন্দু ধর্মের ধ্বংসের পথ হাতমুড়ির স্বর্গালঙ্ঘ্য করা আশ্চর্য্য করে। দক্ষিণের রূপার তৈজস কোথায় বার। প্রাণীর অর্থ কোথায় উগাও হয়।

তারা বলছে,—বুলা ম ভাসে।

মিথ্যা কথা বলবে না। চোরে ধল্লর কথাই কথার মিথ্যা। বুকের দাঁতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা। সঙ্গীতের মানে না আর।

## এক খাবলা তেল আর কায়ক ঘাট জল

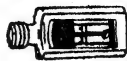
সংসারের কাজের চাপে বেশীর ভাগ মেয়েরাই চুলের যত্ন নেবার কষ্টটুকু করতে নারাজ, এক খাবলা তেল কোন রকমে মাথায় দিয়ে কয়েক ঘাট জল ঢেলেই তাঁরা স্নান আর চুলের ওপর তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন, ফলে চুল তার খোঁরাক না পেয়ে আশে পাশে তার সজীবতা হারিয়ে শুকিয়ে

ওঠে, চুলের অবস্থা ক্রমে শনের দড়ি হয়ে ওঠে, তারপরে চুলে হয় পাক ধরে না হয় তা উঠতে শুরু করে। অকাল-বার্ধক্য ভেঁকে না এনে অন্ততঃ দশ মিনিট যদি আপনি নিয়মিতভাবে জবাকুহম মাথায় মালিশ করেন আর একটু যত্ন নিয়ে তা পরিকার করে আঁচড়ে বাঁধেন তবে কেশ-সৌন্দর্য ওমু দীর্ঘস্থায়ীই হবেনা তার সৌন্দর্য

সংসারের অন্তর্গত পাঁচজকেও আনন্দ দেবে।



# জবাকুহম



সি, কে, সেল এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
জবাকুহম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২  
১১৭, আর্দেনিয়ন স্ট্রীট, মাদ্রাস-১

তার বলছে,—ন চ মম্বপো সিরা।

মদ থাকে না। আবার মনে মনে হাসলেন চন্দ্রকান্ত। শোনো বার, সম্ভারামের ভিকু আর শ্রমণদের জন্ত মদ ঢোলাই হয়। ফসে মদ হওয়ার আগে তারা আকণ্ঠ মতপান করে। মধ্যরাত্রে না কি নটদের নৃত্য-উৎসবে বেগ দেয়।

সেই ছুটন্ত মদ্রয়দল এসে খেবে বার অপেক্ষমান চন্দ্রকান্তর সমুখে। লক্ষ্য করা যায়, ওরা বহন করে এনেছে এক শূন্য পালকী। বিভিন্ন কালকাজ পালকীতে, রূপার পাতের। দেবদেবীর চিত্র আঁকা পালকীর ছুরো।

—ঠাকুরমশাই!

পথের ধূলা কপালে মাখতেই বেন প্রণাম করলে একজন।

চন্দ্রকান্ত বিষয় বোধ করেন। সাগ্রহে দেখতে দেখতে বললেন,—মহাশয়দের বক্তব্য কি? আমাকে কি প্রয়োজনে?

—মা ঠাকুর ডাক পাঠিয়েছেন ঠাকুর মশাই! পালকী পাঠিয়েছেন।

—আমার তো চেনা নাই! কোথায় বসতি! পরিচয় কি?

—আনন্দকুমারীর মা।

বক্তার কথা শেষ হয় না। মাথা নত করলেন চন্দ্রকান্ত। চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে। বললেন,—কারণ কি শুনতে পাই?

—ঠাকুরমশাই, আমাদের রাজলক্ষী আনন্দকুমারীর সন্ধান মিলছে না গত রাত্রি থেকে।

—তজ্ঞত আমার কি করণীয়? আমি কি করতে পারি?

কথা বলতে বলতে বেন আতকে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। যে আশঙ্কায় তিনি গ্রাম ভ্যাগ করে চলেছেন সেই শঙ্কা সত্যে পরিণত হয়।

—চৌধুরী-পরিবারের এই অসময়ে তাঁরা মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী, এই ডাক উপেক্ষা করবেন না অথবা।

—আমি যে কারিগ্যন্তরে চ'লেছি।

—তবুও অমরোহ। গড় করছি মহাশয়কে। ব্রাহ্মণ প্রণামেই হয়। আপনি আর অমত করবেন না। আমাদের সহ চলেন এই পালকীতে। চৌধুরাণী আপনার ক্ষতিপূরণ দিবেন। আপনি তা গণনার বলতে পারবেন।

—গণনার কাজ আমি করি না, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা নাই।

কথা বলছেন ভাবনার চাক্ষুণ্য অধির চন্দ্রকান্ত। কষ্টবশে আর ভয়ন পাণ্ডিত্য নেই। চোখের উজ্জ্বল হারিয়েছে বেন। দৃষ্টিতে জ্ঞাতা ফুটেছে।

লেটেল বাগবীরা এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে বেন এক চাপা গুজন শোনা যায়। বক্রকটাকে তাকায় ঠিক কেউ। বাঁকা হাসি হাসে।

চন্দ্রকান্ত কি ভাবতে থাকেন কে জানে? রূপালে তাঁর চিন্তাবোধা যায়। কথা বলেন না আর।

—পালকীতে ওঠেন, বুধা চিন্তা ভ্যাগ করেন।

—আমাকে রেহাই দেন। আমি বাঙলার কোন প্রকল হবে না। আনন্দকুমারী বর্তমানে কোথায়, সে জীবিতা না মৃত্যু, কিছুই আমার জানা নাই।

—কথার কাজ হবে না। শোনা আভলে বি উঠবে না।

লেটেলদের মধ্যে থেকে কার ব্যঙ্গমিশ্রিত কথার চন্দ্রকান্ত কিনে দেখলেন একবার। সহাত্রে বললেন,—শক্তি প্রয়োগে কোন লাভ হবে না, তোমাদের ময়েকে লিখবে না। তবে চৌধুরাণী ঠাকুরপ বহন ডাক পাঠিয়েছেন তখন তাঁর আদেশ অমান্য করা অসুচিত মনে করি। চৌধুরীমশায় কি মালারণে নাই?

—না মহাশয়! বাণিজ্যবাজারে গেছেন আমাদের হজুর। কবে যে কিরবেন তার কোন খবর নাই।

একান্ত অনিচ্ছায় পালকীতে উঠে বসলেন চন্দ্রকান্ত। হাতের পুলিশা রাখলেন এক পাশে। পালকী ছুটে থাকলো ক্ষতগতিতে। পালকীর মুক্তধার থেকে জমিদার কুমারামের ভগ্নগৃহের এক প্রান্ত অস্পষ্ট দেখা যায়। কুমারামের সহধর্মিণী বিদ্যাবাসিনীর রূপাবল্য মূর্ত হয়ে মনচক্রে ভেসে ওঠে। শুধু রাজকুমারী নয়, আনন্দকুমারীও দেখা দেয় বেন। ছই নারী বেন ছই পৃথক ধাতুতে গঠিত। একজন শান্তশিষ্টা, অজ্ঞান যৌবনচঞ্চল। একজনের রূপ শিল্পমন্ডর, অজ্ঞান বেন অলঙ্কারিত। চাঁদের আলোর মত কমলীয় একজন, অজ্ঞান বেন সূর্যের তীর রশ্মি। প্রথমা আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়া দম্ব করে।

রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী কেঁদেই সারা হল। কেমন শোকার্তের মত অশ্রুপ চোখের জল ফেলেন। নির্দাসনের গুণ ভোগ করছেন তিনি, তাতে বেন হৃৎ নেই। আনন্দকুমারীর বিরহ-অনলে বুক অলছে তাঁর। পুঁথি নকল করতে বসেছিলেন, কিন্তু লেখায় বেন মন বসে না কিছুতে। এক পত্রিক্তি লেখেন আর কালির দাগে নিশ্চিহ্ন করেন সেই লেখা।

পরিচরিকা বললে,—কাটাছুটি করবে, না লেখালেখি করবে?

জলভরা চোখ তুললেন রাজকুমারী। বললেন,—মন লাগে না লেখায়। আনন্দকুমারীর কথা মনে পড়ে কেবলই। সে এখন কোথায় কে জানে? ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে একবার তাকে চোখের দেখা দেখে আসি! আনন্দর মা না জানি কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

বশোদা বললে,—ব্যস্ত হয়ে কি আর কল' হবে? সব স'য়ে বাবে দেখবে বৌ। টাটকা শোকে সবাই এমন উতলা হয়। তার পর একদিন সব ভুলে যায়। আবার হাসি কোটে মুখে। বর্বার মেঘ কেটে গেলেই আবার বোদের আলো কোটে।

—তবুও, অমন সমর্থ মেয়েটা বেহাত হয়ে গেল? আমরা কেউ কিছুই করতে পারবো না?

হেসে ফেললো বশোদা। হেসে হেসে বললে,—জোমরাই বত কাঁকাটা ক'রছো, বার জন্মে এত কষ্টভোগ সে হয়তো হেসে মানিয়ে নেবে। ভুলেও মনে করবে না পেছনে বাঁদের ফেল গেছে। খানিক থেমে আবার পরিচরিকা বললে,—আনন্দ আর কি কখনও সমাজে ঠাই পাবে! ঘরে দেবেন চৌধুরীমশাই?

লেখার মন মেন বিদ্যাবাসিনী। কিন্তু লেখনী বেন চলে না আর। কালি শুকিয়ে যায়। নতমস্তকে ব'সে থাকেন চূপচাপ। আনন্দকুমারীর হাসির লক্ষ বেন কানে ভাসতে থাকে। তার স্নানকিল হাসিতে কেমন ধাক্কা দেই। এমন মিষ্টি হাসি শুনেও আনন্দ

হায়নি। এমন শাট কথা। নিলাজ ভাবভঙ্গী চৌরীকস্তার।  
বেগবোরা গতিবিধি। ভয় কা'কে বলে জানে না।

—আহা আনন্দকুমারী সুখী হোক, প্রার্থনা করি। তার মাথার  
সিঁড়ির অক্ষর হোক।

—সিঁড়ির আলতার ধার ধারে না স্নেহরা। শাড়ীর বসলে বাগরা  
পরায় মেয়েদের। পায়ে জুতো পরায়।

—যে দেশের যেমন রীতি তাই তো হবে।

—দেশের মুখে আঙুন লাগুক। রীতির মাথার বাঁটা মারি আমি।

—বড় নিষ্ঠুর তুমি বশোনা। বা মুখে আসে তাই বল'।

—কেন বলবো না তাই শুনি? আমি কি কারও খাই না পরি?

—সুনতে পাই স্বয়ং নবাব নাকি ঐ ব্লেক্‌দের কাছে মাথা বিকিয়ে  
দিয়েছেন। কত গুণ তাদের।

—আমাদের নবাব ভো মাহুব নয়, পণ্ড। মহুবাথ বলতে কিছু  
নেই তাঁর। দেশে তাই এমন অনাচার চলছে। লালমুখো বাদরদের  
রাজত্ব হবে দেশে। আমাদের শাসন করবে।

বিদ্যাবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। লেখার মন দেন। কিন্তু  
লেখনী চলে না যেন। কালি শুকিয়ে যায়। পরিচায়িকা দূরে থেকে লক্ষ্য  
করে জমিদার-পত্নীকে। অক্ষরাণ রূপ-ঐশ্বর্যের অধিকারী বিদ্যাবাসিনী।  
শূণ্য বেহ, অলঙ্কারের লেশ মাত্র নেই। তবুও তাঁর অবয়বের অলঙ্কার  
দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। রাজকস্তার গড়ন আর গঠন দেখতে দেখতে  
মুগ্ধ হয়ে যায় বশোনা। লেখনী খামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন  
তিনি। তুলট কাগজের শুভ্রতার মাঝে কি লেখা আছে কে জানে,  
বিদ্যাবাসিনী একাগ্রচিত্তে যেন পড়ছেন সেই রহস্যকথা। পরিচায়িকা  
স্থিরচোখে দেখছে তাঁর বর্ণভূষা। [ক্রমশঃ।

## হৈমন্তিক নীহার-গুহ-মল্লিক

কচি কলাপাতার মত সবুজ রোদ।

চাঁবি বিকে কেতে কেতে ধান।

বিষের রঙের মত কেতে তাত্রাত রক্তিম পাকা ধান।

পালশেই নদী—তার বেলোয়ারী জল,

বালি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পারের অনেক নীচে নেমে গেছে।

একটু আগেই জাল ফেলেছিল জেলেরা,

শামুক ছড়ান তাই জলের কিনারে।

শামুকের জাগ আসছে নাকে।

কোমল নীলাভ আকাশে দুধ-সাদা কাশ-ফুল রঙের,

বকের পাখার মত মেঘ নেই।

চিল মাছরাঙাদের শরীরে আমেজ আজ,

মাছ ধরিবার তরে নাই কোন তাড়া;

শিখিল নদীও যেন রূপালী সাপের মত রোদ পোহাতেছে।

ধানের রসে মশগুল কয়েকটি কৃষক,

ওখানে মাঠের পাশে করিতেছে রঙ্গ-আলাপন।

ইহাদের মত আমিও বসিয়া আছি

গাছের শুড়িতে পিঠ রেখে।

গাছের উপর থেকে অনেক হলুদপাতা,

থসে থসে পড়িতেছে গায়ে—বাসের উপরে।

শীতের রাতে নীড়ের পাখীর মতন এক অলসতা, অবসাদ দেহে।

চিন্তা ইচ্ছা উৎসাহ ক্রমেই বিবশ হয়ে আসিতেছে।

তখন তোমার মোটির এল—হেমন্তের ঘেঠা পথে

ঘুলির ঝড় পিছে রেখে।

নেমে এসে বললে, "চল,"

তোমার দেহের ভাঁজে জীবনের ফেনার বর্ণালী।

ভবু বিস্মৃত আঁচল যেন ঘাস ছোঁয় মনে হয়।

পেবে পৃথিবীর মত তোমার মুখের দিকে

চোখ রেখে "কোথায়?" বলতেই আমি দেখি,

তোমার চিবুকে চোখে জ্বলন্ত পাখিীর বিজ্ঞ পান ছেঁয়ে গেল।



# সাময়িক প্রেক্ষা

বন্ধার প্রতিকার কি ?

“গু. ১১৫ জাহুয়ারী নয়াদিল্লীতে বন্ধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের প্রাচ্য আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে প্রাচ্যের ২১টি দেশের বেসরকারী প্রতিনিধি বোগলান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক সভায় মিলিত হইয়া এই কমিটি গঠন করিয়াছেন। এটি কমিটির হেড কোয়ার্টার্স ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হওয়ার ভারতে এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে বন্ধার আক্রমণ নিরোধ করিবার কতখানি সুব্যবস্থা হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন। বন্ধারোগের ভাল চিকিৎসা-পদ্ধতি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে-সম্পর্কে উতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। গত শনিবার কলিকাতায় বহু ইনস্টিটিউটে অঙ্কিত ভ্রাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ায় বার্ষিক সভায় সভাপতির আসন হইতে ডাঃ এ. সি. উকীল বলিয়াছেন যে, বয়স ও পুরুষনারীভেদে বন্ধার আক্রমণ কম-বেশী হওয়া সম্পর্কে ভালরূপে এখনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু জীবনব্যাপী নির্বাহের এবং কাজের মানের উন্নতির দ্বারা যে বন্ধার আক্রমণ হ্রাস করা যায়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বন্ধার আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি যে জীবনের বৈষয়িক অবস্থার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের মানের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা হইয়াছে নাই? তাহা হইতেছে না, বরং দেশের লোকের জীবনব্যাপী মান নিম্নাভিযুক্ত হওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইতেছে। বন্ধারোগের প্রতিরোধের জন্য যেখানে জীবনব্যাপী মান উন্নত করা আবশ্যিক, সেখানে বি, সি, জি, টিকা দিয়া কতটুকু আর ফল পাওয়া যাইতে পারে?”

—দৈনিক বহুমতী।

সরকার—হিসাব চাই

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার প্রস্তাবিত আদর্শ পল্লী গঠনের পরিকল্পনা পরিচালনা করিয়াছেন, এই মর্মে এক স্ববাদে আমরা সন্তোষ প্রকাশিত করিলাম। তারপর দেখিতেছি, সরকার তৎপরতার সহিত এই স্ববাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাইয়াছেন যে, প্রকাশিত স্ববাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ববাদ সর্বথা অমূলক। পক্ষান্তরে রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত আদর্শ পল্লীগঠন পরিকল্পনাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

বলিয়া মনে করেন। বস্তাবিশিষ্ট পল্লীগুলিতে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। আরও কার্য্য বর্ধা সম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে বলিয়াই সরকার পক্ষ আশা করেন। সরকার পক্ষের এই বিবৃতিতে অবস্থাটা পরিষ্কার হইয়াছে। আপাততঃ ষিখা-সন্দেশ দূর হইয়াছে। কিন্তু গত বর্ষার পরবর্তী প্রাবনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠন কার্য্য কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সরকারের প্রস্তাবিত কাজের অগ্রগতির হিসাব পাইলে বুঝা যাইত, আদর্শ পল্লীগঠনের পরিকল্পনা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিদেশী নয়—দেশী চাই

“কলিকাতার বড় বড় হোটেল খরিকারদিগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশ হইতে নর্তক, নর্তকী ও বিলাতী অর্ধেক্তা আনা ইয়া নাচ-গানের বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করার সিদ্ধান্তটি শুধু সম্মেলনযোগী নহে, ইহার ফলে প্রকৃত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ও সঞ্চার হইবে। এই বাবদ মাত্র কলিকাতা সহরের তিনটি বড় বড় হোটেলই বছরে নাকি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ ও অমৃতসর সহরের বড় বড় হোটেল এই বাবদ খরচটা ঘরিলে সাতকোটি ৭০-৮০ লক্ষ টাকার কম হইবে কি না সন্দেহ! বৈদেশিক মুদ্রার বৈধতা বাটতি চলিতেছে, তাহাতে ভারতের পক্ষে আপাততঃ এই খাতে এত টাকা ব্যয় করা চূঃসাধ্য। বিদেশী খরিকারদিগকে আকৃষ্ট করার জন্য এক্ষণে অমুঠান অপরিহার্য্য কি না—সে সম্পর্কেও গুরুতর সন্দেহ আছে। কেন না, ভারতে ভ্রমকালে স্বদেশে, সব সময় দেখা অমুঠানগুলি যে তাঁহারা আবার দেখিতে চাহিবেন—এমন কথা মনে হয় না। বরঞ্চ এ-দেশের নাচ-গান দেখাইবার ব্যবস্থা হয়তো তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় হইত। হোটেল পরিচালকগণ এ-সম্পর্কে চিন্তা করিলে ভালো হয়। বিলাতী ক্যাবারে নাচ তুলিয়া দেওয়ার পরে তাঁহারা যদি দেশী নাচ-গানের আসর বসান, তাহা হইলে সৌখিন খরিকারদিগের আকর্ষণ কমিবে না; অল্প দিকে কিছু লোক কাঁচ পাইতে পারে।”

—যুগান্তর।

কলঙ্কালার বিপদ

“কলিকাতার কলের বাজারে যে শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার এক ক্ষণিক্ত বিবরণ গত কলা ‘বাণীমতা’র প্রকাশিত হইয়াছে। বাসগাছীর অভাবে মাঝে মাঝে প্রায়ই কল চালান অঙ্গ

বন্ধ হইতেছে এক অল্প নানাপ্রকার রেল কর্তৃপক্ষের অধ্যবস্থা ও দুর্নীতি এবং সরকারী উদ্যোগীতার ফলে ফলের যে অপচয় হইতেছে তাহাতে আর কেহ না ইউন, শহরের অসাধ্য রোগী ও শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্য বিশেষ হইয়া পড়িতেছে। তা ছাড়া গরীব কল-বিক্রেতার্য ও বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন। সম্মিলিত কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা এই বিষয়টির আন্তরিক নিন্দা দাখিল করিতেছি। কারণ ইহার সহিত বহুসংখ্যক লোকের স্বাস্থ্য ও জীবিকা জড়িত।” —স্বাধীনতা।

### নির্বাকচনে নমিনেশন

“নমিনেশন ধারণ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় আসিয়া বাংলা কংগ্রেসের ওকালতী করিয়া জঙ্গলাল নেহরুকে বলিতে হইবে—নলিনাক সাতাল অতি সংলোক, তুলনীয় জলে খোয়া অতিশয় সাদা আদমী, উসকো ভোট দেও; পুরুলিয়ার বাংলা ভুক্তির বিরুদ্ধে যাহারা হিন্দীওয়ালদের হইয়া লাঠিবাজি করিয়াছিল সেই দেবেন মাহাতো জাতীয় লোকদের জন্ত বলিতে হইবে—ইহার সাদা বাংলাপ্রেমিক, ইনলোগীকো ভোট দেও। সেই বহুতাতে নেহরু নিশ্চয়ই বলিবেন—কংগ্রেস সত্যতা ছাড়া কিছু মানে না, দেশসেবা ছাড়া কিছু দেখে না। দেবেন মাহাতোকে বিহার বিধান সভায় টিকিট দিলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া আনিবার প্রতিক্ষিত প্রাদেশিক কংগ্রেস দিয়াছিলেন, কংগ্রেস-পতি আন্দোলনের কথাও বলিয়াছিলেন, তার পর অতিশয় নির্লজ্জ ভাবে বিবরাশ্রয় করিয়া দিল্লীর ভাণ হইতে চামড়া বাঁচাইয়াছিলেন। পুরুলিয়ার লোকসেবক-সম্ম বটুকু এলাকা বাংলায় আনিতে পারিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উদ্বাস্ত সমস্তা বাংলার প্রধান সমস্তা। উদ্বাস্ত-মন্ত্রী বেপকা রায়কে পাঠানো হইয়াছে মালদকে, যেখানে ভোটপাতার মুসলমান এবং সাঁওতাল। মুখে বলা হইয়াছে তিন বাহা করিয়াছেন ঠিক করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক কি না, যাচাই করিবার জন্ত কোন উদ্যোগকেন্দ্রে তাঁহাকে নমিনেশন দিতে সাহস হয় নাই। কংগ্রেস মুখে যে সমস্ত নীতিকথা বলিতেছে তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের বিশ্বাস কতটা আছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় উহার নমিনেশন তালিকা। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলিয়া জনসম্মত সহিত কথা বলিতে পারে না, কিন্তু নিজেদের নমিনেশন তালিকায় সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে প্রার্থীর নাম চুকাইতে পারে। কংগ্রেস প্রাদেশিকতার ঘোর বিরোধী বলিয়া প্রচার করে, অথচ তাহাদের তালিকার প্রাদেশিকতার পূর্ণ পরিচয় কল-কল করে। নেহরু বলিয়াছেন—আপনারা কি বড় জিনিষ চাহেন, না মাথা ভাঙিতে চাহেন? কথাটা কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কি মনে করিয়া বলিয়াছেন তাহা ঠিক বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় যে, কংগ্রেসী খড়ের উপর মাথা নামক যে বস্তুর হিরাছে উহা পাথরের, ওটা ভাঙা সহজ নয় বটে, তবে ভাঙিলে ক্ষতি নাই।”

—বৃগবাকী (কলিকাতা)

### শ্রমিক মজলার সরকারী প্রক্টোর নমুনা

“বাধান দেশের কংগ্রেসী সরকারী শ্রমিক মজলার জন্ত বহু কিছু করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু

এই শ্রমিক মজলার নামে শ্রমিকের উপর যে বোঝে চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে—তাহারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্মচরী রাজ্যবীমা কর্পোরেশনের কৃত্তিকলাপ। এই রাজ্যবীমা চালু হইবার পর শ্রমিকের সুবিধা হওয়া দূরে থাক—হয়রাগীর একশেষ হইতে হইতেছে। প্যানেল ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলে ঔষধের দোকানে ঔষধ পাওয়া যায় না। আবার চিকিৎসার তালিকাভুক্ত রোগ ছাড়া অন্য কোন রোগ হইলে নিজের গাঁটের পরসে খরচ করিয়া চিকিৎসা চালাইতে হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা বাইতেছে, প্যানেলের ঔষধ দিয়া রোগ সারাইতে না পারিয়া অন্য কোম্পানীর ভাল ও দামী ঔষধ দিয়া রোগ সারাইতে হইতেছে। কঠিন অস্ত্র হইলে বা এক্সরে ও রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে হাওড়ার বড় ডাক্তারবাড়ির নিকটে ধনী দিতে হইবে। সেই ধনী দেওয়ার কাজে বহু শ্রমিককে ৩৪ বার হাওড়ায় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বাইতে হইবে। সেই বাতায়নের খরচ একত্র করিলে দেখা যাইবে যে প্যানেলের বাহিরের ডাক্তারখানা হইতে সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করিলে এক্ষণে অথবা রক্ত পরীক্ষা হইয়া যাইবে। এইতো গেল এই দিকের কথা। অন্য দিকে কঠিন অস্ত্র হইতে রোগ মুক্তির পর দরিদ্র শ্রমিকের অর্থাভাবে উপযুক্ত পথ্য কিনিতে পারেন না। উপরন্তু কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন এইবার হইতে টনিক জাতীয় দামী ঔষধও বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। ফলে হতভাগ্য শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়িয়াই চলিবে—ইহাই মনে হইতেছে। রোগমুক্তির পর আবার ‘সিঁ লিভের’ টাকা তোলায় কামেলাও কম নয়।”

—সংশল (হাওড়া)

### নির্বাকচনী আসরে

“শ্রীনারায়ণ চৌধুরী শুধু কংগ্রেসের প্রার্থী নন। তিনি জেলা-ফুলবোর্ডের সভাপতি, এ কথাটাও বর্তমানে মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। প্রকাশ, কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের ‘পুথ্যার’ বহুপ ক্ষেত্রে ক্যাডারের চাকুরী নাকি নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই পদে ১২০০ বৃক, পত বৎসর বর্তমান জেলা ফুল বোর্ড বর্জক মনোনীত হয়। এক বৎসরের উপর নিয়োগপত্র পাইবার আশার তঁহার্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। কংগ্রেসের নির্বাকচনী প্রচারে সরকার পরিচালিত উদ্বাস্ত পত্রী বিভাগের লিখকদের নিয়োগে চোঁ চলিতেছে বলিয়া জানা গেল। জেলা শাসকের নাম করিয়া তাহাদের উপর কংগ্রেসী প্রচারে নামিবার জন্ত চাপ দেওয়ার কথা শোনা বাইতেছে। দিল্লি অফিস কংগ্রেস প্রার্থীর ভ্রাতাকে আমদানী ও উদ্বাস্তপত্রীতে তাহাকে ঘোরানো নিশ্চয়ই অনর্থক নয়।”

—নূতন পত্রিকা (বর্ধমান)

### যোগ্যতার লড়াই

“১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়ার দেশে জাতির সাধারণ নির্বাচনের সাদা পঞ্জিয়া সিয়াছে। ১৯৫৭ অব্দে ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে। শাসনের তার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসবল্লভ ব্যক্তির পাইয়াছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করিয়া অন্ত দলীয়রা শাসনভার পাইবার জন্ত খুব চেষ্টা করিয়া বিলম্ব করেন।

হন। তবে কংগ্রেস জরাজীর্ণ করিলেও সব কংগ্রেসী সাক্ষ্য লাভ করে নাই। কেউ কেউ নাছোড়বান্দা হইয়া পরাজয় উপেক্ষা করিয়া কড়াভাঙ্গার গুণে পরীক্ষার ফল ছেলের কম্পাটমেটাল দিয়া দ্বয়ের দ্বাদ বোলে মিটাইয়া এম, এল, এ, খেতাবে বঞ্চিত হইয়া এম, এল, সি, হইয়া শাসন সাধ ও শাসন-বাদ দুইই উপভোগ করিয়া আবার ভোটবৃদ্ধ নামিবার পারতাড়া করিতেছেন। এম, পি, হইতে না পারিয়া শেষ অবধি ককশা প্রাপ্ত হইয়া এম, এল, এ সাহিবা উপনির্বাচনে শোণিত এম, এল, এ হইয়া পদগৌরবে সমৃদ্ধ হইয়া এবার আবার এম, পি, হইবার জন্ত তৈরী হয়েছেন। কত এম, পি, কুমোরেব কুয়া খোঁড়া কাজে যে বত নীচে নামে তার তত উন্নতির মত এম, পি, ছেড়ে এম, এল, এ, হবার প্রয়াস পাইতেছেন। কত লোক নির্বাচনে দাঁড়াবেন তবে ভাগ্য অমুসারে কারো নির্বাচন, কারো নির্বাসন হইলেও দুঃশাস্তি নির্বাণ হইবে না।

—জলীপুর সংবাদ

### ধনী ও দরিদ্রের ট্যাক্স-পার্থক্য

“এতি বছর ধনীদের ট্যাক্স কমছে আর গরীবদের বাড়ছে। ১৯৪৮ সালে ধনীদের স্থপার ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স কমানো হয়েছে ২ কোটি টাকা। অথচ তামাক ও আমদানী কর বসিয়ে ১৪ কোটি টাকা এবং ডাকমাস্তুল বৃদ্ধি করে ৪০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স চাপানো হয়েছে গরীবদের ঘাড়ে। দেখা যাচ্ছে, যেখানে ধনীদের কদলো ২ কোটি টাকা সেখানে গরীবদের ঘাড়ে চাপানো ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালে ধনীদের অতিরিক্ত মুনাফা ট্যাক্স হ্রাস করা হয়েছে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অপর দিকে সূতা বস্ত্রের উপর শুষ্ক বাবদ ১১ কোটি টাকা ও আমদানী শুষ্ক ৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ১৭ কোটি টাকা যে ট্যাক্স বাড়ানো হোল তার বোঝা পড়লো সাধারণ মানুষের উপর। এর পর ১৯৫০-৫১ সালে আবার ব্যবসায়ীদের মুনাফা ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স ১৫ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এইবার তুলনা করুন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সরকার ধনীদের ট্যাক্স কমিয়েছেন ২৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আর ঐ সময়ের মধ্যে গরীবদের ট্যাক্স বাড়িয়েছেন ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ধনীদের ট্যাক্স কেবলই কমিয়ে গরীবদের ট্যাক্স বাড়িয়ে কি রকম দেখার। তাই সরকার এবার আরম্ভ করেছেন গরীবদের সঙ্গে ধনীদের ও সামান্য সামান্য ট্যাক্স বাড়াতে।”

—সাধারণতন্ত্রী (হাওড়া)।

### শিক্ষার ফল

“লক্ষীবাঈনগরে ভারতের রাজনৈতিক বাজারের বিগতমৌন্য কংগ্রেসবাসী-এর সাম্প্রতিক মজলিসের আসর বহুদিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। রূপ নাই—আকর্ষণ নাই—খ্যাতি অপগত—প্রায়, ভবু চট্টকার অসিচ্ছদিক-জেরার চমক লাগাইবার চেষ্টা হাজতর হইলেও কিঞ্চিৎ বেনামাযক বৈ কী। অধিবেশনের জারোজন ও কাক-জমকের শিখনে যে কতখানি জনকল্যাণবিরোধী কার্যকলাপ বর্তমান, তাহা স্থানীয় এক বিশিষ্ট জনসম্মত প্রতিনিধি ভাষ্য্য করিয়াছেন। ইহাই রাজহুকুমারী কংগ্রেসের বর্তমান ধরণ। স্বর্গভার পথর আশ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

নামের বোহে আজ আর লোক জমে না। লক্ষী সরকার গরীতে অধিক্রিত-খাকার কৃষিগত সুবিধার দৌলতে পাইক-বরকন্দাজ দিয়া আসর জমাইতে হয়। এবার লক্ষীবাঈনগরে কংগ্রেসী মজলিসে পুলিশী ঘনঘটা অনেককেই বিমিত্ত করিয়াছে। কংগ্রেসী নেতারা এ কয়দিনে যেন কুসে হিটলার হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিকে বিভিন্ন সভামণ্ডপে নিরাপত্তা এলাকা বহিরা মানিকটা জায়গা গভী কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ছিল প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, সাংবাদিকদের সম্পর্কেও কড়া ব্যবস্থা। শুধু প্রেসকোর্ডই যথেষ্ট নয়, প্রবেশাধিকারের জন্য পুলিশ প্রদত্ত “সিকিউরিটি পাশ” চাই। ঢালাও পুলিশী আয়োজনে, পুলিশের আঁচলের তলার অধিবেশন। এত বায়নাঝা সামলাইয়া জনসাধারণের কাজ করেই বা কখন বেচারারা। বক্তব্য কিছুই নাই, এতাবৎকাল এত বকা হইয়াছে যে দেশের কাছে আজ আর বলিবার মতো তেমন কিছুই নাই। বহু ভাবিয়া একটি মুখবোচক কথা বাহির করা হইয়াছে—“সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠন”। বারান্তরে তাহারই চরিত্তচর্চণ চলিয়াছে। বিশ্লেষণ করিবার লায়িৎ যেখানে নাই সেখানে শুধু উদ্‌গিরণ করিলেই যথেষ্ট। এই দিল্লীর লাফুটি যে কিরূপ অর্থাৎ কংগ্রেসী মার্কাদাগা এই তথাকথিত ‘সমাজতন্ত্র’ বস্তুটি যে কি—তাহা কংগ্রেসী নেতারা কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নাই এবং বলিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা উপলব্ধিও করেন নাই।”

—যুক্তি (কলিকাতা)।

### মেদিনীপুরের দুর্ভবস্থা

“মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় এক বৎসরকাল এ্যাডমিনিস্ট্রিটার কার্যভার গ্রহণ করিলেও মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ঘাট, নন্দমা, আলো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনরূপ উন্নতিই এবাং পরিলক্ষিত হইতেছে না। সমস্ত সহর উচ্চতম হারে (২৬%) সকলে করভার বহন করিলেও আজও পথের জঞ্জাল, নন্দমার পচানি এবং গলিপথের প্রায় ১২০০ কেরোসিন বাতির যেমন ভাগ্য পরিবর্তন হইল না তেমনি শাখাপথগুলির কিয়দংশ গভীর কৃষ্ণক্ষেও প্রায়ই বারি ৮।১০টা পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া পথচারীর বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। কলে সহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুনখারাপী রাহাজানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি রোগেরও বিরাম নাই। কিছুদিন পূর্বেই কয়েকটি অশে কলোয়ার প্রাহুর্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন আবহাওয়ার পরিবর্তনে তাহা প্রশমিত হইলেও টাইফয়েড ও হাম ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ সতর্কতামূলক টিকা ইনজেকশনাদি প্রাদানের তেমন তৎপরতা দেখা বাইতেছে না। জল সরবরাহ এখনও অপ্রতুল এবং গৃহে জলসংযোগ গ্রহণ এখনও অবরোধ সেলামী, ডিপজিট ও বিভিন্ন কাতে সাহায্য বাবদ ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থ আদায় অব্যাহত রহিয়াছে। কলে অধিকারের পক্ষেই এই সংযোগ গ্রহণ সম্ভব না হওয়ার পাতকুরার জলেই নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইতে হইতেছে। সহরের স্বাস্থ্যাবনতির ইহাও একটি অপরিহার্য কারণ। উপরন্তু গত দুই গ্রীষ্মে যে জলদ্রুত পিয়াছে তাহা প্রতিরোধের কোন দ্রোই এবাংক হয় নাই। অথচ এই এ্যাডমিনিস্ট্রিটার পদটি দক্ষরাজ্য পৌরসভার বেতনে ও দিল্লী প্রকার বাৎসরিক



প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ধরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থায় সেই পরিমাণে বণি কাজের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। আশা করি, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ও সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।”

—প্রদীপ (তমলুক)

### শিক্ষায় পক্ষপাত

“ইংরাজ যে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা প্রকার ভেদনীতি সম্মিলিত করিয়াছিল, তাহার মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষকেরা যেন দানী বাঁধিতে না পারেন। এতদ্ব্যতীত যেন কিছু কিছু নিজ নিজ সুবিধার প্রত্যাশায় চিরদিন সরকারের মনোবিক্ষণের অঙ্গ দেশ জাতি সব কিছু ঘুচাইতেও পশ্চাৎপদ না হয়। পাণ্ডা ইংরাজ গিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে হইতে সেই পাণ্ডা ভেদবুদ্ধির তো অবসান হইল না! শিক্ষকদের একতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ছাড়া মাল্টিপারপাস ও একাদশ শ্রেণী যুক্ত করে একটি মাত্র স্কুলকে ভাগাবানু করিয়া অবশিষ্টগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি? ছাত্র, ছাত্রই। এ স্কুল ও স্কুল বলিয়া কথা নয়। সরকারের পক্ষে সব ছাত্রকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। ইংরাজ আমলের মত কতকগুলিকে কোলগত করিয়া অবশিষ্টগুলিকে ফ্যাফা করিতে বাধ্য করা এখন আর শোভা পায় না। এখন বাগ করিতে হইবে, বতরু পয়সায় কুলাইবে তাহা সবাইকে সমান ভাগে বণ্টন করিতে ব্যবস্থা না করিলে, সমানদৃষ্টি, সাম্যবাদ বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠন ইত্যাদি কথাগুলো যে বিরাট ধান্নায় পরিণত হইবে। মোলানা আজাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও একথা সুস্পষ্ট বলিতেই হইবে, তাহার শিক্ষা সংস্কার নীতি বর্ষ হইয়াছে। শিক্ষা বৃদ্ধির আশুকুল্য পূরে থাকুক, নানা বৈষম্যের চক্রবৃদ্ধিতে শিক্ষারও সর্বনাশ হইতেছে, শিক্ষকদেরও মেকদশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। মাল্টিপারপাসের মোহে চূর্ণাণুটি পর্যন্ত জেলমর্দনের উৎসাহে হস্ত কণ্ঠন শ্রুত করিয়াছেন।”

—প্রদীপ (কালনা)।

### পরলোকে ভবতোষ ঘটক

বহুমতী সাহিত্য মন্দিরের অল্পতম একলকিউটার, এসিষ্ট লৌহ-ব্যবসায়ী, টাটা স্কব ডিসার্স এসোসিয়েশন (কন্ট্রোল ষ্টক) লিমিটেডের চেয়ারম্যান, কে সি ঘটক এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কুমুমিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ও কন্ট্রোলসনের ডিরেক্টর বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত স্মার্ট অীভবতোষ ঘটক চন্দননগরের বিখ্যাত ঘটক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম স্বর্গীয় কাকিচন্দ্র ঘটক। ভবতোষ ঘটকের বাল্যকালের শিক্ষা স্কুল হর বিখ্যাত বিপ্রবী ও সাংবাদিক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অগ্নিযুগের বিপ্রবী অীভবীকেশ কাকিলালের শিক্ষকতায়। এই ভাবে বাল্যকাল হইতেই তিনি বিপ্রবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। বৃটিশ শাসন আমলে চন্দননগর ছিল বিপ্রবীদের একটি আড্ডা। বালক ভবতোষ বিপ্রবীদের আড্ডায় চিঠিপত্রাদি লইয়া বাতায়ত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই এই ভাবে তাহার বিপ্রবী-জীবন শুরু হয়। এককালে তিনি অীভববিশ ও বিখ্যাত বিপ্রবী অীভববিশনাথ রত্নাপাণ্ডার

সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই ভাবে তিনি বিপ্রবাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলেন। একত্র স্বর্গত ঘটকের শিক্ষাজীবন বৈদ্যুত অগ্রসর হইতে পারে নাই। তিনি চন্দননগর স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার তাহার পিতৃদেবের লৌহ-ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং তাহার স্বর্গত পিতা ও জ্ঞাতাদিগের সহযোগিতায় বিখ্যাত লৌহ ব্যবসা, কে, সি ঘটক এণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেন। নিজ অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতার কুমুমিকা আয়রণ এণ্ড কন্ট্রোলসন, কুমুমিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উন্নতির মূলে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ঘটক-পরিবারের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বহুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বাধিকারী স্বর্গত সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে একলকিউটার বোর্ড গঠন করিয়া যান, স্বর্গত ঘটক ছিলেন তাহার একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি কলিকাতার বহু জনকল্যাণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য কিংবা সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর জাতীয় বণিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের টেলিফোন এবং উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতা লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, টাটা স্কব ডিসার্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং রেলওয়ে উপদেষ্টা সমিতির অল্পতম সদস্য ও আরও বহু ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বর্গত ঘটক অমায়িক, সর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অল্পের



ভবতোষ ঘটক

আগসে-বিশ্বে তিনি ছিলেন সর্বদাই অগ্রণী। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে প্রভা করিত। বর্ণিত ঘটকের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত।। বৃত্তাকালে তিনি চার পুত্র সর্বশ্রী জীবনীতোষ, প্রোণতোষ, মনতোষ ও প্রিয়তোষ এক ছয় কন্যা সর্বশ্রীমতী ইশিরা, বিজলী, সুপ্রভা, সুলেখা, সুসঙ্গা ও সুবীরা দেবী এক ডাঙপুত্র, জামাতা এবং বহু আত্মীয়-বৃন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। গত সেমবার ৩০শে পৌষ তিনি কার্ণাণলকে হুজুরে গমন করেন। তথায় জনবস্ত্রের কিরা বদ্ধ হইয়া গত মঙ্গলবার মধ্য-রাতিতে তাঁহার কর্ণ জীবনের অবসান ঘটে। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

### শোক-সংবাদ

#### শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মজঃকরণের সুপরিচিত ব্যবহারাজীব পণ্ডিতপ্রবর শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে গত ৫ই পৌষ ৮২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। শিখরনাথের ছাত্রজীবন ছিল সৌরভালোকে সমুজ্জ্বল। বি-এ পরীক্ষায় (১৮৯৪) ট্রিপল অনার্স নিয়ে পদার্থ ও রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অল্পে প্রথম হয়ে এম-এ পরীক্ষায়ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে ডাক কলেজে কিছু দিন অধ্যাপ্যে অধ্যাপনার পর মজঃকরণে ইনি ওকালতি শুরু করেন ৩ ১৯০৪ খৃঃ ওকালতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এঁঁ ছাত্র সাহিত্যে ও নর্শনশাস্ত্রে তাঁর রীতিমত দক্ষতা ছিল। প্রচেষ্টা সাহিত্যিকতা লিখুতা অল্পরূপা দেবী মহাশয়ের সঙ্গে ইনি পরিণয়-মুখে আবদ্ধ ছিলেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অস্বল্পক পরলোকগত অজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরই কোটপুত্র ছিলেন। আমরা অল্পরূপা দেবীকে তাঁর এই গভীর শোকের দিনে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

#### সুহাসচন্দ্র রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যেরই আর একজন প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সুহাসচন্দ্র রায় ১১ই পৌষ ৬২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। প্রথমে ইনি আড়তোষ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোগদান করেন।

#### পান্নালাল বসু

বিখ্যাত আইনজীবী ডাঙরাল সন্ন্যাসীর বামলার বিচারক ও বিচারকসহ প্রাক্তন শিকামন্ত্রী পান্নালাল বসু গত ১৪ই পৌষ রাতে ৬৩ বছর বয়সে বর্ণারোগে করেছেন। নর্শনশাস্ত্রে এম-এ ও ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতায় বসবাসী কলেজে ও দিল্লীর লুই ট্রিকেন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিচারকসহ বোগদান করে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেলা ও দায়রা জজরূপে বসন গ্রহণ করেন। ইনি পঞ্চকোট রাজ-এজেন্টের জেনারেল ম্যানেজার ও কলকাতা পৌরসভার তনয় কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রায়-বহিন্সিয়ার শিক্ষা ও ছাত্রবাহক মন্ত্রী

পদ লাভ করেন। শিক্ষামন্ত্রিরূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সর্বাধ সাধক বিদ্যালয় স্থাপনে, মাধ্যমিক শিক্ষার একাদশ শ্রেণী ও সেই সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে পান্নালাল স্মরণীয় হয়ে রইলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও এঁর অবদান স্বীকৃত। কবিত্বকর 'সুদিত পাষণ' এর ইনি ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। পান্নালালের মৃত্যু নিঃসন্দেহে দেশকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুকালে ইনি একটি মেয়ে ও এগারোটি ছেলে রেখে গেছেন।

#### জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই পৌষ ৮৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয় জন. যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার খ্যাতি সাবা ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান করেছিল। ক্যালকাতা রিভিউ পত্রিকার সঙ্গেও এঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু দিন ইনি এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

#### তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীমামণ্ডের বিখ্যাত গোস্বামী-পরিবারের সন্তান পরলোকগত রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর গত ১৮ই পৌষ রাতে ৫১ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। অক্ষফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে রাজনীতির সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হন। প্রথমে দেশবন্ধু নেতৃত্বে স্বাভাঙ্গলে যোগ দেন ও ঐ দলেরই যেনাতি প্রাদিক্রম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খৃঃ পর্বন্ত এই দলে থাকাকালীন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের চীফ হুইপ, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে বিরোধী দলের সহকারী নেতা—প্রভৃতি পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ পর্বন্ত ইনি বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন ও ঐ সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের অধ্যক্ষী নিযুক্ত হন। প্রধান সম্পাদকরূপে দেশবন্ধু 'কবওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গেও ইনি সঙ্গিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গিলায় এঁর অসামান্য খ্যাতির পরিচয় দেশের ও বিদেশের বহু বিদ্বৎ সুবীজ্ঞকেও হৃদয় করেছে। তৎকালীন বাঙলার পঞ্চ-প্রধানের ইনি ছিলেন অন্যতম। বর্তমানে সুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ব্যক্তিগত পঞ্চ-প্রধানের আর কোন প্রধানই জীবিত রইলেন না।

#### বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত বাঙালিরা হাউসের ব্যবহারায় বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় ৭১ বছর বয়সে বাু পরিবর্তনালপক্ষে কাশ্মীরে বাসকালীন মঙ্গলবার ২৪এ পৌষ দেহান্তরিত হয়েছেন। বাঙলার ব্যবসায় ও সমাজ-ক্ষেত্রে বিনোদগোপালের অবদান অনস্বীকার্য। 'বৃগান্তর' ও অন্যান্য আরো কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিনোদগোপালের যোগাযোগ ছিল।

#### সম্পাদক—প্রোগ্রামটোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৯৬২ অক্টোবর ট্রাট, 'বহুবর্তী মোটরী বেসিনে' প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সৃষ্টিত ও প্রকাশিত



## ছেলেভুলানো ছড়া

গত মাঘ সংখ্যা মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি পর্ষায়ে অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত আমার সংগৃহীত ছেলে-ভুলানো ছড়াটির উপর শ্রীবৈজ্ঞান্য মৈত্র মহাশয়ের চিঠি পড়লাম। এ ছড়াটি উত্তর-রাজসাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। বিগত কয়েক বৎসর ধরে আমার অজ্ঞ প্রান্ত-ছাত্রদের মাধ্যমে নানা অঞ্চলের ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। একই ছড়ার অঞ্চল ভেদে নানা পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ ছড়াটি প্রথমত: 'ইটাকুয়ের পুজার' মত (শোলোক) হিসাবেই সম্ভবত ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু কালের গতিতে সম্ভবত এর চন্দ-মাধুর্য্যের ক্ষয়, একদা একে দেখা গেল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে। এ ছড়াটিরও প্রায় ৪৫টি নমুনা আমার নিকট সংগৃহীত আছে। নানা অঞ্চলে এ নানা ভাবে বর্ণিত হচ্ছে। শেবের দিকে কোন কোন স্থানে 'ভালো কইরা কামাই কইরা বাইও খণ্ডর বাড়ী মধুর হাঁড়ি খাইও দিন চারি'—ইত্যাদি আছে। প্রাচীন সংগৃহীত ছড়ারও অধিকাংশ জুড়ে আছে 'মাতৃ-স্বর্গের যুগল দেবতা থোকা পুটর স্তব' (লোকসাহিত্য)—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্যে ঐকান্ত্যের ভাটাচার্য্য) স্তব; বা ছড়িয়ে আছে তাইতো ছড়া; 'শিবঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কণ্ঠে দান' এ শিবঠাকুর কোন কোন অঞ্চলে একেবারে 'কুলীন-ব্রাহ্মণ' আবার কোন স্থলে টনি 'শিবঠাকুর' অর্থাৎ শিয়াল বা শূগাল! দৈনিক বিচারে একে অন্যরূপে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' পর্ষায়ে ফেলে এর ক্রমধারা ইতিহাস নিরীক্ষণ করা যায়। শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় আগামী সংখ্যা মাসিক বহুমতীতে তাঁর প্রত্ন 'ইটাকুয়ের পুজার' সম্পূর্ণ ছড়াটি পাঠক-পাঠিকার চিঠি-পত্র পর্ষায়ে প্রকাশ করলে ছড়া সম্বন্ধে গবেষণাত্মক অনেকেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত: অগ্রহায়ণ সংখ্যা ছড়াটির ৫ম পঙ্ক্তির শেষ শব্দ 'বুড়ি' ভুলে 'ডি' হয়েছে এবং দ্বাদশ পঙ্ক্তির প্রথম শব্দ 'বউ' ভুলে 'বৈ' ছাপা হয়েছে। আমার সংগৃহীত ছড়াগুলি বহুমতীতে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হ'বে। আশা করি সিদ্ধি। অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ।

## পত্রিকা সমালোচনা

আমি 'মাসিক বহুমতী'র নিয়মিত গ্রাহক না হইলেও পাঠক। গত আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বহুমতীতে 'বৈজ্ঞান্য চিকিৎসা কল্পন'—এই শিরোনামের আপনি লিখিয়াছেন, "চিকিৎসক হওয়া বা চিকিৎসা করা বৈজ্ঞান্যতির প্রধানতম অবলম্বন। বৈজ্ঞান্যক অবলম্বন যে অজ্ঞের ও তার জুরি জুরি প্রমাণ মিছে।" তার পর আপনি

মহুস-হিতা, মহাত্মারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কৃষ্ণভট্ট, অমরকোষ ইত্যাদি হইতে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া আপনাব মন্তব্য সমর্থন করিতে প্রয়াস পাঠিয়াছেন। "চিকিৎসক হওয়া বা চিকিৎসা করা বৈজ্ঞান্যতির প্রধানতম অবলম্বন"—আপনার এ বাক্য সম্বন্ধে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু বিতীয় বাক্যটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। স্বর্গীয় বিচারপতি তাঁর মন্তব্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত— "ভারত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কার এবং জাতিতত্ত্ব প্রণয় সমিতি" হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত একটি পুস্তিকায় দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত-শর্মা নামক কোনও কবিব্রাহ্ম মহাশয় তদলিখিত—"বৈজ্ঞান্যক" (১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণ) নামক গ্রন্থে অকতি যুক্তি সহযোগে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞান্যক অবলম্বন নাই পরন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি মহুস-হিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মহাত্মারত, গীতা এমন কি বেদেরও বহু প্রমাণ কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। "মহুস-হিতা" কৃত্রিমতা পূর্ণ হওয়ায় তাহার টীকার কল্লভট্ট, মেঘাতিথি প্রভৃতির গ্রন্থও ভ্রান্তিমূলক। অমর সিংহ প্রভৃতি কোষশাস্ত্রকারগণ তৎ পরবর্তী যুগের লোক, তাঁহারা উক্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ গ্রন্থে বাহ্য দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। উক্ত গুপ্তশর্মা মহাশয় শুধু ইহা প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা উহা স্বীকার করা হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঁহারা লিখিত ভাবে স্বীকৃত জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিত্বগণ তর্কবাসী, বঙ্গবাসী কলেজে গীতা ও উপনিষদের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় বিচারপতি মন্তব্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌখিক ভাবে সমর্থকদিগের মধ্যে সমসাময়িক নববীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যা নাথ তর্কবাসী মহাশয়ই প্রধান। প্রথমেই পণ্ডিতবর্গে যে লিখিত বিবৃতি দ্বারা শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্তশর্মা মহাশয়কে সমর্থন জানাইয়া ছিলেন—তাঁহাও ঐ পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহুস-হিতা ও কাত্যায়ন সাহিত্যের দায়ভাগ সম্বন্ধে বৈজ্ঞান্যক অবলম্বন শব্দের প্রয়োগ বহিরাছে। ভুবনেশ্বর কবিব্রাহ্ম ইহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন যে, ভ্রান্তব্রাহ্ম বৈজ্ঞান্যকের সম্ভানগণ মধ্যে বাঁহারা বেদাদি পাবন নহেন—তাঁহারা বৈজ্ঞান্যক ব্রাহ্ম নামে কথিত ছিল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহা অসত্য প্রমাণের কোন উপায় দেখিলাম না এক এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যুক্তি

পারিলাম যে, আমরা এতদিন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানিতে পারি নাই বলিয়াই বৈজ্ঞানিক অর্থোপদ্য মনে করিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা ভরসাধারিক বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক অর্থোপদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করি। বিচারপতি তাঁর মতবোধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় অস্বল্প মন্তব্যই করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের মন্তব্য পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়া পরের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। আমার মনে হয় যে, আপনি যে সমস্ত শাস্ত্র-উক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক অর্থোপদ্য প্রমাণ করিতে উত্তরাগী হইয়াছেন, উক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সেগুলি সহজে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। কিন্তু তৎসঙ্গেও বহন তাঁহার উপরিলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তখন উক্ত কবিবাক্ত মহাশয় প্রদত্ত বৃত্তি প্রমাণকে উপেক্ষা করা বোধ হয় বুদ্ধিসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার অস্বল্প ও প্রতিকূল উভয়বিধ বৃত্তি প্রমাণই বিচার করা উচিত। প্রয়োজন বোধ করিলে এ পত্রটি আপনার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীআশীষকুমার সেন। ১ জননারায়ণ বানার্জী লেন। বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬

মাসিক বহুমতীর ১৩৬২র আঘাট সংখ্যায়, ৪১৭ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা পড়িলাম। কবিতাটির নাম 'আমি ভালবাসি না', কবি শ্রীশান্তিভূষণ রায়। কবিতাটি শ্রীশান্তিভূষণ রায়ের নিজের লেখা না অথবা, এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই। অথচ কবিতাটি Caroline E. S. Norton-এর একটি কবিতার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। কবিতাটি Pulgrave's Golden Treasury-র ৩৪১ পৃষ্ঠায় আছে। যদি কবি কবিতাটি নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করেন, তবে এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়! অচ্যুতকুমার ঘোষ। মহারাজগঞ্জ, বিহার।

১৩৬৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'চার জন' শীর্ষক অধ্যায় সহজে কিছু বক্তব্য আছে। উক্ত অধ্যায়ে ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের জীবন-আলেখ্যে একটি অতি মারাত্মক তুল্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম কখনই "ব্রেণ টিউমার" অপারেশন করেন নাই। এমন কি বাঙালীগণের মধ্যেও তিনি একেজের সর্বপ্রথম নহেন। কলিকাতা সহরে সর্বপ্রথম "ব্রেণ টিউমার" অপারেশনের প্রচেষ্টা করেন ডাঃ উমাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এল, আর, জি, কব মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক ডাঃ প্রভাত সাত্তাল (অধুনা পণ্ডিতেরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে সন্ন্যাসধর্মী) হুই সিনবার "ব্রেণ টিউমার" অস্ত্রোপচার করেন। ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম "ব্রেণ টিউমার" অপারেশন করেন গোয়ালির মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি, কে বালকৃষ্ণবাবু। ইহার পরবর্তী যুগে ভেঙ্কটের ডাঃ জ্যাকব চাণ্ডি, মাদ্রাসের ডাঃ রামমূর্ত্তি, বোম্বাইয়ের ডাঃ গ্রিগে ও কলিকাতায় লেখক বরুণ এবং ডাঃ আর এন চ্যাটার্জি (বর্তমানে বিদেশে শিক্ষা-দায়িত্বে নিবিষ্ট) ব্রেণ টিউমার অপারেশন করিয়া থাকেন। আশা করি, সভ্যতার বার্ষে আপনি আমার এই পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন অথবা ভ্রম সংশোধন-বার্তা প্রকাশিত করিয়া বাবিত করিবেন। শ্রীঅশোক বাগচী, ৮, বেলিয়াও রোড, কলিকাতা—২০

মহাশয়, আপনার অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় 'চার জন' আমার জীবনী-প্রসঙ্গে বার্ষা লেখা হইয়াছে, তদাধো "ভারতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রেণ টিউমার অপারেশন করেন ও তাঁর পূর্বে আর কোন ভারতীয় হাসপাতালে ব্রেণ টিউমার অপারেশন হয়নি।" এই লেখাটি ভ্রমবশত ছাপা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহার পূর্বেও ভারতে অনেকে এই অপারেশন করিয়াছেন। সেজন্য এ সহজে আপনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।—ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ। কলিকাতা-২০।

দীর্ঘ দিন ধরে মাসিক বহুমতীর আমি গ্রাহিক। অত্যন্ত সমস্ত পত্র-পত্রিকার মধ্যে মাসিক বহুমতীর স্থান আমার কাছে সার্থ্যে। বর্তমানে নানাবিধ রচনা-সম্ভারে এবং নতুন নতুন বিভাগ সংযোজনে বহুমতী যেন আরও অধিক হয়ে উঠছে। উল্লেখ্যমুখ্য 'রাজ্য-রাজ্য' উপস্থাপনের তুলনা হয় না। নীলকণ্ঠের 'অন্ত ও প্রত্যহ' বাড়লার ঘরে ঘরে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে। সমাজের একটি বিশেষ দিকের মুখোঁস খুলে দিচ্ছেন তিনি। তা ছাড়া বিজ্ঞানবার্তা, খেলাধুলা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভাগগুলি সত্যিই প্রশংসনীয়। 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগটি আপনার সম্পাদনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর ঘোষণা করছে। শৈলজ্ঞানন্দের 'করলাকৃষ্ণ দেশ' মাত্র এক পাতা কি হু' পাতা করে বেরোচ্ছে। এদিকে আপনি দয়া করে একটু দৃষ্টি দিন। সারা মাসে একটি ধারাবাহিক উপস্থাপনের আয়তনের একপ হ্রস্বতা পাঠক-মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, গোয়ালিয়া, কানী।

### পুরাতন সংখ্যার কেনা-বেচা

কাতিক ১৩২১ থেকে ১৩৩২ সালের মাসিক বহুমতীর সংখ্যাগুলি বেচেতে চাই। শ্রীনির্মলেন্দু মিত্র, ৮৩ বাবুঘাট ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৪০।

১৩৫৭ থেকে ১৩৬২ সালের মাসিক বহুমতীর সমস্ত সংখ্যাগুলি বেচেতে চাই। মূল্য ১, ২, ৩, ৪, ৫-র হলে বৎসর ৬, ৭ ও ৮। একসঙ্গে ছয় বছরের কিনলে বছরের এক টাকা হিসাবে কমদামে পাবেন। শ্রীনীলাল দত্ত, ৬০ কৈবর্তপাড়া লেন, সালসিয়া, হাওড়া।

কাতিক ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, আশ্বিন, কাতিক ও চৈত্র ১৩৫৯, শ্রাবণ ১৩৬১ ও ফাল্গুন ১৩৬২ সালের বহুমতীর সংখ্যাগুলি কিনতে চাই। শ্রীঅশোকলাল গোস্বামী, ১বি নেতৃত্বা রো, কলকাতা-১২।

বৈশাখ ও পৌষ ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩৫৯ ও ভাদ্র ১৩৬২ সালের মাসিক বহুমতীর সংখ্যাগুলি কিনতে চাই। এগুলি দিতে পারলে যদি প্রয়োজন হয় তো ১৩৫৬ সালের আশ্বিন সংখ্যাবানি বিনামূল্যে পেতে পারেন। শ্রীগোপেশ্বর সরকার, গ্রাম হাউত্তরা, পোঃ নাইখিয়া, জেলা বীরভূম।



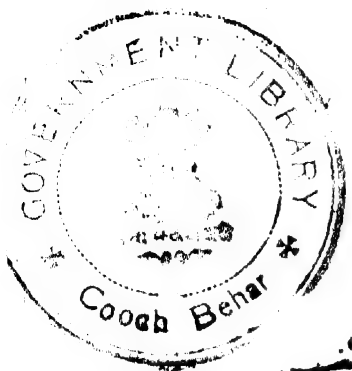
মাসিক বসুমতী

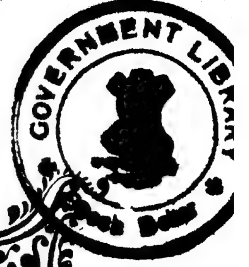
॥ মাস, ১৩৬৩ ॥

(জগন্নাথ)

বুদ্ধ, অজ্ঞাত গুহা

—প্রীতিক্ষিত গুপ্ত অন্ধিত





৩৫শ বর্ষ—মার্চ, ১৩৬৩]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। “আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে পড়ায়। বাস্তবতা বার্য মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মত পাত সাজে, কথা কয়।”

“জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতো মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেক দিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়, গরনা পরতাম, গুড়না গায়ে দিতাম, গুড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতাম।”

“সেজ বাবু আর সেজ গিন্নি দেখে শুভ, সেই ঘরেই আমি শুতাম। তারা ঠিক ছেলের মতন আমায় বসু করতো। তখন আমার উদ্ভাব অবস্থা। সেজ বাবু বলতো—বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুনে পাও? আমি বললাম, পাই।”

“আমার বালকের অবস্থা আজ বলে নয়। সেজা বাবুকে হাত দেখাতাম, বলতাম,—খাঁপা, আমার কি অসুখ করেছে?”

“সেজ গিন্নি সেজ বাবুকে সলেহ করে বলেছিল,—বদি কোথাও বাও, ভট্টাচার্য্য মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো, আমার নীচে বসালে। তার পর আধ ঘণ্টা পরে এসে বললে,—চল বাবা, চল বাবা গাড়ীতে উঠবে চলো। সেজ গিন্নি জিজ্ঞাসা করলে, আমি ঠিক ঐ সব কথা বললাম। আমি বললাম,—জাখোপা, একটি বাড়ীতে আমার পেলাম। উনি আমার নীচে

বসালে, উপরে আপনি গেল। আধ ঘণ্টা পরে এসে বললে,—চল বাবা, চল বাবা। সেজ গিন্নি বা হয় বুঝে নিল।”

“সেজ বাবুর ভাব হলো। সর্বদাই মাতালের মতন থাকে কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এরকম হয়ে বিবর দেখবে কে? ছোট ভট্টাচার্য্য নিশ্চয় কোন ভুল করেছে।”

“কালীঘাটের চন্দ্র হালদার সেজ বাবুর কাছে প্রায় আসতো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি চা করে ঐ রকম করে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগলো। গাট লাগ হয়েছিল। সবাই বললে, সেজ বাবুকে বলে দেওয়া বাচ্ আমি বারণ করলাম।”

“ভক্তিপক্ষেও অস্ত্রবিস্ত্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয় ঈশ্বরের উপর বত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়স্বপ্ন আলুণি লাগবে যেদিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর ত্রীপুরুষের দেহ স্থখে দিকে কি মন থাকতে পারে?”

“শ্রীকৃষ্ণের শিরে মস্তুর-পাখা। মস্তুর-পাখাতে বোনি চিহ্ন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন। কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন, কি সেখানে তিনি নিজে প্রকৃতি হলেন, তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর ঘরের বেশ। নিজে প্রকৃতি ভাব না হলে প্রকৃতি সজ্জের অধিকারী হয় না। প্রকৃতি ভাব হল, তবে রাস, তবে সজ্জাপ।”



# ইচ্ছাশক্তির প্রভাব

নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা

পিতা। বড়ই শক্তিমূল্য অথবা যশস্বী ইউন না কেন, পুত্রের  
তাহার ইলিত পানও অন্ত্যস্ত সন্তোষের বিষয়।

কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইয়াও "ইচ্ছাশক্তির প্রভাব"  
তখনই সত্যকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা ব্যক্ত করিতে  
সন্তোষে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার জীবনের  
কয়েকটি ঘটনার পুনরুজ্জ্বল প্রবৃত্ত হইলাম।

আশা করি, পাঠক ইহাতে আমার অল্প কোন অভিসন্ধি আছে  
বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।

১৮৯২ সনে পিতৃদেব যখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক  
ছিলেন, তখন তাহার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়রূপ গোস্বামী প্রভু ঢাকা  
গেণ্ডারিয়ায় থাকিতেন।

সেই বৎসর ১৩ই মার্চ ব্রাহ্মসমাজের নগর-সাকীর্দনের জন্ত  
নির্ধারিত হয়। সকালে সামাজিক উপাসনার পরে সকলে নগর-  
সাকীর্দনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, ১টার সময়ে কার্ডিন বাহির হইবে।  
বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ৩৪টি অপরিচিত যুবক পিতৃদেবের নিকট  
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, গেণ্ডারিয়া  
আশ্রম হইতে গোঁসাইজীর (শ্রীশ্রীবিজয়রূপ গোস্বামী প্রভুর)  
নির্দেশানুসারে তাহার পিতৃদেবের নিকট আসিয়াছেন। ব্যাপারটি  
এই যে, একটি নব্য উকীল আজ কয়েক দিন একটা উৎকট রোগগ্রস্ত  
হইয়াছেন। তাহার শরীর অস্থির এবং সবল ছিল, হঠাৎ একদিন  
সেখা গেল তিনি শয়ন করিয়া আছেন। কাহারও সঙ্গে কথা  
বলিতেছেন না। এমন করিয়া গীতে গীত লাগাইয়া আছেন যে  
এক কৈটো জল পর্দাও তল কবাইবার উপায় নাই।

হু-তিনি দিন নিরব্রূ উপবাসে থাকায় তাহার শরীর এত দুর্বল  
হইয়াছে যে, এখন প্রকৃত পক্ষে উপাশক্তি আছে কি না সন্দেহ।  
ডাক্তার-কবিরাজগণ কিছুই প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

অবস্থা ক্রমশঃ ধারাপ হইতেছে, এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য,  
কোন দৈব প্রতিকার আছে কি না, জানিবার জন্ত যুবকগণ  
শ্রীশ্রীগোবামী প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে গিয়াছিলেন।  
গোবামী প্রভু পিতৃদেবের নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিকার প্রার্থনা  
করিতে যুবকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

উক্ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত উকীলের বিধবা মাতা ও বালিকা বধূর  
হৃদয়ের দোহাই দিয়া এই সকল কথা পিতৃদেবকে বলিলেন।  
তখন স্নানোৎসব তাহার মাথায় বেল আনা অধিকার করিয়া আছে।  
এই নুতন ব্যাপারটি তাহার মস্তিষ্কাক্রান্তে সহসা একটা বিপ্লব উপস্থিত  
করিল। তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন না যে, তাহার প্রতি কেন এইরূপ  
আদেশ হইল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ উকীলটিকে  
আরোগ্য দান করিবেন। বাহা হউক, তিনি যুবকদিগের সঙ্গে রোগীর  
বাড়ীতে গেলেন। শ্রীশ্রী বাবুজী একটা বাজীতে দোস্তলার ঘরে  
রোগী মারিতে পড়িয়া আছেন। তাহাকে দেখিলে জীবিত কি মৃত  
ঠিক বুঝা যায় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মাতা সে ঘর  
ইহঁতে বাহির হইয়া গেলেন। ঢাকার বিখ্যাত পালোয়ান স্মৃতিচিহ্ন

পার্শ্বাধ (পূরণে বাবু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকীল  
বাবুর বিশেষ বন্ধু। পিতৃদেবকে কি করিতে হইবে বুদ্ধিতে না পারিয়া  
ভাবিলেন যে, তিনি চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিবেন, সেই অবস্থায় মনে  
বাহা উদ্ভিত হইবে তাহাই গুরুদেবের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইবেন।  
তিনি পরেই বাবুকে এবং তাহার সঙ্গী যুবকদের বাহিরে বাইতে  
অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই বাহিরে গেলেন। তিনি  
ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোগীর নিকটে বসিলেন,  
মনে হইল যেন শব্দসাধনা করিতে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে  
তাঁহার শরীরে বৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা একটা বিশেষ শক্তি অনুভব  
করিলেন। সে শক্তি তাঁহার শরীরে ও মনে এমনই বলের সঞ্চায়  
করিল যে তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি ইচ্ছা করিলেই এই রোগীকে  
আরোগ্য প্রদান করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রোগীর  
একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন। রোগী চক্ষু মেলিয়া তাঁহার  
নিকে তাকাইলেন। তিনি সজোরে বলিলেন "উঠিয়া বসুন।" অমনি  
তিনি উঠিয়া বসিলেন। তিনি রোগীর উভয় হস্ত তাঁহার উভয় হস্ত  
দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন "শান্তি: শান্তি: শান্তি:" অমনি  
রোগী বলিয়া উঠিল "শান্তি: শান্তি: শান্তি:"।

ক্রমশঃ তাঁহার মনের বল অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল।  
তিনি বলিলেন, "আপনার কোন ব্যাধি নাই।" রোগী সহাস্ত মুখে  
বলিলেন "না, আমার কোন ব্যাধি নাই।" তিনি বলিলেন "এখনই  
আপনাকে কিছু খাইতে হইবে।" রোগী বলিলেন "আপনি বলিলেই  
খাইব।" তিনি দরজা খুলিয়া সকলকে ডাকিলেন, অন্তঃস্থল হইতে  
ইহারা তাঁহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। দরজা খোলা  
হইলে পরেই বাবু এবং রোগীর মাতা সবেগে ঘরে প্রবেশ করিলেন।  
তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের বাক্য  
ও মুখশ্রীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। পিতৃদেবের আদেশ ক্রমে এক  
শোয়া হালুয়া আনান হইল এবং তাঁহার অনুরোধে রোগী এতই  
বাস্তবতার সহিত উহা খাইতেছিলেন যে, হালুয়া গলায় ঠেকিয়া  
বাইতেছিল কিন্তু ভোক্তার সে দিকে দৃষ্টি রাখার শক্তি ছিল না।  
তিনি জলপান করিতে বসিলেন, জলপান করিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই  
তিনি খাদ্য নিঃশেষ করিলেন। রোগীর ঘরে তাঁহার প্রবেশ হইতে  
তাঁহার আরোগ্যলাভ ও হালুয়া ভক্ষণ কার্য সম্পন্ন হইতে আশ্চর্য্য  
অধিক সময় লাগে নাই, হালুয়া খানিতেই অধিকাংশ সময় গিয়াছিল।  
রোগীর হাতে একখানি গীতা দিয়া তিনি বলিলেন, "উহা পাঠ করিতে  
থাকুন, নিয়মিতরূপে আহার করুন, কথা বলুন এবং মনে রাখুন যে,  
আপনি আরোগ্যলাভ করিলেন।"

রোগী বলিলেন, "তাহাই করিব।" তিনি নিজে বিস্ময়মগ্ন হইয়া  
প্রচার-আশ্রমের (বাগার) দিকে চলিলেন। যখন সিঁড়ি দিয়া  
নাথিতেছেন তখন অনতিদূর রমণী-কণ্ঠ হইতে নির্গত এই  
কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল—"এ লোকটি মাছুর না দেবতা!"  
সেই হইতে পিতৃদেব এই অদ্ভুত শক্তি লাভ করিলেন।

এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে, শ্রীগুরুদেব শিবো



মধ্যে এই শক্তি প্রদান করিয়েন বলিয়াই কোশল করিয়া যুবকদের তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং উপযুক্ত ও জির শিব্যকে এই শক্তি প্রদান করিলেন।

রোগী আবেগ্য করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা কলসেবের নিষেধ ছিল।

ইহার পরে পিতৃদেব ঢাকা হইতে বরিশাল বাইবার গথে তাঁহার দিগির দেশে নরোত্তমপুর গ্রামে করেক দিন অপেক্ষা করিলেন। সেখানেও এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। নরোত্তমপুরের নিকটবর্তী বাগপুর গ্রামে ঈশানচন্দ্র সরকার নামক একটি যুবক তিন মাসের অধিক হইতে অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, পীড়ার প্রকৃতি সেই ঢাকার উকালের পীড়ার মতন কিন্তু দীর্ঘকাল ভুগিয়া এই যুবকের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। গত তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষ চেষ্টায় অতি অল্প খাওয়া তাঁহার উদরস্থ হইয়াছে, স্ততরায় শরীর একেবারে কঙ্কালসার। তিন মাস তাহার নিদ্রা নাই, বাক্যব্যয় নাই। আজ তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিয়া গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে তাহাকে দেখিতে বাইতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার মধ্যে এতটা তীব্র শক্তি প্রবীর্ণ হইল। উক্ত যুবকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল।

ঈশানকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতেন না, তথাপি তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। গ্রামের অনেক গণ্যমান্ত লোকের সঙ্গে তিনিও রওয়ানা হইলেন এবং গিয়া দেখিলেন, ঘরের দাওয়ায় একখানা তক্তপোষের উপর রোগী পড়িয়া আছে, তাহার মুখ দিয়া গেজলা উঠিতেছে। বৃদ্ধা মাতা এবং অজ্ঞাত সকলে সজল নয়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার মনে করিতেছেন, রোগীর অবস্থা এখন-তখন। পিতৃদেব রোগীর কাছে একখানি ছোট টুলে বসিলেন। রোগীর দিকে বতই তাকাইতেছেন, ততই একটা অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণ হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি ধারণ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। তখন রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন, মনে হইতে লাগিল। বাঁধ কাটিয়া দিলে নদীর জল যেমন প্রবল বেগে ধালে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাঁহার শরীর হইতে অনাহুত দৈবশক্তি রোগীর শরীরে ছুটিয়া বাইতেছে, এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি রোগীর ইচ্ছাকে পরাভূত ও অবসর করিয়া তাহারই অঙ্গুস্ত করিতেছে। এই সময়ে তিনি তাহার কঙ্কালসার ডান হাতখানা সজ্ঞারে নাড়িয়া দিলেন। রোগী ক্রমশঃ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশান, আমাকে চিনিতে পারিতেছ?” রোগী বলিল “আজ্ঞে হাঁ।” তিন মাসের পরে হঠাৎ কথা বলিতে শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। প্রাতি পলে পলে তাঁহার ভিতরে শক্তির প্রোত আসিতেছিল। সে শক্তি খরচ করিতে না পারিলে তিনি হয়ত অভিভূত হইয়া পড়িতেন কিন্তু সে দান গ্রহণ করিবার পাত্র নিকটেই ছিল। তিনি সজ্ঞারে রোগীকে আদেশ করিলেন “ঈশান, উঠে বসো।” তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া বসিল। পুনরায় তিনি বলিলেন, “আমার সঙ্গে এসো।” তখনই সে পীড়াইয়া ভাল করিয়া কাণড়টা পরিল এবং তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাঁহার মনে হঠাৎ আশঙ্কার উদয় হইল যে এইরূপ কঙ্কালসার মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিতে গেলে হয়ত

পড়িয়া বাইতে পারে; স্ততরায় তিনি তাহার হাত ধরিলেন। সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে (প্রায় ২০০ হাত দূরে) গেল। সেখানে শুকুরের ঘাটে তাহাকে বসাইয়া তিনি করেক গণ্ডু জল তাহার চক্ষে সজ্ঞারে ছিটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন “তুমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলে, তোমার কিছুমাত্র ব্যাধি নাই।” ঈশান বলিল যে, তাহার কিছু অস্বস্তি নাই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তিনি রোগীকে বাহির বাড়ীর চতুমণ্ডপে লইয়া গেলেন। তখন সে স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। তাঁহার আদেশক্রমে অন্নকণের মধ্যে ভাত ও মুসুরির ডাল রায়া হইল এবং তাঁহার আজ্ঞায় ঈশান আসনে বসিয়া সুস্থ মাহুকের মত নিজের হাতে তৃপ্তির সহিত আহার করিল। তিনি এখন বলিতেছিলেন যে, খাওয়া খুব চমৎকার লাগিতেছে। ঈশান তখন মাথা নাড়িয়া তাঁহার বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে দিতে গোত্রসে ডাল-ভাত উদরস্থ করিতেছিল। সকলে দেখিয়া অবাক! দ্রোলোকেরা পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, “ইনি মাহুঘ না দেবতা!” কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন যে, এই সকল কার্যের উপর তাঁহার নিজের কিছুই কর্তৃত্ব নাই। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর দিয়া এই সব কার্য করিতেছে। তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র।

পরিভ্রমণের সহিত আহার করিয়া ঈশান তক্তপোষে বসিল। তিনি তাহাকে শুইতে অস্বরোধ করিলেন। সে শয়ন করিলে, তাহার মাথায় হাত দিয়া তিনি বলিলেন, “হুই মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমাইবে, তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে, আগামী কল্যাণটার সময়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে, প্রোতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বেলা ৮টার সময়ে তুমি নরোত্তমপুরের রায় মহাশয়ের চারি বাড়ী বেড়াইয়া আসিবে।”

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে ঈশান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তিন মাসের পর প্রথম নিদ্রা। পরের দিন পিতৃদেব ঈশানের জন্য তাঁহার দিগির বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠিক ৮টার কিছু পরে ঈশান তাঁহাদের নিকট হাজির হইল। তাহার পশ্চাতে অনেক বালক যুবক ও বৃদ্ধ, সকলের মুখেই “কি আশ্চর্য ব্যাপার!” ঈশান সরকার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ২০ বৎসরের অধিক কাল বিবর-কার্য করিয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উয়ার এবং অজ্ঞাত কতকগুলি রোগীকে অচিরে আবেগ্য দান করেন। পিতৃদেবের বন্ধু স্বর্গীয় জীৱণ চক্রবর্তী উহা হইতে কয়েকটি ঘটনা “মিরার” নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রিকার প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া নানা স্থান হইতে রোগী আসিতে লাগিল। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে একমাত্র বুধবার রোগী দেখিবেন। কোন কোন বুধবার শতাবিক রোগীও উপস্থিত হইত। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও আসিতেন।

একদিন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ভ্রায়বত মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার ছই চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি চক্ষু খুলিবার অমুমতি দিবার পূর্বে, ভ্রায়বত মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই চক্ষু খুলিতে পারিলেন না। ইহা হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

নববিধান সভায়ের অভ্যন্তর নারিক মহাবান্ধী প্রচারক বর্গীয় ডাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত বন্ধন পিতৃদেবের প্রথম আলোচনা হইল, সেই দিন পিতৃদেব বনামমণ্ড বর্গীয় বিশিষ্ট চন্দ্র পাল মহাশয়ের মুখে পিতৃদেবের নাম স্মরণীয় মজুমদার মহাশয় পিতৃদেবকে বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক কার্য (miracle) বিবাস করেন। তিনি বলিলেন যে, বীজধূত সন্ধ্যাে যে সব অলৌকিক কার্যের উল্লেখ আছে সে সকল অবিবাস করিবার কোন কারণ নাই।

একদিন বরিশালে বনামমণ্ড বর্গীয় অমিনীকুমার দত্ত, অধ্যাপক বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময়ে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রধান সন্তুতাধ্যাপক বর্গীয় কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে বোঝা করিয়া রাখিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে বোঝা হইতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় কথা বলিতে না পারায় অত্যন্ত ভ্রাসবুদ্ধ হইলেন এবং একটা শেলি দিয়া একটু কাগজে লিখিয়া অমিনী বাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি কথা বলিতে পারিতেছেন না। কিরূপে শিক্ষকতা করিবেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা আমোদ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বন্ধন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন অমিনী বাবু পিতৃদেবকে তাঁহার মুখ খুলিয়া দিতে অজ্ঞপ্তি করিলেন। পিতৃদেব বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, কথা বলুন।” অমিনী তিনি ঠা করিয়া মুখ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিজেকে বিশদবুদ্ধ মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

গয়াধায়ে বাসকালে একদিন ডাক্তার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়ের বাড়ী গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি যুবক বসিয়া কথা বলিতেছে। সে যুবকটি পোষ্টাক্সি সামাজ্য বেতনে চাকুরী করে। যুবকের চিবুকখানা অত্যন্ত ঝাঁকা দেখিয়া তিনি ঐরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকটি বলিলেন যে, একবার জ্বর হইয়া ঐ অঙ্গটি বিকৃত হইয়াছে। পিতৃদেবের মনের মধ্যে শক্তি আসিল, তিনি চিবুকখানা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

ডাঃ চন্দ্রনাথ বাবুর একটি ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ অমরনাথ, তীব্র জ্বর ও নিমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, চন্দ্র বাবু নিজে স্ত্রীচিকিৎসক, তিনিই যুবকের চিকিৎসা করিতেছিলেন কিন্তু যুবক বলিয়া বলিল যে, পিতৃদেব তাহাকে ঝাড়িয়া দিলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে। চন্দ্র বাবু বিশেষ অজ্ঞপ্তি তৈরি তাহাকে ঝাড়িয়া দিলেন। সত্যই যুবকটি আরোগ্য লাভ করিল।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক বর্গীয় ব্রজেননাথ শীল, বর্গীয় ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রসিদ্ধ নাট্যকার বর্গীয় জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার এমন একটা বিবাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কোন ডাক্তার তাঁহাকে কাটিবার জন্য ভরোয়ালা উত্তোলন করে, তবে তিনি সজোরে যদি বলেন “থামো” তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের হস্ত অর্ধপথে থামিয়া বাইবে।

ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক ব্রহ্মাশ্রম বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশ চট্টোপাধ্যায় (ডাক নাম “গন্ধ”) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু কাল চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ের কথা বলিতেছেন তখন তাহাকে এক স্থান হইতে সরিতে হইলে কচ্ছপের মতন চারি হাত-পায়ের উপর ভর দিয়া নড়িতে হইত। তাহার বয়স তখন ২৫-২৬ বৎসর। বর্গীয় রেবতীমোহন সেন ও পিতৃদেব একদিন গোয়াবাগানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়াছিলেন। তিন জনে যবে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে গজকচ্ছপের মতন ষণ-ষণ করিয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিল এবং হাতজোড় করিয়া পিতৃদেবকে বলিল “আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি ঝাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছি।” তৎক্ষণাৎ তরতর বেগে তাঁহার মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এক গুণ্ড মাকে (বিনি ছেলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন) ঘর হইতে বাহিরে বাইতে বলিলেন। রেবতী বাবু (তাঁহার গুরুভ্রাতা) তাঁহার কাছেই রহিলেন। তিনি গুণ্ড হাত ধরিয়া তাহাকে ঝাঁড়াইতে বলিলেন। যুবক তখনই তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁড়াইল। তিনি তাহার হাতে একখানি লাঠি দিয়া বলিলেন, “এই লাঠি ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাও।” সে তখনই লাঠি ভর করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সকলেই বিস্ময়াবিত হইলেন। প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, “এইরূপ অদ্ভুত মিরাকল (miracle) আমি কখনও দেখি নাই।” সেই দিন হইতে গুণ্ড বত কাল বাঁচিয়া ছিল সর্বদাই লাঠি ভর করিয়া ভ্রমণ করিত। এই ঘটনা ব্রাহ্মসভার অনেকেই জানেন।

বিখ্যাত ডাক্তার ব্রহ্মাশ্রম বর্গীয় সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের আঙ্গুল ছুরি আঘাত লাগিয়া বিবাক্ত বা হইয়াছিল। অস্ত্রের বস্ত্রায় তিনি নিম্না বাইতে পারিতেন না। মরফিয়া ইনজেকশন্স দিয়াও কোন ফল দর্শিত না। সেই অবস্থায় পিতৃদেব ডাক্তার বাবু সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ী গিয়া ঝাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত পাড়াইয়া আসিতেন।

হাজারিবাগের বিখ্যাত উকীল বর্গীয় গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের হালীপতিভাই ব্রজেন বাবু কুঠরোগাক্রান্ত হইয়া ল্যাগত ছিলেন। তাঁহার শরীরের নানা স্থানে কুঠকত হইয়াছে। তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায়া শায়িত। গিরীন্দ্র বাবু প্রভৃতির যে কারণেই হউক, এইরূপ বিবাস জন্মিয়াছিল যে পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই বোগীকে আরোগ্য প্রদান করিতে পারিবেন। তাঁহাদের অজ্ঞপ্তি তৈরি তিনি বোগীকে দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের মনে হইল তিনি এক সুস্থ্যর নিকট আসিয়াছেন। মুখে, হাতে, নাকে আরও অনেক স্থানে কুঠকত অতিশয় গভীর হইয়া পড়িয়াছে। বোগীর উঠিবার কিবা নড়িবার শক্তি নাই। পিতৃদেব কিছুক্ষণ তাঁহার গুরুত্ব নাম জপ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইল। তখন হাতে জল লইয়া কয়েক বার বোগীর সর্বদেহে ছিটাইয়া দিলেন। তিনি বলেন যে হস্তে একটা মলমও দিয়াছিলেন। বাহা হউক, পরের দিন হইতে বোগী অনেকটা আরোগ্য বোধ করিতে লাগিলেন এবং ২৪ দিনের মধ্যেই হাঁটুরা বেড়াইতে সক্ষম হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতার একটা বাড়ীতে পিতৃসেব শিরীষ বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে সেই দিন কোন বিবাহের বরষাত্রী অনেক জুটিয়াছিলেন। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে একজন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া পরিচয় দিলেন যে, তিনি সেই কুর্ভাগ্যবান ব্রজেন বাবু, তিনি বরষাত্রী আসিয়াছেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যচিত হইয়া পিতৃসেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কিরূপে এইরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন?” তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন—“আপনিই আমার জীবনদাতা।” পিতৃসেবও অবাক হইলেন।

পিতৃসেব-লিখিত “মনোরমার জীবনচিত্র” পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে নবম পৃষ্ঠায় ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তিনি বেখানে লিখিয়াছেন, সেখান হইতে নিয়ে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম—

“এইরূপ কত শত শত ঘটনা হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে

পারিতাম। সহস্র সহস্র লোককে শিবা করিতে পারিতাম। আমার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া কত বড় বড় লোক আমার নিকট শিষ্য স্বীকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন পাঠক বৃত্তিতে পারিবেন যে, ঐগুরুসেব আমাকে কিরূপ কঠিন পরীক্ষায় কেলিয়াছিলেন। যদি গোছারী মহাশয় আমার শুদ্ধ এবং মনোরমা আমার গৃহিণী না হইতেন, তাহা হইলে অর্ধোপার্জনের এইরূপ সুযোগ থাকিতে বিবম দরিদ্রতার মধ্যে এই বিবম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি না, বোর সম্বন্ধের বিবরণ।”

আমার এই বিবৃতিতে লিখিত সকল ঘটনাই পিতৃসেব লিখিত “মনোরমার জীবনচিত্র” পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বখন পুস্তক প্রকাশিত হয় (১য় খণ্ড—১৩২১, ২য় খণ্ড ১৩২৫) তখন, বীহাদের বিবরণ দেখা হইয়াছে তাহার অনেকই জীবিত ছিলেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কোড়ুলী পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে যদি আগ্রহান্বিত হন, তবেই আমি আমার উদ্দেশ্য সকল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

## ফাল্গুনী

শ্রী অমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

তোমরা-পাখা পুর ছড়ালো  
ফুল বরালো কুঞ্জবন,  
অশোক-পলাশ স্তনছে আঁহা  
মৌমাছিরের গুজরণ!

তোমার-আমার ফুলবাসরে  
সজল-হাওয়া আঁচল-ভরে  
আনলো তুলে চাপার কলি  
শাঙ হ'লো রাস্তা মন!

তেউ দিরো না ঝিলের জলে  
খেলার ছলে আনমনে,  
আঁকুল হিয়া চুপটি করে  
আঁজকে পাখির গান শোনে।

তোমার হাতে কীকন বাজে  
বাঁজুক আঁহা লাঁজুক সাঁজে  
আঁমার ডোখে লাগে গো এঁকে  
নীল বপনের আলিঙ্গন।

# বিচিত্র ভ্রমণ

জ্ঞানাজন পাল

[ এই ভ্রমণকাহিনীর লেখক স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্র। এই কাহিনীতে বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে প্রচুর অজ্ঞাত তথ্য আছে। —স ]

“বায়ুজী তখন”, হিন্দিতে এক জন গোকানী আমার ডাকুল

ভারতের প্রায় এক প্রান্তে—এখন ভারতের বাহিরেই এক ছোট সহরের এক বাজারে। প্রয়োজনটা এমন কিছু নয়—একটা রাত্রি প্রায়। সবটাই খুলে বসি।

১৯১৭ সাল। ইংরেজের বড় ভয় তখন, বুঝি বা শীঘ্র ভারত ছেড়ে যেতে হয়। ভিতরের অবস্থার খবর বা—বাহিরে আমাদের জানা ছিল না, এমন কিছু জানতে হয়ত পেরেছে। ভয়টা দিল্লী আর পাঞ্জাবেরই বেশী হয়েছিল, সিপাহী ও সব প্রায় সেই অঞ্চলেরই। হুকুম বাহির হ’ল বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক দিল্লী বা পাঞ্জাবের কোথাও যেতে পারবেন না।

এই সময় সিদ্ধিদের প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন আহুত হ’ল শিকারপুর সহরে। শিকারপুর ছোট শহর; কিন্তু ধনী সিদ্ধি ব্যবসায়ীদের বাসগা। কনফারেন্স একটু ভয়ঙ্কর। রকমেই হবে, জায় ব্যবস্থা হ’ল। তাঁরা আহ্বান জানালেন, বাংলা থেকে বিপিনচন্দ্র পালকে বোম্ব দিতে। শিকারপুর কলিকাতা থেকে যেতে হ’লে দিল্লী দিয়ে যাওয়াই সুবিধা। দিল্লীতে তখন বিপিনচন্দ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ; সুতরাং বোম্ব হয়ে অনেক ঘুরে যেতে হবে। খরচ অনেক বেশী; সময়ও অনেক লাগে। সিদ্ধি-বন্ধুদের আগ্রহে এত ঘুরে যেতে বিপিনচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন; আমি তাঁর সঙ্গে।

একদিন বোম্ব মেলে পিতার সঙ্গে উঠলাম। জিনিষ নেই বটে, কিন্তু একবারে যে নেই তাও নয়। মতিলাল নেহরুর অনেক বাস্র সঙ্গে থাকত বাইরে গেলে; কেমন বড় মোকদ্দমায় গিয়ে জিনিষ এড়াহাবাদ কিরছিলেন, একবার দেখেছিলাম। বিপিনচন্দ্র পালের সে বিভব ছিল না। তবে সঙ্গে নানা রকম চরমের বাস্র থাকত, আর থাকত ইকমিক কুকার। শরীর ভাল হ’ল, পথের ভাঙ খাওয়া চলবে না, এমন কি বাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করবেন তাঁদেরও স্বামীর দিক থেকে খুব লোভের নানা কথ্য রাজ্যও খাওয়া চলবে না। গলা ভাত, মশলা ছাড়া একটা রন্ধকারী বা কোল, একটু মাখম ও সস্তর হ’লে একটু দই—এই ছিল তার শেষের চোন্দ-পনের বছরের বাঁধাধরা আহার। আর ঘুর পাঞ্জার লগাফীতে এটা কুকারের সাহায্যেই তৈরী করার ব্যবস্থা করতে লাগল। ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের উদ্ভাবনে বত জন উপকৃত হয়েছেন, আমার বাবা তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান বলা যেতে পারে। এই তাঁর ছাড়া শেষ জীবনের ১৪১৫ বছর তাঁর সারা ভারত পরিভ্রমণ না বোধ হয় সম্ভব হ’ত না। আমাদের সঙ্গে আর একটা জিনিষ জালদী হয়ে থাকত, সেটা টাইপরাইটার যন্ত্র। যেলেও তিনি বলেন—অর্থাৎ বলে বেতেন, আরাকে টাইপ করে যেতে হ’ত সঙ্গে। এই ভাবে গাড়ীতে ত’ উঠলাম।

নাগপুর পর্যন্ত পথ একটা লেখা শেষ করে ট্রেনে এসে টিকিট

বাসে কেলে দিলাম—কলিকাতার বাবে, বতটা মনে আছে “অমৃতবাজার পত্রিকার” জন্ত। নাগপুরে ক’জন বাড়োয়রী বসিক উঠলেন। বিপিনচন্দ্র যেমন ভালবাসতেন লিখতে, সেমনি বলতে। এই বসিক সহযাত্রীরা রাজনীতিতে আগ্রহশীল, এমন মনে পড়ে না। রাজনীতিতে এখন বাণিজ্যপতিদের যে ঔৎসুক্য, তখন তা ছিল না। কিন্তু বিপিনচন্দ্র মানুষ ভালবাসেন, রাজনীতি করেন না এমন মানুষও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’তেন, দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে এই বসিকেরাও সেখান তীর বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। এর প্রমাণটা বোম্বাই ট্রেনে পৌছেই সেলাম।

দুপুরের পরে গাড়ী থামল “ডি. টি”তে। আমাদের বোম্বাইয়ের আতিথ্যের ভার নিয়েছিলেন তখনকার দিনের এক ধনী ব্যবসায়ী—বহুনাথস হারকাদাস। বিবি বোম্বাইয়ের তিনি ঐ অঞ্চলের এক প্রধান শিষ্য ছিলেন, ইংরেজী সাপ্তাহিক “Young India” পত্রিকার পরিচালক, বোম্ব হয় সম্পাদকত্ব। এই পত্রিকায় বাবা বোম্ব হয় এই সময়ে একজন প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। ট্রেনে তাঁর লোক বা গাড়ী কিছুই কিছু আসেনি। একটু অব্যয়গতি লাগছে। এমন সময় সঙ্গে বসিক সহযাত্রীরা বললেন, তাঁরা বহুনাথসদের আপিসে পৌছিয়ে দিতে পারেন। কথায় জানলাম তাঁরা বেশ বড় ধনী, এক কাপড়ের কলের মালিক বা অংশীদার। তাঁদের নিজেদের মোটর এসেছে ট্রেনে। আমরা তাঁদের গাড়ীতে উঠলাম; আর আমাদের সঙ্গে যে পরিচারকটি ছিল, তাকে জিনিষপত্র সমত ভিক্টোরিয়া বা ভাড়া গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ’ল। বহুনাথসদের আপিসে এলাম; তাঁর গাড়ী ট্রেনে গিয়েছিল, অল্পের দেরীতে আমাদের পায়নি। এরকম আপিস ঠিক আগে দেখিনি। বড় হল—ক’টা কামরায় ভাগ করা। প্রত্যেকের টেবিলে একটা করে ফোন ও পাশে একটা করে সিন্দুক। অস্ত্র আসবাবপত্র বিশেষ নেই, কোরাণীও বেশী নেই। এমন কি ব্যবসা, ভাবলাম হার প্রায় অনেকটা ফোনেই হয়! আর সিন্দুক টাকার ভরে ওঠে। পরে সেটা জানতে পারি। এরা জাদুঘর রায়ের ব্যবসা করেন; যুদ্ধের বাজারে এই রায়ের দাম অসম্ভব রকম চড়ে যায়, ফলে অল্প আয়ালে বহু টাকা এঁদের উপার্জন হয়। আপিসের চেহারা এই রকমই ইঙ্গিত করে।

আমরা ত এলাম, আমাদের পরিচারকের কিছু দেখা নেই; জিনিসপত্র সবই তাঁর সঙ্গে। ভাবনার কথা হ’ল—বিশেষ করে সেদিন রাত্রের ট্রেনেই আমাদের শিকারপুর রওয়ানা হবার কথা। পুলিশের সাহায্য নিলে যে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া বাবে, এমন ভয়সা কম। বহুনাথস বিচক্ষণ লোক; বললেন, চলুন আমরা বেঞ্চই; আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁর বোম্ব হয় এই প্রথম বোম্ব আসা; সহবও দেখি ও তাঁরও সন্ধান করি। তাঁর প্রকাণ্ড মোটরে নগর পরিভ্রমণকেলাম, চোখ আছে বসি পত্রিকার সমত ভিক্টোরিয়াটা দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলও বটে। আমাদের পরিচারককে গাড়ীতে বসান তুলে দেওয়া হ’ল, তখন সে ভাবল, গাড়ীর চালক কোথায় যেতে হবে নিশ্চয় বুঝেছে, চালক ভাবল সোয়ারী ত ট্রিকানা জানবেই। কিছুক্ষণ পরে অবস্থাটা বুকে চালক তাকে বাদালী থাকেন, এমন এক বাড়ীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলল—নাথো, এখানে নিশ্চয় তোমার বাবু আসবে। আমাদের পরিচারকটির কোম্ প্রাণে বাড়ী মনে নেই; কিন্তু

সাধারণ বৃত্তিতে সে যে আমাদের কারো চেয়ে কম নয়, বুকলাম।  
বাক্যে না দেখে সে নামতে রাজী হ'ল না। প্রায় খট্টা আড়াই  
ঘণ্টা সে সহরের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চল ঘুরেছে। আমাদের  
দেখে তার বোরাতি হ'ল যেমন আমাদের তেমন আশ্চর্য্য হল।

বয়নালাস আমাদের তুললেন, গোকুলদাস মোরারজীর  
প্রাসাদের মত বাড়ীর সলগ্ন অতিথি-আবাসে। এই ভ্রমলোক  
তখন বোরাতিয়ের শিল্পপতিদের অগ্রতম। ভাগ্যবিড়ম্বনায়  
এর অনেক বৎসর পরে শোচনীয় ভাবে এ'র মৃত্যু হয়।  
সন্ধ্যার অল্প পরেই আমাদের গাড়ী। ধনীগৃহের অতিথি-  
সংস্কারের আতিথ্যে উৎকর্ষা হল, সময়ে ঠেঁশনে পৌঁছিতে  
পারব কি না। বোরাতি শহর ও শহরতলীতে অনেকগুলি  
ঠেঁশনে গৃহস্থামীর প্রতিনিধি আশঙ্ক করলেন, 'সেটালে' না হয়  
'লাদারে' গিয়ে গাড়ী ধরা যাবে। কলিকাতা অঞ্চলের লোক।  
হাওড়ার বা শিয়ালদহে ট্রেন ফেল করলে আবার সেই ট্রেনই যে ধরা  
যায় অল্প ঠেঁশনে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা বিশেষ নেই। কথটা সেজন্ত  
বুঝতে দেবী হল। ভাবলাম, কিছু আগে বেরতে পারলেই ত  
ভিক্টোরিয়ায় জিনিষপত্র পাঠিয়ে আমরা 'সেটালে' ঠেঁশনেই গুজরাটগামী  
ট্রেন ধরতে পারতাম। কিন্তু এ'র ত তা হতে দেবেন না। এ'রা  
আমাদের এই গৃহ থেকে বিদায় দেবেন না—ঠেঁশনে গিয়ে গাড়ীতে  
তুলে দেবেন। অনেকগুলি লোক এসেছেন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা  
করতে, গুজরাটই বেশী; তাঁরাও অনেকে ঠেঁশনে যাবেন, বুকলাম।  
কিন্তু সময় বত যার, উৎকর্ষিত হয়ে ভাবি, ট্রেন ধরা যাবে ত ?

কিছু পরে বড় থালায় সাজান অনেক খাবার এল। এ'র মাছ,  
মাংস, ডিম খান না, কিন্তু তাতে পরিমাণ বা প্রকার কিছু কমে  
না। এত জিনিষের সহ্যবাহার করতে গেলে কোন কৌশলেই আর  
ট্রেন ধরা যাবে না। সুবিধা, বাবা প্রায় কিছু খান না; আমি ও  
পরিচারক তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। একটু আগে ভাবছিলাম,  
এত লোক ও আমাদের নিয়ে যাবেন কি? বাহিরে বারান্দায়  
বেরিয়ে দেখি, নিশ্চয় পাঁচ-ছ'খানা বড় ও মাঝারি মোটর ঠাঁড়িয়ে  
গেছে। প্রায় অপ্রয়োজন এত গাড়ীর এভাবে সমাবেশ কত চাক  
কিছুপ সমাজ উপার্জন করলে সম্ভব হয়, ভাবলাম। এক দিকের  
পাল্লায় ধন যেখানে এভাবে পড়ে, সেখানে অপর দিকে সাধারণের  
ভাগে কত যে কমে, তার হিসাব কি আমাদের মনে আসে? গাড়ী  
তীরবেগে আমাদের পৌঁছে দিল সেটালে নয়, সেখানে আর গাড়ী  
পাওয়া যাবে না—লাদারে। গাড়ীতে যাত্রাগার ব্যবস্থা আসেই  
করা ছিল। রাজ্যে যে কামরায় উঠলাম, তাতে ছ'জনের  
শোবার ব্যবস্থা ছিল। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন মারাঠী বয়স্ক  
লোক ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। মারাঠী মহিলা এ অঞ্চলে দেখছি,  
আমাদা কামরা ব্যবহারে উৎসুক ন'ন। মেয়েদের এমন সম্রাতিভ  
ব্যবহার—অপরিস্রব পুরুষদের মাঝে ভারতের অস্ত্র কোথাও  
দেখিনি; বাংলা, বিহার বা উত্তর-ভারতে ত নয়ই।

পরের দিন ভোরবেলা বরোদায় পৌঁছলাম। বরোদা নামের  
একটা মায়ী আমাদের মধ্যে ছিল। সেখানে রাজার ব্যবহার  
সাধারণ লেখাপড়া দেখবার বেশী অযোগ্য পায়; মেয়েবাও লেখাপড়ার  
এগিয়ে চলেছে; লাইব্রেরী আন্দোলনের এটা জরাজমি; ঐশ্বর্যবিশেষ  
প্রায় করজমি। রাজার স্বদেশপ্রীতি স্ববিদিত। শুণ্ড অর্থবিশেষ

প্রতি তিনি প্রদর্শনীয় ছিলেন না। শুনেছিলার, মনে পড়ে,  
বিপিনচন্দ্রের "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা পরিচালনে পরোক্ষ ভাবে তিনি  
কিছু অর্ধসাহায্য করেছিলেন। বাংলার গৌরব রমেশচন্দ্র দত্তের  
বরোদাই শেষ কর্মক্ষেত্র ছিল। এদের কারণে বরোদায় ট্রেন থামতেই  
মনটা একটা শ্রদ্ধার ভাবে ভরে গেল।

১০টা এর কম সময়ে আমরা আমেনাবাদ পৌঁছলাম। এখানে  
গাড়ী বদলাতে হ'বে। ছোট লাইনের (narrow gauge)  
গাড়ীতে উঠে মাদোয়ার জংশনে গিয়ে আবার গাড়ী বদলাবার  
প্রয়োজন হবে। দিনের ছোট গাড়ীতে বেশ ভিড়; উঠলাম ত এক  
কামরায়। উপরিসর দেহর করেক জন ব্যবসায়ী মাদোয়ারী দুটো  
বেঞ্চি দখল করে আছেন; আর কেউ যে ওঠে, সেটা একবারেই  
পছন্দ নয়। আমরা দু'জনে একটু বসবার জায়গা চাওয়াতে অত্যন্ত  
অগ্রসর যুগে—সংস্কৃত নাটকে যেমন লেখা থাকে 'নাটোন', সেভাবে  
একটু সরে বা না সরে বসে রহিলেন। কষ্টে ত কোন বকমে বসলাম।  
সহযাত্রীরা বিশ্রামের খাওয়া আরম্ভ করেছেন—পুরী, ভাজি,  
মিষ্টি, ফলও আছে। বিপিনচন্দ্র ভাগা হিন্দিতে পল্ল আশঙ্ক  
করলেন ফলের—আমেরিকার, ক্রাফের, ইতালীর, ইংলণ্ডের।  
সহযাত্রীরা খাচ্ছেন আর শুচ্ছেন; যুগ চলছে, মাথাও নড়ছে।  
ক্রমে দেখি, আপনা-আপনি তাদের মাঝখানে আমাদের বসবার  
জায়গা বেশ একটু বেড়ে গিয়েছে, আরামে বসতে পেলাম।  
সহযাত্রীর প্রসন্নতায় বসবার জায়গার পরিসরও তা'হলে  
বাড়ে। সহযাত্রীরা দু' দলের ছিলেন; যাবেন তাঁরাও আমাদের  
মত অনেক দূরে। সন্ধ্যা মাদোয়ার জংশনে তাঁরাও গাড়ী বদল  
করে যোগপুর বিকানীর রাজ্যের গাড়ীতে উঠবেন। সে গাড়ী  
কামরায় রাজ্যে শোবার জায়গা নাচে দুটা মাথার দুটা। এসে  
দু'জন করে এক দল, প্রতি দলই বিকালের দিক থেকে বলতে আরম্ভ  
করলেন—'শিতাজী' যে গাড়ীতে উঠবেন সে গাড়ীতেই তাঁরা দু'জন  
যাবেন—অল্প দু'জন যেন অল্প গাড়ীতে যান। বিভবের মোহ  
মাহুরের আছেই। বাকবিকৃতিরই যে একটা আকর্ষণ আছে—আম  
বাকে কুটী বা সংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই বাদের, তাহলে  
মধ্যেও এটা দেখে কৌতুক অল্পভব করলাম।

বিখ্যাত আবু পাহাড় পার হয়ে মাদোয়ার জংশনে সন্ধ্যা  
পর গাড়ী এসে থামল। কিন্তু গাড়ী নানান কারণে  
দেবী হওয়ার রাজ্যের গাড়ীর সংযোগটা আর পাওয়া  
না। ট্রেন বড় নয়, মাঝারি বা ছোট। বেশ গরম ক  
এখন। রাজ্যে শুভে হ'লে বাহিরে শুভে হবে। মজা হ'ল  
দিনে বাঁরা একটু বসতে দিতে প্রথমে রাজী ছিলেন  
তাঁরাই 'শিতাজী'র লজ্জা রাজ্যে ভাল খাটুরা সংগ্রহ করে শোবার  
ব্যবস্থা করে গিলেন; আমরা যেন তাঁদেরই অতিথি  
তাঁদের এই অপ্রত্যাশিত যাত্রের কীকে কীকে হ'লেন  
লোক কিন্তু আমরা বোকাতে লাগলেন, তাঁরা দু'জন অল্প দু'জন  
সহযাত্রী হিসাবে কেন বেশী কাম্য। পরের সন্ধ্যা আবার  
রাজ্যের গাড়ীতেই ত উঠতে হবে; শিতাজীর সঙ্গে তাঁর কাম্য  
বাঁরা ইচ্ছাটা হ'লদের কেহই আর তুলছেন না।

মাদোয়ার জংশনে বাইরে শুভে রাজুটা বেশ কাটল।  
সমস্ত দিনও থাকতে হবে, ঠেঁশনেই। লেখা বাঁদের সহজ;

আমাদের নর আনন্দের, তাঁদের দেখানার অনুরোধ আর কোন অবস্থাতে হয় না। হাকিম্বু বুয়ে চা খেয়ে যেমন বাড়ীতে তেমন এই ট্রেনের বিজ্ঞান ককে বসে বিপিনচন্দ্র বলে গেলেন—আমার টাইপ করতে হ'ল মেশিনে ; চলে গেল লেখা "পত্রিকা"র জন্ত কলিকাতায়। হাজেরারী সহবাত্রীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ সম্বরের ভাব এসেছে, একটু হুবে হুবে থাকেন ; আর আমার জিজ্ঞাসা করেন মাঝে মাঝে, কিছু অভাব-অনুরোধ নেই ত ?

সন্ধ্যার বোধপূর্ণ-বিকারী রেল চড়লাম, পরদিন দুপুরের পর হায়দ্রাবাদ (সিঙ্গে) পৌঁছে বিজ্ঞান করে, আবার রাত্রে বাড়ীতে শিকারপুর যাব, এই ব্যবস্থা। মক্কাভূমির মধ্যে দিয়ে রাত্রে গাড়ী চলল। সকালে উঠে দেখি, চারি দিকে খালি ধূ-ধূ বায়ু-চুম্বি। এখানে হরিতে হিরণের মেলা নেই, চলতে গেলে দুর্বা হলতে হয় না ; কোথার বাঙ্গার জামল রূপ আর কোথার এই মক্কাভূমির ধূসর চেহারা। মনে হ'ল কি বিভিন্ন আমাদের এই মহাদেশ। এই রেলের একটা ব্যবস্থা বড় ভাল লেগেছিল। ব্রিটিশ-শাসিত আমাদের ভারতে রেলের খাজ ও পানীয়ের কামরা যেখানে সংযুক্ত থাকে, তা থাকে সাহেবদের জন্য, সাহেবী-এসম্প্রেরা ব্যবহার করতে পারেন সাক্ষাৎ যদি পরদার প্রাচুর্য থাকে। এই ট্রেনের সলর খাবার কামরায় ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ দেশী ধরনের। পিছনে রান্নাঘর, সামনে পিড়ার বসে আর এক পিড়ার খালি-গলাস রেখে গরম পুরী তরকারী প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা।

পরের দিন দুপুরে সিদ্ধ হায়দ্রাবাদে পৌঁছলাম। সহর সামনে আসতেই এক নতুন দৃশ্য দেখলাম। সব বাড়ীর ছাতে কোণার দিক খোলা, ও তার মাথার ছেলান চিলের ছাতের মত ছাত। বৈদ্য অনেক সারা পাল তোলা নৌকা একসঙ্গে জড় হয়েছে। এখানে বাতাসটা সারা বছর এক দিকেই বয় ; আমাদের মত গরমের সময় দক্ষিণ দিকে আর শীতের সময় উত্তর দিকে বয় না। বৃষ্টির বালাই নেই বলতে হয়। মাথার এই পাল দিয়ে খোলা বাতাস ঘরের ভিতরে আনা হয়। বিপিনচন্দ্রের এই অকল পূর্ণ-পরিচিত। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'city of sails'—'পাল তোলা সহর'। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক অধ্যাপক ডাক্তারিয়ার সঙ্গে বোধ হয় এখানেই পরিচয়। বর্তা মনে পড়ে, কয়েকটি প্রতিভাবান তাসী সিদ্ধি বুঝক ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে এসেছিলেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে যৌবনে বিপিনচন্দ্রের বন্ধু হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন বোধ হয় সাহু সুন্দরলাল। গাড়ী ট্রেনে পৌঁছতেই ১১৩০ জন এসে বিপিনচন্দ্রকে নামিয়ে নিলেন। এখন থেকে বিপিনচন্দ্র এসেই অতিথি। ট্রেনেই এরা কলসেন—সরকারের কুন হুকুম—বিপিনচন্দ্রকে নিয়ে কোন শোভাযাত্রা বাহির হ'তে পারবে না, কনফারেন্সেও তিনি সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে পারবেন না, বরং হিসাবে ইচ্ছা করলে বসেও বা থাকতে পারেন। আর সরকারের এই আদেশ অকরে অকরে বাতে পাগিত হয় তার জন্ত নিম্ন সাহেব সঙ্গে ও জেলার কর্তা শিকারপুরে গিয়ে অবস্থান করেন। কি কর্তব্য ? সিদ্ধি বন্ধুরা চান না—বিপিনচন্দ্র অন্তহীন। এই বসে অকার্য্য শেষ পান। অবস্থাটা ভাল করে চিন্তা করা দরকার। বিপিনচন্দ্রের আতিথ্যের যেখানে ব্যবস্থা আছে, সেখানে গিয়েই এ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করা যাবে। একটা

বড় গাড়ীতে তাঁরা ও আমরা উঠলাম ; শহরের মধ্যে গাড়ী চুকতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য—জনমানব নেই। বাড়ী-ঘর, লোকানপাট সব বন্ধ ; বাজা মিহালী দুপুরবেলার। জানলাম হায়দ্রাবাদে প্রায় ৬৭৪৪৩ হয়েছে। ভয়েও বটে, প্রয়োজনেও বটে, লোক সব সহর ছেড়ে গেছে। একটা বড় গোলটা বাড়ীর সামনে দিয়ে গাড়ী যেতে দেখি, সে বাড়ীতে অনেক লোকজন, এটা প্রোগ্রাম-হাসপাতাল। প্রোগ্রাম নগর শূন্য হয়, শৈশবে শুনেছিলাম, এই দেখলাম। সহরের বাইরে নতুন ছাউনি পড়েছে, সেখানে লোক সব গিয়েছে। কিছু বাড়ীও আগে থেকে সেখানে উঠছিল। একটা বাড়ীতে আমাদের তোলা হ'ল। সিদ্ধি হিন্দুগা টেবিলে থান, কাপড় পেতে মাছ-মাংসও থান। পশ্চিম-জিন্স জন্মের বড় বকমের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬৭৪৪৩ ক্যাননে বা খালে বালাস ইলিসের মত অতি সুখাহ এক বকম মাছ হয়। আমরা বাঁদের অতিথি তাঁরা গল্প করলেন এই মাছের জন্য এক নবাবের নাকি প্রাণ গিয়েছিল, গলায় কাটা বিধে নয়, খেতে আরম্ভ করে তিনি আর থামতে পারেননি। সহরের প্রোগ্রাম দৃশ্যে মন বিম্বিত হয়ে গিয়েছিল। বাঁদের বাড়ী উঠেছিলাম তাঁদের কয়েকটি অতি সুন্দর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নতুন অতিথি আমাদের পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল। প্রোগ্রামের জন্য দুই মাত্র ত এরা আছে, অনিন্দিত আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠল। ভোজ্যের এসব বর্ণনা বা স্বাদ কিছুই উপভোগ করতে পারলুম না।

কনফারেন্সে যাওয়ার কি হবে ? রাজনীতি যে একটা কৌশলেরও খেলা, তার আর একটা পরিচয় সেদিন পেলাম। বিপিনচন্দ্র ঠিক করলেন তিনি শিকারপুর যাবেন ; সে বাড়ীতে বওয়ানা হয়ে পরের দিন ভোরে পৌঁছিবেন ; কনফারেন্স সেদিনই আরম্ভ। যাবেন বিদেশী সরকারের পক্ষের সঙ্গে জোরের লড়াই করতে নয়, তাদের উদ্বেগকে অন্য ভাবে বিফল করতে। দেশপ্রেম মনের একটা অতি উন্নত ভাব। লেখা বা বক্তৃতার দ্বারা যেমন একে উদ্দীপ্ত করা যায়, ব্যক্তিত্বের দ্বারাও তেমন জাগান যায় বা জাগিয়ে রাখা যায়। বক্তা বিপিনচন্দ্রকে সরকার মুক্ত করলেন ; তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি সে কাজ করতে চাহিলেন যেটা তাঁর বক্তৃতার দ্বারা করতেন। তাই শিকারপুর ট্রেনে গাড়ী পৌঁছতেই দেখি, কয়েক হাজার লোকের ভিড়। শোভাযাত্রা হওয়া নিষেধ, সমবেত হওয়ার নিষেধ নেই। দেশপ্রেমের জয়ধ্বনিতে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হল ; জনতাকে বলা হল, শান্ত ভাবে সহরের দিকে ফিরে যেতে। দেশপ্রেমের উৎসাহের উদ্ভাসেও যে সত্য লুকিয়ে থাকে, তা দেখলাম। এত বড় জনতা নীরবে নেতাদের আদেশ মেনে নিল। মনে কোত্তর আশ্চর্য্য নিয়ে গেল বলব না, কিন্তু উচ্ছ্বল শিখার সঙ্গে উঠল না।

যিনি কনফারেন্সের সম্পাদক, তাঁর বাড়ীতেই বিপিনচন্দ্র অতিথি। একটা মাঝারি ঘরে বিপিনচন্দ্র বসলেন। অগণিত জনতা গোলাপ ফুলের পাণ্ডি হাতে নিয়ে এক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুক তাঁকে দেখে ফুল রেখে অস্ত্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে বেতে লাগল। শিকারপুর গোলাপের বাগানের অস্ত্র লসিদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ঘরের যেটো গোলাপের পাণ্ডিতে ছেয়ে গেছে ; বেন পাণ্ডি দিয়ে কেউ অপর পাণ্ডি তৈরি করেছে। এ সময়ের আর একটা দৃশ্য

তুলতে পারিনি। এক বর্ষারদী সাধারণ মহিলা বোধ হয় মুসলমান—দূর গ্রাম থেকে এসেছেন বিপিনচন্দ্রকে দেখতে, হাতে তাঁর নিজের গাছের কি একট ফল, কিছু ফুল আর দু'টি পরমা। এই অভিনব অভ্যর্থনার মর্ম পরে বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে বীরা সাধু তাঁরাই ত্যাগী হ'ন। শক্তিমান পুরুষ সংসারে নিজের বা নিজের পরিবারের জন্তই পদ, প্রতিষ্ঠা, বিত্ত সংগ্রহ করে। যে করে না সে বিরাগী। বিপিনচন্দ্র শক্তি থাকতেও সরকারের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা চাননি, অর্থোপার্জনেও মন দেননি—এটা বোধ হয় প্রচার হয়েছিল আগেই। সন্ততঃ এই সাধারণ মহিলার ধারণায় তিনি ত্যাগী। আর ত্যাগী বা সাধুকে দেখতে এসে কিছু ফল, ফুল ও দু'এক পরমা নিয়ে আসতে হয়। এই মহিলাও তাই করেছিলেন। রাজনৈতিক, বক্তা বা বিদ্বান বিপিনচন্দ্রকে ইনি প্রচার অর্থাৎ দিতে আসেননি। এসেছিলেন তাঁর ধারণায় ত্যাগী বিপিনচন্দ্রকে প্রশংসা করতে। দেশকর্মীও আমাদের দেশে ত্যাগী হলেই নমস্ত, নচেৎ ন'ন। ত্যাগী দেশকর্মী গৃহী হ'লেও সাধারণের স্বদয়ে সাধু বা সন্ততঃ আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন। বৃন্দগুম, যে দেশের তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যে এই বোধ এখনও জাগ্রত আছে, সে দেশ ছোট নয়।

রাজনৈতিক কনফারেন্সে বিপিনচন্দ্র নীরব দর্শক হিসাবে কেবল উপস্থিত থাকবেন, এই প্রতিশ্রুতি জেলার কর্তা তাঁর কাছে চাইলেন। শুধু তাই নয়, কনফারেন্সের বাহিরেও জনতার সামনে রাজনৈতিক কোন বক্তৃতা দিতে পারবেন না। নচেৎ তাঁকে সেই দিনই বহিস্কৃত করে দেওয়া হবে বা আবদ্ধ করা হবে। বিপিনচন্দ্র কনফারেন্সে গেলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু দেশপ্রেম জাগরক রাখার কাক ত বাহত হতে দিতে পারা যায় না! তার এক অভিনব পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা হ'ল।

বিপিনচন্দ্রেরও দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি সখকে অঙ্গুবাগ কম ছিল না। রাজনীতি বাদ দিলেও তাঁর বসবাস বা লিখবার বিষয়ের অভাব কখনও দেখিনি। তিনি দেশের সনাতন—কেবল পুরাতন নয়—সাধনা সখকে কিছু বলবেন, ঠিক হল। কনফারেন্সের প্যাণ্ডাল ব্যবহার করা হবে না। তাতে আটকাবে না। এঁদের গোলাপের বেসব বাগান আছে তারই একটার ব্যবস্থা হতে পারবে; কোন কোন বাগানের মধ্যে ভাল চষ আছে। বৃষ্টির জর নেই, বৃষ্টি সে দেশে হয়ই খুব কম। কিন্তু কি ভাবার বলবেন? ইংরেজী খুব কম লোক জানেন। বাংলা কেউ জানেন না, একজন বাঙ্গালীকেও সেখানে দেখিনি। হিন্দি—হতে পারে একরকম, যদি বক্তা সে ভাষা জানেন। বিপিনচন্দ্র সংস্কৃত কিছু জানেন কিন্তু ভাঙা ও উচ্চ আঙ্গের ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের মাধ্যমে। বিপিনচন্দ্র ইংরেজীতে বলবেন, অল্প কেউ তা স্থানীয় সাধারণের ভাষার তর্জমা করে দেবেন, এটা পদ্ধতি হ'ল না। আমাদের সামনে বিদেশী কোন পণ্ডিতের কিছু বলতে হলে এভাবেই তিনি বলেন। বিপিনচন্দ্র ত এঁদের কাছে বিদেশী নন। তিনি রাজী হ'লেন ভাঙ্গা (হয়ত কিছু ভুলও) হিন্দিতেই বলতে। আমার বিম্ময় লাগল।

বিপিনচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির এক সহজ বৈশিষ্ট্য ছিল—জিনি মুখ করে কিছু শিখতে হ'লে তা শিখতে পারতেন না।

তাঁর আশ্চর্যতে আছে, তিনি বাংলায় কান্দী শিখতে পারেন নি। মৌলবী আগে মুখস্থ করে মানে। এই পথে পড়াতে চেয়েছিলেন বলে। ইংরেজী তিনি বা শিখেছিলেন, তা মুখস্থের পথে নয়। তাঁর ছেলেবেলার ইংরেজী শিক্ষক ভুল হলেনও তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে বাধ্য দেননি। এভাবে ভাষার অভিনিহিত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের একটা সহজ যোগ প্রতিষ্ঠিত হ'ত। সংস্কৃত সখকেও অনেকটা তাই ছিল মনে হয়েছে। আর সংস্কৃতের অপভ্রংশে বাংলা প্রভৃতির মত হিন্দিও গঠিত বলে ভাঙ্গা (বা ভুল) হিন্দিতে তিনি দেশের সাধনা সখকে সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে রাজী হ'ন। ঠিক হ'ল সাত দিন ধরে বলবেন। আর লোকের আগ্রহ কত বেশী তা বোঝা গেল যখন ডিকিট করে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ল। এই ছোট সহরের কয়েক শত লোক ভক্তি-সাধনা সখকে ভাঙ্গা হিন্দিতে তাঁর বক্তৃতা নিরমিত শুনলেন। আমার ভয় ছিল বৃষ্টি বা বক্তা তাঁর ভাষণ বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত করেন ভাষার অন্ত্রবিধার বা শ্রোতাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে। কিন্তু ভয় নিছক কল্পনাই ছিল। এর একটা কারণও ছিল।

বিপিনচন্দ্র আগে থেকে তৈরী করা বক্তৃতার কান দিতেন না। তিনি বাগ্মী ছিলেন, শুধু বক্তা নন। তাঁর মস্তের মধ্যে চিন্তা বা ভাবের শ্রোতের খেলা চলত আপন-আপনি; শ্রোতা পালে তার উৎস খুলে যেত। এটা বঁদের হয় ভাষা তাঁদের ভাবকে বাঁধতে পারে না, বাহন মাত্র হয়। ভাষার অন্ত্রবিধার তাঁদের ভাবের শ্রোত কৃষ্ণ হ'তে পারে না। ভাব প্রকাশের তাগিদে আপনি ভাষা খুঁজে বাহির করে; সে ভাষার ব্যাকরণের ভুল বতই থাক বা সাহিত্যের বীতি-বিচারে তা বতই দোষের হোক না কেন। বিপিনচন্দ্রের ভাঙ্গা হিন্দিতে শ্রোতাদের বুঝতে তত অন্ত্রবিধা হয়নি, আর এক কারণে। ভাগবত ধর্ম বা ভক্তিসাধনার মর্ম কথা আমাদের নিরক্ষর লোকেরাও জানেন। কঠিন দার্শনিক মতবোধ তা আচ্ছন্ন হয়নি সম্পূর্ণ; সাধু-সন্তদের জীবনে ও বাণীতে তা জীবন্ত হয়ে দেশের সর্বত্র নিভা ছড়িয়েছে। মুক্ত হয়ে সে জন্ত দেখলাম সাধারণের তাঁর ব্যাখ্যান শুনল। মধ্যে মধ্যে যে তাদের আটকার নি তা নয়। যে দোকানী আমার 'বাবুজী শুভন' বলে ডেকেছিলেন প্রথমেই বলছি, তাঁরও এক জায়গায় এরকম আটকিয়ে ছিল বুঝতে। তিনি বললেন—“আপনার পিতাজীির ব্যাখ্যান খুব সুন্দর হয়েছে। তিনি যে বলেছেন মাঘবই ভগবান, এও ঠিক কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন—পুরুষ ভগবান আর স্ত্রী ভগবতী। বাবুজী, স্ত্রী যদি ভগবতী হ'ন ত আমার ত তাঁকে পূজা করতে হয়। আমি যদি তাঁকে পূজা করি ত হুকুম কি করে করব? কি করে বলব—কাপড় কেটে দাও, বাস্কা করে দাও, বাসন মেখে দাও? এটাতে আমি বড় মুছিলে পড়ে গেছি বুঝতে।” ফিরে এসে বাবার কাছে এ কাহিনী বললাম। বাবার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত বীরা ছিলেন তাঁরা জিনিষ্টা লক্ষ্যকৌতুকের ভাবেই নিলেন, খুব চেসে উঠলেন। আমি কিছু বললাম—সাধু-সন্তদের জীবনে ও বাণীতে যে সত্য ফুটে উঠেছে আমাদের দেশের সাধারণের অন্তর তা অসংকোচে গ্রহণ করেছে; কিন্তু তা সমাজের নিগড় ভাঙেনি। সমাজে এ বাণী প্রতিষ্ঠা পেলেই আমার শিকারপুরের দোকানী বড় তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবেন।



# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

## প্রথম পর্ব

২

শিশুকাল থেকে বারো-তেরো বছর বয়স পর্যন্ত যে ঘটনা যেমন মনে আসছে তাই লিখে চলেছি। সাতবেড়ের ঝড়ের কথা বেশ মনে পড়ে, বিশেষ ক'রে যেবারে ঝড়ের সঙ্গে বড় বড় শিল পড়েছিল।

সাতবেড়ে অঞ্চলে এবং ফরিদপুর জেলার উত্তর অঞ্চলে—এই দু'জায়গারই মাত্র অভিজ্ঞতা তখন—বোশেখ মাসে প্রায় প্রতি দিন বড় ঝড় হয়। বিকেলের দিকেই সাধারণতঃ। এই ঝড়ের খেলা জ্যৈষ্ঠ মাসের আধাআধি পর্যন্ত চলে। অতি অল্পকালের আয়োজনে প্রলয় কাণ্ড। মেঘহীন ভালমাসের আকাশ, দূরশিগন্তে পশ্চিম দিকে বা উত্তর-পশ্চিম কোণে সামান্য একটুখানি কালো আভাস; বাকের ভাবায়—no bigger than a man's hand, কিন্তু ওতেই যথেষ্ট। অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ক্রান্তে কয়েক মিনিটের কাজ। কি তৎপরতা! মনে হবে যেন কেউ প্রকাণ্ড এক অদৃশ্য তুলির টানে মেঘ একে বাচ্ছে শূন্য আকাশ পটে।

স্বরে স্বরে সাজানো কাজল-কালো মেঘ। বর্ষাকালের পদ্মার জোতের মতো টগবগ ক'রে ফুটে-গঠা আকাশ নদী বেন। উপরের স্বরের কিছু মেঘ নিচে আসছে, নিচের স্বরের কিছু মেঘ উপরে উঠছে। সাজানোর কাজটি কিছুতে যেন মনের মতো হচ্ছে না। আতঙ্কিত পাখীরা ছুটে চলেছে আকাশের খোঁজে। তাদের স্পর্শভেদন মনে বিপদের সঙ্কেত এসে গেছে। আকাশের গায়ে জ্বালার একটানা বিপতি। তারপর দেখতে না দেখতে সহসা শুকনো পাতা আর ধুলোবালি উড়িয়ে, বড় বড় গাছকে হেলিয়ে হুলিয়ে, জ্বালের মড়মড় ও শুকনো পাতার বনবন শব্দের সঙ্গে একটানা শীর্ণা শব্দ মিশিয়ে, ঠাণ্ডা প্রবাহের সঙ্গে উঠে এসে ঝড়। কি জার প্রবলতা! সর্বদে অল্পভব করা যায়। তখন জানা পোনা আর সকল শক্তির উৎসকে খেলা মনে হয়।

ঝড়ের এ সর্বনাশা সৃষ্টির সঙ্গে পল্লীবাসী আমাদের শিশুকাল যুগে পরিচয়। বিশেষ ক'রে পায়না-ফরিদপুর অঞ্চলের লোকের।

এ রকম নিয়মিত বড় কলকাতার হয় না। এবং যে ঝড় হয়, তা যতই প্রবল হোক, তাতে তার নিজস্ব শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ বড় যোগ হয় না। কিন্তু পল্লীর ঝড়ে হাজার হাজার বনশ্রুতির আর্জনার যোগ হয়। প্রকৃতির সে এক অদ্ভুত আবির্ভাব রূপ, আর মানুষের মনে তার অদ্ভুত অমুড়তি।

আমি যে বিশেষ ঝড়টির কথা এখন মরণ করছি—সে ঝড়ের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক একটা শিল পড়েছিল, এত বড় শিল আমি আর দেখিনি। অবশ্য সাতবেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঝড়ঝুড়ির সময় নিয়মিত শিল পড়ে এবং প্রতি বছরই। অদ্ভুত দু'এক দিন পথ-ঘাট ঢেকে যায় শিলে। পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি। আজ সে আবহাওয়ার বদল হয়েছে কিনা কোনো ধারণা নেই। তখন এটি বছরের স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। শিল কুড়িয়ে মোটা কাপড়ে ঢাশা নিয়ে বল তৈরি ছিল আমাদের সাধারণ খেলা। কলকাতায় (১৯৩৬ সম্ভবতঃ) একবার মাত্র পথঘাট ছেয়ে যাওয়া শিল পড়তে দেখেছি। কিন্তু আমি যে বিশেষ শিলের কথা বলছি তা এত বড় যে কলকাতার সর্ববৃহৎ পঞ্চশিল বা বাটশিল জুড়লেও তার সমান হবে ব'লে মনে হয় না। ছোট ছিলাম বলেই যে ছোট জিনিসকে বাড়িয়ে দেখেছি তা নয়। বড়গাও সবাই বলেছেন সে শিল অতিকায় শিল।

সেদিন এমনি বড় বড় শিল আকাশ ভেঙে নিচে পড়েছিল বহুক্ষণ ধরে। গ্রামে অধিকাংশই প্রায় টিন আর খড়ের ঘর। বহু খড়ের ঘর ভেদ করেছিল সে শিল, আর টিনের উপর খটখটানেক ধরে সেই অতিকায় শিলের অবিরাম বর্ষণ। মনে হচ্ছিল যেন শিলভরা সম্পূর্ণ আকাশ-কড়াইটাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর কাত ক'রে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে নির্বাক হয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি বড় বড় গাছের আড়ালে ঝড়ের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ, কিন্তু শিলের হাত থেকে বাঁচবার উপায় নেই। সেদিনও অনেক বাড়ির ক্ষতি হয়েছিল। এর সঙ্গে যে ঝড় ছিল তা অতি প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব আর সেদিন কর্ণসোচের হয়নি, শিলের শব্দ আর সব কান্নকে ঢেকে



দিয়েছিল। আমাদের ছুেলের জন্ত বাইরে খোলা জায়গায় কলপেটেও শীটের বড় বর তৈরি হচ্ছিল। পরদিন শুনলাম কড়ে তার চাল উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে অনেক ঘরে। গিয়ে দেখেছিলাম, কাগজের শীটের মতো জড়ানো। টিনের শীট অন্তত সিকি মাইল দূরে বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। ছুেলখরের চার দিক তখনও খোলা ছিল, বেড়া গিয়ে বেধা হয়নি, অতএব বড় অবাধে ভিতরে ঢুক চাল ছিঁড়ে মাখায় ভুলে নিয়ে ঘরে নিক্ষেপ করেছে।

বালককালে গ্রাম্য জীবনের সকল দিকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। বয়স্কদের বা করতে দেখেছি তাই আদর্শ মনে করে তার অনুকরণ করে কৃতার্ব বোধ করেছি। মাছ ধরা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চারদিকে মাছ। স্থান করতে নেমে কাছাকাছি বাঁধা নৌকোর গায়ে গামছা অথবা কাপড় দিয়ে মাছ ধরা ছিল খুব সোজা। দু'জনে দু'দিকে ধরে গামছার একদিক ডুবিয়ে নৌকোর গায়ে গায়ে টেপে ধরে উপরে তুললেই অনেক মাছ। চিড়ি মাছই বেশি। শীতের হুখে যখন বাঁধা ডোবা সব শুকিয়ে আসত তখন অল্প জলে পলো দিয়ে মাছ ধরেছি। আরও কম কানাললে হাত দিয়ে শিঙি মাগুর প্রভৃতি অনেক ধরেকি, মাছের কাঁটার খাও খেয়েছি অনেকবার। বর্ষার হুখে পদ্মার জলে বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি খাঁচা পেতে মাছ ধরাও খুব চলতি ছিল। ওখানে তার নাম ছিল দোয়ার। জেলা ভেদে পৃথক উচ্চারণ শুনেছি। এই খাঁচা বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি। দোয়ার পেতে দু'ধারে বাঁশের কাঠির ক্রস পুঁতে তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়—তারপর দোয়ারের হুখ থেকে ডাঙা পর্বন্ত পাতলা চোচড়ির তৈরি রিকের মতো দেখতে তিনচার হাত লম্বা বেড়া পুঁতে দিতে হয়, যাতে মাছ তাতে বাধা পেয়ে দোয়ারের মধ্যে ঢুক যেতে বাধ্য হয়। একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না এমন কৌশলে তৈরি। সন্ধ্যাবেলা দোয়ার পেতে খুব জোরে গিয়ে তুলতে হয়। বড় বড় চিড়ি ও আড়মাছের বাছা প্রভৃতি অনেক ধরা পড়ে। পিছনের ছোট দরজা খুলে বের করতে হয়। আমিও একবার একজনের প্রায় পায়ে ধরে একটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু বর্ষার পদ্মার বালকের পাক সেটি বিপজ্জনক বোধ হওয়ায় এক দিনের বেশি শখ করা চলল না।

পল্লীগ্রামে বৃড়ি গুড়ানোর শখ ছোটদের মধ্যে যেমন বড়দের মধ্যেও তেমনই দেখেছি। কলকাতায় যেমন প্রতিযোগিতা করে বৃড়ি কেটে দেওয়ার রীতি বা খেলা, আমাদের সে রকম ছিল না। বার বার বৃড়ি তার তার হাতে খণ্টার পর খণ্টা উড়ছে। সে সব বৃড়ির চেহারা বিচিত্র। যে চতুর্কোণ বৃড়ি কলকাতার আকাশে ওড়ে আমাদেরও অর্থাৎ ছোটদের বৃড়িও তাই, কিন্তু কটিভেদে কারো কারো বৃড়ির সঙ্গে দীর্ঘ ল্যাজ জোড়া থাকত। দশ-পনেরো-বিশ হাত লেজ। এবং বৃড়ি আমরা প্রত্যেকে নিজ হাতে তৈরি করে নিতাম। এ কাজ অত্যন্ত সহজ ছিল। সাধারণ কাগজের বৃড়ি, জালবোনা ভারী প্রত্যায় ওড়ানো হত। স্রতোও কেনা নয়। বর্ষার আগে পদ্মার বিজীর্ণ বালুতীরে জাল যেসমত করত ধীরেবেরা। তারই ফলে দেওয়া স্রতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া হত। প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো গুলি। বৃড়ি ঘূর আকাশে উঠে যেত। ল্যাজহীন বৃড়ির নাম ছিল চিলে, আর ল্যাজহীন বৃড়ির নাম ছিল পজি। বাবা বলতেন

কথাটা বোধ হয় পতঙ্গ থেকে এসেছে। আমাদের বৃড়ি তৈরিতে স্রিওল গাছের আঠা ব্যবহার করতাম। কোনো দিকে ওজন সামান্য কিছু ভারী হলে বিপরীত দিকে বাস বেঁধে ওজন ঠিক করে নিতাম।

বয়স্কদের বৃড়ি অস্ত্র জাতের, চাউন ও কৌড়ে বা কোরাড়ে। এ সব নাম কোথেকে এসেছে জানি না। তবে চীনদেশের বৃড়ির ছবি দেখেছি, তাতে এ চাউনের চেহারার মতো বৃড়ি দেখেছি। চাউন উড়লে উড়ন্ত চিলের মতো অনেকটা দেখতে হয় অথবা বাহুড়ের মতো। কৌড়ের চতুর্কোণ চেহারাটা বড়ই স্থূল। তার চার দিকে চারটি কালো নিশান। হ'খানা পা ও হ'খানা হাতের মতো, তবু হুগুটি নেই। কৌড়ের উপরের অংশটি ধনুকের মতো, ছিলেটা বেতচেরা ফিতের। উপরে উড়ন্ত থাকলে একটানা বোঁ—বোঁ শব্দ বাঁশের শব্দের মতো বাজতে থাকে। হাতে ধ'রে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, এমন তার শক্তি। গাছ বেঁধে রাখতে হয় তার মোটা দড়ির এক প্রান্ত। বাঁশের শলার ক্রমে কাগজ আঁটা লম্বা বাজের মতো বৃড়িও দেখেছি কলচিং, তার নাম ফালস বৃড়ি। কৌড়ে বৃড়ি বাবা ওড়ায় তারা এ বৃড়িকে সমস্ত রাত গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, সমস্ত রাত আকাশে বাজতে থাকে একঘেয়ে বাঁশ। কেউ কেউ শখ করে চাউন বৃড়ির মুখেও ছোট একটি ধনুক লাগিয়ে দেয়—বেতের পাতলা ছিলেযুক্ত ধনুক। এ ধনুকও বাজতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আর একটি জিনিস গ্রামে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে সেখানে স্বাস্থ্যচর্চার আয়োজন। খেলার মাঠের কোণে, বাড়িসলার জমিতে, এমন কি বাড়ির ভিতরেও প্যারালেল বার ও ডন বৈঠকের আয়োজন। বয়স তখন আমার আটের বেশি নয়, আমিও এর অনুকরণ করতাম কিন্তু এটি যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তা জানতাম না। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি এ সব। আমরা কয়েক বন্ধু পদ্মার ধারে বালু জড়ো করে নিতাম এবং সেই বালুকুশের উপর উপড় হয়ে পঙ্কতাম দুই কন্ডরে ভর করে। দুই হাত দুই সমকোণে ভেঙে দেহ সম্পূর্ণ সরল রেখে এরকম পড়া বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। এখন যদি এরকম করতে বাই তা হলে দু'হাতের জোড় খুলে ধাবে।

গ্রামে তৈরি ব্যাট ও বল দিয়ে আমরা ক্রিকেট খেলতাম পদ্মার ধারে। কখনো বা ছুেলের ছেলের সঙ্গে কোনো মাঠে ফুটবল খেলা হত। ছুেলের নিজস্ব কোনো খেলার ব্যবস্থা ছিল না। তখনও সাঁতার কাটা সম্পূর্ণ শিখিনি, মাঝে মাঝে অভ্যাস করছি মাত্র।

একটি প্রাণলোককে কুমীরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, গল্প শুনেছি।



চিলে, পজি, কৌড়ে ও চাউন বৃড়ি

বর্ষাকালেই কুমীরের ভয় বেশি। তাকে সবাই সাবধান করে দিয়েছিল—বলেছিল কুমীর দেখা দিয়েছে, বেশি দূরে যেয়ো না, কিন্তু সে তা শোনেনি, বলেছিল, এতকাল চান করলাম—

কথা শেষ হবার আগেই তার পায়ে টান পড়েছিল এবং ওরে বাপরে—বলে ভুবে গিয়েছিল। এ ঘটনা আমার জন্মের পূর্বে ঘটেছিল। আমার কানে একদিন একটি উত্তেজক খবর এসে—

বড় গোলার ঘাটে এই মাত্র একজন লোককে কুমীরে ধরে নিয়ে গেল। কুমীরের মানুষধরা ও মানুষ খাওয়া সম্পর্কে গ্রামে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত। তখন সে সব কাহিনী বিশ্বাস করতাম সরল মনে। বাবা বলত তারিও বিশ্বাস করত। শুনেছি কুমীর মানুষ ধরে নিয়ে কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে ওঠে, তার পর তার হাত পা দুও প্রত্যুত্তি খণ্ড খণ্ড করে কেটে ল্যাজের সাহায্যে শূন্য ছুড়ে দিয়ে শূন্য থেকেই লুফে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে। কুমীর সোঁতারিও যে থেকে কামড়ের খেত পাবে না। কুমীরের একটি গোপন ভাণ্ডার থাকে, সেখানে ত্রীলোকদের দেখে যে সব অলঙ্কার পায়, সেগুলো জমা করে রাখে। এ ভাবে এক একটি কুমীরের ধনভাণ্ডারে হাজার হাজার টাকার অলঙ্কার জমা হয়ে আছে। কেন আছে এবং এর উদ্দেশ্য কি, তা কেউ জানে না, শুটা কুমীরের স্বভাব, অতএব সমালোচনার বাইরে।

একবার বাঘে মানুষ ধরে নিয়ে গেছে গ্রামে চুকে, এমন কাহিনীও শুনেছি। কোন এক অনুদের মাসীর ভাগা ছিল খারাপ। এ ঘটনাও আমার জন্মের পূর্বকার। একবার বর্ষাকালে একটা টাইগার কি করে গ্রামে চুকে বেকারদার পড়ে গিয়েছিল, এবং হৈ-হৈ লগুগালে একটা হেলানো তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে আজর নিয়েছিল। গ্রামে শিকারী নেই কেউ। চারদিকে বহু লোকের পাহারা। কয়েক জন ছুটে গেল তীতিবাল্লার চৌধুরী জমিদারদের বাড়িতে মাইল ছয়েক দূরে। তাঁরা বললেন সমস্ত রাত আটকে রাখো বাঘ, সকালে গিয়ে দাড়া হবে।

সমস্ত রাত নানা রকম কানকটানো আওয়াজ ও হুলা করে দাঁখলি খিরে দাঁখল, কিন্তু সকাল হলে সবাই একে একে চলে যেতে লাগল, কারণ এখন তো আর ভয় নেই, এখন দিনের



এবার সামনে দিলে বাঘ সকালে পালিয়ে গেল

আসে। বাঘের সাধ্য কি এক পা হাঁটে। দিনের আলোর ওরা চোখে দেখে না। কিন্তু এখন বাঘ চোখেও দেখল এবং এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগল, তখন অবশিষ্ট লোকগুলো হাঁপাতে আরম্ভ করেছে। এ কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! এ বাঘের অসাধ্য তো তাহলে কিছুই নেই। এটি নিশ্চয় সামাজিক প্রথা অমোঘকারী বাঘ। কিন্তু তার বিফল যে অভিমোগই থাক, প্রত্যেক সত্য কথাটি এই যে, বাঘ দিনের বেলা ভালই চোখে দেখে এবং সে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তখন গতিশক্তিরহিত বেপমান লোকগুলো চাপা এবং হাঁপা গলায় বলতে লাগল, ওরে, তোরা সোয়-সোল করিস নে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে।

বাঘ অবশ্য এ অমুয্যতির অপেক্ষা না করেই চলতে শুরু করেছিল। কাছের বন জঙ্গল ছিল, সেখানে সে অদৃশ্য হয়ে গেল যুদ্ধের মধ্যে। শিকারীরা এসে বার্ষ হয়ে ফিরে গেলেন। আমাদের বাল্যকালে এ সব কাহিনী নিয়ে মুগ্ধ-মুগ্ধ হুড়া হুচিট হয়ে খুব প্রচারিত হয়েছিল, এখন আর সে-সব হুড়া মনে আনতে পারি না।

প্রচুর সাপ খাওয়া সত্ত্বেও আমি মাত্র একটি লোককে সাপের কামড়ে মারা যেতে দেখেছি ছেলেবেলায়। ওয়ারা কি ভাবে বাড়ায় কাজ করে, ময় পড়ে, গায়ে জল ঢালে, গাছের ডাল দিয়ে চাবুক মারে, আর ময় আঙড়ায়, সব দেখেছি। তিন দিন পরে যতদূর পছন্দ ভাসিয়ে দেওয়া হল। আমি একবার মাত্র শীতকালের এক রাতে বাঘের ডাক শুনেছি, ঘরের পাশে। শীতকাল হচ্ছে বাঘের মরুত্ব। চারদিকের দিনের আওরাজে ঘুম ভেঙেই সে ডাক শুনেতে পাই। কুকুরটা কোথায় যেন লুকিয়ে শুকনো গলায় দীর্ঘ একটানা কৈউ-কৈউ শব্দ করে চলেছে। বাঘটা যোধ করি মিনিট দশেক ডেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুরদার চিত্রিত মণ্ডীর ছিল। তিনি সাধু ব্যক্তি ছিলেন। বা কিছু হাতে আসত, সব বিলিয়ে দিতেন সবাইকে। কেউ কিছু বিক্রি করে গেলে (চুখ, মাছ ইত্যাদি) যদি পরে শুনেতেন, বাজার দরের চেয়ে শুল্ক দিয়ে গেছে, তাহলে পরে তাদের জোর করে আরও বেশি দিয়ে দিতেন। বাড়ির জমির ফল বা তরিতরকারী পাড়ার সবাইকে দিয়ে তার পর খেতেন। এই প্রসঙ্গে বলি—আমাদের বংশ-তালিকায় দেখেছি, উৎকর্ষতন অবিকাশ ব্যক্তিই কিছুকাল সংসার করার পর, সংসার ত্যাগ করে গেছেন। সংসার বিষয়ে উদাসীনতা আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, শুনেছি।

গ্রামে ম্যালেরিয়া ছিল খুব। আমরা প্রায় করে ভুগতাম। আমার অমুগ্ধ শ্রমিক, তার হল কালার। তখন ও নাম ছিল না, ওর নাম ছিল বৌকালান অর। ওর কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন। বাবা মা তাকে নিয়ে কলকাতা এলেন। আমার তখন বয়স এগারো। আমি বাড়িতেই ছিলাম। বহু রকম চিকিৎসা হয়েছিল কলকাতায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছিলেন জগৎ রায়, কবিরাজ চিকিৎসা করেছিলেন বিজয়রত্ন সেন। এ সব মনে আছে—চিঠিতে লিখতেন বাবা। আড়াই মাস পরে রতনদিয়া (মাহুলাল) থেকে একটি লোক এসে খবর দিল তাঁর সব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন রতনদিয়ায়। তাইয়ের অবস্থা অনেকটা ভাল। আঁধাকে বেতে হবে রতনদিয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে রতন হয়ে

গেলায়। শিশুকাল। খেরা পার হয়ে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলছি। পারের বুট জুতা, হেঁটে খুব অস্বাস্থ্য। মনে হচ্ছিল আরো হাঁটি, আরো হাঁটি। কি উৎসাহ রতনদিয়া যেতে। বেলা চারটের রঙন হয়ে প্রায় আটটার এসে পৌঁছলাম রতনদিয়ার। বাবার কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন, সে আর নেই রে।

বাবা সেবারে আর সাতবেড়ে ফিরলেন না। ১১১০ সালের গোড়ার দিকে, বাবা ওখান থেকেই আমাকে পোতাভিয়ার নিয়ে চললেন হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন বলে। হঠাৎ এলাম নতুন পরিবেশে। এসে এক ক্লাস উপরে ভর্তি হলাম—অর্থাৎ নিম্নমমতো হওয়ার উচিত ক্লাস ফাইভ, কিন্তু ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস সিক্সে। গোরালান্দ থেকে ভোরবেলা ব্রহ্মপুত্র লাইনের ট্রাম্বারে উঠে বেলা ১১টা আকাজক সময়ে পাবনা জেলার আরালিয়া (পরে সাধুগঞ্জ) ট্রেনে এসে নামতে হয়। ভোরপূর্ব সেখান থেকে নৌকো ভাড়া ক'রে বড়াল নদী পথে বাড়িভাড়া গ্রাম, তার পর সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটা পথে পোতাভিয়া। বর্ষাকালে বাড়ির দরজার আসে নৌকো। হানীর জমিদার অধিকানাথ রায় স্কুলের সেক্রেটারি—তাদের প্রকাণ্ড বাড়ির একটা ঘরে ছিল হেডমাষ্টারের বাস। সেইখানে হল আমারও বাস।

এ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বড়ই কষ্ট হতে লাগল। রেড়ির তেলের প্রদীপে রাতে পড়া। তার সন্দেশে অন্ধুত। বর্ষাকালে জলে এক রকম লতা গাছ হয় তারই ভিতরের শাঁস, গোল লতা এক শাশা। গ্রামটিও অন্ধুত। এক একটা উঁচু জায়গার উপরে এক একটা পাড়া। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ার যেতে হলে পাহাড়ের মতো নিচে নেমে কখনো সন্ধ্যা চালু পথ বেয়ে কখনো বা বাঁশের সাঁকের উপর দিয়ে গিয়ে আর এক পাড়ার আরোহণ। বর্ষাকালে জলে সব ভরে ওঠে এক হুই পাড়ার মধ্যবর্তী জল, পাড়ার জমির সমতলে এসে পাড়ায়। তখন নৌকোর বাতায়ত। গ্রামটি প্রকাণ্ড, কিন্তু এ রকম গ্রাম্য ভেনিস আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এ গ্রামে সাইকেল বা মোটর সম্পূর্ণ অসল।

মনে হল এ আমার নির্বাসন। এ রকম জায়গার বাবা কেন এবং কি ভাবে এসেছিলেন তা আমি জানি না। তবে এ সময়ের ছু বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পোটকার্ড আমি দেখেছিলাম; চিত্রখানি এই—

৩

দিলাইদহ

সবিনর নদজার পূর্বক নিবেদন,

বোলপুর বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনার অন্তর শিক্তের প্রয়োজন হইয়াছে। বৈতন পকাশ—বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের পূর্ববেক্ষণ ভার লইতে হয়। যদি এ কাৰ্য্যভার গ্রহণ করা আপনাদের অভিমত হয় তবে কতদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারিবেন জানাইবেন। লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনাদের মত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি কানুন মাস এখানেই বাসন করিব হিব করিয়াছি যদি

স্ববিধায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে। আশা করি ভাল আছেন। ইতি এই কানুন ১৩১৪

ভবনীর

ঐবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্ডের বিপরীত দিকে ডাক ছাপ Shelidah B. O. 18  
FE 08 Nadia. ঠিকানা—শ্রদ্ধাংশদ ঐবীন্দ্রনাথ গোহায়া  
সবীপে  
Potazia (Pabna)

কার্ডখানা আজও আমার কাছে আছে। এক পরমা দায়ের পোটকার্ড ১১০৮ সালে লেখা।

বাবা ১১০৫ সালে ১লা এপ্রিল প্রথম এখানে হেডমাষ্টার হয়ে আসেন। এ চিঠি দেখার পর আমি ভিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে, কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন মনে নেই, কিংবা হয়তো বলেছিলেন এখানকার দায়িত্ব হঠাৎ ছাড়ি কি ক'রে। ১১২২ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অল্প একটি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন “আমি একবার ডেকেছিলাম তাঁকে, হয়তো সেখানে ছিলেন সেখানকার সবাই তাঁকে ছাড়তে চাননি।” আমি বলেছিলাম “সম্ভবত তাই।”

পোতাভিয়া গ্রামটি বত বিচিত্রই হোক, আমার শিশুকালের পরিচিত সকল পরিবেশ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন মনে হতে লাগল যে সমস্ত এ জায়গার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। মানিয়ে নিতে দেয় হল, যদিও একবার দেশ গেলে সমস্ত আর এখানে আসা হত না। এখানে সব চেষ্টে বাঁশ লাগত বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগহীনতা। সাতবেড়েতে ছিল পাহা। তার চলন্ত রূপ আমার মনকে সচল ক'রে রাখত। ওপারে ছিল রেলগাড়ি, সেও সর্বদা চলেছে কত দূর দেশে। কিন্তু এখানে কিছু নেই। বহু দূর ছোট নদী, আমার কল্পনাকে বহন করার পক্ষে তা বড়ই ছোট।

বহির্বিষয়ের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আবিষ্কার ক'রে নিলাম। সে আমার কত বড় হুক্তি। সে হচ্ছে এখানকার ডাকঘর। এই ডাকঘরই তো আমাকে এতদিন বাইরের জগতের বাদ গছ



গ্রাম্য ভেনিস—পোতাভিয়া

বহন করে এনেছে, এখানেও তারই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ছোটদের জন্যে যে সব মাসিকপত্র ছিল তার গ্রাহক হয়ে গেলাম, বড়দের কাগজও আমার অপঠিত থাকত না। এ ভিন্ন আমার পরিচিত বাবতীয় বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম নিরমিত। তার ফলে প্রতি ডাকে আমার নামে চিঠি, না হয় পত্রিকা আসত এবং এইরূপে সমস্ত দিন আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। বিকেলে ডাকঘরে না যেতে পারলে দিমটি বুঝা মনে হত। বর্ষাকালে নৌকোর বেতাম, এবং আমি নিজেই নৌকা চালিয়ে বাওরা শিখে গেলাম অল্প দিনের মধ্যে।

সেক্রেটারি অধিকানাথ রায়ের কনিষ্ঠ ঐক্যবন্ধুনাথ রায় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সেশনস জজ)—তিনি তখন মুনসেফ। পরিবারে তাঁরই ছই পুত্র মাত্র। বড়, কণী, আমার সহপাঠী। কণী ‘মুকুল’-এর গ্রাহক ছিল, আমিও এখানে এসেই প্রথমে মুকুলের গ্রাহক হই এবং বাঁধার উত্তর দিয়ে নিজের নাম ছাপা দেখে বড়ই পুলকিত হই। নাম ছাপার অক্ষরে ইতিপূর্বে ইংরেজীতেই দেখেছি। এপিক্যানি নামক খুঁটান ধ্বংসকর সাপ্তাহিক কাগজখানা আমার নামে আসত বরাবর, ইংরেজী শেখার আগে থেকেই। তার পর জেলছবির যুগে বিজ্ঞাপন দেখে বরাবর ট্রান্স ও পকেট প্রেস—নানা জাতীয়, কত যে জানিয়েছিলাম তার সীমাসংখ্যা নেই। প্রথম বরসে নাম ছাপার অক্ষরে দেখার একটা মোহ আছে। ও যেন নিজেকেই পরিচয় আকারে দেখা।

ডাকঘরে চিঠির পর চিঠি। এই চিঠি লেখা আমাকে নেশার মতো পোরে বসল। আমার রচনা শিকা, বাংলা বা ইংরেজী, কলেক্স জীবন পর্যন্ত এই চিঠির সাহায্যেই হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মুকুলের পরে (কতদিন পরে মনে নেই) গ্রাহক হই ‘প্রকৃতির’ এক তারপর ‘শিখর’। প্রকৃতি আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিল। ওতে শি ঘোবের আঁকা ছোট ছেলেরের ছবির মধ্যে এমন একটা অভিব্যক্তি পেলাম যা তাঁর আগে কোনো বাঙালী শিল্পীর ছবিতে পাইনি। এই প্রকৃতিতেও বাঁধার উত্তর দেওয়া চলত নিরমিত এবং শেষে কণীর অক্ষরশ্রেণে বাঁধাও পাঠিয়েছিলাম এবং তা ছাপা হয়েছিল। আমার আঁকা ছবি দু’বার ছাপা হয়েছিল প্রকৃতিতে। বতসুর মনে পড়ে এই প্রকৃতি কাগজেই ১৯১১ সালের মোহনবাগান রেলের ছবি দেখে কি আনন্দ ও গর্ব যে অনুভব করেছিলাম। আজও সে কথা মনে এলে ভাল লাগে। এক গুজোর ছুটিতে বহনীকান্ত সেনের বড়ার সচিব ধবরও প্রকৃতি কাগজেই দেখেছিলাম, খুব সম্ভব।

কিন্তু ডাকঘরের খোলা পথ সত্ত্বেও আমার মন ছুটে যেত দূর রূপা নদীর তীরে। সেখানকার আকাশ বাতাস, সেখানকার অস্তের ছবি, সেই সববে ভেলের ফাঁকালো গন্ধের পরিবেশে বসে স্নানিত পাক বাওয়া, বর্ষার আম আঁটির বাঁশি বাজানো, কুৎসেরের দিকের পাশে অশ্লক চেয়ে থাকা, সেই বতসুর ইচ্ছে পল্লার পাড়ে ছোট ছোট বাউসালের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, সব কিসেসে মনে বেগে উঠত। চোখে শিশুকাল থেকেই কিছু কম স্বপ্নাম। ঘুর ঘুরি বাপসা ছিল, তার সঙ্গে চোখের জল মিশে সব ফোখার হারিয়ে যেত। সে আবার নিজেরই হারিয়ে বাওয়া।

দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি মাটির সঙ্গে আমার কি কটন বন্ধন তা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল না, আজও নেই, কিন্তু তার মৃতি মনকে বিচলিত করে, তখনও এমনিই করত। তাই আমি পোতাভিযাতে কোনো বহুইই ছুঁতিন মাসের বেশি থাকিনি। মুলের পড়ার মনোযোগ খুব বেশিক্ষণ রাখতে পারতাম না, সে ভক্ত ভাল ছাত্র হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো হয়নি। পাঠ্যবস্ত্র মোটামুটি বুঝে যেতাম, এবং অতি দ্রুত। সব জ্যোতবোয়ই মূল সত্যটি অস্পষ্ট হলেও চকিতে চোখে ভেসে উঠত, সেজন্য খুঁটিনাটি হৃদয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। কোনো একটি বিষয় নতুন জানলে নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মনে উত্তেজনা জাগত, আমি যা জেনেছি তা সবাইকে না জানানো পর্যন্ত ভাল লাগত না। এ আমার একটি নতুন উত্তেজনা ছিল।

এই সময় ১৯১০ সালের শেষের দিকে প্রথম কলকাতা বাবার স্রোগ ঘটল। সাতবেড়ে গ্রামের এক মন্ত্রণালী সম্প্রদায়ের ছেলে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন, তাঁর নাম মুকুললাল হালদার। সৌরভাঙ্গি, স্বাধ্যবান। মধুর স্বভাব, মধুর ভাষা। তিনি ষট সনের সুবিখ্যাত মন্ত্রব্যবসায়ী মতিলাল কুণ্ড মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা এলাম এবং এখানেই উঠলাম। কলকাতার প্রথম, তাই প্রায় সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দিন কাটত। মনে আছে এই সময় ধরতলা স্ট্রীটে কোটোগ্রাফ তুলিয়েছিলাম আট আনা দিয়ে। কাচের উপরেই পজিটিভ প্রিন্ট, পিছনে কালো কাগজে ঢাকা ও আর একখানা কাচ চাপিয়ে ফ্রেমে এটে দেওয়া। এক আঁখানা মোটর গাড়িও দেখেছিলাম মনে পড়ে। পরের বছরের শেষে পঞ্চম জর্জ আসা উপলক্ষে কলকাতা আসার প্রবল বাসনা হল এবং রতনদিয়ার কাছে কাশুখালি ট্রেন উঠে আসাতে একা বাওয়া খুবই সুবিধাজনক মনে হল। কিন্তু সে কি ভিড়। দিটার্ণ টিকিট কিনে ডিসেম্বরের বোধ হয় ২০শে ২১শে থেকে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠার চেষ্টা করে বার্ষ হলাম, এবং কয়েকদিন চুপ করে থেকে ২৮শে কিংবা ২৯শে তারিখে নতুন টিকিট কিনে দিনের গাড়িতেই পেলাম, এক দিকের টিকিট নষ্ট হল। দিনের এইট-ডাউন প্যাসেঞ্জার শীতের দিনে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, সেজন্য একা এ গাড়িতে এক দিন চোঁটা করিনি, যদি শিয়ালদা গিয়ে পথ না চিনতে পারি। কিন্তু সঙ্গে একজন বাড়ী পাওয়াতে আর কোনো অসুবিধে হল না। এলাম ১৯১১ সালের শেষে। রাজস্বর্গন হল ১৯১২ সালের প্রথমে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃষ্ট! কলকাতা আসার আলোময়র। চোখে বাঁধা লাগে। মুকুললাল আমাকে খুব ভাল বাসতেন, তিনি রাজস্বর্গন করিয়ে দিলেন মহরানা। প্যাজেন্ট শো। তারপর বাড়ি পোড়ানো। সবই কলনাতীত বাপার। বেশ কয়েক দিন কলকাতা থেকে, ফ্রেমে বাঁধা রাজ্যবাসীর রঙীন ছবি কিনে নিয়ে গেলাম দেশে।

১৯১০ সালের একটি বড় ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। সে হচ্ছে জালির ধুমকতু। জীবনের একটি পরম বিময়। চার দিকে খুব উত্তেজনা। গ্রামের লোকেরা কলাবলি করত ভয়ানক একটা কিছু হবে। ধবরের কাগজে কি লেখে জানবার জন্য ছুটোছুটি করত। প্রথমে শেষ রাজ্যের দিকে উঠত, ক্রমে সময়ের বল হতে হতে

সন্ধ্যা বেলা দৃঢ় হত। অর্ধাং দিনের আলো কমে গেলেই আকাশ জোড়া ধুমকেতু কাঁচা সোনার রঙে ফুটে উঠত। সুনতম ধুমকেতুর লাজ পৃথিবী ছুঁয়ে বাবে, স্তনে ভর্য হত বেশ। তারপর সুনতম পৃথিবী তার লাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, তাকে কোনো ক্রটি হয়নি। ধুমকেতুর মাথাটি থাকত দক্ষিণে পদ্মনদীর ওপারে আর পুচ্ছটি ক্রমশঃ চওড়া হয়ে মধ্য আকাশে গার হয়ে যেত। প্রতিদিন দেখে দেখে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। বেশ মনে আছে রতনদিয়া থেকে এক বন্ধু মজার ভাষায় আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, এখানে আমরা যে ধুমকেতু দেখছি তার দৃষ্টে পীত, তোমাদের ওপানকার ধুমকেতু ক' দাঁতের?

ধুমকেতুর কথায় সতপঠিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিখানি ১৩৬৩ সালের ভাদ্রসংখ্যা কথাসাহিত্যে বেরিয়েছে। চিঠির তারিখ ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০) তিনি লিখছেন, “ধুমকেতু দেখার সুযোগ ঘটেনি। ছেলেবেলায় ছালির ধুমকেতু উঠেছিল শুনেছি, সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা, তখন খুব ছেলেমানুষ পাড়াগায়ে থাকি কেউ দেখায়নি।”

এই চিঠিখানি আমাকে বিভাজ্ঞ করেছে। কারণ বিভূতি বাবু আমার চেয়ে অল্পত চার বছরের বড় ছিলেন। (বারেই লম্বাচাঁকো বিশ্বাস করলে আমাদের বয়সের পার্থক্য চার বছরই পাঁড়ায়)। ১৯১০ সালে ওঁরা ছালির ধুমকেতু এমন বিরাট এবং এমন দৃশ্যীয় ঘটনা এবং এমন দীর্ঘদিনব্যাপী ‘ইভেন্ট’ যে তা পনেরো বোল বছরের বালকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবু তিনি এ রকম লিখলেন কেন, এটি আমার কাছে একটি রহস্য রয়ে গেল। তাঁর জীবিতকালে ছালির ধুমকেতু নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি মনে পড়ে না। সে সময় একথা জানলে এর একটা মীমাংসা তখনই হয়ে যেত, আজ তবু আর কোনো উপায় নেই।

হাই স্কুলে যে ইংরেজী বই প্রথম পড়েছি তার নাম বতদূর মনে পড়ে নেলসনসু ইণ্ডিয়ান রীডার। তার ছ’চর পাভা পরপর একখানা ছ’খানা রঙীন ছবি ছিল। একটি রেলগাড়ির ছবি, একটি জোৎস্না রাতের ছবি। পড়া তুলে সেই ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্নজাল বুনতাম।

একটা কবিতার এইটুকু মাত্র এখন মনে আছে—

Follow me full of glee

Singing merrily merrily merrily.

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনযুতি পড়তে এ ছুটি লাইনের উল্লেখ দেখে চমকিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আরও শিশুকালে, পড়েছিলেন, তাই তিনি এর অনেক কথাই তুলে গিয়েছিলেন। তাঁর যেটুকু মনে ছিল বা ঐ কথাগুলো তাঁর মনে যে রূপ নিয়েছিল, তা এই—

“কলোকা পুলোকা সিগিল মেলাগি মেলাগি মেলাগি।”

তিনি লিখছেন—“অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দশের মূল উচ্চার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু ‘কলোকা’ কথাটা যে কিসের রূপান্তর, তাহা আশিও ভাবিয়া পাই নাই।”

বিষয়টি আমি এর পর তুলে গিয়েছিলাম। নইলে তাঁর জীবিতকালে মনে করিয়ে দিতে পারতাম। খুব অল্প দিন হল, জীবন-যুতির

একটি পরবর্তী মুদ্রণ খুলে দেখি, ‘কলোকা’ কলোকাই আছে, ‘Follow me’-তে ফুটে ওঠেনি।

আর একখানি কলনা-উপাধিকারী বই আমার হাতে আসে এই সময়। নাম ফিলিপসু ইণ্ডিয়ান মডেল অ্যাটলাস। তার এক দিকে দেশজ্ঞাপক রঙীন ম্যাপ, তার বিপরীত পৃষ্ঠায় সেই দেশেরই দ্বিলোক মাপের ছ’ রঙে ছাপা কোটোগ্রাফ। সমুদ্র অংশ নীল, জমির অংশ সিঁথিয়া রঙের। এর এক-একখানা পাঁতার মধ্যে দিয়ে আমি দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতাম। সবচেয়ে ভাল লাগত, ভারতের উত্তরের অংশটি। তুবার-ঢাকা পর্বতচূড়া ও সমস্ত হিমালয়ের উঁচু-নিচু জমির যেন সত্য একখানা কোটোগ্রাফ। কি রহস্য-ভরা সে ছবি। পাহাড়-পর্বত তখন দেখি নি, শুধু সমতল জমি দেখার অভ্যস্ত চোখে হিমালয় খুব ভাল লেগেছিল। বাবার কুমারসভ্যের কাব্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্নায় বঙ্গদর্শনে কিছুকাল আগে ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ছন্দ ও ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণার জন্ম তিনি সে-অনুবাদ মাঝে মাঝে আমাকে তুলিয়ে তুলিয়ে পড়তেন। বিশেষ করে হিমালয়ের বর্ণনা অংশ, যথা—

সিন্ধুরে গৈরিকে কিরুরী-ললনা

বিজয় ভূষা করি’ বিচরিছে শিখরে—

ধাতু-জাভা লেগে বাবে মেঘে শোভে হলনা

অকাল সাঁরের মত পর্বত উপরে।

কটিতেতে চলন্ত জলদের নিয়

ভূমি সাহস্র হ্রায়া সিঁদুরী সমুদ্র

বুড়ির জলে পড়ে হলে পরে থিয়

রোদুরে গিরিচূড় লভিতেছে অশ্রয়ে।

ইত্যাদি ছত্রগুলি বার বার স্তনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর একটা অংশটি অর্ধ মনে জেগে উঠত, এতে হিমালয় সবচেয়ে আমার মনে একটা ভীতিসম্পূর্ণ আকর্ষণ জেগে উঠেছিল এবং তার বছর দুই পরে তার পরিণাম কি হয়েছিল, তা পাবে বলা বাবে। এই অ্যাটলাসে ভূগোলিকের ৩৬৫ দিনের পূর্ব প্রদর্শনের একটি মুদ্রণ রঙীন ছবি ছিল। এ থেকে খুব পরিবর্তনের ধারণা হয়েছিল সহজে। ভূগোলের অনেক জানবার জিনিস এই একখানি বই থেকেই খুব অল্প সময়ে জানা হয়ে গিয়েছিল। ছবিগুলো রঙীন ছিল ব’লেই তার প্রতি এক অদ্ভুত মারা। রঙের সম্পর্কে আমি প্রায় উরাদ ছিলাম। রঙীন ছবির বই ছেলেবেলায় বতঙোলা হাতে এনেছিল তা সবচেয়ে রক্ষা করতাম। বাইবেলের রঙীন ছবির সাহায্যে ইংরেজী অ্যালাকাবের্টের একখানা খুব বড় আকারের বই ছিল। তার কাগজ খুব মোটা, এবং ছ’খানা কাগজ ছ’খানা, মাঝখানে মোটা গজ কাগজ দিয়ে এমন আঁটা যে তা সহজে ছেঁড়া যায় না। সে বইখানাও আমার খুব প্রিয় ছিল। জলছবির আকর্ষণের কথা আগে বলেছি। শেষ পর্বত জলছবি বইএর মার্জিনে, চেরায়ে, ডেয়ে, দরজার, দরজার চৌকাত, জানালায়, আরনাথ, এক শোনে বন্ধুরের হাতে, পায়ে, কপালে, কাপড়ে, জামায়, লাগিয়ে লাগিয়ে জলছবি পার্বে একটা উপসংহার টেনে গিয়েছিলাম।

রঙের নেশা কিন্তু ওতে কাটেনি। তারই কলে বহুদিন রঙীন ছবি আঁকা এবং কিছুকাল পরে তা ফেল (১৯২৮ থেকে) রঙীন কোটোগ্রাফ তোলায় পালা। এ রসে সকল রঙ সেকরা রঙ

জীর্বে এসে উত্তীর্ণ হলেই হয়তো তা পোড়ন হত, কেননা সব কালো হয়ে মিলিয়ে বাবার গাণ তো প্রায় খেতে পাচ্ছি।

১৯১০-১১ সাল থেকে রতনদিয়ার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। সম্ভবত রেল ট্রেন খুব কাছে বসেই। এখান থেকে বতরুর ঈচ্ছা সহজে যাওয়া যায়, এখানে আর শুধু কল্লনার জমণ নয়। এটি আমার কল্লন আশ্রয় জায়গার সঙ্গে অনেকটা মিলে। সাতবেড়েতে পদ্মায় পাড়ে বসে এখানকার পথে চলা রেলগাড়ির খোঁয়া দেখে দেখে মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেছি, এখানকার মাঠে বেন আরও আত্মীয়তা। আমার মাতামহের প্রভাব এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট, অতএব এখানে আমার নতুন মর্যাদা। এখানে বরাবর আমার বন্ধু তাদেরই জমি এখানে দিগন্তস্পর্শী। কালুখালি ট্রেনে (তখন প্রায় তিন মাইল দূরে। ১৯১১-এর প্রথমে রতনদিয়ার সীমানায়।) প্রায় প্রতিদিনই যেতাম রতনদিয়াতে থাকতে। সেতেন-আপ গাড়িতে রাজবাড়ি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টু-ডাউনে ফিরে আসার অত্যন্তপূর্ণ রোমাঞ্চ অনুভব করত। ট্রেনে যেতে যেতে কিংবা ফিরে আসতে আসতে মেঠো পথের উপর একটা প্রচণ্ড মোহ জন্মে গেল। কলা বাহুল্য একমাত্র শীতকালেই এর আকর্ষণ বেশি ছিল, যদিও বর্ষান্তেও দু'একবার গিয়েছি জল ঠেলে। শীতকালের সেই অজস্র ফুলের ভায়ে ভয়ে পড়া ডাল থেকে কথা শুধু। সুখাত কুল পেড়ে খাওয়া, মটরের গাছ থেকে মটরশুটি ছিঁড়ে নেওয়া এবং সব চেয়ে মধুর, আখের গুড়ের টাটকা জমা এবং খাওয়া মাঠের এক জায়গায় আখ মাড়াইয়ের এবং বসে ঝালানোর বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে গেলেই ওটা দক্ষিণা হিসেবে পাওয়া যেত প্রজাদের কাছ থেকে।

হু' মাইল দূরে গাবোয়া গ্রামে প্রতি শীতকালে বসত মেলা। স্থানীয় জমিদার আলিমুজ্জামান চৌধুরী এম-এল-এর জমতে। মথুর কুঁচুর প্রকাণ্ড চালায় প্রকাণ্ড ভিয়েন, বড় বড় কড়ায় বসগোলা, পাশ্চাত্য আর জি-লিপি তৈরি হচ্ছে দিনব্যাপ্ত। খন্ডের বড় খেঁচানে সবচেয়ে বেশি। টাটকা উপাধান তৈরি টাটকা খাবার, পাবনা জমিদারপুত্র অকলে চির প্রসিদ্ধ। তার স্বাদ কলকাতার মিলবে না। জ্বলে বরষের স্বর্গ এই মিষ্টান্নের লোকান। এখানে খাওয়া শেষ করে পুরনো বেল লাইন ধরে ঘোরা পথে ফিরে আসার তৃপ্তিকর আবহাওয়া আর ফিরে এলো না জীবনে।

রতনদিয়ার আরও একটি আকর্ষণ ছিল এখানকার পরিবেশ। সাতবেড়ে গ্রামটি প্রকাণ্ড, বড় এলোমেলো, অধিকাংশ স্থান বনজঙ্গলে জমা। বর্ষায় বড় বড় পথ জলে আর কাদায় তুর্গম হয়ে ওঠে। গ্রামের মধ্যেই ছোট ছোট অনেক খোলা জমি, সেখানে ধান সরষে এবং পাট চাষ হয়। গ্রামের মধ্যে অনেক ডোবা সেখানে পাট পাটানো হয়। রতনদিয়া গ্রাম সে তুলনায় স্বর্গ। এ গ্রামটি ছোট। হৃদয়ঙ্গম চন্দনা নদী (শুধু বর্ষায় প্রোতবর্তী হয়)। উত্তরে গ্রামের সীমানার উপর দিয়ে চলল রেললাইন ১৯১১ থেকে। গ্রামের দৈর্ঘ্য ঈটাপথে মিনিট সাতেক, আর প্রস্থ মিনিট পাঁচেক। একটি বাঁপ কেন্দ্র। বাছাই করা লোকেরা এসে বন একটি গ্রাম গড়ে তুলেছিল পূর্ণ পরিকল্পনার সাহায্যে। বৃষ্টি ঠিকবে এক এক শ্রেণী লোকের বাস এক একটি এলাকায়। সব সাজানো গোছানো। মাট প্রায় লক্ষাধিক পৃথক বাড়ি। এখান ছুটি পথের বায়ে সম্পন্ন লম্বা শিক্ত প্রাকলয়ের বাড়ি। মোট সাড়টি বাড়ি পাঁচ, তার মধ্যে ছুটি বাড়ি

মোট। আকস্মিক ১৯৭৭ সালের হিসেবে একশ থেকে সওয়াশ' বহু গত হল সে সব বাড়ি তৈরি হয়েছে ধরা ধায়। ১৯১০ সালেই একটি বাড়ি ভাঙার মুখে। সেটি গোপাল সার্যাল মহাশয়ের বাড়ি। মানময়ী গাল'স ফুলের লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবার এরই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

এক একটি বাড়ি স্থলর সাজানো, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, এবং চার দিক স্থলর ভাবে ঘেরা।

১৯১১-১০ এর কথা বলছি। রতনদিয়ার ঐশ্বর্যের তখন পূর্ণ অবস্থা। বেহিন্দেবী উপভোগ তখন শেষ উচ্চ মাত্রাচিহ্নে গিয়ে পৌঁছেছে। কি প্রাণধর্ম, কি উচ্ছলতা, কি বিলাস। একটি বালকের চোখে তা অবশ্যই অভিনব। ভোজন বিলাস ভিন্ন অন্য কোনো বিলাসের সৃষ্টি এমন প্রত্যক্ষ করিনি এর আগে। এখানে সমস্ত বিলাসই মাত্রার বাইরে। যখন গান বাজনা আরম্ভ হল তো পনেরো বিশ মিন ধরে চলল তা। যেখানে যত ওস্তাদের সন্ধান পাওয়া যেত কাছাকাছি, তাদের সবাইকে আনা হত সে আসরে।

উচ্চশিক্ষিতরা বিদেশে থাকতেন, ছুটিছাটা উপলক্ষে কদাচিৎ আসতেন। অনেকেরই গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আন্তরিক মিল ছিল না, আদর্শের সত্যতা অনিবার্য। একমাত্র জৈলোকান্য ভট্টাচার্য (রাজবাড়ি রাজা সূর্যকুমার ইনসটিটিউশানের হেডমাস্টার) সহজ মানুষ, তিনি বস্ত্র থেকেও সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় অবদর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—তখন জিলাম তাঁকে বড়স্বয়ং ক'রে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কানীয়াসী হয়েছিলেন। অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (এস-ডিও) স্থায়ীভাবে গ্রাম ছেড়েছিলেন, ব্রজেনকুমার চট্টোপাধ্যায় (ত্রিশুর টেটের ম্যানেজার) কদাচিৎ আসতেন।

বীরা গ্রামে থাকতেন তাঁরা সম্পূর্ণ আর এক জাত। এঁদের মধ্যে আমার মাতামহ বোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর কনিষ্ঠ ললিতচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রামের সর্ব বিখ্যে নেতা—অন্তত সে সময়ে তো বটেই। এ কথা বলছি কারণ তাঁদের এবং গ্রামের আর সবার অগণপতন তার পর থেকেই শুরু। ১৯১০-১১ থেকেই সমৃদ্ধির শেষ নীমা পার হয়ে বাচ্ছিল, সেটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

বোগেশচন্দ্র-ললিতচন্দ্র—এরা বংশগত ভাবে গুণসিঁরি করতেন। গ্রামের প্রধানেরা কয়েকজন এঁদের শিষ্য ছিলেন, দেশ বিদেশে অনেক বড় বড় শিষ্য ছিলেন এঁদের, রাজসাহীর সুবিখ্যাত দানবীর জমিদার কিশোরীমোহন চৌধুরী তাঁদের অন্ততম। এঁদের ঐশ্বর্য কি ভাবে উপার্জিত জানি না, কুটি এবং সৌন্দর্যবোধ কেথেকে এলো তাও জানি না, কিন্তু যা দেখেছি তাতে বিষয় বোধ করেছি।

মামাদের বাড়িটি তিন-চার বিঘে জমির উপর। এমন স্থলর সাজানো বাড়ি তখন আর ছিল না। বহিরলনের উঠানটি একটি 'লন'। তার উত্তরে মণ্ডপ ঘর। সেখানে কালীপূজো হত এবং সালের সময় গৃহদেবতা গোপালকে শোভাবাত্রা করিয়ে এখানে এসে বসানো হত।

লন-এর পশ্চিম দিকের ঘর হাচ্ছ বৈঠকখানা। তার উত্তর দিকের প্রকাণ্ড হল অস্ত্রাগার। সেখানে নানাজাতীয় খড়গ, শড়কী, বল্লম, তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতি থাকত। খড়গ, লম্বা বা নানা রকম নন্দা খাঁকা, মিনেকরা চোখ খাঁকা। এর কড়কড়সে

হলিতে ব্যবহার, আর কতকগুলো শৌখিন। বরষ শাড়ী প্রভৃতি শিকারের জন্ত। এখানে বা বাঘ শিকার দেখেছি তা পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য। বড় মণ্ডণবনের পাশে পূব দিকে পৃথক বন, তাতে বিরাট মিকবকালো শিবলিঙ্গ। পূবের দিকের পৃথক বন কাঠ করলা ইত্যাদি রাখবার। দক্ষিণদিকে বাগানের জমি পার হয়ে দেউড়ী, তার মাঝখান দিয়ে পথ। তার একধারে জোড়া তক্তাপোশে ফরাস পাতা, এবং পাশে প্রকাণ্ড বেঞ্চ। এখানে বৃদ্ধদের পাশা খেলা হত নিয়মিত, কখনো বা গান বাজনা। এ বন্যপ্রাণী অংশে চাকরদের তামাক সাজা ও তৈরির জায়গা। দা দিয়ে তামাক পাতা কেটে কেটে তাতে চিটে গুড় মাখিয়ে ডলে ডলে তামাক তৈরি হত। প্রতিদিন চলত এ কাজ।

বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাস। দেয়ালের ধারে ধারে বাতায় সাজানো। গোটা দুই বেহালার বাজ, তবলা, ঢোলক, পাখোয়াজ, তানপুরা সেতার ইত্যাদি। দেয়ালে সেকলে লিখায় ছাপা রঙীন বা একরঙা বাগানো পট। একটি ছবির নিচে “কিনোমিনি” লেখা ছিল মনে আছে। প্রত্যেক ছুটো ছবির মাঝখানে একটি ক’রে শিং ওয়ালা হরিণের মাথার খুলি। প্রবেশরোধ ঘোষের সিং কাঠের মাউটে লাগানো। মাঝখানে মাথার উপর ব্যাঙ লঠন। বাইরের প্রশস্ত দালানে চারটি খবান্না জাঁকা বড় বড় কাচের আয়রণ ঘেরা দীপাধার ছাত থেকে শিকলে ঝুলছে। দালানে সারি দিয়ে সাজানো চেয়ার বেঞ্চি।

লনে প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে লাগানো চারটি ক’রে ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছ। কোনোটা লম্বা-পাতা লাল রঙ, কোনোটা বেটে পাতা হলুদে ছিট দেওয়া। ললিতচন্দ্র নিজ হাতে এ সব পাতাবাহারের গাছ ছেঁটে দিতেন, ঘাস একটু বড় হলে সমান ক’রে দিতেন এবং সমস্ত লন এবং ফুলের বাগান নিজহাতে পরিষ্কার করতেন। সেখানে একটি কুটো পড়বার উপায় ছিল না। অন্ত্রাগারও তাঁর অধীন। প্রতি মাসে একবার অন্তত সেগুলো বের ক’রে

নিজহাতে ঘষে মেঝে পরিষ্কার ক’রে তাতে নারকল তেল মাখিয়ে রাখতেন।

বাড়ির উত্তরের বাগানে তেজপাতার গাছ, দারুচিনির গাছ, সপেটার গাছ—গ্রামে চুলভদর্শন এ সবই।

কাসীপুজো হত কোনো বিশেষ উপলক্ষে, নিয়মিত নয়। বাহতীর শাক্ত আচার। প্রচুর পত্রবলি, মাংস ও মস্তক ছড়াছড়ি। ললিতচন্দ্র মাঝে মাঝে কাঁচা রক্ত পান করতেন, তিনি অল্প পানীয় স্পর্শ করতেন না। সেটি ছিল জ্যেষ্ঠের অধিকারে।

শিবপুজো করতেন যোগেশচন্দ্রের মা ও ভগিনী। অন্ধরে গৃহ-দেবতা কালো পাখরের গোপাল, নাদু হাতে। রূপোর চোখ। আর কয়েকটি শালগ্রাম-শিলা। একসঙ্গে যোজ পুজো হত। যোগেশচন্দ্রই প্রতিদিন বসন্তে পুজোর। রতনদিয়াতে থাকলে ভোরে উঠে ফুল তুলে দিতাম। সে পুজোর গন্ধ এখনও ভুলিনি।

এই ভট্টাচার্য বাড়ি ছিল সবার ঠাকুর বাড়ি। ঠাকুর সবারই ঠাকুর মশাই। আমিও ঐ দলে পড়েছিলাম। জবদন্ত ছিলেন উয়া। ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ললিতচন্দ্র এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, দেখেছি। বাড়ির সোমানা দিয়ে অল্প কয়েক পাড়ীতে বাবার উপায় ছিল না। একবার দেখেছি পাড়ী-ষাত্রীকে চালেঙ্গ ক’রে নামিয়ে দেওয়া হল, তিনি হেঁটে গেলেন অবশেষে, এবং বাড়ির সোমানা পার হয়ে তবে পাড়ীতে উঠতে পারলেন। বাড়ির সোমানার সঙ্গে যুক্ত পথে অপরিচিত কেউ গেলে, “কে যায়” চালেঙ্গ করা হত এবং তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতে হত। কেউ চালেঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিলে ললিতচন্দ্র অস্ত্র নিয়ে ছুটে আনতেন। যোগেশচন্দ্র ছিলেন বিপন্ন। উৎসবে উলার হয়ে পড়তেন। একবার দেখলাম ঢোল বাজানায় বিগলিত হয়ে বান্দককে খুব দাবা এক জোড়া শাল বংশিলি দিলেন। নিজের দেউ বোঁধ হয় শেষ শাল-জোড়া।

পতনের ঠিক আগের অবস্থা।

ক্রমশঃ।

## সনেট

### দুর্গাদাস সরকার

আমাকে করেছে শিল্পী। অস্ত্র নামে আমি মহীরান।  
মৃত্তিকাও প্রাণ পার আমার অর্ধ অহুভবে,  
পৃথিবী স্বাস্থ্যে খেলে রূপেখরে আমার গৌরবে,  
তবু নিজে ব্যর্থ আমি। ক্ষুধা মনে রুদ্ধ অভিমান।  
কঠিন মাটির বৃকে যে গেল না আমার সীমানা—  
হাতে তার রূপ গড়ি বেঁধে তাকে মনের নিগড়ে।  
যদিও জেনেছি এই : সাধনারও সৌধ ভেঙে পড়ে,  
তবু সে অস্ত্রবে। কোন হৈম হর্যে তার কি ঠিকানা !

কেউ আসে, কেউ যায়, কেউ দেয় ছ’বেলা টহল  
আশ্রয় তুতির তীরে। আমি একা একান্ত নিশ্চল।  
নিখুঁত স্নান, শুনি, ঘরবীর এই শিরদ্বন্দ্ব :  
দেখে মা মিলিয়ে কেউ কতো দৃষ্ট শিল্পের মহল।  
একদা তুমিও এসে। হলে যেন হঠাৎ অবাচ



# স্বামী বিবেকানন্দ ও দীবা ভারত

শ্রীকৃষ্ণোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ প্রতীচীর ভৈরব মনীষিকে বলিরাছিলেন, "If you want to know India, study Vivekananda."

In him nothing is negative, but everything positive". রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের মর্মবাণী কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে। আবার ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীদের নিকট শুধু একটি নিছক অনবিগম্য আদর্শমাত্র নয়—যুগে যুগে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া এই আদর্শ ভারতবাসীর জীবনের সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে এই দেশে অবতার ও মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা ভারতের মর্মবাণীর এক-একটি আলোকশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছেন। ভারতের জনগণ দূর হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আলোকশিখার প্রভা নিরীক্ষণ করিয়াই ভূপুত্র হইয়া উঠে—সেই আলোকে আপন আপন প্রাণের প্রাণীকরণ প্রজ্বলিত করিয়া আদর্শের সন্ধানে সাধনা করিয়াছে। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা চৈতন্যের সন্ধান—অর্থাৎ চৈতন্য লাভের সাধনা। তাই ভারতের মর্মবাণী কি, তাহা বুঝিতে হইলে ভারতের সাধনার বিভিন্ন ধারাগুলি বুঝিতে হইবে।

ভারতীয় সাধনার অঙ্গতম প্রধান সুর ত্যাগের মন্ত্রে ধ্বনিত। অঙ্গতম বলার হেতু এই যে, ত্যাগের সাধনা বলিতেই ভারতের সাধনার সবখানি বুঝায় না। তাহার সাধনার মস্কাকিনী—প্রোতে এ-পাশ ও-পাশ হইতে কত জীবনের কত ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। অবশ্য ত্যাগের সাধনা ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর কোথাও ত্যাগের পথ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের পক্ষে ত্যাগ যেন তাহার মজ্জাগত ধর্ম। তাই ত্যাগ ভারতের মর্মবাণীর সপ্তসুত্রে প্রধান সুর। ভারতের বাহিরে অজ্ঞাত দেশে সিদ্ধার্থের ত্যাগের কান্ডিনী প্রচলিত। কিন্তু কে বধর রাখে, ভারতের পথে, ঘাটে, গিরিকন্দরে কত লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণ বেজ্ঞার সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া অনাগারে অনিত্যার কঠোর সাধনার লিপ্ত? ভারতের সমাজে ও সংসারপ্রমোহে সত্যকার ত্যাগীর অভাব নাই। পরমত্যাগী ক্ষণানবাসী ভোলানাথ শিব এসেছে ত্যাগের আদর্শ।

পুরাকালে এই দেশে শৈশবেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বধন শিক্ষা ও সাধনা শুরু হইত, তখনই ত্যাগের রক্ত তরুণ শিক্ষার্থীর মনের গহন ও অঙ্গের বসন রঞ্জিত হইত। ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষ হইলে আরম্ভ হইত কর্মময় গার্হস্থ্য জীবন। তাহার পর আবার সে বাহির হইয়া আসিত ত্যাগের পথে বানপ্রস্থের বাজায়। পরিশেষে তাহার বাজা সমাপ্ত হইত—চরমত্যাগের মহাসমুদ্রে—সন্ন্যাসধর্মে। অর্থাৎ সকলকে ও ত্যাগ, আবার সমাপ্তিতেও ত্যাগ—কিন্তু মাঝখানে লেখি এক কর্মময় জীবন। এবং এই কর্মময় জীবনের লক্ষ্য যে ভোগবিলাস ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রে ও ইতিহাসে। ভবিষ্যৎ বানপ্রস্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে বাগ-বন্ধ, পুত্রোপাসনা ও অজ্ঞাত বহুবিধ কর্মের মধ্যে যে জীবন বাপন করিত তাহাও ছিল তাহার সাধনার লক্ষ্য। অর্থাৎ ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে ত্যাগও যেমন সত্য, তেমনি কর্মও সত্য। বাহ্যিক সঙ্গের ত্যাগ করিয়া বসে জন্মলে

বা পর্বতগুহার বসিয়া সমাহিতচিত্তে সাধনা করিতেম, তাহাদেরও যেমন লক্ষ্য ছিল চৈতন্য বা ব্রহ্মলাভ, তেমনই বাহ্যিক সঙ্গের ত্যাগ করি তেমন তাহাদেরও লক্ষ্য ছিল কর্মের পথে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান। ভারতীয় দৃষ্টিতে সমস্ত জড় প্রকৃতির মধ্যেও সেই চৈতন্যই বিরাজ করিতেছেন—“সর্বত্র ঋদ্ধিঃ ব্রহ্ম” “ব্রহ্মদেবঃ সর্বমুদ্রা”, এই সত্যই সমগ্র বেদ-উপনিষদের মূল তত্ত্ব। এই সত্য আবিষ্কারের ফলেই ভারতীয় দৃষ্টির সর্বাধার উপাসনার (catholicity) উদ্ভব। বেদান্তের এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে রামকৃষ্ণবিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ। এদেশে এই সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই এখানে মূর্তিপূজার অর্থ পৌত্তলিকতা নয়—অরূপ যে ভাবনায় ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার পূজা। বাহ্যিক এই তত্ত্বের মর্মে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বা সেই উদ্দেশ্যে সাধনার পথে অগ্রসর হন নাই—শুধু পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিতে অথবা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয়ে বেদান্তের এবং ভারতীয় অজ্ঞাত শাস্ত্র ও অজ্ঞাতনের বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারা পৌত্তলিকতা ভিন্ন মূর্তিপূজার আর কোনও তাৎপর্য বুঝিয়া পান নাই।

উপনিষদ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে—সেই তত্ত্ব পৌছিতে হইবে—অর্জন করিতে হইবে মুক্তি—শাশ্বত মুক্তি। তাই আরম্ভ হইল সাধনা। কিন্তু সকল মানুষই আর একই স্তরের জীব নয়। বিবর্তনের পথে মানুষের মধ্যে দেখা দিল স্তরভেদ। তাই এক দিকে দেখা দিল সেই পরমতত্ত্বের বহুধা ব্যঞ্জন—“একং সখিপ্রো বহুধা বদন্তি”—আর দিকে সাধনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথের উদ্ভব। আসিল জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—আসল ত্যাগের পথ, কর্মের পথ। বহুদিন পর্যন্ত ভারতে সাধনার ধারায়—ত্যাগ ও কর্ম সমভাবেই ওতপ্রোত জড়িত ছিল কিন্তু লোকসাধারণ বুদ্ধি ও সমাজের বিস্তারলাভের ফলে কালক্রমে ষাভাবিক নিয়মেই কর্মের পথ প্রাধান্য লাভ করিল। মহাভারতের যুগে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতারে দেখি, কর্মের পথের প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা। ত্যাগের পথ আপামর সকলের জন্য উপযোগী বা উদ্বুদ্ধ নয়—সকলেই সেই পথে সাধনা করিবার অধিকারী নয়। তাই ত্যাগের নামে আসে কর্মবিশুদ্ধতা—আর কর্মবিশুদ্ধতা হইতে ধ্রুব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই ভারতবাসীর কানে কর্মমন্ত্রের নীচা দিলেন—তাহা দিগকে ধ্রুব্য পরিভাগ্য করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ধারা বাহিয়া ভারতবর্ষের সাধনা ও সভ্যতার ইতিহাস বহুদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ কর্মের পথেই প্রবাহিত ছিল।

বৌদ্ধযুগে আসিয়া এই প্রবাহের পথে একটা পরিবর্তন আসিল। ভারতীয় সাধনার ভগবান বুদ্ধের অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ অবদান সর্ব্ব ও সর্ব্বদীন ত্যাগের শিক্ষা। ত্যাগের সাধনা পূর্বেও ছিল। কিন্তু সেই ত্যাগ ছিল অনেকাংশে সংযমের নামান্তর—বুদ্ধের তাহার মহিমাযুক্ত রূপ দিলেন। বস্তুতঃ, ভগবান বুদ্ধই সর্ব্ব ত্যাগের মন্ত্র ভারতময় ছড়াইয়া দিলেন। তাই বুদ্ধের যুগকে বলা যায়—মূলতঃ ত্যাগের ও তপস্যার যুগ। কিন্তু বুদ্ধদেবের



ভ্যাগের মস্তুর পিছনে রহিয়াছে একটা হুংবাব। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার দরদী স্নায়ের দৃষ্টিতে দেখিলেন, জগৎ শুধু হুংবাব—মাছুব শুধু জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিগড়ে বদ্ধ। তাঁহার দরদী স্নায় তাই কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মুক্তির পথের সন্ধান দিলেন—হুংবাব বন্ধন হইতে মুক্তি। বেদান্তও মুক্তির সন্ধান দেয়—সেই মুক্তি সং-চিন্তা-জ্ঞাননের দ্বারা থলিয়া দেয়। বুদ্ধদেব যে মুক্তির সন্ধান দিলেন তাহার তাৎপর্য বিভিন্ন—জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি। এই মুক্তির পরিণতি নির্বাণের শূন্যতায়—তাই Negative. বেদান্তের মুক্তির পরিণতি সন্নিধাননের পূর্ণতায়—তাই Positive. বুদ্ধের হুংবাব হইতেই এই Negativism-এর উদ্ভব। বেদান্তের ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্মের পার্থক্যও এইখানে। বেদান্ত যেখানে দেখিলেন জ্ঞানকে—মাছুব অমৃতের পূর—বুদ্ধ সেখানে দেখিলেন হুংবাবের পাবাবার। তাঁহার ভ্যাগের মস্তুর পিছনেও রহিয়াছে হুংবাব। উপনিষদ যে ভ্যাগের শিক্ষা দেয়, তাহার মূলে কোনরূপ হুংবাব বা পলায়নী মনোবৃত্তি নাই। উপনিষদের বাণী—“তেন ত্যক্তেন তুজীবাঃ”—এই প্রপঞ্চের জগৎকে ভ্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইবে। ভ্যাগের পথে জ্ঞানের সাধনার মায়াবী আবরণ থলিয়া ফেল—জগৎ তখন পরম সত্যে অধিষ্ঠিত জ্ঞানকরম বসিয়া প্রতিষ্ঠাত হইবে।

পরহংসাতর পরমত্যাগী বুদ্ধদেব হুংব হইতে মুক্তিসাধনের জন্ত আপামর সকলের জন্ত ভ্যাগের পথের নির্দেশ দিলেন। তাহার প্রতিক্রিয়াধরপ কালক্রমে সমগ্র দেশময় দেখা দিল একটা কর-বিমুখতা। ভগবান ক্রীষ্টকেই স্থান দখল করিলেন ভগবান বুদ্ধ। Positivism-এর স্থানে আসিল Negativism. একথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগেই এক দিকে ভারতের বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং অপর দিকে ভারতের প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ভারতের বাহিরে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধধর্মের Negativism-এর মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ পতনের বীজ নিহিত ছিল। ভগবান বুদ্ধের ভ্যাগ, তাঁহার কঠোর তপস্বী এবং সর্গেপরি তাঁহার বিশাল স্নায় ও দরদের তুলনা নাই। কিন্তু একটা সমগ্র জাতি ও দেশের প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিতে ক্রীষ্টকেই প্রতিভারও তুলনা নাই। ব্রিট চম্পালোক আদামের স্নায়ের শান্তি আনয়ন করে, সন্দেহ নাই—কিন্তু নিগ্রার আবেশও আনে। আর দীপ্ত সূর্যালোক আনে পৃথিবীর বৃক জীবনের সাড়া—প্রাণের স্পন্দন।

বৌদ্ধযুগের পর আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে ভারতের প্রাণ এক নবজীবনের সাড়া আসে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে শঙ্কর বেদ-উপনিষদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিলেন। ভারতবর্ষ তাহার লুপ্তপ্রায় দার্শনিক পথটি কিরিয়া পাইল—তাঁহার জ্ঞানের ঐতিহ্য সবুজ হইল। শঙ্কর প্রমাণিত করিলেন, ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ অভিযান্ত্রিক তাঁহার বেদান্তে, তাঁহার দর্শনে শুধা চৈতন্তের আবিষ্কারে। ভারতের মূলগত ধর্ম চৈতন্তাশ্রয়ী। বৌদ্ধযুগের শেষে ভারতের আকাশে-বাতাসে একটা জড়বাদের প্রভাব দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্ম আত্মা বা চৈতন্ত সব্বদে নীরবতায় যে নাস্তিকতার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা অনেকাংশে এই জড়বাদের ইচ্ছন যোগায়। বেদান্তের ভিত্তিতে চৈতন্তাশ্রয়ী দার্শনিক মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্কর জড়বাদের হাত হইতে

ভারতবর্ষকে রক্ষা করেন। পরমদরদী বুদ্ধের জয় চটয়াছিল স্নায়ের, এবার মহাজ্ঞানী শঙ্করের জয় হইল মস্তিষ্কের। তখন পর্যন্তও এই দুই-এর মিলনসাম্য সম্ভবপর হইল না। বেদান্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শঙ্কর বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রবর্তিত করিলেন তাঁহার ফলে দেশের বৃক সঞ্জীবিতা আসিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জ্ঞানের আলোক শঙ্কর প্রজ্বলিত করিলেন, সমগ্রকে সাধনার পথে চালিত করিতে সেই আলোক অনেকখানি ব্যর্থ হইল। পাণ্ডিত্যের জয় হইল সত্য, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য জনসাধারণকে সাধনার দিকে পথাপ্ত প্রেরণা জোগাইতে পারে না। বুদ্ধের যুগ ভ্যাগের যুগও যেমন, তেমন তপস্বীর যুগ। শঙ্করের যুগ জ্ঞানের যুগ সন্দেহ নাই—কিন্তু তপস্বীরও যুগ নহে। তাই শঙ্করের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

ষিঠীরতঃ, জ্ঞানের চর্চা করিতে করিতে শঙ্কর পৌঁছিলেন মায়াবাসে। এই মায়াবাসে Negativism পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের মধুর শ্লোক “মায়ায়ামিমদমখিলং হিবা” খুব সহজেই জনসাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিল, কিন্তু “ব্রহ্মপদং ত্বং প্রেবিশ বিদিত্বা” এই উপদেশ প্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল। জনসাধারণ থলিল “প্রাপ্ত সন্নিহিতে মরণে”। কাঙ্ক্ষেই তাঁহাদের যেন আর কিছুই করিবার বহিল না। এই ভাবে শঙ্করের মায়াবাদ আসিল একটা নেতিভব—Negativism, শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতার মতোই এই Negativismও যুগভীর। তবুও শঙ্করের প্রভাব আজিও সমগ্র ভারতে অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ, এবং বত দিন বেদ-উপনিষদ হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূলে রচিবে তত দিন শঙ্করও অমর হইয়া থাকিবেন—কেন না, দার্শনিক ক্ষেত্রে তিনিই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শঙ্করের পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবে ভারতের সাধনার পথে আবার একটা পরিবর্তন দেখা দিল। শঙ্করের জ্ঞানবর্ষের প্রেধরতাকে ব্রিট করিতে দেখা দিল প্রেম-ভক্তির জলভরা মেঘ। ভারতের ত্বিষিত স্নায় শুক হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্তদেবের লইয়া আসিলেন পিপাসার বারি। ভক্তিনোয়ায় আন্দোলিত হইয়া অকোষ ধারায় ঝরিয়া পড়িল প্রেমের মেঘ। শুধু কণেকের পিপাসাই মিটাইল না—বস্তার ভাসাইয়া দিল। “শান্তিপূব তুব-তুব নদে ভেসে যায়”—শুধু নদে কেন, সমগ্র বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল—আসাম, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন তুব-তুব হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তুব-তুব চটিলেন পার্শ্বসারি ক্রীক—“ক্লেয়ে মা য় গমঃ পার্শ্ব” বণীর উল্লাসাত ক্রীক—ভাসিয়া রহিলেন বৃন্দাবনানন্দকারী বংশীধারী ক্রীক; কং ও জ্ঞানের মহিমা নিশ্চয় হইল—এবার জয় হইল প্রেমমস্তুর।

চৈতন্তদেবের বৈষ্ণবধর্মের নিগুণ তত্ত্বের এক দিকে প্রেম অপর দিকে বৈরাগ্য। পৃথিবীর সব আকর্ষণ; সব বন্ধন ছাড়িতে হইবে। চরম বৈরাগ্য না আসিলে কৃষ্ণপ্রোমে মত্ত হওয়া খাটবে না। কিন্তু এইরূপ চরম বৈরাগ্যের তত্ত্ব এবং প্রেমের উচ্চাঙ্গ স্বর আপামর জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। জনসাধারণের হাতে ইচার বিকৃতি হওয়ার সম্ভাবনা—হইলও তাহাই। এই বিকৃতির ফলে “তৃণাশি স্ননীচেন তরোরশি সতিফুনা” ইত্যাদিরূপ শিক্ষার ফলে কালক্রমে জনসাধারণের উপর পড়িল এক ধৈর্যের ছায়া। বৈষ্ণবধর্মের চরম বৈরাগ্যের তত্ত্বের মধ্যেও রহিয়াছে পরিপূর্ণ Negativism. এই Negativism ও ঐকণ পরিণতির জন্ত অনেকাংশে দায়ী।

পরিণামে রামকৃষ্ণাবতারে আসিয়া দেখি, ভারতের সাধনা এক সম্পূর্ণ নতুন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের পথ। পূর্ব-পূর্ব যুগে ভারতের ধর্মবাহিনী এক একটি স্বর যুক্ত হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সপ্তস্বর একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। পূর্ব-পূর্ব যুগে দেখা গিয়াছিল এক-একটি আলোকদগ্ধা—এবার সপ্তস্বরের আলোর মধ্যে আবিস্কৃত হইলেন পূর্ণ পূর্ব। সময়ের পূর্ণতা আসিয়া পূর্বের সমগ্র অশুপূর্ণতা বিধ্বস্ত করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনায়, তাঁহার ব্যাকুলকরা 'মা', 'মা' ডাকে যুগ্মবী মা চিত্তবাহী হইয়া ধরা দিলেন। ভাবি—শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির অবতার। কিন্তু পদক্ষেপেই দেখি, তাঁহার মধ্যে ভক্তির আয়রণে জ্ঞানের অভ্যাস চলিতেছে। সমগ্র বৈশাখ-উপনিষদ বেন তাঁহার মধ্যে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহার কথাগুলো ধ্বনিত হইতেছে উপনিষদের মহত্ত্বটী ধ্বনিতের বাণী, কিন্তু এবার সঙ্কটের পরিবর্তে বলভাষা—তৎকাং শুধু এইটুকু। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমগ্র চেতন ও অচেতন সত্তা ত্যাগের দীক্ষার চাকিত হইয়াছিল—কল তিনি কখন কি মুক্তা স্পর্শ পণ্ডিত করিতে পারিতেন না। বাসনাভ্যাগী দেহ-মনে সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসব্রতের 'সবস্থান সার্বক' করিয়াছে উপনিষদের বাণী—'তেন ভক্তেন ভক্তীথাঃ।' প্রেমের সাধনাকে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপায়িত করিয়াছেন জীবসেবা মন্ত্রে। বলিলেন—'ছিঃ ছিঃ, জীব দয়া কি রে! শিবজ্ঞানে জীবসেবা,' বলিতে বলিতে সমাধিত হইয়া পড়িলেন। স্বীয় অশুভক্তির এই ছোট্ট ছুটি কথায় তিনি নবনের চোখের সম্মুখে একটি নতুন ভগবতের দ্বার খুলিয়া দিলেন। জীব ও শিবের অভেদ জ্ঞান তাঁহার জীবনে হইয়াছিল উপলব্ধিগত সত্য। তাই লোকের এটো পাতা মাথায় বহিয়া গলিয়া বিসর্জন দিতেন—কুকুরের ফুকাবশিষ্ট ও ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে বাইতে বিধা করেন নাই। সর্বপ্রকার ভোগজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল—তাই পদদলিত খাসের বাখা, ফুল তুলিতে পুষ্পপাণ্ডের বেরনা নিজ সেহে অমৃতব করিয়া কাঁতার হইতেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকানন্দের কর্মযোগে রামকৃষ্ণের প্রভাব কোথায়—কর্মযোগে রামকৃষ্ণের অবদান কি? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আসলে অভিন্ন—যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা। ঠাকুর নবনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন ভারতের আত্মার সহস্ররূপ পদ্মের ফুটনোমুখ কুঁড়ি। শুধু নিজের নির্বিকল্প সমাধি চাহে বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎসনা করিয়া কহিলেন, 'তোকে দিয়ে যে ভগবতে আমার অঙ্গেক কাজ রয়েছে।' তাই কর্মযোগী রামকৃষ্ণ নিজের শক্তি নবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া বলিলেন—'তোকে আজ আমার বা কিছু সর্বশক্তি ফুটর হয়ে গেলাম, কিন্তু চারীকাঠি হইল আমার কাজ।' তিনি আশ্বাস দিলেন, সময় হইলে খুলিয়া দিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নির্দেশ দিলেন, এখন তোমাকে ভগবতের মঙ্গলের জন্য—প্রত্যেক জীবের ক্ষণের অঙ্গ ভোগাইবার জন্য ('বালি পেটে ধর হয় না।')—তাঁহার ঐহিক ও পারমাণবিক মুক্তির জন্য সেবার পথে কর্ম করিতে হইবে। এই ভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নবনের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিলেন। সেই দিন হইতে নবন কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ—সেই দিন হইতে রামকৃষ্ণ ও

বিবেকানন্দ অভিন্ন। ভারতের আকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপূর্ব—আমি স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহাপূর্বের আলোকময় বাজী।

তাই ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে স্বামিজী আবিস্কৃত হইলেন জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সমন্বয় মূর্তিতে। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বৈদিক ধর্মের সত্যদ্বি, শ্রীকৃষ্ণের নিকাম কর্ম, বুদ্ধের ক্ষয় ও ত্যাগ, শঙ্করের জ্ঞান, মহাবীর হনুমানের ভক্তি এবং খ্রীষ্টচৈতনের প্রেম। অর্থাৎ ভারতের সকল যুগের সকল সাধনার ধারা স্বামিজীর মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এই মহামিলন বা মহাসমন্বয় পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে Negativism এসেছে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বামিজীর উদ্দেশ্যে ভারতের আকাশ হইতে Negativism এর মেঘ কাটিয়াছে। যমের হৃদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 'সত্ত্বামি যুগে যুগে' এই আশ্বাস-বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিতে—পুনরায় আবিস্কৃত হইয়াছেন বিবেকানন্দাবতারে। যুগ হইতে খ্রীষ্টচৈতন্য পর্যন্ত সকলেই জ্ঞানকাশে শ্রীকৃষ্ণের বিশদীভূত কর্ম antithesis; স্বামিজী এই বিপরীত ভাব বা বিরোধ বিধ্বস্ত করিয়া একটা সমন্বয় (synthesis) আনিলেন। তাঁহার মধ্যে শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে তাহা নয়—শ্রীকৃষ্ণের ভাবের সাথে খ্রীষ্টচৈতন্য, শঙ্কর বুদ্ধ এবং উপনিষদের ভাবের সমন্বয়।

বিবেকানন্দাবতারে আমরা পার্শ্বদর্শিতা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া পাই। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য, বীর্য, নিভাম কর্মের আদর্শ এবং বিশ্বরূপের জ্ঞানালোক। আদর্শ ভক্ত হনুমান স্বামিনাম সঞ্চল করিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। ভক্তবীর বিবেকানন্দও দেখি গুরুপদে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সহায়-সঞ্চালন অবস্থায় সমুদ্রপারে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বাইতেছেন। একটু অমুদ্রাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামিজী ছিলেন জ্ঞানের আয়রণে পরমভক্ত। তাই দেখি, ভবত্যাগীর মন্দিরে বাইরা মায়ের কাছে তিনি আর কিছু প্রার্থনা করিতে পারিলেন না—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। এগাসচ্ছাদনের সঞ্জন তো দূরের কথা—কোথার রহিল তাঁহার জ্ঞান-গরিমা—কোথার রহিল তাঁহার অধৈতবাদ—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে পূর্ণভক্ত, তাহার ভক্তি ছাড়া মায়ের কাছে আর কি আধিক্য থাকিতে পারে? এক বার নয়—হুই বার নয়—তিন তিন বারই ঐ একই প্রার্থনা করিলেন—'মা, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও।' ঠাকুর রামকৃষ্ণও হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলেন—নবন বিষয় বাসনার পাশ কাটিয়াছে। কিছ কি সে সার্বক আশ্রয় বাহা দ্বারা সে এই পাশ কাটিল?—জ্ঞান নয়, বিচার নয়, বিবেক নয়,—তাঁহার অজ্ঞানভাবিত্ত্ব দ্বয়ের শুদ্ধা ভক্তি। আবার তাঁহার গুরুভক্তির কথাও আজ অমুদ্র পৃষ্ঠান্তররূপ ঘরে ঘরে প্রচলিত। এমন গুরুভক্ত শিষ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া লোকে শ্রীরাম কৃষ্ণকে ভাগ্যবান মনে করে। কান্দুয়ার যোগে ঠাকুরের নেহের বধন প্রায় অস্তিত্ব অবস্থা, তখন একদিন পূর্বসন্ধ্যায়িত্ত্ব তাঁহার প্রসাদ স্বামিজী মহা আনন্দে ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন—উপস্থিত গুরুভাইরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহা তাঁহার সীমাহীন গুরুভক্তির নিদর্শন।

স্বামিজীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ভগবান বুদ্ধের দরদী স্নেহ—যে স্নেহ কীর্ষিয়া উঠিয়াছিল সেব ও ধর্মের কোটি কোটি বশবধরণের জন্য বাহারা আজ পতপ্রায় হইয়া পীড়িতরাছে, বাহারা—'অন্যভাবে মর্ষিতেছে' এবং বাহারা 'অর্থপদে কাটাইতেছে'। আবার দেখি

বুকের ত্যাগ। এই ত্যাগ নিজের হৃদয়কে নয়—অপরের হৃদয় মোড়নের জন্য। বলিতেছেন—“দেশের দুর্কশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে এবং এই চিন্তার বিরোধে হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম-বশ, জী-পূত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত তুলিয়াছ—?” আবার বলিতেছেন, ‘তোমার চকুদিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?’ তাঁহার এই বিরাটের উপাসনার ব্রতে যেমন ধ্বনিত হইয়াছে জীবসেবা মন্ত্র, তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে বৈদাস্তিক দিব্যদৃষ্টি।

জানমার্গে আচার্য বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করেরই উত্তরসারক। শঙ্করের মতো বৈদান্তিক তাঁহার জ্ঞানযোগের উৎস এবং বেদান্ত প্রচার তাঁহার জীবনের অন্ততম প্রধান ব্রত। কিন্তু আচার্য শঙ্করের উত্তরসারক জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দের ব্রত আরও বাশক এবং দ্ব্যুতি আরও বিস্তৃত। বিশ্বের জড়বাদের তমসা মিদ্রিত করিয়া সর্বাংগের বেদান্তের তিত্তিতে এক বিশ্বধর্মের (Religion of Universal Gospel) প্রবর্তন বিবেকানন্দাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামিজী দেখিলেন, বেদান্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গলা-বধূনা মিলন হইয়াছে এবং একমাত্র বেদান্তই হইতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু।

স্বামিজীর মধ্যে শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতা রহিয়াছে, কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদের Negativism নাই। শঙ্করের মতে জগৎ নিছক মায়া—অন্তঃপ্রমিথ্যা। স্বামিজী এই মায়াবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, মায়াবাদের এই ব্যাখ্যা মাহুৎসবক কর্মবিমুখ এবং ব্যাহত করে তাহার আধ্যাত্মিক অঙ্গীলন ও তাহার সেবাবের উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন জগৎ পরম (absolute) সত্য না হইলেও আপেক্ষিক (relative) সত্য—অর্থাৎ মারাত্মক জগৎ সত্য। তাই মায়াকে তিনি ‘statement of fact’ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলিলেন “Realise that in illusion is the real”—মায়ায় নিজস্ব বাস্তব রূপ রহিয়াছে—চিরন্তন সত্যকে আড়াল করিয়া মায়া বিরাজ করিতেছে। আবরণ হিসাবে ইহা সত্য। এই আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন সেই সং-চিৎ-আনন্দ। এইরূপে স্বামিজী মায়াবাদের Negativism পরিত্যাগ করিয়া তাহার একটি Positive রূপ দিলেন। মায়ায় negative ব্যাখ্যার একমাত্র ভ্রান্ত সত্য—সমগ্র সৃষ্টিই ভ্রম—‘all this is but illusion’—তুমি, আমি, চন্দ্র-সূর্য সব মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। ভ্রম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই পরম জ্ঞানলাভই একমাত্র লক্ষ্য। এই জ্ঞানের উন্মোকেই মায়ায় ভ্রম কাটিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তা হইবে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বুদ্ধিগামিক মনোবৃত্তি মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়োগলব্ধ জগতের এই negative ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। স্বামিজী বেদান্তের তিত্তিতেই মায়ায় positive রূপ দিয়া প্রজ্ঞা ও যুক্তির, দর্শন ও বিজ্ঞানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধাপিত করিলেন। মায়ায় negative ব্যাখ্যায় মাহুৎসবের কর্মযোগ সাধনার অবকাশ নাই—তাঁহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশেরও প্রায় আসে না। স্বামিজী মায়ায় আপেক্ষিক নিজস্ব সত্যতা (fact) বোকার করিয়াছিলেন বলিয়াই মানবতার মহিমা প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন—বলিতে পারিয়াছিলেন, “We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are

but waves on the boundless ocean which I am.” বেদান্তের প্রতিক্রিয়া তুলিয়া তিনি বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা উঠ, জাগ, “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বহান্ন নিবোধত।” এই মানবতার পরিমণ্ডলে আসিয়া বেদান্তের পূজারী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ভারতের মস্তকে জ্ঞানের কিরীট পুষ্টারাহিলেন—বল হিমাদ্রির শিখরে শিখরে অক্ষয়কিরণদীপ্ত তুষার কিরীট। স্বামিজী সেই দীপ্তোজ্বল তুষার বিগলিত করিয়া প্রেমের ধাতে প্রাবাহিত করিলেন। তাঁহার বিশ্বধর্মের প্রচারে জ্ঞানের সাথে প্রেম মিশিয়াছে এবং প্রেমের সাথে জ্ঞান। চৈতন্যদেবের মতো তিনি প্রেমের বার্ষা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কর্মযোগ সাধনার, তাঁহার বিশ্বধর্মের সঙ্গীতের প্রধান সুরটি প্রেমের সুর—“ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়。” তাই “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিত্ত ঈশ্বর।” এই প্রেমের আবেশে যেন তাঁহার মধ্যে চৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতের কর্মযোগীকে তিনি এই প্রেমের নীকামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। কর্মযোগীর ইহা শুধু আদর্শমাত্র নয়—ভাটাকে বাস্তব জীবনে তিলে তিলে এই সাধনা করিতে হইবে। তাই স্বামিজীর প্রেমের নীকায় নাই নেতি নেতি ভাব—negativism—নাই কোন পলায়নী মনোবৃত্তি। প্রেম ও সেবা তাঁহার কর্মযোগব্রত—একটি positive ধর্ম। বৈরাগ্যের নামে কর্মবিমুখতা নয়—নিকাম কর্মের পথে বৈরাগ্যের সাধনা—স্বাগের সাধনা। কর্মবিমুখতা বৈরাগ্য আনিবে না, আনিবে রৈব্য—আনিবে তামসিকতা। তাই কর্মের উদ্দীপনার তামসিকতা দূর করিতে হইবে। এইরূপে স্বামিজী যে পথের নির্দেশ দিলেন, সেখানে ত্যাগ ও কর্ম, প্রেম ও সেবা হাত ধরাধরি করিয়া চরিতার্থ। সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বামিজী জ্ঞানভিত্তিক, ত্যাগভিত্তিক ও প্রেমভিত্তিক কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভারতের কর্মযোগীকে এক মহতান ব্রতে ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। এই মহাব্রতের একটি ধারা বহুরূপে প্রবর্তিত বিরাটের সেবার মধ্যে প্রেমের সন্ধান—অপূর ধারা জ্ঞান ও প্রেমের বলে বিখ বিজয় করিয়া জগতে চৈতন্যপ্রসারী বিশ্বধর্মের প্রবর্তন।

কবে কোন্ যুগে ভারতের গিরিকলতে, তপোবনে বেদান্তের শাশ্বত বাণী—সদ্বিদ্যামন্ত্র মন্ত্র উপিত হইয়াছিল, কবে কোন্ যুগে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে কর্মমন্ত্র উল্লসিত হইয়াছিল—তাঁহার পর ভারতের বৃকের উপর দিয়া ত্যাগের যুগ, জ্ঞানের যুগ প্রেমের যুগ বহিয়া গেল—ভারতের আকাশে তাহা আদর্শের এক একটি গগনচূষী অঙ্গদচিরেখা (high water mark)। কিং বেদান্তের সর্বাংগবিস্তারিত বলিয়া এবং কর্মযোগভিত্তিক নয় বলিয়া এই সব বিভিন্ন যুগের ভাবধারায় ক্রমে ভ্রমিয়াছিল এবং Negativism এর কুহেলিকা। শ্রীকৃষ্ণের কাল হইতে ভারতের কত যুগ পরে আসিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। স্বামিজীর কণ্ঠে আবার ঝঙ্কত হইল বেদান্তের বাণী “শৃঙ্খল বিধে অমৃতত পুত্ৰাঃ”; উল্লসী নবযুগের কর্মযোগের গীতা। তাঁহার শব্দনিদানে বিদ্রুিত হইল Negativism এর জড়িয়া। সর্বপ্রথম সমগ্র হইল জ্ঞান, ত্যাগ প্রেমের সাথে করের—মিলিত হইল ভারতের সকল যুগের সন্ধ সাধনার ধারা। তাই ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে স্বামিজীকে বুঝিয়া হয় এবং স্বামিজীকে বুঝিতে পারিলেই ভারতবর্ষকে জানা যায়।

# পদ্ম

## কবি মুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

১২, অনন্তপুর, পোঃ হিষ্  
রাঁচি।

অনেক বছর-বুটী মাথার করে অনেক অবিশ্বাস আর অসন্তুকে  
অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি। আসার পথে  
উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিনি, কেবল পূর্ণিমার অশ্রুই আলোর স্তব্ধ  
গভীর বরাকর নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন ছিলো গভীর রাত  
—(বোধ হয় রাত শেষ হয়েই আসছে) আর সেই রাত্রির গভীরতা  
প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌনমুখ বরাকরের জলে, কেমন যেন  
ভাবা শেষেছিল সব কিছুই। সেই ভল আর অদূরবর্তী একটা  
বিঘাট গভীর পাহাড় আমার চোখে একটা কণিকায় রচনা করেছিল।  
বরাকর নদীর এক পাশে বাংলা অপর পাশে বিহার আর তারই  
মধ্যে স্বয়ং স্মৃতি "বরাকর"; কী অদ্ভুত : কী গভীর! আর কোনো  
নদী (বোধ হয় গঙ্গাও না) আমার চোখে এতো মোহনিস্তার করতে  
পারেনি।

আর ভালো লেগেছিল গোমো ট্রেন। সেখানে ট্রেন বদল করার  
জন্তে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে  
উপলব্ধি করেছে। স্তব্ধ ট্রেনে সেই রাত আমার কাছে তার এক  
অস্মৃত সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রইলো চিরকাল, তারপর সকাল হ'লো।  
অপরিস্রিত সকাল। ছোটো ছোটো পাহাড়, ছোটো ছোটো বিতক-  
প্রায় নদী আর পাথরের কুচি ছিটানো লালপাথ, পাশে-পাশে নাম-  
মাস্তানা গাছপালা ইত্যাদি দেখতেদেখতে ট্রেনের পথ ফুরিয়ে  
গেল। তারপর রাঁচি বেগু ধথের বাস-এ করে এগোতে লাগলুম।  
"বাসের কী শিঙাভাড়া গো" সে বিপুল বেগে ধাবমান হ'লো পাহাড়ী  
পথ ধরে, হাজার-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চলতে-চলতে আবেগে  
উঠলে উঠেছি আর ভেবেছি এদুট কেবল আমিই দেখলুম?  
এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করলো? হয়তো  
অনেকেই দেখেছে এই দৃশ্য, কিন্তু তা এমন করে অভিভূত করেছে  
কাকে?

রাঁচি এসে পৌঁছলাম। আমরা যেখানে থাকি সেটা রাঁচি  
র, রাঁচি থেকে একটু দূরে, এই জায়গার নাম ডুয়াতা।  
আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ব'য়ে চলেছে স্মরণপ্রাপ্ত স্বর্ণবর্ণের  
দী, আর তারই কুলে দেখা যায় একটা গোরস্থান, যেটাকে  
দেখতে দেখতে আমি মাঝে মাঝে আশ্রয়হারা হয়ে পড়ি।  
এই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, বটো শুধু আমার  
ই এখানকার সকলেরই প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে  
কত ভলার আমার কয়েকটি বিশিষ্ট রূপের কেটেছে।  
কত শুকবার সকাল থেকে সোমনব্বার হুপুর পর্যন্ত প্রতিটি কণ  
আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দে কেটেছে—কারণ এই সময়টা

আমরা দলে ভারী ছিলাম। রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি  
থেকে ১৮ মাইল দূরে "জোনহা প্রপাত" দেখতে বেরলাম। ট্রেনে  
চাপার কিছুকালের মধ্যেই তুলুল বুটী নামলো এবং ট্রেনে বৃষ্টির  
আনন্দ আমার এই প্রথম। দুধারে পাহাড়-বন বাপসা করে,  
অনেক জলধারার স্রুটি করে বুটী, সেই আমাদের বোম্বাঙ্কিত ক'রলো।  
কিন্তু আরো আনন্দ বাকী ছিলো—প্রতীক্ষা করেছিলো আমাদের  
জন্তে জোনহা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বুটী ভিলে অনেক পথ হাঁটার  
পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধমন্দিরের সামনে এসে  
পাঁড়লাম। মন্দির-বন্ধক এসে আমাদের দরজা খুলে দিলো।  
মন্দিরের সোম্য গাভীরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম নিঃশব্দে,  
দীর পদবিক্ষেপে। মন্দির সন্ধ্যা কয়েকটি দোহার দুয়ার এবং  
গবাক্ষবিশিষ্ট বন্ধ ছিলো, সেগুলি আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম, ফুল  
ভুললাম, মন্দিরে হট্টাধনি করলাম। সেই ধনি পাহাড়ের মধ্যেই  
সীমাবদ্ধ রইলো, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছল না। সন্ধ্যা হ'য়ে  
এসেছিলো, সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী,  
আমরা তাই সেই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম  
অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। গিরে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে,  
চৈতন্যকে অভিভূত করলো। এতদিনকার অভ্যস্ত গত্যুগতিক  
দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় লিখেছে দেখা দিলো।  
মুগ্ধ মুগ্ধ তাই একটা কবিতা আমার হাতে লিখে পারলো না। সে  
কবিতা আমার কাছে আছে, ফিরে গিরে দেখাবো। জোনহা যে  
দেখেছে তার ছোটনাগপুরে আসা সার্থক, যদিও শুভ খুব বিখ্যাত  
প্রপাত, কিন্তু হৃদয়ে "প্রপাত" ল'ননের এবং উপভোগের এত বেশি  
সুবিধা নেই, একথা জোর করেই বলবো এবং জোনহা যে দেখেছে  
সে আমার কথার অবিশ্বাস করবে না। জোনহা সব সময়েই  
এতো স্নানর, এতো উপভোগ্য তা নয়, এমন কী আমরা যদি তার  
আগের দিনও পৌঁছতাম তা হ'লেও এ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম  
নিশ্চিত।

প্রপাত দেখার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বৃদ্ধদের বন্দনা  
করলাম। তারপর গল্পও শুনব করে, সব শেষে নৈশ-ভোজন শেষ  
করে আমরা সেই স্তব্ধ নিবিড় গহন অরণ্যের পাহাড়ে জোনহা  
দূর-নিঃসৃত কলধনি ওনতে ওনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। জোনহা  
সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিঃসৃত ভাবে আঁচড়ে  
আঁচড়ে কলতে লাগলো কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত-অজ্ঞার  
জলধারার বৃকে জেগে রইলো রক্তের লাল আর রক্ত ঘরে  
পোনা বেতে লাগলো আমাদের রক্ত নিখাস। প্রহরীর মত  
জেগে রইলো ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অক্লুপণ বাৎসল্য নিয়ে আর  
আমরা আমাদের সমস্ত ভাবনা জেলে নিলাম সেই বিরাটের



পারে। পরদিন আর একবার ঐক্যবদ্ধ হস্তময়ী জোনহাকে, তার সেই উজ্জল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালোবাসা, তারপর ঘোঁরে ঘোঁরে চলে এলাম অনিচ্ছাসঙ্গে। আসবার সময় যে বেদনা জেগে ছিল বিদায়ের জন্তে তা আর বুঢ়ো না। সেই দিনই দুপুরে আমাদের দলের অর্ধেককে বিদায় দিয়ে সেই বেদনা নির্ধ্বারা তুলে। জোনহার ফিরতি পথে কেয়ার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম আমাদের এই বাত্মা বেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুটলো আর আমরাও জোনহাকে কেলো, সেই আশ্রয়তা বুদ্ধমন্দিরকে কেলো রাঁচি চলে এলাম। এ থেকে বুদ্ধলাম, কোনো কিছুব আসাটাই স্বপ্ন আর বাওয়াটা কঠোর বাস্তব; খুব কম জিনিষটী কাছ আসে কিন্তু ষার প্রায় সব কিছুই। জোনহাট তার বড়ো প্রমাণ। রাঁচি কেয়ার পর আমাদের দলের অধাঙ্গ হানি হওয়ায় আনন্দও প্রায় সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। তবু এরট মগো ত'দিন রাঁচি পাঠাড়ে গেছি এক উন্নতসিত হয়েছি। এট পাঠাড থেকে রাঁচি সহরকে দেখার ভারি মন্দার। মনে হয়, লিপিপুটাননা গড়েছে তাদের সাম্রাজ্য। সহরের মধ্যে একটি লেক আছে, আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃশ্যপটও বন বন বদলার এবং সহরের সৌন্দর্যের জন্তে আমার মনে হয় লেকটিই অনেকখানি দায়ী। রাঁচি পাঠাডের মাধ্যম আছে একটি ছোট্ট শিবের মন্দির, সেই মন্দিরে পাঁড়িয়েট দেখা ষার ছোট্টনাগপুরের দিগন্ত বেন পাঠাড দিয়ে ঘেরা; আর আছে একটি গুহা, সেটও কম উপভোগ্য নয়। আর সব মিলিয়ে দেখা ষার রাঁচির অঞ্চল সন্তোকে, বা একমাত্র রাঁচি পাঠাড থেকেই দেখা সম্ভব।

'ভূগাওয়ার বাঁধ' বলে একটি জিনিষ আছে, যেটিতে আমি একদিন শ্রান করেছি এবং এক সন্ধ্যার বাকে স্বপ্নের গভীরতম অন্তর্ভুক্তি দিয়ে অন্তর্ভব করেছি। এটিকে পুঙ্খবলই ভালো, বড় বোর দীর্ঘ, কিন্তু সবাই একে লেক বলে থাকে, বাই বোক, জলাশয় হিসেবে এটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর তাছাড়া ভূগাওয়ার পথ, মাঠ, বন সবই ভালো, এক কথায় ভালো এখানকার সবই। কেবল ভালো নয় এখানকার প্রতিবেশী; বাস্তবের দ্রব আর মিস্টারদের আধিপত্য। এখানে এখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে যদিও বৃষ্টিটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, তবুও এই বৃষ্টি কাল অসাধ্য সাধন করেছে; ক্ষীণশ্রোতা সুবর্ণবর্ণের বৃক এনেছে বোঁবন। তার কল্লোলময় জলোচ্ছ্বাসে, তার শ্রোতের বেগ আর ঢেউয়ের দ্যাত্মমাত্তিতে আমরা শিহরিত হয়েছি, কারণ কাল সকালেও সুবর্ণবর্ণের মাঝখানে পাঁড়ালে পায়ের পাতা ডিজ্ঞতা না। বাই বোক, রাঁচির অনেক কিছুই এখনো দেখিনি কিন্তু বা দেখছি তাতেই পরিভূত হয়েছি—অর্থাৎ রাঁচি আমার ভালো লেগেছে। যদিও রাঁচির বৈচিত্র্য ক্রমশঃ আমার কাছে কমে আসছে, আর আজকাল সব দিনগুলোর চোরাই প্রায় এক রকম ঠেকে। অতএব বিদায়।

সুস্বাদু ভট্টাচার্য।

পুনঃ—আমার কিংবদন্তে বেশ সেরী হবে। তত দিন বাবারমণের জাটকে তদারক কবিস, দয়া করে। কারণ এখানকার প্রাকৃতিক আকর্ষণের চেয়ে পারিবারিক আকর্ষণ বেশি। কবে বাবো তার ঠিক নেই। 'বত্মা'র কাজ কত দূর? চিঠির উত্তর দিস।

অঃ জঃ।

পরম হান্তাপ্পন,

অঃ—আমার তবু ভেতরে দীর্ঘ রাঁচি খুব বাভাবিক, আর আমিও তোমার রাগিকে সমর্থন করি। কারণ আমার প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই, বিশেষতঃ তোমার স্বপক্ষে আছে বখন বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ। কিন্তু চিঠি না লেখার মত বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা সম্ভব হ'তো না, যদি না আমি বাস ক'রতাম এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে; তবুও আমি তোমাকে বাগ করতে অস্বীকার করছি। কারণ কলকাতার বাইরে একজন রাগ করবার লোক থাকলেও এখন আমার পক্ষে একটা সাধনা যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কিছু ঘটেনি, তবুও কলকাতার নাড়ী ছেড়ে বাওয়ার সব কটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত আমি প্রত্যাক করছি।—দ্বানায়মান কলকাতার ক্রমশঃ স্পন্দনধ্বনি শুধু বাত্মার আগমনী ঘোষণা করেছে, আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে বাধিত জননীর মত সাইরেণ নির্ধ্বাস কেলছে। নগরীর বৃষ্টি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্তে প্রস্তুত হ'চ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক, এই হ'লো কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কি না; জানি না ডাক বিভাগ তত দিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ কল্পনাসে প্রতীক্য করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অত্মে জাপানী বিমান দেখে আতঁনাদ ক'রে উঠবে সাইরেণ সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে।

প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক একটি দিন বেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ। আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সাম্যো। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অদ্ভুতপূর্ণ মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবেত অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত ক'লকাতা হীরে হীরে তলিয়ে বাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, ভূমিও কি তা বিশ্বাস করে, অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, এক রহস্তময়ী নারীর মতো, ভালোবেসেছিলাম শ্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উন্মনিভূ বৃকের সাগিঘো; তার স্পর্শে আমি জেগেছি; তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকবো না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতার ব'সে কলকাতাকে উপভোগ করছি। সত্যি, অরুণ, বড়ো ভালো লেগেছিলো পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোটো পৃথিবীর করুণ। বাঁচতে ইচ্ছা করে কিন্তু নিশ্চিন্ত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিন্ত হবো।

"মরিতে চাহি না আমি স্বপ্নের ভূবনে।" কিন্তু মৃত্যু বনিমে আসছে; প্রতিদিন সে বড়বর ক'রছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা দিবাটি পৃথিবীর সঙ্গে মূল্য যে দিতেই হবে।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটেবে, শুভ তবন থাকবে না আমি, থাকবে না আমার কণিতম পরিচর। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।—এই আমার আজকের সাধনা।

তুমি চলে যাওয়ার দিন আমার দেখা পাওনি কেন জানো? শুধু আমার নিশ্চিন্ত উল্লাসীনতার জন্তে। ভেবে দেখলাম, কোনো লাভ নেই সেই দেখা করার, তবু কেন মিথিমিছি মন খাণাপ করবো?—

—তুমি চলে যাওয়ার পর আমি তারাশংকরের ‘ধাত্রীদেবতা’ বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র-অচিন্তার ‘বনত্রী’ প্রবোধের ‘কলরব’ মণীন্দ্রলাল বসুর ‘রক্তকমল’ ইত্যাদি বইগুলি পড়লাম। প্রত্যেকখানিই লেগেছে খুব ভালো। আর অনাবশ্যক চিঠির কলবর বুদ্ধির কী দরকার? আশা করি তোমরা সকলে, তোমার মা-বাবা-বোন—ইত্যাদি সকলেই দেখে ও মনে সুস্থ। তুমি কি লিখলেটিকলে? তোমার মা গল্প-গল্প কিছু লিখছেন তো? তা হ’লে আজকের মতো লেখনি কিছু চিঠির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ২৪শে শৌ ৮৮

স্বকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন  
বেলেঘাটা—কলকাতা  
—ফাস্তনর একটি দিন।

অঙ্গু—

তোর অতি নিরীহ চিঠিখানা পেরে তোকে কমা করতেই হ’লে কিন্তু তোর অতিরিক্ত বিনয় আমাকে আনন্দ দিলো এই জন্তে যে, কমাটা তোর কাছ থেকে আমারই প্রাপ্য। কারণ তোর আগের ‘ডাক-বাহিত’ ছিলো। বাই হোক, উল্টে আমাকে দেখছি কমা করতে হ’লে। তোর চিঠিটা কাল পেরেছি, কিন্তু পড়লুম আজকে সকালে; কারণ পরে ব্যস্ত করছি। বাস্তবিক, তোর দুটো চিঠিই আমাকে প্রভুত আনন্দ দিলো। কারণ চিঠির মত চিঠি আমার কেউ দেখে না এবং এটুকু বলতে বিধা করবো না যে তোর প্রথম চিঠিটাই আমার জীবনের প্রথম একখানি ভালো চিঠি, বার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা। তোর প্রথম চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি, তোর মতই অলসভায়, এবং একটু নিশ্চিন্ত-নির্ভরতাও ছিলো তার মধ্যে। এবারে চিঠি লিখছি এই জন্তে যে, এতোদিন ভর পেয়ে পেয়ে এবার হরিয়া হয়ে উঠেছি মনে মনে।

কাল বিকেলে তোর বাবা টিকানা খুঁজে খুঁজে অবশেষে তোর চিঠিখানা আমার হাতে গিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তোর মার কাছে। কিন্তু তুই বোধ হয় এখনও এখনো পাসনি যে তাদের আসের সেই লতাজ্বালিত, তুণ্ডামল, স্নন্দর বাড়িটি ভ্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার, যেখানে কেটেছে তাদের কত বর্ষাবৃত্তর সন্ধ্যা। কত বিরস তুপূর, কত উজ্জল প্রভাত, কত চৈতালী হাওয়ায় হাওয়ার গোমাক রাত্রি। তোর কত উক করানর, মিথি পক্ষপে বিজড়িত সেই বাড়িটি, ছেড়ে দেওয়া হলো আপাত-নিশ্চয়জনতার। তোর যা এতে পেরেছিল গভীরতম বেদনা, তার ঠিক আপন জায়গাটিই বন তিনি হারানেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে বেন এক নিকটমত দায়ী স্বরূপ হয়ে উঠলো প্রকৃতির প্রয়োজনে। শতশত

জমকোলাহল যথিত ইচ্ছলবাড়িটি আজ নিহত নিহত। সত্যিই বা মার্য মত তার অবস্থা। তাদের অজ্ঞত স্মৃতিতে তার প্রতিটি প্রত্যেক বেন তাদেরই স্মরণের জন্ত উদ্ভূত, সেখানে এখনো বাতাসে পাওয়া যায় তাদের স্মৃতির সৌরভ; কিন্তু সে আর কত দিন? তবু বাড়িটি বেন আজ তাদেরই ধ্যান করছে।

তাদের নতুন বাড়িটার গেলুম। এ বাড়িটাও ভালো, তবে ও বাড়ির তুলনায় নয়। সেখানে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তোর বাবা এবং মার সঙ্গে প্রচুর গল্প হ’লো। তাদের গত জীবনের কিছু কিছু শুনলাম; শুনলাম স্নন্দরহনের কাহিনী। কালকের সন্ধ্যা কাটলো একটি পরিব্রাজকের কথালাপের মধ্যে দিয়ে; তার পর তোর বাবা-মা তোর ছোট ভাই আর আমি গিয়েছিলাম তাদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে এবং এই জন্তেই এই সবকিছু আমার এত কথা লেখা। দেখলাম শুক বিষয়ে চেয়ে চেয়ে, সত্যিই যোগ-ব্যাখ্যার বিরহিতর মত বাড়িটার এক অপূর্ণ মুহূর্তমানতা। তার পর কিরে এসে হ’লো আরো কথা; কালকের কথাবার্তার আমার তোর বাবা এবং মার ওপর আরও নিবিড়তম স্রব্ধ উদ্ভূত হ’লো। (কথাটা চাটুবার নয়)। তাদের (তোর এবং তোর মার) দু’জনের লেখা গানটা পড়লুম; বেশ ভালো। কালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম ‘পাঁচটি ফাস্তন সন্ধ্যা ও একটি কোকিল’ গল্পটি। আজ তুপূর সেটি পড়লুম। বাস্তবিক, এ রকম এবং এই বর্ণনের গল্প আমি খুব কম পড়েছি (তালোর দিক থেকে), কারণ ভাব এবং ভাবার মুহূর্ত হয়ে গেছি আমি ‘পাঁচটি ফাস্তন সন্ধ্যার’ সঙ্গে একটি কোকিলের সম্পর্ক একটি নতুন বর্ণনের বিনিয়; গল্পটা বিষ-সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।

বাই হোক, এখন তোর খবর কি? তুই চলে আর এখনো, কাল তাদের বাড়িতে তোর অভাব বড় বেশি বোধ হচ্ছিল, তাই চলে আর আমাদের সান্নিধ্যে। অজ্ঞিতের সঙ্গে পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা সে জিজ্ঞাসা করে। তুপূর আজ এসেছিলো—একটা চিঠি দিলো তোকে দেবার জন্তে—আর একটু আগে তাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম বাড়ির পথে।

ভামবাজার প্রায়ই বাই। তুই আমাকে তাদের ওখানে যেতে লিখেছিল, আজ্ঞা চেষ্টা করবো, তুই আবার মারামারি করেছিস না কি? এ সব তো ভালো নয়।

চিঠিটা লিখেই তোর মার কাছে হাবো। বাস্তবিক, তোর যা তোর জীবনের স্বর্গীয় সম্পদ। তোর জীবনের যা কিছু তা যে তোর এই মাকে অবলম্বন করেই, এই গোপন কথাটা আমি জেনে কেলেছি। তুই কিসের স্বগড়া পাঠালি বুঝতে পারলুম না। তুই চলে আর, আমি ব্যাকুল হয়ে ডাকছি, তুই চলে আর। প্রীতি-ঐতি নেওয়ার ব্যাপারে বন্ধন আমাদের সাধ্য নেই, এখন বিদায়।

প্রকান্ত ভট্টাচার্য।

বেলেঘাটা

২২শে চৈত্র, ১৩৪৮

সবুর মেওয়াফল-গাতার—

অঙ্গু, তোর কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশা করা আমার উচিত হয়নি, সেজন্তে কমা চাইছি। বিশেষতঃ, তোর বন্ধন রয়েছে অজ্ঞত অবসর—সেই সময়টা নিছক ব্যস্ত করে বলা কী আমার

উচিত? সুতরাং তোর কাছ থেকে চিঠি প্রাপ্তিই হুবাশা আমার বিচলিত কবেনি।

কোন একটা চিঠিতে আমার ব্যক্তিগত অনেক কিছু বলার থাকলেও—।

একদিন তোর মার সাইরখলাত করলুম গভীরভাবে এবং আর যা লাভ কালুম তা এই চিঠিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। অনেক আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম যা জানার দরকার ছিল আমার। আর তোর বাবার সরল মেতে আমি মুগ্ধ—।

তোর খবর সমস্ত আমার জানা, সুতরাং কোন প্রশ্ন করবো না। আমার এই চিঠির উত্তর বত দিন পরে গুলি দিস—তবে না দিলেও ক্ষতি নেই। ইতি—  
সুকাশ ভট্টাচার্য্য।

২০ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড

২৮ ডিসেম্বর: ১৯৪২

বেলেঘাটা

সোমবার, বেলা ২টো

অরুণ,

দৈবক্রমে এখানে বেঁচে আছি। তাই এতদিনকার নৈশঙ্খা ঘূর্ণির একটা চিঠি পাঠাচ্ছি অপ্রত্যাশিত বোমার মতই তোর অভিমানে 'স্বরক্ষিত' চূর্ণ চূর্ণ করতে। বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়, তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য তেল করে কৃতিত্ব দেখাবো তার উপায় নেই, যেহেতু সাবানপত্র বহুপুর্বেই সে কাঙ্ক্ষিত দেবের বেথোছে। যাক, এ সবকিছু মনুত ক'রে আর বিলাপ করবো না, যেহেতু গত বছরে এমন সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীকতা যথেষ্টই ছিল, ইচ্ছা হ'লে পুরোনো চিঠির তাড়া খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীকতা নয়, দুর্ভাগ্য। তখন ভয়ের কুললী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময় বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিলো না, তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাবার আড়ম্বর প্রকাশ অংশ গ্রহণ করেছিলো, আর এখন তো বর্ণনায় বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেলো, ব্যাপারটা ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুলজের আধিপত্যও আক্রমণের সংগে সংগে বাড়ছে। তোর এখনকার সঠিক সাবান পেয়েছি কি না জানি না, তাই আক্রমণের একটা ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন, বিদিশপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে) চতুর্থ দিন ডালহৌসী অঞ্চলে—(এই দিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে, আর নাগরিকদের সবচেয়ে তীব্র উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়, কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনো অজ্ঞাত। ১ম, ৩য় আর ৫ম দিন বাড়িতেই কেটেছে, কোঁতুলী আনন্দের মধ্য দিয়ে। ২য় দিন বাগিচায় মামার বাড়িতে মামার সংগে আড্ডা দিয়ে কেটেছে, ৪র্থ দিন সন্তানান্তরিত শালা-বৌদির সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে। সেদিনকার ছোট বর্ণনা দিই কেন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় গুলী ছিলো, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কারণ, কয়েক দিন আগে দাদার নতুন বাড়িতে বাবার আয়তন অগ্রাহ্য করে নিজের পৌত্রবধূর ওপর বিকার এসেছিল, তাই ঠিক করলাম, নাঃ, আর বৌদির সংগে আলাপ ক'রে কিরকোই। যে বৌদির সংগে আগে এত শ্রীতি ছিলো, বার সংগে কত দিন লুকোচুরি খেলোছি, সীতার কেটেছি, বাতরিন এবং বহু রাতদিন বকবক করেছি, সেই বৌদির সংগে কী আর সামান্য দরজা খোলার ব্যাপার নিয়ে রাগ ক'রে থেকে লাভ আছে? অবিশ্রিত এতখানি উল্লাসতার মূলে ছিলো সেদিনকার কর্তীনতা, যেহেতু Examination হয়ে গেছে, রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব আরই ছিলো। সুতরাং মহাভয় (!) শুকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর বৌদির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে দাদা না থাকায়, বৌদিই প্রথম কথা করে লক্ষ্য জেতে দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিলেন, তারপর ক্রমশঃ আরে আরে বহু কথা করে অন্তরক হয়ে বৌদির স্বহস্তে প্রস্তুত অরব্যাজনে পরিতোষ লাভ করে, তারপর কিছু রাজনৈতিক কাজ ছিল, সেগুলো সেরে সন্ধ্যার বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এক সন্ত আলাপের ব্যাপ্তিতে বৌদির পরিত্রাণিত চা পান করে আবার বকবক করতে লাগলুম, ৮-১০ টায় সময় বাড়ি বাবো ভেবে উঠলাম এবং সেদিন সেখানে থাকবো না শুনে বৌদি আত্মরিক দুঃখপ্রকাশ করলেন। কিন্তু দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হলো না। কিছুকণ গর করার পর ১-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধ হয় সাইরেশ বাজছে, রেডিও চমকিলো, বন্ধ করতেই সাইরেশের মর্মভেলী আর্তনাদ কানে গেলো; সংগে সংগে দাদা তাড়াতাড়ি করে সবাইকে নিচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হেঁচকি ক'রে বাড়ি মাং করে দিলেন। এমন সময় রক্তমুগ্ধ জাপানী বিমানের প্রবেশ। সংগে সংগে সব কিছু শুরু। আর শুরু হয়ে গেলো, দাদার হায় হায়, বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপনী। ক্রমাগত মহাব্যমূহুর্ভগলো বিবল মুহূর্তমানতার, নৈরাশ্রি বিধে বিধে যেতে থাকলো আর অবিশ্রান্ত এয়োয়নের ভয়াবহ গুলান, মেশিন গানের গুলী, আর সামনে পেছনে বোমা ফটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একবাগে কান পেতেছিলো সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সবকিছু ভীষণ রকম সন্নিহিত। ক্রান্তবগে বোমার এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোম পড়ে, আর দেহ-মনে চমকে উঠি, এমনকি ক'রে প্রাণপণে প্রাণের সামলে তিন দশা কটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তা যেন আর শেষ লগা হবে না, অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয়নি, বার জন্ত এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।

বোমার ব্যাপার বর্ণনা করতে ছুঁপাতা লাগলো, কাগজে এত নাম সন্ধ্যাও আরো ছুঁপাতা লিখছি।—

'সংকলন' গ্রন্থটি 'একপুঞ্জ' নাম নিয়ে বৃক্সেস, স্কিফ, প্রোফ্রজ অঙ্কিত দস্ত, সময় সেন, অচিন্তা, অরুণাশংকর, অমির চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলায় ৫৫ জন কবিব কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমার একটি কবিতাও সসংকেতে স্থান পেয়েছে। ভালো কথা, জুবুর একখানা 'কবিতা' তোর কাছে ছিলো, কিন্তু তোর বাবার কাছ থেকে সেখানা এখনো পাইনি তাই অপার ক'রানোও দেওয়া হয়নি;—অত্যন্ত লক্ষ্যের কথা।



এবার 'আমাদের প্রীতি সহানুভূতিশীল' মেয়েটির কথা বলছি।  
 তাকে চিঠিতে জানানো ঘটনার পর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি ব্যাংকার বাড়িরেছিলেন, আমাকে দেখেই বিস্ময়ে, উচ্চাঙ্গে মগ্ন হয়ে উঠলেন, আমিও আবেগের বস্তুর একটা নমুনার মুখে দিলাম, তিনিও প্রতিদানার্থে 'ক'রে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দরজা খুলে দিলেন, আমি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' সংগে এনেছিলাম তাঁকে দেবার জন্যে। সেখান দিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম এবং অনেকগুলি গল্প করার পর বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর প্রীতি কথার বৃদ্ধিমত্তা, সৌহার্দ্য এবং সাহসের গভীর স্পর্শ পেয়েছিলাম এবং বিদায় নেবার পর পথ চলতে চলতে বার বার মনে হয়েছিল, সেদিন যে কথোপকথন আমাদের মধ্যে হয়েছিল, তার মত মূল্যবান কথোপকথনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসেনি। মেয়েটি নিরুদ্ভাৱ একটি অপরূপ বিকাশ, তার মধ্যে, সহরে চট্টলা, কুটিলতা, বাক-বিব্রণের তাঁর আকর্ষণের কোন আভাস পেলাম না,

অথচ তাঁর মধ্যে স্রষ্টা ও সংস্কৃতির অভাব নেই, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার এক গভীর নীরবতা গ্রাম্য-আবেগের মত সর্বদা বিরাজমান। তবুও সেদিন সূর্য হ'রে কথা বলতে পারিনি, যেহেতু আমি পুরুষ—তিনি নারী।—

এখন তোর খবর কী? শরীর কেমন? গ্রাম্য জীবন কী খাতস্থ হয়েছে? তোর বাবা যে করে এখান থেকে সেলেন, আমি জানতেও পারিনি। তোর ভাই-বোন বাবা-মার কুশল সংবাদ সমেত একখানা চিঠি, যদি খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তো পাঠাস, নতুবা ঘেরী করে পাঠাসনি, কারণ বোম্বাক বিমান সর্বদাই পৃথিবীর নব্বরতা ঘোষণা করছে। তোর উপভোগ্যতার বাকী কত? \*

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

অরুণাচল বস্তুর সৌজাত্যে।

## গ্রীক পাত্রের সম্পর্কে

(জন কীটসের 'Ode to a Grecian Urn')

শোন অরি নৈশকোর কুমারী স্তন্য!  
 হে তুমি পালিতা কল্পা স্তব্ধতা ও মধুর কালের,  
 আরণ্য ঐতিহাসিকা, একমাত্র তুমিই সন্ম  
 রচিত প্রাণময় আখ্যান অসাধ্য বা যোনের কাব্যের :  
 পুষ্পত্রয়ী কোন্ কীর্তি অই উৎকীর্ণ তোমাতে?  
 সেবতা না মানবের? না ও-কীর্তি যুগ-অধিকারে?  
 কোন্ সে স্থানের—টেশ্পী না আর্কেডি চারণ-ক্ষেত্রে?  
 কোন্ দেব, কি নর গুহা? কি নারী পালায় লজ্জাকরে?  
 কোন মন্ত উৎসব? এড়ানো কোন সে অমলসে?  
 কেন বাঁশি কেন ভেরী, কেন এত উল্লাস উথলে?

ক্লান্তরাগ প্রাণ হয়ে, অজ্ঞাত আরও বহু ভূগে  
 স্রমধূর; তাই, সজোরে মধুর বাঁশি বাজো;  
 অবগু-ইন্ডিয়ে নাহি পশিলেও, কিন্তু প্রিয়তর,  
 কল্পনার উদ্যোতনে মৌন তব খুঁয়েই বিরাজো :  
 ভূগো স্তম্ভর্শন বুঝ বৃক্ষতলে, পার না ধামাত্তে  
 ভব গর্ভন, বিটলী ও নিশাঙ্গ না হয়;  
 অধীর প্রেমিক, তব ব্যর্থ, ব্যর্থ চূর্ণ প্রয়াস  
 সাক্ষ্যের লগ্নে এসে—তবু, যেন খেল নাহি রয়;  
 জ্ঞান সে ত হ'তে নারে, বস্তুপি না পেলে সিদ্ধিরূপ,  
 ভালবেসে বাওরা তব চিরকাল, প্রিয়া অপরূপ।

আহা, বস্ত, বস্ত শাখা। নাহি তব পত্রবিমোচন  
 কলাপি না পার তুমি বসন্তের বিদায় রচিতে;  
 আর, কুল বাতরিয়া, স্নানিত তোমা করে না পরশ  
 নব নব সুর, স্রষ্টা করে বাও বাঁশরীধানিতে।  
 আরো সুরী। প্রেমাস্পদ। আরো সুরী, সুরী হে দরিত,  
 স্নানিত কবোক্তা, অকুরান বৈভব প্রেমোদয়,

স্বয়ং আরও চাহে, যৌবনের নিঃশেষ না হয়,  
 নির্ধাসিত হোঁধা হ'তে ভোগের আসক্তি মানবের  
 যে-আসক্তি চুঃখময়, একমাত্র প্রাপ্তিই যে জ্ঞান,  
 বৃত্তিকে বিভ্রান্ত করে এবং রসনার দাহ জ্বালে।

বজ্রের স্থলিতে বল উপনীত আজিকে কাহার?  
 সূর্য বেনীতে কোন্ দেবাজিক, নহ গম্বিষ্ঠিত,  
 যে নিতেছ গো-বংশটি হাথারবে-ডাকা নভপানে  
 কৌম গলদেশ তার মালিকায় করি বিদ্বিষ্ট?  
 নদীতট, সিঁচুতীরে কিংবা এক অচল উপরি  
 গঠিত শহর কোন দুর্গ-সংবলিত শান্তিময়,  
 অধিবাসী-গরিতাক্ত আজিকে কি মজল-প্রত্নাবে?  
 আর, হে শহর, তব সরণিরা সকল সময়  
 মল্লযাযিহীন রবে; বলিবার নাহি কোন জন  
 কেন গো বিজন তুমি, অসম্ভব পুনরাগমন।

অরি গ্রীক আধারিণি। স্তলকণ্ঠে! ক্লপদক বার  
 মর শরীরে একে দিয়েছিল বিশোভন চাহি  
 নয়নারী, বৃক্ষশাখা এবং দলিত তৃণদল,  
 নিম্বতা শিখালে বুঝা অমূল্যানে প্রয়োজন সাহি  
 যে শিক্ষাক্ত অনন্তেরও : শোন, মৌন গ্রামীন কবিতা,  
 কাল দেহে এই নরবংশ হবে বিলুপ্ত যদিও  
 অধিচল রবে তুমি, অনাগতদের হৃদয়ে নব  
 স্তম্ভ-সম্মিত এই বাণী তুমি প্রচার করিও,  
 সত্যই স্তম্ভ, আর স্তম্ভই সত্য—শেষ কথা  
 জ্ঞাতব্য ইহাই মাত্র, হে পৃথিবী, হও অবগতা।

অরুণাচল : জীবনকথক দাশ।



# শ্রী শ্রী গৌরী মাতা

শ্রীকৃষ্ণদেবসেন

প্রায় বর্ষ পূর্বে এক মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পুজনীয়া গৌরীমায় আবির্ভাব। বাংলা ও বাংলাবীর চিরমহনীয় পুণ্যময়ী তিথি এই মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী। আজ প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে একচাঁকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ এই পুণ্য তিথিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাল নিতাই গ্রীষ্ম বিচার না করিয়া নাম ও প্রেম বিলাইয়াছেন, বাহারা দীন দুঃখী দরিদ্র নিঃস্ব কালান্ধ, সমাজে হেয় অস্পৃহ, প্রেমদান্দ্র নিতাই অবাচিত ভাবে তাহারিগকেও প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। এই প্রেমদানের অর্থ কি? সমাজের স্বার্থপর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া উশেক্তিত উপেক্ষিতা নরনারীকে মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার অধিকার দান। বাহারা উন্নত পরিচরিতা সরল তাঁহারী শ্রীমন্তানন্দের অহেতুক কৃপায় রসধন রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণাবনন্দেব লীলা আবাদন করিয়া ভাগবত ধ্যানে তন্ময় ও তদগতচিত্ত হইয়াছেন। ইহাদের দ্বারাই আবার বাংলা-দেশে ধর্মপ্রচার ও সমাজসংস্কারের প্রবল আন্দোলনে এক নবভাবের উদার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হইয়াছিল, বাংলা দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরীমা অল্প বয়সে জাতিবর্ণ ধনীনির্ধন নির্বিকারে তাঁহার বাৎসল্য প্রেমে সকলের হৃদয় সিক্ত করিয়াছেন। এই আবালা ব্রহ্মচারিণী কঠোর তপস্বিনী পুত্ৰভাবা সন্ন্যাসিনী গৌরীমা রাজা-রানী হইতে সামান্য অসহায় দীনহীনা নারীকে পবিত্র ব্রহ্মপূর্ণ সম্ভাবণে শাস্তি ও আনন্দের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীদেবদেবী আশ্রম হইতে গৌরীমায় যে জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এ বিবেকে কোন সংশয় থাকে না। কোথাও তীর্থ পর্যটনকালে কোন রাজা ও রাণীর সম্ভাব-তাপস্বিত হৃদয়ে অভয় ও আশ্বাস দিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ প্রয়াগধামে অল্পকণ্ঠ্য পঞ্চভট্ট নারীকে শাস্তি ও আনন্দের পথে চালিত করিয়াছেন—দুবীকেশে নিঃজনে সাধন-ভজনের উপদেশে, কোথাও বিত্তশালী যতন তাঁহার ব্রহ্মপূর্ণ কঠোর আদেশে সুরাশান ত্যাগ করিয়াছে। আবার বারাকপুর আশ্রমের প্রতিবেশী মুচিরাম, গগন প্রভৃতি হাবর জাতীয় কত নরনারী তাঁহার বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তাহারী তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিত; সরল ভক্তিবিধানে তাহারী আধ্যাত্মিক পথেও অগ্রসর হইয়াছিল। মাতা ঘরে ঘরে শ্রীমা অমৃত্যুপদ্ম অস্ত্র-পুরচারিণীদিগের সহিত মিশ্রিয়া তাঁহাদের স্নেহভ্রূণের ভাগিনী হইয়াছেন, সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলকে সমবেদনা জানাইয়াছেন, খুঁই একমাত্র শাস্তির পথ, বাহা অবলম্বন করিলে মাহুকের সকল আলায়তন্য দূর হয়—ইহা মায়ের তেজঃপূর্ণ অভয়বাণীতে তাহাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল।

গৌরীমায় অপার্থিব মাহুসেহ, তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও সঙ্গাচার, তাঁহার ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠোর তপস্বী, তাঁহার তেজ ও কল্পার দৃষ্টি মাহুকে সহজেই আকৃষ্ট করিত, মুগ্ধ করিত, মানবদেহে তাঁহার দেবী উপলব্ধি করিত। এই কণ্ঠধ্বনিত সন্ন্যাসিনী যে বিবাহ

প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসিনীগণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যে অশুর্ক জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু বাংলার নয়, ভারতে নয়, সমগ্র জগতে দুলভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাংলার ইতিহাসে, ভারতের মহিমাময়ী মহিলাদের ইতিহাসে চিরমহনীয় গৌরীমায় নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেখবাগে বা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গৌরীমাকে প্রথম দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। স্মৃতিস্মরণীয় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মদেবসেন মহাশয় দাঙ্গিলি হইতে কিরীয়া আসিলে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পরিণত হয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে তিনি গৌরীমায় কথা উত্থাপন করেন। মুন্সেয়ে কষ্টহাদিগী ঘাটে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কিঞ্চপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিঞ্চপে তাঁহার আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চতর স্তরে সমাহিত দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নাট্য' (অর্থঃ তাঁহার নিত্যপুজিত শ্রীশ্রীমায়ের শালগ্রাম) ও ঠাকুরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অল্পবয়সে স্থানীয় লোকদের কিঞ্চপে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা আত্মপুঙ্খিক ভাবে তিনি আমার নিকট একে একে বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, গৌরীমা এখন বারাকপুরে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম



শ্রীশ্রীগৌরীমাতা

প্রতিষ্ঠা করিয়া রহিয়াছেন, এবং তিনি মধ্যে মধ্যে সেখানে যাবার নিকট যান।

গৌরীমাক দর্শন করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। কাবণ, তাঁহার নাম এবং তাঁহার অপূর্ণ জীবনকথা, তাঁহার ত্যাগতপ্তায় কথা পূর্বেই আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের মুখে শুনিয়াছিলাম। মহাত্মা রামকৃষ্ণ নব্বের প্রবীত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত” পাঠ করিয়া গৌরীমার আলৌকিক ভাবের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলাম। একদিন শনিবার বেলা দুইটার পর স্নেহেন্দ্রনাথ ও আমি ট্রেনে করিয়া বারাকপুর ট্রেনে গিয়া নামিলাম এবং তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে প্রায় দুই মাইল গিয়া আশ্রমের সমুখে উপস্থিত হইলাম। গলার ভায়ে নির্জনে বৃক্ষলতা-সমাক্রম, তপোবনের স্তায় স্থানটি। ভক্তিবঙ্গোদ্ভূত অন্তরে পর্ণকূটারে প্রবেশ করিলাম। পর্ণকূটার, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃত্তিকানির্মিত নয়। একটি ঘর, পূর্ব-শক্তিতে লম্বা, ইট-বাধানো ঘরের মধ্যে ও বারান্দা। বারান্দাটি সাগ-বাধানো, উহারই সমুখে একটা কাঁচা গোলপাতার ছাঁটনীতে মাটির বারান্দার, বাঁশের ছাঁচা-বেড়া।

ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া গৌরীমা দরজার সমুখে আসিয়া পাড়াইয়াছিলেন। আমার ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদম্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে ঠিক মায়ের মতই স্নেহ-বাৎসল্যে আদর করিলেন, আমি অপরিচিত হইয়াও তাঁহার কাছে যেন অনেক দিনের পরিচিতের মতই আদর পাইলাম। স্নেহের স্বতঃপ্রসূত হইয়া আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমাকে ঠাকুরের জন্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন।

মায়ের আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই স্থানটিকে শান্ত, গভীর ও পরিভ্রাতৃপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শ্রীগৌরীমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—লালপাড়যুক্ত গৈরিক বস্ত্রপরিহিতা, উজ্জলবর্ণা, হাতে শাখা, কপালে দিলুপ,—এক অপূর্ণ মহিমায়ী বাৎসল্য-প্রসূর্ণা দ্বাভূমুখি, আমার তখন কিশোরকাল উত্তীর্ণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, ছাত্রজীবন। সন্ন্যাসিনী মাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি প্রোচর পার হইয়া বৃদ্ধবয়স সীমারেখার পদার্পণ করিতেছেন। মায়ের চক্ষু দুইটি উজ্জল জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু স্নেহ-কল্পা সমন্বিত। মুখমণ্ডলে দিব্য ভাবের দীপ্তি, সমস্ত দেহটি তেজ-জ্যোতিঃ বেমণ্ডিত। আমাকে সন্ধান করিয়া মা বলিলেন, “বাবা, তুমি ঠিক ঠিক মায়ের ছেলে হও। আমাদের দেশে মাতৃজাতির কী কষ্ট, কী ব্যথা, তা আর তোমার আমি কি বলব। মাতৃজাতির ক্লান্তি যত দিন থাকবে দেশের উন্নতি হবে না। জেনো, মায়েরের ঠাসে রাখলে ধর্মকর্মও হবে না। আমি আসন্ন-হিমালয় পর্বটন করে দেখছি, সর্বত্রই মায়ের জাত অশমানিতা, উপেক্ষিতা, লাহিতা, এই অবস্থা যদি থাকবে তখন দেশের জাতের কোন স্বল হবে না। মায়েরের সেবা করলে তাঁদের আশীর্ব্বাদে ধর্মপথেও তোমাদের কল্যাণ হবে।”

আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, “ঠাকুর বলতেন, কামিনীকানন ত্যাগ করতে হবে। মেরেদের সঙ্গে মিশবে না।” ঠাকুরের এই নির্দেশের সঙ্গে পুত্রব্রাহ্মণ মাতৃজাতির সেবা কি করে করবে? এর মিল বা সামঞ্জস্য তো খুঁজে পাই না!

গৌরীমা অধিন সত্যে উত্তর করিলেন, “ঠাকুর যে মায়ের

জাতকে শ্রীজগদমহার মূর্তি বলতেন। তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ জগদ্বন্দনী জ্ঞান করতেন, প্রত্যক্ষ করতেন, তাঁদের সেবা করলেই জগদমহার সেবা হবে। কিন্তু মাতৃজাতির প্রতি কামিনী-বুদ্ধি করলে হবে না, এই কামিনী-বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে, ব্রাহ্মণের ভেতরে যে পুত্রভ্রাতৃ আছেন তাহেই আসক্তি ও ভোগ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। সেজন্য মেয়ে-পুত্র একসঙ্গে থাকতে নেই, ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে নেই। ঠাকুর যেমন পুত্রভ্রাতৃদের বলেছেন—কামিনীকানন ত্যাগ কর, তেমনি মেয়েদেরও বলেছেন—পুত্রবদন করনও বিশ্বাস করবি না। তারা মেয়েদের সরল দেখে কামনার বান্ধব প্রলোভনের জালে টেনে আনে। যুবতী মেয়েদের দেখে পুত্রবরা কত ঢা ঢা করে, ঠাকুর তা নকল করে আমাকে দেখিয়েছেন।

“ঠাকুরের আদেশেই আমি এই মায়ের জাত—জ্যাস্ত জগদমহার সেবার জন্তই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। এখানে মেয়েরা যখন থাকবে তখন কোন পুত্রব ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তোমাদের সেবা কি জান? এই আশ্রমের জন্ত বাইরে যেখানে মেয়েরা যেতে পারবে না সেখানে গিয়ে আমার কথামত তোমরা কাজ করবে। ঠাকুর আমার বলেছিলেন, ‘আমি জল ঢালছি, তুই কাঁচা চটকা।’ আমি তাঁকে বলেছিলাম, ‘এখানে তো সব কাঁচর, কাঁচা হবে কি করে?’ ঠাকুর তখন আমার দিকে তাকিয়ে কল্পবরে বললেন, ‘মা, তুই আমার কথা বুলি না। মেয়েরা বড় দুঃখী, ঘরে ঘরে তাদের কী কষ্ট, কী খালা, কী অন্যাচার, তা তোমাদের কি বলবো। ধর্ম কর্ম তারা করতে পারে না, ধর্মতত্ত্বও তারা বোঝে না। পুত্রবরা তাদের শুধু ভোগের সামগ্রী করে দেখেছে, তাদেরকে ধর্মশিক্ষা কেউ দেয় না। মা, তুই তাদের শিক্ষার ভার নে, ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের শিক্ষা, তাদের খালা দূর কর।’ ঠাকুর এমন ভাবে বললেন, যেন মেয়েদের দুঃখটা মেয়েদের বাখা আমার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘আমি অতি সামান্য মেয়েমানুষ, কখনো সংসারের জগালে পাড়নি, আমি একা কি করবো?’ ঠাকুর আমাকে অভয় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘ভয় কি, তুই কাঁচা চটকা, আমি জল ঢালবো, এর জন্তে তোকে গায়ে গায়ে ঘুরতে হবে না, টাউনে বসেই করবি।’

“তখন ঠাকুরের কথা অন্তরে প্রবেশ করলেও কার্ণাভ কিছু করতে পারি নি, নির্জনে সাধন-ভজন করার জন্তে নানা তীর্থে পর্যটন করেছি, হিমালয়ে, পাহাড়ের গুহার, বিজন প্রদেশে একা থেকে যখন তখন হ’য়ে ধ্যান করেছি, তখন অন্তরের ভেতর থেকে ঠাকুরের সেই বাণী ‘তুই কাঁচা চটকা, আমি জল ঢালছি’ ধ্বনিত হয়ে আমাকে ব্যাকুল চঞ্চল করেছে। আমি জানি, আমি ও তোমরা উপলক্ষ-মাত্র, ঠাকুর স্বয়ং আমার পোছনে রয়েছেন। ঠাকুরের সেই আদেশ পালন করবার জন্যই আমার এই ভ্রত, তাই ভিকে ধার্য ক্ষমাকারে এই আশ্রম স্থাপন করেছি। তোমরা মায়ের ছেলে, ঠাকুরের পায়সলে যখন এসে পড়েছ তখন তোমাদেরই কর্তব্য ঠাকুরের এই কাজের সহায়তা করা। মায়েরের জন্ত আমি ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে প্রস্তুত। চাই তোদের মত দুচুরাটো ছেলে বাবা আমার কথামত বাইরে বাইরে কাজ করতে পারবে। আমি তো সব জায়গায় যেতে পারি নে। তোরা সব চার দিকে বলবি, মায়েরের দুঃখ-দুর্দশার কথা, তাদের দুঃখ দূর করার কথা। এখানে কর্তব্য

চলবে না। আমাদের মেয়েরাই আশ্রম চালাবে। কেবল অর্থসংগ্রহ ও খবরদারি করার জন্যে পুস্তক-ছেলসের আবশ্যক।”

হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, সন্ন্যাসিনী যেন অপরূপ মাতৃভেজে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছেন। চক্ষু যেন অগ্নিকণা দীপ্তিমান, মুখে ককণামাখা, তীব্র আকুলতা রক্তরূপে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার উদীপনাময়ী বাণী নির্গত হইতেছে। সেই মহিমময়ী মাতৃমূর্তি দর্শন করিলে শ্রদ্ধার আশ্রম মস্তক নত হইয়া পড়ে।

অন্তঃপুর তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীকুরুর প্রসঙ্গ, শ্রীমায়ের প্রসঙ্গ, মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালীর কথা—এই সকল আলোচনা হইল। হঠাৎ তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আহা গো, কথার কথার তোমাদের পেসাদ দিতে তুলে গেছি। যুদ্ধের এসে বাস্তবের মুখ স্পর্শ করে গেছে।” এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দামুর প্রসাদ আনিয়া বলিলেন, “প্রসাদ গ্রহণ কর।” এখন যেন সরল সহজ মায়ের মতই মাতৃস্নেহধারায় আমাদের দিকে আগ্রত করিলেন।

প্রাচীন কালে যে গ্রীষ্মিকা প্রচলিত ছিল তাহা বেদে, উপনিষদে, পুরাণে, বৌদ্ধযুগে, মধ্যযুগে, এমন কি অষ্টাবিংশ শতাব্দীতেও অনেক প্রতিভাশালিনী বিদ্যা ও ব্রহ্মবাদিনী স্ববির উল্লেখ আছে। মন্ত্রভট্টা স্ববি শাশ্বতী, অপালা, যোবা, দেবীপুস্তকের স্ববি অমৃতকন্ডা বাক্য, ব্রহ্মবাদিনী সুলভা, বাচস্পতি, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণী এবং সন্ন্যাসিনী নারীর কথা বেদে উল্লেখ আছে। আমরা দেখিতে পাই, শতাব্দীচাৰ্যের সহিত যখন মণ্ডনমিশ্রের অধৈব্যবান সম্বন্ধে বিচার হয় তখন উভয়ের সম্মতিক্রমে মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যজ্ঞ এবং গায়ত্রীমন্ত্রেও নারীজাতির অধিকার ছিল। পরাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা সঙ্ঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সঙ্গীর্ণতা ও অংগপতন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মহাসংহিতা বলিয়াছেন, “বর নারীশূন্ত পূজাস্থে বসন্তে তত্র দেবতাঃ। বরৈতান্তান ন পূজাস্থে সর্বাঙ্গভ্রাতৃকলাঃ ক্রিয়াঃ।” স্মৃতিকার্য্য ইহাও বলিয়াছেন, “সংস্কৃত পিতৃভাষা গৌরবো নাতিরচ্যতে” অর্থাৎ সংসারে যেখানে নারীর সম্মান বা পূজা আছে সকল দেবতারাই সেখানে বিরাজ করেন, যেখানে তাহাদের সম্মান হয় না সেখানে সমস্ত কর্মই বিফল হয়। এমন কি, সহস্র পিতৃগণের অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক। পূর্বে আমাদের শাস্ত্রকারদের এইরূপ উল্লেখ থাকায় তখন মাতৃজাতির সম্মান দেখাইতে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইত না, বরং ইহা অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। খনা, লীলাবতী, হঠাৎ বিজ্ঞানজ্ঞানের নাম অনেকে জানেন। কিন্তু আমাদের দেশের অংগপতনের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিক্ষানীতি অনেকই লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দুই একজন মহীরসী নারী ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে সাধারণতঃ ব্রহ্মবাদি বৃদ্ধকারণেই মেয়েদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিত। “মেয়েমামুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে” এইরূপ ভাষ্য ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল।

এদেশে মেয়েদের অজ্ঞতা দূর করিয়া শিক্ষা প্রচার করিতে বিলাত হইতে প্রথম মিস্ কুক কলিকাতার আসেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তখন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইংরাজ

সম্পাদক যেভারেকু শিয়ারসনকে জানাইয়া দিলেন যে, হিন্দু সমাজে বালিকাশিক্ষাকে বাহিরে বিজ্ঞানপথে পাঠাইতে কেহ চাহে না। তৎকালে অস্তঃপুরে বিশেষী খুঁটান মহিলাদের প্রবেশ করিতে কেহ দিত না। অস্তঃপুর চার্চ মিশনারী সমিতির সহযোগে গ্রীষ্মিকা-প্রসারে মিস্ কুকের উদ্যোগ সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত গৌরমোহন তাঁহার গ্রীষ্মিকা বিধায়ক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে জানাইতেছেন, “প্রথম ইং ১৮২০ সালে জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দনবাগানে ‘বুনাইল পাঠশালা’ নামে এক পাঠশালা করিলেন। তাহাতে আগে কোন কষ্টা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না। এইরূপে এই কলিকাতার প্রায় পঞ্চাশটা গ্রীষ্মিকাশালা হইয়াছে। এই সব পাঠশালার সামান্য লেখাপড়া ও সৌবন্দ্য শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃষ্টধর্ম ও ভজনগানও বালিকাশিক্ষাকে শেখান হইত।”

খুঁটানদের বিজ্ঞানপথে পড়িতে গিয়া গৌরীমা বালিকা বয়সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এই স্থানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতার বিশপ রবার্ট মিলম্যান ও তাঁহার ভগিনী কুমারী জ্যাকলিন্ মেয়রা ডবলিনপুরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি বিজ্ঞানপথ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানপথে গৌরীমা শিক্ষা লাভ করেন। পাঠে তাঁহার অসাধারণ অগ্রগতি ও মেধা, তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্রগুণে কুমারী মিলম্যান এমনই মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে বিলাতে লইয়া গিয়া উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সেকালে কোন স্বর্ণধর্মী হিন্দু পরিবার তাহা অনুমোদন করিত না; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কিছুকাল পরে খুঁটান মিশনারীগণ তাঁহাদের বিজ্ঞানপথে খৃষ্টধর্মের কতকগুলি বালিকাশিক্ষকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন এবং এতদ্ব্যতীত হিন্দু প্রচলিত আচার্য্যনিষ্ঠা স্নেহসেবীর পূজা ও ধর্ম্যাহুতানের বিক্ষুব্ধ মন্তব্য করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদে বালিকা বয়সেই গৌরীমা ঐ বিজ্ঞানপথ ত্যাগ করেন, এবং সহপাঠী অনেক ছাত্রীও উক্ত বিজ্ঞানপথ ত্যাগ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মিশনারীদের বিজ্ঞানপথের সেকালে শিক্ষা বাগদেশে খৃষ্টধর্মেরই প্রচারকেস্বরূপে ব্যবহৃত হইত।

মিশনারী-প্রভাব প্রতিরোধকল্পে ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও ডাক্তার নেভার্গ বালিকা বিজ্ঞানপথ স্থাপন করেন এবং নানা স্থানে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় শ্রীবিজ্ঞানপথ স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সব বালিকা বিজ্ঞানপথে কেবল লেখাপড়া ও সৌবন্দ্য শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রচলিত হিন্দুধর্মের আদর্শ বা শিক্ষার দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। মাতাজী মহারাজী তপস্বিনী বালিকাশিক্ষার মধ্যে হিন্দু শিক্ষা প্রবর্তনে জগৎগুরু পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিক্ষা অবিবাহিত কুমারীশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্তোত্রপাঠ, নিবপূজা ও সমস্ত পূজা প্রভৃতির অন্বেষণ হইত, কিন্তু কুমারীশিক্ষার ভিতরে হিন্দুধর্ম উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দিত না, স্বদেশীয় ভাগ গ্রীষ্মিকার পূর্বেই মতই গাইয়া কর্ম কর্তৃ পরিসমাপ্তি হইত। সেমাজ নারীজাতি অধিকাংশই সামান্য আচার অনুষ্ঠান ছাড়া সমস্ত বিশেষ ভাবে ধর্মের উচ্চ আদর্শের সহ্য রাখিত না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, মেয়েদের এই অসহায় পরিস্থাপন

ও দুর্দশা দেখিয়া খ্রীষ্টীকুর রামকৃষ্ণের তাহাদের বেদনা অনুভব করিতেন, বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁহার গুরুজ্ঞাতাকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ঠাকুরের সবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “এবারে মাতৃভাষা তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন—তিনি যেন আমাদের মা—তেনাম সকল মেয়েকে মার ছাড়া বলে দেখতে হবে, ভারতে দুই মহাপাণ—মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীব জলোকে পিষে ফেলা—He was the saviour of women, saviour of the masses, saviour of all high and low.”

গৌরীমার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নারীজাতির চুলনা প্রত্যাক করিয়া তাঁহারও স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, খ্রীষ্টীকুরের বাণী ও আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি এই সময় এক নিঃসঙ্গল অবস্থায় ‘ঠাকুর জল ঢালবেন’ এই আশ্বাসে ও ভরসায় বারাকপুরে গঙ্গাতীরে নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন, ‘শুধু কয়েক জন নিরাক্ষর্য্যকে আশ্রমে রাখিয়া ধর্মশিক্ষা দিলেই চলিবে না, ঠাকুর যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইবে না। শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে প্রকৃতপক্ষে চরিত্র গঠন, ধর্মসাধন এবং ন্ত্রীজাতির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইবে না, বর্তমান যুগে শিক্ষার মূল আদর্শ কি হইবে? এক দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ দ্রোণকূলের মধ্যে প্রচার হইতেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাভাল পাশ করিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল হইল—এইরূপ ব্যগ্রা জনগণের মনে বন্ধমূল হইতেছে, অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধীরা ইহার বিপক্ষে ঈড়াইয়া প্রাচীন ধর্মের লোহাই দিয়া শুধু রক্তন সোমন যবগৃহস্থালীর কাজ এবং কিছু শুভকাজে ব্রুখহ করাই নারীশিক্ষার চরম বলিয়া মনে করিলেন।

গৌরীমা দেখিলেন, এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে কিন্তু চরম আদর্শ থাকিবে—ধর্ম, আত্মহুত্বিতা বা অহুত্বিতাক্ত জ্ঞান। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে চাই লোকবল, অর্থবল, এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা। উচ্চতাব্যসঙ্গার শিক্ষার্থীরা। শুধু পবিত্রত্বভাবা শিক্ষার্থীরা গঠন হইবার জন্য তিনি মাতৃজাতির মধ্যে হইতে কয়েক জনকে নির্বাচন করিলেন। তাঁহাদের সাধন-উন্নতির অনুসরণ বাহাতে হইতে হয় সেজন্য তাঁহাদের নিকট খ্রীষ্টীমা সাহায্যের বার এবং খ্রীষ্টীকুরের অপূর্ণ আদর্শ ও ভ্যাগ এবং বাণী দিনের পর দিন মুখে ধরিতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা তীর্থে পর্যটন দিয়া বাহা দর্শন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হাদিসকে চলাইতেন, মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী ও পুণ্য স্থানগুলির মহারসী নারীগণের কথা গল্পগুলো তাঁহাদিগকে হইতেন। ইহাতে শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষার্থীরা উভয়েই একটা নতুন আদর্শ জীবন উৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত হইত। এই কথার বলেই আশ্রমে সন্ন্যাসিনীদের মূল প্রতিষ্ঠার স্থানা

প।  
বারে বারে বধন এই কার্য্য বারাকপুর আশ্রমে চলিতেছিল। রক্তপদ উত্তাপী সন্তান গৌরীমাকে আহ্বান জানাইলেন,

কলিকাতা মহানগরিতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে। তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তিনি উত্তর-কলিকাতায় গোয়া-বাগানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং একটা কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিলেন। এই সময় এক দিকে বালিকা বিদ্যালয় ও আশ্রম পরিচালনার ব্যয়, ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপরাধণা শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ তৎসঙ্গে মাতৃভাষার প্রচার এবং অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে আশ্রম ও ন্ত্রীশিক্ষার জন্য সাহায্যের আবেদন, এবং তাঁহাদের ভিতরেও মহান উদ্দেশ্য স্বরূপ করাইবার ঐকান্তিক চেষ্টা—এই প্রকার কত চিন্তা কত কাজ মাকে করিতে হইত, তাহিলে বিম্মিত হইতে হয়। ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে বিম্মিত হইলে তাঁহাকে নিরুৎসাহ অর্থক্লান্তা ও নানাবিধ ধর্মসংঘাতের মধ্য দিয়াও অপরিসীম বৈধ্য ও দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যে সকল সন্তান তাঁহার কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন—এই সব বিম্ম-বজ্রের মধ্যেও গৌরীমা বীর স্থির। দেখিয়াছেন—খ্রীষ্টীকুরের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভরতা, মনে-প্রাণে তাঁহার শ্রুত বিশ্বাস ও পরার্থে আত্মবিসৃতি। তিনি সন্তানদের বলিতেন “ভয় কি? এই কাজ কি তোমার আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার হচ্ছে? তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। খ্রীষ্টীকুরই জল ঢালছেন ও জল ঢালবেন। আমরা শুধু মাটি চটকাব, অর্থাৎ তাঁর কাজ করে যাব”।

এমতাবস্থায় মায়ের নিকট কথের উপদেশ ও তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সকলের স্বল্পে উৎসাহের একটা বিদ্যুৎ চমকের মত প্রেরণা খেলিয়া বাইত। তাঁহাদের দেহ-মনে শিরায়-উপশিরায় উৎসাহের প্রবাহ খেলিয়া বাইত, এবং সকলে দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্মপথে অগ্রসর হইতেন। বেশির মনোবিগল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মায়ের সম্পূর্ণ আশ্রিতা তাঁহার মর্মস্পর্শী কথা এবং মাতৃজাতির দুর্দশা ও শিক্ষাহীনতার কথা ব্যাখ্যাত হইতেন এবং অনেকেই সহানুভূতিপূর্ণ স্বপ্নে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাহারা হিন্দুমানির নিষ্ঠা ও প্রচলিত ধর্ম্মাভিমান আত্মাহীন ছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ এই কার্য্যে সাহায্য করিতেন। সত্যীন্দ্র রঞ্জন দাস বিনি তৎকালে বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন এবং পরে ভারতের বড়লাটের আইনসচিব হইয়াছিলেন, তিনিও মায়ের আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন। একবার জৈনকা দানীলা মহিলার বাড়িতে জৈনক ব্যক্তি বিম্মিত হইয়া সত্যীন্দ্ররঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, “আপনিও গৌরীমার কাজে এভাবে নেমেছেন?” তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, “জগতে এমন অনেক কাজ আছে যা সাধারণ ভূমিতে ঈড়িয়ে মানুষ জাতিধর্ম্ম-নিবিশেষে করতে পারে। মানুষের মত ও পথের বিভিন্নতা তো থাকবেই, তাতে কি এসে-যায়? আমরা ইচ্ছা করলে সবাই মিলে-মিলে কত কাজ করতে পারি। সর্বস্বার্থ্যাগিনী সন্ন্যাসিনী মাতাজী যে উদ্দেশ্যে কাজ করছেন তাঁর ভক্ত আমি ব্রাহ্ম হইলেও বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষে করব, এতে আর আশ্চর্য্য কি? এখানে ব্রাহ্ম ও হিন্দুর কোন কথা নেই”।

আজ খ্রীষ্টীগৌরীমাতার শততম জন্মবার্ষিকী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অসৌক্যিক জীবনের ও আদর্শের অনুধ্যান করিতেছি। বাংলা দেশে অতীতে এবং আধুনিক কালেও কোন সন্ন্যাসিনীদের

ছিল না। কতি কোথাও দুই-একজন সর্বভাগিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ত্রুট্যাবিধী ও সন্ন্যাসিনী-সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষে গৌরীমঠ প্রথম করেন। এবং এই সন্ন্যাসিনী-সংঘের আদর্শ শ্রীশ্রীমা সারলা দেবী।

অনেকেই জানেন—শ্রীশ্রীমা ভক্তদের নিকট বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীমাকুর তাঁহাকে মাতৃভাবের পরিপূর্ণ বিব্রহরূপে বাখিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে ঠাকুরের মহানামাধির পরেই তাঁহারও দেহত্যাগ হইত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছেন, “সংসারের লোকগুলো কিলবিল কচ্ছে, তোমাকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।”

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে তাঁহার গুরুজ্ঞাতা স্বামী শিবানন্দকে লিখিয়াছিলেন (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) “মা-ঠাকুরণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গাঙ্গী, মেহেরী, জগতে জন্মাবে। সেবছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এই জ্ঞাতার মঠ প্রথমে চাই।”

গৌরীমঠে অল্পকাল ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীশ্রীমার নামে সর্বপ্রাণে এই শ্রীশ্রীমায়দেবী আশ্রম—ত্রুট্যাবিধী সন্ন্যাসিনীদের জ্ঞাত প্রথম নারীমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীমার কথা প্রচার করিয়া নারীসমাজকে তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। শুধু কি মাতৃজ্ঞাতি, এই মহান কার্যে বেগপান করিয়া অনেক পুরুষ-সন্তানকেও শ্রীশ্রীমার প্রতি ভক্তিবিধানে ও মাতৃভাবে উৎসাহ করিয়াছেন।

এখন তাঁহার উপদেশের কথা কিছু বলিব। তিনি অতি সহজ এবং প্রাণশূলী ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাঁহার দুই-একটি সার কথা নিয়ে উদ্বৃত্ত করিতেছি। গৃহস্থ-বৃন্দগণকে তিনি বলিতেন, “মা, সকল সমাজের এখন বা অবস্থা তাতে আচারনিষ্ঠা, পবিত্রতা এবং শাস্তি—এক কথায় সমাজের মূলখণ্ডা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদেরই বেশী, একথা তোমরা যেন কখনো ভুলো না। মনে রেখো, বাইরের চাকচিক্যে মেরেদের সৌন্দর্য্য বাড়ে না। মেরেদের আসল সৌন্দর্য্য—তাদের দেহ-মনের পবিত্রতায়।”

আর একটি কথা তিনি গৃহী ও ত্যাগী সকলকেই বলিতেন, “গৃহীই হও, আর সন্ন্যাসীই হও আসল কথা—মন। মন সাঁজা তো সব সাঁজা। মনটি খাঁটি হলে তবে ভগবানের রূপা হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘পবিত্র দেহ-মনে খুব বাকুল ভাবে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়।’ তাঁকে না ডাকলে, তাঁর রূপা না হলে, মানুষের জীবন দুখের বোঝা হয়ে পড়ায়। সকল কাজের মধ্যেই তাঁকে মনন করবে। বাকুল হয়ে তাঁকে ডাকবে, যেন তাঁর পাশপাশে প্রভাতভক্তি হয়।”

গৌরীমার জীবন বাস্তবিকই অপূর্ণ, বাহ্যকে শ্রীশ্রীমাকুর এক তাঁহার গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ “রূপাসিদ্ধা গোপী” বলিতেন। এই গোপীভাবের কথা আমি ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত ও নাট্য-সম্রাট শিখিশচন্দ্র ঘোষের নিকট নিজে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,

“ঠাকুর গৌরীমাকে রূপাসিদ্ধা গোপী বলতেন। গৌরীমা তখন বয়সে যুবতী, ভাবে আবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের সম্মুখে ভগবৎসঙ্গীত গাইতে গাইতে ভাবে নৃত্য করতেন। ঘুপা, লজ্জা বা সঙ্কোচ তাঁর ছিল না। আমাদের দিকে বা আশে-পাশে দৃষ্টি থাকত না। একমাত্র ঠাকুরের দিকে ভাবে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আত্মচারা হয়ে নৃত্য করতেন। দেখ না, তিনি নিজে অসন্ত আশুন, তাই আশুন নিয়ে খেলা করতেন। যে কুমারী ত্রুট্যাবিধীর আশ্রম গৌরীমা করেছেন, ওর মতন অল্প পরিচিত চরিত্রই তা সামলাতে পারেন। এ কাজ বড় সামান্য নয়।”

এই গোপীভাব কি? শ্রীমন্তাগরতে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীউদ্ধব গোপীদেব ভাব দেখিয়া বিম্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। গো-বৎস হরণ করিয়া ত্রুট্য হখন শ্রীকৃষ্ণকে সত্য সত্য পরমব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন ক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুব্ধে গোপীমায়দেবের এত উচ্চ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ত্রুট্য স্বয়ং গোপীপদ লাভ করিবার জন্য বহু প্রার্থনা করিতেও সাহস পান নাই। গোপীভাবের মূল লীলাক্ষেত্র শ্রীমদ্রাধন। শ্রীরাধাকাজিহাতি-স্বলিত শ্রীকৃষ্ণ নবধূপে অবতরণ হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। এই ভাবের অপূর্ণ প্রেমে গরগর মাতোয়ারা শ্রীশ্রীগৌরমুখের যে নাম ও প্রেমে মহাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, তাহা এই অপূর্ণ গোপীভাবেরই রসধন বিব্রহ। আমাদের গৌরীমা তাঁহার দামোদরশিলার মধ্যে সেই গ্রামমুখকেই পরম পতিরূপে দেখা করিতেন। তাঁহার সেই দামোদরশিলার মধ্যেই নন্দীয়ার গৌর-হরিকৈও দেখিতে পাইতেন। এই জ্ঞাত কথাপ্রসঙ্গে তিনি কখনও নবধূপগায়কে তাঁহার স্বয়ংবাড়ী বলিতেন।

একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কোতুকুলে গৌরীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা এবং ঠাকুরের মধ্যে কাহার প্রতি গৌরীমার অধ্বাস অধিক। তখন এই গোপীভাবে মাতোয়ারা গৌরীমা গান গাহিয়া ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন—

“রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বাঁশীধারী,

লোকের বিপদ হলে

ডাকে মধুসূদন বলে

তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।”

এখানেও আমরা দেখি, বৃন্দাবনের সেই গোপীমায়দেবের ভাব ও লীলাকৌতুক। গোপীগণ সকলেই রাইয়ের পক্ষ হইয়া বৃন্দাবনজগৎকে দুই কথা শুনাইয়া দিতেন, এখানেও গৌরীমা শ্রীশ্রীমার পক্ষ লইয়া শ্রীমাম কৃষ্ণের প্রতি সেটকপ ভাবই দেখাইয়াছিলেন। আর একদিন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে গৌরীমা বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার কে? তুমি সেই—কৃষ্ণভগবান স্বয়ং।” এই গোপীভাবই প্রেমমায়ার অপূর্ণ বিকাশ, সাধনায় প্রেমের চরম পরিণতি। একমাত্র অতীন্দ্রিয় ভাবভূমিতেই এই অতীন্দ্রিয় ভাবের রস আধারন ও পরমপুরুষ লাভ। আমরা গৌরীমার জীবন দেখিয়াছি, কখনও তাঁহার বিব্রহের সম্মুখে, কখনও ভাবসুরূপে, তিনি হাসিতেন, কান্দিতেন, গাহিতেন, নাচিতেন। আবার কখনও বা স্থির জড় পুণ্ডলিকার মত বাহজ্ঞান-মুগ্ধ হইয়া বাইতেন। এই গোপীভাবই তাঁহার অন্তঃপ্রবাহ। বাহিরে সকল জীবের প্রতি সেই প্রেমের বিদ্যাক্ষতি খেলিয়া বাইত। সেই প্রেম মনুষ্য ব্যতীত অন্ত জীবজন্তুর প্রতিও প্রবাহিত হইত যেহেতু বাহ্যসম্পদ, বাহ্য দেখিলে বা আধারন করিলে তাঁহাকে দেহময়ী জননী

বলিয়ারই মনে হইত। এই মাতৃভাবই তাঁহাকে গৌরীমা সজ্জায় অভিহিত করিয়াছিল।

যিনি বৃন্দাবনে জীরাধা কিলেন, তিনিই এবার শ্রীমতী সারদা দেবী—কর্ণজ্ঞানী—মাতৃভাবে আবিষ্কৃত। তাঁহার সচরসীসের পোপী সস্তা থাকিলেও এবারের লীলার তাঁহার মানে আখ্যাত। গৌরীমা শ্রীমতীর নামেই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্বক মায়েরই মতিমাণ্ড-কর্ণা প্রচার করিয়াছেন, মায়ের ভাবেই ভাবিত থাকিয়া গৌরীমা বাংলার ঘরে ঘরে মায়েরই নাম প্রচার করিয়াছেন। প্রতি বৎসর তিনি মায়ের আবির্ভাব-তিথিতে মহাসমারোহে মহোৎসব করিতেন। এই সকল উৎসবে দলে দলে

মাতৃব আশ্রয় মায়ের জীবনকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইরাছে, ধ্বংস হইরাছে।

গৌরীমা বর্তমান যুগে আদর্শ নারীশিক্ষার প্রবর্তক, সন্ন্যাসিনী-সংঘের স্বেচ্ছাধিনী আচার্য। ব্যক্তিগত জগতের তিনি কল্পনামতী মা, পরিত্যক্ত অর্থে দরিদ্র নিপীড়িত ও নিপৃষ্ঠীভূত কল্যাণে তাঁহার কী প্রাণপাত প্রচেষ্টা। তাঁহার ভাগ্যপূত নিঃস্বাম কন্যা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি প্রেমাম্পন্ন ইষ্টের পাণপক্ষে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং তাঁহার সহিত বোগযুক্তা,—তাঁহার অপূর্ণ ভাবভক্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা এই শতাব্দিকী অনুষ্ঠানে তাঁহার চিন্তা ও ধ্যান করিয়া ধন্য হইব।

## চুখু

ইতিহাসের দ্বারা পর্যাপ্ত পাঠে দিতে পারে স্নায়াক চুখন কিংবা সুহৃৎের একটা 'কিসি'—এরও অসামান্য মূল্য বা মধ্যমা থাকিতে পারে, তখন অমনি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বিধি এই সর্বের বিভিন্ন নজর পুঁজে পাওয়া যায় এখানে—সেখানে। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী জানতে পারা যায়। প্রমোদ-উত্তানে তিনি আনমনা ভাবে একদিন ঘ্রাফেরা করছিলেন। একটি পথের বাঁকে আনে বলেইনের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাৎ। বৃষ্টি, আবেগ-উদ্ভূতের ভরে অমনি একটি চুখন সমাধা হয়ে গেল, লোকচন্দ্র অন্তরালে। সেই থেকে আনের মধ্যমা বেড়ে গেল প্রচুর মাত্রায়। কিন্তু বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হ'ল তাঁর এই প্রথম দিনকার অপ্রত্যাশিত অথচ মধুর্যমর পরিসরণের।

এক শত বছর আগেকার একটি রোমান্টিক কাহিনী বা ঘটনা। ভ্যালেন্টাইন বেকার তখন একজন উদীয়মান বুটল সামরিক অফিসার। চলতি পথে একদিন তাঁর নজরে পড়লো, একটি সুন্দরী তরুণী রেলের কারবারে মগ্ন। ভ্যালেন্টাইন একটু খানিক মুখে মুগ্ধ অবস্থাতেই তাকে 'কিস' করলে। বেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থাৎ বালিকা এবং মুগ্ধ চিত্তে প্রতিবাদ জানালে, তাঁর অজ্ঞান ও অশিষ্ট আচরণের। সামরিক আদালতে ভ্যালেন্টাইনের বখারোজি বিচার হলো এবং শেষ অবধি চাকরি থেকেই বিদায় নিতে হলো তাঁকে। বেকার-জীবন ভ্যালেন্টাইনের কাছে হুসে হুসে বোধ হ'ল। হতাশ মনে বেশ হেফে তিনি যেয়ে বোম্বার্ন করলেন তুর্কী সেনা-বাহিনীতে। দেখতে দেখতে মিঃ বেকার হয়ে উঠলেন একজন নামকরা জেনারেল। পরিশেষে এমনি হ'ল—তাঁরই সামরিক দক্ষতার সাহায্যে পেরে শিশুরী মৃত্যু (১৮৮০ সাল) জয়যুক্ত হতে পারলে প্রেট বুটেল।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন সোফিস্টিকার। এক দিন দেখা গেল—সোফিস্টিকার কাউন্টারের উপর সে বঁকে পড়েছে—একটি রূপবতী মহিলা ধরিদ্বারকে খাবার দিতে যেয়ে চুখনের তার ব্যাকুলতা। এই অপরাধে কর্তৃপক্ষের ৫০ পাউন্ড জরিমানা হয়ে গেল—কেমন যেন লাগলো তার মনে। কিন্তু পরে জানা যায়, সেই মহিলা তাঁর উইলে ২০ হাজার পাউন্ড রেখে গেছেন দণ্ডিত এই সোফিস্টিকারের নামে। ব্যাপার কি, ব্যাপার কিছুই নয়। আদমকা যে সে 'কিস' করেছিল—সেদিন, তারই মূল্য দিয়ে সেলো এমনি ভাবে এই মহিলা।

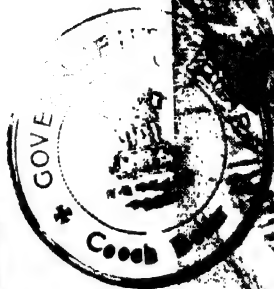
গোমান আইন-কানুনে 'কিসি' বা চুখন বিবাহের একটা সনাক্তরূপ—এর মধ্যমা রাখতেই হ'বে যেমন করেই হোক। চালেমেগনে একদিন মধ্যরাত্রিতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর কন্যা রাজকীয় দপ্তরের একজন সেক্রেটারীকে 'কিস' করছে। বাপ-মায়ের চোখ এড়াবার জন্য এই সম্রাট-কুমারী প্রাণপ্রাণ-প্রাণ পার হয়ে একটি নিদ্রিত স্থানে চলে গেছিল সেই সেক্রেটারী সহ। কিন্তু 'কিসি'—এর মূল্য তাকে দিতেই হ'ল শেষ অবধি—তাই দেখা গেলো চালেমেগনে এ সেক্রেটারীর সঙ্গেই বিবাহ হলেন আপন প্রিয়তমা কস্তার।

নববর্ষের প্রাকালে মিসেস ওলগা কার্ডেল নিউইয়র্ক নগরীতে বসে আছেন তাঁর ঘরে। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে যেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো—অমনি সামনে এক প্রহরারত স্ত্রীমা-সুন্দর পুলিশ। হঠাৎ মনে কি ভাবান্তর হ'ল মিসেস ওলগার, ছুটে গেলেন তিনি রাস্তায় এবং তারপরই একটি চুখনের অক্ষুট শব্দ। অপরাধ হয়ে গেল একটা মন্ত এই নারীর। বিচারালয়ে পৌঁড়িয়ে তিনি বললেন—একে (পুলিশের লোক) 'কিস' করব বলে এক বছর ধরেই আমি প্রতীক্ষা করে এসেছি। বিচারপতির রায়—দুই উলার জরিমানা। মিসেস কার্ডেলের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মন্তব্য করলেন সহজ গলায়—একটি চুখনের মূল্য এ অবতাই হ'তে পারে।

মুসোলিনি কিন্তু প্রকৃত স্থলে পারাম্পরিক 'কিসি' বা চুখন একবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। একটা সুন্দর ঘটনা। ১৯৩৯ সালে একজন স্থল-শিক্ষক ছুটিতে ইতালীয় নরীতীয়ে পেতলেন প্রমোদভবনে। চম্বালোকন্যাত রাত্রিতে জটনকা নারীকে 'কিস' করতে যেয়ে পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়ে যান। অপরাধের শাস্তিরূপে প্রথমে তাঁকে জরিমানা করা হলো দশ লিং (ইতালীয় মুদ্রা)। কিন্তু তিনি এই অর্থ পরিশোধ করতে চাইলেন না। ফলে বারবার তাঁর উপর শমন জারী হয় এবং প্রতিবারই জরিমানা বেড়ে যায় অতিমাত্রায়। ততদিনে তিনি সামরিক চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে নানা স্থানে ঘুরছিলেন। নাৎসী অভ্যর্থনা শিবির থেকেও শেষ মুহুর্তে জরিমানার টাকা না দেওয়ার তাঁর কাছে শমন বার—জরিমানা এখন আর দশ লিং নয়, ৫,০০০ লিয়ার পৌড়িয়েছে। সব অর্থ এবার পরিশোধ করে দিলেন তিনি আর ভাবলেন—'কিসি'—এর মূল্য বুঝি এমনি করেই বেড়ে যায়।



চাই বুটে  
—নীহার রায়



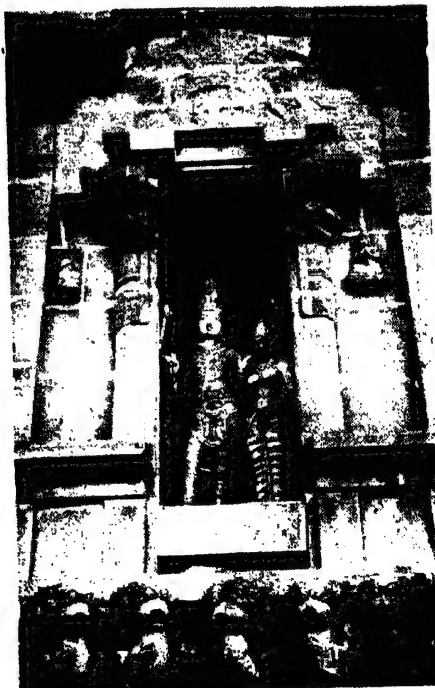
অজস্র পথে

—শান্তরাম বন্দ্যোপাধ্যায়



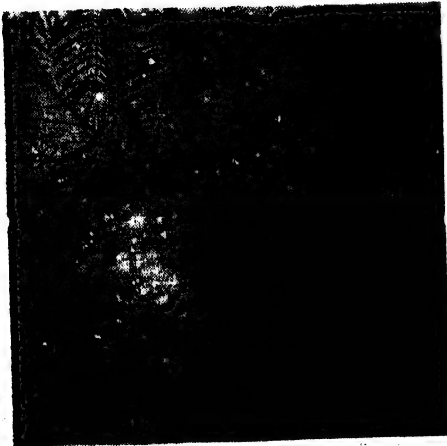
মন্দির

—জহাঙ্গীর ভট্টাচার্য

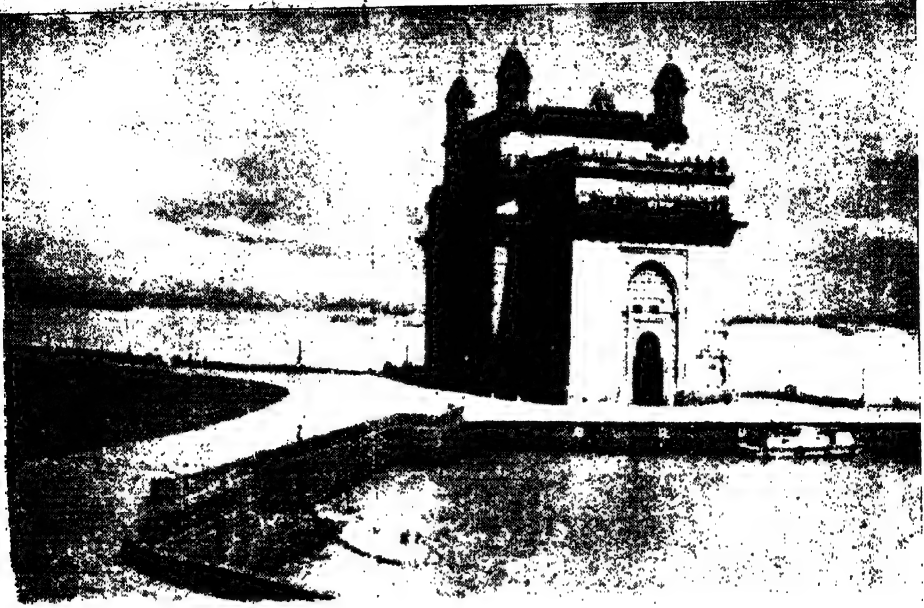


চাঁদমায়া

—অজিতরঞ্জন বসু







হাওলা গেট, বধে

—ব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় (হালিশহর)

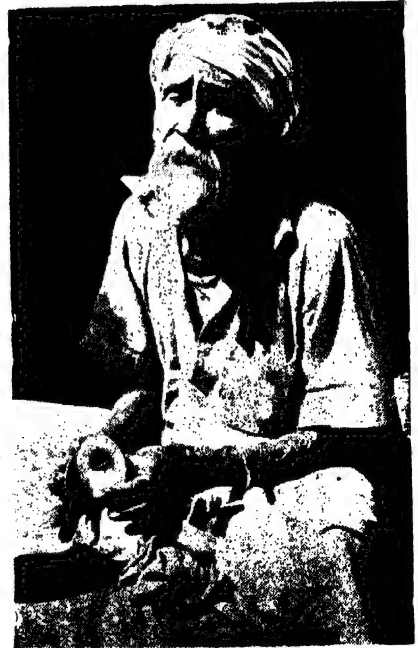
গোপরা ভরণে

—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

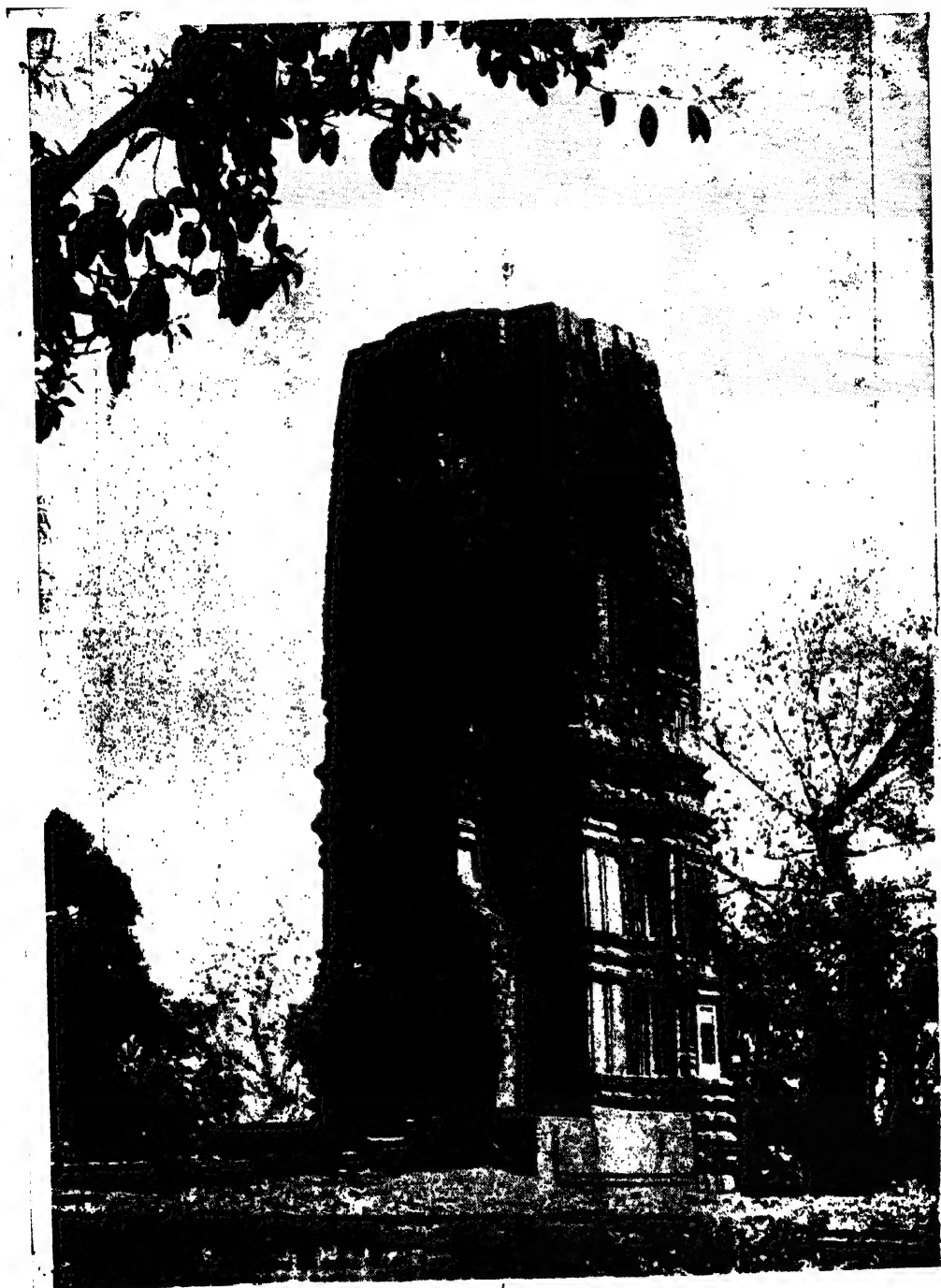


ভক্ত

—জয়দেব দত্ত

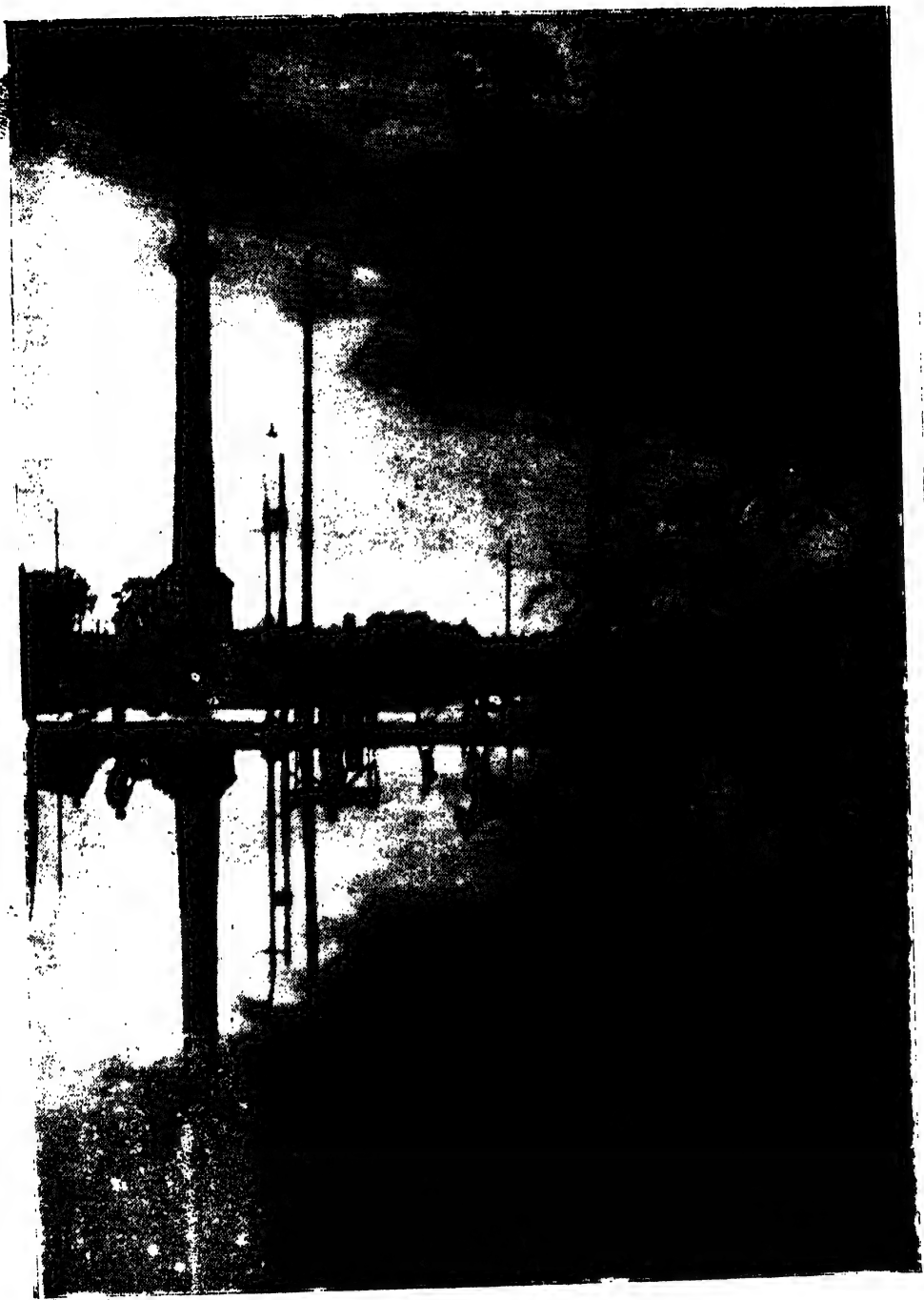






শিবমন্দির (বোলাড়া, ওড়িশা)

—রামকিঙ্কর সিংহ



প্রতিবিম্ব

—দুপালকাতি চন্দ্র

[ দেশবন্দোধ্য বর্ষায়নী চিত্রশিল্পী ]

মানবিক্তান বলে যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন সাধু প্রচেষ্টা অর্পণ-রোধেই স্তম্ভের কোলে আশ্রয় নেয়—তাহলে তার সম্ভাবনের মধ্যে আপনা থেকেই অন্ধ্রেরণা আসবে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করার। তারই প্রত্যাক নিবর্ণন আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণেশ্বনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। 'বাবুবিলাস' গ্রন্থের প্রণেতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখনী ধারণ করলেও শিল্পের প্রতি তাঁর কম অকুণ্ঠ ছিল না। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫৪)। বাবার শিল্পমনের ছায়া পড়ল ছেলের মনে। বড় ছেলে গণেশ্বনাথ চিরস্বর্ণীয় হয়ে থাকবেন তিন্মেলার অল্পতম মীনাক্ষরূপে, তিন্মেলার তাঁর অবদান সর্বজন-স্বীকৃত, মাত্র ২৭ বছর বয়সে (১৮৬৮) এই তরুণ দেশসেবীর হয় জীবনাবসান। ছোট ছেলে গুণেশ্বনাথ জ্যষ্ঠভূতা ভাই জ্যোতির্বিদ্যনাথের সঙ্গে ভর্তি হলেন সরকারী-শিল্প বিভাগে—পাঠ নিলেন অঙ্কনশাস্ত্র সম্বন্ধে। বাবার ও দাদার দেশ-প্রেমের ও সাহসিকতার প্রতি অনুপ্রাণের অধিকারী হলেন পূর্ণমাত্রায়। এ ছাড়া কবি ও উদ্ভিদবিজ্ঞাতও গুণেশ্বনাথের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ৩৪ বছরের যুবক গুণেশ্বনাথ বখন বীরে বীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণতার দিকে, গুণেশ্বনাথ বখন বীরে বীরে যেসকল তার পাণ্ডিত্য, জীবন-বীণায় বেজে উঠছিল আশোচর্য্যের তান হঠাৎ এক দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় নিবে গেল গুণেশ্বনাথের জীবন-বীণ (১৮৮১)। শিল্পীর অন্তর্বাসনা সম্পূর্ণরূপে রপায়িত হল না বাস্তবে, রয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যেই। কল্পনার মায়াজালেই সে বইল বন্দী, কোন সুনিপুণ হাতের স্নমধুর রেখা তাকে করতে এল না মুক্ত। হয় তা সেই কারণেই, গুণেশ্বনাথের আশা অর্পণ হয়ে গেল বলেই তাঁর ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের মধ্যেই জেগে উঠল শিল্পপ্রীতি। তারই ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি কিউবিজমের পুরোছা শিল্পচার্য গগনেশ্বনাথকে, মধ্যাহ্ন পাণ্ডিত্যের সমাহিত দীপ্তি সমরেশ্বনাথকে, বাঙলা সাহিত্যের অল্পতম দ্বিকপাল আধুনিক শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা অবনীন্দ্রনাথকে, বিনয়িনী দেবীকে আর সুনয়নী দেবীকে। গগনেশ্ব-অবনীন্দ্র-সুনয়নী শিল্পখ্যাতি সর্বজনবিদিত কিন্তু সমরেশ্ব-বিনয়িনীও ছিলেন উচ্চরের শিল্পী। এখানেই শেষ নয়, ঐ বংশে এর পরও দেখা দিয়েছেন একাধিক শিল্পী গগনেশ্ব-পুত্র নবেশ্বনাথ, সমরেশ্ব-পুত্র ব্রজীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-পুত্র আলোকেশ্বনাথ।

বংশের জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের স্বর্গীয় বহুনাথ রায়চৌধুরীর মেয়ে সৌদামিনী দেবীর গর্ভে ১২৮২ সালের এক শুভলগ্নে জন্ম নিলেন সুনয়নী দেবী। বহুনাথের আর এক মেয়ে সতাকুমারী ছিলেন সঙ্গীতনাট্যক রাজা শ্রীর পৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিতীর্থ সহধর্মিণী। এঁদেরই পুত্র ছিলেন শিল্পপ্রাণ মহারাজা শ্রীর প্রত্যোক্তকুমার ও দৌহিত্র ছিলেন বরীন্দ্র সঙ্গীতে খ্যাতিমান শিল্পী ও শিশিব-সম্প্রদায়ের অল্পতম প্রাধান ভক্ত স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ছ' বছরের মেয়ে সুনয়নী বাবাকে হারালেন। জীবনের পথে এসেগেলে লাগলেন মা ও দাদাদের ব্রহ্মচার্য্যের নিজেই আবৃত্ত্য রেখে। বখারবিত শুক হলো বিজ্ঞাপিকা। বখাসময়ে বেজে উঠল মিলনের মঙ্গলপাথ। ভারতের নব যাত্রাপথের প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীপুত্র স্বর্গীয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র



স্বাটর্পি স্বর্গীয় বহুনাথমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচীতা হলেন সুনয়নী। দেখতে দেখতে এল উনিশ শো পাঁচ সাল। পাঁচ সালের তাৎপর্য বা মতিমা ছুঁচার কথায় লিপিবদ্ধ করার নয়। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের স্বর্ণমঞ্জরায় চিরউজ্জ্বল এই পাঁচ সালের ইতি-কথা সংরক্ষিত থাকবে চিরদিন। দেশের উন্নতিসাধনে বাঙলা দেশের ঠাকুর-পরিবারের অবদান বিস্ময়জনক। এ যে সেই পরিবার, যেদিন দেশের অবিকাশ বনিকসম্প্রদায় মস্ত ছিলেন সুরায়, এঁরা সেদিন মেতে উঠলেন স্বরে, তাঁরা ছুটে চলেছিলেন আলোয়ার হাতছানিতে, এঁরা ছুটে চলেছিলেন আলোর সন্ধানে, তাঁরা সর্বত্র অর্পণ করেছিলেন বারান্দাদের পাদপদ্মে, এঁরা স্বয়ংভরা প্রজ্ঞা নিবেদন করেছিলেন বীরানন্দাদের ঔচরণে।

ঠাকুর-পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারার ভরিয়ে তুলতে লাগলেন দেশকে, দশকে, জাতিকে। সুনয়নীও ধরলেন অঙ্কনের পথ। কারো কাছে নিলেন না শিক্ষা। অন্তরের হৃৎস্পন্দী বেগে একে গেছেন ছবি, কাতো কাছ থেকে কোন কিছু আশা করে নয়। এলেন এক মেমসাহেব, শিক্ষা দিতে সুনয়নীকে। ছাত্রী



সুনয়নী দেবী

অন্তর স্পর্শ করল না বিশেষিনীর শিক্ষাক্ষেত্রের দ্বারা। শিক্ষাগ্রহণ পূর্ব সেইখানেই হল ইতি। সুনয়নী যখন তুলি ধরেছিলেন তখন বাড়ীতে তাঁর তিন দাদা ও দিদি অঙ্কন-সাহায্যের মধ্য। আশ্চর্য! এঁদের কারোই প্রভাব পড়ল না তাঁর আঁকার। বরং তাঁর ছবিতে যেটুকু অপরের প্রভাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে শিল্প-রসিকতা রসিকতার। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে এবং চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাক-অবনীন্দ্র যুগে রসিকতার সৌন্দর্য প্রায় কেউ ছিলেন না বললেই চলে। সুনয়নীর অঙ্কিত চিত্রাবলী বেশীর ভাগই পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। এদের ছোট পিনোয়া স্বর্গাশা কানখিনী দেবীর (ভূতপূর্ব পৌরপাল জিনবেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রপিতামহ) ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি। সেগুলিও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে সুনয়নীর প্রতি। এঁর অঙ্কিত ছবি বহু সাময়িকীতে হয়েছে প্রকাশিত ও দেশ-বিদেশে বহু স্থানে হয়েছে প্রদর্শিত। এঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে অর্ধনারীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, নীল-অঙ্কনা, বাঁতুরিয়া, মা ও ছেলে প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘অর্ধনারীশ্বর’ ছবিটি প্রথমে শিল্পী বাস্তিল করে দেন পরে তা সংগ্রহ করে রাখেন গগনেন্দ্রনাথ। এখন অবশ্য তা প্রত্যাগ আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। সুনয়নীর মত চোখ ও ভ্রু আঁকার হাত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দেখতে পাননি গগনেন্দ্রনাথ। বিষয়ে হতশঙ্ক হয়ে সুনয়নীর আঁকা ছবিকে মাইট্রাপিস আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন অর্ধনারীশ্বর, পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন কবিত্বের রবীন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মণ দিয়ে কি করে ওয়াশ করতে হয় সুনয়নী তা আগে জানতেন না, এঁরই এক বোনপো প্রবন্ধের শিল্পী শ্রীমদিকুমার হালদার মহাশয়ের বন্ধন কাজ করতেন সেই সময় তা দেখে দেখে শিখে নিয়েছিলেন সুনয়নী। ঠিক এমনই দেখে বা শুনে আরও অনেক কিছু আয়ত্তে এনেছিলেন সুনয়নী। মাত্র অভিধানের সাহায্যে শিখেছিলেন ইংরিজী এবং পরে সে ভাষায় লিখ করেছিলেন রীতিমত ব্যুৎপত্তি। পিয়ানো বাজনা শিখেছিলেন আত্মজের চিহ্ন দেখে। এমনই প্রতিভাময়ী মেয়ে সুনয়নী দেবী! এঁর কয়েকখানি ছবি বহন করছে বেল্লাবেলার স্মরণীয় স্বাক্ষর, কোনটি দেখা দিচ্ছে রূপ-রস-সৌন্দর্যের প্রতিভুরূপে। ছেলেবেলায় গান শিখেছেন মায়ের কাছে। শিখেছেন এপ্রাজ বাজাতেও। অভিনয়প্রীতিও সুনয়নীর মধ্যে বিজ্ঞান। রূপও দিয়েছেন বাড়ীতে অন্তিমীত কয়েকটি নাটকে। পরিচালনাও করেছিলেন একটি।

কালীকৈত্রী কলকাতা। তার উত্তরার্ধে জোড়াসাঁকো অঞ্চল। সেইখানেই বুধরাজ ঘরকানাথ ঠাকুরের বাসপুরী। তারই সলয় বাড়ীটিতে বসত তাঁর প্রাচ্যাত্মিক বৈঠক। ঠাকুর-শরিবারের মধ্যে এ বাড়ী বাড়ীর ছুটি ডাকনাম ছিল তা বর্ণাক্রমে বড়বাড়ী ও বৈঠকখানা-বাড়ী। প্রতিটি সন্ধ্যা সেদিন বলমলিয়ে উঠত কত যশু আলাপনে, বেলোয়ারী বাজ-লঠনের সে কি অপূর্ণ সমারোহ! বৈঠকখানা বাড়ীর প্রতিটি ইট-পাথরের মধ্যে জেগে উঠত প্রাণ। বুধরাজের দেহান্তের পর বড়বাড়ী পেলেন তাঁর বড় ছেলে মহবি দেবেন্দ্রনাথ—এ বাড়ীর দালিকানা পেল সেল ছেলে গিরীন্দ্রনাথের হাতে। আজ বৈঠকখানা বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। ধুলোর মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক লক্ষণের বাহ্যাবলী, চমৎকার ভাবে সুনীপুণ বাস্তবিকদের সাহায্যে বিবৃত করে দেওয়া হয়েছে শত শত স্মৃতির আলোর উজ্জ্বল, পরিমণ্ডিত

এই শিল্পপুরীকে। বাবীন ভারতে শিল্পাচার্য্যের প্রতি এই অপমান যেমনই কলঙ্কের, তেমনই দুঃখের ও তেমনই লজ্জার।

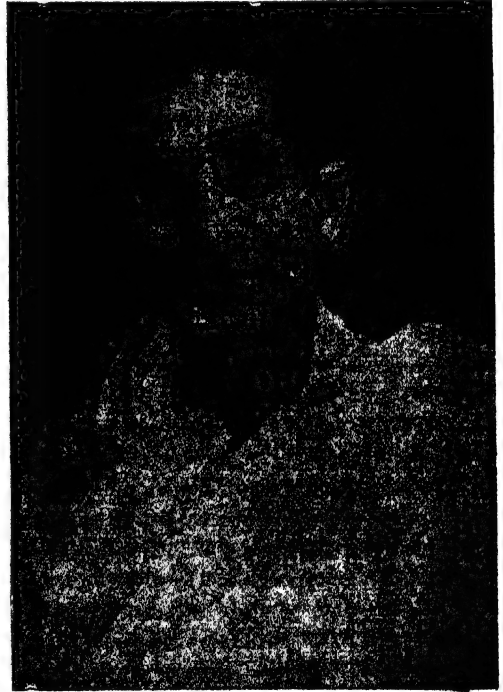
### কথাসিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে তাত্ত্বিক-রচনার একটি বিশেষ ভূমি বিভূতিভূষণের হাতে সার্থক রূপ গ্রহণ করেছে। ‘তাঁর হাত’ রস-কেবলমাত্র বিজ্ঞানের বস্তুসমূহ নয়, সেই হাসির পেছনে কখন ব্যঙ্গ কখনও বা গোপন অঙ্গ প্রকল্প হয়ে থাকে আর সেই জটিল তাঁর হাসির গল্প বাঙালী পাঠকের এত প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিহারের উত্তর-পূর্বাংশে মিথিলার পাণ্ডুগ্রামে ১৩০৩ সালের আষাঢ় মাসে (১৮১৬ খ্রঃ) বিভূতিভূষণের জন্ম হয়।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার চাঁতরা গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। বিভূতিভূষণের পিতামহ মাত্র বোলসতের বছর বয়সে নীলকুঠীতে চাকরার জন্ত মিথিলার যান। পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণের বাবা বিশিণবিহারী মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুগ্রাম ছেড়ে ধারভাঙ্গায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই থেকে তাঁরা ধারভাঙ্গারই অধিবাসী বলা যায়।

ছেলেবেলায় বিভূতিভূষণ ধারভাঙ্গার রাজমুলে পড়াশুনা করেন। সাহিত্যের প্রতি অহুবাগ ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। সেকেন্ড থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় প্রথম সাহিত্য রচনার হাত দেন।



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সে সময় কুস্তগী জেলের কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ভাল গল্পের লব্ধ পুস্তক সরিতেন। সর্গ ছিল রসহানি না করে গল্পের মধ্যে তাঁদের তেলের নাম করতে হবে। গল্পগুলো বেশ বন্ধুরক তব্ধক একখানা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হত, বেশ প্রচারও ছিল। এই বইখানিতে একটু জায়গা পাবার লোভ বিভূতিভূষণের মনে প্রবল হয়ে উঠলো।

অতঃপর গল্প লেখার হাত মিলেন। একটি নাট্যিকা খাড়া করে নিজেই নাটক হয়ে কাঁড়ালেন, তারপর চলল ভাড়াগড়া। হাসি অশ্রু, মান অভিমানে গল্প একেবারে উপচে পড়ল। একবার বা লেখেন আবার তা কাটেন, আবার নতুন করে লেখেন। তারপর গল্প বখন শেষ হল তখন তা ডাকে পাঠাবার শেষ তারিখ একেবারে সিরের এসে গেছে। গল্প লেখাটা ফুলের পড়া নয়, তাই সমস্ত ব্যাপারটা করতে হচ্ছিল গোপনে। সময় অল্প অল্প গল্প শেষ করার পর সেটা আর একবার মাজা-ঘষা করতে হবে, তারপর আছে কপি করা। সমস্তটাই অনিবার্যকমে দুটি এডিয়ে করতে হবে, তার ওপর ছোট ভাইদের অপদৃষ্টিও আছে। তারা যেন আঁচ পেয়েছে ভিতরে ভিতরে তিনি কি একটা করছেন। বেয়াদা রকমে (কীতুহলী) হয়ে উঠেছে তাই সবাই! এ সবের ফলে এদিকে ক্লাসের পড়ারও ক্ষতি হতে লাগল। ফুলে বেকের ওপর কাঁড়ালোটা, মাষ্টারের ধমক টিটকিবি খাওয়াটা করতে গেলে রোজকার ব্যাপার হয়ে কাঁড়াল। তবু মনে মনে ভাবতেন, আর কটা দিনই বা? একদিন তো সবাই দেখবে অল্প ফুলের অল্প ক্লাসের অল্প নামের ছাত্র গল্প লিখে পুস্তক প্রেরণে। শুধু বইয়ে একটি গল্প বেরুন নয়—একেবারে পুস্তক! অবাক হয়ে সবাই হাঁ করে থাকবে।

কিন্তু দিন কতক পরে বখন নির্বাচিত গল্পের বই বেরল, অল্প ফুলের অল্প নামের ছাত্রকেই তখন উঠে হাঁ করে থাকতে হল। দেখা গেল, তার গল্পের নাম-গন্ধও নেই কোথাও।

বাংলা দেশের প্রায় সব বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতই বিভূতিভূষণের গল্প লেখার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার অধ্যায়টাও ছিল এমনি করুণ। কিন্তু তাই বলে লেখা তিনি ছাড়েন নি বা ছাড়তে পারেন নি। কারণ লেখার নেশা একবার যাকে পেয়েছে আর কি তার না লিখে উপায় আছে? অবশেষে উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প। ১১১৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতার তাঁর 'অবিচার', গল্পটি পুরস্কৃত হল।

বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রাহু প্রথম ভাগ'। চিন্তার স্বকীয়তার ও রসরচনার অঙ্গকালের মধ্যেই তিনি বাঙালী পাঠকের পরিচিত হয়ে উঠলেন। সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে বিভূতিভূষণের রচনার সখ্যা খুবই কম ছিল। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর 'রাহু প্রথম ভাগ' ও 'রাহু দ্বিতীয় ভাগ' এই দু'টি মাত্র গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক রচনাতেই তিনি বাঙালী পাঠকের প্রিয় হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর বহু প্রকাশিত উপন্যাস 'নীলদুর্বার' বাংলা সাহিত্যে 'স্বর্গী' স্থান লাভ করেছে। তাঁর অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস : বর্ষা, বনস্ত, শারদীয়া, চৈতালী, হাতে বাড়ি, সুবসন্ত, বরষা, কপালধর, হবার হতে অর্ধে, উত্তরায়ণ, কথোচিত্র, নব-সম্মান, বর্ষাখণি পরীক্ষা,

কানন স্নাত ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ বোল বছর বয়সে ভারতবাসীর রাজ ফুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। কলকাতার তৎকালীন রিপন কলেজ থেকে তিনি সম্মানের সঙ্গে আই, এ, ও পাটনা কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। ছাত্রজীবনে যেমন ছিল তাঁর নানা রকম বই পড়ার নেশা, তেমনই পারদর্শী ছিলেন তিনি হকি, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি খেলায়।

কর্মজীবনে বিভূতিভূষণ সাহিত্যসেবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা, ভারতীয় রাজ-প্রেসের সুপ্রাণিটেণ্ট প্রভৃতির কাজ করেন। পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকা পরিচালনার কাজও তিনি করেন। গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধভাবে বিভূতিভূষণ চিরকুমার। নিরঙ্কুশ, অমায়িক প্রকৃতির সদালাপী মানুষ তিনি। রচনার বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ গোষ্ঠী। তাঁর একাধিক উপন্যাসের চিত্ররূপ গৃহীত হয়েছে।

### শ্রী অমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[ বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও রসসেবায় ]

“বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আমার জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু অবস্থা-বিপর্যয়ে সে পথ আমার ভ্যাগ করতে হলও সত্যতা ও অধ্যবসায়ের পথ আজও ছাড়তে পারিনি। বাংলায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল এবং সে মহাপুরুষের বাণী ও উপদেশই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাথর।”

সেদিন কথা প্রসঙ্গে কলকাতার অত্যন্ত প্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এ. আর. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী শ্রী অমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবন-স্মৃতি থেকে আমাকে জানান।

সকলের দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও আদর্শনিষ্ঠা থাকলে মানুষ সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকেও কত বড় হ'তে পারে, শ্রী অমিররঞ্জন সত্যিই তার একটি অলঙ্কার হ'লেন।

শ্রী অমিররঞ্জনের জন্ম হয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার প্রসিদ্ধ

বল্লাযোগিনী গ্রামে।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের

শৈশব আনন্দ ও

খুলল তার ভেতর

দিয়েই কাটছিল—

কোন আধিক

অনটনই বলতে

গেলে বুঝ্জাবাড়িতে

ছিল না। কিন্তু

অমিররঞ্জনের বয়স

বখন তের কি চৌদ্দ,

সে সময় এক প্রচণ্ড

বিপ্লবের নেমে আসে

তাঁদের সঙ্গারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের

বা ছিল একে একে



শ্রী অমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সব নষ্ট হ'য়ে বার সুযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের অভাবে। শেষ অবধি অবস্থা এমন হ'য়ে পড়িলো, হু'বেলা আহাৰ পৰ্য্যন্ত ঘুৰি আর জোটে না।

অবস্থার বিপর্যয় সত্ত্বেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মনোবল জুটুটু রইলো। বড় তাঁকে হতেই হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁর না পেলেই নয়। এ সম্বন্ধ নিয়েই একদিন দেখা গেল তিনি কাউকে না জানিয়ে এক দুর্ভোগাপূর্ণ রাত্রিতে বাত্মা করলেন বেঙ্গল, সংবাহ পেয়ে বালক অমিয়রঞ্জনকে চাটপী থেকে আনলেন তাঁর বাবা। তারপর অভাবের ভেতরও তাঁর পড়াশুনোর পুনরায় একটা ব্যবস্থা হলো এবং ম্যাট্রিক অবধি গ্রামের স্কুলেই পড়া চলতে থাকে।

ক্রমে সাংসারিক অবস্থা আরও ভাটল হয়ে উঠলো এবং শ্রী অমিয়রঞ্জন পড়াশুনো বন্ধ রেখে ভাগ্যক্ষেপে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সেটা ছিল ১৯২৮ সাল।

আত্মীয় লব্ধ প্রতিষ্ঠা ব্যবসারী শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে থেকে জীবিকার সন্ধান করছিলেন। এর মাঝে চাকরী যে তাঁর একেবারেই জুটলো না এমন নয়, কিন্তু ব্যবসা করবার জন্য ধীর মন ব্যাকুল, তিনি চাকরি করবেন কি করে? তাঁর এক আত্মীয় একটি পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এ সময়, সুযোগ বুঝে কন্ঠী অমিয়রঞ্জন এ উত্তমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন একজন সহযোগী হিসেবে, সেখানে কাজ করতে করতেই তাঁর মনে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করবার ইচ্ছা ও আগ্রহ উদ্ভূত হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে এ ইচ্ছাটী লান্না বাঁধতে থাকে, তার পরেই দেখতে পেলুম ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়ের সূচনা, পূর্ববর্তন পুস্তক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভবনও তাঁর যোগসূত্র ছিল হয়নি। কিন্তু ক্রমে নিজের ব্যবসায়ের পরিচিতি সম্প্রসারিত হয়ে পড়ায় শেষ পর্য্যন্ত (১৯৪০ সাল) চলে আসেন তিনি সেখান থেকে এবং নিজের ব্যবসায় নিয়ে ব্যস্ত করলেন তাঁর পুরোপুরি সময়, উত্তম ও শক্তি। এ মুখোপাধ্যায়ী এও কোম্পানীর জরাজীর্ণ আরম্ভ এখান হ'তেই।

শ্রী অমিয়রঞ্জন যে ধরণের মৌলিক ও ব্যয় বহুল গ্রন্থ প্রকাশ করে এসেছেন তাতে তাঁর স্তন্যদের একটা বিরাট পরিচয়ই আমাদের চোখে পড়ে। গল্প উপভাষা পাঠ্য অন্যান্য সাধারণ পাঠ্যক সমাজের কাছে তাঁর বৃহৎসংখ্যক গ্রন্থসমূহ সঙ্গে সঙ্গে আদৃত হয় তো হবে না তিনি জানতেন, কিন্তু ভবুও এক গভীর আত্মপর্যায়ের প্রেরণায় আর্থিক ক্ষতির দার দারিদ্ৰ্য বীকার করে নিয়েই এ সকল সংসাহিত্য প্রচারে তিনি ব্রতী হন। যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্তকৃত "স্বত্বালোক ও লোচন" (ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), ডাঃ সুনীল দেব "বাংলা প্রবাস", ডাঃ রাসবিহারী দাস প্রণীত "ক্যাপ্টার দর্শন", ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের "শ্রীধার ক্রমবিকাশ", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বঙ্গের মহিলা কবি", ডাঃ অকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সমালোচনা সাহিত্য", শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জী রচিত "কল্যাণীয়া সঙ্গায়" ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ৪০০ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় বরল দায় ৪৮ বছর। তিনি নিঃসন্তান। বাস করেন বড়দেহে জহদার।

### শিক্ষার্থী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

ইনি সন ১৯৮১ সালে, ১১ই মাঘ মঙ্গলবার, ইং ১৮৮০—২০শে ফাল্গুন, বৃন্দাবন জেলার অন্তর্গত বেলডালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই ইহার গভীর ও বাস্তবিক শিক্ষামুগ্ধতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম্য উৎসব ও পূজা-পার্বণে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, কার্তিক প্রভৃতির প্রতিমা ইহাকে যে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিত তাহার প্রায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে অকরে অকরে প্রমাণিত ও রূপায়িত হইয়াছে। গ্রামের অনতিদূরে খোলা মাঠে সঙ্গিগণের সহিত বেড়াইতে গিয়া ক্রীড়ায়ত বহুগণের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও অন্তর্গামী সুখের পার্শ্বচর বঙ্গী মেষগুলি দেখিতেন এবং সময় সময় এতই মুগ্ধ হইয়া বাইতেন যে তাঁহাকে বাড়ী কিরিয়া বাইবার কথা শ্রবণ করাষ্টতে বহুগণকে সতর্ক থাকিতে হইত।

পাঠশালার প্রারম্ভিক ও পরবর্তী জন্মের শিক্ষা ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া যথাকালে এবং কৃতিত্বের সহিত ১৭ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে সময় উক্ত পরীক্ষার, Drawing, optional subject ছিল। ইনি উচ্চাঙ্গে পাশ করিয়া Star পান। ইতিপূর্বে ইনি কখনও কাহারও নিকট উচ্চ শিক্ষা করেন নাই। ক্রমে প্রত্যেক বিষয়েই ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। যদি বখনও কোনও subject-এ হু-এক নম্বরের জন্য সেকণ্ড হইতেন তা হ'লে হু-বে ও ক্ষোভে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রায় অনশন চলিত। ইহাঙ্গের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ বহুল ছিল না। তাঁহার পিতার পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তদুপরি ইহার দ্বিত্ব একান্ত



শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

আন্তরিক ইচ্ছা ছিল শিল্পী হওয়া। বাহা হটক, সাময়িক ভাবে F. A. সেক্ষেত্র বৎসর পড়ার পর, যেমন ভাবেই হোক ইনি শিল্পশিক্ষার জন্য দৃঢ়পন্থক হন।

তখনকার দিনে এই প্রকার শিল্পশিক্ষার প্রতি লোকের নির্ভরতা কিছুই ছিল না। তৎকাল ইংগকে প্রত্যেকের নিকট হইতে নিষ্কংসারের বাণী শুনিতে হইত। একান্ত অমুবাগ বশতঃ এই সকল বিদ্বৎমানসীদের কথার কর্ণপাত না করিয়া এবং বিশ্বাসের বশে ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা নিজের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই শিল্প শিক্ষা প্রাপ্তের জন্য Govt. School of Arts এ ভর্তি হন এবং যথাক্রমে ৬ বৎসর কাল শিক্ষা করিয়া বিশেষ বর্ষের সহিত সকল বিষয়ে পাশ করিয়া বাহির হন।

বৎসর ধানেক Arts School-এ পড়ার পর, একান্ত আর্থিক অনটনের জন্য লালগোলায় মহারাজা বাহাদুর, কাশিমবাজারের রাজা আতঃতাবনাথ রাঘ বাহাদুর এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে বিশেষ ভাবে আর্থিক সাহায্য পান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রায় ৪ বৎসর ইংগকে তাঁহার কলিকাতায় বাগানবাটীতে (বর্তমানে ৩০২নং আপার সাতুলার রোড) আহ্বান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়, ১১০৬ সালের কিছু পূর্বে, ইনি তাঁর দেশের বাড়ী হইতে গো-গাড়ীযোগে—তখনও ওদিকে রেললাইন হয় নাই—১৪ মাইল দূরত্ব পলাশীর বগবনের বর্তমান দৃশ্য দেখিয়া sketch করিয়া আনেন। পরে সেই স্কেচটোখানি, সে সময় (১১০৬ সালে) H. R. H. The Prince of Wales—(পরে H. R. H. King George V.)—কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয় ও তিনি প্রীত হন।

বড়সট বাহাদুর লর্ড মিটো এই paintingখানি দেখিয়াই বলিয়াছিলেন—“Whose Copy is this?” উত্তরে তিনি যখন জানিলেন যে, “It is not a copy, but an original painting and is done by a native student of this place,” তাহাতে তিনি খুবই আশ্চর্যবোধিত হন।

তার পর এই শিল্পী পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, মহারাজা স্ত্রীর প্রোক্তোক্তুমার ঠাকুর বাহাদুরের ডাফতর স্বর্গার ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর এবং H. H. The Feudatory Chief and Maharaja of Jhind, Punjab প্রেরিত জনৈক

উত্পাদক রাজকর্মচারীর শিল্পশিক্ষক হন। পরে বাহান ভাবে এই কার্যের দ্বারা The Earl of Ponis, the descendant of Lord Clive, London, Messrs Taylor Bros. Leeds, England, Hon'ble Justice H. Holmwood of the High Court, Calcutta, Hon'ble Justice Sir Asutosh Mukherjee, Hon'ble Justice Sarada Charan Mitra, Maharaja Sir Jotindra Mohan Tagore, Maharaja Sir Manindra Ch. Nandy (Cossimbazar), Maharaja Sir Jogendra Narayan Roy (Lalgola), Maharaja Bahadur of Krishnagar, Raja Sreenath Roy ( Bhagyakul, Dacca ), Raja Manindra Ch. Sinha ( Paikpara ), Sir Jadu Nath Sircar, Vice Chancellor of Calcutta University, Mr. K. L. Barua, Education Minister, Assam.

প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তগণের প্রশংসা অর্জন ও ১৪টি পৃথক পৃথক শিল্পগ্রন্থদর্শনী হইতে ১৪টি স্ববর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সত্যতঃ ভারতও ইহার বেশ অধিকার আছে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধ্যানের সঙ্গে যথাসম্ভব মিলাইয়া, দেবদেবীর বহু চিত্রাঙ্কনের জন্য নবনীপ বলবিবুধজননী সভা হইতে ইংগকে “শিল্পাচার্য” উপাধি ও ১টি স্ববর্ণপদক দেওয়া হয়।

ইহার অঙ্কিত চিত্রাবলী, মাসিক বহুমতী, মানসী ও বর্ষাবাসী, আর্ধ্যাবর্ত, ভারতী, পুষ্পপাত্র, উপাসনা, গৌরাদেশবর ( Patna ), নগচেনন ( Kathiawar ), সরযুজী ( Allahabad ), Orient ( Indian Press ) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার বয়স ১৪ বৎসর। এখনও তিনি পূর্বের মতই সমান ভাবে চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, তবে বর্তমান গড়গমেটের জহিলদারী উচ্ছেদ নীতির চাপে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও মনীষীগণের মনে অর্থনৈতিক ভীতির ফলে কাজ বর্ধিত কমিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ বলিয়াই ইনি স্রষ্টি ও সুনীতির উপাসনার রত আছেন। সঙ্গীতেও ইহার বর্ধিত অধিকার আছে।

[ মাসিক বহুমতীর পক্ষ থেকে রমেন্দ্রকক গৌরামী, কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র দত্ত লিখিত । ]

## মাতৃজাতির সেবা

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নহবতের সন্নিকটে বকুলবৃক্ষে পুষ্প-চয়নরতা গৌরীমাকে বলেন, “ভাখ গৌরি, আমি জল ঢালাছি, তুই কাপা চটকা।”

বিস্ময়বিদ্ধাক্রান্ত নয়নে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া শিষ্যা প্রশ্ন করিলেন, “এখানে কাপা কোথায় যে চটকাব? সবই যে ঝাঁকর।”

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝিলি? এদেশের মায়েরের বড় হৃৎক, তাকে তাঁদের মধ্যে কাজ করতে হবে।” বামহস্তে বকুলের একটি শাখা ধরিয়া তখনও তিনি দক্ষিণ হস্তদ্বিত পাশ হইতে আঁতে আঁতে জল ঢালিতেছিলেন।

—গৌরীমাতা হইতে





# শ্রীমদভিষেকের দেধাদেধো

মনোজ বসু

ভারতীয় দূতাবাসটা পয়লা নব্বয়ের, কাজকর্ম বিস্তার। অনেকটা জায়গার উপরে গোটো তিনেক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। গাড়ির অঙ্কটা সঠিক বলতে পারছি না—তুনেহিলাম সেই সময়, রীতিমত জ্ঞানদার। দূতাবাসের কর্মচারী জন পনের। নিয়মাস্কিক বা টাইনে দেওয়া হয়, রাশিয়ার ঐ বিবম মাগগি বাজারে তা ফুঁরে টুড়ে বাবার কথা। ভারত সরকার সেজ্ঞত কম দরে ঔদের রুবল রিবরাতের ব্যবস্থা করেছেন। পাউণ্ডে ৩০ রুবল পান ঔরা; বাজার য় বেখানে দশ-এগারো। তা ছাড়া ভুবন হুঁড়ে বাজার করেন—কখনো বেটি ভাল ও সস্তা। হেরেদরে এমনি ভাবে পুথিরে ায়।

দূতাবাসে তিন জন বাঙালি। ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের কথা নেছেন, তিনি দেশে চলে গেলেন তো সেই জায়গায় ধর এসেছেন খন। আছেন রবি ভাঙ্কড়ি—তিন বছর হয়ে গেল, পথ গকাচ্ছেন কবে চলে যাওয়ার ছকুম আসে। আর একটি তরুণ—ঐমান সুব্রহ্মনাথ বসু, বধমান রায়না অঙ্কলে বাড়ি। একলা ছুধ—ঔরই মতো ক'জনে মিলে মেস করে আছেন। বিশেষে কভায়ার আলপনের মতক! পেয়েছি—তিন বাঙালির সঙ্গে বড় মে পেছে। ভাঙ্কড়ি-জায়াও ভাবি খুশি। পুঙ্করী তবু কাজেকর্মে ক্ষুণ্ণ—মেয়েদের অসুবিধা, কথাবার্তার মাহুধ খুঁজে পান না। দেশর মাহুধ—বাঙালি মাহুধ গেরে বর্তে পেছেন একেবারে।

তা ছাড়াগে পেরেছি, আমরাই বা ছেড়ে দেবো কেন? ভাঙ্কড়ি-দ্বীকে খবে বললো, নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে আমাদের।

বেশ তো, বেশ তো—

ভাঙ্কড়ি বিনয় করে বলেন, বড় বড় জায়গার খাওয়াচ্ছে। হোসের সামান্য ভাল-ভাত—

ধরে পড়লাম : ভাল-ভাতই কিন্তু খাওয়াতে হবে আমাদের। ভাত—এক হুহুরির ডাল যদি যোগাড় করতে পারেন। ভাত-ডালের নামে গ্রাণ লালারিত হয়ে উঠছে। কত দিন বস্তু হুখে ওঠে নি।

ভাঙ্কড়ি-জায়া হেসে বললেন, তাই হবে, হুহুরির ডালই জ্ঞাবো। আর বেগুন-ভাজা সর্বের তেলে।

এই গজাহীন দেশে হুহুরির ডাল এক তরুণির সর্বের তেলের তু শু মাত্র আখ্যাসির লোকের পক্ষেই সম্ভব। ঐ বে বললাম—কোড়া বাজার—হল্যাও থেকে মাখন, আট্টলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া থেকে চাল। নিখিল ভুবন কাইমসের জালে—সেই জালের আওতার বাইরে এঁরা।

আজ রাতে লেনিনগ্রাড রওনা হবে, তার আগে সাধের নিমন্ত্ণটা বাই। রবি ভাঙ্কড়ি খবর দিয়ে গেছেন, হুহুরিকা ব্যবস্থা ছে। দকালের দিকটা ভাই বেশি ঝামেলা রাবি বি।

শহরের মলোটোড অঙ্কলে বাইশ নব্বয়ের শিশু-সদনটা দেখা হবে, দেখেই দূতাবাসে ফিরে যাবো।

লড়াইয়ের বেসব শিশুর বাপ-মা মরেছে, তাদেরই জন্ম এমনি সব সদন গড়ে উঠল। পলের সঙ্গে সেই এক দিন কথা হচ্ছিল—দেশে পুঙ্করের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সব মেয়ের বিয়ে হবার কোন উপায় নেই, অতএব কুহারী মেয়ের উপর ট্যাঙ্ক কেন? পল বলেছিল, এই ট্যাঙ্কে আমরা আপত্তি কবি না; যুদ্ধের জন্ত হাজার হাজার বান্ধা অনাধ হয়ে গেল, ট্যাঙ্কের পুরো টাকটা তাদের জন্ত খরচ হয়। দেশ-সুখ মাহুধের অপার মমতা ঐ শিশুদের সম্পর্কে। বেখেছেও তাদের রাখার হালো—মা-বাপ নেই, কোন সময় সে অভাব বুঝতে না পারে।

লোভাবিধি মায়ী আগে আগে গিরে বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। আগে খবর পায় নি, এতগুলো বিশেষিক দেখে তারা হকচকিয়ে গেছে। কতী তরতর করে নেমে এলেন উপর থেকে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করছিল, বড় বড় চোখ মেলে চূপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

১৯৪৩ অব্দে এই সদনের প্রতিষ্ঠা। তিরানকইটা মেয়ে থাকে এখানে। সাত থেকে সতের বছর বয়স। শুধু মাত্র মেয়ে। ছেলেমেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে রাখতে যে মানা আছে, তা নয়। অনেক সদনেই আছে এমন। এখানে স্থানান্তরের জন্ত আলাদা ব্যবস্থা। পড়াতনো বাটারে ইচ্ছুক করতে বায়। সাতটার সময় উঠে ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা প্রাতঃভোজনে দুই দল ভাগ হয়ে। এক দল ভাত পরে ইচ্ছুক চলে যায়, অপর দল বেড়ায়। ন'টা থেকে এগারোটা অবধি ঘরের কাজ করে এই দ্বিতীয় দল। বেলা দুইটায় এই দ্বিতীয় দল ইচ্ছুক যায়। প্রথম দল ইতিমধ্যে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে; পোশাক তৈরীরাি এক নানান রকম হাতের কাজ করে। নাচ-গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। সপ্তাহে একবার করে সিনেমা দেখানো হয় এই বাড়িতে। বাইরের ঘিরেটোয় নিরে বায় মাসে একবার। যক্ষা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অতি চমৎকার এদের প্যারোনিয়র-ক্যাম্প। সেখানে যেতে হয় মাঝে মাঝে। আরও নানা স্থানে নিরে বার—তলস্তরের গ্রামের বাড়ি, ভাঙ্গিলের জঘত্ববি গোথি, লেনিনগ্রাড, স্তালিনগ্রাড—ইতিহাসের স্মৃতিমণ্ডিত এমনি সব জায়গায়। এবারে ইউক্রেনে গিয়েছিল। হ' জন আছেন খবরলাবির জন্ম। তা ছাড়া আছেন ডাক্তার নার্স ও প্যারোনিয়র দলনেতা। মাসে প্রায় হাজার রুবল খরচ প্রত্যেকের জন্ত।

মা-বাপ মা থাকলেই যে সদনে নিরে আসবে, এমন কথা নেই। পোষাপুত্র করে নিতে পারে কেউ, অথবা আত্মীয়বন্ধন এসে জায় নিতে পারে। লড়াইয়ের বায়া অনাধ হয়েছে, গোড়ার তু



তারাই হান পেত এমন সব প্রতিষ্ঠানে। সেই সব ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে প্রায় সবাই বেহিরে গেছে। বাপ কিবা মা বেগাকান্ড—শিশুর দালনপালন করতে পারে না—সেই সব শিশুও নিয়ে আসে সদনে। আর আছে সেই সব, জারজ বলে বাদের দিকে আমরা নিচু চোখে তাকাই। বাপে-মামে বিয়ে হোক চাই না হোক, সন্তানমাত্রই এসেছে বোলঝানা আইনসম্মত ও আদরশীল।

বড় বড় সনন আছে—শ তিনেক থাকবার মতো। কিন্তু এই বকম মায়াবি সননই বেশি—শয়ের কাছাকাছি যেখানে থাকে। লনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনায় সুবিধা করতে পারে না, চোদ্দ বছর রস হতেই তাদের কাঠগরি কান্নকর্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন রল-বিভাগের পরীক্ষায় পাশ করে সেই কাজে চলে গিয়েছে অনেক। হাতের কাজেরও অনেক ব্যবস্থা; সেলাইয়ের কল বিস্তার দেখছি। লনেকে ম্যানিভাঙ্গিটির পড়াশুনো করে আঠারো বছরে এখান থেকে বেহিরে বাবার পর। বাবার সময় দরকার মতো দর্শ-সাহায্যও পায়।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখছি। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা থাকে। ঘরে। আঠারটি খাট, দ্ব্যধরে বিছানা। পাট-ভাড়া তোয়ালে প্রস্তুত হনর। খাসা খাসা শিশুমূর্তি এদিকে সেদিকে, দেখে মন প্রসন্ন হয়। জ্ঞানীশুণী-বিধানের ছবি বাড়িময়। একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ফান্দো গেল—ভ্যালেন্টাইন নাম। আর একটির নাম সিউবা—পায়োনিয়র রলের কেটবিজ্ঞ একজন। রাগ্নাঘরে গ্যাসট্রোভ—সিপাতালের মতন আ্যপ্রন পরে ওদিকে চলাফেরা করতে হয়। নানাব্যে গোল-টেবিলের চারিগণে চারটে করে চেয়ার। বিচ্ছন্ন কাপড় টেবিলের উপর। খাট জন বসতে পারে একসঙ্গে। ফকটি মেয়ে নাতেলা—ইংরেজি শেখে; গুডমনি বলে আহ্বান রল আমাদের। সিউবা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বকুতা শুক রে দিল—ভারতীয় শিশুদের ভালবাসা জানিও। যেন তারা চিঠি-ত্রি লেখে আমাদের। একবার এসে দেখে যায়...

জ্ঞানকে কোলে তুলে দাঁড়িয়েছি। ক্লিক করে ক্যামেরার ছবি লে কেসল।

সদন থেকে সোজা আ্যাবাসি। নিমন্ত্রণটা জুটিয়েছি আমি। গাড়ীর অনেকে সোবারোপ করলেন, বিদেশ-বিহুঁরে সুবিধা-সুবিধা আছে—গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ চাওয়াটা ঠিক হয়নি। গাড়ীপাড়ার পরে তাঁরা পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে তুলছেন এখন। ভালি গৃহস্থ-বাড়ির রাগ্না—অনেক দিন পরে সত্যিকার স্থি পাওয়া গেল। ডেলিগেটদের মধ্যে বাঙালি ক-জনের নিমন্ত্রণ—কিন্তু বীরেন সেন মশায় বাইরের একজনকে নেটুনে সঙ্গে এনেছেন। প্রাদেশিকতার বদনাম খণ্ডে দেওয়া ল এমনি ভাবে। সে ভক্তলোকের মুশকিল—অনু গেলার তো করে থাকেন। গৃহকর্ত্তাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হচ্চেন গভিক থে।

আমাদেরই শুধু নয়, আ্যাবাসিতে ধারা বাঙালি আছেন—পুরুষ রে ও বাচ্চা, সকলের নিমন্ত্রণ। মফোর উপর বাঙালি জীবাড়ির ছাত্রোড়। দেবার বাংলা ভাষা—রেখেডেকে সেরে মলে প্রাথার খিবচনা করে কথা বলবার দরকার হচ্ছে না। জী ভা

ভাহুড়ির ভিন বছর হয়ে গেল এখানে। গৃহস্থ পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে কিছু কিছু। এক ভক্তলোকের কাছে কলভাষা শেখেন সন্তাহে এক খটা করে—মাসে মোট চারদিন। তার বাবদে এক শ' কল করে দিতে হয়। দূতাবাসের আরো অনেককে তিনি শেখান। সুব্রত বসুমা মেসে রাগ্নার লজ এক মেয়েলোক রেখেছেন। সকাল আটটার আসে, একবেলা খাইরে দিয়ে এক অন্ত বেলার রাগ্না ঢাকা দিয়ে রেখে আড়াইটে নাগাত চলে যায়। আপ-থোরাকি—এক-আধবার চা খায় শুধু এখানে। পাচজন লোকের রাগ্না ও বাসন-মাজা—মাইনে হল আটশ' কল অর্থাৎ ন শ' টাকার মতো। বুনুন। একদিন এরা লোকান থেকে ছুধ হুধ দেবার লজ বলেছিলেন, ইউনিয়নে অমনি চিঠি লেগে গেল। ইউনিয়ন হুমকি দিয়ে গুটে : ভেবেছ কি হে, কুলো আটশ' কল মাইনে—তাতে আবার হুধ ও এনে দেবে? বকা হল, আরও চারশ' কল দেবে—তদ্ব্যলো বাজার-করা ছুধ-আনা ও কাপড়-কাটা এই তিনটে কাজ অতিরিক্ত করবে।

কালো রঙের কদর খুঁ। রাগ্নার বেললে কালো আ্যামের দ্ব্যধার চোখে চেয়ে চেয়ে লেখে। ট্রামে চড়ে আমিও একদিন মুশকিলে পড়েছিলাম—সে গল্প পরে শুনবেন। জীমতী ভাহুড়ি বিকালের দিকে হয়তো বা পার্কে গিয়ে বসলেন। কল-মেয়েরা আসে। জীমতীর হাতখানা পরম আগের টেনে নেয় তারা হাতের মধ্যে; বলাবলি করে, আছা কী সুন্দর কালো নেয় তারা জীমতী কালো নন, রীতিমতো গৌরবী। তারই বাহার এমন—আর আসল কালো পেলে উল্লাসে ওরা যে কি করত, ভেবে পাইনে।



মফোর এক শিশুসদনে

বাচ্চা ছেলেপুলে বড় ভালবাসে ওখানকার মেয়েরা। আচ্ছা কিছু নয়, সব দেশেরই এক স্বভাব। ভাড়াড়ির ছেলের নাম বুদ্ধবাব। অত হাল্কাবাব নাম জিতে জড়িয়ে বাবে, জীমতী ভাই সোজা করে বলে দিয়েছিলেন খোঁকা। পার্কে ছেলে নিয়ে গেলে চারিদিক থেকে 'কোকা' 'কোকা' করে অস্থির। নিজের বাক্যের উপরেও অত্যধিক বিশ্বাস। লেশের আচ্ছা রকম প্যাকিং করে শুধুমাত্র নাক এবং একটু চোখ বের করে ছেলেপুলে হিমের মধ্যে নিয়ে বসে। এমন করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পোক্ত করে তোলে বাচ্চাদের। শীতকালে বটখানেক অস্বস্ত বেরুবেই পথে—এটা আবৃত্তিক কৰ্ম, শখ নয়—বুড় বাবুর জ্ঞান।

খাওয়াটা অতিশয় গুরুতর হল। নড়াচড়া মুস্কিল। খুব একচোট শরৎ জলবে সময়কেন্দ্র করে নিই। হোটেলের ফিরতে অপরাহ্ন। তখন একটু চা মুখে ঠেকিয়ে টহল দিতে বেরুব এবার। মেট্রোর কাছে ঘরের চাবি চাইতে গেছি। এই যে, এসেছে অন্তর্কণে। হুজনে তোমার কাছে এসেছে। সেই কখন থেকে এসে বসে আছে।

তাজব লাগে। নেতা কিংবা উপনেতার কোন রকম খামেলায় নই, আমার কাছে আসতে বাবে কোন হতভাগা! কোথায় তারা? কি চায়?!

একটা গোলটেবিল ঘিরে আগন্তুকরা বসে। তার ভিতরে সেই হুজনে বুঝতে পেরেছে, আসামি হাজির। উঠে পাড়াল। তরুণ ছেলে আর ভক্তনী মেয়ে। সুপ্রী উজ্জল চেহারা। গুরুঠাকুর দেখলে বুড়ি বিধবারা বেমন হয়ে ওঠে, মুখে-চোখে সেই প্রকার গঙ্গগ ভাব।

ও দেশের নতুন মানুষ পোলে বেমন ধারা জিজ্ঞাসা করি, ইয়েজি কলবে তোমরা? অর্থাৎ কথা শুনে ক্যালক্যুল করে তাকিয়েছে কি বেকুবের হাসি হেসেছে তো সোভাষি ডাকব।

মেয়েটি পরিষ্কার সাধু বাংলার বলল, আমরা বঙ্গভাবার বাক্যলাপ করিরা প্রীতিসাত করিতে চাই।

বটে হে! তা পাড়িয়ে পাড়িয়ে কতটুকুই বা প্রীতি হবে। সন্ধ্যার বলি, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন মশায়রা। জাঁকিয়ে বসে প্রীতি-রাসে লেগে থাকি আমি। ক্রমাস করলাম: চাকরি কেব-বিদ্যুট কলটল হয়ে পাঠিরে দণ্ড—দরজা হাতে পাঠিও, তিন জনের মতো।

মেয়েটি আলেকসেয়েবা; ছেলেটি গ্রাভুক ডানিয়েলচুক। আমার খাতার বাংলা হরণে নাম-সই আছে তাদের। হাঙ্গেরির বত পেশা হতে পারে, তত ইউনিয়ন সোবিয়েত দেশে। ইউনিয়নগুলো অসীম শক্তিশালী—রাজ্য চালায় আসলে—এরাই। আমাদের লেখকরাও ইউনিয়ন গড়ে বসে আছেন—সোবিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন (Soviet Writers' Union) এর কী বাড়ি মশার, হু-মিন গিয়েছিলাম সেখানে। বকবকে মোটর জেট লেখক মশাররা আনাগোনা করছেন। লনের পাশে পাড়ি মাথবার সুবিভাগ্য জারগা—অত জারগা ভরে বার এক এক সময়, বাড়ি তখন রাজ্যের মাথতে হয়। ইউনিয়নের বিষয় কথচারী নানান বিভাগ। বিশেষি দস্তুর আছে—সেই দস্তুরে বাংলা বিভাগের লোক এরা হাট। কেমন করে জেনেছে, বাড়ালি পিশাভিরেল এসে ছুটেছে একটি; ধবধাবার নিতে এসেছে।

কখন এক দিকে কিছু টেকিল-ঘিরে আদায় করে বসেছি।

আলেকসেয়েবা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: এ তাকব বঙ্গভাবার বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি—অর্থাৎ কি সৌভাগ্য, সেই ভাবার একজন লেখককে চরিত্র দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

বলতে বলতে—হাসি দেখেছে আমার—চুপ করে বার। লজ্জার মুখ নিচু করে।

হেসে তো চৌচির হবার কথা। কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে প্রাণপনে সামলে নিই। অচ্ছা বলবল করছে হুজনের মুখে। বাংলা পড়াশুনো করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কী গভীর ভালবাসা! জানবার জন্ত কত ব্যাকুলতা!

বক্সিমচের কোন বই পড়েছ?

হাঁ, কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছি।

কেমন লাগল?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

শরৎ বাবুর কিছু?

বিরাজ বৌ—

কেমন?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

আমার দুটো বই দিলাম হুজনে। আলেকসেয়েবা আর আসেনি, অগ্রহু হয়ে পড়েছিল। গ্রাভুক আসত; আমার ভাই হয়ে গিয়েছিল, আমি তার দালা। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পড়েছ আমার বইটা?

সম্পূর্ণ পড়িয়াছি। অতীব চিত্তাকর্ষক।

চলুক ছেলে। মনে মনে হাসি, ধরতে পেরেছে। বলে, সাধুভাবার পুস্তক পাঠ করিরা আমাদের বাঙালিছু শিক্ষা। বড়ই হুজের বিষয়, চলিত ভাষায় আমরা কথা বলিতে পারি না।

বললাম, কলকাতায় চলো ভাই। আমার বাড়ি থাকবে, গেজি গারে বেড়াবে, গামছা পরে তেল মাখবে চানের আগে। হু-মাসের মধ্যে চলিত-বাংলার এমন রপ্ত করে দেবো যে আমরাই তখন বুঝে উঠতে পারব না।

চলিত-বাংলার না হোক—এই এক তাজব, বটায় পর বটো উৎকৃষ্ট সাধুভাবার চালিয়ে যাচ্ছে, ভারী ভাণ্ডার বিষয়ের আলোচনা করছে, বাখে না। সে পরিচয় আপনারাও অনেক পেরেছেন। গ্রাভুক ভারতে এসেছিল (এখনো নাকি আছে, নানা রাজ্যে যোগাযুগি করছে); আশ্রয় নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বাংলার বক্তৃতা করেছিল। আমি বাই নি, আপনাদের কেউ কেউ জেনেছেন হয়তো।

প্রথম রাজ্জই তাই দেখছি। সাহিত্যের কথা শুনে এসেছিল, কিন্তু বীরেন সেন মশার নানা রাজনীতিক তর্ক জুড়ে দিলেন। বটায় পর বটো চলল। ডিনারের সময় পায় হয়ে বার, একমল খেয়ে উল্গার তুলতে তুলতে লক্ষসড়া করে ওখবে চুকলেন। রাজ্জি বারোটার সেলিনগ্রাড রওনা হবো আজকেই। এই সব কারণে অনিচ্ছার সঙ্গে তারা উঠে পড়ল। দরজা অবধি গিয়ে ওতারকোট চড়াচ্ছে, তখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গ। করিডরে অনেকদূর সঙ্গে সঙ্গে সেলাম, তখনও।

মন্ডার কিরিয়া খাসিলে যেন সংবাদ পাই। আমরাই সংবাদ লইব। আপনি বিরক্ত হইবেন না।

সে কী কথা! এসো ভাই, শিশুর আসবে আবার। কত জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, কিন্তু তোমাদের এই দুটির মতো এমন বন্ধন আজও এখানে পাইনি।

২০

ঘুম ভাঙল ট্রেনের মধ্যে। রাত দুপুরে উঠেছিলাম। কী অশ্রুণু কামরা, রাজা-মহারাজার ঘরের মতো। কার্পেট বিছানো মেঝের বকমক কারুশিল্পিত আলো। সারা দেয়ালেও কারুশিল্পিত। ছ'কামরার পোশাকখানা। সেটা এমনি কামরার, এদিকটা খুললে গুলিক আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। শৌচাগার কামরার লাগোয়া নয়, একেবারে দূর প্রান্তে। এই এক অশ্রুবিধা—চান্দপনের জনের এক শৌচাগার। শৌচ সম্পর্কে, দেখা যাচ্ছে, বিষম কল্পনাবাদী এসে।

গাড়ি হুলকি চালে চলেছে। এই নিয়ম এখানে, মানুষ-বড়ো গাড়ি অত্যন্ত সামাল হয়ে চালায়। সকলের বাড়ি খন-দৌলত নাকি মানুষের ভবন। আমাদের তুলে হাসি পায়—কি বলেন? কলিকাতা গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি জানিলায় বসে। পৌনে নটা বাজে—এখনও রোদ ওঠে নি, উষাকালের মতন আকাশ। ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াসা। রাত্রে কিছু বরফ পড়েছিল, এখানে—ওখানে চিহ্ন আছে। দাবানলের পর গাছের গুঁড়ির যেমন কালো কালো অবশেষ থাকে, বনের সেই চেহারা। বরফ পড়ে পড়ে এই দশা হয়েছে। বনবাস্তবের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—হৃদয়ের সীমাহীন বাচ্চ-পাইনের বন। ক্ষেত্রখামার মাঝে মাঝে। ফল বেড়ে নিয়ে আঁটি কুপাকার করে রেখেছে, আমাদের গাঁয়ের উঠানে যেমন পোয়ালগালা দেখতে পাই। জলা জায়গা—আমাদেরই বিল-বীজের মতন। কাঁচা রান্ধা—গাড়ির চাকার দাগ পড়ে গেছে। দু-দশটা সবুজ গাছও এবার দেখতে পাচ্ছি—বরফ আর শীত আমলে না এনে হাতে পাতা ফিলমিল করে। জল কেটে ফেলেছে অনেক জায়গায়, গাছের গোড়াগুলো শুধু আছে। চাষবাস করবে। খরস্রোতা নদী—নদী পার হয়ে গ্রাম এলো এবার। কাঠের বাড়ি, ছাত্ত-দেয়াল সমস্ত কাঠের। কিন্তু লোক-জন একটা দেখি না কোন দিকে। শীতে ঘুম ভাঙেনি এখনো গাঁয়ের। ঘর কানোচের সবজিক্ষেতে কয়েকটা সাধা ঘুরগি খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে শুধু। একটা মাঠের উপর বিস্তার গুল। পুষ্ট চেহারা, সাধারণ কালোর মেশানো রং। কিন্তু চরে বেড়াচ্ছে না, নড়াচড়া নেই, স্বাভাবিকপন্থীর মতো একটা জায়গায় ঘরানিমগ্ন বসে। জীব না অতিকার-পুতুল, সম্ভব হয়।

এর পরে পুরোপুরি সবুজ জঙ্গল। অজস্র পাইন ও ফার। আপেল-বাগিচাও অনেক। গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছি। রান্ধাবাট তাল নয়, বরফ-গলা জল জমে আছে এখানে-ওখানে। প্যাচপ্যাচে কালা। এক খোড়ার টানা গাড়ি বাজে কালা ছিটকাতে ছিটকাতে। হুটো একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে এখন—মাথায় টুপি ও গায়ে ওভার কোট এঁটে কালা বাঁচিয়ে সামাল হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথে অবিকল এমনিধারা দেখি। কচি ছেলের হাত ধরে বাপ ঐ কেমন কালা পার হচ্ছে, দেখুন দেখুন।

কামরার কামরার রেডিও বাজছে। আমাদেরও আছে। বন্ধ করে রেখেছি, নয়তো অশ্রুবিধা হয় লেখার। কচি-আঁটি কামরা—এ কচি নান্দো বার না ঠিকতরে গরম করে রেখেছে। কান্দো-বিধা থেকে

বাইরের জগতে থাকিবে আছি, তার সঙ্গে কোন বন্ধন বোণাবোণ নেই। বৃত্ত্যর পরে বাবুদত্ত বয়ে তুবন-ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ভেসে চলেছি বেন।

এবারে এক যন্ত্রবদ্ধ গ্রাম। কাঠের অগণ্য বাড়ি। হাঁস-মুরগি চরাচ্ছে। নিশ্চয় বাচ্চ গাছ এবং সবুজ শত্রুঘর কাব-পাইন। এই সব গাছপালা ও ঘরবাড়ি দেশের সঙ্গে একেবারে মেলে না। সারা পথে দেখে আসছি পতিত জমি বিস্তার। তাই এরা মানুষ চাচ্ছে, অগুণ্ডি মানুষ। মাঠের শেষে দূরে দূরে ফ্যান্টারি চোড়া থেকে ধোঁয়া উঠছে। বড় কারখানা গ্রামপ্রান্তে—নীল কাচের বোড়ার ঘেরা। লোক-চলাচল এবারে প্রচুর। আর দেরি নেই, পথ শেষ হয়ে এসেছে।

বড় ট্রেন। কিন্তু এমন নিচু জলা-জায়গা যে প্রাচীরের আগাগোড়া কাঠের পাটাতনের উপর করতে হয়েছে। কাঠেরও অগ্রভুল নেই। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র—বড় বড় বাঁধকপি ফলে আছে ঐ দেখুন। হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা অনতিদূরে। লেনিনগ্রাড।

জায়গাটা কি মশায় এখানে? তুবনের প্রায় ঐ মাথায়; উত্তর-মেরুর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছি। নেভা নদী ফিললাপ্ত উপদ্বীপের পড়ল—মোহানার উপর ঝাল-কিল-জললে ভরা বর্ষাপ, সেইখানটার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দুপুরী বানিয়ে তুলল। পৃথিবীর এক সেরা শহর। নজরটা যদি ছড়িয়ে রাখেন আর কিঞ্চিৎ যদি কল্পনার দৌড় থাকে, শহরে ঢুকবার মুখে জায়গাটার আকি-অবস্থার আঁচ পেতে পারবেন।

নিরে তুলল একেবারে সকলের সেরা হোটেল আন্তোরিয়ায়। মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে কী যে চড়ে উঠল, কি আর বলি! এতই দহর-মহরম আপনাদের সঙ্গে—কিন্তু দেখা করবার মনন নিয়ে যদি ঐ হোটেলের লাউজে গিয়ে বসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই যে চিনে ফেলতাম এমন কথা হৃদয় করে বলতে পারি।

আন্তোরিয়া জানেন তো? বাড়ি নাড়লে শুনিবে, জানেন নিশ্চয়। লড়াইয়ের সময় জেনেছিলেন, শান্তির সময় এখন তুলে বসে আছেন। লেনিনগ্রাড যিরে ফেলে হিটলার ঘরে নিলেন, নির্বাৎ এইবারে কেলা ফতে। হিসাবপত্র করে ফেললেন, কদিন লাগবে শহর লেনিনগ্রাড পদতলে আছড়ে পড়তে। সেই হিসাব অনুযায়ী আন্তোরিয়ার মানোজারকে চিঠি পাঠালেন, বড়দিনের কৃতি-কান্ডি এবার তোমার হোটেল। অল্পক দিন সন্মিলনে পৌছবে। পাঁচশ লোকের মতো উত্তম খাত ও মস্তুর-জোপাড় রেখো। চিঠির নিচে সহি খুঁ হিটলার মশায়ের। কিন্তু হিসাবে গড়বড় হল। বড়দিন মাটি হয়ে গেল, ঠাণ্ডা এসে পৌছলেন না; ন'শ দিন সন্মিলনে শহর যিরে থেকে শেষটা পিছোতে লাগলেন। ঘরের ছেলে ঘরে—ঘরের একেবারে অন্তরদেশে। তিনশ হাতবোমা মেরেছে একাই একটা মেয়ে, সেই মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ হল ঐ হোটেল। এখন বয়স চল্লিশ; তখন কি বয়স ছিল, হিসাব করে দেখুন। আর একটা ছেলে দেখলাম, পঞ্চাশ-বাঁটা বোমা মেরেছে। এমন কত! সমস্ত ইতিহাসের কথা—আমার পাঠকেরা মহাপণ্ডিত—মায়ের কাছে কোন মাসীর গল্প শোনাতে যাব? সেই তখন আন্তোরিয়ার নাম পেরেছিলেন খবরের কাগজে। তবু আমরা গিয়ে আছি। বৃহন্ন। হিটলার পেরে উঠলেন না, আর আমরা গাড়ি থেকে নেমে মচমচ করে হুতো বাজিয়ে উঠে পড়লাম। সেই কথা বললাম হোটেলের ম্যানেজারকে: দেখলেন তো দাঁষ্ট

হিটলারের চেয়ে অধিক শক্তি ধরি আমরা। বিপুল আরোহণ করেও শেখ অবধি তাঁর আসা ঘটে উঠল না, আর আমরা এই চলে এসেছি—কই রুখতে পারলেন না তো !

মানবজাতি বাড় নেড়ে মেনে নিলেন। বটেই তো। আপনারা হলেন শান্তির দূত, প্রীতি আর সৌহার্দ্য বয়ে নিয়ে এসেছেন—আপনাদের শক্তি কত। হাতিয়ারের জোরে হিটলার চুলতে চাচ্ছিল, সেই লোকের তুলনা আপনাদের সঙ্গে !

বাইরে কনকনে শীত, হাড়-কাঁপানো মেরু-বাতাস—ঘরের ভিতরটা বিছাতের তাপে নাতিশীতোষ্ণ। কাচ এঁটে বাইরের জানলা পাকাপাকি রকমে বন্ধ করা—উত্তাপ বেরিয়ে যেতে না পারে। পর্দা রয়েছে, আলো ঢাকা দিতে চান তো পর্দা টেনে কাচ ঢেকে দিয়ে বন্ধন। জানলা দিয়ে আরামে বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ট্রিক সামনেই পার্ক—ভোরোভিস্কি স্কোয়ার (Vorovski Square) সম্রাট প্রথম-নিকোলাসের মূর্তি পার্কের ভিতর। ঘোড়া পিছনের ছুপারে ঝাঁড়িয়ে আছে, ভারি উশের সম্রাট—মূর্তির এই বিশেষত্ব। শহরের বড় এক কেন্দ্র জায়গাটা—তিন-চারটে বড় রাস্তা বেরিয়েছে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে। ডাইনে বিখ্যাত আইজ্যাক ক্যাথিড্রাল—সেন্ট আইজ্যাকের নামে উৎসর্গ করা। চূড়া সোনার মোড়া—শোনা গেল, বক পরিমাণ সোনা লেগেছিল সোনালি প্রলেপ দিতে। ভিতরটার দামি পাথর বসানো, অল্পস্ব স্বাক্ষর শিল্পকর। জার আর জার্মান ব্যক্তিগণ ওখানে ঈশ্বর-ভজন্যর আসতেন। এখন আর ভজন হয় না গির্জায়। মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, কৌতূহলী মানুষ ঘুরে ঘুরে সেতালের ধর্মীয় চিত্রাবলী দেখত। চূড়ায় উঠে শহর দেখত, দূরের কিনল্যাণ্ড-উপসাগর অবধি নজর চলে এখান থেকে। এখন দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে ভার্য বৈধে গির্জার সংস্কার হচ্ছে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৮ চরিত্র বছর ঘরে বানানো। ইরানী নজর পড়ল ইমারত মাটির তলে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। আর বসলে ফেটে চৌচির হবে। সেটা বন্ধ করার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা উঠে পড়ে লেগেছেন। আটপুঠে তাই ভার্য বেয়েছে।

ক্যাথিড্রালের উল্টো দিকে আর একটা স্কোয়ার। ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হয়েছিল প্রথম-নিকোলাসের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ দমন করা হয়। সেই স্মৃতিতে জায়গাটার নাম দেওয়া হল ডিসেম্ব্রি স্কোয়ার। পিটার্স-গ্রোটে'র বিশাল বলদপু মূর্তি এই স্কোয়ারের প্রান্তে—শহরের অত্যন্তম ঐশ্বর্য বস্তু। বিপ্লবের আমলে ক্ষিপ্ত জনতা অনেক জারের মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে, কিন্তু পিটার্স-গ্রোটে'র দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকায় নি কেউ কোন দিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মূর্তিটা সন্তর্পণে ঢেকে দিয়েছিল, বোমা তাক করতে না পারে ওর উপর। পাথর কাটা হয়েছে সমুদ্রের মতন তরলিত করে, এটা রাশিয়ার প্রতীক। সেই পাথরের উপরে লক্ষ্যপূর্ণ পিটার। পাথরের নিচে লীচ-এক সাপ পেঁচিয়ে আছে ; লক্ষ্যপূর্ণ বিমর্ষিত, সাপ দিয়ে সেইটুকু করেছ।

আর একটু এগিয়ে তরলিগি নেভা। বিশাল নদী—শহরকে প্রত্যেক পাশে ঘুরছে। পূর্ব-বাংলার ধরপ্রোতা নদীগুলোর সঙ্গে ভারি মিল। কিনল্যাণ্ড-উপসাগরের মুখে হুর্গাম জল ও জলা জারগা ছিল—সুইডেনের অবদান। প্রথম-পিটার জায়গাটা রাশিয়ার দখলে

নিয়ে এসে শহরের পশ্চিম করলেন। সারা রাশিয়ার সর্ব অঞ্চল থেকে এক বাইরে থেকেও অগণিত স্থপতি এনে জোড়ানো হল। পাথরের অল্পস্ব অটালিকা উঠল দেখতে দেখতে। শুধু এই সেন্ট-পিটার্সবার্গ ছাড়া রাশিয়ার কোনখানে কেউ পাথরের ইবারত বানাতে পারবে না, এই হুকুম দেওয়া হল। নেভা কিন-উপসাগরে পড়ছে, সেই মোহানার উপর একশ'টা দ্বীপ নিয়ে শহর। কিন্তু দ্বীপ বলে আজকে চিনতে পারছেন না—তিনশ' বাটো। পুলে আটপুঠি এমনি ভাবে বৈধে দিয়েছে। নেভা ছাড়াও আটপুঠি খাল শহরের নানা দিকে। খাল এক নেভার দুই তীরে জলের কোল ছুঁয়ে নিটোল পিচের রাস্তা ; কোথাও বা জলের মধ্যেই নেমে গিয়েছে রাস্তার কিনারা। উল্টো দিকে সারবন্দি অটালিকা। আপনায় মনে হবে, শোভা বাতানোর জন্তেই বৃষ্টি রাস্তার পাশে পাশে মানান করে খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। একটা পুলের নাম হল চুম্বনের সীকা (Bridge of Kisses)। একটেরে নিরিবিচি জায়গা, আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের প্রণয়ীরাও ঐ পুলের উপর এক আশপাশের গাছপালার নিচে ঘোরাঘুরি করে গেছেন। অতি বড় ভারিগি মন্দিরেরও এখানে এসে মন চনমনিয়ে ওঠে।

জারের শীত-প্রাসাদের উল্টো পারে নেভার কুলে আরোহী কুজার নেড়ির করা রয়েছে। জাহাজের কামানগুলি শীতের সন্ধ্যায় আগাগোড়া কাণ্ড মুড়ি দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের। নিশাশ নেবার মতো যৎসামান্য তিসতিস আগুয়াজ ; অল্পস্ব পাতলা রকমের ঘোঁয়াও উড়ছে একটা। পাটপের মুখে। অত বড় প্রাণীটা আলতো বসে বসে চুকট টানছে, এমনি এক ছবি মনে আসে। ব্যাপার সত্যি তাই। এখন কাজকর্ম নেই কুজারের—অনেক খাটান ও বিস্তর যশোলাভের পরে বুড়া বয়সে নদীকুলে বসে বসে অবসর ভোগ করে। ঈশ্বর একটা অদূরে নেভার উপরেই—সেখানকার ছেলেরা মাঝে মাঝে এসে কলকব্জা টিপে দেখে, জাহাজ ব্যাপারের আশ্রয় দেবার জন্য অল্পস্ব যত চালানো হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে মহামায়া প্রবোধের ব্যক্তিগত কৌতুক করার মতো। ১৯০৩ সালে তৈরি—১৯০৪ সালের কশ-জাপান যুদ্ধে খুব খেটেছিল এই কুজার। ইচ্ছত কিন্তু সেজন্তে নয়। ১৯১৭ সালে সুরোরা কুজার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে নেভা নদীর উপর থেকে সর্বপ্রথম জারের উল্টো-পাশে-দিক দিকে গোলা ছুঁড়ছিল। সেদিনের বিপ্লবীদের দেশজোড়া যে খাতির, এই কুজারেরও তাই।

একটা পার্ক—নাম বলল 'পার্ক অব মার্স' (Park of Mars) অদূরে নানান রঙের গম্বুজওয়ালা বাড়ি। 'রক্তের উপ-মন্দির' (Temple on Blood) বাড়িটার নাম। জার প্রথম নিকোলাসকে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের উপর বানানো নেভার তীরবর্তী বহুবিন্দুর্বা বাগান, বাট' ও আগলেগাছ অল্পস্ব পাতা নেই অনেক গাছের, অনেকের পাতা লাল হয়ে গেছে সেই বাগানের ভিতর ছবির মতন টালিছাওয়া ছোট এক বাড়ি বাড়ির পিছন দিকে নেভা থেকে বেরিয়ে আসা খাল বয়ে যাচ্ছে বাড়িটা হল পিটার্স-গ্রোটে'র গ্রীষ্মপ্রাসাদ।

শহরের কয়েকটা পাড়ার উপর দিয়ে দৌড়ানোড়ি করে এসে গাচি একটা গলির মাধ্যম মিনিট খানেক ধরে হাঁপাল। দ্রোলি গৃহাবলী—ঐতিহাসিক জায়গা, বিপ্লবের প্রধান অবদান ছিল এখানে

। বাড়ির একটা খোশে সেনিন তখন থাকতেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পরে এক সময় ভাল করে দেখা যাবে। ওখান থেকে এসে নামলায় পায়োনীর কেশ্র-ভবনে।

ডিরেক্টর মাহুঘটি ভারি রসিক। কথার কথায় হাসি-রহস্য। শিশু ও কেশরদের মধ্যে খেঁক খেঁক নিজের বয়স ভুলে বলে আছেন। এই ৪ অঙ্কে আঠার বছর পুরল ঠগের পায়োনীর-প্যালেসের। মুন্সের ময় ন'শ' দিন আটক ছিল সেনিনগ্রাড।—অর্থাৎ তিন বছরের কাছাকাছি। চারিদিক দিয়ে ঘিরে কেলেছিল—একটি মাহিমশার সৈন্যবাহর জো ছিল না। প্লেনে করে শহরের রসদ আসত। সেই অতি-বড় দুর্বোপের ভিতরেও একদিনের তরে এখানকার কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি। এটা হল মূল-কেন্দ্র—সুখ এট শহরেই কুড়িটা শাখা। সেনিনগ্রাডে ছাত্র আছে চার লক্ষ—তারায় মেধার হতে পারে। হয়েছেও প্রায় সবাই। দু-পাঁচটি মাত্র বাদ। এই কেন্দ্রভবনে এ বছর খরচ হবে সাড়ে সাত মিলিয়ন রুবল। শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তর টাকা দিচ্ছেন। চলে আসুন, ঘরে কিরে দেখে যান একটু।

বাড়ি দুকবার মুখে এসিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। উঠানে সারের গালা। ছেলেমেয়েরা কোদালি নিয়ে সার কেটে কেটে নিয়ে বাচ্ছে। নতুন বাগান হবে কোনদিকে, গাছপালা আঁজাবে। ঘিরে পাড়িয়ে অত্যাধুনিক করল ঐ ছেলেমেয়েরা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের খেলাধুলা মেই। নিয়ে গেল দাবা খেলার ঘরে। ছকের পাশে ঠপ-ওয়াচ। এক একটা চালে কত সময় নেয়, বেরকট হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এমনি নানান খেলা—বুড়ির খেলা, ঘৈষির খেলা, কোঁতুকের খেলা। চিনাম্যাটির বড়িন অতিকার ব্যাং। আর একটা ঘরে রকমারি গাছপালা; ঘরের ছাতে মেঘ-ভরা আকাশে আঁকা। ছাতের দিকে তাকিয়ে হাঁটন একটু—কি আশ্চর্য, আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আপনি পরিষ্কার দেখবেন। কচো তৈরি বড় একটা জারের মতো। এমন কিছুই দেখছেন না—যোরাতে লাগুন ভিতরে দেখবেন পুতুল, পেঁগা ইত্যাদি।

ফুটবল খেলা হচ্ছে পুতুলদের। সুপারির মতো ছোট বল—নিচের দিক থেকে সরিয়ে ঘুরিয়ে মারতে হবে। ডিরেক্টর মশায়ের সঙ্গে আমবাও বসে গোলাম খেলতে। আর একটা খেলা—বিড়াল-পুতুলের লেজে ঘুর থেকে আঁটি পরানো। এমনি অনেক খেলা।

নানা দেশ থেকে উপহার গেছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। ভারত থেকে গেছে ছবির এলবাম ও নানান রকমের পুতুল। বাচ্চাদের আঁকা ছবি এক ঘরে। আর এক ঘরে লাইব্রেরি—বইয়ের সেনসেন চলে।

রাজপ্রাসাদ ছিল এটা—জার-পরিবারের একজন থাকতেন। প্রতিটি ঘরের কাজকর্ম দেখে অস্বাভাবিক হবেন। নৃত্যশালা। কবি পুশকিনের নামে ভাবৎ রাশিয়া মেডে বাস—তিনি কবে নেচেছিলেন নাকি এই নাচের ঘরে। মেয়ালের দায় দিয়ে সেই আমলের জোয়গুতো সাজানো, সাদা কাপড়ের ওয়াড়-দেওয়া। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, ঠিক কোন জায়গাটার নেচেছিলেন পুশকিন, কোন কক্ষে তিনি বসেছিলেন? ভয়ানক সঠিক মালুম না হওয়ার সবগুলো কক্ষেই তারা একটু একটু বসে নেয়।

একটা ঘরে নানারকম পাখর ও বাত। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশের নানা অঞ্চলে অভিবানে বেরোয়—সেই সময়ে তারা এমন সব বড় কুকির নিয়ে আসে। বয়সের বিপুল সঙ্গের। কাজের

আলমারিতে ধরে ধরে সাজিয়ে রেখেছে—মাটির নিচে পাঠায়ে রক্ষে রক্ষে তাদের দেশের কী অপরিমিত সম্পদ।

রূপকথার ঘরগুলোয় ঢলুন এবার। বড় বড় ঘর—মেয়াল-ছাত আসবাবপত্র চোখ-বাঁধানো ছবি গুর মেলা। পুশকিনের লেখা একটা পরীকাহিনী আঁকানো। রাশিয়ার গাভার কাজের খুব নাম—এক গোটা অঞ্চল নিয়ে লাক্সা-শিল্পেরা থাকে। সেখান থেকে তারা এসে লাক্সা-চিত্রণে ঘর-ভরে দিয়ে গেছে। এই নিয়েই বা শিশুদের কত জিজ্ঞাসা। কত ডিম লেগেছিল আঁকতে? ডিরেক্টর মশায়েরও তেমন জবাব; বাইশ হাজার। চুশকিনের ঘরের পাশে গোর্কির ঘর। গোর্কির লেখা একটা রূপকথার পরিচিত্রণ সেখানে।

ছেলোয় নিজ হাতে ছোট ক্রেন বানিয়েছে, বিদ্যুতে চলে। নাগরদোলা—প্রাগ লাগিয়ে দিতে পুতুলেরা নাগরদোলায় খুব উঠানমা করতে লাগল। এ সমস্ত শিশুগণই মাথা থেকে বের করেছে। রেলপথ বানিয়েছে—ওগুন পাহাড় দিয়ে পথ, টানেল, পুল—সুইচ টিপে দিতে গড়গড় করে ট্রেন চলল। একটা কুকুর—লাল জিভ একবার মেলেছে, মুন্সের ভিতরে জিভ নিয়ে নিচ্ছে আবার।

গোলাম ওদের কারখানা-ঘরে—যে জায়গায় ওরা এমনি সব বস্তু বানায়। ছুতোরাখানা। কাঠ কেটে বেঁধা ঘষে ঘষে ছোট ছেলেমেয়েরা নানান জিনিষ গড়ছে। হাতে-কলমে জিনিষ গড়ে কুতি কত তাদের! আরও ক্রেন তৈরি হচ্ছে, দেখলাম, লোহার ছুড়ে ছুড়ে। বয়স কত হে তোমার? ন' বছর। ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি? উহু, নাবিক হবে। তবে এসব বানান্ন কেন? বাঃ রে, ক্রেন না হলে জাহাজের মালপত্র ওঠানো-নামানো হবে কি করে? তাই বটে, আমাইই ভুল! মালপত্রের জন্ত আরও কয়েকটা ক্রেন ইতিমধ্যেই বানিয়ে তাদের উপর তুলে রেখে দিয়েছে।

গোলাম কনসার্টের ঘরে। ছেলে-মেয়ে মিলে দিবি বাজনার ধল হয়েছিল। পরিচালক একটা ছেলে—বছর বোল বয়স। চট করে একখানা গং তনিয়ে দিল।

কনসার্টের পর নাচের ঘরে। মেয়েরা নাচল, এক শিক্ষিকা পিয়ানো বাজালেন। পুতুলের ঘরে—প্রতিটি পুতুল এরা নিজ হাতে গড়ে। কি বছর রূপকথার এক একটি পালা ভেবে তনুস্বারা পুতুল বানায়। পুতুলের মাহুঘ শুধু নয়, কুকুর খরগোশ সাজান্ন ব্যাং। পুতুল ঘরের মাতকর একটা ছেলে—দিবি সে বুড়োমাহুঘের চোখে বন্ধুতা করে তাদের কাজকর্ম কিছু কিছু বুঝিয়ে দিল। পুতুল নাচিয়ে দেখাবে এবার—বাল্য পুতুলের খিয়েটোয় গিয়ে বসে পড়ন। সময় নেই, কিন্তু হয়ত এড়ানো গেল না; তাড়াতাড়ি বা-তোক একটু দাঁও দেখিয়ে। মেয়ের পক্ষে পলকা নৃত্য। কুকুর-বিড়ালে প্রথমটা স্বগড়া, তারপরে স্থগল-নৃত্য। যুগ্মের একটি লোকনৃত্য। একটা হাসি-ছল্লোড়ের নাচ।

যে ছেলে-মেয়েরা পদীর আড়ালে থেকে নাচাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এলো হাতে পুতুল নিয়ে। ভারতের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা জানাব। শিক্ষকরাও ঐতিহ্য জানালেন ভারতে ধীর শিশুদের মাহুঘ করার ভার নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে।

মহাশ্মা গাভীর মূর্তি আঁকা তিনটে মেডেল এবং অশোক-আঁকা একটা মেডেল কেজতখনে দেওয়া হল—ভারতের ঐতিহ্য উপহার।

[ ক্রমশঃ ]

# বাজায় বাজায়



উদয়ভাসু

প্রথমে হুড়াহুড়ি সুরু। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। লক্ষ্যের এমন অকুণ্ণ কুণা দেখা যায় না সতরাচর।

বেমন পরিচ্ছন্ন, তেমন সাজসজ্জা চৌধুরীগৃহের। তামা, শিতল, কাঁসা আর রূপার আসবাব। ঘরে ঘরে জাতিম আর কলাস—আবলুসের চৌকীতে। চানোরা-ঢাকা আভকাঠ থেকে নানা রঙের বকম বেরকম বাউলঠান হুলাছে। দেওয়ালে দেবদেবীর পট, পটের মাথা আর শিং। ঢাল আর তরোয়াল। কবুরী আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে গৃহময়। চন্দ্রকান্ত দেখে দেখে বিস্মিত হন। খুঁটিয়ে দেখেন সকল কিছু। ঢালাও লবা দালানে মৃতির সাথি। পাখর আর বাতুর শিল্পশোভা—ভাঙবোঁর বাতুরের দেখছেন বেন চন্দ্রকান্ত। শিল্পীদের রূপকল্পনার ভুলভ্রান্তি নেই কোথাও, শাস্ত্রসম্মত দেহগঠন চাক্ষুষ দেখতে পেরে সন্তোষের দেবদেবীর সাক্ষাৎ মিলেছে বেন। একটি মূর্তির সমুখে থমকে থাকলেন চন্দ্রকান্ত, নিষিদ্ধ চোখে। 'ও মরিপয়ে হ'। ময়্র বলতে বলতে চন্দ্রকান্ত চকু নিম্নীলিত করেন ভক্তির উচ্চাসে। চন্দ্রকান্ত শক্তিময়্র দীক্ষিত, তথাপি এই ভয়কল্পের হর্তাকর্তাবিধাতা, সৃষ্টির রক্ষাকর্তা অবলোকিতেশ্বরকে দেখতে দেখতে মনে মনে প্রশ্রয় জানালেন বার বার। বোধিদেব অবলোকিতেশ্বরের স্থান বোধ দেবসম্মত অতি উচ্চে। তিনি কল্যায় অবতার, অর্থাৎ মহাকাব্যিক। কথিত আছে, তিনি মানুষের দুঃখকষ্টভোগ দেখে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি নিজের মোক্ষ বোগাভাবে অকল্পন করা সম্বোধ সেই মূর্তি পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। মানুষ দুঃখের করাল হাত থেকে পরিত্রাণ পাক, সম্যক সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। বতর্গিন তা না হয় ততর্গিন বিজ্ঞান নেই অবলোকিতেশ্বরের। যে জীব যে রূপে থাকে পূজা করে, অবলোকিতেশ্বরের সেই সেই রূপধারণে দেখা দেন ভক্তকে। বারা ভবাগতকে মানে ভাসের ভবাগতরূপে, বারা শৈব তাদের শিবরূপে, বারা বিষ্ণুকে পূজা করে তাদের মনের চোখে বিষ্ণুরূপধারী হয়ে ফুটে ওঠেন। 'ও মরিপয়ে হ'। আবার বোধময়্র উভারণ করলেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর সমুখে বোধিদেব লোকেশ্বরের সুধাবতী মূর্তি। শুভপ্রভাবের রূপারোপ দেখে দেখে ভাব-তসময়্র আসে চন্দ্রকান্ত। এই মূর্তিতে লোকেশ্বর যেতবর্ণ বিশিষ্ট; ত্রিমূখ ও বহুভূজ। হট্টম পদের পদে সলিলাঙ্গনে উপবিষ্ট। সঙ্গে একাসনে শক্তি অধিষ্ঠিত। লোকনাথ তিনি দক্ষিণ হস্তে বাণ, অক্ষমালা এবং বরমুদ্রা প্রদর্শন করেন। দুই বাম হস্তে গজ ও পক্ষ ধারণ করেন। কৃত্যরীতি শক্তিকল্পী জগদেবীর উরুতে ভক্ত থাকে। বুল দেবতাকে বজ্রভায়া, বিখভায়া, পক্ষভায়া দেবীরা ঘিরে আছেন।

দালানের শেষ-প্রান্তে দুর্বা-আলো পৌঁছায় না। তাই আঁধার-কালো।

সহসা চোখ পড়তেই চমক লাগে বেন। চন্দ্রকান্ত তাঁর দৃষ্টি বিক্ষারিত করেন। দশমহাবিভার অস্ততমা ছিন্নমস্তার কুম্মুতি। আপনার ক্রিয়র আগুনি পান করছেন মহাকালী। ছিন্ন মুণ্ড ঘরে আছেন এক হাতে।

—মাং অমুসর! আমাকে অমুসরণ করুন।

কার অমুসোষের শব্দ শুনলেন চন্দ্রকান্ত। কোন মূর্তি কথা বলছে এমন মনুষ্য-কণ্ঠে! চতুর্দিকে চোখ ফিরালেন চন্দ্রকান্ত। সহসা দেখলেন এক বাহক ব্রাহ্মণকে। চন্দ্রকান্ত তাকে বিলম্ব চেনেন, জ্ঞান এই চৌধুরীগৃহের মূল-পুর্বোহিত। কান্তপ গোত্রীয়, বাদী জেলী।

—প্রতি-প্রণাম।

ব্রাহ্মণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বললেন চন্দ্রকান্ত। অবিরত উত্তরীর সায়লালেন। কহজোড় কপালে ছোঁগালেন।

—জয় গুরু। ব্রাহ্মণ কথার শেষে আবার কথা বললেন কেমন বেন নত কণ্ঠে। বললেন,—চৌধুরী-গৃহিণী মহাশয়ের সাক্ষাৎ-প্রার্থী। বজ্রবাণ হরেছে তাঁর। একমাত্র কস্তা, তার কোন সন্ধান নাই গত ব্যক্তি থেকে। গৃহকর্তাও বর্তমানে অমুপস্থিত, কার্যাব্যপদেশে স্থানান্তরে গেছেন। বাবিত্য ব্যাভার গেছেন, শ্রীত্রয়ে কিয়বেন তেমন কোন আশা নাই।

চন্দ্রকান্তর চোখের তারা অচঞ্চল, স্থির। কথা শুনছেন, কিন্তু বেন মূঢ় দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। ব্রাহ্মণের পিছনে চললেন অবাধ্য পক্ষপে। অনিচ্ছা, তবুও চললেন।

ব্রাহ্মণ বলেন,—শুনা বাট, গত রাত্রে চৌধুরীকস্তা আনন্দকুমারী সপ্তগ্রামের জমিদার কুমারামের ভগ্নালয়ে বার। ততঃপর সেই স্থান থেকে নৌকা বাড়া করে।

শব্দ এমন আলামর, তা বেন জানা ছিল না চন্দ্রকান্তর। ইচ্ছা হয়, ঐ ব্রাহ্মণের মুখে হাত চেপে কথা বলা বামিয়ে দেন এখনই। যে দুর্ঘটনা তাঁর চোখের সমুখে দেখেছেন, সেই কাহিনীর পুনরুক্তি অজ্ঞের মুখে শোনার কিলাত আছে? চন্দ্রকান্ত বললেন,—চৌধুরী-গৃহিণীর নিকটে আমি যা জানি ব্যক্ত করবো। জরনা-করনার কোন কল নাই। বা সত্য তার বেন অপপ্রচার না হয়।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আমাদের মনোগত ইচ্ছা তাই হোক।

চন্দ্রকান্তর মুখে দুঃখাচ্ছন্নতার কাতরতা পরিফুট হয়। ইংৎ নত কণ্ঠে বললেন,—আনন্দকুমারীকে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করাই জ্ঞেয়।

ব্রাহ্মণ চলতে চলতে হঠাৎ বেন ভেঙে হয়ে পড়েন। তাঁর পদক্ষেপে বিঘটিত পড়ে। ধানিক চিন্তাম্বর থেকে বললেন,—এই চরম সিদ্ধান্তের কিছু কারণ আছে ?

—হী মহাশয়। চন্দ্রকান্ত বললেন কৃত্রিম হাসির সঙ্গে। বললেন,—আপনারা জ্ঞাত হোন, আনন্দকে আমরা সকলে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে আছে, তবুও নাই।

চোখ চুলকলিয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের চোখের লালাত প্রান্ত পদ্মরাগ হ্রির মত লাল আভা ছড়ায়। গলকবল খরখরিয়ে কীপতে থাকে। কপালে চিন্তাযেবা দেখা দেয়। কি বলতে চেষ্টা নীরব হয়ে থাকেন। যে পথে চলেছিলেন সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন আবার। অশ্রুতির দীর্ঘবাস ফেশলেন।

দুহোরে দুহোরে মঙ্গলকলস। ঘরদ্বারে আগ্রহের মাল। বুলছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে আতরের সুগন্ধ। তিব্বতের কন্যার উগ্রগন্ধ। এক কক্ষ মধ্যে দুই বার চন্দ্রকান্তর। দেখলেন নিরেট সোনার বুদ্ধমূর্তি। মূলদেবতা আদিবুদ্ধের প্রতীমূর্তি। ধ্যানাসনে বেন সমাধি হয়েছ তাঁর। পদ্মপাণ্ডির মত আয়ত আঁধি ধ্যানমুগ্ধিত ও অর্ধনিমীলিত। মণিমাণিক্যের অলঙ্কার সর্বদেহে। পরিধানের বস্ত্র বিচিত্র। দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে ষড়। ধারণ করেছেন। ছই হস্তই বন্ধের 'পরে বন্ধ'কার মুদ্রার সজ্জিত।

কক্ষমধ্যে বুদ্ধ-বন্দনা চলেছে। হোমকুণ্ডে অলছে। পঞ্চপ্রদীপ অলছে। ধূপ আর ধূনা অলছে। তাঁর অর্ধনিমীলিত চন্দ্রবরুণ বেন অল-অল করছে। পূজারী গভীর কণ্ঠে বুদ্ধ-বন্দনা গাইছেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—মহাশয়, আরও কতটা পথ? পা যে আর চলে না।

ব্রাহ্মণ বলেন,—এটি দেবত্রকুল। এই স্থান থেকে সবচেয়ে পৌছাতে হবে। সমস্তের শেষে অন্ধরমুখে যাওয়া হবে। চৌধুরী-গৃহিণী সেই স্থলেই অপেক্ষমান। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন হিন্দু-বর্ষিক-কুলরমণীগণ প্রায় অস্বাভাবিক। চৌধুরীপত্নী আপনি মহল ভাগ করেন না।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন বৃহৎ। বললেন,—কেবল আনন্দই বত বাধাবিহীনকে অমাত্র করে। নিষেধ মানে না।

—হী, চৌধুরী-কন্তা স্বাধীনচেতা। এমন মেয়ে আমি তো আমার এই দীর্ঘ জীবনে কখনও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ এক লালানের বাক হয়ে কথা বললেন।

দেবত্র মন্দির, মণ্ডপ, দালান ও উঠানের সঙ্গর কুলবাগান। অত্র গাছের স্থান নেই, আছে মাত্র গজপুষ্পের গাছ আর লতা। দেবদেবীর পূজার বৃথা-কুলের ঠাই নেই। প্রৌঢ়বতুর কুল 'ব'য়েছে গাছে গাছে। বৈশাখের দারুণ দাহনে কত গাছ পত্রহীনপ্রায় হয়ে আছে। শুভ শিশুর তুলার মত বেল আর বৃইয়ের শুকব বন সবুজ পাতার আড়াল থেকে দেখছে বেন উঁকি দিয়ে। হালাকরেরা গাছ আর লতাব তদারক সেগে আছে। বিভিন্নবর্ণের প্রজাপতি উড়ছে।

সবের ভোরগভীরের মস্তকে সড়টনান গণেশমূর্তি। সন্ন্যাস দেব তিনি,—আহু, কাষ, অর্ঘ্য আর সিঁচি পান করেন। সন্ন্যাসের দেবতা তিনি, অন্যের বহু। পৌরীপূজ গণেশকে প্রার্থা জানালেন

চন্দ্রকান্ত। আকাশে প্রথম আলোর চিকণ খেলতে দেখেই দিবারন্তে প্রথম প্রগতি জানিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মমুহুর্তে, পরব্রহ্মরূপ গুণেশ গণেশকে—সর্ববিধা আর সর্বসিদ্ধির দেবতাকে।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন নত কণ্ঠে। বললেন,—মহাশয়ের সঙ্গে কি চৌধুরী-কন্তার পূর্ব-পরিচয় আছে ?

ঈষৎ হাসলেন চন্দ্রকান্ত। কক্ষক বেন অজ্ঞানা থাকলেন। বললেন,—হী, আনন্দ আমার খুবই পরিচিত। সে আমার ব্যাঙ্গসহচরী। শৈশবসঙ্গিনী।

সবচেয়ে পদাৰ্পণ করেই পুনরায় ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন,—আমার বতস্বর জানা আছে, মহাশয় তো এখনও পর্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই।

—হী, বতাবধি বলেছেন।

—এত কাল অবধি পাণিগ্রহণ না করার কি কারণ? সঙ্গার-বিহুকা কেন ?

—কারণ অভাব-অনটন। প্রাসাদাদিনের যোগ্য ব্যবস্থা নাই।

—মহাশয়ের কণ্ঠ কি ?

—একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করি। দান আর সিংহা উত্তর চালাই। কোনক্রমে দিন ওজরাণ করি।

—আপনার সহ আনন্দকুমারীর শেষ সাক্ষাৎ হয় কবে ?

—গত রজনীতে।

চন্দ্রকান্ত মিথ্যা বলেন না। মিথ্যার আশ্রয় কল ভুত হয় না, তা তিনি জানেন।

ব্রাহ্মণ একবার চকু ফিরিয়ে দেখলেন অনুসরণকারীকে। তাঁর আগাগমন্তক নিরীক্ষণ করলেন। বললেন,—মহাশয়, আর কিছু জানতে চাই না আমি। চৌধুরী-গৃহিণী এখন বা জানতে চান জানাবেন।

—তথ্যাত।

ব্রাহ্মণ আবার কথা বললেন। বললেন,—বিষয়টি খুবই রহস্যজনক বনে হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, এক তিনিই জানেন।

—রহস্য নয়, এ কেবলই কপালের দুর্ভাগ্য। কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে আবার চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দকুমারীর দুর্ভাগ্য।

—গাতগীর জমিদার কুলরামের সহধর্মিণীকে আপনি জানেন কি ব্রাহ্মণের কৌতুহল বেন অদম্য। নীরবতা অধিকক্ষণ পালন করলে পাবেন না তিনি। তাই পুনরায় প্রশ্ন করলেন ব্যগ্র কণ্ঠে।

মুখে হাসি ফুটলো। সহান্তে চন্দ্রকান্ত বললেন,—হী, তিনি আমার পরিচিত। তিনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। রূপে আর গুণে অতুলনীয়। তাঁর মত এমন তাঁর কুছাধান ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মনে হয়, কোন 'দেবীর কক্ষে তাঁর জন্ম।

ব্রাহ্মণ কথা শুনে বিষয় প্রকাশ করেন। তাঁর মনে কি এ বহুদূর ধারণা বেন পরিবর্তিত হয় এক দিনে! ব্রাহ্মণ বললেন,—ভবে লোকে তাঁকে বলা বলে কেন? যদিও আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই।

শ্রিতহাসির খেলা চলে চন্দ্রকান্তর মুখে। বলেন,—তদা কক্ষ কর্ণপাত না করাই সমীচীন। সাতর্গীর জমিদারপত্নী মারীজা আদর্শব্রত, সমজ্ঞা। আমি তাঁকে প্রাণ-মরফার জানাই।



এক দায়িত্বে পৌঁছে জ্ঞান গতি রহিত করলেন। বললেন,— মহাশয়, এই স্থানেই আমি আপনাকে ত্যাগ করি। আমি বাই, আপনি থাকেন। চৌধুরী-গৃহিণীর মহলের এই প্রবেশদ্বার।

চৌধুরী আকুল নরনে অপেক্ষায় ছিলেন। কান্নার আবেগে তিনি যেন বাকহীনা। দূর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, দুয়োরে একজন সর্কারহস্তর পুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। চৌধুরী সজলচোখে সেখান আগন্তুক অতি সুপুরুষ। তাঁর শরীর দৃঢ়; বক বিশাল; ললাট বিস্তৃত; বর্ণ কাকনসন্নিভ, মুখকান্তি জ্ঞানগাভীরাপূর্ণ।

—তুমি আমার সন্তানতুল্য। দীর্ঘজীবন হোক তোমার।

নারীকণ্ঠের কথা শুনে মাথা নত করলেন চন্দ্রকান্ত। দুয়োরের পাশ থেকে কাতর সুরের কথা ভেসে আসে।

—আমার পুত্র নাই, তুমিই আমার সেই। তুমি সুখী হও, আশীর্বাদ করি। মা মনসা, তোমার মঙ্গল কল্পন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—আপনার আশীষ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি। এখন কি জন্ত আমাকে আহ্বান, তাই ব্যক্ত করুন।

কান্নার বেগ সামলে চৌধুরী-গৃহিণী বললেন,—আমার একমাত্র মেয়েটাকে হারিয়ে আমি সর্কার হারিয়েছি। তাকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে। বল' সে এখন কোথায়? কেমন আছে? বেঁচে আছে না ম'রেছে?

দীর্ঘশ্বাস কেলেলে চন্দ্রকান্ত। কি বলবেন উত্তরে, ভাবতে থাকেন যেন। কপালে কর স্পর্শ করেন। ভেবে ভেবে বললেন,— আনন্দকুমারকে এক বিধবী হরণ ক'রেছে গত রাত্রে।

—কে সেই পারণ্ড? কি নাম তার?

চৌধুরী কথা বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যেন। বৈধব্য ধারণ করতে পারেন না তার।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ইরাজপক্ষের এক কর্ণচাটী। তার নাম জ্যালেট। জরীপের কাজ করে সে। গত কয়েক মাস বাফ আলায়গের আশে-পাশে ঘোরায়ুরি আর মাশামাশির কাজ করছে।

—তবে এখন উপায়? কোন্ পাশে আমার এই শান্তিভোগ?

—ইরাজের কুঠীতে বোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, যদি কোন উপায় হয় এই আশায়।

—কে করবে এই কাজ? তেমন বোগ্যতা কার আছে, আমি তো জানি না। আমার আনন্দকে তুমিই কিরিয়ে গিয়েছো পারবে।

—চৌধুরী মহাশয় আগে আসেন, তিনিই এই কাজ করতে পারেন। তাঁর প্রত্যক-প্রতিপত্তি অনবীকার্য। ইরাজদের সঙ্গে দূর ব্যবসায়ত্বের ঘনিষ্ঠ বোগাযোগ। আমি জানি, ইরাজ, ওলদাজির করাসী কুঠীতে তিনি মাল সববাহ্য করেন। সমগ্র বাঙালী জন বাণিজ্য চালানার অধিকার তাঁর আছে। চৌধুরী মহাশয়ের নামডাক বিদ্যেই মহলে।

চৌধুরী প্রৌঢ় অতিক্রম ক'রেছেন, কিন্তু বান্ধিকার সীমায় ন নি এখনও। ভারী ওজনর ক'থনা সোনার গরনা তাঁর লেহে। চিহ্নর গলায়; কোমরে মোহনগীথা। লাগ-তাগা ওপর হাতে। চুড়ি আর বালা আর বহুই পর্যন্ত। পায়ে নগাশ আড়ট। গিল সিঁড়ির টিপ দর, টোপ।

জলচৌকি বসিয়ে দিয়ে বার ঘোমটা-ঢাকা হুঁধর কুলালী এক দানী। জলের খটর হুঁধে গামছা বেধে বার। হুঁধ-হাত-পা ঘোমার জল দিয়ে বার।

বেলে পাখরের কঠিন মেয়ের চলতে চলতে সত্যিই পানদয় যেন ব্যাধাতুর হয়েছে। চন্দ্রকান্ত জল ঢালেন পায়ে। কুলকুচা করেন। চোখে, কপালে আর কানে জল-হাত সেন।

নিখর হয়েছিলেন যেন চৌধুরী-গৃহিণী। জ্বাচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—আনন্দর বজায় একজন মাঝিও এসে ঠিক এই একই কথা বলেছে।

—কি বলেছে মাঝি?

কথায় আগ্রহ ফুটলো। চন্দ্রকান্ত বললেন জলচৌকিতে ব'সে।

—মাঝিও ব'লেছে ইরাজ সাহেবের নৌকা থেকে প্রথম আক্রমণ হয়।

—আর কি ব'লেছে মাঝি?

চৌধুরীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন চন্দ্রকান্ত।

খেমে থাকেন অন্তঃপুরবাসিনী। কথা হারিয়েছেন তিনি যেন। কিংবা বেঙ্কায় যেন খেমে আছেন।

—মাঝি আর কি ব'লেছে?

আবার বললেন চন্দ্রকান্ত। কঠিন হয়ে ব্যস্ততা যেন। মহিলার নীরবতা যেন অসহ্য ঠেকেছে।

—মাঝি তো বলে যে আপনিও না কি ছিলেন আনন্দর বজায়।

চৌধুরী প্রায় যেন ফিসফিস করে কথাগুলি বললেন।

—মিথ্যা কথা বলে নাই মাঝি। হী আমিও ছিলাম।

আবার সেই ফিসফিস সুরের কথা। চৌধুরী বললেন,—আমরা জানি, আনন্দকুমারি কেন বিবাহে সম্মত হয় না। আমরা জানি তার কি মনের বাসনা। আমরা জানি সে আপনাকেই—

কথা আর শেষ হয় না। শেষাংশে গিয়ে বাক সম্বত করলেন চৌধুরী-গৃহিণী।

—গতরাত্রে আমাদের উভয়ের মধ্যে মাল্য-বিনিময় হয়েছে।

—কোথায়?

—আসমানদীঘির তীরে। জমিদার-গৃহলগ্ন পুষ্পউজানে।

—সাকী কে ছিল?

—আকাশের চাঁদ আর তারকারাজি। উজানের বুদ্ধসমূহ। আসমান দীঘি। রাজির অন্ধকার।

—মায়াব কোন কেউ?

—না কেহ নয়।

—তবে আপনি বন্ধ করলেন না কেন আনন্দকে? আমার বাছাকে?

—রক্ষার কোন উপায় ছিল না। ইরাজপক্ষের গুলী-বাকসের সঙ্গে লড়াই চালানার মত বোগ্য অন্ত ছিল না কাছে।

—আবার যদি আনন্দকে কখনও ফিরে পাই, আপনি তাকে গ্রহণ করবেন কি?

চৌধুরী আর বীর কণ্ঠে কথা বললেন না। শেষ কথাগুলি বললেন যেন স্বর উঁচিয়ে।

চন্দ্রকান্ত পাত্তাবী অবলম্বন করেন। ধ'না কিছুই বললেন না। ক্রুদ্ধিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন। আকাশ থেকে



পড়েছে যেন মাথার। বধা উত্তর না দেওয়ার অসমর্থ্যে অবস্থি বোধ করতে হয়। এবার চন্দ্রকান্তর মুখে কথা হারায়।

অন্য ঠেকে চৌধুরী-গৃহিণীর। তিনি আরও জোরালো হয়ে বললেন,—আপনি যদি তাকে গ্রহণ করেন তবেই আমি আনন্দকে কিরাতে চাইবো। নয়তো আর চাই না তাকে। যাক সে যেখানে গেছে। যেমন আছে থাক।

—ঠিক এই মুহূর্তে আমি আমার বক্তব্য জানাতে পারি না। আমাকে চিন্তার অবকাশ দেওয়া হোক। কয়েক দিনের সময় দেওয়া হোক।

এমন বিবম এক সমস্তার সম্মুখীন হ'তে হবে করুণায় ছিল না যেন চন্দ্রকান্তর। নৌকার মাঝিরের কেউ ভ্রাস্ত্র ফিরে আসতে পারে, আদর্শেই ভাবতে পারেন নি। মাঝি ফিরে এসেছে জানলে এই দিগড় মাড়াতেন না তিনি। যেমন চলছিলেন উদ্বেগহীন ভাবে তেমনই তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন। দেশে দেশে ঘুরতেন পদব্রজে। সারা বাঙলা দেশ দেখতেন ঘুরে ঘুরে। বঙ্গদেশ দেখার পর কাশী-কোশলেব দিকে যেতেন—এই ছিল তাঁর যাত্রাপঞ্জী। এই ইচ্ছাকে মনের কোণে লুকিয়ে রেখে যাত্রা ক'রেছিলেন। তেমন সময়ে ডাক পড়'লা পেছন থেকে। পিছু ডাক প'ড়লো।

কপালের দুই পাশে ঘামের বিলু ফুটছে একে একে। নতমাথা আর উঠে না। আনত দুই ফিরছে না আর কোথাও। মুখের সৌম্যতা মুছে যায় যেন। মাঝ-কপালে আঁকুক্ষণ।

—মাগে আপনাব কথা পাঠ, তারপর অস্ত্র কান্ত আমার। কথা বলি না পাঠ, মিথ্যা আর তাকে ফিরিয়ে মুখ পড়াবো না।

কান্নার স্বরে বললেন চৌধুরী। তাঁর কোরা শাড়ীর চওড়া লাল পাড দুহোবের পাশ থেকে একবার দেখা দেয় যেন। দেখা যায় তু'খানি পা। আলতায় লাল।

কৃষ্ণাঙ্গী দানী আবার আসে। সিংহর চুবড়ী বসিয়ে দিয়ে যায় চন্দ্রকান্তর কাছে। চাল, ডাল, তেল, সন্মণ, ঘি, শস্তা, পরিবেশ বস্ত্র আর পাখেরবরণ কার্যকট বৌপামুদ্রা আছে সিংহর চুবড়ীতে।

—আমার প্রতি এই করুণা কেন মা ঠাকুরণ? বায়ুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই বান। চন্দ্রকান্ত সহাস্তে কথা বলছেন। কথার জের টেনে বললেন,—ভাট কি এত বিদায়ের দক্ষিণা?

চৌধুরী-গৃহিণী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন,—ভ্রাক্ষণজাতি আমাদের মাথার মণি। আমরা ভ্রাক্ষণকে দেবতা জ্ঞান করি। এ তো আমাদের দান নয়, অর্ঘ্য। আপনি খুশী হোন। এ তো অতি সামান্য। মূল্যহীন বললেও হয়।

—আপনার অশ্রের রূপ। আমি হুটুটিতে গ্রহণ করছি। চন্দ্রকান্ত কথা বলতে বলতে চৌকী ত্যাগ ক'রে উঠে পঁড়ালেন। বললেন,—অমৃত পাই তো বিদায় লই আমি।

—আজকের মত শেষ কথাটা শুধাই। সাতগাঁর জমিদার কৃষ্ণরামের দ্বীক আপনি তো জানেন। আবার কিসকিসিয়ে কথা বলেন চৌধুরী। বলেন,—ভীর নাম শুনে পাই বিদ্যাবাসিনী, তিনি তো রাজকন্তা?

—হী, আপনি যথার্থই বলেছেন।

কেমন যেন সলজ্জায় বললেন চন্দ্রকান্ত। সিংহর চুবড়ী কাঁধে তুললেন কথার শেষে।

চৌধুরী বলেন,—বিদ্যাবাসিনী হালুবাটা কেন? আবার আনন্দকে কি সেই এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে?

—আপনার অমুখ্যানে বিস্ময় সত্য নাই। রাজকন্তার তুলনা খুঁজে মেলে না। আনন্দের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা অপার। এই দুর্ঘটনার তিনিও খুবই ব্যথা পেয়েছেন।

—জমিদার কৃষ্ণরাম তবে তাকে ত্যাগ করেছেন কি কারণে? কি দোষ তার?

—কৃষ্ণরামের বিষয়লালসার শেষ নাই। রাজকন্তার পিতার ভুলসম্প্রতিতে অংশ দাবী ক'রেছেন তিনি। দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাজকন্তার মুক্তি নাই।

আকাশ থেকে পড়লেন যেন চৌধুরী-গৃহিণী। বিস্ময় প্রকাশ করলেন মুখে। বললেন,—আতা ব্যাচারা! অমৃতের তুর্ভাগ আর কি! খানিক থেমে আবার বললেন,—রাজকন্তার প্রশংসায় আনন্দ যেন পঞ্চমুখ ছিল।

—বিদায় মা ঠাকুরণ!

—আপনার সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম নেই জানিয়েন।

—আপনি অধীর হবেন না। শীঘ্র আসছি আমি।

—প্রণাম জানাই আমি।

—আপনার জয় হোক।

—বিদায়।

—প্রণাম।

আকাশে অনেক তারা। গ্রহ আর উপগ্রহ। বাজির অন্ধকারে পৃথিবীর মাটি থেকে জ্যোতিষ্কের ত্রুষ্ণীপ ঠাওরানো যায় না। আরতন বোকা যায় না। গুণাগুণের মান নির্ণয় সম্ভব হয় না। শুধু দেখা যায়, নক্ষত্রমণ্ডলী দ্রান হয়ে থাকে চাঁদের আশ-পাশে। উজ্জল চন্দ্রের কাছে দেখায় যেন নিবুনিবু নীপালোক। দশ ক'রে কখন হয়তো নিবে যাবে।

বিদ্যাবাসিনী যেন চাঁদের সমতুল্য। আর আর সকলের সা তাঁর তুলনা চলে না যেন। চন্দ্রকান্ত পথ চলতে চলতে গভীর চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে বান। আকাশের চাঁদের মত তাঁর মা আকাশে বিদ্যাবাসিনীর মুখচন্দ্রে ভেসে ওঠে বার বার। পূরি এক অল্পভুতির আবেগে রাজকন্তাকে অন্তরের প্রজ্ঞা জানাতে ইচ্ছা হয়। বিদ্যাবাসিনীর মত সহনশীলতা সহসা যেন দেখা যায় না কিন্তু চৌধুরী-গৃহিণীর কথা আর আবেদনের ভাষা যেন কাশে ফি ছড়ায় এখনও। কি কথা বললেন তিনি! কি অসম্ভব কথা বৈশাখের প্রথম সূর্য্যোদয়ে পথের মাটি উক হয়ে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত চোখ গতি দ্রুত করেন। পথের পাশের ঘাস-মাটি ঘ'রে এগিয়ে চললেন। কাঁধে সিংহর পাত্র। অনেক দূর থেকে দৃষ্টিপথে প কৃষ্ণরামের গুহ্র-আলার। জবা আর ব্যাধিগ্রস্ত ইটের কাঠা ঝাড়িয়ে আছে ধ্বংসের পথ চেয়ে। পাত্রের পথের মত ভাঙাচুড়িলে যেন ফুটে আছেন লক্ষ্মীস্বরূপা বিদ্যাবাসিনী।

নিজেকে যেন বিচার দিতে সাহ হয় চন্দ্রকান্তর। নিজের কৃষ্ণবদন আঁকায়ে ইচ্ছা হয়। সবদেহ বদন ছিন্ন হয়ে পড়ে

আকাশের চাঁদের মত তাঁর বল-আকাশে বার বার উদয় হয় সেই টাঁদমুখের। মনে মনে লজ্জাহতব করতেন হয়। একবার যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তাঁর মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা যায়। পথে জন-সমূহ নেই, তবুও লজ্জার বেন অধীর হ'য়ে ওঠেন চক্ৰকান্ত। আরও ক্রত চলতে থাকেন তিনি। হাস-মাটি পদললিত হয়।

অনভ্যাসের কল। হাত চলে না বেন। এক পণ্ডিত লিখতে কাটাছুটি করতে হয় কত। পুঁথি নকলের কাজ শেরে বেন সব চুখালা তুলে গেছেন রাজকুমারী। তুলট কাগজের বৃকে কালির আঁখর ভ্রমতে থাকে সারি সারি। লেখার আড়ষ্টতা আর না থাকলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে লেখনী চালনা করেন।

ডেকে ডেকে সারা হয়ে বার পরিচারিকা। ডাকাডাকিতে কোন কল না পাওয়ার সে-ও নীরব হয়ে বসে থাকে এক পাশে, গোমড়া মুখে। থেকে থেকে হাওয়া চলে না। গুমট গরমে হাত-পাখার বাতাস খায় মধ্যে মধ্যে। চূপচাপ থাকতে পারে না বশোদা। কেমন বেন আনটান করে। বিরক্তির স্বরে কাটা-কাটা কথা বলে। বললে,—রান্না ছুড়িয়ে যাচ্ছে যে ওগিকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে যা খুঁজি কর' না, বলতে আসবো না তখন।

বুহু বুহু হাসির বিলিক খেলসো বিদ্যাবাসিনীর লাল অধরপ্রান্তে। হেসে হেসে বললেন,—এই পাতাখান লেখা শেষ না হ'লে উঠবো না আমি, তুমি হাই বল' না কেন।

—এরই মধ্যে বেশা ধরে গেছে বৃষ্টি ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বেশ ভাল লাগছে লেখার কাজ করতে।

এব তুলে থাকছি লিখতে লিখতে।

—পণ্ডিত হতে চাও না কি বোঁ ?

—ত এমন সৌভাগ্য কি হবে কখনও ? কিই বা জানি আমি। কিছুই জানি না।

লেখা না থামিয়ে কথা বললেন রাজকন্ঠা। আশাব্যানে তাঁর শত্রুর কাপড় স'রে গেছে। হৃদয়স্তম্ভ পৃষ্ঠদেশে এলো কেশের বোঝা রয়েছে। কক্ষ কুঙ্গল উড়ছে মাঝে মাঝে। পরিচারিকার বিরক্তির গুঁড়ি স্থির হয়ে থাকে। বশোদার চোখে বেন বিহ্বলতা দেখা যায়, বিদ্যাবাসিনীর কক্ষহৃদয়ের রূপ দেখতে দেখতে। এমন নিখুঁত রূপগঠন বেন চোখে পড়ে না কোথাও। পাশ থেকে দেখা যায় বিজ্ঞানীর সুখমণ্ডল, কুমারের তৈরী প্রতিমার মত দেখায় বেন।

লেখার কক্ষে বিরত হয়ে মধ্যমিনের আকাশে চোখ তুললেন বিদ্যাবাসিনী। রূপার চাঁদোরা বেন মহাসুতে। সূর্যের আলোর জ্বল করছে গুজ্জমেখ। আকাশে চিল আর শহুনি উড়ছে। সূর্য কাক ডাকছে কোথায়। অগ্নিকুণ্ড জ্বলে বেন কোন পুঞ্জ, বাতাসে বেন আগুনের পরশ লাগে।

পরিচারিকা কথা বললে হঠাৎ। বিতর্কায় স্বর তার কথার। বলে,—বোঁ, তুমি দেখছি তোমার স্বতর আর শিশুকুলের নাম বোঝে।

—কেন গো বশোদা ? হেসে হেসে বললেন বিদ্যাবাসিনী। তাঁর সারির মত সমাজরত্নর পীতের সারি দেখা যায়। বললেন,—এমন গম্বীজ কাপটা ক'রেছি, তাই তনি ?

—বয়ের বোঁ রোজগার করতে নামবে, সে কেমন কথা। মুখ বঁকিরে কথা বলে পরিচারিকা। অভিব্যঙ্গের স্বরে।

খিল-খিল হেসে উঠলেন রাজকুমারী। তাঁর কণ্ঠবনের প্রতিধ্বনি জ্বলসো শূন্যপুরীতে। জ্বলস মধ্যাহ্ন হেসে উঠলো বেন। হাসতে হাসতে বিদ্যাবাসিনী বললেন,—ভাত-কাপড়টা খোঁরামীর কাছ থেকে যদি না নিই, তাতে আর তোমার মাথাব্যথা কেন ? কুলেই বা কালি পড়বে কেন ?

—দেখে নিও বোঁ, সমাজে টি চি প'ড়ে যাবে।

—তা বাক, কতি কি তার ?

—মুখ দেখাতে পারবে না আর।

—এ গোড়া মুখ আর নাই দেখালাম।

একান্ত দুঃখের কথা, কিন্তু হাসতে হাসতে বললেন বিদ্যাবাসিনী। কথার শেষে আবার লেখার মন দিলেন। মুখের হাসি মিলালো না।

—বাই বল' তুমি, আমি বোঁ ভাল বুঝি না তেমন। র'রে বসে কাজ কর'।

—ঢের হয়েছে। তোমার উপদেশ-অমৃত আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এখন চল' এক ঘুর্তা ভাত খেতে দেবে। আমার লেখা আপাতত শেষ হয়েছে। পাতা পূরণ হয়ে গেছে।

কথার শেষে লেখনী নামিয়ে রাখলেন রাজকন্ঠা। কক্ষ চুলের রাশিতে ঢেউ নাচিয়ে উঠে পড়লেন আগুন ছেড়ে।

পরিচারিকাও উঠে পড়লো। বললে,—এত যে লেখা-লেখি ক'রছো, ভাইদের ছু'চার ছুজ লিখতে পারছো না ?

—কি লিখতে হবে ভাই তনি ?

—লিখতে হবে যে, আমাদের জমিদার বা চাইছেন বেন দিয়ে দেওয়া হয়।

বশোদার কথা শুনে আবার খিল-খিল হাসি ধ'রলেন রাজকুমারী। আলগা শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাঁকার হাওয়ায়।

আমোদনের দেহবোধা দেখলেন ঘরমুখের দালান থেকে। কাঁচা রূপার প্রবাহ বইছে বেন। মধ্যাংশের সূর্যের প্রতিধ্বনি আমোদনের বৃক। দিবলরে বনবোধা শুদ্ধ হয়ে আছে। আকাশ-স্পর্শী গাছেরা বেন দাহনঝালার ক্রান্ত। পত্রশাখা হয়তো তাই নিকম্প।

—দাবী যদি ভিত্তিহীন হয় বশোদা ?

দালান থেকে কথা বললেন রাজকুমারী। এক জলপাত্র থেকে এক আঁচল জল তুলে চোখে-মুখে ছোঁ'রালেন।

—জানি না বাছা এতশত।

কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে বার পরিচারিকা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে শব্দ তুলে নীচে নেমে যায়।

দুই ভাইয়ের মুখ দু'টি মনে পড়ে রাজকুমারীর। রাজাবাহাদুর আর রাজকুমারক। রাজা কালীশঙ্কর আর কুমার কালীশঙ্করক। বেশ তুলে ছিলেন একতরুণ, হঠাৎ বেন মনে পড়লো আর বুঝটা হ'ছ ক'বে উঠলো। চোখে জলের চিকণ খেললো। সিঁড়ির দিকে চললেন বিদ্যাবাসিনী।

ওগরের মেন কোয়ার্টার্স-এর মতই অনেকটা জায়গা জুড়ে নীচের আপিস কোয়ার্টার্স। হাল কেশনের বড়-সড় আপিস-বাড়ি বলতে বা বোঝায় তেমন কিছু নেই। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দালান গোটা কতক। দু'তিনটে করে ঘর; পরমর্খালা অল্পবায়ী সেই সব ঘরের আসবাব-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম। বিচ্ছিন্ন হলেও দালানগুলি মেন কোয়ার্টার্স-এর মত অন্তর্ভুক্ত দূরে দূরে নয়। প্রয়োজনে সব সময়েই কর্মচারীদের এক দালান থেকে অন্য দালানে আনাগোনা করতে হয়।

সকালের আপিস শুরু হবার আগে সাধারণ কর্মচারীদের আড্ডা বসে একপ্রহর। সব একসঙ্গে নয়। এখানে সেখানে, বিচ্ছিন্ন ভাবে। দাওয়ার ওপর, এরডো-খেবডো পাখুরে মাটিতে, ছোট ছোট ঝোপের ছায়ার, অথবা শিলায়।

কিন্তু প্রায়ই ব্যতিক্রমও ঘটে আবার। মাঝপথে জটলা ধামিরে যে বার কাজে বসে বার চুপচাপ। ইচ্ছার হোক আর অনিচ্ছার হোক। তখনই, যখন একেবারে ওই কোণের দালানটিতে একজনের উপস্থিতির ভাবাস পায়।

কারো কোনো অসুশাসন নেই এর পিছনে। কোনো দ্রুতি নেই কারো। কিন্তু এমন হয়ে আসছে। শুধু আপিস-পরিবেশ নয়। আউটডোরও। মড়াইয়ের বুকও। দলে দলে কোলাল-শাবল চালাচ্ছে মাটি-কাটা কুলিরা, একটু-আধটু মস্তর্য করছে মাটির বড়ি বা পাথর মাথায় কামিনরা, তখির তলারকের কীকে কীকে তাদের থোলা বুকুর ওপর একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কুলিবাবু। এরই মধ্যে হয়ত দেখা গেল, প্রায় কোন দিকে না তাকিয়েই লোকটি চলে যাচ্ছে একপাশ দিয়ে। কুলিরা সচেতন হল একটু, ভুড়ি-মাথায় কামিনরা ঘিরে ঘিরে দেখে নিল, মুখের ভিড়ি ছুঁড়ে ফেল দিয়ে তৎপর হল কুলিবাবু। স্বল্প সমাবেশের দিকেও তাই। লোকটি হয়ত ঝাঁজছে একটু কোথাও, কোথাও বা পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে কর্মচারীদের একটুখানি বাড়তি নিবিষ্টতা চোখে পড়বে।

...চিৎ ইঞ্জিনিয়ার বালদ গাঙ্গুলি!

কোণের দালানের স্বতন্ত্র ঘরটিতে কর্মময়। কাগজপত্র দেখছে। সই করছে। কাইল বাঁটেছে। টেবিলে ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ছড়ানো। দেয়াল দেয়ালে চার্ট, মাপ। ঘরে ঢুকলে প্রথমই সমস্ত শব্দকল্পনার নম্রতা চোখে পড়ে।

টেবিলের গায়ের বোতাম টিপতে প্যা—ক্ করে শব্দ হল একটা। বেয়ামার আবির্ভাব!

—ওভারসিয়ার রায় বাবু।

বেয়ারা চলে গেল। খানিক বাদে অল্পবয়স্ক একটি লোক হস্তবস্ত্র হেরে ঘরে এলো। রায় বাবু তো এখনো জয়েন করেন নি তার।

ইঞ্জিনিয়ারের মুখে বিরক্তির রেখা।—শিল্পওরে সারভে কাইল কে ডিল করছে নিয়ে আসতে বলুন।

আগন্তুক বেশ একটু বিব্রত মুখে বেরিয়ে গেল।

সামনের উঠান ডিঙালেই আর একটা দালান। তেমনি একটা বড় ঘরের মোকতে দেয়ালে টেবিলে সর্বত্র ছাইয়ের ছড়াছড়ি।



## পত্র পত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আঁকার সরঞ্জামেরও। টেবিলে ছড়ানো উইয়ের ওপরেই দু'পা চালিয়ে দিয়ে চেয়ার মাথা রেখে সিগারেট টানছে নরেন চৌধুরী। বাঁ হাতে হাতীর ঠাঁতের কান-কাঠি দিয়ে কানে স্বডস্বড়ি দিচ্ছে আর গলা দিয়ে সেই পেটেট শব্দ বার করছে।

কাইল-হাতে সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করল। নরেন চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়ার জটিলতা সৃষ্টি করতে করতেই অঙ্গ নেড়ে তাকালো তার দিকে।

কাইল-বাহক একটু ইতস্তত করে বলল, বড় সাহেব ডেকেছেন—ধূস রচনা বন্ধ হ'ল। ঈশ্বর কৌতূহলে তাকালো নরেন চৌধুরী। পরে সক্ষিপ্ত জবাব দিল, বাচ্চি।

—না, মানে—জাপনাকে নয়—শিল্পওরে ফাইল নিয়ে আমার মেতে বসেছেন।

বাণীর বুক নিতে আর সময় লাগল না একটুও। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নরেন চৌধুরী যে কাগজটার ওপর ছাই বাড়ছিল তাতে জুজাবশিষ্ট সিগারেটটা টিপে টিপে নেবাল। তার পর ছাইস্বস্ত্র কাগজটা মুড়ে ওরেষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়ালের গায়ে ওলটানো একটা কার্ডবোর্ড সোজা করে দিল। বড় বড় হরফ তাতে ঘরে ধূমপান নিষেধ বাণী লেখা। কিংবদন্তি বসল।

দুশ্চিন্তা ভুলে ছেলেটি হাসতে লাগল মিটি-মিটি। এই লোকটির সঙ্গে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আছে সকলেরই।

—তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যেতে হলে আমি কি মাঝপথের হলটি ট্রেন।

—কি করব, অবনী বাবু তো অস্বস্ত—এ সব কখনো করোঁ যে ছুট করে কাইল নিয়ে গিয়ে হাজির হব? কাইল তো যেমন ছি তেমনি পড়ে আছে।

—হঁ? তবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে! খুব কড়া কড়া কীকে দু'কথা শুনিয়ো এসোসে বাও—বাও বাও বাও—দেবী কোত না!

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে কেলল ছেলেটি। কিন্তু হাসলে চলেবে বা বাবু কিছু করতে হবে এতুনি। কাইল তার টেবিলের ওপরে বসল, আপসি বা করবার ককন, আমি চললাম—।

ক্রত প্রাণন।

ফাইল তুলে নিয়ে নরেন চৌধুরী নেড়েচেড়ে দেখল একবার। গীতার দাঁতের কানকাঠি পকেটে ফেলল। পরে ফাইল-হাতে হাফা-হু শিশু দিতে দিতে বাইরে এসে উঠান ডিঙিরে গম্ভ্যস্থানে চলল।

—গুড মনিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। দরজা ঠেলে ধরে প্রবেশ করল।—এই নাও তোমার স্পিল্‌গুয়ে ফাইল।

—বোসো, তুমি যে?

—আমি ছাড়া ওই শালা ফাইল নিয়ে কে আর তোমার কাছে আসবে? সারাক্ষণ মুখখানা যে করে থাকে, ওপরঅলার হয়েই অস্থির সব

মুহু হেসে বাদল গাঙ্গুলি তাকালো তার দিকে।—সেই রকমই দেখি বটে।

হা-হা করে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী।—হুঃ খাকে তো লো, ছজুর টুকু ব জুড়েনি—। সবার সব-কিছু নিয়ে তোমার কাছে আসতে হয় বলে আমার একটা আলাদা এলাওয়ারের জন্য লেখা চিঠি তোমার।

—লিখব'ধন। কিন্তু এ ফাইলের কি হল?

—কি আর হবে, অবনী বাবু সেবে উঠুন।

মনশূন্য হল না স্পষ্টই বোঝা গেল।—অবনী বাবু যদি এখন আসে সেরে না গুঠন ও ফাইল আমি পড়ে থাকব?

বড় সাহেবের কথার পিঠে কথা বলতে একমাত্র নরেনই পারে। মাথা নেড়ে সায় দিল সে, ঠিক কথা, হু'মাসে কেন, অবনী বাবু তার যদি সেরে না-ই গুঠন—স্পিল্‌গুয়ে কি বন্ধ হয়ে যাবে?

বাদল গাঙ্গুলি হার মানল প্রায়।—ওরা বুঝি এই করতাই ইল নিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছে?

—কি করবে, ওদের তো বিচিতে হবে। বাকু, কিছু ভেবো না, ঈল তোমার হু'মাসেই ঠিক করিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ কি একটা জলব এলো বেন মাথায়। উঠতে গিয়েও চেয়ারে হেলান দিয়ে সে পড়ল আবার ১০০ মন হয় না, সাধনা আকাশ থেকে পড়বে কেবাবে। বলল, তুমি তো আছা বড় সাহেব, বোসে জলে সারা হয়ে লোক অস্থিরে পড়ে গেলেন, আর এখান থেকে এখানে তুমি লাঠি ধার দেখতেও গেলে না তাঁকে?

বিরত করাই উদ্বেগ। বিরত হগও।—উনি তো এখন ভালো ছেন শুনেছি—।

—ভাংলো একবার বাওয়া উচিত তোমার। তুমি হলে এই কি কামিলির মাথা—

হেসে উঠল হু'মাসেই। বাদল গাঙ্গুলি বলল, গালাগালাট ভালই লাগে। আমি বাব'ধন—।

—বেও, আছাই বেও। অবন্ত ভালই আছেন এখন তিনি, তবু পাও তো করে লোকে।

তার বুকের দিকে চেয়ে হঠাৎই কিছু বেন মনে পড়ে গেল বাদল লিখক। মুহু'হেসে বলল, আশা বার করে সে তো বোঝই হ বোধ হয়—। পরকণে গভীর মুখে হাতের কাজে মন দিল সে। মুহু'হেসে নরেন চৌধুরী চেয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু না। আশা নেই। বিগুণ একাগ্রতার কাগজপত্র দেখে—প্রায় ক্ষুদ্র বোসো।

—চলি। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে নিজস্ব হয়ে গেল নরেন চৌধুরী। একটা কাজ মন হল না। সাধনার চিক, ইঞ্জিনিয়ার দর্শন ঘটবে আজ। ওর তখনকার মুখখানা দেখার সোচ্চ হচ্ছিল খুব। কিন্তু দেখতে গেলে সব শূন্য। পরে বরং শোনা যাবে। কিছু একটা দৃষ্ট কল্পনা করেই হয়ত হাসছে আপন মনে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ অস্তরকম। কি রকম জানলে নরেন চৌধুরীর মুখে হাসি আসত কি না সম্ভব!

সাধনার মেজাজ সেদিন অস্তরকম। ছোঁকরা ঢাকরটার দেখা নেই তিন দিন। গোন্ধটার খাবার পর্যন্ত কুসিয়ে এসেছে। মেজাজ আরো বিগড়েছে অস্তরকম। পাহাড়ের পিছল দিকেও নতুন রাজ্য বার করা হচ্ছে একটা। যেখানে গোন্ধ বাঁধা হয় তার থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থ। বড় একটা পাখরের চাড়, ভূমিলাস করা হচ্ছে সেখানে। আর থেকে থেকে সেই বিস্ফোরণের গুজুগর্জন ভয়ে ত্রাসে এদিকে সেদিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছে গোন্ধটা।

ওদিকটা একবার পরিদর্শন করে আপন মনে আসছিল বাদল গাঙ্গুলি। অনতিদূরের নারীকণ্ঠে থমকে দাঁড়াল। খুঁটির সঙ্গে একটা গোন্ধ বাঁধা। মেয়েটি তাকে বোঝাচ্ছে, গোন্ধ বলে গোন্ধ, আছা গোন্ধ তুই, সেই থেকে শুনছিল ওই শব্দ, তবু তোর ভয় গেল না। ওখানে শব্দ হচ্ছে তো। তোর তাকে কী? ঘুরে ঘুরে দিকি খাবি দাবি মোটা হবি, না ভয়েই মলো!

শান্তনেত্র কথাকুলি তনে গাভীকতা ভারী আশঙ্ক হ'ল বেন।

—চল বাড়ি চল, আমি তো আছি, ভয় কি?

এক হাতে বাসতি এবং অস্তর হাতে খুঁটি থেকে দড়ি তুলে নিল সাধনা। অগ্নবের মায়বটার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল একবার। চেহারা-পত্র বেশভূষা এমন কিছু নয়, বাতে করে এই মেজাজ সাহেবও কৌতুহল জাগতে পারে। ওরকম হা করে দাঁড়িয়ে দেখাটাই বরং বিরক্তিকর আরো। লোকগুলোর শব্দবই ওই।

ঠিক এমনি সময় আচমকা আবার সেই শব্দ একটা। তর শেরে গোন্ধটা দিল ছুট। হাত থেকে দড়ি ফসকে গেল সাধনার। বালতিটাও ছিটকে পড়ল। আর, ঢাল সামলাতে না পেরে নিজেরও হড়মুড় করে আছাড় খেল একটা।

বাদল গাঙ্গুলি দড়িটা ধরে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে ভীতবস্ত গোন্ধটাকে ধামালো কোন প্রকারে। তার পর ফিরে চেয়ে দেখে ওই অবস্থা। সাধনা মাটি ছেড়ে উঠতে পারেনি তখনো।

গা-কাড়া দিয়ে উঠল শেবে। বেশ লেগেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কাপড় সামলাতে সামলাতে অস্বিমূর্তিতে গোন্ধটার সামনে এসে হাত নেড়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, চলো বাড়ি চলো আজ, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা—পাজী হতছাড়া ভীত গোন্ধ—বাস বাস কি সাহে!

সামনের লোকটিকে দেখল। শব্দ হাতে গোন্ধের দড়ি ধরে নিম্পলকনে তার দিকেই চেয়ে আছে। দাগে পর পর কয়েক কয়েক সাধনা ভূপতিত বালতিটার কাছে গেল। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতার শব্দ বেশবাস সমুদ্র করে নিল একটু। বালতিটা হাতে তুলে নিল তার পর। সামনে এসে বলল, ওটাকে ধরে একটু এগিয়ে দিতে পারবেন? ওই সামনেই বাড়ি—

নিজের অভ্যন্তরে সামনে-পিছনে একবার দেখে নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি বাড় নাড়ল, পারবে।

হন হন করে ক'পা এগিয়ে গেল সাধনা। পিছনে দড়ি ধরে গোন্ধ আপলে চলল চিক ইজিরিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

থমকে দাঁড়িয়ে সাধনা পিছনে ফিরে দেখল। ডর পেলেও গোল হাতছাড়া হয়নি। রাগে গর গর করে বলে উঠল, ওঃ ঘটা কত! জল আনছে না তো একেবারে সমুদ্র নিয়ে আসছে সব! ক্রকুটি করে তাকালো, আপনি ওই ওখানে কাজ করেন?

প্রশ্ন অবান্তর নিজেই জানে। ডামের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখানে। কিন্তু রাগের মাধুর অতশত খেরাল নেই সাধনার।

বাদল গাঙ্গুলি বাড় নাড়ল, করে—

—ওসর বলে দেবন মাটির নীচে এস্তার জল আছে, মিথ্যা আর এত ধাঁক-ডাক করা কেন, অমনি করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই জল জলময় হয়ে থাকে সব।

মেয়েটি কে, অনেকক্ষণই চিনেছে বাদল গাঙ্গুলি। বলল, জলের জন্ত নয়, ওখানে একটা রাস্তা হচ্ছে।

কোমরের বাধায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁটুও বোধ হয় ছেঁড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে হল না।—হ্যাঁ, দলে দলে লোক গিয়ে জলের মধ্যে সঁতার কাটেবে সেই জন্ত রাস্তা হচ্ছে।

কেন যে বাদল গাঙ্গুলি একটু বোকাবার লোভ সবরণ করতে পারল না সেই জানে। বৃহৎ হেসে বলল, রাস্তা হলে তবে তার পাশ দিয়ে নাসা। কেটে এখানকার গায়ের দিকে জল পাঠানো হবে, নইলে—

—খাঙ্ খাঙ্ খাঙ্, আপনাকে আর বোকাতে হবে না, আপনাদের থেকে ঢের বড় বড় চাকুরীদের মুখে অষ্টপ্রহর এই জল-কর্তন শুনিছি।

আবার সে হন-হন করে এগিয়ে গেল। অধঃস্থিত কোঁতুকে বাদল গাঙ্গুলি অল্পসরণ করল তাকে। আনাড়ি হাত বুকেই গোঁকটা নেন এদিক-ওদিকে যেতে চাইছে। কোন বকমে সে সামলে চলছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে পায়ে অনভ্যস্ততাও প্রকাশ পাচ্ছে।

সাধনা দাঁড়াল আবার। নিম্পূহ অবহেলায় দেখল একবার। দৃষ্টি-বিনিময়। এই তো বুঝে, ডাব-ডাব করে সেখতেই ওস্তাদ। বলল, একটা গোল ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে আসতে পারেন না, কোন কাজ হয় আপনাদের দিয়ে তাও বুঝিনে। অতটা দড়ি ছেঁড়ে দিয়ে ধরলে ও ভো। এদিক ওদিক যেতে-চাইরেই, দড়িটা গুটিয়ে নিন আরো। বেশ একটা বৈচিত্র্য অল্পভব করছে বাদল গাঙ্গুলি। নির্দেশ মত দড়ি গুটিয়ে গোঁকটাকে কাছাকাছি আনা হল।

বাড়ি। পাশের সেই প্রবেশপথ দিয়ে সাধনা আগে আগে চলল। পিছনে গোন্ধ নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি। গোয়ালঘর। সাধনার বেলাজ সপ্তমে চড়া তখনো। ভ্রম করে বালতিটা রেখে বাদলের হাত থেকে দড়িপাছা নিয়ে খুঁটিতে গলিয়ে লিল।

কিন্তু এই বশিষ্ঠাও গোঁকটার খুব পছন্দ নয়। পিছু হটতে চেষ্টা করে বাদলের গা বেঁধে এসে প্রায়। একটু ব্যর্থান বজায় রাখতে গিয়ে তাকেও সুরতে হল। কলে এবার তারই পা লেগে বালতি ওগালো। ভিতরের আবর্জনা পদার্থ কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল।

আবার বকুনির ভয়েই চরতো বাদল গাঙ্গুলি মাটি থেকে সেই জলে-খোলে যেখানে পদার্থ ছ'হ'স্তের আঁজলার তুলে নিল বানিকটা।

সাধনা মুখ কিরিয়ে দেখল একবার। কিছু না বলে গড়ানো বালতিটা তুলে নিয়ে গোন্ধর মুখের কাছে রেখে নতুন করে খাবার জোগান দিতে লাগল।

মাটি থেকে যা তুলেছিল তাই নিয়ে অজলিবদ্ধ দুই হাতে বাদল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে রইল চূপচাপ। বাড়ির ভিতর থেকে অবনী বাবুর কঠোর ভেসে এলো, সাধনা এলি—

এদিক থেকে অসহিষ্ণু জবাব গেল, বাই বাবা বাই! জল আনার যা ঘটা তোমাদের, ভগ্নীত্বও গলা আনতে অত ভোঁড়োভাড় করেনি, ভয়ে স্বন্দরীটা একেবারে আধমরা হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে আবার শোনা গেল, কি বলছিস কিছু শুনেছি পাচ্ছি না।

—কিছু শুনে কাজ নেই, ওখানে চূপ করে বসে থাকো, আমি আসছি।

সামনের লোকটার দিকে তাকালো এবার। অনেক নাজেহাল হয়েছে। ঠাঁ করে চেয়ে থাকার সাধ মিটেছে হয়ত। ঈষৎ সম্বর কঠে বলল, আপনি আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওই ওদিকে জল আছে হাত খুঁয়ে কেনুনগে, তার পর ওই ওখানে বাবার কাছে বসুন গে বান, আমি আসছি—

ধাধণ, ডামে কাজ করে বখন তার বাবাকে চেনেই। হাতের কাজ সেবে না হয় হুঁটো মিটি কথা বলা হবে।

হুকুম মত হাতের সেই বন্ধ বালতিতে কেস বাদল গাঙ্গুলি বাইরে এসে জলের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। গোয়ালঘরের কঠোর শুনল, গোন্ধর উদ্দেশে সাধনা বলাছে, তুমি হাড়বজ্ঞাত হয়েছ, বুঝলে? আছাড় বাইরে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে—নাও গেলো এখন—

জলের সন্ধানে এসে বাদল গাঙ্গুলি ধীর সামনে পড়ে গেল তিনি অবনী রায়। বরসঙ্গর বারান্দার ইজিচেরারে অর্ধশয়ান। মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। কোন দিক থেকে কে এলো টের পাননি। কাছাকাছি হতে খবরের কাগজ সরালেন। তারপর চোয়ার ছেঁড়ে শয্যাবস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন একেবারে।—তর আপনি! এদিকে আসুন তর এদিকে—ভারী সৌভাগ্য আমার!

ওদিকে গোয়ালঘর ছেঁড়ে সবে বেরিয়েছে সাধনা। শোনাযার হুঁপ মত দাঁড়িয়ে গেল সে। একখানি নির্বাক পুতুল বেন। মাথায়ও ঢুকছে না কিছু।

বাদল গাঙ্গুলির হাত ধোয়া হল না আর। হাত হুঁটো পিছনে নিয়ে সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।

—আসুন তর আসুন, ওরে সাধনা, একটা চোয়ার দিয়ে যা না লীগিরি—আপনি এখানে বসুন তর—

চোয়ার নিয়ে আসবে কি, মাটির সঙ্গে পা আটকে আছে সাধনার। কোনরকমে একটা বেতের চোয়ার নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালো। দেখল, বাবা অনেকটা বেন আভ্যন্তরীণ হলেই আরও ইজিচেরারে বসে পড়লেন।—চোয়ারটা এগিয়ে দে,—এই আদর মেরে সাধনা।

বাল গাঙ্গুলি দিয়ে দেখল ভাকে। হকচকিয়ে গিয়ে সাধনা বলল, নুন মস্কার—কঠোর নয়, যেন কারা বেরিয়ে আসছে গলা বেরে।

হুঁহাত তুলতে গিয়ে হাতের অবস্থা দেখেই আবার বর্ণাশ্রম ঠাঙিয়ে বাল গাঙ্গুলি মাখা নাড়ল শুধু। সাধনা চেয়ার নিয়ে আর এগোতে পারছে না।

—খাক চেয়ার দরকার নেই। হাত হুঁটো তেমনি পিছনে রেখেই অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন এখন?

—আমি তো সেরেই গেছি, আপনি মিছিমিছি কষ্ট করে এতটা পথ এলেন!

পিছন থেকে লোকটির হুই হাতের অবস্থা দেখে সাধনার হুঁ চকু আরো স্থির। চেয়ার রেখে প্রস্থান করে বীচল।

বাল গাঙ্গুলি বলল, না কষ্ট কি, আগেই আসা উচিত ছিল, আজ নরেন বলতে খেয়াল হল।

আড়াল থেকে সাধনা কাঠ হয়ে দেখছে আর শুনেছে। অবনী বাবু বললেন, নরেনের কাণ্ড—আমি তো হুঁচার দিনের মধ্যেই কাজে বাব ভাবছি, আপনি বসুন না একটু, এক পেয়ালা চা অন্তত—

—না, এখন চা নয়, আমার তাড়া আছে। আপনি বেশ সেরে উঠুন আগে, এখন কাজে বেরবার দরকার নেই। ভালো বোধ করলে হুই একটা ফাইল বরাং এখানে আনিবে নেবেন। আচ্ছা—

উঠে ঠাঙিয়ে অবনী বাবু নমস্কার জানালেন। বাল গাঙ্গুলি চলে এলো। বাইরে সিঁড়ির কাছে জল-সাবান তোয়ালে নিয়ে সাধনা অপেক্ষা করছে। ঠাড়াতে হল। দেখল একটু। কে বলবে খানিক আগে এই মনে এমন মেজাজে গোক আর মাহুয় হুই-ই একসঙ্গে ভাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। লজ্জা দেবার জুগুই জিজ্ঞাসা করল, আছাড়টা খেয়ে আপনার তখন লেগেছিল বোধ হয় খুব?

জলের ঘটি তুলে নিয়ে সাধনা মাথা নাড়ল, লাগেনি।

সিঁড়ির কাছে ঠাঙিয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে সাধনা জল ঢালতে লাগল। ওর বিস্তৃত মুখের দিকে চেয়ে আছে বাল গাঙ্গুলি। বেশ কৌতুক অনুভব করছে।

প্রায় মরিয়া হয়েই সাধনা বলে ফেলল, আমি... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—কি বুঝতে পারেন নি?

চোক গিলল সাধনা। কথা বোগাতে না পেরে তোয়ালে ধুসিয়ে দিল।

—এখন বুঝতে পেরেছেন?

সাধনা তাড়াভাড়ি বাড় নাড়ল, পেরেছে।

—আচ্ছা। হাসি চেপে তোয়ালে তার হাতে কেবল দিয়ে বাল গাঙ্গুলি প্রস্থান করল।

সেদিকে চেয়ে সাধনা ঠাঙিয়েই রইল খানিকক্ষণ। বিজ্ঞান ঠাড়া কাটরে উঠতে পারছে না। গোয়ালঘর থেকে গোকটার বাব বব কানে এলো। হঠাৎ হাসি পেরে গেল সাধনার। বেদম লি। অক্লান্ত। হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়ে হুঁহে গললে চাপা দিল।

ভিতর থেকে অবনী বাবু ডাকলেন, সাধনা!

হাসি সামলে কোন একারে লাড়া গিল, বাই বাবা!

কিন্তু বাবার কাছেও আসতে পারছে না চট করে। তাঁর সামনেও হেসেই ফেলবে হয়ত। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুখ মুছে দমটম নিয়ে উঠল সে।

—দেখলি আমাদের চিকু ইঞ্জিনিয়ারকে?

সাধনা নিরীহ মুখে মাথা নাড়ল। হুঁহে বাই বলুন, চিক ইঞ্জিনিয়ার দেখতে আসার অবনী বাবু মনে মনে খুশি খুব। প্রশংসার মেতে উঠলেন। এতটুকু অহঙ্কার নেই, শুধু কাঁচটি হলেই খুশি, আর কাজ বোঝে কত! তুই যদি চট করে একটু চা করে এনে দিতিস।

যেমন স্বভাব, সাধনা কস করে বলে বসল, বেশ করে বোল খাইয়ে দিয়েছি।

—বোল! বোল কি রে? কার কথা বলছিস?

চট করে সামলে নিল সাধনা, ওই সন্দরীর কথা, ভীতুর একশেষ, আজ আমার নাজেহাল করেছে একবারে! বড় বকমের জিত কাটল, এই গো বাবা, তোমার ওরুধের সময় পেরিয়ে গেল, নিয়ে আসি আগে। চল পায়ে সরে পড়ল সেখান থেকে।

নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সাধনা। কাউকে না বলা পর্যন্ত ভেতরটা ফুলাচ্ছে যেন। ক'কে বলবে, বাবাকে? ও-বা-বা! একজনকেই শুধু বলা যেতে পারে। উদুগু আগ্রহে নরেনের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু আসবেই এমন কোন কথা নেই। সকালে আগিসে নামার আগে বাবাকে দেখে গেছে, না আসাই সম্ভব।

বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগছে না আর। কোন ছোট পরিসরে গুকে কুলাবে না এখন। বাইরের উন্মুক্ততা যেন টানছে। বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। কোন দিকে যাবে? যে দিকে লোক নেই। চলল। গোড়া থেকে ভাবতে চেষ্টা করল একবার ব্যাপারটা। কিন্তু ভাববে কি, মনে পড়ে আর নিজের মনেই হেসে বুন। লোকজন নেই এদিকটায় দক্ষ।

এই চিক ইঞ্জিনিয়ার বাল গাঙ্গুলি! কি কাণ্ড! কিন্তু একেবারে হাসকা লাগছে ভিতরটা। কিসের একটা আবিষ্কৃত্য যেন কেটে গেছে। মোহগ্রস্ততাও বলা যেতে পারে। বাবা, বাবা—অদেখা মাহুয় দেখা মাহুবকে কতই না ছাড়িয়ে যায়। এরই সামনে পড়ে বাওয়ার ভয়ে কত দিন সে কি না একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে! অবশ্য লজ্জার মরে বাচ্ছিল আজও! কিন্তু সে ওই বিদিকিছির কাণ্ডটা ঘটে গেল বলে। নইলে, হু—!

পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেরড়ো সাকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে। কতটা এসেছে খেয়াল নেই। আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের এম.এ. পড়া মেয়ে স্বর্ণার কথা মনে পড়ল। আর সেদিনের সেই পার্টীর কথাও। এখন আর বৈমানান মনে হচ্ছে না একটুও। ওই ভোঁতা চেহারার লোকটির তুলনার মেরেটাই বরাং বেশি বকখক। কি হল সেদিন আজ আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে; নরেন বাবুর সবচেয়েই বেশি বেশি। গেলেই পারত—

অন্য মেয়েদলার খিল-খিল হাসির শব্দে সজবিত হয়ে যেনে

গেল সাধনা; পাহাড়ের ওপারে বিদ্যার দূর পা-চাকা দিয়েছে। পাহাড়ের রক্ত আর আকাশের রক্ত এক হয়ে আসছে। এরই মধ্যে নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসিতে আসন্ন প্রদোষের স্তব্ধতা কেটে চৌচির হয়ে গেল যেন!

পারে পারে এগলো সাধনা।—স্বচ্ছার নয়। হুঁয়ার কোঁতুহলে। অদূরের একটা বড় পাথরের আড়াল পেছতেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। পালাতে পারলে পালাতো সাধনা। কিন্তু আর সুযোগ নেই আড়াল হবারও!

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি। আর মাঝির ছেলে হোপুন!

—ই-ই-দিদিয়া!—খুশির মাত্রা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল চাঁদমণির! একটা ছোট পাথরে গা ঢেলে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল।—ই দিদিয়া!—আঁই রে দিদিয়া!—মায়াবুকের রাণীপানা দেখতে লাগছে তুকে—ইমিকে আর না কেনে—!

কি করবে সাধনা? সম্ভব হলে উল্টো দিকে ছুটতো। সম্ভব নয়। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করছিল এখানে?

বড় করে নিশ্বাস ফেলল চাঁদমণি। কালো চোখের বিদ্যুৎকটাক্ষ নিকশিত হল হোপুনের ওপর। চোখে-মুখে হাতের আভাসে তড়িত চপলতার ঝিলিক। ওরাঃ চালাঃ কানাইঃ—ঘরপানে যেতে লেগেছিলাম—মরদটার 'দিল' দেখ কেনে—সন্ধ্যা কালে লুবতির মতন পাছু নেছে—লাজডর নাই!

কি কুক্ষণ এই ক্যাসানের মধ্যে এসে পড়েছে সাধনা! হতচ্ছাড়ী ঘেরটার জিভ যেন সাপের ছোঁবল। তবু হোপুনের দিকে এক বার না তাকিয়ে পারলে না সাধনা। বে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা যেন একটা অপরাধ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিরত, সমুচিত। মড়াইয়ের পাথরে-কোঁরা পাণ্ডা নয়। নিরস্ত্র বিহ্বল, দেউলে মূর্তি।

চাঁদমণির আলা তিকরনা কালো চোখের তারা দুটো বারকতক যেন নেচে বেড়ালো সাধনার মুখের ওপর। উচ্ছলকণ্ঠে খিল-খিল করে হেসে উঠল তারপর। তীক্ষ্ণ পাহাড়-চেরা হাসি। দেখে লে, দেখে লে, দিদিয়ার আঙগা মুখ দেখে লে—চান্দো মুখে আঙন লেগেছে দেখে।

এবারে সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন। পিছনে হাসির রমকে ডেকে পড়ছে চাঁদমণি। হাসি নয় তো যেন বরফ-গলানো জল। গায়ে কাঁটা দেয় আর অবশ করে ফেলে।

অনেকটা পথ এসে হাঁপ কেলে বাঁচে সাধনা। হাঁপিয়েই গেছে। অজানা অল্পভুতির স্পর্শ আছে মেয়েটার হাসির মধ্যে। দূরে আগ্নেয়াস্ত্রে সেটার অবশিষ্ট যেন জড়িয়ে আছে গায়ের সঙ্গে। হুশ করে বসে পড়ল এক জায়গায়। বড় বড় মম নিল হুচারটে। হাতের কাছে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। নিজের অজান্তে হাতের মুঠোর বারকতক নিশ্চেষ্ট করত চাইল ওটা।

তারপর শব্দ হল, সহজ হল।

কেন মরতে গিয়েছিল ওখানে। ভাবল, জেনে-সুনে তো আর যায়নি। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যেন বোঁচা খেল একটা। জেনে-সুনে নয়? ওই নিরিবিগল নিজস্ব কি একজনের জন্ত নাকি? না একা কেউ এখানে বসে অমন করে হাসে? রাগ করে পাথরটা দূরে ছুঁড়ে কেলে দিল সাধনা।

মুখে হারমানা হাসির আভাস।

—কিন্তু কেনই বা বিয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার ওদের। লোকটা মেয়েকে বত না, হোপুনকে ভালবাসে তার থেকে বেশি। তবু বিয়ে দিচ্ছে না কেন? জিজ্ঞাসা করলে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে পাগল সর্দার। সেই এক কথাই বলে তারপর। দেবে—। সময় হলে দেবে। সময়ের আর বাকি কত সে তো দেখেছে। মড়াই বাধার আগে পঞ্চম গায়ের মাঁষি হোপুনের বাবার প্রতিপত্তি কম ছিল না। দিনকাল বদলালেও এখনো কেলনা লোক নয় সে, মুকুবিই বটে। মড়াইয়ের গোলযোগ মিটে যেতে আসোয়া স্বরূপ সে নিজেই এসে ছেলের জন্ত চাঁদমণিকে চেয়েছে। কিন্তু পাগল সর্দার সেই কথাই বলেছে তাকেও। বিয়ে দেবে। কিন্তু এখন নয়। পরে। বেশ অসম্ভব হয়েই ফিরে গেছে হোপুনের বাবা। হোপুনও খুশি হয়নি।

পাগল সর্দার নিজেই গল্প করেছে সাধনার কাছে।

হোপুনের বাবার মত সাধনার একবারও মনে হয়নি, মেয়ে নিয়ে মাঁষির ছেলেকে খেলাচ্ছে পাগল সর্দার। বরং মনে হয়েছে, লোকটার বৃকের কোথায় যেন মস্ত ক্ষত।—কিন্তু বিয়ে বধন দেবেই ঠিক করেছে, দিচ্ছে না কেন? যে দম্ভজাল মেয়ে ওর। হেসেই কেলে সাধনা—পাজী হতচ্ছাড়ী মেয়ে।

বাড়ি ফিরে সাধনা দেখে নরেন বাবু বসে আছে বাবার কাছে। অপ্রত্যাশিত নয়। আসতে আসতে ভাবছিলও।

মড়াইয়ে নেমে অনেক দিন পরে আবার সেই পুরানো দিকেই পা বাড়ালো সাধনা। রক্ত-সমাবেশের দিকে নয়। ওর মনোবলও নতুন কিছুর আমদানী ঘটেছে। তাই চোখ বেগিকে টানছে সেদিকে না গিয়ে মন বেগিকে টানছে সেদিকে এগুলো।

দূরে এক জায়গায় হোপুন কাজ করছে। কিন্তু ওর দলের মধ্যে চাঁদমণি নেই। নিজের অজান্তে সাধনার দুই চোখ চার দিকে ঘুরল একপ্রহ। হয়ত তার বাবার সঙ্গে আছে, হয়ত বা আর কারো দলে গিয়ে ভিড়েছে। কেন জানি ভাল লাগল না সাধনার। ঠিক এমনটি প্রত্যাশা করে আসেনি। ভই হোপুন লোকটার দিকেই চোখ গেল আবার। দুই হাতের কোদাল উঠছে মাথার ওপর। লৌহখণ্ডের ধারালো দিকটা দূরচ্ছটার স্বকমকিয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচক করছে ঘামে-ভেঙা পেশল কালো দেহের কঠিন রেখাগুলি। তেমনি ঋকু, কঠিন। আর তেমনি নিবিচার, নিরাসক্ত। কে বলবে, বিগত প্রদোষের অতঃ-নির্জনে এই সেই ঘরাপড়া বিদ্বিষিত মূর্তি। সাধনাকে সেও দেখল। কিংবা দেখেও দেখল না।

অনেক দূরে বড়-বড় ঋম-ঝমর শব্দ হচ্ছে একটা। চারিঃ মেরিন চলছে। সাধনা এগুলো। মাটি থেকে ক্রমশ ওই ওপরে উঠে গেছে চার পাঁচ তলা সমান উঁচু কনডোয়ার। আগাসোঁকা এক হাত প্রমাণ চওড়া পুরু চামড়ার বেল্ট ফিট করা। অনবরত ঘুরছে। এ মাথা থেকে বেল্ট-এর ওপর পাথরকুটি ঢেলে লাগাই সড় সড় করে ওপরে চলল। ওপরে দুর্গামান এক বিশাল ইস্পাতের জোঁহাড়ার কংক্রিট মিশ্রশচার তৈরী ব্যবস্থা। চারিঃ হয়ে গেলে সেটা ক্রমে করে ঢেলে নিয়ে এলো অভিকার বলতির আকাঙ্ক্ষা লোহার বাকটে। এমিক থেকে দেখলে মনে হয়, বেল্টের ওপর দিত

মাটি থেকে পাঁচতলা সযান উঠে একসারি পাথর-কুটির অবিরাম শোভাবাত্রা চলছে যেন। মইয়ের মত একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়; কিন্তু একটু পা ফসকালেই সব শেষ। আর ওঠা যায় কেবল সঙ্গ 'কেজ' কঁটা করে। কবচাবীর সচরাচর কেজ-এ কয়েই ওঠে। সাধনার ভিতরটা উসখুস করে সেখানে উঠে সব দেখার আগ্রহে। ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই অনায়াসে উঠতে পারে সে। লোকজন হাঁ-হাঁ করে উঠবে তাহলে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধে পেলে ওখানে একদিন উঠবেই ও। ঠিক উঠবে।

--নমস্কার!

এত কাছে, সাধনা চমকে উঠল প্রায়। নীল চশমা, হীরের আভটি, বাকী ট্রাউজার, সিনের বৃশপাট।

ঘোষ-চাকলাদারের রথবীর ঘোষ।

প্রত্যভিগদন। প্রথম সাক্ষাতের সেই আড়ষ্ট সঙ্কোচ তোলেনি সাধনা। যেমন ওর বুদ্ধি। আজ তো যুথের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝে কম করে বছর চলিশ বয়েস হবে। হেসে বাক্যগোপন শুরু করে দিল সাধনা।—এমিকটায় বৃষ্টি আপনার কাজকর?

—হ্যাঁ, আজ একবারে আমার রাজস্ব এসে পড়েছেন।

—আগেও এসেছি। উঁচু সেই ঘরের মত এলিভেটরের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওখানটার ওঠা যায় না?

—কেন যাবে না, ওই তো উঠছে ওরা। আচ্ছা আপনাকে কেজ-এ করে একদিন তুলব খঁন।—আপনি আমার গোড়াউনও দেখেননি বোধ হয়?

—না তো, কোথায় সেটা?

—মাইল দুই হবে এখান থেকে। জিপে বেতে হবে, চলুন একদিন—মস্ত মস্ত সিয়েট আর বাঁলুর পাহাড় দেখতে পাবেন। সাধনা সাগ্রহে রাজি। কবে নিয়ে যাবেন?

—বেসিন খুশি, আজই চলুন না?

ছ'বশ পা এগিয়েছে। মনে মনে সাধনা কল্পনা করে নিচ্ছে আজ বাওয়া চলে কি না। কাছেই একটা এবড়ো-খবড়ো নীচু জায়গার ওপর চোখ পড়ল। আরো এগুলো খানিকটা। ছোট একটা পাশ্চ বসিয়ে জল ছেঁচে জমা হই লোক। আর বড়িতে পাথরের মুড়ি বোঝাই করে করে ঘুরে ফেরে দিয়ে আসছে পনের কিনাট মেয়ে। এদের কাবোরই বয়েস বেশি নয়। এখানে ঈদগাহিকও দেখা গেল।

পাশ থেকে রথবীর ঘোষ জানালো, কাটাছুটিতে জল উঠছে, এখান থেকে পাথর না সরালে হাত-পা ভাঙার ভয় আছে বলে স্নেহলোক লাসিরে দেওয়া হয়েছে।

কানে গেল না সাধনার। বড়ি-হাতে চাঁদমশি নিপলক চেয়ে আছে এদিকেই। তার কালো চোখে যেন শাদা আঙন ঠিকরে নিচ্ছে।

জলারকরত কুলিবাং তাজা দিল, দাড়িন পড়লি কেনে, পাগলপ তুলে লো।

চাঁদমশি ঝাঁপিয়ে উঠল ডাকেই, বসকাইছিল কিসের লেসে, কোপাকো (বুড়ু) বিদায় লিব মাই?

একপাও নড়ল না। অসম্ভব দুই চোখ এদিকেই নিষ্কণ্ড হল আবার। চলতে চলতে শিঙন কিরে তাকালো সাধনা। চাঁদমশি ঝাঁড়িয়েই আছে। সাধনা অবাক। কাল কি দেখেছিল আজ কি দেখছে। কাল বরং রাগতে পারত। উটে হাঁসির বস্তার নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ওকে। কিন্তু আজ কি হল—!

—যাবেন নাকি আজ গোড়াউন দেখতে?

—জ্যা? আশ্চর্য হয়ে সাধনা তাকালো তার দিকে। অভ্যস্ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা জোড়ালো আলো ঝলে উঠলে যেমন হয়, চোখে চোখ পড়তে তেমনি একটা খালি খেল সাধনা।

নীল চশমাটা রথবীর ঘোষের হাতে। চেয়ে আছে। চেয়েই ছিল। সাধনা লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। চাউনি নয়, অজ্ঞাত একটা নয়তার স্পর্শ লাগল যেন ওর চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে। দৃষ্টি নয়, লেহন।

—না আজ না, আর একদিন যাব খঁন। সবলে সেই পিচ্ছিল দৃষ্টির জুঁ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সাধনা। পাশাপাশির ব্যবধান বাড়ল।

—আজ কাজ আছে বৃষ্টি?

—বাবার শরীর খারাপ—বাড়ি বেতে হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে তিনি অসুস্থ। অস্তরঙ্গ হুচিহ্না রথবীর ঘোষের!—তিনি সেরে ওঠেননি এখনো?

—উঠেছেন—

—আচ্ছা, আজ থাক তাহলে, তাজা কি। চলুন, আমারও ওদিকেই কাজ আছে একটু।

দৃষ্টি-বিনিময় ঘটল আবারও। ঘটবে জেনেও না তাকিয়ে পারল না সাধনা। অসহায় বোধ করছে কেমন। দিন দুপুর। এত বড় মড়াইয়ে এত লোক কাজ করছে। তবু—। পুরুষের চোখে কামনার দাহ এ বয়েস পর্যন্ত একেবারে দেখেনি এমন নয়। কিন্তু এ সে বকম নয়। অস্বস্তিকর সিন্ত অহুত্বটি একটা। না তাকিয়েও তার চাউনিটা যেন উপলব্ধি করছে সাধনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। খুঁটিয়ে আশ্বাসন করার মত। যেটুকু বস্ত্র গায়ে জড়িয়েছে এ দৃষ্টির সামনে সেটুকু যেন মোটেই কখেই নয়।

বাঁচা গেল।

ওই অদূরে পাগল সর্দার ঝাড়িয়ে। একলা নয়, দলের সঙ্গে। সাধনাকে দেখেছে। দেখে হাতের কাজ থামিয়ে এদিকে চেয়ে আছে। অবশ ভাবটা নিমেষে কেটে গেল সাধনার। আপনি থান, আমি একটু পরে যাব।

হন-হন করে একেবারে সর্দারের কাছে গিরে খায়ল সে। হাঁক ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে খেমে গেছে। কিন্তু সর্দারের দিকে চেয়ে বিরত বোধ করছে আবার। নিরক্ষর বুকের একজোড়া সন্ধানী প্রাজ চোখ বারকতক যেন শিখিল ভাবে বিচরণ করে কিরল ওর বুকের ওপর। তার পর, অদূরে রথবীর ঘোষ যেখানে ঝাড়িয়েছিল এখনো, সেই দিকে। তার নীল চশমা চোখে উঠছে।

সাধনা বিমূঢ় আবারো। দৃষ্টি নয়, অকস্মৎ যেন ছোট ছোট কয়লার টুকরো বন্ধকিত উঠছে পাগল সর্দারের অদিকোটরে।



দেখছে আবার চোখে শুক করেছে রণবীর ঘোষ। পাগল সর্দার  
য়েই আছে।

কিরে তাকালো খানিক বাদে। ঠাণ্ডা হয়েছে। মেহসিক্তও  
ন। সামনের কাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলল, অন্তে টুকচি বসে  
দাঁট চলে কেনে—।

হুঁজুনেই এসে বসল মাটির ওপর। সর্দার ভিজ্ঞাসা করল,  
বাসীর বাবুর শরীল আরাম হ'ছে—?

সাহুনা ঘাড় নাড়ল, হয়েছে—।

—তু ইদিকে কোথা য়েয়েছিলি?

—কোথাও না, এমনি ঘুরছিলাম।

একটু থেমে সর্দার ভিজ্ঞাসা করল, উ কনট্রাটির বাবুর সছ তে?

চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে সাহুনা জবাব দিল, না  
এখানে দেখা হল।

—তু আমার খানে ছুটুটে আসলি কিসের লেগে, উ কি বলল  
বট্টে?

আবার তাকালো সাহুনা।—ছুটে আবার কোথায় এলাম।  
তোমাকে দেখেই তো এলাম। কি ভেবে পায়ের প্রেক্ষণও জবাব  
দিল।—উনি বলছিলেন আমাকে একদিন তাঁর গোড়াউন দেখাতে  
নিরে বাবেন।

চূপচাপ কিছুক্ষণ।—তু বাস না দিদিয়া, আমি একটো দিন  
কুকে সেটা দেখিয়ে লিয়ে আসব...।

বাবে না তো বটেই। কিন্তু সাহুনা উম্মুখ আরো কিছু শোনার  
জন্ত।

রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না ওরা। নিজে খেবেই সর্দার  
জানালো অনেক কথা।—খুব 'ভদ্র মুনিব' নয় ওই বাবুটি, 'চি'  
লোকের' মান মরাদ্দ রাখতে জানে না—কাঁক পেলেই সোমন্ত  
য়েয়েগুলোকে বিগড়ে দেয়—এই নিয়ে খুব গণ্ডগোলও পাকিয়ে  
উঠেছিল একবার, ইত্যাদি—।

সাহুনার লক্ষ্য গেছে। উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, ওর নামে  
মুকুলিসের কাছে নালিশ করো না কেন তোমরা?

পাগল সর্দার সখেমে জানায়, তাও করা হয়েছিল কিন্তু মুকুলিসের  
কাছে ও অত্যাচার জ্ঞানায় নয়, বড় সাহেব তথু কাজই বোঝে, মেয়েদের  
দাম বাবে না।

বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সর্দারের কোভ সাহুনাকেও  
স্পর্শ করল যেন। গা-ঝাড়া দিয়ে সর্দার তার বক্তব্যটুকুই কিরে  
বলল আবার।—উনি সন্তে তু বাস না দিদিয়া, বোঝলি?

মুখ ফুটে সাহুনা বলতে পারল না কিছু। কিন্তু মাথা নেড়ে  
সার দিল তৎক্ষণাৎ। বুঝেছে, বাবে না—।

মড়াইয়ের গহ্বর থেকে উপরে পা দিয়েই সাহুনা আড়ষ্ট  
হয়ে গেল আবার। জায়গাটা এমন নয় যে কাটিকে  
পরিহার করে চলেতে চাইলেই চলা যায়। পাঁচটা পথ নেই  
আনাসোনা চলা-কোরার।

অনুরে রণবীর ঘোষ ঠাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে।

সাহুনা ধরে নিল লোকটা হচ্ছে করেই ঠাঁড়িয়ে আছে।—অশেকা  
করছে। এতেই কাজ হল। আড়ষ্টতা গেল। দ্বিতীয় পথ নেই  
যখন পাশ কাটাতে হবে। তরটা কিসের।

এবারও সহাত্রেই আপায়ন করল রণবীর ঘোষ। এই কিম্বদন্তি  
না কি?

হীনা সাহুনা কিছুই বলল না।

—আমিও আটকে গেলাম, চলুন। এক মিনিট, এঁর সঙ্গে  
আপনার আলাপ হয়নি, আমার পার্টনার যিঞ্জন চাকলাদার।

সাহুনা দেখল। চিনল। জিপের সেই দ্বিতীয় লোকটি যে  
তাকে সামনের আসন ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু  
এদের কারো সঙ্গেই আর আলাপ করার জন্ত ব্যগ্র নয় সাহুনা।  
প্রতিনিমন্ত্রণের হাত তুলল কি তুলল না।

পড়ন্ত বোদে রণবীর ঘোষের নীল চশমা বুকপকেট অ  
করেছে। কলমের ক্লিপের মত তার একটা ডাঁট পকেটের  
ঝুলছে। ওভাবে তখন হঠাৎ ওই সর্দার লোকটার কাঁচ  
বাংলায় বা এখনকার এই নির্ধাক পরিবর্তনে কিছু উপলব্ধি  
কি না সেই জানে। চোখের সে নয় দৃষ্টি গেছে। বেশ হ  
মেজাজেই সঙ্গ নিয়ে বলল, বাবার শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি  
বাবেন বলেছিলেন তখন—এই তাড়াতাড়ি?

সাহুনা নিরন্তর। সাদাসিমে কিছু বলতে পারলে বলত। একটু  
হাসতে পারলে হাসত অন্তত। কিন্তু কিছুই পারল না। ওদিকে  
যিঞ্জন চাকলাদারও নীরব। রণবীর ঘোষ বলল আবার, চলুন, ওই  
সামনেই কিপ রয়েছে।

সামনেই মানে বাকের মুখে ভুতু বাবুর সোফানের সামনে।  
মনে মনে আবারও যেন ঝাঁপল সাহুনা। ভয় না হোক অশঙ্কি বাবে  
কোথায়। নারীচেতনার অশক্তি। এ ভাবে ও চেতনার মুখোমুখি  
আর বড় হয়নি কখনো। কিন্তু জবাব না দিলে নয় এবার। বেশ  
সহজ ভাবেই বলল, আমার যেতে ঢের দেবী এখনো, আপনারা বান।

রণবীর ঘোষ একবার বাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ওকে। 'তু'-চার  
মুহুর্তের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। এখানে আবার কোথায় বাবেন?

—কাজ আছে। মনে মনে নিজেই বিশ্বস্ত হল সাহুনা।  
হাসতেও পারল ষতটুকু হাসা দরকার।

সোফানের বাইরে ঠাঁড়িয়ে ছিল ভুতু বাবু। তার ছির চোখ ছুটো  
আরো বেশি গোল দেখাচ্ছে যেন। চেয়েছিল ফ্যাল ফ্যাল করে।  
এদের সঙ্গে দেখে সাহুনাকে ভাবেনি যেন। আরো কাছাকাছি হতে  
এদেরও চোখে চোখ পড়ল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল  
ভুতু বাবু।

তারা জিপের দিকে এগুতে সাহুনা ঘুরে ঠাঁড়াল। রণবীর  
ঘোষও থেমে গেল।—ও, এইখানে আপনার কাজ বুঝি?

বাড় নেড়ে সাহুনা বাস্তা পার হয়ে ভুতু বাবুর সোফানের দিকে  
চলল। খুব নিশ্চিন্ত নয় এখনো।—ভুতু বাবুর সোফান সকলের  
জন্তই খোলা। আড়াল হলও ভুতু বাবু লক্ষ্য করছিল ঠিকই।  
খতমত খেয়ে উঠে ঠাঁড়াল।—মা লক্ষ্মী! আহুন, আহুন!

ভিতরের দিকে কোণের একটা বেঞ্চে ধূপ করে বসে পড়ল  
সাহুনা।—কই, চা দিতে বলুন।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। সাবান দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুতু বাবু নিজেই  
একটা স্লাস পরিষ্কার করতে বসে গেল।

আড়চোখে সাহুনা ঘুরে শালগাছের নীচে জিপটাকে দেখেছে।  
উৎকর্ণ।—টান্ট শোন। জিপ চড়াই তেতে চলল।

নিশ্চিত। কিরে দেখে চা ভৈরী শেষ ভূত বাবু। হেসে বলল, পরগা নেই কিন্তু সঙ্গে, কাল এনে দেব।

পানবাওয়া পুরু কালো জিভ বার করে মাথা ঝাঁকালো ভূত বাবু। সাধনার কথাগুলি ঝেঁকেই কান থেকে বার করে দিল বেন। চায়ের গেলস তার সামনে রেখে বলল, আপনাদের চাট্টি খেয়ে-পয়েই বেঁচে আছি মা-লক্ষী, তাবলে এ রকম বললে ভূত ছেড়ে ভুতেও লজ্জা পাবে—

নয়ন বাবু তনলে বলতো;—‘বু’। কিন্তু এর মুখে মা-বাবু কখনো বোঝে নাগে। আজ এই মুহূর্তে তো রীতিমত ন জন মনে হচ্ছিল সাধনার। চায়ের প্রয়োজন কুরালেও গা সাগ্রহেই টেনে নিল।

ধা কাটিয়ে ভূত বাবুই প্রের করল প্রথম।—এনাদের সঙ্গে াপ পরিচর আছে মা-লক্ষীর?

গদের সঙ্গে? চায়ের রূপ নিরীক্ষণ করছে সাধনা।

এই ঘোষ বাবু আর চাকলাদার বাবুর কথা বলছিলাম, এক গচ্ছিলন মনে হল—

—একটু-আখটু। হুঁচর চুয়কে গলা ভিজল।—আপনিও চেনেন বুঝি ওদের?

—বিলক্ষণ! ভূত আর কাক ন চেনে এখানে? আর ওদের তো।—খেয়ে গেল।—তা বেশ লোক, লাখো লাখো টাকা কামাচ্ছেন, খরচেও অক্ষপণ—বিশেষ করে ওই ঘোষ বাবুটি, বাকে বলে দিলদার মাহুব।

তনলে নয়ন বাবু যা বলত ভেবে এখন একটু খটকা লাগছে। দূর থেকে ওই হুঁজনের সঙ্গে ওকে দেখে লোকটার সেই নিম্পলক বিষয় ভোলেনি সাধনা। তার আড়াল হওয়াটুকুও নয়। চা নিঃশেষ হল। মনের হাওয়ার মন চলে, যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার কথা সেমিকেই খুঁকল সাধনা। উম্মনের ছাই খুঁচিয়ে আঁচ তোলার মতই ফু করে ভূত বাবুকেও একপ্রহ খুঁচিয়ে দিল বেন। কিন্তু আপনাদের পাগল সর্দারের মুখে তো সুনলাম, ওই ঘোষ বাবুটি মোটেই ভালো লোক নন!

নড়েচড়ে কিছুটা টান হয়ে বলল গোলগাল ভূত বাবু। আলগা জড়ির ছাই কিছু ঝরেও পড়ল নিজের অগোচরে। গলা নামিয়ে সাগ্রহে বলল, বলছে বুঝি? কবে? আজ? তার পরেও আপনি—ব্যাপারটা কি জানেন, অলো পরগাওয়ালা লোকের একটু-আখটু যেমন ইয়ে—

কি বলবে আর কি বলবে না, ঠিক না পেয়ে হাঁসকাঁস করে খেমেই গেল। খেয়ে গিয়ে মনে হল, বেটুকু বলছে, বলা উচিত হয়নি। মেরোটকে বেশ হাসিমুখে এদের সঙ্গে আসতে দেখেছিল—কোন কথা কোথায় গিয়ে পড়ায়, ঠিক কি? গলা চড়িয়ে দিল।—তা ও-ব্যাটারা তো বলবেই, নিজের ঘর সামলাতে পারিল না, বত দোর বাইরের লোকের! নিশ্চয় করিস, দুহের মেয়ে রেখে সেই কোন দুপে তোর নিজের বউ পালায় নি ঘর ছেড়ে? আর তোর মেরোটাই

বা কি, একসঙ্গে দশটা লোকের মুণ্ড চটকে বেড়াচ্ছে—সে বাবে বাশের হাতে হাড়ভাঙা শিটুনি খেয়ে ঢিট হযোছে, নইলে ওই বাহাদুর জমাদারটার সঙ্গেই তো প্রায়, বাকুগে—

পাগল সর্দারের জীবনে গভীর অঘটন কিছু আঁচ করেছিল সাধনা। কিন্তু বাহাদুরসারিষ্ট চাঁদমণির প্রসঙ্গটা প্রচণ্ড বিষয়। ছান-কাল ভুলে সাধনা ধী করে চেয়ে রইল ভূত বাবুর মুখের দিকে। লজ্জা বা সঙ্কটের অবকাশও নেই। ভূত বাবু বলে গেল, ওদের পূর্বপুরুষেরা হাঁসের লোভে, পায়রার লোভে, খেলনাপাতির লোভে ঘর-বাড়ি বিক্রিয়েছে জাত কে জাত—সেপাই-বেয়ারা পাহারাওলার সঙ্গে আজন্তক তিন-তিনটে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে এই সেড় বছরের মধ্যে। সেই মেয়েগুলো ঠিক ওদের জাতের নয় অবশ্য, কতই তো আছে এখানে—ওডচড়ে শাড়ী আর টুনকো গয়না পেল হুঁচরখানা, অমনি চেল ঘর-বাড়ি ছেড়ে। আর পেতোক বারই পেখমে শোষ চাপাবে বাবুদের ঘাড়ে—যেন ওই কন্তেই আছে বাবুরা। গেল বার এই নিয়ে গোল পাকিয়ে উঠতে বড় সাহেব কশে ধমকে দিয়েছে সঙ্কলকে—সমঝে চলতে না পারলে মেয়েদের ঘরে আটকে রেখে দাওগে বাও, কাজ করতে হবে না—বড় সাহেবের কাছে ও-সব মেয়ে-টোয়ের কোন খাতির নেই, বুঝলেন।

তড়বড় করে এতগুলো কথা বলেও ভূত বাবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না বোধ হয়। সাধনার নির্বাক মুখের ওপর দুই গোল চক্ষু সযত্ন হল আবার। এই ভূত কারো নিশ্চের মধ্যে নেই, বুঝলেন? নিজেরা সামলে-সমলে থাক না যেভাবে খুশি, কে তাদের বারণ করেছে—মিথ্যা নিশ্চ কন্তে বাস কেন—যা বলব হক্ কথা বলব, নিশ্চ কেন কব, কি বলেন? এই এতগুলো কথা হল, একটা নিশ্চের কথা কারো নামে বলেছি—আপনিই বলুন?

এত কথার সার কথাটা এতক্ষণ স্পষ্ট হল যেন। সাধনা মাথা নেড়ে নীরবে আশ্বাস দিল তাকে, নিশ্চ কারো করা হয়নি বটে। কিন্তু ভালও লাগছে না আর। উঠে পড়ল। নিশ্চিন্তে এবার বাড়ি ফেরা বাবে বোধ হয়।

চড়াইয়ের মাঝামাঝি এসে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অভল মড়াইয়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ পঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূরে দূরে ওই মাহুবেরা কাজ করছে। আর ওদের মেরেরা।—এত উঁচু থেকে মেয়ে পুরুষের তফাৎ বোঝা যায় না খুব। পাগল সর্দারের কোভটুকু সাধনার মন থেকে মোছেনি তখনো। ভূত বাবুর মুখে বড় সাহেবের অমুশাসনের কথা শুনে বর বেড়েছে আরো। নিবিড় মমতায় সেই দূরের দিকে দৃষ্টি পড়ে রইল।—ওই মাহুবদের রীতি জালাল। নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে। ঘরে-বাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি। ওদের এই আনন্দ, এই যিনিময়টুকুই বিশেষ করে স্পর্শ করে তাকে। লোভের বিষ ছড়িয়ে এটুকু কণুণিত করা যেমন জঘন্য অপরাধ, নিশ্চই অমুশাসনের ভ্রুকুটিতে তাকে ব্যাহত করাও তার থেকে কম নিষ্ঠুরতা নয়। পঁড়িয়ে পঁড়িয়ে অজ্ঞত সেই রকমই মনে হল সাধনার। [ ক্রমশঃ ]

। মাসিক বনুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

আমি মেরীয়ামকে ভালো করে জানি। সাক্ষ্যের প্রতি  
ওর তীব্র মোহ আর তুমি শিল্পী হিসেবে সেই সাক্ষ্য লাভ  
করেছ। তবে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, মেরীয়াম অত্যন্ত বয়সের  
মেয়ে। অনেক ব্যাপারে তাকে ঠিক বুঝতে পারি না। ও জাতে  
ইহুদী। ছোটবেলা থেকে মা-বাবা নেই ওর। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা  
আছে, আর খুব ভালো করে বোঝে ও কি চায়। ওর জীবনের  
পরিকল্পনায় প্রেমের স্থান নেই। কপদকশূণ্য যুবকের সঙ্গে  
প্রেমে পড়তে ও নারাজ। এ্যাভেহু জ বুইসের একটা বাড়ির  
দিকে ওর চোখ আছে। আর আমার যদি খুব বেশী ভাল না হ'লে  
থাকে, তাহলে মনে হয় সেটা এক দিন ওরই কথারস্ত হবে। এখন  
একজন বর্ধাশ্রম মনের মাস্তুরের আবির্ভাবের প্রতীকার আছে।  
এখন অপেক্ষা করবে, ওর বয়েস তো মোটে একশ।

—এ সবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

—বললুম তো একুশি। আমার মনে হয় তোমরা দু'জন বনিষ্ঠ বন্ধু  
হতে পারো। বন্ধুত্ব ! একথা মনে রেখো। শুধু বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়।

—আমার সংস্পর্শে ও বেশ নিরাপদেই থাকবে, হেনরী বলে  
উঠলো। প্রেমে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই না ?

—হ্যাঁ—তা এক রকম সত্যি। সেও সঙ্গী চায়, প্রেম চায় না।  
তুমি বিশ্বাস না করতে পারো, তবে এ কথা সত্যি যে অনেক মেয়েই  
আছে যারা শুধু পুরুষের মিতালি চায়, তাদের শব্দাসঙ্গিনী হতে  
চায় না।

—তুমি বলতে চাইছ ও আমার বন্ধুত্ব কামনা করে। একসঙ্গে  
খিয়েটরে যাবে, ডিনার খাবে, এই সব।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এমন ব্যবহার করবে যাতে তোমার সঙ্গে  
বুঝতে ওর ভালো লাগে। তবে মনে হয় ওর ইচ্ছে আছে। আর  
একটা কথা। এ সব চিরকাল চলবে ভেবে না। ইতিমধ্যে কোন  
লোক আসতে পারে। ও বা চায় দিতে পারে। আর সে যদি দেয়  
তাহলে—তবে এর মধ্যে তুমি—যদিও ছ'মাস কি এক বছর ওর  
মুন্সের সাহচর্য উপভোগ করতে পারো। বা হোক, তোমার সব  
কথাই খুলে বললুম। ইচ্ছে হয় নাও কিংবা ছেড়ে দাও। তবে  
তোমার বুদ্ধি বলে কিছু থাকলে ওকে গ্রহণই করবে।

রূপালী  
পদ্মের  
কমহিনী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ছ' সপ্তাহ পরে হেনরী প্রেস ডেনমার্ক আর কত লা পেঙ্ক-এ  
মেরীয়ামের জন্তে অপেক্ষা করতো। এখন এইখানে দু'জনে প্রায়  
সাক্ষাৎ হয়।

মেরীয়াম ! আন্তর আস্তে তার মায় উচ্চারণ করে হেনরী।  
মেরীয়াম—ছ' সপ্তাহের মধ্যে মেরীয়ামের সংস্পর্শে সে যে অতাবিভ  
আনন্দ লাভ করেছিল, সে সুখের অস্তিত্ব সে কোন দিন কখন  
করেনি। সে যেন হেনরীর জীবনের ধারা পাশে দিয়েছিলো।  
এখন থেকে তার মস্তপানের মাত্রা কমে গেল। হুখে থাকলে কে  
আর বেহুঁস হতে চায় ? যখন তখন সে আর গান শুনতে যায় না,  
পথে পথে বুখা ঘুরে বেড়ায় না। হুমোর ঠিক সময়ে, আর ছবি  
আঁকার কাজে মন দিলো ফের।

একদিন তারা মসেলারের 'প্রেসাস রিডিকিউলস' দেখলে  
দু'জনে। অল্প দিন গান শুনতে গেল এক জলসায়। সেখানে  
মেরীয়াম তার চমৎকার ব্যবহারে, রূপলাবণ্যে আর গানের সমস্ত  
দাবিতায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তার পদের সন্ধ্যার তারাল

যু লাঁ রু জ

মূল লেখক : পিয়ের লা মুর

বেনসীসএ গেল। অল্পটান শেষ হওয়ার পরে হেনরী তাকে বঙ্গমঞ্চের পেছনের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো সাথ বার্নহার্ড-এর সঙ্গে। রবিবার অপরাহ্নে তারা লুডারে বেড়াতে গিয়েছিলো। যদিও হেনরীর মতে ওটা 'পুর্বান কবরখানা'। বিভিন্ন জায়গায় ঘূঁড়নে এই একসঙ্গে বেড়ানো-তার কাছে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

এই ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে লাগলো। প্রত্যেক সন্ধ্যায় হেনরী গ্রেস ডেনলোমে মেরীয়া-এর জন্তে অপেক্ষা করে। তারি খিচোরি, গুপেরায় কনসার্ট আর সার্কাসে যায়। হেনরী তাকে নিয়ে ভেলাডোম জু হিভারে গিয়েছিলো। আর তাকে বখন হেনরী বিখ্যাত জিমারখানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে বেশ চমৎকৃত হয়েছিল। একদিন তারা গেলো সালো। ইণ্ডিয়ানে। সে একটা রোমহর্ষক, অভিজ্ঞতা। বড় বড় যন্ত্র এখান থেকে ওখানে গর্জন ক'রে বাজে, ঘরের মধ্যে ঘোড়া ছোট্টাছুটি করছে। অনেক লোক এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠছে। কেউ বা উঠে পড়ছে চেয়ার ছেড়ে। মুহূর্তে হয়ে পড়ছে অনেক।

কোন কোন দিন তারা জয়েন্টস-এর সঙ্গে একসঙ্গে ডিনার খাচ্ছে। গল্প গুজব করে বা তাস খেলে সন্ধ্যা বাপন করছে। রবিবার সকালে মেরীয়া আকস্মিক ভাবে তার ঠুঁড়িতে এসে হাক্কির হতো। বই হাতে কোচের ওপর বসে পড়তো। হেনরীর ছবি আঁকা দেখতো মন দিয়ে। মেরীয়া-এর সঙ্গে ম্যাডাম লুভেরতের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেশ। হেনরীর পেছনে বসে বসে তারা বহুক্ষণ ধরে ফিস ফিস করে গল্প করতো।

ঘরে ঘরে মেরীয়া-এর সঙ্গে হেনরীর বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে পরিণত হ'ল। হেনরী নিজের সবচেয়ে অনেক কথাই তাকে বললো। বিগত কয়েক বছরের নিঃসঙ্গতার কথা বললো। সে তাকে ডেনিসের সবচেয়ে গল্প করলো। আর এক অজ্ঞানুখী সন্ধ্যায় মেরী শার্লটের বুস্তান্ত এক এক ক'রে খুলে বললো। মেরীয়াও তাকে বিশ্বাস করতে লাগলো। সেও বললো তার শৈশবের সমস্ত কাহিনী।

তার পর যে মাস এলো। বসন্তের মায়ামজের প্যারিসের পঞ্চম বৃক্ষপর্ণে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। গাছে গাছে দেখা গেলো রঙিন ফুলের সজ্জা। দরজার সামনে প্রাণীদের চূষনরত দেখা যেতে লাগলো।

জেন এড্রিল তার প্রাণীর সঙ্গে লগুন ছেড়ে চললো। সঙ্গে তার দাসী আর বিজনেস ম্যানেরা বাচ্ছিলো। আর ছিলো দুটো ছোট্ট লোমশ কুকুর আর কুড়িটা তোরঙ্গ পেরি। একটা লাগেজ কোথায় মিশে গেছে বলে মন ধুঁতুত করছিলো তার। শেষ যুহুর্টে টেলিগ্রাম আর উপহার হাতে গীতমঞ্চের তারকার মতো দেখাছিল তাকে।

ঐশ ছাড়বার পূর্বে সে কয়েক যুহুর্টে জন্তে হেনরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।—তোমাকে নতুন মাস্ক মনে হচ্ছে, হাতের দস্তানা দিয়ে হাওরা খেতে খেতে সে হেনরীকে বললো। মেরীয়া-এর সঙ্গে কেমন দিন কাটছে বলে।

চমৎকার। তুমি বতখানি বলেছিলে ও তার চেয়ে সুন্দর। তুমি আমার জন্তে যা করেছ তার ঋণ কোন দিন পোষ দিতে পারবো না। তুমি বতো পোটার চাও আমি একে দিতে রাজি আছি।

তার কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা অদ্ভুত করে জেন তার দিকে সন্দেহ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলো।

—হেনরী, মনে রেখো শুধু বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়।

সেমিন সন্ধ্যায় হেনরী মেরীয়া-এর সঙ্গে এক সঙ্গীতসভায় নিয়ে গিয়েছিলো। এই অল্পটান হচ্ছিল এক মৃতসঙ্গীতকারের সম্মানার্থে। তিনি সম্প্রতি ডিয়েনায় মারা গেছেন। সঙ্গীতের সময় মেরীয়া-এর নিম্নলিখিত চোখে ঘান-মন্ডের মতো বসেছিল। হাত দুটো শিথিল হ'য়ে কোলের উপর পড়ছিল। সঙ্গীতের বিপুল মূর্তনা-তরঙ্গে সে যেন ডুবে গিয়েছিলো। আড়চোখে তাকে দেখতে দেখতে হেনরী মনের পটে তার ছবি একে নিচ্ছিল। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তার আনন্দ-পুলকিত মুখ, দ্বিধাভিন্ন চোখের রক্তিমতা, আর শুভ কণ্ঠের ওপরে সূক্ষ্ম রেখাবলী।

সঙ্গীতের অন্তিম মূর্তনায় সে তার হাতের আঙুল হেনরীর আঙুলের মধ্যে জড়িয়েছিল। দৃষ্টবান হেনরী, এই গান শোনার জন্তে অজ্ঞপ্র দৃষ্টবান। এই গান আমি জীবনে বতো বার শুনেবো তোমার কথা তক্ষুণি মনে পড়বে।

ঘরে ফিরে মেরীয়া তার কোটটা কোচের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। আঙুন জালতে তার পর নীচ হয়ে বসলো।

আমি যদি ভেলে দিতে পারতুম—সোফা থেকে হেনরী বলে ওঠে। সে কোন উত্তর দেয়নি। তার পর লাফিয়ে উঠে হাত দিয়ে দ্বাটটা সোজা করে নিয়ে বলেছিলো, কফি তৈরী করছি, তুমি যদি থাও তো বসো।

রান্নাঘরে সে অদৃশ্য হলো। কিছুক্ষণ ধরে হেনরী কফি তৈরীর বনবন শব্দ শুনে পেলো। কত সামান্য জিনিষ পেয়েই না মানুষ সুখী হয়! একটু আগুনের উত্তাপ একটুখানি কফি আর একটি মেয়ে—মেরীয়া-এর মতো মেয়ে। কি নয়ম আর উষ্ণ তার হাতের স্পর্শ—

—তোমাকে আজ রাগিত্তিরে সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। সোফা থেকে হেনরী বললো।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে মেরীয়া। দৃষ্টবান হেনরী। অনেক বার তুমি আমার প্রশংসা করলে।

আমার কাছ থেকে কিংবা অন্য কাঙ্ক্ষার কাছ থেকেই তোমার প্রশংসার দরকার নেই। তুমি সুন্দর—একথা তুমি ভালো করেই জানো। সত্যি বলতে কি একটু বেশী সুন্দর। তাছাড়া কোন মেয়েকে সে নিজেকে জানে না এমন কোন প্রশংসার কথাই বলা যায় না। নিজের সবচেয়ে মেরীয়া খুব সচেতন।

তবে প্রশংসা শুনে তার ভালোই বাসে। কফি তৈরীর আগুনের চেয়ে জ্বোরে হেসে মেরীয়া-এর বসেছিল।

আবার বখন মেরীয়া-এর ঘরে এলো তার হাতে হ' পেরালা কফি। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। হেনরীর দিকে কবির পেরালা বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে।

ফায়ার গ্রেসের কাছেই সে বসলো। ভালো ভেলাভেট কাটের তলায় তার পা ছাঁচি হ' ভাঁজ করা। কিছুক্ষণ ঘুঁড়নেই চূপচাপ।

ওরকম একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?—আগুনের দিকে থেকে দেখা না সরিয়েই মেরীয়া জিজ্ঞাসা করলো।

সত্যি শুনেচো চাও? আমি জানিছিলো তুমি সত্যি সত্যি এখানে

হয়ে না আমি মনের কল্পনা দিয়ে তোমার মূর্তি তৈরী করেছি।  
কল্পনায় আমার জোড়া নেই। আমি অনেক জিনিষ দেখি বার  
কোন বাস্তব নেই, তোমার সঙ্গে কোন দিন আমার সাক্ষাৎ হয়নি।  
তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে আমি যে কি খুশী কি বলবো।  
তুমি খুশী নয়, কৃতজ্ঞও বলতে পারি।

মেহীয়ায় একটুও নড়েনি। তার স্থির মূর্তি ঘিরে যেন একটা  
অনিশ্চিত উৎকর্ষা জ্বলে উঠলো। কোলের ওপর ককির পেয়লা  
নামিয়ে রাখলো সে। চিন্তাক্ষর মুখখানা অনেক দূরে মনে হচ্ছিল যেন।

হেনরী, তুমি কি আমার প্রেমে পড়েছ ?

সে অস্বভাব করলো তবল পানীয়টা সজ্জায়ে নেমে গেলো।  
হাতের মধ্যে ত্র্যাণ্ডির দ্বারটা কঁপে উঠলো। এবার মেহীয়ায় তাকে  
তাগ করবে—সারা সন্ধ্যা তাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। খুব স্নন্দর—  
সে হয়তো বলবে যে ধনী যুবকটির প্রতীক্ষায় সে আছে সে যুবকটি  
এসেছে—কি বা যুবক পেয়েছে সে তাকে ভালোবাসে—

তোমার প্রেমে পড়েছি ? ও কি বলছে ? নিশ্চয় না। মস্তিষ্কের  
প্রতিটি রক্ত-স্রোত চেনা। এবার তাকে স্নন্দর করে মিথ্যা বলতে  
হবে। তাকে বিশ্বাস করতে না পারলে হেনরীকে তাগ করবে সে।

—না, মেহীয়ায়, নব্বইশ হেসে সে বললো। আমি শুধু তোমার  
বন্ধুই থাকতে চাই। মিতালির আনন্দ ছাড়া তোমার কাছে অল্প  
কিছু প্রত্যাশাও করি না, প্রয়োজনও নেই। আমি জানি তুমি  
এক দিন চলে যাবে। তবে বাওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের বন্ধু  
বজায় থাক, এই শুধু চাই।

সে হেনরীর মুখের ভাব ভালো করে লক্ষ্য করছিল। বললো,  
একথা শুনে খুশী হলাম হেনরী। আমিও তোমার বন্ধু হয়ে থাকতে  
চাই। আমিও তোমার কাছে কম কৃতজ্ঞ নয়। তুমি বা  
জানো, যতটুকু কল্পনা করো, তার চেয়ে হয়তো বেশী।  
আমি জীবনের কাছে কি চাই, জেনে হয়তো তোমায় বলছে।  
তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি না, তুমি আমার  
ভালবাসবে এও আমি চাই না। কারণ, ভালোবাসলে তুমি হুঃখ,  
পারে। আর তুমি হুঃখ পাও এ আমার অভিপ্রায় নয়। আমি  
তোমাকে আনন্দই দিতে চাই হুঃখ নয়।

ধন্যবাদ, মেহীয়ায়। মুহূর্তে হেনরী বললো। আমাদের মধ্যে  
কোন কথাই অস্পষ্ট রইলো না। এখন আমি বাড়ী যাই তাহলে।  
কাল রবিবার, তুমি ভাসে লাসে যাবে কি ? সে তার শূণ্য পানপাত্র  
টেবিলের কোণে রেখেছিল। ছড়িটা তুলে নিয়েছিল হাতে। কিন্তু  
সে গুঁড়ায় আগেই মেহীয়ায় তার পাশে এসে ঝাঁড়াল। টোঁটো  
তার টোঁটের খুব কাছে এনে বললে, একুশি বেণ্ড না হেনরী।

গ্রীষ্মকালটা তারা দু'জনে আর্কটনের সমুদ্রের ঘাটে কাটাল।

একসঙ্গে নৌকা চড়তো, মাছ ধরতো। চোখ বুজে, সূর্যের দিকে  
দৃষ্টি করে ডেকের ওপর শুয়ে থাকতো দু'জনে। সহজ কথাতেই হেসে  
গুঁড়তো সে। আর উজ্জল খুশীতে মানুষ যেমন-বাল্কে কথা বলে, তেমন  
ফেনিল উচ্ছ্বাসে কথাবার্তা বলে যেতো। একসঙ্গে ভোজন করতো  
তারা। শীতের শহরে পাইনবীথির মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে  
ঝেঁড়াতে যেতো। জলটুকুর মতো কোন কাঁকড়ে বা হোক করে  
সময় কাটিয়ে দিতো। বিহ্বল হুড়তো। তার পর রাত্রি তার  
নিবিড় অন্ধকারে তাদের আলিঙ্গনবন্ধ আনন্দকে ঘিরে দিতো।

হেনরী কখনো তাকে ভুলবে না, সেও মনে রাখবে হেনরীকে  
চিরদিন। এই কুৎসিত বামনের কথা কোন দিন সে বিস্মৃত হবে না।  
ভুলবে না তার ভালোময় প্রেম।

সে হেনরীকে ভালোবাসেনি। এ কথা হেনরী জানতো।  
কোন দিন ভালোবাসবে না এ কথাও বুঝতো। সে তাকে দেহ  
দিয়েছে, হৃদয় দেবে না। হেনরী যদি আয়ো তরুণ হতো, আর একটু  
অনভিজ্ঞ হতো তাহলে হয়তো আশা করতো। কিন্তু এখন আর  
নয়। এখন সে তিরিশ উত্তীর্ণ, দাড়িতে পাক ধরছে তার।

নিজের কথা হলো—সে সত্যি মেহীয়ায়কে ভালোবেসেছে। খুব  
গাঢ় গভীর ভাবেই। এক্ষেত্রে সে হুঃখিত। মনকে বশ করতে কম  
চেষ্টা করেনি সে, কিন্তু পাবেনি। এই সমস্তার মীমাংসা করতেই হবে  
তাকে। সে মেহীয়ায়কে মিথ্যা কথা বলছে। বিদায়ের শেষ মুহূর্তে  
যখন উপস্থিত হবে সে যেন সসজ্জায়ে বিদায় দিতে পারে। অস্বস্তিক  
প্রোম্পতদের হস্তাকর অভিনয় তাকে যেন না করতে হয়—

প্যারিসে ফেরার পথে গাড়িতে পাশাপাশি বসে হৃদ্যন্ত দেখছিল  
তারা। সমুদ্রে তখনো কয়েক জন বান করছিল—চোখ থেকে মুছে  
ফেলেছিল নোণাজল। বাতাস মুহূর্তের ভাবে বইছিল।

মেহীয়ায় তার হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিল। এই গ্রীষ্মকালটা  
আমার জীবনে সবচেয়ে সুখে কাটলো। চার সপ্তাহ যেন ষোল  
ছিলো। এদিনগুলোর কথা কখনো ভুলবো না আমি।

আমিও প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, হেনরী তার শুভ হাতের দিকে



লোতরেকের আঁকা পোষ্টার

চেয়ে অকুট হয়ে বসলো। এ ক'দিন একটা ভাড়াটাকি শেষ হয়ে গেল বলে হুঃখ হচ্ছে।

তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, তাই না? এবার মেরীয়ায় প্রেরণ করেনি। কঠোর তার স্থির প্রত্যয়। আমি অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তবে সঠিক বুঝতে পারছি না।

হেনরী মাথা নেড়ে বীকৃতি জানাল। মিথ্যা হলনা করে দৃঢ় হ'য়ে পড়ছে সে। অনেক আসামী যেমন মানসিক যন্ত্রণায় নিজের পাপ স্বীকার করে ফেলে, তেমনি ভাবে স্বীকার করলো হেনরী।

হ্যাঁ, মেরীয়ায়, আমি তোমার ভালোবেসেছি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেই দিনই ভালোবেসেছি। এখন তোমার বলেছি শুধু তোমার বন্ধুর চাই তখন এমনি ভালোবাসতাম। সে হায়ে আমি তোমার মিমো কথা বলেছিলাম। মিমো বলেছি তোমাকে হায়াবাব আশ্চর্য। তার পর থেকে মিমোই বলে আসছি। আশা করেছিলাম তুমি বুঝতে পারবে না। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোন দিন একথা বলবো না তোমাকে। কিন্তু এখন জানতেই পেরেছো তখন বলে, আমাকে কি তোমার তার নিতে দেবে না?

মুখ দিয়ে কথাটা উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অজড়ত করলো মেরীয়ায়ের হাতটা তার মুঠোর মধ্যে থেকে সরে গেলো।

এ রকম হবে আমি জানতাম। এ ছাড়া আমি দুঃখিত। মেরীয়ায়ের কঠোর খুব মুহু ও ব্যাধাপূর্ণ। তুমি বলতে, আমার ভালোবাসা তুমি আশা কর না। সে তোমার ভুল হেনরী। যে বাক ভালোবাসে তার কাছ থেকে ভালোবাসার প্রতিদান সে চাইবেই। তুমি চাও। না বলো না। তুমি এখনো বিশ্বাস কর আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করলে। সদয় হলে, বৈধ ধরে থাকলে এক দিন আমি তোমার ভালোবাসবো। এ ভুল তোমার কোন দিন জাওবে না। কোন দিন না। তোমার এ আশার কোন দিন শেষ হবে না। কোন না কোন মেয়ের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার প্রত্যাশা তুমি করবেই। আর প্রত্যেক বারেই শুধু দুঃখ আর আঘাত পাবে। যেমন হুঃখ আমি তোমার দিছি। ভেবে দেখো, তোমার আর আমার অবস্থা প্রায় একই। আমরা দু'জনেই বা চাই কেউই তা পাচ্ছি না। দু'জনেই ভালোবাসা চাই, কেউ কি পেয়েছি কি? আমি পাচ্ছি না আমি চাই না বলে, আর তুমি পাচ্ছ না বীকৃতি আর কুৎসিত বলে।

শেষ কথাটা হেনরীকে আঘাত করলো। তার মুখে বেন কণ্ঠস্বরো আশাহীন সমাপ্তির আকার ধারণ করেছে মনে হলো। তার আকাশ খুসর, বাতাস ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রতীর তামাটে মনে হতে লাগলো।

মেরীয়ায় দেখলো, হেনরীর মুখ থেকে শেষ রক্তাভটুকু মিলিয়ে গেল। তবুও বেছায়ার ধীরে ধীরে সে ক্লান্তে লাগলো, হ্যাঁ, হেনরী, আমি খোঁড়া আর কুৎসিত। সারাজীবন তুমি চেষ্টা করছ এ কথা ভুল থাকতে, লোককে ভুলিয়ে রাখতে, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ। তুমি আমার ভালোবাসা চাও কোন মেয়েই সে ভাবে তোমাকে ভালোবাসতে পার না। যদি সম্ভব হতো আমিই তোমার ভালোবাসতাম। চেষ্টাও বন্ধ। কিন্তু পারিনি, কোন দিন পায়বোও না।

মুখ তুলে হেনরী তার কথার বাধা দিতে চেষ্টা করলো। না, নয়—রক্ত ভগ্নিমার মেরীয়ায় বললো। তুমি জানো, কোন

আমি তোমার ভালোবাসি না—কেন কোন দিন ভালোবাসব না। কারণ আমাকে এখনো ভালোবাসি। হায় কথা তোমাকে অনেক বা বলছি। যে আমার বিয়ে করতে চেয়েছিলো। তুমি যদি আমাকে এ্যাডেনিউ ভু বইসেবে সব চেয়ে ভালো বাড়িটা দাও; শুল্লর পোষার হীরে জহরত উজাড় করে এনে দাও, তবুও কোন দিন তোমার আমি ভালোবাসতে পারব না। বরং এই দান্নের জন্তে কম পছন্দ করবো। হয়তো দুপাই করবো। তুমি তখন আর আমার বন্ধু থাকবে না। তখন তোমাকে এক জন ধনী বুকের মতো মনে হবে যে টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে। ঐ টাকার জন্তে তোমাকে যুগা করবো। আমি এসব জিনিষ চাই, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নয়। বাক পছন্দ করি না তার কাছ থেকে শুধু এই সব হাত পেতে নিতে পারি। তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু এ সত্য—তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত? মনে হয় আর দেখাশোনা না করাই ভালো। আমার প্রতিজ্ঞাই ছিলো তুমি আমার ভালোবাসলে আর সাক্ষাৎ করব না।

জ্ঞান হেসে মেরীয়ায় হেনরীর দিকে তাকাল। খুসর গোখুরির আলোতে তার চোখ দুটো ছল-ছল করছিল।

তবে দেখো, আমারও দুর্বলতা আছে। তোমাকে আমি এতো পছন্দ করি, তুমি আমার এত প্রিয় যে তোমার সঙ্গে দেখা না করার কথা ভাবতেই পারি না। গত শীতকালে আমরা কত স্নহী ছিলাম। সেই লুতার আর ঘরের মধ্যে সেই সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে করে দেখো। এখনো ঐ ভাবে আমরা দিন কাটাতে পারি। কিন্তু তুমি ভালোবাসার কথা আর কখনো মুখে আনবে না। এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে হেনরী! চেষ্টা করে দেখো।

সমুদ্রতীরের বালুকাভূমির পেছনে সূর্য অস্ত গেছে। হু'টো নৌকা তীরে এসে নোঙর ফেললো। রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা সমস্ত আকাশে ছেয়ে গেছে।

প্যারিসে ফিরলো তারা। তাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের ছায়া ঘনিয়ে আসছিল বেন। আর্চেনের বনিত দিনগুলি অতিবাহিত করার পর শুধু মাত্র জন্ম আলাপ-আলোচনায় তৃপ্ত থাকি হেনরীর পক্ষে কঠিন মুশকিল। ডেকের ওপর সেই মেরীয়ায়ের অসম্ভব মূর্তির সঙ্গে এই আপাদমস্তক বসনাবৃত রূপের বৃত্ত তফাৎ। তবে হেনরী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। প্রেমের কথা সে উচ্চারণ করেনি।

আবার প্রতিদিন সায়াহ্নে প্রেম ভেনডমে যেতে লাগলো। চার দিকের কোলাহলের মধ্যে মেরীয়ায়ের প্রতীকার বসে থাকতো। তারা আবার নানা জায়গায় বেড়াতে লাগলো। হয়তো, মতপানের বিষয়ে তর্কবিতর্ক করতো। ওপরের কনসার্টে যেতো। আর মেরীয়ায়ের ক'দিস পেতিস চ্যাম্পস-এর হোট ঘরে আগুনের ধারে বসে গল্পগজব করতো।

গত শীতকালের মতো এবারও হেনরী জানলময় বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সখ্যতার মধ্যে হুঃখ বেগুনা সুর বাজছিল। হু'জনের মনেই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কথোপকথনের মাঝখানে আকস্মিক ভাবে হু'চার মিনিট স্তব্ধতা দেখা দিত। কষ্টকৃত হাসিতে আর জোর করে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে 'সেটা চাচ্ছি' সেবার চেষ্টা করতো হু'জনেই। ওদের

হৃদয় আপে যে স্বাভাবিক বহু ছিল এখন তার মধ্যে শুষ্ক হলনা দেখা গিয়েছে।

তার দিকের জনতা হেনরীর পক্ষে এখন অসহ্য মনে হতো। সাধারণের মধ্যে মেয়রারের সঙ্গে বেহুলে খুশী হতো না মোটেই। কোন হুজু খুব মেয়রারের দিকে চেয়ে আছে দেখলে কি এক অজানা আশঙ্কার তার মন ভরে ওঠে। মেয়রারের এতো রূপ যদি না থাকতো! তার মনে মনে যেন দুঃখই হয়।

তাকে হারাবার ভয় হতো। হেনরীকে পেয়ে বসলো, সে যেন ততোই তাকে মন-প্রাণ দিয়ে চাইতে লাগলো। সে আবিষ্কার করলো, ঈর্ষা ও বাসনার মতো যুক্তিতে কান দেয় না, হৃদয় ও স্নেহের মতো সমান বেছাচারী। মেয়রারের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভাবনা তার মনে এক বিন্দু শান্তি অবশিষ্ট রাখেনি।

নিজের প্রতি অত্যাচারিণীকে আবার মন খাওয়া বসলো। খুব বেশী খেতো না। কারণ, পাছে তার মস্তপানের ছল ধরে সে চলে যায়।

তারের সমস্ত চেষ্টা সবেও তারের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগলো। তারের কথাবার্তার অকথিত ভূঁইসনার স্রব বাজতে লাগলো। চোখে সাধনানী দৃষ্টি দেখা গেল। খাবার টেবিলে হেনরী মেয়রারের প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী ভালো করে লক্ষ্য করতো। খিচিটোরের ইশারাদেশে বাইরে বেরতে রাজী হতো না মেয়রায়। হেনরী আবার তাকে প্রাণ করতে শুরু করেছে।

এক দিন মিরায়াম বললো, তাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। হেনরী ক্রমাগত চেয়েছিল, সেও ক্রমাগত করেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়রায় আর সহ্য করতে পারে নি। এভাবে আমরা চলতে পারি না, কিছুতেই না। এক দিন সন্ধ্যার বা হাতে কপাল টিপে ধরে মেয়রায় বলেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে চলছো, অল্প কোন লোককে আমি সে-সুযোগ দিতাম না।

—কারণ, তুমি আমার জন্য দুঃখ বোধ কর, তাই না? আমি) খোঁড়া বলে তুমি আমার দয়া কর। বল, ঠিক কি না?

আঃ আমার মাথার দিবি খামো বলছি। তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জানো না। আমাদের মধ্যেকার সঙ্কট তুমিই নষ্ট করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে এখন দুঃখ হয়। সত্যি দুঃখ হয়। আমি আর চাই না তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

তার কথায় হেনরী সচেতন হয়ে উঠলো। তার সারা খুব ছাই-এর মতো সাদা হয়ে গেল।

মেয়রায়, দয়া করে আমার ছেড়ে যেও না। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবো না, কোন সন্দেহ করবো না। শুধু দয়া করে আমার যেতে বলা না।

মেয়রায় হেনরীর অঙ্গসজ্জা চোখ, কম্পিত টেট আর ককণ পা দুটোর দিকে চেয়ে দেখলো। আচ্ছা বেশ, দুঃখিত কঠে তার পর বললো; তাই হোক, আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

আবার বসন্তকাল এলো। মরিস লগুনে হেনরীর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। লগুনে বাওয়ার দিন যতো ঘনিষ্ঠে আসতে লাগলো হেনরী ততো বদমেজাজী আর চঞ্চল হয়ে উঠলো। মেয়রায়াকে একা প্যারিসে রেখে যেতে তার কি রকম আতঙ্ক জাগছিল। বাওয়ার ঠিক তিন দিন আগে সে মরিসকে বলে বসলো, সে বাবে না।

এ সবাই মরিস আতঙ্কী হলো। বাবে না? প্রথমে মরিস, তার পর বাগের আভাস দেখা গেল তার মুখে। বাবে না? এবার সে গর্জন করে উঠলো। তোমার কি মতিছন্ন হয়েছে?

—আমার ছবি তো তারা দেখতে পারে। তাই দেখতেই তারা চায়। তারা আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই চায় না। তাহলে আমার গিরে লাভ কি?

গিয়ে লাভ কি? মরিসের নীল চোখ বাগে কাঁপতে লাগলো। বলছি কেন তোমার বাওয়া উচিত। আমি এক বছর ধরে এই প্রদর্শনীর জন্যে পরিশ্রম করছি। তুমি যে বাচ্ছ একথা ইতিমধ্যে ছাপান হয়ে গেছে। অনেকের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাতের কথা স্থির হয়ে আছে। তোমার সম্মানে সেখানে ডিনার দেওয়া হচ্ছে। ছবি টাঙানার জন্যে মিটার মারচেও তোমার মতামত চান। আর খ্রিস্ট অব ওয়েলস—

হ্যাঁ,—তা বটে, তিনি আমার প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করছেন একথা তুলে গিয়েছিল। আমার প্রতি খুব সন্মত তিনি।

মরিস, মিসিরা, মেয়রায় একসঙ্গে সবাই বোঝালো যে তার বাওয়া উচিত। আচ্ছা বেশ, সে অনিচ্ছা সবেও রাজী হয়ে বসলো; শুধু এক সপ্তাহের জন্যে, তার এক দিনও বেশী নয়।

মেয়রায় তার সঙ্গে ট্রেনে গিয়েছিলো। ট্রেন ছাড়বার আগে একটা কামরায় হেনরীর কাছে বসেছিল।

এক সপ্তাহ শুধু মেয়রারের মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলো, তুমি চিঠি লেবে তো? ঠিকানা মনে রেখো। ক্লারিসস গ্লুভেনের কোয়ার। যদি আমাকে দরকার হয়—যে কোন কারণেই হোক, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করবে। আমি ততক্ষণ চলে আসবো।

হৃদয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। বিলম্বের শেষ যুগান্ত যেন বৃকের স্পন্দনের তালে এগিয়ে আসছে।

—আমি এখন কিংবো, সব অল্প রকম হয়ে যাবে দেখো—



মুণী রজ হোটেলের দৃশ্য—লোভের অন্ধিত



মেয়রাম কোন জবাব দেয় নি। তার কথাও ভনতে পেরেছে বলে মনে হ'লো না। গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো শুধু। বেন চোখ দিয়ে কিছু বলতে চার সে।

শ্রেষ্টেব হুইসিল বেঞ্চে উঠলো। বনবন করে একটা কাঁকানি লাগলো এই দীর্ঘ সরাইয়ের গায়ে।

চলি হেনরী। মেয়রাম হেনরীর গুঁঠাথরে চুখন করলো। ঐশ চলতে শুরু করলে হেনরী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো। কাজের ঘূর্ণিপাকে পনের দিনগুলো কাটতে লাগলো। প্যারিসে যে সমস্ত ইংরেজ শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের কাছে প্রচুর আপ্যায়ন পেলো হেনরী। লগুন তার ভালোই লাগছিল।

কিছু মেয়রামের কোন সংবাদ না পেয়ে সব আনন্দ উবে গেল। লগুনে পৌঁছে মেয়রামের কাছে থেকে কোন টেলিগ্রাম না পেয়ে সে ভীষণ মুগ্ধে পড়েছিল। পনের দু' দিন কোন চিঠি না পেয়ে তার অর্ধেক আশঙ্কার পরিণত হলো। কেন, কেন মেয়রাম তাকে চিঠি লিখছে না? বিদায় নেবার পর হেনরী তাকে যে ফুলের গুঁবক পাঠিয়েছিল, সে লজ্জা কেন দত্তবার দিল না সে? সে কি এতোই ব্যস্ত যে একধানী চিঠি লেখবার সময় নেই তার? সে কি অসুস্থ? ভীষণ ভাবনা তার মন অস্থির করে তুলেছিল।

প্রদর্শনী তার মন ভেঙে গিয়েছিলো। আগের দিন রাতে হোটেলের একলা মন খেয়ে কাটিয়েছে। সারা রাত নিজের ওপর অজান্তার করেছে। নানা হৃদয়স্তায় অস্থির হয়েছে। মাথার চুলের কীকে কীকে আঙুল বুলিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে সারা রাত ভেঙ্গে কাটিয়েছে।

মেয়রাম হয়তো কোন ধনী মহিলার গাড়িনের মডেল করছে। কিংবা সে হয়তো কোন শুল্ক আর স্বল্প তরুণের সঙ্গে ডারসিনে ডিনার খাচ্ছে। কিংবা হয়তো অসুস্থ—শয্যাগত হয়ে পড়েছে—যে জন্মে তাকে কোন সংবাদ দিতে পাচ্ছে না। হয়তো আকস্মিক কোন দুর্ভাগ্যের আঘাত হয়েছে সে—ট্রেচারের কোন হানপাতালে নিয়ে বাওয়া হয়েছে তাকে—সে হয়তো মৃত্যু—

সেদিন যখন সে গ্যালারিতে এলো তখন দুর্ভাবনার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ছড়ি নিয়ে কোন রকমে টলতে টলতে ভেলভেট-পাতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ঘর তখন নির্জন, গ্লাডিওলি ফুলের মিষ্ট গন্ধে আচ্ছন্ন। সে সোফায় শুয়ে পড়েছিল।

বেশ, কাল সে মেয়রামের কি হয়েছে জানতে পারবে। একটা ট্রেন লক্ষ্য ছাড়ায় ভোভার যাবে। ট্রেনটা ধরতে হবে। তার মুখ স্বস্তির মুহূর্ত হানি দেখা দিল। বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করা হয়। শুয়ে শুয়ে হৃদয়ের কামনার রঙিন স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে।

হিসিয়ে। তার! কি উজ্জ্বল হবে বাবা! আমাকে জেতালো লোকটা ভীষণ মদ খায়। সাংবাদিক হওয়া উচিত ছিল আমার। ওর ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। ওঃ এই ধরনীগুলো মন কি বকম—

প্রথমে হেনরী বেন সারা দেখে মুহূর্তকাণি অসুস্থত্ব করলো। দু' গুণন আসতে লাগলো তার কানে। তারপর কীথের ওপর কটম হাতের চাপ অসুভব করলো। কে যেন উত্তেজনার তার ঘর বরে ডাকছে। আশংকাল চোখের কীক দিয়ে সে বেন তাকে ঘরে জনশ্রুতি বয়ে বেতে দেখলো। তার পর দেখল প্রদর্শনীর

প্রবেশক মাঠে তার দিকে বিকৃত মুখে চেয়ে কুঁক কণ্ঠে ডাকছে। সে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছিল—চোখে-মুখে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। তারপর সোফার ওপর উঠে বসলো।

আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না? সে আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো ছিল। তারপর চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, প্রিন্স অফ ওয়েলস—হ্যাঁ, তিনি এসে চলে গেছেন। মাঠেও কুককণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলো। এসে চলে গেছেন, শুনতে পাচ্ছেন?

হেনরী মাঠেওর দিকে তাকিয়ে বললো, আমার ডাকেন নি কেন?

ডাকিনি তার কারণ, তিনিই বাগন করেছিলেন। দীর্ঘ হাসির রেখায় হেনরীর ঠোঁটটা বড় হয়ে গিয়েছিলো। খুব ভালো তো প্রিন্স—আমার প্রতি কি সদয়, সে ভেবেছিলো—

হাসতে হাসতে সে চার দিকের ভীড় দেখছিলো। তার পর হঠাৎ বললো, ট্রেনটা ধরতে হবে, ক'টা বাজলো এখন?

পাঁচটা বাজে—কে এক জন সময় বলে দিলো।

এখন তার নিজাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেছে। মাথার টুপি আর হাতের ছড়িটা তুলে নিলো সে।

দরজার সামনে গিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে মাথা নীচু করলো। তারপর আমতা আমতা করে বলে গেলো, ট্রেন ধরতে হবে...খুব দরকার—বয়াল হাইনেসের সঙ্গে দেখা হলো না বলে আমি অসুস্থ, আর এক বার মাথা নীচু করে সে অসুস্থ হলো। ভেলভেটের পর্দা একটু দুলে স্থির হয়ে গেলো।

যখন ট্রেন প্যারিসের শহরভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে বাড়ছিল তখন হঠাৎ একটা চিন্তা তার মনে এলো। সে চিন্তার চমকে সে বেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। শূন্য দৃষ্টিতে ঠাঁ করে সে জানলার ওপর তার নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুখ—সে একটা আশ্চর্য বোকা। একথা আগে ভাবেনি কেন? মেয়রামের কাছে এ প্রস্তাব করা উচিত ছিলো তার। তাকে হারাবার ভয় এমন গোয়ে বসেছিল যে সে একথা ভাবেনি বিবাহ একমাত্র না হারানোর ছায়া ব্যবস্থা। হয়তো সেও এই চেয়েছিলো—তাকে অর্থ নয়, তার খ্যাতি দিতে পারতো সে—

আজ রাত্তিরে সে এ ভুলের সংশোধন করবে। মেয়রাম—সে বলবে, আমার খুব কাছে এসে একটু বসো। কিছুকণ তার পরস্পরের হাত হাতে নিয়ে অন্ধনের দিকে চেয়ে থাকবে। তার পর শব্দ গভীর ভাবে সে বলবে, মেয়রাম—। হেনরীর পুরোন পদবি তার নামের সঙ্গে কি স্বন্দর মানাবে। মেয়রাম, কমটের তু ভুলাস লোকে—

ট্রেন এসে ট্রেনে থামলো। প্রাক্কর নেমে ভিড়ের মধ্যে থাকা দিতে দিতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো। গাড়ীতে উঠে বসলো, ২১ নম্বর ক্যাল কলিনকোর্ট। তাড়াতাড়ি গেলো পাঁচ ক্রাক বকশিশ দোব।

পাঁড়ো পাঁড়ো, সে বলেছিলো যখন ল্যাংগো বাড়ির কাছে এসে পাড়িয়েছিল, একটু অপেক্ষা করবে আমি ফিরবো—

ঘরে গিয়ে সে হান সেয়ে, জামাকাপড় বদলে যখন বেলবার জন্মে প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় ম্যাডাম লুকাতের পারের শব্দ সিঁড়ির ওপর শুনতে পেলো। দরজা খুলে গেলো।

কি খবর ম্যাডাম লুবে? সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। তার



মনে হলো, কি বেন ঘটেছে। ম্যাডাম লুবাতের মুখ দেখেই সে অহুমান করতে পেরেছিল। ঘরের মেয়ের ওপর শক্ত করে সে ঝাঁড়িয়েছিলো, তবু অপারমম্বক বেন কাঁপছিল তার। যেমন মেরী শালটেট এই ঘরে এইখানে ঝাঁড়িয়ে কঁপে কঁপে উঠেছিল।

কি খবর? সে আবার প্রশ্ন করেছিলো। ম্যাডাম লুবাতের চোখ দুটো খুব বড় বড়, শুকনো আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। একটু বসো মিসিয়ে তুলোস। তিনি বলেছিলেন হেনরীকে।

হেনরী কোন কথা বলতে পারে নি। একদৃষ্টিতে ম্যাডাম লুবাতের দিকে তাকিয়েছিলো। তিনি এপ্রোশের মধ্যে থেকে একটা বড় থাম টেনে বার করলেন। হেনরীর সারা দেহ এমন ভাবে কঁপে কঁপে উঠেছিলো যে, তার দাঁতে দাঁত ঘষে যাচ্ছিল। মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্তে মায়ের বোধ হয় এই রকম অহুভব করে।

তুমি যেদিন লগুন 'বাও মেরীয়াম, সেদিন এই চিঠিটা' রেখে গেছে। হেনরী থাম ছিঁড়ে কেলে চিঠির ওপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। 'আজ রাত্তিরে আমি মিসিয়ে ড্রেশের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। বন্ধু, এইখানেই ছেদ টানা বোধ হয় প্রেয়ঃ—'

[তুলোস লোজেকের জীবনে আনন্দের দৃষ্টে এইখানেই বহনিকা পতন। ১৯০১ সালের ১ই সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুর পূর্বে যে কয় দিন সে বেঁচেছিলো—ব্যথা-যন্ত্রণার আর অবশিষ্ট ছিল না। অতিরিক্ত মত-পানে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছিলো। একটা পাগলা-গারমে কিছু দিন

খাকতে হয়েছিলো তাকে। কিন্তু শিরীর হাতের অপূর্ণ সৃষ্টি বন্ধ হয়নি তখনো। তার সার্থক প্রীতিভার সৃষ্টি একবারও ব্যর্থ-বিফল হয়নি। তার পর সে তার মায়ের কাছে শান্তির মধ্যে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলো।]

এখন তার কাছে শুধু মা রইলো। খুব কাছে—আমো কাছে—তার মায়ের মুখখানা তার চোঁট স্পর্শ করছে বেন। তাঁর স্নিগ্ধ আঙুলের স্পর্শ চুলের মধ্যে অহুভব করছে সে। যেমন করতো বহু দিন পূর্বের সেই শৈশবের দিনগুলিতে।

ঘুমোও রিবি, একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর। কোঁটা কোঁটা অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল, তবুও তাঁর মুখে হাসি লেগেছিলো বেন। না ঠিক হাসছেন না, তবে সুখী মনে হচ্ছে তাঁকে। সে নিশ্চয় বলতে পারে। গর্ভ অহুভব করলো হেনরী। মায়ের আশা অপূর্ণ বাধে নি সে। সব স্বপ্নের সমাপ্তি এখন। তার মা তাকে আর ধরে রাখবে না—

একটু ঘুমোও রিবি—  
তার মায়ের সজল অশ্রুর মুখ বেন কত দূরে সরে যাচ্ছে। অশ্রুট ছায়ায় হয়ে আসছে যেন। দিনের প্রথম আলোর সারা ঘর ভরে উঠেছে, তবু কি অন্ধকার। এ মহা অন্ধকার তার মনের মধ্যে থেকে উঠে আসছে। মা—মা—বিদায় মা!!

অম্মবাদক—কল্যাণ দাশগুপ্ত ও মাদ্রাসাদ দে।

সমাপ্ত

## হতাশ মুহূর্তগুলোকে চিনি

অশোক ভট্টাচার্য

আমার জীবনের পূর মুহূর্তগুলোকে আমি চিনি :  
আমার স্বপ্নালু মনের নীল আকাশ ছুড়ে  
কালো শকুনির মতো তারা আসে  
একে একে দলে দলে, তার পর তারা নামে  
আমারই বৃকের সোনালী প্রান্তর ঘিরে।

তাদের বিশাল খড়্গ-জীবা কালো পাখা  
হুতাশ চোঁট আর স্তম্ভাক্র চোখে দিকে তাকিয়ে  
আতঙ্কে শিউরে উঠি আমি।  
আর তারা ধীরে ধীরে, একে একে  
আমার হৃদয়কে দীর্ঘ ক'রে নিঃশ্ব ক'রে  
আমাকে হনন ক'রে ফিরে যায়।

তখনও আমি আমার মৃত বোঝা চোখে তাকিয়ে থাকি :  
সেখি, জীবনের কংকাল অবশেষ।

আমার কালো হতাশ মুহূর্তগুলোকে আমি চিনি।



ન્યૂગત પ્રકાશિત્ત્વ વ્રાય

পত্রত্যাগের এক মাস

‘টোর সময় কুঠিতে গেলাম। নূতন কর্ত্তী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পত্র নাই কেন?’ কালও পত্র চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলাম ‘কি ন’।’ আবার বলিলাম, ‘তিনি বাহিরে গিয়াছেন।’ তিনি বলিলেন, ‘Mr. Roy খুব ভাল ব্রাহ্ম; না?’ আমি বলিলাম ‘আমি কি বলিব?’ তিনি বলিলেন, ‘কত কষ্ট হইতেছে, তবুও তোমাকে রক্তুরে পাঠাইয়াছেন।’ আমি বলিলাম, ‘সংসারের কষ্ট না নিলে সুখানের পথে চলা যায় না। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। ক্রমশঃ রীক্ষা সহজ হইয়া আসিতেছে, আসক্তি প্রায় হারিল, তাহার আর দায় নাই।’ মন প্রায় শান্ত হইয়া আসিল। আহার, বিহার, পান্না, শরদ বনদ বাধা করিতেছি, মনে হইতেছে তুমিও যেন কি করিতেছ। একটুও তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।’ আর পায় আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই তোমার তত্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। মনে হইতেছে আমার অপেক্ষা তোমার কষ্ট বেশী হইতেছে।’

‘না কেন মনে হইতেছে আমি না?’ তোমার পরীক্ষা বেশী মনে হয়।

২৩শে, ২৪শে, দুদিনে ক্রমে ভোমার মন আরও শান্ত হইয়া আসিল; ২৪শে সেপ্টেম্বর ইংরাজি তৃতীয় পৃষ্ঠক শেষ করিলে। ২৫শে ভোমার মন আরও ভাল ছিল। শ্রান্তে উঠিবারমাত্র ভোমার মনের যেটুকু শ্রুততা ছিল তাহাও বেনে পূর্ণ হইল। আশ্চর্য্যর সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বেনে আজ আমার সাহায্য অল্পভব করিতে লাগিল, পূলাকিত হইতে লাগিল। এইমিন বেলা ৪টার সময় মিস খোবার পাখাড় হইতে কিরির আসিলেন। তুমি দেখা করিতে গেলে : তিনি বৃকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাল আছে? ভোমার সন্ধানেরা ভাল ত?" বিদ্যুৎ ঈশ্বরকর্তার এই আশ্বাসে ভোমার চক্রে জল আসিল, হৃদয়ে ধন্যবাদ দিলে। এইমিন তত্ত্বাবধায় ছিল। তত্ত্বাবধায়

মনেকে বাতী বার; বাঘের বাতী ঘুরে তাহার শনিবার আত্মীয়  
বন্ধনকে পত্র লিখে। তোমার মনে হইল, সুবোধকে পত্র  
লিখিলে কিরূপ হয়? তাহা হইলে আমিও তোমার সন্ধান পাই।  
কিন্তু তাহা করিতে কিছুতেই তোমার মন সার দিল না।

১১শে সেপ্টেম্বর পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে যে  
চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার এক অংশ এই কথা ছিল—“পত্র লেখা  
হাঁড়িলে কি উপায়ে ভালবাসিব ও বাসিবে?—মনে ও ভাবে।  
মনের এক শক্তি আছে তাহা যাহা সে দেশ কালকে অতিক্রম করিতে  
পারে; সাধুসঙ্গ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই করিয়া আচার্য্য  
দিশা-তীর্থ যাত্রা, মুসা-তীর্থ যাত্রা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু  
সটাও আশ্চর্য্য; তীর্থযাত্রার ফল হইল কি না, তাহার কোন  
প্রমাণ নাই। কিন্তু আমি যদি অঘোর-তীর্থে যাত্রা করি আর তুমি  
যদি প্রকাশ-তীর্থে যাত্রা করিতে পার, তাহা হইলে প্রমাণ হইবে,  
যে তীর্থযাত্রা সম্ভব। তুমি তোমার ভাবগুলি ভাষ্যেরিতে লিখিবে,  
আমি আমার ভাবগুলি লিখিব; তারপর যদি সেই ভাবগুলি  
মিলিয়া যায়, তাহা হইলে একটী ভ্রমকে সন্দেহ দূর করিয়া যাইতে  
পারিব।” এই কথা অনুসারে তুমি তোমার দৈনিক পুস্তকে নিজের  
প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে। আমিও প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতাম;  
সে সঙ্গ আমি আমার পূর্বজীবনের ইতিহাস তোমাকে সন্ধান  
দিয়া লিখিতে লাগিলাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর তুমি দিয়া চক্রে দেখিয়া লিখিলে, আমি বাঁকী-  
রে কিরিয় আসিয়াছি। আমি দৈনিক খুলিয়া দেখি, বধাধই  
আমি বাঁকীপুরে কিরিয় আসিয়াছি। ইহা কিরূপে বুঝিলে?  
দিন তোমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইল, কিন্তু বস্ত্রা বুদ্ধির সঙ্গে  
নে মনে আমাকে সাহস দিয়াছে, আর দৈনিকে লিখিয়াছে, “তুমি  
গরিবও না, আমি চিরদিনই তোমার। হুঃ করিও না, মার আর  
হামার ইচ্ছা পালন করিতে করিতে গেলাম। এ আমার বড়  
খের বাওয়া; আমি বড় সুখী। আমার হুঃ আসিল না।  
হামার সঙ্গে একত্র হইয়া, তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহকাল ও  
বকালে সুখী হইলাম। তবে আর কেন হুঃ করিবে? এ সকল  
খা আজ কেন মনে হইতেছে, তুমি জান, আর মা জানেন। বা  
নে উঠিল, প্রতিদিনকার মনের কথা লিখিয়া রাখিলাম। তুমি  
ডিও, আর জগৎকে বলিও, যে একজনকে চিরসুখী করিয়া মার  
কট পাঠাইয়া দিলে। সর্বাঙ্গিনীর শরীর খুব ধারাপ বোধ  
হইতেছে, নিজেরও মাথায় একটা কি বেদনা, ইত্যাদি ভাবিয়া  
কবার মনে হইতেছিল, কিরিয় বাইবার জন্ত তোমাকে বলি।  
সুখ অমনি চেনা হইল। ভাবিলাম, মা আমার তো নিশ্চিন্ত  
ন; তিনি সকলি জানিতেছেন। বা এখন প্রয়োজন, নিশ্চয়  
রহিলেন। এই ভাবিয়া মনকে বুঝাইলাম।”

এদিন শেষ রাতে ঘড়ি দেখিতে গেলে, দেখিলে ঘড়ি ধারাপ  
গিয়াছে। নিকটে থাকিলে আমিই ঘোরমত করিয়া  
তাম। সে ভার আমার, কিন্তু তখন আমি থাকিলেও নাই।  
মাকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং উত্তর পাইলে যে, তখনও কাজ  
গম্যকই করিতে হইবে। বিভাগের গিয়া কিছু লাজ হওয়ার

সেইখানেই প্রার্থনা করিলে, ও আমার পরিভ্রমের কথা মনে করিয়া  
পড়া প্রস্তুত করিলে। এখন রাতে একটী প্রার্থনা ও জাগিয়া নাই,  
তোমার শরীর অসুস্থ, তখন আপনার অবস্থা আমাকে দেখাইবার  
ইচ্ছা হইল, ও আমাকে দেখিবার সাধ হইল। এই সময়ের আমার  
দৈনিক খুলিয়া দেখি, “সে সময় আমারও মনের অবস্থা ঐক্যপই  
হইয়াছিল।” আমিও পরমাত্মার মধ্য দিয়া তোমাকে দেখিতে  
ছিলাম। আর একদিন শয়ন করিতে বাইবার সময় লিখিয়াছিলাম,  
“এ রজনীতে যদি হুঃ কষ্ট বিপদ আসে, আমাকে তাহা দাও;  
সকলের হইয়া আমি বহন করিব।”

তখন তুমি লিখিয়াছিলে, “দুই জনের মধ্যে একজন এখন এ  
লোকে না থাকিব, তখন অপরের কাজ বন্ধ হইবে না; কেবল এক  
রকমের অভাববোধ যেন ভিতরে থাকিবে। এখন আমার অবস্থা  
এই যে, শোকে মুগ্ধমান হই না বটে, কাজকর্ম সবই করিতেছি,  
কিন্তু আমার প্রিয়জন কখনও কাছে থাকেন, কখনও দেখিতে  
পাই না। প্রথম দিন কয়েকের চেয়ে আজকার মন খুব ভাল।”  
দেখি, তখন তুমি বাহা অল্পভব করিয়াছিলে, আজ দেখ আমার  
তাহাই হইয়াছে। কাজকর্ম সবই চলিতেছে, কিন্তু একটা  
অভাব বোধ থাকিতেছে, সন্ধ্যা মনে পড়ে, তুমি শরীরে থাকিলে  
আমার এ সকল কার্য্য কেমন ভাল করিয়া করিতে পারিতেন।

আমি এই সময়ে তোমাকে সন্ধান করিয়া আমার পূর্বজীবনের  
যে ইতিহাস লিখিতেছিলাম, তাহার একখানি খাতা লেখা শেষ  
হইল। তখন পত্র বন্ধের কয়েক দিন হইয়াছে। তোমার কাছে  
সে খাতাখানি পাঠাইতে মনে প্রেরণা পাইলাম ও পাঠাইলাম। এই  
দিনে তোমার মন অত্যন্ত অস্থির হইতেছিল; মনে করিয়াছিল  
কি যেন একটা নতুন ঘটনা; সত্য সত্যই তাহা হইল। এমন  
করিয়া যে লিখিব, তাহা তুমি জানিতে না, আমিও জানিতাম  
না। পুস্তক পাইয়া তোমার মনে কি ভাব আসিল, তাহা  
তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলে। “কল্যাণী বুঝিয়াছিলাম যে,  
আজ কিছু নতুন সীলা মা করিবেন। আজ তাহাই হইল। ধন, বস্ত্র  
লত বস্ত্রবাদ দি সেই জননীকে। আমার বাঘের নাম যে অসুস্থ  
হইল, আসক্তি যে হারিয়ে গেল, তাহাতে যে অঘোর-প্রকাশ কি সুখী  
হইল, তাহা বলিতে পারি না। কত পরিমাণে যে বাগের পরিচর  
দয়কার তাহাও বুঝিলাম। এক জনের অভাব হইলে যে আর এক  
জনকে কিরূপে শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, তাহাও বুঝিলাম।  
বিবাস যে কত পরিমাণে বাড়িল, তাহা বলিতে পারি না। মার  
সহিত যেন আরও নিকট হইয়াছি, তোমার সহিতও হইয়াছি তাহার  
আর ভুল নাই। প্রথমে ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু মার কৃপার ও  
তোমার আশীর্বাদে সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। অঘোর-প্রকাশের জীবন-  
পুস্তকে লেখা থাকিবে যে মহাত্যাগেই মতা সুখ। বত ভাগ্য ততই  
সুখ, ইহার আর ভুল নাই।” এই পুস্তক পাইয়া তোমার ইচ্ছা  
হইয়াছিল যে তুমিও পত্র লেখ; কিন্তু মার ইচ্ছা নয় জানিয়া আর  
লিখিলে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিত যে আমার পুরাতন পত্রগুলি  
পাঠ কর। কিন্তু প্রাণ সার দিল না। তাই সেগুলি সম্পর্ক  
করিলে না।

এখন এমন অবস্থার উপস্থিত হইয়াছে যে পত্র দিলেও হয়, না  
দিলেও হয়, কোন পয়োরা নাই। পূর্বে এক দিন সন্ধান না পাইলে

খাবার টাকা হইতে কাটরা, কম খাইয়া, টেলিগ্রাফ করিতে। আজ তার এ দশা কিরূপে হইল? ব্রহ্মপুত্রবলেই হইল। ৬ই অক্টোবর ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন, 'আজ ১৫ দিন তোমার সবাদ পাই নাই বটে, কিন্তু মন খুব ভাল। এ কথা এই জন্ত বলিলাম, যে আমার মত আসক্ত লোকও মার কুপার এমন সুখ পায়। শ্রমের অমৃত বাবুর বড় সাধ ছিল, যে তোমার নিকটে থাকিলে আমার মুখে যে হাসি থাকে, তোমা হইতে দূরে থাকিলেও যেন আমার মুখে সে হাসি দেখিতে পান। যা তাঁহার জন্তের সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।' এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, পূর্বে যখন আমাকে ছাড়িয়া গয়ায় উৎসবে ও গাঙ্গিপুয়ের উৎসবে গিয়াছিলেন, তখন শ্রমের অমৃত বাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে তোমার মন ভাল করিয়া খুলিতেছে না।

এই সময় তোমার সাহসও বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রতি রবিবার তিনটি মেয়েকে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে অথোয়া ব্রাহ্মসমাজে বাইতে; কিরিয়া আসিতে রাতি দশটা বাজিত। একা তিনটি বয়স্ক কণ্ঠা লইয়া বাইতে হইত। তুমি একাকী, নতুন সহর; যদি কোন নতুন বিশপ উপস্থিত হয় কে তোমাদের রক্ষক? যা জননী প্রেয়ারী হইয়া বাইতেন, তাই তোমার কোনও ভয় করিত না।

একদিন সমাজের উপাসনার পর তুমি মেয়েদের লইয়া সংগ্রহ করিতেছিলে, এমন সময়ে ভাই বিহারীলাল ঘোষ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "হেমের মা (তাহার পত্নী) আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।" তখন রাতি ১টা। তুমি ইতস্ততঃ করিতেছিলে। ভাই বিহারীলাল তখন পাঁড়িতা পত্নীকে লইয়া একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী বন্ধুর বাড়িতে অবস্থিত করিতেছিলেন। গৃহকর্তা ব্রাহ্মদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তুমি ভাবিতে লাগিলে, এমন বাড়িতে গৃহকর্তার নিমন্ত্রণ বিনা কিরূপে প্রবেশ করিবে? ভাই বিহারীলাল বলিলেন, 'হয়তো বাঁচিবেন না, একবার দেখিয়া যান।' আর কি তুমি থাকিতে পার? পাড়া করিয়া চলিলে। সে বাড়ির দরজায় যখন পাড়া অপেক্ষা করিতেছিল, তখন একবার মাকে ডাকিলে; আর বুঝিলে আমার আত্মা তোমায় সঙ্গে রহিয়াছে। বিহারী বাবু আসিয়া উপরে বাইতে বলিলেন, তুমি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে। উঠিবার সময় মুখে মা মা শব্দ করিতে করিতে উঠিলে। গিয়া ভালই করিলে। না গেলে ভগিনীর সে স্বপ্নের দৃশ্য দেখিতে পাইতে না; তোমার নির্ভরের পরিচয়ও দেওয়া হইত না। এই গৃহস্থানী লোকিকভাবে তোমার অপরিচিত, তাহাতে আবার তিনি কোনও ব্রাহ্মকে বাড়িতে আসিতে দিচ্ছেন না। কিন্তু যে মাকে চিনিয়াছে, তাহার কাছে সকল হান, সকল ভীষই পরিচিত। তুমি গিয়া দেখিলে ভগিনীর সেই অস্বাভাবিকতা। তুমি অতি সন্তপণে গলা ধরিয়া চুপন করিলে। তিনি বলিলেন, "মনে আছে তো?" তুমি বলিলে, "আর কি ভুলিতে পারি?" বুকের বেদনায় তিনি কথা কহিতে পারিতেছিলেন না; রোগের নানারূপ যন্ত্রণা এবং ধর; কিন্তু বতকণ তুমি রহিলে, সেই মুখের হাসিতে শরীর আলো করিয়া রাখিয়াছিল। রোগের মধ্যে এমন হাসি দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইলে। ভগিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হয় ত আর বাঁচিব না।" তুমি প্রতিবাদ করিলে, এক রাজপুত্রে বাইতে নিমন্ত্রণ করিলে। তাহাতে তিনি হুসী হইলেন। এই অবকাশে মায়ের কথাও অনেক বলিলে। নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসাবাদকিনী গৃহস্থানী সকল

কথা শুনিলেন, ও বলিলেন, "আপনি আসিবেন বলির আপনায় প্রতীকার অনেককণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। আবার রবিবার আসিবেন, মেয়েদের সঙ্গে লইয়া আসিবেন।" তাহা এই অভ্যর্থনা ও আদর পাইয়া প্রেমময়ী মাতাকে বায় বা যন্ত্রণাদ গিলে। ইহার পর হইতে আর অপরিচিত লোকে বাড়িতে বাইতে ভয় পাইতে না।

এই অক্টোবর তুমি একটি বক্তৃতাতে নিমন্ত্রিত হইলে। একক পারসী স্ত্রীলোক হিন্দীতে বক্তৃতা দিবেন; তুমি বাইবে কি না। বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে। অমনি ভগবান ব্যাখ্যা দিলেন। কি আশ্চর্য উপায়! কত সহজ। বক্তৃতা শুনিতে গেলে ও গিয়া উপকৃত হইলে।

১৪ই অক্টোবর হইতে আবার দ্বিপ্রহরে স্থল হইতে আর হইল। এতদিন গ্রীষ্মকাল বলিয়া সকালে হইত। প্রথম বেলা বেলায় স্থল কিবা কাছারী করিতে হয় সেদিন কেমন একটু ঘুম পায় মনের বেলায় বিশ্রাম করা তোমার অভ্যাস হইয়াছিল। তাই প করিতে করিতে শরীর কেমন করিতে লাগিল ঘুমও পাইল। নামের গুণে সকলি করিতে পার, সেই নাম করিতে লাগিলে। আম পরিশ্রমের কথা শ্রবণ করিলে, অমনি নতুন বল পাইলে। তার খুব পড়িলে ও পড়া বেশ দিলে।

মাঝে মাঝে মনটা পত্রের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আজ নু রুটানের মিনে কি জানি কেন পত্র পাইবার আশা প্রবল হইল। ৫ টার সময় আহ্বার হইল। তার পর কুঠিতে গেলে। আমার কিন্তু পাইলে না। মনটাতে আশা পোষণ করিয়াছিলে বলিয়া; একটু কষ্ট হইল, তাই ফিরিতে ফিরিতে মায়ের নাম উচ্চারণ করি লাগিলে। উচ্চারণ করিতে করিতে যেন তুলিলে, আমিও তো সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিতেছি। তখন তোমার মুখ অত্যন্ত প্রশংসিত একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রফুল কেন? পত্র পাইয়াছে না কি?' তুমি বলিলে, "না।" 'প্রফুল কেন?' তোমার উত্তর—'জানি না।' তিনি বলিলেন, 'সব সময়ই প্রফুল থাক।'।

এক রবিবারে ৮ টার সময়ে গৃহে বসিয়া আছ, এমন ৭ বোড়িঙের একটি মেয়ের মা তোমার ঘরে আসিলেন। তাঁহার ক কি'র টাকা জানিয়াছিলেন, মিসু খোবর্প বাড়িতে নাই, আর কাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাই তোমার নিকট টাকা রা গেলেন। তুমি আশ্চর্যাব্যস্ত হইলে। তিনি গুটান হইয়াও ৭ অপেক্ষা তোমাকে অধিক বিশ্বাস করিলেন।

আর একদিন জল গরম করিবার জন্ত আগুন জ্বা বাইতেছিলে। পথে পড়িয়া গেলে। আগুন জ্বাও হইল না। গরমও হইল না, হানও হইল না। উপাসনায় বসিয়া মনে বর্থা আসিল। তার পর আমার প্রেরিত আমার পূর্বজীবনের ইতিব খাতা আর একখণ্ড পাইলে। অভিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িতে প করিতেছি, এমন সময় খাবার বটল বাজিল। অমনি সে বই র গিতে হইল। আহা! মায়ের পর আবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, এবার স্থলের বটল বাজিল। আর তাহা পড়া হইল না; পুস্তক লইয়া পড়িতে গেলে। পড়া বেশ হইল। এই যে নিজের কর্তব্যে দৃঢ় থাকিলে ইহাতে তোমার মন বড় সুখী।

বেলা ১টার সময় এই আশ্বশ্রাদ্দ লাভ করিলে। আশনার কর্তব্য করিলে এইরূপ হাতে হাতেই পুণ্যকার পাওয়া যায়।

আর একদিন আমার ঐরূপ একখানি খাতা পাইয়া তোমার মনে হইয়াছিল, “আমি তো পত্র চাহিতেছি না, তবে তুমি লিখিতে পেরে কি?” কিন্তু যিনি আমাকে বারণ করেন, তিনি তোমাকেও বারণ করিলেন। পত্র লেখা হইল, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইল না। পত্র লেখাতেও যে মুখ আছে। ছোটবেলার গুরুজনের আজ্ঞার দিনের বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে না; এখন পরম গুরুর আজ্ঞার আমাকে পত্র লেখা বন্ধ হইল।

এই যে ৮ মাস প্রতিদিন ১৪১৫ ঘটিকা করিয়া পাঠ অভ্যাস করিলে, ইহাতে তোমার চক্ষুর জ্যোতিঃ না কমিয়া যেন আরও বাড়িতে লাগিল। যেন বালাচক্ষু পাইলে। বাস্তবিক এ সময়ে তোমার চেহারা ও স্বভাব এত শিশুর মত হইয়াছিল যে, তোমার মেরে দুটিকে দেখিয়া লোকে মনে করিত না যে তাহারা তোমার কণ্ডা। কেহ কেহ তোমার স্বামীর পূর্বপক্ষের কণ্ডা বলিয়া সন্দেহ করিত।

### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যে কলমে শেষ এক মাস

ক্রমে পত্রসাধন শেষ করিবার দিন আসিল। ২০শে অক্টোবর আমি তোমাকে প্রথম পত্র লিখিলাম। এক মাস ধরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছিল, পাছে ভ্রত ভঙ্গ হয়, পাছে পত্র নিজ ইচ্ছায় লিখিয়া ফেল। বৈধ্য ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে লাভ স্তির লোকসান হয় না। আচার্য্য দুঃখ করিয়াছিলেন যে, ধর্ম লইয়া সকলেই বলে লোকসান, কিন্তু এত ভাগ করিয়াও তুমি বলিলে লাভ।

২১শে অক্টোবর বিকালে কুঠিতে গিয়া দেখিলে, টেবিলের উপর আমার লিখিত পত্র বহিয়াছে। কিন্তু এখন যে আপনাকে জয় করিয়াছে, তাই আর ব্যস্ত হইলে না। পূর্বজীবন এবং এখনকার জীবন কত ভিন্ন। প্রবোধ একদিন আমার লিখিত পত্র তোমাকে দিতে বিলম্ব করিয়াছিল, সে জন্ত সে বেচারী কতই লজ্জিত হইয়াছিল, আর তুমিই বা কত মঞ্চাহত হইয়াছিলে। প্রবোধজ্ঞে নিজে ডাকঘরে গিয়া তোমার পত্র তোমাকে আনিয়া দিলে তুমি তৃপ্ত হইতে। তারপর মতিহারিতে পাছে পত্রের বিলম্ব হয় তাই ডাক্তারমাতা রামচন্দ্র নিজে তোমার পত্র লইয়া যাইতেন। পত্র পাইতে বিলম্ব হইত বলিয়া আমাকে পোষ্ট মাস্টারের নামে অভিযোগ করিতে বলিয়াছিল। এখন যেখানকার পত্র সেইখানেই রহিল, চাহিলে না। মনে মনে বলিলে, পত্র পাইবার হয় তো অবশ্যই পাইব। শুণু হাতে আশনার স্থানে চলিয়া গেলে। কিছু পরে একটি ঘরে তোমার পত্র তোমাকে অর্পণ করিল। এইরূপে তুমি বৈধ্য শিক্ষা করিতে লাগিলে। এই যে জয়লাভ হইল, ইহাতে তোমার আনন্দ বহিল না। তুমি লিখিলে, “পত্র ভালবাসিতাম বলিয়া কত লোকের গল্পনা খাইয়াও নিজ পত্র লিখিতে, কখনও তুমিও ভোল নাই, আমিও ভুলি নাই। যখন বাটাতে থাকিতাম, তখন পূর্ণ অধীন ছিলাম। দিনে সময় পাইতাম না, কারণ দাসদাসীর, পাচকের, গৃহিণীর সমস্ত কাজই নিজে করিতে হইত, তারপর সন্ধান পালন। স্তবরাগ রজিতে

নিজার সময় হইতে কিছু কাটিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত। কত দিন তৈল পাইতাম না, যদি সকলের শয়নের পর কেহ দেখিতেন প্রাণী শ্লিভিতেছে, বড় বকিতেন,—এত তৈল কোথা হইতে আসিবে? অমনি প্রাণীশ নির্বাণ হইত। অন্ধকারে কালি, কলম আর খুঁটীরা পাইতাম না। অন্ধকারে বল দেখি কিরূপে পত্র লিখিতাম? ঝাঁটার কাটি আমার কলম, পুই শাকের বীচির রস আমার কালি, চন্দ্র আমার আলো হইত, এই উপায়ে আমার পত্র প্রস্তুত হইত।”

এক দিকে মায়ের যেমন আদর, আবার অপরাধ হইলে একটুতে মুখ ভারি হয়। ২৩শে অক্টোবর একটু বিলম্বে উঠিয়াছিল। কেন তাহা হইল? এ অপরাধ আর তাহার সহ হইল না। সমস্ত দিন মুখ ভারি করিয়া থাকিলেন। এত শাসনে তবে দ্বাহু উদ্ধার হয়।

২৪শে অক্টোবর আশ্ব একটি বিশেষ ঘটনা ঘটয়াছিল। একটি বালালী মেয়ে বেশী দামের কাপড় চাহিয়াছিলেন। কতী মিসু খোবর্ণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নীতের সময় তোমরা সাধা কি মেরুণ ব্যবহার কর? তুমি বলিলে সাধা। কতী সেই ছাত্রীকে বলিলেন, “ইহার অপেক্ষা তুমি ধনী নও, বেশী মূল্যের কাপড় পাইবে না।” সে ছাত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া অতিমাত্রায় কথায় মাতাকে পত্র লিখিলেন। লেখা পত্র তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েদের বালালা পত্রগুলি কতী তোমাকে পড়িতে দিতেন, তুমি মত দিলে তবে ডাকে দেওয়া হইত। মন্দ বলিলে ফেরত বাইত। এ ব্যবহারে তোমার বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল। বিশ্বাস করিলে “কিছু বিশ্বাসভাজন হইতে হয়, সে শিক্ষা বেশ লাভ করিয়াছিল। তোমাকে এত বিশ্বাস করেন বলিয়া নিজের কথা নিজ কণ্ডাদের কোন ভুল হইলে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাহা স্বীকার করিতে। ঐ দিন ঐ ছাত্রীর পত্রও তোমার নিজের পত্র লইয়া কুঠিতে গেল, কতী নিজস্থানে ছিলেন না বলিয়া ঐ ছাত্রীর পত্র সেখান হইল না। একে একে তিন বার গেলে কিন্তু সাক্ষাৎ হইল না। টেবিলে পত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। পত্রবাহক কিছু জানিত না, সে অজ্ঞাত পত্রের সহিত সে পত্রও ডাকে দিয়া আসিল। যদি প্রথম শিক্ষাবিত্তীকে পত্রখানি দেখাইতে, ভাল হইত। একখানি আপত্তিজনক পত্র তোমার অসাধনান্ধার জন্ত ডাকে চলিয়া গেল, ইহাতে তোমার মনে অত্যন্ত লজ্জা ও অসুখ উপস্থিত হইল। তুমি সন্ধ্যার সময় কুঠিতে গিয়া যেমন দেখিলে টেবিলে পত্র নাই, অমনি মন বলিয়া উঠিল, করিলে কি? যিনি তোমাকে এত বিশ্বাস করেন তাহার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে? বিবেক তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বলিল, কতীর নিকট গিয়া সব খুলিয়া বল ও ক্ষমা চাও। সেই যে মতিহারিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলে, তাই এখন সহজ হইল। কতীর দেখা পাইলে না, স্তবরাগ মনেও শাস্তি পাইলে না। পাঠ করিতে বসিলে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিলে না। চতুর্দশবার ৭টার সময় কুঠিতে গিয়া কতীর সাক্ষাৎ পাইলে। তিনি লিখিতেছিলেন; লেখা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

তুমি—আজ আমি একটি ভারি অপরাধ করিয়াছি; আপনি মাগ করিবেন ?

কতী—(হাসিতে হাসিতে) শীঘ্র তুমিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমনকি অপরাধ করিতে পার ? (পরিহাসসহলে) কিছু চুরি করিয়াছ নাকি ?

তুমি—চুরি তো ভাল, কারণ সে বাহিরের অপরাধ।

কতী—(তোমাকে আরও নিকটে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া) বল।

তুমি—আমি পুর্বেক সমস্ত ঘটনা বলিলে। কতী খুব হাসিলেন, ও বলিলেন, এই ? ইহার জন্ত এত !

তুমি—আমি বিশ্বাস করি, এ অপরাধ আমার আর কখন দেখিতে পাইবেন না। অন্তঃস্বামীকে ক্ষমা করুন।

কতী তোমার মুখে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার ক্ষমা চাহিবার পূর্বেই তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। এ কিছুই নয়; বহুশ্রী বেশ ভূষা, বিলাস, বাহাতে বিভ্রান্ত হইতে চলিয়া যায়, এ তাহারই চেষ্টা।

তুমি এই ঘটনার বৃত্তিতে লোভ করিয়া যদি স্বীকার করিতে পার, তবে সে লোভের ক্ষমা হয়, আর সে লোভ ভবিষ্যতে না করিবার জন্ত মনে চেষ্টাও হয়। মা বিশেষে লইয়া গিয়া অনেক শিখাইলেন।

২৩শে অক্টোবর মিস্ খোবর্গের নিকট পরীক্ষা দিবার জন্ত আবেদন করিলে। তিনি হাসিয়া স্বীকার করিলেন। তুমি বলিলে, “কিন্তু, ক্লাসে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিতে হইবে।” তিনি বলিলেন, “খুব ভাল কথা, অবশ্যই দিব।” তারপর তাঁহার সঙ্গে স্থল সন্থকে অনেক কথা হইল। তিনি অনেক সময় তোমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

২৪শে অক্টোবর তারিখে তোমার একজন মেম-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আদর করিয়া তোমাকে এক বাস্ক আঙ্গুর খাইতে সিলেন। তুমি খাইতে চাহিলে না; কারণ তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোনও ভাল জিনিস সম্ভোগ করিতে না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে একটা আঙ্গুর উঠাইয়া লইলে, এবং আঙ্গুরটির দিকে লক্ষ্য করিয়া মনের কল্পনা বর্ণনা করিতে লাগিলে। মেম বলিলেন, “কেবল দেখিবে?” তুমি একটু হাসিলে, কিন্তু খাইলে না। মেমের মনে কি হইল কি জানি; তিনি সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তুমি স্বীকার করিলে। পাঠ ও আহারের পর বহু অন্ধকার হইয়া আসিল। তুমি তোমার প্রিয় আশ্রয় সঙ্গে বোগসাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় সেই মেমটি হাজির। তিনি তোমার হাত নিজ হাতে গোপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, “বল আমাকে আর ভুলিলে না। যখন কলিকাতার বাইবে আমার সঙ্গে দেখা করিবে, আমার জন্ত প্রার্থনা করিবে।” তুমি বলিলে, চেষ্টা করিবে। তিনিও তোমার জন্ত প্রার্থনা করিবেন বলিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছিলেন; তুমি যে ঈশ্বরকে পাইয়াছ, তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরম শিতাকে তুমিও চাও, এই কারণে তোমার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ।

তুমি লক্ষ্য করিলে থাকিতে তোমার হই কত বাতীত আর একটি কস্তার ভার লইয়াছিলে। তাঁহার শিতা লক্ষ্য সহরেই থাকিতেন। সেই কতী একদিন শিতার কাছে বাইতে চাহিলেন।

সঙ্গে কে হাইবে? মিস্ খোবর্গের সাধারণ আদেশ ছিল যে, মিসেস্ যায় যত দিন বেখানে ইচ্ছা করেন থাকিতে পারিবেন। এমন অল্পমতি সত্ত্বেও সেই কস্তার বাটীতে গিয়া রাত্রিবাস করিতে পারিলে না। কারণ দিনকয়েক পূর্বে কথার কথার মিস খোবর্গকে বলিয়াছিল যে, নভেম্বর মাসের পূর্বে তুমি কোথাও গিয়া থাকিবে না। তিনি সে কথা তুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তো ভোল নাই। অনেক দিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, একত্রে সন্ধ্যাপাণ হইবে, বাহিরে থাকিবার জন্ত তোমার মন ব্যস্ত। তাই মিস্ খোবর্গকে পূর্বের কথা মরণ করাইয়া দিয়া সে সন্ধ্যা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে। কিন্তু মিস্ খোবর্গ কুঠিতে নাই। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না; ৮টার সময় গোপাল বাবুর বাটীতে গেলে, কস্তাকে তাঁহার মায়ের হাতে অর্পণ করিলে, এবং জানাইলে যে, রাত্রিতেই তুমি ফিরিয়া বাইবে। এই কথা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, তাহা কখনই হইবে না। তুমি মেমের নিকটে তোমার সন্তোষ কথা বলিয়া বলিলে, যে তোমার সন্তোষের ভার তোমার ভাই বোনের হাতে। ইহাতেই সকলে পরাস্ত হইয়া গেলেন, গাড়ী করিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন তোমার ভবিষ্যৎ কাৰ্য্যক্ষেত্র বিষয়ে ঐ কস্তার শিতা বহু বাবুর সঙ্গে এইরূপ আলোচন হয়।

বহু বাবু—শাপনারা নাকি ঝাঁকুপে স্থল করিতেছেন?

তুমি—ইচ্ছা তো আছে, তবে জানি না।

বহু বাবু—টাকা কোথায়?

তুমি—তাহা জানি না। তবে বিশ্বাস করি যদি সত্য মার কাজ কেহ করে, তাহার টাকার অভাব হইবে না। অনেকে দিতে পারেন। টাকার জন্ত কিছু ভাবি না; আসিবে। কোনও দিন কোনও ভাল কাজ টাকার জন্ত বন্ধ থাকে না।

বহু বাবু—এ ভার লইবার লোক কোথায়?

তুমি—জানি না, অবশ্যই লোক আসিবে। আর স্বয়ং মা-ই লোক। শ্রমের অ—বাবু এ বিষয়ে খুব উৎসাহী, তিনি কিছু করিতে পারেন।

বহু বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তিনি বেশ লোক। কত টাকা খরচ হইবে মনে করেন?

তুমি—জানি না, কিছুই ঠিক নাই। মনের ইচ্ছা যে একটা স্থল হয়। তাই মনে হয় মাসিক এক শত টাকার কমে চলিবে না।

বহু বাবু—মেয়েদের নিকট কত ক'রে লওয়া বাইবে?

তুমি—এ সকল কথা কিছু স্থির হয় নাই। তবে মনে হয় গরিবেরা কম দিবেন। ধনীরা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া একটু বেশী দিতে ইচ্ছা করিলে দিবেন।

বহু বাবু—মেয়ে কোথায় পাইবেন?

তুমি—কিছুই জানি না।

বহু বাবু—এ বিষয়ে আপনাদের সহায়ত্ব করিবার কেহ আছেন?

তুমি—ভগবান, আর এ পৃথিবীতে প্রভেদে অমৃত বাবু।

বহু বাবু—এ বড় কাজ, হাতে লইলে লোকের গালি খাইতে হইবে।

# দেখুন! মাত্র অর্ধেক সানলাইট সাবানেই



এত সব জামাকাপড়

কাচা যায়!



**সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !**

ফেনার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়ামূল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অর্ধেকটী সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার দরুনই প্রতিটি  
ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকর সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**



তুমি—জানি। কোন কাজ কোন দিন কে বিনা গাল  
খাইয়া কলিত পারিয়াছেন, যে সে আশা আমরা করিব ?

বাবু—(খুশী হইয়া) তবে আমি কিছু বলি। (১) ঈশ্বর  
হাদিসের কলিত উত্তর নির্ভর করিবেন না। (২) বিলাস  
একবারে থাকিবে না। (৩) আশনারা দুইটিতে একবারে সেই  
কম প্রাপ্তি দিবেন। পৃথিবীর গালি ও নিশাতে ভয় করিবেন না।

তুমি—ইচ্ছা তো তাই।

বহু বাবু—এইরূপ করিলে আশনারিগকে কত দিয়া নিশ্চিত  
হইতে পারি।

আর এক দিন গোপাল বাবুর বাটাতে তোমার নিয়ন্ত্রণ হইল।  
সে দিন আবার যে কথাবার্তা হইল তাহার সার অংশ এই।

তুমি—কিসে মেয়েরা সত্য খাটা উপাসনা শিখিতে পারেন,  
কিসে পরলোকের বিবর জানিতে পারেন, পুরুষেরা এই সকল বিবর  
মেয়েদের ভাল করিয়া শিখাইয়া দেন। মেয়েদের মন অতি দুর্বল,  
জ্ঞান অতি কম। বিশেষ বড় না করিলে মেয়েরা এখন লাভ  
করিতে পারিবেন না। আর তাই যদি না পারেন কি শোচনীয়  
অবস্থা দেখুন দেখি ? অনেক সময় পুরুষেরা মেয়েদের সমাজে কিছু  
সাধারণ করিয়াই বলিয়া দেন, 'বাহা বলিলাম তাহাই এখন হজম  
কর।' দুর্বলা নারী হয়তো এমনই হজম করিয়া ফেলিলেন যে,  
আর তাহার চিহ্নই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া কেহ কেহ  
বলেন, 'মেয়েদের কিছুই হইবে না।' একবার কোনও বিবর না  
বুঝিতে পারিলেই বলেন, 'আর কি করিব ?' মা জননী যদি  
পুরুষদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন, কি হইত ?

বহু বাবু—পুরুষেরাই এখনও কিছু পান নাই, নারীকে কি  
দিবেন ?

তুমি—বাহা পাইয়াছেন তাই দিন। এখনকার মত তাহাই  
অনেক হইবে। আবার দিতে দিতে যে বাড়ি।

বহু বাবু—বাহারার দিতে আসিয়াছেন (অর্থাৎ প্রচারকেরা)  
আহারীয় দিন।

তুমি—আহার্য দিন, কিন্তু আমার মনে হয় আপন স্বামী, ভাই,  
বাশ যদি দেন, তাহাতে বেশী কল হইবে।

এই কথায় বহু বাবুর দ্বী বড় খুশী হইলেন। সকলেই অতি  
মিষ্ট ও শান্ত ভাবে কথা বলিতেছিলেন।

রাতি ১১টা পর্যন্ত এইরূপ কথাবার্তার পর সে বাড়ীর পুরুষেরা  
আহার করিলেন। পরে ১০টার সময় মেয়েরা আহার করিতে  
হইলেন। অধিক রাতি হইয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা খুব খুশী;  
জানিল যে তোমাদের সে রাতিতে আর কিরিয়া বাওয়া হইবে না।  
কিন্তু তাহার তোমাকে চেনে নাই; সকল মেয়েরা আহার করিতেই  
হইলেন, তুমি ও তোমার দুই মেয়ে অভ্যস্তের মত পাড়া গুটাইয়া  
চলিয়া পড়িলে ও ক্ষমা চাহিলে। ভুবন বাবুর গাড়ীতে রাতি ১১টার  
পর কলসে চলিয়া গেল।

৩১শে অক্টোবর তোমার ভাই জ্ঞান তোমার সঙ্গে দেখা করিতে  
হইল। অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া  
সে খুব খুশী দিলে। বড় ভাল লাগিল। ১টা হইতে ১১টা  
বিশ্রাম তাহার সঙ্গে আলাপ হইল। তারপর জ্ঞান বিশেষ অল্পরোধ  
হইলেন, বাহাতে তুমি তাঁহার খণ্ডরবাড়ী বাও, ও তোমার বৃদ্ধা

মাসীর সহিত সাক্ষাৎ কর। দুটায় পরে বাইতে স্বীকার করিলে,  
কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। ইতস্তত করিতে দেখিয়া  
জ্ঞান বলিলেন 'বিবেচনা করিয়া বলিও'। তুমি রক্ষা পাইলে।  
একদিকে ভাইয়ের অল্পরোধ, আর একদিকে কর্তব্যের অল্পরোধ।  
শেষটাই জয়লাভ করিল। কথাবার্তার সময় জ্ঞানের মধ্যে তিনিলে,—  
বাবু বলিয়াছেন, 'তোমার দিদি একজন ভক্ত'। তুমি তিনিয়া  
লজ্জিত হইলে। ভাবিলে, মিন রাতি যে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে,  
সে আবার ভক্ত, এ কি কথা !

পরের দিন ভাই জ্ঞান বখন একেবারে গাড়ী করিয়া আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে আর কিয়াইতে পারিলে না।  
তোমাকে বাইতে হইল, মেয়েরাও সঙ্গে গেলেন। প্রথমে বৃদ্ধা  
মাসীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তারপর জ্ঞানের খণ্ডরবাড়ী গেল।  
এ বিঘরে পরে শিখরাহ, 'সেখানেও ১১ ঘণ্টা ছিলাম। অনেক  
দিন হিন্দু-পরিবার দেখি নাই। সকলেই নৃতন বোধ হইল।  
যেমন ঈশ্বরের নিকটে আমরা অজ্ঞান, তেমন এ সকল পরিবার  
অজ্ঞান বোধ হইতে লাগিল। মাসীর সহিত ও তাঁহার পুত্রবধূ  
সহিত ধর্মবিষয়ক অনেক গল্প হইল। বহু বাল্যকালে আমার খুব  
ভালবাসিতেন। এখনও সেই মেহ ভোলেন নাই। পরে ৫টার  
সময় জ্ঞান আমাদের সমাজবাড়ী পৌছিয়া গেলেন। সেইখানে  
বসিয়া নানা কথা হইল। বিশেষ কথা দাদার ছেলের পড়ার  
বিবর। একটু পরে সব লোক সমাজে আসিয়া পড়িলেন,—জ্ঞানও  
বাটা চলিয়া গেলেন, আমার একটু মনটা কেমন করিতে লাগিল।  
আমার ভাই সমাজে বসিলেন না। মনে মনে তার জ্ঞান যার নিকট  
বলিলাম।"

প্রাতঃস্মৃতির দিন গোপালবাবুর দ্বী অনেক ভাল খাবার,  
কল, চন্দন বিভাগের পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তো ভাই নাই,  
সকলেই ভগিনী। ভাই ভগিনী-স্মৃতিরাই হইল। তুমি সকলকে  
ভাগ করিয়া দিলে, কতী মেমকেও দিয়া আসিলে; কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট  
জিনিষটি (কলসার মাতা যেমন প্রস্তুত করিতেন সেইরূপ চন্দ্রপুলি)  
খাইলে না। ঐ খাবারটি আমি ভালবাসি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া  
খাইতে ইচ্ছা হইল না। আমের সময় আম খাইলে না, ভগিনী-  
স্মৃতির চন্দ্রপুলিও ত্যাগ করিলে। তোমার বড়ই ভয় হইত,  
পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়। "সর্বদা সতর্ক থাকিলে পতন হইতে বাঁচ  
বার" এই শিক্ষা লাভ করিলে।

আর একদিন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মেয়েদের হাসপাতাল  
দেখিতে গিয়াছিলে। তিনি গাড়ী ভাড়ার অংশ দিতে চাহিলেন;  
তুমি লইলে না কেন ? অভ্যাস নাই বলিয়া। তিনিও বুঝিলেন।  
কিরিয়া আসিবার সময় মিসু ডাক্তার ছাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন,  
তাহাও লইলে না কেন ? এটাও অভ্যাসের জন্ত। সে দিন রবিবার  
ছিল। পথে ভগিনী মহালক্ষ্মীকে (বিহারী বাবুর দ্বী) দেখিতে  
গেলে। তিনি তখনও যোগে জীর্ণ জীর্ণ। তাঁহার ইচ্ছা তুমি আর  
কিছুক্ষণ থাক, তুমি বলিলে, সমাজে বাইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা  
করিলেন, সে দিন কি রবিবার ? হ্যাঁ, এই উত্তর পাইয়া তিনি চুপ  
করিলেন। সমাজে গিয়া তোমার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল,  
সমাজে না গিয়া যদি ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিতে, খুব  
ভাল হইত।



১২ই নভেম্বর লিখিতেছে, “এই মাত্র তুল হইতে আসিলাম, কাল হইতে বৃক্কের ভিতর কেমন করিতেছে জানি না। যেমকে লিলাম, তিনি একটি ঔষধ খাওয়াইয়া গেলেন। পরে তোমার ত্রপাঠ করিয়া বুঝিলাম, কেন মন অমন করিতেছে। আজ হয়তো তোমার বেদনাটা বাড়িয়াছে কিবা কোড়াটা কাটাইয়াছ ও আমার খো মনে করিতেছে। পত্র পাইবার অনেক আগে হইতে ক কেমন করিতেছিল। না বলিলে কি হইবে, মা-ই বলিয়া দন।”

একদিন ডাকের পত্র দিয়া চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় মিসু খাবর্ণ বলিলেন—মিসেস্ বায়, একটু অপেক্ষা কর। (জৈনৈক প্রতীতি)—তুমি এখন বাও, মিসেস্ বায়ের সঙ্গে অনেক দিনের র আলাপ করিব। মিসেস্ বায়, তুল সব্বদে কি বল? বোড়ি করুণ চলিতেছে? তুমি যে আমার বন্ধু।

তুমি—(অনেক ভাল মন্দ বাহা জানিতে বলিলে; শেষে—) দি আমি কোন কথা তুল বলিয়া থাকি মাগ করিবেন।

মিস খোবর্ণ—(তোমার গলা জড়াইয়া নিজ বক্ষে চাপিয়া) মামাদের মধ্যে কখনও অমিলনের কথা হইবে না, মাগ চাহিবার পূর্বেই সকল মাগ হইয়া আছে।

সন্ধ্যার সময় মিস খোবর্ণ তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি মেয়ে পীড়িত; সুসার কি তাহার নিকটে বাজি দুই প্রহর পর্যন্ত থাকিতে পারিবেন? আর একটি মেয়েকে সঙ্গে দিব। তুমি বলিলে, সুসারকে জিজ্ঞাসা করি। এ কথা বলিয়াই মনে অভিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। ভাবিলে কোথায় আমি নিজে হইতে সেবার তার লইবার প্রস্তাব করিব, তাহা না করিয়া এ কথা কেন বলিলাম? প্রকাশ করিয়া বলিলে—হয় সুসার থাকিবেন, নয় আমি থাকিব।

মিস খোবর্ণ—(আপনার বৃক্ক চাপিয়া ধরিয়া) তুমি বড় রোগী হইয়া গিয়াছ। আমি তোমাকে এ কাছ দিব না। অস্ত বন্দোবস্ত করিব। কিছুতেই তুলিলেন না, অস্ত মেয়ের বন্দোবস্ত হইল।

তুমি কিন্তু নিজের ঘরে গেলে না, রোগীর গৃহে গিয়া সেবা করিতে লাগিলে।

মিসু খোবর্ণ একটু পরে আসিয়া বলিলেন, শয়ন করিতে বাও। বড় রোগী হইয়া গিয়াছ, অস্থির করিবে। (বাইবার সময় তোমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।)

তুমি—না, আমি এখানেই থাকিব।

মিসু খোবর্ণ—অস্ত দিন থাকিবে, একটু ভাল হও।

তুমি—না, আজ আমি থাকিব। (তোমার মনে তখনও অল্পতাপের অনল জলিতেছিল।)

মিসু খোবর্ণ তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন এক বলিলেন, “হুকুম মানো”।

তুমি—যে আজ্ঞা। (ঘরে গেলে।)

যে তুমি অসাবধান হইয়া পূর্বে কৃত অপরাধ করিতে, তাহার আজ এই দণ্ড। এই সামান্ত অপরাধে কৃত আত্মশ্রুতি, কৃত অল্পতাপ সহিতে হইল। পরে তোমার এই অপরাধের কথা জাই বোনের কাছে প্রচার করিতে বলিয়াছে। আরও অল্পতাপ করিয়াছ,

“বলিও মার নামে একজন অজ্ঞান বন্দারী, আজ একজন জ্ঞানবর্ণে ভূষিতা মহানারীর বন্ধু হইয়া প্রেরণা হইয়াছেন। এই কি পৃথিবীর কৌশলে হইতে পারে? না। সেই জননার কৌশলে। মাকে প্রার্থণে গ্রাণ করিতে পারিলে আর কিছুই অভাব থাকে না। এ তো আমার গৌরব নয়, মার আর তোমার।”

এক দিন গোপাল বাবু তোমাকে, তোমার কন্ডায়কে ও বোর্ডিঙের আর দুটি কন্ডাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার পত্রখানি মিস খোবর্ণের কাছে পাঠাইয়া দিলে। অল্পকণ মধ্যেই মিস খোবর্ণ তোমার ঘরে আসিয়া তোমাকে একান্ত ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্ত মেয়ে দুটিকে পাঠান বিধরে তোমার পরামর্শ কি?”

তুমি—আমার মেয়ে হইলে বাইতে দিতাম। কিন্তু এ দুটি মেয়ে গুটান, ইহাদের সব্বদে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

মিস খোবর্ণ—তুমি বাইবে?

তুমি—না।

মিস খোবর্ণ—তুমি গেলে উহাদের বাইতে দিতাম, কিন্তু একা বাইতে দিব না। এ মাসের শেষ শনিবারে বন্ধন তুমি বাইবে তখন তোমার সঙ্গে উহারাও বাইবে।

মেয়েরা বলিল, “মিস খোবর্ণ তোমার সকল কথাই শোনেন।” তুমি বলিলে, “আমি কি করিব?”

আর একদিন তুমি দৈনিক লিখিতেছিল, একটি এফ এ ক্লাসের মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি?” তুমি বলিলে “ডায়েরী।” বিজ্ঞাবর্তী মেয়ে ডায়েরী কি তা জানেন না, কেমন করিয়াই বা জানিবেন? অল্প লোকেই দৈনিক বৃত্তান্ত লিখিতে অভ্যাস করেন এবং উহাতে কি ফল হয় তাহা জানেন না। তোমার দেখাদেখি সেই মেয়েটিও তাঁহার মানের খাতার ডায়েরী লিখিতে উক্ত হইলেন। অবশেষে সে খাতাখানিকে এ অভ্যাস হইতে বাঁচাইবার জন্য ভিন্ন কাগজ আনান হইল ও সেই দিনই তাঁহার ডায়েরী লেখা আরম্ভ হইল।

তোমার লক্ষ্যে ত্যাগের সময় বতাই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ কার্যের বিধরে ততই তোমার মনে চিন্তা আসিতে লাগিল। একদিন দৈনিকে লিখিলে—“এই তো কার্যের বৃনয়াদ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে বলিতে পারি না। কেমন করিয়া হইবে, তাহাও জানি না, কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপাসনা: গৃহ, একটি মেয়েদের তুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি ছাত্রাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। তুল্লাট তে অতি শীঘ্র করিতে হইবে। খরচ আপাতত মাসে প্রায় ১০০ টাকা করিয়া লাগিবে। একটি বড় বাটার প্রয়োজন। ৩০।৩৫ টাকা হইলে—বাবুর কন্ডা, বিদ্যি এটাল পাস করিয়াছেন, আসিতে পারেন। এখন বৃক্কিডোয় জ্ঞানের কত প্রয়োজন। কত মেয়ে এই জ্ঞানের অভাবে ব্রাহ্ম সমাজে জড়ের মত আহা-নিষ্কার দিন কাটাইতেছেন। টাকার অল্প আমরা কোন দিন ভাবি নাই, ভাবিও না। বহি সন্ত মায়ের কাজ অব্যবহা-প্রকাশ করিতে পারে, নিশ্চয় কোন অজ্ঞান থাকিবে না।”

# কৈলাকুঠি দেঙ্গি

(উপভাস)

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৮

সীতারাম সত্যিই ছাড়া পেলো !

একখানা ট্যান্সি এসে ঠাঁড়ালো সীতারামের বাড়ীর দরজার ।  
সেদিন তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে ।

ট্যান্সি থেকে প্রথমে নামলো বুড়োশিব । ট্যান্সির ভাড়া চুকিয়ে  
দিয়ে সীতারামকে বললে, নামো ।

সীতারাম নামতেই বুড়োশিব বললে, দোরটা খোলা থাকলে  
চাল হতো ।

—কেন ?

—তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল, চুপি চুপি সেরে নিতাম ।

সীতারাম বললে, এতটা রান্ডা এলাম, পরামর্শ করবার সময়  
পেলো না তুমি ? তা বেশ তো, এইখানে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে সেরে  
দাও ।

বুড়োশিব বললে, না । তোমাকে দেখবার জন্মে লোক জড়ো  
হবে বাবে ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কি করবে ভাবছে, এমন সময় বাইরের  
করের বন্ধ দরজার পেছনে খুঁট করে আওয়াজ হ'লো । মনে হ'লো  
কিটা কে খেন খুললে ।

দোর খুলে চাকরটা বেরিয়ে এলো । সীতারাম এগিয়ে গিয়ে বললে,  
কলো । হ'লেন বাইরের ঘরে ঢুকলো । আলো নেই । অন্ধকার ।  
চাকর বোধ করি আলো আনতে বাচ্ছিল, বুড়োশিব ডাকলে, শোন ।  
চাকরটা থমকে ধামলো ।

বুড়োশিব জিজ্ঞাসা করলে, আমরা এসেছি—না কি বিকিমণি  
কেউ জানে ?

চাকর বাড়ি নেড়ে বললে, না বাবু ! আমি দেখতে পেলাম ।  
আমার কাছে চাবি ছিল—খুলে গিলাম । লঠন আমি ।

বুড়োশিব বাবু করলে । বললে, না । আলো আনতে হবে  
না । আমরা যে এসেছি সে কথা জানাসনি কাউকে । ওইখানে  
দিয়ে কোথাও চুপটি করে বোস । দরকার হ'লে ডাকবো ।  
এই বসে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়ে বুড়োশিব সীতারামের

কাছে এসে বসলো । বললে, শোনো । যে কথা তোমাকে এখনও  
জানাইনি—

—কি এমন কথা হে ?

বুড়োশিব বললে, রঞ্জন মরেনি ।

সীতারাম বললে, এ কথা তো তুমি প্রথম দিন থেকেই বলছো ।

কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা ?

বুড়োশিব বললে, সবাই করবে । আমি প্রমাণ করে দেবো ।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে যে লাশটা পাওয়া গেল  
সেটা কার ?

—তা জানি না ।

সীতারাম বললে, সেইজন্মেই বুঝি আজ আমাকে ছেড়ে দিলে ?

বুড়োশিব বললে, না । তোমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেলো  
না বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো । দেবুর একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান  
আর ওর কলিয়ারীর জন দুই-তিন সিপি কুলিকে বোধ হয়  
শিথিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করেছিল তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার  
বলে ।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, কি বলতো তারা ?

বুড়োশিব বললে, বলতো তোমাকে তারা কোদাল আর লঠন  
নিরে জনকতক লোকের সঙ্গে মুখো-পুতুর থেকে আসতে দেখেছে  
একদিন শেষ-রাত্রে ।

এত দুঃখও সীতারামের মুখে হাসি ফুটলো । বললে, তার পর ?  
কি হ'লো ? তারা বললে না কেন ?

বুড়োশিব বললে, ভরসা হলো না বোধ হয় । তখনাম নাকি  
কথাগুলো কিছুতেই তারা মুখস্থ করতে পারলে না । একবার হঠাৎ  
বেশ গড় গড় করে বসে গেল, কিন্তু আর একবার খেঁচি জিজ্ঞাসা করা,  
আর বাস, সব গোলামাল করে ফেললে । কেউ বলে, কোদাল নামিয়ে  
লঠন দিয়ে মাটি কোপাতে দেখেছে । আমার কেউ বলে—

সীতারাম হো-হো করে হেসে উঠলো । বললে, বুকেছি । মিথ্যা  
কথা, জেরার টংকে না কখনও । বাকুণে, এখন তোমার পরামর্শটা  
কি, তাই বলি ?

বুড়োশিব বললে, আমি যা করবো তার ওপর তুমি কিছু বলবে বল ?

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে তুমি ?

—যা করবো তা তুমি দেখতেই পাবে।

—তবু বল না তুমি কি করবে।

বুড়োশিব বললে, মালা তার সঙ্গে রক্তনের বিয়ে দেবো ?

—রক্তনকে তুমি পাবে কোথায় ?

—পেতেই হবে। না গেলে তো বিয়ে হবে না।

সীতারাম খানিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে, তার পর সে, তোমরা দিতে চাও দাঁও, কিন্তু—

বুড়োশিব এবল বেগে মাথা নেড়ে তার আপত্তি জানালে। বললে, না কিন্তু-কিন্তু নয়। তোমার আবার কিন্তু কিসের ? তোমার নও কথা আমি শুনবো না।

সীতারাম বললে, তাই'লে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

বুড়োশিব বললে, তোমার মেন্দে, তাই তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা দাম।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে কি দেবু চাটুজ্যের অমতেই দেবে ভেবেছো ?

বুড়োশিব বললে, ঠ্যা। সে এখনও জানে না যে তার ছেলে আছে।

—কখন জানবে ?

বুড়োশিব বললে, তখন সে তোমার জামাই।

সীতারাম বললে, বেশ ভাল করে ভেবে রাখো।

—ভাববার কিছু নেই।

জালো। বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সীতারাম উঠে পাড়ালো।

কত দিন সে তার দ্রীকজ্ঞাকে দেখেনি। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠছিল তাদের দেখবার জন্যে। তাই সে আর ব্রহ্মচর্য বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠানে পাড়িয়ে ডাকলে, মালা !

ছ'বার ডাকবার প্রয়োজন হলো না। তৎক্ষণাৎ দৌতলা থেকে মালায় কঠকঠ শোনা গেল : বাবা !

জালো হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মালা। সিঁড়ির মাথায় পাড়িয়ে রইলো তার মা।

সিঁড়ির মাঝখানে ছ'জনের হুখোহুখি দেখা। মালা তার আবার হুখের দিকে তাকিয়ে আবার ডাকলে, বাবা !

কাল্লার তার কঠকঠ তখন ভারি হয়ে এসেছে। চোখ দুটো জলে ভরা।

কাঁধে হাত রেখে সীতারাম বললে, চল। মা কেমন আছে ?

কান্নন নিজেই জবাব দিলে। বললে, ভালই আছি। খারাপ কেন থাকবো ? —বাবা ! যে ভর আমার হয়েছিল।

সীতারাম বললে, সে ভয় গেল তো ?

কান্নন বললে, গেছে। অনেক আসেই গেছে। রক্তন এসেছে। শুনেছো তো ?

## সর্দিকাসির যন্ত্রনা দূর করার নূতন উপায়।

এই ভাল জোরালো মলমটি মালিশ করা মাত্রই  
দু'ভাবে সর্দি কাসি পালাবে।



১। ভিকস ডেপোরাব ড্রকের মধ্যে গিরে হুক ও শ্বসন করে।	২। ভিকস ডেপোরাব এর তীর ওষধের গন্ধ শুকলে নাকের ও গলার সর্দির যন্ত্রনা দূর হয়।
---	--

**ভিকস**  
ডেপোরাব



ভিকস ডেপোরাব একটি ঔষধ

সীতারাম বললে, ওনলাম। বুড়োশিব বললে—একুণি।

বুড়োশিব ছিল সীতারামের পেছনে। বললে, বা ভেবেছিলাম তা কিছু হলো না। ভেবেছিলাম, সীতারামকে চমকে দেবো।

কাঞ্চন বললে, হতভাগা মেয়ে দিয়েছিল সব নষ্ট করে। বললি সে মালার দিকে একবার তাকালে। বললে, বলবো?

মালা তার মায়ের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না, একটি কথাও বললে না, লগ্ন হাতে নিয়ে যেমন আসছিল, তেমনি আসতে লাগলো।

কাঞ্চন তার নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে, এই ঘরে এসে বোসো। বলছি।

সীতারাম তার নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে, কেন, এ-ঘরে কি হলো?

কাঞ্চন বললে, ও-ঘরে রজন রয়েছে যে!

সীতারাম এতক্ষণ পরে সত্যি বিমিত্ত হলো। বললে, রজন! এখানে?

কথা বললে বুড়োশিব। বললে,—তবে আর বলছি কি! রজন তার বাপের কাছে না গিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে। সে বুড়োশিবের এখনও জানে না যে, তার ছেলে বেঁচে আছে।

এই কথা বলেই বুড়োশিব চলে যাচ্ছিল রজন যে-ঘরে রয়েছে সেই ঘরের দিকে। কাঞ্চন তাকে যেতে দিলে না। সামান্য-সামান্য তাকিয়ে কথা সে কোনো দিন বলেনি তার সঙ্গে, সেদিন কিন্তু কোনও বাধা-নিষেধ সে মানলে না। বললে, না না, আপনিও আগুন। মেয়েটা আমাকে কি রকম বিপদে ফেলেছিল শুনে যান।

—বিপদে ফেলেছিল?

বুড়োশিব তাকালে মালার দিকে। বললে, কি রে, কি করেছিলি? মালা একটি কথাও বললে না। শুধু তার হাতের লগ্নটা একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়োশিব বললে, বলুন এবার। মালা পালাচ্ছে।

কাঞ্চন ডাকলে, মালা!

মালা দোরের কাছ থেকে ফিরে পাড়িয়ে বললে, বাবাকে একটু ছিঁব হ'তে দাও মা! আমি যাচ্ছি খাবার করতে।

কাঞ্চন বললে, তাই বা।

মালা চলে যাবার পর, কাঞ্চন এগিয়ে গেল সীতারামের কাছে। বুড়োশিবের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, রজনকে উনি ধরে আনলেন আমাদের বাড়ীতে। আমি তো অবাক!

সীতারাম বুড়োশিবের দিকে তাকালে। বললে, কোথায় গেলে? কে?

বুড়োশিব বললে, আমি বাড়িলাম কলকাতা।—তোমার মাংসলা জন্তে ভাল একজন ব্যাধিষ্টার আনতে। রজনের সঙ্গে টেপনের পথে দেখা। ও-ও আসছিল ওর পিসির বাড়ী থেকে। রাজকন্তাকে বিয়ে করবার ভরে পালিয়েছিল দেখানে। রজন জানতো না যে এখানে এত-সব কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি শুকে ওর বাবার কাছে যেতে দিলাম না। এক রকম জোর করে নিয়ে এলাম এইখানে। বললাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি থাকো এইখানে। ছেলেটি বড় ভাল ছেলে—রাজি হয়ে গেল। আমি সেলাম পুরুত ডাকতে। ভাবলাম, মালার সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দিই। তারপর ওর বাবার হাতে ছেলে-বোঁ একসঙ্গে তুলে দেবো। হঠাৎ মনে পড়লো—আজ তোমার মাংসলার দিন। কিন্তু আজ যে তোমাকে ছেড়ে দেবে, তা ভাবিনি। ছেড়ে যদি না দিতো, মালার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে রজনকে হাজির করে দিতাম আদালতে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পথ পেতো না।

কাঞ্চন বললে, বিয়ে আপনি দিতেন কেমন করে? ছেলে রাজি হয়েছে, কিন্তু মেয়ে এদিকে বৈকি বসেছে।

বুড়োশিব বললে, বৈকি বসেছে কি রকম?

কাঞ্চন বললে, তবে আর বলছি কি! এদিকে শুনি দু'জনে এত ভাব, এত ভাব, তা রজন যে এলো বাড়ীতে তো একটি বার গেট না ওর কাছে! আজ দুপুরে বাওয়া-দাওয়ার পর জোর করে পাঠালো। গিয়ে দেখি না—রজনকে বিনয় করে দিয়েছে ভাগ্যাসু নীচের পোরে তলা বন্ধ করেছিলাম, নইলে এতক্ষণ রজনকে এখানে দেখতে পেতেন না।

বুড়োশিব ভিজ্জাসা করলে, মালা কি বলেছিল ওকে?

কাঞ্চন বললে, কি বলেছিল তা মালাই জানে। আমি ভিজ্জাস করতে মালা বললে, তোমরা আমার বিয়ের জন্তে খেই-খেই কে নাচছে, কিন্তু আমার বাবার কথাটা একবার কেউ ভেবেও দেখেছে না। আমার বাবাকে যিনি এত বড় অপমান করলেন, তাঁর বে হয়ে তাঁর বাড়ীতে আমি যার কেমন করে? আমার বাবার মাংস হেঁট হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে বুড়োশিবের মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল মনে হলো কি যেন সে ভাবছে। সীতারাম কিন্তু একটি কথা বললে না। উঠে পাড়ালো। বললে, আসছি।

বুড়োশিব একা-একা বসেই বা থাকে কেমন করে? সে-ও উঠলো বললে, চল, আমিও যাই।

সীতারাম বললে, তুমি বোসো রজনের কাছে। আমি আসছি [ক্রমশঃ]

কিন্তু, হায়, কেন বঙ্গব্রতগণ!

এ উৎসব-উৎসে চুয়েছ মগন!

প্রকৃত উৎসব বাহা হ'লে হয়,

তোমাদের তাহা হ'য়েছে বিলম্ব,

এ উৎসব শুধু ছেলেমি করা।

বলিয না আমি বুঝে লও মনে,

বঞ্চিত তোমরা রয়েছ কি ধনে;

কালে যদি পার সে ধন লাভিতে

উৎসব করিও হরষিত চিত্তে

নাচিয়া কুঁদিয়া কীপারে ধরা।

—রাজকুমার বার।

# এসে গেছে! এই ডবল ঢাকনা দেওয়া নতুন টিন ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটী ও তাজা রাখে



- বিশুদ্ধ ও তাজা ডালডা কেনার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে হ্রাসিত রাখে।
- বিশুদ্ধ ও তাজা ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসান বাইরের ঢাকনাটি ডালডাকে সবদিকই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- খুলতেও কি সুবিধে খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
- পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে—ডাল টিনে মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।

ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ এবং ১০ পাউন্ড টিনে পাওঁ দ্রুত  
\* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে

ডাল ডা মার্কা বনস্বতি

ডালডা আমার  
পক্ষে জায়ে!



# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

২৩শে আগষ্ট। আজ সকালে আমি গ্রামের পুরনো বাসিন্দাদের দেখতে বেরিয়েছিলাম। একটি পরিবারকে আমার বড় ভাল লাগে। বুড়ো বাপ আঁত্রে কোরেন, তাঁর স্ত্রী মিঠাল আর বোল বছরের এক মেয়ে; মেয়েটি খুবই কর্তৃত্বপূর্ণ, ধীর ও স্ত্রী। বেচারাদের দিন কাটো দারুণ দারিদ্ৰ্য্যে। মেয়েটির আশ্রাণ চেষ্টা, বোজ হ'লুটো অন্ন-সহ্যানের জন্ত, কিন্তু একজনের বোজগারে তিনটে পেট চলে না। তা সত্ত্বেও এদের কোন অভিযোগ নেই, কারো কাছে নিজেদের দুঃখের কথা ভাঙে না। এত চাপা ওদের স্বভাব, তবু আমি জানি কী দারুণ ওদের অভাব। সন্তানরা জমিদার-গিরীকে এদের কথা বলব ভাবছি, কারণ তাঁর নাকি একটি পরিচারিকার দরকার।

২৪শে আগষ্ট। আজ সকালে আমার জানালার সামনে বসেছিলাম। দিনটা বেশ উজ্জ্বল; নির্বেশ পরিষ্কার আকাশ। বসে বসে ভাবছিলাম, আমাদের প্রতি—এই সব পাণী-তাপীদের প্রতি—ভগবানের করুণার কথা। বাগানে স্বর্ণধার শিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা চড়ুই সেই জলে তুফা মেটাচ্ছে। প্রত্যেক বার জল পান করে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইছে, যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তার স্তম্ভিকণ্টকে, সর্বমঙ্গলময়কে। হে ভগবান! আমার জ্ঞপ্তেও যেন অনুভব করতে পারি তোমার মহত্ত্ব, তোমার রূপ। আজ আমি প্রেস্টিনদের মাকে দেখে এলাম; গ্রামের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বৃদ্ধা। তারপর গেলার কোরেনদের বাড়ীতে। জানেৎ দেখলাম মাহুলী গোছের একটা স্থপ ছাল দিচ্ছে; এক খণ্ড মাস আর একটা ফুলকপি তার মধ্যে ছেড়ে দিলাম,—এগুলি আমার বাজেরই ছিল। ছাইয়ের তলায় গোটা বারো আলুও নলসে দিলাম। গরীব বেচারাদের জন্ত এই দিইয়েই বেশ ভাল একটা খানা তৈরী হল। ওদের বাবা-মা ধী ধী করে ছুটে এসেছিলেন আমার কাণ্ড দেখে; কিন্তু আমি বললাম যে এবিষয়ে তাঁদের মাথা না ঘামালেও চলেবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে জানেৎ এল ছোট ওই বেড়াটা অবধি; আমার গন্তবাদ জানাতে চার, কিন্তু একটা চুইতেই তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল; আমরা সেই অবস্থা, বহু চেষ্টারও নিজেদের চাপতে পারলাম না।

হোট্ট একটি পেরো স্থব ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ী হুকছি, এমন সময় বাবার গলা তনলাম।

“এতকণে কিবলি খুকি।” হলধর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, “আমি ত তেবে সারা, কোথাও কিছু খটল বুঝি।”

“তুমি কি আমার খুঁজছিলে বাবা? তোমার উধির করার জন্তে আমি কমা চাইছি বাবা।”

“জারে, আগে ভেতরে আর, এই দেখ লুই এসে বসে আছে এক বটা ধরে; বাড়ীতে আর কেউই নেই, ওর সঙ্গে কথা বলে।”

তার পর এক তরুণ অকিসারের সাথে বাবা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন; আগে কখনো দেখিনি একে।

“এই যে লুই, এই আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান!” অকিসারটি এমন সরল হাসি ও অমায়িক দুঃগে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন যে তক্ষুণি আমি বড় আশস্ত্র বোধ করলাম।

“কি রে মার্গরিৎ, এর কথা বোধ হয় তোর মনে নেই, না?”

“উহ—” আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

“তোমরা যে হুঁজনেই খুব ছোট তখন।”

লুইয়ের বয়েস বড় জোর বছর তুড়ি। বোকে-পোড়া মুখে নতুন যোমের উদ্বেগ; মনোহর গঠন, অশিশাল বুক, ঘন কটা চুল; নির্ভীক বহু কপিল দুটি চোখ স্নেহ ও অকপটতার ভরা। টোটে তার থেকে থেকে একটা যথার ছাপ ফুটে ওঠে, বিশেষতঃ যখন তার মায়ের কথা ওঠে; কিন্তু হাসলে তার সারা মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমার কাঁধের ওপর বাবা হাত রাখলেন।

“সাবধান!” গভীর অধঃ সর্কাতুর্ক কণ্ঠে তিনি বললেন,

“তোমার সামনে বীকে দেখছ, তিনি হচ্ছেন ষাশিশ অথারোহী বাহিনীর বিখ্যাত ক্যাপ্টেন লুই লফেড; সম্প্রতি ইনি আলাজেরিয়া থেকে ফিরছেন। করেক দিন এখানেই কাটাবেন। গিয়ে এর জন্তে একটা ঘর সাজিয়ে কেন্দ্র ত খুকি। তার আগে তোর মাকে এক দোঁড়ে গিয়ে বলে আর যে লুই এসেছে। তাঁকে ত কোথাও দেখতেই পেলাম না; নইলে নিজে গিয়েই স্নহবরটা তাঁকে দিয়ে আসতাম।”

গিয়ে দেখি ক্ষেতের মধ্যে মা তাঁর মটর আর শিমগাছগুলোর পরিচর্যা করছেন।

“মা, লুই লফেড এসেছেন।”

চট করে তিনি ঘুরে পাঁড়ালেন।

“কি বললি খুকি?” তিনি চৈতরে উঠলেন, “এমন খবর এনে দিলি, আর রে, তোকে চুমা দিই।”

আমার চুবনাত্তে তিনি আমার হাত ধরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

“বলি ওগো, ও হেনরী!” বাবাকে তিনি শুভালেন, “জারে আগে আমার খবর দিতে পারনি?”

“তোমার যে কোথাও খুঁজে পেলাম না গো,” লুইকে একটা নতুন বন্ধু দেখাতে দেখাতে তিনি চোখ তুলে জবাব দিলেন।

“লুই, বাপ আমার, তোকে দেখে কী যে সুখী হলার।”

এসিয়ে গিয়ে তিনি ক্যাপ্টেনের শির চুবন করলেন। সে বেচারী বড় বিচলিত হয়ে পড়ছে; টোটে দুটি তার কাঁপতে লাগল, আর ঝাপসা হয়ে এল তার চোখ। বাবা আমার তার কাছে টেনে

মিয়ে গেলেন। তাঁর চোখও সজল; কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। এখন অবস্থা সবই জানি। মাত্র সত্তের বছর বয়েসে লুই অনাথ হয়; তার বাবা মারা বাবার দুদিন বাদেই মারা যান তার মা। আমার বাবা ও তার বাবা ছিলেন একই সৈন্ত বিভাগে। শোকে মুহম্মান তরুণ উম্মাদপ্রায় অবস্থায় তখনি আফ্রিকা চলে যায়। বাবামা ছাড়া বেচারি কিছুই জানত না! সেই শেব বারের মত আমার মা বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। নাঃ, এবার আমার কাহিনী থামান দরকার।

“এত দিন কেমন ছিলি রে লুই? ভাল ত?” মা জানতে চাইলেন।

“নাঃ, বরাবর ভালই ছিলাম না; এখান থেকে বাবার তিন দিন বাদেই ঘরে পড়ি, বার জের এক মাসেরও বেশী চলে; কিন্তু বর্তমানে, সে হাসল, “আমার চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য করো আছে কিনা জানি না।”

খাবার পর বাবা আমার হাতে লুইকে স্তম্ভ করে দেবার সময় বলে গেলেন, “মার্গরিৎ, লুইকে এবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর আশ্রিতগুলো দেখিয়ে আন; আমার কিছু চিঠি লিখতে হবে আর তোর মা ঘর গোছাতে বসবেন।”

অতিরিক্ত আমি বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার খরগোস দেখালাম। আদর করবার জন্য লুই তাদের একটাকে সবে হাতে তুলেছে আর অমনি দুইটা কচ করে ওর আঙুলে কামড় বসিয়ে দিল। দেখলাম অতি ধীরে সে জন্তুটাকে বাসের ওপর নামিয়ে রাখল, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম খানিক বাদে, ওর আঙুল দিয়ে বস্তুর ধারা বয়ে চলেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলাম, “জন্তুটা কি তোমার কামড়েছে?”

সে শুধু হাসল, “নাঃ, ও কিছু নয়।”

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা দেখে শেষ পর্যন্ত ও দেখাল, একটা আঙুলে ছোট চারটি পাতের লাগ। তাড়াতাড়ি আঙুলটা আমি বেঁধে দিয়ে, অপ্রতিভ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, “তোমার কি খুব বেশী ব্যথা করছে?”

“মোটাই না।” তারপর নীচু গলায় লুই বলল, “জান, তোমায় দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে বাচ্ছে।” আমি চুপ করে রইলাম।

তেমনি ভাবেই লুই জিগ্যেস করল, “আচ্ছা তুমি কি তাঁকে দেখেছ?”

“বোধ হয় আমি দেখেছি, তবে তাঁর চেহারাটা ঠিক মনে পড়ে না।”

একটা বুড়ো ওকের তলার আমরা গিয়ে বসলাম।

“বল ত, আফ্রিকায় গিয়ে তুমি কি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?”

“আমার ত বাঁচবার আশাই ছিল না; প্রিয়জন বলতে বিহানার পাশে কেউ ছিল না, বার থেকে একটু সাহায্য পাই; আমার মা-বাবা মারা বাবার ঠিক এক মাস পরের কথা; এক সহকর্মী আমার তত্প্রণা করত; প্রকাশের ঘোরে কত বার যে মাকে দেখেছি! তাঁকে দেখতাম, মার্বেলের মত সাধা, সারা মুখ এক অশ্রু মধুর হাসিতে উজ্জল; তিনি আমার হাত দুটা এসে ধরতেন; আমার বলন্ত

কপালের ওপর রাখতেন তাঁর ওষ্ঠ,—আমি তখনি শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে বসতাম, কিন্তু আবার ভেঙে পড়তাম নিরাশায়। কারণ, এই ভাবেই ত তাঁর সাথে পরলোকে মিলিত হবার অশ্রুটি শেহিয়ে যেত।”

সে খেমে গেল আর স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঘরের মাঠ পানে।

আমি কাঁদছিলাম। হঠাৎ সে মুখ ফেরাল।

“একি, তুমি কাঁদছ? আমার জন্যে?”

“কত কষ্টই না পেয়েছ তুমি!” আমি উত্তর দিলাম। খানিক বাদে সাধারণ ভাবে সে আমার বলল, “চল ত, তোমার বাবার বুড়ো ঘোড়াটা আমায় দেখিয়ে দেবে।”

২৫শে আগষ্ট। আজ খুব ভোরে উঠে প্রাতরাশের আগেই আমি হাঁস-মুরগীগুলোকে খেতে দিচ্ছিলাম। লুই এসে পাঁড়াল আমার পাশে।

“তুমি দেখছি খুব সকাল সকাল উঠেছ আজ; দেখ আমিও কেমন উঠে পড়েছি।” সে বলল।

“তা ত হল, কিন্তু তোমার আঙুলের খবর কি?”

“বোধ হয় ভালই আছে, যদিও আজ আর খুলে দেখিনি।”

“ব্যাকওকটা এক অবধি খোলই নি?” সবিনয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

“উঁহ, যেহেতু তুমি বেঁচেছ, তোমাকেই এটা খুলে দিতে হবে।” তার অমুরোধ মত আমি খুলেই দিলাম। বুড়ি দাই তেরেস তখন সেখান দিয়ে আসছিল।

“কান্টেন সাহেবের হল কি থুতুমা?”

“বুঝলে তেরেস, একটা খরগোস এত দুই বে গুকে কামড়ে দিয়েছে।”

“ওঃ, এই কথা? বাছা বে! আমায় ত মনে হয় ওর আসল কব আবার গভীর।”

এই বলে সে চলে গেল। লুই আমার দিকে একটু ঝুঁকি বসল তার চাউনির ভঙ্গীতে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। “বুঝলে, ও হচ্ছে আমার মায়ের হাই,” আমি কথা ফেরালাম, “আচ্ছা একটা কথা। তুমি কি কখনো খুব আহত হয়েছিলে?”

“তিন বার,” সে একটু খেমে বলল।

“শুকতর ভাবে?”

“আমি শুধু শুকতর আঘাতের কথাই মনে রাখি।”

প্রাতরাশের পর আমরা সবাই বলে গেলাম। আমাদের আগে বাবা-মা বাড়ী চলে গেলেন। ছোট নদীটির তীরে লুই আর আমি বসে জিলাম, পথের দিকে চেয়ে লুই বলল: “কেউ যেন আসছে আমি বাড়ি ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, ‘জমিদার আসছে।’

লুই প্রকৃটি করল, “কে জমিদার? নাম কি?”

“মুহারভেনের জমিদার।”

“তুমি ওকে চেন?”

“হ্যাঁ; ওর মা আর আমার মা একই কনভেন্টে ছিলেন।”

আমাদের সামনে এসে জমিদার আমার অভিযান জানায় তারপর লুইয়ের দিকে ফিরে তার পানে হাত বাড়িয়ে দিল।

“কান্টেন লক্ষ্যকে সজ্ঞাধ জ্ঞানিয়ে নিজেকে সম্মানিত করছি; আমার বাবা তোমাদের বেজিমেটাই কাজ করতেন।”

লুই হাসল। "সত্যি" রহস্যভেদে সে জিগোস করল।

আমরা গল্প-গল্পে মেতে গেলাম।

"আমরা কিন্তু মা-ছেলে সবাই তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।"

জমিদার বলল, "কবে আমাদের সৌভাগ্য হবে তোমাকে আমাদের প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবার?"

"দিন পনের বাদেই সম্ভবতঃ।"

"আমার মামাও ওই সময় নাগাদ আসছেন; ভালই হল; অন্তর্ধার তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে হযত বিরক্তি বোধ করতে।"

"উহু, মোটেই না।"

"তোমার কথা আমি অবশ্য বিশ্বাস করি। কারণ যার অন্তর হৃদয়, কোন কিছুতেই তার বিরক্তি আসে না।"

"তুমি যা বললে, তা অতীব সত্যি।" লুই অগ্নমনস্বভাবে জলে হুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সায় দিল।

অনতিকাল পরেই আমরা বাড়ী বাবার জন্তে উঠে পড়লাম। বাবার আগে জমিদার লুইকে বলে গেল, "শীগগির তোমার সাথে দেখা হবে আশা করি। আমার মামাও হুড়ি হবেন তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।"

"ধন্যবাদ", জানাল লুই প্রেসর মনে। তারপর জমিদার অদৃশ্য হয়ে গেল।

২১শে আগষ্ট। আজ সকালে লুই চলে গেল। আমরা সকলেই বড় খুশি পড়েছি। মা অঙ্গ-সম্বরণ করতে পারেন নি তাকে আলিঙ্গন-কালে; দশ বার তাকে নিয়ে দিঘি করিয়েছেন, শীগগির সে আবার আসবে। বাবা আর আমি পথের থানিকটা জুড়ে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। নীরবেই আমরা চলছিলাম, কখন প্রিয়জনকে বিদায় জানানো—যতই "আবার দেখা হবে" বলা বাক—বড় দুঃখ। একসঙ্গে গীর্জা অবধি গিয়ে লুই এগিয়ে গেল।

"আমার ভুলবে না, বল?" লুই করমর্দন করবার সময় বলল।

"কখনো না, নিশ্চিত খোকা।"

"আর আমি," সে জানাল নীচু গলায়, "যদিও আর কোন দিন তোমার সাথে দেখা না হয়, জীবনে তোমার ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু দেখা হবেই, আমি জানি তুমি ফিরে আসবে!" ওর হিম্বর ভাব দেখে আমি জবাব দিলাম।

"আবার দেখা হলে তুমি সুখী হবে?"

"বিলম্ব। তুমি আবার এলে আমরা সত্যিই খ্রীত হব, জাই না বাবা?"

"নিশ্চয়ই।" লুইয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘাশ ছাড়লেন তিনি।

খোড়ায় চেপে সে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। বনের মাঝে লাভ হবার আগে ফিরে তাকিয়ে সে টুপি নাড়ল। দুই হাতে লামায় জড়িয়ে ধরে বহুলা বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হৃদয়ের পিতা—কী গভীর না তাঁর ভালবাসা! তাঁর চোখ বহুলায় জ্বলে জ্বলে।

"মা আমার, নিশাপা বনের ফুল।" শির চূষন করে তিনি লুইকে বলে ফেললেন। আমরা ফিরে চললাম।

"চল মা, মন খারাপ করে কি লাভ? আশা করি ওও কথামত শীগগির ফিরে আসবে।"

"আমিও তাই চাই বাবা, আর কয়েক দিন যদি ও থেকে যেত, বেশ হত, চলে যাওয়ায় বড় যেন কাঁকা লাগছে।"

"ও চলে যাওয়ায় তোর মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন, ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসেন, আর আমি—আমিও ওকে বড় স্নেহ করি।—তুই, মার্গরিৎ?"

"আমিও বাবা!"

লুই চলে যাওয়াতে সারা বাড়ীটা কাঁকা লাগছে। যদিও অল্প কয়েক দিন ও ছিল আমাদের মধ্যে, তবুও ও চলে গেছে, মনে হচ্ছে বাড়ীরই কেউ গেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন। বাবা-মাকে তিনি অমুরোপ করলেন,—আমায় নিয়ে অবশ্যই তাঁরা যেন একবারটি প্রাঙ্গণে যান। তাঁরা জানালেন যে এখন বোধ হয় তা সম্ভব হবে না।—আমার বাপু মনে হয় নিমন্ত্রণটা রক্ষা করলেই ভাল হত। কথায় কথায় জমিদার-গিন্নী বললেন যে তাঁর একটি পরিচারিকার বড় দরকার। আমি তখন জানেং কোরেন—এর উল্লেখ করলাম। তিনি তাকে দেখতে চাইলেন, এবং আমি কথা দিলাম যে জানেংকে প্রাঙ্গণে গিয়ে ঠর সাথে দেখা করতে নির্দেশ দেন। যখন আমি কোরেনদের দুঃখ ও মেয়েটির 'নিষ্ঠার কথা বললাম, তিনি আকুল হয়ে কঁদেই ফেললেন। আমার ধারণা জানেংকে তিনি কাজে বহাল করে নেবেন।

"এখনো এক মাস হয়নি তুই আমাদের কাছে এসেছিল, এর মধ্যে তুই পেয়ে গিয়েছিল যত দীন-দুঃখের হৃদয়?" তিনি বিশ্ময়-মিশ্রিত আনন্দে গরগদ হয়ে বললেন, "তুই যে একেবারে সাক্ষাৎ দেবদূত,—ওদের রক্ষাকত্রী!"

৪ঠা সেপ্টেম্বর। বাবা আজ সকালে লুইয়ের একটা চিঠি পেয়েছেন। সে এখন পারীতে আছে, তবে শীঘ্রই আলজেরিয়া যেতে হবে। ডিসেম্বরে সে ফিরে আসবে, সে লিখেছে, "আপনাদের সাথে পুনর্মিলিত হব আশা করি। আপনি ও মাদাম আর্ডের যে অকুণ্ঠ যত্ন করেছেন আমার স্বর্গত পিতা-মাতা ও আমাকে, তা জীবনে বিস্মৃত হব না। আমার শোকসন্তপ্ত মুহূর্তে আপনাদের নিকট যে বাৎসল্য পেয়েছি সে ঋণ কখনো শোধ করবার ক্ষমতা আমার হবে না। স্বর্গের দেবতার। সে ঋণ শোধ করুন আর রক্ষা করুন আপনাদের সবাইকে সকল বিপদ-আপদ থেকে,—এই আমার প্রার্থনা। আমি দূরদেশে থাকা কালীন আমায় ভুলে যাবেন না যেন; অবশ্য এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। কারণ আপনিই আমার পিতার অভাব আর মাদাম আর্ডের আমার মাতার অভাব পূর্ণ করেছেন, আর, আমি জানি, আপনাদের হৃদয়ের একাংশ চিরদিন অধিকার করে থাকবে—লুই লেফে।"

আজ আমি জমিদার-গিন্নীকে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেং কোরেনদের বাড়ী। গাভুঁও সঙ্গে ছিল। মেয়েটিকে দেখে কঁতেসু বড় সন্তুষ্ট হলেন। তখনি তাকে বহাল করে নিলেন। জানেংকে পায় কে? আমার হাত ধরে সে কঁদে ফেলল, ওর চোখে জল দেখে আমিও বেসামাল হয়ে পড়লাম; তবু ওকে শান্ত করতে সচেষ্ট ছলাম। উঁচু গলায় তার মা-বাবা-আমার অভ্যস্ত আলীষ জানাতে লাগলেন। জানেং প্রাঙ্গণে বাবে কাল থেকে। গাভুঁ কোয়ার পথে আমরা অভিনন্দিত করল, "তুমি সত্যি বড় লক্ষী মেয়ে।"



“না, আমি লম্বী হতে চাই, কিন্তু হলাম কই?”

“হা, আচ্ছা বলত তুমি না থাকলে এই গরীব বেচারাদের অবস্থাটা ক’হত?” সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল।

“ভুলছ কেন—ভগবান তাদের কোন দিনই ছেড়ে যেতেন না। তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি অপার দীর্ঘ ভালবাসা, তাদের আপন দৃষ্টান্তরূপে দেখেন,—বাণ কি নিজের হেঙ্গে-মায়ে ছেড়ে থাকতে পারে?”

চারি দিক স্তব্ধ।

“হাই হোক, মেয়েটি বড় সুন্দর,” গাভী আবার শুরু করল। “বেশ, তুমি আর আমি একমত, জেনে বড় আশান্ত হলাম; ওর আয়ত চোখ দুটি কি চমৎকার না? শব্দের আকাশের মত নীল।”

“আচ্ছা, এটা কি তোমার অন্তরের কথা?”

“বটে, তুমি কি বলতে চাও?” আমি পাঁচটা প্রশ্ন করলাম, চোখ তুলে দেখি দুই মিতে তার চোখও ভরা। সে হেসে ফেলল।

“আমার যা স্বখী বলি যদি, তোমার কী বা এসে গেল?”

ইতিমধ্যেই আমাদের বাগানের সীমানার পৌছ গেছি; ওরা বিদায় নিল।

এই সেপ্টেম্বর—কাল আমি প্রাসাদে বাব। সারা সকালটা কেটেছে গোছ-গাছ করতে। আটটা বাজল ঘড়িতে। জানলাটা খুলেই রেখেছি; চকচকে তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে

আর রূপালী চাঁদটা ভাগ করে দিয়েছে আমার ঘরখানা আসলে আর ছায়ায়। চারি দিক নীরব; কোথাও টু শব্দটি নেই। হাওয়া পর্যন্ত স্তব্ধ। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমাদের কনভেন্টের ভগিনী ভেবেনিকের কথা মনে পড়ে গেল—চাঁদ দেখে। তিনিও রাতের ওই গ্রহের মতই ত নিঃশব্দ, সুন্দর, পাণ্ডব; ভগবতের কোলাহলের বহু দূরে, কনভেন্টের পবিত্র পরিবেশে তিনি বাপন করছেন শান্ত নিবেদিত জীবন। কী তাঁর মহৎ চরিত্র! তিনি যে আমার এত ভালবাসেন, তার ক্ষমতা আমি আন্তরিক স্বখী; কারণ তাঁর মত স্নেহপ্রবণ ব্যক্তির ভালবাসা পাওয়ার যে কী অপরিমিত তৃপ্তি! সর্বদা তাঁর দেওয়া জুশটি আমি পরে বেড়াই।

এই সেপ্টেম্বর—প্রুয়ারভেনের প্রাসাদ; আমি আজ এই প্রাচীন প্রাসাদে বাস করছি; বড় ভাল লাগছে; একা ঘরন থাকি তখন এই অস্তিকার প্রাসাদের মাঝে অল্পভব করি এক বিস্তার, কেমন যেন অবসাদ—হা আমার আচ্ছন্ন করে দেয় বিবাদে, চিন্তায়। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাটা করা হয়েছে, সব কিছুই আমার মনোমত হয় রাতে, সেদিকে সবার নজর। গত কাল পাঁচটার সময় জমিদার ও তাঁর ভাই আমার আনতে গিয়েছিলেন; পেছন পেছন এসেছিল তাঁদের পরিবারের রাজকীয় গাড়ীটা। হেঁটে গেলেই ভাল হয় বলতে বাবা জোরে হেসে উঠলেন।

“গাড়ীটা দেখে বুঝি ভয় করছে রে খুকি? পড়ে যাবার শঙ্কা?” জমিদারও হাসল।

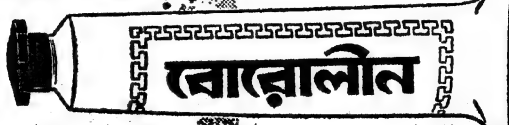


উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম

পরিবেশক—

জি. দত্ত এন্ড কোং

১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



বোরোলীন

সকল ষ্টেশনার ও  
ডাক্তারখানায়  
পাওয়া যায়।

## শৈশব ও কমনীয়তা

শীতের দিনে আপনার কোমল ত্বককে  
রক্ষার হাত থেকে রক্ষা করবে।

মুখশ্রীর কোমলতা ও সজীবতা  
বজায় থাকবে।

নিয়মিত বোরোলীন ব্যবহারে আপনার  
ত্বকশ্রী উজ্জ্বল ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

এর প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধ স্বেদ  
সর্বদা মনকে মাতিয়ে রাখবে।

“আমার কিছু মনে হয় না মাদামোয়েল,” সে বলল, “তোমার প্রজ্ঞাটা বেশ সৌন্দর্যী।”

মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে স্বতই অশ্রু নেমে এল চুই গাল রেখে বহু চোঁচায় তা বাধা মানল না।

“বা ব্যাঃ কান্ডে নেই,” তিনি বোঝালেন আমার, “দেখা শুইয়েই বন হল, আর, এসবই তোঁর ভালর জন্তে।”

বনের পথটাই সবচেয়ে ছায়াশীতল বলে আমরা সেদিক দিয়ে চললাম। আমার বাঁ দিকে জমিদার অস্ত্র দিকে তার ভাই। লুইয়ের প্রেস উঠলে জমিদার তার সবচেয়ে বিশদ ভাবে জানতে চাইল। গাভ্রকে আমি ভিজ্ঞাসা করেছিলাম জানেংকে পেয়ে তার মা খুশী কি না। সে জানাল যে ওর কাছে মন আর মাহিত রুচির মাঝে কোনও কিছু বলার কীক নেই। চারি ধারের মনোরম দুস্তর দিকে জমিদার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অন্তহুর্ষের সিন্ধুরে আলোয় সেই লয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তমসাহ্লর ব্যাধাতুর এই প্রোদান; যেই ও জুয়ের কোপ এবং নানারকম ঘাসে ঢাকা একটি পাহাড় উঁকি মারছিল প্রোদানের ঠিক পেছন থেকে। একটা বড় ফেত পার হতে হল; অকুপণ হুর্ষের আলোর পুষ্ট বব ওটের প্রাচুর্ষ চারি দিকে। গাছে গাছে পড়নি এখনো হেমন্তের হলুদ ছোপ। আজ অবধি এখানে চলছে গ্রীষ্মের রাজত্ব। কয়েকটি পাখি ও পাহাড়ের পাদদেশে দুখর একটি নদী ছাড়া আর সবই নীরব। প্রাচীন একটি খিলানের নীচে পাড়িয়ে জমিদারগিন্নী আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। সন্মহ আলিঙ্গনে তিনি আমার নিয়ে গেলেন কসবার ঘরে।

“সোনা আমার, তোকে এখনো পেয়ে যে কী আনন্দ হল!” বলে তিনি হেসেই ধমক নিলেন, “হ্যাঁ রে মাদামোয়া, তুই ওকে পাড়িতে আনলি না কেন রে?”

“মাদামোয়েল ষাটতেই চাইছিল, আর কথাটা আমায়ো মনঃপুত হল বলে ওকে বাধা দিইনি।” বলে সে হাসল।

তিনি আমার শুধালেন, “কিছু বাধা বলত, তুই স্তাভ হসনি?”

“মোটাই না। হেঁটে এলাম, বেশ ভাল লাগছে; বনের ওরাটা কী মিষ্ট!”—তারপর তিনি আমার বাপ-মার কুশল নিতে চাইলেন। তাঁর ভাই এসেছেন শুনলাম, কিন্তু কোথায় বেন রিয়েছেন, রাতে খাবার আগেই ফিরবেন।

“চল মা, তোঁর ঘরটা দেখিয়ে দিই। খাবার আগে একটু দূরে নে।”

তাঁর পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলাম—তাঁর ভাবার—“আমার বাঁ। সামনের মাঠ থেকে হাজার স্ববাস, আর জানলার ধারে মিষ্ট হুসুর গন্ধে ঘরটা আমোদিত। ঠিক নীচেই এক অপূর্ব বাগান। অনেক দূরে, একটা লম্বা নীল রেখা হুর্ষের আলোর স্বলমল

করছিল: তুই ত সন্মহ। অবীর হয়ে আমি ছুটে গোলাম কীতস-এ কাছ, জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে।

“কি সুন্দর ঘরটা যে লাগল! আপনি সত্যি বড় ভাল!”

তিনি অন্তরে অন্তরে অতি তৃপ্ত হলেন।

“বহি ভগবান করেন তবু তোকে চিরদিনের মত ঘরটা ছেয়ে দেব,” চিন্তাকুল অথচ প্রেমের তাঁর মুখ।

“তার পর তিনি বললেন, “হা মার্গরিথ, এ যে তোঁর নিজেরই বাড়ী; তোঁর প্রসাধন বহি আমার আগেই শেষ হয়, অপেক্ষা ন করে বিনা বিধির নিচে হলঘরে চলে বাস। ওখানে দেখিস তোঁকে পেয়ে সবাই কি কাণ্ডটা না করে।”

তিনি চলে গেলেন। আমি একা,—পাশের নিতৃত ককে গিয়ে অভ্যাস মত আমি নতজন্ম হয়ে বসলাম, সেখানে রাখা কুশের সামনে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাঁর অসাম কল্পণর জন্ত, আর প্রাচীন করলাম, তাঁর চোখে যা ভাল শুধু সেটুকু করবার অধিকার তিনি বেন দেন আমাকে। হে ভগবান! কমা কর আমার সমস্ত পাপ, পাণ্ডা যে আমার অঙ্গবা!—উঠে গেলাম, জানলার বাইরে তাকালাম তার পর সাদা মসলিনের একটা কাপড় পরলাম, বাঁধলাম নীর সাটিনের একটা ফিতে। এই পোষাক আমার বাবার খুব পছন্দ তাঁরী হয়ে নীচে গোলাম। হলঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি মাথার চুল ও নিমিড় গোঁফে স্তম্ভতার ছাপ পড়েছে, ছোট ছোট চোঁ মুত্তিতে ভরা। আমার দেখে তিনি এগিয়ে এলেন ও করমর্দন কত সোৎসাহে বললেন:

“তোমার আমি চিনি মাদামোয়েল, তোমার কথা চেন শুনেছি প্রারই আমার বোনের মুখে শুনি তোমার কথা; উল্লেখ বহি কখনো ওঠে, তিনি তোমার নামে অজ্ঞান,—আর এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলেন। আমি হচ্ছি কর্ণেল স্কেল।”

আমার মনে হল তিনি বেন আমার অন্তর অবধি দেখে নিচ্ছেন কারণ একান্ত দুঃস্থিতে তিনি কিছুকণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তা পর বললেন, “চল মা, বড় সন্তুষ্ট হলাম তোমার দেখে; ভেতরে চল।” আমায় হাত ধরে তিনি ‘হলে’ নিয়ে গেলেন। তাঁর পরিচর পেয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম; কারণ তাঁকে একটু কক্ষ মেজাজী ও কাঠোঠা গোছের কল্পনা করেছিলাম। কে জানত তিনি এত অমায়িক হলঘরে দেখি জমিদার আর তার ভাই বসে আছে। খোলা জানল দিয়ে দেখতে পেলাম, ছাতভরতি নানা রকম প্রতীমুর্তি আর হস্তাপ স্বন্দর স্বন্দর গাছপালা। কর্ণেল সাহেব ইতিমধ্যেই বেশ স্নেহাসহ হয়ে পড়েছেন মনে হল। জানেংকে দেখে, আর সে সুখী হয়েই জেনে পুলকিত হলাম। আমায় সে মধুর হাসি আর আরত নীর চোখের নীরব ভাবায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক : পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

[ মাসিক বন্ধুত্বমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



অপকল্প ও অনিন্দ্য

অপর্যাপ্ত অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
মিথ্য ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাড্জেয় প্রসাধনী।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম এল. বসু যুগাও কোং প্রাইভেট লি  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

লক্ষ্মীবিলাস বালি অভুলনীয়



# উটরোগ

(নাটক)

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]  
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

## চতুর্থ দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ বিশাখাগার  
স্বর্ষপাল, চন্দ্রশীলা ও রাজগুরু উদয়াদিত্য

উদয়াদিত্য। আমার আশীর্বাদ ত তোমার জন্ত সর্বদাই জাগ্রত আছে স্বর্ষপাল। তোমার আরোগ্য বিধানের জন্তে কোনো বাগ-বজ্র শাস্তি-বজ্রায়ন বাদ পড়বে না। কিন্তু—

স্বর্ষপাল। (করজোড়ে) আর কিন্তু নয় গুরুদেব! গত নয় মাস 'কিছু' 'কিছু' করে কোনো কল পাওয়া যায়নি, মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে গেছি। এখনো যদি কোন আশা থাকে ত আপনাদের আশীর্বাদ আর দৈব-অমুল্যগ্রহের মধ্যেই তা আছে।

উদয়াদিত্য। দৈবামুহুর্তনের সহিত লৌকিক প্রচেষ্টার যোগ থাকলে দৈবামুহুর্তনও জোরালো হয় বাবা! চিকিৎসা একেবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে না তোমার।

স্বর্ষপাল। একেবারে ত' ছেড়ে দিচ্ছিনে গুরুদেব,—প্রকৃত লজ্জিশীল কার্যক্রম চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসা-ভার অর্পণ করবার ব্যবস্থা করছি। আর যে চিকিৎসক আমাকে সারাতে পারবে, তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি।



উদয়াদিত্য—তোমার আরোগ্য-বিধানের জন্ত কোনো বাগ-বজ্র শাস্তি-বজ্রায়ন বাদ পড়বে না।

চন্দ্রশীলা। কিন্তু মহারাজ, তিন মাসের মধ্যে সারাতে না পারলে চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হবে, এ সর্তে বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও চিকিৎসার ভার নিতে সাহস করবে না।

স্বর্ষপাল। না কল্পেও খুব দুঃখিত হবে না মহারাজি। এ রোগে মৃত্যু অনিবার্য তা ত' বুঝতেই পারছি, নলন নলন

আর অমিষ্ট-বসায়নের হাত থেকে মুক্তিস্নাত ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তিভোগ ক'রে মরতে চাই।

উদয়াদিত্য। এ যন্ত্রব্যের দ্বারা তুমি কিন্তু আমাদের পীড়িত করছ স্বর্ষপাল!

স্বর্ষপাল। তা নিশ্চয়ই করছি, কিন্তু অনেক দুঃখে পীড়িত হ'য়ে তবে করছি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে) প্রধান মন্ত্রীমশায় এসেছেন মহারাজ!

স্বর্ষপাল। নিয়ে আর। (উদয়াদিত্যের প্রতি) যেদিন শঙ্কর মিশ্র আমার চিকিৎসার ভার দত্তভাট্টের হাতে দিয়েছিলেন, সেদিন মনে হয়েছিল রোগ কঠিন। তার পর তিন মাসের মধ্যে দত্তভাট্টকে নিয়ে তিন জন বৈজ্ঞানিক হার মানায় বুঝেছি, এ রোগ সাবাবার রোগ নয়।

(বল্লভাচার্যের প্রবেশ)

বল্লভাচার্য। জয় হোক মহারাজী-মহারাজার!

স্বর্ষপাল। জয় হোক।

বল্লভাচার্য। (উদয়াদিত্যের নিকটে গিয়ে পদমূলি গ্রহণ)

উদয়াদিত্য। কল্যাণ হোক।

স্বর্ষপাল। আসন গ্রহণ করণ প্রধানমন্ত্রী মশায়! তারপর? যোষণার সব ব্যবস্থা করেছেন ত?

বল্লভাচার্য। আছে হ্যাঁ, ব্যবস্থা প্রস্তুত।

স্বর্ষপাল। নিজ রাজ্য ছাড়া আর কোন্ কোন্ রাজ্যে যোষণা প্রচার করছেন?

বল্লভাচার্য। তা, অনেক রাজ্যেই করেছি। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য-রাজ্য পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা।

স্বর্ষপাল। উত্তম।

বল্লভাচার্য। কিন্তু মহারাজ! আমার আশঙ্কা, এর দ্বারা কোনো কল হবে না।

স্বর্ষপাল। আপনাদের আশঙ্কা, আমার বিশ্বাস। যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে আপনি যোষণার ব্যবস্থা করেছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার লোভের দ্বারাও মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে পারবে না।

বল্লভাচার্য। আমার অপরাধ কমা করবেন মহারাজ! তাই যদি হয়, তা হলে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করছেন তা ত' আশ্বহত্যারই নামাঙ্কর।

স্বর্ষপাল। আমি ব্যবস্থা করছি আশ্বহত্যার নামাঙ্করের, আপনি কেউ হ'লে এর বহু পূর্বে আশ্বহত্যাই করত।

বল্লভাচার্য। মহারাজ! আমি আপনাদের সভাসদগণের সুখপার হ'য়ে আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাতে এসেছি।

স্বর্ষপাল। কি বলুন?

বল্লভাচার্য। চিকিৎসা বিষয়ে আপনার এ সিদ্ধান্তের আপনি দয়া ক'রে পুনর্বিবেচনা করুন।

চন্দ্রশীলা। (সাগ্রহে) মহারাজ! আমি অন্তরের সঙ্গে এ প্রার্থনার যোগ দিচ্ছি।

উদয়াদিত্য। আমি এ প্রার্থনা প্রবল ভাবে সমর্থন করছি স্বর্ষপাল। চিকিৎসা ভূমি পরিভ্রমণ কোরো না।

স্বর্ণপাল। (করজোড়ে) আপনি আশীর্বাদ করুন জরুরে, আমাকে যেন চিকিৎসা পরিচর্যা করতে না হয়; নীজই যেন হৃদ্য-দণ্ড অতিক্রম করবার যোগ্যতা নিয়ে অপরাধের চিকিৎসক দেখা দেয়।

### প্রথম দৃশ্য

চৈতন্য

দেবরাজ উপাখ্যায়ের গৃহ

[প্রভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে দেবরাজ উপবিষ্ট]

(দেবরাজের স্ত্রী নারায়ণীর প্রবেশ)

নারায়ণী। শুনছ?

দেবরাজ। (অন্তমনস্ত ভাবে) না।

নারায়ণী। (উচ্চতর কণ্ঠে) বলি, শুনছ?

দেবরাজ। হ্যাঁ।

নারায়ণী। কি শুনছ?

দেবরাজ। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার নৃপূর্ণ-নিষ্কাশ। যিনি-যিনি যিনি-বিনি করতে করতে তারা আসছে তোমার ভাগ্যের আলো করতে।

নারায়ণী। তার আগে আর একটা জিনিসের আশা দরকার।

দেবরাজ। কিসের বল ত?—আটার?

নারায়ণী। হ্যাঁ। হুটো পেটের সিক্ত-পরিমাণ আশুন নেবাতের পাত্রে, বাড়িতে ততটুকুও আটার সংস্থান নেই, ওদিকে তুমি লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রার স্বপ্ন দেখছ!

দেবরাজ। স্বপ্ন নয় নারায়ণী, স্বপ্ন নয়। একবারে সত্যি। সিংহগড়ের রাজা স্বর্ণপালের পক্ষ থেকে যে বোঝা ক'রে গেছে তা শুনেছ ত?

নারায়ণী। শুনেছি।

দেবরাজ। আমি সিংহগড়ে গিয়ে রাজাকে বোঝানোর ক'রে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার নিয়ে আসব।

নারায়ণী। এ কথা বলছ, অথচ বলছ স্বপ্ন দেখছ না? আমাদের মহারাজার প্রধান বৈজ্ঞানিক গোবিন্দ শর্মা পশ্চিম-ভারতের সকলের বড় কবিরাজ। তিনিই যেতে সাহস করলেন না, কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক-কবিরাজ হার মেনে গেল, আর তুমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গ জান না, তুমি বাবে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করতে? সে যেও রাজ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, দিনের বেলা বাও, যদি পার কিছু আটা জোগাড় ক'রে আনতে।

দেবরাজ। আটা আমি যে রকমে পারি এনে দিচ্ছি; কিন্তু সিংহগড়ে বাবই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গ জানিনি সে কথা ঠিক, কিন্তু বড় বড় কবিরাজ-বৈজ্ঞানিক যখন হার মেনেছে তখন কেতেই পারছ, এ রোগ বিজ্ঞানের সারবার নয়। যদি সারে, ক্ষিতে সারবে।

নারায়ণী। বুদ্ধিতে কখনো রোগ সারে?

দেবরাজ। না যদি সারে তার দণ্ড ত' স্বর্ণপাল ঠিক করেই রাখছেন। অর্ধের এই নিদারুণ অভাব আর সহ হয় না নারায়ণী, দাগাপরীকী করতেই হবে। অর্ধ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে কিরব, ইলো এ দুশিত-জীবন শেষ হওয়াই ভাল।

নারায়ণী। কিন্তু আর একটা জীবন?

দেবরাজ। সে জীবন যখন হুটো নৌকোর আশ্রয় নিয়েছে তখন তার অদৃষ্টে হয় ভাঙ্গা নর ডোবা আছেই। কাল সকালে স্বর্ণপালের তিন দণ্ড পূর্বে সিংহগড় রাজ্য করব।

নারায়ণী। ওগো, এ ত' তা হলে আশ্চর্য্য করাতে বাওরাই হবে!

দেবরাজ। জীবন-সংগ্রামে লড়তে গিয়ে এ আশ্চর্য্যতা না খেয়ে মরার চেয়ে গৌরবের হবে নারায়ণী! তা ছাড়া, এত হতাশ হবারই বা কি কারণ আছে? শাস্ত্রে বলে বুদ্ধিমান বলত তত্ত্ব। বুদ্ধিবলে শশক সিংহর গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল, আর আমি স্বর্ণপালের শূল থেকে পারব না?

নারায়ণী। চৈতন্য থেকে সিংহগড় কতখানি পথ?

দেবরাজ। পঁচিশ কোশ।

নারায়ণী। এই পঁচিশ কোশ হেঁটে যাবে?

দেবরাজ। কেপেছ? দীপকমলের টাট ঘোড়াটা চেরে নিয়ে সওয়ার হ'য়ে যাবে।

নারায়ণী। সেই ঘিয়েভাজা হাড়ডিম্বার ঘোড়াটার চ'ড়ে যাবে তুমি?

দেবরাজ। সওয়ারই বা কোন্ নাহুস-মুহুর নারায়ণী? ঘোড়া আর সওয়ার বেমানান হবে না।

নারায়ণী। না, বেমানান হবে না। পথের খানিকটা সওয়ার বাবে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, আর খানিকটা ঘোড়া বাবে সওয়ারের কাঁধে উঠে। পথে যাবে কি, খাওয়াবেই বা কি?

দেবরাজ। খাব ভিক্ষান্ন, আর খাওয়াব পথের ঘাস। রত দিন না ফিরি তুমিও বেচে-বুচে চেয়ে-চিন্তে বেমন ক'রে পার দেহে প্রাণটা বজায় রেখো। আর দেখ, তোমার কাছে লাল রঙের গুঁড়ো ছিল না?

নারায়ণী। আছে। লাল রঙে আবার কি হবে?

দেবরাজ। কাজে লাগবে নারায়ণী, কাজে লাগবে। সামান্য একটু নেকড়ায় বেঁধে দিও। আর পাজিও ত' একটা চাই—(একটু চিন্তা ক'রে) সে রাজপুরীতে সোনারূপের অনেক পার মিলবে।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণ

পাহারার প্রহরী

[ধূলিধূসরিত দেবরাজ অকূরে ঘোড়া বেঁধে তোরণের সম্মুখে এসে প্রবেশোত্ত]

প্রহরী। (হাত দিয়ে আটকে) কোথা যাও?

দেবরাজ। (জুরুনেত্র) রাজপুরীতে।

প্রহরী। কার কাছে?

দেবরাজ। মহারাজার কাছে।

প্রহরী। (সর্বোৎসাহে তর্জন ক'রে) পালা! কানাকড়ির জিহ্বা, মহারাজার কাছে যাবেন! পালা এখান থেকে, নইলে এখনি বন্দী করব।

দেবরাজ। (ভীতকণ্ঠে) কী করবে আমাকে? একবার ক'রে দেখ না মজাটা। এই কানাকড়ির বন্দীকে শেষ পর্যন্ত বন্দনা করতে না হয়। ছাড়ো পথ, আমার সময় নষ্ট কোরো না।

প্রহরী। (কতকটা নরম স্বরে) কে তুমি?

দেবরাজ। আমি মহাচণ্ড অশানবাসী হুঁং-ক্রৈট গোত্রের তাত্ত্বিক দেবরাজ উপাধ্যায়।

প্রহরী। কি কাল এখানে?

দেবরাজ। মহারাজার অস্থল শুনে নিফোটা আসন থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ প্রয়োগের আজ প্রাপ্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হয়েছ। (উচ্চতর কণ্ঠে) তুমি রাজকোষী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজ দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করে তোমার কর্তৃত্বের পর তোমার জায়গার উত্তম সিকে বাহাল করা। আপাতত ফিরে চললাম।

প্রহরী। (খপ ক'রে দেবরাজের হাত ঢেপে ধ'রে) পোন। উত্তম সি কে?

দেবরাজ। মধ্যম সিএর বড় ভাই।

প্রহরী। মধ্যম সি আমার কে?

দেবরাজ। উত্তম সিএর ছোট ভাই। হাত ছাড়ো, এখন তোমার ব্যবস্থার মহা-ভুলসবট আসনে বসতে হবে।

প্রহরী। (এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে হাত ছেড়ে দিয়ে) উত্তম সি মধ্যম সিরের আমি জানিনে, আপনি কিন্তু আমাকে অধ্যম সি বলে জানবেন। (মাথা থেকে শিরশ্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের লক্ষ্যে রেখে) আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি প্রভু! আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

দেবরাজ। তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দাও।

প্রহরী। মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। ঐ প্রধানমন্ত্রী মশায় এগিকে আসছেন, আমি ওঁর কাছে আপনার কথা বলছি, উনি আপনাকে মহারাজার কাছে নিয়ে যাবেন। (করজোড়ে) কিন্তু প্রভু, আপনি যেন ওঁর কাছে—

দেবরাজ। কমা বধন করেছি, কোনো ভয় নেই তোমার।

(বলভাচার্যের প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদন ক'রে) প্রভু, ইনি মহাতাত্ত্বিক, মহারাজকে সারাবার জন্মে এসেছেন।

বলভাচার্য। (দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?

দেবরাজ। হ্যাঁ, সারাব বই কি।

বলভাচার্য। কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল, তা জানেন ত?

দেবরাজ। সব জানি মন্ত্রীমশায়। চৈতন্য থেকে সিংহগড় এই দীর্ঘপথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন বিতে আসিনি, পরে

জীবন মিটেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখানে আমি অর্ধোপার্জনই করব। প্রাণত্যাগ করব না।

বলভাচার্য। ভগবানের অমুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্ধোপার্জন করেই যান।

দেবরাজ। কাকর অমুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কাজ আমি নিজের বিত্তবুদ্ধির অমুগ্রহেই করব।

বলভাচার্য। তাতেও আমরা কম খুসি হব না। এখন চলুন, মহারাজের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।

[ উত্তরের প্রস্থান। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর—বিগ্রাম কক্ষ

সুর্ষপাল ও চন্দ্রশীলা

চন্দ্রশীলা। সেই ভক্তই ত বলেছিলেন মহারাজ, এ ব্যবস্থার প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হবে। এত ভয়ঙ্কর দণ্ডের বিধান আপনি করেছেন, মহা শক্তিশালী চিকিৎসকও আসতে সাহস করছে না। একটা বা-হোক চিকিৎসা চলে এই ভিন মাসে খানিকটা উপকারও ত' হ'তে পারত।

সুর্ষপাল। তা বলা যায় না মহারাজি, তাতে অপকারও হ'তে পারত। শনি যেখানে কুপিত হয়েছে সেখানে রাহুর আরাধনা করলে শনি আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

চন্দ্রশীলা। আজ কেমন বোধ করছেন?

সুর্ষপাল। এ প্রশ্নর উত্তর দিয়ে তোমাকে খুসি করতে পারব না চন্দ্রা!

চন্দ্রশীলা। একটু নাচ দেখবেন?

সুর্ষপাল। না।

চন্দ্রশীলা। গান শুনবেন?

সুর্ষপাল। না। একেবারে হতাশ হয়ে না চন্দ্রা,—এখনো মহারাজির মুখচন্দ্র তার চন্দ্র হারায় নি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (অভিবাদনান্তে) প্রধান মন্ত্রীমশায় দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন।

সুর্ষপাল। আসুন এখানে।

[ পরিচারিকার প্রস্থান। ]

সুর্ষপাল। আবার কি দরকার পড়ল কে জানে? রাজকাঁধে আর ভাল লাগে না মহারাজি!

(বলভাচার্যের প্রবেশ)

বলভাচার্য। জয় হোক মহারাজের।

সুর্ষপাল। বহন। কি সুবাদ?

বলভাচার্য। সুসুবাদ মহারাজ। আপনাকে চিকিৎসা করতে একজন চিকিৎসক এসেছে।

চন্দ্রশীলা। (হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে) এসেছে? সর্বত্র কথা জানে ত?

বলভাচার্য। লক্ষ্য জানে মহারাজি। মহারাজকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চয়শ্বর।



একটি-দুইটি সি আশায় কে?

চন্দ্রশীলা। জর বাবা কখনাথ। বুধ ভুলে চাও। তোমাকে  
মি হুঁহাজার ভবি সোনার সিংহাসন দোবো।

সুৰ্যপাল। কি জাত ?

বলভাচার্য। ব্রাহ্মণ,—তাত্ত্বিক।

সুৰ্যপাল। (উৎফুল্ল ভাবে) তাত্ত্বিক ? তাত্ত্বিক পদ্ধতিতেই  
বুধ দেবে না কি ?

বলভাচার্য। সেই রকমই ত বলে।

সুৰ্যপাল। সে কথা ভাল। ভেবজশক্তির সঙ্গে মন্ত্রশক্তির  
গাণ হ'লে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

বলভাচার্য। উপকার হলে ত আমরা বেঁচে বাই মহারাজ !  
কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।

সুৰ্যপাল। তা হোক্। তাত্ত্বিকদের চেহারা ভাল হয় না।

বলভাচার্য। মহারাজ, তাত্ত্বিক না হয় সে নিজে, তার বোড়া ত  
যার তাত্ত্বিক নয় ?

চন্দ্রশীলা। বোড়াও খুব খারাপ দেখতে না কি ?

বলভাচার্য। মহারাজি, সওয়ার বলে আমার দেখে, বোড়া বলে  
লামায় দেখে, ওরা হুঁজনে চৈতন্য থেকে সিংহগড় এই পঁচিশ ক্রোশ  
কি ক'রে যে বেহ বজায় রেখে এসেছে, সেটা পরমশ্রমের কথা।

সুৰ্যপাল। ডাকিয়ে পাঠান তাকে।

বলভাচার্য। অলিন্দে পাড়িয়ে আছে, আমি নিজেই নিয়ে  
আসি। [নিঃস্রাস্ত।

চন্দ্রশীলা। আমি না হয় পাশের কক্ষে অপেক্ষা করি মহারাজ।

সুৰ্যপাল। তা করতে পার।

[চন্দ্রশীলার প্রস্থান, কিছু পরে দেবরাজ ও বলভাচার্যের প্রবেশ।

দেবরাজ। জর হোক মহারাজার।

সুৰ্যপাল। (দেবরাজের মূর্তি দেখে একটু হতভাল হ'য়ে) তুমি  
আমাকে সারাতো পারবে ?

দেবরাজ। নিশ্চয় পারব।

সুৰ্যপাল। তিন মাসের মধ্যে ?

দেবরাজ। তিন মাসের মধ্যে বলছেন কি মহারাজ ! (হাতের  
স্তিন আঁচল দেখিয়ে) তিন দিনে আপনাকে সারাবো।

সুৰ্যপাল। তুমি পাগল !

দেবরাজ। মহারাজ, এ পর্যন্ত ধারা আপনার চিকিৎসা করেছেন,  
তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন ?

সুৰ্যপাল। না, তাঁরা কেন পাগল হবেন ?

দেবরাজ। (করজোড়ে) মহারাজ, মার্জনা করবেন, গৃহ  
মন্ডিরের লোকেরা যখন স্রব্ধি করতে পারেনি, তখন একবার  
পাগলকে পরীক্ষা করেই দেখুন না ? আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন  
যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্রদানে কৃত্তক যোগের দ্বারা শিববিদ্যুর  
চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্ভূত ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত'  
কি ? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসিনি মহারাজ !  
মহাচণ্ড শ্রদানে ঊনকট ভৈরবের যে মণিরওহা নির্ধাণ করব, আমি  
এসছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি  
আপনাকে নিঃসন্দেহে বলে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন  
এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ স্বর্ঘ্যরূপে আপনাকে  
দিতে হবে।

সুৰ্যপাল। (উৎসাহ জরে) তা যদি দিতে হয় ত' এক লক্ষ  
নয়, হু' লক্ষ স্বর্ঘ্যরূপে তোমাকে দেব ; কিন্তু তা যদি না হয় তা  
হ'লে—

দেবরাজ। তা হ'লে পঞ্চম দিনের সকালে আমাকে মূলে  
চড়াবেন মহারাজ। আপাততঃ আপনার রাশি কি, আমাকে বলুন।

সুৰ্যপাল। সিংহ রাশি।

দেবরাজ। আর মহারাজি ?

সুৰ্যপাল। বুধ রাশি।

দেবরাজ। (নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে  
রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ  
ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।

সুৰ্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। (একটু স্থির ভাবে দেখে) আচ্ছা, এবার ঠিক  
উঠে—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।

সুৰ্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন।

সুৰ্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। কোনো ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে  
স্বস্থ ক'রে দেব। তবে বোগশাস্তির পর 'হুঁত' দান  
রবিনন্দন' করতে হবে।

সুৰ্যপাল। সে কি ?

দেবরাজ। সে অতি সামান্য ব্যাপার, বথাকালে জানিয়ে  
পারবেন। এখন আমি ঢালাম, সন্ধ্যার সময়ে গৃহস্থ নিয়ে আসি  
আর সেই সময়ে ঐষদ সেবনের নিয়ম আপনাকে জানিয়ে দোবো।

সুৰ্যপাল। নিয়ম খুব কঠিন না কি ?

দেবরাজ। আছে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, জলের মতে  
সোজা, আপনা-আপনিই পালন হ'য়ে যাবে। কিন্তু কঠিনই হোক  
আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে গৃহস্থ উপকার কেন হত  
বলুন ?

সুৰ্যপাল। সে ত' সত্যি কথা। তোমার কোনো চিন্তা নেই  
নিয়ম আমি অন্ধরে অন্ধরে পালন করব।

দেবরাজ। তা হ'লেই হ'ল। বিশেষতঃ এই চিকিৎসার বন্ধ  
আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।

সুৰ্যপাল। বটেই ত। (বলভাচার্যের প্রতি) ব্রাহ্মণকে নিতে  
গিয়ে আহায এক বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।

দেবরাজ। (করজোড়ে) একা নই মহারাজ, সঙ্গে একটি ভূম  
আছে।

সুৰ্যপাল। (স্মিতহাস্তে) একেবারে তুলল—(প্রধান মন্ত্রী  
প্রতি) আচ্ছা, তারও নানাপানির ব্যবস্থা ক'রে দিন।

বলভাচার্য। যে আছে। গৃহপাল মহাশয়কে উপযুক্ত উপদেষ্টা  
দিচ্ছি।

দেবরাজ। (বলভাচার্যের প্রতি) মন্ত্রীমহার, আপনি বাম  
প্রাসাদে আর বাইরে ঢেঁড়া শিটিয়ে ঘোষণা ক'রে দিন, যেউৎসর্গ  
ব্যাপিতে মহারাজ প্রায় মৃত্যুর দ্বারে এসে হাজির হয়েছেন, আজ থেকে  
চতুর্দশ দিনে তা থেকে তাঁর বৈবাহিক বিবৃতি। তাত্ত্বিক প্রকৃষ্ণ  
অত্যন্ত বদল দেখবার জন্য সন্দেহাবশত প্রকৃত হোক।

সুৰ্ধপাল। আগে থেকে ঘোষণা করা ভাল হবে কি ?

দেবরাজ। আপনাকে পরীক্ষা করে আমার খবন একেবারে হৃৎ প্রত্যয় হয়েছে, তখন ভাল না হবার কি কারণ থাকতে পারে বলুন ? তা ছাড়া মহারাজ, একটা প্রত্যাশাময় পরিবেশে আপনার আরোগ্য দ্রুত হ'তে পারবে। আর আমার দারিদ্রবোধও উৎসাহ লাভ করবে।

সুৰ্ধপাল। ( বজ্রভাচারের প্রতি ) তা হ'লে দিন ঢেঁড়া পিটরে।

দেবরাজ। আর দেখুন মন্ত্রীমশায়, ঢেঁড়ার ঘোষণায় এটুকু বাক্য জুড়ে দেবেন যে, জনসাধারণ যেন পঞ্চম দিবসে দুটি অমৃত্যুনের মধ্যে একটির জন্য প্রস্তুত থাকে, হয় সকলে দেবরাজের শূলারোহণ, নয় রাতে মহারাজের আরোগ্যলাভে মহামহোৎসব।

( রাজা ও মন্ত্রীর পূর্বস্বরের দিকে অর্ধস্বর্ণ ভাবে অবলোকন )

দেবরাজ। আর দেখুন, আমার পিছনে দু'জন সতর্ক প্রহরী মোতায়ন করে দিন।

বজ্রভাচারী। ( সন্নিহিত ) কেন বলুন দেখি ?

দেবরাজ। রাতে দিন চারেক পেট ভ'রে রাজভোগ খেয়ে নিয়ে প্রাণদণ্ডের ভয়ে গা-ঢাকা দিতে না পারি।

সুৰ্ধপাল। হাঃ হাঃ হাঃ! সে জন্তে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না দেবরাজ! গা-ঢাকা দেবার একবার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে, অনেক প্রহরীই তোমার গায়ের প্রতি মোতায়ন আছে।

দেবরাজ। বাক, তা হ'লে ত' চুকেই গেল। এবার আমি তা হ'লে চলি। কিন্তু বাবার আগে ধূলাপায়ের মললাচারটা করে বাই। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিন বার বলুন—ক্রি—কটু ক্রি—কটু ক্রি—কটু।

সুৰ্ধপাল। ( এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ) ক্রি—কটু ক্রি—কটু ক্রি—কটু।

দেবরাজ। ( নিজে গভীর মুখে ) ক্রি—কটু ক্রি—কটু ক্রি—কটু। ( বজ্রভাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ) আপনিও তিন বার বলুন।

বজ্রভাচারী। ( ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে ) আমি বলব ? কিন্তু আদ্যার ত' কোনো—

দেবরাজ। আর মশায় ব'লেই কেলুন না। তাত্ত্বিক প্রার্থনার বোগ দিতে আপত্তির কি আছে ? ব'লে কেলুন,—অধিকতর ন প্রার্থনা।

বজ্রভাচারী। ক্রি—কটু ক্রি—কটু ক্রি—কটু।

দেবরাজ। উত্তম। এবার তা হ'লে আসি মহারাজ!

সুৰ্ধপাল। এস।

দেবরাজ। মহারাজার জয় হোক। [ প্রস্থান। ]

### তৃতীয় দৃশ্য

সিংগড় রাজপথ

নেপথ্যে ঢেঁড়া পেটার শব্দ—ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া

( সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়াবাদক ও ঘোষণাকারীর প্রবেশ )

ঘোষণাকারী। শোন শোন নগরবাসী আর নগরবাসিনী! দিন শুভ সুবাদ! মহাপ্রতীক্ষিত তাত্ত্বিক চিকিৎসক শ্রীদেবরাজ পায়ার মহারাজের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছেন।

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া—

ঘোষণাকারী। কান পেতে মন দিয়ে শোন সকলে—তাত্ত্বিক মশায় সর্ভ করেছেন তিন দিন ঔষধ পানের পর মহারাজ যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করেন তা হ'লে নিজে গিয়ে শূলারোহণ করবেন তোমাদের প্রতি তাঁর অনুরোধ, আগামী সোমবার দুটি অমৃত্যুনের মধ্যে একটির জন্য প্রস্তুত হও—হয় প্রাতঃকালে তাত্ত্বিক মশায়ের শূলে স্বয়মারোহণ, নয় মহারাজার আরোগ্যলাভে হেতু রাত্তিকালে আনন্দোৎসব।

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া—

ঘোষণাকারী। কান পেতে মন দিয়ে শোন সকলে—মহারাজের আরোগ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক মশায় একেবারে নিঃসন্দেহ ব'লে শূলারোহণের কথা বলতে পেরেছেন—সুতরাং তোমরা আনন্দোৎসবে নীপমালার জন্তে সপ্তে পাকাতে আরম্ভ কর।

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া-ঢেঁড়া।

[ উভয়ে প্রস্থানোত্তত। ]

( উভয়ের পিছনে পিছনে কয়েক জন নর-নারীর গমন )

১ম পুরুষ। বাবা! আমার ছেলে পা ভেঙেছে—তাত্ত্বিক মশায়ের দয়া হয় না ?

নারী। বাবা! আমার সোয়ামী হাঁপানীতে সারা রাত জাগে—তাকে যদি দয়া করে—

২য় পুরুষ। বাবা! আমার ইস্ত্রী ঢেলা কাঠ নিয়ে নিতাই আমাকে তিন বার পিটায়—তার মেজাজটা একটু যদি—

[ সকলের প্রস্থান। ]

নেপথ্য হ'তে 'শোন, শোন, নগরবাসী, আর নগরবাসিনী'।

( শব্দ মিশ্র ও দত্তভাষুর হৃদিক দিয়ে প্রবেশ )

দত্তভাষু। প্রণাম হই মিশ্রজী! কি ব্যাপার বলুন ত' ?

এ যে একেবারে ভেঁক লাগিয়ে দিলে।

শব্দর মিশ্র। আমি চিকিৎসক,—চিকিৎসকের নিদান করব ?

দত্তভাষু। করুন।

শব্দর মিশ্র। দেবরাজ আর বাই হোক, চিকিৎসক নয়, সম্ভবতঃ তাত্ত্বিকও নয়। তবে প্রাণদণ্ড অবধারিত জেনেও কেন এমন কার্যে অগ্রসর হয়েছে, এইটুকু নিদান মিলছে না।

দত্তভাষু। যদি অমুমতি করেন, আমি ওটুকু মিলিয়ে দিই।

শব্দর মিশ্র। বেশ ত' দাও।

দত্তভাষু। জ্বর খার্য অহরহ হুঃহুঃ রক্তা লাভের কলে দেবরাজ বৈধ উপায়ে আশ্বহত্যা করতে এসেছে। পৃথিবী ত্যাগ করতে চায় কয়েক দিনের রাজভোগের পর।

শব্দর মিশ্র। হাঃ হাঃ হাঃ! নিতান্ত মন্দ মেলাও নি।

কিন্তু সে বাই হোক, দত্তভাষু, সর্গান্তকরণে কামনা করি মহারাজ আরোগ্য লাভ করুন, কিন্তু একান্তই যদি সেই শুভ ঘটনা ঘটে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঝাঁকর করে নিয়ে চরক-সুশ্রুতকে বিদায় দোব। কবরজি ওষুধের পোকান তুলে দিয়ে অশানক্ষেত্রে আলানি কার্ত্তর পোকান খুলব।

দত্তভাষু। আর, আমি বনে গিয়ে আপনার আলানি কার্ত্তর চালানলার হব।

শব্দর মিশ্র। এ ব্যবস্থা অতি উত্তম হবে। মোক্ষের নিদানের



ল ছেড়ে দিয়ে তোমাকে আমাকে শবের নিদ্রার হাল ধরা  
ব: হা: হা: হা: ...আচ্ছা, আসি।

দস্তভায়। (অভিবাদন করি) আসুন।

(পট পরিবর্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

বিশ্রাম কক্ষ

সন্ধ্যাকাল

স্বর্ণপাল ও চন্দ্রশীলা

চন্দ্রশীলা। প্রধান মন্ত্রী বলছিলেন, চেতারা দেখলে শ্রদ্ধা হয় না,  
স্তু বেতে-আসতে আমি বস্তুক্ দেখলাম, চেতারা ত' এমন কিছু  
প লাগল না মহারাজ! চেতারায় বেশ যেন একটু ইয়ে আছে।

স্বর্ণপাল। তাছাড়া, দেবরাজের কথা ত' এ পর্যন্ত শোননি।  
নলে বৃকতে কথাবার্তার মধ্যেও প্রচুর ইয়ে।

চন্দ্রশীলা। (সোৎসাহে) তাই নাকি? (তারপর স্বর্ণপালের  
থ কৌতুক হাসির কামেজ দেখে) ও! পরিচাস করছ মহারাজ?

স্বর্ণপাল। (হাসিমুখে) পরিচাস করলেও ইয়ে করছিনে চন্দ্রা!

চন্দ্রশীলা। কি করছ না?

স্বর্ণপাল। অবিশ্বাস করছিনে। দেবরাজের ভাবভঙ্গি দেখে

আর কথাবার্তা শুনেই সত্যিই মনে হয় সে সাধারণ মানুষ নয়,—  
সম্ভবতঃ কিছুটা অসৌক্যিক শক্তি ধারণ করে।

চন্দ্রশীলা। সম্ভবতঃ নয় মহারাজ, নিশ্চয়। তা নইলে  
এমন কর'রে কেউ নিজে উৎসাহী হ'রে নিজের শূলদণ্ডের চোঁড়া  
পেটায়?

স্বর্ণপাল। তাছাড়া, মধ্যাহ্নে দেবরাজ যে পরিমাণ দই—আর  
মণ্ডা উদরসাৎ করেছে, শুনলাম, তার দ্বারা জীবনের প্রতি তার  
কিছুমাত্র অস্পৃহা অথবা শূলদণ্ডের জন্ত কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা প্রমাণ  
হয় না।

চন্দ্রশীলা। তা হ'লেই বোকা যাচ্ছে, তোমার আরোগ্যের  
বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (অভিবাদনান্তে) ঔষধ নিয়ে তাত্ত্বিক মহাশয়  
উপস্থিত হয়েছেন মহারাজ!

স্বর্ণপাল। এখানে নিয়ে এস তাঁকে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

চন্দ্রশীলা। জয় বাবা রক্তনাথ! দেবরাজের দেহ ধারণ করিয়ে  
ধনুস্তরিক পাইও।

(স্বর্ণপালে লাল রঙের তরল পদার্থ সহ দেবরাজের প্রবেশ)

দেবরাজ। জয় হোক মহারাজী-মহারাজের!



উৎসবের দিনে



কে. হোডের

মুবাঙ্গিত  
প্রসাধন সামগ্রী

কে. হোড এও কোং

কলিকাতা-১৪

চন্দ্রশীলা। (আমন ভ্যাগ করে উঠে) জর হোক আপনার উপাধায়কী!

দেবরাজ। (চন্দ্রশীলার হাতে ঔষধের পাত্র দিতে গিয়ে থমকে ধাঁড়িয়ে পড়ে হর্ষবিহারিত নেত্রে কক্ষপাল চন্দ্রশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আহা, কী দেখলাম!

সুর্বপাল। কি দেখলে দেবরাজ?

দেবরাজ। দেখলাম, সুস্থ ভবিষ্যতের এক অপূর্ণ চিত্র!

মহারাজীর মুক্তার মত দম্ভগুলি সমস্ত পড়ে গেছে, রাধার ভ্রমরকুম্ভ বেশ কাপ-কুলের মতো সাঁপা হয়েচে, আর তার মধ্যে হল-হল করছে লাল রঙের উজ্জল সিঁদুর-রেখা। সাধ্য কি কোনো দুইগ্রহ আপনার ক্ষতি করে!

চন্দ্রশীলা। জর হোক আপনার দেবরাজ্ঞী! (আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে চন্দ্রশীলা দেবরাজের পদস্পর্শ করতে উজ্জত)

দেবরাজ। (তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে) হাত পরিষ্কার রাখবেন, রাণীমা, আপনার হাতেই ওষুধ দোবো।

চন্দ্রশীলা। (হু' হাত পেতে তক্ষি ভরে ঔষধ নিয়ে) কোথায় রাখব ওষুধ?

দেবরাজ। উপস্থিত ঐ পুষ্পাধারের পাশে রাখুন, পরে শয়ন-কক্ষে নিয়ে যাবেন।

সুর্বপাল। ঐ মহাসনে উপবেশন কর দেবরাজ।

দেবরাজ। (উপবেশন করে) মহারাজ, তিন দিন ঔষধ পান করলে আপনার দেহের রক্ত বা উপস্থিত ব্যাধির আক্রমণে পাণ্ডুবর্ণে ধাঁড়িয়েছে, এক পক্ষ কালের মধ্যে আমার ঔষধের মত লাগতে ব'র ধারণ করবে।

সুর্বপাল। উত্তম কথা। এইবার ঔষধ পানের নিয়ম বল?

দেবরাজ। নিয়ম কঠিন নয়, কিন্তু ধুঁচিলাটি কিছু আছে। মনোবোপ দির তত্বন।

সুর্বপাল। বল।

দেবরাজ। রাণীমা, আপনিও ভাল করে তত্বন।

চন্দ্রশীলা। আছে হ্যাঁ, শোনবার জন্য প্রস্তুত আছি।

দেবরাজ। আজ থেকে তিন রাত্রি আপনি মহারাজীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালাকে পুর্বাশ্রয়ে শয়ন করবেন। উষ্মের পাড়াট সমস্ত রাত পালকের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যুষে উঠে আমাকে ডাকিয়ে আনাবেন। আমি আপনার শয়ন-ঘরের বাইরে অলিঙ্গ অপেক্ষা করব। তার পর মহারাজী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ সেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পুর্বমুখে ব'লে সমস্ত ওষুধটা চুষুক গিয়ে থেকে কেমনে। তার পর আমাকে ডাকলে আমি ভেতরে গিয়ে আপনার বাঁ হাত ধ'রে রৈবশন মন্ত্র পড়লে আপনার উষ্ণ ওষুধের সঙ্গে তাত্ত্বিক প্রত্যেক একটা দৈনন্দিক বিলন ঘটবে।

সুর্বপাল। তার পর?

দেবরাজ। তার পর আর কিছু না। আবার কাল সন্ধ্যার দশ এক পান ওষুধ দিয়ে বাব, বেটা ঠিক একই পদ্ধতিতে পরত পরতে থাকবে।

সুর্বপাল। বাস?

দেবরাজ। বাস। এমনি তিন দিন।

সুর্বপাল। আর কোনও নিয়ম নেই?

দেবরাজ। আর একটা মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল আপনার এ ব্যাধির মূলে উত্তীর্ণা গোধ আছে, ওষুধ ধাবার সময়ে আপনি কমাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার ত হবেই না, উলটে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।

সুর্বপাল। (সকৌতুকে) উট কি?

দেবরাজ। এই জন্ত উট। হাতী বোড়া উট বলে না? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।

সুর্বপাল। আহা হা। অত ক'রে বলতে হবে না। আমার নিজের উটপালাতেই ত' হাজারো উট আছে। তার মধ্যে চুনডিনাখ নামে আমার খাস উট অনেক টাকা দিয়ে খাস আরব দেশ থেকে আনানো। না, না, উট মনে করব কেন? উট মনে করবার কি দরকার আছে?

দেবরাজ। কোনো দরকার সেই মহারাজ, কোনো দরকার নেই। বরং না মনে করবারই দরকার আছে।

চন্দ্রশীলা। তা ছাড়া মহারাজ, যে কোনো কথা মনে রাখার চেয়ে ভুলে থাকা অনেক সহজ; সুতরাং এ নিয়ম সহজেই পালিত হ'তে পারবে।

সুর্বপাল। আর কোনও নিয়ম আছে দেবরাজ?

দেবরাজ। না মহারাজ, আর কোনও নিয়ম নেই। তবে একটা কথা আছে।

সুর্বপাল। কি কথা?

দেবরাজ। আপনার উত্তীর্ণা দেবের কথা বা ঐ সম্পর্কে যে কোনও কথা আমার তিন জন ছাড়া চতুর্থ কোনও ব্যক্তির কানে যেন না প্রবেশ করে। তিন দিন পরে আপনি ভাল হওয়ার পর বলতে আর কোনও আপত্তি থাকবে না।

সুর্বপাল। এমনি হয়ত বলতামই না, নিষেধ ক'রে দিলে ভালই হ'ল।

দেবরাজ। রাণীমা, আপনিও যেন আপনার সহচরীদের কাছে—

চন্দ্রশীলা। না, না, সে কি কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের হুঁজুরের দ্বারা এ কথা কারো কাছে প্রকাশ হবে না।

দেবরাজ। কাল সকালে ওষুধ ধাবার আগে আমাকে ডাকিয়ে আনাবেন। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি?

সুর্বপাল। এস।

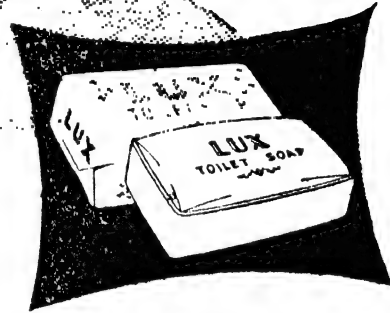
দেবরাজ। জর হোক রাণীমায়, জর হোক মহারাজের!

[ অভিবাদনান্তে প্রস্থান। ]

চন্দ্রশীলা। আমি নিঃসন্দেহ মহারাজ, আর তিন তিনেক পরে তুমি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম হবে।

সুর্বপাল। আমারও আশা হচ্ছে। ঐ যে বললে ওষুধ খাওয়ার পর আমার বাঁ হাত ধ'রে কি-একটা মন্ত্র পড়বে, এটাই আসল কথা। এখানেই হবে ভেবেজের সঙ্গে তত্ত্বের যোগসাধন।

[ প্রস্থান ]



প্রগতি ঘোষ লাক্স টয়লেট  
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন  
“এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা  
প্রমাণ করে।”

প্রগতি ঘোষ গুণী শিরি এবং হৃন্দরী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের তাঁতে  
জ্বাল লাগার জ্বলে তাঁর ত্বকের লাভণ্যও অনেকখানি দারী। সেইজন্তে তিনি সব-  
চেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের  
সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ  
স্বরের মত ফেগার রাশি আপনার সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিহ্ন - তারকা দেব সৌন্দর্য সাবান

L.T.E. 615-50 80

# কল্যা-বিলাস

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]  
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তরুণের নিয়ে নিরবলম্বিত সন্তোষ-প্রথের মধ্য দিয়ে যে বায়বনিতা  
এই অর্ধশাশ্বত হয়েচে, আশ্চর্য, তারও যন্ত্রি-যন্ত্রি করতে  
থাকেন এই সব জীবনের...নির্ভরনে সোচ্ছ্রাসে এবং সলা। ১৬

চপলায় থাকেন হর্যে; কিন্তু আপন মনে গান গেয়ে ওঠেন  
পাখের দিকে চেয়ে চেয়ে, নিজেকে দেখিয়ে। অকারণে ছুটে চলেন,  
অথবা অকারণে হেসে ওঠেন...ফটিক পাখের মালার মত  
ঠুন-ঠুন। ১৭

অজনারা কিন্তু নিজের ঘরে পুরুষ মানুষের মতই সব কাজ করে  
বেড়ান। বলেন—

“বলতে করতে কিছুই পাবেন না, জানেন না, এমন পণ্ড আমার  
স্বামী।” ১৮

অতএব তোরবেলায় তিনি ওঠেন, ব্যবসা-বাণিজ্য আইন-আশালত  
নিজেই করেন; জীবন্ত স্বামীর গৃহীণীরাপে গৃহস্থানি জমকিয়ে  
রাখেন চেষ্টায়। ১৯

ঈর্ষাপরায়ণ বুড়ের স্ত্রী, চাকুরের স্ত্রী, মনিবের স্ত্রী, কারিগরের স্ত্রী,  
মটের বোঁ, কপণের বোঁ, লম্পটের বোঁ বা বণিকের বোঁ,...এঁদের  
প্রকৃতিই হচ্ছে, সভা-সমিতিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, অভাবতই  
এঁদের বাৎসল্য করে পড়ে, তরুণদের উপরে। পরের গুণের বিচার  
বর্নিয়ার এঁরা সদা-পটু, নিজের স্বামীর পোষ-ব্যাখ্যান এঁরা  
শতশ্রুতী। ২০-২১

যে রমণীর বৈভব কম, অতি-সুখের মধ্যে যিনি লাগিতা, যিনি  
কপসী, অথবা যে ভাবীর রূপের বিকৃতি-লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অথবা  
কিছু ক্রমশঃ, অথবা যিনি সকল কলা-দামবতী...তার প্রত্যেকেই  
স্বামী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ২২

যে স্ত্রীলোক দ্ব্যুত ও মধুপানে আসক্তা, একবার কথা বলতে  
করলে যিনি তার ধামতে চান না, একবার গান গাইতে  
আমন্ত্রণ করলে কষ্ট বীর স্মৃতির বিরতি তুলে যায়;

গায় সঙ্গে সঙ্গে করেন অনেক কলটাতা বয়স; অথবা যিনি  
স্বাস্থ্যবতী;—সাধারণতঃ সে ধরনের স্ত্রীলোকের পক্ষপাতিত্ব শ্রুতের  
কিছুই চলে পড়ে। ২৩

স্বপ্নে কাজ যিনি করেন না; বেশ-বিন্যাসের পারিণাট্য নিয়েই  
কিছু কিছু “কটান; কাজকরে বীর আগল নেই; প্রত্যুত্তরবিধান  
কিছু কিছু, সভ্যতাই ও বতাবিলম্বা;—

যে কে কেমন আছে, অথবা হাঁড়ির খবর নিতে যিনি তৎপর  
বীর আলাপে প্রকাশ পায় ক্রীতির পেশলতা।

বিজনে বন্ধন থাকেন তখন বীর মন্তস্তার অন্ত থাকে না খেলা-  
ধুলায় বা আড়ম্বরে, অথচ প্রকৃত্তে নিজেকে যিনি প্রচার করে বেড়ান  
সাবিত্রীসমা;

স্বাধীনতাস্বার মত, যিনি আজ বজ্রাঘাতনে, কাল তীর্থে, পবন  
মন্দিরে, গণংকার, বৈভ, বজ্রবাক্যবাদের গৃহে গৃহে চক্কী ঘোরান ঘোরেন,  
পান-ভোজন করান, যাত্রা-উৎসবে চুটিয়ে ব্যয় করেন;

ভিক্ষুক-তাপসে বীর ভক্তি,

আপনজননে বিরক্তি,

কিন্তু মনোহরমটিতে আসক্তি,

এবং যিনি...

দর্শন-দীক্ষারক্তা,

দয়িত-বিরক্তা,

ও সমাধিসংযুক্তা;

এই রকমের গোষ্ঠী-মজানো মিত্রা দেখলেই বুঝবে, রমণীটি নষ্ট  
চরিত্র। ২৪-২৮

মনে রেখো, এই স্ত্রীলোকেরা, এই পিশাচীরা, রাজি-বাসিণী  
স্বাক্ষার মত প্রেমিকদের বক্তিত্ব ভালবাসাটিকে অন্ধকার করে দেন;  
এঁরা চপলা, এঁরা কুয়া, বজ্রছায়াহারা। গ্রাহের আবির্ভাবের অন্ত  
থাকে না এঁদের প্রেমের কৃষ্ণ গগনে। সরল সূচের দল এঁদের অতি  
নগণ্য কাজটিকেও মন দিয়ে করেন, এঁদের বাহন হন। এঁদের  
কাছে বীর অপরাধিত হয়ে থাকতে চান, তাঁদের শপথ করেই নিজে  
হয়ে থাকতে হয়। শৃঙ্গার এবং শৌর্ভের ল্লাভা, ও নানান অসমঞ্জস  
লানের বর্নিয়া,—এঁ হেন রমণীরূপের করণ্যে, বশীকরণের অমন্ত্র-বন্ত্র  
হয়ে দাঁড়ায়। ২৯-৩১

কলিকাল-তিমিরবজ্রের সহস্র মারামারী এই নিশাচরীদের প্রাণে  
এত অধিক নৃশংস কাহিনী ওনতে পাওয়া যায় যে, বৎসগণ, কম্প দিয়ে  
নিউরে ওঠে গা। ৩২

এই পৃথিবীতে পুরাকালে অতি প্রসিদ্ধ জনৈক বশিকরাজ ছিলেন,  
“ধনসন্ত” তাঁর নাম। সহস্রের মতই তিনি ছিলেন ধন-রত্নের  
আলসার। কুবের-স্বরী তাঁর বৈভব। ৩৩

“বহু-মতী”—নামে তাঁর একটি তমসারী ছিলেন। বৈভবের তিনি

ত, কামের তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী। লাংগো চল চল তাঁর অঙ্গ।  
জ্বিনী হয়েছিলেন, হুনরনের কেবল ঘাড় নাচ দেখিয়েই। ৩৪  
ধনসত্ত্ব অপূর্ণক। অতএব তাঁকে একদিন প্রাণপ্রিয় কন্ঠাটিকে  
দে বিনিহিতা ক'রে, বসিক "সমুদ্রগন্ত"র হাতে তুলে দিতে  
লা। সমুদ্রগন্তেরও তুল্যবিভব, তুল্যকুল ইত্যাদি। ৩৫  
মৃগনয়নার প্রেমে বিভোর হ'রে স্বত্ত্বমন্দিরে সমুদ্রগন্ত  
বহিষ্কৃতি লাভ করে আছেন, এমন সময়ে একদা সংবাদ এল, বীপান্তর  
ক হঠাৎ বাণিজ্য পণ্য উপস্থিত হয়েছে; কি করেন? তথ্যাদির  
অতএব, সমুদ্রগন্তকে প্রেমান কহতেই হোলো। ৩৬  
স্বামীও গেলেন, আর তরুণীটিও জনকগৃহে স্ববীর্ষের সঙ্গে  
শিখরে করলেন আরোহণ। কেলিবিলাসো হয়ে বিলাসোৎসবে  
প্র ময় হয়ে গেলেন বিলাসময়ী। ৩৭

সেদিন সৌধের উপরে তিনি উঠেছেন, হঠাৎ তাঁর নয়নে পড়ল  
এটি তরুণ-কুমার, পথ নিয়ে তিনি চলেছেন। ডাগর হয়ে উঠল  
য হুনরন। সত্যিই, কামলবের মত চেহারা। সেখই, কোথায়  
ন ভেঙে ভেসে গেল বহুমতীর ধৈর্ষের বাঁধ। কুমতি কুপিতা হলে  
মনিই হয়। ৩৮

চলবল ক'রে উঠল তাঁর হুনরনের কাজল তারা। কে বেন  
নাখা থেকে এসে হঠাৎ চুরি ক'রে নিয়ে চলে গেল তাঁর বিচার  
বচনচার বৃদ্ধিটুকুও। তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল স্বরণ করা--  
বিবিকার। ৩৯

মুকুল হয়ে উঠল তাঁর কটিভটের মেখলা।  
মখলা বেন মুখরা হয়েই তাঁকে স্মৃতির মিনতি ক'রে জানালো—

"শীল পালন করো, চপলা হোয়ো না, নিরুপায় নদীর মত কুল-  
রাসিনী হোয়ো না।" ৪০

কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না তরুণী।

একান্তে সন্ধ্যা থেকে নিয়ে তাঁর মনের কথাটি ব'লে ফেললেন।  
এবং তাকেই দূতী ক'রে তরুণ-কুমারটিকে ডাকিয়ে আনালেন অন্তরে।  
কামিনীদের চিত্ত বখন চঞ্চল হ'য়ে কীপতে কীপতে ছোটো, তখন তার  
গতিরোধ করে কার সাধ্য? ৪১

তরুণ-কুমারটিকে নিয়ে প্রেমতা হয়ে উঠলেন বৈবরণী।

কামের সে কী বিকাশ।  
সুরতের সে কী বিলাস।  
নর্ম পরিহাসের সে কী সুলভতা।

সম্ভ্রান্ত হু জনের প্রেম রচনা ক'রে ফেলল মোহনৌড়। পরিতৃপ্তা  
হয়ে উঠলেন বৈবরণী। ৪২

তার পরে একদিন মহাসমারোহে সমুদ্রগন্ত কিংবে এলেন স্বত্ত্ব-  
মন্দিরে; স্বরিতেই তিনি সমাধা ক'রে কেলেছিলেন বাণিজ্য-কৃত্য;  
কারণ প্রেমে তাঁকে অত্যন্ত আকুল করে কেলেছিল দরিতার  
বর্ণনাধকর্তা। ৪৩

মহোৎসবের মাতামাতি, ব্যস্ত-সমস্ত পরিজন, ভোগৈশ্বর্যের  
হুড়াহুড়ি,--তার মধ্যে দিবসভাগটি কোনকমে অভিবাহিত ক'রে  
পেয়ে প্রিয়তমাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রগন্ত প্রবেশ করলেন  
শয়নগৃহে। ৪৪

সম্মীর শয়নীর। বহু-বিতান, মনোরম স্থান। হাই তুলছে  
স্বস্তি-ধূপ, সুরগৃহ-স্বরূপ। সন্তোষে অলছে মণি-প্রদীপ, বেন  
আনন্দ-নৌপ। ৪৫

মধুমসিবার তখন বিলুপিত হয়ে এসেছে প্রেয়সীর নয়ন-কমল।  
প্রিয়তমাকে সঘন আলিঙ্গন করতে করতে রতিলাসে সমুদ্রগন্ত  
শয্যায় এসে বসলেন, নব-পদ্মিনীকে নিয়ে বেন মন্তগঞ্জের লীলা। ৪৬

তরুণীটি কিন্তু শয়ন ক'রে রইলেন, নয়ন নিম্নলিত ক'রে।  
তিনি আজ ধ্যানপরা বেন যোগিনী। এক তাঁর ধ্যানের লক্ষ্য-  
স্থল, সেই পরপুরুষ, হৃদয়ান্তরস্থিত সেই তরুণ-কুমার। ৪৭

স্বামী মহাশয় তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন, বারংবার মুখ  
চুষন করতে লাগলেন, নীবিমোক্ষ করলেন, উদ্ধাসের তাঁর অস্ত  
নেই, কিন্তু ভাষার কেবল মনে পড়ে যেতে লাগল সেই তরুণ  
কুমারটির রূপ, যিনি তাঁর শীল-হর। সঙ্কটিত হ'রে রইল তাঁর  
অঙ্গ। ৪৮

মুচ স্বামী সমুদ্রগন্ত।

তিনি ভাবলেন—প্রেয়সী নিশ্চয় প্রণয়-কুপিতা হয়ে রয়েছেন।  
অতএব তিনি অনেক তোষামোদ করলেন, প্রসিদ্ধান্ত করলেন,  
বললেন—"প্রসাদ-ভিক্ষা দাও।" ৪৯

সঙ্গারে কিন্তু বৎসগণ, দেখা যায়, যে সব প্রেষ্ঠা প্রেয়সীর  
পর-পুরুষ-রাগিনী;--অতএব বিদ্রুহী,--অতএব অপমান করে  
প্রেমের,--তাদের উপরেই সমধিক ঢলে পড়ে অভিমোহাচ্ছন্ন  
পুরুষ পুত্তদের মন। ৫০

পরের ঘরে বখন চলে যায় ভালবাসা, স্বাধীনতা লাভ ক'রে  
বখন কাম, তখন কী করতে পারে স্বামীর প্রেম? সন্ধ্যাকালে  
কালো মেঘ রাঙা হয়ে উঠলেও, ভাস্করই তাকে রাঙায়। ৫১

বহুমতীর মাথায় তখন এক চিন্তা,--উপবনের গোপন কুঞ্জে  
তরুণ-বল্লভটি-সম্ভ্রান্ত অমুসারে নিশ্চয় এখন বসে আছেন। এই  
কথা ভাবতে ভাবতে তিনি তখন মালাদান করলেন তাঁর পতিটিকে,  
পতি তো নয়, বেন বিধ। সমুদ্রিতার মত বহুকণ তিনি পড়ে  
রইলেন। ৫২

তার পরে প্রায়শ্চাত্ত সমুদ্রগন্তের হুনরন বখন মুদ্রিত হয়ে  
গেল গাঢ় ঘ্রুহ, তরুণীটি তখন উঠলেন, রচনা করলেন বেশকুয়া,  
কক থেকে বিলাস নেবার জন্তে প্রস্তুত হলেন নিঃশব্দে।

সেই মুহূর্ত্তে একটি চোর কিন্তু এসে প্রবেশ করল তাঁর ভবনে।  
গৃহবাসীরা সকলেই সে রাতে মধুপানে মাতাল হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন  
স্বখে, সুযোগ বুকে তাই চোরের এই শুভাবির্ভাব। ৫৩

চোর দেখতে পেল গমনোৎস্রক। সালকার তরুণীটিকে। কিন্তু  
তরুণীটি টের পেলেন না যে চোর এসেছে। ৫৪

আকাশের ইন্দ্রকোণে তখন বীয়ে বীয়ে দেখা দিয়েছেন শশাঙ্ক।  
ইন্দ্রবল্লভা মীলিততারা দিগন্তনাকে সঘন আলিঙ্গন ক'রে বেন  
এইমাত্র তিনি চমকে উঠেছেন কঁপে। ৫৫  
যে স্বামিনীতে সঙ্কটিত হয় কমললল এবং বিকসিত হয়ে ওঠে

হুহু, সেই বামিনীর কণ্ঠ হাঁসির মতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল চন্দ্রসেবের তুহিনতরা জ্যোৎস্না। ৫৬

বকিণেবের খবরটাশে শাও। হয়ে পড়েছিলেন বেবী আকাশ-মুন্দরী; চন্দ্রসেবের শুভাগমনে তাঁকেই আবার সানন্দ। হয়ে উঠতে দেখে ভ্রমর-মুগ্ধত আনন্দে কুহু-মুগ্ধ বিকসিত ক'রে যেন হাত করে উঠল লীখিতলি। ৫৭

রজনী রমণীর অল ঘিরে তিমির কঙ্করের নীলাবরণ। যেই সোঁতে হুরণ করে নিলেন চন্দ্রসেব, অমনি যেন তিনি সরমে ঘরে পিরে সবারির সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন কুহু-মুগ্ধবিকল ভ্রমরদের নীল উত্তরীর। ৫৮

ভ্রমরপরে, বখন সমুদ্র পূবী নিখিল হয়ে গেল ঘমে এবং বিপুল হয়ে উঠল চন্দ্রালোক, মধ্যরাতে তখন তরুণীটি তমিস্রা দেবীর মতই নির্বিলম্ব হয়ে বীরগণ-সকারে প্রস্থান করলেন উপবনের দিকে। ৫৯

বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব এই উপবন।

উপবনে তিনি প্রবেশ করলেন, সম্পূর্ণ-বিবশ।

কে জানত মদনের পুষ্পবাণ আগুন হানে। তাঁর অলক্ষ্যে, তাঁরি পিছনে পিছনে, তাঁরি ছবনের লোভে লোভে, উপবনে প্রবেশ করল চোরটিও।

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল চোর। ৬০

পত্রময়র সেই কানদে চোর দেখতে পেল তরুণীর প্রিয়তমটিকে।

তাঁর অল বিকৃত্তিত;

পারের চান্দরখানি তেজপাতার মত চকচক করে কাঁপছে;

ছড়িয়ে পড়েছে কুহুয়;

শকাবলক এক অবস্থার;

পাখী বসেছে পায়ে। ৬১

পরাণ প্রায়ের বিরহে যেন তাঁর সর্বস্ব হলে গেছে;

দিগন্তসি জ্যোৎস্নার অনলে যেন পড়ে গেছে। ৬২

প্রাণ হাতে ক'রে সজ্জত স্থানে বহুশ তিনি বসে ছিলেন; প্রেরণীর সঙ্গে পুনর্মিলন তাহলে দুরাশা; শেষে আশাহীন হ'য়ে বুকবিলবিত লতারজন্তুতে কঠটি গলিয়ে প্রাণ হারিয়ে তিনি কুলেছেন। ৬৩

এই অবস্থার না তাঁকে দেখে তরুণী প্রথমে যেন বিলীনা হয়েছিলেন। তারপরে দুঃখে শোক সজ্জা বিলাপ করতে করতে, অসি-দীর্ঘা বজরার মত, লাটিয়ে পড়লেন মাটিতে, ধরিত্রীর আলিঙ্গনে। ৬৪

সজ্জা হারানেন। এক হুহুর্গে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল তাঁর হৃদয়নের প্রসিদ্ধ নাচ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপরে বীরে বীরে তিনি উঠে বসলেন। প্রাণ যেন বীরে বীরে কিরে এল দেখে।

কিন্তু সে কোথায়, যে ছিল তাঁর হৃদয়নের আনন্দ। প্রিয়তমের চন্দ্র-সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে তরুণীর সে কী তরুণ ককণ আর্জখনি। লঘুবে-তাকে অনেক ডাকলেন। কোথায় গেলে

তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। মন ভাগ্যকে হুহুলেন। পূণ্য ব'লে জগতে আজ কিছুই নেই? কোথার জামি আর কোথার আ-সুন্দর? ৬৫-৬৬

তারপরে অবলাটি অতিবাহিত লতাপাশ থেকে তরুণের দেহটির মুক্ত ক'রে, কোলের উপর সোঁতে শুইয়ে, প্রাণ ঢেলে চুষন করল লাগলেন তাঁর মুখ; যদি জীবন ফিরিয়ে আনে চুষন। ৬৭

একেই বলে মোহ।

নিজের মুখের মধ্যে প্রিয়তমের মুখকমলাটিকে গ্রহণ ক'রে তিনি তাবু-গড়িত ক'রে নিলেন তাঁর মুখ; যেন মুখের মধ্যে প্রবেশিত হয়ে গেল সাকার একটুকরো রক্তিম ভালবাসা। ৬৮

তারপরে হঠাৎ ঘটে গেল এক অজুতপূর্ব কাণ্ড।

কুহু-মুগ্ধমুগ্ধাঙ্গির সৌরভে আহুত হয়েই যেন পাবে পরীরের মধ্যে জেগে উঠল জনৈক বেতাল। পালক ফেলতে না ফেলতেই সে নাসিকাটি কর্তন করে ফেলল তরুণীর। ৬৯

চাপলোর, হুনাতির উচিত ফলই ফলল।

ছিন্ন-নাসিকা তরুণী তখন পালালেন, স্বামীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন, হাহাকার শব্দে বাড়ী মাধার ক'রে তুললেন। ৭০

নিদারুণ আন্তর্নাসে জেগে উঠল পূর্ববাসীরা, জেগে বিছানায় উঠে বসলেন সমুদ্রমন্ত। কিন্তু পত্নী দেবী তখন তারঘরে চাঁৎকার দিয়ে বসলেন—

“আমার সর্বনাশ করেছে, নাক কেটে ফেলে দিয়েছে—আমার স্বামী।” ৭১

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন স্বত্বর, আত্মীয়-বন্ধন সকলে। অজস্র ক্রুদ্ধ প্রশ্নের একটিও উত্তর দিতে পারলেন না সমুদ্রমন্ত। একটি অক্ষরও বেরোনা তাঁর মুখ থেকে। পরদেশে বিকিয়ে বাধ্য বাবার মত তিনি শুক হয়ে কাঁড়িয়ে রইলেন। ৭২

তার পরদিন সূত্রভাত হল। তাঁর বিরুদ্ধে রাজসভার অভিযোগ জানানলেন স্বত্বরকুল। ঝুট হয়ে উঠলেন নরপতি। ফলে, সমুদ্র মন্তের লাভ হল প্রচুর অর্থদণ্ড। ৭৩

চোর কিছু এগিকে সমস্ত ব্যাপারখানি স্বচক্ষে দেখেছিল। বেচারী বিষয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। শেষে নিজেকে সত্বর করতে না পেরে, রাজসমক্ষে উপস্থিত হ'য়ে সে নিবেদন করে বসল আতোপান্ত স্বার্থ ঘটনা। রাজা শুনলেন, খুশী হলেন, এবং তাকে পূর্বকার মিলেন—বলয়। উত্তানে সভার মুখের মধ্যে সন্ধান করতেই হস্তগত হল তরুণীর ছিন্ন নাসা।

একটি সামান্য চোর, অকারণ-সুন্দরের আদর্শ দেখিয়ে শুদ্ধি-বিধান ক'রে দিল সমুদ্রমন্তের। ৭৪-৭৫

বৎসগণ, চপলারা এই ধরনেরই হন। তাঁরা কুটিলার চেহেরে কুটিলার, তাঁদের আচার-বিচার নেই, তাঁরা ক্রুর, লঙ্কাহীনা। যে বুদ্ধি-ধর এই হেন রমণীহাদের জানেন, তাঁকে ঠকাত্তে পারে না জ্বালোক। ৭৬

ইতি কামবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

[ ক্রমশঃ।

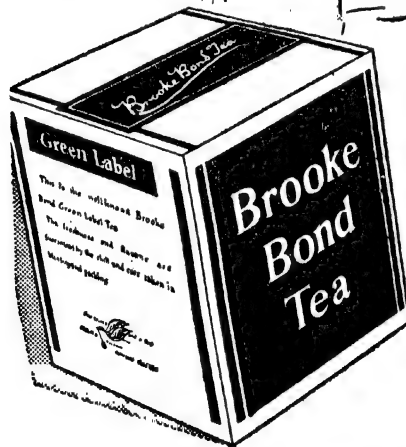
[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

## ସବାଇ ଜାମେନ -

ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ  
ବ୍ରୁକ ବଣ୍ଡ ଚାୟେ  
ଅନେକ ବେଶୀ କାମ  
ଭାଲେ ଚା ଡେରି  
କରି ସାରି

ବାମାନ ଥେକେ ଅନ୍ୟମନ୍ତ  
ଅନ୍ୟବରାହ କରା ହସ ବଳେ  
ବ୍ରୁକ ବଣ୍ଡ ଚା  
ଏକେବାଢ଼େ ତାଜା ଥାଏ

ଲୋକେ ହୋଇ  
ମାଡ଼େ ମାଟ କୋଠିରୁ  
ବେଶୀ କାମ  
ବ୍ରୁକ ବଣ୍ଡ ଚା  
ଥାଏ ଥାକେନ



ଏହି ଜାତୀୟ  
ଅନ୍ୟ ସେ କୋଳ ମାର୍କା  
ଚାୟେର ଚାୟେ

# ବ୍ରୁକ ବଣ୍ଡ ଚା

ବେଶୀ ଲୋକେ ଖାନ୍ !

## ଅତଏବ, ବ୍ରୁକ ବଣ୍ଡ ଚା-ହେଉଁ ଡୋର୍ଟି ଦିଅ !



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ একটি মাস কাটলো 'করুণ'-তে—নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে।

তার পর জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটি দিনে আমার ভাগ্যতরী এসে ভিড়লো—কনসার্টিনোপল-এ।

প্রথম দিনেই গেলাম 'ওসমান-পাশা অফ কারমনিয়া'র উদ্দেশে। চিঠিখানি সঙ্গে নিয়ে। কাউন্ট ও বনিভ্যাইলই ঐ নামে অভিহিত হয়েছিলেন সিংহাসন পাবার পর।

করাসী কায়দার সাজানো মস্ত একটি হল আমাকে আগত জানালেন। তারপর প্রৱণ করলেন—“বোমের কার্ডিভাল আপনাকে পাঠিয়েছেন—আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?”

তার হাতোজল মিত দুখের দিকে ঢেয়ে আমার অপরিচয়ের কথা মুহূর্তে কেটে গেলো। অসকোচেই জানালাম, মনের এক তীব্র নৈরাশ্রের মুহূর্তে আমি নিজেই কার্ডিভালের কাছে এখানে আসার জন্য পরিচয়পত্র চেয়েছিলাম। তারপর সেই দায়িত্ব পালন করবার জন্যে নিজেকে বাধ্য করেছি এখানে আসতে।

—“তাহলে আমাকে আপনার সভাকারের কোনো প্রয়োজন নেই?”

—“প্রয়োজন কিছু নেই, সে কথা সত্যি—কিন্তু একথাও সত্যি যে আমার আনন্দেরও সীমা নেই। আপনার সামনে ঠাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য থেকে তো বঞ্চিত হইনি—আজ রাত্রে ইউরোপে আপনার কথা আলোচিত হচ্ছে—অতীতেও হয়েছে আর ভবিষ্যতেও বহু দিন ধরেই হবে।”

কার্ডিভাল তার চিঠিতে আমাকে উচ্চশিক্ষিত বলে অভিহিত আর পাশা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ঠাঁড় লাইব্রেরীটি দেখতে চাই না। আগ্রহের সঙ্গেই রাজী হলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন যে একটি মস্ত ঘরে। তার চার পাশে সারি সারি জাকরী-কাটা আ তার উপর পর্দা বুলানো। পাশা এগিয়ে গিয়ে একটি মরজা হলেন—কিছু বই? বই কোথায়? সারি সারি বাঁধানো বই-এর সে সারি সারি বোতল—সুরার—সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মরজা অকুয়ান ভাণ্ডার।—“এই—এই হোলো আমার লাইব্রেরী—হোলো আমার অস্ত্রপুং।—বুখ হোয়েছি, বখেচ্ছাচার করে অনেক নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু সুরা? সুরা শুধু জীবনকে হার করে না—সেই দীর্ঘ পথ রতীন করে তোলে তার নেশার তার পর।”

পনরদিন পাশা এক ভোজসভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রচুর ইরোজ ও অকাত্ত পদস্থ সন্তান নাগরিকদের সমাবেশ দেখলাম। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি বৃদ্ধ—বয়স প্রায় বাটের কাছাকাছি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর। তাছাড়া তার শাস্ত্র, গভীর দুখের দিকে তাকালে আপনিই সন্মম লাগে। পাশা তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—নীতিবিদ, ধার্মিক, দার্শনিক আর প্রচুর বিত্তবান বলে। তার নাম জন্তক আলি।

সেদিনের পরিচয় মাত্র চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রীতিমত ঘনিষ্ঠতার ঠাঁড়ালো। আমরা প্রতিদিন ধর্ম, নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। একদিন হঠাৎ জন্তক আলি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিবাহিত কিনা। বিবাহিত নই আর আপাততঃ বিবাহ করার মত কোনো সিদ্ধিও নেই শুনে আমাকে বললেন, এটা শুধু অপরাধ নয়, ঈশ্বরের আদেশও অমান্য করা হয় এতে। তারপর বললেন,—“শোনো, আমার হৃদি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেরা তাদের সম্পত্তির অংশ আগেই পেয়ে গেছে। বাকী যা কিছু আছে সব আমার মেয়ে জেলমার। জেলমার চোপ আর চুল তার মায়ের মতই নিবিড় কালো, তার বং হার মানায় খেত পাখরে গড়া মৃত্তিকে। ঐকি আর ইতালীর ভাষা সে জানে—জানে বীণা বাজিয়ে গান গাইতে। আজ অবধি কোনো পুরুষের সৌভাগ্য হয়নি তাকে চোখে দেখবার। আমার এই অমূল্য রত্নটিকে আমি তোমাকে দিতে রাজী। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি বছর থাকতে হবে আমার কোনো আত্মীয়ের কাছে—সেখানে তুমি শিখবে আমাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি—আমাদের রুচি, রীতি, নীতি। তারপর যেদিন তুমি নিজেকে সত্যিকার মুসলমান বলে এসে ঠাঁড়াবে, জেলমা সেদিনই তোমার হবে। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে তুমি সেই সঙ্গে। না, না তোমার কাছ থেকে এখন কোনো কথাই আমি চাই না। চিন্তা কর এ বিষয়ে, বত দিন না, সহজে উত্তর দিতে পারো।

এর পর দিন চারেক জন্তক আলির কাছে যেতে পারিনি কি এক সন্ধ্যা। কিন্তু তিনি নিজেই এ সন্ধ্যা ভেঙে দিয়ে আগের মতই সহজভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এরই মধ্যে একদিন ঠাঁড় বাড়ীর বাগানে বেড়াছিলাম—এমন সময় দারুণ বৃষ্টি এলো। ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামনেই যে হলটার চুকলাম সেখানে এর আগেই কয়েক বার এসেছি। চুকেই দেখি, জানলার ধারে একজন দাসী কি কাজ করছে আর একটি তরুণী তার পাশে ঠাঁড়িয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছে। আমাকে দেখেই তরুণী কিপ্রহাতে তড়ানার দুখ ঢেকে বেললে। অপ্রস্তুত হয়ে আমি চলে আসবার উপক্রম করতই সেই অবশ্যনের



ফাঁস থেকে ভেসে এলো মধুকরা কণ্ঠের সুকান্তর মিনতি।  
[সি সাহেবের নির্দেশ আছে, তাঁর অচুপস্থিতিতে আমাকে অভ্যর্থনা  
দানাবার। আমার মনে হোলো এ নিশ্চয়ই কেলম।] আলি  
[হেব নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয় করার জন্য এমন নিভৃত আলাপের  
যোগ্য দিয়েছেন। অবশ্যই আমাদের আড়াল থেকে আবার ভেসে এলো  
সই মধুকরা—

—“আমি কে আপনি জানেন?”

—“না, জানি না তো বটেই, আশ্চর্য্যও করতে পারছি না—”

—“আমি আপনার বন্ধু আলি সাহেবের স্ত্রী। বছর পাঁচেক  
মাগে আমাদের বিবাহ হয়। আমার এখন আঠারো বছর  
বয়স—”

অবাক হোলাম, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করানোর  
মত এতটা উপর-চিহ্নিত কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে  
সম্ভব? অবশ্য বিবাহিতা জ্ঞানার পর আলাপ করাটা  
অনেক সহজ মনে হোলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সেই  
চিরন্তন প্রকৃতিও জেগে উঠলো—দেখতেই হবে ঐ অবশ্যের  
আড়ালে লুকানো বহুসময়ক। আমার সামনে ঠাঁড়িয়ে  
যেন কোন ভাষার নিপুণ হাতে খোদাই-করা শুভ্র পাখাণ-  
প্রতিমা। কিন্তু ঐ অপকৃপার আত্মার বিকাশ যে দুটি  
দীপাধারে সেই দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে বস্তুত থাকি কেমন করে? চোখের  
সামনে শুধু উন্মুক্ত একটি স্থলসিত, সুগঠিত বাহ। তার লীলায়িত  
ভীতে মানস নয়নে জেগে উঠলো ওড়না-ঢাকা তবীর তল্লদেহখানি।  
কোমল মসলিনের বহিঃসং তার দেহের ছন্দ ঢাকতে পারে নি—ঢাকতে

পারে নি তার অসুখী স্বয়ং। শুধু আবরণে বসী হোয়ে আছে তার  
উজ্জল কোমল পেলবতা। দেহভীতে বাঁধা পড়ে আছে এক অপকৃপ  
ছন্দ, এক কোমল মূর্ত্যনা—

হৃদয়, বিমিত, বিহ্বল অবস্থার কখন এগিয়ে গেছি, দুই হাত  
বাড়িয়ে ঐ অবশ্যের আড়াল ঘূরিয়ে দিতে—চকিতে, ক্রান্তে উঠে  
পাড়ালেন তিনি—সবিসং ফিরে এলো, আমার কানে এলো তাঁর  
ভংগনীর ভীতে সেই কোমল মধুকরা কণ্ঠস্বর—

—“এমনি করেই বসি বন্ধুর বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে হইবে? তাঁর  
জীকে অপমান করে বসি আতিথ্যের স্বর্ণ শোধ করতে হয়?”

—“আমাকে কমা কল্পন। আমাদের দেশে হীনতম লোকও  
সম্রাজ্যের মুখদর্শন থেকে বস্তুত থাকে না—”

—“হ্যাঁ, কিন্তু যখন ঢাকা থাকে তখন ওড়না ছিঁড়ে বোধ হয়  
তার দেখে না—ভক্ত আমাকে এর প্রতিফল দেবেই—”

এ কথার আমি সত্যিই ভয় পেলাম। তখন ঐর পায়ের তলায়  
বসে কমা চাইলাম। অনেক অমুনহ-বিনয়ের পর তিনি শান্ত  
হোলেন। তখন অমুনহি পেলাম তাঁর হাতখানি স্পর্শ করার।

এমন সময় জন্তক আলি এলেন। আমাকে আলিঙ্গন করে  
জীকে বস্ত্রবাস জানালেন আমাকে সঙ্গে দেওয়ার জন্তে। তার পর  
জীর হাত ধরে অস্ত্র-পুরের দিকে গেলেন।

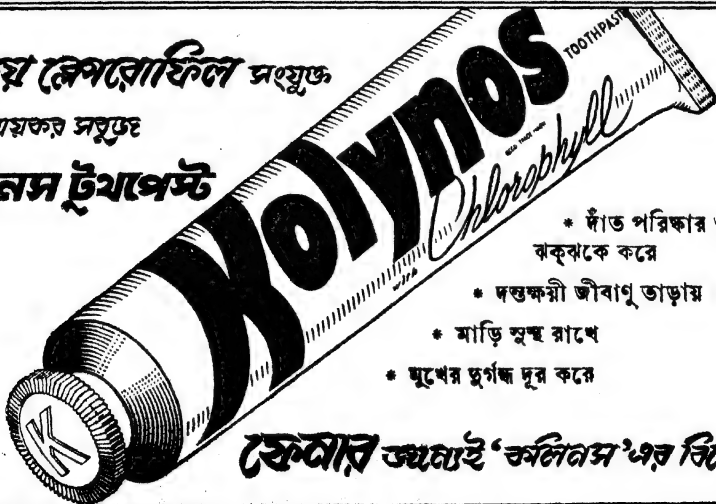
আমি পরে পাশার কাছে এই সব কাহিনী বলাতে তিনি হেসে  
উঠলেন। বললেন,—“কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার  
আনাড়ীশণায় মহিলাটি শুধু মনে মনে হেসেছেন। খুব সনাতনপন্থী  
তুর্কী মহিলাদেরও সমস্ত লজ্জা ঐ মুখে। ওড়নার মুখ ঢাকা থাকলে

## সারিফার, মডার্ন মুত দাঁত

সারিফার ক্লোরোফিল সংযুক্ত

বিদ্যায়কর সমুদ্র

ফলিনস টুথপেস্ট



\* দাঁত পরিষ্কার ও  
রক্ষণ করে

\* দস্তকরী জীবাণু ত্যাগ

\* মাড়ি সুস্থ রাখে

\* মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

ফেলার জন্মই ‘ফলিনস’ এর বিশেষত্ব!

আর কিছুতেই তাঁরা লজ্জা পান না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, স্বামীর সঙ্গে বিশ্রাস্তাগানের সময়েও এঁর মুখ ওড়নার ঢাকা থাকে—”

অবশ্য এর পর আলি সাহেবও তাঁর জ্বর সঙ্গে সাক্ষাতের আর কোনো সন্ধান আমাকে দেন নি। ঠিকই করেছিলেন অবশ্য। এর কিছু দিন পরেই আমার ফেরার সময় হয়ে এসে। এক দিন বাজারে নানা রকম জিনিষপত্র দেখছিলাম এমন সময় আলি সাহেবও সেখানে এলেন। এসে প্রথমেই আমার কচির আমার গছন্দকরা জিনিষগুলির খুব প্রশংসা করলেন। আমি কিন্তু কোনো জিনিষই কিনিনি—কারণ প্রত্যেকটি জিনিষেরই দেখলাম অসম্ভব বোঁদী দাম—কিন্তু আলি সাহেব বললেন, কোনোটারই দাম বেশী নয়, সবই ঠিক দাম। কিনলেনও প্রচুর জিনিষ। কিন্তু পরদিনই সব জিনিষগুলি আমার বাড়ীতে উপহার বলে পাঠিয়ে দিলেন। আমি বুঝেছিলাম এই দেওয়ার আড়ালে কতখানি আন্তরিক স্নেহ লুকানো আছে—এও বুঝেছিলাম, এগুলি কিরিয়ে দিতে দোষ কতখানি আঁখাত লাগবে তাঁর মনে। কত অজস্র জিনিষ যে তার স্থখা নেই, প্রায় পাচ শ’ ছ’শ’ টাকার (তখনকার দিনে) মত হবে।

বাজার দিন সন্ধ্যার বৃষ্ণ ভরলোক আমাকে বিদায় দিতে এসে কৈশে ভাঙ্গলেন। সেদিন জানালেন তাঁর জেলমাকে বিয়ে করার অসুযোগ না মনে আমি তাঁর প্রছাই অর্জন করেছি। জাহাজের কেবিনে চুকে দেখি, মস্ত এক বায়লভণ্ডি আরও অজস্র উপহার উনি খেতে গেছেন। পাশাও উপহার দিয়েছিলেন বিদায় নেবার সময় করেক রকম উৎকৃষ্ট তুলত স্বরা।

প্রত্যেকজন আর অভাবের দাবী মেটাতে এই সব উপহারের তুলত সন্ধ্যার আমার সব সমস্তার সমাধান করে দিতো। মনে রেখাপাত করতো না কিছুই।

ভেনিস। দীর্ঘ দিন পর আবার পা দিলাম দেশের মাটিতে। কিন্তু করকু হোয়ে ভেনিসেও পৌছবার ভিতরই সবসময় নিশ্চেষ্ট করে কেলেছিলাম। তাই স্বদেশে ফিরে প্রধান চিন্তা হলো অর্থ উপার্জনের। জুয়া খেলা খরলাম। ভাগ্য বিক্রম। করেক দিনেই নিঃস্বল হোলাম। কি করি? কোথার কাজ পাই? উপোস করে মরতে আমি পারবো না, কিন্তু কাজও তো আমাকে কেউই দিতে পার না? এমন অবস্থার ডাঃ গাংসির কাছে লেখা ভার্জালিন লিখলোই আমাকে পথ-নির্দেশ দিলে। আবে প্রিয়ানী আমাকে একটা থিয়েটারের কাজ দিলেন—সেখানে প্রতিদিন এক ক্রাউন করে পেলাম। বাই হোক, তবু ঈর্জাবার মত মাটি পেলাম—তারপর ভাগ্য।

সেই ভাগ্যই নিয়ে এলো আমাকে এক বিবাহ উৎসবে বাতকার হিসাবে। উৎসবের তৃতীয় দিনে প্রায় ভোর রাতে বধন বাড়ী কিরছি তখন দেখলাম আমার আগে আগে একজন সেনেটের সস্ত্র চলেছেন। সেই তিনি তাঁর গণ্ডোলাতে উঠতে বাবেন অমনি একথানা চিঠি তাঁর চক্রে থেকে পড়ে গেল। উনি টের পেলেম না দেখে আমি সেটা ভড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিলাম। উনি বহুবার জানিয়ে আমাকে তাঁর গণ্ডোলাতে উঠে আসতে বললেন বাড়ী পৌছে দেবেন বলে। আমরা

হুঁজনে গণ্ডোলাতে উঠে বসতে মা বসতেই উনি বললেন, তাঁর বাতটা একটু জোরে ধরে দিতে কেমন যেন বিহুনিম্ব করে অসাড় হয়ে আসছে। আমি খুব জোরে জোরে যথেষ্ট লাগলাম, কিন্তু উনি কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠলেন তাঁর সমস্ত শরীর নাকি অবশ হোয়ে আসছে। বোধ হয় মারা যাচ্ছে—চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, যন্ত্রণার বিবর্ণ মুখ কেমন অকৃত ভাবে বেঁকে আছে। বুঝতে দেবী হোলো না যে এ নির্খাৎ সন্ন্যাস রোগ। তখন গণ্ডোলা থামাতে বলে ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটলাম। তাড়াতাড়ি তো ডাক্তার ড্রেসি গাউন পরেই চলে এলেন। এসে তাঁর শরীরের এক অংশ চিরে খানিকটা রক্ত বার করে দিলেন। আমি আমার সার্ট ছিঁড়ে জায়গাটাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। তার পর কিপ্রগতিতে গণ্ডোলা চাফিয়ে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌছলাম। চাকরদের ডাকাডাকি করে তুলে সবাই মিলে বধন তাঁকে ধরে বিহানার শুইয়ে দিলাম তখন তাঁর দেখে প্রাণ আছে কি নেই, বোম্বার উপর ছিল না। নিজেই তাঁর একজন চাকরকে ডাক্তার ডাকবার আদেশ দিয়ে বিহানার পাশে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে হুঁজনে বেশ সজ্জা ভরলোক ঘরের ভিতর এলেন। তখনলাম, তাঁর হুঁজনে বন্ধু। সমস্ত ঘটনাটা তাঁদের কাছে বললাম, আমার পরিচয় আমি জানাইনি, তাঁরাও নিজে থেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। সার্ব দিন কাটলো একই ভাবে, রোগীর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হোলো না।

প্রায় মাস রাতে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। স্বর অসম্ভব বেড়ে গেলো, সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্ট। অত হাসকষ্ট দেখে আমি উঠে তাঁর বন্ধুদের ডাকলাম। তাঁদের বললাম যে, ডাক্তার তাঁর সারা বুক জুড়ে যে প্লেটস দিয়ে গেছেন সেটা যদি একটুগি না সরিয়ে ফেলি তাহলে তাঁকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তারা কিছু বলবার আগেই আমি সেটা টেনে খুলে ফেললাম। তারপর অল্প গরম জলে বেশ ভালো করে স্পঞ্জ করে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর নিঃশ্বাস সহজ হোয়ে এলো—অনেক স্নহুও মনে হোলো। ধীরে ধীরে শান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে বধন আবার ডাক্তার এলেন তখন রোগী অনেকটা সুস্থ। ডাক্তারকে বললেন, “এমন ডাক্তার পেয়েছি যে তোমার চেয়ে ভালো ডাক্তারী জানে—”

—“তাহলে আমার বধন প্রয়োজন নেই, তখন নতুন ডাক্তারের চাক্ষেই থাকুন”—বলে ডাক্তার গম্ভীর হোয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনে হোলো অত্যন্ত কৃত হোয়েছেন। হওয়াই বাতাবিক।

তিন জনেই আমার কাজে-কর্মে কথাবার্তার বেশ একটু অভিজুত হোয়েছেন দেখে আমিও একটু সবজান্ডার চালে চলেতে লাগলাম। ভাবখানা যেন, সমস্ত আইনকাহন যেন আমার হাতের মুঠোর। তাদের লেখা জীবনে পড়িনি তাদের সবচেয়ে সব সময় বড় বড় কথা বলে, তাদের লেখা থেকে আড়িয়ে তিন জনকেই রীতিমত বৃত্ত করেছিলাম।

এই ভাবে তাক লাগানোতে সোঁদের কিছু ছিল না। বিশ বছর বয়স তখন আমার। বাহাঘরী দেখানোর সোভ ছাড়তে পারি? তাহাড়া আমার বাহ্যও ছিলো চমৎকার। সেই বয়সে জীবনের পাওনার খাতার কেউ কি শূন্যের এক বসাতে চার? অবশ্য আমার

মোক্ষ-প্রমোদ যে খুবই নির্দোষ হোতো। সব সময় তা মোটেই  
ন। কিন্তু সেও তো বয়সের লোভ।

ভেনিসে তো কেউ ভাবতেও পারতো না আমার মত লোকের  
দে মেশবার কথা। তাদের চিন্তাধারা, তাদের আদর্শ সবই উচ্চ  
তার, পবিত্র ভাবের—আমি ছিলাম পুরোপুরি বক্তৃতা-সেবক, মাছুর,  
টিব মায়ার বাঁধা। তাদের কঠোর, সংযত, নীতির বাস্তব ধরে বাস্তব  
সী আমি হোতে পারিনি—আমার পাথর আনন্দ আর উপভোগ।

যাক সে কথা। গরমের শুরুতেই উনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন  
—সেনেটে বাবার মত তো বটেই। তাঁর নাম ছিলো ম্যাসিয়ে ড  
গাগারিন। বৈদ্য প্রথম সেনেটে গেলেন তার আগের দিন উনি  
দামাকে ডেকে পাঠালেন—আমি এলে আমাকে পাশে বসিয়ে  
লেন,—

—“তুমি বাই হও না কেন, আমি তোমার কাছে চিরকণী।  
তুমি আমাকে নিশ্চিত মুক্তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আগে  
থায় তোমার অভিভাবক্য করেছেন, তারা তোমাকে ডাক্তার  
কিবা ধর্মবাস্তব, কিবা, আইনজ্ঞ এই সব করতে চেয়েছেন—কিন্তু  
তারা সবাই ভুল করেছেন। কেউই তোমাকে বোঝেননি। তোমার  
ভাগ্যদেবতাই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। আমি তোমাকে  
বুঝি—তোমাকে সমর্থনও করি। আমি মুক্ত্য পর্যন্ত তোমাকে আমার  
নিজের ছেলের মত দেখবো। আমার বাড়ীতেই থাকবে তোমার  
নিজের ঘর। আমার সঙ্গে এক টেবিলেই তুমি খাবে। তোমার

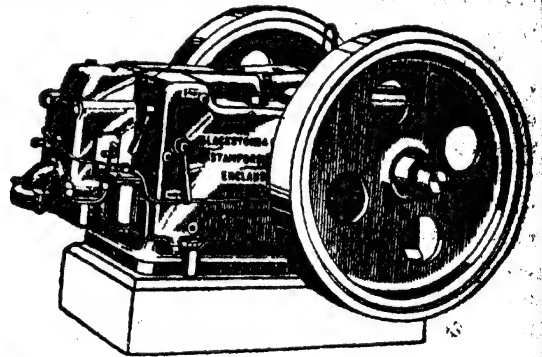
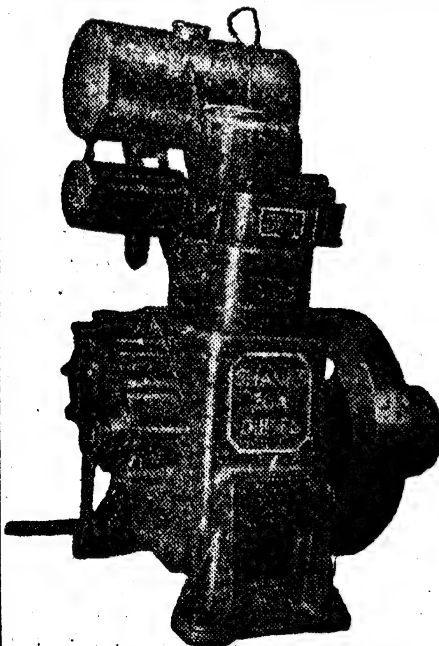
একজন নিজস্ব চাকর থাকবে, নিজস্ব একটি গাঙালা থাকবে আর  
মাসে দশ সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) তুমি হাতখরচা পাবে। তোমার  
বয়সে আমার জন্মে আমার বাবাও ঠিক এই ব্যবস্থাই করে  
দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের ভক্ত কোনো ভাবনা তোমার করতে  
হবে না। তুমি শুধু আমোদ-আজ্ঞাসে দিন কাটাও। বাই হোক  
না কেন, সব সময় মনে রেখো, আমি তোমার পাশে আছি—  
পিতার মত—বন্ধুর মত...”

আমার ভাগ্য এমনই চিরদিন। দরিদ্র বেহালা-বাঁজির থেকে  
একেবারে অর্থ আর সামর্থ্যের শিবরে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বহুর তিনেক পরের কথা। তখন আমি নেপলসে বেড়াতে  
যাবার পথে সেলেনাতে একটা হোটলে উঠেছি। বেশ দিলদরিয়া  
মেজাজ তখন। সঙ্গে আছে বেশ কিছু সোনালানা, মণিব্যাগটি  
ভর্তি, তা ছাড়া টেইশ বছরের অদম্য উৎসাহ।

একদিন ভোরবেলা দারুণ চটোমেচিতে ঘুম ভেঙে গেলো। দরজা  
খুলে দেখি, চার দিকে পুলিশ আর সামনেই একটা ঘরের দরজা হাট  
করে খোলা। আমার দরজা থেকেই দেখতে গেলাম সেই ঘরে  
বিছানার উপর বসে এক ভদ্রলোক লাতিন ভাষার অনর্গল চিৎকার  
করে যাচ্ছেন।



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শির ও কৃষিকার্য দেশের অন্ন ও প্রাণ এক  
আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিটল, ব্রাকস্টোন  
ভিকেল ইঞ্জিন, লিটল পাম্পিং নেট, ডাভল্ড ভিকেল ইঞ্জিন  
ডাভল্ড পাম্পিং নেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রিট, বিভল কলিকাতা-১

ফোন ১-২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বরলার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়ালো, গাল্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়ের মত প্রস্তুত থাকবে।

মান্যজারকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারখানা কি? তিনি বললেন,—“এই ড্রলোকের সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে, এখন বিংশের কাছ থেকে তাঁর অল্পবয়সী ভ্রাতাকে এসেছে মেয়েটি ওঁর স্ত্রী কি না। যদি স্ত্রী হয়, ততলে যে গোলমালের কিছুই নেই, শুধু ওঁদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখালেই সব কামেলা চুকে যায়। তা’না হলে অবশ্য দু’জনাতেই হাজত-বাস করতে হবে। কিন্তু মশাই, মাত্র তিনটি সেকুইন পেলেই আমি সব মিটিয়ে দিতে পারি। শুধু পুলিশের বড় কর্তাকে একবার বলা, তাহলেই তিনি পুলিশদের সত্বরে নেবেন। আপনি যদি লাগিন ভাষা জানেন তো একবার হুদা করে বান; গিয়ে ঐ ড্রলোককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন”—

“জোর করে দরজাটা খুলেছিলো কা’রা?”

—“কেউ নয় মশাই, আমিই খুলেছিলাম, ওটা আমারই কর্তব্য।”

ব্যাপারটাতে মাথা গলানোই ঠিক করে ফেললাম। সটান চুকে গোলাঘর তাঁর ঘরে। ড্রলোককে বুঝিয়ে দিলাম কেন লোকগুলো এই কামেলা করছে। ড্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, ওঁর সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি পুরুষ কি নারী বোঝবার উপায় নেই। কারণ, তিনিও ওঁরই মত অফিসারের পোষাক পরা। এই বলে তিনি একটা পাম্পশোট বের করে দেখালেন। তাতে ‘কার্ডিভাল আলবানি’র সই করা নাম—উনি হাজিরমান বেজমেন্টের ক্যাপ্টেন, ওঁরই কাগজপত্র নিয়ে ‘পারমা’তে চলেছেন। আমি লাগিন ভাষাতেই তাকে বললাম,—“ক্যাপ্টেন অল্পমতি করুন আপনার হোয়ে আমি বিংশের কাছে বাই, গিয়ে জানাই, তাঁর অল্পবয়সী আপনার সঙ্গে কি জব্বত ব্যবহার করছে। আর এই কামেলাও একেবারে চুকিয়ে আসি।”

অল্প পুলিশগুলো যে ভাবে একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক ড্রলোককে অপমান করলে তার জন্তে রাগে আমার সর্বশরীর অলঙ্ঘিত। আর সেই সঙ্গে সমস্ত মনও অস্থির হোয়ে উঠেছিলো ব্যাপারটার আড়ালে অল্প রহস্যের জানার কৌতুহলে।

বিংশের কাছে সুবিধা করতে না পেরে সোজা গোলাম জেনারেল স্পাডার কাছে। তখন ওঁরই অধীনে ছিলো এই শহরটা। তিনি সব জেনে অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হোয়ে সম্ভব্য করলেন, বর্ধবাজকদের কাজ হোলো ঈশ্বর আর পরলোক নিয়ে। ইচ্ছাশক্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন অধিকার তাদের নেই। কথা দিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। আর আমার সঙ্গেই লোক পাঠালেন হোটেল থেকে পুলিশদের সত্বরে নেবার নির্দেশ দিয়ে।

হোটেল ঘিরে থাকা লজ্জাটার সামনে পাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা করতে লাগলাম। ওঁই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করলাম, ওঁদের সঙ্গে সর্বত্র প্রোভিশন করতে পারি কি না।

—“আমার সর্বত্রকে জিজ্ঞাসা করুন”—ক্যাপ্টেন বললেন।

—“জ্ঞ, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ যদিও পাইনি, কিন্তু আপনার ঘেঁষিলো স্ত্রীরের ছান আমি নিতে পারি কি?”—কবাসী ভাবার বেশ কারণ কবেই বললাম।

একশাঙ্ক সজকাটা ফুলের মত ভাল, ভাবী মিষ্ট একখানি ফুল-গোবীরে এসে। মাথার ফেলসের টুপি। তার ডলা থেকে কামেলাগুলো চুসে গেল উঁকি দিয়ে। হাসিমুখে সমস্ত জানালো। ওঁর স্ত্রীর বিয়ে এখন প্রোভিশনের। বঁকাখানেক পর ডরটায় এসে আনাকে বাধার ঘরে তাকে নিয়ে গেল।

রহস্যময়ী স্ত্রীমণীটি হোলেন এক অপূর্ণ শূন্যের কবাসী মহিলা। ঘন নীল অফিসারের পোষাক ঠেকে আরও মিষ্ট আরও রূপসী দেখাছিল। সঙ্গের অভিনবকটির বয়স বাটের নীচে নয়—অথচ আমার তেইশ বছরের মন কিছুতেই তাদের গল্পত্যা সম্বন্ধ জানতে পারছিল না। কি দাঙ্গা বৈধম্য। তার উপর মেয়েটি কবাসী ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না আর ড্রলোকটি কবাসী একবর্ণও বোঝেন না। আর একটু সাহসে ভর করে বললাম ক্যাপ্টেনকে যে তিনি বধন ‘পারমা’তেই বাচ্ছেন, তখন ট্রোণেতে আমার কামরার বাকী চুটো সিট যদি ওঁরা নেন তাহলে বাঞ্ছিত হই। তিনি বললেন,—“আমি তো আনদের সঙ্গেই হালী; কিন্তু হেনরিচটাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।”

—“ভয়ে, আপনার সঙ্গে ‘পারমা’ অবধি একসঙ্গে বাধার সৌভাগ্য কি আমার হবে?” আবার সেই ফরাসী কায়দা।

—“থু-থু-রাকি:—অন্ততঃ কথা বলেও বাঁচবে, কয়েক দিন কি দুর্ভোগই না গোছে আমার”—আমার ট্রোণের কামরাতা’ এতক্ষণ অবধি আমার বহনতেই বিরাজ করছিলো—এবার তাকে সত্যো রূপায়িত করতে চললাম। পরদিনই হাতা স্থির হোলো।

ট্রোণ ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকে আমার একটু অপোহান্তি হতে লাগলো। হাজিরমান ড্রলোক বেরাচী চুপ করে বসে আছেন এক ধারে, আমাদের একটি কথাও ওঁর বোঝগম্য হচ্ছে না। তাই মেয়েটি বখনই কিছু গাশির অথবা মজার কথা বলছিলো তখনই সেটা আমি লাগিনে অল্পবয়সী করে তাকে শোনাতে লাগলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ওঁর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হোয়ে উঠছে।

কবাসী ভাবার সেই প্রথম আমি কবাসী মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। মেয়েটি কথা বলার ভঙ্গী ভারী চমৎকার। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মত। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো ও নিশ্চয়ই থু-বেপারোয়া ঘরদের মেয়ে। মনে মনে চাইছিলামও তাই বেন হয়। কারণ, ক্রমেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত মন চাইছে ওঁই বুকের ফল থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করতে। অবশ্য বুকের মনে বাটে থু-বেপা আখ্যাত না লাগে তার দিকেও আমার টুটি ছিলো। কেন জানি না, এই বুড় মিলিটারী অফিসারটিকে দেখেই আমার প্রজ্ঞা ভেঙেছিলো ওঁর উপর। কিন্তু মেয়েটি কেমন ধরনের? পুরুষের বেশ পরে থাকে, সঙ্গে না আছে কোনো মালপত্র, না আছে কোনো মেয়েলী প্রসাধন-সজ্জা কিংবা টুকটাকি কিছু—একটা সেমিজ অবধি নেই। আচ্ছা, ক্যাপ্টেনের সাঁট নিয়ে পরে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটাই বেন দাঙ্গা হোয়ালির মত—তাইতেই আমার উৎসাহও বাড়তে লাগলো।

বাজিবেলা বেশ একটি উপাসের জোজের পর সবাই মিলে আন্তনের ঘরে বসে জিলায়। তখন কৌতুহল আর চাপতে না পেরে সাহসে ভর দিয়ে মেয়েটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, ওঁই বুড় ড্রলোকটির সব কি করে নিলো? ওঁকে ওও বাবার বহসীই বনে হয়, তবে?

—“যদি জানতেই চান তো ওঁকেই বলুন সমস্ত কাহিনীটা আপনারকে শোনিয়ে। দেখবেন যেন কিছু বাধ না যায়”—মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো।

বধন ক্যাপ্টেনকে বোঝানো গেল যে, কাহিনীটা বলার মেয়েটি

একটুও আপত্তি নেই, তখন তিনি হুক করছেন বলতে। "আমার হু" মাসের ছুটি ছিলো। তাই ভাবলাম, রোমেতেই ছুটিটা কাটিয়ে আসবো। আমার ধারণা ছিলো, শিক্ষিত সমাজে সবাই বুরি লাতিন ভাষা জানে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার ধারণা একেবারেই মিথ্যা, তখন বুঝতেই পারছেন কি অসহ্য অবস্থা আমার হোলো। কোনো রকমে একটি মাস কাটার পর কাউন্সিল আলবেনী যখন আমাকে কাজের জন্ত পারমা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, তখন আমি যেন বাঁচলাম। ওই সময় ক'দিনের জন্ত এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন জেটির ধারে বেড়াছিলাম, এমন সময় দেখলাম এক বৃদ্ধ অকিসার আর এই মেয়েটি একটা নৌকা থেকে নামলো। তখনও ওর ঠিক এই রকম পুরুষের বেশ। তা' হোক, মেয়েটির চেহারাটা ভারী ভালো লাগলো। অবশ্য তুলেই যেতাম, পরে যদি না হোটলে ফিরে দেখতাম আমার সামনের ঘরটাই ওরা দখল করেছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম, ওরা দুখোদুখী খেতে বসেছে—লক্ষ্য করলাম, দুজনেই নিঃশব্দে খেয়ে গেল, একটিও কথা না বলে। খাবার পর মেয়েটি উঠে কোথায় বেরিয়ে গেল আর অকিসারটি চুপচাপ বসে কী পড়তে লাগলেন। পরদিন দেখলাম, মেয়েটি একলা, অকিসারটি কোথায় বেরিয়েছেন। সুযোগ বুঝে আমি আমার চাকরকে দিয়ে ওকে লিখে পাঠালাম, যদি ও আমার সঙ্গে কিছুকণ কাটাতে রাজী হয়, তাহলে আমি ওকে লম্বা সেকুইন দেবো। মেয়েটি বলে পাঠালে, আজ খাবার পরেই ওরা রোমে চলে যাবে। ইচ্ছা হোলো আমি সেখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

"রোমে ফিরে এলাম। ওই মেয়েটির চিন্তা নিয়ে আর একটুও মাথা ঘামাই নি। শেষে যখন আমার চলে খাবার আর দুধনি মাত্র বাকী, এমন সময় আমার চাকর এসে বললে, মেয়েটিকে দেখেছে, কোথায় উঠেছে তাও দেখেছে। আর এখনও সেই অকিসারটির সঙ্গে আছে। আমি বলে পাঠালাম মেয়েটিকে যেমন করে হোক জানাতে যে আমি কালই রোম থেকে চলে যাবছি। মেয়েটি জানালে ঠিক ক'টার সময় কোন গাড়ীতে আমি যাবো জানলে ও আমার সঙ্গে শহরের বাইরে দেখা করতে পারে... আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়তেও পারে। স্থান, কাল সব জানলাম। বধ্যভূমির মেয়েটি এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো... বাস, সেই থেকে আমার সঙ্গেই আছে। ওর কাছ থেকে এটুকু বুঝছি যে ও আমার সঙ্গেই 'পারমা' যেতে চায়, সেখানে ওর কি কাজ আছে... আর রোমেতে ও আর কি করতে চায় না। বুঝতেই পারছি। পরস্পরের কথা না বোঝার কি অসুবিধাতেই পড়তে হোমনেছে। এখন কি, এটুকু আমি ওকে বোঝাতে পারিনি যে যদি কেউ আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, ওকে যদি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি একেবারেই ওর কোনো পরিচয় জানি না। কে, কোথা থেকে এলো কিছুই না—তবু জানি ওর নাম হেনরিয়েটা। ও কখনো কি না আসলে তা'ও ঠিক জানি না। তবে এটা দেখছি অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ এককৃত্রিম মেয়ে, তাছাড়া মনে হয় বেশ উচ্চশিক্ষিত। মেয়েটির উপস্থিতি হৃদিতও যেমন সাহসও তেমনি। আপনাকে যদি ও নিজের কাহিনী বলে আর আপনি যদি দয়া করে লাতিনে আমার

সেটি শোনান তাহলে আমি কত যে সুখী হই, বলতে পারি না। সত্যিই ওর ওপর আমার একটা টান পড়ে গেছে, ওর এককৃত্রিম বন্ধুই হোতে চাই আমি—'পারমা'তে ও চলে যাবে মনে হোলো আমার ভীষণ কষ্ট হয়। ওকে বলুন আমি ত্রিশটি সেকুইন উপহার দিতে চাই—সত্যি থাকলে আরও বেশী দিতাম।"

ক্যান্টেনের কাছে শোনা কাহিনীটা হেনরিয়েটাকে বহুবাদ করে শোনতে গিয়ে দেখলাম ওর মুখ রক্তা হোরে উঠেছে। কিন্তু বিবাহীন ভাবে সব কাহিনীটাকে স্বীকার করলে। তারপর আমাকে বললে "আপনি ওকে বলুন, যে জন্তে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না ঠিক সেই জন্তেই সত্য কাহিনীটাও বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর ঐ ত্রিশ সেকুইনের আর্থখানা সেকুইনও আমি নিতে পারবো না—উনি জোর করলে শুধু দুঃখই পাবে। 'পারমা'তে পৌঁছে আমি ওর কাছে বিদায় নিতে চাই, আর আমার ইচ্ছাকৃত পথেই আমি যেতে চাই। উনি যেন জানতে না চান আর ভবিষ্যতে যদি কখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়, তবে দয়া করে না চেনার ভান করলেই আমি সব চেয়ে অসুখী হবো।"

যেচারা ক্যান্টেনটি সব শুনে অত্যন্ত দুঃস্থ হোলেন মনে হোলো। জানতে চাইলেন মেয়েটির কোনো কিছু প্রয়োজন বা অভাব আছে কি না। উত্তরে হেনরিয়েটা জানালে, তার জন্তে ওঁর ব্যস্ত হবার একটুও দরকার নেই।

এর পর কথাবার্তা আর মোটেই জমলো না। আমিও উঠে পড়

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম.

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"

☆

এটি পাকি ২৪ টা বড় প্রাকসের

ARYA'S SLICED BREAD

ARYA'S SLICED BREAD

ARYA'S SLICED BREAD

PREPARED BY CALCUTTA

- কমে প্রস্তুত
- দ্রুমে সেরা
- যেসব প্যাক
- ও ফলি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সন্তোষ রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী

কলিকাতা - ২৯

ওদের 'ভক্তগি' জানালাম। লক্ষ্য করলাম, হেনরিয়েরা হুখ আরম্ভ হোলে উঠেছে।

মেয়েটি কে? নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, কি আশ্চর্য্য সন্নিবেশ ওর মধ্যে? ওর ওই পবিত্র সরল স্বভাব; ভয় সহ্যত ব্যবহারের সঙ্গে এমন চরম উদ্ধৃঙ্খলতা কেমন করে সম্ভব হয়? কে ওর জন্তে 'পারমা'তে অপেক্ষা করে আছে? ওর প্রেমিক না ওর স্বামী? ওখানকার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে কি ও? কে জানে, যোমে সেই অকিসারটির কল থেকে আশ্চর্য্যকার জ্বলন্ত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে কি না? বাই হোক, ওদের সঙ্গে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা মেয়েটিকে জানাতেই হবে। নাহলে এ সবই তো পণ্ডশ্রম।

পরদিন এক সময় সুরোগ্য বৃষ্টি জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপ্টেনকে যে সব আদেশ করলেন আমার উপরও ঐ একই আদেশ জারী করবেন নাকি?" উত্তরে বললেন,— "আদেশ বলছেন কেন? আদেশ করবার কি অধিকার আমার? ও শুধু অমরোথ। আমি তাঁকে অমরোথ করে আমার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে অমরোথ জানিয়েছি। আপনিও যদি আমার বন্ধ হন তবে আপনাকেও ওই একই অমরোথ আমার।"

— "ভদ্রে, বা আপনি বললেন তা' মেনে চলা করাসীয়ে পক্ষে সম্ভব হোলেও একজন ইতালীয়ের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। একই শহরে থাকবে অথচ দেখা-সাক্ষাৎ করবে না? আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাহলে আপনার উপরই নির্ভর করছে আমার এখানেই বিদায় নেওয়া কিবা আপনারদের সঙ্গে বাওয়া। যদি বলেন আমি আপনারদের সঙ্গে যেতে পারি, তাহলে পোড়াতেই সাবধান করে রাখছি শুধু বন্ধুত্বই আমি তুণ্ড নই—বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই—কথা দিন আমাকে? তুণ্ড নেই, ক্যাপ্টেনের মনে কিছুমাত্রও আঘাত দেবে না; তিনি বুঝছেন আপনার প্রতি আমার মনোভাবটা কি। আশ্চর্য্যই হলেন, বিদায় বেলায় আমার মত নিরাপদ আশ্রমে আপনাকে রেখে গেলে। কিন্তু ও কি আপনি হাসছেন কেন?"

— "হাসছেন না? আশ্চর্য্য লোক আপনি। এমন করে কথা মিছলেন একটা মেয়ের কাছে—একবারে সোজা খাঁড়া উঠিয়ে? একটু কিম্বদ, একটু কোমলতা, একটু রঙ, একটু হাস—একবারে কিছুই না।" উচ্চ মধুর কণ্ঠ হেসে উঠলো হেনরিয়েরা।

— "হাঁ, আমি জানি, আমি কোমল নই, আমি হাসিক নই, আমি কী নই—কিন্তু জলরতাপের ভাণ্ডার আমার সম্ভ্রান্ত—শুধু আমি ভোগ করতে—বলুন, বলুন ইগগির, নষ্ট করবার মত সময় কই?"

— "জলুর আরামের সঙ্গে পারমা অবধি," উত্তর এলো।

তবু হাতটিতে আমি চুষন করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন এসে পড়লেন। খুব বাতাসিক জবাবেই উনি এটা নিলেন। তার পর আমাকে এক ঘায়ে ওকে নিয়ে গিয়ে জানালেন যে, ওর মনে হয় ওর একলাই পারমাতে চলে যাওয়া উচিত। আমরা না হয় দু'একদিন পড়ে লৌহাণো। তাই ঠিক হোলে। বিদায় ব্যাপারটাও খুব সহজ করে বাতাসিকভাবেই ঘটলো।

— "তিনি চলে যাবার কয়েক দিন পর আমি হেনরিয়েরাকে জিজ্ঞাসা

করলাম— "অর্থহীন, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় ও পারমাতে কি করতো? স্বীকার করলে হেনরিয়েরা যে নানারকম অন্ত্রবিধার ওকে পড়তো হোতো। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বললো যে, ও জানতো আমি ওকে দেখাবোই—ও বুঝেছিলো যে আমি ওর বিশেষ পাশে পাঁড়াবোই। একটু থেমে, একটু বিধার সঙ্গে বললো আমি যেন ওকে খারাপ না ভাবি, বা কিছু হোয়ে গেছে সে সব ঘটনার জন্ত দায়ী ওর স্বত্তর আর স্বামী। দুজনেই শুধু নিষ্ঠুর নয়, নরশিশাচ।

'পারমা'তে এসে আমি আমার মায়ের কুমারীবেলায় পদবী 'ফার্সী' নামের সঙ্গে যোগ করলাম। আর হেনরিয়েরা নাম নিলে 'আনি' জ' আরসি। আমরা একটা হোটলে গিয়ে উঠলাম। একটি ফরাসী হোকরা চাকরেরও ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর বাজারে দ্রুত দ্রুত বড় একটা দোকানে ঢুকে চাইলাম চকিশ সম্বন্ধ করবার মত খুব ভালো কাপড়, কয়েকটা পেটিকোট, কিছু দামী মসলিন ক্রমালের জুতা। তারপর দোকানীকে আমার ঠিকানা দিয়ে একজন দর্জি পাঠাতে বলে এলাম। বেয়িরে এসে আর একটা দোকানেও কিছু টুকটাকী কিনে কতকগুলি ভালো সিডের আর পুতির মোছাও কিনে নিলাম।

কি অপূর্ণ মুহূর্তটি এলো! আগে থেকে এসব কেনার ব্যাপার আমি কিছুই বলিনি হেনরিয়েরাকে। কিন্তু জিনিষগুলি দেখে কি গভীর তৃপ্তি আর খুশীর হাসি ওর মুখে ফুটে উঠলো! এতটুকু উজ্জ্বল আড়ম্বর ছিল না—ছিলো কৃতজ্ঞতা ওর প্রকাশভঙ্গিতে—পছন্দের আর স্বচির প্রশংসার। আনন্দের উজ্জ্বল ছিল না কিন্তু খুশীর মিষ্ট হাসি আরও মধুর হোয়ে ছুটে উঠেছিলো।

দর্জিরের হাকামা চুকে গেলে দুজনে টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে হাজির। হেনরিয়েরা ছোট্টো মেয়ের মত ছুটে গিয়ে "বাবা" বলে ডেকে ওর হাত ধরে নিয়ে এলো। সবাই মিলে খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেললাম। ক্যাপ্টেন দেখলাম সত্যিই খুব খুশী হোয়েছেন, সেই বেগবোয়া মেয়েটিকে এমন নিশ্চিন্ত পরিবেশে দেখে। সত্যিই ওকে আশ্চর্য্যিক ভালোবাসতেন উনি।

সন্ধ্যার খাবার পর দুজনে বসে গল্প করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম হেনরিয়েরার মুখখানি অত্যন্ত জ্ঞান, বিরাগ। কারণ জানতে চাইলে ও মুহূর্তেই বললো,— "বন্ধু, তুমি তো আজ অনেক টাকা আমার জন্তে খরচ করলে—সে কি আমার কাছ থেকে আরও বেশী মনোবোগের আশায়? আমি বিশ্বাস করি না সেকথা। কিন্তু কেনো আজ তোমাকে বত ভালোবাসি গত কালও ঠিক এমনই ভালোবাসতাম—কিছুমাত্র কম নয়। তোমাকে আমি ভালোবাসি, সমস্ত মন দিয়েই ভালোবাসি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া বা কিছু তুমি আমাকে দাও তার আর কোনো দ্বন্দ্বই আমার কাছে নেই। শুধু আমাকে মনে করে এনেছো এই চিঠিটুকুই তার লক্ষ্য। কিন্তু যদি তুমি সত্যিই ধনী না হও তবে তো কতখানি আশ্চর্য্যানি আমার বাড়কে—অকারণ, অনর্থক তোমার এই অপহার!"

— "আমার, আজ এক মুহূর্তের জন্তেও ভাবতে দাঁড়াবে

# তার রূপের কথা এর মুখে ধরে না

—যার কোমল মুখের বসন্তবীর্য প্রসাধন



## পণ্ডস কোল্ড ক্রীম

প্রতিবার মুখ ধোয়ার পরই  
পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে  
মাখবেন। এতে স্বকের  
স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ  
হয়, মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও নির্মল  
থাকে। পণ্ডস কোল্ড ক্রীম  
স্বকের গভীর থেকে ময়লা  
বার ক'রে মুখ স্বক  
বাতবিকই পরিকার রাখে!



### বিনামূল্যে পুস্তিকা:

আমাদের প্রধান-পুস্তিকা 'লাভ লিয়ার  
উইথ পণ্ডস' চেয়ে পাঠান। মুখশ্রী ও  
সৌন্দর্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা  
এতে পাবেন। ঠিকানা—পো: বক্স  
১৬১২, বোম্বাই ১।



আমি হৌ। আমি জানি তুমি আমাকে কোনো দিনই নিষে করবে না। কিন্তু আজ আর কোনো চিন্তা নয় তুমি বলো তুমি আমাকে ছেড়ে বাবে না—কখনও না, কোনো দিনও না—কথা দাও—

—“বহুদূর সাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বলো? তুমি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন? না তোমাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয়?”

—“স্বাধীন—একবারে পুরোপুরি স্বাধীন—”

—“ভালো, অভিনন্দন জানাই তোমাকে। কিন্তু তার বেশি যে কিছুই বলতে পারি না। প্রতি দুহুর্ন্তে ভয় করে, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে, চিনে ফেলবে আর ছিনিয়ে নিয়ে বাবে তোমার বাহুবন্ধন থেকে—”

—“অমন করে বলো না—সত্যিই কি তোমার মনে হয় এমন বিপদও ঘটতে পারে?”

—“না, অবশ্য পরিচিত কেউ যদি আমাকে দেখে না ফেলে—”

—“বে অফিসারটি যোমে তোমার সঙ্গে ছিলেন তাঁর কাছে ধরা পড়ার ভয় করছে?”

—“একটুও না—তিনি তো আমার স্বপ্ন—আমার খোঁজ নেবার জন্যে তাঁর একটুও মাথাব্যথা নেই, এ আমি জানি। বরং আমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বিচক্ষণ। কেন ছেলেদের শোবাক পরে পাগলের মত ব্যবহার করেছি জানো—ঊঁম আমাকে ভোর করে একটা কনভেন্টে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন, আমার আন্তরিক অস্বীকার। কিন্তু বহু, আর নয় আর তুমি জানতে চেনো না আমার কাহিনী। ও অমনিই রহস্ত ঢাকা থাক।”

—“তোমার এই গোপনতাকে আমি লক্ষ্য করি। কিন্তু মানসী, আমার মনের কোণ থেকে আজ ভয়ের ঝাঁটা সরিয়ে ক্যালো, তুমি ভালোবাসার কুল কোটাও—তুমি ভালোবাসো।

একটানা অনশ্বর শ্রোতে কাটতে লাগলো দিনগুলি—কেটেই যেতো হৃদয় চিরদিন। কিন্তু কৃষ্ণ দেখা হোলো, পরিচয় হোলো, কুন্ডলো মৃদুরে ছায়েসার সঙ্গে। একটা লাইব্রেরিতে এই কলসী ভরসোকেব সঙ্গে দেখা। ওঁর কথাবার্তা, পছন্দসিদ্ধান্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আমাকে এত হুত করলো যে, সে পাড়ার লাইব্রেরিতেও শুধু সীমাবদ্ধ হইলো না, আমাদের হোটেলের একটুকু বলাচীর গল্পকাণ্ড অব্যবহিত হইলো ওঁর জন্যে। কৃষ্ণের সঙ্গে হেনরিঘেটের পরিচয় করালাম।

পাল-পাল জ্বলন্ত হেনরিঘেট। আমি অপেক্ষাতে নিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কয়েকই সারি হোটে ও, পাছে কেউ দেখে ক্যালো। সেই শিশুর বয়স বিজ্ঞপ্ত করলো, কিন্তু কলসী মেয়েরা সহজেই যে লক্ষ্যে পড়ল। ভয়ের ভাঙে কলসী অধি মাথোতা না বেচারা—বললো তো বালাভাইই না। কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়া হেনরিঘেটকে বিশ্রাম করাই। সেবে একদিন কলসী ওঁর বাড়িতে যেতে, আর আমার অতিথি হই তুমি-আমার। কিন্তু কলসী পৌছলো, দেখি বাড়ীতে কিছুই নেই। বাড়ীতেও কেউই হেনরিঘেট পাঁচ দিবে গৌরব করে আসবে মজা-উভয়জন। কিন্তু সে সন্ধ্যাটা নির্দিষ্টই হইলো না।

হেনরিঘেটের সব চেয়ে ভয় ছিলো অভিজ্ঞত সমাবেশে। কিন্তু কয়েকই অসতর্ক হওয়ার ফলে আর ওই নাছোড় ছায়েসার পাজার পড়ে রাজসভার উৎসবে পর্যন্ত বোপ দিলাম। আর সেই হোলো আমাদের কাল। সেখানে একটি বেশ সুশৃঙ্খল অধ্যাপক সৈনিক রাজ-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে কিংছিলো। তার দৃষ্টি বার বার দেখি আমার পাখবন্ধিনীটির উপর পড়ছে। একবার আমাদের মুখোমুখি হওয়ারো আমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানালাম। লোকটি কিন্তু তখন ছায়েসাকে একান্ত ডেকে নিয়ে মুহু মুহু কি সব কথাবার্তা বলতে লাগলো। তার পর আমার বিদায় নেবার আগে আবার এসে হাজির হোলো। অতি বিনীত ভাবে হেনরিঘেটকে লক্ষ্য করে বললে, ডেকে বেন চেনে বলেই মনে হচ্ছে।—“কিন্তু আপনাকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না”—হেনরিঘেট অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললো। “ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না, আমাকে মাপ করবেন—”

ছায়েসা এসে বললে লোকটির নাম ড জীতোয়ান। ও বলছিলো হেনরিঘেটকে চেনে, তাই ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে অনুবোধ করছিলো। ছায়েসা অবশ্য বলেছিলো চেনেই যদি, তবে আমার পরিচয়ের কি প্রকার? কিন্তু তা শোনেনি ও।

স্পষ্ট দেখলাম হেনরিঘেটের চোখে-মুখে একটি অবস্থির ভাব ফুটে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ড জীতোয়ানকে যে না চেনার ভাণ করলো সেটা কি সত্যি, না ইচ্ছে করেই চিনতে চাইলো না?

—“চিনি না ঠিকই” হেনরিঘেট বললে, “তবে ওঁর নামটা চেনা—খুবই চেনা। প্রভুজ্ঞ ওরা বেশ নামকরা পরিবার, কিন্তু ওই লোকটিকে এর আগে কখনও দেখিনি।”

কিরে এলাম হোটেল। কিন্তু হেনরিঘেটকে দেখে আমার মনের সমস্ত আনন্দ-নিমেবে অন্তর্হিত হোলো। কি জ্ঞান, চকল ভাব! মিষ্ট হাসিভরা মুখখানি কোনো অজানা ভয়ে স্নান হোয়ে গেছে। এক অন্তত কালো ছায়া আমার মনের সব আলো বেন ঢেকে দিলো।

সেই সন্ধ্যাতেই আমার চাকর এসে আমাকে একখানা চিঠি দিলে। বললে, পত্রবাহক অপেক্ষা করছে উত্তরের। চিঠিখানা হাতে নিয়ে হেনরিঘেটের কাছে গেলাম।

—“হেনরিঘেট, কেন এই চিঠিটা এলো বলতো? আমার একটুও ভালো লাগছে না, খালি মনে হচ্ছে বেন কোনো অন্তত ইঙ্গিত এটা ব’য়ে এনেছে। আমার খুলতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।”

আমার হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে হেনরিঘেট খুলে ফেললো। আমাকেই স্বাধীন করে লেখা—

—“অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যেও নয় করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমার বাড়িতে কিবা আপনার বাড়িতে বৈশােনে আপনার ইচ্ছা। কয়েকটি বিশেষ কথা আছে—বা আপনার পোনা একান্ত প্রয়োজন।

ইতি

ড জীতোয়ান।”

[ কলসী :

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।



পাক হাটের একটি তিনতলা বাড়ীর দোতলার একটি ফ্ল্যাট। দুইখানি ঘর, একখানি বড় ও একখানি ছোট। ছোটঘরটি ঘর, বড়টি ড্রইংরুম। সামনে একটি প্রকাণ্ড বাগান, পিছনে ঘর ও বাথরুম। ঘর দুইখানি আধুনিক রুচি অনুযায়ী সজ্জা করা। সোফা, সেট, কার্পেট, টেবল-চারমেনিয়াম, রেডিও, সবই হু। একটি খোলা শেলফে অনেকগুলি বাংলা বই সজ্জা করা। একটি কাচের আলমারিতে ইংরাজি ও বাংলা বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলি বই। দরজার ও জানালার শাউনিকেনে নানা। শোবার ঘরে একখানি শুক্ল খাত। বালিশের শ একটি বেড-স্টুট। খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলে দুখানি বই আর সাময়িক পত্র, একটি টেবল-ল্যাম্প, ২ চাকাদেশের একটি জলের ঘাস। রান্নাঘরে কিছুই নাই দলেট চলে। একটি ছোট ইলেকট্রিক হীটার, প্রয়োজন মত জল, প্রকৃতি গরম করা যায় বা ডিম সিদ্ধ করা বা ভাজা চলে। দু ফলও আছে একখানি গ্রেটে। ছবি, কাঁটা, একটি ফুটের টিন ও মাখনের টিনও আছে। বেশ বোকা যায়, রান্নার গান আভোজন নাই। একটি টিকা চাকর সকাল-বিকাল তিন ঘণ্টা রিয়া থাকে, বাড়ির কাজকর্ম করে, ছুতা পাশিলা করে। কাজ। থাকিলে ঘরের বাড়ির দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে। কটি আয়া আছে, সেই প্রায় সর্বদা বাড়িতে থাকে। রান্নাঘরের ক পাশে মেয়ের বিজ্ঞান করিয়া পোয়।

ড্রইংরুমের বাড়ির দরজার পাশে একখানি শিতলের ফলক লগ্নালে বসানো আছে। তাহাতে লেখা—মিস্ হেমলতা পাল, ডি, ডি, এস-সি, তাহার নীচে লেখা—দাম্পত্য এবং বহন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। দরজার অপর পাশে ঐরূপ আর একটি ফলকে ঐ ভাষাগুলিই ইংরাজি করিয়া লেখা—Miss H. Paul. D. D. 3c. Specialist in Cooking and Conjugal Science. ডি, ডি, এস-সি, কথার অর্থ—ডক্টর অফ ডোমেস্টিক সায়েন্স।

মিস পাল সম্প্রতি বিদেশ হইতে উক্ত ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোমেস্টিক সায়েন্সের চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হইলেই তিনি সেই চেয়ারে উপবিষ্ট হইবেন, এইরূপ আশা আছে। আপাতত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতেছেন। কনসালটেশন কি বোল টাকা। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে আট টাকাও লইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাসমিতে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন এবং সুযোগ পাইলেই কোন কোন সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও করিয়া থাকেন।

মিস পাল অবিবাহিত। বিবাহ কোন দিন করিবেন, এ ইচ্ছা তাঁহার মনেও আসে না। প্র্যাকটিস ও কয়েক জন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-বন্ধনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, ইহাই তাঁহার সামাজিক জীবন। ফ্ল্যাটে একাকী থাকেন। রান্নার হাজানি নাই। নিকটবর্তী একটি হোটেলের সহিত ব্যবস্থা আছে, দিনে চার বার আহাৰ্য সাজাইয়া দিয়া যায়। বিশেষ কোন প্রয়োজন হইলে আয়া আছে, ইলেকট্রিক হীটার আছে।

মিস পালের নিম্নলিখিত জীবন সন্মুখ হইতে চলিয়াছে।

২

একদিন প্রাতে মিস পাল চা খাইতে বসিয়াছেন। হোটেল হইতে একটি লোক একটি বড় ঐ-তে সব সরঞ্জাম গুছাইয়া আনিয়া



তাস্কর

একটি ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছে। চা, চিনি, দুধ প্রকৃতি হাড়া কিছু খাওয়া আছে। দু'খানি টোট, একটি ডিমের ওমলেট, চারখানা শ্রাওউইচ, চারখানা বিস্কুট, একটি কলা ও একটি আপেল। পছন্দমত দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা তৈয়ার করিয়া কেবল এক চুমুক খাইয়াছেন, এমন সময়ে ফোন বাজিয়া উঠিল। মিস পাল আরাকে ডাকিয়া বলিলেন, কোনটা ঘর। যদি 'কল' হয়, তবে রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাকে বলবে। আর যদি অন্য কেউ হয়, তবে বলবে এক ঘণ্টা পরে ফোন করতে।

আয়া কোন ধরিল, ছালা?

কোন : এটা কি ডাঃ পালের বাড়ী?

আয়া : হ্যাঁ। আপনার কি দরকার বলুন?

কোন : এখনই একটা 'কল' দেব। ওঁকে একবার আসতে হবে।

আয়া : একটু ধরুন।

আয়া মিস পালকে বলিল, একটা 'কল' আছে।

মিস পাল ভ্রূণবিনে হাত দুছিয়া উঠিয়া গিয়া কোন ধরিলেন। বলিলেন, ছালা, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

জবানীপুর, বেলতলা থেকে।

কি কেস বলুন তো?

মাছ।

ও, আচ্ছা। আবি এক ঘণ্টার মধ্যেই আবি টিকানারি বলুন।

টিকানা জানিয়া লইয়া মিস পাল আবার চাফে প্রাইভেট বলিলেন এবং একটু ভাড়াভাড়া বাড়ীতে শেব করিয়া সন্ধ্যা-চুম্বিক কামের লোক রং-এর গোল ব্যাগ হাতে করিয়া চাকরকে বলিলেন, গাড়ী টিক আছে?

চাকর বলিল, আছে হ্যাঁ।

মিস পালের গাড়ী সম্বন্ধে বেলতলার একটি বাড়ীর লোক আসিয়া গাড়ীল। বাড়ীর কর্তা বাড়ীতে ছিলেন না। একটি লোক আসিয়া মিস পালকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। দুই আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং একখানি চেয়ার আনিয়া তাকে মিস পালকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মিস পাল বসিয়া বসিয়া

হলেন, আপনার স্বামী কি করেন? গৃহিণী বলিলেন, তিনি  
—হলেন একাডেমির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর।

মিস পাল বলিলেন, আপনার বাড়িতে কত জন লোক?

এই ধরন, নয়দশ জন হবেন।

বেশ। এইবার বলুন, কি ব্যাপার।

গৃহিণী একটু দূরে বারান্দার দিকে তাকাইয়া মিস পালকে  
বলিলেন, এই দেখুন।

হ্যাঁ। একটা মস্ত কাতলা মাছ, ছয় সাত সের হবে।

গৃহিণী বলিলেন, তা হবে। উনি যোগ এমনি ওজনের মাছ  
এনে ফেলবেন। কোন দিন কাতলা, কোন দিন কই, কোন দিন  
একটা আটসেরি চাউ। কোন দিন দশ-বারো গুণ্ডা গলদা চিড়ী,  
কোন দিন সাত-আটটা ইলিশ।

বেশ, তার পর?

এখন আমি কি কি? এসব বাঁধবে কি করে?

একজ্যাস্টিল। সেই জন্তই তো আমরা আছি। ধরুন, আজকের  
এক কাতলা মাছ। আগে ছুরি দিয়ে বা চামচে দিয়ে বা এই বকম  
কিছু নিয়ে জাঁপ ছাড়িয়ে ফেলুন। বিকরে, আগে কেটে নিয়ে পরে  
জাঁপ ছাড়িয়ে পাবেন। বাড়ির কাছে কেটে ছুড়োটা আলো  
করুন। যদি বিটতে না কাটতে পারেন, তাহলে বিটর গোড়ার  
দেখে লা দিয়ে কাটতে পারেন। মুড়োর প্রকাণ্ড কান দু'টো  
কেটে ফেলুন, কানের ফুল দুটোও কেটে বের করুন। তারপর লা  
দিয়ে বা বিট দিয়ে মুড়োটাকে দু'ভাগ বা চার ভাগ করে কাটুন।  
একিধারে ছুড়িকট করতে পারেন সোনাযুগের ডাল দিয়ে। মাছের  
পেটের নিকটায় হাত ঢুকিয়ে তেল বের করে ফেলুন। দেখবেন বেন  
শিঙি গলে না যায়। এবার মাছটাকে ঢাকা ঢাকা করে ফেলুন।  
কঁচা কোল ও গাদা আলো করবেন। পরিমাণ মত লেজটা  
আলাদা থাকবে। বাড়িতে নুতন রোঁ থাকলে, তাকে লেজটা  
জাল করে ভেজে খেতে দেবেন। গাঙ্গার মাছ বাড়ীর লোক বুঝে  
ধানকতক ভাজা করতে পারেন। কালিয়া করতে পারেন।  
ইচ্ছা করলে ধানকতক চপ করতে পারেন, মাছের পোঁতাও মন্দ  
হবে না। বড় পটল পেলে কোড়মা করতে পারেন। কায়ে যদি  
মুগ হয়, টক করতে পারেন। বাঁকুড়া প্রকৃতি অকলে বড় মাছ  
পেলেই মাছের টক করে থাকে। ইলিশ মাছ হ'লে কাল, খোল,  
দুইবার, ভাপেশিক মাছ, ভাজা, টক, এসব ছাড়াও মুড়ো দিয়ে  
কিছু শাকের কট বাঁধতে পারেন, চমৎকার খেতে। লাউপাতার  
মুড়ো পাতভাড়িও বেশ হয়। কেমন, মনে থাকবে?

হ্যাঁ, থাকবে। উঁ, বাঁচলেন আপনি। এত মাছ। অথচ  
কিছু বাঁধতে জানিনে বলেই আমাদের এত দুর্দশ।

একজ্যাস্টিল। সেই জন্তই আমি সবাইকে বলি, এখনি একটা  
জন-বিষয়বিভাগের স্থাপন করতে। কত আর খরচ? কোটি দুই  
টাকা হ'লেই চলনগই বিষয়বিভাগের একটা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।  
প্রাথমিক একথা জাল করে উপলব্ধি করতে হবে, আমরা রাষ্ট্র  
কর্তৃপক্ষ জানিনে বলেই আমাদের স্বাধীন এমন করে ভেঙে পড়ছে।

মিস পাল আরও বক্তৃতা করতে বাচ্ছিলেন। গৃহিণী বাগ  
দিলে কয়েকজন, এখন আমার কাজে লাগতে হবে। ওদের ইচ্ছা  
কিছু আছে।

হ্যাঁ। আজ মাছ পর্বন্তই থাক। পরে বরক আর একটা  
'কল' দেবেন, তখন, পাঁটার মাংস, হরিণের মাংস, কক্কশের মাংস,  
কাঁকড়া-মাছ, কুচ-মাছ প্রভৃতি সবধে করেটা স্পেশাল উপদেশ  
দিয়ে যাব।

গৃহিণী বলিলেন, আমরা জেনারেল মাহুদ, আমরা জেনারেল  
খাবার খাই, বেশি স্পেশাল মাছ-মাংস সর্বগা খাই না।

তবু। দরকার হ'লে বলবেন।

নিশ্চয়ই।

মিস পাল তাহার নির্ধারিত কি লইয়া প্রস্থান করিলেন।  
গৃহিণী কাতলা মাছে মনোনিবেশ করিলেন।

### ৩

মিস পাল সকাল আটটার সময়ে একটা কোন পাইয়া বখারীতি  
সাজিয়া শুজিয়া মোটরে উঠিয়া যাত্রা করিলেন। গ্রামপুকুরে একটা  
ছোট দোতলা বাড়ী। বাস করেন গোবিন্দ বাবু, বেলগের বুকি-  
লার্ক। গোবিন্দ বাবু ডিউটিতে গিয়াছেন। তাহার দ্বী সন্ন্যাসী  
গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

মিস পাল বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, আপনি  
কোন করেছেন?

হ্যাঁ, পাশের বাড়িতে কোন আছে। সেখান থেকেই কোন  
করেছি।

অমন বিষয় হ'য়ে বসে আছেন, কি ব্যাপার?

সামনেই একটা পিতলের কলসী, দুধে ভরা। প্রায় দশ সের  
হইবে। কলসীটি দেখাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, দেখুন, প্রায় বোজাই  
এক বড়া করে দুধ আসে অথচ কি করে বাঁধতে হয়, খেতে হয়,  
তা জানিনে বলে, অনেক দিনই দুধ ঝেঁলে ঢেলে ফেলে দিতে হয়।

একজ্যাস্টিল। এই জন্তই আমি বলি, ডোমেষ্টিক সার্যাল,  
বিশেষতঃ কৃষি; এবং কনজুগাল সার্যাল আমাদের দেশের মেয়েদের  
সব চেয়ে আগে দেখা দরকার। এটাকে হাক বলে টপ-প্রায়েরিটি  
দিতে হবে। দু'চার কোটি টাকা আর এমন বেশি কি? এতে  
এখনই একটা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যায়। বাক, ভাল কথার কেউ  
কোন দিন কান দেয় না।

সন্ন্যাসী বলিলেন, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আপনার বক্তৃতাটা একটু  
অন্ত সময়ে—

হ্যাঁ, বা বলছেন। এখন আপনার সমস্তা ওই দুধ নিয়ে।  
তবে শুধুন। যদি দুধটা পাঁচরাইজড, দুধ হয়, তাহলে কাঁচা দুধই  
এক গেলাস-করে সবাইকে খাইয়ে দিন। নইলে, কিংবা কাঁচা দুধ  
পছন্দ না হ'লে, একটু জাল দিয়ে এক এক বাটি সকলকে দিতে  
পারেন। বেশি করে জাল দিয়ে ক্ষীর করতে পারেন। মিঠা  
জালে বসিয়ে রেখে মোটা সর পড়তে পারেন। সর খেতে কে না  
ভালবাসে? আরো ঘন করে খোয়া ক্ষীর করতে পারেন। তাতে  
সমান পরিমাণ চিনি দিয়ে চট্টকালেই খালা পোঁড়া হবে। ইচ্ছা  
করলে দুই পাততে পারেন, একটু চিনি মিশিয়ে সিলেই খালা মিঠা  
দই হবে। তুবড়ুরে গন্ধওয়ালা কামিনী চাল দিয়ে পায়স বাঁধতে  
পারেন। বাবার, কিসমিস, একটু কপূর তাতে মিলে চমৎকার স্বাদ  
ও গন্ধ হবে। কমলালেবু ছাড়িয়ে, বাঁচি ফেলে, কোরাকলোর, গা

থেকে ছাল ছাড়িয়ে তধু ভিতরের নরম রসভরা অংশটা দিয়ে কীর-কমলা করতে পারেন। ছানার জল দিয়ে বা ফিটকিরি দিয়ে বা লবুর রস দিয়ে ছানা কাটাতে পারেন। ছানা শুধু খেতে পারেন, চিনি দিয়ে খেতে পারেন। ছানা-চিনি চট্টকে বা বেটে ছাল দিয়ে সন্দেশ করতে পারেন। ছানার ডালনাও বেশ খেতে। তা ছাড়া ছানার পোলাও, ছানার মুড়কি, ছানার জিলিপী, এসব করতে পারেন। নরম ছানা দিয়ে সেডিকেনি বেশ হয়।

সরলা বলিলেন, আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত থাক। বা বললেন, সবটা ভাল করে শিখে নি। তার পরে দরকার হলে বয়ঃ—

হ্যাঁ। দরকার হলে আবার একটা 'কল' দেবেন। আর একটা কথা বলি, যদি ওই সমস্ত দ্বারা বেশেও পাঁচসাত সের দুধ উৎপন্ন হয়, তাহলে কচি ছেলেমেয়েগুলোকে তাতে চান করিয়ে দেবেন। গায়ের চর্ম খুব নরম ও মৃদু হবে।

হ্যাঁ, তাই করব। ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, নইলে কি যে করতুম এত দুধ দিয়ে।

মিস পাল তাঁহার কি লঠিয়া প্রস্তাব করিলেন। সরলা দুইদে কলসী কাঁখে করিয়া রাষ্ট্রাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

## ৪

এমনি 'কল' মিস পাল প্রায় প্রত্যহই পান। 'কল' আসে সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের নিকট চইতে। বাঁহারা ধনী, তাঁহাদের সুগন্ধ পাচক-পাচিকা আছে। তাঁহাদের কাছে মিস পালের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম।

'কল' পাইয়া মিস পাল কখনো দেখেন, প্রকাণ্ড একটি যুড়ি সামনে করিয়া বাড়ীর গৃহিণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। ঝড়িতে অপঘাত্ত পরিমাণ ফল—আম, আনারস, কলা, আপেল, আঁড়ুর, বেলানা, নারিকেল, আতা, পেয়ারা, তাল, আরো কত কি! কিন্তু ওগুলি দিয়া কি করিতে হয়, কেমন করিয়া খাইতে হয়, তাহা জানিতে না পারায় প্রত্যহ রাশি রাশি ফল নষ্ট হইয়া যায়। মিস পাল সুপারমার্শ দিয়া এগুলির আহারের ব্যবস্থা করেন। আবার কোন বাড়ীতে দিয়া দেখেন, ঘি, মাখন, ছানা, কীর, পর্যাপ্ত পরিমাণেরও অধিক আসিয়াছে, অথচ ওগুলি কিঞ্চে রন্ধনাদিতে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানা না থাকায় গৃহিণী ভরানক বিপদে পড়িয়াছেন। মিস পাল তাঁহাদিগকে সং পরামর্শ দেন। এমনি করিয়া মিস পালের কর্তব্যপরতায় শত শত সহস্র সহস্র গৃহস্থ পনম স্বস্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছেন।

একদিন একটি 'কল' পাইয়া মিস পাল গিয়া দেখেন, একটি ঘরে নবনী নামে এক নববিবাহিত যুবক একখানি চেয়ারে পিছনের দিকে একটু হেলান দিয়া বসিয়া আছে। যুধখানি অস্বাভাব্য রাষ্ট্রিয় মত অঙ্গভঙ্গ্য। এই ছেলোটিকে দেখাইয়া দিয়া ইহার একটি নিকট-আত্মীয় ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মিস পাল ছেলোটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

নবনী বলিল, আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। ওঁরা জোর করে ঘরে বসিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বলিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

মিস পাল বলিল, এতে কীদ্বারা কি হ'ল?

আমি যে কিছুই জানি নে!

মিস পাল বলিলেন, এটা অতি পুরাতন কথা। আমাদের দেশে যে বিবাহ-সম্রা এসে দেখা দিয়েছে, এই যে ছেলেরা মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না, এ সবের এক মাত্র কারণ অজ্ঞতা। বিবাহ কি, প্রেম কি, স্ত্রীকে কি বলতে হয়, কি বলতে হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতাই আমাদের সামাজিক জীবনের প্রধানতম সম্রা। অথচ, এ সব শিক্ষার জন্ত না আছে একটা কলেজ, না আছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই জন্তই তো আমরা এ ক্ষুদ্র জীবনের এই বিরাট সাধনা। বাক, এখন বল, তোমার কি প্রশ্ন?

কি প্রশ্ন করব, তাই তো জানিনে। প্রথম দেখা হ'লে কি বলব?

একজ্যাক্টলি। প্রথমে কি বলতে হয়, তা না জানায় জন্তই এসেছে এই বিরাট বিবাহ-সম্রা। সবই তোমাকে বলছি। একটু কাঁচে এস।

মিস পাল নবনীকে পাশে বসাইয়া কানে কানে অনেক কথা বলিলেন। নবনী কখনো গম্ভীর হয়, কখনো ঝিক করিয়া হাসিয়া ফেল, কখনো লজ্জায় গাল দুটো পাকা টপাটোর মত লাল হইয়া উঠে। বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মিস পাল বলিলেন, এইজন্তই এসেছে এত সম্রা, আর কোন সম্রাই নাই বিবাহ-অগন্তে। বাক, এবার তোমার স্ত্রীকে একটু ডেকে আন।

নবনী গিয়া তাহার নবপরিণীতা স্ত্রীকে মিস পালের কাছে পৌছাইয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। মিস পাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা কর।

আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ভারি ডোপো মেয়ে দেখছি!

আমাদের আল সম্রার কাছেও আপনারা বান না।

ওরে বাপ!

আঁৎকে উঠলেন যে? এই কথা বলিয়া বধু উঠিয়া গেল।

নবনী ফিরিয়া আসিয়া মিস পালকে তাঁহার প্রাণ্য কি দিয়া নমস্কার করিল।

মিস পাল বলিলেন, এই কনজুগাল সারেল না শেখায় জন্তই আমাদের দেশ অঃপাতে যাচ্ছে। সিনেমা, ফুটপাথের বই এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে বিশেষজ্ঞদিগের চিত্তোত্তাপবিধী রচনা, এগুলি অতি অপ্রচুর। এজন্ত আমাদের মত বিশেষজ্ঞদের বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা, বাসি। আমি ঐগিরিই কনজুগাল কলেজের একটা বিস্তারিত বসড়া করে জনসাধারণের কাছে টাকার জন্ত আবেদন করব। তখন তোমাদের সাহায্য চাই।

নবনী কি যেন বলিতে বাইতেছিল। সহসা ঘরের অপর দিকের নবযুগের রোষকষারিত চোখ দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

মিস পাল বীয়ে বীয়ে বাহির হইয়া গেলেন।



## \* ছেটিদের আমর \*

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সাধারণ মানুষ থেকে ওরা বেন অনেক বৃহৎ। এই সাধারণ মানুষ যুগে যুগে দেশে বারা দশ জনের এক জন, তাদের পাঠিয়েছে। আর বড়ো মানুষেরা পাঠিয়েছে বড়ো চাকুরে। একথা বলেছিলো ওদের দিগিমণি মিস শীলা, যে দিগিমণি বলা পছন্দ করে। বীণাসু এসেছিলেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। আরো একজন সীতার বলেছিলো মানুষের কাজে লাগে। প্রতিবেশীকে দেখে।

মীরাদের প্রতিবেশীদের দেখবার উপায়ই নেই। তারা দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। বিপদেও নেই, সম্পদেও নেই। বিপদের দিনে ডাডির সাহেবী প্যাটার্ণের বজুবা শুধু খোজ-খবর নেয়, ডাক্তার হয় সেই বাগবাজারের বাড়ীর ছেলেদের।

এ বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল মীরার। শেখর ওর নাম। এ বাড়িতে একদিন বেড়াতে এলো বাসে করে। বললে, কলকাতার সঙ্গে যদি পরিচিত হ'তে চাও, তবে কলকাতার বাসে উঠতে হবে। প্রাইভেট বাস, ট্রেট বাস। লেভিজ স্ট নেই বলে কণ্ঠের টেচাচ্ছে, তবু লেভিরা উঠবে। উঠবে শুধু নয়, রড ধরে পাঁড়িরে বাবে। হাসিমুখে। অসময়ে কালীঘাট চলেছে, অফিস টাইমে। অফিসের বাবুয়া প্যাট-কোট পরে পান চিবুতে চিবুতে বাজনাতি আলোচনা করতে করতে চলেছে। তার মধ্যে মূলকলেজের ছেলেরা উঠবে। হুঁপা হাটবে না। বিপজ্জনক ভাবে

বলতে বলতে বাবে। সবাই হাসিমুখে। এই কলকাতার বৈশিষ্ট্য ভাবনা অনেক। কিন্তু ভাবে না ওরা।

ভাবনা এলে কি করে শেখরগা? মীরার প্রশ্ন।

সিনেমার লাইন দেয়। থিয়েটারে চোকে। থিয়েটারের সাত টাকার টিকিট বারা কিনে সীটগুলো ভরিয়ে দেয়, তারা সবাই বড়লোক নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকে আছে। বায় সাগা দুপুর বসে ক্রিকেট খেলা দেখতে। বড়োরাও বায় সার্কাস, ফুটবল, গানের জলসার। কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে বেসুড়ে ভিড় করে নানা ধরনের লোক। সংলোকও আসে। অসংও আসে।

বেথেছিলো বটে মীরা ৩১শে ডিসেম্বর চিড়িয়াখানার ভিড়। মোটর থেকে নেমে লাইন দিতে হয় এক মাইল। মীরা বুঝতে পারলো না ঐ দিনে ছু দেখতেই হবে, এমনই বা কি মানে আছে? যে কোনো দিন ত' নিরিবিলিতে দেখা যায়। মীরারা ফিরে এসেছিলো।

১লা জানুয়ারী গিয়েছিলো বটানিকাল গার্ডেনে। শিবপুরে। গঙ্গার ধারে। সেখানে ওরা লাক নিয়ে গিয়েছিলো। ব'সে খাবার মতন কোনো দ্রব্য খাসে ভরা জায়গা ছিলো না। সর্বত্র লোকের ভিড়। সভ্য লোক, অসভ্য লোক।

শেখর পর্যন্ত গঙ্গার ধারে, যেদিকে নদীর শোভা দেখবার জন্যে বেশী কেউ নেই, সেইখানে ব'সে ওরা খাবার খেয়ে নেয়।

শেখর বললে, দক্ষিণেশ্বরে মেলা হয়। মন্দিরে যত না লোক তার বিশস্ত লোক লোকানে, মাঠে।

জুতো পরেই সব প্রাঙ্গণে ঢুক পড়ছে। মানছে না যে জুতো পরে ফটক পার হওয়া নিষেধ। জুতো রাখবার জন্যে লোককে হুঁচাব পরগা দিতে হয়। সেই লোকেরা নম্বনমায়া টিকিট একটা তোমার জুতার মধ্যে রাখবে, একটা তোমার হাতে দেবে।

তুমি যদি সেই খবরটুকু না কথতে চাও, তোমার মন্দিরে আসা উচিত নয়। তুমি বা খুঁসি তাই করতে পারো না পরমহংসদেবের লীলাভূমিতে।

ভিড় বলে হ্যাঁ, পারি।

পুলিশের উচিত ওদের চুকতে না দেওয়া।

কিন্তু পুলিশ কত দিক দেখবে? অসংখ্য চোর চারি ধারে ঘুরছে, কাকুর হার ছিড়ে নিচ্ছে, কাকুর কানের ঢুল ছিনিয়ে নিচ্ছে, কাকুর আঁচল কেটে টাক নিয়ে পালাচ্ছে।

বাসে বেশী কাণ্ড। শেখর বলে, প্রাইভেট বাসগুলোর বেশী আলো নেই, অন্ধকার, তার মধ্যে পকেট-কাটা উঠবেই। এক জন নয়, অনেক জন। কণ্ঠাঙ্গুর তাদের চেনে। কিছু বলে না। সাবধান ক'বে দেখ না। তারা কাকুর না কাকুর পকেট চিরে ব্যাগ নিয়ে বাজারের কাছে নেমে যাবেই। এ পাশে মণিব্যাগ নিয়ে যেতে নেই। কোনো বাসেই যেতে নেই, যে বাস অন্ধকার। ভক্তবেশী, ধৃতি-পাজারি সার্ট-কোট-প্যাট পরা সাপের মতন বিবাক এই সব মানুষেরা মানুষের কতি করবায় জন্যে সব জায়গায় ঘুরছে।

মীরা বলে, শহরের সব জায়গায় তা'হলে জব আছে বলা?

# রত্নবেদী

ঐপ্রভাতকিরণ বসু

তা ত' আছে, আবার আনন্দও আছে। অনেক ভালো লোক, অনেক ভালো কথা, অনেক ভালো গান, তাও ত' চলেছে এই শহর ভেঁরে। যেহিঁকটা মলিন, নোংরা অন্ধকার, সেহিঁকের সম্পর্ক ছেড়ে তুমি যদি যাও যেহিঁকে আলো আনন্দ আর শিক্ষা, তবেই পাবে এই শহরের সত্যি পরিচয়।

ঝাপসা পরিচয় শহরের সঙ্গে তার হয়েছে, এখন মীরা চায় মেহ। মীরা চায় ভালোবাসা। এদের বাড়ীর বে ভালোবাসা তা যেন পাশিগুকা, তার মধ্যে যেন প্রাণ নেই। এ যেন ভগ্নস্তা। এখানে মায়ী নেই।

তাঁই এখানে অসুস্থ হ'লে মোটা কী-এর বড়ো ডাক্তার আসে, দামী বেশ আসে, সুশ্রী নার্স আসে, টেম্পারেচার লেখা হয়, পথা ঠিক ঠিক পড়ে, কিছু সংমাও যা করত, পিসিমা যা করত, সেই মাথায ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জিগোস করা নেই, আজ কেমন আছিস? না, অর ছেড়ে গাছে। এবার ময়লার কটি ঘাব মিলি মাছের ঝোল।

শেখর বলে, নাট বা ভা রটলো, কিছু আগামে তুমি আছ! মাজেক-এব সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের মেঝে, তার ওপর গালচে কার্পেট, রত ধারি, রত পাখা, একটা ঘরেই ক'টা ভালো। আজ কি খাব, ফাল কি বাজাব তবে—দিন চলবে কি করে, এখানে ওখানে ঘাব কি গ'বে, এসব কিছুই ভাবতে হয় না, এক কথায় দুর্ভাবনা বলেই কোনো জিনিস এখানে নেই। এটো বা কম কি?

দুর্ভাবনা নেই, কিছু ভাবনা আছে শেখরবা, দিন কাটবে কি করে। তাল থেকে কটন বাঁধা শোয়া-বসা চলা ফেরা খাওয়া-বেড়ানো—বড়িগো শোনো, টোরেজী ছবি'র বই দেখো, পরিচিত কাউকে ফোন দাও—কিন্তু ঐ র চকন শহরের কথা বললে, তার কত নতুনত্ব, ফালকের সঙ্গে আজকে মেলে না। এখানে ভাই, তা পাবে না। এখানে সামবাদের সঙ্গে মঙ্গলবাদের কোনো তফাৎ নেই।

মীরার কথা শুনে শেখর অবাক। তাদের সংসারে সব ঈন মাছ আসে না, দুখ সকলে খায় না—আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের মিল করবার জন্তে কর্তাদের সঙ্গে গিন্নীদের নিতান্ত পরামর্শ। এসময়ের আঙনের বে আঁচ, তা খানিক খানিক ছোটদের গারে এসে লাগে বৈ কি!

কলেজে খুলে একসঙ্গে তিন মাসের মাইনে দেওয়া, নতুন বই ফনা, মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে ত বটেই, পড়ানোর ব্যাপারেও কত কম কথা গুঁতে, তা ত ওরা শুনে পায়।

সে জায়গায় এখানে একটা বাবুর্জির পঞ্চাশ টাকা মাইনে, চাকরের মিশ টাকা, ঠাকুরের পঞ্চাশ টাকা, আবার চল্লিশ টাকা, ডাইভারের 'কণ' পঞ্চাশ টাকা, এসব শুনে শুনে ত' মনে হয় এরা খুব সুখী।

কে যেন বলছিলো, এন রাহ-চৌধুরীর সংসার-স্বরচ মাসে তিন আঁচার টাকা।

এতও বই সুখ না থাকে, তবে সুখ কোথায়?

বুধদেবও বলেছিলেন রাজদেব সুখ নেই, তাই রাজ্য ছেড়ে চলেই গিয়েছিলেন, মীরা কি তাই বলতে চায় না কি? না কি গরীব বের মেয়ে বড়লোকের বাড়ীতে এসে তার নৃশ্য বুঝতে পারছে না!

কাঁথির পিসিমা এসেছেন। এখন থাকেন কাশীতে। তবু ায় কাঁথির পিসিমা। কোন যুগে হয়ত কাঁথিতে ছিলেন, সেই থেকে ামটা হ'য়ে গেছে।

তিনি এসেই বললেন, স্নেহাচার আমার সইবে না। বৌ, আমার পঞ্চাশ আনিয়ো দাও। পুজোর জায়গা ঠিক করে দাও। তোমার বাবুর্জি-টাবুর্জি যেন সেদিকে না আসে।

বৌ ত মানে খুব দেখা গেল। কাঁথির পিসিমার কাছে আর 'মেমসার' নয়, ও সব ঢালাকী চলবে না। কাঁথির পিসিমার কাছে তখু 'বৌ'।

কেন জানি না, সাহেবও খুব খাতির করলো। এই কাঁথির পিসিমা না-কি ভাইপো যখন ছোট ছিল, শুখন কোলে-পিঠে নিয়ে অনেক বর করেছেন। কত স্মরণ স্মরণ গল্প বলেছেন।

সেই সব দিনের কথা না কি কিছুতেই ভোলা যায় না। তাই না কি কাঁথির পিসিমার জন্তে পুজোর জায়গা ঠিক হল ওখারে, যে কাপড় ছাড়ার ঘরটা ছিল, সেইটা পরিষ্কার করে। একটা পাথরের জলটোকে দেওয়া হল। তাইতে কাঁথির পিসিমা পাথরের শিবলিঙ্গ রাখলেন, ছোট একটুকু ফিকে নীল পাথরের। কাশী থেকে কেনা। রাখলেন তাঁর কষ্টিপাথরের গোপালকে।

কী স্মরণ ধূপ এনেছেন সেখান থেকে! চন্দন-ধূপ, কস্তুরী-ধূপ। রুক্মিনীরায়ণের একখানি বাঁধানো ছবি টাঙালেন সামনের দেয়ালে পেরেক মেয়ে।

দেখতে দেখতে ঘরের কোণটি যেন নতুন রূপ নিলো। সমস্ত ঘরখানাই যেন বদলে গেল। তার মার্বেল পাথরের মেঝে ধূয়ে-বুছে চকচকে ক'রে ফেললেন। ধূপ-ধূনোর গন্ধ, শাঁখ আর ঘণ্টার ধ্বনি, ফুলের শোভা আর মুহু স্ববাসে মনে হল যেন মন্দির।

গহদের কাপড়, ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। কাঁথির পিসিমার এত ব্যয় হয়েছে, তবু কী শক্ত, কী স্মরণ দেখতে!

মীরার ইচ্ছা করছে তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি ডাকেন নি। তাই এগোতে সাহস করছিলো না।

তার পর হঠাৎ একবার ডাকলেন। কোনো পরিচয় জিগোস করলেন না। যেন সব জানা। জানতে চাইলেন না, তার কাপড় কাটা কি না।

বললেন, পাশে এসে বোস। তারপর প্রসাদের সম্বেশ নিয়ে বললেন, নে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কী স্মরণ তিনি প্রণাম করলেন!

বললেন, স্তোত্র শিখবি?

মীরা জোরে ঘাড় নাড়লো অক্ষুণি। যেন সে অপেক্ষা করতে পারছে না।

কাঁথির পিসিমা বললেন, আমি যেমন সুরে বলি, তেমনই বলি। কেমন?

মীরা রাজী।

উনি ব'লে চললেন,

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে!

ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে।

উনি থামলো মীরা ধরলো। ঠিক হচ্ছিলো না, 'তরলত' ব'লে মীরা খেমে বাড়ছিলো।

উনি আবার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে বললেন।

শররমৌলিনিবাসিনি বিমলে!

মম মতিরাঙা তব পদকমলে।

মীরা শব্দরম্যোলিনি বলে খেমে বাহিলো। সংকৃত ভ' জামে না, যানেও জানে না। গোলমাল হবেই ত!

কাঁথির পিসিমা খালি হাসেন। রাগ করেন না। বলেন, হবে তোরা। একদিনে কি আর হয়! আবার ওবেলা বসবি আমার সঙ্গে। তোকে আমি 'প্রণামি শিবং শিবকল্লতরং' শিখিয়ে ছাড়ব।

ওবেলা বসবে কি? মীরা যাবে কোথায়? তার ত খালি পিসিমার সঙ্গে ঘুরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু না, যুঁহিল আছে। ছুল না হয় আজ বন্ধ। কিন্তু মেম ঠিক পড়াতে আসবে। তাছাড়া ঠিক ঠিক সময়ে নাওয়া-খাওয়া এ বাড়ীতে করতেই হবে। এবাড়ীর বাবুন-চাকর চাকর জন্তে বসে থাকে না।

পিসিমা না হয় স্বপাক রান্না করবেন। তাঁর কত বেলা হল, চাকর দেখবার দরকার নেই। তবু এক কাকৈ ও কাঁথির পিসিমার কাছে এলো। এসে বললে, দিহু, কি রাঁধলেন দেখি?

কালো পাখরের খালায় পিসিমা ভাত বাড়ছিলেন, আলোচালের ভাতগুলো সমুদ্রের কেনার মতন শাল, আর ডাল-ভাতে, কাঁচকলা-জুতে, বেগুন-ভাতে, আলু-ভাতে আর কুমড়া ছেঁচকি।

খাবি? খিদে পেরেছে হুপুবেলা? তোদের ত আবার লাক খাবার সময় হল।

না দিহু, লাক খাব না। আপনি দিন একটু একটু করে।

একটু একটু করেই তিনি দিলেন কালো পাখরের বেকাবিতে। এ সব পাখরের বাসন গরুা থেকে কেনা। উনি বললেন। গরার কুচকুচে কালো পাখরের পাহাড়গুলো বেন মীরার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কদ্দনদীর সোনালী বালির ধারে ধারে কালো কুচকুচে পাহাড়ের রাশা না কি?

ভাতের সঙ্গে উনি খি মিলেন। এটোরা থেকে আনিয়েছেন। কী তার সুগন্ধ! কী তার স্বাদ!

সেলিন পড়ন্ত যোনের হুপুবেলায় হুঁড়াকা নিশ্চলতার কালো পাখরের বেকাবিতে কাঁথির পিসিমার রান্না আলোচালের ভাত ভাতে-ভাত দিয়ে বেতে বেতে মীরার মনে হল বেন অন্ত থাকছে। তার পিসিমার রান্না এত সুন্দর নয়। কোড়নগুলো বেন অন্ত। রান্নার হাতটাই বেন আলো।

এ বাড়ীর কোনো রান্না এ রান্নার কাছে লাগে না। তার পরে উনি মিলেন একটু কীর, আর মর্ডমান কলা। তাই দিয়ে শেষপাতের ভাতগুলো কী চমৎকার লাগলো!

বাঙালী মেয়ের মুখে কীম, পুজি, কেক, শ্রাণ্ডউইচ, কী নিরমিখি রান্নার মতন ভালো লাগতে পারে?

পূজার ঘরের কোণেই কাঁথির পিসিমা তাঁর বিছানা পাড়লেন নাটতে। ঠাকুরের দিকে বেন পা হয় না, দরজার দিকেও না। জানলার দিকে হবে।

সন্ধ্যাকাল পড়া হ'লে গেলে নীল আলোখালা সেই ঘরে ঠাণ্ডা বিছানার সোতে বীরা এলো। ব্রক বিকসের পর। সেই ব্রক পরে বিছানা ছোঁরা হবে কি না সে ভাবছিলো। কাঁথির পিসিমা ডাকলেন, নাভনী আর। পাড়ির কেন? ভাবছিল বিছানা ছুঁবি কি না? আর, কোন দোষ নেই।

দিহুর কাছে ও গুলো। বাগানের খাউপাছগুলো কাঁপিয়ে দিহু

হাওরা আসছে বারান্দার খাড়া খেয়ে। নীল আলোখালা ঘরে কাঁথির পিসিমার মুখে কাঁথির গল্প, কাঁথির গল্প শুনে শুনে মীরার মনে হল, সমুদ্রের কিনারা থেকে কত দূর পর্যন্ত মাটি ছড়িয়ে আছে কত বিচিত্র দেশে। কতটুকুই বা তার দেখা হল? আর শুধু চোখে দেখে কতটুকুই বা জানা যায়?

সমুদ্র ত কত লোক দেখেছে। বে পুরীতে গেছে, সেই দেখেছে। অন্ত অন্ত দেশেও হয়ত সমুদ্র আছে। কিন্তু মীরা যেমন ক'রে সমুদ্রের সমস্ত রূপ, সমুদ্রতীরের সমস্ত জীবনবাহা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে, তেমন ক'রে সমুদ্রকে জেনেছে কি তারা? বারা ভগবতু নর্শন ক'রে দু'এক দিন সমুদ্র-মান ক'রে দেশে ফিরে গেছে?

তেমনি কাঁথি, কাঁথি, দাখিলিঙ্গ, শিল, চেরাপুঞ্জি এসব হুচার দিনে বা হুচার মাসে কিছুই শেষ করা যায় না।

কলকাতা ত বাইট না। ওয়েলিংটন ঘোঁরায়ে মেলা দেখতে গিয়েছিলো মীরা ছুলের অন্ত মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ লীলা একজন শিক্ষয়িত্রীকে বলে মীরাকে নিয়ে চললো তাদের বাড়ী দেখিয়ে আনবে বলে। বললে কাছে। হেটেই বাড়ী বাবে।

মল্লিক সার্কল দিয়ে ওরা ঢুকলো, তার পর অকুর নত ষ্ট্রীট, তার পর কি একটা রাস্তার নাম দেখতে গেলে না, এলো বাস্তারাম অকুর ষ্ট্রীটে, তার পর মল্লিক ডিপেন্দ্রজারি লেন, পঞ্চাননলা, হিলায়াম ব্যানাজী লেন, বাঁকা রায় ষ্ট্রীট, রামকানাই অধিকারী লেন দিয়ে শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে পড়লো। বড়ো বাড়ীর একটা প্ল্যাট লীলাদের।

কিন্তু এই পথটুকু বেতে কত অসংখ্য বাড়ী, কত সেকালের, কত একালের, কত অন্ধকার ঘর, কত আলো-ভরা বাগান, কত মন্দির, কত পাঠশালা বে গেলো, বলবার নয়! এক একটা রাস্তায় যদি বড় মোটর চোকে, আর ওদিক থেকে একখানা রিক্স আসে, উপায় নেই পাশ কাটাবার। অথচ এই গলিগুলির প্রত্যেক বাড়ীতে বিয়ে-খা খাওয়া-পাওয়া হয়েছে, কত গাড়ী পাঁড়িয়েছে, কত লোক এসেছে, কত বৃষ্টির জল জমেছে—কি করে কি হয়েছে, ও ভেবে গেলো না। এই সামান্ত পল্লীর অসংখ্য ঘরে কত লোকের মনে কত সুখ-দুঃখের খেলা—অন্ত লোক হয়ত একটা বড়ো গ্রামেও নেই বা আছে বোঁবাজার-এর এই সামান্ততম অংশে—এই যদি কলকাতা! হাজার ভাগের এক ভাগ হয়, তাহ'লে মহানগরীর সম্পূর্ণ ছবি খি কল্পনা করা যায়?

এ কথা দিহুকে বলতে তিনি হাসলেন। বললেন—কাঁথি অনেকটা এমনি, তার সঙ্গ সঙ্গ গলির দু'ধারে আকাশ-ছোঁরা পাখর বাড়ী। কলকাতায় ভ' ইট, কাঁঠ, বালি, পাথর নেই।

এর মাকে এক দিন ওর বাবা দে-মশাই, যা আর পিসিমা নিয়ে এলো। তারা ত মীরাকে দেখে অবাক।

কলকাতায় থেকে মীরার রং খুব কপা হয়েছে, তার ওপর নাচ রকম সাজসজ্জা করে দেখাচ্ছে বেন মেম। মেমের মতন সাঁচ পোষাক। গলাটাও বেন কেমন বললে গেছে। বেন মাজা-মাজা ঝাঁড়াবার ভলী, বসবার ভলী—সব নতুন নতুন। কারদামাকি ডায়াকসে সোকার সোটিতে ওদের বসিয়ে প্রত্যেককে চা আর আদা জলখাবার দিলে। ওরা বসিনে কল খুলে হাত খুলে।

মীরা ওশিসিয়া ওশিসিয়া ব'লে ছুটে এলো না। যদিও কাঁধের পিসিমার কাছে দিগা দিগু ব'লে ছেলেমানুষের মতন ছুটে যায়।

আসলে ওর মনে হয়েছিলো, ওরা আমার পর ক'রে দিয়েছে। যাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এই রকম মনে হলে অভিমান আসা স্বাভাবিক। মিসেস চৌধুরী এসে শ্রব ক'রে বললে—নমস্কার। বুখে হাসি। যেন কত আন্তরিকতা। আরো বললে, বড়ো খুশি হয়েছি আপনারা আসতে। মেয়েকে ত একখানা চিঠি লিখেও বোঝ করেন নি। এতে ওর মনে দুঃখ হ'তে পারে ত'?

ওর বাবা বললে, তা ত' পারে। কিন্তু দেখন চিঠি-লেখাটেখা আমাদের কারুরই আসে না। জানি, আপনারাও কাছে আছে, ভালোই আছে। দেখছি ত', বলতে নেই—মেয়ে আমার সুখেই আছে। তা আছে। সুস্থিত হচ্ছে, ওর এমন একটা সঙ্গী নেই বাড়ীতে, যার সঙ্গে গল্প-উল্লাস করে। এসেছেন ক'দিন আমাদের এক পিসিমা, বয়স তাঁর অনেক, কিন্তু সম্পর্কে ঠাকুমা। দেখছি তাঁর সঙ্গে বেশ মিল হয়েছে। যখন ফুরসৎ পাচ্ছে, গিয়ে ছুটেছে তাঁর কাছে। যে ক'দিন তিনি থাকেন, বুখি—ওর কাটবে ভালো। কিন্তু আপনারা কোথায় উঠছেন?

এ প্রশ্নে ওর বাপ-মা বড়ো অনুরোধের পড়লো। পিসিমা ত' ধী ক'রে বাগানের দিকে চেয়ে বইলো।

উপস্থিত ওরা উঠেছে কলীঘাটে এক ধরমশালায়। সেখানে মালপত্র রেখে ৮কালো দর্শন ক'রে কিছু তেলেভাজা খেয়ে এখানে এসেছে।

আশা ছিল, এরা বলবে এখানে থাকতে। তার পর বিছানাপত্র আনিবে নিলেই চলবে। এ বাড়ীতে ত অনেক ঘর দেখা যাচ্ছে।

তবু মীরার বাবা বললে, উঠছি ধরমশালায়। আপনারা এখানে দু'চার দিন থাকা বুখি চলবে না?

না—না, আমরা এখানে হবে না। হলে ত' ভালোই হত।

ওরা উঠলো।

মিসেস চৌধুরী ব'লে গিলে, যে ক'দিন আছেন, রোজ একবার ক'রে মেয়েকে দেখে যাবেন। যখন খুশি।

সুখে থাকুক মেয়ে ঐশ্বর্ষের মধ্যে। বাপ-মা-পিসিমার যে দুঃখ সেই দুঃখ।

ওরা চ'লে গেল।

বাগানের গাছে গাছে ঘরে-ফেরা পাখী কিলসো সন্ধ্যাবেলার। কাঁধের পিসিমা দক্ষিণের বারান্দায় জপে বসেছেন। বললেন, মীরা, তোর বলা উচিত ছিল তোর মামীকে—অজ্ঞাত: একদিনের জন্তে ওরা এখানে থেকে যাক।

আমি কি ক'রে বলব দিগা, আমি কিছু বলতে পারি না।

ছোট ভাই ছুটে এসেছিলো, তাদের হাতে তোর একটা খেলনাও দিল না?

ও কথা মনে হয়নি।

মনে করতে হয়।

কাঁধের পিসিমা অজ্ঞ ঘরণের চিন্তা করেন।

তাঁর আর এক ভাইপো এলো বিরাজ, সেদিন বিকেলে। বললে, পিসিমা, তোমার গোপালকে একটু থায়ে, আবার ভালো চাকরী করে দিন।

কি হল তোর? যে কাজ করছিলি?

সে কাজে উন্নতি নেই। ওপরতলা আমাদের ওপর চটা। আমাদের ডিভিডে বাজের লোককে ওপরে তুলে দিচ্ছে, আমাদের ওপর বত রাগ। আমিও এম-এ। আমি পাছি না, পাচ্ছে, আই-এ ফেল, বিক্রম ফেলরা। এত অজ্ঞায় সজ্জ হয় না। শত্রু আমার চারি দিকে।

শত্রু তোর কেউ নয় বিরাজ। গ্রহ প্রতিকূল এখন ভগবান ত' নিজে শান্তি দেন না, গ্রহকে গিরে দেওয়ান। রোগ, শোক, অপমান, পরাজয়, ব্যর্থতা কার জীবনে না আসে? সকলের জীবনেই আসে। ভগবানকে ডাকলে শুধু সহশক্তি তিনি দেন, শান্তি কমাতে পারেন না, কমান না। মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে না, মানুষকে দিয়েই গ্রহ করার বা করবার। তুই কারুর ওপর রাগ রাখিস নি। সময় যখন ভালো আসবে, সব দিক থেকে তোর ভালো হবে। গোপাল এখন তোমাকে রাতারাতি কি ক'রে রাজা করে দেবেন? তাহ'লে তোমার কর্তব্য কে তুলবে? মানুষ কিছুই নয়। মানুষের ওপর রাগ রাখিসনি। তাঁর বা ইচ্ছা তাই হবে। মঙ্গলময় তিনি। [ক্রমশ:]

## কিসমত কি খেল

দেবদত্তা রায়

বাগদাদ শহরে বাস করত শাদ আর শাদী, দুই বন্ধু।

শিকবেলার খেলার সাথী, বড় হস্তেও সেই বন্ধুদের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। টাকার অভাব হ'জনের কারুরই ছিল না, কাজেই কেউ কারুর ধার ধারত না বলেই সম্ভবত বন্ধুকে কাটল যেরনি এ পর্যন্ত। এতেন হিরহরাত্তার মধ্যে মতের গরমিল এতদূর গড়াতে পারে যে এক জনকে দেখে আরেক জন মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—এটা পড়শীরা কেউ আশা করতে পারেনি। কিন্তু এমন অসম্ভবও সম্ভব হতে দেখা গিয়েছিল একবার, আর সেই কাহিনীটাই আজ তোমাদের শোনাব।

আসলে বাপারটা হচ্ছে, খোশমেজাজে গল্পগাছা করতে করতে হঠাৎ শাদ বলে বলল, "ভাগ্যের উপর কারো টেকা চলে না যে, এই যে একজন ভিক্ষে করে আর আরেক জন টাকার গদীতে শুয়ে পড়ে এ সবই হলো ভাগ্য—নসিব—তকদীরের খেল।" শাদী প্রতিবাদ করে বললে, "দেখ, বাবা হাত-পা ছেড়ে থালি বসে থাকতে জানে তারাই ঐ নসিবের দোহাই পাড়ে আর লাখ টাকার খব্দ দেখে দেখে ছেঁড়া চাটাইয়ে পাশ করে। যার উত্তম আছে, তরস আছে, সাহস আছে, তেমন লোককে একটা টাকা দিলেও সে দশটা টাকা করে আনবে। এই যে বাবজান এমন কলাও কারবার কেলে রেখে খোশার শাজ্ঞানে মাড়া দিয়ে চলে গেলেন, আমি বা হাত গুটিয়ে ধী করে 'নসিব বা করে' বলে বসে থাকতুম তাহলে হতো কি কিছু? আসল কথা হলো টাকা, আর সেই টাকার খাটাতে জানা—বাস, আর তোমার কিছু দেখতে হবে না।"

শাদ শাদ হাসি ফেলে বললে, মোস্তা—নসিবে না থাকলে হাত টাকা হাতে থাকলে আর হাজার খাটাবার ক্ষমতা থাকলেও কি হয় না আর তকদীর এসার থাকলে রাজার হুকুমে পাওরা ত এক টুকরো লোহাও ঐ জ্ঞানের সোনার দামে দানী হবে পড়ার



শা'দী নিজের মস্তের উপর কারো মত সইতে পারে না, অতএব তর্ক, এক তর্কাতর্কি কচকচি বলে সেই অবতন, দুই প্রাণের মোড়ের কথাবার্তা বন্ধ, পাড়াপড়শীর চক্ষু চড়কগাছ।

বাই হোক, শাদ তার বন্ধুর মতন অন্তটা ছেদীও ছিল না, তার স্বভাবটাও ছিল নির্ভরযোগ্য। নিজে থেকেই সে একদিন গিয়ে শাদীর সঙ্গে ভাব করে ফেললে, কিন্তু ঝগড়ার আসল কারণ সেই পুরানো তর্কটা দু'জনের মনেই একটা বোঁচা হয়ে ভেগে রইল। শেষে এই অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলবার জন্য শা'দীই জোর করে হেসে বলে উঠল, "কই দোস্ত, আমাদের সেই তর্কটার তো কোনো ক্ষয়সালা হল না? আমি বলি কি, কথটা উঠেই বখন পড়েছে তখন আমরা একবার কাউকে দিয়ে পরখ করে সত্যটা যদি বাচাই করে নিই তো দোব কী?"

দোবের কিছু এতে আছে বলে শাদেরও মনে হ'ল না। দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল বাগদানের পথে আপন আপন মতামতের সত্যতা বাচাই করে নিতে। পথ চলতে চলতে কত লোকই তো দেখে, কিন্তু কাউকে দেখেই মনে হয় না যে এর উপর গিয়ে পরখ করে বাচাই করা চলে। শেষ অবধি একটি পরিশ্রমী কারিগরকে তাদের দু'জনেরই পছন্দ হল, লোকটির নাম খাজা হাসান, দড়ি তৈরীর কাজ করে। শাদ আর শা'দী দু'জনেই লোকটির সঙ্গে আপাশ করে মতলবটা খুলে বললে।

তাদের এই বিদগ্ধ "এক্সপেরিমেন্টের" ব্যাপারটায় খাজা হাসান যে হস্কাফিয়ে গিয়েছিল তা কলাই বাহুল্য। কিন্তু বড়লোকের হাজার রকম উদ্ভট খেলার মতো এটাও একটা বলেই ধরে নিলে বেচারী। আর সত্যি কথা বলতে কী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গরীব সঙ্গারের ফটিগোস্ত জোগাড় করতে করতে হরণায় হয়ে গেলেও খাজা হাসানের ভিতর যে একটি কৌতুকপ্রিয় মন ছিল সচি তখনও মরেনি। কাজেই শা'দী যখন তার নিজের মতামত পাখ করে নিতে খাজা হাসানের হাতে দু'শোটি সোনার মোহর সমেত কারুকার্যকর ছোট একটি চামড়ার থলিয়া দিয়ে বললে, হাসান, আশা করি টাকাটার সন্ধ্যাবহার করে তুমি নিজের অবস্থা কমাবে, আর উপযুক্ত কাজে টাকাটা খাটিয়ে 'টাকাই টাকা টানে' নামার এই মস্তের সত্যতা প্রমাণ করবে," তখন তাকে বহুত কত আপাশ করে টাকাটা নিতে হাসান থিখা করলে না।

বন্ধুরা চলে যেতে হাসান দশটি মোহর বার করে বাকী একশো দুইটি মোহরসমত থলিয়াটা নিজের মাথার পাগড়ীর ভাঁজের ভেতর পুরে গুণ্ণুটোর ছুটো কাঁড় দিয়ে সেটা পাগড়ীর সঙ্গে গেঁথে ফেলে, পাছে হারিয়ে যায়, তারপর চললো বাজারে পরিবায়ের, তার তার পাঁচটা বাকী আর তাদের মাঝে মজ্ঞ নতুন কাপড়-কাপড় আর খাবারদাবার কিনে আনতে। এখন একটা ব্যাপারের কথা আর মোকামে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। এই দুই দিনে সে আগে তার দড়ির ব্যবসাসটা বড় করে কাঁদবে। সেই তার আরো তার সঙ্গার হাঙ্গল হবে, ভাল কাপড়চোপড়, খাবার—নানা ধরের জাল বুনতে বুনতে হাসান বাজার থেকে ফিরে আসবে কিনে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

এখন সদর তার হাতের মাসে-মস্তির দিকে পড়লো হতভাগা ফিলের চোখ—হেঁ। বেবে মাসটা কেড়ে নিতে সেটা উড়তে

উড়তে নেমে পড়লো হাসানের প্রায় মাথার উপর। হাসান তাড়াতাড়িতে মাস সামলাতে যেতেই তার হাতের বোঁচকা-বুঁচিকলোর একটা খসে পড়ে গেল মাটিতে, আর সেটা কুড়িয়ে নিতে যেই বেচারী হেঁট হয়েছে অমনি সেই শয়তান চিল ভাগ কসকে মাসের বগলে তার পাগড়ীটার পড়েই, সেটা কি, জা না দেখেই ছেঁ। বেবে তুলে আকাশে ছানা মেলে পগার পায়। হতভাগ্য হাসান। মাথায় হাত দিয়ে সে সেখানেই বসে পড়ল। তার এত ভয়না-কল্পনা ভবিষ্যতের সুখবঙ্গ এক নিমিষে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল!

মাস দুই পরে শাদ আর শা'দী এক দিন হাসানের মোকামে এসে হাজির। তারা শু' দেখেই অবাক যে, শা'দীর টাকার হাসানের অবস্থা তো কেবল নি বর তার জামার ক'টা নতুন তালি। আসলে নতুন পাগড়ী কিনতে হয়েছে বলে বেচারার পুরানো জামাটা আর বদলানো হয়ে উঠেছে। নতুন পাগড়ী আবার পূর্ণাঙ্গ—বাণ রে, অত নবাবী!

শাদ সব শুনে আরো কয়েকটা কাহিনী বলছিল, চিলের এ রকম ব্যাপার সে অনেক দেখেছে ও শুনেছে। শা'দী ত' প্রথমে বিশ্বাসই করবে না। ভাবলে, বাজে ব্যাপারে টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়ে হাসান এখন এক গল্প কৈছে মন্দ নয়, কিন্তু শাদের কাহিনীগুলো শুনে তারও বিশ্বাস হল যে হ্যাঁ, এ রকমটা হ'লেও হ'তে পারে। বাই হোক, শা'দী মেজাজী হলেও সদাশয় লোক সন্দেহ নেই, হাসানকে সে আবার দুই শো মোহর দিয়ে বলে গেল, "দেখো এবার যেন চিলে নিরে না পাগায়!"

হাসান এবার টাকাটা নিতে রাজী হইনি, কাজ কি বাবা ক্যাসার খাড়ে নিয়ে? কিন্তু রাজী হ'তে হ'ল। এবার টাকাটা সে খুব সাবধানে একটা ছোট থলিতে পুরে তার মুখটা সেলাই করে বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এলো একটা ভূবির জালার। আগে তার একটা ঘোড়া ছিল, এটার তারই ভূবির থাকত। কিন্তু ঘোড়াটা মারা যাবার পর ও জালাটা ভাঁড়ারের এক অন্ধকার কোণে এমনই পাড়ে থাকে, কেউ হাতও দেয় না। কাজেই হাসান নিশ্চিন্ত হয়ে মোকামে গিয়ে বসল।

কিন্তু ভাগ্যের খেলা! মাছুষকে নিয়ে চোখ বেঁধে লুকোচুরির খেলা খেলেই তার আনন্দ। হাসানের বিবি আয়েবার স্নান করবার সাজিমাটি ফুরিয়েছে, এক জন সাজিমাটিওয়ালাকে ডেকে খানিকটা সাজিমাটি কিনে তার বদলী এই অকোম্বা ভূবির জালাটা বিক্রী করে দিল সে। সে ত' আর জানে না কী সর্বনাশটাই সে করে বসল। হাসান বাড়ী কিরতই সে হাসি-হাসি বুখে তার কাছে গিয়ে বললে, "আজ বা জিতেছি জানো, তোমাকে ক'দিন থেকে বলছি তুমি তো এনে দিলে না—এ দিকে গোছল করতে পারি না, কাপড় কাচতে পারি না, আজ দেখ সাজিমাটি কিনেছি কাপড়-চোপড় ছেলেপিলেদের গা তক্ তক্ করছে। ভাবছ পরস্য ছিল না, কি করে কিনলাম? সেইটাই তো মজা, এই বাতিল ভূবির জালাটা বদলে"—

"জ্যা"—যবের মধ্যে লত বন্ধপাত হলেও হাসান এতটা চমকাত না। পাগলের মত ছুটে গেল সে ভাঁড়ারে—নেই, নেই নেই, তার সেই ভূবির জালা নেই, তার সঙ্গে নেই সেই হু'শো সোনার ঝুঁকুকে চক্কে মোহর! রাগে হুঃখে কিন্তু হয়ে সে চীকার করে উঠল, "হতভাগ্য কবলি কি, যবের লক্ষীকে বিয়ের কয়ে দিলি? এখন



শা'দীকে আমি কি বলে বোঝাবো? ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—আম্বাহারী হয়ে হাসান বোঁ-এর গালে ঠাস করে এক চড় কবিয়ে দিলে। তার বিলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, তাই শুনে হুজুর রাগে আয়েমাও গেল পাগলের মতন হয়ে। “তবে আমাকে একবার বলতে কি হয়েছিল রে বিটলে বুড়ো আমি কি তোর ওই টাকা চুরি করে বড়লোক হতুম? হবে না? নিজের ইচ্ছায়, তাকেও অবিশেষ, বেশ হয়েছে খোদা উচিত শাস্তি দিয়েছেন। হায় হায়, একটি বার আমাকে বললে কি আমি নিজের হাতে”—শোকে পাগলের মতন হয়ে আয়েমাও হাসানের দাড়ি টেনে চুল ছিঁড়ে কিল ঘুরি কোনোটাই আর বাক রাখল না। হাসান তখন আপোষের আয়াস বলে উঠল, “আজ্ঞা বাক বাক, নসিবে নেই তা আর কী হবে, আমরা কালও যেমন ছিলাম আজও তেমনি থাকব। এখন চেষ্টায়ে হাট বাধিয়ে তো লাভ নেই, লোকে শুনলে যে হুজুরের গালেই চূপ-কালি দেবে।”

তিন মাস পরে আবার শাদ আর শা'দীর আবির্ভাব। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে তারা এ ব্যতীত দেখলে যে সেই ঘৃণিত লোকান ঘরটায় বৃক্কের সঙ্গে মাথা মিলিয়ে বাড় হেঁট করে হাসান এক মনে সেই একই কাজ করে চলেছে। উপরন্তু পাগড়ীতোও একটা তালি পড়েছে। তাদের দেখেই হাসান না দেখার ভাণ করে মাথাটা আরো বু'কিয়ে দিতে জ্ঞাতি করলে না, কিন্তু শাদ এসে তার হাত ধরবার পরও তো আর না দেখার ভাণ করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

শা'দীকে কিন্তু এবার আর আমি শেষ দিতে পারব না। এবার সে ধৈর্য্য হারালে। শাদ কিন্তু হাসানের যুগ দেখে সবটাই বিশ্বাস করে নিলে। এবার তার পরীক্ষার পালা। পথে আসতে এক টুকরো সীসা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তাই সে হাসানের হাতে তুলে দিয়ে বললে, “হ্যাঁ এটা আমার পায়ে বেধে গিয়েছিল বলে তুলে এনেছিলাম, নৈবাৎ এটা তোমার কাজেও লেগে যেতে পারে, এটা তুমি বেধে দাও।” তারপর শাদ বিনীত ভাবে বিলম্ব নিয়ে আর শা'দী সমস্তটাই অবিশ্বাস করে গালি দিতে দিতে ফিরে চলল, আর হাসান কাঁদো-কাঁদো হয়ে খালি বলতে লাগল, “আমি তো নিতে চাইনি, ফুটা নসিবে কি আর সোনার মোহর টেকে?”

সেই ব্যস্তিরে কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হলো। হলো কি, এক জেলের জাল মেরামতের জন্য এক টুকরো সীসা দরকার, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। হাসান শুনে তাকে শাদের দেওয়া সীসা-টুকরোটা দিতেই সে বললে, “ভারি উপকার করলে। এই জাল সারিয়ে তবে মাছ ধরতে যাব। তা ভাই, প্রথম ভালে যা মাছ পড়বে আমি তোমায় দিয়ে দেব, সত্যি ভারি উপকার করলে তুমি আমার।” কথা মতন সত্যিই বেশ বড়গোছের একটা মাছ সে হাসানের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। আবার আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মাছটা কুটেতে বসে আয়েমা তার পেট থেকে একটা অলুপলে পাখর পেলো। সন্ধ্যাবেলায় তাদের তেলের খরচটাও বেঁচে গেল। ঐ পাখরটা থেকে একটা কি বকম আলো বোয়ালে তাদের আঁধার ঘরখানিক উজ্জ্বল করে তুললে। তাই দেখে হাসানের মনে ভারি সন্দেহ হল। পাখরটা মার্কি নয় তো?

সত্যিই সেটা লক্ষ টাকা দামের বস্ত্র। কোনো এক জাহাজ-খুঁবির কলে ওটা জলের ভাষায় হারিয়ে বার, মাছটা খাবার মনে

করে খেয়ে কেলছিল। নসিবেবের করে ঐ মাছটাই আজ এসে হাসানের ঘরে উঠেছে।

হাসান হীরেটাকে নিয়ে পরদিন গেল বাগদাদের সেরা জহরীর কাছে। তিনি যাচাই করে বলে দিলেন, এটা লক্ষ টাকা দামের বহুমূল্য বস্ত্র। এক জহরতওয়ালার ইচ্ছা হীরেটাকে কিনলে। অবিশ্যি সে অনেক দরকষাকষি করে দাম কমাতে কসুর করেনি, কিন্তু হাসান অটল হয়ে বইল। বললে, “লক্ষ রূপয়ার একটি রূপয়া কম হলেও ও মার্কি আমি বেচবো না। ঘরেই রেখে দেবো।”

ছ'মাস পরে শাদ আর শা'দীর সঙ্গে আবার হাসানের দেখা হলো। লক্ষপতির বিশাল প্রাসাদের সামান্য বৈঠকখানার বসে হাসান আজ তাদের অভ্যর্থনা করলে। শাদ অকৃত্রিম আনন্দে আম্বাহারী হয়ে হাসানকে বুক জড়িয়ে ধরেছিল, শা'দী কিন্তু প্রথমটার বিশ্বাস করতে চায়নি। সে ভাবলে, তার টাকার বড়লোক হয়ে হাসান আজ এই গল্প তৈরী করে বলছে। এই সময় সেই ইহলী বণিকটি কিছু কাজ কারবার করতে হাসানের বাড়ীতে এসেছিলেন, তাঁর সাক্ষা পেয়ে তখন শা'দীর প্রকৃত ঘটনা বিশ্বাস হয়। শাদের সঙ্গে শা'দীকেও প্রচুর দখলদার দিয়ে হাসান শা'দীর সেই চার শো টাকা ফিরিয়ে দিলে।

ফিরে যেতে যেতে শা'দী বললে, “কি দোস্ত, জিত হলো কার?” শা'দী উত্তর করলে, “তাই দেখলুম দোস্ত, নসিবেব খেলাই এই দুনিয়ার সেরা খেলা। তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু হেরে গিয়েছি বলে আমার আর হুজ নেই, আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে।”

সেই পুরোনো দিনের মত দুই বন্ধু আবার হুজুরের কর্মসূচন করলেন।

## ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

কল্যাণী দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,

জীবে প্রেম করে যেই জন

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

মাহুঘের সেবা করাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ, পাখরের দেবতার পূজা না করলেও ক্ষতি নেই যদি মাহুঘকে সেবা দিয়ে শ্রীতি দিয়ে স্তবী করা যায়। কারণ, পাখরের প্রতিমার মধ্যে স্তব-স্তব্ধে অল্পভব করবার কোনো শক্তি নেই, কিন্তু মাহুঘের সেবা করলে পরোক্ষ ভাবে জাগ্রত ভগবানেরই সেবা করা হয়। সেবা নানা প্রকারের হতে পারে; তার মধ্যে রোগসেবা হচ্ছে অজ্ঞতম মহৎ কাজ।

যে সব নারীগণ সেবাজ্ঞে নীলা নিয়ে আজ শত শত বিপন্ন বিধাব্রান্ত জীবনকে সুস্থ করে তাদের যুগে হাসি ফুটিয়ে তোলা ব্রত নিয়েছেন, তাঁদের এই সেবাব্রতের প্রথম পথপ্রদর্শিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা আজ স্রষ্টার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম হয়। ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন

তঁার নাম রাখা হয় ফ্রোয়েল। ফ্রোয়েল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতালী-প্রবাসী এক ইংরাজ-পরিবারে। ফ্রোয়েলের জন্মের কিছুকাল পরেই ঐ পরিবার ইংলণ্ডে ফিরে যান। ইংলণ্ডের অভিজাত ঘনী পরিবারে ফ্রোয়েল জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ঘনীপুত্রের অত্যধিক বিলাস-বাসন তঁার মনকে সুখী করতে পারেনি। দিন-রাত কি বেন তিনি চিন্তা করতেন, কোথাও কোনো আশ্রয় বোগীকে দেখলেই তঁার প্রাণ কেঁদে উঠত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে তঁার নিজের জীবনকে আশ্রয় বোগিগণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। পিতাকে তিনি তঁার বাসনা জানান। আশ্চর্য! এত বড় বংশের মেয়ে নাস হ'বে কেমন করে? পিতামহাচার নিকট হতে ফ্রোয়েল বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অন্তরের অমম্য বাসনাকে কোনো বাধাই দমন করতে পারে না। তাই বহু চেষ্টার পর ফ্রোয়েল চিকিৎসা ও পরিচর্যাবিজ্ঞা অধ্যয়ন করতে থাকেন। ইংলণ্ডে কিছুদিন শিক্ষার পর তিনি শুনলেন যে, কাইসারবার্গ সহরে প্যাট্রি স্কিডলার নামের জনৈক চিকিৎসক নাসি শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফ্রোয়েল সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিযুক্ত হলেন। তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্সের হাসপাতালের বিধি-ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

ফ্রোয়েলের বয়স বখন চৌত্রিশ বছর, সেই সময় সমগ্র দেশের বৃক বনিয়ে এল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিভীষিকা। শত শত আহত সৈন্যদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হতে এল সাহায্যের আবেদন। সেবার অভাবে প্রতিদিন বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাতে লাগল। কিন্তু এই বিভীষিকাময় পরিবেশের মাঝে কে যাবে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আহতের সেবা করতে? ফ্রোয়েল স্থির থাকতে পারলেন না। ভাবলেন, এইতো এসেছে তার চির-প্রতীক্ষিত মামুকে সেবা করবার সুযোগ। সকল বাধা-বিশৃঙ্খলিত সর্বিয়ে কেলে মাত্র তিরিশটি নাস' সঙ্গে নিয়ে তিনি বাত্রা করলেন ইটালীর সৈন্যদের হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। সেখানে চার দিকে অব্যবস্থা ও আহত সৈন্যগণের কল্ল

কারার ফ্রোয়েলের দরদী মন কল্লপায় ভরে গেল; তিনি মুষ্টিমতী কল্যাণীরূপে নিজের সকল কষ্ট সহ্য করে দিন রাত থরে আহতদের সেবা করতে লাগলেন। এবং সেখানে সকল প্রকার সুব্যবস্থা করলেন।

গভীর রাত্রি, ফ্রোয়েলের চোখে ঘুম নাই; দীপ তাতে তিনি প্রত্যেক বোগীকে পর্যবেক্ষণ করে বেড়াইতেন, যদি কারও রোগ যন্ত্রণার দরকার হয় সেবার। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমশ তঁার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ইটালীর শেষ সৈন্যকটিও বত দিন অবধি না সুস্থ হয়ে উঠেন, তত দিন পর্যন্ত তিনি কি করে অবসর নেবেন এই সেবার কাজ হতে? অবশেষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানে ফ্রোয়েল অসুস্থ শরীরে তঁার নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফ্রোয়েলের মহৎ কার্য দর্শনে মুগ্ধ ইংলণ্ডবাসী তাঁকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানান। তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য বহু প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি সব-কিছুই প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। পরিশেষে গডবর্গমেন্ট থেকে তাঁকে সম্মানজনক উপাধি গ্রহণ করবার জন্য বখন বাচাঘাটি চলতে থাকে, তখন তিনি জানান যে, শুধু একটি আমার প্রার্থনীয় বাসনা আছে—তা হচ্ছে লণ্ডনে একটি হাসপাতাল ও নাসদের শিক্ষালয় স্থাপন। জাতির নিকট হতে সে ইচ্ছাটি পূর্ণ হলেই আমি সবচেয়ে সুখী হব। ফ্রোয়েলের এই আবেদনের ফলে জনসাধারণের নিকট হতে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং দেশবাসীর পক্ষ হতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড তঁার হাতে প্রদান করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পুথিবার সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল ও নাস-শিক্ষালয় "সেন্ট টমাস হাসপাতাল এবং নাইটিঙ্গেল হোম" লণ্ডন সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাইটিঙ্গেলের মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে সবচেয়ে সম্মানিত উপাধি "অর্ডার অফ মেরিট" দ্বারা তাঁকে ভূষিত করা হয় এবং বহু দেশের রাজা প্রভৃতির নিকট হতেও শেষ জীবনে তিনি বহু সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আর্দ্রের জননীষকণা সেবাক্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী সর্বজনপূজ্য এই মহীয়সী নারী পরলোক গমন করেন।

## ● মাসিক বঙ্গমতীর বর্তমান মূল্য ●

ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজি: ডাকে .....২৪

বাৎসরিক " " .....১২

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজি: ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ).....২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে

গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাল

নিশিঅর্ডার কুশলেন বা পত্রের অবতাই গ্রাহক-সংখ্যা

উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সভাক ১৫

" বাৎসরিক সভাক .....৭।।

প্রাপ্ত সংখ্যা ১।

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৮

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১

বাৎসরিক " " .....১০।।

বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত সংখ্যা " " .....১৮



অস্বাদ

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

• RP 144-X82 BG •



# বিত্তেকানন্দ স্টোত্র

সুমণি মিত্র

১৮

তবু তাঁকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা ভার।  
একটা গল্প শোনো শ্রীমা' সারসার।  
যেমন মিলে এই ছোটো কাব্যটা,  
ভেমনি তীক্ষ্ণ এর তাৎপৰ্য্যটা।

"রাতের অন্ধকার ঢেলে দিয়ে দূরে  
চাঁদের শুভ্র ছায়া পোড়োছে পুত্রে।  
তাকে পেয়ে ছোটো মাছ তারি মজা পায়,  
বাঁকে-বাঁকে আসে আর হাসে নাচে গায়।  
ভাবে মনে—এ-মাজুটা আমাদেরই কেউ ;  
খুশিতে অবীর হোরে জলে তোলে ঢেউ।  
মাছদের কেউ নয় আকাশের চাঁদ,  
ওটা ওর ছায়া, তবু যোচেনা প্রমায়।  
লাকালাকি দাপাদাপি কোরে নিয়ে শেষে,  
আকাশের চাঁদ বেই দিগন্তে মেশে,  
তখন ভারতে থাকে—যে ছিলো সে কৈ ?  
আবার আঁধার নায়ে, থাকে তৈ-তৈ।  
অবদান ঘিরে ধরে, ভাবে এলোমেলো।  
মাছেরা কিমিয়ে পড়ে, বোঝেনা কে এলো।" ১

১৯

বে-কথা বোঝাতে চান শ্রীমা', অর্থাৎ  
জীব আর অবতারে অসীম তফাৎ।

১। শ্রীমাদের কথা (দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

জীব হোলো পঞ্চিল পুরুষের মাহ।  
অবতার পুরুষের ঐ ছায়া-চাঁদ।  
নয়দুর্গী অবতার-বিধাতারই ছায়া ;  
তবু যে মাছের ভাবি—এটা তাঁরই মায়।  
পঞ্চিল পৃথিবীতে অবতার এলে,  
আমরা মাছের দল তাঁকে কাছে পেলে  
মাছেরবোথেকে তাঁকে ভাবি সাধারণ,  
ভগবান-বুদ্ধিতে কোরিনা গ্রহণ।  
মনে ভাবি—ইনি বুদ্ধি আমাদেরই জন,  
আনন্দ-বেদনায় দোলায়িত মন।  
ভালো আর মন্দেব মায়। দিয়ে গড়া,  
বিশ্বাস ও স্বপ্নের ছায়া দিয়ে ভরা,  
সত্য ও মিথ্যের মোহ দিয়ে ঘেরা,  
আশা আর হতাশার ব্যথা দিয়ে চেরা,  
জানা আর অজানার আবছা আলোতে,  
পানি-ঢাকা পৃথিবীর পাকের তলায়,  
অন্তর্য চিত্তের অস্বচ্ছতা  
বেজীবন আমাদের কাটছে কদিন,  
মনে ভাবি—উনি বুদ্ধি তারই মায়ারান।  
আমাদের মতো বুদ্ধি উনিও অশ্বি,  
পঞ্চিল এ-পৃথিবীর রুদ্ধাক্ত জীব।

২০

"Is not this Jesus,  
The son of Joseph,  
Whose father and mother we know ?  
How is it then  
That he saith,  
I came down from heaven ?" ২

বতই বোলুন ঐ প্রতিবিম্ব-চাঁদ,  
"Ye are from beneath ;  
I am from above ;  
Ye are of this world ;  
I am not of this world ;" ৩  
বতই বোলুন তিন, বতই শোনান,  
"I and my father are one", ৪

২। "হীত তো ঐ জোসেফেরই ছেলে, যার বাপ-মা আমাদের  
পরিচিত ? তবে সে কোন্ বুদ্ধিতে বলে, 'আমি বর্গ থেকে এসেছি' ?"  
—St. John. (chap. VI. 42)

৩। "তোমরা এসেছো নীচে থেকে ; আর আমি এসেছি ওপর  
থেকে ; তোমরা হোস পৃথিবীর জীব ; আর আমি হচ্ছি অপার্থিব।"  
—ibid., (chap. VIII. 23)

৪। "আমি আর আমার পিতা এক।"—ibid., (chap.  
X. 30)

আমাদের কাছে তিনি "Son of Joseph",  
পাড়ারপারে বাড়ি তাঁর, গ্রাম Nazareth.  
তার বেশি হোতে গেলে সমূহ বিপদ !  
"...Being a man, makest thyself  
God ?" e

সব চেয়ে অপরাধ এটাই ঠিক  
Joseph এর ছেলে কিনা বলে ঈশ্বর !

২১

মাছের চাইতে পেকে মাছের 'আমি';  
না-বুকে নীরব থাক, তা না ঈদ্রামি !  
মাছ আর মাছের তফাৎ অনেক ।  
মাছেরা চাঁদের গায়ে ঠোকে না পেরেখ ।  
'ভগবান-যুক্তিতে নেবোনা তোমার'  
—একথা মাছের যদি তাঁকেই শোনায়,  
তা হোলে বিশেষ কিছু হয় না দোষের,  
তবু এর মানে আছে, কমা আছে এর ।  
নয়রূপে পাই ষাঁকে আমাদের ঘরে  
ভগবানবোধে তাঁকে নিই বা কি কোরে ?  
ও-কিছু দোষের নয়, দোষটা শুধন,  
চাঁদের বিচার করে মাছেরা শুধন,  
বীজের বিচার করে শিশুরা যেদিন,  
পৃথিবীর ইতিহাসে নামে হুদিন ।

চুনো-পুঁটি করে কিনা চাঁদের বিচার ।  
'জীবনের আলো'টাকে বলে "deceiver." ৬  
এক ফোটা জীব কিনা মারে তাঁকে কিল !  
সন্দেহ বলে কিনা—"he hath a devil." ৭  
কাঁটার মুকুটখানা মাথায় পরায়,  
তারপর তাঁকে কিনা 'ক্রশ'তে চড়ায় ।  
'ক্রশ' উঠে পিপাসায় জল চান, আর  
জলের বদলে তার তেতো 'তিনিগার' ।  
কি করেন, তাই খান, ওরা যে বালক ।  
মাথাটা হুইয়ে শেষে "gave up the ghost." ৮

সবচেয়ে বড়ো কথা, শূলে তার বাবা,  
তাঁর কাছে অভিশাপ পায়নাকো তারা ।

২২

"এতে চাংশকল্যঃ পুংসঃ স্বকল্প ভগবান্ স্বয়ং" ১  
সে-যুগের কাছে তিনি 'দেবকী-নন্দন' ।  
এখানেই এলাপের হয়নিকে। ইতি ।  
ব্যাসভট্ট-উদ্ধব-বিহর প্রভৃতি  
অবতার বোলে তাঁকে মানলেও ভাই,  
জনসাধারণ তাঁকে ছুঁড়েছে কাপাই ।  
জরাসন্ধ, শিশুপাল কি বোলেছে তাঁকে ?  
ওদের কৃষ্ণ-ধ্বংস আজো মাথা কাটে ।  
'মহাভারতের' ঐ 'সত্যপর্যন্তে'  
দেখি কতো মহিপাল ছিলো এদলেতে ।  
জরাসন্ধ-যড়যন্ত্র জানা নেই কার ?  
'বৈবস্বতকে' গিয়ে তবু জান্ বাঁচে তাঁর ।  
সন্ধির কথা নিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং  
'হস্তিনা'র সূত্ররূপে এলেন বধন,  
দুর্যোধন কি করেন 'উদ্বোধপর্বে'তে ?  
কিসের উদ্বোধ চল বিনা-যুক্তিতে ?  
'মণি-চোর' অপরাধ দিয়েছিলো বাবা,  
কৃষ্ণের জ্যোতিবর্গ কি বোলেছে তারা ?  
বাদবশিষ্ঠকে মেয়ে উনি নাকি তাঁর  
'স্রমস্তুক মণি' চুরি করেন গলায় !  
'প্রভাসের ধ্বংস-লীলা' চোখেছে বধন,  
সশরীরে উপস্থিত 'ব্রহ্ম' স্বয়ং !

সব-প্রধান ঐ যুগ-অবতার,  
তামসিক ইত্যদেরা কি বুঝে উঠার ?  
বিস্তার পোকা হেটা থাকে বিস্তার,  
ভাতের হাড়ির ঐ বিস্কৃততার  
তাকে যদি কোনো দিন পুরে মাথা হয়,  
নিশ্চয়ই জ্বেনো তার প্রাণ সংসার ।  
বিস্তারই আমাদের প্রাণের জিনিস,  
ভাতের হাড়ির ঐ গকটা বিষ ।  
ভাতের বিস্কৃততা কোরে থাকি তাই ।  
বাগে শেলে হয়তো বা 'ক্রশ'তে চড়াই !

২৩

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ ।  
আমি সেই ভগবান দেবকী-নন্দন ।  
অনন্ত ব্রহ্মও কোটা মায়ে আমি নাথ ।" ১০  
তবু সে-যুগের মনে যোতে নি প্রমাদ ।  
'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আমরা বা পাই ।  
মিসের ছেলে তিনি, পাড়ার নিমাই ।

৫। "মাছের হোয়ে কি না নিজেকে ঈশ্বর বোলে গেরে  
খেড়াছে।"—ibid., (chap. X. 33)

৬। "প্রভারক"—St. John. (chap. VII. 12)

৭। "ও হোছে একটি শরভান।"—ibid., (chap. VII. 20)

৮। "প্রাণত্যাগ কোরলেন।"—ibid., (chap. XIX. 30)

১। "অন্তর অবতার ভগবানের অংশ বা কলা, কিন্তু ই  
হোলেন স্বয়ং ভগবান্।"—ভাগবত ।

১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড) ৮ম অধ্যায় )

“কেহো বলে—‘এত বা সস্ত্রহ কেনে করি ।  
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি বরি ।  
তিঁহো নববীণে জগন্নাথ মিল্ল পুর ।  
আমরাও নহি অন্ন মাছবের পুর ।  
হের সতে পড়িলাও কালি তান সনে ।  
আজি তিঁহো পোনাক্রি বা হইলা কেমনে ।” ১১

“কেহো বলে—‘আরে ভাই । মদিরা আনিয়া ।  
সতে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ।’  
কেহো বলে—‘ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত ।  
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত্ত ।’  
কেহো বলে—‘হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার ।’  
কেহো বলে—‘সঙ্গদোষ হইল তাহার ।’...  
‘রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকস্তা আনে ।  
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা’ সভার সনে ।  
ডাক্য, ভোজ্য, গন্ধ্য, মালা, বিবিধ বসন ।  
খাইয়া তা’ সভাসঙ্গে বিবিধ রমণ ।  
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ ।  
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ।” ১২

২৪

এইবার ‘রামকৃষ্ণ-পুঁথি’ খুলে ভাই ।  
‘বে-রাম বে-কৃষ্ণ’ তাঁর দশটা পোনাই ।

যিনি নিজে “বলিলেন করি উচ্চরব ।  
বারেক শ্রীকৃষ্ণ শ্রবো বারেক রাব ।  
সেইজন অবতীর্ণ এই ধরাধামে ।  
জীবের উদ্ধার হেতু রামকৃষ্ণ নামে ।  
পূর্ণ আবির্ভাব মোর এই অবতারে ।  
অষ্টম চৈতন্ত নিত্যানন্দ একধারে ।”

জনতার প্রতিনিধি দেখেছে কি চোখে,  
একটা নমুনা শোনো নীচেকার লোকে ।—

“শ্রীকৃষ্ণ না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ ।  
জটা-ভষ্ম-বাথছাল গৈরিক বসন ।  
ব্রাহ্মণ সামান্তজ্ঞান করিয়া তাঁহার ।  
একাসনে শ্রীপ্রভু বসিল খটায় ।  
বিভ্রামে দুষ্টিহীন সকাঁড়ক মনে ।  
ইতি উত্তি মন্দিরের চার চারিপানে ।  
বেধোনে বা কিছু সব করি নিরীক্ষণ ।  
পশ্চাতে শ্রীপ্রভুদেবে করেন তখন ।  
চাহিয়া শ্রীমুখপানে রহস্ত ভাবার ।

তুমিই পরমহংস চেনা নাহি বার ।  
বড়ই মজার ভাই বাছ এইখানে ।  
কমট আসব হেন করিলে কেমনে ।  
আজন্ম ষাঁটিরা শাস্ত্র এছ অগণন ।  
না পারি করিতে পোড়া উদয় পোষণ ।  
লইয়া পরমহংস নামমাত্র এক ।  
কেমনে করিলে তুমি পসার এতক ।

জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে উপহাস ভাবে ।  
এতগুলি লোকে তুমি বশ কৈলে কিসে ।  
চেহারা শ্বেশ বেশ হয় অল্পমান ।  
সম্ভ্রান্ত বংশের সব ভ্রমের সন্তান ।  
নিজে হইয়াছ বাহা কতি নাহি তার ।  
পরের ছাঁওয়াল নষ্ট শোভা নাহি পায় ।” ১৩

২৫

এ তো তবু পদে আছে, ‘হালদার’ ১৪ যেটা  
ঠাকুরকে কোরেছিলো, বীভৎস সেটা ।  
‘কালীঘাটে’ বাস যার—সেই ‘হালদার’ ।  
যেমন মূর্খ আর তেমনি গৌরার ।

১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন । (পৃ: ৪৫১ ও ৪৮৬)

১৪। “মথুরনাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত ঠাকুরের প্রতি মথুরাবাবুর অবচলিত ভক্তি দেখিয়া হিংসার জন্মের; ভাবে—‘লোকটা বাবুকে কোনরূপ স্বপ্ন টুন করিয়া এরূপ বশীভূত করিয়াছে’; ভাবে—‘তাই তো, বাবুকে হাত করিবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্ত সব পণ্ড ? আবার সরল বালকের ভাণ দেখার । যদি এতই সরল তো বলে দিক বশীকরণের ক্রিয়াটা । আমার যত বিজ্ঞা সব ষেড়ঝুড়ে বাবুটাকে একটু বাগে আনছিলাম, এমন সময় এ আশা কোথা হতে এল ?’...

জানুবারারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্ধ-বাহুদশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই । ঠাকুরের সমাধি ভাঙিতেছে; বাহুদশগতের অঙ্গে অঙ্গে হ’ল আসিতেছে । এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুরকে একাকী ভগবৎ সেবিয়াই ভাবিল, ইহাই সময় । নিকটে বাইরা এদিক ওদিক চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—‘অ বাহুন, বলনা—বাবুটাকে কি কোরে হাত করলি ? কি করে বাগালি, বলনা ? উত্তর করে চুপ করে রইলি যে ? বলনা ?’ বার বার এরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুণ্ঠিত হইয়া ‘বা শালা বলিলা’ বলিয়া সন্মোহে পলায়িত করিয়া অস্ত্র গমন করিল । নিবর্ত্তমান ঠাকুর মথুর বাবু একথা জানিতে পারিলে কোরে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে বুঝি। চুপ করিয়া রহিলেন ।”  
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ (৩য় খণ্ড, পৃ: ১১১ ও ২০২) ।

১। শ্রীচৈতন্তভাগবত (মধ্যখণ্ড) ২৫শ অধ্যায়)

২। ঐ (মধ্যখণ্ড) ৮ম অধ্যায়)

অনেকেই ঠাকুরকে বোনেনি সেদিন।  
কেউ ঝাল খেড়ে গ্যাছে, কেউ উদাসীন।  
কটুখি কোরে গ্যাছে অনেকেই জানি,  
কেউ বাপু করেনিকো! এত বীরবাহি!  
বিটলে বায়ুনটার এত বজ্রাতি,  
ঠাকুরের ঐজ্ঞে মারে কিনা লাখি!  
তার ফলে বায়ুনের খাসা পরিণাম,  
ইতিহাসে আজ তার উঠে গ্যাছে নাম।  
এখন পুঁথিতে এর ঘটনাটা পোড়ে,  
প্রথমেই এক চোঁট বাপাস্ত্র কোরে,  
মনে-মনে সকলেই বুট জুতো পায়  
বায়ুনকে দমাদম লাখি ঘেরে বার।  
একটা লাখির কলে কে জানতো হাই,  
অনন্তকাল তাকে লাখাবে সবাই!

২৬

ঐরামকৃষ্ণদেব অবতার আজ।  
সে যুগের কাছে তিনি 'ছোটো-ভট্টচার'।  
স্বামিজীর মতো ধীর শক্তি, সাধনা  
রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধাধিতে ছিলো এক কণা,  
বেদময় বাণী ধীর 'mightier than  
Those who have preceded,'<sup>১৫</sup>,

সেই শক্তিমাত্র

সে-যুগের কাছে কিনা আর একটা লোক!  
খুব যদি বেশি হন 'সিদ্ধসাধক'!  
মায়ার প্রভাবে বার! আরোই বেহুঁস,  
তাদের উঁবর মনে উনি 'great goose'  
রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যের দল,  
তাদের সমষ্টি যিনি, 'summation of all'  
কেশব, বিজয় আর অন্তরঙ্গ ছাড়া,  
কি বুঝেছে সেদিনের শিক্তি বারা?  
তাদের কাছেতে ঐরামানন্দাম,  
বেগুণ-গলার কাছে হীরের বা দাম!

১৫। "Once more the wheel is turning up,  
once more vibrations have been set in motion  
from India which are destined at no distant day  
to reach the farthest limits of the earth. One  
voice has spoken, whose echoes are rolling on  
and gathering strength every day, a voice even  
mightier than those which have preceded it, for  
it is the summation of them all."—Reply to  
Khetri address.

... "ধীর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ,  
বীজ, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে  
নিরুপদ্রাব্যমি।।"

—পত্রাবলী (১ম, পৃ: ৪৬৮

২৭

হীরে 'ভাসে' সু' ঐ বেগুণ-গলার  
মজাদার গল্পটা শোনো এইবার।—  
"একজন বাবু তার চাকরের হাতে  
একখানা হীরে দিয়ে বোজেন তাকে,—  
'জেনে আর বাজারেতে কতো দাম এর।  
দামটা জেনেই তুই ফিরে আর ফের।'  
চাকর তো হীরে নিয়ে বাজারেতে বার।  
প্রথমে বেগুণ-গলা, তাকে পাকুড়ায়।  
বোলে সে হীরেখানা হাতে দিয়ে তার,—  
'কতো দাম দিতে পারো এই হীরেটার?'  
হীরেটাকে বেশ কোরে নেড়ে-চেড়ে শেবে,  
বেগুণ-বুড়ি নিয়ে সামান্ত কেশে,  
অনেক ভাবার পর বলে কি শুহন,—  
'বড়োজোর দিতে পারি ন'সের বেগুণ।'  
চাকরটা বলে—'তাই আর একটু গুটো।'  
পুরোপুরি দশসের দাও অন্ততঃ।'  
তাতে সে বেগুণ-গলা বলে কিনা হেসে,  
বাজারে বা দর তার বেশি বোলেছে সে।" ১৬

আমরা বেগুণ-গলা, নেই কোনো গুণ।  
অবতার খুব জোর 'ন'সের বেগুণ!  
বাজারদরের চেয়ে তাও বেশি বায়!  
আঁচিসের হোলে পরে তবেই পোষায়!

২৮

তা-ছাড়া কি আশা করো? দোষ দেওয়া মিছে  
ঠাকুর বে অবতার 'কাগজে লিখেছে'?  
তবে শোনো ঠাকুরের দানাদার শ্রব।  
অবতার-না-মানার কারণটি বেশ!

"একজন বলে তার বন্ধুকে—'শোন,  
কালকে ও-পাড়া দিয়ে বাছি বখন,  
নড়বাড়ে বাড়িখানা হুড়-মুড় কোরে  
হাজায় পোড়ে গ্যালো চোখের ওপরে!'  
বন্ধুটি শিক্তি, শুনে বলে—'সে কি।  
পাঁড়া পাঁড়া, খবরের কাগজটা দেখি।'  
তারপর কাগজের লম্বা 'কলম'  
তল-তল কোরে খুঁজেও বখন  
ঘটনার উল্লেখ পেলোনা কোথাও,  
তখন বোলে হেসে—'গাঁজা রেখে দাও।'  
বন্ধুটি বলে—'বা: যে, চোখে দেখেছি বে।'  
—'কি জুলুম, কাগজেতে কিছু লেখনি যে?'

১৬। ঐরামকৃষ্ণকথায়ত।

মনে কিছু কোবানো হে, কাগজে বা নেই  
—সেখব মেনে নেবো তুমি দেখলেই ? ১৭

ভগবান আসেন যে মাছুষের সঙ্গে,  
সেখা কি সাহেবের বই এ লেখা আছে ?  
যে-কালে তা লেখা নেই, কি কোরে তা মানি ?  
কতই বলানো কেন, শুনিছিনা আমি ।

২৯

‘মোকম্বার’ আর ‘রল’-এর কুপার  
ঠাকুর যে অবতার আজ শোনা যায় ।  
ঠাকুরের কথা ওরা কাগজে লেখায় ১৮  
অনেকেই বাসে চোড়ে ‘মঠ’ ১১ চোলে যায় ।  
‘মোলিক্লেজ’ ক্যামেরাটা বগলেতে ধোলে ।  
সাবাদিন নেচে-কুঁদে খালি ফটা তোলে ।  
‘টফিন-ক্যারিয়ারে’তে পুন্ডা নিয়ে আসে ।  
নিজেদেরই ভোগ দিয়ে শুয়ে পড়ে বাসে ।  
কটির টুকরো আর কলার খোসার  
মাঠটা নোয়া কোরে বাড়ি ফিরে যায় ।

৩০

এরা ভবু বাই হোক ঠাকুরকে মানে ।  
বাই হোক আসে ভবু ঠাকুরেরই টানে ।  
কোথাও এদের আছে শুভবোধ মনে,  
নইলে ‘লেকে’ না গিরে ‘মঠ’ আসে কেন ?  
আজ্ঞা মালুক আর ঘুরেই বেড়াক,  
একদিন ঘুচে যাবে জড়তার ডাক ।  
ঠাকুরের আগুতার ভাসার মানেই,  
এদের চেতনা হোতে বেশি দেয় নেই ।

১৭। শ্রীশ্রীমতককথামৃত ।

১৮। অধ্যাপক মোকম্বারই (Prof. Max Muller)

সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ‘Nineteenth Century’-র ১৮১৬ সালের আগষ্ট সংখ্যায় শ্রীশ্রীমতককদের জীবন এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর ‘The Life and Sayings of Ramkrishna’ নাম দিয়ে দু’পো পাতার একখানা প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীমতকদের এই জীবনী প্রাচ্য ও পাকাতা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো।

ফরাসী মনোবী রমঁয়া রল্যান্ড (Romain Rolland) ঠাকুর ও বামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত। ১৯২৮ সালে ইনি ‘Life of Ramkrishna’ নামে তিনপো অটোপ পাতার এক বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তারপরই ‘The life of Vivekananda and the Universal Gospel’ নাম দিয়ে বামিজীরও একখানা জীবনী রচনা করেন। এটা চারপো-পয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ঠাকুর ও বামিজীর এই দু’খানা জীবনীই বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

১১। ‘লেকু-মঠ’। এখানেই বামিজী ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত কোরে গ্যাছেন।

এইভাবে স্নক হয় স্ততসংস্কার ।  
যেতে যেতে জেগে যায় বিবেক-শিখার ।  
ঐ যে সাধুরা যান গৈরিকবাসে,  
আজ্ঞার কীকে-কীকে বেটা চোখে ভাসে,  
ঐ জড়-জীবনেতে তারও আছে দাম ।  
গোকম্বার অধিকার নাইবা পেলাম,  
সেখতে তো পেতে পারি বেটা চোখে পড়ে ।  
গোকম্বা দেখাও ভালো, মনে ছোপ ধরে ।  
বিরাগের যে আগুন জ্বলছে ‘মঠ’-র ।  
চিন্তার তরঙ্গ সাধুসংস্কার,  
অজান্তে পাই বেটা বিনা পরসার,  
তার দাম প্রকাশিত হয়না ভাবার ।  
‘প্রেম’-র চেয়েও ওর সাক্ষাৎকার  
প্রচণ্ড শক্তিটা আরো জোরদার ।  
নিঃসারে মনে ঢুকে উঁকি-খুঁকি মারে ।  
হুগু যে শুভ-বোধ, তাকে তুলে ছাড়ো ।

এইভাবে আগ্রহ শুভবোধ তাকে  
মিরে বাবে বামিজীর পাকা বাড়িটাতে ।  
ঠাকুরের কুপা আর আগ্রহ তার  
হয়তো পৌছে দেবে ঐ পোতলার  
প্রশস্ত ঘরটাতে—যে ঘরেতে আজ  
‘ঠাকুরের প্রতিমিথি’ করেন বিবাজ । ২০  
এই ‘জাত-সাপ’ ২১ যদি মারেন ছোবোল,  
তিনি ডাকে ঘুচে যাবে জড়তার বোল ।

তাই বারা ‘মুলার’ ও ‘রমঁয়া রল’-এ পোড়ে  
‘ক্যামেরা’টা কাঁধে নিয়ে ‘ট্রাউজার’ পোরে  
ঘন-ঘন মঠে আসে আজ্ঞাও দিতে,  
ভাসের অসার ভাবা চলনা কিছুতে ।  
আজ্ঞাবি কথা নয়, সাদা চোখে ঢের  
ভিস্-বাকী খেতে আমি দেখছি এদের ।  
অতএব সবশেষে ‘ফ্রেক’, ‘জাৰাপ’  
হুই মহা মনোবাক জানাই প্রণাম ।

[ ক্রমশঃ ]

২০। মঠাধ্যক্ষ। বামিজী বোলেছেন, শ্রীমতকদের অধ্যক্ষই হোছেন ঠাকুরের প্রতিমিথি। বরা ঠাকুরই এর মাধ্যমে সন পয়চালনা কোরেনে।

২১। গুরুত্ব বোধান্তে গিরে শ্রীমতকদের বোলভেন,—যদি চোঁড়া সাপে ব্যাঙ ধরে, তাহোলে সে তাকে গিলতেও পারেনা ছাড়তেও পারেনা। যদি জাতনাশে ধরে তাহোলে তিনডাকের পর ব্যাঙটা চূপ হোরে যায়। অর্থাৎ গুরু কীটা হোলে গুরুও বন্ধা, শিবেরও বন্ধা। যদি সনুও হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে চূপে যায়।

—শ্রীশ্রীমতককথামৃত



# মার্গো

CHC-11 881

স্নানের  
সময়  
মার্গো সোপ



ব্যবহার করতে ভুলবেন না

সুস্বাদু-সুন্দর মার্গো সোপের প্রচুর স্বিচ্ছ ফেশা  
সোমকুপের গভীরে প্রবেশ ক'রে শরীরের মলিনতা দূর  
করে এবং শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাসেও তরুণ  
মহুশ ও কোমল রাখে। পরিবারের সকলের পক্ষেই  
মার্গো সোপ একটি আদর্শ সাবান। কোমল দেহের  
পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

ক লি কা ভা - ২২



# \*বিজ্ঞান বার্তা\*

পঞ্চম মিশ্র

গত ১৪ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন কোলকাতায় শুরু হয় এবং ২০শে জানুয়ারীর আলোচনা সভার পরে এর সমাপ্তি ঘটে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের ধারাই সাধারণ ভাবে অনুসরণ করা হয় কিন্তু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের জন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা অনুযায়ী এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধন ১৪ই জানুয়ারী স্থির করা হয়েছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ইতিহাসে এই ১৪ই জানুয়ারী কিন্তু এক মহাস্মরণীয় দিন। তেতারিখ বছর আগে, ১৯১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে এই কোলকাতা সহরেই। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের যে বিরাট রূপ এই বছর কোলকাতার বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করলেন, ১৯১৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির একটি ঐতিহাসিক কক্ষে মাত্র ১০৫ জন সভ্যের উপস্থিতিতে তার জন্ম হয়। সেই সভ্য সভাপতিত্ব করেন চিরস্মরণীয় শ্রীর আততোব মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের পাঁচটি বিভাগে মাত্র ৩৫টি প্রবন্ধ সেই অধিবেশনে পেশ করা হয়। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জন্মস্থান কোন দিনই এই সম্মেলনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে কার্ণাণ করেনি। এসিয়াটিক সোসাইটি আপন আবাসে এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যালয় স্থাপন করবার সুযোগ দিয়েছে; কোলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠান দিয়েছে একধণ্ডা জমি, কার্যালয়স্বত্ব গড়ে তুলবার জন্ত। এই বৎসর সাধারণ সভাপতি ডাঃ বিদ্যাসুন্দর দাস মহাশয় সেই জমিতে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের নিজস্ব কার্যালয় ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এই ৪৪তম অধিবেশন হলো কোলকাতার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন।

যদি কি সাহায্য, কোলকাতা বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মর্যাদা বক্ষা করেছে। ১৯৪৩ সালের কথা, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হবে স্থির হয়েছে লক্ষ্যকোঁতে। আগষ্ট আন্দোলনের বহিঃ তখন সারা দেশব্যপী চকল করে দেখেছে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সেই সময়ের নির্বাচিত সভাপতি ঐক্যবরদাস দেহেক তখন হারানো। দেশের তখন চরম দুর্দিন, অর্থাৎ বিজ্ঞান-কংগ্রেসেরও অভ্যন্তর দুর্দিন। শেষ সময়ে বিস্তৃত লক্ষ্যকোঁ

জানাল, তারা এই বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের গুরুদায়িত্ব নিতে অপারগ। এখন উপায়—ভারতের বিজ্ঞান-মহাসম্মেলন তবে কি এই বৎসর স্থগিত থাকবে? জাপানী বোমার ভয়ে এক আয়ো নানা শত সমস্তায় কোলকাতা মহানগরীও তখন বিস্ত্রত, কিন্তু সেই শেষ সময়ে সে এগিয়ে এসে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে। এর মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের রক্ত জয়ন্তী উৎসবের দায়িত্বও কোলকাতা গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এইবার কোলকাতা কি করলো? বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এইবার কোলকাতা যে চরম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, তার লজ্জা আজ এই সহরের জনসাধারণকেও কলঙ্কিত করেছে। সভ্যদের দেয় ব্যাজ কার্ড সবই হয়ে গিয়েছিল গুলট-পালট। অস্তিত্ব প্রদেশের প্রতিনিধিরা এসে অনেকই সর্বকম প্রবেশপত্র না পাবার দরুণ সব অস্থানে বোগলান করতে সক্ষম হননি। কেউ কেউ একটর বসলে তিনখানা কার্ড পেয়েছেন—চমৎকার ব্যবস্থা! আবার কোন কোন সাধারণ সভ্যকে তুল করে পাণ্ডাশালে বসবার জন্ত অধিবেশনের সভ্যদের কার্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বিনা কারণে বসতে হয়েছে অনেক পেছনে। পাণ্ডাশালার মধ্যে সামনের দিকে একটি আংশে বড় বড় করে লেখা ছিল 'সাধারণ সভ্যদের জন্ত'। অনেক সাধারণ সভ্য সেই লেখা পড়ই নিজেদের জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু ছেদ্দাসেবকেরা কার্ড চেক করে তাঁদের পেছনে 'অধিবেশন সভ্যদের' স্থানে বসিয়ে দিয়ে এসেন। শত অস্থবোধ করেও, নিজেদের বুকে সাধারণ সভ্যদের ব্যাজ থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারলেন না!

সাধারণ সভ্যদের কর্তৃপক্ষ তুল করে 'অধিবেশন সভ্যদের' কার্ড দিয়েছেন, অথচ সাধারণ সভ্যদের নিষর্দন পত্র, ব্যাজ সব থাকা সত্ত্বেও সেই তুলের মাতুল দিতে হল সভ্যকে। বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে, বিজ্ঞানী ও কর্মীদের চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেওয়ার এই মিলিটারী ব্যবস্থা আমার দৃষ্টি অভিজ্ঞতার এই প্রথম দেখলাম। অস্ত প্রদেশীয় অনেক প্রতিনিধিকেও এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে,—এ আমাদের সকলের লজ্জা। কোলকাতার কোন কোন সভ্যকেই যে প্রকার অন্তর্বিধার পড়তে হয়েছিল তা শুনলেই বুঝতে পারবেন, অস্ত প্রদেশের কয়েক জন প্রতিনিধি কি প্রকার নাজেহাল হয়েছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির রীতাব ডাঃ জ্যোতি সেন, বুল অস্থটানেরই প্রবেশপত্র তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পান নি, বলে অস্থটানে বোগলানের জন্ত তাঁকে যে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা একজন সভ্যের পক্ষে রীতিমত অপমানকর। এ ছাড়াও প্রত্যেকটি অস্থটানে ক্রটি-বিচ্যুতির স্থা নিত্য কম ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতি নিজেদের সহরের পরিচর-সবলিত একটি দারক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তাও অস্থত তুলে ভর্তি, এই সহজ তুলগুলি একই মনোবোগ দিলেই তাঁরা শোধরাতে পারতেন।

আর সমালোচনা নয়, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের এবারকার কর্তব্যপত্রতা সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে। পঞ্চম মিশ্র তো হার, ভারতের প্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের অনেকেও তাঁর সমালোচনা করে এঁদের নাগাল পাননি। অতএব বা হয়েছে তাই ভালো,—এবার অস্ত প্রদেশে আসা দাক। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আলোচনা সম্মেলন

বিখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীদের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। অবশ্য সাধারণের কাছে বক্তৃতার বিষয়ের চেয়ে বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত আকর্ষণই হয় বেশী। খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের দেখবার জন্য এবং তাঁদের মুখে আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্য বিজ্ঞানকর্মীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বীরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক গার্ডন চাইল্ড, অধ্যাপক হারজবার্গ, অধ্যাপক শ্লেসার জেনিস্ এবং অধ্যাপক নেসমিয়ানভ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক গার্ডন চাইল্ড একজন প্রকৃত বহুভাষী, প্রাচীন যুগের সভ্যতার বিষয়েই তাঁর আলোচনা করার কথা, তাই তাঁর সভাতেই সাধারণ লোক সব চেয়ে বেশী আকর্ষিত হয়েছিল। ছবির মাধ্যমে তাঁর বক্তৃতা চমৎকার হয়, কিন্তু কথার জড়তার জন্য অনেকই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। রুশীয় বিজ্ঞানী নেসমিয়ানভ কোন জনপ্রিয় বক্তৃতা দেন নি, রসায়ন-বিজ্ঞান শাখার আলোচনাচক্রের মধ্যে তিনি নিজস্ব গবেষণার বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। বিজ্ঞানী হারজবার্গ ও শ্লেসার জেনিস সাহেবের বক্তৃতাও বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ও বাংলায় বিজ্ঞানকর্মীরা যথেষ্ট উপভোগ করেছিলেন। ডাঃ এন নন্দ-মজুমদারের রূপকণ্ড অভিনয়ের সচিব বক্তৃতাটিই এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানী দলের রূপকণ্ড অভিনয়ানের বিষয়টি ডাঃ নন্দ-মজুমদার রতন ছায়াচিত্রের সহায়তায় বর্ণনা করেন। নগাধিরাঙ্গ হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে প্রাপ্ত একদল তীর্থযাত্রীর

দেহারশেষ এবং বস্ত্রসমূহের পরিচয় জ্ঞোতার্য কৃদ্বিন্মাশে অবশ্য করেন। সিনেট হলে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীতেই এই বস্ত্রগুলির বহুপ তীরা দেখেছেন, এবার তার পরিচয় কাহিনী সকলকেই তৃপ্ত করলো।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীটিতে কয়েকটি যন্ত্রপাতির দোকান ছাড়া সাধারণতঃ আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সারা ভারতবর্ষের এমন কি অন্যান্য রাষ্ট্রের বহু প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা এখানে এসে সমবেত হন; তাই গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রসমূহের প্রদর্শনী করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে, আন্তঃতাত্ত্বিক শতাব্দিকী প্রদর্শনী এবং আন্তঃতাত্ত্বিক মিউজিয়াম বাদ দিলে দেখা যায়, এবারও দোকানদার ছাড়া কেবলমাত্র রূপকণ্ড এবং আণবিক শক্তি-কমিশনের প্রদর্শনীই ছিল। রূপকণ্ডের বস্ত্রসমূহ অভিনয়দের দাবী করতে পারে। আণবিক শক্তি কমিশনের প্রদর্শনী সাধারণের কোঁতুল নিবৃত্তির বিশেষ সহায়ক, তাই এরও মূল্য নেহাত কম নয়। পক্ষধর মিশ্র মনে করেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনী বোধ হয় আরও অনেক চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব।

জে, রবার্ট, ওপেনহাইমার

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দিকী উৎসবে রূপকণ্ড ভারতবর্ষ ও বিশ্বের কয়েক জন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিকে সম্মানস্বরূপে

## শুভ বিবাহে

শুভ বিবাহে কিংবা যে কোনও শুভ কাজে যৌতুক দেবার মত আধুনিক মনোরম ডিজাইনের খাটি গিনি সোনার গহনা ও সাজা গ্রহণের প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।

ফোন : ৩৪-৪৯৮২

## অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস

স্বামিকার ও স্বর্ণ শিল্পী

৮৫, বহুভা জার ফ্লিট • কলিকাতা ১২

দ ৩ ম্যানসন

ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। বাবা এই সম্মান লাভ করেন, প্রিন্সটনের বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা-মন্ডলের ডিরেক্টর জে. রবার্ট ওপেনহাইমার তাঁদেরই এক জন। বিশেষ সমার্বভনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধ্যাপকিত্বে তাঁকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি অর্পণ করে সম্মানিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যুৎ ডাঃ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার ১৯০৪ সালের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্ক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মিতে তিনি জার্মানদেশবাসী ইহুদি, তাঁর বাবা বয়নশিল্পের ব্যবসায় আমেরিকাতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বালাকালেই রবার্ট ওপেনহাইমার স্কুলের লেখাপড়াতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অল্প সময়ের মধ্যে একসঙ্গে ফরাসী, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা এবং পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তক সকল শিক্ষা করে তিনি তাঁর শিক্ষকদের অবাক করে দেন। অবাক হবার মতোই কথা, মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি নিউইয়র্কের খনিজ বিষয়ক সমিতির সভাপদে নির্বাচিত হন, আর সব সভারাই তখন প্রায় ৩০ এর কোঠা অতিক্রম করতেন! স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে, ওপেনহাইমার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সটন হবার ৪ বছরের পাঠ্যতালিকা মাত্র ৩ বছরে সমাপ্ত করে ঐ পরীক্ষায় সাক্ষর্য্যর সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। উচ্চশিক্ষার জন্য এবার তাঁর বাবা তাঁকে বিশেষ পাঠান। প্রথমে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর জার্মানীর গটটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি জার্মানীর গটটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করেন।

আমেরিকার প্রত্যাগমন করে ওপেনহাইমার একসঙ্গে হুট প্রিন্সটন বোর্গান করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। একটি বার্কলেতে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অপরটি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। উভয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করে একযোগে তিনি এই হুট প্রতিষ্ঠানেই কাজ করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগ তাঁকে প্রথম পরমাণু-বোমা নির্মাণ পরিকল্পনার নেতৃত্ব করতে আহ্বান করেন। পরমাণু বোমা নির্মিত এক মহাব্যুৎসব যাবত হবার পর তার প্রচণ্ড ক্রমতা ও নারকীয় ধ্বংসালীরা তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। পরমাণু বোমার স্বতন্ত্রকারী ক্রমতা দেখে যখন শান্তিকামী মানুষ একে সভ্যতার অস্তিত্বের বস্তু বর্ণনা করে এর সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীদের দোষ দিলেন, তখন ওপেনহাইমার বলেছিলেন;—“The World cannot turn its back on knowledge.”

বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার-এর পর আমেরিকার পরমাণু শক্তি-কমিশনের, হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ওপেনহাইমারের মনোভাবের বশেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল; তাঁর নির্ভীক সমালোচনার বিরত হয়ে সরকার আণবিক শক্তি-কমিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করে দিয়ে, আণবিক শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা সমূহের গুপ্ততাব্যবস্থা জানবার অধিকার থেকে এই বিজ্ঞানীকে বঞ্চিত করেন।

১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার প্রিন্সটনের বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট কর আত্মত্যাগ ট্যাডজি-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। বহু কোটি ডলার ব্যয় করে নির্মিত এই বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা-মন্ডলে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী নীলস বোর প্রভৃতি চিন্তা-নায়েকরা গবেষণা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবার্ট ওপেনহাইমার অত্যন্ত মধুর প্রকৃতির লোক,—ছাত্রদের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সন্ধন সবচেয়ে বেশী। ১৯৪০ সালে তিনি বিবাহ করেন,—তাঁর স্ত্রীর নাম ক্যাথেরিন পুয়েননিং হ্যারিসন। বর্তমানে ২টি সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে প্রিন্সটনের একটি সড়ের কামরা-বিশিষ্ট বিরাট বাড়ীতে ওপেনহাইমার শান্তিতে বাস করছেন। কড়া মন ও মঙ্গলসংযুক্ত খাতের প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি আছে। খেলাধুলার মধ্যে ঘোড়ার চড়তেই তিনি বিশেষ ভালোবাসেন। প্রতিবেশী ও লোকজনের সঙ্গে গল্প করাও তাঁর অবসর সময় বাপনের আর একটি প্রধান উপায়।

প্রথম পরমাণু-বোমা নির্মাতা এই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানী মনে-প্রাণে শান্তিকামী, তিনি বিশ্বাস করেন, খোলা মনে আলাপ-আলোচনার দ্বারাই বিবেচনা শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। বিশ্বশান্তির সম্ভাবনার বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওপেনহাইমার বলেছিলেন, মাত্র হৌ লক্ষ্যে মানুষের বৈদ্যন পৌঁছোতে পারবে, সেদিনই পৃথিবীর এই অশান্ত উত্তেজনার ঘটবে পরিসমাপ্তি। প্রথম লক্ষ্যটি হলো কলকাতায় রাজ্যশাসনের অবসান, দ্বিতীয়টি হলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গোপনীর রহস্তজালের উদ্ঘাটন। গোপনীর আবহাওয়ার মধ্যেই মিশে থাকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভাব; তাই খোলা মনে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি যদি একযোগে মানবকল্যাণে অগ্রসর হতে না পারে, তাহলে শান্তিময় জগতের প্রত্যাশা কবাই বুঝা।

বিজ্ঞানী জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের বর্তমান বয়স মাত্র ৫৩ বছর,—এই অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর কাছে সমগ্র মানব-সভ্যতা আরও অনেক কিছু শাশা করে। তাই আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অধিবর্ষের দিনে ‘মাসিক বসুমতী’র কাছে সাময়িকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্ভাগ্যবশত বহনের সামিল হয়ে থাকিবে। অল্প মাত্রায় সঙ্গ মাসিকের মতো, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির স্পর্শক ব্যায় না রাখিলে চল না। কারণ ওপেনহাইমার, কিংবা অন্যদের, কারণ ওপেনহাইমার কিংবা বিবাহ-সম্বন্ধে, মর্যাদা কারও কোন কৃতকার্যতার আপন ‘মাসিক বসুমতী’ উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, মাসিক বসুমতী তার দৃষ্টি ফল করতে পারে একমাত্র

‘মাসিক বসুমতী’। এই উপহারের জন্য মনুষ্য আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপন শুধু নাম টিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রস্তুত টিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আশ্বাসে। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে থুই হবেন, সপ্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের প্রাক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, জীবিত্যে এই সখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে কে-কোন জাতবোধের জন্য লিখন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

# ফুলের বিচিত্র সম্ভার!

অতি মনোরম সুরভিত ট্যাল্‌কাম  
পাউডার ফরাসী সহযোগিতায়  
একান্তই আপনার জগতে তৈরী।

## লোকহে

ট্যাল্‌কাম  
পাউডার  
কিন বকসের হৃদয়



টা টা র এ ক টি শি য়ো জ ব

লোকহে আইটেট লিমিটেড, বয়ে হাউস, কোট, বোম্বাই-১

# শ র ৭ - স্মৃতি র টু কি টা কি

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কোন একটা কাজের জন্য প্রায় মাসখানেক আমাকে বরানগর থেকে আবার দক্ষিণ-কোলকাতায় এসে থাকতে হয়। সেই সময় একদিন সকালে—অধিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়ী এসেছি। আমার সঙ্গে ২২।২৪ বছরের একটি যুবক আছে। সে বেশ ভাল লেখে। তার কলমটির ভেতর থেকে শক্তিশালী ভাবায় সৌন্দর্যভরা লেখা বেরুতো। ছোট-বড় সব রকম জিনিষই সে দেখতে জানে এবং দেখার পর সে জিনিষ সে নিখুঁত ভাবে তার কলমের দ্বারা আঁকতে পারে। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি (observation) অনেক নামকরা লেখকের চাইতেও তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু তরুণ বয়স ও নতুন লেখক বলে কোনও নামকরা পত্রিকার সম্পাদকই তার লেখা গল্প পত্রস্থ করতে রাজি হতেন না। এজন্য সে আমার শরণাপন্ন হয়। আমি আবার তাকে সঙ্গে এনে শরৎচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছি। অনেক চেষ্টা করলেও সে তার কোনও গল্প প্রথম শ্রেণীর কোন কাগজে বার করতে পারে নি। তার হুঁচকিয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি—সেদিন সে সঙ্গে করেই এনেছিল। শরৎচন্দ্রকে বললাম—“সম্পাদকদের কি অন্তর দেখুন ত’ দাদা! নতুন আর তরুণ হোসেই, তাঁদের কাগজে এদের প্রবেশাধিকার থাকবে না, একেমন কথা?” হেসেটিকে বললাম—“গল্প দুটো রেখে বাও, উনি পড়ে দেখবেন, তারপর কোনও ভাল কাগজে—বাতে বার হয়, তার জন্য চেষ্টা করা যাবে, বুঝলে? আজকে তুমি বাও, ইচ্ছাশ্রমের পরে, দাদার সঙ্গেই হোক বা আমার সঙ্গেই হোক, দেখা করো।” হেসেটি তার লেখা গল্প দুটো রেখে চলে গেলো। সে চলে গেলে আমি বললাম—“সম্পাদকদের কি রকম বিচার দেখুন দেখি! তরুণ আর নতুন লেখকের খুব ভাল লেখা হোকও তঁারা তা ছাপাতে রাজী হন না, এটা বড় দুঃখের কথা! ভাল-মন্দ লেখার কি তাহা হলে বুঝে আর তারুণ্যই হোক মাপকাঠি? আমি ত বুঝি, লেখা ভাল হোসেই হোক। লেখক তরুণই হোক আর প্রবীণই হোক, তা নিয়ে ত’ আর কথা নয়।”

শরৎচন্দ্র বললেন—“সাহিত্যক্ষেত্রের এইগুলো হোল—কাঁটা-বেড়া। অবিকার লেখকের এই ‘কাঁটা-বেড়া’ ‘জল-বেড়া’ ডিজিরে তবে সাহিত্যিক হোতে হয়। যাকে এসব বাধা-বিপত্তি দুর্ভোগ তুগতে না হয়, সে ত ভাগ্যবান সাহিত্যিক। আমি ত এই ভয়েই প্রথমে কোন বড় কাগজে বেঁধতে সাহস করি নি। তাই প্রথমে ভবে ভরে আমার পানীটা দাগিয়েছিলুম—‘বয়না’র।”

হেসেটি চলে বাবার পর, এ সবকে আমাদের মধ্যে কিছুকণ কথাবার্তা হোল। এই শ্রেণীর তরুণ লেখকদের ওপর আমার উত্তরেই খুব বেশী মাত্রায় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলাম। কিন্তু হুশকিল এই যে, প্রচলিত সম্পাদককে কোন-কিছুর জন্য অহরোধ বা পেড়াশিড়ী করা শরৎচন্দ্রের স্বভাববিকৃত ছিল। স্বভাবের দিক দিয়ে একজন কোন কথা আমার না থাকলেও, এক-আধ জন ছাড়া, কোনও সম্পাদকের সঙ্গে আমার তেমন পোই-পোই ছিল না। সে এক-স্বাধ জনের কাছে আমি চেষ্টা করতেনও কখনও করি নি, কিন্তু কোন কল হয় নি। তার পর্বত এই ঠিক হোল যে, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রও চেষ্টা করবেন,

আমিও আর একবার চেষ্টা করবো। তবে কোনও ফল হবে না, এ-ও আমার জানি।

ওঁঁবার সময় শরৎচন্দ্র বললেন—“কিন্তু আমার ওপর আজ এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভাল করলে না। হুঁ-দুটো হাতে-লেখা গল্প পড়া—ওঃ! ও ত আমার দ্বারা—। তুমি ত পড়েচ। তোমার এখন ভাল লেগেচে, তখন নিশ্চয়ই আমারও ভাল লাগবে; স্তবরা—”

“স্তবরা—একটা থাক, একটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। ছেলেটি বড় ভাল; একটু কষ্ট করে ওর একটা গল্প আপনি পড়বেন দাদা! যেন ভুলবেন না।”

“পড়বো’খন : ভুল আমার হয় না।”

যাব বলে পিছু ফিরেছিলাম; দাদার ঐ কথায় আবার ঘুরে ঈড়ালাম, হাসতে হাসতে বললাম—“ও কথা আর বলবেন না দাদা। চিড়ের কথাটা না হয় পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু বোটানিকেল গার্ডেনের Pen Club-এর ব্যাপারটা এখনো টাইট।” শরৎচন্দ্র আর কিছু বললেন না; আমি হাসতে-হাসতেই চলে এলাম।

চিড়ের ব্যাপারটা একটু বলি।

অপরায় কাল। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই সময় প্রায়ই আমরা ‘লেক’-এর দিকে বেড়াতে যেতাম। সেদিন গিয়ে দেখি, তিনি বেরবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখে বললেন—“চল, আজ একটু বাজারের দিকে বাওয়া যাক।”

গাড়ী তৈরী ছিল, এলাম হুঁজনে জগদ্বাবুর বাজারে। এটা-ওটা অনেক-কিছু কেনা-কাটা হোল। শেষে একটা জিনিস কেনা নিয়ে শরৎচন্দ্র মহা হুশকিলে পড়লেন। এই জিনিসটা কিনে নিয়ে বাবার জন্য বাজারের মেয়েরা শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। এই জিনিসটা আনতে মেয়েরা শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ প্রকাশকে ক’দিন ধরে বলছেন, তিনি ভুলে যান; বাড়ীর চাকর-বাকরদের বলে দেন, তারায় ভুলে যায়। তাই আজ অনেক করে খোদ শরৎচন্দ্রকে তাঁরা ঐ জিনিসটা আনতে বলে দিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র জিনিসটার নাম একবারেই ভুলে গেলেন। শুধু মনে আছে তাঁর যে জিনিসটা খুবই উপকারী এবং দরকারী, সেটা নিয়ে বেচেই হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারলেন না। জিনিসটা ভিজিরে খেতে হয়। স্তবরা! ভিজিরে খাবার জিনিস—কি হোতে পারে?

আমি বললাম—“ভিজিরে খাবার জিনিস? এ নামে পড়বার ত’ কিছু নেই, নিচুর—মিছরী।”

“না, মিছরী নয়।”

“তা হোসে—বাতাসা।”

“আরে হুঁ! ওসব নয়।”

“তবে কি—হোসা?”

শরৎচন্দ্র একান্তমনে ভারত-ভারত মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ—হোসা নয়।

“তা হোলো, কাঁচা গোটা যুগ, কি বরষাটা কড়াই বোধ হয়। কোন পুঞ্জের নৈমিত্তির জন্তে ত?”

একই ভাবে ভাবতে-ভাবতে শরৎচন্দ্র বললেন—“আস-হা না না, ওসব নয়। আর কি বললে তুমি? ছোলা? তা হোতে পারে; বোধ হয় ছোলাই—” পরক্ষণেই আবার বললেন—“না: ছোলা নয়। কেন না, একটা ছোট খামার প্রায় আধ ধামা ছোলা আজ সকালেই আমি ভাঁড়ারে দেখেছি, মেজের ওপর সামনেই রয়েছে।”

একটা ভিনিসের নাম অল্পক্ষণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই ভাবে ভুলে যাওয়া এবং বার্ষিকতার সঙ্গে সেটা আমাদের চুঁতনের মনে অনিবার্য চেষ্টা করাটা এক্ষণে পর্যন্ত আমার মনে বিরক্তির আনছিলো, কিন্তু এখন তার বদলে একটা উৎসাহের নাড়া যেন মনের ওপর এসে লাগলো। গভীর ভাবে ভাবতে লাগলুম। কি হোতে পারে? ভিজিয়ে খেতে হয়, অথচ—মিছরী নয়, বাতাসা নয়, ছোলা নয়, যুগ নয়, বুট নয়—তা হোলো, আর কি হোতে পারে? আমার মনে পড়লো, ‘আলিবাবা’র সেই ‘কাসেমের কথা। ‘চিচি কাঁক’, ‘কথাটা ভুলে গিয়ে, শেষ কালে ‘ঝিঙে কাঁক’, ‘বেগুন কাঁক’, ‘আলু কাঁক’, ‘পটল কাঁক’, ‘চাঁড়স কাঁক’,—সব কাঁক! এ ক্ষেত্রেও আমাদের দেখছি, সেই দশা হোল, যা কিছু বলছি, সবই কাঁকা হোয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমি বলে উঠলুম—“দাদা, ইসবগুল কি?” শরৎচন্দ্র

আমার কথায় কান না দিয়ে, লাফিয়ে উঠে বললেন—“চিঁড়ে—চিঁড়ে।”

বাঁচা গেল! চম্পিশ-দস্যুর গুহা থেকে বেরোবার পথ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। একটা দুদীর দোকান থেকে সের-আড়াই চিঁড়ে কিনে নিয়ে আমার বাড়ীর পথে ফিরলুম। আমাকে আমার বাড়ীর কাছ-বরাবর নামিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র চলে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা যেতেই শরৎচন্দ্র বললেন—“কাল তোমার জন্তে আমি বাড়ীতে কি বকুনিই খেলুম?”

চমকে উঠে বললুম—“কেন; কাল আমি কি করেছিলুম, দাদা?”

“তুমি চিঁড়ের কথা বললে, আমি চিঁড়ে নিয়ে এলুম। তারপর খুব একচোট বকুনি খেলুম।”

“তাহোলো—চিঁড়ে নয়? কি আনতে বলেছিলেন?”

“নালতে-পাতা। ছেলেমেয়ে দু’টোর কুমি হোয়েচে, ঠঁদেরও পিক্তি বেড়েচে, সব ভিজিয়ে দিনকতক খাবে। ও! ওর জন্তে কাল কি-কথাটাই শুনতে হোল।”

“শুনবেনই ত। আপনিই ত” বললেন—“চিঁড়ে। আমার হাড়ে এখন দোষ চাপালে ত চলবে না। আমি বরং ‘নালতে-পাতা’র কাছাকাছি গিয়েছিলুম; ‘ইসবগুল’ বলেছিলুম।”



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাষা  
আগ্রার ভাষা  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০-*দুর্গেশ কুমারী শর্মা* এডিকার-গ্রাম-গিনিয়াট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা রিবেস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা যা যার—এমন কোর জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বারা বিকৃত সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিন্তাচরিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ হাতে কোর সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক গৃহী রাধিব্যার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোরদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নিষ্পিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অবসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং

বাঁক ; এই হোল চিড়ের কাহিনী। শরৎচন্দ্রের এইরকম ভুল হবার প্রধান কারণ, তাঁর মাথার সর্বদা ভীড় জমিয়ে থাকতো—খালি লেখার ভাবনা। লেখার বিষয় ছাড়া, তাঁর মনের ওপর অন্য কোন কথাই গভীর ভাবে বসতো না। বিশেষতঃ ঐ সময়ে 'চরিত্রহীন'র নতুন সংস্করণের জন্তে তাঁর মন খুব ব্যস্ত থাকতো। ঐ সময় একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন—'হুটো আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে, তাকে একসঙ্গে জুড়ে 'চরিত্রহীন' লিখতে হয়েছে। এই হুটোর মিল রেখে একটা সমাপ্তি আনা বড় শক্ত।'

এর কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই বিমর্ষচিত্ত দেখতুম। এই অবস্থার প্রায়ই তিনি হতাশার সুরে একটা কথা বলতেন। সে কথাটা হচ্ছে—'কি হোল!' কথাটা বেদনাভাজিত হোয়ে তাঁর অন্তর থেকে বেরতো। তাঁর এই 'কি হোল'র মানেটা এই যে, এক দিন ধরে, এত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, এত ছুটোছুটি, লাফালাফি, দাশা-দাশির পর, জীবন একোখার এসে পঁড়ালো! সেসবের কল কি হোল, পরিণাম কি হোল! মনের যে-অবস্থার তাঁর হৃদ থেকে প্রায়ই এই 'কি হোল' কথাটা স্তন্যভূম, মনের সেরূপ অবস্থা হওয়ার কারণটা বোধ হয় আমি বুঝতে পারতুম। মাত্রাবিক পরিপ্রেক্ষণের পর, যেমন লোকের মেহে-মনে ক্লান্তি আসে; এ সেই ক্লান্তিভাব। অল্পবয়স থেকে স্নর করে, দীর্ঘদিন ধরে মনের ওপর একটা অবসাদ আসে। প্রাক্তন মন তখন নিজীবের মত হোয়ে যায়। হবত একটা কপিক উৎসাহ-উত্তেজনার সে-মন একটু ঢাঙ্গা হোয়ে ওঠে, কিন্তু তা হারী হয় না। এই অবসাদগ্রস্ত নিজীব মনকে ঢাঙ্গা করে তুলতে, তিনি কিছুদিন উত্তেজক জিনিসও ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাতে কল আরো ধারাপ হোত।

সপ্রতি কোন এক পত্রিকার আমাদের এক বন্ধুহানীর ব্যক্তি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই সময়ে শরৎচন্দ্র না কি তাঁকে কথাগুলো বলেছিলেন—'আমার লেখা আর তোমার কিছু প্রোতাপা কোনো না, আমার 'জরা'র আক্রমণ করেছে।' শরৎচন্দ্র যদি তাঁকে এই কথা বলে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজের মনের এই অবস্থাটা নিজেই ঠিক ধরতে পারেন নি বলেই মনে হয়। মাহুকের যে বয়সে 'জরা' এসে মনকে আক্রমণ করে, শরৎচন্দ্রের সে বয়স তখন হয়নি। প্রকৃত বা 'জরা', তা মাহুকে কমপক্ষে তার ৩৯-১০ বছর বয়সেই আক্রমণ করে। আমি নিজেকে দিয়েই প্রমাণি যে, এখন আমার বয়স ৭৫ বছর। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে এত দিনে আমি 'জরা'র আক্রমিত হোয়েছি। ৬৬বছর আগে থেকেই হরত অল্পে অল্পে হোয়েছি। কিন্তু বখনকার কথা বলছি, তখন শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল—৩০। বাট বছর বয়সে বড় একটা কারোকে 'জরা'র ধরে না। খুব তাড়াতাড়ি মরলেও, ৩৫/৩৬ বছর বয়সের আগে যে কারোকে 'জরা' আক্রমণ করে, এ আমার মনে হয় না। তবে হয় ত আমার জামের সমতায় জন্মে এ বিষয়ে আমার ধারণা ভুল হোতেও পারে।

বাই হোক, শরৎচন্দ্রের হৃদে ওই হতাশাব্যঞ্জক 'কি হোল'র জ্বরে, আমি তাঁকে একদিন বললাম—'দাদা, সবই ত হোয়েছে।

কিছু হবার, সবই ত ঠিক-ঠিক হোয়েছে, কিছুই ত বাকী

নেই, দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার পর, সোলায় তরে তুলেছেন তার পর হোটাছুটি করেছেন, লাফালাফি দাশা-দাশি নোড়-নোড় করেছেন, কত খেলা খেলেছেন, যৌবন কালে কত প্রেম-প্রণয়ের কত বিরহ-মিলনের, কত স্বপ্ন মাধুর্যের, কত আশা-নিরাশা, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ভেতর দিয়ে চলে এসেছেন। তার পর সাহিত্য-জগতের চিত্রকর হোয়ে, কত ভিন্ন ভিন্ন মাহুকের, সমাজের, সংসারের নিখুঁত ছবি একে কত বশ-মান, আনন্দ আদর-অভিনন্দন পেয়েছেন। আবার এখন এমন এক জায়গায় এসে পঁড়িয়েছেন, মন যেখানে আর পা বাড়িয়ে এগিয়ে যাবার উৎসাহ পাচ্ছে না, খালি চলে আসা পথের গিকে চেয়ে চেয়ে হতাশা আর ব্যথার সে-মন আপনীর জেলে পড়ছে। স্তবত্যা জীবনের যা কিছু হবার, সবই ত ঠিক ঠিক হোয়ে আসছে দাদা, একচুলও তার এমিক-ওমিক হয়নি; স্তবত্যা কিছু না হওয়ার জন্তে হুঃখ করবার ত কিছুই নেই; দাদা!'

হুখে এই কথা বললুম বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মানসিক অবসাদের অন্ততর কারণটাও কথা ভাবতে লাগলুম। হয়—এ ভাবটা তাঁর ক্লান্ত মনের অবসাদ, নয় ত—অন্ত একটা কারণও হোতে পারে। গত জীবনে শরৎচন্দ্রের সুরাপানের অভ্যাস ছিল। শুনেছি তিনি অন্তিরিক্ত মাত্রাতেই ঐ জিনিসটা পান করতেন। এ অভ্যাসটা বর্ষা প্রবাসকালে তাঁর বেশী ছিল। সেখান থেকে চলে এসে বখন শিবপুরে থাকেন, তখনও কিছু কিছু ছিল। তার পর হঠাৎ সেই অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করেন।

এক জিনিসকে ত্যাগ কোরে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অন্য জিনিসকে গ্রহণ করেন। সে জিনিস হোল আফি। আফি ধরেই ক্রমে ক্রমে ওয় মাত্রা তিনি বাড়িয়ে গিলেন। তারপর তার মাত্রা আবার কমিয়ে আনেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে অধিক মাত্রার সুরাপানের অনিবার্য ফল—মায়ুমস্তার হ্রাসলতা আর মানসিক অবসাদ। মনে হয়, শরৎচন্দ্রের বর্তমান মানসিক অবসাদের মূল কারণ এইটাই, 'জরা' নয়।

তাঁর সুরাপানের কথাও একটা কথা না লিখে পারিচি না। তিনি সুরাপান করতেন সত্য এবং হয়ত একটু বেশী মাত্রার পান করতেন, তা'ও সত্য, কিন্তু বর্ষা থাকাকালে তাঁর সুরাপানের মাত্রার কথা একখানা বইয়ে পড়ে আমাকে চমকে উঠতে হ'য়েছে। এই রকম অনন্তর আজও কি কথা ছাপার অক্ষরে কি করে প্রকাশিত হয় তা ভাবতেও পারি না। বইখানার নাম বোধ হয়—'শরৎচন্দ্র'। লেখক এক জায়গায় লিখছেন যে 'বর্ষার একদিন রাতে একজন য়ালো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে বাজী রেখে ও পাজা দিয়ে, শরৎচন্দ্র পর পর আঠারো বোতল সুরা পান করেছিলেন।' বইখানা আমার নেই; থাকলে তার থেকে হব্ব বাকটা তুলে দিতে পারতাম। তাহ'লেও কথাটা এইরূপই। তারপরই লিখছেন—'কিন্তু তা'তেও তাঁর কিছুই হয় নি'। অক্লুত কথা! এক বোতল নয়, ছ' বোতল নয়, একেবারে আঠারো বোতল! কোরাট বোতলের মাগ তিন পোরা অর্থাৎ ২৪ আউন্স! ১৮ বোতলে হয় সাড়ে তের সের। বুকাগনের পেটের বোলে সাড়ে তের সের জল তিনি ধরাতে পারতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত একজন সাধারণ মাহুৎ ১৩৪ সের—জল নয় সুরা অল্পে এবং সহজে উদরহ কমলেন এবং করে দিখা-দুঃখ হইলেন—এর চেয়ে সুরাপানের কথা



আর নেই। কিন্তু এটা গভীর চিন্তাধারক কথাও বটে! বাড়লার সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক সর্বজনমাত্র উপভোগ্যসম্মতের বিষয়ে এইধরনের আত্মকথন ও বৈপর্য্যীয় দেখা কি কোরে স্মৃতি পৃথকে স্থান পায়—তা বুঝি না।

বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র সবচেয়ে আর একটা কথা বহুসংস্কৃত মুখে প্রায়ই শোনা যেত। তিনি যখন সামন্তবর্গে রূপনারায়ণ নদেব ধারে বাস করতেন, তখন অনেকেই কোলকাতা থেকে তাঁকে দেখতে সেখানে যেতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রজ্ঞা ভরে তাঁর জন্ত মিষ্টান্নাদি নিয়ে যেতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এত দাম্পত্য ছিলেন যে, সেই সকল মিষ্টান্ন, উপহারদাতাদের সামনেই তিনি তাঁর শ্রিয় কুতূহ 'ভেলী'কে ধারণাতেন, নিজে তার এক রতিও খেতেন না। এসব ব্যাপারের প্রতিবার করতে বাওয়াই মূর্খতা। স্মরণ্য এইখানেই এসবের পূর্ণচ্ছন্দ ফেলা থাক।

'বিচিত্রা' যখন তার বিচিত্র রূপ ও সাহিত্যসম্ভার নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করলো এবং সাহিত্যরসিকগণের কাছে প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে সমাদর লাভ করলো, তখন থেকেই 'বিচিত্রা'র সম্পাদক গৌড়েশ্বরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা। ধরতে গেলে আমার সাহিত্য-স্বাভাবের সূত্র 'বিচিত্রা'তেই। 'বিচিত্রা'র গোড়া থেকেই আমি 'বিচিত্রা'তে লিখতে থাকি। স্বর্গভ্য: বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' ও আমার ছোটগল্প, একই সময়ে মাসের পর মাস 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত হতো থাকে। এজন্য বিভূতিভূষণ ও আমি প্রায়ই 'বিচিত্রা' আকস্মিক যেতাম। 'বিচিত্রা'র আকর্ষণের চেয়ে তার সম্পাদকের আকর্ষণ আমাদের কাছে ছিল আরও বেশী। উপেন বাবুর মত অমায়িক লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি যেমন স্তম্ভী, তেমনি জ্ঞানী, তেমনি নিরহঙ্কারী। এমন লোক খুব কমই আছে, যিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সৌভাগ্যে মুগ্ধ না হয়েছেন। উপেন বাবুর কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা করে আমি আনন্দ পেতাম; সেজন্য মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে যেতাম। একবার উপেন বাবুর কাছে প্রস্তাব করলুম, 'সাহিত্যিক ও কবিরা মিলে একখানা নাটক অভিনয় করলে কেমন হয়?' এ বিষয়ে অনেক দিন থেকেই আমার খুব একটা বোঁক ছিল। আমার প্রস্তাবের স্বাপেক্ষে তিনি খুব আনন্দের ও উৎসাহের সঙ্গে মত প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন—'চল বন্ধোপাধ্যায়ের জামাতা অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী ও কর্মী। অমরেন্দ্রকে একথা জানালে, উৎসাহের সঙ্গে সাদা পাওয়া যাবে; তারপর আপনি ত আছেনই।' উপেন বাবুর কথায় খুবই উৎসাহিত হলুম। তিনি বললেন—'শরৎকে একখাটা জানাবেন; তাকে এ ব্যাপারে চাই কিছু।' মনে মনে ভাবলাম শরৎচন্দ্রও সহজেই এ ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গেই রাজী হবেন।

স্মরণ্য কয়েক দিন পরে শরৎচন্দ্রকে কথাটা জানলাম। শরৎচন্দ্র শোনা মাত্রই বললেন—'দূর-দূর। ক্ষেপে। ও কিছুতেই হবে না?' তাঁর উত্তরের ভঙ্গীটা শুনে রাগ হোল; জিজ্ঞাসা করলুম—'হবে না কেন?'

'অর্থাৎ, হোতে পারে না বোলেই হবে না। বত সব পাগলামী তোমাদের।'

আমি কিছু বলতে গিয়ে আর বললুম না। শরৎচন্দ্রের কথায় বেশ একটু উৎসাহভঙ্গ হোয়েই গেলুম। কিন্তু একেবারে হতাশা হলুম না। হতাশা হলুম দিন কয়েক পরে উপেন বাবুর কাছে গিয়ে। উপেন বাবু সেদিন বললেন—'কতদূর কি হোল? শরৎকে সব বলচেন ত?'

'হ্যাঁ, সবই বলছি।'

'রাজী ত?'

বলতে বাজিলুম সত্য কথা, যে—রাজী ন'ন; কিন্তু তা না বোলে, বললাম—'হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র খুব রাজী।'

'বেশ। তাহোলে খুব শীগগির বাতে হয়, উঠে পোড়ে লাগে। কিন্তু একটা কথা। 'প্রেটা' কিন্তু সাধারণ ভাবে করা হবে না, একটু নতুন রকম—অর্থাৎ extempore play।'

উপেন বাবুর কথা শুনে চমকে উঠলুম। বুঝলুম—লক্ষণ সুবিধার নয়। উপেন বাবু বললেন—'রবীন্দ্রনাথকেও অভিনয়ের রাতে আমায় নামাতে পারবে। সে ভার আমার। তবে, একটা কথা, রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে কোলকাতার আসবেন, আমাদের ঠিক ঐ সময় বেঁচে অভিনয় আয়োজনটা করে ফেলতে হবে। শরৎকে কথাটা বলবেন।'

মনে মনে বললুম, শরৎকে কথাটা বলবার 'আর দরকার হবে না। বেশ বুঝলুম যে, হবে না। উপেন বাবু বললেন—'আমি নিজে কিছু কোন ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করতে পারবে না। সে দক্ষতা আমার মোটেই নেই। আমি একটা ভিথিরী বাবাজী বা এরকম কিছু একটা সেজে দু'-একখানা কর্তৃক-গান গাইব।'

নিরুৎসাহ হলুম বটে, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়লুম না। কথাটা শৈলজ্ঞানন্দকে বললাম। শৈলজ্ঞানন্দের কাছ থেকে খুবই উৎসাহ পেলাম। আরও দু'-চারজনকে বললাম। তাঁরাও উৎসাহ দিলেন। তখন ভাবলাম, এঁদের সকলের ইচ্ছা ও উৎসাহটা শরৎচন্দ্রকে আর একবার জানাই। কয়েক দিন পরে তাই জানালাম। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'বধা পূর্ব্ব তথা পরা' তাঁর সেই একই উত্তর—'তোমার মাথা ধারণা হোয়ে গেছে; একখনো হয়?'

'আচ্ছা দাদা, হবে নাই বা কেন?'

'আরে পাগল! হবেই বা কেন?'

একটুখানি ভেবে আমি বললুম—'হবে এই জন্তে যে, আমার করবে।'

'আমরা কারা, একে একে নাম কর যিকি।'

আমি বারো-চোদ্দজনের নাম কোরে গেলাম। শরৎচন্দ্র বললেন—'এঁদের মধ্যে দু'-চার জন ছাড়া, ট্রেজে নেমে গ্রে করতে কেউ পারবেন না। এই সব সাহিত্যিক ও কবি—এঁদের প্রকৃতি খুব নরম, ঠাণ্ডা, এঁরা ঘরে একান্তে বোসে লিখতে পারেন, কিন্তু ট্রেজে ঝাঁড়িয়ে এঁরা অভিনয় করতে পারবেন বলেও আমার মনে হয় না। ঘর—'অরু' রায়: তিনি ট্রেজে নেমে যখন দেখবেন, তাঁর সামনে এক হাজার মাথা আর তার নিচে দু'হাজার চোখ তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন তাঁর বা বলবার কথা সবারই তিনি ভুলে যাবেন, তাঁর পা ধরবার কোরে কীপবে, কিছুই তিনি বলতে পারবেন না—সে একটা বিতর্কিত ব্যাপার হবে। তোমরা

হু'একজন ডানপিটে বার। আহ, তারা হয়ত পারবে, কিন্তু আমার বিবাস, আর কেউ পারবেন না।"

আমি কথাগুলো ভারতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক ধাঙ্কিলেন। দুটো টান দিয়ে আবার বললেন—“এব জন্তে আর মিছে চেষ্টা করো না, এ হবে না। তবে এর পরের যুগে, যখন হয়ত তুমিও থাকবে না, আমিও থাকবো না, তখন ধীরা সাহিত্যিক আর কবি হবেন, তাঁরা পারবেন। এবং তবেও তাই। তখন অভিনয়-শিল্পীরা সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে এক হোয়ে মিশে যাবে। বা বললুম, ভাল কোরে ভেবে দেখো।”

তাই দেখলুম। হু'টার দিন ধরে ভেবে দেখবার পর বুঝতে পারলুম, শরৎচন্দ্রের কথাগুলো ঠিকই। স্মৃত্তরা আর ও জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করলুম। থিয়েটারের ব্যাপারে গোড়া থেকেই শরৎচন্দ্রের উৎসাহ বা সমর্থন ছিল না। তিনি বরাবরই বলে আসছেন—“কিছুতেই হবে না, যেহেতু হতে পারে না।” শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কথাই ফলে গেল এবং বুঝতে পারা গেল যে, সত্যই হোতে পারে না। তখন না হোয়ে যদি এখন হোত, তাহালে হতে পারতো। সময়টা তখন ঠিক উপযুক্ত ছিল না। বিশ বছর আগের তুলনায় এখন খুব পরিবর্তন হোয়েছে। এখন যে সব সাহিত্যিক ও কবি বাণী সেবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ হোয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তখন এঁদের পাওয়া গেলে খুব ভাল ভাবেই অভিনয় করতে সমর্থ হতুম। কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম যে এইরকম একটা আয়োজন হচ্ছে। অল্পদিন পূর্বে কাগজে পড়লাম যে তখনকার হু'একজন ও এখনকার কয়েক জন মিলে বেতার-প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় অভিনয় করেছেন। সংবাদটা পড়ে আমার মন আনন্দানু কোরে উঠেছিল। কিন্তু এখন ৭৫ বছর বয়স আমার পক্ষে আর কোন উপায় না থাকলেও, ঘরে খুব একটা আনন্দ পাচ্ছি।

আজ শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে তিনিও আনন্দ পেতেন। পরিচালনা কথা, তাঁর সৃষ্টিকর্তা অকালে তাঁকে আমাদের কাছে থেকে হিনিয়ে নিলেন; নইলে শ্রববার বয়স তাঁর হয়নি। এ হৃৎক করে আর লাভ নেই, এ হৃৎকের আর অন্ত

নেই। শুধুই কি শরৎচন্দ্র? শরৎচন্দ্র গেলেন; তাঁর শেষ জীবনের সর্বসময়ের সঙ্গী, তাঁর মাতুল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায় গেলেন; সত্যীন্দ্র ঘটক গেলেন, কান্তি বোব গেলেন; বিভূতিভূষণ গেলেন। তারপর এই সেদিন, বিনামেষে বজ্রাঘাতের মত রাধেশ রায়, সহসা আমাদের ছেড়ে ওই একই পথের পথিক হলেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ স্ত্রীরাধেশকে শরৎচন্দ্র বংগবানোত্তি ভালবাসতেন। হৃৎকের কথা যে, সন্দেহই গেলেন অন্তর্যয়ে। ঠিক বুড়া হোয়ে কেউই গেলেন না। শুধু ‘বুড়া’ হোয়ে এই সব কঠিন আঘাত সহ্য করবার জন্ত পড়ে থাকলাম আমি। জানি না, আরো কত আঘাত সহ্য করতে হবে। সৃষ্টিকর্তার এ কী নিদারুণ পরিহাস। জগতের এ কী নির্ভর বিধান, যে আজ এক একে এঁদের সবগুলিকেই এত অকস্মাৎ এটি ভাবে হারাতে হোল। শরৎচন্দ্রের কথা বলতে বসেছি, শরৎচন্দ্রের কথাই বলি + শরৎচন্দ্রকে এক দিন ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে নিজেকে যেমন ভাগ্যবান ভেবেছিলাম, আজ তাঁকে হারিয়ে, নিজেকে তেমনি হুঁচকা বলেই মনে করছি। তাঁর জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক বই বহুবার কোরে পড়েছি আর সেই সঙ্গে ভেবেছি, এই ‘স্রীকান্ত’র লেখক, এই ‘পশ্চিমমশাই’ ‘নিষ্কৃতি’ ‘চন্দ্রনাথের’ লেখক, এই ‘সেবদাস’ ‘বিদ্যাজীবো’ ‘পল্লীসমাজ’ ‘বিলু’র ছেলে, ‘রামের’ স্মৃতির লেখককে কত সহজে, কত সহজে আর কত কাছে আমি পেয়েছি। এর দাম যে কত বেশী, তাঁর মাপ ঠিক করতে তখন ‘খাই’ পেঁহুম না। কিন্তু সে পাওয়া আজ এক-একটা বৃক-ভাঙ্গা দীর্ঘবাসের সঙ্গে কিরিয়ে দিতে হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন বই-ই আর পড়িনি, ছুঁইও নি। সে সব যে কোথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, কোথায় পোকার কাটচে বা পোড়ে-পোড়ে পচছে, কেই বা নিয়ে বাচ্ছে, সে সব খবরও আর রাখি না; কারণ, ব্যথার উপর ব্যথা পেতে আর চাই না; সে শক্তি এখন নেই। তাছাড়া, হৃৎক করবারও এখন অবসর নেই; কারণ, শরৎচন্দ্র সবচে বা বলতে বসেছি, তার এখনো কিছুটা বাঁকা আছে। পরসংখ্যার তা বলবার জন্তে আবার ত প্রস্তত হোতে হবে।

[ক্রমঃ:]

## শীতান্তিক

শীতবাসন্তি চট্টোপাধ্যায়

শীত-সকালে নীল সাগরে চাঁদ বেন ঘুপপরি  
আকাশ ভরে আলোর ঘুঁশি অল্প অল্প অন্ধর  
দূর দেশে কোন্ অজান্তেই পাল তোলে মন-তরী  
শখাচিল শঙ্কাহীন উলাস প্রাণবন্ত।

আলতো শীত নিব্বুন বন : ঠাকুরার কাঠ-ঠাকুরা  
বাঁধুই মেয়ে স্বপ্ন মেলে অসীর আদিশন্ত  
মিষ্টি দিন—মিষ্টি হিম তোমার কানো কৌকড়া  
বিবাহ বাক্যে কিম্বদন্তী চম্পা ভাগ্যমত।

ধানের শীষ চমক-চুম গাঙশালিকের জন্ত  
কোন মাঠে কোন গাঁয়ের বধু গানের সোনা বুনতো  
কে ছোঁরাতে প্রাণে তোমার ভালোবাসার ধ্বংস  
পাহাড়তলী আশুন জেলে বরফ-করা সুনতো।

ঘুমার ঘুপ বাতান-কাঁপা কাকজোয়ারের জলতে  
ঘুঁশ-কাঁপা হীরে-পাঙ্গা—আনতো এমন জানতো  
অনেক ঘুরে তোমার বাঁপ : নীপগানে নেই সপতে  
যার বে চলে সোনার শীত, শুধু আছে ঘুম পাড়া।

**স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত  
লাইফবয় সাবান দিয়ে  
চান করে -**

**— এতে দৈনন্দিনের\* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!**

\* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে  
আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু  
থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের  
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে  
স্বাস্থ্যবান লোক মাঝেই লাইফবয় সাবান  
দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের  
স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান  
সেই স্বরূপে তাজা ভাব এনে দেয়।



নীলকণ্ঠ

ষোলো

টলিউড শরিকমার' পথে টলিউড ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। তবুও, আরেকটু দূর নিয়ে যাবো আপনাদের। টলিউডের সত্যিকারের চেহারা টলিউডের বাইরে না এলে দেখা অসম্ভব; দেখানো শক্ত। বাড়ীর কথা লিখতে হলে বাড়ীর বাইরে কী ঘটছে তার কথা চাই খবর। টলিউডের বাইরে এসে দেখছি টলিউডের বাইরে পা ফেলবার উপায় নেই। কলকাতার স্বর্গমর্তপাতাল এই ত্রিশদ ভূমিই আজ টলিউডের অন্তর্গত। রূপালী পর্দায় নয় শুধু পর্দানবীন গৃহের আবরণও উন্মোচন করতে সে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দ্রুত এবং নিশ্চিত। সুরা-উদ্ভূত দুজন; একজন পিষে পিষে খাবার পর বলছে আরেকজনকে : ওরে ভজা আর খাগনে! তোকে যে দেখা বাচ্ছে না আর,—তোর সব ঝাপসা করে আসছে! ঠিক এমনি অবস্থাই আজকের কলকাতার। শুধু গুজিক নয়; টালিগুজিকার পেয়ে বসেছে তাকে। ঝাপসা হয়ে আসছে তার দৃষ্টি।

কোনও বাড়িবাড়িরই মাশ নেই। সংস্কৃতি-কুট্ট-বৈলম্ব্য কোনও বাড়িবাড়িরই কল ভালো নয়। তার মারাত্মকতম দৃষ্টান্ত করাসী দেশ। সুরা, লাকি, আর সুর করাসী দেশকে দিনে দিনে এমন দুর্বল করে তুলেছে যে, ছোট-বড় বেকোনও অন্তরের চোখ রাঙানিতেই তার লক্ষ্যকম্প আর ধামবার নয়। তারই অন্ধ অহঙ্করণ করে রাঙা দেশ আজ বার বার। হুই-চুতীরণ গেছে; বাকী বাড়লা দেশটা এখন এসে ঠেকেছে শুধু কলকাতায়। বাড়ালী মারা পড়ছে

সঙ্গে চাই এগ্রিকালচারও। উনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশে যেদেশী অথবা নব-জাগরণের যুগ। বিংশ শতাব্দীকে কি বলা হবে, সে কথা বলতে পারে আগামী কাল; আমাদের শুধু বেকথা মনে হয়েছে, তা' হলো কর্ণের উপাসক নেই আর কেউ এদেশে; আমাদের সকলেরই আরাধ্য আজকে কৃষ্ণকর্ণ। নাকে ভেজাল তেল দিলেও আমাদের যমোন চাই। নির্ভেজাল ঘৃণ। কোনও অস্ত্রের প্রতিবাদেই অক্ষম হীনবীর্য আমরা, বারা আজকে শাসকের গদীতে আসীন, তাদের শুধু ভোট দিয়েই আমাদের ঘুম নয়; তাদের ভোট দিয়ে তবেই আমাদের নিশ্চিন্তে পড়ে-পড়ি ঘুম দেওয়া।

এর আগে লিখেছি 'Poverty is the only Crime'—দারিদ্র্যই একমাত্র পাপ। আরও লিখেছি, আজকের অধঃপতিত কলকাতার উৎস অভাব। অভাব ঠিকই; কিন্তু শুধু অভাব নয়। স্বভাবও বটে! অভাবেই শুধু স্বভাব নষ্ট নয়; স্বভাবেও অভাব সৃষ্ট! অভাব যদি সত্যি সত্যি অহুভূত হতো, তাহলে কলকাতায় এতগুলি প্রেক্ষাগৃহে এতগুলি 'পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ'-র নিশান উজ্জীন হতো না। অভাব যদি সত্যিই তীব্র তাবে বাজতো, তাহলে নাচ-গান-জলসায় উদ্ভূত হতো না কলকাতা, খেলার মাঠে ভেঙ্গে পড়তো না অধঃভূত, অহুভূত বাঙালী। এ সবেরই প্রয়োজন আছে; কিন্তু শুধু এ প্রয়োজনই জন-জনে ধারণা করার বাঁধা পড়ার বিক্রী হবার দরকার নেই। প্রমোদ চাই; প্রমত্ত হতে চাই না!

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিত্ত নেই; উদ্ভূত ত' নেইই। তবুও তার মারাত্মক ভ্রমতা-রকায় বেলামাল হওয়া চাইই। এই মধ্যবিত্ত বাঙালীর কথাই বলছি। এরা সবাই কিছু অভাবে মৃত নয়; স্বভাবেই অধঃমৃত। এদের কোন ভবিষ্যদ্বিষ্ঠা নেই। আজকের দিনটা চলে গেলেই নিশ্চিন্ত; কালকের ভাবনা কালকে। তাই মধ্যবিত্তরা 'খি' চাকর ঠাকুর ছাড়তে না পেলে একদিন বসন্তবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়; গিয়ে ওঠে বসন্তোতে। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সঙ্গে এক হয়ে সাম্যের জয় গায়। কাল'মার্জ' যে সাম্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে সাম্যে নীচুর গুঁড়বার কথা ওপরে। মার্জ'বালীরা যে সাম্যের হৃৎস্পন্দ দেখাচ্ছে, সে সাম্যে উঁচু নেমে আসছে নীচুতে। গান্ধীবাদ মানে যে অবস্থায় গান্ধীকে বাদ দিলেই সুবিধে হয়। মার্জ'বাদ মানেও তাই; কাল'মার্জ'কে পুরো বরবাদ।

একান্নবতী পরিবারের অসুবিধের দিকটাই আমরা দেখেছি সুবিধার দিকটা নয়। দেখি নি, তার কারণ সকলের সুবিধার নিজের বড় অসুবিধা। তাই একান্নবতী পরিবারের একাডে প্রতিপালন নয় আর। তার বকলে স্ট্যাটে স্ট্যাটে স্ট্যাটে হয়ে শুয়ে থাক। আত্মীয়-স্বজন আজকে অনাহৃত। বড়-বাকব পাল-পার্শ্ব আজ ছুয়া। স্বার্থভাগের কথা ভুলে স্বার্থ ঝাঁকড়ে থাকার ফলে একান্নবতী পরিবার ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ডই আঘাত পেয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে : ভালবো ত' মচকারো না!

এই সেদিনকার কথা। মকঃবলের বড় উকীলের বাড়ী দেখ করতে গেছে একজন মস্ত বড়ো মজেল। দ্বিগে দেখে দাক্তরা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, খালি পা, খোঁচা খোঁচা লাড়িতওয়াল বৃদ্ধে হ'কো টানছে। মজেল জিজ্ঞেস করেছে : বাবু কোথায়? বুড়ো জবাব দেই। বাবু কোথায়? বুড়ো চুপচাপ। আরে কথা কওন হে? তার কোথায়? একদিকে বড়োর বাক্যহুতি হয়; কো

বাবু? মজেল বলে: উকীল বাবুর কথা বলছি; আবার বাবু কে? বাড়ীতে। বুড়ো এবার নিজমুঠি ঘরে: আমিও সেই কথাই লিখি; তোমার উকীল আবার বাবু হলো কবে? বাবু? তোমার ব্যাটা। তখনত পাই মাসে দেড় হাজার টাকা রোজগার; তা-ও সংসার চালাতে হিমসিম! মেয়ের বিয়ে দিতে আমার কাছেই ত' হাত পাতে! আত্মীয়-স্বজন আসছে তখনলেই রক্ত জল! বাড়ী করেছে ধার করে;—তবুও টাকালো দিতে পারেন না! বাবু? হ—বাবু হ'লি আমি। বাট বছর বয়স; এখনও কীত পড়েনি; মাথা ভরা চুল আছে। দশটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি; আত্মীয়-স্বজনের ফেলিপিলেদের খাইয়ে-পারিয়ে-পড়িয়ে মামুষ করেছি; কখনও ফেবাই নি কাউকে; লোল দুর্গোৎসব করি আজও; মরে গেলে যে টাকা রেখে যাবো তাতে দুশো বছর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না এ-বংশে কাকুর!

বুড়োর বাক্য শুনে মজেল বুড়বাক! বুঝতে পারে এ বুড়ো শুধু বাবু নয়; শুধু বাড়ীরই নয়, পাঁচ দশটা গাঁয়ের মাথা কর্তাবাবু। মারা যাবে সেদিন সেদিন বহু বাড়ীতে খাওয়া হবে না; রাত্তি জলবে না হারিকেন। কীদবে আশপাশের পাঁচ দশ গাঁ। কীদবে তারা সেদিন সন্তা সন্তি! সন্তি সন্তি অনাথ হবে সেদিন। পিতৃবিয়োগ হবে সব কটা গাঁয়ের।

সেই কর্তাবাবুর বদলে আজ Dad-এদের দিন এসেছে। বৈতে থাকতেই তাই Dadদের নাকের ওপরেই পোলাপানের ড্যা ড্যা ড্যা। ডা ড্যা ড্যা। ডা ড্যা ড্যা।

মনে করবেন না তখন দিনকাল সম্ভা ছিলো বসেই কর্তাবাবুর এত সব পারতেন। আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মালে সেই সম্ভার দিনেও তাদের তিন অবস্থা হতো। মনে করবেন না বিভাসাগর সেকালে জন্মেছিলেন বসেই বিভাসাগর হয়েছিলেন। একাঙ্গেও জন্মালে তিনি অবগুণ্ডাবী বিভাসাগরই হতেন। এবং ওই বড়বাজার থেকেই বেকতো এয়ুগের বিভাসাগরও। সেদিনকার বাংলা দেশে রঙ্গ ছিলো কিন্তু সিনেমা রেডিও মাইক ছিলো না। তাই দোল দুর্গোৎসবে পাড়ার লোকের কাল ভাজতে হতো না।

এদেশের কথা বললে এদেশে কাকুর কাশে বায় না তাই মার্কিন দেশের কথাই বলি। আজকের বিলেত দেশটা সত্যিই মাটির, সোনা রূপার নয়; কিন্তু মার্কিন দেশটা মাটির নয়; ডলারের। সেইখান-কার এক কারখানার প্রমিক জিওয়েস করছে তার বাবাকে: আজ্ঞা বাবা, তোমাদের পেনসন পাবার পরেও এত টাকা হাতে থাকতো কী করে বলোত? অসীতিগর বৃদ্ধ বললো জবাবে আমাদের সময়ে যে তাদের মতো মাইনে থেকে হেল্প, ইনসিওরেন্স, আন-এমপ্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্স বাবর এক পরগাও কাটা যেতো না রে!

কথাটা বাঁটি। সেদিন যে একজনের সঙ্গে অনেক প্রতিপালিত হতো আর আজ যে অনেকের সঙ্গে অতিরিক্ত একজনেরও প্রতিপালিত হওয়াটা দুষ্টিকট হয়ে পড়িয়েছে। তার মোক্ষ কারণটা সম্ভা দামের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না; পাওয়া যাবে মনোবৃত্তির মধ্যে। মনোবৃত্তিটাই সেদিন দামী ছিলো। অল্প নিজের নয় শুধু; অস্ত্রেরও তাতে উদয় পূর্ণ করতে পারলে খুশী হতেন কর্তাবাবুরা। অল্পপূর্ণী তাতেই তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকতেন, শাক ভাত সকলের সঙ্গে ভাগ করে খেলে তখন আর তা শাকার থাকে না; তখন তাই হয়ে ওঠে পরমার! দেবভোগ্য। প্রসাদ!

আজকে সব চেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির স্লোগান। বললে বহু লোকের পেতন হবে না এবং আরও বহু লোকের উদ্ভা হবে কিন্তু আমাদের নিকৃপায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর বই লেখা হতে পারে, রাজনৈতিক বক্তৃতাও, কিন্তু গ্রীক রোমান সভ্যতা যতটুকু বৈতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধ এই তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতা। ভারতীয় সভ্যতার বদলে জহরলালের ভারতবর্ষে যার পত্তন হচ্ছে তাকে বিশ্ব না ভারতীয় সভ্যতা বলব জানি না, তবে এটুকু জানি আমরা যে বলি বহু সভ্যতার উপান পত্তনের পরেও ভারতীয় সভ্যতা যার সকলকে গ্রাস করেছে কিন্তু নিজের সভা বিসর্জন দেয় নি,—একথা কবির কল্পনা মাত্র, তার চেয়ে বেশি নয়। হৃদয় স্তরে আমাদের কোনও সর্বভারতীয় সহিত্তি নেই; স্থল ক্ষেত্রে আমাদের সর্বভারতীয় কোনও ভাষা শৌবাংক খাও কিছুই নেই। রাজকাপুর ঠিকই বলেছে, ছুতা ছায় জাপানী। হিন্দী এখনও যে অবস্থায় রয়েছে তাতে তা বনমাতৃষের ভাষা হলও তা কোনও মামুষের ভাষা হবার এখনও সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সনাতন ভারতবর্ষের বাণী ছিলো নাকি অহিংসার বাণী। আজকের ভারতবর্ষের বাণীও অহিংসার। সনাতন ভারতবর্ষে সে বাণীর পেছনে অর্থ ছিলো; আজকের ভারতবর্ষে সে বাণী নেহাউই অর্থহীন। শক্তিমামনেরই অহিংস হওয়া মানায়, তাই অশোকে



সর্বরূচি সম্মাত  
সুন্দর আলোকায়  
একমাত্র  
জিবি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকারক

জুয়েলার্স  
**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স**  
১৬৭ নি. বহুবাজার রোড কলিকাতা-১১

অহিসাস অৰ্ধ ছিলো কিছু। আজকের এটম বোম্বার যুগে ভারতবর্ষের অহিসাস বৃষ্টি, ভিত্তারী কামিনী-কাঞ্চন ভ্যালের মতোই। আমরা আজকে হিংস্র হলেও বতুটুকু এসে যায়, অহিসা থাকলেও ততটুকুই এসে যায় ম্যারিকারস্তার।

ভারতীয়ানা নব্বন্ধে ভাবি না কিন্তু বা সত্যিই ছিলো, বা এখনও আছে কিন্তু আর থাকছে না তা'হলো বাঙালীয়া। বড়লোকের নীচের ভলার এক মধ্যবিত্তের সকলেরই বাংলা দেশ যে বন্ধ হারাতে বসেছে তা হচ্ছে এই বাঙালীয়া। এইটুকুই ছিলো, এইটুকুই আছে; এবং এইটুকু গেলেই বাঙালী বাবে। বাঙালীর যেদিন সত্যি সত্যি অৰ্ধ ছিলো সেদিনও তার কাছে অৰ্ধ পরমার্থ ছিলো না। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ করতেও সে পেছপাও হয়নি ভারতীর সাধ্য-সাধনায়। বাঙালীর কবির জীবনেই: বাঁধা প'ল এক মালা বাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী?

বিশ্বক্রেমে বেসামাল আজকে আমরা প্রথমে মাহুৰ; তারপর ভারতীয়; এবং সর্বশেষে বাঙালী। সাধারণ সময়ে এতে ভয়ের ছিলো না কিছু। আজ সঙ্কটের মুহুর্তে আমাদের আবার প্রথমে বাঙালী হওয়াই দরকার। সেদিন বাঙালীর এই বিশেষ বোধই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালাকে রত্নগর্ভা করেছিলো। কিন্তু শুধু রামমোহন, বিভাসাগর, বিবেকানন্দ, আত্মতাবের কথা ভেবে বলছি না; সেদিনকার বাঙাল দেশে অশিক্ষিত শুভা জ্ঞেয়ী বাঙালীর মধ্যেও বাঙালীয়া মরে নি। এখন তাহলে সেই গল্পই বলি।

শ্রীরামপুর থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে বোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেন এক বাঙালী ভললোক। সহযাত্রীরা সবাই খাঁটি সাহেব। কালা-আলমীকে এক গাড়ীতে ভানের ভারি অপছন্দ। গালমন্দ ত করেই, গায়ে পা তুলে দেয়; ভর দেখায়। শেখকাল না গেলে একদিন ঝড়জলার বিখ্যাত বেরাকুৰ শুটার মরণ নেন। বেরাকুবের রেট বাঁধা; একবারে খুন করে বেলাতে হাজার টাকা; সাম্ভাতিক জন্মে পাঁচশো কল্প উত্তম-মধ্যমে একশো; শুধু একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে পঞ্চাশ; ভললোক পঞ্চাশ টাকা আর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের দাম দিয়ে বেরাকুবের সঙ্গে ব্যবস্থা পাঁকা করেন।

পরের দিন; ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, বেরাকুবের দেখা নেই। ট্রেন দৌড়তে আরম্ভ করতই বেরাকুব ঢুকলো দরজা ঠেলে সেকেণ্ড ক্লাসে। একটু বাসেই সাহেবরা সেই আরম্ভ করলো গালাগাল; ছাই ফেলো; ভর দেখানো; নিত্যকৰ্পপদ্ধতি। বেরাকুব ইজিতে বাঙালী ভললোকটিকে বললেন পা তুলে দিতে সাহেবের গায়ের ওপর। কিন্তু হাজার হলেও বাঙালী বড়বানু। সেদিনকার স্ত্রী অস্ত্র না বাওয়া হলেও বাক্ষর গোয়ার গায়ে কুক্কাদ তুলে নেন কী করে। বড়লোক অসেক ইজিভের পর চোখ বুঁজে সেই ভললোক তুলে ফেলেন পা সাহেবের বুকে।

ভোলা মায় সাতেবদের গর্জন: What? Stupid Bengalees?—How dare you? সাহেবের কথা শেষ হবার গায়েই বেরাকুবের কাজ শেষ! কোলুই-এর বিখ্যাত upper cut-এ কয়েক কাত। সাহেব কাতরার বত বেরাকুব তত গরজার: What? Bengalees? Plural gender?—অর্থাৎ তুমি কেন বাঙালীকে ঐশিড কালতে পারো? কিন্তু Bengalees বললে কী?

বেরাকুবের মূখে plural gender শুনে বারা হাসবে তাদের

কালো কাশে বলা দরকার একটা কথা; সেকথা আর কিছুই নয়; সামান্য কথা! সে হচ্ছে এই যে অশিক্ষিত বর্ষর বেরাকুবের ইংরেজি জ্ঞান ছিলো না একথা ঠিক কিন্তু Gender Sense ঠিকই ছিলো! আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের আল হরত ইংরেজি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের সমস্ত জাতিটারই Gender Sense বৈঠক হয়ে গেছে কখন।

## সতের

আজকের বাঙালী ছেলে মেয়েদের বার্ষিক এবং মহাভারত পাঠ করে যদি শোনাতোও বা পারেন তবুও তাতে লাভ হবে না কিছু। লাভ হবে না কারণ বার্ষিক থেকে তারা যেটুকু বুঝেছে তা হলো পরস্পরী হরণেই পুরুষকায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয়; মহাভারত থেকে তারা পেয়েছে সারমর্ম এই যে এক ছুঁচ ভমিও বিনামূল্যে বা মামলার বত জাহ্য পাণ্ডনালারই হক তাকে দেওয়া মরদের কাজ নয়। এই বাঙালীই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু এইটুকুই নিয়েছে যে ম্যাটিক পাশ করবার কোনও দরকার নেই। মধুসূদনের জীবন থেকে জানবার মধ্যে জেনেছে যে কবিতা লেখা মতশান ছাড়া অসম্ভব। এই বাঙালী বুঝ-বুঝতাদেরই ধারণা উজ্জ্বলতা শিল্পী-জীবনের জন্তে বৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য!

জলতরঙ্গে টলোমলো উটরাম বুকের বারান্দায় বসে এই সব কথাই সেদিন বিশ্লেষ করে মনে পড়িয়ে ছিলো একজন। সে এক জনকে আজকে হঠাৎ দেখলে হয়ত চিনতে পারবে না অনেকেই। আজকের তরুণ-তরুণী বারা সিনেমা বলতে পাগল তাদের মধ্যে প্রায় কেউই তাকে চোখে দেখেনি; নাম শুনেছে মাত্র। কিন্তু পনেরো বছর আগেও আরাধনা সেনের নামে টিকিট ঘরের সারের ভেঙ্গে পড়তো মাহুৰ। শুধু তার নামটুকু গোষ্ঠীর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁজে কিবা সিনেমা হাউসে এ্যাডভান্স বিক্রি হয়ে যেতো। সাতদিনের সব টিকিট। আজকের দিনের যে ফিল্মে নামে তারই Star হবার মতো নয়; সত্যিকায়ের Star ছিলো আরাধনা সেদিন। বন্ধ অফিসে বার একবার নামে টাকা আসে সেই যে একমাত্র Star নামের বোগ্য একখাটাও হয়ত আজ অনেকেই অজানা। আরাধনা সেন ছিলো সেদিন box-office।

সেই আরাধনাকে দীর্ঘ দিন বাদে উটরাম বুকেতে হঠাৎ দেখে চট করে আশ্মিও চিনতে পারিনি। চেনবার কথাও নয়। চোখে পগলার; মুখে সজা মদের গন্ধ; ঠোঁটে সিগারেট; বেশাব বর্ণনার অল্পমুহুর্ত। অনবল্লভ অসম্ভব প্রলাপ তুখোড় ইংরেজিতে। টেলিফোন করল বুকে থেকে; বাসকে ডাকলো তাকে টেলিফোনে ডাকা দূরের কথা তার দেখা পাবার মত লোক ভারতবর্ষে বেশি নেই। ডেকে অল্পরাগ-অল্পবোগ মিঞ্জিত সুরে বা বললো তা'হলো তাকে হোটেল থেকে বার করে দিয়েছে। একটু বাসেই আরাধনা যেমন এসেছিলো তেমন চলে গেলো। পা টলছে; শাড়ী খুলে খুলে পড়ছে। সিগারেট নিবছে। জলছে।

মনে পড়ে গেলো হুড়ি বছর আগের কথা। আরাধনা তখনও বাস; সেন হলো সেই সময়েই প্রায়। নিরু সেনের সঙ্গে বিয়ে হলো বন্দন তার তখন তার দেহে লাক্ষ্য টলহল করতো; খুসী হলাহল করতো হাট বড় বড় চোখে। যে

আসরে বহু জীড়ের মধ্যে গিয়েই বসতো মনে হতো এক বুটো আলো পড়ে আছে তার শরীরের চার দিকে। অল অল করে উঠতো সবটুকু আয়রণ। ঝলমল করে উঠত আশ-পাশ।

কোনও কোনও লোক যেমন গলায় শূন্য নিয়েই জন্মায়, কেউ কেউ কলমে নিয়ে কবি, তেমনি শরীরে সর্পিণ গতি নিয়ে হু'পায়ে নিয়ে নৃত্যের ভাল আরাধনা এসেছিলো পৃথিবীতে। ছোট মেয়ে বখন এই এতটুকু তখন থেকেই মনে হত মেয়েটা হাঁটে না, নাচতে নাচতে চলে। যৌবনে মনে হত সেই মেয়েকে বেন হু'হাতে সে তার ভরা যৌবনের হৃদয় সৌরভ হু'পাশে ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। জ্বলনও সেই সৌরভ সৌরভই ছিলো; সে সৌরভ সঞ্জীবিত করত রাস্তাবকে; মাতাল করত না।

দশ বছর বয়সে বাড়ীর ঘরোয়া এক আয়োজনে নটীর পূজার নাচলো সেই পরমাপ্রসন্ন মেয়েটি। সকলের বিচ্ছারিত দৃষ্টি সামনে উৎসাহিত হলো সেই চিরন্তন সত্য; সকলেই শিল্পী নয়; মাত্র কেউ কেউ শিল্পী। আরাধনা অবশ্য এ সব কিছুই বুঝলো না। সে নেচে গেলো তার ছুটি পায়ে স্তরের ফুল ফুটিয়ে। কিন্তু সেই বৃষ্টি কাল হলো তার। পুরুষ নষ্ট হয় অর্ধে; নারী খ্যাতিতে। আরাধনা অবশ্য তখন এতো বাচ্চা যে হাততালি তার ভালো লাগলেও হাততালি শুনে নষ্ট হবার বয়স তার নয়। কিন্তু তার খ্যাতি-অচেতন কিশোর মনে সেইদিনই বাইরের পৃথিবীর ডাক এনেছিলো কিনা পলাতকা পদপতন ফেলে কে বলবে সেকথা আজ।

আরাধনা নাচের পৃথিবীতে পেলো নতুন জন্ম। নিজের মধ্যে যে নতুন মহাদেশ সে আবিষ্কার করলো সেইখানেই হারিয়ে গেলো সে। নাচতে গেলে সে আর কিছু চায় না। তবলার বোল হ'ত বহু শব্দ আরাধনার পায়ে পড়ে সে কুটতো তেমনি অনায়াসে যেমন অনায়াসে গাছের ডালে ফুল ফোটে। যুগ্ম হোক বহু আয়াসসাধ্য আরাধনার আজুলে ছিলো তার অবজ্ঞাস্যবী মুক্তি ভগীরথের ডাকে শিবের জটা থেকে যেমন জাহ্নবীর। সেদিন আরাধনাকে দেখে সকলের একথাই মনে হতো যে এ-মেয়ের সৌন্দর্য্য বিবাহ দিতে হলেও কার অসৌন্দর্য্য আশীর্বাদে যেন এর জন্মমুহূর্তেই গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে নাচের তালের সঙ্গে। জীবন মহাদেশের নৃত্য এ মেয়ে তখনই শুনেতে পেরেছে কাণে।

কিন্তু সেদিন বাকে আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিলো আজ যে আবার তাকেই অভিলাপ বলে মনে হয় এ ধীর রহস্ত তাঁর সব কিছুই জানে আমরা মনগড়া তৈরী করে নিই কিন্তু নিজের হাতে তিনি সেই 'গড়া'কে ভাজেন; ভেঙ্গে আবার গড়েন; এবং সে ভাঙা-গড়ার আদি-অন্ত কিছুই নয় আমাদের অবিগত। সেরহস্ত তাই রহস্তই থাকে; দেখা এখন কালতে বাচ্চিলাস তা হচ্ছে আরাধনার নাচে তার বাড়ীর লোকেরা বহুই বাহবা নিক উৎসাহ ভূমিকায় তাকে দেখার

কথা সেদিন কাকুর উদয়ভঙ্গ করলোও হিলো না। শুধু আরাধনার মা'র ছাড়া। আরাধনার মা'ই শুধু মেয়েকে নিয়ে সেই বকে মাতবাব হয়ে রক্তীন ছিলেন সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হবার অনেক আগেই ঘর ভাঙে জ্বালাকের। সেও কিন্তু অনেক গয়ের কথা। আরাধনার বিয়ে হয়ে গেলো নিম্ন সেনের সঙ্গে বখারীতি। নিম্ন সেন বিলোভ গেলো। ফিরে এলো পঙ্ক শরীর নিয়ে। দেশে ফিরে দেখা হলো নরেন ঘোষের সঙ্গে। নরেন ঘোষ দিলো নাচের দল খোলায় পরামর্শ। নিম্ন সেন আঁকড়ে ধরলো সেই পরামর্শ ভেঙ্গে বাওয়া লোক যেমন করে খড়ের ডগা আঁকড়ে ধরে তেমন করে নয়; আঁকড়ে ধরলো মানুষ যেমন করে আঁকড়ে ধরে ধর বাঁধা।

দল তৈরী হলো; নাম হলো 'নব-বুদ্ধাবন'। আইমা তোনা হলো এই নাচের দলের আরাধনা। শনির মত এসে ছুটলো বাজারে নীলধর্ম্মর। সেই বোঝালো সবাইকে বিশেষ করে আরাধনাকে যে শিল্পীর ক্ষমতা নয় সামাজিক বিধিনিষেধ। তার বিচার হবে না সাধারণ মানুষের মত মোটেই। তার বিচার সে কেমন শিল্পী তারই নিষ্ঠিতে। অতএব? অতএব নব-বুদ্ধাবনে ঢলে পড়তে লাগলো এ ভর গারে। শিল্প-অচেতনের নয়; অচেতনের লীলার নরক ভলজার হলো। আরাধনার মুখে উঠলো মদের গলাস। পা পড়তে লাগলো বতী নয় নাচের তালে ততটা সোমরসের আধিক্য। চোখ বুঁজে বসে রইল নিম্ন সেন—সিঁথিরের স্বপ্ন দেখছিলো সে।


মগাঁদার সাহিত্যিক রূপেরা লিখেছিলেন মাদাম বোভারী। সেই বই বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক পর্যায়ের; তবুও মাদাম বোভারী পড়তে-পড়তে কিছুতেই না মনে করে উপায় নেই 'বে এর বহু অংশই কল্পিত। মাদাম বোভারীর জীবনের অনেক পরিচ্ছেদই তার প্রচীর অদেখা। এবং একথাও ঠিক যে, এই জীবনের অল একটুখানি দেখা এবং অনেকটাই অদেখা বলেই রক্ষে। তাইতেই

ফোন : ৩৪-৪১০২

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** হুজুর রুমলী  
মাসিকার ১ মনসিণী

১০২ . এ ২ বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



জাঞ্চ :—২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩  
(বাজা রোডের স্ট্রীট ৩ বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)



জীবনের সামান্য সত্য এবং অসামান্য কল্পনা একত্র করে রচনা করতে পেরেছিলেন উপজ্ঞাস-শৈলীর চরম পরাকাষ্ঠা মাদাম বোভারী। বাস্তব সত্যের সঙ্গে নিজের মনের মাদুরী যেশাচ্ছে শেরেহিলেন বলেই মাদাম বোভারী পড়া যায়। নাহলে মাদাম বোভারী উপজ্ঞাস যদি মাদাম বোভারীর জীবনের বথার্ঘ্য প্রতিলিপি হতো তাহলে মাদাম বোভারী, পড়ে কাকুর কাকুর অলীলই মনে হতো যে তা নয়; অনেক বেশি লোকের মনে হতো যে মাদাম বোভারী অবিখ্যাত। কারণ জীবন শুধু উপজ্ঞাসের চেয়ে যে অলৌকিক মাত্র, তা নয়; কাঁচা জীবন পাকা উপজ্ঞাসের চেয়ে অনেক অনেক, অনেক বেশি Shockingও বটে।

‘নব-বুদ্ধানন’ বলে সেই নাচের দলে প্রধান নর্তকী হয়ে নেমে আরাধনার জীবনে যে পতনের প্রারম্ভ তার ছবি এখানে তুলে ধরলে একটি অধঃপতনের ইতিহাসের পাঠা নিজের হাতে ওষ্ঠাতে ওষ্ঠাতে অত ও প্রত্যাহর অনেক পাঠকই অত ও প্রত্যাহর লেখককে কমা করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়; অত ও প্রত্যাহর কাকুর কোন্ গোরে অত কাঙালী লেখকদের মতো জনপ্রিয় হবার চেষ্টা না করে বরং যাতে কৃতার্থ হবো তা হচ্ছে আরাধনার জীবনের সেই অলিখিত পরিচ্ছেদ কল্পনার পাঠ করেই যদি জীবনের ট্রাজেডী দেখে অত হু’একজনকেও শিউরে উঠতে দেখি। কুসংস্কৃত অসুখ কত কুসংস্কৃত তার কালো প্রচুরমূলক ছায়াচিহ্নরূপে আমার আপত্তি। সেই সব ছবি দেখে বত লোক বারবনিতাগৃহে বাওয়া বন্ধ করে তার ঘরেও অনেক বেশি লোক এই মনে করে আশ্বাস পায় যে এ অসুখও এমন কিছু দুরারোগ্য নয়; এ অসুখও সারানো যায়। তারা মনে করে অসুখ গোপন করাতেই বা কিছু ক্ষতি; এই সব জ্বীলোকের কাছে লৈকহ মুখের আশায় বাওয়া তেমন মারাত্মক নয় বরূি।

অত এই আরাধনাই কি না পারতো? কি না পেতো জীবনে? শুধু দেশে নয়; পৃথিবীর যে কোন নৃত্যমঞ্চের সে হতে পারতো প্রাইমা ডোনা! সাহিত্য-প্রিয় বিজ্ঞান-বর্ধ সমাজনেতৃত্বে যে সব বাঙালী বিশ্ববর্ধীয় হয়েছে তাদের কাকুর চেয়ে নিজের ক্ষেত্রে আরাধনার কম সম্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু সম্ভাবনা শুধু সম্ভাবনাই হইলো। হু’ডি ফুল হয়ে ফুটে ফুটে বড়িয়ে গেলো। শুধু যে সম্ভাবনার কথা সেদিন মনেও আনেনি কেউ সেই চরম অধঃপতনের সম্ভাবনা আরাধনার জীবনে সত্য হয়ে রইলো। আরাধনা সেন,— দীপালী ব্যাকহেড কি ইন্সটিটুট ডানকানের সঙ্গে সমান কি না জানিনা; কিন্তু আরাধনা নিজেই যদি আজও নিজের জীবনী লেখে ইন্সটিটুটের আত্মজীবনীতে চরে তা কম উত্তেজক হবে না। শুধু উত্তেজক নয়; কম বিরোগাণ্ডও হবে কি? এক পাঠকরা সে জীবনী পড়ে শুধু শিউরে উঠতো; কিন্তু আরাধনা নিজে পড়লে কোনদিন তার নিজের জীবনী পাগল হয়ে যেতো; আর না হয় করতো আত্মহত্যা। এখন যেমন করছে তেমন তিলে তিলে নর; হঠাৎ স্বনিকা পতন ঘটতো। অনেকবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার দৃশ্যমুখে বেদন করছে সে: জীবনের রঙ্গমঞ্চও, তেমনই করতো কাকুর ককশ পুনরাবৃত্তি। হয়তো; হয়তো নয়।

অথবা এই লেখাটুকুও যদি আরাধনার হাতে গিরে পড়ে তাহলে আরাধনা নিশ্চয়ই চমকে উঠবে; চমকায় করে উঠবে। নিজের কাছে থেকে পালিয়ে মিথোই বাজেট চাইবে সে। যেমন চেয়েছিলো

নাকি, কল্পনা করতে পারি আজ, Picture of Dorian Grey পড়ে তার শ্রী অঙ্কায় ওহাইলুড।

আরাধনার যে জীবনের কথা বলতে গিরে বললাম না, সেই না-বলা-জীবন এই কথাই বলতে চেয়েছে বার বার যে হাততালি, এনকোর, লাইম লাইট, ফ্যান-মেস সবই সত্য। কিন্তু শিল্পীর জীবনে সব চেয়ে বড় সত্য তুচ্ছ। সেই তুচ্ছ মাত্র হু’একজনকেই মেটে; বাকী সকলেরই অপমৃত্যু হয় মরীচিকার পেছনে ছুটে। ফুল হয়ে ফুটে ওঠায় মুক্তির বত আনন্দ, নদী হয়ে মরীচিকায় মুখ বুজে মরে বাওয়ার সম্ভাবনা কি তার চেয়ে এতটুকু কম বেদনার?

## আঠার

সব মার্কেই দূর থেকে সবুজ দেখায়; বহুদূর থেকে মরীচিকাকে মনে হয় তৃষ্ণার মুক্তি; আর টলিউডকে একেবারে কাছ থেকেও মনে হয় স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গের ভেতরে ঢুকলে তখন আর স্বর্গ মনে হয় না; মনে হয় বিসর্গ। একটি নয় দুটি শৃঙ্গি; ইহলোকেও শৃঙ্গি; পরলোকেও শৃঙ্গি। টলিউডের বাইরে থেকে মনে হয় বৃষি টলিউডে যায় কাজ করে তাদের জীবন টালিগঞ্জের ট্রিঙেতে তোলা ছবির মতই স্থল্লর; সাজানো; সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্সে স্বচ্ছন্দ। তারা বাইরে থেকে জানে বলেই এইভাবে জানে; ভেতরে ঢুক চোখ খোলা রাখলে তারাও দেখতে পেতো এখানেও পৃথিবীর সকল প্রান্তের মত, জীবনের আর-আর ক্ষেত্রে যেমন এখানেও তেমনি অতি সামান্যস্থায়ক লোকেরই ট্রিঙেবোকার; আর বাকী অসংখ্য লোক প্রায়ই বোকার।

কাব্য পড়ে কবিকে যেমন মনে হয় কবি নাকি তেমন নয়। কোনও কোনও কবি তেমন নয়; কোনও কোনও কবি অবিকৃত তেমনই। লেখকা নয়; কিসের কাগজে এই সব লোকদের সঙ্গে কাগজগোলাই ইটায়ত্না পড়ে ফিল্মবাজের নরনারীদের যেমন মনে হয় তারা কিছ সত্যি তেমন নয়। একজনও নয়। টলিউডে প্রবেশ করে চরিত্র খারাপ হবার কথা বলে যারা তারা চরিত্র কি তাও বোঝে না, চরিত্র খারাপ হওয়া বলতে গিরে কি বোঝায় তাও বোঝে না জ্বীলোকের সঙ্গে পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধের বাইরে দৈহিক মিলনো মাত্র চরিত্রের অধঃপতন নয়, চরিত্র এর চেয়েও অনেক বড় জিনিষ একথা থেকে অবগত একথা কেউ বেন মনে না করেন যে অবাধ দো উপভোগে বৃষি চরিত্র বজায় থাকে। না থাকে না। কিন্তু এছাড়া এর বাইরেও চরিত্র রক্ষার গুরুতর পারিষ আছে মাহুদের।

সে দায় মহুদের দায়। জীবনে কোনও রকম দেহবিলাস ন করয়েও মাহুদ চরিত্রহীন হতে পারে; অনায়াসে পারে। যে স্বর্গ সর্ব্ব; যে খ্যাতি-সর্ব্ব; যে আশ্রয়-সর্ব্ব আর যে স্বাধ-সর্ব্ব সেও চরিত্রহীন। বারো খ্যাতিমান, স্বর্গবান তাদের থেকে অনেক অখ্যাতি-অবজ্ঞাত লোকের মধ্যেই চরিত্রের বিকাশ দেখেছি আমি চরিত্র মানে হচ্ছে গোটা মাহুদ। মাহুদ একটা কোনও দি বড় হতে গিরে জীবনের আর সব দিকে এত ছোট হয়ে যায় যে আমাদের দেশের জীবনীতে তা লেখা যায় না বলেই বাংলা ভাষা কোন ‘জীবন-চরিত্র’ আজও লেখা হয় না; বা লেখা হয় তা সব চরিত্রাহীন। সেই সব চরিত্রাহীন চরিত্রের অব্যত পরিবেশনে পরিবর্তে সুতর চরিত্রচিত্রণ করেই কৃতার্থ।



কিন্দ-পত্রিকার ছাপা ইন্টারভিউ পড়ে কিন্ড-ষ্টার অথবা পরিচালক ৫ চার বার। তারা জানে না যে চরিত্র খারাপ হবার সুযোগই তারা পাবে না কোনও দিন। কাজেই সে ভয় নয়; ভয় হচ্ছে চরিত্র হারাবার নয়; চাকরী হারাবার। টলিউডে পার্মানেন্ট হয় না কেউ। বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের চাকরীর মতো এখানে সবাই পার্মানেন্টলি টেম্পারারী। শুধু কিন্ড-ষ্টার কি কর্মী নয়, বার। ছবির প্রযোজক তারা আজ বসে আছে টাকার ওপর; কাল 'হুগার' ওপর; পরন্তু রাস্তার ওপর। এই হলো এলাইনের আজ-কাল-পরন্তু গল্প। যে কোনও ব্যবসায় লোকসান হলেও ব্যবসা উঠে যেতে যেতেও সময় লাগে। এখানে একখানার পর আরেকখানা ছবি না লাগলেই সারা জীবন জলছবি; সমস্ত জীবনটাই কেঁদে কুল না পাওয়ার চোখের জলের ছবি।

ভয়বশ থেকে এসে পরিচালকের ফোর্স এসিষ্টেন্ট হবার হুঁড়োগ্যে যখন বিশেষ পল্লীর মেয়েদের ডাকতে হবে ম্যাদ্যাম বলে তখন নিজেকে মনে হবে ডাম-ফুল। আর মনে হবে নিজের মায়ের কথা। নিজের কথা মনে করেই তার মনে হবে যে তার মা যাকে গর্ভে ধরেছিলেন, সে মাছুষ নয়; গর্ভপ্রাব।

কিন্দ-পত্রিকার এই সব হুঁড়ি-বুড়ি মিথ্যে না পড়ে এখন একটি সত্যিকারের ইন্টারভিউ পড়ুন। এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে আপনারাও সকলের না হলেও হু-একজনের চোখ খুলে গেলো আমি হুদী। বার কথা বলতে বাচ্ছি সে হলো বিগত যুগের প্রথম হু-তিনজনের মধ্যে নাম করা যায় এমন একজন অভিনেত্রী। সেই অভিনেত্রীটি তখন একটি ষ্টুডিওতে পুরো দমে স্যুটিং করছে রোল। কিছু রোলই স্যুটিং করতে করতেই বেই শুনে পাকছে ষ্টুডিওর সেট একটি মোটর গাড়ীর হর্ণ, সেই বাধা যেমন ত্রিকুণের বাঁশী শুনে আকুল হয়ে ছুটতেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম বন্ধ রেখে সেই গাড়ীতে করে উঠাও হচ্ছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কিছু কালটা পুরাণের কাল নয়, বাধা চলে গেলোও সংসার চলতো কিন্তু অভিনেত্রী চলে গেলে স্যুটিং চলে না; ষ্টুডিওর জোর হচ্ছে ট্যান্ডার মিটার; প্রতি যুহুর্ন্তে তার ভাড়া উঠছে। হু-তিন দিন হতে সবাই নড়ে চড়ে বসলো।

পরিচালকগোষ্ঠীর অন্ততম একটি স্বপ্নদর্শী যুবক যে বাধা দিতে পারতো তাকেও কটাক্ষে ঘাবেল করেছিলো অভিনেত্রীটি। পুরো না পারলেও আশ্রয় করে ফেলেছিলো বলে অন্তরের ধারণা। সেই ধারণা থেকে আর নিষ্ক্রিয়তার দরুণ আজাদো হাসি ঠাটা তামাসা পাগল করে তুললো সেই অন্ততম পরিচালককে। কলে একদিন তাকে বাধা দিলে বাধবে লড়াই জেনেও বৃহৎকোড় অবতীর্ণ হতে হলো। অভিনেত্রীটিকে আইনের ভয় দেখালে সে হেসে উড়িয়ে দিলো; বলল: উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি আমি; কোন আর্টিষ্টকেই কট-টি ধাক্কা দেও কেউ বাধ্য করতে পারে না তার ইচ্ছে বিরুদ্ধে কাজ করতে। পরিচালক বললো: জোর করে আটকে রাখবে সে। অভিনেত্রী বললো, গায়ের জোর দেখাতে গেলে জুতো খাবে পরিচালক; এবং আরোও বা বললো তা বিশেষ পল্লীর মেয়েবাও প্রকৃতি উচ্চারণ করতে ভয় পায়। বলে চলে গেলো অভিনেত্রী কুলমারী।

কর্ণধারের কাণে উঠলো কথাটা; কাণ ধরে সবাইকে ডেকে আনলেন তিনি। অভিনেত্রীটি বিলকুল অস্বীকার করলো সব। পরিচালক যদিও নেপথ্যে প্রচুর তর্জন-গর্জন করেছিলেন, সামনে এসে কিছু স্পিকারি নট। অভিনেত্রীটির মৌচের কোণে সবে মাত্র হাসির রেখা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে কি না করেছে, এমন সময় পরিচালকের সহকারী একজন বলেন: হেসে রেহাই নেই; হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে পারি আমি। ক্লেশ ওঠে অভিনেত্রীটি: কী পারেন আপনি? পারেন ত' ভাবুন। বটে?—সহকারী পরিচালক সবাইকে নিয়ে প্রোজেকশান রুম গিয়ে চালিয়ে দেয় সাউণ্ড কিন্ড; প্রত্যেকটি কথা, মায় বিশেষ পল্লীর সেই ইতিহাসিক পৃষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব হয় পর্দায়। সকলের অজান্তে সেদিনকার সেই অভিনেত্রী-পরিচালকের সবটুকু সালাপ রেকর্ড করে রেখেছিলেন সহকারী পরিচালক। মাথা নীচু হয়ে আসে অভিনেত্রীর। আর পরিচালক এতক্ষণে উঠে ঠাড়ায় সোজা হয়ে। প্রসঙ্গত আবার উল্লেখযোগ্য টলিউডে পরিচালক পায় বেশ হাজার টাকা ছবির জন্যে; আর সহকারীর মাইনে মাসে দেড়শো টাকা। মুচিয়ায় গুড়ের দেশে কপালই আসল; কাজ নয়।

এই ইন্টারভিউতেও ভুতের ভয় না গেলে আরও কড়া ডোজ দিচ্ছি। এ ঘটনাটি সাম্প্রতিকতম। এক ভয়লোক আর তার কিন্ড-ষ্টার জী আর তাদের একমাত্র মেয়েকে নিয়েই এই হু-বুটনা। ভয়লোক এবং জীলোকদের অগ্ন্য এক নাইট ক্লাবে মাকে অস্ত্র লোকের কঠিনতা অবস্থায় মাতাল হতে দেখে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়; ভয়লোক জীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠে ঠাঁট দিতে দেয় করেন। জী দরজা খুলে আবার লাকিয়ে পড়েন সেই অস্ত্র লোকটির বুকের ওপর। পরের দিন মেয়েটি লোকের জলে যায় আত্মহত্যা করতে। মরতে পারে না; ফিরে আসে বাপ-মায়ের যুগল পাণের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন ধরে।

হুঁচার জন স্বামী অথবা জী মরে বেঁচে গেছে। টলিউডে প্রচুর স্বামি-জী বেঁচে মরে আছে। কিন্তু এসব কথা কাকে বলছি; মাছুষই উপদেশের যশি-যুক্ত খোজে। নীতিপুস্তক বললে Not to cast pearls before swines।—বলছে না?

[ ক্রমশ: ]

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের ঘাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জ্ঞান প্রতীলাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যার্লস ব্রাশন্যাল কিংস সেক্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১



জাতাব্য বশত গত বারে অলিম্পিকের সীতারের ফলাফল দেখা সম্ভব হয়নি; তাই এইবারে সংক্ষেপে দিয়ে আগামী চার বছরের মত অলিম্পিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থেকে বহনিকা টেনে দেব।

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সীতারে অস্ট্রেলিয়ার হেলেনে এবং মেয়েদের সাক্ষাৎই সর্বাপেক্ষা বেশী। পুরানো অলিম্পিক রেকর্ড স্থান করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

পুরুষ—১ম—জন হেনরিক (অস্ট্রেলিয়া) ৫৫'৪ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—জে, ডেভিড (অস্ট্রেলিয়া) ৫৫'৮ সেকেন্ড। ৩য়—জি, চ্যাপম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ৫৬'৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—আর পাটারসন (আমেরিকা) ৬৩'—ডব্লিউ উলসে (আমেরিকা)।

মহিলা—১ম—ডন ফ্রেন্সার (অস্ট্রেলিয়া) ৬২ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড) ২য়—লোরেন ক্র্যাপ (অস্ট্রেলিয়া) ৬২'৩ সেকেন্ড। ৩য়—কোথ লিচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬৫'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—জে বোসাভো (আমেরিকা) ৫ম—ভি গ্রাট (কানাডা) ৬৩—এস ম্যান (আমেরিকা)।

৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সীতারে পুরুষ বিভাগে ১৭ বছরের স্থল হুজা হারো রোজ স্বর্ণপদক লাভ করলেন। মেয়েদের বিভাগে প্রত্যেকেই পুরাতন অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

পুরুষ—১ম—হারো রোজ (অস্ট্রেলিয়া) ৪মি: ২৭'৩ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড) ২য়—টি, ইয়ামানাকা (জাপান) ৪মি: ৩০'৪ সেকেন্ড। ৩য়—জর্জ বীন (আমেরিকা) ৪মি: ৩২'৫ সেকেন্ড। ৪র্থ—কে হালোবান (অস্ট্রেলিয়া) ৫ম—এইচ জিও বোত্ত (জার্মানি) ৬ম—জি, উইনর (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলা—১ম—লোরেন ক্র্যাপ (অস্ট্রেলিয়া) ৪মি: ৪৪'৬ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ডন ফ্রেন্সার (অস্ট্রেলিয়া) ৪মি: ২'৫ সেকেন্ড। ৩য়—ক্যা (আমেরিকা) সময় ৪মি: ৭'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—এম, মিডার (আমেরিকা)। ৫ম—এস, জেকেলী (হাঙ্গেরী) ৬ম—এস ম্যান (আমেরিকা)।

১০০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে পুরুষদের বিভাগের ৪০০ মিটার ফ্রি হিসেবের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। শুধু বৃষ্টি স্থান অধিকার করেছেন বরটের কোল।

৪ × ২০০ মিটার রিলে রেসে অস্ট্রেলিয়ার সীতারের নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে বম্বেট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

৪ × ২০০ মিটার ১২'৩০ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব

রেকর্ড) ১ম—৩৪'৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—জাপান। ৫ম—জার্মানি। ৬ম—গ্রেট ব্রিটেন।

৪ × ১০০ মিটার মেয়েদের রিলে রেসে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের কৃতিত্ব নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

১ম—অস্ট্রেলিয়া ৪ মি: ১৭'১ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড)। ২য়—আমেরিকা ৪ মি: ১৯'২ সেকেন্ড। ৩য়—দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ মি: ২৫'৭ সেকেন্ড। ৪র্থ—জার্মানি। ৫ম—কানাডা। ৬ম—সুইডেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে অস্ট্রেলিয়ার সীতারদের প্রাধান্য। মেয়েদের বিভাগে ব্রিটেনের সীতারপটায়সী গ্রীণহাম স্বর্ণপদক লাভ করায় দীর্ঘ ৩২ বছরের পরে ইংলণ্ড ঘরে তুললো একটি স্বর্ণপদক।

পুরুষ—ডি, থিলো (অস্ট্রেলিয়া) ১ মি: ২'২ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—জে, মকটন (অস্ট্রেলিয়া) ১ মি: ৩'২ সেকেন্ড। ৩য়—এক, ম্যাকিনে (আমেরিকা) ১ মি: ৪'৫ সেকেন্ড। ৪র্থ—আর, ক্রিষ্টোফোন (ফ্রান্স)। ৫ম—জে, হেয়ারস্ (অস্ট্রেলিয়া)। ৬ম—জি, সাইন্স (ব্রিটেন)।

মহিলা—১ম—জুডি গ্রীণহাম (ব্রিটেন) ১ মি: ১২'৯ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—সি, কোন (আমেরিকা) ১ মি: ১২'৯ সেকেন্ড। ৩য়—এম, এডওয়ার্ড (ব্রিটেন) ১ মি: ১৩'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—এইচ, স্মিথ (জার্মানি)। ৫ম—এম, মার্কি (আমেরিকা)। ৬ম—জে, হারেল (ব্রিটেন)।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক মেসোবর্গ অলিম্পিকে নতুন করে প্রবর্তন করা হোল।

১ম—ডব্লিউ, ওরজিক (আমেরিকা) ২ মি: ১৯'৩ সেকেন্ড। ২য়—টি, ইশিমটো (জাপান) ২ মি: ২৩'৮ সেকেন্ড। ৩য়—জি, টাম্পেক (হাঙ্গেরী) ২ মি: ২৩'৯ সেকেন্ড। ৪র্থ—জে, নেসলন (আমেরিকা)। ৫ম—জে, মার্গাল। ৬ম—ই, রিয়ার (আমেরিকা)।

২০০ মিটার শেট স্ট্রোকে পুরুষ বিভাগে জাপানের সীতার স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, এবং মেয়েদের বিভাগে জার্মানির ইউ হামো।

পুরুষ—১ম—এম, কুরকাওয়া (জাপান) সময় ২ মি: ৩৪'৭ সেকেন্ড। ২য়—এম, জোসিমুহা (জাপান) সময় ২ মি: ৩৬'৭ সেকেন্ড। ৩য়—কে, আনুনিটেড (রাশিয়া) ২ মি: ৩৬'৮ সেকেন্ড। ৪র্থ—টি, গ্যাথারকোল (অস্ট্রেলিয়া)। ৫ম—আই মশাদ (রাশিয়া)। ৬ম—কে, গ্রেবি (ডেনমার্ক)।

মহিলা—১ম—ইউ, হামো (জার্মানি) ২ মি: ৫০'১ সেকেন্ড। ২য়—ইভা জেকেলি (হাঙ্গেরী) ২ মি: ৫৪'৮ সেকেন্ড। ৩য়—ই মেব্রিগ তেন এলসেন (জার্মানি) ২ মি: ৫৫'১ সেকেন্ড। ৪র্থ—জি জেরিসিভিক (হাঙ্গেরী)। ৫ম—কে ডিলারম্যান (হাঙ্গেরী) ৬ম—এইচ, জর্ডন (ব্রিটেন)।

১০০ মিটার ফ্রি স্ট্রোক মেয়েদের বিভাগে অলিম্পিকে এবং নতুন করে পত্র হোল।

১ম—শেলী ম্যান (আমেরিকা) ১ মি: ১১ সেকেন্ড। ২য়—এল, হ্যামে (আমেরিকা) ১ মি: ১১'৯ সেকেন্ড। ৩য়—এম, সিরাস (আমেরিকা) ১ মি: ১৪'৪ সেকেন্ড। ৪র্থ—লিটে মারিজিকি (হাঙ্গেরী) ৫ম—বি বেনাভিচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬ম—জে ম্যাগেনো (জার্মানি)।

৪ × ২০০ মিটার ১২'৩০ সেকেন্ড (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব

ফরেন। মেম্বরের বিভাগে আমেরিকার অর্থ-অর্থকার। তিনটি  
হানই আমেরিকার ভাগে।

পুরুষ—১ম—জে, ক্যাপিলা (মেক্সিকো) ১৫২'৪৫ পয়েন্ট।  
২য়—জে, টোরিয়ান (আমেরিকা) ১৫২'৪১ পয়েন্ট। ৩য়—আর,  
কেনার (আমেরিকা) ১৪১'৭১ পয়েন্ট। ৪র্থ—জে, গরল্যাচ  
(হাঙ্গেরী)। ৫ম—আর, কেনার (রাশিয়া)। ৬ষ্ঠ—ডব্লিউ,  
কারেল (আমেরিকা)।

মহিলা—১ম—হাট ম্যাককর্মিক ৮৪'৮৫ পয়েন্ট। ২য়—জে,  
আরউটন ৮১'৩৪ পয়েন্ট। ৩য়—পি ম্যাস' ৮১'৫৮ পয়েন্ট।  
এঁরা তিন জনই আমেরিকার প্রতিনিধি।

স্মিথ বোর্ড ডেভিড—এ পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকার  
শ্রেষ্ঠ বক্সার আছে।

পুরুষ—১ম—আর ক্লটওয়ার্কি (আমেরিকা) ১৫১'৫৬ পয়েন্ট।  
২য়—ডি হার্পার (আমেরিকা) ১৫৬'২০ পয়েন্ট। ৩য়—জে ক্যাপিলা  
(মেক্সিকো) ১৫০'৬১ পয়েন্ট। ৪র্থ—জে, হুস ইটেন (আমেরিকা)  
৫ম—জি, আউথালোক (রাশিয়া) ৬ষ্ঠ—আর ব্রেনার (রাশিয়া)।

মহিলা—প্যাট ম্যাককর্মিক (আমেরিকা) ১৪২'৩৬ পয়েন্ট।  
২য়—জে, আরউটন (আমেরিকা) ১২৫'৮৯ পয়েন্ট। ৩য়—আই,  
ম্যাকডোনাল্ড (ক্যানাডা) ১২১'৪০ পয়েন্ট।

### ডেভিস কাপ

গত বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া এবারেও আমেরিকাকে  
পাঁচটি খেলায় পরাজিত করে ডেভিস কাপ লাভ করেছে। চারটি  
সিঙ্গেলস ও একটি ডাবলস খেলার মধ্যে আমেরিকা একটি খেলাতেও  
জয়লাভ করতে পারেনি।

### সিঙ্গেলস

লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-০ ও ৬-০ গেমে হার্বি ফ্রায়কে  
(আমেরিকা) পরাজিত করেন।

কেন বোল্ডওয়ান (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৪, ৪-৬ ও ৬-১ গেমে  
ভিক্টর সেসাসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ডিক সেসাসকে (আমেরিকা) ৬-২,  
৭-৫ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। কেন বোল্ডওয়ান (অস্ট্রেলিয়া)  
সাম সিয়ামালভাকে (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-১, ৬-০ ও ৭-৫ গেমে  
পরাজিত করেন।

### ডাবলস

লুই হোড, কেন বোল্ডওয়ান ৬-১, ১-৬, ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে ডিক  
সেসাস ও সাম সিয়ামালভাকে পরাজিত করেন।

### ফুটবল

কলকাতার ফুটবল বড়দিনের সময় পরীক্ষণ করল অলিম্পিক  
বার্ণার যুগোশ্লাভিয়া দলের প্রশ্রয়ী খেলায় মধ্য দিয়ে।

উপর্যুপরি তিন বারের অলিম্পিক বার্ণার যুগোশ্লাভিয়া দলের  
ফুটবল-মান অনেক উন্নত। ২১ তারিখে আই, এফ, এফ বাছাই  
দলকে যুগোশ্লাভিয়া ০-০ গোলে পরাজিত করে। এঁদের মধ্যে  
থরডের দর্শনার খেলা দেখিয়েছেন লেক্সট আউট সেলুলার। তাঁর  
অনুর্ভব নৈপুণ্য দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

### ডুবাও কাপ

ভারতের তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতায় লাভ করেছে কলকাতার  
তিনটি জনপ্রিয় দল। আই, এফ, এ. শ্রীত মোহনবাগান, গোডার্স,  
মহামেডান স্পোর্টিং এবং ডুবাও কাপ লাভ করলে ইষ্টবেঙ্গল দল।

### ক্রিকেট

অতীত ও বর্তমানের ধ্রুবক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মিলে  
কলকাতার ইডেন উদ্যানে রক্ত জয়ন্তীর প্রশ্রয়ী খেলায় আয়োজন  
করা হয়েছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় রাশিয়ান সার্কাস তাঁদের  
নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের একটি অংশকে মতিভ্রমে রেখেছিল।  
তাই আশাশূন্য দর্শক-সমাগম তখন। ডাঃ বি, সি, রাইয়ের দল  
সাধারণতাদের খ্যাতিমান সব খেলোয়াড় নিয়ে গড়া সফরকারী জয়ন্তী  
দলকে ১৪২ রানে পরাজিত করেছে। অনেক দিন পরে অমরনাথ,  
হাজর, মুস্তাক প্রভৃতি খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য ও  
শ্রীলঙ্কা বোডার্স, ও টুমান প্রভৃতির বল দেখে দীর্ঘ হয়েছি।

### টুকরো খবর

নববর্ষ উপলক্ষে ইংল্যান্ডের ক্রীড়ামান ফুটবল খেলোয়াড় ম্যাথু  
নববর্ষে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে সি, বি, ই, উপাধি লাভ  
করেছেন। সাধারণতঃ দিবস উপলক্ষে এবারে অলিম্পিক হকি খেলায়  
অধিনায়ক বলবীর শিকে 'ভারতকী' খেতাবে সম্মানিত করেছেন।  
এ সংবাদে ক্রীড়ামানী মাত্রই আনন্দিত হয়েছেন।



No other watch, today, brings  
with it such a record for  
precision. This is backed by  
a world-guarantee of satis-  
factory service.

রায় কাজিন এণ্ড কো

৪২৪ ডালহৌসী স্টোর,  
কলিকাতা-১

Official OMEGA Dealer

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## শ্রীশ্রীসারদা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমালতী গৃহ-রায়

দুই

সন্ধানের জন্য নানা হয়েও সারদা দেবী মা কেন, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতেও বেশী দূর যেতে হয় না। আদর্শের তাঁর জীবন-ধটনা পুথ্যমুখরুপে আলোচনা করলে যে মহীয়সী রূপটি তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে, তাই হচ্ছে তাঁর মাতৃরূপ। তাই তিনি শত-সহস্র কণ্ঠে মা। অনাবিল ভালবাসা ও স্নেহময়ী দয়ালু মাতৃভাব বা তাঁর জীবনের প্রতি রসে ও ছন্দে ফুটে উঠতো, তাঁর আর তুলনা নেই—তাই তিনি মা।

তাঁর মাতৃস্নেহের পরিধি কখনোই কোন দেশকাল পারাপাত্র বিচারের অপেক্ষা রাখতো না। লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিশেষী, অপর ভাড়াভাষী, বিক্ষুব্ধ আচার নিয়ম পালনকারী সম্ভ্রমদের জন্তও তাঁর স্নেহ সলা প্রসারিত থাকতো। নিজ দেশাচারকে উপেক্ষা করেও তাদের বুকে টেনে নিতে তাঁর বাধ্যতো না। তাই তিনি মা। আচারে, বিচারে, শুদ্ধিতে নিষ্ঠার, তিনি আদর্শ নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হওয়া সত্ত্বেও পাত্রাপাত্র নির্কিণ্ণে মাতৃস্নেহ প্রকাশ তাঁর কোন দিন বাধা হতে পারেনি। এ শুধু মাতৃস্নেহেই সম্ভব। তাই তিনি মা।

তা যদি না-ই হত, তবে ভৌগোলিক পরিধি ছাড়িয়ে তাঁর অনাবিল মাতৃস্নেহের বসাবাসাদ সর্ব পাত্রাপাত্রাবাসীরা পেতে পারতো না। ভূমিণী নিবেদিতা বধন প্রথম এদেশে আসেন, বামী বিবেকানন্দের মহা হৃদিত্তা হয়েছিল, কি করে এই চৌর্যভাষা বাঁচানো গোবর পদ্মজন্মের গুণিবাচিকগুণে যুগে তাঁকে আশ্রয় দেবেন। সেই সময় সারদা দেবীই নির্ভয়ে এগিয়ে এসে তাঁর হৃদিত্তা বুঢ়িয়েছিলেন, নিবেদিতাকে নিজ স্নেহাঙ্কলে আশ্রয় দিয়ে। সমাজ সংস্কার বা কঠোর সমালোচনার যে কি পরিণতি হতে পারে একবারও তা ভাবেন নি। সম্ভ্রমহীন রমণীর এ বুগীর প্রেম একমাত্র বিশ্বমাতৃস্নেহেই সম্ভব। কাজে কাজেই তাই তিনি সকলের মা।

সাধারণ মায়াদের মধ্যে আমরা যে ভালবাসা মমতা সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও ভ্রাতার প্রকাশ বেশি এর অপার্থিব বলে বর্ণনা করি, তা

লক্ষ্যে তাঁর বিশ্বাসী সম্ভ্রমধর্মী কবি। মতি কথা কয়ে বলেন, বাবা তাঁর কেউই নয়। তাই তিনি মা। তিনি ছিলেন পতিত-পাবনী, অসহায়ের সহায়, দুর্বলের বল, অন্তর্ভাসিনী মহামায়া। কী মহাশক্তি আবার হলে যে এ সম্ভব হয়, তাঁর পরিমাপ করা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সম্ভব নয়। তাই তো কলম চলতে চলতে থেমে যায়। স্তব-বিম্বের ভাবি যে, নানী তো আমরাও। আমরাও মা। কিন্তু একি অপরূপ এক মহিমাময়ী মাতৃরূপের প্রকাশ আমাদের শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর?

আদর্শ স্থাপনের জন্যই বুঝি তাঁর মরদেহ এই অমরলীলা। আর কি আদর্শ নিয়েছি আমরা আধুনিক নারীরা? দুঃখে অন্তঃকরণে ভরে ওঠে। বার্থই কি বাবে ঐ মহিমাময়ী নারীর পরিচয় জীবনাদর্শ? বুঝা কি হবে দেবীর মর্ত্যে আগমন? আবার মনে হয়, না, না, এ তো বার্থ হবার নয়! ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তো নূতনের আবাহন। ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই অক্ষয়ের আকর্ষণ। শ্রীশ্রীমায়ের এই দেবোপম চরিত্রের শিক্ষা হারিয়ে বায়নি। বর্তমান সভ্যতার খোলসের আবরণ বন্ধন খসে পড়বে, ধ্বংস হবে, তখনই তা নূতন করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবার সূচনা হবে। আধুনিক যুগসভ্যতা ক্রমেই বিকৃতির মধ্য দিয়ে ক্রান্ত গতিতে ধ্বংসের পাথে এগিয়ে চলেছে, হয় তো বা শুভ শিকার বীজটি অঙ্কুরিত করবে বলেই।

সারদা দেবীর দেবীমাহাত্ম্য এত দিন শুধু তাঁর নিকটতম কয়েকটি ভক্তের অন্তরের অন্তরতম মণিকোঠায়ই সংরক্ষিত লুকানো ছিল। পরম শ্রদ্ধার তাঁরা তাঁকে পূজা করতেন। কিন্তু যিনি বিশ্ববরণ্যে, সর্বপুত্রনায়ক, তিনি কি করে থাকতে পারেন সামান্য কয়েকটি ভক্তের হৃদয়সনে? তাঁর আসন যে যুগে যুগে কোটি কোটি অন্তরে বিছানো রয়েছে এবং থাকবে। কাজেই এখন বসন্ত দিন যাচ্ছে, ততই সারদা দেবীর দেবীমাহাত্ম্য স্বমহিমায় ফুটে বের হচ্ছে ও বিশ্বহৃদয়ায় বিস্তারিত সৃষ্টি করছে।

আজ থেকে একশ বছর আগের ভারতকে বিচার করলে তাঁর সমাজবিধি, শাসন, আচার-বিচার শুদ্ধিনিষ্ঠা ধর্মসংস্কার সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলে যোর অন্ধকারের মধ্যে যেন শত-সহস্রচ্ছটাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতই মনে হয় সাবরা দেবীকে। যেন চতুর্দিকের ঘনায়মান অন্ধকারকে শত-সহস্র হস্তে একই সময়ে বিনাশ করতে চেয়েছেন তিনি। তিনি যেন অশ্রুনাশিনী দুর্গা।

অন্ধকারে থাকতে থাকতে মানুষ অন্ধকারেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আলোর কথা তাদের মনেও থাকে না। সেকালে মায়ের দিনের ভারতও কুসংস্কারের অন্ধকারেই বেশ তৃপ্ত ছিল। কুসংস্কারবৃত্ত হবার জন্ত বা আলোর জন্ত কোন আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু স্নিগ্ধ জ্যোত্স্নার মত বিপ্লবের আশীষ ও করুণাময়ীরাপে এসেও অন্ধকারে অভ্যস্ত সেদিনের মানুষ তাদের আলঙ্কার দৃষ্টিতে সারদা দেবীর মহিমা বুঝতে পারেনি। তাদের চোখ ধাঁধিয়েছিল। অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু স্নিগ্ধ জ্যোত্স্না তো সত্যিই কিছু চোখকলসানো স্বর্ষ্যতাপ নয়, তাই বেশী দিন বিভ্রান্ত হবার উপায় ছিল না তাদের।

সারদা দেবীর যুগের মানুষ যেন দেশাচার কুলাচাদের জন্তই বাঁচতো। মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই যে দেশাচারের সৃষ্টি, তা যেমন মানুষই পড়ে, আবার প্রয়োজনে মানুষই তাকে ভাঙতেও পারে; তারা তা বুঝতো না। কিন্তু সারদা দেবী তো বুঝতেন।

বসানই মলল। সেই জটাই তাঁর ওক্ত সন্তানদের মললের জড়, যাদের প্রয়োজনের জড় তিনি নির্ভীকচিত্তে ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা দ্বারাতে ইতস্তত করতেন না।

ব্যক্তিগত কারণে অবশ্য তিনি সমাজপ্রথা লঙ্ঘনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু যেখানেই তাঁর মাতৃহৃদয়ে অগাধত পড়তো, সেখানে তিনি নত হতে পারতেন না। ঐ ছুৎস্পর্শকাতর যুগে তাই তাঁকে দেখা যেত অত্যন্ত সহজ ভাবে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ভক্তদের সঙ্গে আপন গর্ভধারিণী জননীর মত অস্ত্রবস্ত্র ব্যবহার করতে।

তিনি যখন খেতে বসতেন, চারিদিক থেকে ভক্তরা হাত পাতেতো একটু প্রসাদ পাবার জন্য। অবলীলাক্রমে তিনি খেতে খেতেই তাঁর পাতের মাগা ভাত তাদের হাতে চেষ্টাচুপে ছড়িয়ে দিতেন, যাতে পড়ে না যায়। তারপর দ্বিবি সেই হাতেই খেতে থাকতেন। হাত ধোবার প্রসঙ্গও তাঁর মনে আসতো না। কোন সময় হয়তো তাঁর হাতে মুড়ী-মুড়কী খেতে বসে ভক্তদের হাতে মুঠো মুঠো তুলে দিতে দিতে নিজেও খেতে থাকতেন। তারা কোন বর্ষ কি জাত, এ প্রশ্ন তাঁর মনে আসতো না। তিনি মা আর তারা তাঁর সন্তান, এই তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল। মুসলমান ভক্তদের তিনি কেনে-কেনেই নিজের ঘরের দাওয়ায়

বসিয়ে খেতে দিতেন। তাঁর সবত পরিবেশনে মাতৃস্নেহের পরিচয় থাকতো। তারা বাসন নিয়ে উঠে গেলে তিনি নিজ হাতে তাদের উচ্ছিন্ন স্থান মুক্ত করতেন। বাথ নিলেও শুনতেন না। মা কি সন্তানের নিষেধে তার সেবা কাজ বন্ধ করেন? কত সময় কত অস্পৃহ নিয়ন্ত্রণের ভক্তরা তাঁর কাছে কোন কাজে এসে অস্পৃহ হয়ে পড়লে তিনি নিজে তাদের পরিচর্যা করতেন। গোলমাল বাধবার, বাধা পাবার আশঙ্কায় তিনি চুপি চুপি তাদের মলমুত্র পরিষ্কার করতেন। বিলুপ্তাও বিধা জাগতো না তাঁর মনে। তিনি জানতেন মায়ের কাছে সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। থাকতেও পারে না। এরা যে সবাই তাঁর সন্তান আর তিনি যে তাদের মা!

সমাজচোখে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-বিধবাদের এরকম আচরণ অবশ্য তখনকার দিনে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তখনকার দর্বা-পরায়ণ সমাজপতিরা এসব ব্যাপারে একেবারে নিঃশব্দে যে থাকতেন, তাও নয়। সামাজিক আইনের অজুহাতে নানা ছলে তারা সারদা দেবীর কাছ থেকে টাকা আশায় করতেন। চাওরা মাজ সারদা দেবী তাদের ঐ টাকা দিয়ে দিতেন। তিনি ঐই অর্থদণ্ডকে শাস্তি ভাবতেন না। তিনি বরং খুসী হতেন, এভাবে কিছু কিছু

## মনের কথা

"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স' দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও নারিকবোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিগি কলমারে গহনা নির্মাণ ও রত্ন-করকারী  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



অর্থ নিয়েই অতীত কাজের ব্যাখ্যা অংশগঠিত হয় ভেবে। সমাজ-  
শাসন মায়ের যেখ থেকে সন্তানদের বঞ্চিত রাখবে এ তাঁর অসহ  
ছিল। ঈশ্বরসেবা জানে তিনি যে কর্তব্য কর্তৃপক্ষ করতেন, তা বেন  
তাঁর সহজ স্বভাবের ভাবেই হত। সে সব কাজে কোন বাধা-নিষেধ  
যা শাসনের ভয় তাঁর মনের কোণেও জাগতো না।

যাযী বিবেকানন্দ বলছিলেন, একমাত্র চরিত্রই বাধা-বিরুদ্ধ  
স্বল্পত প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ। তার সেই বাণীটি বেন  
সায়দা দেবীর মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছিল। সায়দা দেবী তো রূপল,  
মনল, বিজ্ঞানল ইত্যাদি চলিত কথায় তাদের আমরা বল ভাবি,  
তাঁর কোন বল নিয়েই জন্মাননি। একমাত্র চরিত্রবলই তাঁকে সকল  
মলে বলীভাৱন করেছিল। তাঁর নিজ চরিত্রমহিমায় তিনি অগণিত  
পাণী তালী শোকসন্তপ্ত ও দুঃখী সঙ্গীরা নয়নারীর জীবনদর্শ গড়ে  
দিয়েছিলেন। আভিজাত্যহীন, অশিক্ষিতা দরিদ্র ও একান্ত  
লজ্জাবীলা পরায়মণীর চরিত্রবলের কাছেই তখনকার সলিহ,  
ঈর্ষাকান্ডর মাছব নিজ থেকেই মাথা নীচু করেছিল। তাদের  
সামাজিক বহুদূর নানারকম বাধা-নিষেধের প্রাচীরও তাই ভেঙে  
পড়েছিল।

অভ্যাসিলা বহুভাষার মত অনাবিল মেহবারা সর্বদাই তাঁর  
অন্তরে বইতো। বারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতো, তারাই তা  
অনুভব না করে পারতো না। তাঁর স্নেহস্পর্শ থেকে কীট পতঙ্গ  
পতপাখী পর্যন্ত কিছুই বার বেতো না। গৃহপালিত কুকুর বিড়াল  
গরুগুলির প্রতিও তাঁর কি অসীম মমতাই না প্রকাশ পেতো!

আশ্রমের বিড়ালগুলি ভক্তদের বইই উপাভা করতো। তারা  
বখন খেতে বসত, বিড়ালগুলি তাদের পাতেব মাছ তুলে নিয়ে  
পালিয়ে যেতো। ছেলেরা খেতে বসে এমনি রোজ উতাক্ত  
হয়, এ মায়ের সহ্য হতো না। তিনি খাবার সময় তাদের  
হাতের কাছে লাগি রেখে বলতেন, 'বখন ভারি বিরক্ত করবে এই  
কাণ্ডি হইল ভাড়িয়ে সি'। কিন্তু সব ভক্তরা অত নরম পছন্দ রাজী  
ছিলেন না। তাদের ২১ জন মায়ে মায়েই বিড়ালগুলিকে চুষ্কর  
প্রকার দিত। মায়ের অন্তর তাদের ব্যাখার আবার কাঁদতো।  
'আহা অবলা মুক জীব, এদের কি অমনি করে মারতে হয়?' অখচ  
দুঃ সময় সবাইকে প্রেতবাদ করতেও তিনি পারতেন না। সঙ্কোচ  
সেধ করতেন।

জান মহারাজ এই বিড়ালগুলিকে দেখতে পেলেই মারতেন।  
একবার মার বেখাও বাবার কথা হ'লে বড়ই ভাবনা হ'লো, 'আমি  
কাছে থাকতেই জান বিড়ালগুলিকে এত মারে, আমি না থাকলে  
হতো একেবারেই মেরে ফেলবে।' রওয়ানা হবার সময় তাকে তিনি  
বললেন 'বিড়ালগুলিকে মারিসনে বাবা, এদের মধ্যে কিছু  
দুঃখি রয়েছে।' সত্যি সত্যিই সেই থেকে জান মহারাজের গভীর  
নির্বন্ধন হয়। তিনি বিড়ালগুলিকে মারা দূরে থাকুক, মাড়ুজানে  
লগ্ন করতেন। নিজে নিরাধিপাণী হয়েও বাজার থেকে মাছ এনে  
সেই খাওয়ারতেন।

এই জান মহারাজেরই একবার কি এক ধারণা হ'ল, গরুকে জল  
তে না দিলে দুধ ভাল দেয়। তাই তিনি আদেশ দিলেন খড়  
তালী ভাতের কোন ছাড়া গরুকে বেন জল দেওয়া না হয়। আশ্রমে  
আদেশ অবজ্ঞা করার মত সাহস কারুই ছিল না। কাজেই

গরুদের জল পান নিষিদ্ধ হ'ল। এ আদেশ কানে যেতে সাংসা দেবী  
অন্তর ব্যাখার টন টন করে উঠলো। একটু ভাল দুধ খাওয়ার ভয়  
গরুদের তৃষ্ণার্ত ব্যাখার ব্যবস্থার তিনি আঁখির হয়ে উঠলেন। অখচ  
বহুত সন্তান জান মহারাজকে তিনি মাড় করতেন বাল সন্ন্যাসি  
তাঁকে কিছু বলতেও পারলেন না।

একদিন দুপুরবেলা গরুদের খাওয়ার কানে যেতে তিনি আঁখি স্থির  
থাকতে পারলেন না। রামদয় মহারাজকে ডেকে বললেন, 'দেখ তো  
বাবা, জান বুঝিয়েছে নাকি? জান বুঝলে চট করে দুই মারুতি  
জল এ তৃষ্ণার্ত গরুগুলিকে একটু দিয়ে আয় তো।'

গরুগুলির সম্মুখে জলের বাসতি রাখা মাত্র তারা চো চো করে  
অত্যন্ত তৃষ্ণার্তের মত সবটা জল খেয়ে নিল। তা দেখে সায়দা দেবীর  
হৃৎগাধে জল লো। তিনি বললেন 'আহা জান ভদের এই ভেটটা  
কেম বোঝে না যে। দুই বাধা রামদয়, জান বুঝিয়ে পড়লে কি  
যোজ দুঃখার্তি জল দেয়ে খাইয়ে হাস বুঝি?' সায়দা দেবীর মাড়ু-  
অন্তরখানি এমনি করে সাতা স্থিখে ভুজই কাঁদতো। একটা জোয়া  
শিপড়ে মারলে পৃথু তাঁর অন্তরে ব্যাধ লাগতো, মাড়ু-চিঠেই  
তাঁর লব চেয়ে বেন বড় পরিচয় ছিল। তাই তিনি মা।

আশ্রম ছেড়ে কোথায় বাওয়া-আসা কালে তিনি যে পোছগাই  
করতেন, সে মাড়ুধোবও তুলনা ছিল না। যেখান থেকে যেতেন  
সেখানে পাছে কাকর কোন অন্তবিধা হয় তাই নিপুণভাবে সব  
ছদ্মবে হাতের কাছে রেখে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন তিনি বৎসান  
হতেন। আবার যেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে বাতে তাদের কোন  
অন্তবিধার না ফেলেন, তার ভক্তও তাঁর ছিল অল্প বহুত গোছগাছ।  
তাঁর প্রতি কথার প্রতি ব্যবহারে প্রতি কাছেই বেন অন্তরের  
মাড়ুস্নেহ করে পড়তো। তিনি বলতেন, 'আমি যে তোদের  
কথার কথা মা নই যে। পাতানো মা-ও নই। আমি যে তোদের  
সত্যিকারের মা।' এই কথা করত যে অন্তরে অন্তরে কতটা  
সত্য তাঁর মেহস্পর্শে বারাই এসেছে, তাদের চের ভাল আঁখ  
কেউ জানে না।

মা বেন বাহু জানতেন। সন্তানরাও নিজাদের গর্ভগাঢ়ী  
জননীকে তুলে মা ছাড়া আর কিছু জানতো না। মায়ের পাতেব  
একটু প্রসাদ, মায়ের একটু দর্শন, মায়ের একটু স্নেহতপশ  
পাবার জন্য তাদের মধ্যে একটা আকুলি-বিকুলি দেখা যেতো।  
সায়দা দেবীর অনাবিল মাড়ুস্নেহের পরশ পেয়ে স্বত মাড়ুস্নেহ  
যে জীবনের মোড় ঘুরে গেছে তার অন্ত নেই। প্রকৃত  
দরদী মমতাময়ী মায়ের অন্তরের পরশ না পেলে এ কি  
সম্ভব হ'তো?

বুটতে ভিজে ভক্তরা এলে আপন পরিবেশ বসন বহুতেন তাদের  
হাতে তুলে দিয়ে তাদের তিনি বেশ পরিবর্তন করতে বলতেন।  
শীতবস্ত্র কাঙ্কর সাথে না থাকলে নিজের কলধানা তাদের হাতে  
ভাজে দিতেন। তাদের সঙ্কোচ দেখলে এই ব'লে তাদের সজ্ঞ করে  
দিতেন 'দ্যা বাবা, মায়ের জিনিষ ব্যবহারে কি ছেলদের সঙ্কোচ  
হয়?'

বিশেষ থেকে ভক্তরা নোরা জামাকাপড় নিয়ে এলে মা লেঙলি  
নিজের হাতে কেচে পরিষ্কার করে দিতেন। আবার দুঃ থেকে কেউ  
লাজ হয়ে এলে কাছে বসে নিজ হাতে তাকে পাখায় হাতুয়া

দিতেন। বাধা পর নিজ হাতে তাদের হাত-খুঁচ খোঁচা জল ঢেলে দিতেন। ভক্তদের উদ্ভিষ্ট বাসন পূর্ণ্য তিনি নিজ হাতে রাজতেন। বাধা দিলে বলতেন 'হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমাদের দা নই?'

ভক্তদের কাকুর ঘা-পাঁচড়া হলে মা তাদের পরিভার করে দিতেন। দিনের পর দিন নিজ হাতে খাটয়ে দিতেন। কত শ্রীভক্তরা সন্তানাদি নিয়ে আসতো। তাদের শিশুদের মলমূত্র মা নিজে পরিষ্কার করতেন। বাধা দিলে বলতেন, 'মেয়ের জন্ত মা তো কত কিছুই করেন, আমি আর কতটুকুই পারি?'

মা সকলকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। নিজে না খেয়ে ভাল জিনিষ সব ভক্তসন্তানদের খাওয়াবেন বলে তুলে বেখে দিতেন। ঠাকুরের কাছে কালীঘরে ভক্তরা এলে তিনি নহরতঘরে বসে টের পেতেন আর যে বা ভালবাসে তাই রাখতে বলতেন। কেউ কোথাও কাজে গেলে না ফেরা পূর্ণ্য রোহরৎসলা মায়ের মত নিজে না খেয়ে বসে থাকতেন। কে কি খেতে ভালবাসে, কার কি না হলে কষ্ট হয়, সব তাঁর জানা থাকতো। তার ভক্ত অবশ্য তাঁর পরিভ্রমের অঙ্গ থাকতো না। কিন্তু হাদিমুখেই তিনি সব করতেন। তাঁর চাঁদেবী ভক্তদের ঘূষের জন্ত বাটি হাতে কত দিন তাঁকে দেখা পেছে এ বাড়ী ওবাড়ী ঘুরে বেড়াতো।

ঘর থেকে বাঁরা আসতেন, পথকষ্ট বুকে তিনি তাঁদের ২৪ দিন বিশ্রাম নিয়ে বেতে বাধা করতেন। অভাবের সসারে অভাব বৃদ্ধির কথা তাঁর মনেও আসতো না। ভালোমন্দ খাবার ফল মিষ্টি বাই বধন ভক্তরা পাঠাতো তিনি শিকের তুলে রাখতেন 'কী জানি, বাত বিরাতে কখন কে আসবে বলা তো যায় না।'

ঠাকুরের লর্ন পেতে যে সব শ্রীভক্তরা আসতেন, রাত্রি হয়ে গেলে কিয়তে পারতেন না। ঠাকুর তাদের বলতেন কালীমন্দিরের বারান্দায় থাকতে। মা শুনে ছুটে আসতেন। 'মা থাকতে মেয়েরা বারান্দায় পড়ে থাকবে, তা কি চর?' ঘূষে নহরতগানার কুতুখবটির ছড়ানো বিচিত্র আসবাব কোথায় উঠাও হয়ে যেতো। ছোট মেয়েটুকুতে তাদের নিয়ে এহনি জড়িয়ে শুতেন যে মনে হত তারা বেন তাঁর কত আগনার। সন্তানদের আনন্দেই তাঁর আনন্দ, তাঁদের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি, সুখে সুখ, দুঃখে তাঁর বেন দুঃখ, এমন কি তাদের ঘূষেই বেন তিনি আহার করতেন। তাঁর কাছে এসে কেউ কখনো অভুক্ত বিদায় নিতে পারতো না।

রাত্রি-দিন মায়ের কাজের অঙ্গ ছিল না। অল্প দিনের জন্ত পিজালয়ে গেলেও সেধানকার সব বোঝা নিজের মাথায় নিতেন। ঘবে-বাইরে সকলের জন্তই তাঁর অস্তর সমান ভাবে ঝাঁপতো। ভক্ত সমাগয়ের কোন নির্দিষ্ট সময় না থাকায় তাঁর পরিভ্রমের অঙ্গ থাকতো না। পান সাজা তাঁর এক মজ্জ কাজ ছিল। কেউ এলে-গেলে তার স্নমুখে বেকাবে করে কিছু প্রসাদ, এক দুঁস জল ও হ' খিলি পান নিয়ে এসে দাঁড়াতেন। ভক্তদের কাছে এই বেকাব হাতে দাঁড়ানো মাকে দেখলে বেন চোখ জড়িয়ে যেতো। তাঁর সমস্ত অন্তরের হাতুয়েইটুকু নিয়ে বেন সন্তানের সন্মুখে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। আবার তারা বধন রতনানা হয়ে যেতো, তাদের বাতাপথের নিকে তাকিয়ে সমানে তিনি চুর্ণানাম জপ করতেন। ঘূষেই ভক্তরা বিদায় নিলে তাঁর চোখের জল বাধা যানতো না।

সকল চোখে অনেক ঘূষ পূর্ণ্য তাদের সাথে সাথে এগিয়ে দিতেন। আবার তারাও পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পূর্ণ্য সমানে দিতেন কিয়ে কিয়ে মাকে দেখতো। ভক্তদের কত পুতিচিহ্নই যে মায়ের বাজে থাকতো, তার অঙ্গ নেই। লতছির হয়ে গেলেও মা গ্রাণ ধরে তা কেসতে পারতেন না। মার জীবনের শেষ দিন পূর্ণ্য নিবেদিতার দেওয়া একটি কুমাল ছিল অবস্থায় তাঁর বাজে রাখা ছিল। এ মায়ের কি আর তুলনা ঘিলে?

সারদা দেবীর সোভলুভতাও এক দৈবী সম্পদ ছিল। অগণিত ভক্ত-সন্তানের তিনি জননী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছিত মাত্রই তারা হয়তো মাকে রাজরাণীর মত রাখতে পারতো। কিন্তু সেই মাটির ঘরের দাঁড়ায় বসে পান সাজতে, কুটনো কাটতে, কটি বেলেতে ও নানারকম সৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে কারিক পরিভ্রম করতই ভালবাসতেন তিনি। সেই গারিষের মধ্যেই হাদিমুখে ভক্তদের সেবা করতেন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা এতই বেশী ছিল যে পথের দিনের সাংস্থানটুকু বিলিয়েও ভক্তসেবা করতেন তিনি। দারিদ্ৰ্যের সঙ্গে যুদ্ধকালেও কোন প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারতো না।

একবার এক মাড়োয়ারী ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্ত দশ হাজার টাকা দিতে এসেছিলেন। ঠাকুর টাকা ল্পর্শ করতেন না, তাই ঐ টাকা গ্রহণে অসম্মত হ'ন। ভক্তটি ঐ টাকাটা সারদা দেবীর কাছে দিবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্ত। মা যাতে নিজে ঐ অর্থ গ্রহণেন। ঐ সমস্যাটা মাকে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে ঠাকুর ও ভক্ত সন্তানদের সেবা করতে হত। কিন্তু তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করলে প্রকায়ান্তরে ঠাকুরেরই নেওয়া হয়, 'এই ঘটায় করে ভক্তটিকে কিরিয়ে দিলেন। কিছুতেই নিলেন না সে অর্থ। ঐ সময়টায় সারদা দেবীর পিজালয়ের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ঐ ভক্তটিকে তিনি যদি আদেশ করতেন, ঐ অর্থ তাঁর পিজালয়ে দান করত, তবে হয়তো ভক্তটি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতো। কিন্তু তাও করেনি তিনি। যে ভাবেই ঐ অর্থ ব্যবহারের তিনি নির্দেশ দিবেন, প্রকায়ান্তরে তাঁরই তা গ্রহণ করা হবে, এই বিবেচনা তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল।

মাসান্ত তীর্থ ভ্রমণের সময়ও সারদা দেবীর সন্মুখে এ রকমই এক প্রলোভন আসে। রামনাসের মহারাজা তাঁকে তাঁর রাজভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়ে তাঁকে তাঁর ঐর্ষ্যাভাণ্ডার থেকে কিছু গ্রহণ করতে বারবার সাহুদর অমুরোধ জানান। রাজভাণ্ডার কত মহামূল্য চোষ ঝলসানো মণিমাণিক্যের সমাবেশ। সারদা দেবী হয়তো জীবনেও এসব চোখে দেখেননি। কিন্তু কোন মতেই তাঁকে কিছু গ্রহণ করতে সম্মত করান যায়নি। বারবার সাহুদর অমুরোধে ঐ একই জবাব দিয়েছিলেন যে, ধনঐর্ষ্যা তাঁর কাম্য নয়। সন্তানের ঐর্ষ্যা দেখেই তিনি হত হয়েছেন। [ক্রমশঃ]

## “আশা” কবিতায় কবি নবীনচন্দ্র

সন্ধ্যা বসাক

“কাহেলের “আশা” পৃথালোক পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ গগনে বিচরণ করে; নবীন বাবুর আশা মেঘগগন প্রায় কঠোর জায় ছাড়রের রক্তে রক্তে সঞ্চার করিয়া প্রাণ-মন কাড়িয়া লয় হুইট্টই স্মরণ ও সুখবর্শন। কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন সূর্যের



ধরজ্যোতিঃ; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার মীতল কান্তি। একটি সূর্যবর্তিনী, আর একটি মধুস্পর্শিনী।” (কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

সত্যই “আশা” নবীনচন্দ্রের অমর সৃষ্টি। ইহা “পলাশীর যুগ” কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অংশমাত্র। ইহা নবীন কবির মনের মুক্তির। ইহাতে তাঁহার নবীন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। মানবজীবনে আশার অমোঘ প্রভাবই কবিতার বিষয়বস্তু। এই “আশা” বহিঃ প্রাধান্যতঃ শ্বেত সেনাপতি স্ট্রাইভের এক তাহার সেনাদলের—তথাপি প্রসঙ্গজ্ঞে কবির অন্তরের আশাটিও প্রতিফলিত হইয়াছে।

কবিও আশার মোহিনী মায়ায় পিছনে মরীচিকার ছায় ছায়াবিত হইয়াছেন। বাঙালার বিজ্ঞাত একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কবি কাব্য লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সাহিত্য রচনার এই পথ অনন্তসংবিত। তাই ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কবির মনে জাগে সন্দেহ। বঙ্গের মহাকবিগণ তাঁহাদের সূর্যপ্রসারী কল্পনার বর্ডিন স্কুটার জাল বুনিয়া মাতৃভাবকে বৈচিত্র্যময় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সেই কল্পনাশক্তি কোথায়? কেমন করিয়া তিনি সদৃশতা লাভ করিবেন? তাইতো কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনি,

“দুঃশাসার মস্ত্রে যুদ্ধ আমি মৃচমতি!

নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ করেনি,

সে পথে কেন হবে যম গতি?”

কিন্তু পরমুহূর্তেই কবির মনে আশার জ্বলিত আলো প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার মনে গোপন রক্ত ধ্বনিত হইতে থাকে—  
আশা বিশ্বভুবনে গতি দান করে, যুগ্ম অঙ্গহীন কালজালও  
চিবার আশার আবার ভিকার বহির্গত হয়। আশার এই প্রেরণায়  
মুগ্ধ হইয়া কবি বলিয়া উঠেন,

“.....কিধা অসম্ভব

নহে কিছু হে ত্যসে, তোমার মায়ায়;

কত ক্রুর নর ধরি পদচ্যায় তব

লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়।”

আলোচ্য অংশে কবির আবেগ ও উজ্জ্বলের প্রাধান্য দেখা যায়। হার কলে ভাববস্তুর বস্তায় পাঠকের মন সোলায়িত হইয়া উঠে, বস্তুর যুগলে টান পড়ে। দুঃশাসকে আশ্রয় করিয়া এই মৃত্যুশীল সোরে কবিকীর্তি-জনিত অমরতা লাভের প্রয়াস সত্যই অভিনব। পট্টনের “নিউজ” বিহারীলালের “কল্পলক্ষ্মী সারদা” বরীন্দ্রনাথের “দীনেশবর্তা,” এবং নবীনচন্দ্রের “দুঃশাসা” একই পর্যায়ভুক্ত হইয়া দ্বিগাহে। নবীন কবিও তাঁহার কাব্য রচনার মূলে অল্পভব রাখিয়াছেন কৃচকিনী আশার প্রভাব।

এই কথাগুলিকে জাবোজ্ঞাসের ফলে নবীনচন্দ্রের অসংবত, সতর্ক প্রকাশ বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। রক্ত কবিকল্পনা ও প্রতিভা হাঁড়া যে সার্বিক কাব্য রচিত হইতে পারে না, ইহা নবীন কবির জানা ছিল। আর সেই স্বল্পনী প্রতিভা সম্বৃত কল্পনাশক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথাও তিনি জানিতেন। চমি যে আশার পলায় অঙ্গসংগণ করিয়াছিলেন, ইহার একমাত্র কারণ আত্মপ্রত্যয়ের উপর তাঁহার অবলম্ব নিষ্ঠা। যতনী কীর্তি

রচনার ক্ষেত্রে প্রতিভাই যে একমাত্র বিবেচ্য বস্তু নহে, ইহার সত্য যে সুগভীর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা বিনরী নবীনচন্দ্র জন্মসময় করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুঃবস্ত আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি কবিকীর্তি লাভের আশা করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কবির আশা নিছক আবেগমাত্র নহে—এবং ইহা ব্যর্থ হয় নাই “পলাশীর যুদ্ধই” তাহার বলন্ত স্বাকর।

## মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক : তরু দত্ত

সলিলপ্রসাদ ঘোষ

কবি বলেছেন :—

যুগে যুগে যুগে

ভারতের নারী

দিয়ে নানা প্রতিভার পরিচয়।

এ মর জগতে

হচ্ছে ছিন্ন অমর

ভাতি' চির স্নানহীন গরিমার।

এ কথা বিশেষ করে স্মরণ হয়, বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যিনি সাহিত্য রচনা করে দেশ-দেশান্তরে খ্যাতি লাভ করেছিলেন,—সেই মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক তরু দত্তের প্রসঙ্গে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারে তরু দত্তের জন্ম হয়। এই দত্ত-পরিবারের আদিমিবাস ছিল বর্ধমান জিলার আত্মপুর গ্রামে। এই বংশের নীলমণি দত্ত কলিকাতায় এসে রামবাগানে বিরাট ঔটালিকা নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিখ্যাত উইলিয়াম কেরীকে তিনি তাঁর বাগমারীর বাগানে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। অস্কাট মহৎ গুণাবলীর সঙ্গে এই পরিবারের বিদ্যাহাবগের কথাও সর্বজনজ্ঞাত। গির্জাচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, লক্ষীচন্দ্র, হরচন্দ্র এবং তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ইংরাজী রচনার খ্যাতি ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে এঁদের রচিত “The Dutt Family Album” নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্তও এই পরিবারের সন্তান। বিশেষতঃ তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত অত্যন্ত সাহিত্যাহুয়াগী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সেকালের বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা “The Calcutta Review” পত্রিকার সম্পাদক রেভারেন্ড ডাঃ জর্জ মিথ লিখিয়াছেন,—“I have always regarded him as the finest English scholar amongst the natives of Bengal and consequently of India.”

খাতনামা অধ্যাপক কাওয়েল কবিকল্পের চতুর্ভাবের ইংরেজী পত্নাহুবার করেছিলেন এই গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সাহায্যে।

তরু ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা। বহিঃ ও তাঁরা গুণেধরে দীক্ষিত ছিলেন এবং সেকালের রীতি অনুসারে আচার-ব্যবহার, পৌরাক-পরিচ্ছদ সকল বিষয়েই বৈদেশিক রীতিনীতির অনুকরণ করতেন, তথাপি তরুর মা, কস্তার চরিত্র গঠনের জন্য তাঁকে দেশজ ছড়া ও পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন। সম্ভবতঃ এরই ফলে, সেই শৈশব কালেই তরু গীতি-কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।



তরুর কৈশোর রামবাগানের গৃহ ও বাগমারীর বাগানেই অতিবাহিত হয়। এই উজ্জ্বল তরুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং কবি তাঁর পরবর্তী জীবনে এই বাগানকে কবিতায় অমর করে রেখে গেছেন। গোবিন্দচন্দ্র পুত্রকর্তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত গৃহেই করেছিলেন। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক গৃহশিক্ষকের নিকট তরু ও তাঁর দিদি অরু ইংরেজী পাঠ গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অরু ও তরুর দাদা অবজুর্নাবের মৃত্যু হয়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দুই কস্তার উপর বর্ষিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র সপরিবারে ইউরোপ যাত্রা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয় যে গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী ও তাঁর দুই কস্তা অরু ও তরু দত্তই সর্বপ্রথম বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলা হিসাবে ইউরোপ ভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁরা প্রথমে মর্সল বন্দর হয়ে ব্রিস্টল-ক্রাফে গিয়ে অবস্থান করেন, এর কিছুদিন পর গোবিন্দচন্দ্র নীল সহরে উপস্থিত হন। এখানে ফরাসী ভাষা শেখাবার জন্ত অরু ও তরু এক ফরাসী স্কুলে ভর্তি হন। ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফরাসী জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিশোরী অরু ও তরুর মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। এর পর প্যারিসে কিছুদিন থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইংলণ্ডের ভ্রমণে সহজে এক মনোমগ্ন স্রসঞ্চিত গৃহে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়।

ভ্রমণের স্মরণ পরিবেশই তরুর স্তম্ভ কবিত্রিভিত্তিকে আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়ে দেয় এবং তরু এখানে বসেই প্রথম ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন। তরুর দিদি অরুও যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন এবং তরুর মতই ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন বটে, কিন্তু তবুও কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতশিক্ষা সকল বিষয়েই তরু তাঁর দিদির পেছনে কেলে এগিয়ে যেতেন আর অরু স্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কেমব্রিজ গমন করেন। এখানেও দুই ভগিনী আরও ভালোভাবে ফরাসী ভাষা শিক্ষার আত্মনিয়োগ করেন। এখানকার মহিলাদের জন্ত আত্মতৃপ্ত সভা সমিতিতে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হয়ে অরু ও তরু সেখানকার বিভিন্ন আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ গ্রহণ করতেন। অরু ও তরুর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও মিষ্ট, তাই বহু বাগা সন্তোষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু নরনারীর সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সৌহারদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করে তাঁরা 'পেশোয়ার' জাহাজে যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু হায়, কলিকাতায় এক গভীরতম দুঃখ এই পরিবারের জন্ত অপেক্ষা করছিল,—মাত্র এক বছরের মধ্যেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তরুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দিদি অরু দত্ত বঙ্গাবোগে মারা গেলেন! দিদির এই অকাল মৃত্যু তরুর কোমল হৃদয়ে এক নিদারুণ আঘাত হানলো, কিন্তু পিতার কথা স্মরণ করে সকল দুঃখ বেশনাকে তিনি অন্তরের অন্তরালে গোপন রাখলেন। তরুর সকল কাজে সজ্জিনী ছিলেন তাঁর দিদি অরু। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা সকল বিষয়ে এক সঙ্গে কাজ করতেন দু'জনে, আপন ভাবে বিভোর হয়ে এগিয়ে যেতেন তরু, আর দিদি অরু লক্ষ্যে লক্ষ্যে রাখতেন

ছোট-বোনটির ওপরে, এর ফলে হয়তো তাঁর নিজের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটতো, কিন্তু তাঁর সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না।

এই সময় থেকেই তরুরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মানসিক ও দৈহিক রক্ষণা লাগবের জন্ত তিনি এই সময়ে আরও গভীর ভাবে পড়া ও লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গৃহে বসেই একদিকে চলে সাক্ষরত শিক্ষা আর একদিকে 'হাট ইয় ফরাসী' কাব্যের অমুবাদ; মৌলিক উপন্যাস প্রভৃতি। তরু দত্তের অবিবাহিত শ্রেষ্ঠ রচনা এই সময়েই রচিত হয়। এর থেকে এই মনে হয়, তিনি যেন মৃত্যুর পদবিনী আগেই স্তন্যে পেয়েছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত রচনা অতি ক্রম এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লিখে শেষ করেছিলেন। এই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই তরু দত্তের রচনা প্রথম ছাপার হরকে মুদ্রিত হয়। একটি ফরাসী কবিতার ইংরেজী অমুবাদ রেজায়েশ লালবিহারী দে সম্পাদিত "Bengal Magazine" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৭৭ খৃঃ) এ পত্রিকায় তাঁর রচিত কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়েই তিনি ফরাসী ভাষায় একখানি মৌলিক উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এই উপন্যাসখানির নাম, "Le Journal de Mmd' Arves" অর্থাৎ 'কুমারী আরভার' এর দিনপঞ্জী'। এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

Steps leading to happy Patients



DEPENDABLE TEST  
QUALITY LENSES  
SCIENTIFIC FITTINGS  
COMFORTABLE FRAMES  
SMART STYLING  
RELIABLE SERVICE

Phone:  
B.B. 1717

CALCUTTA OPTICAL CO  
PRIVATE LIMITED  
45, AMHERST ST. CAL-9

দত্তের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কত বিরাট ছিল, তা এই উপজ্ঞাসীর কথা আলোচনা করেই জানা যায়। ইংরেজী ভাষাকে বলা হয় Common Language বা বিশ্বভাষা অর্থাৎ বিশ্বের বহু ভাষাভাষী জাতিই ইংরেজী ভাষা বোঝেন বা ব্যবহার করেন। এমন কি বিশ্বের অনেক জাতি বাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয়, এমন বহু ব্যক্তি এই ইংরেজী ভাষায় কাব্য, সাহিত্য, উপজ্ঞাস প্রভৃতি রচনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং যশস্বীও হয়েছেন। কিন্তু কয়টি জাতি ছাড়া বিশ্বের আর কোনও জাতি কয়টি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হননি,—কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম জার্মানী বাঙালী তরুণী, তরু দত্ত। তাঁর রচিত উপজ্ঞাসের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে এক কথাই কিছু বলা অসম্ভব। তবে কৌতূহলী পাঠক এই উপজ্ঞাসের বাংলা অনুবাদ পড়ে কিছু অভ্যাস পেতে পারেন। আর বর্তমানে 'মাসিক বসন্তমতী'তেও এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, খেঁচা খরে নিজেরা পড়ে এর বিচার করুন। তবে এই উপজ্ঞাসের ভূমিকা-লেখিকা বিখ্যাত কন্যাসাহিত্যিক, Clarissa এর একটি ছোট মন্তব্যেই বহু আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়েছে, সে হচ্ছে যে—“একখানি উপজ্ঞাস রচনা করেই তরু দত্ত কন্যাসাহিত্যে অবস্থ লাভ করেছেন।” হৃৎকের বিষয়, কোন অনুবাদকই এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরের 'সাপ্তাহিক সবাদ প্রেস' থেকে তরুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "A Sheaf Gleaned in French fields" নামে কাব্যসংকলনটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বহু বিখ্যাত কন্যাসাহিত্যিক কবির রচনা স্থূললিপি ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ হয়, তখন এদেশের সুপণ্ডিত কোন ইংরেজের রচনা। কিন্তু অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের বিষয় যে, ইংলও ও ফ্রান্সের বহু খ্যাতনামা পত্রিকা এই বাঙালী তরুণীর অনূর্ভূত সাহিত্যকর্মের ভূমসী প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে কন্যাসাহিত্যিক Andre' Theuricq এবং ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক Edmund Gosse এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি ইংলণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পর পর কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। অবশ্য কবির প্রথম সংস্করণ ছাড়া আর কোন সংস্করণ বলা সম্ভব হয়নি, কারণ এর পরই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট, প্রতিভার বরপুত্রী, কবি তরু দত্ত পূর্বোক্ত বসন্তমতীতে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একশ বৎসর।

তরুর মৃত্যুর পর, পিতা গোবিন্দচন্দ্র কল্লার কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করে "Ancient Ballads & Legends of Hindustan" নামে একটি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছে, এর মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের কয়েকটি বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখও দেখা যায়। গ্রন্থের কবি-পরিচিতি লেখেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক Sir Edmund Gosse, তিনি কবির অনুবাদ ও মূল রচনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

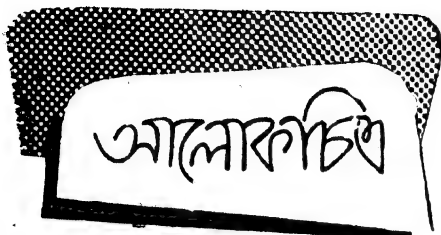
"When the history of the literature of our country comes to be written, there is sure to

be a page in it dedicated to this fragile exotic blossom of song."

কিন্তু গভীর হৃৎকের কথা যে, এতদূর গম্ভীর প্রতিভাটি রক্ষিত হয়নি। পরবর্তী ইংরেজ সাহিত্যসমালোচকেরা এ সম্পর্কে অত্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এতদূর গম্ভীর পরবর্তী বিদেশী সমালোচকের কথা বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ তাঁরা অনেক পূর্বের লোক। কিন্তু আমরা মানে বাঙালী বা ভারতীয়রা? আমরাই কি তরু দত্তের কবিতা-ভাষা বা তাঁর কাব্যের যথাযোগ্য মূল্য বা মর্যাদা দিয়েছি? যেহেতু তিনি বাংলা বা ভারতীয় ভাষায় একটি লাইনও লেখেননি, শুধু মাত্র সেই অপরাধেই আমরা একটা বিরাট সাহিত্য-প্রতিভার সম্পর্কে কি নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়েছি, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। সার্থক সাহিত্য যে দেশ, কাল ও ভাষার দ্বারা গঠিত নীতিমূলক নয়, বিভিন্ন চেহারা ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সার্থক সাহিত্য যে সার্বজনীন ও সর্বকালীন; এই মূল কথাটা আমরা (অর্থাৎ বাঙালীরা, যারা সাহিত্য নিয়ে কম হৈচৈ করি না,) বুঝতে পারি না!—এটাও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু এরকম ক্ষতি কার? লক্ষ্য কোন পক্ষের? যিনি প্রতিভার অধিকারী তিনি, না যারা প্রতিভাকে চিনলো না অথবা চিনতে পেরেও অবহেলায় আজ থাকে বিধ্বস্ত হতে বসেছে? এর উত্তর ভবিষ্যৎ কালকে আমাদেরই দিতে হবে।

কোনও বকম তুলনা না করেও বলা চলে যে, তরু দত্তের প্রতিভার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র যে সকল বাঙালী কবি ও লেখকের মধ্যে দেখা গেছে, তাঁদের সম্পর্কে আমরা কতই না উৎসাহ বোধ করছি। তাঁদের প্রতিভা, কবিতাদান, কবিতা-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি নানা ভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে মোটা মোটা কত কেতাবই না রচিত হয়েছে! অথচ, আজ যে বাংলা দেশে সাহিত্যসমালোচক বা সাহিত্য-বোদ্ধার অভাব ঘটেছে তাও নয়, কিন্তু তাতে কি? আজও তরু দত্তের কাব্য বা জীবনী নিয়ে কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। এমন কি বাংলা ভাষায় কবির একখানিও বিস্তারিত জীবনীও নেই। আর গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও তরু দত্তের সম্পর্কে কোন মূল্যবান প্রবন্ধ বা তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাও আজ আর কোনও পত্র-পত্রিকার দেখা যাবে না। এর একমাত্র কারণ, আত্মবিধ্বস্ত বাঙালী তাঁর নাম, তাঁর কীর্তি সব আজ ভুলতে বসেছে। আর বাদের কানে নামটা পৌঁছেতে, তাদেরও ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয়, তারা জানেন,—“তরু দত্ত। হ্যাঁ, ইংরেজীতে কবিতা-টবিতা লিখেছিল বটে!” ব্যস, এই পর্যন্ত, তাঁর বেশী নয়।

সেই জন্য এই কয়েক মাস আগে, কবি তরু দত্তের জন্মশত বার্ষিকী দিবস, হৃৎকরণের বাঙালীর হাত এড়িয়ে নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আপসার সাফু লার রোডে সি, এম, এস সমাধি ক্ষেত্রে, (প্রবাসী অফিসের বিপরীত দিকে) সেদিন তরুণী কবির সমাধিতে একটিও ফুল পৌঁছায়নি। হয়তো সেই কারণেই, কবি তরু ও তরু দত্তের সমাধি দেশবাসীর অবজার ও অবহেলার হস্তেই হতমান হয়ে আপাছাড়ি মধ্যে আত্মবিস্মৃতির পথ খুঁজছে।



সমাহিতা  
—নিখিল দত্ত



—মেঘদত্তা রায়  
যা ছিলেন



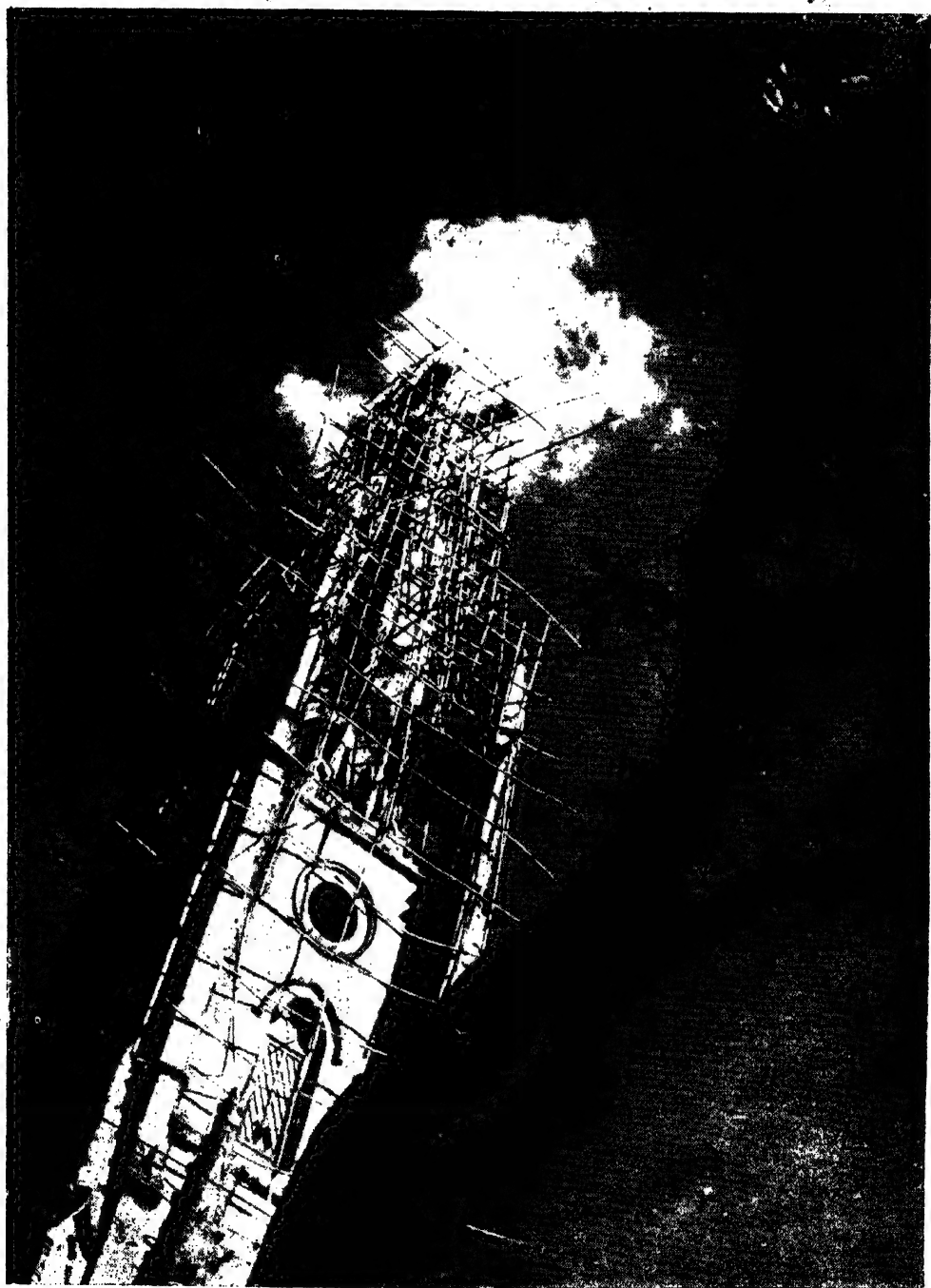
—মেঘদত্তা রায়  
যা হইয়াছেন





দাঁতের লড়াই

—রথীল দাস



মাটির ফসল

—জীবনক চট্টোপাধ্যায়

নৌ ও নাবিক (মরু, রাশিয়া)





# ক্যালেক্টিক্যাল ক্যান্ডারাইডিন কেশ তৈল

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল ও অত্যন্ত উত্তম তৈল  
সংমিশ্রণে এবং ক্যান্ডারাইডিন সহযোগে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ স্তম্ভুর  
গন্ধে সুসজ্জিত। কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও  
অরামাস নিবারণক।

৫ আউন্স স্ফূটন আধারে পাওয়া যায়।

- নানারকম খোঁপার ছবি সহ “কেশবর্তী” পুস্তিক।  
চিঠি লিখলে পাঠান হয়।



দি ক্যালেক্টা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৩



### খাত্তা হিসাবে দুধ

খাত্তাখাবার হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্বাধিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে সব দেশেই। শিশুদের জন্যে দুধ না হলে একরূপ চলেই না—ওদের জীবনরক্ষা ও দেহপুষ্টির নিমিত্ত এইটি প্রায় চিরকালই অপরিহার্য।

খাত্তাখালিকার দুধের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম পর্ষায়ে। এইটির প্রধান কারণ, এতে খাত্তাপ্রাণ যেমন রয়েছে প্রচুর, তার চেয়েও বেশী—অল্প সব জিনিস থেকে এ সহজপাচ্য। বিলেতী চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরাই পরীক্ষা করে দেখেছেন—যেখানে কুটি হজম করতে একটি স্তন্য মাতৃদেহের দু' ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় প্রয়োজন, সেখানে এক গ্রাম দুধ হজমে সময় দরকার মাত্র এক ঘণ্টা। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ আরও বলে থাকেন—দুধ নাকি চুবে ধীরে ধীরে খাওয়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি পান করা ভাল। কারণ এতে পাকস্থলীর হজমশক্তির সহায়তা হয় অনেকখানি।

দুধের মধ্যে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে, তুলনায় এইটি হজম করাই সবচেয়ে সহজ। এর ভেতরও আবার গরুর দুধ অপেক্ষা গাভী-দুগ্ধে স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী। খাত্তাপ্রাণ বিচার ফলে শীতকালীন আর গ্রীষ্মকালীন দুধ একরূপ থাকে না। উত্তরালীন দুগ্ধে ভিটামিন 'ডি' বেশ-পরিমাণে থাকে, তার চতুর্থাংশ ভিটামিন পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালীন দুধে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক গ্যালন (গড়পড়তা হিসাব) গো-দুগ্ধে ক্যালরি বেশ থাকে ১৪৪ আউন্স, ৬০ আউন্স প্রোটিন, ১৫ গাউন্স জিনি ও ১৫ আউন্স খনিজ পদার্থ। দুধে কি কি উপাদান আছে, গবেষণাপায়ে পরীক্ষার দ্বারা পড়েছে সে সবই। কিন্তু তাই চলকৃত্রিম দুগ্ধ তৈরী করা এখনও সম্ভব হয়নি বা করার সকল প্রয়াস ব্যর্থই হয়েছে।

বাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কৃত্রিম বহুদিন পূর্বেও খাওয়া হয়। এই রীতি প্রাচীন কাল থেকেই যথুযা সমাজে প্রচলিত আছে। মার্কো পোলোর এক নির্ভরযোগ্য বিবরণে জানা যাচ্ছে যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে মঙ্গোলরা খুবই পিঠে লোক-প্রিয় খাবার হবার সময় সবে শুরু করে। দুধের ভাল বাখণ্ডে। এক সপ্তাহে তারা সব খণ্ড করে একটি চাকড়ার ঠেসে জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিজে এবং বোতলটি খুলিয়ে দিতে

চলতি অবস্থার খবরের পিঠে লবান জীনের সঙ্গে। এই ভাবে খুঁচি মাইল খাওয়ার পরই দেখা যেতো নাড়াচাড়ার বোতলে জিনিবটি অবিকল ভেঙে পড়িত। হয়েছে এবং পানেরও সম্পূর্ণ উপযোগী। তবে তখনকার দিনে শুধু দুধ কিভাবে করা হতো মার্কো পোলোর বিবরণে তা জানা যায় না।

গরুর দুধ দোহনের আগে কোন কারণে দাবড়ি দায় তবে অনেক ক্ষেত্রেই দুধ কম মিলে বা একবারেই পাওয়া যায় না। পুষ্টিবেশ বা দুগ্ধ দোহনকারীর রক্তবলের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এই ভাবে দেখা গেছে সকল দেশেই লক্ষ লক্ষ গ্যালন দুধ নষ্ট হয়ে গেছে। গাউ-গরুর থেকে দুধ যদি উপযুক্ত পরিমাণে পেতে হয়, তবে তার প্রতি অত্যধিক বড় প্রয়োজন। গোয়ালকে আপন ভাবে গৃহস্থ করলে এবং সেভাবে খাত্তা জল মিলে, তার অন্তরের স্নেহ দুগ্ধাকারে বিগলিত হয়ে আসবেই পূর্ণপূর্ণ মাত্রায়।

বসন্তে কি, দুধ হচ্ছে অমৃতের সমতুল্য। শিশু দুধক, বৃদ্ধ সকল বয়সের লোকের পক্ষেই ইহা উপকারী। পরীক্ষারই একটি কল—প্রতি পাঁচজন একজনকে হজম দুধ হজম হ'ল না এবং ১৫ জনের ভিতর মাত্র একজনকে শরীরে হয়তো এর ফ্রিগা হ'ল অন্তরূপ। কিন্তু সর্বাধিক উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাত্তা বসন্তে দুধের মধ্যদ্বারা কোন ক্রমেই কমবে না, ইহা নিশ্চিত।

### অব্যবহার্য টিন পুনরুদ্ধার

সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অব্যবহার্য টিন প্রচুর পরিমাণে পড়ে থাকে। টিনের তৈরি কোনটিতে করে গৃহস্থের ঘরে আসে নানান ভেল, মাখন, সংরক্ষিত মাছ, জাম ও তেলি, গুহপত্র এবং নানাবিধ রক্তক ও বাসায়নিক দ্রব্য। এ ছাড়াও বড় বড় টিনে করে আসে কেবোসিন তেল, দালনা, পেট্রোল প্রভৃতি। ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি বেচ করে নেওয়ার পর টিনের এই পাত্রগুলি সংসারে সাধারণত অব্যবহার্য আবর্জনা রূপেই পড়ে থাকে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পে টিনের চাহিদা বাড়েই যেতেছে। টিনের তৈরি বিভিন্ন আকার ও আয়তনের পাত্র ছাড়াও টিন থেকে তৈরি হয়, ট্যানাস ও ট্যানিক ক্রোমাইড, টিন্ ডাইকসাইড প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বাসায়নিক দ্রব্য। এ ছাড়াও লৌহ দ্রব্যের ওপর টিনের একটা পাতলা আবরণ দেওয়া হয়। আবার ব্রোজ, বেল-মোটাল প্রভৃতি কয়েকটি মিশ্র ধাতু তৈরির কাজেও টিন ব্যবহৃত হয়। শিল্পে টিনের এই গুরুত্ব অনেক ব্যবহার আছে। টিনের এত ব্যবহার হয়েছে অথচ আমাদের দেশে এই ধাতুটি পাওয়া যায় খুবই অল্প পরিমাণে। এ অবস্থায় অব্যবহার্য টিনকে আবর্জনা রূপে ফেল রাখা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে দেখেছেন, এই অব্যবহার্য টিনের দ্রব্যগুলি থেকে বিশুদ্ধ টিন পুনরুদ্ধার করে তাকে আবার বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করা যায় কি না। বিজ্ঞানীরা এ কাজে সাফল্য লাভ করেছেন। তাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত টিনকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

কেলে দেওয়া টিনের কুপের মধ্যে শুক ক্রোমিন গ্যাস প্রস্তুতি করতে থাকলে টিন এই গ্যাস কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাসায়নিক কিছুর সাহায্যে 'টিন-টেট্রাক্লোরাইড' নামে একটি তরল পদার্থে পরিণত হয়। বাক্স সম্পর্কে এসেই এই বাসায়নিক দ্রব্যটি থেকে পোঁতা কেবোনে



থাকে। এই জিনিষটি কলে সহজেই জবীকৃত হয় এবং এই অবশেষে কিছুক্ষণ ধরে ফেলে রাখলে তা থেকে স্মৃতি হয় হাইড্রোটেড অর্থাৎ জলমুক্ত লানাদার "থ্যানিক-অক্সাইড"। এই "থ্যানিক-অক্সাইড" রপ্তানি শিল্পে এবং কৃত্রিম রেশম শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ফেলে দেওয়া টিনকে এই ভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে থ্যানিক-অক্সাইডে পরিণত করে শিল্পে নিয়োগ করা যায়।

অপর প্রক্রিয়া : এই প্রক্রিয়ায় অব্যবহার্য টিনের ত্র্যণ্ডলিকে চূর্ণ করে প্রথমে খুব ভাল ক'রে আসিড এবং কক্টিক সোডা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং পরে ঐ ভিজা ত্র্যণ্ডলিকে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এইবার এই পরিষ্কৃত এবং শুকনো টিনের চূর্ণ ত্র্যণ্ডলিকে লোহার তৈরি বড় বড় চোতাগুলি পাত্রের মধ্যে ভর্তি করে ঐ পাত্রের মধ্যে ৫৪ পাউণ্ড চাপে শুষ্ক স্কোভিন গ্যাস প্রবাহিত করা হয় এবং পাত্রের মধ্যেকার উত্তাপকে ৩৮° সেন্টিগ্রেডের বেশী উঠতে দেওয়া হয় না। এইবার ধীরে ধীরে পাত্রমধ্যস্থিত গ্যাসের চাপ কমতে থাকে এবং চাপ কমার সাথে সাথেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

যখন গ্যাসের চাপ আর কমে না, তখন চাপ-নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা এক ভায়গার স্থির হ'লে থাকে এবং তখনই বোঝা যায় যে, পাত্রমধ্যস্থিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্ত হয়েছে। এই সময় অতিরিক্ত গ্যাস বের করে নিয়ে পাত্রমধ্যস্থিত টিনের টুকরোগুলিকে জল সেলে দেওয়া হয়। তাতে করে টিন অক্সাইড পৃথক হয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়াটি হলো সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া এবং এতে খরচও কম পড়ে।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে টিন পুনরুদ্ধার করা যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিচালক টিনের ত্র্যণ্ডলিকে পুরোস্ত প্রক্রিয়ার পরিষ্কার ক'রে নিয়ে চূর্ণ ক'রে ফেলা হয় এবং ঐ চূর্ণকে তারের জাল দিয়ে তৈরি একটি সিলিণ্ডারে ভর্তি করা হয়। এই চূর্ণাকৃত টিন-ভর্তি সিলিণ্ডারটিকে কক্টিক সোডা ও কক্টিক পটাশের ত্র্যণ্ড পূর্ণ একটি বড় চৌবাচ্চার মধ্যে রেখে যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরান হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে এক পাশে রাখা হয় একটি বিদ্যুৎ টিনের প্রোট। এই টিনের প্রোটটিকে করা হয় নেগেটিভ ইলেক্ট্রোড এবং জালের তৈরি সিলিণ্ডারটিকে করা হয় পজিটিভ ইলেক্ট্রোড। ডায়নামোর সাথে এই দুটি ইলেক্ট্রোডকে যুক্ত করে দিলে সিলিণ্ডারের মধ্যে দিয়ে চৌবাচ্চার তড়িৎ-স্রোত চুকে বিদ্যুৎ টিনের প্রোটের মধ্যে দিয়ে ঐ তড়িৎ-স্রোত বেরিয়ে এসে ডায়নামোতে ফিরে যায়। এই তড়িৎ প্রবাহের ফলে জালের সিলিণ্ডারের মধ্যে থেকে টিনের অণু বের হ'লে চৌবাচ্চার মধ্যস্থিত ত্র্যণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শেষে অণুগুলি ক্রমাগত জমতে থাকে বিদ্যুৎ টিন প্রোটের ওপর। অনেকক্ষণ যাবৎ তড়িৎ প্রবাহিত ক'রলে বিদ্যুৎ টিন প্রোটের ওপর বেশ পুরু হয়েই বিদ্যুৎ টিন জমি যায় এবং তখন তার থেকে চেঁচে বিদ্যুৎ টিন উদ্ধার করা হয়।

উপরোক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সাধারণত টিন পুনরুদ্ধার

মারী স্টোপেস  
বিবাহিত  
প্রেম

অনুবাদ : কল্পনা রায়

"Prevention is better than cure.

বিশেষে ডাক্তাররা অন্তর্গত বিবাহের দাওয়াই হিসাবে Prescribe করেন Marie Stopes-এর Married Love বইখানা। আগে থাকতে সেতুবন্ধের মূলমন্ত্র জানা থাকলে আর জাবতে হবে না, বিবাহ দুটি স্থলর মিলিয়ে দেয়, কিন্তু সেই মিলটা কোথায় খুঁজতে খুঁজতে আজীবন কেটে যায় কেন। আশনাদের জীবন রূপে রসে বর্ণে মানুষের ডায়রে ভুলতে সাহায্য করবে 'বিবাহিত প্রেম' বইখানা।"

১৩৬২ সালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ  
ত্রিভূলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
প রি ক্র মা — ৩১

রূপ সত্যের আন্তর্জাতিক প্রতীক,  
প্রকৃতিবাদের নায়ক  
এমিল জোলা  
বহিষ্ ৩১০ রেণার প্রেম ৪১  
বৈদেহী ৩১০ স্বপনচারিণী ২৫০

রবীন্দ্রনাথকেও যে গ্রন্থ অভিজ্ঞত করেছিল  
ব্যারনার দ'ন দে সাঁ পীয়ারের  
পল ও ভিজিান — ৩১

জগতের গুরুত্ব মোপাসাঁর  
মোপাসাঁর একাদশ ৩১০

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তরেখাবিধ  
কিরোর  
হাতের গোপন কথা ৩১

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ  
ক্রিকেট মেদার ডম জ্যোতম্যামের  
ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ ৪১

বার্লভার্ক

তোনাম  
মোহোটি

"বহুশ্রম দ্রুত সঞ্চারণশীল এ কাহিনি  
নিঃসন্দেহে বালভার্কের রচনাবলীর মধ্যে  
সর্বাপেক্ষা উত্তমক।"

The Library of world's best books.

"ছলনা ও কামনার যে চিত্তাকর্ষক কাহিনি  
মূলগ্রন্থে পাওয়া যায়, বাগদাদী পাঠক সমাজের  
জ্ঞাত গ্রন্থাকরুর ভাটগাওঁর অনবদ্য অমূল্য  
মূল্যের ভাবধারা এবং নিকটবর্তী রহস্যময়  
পারবেশটিকে অস্বপ্নে রেখেছে।"

কিরোর  
আপনি কবে জন্মেছেন (বয়স)  
Cheiro-র When were you  
born-এর অনুবাদ।

আর্ট স্ট্যান্ড লেটাল পাবলিশাল—অবাকুস হাউস, কলিকাতা-১২

করা হ'লে থাকে। যদি এই কাজে প্রচুর পরিমাণে অধ্যবসায় টিনের জ্বা সরবরাহ পাওয়া যায়, তবে তার থেকে টিন পুনরুদ্ধারের কাজও বেশ ভাল ভাবে চালান যায়, কিন্তু চাহিদা অল্পব্যয়ী পরিমিত অধ্যবসায় টিনের জিনিষ সরবরাহ না পেলে এ ব্যবসারে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। দেশীয় শিল্পপতির টিন পুনরুদ্ধারের কাজে লিপ্ত হ'লে বেশ ভাল ফল পাবেন বলেই আশা করা যায়।

—অমরনাথ রায়

### অল্প পুঁজিতে ব্যবসায়

বয়স্কদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্তে মোটা পুঁজির দরকার কিন্তু সে পুঁজি সংগ্রহ ইচ্ছে থাকলেও কলনার পক্ষে সম্ভব হয়? অবশ্য জীবিকার জন্তে, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্তে এখনও অনেক ব্যবসা করা যায়, যাতে তত বেশী পুঁজির দরকার করে না। এর ভেতর কতগুলো বিশেষ 'বার' বা খাবার-দোকানের কথাই বলা চলে—বাসের স্ট্রু পরিচালনার সাফল্য নিশ্চিত।

বিলেতে ছোটখাট অথচ লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে পনের হাজার খাবারের 'বার' বা দোকান দেখতে পাওয়া যায়—সেখানে শুধু চাককি প্রস্তুতি পানীয়ই নয়, বিভিন্ন খাতখাবারও সরবরাহ হয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। এদের ব্যবস্থা সবই বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ নামেই এরা পরিচিত। প্রত্যহ কত নবনারী এসে এ সকল কেন্দ্রে ভীড় করে, শরীরকে চাঙ্গা করে বাড়ী ফিরে যায়, ইহুতা নেই।

বিলেতের এ খাত সরবরাহ 'বার'গুলো পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্য—এ জগতে নারী কর্মচারীই বেশীভাগ। এর একটা সুবিধা মালিকের পক্ষ থেকে—পুরুষ কর্মচারীর চেয়ে মেয়েদের হাস মাহিনা দিতে হয় অনেক কম। মূলধন বলতেও এই শ্রেণীর বিপণির জন্তে অস্বাভাবিক কিছু একটা দাবী নেই। এতে চাই চাককি তৈরীর জন্তে সরঞ্জাম, একটি রিক্রিজারেটর, মাটির বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও খাবার বিক্রয়ের জন্ত 'য়েন্টার', কেবিন, কাস্কেটেরিয়া এসব ক্রমেই অধিক সংখ্যায় গড়ে উঠছে। এখনও যে এই শ্রেণীর ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা এখানে

প্রচুর, সে বলাই বাহুল্য। পুঁজি বা মূলধন এ সকলের জন্তে বিরাট কিছু নিশ্চয়ই চাই নে, বিশেষ ভাবে বোট চাই সে হচ্ছে—উভাসীপনা, অধ্যাহত উদ্ভব ও অধ্যবসায়। অল্পসংখ্যের ভেতর অল্প পরসার পরিবর্তে অধিকসংখ্য লোককে কিভাবে পরিতৃপ্ত করা যেতে পারে, ভাবতে হবে এই সমস্ত গভীর মনোযোগ সহকারে।

'মিষ্ণুবার' বা দুধ বিক্রয় কেন্দ্রও গড়ে উঠছে আমাদের সহরগুলিতে কিছু সংখ্যায়। এইটিও একটি অল্প মূলধনে ভাল পরসার ব্যবসা বলা চলে। দিবসান্তে এক কাপ 'চা' যেখানে চাই, সেখানে এক শো-আথ শো খাটি গরম দুধ পাওয়া গেলে কিনিতে লোকের অভাব নিশ্চয়ই হয় না। শুধু শারীরিক পুষ্টির প্রসঙ্গই নয়, স্বচির জন্তেও আমাদের দেশের নরনারীরা দুধের বড় ভক্ত। সুতরাং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে দুধের দোকান খুলে বসলে সম্ভাব্য হবে আসবেই। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন বোটি বড়রকম, সে হচ্ছে ব্যবসারে তুচ্ছতা ও পরিবেশে স্বচ্ছতা সুরক্ষণ।

শ্রীত-প্রধান রাজ্য বিলেতে 'মিষ্ণু বার' বা দুধের দোকান আরম্ভ হয়েছে খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়। এমন কি, ১৯৩৫ সাল অবধি 'মিষ্ণু বার' বলতে কিছু ছিল না লগুনের রাজ্যপথে। বৃটিশ মিষ্ণু মার্কেটিং বোর্ড এ ব্যাপারে যখন এগিয়ে এলেন, তখন থেকেই সেদেশে স্থাপিত হয়ে চলে বহু দুধ বিপণি বা দুধ বিক্রয়-কেন্দ্র। আবার দুধ যখন আরম্ভ হলো, তখন দুধের সরবরাহ কমে যাওয়ায়, সেই সব দোকানগুলোতে অল্প সব খাবারের ব্যবস্থা হয়। চা, কফি প্রস্তুতির বার বা দোকানের মতো আইসক্রীম, সোডা, সরবত—এ সকল বিক্রয়ের কাউটারও সেখানে পাওয়া যায় লগুনের রাজ্যের অসংখ্য। আমাদের দেশেও এই জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা উপেক্ষা করা চলে না। অল্প পুঁজিতে বা মূলধনে জীবনোপার্জের ব্যবস্থা এই সব নানা দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে চলতে পারে, এইটি পরিষ্কার। দেশের লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ও সমর্থনের দাবী উঠে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। অপর দিকে সরকার যদি সত্যি জাতীয় ভাবাপন্ন হ'ন এবং জাতির স্বার্থেই কাজ করে যান, তা হ'লে আশা করবারও থাকে অনেকটা।

### মানসগঞ্জ

#### রত্নীন চট্টোপাধ্যায়

এ-পায়ে মারামাটির চর, ও-পায়ে ছায়া নাচে  
তমাল-তালের পাতার পাতার। ডাঙ্কল অবিদ্রাম  
চলেছে তার দীর্ঘকল্প কালা গেরে। গ্রাম  
রাস্তালীন অঁচল মেলে শুধু হ'য়ে আছে।

এ-পায়ে সরসরীর্ণ বট, ফটিলধরা বাটে  
দৌলো নেই, বাজী নেই। খেয়ায় মাঝির মন  
ছড়িয়ে আছে সজ্জা কাজে। জোয়ার অনেককণ  
কিরিয়ে নিলে ঢেউয়ের দল। পাখ্যপ্রায় ধাঁটে।

ভাবনা ভালাই নিরুদ্দেশের আকাশে মন মেলে,  
বসিও দিন ধূসর হোসো, সন্ধ্যা ও-পার থেকে  
ছায়া ছড়ায়। ব্যগ্রনীড় পাখিরা শেষ থেকে,  
কখন গেছে চলেই, শুধু সকল কাজ বেলে।

একলা আছি বিবাসী এই নদীর পারে বাসে  
তুসেই যদি কখনো কোনো যত্নের সঙ্গে আসে।



ভিটামিন যুক্ত

কোলে

**HP**

বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লি., কলিকাতা-১



পুষ্টিকর স্বাদ সচ্ছন্দ

খনিজারাকট

মেরী

পেটিটবারো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সলজী

যার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।



### টুঙ্গর গান

মানুষের বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট পর্ব 'টুঙ্গ'। এই উপলক্ষে সীত টুঙ্গর গান একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক সঙ্গীত। প্রেয়ারপ সজ্ঞাতি হইতে পৌর বা মকর সজ্ঞাতি পর্বন্ত এই মোসাম টুঙ্গ গান গাওয়া হয়।

বাঙলা দেশে 'তুহল তুহলী' বা 'তোবলা' ব্রতেরই রূপান্তর টুঙ্গ। তোবলা ব্রতের সঙ্গেও অজ্ঞাত ব্রতের জার এক প্রকার গান আছে; কিন্তু সে গানগুলি ব্রতকথার আত্মবিক্রম মন্ত্রগান মাত্র। যেমন, তুহতুহলী কাঁখে ছাতি। বাপ-মার ঘন বাচা বাতি। বাপীর ঘন নিরুপতি। বাপের ঘন কাছাকাটি। (আর) পুত্রের ঘন পরিপাটি।

তুহলী গো মাই। তুহলী গো মাই।

তোমার পুজার আমি কি বর পাই?

আলিঙ্গন যত্নিত একটি হৃৎপাত্রে গোবরের গুলি সাজাইয়া তাহার ঊপর নবাবের ধানের তুহ, সরিষা এবং শীতকালীন ফলফল সাজাইয়া দেওয়া হয়। সারা মাস ধরিয়া কুমারী মেয়েরা দিনের পরদিন তাহার সমুখে পুষ্প অর্ঘ্য সাজাইয়া, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জালাইয়া পান গাছিয়া তাহাকে সবচেয়ে ঘুম পাড়ায়। ইহাকে বলে 'টুঙ্গ হুলাদো,' এই শ্রেণীর গান—

টুঙ্গ হুল হুল হুল গো, ভাল তুলসীর ফুল গো।

আঙু বার মা হাতী খোড়া, পিছু বার মা বারি।

কাঁথির চলায়ে মোরা চলিতে মা গাছি গো।

একত পলক, এই তুহ ব্রত নবাবেরই উৎসব, ইহার মাধ্যমেই পিকানের বলে অকাল-বাৎসল্য ভাবের উদ্ভব হয়। সন্দের ঘরের ঘর শিকলও ভাঙায়া এই ব্রতের মাধ্যমেই প্রথম প্রহা করে—

আলা গো তুহতুহরি ঘরে বাইরে গাইগুলি

পোয়ের পোষকের সমস্তের ফুল;

আমরা পুছি গো মা-বাপের ফুল ॥

টুঙ্গ কুশিলম্বারই পুজা। পোয়ের নবাব সুরভিত পূহ প্রাক্ষণ চকলা গুললারীরা তুহ হাড়া কাহার পুজা করিবে?

বাঙলা দেশের এই ব্রতই মানবদেহ ও মনুষ্যের প্রেমাবিত হইয়াছে। মানুষের পিয়া টুঙ্গ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মানবদেহের মন কলে কলেমের পুজার বিধিবিধানের কিছু পার্থক্য আছে।

এ অঞ্চলে বরষা বিবাহিতা মেয়েরা টুঙ্গকে সন্তান কামনা করিয়া আরাধনা করে।

পোয়ের প্রথম একটি সবার নবাবের মানকলাট, হৃৎ প্রভৃতি মাথিয়া চাপা দেওয়া হয়। লক্ষী পুজার প্রলোভিত তাহা স্থাপন করিয়া সারা মাস ধরিয়া, তাহার পুজা করা হয়। বিসর্জনের সমারোহ ঘটর আয়োজনের ভিত্ত অনেক স্থলে আবার সজ্ঞাতির আগের দিন একটি প্রতিমা স্থাপন করিয়াও টুঙ্গ পূজা হয়। যেভাবেই এই প্রতিমা লক্ষীপ্রতিমার অনুরূপ পরিকল্পিত হয়। প্রতিমা পা কাঁক করিয়া কোমরে হাত দিয়া এক বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকে; প্রতিমার এই দাঁড়াইবার ভঙ্গী বেন সেবীদ অপেক্ষা সর্বাধিকই মৃদুনা করে।

পূর্ব বছরের 'সহেলা' গানের ভাৱ টুঙ্গ গানের মাধ্যমেও বালিকায়া কুশিলম্বার সঙ্গে সখীত্ব পাতায়, সবীকে কি দিয়া পরিভূতি করিবে তাহার একটা বড় কিস্তি দাখিল করে—

আজ আমাদের শানলা ফুল ডালা

বহন দিলে হর মজা।

টুঙ্গ তোকে ভাব করেছি, বড় দারে ঠেকেছি।

ইলসা মাছের ফলসা দিয়ে মেথি দিয়ে ভেজেছি।

টুঙ্গ গানের সঙ্গে ভাৱ গানের সামুদ্র লক্ষ্যীয়, একই ঢঙ একই স্বরে উভয় শ্রেণীর ছড়া গাওয়া হয়। মানকুম ও তৎসলার পশ্চিম বছরের বহু অংশে টুঙ্গ ও ভাৱ পুজা একান্তক হইয়া গিয়াছে। আবার টুঙ্গ পুজাও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধরিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মাটি দিয়া ছোট পুতল গড়িয়া তাহার পুজা করা হয়, আবার অনেক অঞ্চলে বমপুত্র ব্রতের জার ছোট গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে ফল ঢালিয়া পুজা করে, কোথাও আবার ভাৱ জার হলুদবর্ণের প্রতিমা সাজাইয়া তেগ অর্পণ করিয়া তাহার পুজা হয়। এই সকল পুজারই মন্ত্র টুঙ্গর গান, গানের বিষয়বস্তু অঙ্গলার, বহুস্বানের মুখে সঙ্গারের যে সকল কথাবার্তা হয়, সেগুলিই বেন তালিকার জার সুর করিয়া বলা হয়, যেমন—

হলুদবনের তুহ তুহি হলুদ কেন মাখ না?

শাওতী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।

ও তুহর মা, ও তুহর মা, তোদের কি কি ততকারী?

এ শালারি ক্ষেতের বেগুন, এ কানারি গুলি।

মানকুমারীবালায় বিচিত্র টানে ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমের দ্বারা মেয়েরা এ সকল গানে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ সকল গানের মধ্যে বেন একটা কল্পনা-বিগলিত স্নহর কামনার সুর জড়িত আছে, সামান্য তুহু কথায় কি ভাবে বেন অপূর্ণ আবেগের সূচনা করে—

একলা ঘরের বড় ছিল চকলা মন কে ক'রে দিলি?

পুতলিয়ার সূর চানর উড়ে গেলে ঘর না।

বার সাথে বিচ্ছেদের কথা, প্রাণ গেলে বা কাড়ব না।

এক পোরা হুহরি নিয়ে চাপব কলের পাড়িতে।

মা জননী কান্দবে বধন বুকাবি ভাই সবাই দিলি।

দখির স্বর সন্তান বালিকার সবার হইয়া বিশেষ কিছু তো

গায়ে না, তাহাদের বাসনা সামান্যই—

আমরা টুঙ্গ একটি ফুলে ফুল ভোলে বই ফলে না।

কোন বিড়ালী দিল বুসো গানের বহন ফিল না।

মাগো আমার বুঝা মাথা এক পোরা তেল কই পাব ?

পাঁচ তাঁকার মাল পাব কোন বাজারে নামাঝো ।

বাঙলা দেশের সাধারণ গ্রামবাসীদের মতই বুদ্ধন্তর বাঙলার দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনের চুখ-দুর্দশার অস্ত্র নাই । যেন্নের তাহাদের চুখ-দুর্দশার সকল আক্ষেপ টুহুর গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করিতাছে । বিশেষতঃ, টুহুর অবলা নারীদেরই শরণা, তাহাদের প্রাণের আবেগনও টুহুর গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ।

বালিকা বধূর মন বহুদিন শিখালয়ের জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতাছিল, বহুদিন পরে এই পূর্ব উপলক্ষে তাহার আগমন হইয়াছে, কিন্তু অভিমানের বেদনা তাহার ঘটে নাই—

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা খুন্সর ঘরে,  
পরের মা কি বেদন বুঝে, অন্তরে কেড়ে মারে,  
এমন মন বলে

উড়ে যাবে বউস রানো মায়ের কোলে ।

বালিকারা আসন্ন স্বর্শশাসিত পতিগৃহবাত্মর আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে । এই শঙ্কার সঙ্গে যে একেবারে আনন্ড "নাহি তাহা নহে, তবে সে সঙ্গে আছে শিখালয়ের চুখ-দুর্দশার স্থিতি—

মনে করি পরকুল হাব, পরকুল হাওয়া হ'ল না ।

এ বছর যেমন-তেমন আর বছর আর থাকব না ।

ও রামের মা, ও রামের মা, দেখ না রামের দুর্দশা ;

বস্ত্র বিদ্রু গাছের বাকড, তেল বিদ্রু মাথার জটা ।

জলবয়সী বালিকারা গানের মাধ্যমে বিবাদ বিসংবাদও করিয়া থাকে । টুহুর পুলা তো প্রতি ঘরে ঘরেই হয়, এই পুড়ে প্রতিবেশিনী-দের মধ্যে বসকলত শুভ হয়—

আমার টুহুর মুড়ি ভাজে, কীকন বাজে চাত্তে লো ।

তোদের টুহুর জাকামাগী আঁচলে পেতে জাগে লো ।

আমার টুহুর চিঁড়ে কোটে লালান কোঠার উপরে ।

তোদের টুহুর গরবাখাকী আঁচলে পেতে লর মেগে ।

এই সকল তর্জার লড়াই-এর সঙ্গে অজান্তে সখীরা সমবেত কণ্ঠে ধ্বা ধবে—বাঁধন বাঁধজোড়া তাকে কে দিল যে কালকড়া ।

সঙ্গে 'ত্রা তিন ত্রা তিন' বাজে মালল, সাধারণতঃ এ বাজনাও যেন্নেরাই বাজায় ।

টুহুর গানের মাধ্যমে ছোট ছোট পালা গানেরও অভিনয় হয় ; এই সকল গানের নাটকীয়তা রীতিমত উপভোগ্য । একজন বালিকা কুটিলার অংশ গ্রহণ করিয়া আয়ান খোবকে বলে—

দাদা দেখবে চলে ।

বউ গালালো, কি বুছি করি বলে ।

বাঁশীর ঠারে রইতে নারে গো তাড়াতাড়ি ছুটি ।

না মানিল লো আমার মানা, গালিগালাজ করিল ।

লাজ লজ্জা শরম ভরম হে সবই সে খোয়ালো ।

অপর একটি বালিকা আয়ানের জবাবীতে বলে—

পেছন ঘর কুটিলে, ঘর যে কুটিলে ।

সোজাশুষ্কি ছুটে চল কদমতলে ।

দেখি সে পোয়ালো হোঁড়া পালাবে কেমন ছলে ।

কি ভাবে পাঁচা বসি, দেখি গো তুই লজবে ।

আয়ান ঘোষ ও কুটিলাকে আসিতে দেখিয়া কদমতলে বিকৃত রাধা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে—

হের তের কালা ।

কদমতলে আসিতেছে ঘোষ আর ঘোষের বালা ।

কি করিব, কোথা যাব হে, বল বল এই বেলা ।

অনেক দূরে আছে তারা, আসুলে পড়ে বিবদ্বালা ।

ঐক্যকণ্ড তখন ভয়ে আকুল হইয়া বলে—

ভয়ে অঙ্গ ধরখর হে, করিব যে কিবা লীলা ।

ছাড় ছাড় হস্ত ছাড়রে, ভবে করি জলে খেলা ।

কেবল বাধাক্ষেপে কাঁহনই নয়, রামায়ণী কথায় টুহুর গানের অজ্ঞতম বিষয়বস্তু । কথকতা, পাঁচালী ও বাজাগানের মাধ্যমে কুকলীলা, কুকপাণ্ডবের যুদ্ধ এবং সীতাহরণ উপাখ্যান প্রত্যন্ত বজের নিশ্চুত পল্লীর গৃহস্থ বৃন্দদেরও সুপরিচিত ছিল, তাহারাও নিজেরেই রচিত ঘরোয়া-গানেও কথায় কথায় এই সকল কাহিনীর পুনরাবৃত্তির করিত ।

বাধা দণ্ডকারণো সীতাকে হরণ করিতে আসিয়া তাহার অপকণ রণলাবণ্য দেখিয়া প্রাণ করিতেছে—

তুমি কার কুমারী ?

পরিচয় দাও গো তোমার প্রাণ করি ।

সীতা অতিথিকে বিনীত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিতেছেন—

আমি রাজনন্দিনী,

জনক জনক সহ হে বহুব্রহ্মা জননী ।

দাদলে জনম আমার নাম সীতা ঠাকুরাণী ।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আছে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা  
খুবই আন্তা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়াকিনের  
১৮-৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অস্তি-  
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে ।

কোন বছরের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার  
জন্ত লিখুন ।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এল্‌গ্যান্সেড ইন্সট, কলিকাতা - ১

মিথিলা শিতারি বাঁকা বে ধরখাতা ধরনী,  
অবোধার কুপতি বস্তুর দশরথ নৃপমণি ;  
স্বামী আমার রামচন্দ্র বৃষমণি ।

টুঙ্গব বিসর্জন হয় মকর সক্রান্তির দিন । এই দিনের গান  
যেন টুঙ্গব বিজয়া গীতি । বালিকারা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে  
টুঙ্গ তালাইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে—

আমার টুঙ্গ ঘনে ।

বিহার দিয়ে ঘরে বাবো কেমনে ।

হাসাববি আজ টুঙ্গ ঘনকে গুজ্জিহি অতি বতনে ।

তাহারে বিহার দিলাম আজি এই মকর দিনে ।

শাখা শাড়ী সিলুর দিলাম গো, আলতা দিলাম চরণে ।

যনে দুঃখ হয় বড়, ফিরে বেতে ভবনে ।

কাছ গানের ভার টুঙ্গ গানেরও আগমন, জাগরণ, পূজা, ভাসন  
প্রকৃতি পালা ভাগ আছে । টুঙ্গব আগমনী গান তো রীতিমত  
আনন্দের আলোড়ন, এ সকল গান মনেই সুখাতের ও বেশভূষার  
কিরিতি—

টুঙ্গপূজার বাজার ।

বোদরলী-শাড়ীর জুয়ে বাব গো হাওড়ার বাজার ।

গায়ো ব্লাউজ কিনব হাটে গো, কিনব চুড়ি বিলবাহার ।

বাগবাজারের বসগোলা গো, ভাষবাজারের দানাদার

কলমলাপি কিনব সকল, দেখে ভাল আভুতলার ।

টুঙ্গ গানের অধিকাংশই টুঙ্গব মেলাতেই শোনা যায় । কবির  
গানের আসরের মতো টুঙ্গ গানের মেলাতেও গায়িকারা মুখে মুখে  
গান বাঁধিয়া মুক্তিলা ধাকে । তাহার ফলে গানগুলির হৃদয়, ভাব  
প্রকৃতি এসোমেসো হইলেও এগুলি স্বচ্ছ-সরল ।

যে সকল টুঙ্গ গানের মধ্যে সাম্প্রতিক জাতীয় সমস্যাগুলির  
অগ্রগণ্য হইয়াছে, তাহাতে বরষা মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করিয়া  
থাকে । কেবল নিম্নের ব্যক্তিগত দুঃখই নয়, রাষ্ট্রীয় অবিচার,  
সমাজের অস্বচ্ছতা, পারিবারিক পরিস্থিতি, প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতি  
বৃহত্তর ঘটনাও মালবরের গভীর গানের ভার টুঙ্গ গানেরও বিস্তরবস্ত  
হইয়া উঠিয়াছে । এইভাবেই টুঙ্গ গানের স্রব মানবজন্মের প্রামাণ্যের  
সীমা ছাড়িয়া সারা বাঙলাদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

ওরে স্বাধীন প্রজা ।

তোরা এবার স্বাধীন হয়ে ঢাক বাজা ।

নবীন স্বাধীন ভারতবাসী রে, নবীন যে তোদের ধ্বজা,

নবীন তোদের আইন কাছন লো, নবীন যে তোদের রাজা ।

একালে সমাজ সংসার, জীবনযাত্রার যে সকল পরিবর্তনের  
সূচনা হইয়াছে, বহরশী পল্লীর জীলোকেরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে ।  
তাহারা লম্বু পরিহাসের মধ্য দিয়া সে পরিবর্তনের উপর টাকটিল্পনী  
করিয়াছে—

স্ত্রী স্বাধীনতার উঠেছে গেজেটখানি ।

স্বামী ছেড়ে করছে চাকরী গো, কত সব বিনোদিনী ।

কাস্তা বাজার নেয় না সন্ধান, এমন অভিজানি ।

সিনেমা আর থিয়েটারে গো, লাভমেবেজ হাটছানি ।

সাম্প্রতিক সিঁড়ম ও মানডমে বাঙালীদের স্বাধীনায়িকর  
রাজনীতিক আন্দোলনের রূপ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই টুঙ্গ গানে ।  
পূর্বের জায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কুমারীরা আজও মকর  
সক্রান্তির দিনে টুঙ্গ বিসর্জন দেয়, গৃহে গৃহে আজও সন্ধ্যাবেলার  
প্রদীপ নিবিড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু আজ যেন তাহাদের দুঃখ আরও  
বৃহত্তর আরও সার্বজনীন ; জননী বঙ্গভাবার সঙ্গে বিচ্ছেদ আশঙ্কায়  
তাহাদের মন ব্যথাতর, ভাষাক্রান্ত—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে ।

(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে ।

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে তার পুরুষের আমলে ।

এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে ।

দেশের মানুষ ছাড়িস যদি ভাষার চির অধিকার ।

দেশের শাসন অচল হবে, ঘটবে দেশে অনাচার ।

—জয়দেব বসু

## রেকর্ড-পরিচয়

নতুন প্রকাশিত রেকর্ডে এবার অনেক ভালো ভালো গান  
বেরিয়েছে । এখানে আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিলাম :

### হিজ মাস্টার ভয়েস

N 82727—ভায়ল মিঞ্জের নতুন গান—“তুমি আর আমি  
তু” এবং “এতো আলো আর এতো হাসি গান” । বিরহসঙ্গীত  
হলেও সত্যিই চমৎকার । N 82729—সুবীর সেন যে সত্যি  
গাইছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল নতুন এই আধুনিক গান  
চ’খানিতে—“মনের আকাশ জুড়ে” এবং “বার আলো নিভে গেছে ।”  
N 82730—কুমারী পূর্বী সরকার আবার হু’খানি ভালো আধুনিক  
গান উপহার দিয়েছেন—“চৈতালী চন্দ্রাবনে” এবং “সে তো জানো  
তুমি ডাকিলেই ।” N 82731—ঈশ্বরী গীতা লক্ষ ( হার ) নতুন  
আধুনিক গান—“কম কুম বসুধায়” এবং “তোমার দেখছি তজাবিহীন  
বাক্যে ভাষায় ।”

সুখী ও চিত্র সহযোগে নাচ শিখিবার পুস্তক

নাচের ইতিকথা ১ম খণ্ড ২৥০

ঐগোপী ভট্টাচার্য ও ঐনেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোড় শিখিবার পুস্তক

দোড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি ১৥০

ঐগণকানন গাঙ্গুলী প্রণীত

ঢাকা ইন্ডেস্ট্রস লাইব্রেরী

৫ নং ভানাদরণ মে ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

## কলহিয়া

GE 24816—গীতজী কুমারী সন্ধা বুধোপাধ্যায় নতুন চমৎকার দুটি আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন—“তুমি এলে তাই” এবং “আর জনমে হয় যেন গো।” GE 24817—কুমারী গায়ত্রী বসুর নতুন গান—“আর পরী আর পরী” এবং “এই কান্ডন হোক অবসান।” GE 24818—কুমারী ইলা চক্রবর্তীর কণ্ঠে দিলীপ সরকারের দেওয়া নূর গান—“অগ্নি অগ্নি শুকতার” এবং “উদ্বন মন আমার।” GE 24819—সরেন চক্রবর্তী নতুন পরীসঙ্গীত শোনালেন—“মনে লয় মোর” এবং “সুখধূনির তীরে কে বায় গো।”

## আমার কথা (২৫)

### অনিল বাগচী

জ্ঞানে, গুণে, দানধর্মে, পরোপকারিতায়, কলামুখ্যে, শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপোষণায় বাঙলা দেশের যে সকল জমিদার বাণেশ্বর মুক্তি আনন্দ অমলিন—শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোঁস্বামী পরিবার তাঁদেরই অন্ততম। অজ্ঞাত নানাবিধ গুণের সঙ্গে এদের সঙ্গীতমুগ্ধাঙ্গ ছিল অসাধারণ। এদের সত্য আলোয় উজ্জ্বল করতেন বহু গুণী শিল্পী। এঁদের নাচঘর বহুত হ'ত বহু কৃতী সুবাস্তবের সুবাস্তব। শিল্পীদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথরাম মিশ্র, মুন্সি মিশ্র প্রভৃতির নাম সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখনীয়। নরনাথ মাস্কুং: ক্রমঃ এই প্রবালটি যেন সত্য হয়ে উঠল এসেই এক ভাগ্যনাথ মধ্যে। ছোট ছেলে, মামার বাড়ীতে স্নেহ মনো বহন অতিগৃহিত করে তখন সাবুদের সুবাসনা। বাস্তব মতো তাকে। অজ্ঞাত তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে সঙ্গীতের প্রতি একটা অজিনব আকর্ষণ। এমন করেই সঙ্গীত পরিণালক অনিল বাগচীর সারা মন জুড়ে বসেছিল সঙ্গীতের অসামান্য প্রভাব।

পৈত্রিক নিবাস নবদ্বীপে। শ্রীগৌরানন্দের সময় থেকে। পড়ুসেব—পবলোকগত চরিত্রসম বাগচী। জন্ম—যেন্নীপুরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় ডর্ভি হলেন চিন্মু হুলে। বখাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। উত্তীর্ণ হলেন আই-এস-সি বীকান্তেও। সিটি কলেজ থেকে। চলে গেলেন কান্ধী। সেখানে ধায়র চলতে লাগল, চলতে লাগল সঙ্গীতশিক্ষাও। ডর্ভি হলেন জিনিয়ারিং ক্লাসে। এদিকে গুস্তাফ মেহেরী সোসেন, গুণী মিশ্র, হেশপ্রসাদ মিশ্রের নিলেন শিষ্য। বাঙলাদেশের ছেলে। তার প্রদেশের ‘সুখজয়া সহজে ধরা দিতে চান না। দখে মেরে দেবে যে! আজ সারা ভারত জুড়ে প্রচেষ্টা চলেছে উল্লী বিলুপ্তি। তার কারণ হিসাব তো আছেই, আর সে হিসাব মেকলও হচ্ছে নিষ্কারণ ভয় ও ভাব্যহীন ভীতি। যাই জানে, বাঙালী কি অসম্ভব মেধাবী জাত, সেটাজুটেই তো আজ তাকে নাশ করার চেষ্টার সীমা নেই। অনিল বাগচী মমলেন। নিজে তাঁকে হলেই। পরসেবা করে, তাৎক্ষণিক সেজে দিয়ে জর বলেন তিনি গুস্তাফের চিত্ত। এমনই সময়ে চঠাৎ তাঁকে চলে দিতে হল কলকাতায়। চল শিষ্যব্রোণ। মহাগুস্তাফ নিপাত। শ করলেন ব্যাক্তি ও ব্যাক্তিগুস্তী। কর নিলেন লয়েডস্ ব্যাক্ত। জীবন অনিল বাগচীর সহ হবে কেন, জীবনব্যাপী সাধনা আজীবন

যন্ত্রের মতিমা কখনও খর্ব হবার নয়। ছেড়ে দিলেন চাকরী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ। সজ্জাত শিগ্গ মত পৃথিবীর আলো সব দেখছে ইণ্ডিয়ান ট্রেড কাক্ট্রিং করপোরেশান আজ বাব নাম অল ইণ্ডিয়া রেডিও। স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আহবানে সেই প্রথমবারেই অনিল বাগচী চুকলেন রেডিওর। তখন ধারা রেডিওর প্রাণব্রুপ ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজ সঙ্গীতচর্চা কুকচর দে. রাইচাঁদ বড়াল. বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জয়, রাজেন সেনগুপ্ত. বীরেন দার, সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা, আনুরবালা, উবারাণী, পুশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সর্বিশেষ স্মরণীয়। ব্যবসায় গানে সুর দিয়ে এঁরা সেদিন পরিবেশন করতেন সঙ্গীতের উপহার।

কিছুটা পিছিয়ে যাই। বোলপুরে বান অনিল বাগচী। তারপর সম্পর্কে আসেন স্বর্গতঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিত্ত্বর ভাবায় যিনি ছিলেন ‘সকল গানের ভাগুরী মোর সকল সুরের ‘কাতুরী।’ দুই আকর্ষণ করলেন কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের তাঁরই একটি অনবন্ত গান অপর ভাবে গেয়ে। দিনেন্দ্রনাথ টেনে নিলেন তত্ত্ব শিক্ষাবীক। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবীক গুরু দিয়ে বেতে লাগলেন স্নেহ ভালবাসা আশীর্বাদ। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমুক্তা ইন্দ্রি দেবী চৌধুরাণীও সঙ্গীত সংক্ষে শিক্ষা নিয়েছেন অনিল বাগচীকে।

কাজী নজরুলের সঙ্গে নিবিড় বন্ধু স্থাপিত হল অনিল বাগচীর। দিনের পর দিন নিকটতম সারিয়ে এসেছেন বাঙলায় মানসলোকের রাজকুমার সত্যাব্রুপ বসুর। সত্যাব্রুপের জাতীয় মহাবিভালয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে, নজরুলের ধুকতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গিষ্ট থেকে বহুবার কাগাবরণ ও নানাবিধ পুলিনী অত্যাচার সহ করতে হয়েছে অনিল বাগচীকে। ‘সংকল্প’ বলে ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নেতাজী ছিলেন তার সভাপতি



অনিল বাগচী

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, বর্গীয় ক্যান্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজুতি সাহা, সাগর লাহিড়ী প্রভৃতি এই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনিল বাবু ছিলেন এর প্রাণ। সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র বাসন্তী বিভাবীধির যুগ সম্পাদক ছিলেন অনিল বাবু বাবু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সঙ্গীতচর্চা বিনোদনাথ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অনিল বাবু বেকর্ড করলেন হিন্দুস্থানের মাধ্যমে একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত। 'বখন পড়বে না' যোগ পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। এবং আর একটি আধুনিক গান।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ অনিল বাবু যোগ দিলেন সঙ্গীত পরিচালকের কর্মতায়। 'মাটির ঘর' এর নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য-ভাঁকে নিয়ে এলেন রঙমহলে। 'মাটির ঘর' এর পর 'রাজপথ', 'বিল বহর আগে', 'মাইকেল মধুসূদন', নাটকেও সুর দিলেন অনিল বাগচী।

আহ্বান এলো নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও অপরাধিত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবার থেকে। যোগ দিলেন মিনার্ভার। সুর দিলেন 'চিরন্তনী', 'দেবদাস', 'কীটাকমল', 'মাটির মায়' প্রভৃতি নাটকে। অনেককাল পরে আবার 'মিনার্ভা'তে যোগ দিয়েছিলেন অনিল বাবু। নাট্যকার মহম্মদ রায় ও নটপার্ব ছবি বিশ্বাসের আহ্বানে। তখন সুর দিলেন 'বিশ্বের বন্ধী' ও 'জীবনটাই নাটক' এ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ 'সঙ্গীতবিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করলেন অনিল বাগচীকে। নিখিলবল সঙ্গীত সম্মিলনী থেকে পদক পেলেন অনিল বাগচী। লক্ষ্মী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীতস্থলানে গান গেয়ে শ্রোতৃ-বর্গকে পরিতৃপ্তি পান করেন অনিল বাবু। 'ফটিনচার্ট' কলেজের ফটিন চার্ট সোসাইটির সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করার মূলে ছিলেন অনিল বাগচী। নিখিলবল সঙ্গীত সম্মেলনের বিচারকের পদও অনিল বাবুর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এলেন চিত্ররঙ্গতে। এখান ডাক দিলেন রাধা ফিল্মসের কর্ণধার ও এককালের প্রবাসবাসী শ্রীমাধব বোবাল। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিকরূপে এ জগতে মাধব বোবালের আবির্ভাব। সেই থেকে প্রায় বার্ষিক কত বনামপ্রসিদ্ধ কলাকৃশলীকে এ জগতে ঢোকায় প্রথম সঙ্গীত করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শৈলজানন্দের কাহিনী 'সঙ্গীত' মাধব বোবালের প্রথম ছবি। পরিচালনার অপূর্ণ মিত্র। কবিতার ভার পেলেন অনিল বাগচী। নায়ক-নারিকা মিলেন কল্যাণীয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা দেবী। 'সঙ্গীত' ছবিটি ছিল। বি-এ-কে-এর বিচারে অনিল বাগচী গৃহীত হয়েছিল বহুবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকরূপে। অনিল বাবুর দ্বিতীয়

ছবি দেবকীকুমারের 'তার শঙ্করনাথ'। হিট। তারপর দেবকী বাবুরই আর একটি ছবি 'কবি'। সুরার হিট। কবির সঙ্গীত পরিচালনাও বহুবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনারূপে গণ্য ছিল। বাণী বাসমণি। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও সৃষ্টি করেছে অজুতপূর্ণ আলোড়ন। মায়াকানন, মহাগান, মূল্যহা, দুঃসহ, মানকণ্ড, শান্তি, বাহারগী, দুর্গেশনন্দিনী, বড়ের পর, বোড়শী, সতী, সতী বেহুলা, অসমাপ্ত, কালো বে, ভাঙ্কড়ী মশাই, বড় গিগি প্রভৃতি ছায়া চিত্রে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন অনিল বাবু। আগন্তপ্রায় ও নিম্নায়মান ছবিগুলির মধ্যে শ্রীম্মা, বেলা ভাঙার বেলা, ভাঙন প্রভৃতিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব আছে অনিল বাবুর। আজ অবধি প্রায় পঞ্চাশ গান রেকর্ড আছে অনিল বাবুর। সঙ্গীতকারদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, সুরবাহ পুরকারহ, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, ভ্রামল গুপ্ত, বটকৃষ্ণ বসু, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার আনন্দ পান অনিল বাগচী।

কথা ওঠে আজকের চিত্র-সঙ্গীত সন্ধানে। হতাশার সঙ্গে উত্তর আসে নেগলেকটেড। চিত্র-সঙ্গীত সন্ধানে যথাব্যোগ বিচার হয় নি। যে একবার বাণী বাজিয়েছে, যে শুধু এস্রাজ বাজাতে পারে তাকে সমগ্র ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার দিলে সংস্কৃতি কি করে সেখানে সম্ভবপর? তিনি বলেন বাঙলাদেশে বাঁরা আগে সুরযোগ পেতেন না। তাঁরা বসে চলে যান—সেখানে নাম করলেই এমনই খুরি খুরি টাক দিয়ে তাঁদের ডেকে আনা হয়। এর অর্থ কি? জিজ্ঞাসা করি—বাঙলার সুরযোগ না পেয়ে বসে গিয়েই বা তাঁরা সুরযোগ পান কি করে—শিরী উত্তর দেন—সেখানে প্রতিভার দরকার হয় না, আপনি দেখে বুজে থাকুন—ভাববেন হয় তো কোন বিদীতি ছবি দেখেছেন, এমনই অমূল্য সর্বস্ব বোঝাইয়ের সঙ্গীত। তাছাড়া গভীর নেই তাঁর মধ্যে এতটুকু? হালকা বস সাময়িক পরিতৃপ্তি দিতে পারে ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতার কতটুকু? সব থেকে লজ্জার কথা কয়েকজন বিদেশী অভাগত বোঝাইয়ের সঙ্গীত দেখে তার অমূল্য প্রবৃত্তি নিয়ে তো পরিষ্কার খোলাখুলি সমালোচনা করে গেছেন। ভারতের পক্ষে এ ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাকর। অনিল বাবুর লেখনীও গতিবান। নানা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় তাঁর রচনা। শেষে বললেন যে আজকে মিউজিক ডিরেক্টর বলে কেউ নেই—বাঁরা আছেন তাঁরা এখানে-ওখানে চুক্তির জন্তে ধরা দেন, কাজ জোগাড় করেন, বাস তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আমার প্রশ্ন, তবে এঁদের আপনি কি বলে অভিহিত করেন—স্বচকি হেসে উত্তর দেন শিরী এরা—এরা হচ্ছে মিউজিক কন্সটাইটার।

... এ সময়ের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মেদিনীপুর বিভাগ্যগর যুতিমন্দিরের দেওরালপাড়ের ভাষ্যের একটি নমুনার আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটি পুদিনবিরারী চক্রবর্তী গৃহীত।



## ষ্টার থিয়েটারে ত্রীকান্ত

ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থব্যয়ে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন। প্রথমেই হচ্ছে এঁদের তীর্থ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কথা। ভারতের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারই প্রথম একাজে অগ্রণী হয়েছেন। শুধু এই নয় দর্শকদের বসবার নৈ হয়েছো আরো অধিকতর আরামপ্রদ। মঞ্চ শৈলীর নব্বের মধ্যে আছে টিলির সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা। একটি বিষয় সবারই গোখে পড়বে। সেটি হচ্ছে ডপসিনে দারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের যে ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দিয়ে তির সময় সিনেমা হাউসের মত ব্লাইন্ডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রেরণ ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে নয় সেটি হচ্ছে ষ্টার থিয়েটারের সাক্ষিপ্ত ইতিহাস। একথা প্রায় সকলেই জানেন যে কাতার প্রাচীন নাট্যশালায় মধ্যে ষ্টার থিয়েটার অন্ততম। ৭৬ সালে এই রঙ্গালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। সে আজ বছর আগেকার কথা। ঠাকুর জীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্র বিশ্বের প্রেক্ষাগৃহ দেখতে এসে এই রঙ্গালয়কে দৃষ্ট করেছিলেন। রই এক বছর আগে থিয়েটারটি হাতীবাগানে চলে সে বিডন ট্রাটের বাড়ী থেকে। ষ্টার থিয়েটারের বর্তমান স্থায়িকারী সলিলকুমার মিত্র ম'শায় একে নবরূপে সাজিয়ে বর্তমানে মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রঙ্গালয়ে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন।

এবারে নাটকখানি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। পরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের ত্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব বলধনে ব্যতনামা নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সমালোচক দেবনারায়ণ গু মহাশয় নাটকখানি রচনা করে সমগ্র দর্শক সমাজ তথা স্কালীর প্রশংসা ভাজন হয়েছেন। নাট্যরূপ দানে তাঁর কৃতিত্ব হদিন পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। ত্রীকান্তের দুটি পর্বকে একটি টিকে রূপায়িত করবার বাসনাকে যদি মনে নেওয়া যায় এক তার বার্ষিক রূপদানে দেবনারায়ণ গু মহাশয় যে কৃতিত্ব করেছেন। কথা অবসরকার্য। সমালোচকের দৃষ্টিতে অবিশিষ্ট বলা যেতে পারে যে ত্রীকান্ত কোথাও ঠিক compact ঠাস-বুনানির নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। সংক্ষেপে একথা অনায়াসেই ব্যক্ত করা যেতে পারে যে এ উপলক্ষে এত প্রচুর ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীদের সংখ্যা এত বেশী যে ত্রীকান্তের দু-দুটি পাঠকে সাড়ে তিন ঘণ্টার একটি নাটকের মধ্যে পার্থক্য ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে নাট্যকার দেবনারায়ণ বাবু যতখানি সার্থক করে তোলা সম্ভব তা অবশ্যই করেছেন একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

তবে এ সম্পর্কে আরো দু একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। নাটকখানিতে বহু বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ করে entertainment এর দিকে ঝোঁক রাখতে গিয়ে ত্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর অন্তর্নিহিত প্রেমটা ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে জমে উঠতে উঠতে পরিণতিতে ঠিক পৌছয়নি বলে মনে হয়। তবে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ছোট ছোট নানা চরিত্রের আসা বাওয়া এ নাটকের বৃত্তগুলি পৃথক ভাবে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ সকল দৃষ্টের আকর্ষণ্য বহুই কাজে ব্যয়মান এবং ব্যস্তিক কলাকৌশল, আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জার নিপুণতা যেমন প্রচুর সহায়তা করেছে, তেমনি সহায়তা করেছে



অভিনেতা অভিনেত্রীদের টিমওয়ার্ক। ছোট বড় চরিত্র রূপায়ণে প্রায় সকলেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনয় চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছেন। চরিত্রাঙ্গণ সংবেদনশীল সংলাপ ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে অভিনয় চরিত্রটিকে ইনি করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। শিপ্রা মিত্রকে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় মানিয়েছে ভালই। পিরায়ী বাইজী ও ত্রীকান্তের প্রিয়া— এই দুটি সত্তা তাঁর মধ্যে প্রতিকলিত। কোন কোন স্থানে শিপ্রা দেবীর অভিনয়ে অমৃভূতির অভাব ঘটলেও রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সঠিকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন দর্শকদের কাছে। ত্রীকান্তের (বড়) ভূমিকায় নিখিলকুমারকে এঁদের কাছে নিশ্চিত বলে মনে হ'লো। তার কাগণ খুব সম্ভবত রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় এই প্রথম। ভবিষ্যৎ তাঁর অভিনয় আরও উন্নত হ'বে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। অরুণা দিগির ভূমিকায় অপর্ণা দেবী, শাহজাদী ভূমিকায় কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায়, নতুনলার ভূমিকায় অমৃপকুমার, ইন্দ্রনাথ—শ্রীমান হুসেন অভিনয় ভালই করেছেন। অভিনয় বামীর ক্ষুদ্র ভূমিকায় একটি মাত্র দৃষ্টে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দানে সক্ষম হয়েছে একথা অনায়াসেই বলা চলে। ভাষ্কর্যমুখোপাধ্যায়ের (নন্দ মিত্রী) ও জাম লাহার (সাধুজী) কৌতুকাভিনয় উপভোগ্য। উপরেই চরিত্রে বোয়ারাণী কথার রূপদান করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে বাইজীবোশী শ্রীমতী শিপ্রার গান দুখানি যে দর্শকদের বখেট আনন্দ দান করেছে তা বলাই বাহুল্য। সর্বশেষে আমরা আর একবার দৃষ্টবাদ জানাই ষ্টারের কর্তৃপক্ষ ও স্প্রিট সকলকে ধ্যেয়ে এ সাধু প্রচেষ্টার জন্তে।

## শেষ পরিচয়

অভিনবহু যথিত হয়ে দেখা দিয়েছে শেষ পরিচয়। খ্যাতিমান কবি বিমল ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে স্বদীপ মজুমদারের পরিচালনায় গৃহীত হয়েছে এই ছায়াছবি। এই চিত্রে বাঙালী দর্শকের মনের ধোঁরাকের অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে। দুটি মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প বলেছেন বিমল ঘোষ। গল্পের শেষ অংশ অবধি সাধারণ দর্শকের অনেকেই ধরতে পারেন না যে য়োনাকী ও য়ীরা আসলে দুজন জোরা এক নয়। কৃতিত্ব এই যে এই য়ীরা-য়োনাকী অংশটি এমন সঠিকভাবে

উপস্থাপিত করা হয়েছে যে সারা ছবি ভুড়ে তারা থাক। সত্যও বুল বক্তব্য কেবাও বা ধারনি। ছবির গতি ভুলে যায় নি এতটুকু। একবার মীনাঙ্কী পরের বারই মারা কেব মীনাঙ্কী এই অধ্যায়গুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এইই মধ্যে পাণ্ডা বাবে প্রেমের উপাসনা, প্রতিবিন্দুর দমনশালা, সন্তানহাবার বুককাটা বেলনা, দেখা বাবে অর্বালালদার বসীভূত হয়ে মাছব কতখানি নীচে নামতে পায়ে—তারই প্রতিচ্ছবি। তবে একটি জায়গার চোখে লাগে, বসে থেকে মারা পালাচ্ছে উৎপলের ছালায়, সে ট্রেপে উঠল, উৎপলও উঠল—তারপর সে কি করে ট্রেপ থেকে পালাল—উৎপল বধন উঠে পড়েছে তখন আর কি তার পক্ষে কোন উপায় থাকে পালাবার? আর একটি প্রশ্ন জাগে যে উৎপল বর্ণিত হচ্ছে একজন অত্যন্ত কুৎসিত চরিত্রের অধিকারীরূপে, ছবির শেবাংশে সে রাতারাতি ও-রকম বললে গেলে কি করে? দ্বীপের একটি বম্বল বোন তখনই তার ভোল বললে গেল। এ কি করে সম্ভব হয়? চিত্রগ্রহণের কাজ সুন্দর হয়েছে। দেওজীভাইএর মত চিত্রকরকে নতুন করে বলবার কিছুই নেই। অভিনয়ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সারিব্রী চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ছটি চরিত্র অভিনয় করেছেন অল্প কয়েকজনায়গায়ই একেবারে প্রভাব অস্ত্রের উপর পড়ে নি। বিকাশ দার ও বসন্ত চৌধুরী অভিনয়ও প্রশংসনীয়। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জীবন বসু, প্রেমচন্দ্র বসু, ভাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, জাম লাগ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অতিথি-শিল্পী বিনিন গুপ্ত, ছায়া দেবী, তপতী বোব, মমিতা সিন্ধ, অর্পণা দেবী, নিতাননী দেবী প্রভৃতিও প্রশংসিত করেছেন। এরা ছাড়াও শান্তা দেবী, জহর দার, কুঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বরুণ মুখোপাধ্যায়, এক তারাকুমার ভাঙ্কাকেও দেখা বাবে এই ছবিত। মিত্রা বিশ্বাসের এখনও সময় লাগবে জাতে উঠতে। সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে আশাহরুণ কৃতিত্বই দেখিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

### বড়দিদি

স্বপ্নচক্রের এই গল্পের চিত্ররূপ এই প্রথম নয়। অনেকদিন আগে বাঙালীর সৌরভ নিউ থিয়েটার্স উপহার দিয়েছিলেন বড়দিদি এক ভাঁদের সেই উপহার লাভ করেছিল অভূতপূর্ব অভিলক্ষণ। সেই গল্পই—...অল্প নির্ভাতা-গোষ্ঠীর দ্বারা নতুন রূপ পেয়ে আজ দেখা দিয়েছে। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নিউ থিয়েটার্সের বড়দিদির নাগাল ধরতে পারেনি এম-কে-জির বড়দিদি। এ কাহিনীর বিবরণ সর্বজনবিস্তৃত, সুতরাং সে সবকে আদিক বলা নিম্প্রয়োজন। বড়দিদির প্রধান উপজীব্য গ্রামের বাড়ি-প্রতিষ্ঠান। আবেগাচ্ছল অহুত্ব, স্বপ্নের স্বপ্ন কোণগুলিরও সঙ্গীততা ও নীরবে অস্তবর্ণন এই প্রধান চরিত্র দুটির বৈশিষ্ট্য। অজর কয় পরিচালনার দ্বারা এ জিনিষগুলি আনতে পারেন নি ছায়াছবির মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ তার বাড়িতেই মারা যায়। এখানে অজর বাবু তাকে ঘেরেছেন নৌকোতেই। ছবির শুরুতেই সময় সবচেয়ে অবহিত করা হয়েছে দর্শকদ্বারাধারকে, করে নিজেরাই সে বিবরণে রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাই আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার এক কাহিনীর নায়কের হাতে আদম্বা দেখতে পাচ্ছি কিভাষণ। চাকর চান্নের দর বলছে না, বসেছে বাধকম।

জহ্ন-মহিলা যে গোড়ার গাড়ীতে আসছেন সে গাড়ীর জানলাগুলো খোলা। এ ছাড়া আরো একটি চোখে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাজারে বাড়িতে এল শুধুমাত্র ব্যাগটি হাতে নিয়ে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখতে পেলুম তার ঘরখানি ছেয়ে গেছে অসংখ্য গ্রে, শিবচন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত করে আরও ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে এ সব বই একান্তভাবে সুরেন্দ্রেরই। অত বই সে কোথা থেকে পেল? ক্যামেরার যে পরিমাণ কৃতিত্ব কর মহাশয় দেখিয়েছেন সে তুলনায় পরিচালনার মান তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। অভিনয়ক্ষেত্রে সন্ধ্যারাগীর অভিনয় নির্ভুত কিন্তু উত্তমকুমারের অভিনয় মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটে না। সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত এবং জানীও, সে আত্মতোলা ও ভাবুক প্রকৃতির কিন্তু তাই বলে সে রামচাঁড়োঁস বোব ছিল না, অন্ততঃ ছবিতে তো আদম্বা যে জিনিষ দেখেছি, তার থেকেও চোখে লাগে যে ছবিতে নায়কের নিজস্বতা বিন্দুমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না, সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য তার কর্তৃত্বশক্তি তো এখানে অল্পপাতিত। একমাত্র শেষ অধ্যায়ে বড়দিদিকে ফিরিয়ে আনবার সময়ে যেন তার অস্তিত্বের কিছুটা স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত, মাতের গোপাল, বড়দিদির মেহাশ্যপদ ও সপরিবার নাহেব বৈষ্ণব। তার নিজস্ব সত্তার ও ভাবধারার প্রকাশ কই? কেন তার প্রভাব পড়ছে না ছবিতে? বীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় অভিনন্দন বাগ্য। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, তুলসী সাহিত্যী, অরুণকুমার, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, যেনকা দেবী, দীপ্তি দার (এর তো কোন সুযোগই নেই বললে চলে) প্রভৃতির অভিনয় ভালো লাগবে। এ ছাড়া এতে অভিনয় করেছেন জীবন বসু, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, শিবতালী চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, শঙ্কু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান জামল, তপতী বোব, অরুণীলা দেবী, মমিতা বোব, সন্ধ্যা দেবী, অজন্তা কয়, শান্তা দেবী প্রভৃতি। রূপা গাঙ্গুলীর ভবিষ্যতের ঠিকানা সবচেয়ে আশা রাখা যায়।

### রক্তপট প্রসঙ্গে

বিভিন্ন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'মেঘমল্লার' কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন আজ প্রোডাকসাল। শিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বরীন মজুমদার, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, মালা সিন্ধা, সারিব্রী চট্টোপাধ্যায় ও আশীষকুমার প্রভৃতি। সন্ধ্যাংশে ভরিয়ে তোলা হচ্ছে বড় গোলাম আলী, এ, কানন, প্রবুদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হোবাবাই বরদেকার, সুরবর্তী দানে, মারা চট্টোপাধ্যায়, প্রতীমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের সমন্বয়ে। \* \* বিহারক ভট্টাচার্যের লেখা 'খেলা ভাঙার খেলা' পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়, ক্যামেরার হাতল বোরাচ্ছেন সুবীর বসু, সুরের আবহাওয়া সৃষ্টি করছেন অনিল বাগচী, রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন বোবাল, বিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ভাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর

রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রঘু চন্দ্রোপাধ্যায়, শ্রীমান্ বিহু, পদ্মা দেবী, সুমিত্রা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, গুলা সেন, সুমালা চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী প্রভৃতি।

• • চিত্র বহুর পরিচালনার তোলা হচ্ছে বহু। নটিকতা ঘোষ সঙ্গীতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অভিনয়ের দায়িত্ব নিরুদ্দেশ—ছবি বিবাস, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, বলিনা দেবী, মালা সিন্ধা, প্রভৃতি, • • মেহের কালীবাড়ীর সর্বানন্দ ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে বীরেশ্বর বহুর পরিচালনার গৃহীত হচ্ছে 'বাকসিদ্ধ' ছবিটি। এতে অংশ গ্রহণ করছেন অরুণ চৌধুরী, ছবি বিবাস, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, অরুণাণ্ড (নায়ক), মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ, তুলসী লাহিড়ী ও চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বীরাজ দাস, বাবুয়া, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মেনকা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী দেবী এবং সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবধানী ও কয়েকটি বাঘ, ভালুক ও কতিপয় জন্তু জানোয়ার। পূর্বাচল পরিচালিত 'গায়েব বাড়ী'র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীতি রায়। এতে রূপারোপের দায়িত্ব নিরুদ্দেশ—বীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সাত্তাল, কমল মিত্র, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, শ্রামলী চক্রবর্তী, স্থত্রীয়া সরকার প্রমুখ শিল্পীরা। • • 'জলকায়' ছবিখানি মুক্তির দিন গুণছে। প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই আখ্যায়িকার রূপ নিরুদ্দেশ জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বীরাজ ভট্টাচার্য, সমর রায়, সন্তোষ সিংহ, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, বীরাজ দাস, শ্রীমান্ সুখেন, শ্রীমান্ ব্রজ, শোভা সেন, তপসী ঘোষ, রেণুকা রায়, প্রীতিধারা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রভাত চক্রবর্তী।

### গুরুবারের বেতারনাট্য

১১ই মার্চ—কঙ্কাল। কাহিনী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নাট্যরূপ ও পরিচালনা বাণীকুমার। রূপায়ণে—পরিমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গদাধর সেন, মুকুন্দ পোদার, গোপাল দাস, উষা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দত্ত, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়, কুলা সরকার। • • ১৮ই মার্চ—ত্রিধাম। কাহিনী—সুবোধ ঘোষ, নাট্যরূপ—মুরারীমোহন সেনগুপ্ত, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট। রূপায়ণে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ চক্রবর্তী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি দেবী, নীলিমা দাস, রমা অধিকারী, রাজলক্ষ্মী। • • ২৫ই মার্চ—সন্ধি। কাহিনী—শৈলজ্ঞানন্দ, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—ঐধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—বীরেশ্বর সেন, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মপতি কুহু, মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, নির্মল কর, সাধনা রায়চৌধুরী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা দেবী, নীরা মল্লিক।

গত ২১ই পৌষ থেকে ৫ই মার্চ অবধি বেতার সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এই এক সপ্তাহ প্রতিদিন একটি করে নাটকের অভিনয় হয়! প্রথম দিন ২১ই পৌষ বিম্বকণা বহুমুখ থেকে কর্তৃপক্ষ আয়োজনিকেন্দ্র নাটকটি বেতারায়িত করেন। • • ৩০এ পৌষ

—হুচিরাং গুড়। কাহিনী—বহিষতন্ত্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। রূপায়ণে—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণকুমার, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, বনোজ চট্টোপাধ্যায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকীর্ণ গাঙ্গুলী, অম্বা সাত্তাল, কেঠ দাস, মণি ঘোষ, সত্যেন সেন, মালকম, আরতি পস, সত্যাত্মা দাস। • • ১লা মার্চ—মেঘনাদবধ। কাহিনী—মহাকবি মধুসূদন, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—ঐধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—কমল মিত্র, বীরেশ্বর সেন, জয়ন্ত চৌধুরী, জ্ঞানেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী চট্টোপাধ্যায়, কালীর্ণ চক্রবর্তী, অজিত কুমার রায়, অরুণাণ্ড গুপ্তা, সিলি গুহ, মীনাকী দত্ত, প্রতিমা দাশগুপ্তা, শান্তি সেন। • • ২রা মার্চ—অলিবাং। রচনা—কীবোধপ্রসাদ, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, রূপায়ণে—শ্রামল ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, গুহেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, জহর রায়, ঐধর ভট্টাচার্য, ললিত চৌধুরী, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতু চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, নীলিমা দাস, স্বর্ণা দেবী, সঙ্গীতে—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, কল্যাণী মজুমদার, (সঙ্গীত পরিচালনা—রাজেন সরকার)। • • ৩রা মার্চ—বোড়শী। রচনা—শব্দচন্দ্র, পরিচালনা—ঐধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, ঐধর ভট্টাচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবীন্দ্র চৌধুরী, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, মণি চক্রবর্তী, গজেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীর সরকার, শিপ্রা মিত্র, বনানী পাল। • • ৪ঠা মার্চ—কদম্ব অভিজ্ঞান—পুরন্দরপ্রাপ্ত মারাঠা গদ্য থেকে



মালা সিন্ধা

ছবি—মদন বহু

অল্পবয়স—মুম্বাই চৌধুরী (ইংরাজী থেকে), পরিচালনা—বাবীজীমার।  
কণাশঙ্কর—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তালু চট্টোপাধ্যায়, 'মুম্বাই'র  
কলোপাধ্যায়, বাণী পলোপাধ্যায়, বারী বার। \* \* এই মাঝ—  
শব্দ মিত্রের নেতৃত্বে বহুকণী সম্প্রদায় দ্বারা কবিত্বের রক্তকবীর  
বেতাব্যস্তিত্ব।

### চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীমতী শোভা সেন

শ্রীমৎশ্রদ্ধাঙ্ক পোখামী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'বাবলা' চিত্রখানি একদিন প্রশংসা অর্জন  
করেছিল। শুধু বিশ্বেই নয় আমাদের এদেশেও। তাই এবারে  
সেই চিত্রের অন্ততমা নায়িকা শ্রীমতী শোভা সেনের মতামত জানাবো  
বলেই বেরিয়ে পড়লুম। পূর্বাহ্নেই শ্রীমতী সেনের বাড়ীর ঠিকানা  
জেনে নিয়েছিলুম সহকর্মী সুনীল ঘোষের কাছ থেকে। শ্রীমতী  
শোভা সেনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি।

অভিজ্ঞাত ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও বধূ ইনি। শ্রীমতী  
সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। শিশুকাল থেকেই  
শিল্পের দিকে একটু বিশেষ টান এর ছিল বরাবরই, তাই পরবর্তী  
জীবনে এঁকে দেখতে পেলুম আমবা বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে।

বাক, শেষ পর্যন্ত গিরে হাজির হ'লুম টালীগঞ্জের আত্মকলগড়  
হলোনীতে। শ্রীমতী সেনের গৃহে। আমার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত  
করতেই অল্পবয়স এ'ল, চিত্রাচর্চিত ভাবে না লিখে আপনায় একটু  
কিছু বল করুন। কেন না অন্তর্ভুক্ত সিনেমা সংক্রান্ত কাগজ থেকে  
আপনাদের 'মাসিক বসন্তমতী' ভিন্ন ধরনের এবং এ পত্রিকাটির উপর  
আমাদের প্রাণ রয়েছে বসন্তে। আমি সবিনয়ে তাঁর প্রত্যুত্তর



শ্রীমতী শোভা সেন।

দিলুম এবং শিল্পীদের মতামত লেখার ব্যাপারে আমাদের ধারণা যে  
সম্পূর্ণ পৃথক, তা জানাতেও কষ্ট করলুম না।

এরপরেই শুরু হলো আমাদের আলোচনা। আমার প্রশ্ন এবং  
শ্রীমতী সেনের উত্তর। শ্রীমতী সেন বীরে বীরে বলে চললেন,  
১৯৪৭ সালে 'হিরমূল' ছবিতে 'বাতাসী'র চরিত্রে আমার প্রথম  
আত্মপ্রকাশ। তারপর বহু ছবিতে এবং বিভিন্ন চরিত্রে রূপলাভ  
করেছি প্রচুর। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয়  
করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা আজ বলা সহজ নয়; তবে  
এটুকু অবশ্যই বলবো যে 'বাবলা' ছবিতে 'মায়ের' ভূমিকায়  
অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর আমি এবং একথাও স্বীকার  
করবো যে তৃপ্তিও পেয়েছি সেই পরিমাণে।

আমার অপর একটি প্রার্থ্যন উত্তরে শ্রীমতী সেন বললেন,  
চলচ্চিত্র-জগতে যোগদানের আমার বিশেষ কোন কারণই ছিল  
না। আমি গণনাট্য-সঙ্গে অভিনয় করতুম এবং এখনও  
করি। এ সংস্কারই অন্ততম সহকর্মী শ্রীনিমাই ঘোষ 'হিরমূল'  
ছবি করেন। তিনিই আগ্রহ করে তাঁর ছবিতে আমাকে  
কাজ করতে বলেন এবং আমি সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে রাজী  
হই। এই হ'লো চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার গোড়ার কথা।  
ছবিতে যোগদানের পর কোন ক্ষেত্রেই আমার কোন পরিবর্তন  
আসেনি—সে সামাজিক জীবনেই হোক আর পারিবারিক  
জীবনেই হোক, একথা অবশ্যই বলবো।

আমার দৈনন্দিন কথাশ্রুতি যদি জানতে চান তবে বলবো,  
শ্রীমতী সেন বললেন, অন্তর্ভুক্ত গৃহস্থ পরিবারের বধূর মত আমিও  
সংসারের কাজকর্ম দেখি। তারপর যেদিন স্রাটিক থাকে না, নাটক  
একাডেমিতে র‍্যাংস করতে চলে বাই। সন্ধ্যার বাড়ী ফিরে ছেলের  
লেখাপড়া দেখি। যেদিন লিটল থিয়েটার গ্রুপের শো থাকে  
সেদিন সেখান হয়ে বাড়ী ফিরি এবং যথারীতি সংসারের কাজকর্ম  
দেখি। একটা কথা এখানে না বললে নয় যে, লিটল থিয়েটার  
গ্রুপ-এর আমি একজন সক্রিয় সদস্য।

এর পরেই শ্রীমতী সেন বললেন যে, 'কাদী ফিল্মস্'এ একখানা  
ছবির মহরৎ আছে। আমাকে অনেক অমুযোগ্য করে গেছে।  
একটিবার বেতে সেখানে হবেই। আপনাকে ঘটনাক্রমে একটু  
বলতে হ'বে, আমি এরই ভেতর চলে আসবো। বলেই তিনি  
ছুটলেন। শ্রী সেন আমাকে খবরের কাগজ এনে দিলেন পড়তে।  
আমি বললুম, একবার রিজেক্ট প্রোজেক্ট এ হারিদাস ভট্টাচার্য (পরিচালক)  
ও শিল্পী বসন্ত চৌধুরীর বাড়ীর দিকে চলি। গেলুমও কিন্তু  
ভাগ্যদোষে তাঁদের কাজকর্ম দেখা পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে  
দেখি শ্রীমতী সেনও ফিরে এসেছেন। অগ্রপ্রাণী পরিচালকমণ্ডলীর  
অন্ততম শ্রী—আলার ধরণ আলোপ আলোচনার বাধা পড়লো  
কিছুক্ষণ। তারপরেই আবার শুরু হলো আলোপ আলোচনা।

শ্রীমতী সেন বলতে থাকেন, বিশেষ কোন 'হবি'র কথা যদি  
বলেন তবে বলবো বই পড়াই আমার একটা খেয়াল বা 'হবি'।  
কিছু শিখবো ও কিছু জানবো চিরদিনই এই হলো আমার  
লক্ষ্য। নাটক ও চলচ্চিত্র সহকারী পুঁথি পুস্তকই আমার ভাল  
লাগে। গল্প কথা কবিতা লেখবার অভ্যাস আমার নাই।  
তবে সিনেমা সম্পর্কিত প্রবন্ধ আমি অনেক বার লিখেছি।

শোবাক পরিচ্ছন্ন সবচেয়ে আশ্চর্য্য নিজস্ব মতামত কি, জানতে চাইলুম আমি শ্রীমতী শোভা সেনের কাছে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে সালাসিয়ে উঠেছিলেন, ডক্টর হুচিন্সন শোবাক পরিচ্ছন্ন আমি পছন্দ করি।

অভিনেতা অভিনেত্রী হতে হলে কি কি গুণের একান্ত আবশ্যক, প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী সেন বিবাহান কণ্ঠে উত্তর দিলেন প্রচেষ্টা, সূকঠ, অভিনয়-সঙ্গতা এবং তা'র সাথে চাই নিয়মাবলী। আর এর সঙ্গে অভিনয়-শিক্ষার একাধরতা না হলে চলবে না।

ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি কি উপাদান বিশেষ ভাবে চাই যদি জানতে চান, তবে বলবো সর্বপ্রথমে—চাই ভাল গল্প বা কাহিনী। ছবি তৈরী করতে হলে সর্বশাই লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার উপাদান, তাতে কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে। আমাদের দেশের সন্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার প্রতি দৃষ্টি না রাখলে চলবে না। ছবি ভাল করার জন্য 'টিম ওয়ার্ক' যে চাই-ই, সে আশা করি না বললেও চলে। আর একটি জিনিষ অবশ্যই বলা হ'লো না—ছবির মূল্য যদি বাড়াতে হয়, তবে একে বাস্তবধর্মী ও Suggestive হতে হবে। নতুন চিন্তাধারা ও মৌলিক কাহিনী নিয়ে ছবি যদি গড়ে উঠলো, তবে সেটি ভাল না হ'য়ে পারে না। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য, এ বলাই বাহুল্য।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?

—নিশ্চয়ই। আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলার মেয়েদের এটি অবশ্য প্রয়োজন—বেটার অভাব আছে। শিল্পীদের পক্ষে স্বাস্থ্যই হচ্ছে প্রকৃত সম্পদ, এটা তুললে চলবে না।

অভিজ্ঞাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান সম্পর্কে মতামত জানাতে হলে আমি বলবো—শ্রীমতী সেন বলে চলেন, এ নিয়ে আজ আর প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? শিক্ষিত ও অভিজ্ঞাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে নিশ্চয়ই আসবেন এবং এ'রা যত বেশী সংখ্যার আসবেন ততই এ শিল্পের পক্ষে ভাল। শুধু একটি

জিনিষ লক্ষ্য রাখা প্রকার—এ লাইনে আসতে যেহে সন্মান, অভিজ্ঞতা, বেন কোন অবস্থাতেই ক্ষুর হওয়ার কারণ না হয়। প্রকৃত শিক্ষিতের মত আচরণই সকলের কাম্য হওয়া চাই। বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অবশ্য স্বী আপত্তি করেন কি না, এ নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার তো মনে হয়, পার্শ্ব্য জীবন ও শিল্পীজীবনের ভেতর একটা বন্ধা করে নেওয়াই উচিত। আসল হচ্ছে, নিজের মধ্যে একটা Understanding থাকা। উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম থাকলে সবই ঠিক রইল।

—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়?

শ্রীমতী সেন জোর গলায় বলেন, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব যে অনেকখানি, অস্বীকার করা যায় না। চলচ্চিত্র সমাজকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে শেখবার ও শেখাবার আছে অনেক কিছু। সমাজের দিকে তাকিয়ে আমাদের দেশে ছবি আজ কাল তৈরী হচ্ছে বটে তবে অগ্রগতি বতটা হওয়া উচিত ছিল সে ভাবে এখনও হয়নি। ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছবি অনেক বেশী হওয়া উচিত। সমাজ-জীবনের সমস্তাগুলো লোকচক্ষুর সমুখে তুলে ধরতে হবে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপট ছবিতো করে তুলতে হবে রূপায়িত।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শ্রীমতী সেন তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে কয়েকটি কথা জানান। বললেন তিনি—বেথন কলেজে যখন পড়তুম তখন থেকেই আমার অভিনয়ের অভ্যাস। বি. এ. পাশ করার পর আমি I. P. T. Actে যোগ দিই। 'নবান' বইতে বলতে গেলে আমার প্রথম অভিনয়ের তার পর রেডিওতে যোগ দিই ১৯৪৫ সালে, ১৯৪৬ সালে আমি চলচ্চিত্রে যোগদান করি সে অবস্থি প্রথমেই বলছি। ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চাই বা কাটবে সে এখনি বলা কঠিন; তবে শিল্পী আমি, শিল্পীজীবনই আমার কাম্য। ভবিষ্যতে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যদি আহ্বান আসে, সেটি গ্রহণ করবো—এইমাত্র বলতে পারি।

## শীতে

প্রজেক্টরুমার রায়

কনকনে হিমরাত্রি

দুপুরেই হাত কি বাড়ায়?

শীতের স্বপ্নায়ু দিনে

জ্বু-জ্বু বুড়ী

চ'কান ডানায় ঢেক বোঁহ পাঠায়—

নিম্বকিম্বু রোদ সরে যায়।

সবুখেই হিমরাত্রি—

চরহাড়া বত বাতী

জীবনের পাখশালায়

লুকিত মুহূর্ত গোপে

নিশ্চিত মুহূর্ত প্রতীকার।

প্রেমের উত্তাপে আর

আস্থার উত্তাপে

এই সব হৃদভাগ্যে

কে বনো বাঁচার?



আও চট্টোপাধ্যায়

একটা সেক্ট, ভারী মিষ্টি সেক্ট। গন্ধটা বেন খুবই ঢেনা-ঢেনা।  
 'হুই কি? না বিলিতি ফেলিওট্রোপ? না ব্যাডেল?'  
 লাসিনী প্যারী সত্তরের সর্বজনবলিত সেক্ট। কি জানি কি সেক্ট  
 হুই খুব বেন পরিচিত। ধর জাপ বেন হু'নাক দিয়ে নিরেছি কত বার,  
 দ্রুত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি কত মজলিসি সন্ধ্যার। আজ  
 আবার সেই সেক্ট কে মেখে এল? সামনের ওই চকচকে টাকের  
 মাশে-মাশে নিশ্চয়ই ওই রোমাঞ্চের গন্ধের উৎস নেই, কিংবা ওই  
 বিজ্ঞ রাড়ির এমিক-ওমিক। বাকগে, অত গবেষণার প্রয়োজন কি!  
 ভোকা আবাদে কামড় দি এই মোলায়েম ক্রিম-বোলটাতে।  
 আর পাশেই রয়েছে কত বিচিত্র পেস্ট্রি আর প্যাটি। আর  
 ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে কত আধুনিক-আধুনিকা, ঢুল হান্ড  
 আর বাহডলিয়া, ঢোখ আর টোটের কত লাশ। সবুজ লনের  
 উপর পেলোর বেতের চেয়ার আর টেবিলগুলি, ফুলগাটা ঈষৎ হরিদ্রাক্ত  
 কত পোলাপিচিত্র আর গ্রাস। এবার-ওবার কত কিস-কাস, কত  
 লগা-হাসি। কত কটাক্ষের শর-সন্ধান। পেলব বাহগুলো বেন  
 রাখন দিয়ে গড়া!

সব শেষ হতে এখানে সময় লাগবে। খাওয়াটা উপলব্ধ।  
কলে এসেছে স্বাদ নিতে সজ্জের, এসেছে রোমাঙ্কের সন্ধান। নতুন  
কিনারা জোগাড় করতে সন্ধ্যা কাটাবার। তুলে-বাড়ী সন্ধ্যাবেলাকে  
বিহার স্বপ্ন করতে। যদি স্বপ্ন করেই হয়, ওই গছটাকেই  
স্থিতির জল থেকে তুলে আনা ভাল। কত নিভৃত লজ্জাকার  
ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর এক আকাশ-ভারা। আর বাউ  
নিছক নিছক। কত বর্ষানি প্রেমান, শুষ্ক খা-লাগে ঘোঁকে।  
সব হয় সেই হেলিকটাই। গছটা বেন শুকুনে লাবণ্য ছাই  
শব্দ, ক্রি়া বাসি কুলার পাশায় লত। ভোজ্যকার মুখেরে বাওয়া

বায়ির মত। দুইটি-দুইটি সময় নষ্ট করবার পাগলামি ত উত্তীর্ণ হয়ে আসা গেছে। কিন্তু তারপর বেশ-মরটা কেটে গেছে, তা বেন কত শতাব্দী। সেসময়টাকেই বা কি সার্থক কাজে লাগানাম? তার চেয়ে ওই অকল্যাণকার চ্যান্ডি কেকটা খাওয়া ভাল, সময়ের চমৎকার সম্ভাবনার, হিসেবী লোকের মত কাজ। আর এক পোরালো চা ঢেলে নেওয়া যাক, নতুন গিউটা বখান দিয়ে গেছে। পাশের লোক দুটির সঙ্গে অলাপ জমালে কেমন হয়? কিন্তু ওরা দুই দল ত সখাসামিগণের উত্তাল মশগুল, কানেই যাবে না আমার কী খবর।

এ ত আর কুমার আইভিভিত্তিক রাবির বাবালা নর, এ একটা রীতিমত চায়ের পাট, নাম-কথা ঘরের সামাজিক অস্থান। গৃহকর্তার বিবাহের উৎসব, তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর জনারগে প্রথম প্রস্তুতি হবার উত্তর। কে গৃহকর্তা কে জানে, আর কোন সোভাগ্যবতাই বা তাঁর আধুর পশ্চিম পনককে রাবিরে সিতে এসেছে। সে-বহন আমার প্রবেশনই বা কি, আমার তৃতীয় পেছালা বখন এমন সোভানীর ভাবে তৈরী হয়েছে। চুমুকে চুমুকে সন্ধ্যার অনির্বচনীয় সময় অতিবাহিত হবে। পাশে কোথায় চাপা সুরে ইটালিয়ান ব্যাণ্ড বাজছে। গৃহকর্তা হনী। চোখেও তাঁকে দেখি নি। বন্ধুর অজ্ঞারেবে এখানে আসা। তারও পাতা নেই। শুধু মাঝে মাঝে নাকে আসছে সেই অস্তি-পরিচিত সেটা, তুলে-বাগড়া স্বপ্নের মত, হেঁচো স্থিরি সঙ্গ বাস। ওই গন্ধের সঙ্গে এতটা বাবালায় থুথু আলাপ ছিল আর আইভিভিত্তিক এবং অনেকগুলো নিবৃত্ত সন্ধ্যার।

চার পাশে সব উঠে, বসছে, চলা-ফেরা করছে। কত হাসি, কত সজাষণ। শ্রীতি বিতরণের হরিব-লুট চলেছে। একটু মিত্তক হলেই এখানে এক সন্ধ্যাতই শরীতিতের পার্শ্ব বেশ বাড়িয়ে নেওয়া যায়। সামাজিক জীবেরা তাই এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের আশে-পাশে ঘুরঘুর করে। ভাগ্যলক্ষীর কৃপা-শক্ত কোন মাহেশ্বরালয়ে কোনো লোকেরা নাযিকার সঙ্গে দৃষ্টির মালা-বিনিময় হয়ে থাকে, কে জানে। কিন্তু ওই লেলিপত্রের পাগে-বোঝা আমারা একক জীবন সম্পূর্ণ স্বরক্ষিত, সীমান্তের গণ্ডী ডিঙিয়ে কোনো বৌরী কাংক্ষার কিংবা মলয়াকুল অক্ষল-প্রান্তের প্রবেশাধিকার নেই। আমি তাই চা-এর বাড়ে নিমগ্ন, আশে-পাশের সমস্ত মিলিত কণ্ঠের গুনতে পাচ্ছি কন্ঠার সেই মিষ্টি গুণগুণ, সেই সব সন্ধ্যার অপরিতচিত বায়াম্বার ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো স্বরের লুটোপুটি, হৃগগে-আখিষ্ট বস্ত্রের বেখানে আজও হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান্তকূটের কবির বিরহাকুল মশাকান্তা হৃদয়ের মানুষ-মাড়িত পূর্ণা-শাসিত একটি প্রকাণ্ড কবরী আমার চারপাশের পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে রেখেছে।

কিন্তু হেলিগট্রোপ স্টেট এখানে কে ব্যবহার করে। নবীনা গৃহীণীটিকে এখানে চোখে দেখিনি। খুব সম্ভব তিনি অভিযানের উদারকী করে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, এবং তাঁরই বাতালু থেকে এই সুগন্ধের প্রমাণ হড়াচ্ছেন। কুংব-ভাণ্ডারের অধিকারিণী হয়েছেন তিনি, যে-কোনো স্টেট ব্যবহারে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমতা আর অধিকার আছে। স্তম্ভর্য একবার অন্তত তাঁর দর্শন লাভ করে নরন সার্বক করা প্রয়োজন। তাঁর গার্ভার্ণ কি হেলিগট্রোপের মত দুঃ-ভঙ্গ হবে। সাধা জেলাডেটের মত কমনীয়? তা না হোক, স্তম্ভত আদ্যদের রক্ষণীস্বার্থ মত পেলব নেহ-নাথুর্থে আর

পক্ষ-স্বামীর প্রতিটি বক্তব্যকে সার্থক করার মত তাঁর সামর্থ্য থাকা নাই; নইলে হেলিওগ্রাফ ব্যবহার করার অধিকার আসবে তাঁর কাছ থেকে। সেই আরেক জনের মত একটি টিকল নাক, টানাটানা হাজলঝাঁকা চোখ, দীর্ঘায়ত কুম্ভ-কোমল দেহ কি তাঁর আছে? এক-রক্তের সমস্ত বাড়া কামনা দিয়ে তাঁর চোঁট চুটি কি গড়া? মাড়ুলগুলি কি অপর আঙুলের সঙ্গে জড়াবার ইচ্ছার বৃত্তি নিয়েছে?

পাশের টেবলে চারটি তরুণ ইতিমধ্যেই বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। একটু উৎকর্ণ হতেই শোনা গেল একজন বলছে, "ভানো, ঠিক নিয়ে আজ এই উৎসব, তিনি নাকি বিয়ের আগে অনেকেরই লাভের জিনিষ ছিলেন।" আর একজন বলল, "তাতে আর লাভের কথা কি আছে, এমন বীর রূপ! কিন্তু টাকাই যদি তাঁর পছন্দ, টাকা আছে এমন যুবক কি সহজে মিলত না?" দ্বার একজন বোধ হয় কবি, সে কাব্যিক সমাধান করে দিল এই দুত্ব প্রেরণ, "নিজের প্রকৃষ্টিত যৌবনের মালা দিয়ে স্বামীর প্রকাশ্য টাকটি ঢাকবেন, এতেই তাঁর মতিমা।" চতুর্থ কোনো কথা বলল না, তার বাস্তব-বস্তি চোঁটের পাশ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিল। মেঘবৃত্তের মত উড়ে গিয়ে সেই হতশ হৃদয়ের ধোঁয়া ভ্রমরমত নারিকার দেহের চার পাশে ঘুর বেড়াবে কি না জানি না, শুধু এইটুকু বোধগম্য হল যে সোনারিকা আলাপ-আলোচনার বন্ধ হবার ব্যোধ্যতা রাখেন। সুতরাং বাড়ি বাবার আগে তাঁকে একবার দেখতে হবে।

দেখতে হবে বই কি তাঁকে, যিনি সবকিছু বাদ দিয়ে ভাবনে কেবল টাকাকে বরণ করে নিলেন, অর্থাৎ এতদূর পক্ষে যিনি অসাধারণ বুদ্ধিশালিন। তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে টাকা দিয়ে এখন সবকিছুই কেনা যায়, এমন কি যৌবনকে, এমন কি প্রায়শ্চকও। তাই সেই সব সম্ভা জিনিষের উপর তাঁর লোভ থাকবে কেন? বুদ্ধিমত্তা, সন্দেহ নেই। বাবার আগে একবার তাঁকে নিশ্চয় দেখে যেতে হবে। তাতে কিছু থাকলে উপহার একটা দেওয়াও চলত, কিন্তু সজীবটা চাইৎ থবে এনেছে। তার রবিবার, মার্কেট বন্ধ, ভাল জিনিষ কেনবার উপায় ছিল না। আর, এত গুণশেকের বউকে বাত্মা সম্ভা জিনিষ উপহার দেওয়া যায় না, বিশেষ করে সে নিজেরই যখন সম্ভা জিনিষ পছন্দ করে না। একমাত্র বাড়িতে আছে একটি 'সাদা হেলিওগ্রাফের' কুমারী শিশি, বা আজও খোলা হয়নি। কিন্তু সেটি কেনা হয়েছিল আর একজনের জন্ত, কিন্তু তাকে আর দেবার সুযোগ হয়নি। এখন সেটি ঘাড় থেকে নামানো যায় যদি যিনি ওই স্টেট ব্যবহার করেন, অন্তত আজ করেছেন, তাঁকে যদি দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁরই ত পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না! কেবল চার পাশে গন্ধের একটু চমক ছড়িয়ে বাচ্ছেন যাত্র।

একটু ঘাড় বঁকিয়ে যে তাঁকে দেখব, সে উপায়ও নেই। অনেক অবস্থিত লোকের ভীড়, যারা আসার জমাতে এসেছে, সুযোগ সুবিধা নিতে এসেছে, খেতে এসেছে। কিন্তু আমার হেলিওগ্রাফ বীর কাছে বাবে তাঁকে একটি বার দেখাও ত প্রয়োজন। তিনি স্বামীর মত কক চুলের কাঁপানো অঙ্গসংযোজিত করেন কি না, দীর্ঘ চোখের নিচের পাতার দৃষ্টি কান্ডলের লজ্জিত রেখা টানেন কি না, নরপদলের পান-পাড়া

হুটি দৃষ্টিত চোঁটে একাধিক সূত্র রজনীর যোমাঞ্চ আছে কি না, এসব খবর আমার জানা চাই। কারণ এটি বাকে দেবার কথা ছিল তাকে শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া হয়নি। কেন যে দেওয়া হয়নি তার ইতিহাস সুদীর্ঘ, সমীচীন ব্যক্তির মত। তবু সেই বারান্দার একটি মোহাচ্ছন্ন আবেশ ওই গন্ধটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ভীড়ের মধ্যে এসে আবার যে সেই গন্ধটির সঙ্গে পরিচয় হবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

চার পার্শ্বের নর-নারীদের দেখে ভারী হাসি পেতে লাগল। এরা যেন সব লোকের লেজে ভর দিয়ে সাবসার ক্যান্ডার বসে আছে। স্বর্ষ্যসন্ধানগুলিকে সবুজ লালন করছে। পাছে চার পাশে তাকালে নিজেকে সংভত করতে না পারি, চাইৎ উচ্ছাস্ত করে উঠি, এই ভয়ে টেবলের আশে-পাশে তাকাতে পারছিলাম না। নেপাৎ বেসিকের মত ঘাড় ঝুঁকি চায়ের পেয়ালার সীতার কাটছিলাম। কিন্তু একটি পেয়ালার আর কত চা খতে পারে, তাতে কত বার আর চা নেওয়া যেতে পারে? অবশ্য এইবার সজীবের আসব বসবার একটা ভোড়োড়ো দেখা যেতে লাগল, তাতেই নিম্নর থাকবার একটা ভাণ দেখানো যেতে পারবে। কিন্তু নবযুগকে একবার দেখবার পর না হয় ধৈর্যের এই বকম একটা পরীক্ষা দেওয়া চলতে পারে। আপাতত সজীবের সন্ধান উঠে পড়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

লনটি বড়ই, কিন্তু ভাড়া করে আনা টেরা-টেবলে আকর্ষণ। মাথার উপরে চম্ভাতপ, তাতে অল্প আলাব সমারোহ। একটা রীতিমত বিয়ের রীতিমত উৎসব আয়োজন। হোক না আচাৰ্য্যগুলি বিদেশীয় তৈরি, আমার হেলিওগ্রাফও ত তাই, কিন্তু সেই নিম্নর বারান্দাটি আর এই লনটি খাঁটি এদেশীয়। আশে-পাশে বেশ খুচরো রসালাপ চলেছে এখানে-ওখানে, কারণ রসনা তখন রস-সিক্ত। অর্থাৎ পাটি তখন রীতিমত জমে উঠেছে। এই জনারণের মধ্যে কি করেই বা সজীবের এই গন্ধের উৎস সন্ধান সম্ভব। নিতৃত ইচ্ছার মত সেই বারান্দাটি আইভিমণ্ডিত অনেক সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখুক। এই কোলাহলের মধ্যে তাকে টেনে এনে কি লাভ! যেদিন শেষ বারের মত সেখান থেকে বিদায় নিই, সেদিন নিশ্চয়ই অন্তঃসত্তার অভাব অনুভব করেছিলাম, যদিও তার কারণ খুঁজে পাইনি, কেবলমাত্র আমার চিত্তহীনতা ছাড়া।

সুতরাং উঠে পড়লাম এবং সেই সামাজিক জীবগুলির আশ-পাশ দিয়েই সামনের মকের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রথম বাধা পেলাম সজীবের কাছ থেকেই। এতকণ কোথায় ছিল জানি না, কিন্তু আমার এই একান্ত প্রয়োজনের সময়েই পথরোধ করে পড়াল। বলল, অর্থাৎ প্রশ্ন করল, "পালাতেই যদি চাও ত সামনে বাছ কেন? আর এত তাড়াতাড়ি পালাবেই বা কেন?"

অবিসংখ্যিত সত্য কথা। হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "উৎসবে যোগ দিলাম তোমার পাল্লার পড়ে, আর বর-বৌ দেখব না।"

বাঁকা হাসিতে সজীবের চোঁটের কোণগুলো হুমড়ে গেল। বলল, "এখানে সবাই গান গুনতে আর যেতে আসে। আহা, হোটেলেও ত দেখা পাবেই, খেঁচা ঘর।"

সজীব আধুনিকতার একটি পরিচায়িত সংস্করণ, নিম্নর



বাক্যগুলোর বিবরণী। সে এখানে আসে এখানে আসাটাকে অব্যাহত রাখবার জন্যই। মুঠকর্তার বিপরীত পাটলিভেও এসেছে। পরে যখন এগুলি গৃহকর্তার পাট চলে, তখনও ও আসবে সুখায় কেবল-সেইটুকুতে নিলিগু ভাবে কামড় দিয়ে বেড়াবার জন্য। হোটেল কে, কিংবা তিনি কি সেট ব্যবহার করেন এসব ভুল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তার অবসর নেই এবং অভিজ্ঞিও নেই।

একটুও না হেসে, বেশ গভীর ভাবে বললাম, “একটু পাশে চলে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।”

আমার এই গভীর ভাব ভঙ্গীকে ও বরাবর তাকিয়ে করে এসেছে, কাশ ওর কাছে ভাগ্যাতক সব কিছুই ছিল ঠাসেব পাঠে জলের মত অশ্রুতপল। সেমিক দিয়ে ও ছিল পরমহংস। ঠিক আমেরিকানদের মত বার বার বলে take it easy। তবু এই উৎসব পরিবেশে হঠাৎ আমার এই ভাবভঙ্গী দেখে সে বেশ চিন্তিত ভাবে চেয়ার-টেবলের এলাকা ছেড়ে একটি পায়-কুস্তুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, “কি, বল! তোমাদের নিয়েই বিপদ। তিলকে তাল কর। কি হয়েছে?”

বললাম, “আমি নব-বধূকে উপহার দিতে চাই।”

বললাম সে বুঝিলে পড়েছে। বলল, “তুমি পরিচিত নও, কি করে দেবে?”

ঈষৎ উদ্বার সঙ্গে উত্তর দিলাম, “অপরিস্রুত হয়ে বিয়ের উৎসবে খেতে আসতে পারি, আর উপহার দিলেই যত দোষ? তোমার বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় দিতে পারি।”

“উপহার কি এনেছ?”

“এখনি নিয়ে আনছি। তুমি কিন্তু চলে যেও না, তোমার হাত দিয়েই দেব কি না।”

“এর মধ্যে চলে যাব কি!” সজীব প্রশ্নের হাসি হাসল, যেমন করে প্রবাসী নাবালকের কথা শুনে হাসে, “পাট ভাঙবার পরেও দেখবে আমার নড়বারই মতলব নেই।”

নিশ্চিন্ত মনে বেশ দূরে এলাম এবং একটি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। উপহার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে এবং সে-উপহার হবে ওই হেলিওগ্রাফের শিশি। শুভ্র অকলঙ্ক হেলিওগ্রাফ। কারণ যখন সজীবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখনই পাশে চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখে নিতেই নববধূকে। সেও নববধূই, তা আশ-পাশের সকলের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তা থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। স্তব্ধতা ওই হেলিওগ্রাফই হবে উপযুক্ত উপহার। ওইটির সঙ্গেই দেওয়া হবে অনেকগুলি অনির্বচনীয় সন্ধ্যার মালা, অনেক বিভিন্ন রক্তের রক্তিন ফুল, অনেক বিপ্রাচরিক দিব্য-স্বপ্ন। গোলাকার টাকা আজ অনেক পূর্ণস্রুতে পাকাত করল। পুণিয়ার বেটীদণ্ডি আইভিলতার পাশ দিয়ে তাকাত।

নিশ্চয় হৃদয়ের সঙ্গে প্রসাধন করলাম। সামনে দাঁড়িয়ে হাতে দিতে হবে, চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হাত একটু কাঁপলে চলবে না। সজীবের হাত দিয়ে দেওয়ার সম্ভব ভাগ্য করলাম, যদিও হেলিওগ্রাফের শিশি তার হাত দিয়ে পৌঁছালেও যথেষ্ট কাজ হত। তবু আমাকেই এই শতাব্দীর অভিশাপের সন্ধ্যায় হতে হবে, যেখানে টাকা হৃদয়ের চেয়ে বড়, স্বপ্নের চেয়ে বড়। যেখানে স্তম্ভ-খাকার ইচ্ছা স্বথকে নির্ভাসনে পাঠায়। যেখানে চেনা-গন্ধ লেগে থাকে ফেল-আসা সময়ের গায়ে, অধুনা অনাদৃত কোনো বই-এর মধ্যে করেটা শুকনো ফুলের পাণ্ডুর মত।

খুব মনোযোগ দিয়ে সাজতে লাগলাম। সামনে টেবলে বের করে রেখেছি “শুভ্র হেলিওগ্রাফ”-এর শিশি। আজ সেটি উপহার দেবার শেষ সুযোগ উপস্থিত। তার পর পৃথিবীর নিরর্থক প্রতিদিন নভোপথ পরিক্রমার কোনো মানে যদি না-ই থাকে, একটি শেষ উৎসব-রক্তনী হৃদয়খলিত চূর্ণ-বিচূর্ণ শিশির গন্ধ-সুবাস আর একবার বোমাকিত হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। ঈষৎ হেসে চলে আস নিজে লাগলাম।

## নার্সিসাস

জয়ন্তী সেন

আত্মপ্রেমের বৃত্তকা আঁতা হল না কি প্রশমিত?

সূর্য-বড়ির বেশনা লীপ্ত অমোঘ জীবন 'পরে  
সূর্য-বুধীর ভ্রামাখা মন কালের হাওয়ার করে  
বন্দ্য পৃথিবী ফসল বিহীন ক্রন্দনে মুখরিত।

কীর্ণ তারার স্পৃষ্ট সহসা শিবসের অবসান

এখনো কি মোহে মুগ্ধ মনেতে বাজিল না আত্মান?

ধূসর স্নেহের বিদ্রুত কণে কুসুমিত নির্ভনে  
বিধিত রূপে আত্মহারার আত্মতাকিনী লেখা  
নিরুপাধার বর্ণালী মায়্য হুয়াশা দহন একা  
প্রতিধ্বনির অন্তরু কামনা জর্জরিত মনে—  
হেনেছ আঘাত প্রত্যাখ্যান—নির্ধাক অগমান  
নির্জিত প্রেম, হৃদর দাহ তবু আজো জ্বলান।

সুগ-সুগাজ করে গেল বুখা পিঙ্গল করাপাতা

পীত পৃথিবীর বৃত্তিকা-মনে মায়ীরা চূড়িত

ধূসর চাঁদের পাণ্ডুলিপিতে এখা অগ্নিমিত

কুয়াশা-সুখ্য নিম্নমাণিতে ফুলেছে আদোকা গীথা।

হুখ ফুলে চাও আত্মল প্রেমিক শোদো পেতে আজ কান

অজরীকে বিজ্ঞান বেদনার অভিয়ার।



# সাহিত্য পরিচয়

## মেয়েদের লেখা

পুস্তকের চেয়ে মেয়েদের লেখা পৃথিবীর সব দেশেই কম। বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসের লেখিকা হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন। কয়েকটি দেশে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক আছেন মাত্র। কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা বলা যায় না, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও আমেরিকার আধুনিক লেখিকাদের মধ্যে কবির সংখ্যাটী সর্বাধিক। অল্প পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখিকার সংখ্যা নিতান্ত নূন্য নয় বটে। এবং মেয়েদের পরিচালিত চিত্রসাহিত্য বাতীত অত্যন্ত পত্র-পত্রিকাও প্রচুর প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু উচ্চতর গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতার প্রকাশ পর্যাপ্ত পরি-লক্ষিত হয় না।

সম্প্রতি আমাদের দেশে ঘটনাটি কিন্তু দেখা দিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। অর্থাৎ অধুনা বাংলা সাহিত্যে কাব্য-কবিতা অপেক্ষা বহু গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বহু মহিলা লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তাঁদের রচনার মধ্যে সৃষ্টিশক্তির নিদর্শনও দেখা গিয়েছে। এ বিষয়ে পুস্তকের সমকক্ষ হিসাবে একাসনে তাঁদের স্থান দেওয়া না গেলেও, অনেক অর্বাচীন লেখকের চেয়ে তাঁদের রচনাশৈলী দৃষ্টিভঙ্গী ও ঘটনা-বিস্তারপট্টিতে যে কিছু কম নয়, তা বলতে বিধা নেই। এই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অল্প পুস্তকের সঙ্গে নারীর মানসিক প্রকৃতির অঙ্গগত কিছুটা তারতম্য থাকার নর-নারীর

মিলন প্রায় পুঙ্খ যে ক্ষেত্রে বলগাহীন সাংস্কারহীন, সে ক্ষেত্রে নারী অপেক্ষাকৃত লজ্জাশীল, বেশমানা। শিল্পমনের পরিশ্রমক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করলে সাহিত্যের অঙ্গসমূহ নারীর পক্ষে এ বেশদুর্ভাগ্য বহিঃস্থ। কিন্তু তবুও সাংস্কারগত কচিৎবাধকে অনেক স্থলে এখনও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাহিনীর মধ্যে বিপুলভিত্তি বিরংসার বিষয়কে আমাদের মহিলা লেখিকারা বেশবোরা ভাবে উল্লেখ করেন এবং যেমন আমরা সমর্থন করি না, তেমনই সাংস্কারের গভীর মধ্যে থেকে রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করবেন, এও শিল্পমনের পরিচায়ক হয়ে যায়।

এই আলোচনার মূল বস্তুকে থেকে প্রসঙ্গত আমরা অনেকটা সরে এলেও এ কথা আজ স্বীকার করতেই হয় যে, অধুনা গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে বহুশ্রী কৃতিত্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এই গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মেয়েদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও কৃতিত্ব দেখা দিয়েছে, সে পরিমাণ আগ্রহ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। সম্ভবতঃ বর্তমান কালে পুস্তকের অপেক্ষা মেয়েরা বেশি প্রাকটিক্যাল হয়ে ওঠার কয়েকটি কাব্যজগতে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা ছিল অভিন্নরূপ। অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসের চেয়ে সেখানে মেয়েদের মধ্যে কবিতা লেখার বেওয়াড়ই ছিল বেশী, এবং তার মধ্যে দিয়েই মেয়েদের চিরন্তন স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে উঠত।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক

রবীন্দ্র-রচনাবলীর তালিকার বিশ্বভারতীর প্রোগ্রামিক, প্রবীণ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের বৃহৎ তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই শেষ খণ্ডের জন্মিকার এক স্থানে গ্রন্থকাঃ লিখেছেন, "আমাদের এই আলোচ্য খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সাত বৎসরের ইতিহাস। এই পর্বটির ইতিহাস যেমন জটিল, উপাদানও তেমনই আঁত প্রচুর।" কথাটি ঠিক সত্য। বিচিত্র উপাদানে প্রস্তুত এই ইতিহাস প্রাক্তন সাহিত্যের মধ্যে মূল্যবান তথ্যাদির সহযোগিতায়, (৮ শেখা ডিমাই সাইজ) ৩৭৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ঘরে দিয়েছেন গ্রন্থকার। প্রায় ৪০টি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শেষ সাতটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৩৫ সাল থেকে এর আরম্ভ এবং শেষ ১৯৪১-এর ৭ই আগস্ট কবির মহাপ্রয়াণের দিন। অন্তঃসংবাদ অধ্যবসার ও যন্ত্রের কল এই গ্রন্থ। কত ঘটনা, কত লোক আর কত লেখার কাহিনীতে ভরা

কবির শেষ জীবনের এই খণ্ডটিই যেন আজ সমগ্র মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। 'শেষ কয়েক মাস' নামক পরিচ্ছেদটি ও 'পরিশিষ্ট'র মধ্যে—সংযোজন ও সংশোধন রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা বইয়ের তালিকা, ১৯৩৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ও নিবেদিতক। বিভাগগুলি অত্যন্ত গবেষণাপ্রস্তুত ও তথ্যপূর্ণ। কবিত্বের সর্বাঙ্গীণ দিক সম্পর্কে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আর নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই একমাত্র গ্রন্থের জন্যই প্রভাতকুমার বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষর স্থান অধিকার করে থাকবেন সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতী, ৬৩ ধারকানাথ ঠাকুর স্টোর, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত। এই খণ্ডের মূল্য : ১০/- টাকা।

### প্রেমের গল্প

বাঙালি বিবাহাঙ্গিতে উপহার দেবার মত বই অনেক বেরিয়েছে বটে। কিন্তু 'প্রেমের গল্প' নামক বই মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সকলটির সব দিক থেকেই যেন সার্বক একখানি উপহারের বই হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র উপহারের জন্যেই নয়, এর সাহিত্যিক

মৃত্যুও আছে বটে। এক সঙ্গে ডেইশ জন নামকরা সমসাময়িক গল্পকারের তেইশটি গল্পের এমন সচিত্র সমালোচনা এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি বলে মনে হয় না। এই লেখকের প্রত্যেকের চিত্র ও জীবনী আছে এর মধ্যে। মুকুটবান সম্পাদকের সুসম্পাদনের পরিচয় আছে এর সর্বত্র। প্রচ্ছদ-পটটি ত্রিবিধ-রচিত এবং জায়গার প্রেমের পরাকাষ্ঠা যেখানে সর্বোত্তমরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সার্থক রূপটি শিল্পী কালীকৃষ্ণ বোষ দৃষ্টিভঙ্গির তুলিতে ফুটে উঠেছে অপরূপ ভাবে। এর পর সম্পাদকের সুচিন্তিত ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রেমের উপর এটি একটি উল্লেখযোগ্য ‘থিসিস’ বিশেষ। নানা দিক থেকে প্রেম-ভালবাসার স্বরূপটি তিনি হুটিয়ে তুলেছেন এই আনন্দদায়ক ভূমিকাটির মধ্যে। প্রিয়জনকে উপহার দেবার পূর্বে এই উপাদেশ গ্রন্থখানির কথা অনেকেই যে চিন্তা করবেন তা আরবা নিশ্চিত বলতে পারি। প্রকাশক রীডার্স কর্পার, ৫ শব্দর বোম্ব লেন, কলিকাতা-৬। সাধারণ সংস্করণ—মূল্য ৭১০, শোভন সংস্করণ মূল্য ১০৮ টাকা।

### শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী

পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনকথা যে কত পবিত্র কত স্নিগ্ধ, তা নতুন করে বলবার নয়। অধিকন্তু বলা বোধ হয় সম্ভবপরও নয়। মায়ের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে এই গ্রন্থটি সুলিখিত হয়েছে। এতে মায়ের পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনর একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্কও বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। মায়ের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি স্মরণ ভাবে একত্রে সঙ্গ্রহ করে লেখক সম্পাদনা করেছেন সেইগুলি। মায়ের দিব্যজীবনের প্রভাব জাতির বাত্মপথের বিশেষ পাথের। আজকের দিনের হিসেব, লোভ-বৈষম্যের সন্মিলনে যে ক্ষণের মরণলীলা বিজ্ঞাতবেগে ছুটে চলছে জাতির বৃকের উপর দিয়ে, মায়ের মা তৈ: আশীর্বাদী পায়ে এই ক্ষণলীলার অবসান করতে। সমগ্র পুস্তকটি রচনা করতে লেখক যে অমূল্য স্বীকার করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার। অন্ধকার দুর্ভোগের বিশেষ মায়ের পুত্রপবিত্র জীবনের কাহিনী যত প্রসার ও প্রচারণা লাভ করে ততই মঙ্গল। লেখক—শ্রীমানদামণিকর দাশগুপ্ত। ব্লক এ, ফ্লাট ২, গভর্নমেন্ট হাউসিং টেট এটালী থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত। দাম হু’ টাকা।

### বাংলার আগরণ

অতীতের জ্ঞানের সাধনা ও সাহিত্যকীর্তির নব নব আবিষ্কার, নব নব সৃষ্টি মানবমনে নতুন পুলক ও অনুভূতি, জীবনানন্দ, জীবনদর্শন ও জীবনধর্ম সর্বত্র নতুন চেতনার সঞ্চার সাধারণতঃ এই তিন ভাবেই ভাগ করা যায় রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণে। বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লসিত জীবনের পাওয়া গিয়েছিল নবজাগরণের ছাপ। এই নবজাগরণে প্রথম দাপ্তরিক বাঙালি জাতিয়েছিলেন রাধা রামমোহন। পরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র অধ্যায় গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল, দুই হুটি আর পথ চলার এক অভিনব উপাখ্যান। এই অপরূপ ভিহানকে কেন্দ্র করে বনামধন্য সাহিত্যিকরা কাজী আবদুল ওহুদ

রচনা করেছেন আগরণ গ্রন্থটি। রামমোহনের যুগ থেকে সর্বভারতীয় আগরণ ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অবধি এই গ্রন্থের উপাদান। প্রত্যেকটি ঘটনার উপস্থাপন গ্রন্থের ওহুদ সাচেবের প্রাণপাত গবেষণার স্বাক্ষর বহন করছে। বাঙলা দেশের পণ্ডিত মহলে এ গ্রন্থ সমাদর লাভ তো করবেই, অধিকন্তু তত্ত্ব গবেষণার দরবারেও এর আবেদন কম নয়। লেখক—কাজী আবদুল ওহুদ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

### DISSENTIENT REPORT

দেশগোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য গৌরবান্বিত জীবনের পরিণতি রহস্যের মধ্যেই রয়ে গেল। কিছুকাল আগে ভারত সরকার তিন জন প্রতিনিধি পাঠালেন অন্ধুলে, সত্য ঘটনা উদ্ঘাটিত করার জন্য। বিশ্ববাসিত নেতার সত্য সত্যই তাইহাকুর বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছে কি না, এ সম্বন্ধে অসুস্থস্থান করে প্রকৃত তথ্য পরিবেশিত করে দেশবাসীর এই দীর্ঘ দিনের ব্যাধুলতার অবসান করার জন্য ভারত থেকে যে তিন জন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অপর দু’জনের মতের সঙ্গে লেখকের মতভেদ হওয়ায় লেখক নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার সঙ্গে বর্ধমান যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করে রচনা করেছেন এই গ্রন্থ। নেতাজীর সত্য সত্যি মৃত্যু হয়েছে কি না, এই রহস্যের সমাধানের জন্য যে সকল পথ অবলম্বন করা উচিত ছিল, সেই পথগুলি ইচ্ছাপূর্বক পরিহার করে অন্ত্যস্ত সন্দেহের যে সম্ভাভে উপনীত হয়েছেন, তার মধ্যে সত্যতার স্বাক্ষর খুঁজে পান না লেখক। কয়েকটি পত্র ও নজার দ্বারা নিজের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। লেখকের এই সমস্ত শ্রম সার্থক হোক ও নেতাজীর স্মরণে সমস্ত মিথ্যা প্রচার ও রটনার সমাপ্তি হোক এবং বা সত্য তাই উপলব্ধি করতে দেশবাসী সক্ষম হ’ল, এই কামনাটী করি। লেখক—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু। ৮৬ ডাঃ সুরেশ সরকার রোডস্থ স্বর্ণ প্রকাশনী থেকে শ্রীমদান বসু কল্‌ক প্রকাশিত। দাম দু’ টাকা।

### স্মৃতির রেখা

বাঙলা ভাষায় বহু বিশেষ গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে, যার কল আমরা দু’বের অনেক কিছুই অন্তে পেয়েছি নিকটে। স্মৃতি সাগরপারের বহু গ্রন্থ আমরা বাঙলার করেছি রূপায়িত। ভারতবর্ষের অন্ত্য প্রদেশের বহু স্মরণ ছাড়িয়ে আছে অননুদিত অবস্থায়। হিন্দী সাহিত্যে মহিলা লেখিকার মধ্যে শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। কবি হিসেবেই এর সমধিক প্রসিদ্ধি। বঁদের কাব্যে ছায়াবাদ ও রহস্যবাদ অভিব্যক্ত হয়েছে ইনি তাঁদের শীর্ষরানীয়া। মাসিক বহুমুখ্যের লেখিকা শ্রীমতী মালিনা রায় মহাদেবীর ‘স্মৃতি কী রেখা’ গ্রন্থটি অনুবাদ করে কৃষ্ণজ্যোত্স্নান হয়েছেন। এই বইটির অনেকগুলি গল্প ইতিপূর্বে মাসিক বহুমুখ্যের মাধ্যমেই আগমনা পড়েছেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের কাছে অবাঙালারা আরো নিকটে এগিয়ে আসে। আরো পরিচিত হয় তাদের জীবনধারা ও সমাজপ্রথা। লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা, অনুবাদিকা শ্রীমতী মালিনা রায়, ৬৬ ভাদ্রাচরণ লে প্লটস্থ ‘প্রদীপিকা’ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীমদান বসু। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

## ভূগোলাতক

বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্য হিসাবে পরিবেশন করার কাজে লেখক ব্যবহৃত শব্দচাৰ্য্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কুশলতা দেখিয়েছেন। জীবনদর্শনের বিচিত্র ছাপ নিয়ে তাঁর অভিনব উপভাস ভূগোলাতক আশ্চর্য্যকর করেছে। এ ধরনের উপভাস কচিং প্রকাশিত হয়েছে; প্রত্যক্ষদর্শনের আন্তরিক অল্পকৃতি ভূগোলাতকের বিভিন্ন চরিত্রকে সরল ও সার্থক করে তুলেছে। দায়িক বহুমতীতে আশিক প্রকাশিত ভূগোলাতকের বর্তমান পূর্ণরূপ পাঠক-সমাজকে তার অভিনব বৈশিষ্ট্য বুঝে করবার শক্তি রাখে। ভূগোলাতক শিত্তমনের ক্রম-পরিণতি ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে বাংলার প্রাচীন গ্রামীন-সংস্কৃতি পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মনোহর। মিত্র ও ঘোষ। ১০, গুডামেরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

## গৌরীমাতা

ভারতবর্ষ মাতৃজাতির কল্যাণে গৌরীমাতা। যুগে যুগে শত শত সাধকের তপঃশ্রাবণে ভারত পেয়েছে সত্যের নির্দেশ, এখানে সাধকদের সঙ্গে সাধিকাদের অবদানও কম নয়। সেই কল্যাণ-রূপিনী সাধিকাদের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার নামোল্লেখ অনায়াসে করা চলে। পরমহংস রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধাশিষ্যা গৌরীমাতা। তাঁকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যলাভে ভাগ্যবতী তিনি, তাঁগের আলোর উজ্জ্বল তাঁর জীবন। গৌরীমাতার আদর্শ ও বাণী দেশকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুক। দেউথানেই গ্রন্থকর্তার সমস্ত ভ্রমবীকারের সার্থকতা। প্রদ্বেরা তুর্গাপুরী দেবী অতি সুনিপুণ ভাবে সংকলিত করেছেন এই জীবনী-পুস্তিকা। সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে গৌরীমাতার জীবনের অসামান্য ঘটনাবলী। লেখিকা শ্রীতুর্গাপুরী দেবী ২৬ মহারানী হেমন্তকুমারী শ্রীটব শ্রীশ্রীসারস্বতীর আলম থেকে শ্রীমতী সত্যপানুরী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

## রাজায়-রাজায়

[ ৬০৪ পৃষ্ঠার পর ]

রাজাবাহাদুর তখন নেশায় আচ্ছন্ন। মজলিসখবরের কয়সে এলিয়ে পড়েছেন। দু'জন খানসমা হস্তার খালব-দেওয়া বড় হাত-পাখা খেলিয়ে খেলিয়ে ব্যতাস বওয়াচ্ছে। দরবার ভেঙে গেছে আজ অসময়ে। দালাল আর শুক্করীর দল এসে ফিরে গেছে রাজার সাক্ষাৎ না পেয়ে। কাগজে আর চুক্তিতে সই হ'ল না আজ আর। রাজাবাহাদুরের হাত চলো না। ময়ূরপেখমের কলম খসে পড়লো হাত থেকে। কালীশঙ্কর কিছুতেই চোখ মেলে তাকালেন না। দেওয়ানের বারবার নিবেদন অস্বপ্নের সঙ্গেও রাজা আসবের পাত্র হস্তান্তর করতে চাইলেন না। নেশায় ঘেন সমাধিময় হয়ে থাকলেন। তবুও দেওয়ান ডাক দিলেন রাজার কানে কানে। বললেন,—হজুর, কুমারবাহাদুর দর্শন প্রার্থনা ক'রেছেন। আপনি প্রকৃতিস্থ হোন।

নেশার ঘোরে কালীশঙ্কর বললেন,—কে?

দেওয়ান আবার বললেন,—হজুরের কনিষ্ঠ সহোদর, আমাদের কুমারবাহাদুর।

রাজা আবার বললেন,—কে?

—কুমারবাহাদুর কালীশঙ্কর।

কর্ণকুহরে নামটি পৌছতেই পূবা চোখ ঝুললেন কালীশঙ্কর। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,—কোথায় তিনি?

—দরবারে অপেক্ষা করছেন।

—সুদোহ, গাথা। সে কি অপেক্ষার ধার ধারে?

দেওয়ান প্রায় ছুটলেন। মজলিসখবরের বাইরে অদ্ভুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুরোরে দেখা দিলেন কুমার কালীশঙ্কর। সত্তরাত তিনি মজলিসে আসামাত্র সুগন্ধি কেশটেলের গন্ধ ভাসলো। গরদের জোড় পরিধানে। কুঁচানো ধুতি আর চামর। গলায় রক্তাক্তের মালা।

—রাজা, আমি তো কাল প্রাতেই বাত্মা করতে মনস্থ ক'রেছি।

চুপি চুপি কথা বলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—কোথায় জই?

—আমাদের রাজকুমারী সহোদরকে হরণ করতে।

—তোমার ভয় হোক। লোক-লম্বর সঙ্গে ল'বে তো?

—হী।

—অস্ত্রশস্ত্র?

—হী।

—রক্ষাকবচ?

—হী।

—আহার্য?

—হী।

—বাত্মা নদীপথে না অস্বারোহণে?

—নদীপথে বাওরাই স্থির ক'রেছি।

—দেখিও, কিছু না প্রকাশ পায়। হুনাকরেও বেন কেউ না জানে। আর কি চাও তাই বল'?

—আর কিছুই নয়, তোমার পদধূলি ভিক্ষা করি।

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর জোড়ের পাদম্পর্শ করলেন।

সেই হাত নিজে কপালে ছেঁয়ালেন।

রাজাবাহাদুর অবশ হাত তুলে আশীষ জানালেন। বললেন,—

তিষ্ঠ, হাইও না। এই অঙ্গুরীর তোমাকে আমি দান করলাম।

তোমার হাতে স্থান পা'ক। অত্যন্ত সুফলদায়ী এই অঙ্গুরীটি।

কুমার কালীশঙ্কর আঙুলি হাতে পেয়ে বুড়িয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

নবরত্নের পদ্ম আঙুলিতে। বললেন,—প্রাতে বাত্মার পূর্বে আর

সাক্ষাৎ হবে না।

—তখান্ড।

গরদের চামরের আঁচল উড়িয়ে কুমার কালীশঙ্কর মজলিস ত্যাগ

করলেন। ধরে সুগন্ধি তেলের গন্ধ ভাসিয়ে রেখে গেলেন। চোখ

আবার বন্ধ করলেন রাজাবাহাদুর। কত বেন চিন্তা তাঁর।

ভাবনার আলা নেই আর। বেন নিজার অচেতন হ'লেন রাজা-

বাহাদুর। কৃষ্ণের খাস বেললেন।

[ কবিতা: ]

## পরিবর্তন



বারি দেবী

শেষ রাতের ঐক্যে আধার-সায়রে আলোর কমলগুলি  
সবমাত্রা দল মেলতে শুরু করেছে। কলকাতা মহানগরী  
তখনও ঘুমে চুপুচুপু। হু-একটি ভিড়গলো অলস-সুতিতে বাতাস প্রক  
করেছে রাজপথগুলোর ওপর। গলার ধারে, আউটরাম ঘাটের  
কাছাকাছি একটা জায়গার পাড়ী রেখে নেমে এলো উবা চ্যাটার্জি।  
উলস ঘুটি বেলে একবার চেয়ে দেখলো। অসীমের পটভূমিকার দপ-দপ  
করে কলছে শুকতারাটা।

পথ ক্রান্তির এসে বসে পড়লো, গলার ধারে কাঁকরা  
পাছতলায় বেকিটাতো। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার বেন কোন  
কম্বলী হৃৎকের সমতা ছড়ানো, উবার চোখে বেন লাগে সূর্য তন্ত্রার  
পদম।

গলার ধারে আর একখানি পাড়ী খামলো। দরজা খুলে  
নেমে আসে অনিরুদ্ধ। চোখে-মুখে ওর বিনিময় রজনীর ক্রান্তির  
ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো; একটা সিগারেট ধরিয়ে পায় পায়  
এদিকে বার এ গাছতলায় বেকিটার নিকে।

বেকির পাশে ঝাড়িয়ে চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ। নিজের চোখকে  
বিশ্বাস করতে পারে না। একি সম্ভব! আজ যে ওর বিয়ে।

বেকির হাতলে একখানি হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাথা রেখে  
দিয়ে পড়েছে উবা। স্থগথানি রান, চোখের কোলে রাত্রিভাগবতের  
হাসিমা, চুপু কুস্তলগুলো নিয়ে খেলা করছে দুঃস্থ বাতাস।

ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না অনিরুদ্ধ। ওকে  
হাসাতেও ইচ্ছা করে না। সন্তর্পণে বসে পড়ে ওর পাশে।

এই স্থানটি যে ওদের প্রাণনদী-সঙ্গমের মহাতীর্থ। বন সেওয়ার-  
রক্তরাস টুকরো টুকরো হাসি আর কথার জলতরঙ্গ, এখানকার  
লাফে, বাতাসে, জলকল্লোলে আজও বুধি কান পাতলে শোনা  
যে।

বেশী দিনের জো কথা নয়। মাত্র পাঁচ মাস আগেও  
এ কত সন্ধ্যার সুহৃৎগুলো ওদের মধুর হয়ে উঠেছিল  
ইখামে...কোথায় গেল সেই দিনগুলো? কেন গেল?  
সব জেন কি তবে হুঁকো রজনী কালের মত ছিলো?  
সামান্য কুল বোঝাবুঝি আঘাতে জেত হুঁ হুয়ে গেল?

না, না! এ চিন্তাও যে ওর পক্ষে বেনাশায়ক। যে  
প্রেমজ্বলের অবিবাসী ছিল ওরা, সেটা কোন বিলাসী প্রেমো-  
কানন নয়, সে যে ছিল প্রকৃতিসৃষ্ট মনতান। সে মনতানের  
ওয়েসিদের সন্ধান পেয়েছিলো ওরা। সে তো নয় জাতি মরীচিকা;  
সে যে শাশ্বত প্রেমের অনুরাগী।

সুতিভাগবতের গভীর অন্তরে তলিয়ে বার ওর বিহুত মন।  
বহর তিনেক আগের কথা। স্টটিসচার্ট কলেজে এলো তরুণ  
অধ্যাপক অনিরুদ্ধ হালদার। তার বছর খানেক আগে এই কলেজেই  
ভর্তি হয়েছিলো উবা চ্যাটার্জি। এখন সে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে।

ওদের দুজনের নাম নিয়ে কলেজের ছেলে-মেয়েরা অনেকটাই  
হাসাহাসি করে। একদিন এই রকম "উবা-অনিরুদ্ধ" নাম খচিত  
রসালো কথার টুকরো ভেসে এলো ওদের দু'জনেরই কানে—উবা  
আরুদ্ধ মুখে হঠাৎ চেয়ে দেখলো অনিরুদ্ধর মুখ ঘুটিপাত তার  
মুখের ওপরই নিবন্ধ।

উভয়ের মনেই লাগলো নামের দোলা। কলেজশুদ্ধ ছেলে-  
মেয়ে যদি অমন করে নামে নামে অনবরতই মেলাতে থাকে,  
তবে এখানে ওদেরও মনে মনে প্রশ্নেতে দোষ কি? জ্বোয়র গুণ  
থাকলে, নামেরও গুণ আছে, আকর্ষণী শক্তি আছে। এ  
মাধ্যার্থকে অস্বীকার করবার শক্তি চন্দ্র-সূর্যের নেই; সাধারণ  
বাহুরের থাকবে মনে করা তুল অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ উবাকে বলে—তোমার এমন নাম দিলো কে?

উবা হেসে জবাব দেয়—বিনি তোমার নাম দিয়েছিলেন  
অনিরুদ্ধ। কলেজশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে  
ওদের নব অমুরাগ পর্যট। তার পরের দিনগুলো কি রোমাঞ্চকর!  
সেদিনগুলো বেন বাস্তব জগতের নয়, স্বপ্ন দিয়ে গড়া দিনগুলো,  
সত্যিই এসেছিল ওদের জীবনে।

অনিরুদ্ধের বাড়ীতে কেউ ছিলো না, একজন পুত্রানো চাকর  
ছাড়া। অবধা ভালো, তবে আপনজন কেউ নেই।

উবাও বড়লোকের মেয়ে, তবে চলাফেরার একেবারে বেপবোরা  
স্বাধীনতা পায়নি; বাপ-মায়ের নিষেধের ছকে-বাঁধা জীবন  
ছিলো তার।

অনিরুদ্ধর আগলভাঙা প্রেম উবার মানসপগনে দীপ্ত সূর্যের  
মত বলে উঠলো। তার উজ্জল কিরণে উবা হয়ে উঠলো দীপ্তময়ী,  
মহিমময়ী, গরীমদী।

উবা কিছু ভেবে দেখেনি; বেন একটা ছুনিবার শ্রোতে সে  
ভেসে চলেছিলো হাড্ডা ফুলের মত। অনিরুদ্ধর মাঝে সে বুঁজে  
পেরেছে নিজের পূর্ণতা।

সে এখন প্রায়ই মায়ের পাঠানো গাড়ী কিরিয়ে দেয়। বলে  
পাঠার বাছবীর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে, অথবা তাদের সঙ্গে সিনেমা,  
না হয় আর কোনো কার্য।

মাকে বলে উবা—আমাদের ইংলিশের প্রফেসরকে বাড়ীতে  
একদিন নেমন্তন্ন করবো মা? ওর কাছে যদি আমি পড়ার সুযোগ  
পাই, দেখো এখানে ক্যাঁ রান মার্ক নিশ্চয়ই পাবো আমি।

এ আর বেশী কথা কি? অনিরুদ্ধ প্রথমে উবারের বাড়ীতে  
গেলো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে; তারপর আসা-যাওয়া চললো, উবার  
পড়ার ঘরে, মাকে মাকে গাড়ীতে করে গলার ধার, লেক, বোটানিকাল  
গার্ডেন।

সে বছর শ্রাবণের কুল-পূর্ণিমার উষ্মা দেখে বাড়িতে ছিলো রাধাগোবিন্দের কুল উৎসব। মধুর কীর্তন আর ভক্তদের উল্লাস তুফলহরী মনে পড়িয়ে দেয় কুলবনের তাল-তমাল-খেয়া নিকুল বনে পরমপুঙ্খ ও প্রকৃতির কুলনলীলা। মানবচিন্তেও বৃষ্টি লাগে তার লোলা।

বেতচন্দনের গুঁড়োর মত শুভ্র জোৎস্নাধারা করে পড়ছিলো ইন্দ্রনীল চন্দ্রাতপ থেকে। উত্তলা পূর্বের বাতাসে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ। বাগানে ল্যাভেণ্ডারের ঘোণের গা বেঁবে ঝাড়িয়েছিলো উষ্মা আর অনিচ্ছ। দু'জনে দু'জনার মণিবন্ধে বেঁধে দিয়েছে জরির কুল-সেওয়া রাখী। চাঁদের আলোর স্নগমল করছিলো, রঙিন রাখীগুলো। উষ্মার পরনে ছিলো সোনালী জরির পাড়-বনামো সাদা শিকন শাড়ী। ঝোঁপার জড়ানো টাটকা দুইয়ের গোড়ের মালা। বেলজিয়াম গ্রাসের মত শুভ্র উজ্জ্বল রূপের বাঁতা বেনে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো ওর সর্বাবয়ব থেকে। রাখীবন্ধনের সময় ওয়া উচ্চারণ করেছিলো, অনন্তকালের স্নহ-বন্ধনের প্রতিশ্রুতি।

তার পর একটা রঙিন বস্ত্রের ভেতর দিয়ে কেটে গেলো গুদের তিনটি বছর। প্রতি বছর এই রাখী-বন্ধন উৎসবটি পালন করতো ওরা। এটিই বেন মিলন-তিথির অগ্নীয় উৎসবরূপে গুদের জীবনে বার বার কিংগে আসতো।

চতুর্থ বর্ষ চলেছে উষ্মার। পরীক্ষার সময় আসন্ন। গুদের মধ্যে সবচেয়ে বেটি মেধাবী ছাত্রী ছিলো, নাম তার মধুরী সেন। অত্যন্ত গরীবের ঘরে, বাপের আশা-ভরসা অনেক কিছু ওই মেয়েটির ওপর। যদি ভালো ভাবে পাস করতে পারে, অক্সিসের বড় সাহেব ভালো মাইনেতে একটা চাকরী দেবেন, কথা দিয়েছেন।

মধুরী চার অনিচ্ছুর সাহায্য। অনিচ্ছ ওকে আশ্বাস দেয়, তার দ্বারা যদি উপকার হয় ওর ভবিষ্যৎ-জীবনের, এতে সে আপত্তির কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

কলেজের পর মধুরী যেতো অনিচ্ছুর বাড়ী। নোট লিখে নিয়ে আসতো। ওকে সাহায্য করবার পর, উষ্মার কাছে বাওড়ার সময়টা ধানিকটা পেছিয়ে যেতে লাগলো। উষ্মা ক'দিন অভিমান করে বলেছিলো, কখন থেকে বসে আছি তোমার পথ চেয়ে, এত দেবী করলে কেন?

সবল ভাবে বলে অনিচ্ছ, মধুরীর কথা। ওর প্রতি একটু সমবেদনাও জানিয়ে বলে, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী, একটু সাহায্য সহায়তা পেলে ও নিশ্চিত স্নলারশিপ পাবে এবার।

এক বৃহস্পতি উষ্মার ঘুমের আলোটুকু বেন লুপ্ত করে নিয়ে গেলো। ছী-চরিত্র-অনভিজ্ঞ পুঙ্খ এটুকু বুঝতে পারে না যে, মেয়েরা তার পরম প্রিয়জনের অপর কোনো মেয়ের প্রতি সামান্য মনোবোণও সহ্যেতে পারে না। এর স্বপক্ষে বত বৃষ্টিই থাক না কেন। উষ্মা সেদিন বুঝে কোনো প্রতিবাদ না জানালেও, বেশ গম্ভীর হয়ে রইলো।

এ ব্যাপার নিয়ে কলেজেও বৃহ গুজন চলেছিলো, দু'একটা টুকরো আক্ষেপাঙ্কি ছিটকে এলো উষ্মার কানে—

হায় সখি, কেমন ধরিব হিয়া—  
আমারি ঝুঁয়া আন বাড়ী বার,  
আমারি আঙিনা বিরা।

উঃ। কাটা ভারে বেল ফুঁসে ছিটে। তীক্ষ্ণ অভিমানে একদিন উষ্মা বলে ফেললো, আমাকে পড়াতে আর হবে না অনিচ্ছ! কারণ পরীক্ষা আমি এবারে দেব না। মহা বিসময়ভরে বলে অনিচ্ছ। পাগলামি না কি? একি অদ্ভুত খেয়াল চাপলো তোমার মাথার উষ্মা? পরীক্ষা দেবে না কেন?

আরক্তবুধে তীব্র ঝাঁকের সঙ্গে জবাব দেয় উষ্মা—খেয়াল?  
না খেয়ালী আমি নই। খেয়াল খুঁজতে মেতে যারা অপরের জীবন নষ্ট করে তাদের বুধে একথাটা বড়ই বৈমানিক অনিচ্ছ।

স্তম্ভিত ভাবে অনিচ্ছ কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলো ওর বুকের পানে! এ কি ভ্রমস্ত্র মনের পরিচয় আজ দিলো উষ্মা! একজন অসহায় দরিদ্র মেয়ের প্রতি ঐ ধরনের বিবেক, এমন হীন সন্দেহ, এ কি সত্যই সম্ভব এই রূপসী, বিদ্যাবী, ধনীর দুলালীর পক্ষে?

উষ্মা অনিচ্ছকে নির্দীপক হয়ে থাকতে দেখে অনিচ্ছ আক্রোশে জলে ওঠে। উদ্ভত ভঙ্গীতে ঝাড়িয়ে উঠে বলে,—তোমার অভিমান চমৎকার! তবে মনে রেখো, তুচ্ছ খেয়াল মেটাতে যেয়েদের জীবন নিয়ে যে খেলা চলেছে তোমার, এর পেছনে আসছে তার নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া! এ খেলার বহুটা সুখ পাছ—

আরো কি বলতে গিয়ে বলা আর হল না, উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগকে দমন করতে করতে বর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো উষ্মা।

তারপর সে আর কলেজে আসেনি। অনিচ্ছও আর বারনি গুদের বাড়ীতে। কিন্তু কি করতে কি হল? উষ্মার উপর সাংঘর্ষিক ভাবে রাগত হলেও, অনিচ্ছুর জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে যে ওর মধুরা স্মৃতি। সে স্মৃতি যে আজ দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর অন্তরে।

মাকে দু'-একদিন দ্রুত চলমান মোটরে দেখেছে অনিচ্ছ উষ্মাকে আর তার পাশে উপবিষ্ট দামী স্যুটপরা এক স্ত্রী বৃককে। মনে চাপা বেদনা গুমেয়ে ওঠে। তবুও নিজেকে বোকার;—ওর হৃদয়েই সুখী হওয়াই তো তোমার প্রেমিক-মনের গুঁহ। মাকে মাঝে জেবেছে অনিচ্ছ রাখে উষ্মার কাছে, ক্ষমা চেয়ে নেবে, তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির। তার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস উষ্মা ওকে দেখলে নিজেকে আর বুঝে সরিয়ে রাখতে পারবে না, সে হয় তো এখনও প্রতিদিন ওর প্রতীক্ষার বসে থাকে। গুপরের দৃষ্টান্তলো ওর ছলনা মাত্র। কিন্তু এসব স্তোত্রবাক্য মনে যে মানে না! পুরুষদের অহমিকা ওর অভিমানে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

প্রায় চার মাস কেটে গেলো—কিরে এলো শ্রাবণ মাসে কুল-পূর্ণিমা। সারা দিন শূন্য ভরনে অশান্ত মনের মর্মলাহ জ্বালা বুকে নিয়ে কাটালো অনিচ্ছ। বাইরে বেন শোনা বাজছে কার পদমঞ্চ। বৃষ্টি আগছে তার অভিমানী প্রিয়া! হাতে জরি কলমলো রাখী আর স্নগন্ধ গুপমাল্য নিয়ে। কৈ না! বুঝা প্রতীক্ষার আকুলচিহ্ন বার্ষিক বৃহস্পতির পদধ্বনি আর শুনতে পারে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আকাশে দেখা গিলো বোলকলার পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ। রা, ওর পানে চাইতে পারা বাবে না। হৃদোথ জেবে বুধ কিরিয়ে নেয় অনিচ্ছ। ব্রহ্মস্পর্কিয়া শিসিরা ক'দিন ছিলো এখানে। অনিচ্ছ বলে, চলো শিসিরা দক্ষিণেশ্বরের হাবিয়ে কই।

শিমিকে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ। ছুটে গিয়েছিলো সর্বসম্প্রদায়বিশী ভবতাবিরীষ চরণপ্রান্তে। প্রাণজয়ের কেঁপেছিলো মায়ের চরণের বসে—শিশুর মত ব্যাকুলকণ্ঠে চেয়েছিলো, যা গো, একটু শান্তি দাও মা! বুকেটা বড় অলস বাচ্ছে।

সেই কালে রাতে বাড়ীতে কিরে হিন্দুস্থানী বুড়ো চাকরের কাছে তুললো, সে, বাসিগঞ্জ থেকে দিগিমিণি এসেছিলেন : তা, ও বলে দিয়েছিলো, বাবু ভো বাড়ী নেই, কিছু বলতে হবে?—দিগিমিণি একমম ছুটে নেমে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেন, কিছু জবাব করলেন না।

ওঃ! আবার অল্পশোচনার দংশন!—সে এসে কিবে গেছে? কি করবে অনিরুদ্ধ? এখন বাবে তার কাছে? কিন্তু রাত বে বাইরেটা বেছে নেজে, লোকে ভাববে কি?

তার পরদিনই গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ। কিন্তু হতাশ হয়ে কিরে এলো। উবা তার দাদা আর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে আজ ভোরে মোটেবে দীবা বসনা হয়ে গেছে। কিরতে চার-পাঁচ দিন দেয়ী হবে।

উবার ছোট ডাইটির কাছে আরো জানলো, কিরে এলে, দাদার ঐ বন্ধুর সঙ্গে দিগির বিয়ে হবে। বাবা আর মা কবে থেকে বলছিলেন দিগিরে ঐ সরোজলার কথা, দিগির মত আর হয় না। কিন্তু কাল রাতে দিগির বে কি হল, মাকে ডেকে নিজেই বললো, সরোজলাকে বিয়ে করবে। সরোজলাও তখন ছিলো, অমনি গুদের ঠিক হল, আজ রাতে দীবার বেড়াতে, আর কিরে এলেই বিয়ে হবে।

—বন্ধু না ভ্রাতা, আমার এত ইচ্ছে করছিলো গুদের সঙ্গে বাবার; কিন্তু ওরা আমার কথা মোটে গেরাছাই করলো না,—আচ্ছা আমিও ঠিক করেছি পুজোর ছুটিতে একলাই দার্জিলিং বাবো। কারকে আমার দরকার নেই। ছেলেটি চোখ ছলছলিয়ে বসে রইলো।

শুভ মনে অনিরুদ্ধ কিরে এলো!

দিন কতক পরে উবার দাদা এসে একখানি গোলাপী খাম দিয়ে জানিয়ে গেলো, উবার বিয়ে। আপনার অবশ্যই বাওরা চাই। সে বড় ব্যস্ত আছে সেজন্য আসতে পারলো না, ইত্যাদি।

এ পাড়ারও বিয়ে লেগছে একটা বাড়ীতে। কাল সারা দিন সারা রাত সানাইয়ের কল্লপ বাসিণী গুকে বেনে পাগল করে তুলেছে। মিলন-বাগিণীর মারে ও অনবরত শুনেছে বিসম্মনের সুর।

সারা রাত ইজিচেয়ার বসে, একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ভোর হয়ে আসছে; বাথার অসম্বল স্রাব। দুঃস্বপ্নের শিরার দশদশানি। বড় অলস লাগছে। বুড়ো চাকরটাকে ডেকে কলসো অনিরুদ্ধ, বাড়ীর কটক বন্ধ করো, আমি একটু বাইরে বাচ্ছি। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে এলো সে জনশূন্য পথে,—কোথার বাবে? হ্যাঁ, পল্লীর ধারে সেই গাছতলার বেঁকে? বড় লোভনীর জায়গাটা।

ভোরে ঠাণ্ডা বাতাসে বসে থাকতে থাকতে কখন তব্রার আটার জড়িয়ে গেছে উবার চোখ দুটো। পরিশ্রান্ত, দৃঢ় অহুত্বের কেন্দ্র-হলে, বেনে কে বুলিয়ে দিলে পরম প্রোশান্তির প্রবেশ। কি যমুর স্বপ্ন বোঝে নেমে এসেছে ওর চিন্তাকোশে। বেনে কায়-কৌর পরম বাহিড়ের অকৃত-স্বপ্নবিশি কল উঠেছে ওর অবতের মনের বাপিকোঠার।—আর

কি বগীর? আনন্দের শিখর খেলে বাচ্ছে প্রীতি বনীর ভেতর। খাসে-প্রাশাসে বেনে জেসে আসছে বড় পরিচিত বড় ভালোলাগা একটি গন্ধ। কিরের গন্ধ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বে একটা সিগারেটের গন্ধ। অনিরুদ্ধর হাতে অলতো ঐ সিগারেট। ও গন্ধ অজান্তে তার কাছে। অজ্ঞতের গভীর অলতো চাপা মনটা বাপ-বোণা পাখীর মত ছটফট করে ওঠে—নিউঁয়! কোথা তুমি? তোমার অবলোর বিবাক্ত শরণ্যতে আমার জ্বপিত্তা বে ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে গেলো। কি ক্রটি পেরেছিলো আমার? তোমার ওপর রাগ করেছিলাম? তোমাকে হুটো আলাভরা কথা শুনিয়েছিলাম? আগে তো শুনেছো এই আলামহীর কাছে অনেক মিথি কথা! তার সঙ্গে ছুটো অগ্রির বাক্য গ্রহণ করতে পারলে না কেন? কেন বুললে না ওগুলো সব মিথ্যে প্রলাপ মাত্র? কেন চেয়ে দেখলেন না আমার প্রির-বিচ্ছেদ-আশঙ্কা উৎপলিত মনের দিকে? কেন শুনে না তার স্বনরভাড়া আকুল ক্রন্দন? তোমাকে তুলে গেছি এই তোমার ধাবা?—সাগর কি ভোলে চানের প্রেম? উবা কি তুলে যেতে পারে অনিরুদ্ধকে? কৈ তুমি তো একবারও কিরে এলে না, ওগো তোমার একবার দর্শন পেলে, একটি কথা শুনেলে, সব বে ঠিক হয়ে যেতো,—আমি বে আকুল প্রতীকা নিয়ে কত দিন-রাত অপেক্ষা করলাম তোমার জন্ত—তুমি তো এলে না? আমি বে মনে মনে রোজ ছুটে গেছি তোমার সন্ধানে,—কিন্তু দৃষ্টের লজ্জার আর নিফল অভিমানে প্রাটার বাইরে রেখেছিলো আমাকে আবদ্ধ করে।

আমাকে দেখেছো সরোজের সঙ্গে বেড়াতে? কি ভাবলে তুমি? গুকে ভালোবেসেছি? মিথ্যে কথা। জগতের সব চেয়ে বড় মিথ্যা এই বে, বে পুঙ্খের সোনার কাঠির পরশে জেগে ওঠে নাবীর স্তম্ভমার বৃন্তিগুলো; বুলে বার তার মনের রক্তকপাট, টুটে বার নাবীর যুগ-যুগান্তের নিজার জড়তা! তার মনোমন্দিরে বে দেবতার প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হোল, প্রথম আঁধি মেলে সে দেখলো বার মোহন রূপ, অন্ততাসিকনে বে পরমপুঙ্খ প্রেমমন্ড্রে করলো দীক্ষা দান, তাকে তুলতে পারে না কোনো নাবীর সচেতন মন। মনের স্বর্ণদেউলে, পায় না অপর কোনো পুঙ্খ, প্রবেশাধিকার। বা দেখেছো, বা বুকেছো, ও-সব তোমার মনে বিবেক-বহি আলবার একটা বাচ্ছিক প্রতীক মাত্র।

প্রবল অরে বিকারের ঘোরে রোগী অনেক সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বার, কত কি অঘটন ঘটায়, কত প্রলাপ বকে। সে কি বুঝতে পারে, সে কি করছে? তার মানসিক বিকার আর ব্যাধির তীর বাতনা গুকে দিরে করিয়ে নেয় ঐ সব। তাই আমিও করেছিলাম,—তোমার নিলিগু মনকে আকর্ষণ করবার জন্তে, তোমার প্রতি প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনার তাগিদে মিশেছিলাম ঐ মূল্যহীন শিশু কুলটার সঙ্গে।—তোমার বাড়ীর আশে-পাশে গাড়ী করে বোরাফেরা করেছি, তুমি কিরে চাইবে বলে।

কিন্তু হায়, তুমি বে কত বড় নিদ্রম, পাখা তা বুদ্ধিমান জালে, বুঝতে পারলাম,—যেদিন সকল লাজলজ্জা অদম্যদের কুল জ্য সুরির বাধী পুশিমার দিন সন্ধ্যার ছুটে গেলাম তোমার কল্ল, শিরে তুললাম তোমার চাকরের কাছে, “বাবু মাইজীকে। লায় জ্ঞানীয় শিরা।” মাইজী। কে মাইজী? ওগো কে কেড়ে নিলে আমার দাব্য অধিকারকে?

কে সে? হ্যাঁ বুঝতে পেয়েছি, সে হচ্ছে মাদুরী সেন। মনটা আর্জিকর্মে চিন্তার কয়ে উঠলো, হ'হাতে তার টুটি রূপে ধরে তাকে জড়ায় করলাম।

বাড়ী কিরে দেখি বসে আছে সত্যোজ, দানার ঘরে। হ্যাঁ একটা কিছু করতে হবে, এ প্রহসনের সমাপ্তির রেখা টানতে হবে। মাকে জানালাম, আমার সমস্যা আছে বিয়েতে। তবে একটা সর্কে, কাল ভোরবেলার অনেক ঘুবে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। সত্যোজ তো প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলো আনন্দে। তখনই ছিঁব হয়ে গেলো। পরদিন ভোরে পালিয়ে সেলাম আমি, আমার নিজের কাছ থেকে।

কোথায় সেলাম, কি দেখলাম, কি কথা বলেছিলাম, আর তো কিছুই আমার জানা নেই? কারণ ঐ কুলন পূর্ণিমার রাতেই আমার মনের সূত্রা খটেছিলো। তারপর যে রইলো, সে আমার মনের প্রোতাহা। সে নিরবলম্ব, বায়ুভূত মহাপুত্র।

ভারি কৌতূহল নিয়ে চেয়ে দেখছি বাড়ীতে এত উৎসব কিসের? এত স্মরণ স্মরণ শাড়ী ব্লাউস, মণিযুক্তাধিষ্ঠিত আভরণ, এত লোকের কোলাহল, এত আসা, এত কুল, এ সব কিসের জন্ত? আমি তো মরেছি, এ সব কি আমার চিরবিধায়ের শোভাযাত্রার আয়োজন? কাল আবার সকাল থেকে বাড়ীতে সানাই বাজছে। উঃ! কি কাহ্নাভরা সুর ওয়? হ্যাঁ আমি ঠিকই শুনেছি, অনিরুদ্ধ কাঁদছে, উঁহা কাঁদছে। কাঁদছে ঐ সুরের মধ্যে শত বিদেহী প্রেমিকার অতৃপ্ত আত্মা।

রাত চল। ভারি রাতের কোলে ঘুম ঢলে পড়লো বাড়ীর প্রতিটি ভাগ্য প্রাপী। আমি জেগেছিলাম, আমার হুঁ চোখে জলছিলো মশাল, আর বুকে জলছিলো চিতার আগুন। নিজের মনে হেসে উঠছিলাম,—একটা কথা ভেবে। কাল এই সময় কত মিথ্যা হয়ে যাবে সব আয়োজন। মা কাঁদবে? বাবা কাঁদবেন? তা কাঁদুন ওরা। আমিও তো কত বাতনা ভোগ করলাম, কত কাহ্না কাঁদলাম। দাদা আছে, মিম্ব, চিন্ন আছে, ওরা আবার ভুলিয়ে দেবে মা-বাবার সব বস্ত্রা। কিন্তু আমাকে কে ভোলাবে? কে নেবাবে আমার বুকের এই অনির্বাক্য চিতার আগুন? কেউ নেই। যে ছিলো, সে হারিয়ে গেছে জীবনে।

ভোর হয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে নিলাম, মা বাগকে ভাইদের, ছোট বাচ্চু বোনকে। আর কোনো জ্বর নেই, কোনো নাগিল নেই কান্নার বিস্মৃতি! মনে পেয়েছি এক অতৃপ্ত পূর্ণ ঐশ্বরিক চেতনার আলো। সেই আলোয় বেগতে পেয়েছি আমার পথ।

গাড়ী বার করে নিলাম গ্যারেজ থেকে। দারোয়ানকে বলে এসেছি, বাবুকে বোলো দিনিমণি একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন।

এসেছি গলার ধারে, ঐ যে পত্রবহুল নামনা-তানা গাছটা। ও যে মিনতি জানিয়ে পাতার কান্নার ছলিয়ে ডাকছে আমায়, বাবেই তো গলার কোলে, একটু বসে যাও আমার কাছে। তোমরা যে আমার বড় চেনা।

না এ আকর্ষণ কাতানো গেলো না, আসতেই চল ওব তলার।

কিন্তু সব যেমন এলোমেলো হয়ে বাচ্ছে? ও গছটা কিসের? একদা স্বপ্নজীবনের পরশ লাগছে বেন দেখে-মনে? জীবন-দর্শিত

আসছে যিশুর জোয়ার। চট করে উঠার চোখ ছেড়ে ছুটে পালালো ভগ্না।

উঁহা বুধ কিরিরে চাইলো অনিরুদ্ধ দিকে। তার পর মহাবিশ্বের আর কতক পুনরোজ্জীবনের স্বাভাবিক ধরমারিয়ে কেঁপে উঠে ছিন্ন লতিকার মত লুটিয়ে পড়লো। ওয় দেহখানা বেকির হাবসের ওপর।

পরম দেহভরে ওকে ধরে তুলে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করে অনিরুদ্ধ। আর তো তোমার খিরের দিন; এমন সময় এখানে এসেছিস কেন উঁহা?

চোখ তুলে অমুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ওয় দিকে চায় উঁহা। সে চোখের তারার রহস্য চিকারকিরে ওঠে।

পরম স্রাস্তি ভরে জবাব দেয়, তুমি এখানে এমন সময় কেন এসেছো অনিরুদ্ধ? বিয়ে? কারা বিয়ে? মড়ার আবার বিয়ে হয়? মড়ার ওপর ওরা বড় খাঁড়ার যা দিচ্ছে, তাই নিজেই বিয়ে নিয়ে এলাম নিজের শবদেহটাকে ঐ গলার জলে বিসর্জন দেব বলে।

—উঁহা! এ তুমি কি বলছো? অস্টু চিন্তার কয়ে ওঠে অনিরুদ্ধ।

ঠিকই বলছি। এই দেখো। ঢকল ভাবে উঠে গাঁড়ায় উঁহা।

উম্মানের মত ওকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে বেঁধে কেলে অনিরুদ্ধ। কোথায় বাবে? আমি যেতে দেব না। তুমি যে একান্ত আমার। হুঁহার সাধ্য কি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়?

তখন ভোরের থমথমে অন্ধকার সরে গেছে। পূর্ণ সিন্ধুর সিঁড়ি বেয়ে নব-অমুগাগিণী, লাজনন্দা উঁহা, রক্তাধরে অবলম্বন টেনে বাবে ধীরে চলছে প্রিয় সন্ন্যাসনে।

অনিরুদ্ধ আবেগভরে ডাকে—চলো উঁহা, আমরা বাই।

জিজ্ঞাসে দৃষ্টি মেলে স্রীণ স্বরে উঁহা বললো, কোথায়?

—ঘরে, অনেক ঘরে,—হিমি তো জীবন বিসর্জন দিতে এসেছিলে? তাকে কিরিরে নিয়ে এসেছি আমি। এতে আর কারুর অধিকার নেই উঁহা।

হুঁচোখ পুনরাবেশে নিমীলিত হয়ে আসে উঁহার। টোটে ফুটে ওঠে এক অনির্বাক্যের আনন্দসিক্ত মুহূর্ত হাসি।—মোহনসুরে জবাব দেয়—

অধিকার কোন দিন কারুর ছিলো না। তবে তোমাকে হারিয়ে মন আমার মরেই গিয়েছিলো, আজ শুধু এসেছিলাম দেহটাকে বিসর্জন দিতে। সেই শবদেহে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করলে তুমি। জগতের কাছে আপাতদৃষ্টিতে আমি সুতই রয়ে গেলাম।—তখন হুঁচার জন বাস্তবোন্মত্তের আনন্দোৎসব সবে শুরু হয়েছে উদ্ভূত ময়দানে, গলার ধারে। গাছে গাছে বিহগজ্ঞ প্রভাত-বন্দনার সুরের আলাপ ধরেছে। মশল জলে-তেজ পিচের বাস্তব হুঁহ শব্দে মোটরবানে ছুটে চলছে অনিরুদ্ধ উঁহাকে নিয়ে।

পেছনে রইলো বেগনামের কতীত! আর রইলো উঁহার পুণ্য মরিস পাড়িখামা।





## ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

### রাজা সৌদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ—

মুগ্য প্রাচ্য সম্পর্ক প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা যে বিচরক সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সৌদীআরবের রাজ্যের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একথা অনুভবীয়। ইরাকের যুবরাজ আবদুল ইল্লাহের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন অপেক্ষাও উহার সফরের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইরাক বাগদাদ চুক্তির অন্ততম লক্ষ্য। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্ক প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনাও ইরাকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই শিক দিয়া ইরাক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃষ্টিতে 'গুড বর', একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিকট হইতে ইরাক আর কি কি সাহায্য পাইতে পারে ইরাকের যুবরাজ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত তাহারই আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন সম্পর্কে অজ্ঞাত আরব রাষ্ট্রের মত পরিবর্তন করিবার মত প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা ইরাকের নাই। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও সৌদী আরব বাগদাদ চুক্তির বিরোধী। সৌদীআরবের রাজকংশ এক ইরাকের রাজকংশের মধ্যে বিরোধও অনেক দিনের। মিশর, সিরিয়া ও জর্ডান সরকারী ভাবে আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের বিরোধিতা করিয়াছে। সৌদীআরব অবশ্য প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। কিন্তু জাহুযারী মাসের মগাজগে কয়েকবারে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও সৌদীআরব এই চারটি আরব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে যে সম্মেলন হয় তাগাত আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের বিরোধিতা করিয়াই প্রস্তাব পূর্ত্য হইয়াছে। সুতরাং সৌদীআরব এই প্রস্তাবের অন্ততম সমর্থক। ইরাকের অভিমত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে জানাইবার জন্য সম্মেলন সৌদীআরবের রাজাকে ক্ষমতা দান করে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে সৌদীআরবের রাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনার যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, তাগা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্বে সৌদীআরবের রাজা বখন যুবরাজ ছিলেন এই সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌদী

এই সফরের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিউইয়র্কের মেসার্স নিউইয়র্ক নগরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সতর্কতা জানাইতে অস্বীকৃত হয়। ইহার বেসকল কারণ তিনি উল্লেখ করেন সেগুলি কূটনীতি বিষয়োবীত শুধু নয়, সৌদী আরবের রাজ্যের পক্ষেও ক্ষতিমূলক হয় নাই। নিউইয়র্ক সহরে ইহুদী এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য। ইহা-ই অস্বস্তি উত্থার কারণ। নিউইয়র্ক নগরী তাঁহাকে সতর্কতা না করার একটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়াছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার। রাজা সৌদ ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সাধারণতঃ প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে উপস্থিত থাকিয়াই সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, অভ্যর্থনা করিবার ভিত্তি বিমান ঘাঁটিতে কখনও যান না। সৌদী আরবের রাজার অভ্যর্থনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই রীতিনুয় ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কেন স্বয়ং ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়া রাজা সৌদকে অভ্যর্থনা করিলেন, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর বোধ হয় ইহাই যে, উগাও তাঁহার মধ্য প্রাচ্য পরিকল্পনারই একটি অংশ। মধ্য প্রাচ্য সম্পর্ক আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, অজ্ঞাত নিবেশকে দেশগুলিতেও আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রগণ্যী তীব্র ভাষায় উহার নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু সৌদী আরবের রাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনা যে এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার একটা বিশিষ্ট ধারা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌদীআরবের রাজা কায্যতঃ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-পুতুলিকা (oil puppet) ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু বাগদাদ চুক্তি বিরোধীদের সহিত বাগদাদ করিয়া তিনি পশ্চিমীশক্তি বিরোধী বোভুদিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাগাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরব উপদ্বীপের উত্তর ও পূর্বে উৎকল বৃত্তিণের আশ্রিত যে সকল শেখ এবং মুসলমান আছেন রাজা সৌদী অর্ধ সাহায্য দিয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তিণবিরোধী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, বৃটেন এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বৃত্তিণ জর্ডান চুক্তি বাতিল করিতে হইলে অজ্ঞাত আরব রাষ্ট্রের নিকট হইতে জর্ডানের অর্ধসাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। জাহুযারী মাসের (১৯৫৭) মাঝামাঝি কার্যকালে বাগদাদ চুক্তি বিরোধী যে চারটি আরব রাষ্ট্রের সম্মেলন হইয়া গেল তাগাতে মিশর, সৌদী আরব এবং সিরিয়া এই তিনটি আরব রাষ্ট্র তর্জনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (১) সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিশর ও সৌদী আরব প্রত্যেকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং সিরিয়া ২৫ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দিবে। রাজা সৌদ মার্কিন তৈল কোম্পানীর প্রেস্তু রয়েলটি বাবদ প্রচুর অর্ধ পাইয়া থাকেন। উহার পরিমাণ বার্ষিক ৫০ কোটি ডলার। ইহা সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে মধ্য প্রাচ্যে অর্থনৈতিক সাহায্যদাতার ভূমিকা বৈকি দিন গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য যদি আরব রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে তবে উগার সমুখে সৌদীআরবের অর্থনৈতিক সাহায্যের কোন স্থানই থাকিবে না। রাশিয়ার সাহায্য প্রকাশিতে হইলে মার্কিন সাহায্য প্রয়োজন। তা হইলে অস্বস্তি খাল বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি



চইতে রাজা সৌদের আরও কমিয়া গিয়াছে। কাজেই মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে তাঁহার অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়াও প্রত্যাশন। যিনি তৈল বাবদ বৎসরে ৩০ কোটি ডলার রয়লটি পাষ্টয়া থাকেন তাঁহাকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে মাকিণ কংগ্রেসকে সম্মত করান খুব সহজ হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। সৌদী আরবের সামরিক সাহায্যও প্রয়োজন। রাজা সৌদ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ২০ কোটি ডলার চইতে ২৫ কোটি ডলার সাময়িক সাহায্য চাহিয়াছেন। ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই।

ঘরে-গাউরে সৌদী আরবের সমস্তা যেমন কম নয়, তেমনি সমস্তাগুলি কঠিনও বটে। বুবাটমি মরুজান লইয়া বুটেনের সহিত তাহার বিরোধটা অনেক দিনের। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার হস্তক্ষেপ করিলে বুটেনের সহিত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা আরও তিক্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। মধ্যপ্রাচ্য প্রভাব বিস্তার লইয়া মিশরের সহিত সৌদী আরবের প্রতিযোগিতা একেবারেই নষ্ট, একথা বলা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যে কর্ণেল নাসেরের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজা সৌদ গোড়া রক্ষণশীলদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ণেল নাসেরের বিতাগিতা করার যে বিপদ আছে তাহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন। আবার কর্ণেল নাসেরের সহিত মিত্রতা করার পরিণাম যে খাল কাটিয়া কুমীর আনাশর মতই তাহাও তিনি ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতেছেন। তৈল চইতে যে-বিপুল অর্থ বহেলটিরণ পাতোয়া যায় তাহা তাঁহার ও রাজপরিবারের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত আয়রূপে গণ্য হইয়া থাকে। রাজপরিবারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা ঐ অর্থকে সরকারী অর্থরূপে গণ্য করিবার এবং উহার উপযুক্ত হিসাব রাখিবার দাবী তুলিয়াছে। ক্ষমতাচ্যুত রাজপরিবারের শাসনের পরিবর্তে দাবী করিতেছেন জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। ইহার উপর কার্যের বেড়িও চইতে জনগণের জয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আরব জগতে প্রচার করা হইতেছে। রাজা সৌদ উহার বিপদের কথা ভাল করিয়াই জানেন। মিশরীয় শিক্ষকরা সৌদী আরবের ছুলুগুসিতও প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিপদ ছাড়াও সামরিক ব্যাপারে তিনি উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

সৌদী আরবের প্রাক্তন রাজা ইবন সৌদ উপজাতীয় ওয়াহাবীদের সাহায্যে আরবে প্রাচ্যে অত্যাচার করেন। তৈল চইতে অর্থাগম আরম্ভ হওয়ার পর তাঁহার শাসন ব্যবস্থা সুশ্রোতিষ্ঠিত হয়, সেই সঙ্গে ওয়াহাবীদের ক্ষমতাও হ্রাস প্রায়। কিন্তু এখন দেখা দিয়াছে এক নতুন সমস্তা। সৌদী আরব বাহিনীতে মাকিণ উপদেষ্টা অবস্থাই আছে। কিন্তু মিশরের সহিত চুক্তির কল মিশরীয় সামরিক মিশনও আসিয়াছে। সৌদী আরব বাহিনীর তত্ত্বাবধি অফিসারদের উপর মিশরীয় সামরিক উপদেষ্টাদের প্রভাবের পরিণাম কি হইতে পারে তাহা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাহিরের লোক তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করে রাজা সৌদ তাহা পছন্দ করেন না। এই কারণেই কয়েক বৎসর পূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পারমাণবিক দেশবন্ধা চুক্তিতে সৌদী

আরব রাজী হয় নাই। সৌদী আরবের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, এই অজুহাতে মাকিণ বাহিনীর মিশনকে সৌদী আরব হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শক্তি-বিরোধী ডুমিক প্রচণ্ড করিয়া রাজা সৌদ তাঁহার প্রভাব অল্প রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু সৌদী আরবের উপর কর্ণেল নাসেরের প্রভাবের কথাও তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইতেছে। বুটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণের ফলে কর্ণেল নাসের যে খুবই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুয়েজ খালের উপর আধিপত্য রক্ষার প্রেরণ লইয়া তিনি খুবই বিব্রত। ইহার উপর মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সমস্তাও আছে। কর্ণেল নাসের যদি এই সকল সমস্তা কাটাইয়া উঠিতে পারেন, তাহা চইলে তিনি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন। তাঁহার সম্মুখে রাজা সৌদ শুধু যান চইয়াই ঘাইবেন না, নাসেরের সাফল্যের প্রতিক্রিয়া সৌদ আরবের কল্যাণেরও দেখা দিবে। উহার ফলে রাজা সৌদের সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্য বিপর্যয় হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। এই বিপদ হইতে সৌদ পাঠিবার স্তম্ভ তাঁহার বন্ধু ও সাহায্য প্রয়োজন। আইসেনহাওয়ার পবিত্রতার সাফল্যের জন্তও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও মধ্যপ্রাচ্যে একজন বিশিষ্ট মিত্র প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতেই রাজা সৌদের আমেরিকা ভ্রমণ এবং প্রে: আইসেনহাওয়ারের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার পবিত্রতাকে কার্যকরী করিবার উপায় হিসাবেই রাজা সৌদকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজা সৌদও এই আমন্ত্রণকে নিজের জন্ত কিছু সুবিধা আনাগের সুযোগে গণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুই দিক চইতেই যে সুবিধা আনাগের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দশ দিনব্যাপী মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর রাজা সৌদ ১ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) শেনে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারি প্রে: আইসেনহাওয়ার এবং রাজা সৌদ তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার কক্ষাল সম্পর্কে যে ছয় দফাবিশিষ্ট যুক্ত ইচ্ছাচার প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে উভয়ের উদ্দেশ্যই যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বশান্তির জন্ত সৌদী আশ্রয়কে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উভয়েই একমত হইয়াছেন। সৌদী আশ্রয়কে শক্তিশালী করার সহিত ইচ্ছাচারে পক্ষম দফার সম্বন্ধ খুব নিবিড়। সৌদী আরবের বাহিনীতে মাকিণ বিমানবীতি আছে তাহার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসরে জঙ্গ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাছাড়া সৌদী আরব বাহিনীতে শক্তিশালী করিবার জন্ত প্রে: আইসেনহাওয়ার রাজা সৌদে আশ্বাস দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বন্ধার জঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং সৈন্যদিককে শিক্ষাদান সম্পন্ন করিবার চরকা কড়া হইতেছে। সৌদী আরবের সৈন্য বাহিনী কার্যরোধিত যৌথ আরব কমান্ডের অধীন। মাকিণ সামরিক সাহায্যের ফলে যৌথ আরব কমান্ডের গতি কি হইবে তা অজ্ঞান করা কঠিন। মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া, জর্ডান ইয়েমেন এই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র লইয়া যে আত্মজাত গতি উঠিয়াছে তাহাকে অনেক 'নাসের ফেডারেশন' নামে অভিহিত

করিয়াছেন। বার্ষিক সাময়িক সাহায্য পাইয়া সৌদি আরব অতি দীর্ঘ এই জাভানের বাহিরে চলিয়া আসিবে এবং সৌদি আরব বাহিনীকে যৌথ আরব কমান্ডের আওতা হইতে মুক্ত করা হইবে, ইহাও স্বীকার করা কঠিন। ইহা করিতে গেলে যে-উদ্দেশ্যে প্রে: আইসেনহাওয়ার রাজ্য সৌদকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত সমস্তা শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক উপায়ে মীমাংসা করার অভিপ্রায়ও যুক্ত ইজ্ঞাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজ্যের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভিপ্রায় ও নীতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শান্তিতে বাস করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা ভোগ করার দাবীও স্বীকার করা হইয়াছে। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যেরই একটি রাষ্ট্র। ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীন হইতেই আরব-ইসরাইল বিরোধ চলিছে। আরব রাষ্ট্রগুলি মধ্যপ্রাচ্যে হইতে ইসরাইল রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়। যুক্ত ইজ্ঞাহারের উল্লিখিত যোষণা দ্বারা আরব-ইসরাইল বিরোধের মীমাংসা সহজ হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। যুক্ত ইজ্ঞাহারে রাজ্য সৌদি বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও যোষণা করিয়াছেন যে, বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের উন্নতি সাধন করিতে অস্বস্তি আরব নেতাদের অভিপ্রায়ও তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ইজ্ঞাহারে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য সৌদি ওয়াশিংটনে প্রকাশিত যোষণা করিয়াছেন যে, প্রে: আইসেনহাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তিনি খসি হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনাটি ভুল। আরব রাষ্ট্রগুলি এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া উহার গুণাগুণ দেখিতে পারেন। দেশে করিয়া আরব দেশগুলির সহিত এবিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন, তাহা সৌদি ইহাও যোষণা করিয়াছেন। তাহার পক্ষে এই দাবি পালন বা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তিনি এই দাবি গ্রহণ করার প্রে: আইসেনহাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে।

### নিরাপত্তা পরিষদের কাশ্মীর সমস্যা—

নিরাপত্তা পরিষদে আবার কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্ত পাকিস্তান যে আবেদন ধরে, তাহুসারে গত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৭) নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সনের ২৩শে ডিসেম্বরের পর কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার জন্ত রাপত্তা পরিষদের ইহা-ই প্রথম অধিবেশন। কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত কাশ্মীর গণপরিষদের গৃহীত হয় তাহা কার্যকরী করার তারিখ স্থির হয় ২৬শে জানুয়ারী। উহা যৌথ দ্বিবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের এই আবেদন। পাকিস্তানের রাষ্ট্র মন্ত্রী মালিক বিরোধ খান নূন পাকিস্তানের দাবী উপস্থাপন করিয়া আলোচনার উদ্বোধন করেন। এই বক্তৃতায় তিনি কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী প্রেরণের

এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিরোধের জন্ত নির্দেশস্বত্বের দাবী উপস্থাপন করেন। ২৪শে জানুয়ারী বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র, ব্রুটন, অস্ট্রেলিয়া কলম্বিয়া ও কিউবা এই পঞ্চাশটি কাশ্মীর সম্পর্কে এক থসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করে এবং ২৫শে জানুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগার জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। রাশিয়া ভোটগানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই এই প্রস্তাবটি রচিত হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বেই উহা প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্ত প্রস্তাবের ২৮টিভাৱ এত উল্লেখ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শ্রীমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়া পূর্বেই পাকিস্তান করিবার যৌথও তাহাদের ছিল না। ভারতের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শ্রীমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়া পূর্বেই এই পঞ্চাশটি তাহাদের কর্তব্য স্থির করিয়া রাখার তাহাদের ভারতবিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের ভারতবিরোধী মনোভাবের কথা যে আমরা জানি না তাহা নয়। শ্রীমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে প্রস্তাবটি রচিত হইতেই যে উহা অস্বস্তি হইত তাহাও আমরা মনে করি না। কিন্তু তাহার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রস্তাব রচনা করায় পাকিস্তানকে সমর্থন করিতে তাহাদের নির্লজ্জ আগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

উক্ত প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায় কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের নীতিতে নিরাপত্তা পরিষদ অব্যবহিত থাকার কথা যোষণা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের জন্ত কাশ্মীর গণপরিষদ কিছু কবিলে তাহা দ্বারা কাশ্মীরের গঠন প্রকৃত নিদ্ধারিত হইবে না। নিরাপত্তা পরিষদ যে কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে বিবেচনা চালাইয়া বাইতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রস্তাবে তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যে দুইটি তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে অসিদ্ধ করা। কাশ্মীর কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা উহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব যে কাশ্মীর সমস্যাতে নূতন রূপ দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাকিস্তান যে আক্রমণকারী, এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং কাশ্মীরকে পরিশ্রুত করা হইয়াছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরোধী অঞ্চল। কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত করিয়া যে নূতন কিছু করে নাই, মহাশয়। কর্তৃক কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে নূতন করিয়া যোষণা করিয়াছে মাত্র, এই সত্যকে মোটেই আমল দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং তাহাদের তাঁবেদারের নিকট হইতে অস্বস্তি প্রকাশ করা যে দুঃখামাত্র, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু রাশিয়া প্রস্তাবটিতে ভেটো দেয় নাই। কেবল ভোটগানে বিরত ছিল, ইহা বিশ্বাসের বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হাজীর ব্যাপারে ভারত যেমনভাবে প্রকাশ করিয়াছিল, উহা যে তাহারই প্রতিক্রিয়া, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বিরোধী। রাশিয়ার সমর্থনও ভারত হারাইল। ভারতকে এই মূল্য দিয়া নিরপেক্ষ নীতি রক্ষা করিতে হইতেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে এবার প্রথম বক্তব্য পাকিস্তানই কর

হইয়াছে। অবশ্য পূর্বেও কার্যতঃ পাকিস্তানেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিষদ কি করিবে, ইহাই প্রশ্ন। ৩০শে জানুয়ারী পাক-পরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ কিরোজ খাঁ নূন বৈকল্যতা দেন, তাহাতে কান্দ্রারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী প্রেরণ এবং কান্দ্রার হটতে উভয় পক্ষকে সৈন্য সরাইয়া লইবার নির্দেশ দিবার জল্প নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আকাব ধরিয়াছেন। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেনন গত ২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার স্মরণীয় বক্তৃতার মিঃ নূনের সমস্ত উক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা আলোমতী হয় নাই বটে, কিন্তু যুক্তি ও তথ্যে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তানকে সমর্থন করিতে যাহার দৃঢ়স্বপ্ন যুক্তি ও তথ্যে তাঁহাদের স্বপ্নের পরিবর্তন, হইবে এতখানি দুঃখান 'করিবার কিছুই দেখা বাইতেছে না।

### আলজেরিয়া ও ফ্রান্স—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে আলজেরিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনো ১১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক নিলম্বক বিবৃতি পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন যে, আলজেরিয়া ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং আলজেরিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ফ্রান্স কিছুতেই মানিয়া লইবে না। কথাটা বিশ্বাসীর কাছে নূতন নয়। ফ্রান্স বহু বার বিশ্বাসীকে এই মিথ্যা উক্তি শুনাইয়াছে। আলজেরিয়া সমস্যা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ প্রত্যাখ্যে ১৯৫৫ সালে ফ্রান্স সাধারণ পরিষদ হইতে বাহিব হইয়া যায়। তথাপি ফ্রান্স এই অধিবেশনে যোগদান করিল কেন, মঃ পিনো তাহার কারণও বিবৃত করিয়াছেন। আলজেরিয়ার ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষিদ্ধিত ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে নিলম্বচর্চা চলিতেছে, প্রকাশ্য ভাবে তাহার উদ্ভব দেওয়া তাঁহার একটি উদ্দেশ্য। ষষ্ঠীয়তঃ আলজেরিয়ার ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বহর কত বাড়িয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিতে চান। তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য সদস্যদিগকে সদুপদেশ দান। ফ্রান্স যেভাবে সনদের মধ্যমা রক্ষা করিতেছে অজ্ঞাত সমস্ত রাষ্ট্রকে সেই ভাবে সনদের মধ্যমা রক্ষা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। মঃ পিনোর নিলম্বক শুদ্ধতা এই বিবৃতির মধ্যে সীমাহীন হইয়া উঠিয়াছে।

আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া একটি আইন পাশ করিলেই আলজেরিয়া ফ্রান্সের অঙ্গীভূত হইল, ফ্রান্সের সীমান্ত আলজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইল, নিলম্বক সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া আর কাহারও পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয়। ইহা সকলেই জানে, ১৮৩০ সালের পূর্বে পর্যন্ত আলজেরিয়া নামে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুটেন ও ফ্রান্স মিলিত ভাবে ১৮২৪ সালে আলজেরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু আলজেরিয়াবাসীর শৌর্যবীর্যের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পর ১৮২৭ সালে আবার ফ্রান্স আলজেরিয়া আক্রমণ করে। এবারও ফ্রান্স পরাজিত হয়। অন্তঃপর ১৮৩০ সালে ফ্রান্স পুনরায় আক্রমণ করে এবং উহা দখল করিতে সক্ষম হয়। এই ঐতিহাসিক সত্য কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কমিটিতে

মঃ পিনো যখন আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া দাবী করিতেছিলেন সেই সময় আলজেরিয়ার অধিবাসীরা হরতাল করিয়া তাঁহার দাবীর অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। আলজেরিয়ার ফ্রান্সের ৪ লক্ষ সৈন্য বাণীবতাকামীদিগকে দমন করিবার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। মঃ পিনোর পক্ষে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, এই ৪ লক্ষ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতেছে। কাহার এই বিদ্রোহী? আলজেরিয়ার ফরাসী কোলোন বা ফরাসী উপনিবেশিক ছাড়া আর সকলেই 'বিদ্রোহী' পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং আলজেরিয়া যে ফ্রান্সের অঙ্গ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানের জল্প ফরাসী গবর্নমেন্টের চারি দশাবিশিষ্ট একটি প্রস্তাবও মঃ পিনো তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৭) ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে আলজেরিয়া সম্পর্কে যে পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন মঃ পিনো তাহারই পুনরুৎপন্ন করিয়াছেন মাত্র। এই পরিকল্পনার মধ্যে যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই অস্পষ্টতার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, উহাতে আলজেরিয়ার অধিবাসীদিগকে স্বাধীনতা দিবার কোন কথা নাই।

### ভারতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও মাঃ জুকার—

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুস্বয়ি এল-কুওয়াতীর ১০ দিন এবং হাশিমিয়ার দেশরক্ষামন্ত্রী মার্শাল জুকারের ১৮ দিনব্যাপী ভারত ভ্রমণের একেবারেই কোন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নাই একথা বলা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সিরিয়া শুধু বাগদাদ চুক্তি বিবোধীই নয়, শুধু তথাকথিত 'নাসের ফেডারেশনের'ই সদস্য নয়, পশ্চিমী শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে সিরিয়া কখনোই শিবিরে যোগদান করিয়া ফেলিয়াছে। বুটেন ও ফ্রান্স যখন মিশর আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময় ইরাক সিরিয়া এবং ইসরাইল জর্ডান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া পরে প্রকাশ পাইয়াছে। দামাস্কাসে এই চক্রান্তের আসামীদের বিচারের সময় একজন আসামী বলিয়াছে যে, ইরাক সিরিয়া আক্রমণের জল্প প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বুটেনের মিশর আক্রমণের সময়েই বুটেন ও মার্কিন এজেন্টদের সহযোগিতায় আক্রমণ আরম্ভ করা স্থির করা হইয়াছিল। ভারতের মত সিরিয়াও পশ্চিম এশিয়ার বুটেন প্রভাব বিপুল হওয়ার শক্তিশূন্যতা ঘটাইছে একথা স্বীকার করে না।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রথমে পাকিস্তানে বান এবং পাকিস্তান ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৭ জানুয়ারী (১৯৫৭) নয়াদিল্লীতে পৌছেন। করাচীতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মধ্যে চারদিন ব্যাপী আলোচনার পর যেখুজ্জ বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় না যে, পশ্চিম এশিয়ার মিথ্যা সহযোগিতার সফরের ফলে সিরিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক নিকটতর হইয়াছে। নয়াদিল্লীতে নেহরুজীর সহিত তাঁহার আলোচনার পর যেখুজ্জ বিবৃতি প্রকাশ করা হয় (২১শে জানুয়ারী) তাহাতে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাগুলি সমাধানের জল্প সাময়িক দিক হইতে প্রোচটার নিশা করা হইয়াছে। আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা নাই বটে, কিন্তু এই সমালোচনা যে উদ্যত

সম্পর্কেই প্রচেষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। বাগদাদ চুক্তি যে আরব জগতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও যুক্তিবৃত্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাজেরীর কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু উপনিবেশিকতা বৈরুপট্র ক্রমণ কক্ষ প্রাচ্যর অবদান ঘটাইবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে।

রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকভ মঃ বুলগানিন ও মঃ কুশেভের সহিতই ভারতে আসিবার জন্ত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি আসিতে পারেন নাই। কিন্তু পোলাণ্ড ও হাজেরীর ঘটনাবলী এবং পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর তাঁহার ভারতে আগমনের ওকথ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্শাল জুকভ ২৪শে জানুয়ারী (১৯২৭) নয়াদিল্লীতে পৌঁছেন। ঠিক সেই দিনই কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই মস্কো, ওয়াশিংটন, লুপেঞ্জ এবং কাবুল ভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে আসেন। দুই মাসের মধ্যে ইহা তাঁহার তৃতীয় বার ভারতে আগমন। তিনি প্রথমে আসেন নেহরুর ওয়াশিংটন যাত্রার পূর্বে। নেহরুজী আমেরিকা হইতে করিয়া আসিলে তিনি পরিকল্পনা সঙ্করের পর আবার ভারত আসেন। অন্তঃপর তিনি মস্কো, পূর্ব ইউরোপ এবং কাবুল ভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে আসেন এবং নেহরুজীর সহিত তিন ঘণ্টা আলোচনা করেন। মস্কো, পোলাণ্ড এবং হাজেরী ভ্রমণের পূর্বে গত ডিসেম্বর মাসে নেহরুজীর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয়, তখন তাহা হাজেরীর ব্যাপার সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। এবারের আলোচনায় এই মতপার্থক্য দূর হইয়াছে, একথাও স্বীকার করা যায় না।

মস্কো হইতে চীন ও রাশিয়ার প্রকাশিত যুক্ত ইচ্ছাচারে বলা হইয়াছে যে, প্রতিবিপ্লব দমনের জন্ত হাজেরীর জনগণকে সাহায্য করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন হাজেরী ও অজ্ঞাত সমাজবাদী রাষ্ট্রের স্রমিকদের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। জরুরিতে চৌ-এন লাই পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং গবর্নমেন্টের সহিত যে যুক্তি বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে হাজেরীর কাদার গবর্নমেন্টকে সমর্থন করা হইয়াছে। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্শাল জুকভের ভারতে আগমনের তাৎপর্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মার্শাল জুকভের ভারতে অবস্থানের সময়েই নিরাপত্তা পরিবদে কান্দীর সম্পর্কে পঞ্চ শক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সাময়িক চুক্তির বিরোধিতার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। হাজেরী সম্পর্কে ভারত যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাতে রূপ-ভারত-মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না তাহা বৃথিবা উর্দা হয়ত খুব সহজ নয়। ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলে মার্শাল জুকভের ভারত ভ্রমণের ফলে রূপ-ভারত মৈত্রী আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না তাহাও বলা কঠিন।

### মধ্যপ্রাচ্য ও বুটেন—

২১শে মার্চ হইতে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত বারমুডার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাঞ্চিফিল্ডের

মধ্যে আলোচনা বৈঠক চলিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বারমুডার এই ধরনের বৈঠক এই প্রথম নয়। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ জোসেফ স্টেনিয়েলের মধ্যে এক বৈঠক হইয়াছিল। এবার ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলের সহিত প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের আলোচনা পৃথক ভাবে ওয়াশিংটনে হইবে। বারমুডার বেসামেলন হইবে স্বল্পেজ সমস্তা সৃষ্টি হওয়ার পর উহাই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের প্রথম সন্মেলন। এই সন্মেলনের প্রয়োজনীয়তা যে উভয় পক্ষই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বুটেন ও ত্রাংলোর মিশর আক্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ না করার বুটেনে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের প্রভাব ১৯৪৫ সালেই বিপুল হ্রাস; বুটেন নানা উপায়ে তাহার প্রভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু স্বল্পেজ সমস্তা দেখা দেওয়ার অনেক পূর্বে হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ প্রভাবও হ্রাস পাইতেছিল। বুটেন মিশর আক্রমণ করার পর এই প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। এদিকে প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে চক্ষিমাণে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনায় বুটেন খুসী হইয়াছে, তাহার মনে আশা জাগিয়াছে যে, এই পরিকল্পনার বিড়কী দরজা দিয়া আবার সে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বৃদ্ধি রত মার্কিন সৈন্য বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য পাশ না থাকিলে অধিকতর নিরাপন্ন মনে করিবে, মিঃ ডায়েলসের এই উক্তি শুনি বুটেন ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্সের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে মিঃ ডায়েলস এই কথা বলিযাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ ঘোষ করার জন্ত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গ বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী বাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আইসেন-হাওয়ারের পরিকল্পনা অস্বীকার্য প্রাপ্ত হইবে।

মধ্য প্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তিই এখন বুটেনের একমাত্র ভরসা। কিন্তু আন্ধারায় এই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে তুরস্ক, পার্শ্বাঞ্চল, ইরান এবং ইরাক এই চারিরাষ্ট্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উৎসাহে বুটেন আমন্ত্রিত হয় নাই। এই সম্মেলন বাগদাদ চুক্তি পরিষদের অধিবেশন নয়, ইহা ভাবিয়া বুটেন অবজট্টসংঘনা লাভ করিতে পারে। দুই মাসের মধ্যে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্গত সমস্ত রাষ্ট্রকে লইয়া এক সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইরাকের প্রধান মন্ত্রী জেঃ মুরী লাবী করিয়াছেন যে, এই সম্মেলন হইতে বুটেনকে বাদ দিতে হইবে। ইহাই বাগদাদ চুক্তিতে বুটেনের অবস্থা। এদিকে জর্ডান বুটেনের সহিত তাহার ২০ বৎসরের চুক্তি বাতিল করিবার দাবী তুলিয়াছে। বুটেনের নিকট হইতে জর্ডান বৎসরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য পাইয়া থাকে। মিশর সৌদি আরব এবং সিরিয়া এই পরিমাণ অর্থ সাহায্যদিতে স্বীকৃত হওয়ার পরই বুটেনও এই চুক্তি বাতিল করা সম্পর্কে রাজী হইয়া জর্ডানের নিকট পত্র দিয়াছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড গত ২২শে জানুয়ারী বলিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ইপ-জর্ডান চুক্তিই ঐকটমিক মূল্য কিছুই আর এখন নাই। ১২ই ফেব্রুয়, ১৯৪৭।

# সাময়িক প্রেস



## কংগ্রেসী মনোনয়ন

“কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ লোককে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে নেহরুজী তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি কাগরও বিক্রেতা দুর্নীতির অভিযোগ থাকিয়া থাকে তবে তিনি সত্যিই কংগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য নহেন। দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য নহেন নেহরুজীর একথা স্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। কারণ, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সন্দেহ প্রতাপ সিং কাইরণের মত ব্যক্তির বিক্রেতা দুর্নীতির অভিযোগকে তিনি বিস্ময়কর বলিয়া মনে করেন। তাহার বিক্রেতা যদি সত্যিই একজন অভিযোগ উঠিয়া থাকে, তবে বিস্ময়কর বলিয়া তিনি উহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। বরং তাহার সুনামের খাতিরেই অভিযোগ খণ্ডন করা তাহার উচিত ছিল। মনোনয়নের পক্ষে নেহরুজী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা লোকের কাছে সম্ভাবনামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উহার মধ্যে নেহরুজীর ভিত্তিটাই মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া লোকের মনে আশঙ্কা জন্মবে। অবশ্য প্রার্থীরা যোগ্যতা কংগ্রেসের বড় কর্তাদের দৃষ্টিতে কি, ভোটদাতাদের সে সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ভোটদাতারা যে সকল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়া নির্বাচিত করিবেন, নির্বাচনের পর আইন সভায় তাহার প্রকৃতপক্ষে ভোটদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন না। তাহার পরিচালিত হইবেন কংগ্রেসের বড় কর্তাদের নির্দেশে। বাহালা বিনা ওজর-আপত্তিতে বড় কর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আইন সভায় ভোট দিবেন, স্বাধীন ভাবে ভোট দিবার বায়না ধরিবেন না, এইরূপ প্রার্থীই যে কংগ্রেসের বড় কর্তাদের দৃষ্টিতে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা থাকিতে পারে না। কংগ্রেস যে এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকেই মনোনয়ন দিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## পল্লীর চিকিৎসা

“কলিকাতা জাশনাল মেডিকেল কলেজের পুনঃশ্রিত উৎসব অনুষ্ঠানে বিচারপতি জিন্নামহোদয় যুগোপাধ্যায় তরুণ চিকিৎসকগণকে গ্রামে গিয়া পল্লীর অধিবাসীদের চিকিৎসা ও সেবাকার্যে আশ্বিনিয়ে

করিবার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকালটির ডীন ডাঃ সুরোধ মিত্র তাহার ভাষণে বলেন যে, বর্তমান পল্লীতে ভাল বাস্তবায়ন, ভাল বাসস্থান ও অল্পাধিক সুখস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন তিনি তরুণ চিকিৎসকদের গ্রামে বাইতে বলিতে পারেন না। তিনি সমুদয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার দাবী করেন। দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিকল্প কথা বলিয়াছেন, মনে হইতে পারে। বিচারপতি যুগোপাধ্যায় যে আদর্শ ও প্রয়োজনের দিক হইতে কথা বলিয়াছেন, ডাঃ মিত্র সেই দিক হইতে কথা বলেন নাই। গ্রামের অসুবিধার কথাটাই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং তাহার বক্তব্য পাঁড়ায় এটি যে, আগে অসুবিধা দূর হউক, তাহার পরে তরুণ ডাক্তারগণ গ্রামে যাইবে। পূর্বে বাইতে বলা আবাস্তব। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বাস্তবায়নের অসুবিধা আছে; ভাল বাসস্থানের অসুবিধা আছে, ছেলেরা শিক্ষাদানের অসুবিধা আছে ইহা সত্য এবং এটি অসুবিধা দূর হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহাই কি বাস্তব যে সহজে ভীড় কালেক্টে তরুণ চিকিৎসকগণ যথেষ্ট স্বল্পে থাকিতে পারিবেন? ইহাও তো মনে রাখিবার যে আমাদের দেশের শতকরা ৮-১০ জনই পল্লীতে থাকে। আর পল্লী মাঝেই শিক্ষিত চিকিৎসকদের বসবাসের তরুণ্যকাল ইহাও নয়। যথেষ্ট উপার্জন না হইলে সহজেই কি তরুণ চিকিৎসকগণ ভাল বাসস্থানের ও স্বাস্থ্যকর আশা করিতে পারেন? তাহা ছাড়া পল্লীতে শিক্ষিত চিকিৎসক ১০০ টাকার উপার্জন করিতে পারিবেন না; পল্লীর লোককে এতোটাই নিঃশ্রম মনে করাও চলে না। অল্প সরকারি বর্তুক নিযুক্ত চিকিৎসকগণের বেতন বাৎসরিক প্রকৃতির উন্নতি বিধান একান্ত বর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পল্লীতে জিাল্লার মোটেই নাই ইহাও স্বাভাবিক অসুবিধা নহে। আর, বিচারক যুগোপাধ্যায় তরুণ চিকিৎসকগণের সমুদয় বেতনসেবার আদর্শের কথা বলিয়াছেন তাহাই বা তরুণ ব্যাপার কেন? পল্লীবাসীর সেবার প্রেরণা হইয়া গ্রামে কাজ আশ্রয় করিলে পল্লীর চিকিৎসকও এক দল কেন আরও অধিক উপার্জনে সক্ষম—ইহা কষ্টকল্পনা নয়। তবে সত্যকথা পল্লীতে বাইবে তাগাত সন্তুষ্ট নহে; আর সত্যকথা সত্য থাকিলে, যেভাবেই হউক, ইহাও বাস্তব কথা নহে। ইহাও মনে রাখা সত্য যে পল্লীর অসুবিধা চিরকাল এক থাকে নাই এবং থাকবে না। পল্লীর প্রয়োজন এবং নিজের প্রয়োজন একই সঙ্গে মিটিতে পারে এই আশা ও প্রেরণা থাকা কিছু মন্দ কথা নহে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## নয়া পরসার ত্রুটি

সিকি আশুলি ও টাকা লইয়া কোন গোলযোগের কারণ নাই, নরসিংপুর সহিত উহার বিনিময় অব্যাহতি চলিতে পারিবে। দুই নয়া হইতে এক পরসার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ লইয়া বাহা কিছু সীমিত হইতে ইচ্ছাওলি বখাসজব শীত্র বাহাতে বাজার হইতে কুসিরা কোলার সর্বস্তরকার বিভিন্ন মিলিট এ বা মুজা তৈয়ারি কারখানার প্রচুর পরিমাণে নতুন মুজা তৈয়ারি করিতেছেন। আগামী তিন বৎসর পর্যন্ত পুরাতন মুজা প্রচলিত থাকিবে, তাহার পরে উহা অচল হইবে। স্তব্ধতা জনসাধারণ এলা প্রাচীরের পর হইতে বস্ত শীত্র পুরাতন মুজার বিনিময়ে নতুন মুজা বলল করিয়া লইতে থাকিবেন, খুচরা মুজা বিনিময়ের অন্তর্বিধা তত শীত্রই পূর হইবে। সরকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, সহর ও মফস্বলের ট্রেনারী সমূহে, হায়দরাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও মহীশূর ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নতুন মুজা চালু করিবেন। প্রথম দিকে লস, পাঁচ, দুই ও এক নয়া পরসার বিনিময়ে পুরাতন মুজা বলল করিয়া লওয়া চলিবে। প্রথমে একবারে চার আনা মূল্যের বর্তমান মুজার বলল দেওয়া হইবে। অর্থাৎ চার আনার বললে মোট পঁচিশটি নয়া পরসার বা অনুরূপ মুজা বলল করিয়া লইলে আর বিনিময়ের ব্যাপারে লোকসানের আশঙ্কা থাকিবে না। চার আনা মূল্যের কম পরিমাণ মুজা বলল হইতে গেলেই আনার হিসাবে ও লসমিকের হিসাবে বিনিময়ের গোলযোগে লোকসানের বা লাভের প্রশ্ন জন্মিত পাবে বলিয়া এতরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু একসঙ্গে চার আনা পরিমাণ মূল্যের বর্তমান মুজা বিনিময় করিয়া লইলে আর কোন অন্তর্বিধার কারণ ঘটিবে না। বোলখানি বর্তমান পরসার আটখানি ডগল পরসার, চারখানি আনি বা দুইখানি দুইখানি বা একখানি সিকি গিলেট উটার বিনিময়ে পঁচিশ নয়া পরসার মূল্যের নতুন মুজা পাওয়া যাইবে। চারখানি আনি দিয়াই হউক এবং দুইখানি আনি ও একখানি দুইখানি দিয়াই হউক, যে কোন হিসাবে মোট চার আনা করিয়া উগার বিনিময়ে মোট পঁচিশ নয়া পরসার মূল্যের মুজা আনিতেই বিনিময়জনিত অতি ক্ষুদ্র আশের লাভ লোকসানের সমস্তা অনায়াসে সমাধান হইয়া গিয়াছে। অতএব দুই আনা বা এক আনা অর্থাৎ সিকির প্রমাণ বলল না করিয়া এক সঙ্গে বর্তমান মুজার মোট চার আনা মূল্যের বিনিময় লইলে কোন অন্তর্বিধি ঘটিবে না।—মুগাঙ্কর

## কাশ্মীর সমস্যা কি ?

“মার্টিন প্রেসিডেন্ট ও কমনওয়েলথের প্রধান পাণ্ডা বুটিন সাম্রাজ্যবাদীদের বহু বলিয়া জিনেহরু এখনও বন্দে ছান দিতেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ৩১শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষ যে কাশ্মীর প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিতে কোন দিন কোন মতেই লুপ্ত করিতে রাজী নব, তাহা নিম্নার সকলেই জানে। এমতাবস্থায় কাশ্মীর প্রশ্নের উপর জিনেহরু কোন দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরামর্শ লইয়া সুরক্ষিত অভিমত দ্বারা করিবার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কথা তিনি ও তাহার সংকাষ বলিয়া আসিয়াছেন। এবং তাহারাই সমগ্র মহাদ্বীপকে জটিলতর করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বর্তমান জটিলতর পরিস্থিতিতে আর এক বার কয়টিই পাঠের পলিট

ব্যবহার সমস্ত জীভূষণ ও প্রাধান্যময়ী নেহরুকে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপবৃত্ত অবস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলাপ আলোচনাই কাশ্মীর প্রশ্নের সমাধানের স্রেষ্ঠ পথ, ভারতের কর্তব্য অবিলম্বে কাশ্মীর প্রশ্নটি আতিসংঘ হইতে প্রত্যাহার করা কিন্তু জিনেহরু সে পরামর্শ গ্রহণ করিতে রাজী নন। কাশ্মীর প্রশ্নে সকল রাজনৈতিক দলেরই মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও এরূপ একটি জাতীয় প্রশ্নকে কংগ্রেস দলীয় প্রশ্ন করিয়া নির্বাচনের সময়ে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করিতেছে। একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় উত্তাগেয় প্রশ্নকে জিনেহরু ও কংগ্রেসের অজ্ঞাত নেতা ভাবে উপেক্ষা করিয়া নিম্নক স্থবিধাবাদী কার্যকার নির্বাচনে ভারতের খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। ইহার চাঁটতে লজ্জা ও কোভের আর কি আছে? জিনেহরু বিভিন্ন পাণ্ডা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় বাহা বলিতেছেন তাহাও অর্থ হইল—কংগ্রেস ছাড়া ভারতে আর কোন রাজনৈতিক দলই নাই।

—স্বাধীনতা।

## নির্বাচনের আগে

“বাল্লালী উদার, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া বাল্লালী সাহা দেশের মুক্তি আনিয়া দেয়। আত্মবল্লব সংগ্রামকেও অনেক বাল্লালী প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে করে। এই বাল্লালী ভাতিকে ধ্বংসের ভক্ত বিরাট বড়বুজ চলিতেছে। কংগ্রেসের মুক্তকীর্তি এবং তাঁদের মাড়োয়ারী বক্তৃতা এই বড়বুজের নায়ক। পৃথিবীর কোন দেশে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে এত ভেতাল চলে না, একা বাল্লালীর বড়টা চলে। তার কারণ গণমৈত্রি ভেতালসাতার সহায়। বাল্লালীর স্বাধা যদি নষ্ট হয়, নিত্যা মূল্যবুদ্ধির চাপে যদি তাগাক জীবন-সংগ্রামে জর্জরিত থাকিতে চয়, বাল্লালী জননাকে যদি শিশু পুত্র-কন্যা কেলিয়া সংসারের প্রয়োজনে চাকরীতে চুকিতে হয়, তো বাল্লালীর সেই, মন, আত্মা বাচিতে পারে না। বাল্লালী যদি স্নহ থাকে, বাল্লালীর যদি অবসর থাকে, বাল্লালীর বুদ্ধি যদি মুক্ত থাকে, তবে কংগ্রেসী চায়েরা জানেন যে তাহাদের আবুহোসেনী টুকিতে পারিবে না। যে বাল্লালী স্বাধীনতা আনিয়াছে, সেই বাল্লালীই স্বাধীনতা ত্রুটিভুক্ত করিতে সক্ষম। আজও বিপদে পড়িলে বাল্লালীকেই ডাকিতে হয় দিল্লী উদ্ধারে। বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন সামলাইতে ডাকিতে হইয়াছে—সকুমার সেনকে, কেন্দ্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন গড়িা দিতে ডাকিতে হইয়াছে—রবি ব্যানার্জিকে, প্রথম পাঁচশালা প্রানের ধ্বংসস্থাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ভারতের পরিচরনাকে বিশ্বের দণ্ডবায়ে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত রূপ দিতে ডাকিতে হইয়াছে—প্রশান্ত মহালানবীশকে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতের সম্মান রাখিতে দুই দিন আগে স্বয়ং জহরলালকে টেলিফোন করিয়া পাঠাইতে হইয়াছে—মেঘনাদ সাগকে। চায়েরাবাদ জয়ে পাঠাইতে হইয়াছে সেনাধ্যক্ষ জে. এম. চৌধুরীকে। দিল্লী চার বিপদ সামলাইবার ভক্ত কয়েক জন বাল্লালী থাকুক, কিন্তু সব বাল্লালী বেন এই ভাবে গড়িয়া উঠার সুযোগ না পায়, দেশের কথা চিন্তার সময় তার না থাকে। অর্থনৈতিক দাসত্বের খুঁটিতে বাঁধিয়া তাহারা

বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে পদানত রাখিতে চায়। লণ্ডনের মত দিল্লীও চায় বাঙ্গালীকে শুধু ভাড়া খাটাইতে। ইংরেজ বাঙ্গালীকে চিনিতে, তাই যুদ্ধের সময় বাহাতে বাঙ্গালদেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলিতে না পারে তার জন্য তাহারা আগে সৃষ্টি করিয়াছে হুজির, তারপরে আনিয়াছে রেশন, রেশন লোকানের দরজায় বাঙ্গালীকে এমন ভাবে রাখিয়া রাখিয়াছে যেন বিপ্লবী বাঙ্গালী মাথা না তুলিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের এই নীতি হুবহু নকল করিয়াছে কংগ্রেস। কমুনিষ্ট দল ভারতে ক্ষমতা অধিকার করিবার সম্ভাবনা থাকিলে তবে তাদের বেলায় এই প্রসঙ্গ উঠে। ইহা তাহারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না, করিলে কংগ্রেসের বিটিম পি-এস-পিকে সঙ্গে লইয়া তাহারা নির্দোষে নামিত না। কংগ্রেস, কমুনিষ্ট, পি-এস-পি প্রভৃতিকে স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব করিতে হইবে অবাঙ্গালী কায়মো খার্বের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার সঙ্গামে তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিবেন কিনা, থাকিলে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিবেন। ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী গঠনের প্রদ্রষ্ট দক্ষিণ-বায় সমস্ত দল বাঙ্গালীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন তাহার প্রতিকারে তাহারা প্রস্তুত আছেন কি না তাহাও জানা দরকার। বাঙ্গালীর বিধানসভায় বাঙ্গালীর মনের কথা অকুতোভয়ে বলিবার জন্য বাঙ্গালী কাহাংকুও পার্লামেন্টে কি না তাহাই আশ্রয় চেষ্টা বড় প্রশ্ন। বিরক্ত গবর্ণমেন্ট যেখানে অসম্মত, বিরোধীপন্থি বৃদ্ধিই সেখানে একমাত্র কাম্য। বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা আজ বাঙ্গালী জাতির জীবন-মরণের সমস্যা। অবাঙ্গালী শ্রমিক সংগঠন বাহাদের জীবিকা ও রাজনীতি, তাহারা কি ইহা পারিবে? বাঙ্গালীকে আজ প্রকৃত বন্ধু চিনিয়া লইতে হইবে।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

### বুদ্ধির অপম্য

“নেহেরু মাস্তাজে বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথাই প্রমাণ পাইলে হয় তিনি চুক্তি মানিবেন অথবা প্রশান মন্ত্রি ত্যাগ করিবেন। তাহার মনে ঘন কেন? চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, কে তাহাকে বুঝাইবে? বুটেন, আমেরিকা? আর বৃষ্টিতে পারিলে তিনি রাষ্ট্রসভ্যের ফৌজ কাশ্মীরে নামিতে দিবেন অথবা প্রশান মন্ত্রি ত্যাগ করিবেন। কি করিবেন—সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্থিরনিশ্চয় নন কেন? রাষ্ট্রসভ্যের ফৌজ সম্বন্ধে বা রাষ্ট্রসভ্য সম্বন্ধে তাহার মোহ থাকিতে পারে, যেমন তাহার আছে কমন্ওয়েলথ সম্বন্ধে—আমাদের হার জনসাধারণের সে মোহ নাই। আমরা ইতিহাসের নিক্ষেপ পুনরাবৃত্তি আর চাই না। ছদ্মবেশে মিষ্টভাষা বলিয়া আজকাল সাম্রাজ্যবাদ প্রকট হইয়াছে। ইহা আমরা জানি। নেহেরু কি বৃষ্টিতেছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু গণতন্ত্রের নেতৃত্বগণ জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করিলে, ইতিহাসের বিচার হইতে তিনিও বাদ বাইবেন না। আমরা আজও কমন্ওয়েলথ রহস্ত বৃষ্টিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যানী রহস্তও বৃষ্টি না। উহার অন্তরালে কি খেলা চলিতেছে আগামী কয়েক মাসের ঘটনাই তাহা প্রকাশ করিবে।”—মেদিনীপুর হিতৈষী।

### প্রতিকার আবশ্যক

“কাঁচিকালীসগর রাজার পাখে” সহরের আবর্জনারাশি নিক্ষেপ হইয়া থাকে। ঐ স্থানে থাকে মাদক এনন অসতর্ক ভাবে রাজার

উপর আবর্জনা ফেলা হয় বাহাতে সাধারণের ঐ অংশটুকু অতিক্রম করিতে খুবই অসম্মত বোধ হয়। এ ছাড়া সহরের মৃত কুকুর, বিড়াল আদিও নিক্ষেপে ঐ স্থানটিতে পুতিগন্ধময় এক শুষ্কারজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সহরের সাধারণ-মুখে এইরূপ এক কদম্বা ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আদৌ গৌরবের বিষয় নহে। আশা করি ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ মৃত জন্তুগুলিকে আবর্জনারাশির মধ্যে প্রোথিত করার ব্যবস্থা এবং রাস্তার নিম্নপার্শ্বে আবর্জনা-স্থূপ নিক্ষেপের প্রতি তীব্রদৃষ্টি দিয়া কর্তব্য কণ্ঠ বজায় রাখিবেন।”

—নীহার (কাঁচ)

### ভোটদাতা ও ভোটপ্রার্থী

“রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ ভাসমন্ড পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ভর করিবে উপযুক্ত ব্যক্তি ও উপযুক্ত মতবাদের সমর্থনে ভোট দান করার উপর। জাতি সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য জনগণকে এখন জীবন পণ করিতে হইবে না শুধু ভোটের দিনে এক খানি বা দুইখানি ভোটপত্র ভোট-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আপন আদর্শ অনুযায়ী পাঁচ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, জাতি গঠন, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দৈত্যের অবসানের জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োজিত করিবেন ভোটদাতাগণ। ছোট কথায় বৃষ্টিতে হইলে বুঝা যাইবে, ইউনিয়ন বোর্ডের কথা ভাবিলে একটি ইউনিয়নের জনস্বাস্থ্য রক্ষা পথবাট মোরামত ইত্যাদি কয়েকটি কাজের ভার

শক্তিমবজ হোমিও ও হেট ফ্যাকালটিয় ডুতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ইন্সটিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আন্তঃভাষা হোমিও কলেজের ডুতপূর্ব ভাইস-প্রিন্সিপাল ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.এ., এইচ-এম-বি এণ্ড

### কয়েকখানি অতুলনীয় পুস্তক

(৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত)

### ১। শিশুরোগ চিকিৎসা।

পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ  
৪৬০ পৃ—৫৫০

উদ্যম, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, কলেরা প্রভৃতি পরিণাক যন্ত্রাদির পীড়া—স্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসগ্রন্থের পীড়া—ছায়া, হাম, বসন্ত, ডিস্কথেরিয়া, হিককফ, ক্রিমি, মেনিনজাইটিস, চর্মরোগ প্রভৃতি সাধারণ পীড়া—স্কাই, রিকটুস ম্যারাসমাস প্রভৃতি শিশুদের বিশিষ্ট পীড়াসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ও চিকিৎসা অতি প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ, সাবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত।

### ২। কলেরা, হাম ও বসন্ত চিকিৎসা।

১৮২ পৃ—  
২৫০

### ৩। জ্বররোগ চিকিৎসা।

পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ—  
৩২৪ পৃ—৩৫০

Late Dr. Sarat Chandra Ghose M.D., M.R.S.L (Lond.)

“You have dealt with the diseases of females and their Homœopathic treatment in a masterly way; the symptomatic indications of remedies are simply wonderful. Your book bears the stamp of being written by one who is a thorough master of the subjects dealt with....”

প্রকাশক—ডাক্তার হোমিও হেল, ১২১১, বোম্বারাইট, কলি:



ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা কবাইবার আইন আছে। প্রতি তিন বৎসর প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটাধিকারী ভোট দিয়া নিতেনের প্রতিনিধি পাঠান সেই প্রতিনিধিগণ আবার ভোট দিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। প্রেসিডেন্ট মহাশয় অন্তঃস্থ মেম্বরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিন বৎসর ইউনিয়ন বোর্ড চালান, কিন্তু প্রেসিডেন্ট মহাশয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রাও নয় মালিকও নয়। ঠিক সেইরূপ সাধারণ নির্বাচনে ভোটাধিকারী ভোটপত্র দিয়া যে ব্যক্তি বা যে দলকে নির্বাচিত করিবেন সেই ব্যক্তি বা সেই দল অথবা বিভিন্ন মিলিত দলের এম, এল, এল, গণসংখ্যায় বেশী হইলে পাঁচ বৎসর রাষ্ট্রের কাজ চালাইবেন। আবার পাঁচ বৎসর পরে ভোট আসিবে নতুন প্রার্থী নির্বাচনের সুযোগ ও সময় ভোটাধিকারীদের মিলিবে। সেই সাধারণ নির্বাচন আগত ভোটাধিকারীকে আশ্বস্তেতা—সমাজ-কল্যাণ ও রাষ্ট্রকল্যাণের জন্য ভোট দিতে হইবে। —বীরভূম বাণী।

### গান্ধী-ফাণ্ডের টাকা ও ময়ূরাকীর “কাঁকা আওয়াজ”

“গান্ধী-ফাণ্ডের টাকা সম্পর্কে যে অভিযোগ বহু দিন হইতে উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে আবার একটি ‘কাঁকা আওয়াজ’ করিয়া ময়ূরাকীর বন্ধ প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই ‘কাঁকা আওয়াজের’ কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে এই অর্ধের হিসাব দেওয়া সম্পর্কে ‘ময়ূরাকীর’ অল্প পরিচালকের হস্ত কতখানি, জেলা কংগ্রেস সভাপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ডাঃ ঘোষের মন্তব্য যদি তাঁহার সেই চৈতন্য না হয় থাকে, তবে কি তবে সেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইতে পারে তাহা আমাদের বিশ্বাস অগম্য। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার বাহ্যর উৎসাহ ছিল, সেই অর্থ কোথায় বা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা জানাইতে এত কুঠা কেন? তিনি যে সং এবং সরকারের ‘বিশ্বাসভাজন’ সেই সম্পর্কে একটি সরকারী সার্টিফিকেট ‘ময়ূরাকীতে’ প্রকাশ করিলেই তো পারেন। বারে বারে একই কথা বলিয়া তিনি নিজের সত্যতার যে বড়াই করিতেছেন তাহাতেই বীরভূমবাসীর অধিকতর সন্দেহের কারণ হইতেছে। —বীরভূম বাণী।

### খাজমুলা বুদ্ধি

“খাজমুলায় মূল্য বুদ্ধি উত্তরোত্তর ক্ষতগতিতে চলিতেছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সরকার এবং দরদী দেশপ্রেমিকগণের নিকট আমরা এই মূল্যবুদ্ধির সর্বনাশ এবং প্রবৃদ্ধপ্রার্থী প্রতিফিরার প্রতি আশা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সন্নিবদ্ধ অনুরোধ জানাইয়াছি। মনোবিক্রম মুহূর্ত্ত অধিক মুহূর্ত্ত জাতির নাতিশ্রাস উঠিতেছে, তবুও সত্য মিলিল না। ইহার অপেক্ষা হৃৎকের বিষয় আর কি থাকিতে পারে জানি না। —রাঢ়ীপিকা।

### অধিক সন্ন্যাসীতে গাঞ্জন নষ্ট

“এবারকার নির্বাচনে জাবিয়াছলাম যে গতবারের মতই একটি দক্ষিণ ও একটি বামপন্থীর মধ্যেই মূলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে জনসাধারণ হ্রাস করিয়া লইতে পারেন কাহাকে ভোট দিবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বামপন্থী তিন জন ও দক্ষিণপন্থী দুই জন এবং বাক্ত মুলসমান প্রার্থী একজন মোট

ছয় জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা কঠিনসাধ্য হইবে, উপরন্তু নানা উপসর্গ এই ব্যাপারে আসিয়া পড়ে। ব্যক্তিগত ষোণ্যতার কথা না বলিয়াও কেবল মাত্র দেশপ্রেমের জন্যই একটি মাত্র দক্ষিণ ও একটি মাত্র বামপন্থী প্রার্থী বাদে আমরা অন্তঃপ্রাণিককে আপনাপন নাম প্রত্যাখ্যার করিয়া লইতে বলিতে পারি। নতুন অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট হুড়া একজন বাদে আর কাহারও কোন সুবিধা দেখা যাইবে না। ভোট ভাগাভাগির কলে নানতম জনসমর্থিত ব্যক্তিরও ভোট-সাগরে পার হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা আশা করিতেছি যে প্রাধিকণ এই দিকটা চিন্তা অবগত করিয়া দেখিবেন। বন্দে মাতরম্। —আসানসোল হিতৈষী।

### শৌক-সংবাদ

#### মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত কহলা-শিল্পপতি ও মাইনিং ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ৬ই মার্চ ৭৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কহলা-শিল্প-নায়কদের প্রতিভূরূপ ইনি ১৯০৭ খৃঃ থেকে দশ বছর বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন।

শিল্পক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পৌরসভার প্রাক্তন চাক-ইঞ্জিনিয়ার ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং উপদেষ্টা শিল্পক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ৭ই মার্চ লোকান্তরিত হয়েছেন। এঁর অগ্রজ ডাঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও একটি পুত্র বর্তমান।

#### রাজমোহন সেন

প্রদেয় মনোবী ও গণিতশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ রাজমোহন সেন গত ১৬ই মার্চ ৯৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। গণিতশাস্ত্রে এঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৮৮২ খ্রীঃক্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষার (গণিতশাস্ত্রে) খ্যাতনামা গণিতজ্ঞদের কে, পি, বসু ও বাবু চক্রবর্তী ব্যাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন রাজমোহন। ইনি টাকা ও বহরমপুরে অধ্যাপনার পর রাজসাহী কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপকের কাবজার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বছর (১৯১৯ খৃঃ) ইনি সেই পদে সমাসীন ছিলেন। গণিতজ্ঞ রাজমোহনের সঙ্গীত-শাস্ত্রেও ছিল প্রবল অনুরাগ। ওস্তাদ মজীর কাছে ইনি সেতার বাজনা শিখা করেন। মৃত্যুকালে ইনি দ্বীতীযুক্তা নিশিতারা দেবী (৮৮) ও পুত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বনামদত্ত শিকারভাট্টা জীবিত, এম, সেনকে রেখে গেছেন।

#### সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

গত ২৪শে মার্চ প্রাতঃকালে বাঙালী জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মাত্র ৪৬ বছর বয়সে কাল-কর্মালিত হয়েছেন। সিধু গাঙ্গুলী নামেই সিদ্ধেশ্বর সমধিক পরিচিত ছিলেন অভিনয়-জগতে। সিধু বাবু অভিনয়-বক্তা ও নাট্যকোচক হুগলিতে আকৃতি নাট্যমোদীদের কাছে একদিন গর্বের বস্তু ছিল। কিছুকাল পূর্বে তিনি নিঃসমত রক্ত-জগৎ থেকে বিদার গ্রহণ করেন।

### সম্পাদক—ঐশ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৯৬৭ বঙ্গাব্দ ১৮, “বহুসভা” রোটারী মেসিনে ঐতিহাসিকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





২১১ মঙ্গলা সেন, কলকাতা থেকে মিনতি চন্ন 'মাসিক' 'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'আধুনিকা' এক পুস্তকাকারে

প্রকাশিত উপজ্ঞাসের মধ্যে অসামঞ্জস্য সংঘর্ষে দেসব কথা লিখেছেন, তার লেখক-রূপে সমস্তাটির সমাধান করে সবিরে জানাচ্ছি যে: 'মাসিক বসুমতী'তে 'আধুনিকা' প্রকাশিত হবার পরই 'সাহিত্য-অগণ্য' নামক বিশিষ্ট প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সর্বে উপজ্ঞাসাধিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হই যে, মাসিক বসুমতীতে উহা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন। সুতরাং মাসিকের সংখ্যাগুলি থেকে কবিতা সংগ্রহ করে 'সাহিত্য-অগণ্য' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বইখানির ছাপার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সে ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রসাধন বা পরিবর্তন লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। এদিকে 'মাসিক বসুমতী'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কাহিনীটি সমাপ্ত কববার নির্ধারিত ফাল উপস্থিত হওয়ায় ঘটনাবল্য দীর্ঘ উপাখ্যানটির এমন স্থানে ছদ বা পাঁড়ি টানতে হয়—পাঠক মহল আধুনিক উপজ্ঞাসের রীতিতে মাস্তি বলে সাহস করবেন। সেই জন্তই মাসিকে প্রকাশিত কাহিনীর উপসংহার—নাগিকা দেবীর নিদেশমত তার তথাকথিত আধুনিকা ভগিনী রাণীকে আশীর্বাদ দৃষ্টে আনিয়ে তার মুখ দিয়ে আধুনিকা'র প্রকৃত সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে সেই চাক্ষু্যকর অবস্থাটির মাস্তি করতে হয়েছে লেখককে। মাসিকের পাঠক-পাঠিকাদের এ বন্ধে অসন্তোষের যে কিছু নেই, মিনতি চেষ্টার কথাতেই তা প্রকাশ হয়েছে। মাসিকের লেখা ধারাবাহিক ভাবে পড়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন, বই পড়ে তা পাননি। তার কারণ, আসলে প্রজ্ঞাপলঙ্কির পর দেবী রাণীকে পত্র লিখে 'আধুনিকা' সম্পর্কে যে দেশ দিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়, সেখানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত আধুনিকার বড় একটা ছেদ পড়েছে মাত্র—শেষ নয়। কারণ, আধুনিকা সম্পর্কে বোঝাপড়ার ব্যাপারে নায়ক ললিত যেমন ডালে পড়ে আছে, তেমনি স্বল্পভাবিণী সরমসংকুচিতা দেবীর স্বত আধুনিকারূপে স্নেহাতুরা হুটি সন্তানবতী নারীর পরম তিক্তভক্তির সার্থক করার উদ্দেশ্যে সাংগামিক অভিধান—দীর্ঘতাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহের প্রতীক্ষা করছে। আধুনিকা উপজ্ঞাসে এ কথা স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। শ্রীমণিসাল দ্বাপাধ্যায়, ৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা—৩

### পুরাতন সংখ্যার কেনা-বেচা

১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা যথামূল্যে কিনতে চাই।—বর্ণজিৎ দ্বাপাধ্যায়। ঠেপানারী অফিস এমগ্রয়িজ রাসোসিয়েশন (গ্রন্থাগার দপ্তর) ৩ চার্চ লেন, কলকাতা ১।

১৩৫৬ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যাগুলি পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় প্রতি সংখ্যা এক টাকা হিসাবে ছাড়া ১৫ সালের আধিনি থেকে চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলিও বেচতে।—শ্রীউমাপ্রসাদ ঘোষাল, ১৪বি যুগলকিশোর দাস লেন, হাটুয়া ৬।

১৩৬০, ৬১, ৬২ সালের সংখ্যাগুলি ও ১৩৫১ সালের আটপানি বেচতে চাই। পুরো তিন বছরের নিলে প্রতি সংখ্যা দশ টাকা হিসাবে ও খুচরা নিলে প্রতি সংখ্যা বারো আনা হিসাবে

মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।—শ্রীকল্পদামর পাণ্ডে, ১বি ককির চক্রবর্তী লেন, কলকাতা ৬।

১৩৬২ সালের সংখ্যাগুলি প্রজ্ঞাপট সমেত অবিকৃত অবস্থায় মোট দশ টাকায় বেচতে চাই।—শ্রীমতী লীলা সরকার, লীলা কট, কুকেড লেন, চুঁচুড়া (হুগলী)।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাসের মাসিক বসুমতীর জন্ত ৬০ পাঠাইলাম। গীতা মিত্র। লক্ষ্মী, ইউ, পি।

মহিষাউর যোগে পৌষ ১৩৬৩ হইতে এক বৎসরের জন্ত অগ্রিম মূল্য ১৫ পাঠাইলাম। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

আমার চালা পুরা বছরের ১৫ টাকা পাঠাইলাম, শ্রীমতী ইরা দেবী চালিফগাওন।

আপনার মারকলিপি পাঠাইলাম, ৭১০ আনা পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীলক্ষ্মী চক্রবর্তী, আসানসোল।

জন্ত ১৫ পাঠাইলাম। আমার ১৩৬৩ সালের মাঘ মাস হইতে একখানি করিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা পাঠাইবেন। সেই সঙ্গে আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা করিয়া বাবিত করিবেন। আমি এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চালা পাঠাইলাম। শ্রীমতী দেবী। কাছাড়, আসাম।

Rs. 15/- being annual subscription for the 'Monthly Basumati', for further one year as from the month of Poush, Please acknowledge receipt. —N. G. Chaudhuri, Assam.

I am sending Rs. 7/8/- only for the subscription for six months. Please acknowledge the amount and send the magazine regularly, yours sincerely. Kanika Dutta. Ganjam.

I am remitting herewith Rs. 7/8/- only on a/c. of my subscription for the period from "Poush to Jaistha." Kindly send me copy of Poush issue at the following address. Leela Ghose. C/o. Mr. A. K. Ghose Dey. Supdt. office of the Asst. collector, Central Excise, Nagpur.

Sending a M. O. for Rs. 7/8/- only for a halfyearly subscription. Please enlist my name and send M. Basumati regularly from Magh 1363 B. S. Please acknowledge receipt of the M. O. with compliments to you. Anisur Rahaman. Hooghly.

Sending herewith Rs. 15/- for annual subscription. Kindly enlist me as a subscriber with effect from the Poush issue. Mrs. K. B. Gupta. Hyderabad Deccan).



মাসিক বসুমতী  
॥ ফাল্গুন, ১৩৬০ ॥

(অলংকৃত)

বিশ্রাম  
—ঐশ্বরানন্দ রায় অঙ্কিত





৩৫শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৩]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীমহাকবিগণ। “ঈশ্বরকে জানিতে গেলে কথার (শাস্ত্র ও গুরুবাক্য) বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসেই তাঁকে বুঝতে পারা যায়। জীব ঈশ্বরচিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাস নাই। আবার তুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। বিবরীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী-জেমীর কৌদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে—আমার ঈশ্বর আছেন! অস্ত্রের শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না।”

“বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসে সব হতে পারে। যার ঠিক বিশ্বাস তার সব তাতেই বিশ্বাস হয়—সাকার নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস চাই—বালকের মত বিশ্বাস। বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন,—ও তোর দাদা হয়, তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। মা বলেছেন, জুজু আছে, তো বালকের অমনি বোল আনা বিশ্বাস যে ওখরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের মত বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দা দায়। সদাসর্বদিকে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।”

“বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা! এই ব্যাকুলতা হলো তো অকণ উদয় হলো। তার পর সূধ্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালাে যেতো। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালাে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলতে মা বললেন—তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলে—মধুসূদন কে? মা বললেন,—মধুসূদন তোমার দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে বাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে—দাদা মধুসূদন! কেউ কোথাও নাই। তখন উঠেচোষে কীরন্তে লাগলো,—কোথায় দাদা মধুসূদন! তুমি এসো, আমার বা ভয় পেয়েছে! ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না—এসে বললেন এই যে আমি, তোর ভয় কি? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালাে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন, আর বললেন,—তুই এখন ডাকবি আমি আসবো—ভয় কি? এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা।”

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

## শ্রীমুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত এই তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি গত ২৪শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রথম সভার পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে সকল মতাপেক্ষ সমগ্র শক্তি দিয়ে যাদবপুর কলেজটিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার পরিচালনা করেছেন, তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে চিরকালের জন্য ইহার পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি বিশেষ স্থান রাখা হয়েছে। কারণ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদই এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা এবং তাঁরাই এত দিন এর পরিচালনা করেছেন। তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছেন যে, সরকার সর্বদাই পরিষদকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন।

পরিষদে তিনি বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আনন্দিত কিংবা তিনি বৈশিষ্ট্য আনন্দিত, এ কথা তিনি বলতে পারেন না।

এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের একটা ছায়া ফল। ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দে ইংরেজ এদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা জাতীয় আশ্রয়ের অঙ্গরূপ ছিল না। কেহাণী তৈরির প্রয়োজনে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের হাতে নেন, তখন থেকে সন্তায় কেহাণী তৈরী হতে লাগল। কিন্তু ক্রমে শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ অভাব আর থাকল না। বরং শিক্ষিত ফোকরের সংখ্যা বেড়ে গেল। একটা জাতির উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন, দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলা। কিন্তু সেটা ছিল ইংরেজের স্বার্থের প্রতিফল। সুতরাং দেশের চিন্তাশীল দানবীরা ইংরাজী শিক্ষার গোদায় গলন স্বাক্ষর সচেতন হয়ে উঠলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রুক্মিণীকান্ত উপাধ্যায়, বিপিন পাল, সিংহরি নিবেদিতা, সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈষীরা এ বিষয়ে বহুটি আলোচনা করেন।

কিছু দিন পরে দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দৃষ্ট দেখে দেখা দেয় আত্মনির্ভরতার এক অদ্ভুতপূর্ণ প্রেরণা। এটা হল ১৯০৫ সালের শেফার্ডের কথা। ছাত্রসমাজ দলে দলে গভর্ণমেন্ট বিদ্যালয় এবং গভর্ণমেন্ট অনুষঙ্গিক বিদ্যালয় বন্ধন করে। এই ছাত্রসমাজকে জাতীয় আশ্রণ ও দেশের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে রপণে পরিচালনা করার প্রয়োজনেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা। গ্র্যামিটার স্কুলেও চৌধুরী (তখনও হাইকোর্টের জজ হন নি) থাকানে বাংলার নেতারা ১৯০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর এক সভার বসিত হয়ে একটা অস্থায়ী কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে হলেন ডাঃ রাসবিহারী বোষ, ভারকনাথ পালিত, ডায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেননাথ পাল, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস, সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজেননাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি চল্লিশ জন লোক। সম্প্রদায় হলেন আততায়ী চৌধুরী ও ডাঃ নীলরতন সরকার। এই কমিটির সিদ্ধান্ত পরদিন এক প্রকাশ্য সভায় জানান হল।

নিয়মকানুন তৈরি হয়ে ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি প্রকাশ্য সম্মেলনে গৃহীত হ'ল। আর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হ'ল, 'জাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এই পরিষদ ১৮৬০ সালের ২১শে আইন অনুসারে ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের ১লা জুন রেজিস্ট্রী হ'ল। ইতিমধ্যে বাংলায় মফস্বলে কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে ডাঃ রাসবিহারী বোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উত্তেজিত ছিলেন। তিনি এই সভায় পরিষদের আদর্শ ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা না করেও ভারতীয় জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চর্চা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমুদ্রণীয় ভাষায় এই জাতীয় শিক্ষার শুভ সূচনাকে অভিনন্দন জানান।

স্বনামগন্ত বাঙ্গালী দানবীর 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক দিলেন এক লক্ষ টাকা। মহম্মদসিংহ গৌরীর জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও মুক্তাগাছার মহারাজা সুর্যবাস্তব আচার্য্য-চৌধুরী আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দানপত্র করে দিলেন। আরও অনেকে পরিষদকে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, বরোদার গাইকোয়ার কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীঅরবিন্দ বোষ। তিনি নামমাত্র বেতনে এই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্বর, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত জয়ালঙ্কার, মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাখ্যাবোদান্তর্থাৎ, কীরোরপ্রসাদ বিত্তাবিনোদ, হারাপচন্দ্র চাকলাদার, অরবিন্দপ্রকাশ বোষ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই জাশানাল কলেজে যোগ দিলেন। জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল ১৬৬ নং বোবাজার স্ট্রীটে, বর্তমান বহুমতী সাহিত্য মন্দির ভবনে। এখানকার শিক্ষার ভিত্তি হ'ল ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পরিষদ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাক্ষ্য বহুভারও আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, ডাঃ এ. কে. কুমারস্বামী প্রাচীন শিল্পকলা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ ও ইতিহাসের দত্ত উপনিষদ স্বাক্ষর বহুতা দিলেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই পরিষদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন এবং খাতা পরীক্ষা করতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ জাতীয় হয়ে উঠল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান আলোচনা আর ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষা দান কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে প্রথমেই হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু ভারকনাথ পালিত প্রভৃতি পূর্বেরকার অস্থায়ী কমিটির কয়েক জন সভা এই বিষয়ে আগে প্রাথমিক দোষ

প্রস্তাব করলেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে কয়েক জন এই কমিটি ত্যাগ করে তাঁরা আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তার নাম দিলেন—“সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন।” এই সভাটিও ১৮৬০ সালের ২১শে আটন অক্টোবরী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন বেঙ্গলী করা হ'ল। তারকনাথ পালিত ১২ আপার সাকুলার বোর্ডে নিজের একটি বাড়ীতে ১৯০৬ সালের ২৫শে জুলাই “বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট” স্থাপন করলেন। এই সভারও সভাপতি হলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এবং সম্পাদক হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, সভাপতি বহু ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

এখানে শেখান আরও হল—(১) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (২) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৩) ভূতত্ত্ব ও (৪) কলিত রসায়ন। কাচ ও মৃৎশিল্প, রন্ধন, সাবান তৈরী ও চামড়ার কাজ শেখানো বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও কতকগুলি কাজ যেমন এসিষ্টেন্ট ফোরম্যান, ইঞ্জিন চালনা, মিটার ও মেকানিক্যাল ড্রাক্টম্যানের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হ'ল।

১৯১০ সাল। তখন স্বদেশী আন্দোলনের দেশব্যাপী প্রবল ছরল ঘেমে এসেছে। ব্রাহ্মণাল স্কুল ও কলেজ এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটেই ব্রাহ্মণাল স্কুল ও কলেজ উঠে এসে ১৯১০ সালের মে মাসে। দুই প্রতিষ্ঠানই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অঙ্গীভূত হল। তবে প্রত্যেকটি পরিষদের অধীনে স্বতন্ত্র পরিচালক সভা রইল। ১৯১০ সালের জুন মাসে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আমেরিকার হার্ভার্ড, ইয়েন ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত জন ছাত্র পাঠাবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করলেন। এই দানের একটা সর্পি ছিল, যারা বিশেষ থেকে শিক্ষা লাভ করে আসবে তারা প্রত্যেকে সাত বৎসর পরিষদের অধীনে একটা নির্দিষ্ট বেসনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। এই টাকার সাহায্যে ঝাঁরা বিদেশে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জন দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৯০৪ সালের নতুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই সময় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসচ্যান্সেলার হয়ে শ্রীর আত্মত্যাগ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্গঠন করতে আরম্ভ করলেন। যদিও তিনি কখনও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সংস্কৃত হননি। তবে তিনি এই জাতীয় আদর্শে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার বিশেষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারী প্রতিষ্ঠান। তার সম্পদ ও শক্তি অপরিসীম। আবার ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে গেল। সুতরাং আগের মত বাপক আন্দোলনের আর প্রয়োজন ছিল না। এখন আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রয়োজনও অনেক অল্পই বাক্য করলেন না। তারকনাথ পালিত পরিষদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। তাঁরই আদেশে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ব্রাহ্মণাল স্কুল ও কলেজ আপার সাকুলার বোর্ডের বাড়ী থেকে উঠে গেল। তখন ১৯১২ সালে তারকনাথ এই সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন। তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলি মানিকতলায়

মুরারিপুরে ‘পঞ্চবটি ভিঙ্গা’ নামে একটা বাগানবাড়ীতে উঠে গেল।

এই সময় ব্রাহ্মণাল কলেজের ছাত্রসংখ্যা খুব কমে যায়। ১৯১৭ সালে কলেজ বিভাগ এবং ১৯২০ সালে স্কুল বিভাগ উঠে বাবার মত হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে আবার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে তিনগুণ (৬৬৫ জন) হ'ল। মকবলের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিষদ তাদেরও অর্থসাহায্য করতেন। চাঁদপুরে হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়টি বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেও দেশ বিভাগের পর উঠে যায়। বরিশালের বানারিপাড়ার জাতীয় বিদ্যালয়টি বহু দিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেও দেশ বিভাগের পর আর আত্মরক্ষা করতে পারল না।

১৯২১ সালে ছাত্রসংখ্যা অকস্মাৎ বেড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিপদে পড়লেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। তাছাড়া শ্রীজ্ঞানেশ্বরের রায়চৌধুরীর দানের একটি সর্পি ছিল যে, দানের সময় থেকে পনের বৎসর পরে পরিষদের মূলধন তাঁর দান বাদে সাত লক্ষ টাকার কম হলে তাঁর দান থেকে পরিষদ বঞ্চিত হবে। ১৯২১ সালটি সেই জন্য পরিষদের ইতিহাসে একটা ভীষণ সঙ্কটময় সময়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। তিনি সব সর্বের কথা জানতেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর প্রকাশ পেল যে তাঁর উইলে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে তের লক্ষ টাকা দান করেছেন। দানবীর রাসবিহারী ঘোষের দানে পরিষদের শিক্ষাতরীর পালে হাওয়া লেগে শিক্ষাতরী আবার তরুণের ঘেমে ছুটে চলল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাসে কড়কান্দী কেটে গিয়ে আবার মেঘবস্ত্র নির্মল নীল আকাশ দেখা গেল।

রাসবিহারী ঘোষের দেহত্যাগের পর শ্রীর আত্মত্যাগ চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হলেন। আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অগ্রতম সম্পাদক। এই দুই জনের স্নেহপুষ্ট হয়ে সৃষ্টি থেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ধরা হয়েছে। অর্থের অভাব দূর হওয়াতে কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট থেকে ১৯২২ বিঘা জমি নাম মাত্র খাজনায় লীজ নেন। যাবৎপরে এই জমির ওপর রাসবিহারী ঘোষের অর্থে গড়ে উঠল বিরাট অট্টালিকা সমূহ।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে মূল বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল। ১৯২৮ সালে শেখ পর্যন্ত সওয়া আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলেজ-ভবন, পরীক্ষণ ও গবেষণাগার, বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহ, কারখানা, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকগণের বাসগৃহ প্রভৃতি তৈরি হ'ল। কলেজ-ভবনটি তৈরী হ'লেই ইনস্টিটিউট ১৯২৪ সালের জুন মাসে এখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৩ সালে পরিষদ এখানকার তিন জন অধ্যাপককে উচ্চতম ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখাবার জন্য কার্খাসীতে পঠান। তাঁরা প্রত্যেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে উত্তর উপাধি পান।

কৃষিতত্ত্ব শিক্ষাগণের জন্য ১৯২১ সালে ভবানীপুর নিবাসী

দোপাশাচন্দ্র সিংহ ষাংসরিক সাড়ে চার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি পরিষদকে দান করেন। কিন্তু পরিষদ কৃষিবিজ্ঞান শেখাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। প্রথমে তাঁরা কিছুদিন চুচুড়া কৃষি-বিজ্ঞানকে এবং বিশ্বভারতীর অন্তর্গত ঐনিকৈতনকে এই উপস্থিতি থেকে সাহায্য করতেন। ১৯২১ সালে পরিষদ করণপোষণের নিকট থেকে ১২ বিঘা জমি পান। কিন্তু নানা কারণে কৃষি বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। পরে আবার কৃষি বিভাগ খোলার কথা হয়। ১৯২৭ সাল থেকে করণপোষণ পরিষদকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালেও করণপোষণ পরিষদকে একতাপান দেড় লক্ষ টাকা দান করেন।

১৯২৯ সালে কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নাম বদল করে "কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল" নামকরণ করেন। এখানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে বাবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জুনিয়ার বিভাগে তিন বৎসর এক সিনিয়ার বিভাগে পাঁচ বৎসর পড়ার ব্যবস্থা আছে। সিনিয়ার বিভাগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটি উপবিভাগ আছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে ও স্থল বিভাগ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু পূর্বোক্তার সাক্ষ্য বক্তৃতার ব্যবস্থার পরিবর্তে হেমচন্দ্র বসুমতীক চেয়ার নামে ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রবোধচন্দ্র বসুমতীক চেয়ার নামে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯০৬ সাল থেকেই এটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়। অরবিন্দ ঘোষ, ত্রিবাথাকুরদ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎচরণ দত্ত, প্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনোবিগণ এই পদে নিযুক্ত থেকে বক্তৃতা দিতেন। দর্শন-বিভাগে অধ্যাপনা করতেন দীপেন্দ্রমোহন দত্ত, মহামহোপাধ্যায় কণিষ্ঠচরণ তর্কবাগীশ, ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি।

রাত্রি যার, দিন আসে। প্রকৃতি রঙের টানে গভীর অমানিশার অন্ধকারের পর পূর্ব-আকাশকে আলোর আভাষ রাঙিয়ে তোলে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ বহু বড়-বড় অতিক্রম করে এখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুদৃঢ় আশ্রয় লাভ করেছে। যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এখানকার ছাত্রেরা দেশের কৃতি সম্ভান হয়ে প্রকৃত মাত্রায় হয়ে উঠুক। বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আশ্রয় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

## দৌহে যবে লইবু বিদায়

(Lord Byron-এর 'When we two parted' কবিতা থেকে)

অন্ধ যবেছিল মোদের হৃ' নয়নে  
 বুথেতে ছিল না ত' বাগী,  
 ভগ্ন অন্তরে, দীর্ঘ দিন তবে  
 বিদায় দিলে হবে রাশি।

মহিরাহীন তব শীতল চরণে  
 কি নিরাশা ত'ল বে প্রকাশ।  
 পাশে কপোলেতে বসি বা ফুটেছিল  
 আজিকার হুঃখের আগস।

প্রভাত-হিম-কণা, পরশি' লগাতি মোর  
 কছিল কী বেদনার বাগী,  
 তারি মাঝে ছিল বসি, এ' মরম বাতনার  
 লুকানো সে ইঙ্গিতবানি।

হালিন হয়েছে আজি শুভ্র শশের মাসা  
 লগ্ন্য বে ভাঙিছে তার।  
 তোমার অপবনে কামাভ-ক' বেদনা সে,  
 সেও কেন আমারি গো দায়।

দীর্ঘ দিনের পরে বসি কতু দেখা হয়  
 কেমনে বরিব' তোমা রাশি ?  
 অন্ধ রবে শুধু আমার হৃ' নয়নে,  
 বুথে না রবে কোনও বাগী।  
 অন্ধকার : জানসী মুখোপাধ্যায়।

সমুখে করে যবে সকলে কানাকানি  
 কি'বে যে তাহা শেলসম,  
 শিহরি বেদনার মনেতে ভাবি হায়  
 কেন এত প্রিয় ছিলে মম ?

তোমার সাথে মোর নিবিড় পরিচয়  
 সে কথা গুনের জানা নাই—  
 গভীর বেদনার ভাষা যে নাতি হায়,  
 নীরবে স'য়ে বাব তাই।

গোপনে মিলেছি দৌহে, নীরবে কানিবি আমি  
 ছুঁমি ত' ভুলেই সব স্মৃতি,  
 ছুঁমি যে হলিতে পার, একথা ভাবিনি কতু,  
 জানি নাই এ নিষ্ঠুর স্বীতি।



# বিজ্ঞানের অত্যাচার

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

আজ আপনারা আমাকে এই আনন্দময়স্থানে যোগ দিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজকার এই আনন্দময়সভা বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। শুধু বর্তমান কালের 'বিজ্ঞানের অত্যাচার' সম্পর্কে সামান্য দুই-একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

অগ্নি প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের জন্ত অন্নপ্রসাদ রন্ধন করিয়া তাহাদের প্রাণ ধারণের সহায়তা করে। আবার এই দাতিকা শক্তিতে অগ্নিপ্রসূত হইলে ধনসম্পত্তির ধ্বংস ঘটায়। ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিয়ন্তা, ভগবতের সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রেরণাদায়ক, অথচ এই ধর্মের নামে পৃথিবীতে বহু প্রকার অন্যাকাচ, অত্যাচার এবং নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সেদূর অল্প কয়েক কারণেই হয় নাই। সেইরূপ, বিজ্ঞান এক দিকে যেমন প্রকৃতির এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, বিবিধ প্রকার আবিষ্কার উদ্ভাবন করিয়া আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছে, অগণিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু নির্মাণ করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়াছে, তেমনি অল্প দিকে মানবের অন্তর্নিহিত লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, ক্রুরতা প্রভৃতির সুযোগ লইয়া বিবিধ অনর্থ ও অকল্যাণ ঘটাইতেছে। আটম-নবম প্রভৃতি বিরাট বিরাট মারণাস্ত্রের কথা না হয় নাই আলোচনা করিলাম। আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যে আমাদের বিজ্ঞানের বহু অপপ্রয়োগের সন্ধান হইতে হয়।

প্রতিদিনের প্রতি যুহুতেই আমরা বিজ্ঞানের সুখাপেক্ষী। টুথপেষ্ট দিয়া দাঁত মাজা, অন্নরাজন রন্ধন করা, বানবাহন চলাচল করা, চোখে চশমা পরা, রোগে চিকিৎসা করা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমরা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরাধীন। বিজ্ঞান ব্যতীত আমরা কোন কাজই করিতে পারি না। অথচ এই বিজ্ঞান-প্রয়োগের কীকে কীকে আমাদের বিজ্ঞানের বহু অত্যাচারও সঙ্গিত হয়।

বৈজ্ঞানিক নামের মোহের সুযোগ লইয়া অনেক স্থলে স্বার্থসিদ্ধি করা হইয়া থাকে। বহু স্রাবের উপকারিতা সন্দেহ প্রভৃতি ভ্রমাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক নামের সুযোগ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপিত ইলেক্ট্রিক রসায়নের নামের মূল কারণ হয়তো এই যে, যে ঘরে বসিয়া বোতলে রসায়ন ভরা হইয়াছে, সেই ঘর ইলেক্ট্রিক আলোর আলোকিত। পত্রিকার পাতায় কেমিক্যাল স্বর্ণের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এই কেমিক্যাল স্বর্ণের বোল গাছা ভাটিয়া চুড়ীর দাম সাত টাকা মাত্র এবং তৎসহ দুইটি উপহার, একখানি 'পতি পরম গুরু' খচিত চিকিৎসা এবং এক শিশি সুবাসিত তরল আলতা। এই সকল বিজ্ঞাপনে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন।

বিজ্ঞানের একটি অভিনব অবদানের কথা মনে পড়িতেছে। বর্তমানে যে কেমিক্যাল যুগ প্রচলিত হইয়াছে, ওই বস্তুটি কি, আপনারা বলিতে পারেন? ইহাকে যুগ কেন বলা হয়? বিতর্ক যুগের পার্শ্বে এই কেমিক্যাল যুগ ঠিক বেশ পরবর্ত্ত

পার্শ্বে গোময়। এই যুগে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কি না তাহা আমরা জানি না। এই যুগের কোন ব্যতীর্ণ্য আছে কি না, থাকিলেও তাহা কতটুকু, তাহা আমরা জানি না। শরীরের উপর কোন প্রভাব কি প্রভাব তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। দুই চারি দিনের বা দুই চারি বৎসরের পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তেতো বাঙ্গালীর শরীরের ভাতের কি প্রভাব, তাহা নির্ণয় করিতে বহু বৎসর আগতক। এমন কি, বহু পুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ব্যতীত ইহা সঠিক নির্ণয় করা যায়ই না। তেমনি এই কেমিক্যাল যুগে আমাদের শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় কি না, তাহাও নির্ণয় করা অল্প সময়ে সম্ভব নয়। আমাদের এবং আমাদের বংশধরের শরীরে এই কেমিক্যাল যুগের ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। ক্রিস্টোফার বোল The fat which is build up by an animal is peculiar to the animal, but if it is starved and subsequently fed on fat unusual to its diet, it may put on fat of another composition. এই ব্যাপারটি একটু বিস্তৃত বা extend করিলে, আশঙ্কা হয়, যুগ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে ফিলু প্রস্তুত হইয়াছে, এই কেমিক্যাল যুগের প্রভাবে তাহা ক্রমশঃ দালদালুতে পরিণত হইয়া না যায়। এই কেমিক্যাল যুগের সাগাথো বিপুল যুগকে ভেঙা যুগে পরিণত করিবার যে সুবর্ণ সুযোগ হইয়াছে, তাহা সুবিদিত। এই ভেঙা নিবারণের জন্য কেমিক্যাল যুগে কেন রক্ত মিশানো যাউতেছে না, তাহাও একটি কেমিক্যাল রহস্য! লোকে লো নানা প্রকার রক্ত দেওয়া যায়, টাকিতে, বিছুটে, কেঁকে বিবিধ রক্ত লাগান যায়, লম্বেস, বসগোলা, পান্ডুগায় রক্ত দেওয়া যায়, রামধনুর বিবিধ বর্ণের সিরাপ প্রস্তুত করা যায়, অথচ কেমিক্যাল যুগে কেন রক্ত ধরান যায় না, তাহা বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। এই কেমিক্যাল যুগ উৎপাদনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া এই অর্ধে গোজাতির উন্নতি ও সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা করিয়া বিপুল দ্রুত ও যুগ উৎপাদন করিলে রসায়ন শাস্ত্রের পৌরবের বুদ্ধিই হইত, জানি হইত না।

আমার একটি ভুল ধারণা ছিল, প্রয়োজনানুসারে মংগু দুই-চারি দিন বরফের মধ্যে বা কোণ্ডটোয়েক্সে রাখা হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে জানিতে পারিলাম, মংগু তিন চার মাস পর্যন্ত ঠাণ্ডা ঘরে থাকিতে পারে এবং থাকে। এই সংবাদে ভীত হইলাম। মংগুকে এইরূপে ঠাণ্ডা ঘরেই হটক বা অন্তর্ঘরেই হটক রাখিয়া দিলে তাহা প্রাণনাশক বিধে হয়তো পরিণত হয় না, কিন্তু উহার মংগুত্ব যে থাকে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজকাল বাজারের যে মাছ আমরা খাই, তাহার আঁধারের টাটকা মাছের খাদ্য নাই। টাটকা মাছের খাদ্য আমরা একরূপ ফুলিগাই গিয়াছি। পৃথিবীতে বহু প্রকার আমিষ খাদ্য আছে, তাহার মধ্যে আমাদের দেশের কই মাছ, কাঁতা মাছ এবং ইলিশ মাছের বহু স্বাদ্য খাদ্য দায় নাই। অবৈজ্ঞানিক নৃশংস ব্যক্তির

সেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কষ্ট কাতলা দেখিলে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এখন ওটগুলিকে দেখিলে মনে হয়, এক একটা গলিত শব পড়িয়া আছে। মাছের কালিয়া খাইবার সময়ে মনে হয়, বুটের কালিয়া খাইতেছি। যে মাছগুলি স্বভাবতই কোমল, যেমন পাঁচা, জাড, ঢা, প্রভৃতি, সেগুলি খাইবার সময়ে মনে হয়, মূণ-লক্ষা গিরা বালি খাইতেছি। মাছগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরূপ অখাদ্য করিয়া খাইবার সার্থকতা কি? বহু দিন কোল্ড-ট্রোয়েকে থাকিবার পর মাছের খাদ্যমূল্য কতটা বজায় থাকে, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্নাব আছে। একটা সমুদ্রতট দশপানের সের ওজনের কই বা কাতলা মাছ আনিয়া আপনাদের কোল্ডট্রোয়েকে রাখিয়া দিন। তারপর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া উহা হঠাৎ কুড়ি সি. সি. পরিমাণ হুটাই টুকরা কাটিয়া লইয়া, তাহার একটি টুকরা ছাঁকা তেলে ভালিয়া বেশ বাগানী রঙের করিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিবেন এবং অপর টুকরাটি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতি সপ্তাহে উহার খাদ্যগুণ কিরূপে অবনত হয় এবং ক্রমশ কিরূপে অখাদ্য হইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্ত বা এ ধরনের বিশেষ প্রয়োজনের জন্ত শুটকি মাছ, টিনে-ভরা মাছ, প্রভৃতির প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ নৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত যেহেতু টাটকা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিকৃত করিয়া ভোজনের কুণ্ডি এক স্বাস্থ্যের উন্নতি নষ্ট করিবার তেজু নাই। মাছ যখন বেশি পাওয়া যায় তখন না হয় একটু বেশি করিয়াই খাওয়া যাইবে। আবার যখন মাছ পাওয়া না যায়, তখন না হয় নাই খাইলাম। যে সময়ের যে খাদ্য, সে সময়ে তাহা খাওয়া, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আয়ের সময়ে আম, জামের সময়ে জাম, ইহা স্বাস্থ্যসম্মত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। পৌষমাসে লিচু কি না খাইলেই নয়?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যেমন অগণিত তিতকর অবদান আছে, তেমনি বহু অবদানও আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, মানুষের শরীর শুধু একটা Physico-Chemical Compound নয় শুধু physics এবং Chemistry দ্বারা শরীরের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শরীরের মধ্যে এমন বহু উপাদান আছে এবং এমন সকল প্রক্রিয়া আছে, যাহা Physics এবং Chemistry-এর সাহায্যে বুঝা যায় না। এইরূপ অনেক বিষয়ে শারীরতত্ত্ববিদগণ একটা vital force বা vital action বা প্রাণশক্তির অবতারণা করিয়া সমস্যার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অথচ এই প্রাণশক্তি কিরূপ বা ইহার সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। একটি জীবিত সেল এক একটি মৃত সেলের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। পাকস্থলীর পাচক রসে পাকস্থলীটি নিজেই কেন পরিপাক হইয়া যায় না।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, "The digestive enzymes do not enter the living cells." কিন্তু কেন? এ কথাই কোন উত্তর নাই। Intestinal absorption সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "A number of phenomena concerned in absorption can, however, only be explained as being due to the vital activity of the cells themselves. Thus it is found that .4 per cent sodium chloride is more rapidly absorbed than water, while

isotonic solutions of sodium or magnesium sulphate are unabsorbed." আবার বলা হইয়াছে, "Glucose is more easily absorbed than lactose or xylose, although the latter has a smaller molecule. This is in direct conflict with physical laws and can only be explained as a result of vital action on the part of the cells." এই সকল ক্ষেত্রে যে vital action বা vital force-এর দোহাই দেওয়া হইয়াছে, সেসম্বন্ধে কোন গবেষণা এখনও হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শরীরের মধ্যে এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা physics এবং chemistry-এর আয়ত্তের বাহিরে। এই জটিল শুধু physics এবং chemistry-এর উপর নির্ভর করিয়া যে-সকল ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি স্বাভাবিক ভাবে কল-প্রসূ হইতেছে না। একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, ইহার উপকারিতা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়, আবার কিছুদিন পরেই ঘোষিত হয় যে, উক্ত ঔষধ সেবনে বহু প্রকার অপকারের আশঙ্কা আছে। ইহার স্থলে আবার নূতন আর একটি ঔষধের উপকারিতা বিজ্ঞাপিত হয়। তত দিনে লক্ষ লক্ষ নরনারী পূর্বাঙ্গ ঔষধ ব্যবহার করিয়া হয়তো নানাবিধ জটিল এবং দুর্যোগ্য উপদর্শে ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছেন! একটি রোগ সারিতে গিয়া অপর একটি নূতন রোগের সৃষ্টি হয়, ইহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। হীপানি সারিতে গিয়া পক্ষাঘাত, টাইফয়েড সারিতে গিয়া রক্তস্রাব, প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে ঘটতেছে। শরীরের অন্তর্নিহিত vital force বা প্রাণশক্তির সহিত দেহের, রোগের এবং রোগ-নাশক ঔষধের মৌলিক সম্পর্ক কি, তাহা স্বাভাবিকরূপে আমরা অবগত হইতে পারি নাই বলিয়াই এরূপ ঘটতেছে। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান, এরূপ দম্ভ অসমীচীন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একত্রিত হইয়াও একটি পিপীলিকা বা একটি তৃণ বা এক বিস্মৃদ্ধ বা একগাছি কেল প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

বৈজ্ঞানিক অত্যাচারের মূল কারণ এই যে, বিজ্ঞান বত ক্রম উন্নত হইয়াছে, বত সূত্র-প্রসারী হইয়াছে, মানুষের মন তাহা হয় নাই। মানুষের মনের আদিম দুর্বলতাগুলি প্রায় আদিম অবস্থাতেই রহিয়াছে। মানুষের ধর্মজ্ঞান এখন এই সকল দুর্বলতার মূল উৎপাতন করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু ধর্মবিশ্বাসের অবনতিই ঘটিয়াছে। বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশল আরম্ভ হওয়ার মানুষের কুপ্রভুত্বগুলি বিজ্ঞানের সহায়তার ক্রমশ বেন আরও অযোগ্য লাভ করিতেছে। এই জটিল সমগ্র জগতে বিজ্ঞান-প্রসূত বাহ্য উচ্ছ্বাসের পাশে রহিয়াছে বিবিধ পাপের গভীর কালিমা। এই কথা উপলব্ধি করিয়াই আইনস্টাইন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, Science has progressed much faster than morals.

আজিকার এই মনোময় বৈজ্ঞানিক সন্ধ্যায় আপনাদের সমুখে বিজ্ঞানের নিশা করিয়া আর আপনাদের কালহরণ বা খেঁচ পয়কা করিব না। আমি পুনরায় এই অজ্ঞানের উত্তোক্তাঙ্গিকগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।\*

\*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের পুনর্দিলন সভার প্রধান অতিথিরূপে পঠিত—৫।১।৫৭,

# প্রথম চৌধুরীর সনেট

শ্রীশুশ্রীস বন্দ্যোপাধ্যায়

‘সনেট-পকাশ’ পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে লিখেছিলেন—  
—‘বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর  
কানো লাইনটি বার্থ নয়, কোথাও কাকি নেই’—

প্রথম চৌধুরীর সনেটের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ’লে তাঁর কাব্যের  
এই অনন্তসদৃশতাই প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনন্তসদৃশতা  
হুটে উঠেছে তাঁর কাব্যের ভাববস্ত্র এবং প্রকাশরীতিতে। তাঁর  
মাগে বন্ধ কবি বাংলা সনেট অথবা চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন  
কিন্তু তাঁদের কবিতার সঙ্গে প্রথম চৌধুরীর কবিতার আদৌ মিল  
নই—না দৃষ্টিভঙ্গী, না প্রকাশরীতি। কবি নিজেকে একটি চিঠিতে  
লিখেছেন—‘কবিতা বন্ধকেই আমরা আটের কোঠায় ফেলি।  
সনেটে এই আট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিষ।  
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotionই চরম আটকে  
দিলে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু আট অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী।  
আমি যে সনেট লিখেছি, সে অনেকটা experiment হিসেবে।’  
এছাড়া ‘পদ-চারণের’ উৎসর্গ-পাত্র কবি আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন  
যে, তাঁর কবিতায় আর কিছু না থাক, rhyme বা মিল আছে,  
আর আছে কিংবা reason বা যুক্তি। এর প্রথমটি পুষ্টের এবং  
দ্বিতীয়টি গুণের বিশেষ গুণ। হ’লে গুণের রচনার হুটি বিশেষ গুণ  
নির্দেশ তাঁর কাব্য; তাই তাব স্বাদও হয়েছে অপূর্ণ!

প্রথম চৌধুরীর কবিতায় ছন্দ আছে, মিলও আছে কিন্তু  
প্রকাশভঙ্গীতে হুটেছে ব্যঙ্গনার বসলে বক্তাবক্তি। কারণ সেখানে  
স্বল্পবাক্যে ক্ষণ, যুক্তিনিষ্ঠাই প্রবল। নিজের কবিধর্মের পরিচয়  
দেওয়ার সময় কবি তাই লিখেছেন;—

‘করনা রাখিলে আমি আকাশে তুলিয়ে,—

স্বপ্নের জন্মিলে মোর ভাবের অন্ধর,  
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যতে হুলিয়ে।

কবিতার বস সব লাল-নীল ফুল,  
মনের আকাশে আমি সবুজে ফোটাই,  
তাদের সবারি বস পৃথিবীতে মূল,—  
মনোবুড়ি বৃন্দ হ’লে ছাড়িলে লাটাই।’

বুদ্ধির সাহায্যে ভাবকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ফলে তাঁর বহু  
কবিতায় সত্যই ‘ভাবার স্রসার আছে, নাই ভাবপ্রাণ। গোলাপের  
ছোপ আছে, নাই তার রূপ।’

কবি অবশ্য এর উত্তরে লিখেছেন,—

‘সনেটের গোপাণীয়া ছত্র চতুর্দশ,  
এ-পায়ে যায় না ঢালা এক গঙ্গারস।  
জানি মোর ভারতীর তছুর তনিমা,  
না বধি রাবণ পত্ন, কিংবা রাণা কংস।  
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা;  
অর্থাৎ ভাবার বৃত্ত মনের ভগ্নাংশ।’

বলা বাহুল্য যে, সনেটের চোদ্দটি অঙ্কের পায়ে ‘একগলা বস’

কেউ প্রত্যাশা করে না। কবি-মনের ভগ্নাংশই তার মধ্যে  
রূপায়িত হয়ে ওঠে কিন্তু সেই ভগ্নাংশের হিসাব গণিতিক  
নয়। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি  
স্মরণ করা যায়। ‘A poem does not require to be an  
epic to be great, any more than a man need  
to be a giant to be noble.’ ভাবের অণিমা সকল কবিই  
সাধনায় ধন। একটি বছর, একটি দিন বা ঘণ্টার মত একটি বিশেষ  
বৃহত্তর এই ভাবের অণিমা অহুড়ত হ’তে পারে, আর সেই বৃহত্তর  
স্মৃতিকে কাব্যে মহিমায়িত করে তোলাট সনেট রচয়িতার উদ্দেশ্য।  
একজন খ্যাতনামা সনেটকার এই কথাগুলি একটি সনেটের মধ্যে  
দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

‘A sonnet is a moment’s monument  
Memorial from the soul’s eternity  
To one deathless hour.’

প্রথম চৌধুরীর সনেটের গুণাগুণ সহজে বিস্তৃত সমালোচনার  
ভূমিকায় একথা বলা যায় যে, বাংলা চতুর্দশপদী কবিতায় তিনি  
ছন্দের নৈপুণ্য ও ভাব-সংযমের যে পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষ করে  
সেজ্ঞেই তাঁর কবিতা অনন্তসাধারণ হয়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যের  
কথা মনে রেখেই কবি সমালোচক প্রিয়নাথ সেন প্রথম চৌধুরীর  
কবিতা আলোচনা করার সময় মধ্যমশ্রেণীর ইংরেজ কবি  
Mathew Pierre-এর নাম উল্লেখ করেছেন। Pierre-এর মত  
প্রথম চৌধুরীকেও তিনি এক বিশেষ মধ্যমা-সম্পন্ন কবি বলে অভিহিত  
করেছেন। বাস্তবিকই বীরবলী গদ্যের মত বীরবলী পদ্যও হস্ত-বাক্য  
মিশ্রিত বন্ধ দুইক্ষেপের ফলে অনন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু দুইটি তাঁর  
তির্ধক নয়, প্রকাশভঙ্গীতেও হুম্মাতিহুম্ম বক্তাবক্তি অমূল্যবিশিষ্ট হয়ে  
চিন্তাপ্রসূত বাগ-বৈদ্যের চমক সৃষ্টি করেছে। এই ভাবে এক  
আশ্চর্যশক্তি বলে ভাব ভাষা আর ছন্দ মিলিয়ে প্রথম চৌধুরী এক শ্রেণীর  
স্মৃতি-কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ভাষা এবং ছন্দের বিচারে  
এগুলির মধ্যে শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও এর মধ্যে এমন  
একটা কাঠিক খেকে গেছে, বার ফলে কবিতাগুলি ‘নির্মমভাবে নিখুঁত’  
হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলি সহজে একটি চিঠিতে  
লিখেছেন—‘বীণাপানিকে প্রথম গড়গপানি মূর্তিতে সাজাবার  
আয়োজন করেছেন।’ প্রথম চৌধুরীর সনেট তাঁর গল্পেরই মত  
‘পালিশ করা, বকরকে, তিক্ত।’

এবার তাঁর সনেটের গঠনভঙ্গীর আলোচনায় আসা বাক।  
প্রথম চৌধুরীর সনেটের গঠন সহজে শোনা যায় যে, তিনি ইতালীর  
বা ইংরেজ কবিদের অনুসরণ না করে ফরাসী কবির শরণাপন্ন  
হয়েছেন। এই উক্তি আংশিক ভাবে সত্য। তাঁর অধিকাংশ  
সনেটেই বটক অংশকে দু’ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে একটি চিঠির  
শ্লোক দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেকে একটি চিঠিতে লেখেন যে,  
এই ভাবে বটক অংশকে দু’ভাগে ভাগ করার রীতি তিনি ফরাসী  
সনেটকারদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন ফরাসী  
কবির সনেটে বটকের প্রথম দু’পংক্তিতে অন্ত্যমিল দেখা যায়, কিন্তু

সেখানেও ভাবের ছন্দ পড়েনি। অপবপকে প্রথম চৌধুরীর বহু সনেটেই ভাববস্তু ঐ পথার স্রোকেই পূর্ণতালাভ করেছে এবং ভাবতরঙ্গও সেই সঙ্গে প্রশমিত হয়েছে। সুতরাং তিনি যে করাসী সনেটকারদের রীতি হুবহু অনুসরণ করেছিলেন, তা বলা চলে না। ইংরেজ কবিদের মধ্যে মিল্টনের দু'একটি সনেটে অবশ্য সপ্তম পংক্তিতে চন্দ্রের সঙ্গে ভাবের যতিপাত হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত ক্ষেত্রে আবার মিল্টনের সঙ্গে প্রথম চৌধুরীর সনেটের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া প্রথম চৌধুরী নিজেই যদিও "সনেট পঞ্চাশৎ"-এর প্রথম চতুর্দশপদী কবিতায় লিখেছেন :

পেত্রাকী চরণে ঘরি করি ছন্দোবদ্ধ,

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বারালীর ছন্দ

গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।"

তবু লক্ষণীয় এই যে, উল্লিখিত সনেটটিও পেত্রাকীর রীতিতে রচিত হয় নি। একমাত্র "পদচারণের" অন্তর্গত 'সনেট সুনন্দী', 'বনকুল', 'চৈবপুন্দ' ইত্যাদি কয়েকটি সনেটে পেত্রাকীর ছন্দোবদ্ধ অনুসৃত হয়েছে।

কবি অবশ্য Terza Rima ছন্দে রচিত "কৈকির" নামক কবিতার লিখেছেন—

আনিম্ম সংগ্রহ করি বিবৎ প্রমাণ

ইতালির পিতলের কুম্ব কর্ণটি,

তিনটি চাবিতে ঘার খোলো ক্ষুদ্র প্রাণ।

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,

কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পত্র,—

প্রকৃতি বাহার "ভেঠ", আকৃতি "কনেঠ।"

অন্তরে যদিও নাই দোষনের মন্ত,

রূপেতে সনেট কিন্তু নবীন কিশোরী,

বারো কিশা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চৌদ্দ'।"

বিখ্যাত করাসী সনেটকার Soulaire কিন্তু সনেটের কঠিন বিধি-বাহুল্যের মধ্যে স্থান্যের অভাব অল্পভব করেন নি। সনেটের বৈশিষ্ট্য সন্ধান্দে লেখা তাঁর একটি সনেটের প্রিয়নাথ সেন কতৃক অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"চুকিবে না কাহা" বলে মুদ্রা হাসি মুখ

হিঁড়িবে যে ছোট জামা বেহু পরিদর

বাকাইয়া কটিতট ফুলহইয়া বুক,

বাড়াইল প্রান্তকুল পথে রম্য কুর।

দীর আমি ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম

তুমি বাসে সাজাইছ দেহখণ্ডি তাঁর

কোথাও বঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম

শির-বন্ধ-বন্ধ পরে করে দিল্লি পার।

উদ্ভিন্ন দেখ বাসে—কলার কৌশলে

উজ্জ্বল সেহলতা—প্রতি অঙ্গরেখা

হাসিছে লজ্জাটি বাহু সমান সললে,

টিক বসিয়াছে বাস। শোভে তাহে লেখা।

জয়রে অভাব নাই—বাহুলা শরীরে  
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।"

সনেটের ভাববস্তু পরিমুট করার জন্যে প্রথম চৌধুরী প্রচুর মিত্রাক্ষরযুক্ত মিল ব্যবহার করেছেন। মিত্রাক্ষরের প্রাচুর্য সনেটকে গীতিকবিতার উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর থেকে মুক্ত রাখে। কিন্তু মিত্রাক্ষর মিলের আধিক্যের ফলে তাঁর সনেটে অনেক সময় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। অন্ত্যমিল হিসাবে একটি শব্দের পর পর দু'পংক্তিতে ব্যবহারও ক্রটিমধুর হয়নি। কিন্তু সাধু বা তৎসম শব্দের সঙ্গে তুল্য বা গ্রাম্য শব্দের স্মরণ প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। যেমন :—

"সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়

ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি

সে তিমিরে চিরেছিল বিভাৎ-করাতী।"

স্থানে স্থানে এই ধরনের মিল এত সহজ ও সন্নিপাত যে শুধু শব্দ-অন্যিই নয়, একটা মধুর ছন্দ-অন্যিও সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ;

আগেকার জীবনের পালা ত'ল শেষ।

করা ফুলে ভরা বিশ্ব, গন্ধ নাই লেশ।

কবি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এবং করাসী কবিদের মতই কলাপ্রিয় ও কলাদক্ষ। তাঁর বহু উক্তি প্রবাস-বাক্যের মত শাশিত এবং ভাবগর্ভ। যেমন, 'সৃষ্টির সন্নিপাত সার কাকন-কামিনী।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, করাসী সনেটের আঙ্গিক হুবহু গ্রহণ না করলেও প্রথম চৌধুরী করাসী সনেটের শিল্পকলা বাংলা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক Lytton Strachey করাসী কবিতার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—"The one high principle which though in many generations has guided like-a star the writers of France is the principle of deliberation, of intention of a conscious search for ordered beauty, an unwavering—an indomitable pursuit of the endless glories of art." প্রথম চৌধুরীর মেন্ডাজ করাসী কবিশুলভ। করাসী কবিতার মত তাঁর কবিতায়ও ভাবের উল্লসিত বা ভাব্য শিথিলতা নেই। করাসী কবিদের মত তিনিও 'ordered beauty'-র সাধক।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রথম চৌধুরীর সনেটগুলিকে মেটামুট ভাবে লঘু রসাত্মক ও বাস্তবপ্রধান এবং প্রেম ও ভাবমূলক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া কবিশ্রদ্ধাঞ্জলি, নারিকায় রূপবর্ণনা, রাগ-রাগিণীর পরিচয়ও কয়েকটি সনেটে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির ভাব-চিন্তা এবং ভাব-ধারণার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ঐ দু'শ্রেণীর কবিতায় সুপরিমুট। জয়দেবের কাব্য সন্ধান্দে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কবি প্রতিবাদ করেছেন অল্প মধুর ভাষায় ;—

"উদ্ভদ মনন রাগে জাগালে যৌবনে

রতিমত্তে কবিওক দীক্ষা দিলে বলে।

আদি রসে দেশ ভাসে, অজস্র জোয়ার  
ডাকো কড়ি, রুদ্ধ আসে, করে করবাল।”

‘চোর-কবি’ সনেটটিও অনেকটা এই রকমের, তবে ‘জয়দেবের’ মত লম্বা ও সরল নয়। এই ধরণের সনেটের মধ্যে ‘ভূর্ভুহরি’ নামক সনেটে কবির স্বভাবসিদ্ধ হাড্ডা ভাবের পরিবর্তে এক অপূর্ণ মননসম্মত ভাব ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাত্ম অহুত্বাতি এবং সৌন্দর্যপ্রীতির মধ্যে ভূর্ভুগবির মনের বিধা গতির উল্লেখ করে কবি মানব-মনের অনন্ত পিপাসার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। কবির ভাষায়,—

“ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার।

সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা,—

রক্ত দিয়ে তাই গাথা বৈরাগ্যের হার।”

প্রথম চৌধুরী পুষ্প-বিলাসও বিচিত্র ধরণের। অজ্ঞাত কবির মত তিনি ফুলের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস এবং নয়ন-মুগ্ধকর শোভার তৃপ্তি পান না, তাই রূপের আশ্রয় আলিয়ে যায় বন আলো করে থাকে বা বিলাসের সম্ভার হয়ে উঠে—সেই রক্তজবা, পলাশ বা গোলাপ কবির মনে সাড়া জাগায় না।

কবি লিখেছেন :—

“ভাল আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল,

নারীর আদর পেয়ে যারা হয় দল,

ফুলের বাসরে যারা হইয়াছে পণ্য,

কবিরা যাদের নিয়ে করে হলধূল।”

কবি বিহ্বল চিত্তে সেই ফুলের সন্ধান করেন ‘বাহার অন্তরে আছে হলহাল।’ রাত্রির ঘন অন্ধকারে বর্ণোজ্জ্বল ফুলেরা যখন ২৫ হারায়, সেই অবসরে বেরজনীগন্ধা তার গোপন সঞ্চিত গন্ধ ঢেলে দেয়, কবি তাকেই উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :—

“আবার আসিবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,

নিবসের আলো হবে ক্রমে হবে ঘোর,

কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর সোর,

যোর পাশে ফুটে তুমি হে রজনীগন্ধা।”

সঙ্গীত-চর্চায়ও কবির কৃতি অনন্তস্থলত। ‘গজল’ নামক সনেটে কবি এই কৃতি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন—

“যে সুর পশিয়া কানে চোখে আসে জল,

সে সুর বিবাদী জেনো মোয় কবিতার ;

মম গীতে নত তব চোখের পাতার

সীমন্তে রচিতা দিব হু’ ছত্র কাঙ্গাল।”

প্রথম চৌধুরী প্রেম, আদর্শ ইত্যাদি সবকিছু করেকটি ব্যঙ্গাত্মক সনেটও রচনা করেছেন। এই সনেটগুলির কাব্য-মূল্য নগণ্য। আমল কবির এই আপাত কঠোরতা এবং ব্যঙ্গের হাসির পেছনে ব্যাধির অজুই লুকানো রয়েছে। কবি নিজেই সেকথা বলেছেন ‘হাসি’ নামক সনেটে :—

“নয়ন যখন দিই হাসিতে ফুড়িয়ে

লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অজুজল,

বুখা কাজ। জীবনের প্রতি বর্ষ পল

স্মৃতিতে একত্র করা, অতীত ফুড়িয়ে।”

বাদ ও হাড্ডা হাসির ছদ্ম আবরণের তলার যে কল্পনাপ্রবণ ও অহুত্বাতি মনটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কয়েকটি ভাব-প্রধান সনেটে তার

প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব ও রসের সুরণ এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতায় এই কবিতাগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। যে কবি ইতিপূর্বে লিখেছেন :—

“নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,

আমার ছন্দর যাচে বাহুর বন্ধন।”

তিনিই পরে ‘ভুল’ নামক কবিতায় লিখেছেন :—

“ভাল তোমা বেলেছিলাম, মিছে কথা নয়।

যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,

বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।

বকুলের গন্ধ বল কত দিন রয় ?

নিবানো আশ্রয় জানি বলিবে না আর,

মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেশা তার—

ছন্দিলয় আমরয় পারিভাত-হার।

ছন্দয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।”

‘পরিচয়’ নামক সনেটটিতে প্রেমের এক অপূর্ণ মায়াময় স্মৃতি-চিত্র এঁকেছেন কবি। কবিতাটির ভাব যেমন গভীর, ভাষাও তেমনি গাঢ় এবং মধুর। কবি তাঁর প্রেমসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :—

“দেখেছি তোমায় কোন্ মাথারী পার্শে,

প্রকৃতির ঐশ্বরের সৌন্দর্যের সার।

এসেছিলে রূপ ধরি প্রতিমা উবার ;

গন্ধর্ব্বশালার কিংবা আলোধ্য-ভবনে।

মেঘাচ্ছন্ন কোন্ দূর অতীত প্রাণে

এসেছিলে কাছে কিংবা করি অভিসার ;

জীবাণুর মাঝে করি রূপের প্রসার

গগন-সীমান্তে কোন্ বিশ্বস্ত ভ্রবনে।”

‘রূপক’, ‘অবেষণ’, ‘মানব-সমাজ’, ‘আত্মপ্রকাশ’ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় যেন এক নিরাসক্ত কবি-চিত্তের গভীর ভাবনা বঙ্কিত হয়েছে।

প্রথম চৌধুরী কবিতায় কবাসী-কাব্যের প্রভাব সবচেয়ে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, কবাসী-কাব্যের দু’টি প্রধান গুণ—স্পষ্টতা এবং কলা-নৈপুণ্য চৌধুরী মহাশয় তাঁর সনেটে গ্রহণ করেছেন। তার ফলে তাঁর কয়েকটি সনেট অপূর্ণ উজ্জলতা এবং বহুতা লাভ করেছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত স্পষ্টতা এবং কলা-প্রীতির জটাই বোধ হয় কবাসী-কাব্যে কল্পনা-ঐর্ষ্য অপেক্ষাকৃত স্থান মনে হয়। প্রথম চৌধুরী কিন্তু শুধু কলা-নিপুণ কবি নন। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর এমন কয়েকটি সনেটের আলোচনা করেছি, যেগুলির ভাব-বস্তুর মধ্যে অতি কোমল কল্পনা-ঐর্ষ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রথম চৌধুরীকে কোন এক বিশেষ দেশের কাব্যকলার অঙ্ককারী বলা চলে না। তিনি বাংলা সনেটের বিষয়বস্তু এবং প্রকাশধারা সম্পর্কে যে পরীক্ষা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, কবি যেখানে ব্যঙ্গপরায়ণ সেখানে তিনি কবাসী। তাঁর শব্দসম্পদ সুনির্বাচিত, পরিমিত শাসিত এবং প্রকাশভঙ্গী তির্যক ও তীক্ষ্ণ। আবার যেখানে কবি তাঁর গোপন অহুত্বাতিকে ভাবায় ব্যক্ত করেছেন সেখানে তিনি আর কবাসী ন’ন, ইংরেজ। ছন্দাবলম্বের গভীরতা এবং অহুত্বাতির পাটতাকে রোমাঞ্চিক কাব্য-রসে মগ্নিত করেছেন। এই অনন্তসমৃদ্ধতাই কবি হিসাবে প্রথম চৌধুরীকে এক পৃথক মহাপার অধিকারী করেছে।



# স্মৃতিচিত্র



পরিমল গোস্বামী

প্রথম পর্ব

৩

নতুনদিয়ার অখ্যাত পল্লীজীবনে ইংরেজী প্রভাবই স্পষ্ট, অখট মজা এই যে, বাঁদের মধ্যে এ প্রভাব সব চেয়ে বেশি প্রকট, তাঁরা ইংরেজী জানতেন না আরো। তাঁদের বাড়িঘরের চেহারায়, চালচলনে, অনেকখানি আধুনিক ছাপ। এটি কি ক'রে সম্ভব হল তা আমি জানি না। বারা বৎসর ইংরেজী শিখা পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন শুদ্ধাচারী।

গানবাজনার পরিবেশটি ছিল অদ্বুত। নদীয়া জেলার এক সানাই-বাদক, আকবর আলী সেখ, মাঝে মাঝে সানাই বাজাতে আসত, কিছুদিন পর থেকে সে গ্রামের আসরে রয়ে গেল, তাকে আর ছাড়া হল না, সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর ওখানে বাস ক'রে গেল। কঠোরজীবন সে ওস্তাদ ছিল। সব আসরে তাকে দেখা যেত, সে না থাকলে আসর জমত না। আশ্চর্য্যবী লোক, খুব হাসিখুসি ভাব।

গ্রামে কশাঙ্করমিক ভাবে বারা ঢাক-ঢোল বাজাত, তবলা বাজাতেও তাদেরই ডাক পড়ত। ঢোল ও তবলা দুইই সমান চলত তাদের হাতে।

বেণী ভট্টাচার্য (বেণী ঠাকুর নামে পরিচিত) খুব তবলা-উৎসাহী ছিলেন। তিনি পাণিনি পড়ার চেষ্টা ক'রে ব্যাক্যাম হয়ে তবলা ধরেছিলেন। আমি শিশুকাল থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত তাঁকে তবলা অভ্যাস করতে দেখেছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাস চালিয়ে গেছেন। শেষ রাতে উঠতেন এবং তবলার বোল মুখে উচ্চারণ করতে করতে বাজাতেন। নিমন্ত্রণ বৃক্ষ প্রায়ের প্রান্ত থেকেও তা শোনা যেত।

কোনো আসর বসলেই তিনি আগে এসে তবলা দখল ক'রে বসতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়কের গান শুনে যেত, তিনি সবার গাল খেতেন, কিন্তু দমতেন না সহজে। অনেক সময় তাঁকে জোর ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাড়িতে তিনি অনেক টাকা খরচ ক'রে একখানা কক্কেট টিনের ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। ঘরখানা যাতে খুব সম্ভবত হয়, বড়ো ওড়তে না পারে, সেক্ষেত্রে আস্ত শালকাঠের

খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বড় বড় গাছের আড়ালে ঘরখানা স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপদে ছিল, তদুপরি শালকাঠের খুঁটি, বড়ের সাধ্য কি তাকে নড়ায়। বহু অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ ছিল এ ঘর তৈরির পিছনে।

এই ঘর ছিল গানের একটি বড় আসর। প্রবীণদের পরবর্তী ধাপের শ্রমীদের এটি শীতস্থান ছিল। এই খানেই বেণী ঠাকুরের তবলা সাধনা চলত। গানের পুরো আসর চলেছে এমন সময় হঠাৎ পশ্চিম আকাশে দেখা দিল কাল বোশেখীর মেঘ। বড়ের সন্কেত। বেণী ঠাকুরের তবলার ভুল তাল বাজতে লাগল, তিনি তবলা ছেড়ে মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে চাইতে লাগলেন। তার পর আসন্ন বড়ের প্রথম শব্দে, সব ফেলে, বড়ের বেগে ছুটে চললেন কিছু দূরে অবস্থিত বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাকা বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সেখানেই কি সম্পূর্ণ ভরসা আছে? যদি সেই একতলা ইমারত ভেঙে পড়ে? তাই তিনি বরদানন্দকে বলেছিলেন, হলঘরে গোটাকত শালকাঠের খাম লাগিয়ে দিন, তা হলে খুব ভাল হবে।

অরবিন্দ ঘোষ এলেন পাশাঘাতে। জারগাটি বতনদিয়া থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে, কালুখালি ষ্টেশন থেকে চার মাইল। কোন বছর ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আর এক উৎসাহী বন্ধু, হরেন্দ্রকুমার রায়, সকালের এইট ডাউন প্যাসেঞ্জারে সেখানে গিয়ে হাজির। অরবিন্দ ঘোষ তখন খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন, বালকমনে সে নামে রোমাঙ্ককর বিষয়। শুধু তাঁকে দেখতে ছুটে বাওয়া।

পাশা ষ্টেশনের আশ্রয়ে গিয়ে বসে আছি। এরই কয়েক মাইল দূরে দু'-তিন বছর আগে এক অতি ভয়াবহ কলিশন ঘটেছিল, পুজোর ছুটির ব্যাক্তিবাহী ট্রেনের। দুই গাড়ির ইঞ্জিনে ইঞ্জিন সামনা-সামনি ধাক্কা লেগেছিল। মনে পড়ে খবরের কাগজে তার কল্পিত ছবি ছাপা হয়েছিল, লাইন ব্রকে ছাপা ছবি। দুই ইঞ্জিন খাড়া হয়ে উঠেছে স্পষ্ট মনে আছে। কত গুজব বে বটেছিল! সত্য মিথ্যা জানি না, শুনেছিলাম, বরা আধমরা শত শত ব্যাক্তিক হালগাড়ি বোঝাই ক'রে গোহালন্দ ঘাটে নিয়ে গাড়িবহু ভূমিতে দেওয়া হয়েছিল। পাশার পরবর্তী মাথাপাড়া ষ্টেশন। এই দুই ষ্টেশনের মাঝখানে ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা।

ষ্টেশনে বসে আছি, কোথায় অরবিন্দ ঘোষ, কোথায়

গেলে তাঁর দেখা পাওয়া বাবে ভাবছি, এমন সময় বিরাট এক স্বদেশী সংকীর্ণ দল সে পথে এলো গান গাইতে গাইতে। আমরা সেই দলে মিশে গেলাম। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রইল অরবিন্দ ঘোষকে খুঁজে বের করা। এই কীর্ণ দলের কোন জন অরবিন্দ ঘোষ হুজুনে অহুমান করতে লাগলাম। শেষে হুজুনে একমত হয়ে এক ব্যক্তির উপর লক্ষ্য রাখলাম। পাছে আমাদের বোকা মনে করে, সে ভক্ত কাউকে কিছু ভিজ্ঞাসা করিনি।

বিকলে সভা। সভার বিজ্ঞপ্তি বিলি হয়েছিল, তাতে দেখলাম, পাশা স্বদেশবান্ধব সমিতিতে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা দেবেন। বিকলে সভাস্থলে গেলাম। অরবিন্দ ঘোষকে দেখলাম। গলায় পদ্মফুলের মালা। হাতা চেহারা। তবে কীর্ণনের তিনি নন। আরও একটি নাম ও চেহারা মনে পড়ে—গীশপতি কাব্যতীর্থ। খুব জোর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কারো বক্তব্যই মর্মে প্রবেশ করেনি, আমরা শুধু চোখকে খুঁশি করতে গিয়েছিলাম।

১১১-১২ থেকে রতনদিয়াতে আসা আরও একটু বেশি হতে লাগল। ঝুলে বছরে তিন মাসের বেশি কখনো থাকিনি। তার একটি কারণ ছিল ম্যালেরিয়া। এ সময় ম্যালেরিয়ার পুনঃপুনঃ ভোগতে লাগলাম। সামান্য অর হলই ভাত বন্ধ হত। দুধ খাওয়া ভরানক অপরাধ ছিল, কারণ ওতে নিউমোনিয়া হয়। ঘরের তাপ ১০৫ ডিগ্রী হলেও মাথার জল দেওয়া নিষেধ ছিল। এ সব কারণে ম্যালেরিয়া হলে খাওয়ার দিকে লোভ খুব বেড়ে যেত। ভাত না খেয়ে, দুধ না খেয়ে, দুর্বল হয়ে পড়তে হত খুব। অতএব এ ব্যাধিটি বালকের পক্ষে সুরক্ষের ছিল না আদৌ। একবার ম্যালেরিয়ার মাসখানেক ভোগলাম, আর শুয়ে শুয়ে ভাতখাওয়া সুখী লোকদের কথা কল্পনা করতে লাগলাম। নিজের উপর ভীষণ রাগ হত।

আমার জ্যেষ্ঠত ভাই নলিনী কলকাতার প্রায় আসতেন। তিনি একবার কলকাতা থেকে রতনদিয়া ফিরে গিয়ে আমাকে একটি পরম উদ্ভেক্তনাশূর খবর দিলেন—কলকাতায় ম্যালেরিয়ার এক ওষুধ বেরিয়েছে, তাতে পথ্যের কোনো বিচার নেই, বা ইচ্ছে খাওয়া যায়। সে ওষুধের এইটিই প্রধান আকর্ষণ। তখন আনন্দে যোগশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠলাম, এবং ঠিকানা নিয়ে ১০০ ডিগ্রী অর গায়ে, পরদিনই এক রিটার্ন টিকিট কেটে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম। বত্বর মনে পড়ে ওষুধের নাম জার্মলীন।

ওষুধ কেনা বাবদ কিছু টাকা ও উজ্জ্বল গোটা পাঁচেক টাকা সঙ্গে রইল টিকিট কেনার পর। এসেই ওষুধ নিয়ে ফিরে বাব। কলকাতার পথ তখন আমার চেনা। (টাইম টেবলের সঙ্গে কলকাতায় ম্যাপ থাকত, তা দেখে বড় বড় সমস্ত পথ চিনে ফেলেছিলাম।) ওষুধ খেলে সব খাওয়া যায়, বিধিনিষেধ কিছুই নেই, যত ভাবছি তত উজ্জ্বল হচ্ছি, ট্রেনের মধ্যে সময় যেন আর কাটে না। শেষে গিরিঙ্গদ পৌঁছে ওষুধের দোকানে না গিয়ে সোজা মিরীপুর স্ট্রীটের ধাবারের দোকানে উঠে আগে তুস্তির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। ঝট লেনে উঠেছিলাম। পরদিন সকালে উঠে সন্দেশ দিয়ে শুক করে বিকেল পর্যন্ত ডিমভাজা, লুচি, রাবড়ি, রসগোল্লায় শেব। ওষুধ খেলে তো এ সব খাওয়া বাবেই, তবে আর চিন্তা কি। সামান্য একটু আগে-পরের ব্যাপার যাত্রা।

সেমিনও ওষুধ কেনা হল না, পরদিনও না, তার পরের দিনও না। ওষুধ অপেক্ষা করতে পারে, খাওয়া পারে না। এত দিনের কষ্ট বাসনা মিটিয়ে নিলাম মনের সাথে। তারপর ওষুধ কেনার পালা। কিন্তু তখন আর তাঁর প্রয়োজন ছিল না। পরদাও ছিল না। ঘরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম শূন্য হাতে, এবং ফিরে আসার পর অর আপনা থেকেই সেবে গেল সে বাবের মতো।

এর কিছু দিনের মধ্যেই রতনদিয়া গ্রামের শিকারীদের মারা একটা বাঘ দেখলাম। সেটি টাইগার, ডোরা-কাটা। চার পা বাঁধা, একটা লবা বাঁশের সঙ্গে বাড়ে ঝুলিয়ে আনা হল গ্রামে। বহু লোকের ভিড় জমল সে বাঘ দেখতে। এখানে বাঘ মারা হত এক অভিনব নিষ্ঠুর উপায়ে। গ্রামের বাইরে অজ্ঞাত যে সব গ্রাম আছে তার অবিকাংশই ঘন জঙ্গলে ভরা। বাঘের দৌরাঙ্কায় খবর শীতকালে প্রায় পাওয়া যেত।

এই রকম বাঘের খবর এলে রতনদিয়ার শিকারীদের পরিচালনার নানা গ্রামের শিকারী সেখানে গিয়ে সন্দেহ জনক স্থানে অহুগতান চালিয়ে বাঘের অবস্থান জায়গাটি আবিষ্কার করত এবং বহু লোকের সতর্ক পাহরার দড়ির জাল দিয়ে তার চারদিক বেঁধে ফেলত। খণ্ড খণ্ড জাল বহু লোকে বহন করত। ঘেরা সম্পূর্ণ হলে ঘেরা জায়গার আয়তন ক্রমে ছোট করে আনা হত চার দিকের জঙ্গল কেটে কেটে। জালের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে জঙ্গল কাটতে থাকলেই জালের ঘের ক্রমে ক্রমে আসত। বাঘ শড়কির বৌচার দূরত্বের মধ্যে আসা চাই, নইলে শিকার ব্যর্থ। জঙ্গল ঘেরার কাজটি খুব কঠিন। সমস্ত দিন লাগত। তারপর রাখে আশুন



“এতকিতে শত শত বর্ষক একসঙ্গে বাঘ। বঁলে চিংড়ার ক’রে ছুটতে লাগল।”

খেলো হুয়া ক'রে পাহারা দেওয়া হত। পরদিন সকাল থেকে মারার আয়োজন।

কি ক'রে বাঘ মারা হয় তা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল অল্প দিনের মধ্যেই। চলনা নদীর তপারে মোহনপুর গ্রামে একটি চিতাবাঘ বেড়া হয়েছে, এবং সকালে মারা হবে শুনে দলে দলে লোক বাচ্ছে দেখতে, আমিও সে দলে যোগ দিলাম। বাঁশের সাঁকোর পায়ে মাইল খানেক হাঁটলেই সেই গ্রাম।

গিয়ে দেখলাম, দড়ির জালে বেড়া জঙ্গল। বেশ উঁচু, বাঘ তা ডিঙিয়ে বেতে পারে না হঠাৎ। আমি বখন গেলাম তখন দেখি, বাঘকে কেন্দ্র ক'রে জঙ্গলের যে বুড়ী বেড়া হয়েছে তার ব্যাস যথেষ্ট দীর্ঘ, তাকে আরও খাটো না করলে হবে না। তাই জালের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চার দিক থেকে জঙ্গল কাটা হচ্ছে। আমাদের কাঁড়াবার জায়গায় কিছু পুইই অনেক গাছ ছিল, তার খোঁচা-খোঁচা গুঁড়ি অবশিষ্ট আছে, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

যেহা বুড়ীটির ব্যাস ২৫-৩০ হাতের বেশি না হলেই ভাল। জালের কাঁদে কোন্ বাঘকে বন্দুক দিয়ে মারা নিবে। নিয়ম হচ্ছে বাঘকে ঢিল মেয়ে বা খুঁড়িয়ে উদ্বেজিত ক'রে তুলতে হবে। তার পর বাঘ ছুটে আসবে আক্রমণ করতে, কিন্তু লাফিয়ে পড়বে দড়ির জালে, আর ঠিক সেই সময় শড়কি দিয়ে খোঁচা মারতে হবে। খোঁচা খেয়ে বাঘ বিশপরীত দিকে ছুটে বাবে, কিন্তু সেখানেও শিকারীরা ছাছির। সেখান থেকে খোঁচা খেয়ে গর্জন করতে করতে আর এক দিকে বাবে, আবার সেখানে খোঁচা খাবে। এই ভাবে বহু শিকারী একসঙ্গে হুয়া করতে করতে বাঘকে একটু একটু ক'রে কানু করতে থাকবে। কারো শড়কির কোনো একটি আঘাতে বাঘকে ধরাশায়ী করা নিবে, তা হলে সেটি হবে শিকার-আইনের বিলম্বচারণ। সব শিকারী বাতে অন্তত একটি ক'রে খোঁচা মারতে পারে এই হচ্ছে আইন। হত্যার এই নিষ্ঠুর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি সবাইকে মানতে হয়। এটি কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তর ধ'রে, অথবা কোন্ অতি সভ্যযুগের ক্লাসিকতার অন্তর্গত বলে আসছে, তা ভেবে পাওয়া যায় না।

বাই হোক, মোহনপুরের সেই জালবেড়া বাঘের বাইরে আমাদের উপস্থিতিতে সেদিন আমার নিজেরই কাছে বিষমরকর বোধ হচ্ছিল। তার কারণ, কোনো জিনিসের পরিণাম দর্শন যে যত্নে সজ্জব নয়, সেই যত্নে আমি সেদিন কিঞ্চিৎ পরিণাম চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলাম। শিকারীদের উপর ভরসা করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়, বাঘের আচার ব্যবহার সম্পর্কেও কোনো জ্ঞান সেই, এমন অবস্থার দড়ির জালে বেড়া এক অতুল হিসাব আক্রমণ-সীমার মধ্যে ঝাঁড়িয়ে ধুব পূলক অজুতব করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বখন দেখি বেকী ঠাকুর সেখানে এসেছেন, তখন মনের জোর করে এলো অনেকখানি। তখন এই কথাটাই মনে এলো যে তা হলে সম্ভবতঃ ভয়ের কিছু নেই।

অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে, দড়ির জালের বাইরে থেকে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে জঙ্গল কাটা দেখছিলাম। এক সাহসী ভেলে কিছু দূরে একটি গাছের উপরে উঠে বসেছি। সেটি বেটনীর ভিতরে অবস্থিত। সে নিরাপদ উত্তার নিশ্চিন্ত ছিল।

বেলা তখন সাড়ে আটটা বা নটা হবে। এমন সময় অতর্কিত শত শত দর্শক একসঙ্গে "বাঘ!" বলে চিৎকার করে ছুটতে লাগল ডান দ্বার থেকে বাঁ দ্বারে। আমি পড়ে গেলাম সেই দিশাহারা ছুটন্ত লোকের গতিপথে। পড়েও গেলাম এক ধাক্কায়। অতঃপরো ভয়ানক লোকের উদ্ভ্রান্ত অবস্থার চাপটা ধুব সহজ ছিল না। তাদের সমস্ত আতঙ্ক আমার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াতে আমিও যুহুতে বিভ্রান্ত-শক্তি লাভ করলাম এবং এক লাফ উঠে তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলাম। পড়ে গিয়ে কাঁটাগাছের কাঁটাওয়ায় উদ্ধত গুঁড়িতে পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, কিন্তু সেমিকে খোয়াল ছিল না। যুহুতে কি যে ঘটে গেল তা জানবার উপায় ছিল না।

বখন সঠিত ফিরে এলো, তখন দেখি, আরও অনেকের সঙ্গে আমিও উঠে এসেছি নিকটস্থ এক গুহাঘের একটি ঘরে। তখন নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, ছুটন্ত লোকের ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে বাওরাকেই আমি শেষ সিদ্ধান্ত বলে মনে নিই নি।

এখানে ঝাঁড়িয়ে দেহের কন্পান কিছু কম পড়ার পর শোন গেল, চিতাবাঘটি গাছের ডালে-বসা ছেলোকে লক্ষ্য ক'রে উল্লাসের এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল বা দর্শকগণ যুহুতঃপত্তে দণ্ডিত করেই চিতা বাঘের কাছ থেকে আর্দ্র আশা করেনি, তাই এই কাণ্ড। অবশ্য এ ধরটাই সত্য কি না তাও বলা যায় না। মাহুব নিজের ভীততা ঢাকার জন্য প্রতিপক্ষের শক্তিতে অসৌকিক্য আঘাণ ক'রে থাকে। সম্ভবতঃ ভয়েই এখানকার দর্শকেরা সামান্য একটি চিত্রক দর্শনে এ রকম বিচিত্র ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু বাঘটা জাল ডিঙিয়ে বাইরে এসেছে কি না, তা কেউ বলতে পারল না। কারণ কোনো দর্শকই কোনো ধবর ঠিক জানে না, জানবার আর উপায়ও নেই তখন। কারণ আমরা তখন মিনিট পাঁচেক দৌড়পথের দূরত্বে। এই অনিশ্চিত ধবরে আমাদের মধ্যে ভয় আরও বেড়ে গেল।

দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শক সেই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা ক'জন আছি একটি টেকশালায়। থড়ের ঘর, বাঁশের খুঁটির উপর ঝাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরের দরজা নেই।

এই প্রসঙ্গে আর এক বীরের কথা না বললে বর্ণনা বুধা হবে। সে ললিতচন্দ্রের পুত্র, নাম প্রজোতকুমার। এ রকম কীর্ণজীবী যে, মনে হয় হাওরায় উড়ে বাবে। দেহ লম্বা এক হাড্ডা। এই বালকের সাহস ছিল হুঁমুনীয়—এক গলার আওরাক আর সবাইকে ছাপিয়ে বেত। সমস্ত হুঁমুনায়িক কাজে তার অগ্রাধিকার। সব কাজে সে এগিয়ে আসবে সবাই আগে এবং কি করলে সে কাজ সবচেয়ে সহজ হবে, তার পরিকল্পনা তার মুখ থেকে খইয়ের মতো ফুটে বেরোত।

হুঁমুনায় আর কেউ কিছু জানে না, সে সব জানে, একথা সে নিজে বিশ্বাস করত। শিকারের ধবর পেলেই সে গ্রাম থেকে নিকটস্থ। তাকে সর্বদা দেখা যেত শিকারীদের সঙ্গে।

মোহনপুরের শিকারের স্থানে সে আগেই এসে পৌঁছেছিল এক বখন বাঘ বলে ভয়ানক চিৎকারের সঙ্গে সবাই উদ্ভ্রান্ত ভাবে ছুটে পালিয়েছিল তার মধ্যে তাকে দেখা যায় নি।

সাহস ছিল তার খুই বেশি, তু সেখটি উপযুক্ত হলে শিকারীদের উপর সঙ্গী না ক'রে সে নিজেই শিকারী হতে পারত।



কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে মিটিয়েছিল অল্প ভাবে। নানা স্থানে জ্ঞাতদের সঙ্গে বাঘ শিকারে উপস্থিত থেকে সে এটি অন্তত বুঝেছিল যে, আর হাতেই হোক শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে বাঘ শিকার করা যায় না। ভিতরে অদম্য ভেজ, বাইরে শক্তির অভাব। সত্ত্বত এই কারণেই সে গোপনে গোপনে সঙ্গীসবানীদের দলে মিশেছিল।

এ খবর আমাদের কারো জানা ছিল না। জানলাম অনেক দিন পরে (১৯৩৩?)। কালুখালি ঈশানের কাছে চকিশ বছর আগে লাট সাহেবের (আগারসন) গাড়ির নিচে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, তার ফলে এই প্রজাতত্বকুমার। সে নিজ হাতে রেললাইন সিঁগড়ালের কাছে মারাত্মক বোমা পেতে এসেছিল। ধরা পড়ে গিয়েছিল অবস্থা। জেল খেটেছিল চার বছরের বেশি।

মোহনপুরের বাঘ শিকারের সময় তার বয়স দশ বছরের বেশি নয়, কিন্তু গর্ভনে তখনই সে বাঘের সমান যায়। আমাদের পাশের আসার পর সে এসে আমাদের সাহস দিতে লাগল।

এমন সময় আর একজন পলাতক দর্শক এসে বখন খবর দিল, বাঘ বেরিয়ে এসেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, তখন কানের কাছে এক আত্মবী ধনি শুনে চমকে উঠলাম। দেখি চাপা ও কীপা কান্নার সুরে কে আমাদের মাথার উপর থেকে আবৃত্তি করছে—হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান—

ঢেরে দেখি বৌী ঠাকুর।

তিনি সবার আগে ছুটে এসে এই ঘরের একটি বাঁশের আড়ের উপর বসে আছেন।

অনেক পরে জানা গেল, বাঘ বেরিয়ে যায়নি। যে ছেলেরি গাছের ডালে বসে ছিল বাঘ তার দিকে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু বাজা গানের দর্শক শিকারের দর্শক হতে গেলে অনর্থকটা বাজাবিক। বাই হোক, আমরা নিশ্চিন্ত মনে ওখান থেকেই আর এক পথে বাড়ির দিকে রওনা হলাম, বাঘ বাঁরা দেখার আর সাহস হল না। চিত্তা বাঘটিকে দুপুর বেলা মাঝ হয়েছিল।

রতনদিয়াতে প্রায় প্রতিদিন গানের আসর বসত। আসরের তিনটি আরগা ছিল। একটি বোগেশচন্দ্রের বাড়িতে, একটি বৌী ঠাকুরের বাড়িতে, আর একটি গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে। তখনকার আধুনিক রজনী সেনের গান 'বধির' বনিক। তুলিয়া যোরে প্রহু' গানটি বহু বার শুনেছি বীরেন্দ্র মল্লিকার মুখে। তিনি সাজবড়ে থেকে এসে গানের আসরে হুঁচকার সত্ত্বাহ কাটিয়ে যেতেন। গানের পরিবেশ ভালই লাগত, অকারণ এক কোণে বসে থাকতাম। অবিকাল গানই প্রকাশ বা যোয়াল। বৌী ঠাকুরের তবলা চর্চায় উদ্ভূতি হবে মনে করে বৌী ঠাকুরের কেবল জন শুভার্থী আমাকে হারমোনিয়াম বাজনা দেখাতে লাগলেন এবং হাত কিছু উন্নত হলে হুঁতিনটি গং দেখালেন। প্রথমত গানের সঙ্গে হাতে মাত্রা ভাল প্রকৃতি ভাগ বোঝালেন, তার পর হারমোনিয়ামে। শেষে বখন দেখলেন হুঁতিনটি গং আমার বেশ দেখা হয়ে গেছে, তখন বৌী ঠাকুরকে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল তাঁর তবিল্যৎ কলাশের জন্ত। আমার বাজনার সঙ্গে তিনি তবলা চর্চা করতেন। কিন্তু আমি ও বৌী ঠাকুর-জির আর সবাই জানতেন, বৌী ঠাকুরের শিকা আরভেই শেষ হয়ে গেছে, তার আর কোনো বিবর্তন নেই। দাঙ্গাধানে আমার

বৌীকু ছর্ভোগ ছিল তা তুগলাম। অবস্থা এ পথে আমারও কোনো বিবর্তন ছিল না।

আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা হলেও এখানে সেটি উল্লেখ করে গানের আসরের কথা শেষ করি। বরিশালের এক ওস্তাদ গায়ক কাছাকাছি কোথায়ও এসেছেন শুনে গ্রামের উৎসাহীরা তাঁকে ধরে নিয়ে এসেন। নামটি বতদূর মনে হয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে আসব বগবে, উত্তেজনা বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু বসিক ব্যক্তি আসছেন নানা স্থান থেকে। আমিও গেলাম। তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবে কে, তা নিয়ে কথা উঠেছিল। বৌী ঠাকুরের খুব ইচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখেন। অতিথি তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আর সবাই তাতে আশঙ্কিত। কহাতে তিনি মনঃকুণ্ড হলে। তবলাবাদকের অভাব ছিল না, কিন্তু তবু একটা আত্মবী বোগাযোগ ঘটল। ঠিক এই সময় কলকাতা অঞ্চলের কোনো এক সুবিখ্যাত বাত্রার দলের নামকরা তবলাবাদক, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনদিয়াতে এসেছিলেন এক 'আত্মবী' বাড়িতে। তিনি কিছুদিন আগে অন্ত্র থেকে উঠে কয়েক দিনের জন্ত বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। তাঁকেই ধরে আনা হল।

গানের আসর বসবে সকালে, আমিও দর্শকরূপে উপস্থিত আছি। দেখি, সেই নবাগত ওস্তাদ গাজা টানছেন। এক ছিলিম শেষ হয়ে গেল, আর এক ছিলিম ধরালেন। তারপর আরও এক ছিলিম। কত বড় গায়ক, সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার। পর-পর আট ছিলিম শেষ হল। এক ঘট্টা লাগল মোটের উপর। এর পর শুরু হল গান। এ রকম গান গাওয়া আমি আগে বা পরে আর কখনো দেখিনি। প্রায় তিন ঘট্টার শেষ হল সে গান। অনেক গান নয়, একটি মাত্র গান। বত রকম সুর বিস্তার সম্ভব, বত রকম মাত্রা ভাগ সম্ভব, মিনিটে এক মাত্রা থেকে সেকেন্ডে দশ পানবো মাত্রা। বাদে সুর নামতে নামতে আর নেই সুর, তখন শুধু হাত নাড়া আর হুখ নাড়া। চল মিনিট চারপাঁচ এই নীরব গান। সুর প্রবেশের সীমানায় উঠে এলো খাদ থেকে, 'কেড ইন' করে। তার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চড়ার দিকে তুলতে তুলতে আবার সুরের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল, সুর পলাততে সেই, যন্ত্রে সেই। চল নীরব



‘আমার বাজনার সঙ্গে তিনি তবলা-চর্চা করতেন।’

পান তিনচার মিনিট। তারপর চড়ার অজ্ঞতির বেশ থেকে সরে নেমে এলো অজ্ঞতির সীমানায়। তবলা কিন্তু চলছে অবিচল।

যে সাতটি রং আমার চোখে দেখি, সেগুলো তরঙ্গ-সৈন্যের হিচকিবে পর পর সাজালে তার দীর্ঘ প্রান্তে থাকে লাল, হুং প্রান্তে থাকে বেগুনী। রেড আর ভায়োলেট। হু'মিকেই রং আছে আরও, কিন্তু তা চোখে দেখা যায় না। লালের পারে যে রঙটি আছে তাকে বলা হয় ইনফ্রা রেড, বেগুনী পারে যে রঙটি আছে তাকে বলা হয় আলট্রা ভায়োলেট। এ দুটি কথা শুনে কেবলই ব্যস্ত হই, কিন্তু জীবনে এই প্রথম গানের সাতটি সুরের দুই প্রান্তে সুরের ইনফ্রা রেড ও আলট্রা ভায়োলেটের অস্তিত্ব সন্ধান পাওয়া গেল।

আজ বন্দোপাখ্যারের বাজনা উঠ প্রাণসিঁত হল, কিন্তু তাঁর কাছেও গানের এ রীতি নতুন। একই পান প্রায় তিন ঘণ্টা পাওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার।

বিকলে আবার আসর বসল। এবারে আরো বেশি শ্রোতা। কিন্তু গানের আগে যেমন রংের আলাপ, তেমনি ওস্তাদজির সব কিছুর আগে গাঁহার আলাপ। বখাওয়াটি আট ছিলিম, বাঁধা বরাহ। আজ বাবু বাজনা শেষ ক'রে বললেন, হাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে।

পরদিন আসর বসল সকাল বেলা। রাজবাড়ি থেকে হেডমাস্টার জৈলোক্যানাথ ভট্টাচার্য এসেছেন। গাঁহা-পর্ষ তখন কেবল শুরু। বহু শ্রোতার ভিড়। বৈধ বাধা কঠিন। জৈলোক্য বাবু বৈধের সঙ্গে তিন ছিলিম পর্বত টানা দেখলেন। চতুর্থ বার সাঁতার সময় হুহাত দিয়ে ওস্তাদজির হুহাত চেপে ধ'রে বললেন, এখন আর থাকেন না দয়া ক'রে, এত সোক বসে আছে। ওস্তাদজি কলকে ছেড়ে দিয়ে তানপুটী তুলে নিলেন এবং তাতে গেলাপ পরিবেশের সুরের সঙ্গে খাড়া ক'রে রেখে অভ্যন্তর-স্বহিত কর্তে বললেন—ওটা যদি থাকে তবে এটাও থাক।—ব'লে শুধু হয়ে ব'সে বইলেন। জৈলোক্য বাবু বললেন, না না, আমার অভ্যন্তর হয়েছে, আপনি চলিয়ে যান।

আজ বাবুর হাতে ব্যথা হয়ে আর হয়েছিল, তাঁকে এক রকম জোর করেই তুলে আনা হয়েছিল, কিন্তু বাজাতে ব'লে তিনি সে সব ভুলে গেলেন, এবং বাজনা শেষে বেশি রকম অল্প হলে পড়লেন। ঐ রকম তবলার হাত স্থানীয় কারো পূর্বে দেখা ছিল না, সবাই একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু ওস্তাদজির গানের উচ্চ প্রশংসা হলেও তাঁর তিন ঘণ্টা বিস্তারী গানের রীতিতে সবাই অবাক। এর মতিনব্বই লোকের কৌতুহল উত্তেজিত করেছিল বেশি।

আজ বাবুর অকমতা সত্ত্বেও শেষ পর্বত বৈধী ঠাকুরকে এ আসরে কোনো সুযোগই দেওয়া হল না, এবং উপস্থিত অজ্ঞ বাদকেরা একাজে গাফিল পেলেন না, অতএব আসর তিন দিনের বেশি চলল না।

ক্রমেই রতনসিঁতার সঙ্গে যনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। এখান থেকে যে-কোনো জায়গার বাওয়া সবচেয়ে সোজা, অথচ সব সময় থাকে থাকেও সম্ভব নয়। সে জন্ত শিশুকালের স্বপ্ন সকল 'রে একখানা হাইনাইকেল কিনে ফেললাম। এতে গ্রাম্য-স্বপ্নের দুখ আরক্তের মধ্যে এসে গেল। সকলে রতনসিঁতার থেকে

যেখানে চন্দনা নদীপারের কেরিকাতোর বড় রাজা ধ'রে পাশা ট্রেন, এক তার পর থেকে গ্রাম্যপথে পশ্চার বালুচরে বাওয়া এক খেরা নৌকোর নদী পার হয়ে সাতবেড়ি। এই বাতায়ন শীতকালে বুঝি সহজ। সাতবেড়ি থেকে পোতাশ্রিতা ২৮ মাইল দূর। সাইকেল উত্তর-পূর্ব দিকই ব্যবহার করলাম। দুটি শীতকালে সাইকেলে পোতাশ্রিতা গিয়েছি। সাইকেলের সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সহ ব্যাগ ও পিছনে টুল-ব্যাগ বাঁধা থাকত। পথে প্রয়োজন বোধে মেরামতের কাজও শিখে নিয়েছিলাম।

পথ চলা তখন কত নিরাপদ ছিল। একা বালকের পক্ষে পাবনা জেলার আধুনিকতা-স্পর্শবর্জিত অজ্ঞ পাড়াগায়ের মধ্যে দিয়ে বাওয়া-আসা, সরল নির্ভরতা ও বিধাসের উপর ভিত্তি ক'রেই তো চলত। অপরিচিত গ্রাম্য জীবনের সমস্ত পরিবেশটি আমার চেতনার মধ্যে এক অদ্ভুত শব্দ, ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আজও।

কলকাতার শব্দও পরিবেশও আমার পরিচিত হওয়ারতে সেই গালাকলেই কত জনের ফরমায়েস খাটতে হত। একবার এক নিউমোনিয়া রোগিনীর অজ্ঞ অজ্ঞেয় সিলিগুরি নিয়ে গেলাম টাকা জমা দিয়ে, এক তা পৌঁছে দিয়ে জমা টাকা তুলে নিয়ে গেলাম। একবার এক বৌগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এলাম। শিয়ালদহ থেকে পাকী ভাড়া লাগল এক টাকা। তখন পাকী সব সময়ই পাওয়া যেত, বিকৃত ছিল না। এক হঠাৎ-অন্ধ-হওয়া রক্তুক মাসে দুতিন বার নিয়ে আসতে হত ডাক্তার বতীন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে, বীড়ন ট্রীটে। চোখ ভাল হয়ে গিয়েছিল বছর খানেকের চিকিৎসার।

এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন অন্ধ বন্ধুকে নিয়ে আসছি এই ডাউন প্যাডেলারে। ১৯১৩ সালের প্রথম দিক হবে, বতবুর্ মনে হয়। কুমারখালি থেকে এক ভরলোক উঠলেন আমাদেরই কামরার। তখন গাড়িতে ভিড় থাকত না আরো। কুমারখালি থেকে ওঠা ভরলোকের হাতে প্রায় দশ ইঞ্চি ব্যাসের এক পানের ডিবে, তাঁর বড় সিগারেট কেস-এ ২০টি সিগারেট। তিনি ক্রমাগত পান ও সিগারেট খাচ্ছেন, কিন্তু পোড়ার ট্রেনে এসে বখন তিনি আরও গোটা-শকাশক পান আর দু-প্যাকেট সিগারেট কিনলেন, তখন তাঁর দিকে অবাক-বিশ্বাসে চেয়ে বইলাম। এত পান-সিগারেট খাওয়া করবেন দেখিনি, আমার কাছে এটি একটি নতুন আবিষ্কার বলে মনে হল, তাই কৌতুহল বশত তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁর নাম হরিপদ সাত্তাল। প্রশস্ত দেখে, স্থল কিঞ্চিৎ, কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন কৌকড়ানো চুল। তনুলাম বি-এ চতুর্থ বার্ষিক প্রেক্ষিতে পড়েন, এক আরও আদর্শ ব্যাপার, তিনি ডাক্তার বতীন্দ্র মৈত্রের বাড়িতেই থাকেন। আমরাও সেখানেই বাছি।

এর পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবনি, শুধু মনে রেখেছি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আরও কয়েক বছর পার হয়ে এসে তাঁর কথাটি শেষ ক'রে রাখি। যে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সে সময় আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। তারপর আমি বি-এ পড়তে এসে দেখি, তাঁর সঙ্গেই পড়ছি। বুঝি আদর্শ লাগল। তনুলাম অনেক দিন ধ'রে তিনি ফেল করতেন। তারপর আমি বি-এ পাস ক'রে চলে যাই।

প্রাইভেট এম-এ পরীক্ষা (১৯২৩) দিতে এসে দেখি, তিনি তখনও বি-এ পড়ছেন। আরও বললেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে এক আবেদন পাঠিয়েছেন যে, তিনি গত আট বছর ধরে বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং এই আট বছরের হিসেবে তিনি সব বিষয়েই পাস করেছেন, এমন অবস্থায় তাঁকে বি-এ পাস ঘোষণা করা হোক। সুনাম বিশ্ববিদ্যালয় এ চিঠির উত্তর দেননি।

তাঁর স্মৃতিতে অসঙ্গতি ছিল না কিছু। এক বিষয়ে কেল করলে পরের বছর আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার রীতি যে অজ্ঞার, তা এত দিনে সশেষিত হয়েছে।

আমি এম-এ পাস করার পর একবার কলকাতা আসি, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা, আমাকে ধরলেন ইংরেজী নাটকটা একটু পড়িয়ে দিতে। কয়েক দিন দিয়েছিলাম। এর কয়েক বছর পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা, সুনাম বি-এ পাস করেছেন এবং ল' পড়ছেন। আরও কিছুদিন পরে শুনি, তিনি আর বেঁচে নেই। অবিরাম পান সিগারেট খাওয়া যেমন পূর্বে দেখা ছিল না, তেমনি অবিরাম পরীক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্তও পূর্বে দেখা ছিল না। এ রকম দৈর্ঘ্য সম্ভবত আজ আর দেখা যাবে না।

আমার নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল। অবশ্য প্রধান বাধা মনোর। স্কুলের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত ভাল লাগলেও দৈনিক বাধা প্রবল হয়ে ওঠে। ম্যাসেরিয়ায় আরও একবার খুব বেশি রকম আক্রান্ত হই। তবু যে পড়ার ধারা বজায় রেখেছিলাম সে কেবল বন্ধুদের পড়িয়ে। অল্পকালে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত। রতনদিয়া এবং পাখবতী অনেক গ্রাম অল্পত দশ জন ছাত্র কালুখালি ষ্টেশন থেকে রেলের দৈনিক যাত্রী ছিল রাজবাড়ি স্কুলের। তারা সবাই আমার কাছে আসত যাপ আঁকিয়ে নিতে। পড়াতায় অনেককে। ওতেই আমার নিজের পড়ার কাজ হয়ে যেত।

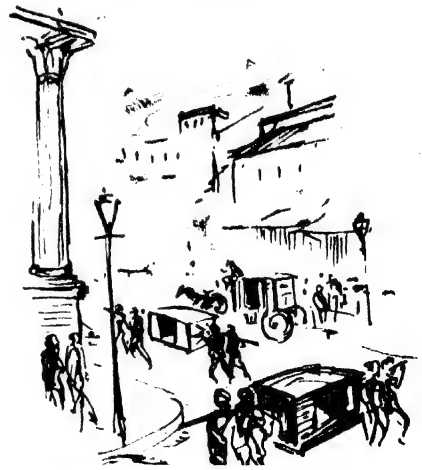
গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে একটি ঘর নিয়ে কবিরাজ দিগন্তনারায়ণ ভট্টাচার্য কবিরাজি করতেন। তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছিলেন, কিন্তু কোন্‌ স্মৃতে তা আমার মনে নেই। কবিরাজের চেয়ে তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন বেশি। তখন তাঁর জাতিভেদ নামক স্মৃতিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার রক্ষণশীল মহলে তা নিয়ে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন লেকটেন্যান্ট কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ বই পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কেন না আমিও মনে মনে ছিলাম নিরম ভাঙার দলে। আমার আর এক অমুচর হরেন্দ্রকুমার রায় (পূর্বে উল্লেখিত), সেও দিগন্তনারায়ণের বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আমাদের বালকমন সহজে প্রভাবাধিত হওয়া স্বাভাবিক, এ বিষয়ে হরেন্দ্রকুমার ছিল চরম। এ রকম মানসিক গঠন আর আমি বিত্তার দেখিনি। আমার অনেক উৎসাহজনক কাকেরই সে ছিল সঙ্গী, কিন্তু সেখানে সে আমাকে ছাড়িয়ে যেত সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য ছিল আমার নাগালের বাইরে। সে স্কুলে খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুলের একটি বার্ষিক পরীক্ষার একবার অর্ধে পুরো মার্ক পেল। কিন্তু তার পরের বছর অর্ধে পেল শূন্য। কি করে এটা হল, তা উল্লেখযোগ্য।

তার শিশুত্ব ভাই প্রবোধের চট্টোপাধ্যায় তখন সাহেবগঞ্জ

স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে। বাইরের জগতের বা কিছু আধুনিক তা তখন পর্যন্ত তারই মহাছতার রতনদিয়ার ছাত্রমহলে আমদানি হত। ফুটবল খেলার টীম গঠন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা প্রভৃতিতে তার ভীষণ উৎসাহ। আমার সঙ্গে গভীর বন্ধু হয়েছিল তার, যদিও তিন চার ক্লাস উপরে পড়ত সে। একবার সে ডি, এল, রায়ের সাক্ষাৎনে উৎসুক হয়ে এলো গ্রামে এক খণ্ড সাক্ষাহান হাতে নিয়ে। প্রায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (তখন স্কুলের ছাত্র) খিজেল্লালের একখানা কোটোগ্রাফ দেখালেন, তাতে লেখা ছিল 'আমার তরুণ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে।' এই দুটি ঘটনার যোগাযোগে খিজেল্লাল ওধানকার স্কুলের ছেলেরদের মধ্যে 'হীরা' হয়ে পড়লেন। সে কি উদ্ভাদনা। প্রবোধ আশন উদ্ভাদনা সবার মধ্যে সঞ্চারিত করল, এবং সে তার কাজ শেষ ক'রে সাহেবগঞ্জে ফিরে গেল, কিন্তু সর্বনাশ হল হরেন্দ্রের। সাক্ষাহান হল তার ধ্যান জ্ঞান। তার বাইরে জগতে আর কিছু নেই, সে আগাগোড়া সাক্ষাহান মুগ্ধ ক'রে এমন আনন্দ পেল যার কাছে স্কুল তুচ্ছ হয়ে গেল, এবং পরের বছর অর্ধে শূন্য এবং অজ্ঞাত বিষয়ে কম মার্ক পেয়ে কেল করল। শুধু তাই নয়, একদিন স্বপ্ন দেখল, সে নিজে ডি-এল রায় হয়ে গেছে।

দিগন্তনারায়ণের প্রভাবে হরেন্দ্র সমাজ বিষয়ে চিন্তাশীল হয়ে উঠল এবং কয়েকখানা বইও লিখেছিল জাতির অংশপতন বিষয়ে। অবশ্য এ সবই তার নিজের অংশপতনের পরে। বহুকাল পরে (১৯২৯ সম্ভবত) সে শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে যায়। তখন তাকে ঠাঁট ক'রে বলা হত, খিজেল্লাল তোমার সর্বনাশ করলেন, বাঁচালেন রবীন্দ্রনাথ। এই হরেন্দ্রকুমারের মনের একটা অংশ বরাবরই কোমল ছিল, সেজন্য শান্তিনিকেতনে ছাত্রের কাজের কীকে সে-মনের বতরুত অবশিষ্ট থাকত তাইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে মেতে সে প্রায় উদ্ভাদ হয়ে উঠেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যেত দেশে কিরলে। কলকাতায় ক্রিশ্চিয়ানকুমার ভাড়াড়ি বনন বোগেল



"শিয়াল থেকে মেডিক্যাল কলেজ, পাড়ী-ভাড়া লাগল এক টাকা।"

চৌধুরী সীতা মঞ্চ করেন তখন আমার সঙ্গে সে সেই নাটক মঞ্চে এমন অতিক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে আমার ভয় হয়েছিল পাখা খারাপ হয়ে না যায়। অভিনয় দেখে ফিরে এসে সে সমস্ত ঠাট ভেঙ্গে বসে ছিল, আমাকে ধুমোতে দেখনি। দশ পনেরো মিনিট পর পর আমাকে থান্ডা মেখে জাগিয়ে শুধু বলছিল, 'কি লক্সাম!' এর পর তিন দিন আর সে কোনো কাজ করতে গিয়েনি। কয়েক বছর পরে সে বাস ট্যাক্সিয়ার মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র গ্রামে থাকলে খুব হৈই-এর মধ্যে দিন কাটত। পূর্ণা আকৃতি চলছে নানা নাটক কাব্য থেকে। ডাকঘর ছিল গাটুজোলের বাড়িতে। অক্ষর চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র বোগেন্দ্র-চুমার লাচোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তিনি পাঠ শেষ না করেই সল এসেছিলেন দেশে। দেশের সম্পত্তি তিনিই দেখাশোনা করতেন। তিনি ছিলেন রতনবিরি ডাকঘরের পাঁচ টাকা বেতনের পোষ্টমাস্টার। একদিন রবীন্দ্র মৈত্রের ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার ধবর এলে ডাকঘরে। আমরা বাঙালি ডাকঘরে, দেখি রবীন্দ্র মৈত্র উল্লাসে কেটে পড়তেন। বাকি দেখছেন তাকেই বলতেন, 'জান আমি কেল কবেছি।' হাতে পোষ্টকার্ড, তাতে প্রথম বিভাগে পাস করার ধবর ছিল। 'কেল কবেছি' বলেই সেখান। সামনে মেলে বহুছিলেন।

আমার অনুষ্ঠানবিমলের অকাল মৃত্যুতে বাবা শোকাহত হয়েছিলেন স্বভাবতই। তা তুলে থাকবার জন্য গীতার মধ্যে ছুব মারলেন এবং ঐ সঙ্গে অনুবাদও করতে লাগলেন। শেষ দ্বারে উঠে সেতার নিয়ে বসতেন এবং আপন মনে বাজিয়ে চলতেন। কিছুদিনের মধ্যেই গীতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হল। সেটি ১৯১২ সাল। বাবার চতুর্ন নির্ভরযোগ্য ছাত্র, শ্রীললিতারঞ্জন রায় বর্তমানে পাবনা এন্ডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ) ও শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ হুখোপাধ্যায় তখন কলকাতার থেকে কলেজে পড়তেন। তাঁদের উপর ভার পড়ল গীতার অনুবাদ ছাপাবার। এই সময় আমি 'হুবি জীভা অভ্যাস করছিলাম।' 'হাউ টু ড্রু ওড শিকচাস' নামক একখানি খুব মোটা বই বাবা কিনে নিয়েছিলেন। তা থেকে বাবার সাহায্যে পাসপোর্টবিদ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা তে কেরি হল না। বিলুপ্ত থেকে ডাকে অনেক স্তম্ভিত ছবি জানিয়ে নিয়েছিলাম। তা ভিন্ন মাস্টারলীসেস অক আর্ট নামক কথানা বড় বই কিনেছিলাম। গীতার জন্য কয়েকখানা ছবি কে দিয়েছিলাম সেই বালক বয়সে। আমাকে উল্লাহ সেবার সন্তোষে ছাপাও হয়েছিল, যদিও না হলেই ভাল হত।

অনুবাদ গীতাকিনু নামে ছাপা হয়। ছাপার সময় আমিও একবার কলকাতায় এসেছি। ব্রুক করেছিলেন কে, ভি সেন, এর সঙ্গে এই উপসর্গে আলাপ হয়েছিল। পুরনো বিশপ সেক্সের বাড়ির পোতলার ছিল তাঁর বুক তৈরির কারখানা। নিচে ইক্সপ্রেস নামক এক ছাপাখানা ছিল, ফটকে ঢুকেই জান ধারে। অনুবাদের সময় ছকের আনন্দে বাবা খুব উদ্ভূসিত হয়ে গিয়েছিলেন। উল্লাহী প্রোডাক্টের কাছে অল্পভ্রাতৃত্ব পেড়ে পেড়ে নাকতেন। মূল শ্রীমদ্ভগবতগীতার বতগুলি ছত্র আছে, প্যাক্সবাসেও ঠিক ততগুলি ছত্র। প্রচলিত স্কোচগুলি পৃথক পৃথক অনুবাদ করা হয়েছিল, বাতে সহজে বুঝ করা যায়। পয়সার চলতে চলতে হঠাৎ এসে—

বসনধানি জীর্ণ যানি যেমন তাকে বেলে'  
আরেক নব বসন পরে মানব অবলোকে,  
তাহারি প্রায় দেহীর কার জীর্ণ হলে পর  
আবার সে বে প্রহণ করে নুতন কলেবর। (২-২২)

কিংবা  
কবি পুরাতন, বিশ্ব শাসনকারী,  
অণু হতে অণুস্থল সে তত্ত্ব ধরে,  
অনন্ত ভূপ, অচিন্ত্য রূপধারী

সূর্যের সম অজ্ঞান-ভ্রম হয়ে—(১-১)

এ সব বিচিত্র ছন্দের মালিকতার পাঠগরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে যেত। ছন্দের রন্ধারের অদ্বুত এক নন্দনশক্তি। বিশ্বরূপ দর্শন (একাদশ অধ্যায়) বিশেষ করে অনুবাদকারীর প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি নিজের ছন্দের টানে ভেঙ্গে যেতে লাগলেন। সে ধনি আঁখও কানে স্বকৃত হচ্ছে—

"অনল-বসনা লেলিহা বসনা মেলিয়া সকল দিলে,  
তোমার বদন বিশ্বের জন নিশ্চেষ্টে গরাসিছে।  
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ তেজে বে উঠিল ভরি'  
উগ্র বলক সমগ্র লোক দর্শি ছুটিল, হরি।" (৩০)

কিংবা "বিশ বিশাল গ্রাসি আমি কাল স্বয়ং ভয়ঙ্কর—  
নিখিল-বিনাশ-সাধনে আদ্যাস করিছ অনন্তর।  
তুমি নাহি মারো, তথাপি কাহারো নিস্তার নাহি আজি,  
যয়েছে যদিও প্রতিপক্ষীয় হত্যক বোঝা সাজি। (৩২)

তুমি উঠি তবে খ্যাতি লুটি লবে, সময়ে সমুদ্রত;  
অসত্যিপুত্র জিনিয়া তুচ্ছ বাজ্য সমুদ্রত।  
আমিই সবাকৈ বধিগাহি আগে, কেহই রহেনি বাঁচি—  
নিমিত্তার্থ কেবল মাত্র হও হে সবাসাচী। (৩৩)

শ্রীমদ্ভগবতগীতার এর চেয়ে ভাল অনুবাদ হয়েছিল কি না, আমার জানা নেই।

প্রকাশকের নাম ছিল শ্রীললিতারঞ্জন রায় ও শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ হুখোপাধ্যায় ৫, রামতল্ল বস্ত্র সেন। রবীন্দ্রনাথ গীতাকিনু পাঠাতে ছোট একখানি চিঠি দিয়েছিলেন, হুখের বিষয় সে চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। বই বিক্রির ব্যবস্থাও প্রকাশকেরাই করেছিলেন। আখিও মাঝে মাঝে এসে বই দোকানে বিতাম। ছুটি মাত্র জায়গার রাখা হত। গুজলার চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও বয়েজ বুক ট্রেস। এঁরা প্রতি মাসে বিক্রয় কমিশন কেটে টাকা শোধ করে দিতেন। বয়েজ ঘোষের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়, আমার সঙ্গে অত্যন্ত সম্ভদর ব্যবহার করতেন। আঁখও তিনি টিকে আছেন বয়েজ লাইব্রেরিতে—তখনও একা, এখনও একা।

পোতাভিযোতে ইতিমধ্যে আমি আঁখও হুখানা কাগজের গ্রাহক হয়েছি। একখানা লণ্ডন থেকে আসত 'বয়েজ ওজ পেশার' আর একখানা 'ইংলিশম্যান', বিশাপ্তাহিক। নিজের পছন্দসই সংবাদ বা রচনা বেছে নিয়ে পড়তাম এবং মোটামুটি এক বছর বুঝে নিতাম। রুহুল, প্রকৃতি, শিশু, নির্যমিত আসত। 'বালক' নামক একখানা মিশনারি কাগজ বার্ষিক মূল্য ছ আনা, আমার খুব প্রিয় ছিল। মনে আছে চার লাইন হুড়া লিখে আত্মাহার লিঙ্কন-এর কীবনী উপহার পেয়েছিলাম।

লেখার ইচ্ছে হত। কবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখত, তার কবিতা সে সময় ছাপা হত কোনো কোনো কাগজে। বাবা বললেন, রচনা অভ্যাস করতে হলে খবরের কাগজে লেখা অভ্যাস করা ভাল। তাই ঠিক করলাম। পান্না থেকে স্বগঙ্গা নামক একখানা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ হত, তাইতে পনেরো দিন পর পর স্থানীয় সংবাদ লিখে পাঠাতাম। স্থানীয় আবহাওয়া ও অন্যান্য অনেক তুচ্ছ খবর লিখতাম এবং তা আমার নামে ছাপা হত। একখানা ক'রে কাগজ পেতাম তার বিনিময়ে। ১৯১৩ সাল সম্ভবত, মনে পড়ছে না ঠিক।

১৯১৩ সালের ১২ই ফিরাব্রী ১৩ই মে, পোতাশ্রিতা স্কুলের ক্রীড়ার ছুটির কিছু পূর্বে ঘটনা। দিনাভ্রমণের একটি ঢেলে, নাম উপেন, পোতাশ্রিতাতে পড়ত। সে ছুটির আগেই বাড়ি বাছে, আমারও খুব টাচ্ছে হল ওব নল পোতাশ্রিতা হয়ে রতনদিয়াতে আসি। সকালে রওনা হয়ে রাত ৮টার সময় গোয়ালন্দ পৌঁছলাম স্ট্রিমারে। উপেনের কাছে আগেই শুভদ্রিলাম সে তিমালয় দেখেছে এবং বরফঢাকা কাননভঙ্গাও দেখেছে, বহু দূর থেকেই দেখা যায়।

তিমালয় সম্পর্কে আমার একটা রতনদ্রম্য আকর্ষণ ভাস্কর্য ছিল, আগে বলেছি। হঠাৎ খোলা হল উপেনের সঙ্গেই যদি চলে যায়, তা হলে তিমালয় নর্শন সহজেই হতে পারে। নইলে ভবিষ্যতে হবে হবে বা আলো হবে কি না কে জানে? এ স্বপ্নেগ ছাড়া চলে না, সঙ্গে বয়েই টাকা ছিল, আর ছিল আমার গ্লাউট্রান ব্যাগে ছবি আঁকার খাতা আর দু-একটি টুকটাকি জিনিস। দার্শিলিঙ সম্পর্কে সে সময় কোনো ধারণা ছিল না, শুভদ্রিলাম ঠাণ্ডা বেশ, তাই বাপেশের শেষের উত্তপ্ত হাওয়ায় সে ঠাণ্ডা করনা ক'রে ভাল লাগল। তারপর গোয়ালন্দ থেকে পোড়ার, সেখান থেকে দাছকদিয়া ঘাট পার হয়ে সারাবাট থেকে আর এক গাড়িতে সমস্ত দিন ধ'রে গেলাম শিলিগুড়ি। পথে করেক ষটা ধ'রে অবিরাম বরণ হয়েছিল। সারাবাট থেকে সম্ভবত সাত্তাহার গিয়ে মিটার গেক লাটনের গাড়িতে উঠেছিলাম, এখন মনে নেই। শিলিগুড়িতে পৌঁছতে রাত হয়েছিল। সেখানে গিয়ে জানা গেল, পরদিন সকালে দার্শিলিঙের গাড়ি। সম্ভা হল রাত কাটাও কোথায় এবং খাওয়া নাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে।

প্রাটিকর্ষের উপরে এক ভরলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, বাজারের দিকে গেলে একটি ধাবারের সোকান আছে। অতএব সেই দিকেই রওনা হচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন ব্যাগ টেনে নিচ্ছে কেন, অস্থবিরে হবে। কোথায় রাখব ব্যাগ? বললেন, এই প্রাটিকর্ষে রেখে বাও, কেউ নেবে না। অবিশ্বাস করতে শিখিনি তখনো, তাই কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে ব্যাগ শিলিগুড়ির সেই দীর্ঘ প্রাটিকর্ষে রেখে রাত্রের অন্ধকারে ধাবারের সোকানের সন্ধানে বাজা করলাম দুই বালক।

সোকান পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেবানকার খাত দুখে স্পর্শ মাত্র ক'রেই কেসে সিতে হল, অনেক দিনের পাচা খাত। হতান মনে কিরে এলাম, ব্যাগটি সত্যিই কেউ ছোঁয়নি, যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি পড়ে ছিল। আমার 'পথে পথে' বইতে এই জন্মের উল্লেখ আছে, সেখানে এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছি—  
"শিলিগুড়িকে একত প্রাশংসা করছি না, কেন না শিলিগুড়ি ১৯১৩

সালে যে কত অবনত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে। সে সময় শ্রুত প্রাটিকর্ষ থেকে একটি গ্লাউট্রান ব্যাগ চুরি করার মতো লোক সেখানে ছিল না। চোর তো ছিলই না, এমন স্বপ্নেগ পেলে সাময়িক ভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও কেউ ছিল না।"

শ্রেনের লোকের পরামর্শ শুনে বাড়িটা 'দার্শিলিঙ তিমালয়ান' গাড়ির মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে নিলাম। এরকম অদ্ভুত খেলনা গাড়ি দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল। আমবা কোথায় যে ঠিক বাব তা জানি না; দার্শিলিঙে, না তার আগের কোনো শ্রেনে, কিছুই স্থির করিনি। কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শুভদ্রিলাম, গাড়ির মধ্যেই টিকিট পাওয়া যায় ট্রামের মতো। তাই টাইম টেবল দেখে তিনঘরীয়া তারপর কাসিয়ার এবং সেখান থেকে দার্শিলিঙের টিকিট কিনলাম। নামতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মাথাপাথে। বত উপরে উঠছি তত অদ্ভুত লাগতে, এবং দেখছি সবার গায়েই শীতের পোষাক। আমবা বুঝেই পাবি নি কেন এ সময়ে সবার গায়ে শীতের পোষাক। দার্শিলিঙে পৌঁছে অবশ্য বুঝেছিলাম। শীত খুব বেশি ছিল না দিনের বেলা, যে মাস। কিন্তু সবার মাঝখানে আমাদের পোষাক বোঝা লাগছিল। আমার গায়ে ঢেকর ছিটের গলাবন্ধ কোট, সঙ্গী গায়ে শাট। দার্শিলিঙে নামতেই এক যুবক কাছে এসে খুব ভরভাবে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি পুলিশের লোক বলে পরিচয় দিলেন। তিনি আমাদের পোষাক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, পালিয়ে এসেছ বাউ থেকে?

এ প্রশ্নের উত্তরে সোকা বললাম, না। কোথাও বাওরা বিবরে এ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তা জানতাম না। কাউকে বলে আসিনি ঠিক, কিন্তু আমার কাছে বলে আসা আর না বলে



"দার্শিলিঙে সবার মাঝখানে আমাদের পোষাক বোঝা লাগছিল।"

আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বাবা আমার কোনো কাজে কখনো বাধা দেন নি, এবং শুধু তাই নয়, আমি যা করেছি তাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই না বলে এসেছি বললেও তা পালিয়ে আসার সমান ভটিলতা সৃষ্টি করত। পুলিশ-অফিসারের উদ্দেশ্য কিছু খারাপ ছিল না। তাঁর কাছেই সুনাম কোমো হোটেল বা স্তানারটোরিয়ায় একটি সীট খালি নেই এবং সেজন্য তিনিই আমাদের থাকবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পাবনার লোক শুনে পাবনার এক ভজ্জলোক, নাম অরুণাগোবিন্দ সাজ্জাল, তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সবকারী অফিসের কেরানি, আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করলেন। দু'টো গুলিরকোট সংগ্রহ ক'রে দিলেন। ঝাওয়া তাঁদের মেসে চলত, শোবার ব্যবস্থা হল আরও সুন্দর। পরিচয় হতে হতে রতনদিয়ার অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক শরীকের পুত্র নাম শৈলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (পাণ্ডি নামে পরিচিত) এগিয়ে এলেন রতনদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে শুনে। তিনি তখন একটা বড় বাড়িতে থাকতেন, বাড়িটি খালি ছিল। সেইখানে রাত্রিবাস ঘটতে লাগল।

পুলিস-অফিসার প্রতিদিন খোঁজ নিতে আসতেন এবং প্রতিদিন

আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিজে পাঠ করতেন। আমি আসবার সময় শিলিগুড়ি থেকে আগেই বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।

দার্জিলিংয়ের সমস্ত সুন্দর লাগল। এ রকম উদ্ভাসকর্য সৌন্দর্য আর আমি দেখিনি। দার্জিলিংয়ের দৃশ্যবৈচিত্র্য, শত রকমের অভিন্নবৎ আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। যা ছিল এত দিনের কল্পনা, বার ভক্ত অন্তরে অন্তরে আমি এমন টান অনুভব করেছি, তা যে এমন আশ্চর্য সুন্দর, তা যে ভাবার অনেক উর্ধ্বে একটি অর্ধচৈতন্য সত্তার শুধু স্পন্দনময় একটি আনন্দ-আবেগ, তা আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি ইতিপূর্বে ভাবপ্রবণ হরেন্দ্রকুমারের সীতা নাটক দেখার পরিণাম বর্ণনা করেছি। চিন্তা করতে গিয়ে দেখি, দার্জিলিং দেখে আমিও ঠিক ঐ রকমই অভিভূত হয়েছিলাম। দুটি পৃথক জিনিস, কিন্তু অল্পভূতির গভীরতা সম্ভবত দু'দিকেই সমান।

একটি সম্ভ্রান্ত বলিষ্ঠ সৌন্দর্যের স্পর্শ যে একটি ভাবপ্রবণ বালকমনকে এমন ভাবে ভেঙে-চূরে দার্জিলিংয়ের কুয়াসার শুঁড়ে ওঁড়ে গুলনার মতো চরমিক ছড়িয়ে দিতে পারে, তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিজেকে শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, এ কি দেখলাম!

[ ক্রমশঃ ]

## ইনেকশন

### ত্রীভুবার নিয়োগী

প্রকৃতি চলে আগত ইনেকশন,

তখন-এ-সাইদ শুক হবে ভাগ্যভাগি,

আবার নতুন বাগানো কুক্কর,

শোনা বার ওই আকাশ-বাতাসে ভূখা গুপ্তের ডাক।

আজকের রণে হয়ত' শান্তি, নয়ত' হুর্বাধন

বৈঠে থাকবেই, এ দু'য়ের এক পাঁচ বছরের জন্মে,

শোবন, শাসনে হয়ত' জোয়ার আসবে নতুন কোয়ে,

নয়ত' মাদুর মদুরাধ ফিরে পাবে এইবার।

মসনন নিয়ে কাঁড়াকাড়ি হবে পার্শ্ব-জয়ন্তে,

চুই বোদ্ধার বকে আজকে সন্তাননার দোলা,

তর্পণ হবে একের বসন্তে, অস্ত্রে তিলক প'রে

সিঁতাসনন ওপরে বসবে জ্বাঘের লগু হাত।

ডাক দেয় আজ তাই সেনার পার্শ্ব-সাবধি রেহে

ক্রকট-কুটিল নেত্র ডাকছে হুর্বাধনের সেনা,

তাই ভাবি আজ কাহার হস্তে মানাবে ও কায়কণ্ঠ,

তাই ভাবি আজ কার কাছে হাব দু' দিকে দু' ক্রুর ডাকে।

কুব কুকুর ছলনার স্নেহে ক-মস্ত্রনার ধারা,

হুর্বাধনের শিবায়-শিবায় কুটিল জোয়ার চলে,

তাই আজ ভাবি কারে সাড়া দেব দু'জনে উল্লবকী,

দু'জনায় হাতে উত্তত আজ মারণ-অস্ত্র দেখি।

বেই পাক আজ মসনন ভাই, আমি যে ছোট সেনা,

হয়ত' মিলবে সৌহর্য, ভূখা পেটে মিলবে না,

দু' মূঠা অন্ন সুখে খেতে তাই, কুক, হুর্বাধন,

আমি যব দু'বে, কক্ক না তারা আগামী নির্বাচন।



# পঞ্চ

[ গিরীশমোহিনী দাসী রচিত 'ভৈরবী হিন্দু মন্দির' পত্রিকা ]  
হটতে ত্রিপুর প্রসঙ্গ বঙ্গোপাখ্যারের সৌভাগ্যে ]

পরমপূজ্য প্রণয়নবিজ্ঞ প্রাণবল্লভ  
শ্রীযুক্ত... স্বাধীনপরিপালকে

প্রাণেশ্বর !

অত তিন দিবস হইল আপনার বদন শশধর অঙ্গশরনে এ অবলার  
স্বপ্ন গগন যোগ চিত্তা-স্তিমিরাবৃত্ত রহিয়াছে। মঙ্গল সমাচার দানে  
চিত্তা-স্তিমির দূরীকৃত করিবেন।

প্রিয়তম ! তিন দিবস আপনার কোন সমাচার না পাওয়া  
কাননদম। কুরঙ্গিনীর হ্রাস আছি ; কাহাকেও ভিজ্ঞাসা করিতে  
পারি না এবং আপনার নিকট অধিক লোক থাকে এতন্ত  
পরিচা-বিকাশে আপনারা কিছু ভিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তবে  
আমি আর কি প্রকারে সমাচার পাঠিতে পারি ? এতন্ত আমাকে  
নিষ্ঠুরা বিবেচনা করিবেন না।

গত ত্রিভুজনা ওহে গুণমণি,  
না পেয়ে তব সংবাদ।

হায় মোর মন, ভাবে সর্বক্ষণ  
ঘটিল এ কি প্রেমার।

হয়ে কুলনারী সুরমেতে মরি  
ভিজ্ঞাসিতে নারি কারে।

ওহে প্রাণপতি ! তবে কিসে সতী  
সমাচার পেতে পারি।

বালা ইউক ভাই এই ভিক্ষা চাই  
ঈশ্বর সদনে আমি।

থাক বেইখানে রেখ মোরে মনে,  
কুশলে থাকহ তুমি।

কলিকাতা  
বহুবাজার  
১৫ই কার্তিক ১২১৭  
তদনুপাত  
শ্রীমতী...

[ শ্রীযুক্ত দক্ষিণায়জন মিত্রমজুমদারের রত্নোপভাস ঠাকুরদাদার কুলি  
পড়িয়া লেখকের নিকট ৩৭বীজনাখের পত্র ]

১নং পত্র  
ও

শিলাইদহ, নদীয়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পুণ্যমালা পড়িবার সময়ে তোমার বসামত  
হাতে একটা পেন্সিল লইয়া বসিয়াছিলাম—কিন্তু তোমার লেখার  
গায়ে কোথাও একটা আঁড় পড়িল না। এ জিনিস বিশেষ উপাস্যের  
হইয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যে বিশেষ

রসে তোমার এই কাহিনীগুণিতে মধুরভাবে বসিত হওয়াতে এইগুলি  
বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে। ইতি

১৪ই চৈত্র  
১০১৪

তদানুযায়ী  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২নং পত্র  
ও

শিলাইদহ, নদীয়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার উপহার গ্রন্থ পাঠিয়া বিশেষ আনন্দলাভ  
করিলাম। বাংলার এই কুলি (ঠাকুরদাদার কুলি) এবার চিত্রে এক  
রসে খুব করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছ—তোমার এই রসের কুলি অক্ষর  
হোক। আমার শরীর ভাল নাই। তবে পড়িয়াছিলাম—এখনও  
সুস্থ হইয়া উঠিতে পারি নাই।—অতএব তোমাকে আশীর্বাদ  
জানাইয়া আজ এইখানেই বিশ্রাম লাভ করিতে চাই।

কার্তিকের শেষে অথবা অগ্রহাটের আরম্ভে কলিকাতায় বাইব,  
তখন দেখা হইবে। ইতি

২রা কার্তিক  
১০১৫

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা' উপভাস পড়িয়া লেখকের  
নিকট ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র ]

স্নেহের গজেন্দ্র বাবু,

পত্র আপনার 'রাত্রির তপস্যা' পেয়েছি। বইখানা পেয়েই  
পড়ে ফেলেছি। এরকম একখানি উচ্চ শ্রেণীর উপভাস কিছু  
দিনের মধ্যে পড়েছি বলে মনে হয় না। যে সব নামজাদা  
লেখকদের বই ছেপে আপনারা গুরু করেন ও তাঁদের জয়ন্তী  
করেন, তাঁদের অনেকের চেয়ে আপনার বইখানা ভাল হয়েছে।  
আধুনিক উপভাস প্রেমের ছেঁদো গল্প আর কমিউনিজমের নানা  
উদ্ভেজনার গল্প পড়ে 'পড়ে' প্রায় হয়রাণ হয়ে গিয়েছি।  
আপনার ভাষা একেবারে নতুন প্রোভের মত হলেও স্বচ্ছ  
সাবলীল। কোথাও কোন জড়তা নেই, বা প্রকাশের দৈর্ঘ্য নেই।  
কোনও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিশেষ জটিলতা নেই, অথচ নানা দিকের  
নানা ছবি বেশ সুন্দর হয়ে ফুটেছে। কচির গুণিতা ও ভাবের পবিত্রত  
বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এরকম একখানা বই বাংলা  
সাহিত্যে বিরল, অতি বিরল বললেও দোষ হবে না। আপনারা  
বইটার সঙ্গে আমার 'অধ্যাপক' বইটার একটা জড়িতগত এক্সা আছে  
তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। মূল সমস্যা এক জাতীয় ; তবে  
আপনি যে স্তরের ছবি দিতে চেষ্টা করেছেন, আমি তার উপরের স্তরে  
হাত দিয়েছিলাম। তাই আমার আলোচনা একটু ভারী হয়েছে  
আপনার আলোচনার সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় অনেক বেশী, তা  
সেগুলি জনসাধারণের পক্ষে বেশী হস্ত ও অসুবিধাবোধ্য হয়েছে। তা  
আলোচনা আপনিও কিছু কম করেননি। শব্দ বাক্যের গজের ম

নিম্ন গল্পের কথা দিয়ে ছবি ফোটানোর চেষ্টা আপনি করেননি।  
বরীজনাথের মত চিন্তের বাস্তবপ্রতিষ্ঠাতা দেখাবার দিকও আপনার  
নয়। আপনি যে সব সমস্যার কথা তুলেছেন সেগুলি এমন সমস্যা  
যার উত্তর দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণেরও সাধ্যাতীত হ'ত। আমি যে  
সমস্যার কথা তুলেছিলাম সেটা অতি উচ্চ স্তরের, অতি ক্ষুদ্র  
সমস্যারের লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তাই তার হয়ত একটা  
মীমাংসা হ'তে পারে। কিন্তু বিরাট জ্ঞানসাধারণের যে শিক্ষার  
সমস্যা রয়েছে তার সমাধান যে আমাদের দেশেই কেবল  
হুঃসাধ্য তা নয়, এদেশেও শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় তেমনই হুঃসাধ্য  
হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে বোলপুর, হরিবার, সবরমতী  
প্রভৃতি নানা স্থানে বা ২। ১টা চেষ্টা হয়েছে সবই ব্যর্থ হয়েছে।  
'সন্ধ্যার' চেষ্টাও যে ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।  
এ সম্বন্ধে আমার এত কথা বলবার আছে যে তা লিখতে  
গেলে একটা পুঁথি হয়ে যায়। 'সন্ধ্যার' চরিত্রটি ভাল একেছেন।  
স্ট্রীচারিয়ার অতি মহত্ব ও অতি দীনতা এ উভয়ই আমার  
জীবনে আমি দেখেছি। কেউ মেয়েদের চরিত্র তটি ও বিপুল  
করে আঁকলে আমার বড় ভাল লাগে। মেয়েদের জীবনটা  
সমস্যারের প্রবল বাস্তবপ্রতিষ্ঠাতার একটু আড়ালে। সেজন্য  
এখনও তাদের জীবনেই উন্নত আদর্শের উপাদান অনেক বেশী  
পরিমাণে পাওয়া যায়, যদিও স্নিহতার ও জঘন্যতার অনেক মেয়েই  
অনেক পুরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। পুরুষের পৌত্তল্য বুদ্ধি অনেক  
সময়ে তাকে অভিমান দৃষ্ট করে তোলে। যেটাকে পৌত্তল্য বা বীর্য  
বলে মনে করে, সেটা হয়ত অনেক সময় অভিমান ও মিথ্যা গর্ভ এবং  
এই গর্ভই আপনার ভূপেনের জীবনে ট্রাজেডি ঘটিয়ে তুলেছিল।  
আপনার গল্পের মধ্যে যে পরিস্থিতিগুলির সংগঠন করে তুলেছিলেন,  
সেগুলি বেশ ভালই হয়েছে। পরিস্থিতির দ্বারা যে ট্রাজেডি ঘটে  
তার দুলে থাকে চরিত্রের দৃষ্ট, সে জটিল তা বাস্তবিক এবং  
অপরিহার্য। আর বেশী কথা বলব না। আপনার গল্পটি পড়ে  
জানি খুশী হয়েছে। ইতি—

আশীর্বাদক

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

[ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প পড়িয়া লেখকের নিকট

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ বসুর পত্র ]

ঐতিহাসিকভাবে,

আপনার ১৪ জুনের পত্র বাকালে পেয়েছি, 'শ্রেষ্ঠ গল্প'ও তার  
আসে পৌঁছেছে। • • •

আপনার গল্প আমার ভাল লাগে। লেখা সরল, যুগ্মসংবহন,  
যে সমাজকে জানি তারই কথা, এবং পাত্র-পাত্রীর বাক্য ও আচরণে  
কৃত্রিম শ্যাঁচ নেই। গল্প পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন বা  
নিত্যনৈমিত্তিক চিন্তা থেকে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতি। যে গল্পের উদ্দেশ্য  
মত প্রচার বা কৃত্রিম সমস্যার উদ্ভাবন, তা text book এর মতন  
হুঃসাধ্য। অবস্থা বিশেষে তা ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সর্বদা  
নয়। আপনার রচনা সর্ববিস্ময় গতোহপি বা' আদ্যম পড়া যায়।  
ঐশ্বর্য ভাষাশব্দর বাবু ভূমিকার বা সিগেছেন, আমারও সেই মত।  
'কথাসাহিত্য' মাকে মাকে পড়েছি। ছোট হলেও নতুন রসম।  
আশা করি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আমার লেখার প্রযুক্তি  
যেন যেন করছি,

কিন্তু লিখতে আগ্রহ আছে, মাছুসী নমস্কার-আশীর্বাদের মতন  
কৃত্রিম হয়ে পড়বে। কিছু মনে করবেন না। আপনার

বালেশ্বরের বসু

[ 'মহাপ্রবাহনের পথে' পড়িয়া প্রবোধকুমার সাঙ্গালকে  
লিখিত নেতাজী স্তবাবলম্ব বসুর পত্র ]

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'মহাপ্রবাহনের পথে' পড়িলাম।—আপনি যে তীর্থ-  
ভ্রমণের একটা বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহার ফলেই বোধ হয়  
আপনার ভ্রমণকাহিনী রস-সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। মাছুষের  
মন একটা বিচিত্র জিনিস—কলিকাতার অঙ্গগলিতে অথবা তুয়াং-  
বল বরীজনাথের উপর মাছুষের অন্তর-প্রেক্ষিত সহজে বলবার না  
এবং চিত্তগত না ঘটলে তীর্থযাত্রার কাণ্ডিক রেশের কোন আধ্যাত্মিক  
মূল্য নাই। এসব কথা আপনার বইয়ের মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।  
আপনার পুস্তক তীর্থযাত্রাকামীদের হাতে পড়িলে তাহাদের মন  
হইবে।

"রাধারাগী"র জন্য আমার বাস্তবিক কষ্ট হইয়াছে এবং আপনার  
উপর রাগ হইয়াছে—আপনার স্বয়ংসিদ্ধতার জন্য—যদিও আপনি  
বলিতে পারেন যে, হঠাৎ ঐ অবস্থার পড়িলে আমিও ঐরূপ আচরণ  
করিতাম। হঠাৎ ঐ অবস্থার পড়িলে আমি কি করিতাম, সে  
অনুমান এখন করিয়া লাভ নাই। তবে একথা আমি বলিতে পারি  
যে, আমার মতে আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার ত্রী-জাতির  
উপর যোর অন্তর্য ও অবিচার করা হয় এবং তথাকথিত শিক্ষিত  
ভ্রাতৃলোক আমরা, তাহা দেখিয়াও দেখি না।

"রাগী"র যে চিত্র আপনি আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন স্বকর,  
তেমনই স্বয়ংসিদ্ধ হইয়াছে। অন্ত্যস্ত পাঠকের মত, আমারও রাগীর  
সম্বন্ধে আরও জানিতে ইচ্ছা হয়—বখন পুস্তকটা শেষ করি। পাঠক  
যদি অতৃপ্তি এবং ভিজ্ঞান-ভাবের মধ্যে পুস্তক শেষ করেন, তাহা  
হইলেই বৃষ্টি হইবে যে, লেখকের স্মৃতি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

বাং স্তবাবলম্ব বসু

[ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে

বরীজনাথের ভূমিকা-লিপি ]

'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটা অন্ত্যস্ত দেশি, কিন্তু কাছের  
জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকী থাকে, যেখানে আভ্যন্তরাল  
আছি সেখানেও সব মাছুষের সব জায়গার প্রবেশ ঘটে  
না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়ারীয়েই কথা, সেও অজানা  
বাস্তব নতুন করে দেখতে হয়, লেখার গুণ এই যে, নতুন  
জিনিস আপসা হয়নি, মনে হয় খুব বাটী, উঁচু সরের কথা  
মন তোলাবার জন্যে সজা সরের রাডতার সাজ পরাবার চেষ্টা  
নেই, বইখানা কাড়িয়ে আছে আপনি সত্যের কোবে, এই  
বইখানিতে পেরেছি বার্থা গল্পের বাস, এর থেকে শিক্ষা  
হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক, বা পূর্বে এমন করে  
লেখিনি, এই গল্পে পাছপালা পথঘাট ঘেরপুকুর প্রবাহ সমস্তকে  
আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে  
প্রেক্ষিত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস  
পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে হুঃসাধ্য।  
১৩৪০। বরীজনাথ।



# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২১

আন্তারিয়া হোটেলের এক একটা পুরো ঘর দখল করে প্রতি জনে বাগদান করছি। উঁহ, মাখানটা দেয়াল-ঘেরা না হলেও ঘর দুটো বলতে হবে। একটার শোওয়া, অপরটা দামী আসবাবপত্র সাজানো বৈঠকখানা। আট-দশটা বন্ধু নিয়ে আরামসে বৈঠকখানায়-ওঠাবসা করতে পারেন। হারের কপাল, একলা আমাকেই এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে দেয় না, তার আবার বন্ধুবান্ধব সহ গুলতানি! খাটের উপর সওয়া হাত উঁচু গদি—সে এমন বন্ধ, বপুখানি তছপরি নিষ্কেশ মাঝেই গমিতে বিলীন হয়ে যায়। হৃপুয়ের ভোজন শেষে এই 'হাডু-কাপানো' সীতে হু-দণ্ড যে সেখানে গড়াগড়ি করব, কিছুতে তা হতে দেবে না হস্তভাগ্য। ঠাসা প্রোগ্রাম।

সেকলে বন্ধ অজ্ঞান আমায়—সকাল সকাল উঠি। পাঁচটায় উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে জ্ঞানজার পদা সবিয়েছি—আরে সর্বনাশ, সেনিনগ্রাডে রাত হুপুও বে এখন! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। শেষটা আর পেয়ে উঠিলে, পোনে-ছটায় উঠে মরায় হয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। প্রাণের সাড়া নেই কোন দিকে কোথাও। ভিজে রাস্তা—বুড়ি হয়ে গেছে রাস্তা, অথবা কুয়াশা থেকে জল জমেছে। রাস্তার সারবন্ধি উজ্জ্বল আলো অবাক হয়ে তাকান্ধে, কোন নিশাচর হে, হুঁটার সময় উঠে টেবিলে কাজ করে!

সাতটা হল, আটটা হল। রাত পোহাবার লক্ষ্য নেই। ভয় ধরে যাচ্ছে এবার, বিধাতার রবিস্বস্তি বিগড়ে গেল না কি? ন'টা বাজলে তখন দেখি, ভোরের আলো ফুট-ফুট করছে। লোক চলাচল হচ্ছে হু-পাচটি; ট্রলি-বাস ও মোটরবাস চলছে। পার্কের মাখান দিয়ে মাহুদ আড়াআড়ি পথ ভাঙছে। কিন্তু জমে ওঠেনি এখনো। নিতান্ত যাদের কাজের গরজ, তারাই বেরিয়েছে; গোটা শহর জাগতে দেবি আছে। তবু এ পুরো সীতকাল নয়, সবে অক্টোবরের তেসরা।

গ্রীষ্মের সময় আবার ঠিক উঠে। শ্বিনমান কিছুতে নড়তে চায় না। আলো-ভরা রাত দশটায় দলবল সহ টহল দিয়ে বেড়াবেন। 'সাগা রাত' ওরা নাম দিয়েছে।

—এই প্যাচপেচে বুড়ি-বালসা বরক-কুয়াশা, এমন বেশে থাক কি করে বলা তো? এক বেলাতেই আমরা যে গিগিয়ে উঠি!

—চড়চড়ে বোদ আশুন-ভরা হাওয়া এমন দেশে থাক কি করে তোমরা? আমরা তো একটা বেলোও টিকতে পারব না সেখানে।

হাতিমেট্র—এলাচি বাপার, রাশিয়ার সব চেয়ে বড় মিউজিয়াম। লণ্ডনের বৃটিশ-মিউজিয়াম ও প্যারিস লুভরে—তারাই সমকক্ষ। নেভার কুল বিশাল প্রাসাদাবলী—আগে বলত উইটাই-প্যালেস, সীডপ্রাসাদ। আঠারো শতকের দামামারি তৈরি (১৭৫৪-১৭৬২)।

এখনকার নাম হয়েছে প্যালেস অব আর্ট, শিল্পপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের লাগোয়া আরও সব প্রাসাদ গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। হারমিট্রজ এইখানে। এক হল থেকে আর এক হলে যাচ্ছি—নেভা চোখের সামনে আসছে বারখার। আর এক পাশে খাল—নেভা থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে শহরের মধ্যে হারিয়ে গেছে। খাসা ভায়গা। একতলা দোতলা তিনতলা জুড়ে হলের পরে হল আর গ্যালারি। গুলতিতে তিন শ'। হলগুলো ভূঁয়ে নামিয়ে যদি পাশাপাশি বসানো যায়, হিসাব করে দেখা চায়েছে, লম্বার আড়াই মাইল যাবে। সোনালা কাজকর্ম। খামগুলো পুরো এক এক পাখর কেটে তৈরি। নগ্ন নারী ও পুরুষ মূর্তি—সেকালের বনেদি ধাঁচের গৃহ-সজ্জা। ঘরে ঘরে শিল্পবস্ত্র ভরতি—মোটামুটি দুই মিলিয়ন গুলতিতে।

প্রথম পিটারের স্বর্ণখচিত গাড়ি। অতিকায় আলো। রাজকীয় সমারোহের নানা ছবি। সম্রাটের বিশাল ছবি। ফরাসী, ইতালীয়, ডাচ ও স্প্যানিশ ছবি। আঠারো শতকের কলীয় সংস্কৃতির নমুনা।

বিপুলায়ন এক একটা ঘর শেষ করে করিডরে এসে পড়বেন। অপরিপ সাজানো। নেভা বিকমিক করছে ঐ। বসে একটু বিশ্রাম নিন, থকল তো কম নয়।

রকমারি ঘড়ি—নানা যুগের, নানা প্যাটানের। গাছের ডালে মণিমাণিক্যের ময়ূর—ময়ূর কেমন শেখম সোনার ঐ দেখুন। মোজেরিকে বানানো ছবি—ছোট-বড় বিভিন্ন।

দোতলায় বাগান। ছাত্তর উপর সাত ফুট মাটি কেলে তার উপর রকমারি কুল ও কল লাগিয়েছে, ফোড়ানয় জল বরছে। নেভা নদী দেখুন কাঁড়িরে কাঁড়িরে এই স্বপ্নময় পরিবেশে।

সবুজ পাখরের বৃহৎ সেকলে পাত্র। এই পাখর উরল পর্বত থেকে নিয়ে এসেছে। তের-চোদ্দ শতকের ইতালীয় শিল্পকর, আসবাবপত্র, অগ্নি-আধার, বাজ, দরজা। ফ্রোয়েদের কাজ। চিনামাটির হরেক মূর্তি। বাইবেলের নানা ঘটনায় ছবি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা রীতুর অনেক ছবি, রীতুর সূত্রায় পর শোকনৃত্য। লিওনার্ডো দা-ভিক্কির মূল ছবি দু'খানা। ভাটিকানের বাবতীর ছবির নকল—কাপড়ে আঁকা। রামায়ণের ছবির নকল। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়-কাথারিন এই সমস্ত আঁকিয়েছিলেন। বাকারেলের মূল ছবি—বোসেক মেরী ও ছেলে, ডলফিন ও ঘুমন্ত ছেলে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি। টিসিরানের ছবি—জীবন্ত, বেন কথা বলছে...

ভাগো ছবিগুলো সবিয়ে নেওরা হয়েছিল লড়াইয়ের সময়। নয়তো কিছুই থাকত না। উপরটা কাচে ঢাকা, ছবির উপর যাতে ঠিক মতো আলো এসে পড়ে। বোমা পড়ে উপরের কাচ চূষমার হয়ে আশুন ঘরে গিয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়েছে, বৃহত্তর পারবেন না এখন।

এখানের শিল্পীদের গড়া মূর্তি ও ছবি। পাখর হুঁদে কী সব অপূর্ণ মূর্তি বের করেছে! সত্তের শতকের ক্রেমিশ শিল্প।

ভান-ডাইকের আঁকা ছবি, ভানডাইকের নিজের ছবি। রোঁদার ছবি। একটা ছবি—মুহূর্ত্ত বন্দী বাপকে মেয়ে বৃকের হৃৎ খাওয়াচ্ছে। কী মনোরম!

রেনোয়াটের পুরো একটা ঘর। তাঁর দ্বীপ ছবি। বীণার দেহ ক্রম থেকে ক্রম হচ্ছে। ম্যাডোনা। শিশু বীণা আবার ক্রম হচ্ছে। বাইবেলের সেই ছবি—বেথসাবি ছেলে ফিরে আসছে। রেনোয়ার আঁকা ছবি। একটা ছবি সামনে দিয়ে দেখলে একেবারে খাপসা—কুয়াসার আচ্ছন্ন। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে তাকালে কুয়াসার আড়াল থেকে সেতু দেখা দেবে। সকল দেশের ছবি আছে, কলীয় ছবি নেই—যে আছে পৃথক মিউজিয়ামে। ছবির অন্ত নেই—যত নাম-করা জিনিষ জড়ো করেছে। মূল-ছবি না মিলল তো চৌকোচিত্র করে নকল নিয়ে এসেছে।

নাট্যীদের বর্ষ। একটার ওজন পঞ্চাশ পাউণ্ড—এই বস্তু গায়ে চড়িয়ে লড়াই করত। চারি ও নাগরিকরা বিভিন্ন যুগে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার অনেকগুলো কঙ্কণের খোলায় টেবিল। রুমার বকমারি মতপাত্র। সিংহর উপর সোনার তারে গাঁথা ছবি। ভলন্তেরায়ের মূর্ত্তি—অবিকল বাঙালি টুলো পণ্ডিতের মতো।

ভারতের শিল্পকর্ম একটা ঘরে। নানা রকমের কাপড়। আঠার শতকের অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তার সঙ্গ্রহ। এক বৃটিশ-মিউজিয়াম ছাড়া এ-সব অস্ত্র কোথাও নেই।

রুমার কাজকর্ম-করা কক্ষিন এক সেনাপতির মূর্ত্তিতে। তিন হাজার পাউণ্ড রূপা লেগেছে। অষ্টাদশ শতকের ছাপাখানা। দরবার-ঘর—প্রথম-পিতারের সিংহাসন। পুরানো পতাকা, সে আমলের সৈন্যদের পোশাক। অভ্যর্থনা-ঘর—এই-ঘরে শুধুমাত্র জার বসবেন, আর কেউ বসতে পারে না। হাত আর মেজ্ঞে অবিকল এক রঙের। পাখরের টুকরোর এক ম্যাপ বানিয়েছে এই সেদিন—১৯৩৭। আছে। নানা রঙের পরিতালিশ হাজার টুকরা পাখর লাগল।

মণি-মণিকোর ঘর। তিন হাজার বছর আগেকার গয়না ককেশাস অঞ্চল কবর খুঁড়ে পাওয়া। সোনার বহা হরিণ ও ঘোড়া—একটা নদীর পাড় ভাঙছিল, সেইখানে পেরেছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রাচীন অনেক গয়না—ক্রিমিয়ার পাওয়া গেছে। হীরা-বাথানো ছড়ি, আট।

কল জাতটা ঘরেই থিয়েটার-পাগলা। মস্কো শহরে চুয়ান্দিশটা থিয়েটার। শহর বত ছোটই হোক, থিয়েটার ছোটো চারটে থাকবেই। যে জায়গার বাচ্ছি, নিত্যন্ত সময়ের অকুলান না পড়লে থিয়েটার-হল এক নজর দেখিয়েই দেবে।

এই দেশেই লেবেসিয়েভ (পেরাসিম স্ত্রোপানোভি লেবেসিয়েভ) বাংলা থিয়েটার করছেন কলকাতার গিরে। সে কি আজকের কথা—সেক্ষণ বহুরের উপর হয়ে গেছে। ২৭ নবেম্বর, ১৯২৫। তারিখটা সোনার অক্ষরে গিথে রেখে দিন। তার আগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি। অন্তত পক্ষে পুঁথিপত্র কোন রকম নিশানা পাইনে।

লেবেসিয়েভ বিস্তার কষ্ট করে বাংলা শিখলেন। বাংলা ভাষার মতন একটা ব্যাকরণই গিথে ফেললেন—বাংলা শিখতে তাঁর মতন এত কষ্ট আর কারো বেন করতে না হয়। লণ্ডন শহরে যে কল-রাষ্ট্রত ছিল, তার কাছে চিঠি লিখছেন: অনেক বয়ে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিছু কিছু শিখেছি। আমার এই সাধনার কল

বদেশে প্রচার করতে চাই। হিংস্রটে ইংরেজ কিছুতে তা হতে দেবে না। যেমন করে পার, আমার দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত করে দাও।

ইংরেজের রাজত্ব—রাশিয়ার সঙ্গে রাজনীতিক সামাজিক কোন রকম সম্পর্ক নেই। তবু ভালবেসে শিখে মিলেন তিনি বাংলা ভাষা। নাটকের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আবৃত্তি করতেন সুবলয় যোগে। কল ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানশব্দের তত্ত্ব মা করলেন। ইউরোপীয় ভাষায় বাংলা বইয়ের সেই সর্বপ্রথম তত্ত্ব মা। বাংলা অভিধান ও কথোপকথনের বই, বীজগণিত এবং বাংলা পঞ্জিকার কিছু কিছু তত্ত্ব মা হল। সংস্কৃত, বাংলা ও মিশ্র হিন্দির স্বভাবিতাবলীও অনেক তিনি সংগ্রহ করলেন।

যে বাংলা নাটক অভিনয় হয় সেটা ডিসগাইজ (Disguise) নামক ইংরেজি কমেডির তত্ত্ব মা। লেবেসিয়েভ নিজে তত্ত্ব মা করেন। দুই রাত্রি অভিনয় হল—চারশ' লোকের মতন জায়গা, সেখানে তিলধারনের ঠাঁই নেই, বাঙালি অভিনেতা দিয়ে অভিনয় হল; পালার মধ্যে একটি ইংরেজি কথা থাকতে দেওয়া হয়নি।

এই দেখুন, থিয়েটারের কথায় কথায় কতদূর এসে পড়লাম। আজ বিকালে নিয়ে চলেছে কিন্তু থিয়েটার-হলে নয়, বীরা সব একটা থিয়েটার করছেন তাঁদের বাড়িতে।

জায়গার ইংরেজি নাম—হাউস ফর ভোয়ান্দি থিয়েট্রিক্যাল আর্টিস্টস্। কড়া বাংলায় ব্যাখ্যা করলে পাঁজাচ্ছে—অবসরপ্রাপ্ত নাট্যাশ্রমীদের আশ্রয়স্থান। নেভার পুল পার হলাম। তারপর খালের পর খাল পার হয়ে শহরতলী মুখো বাচ্ছি। পাল ধারে বিস্তার কাঠের গোলা। কলকাতার নিমন্তলা অঞ্চলে যেমন দেখতে পান। কাঠ সাজিয়ে পাহাড় বানিয়েছে। খালের জলে গাছের গুঁড়ি ভাসছে বিস্তার—কল থেকে, এখানে ডাঙার তোলা হয় নি। অনেক দূরের জল থেকে গাছ কেটে নদী-খালে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

বিস্তার আলিগলি ঘুরে পুনশ্চ এক খাল পেরে গোলাম। খালের পাশে পাশে চলছি। হুবহু আজ ঘুর দেখান নি, টিপটিপে বৃষ্টি দিন ভর চলছে। হঠাৎ ঢেপে এসে বৃষ্টিটা—মুহূর্ত্তবে চলেছে। তারই মধ্যে সেই খাল ধারে আমাদের গাড়িগুলো থেমে পড়াল। জন কয়েক বুড়ো থুপুড়ে মাছুব—তার মধ্যে মহিলাও আছেন—অবিরল ধারার মধ্যে রাস্তার পাঁড়রে ভিজছেন। গাড়ি-খামতে অদূরের বাড়ি থেকে আরও বিস্তার বেরিয়ে এলেন। হাত ধরে ধরে পরম সমাগতে সকলকে নামাচ্ছেন—স্বত্ববাবু নতুন জামাইরা এসেছেন ঘর।

গোতলার হল-ঘরে নিয়ে বসাল। ওখানকার বত বাসিন্দা কারো আসতে আর বাকি নেই। সবাই বুড়োবুড়ি পলিত কেশ সকলের। ঘর বোঝাই সোফা-চেয়ার—তবু কম পড়ি বাচ্ছে। আমরা ওঁরা ছুতরকের গুণগিত অনেক। তা দেখলাম, বুড়ো হলে কি হবে—পায়ে দস্তরমতো তাগত আছে, এবং ওঁদের ছুটোছুটি করে সবাই চেয়ার টেনে নিয়ে আসছেন। খুনখুন এক বুড়ো আবদুল কাঠের যে গন্ধমান অবলীলা ক্রমে মাথার ঘরে নিয়ে এলেন—হলপ করে বলছি, মুখে বলিয়েখা। কোটের ভিতরের কোথ, শনের মতন চুল—সমস্ত ছদ্মবেশ ওঁদের। থিয়েটারে যে কায়দার পঁচিশ বছরের ছেঁড়া পঁচিশ বছরের বুড়ো সেকে আসেন।

জমিয়ে তো বলা গেল। শুনিছি এখানকার ব্যাপার। থিয়েটারের তিন গোত্র—অপেরা, বায়ো ও ড্রামা। তারই কোঁস

এক পোত্রেব মানুষ হওয়া চাই, তবে এখানে ঠাই মিলবে। এবং হবেন বুড়োমানুষ—যেয়ে চলে নেহাৎ পক্ষে পঞ্চাশ, পুঙ্খ হলে পঞ্চাশ। তার আগে টোকবার এক্টিয়ার নেই। আমাদের দেশে নাক সিঁটকান—এ লোকটা খিয়েটার কবত এক সময়, আজকে তার অবস্থা দেখ। এ দেশে ঠিক টোটো বেওয়া—তাদের এক রকম মাথার তুলে নাচার। আজ, আমাদের কত সন্ধ্যা অনিশ্চয় ভরে নিয়েছে। কত রসের জোগানদার! আজকে বরষ হয়ে অশক্ত হয়ে পড়েছে বলেই কি তুলে যাব তোমাদের? জাত ধরেই কৃতজ্ঞ, সরকার মোটা পেচন দেয়। এ কিন্তু আজকের সাম্যবাদী রাশিয়া বলে নয়—কেনক আগে ভারের আমল থেকেই। যে হাউসে এসেছি, এর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ অব্দে। এই থেকে বৃত্তে পারছেন।

আজ্ঞায়তন তেমন যদি না থাকে, নাট্যশিল্পীরা এখানে এসে ওঠেন। ছেলেপুলের কামেলা না থাকলে অনেক স্বামী থাকেন স্ত্রীকে ফাটরকপ সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রীরাও তেমনই এসে ওঠেন নিম্ন নিম্ন স্বামী-পুটলি সহ। বেড়ে মজার হয়েছেন—সেকালের সেই খিয়েটারি জীবনের মতোই। পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিবারাত্রি বিজ্ঞান স্তম্ভ নিচ্ছেন, এমনত বিবেচনা করবেন না। কেউ কেউ আত্মজীবনী লিখছেন—এটো মোটা হিজিবিজি খাতা দেখিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে নানান খবর খিয়েটার-জগতের—বিশ্বের গুরুত্ব ও তত্ত্বকথা। চলতি খিয়েটারের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে কারো কারো—অভিনয় করেন না, নতুন আমলের অভিনেতাদের অভিনয় দেখান, বিবিধ উপদেশ ছাচ্ছেন প্রাপ্তি কিছুই নয়—বিনি মাইনে আপ-খোরাকি।

হাউস চালানোর সমস্ত রকম দায় এঁদের। সরকার শুধুমাত্র টাকা দিয়ে খালাস। অশন আর বসন হলোই হবে না—এতে মানুষ বাঁচে না, বিশেষ করে এই সব শিল্পীমানুষ। বিরাট লাইব্রেরি আছে, চুপচাপ পড়াশুনো করে বসে বসে। আছে রকমারি ব্যান্ড, সোরগোল করে যত খুশি বাজাও—অনেকখানি জায়গা নিয়ে কম্পাউণ্ড, পাড়ার লোকের তেড়ে এসে পড়বার আশঙ্কা নেই। দেয়াল ছবিতে ছবিতে ঠাসা। মেসের উপর এঁরা সব জমিয়ে বসেন—আর দেয়ালে এঁদের মাথার কাছে আগের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সুরকারেরা, আজকে বাঁরা জীবন্ত নেই।

পুরানো প্রতিষ্ঠান—মাগেই শুনিয়ে নিয়েছি। সৈবনা (Saibna) নামে এক অভিনেত্রী সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই আশ্রয় সন্দের পত্তন করেন। বুড়ো হলে নটনটীর আর কদর থাকে না, কষ্টে পড়ে যায়। বুড়োখুড়কে কে ঠেকের উপর দেখতে চায়? গলাও থাকে না তখন। তার জন্ত এক সমিতি গড়া হল—নটনটীর অধিকার-রক্ষা সমিতি। শিল্পীরা, বুড়ো বয়সে যাতে নিশ্চিন্ত আরায়ে থাকতে পারে, সেটাই হল সমিতির কাজ। এই কাজে জনসাধারণ হুত্বাতে টাকা দিলেন। বিপ্লবের পরে আর কোন কামেলা হইল না, কাজকে টাকা দিতে হয় না। ট্রেট সমস্ত ভার বইছে। ট্রেট বলতে পুলিশ-ঘেরা বিশেষ কয়েকটা অটালিকার ভন কয়েক ঝালু ব্যক্তি নয়—ট্রেট মানে জনসাধারণ। জনসাধারণ তাদের ট্রেটের মাঝফতে এই সন চালচ্ছে। চালাচ্ছে রাজস্ব প্রণালীতে। প্রতি লোকের জন্ত মাসিক ত্তোরা শ' থেকে চোদ্দ শ' কবল খরচ—আমাদের টাকায় পনের শ' বোল শ'ই মতন। বুনন এবারে। লেনিনগ্রাদের এই

হাউস এখন এক শ' পচাঁসের জন আছেন, তন্মধ্যে এক শ'র উপর মেয়ে। প্রায় প্রেমীলা-বান্ধা বানিয়ে ফেলেছে। তবে লোলচর্চা ছাড়া প্রেমীলারা—এটো বড় চোখে লাগে।

খিয়েটার-শিল্পীর আশ্রয় সন এই একটি মাত্র নয়, মস্তোভেও আছে। আর খিয়েটারের মানুষ বলে নয়—বুড়োমানুষের আশ্রয় সন সোবিয়েত দেশময় ছড়ানো। কতক আছে পেশা হিসাবে আলাদা করা—এই একটার যেমন এসেছি। আবার সাধারণ সনও বিশ্বের আছে—যে কোন বুড়োবুড়ি গিয়ে উঠতে পারেন। এতে কুলায় না—নতুন নতুন বিশ্বের সন দিনকে দিন বাড়ানো হচ্ছে।

সেকালের নাম-করা বালেনিনা নাম করা গায়ক কত ভনের সঙ্গে আলাপ হল। লাখ লাখ মানুষ একলা পাগল হত তাঁদের নামে। আজকে নির্জন অন্তরীণ অবসর—পার-প্রদীপের আলো জলে না, নামই জানে না নতুন কালের মানুষ যারা খিয়েটারে যায়। টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে সেকালের এক-কাধ কলি হঠাৎ গেরে ওঠেন কখনোমনে—দেয়ালে ছাঁতে একটুকু রংগত হয়ে মিলিয়ে যায়।

এক ভয়ালোক একেবারে নতুন এসেছেন। দস্তুরমতো সঙ্কল অবস্থা—এখানে আসবার মতন নয়, ছিলেনও এতদিন বাড়িতে। কিন্তু বিবন একঘেয়ে লাগছিল, টিকতে পারলেন না, সমস্ত ছেড়েছুড়ে দলের মাঝখানে চলে এসেছেন। বসলেন, দিনরাত স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি যেন মশায়। আমোদ-উৎসব বোজাই কিছু না কিছু আছে। মরার কথা আর মনে আসে না। কিন্তু আমার মতো লোককে কায়েমি হয়ে থাকতে দেবে না, দু-দশ দিন পরে বিদায় করে দেবে। ঐ একটা ভাবনায় বড় হুসড়ে আছি, ভক্ত কিছু মনে আসে না।

কত দূর থেকে গিয়েছি আমরা, কত কি দেখাবার আছে। তাই নিয়ে চুপ করছেন। বৃত্তি আর দিন পেলাে না, আজই চলে পড়েছে। আপনাদের এর মধ্যে কেমন করে বের করি বলুন তো?

তবু ছাড়লেন না শেষ পর্যন্ত। ওই আদি-বাড়ির পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ি। জল ছপছপ করে দেখানে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন।

নতুন বাড়ি চুক চোখে আর পলক পড়ে না। বাজ-অটালিকা। পাক লোক ফুলবাগান—যত রকমে সাজানো যায়, খঁত রাখে নি। চেয়ারে চেয়ারে সোনালি কাজকর্ম। দেয়ালের কুল্লিতে কুল্লিতে ভাস্করের পাকা হাতের নানা মূর্তি। এত্নক ওত্নক ঘিরে টানা-বায়াঙা চলে গেছে। বায়াঙার লাগোয়া ঘর। উঁক-ওকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—ঘরে ঘরে বোভও, খাটপালঙ্ক, ছবিতে ছবিতে এলাহি কাণ্ড। যারা পঙ্ক ও ব্যাথিগ্রস্ত, তাদের জন্ত আলাদা জায়গা এই নতুন বাড়িতে; সকলের সঙ্গে একত্র থাকতে দেয় না। নিচের তলয় ডাক্তারখানা, হাসপাতাল। চিকিৎসা বাবদে এক পা বাইরে যেতে হয় না। এক বাড়ির ভিতরে সমস্ত।

চাটা খেয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা। উঁহ, বাড় নাড়লে ছাড়ছিলে। আপনাদের ভারতের কত কথা শুনেছি! ছবিও দেখেছি। গাছ-পালায় সবুজ শান্তব্রহ্ম এক আশ্চর্য রোমাণ্টিক দেশ। আমাদের কত পোলের মধ্যে ভারতের নাম এসেছে কতবার। এক মহিলা বললেন, বৌবন বরষ থেকে আমার বড় সাথ রহতময় বিচিত্র ভারতবর্ষ দেখে আসব। সে তো হবে না আর জীবনে—আপনাদের কাছে বসে গল্পগজব করে সেই সাথ মেটাই আজ খানিকটা। পালাতে দেবো না।

কি বলবেন আর এর পরে? এইই মধ্যে ঐ আদি-বাড়ির খানায়রে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। সে কী রাসুসে কাণ্ড—দেখে আঁতকে উঠতে হয়। ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিল। কতই তো নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু যত্নাব দরজায়-ধাঁড়ানো রূপশিল্পীদের এই সমাদর অল্প কোথায় পাবো? ভারতীয় সিনেমা-দল—বাদের দেখা আগে পেয়েছেন—এই সেলিনগ্রাভও তাঁরা ইতিমধ্যে ঘরে গেছেন। সেই গল্প উঠল। ভারতের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল, এঁদের অনেকে দেখে এসেছেন গিয়ে। সৌরভরোহাঙ্গল ভারতের রূপ দেখে এলেন ছবির ভিতরে। ভারতের সুখসৌভাগ্য কামনা করে ভারতের বন্ধুত্ব স্বরণ করে পাঠের পর পাঠ চলল। ও বলে বক্তিত আমরা ক'টি গোবিন্দদাস ফালফাল করে তাকিয়ে আছি।

খাওয়া অল্প ভরোড লেগে গেল। এ বলে, এমিকে আসুন; ও বলে, ওমিকে চলুন। যে যার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। চুয়াশি বছরের এক বুড় ক'জনকে নিয়ে বসিয়ে বাস্তু খুলে অতিকার এলবাম বের করলেন। কিশোর বয়স থেকে কত পালার কত রকম অভিনয় করে এসেছেন, সেই সব ছবি। আর এক বুড়ি—বয়স সত্তরের নিচে হবে না, গাল ও চোখের নিচে চামড়া খুলে পড়েছে—হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো মহিমাবিত এক সন্ন্যাসীর ছবি দেখালেন। দেখ, চিনতে পারছ? আমি—আমিই সাক্ষ্যতম চরিত্র-পর্যায়িত বহুর আগে। ভক্তিত হয়ে বাই। চলল পরিপূর্ণ-বোবনা কোন অপকরণ আরও ছবি। ছবির মুখোমুখী বীজবর্ণন এই বুড়। শব্দগাঢ়ের মোহনরূপের সামনাসামনি তুলনা করে দেখানো। একবার ছবির দিকে আর একবার ঐ ছবিগার মুখে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি।

রাত্রিবেলা ডিনার সেরে নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছি। পালা হল লাল পশি। বালে ও প্যাটোমাইন একসঙ্গে—অর্থাৎ নাচ আর মুক-অভিনয়। বৃষ্ণপটের ভারি জাঁকজমক—নাচ দেখবেন কি, সিন দেখেই থ হয়ে বাবেন। বৃষ্ণ মক নয়—কিন্তু আলো আর পর্দা খেলিয়ে আশ্চর্য গতিবেগ আনে, মায়ারহস্ত ঘনিয়ে তোলে।

আমেরিকা থেকে মালের জাহাজ এসেছে চান্নের বন্দরে। কুলিরা মাল নামাচ্ছে, বড় কষ্ট তাদের। নানান দায়-দরকারে বিশ্বের লোক জাহাজঘাটার আনাগোনা করছে। ঘাটের এক দিকে কলের দোকান। রিক্সা চেপে মার্কিন মালিক দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা বকশিস চাইল তো লাখি। অঙ্ককার হল ঠেক, জালের এক পর্দা পড়ল। আলো হললে দেখি, খুব নাচ ও আমোদবৃত্তি। আর পিছনে জালের কীক দিয়ে দেখা বার, ক্লাস্ত কুলিরা জাহাজের মাল নামাচ্ছে, ছুটোছুটি, বিবম ব্যস্ততা সেমিকে।

নারিক সব চেয়ে ভাল নাচে। মার্কিন মালিক নাচের ভিতরেই হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে পাশে বসাল। জাহাজঘাটে বিবম গুণগোল হঠাৎ। নাচের মেয়ে ছুটল সেমিকে। অঙ্ককার।

জালের পর্দা নেই—স্ট্যাণ্ডি জাহাজ ঘাট! কুলি পর্দার ক্বে পাঁড়িয়েছে (পর্দার হল মাণ্ড-সে-তুদের প্রতীক—টানা দালাল মার্কিন মালিকের হয়ে ছুটোছুটি করছে, সে হল চিরায় হাইসেক)। সৈন্যল ছুটে এসে, কিন্তু জনতার রোবের সামনে

উজ্জত বন্ধুত্ব সরিয়ে নেয়। নাহিকা এসে গেছে ঐ কুলিদের মধ্যে। নেচে নেচে তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফুল দিল মেয়েটারে—লাল রঙের পশিফুল। জাহাজের লোকেরাও নাচে এসে যোগ দেয়। ক্লাসিকালের সঙ্গে আধুনিক নাচ মিলিয়ে দিয়েছে। পালা শেষ হলেও লোক ছাড়বে না—উঠে পাঁড়িয়ে কেবলি হাততালি। পাগল হবে স্বর্থনা জানাচ্ছে—পর্দা সরিয়ে শিল্পীদের বায়বায় বেরিয়ে আসতে হয়।

২২

জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠে এক সন্ধ্যায় ময় গয়ে বসেছিলাম। বুলেটের কত দেয়ালে দেয়ালে, গাছের শুভিতে—সেগুলো বন্ধু করে রেখেছে। আর সেই কুয়া—বার মধ্যে আতঙ্কিত শত শত মানুষ আপিয়ে পড়ে। তবু বাচে ন।

জাহাজের প্রাসাদ-অঙ্গনে বৃহতে বৃহতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে এসে যায়। ১১-০-৫-এর বক্তাক্ত রবিবার জাহাজের কাছে দরখাস্ত নিয়ে এসে বিপুল জনতা। জাহাজের দলেবই কেটবিট, একজন বৃদ্ধি দিয়েছেন: সোভাগ্রজি চলে বাও, সুবিধা হবে। চলেছে তারা—হাতে আইকন, জাহাজের ছাব। দয়ার প্রার্থী, অস্ত্রহীন, অসহায়—তাদের উপর রাইফেলের আগুন। ভারতব্রের সমাধি বচিত হল সেই রবিবার। একটা মেয়ে কাবলিনা চোখে—জাহাজ-মায়েরা নিবেদ কোরো না তোমাদের স্বামী-ভৈলোদের। জীবন দিক তারা মহৎ কাজে। কেঁদো না, গিয়েই থাকে যদি জীবন। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আছি—আছি আমরা। এক জাহাজের বোল মাছুর ঐ উঠানে পড়ে গেল। কত বাক্স, কত মেরেলোক তার ভিতরে।

বৃহতে বৃহতে অনেক বেলা হয়ে গেল। হোক—বেলা না হলে হুনিভাগিটি খোলে না। গলির মোড়ে এক ভিখারি দেখলাম। এমিক-ওমিক তাকায় আর ভিক্ষা চায়। ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু আইনে মানা, পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যাবে। সোবিয়েত রাজ্যে মোটামুট দেড় জন ভিখারি চোখে পড়েছে আমার। এই একটা, আর মকোর বাস্তায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে চঠাৎ একজন সাধনে এসে চাকের পলকে আবার উধাও হয়ে গেল। সেই লোকের সবুধে মতভেদ আছে। কেউ বললেন, ভিখারিই বটে, পুলিশের আঁচ পেয়ে ভেগে পড়ল। মতান্তরে, সেকলে বুড়া মাছুর—বিশেষদের দেখে কোঁতুলভের একটুকু দেখে নিল। আঁখাসিতে গল্পে গল্পে একদিন তুলেছিলাম কথাটা। তা হতে পারে ভিখারী। দেখা যায় এমন এক-আখটা। আইন থাকলে কি হবে, আইন কীকি দেবার মাছুরও থাকে। বয়স হয়ে গিয়ে পেনসন পাচ্ছে, আর কম হয়ে গেছে—আর মদ খাওরাটা বড় চালু ওদেশে, হয়তো বা পেনসনের টাকা মদে ফুঁক দিয়ে চোখে অঙ্ককার দেখছে এখন। বিশেষ লোক দেখে মৃত্যু করে হাত পাতে, কোকটে কিছু যদি জুটে যায়।

সেলিনগ্রাভ হুনিভাগিটি আমার বড় আপন মনে হল। বিশেষ করে প্রাচ্যবিজ্ঞ অংশীদারের যে বিভাগ আছে। কোথায় আমার বাংলাদেশ আর কোথায় ওই মিনলাও উপদ্বীপের উপাত্ত প্রাচীন বিভাগদ্বয়। টিপটিপ কুই পড়ছে, নেভার জোঙ্গা হাওয়া গা কেটে

কেউ বেন চাঁদের ভিতর অবধি শীত বসিয়ে দিচ্ছে। কোন কিছুতে কান্ড নেই। বড় বড় হল আর করিডরের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি।

এই ১৯৫৪ অব্দে প্রাচ্য-বিজ্ঞান বিভাগের নিয়মানুষ্ঠিত বছর বয়স পূর্ণ। আগামী বছর শতবার্ষিক উৎসব। ভারতের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলা তিন্মি উর্দু মাগাঠি ও পাঞ্জাবি এই পাঁচটা ভাষা পড়ানো হয়। প্রাচীন ভাষাও মধ্যে পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত। ভারতের বাইরের চীন আরও তুর্কি ইরান কোরিয়া জাপান প্রভৃতি স্থানের ভাষা।

ভারতীয় ভাষাও মধ্যে, বহুদূর খবর পাই, সকলের আগে এক সব চেয়ে দরদার সঙ্গে শিপতে শুরু করে বাংলা। বাংলার সে প্রভাব নেই এখন, মিটেয়ে আসছে। তিন্মি-উর্দুর উপরে জোর। শুদের শিবে রাষ্ট্রনাথার পাগড়ি—হবেই তো। এই যুনিভার্সিটির ডক্টর বরনিকভ মহানগর ও তুর্কসীদারের রামায়ণের ও অনুবাদ করেছেন। আরও বিস্তার সাহিত্যিকার্তি আছে তাঁর। বুদ্ধ অধ্যাপক গন্ত হয়েছেন, ছেলে বরনিকভ ইদানীং উর্দু তিন্মির অধ্যাপক।

প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা ভেরা নভিকভা—মোটাসোটা পোঙ্গাল চোগরা আর দশটা কশ্মীরের মতো সাক্ষসজ্ঞায় একবারে উলসীন। বাংলা শেখানোর ভার তাঁর উপরে। দশটি ছাত্রছাত্রী বাংলা ক্লাস। আর নিতে পারছেন না, এরা ক'জনকে সামলাবেন? বাংলা ছাড়া পাঞ্জাবির ভারও তাঁর উপর। এবং আরও কি কি—সঠিক এখন মনে পড়ছে না। পাঁচ বছরের কোর্স—তারপরে ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রি নিয়ে কাজকর্ম চলে যায়—শত শত মিউজিয়াম আছে, তাদের প্রাচ্য বিভাগে; প্রাচ্যের নানা দৃশ্যবাসে; বিভিন্ন লাইব্রেরিতে; একাডেমি অব সায়েন্সের কাজে। সরকারের প্রাচ্য-পুস্তক প্রকাশন বিভাগ আছে, তার ভল্টেও বহু লোকের দরকার। পাশ-টাশ করে প্রাচ্য বাণ্যাবের গবেষণা করেন অনেকে; নানা সাময়িক পত্র সেসব ছাপা হয়।

সাতটি ছেলেমেয়ে এবারের পঞ্চম শ্রেণীতে। তারা পাশ করে থাকে, আগামী বছর মাষ্টার হতে পারবে তাদের গুটিকয়েক। বাংলার ক্লাস তখন আর কিছু বড় করা চলেবে।

নভিকভা নিজে দশ বছর ধরে বাংলা শিখেছেন। শিক্ক দাউদ আলি দস্ত, অথবা প্রথমনাথ দস্ত—বাঁর কথা আগে কিছু পেয়েছেন। কলকাতার এক হুঃসাহসিক ছেলে ১৯০৫ অব্দে বেরিয়ে পড়েন—বিশেষ শক্তির সঙ্গে যোগসাজস করে যদি ইংরেজ জাভানো যায়। কত বেশে ঘুরলেন, তুর্কি বেজিমেটে ঢুকলেন মুসলমানি নাম দাউদ আলি নিয়ে। কফাসি ও ইউরোপের নানা তহাট ঘুরে অবশেষে বাশিচায়। রাজনীতি চেড়ে শেখটা মহন্তর কাজে নামলেন—বাংলা শিখানো। মাঝে যুনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপক হলেন। কশ্মীরে বিয়ে করলেন—তিনি হলেন বীণা দস্ত কিংবা হুঃজাহান দস্ত, স্বামীকে যেমন যেমন প্রেমম অথবা দাউদ আলি বলবেন। দাউদ আলি এই সেগিন (১৯৫৩) দেহ রেখেছেন; মজিলা আছেন মস্তোয়। চোন্দ-পনোরো বছরের ছেলে একটি, পড়াশুনো করছে। বীণা দেবীর ভাগ্য বিশেষ করে বাংলা দেশের স্বত্বকে ভারি আগ্রহ। কিন্তু হুঃকিশ হয়েছে ভারতীয় ভাষা একটিও জানেন না।

যাক গে, কি কথার কদর এসে পড়ল। এই প্রথমনাথের শিষ্য নভিকভ। গুরুদ নামে অর্থাৎ হুঃ বলবল করে উঠল।

পুরানো কথা বলতে লাগলেন। আমার পোরা-বাগো। বাংলার শিক্ষিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁর জীবনসামান্য—আর আমি হলম বাংলায় পিশাতিবেল, ততপরি হুঃর জাতভাট বাহালি। মুঠায় মধ্যে তাঁর দৈবাৎ এক কোহিনুর ছিটক এসে পড়েছে, এমন গড়িক। কি ভাবে সমাধির লোকবোন ডেবে পড়ান না। আর হারা এসেছেন, তাঁরা সবাই ছড়িয়ে গেছেন অল্প লোকের তাঁবে; নভিকভা আমার ঘুরিয়ে দেয়াছেন, বত কথাবার্তা আমারই সঙ্গে। লেনিন এই যুনিভার্সিটির ছাত্র। এই খানটায় বসে কাজ করতেন—এমনি সব শরীরি লায়গা দেখে বেড়াচ্ছি।

আমার ছাপানা বই নিয়ে এসেছি, মওকা বুক হাতে দিলাম। প্রাচ্য গ্রন্থাগারে থাকবে অল্পাঙ্গ বাংলা বইয়ের সঙ্গে। কতবার কত রকমে যে মড়াচোড়া কামলেন। এত বই—তবু হইয়ের ক'ঙাল এঁরা।

ইতিহাসের ছাত্র চীনে মুখাজ্জ মশার। কথা তুললেন, ভারতের ইতিহাস কিভাবে পড়ানো হয় সোবিয়তে—কি রকম ভাষা হয়েছে এ বেশ ভারত-ইতিহাসের? ইতিহাস নিয়ে খুব কৌক পড়েছেন—সম্প্রতি প্রাচ্য ইতিহাস ছাপা হয়েছে, তাতে সব পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক ডক্টর কালিনিয়ভ এসে পড়লেন, ইতিহাসের আলোচনা আর এততে পারল না। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন আমাদের সকলকে; কতবার করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন। ভারতের মাতৃভাষ—অতএব দেবভাষাটা বিশেষ ভাবে বস্তু, এটাই ধরে নিয়েছেন অধ্যাপক। আমাদের ঘাম দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতে জবাব দিতে হলে তো গেছি একবারে। মাধায় অল্প টাক, সমাপ্রসঙ্গ বৈক সম্ভব—গোটা রামায়ণখানার তর্জমা করেছেন সংস্কৃত থেকে কশ ভাষায়। এমন দিকপাল পণ্ডিত—চালচলেন বুঝার জো নেই। সাহের হলে কি হবে, সংস্কৃত পড়ে পড়ে টুলা পণ্ডিত যেন গেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ভাবসাং হয়েছে কেম্‌ব্রিজের এক ভাষাতাত্ত্বিক সমাবেশে। সুনীতিকুমারের কাছে কালিয়ানভ দ্রোক লিখে দিয়েছিলেন—ভারত-সোবিয়ত-মৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির নামে পান-প্রস্তাব।

মৈত্রীর ভারতবর্ষ-সোবিয়ত ভূমোহনস্বায়।

পাত্রমুখাপায়মাঃ শান্ত্যর্থং সর্গদ্বয়েন।

সুনীতিকুমারই বা কম কিসে? তিনি পাগটা দ্রোক ছাড়লেন : শ্রীকল্যাণ-বিরবর্নন শ্রেয়সঃ সাধনঃ তথা।

হইব কাময়ে হুঃ কবীয়াগাঃ শ্রমঃ বৈ।

[ 'কল্যাণ' কথাটির সাধারণ অর্থ তো জাহাজ; আবার কালিনিয়ভ কল্যাণ হয়ে কাঁড়িয়েছেন। 'শ্রমঃ' হল সৌরব; আবার দ্রাক্ষজাতি—'দ্রাক্ষ' অর্থ হল সৌরবময় জাত ]

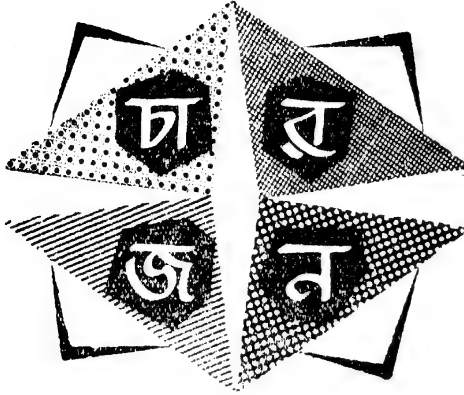
দ্রোক দুটো ছিল আমার কাছে। শোনালুম। কালিনিয়ভ বললেন, দ্রোকের উৎস শুকিয়ে যাবনি আমার। দাও খাজা, তোমায় একটা বানিয়ে দিচ্ছি। আমার খাতায় নিজের হাতে দেবনাগরি হরকে লিখে দিলেন নতুন দ্রোক :

মৈত্রঃ চেন্দ্রমবিন্দোঃ প্রভানামাব্যতোরহঃ।

জীবতু জনতাড়ুঠো ভাণ্ডু শাখতীঃ সঙ্গঃ।

(কল্যানোভ, লেনিনপ্রাণে)

[ ক্রমশঃ



হেমেন্দ্রকুমার রায়

[ বন্যায়ত্ত শিল্প-সাহিত্য বাহুরকর ]

শিহরণ ও রোমাঞ্চ কথা দুটোর অর্থ খুব সস্তার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ সস্তা দরের ছু'চারটে বাচ্চাতুর্কের বাপ মেয়ে একে ধরাশায়ী করা যায় না। বক্তব্যের অসারতা যেখানে, সেখানে থেকে বহু দূরে এ করে বসতি স্থাপন। শিহরণ ও রোমাঞ্চ তাকেই বলব, যাতে দেখা যাবে এককে কিন্তু বোঝা যাবে অনেককে—বালকদের সঙ্গে আলাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই বড়দের হাতে হাত মেলানোরও এর সমান অবিকার। অন্তরের গভীরতা যার ঢাকা থাকবে সারল্যের মুখোশে অথচ অম্লভব করা যাবে তাকে সম্পূর্ণ। সাহিত্যের বেলাভূমিতে শিহরণ ও রোমাঞ্চ সর্বত্রই পরিবেশনীয়। এতে শুধু পুলকই থাকবে না থাকবে অনেক অজানা তথ্য, পাওয়া যাবে মনের খোঁজ, চিত্ত হবে পরিতৃপ্ত হ্রদ কানায় কানায় ভরে উঠবে এর সারগর্ভ বক্তব্যে। জীবনের চলার পথে দিক নির্দেশনার দায়িত্বও এর উপর কম নয়—এখন এইগুলিকে প্রসূত করে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন



হেমেন্দ্রকুমার রায়

শক্তিশালী লেখনীয়, বলা বাহুল্য, এই শক্তিশালী লেখনীর অধিকারীদের তালিকা য দেখা যাবে বিশেষ হরপে দেখা আছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আজ 'হেমেন্দ্রকুমার' তাঁর জা স ল না মে পাড়িয়েছে আর মূল নাম 'প্রশাদদাস' রূপান্তরিত হয়ে গেছে ছদ্মনামে। পিতৃসেবের নাম বর্ণনা যথিকানাথ

রায় মহাশয়। আদি বাড়ী পাখুরিয়াবাটা অঞ্চলে। পথ সম্প্রসারণের বার্ষিক পৌরসভার পুষ্টি বাস্তবিকদের বৃদ্ধির কবলে তাকে দিতে হয়েছে আত্মহত্যা। তারপর থেকে বাস শুদ্ধ হয়েচে বাগবাড়ায় অঞ্চলে। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যাংশে প্রশাদদাসের পৃথিবীর আলো প্রথম দর্শন। প্রশাদদাসকে ছেলেবেলা থেকে আকৃষ্ট করে পিতৃসেবের গ্রন্থ সংগ্রহ। কখন যে অজান্তে সাক্ষ্যের হাতছানি আকর্ষণ করে বালক প্রশাদদাসের মন পৌনে সত্তর বছরের বৃদ্ধ হেমেন্দ্রকুমারের কাছে আজও অন্ধকারে ঢাকা আছে সেই বহুত।

হেমেন্দ্রকুমারের অসামান্য ক্ষমতা শুধু সাহিত্যের শিল্পবিভাগে বন্দী নয়। তার খারা বহুযুগীন। কবিতায়, গান লেখায়, প্রবন্ধ রচনায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, এক প্রবন্ধ রচনাই তাঁর বহুবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করা। বাঙলার অভিনয় জগৎ, বিদেশের অভিনয় জগৎ, বাঙলার সাহিত্য জগৎ, বিদেশের সাহিত্য জগৎ, নানান দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, অপরাধ কৌশল সম্বন্ধে অল্পে অল্পে আলোচনা, সঙ্গীত-নৃত্য-শিল্পকলা-মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশনায় কোনটিতেই তাঁর লেখনী অচল নয়, সমান বেগেই বেগবান।

সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে অল্প সময়ের শিক্ষাগত করছেন হেমেন্দ্রকুমার। সাময়িক বাহিনীর হিসাব বিভাগের কর্মিরূপে কিছুকাল দেখা গেছে হেমেন্দ্রকুমারকে। কিন্তু সহ্য হল না কবির, তাঁর মন অল্প কালের জন্তে, হিসাব-নিকাশের জালে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলার জন্তে নয়, তাই সেই সীমায়িত গণ্ডির ভিতর থেকে মুক্তিলাভ করে সাহিত্যের অসীম অনন্ত আকাশের তলার দাঁড়িয়ে হালকা নিঃশ্বাসে স্বস্তি বোধ করলেন। 'বহুনা'র সম্পাদকীয় বিভাগে করলেন যোগদান। আজীবন অতিবাহিত করে গেলেন সৃষ্টিধর্মী পরিবেশে, নিজেকে উৎসর্গিত করলেন সাহিত্যের বোম্বলে—আবদ্ধ করে রাখলেন শিল্প-অভিনয়-সঙ্গীত-নৃত্য জগতের আভিনায়।

লেখা আরম্ভ করেছেন ছেলেবেলা থেকে। কল্যাণ-এর পূর্বযুগে বাঙলার সাহিত্য জগত সেদিন আলো করেছিল 'ভারতী'। কবি-বান্দ্যকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদা যার ছিলেন সম্পাদক—'ভারতী'র সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধারা ছিলেন তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের আদর্শ। রবীন্দ্র-নিষ্ঠা ছিল তাঁদের অঙ্গ। তাঁদের সামনে রবীন্দ্রনাথের নিদ্বন্দ্বিতা কোন ব্যক্তিই কখনো সহজে নিষ্কৃতি পেরেছেন বলে জানা যায় না। রবীন্দ্রআদর্শে অনুপ্রাণিত সেদিনকার এই সাহিত্যসেবীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চাক বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমচাঁদ আতর্ষী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অনেকেরই করছেন আলোকিত, যথা : রবীন্দ্রনাথ, বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, শংকর, অবনীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, নীলেশচন্দ্র সেন, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে। স্বল্পপত্রের প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার বলেন—তোমরা অনেকেই জানো না যে, স্বল্পপত্রের প্রতিষ্ঠার পিছনে সর্বপ্রায়ে ছিলো, মণিলালের উত্তম ও কল্পনা। মণিলালের প্রচেষ্টাতেই বীরবল-এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন এ

তার লেখা আবার নতুন করে আবৃত্ত্য হয়। সেদিনকার রঙ্গমঞ্চে সাহিত্যিকদের যোগ ছিল অবিস্মৃত। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে জানা যায় যে—এব প্রাধান্য কেন্দ্রস্থল শিল্পিকুমার। বলছেন—শিল্পি ভাঙ্গাবাস্তব সাহিত্যিকদের, সাহিত্যের প্রতি ছিল তার অচলা ভক্তি, নিজেকে সে সাহিত্যিকের মতই সাজিয়ে রাখত। তার চুখকী আর্গুমেন্ট প্রভাব অতিক্রম করা সেদিনকার সাহিত্যিকদের পক্ষে ছিল দুরূহ। স্মরণ্য তার স্মরণেই সেদিন বিস্ময়ের রঙে ছিল আমাদের আনাগোণা। শুধু অভিনয়ের দিকটাই সে পূর্ণ করেনি, তার আত্মসঙ্গিক দিকগুলোর পরিচালনার ভারও সে সঁপে নিজেছিল যথাযোগ্য গুণী ব্যক্তির হাতে। হেমেন্দ্রকুমারের মতে শিল্পি সম্প্রদায় ছিল জ্ঞানী-গুণী মিলন ক্ষেত্র। শিল্পিকুমারের অসাধারণ দূরদর্শিতার ফলেই রঙ্গমঞ্চ লাভ করেছে বিশিষ্ট গুণীদের সান্নিধ্য। অর্থাৎ সঙ্গীতচর্চা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, চান্দ রায়, প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পনির্দেশক রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু), সঙ্গীতচর্চা কৃষ্ণচন্দ্র দে, খ্যাতিমান রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারেরও একটি উল্লেখযোগ্য আসন ছিল।

হেমেন্দ্রকুমার সম্পাদনাও করেছেন কয়েকটি পত্রিকা। তাদের মধ্যে দীপালী, নাচঘর, চন্দ্রা, শিল্পি, বহুমাল্য-এর নাম উল্লেখনীয়। বহু ছায় চিত্রের পরিচালনার মূলে ছিল হেমেন্দ্রকুমারের স্বপট হাত। বহু ছবি স্ববাসোপ ও নৃত্য পরিকল্পনাও হয়েছে হেমেন্দ্রকুমারের দ্বারা। সত্যিভাবে বলা যায় যে চলচ্চিত্র বা বঙ্গমঞ্চে সর্বদা আলোচনা করা বা পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রবর্তন, ধরতে গেলে হেমেন্দ্রকুমারই প্রথম করেন। সঙ্গীত বিভাগ এর শুরু ছিলেন বাবিকামোহন গোস্বামীর ছাত্র শ্রদ্ধেয় মহিম মুখোপাধ্যায়।

এই সংখ্যা আজ তাঁর ঠাঁড়িয়েছে দেড়শ'রও উপরে। তাদের মধ্যে যথের ধন, আবার যথের ধন ময়নামতীর মায়াকানন, মেঘসূতার মতে আগমন, মাহুঘ পিণ্ডা, বিশাল গড়ের দুঃশাসন প্রভৃতি উল্লেখ্য যোগ্য কয়েকটি নামোল্লেখ মাত্র। 'অভিনয় কলা ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটি তাঁর এখন প্রকাশের পথে। 'বঙ্গ রঙ্গালয় ও শিল্পিকুমার' গ্রন্থটি থেকে নাট্যাঙ্গানী ব্যক্তি অনেক রস পায়বেন আহরণ করতে। এ ছাড়া 'বাঁদের দেখছি' ও 'এখন বাঁদের দেখছি' গ্রন্থগুলিতে হেমেন্দ্রকুমার সে যুগের ও এ যুগের বিখ্যাত স্বনামধন্য পুরুষদের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যের স্মৃতিচিত্রগুলি ধরে রেখেছেন—এই রেখাচিত্রগুলির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে হেমেন্দ্রকুমারের জীবন কাহিনী—আছে তখনকার ও এখনকার সাহিত্য ও অভিনয়-রঙ্গমঞ্চে সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে গির্জাচন্দ্র বোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অর্ধেন্দ্রশেখর মুখার্জী, প্রথম চৌধুরী, জলধর সেন, বিজ্ঞানেশ্বর রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়িন্দর, বিশিন-চন্দ্র পাল, অরেন্দ্র সমাজপতি, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী, অমৃতলাল বসু, মহারাজা জগদীশনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, স্বরাজনাথ ঠাকুর, তারামল্লারী প্রভৃতির সর্বদা স্মৃতিকথা 'বাঁদের দেখছি' গ্রন্থের সম্পদবিশেষ। 'নৃত্য-নাট্য-চিত্র' সর্বদা আজ অবধি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার বহু লিখেছেন তার থেকে বাছাই বাছাই অংশগুলি বেছে নিয়ে সম্পাদিত করলে পর পর চারখানি খণ্ড তা থেকে অনায়াসে হয়। বাট বছর

আগের কলকাতা নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থটিতে সকল দিক দিয়ে কলকাতা সর্বদা আলোচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার।

এতগুলি দিকে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী বাঙালার ছেলে-মেয়েরা। তাদের হৃদয়ে তাঁর আসন অটল। জাহ্নবী পত্রিকা থেকে যে লেখনীর স্রবাপাত হয়েছিল সেই লেখনী নিত্য নব-রসে উপাদানে ভরিয়ে দিয়েছে বাঙালার কিশোর-চিত্ত। তাঁর সাহিত্যে যেমন আছে তিতি, আছে আতঙ্ক, আছে ত্রাস, তেমনি আছে সাহিত্য-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ-সৌরজগৎ-আইন-চিকিৎসা-সাহিত্য সর্বদা কিশোরোপযোগী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। আছে কাহিনীর প্রত্যেকটি পদক্ষেপের পিছনে অবিস্মৃত ব্যাখ্যা—আছে নিঃসীম গভীরতা।

সরকারী চাকরীর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ছেড়ে যিনি ফাঁপিরে পড়লেন সাহিত্যের অগাধ সাগরে—অতলে তলিয়ে গিয়ে জীবনব্যাপী অবেষণ যিনি আজও আহরণ করছেন মুঠো মুঠো রত্ন—বাঙাল দেশের এক নগণ্য সাময়িক-পত্রসৌর্য্যে তাঁকে জানাই অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ

[ ভারত-বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, মনঃসমীক্ষণ ও লুইসী পার্ক  
বাসিক হাসপাতালের অধিকর্তা ]

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে স্বল্প কয়েকজন বাঙালী পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ তাঁদের অন্যতম। গাঝো জাতির মনঃসমীক্ষণ, গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কার্তি।

তিনি কলেজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন নি—মনোবিজ্ঞান ও মনঃসমীক্ষণ চর্চা করতেন আপন ইচ্ছায়। জয়গত ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের এই শাখার উপর তাঁর ছিল অগাধ অনুরাগ, পরে স্বনামধন্য চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী আচার্য



তরুণচন্দ্র সিংহ



গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রভাবে তাঁর এই অধ্যাপক আরও বৃত্তি হয় এবং তিনি মনোবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

ডাঃ তরুণেন্দ্র সিংহ ১৯০৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার সুন্দর বিখ্যাত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দর মহাশয় ভূপেন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁর ছোটতাত পুত্র। তাঁর পিতার নাম ৬কুমার নীতিচন্দ্র সিংহ এবং মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। বাসশিক্ষা সুগেই এবং ছুলের শিক্ষা কলিকাতায় হিন্দু স্কুলে লাভ করেন। ঢাকার জগন্নাথ ইনস্টিটিউটে কলেজ থেকে আই-এস সি পান করার পর, পদার্থ বিজ্ঞান অনার্স নিয়ে ঢাকার জগন্নাথ হলে ভর্তি হন। এখানে তিনি আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ছাত্ররূপে সর্বপ্রথম পরিচিত হন। ডাঃ সিংহ কিছু বি-এস সি পরীক্ষা দিতে পারলেন না—পেটে আরক্ত হলো এটও বস্তু। ডাক্তাররা বললেন ‘গলস্টোন’ হয়েছে। এক বছর বিশ্রাম নেওয়ার পর শরীর বখন একটু ভালো হল তখন তিনি কলিকাতায় এসে মনোবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে আবার বি-এস সি তে ভর্তি হলেন। কিন্তু শরীর ভেঙ্গে পড়লো, রোগের প্রকোপ উঠলো বেড়ে। অতএব পড়াশুনা আবার ছাড়তে হলো—সোজা করে গেলেন সুগে।

বাড়ীতে স্নান করলেন ইংরাজি, বাংলা সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনা, দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা পঞ্চাশ পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন। শরীর আরো ভেঙে পড়লো—ঘুর্ণা আবার সূচ হয় না। মরীয়া হয়ে তিনি জেল ধরলেন অপারেশন করার জন্য। অপারেশন করতে পরিবারের অনেকেই মত ছিল না, গলস্টোন ছিল তখনকার দিনে (১৯৩২) খুবই কঠিন রোগ। কিন্তু ডাঃ সিংহ এই ভাবে বাঁচতে আর চাইলেন না, বাঁচতে যদি হয় মাথার মতো বাঁচবেন,—অসত্য। সকলকে অপারেশন মত দিতে হলো। অপারেশন হলো যেভিক্যাল কলেজ,—করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাথার মনের কথা জানতে পারার একটা আশ্রয়। ডাঃ সিংহের অতি শিওকাল থেকেই ছিল। মাত্র ৩-৪ বছর বয়সেও তিনি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন,—ভাবতেন যদি ওর মনের ইচ্ছেটা বোঝা যায়, তাহলে বড় মজা হয়। অবশ্য মনোবিজ্ঞানের পাণ্ডে আসবার জন্য অল্পপ্রেরণা তিনি পান আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের কাছ থেকে। রোগাক্রান্ত শরীরে সুসঙ্গ বখন তাঁর সময় কাটতো না, তখনই তিনি মনোবিজ্ঞানের চর্চা ও অধ্যয়ন শুরু করেন। গিরীন্দ্র বাবু ছিলেন তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক,—তিনিই ডাঃ সিংহকে ইণ্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভ্য করে দেন,—কলে এ সোসাইটির লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ ডাঃ সিংহ পেলেন। ডাকযোগে বই আনিতে এই বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করলেন শুরু। রোগমুক্তির পরই তাঁর মন এই দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে—গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়কে তিনি ধরলেন মনঃসমীক্ষণ শেখাবার জন্য। বসু মহাশয় তাঁকে এতদিন কেবল পড়তে উৎসাহ দিতেন, মনঃসমীক্ষণ শিখতে চাইলেই বলতেন, পড়ো, আরো পড়ো। ১৯৩৪ সালে তিনি ডাঃ সিংহকে তাঁর বেলগাছিয়ায় ক্লিনিকে বাবার অধিকার দিলেন,—এটি বৃহৎপতিবার রিকলে বসু মহাশয়ের নৈমিত্তিক মানসিক চিকিৎসা করতেন—রোগী লেখতেন, আর

ডাঃ সিংহ করতেন অধিকৃত্য সফল। এবার আর বই পড়া নিজে কেবল নয়—ঠাতে-কলমে শিক্ষা। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে ডাঃ সিংহের যোগাযোগ স্থাপিত হলো, পৃথিবী-বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় নিজে যত্ন করে তাঁকে বিভিন্ন রোগীর মানসিক পরিবর্তিত বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। ডাঃ সিংহ কিন্তু কেবল এই ক্লিনিকেই তৃপ্ত নন—এ কেবল out door বিভাগ। মানসিক রোগের একটি সম্পূর্ণ হাসপাতাল নির্মাণ করতে তাঁর ইচ্ছা হলো। আচার্য্য বসু হাসপাতালের একটি পরিবর্তন করতে ডাঃ সিংহকে নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো কাজ, শিখ্য পরিবর্তন। করেন এবং শুকশাখা আলোচনা হয়। ২৪শে শিখ্যের প্যারা-টাইফয়েড হওয়াতে পরিকল্পনার কাজ কিছু দিন ব্যাহত হলো। অল্প সময়ের পর আচার্য্য বসুর নির্দেশেই ডাঃ সিংহকে স্বাস্থ্যসাধনের জন্য সুগে ফিরে যেতে হয়, সেখানে গিয়ে মাত্র পনের দিনের মধ্যে শরীর গেল ভালো হয়ে। কিন্তু শুকর আদেশ, কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতায় ফিরতে পারবে না। কলিকাতায় বড় বেরিয়ারি হচ্ছে—যা শরীর, আবার একটা নতুন রোগের উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু সময় কাটে কি করে?—শিখ্য চিঠি লিখলেন। গারো অঞ্চলে ঘুরে বেড়াও,—তাদের মন বিশ্লেষণ কর, আর যা তথ্য পাও সব কেবল লিখে যাও;—এলো শুকর আদেশ।

ডাঃ সিংহের ভাবনে স্নান হলো এক নতুন অধ্যায়। তিনি ইংরাজ সরকারের বিশেষ অজুহতি নিয়ে দিনের পর দিন পাড় খাটতে লাগলেন বিভিন্ন গারো-পল্লীতে। লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন তাদের স্বপ্ন,—স্বপ্নের কার্যকারণ সমূহ। এর জন্য কম বিপদে তাকে পড়তে হয়নি, কোন কোন গারো-পল্লীতে আটক পর্বত পড়েছেন, সঙ্গেই করে অনেক গ্রামে আবার প্রথমে ঢুকতেই দেয় নি। অনেক গ্রামে আবার রাজপরিবারের ছেলে বলে পেয়েছেন রাজসমাদর। এই গবেষণার শুরু চোখে এসেই কিন্তু এই গবেষণা চলে সুদীর্ঘ ১২ বছর ধরে। গারো জাতির মনঃসমীক্ষণই ডাঃ তরুণেন্দ্র সিংহের জীবনের এক অমূল্য কণ্ঠি।

বাই হোক, চোখ থেকে ফিরে এসে ১৯৩৭ সালে ডাঃ সিংহ, আচার্য্য বসুকে ধরলেন তাঁর নিজের মনঃসমীক্ষণ করার জন্য। মনঃসমীক্ষণ না হলে পরীক্ষা দিয়েও মনঃসমীক্ষক হবার অজুহতিপত্র পাওয়া যায় না। তাঁর মনঃসমীক্ষণ চলতে লাগলো—ইতিমধ্যে ডাঃ সিংহের পরিকল্পনা জুজুয়ারী ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো লুইসী মানসিক হাসপাতাল। এই হাসপাতালের অধিকর্তারূপে নিযুক্ত হলেন জীতরুণেন্দ্র সিংহ, তখনও তিনি প্রায় ছুট নন। যদিও ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণার মূল্য বহু বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছে বর্ধিত স্থান ও সমাদর লাভ করেছে। আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় মাথার চিনতেন, তাই কেবলমাত্র ডিগ্রীর উপর মূল্য না দিয়ে গুণগত বিচার করে জীতরুণেন্দ্র সিংহ মহাশয়কে অধিকর্তা নিযুক্ত করলেন, জী সিংহের বয়স তখন মাত্র ৩৪ বছর। এর জন্য কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির পরীক্ষার সদস্যনে উত্তীর্ণ হয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা করার অজুহতি পেলেন। বিশ্ববিজ্ঞানভ্যে ডিগ্রী না থাকলে পরে পরে অনেক বাধা আসতে পারে, তাই সিংহ মহাশয় ১৯৪২ সালে পুনরায় মনোবিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি-এস সি পড়তে



আরম্ভ করেন এবং ১৯৪৪ এবং ১৯৪৬ সালে মনোবিজ্ঞানে বৎসরিক বি-এস-সি অনার্স এবং এম-এস-সি'তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন পরে 'গারো ভাষার মন' নামক একটি থিসিস রচনা করে তিনি বি-এস-সি ডিগ্রীও লাভ করলেন। তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি বিজ্ঞানী-মহলে অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করলো। এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে এলেন এগিয়ে। ডাঃ তরুণ সিং প্রজুয়েট হবার আগেই মনঃ-সমীক্ষক হবার ডিপ্লোমা পান, নিয়ম আছে প্রজুয়েট না হলে কেউ এ ডিপ্লোমা পাবে না, তিনিই এর প্রথম এবং বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। বর্তমানে ইনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষক সমিতির সম্পাদকের পদও অধিকার করে আছেন।

ইনি অল্পতরার সগণিষ মানুষ। পাকিস্তান হবার পর স্রসঙ্গের সঙ্গে সখ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,—তবু দেশের কথা উঠলে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠে। মনে পড়ে তাঁর হাতীতে চড়ে শিকারের কথা, ঘোড়ায় চড়ে মাঠে প্রান্তরে বেড়ান আর গারোপল্লীতে সাধারণের সঙ্গে এক হয়ে তাদের মনের ববর সংগ্রহ করা। ফলেবোলায় ইনি কবিতাও লিখতেন,—কবিতাকক একবার কবিতা পাঠিয়ে প্রশংসাও পেয়েছিলেন। গান-বাজনার চর্চাও তাঁর একফালে ছিল। এই সব বিষয়ে তিনি সবচেয়ে উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়েছিলেন দাদা (মহাভাজা) ও বাবার কাছ থেকে।

মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণসিং সিং মহাশয় ভারতবর্ষের চিকিৎসক মহলে এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। মাতৃভূমির সেবার জন্তু আত্মা এই অল্পজ্ঞকর্মী মনোবিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

### ঐজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(বনামপ্রতিষ্ঠ সত্যান্ধরী গ্রন্থসেবী)

তাত্ত্বিক এক অগতিরগম আনন্দের অহুত্বিত ভাগে তখনই বধন দেখা যায় এই আত্মপ্রকাশের বৃগুও এমন কয়েক জন মানুষ আছেন, যারা সকল সময়ে তা থেকে দূরে থাকারই পক্ষপাতী। আত্মপ্রচার অপেক্ষা জনসেবাকেই তাঁরা সন্মান দিয়ে থাকেন অধিক পরিমাণে। সেবাই তাঁদের আনন্দ, কষ্টই তাঁদের লজ্জা, অধ্যবসায়ই তাঁদের অবলম্বন। এই ধরনের স্বল্পসংখ্যক কয়েক জনের মধ্যে ঐজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। গ্রন্থ-অগতির এক জন উল্লখ-যোগ্য পুরুষ এই জিতেন্দ্রনাথ। প্রকাশক মহলে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানের অধিকারী তিনি। এক কথায় সংসারিতোর বৃগুপং সৃষ্টি ও প্রসারকর উৎসর্গিতপ্রাণ বিজ্ঞানসাহারী ঐজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জিতেন্দ্রনাথের শৈশুক নিবাস হুগলীতে হলেও, ইংরেজী ১৯০৬ সালে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শুল্ক-কলেজের শিক্ষাকালও অতিবাহিত হর কলিকাতায়। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজ থেকে তিনি বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি দিল্লী বাহা করেন এবং সেখানে গিয়ে আইন পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশার সাক্ষাৎলাভ করার পক্ষে উর্দ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকায়, তিনি অর্ধপথে এই অধ্যয়ন প্রত্যেক জাতি

করেন। জিতেন্দ্রনাথের শিতা পীচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ভারতীয় 'ডাক-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সেই সময় ডাক-বিভাগ থেকে চাকরির জন্তু তাঁর আহ্বান আসে, কিন্তু স্বাণীন মনোবৃত্তির জন্তু তিনি চাকরি গ্রহণে অসম্মত হন। বিদ্যাতাপুরুষের তত্ত-ইজিতই যেন কাব্যগতিকের এর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বখানিদিই ডাক-বিভাগের কাছাকাড় গ্রহণ করলে আজ আমরা তাঁকে উক্ত বিভাগেরই কোন একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকতে হত বোধহয়, কিন্তু পুস্তক প্রকাশনের অন্তরালে থেকে যে দরদী মাতৃঘটি বন্ধুর মত সেবা করে চলেছেন বাঙলা সাহিত্যের দল নিকিশের, যিনি পুস্তকানুগামী ও সাহিত্যসেবীদের সমান প্রিয়, সেই জিতেন্দ্রনাথকে আমরা এত কাছে পেতাম কি?

সরকার প্রের্ষিত আইনে বর্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে সাপ্তাহিক ছুটি স্বার্থ্য্য হয়েছ, সে সময় এরূপ ছুটির আইন বা রেওয়াজ ছিল না। জিতেন্দ্রনাথ এই ছুটির প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতি মঙ্গলবার নয়াদিল্লীর ব্যবসায়ী মহলে একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও নয়াদিল্লীর বাঙালী ব্যবসায়ীগণ এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন। ১৯৪০ সালে জিতেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বনামমঞ্জ বীজগণিত-প্রণেতা স্বর্গত কে, পি. বহুর স্বরণ্য পুর জীমিবিবেশ বহু এর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বহু মহাশয়ের আগ্রহাতিশ্রোই ইনি আবৃত্তি হন গ্রন্থ প্রকাশের দিকে। গ্রন্থ প্রকাশের সর্বাসীন নিক সখ্যে তাঁর উন্নত, উদার চিন্তা ও নিরবকাশ পরিভ্রম স্বল্পকালের মধ্যেই ইতিবান-প্রাঃসাসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ (আই, এ, পি) নামক সন্নিহিত প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ফুল-ফলে জীমণ্ডিত করে তোলেন।



ঐজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট দিন। সেই দিনটি প্রতি মাসের ১ই তারিখ; অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহের সন্ধ্যাপ্তি ও দ্বিতীয় সপ্তাহের সূচনাকাল। এই সন্ধ্যায় ১ই-এর প্রাটা জিতেঙ্গনাথ। প্রকাশন বিষয়ে 'ব-নির্বাচিত গল্প' আই. এ. পির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই গ্রন্থমালায় গল্পগুলি লেখকরা নিজেসাই নির্বাচন করেন। তাছাড়া এই গ্রন্থমালায় লেখকদের প্রতিকৃতি ও পরিচিতি ব্যতীত তাঁদের বহুস্তরকারের প্রতিকৃতিবিসহ গ্রন্থের ছুমিকাও এর একটি অন্ততম আকর্ষণ। এতদ্বারা লেখকদের লেখার হাতের সঙ্গে সঙ্গে, হাতের লেখারও পরিচয় পাবেন পাঠকগণ।

প্রথম দিকে আই. এ. পি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের রাক্ষসের মতোই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে জিতেঙ্গনাথের প্রেরণাতেই সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হন। উক্ত সময় প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ-পাতাল' উপন্যাসখানি আই. এ. পির অন্ততম প্রথম গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা সুস্থ সাহিত্যিকগণেরই সহায়ত্ব লাভ করে এবং জয়বাংলার পথে এগিয়ে চলে। জিতেঙ্গনাথ বলেন, এই সময় তিনি বহু জনের বন্ধু ও সহযোগিতা লাভ করেন। তন্মধ্যে বীরা তাঁকে প্রথম দিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও শিল্পী অজিত গুপ্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সাপাশ্রয় করে বঙ্গবন্ধুর মতোই আই. এ. পির গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় এক শতের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গল্প, উপন্যাস ও রম্য রচনা ব্যতীত আমরা কয়েকখানির মাত্র নাট্যমেলের করলাম। যেমন বীরবলের 'বোম্বারের ত্রিকণা' রাজেশ্বরের বহুর 'বিতস্তা', প্রবোধ ঘোষের 'ভারতীয় কোলের ইতিহাস', অনাথনাথ বসুর 'মীরাবাদ', বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', প্রাণতোষ ঘটকের 'রত্নমালা', ও 'কলকাতার পঞ্চাট', গ্রামপাণ চক্রবর্তীর 'কলঙ্কারচক্রিকা', মোহিতলাল রায়চাঁদের 'সাহিত্য বিচার', অপরূপা দেবীর 'মাধব চিত্তরঞ্জন', ক্রমেঙ্গকুমার রায়ের 'এখন বাঁদের দেখছি' ধ্বংসপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা ও তাঁহারা', দিলীপকুমার রায়ের 'দেশে দেশে চলি উড়ে', দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, উমা দেবীর 'গৌড়ীয় বন্দীর রদের আলোকিকণ', নরেন্দ্রনাথ বাগলের 'ভারতে জাতিযুদ্ধ ও কোম্পানিবিচারের সূত্রাবলী'। শান্তিদেব বোম্বের ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রভৃতি।

যে সময় সাধারণ পাঠকের কাছে গল্প-উপন্যাস ও লঘু বিবরক এই অপেক্ষাকৃত বেশী সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছিল, সেই সময়ে তা ধরনের প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং প্রাচীন বিশ্বতত্ত্বের মূল্যবান গ্রন্থগুলির অনুগ্রহ করে তীক্ষ্ণবী জিতেঙ্গনাথ সংসাহিত্যের প্রচারে প্রকৃত সাহায্য করেন।

প্রকাশন বিষয়ে জিতেঙ্গনাথ দলদলির উর্ধ্বে, পক্ষপাতশূন্য। জি অপেক্ষা সাহিত্যের বিচারে, সাহিত্যকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে দেন সর্বক্ষেত্রে। সে কারণ, সর্বদলীয় সমর্থনও তিনি লাভ করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সমান বন্ধুও পেরে আসছেন।

জিতেঙ্গনাথের মতে প্রকাশকের প্রধান দায়িত্ব হল, 'স্বকটপূর্ণ

ও সারগত পুস্তক পরিবেশন করে বখাসম্ভব জাযা মূল্য পাঠকের সমুখে তা উপস্থিত করা। প্রকাশকের আর একটি দিক সম্বন্ধে জিতেঙ্গনাথ মন্তব্য করেন যে, বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তির দ্বারা পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করা প্রকাশকের কোন মতেই উচিত নয়। আর একটি দিকে প্রকাশকের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; সেটি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনের মান সম্বন্ধে পাঠকদের হাতে একটি সঠিক ধারণা জন্মায় সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখা এবং এ জ্ঞাত তদুপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করা।

দূরচেতা জিতেঙ্গনাথের একটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সত্যপ্রিয়তা। এমন কি এরোজনে অপ্রিয় সত্য ভাবশেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। উপযুক্ত উক্তিগুলির মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, সেটিই ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে।

### বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

( অবসরপ্রাপ্ত প্রধান-শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ )

জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ তাহা অসমর্থদেহী নবাব বঙ্গের বহু ব্রীহেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। নিয়মিত নৃতন নৃতন গ্রন্থ পাঠ ও নিজ পৌত্র-পৌত্রীদের পাঠন তাঁহার প্রাত্যহিক কর্তব্যবস্তু। কারণ, তিনি মনে করেন যে, মানব জীবনে শিক্ষা সমাপনের কোন সীমারেখা অঙ্কিত করা যায় না।

১৮৬৮ সালের জাহ্নুয়ারী মাসে বেণীমাধব কলিকাতার সন্নিকটস্থ হালিশহর গ্রামে এক উচ্চ বৈদিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নীক্ষাশ্রীত ঈশ্বরপুরী, সাধক রামপ্রসাদ ও



বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

“চৈতন্যভাগবত” প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্র এই গ্রামেই ছিল।

স্থানীয় পাঠশালা ও ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হালিশহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিপণ্য কলেজ হইতে বি. এ পাশ করেন। পর বৎসর তিনি বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক), অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক মম্বত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডাঃ স্যার বহুবাহু সরকার কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে বেণীমাধব তাঁহার পিতৃবন্ধু স্বব্রজ মথুরানাথ গুপ্তের গৃহে অবস্থানকালে তদীয় পুত্র বিখ্যাত সাংবাদিক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং স্বদেশসেবী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ডাক্তার সিডলিয়ার্জ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কলেজে অধ্যাপক (পরে রাষ্ট্রদূত) হরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং মনোহরনাথ গুপ্তের (স্বামী) তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

১৮৯১ সালে তিনি মজঃফরপুরে মজঃফরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত “মুখাঙ্কি সেমিনারী”তে প্রথমে শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই স্থানে তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা আইনজীবী শরৎকুমার চক্রবর্তীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। একবার জামাতৃগৃহে আগমন করিলে বেণীমাধবের বিশেষ অমুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় বিদ্যালয়ে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে উগাই “বঙ্গেশী সমাজ” নামে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ চাকলা সৃষ্টি করে। কিছুদিন পরে কবিগুরুর আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে গমন করেন এবং ভারত বিখ্যাত ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায় ও আনি বৈশাখের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগলাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ বেণীমাধব বলেন, আজ বিহারীয়া বাঙ্গালীর

বহুই বিরুদ্ধাচরণ কক্ক নাকেন, প্রান্তঃস্বরগীর ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বহুবাহু পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালীরাই তাঁহাদের আদি শিক্ষাগুরু। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই বিহারে প্রথম হিন্দী সাহিত্য রচনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

১৯০৭ সালে তদানীন্তন ডি. পি. জাট, আল’ সাহেবের সুপারিশে বেণীমাধব বাবু দ্বারভাঙ্গা সরকারী বিদ্যালয়ে ও ১৯০৯ সালে মজঃফরপুর জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে বিহার পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইলে তিনি ঢাকা সরকারী বিদ্যালয়ে বদলী হইয়া আসেন। উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। ১৯১৭ সালে তিনি বারাকপুর সরকারী বিদ্যালয়ে আগমন করেন এবং ১৯২৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন ডি. পি. জাট ও টেন সাহেব বেণীমাধবের কার্যদক্ষতাকে পুননিয়োগের জন্য তাঁহাকে বেসরকারী বর্তমান টাউন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য অমুরোধ করিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি বারাকপুর দেবীপ্রসাদ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে ৪৫ বৎসরের শিক্ষাক্রমীয় জীবন হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময় মতকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কুমুরোধে সমাজসেবী স্ব-স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান “বারাকপুর মতকুমার-সমিতি” সভাপতির পদে তিনি বৃত্ত হন। বেণীমাধবের ভূতপূর্ব ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কৃতি ও গণ্যমান্য হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আদর্শ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা অংশ অমীত হওয়া, বয়সোপযোগী উপক্ৰাস, কাব্য, নাটক, গল্প গ্রন্থের ব্যবস্থা করা, খেলা-ধূলা ও দলবদ্ধ ভ্রমণের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন করা বর্তমান শিক্ষা-পরিচালকদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

[মাসিক বহুমতীর পক্ষ থেকে কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র ও অমিয়কুমার ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত]।

### গুপ্তচরবৃত্তিতে নারী

পারদর্শিনী গুপ্তচর হিসেবে হল্যাণ্ডের মাতাহিরির নাম একদিন ছড়িয়ে পড়ছিল সারা বিশ্বে। কিন্তু তাই থেকেই সরাসরি এ বলা চলে না—গুপ্তচরবৃত্তিতে পুরুষদের অপেক্ষা নারীরাই অধিকতর লক্ষ্য ও ক্ষিপ্ত। তত্ত্বাবধীরাই বরঞ্চ বিচার-বিলম্বণ করে দেখেছেন—গুপ্তচর হিসেবে নারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমকক্ষ নয়। মোটামুটি ভাবে নারী গুপ্তচররা বার্ষিক প্রমাণ করেছে এ দাবং নিজেদের।

তবে একটা কথা ঠিক এবং সেটি বলতে হবে—নারীরা দোঁতা বা বাস্তবিকের কাজে খুবই চমৎকার। গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে দোঁতা-বৃত্তির সম্পর্ক ও যোগাযোগ একান্ত ঘনিষ্ঠ। পরন্তু এইটি স্বীকৃত

হয়ে আসছে, গুপ্তচর বৃত্তির একটি প্রধান অঙ্গই হল দোঁতা। অনেক সময় গোপন সংবাদ সংগ্রহ অপেক্ষাও দোঁতা-বৃত্তিতে অধিকতর রোমাঞ্চ লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনী রয়েছে—জর্নৈকা নারী-দূত সংবাদ বহন করে নিয়ে যায় একবার অপূর্ণ পদ্ধতিতে। যাত্রার পূর্বে সে নাকি বহনযোগ্য বার্তাটি নিজের শূণ্য পৃষ্ঠদেশে এক প্রকার অদৃশ্যমান কালিতে লিখে নিয়েছিল। আর একটি চট্টা নারী একটি পাতে জাতব্য গোপন বার্তা এমন ভাবে খোলাই করেছিল, যে-কোন আবিষ্কারে প্রয়োজন হয়েছিল কমপক্ষে দুটি বছর সময়। পুরুষদের দোঁতা সম্পর্কে অবশিষ্ট এ ধরনের নানা চমকপ্রদ কাহিনী জানতে পারা যায়।

# যুক্তি-সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজ

লেঃ এন, বি, দাস, আই এন এ

আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গী প্রয়োগ করে তার বৃদ্ধ চালাবার ক্ষমতা ভেঙ্গে দিতে পারলেই চরম বিজয় সম্ভব, সেইরূপ বিদেশী শাসকদের শক্তি পূর্বদন্ত না করতে পারলে দাস জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে। বিপ্লবীদের পক্ষে তাই একমাত্র কর্তব্য হলো বিদেশী শাসকদের শক্তি উৎসাদন করা, নতুবা তাদের বিপ্লবীদের দলে আনয়ন করা। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর উপর। কারণ, ভারতে বৃটিশ সৈন্য-সংখ্যা ছিল কম। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর উপর কড়া নজর রেখে তাই তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালিয়ে গিয়েছিল। রত দিন পর্যন্ত ভারতীয় সেনা বাহিনী ও ভারতীয় পুলিশ বাহিনী অধুগত ছিল, তত দিন ভারতে বৃটিশ শাসন নিয়ন্ত্রণ ভাবেই কায়েম ছিল, একথা ভেবেই বৃটিশ শাসকেরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর অধুগত্য বন্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা থাকত। ভারতের জন-সাধারণ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবল প্রচার-প্রচারণা থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন, তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো, যাতে তাদের দ্বারা নিজ দেশবাসীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা না সম্ভব হতো, তাদের মধ্যে জাতি ও ধর্মের বিভেদ জ্বলিয়ে রাখা হতো। ফলে নিজস্বের মধ্যে ব্যবধান বজায় থাকতো এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে কখনই সম্মুখ আন্দোলন করতে সমর্থ হতো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন ভাবেই ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরি করতো, বৃটিশ কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা ব্যতীত বৃদ্ধ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। ১৮৫৭ সালের মহান বিপ্লবের পর প্রায় নব্বই বৎসর ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে নিরঙ্কুশ ভাবে শাসন-কার্য চালিয়ে যেতে পেরেছে, তাতেই তাদের নীতির সার্থকতা প্রমাণ করে। ইহা সত্য যে, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান-রূপে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খুবই অসুবিধার পড়ে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধুগত্য ও ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করে তারা আশা করেছিল, ভারতীয় জন-সাধারণের সামান্য কিছু দাবী-দাওয়া মেনে নিলেই চলবে। মিঃ চার্চিলের মতো কয়েক জন লোক এই সামান্য দাবী মানতেও রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এমন কি ১৯৪২ সালের বিপ্লবের পরেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দস্ত কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র নেতাজী দেশের এই পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতীয় জনগণ যদি অধিকতর শক্তিশালী না হয় তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। নিরস্ত ভারতবাসীর পক্ষে এমন কোনো সমস্ত বিপ্লব করা সম্ভব ছিল না যা দ্বারা সাক্ষ্য অর্জন করা যেত এক জনগণের অভ্যুদয় ব্যতীত ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের আশাও ছিল কণ, ভারতের একমাত্র আশা ছিল, বৃটিশ যদি কোনে বিপর্যয় লিপ্ত হয় তবে যে সুযোগ বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য লাভ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা। বৃদ্ধের পরিণাম কি হয়, তার উপর নির্ভর না করেও একথা

নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, বৃদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর উপর তাদের প্রভাব হ্রাস পেয়ে যাবে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপের বৃদ্ধ আক্রমণ হবার পর নেতাজী বহুদিন আকাজক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হলো, তিনি ভারতবর্ষ থেকে পাড়িয়ে জাপানী গেলেন। এবং সেখানে জাপানীদের সাহায্যে ভারতীয় বেসামরিক অধিবাসী এবং ভারতীয় বৃদ্ধবন্দীদের সাহায্যে একটি ভারতীয় ফৌজ গঠন করলেন। এই ফৌজই ভারতের স্বাধীনতাঙ্গারের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রথম কার্যকরী অগ্রদূত। জাপানের বৃদ্ধ যোগদানের পর প্রবীণ ভারতীয় বিপ্লবী জীয়াসবিহারী বসু নেতাজীর অধুগত্য ত্যাগ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ভারতীয় বাহিনী গঠন করেন। ১৯৪০ সালে নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসেন। তখন থেকেই ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্তৃত্বধানে আসে। ১৯৪০ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। এই স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন, জাপানী, জাপান, ইতালী ব্রহ্ম, ফিলিপাইন থাইল্যান্ড, কোটিগা মাফু এবং ওয়াংটাই ওয়েইর চীন, আইরিশ নেতা ডিভালেরা এই সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকার প্রতীক্ষায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই সেনাবাহিনীর স্বাধীনতাকামী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যেক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে তোলে। বৃটিশ বাহিনীর যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে আসে তাদের মনে থেকেও বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়ে যায়, বৃটিশের প্রতি অধুগত্য সম্পূর্ণরূপে ধূসর হু হু করে। ফলে দিয়ে তারা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করল, আজাদ হিন্দ ফৌজের এটাই সর্বপ্রথম প্রকৃত জয়লাভ।

দ্বিতীয় লালকোয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বিচার আরম্ভ হয়, তার বিবরণ থেকে দু'প্রাচ্যে এবং ইউরোপে নেতাজীর অদ্বুত কর্ম-সংগঠন ও স্বাধীনতার জন্য পরম উৎসাহশীল সংগ্রামের কাহিনী জানা যায়। ইক্ষল, কোহিমা মাউনপোপ এবং ইউরোপ ও ব্রহ্মের বৃদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ বাহিনীর রক্তপাত বার্ষ হয়নি। ভারতের জনগণ সে কাহিনী পাঠ করে চক্কল হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সৈনিকেরা ভারতে সমস্ত বিপ্লবের আবেদন জানায়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি তাদের আবেদনে সে সময় কর্পণাত করতেন তাহলে দেশ বিভাগ হত না এবং আমরা দেশ বিভাগের মাণ্ডল হিসাবে রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করতাম না। যদিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সে সময়ে অস্বাভাবিক সতর্ক প্রদর্শন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহাযী সৈনিকেরা তাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য নিয়ে চুপ করে থাকতে পারলেন না। ভারতীয় নৌবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের ফলেই ইংরেজ বশতে পারলো ভারতে তাদের শাসনকাল শেষ হয়ে আসছে অন্ত্রবলে ভারতকে দমন করে রাখবার প্রচেষ্টা আর কার্যকরী হল না, তাই তারা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি আপোষ নিষ্পত্তি করলো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তা নেতাজীর আকাজক্ষিত স্বাধীনতা নয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ফলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হয়।

আলোকচিত্র

ওরা কান্না করে  
—তারাপাণ্ডা বন্দ্যোপাধ্যায়

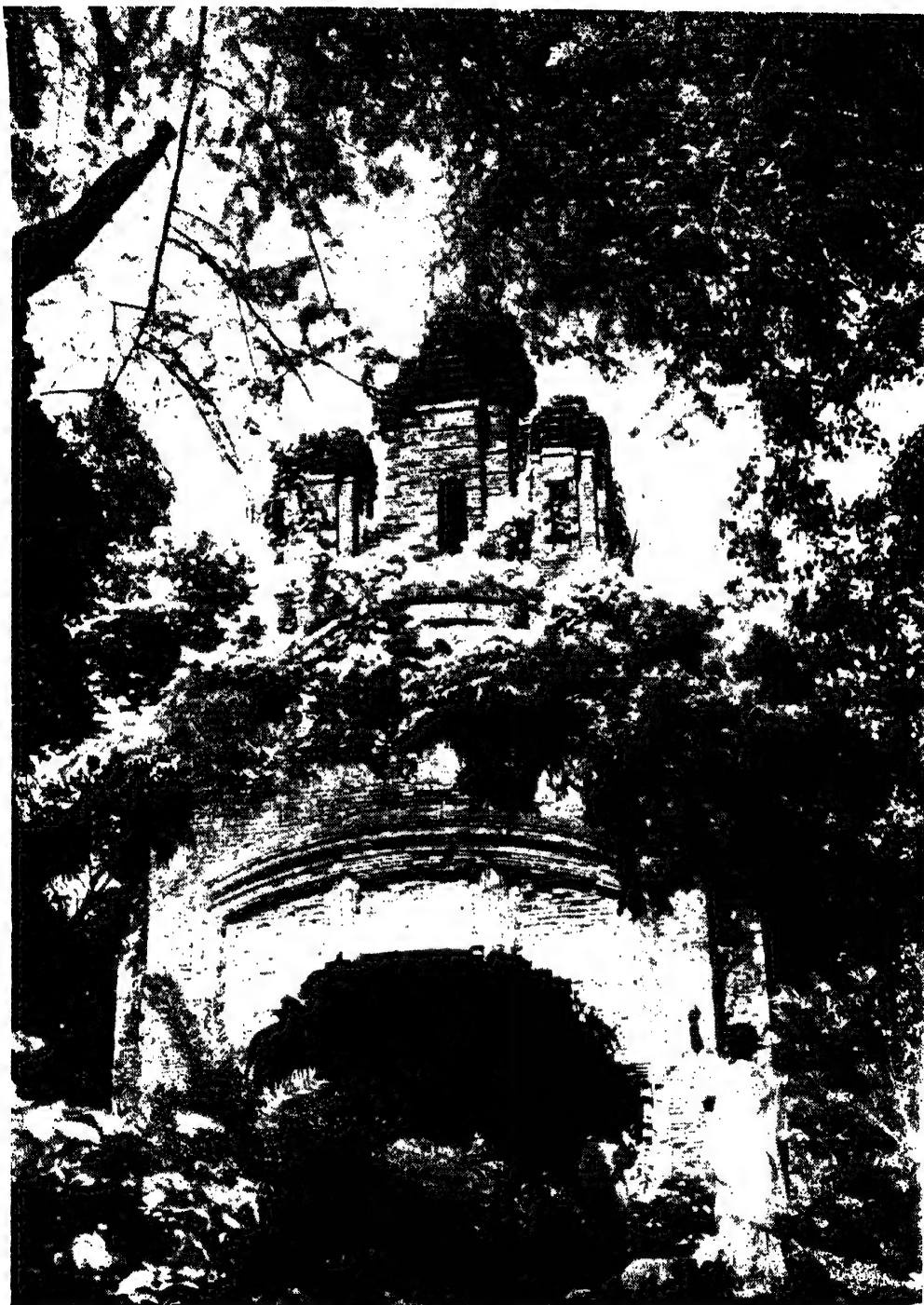


সাবধান  
—স্বপ্ন রায়



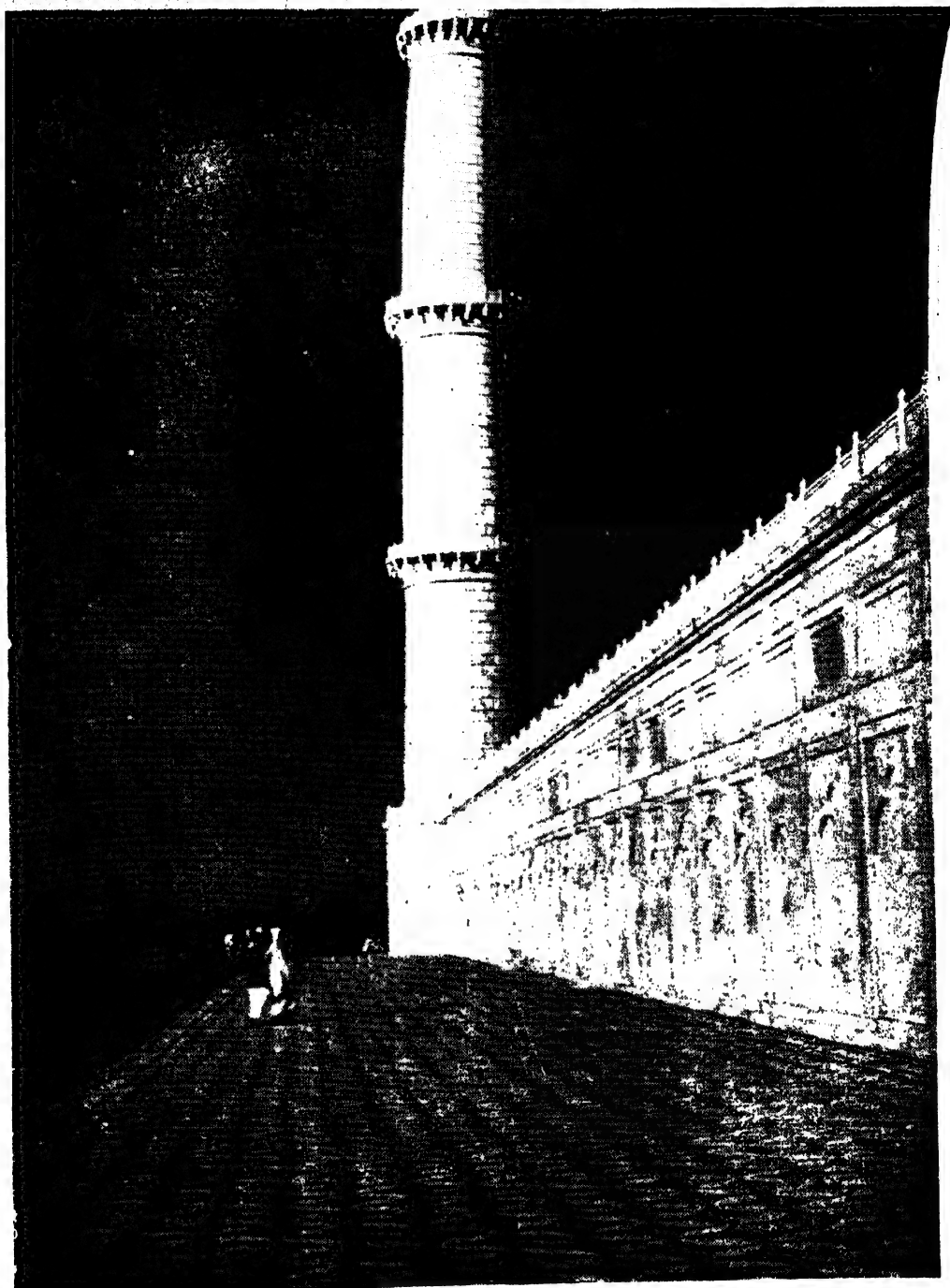
শিল্পী  
—অসীমকুমার দত্ত





ভয় দেউল

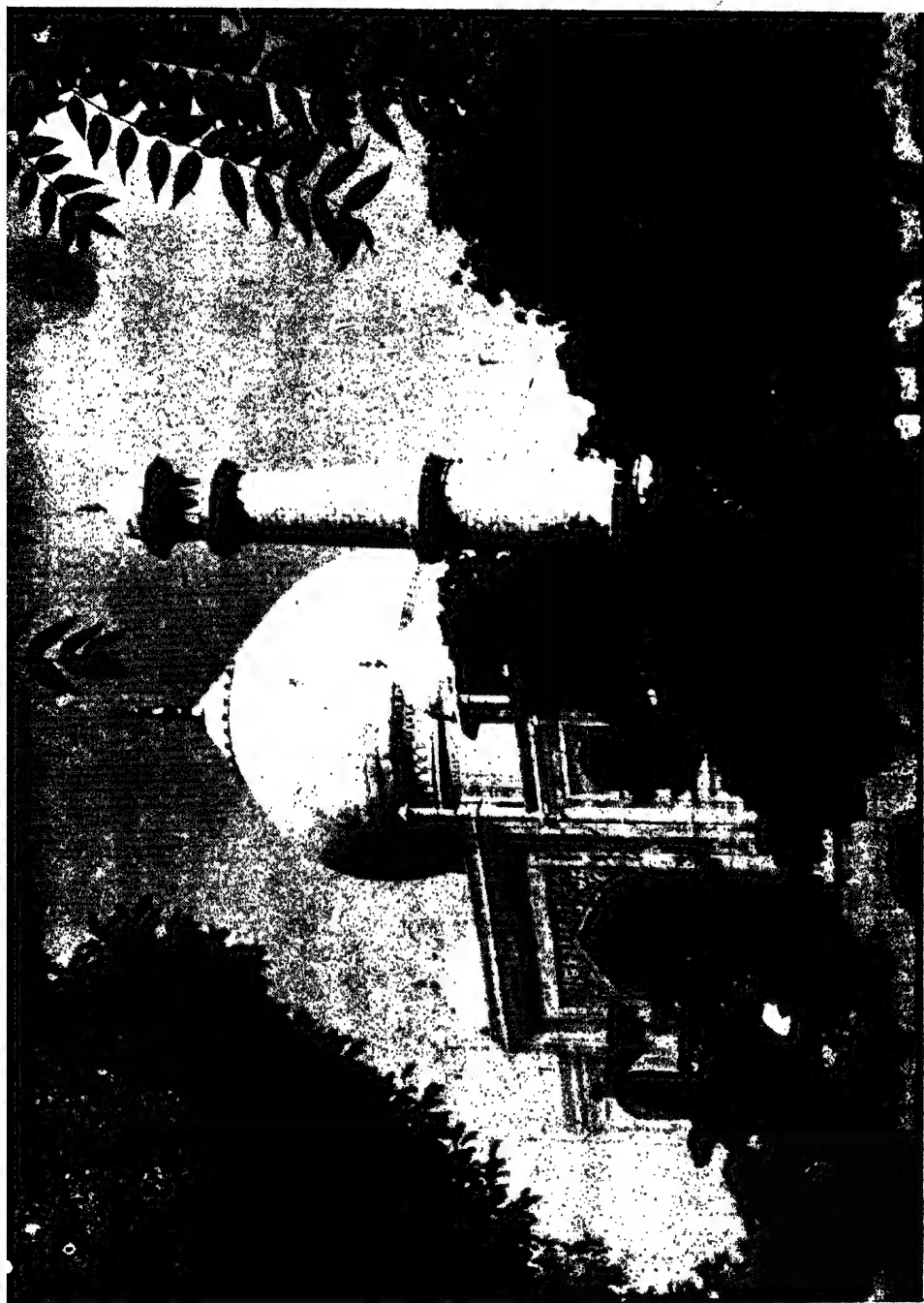
—আবুল হুসেইন



মিনার

—সত্যেন্দ্র নন্দী







# ওমদী

জরাসন্ধ

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ওমদী ভেঙ্গে গেল। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার সেই বজ্রভঙ্গার—হজের! আপাততঃ আশঙ্ক্য হলেন মহেশ তালুকদার। বাজ নয়, বাঘও নয়, তাঁরই অশ্রুগত অমৃত চাক হেডওয়ার্ডার মহাবল সিং। পরক্ষণেই আবার কপালে ফুটে উঠল চুস্তিয়ার রেখা। গুরুতর অঘটন কিছু না ঘটলে এই গভীর রাতে তার ডাক পড়েনি। জেলের সাহেবের দৃম ভাঙ্গাবার আগে জানালার শিক ভেঙ্গে উধাও হয়েছে। হয়তো কোনো খুফর দারমলি, কিংবা বারো নব্বয়ের জুয়ার আড্ডার বিড়ির বখরা নিয়ে বড়ু মণ্ডলের শীত ভেঙ্গেছে ছলিমদির ঘুসি। তাইই চমকপ্রবণ রিপোর্ট শেখ করবার জন্তে তাঁর জানালার হানা দিয়েছেন জমাদার সাহেব।

বাজুখাই কঠোর আর একটা উৎসর্গণ ঘটবার আগেই নাড়া দিলেন তালুকদার—কেয়া ছা?।

নরম সুরে জবাব এল, সেলাম হজুর, জেনানা ফাটকমে হলা হোতা ছয়।

—জেনানা ফাটকে তলা! কেন, ভাগল নাকি কেউ?

—নেহি হজুর, এক আদমিকা শকত বেয়ার ছা।

—ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

—জী হাঁ। ডাক্তার বাবু আফিসমে বৈঠল বা।

অন্তএব উঠতে হল। সুইচ টিপতেই নজর পড়ল, টেবিলের কোণে টাইমপিসটার উপর। রাত তিনটা বেজে পনর। শেষ-মাখের দুর্দান্ত শীত। ওত পেতে বসে ছিল লেপের বাইরে। বেরিয়ে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অনাবৃত সেহের উপর। আল্লা থেকে জামাটা আনতে গিয়ে চোখ পড়ল ডেসিং-টেবিলের আয়নার। নিম্নের দিকে দৃশকাল চেয়ে বইলেন জেলের সাহেব। সন্তানপ্রায়ুজ্ঞ যুবের উপর গভীর হয়ে উঠল বিরক্তির কুঞ্জন। তারপর আপা-মজ্ঞক বরাবৃত করে টেবিলের টানার ভিতর থেকে বের করলেন একটা থলে—জেনানা ফাটকের চাবির গোছা।

জেলখানার আসল প্রতীক এই তালাচাবি। কয়েকটিকে হায়েব হবার সুযোগ দাও, তার সমাধি-বেরোই মনকে কিরিয়ে আনো। সমাজ-কল্যাণের দিকে—এ সব হল কাগজত্বের কেতাবি কথা। কাজের কথা হল, তাকে আটকে রাখো। তার অপন-বসন আরাম বিয়াম

কাজকর্মের দিকে নজর দাও, আপত্তি নেই, কিন্তু সমাজপ্রতীক দুই রাখো, সে যেন না পালায়। জেলের welfareটা তোমার ভাববার বিষয়, কিন্তু ভাবনার বিষয় হল তার security.

সে কোনো একটা কারাদুর্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চার দিক ঘিরে আছে চৌদ্ধ ফুট উঁচু দুর্গত্যা পাটিল। এক পাশে একটি হাজি লৌহতোরণ। তার সামনে অহোরাত্র টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী। শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করেই নিশ্চিত হয়ে বসে নেই জেলের কর্তৃমহল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটিল এবং ব্যাপকতার তালাচাবির অবরোধ। সূর্যের পাটে বসবার আগেই সারা জেল জুড়ে শুরু হবে 'লক-আপ' পর্বের আয়োজন। মেট আর কয়েদী-পাহারার দল তাদের আপন আপন বাহিনী কুড়িয়ে এনে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে দেবে লম্বা লম্বা ব্যারাক এবং সেল ব্লকের দরজার সামনে। 'গুলতি' হবে—সো, চার, ছ, আট ... তারপর সার বেধে তারা চুকে পড়বে পূর্বনির্দিষ্ট 'নব্বয়ের' বিশাল গহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা হবে জৌহ-কপাটের বনংকার আর তাগাবজের ক্লিক ক্লিক। নিশান্তে বারো তালার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল, দিনান্তে আবার তাদের কিরে বেতে হবে সেই দুর্গবদ্ধ তালার আশ্রয়ে। অন্তঃপর 'লক-আপ' পর্বের অবসান। নিরুদ্বেগ সবল কঠে ঘোষণা করবে চাক-হেডওয়ার্ডার, সব ঠিক ছা। সেন্ট্রাল টাওয়ারের শিখর থেকে বেজে উঠবে 'তিন ঘণ্টা'র প্রতিধ্বনি—সব ঠিক ছা।

দরজার ব্লকের উপর তালার মালা ঝুলিয়ে দিয়েই কি দায়মুক্ত হলেন কর্তৃপক্ষ? না, না। এটা শুধু খুচনা। তারপর থেকে শুরু হবে তালার উপর বল প্রয়োগ। প্রহরে প্রহরে তার শক্তি পরীক্ষা করে বাবে শক্তিমান প্রহরীর দল, আর তার বিরাট চাবির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে টহল দেবে আর একদল নিশাচর। জেলকোডে তাদের নাম হেডওয়ার্ডার, সিপাই-কোডে বলে জমাদার সাহেব। কয়েকটা করে ব্যারাক বা ওয়ার্ড নিয়ে তাদের আঞ্চলিক এলাকা এবং নিজ নিজ অধিকারের প্রতিটি চাবির জন্তে তাদের জবাবদিহির দায়িত্ব। কেবল একটি মাত্র ক্ষুদ্র দাঙ্গা তাদের এলাকার বাইরে। তার নাম কিমেল ওয়ার্ড বা জেনানা ফাটক। সেখানকার চাবিগুচ্ছের নৈশ মালিক খয়র জেলের সাহেব।

মহেশের মনে পড়ল দীর্ঘ দিন পিছনে কেলে-আসা সেই সন্ধ্যাটির কথা, 'লক-আপ' অন্তে প্রথম যেদিন তাঁর হাতে এসেছিল এই জেনানা ফাটকের চাবির খলি। সে যেন তুচ্ছ একতাল্লা চাবি নয়, তার সঙ্গে জড়ানো একটি নারীর মতো পৌরষের অধিকার। আজ

থেকে প্রতিটি রাত আমারই হাতে ভক্ত হল করেকটি অসহায় বন্দিনীর মান, সম্ম, নিরাপত্তা, আমারই উপরে তার। একান্ত নির্ভর—এমনি একটা পুলকময় অহুত্বের মুহূর্ণশ চরিতো সেগেছিল তার সেদিনের তরুণ মনে,—তুলেছিল একটুখানি মিষ্ট স্রবের গুঞ্জরণ। তারপর এক দিন কখন তার শেষ রেশটুকও কোথার মিলিয়ে গেছে! আজ এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে ঐ সঠনধারী বড় জনাদায়ের অমুসরণ করতে গিয়ে চকিতে মনে হল সেইদিনকার কথা। এক বলক কোঁচুক-হাসির মুহূর্ণশ গোফের কোণ ছুটো নড়ে উঠল।

এত রাতে হঠাৎ রিপোর্ট পেয়ে জেলের সাহেবের মনে যে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছিল, জেনানা কাটকের কাছাকাছি আসতেই সেটা মিলিয়ে গেল। তুল করেছে জমাদার। এ হঠাৎ নয়, নারীকঠোর কল-কাকলী। সুরসিক বলে বিখ্যাত পুরুষের খ্যাতি নেই। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তিনি রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নারী জাতির বাগ্মন্ত্রে বেগ দিয়েছেন অপরিমেষ, কিন্তু ব্রেক নামক কোনো বলগার সংযোগ করেন নি। তাই দেখা যায়, স্বাভাবিক লর্শন মার্কেই তারা পুলকিত, তবু হঠাৎ গুটন, এবং যুগোবহী হলেই খুলে যায় যুগের জর্জল। তারপর সেই বুদ্ধ দ্বারপথে যে ঝটিকা-প্রবাহ ছুটে চলে, তাকে রোধ করতে পারে, ন্যায় এমন শক্তি নেই। যে-কোনো নারীসমাবেশে গিয়ে দেখুন, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। রেলের জেনানা কামরা থেকে, লেডি-হটেলের কমন রুম, পল্লীপুকুরের স্নানের ঘাট থেকে মহিলা-সমিতির বাৎসরিক সম্মেলন—সর্বত্র এই একই দৃষ্ট। সকলেই বক্তা, অভাব শুধু শোতার। জেলের পাঁচিলের মধ্যে বসে নারী অনেক কিছু তুলে থাকতে পারে, কিন্তু এই সনাতন জাতীর বৈশিষ্ট্য হারাতে পারে না।

কম্পাউন্ড-সেট খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই কানে গেল কিমেল-ওয়ার্ডার হুশীলা হস্তের চঞ্চল ধমক। কোলাহলের সুর নেমে গেল কিন্তু গতি বন্ধ হল না। জেলের এবং জেলডাক্তার সলবলো ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে পঁজালেন। দরজার তালা খুলতেই কিপ্রগতিতে এগিয়ে এল একটি মেয়ে। ডোরাকাটা জেলের সাজীখানা শক্ত করে কোমরে হুকানো। সর্বাঙ্গে একটি অনাড়ম্বর সহজ ভঙ্গী, তৃতীয় শ্রেণীর জেনানা কাটকে যেটা স্থলভ নয়। ডাক্তার সিঁড়ির গোড়ার এগিয়ে যেতেই সে বাধা দিল।

একটু পরে উঠেবন, ডাক্তার বাবু। দরজার সামনেটা নোংরা হয়ে আছে। এখনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। হুশীলার উদ্দেশে চিড়িয়ে বলল, আরি বাচ্ছি, মাদাম। বলেই, তর-তর করে সিঁড়ি করে নেমে এল এবং জমাদারের দিকে চেয়ে বলল, আলোটা একটু ধরবেন, জমাদার সাহেব। বড় অন্ধকার।

জমাদার আলো নিয়ে গেল ওর সঙ্গে। ওয়ার্ডের পেছনে বতরুণ ওরা অকৃত হয়ে না গেল, তালুকদার নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিজ্ঞানসূচী ফেরালেন হুশীলার দিকে। হুশীলা প্রায়টা খুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ওর নাম হেনা। কবিরপুর জেল থেকে চালান এসেছে।

সহেপ দ্রুত কৃত করে বললেন, কদিন ?

—জা, দিন পনের হবে।

—কোথেকে বলে তো মনে হয় না।

হুশীলা মুহূর্ণশে বলল, দেখেছেন বৈ কি ? কোই হৈ তো থাকে নম্বর খোঁসার সময়। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি।

জেলের বিমোহন হলেন। লক্ষ্য না করবার মত মেয়ে তো নয়! তবে এ হয়তো সেই জ্বাতির, চিবদিন দ্বারা ভিত্তির মধ্যেই থাকে, শুধু প্রবেশজনের দিনে বোঝা যায় ভিড় থেকে তারা আলাদা।

মিনিট চারেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। এক হাতে খাঁটা, আর এক হাতে মস্ত বড় জলের বালতি। আর একবার হুশীলার স্বাক্ষর শোনা গেল, 'বলি, তোদের কি সব হাতে-পায়ে থিল ধরেছে। ঐ একটা মাহুশ কত করবে, শুনি?' একটা চাপা গুঞ্জন উঠল মেয়েদের দলে। দু'-এক দল উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু এগিয়ে আসবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক হেনার পাশে এসে বলল, 'খাঁটাটা আমার হাতে দাও, দিমিমাশি। তুমি ওদিক থেকে জল ঢালো।' সঙ্গে সঙ্গে নাকে কাপড় দিয়ে টেঁচিয়ে উঠল, আপনারা সব সরে যাও বাবুয়া—'তুমি শারবে না, কাম্বর মা,' বাধা দিয়ে বলল হেনা। আমি চট করে ঘুরে দিচ্ছি। তুমি বর: কিনাইলের টিনটা নিয়ে এসো। ঐ কোণে আছে।

কয়েকটা লখা টান দিয়ে সিঁড়ির মুখে থানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে খাঁটা এবং বালতি নিচে নামিয়ে রাখল। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আসুন। অনেকক্ষণ আপনাদের কষ্ট দিলাম ঠাণ্ডার মধ্যে।

ডাক্তারের পিছনে তালুকদারও সিঁড়িতে উঠবার উত্তোষ করছিলেন। হেনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আর নাই বা এসেন শ্রম, এই সব অসুখ-বিসুখের মধ্যে। তার চেয়ে বর: আমাদের ঐ খাঁটিন ঘরের বারান্দায় গিয়ে ঝাঁড়ান। বড় হিম পড়ছে। ঘরে চুকেই হুশীলাকে ফিস ফিস করে কি বলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তাড়াতাড়ি নেমে এসে ওয়ার্ড-মেডের ভিতর থেকে একটা মোড়ি বের করে জাঁচল দিয়ে মুছে পেতে দিল বারান্দায়। তারপর জেলের সাহেবের কাছে গিয়ে নির্দোষ বিনয়ের স্তরে বসতে অহরোধ করল। তালুকদার কোঁচুক দৃষ্টিতে হুশীলা জমাদারদ্বার ঐ সিংহাসনটির দিকে তাকালেন, এবং কোনো উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে সেটি গ্রহণ করলেন।

ডাক্তার বসে তরুণ। জেলের চাকরিও বেশি দিনের নয়। তখনো পুরোপুরি জেল-ডাক্তার হয়ে উঠতে পারেননি। বোগীকে হোগী বলেই দেখেন, কয়েদী বলে নয়। মিনিট দশেক পরে দ্বারের নলটা গলার কুলিয়ে স্বন বেরিয়ে এলেন, হেনাকেও তার পাশে দেখা গেল। বলতে বলতে আসছে, বোধ হয় তাঁর কোনো প্রব্রের উত্তরে, না; বস্ত্রবহি এর আগে আর হয়নি। অব্রটা চলছে বেশ কিছুদিন থেকে; তার সঙ্গে কাশি, রাত্তিরে রাত্তিরে ঘাম, তার পরেই ভীষণ দুর্বলতা, সবই আমি, আপনি আসার আগেই জিজ্ঞাস করে করে জেনে নিয়েছি।

—অবচ, এত দিন আমাকে কিছুই বলেনি, বিরক্তির স্তরে বললেন ডাক্তার।

—আপনাকে বলেনি, তার কারণ আছে।

—কী কারণ? সাগ্রহে দৃষ্টি মেলে চাইলেন ওর মুখের দিকে।

তেরদিন ছয় গাভীর্ষের স্তরে বলল হেনা, যদি ভাত বন্ধ করে দেন। ভাত, বলে হেসে উঠলেন ডাক্তার। পাশে যে দাঁড়িয়ে তার

চোখে-মুখেও ছড়িয়ে গেল সে হাসির ছোঁয়াচ। তারই উপর কারেক জনের দৃষ্টি স্পর্শ অনুভব করে চকিতে চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি।

কাছে এলে লঠনের আলোয় তাঁর এই নতুন কয়েদীটিকে আর একটি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন জেলের সাহেব। বাইশ-তেইশ বছরের শ্রামবর্ণা মেয়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে তার নিখুঁত দেহবিন্যাস। প্রতিটি অঙ্গ এবং তার প্রতিটি রেখা ও কোণ যেন কোনো নিপুণ ডাঙ্করের সহজ সাংনার ফল। বাহুল্য নেই, নেই কোনোখানে এতটুকু অগুণ্ণতা। সব মিলিয়ে একটি অমূখ্য শিল্পসৃষ্টি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন তালুকদার। নাতিপ্রশস্ত কপালের নীচে মমতা-ভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ। স্তম্ভিত নিটোল দুটি গণ্ড; আলগোছে নেমে এসে মিলে গেছে চিবুকের রেখার। পাতলা টেট দু'খানিতে মাথুয়ের সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তিত্ব।

কী দেখলে? ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তালুকদার।—একবার না করে ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাহলেও ওখানে রাখা চলবে না। সবিয়ে দেওয়াই দরকার। রক্ত-টুকু দেখে সবাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। বেশ তো; হাসপাতালে নিয়ে যাও।

সাধারণ ওয়ার্ড থেকে খানিকটা দূরে কম্পাউণ্ড-পার্চিসের গা বেঁসে এক রাশ নেবুগাছের খোপের আড়ালে একখানা মাত্র ঘর। দেইটাই কিমেল হাসপাতাল। ডাক্তার একবার সেদিকে চোখ বুজিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে তো যাবো। কিন্তু একটা মুখিল আছে।

—কী মুখিল?

—একা-একা কিছুতেই যেতে চাইছে না।

—একা যাবে কেন? উত্তর দিল হেনা। আমি থাকবো ওর কাছে।

—আপনি! হেনার সর্বাগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কপাল কুণ্ডিত করলেন ডাক্তার। মাথা নেড়ে বললেন, উহঁ।

দেহের চার দিকে আঁচলখানা আরো খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে হেনা যুহু হেসে বলল, কেন? পারবো না ভাবছেন? খুব পারবো।

—পারার কথা হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ডাক্তার। তারপর জেলের সাহেবের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, এ রোগের সব চেয়ে সহজ শিকার হচ্ছে যৌবন। কসু করে ধরে কেলেতে পারে।

—পোকাগুলো তো বেশ রসিক দেখছি, যত্নব্যব করলেন তালুকদার। তোমরা এদের খালি খালি নিলেক করে বেড়াও।

ডাক্তার হেসে উঠলেন। ঠিক তখনই ওরার্ডের ভিতর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেল। হেনা ছুটে চলে গেল। ডাক্তারও তাকে অহুসরণ করলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, শব্দই করবার বিশেষ কিছু নেই। কাশিতও রক্ত বসেছে, ঘাঘ্রামটা কাল সকালেই নিতে হবে।

জেলের বললেন, সর্বাধার ব্যবস্থাও কাল সকালেই করো। এত রাতে টানা-ইন্ডেক্স শ্রবণে হবে না। ঘরটাও একটু কেড়ে-পুঁছে গোছগাছ করে নিতে হবে। এ্যাখিনি খালি পড়ে আছে।

একটু থেমে, স্ত্রীলার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন,

ঠিক খালি বোধ হয় নেই। কারো কারো দিবানিন্দা ডিউটি বোধ হয় ওখানেই সেবে নেওয়া হয়। কি বল জমাদার?

মহাবল সিংএর জমকালো গৌফের নিচে চকিতে একটা হাসির বিলিক খেল গেল। নিজের মুখে নিজের নাম উল্লেখ মাত্র বৃত্ত টুকে অ্যাটেনশন হয়ে পীড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভী, হজুর!

—বেশ, তাহলে এবার চলো, ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন তালুকদার, যে রকম ঠাণ্ডার বহর, আর কিছুক্ষণ এই খোলা বারান্দায় বায়ু সেবন করলে আমাদেরও তোমার হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হবে। বলে, মাফলারের উপর ওভার-কোটের কলারটা আর একটু তুলে দিয়ে জমাল বের করে নাক বাড়লেন।

স্ত্রীলাকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সেবার পর বাবার ভক্ত পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হেনা ছুটে এসে বলল, রোগীর সঙ্গে আমিই থাকবো তো?

ডাক্তারের মুখ গভীর। সেদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, তালুকদার, যোগটা তো ভাল নয়, দেখতে পাচ্ছ। ষাঁটাখাঁটি করলে বিপদ ঘটতে পারে।

হেনা কিছুমাত্র দমে না গিয়ে যুহুকণ্ঠে বলল, সে বিপদ তো সবার বেলাতেই আছে।

—তা আছে; কিন্তু তোমার এই বয়সে আর সম্ভাবনা একটু বেশী।

—তা হোক; আমিই ওর দেখা-শুনা করবো। আপনি বলে দিয়ে যান।

জেলের দ্বিধে পীড়ালেন। অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখের চেহারা ঠিক দেখতে পেলেন না। বিমিত হলেন ওর কণ্ঠের দুঢ়তার। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে সহজ ভাবেই বললেন, বিপদ আছে জেমেও এত বড় ব্যক্তি তুমি নিতে চাইছ কেন?

হেনা জবাব দিল না। নতমুখে পীড়িয়ে আঁচলের কোণে আঙল জড়াতে লাগল। মহেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তুমি ওরার্ডে যাও। হাসপাতালে কে থাকবে, কাল সকালে আমরাই স্থির করবো।

—আপনারা হয়তো জানেন না, দুখ তুলে যুহু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু আমি জানি, এখানে আর বারায় রয়েছি তাদের সবারই ঘর-সংসার আছে, আপনারা ভন আছে; একদিন তাদের কাছে ফিরে বাবার আশা রাখে। তারা এ ব্যক্তি নেবে কেন? আপনি হুকুম করলে অবিভি না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

একজন সাধারণ মেয়ে-কয়েদী জেলের সাহেবের সামনে পীড়িয়ে তার মুখের উপর তর্ক কার যাবে, মহাবল সিং জমাদার কিংবা স্ত্রীল জমাদারবীর পক্ষে সেটা অবদার করা সহজ নয়। প্রথম দিন যত্ন থেকেই ছটকট করছিল। বিতর ব্যক্তি আর থাকতে না পেয়ে কী একটা বলে উঠতেই, হাত তুলে খামখে দিলেন তালুকদার। তারপর তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কোন্টা ঠিক আর কোন্টা ঠিক নয়, সে বিবেচনার ভার আমাদের। তবু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো। অজ সবার বেলায় যে বাবার কথা বলছিলে সেটা কি তোমার বেলায় নেই? তোমাকেও তো একদিন কবে ফিরে সঙ্গারের ভার নিতে হবে।

হেনা যুহুর্ন্ত কাল কী জেবে নিয়ে বলল, না; সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

নিভান্ত সহজ স্বর। তবু কিছু একটা ছিল তার মধ্যে, বহুদর্শী জেলর মতেন তালুকদারের কটিন অস্ত্রেরও তার ছোঁয়া লাগল। এই আশ্চর্য মেয়েটির পূর্বজীবনের কোন ইতিহাস তাঁর জানা নেই। চোখের উপর যেটুকু দেখলেন তার থেকেই মনে হল, এই বয়সে সমস্ত জেনে-গুনেও এই যে নিশ্চিত বিপদের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়া, এর সবটুকুই বোধ হয় পরোপকারের প্রেরণা নয়।

জেলর সাহেবকে নিরুত্তর দেখে হেনা যেন উৎসাহিত হতে উঠল। ছুটে গিয়ে ওয়ার্ডের ভিতর থেকে নিয়ে এল তার কয়েদী টিকেট। ঠাঁর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, তাহলে লিখে দিন। সুকীলা ধমকে উঠল, পাগল হলি না কি তুই? এটা কি ঠাঁর খাটিনি পাশ করবার সময়? দে, আমাকে দে টিকেট।

—আপনি খায়ুন তো মাসোমা, খানিকটা আদারের সুরে বলল, হেনা। এখন না করিয়ে নিলে কাল ঠাঁর মনে থাকবে কি না! এদিকে আবার বাগড়া দেবার লোকের তো অভাব নেই, বলে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। তালুকদার হাত বাড়িয়ে টিকেটখানা নিলেন ওর হাত থেকে। নিজের অজান্তাসরেই যেন চমকে উঠলেন যখন নজর পড়ল অপরাধের ধাণটার উপর। এই মেয়ে খুন করেছিল! বিব' খাইয়ে। কাকে? কেন? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। এই সামান্য ব্যাপারের বিষয় তাঁর শোভা পায় না। তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কত লত বার নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন জেলর সাহেব। উত্তর পাননি। এ এক আদি-অন্তহীন আদিম রহস্য। এমন আরো কত দেখেছেন তিনি। দিবিয়া স্বাভাবিক মায়ূব। কথার-বার্তার, চোখার হাব-ভাবে অঙ্গ দশ জনের মত। কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। হঠাৎ টিকেট উন্টে দেখা গেল, ঐ অতি সাধারণ হাত দু'খানা নয়রক্তে কলঙ্কিত। টিকেট যে দেখেনি, তার কাছে সে পরিচয় হয়তো কোনো দিনই প্রকাশ পাবে না। তবু দাগ থেকে যায়। অঙ্গ সকলের অলক্ষ্যে হয়তো শুধু তার নিজের বুকের মধ্যে একটা মসৌখে সে বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। এই খুনি মেয়েটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তালুকদার। খুঁজতে চেষ্টা করলেন সেই মুহূর্তহীন কালো ছায়া। কিন্তু ঐ প্রশান্ত চোখ দুটির মধ্যে তার কোনো আভাস চোখে পড়ল না। মনের মধ্যে জেগে রইল শুধু সেই সমাধানহীন চিরন্তন প্রশ্ন—এ কেন্দ্র করে সস্তব? একদিন যেহাত একজনকে প্রাণ নিয়েছিল, আজ সে আর একজনকে প্রাণ দেবার জন্তে ব্যাকুল। বিনাযুগ্মে নয়, নিজের প্রাণের বিনিময়ে। এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে তো কোনো কীকি নেই?

বুকপকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে বললেন তালুকদার, তোমার কথা আমি রাখলাম। কিন্তু আমার একটা কথাও তোমাকে দাখতে হবে।

—কী কথা বলুন? আপনি বা হুকুম করবেন, আমি আনন্দে মাথা পেতে দেবো।

—বংশ; কিন্তু আজ নয়, তার সময় একদিন আসবে। সেই দিন তোমাকে জানাবো।

এইটুকু বলেই সেট টিকেটের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখে গিলেন, Sick Attendant, T. B. Ward. বন্দারোগীর নামের পরে বহাল হল হেনা মিত্র।

জেলর সাহেবের হাত থেকে টিকেটখানা ফিরে পাবার পর সেই লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হেনা। তার পর সেটা বুক চোপে ধরে বসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। হাত দু'খানা পায়ের ঠিকরে মাথার রাখল। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে যখন মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে, সবিস্ময়ে দেখলেন তালুকদার সেট চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ ফেয়ালেন। মনে হল ঐ শিশির বরা তামসী রাত্রির সঙ্গে এই অক্ষসজল তামল মুখখানার কোথায় যেন একটা মিল আছে!

পরদিন ভোর থেকেই হেনার কাজ শুরু হয়ে গেল। কোমরে অঁচাল জড়িয়ে ধরে-মুছে ঘসে-মেজে ঝকঝকে করে তুলল সেই নেবুতলার ছোট্ট হাসপাতাল। আরো দু'তিনটি মেয়েও খাটল তার সঙ্গে। মেট্রন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দু'খানা লোহার খাট, দু'সেট আনকোরা নতুন গদি, বালিশ, চাদর, মশারি। সব সাক্ষিয়ে গুলিয়ে পরিপাটি করে বিছানা পেতে বোগীকে শুইয়ে দিল জানালার ধারে। বেড-সাইড টেবিলটাও গুছিয়ে স্কেল। সেখানে রইল টেম্পারেচার চাট, থার্মোমিটার, থার্মোমিটার পাত্র এবং আর সব টুকটাকি। একটা মাটির সরা আনিয়ে, তার মধ্যে কয়লা জ্বালে, খানিকটা বুনা ছিটের বসিয়ে দিল খাটের পাশে। শুগন্ধ ধোঁয়ার স্বর ভরে উঠল।

গোছান-পর্ব শেষ হলে সকাল সকাল স্নান সেরে নিজের হাতে সাজিমাটি নিয়ে কাচা 'ফিমেল-কুর্জার' উপর গোবাকটা শাড়িখানা জড়িয়ে এক রাশ ভিজ় চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, সবে এসে বসেছে বুড়ীর খাটের পাশে বাবা ছোট টুলটিতে, এমন সময় ডাক্তার এসে পড়লেন। চার দিকটা একবার চোখ বুলিয়ে, তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র অব্যয়—বাঃ! তার পর ওর দিকে যখন চোখ ফেয়ালেন, সে চোখে কিছুক্ষণ আর পলক পড়ল না। হেনার মুখের উপর ছড়িয়ে গেল এক কলক আয়ত্ন আভা। সেইটাই বোধ হয় লুকাবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে থার্মোমিটারটা ঝাড়তে শুরু করে দিল। ডাক্তারও ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছেন। হেসে বললেন, আপনাব হাতে দেখছি বাত্ব আছে। এই সব তুচ্ছ জিনিষগুলো অঙ্গ হাসপাতালেও তো দেখেছি; কিন্তু—হঠাৎ বুড়ীর দিকে নজর পড়তেই সুর বদলে গেল, এই যে, আমার পেসেন্টও দেখছি বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। কেমন আছ, কি নাম যেন তোমার?

হেনা হেসে ফেলল, এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? ওর নাম মোনার মা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোনার মা। কেমন লাগছে আজ?

বুড়ী স্নান হেসে বলল, ভাল আছি, বাবা! আমার মা রয়েছে কাছে, আর আমার ভয় নেই।

বেশ, কই দিন থার্মোমিটার। হেনার দিকে হাত বাড়ালেন বুড়ী বলল, হ্যাঁ বাবা, আমার মাকে এখানেই থাকতে লেবে তো?

—কেন, একলা থাকতে পারবে না?

—একলা! না, বাবা! তাহলে আমি করেই বাবো, বর

কম্পিত হাতখানা দিয়ে হেনাকে ধরে ফেলল, বেন এখনই কেউ তাকে নিয়ে চলে বাসছে। হেনা সেই হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। মাথা নেড়ে বলল, দেখলেন তো?

ডাক্তারের মুখেও যুধু হাসি ফুটে উঠল। বুড়ীকে আশাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে একলা থাকতে হবে না। উনিও থাকবেন তোমার ঘরে।

রোগী দেখা হয়ে গেলে নার্সকে দু'চারটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বাবাক্সার সিঁড়িতে যেমনি পা বাড়িয়েছেন ডাক্তার, হেনা এগিয়ে এসে গভীর মুখে বলল, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, জানতে পারি এ ঘরে পোস্টেট আপনার ক'জন?

উনি প্রকটা হঠাৎ ধরতে পারলেন না। বললেন, কেন?

চোখের ইস্যাবায় দ্বিতীয় দফা খাটবিহানা দেখিয়ে দিয়ে তেমনি জাবাই বলল হেনা, ওদল কার জন্তে?

ডাক্তার হাসলেন, সেটা এখনো বুঝতে পারেননি?

—পারলে আমার জিজ্ঞেস করবো কেন?

—ঐ বিছানাটা বার জন্তে, তিনি আমার পোস্টেট নন। তবু পোস্টেটের চেয়েও তার ওপর বেশি নজর দিতে হয়।

—কিন্তু সে যে তা মোটেই চায় না।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। পূর্ব দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর নাসের দিকে। তারপর বাগটা ভুলে নিয়ে বললেন, দেখুন, সন্সারে যাব যা পাওনা, তা সে পাবেই। না চাইলেও পাবে। তা নিয়ে ব্যগড়া করে লাভ নেই।

—কিন্তু, এগুলো তো সত্যিই আমার পাওনা নয়, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমি সাধারণ কয়েদী। বিছানা বলতে আমার প্রাপ্য শুধু দুটো কবল।

—জানি। সে সব জেনেই একটা জিনিষ আপনাকে পাঠানো হয়েছে।

—কেন?

—কেন আবার কি? এই টি বি রোগীর ঘরে শুধু দুটো কবল বিছিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে পারবেন?

—কেন পারবো না? অজ্ঞ সবাই যদি পারে আমিও পারবো।

—আপনি পারলেও, আমি তা দিতে পারি না। বলে আর কোনো প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লেন। হেনা করেক মিনিট শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন, আবার কী হল?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন না?

—আপনি আমাকে 'আপনি আপনি' করেন কেন? আমরা সাধারণ কয়েদী। অজ্ঞ সব বাবু, সিপাই, জমাদার সকলেই তো আমাদের 'তুমি' বলে থাকেন।

ডাক্তারের দৃষ্টি গভীর হয়ে এল। সমস্ত মুখে ঘনিয়ে এল গাভীরের ছায়া। তারপর অনেকটা বেন আপন মনে বদলেন, সকলের চোখ ভেে সমান নয়। কেউ যদি মনে করে, সাধারণ

কয়েদী এই কথাটার মধ্যেই একজনের পরিচয় শেষ হয়ে যায়নি, তাতে আশস্তির কী আছে? মানুষ কি সব সময়ে নিজেকে দেখতে পায়, না বুঝতে পারে হেনা?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডাক্তার বীরে বীরে চলে গেলেন। কিন্তু আরেক জনের পা দু'টো বেন অচল হয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অতিভুতের মত। ইতিমধ্যে সুশীলা কখন এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, টের পারিনি। হঠাৎ চমক ভাঙল তার ডাক শুনে, এখানে কি করছিল? ও মা, চোখ দুটো যে ছলছল করছে। জর-টর হয়নি তো? দেখি, বলে কাছে এসে কপালে হাত রাখল। আশ্বাসের স্বরে বলল, না, গা তো দেখছি ঠাণ্ডা।

মুখে একটু স্থান হাসি 'টেনে এনে হেনা বলল, আমি কি কচি খুঁকী, মাসীমা, যে জর হলেও বুঝতে পারবো না? কিছু হয়নি আমার।

—না হলেই ভালো, বাপু। কৌৎসের মাথায় কাণ্ড তো একটা বাঘিয়ে বসলে। এখন বিপদ-আপদ না ঘটলেই বাঁচি। কী দরকার ছিল ঐ ঘাটের মড়াটাকে আগলে রাখবার? ব্যারাম হয়েছে, বুঝক সবকার, বুঝক জেলখানার বাবু। তোর কি? কোন্ সাত পুরুষের কুটুম ঐ বুড়ী, যে ওকে বাঁচিয়ে না তুললে আর চলেছে না? তোর যদি কিছু ছু, তখন দেখবে কে, শুনি?

হেনা কিম্বদিকি করে বলল, অজ্ঞে মাসীমা! শুনতে পাবে যে?

—শুধুক গে। ভারী বয়ে গেল আমার? না বাপু, এসব আশিখোতা আমার ভালো লাগে না। আর জেলের বাবুর আঙুলটাই বা কী বকম! একজন চাইলো বলেই কি তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হবে? কেন, বন্ধারোগীর জন্তেও তো হাসপাতাল আছে। পাঠিয়ে দাও না সেখানে?

—তাই হয়তো দিতেন, বীরে বীরে করণ কর্তে বলল হেনা, তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু দয়া হল। তাই এক কালে আমাকে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুশীলা অলে উঠল, দয়া। এব নাই হল ওর দয়া।

—হ্যাঁ, মাসীমা। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ঐ শুভুন, বুড়ী আবার কাশতে শুরু করেছে। আমি বাই... বলে হাসতে হাসতে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকল। সুশীলা মুখখানা বিকৃত করে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে চলল খাটনি ঘরের দিকে।

এর পর ক'টা দিন কেটে গেল রীতিমত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। একজের কটো তোলার জন্তে মৌনার মাকে পাঠানো হল বাইরের সদর হাসপাতালে। রিপোর্ট আসবার পর বিশেষজ্ঞ এলেন। জেলের বড় সাহেব একাধারে সুপার এবং মেডিক্যাল অফিসার। তিনিও একদিন এসে বেবে গেলেন। কাজের স্বত্রে ডাক্তারকে একদিন অনেকখানি বেশি সময় কাটাতে হয়েছে রোগীর ঘরে। হেনাকেও থাকতে হয়েছে তাঁর হাতের কাছে। কখন কি চাই, কখন কি করতে হবে। কাজকর্মের মধ্যে কত বার দু'জনের চোখোচোখী হয়েছে, পাঁড়তে হয়েছে একে অজ্ঞের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়া লেগেছে আঙুলের, একজনের দেহে লেগেছে আরেক জনের নিঃশ্বাস। অকস্মাৎ হেনার বুকের মধ্যে ঢেঁল হয়ে উঠেছে রক্তশ্রোত, কখনো আবার অলপ হয়ে এসেছে হাত দু'টো। কিন্তু এই অসদৃশ ছন্দাভঙ্গ্য তার কাছে এতটুকু প্রেরণ পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহা চিন্তকে চোখ

বাড়িরে শাসন করেছে। নিজেকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে নিরলস সেবার মধ্যে।

কয়েক দিন পরে সকাল সাড়ে আটটার বখারীতি মৌলী দেখতে এসেছেন ডাক্তার। বুড়ীর মুখে খানসামিটার দিয়ে অপেক্ষা করছেন। হেনা সেই ঝাঁকে ভাড়াভাড়ি ঘরটা গুড়িয়ে ফেলছিল। তার পর বোণীর বাসি কাশড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে খাবার জন্তে পা বাড়াতাই ডাক্তার বললেন, শোনো। হেনা কিরে পাঁড়াল। চোখে পড়ল দু'টি একান্ত সুন্দর চোখ। মনে হল শুধু এই দু'দুর্ভে নয়, এতক্ষণ ধরেই বোধ হয় তারা তাকে অলসরণ করেছে। নিজের অজান্তে বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। দেহটাও কেমন আড়ট হয়ে এল। বুকের কাপড়খানা টেনে দিয়ে বলল, কি লসছেন? ডাক্তারের মুখে সলজ হাসি। অপ্রতিভ হয়ে বললেন, না, থাক।

—কিছু চাই কি?

—না; দেখছিলাম, তুমি বখন ছুটোছুটি করে কাজ কর, ভারী আশ্চর্য লাগে। কেমন একটা হৃদয় ছন্দ আছে তোমার চলাফেরার মধ্যে।

—এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম, কী না জানি দরকারী কথা। আরো একটা কি বলতে বাঞ্ছিনে ডাক্তার। হেনা বাধা দিয়ে বলল, ও মা, ও করছেন কি? আর কতক্ষণ জিত বার করে থাকবে বেচারা! গুটা তুলুন, তার পর না হয় ছন্দ দেখবেন বলে বলে। বলেই বেরিয়ে গেল তখনই দ্রুত ফুলে।

বাইরে গিয়েই থমকে পাঁড়াল। এ কী করল সে! স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে এল, ঠিক ঐ দ্রুতত্বকে সে মনে মনে উপভোগ করেছে, ভালো লেগেছে তার মিষ্টি স্বাদ। বাইরে যে ভাবই দেখাক, খুশী হয়েছে তার অন্তর। ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে। তার একমাত্র কর্তব্য ছিল একটা কড়া উত্তর। বলা উচিত ছিল, আপনি তো এখানে আমার দেহের ছন্দ দেখতে আসেন না, ডাক্তারবাবু। আপনার অজ্ঞ কাজ আছে, লারিভ আছে। সেই দিকে মন দিন। একবার ভালল, কিরে গিয়ে গুনিয়ে দেব কথাগুলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠলো না। কী ভাববেন ডাক্তারবাবু। কাশড়গুলো কেতে নিয়েও তার কিরে বাওয়া হল না। কী এক মধুর লজ্জার বেন জড়িয়ে গেল পা দু'খানা।

পর্যায় আবার রাউণ্ড এসেছেন ডাক্তার। হাসপাতালের সজার বাইরে তার টিকেটখানা হাতে নিয়ে নিশেধে পাঁড়িয়ে আছে হেনা। দু'খানা আবারের মেঘের মত থমথম করছে। ডাক্তার পাঁড়িয়ে পড়লেন। উষ্মির কর্তে বললেন, এখানে পাঁড়িয়ে যে? ঘর ভালো তো? বুড়ী কেমন আছে?

হেনা সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। টিকেটখানা এগিয়ে দিয়ে উচ্চ কর্তে বলল, এ সব কী লিখেছেন আমার টিকিটে? আমার তো কোনো অন্তর্য করেনি?

ডাক্তার লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, এই ব্যাপার? আমি তো বীতিমত খাবড় পিরেছিলাম। ; অন্তর্য তোমার করেনি। তবু, এই বাড়িটি খাবারটুকু আমার একান্ত দরকার।

—কিছু দরকার নেই, খানিকটা উদ্ভত হয়ে বলে উঠল হেনা। কলার বা বাক্স, তাই আমার যথেষ্ট। এ সব আপনি কেটে দিন।

ডাক্তার অমুযোগের হয়ে বলল, জাখ, তুমি সব বোঝো, আর এই সোজা কথাটা বুঝতে চাও না, বন্ধারোগের নাম করতে গিয়ে যদি তাকে resait মানে ঠিকিয়ে রাখবার ক্ষমতা বাড়ানো না যায়, যে কোনো সময়ে সর্বনাশ ঘটতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণে পোট্রাই খাবার পেতে না পড়লে এ টি-বি germগুলোর সঙ্গে লড়বে কি দিয়ে?

—আমার বা আছে, তা দিয়েই লড়বো। না পারি, মরবো। তাই বলে রোগের সেবার নাম করে ডিম-মাখন গিলতে পারবো না।

—আহা, ব্যাখিটাই তো হল হাজর্যাখি। তাকে রাখতে হলে রাজভোগ ছাড়া চলবে কেন? তোমার বোণীর খাবার শিষ্টাটা দেখেছ তো? সে তুলনার তোমাকে তো কিছুই দিইনি।

—বোণীকে আপনার বা-খুশী দিতে পারেন। আমি তো আপনার বোণী নই। আমাকে গিছেন কিসের জন্তে? দিলেই বা আমি নেবো কেন?

ডাক্তারের হয়ে কোড ফুট উঠল—নেওয়া না-নেওয়া তোমার ইচ্ছে। ডাক্তার হিসেবে আমার একটা লারিভ আছে; তাই দিয়েছিলাম। না খেতে চাও, খেও না। আমার কী!

টিকেটখানা ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তার ঘরে গিয়ে চুকলেন। বুড়ীর অবস্থা খানিকটা ভালো। তার সঙ্গে দু'চারটা কথা হল। মিটসেফের মধ্যে সাজানো রয়েছে তার খাবার—মাখন, কটি, ডিম, দুধ আর দু'চার বকমের ফল। সেই দিকে চেয়ে বললেন, খাবার টাবারগুলো সব খাচ্ছে তো?

—আমি তো থাকি বাবু; ও কিন্তু কিছুই চোঁয় না। খালি দু'বেলা ছুটো ভাত, ফাইল থেকে বা আসে। আপনি একটু বুকিয়ে বলে বান ডাক্তারবাবু!

—আমার কথা শোনো কৈ?

—চলবে। আপনি হবে ও খুব মাস্তি করে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ডাক্তারের কাজ শেষ হল। নেবু বোণের পাশ দিয়ে লখ। মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন মাস পড়েছে। ফুল এসেছে নেবুগাছে। সকালবেলায় তাজা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার মিষ্টি গন্ধ। কাছেই একটা ঘনপল্লব আমের গাছ। ভালপালাগুলো হুইয়ে পড়েছে বুকুলের ভায়ে। তার উপরে মধু-মাতাল মৌমাছির ভিড়। আকাশ গাঢ় নীল। তার নীচে এই শিশির-স্নিগ্ধ আলো-বলমল সীতের প্রভাত। কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, কোলাহল নেই। শুধু খানিকটা দূরে ঐ খাটনি ঘর থেকে ভেসে আসছে একটানা ভালভাওয়ার শব্দ; তার সঙ্গে একটা স্বকণ্ঠী মেয়ের ঘেঁটো স্বরের গান। সব মিলিয়ে ডাক্তারের তরুণ মনে ফুটে উঠল একটি পরিপূর্ণ স্বর।

নেবুগাছের আড়াল থেকে নিশেধে বেরিয়ে এল হেনা। ডাক্তারের হঠাৎ মনে হল, বসন্ত-প্রভাতের এই অপরূপ ছবিটির সঙ্গে সে-ও যেন সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ঐ শ্রামল চিকণ তরু-লেখানি যদি না থাকত, সমস্ত দু'গটাই বৃষ্টি অপরূপ থেকে যেত।

তুমি এখানে? বিষয়ের হয়ে বললেন ডাক্তার। তার মধ্যে ফুটে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা।

—এখনি পাঁড়িয়েছিলাম, গভীর কর্তে উত্তর এল।

—দিনটা ভারী স্থল্লর, না ?

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, টিবিদের যারা নাস' করে সব হাসপাতালেই কি তাদের বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা আছে ?

—সব হাসপাতালের খবর জানি না, আচমকা আখ্যাতটা সামলে নিয়ে বললেন ডাক্তার, আমার হাসপাতালের কথা বলতে পারি ?

—আমি বলতে চাইছিলাম, এ খাবারগুলো কি সত্যি সত্যিই আমার দরকার, না ওটা শুধু আমার ভঞ্জে, মানে আমাকে আপনারা দয়া করেন, তাই হয়তো আপনি—কথাটা শেষ করতে পারল না। কুণ্ডলভিত্তি আরও চোখ দুটি তুলে ধরল ডাক্তারের মুখের পানে। সেই দিকে চেয়ে, লক্ষ্যের সন্ধ্যাে মাধুর্যে মগ্নিত সেই কণ্ঠ শুনে ডাক্তারের বুকের ভিতরটা ব্যথায় ভরে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে গভীর স্তবে বললেন, তোমাকে হাতে করে দেবার মত আমার তো কিছুই নেই, হেনা। সে উপায়ও নেই। ডাক্তার হিসেবে যেটুকু বিলাম, সামান্য একটু খাবার, তাও যদি না নেও, আমি আর কি করতে পারি !

হেনা জবাব দিল না, তেমনি করুণ চোখে চেয়ে রইল। ডাক্তার আবার বললেন, কিসের জঞ্জে নিজের ইচ্ছায় এই বিপদের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ, আমি জানি না। হয়তো এর পেছনে কোনো গভীর কারণ আছে। কিন্তু একটু জানি, যেমন করে হোক তোমাকে বাঁচাতে হবে। এখানে এই জেলের মধ্যে আমার চোখের সামনে তোমাকে আমি আবদ্ধহতা করতে দেবো না। হেনার চোখে বিছাৎ খেলে গেল। আবেগ-কম্পিত সুরে বলল, কেন ? আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ ?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর একান্ত কাঙ্ক্ষিতে ঝড়িয়ে আছে হেনা। হেঁট হ'খানা কেঁপে কেঁপে উঠছে, চকল নিঃশ্বাসে তুলে উঠছে তার উন্নত বুক। সেই চোখ দুটো তাঁর প্রতীক্ষার তখনো তাঁর বুকের পানে চেয়ে। ডাক্তারের প্রশস্ত বুকের মধ্যে উদ্ভাব হয়ে উঠল রক্তস্রোত। আজ হয়তো সে কোনো বাধা মনেবে না। কিন্তু না, বাধা ভুট্ট রইল। নিজেকে স্মরণ করে যুগ কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, কী লাভ ? তা জানি না। হয়তো কোনো লাভই নেই। কিন্তু লাভলোকসানের হিদাবটাই কি মাছবের জীবনের সব, হেনা ? তার বাইরে আর কিছু নেই ? আর কিছু দেখতে পাও না ?...বলে, কখনো বা করেননি, হঠাৎ নত হয়ে ওর ডান হাতখানা তুলে নিলেন নিজের ছাট উত্তপ্ত হাতের মধ্যে। পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে ক্রত বেগে এগিয়ে গেলেন।

যুগুত কালের একটি নিবিড় স্পর্শ। হেনার সমস্ত শরীর বারংবার শিউরে উঠল। কোনো রকমে ছুটে গিয়ে গুটিয়ে পড়ল তার সেই নতুন খাটখানার উপর, সেখানে সাজানো প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে আজ একজনের গভীর প্রাণের স্পর্শ। বাসিন্দে মুখ রেখে চোখের জলের ধারা আর ধরে রাখতে পারলো না।

বুড়ী স্তবে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। লক্ষ শুনে পাশ কিসেই বাজছে হয়ে উঠল। বার বার বলতে লাগল, কী হল, না ! অমন করছ কেন ?

পর পর কয়েক দিন ডাক্তার হাসপাতালে এসে তার নাসের দেখা পেলেন না। তার জায়গায় দেখলেন আর একটি মেয়ে। তার নাম কমলা। এক পাশে ঝাড়িয়ে থাকে, কখন কি দরকার হয়। তার পর

যোগী দেখা যেমন শেষ হল, সাবানটা এগিয়ে নিয়ে হাতে জল ঢেলে তোরালোটা বাড়িয়ে ধরে—এটুকু তার কাজ। টেবিলের উপর চাপা দেওয়া টেম্পারেচার-গার্ট হেনার হাতে তৈরি। তার পাশে তারই হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সঙ্ক্ষিপ্ত নোট। তা ছাড়া যা কিছু দরকারী জিনিস, সব বধ্যস্থানে পরিপাটি করে সাজানো। যেমিকে তাকানো যায়, সর্বত্র তার নিপুণ হাতের চিহ্ন।

সেদিন কাজ শেষে ফিরে যাবার সময় সিঁড়ি থেকে নেমেই ডাক্তার হঠাৎ ফিরে ঝাঁড়ালেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের দিমিগশি কোথায় ?

কমলা বলল, এই তো ছিল এখানে। বোধ হয় চান করতে গেছে। ডেকে দেখো ?

ডাক্তার একটু ইতস্তত করলেন ; তার পর বললেন, না থাক।

পরদিন ডাক্তার আসবার সময় হতেই হেনা তার কাজ শেষে বধ্যব্রীতি চলে বাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরোতেই হুশীলার সঙ্গে দেখা।

—কোথায় বাচ্ছিল ?

—বাচ্ছি একটু ও দিকে।

—এই নে। ডাক্তারবাবু আসতে পারবেন না। একটা চিঠি দিয়েছেন তোকে।

—আমাকে ! কিসের চিঠি ? কপাল কুক্ষিত করে জানতে চাইল হেনা।

—আমি কী জানি, কিসের চিঠি ? কি করতে উরতে হবে, তাই বোধ হয় লিখে জানিয়েছেন। নে, ধর।

ডায়ালোট রংএর মুখবন্ধ খাম। উপরে কোনো নাম নেই। হাতে করতেই হাতটা ঝুপে উঠল। একটু ঘেন দোলা লাগল বকের মাঝখানে। কি জানি কি আছে এ চিঠির মধ্যে ! খুলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল হেনা। মাথা নেড়ে বলল মনে মনে, না, এ চিঠি সে খুলবে না। যেমন আছে তেমনি ফিরিয়ে দেবে হুশীলার হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি এগিয়েও গেল খানিকটা তাকে ধরবার জঞ্জে। আবার কী ভেবে ধীরে ধীরে ফিরে এল। খামটার দিকে আবেক বার চেয়ে দেখল। মনের মধ্যে ছুঁয়ে গেল কিসের একটুখানি যুগ সৌরভ, একটু কিসের মোহময় অমৃত্যু। তার পরে আনমনে কখন ছিঁড়ে কেলস একটা ধার। ছোট একখানি কাগজে প্রলম্ব করে লেখা কয়েকটি কথা—

"হেনা, তোমার কোনো ডাবনা নেই। আমার দিক থেকে কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির হও। তোমার পথ থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে নিলাম। দেবতোষ।"

দেবতোষ। বেশ নামটি তো ! ডাক্তারবাবুর নাম এই প্রশংস জানল হেনা। জানতে ইচ্ছা হয়েছে কত দিন। কিন্তু কাজকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। দেবতোষ। মনে মনে আউড়ে নিল নামটা। তার পর আবার পড়ল চিঠিখানা। মনকে বোঝাতে চাইল, এ ভালোই হল। এই হুজুই তো চেয়েছিল। এরই জঞ্জে পাগিয়ে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। সহজ ভাবে একটা বার কাছে এসে ঝাঁড়তে পারেনি। দিন কেটেছে ছটকট করে, রাত কেটেছে, অস্থির অনিদ্রায়। স্বপ্ন নেই, শান্তি নেই। বকের মধ্যে বয়ে নিয়ে ফিরেছে হৃৎসহ গুজ্জর। সে তার নেমে গেল। আজ সে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। বাক্য নিয়ে তার এত

হুঁতাবনা, তিনি নিজের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই আশাসভা  
অভয়বাণী—কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির  
হও।

চিঠিখানা হাতে করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হেনা। মনে মনে  
বলল, আমি বাঁচলাম। তার পরে এক সময়ে মনে হল, কই স্বস্তির  
হাওয়ায় তার বকের বোঝা নামল কই? নিভৃত অন্তরের কোণে কে  
এক অব্যবসে বইল মুখভার করে, কে এক গোটা চেয়ে বইল ভূবিত  
দৃষ্টি মেলে। মনে পড়ল, কত দিন আগে কী একটা বইতে পড়েছিল,  
এক রকম অসভ্য জাত আছে, পাখীর পালক যাদের অমূল্য অলঙ্কার,  
বনের পথে চলতে চলতে গজমুক্তা কুড়িয়ে পেলে ছুঁড়ে দেয় গভীর  
জলসে। আজ সেও কি তেমনি মুক্তের মত ফেলে চলে যাচ্ছে না  
জীবনের সেই পরম রক্ত, সহস্র মুক্তার চেয়েও বা মূল্যবান?

সহসা জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে এল চিন্তার মোড়। না, না।

এ কী করছে সে! এই সর্বনাশা মোহজালের মায়া তাকে কাটিয়ে  
উঠতে হবে। একথা ভুললে চলবে না, সংসারে কিছু পেতে হ'লে  
তার দাম দিতে হয়। কিন্তু তার তো কানাকড়িও সম্বল নেই। এই  
কুসজীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সব এক দিন খালে-পুড়ে ছাই হয়ে  
গেছে। যেথেকে গেছে শুধু কালি। আজ চারি দিকে শুধু অন্ধকার,  
তার কোথাও নেই এক বিন্দু আলোর রশ্মি। অথচ এক দিন তার  
সবই ছিল। নারীজন্মের সেটা পরম সম্পদ, যা দিয়ে সে নিজে  
সার্থক হয়, অজ্ঞকে সার্থক করে তোলে, অন্ধ দশ জন ময়ের মত  
সেখানে সেও বঞ্চিত ছিল না। তার পর জীবনের বাইশটা বছর  
কাটিতে না কাটিতেই সংসারের সহজ সম্বল পথ থেকে কে তাঁকে নির্মম  
হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল! তবু তো অশ্রুর মৃত্যু নেই, গোড়ের  
শেষ নেই। সব গেছে, তবু অশ্রুর ঘোর কাটে না। বিধাতার  
এ কী নির্ভর পরিহাস!

[ ক্রমশঃ ]



## হায় সে কথা

এলা বন্ধু

মরমের কথা হলো না বলা বলিতে গিয়া,  
নিমেষ তরে সরমে বাখিল মুখের হিয়া।

সহসা কেন কৈশে গেল মন

ধুলায় লুটাল বৃক্ষের ধন,

বহিল আঁখি আঁখিতে শুধু নীরবে চাহিয়া।

মরমের কথা হলো না বলা বলিতে গিয়া।

আজি নিশীথে বৃক্ষের মাথো কে মরে কীদিয়া,  
হারানো অশ্রুর ছিন্ন মালা গাঁথিব কি গিয়া?

বহু আয়সে সম্বতনে গাঁথা,

বহু বরষের আঁখিজল মাথা,

নিমেষে সে যেন চলে গেল তারে পায়ে দলিয়া,

আজি নিশীথে বৃক্ষের মাথো কে মরে কীদিয়া?

বুঝেছি স্বপ্ন ভেঙ্গেছে শুধু রয়েছে ঘোর,  
শেষ বসন্তের ডালা সাজানো হয়েছে মোর।

নেই আর বে উড়লা কাঙনে

আবীর খেলা খিঁচল মনে,

কুহু বহানে লজ্জা নয়নে জড়ানো ভোর।

বুঝেছি স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, শুধু রয়েছে ঘোর।

রয়েছে শুধু হাসিতে ঢাকা কথার ছল,

অন্ধ দৃষ্টি খুঁজে না পায় বৃক্ষের তল।

নেই আর সে ব্যাকুল চাওয়া

মধুর মিষ্টিতে মধুর পাওয়া,

ভরা জোয়ারে ভেসে চলে যাওয়া ক্ষয় লল

রয়েছে শুধু হাসিতে ঢাকা কথার ছল।

নাই হলো তবে ছিন্ন অশ্রুর মালা গাঁথা,

ধুলায় মিশাক অবহেলায় তুচ্ছ বা তা।

পাবার বা তা পেয়েই পেলেন,

শূন্য জগত ভরে নিলেম।

বইল সেখার চিরদিনের আসন পাতা।

নাই হলো তবে ছিন্ন অশ্রুর মালা গাঁথা!

হায় সে কথা বলিতে সেদিন হলো না বলা,

মরম-মাঝারে থাকুক সেই চিহ্ন না-কলা।

বুঝি বা কত দুঃখভালা হাতে

অঙ্গ-সম্বল নরন-পাতে,

মানসতীরে তনিব ভাহার একেলা ঢালা,

হায় সে কথা বলিতে সেদিন হলো না বলা।



চুটির দিন নয়। তবু মন্ত একটা মাহ্ এনে হাজির নরেন চৌধুরী। এই বোঝা জায়গায় টাটকা মাহ্ কমই জোটে। রেস্তোরাঁরটারে কল্যাণে একবারের চালান পাঁচ-সাত দিন চালায় এখানকার মাছের কারবারী। তাই সামনা সামনি লোভনীয় কিছু পেয়ে গেলে চুটির দিন হোক আর যেদিন হোক নরেন চৌধুরীর পক্ষে লোভ সামলানো দায়।

নতুন নয়। এ রকম আরো হয়েছে। সাধুনা খুব একপ্রস্থ বকাঝকা করে দাওয়ায় বসে সেই মাহ্ কোটা প্রায় শেষ করে এনেছে। অবনী বাবু সকালের আপিসে বেঙ্কবার উজোগ কর-ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আপিস সংক্রান্ত কিছু দরকারী কথাবার্তা সেবে ফিরে এসে নরেন বলল, বাক, তোমার পিড়িবোকে তুলিয়ে-ভালিয়ে ইস্তুলে পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এখন বাবা নিশ্চিন্দ !

—আপনার ইস্তুল নেই ?

হতাশ-নেত্রের তার দিকে চেয়ে থেকে নরেন বলল, এটু টা ক্রটাস ! তোমার বাবাকে বসে দিলাম একটু বাদে বাব—এই মাহ্ রেখে একুনি বাই কি করে বসে !

—আ-হা, তা তো বটেই ! চুপি করে এবার ওই মোড়ায় বসে থাকুন, আমায় কাজ করতে দিন নয় তো আপনার মাহ্ আবার জলে গিয়ে সাতার কাটবে।

ছটিক্তে মোড়ায় আসন পরিগ্রহ করল নরেন চৌধুরী।—বেশ। কিন্তু আমি তা হলে যুখ বৃজে বসে এখন কি করব ?

—কান কুড়কুড় করুন।

মন্ত এক সমস্তার সমাধান হল যেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নরেন হাতীর ঠাঁতের কান-কাঠি বার করল। তারপর সন্তর্পণে সেটা কর্ণপটহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গোটা কতক সেই অদ্ভুত শব্দ বার করল গলা দিয়ে। হাসতে হাসতে সাধুনা বীটর ওপরেই পড়ে জার কি। কি বিচ্ছিন্নি পড়াব, মা গো !

—এই। এই মেরে ! কেটে একুনি রক্তগলা হবে যে ! থাক বাবা, এই আমি রেখে দিচ্ছি কান-কাঠি। সাথে কি সবাই ছেলেমানুষ বসে !

ছয়কোপে সাধুনা তাকালো তার দিকে, কে বলে ?

—ওই ওরা—

—কারা ?

—ওই ডাম কলোনীতে বারা কাজ করে, বারা মাটি কাটে, বারা ইট চুন স্ররকি নিয়ে খাঁটাখাঁটি করে তারা—তাদের সঙ্গেই বেশি ভাব কি না তোমার।

—মিথোবাদী ! আবার মাহ্ কাটার মন দিল সাধুনা।

নরেন দেখছে। সেদিনের মত দৈ-মাহ্ হবে তো ?

—হু।

—আর মাছের পোলাও ?

—হবে।

—আর মাছের চপ ?

—হবে, হবে, হবে—বাবার বাবা, একেবারে পেটুক রাম পোষামী। নামকরণের কৃত্তিতে নিজেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

হাসির ধার দিয়েও গেল না নরেন। গভীর মুখে প্রস্তাব করল, একটা ছুতানাতার আজ তাহলে আপিসটা কামাই করে দিই, কি বসে ?



## পঞ্চ ত পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

—তা হলে কিছু হবে না। সেবারের মত ঠিক একটার গাছতলায় বসে লাক খাবেন।

কিন্তু নরেন চৌধুরীর এই অবসর বিনোদনের আনন্দে ছেদ পড়ল একটু পরেই।

কড়া নাড়ার শব্দ হল বাইরে।

সাধুনা উঠে দেখতে গেল।

ভৃত্যপ্রেরীর একজন লোক দাঁড়িয়ে। সাধুনা চেনে তাকে। অনেকদিন তার পিছনে পিছনে অথবা আগে আগে টিকিন ক্যারিয়ারে করে মনিবের খাবার নিয়ে নামতে দেখেছে। লোকটার ভাবভঙ্গী চালচলনে একটা গুরুগভীর আশ্রমবাসীর ভাব দেখে ডেকে আলাপ করে নি কখনো। সর্কোতুকে নিরীক্ষণ করেছে শুধু। বড়সাহেব অর্থাৎ চিক ইঞ্জিনিয়ারের খাস চাকর নিধুরাম। নরেনের মুখে ওর গল্পও শুনেছে সাধুনা। বহুকাল ধরে আছে, এবং প্রভুর হাবভাব চালচলন সবচেয়ে অত্মশীলন করে আসছে।

—লরেন বাবু এখানে আছেন দ্বিমিনি ?

সাধুনা বাড় নাড়ল।

অস্তির নিঃশাস ফেলল নিধুরাম। সায়েবের চিরকুট নিয়ে আমি তামাম রাজ্যি উন্নয়ন খুঁজতেছি। একবার ডেকে সেন।

সাধুনা হাত বাড়াল, আমায় দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ফিরে এসে সেটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন, আপনার—

—কে দিলে ?

—ভগীরথ বাবুর চাকর নিধু।

কিছু না বুঝেই নরেন চিরকুটটা নিয়ে পড়ল। বড় করে একটা নিরুপায়-নির্দোষ ফেলতে গিয়ে থেমে গেল। বিম্বিত নেত্রে তাকালো, ভগীরথ বাবু মানে ?

নিরীহ মুখে ফিরে তাকালো সাধুনা। নরেন চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠল।—তোমার সাহস তো কম নয়। বিলেত জার্মান কেরত চিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সেদিন ওই কাণ্ড করলে, আজ আবার তাকে বলছ ভগীরথ বাবু।

—সেদিনও বলেছিলাম। সাধুনা হেসে ফেলল, আমার কি দোষ, আমি কি গুলে জানব উনি বড় সাহেব—কোট প্যাণ্টের বা ছিবি, ওর থেকে আপনাকেই অনেক বড় সাহেব মনে হয়।

—ঠাট্টা হচ্ছে! কিন্তু সেদিনের কথাবার্তায় তো মনে হল বড় সাহেব গুরুত্ব বলেই বেশি পছন্দ তোমার।

সান্দনাও ছাড়বার পাত্রী নয়। স্বীকার করে নিল। পছন্দই তো। সুললিত জগৎ ওকেই রাখব ভাবছি, এ ছোঁড়াটা বেজার ঝাঁকি দেয়। হাত অবজ্ঞা কাঁটা, তা হলেও গায়ে জোর টোর আছে, পারবে খন—

বাক্য নিয়ে এই হাসিঠাট্টা, তার চিরকুটের তাসিলটুকু তা বলে ভোলা চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন চৌধুরীকে উঠতে হল।—বাই বাবা, এফুনি হয়তো আবার দ্বিতীয় দফা পেয়ালা এসে ছাঞ্জির হবে।

সান্দনা হাফা নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এই মায়াঘটির আচরণে একটুকু ব্যতিক্রম দেখেনি কখনো। ভালো লাগতো। এখানে লাগে। কিন্তু কোথায় যেন তফাৎ একটু। এতক্ষণ তার এই বসে থাকটা শুধু মাছের আকর্ষণে কি না আগে একবারও মনে হত না। কিন্তু এখন হয়। তফাৎ এখানেই। সবপ্রথম মাসি ওকে সময়ে দিয়ে গেছে। তারপরে চাঁদমণি আর হোপনের নিভৃত-বিনোদনের ছাপটা চোঁটা করেও ভুলতে পারেনি মন থেকে। আর নিজের সন্ধে সবচেয়ে বেশি ওকে সচেতন করেছে মড়াইয়ের বুক কটা ঈর্ষার বণবীর ঘোবের সেই নগ্ন দৃষ্টিলেহন। সব মিলিয়ে সান্দনার ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে একটু। এই পরিবর্তনের উপলক্ষটুকুই অবস্থার কারণ।

একটা বাজার কিছুক্ষণ আগে সান্দনা দুই হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধেও একটা ধলে বলছে। যেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আর একটা লোকও হলে দুলে চলছে। নিধুরাম—। ডাকল, ও নিধু, বাবুর খাবার নিয়ে বাছ?

ডাক শুনে নিধুরাম ঠাঁড়িয়ে পড়ল। সে কাছে আসতে একগাল হেসে জবাব দিল, হ্যা গো দিদিমণি, তুমিও খাবার নিয়ে বাছ?

যেন একই কাজ হ'জনার। খুশি মুখে সান্দনা বলল, হ্যা, বাবা! আর নরেন বাবুর। ভালোই হল, চলে তোমার সঙ্গে বাই।

—অন্ত বড় বড় দুটো টিফিন-কার নিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? একটা বর আমায় দাও—

সান্দনা জবাব দিল, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, নামার সময় ভারী হলেও টের পাওয়া যায় না।

হুঁপা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবুর বান্না তুমিই কর বুঝি?

নিধু সর্গে জবাব দিল, শুধু বান্না! সব কাজেই এই নিধুরাম— নিধু ছাড়া বাবু আসল।

কি ভাল সান্দনা। নিছক মেয়েলি কোঁতুল। আগেও হয়েছে। কিন্তু আগে সুযোগ মেলেনি। পথের ধারে একটা পাখরের ওপর বসে পড়ে বলল, এখানে বসি হুঁমিনিট, একবারে অন্ত হাঁটতে পারিনি। আচ্ছা দেখি নিধু কি রাখলে তুমি—

জবাবের প্রতীক্ষা না করে তার হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার টেনে নিল। ক্যারিয়ারের ছাওলে একটা তোরালে জড়ানো। কুল বা বেগল, সান্দনার চক্ষুর।

—ভাত যে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে আছে নিধু!

—বাবুর ওই রকমই খাওয়া অব্যাস, আমি গরম ভাত ছাড়া খেতে পারিনি।

বাটি তুলে তুলে সান্দনা দেখছে। এক বাটিতে একটু ভরকারি, পরের বাটিতে একটু মাছ। দেখে মুখে কৃষ্ণ রং পাড়ল গোটা-কতক। নিধু বলল, তলার বাটিতে বিলিতি বেগুনের চাটনিও আছে।

—এই দিয়ে থাকেন তোমার বাবু?

আত্মপ্রত্যয়ে মাথা দুগিয়ে হাতবদন নিধুরাম বলল, হ্যা, একেবারে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। আমার বাবু বড় ভালো গো দিদিমণি—যা রেখে দিই মুখটি বুকে খেয়ে নেন।

—খাসা! সান্দনা হঠাৎ রেগেই গেল যেন। কিন্তু নিধুর কাছে সেটা প্রকাশ পেল না। বাটিগুলো আবার গুছিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার বন্ধ করল সান্দনা। এক মুহূর্ত ভেবে এমিক ওমিক তাকিয়ে বলল, ওই শালতলা থেকে দু'টো পাতা কুড়িয়ে আনো তো, হাতে লেগে গেছে।

নিধু বলল, এই তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল না।

—আঃ, বা বলচি শোন না, ওই তো কত পাতা পড়ে আছে।

খতমত খেয়ে নিধু তাড়াহাড়ি পাতা আনতে গেল। ফিরে এসে দেখে দু'হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে মেয়েটা উঠে পাড়িয়েছে। বলল, থাকগে দরকার নেই, মুছে নিয়েছি।

পাতা কেলে তোয়ালে জড়ানো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নিধুরামও অগ্রসর হল। কিন্তু সান্দনা ধামল পরক্ষণেই।—তুমি যাও নিধু, আমার একটা জিনিস আনতে ভুল হয়ে গেছে, চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

হন হন করে সে ফিরে চলল আবার।

হতভম্বের মত নিধুরাম ঠাঁড়িয়ে হইল কিছুক্ষণ। খেয়াল করলে তফাৎ কিছু খেয়াল হবারই কথা। এই মর্মগ্রাহী যোগাযোগ এক নারীচরিত্রের দুঃস্বপ্নতার কথা ভাবতে ভাবতে নিধু গম্ভ্য পাখে অবতরণ করতে লাগল।

কিন্তু সেটুকু বখাবথ উপলব্ধি করল যখন, দুই চক্ষু স্থির একেবারে।

আগিস ঘরে বসেই মধ্যাহ্নের আহার পর্ব সমাধা করে থাকে বাবল গাঙ্গুলি। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একে একে আহাৰ্য সামগ্রী নাবাচ্ছে আর অবাক হচ্ছে। আর ততোধিক বিস্ময়িত হয়ে উঠছে অদূরে দণ্ডায়মান নিধুরাম।

—কি রে, কয়েকদিন কি এসব—এ আবার তুই কবে রাখতে শিখলি?

টেবিলের ওপর তোরালের পাশে টিফিন ক্যারিয়ারের ছাওলের দিকে তাকালো নিধুরাম। অবাক বিষয়ে দেখল তোরালেটা তাদের বটে, কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারটা তাদের নয়। আহাররত মনিবের দিকে তাকালো। কি বলতে গিরেও ভোজ্য পদার্থের দিকে চেরে রসনা সিক্ত হয়ে ওঠার আর বলা হল না। চেরে চেরে দেখতে লাগল শুধু।

খেতে খেতে বাবল গাঙ্গুলি বলল, এমন যদি রাখতে পারিস ঈদারাম, বায়বাস ওই একেবারে হাইড্রস খাজান কেন তনি?

ঢোঁক গিলে নিধুরাম হাসতে চেষ্টা করল শুধু। চোখের দৃষ্টি মাছ আর পোলাওয়ের ওপরেই আটকে আছে। বাবু খাওরায় নমুনা দেখে কিছু মাত্র আশা আছে বলে মনে হল না। বাটির শেষ মাছের টুকরোটাও প্লেটে নামিয়ে নিয়েছে...

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পন নেড়ে আহার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নিধুরাম।

ওসিকে বাড়ি ফিরে আবার টিকিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে আসতে আসতে ভাবছে সাধনা। কাঁচটা ভালো হল না। ভদ্রলোক জানবেই। আগ্রহ, কিন্তু ওই গিয়ে খায় কি করে। তবু ভালো হল না কাঁচটা। কি ভাববে কে জানে। হয়ত হাসবে মনে মনে আর মজা করে খাবে। মেয়েদের পরে লোকটার বিহম অবজ্ঞা শুনেছে। একে একে তিনজনের মুখে শুনেছে। আর্ডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জির চায়ের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে নরেন বাবু বলেছিল প্রথম। কি বলেছিল অত মনে নেই, কিন্তু মেয়েদের প্রতি লোকটার মনোভাব প্রসঙ্গেই কি যেন ইঙ্গিত করেছিল। তারপর সেদিন মড়াইয়ে বসে পাগল সর্দার সখোদে বলেছিল। বলেছিল বড়সাহেব শুধু কাঁচই বোঝে মেয়েদের দাম বোঝে না। আর ছুত বাবুও সেদিন বড়সাহেবের অমুশাসন প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে সেই কথাই সমর্থন করেছে।

শুনে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল সাধনা। আঁজ বিরক্তি বাড়ল আরো। বা খুশি থাক, যেমন খুশি থাক, ওর তাতে কি। কোন খোশামোদ তেঁরাবোদের ধার ধারে না সে। কিন্তু লোকটা তাই ভাববে হয়ত...

বাবার নির্দিষ্ট শিলাসনে খাবার রেখে সাধনা বলল, নাও বাবা, তুমি বসে বাও, আমার একটু দেরী হয়ে গেল আসতে, নরেন বাবুকে আমি খুঁজে বার করে নিছি।

কিদের মুখে অবনী বাবু আর বিকলিত করলেন না। দ্বিতীয় টিকিন ক্যারিয়ার নিয়ে সাধনা নরেনের আপিস ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে কেউ নেই। বেরিয়ে এলো। দালানের পিছনের গাছতলায় ধানী বৃদ্ধের মত বসে আছে চূপচাপ। সাধনা হেসে ফেলল। —কি ঘৃষ্ণিলেন না কি?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন জবাব দিল, খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে এ ভাবে শাস্তি দিতে বোধ হয় মেয়েরাই পারে।

—সত্যি বড় দেরী হয়ে গেল। পরিপাটি করে আহাৰ্য গুছিয়ে দিল তার সামনে। নিবু এবারে শুক ককন।

নরেন বলল, আসে দেরী হল কেন তাই শুনি?

—নিজে গিঘি করে খেয়ে দেবে ঘৃষ্ণিলশাম বলে আরম্ভ ককন, নয় তো সব আবার টিকিন ক্যারিয়ারে তুলে নোব এজুনি।

ক্রমে আহাৰ্য মন দিল নরেন চৌধুরী। গোঁ-গ্রাসে। সাধনা হাসতে লাগল।

মড়াইয়ের অত ঘাটা দেখা যায় এখানে বসেও। লোকজন তেমন নজরে আসে না। বহুপাতি বা গঠন সমাবেশ কিছু কিছু চোখে পড়ত। একটা ছোট্ট করে কনকিটের ব্লক উঠছে প্রায় পাতাল গর্ভ থেকে। এককম বহু ব্লক একসঙ্গে জুড়ে দিলে তবে বড়াইকে বহাবরকার মত প্রাচীর অববোধে বিখণ্ডিত করা সম্পূর্ণ

হবে। সাধনার মনে পড়ল কি যেন। সেদিন ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পারে নি। বলল, আচ্ছা, ওই ব্লকের নীচে যে লোহার ঘরের মত কি একটা তৈরী হচ্ছে, ওটা কী?

—দাড়াও বাবু, এখন তোমার কথাই জবাব দিতে গেলে আমার খাওয়া পণ্ড।

—আঃ, বলুন না কি ওটা—লোহার ঘরের মধ্যে একরাশ লোহা-লক্কর দরজা ঢাকা হাওল-ম্যাংল—কি হচ্ছে ওখানে?

—অটোমেটিক প্রেসার গেট হচ্ছে। বুঝলে?

সাধনা ঘাড় নাড়ল, না। কি হবে ওতে?

—বরাবর জলের নীচে থাকবে, জল বাড়লে তার প্রেসারে আপনি যন্ত্রপাতি চলবে, আর কমলে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধনা উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার পর?

—তার পর পোলাওয়ের সঙ্গে কালিয়া মিশিয়ে তাতে চপ ভেঙে একবারে উদরে চালান। আচ্ছা, আমাকে এখন বকাছ কেন, দেখছ না ব্যস্ত আছি?

কিন্তু সাধনার মন তখন অস্ত্র রাজ্যে ধাওয়া করেছে। সাগ্রহে বলল, চলুন তাহলে ওর ভিতরে এক দিন গিয়ে ঘুরে আসি।

—কেন?

—আপনি তো বলছেন, বরাবর ওটা জলের নীচে থাকবে। কেউ জানতেও পারবে না ওখানে এ রকম একটা জিনিস আছে, আর সাধনা বলে একটা মেয়ে সেখানে খোরাঘুরি করত—বেশ মজা না?

বড় রকমের একটা গরাস মুখে তুলে নরেন বলল, হঁঃ! তোমার তো সবচেয়েই মজা।

বাস্তবে কিরে এল সাধনা। তেমনি জবাব দিল, না, তা কেন, যত মজা আপনার ওই পোলাও-কালিয়ার মধ্যে।

ওর এ ধরনের আগ্রহের কারণ কিছু কিছু জেনেছে নরেন চৌধুরী। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার জন্তই মুখ তুলল এবার। কিন্তু সাধনা কেমন যেন বিরত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ওর দৃষ্টি অমুসরণ করে ফিরে তাকালো। পারে পায়ের এদিকে আসছে চিক ইজিনারায় বাসল গাঙ্গুলি। কাছে আসতে নরেন হেসে ফেলল।—আবার তুমি এসে গেলে, নিরিবিলিতে থাকিলুম চাটি!

মুহু হেসে বাসল গাঙ্গুলি ছ'জনকেই নিরীকণ করল একবার। পরে সাধনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, অষ্টপ্রহর জলকীর্জন শোনেন বলেছিলেন সেদিন—এ'র কাছে শোনেন?

সাধনা জবাব দিল না। এক গাল মুখে নিয়েই নরেন চৌধুরী ছ' চোখ কপালে তুলে বলল, আমি জলকীর্জন করি। ওর কাছে!...আর জন্মে ওই বর চাতক পাখি ছিল, জল আসবে শুনেই মনে মনে অষ্টপ্রহর সাতার কাটছে তাতে।

সাধনা বড় রকমের একটা জেচি কাটল তাকে।—হ্যাঁ কাটছে সাতার, আপনাকে বলেছে।

বাসল গাঙ্গুলি সর্কোতুকে চেয়ে রইল। শপকে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী। পরে বলল, বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন, দেখ কি থাকি, এ রাজ্যে এ রকম ছোট্ট না সচরাচর, সাধনা আর একটা ডিশ—

শব্দবাত্তে উঠে দাঁড়াল সাধনা। অনেক দেরী হয়ে গেল, বাবা অপেক্ষা করছেন, আমি—আমি চলি, খাওয়া হয়ে গেলে ওগুলো বেরায়া দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

যাবার জন্ত পা বাড়ান।

বাবল গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, ওই...ও ভালো আছে?

সান্দ্রা খামল।—কে?

—ওই কি ঘেন ওর নাম—আপনার স্মরণী?

বিরত হোক আর হাই হোক, উক্তার আঁচটুকু যায়নি।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ ভালো আছে, আপনার খোঁজ করছিল।

শ্রুত প্রস্ফুটন করল। স্বাঁজ মিটেছে একটু। বড়দাসের হোক আর যেই হোক, খাবার পাঠক আর হাই করুক, ও কেয়ার করে না কাউকে সেটা বুঝবে।

এরকম কথা চিক ইঞ্জিনিয়ার শুনে অভ্যস্ত নয়। বিমিত্ত নেত্রে চেয়ে রইল যতক্ষণ দেখা গেল।

মনে মনে বিরত একটু নরেনও হয়েছে। হেসে বলল, কিছু মনে কোরো না হে, ওর চালচলন কথাবার্তা সব ওট রকম।...তোমাকে দেখার আগে তো একেবারে ভগবান গোছের একজন ঠাণ্ডেছিল।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবল গাঙ্গুলি হাফা জবাব দিল, আর দেখার পরে গোপাল ভেবে গোফ টানিয়ে ছেড়েছিল।

নরেন সশব্দে হেসে উঠল। না হে, ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে সেদিন, সে যদি দেখতে...

সেদিন না হোক, আজ লজ্জার বহর স্বচক্ষেই দেখল বটে। সে কথা বলেই টিঙ্গনী কাটতে বাজিল আবারও। কিন্তু তার আগেই ছড়ানো আবাহ্য সামগ্রীর দিকে চোখ আটকে গেল যেন। সেই মাছের পেলাও আর কালিয়া, সেই মাছের ফ্রাই আর চপ।

অবাক বিষয়ে চেয়েই রইল সে।

—কি হল? নরেন বুঝে উঠছে না।

—কিছু না, খাও তুমি। আশ্চর্য হয়ে নিজের আপিস ঘরের দিকে পা বাড়ানো আবার।

যাবার কাছে যাবার কোন তাড়া নেই সান্দ্রার। তাঁর টিকিন ক্যারিয়ারও বেরোয়াই নিয়ে যাবে। মেজাজ এখন প্রসন্ন একটু। তুতু বাবু দোকানের উদ্দেশ্যে চলল। বাবে ঠিকই করেছিল। সেদিনের চায়ের পয়সা ক'টি দেওয়া হয়নি।

কিন্তু এসে বিগুন বিষয় আর বিগুন বিপন্ন অবস্থা তার।

এক কোণে, বাইরে থেকে দেখাও যায় না এমনি এক কোণের বেকিত পাশাপাশি খেঁখোঁষি বসে চা খাচ্ছে আর হেসে গল্প করছে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। মেয়েটিকে চেনে সান্দ্রা না। অ্যামিনিষ্ট্রেটর অফিসারের মেয়ে স্বরণা। আর লোকটিকেও যেন দেখেছে কোথায়... টেবিলের ওপরেই ছোট একটা স্ন্যাকস।

তুতু বাবু তার ক্যাশবাক্সের সামনে বসে নিবাসন্ত মুখে একটা পুনানো কাগজ নাড়াচাড়া করছে। তার চোখ-কান অস্ত্র, অর্থাৎ সেই কোণের দিকে। হঠাৎ সান্দ্রাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, এই যে, আশ্রন মালস্মী, আশ্রন!

কোণের ছাঁজের কলগুজনে ছেন পড়ল। বাড়ি কিরিয়ে তারা ডাকালো এদিকে। স্বরণা মেয়েটি নিজের অভ্যন্তেই যেন সঙ্গীর কাছ থেকে নুশোভন ব্যবধানে সরে বসল একটু। এদিকে মালস্মী রাড়িয়ে উঠেছে।

—স্বরণ মালস্মী, চা দিই? নানন্দে ডাবছে তুতু বাবু,

একটুখানি আক দিয়ে আলাদা ক্যাবিন এবারে একটা না করলেই নয়।

সান্দ্রা অশ্রুট আশ্রুতি জামিয়ে বলল, না, এখন চা নয়। পয়সা ক'টি বাড়িয়ে দিল, সেদিনের সেই...

অঁতাকে উঠে হাত গুটিয়ে নিল তুতু বাবু। কিন্তু কিছু বলার আগেই কাঠের বাক্সের ডালার কুটা দিয়ে পয়সা ক'টা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল সান্দ্রা। তার পর যাবার জন্ত ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল আবার।

—চললেন যে? আমার চিনতে পারলেন না? স্বরণা বলল।

বিস্ত্রস্তম্বে ঘাড় নাড়ল সান্দ্রা, চিনতে পেরেছে—

—আশ্রন তাহলে পালাচ্ছেন যে বড়? আমরা বুঝি কেউ নই?

উঠে এসে একেবারে হাত ধরে বেকির ওপর বসিয়ে দিল তাকে। সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল, আমাদের এখানে একাধারে গিরিকন্ডা আর মড়াই-কন্ডা আছেন একজন, তোমাকে বলেছিলাম না? এই ইনি

—সাইনোশিওর অফ দি স্পট—লক্ষ্মীর নক্ষত্রবিশেষ—আর ইনি এই...আমাদের একজন বন্ধু, কলকাতার থাকেন, এখন ফিরে চলেছেন।—কই তুতু বাবু, একে চা দিলেন না?

আর এক পেয়ালা চা নিয়ে হাজির হল তুতু বাবু।

পুরু লেশএর সোনালী চশমার ওধারে ঝিকমিকি হাসি ও আর একজনের নীরব কৌতূহলের মধ্যে পড়ে সান্দ্রা যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। বিনিময়ে নমস্কারও করতে পারল না। কিন্তু তবু

বন্ধুটিকে যেন চিনেছে সান্দ্রা। ওদের অগোচরে যেন কোয়ার্টারস্‌এ স্বরণার সঙ্গে দেখেছিল আর একদিন। ভেবেছিল, আত্মীয়-পরিজন কেউ হবে। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে ভালো লেগেছিল স্বরণাকে। কিন্তু আজ ভালো লাগল না তেমন। একটা

অবিবাদের কারণ দেখলে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

স্বরণা জিজ্ঞাসা করল, ওপরে যাচ্ছেন তো? চলুন একসঙ্গে হাই।

সঙ্গীর দিকে তাকালো, তোমার গাড়ির সময় হয়ে গেল বোধ হয়?

—হ্যাঁ, এইবার উঠব। হাতঘড়ি দেখা এক জবাব।

তিনজনই উঠল একটু বাদে। স্ন্যাকস হাতে বন্ধু বধাবিধি বিদায় নিল। ওরা ছ'জন চড়াইয়ের পথ ধরল।

রয়ে সরে উঠলে বড় জোর আত্মঘটী লাগে সান্দ্রার মেন কোয়ার্টারস পর্বত উঠতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সেখানে। কিন্তু এই একঘণ্টা সান্দ্রার এক জীবনের বিষয় যেন। মেয়েটার মাথার গোলাযোগে আছে কি না তাও সন্দেহ হ'ছিল মাঝে মাঝে।

স্বরণাই কথা বলে গেল। অনর্গল কথা। যে সব কথা একদিনের আলোপে কেউ বলে না, তেমন ধরনের কথাও। আর অজস্র হাসি।

সান্দ্রা বোবা সারাক্ষণ।

—সান্দ্রাদের বাড়ি একদিন সে বাবে অনেকদিন ভেবেছে। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই। হয়ে ওঠেনি।—কি করে হবে?

ও বাবা! মায়ের বা ছ'টা হা বাছাই! তা এবার একদিন ঠিক যাবে। এখানে যে বাড়িতেই বাস, মেয়েরা, মানে মহিলারা সবাই বলে

সান্দ্রার কথা। বলে মানে টিঙ্গনী কাটে। হিংসা, সোজা হিংসা—বুঝলেন না অ্যারিষ্টক্যাট কি না ওরা? ও যা, আপনি

আপনি করে বলছে কেন সে সান্দ্রাকে। বয়েস কত? বতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—ঈ অবশ্য...বাকসে, আর আপনি

আপনি করে বলছে কেন সে সান্দ্রাকে। বয়েস কত? বতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—ঈ অবশ্য...বাকসে, আর আপনি

আপনি করে বলছে কেন সে সান্দ্রাকে। বয়েস কত? বতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—ঈ অবশ্য...বাকসে, আর আপনি

আপনি করে বলছে কেন সে সান্দ্রাকে। বয়েস কত? বতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—ঈ অবশ্য...বাকসে, আর আপনি

বলবে না। স্বর্ণা কলকাতায় কবে যাবে? কেন? এম এ ক্লাস! ...ও, মা বলেছিল বুঝি সেই প্রথম দিন—হ্যাঁ, এম, এ পাড়ে বই কি, পাঁচ বছর ধরেই পড়ছে। কবে যে শেষ হবে পড়া কে জানে! না, হঠাৎ থাকে না। ঝাণ্ডার কাছে থাকে। দাদা বৌদি ঠিক মায়ের মনের মত হয়েছে। অ্যারিস্টক্রেট হয়েছে। কি মজা জানো—ওই জন্তাই আবার বৌদির ওপর মা মনে মনে একটু—নিজের বোনদের মধ্যে মায়েরই মন মত কিছু হল না কি না—বাবা তো এতদিনে ঘবে মোড়ে মোটে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার—বোনদের ওরা সব মস্ত মস্ত দিকপাল এক একজন। না, এখন সে চট করে যাচ্ছে না, মা, যেতে দিলে তো। নতুন নতুন কত হোমরা চোমরা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হচ্ছে এখানে! নরেন চৌধুরী লোকটি বেশ—আলাপ হয়েছে, দিবি হাসি-খুশি আর তোমার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ! কিন্তু ওই গোমরা মুখো চিক ইঞ্জিনিয়ারটিকে দেখলে গায়ে জ্বর আসে, রসকল শূন্য নিরেট একেবারে, প্রথম দিন পাটিতে ওকে এনটারটেন করতে গিয়ে মায়েরই হিমসিম অবস্থা, আমাদের মজা লাগছিল বেশ। আচ্ছা, এই যে লোকটা গেল, গাড়ি পাবে তো? আর একটু আগে উল্টেই পারত—মাঠারী বৃদ্ধি আর কত হবে—মা বলে মাখায় শালা ত্রয থাকলে কেউ আর প্রাইভেট কলেজে ছেলে পড়ায় না—কিন্তু লোকটা ভালো, বুঝলে—মা বলে বোকা কিন্তু আসলে ভালো বলেই একটু বোকা মত দেখায় আর কি।

সারাক্ষণ সান্না হান কাল বিম্বত হয়ে বাড়ি ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েই ওপরে উঠে এলো। নিজে বাথরুম শাটু কখাও বলেনি, কিন্তু স্বর্ণা ধামতে মনে হল ও নিজেই যেন হাঁপিয়ে গেছে বেশি। মেন কোয়ার্টারস এ পৌছেই হাসতে হাসতে বিদায় নিল স্বর্ণা। কিন্তু সোনালী চশমার ওপরে তার চকচকে দুই চোখে শুধু হাসিই চিকচিক করছিল কি না তাও যেন বুঝে উঠছিল না সান্না।

বাড়ি ফিরে বাবল গাঙ্গুলি সামনে নিধুকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ, আমাদের দুপুরের খাবার আজ কোথা থেকে এসেছে?

কাপড়ে পড়লো নিধুরাম। বলত তখনই। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক সামগ্রী দেখে জিব নেড়ে কথা বলা শক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই বলা হয়ে ওঠেনি তখন। কোন একবারে জবাব দিল, আজ—বাড়ি থেকেই তো এসেছিল, পথের মধ্যে ওই—ওভারসিয়ার-দিবসিগণ কি রেখেছি দেখতে চাইলে—তারপর কেমন করে কি হয়ে গেল!

প্রজ্ঞার হাসির আভাস বাবল গাঙ্গুলির মুখে।—বা পালা, আর শোন, এখন কিছু খাব না।

দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। জামা কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে ইঞ্জিনেরোয় গা এলিয়ে দিল।

ক্লাস্ত লাগছে। রাজ্যের অবসাদ। কাজের মধ্যে ডুব থাকে সারাক্ষণ কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছিল না। অন্তর্দ্বন্দ্বের থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। ঘরের আলো দিবিরে আরাম কোয়ার্টার গা ছেড়ে দিয়েও আরাম কিছু পাচ্ছে না।

বিষ্মতির কবরের তলায় সব কিছুই নির্ভাসন অত সহজ নয় আজ সেটাই আবার নতুন করে উপলব্ধি করছিল বোধ হয়। কাজে ডুব থাক আর বাই করুক। হাল ছেড়ে দিল বাবল গাঙ্গুলি।—আশ্রুক ওরা। আশ্রুক ব্যাধি নুতের। আশ্রুক গুণির

নুতের। ভীড় করে আশ্রুক নিরুত্তর অন্তর থেকে ব্যর্থতার বত বোঝা আর বত কিছু—

এবারে যেন সহজ হল একটু। টানধরা হাতগুলি শিথিল হল অনেকটা। ওভারসিয়ারের ওই মেয়েটার আজকের এই খাবার বদলে পাঠানো থেকে সেই আর একদিনের আর এক মেয়ের টিফিন ক্যারিয়ার পাঠানো মনে পড়ছে। এক নয়। একরকমও নয়। বরং একেবারে উল্টো। তবু মনে পড়ছে। আজ ছিল পূর্ণতার বিষয়। সেদিন ছিল শ্রুতার বিষয় ১০০ সেদিন সেও ভালো লেগেছিল বাবল গাঙ্গুলির। কিন্তু সেদিনের সেই ভালোলাগটুকুও বুকের ভিতরে টনটনিয়ে উঠছে যেন। ওর নতুন দিনের সেই ভরা প্রাচুর্য অমনি এক শ্রুতার দেউলে উজার করে দিয়ে বসে আছে আজও, সেই ব্যাধিটাই যেন নতুন করে জাগিয়ে দিল একজন সামান্য ওভারসিয়ারের এক অতি সাধারণ মেয়ের ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।

...ঠিক একটার সময় সেদিন মোটার হর্ন বেজে উঠেছিল নেশন-বিলডার্স লিমিটেডের দোর গোড়ায়।

উচু-নীচু, আপিসস্থল লোক চিনত এই মোটার হর্ন। তারা বলতে জামের বাঁশ। সাত সুরে মেশানো মাকামারা হর্ন। কিন্তু একটার সময় কেউ শুনেত অভ্যস্ত নয় এ হর্ন। ওটা বেজে উঠত ঠিক কাটার কাটার পাঁচটা। বাড়ির দিকে না চেয়েও অজ্ঞ কর্মচারীরা বুঝতে পারত, পাঁচটা বাজল। জানত, এইবার পড়ি মরি করে ছুটেবে একজন। বত কাজ থাক, আর বত কাইলই জমে উঠুক। সত্যি তাই। বাবল গাঙ্গুলি তখন কলের মাছুর নয় আজকের মত। কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়েই হয়তো শেষ ফাইলের কাজ শেষ করে নিত সেই মুহূর্তই হলের তাগিদে। নয়ত ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখত পরের দিনের জন্ত। তারপর একে ঠেলে, ওকে থাকা দিয়ে তরতর করে নেমে আসত সিঁড়ি বেয়ে।

এরই মধ্যে তাক বুঝে একমাত্র নরেন চৌধুরী এসে পথ রোধ করে পাঁড়াত মাঝে মাঝে। জামের বাঁশ কখাটা তারই মস্তিষ্কজাত। গলা ছেঁকেই একদিন বলে উঠেছিল, জামের বাঁশ শুনে পোপিনীকুলই আবুল হত, লোক হাসলে তুমি।

তাকে ঠেলে দিয়ে বাবল গাঙ্গুলি অবাব দিয়েছিল, কলিতে সব উল্টো বন্ধ, সব উল্টো—

তবু একমাত্র সে পথ আগলালেই ধামতে হত। নরেন কখনো বলত, এ ফাইলের কাজ শেষ করে দিয়ে বাও, নয় তো খেলারত দিতে হবে।

—কি খেলারত?

—আমিও বাব সঙ্গে।

বাবল গাঙ্গুলি কখনো হিড় হিড় করে তাকে নুতু টেনে নামাতো সিঁড়ি দিয়ে। কখনো আবার এক থাকার তাকে ফিরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে একাই ছুটত। একগাল হেসে মোটরগানের সামনে এসে পাঁড়াত। কে বলবে বাবল গাঙ্গুলি একজন ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ার, আর কে বলবে ওই বকবকে তকতকে মোটার গাড়ি এক ক্রান্তগতির ব্যতিক্রম সন্ধ্যায় যাত্র। ওই মোটার গাড়িতে নীলাকে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখলে কাব্যের হৃদয়ভি লাগত ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারের যদোবস্ত্রের যথিধানে। বোঝে দেখত আর রোজই ভালো লাগত আর রোজই নতুন লাগত।

হাতের পর বোজাই তো সকাল হয়, বোজাই কি সেটা নতুন নয়?  
বোজাই তো সূর্য ওঠে, নতুন নয় বোজাই?

বতকশ না নেমে আসে, থেকে থেকে ততকশই হন' বাজে।  
সেরী হলে ছয় কোঁচু নীলা ঝাঁজিয়ে উঠত, কানে তুলো গুলে বসে  
থাকো না কি, একবার থেকে হন' বাজাচ্ছি।

দরজা খুলে ধুপ করে তার পাশে বসে পড়ে বাদল জবাব দেয়,  
ওনেছি, সবকটাই ওনেছি—তোমার ওই মিষ্টি হন' শুধু আমার নয়,  
আপিসগুরু লোকেরই কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে বেঁধে  
—কিন্তু সখি, কাজ বড় বিবম গরল।

তবে নাবো, কাজই করো গে বাও!

কখনো আবার কোন জবাব না দিয়ে সেই ভরা দিনের  
খোলা বাস্তব, মোটরের ভিতর হঠাৎ একেবারে তার সমগ্রগলভ  
সামিথ্যে বকে আসত বাদল গাঙ্গুলি।

—এই! ষ্ট্রিয়ারি ছেড়ে স্বাসস্তব দরজার দিকে ঝুঁকে বসত  
নীলা। বাস্তব মধ্যে ইয়ারকি করতে হবে না। রাগ দেখাত  
সত্যি, কিন্তু টোন্টের হাসিটুকু একেবারে গোপন করতে  
পারত না। গাড়িতে ঠাঁট দিত তারপর। কমলকলি হাতে  
ষ্ট্রিয়ারি ধরে গাড়ি চালাত আর বাদল গাঙ্গুলি দেখত চেয়ে চেয়ে।  
গাড়িটা বেন ওর দাসহুদাস।

কখনো পাটতে বেত, কখনো নাচগান বাজনার আসরে, কখনো  
লাবে বা খিয়েটার বারফোপে। আবার কখনো কোথাও না—শুধু  
পাশাপাশি বাওয়াটাই উপলব্ধ।

বোজা, প্রত্যহ।

কিন্তু দিনে দুপুরে বেলা একটার সেদিন ওই মোটরের হন' কেন?  
দোতলার বিশাল হলরই একবারে সারি সারি চেঁষার পদস্থ  
অফিসারদের। ওরই একটা থেকে স্পিগ জাঁটা দরজা ঠেলে এসুনি  
একজন বেরিয়ে এসে হস্তনস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে খাওয়া করবে এবার,  
সেটাই প্রত্যাশিত ছিল হলর দ্বিতীয় কর্মচারীদের। কিন্তু কেউ  
এলো না। আর উদ্দেশে হন', তার চেঁষার থেকে বেয়ারার উদ্দেশে  
প্যাক করে একটা শব্দ হল শুধু।

বাদল গাঙ্গুলি জানত এসময়ে এই হন' বাজবে; কিন্তু বাজলেও  
যান্ত্র হওয়ার মত কিছু নয়। বেয়ারা ছুটে আসতে তাকে বলল,  
দেখো, ওই নীচের গাড়িতে আমার খাবার এসেছে, নিয়ে এসো।

বেয়ারা প্রস্থান করল।

ছুরে সেদিন ওর লাফের নেমস্তব্ব ছিল নীলার ওখানে। প্রায়ই  
থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কাজে ব্যস্ত থুং। একবার উঠলেতো আর  
অন্ন সময় হবে না। বাদল বলেছে তার খাবার আপিসে পাঠিয়ে  
দিতে।

—কেন, তোমার আসতে কি?

—বেয়ারা চাপ কাজের, তোমার বাবাই বিবম তৈতে আছেন,  
ছুটি মিলবে না।

দেখান কিজার্মি নিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী।  
মায় ডাকের ছড়ছড়ি। সরকারী বেসরকারী একপার্ট কমিটিতে  
বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক পড়ে বখন তখন। নীলার বাবা। বাদল  
গাঙ্গুলির জব্বী শব্দ। হলে কি হবে, কাজের সময় কোন সম্পর্কের  
ধুক থাকেন না। একটু এদিক ওদিক হলে ছাড়ন ছোড়ন মেই।

নেই বলেই ধাপে ধাপে এত অন্ন সময় অন্তটা উঠতে পেরেছিল  
বাদল গাঙ্গুলি। কারণ, এমিক-ওমিক বড় হত না তার  
কাজ। হলেও ভালর জন্তেই হয়েছে। অনেক বার সেটা  
বুঝটান করেই প্রমাণ করে এসেছে সে।

তুং কুচক নীলা চেয়েছিল তার দিকে। অর্থাৎ চালাকি  
পেয়েছে? হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গেছে পাশের ঘরে।  
—বাবা, কাল ও লাফে আসতে পারবে না বলছে, এত কাজ তুমি  
নাকি ছুটি দেবে না—খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পাইপ যুখে বিপুল বাড়রী হাসেন। বাদল গাঙ্গুলির পদমর্খালার  
ছ' বটা ছুটি বেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপটা  
মিথো নয়। আর শ্রীমান কাজ ছেড়ে একবার বেকলে খেয়ে-দেয়ে  
সুবোধ ছেলেটির মত আবার আপিস করবে সে আশাও রাখেন  
না। বলেছেন, কাজটা আগে না তোর খাওয়া আগে? তুই  
তো তোর বন্ধুদের কম্প্যানী পাচ্ছিসই—ওর খাবারটা পাঠিয়েই  
দিস।

পছন্দ হল না। নীলারও না, নীলার মায়েরও না। মিসেস  
বাড়রী বললেন, আচ্ছা, কতকগুলি বা লাগবে—তোমার কাজ একেবারে  
উল্টে যাবে ওটুকুতে!

বিপুল বাবু জবাব দেন, ওন্টাবে কি না সে তো ওই ভালো  
জানেন। কাজ আছে বখন বলাছে নিশ্চয়ই কাজ আছে—ওটাও তো  
আপিস একটা না কি!

—থাক বাবা থাক, আপিসেই পাঠাব'খন সব খাবার। কিরে  
বেতে বেতে রাগ করে নীলা বলেছে, আমারও যেমন—তোমার কাছে  
এসেছিল বলে।

দরজা ঠেলে অতিক্রম টিকিন-কারিয়ার নিয়ে বেয়ারার আবির্ভাব।  
টেবিল থেকে ফাইল সরিয়ে গ্লাস-ডিস সাজালো। তার পর টিকিন  
কারিয়ার খুলে একেবারে হাঁ। প্রথম বাটিতে কিছু নেই—শুধু এক  
লাইন লেখা কাগজ একটা। বেয়ারার সামনেই অপ্রস্তুতের একশেষ।  
নীলা বড় বড় করে লিখেছে, খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো পরপাঠ চলে  
এসো। ওমিকে দ্বিতীয় বাটিটাও খুলে ফেলেছে বেয়ারা। তাতও  
দ্বিগ্ন একটা। বাদল গাঙ্গুলি ইশারার বেয়ারাকে বলল চলে যেতে।  
সব ক'টা বাটিতেই ওই এক টুকরো করে কাগজ। লাফের মেহু  
কি, কারা কারা অপেক্ষা করছে, কতকগুলির মধ্যে না এলে মেহুটা  
শুধু মুখেই ওনতে হবে, ইত্যাদি।

টিফিন-কারিয়ার লেখেই ক্ষিধেটা বেশ চাড়িয়ে উঠেছিল বাদল  
গাঙ্গুলির।...হাসিও পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। বেশি রাগ  
হয়েছে বেয়ারার সামনে অপ্রস্তুত হয়েছে বলে। বোতাম টিপে  
তাকে ডাকল আবার। নিশে'ন মত সে টিকিন-কারিয়ার ইত্যাদি  
গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু জ্বব বাদল গাঙ্গুলিও করতে জানে। কাজ মাথার উঠল।  
বসে আছে অপেক্ষা করে। টেলিফোন বেজে উঠল। বিসিভার  
তুলে নিল।

ওয়ার থেকে। কি এসে না?

এবার থেকে। এছুরি বাবো, একেবারে মুখ তুলতে পারছি  
না। তোমরা অপেক্ষা কোরো না।

—না, ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।

—সেইজন্মেই তো আরো যাবো না। আমার জন্মে তুমি একা বসে থাকবে।

—চালাকী করতে হবে না, এসো শিগ্গির।

—যাচ্ছি, তোমার শুরু করো। হাতের কাঁজটুকু সেরে না গেলে তোমার বাবাই চাকরী খতম করে দেবেন। অপেক্ষা কোরো না কিন্তু, হ্যা—ঠিক বাবো।

ঠিকই গিয়েছিল। ঠিক পাঁচটায় আপিস থেকে বেরিয়েছে। তার পর যেতে বসন্তু লাগে।

নীলা চটেছিল। তার থেকে বেশি চটেছিলেন নীলার মা। কেন জানি স্বামী বা মেয়ের মত ওকে অন্তর্নিহিত স্রোতে দেখতে পাবেন নি মহিলা। যেভাবে জামাইকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিলেন, সে ভাবে ঠিক পাওয়া যাবে কি না তেমন একটা সংশয় ছিল বললেই বোধ হয়। এত বড় বাড়ি, দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলের তেই ইচ্ছার বয়স পেরোয়নি। বিয়ের পর জামাই অন্যায়সেই এখানেই থাকতে পারে। এখন থেকেই থাকতে পারে। সে মনোভাব অনেকবারই বক্তৃতা করেছেন তিনি। কিন্তু গ্যোঁয়ো মাই বেশি হল ওর। আর যে ছিপি ওর বাড়ির। মেয়ের সেখানে গিয়ে থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

বিকল পাঁচটা না বাজতে মেয়ে সেজেগুজে সাত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে বায় কোথায় ভানেন। বিরক্তও হন। মেয়ের বাবার উদ্দেশ্যে অনেকদিন বলেছেন, যেমন তুমি তেমন তোমার মেয়ে, দু'জনেই তোমরা দিনকে দিন ওকে বাড়িয়ে তুলছ। ঘড়িতে চারটে বাজলেই মেয়ের আর তর সয় না, ছুটবে গাড়ি নিয়ে। কেন, গ্যাট হয়ে বাড়ি বসে থাক, ও আপনি আসবে খন সড় সড় করে।

আড়াল থেকে নীলাও শোনে। বিপুল বাড়রীর মেজাজ ভালো না থাকলে জবাব দেন না। ভালো থাকলে বলেন, তা ওদের বিয়েটা দিয়ে নাও না, মিষ্টি মিষ্টি দেবী করে লাভ কী?

—খামো বাপু তুমি, হেসে খেলে দু'দিন বেড়াচ্ছে মেয়েটা বেড়াক, তার পর তো আচ্ছাই বিয়ে, বিয়ে পালাচ্ছে না কি?

জ্বলোক ঠাট্টা করেন, কিন্তু তোমার মেয়ে যে পালাচ্ছে!

এ সব খবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীলাই আবার বাবাকে জানিয়েছে। মায়ের এ অমূল্য অন্বেষণ ওদের দু'জনের কাছেই হাসির ব্যাপার।

বিপুল বাড়রী সেদিন বাড়ি ফেরা মাত্র মহিলা অগ্নিমূর্তি হয়ে ভাবী জামাইয়ের লাঞ্চে না আসার দাপ্তিকতাটাই বড় করে বিস্তার করতে বসলেন। মেয়েটা সেই থেকে প্রায় না খেয়ে মন খারাপ করে আছে। বলেছিলেন না, যে ভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সে ভাবে পোষ মানেনি ও, আর মানবেন ও কক্ষনা?

বিপুল বাবু বলেন, কিন্তু ওর তো খাবারটা আপিসে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল।

—কেন, ও আসবে না কেন? টেলিফোনে বলল আসবে, তার পরেও এলো না কেন?

বাবল আসার পর তার কাছেও মেয়ের থকলটাই কেনিয়ে তুললেন মিসেস বাড়রী। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার না পাঠাবার ব্যাপারে তাঁরও পদ্যক সার ছিল বললেই বাপ চাপতে পারছিলেন না। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে আপসটা ওর সহজেই হয়ে গেল। কারণ, কাঁজটা আর বাই হোক ভালো হয়নি খুব, সেটা নীলা উপলব্ধি করছিল।

হুপুবে খাওয়াটা বেশ ভালো ভাবে উত্তল করে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল তার পর। গাড়ি চালাতে চালাতে মায়ের মেজাজ কতখানি বিগড়েছে নীলা তারই কিরিত্তি সিদ্ধিল একটা।

সে খামতে বাবল সিজাসা করল, আর কি বললেন তোমার মা?

—আর বললেন, ছেলোটা এখনো ঠিক পোষ মানেনি।

—তোমাদের টিম কুকুরের মত?

—তোমার বা বুনা স্বভাব, ওতে কুলোবে না, আরো শক্ত লোকস দরকার।

সন্ধ্যার একটা নিরিবিলা পথ ধরে নীলা গাড়ি চালাচ্ছিল। ষ্ট্রিয়ারিং থেকে হাত তোলার উপায় নেই। আচমকা অধর স্পর্শে গাড়ির টাল সামলানো লায় হয়েছিল প্রায়। ছয় কোশে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল শুধু, অ্যাকসিডেন্ট হলে তখন?

জবাবে আবার। এবং তেমনি আচমকা।

—ভালো হবে না বলছি, একুনি দোষ কিন্তু ষ্ট্রিয়ারিং ছেড়ে।

বাবল গাঙ্গুলি তেসেছে, বলেছে একে বুনা স্বভাব, তার ছাড়। আচ্ছি আমার কি লোব।

কিন্তু মধ্যাহ্নের এট আহার প্রসঙ্গ বাড়িতে ওর নিম্নের মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতে একেবারে অন্তরকম ঝাঁড়াল ব্যাপারটা। রাত্রিতে থাকে না শুনে মা খবর করতে এসেছিলেন, সেই হুপুবে নেমন্তন্ন খেয়েছিল, এখনো ক্ষিদে পায়নি?

মায়ের কাছে হাসতে হাসতে সবিস্তারে জাপন করেছিল 'হুপুবে মজার ব্যাপারটা। ওকে জ্ঞপ করতে গিয়ে উটে নিজেহাই কেমন জ্ঞপ হয়েছে সেই কথা।

কিন্তু মা এর মধ্যে মজা কিছু দেখলেন না, আর জ্ঞপ হওয়া বা করার আনন্দও কিছুমাত্র উপভোগ করলেন বলে মনে হল না। শোনা মাত্র মুখ বেন শাল হয়ে গিয়েছিল মায়ের। অসুট আকৃতিতে বলে ফেলছিলেন, খালি টিফিন ক্যারিয়ার পাঠিয়ে তারা তোকে সমস্ত দিন না খাটয়ে রাখল!

সামনে নেবার জন্ত ছেলে তারপরে অনেক কথাই হনত বলেছিল। কিন্তু মা তার একবর্ণও শুনেছেন বলে মনে হয়নি। আর একটা কথাও না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছিলেন তিনি।

মনে মনে মায়ের 'পরে সেদিন একটু বিরক্তও হয়েছিল। মায়ের চোখের সামনে ওর সমস্ত তিতরগুণ খোলাখুলি ধরা পড়ে যেত বললেই বোধ হয়। ভাবত, মায়ের ধারণা মিথ্যা নয় খুব। কিন্তু যোগ্যতা তো তারও আছে। নেশান বিভ্রাস'এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী চাকার গণ্ডা লোক চরান, ওর মত তো আর পাঁচজনকে বেছে নেন নি তিনি। যোগ্যতা মা বাঁকলে, বরাবর স্ফলুরিণি না পেল, ওর মত গরীবের ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাই স্বপ্ন। অবশ্য এই পড়ার মধ্যে মা অনেকখানি। ছেলে-বেলা থেকে মায়ের সবল ইচ্ছাশক্তিই যেন ঘিরে থাকত ওকে। চাকরীতে চূক চট করেই নাম করেছিল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী কোম্পানী থেকেই ওকে টেনিঃএর জন্ত বাটরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ রকম একটা ছেলেকে বড় হবার প্রবোগ দেওয়াও সহজ, আর সুযোগ দিয়ে কিনে রাখাও সহজ। বিপুল বাড়রীর খার্ব সেদিনও অবিলম্বিত ছিল না বাবল গাঙ্গুলির। নীলাকে কাছাকাছি পাওয়ার পর থেকে সে খাচ্ছে পাকে পাকে

জড়িয়ে যেতে আপত্তিও ছিল না তার। গরীবের ছেলে এতবড় ভাগ্যের সন্ধাননা কখনো ভাবেনি। কিন্তু ওর অস্থিমজ্জার আর একটিকে মিশে আছে মায়ের গড়া সন্ধ্যাবোধ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করতে চেষ্টা, কিন্তু কেনা হয়ে থাকতে চায়নি তাঁদের। অনেক সময় সেটা নিজেরই সে বরণান্ত করতে পারত না। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের চুপ্চুপ্তা বা ইঙ্গিত কটাকট খুব ভালো লাগত না তা বলে।

...কিন্তু সব শেষে একদিন সব কিছুই সেই কল্লান্তক অবসান।

আলো নেবানো ঘরের নিভৃত্তে বসে থাকতে থাকতে বাদল গাঙ্গুলির হঠাৎ মনে হল ঘরের বাতাস যেন কমে যাচ্ছে। একটা অব্যক্ত শূন্যতা চেপে বসছে ক্রমশ। ইঞ্জিনের ছেড়ে উঠে পাড়াল। সামনের টেবিলে নীলার ফোটা আছে একখানা। অনেকদিন ধরেই আছে। রাখার কোন অর্থ হয় না। তবু রেখেছে। চোখের সামনে ওকে রেখে, ওর সখ্যকে, একমাত্র মা ছাড়া ছিন্দিয়ার সমস্ত নারীর সখ্যকেই নির্মন নিম্পূহতার ভিতরটাকে অস্বস্তিশূন্য করে তোলার তাগিদেই ওটা রেখেছিল যোধ হয়।

সামনে এসে পাড়াল। ছুঁহাতে তুলে নিল কোটোখানা। আরো অনেক ছিল। সব নির্মূল করে ফেলেছে। এটাও করত—

—হ্যাঁ, এত বুধিগ আর এটুকু বুধিগনে, স্বর হলে গারে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায় ?

সচকিতে ঘরে পাড়াল বাদল গাঙ্গুলি। ঘরের মধ্যে, শূন্য ঘরের মধ্যে, তার খুব কাঁচে, একেবারে কাছে, কোথায় বুধি মা এসে পাড়িয়েছে। তার মা! তার মায়ের কথা! সেই সবশেষে সব শেষ করার জন্তই ও যখন ফোটা ছিঁড়ছিল একে একে—ওর মা বলেছিল। সেই কথাগুলি যেন আজ আবার মিবিড় স্পর্শ হয়ে কানের ভিতরে, বুকের ভিতরে পৌঁছল হঠাৎ। অব্যক্ত বাতনায় শূন্য ঘরের মধ্যে একমাত্র সেই মাকেই যেন খুঁজে বেড়ালো মড়াইয়ের ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। মা, মা গো...!

—কে ? হাতের কোটো রেখে দিল। নিভৃত্ত রোমস্থানে ছেদ পড়ে গেল।

—আমি নিধু, বাস্তিরের খাবার।

ঘরের আলো জ্বলে দিল বাদল গাঙ্গুলি। ঘড়ি দেখল। ছোট টেবিলে খাবার রেখে অপেক্ষা করতে লাগল নিধু। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পর্গহীন নিম্পূহতার আবরণ নেবে এসেছে ভিতরে-বাইরে।

চেয়ার টেনে আহায়ে বসল কলের মায়া চিক ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। [ ক্রমশঃ ।

## ফাল্গুনী

### বান্ধবের গুণ

হ হ করে হাওয়া :  
গুচ্ছ বোধির  
মুহু-মুহু  
নম্র অধীর  
সুখ-সকাল গুঞ্জে ।

বঁধে রাখি মন :  
হয়ে যায় পাখী।  
নবধন ছায়  
কোন সুরে ডাকি  
স্বপ্ন-শিখিল কুঞ্জে ।

দেখেছি তখন  
ছিলে উদ্মনা ;  
পাতা-স্বরূপ দিন :  
বলে দিন গোখা  
চন্দন-চাক গুঞ্জে ।

পলাশ-শাখায়  
এবার বন্ধা।  
ছুঁহাতে ছুঁড়াও  
কাঁবে অনভা  
আমাকে লগায় জ্বলে ।





অপকল্প ও অনিন্দ্য

অপর্যাপ্ত অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
ম্লিধ ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাজেয় প্রসাধনী।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম এল. বসু য্যাও কোং প্রাইভেট লি  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-২

লক্ষ্মীবিলাস বালি অভুলনীয়



## বারীন্দ্রনাথ দাশ

কনফারেন্স একলা বলেছিলেন—Everything has its beauty, but not everyone sees it : সৌন্দর্যের প্রকাশ সব কিছুব মধ্যেই, কিন্তু তাকে দেখবার চোখ নেই অনেকেরই। সেদিন থেকে আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে রূপকথার পাতায় চালান হয়ে গেছে সম্রাট শিহুয়াং-টি, স্বর্ণের দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে হান রাজবংশের স্বর্ণযুগ। সুই, তাং, সূং রাজাদের ঐশ্বর্য, জেন্সি থানের স্বর্ণ-বাহিনীর অভিযান, কুংলাই থানের শৌর্য, মিং আর মাঞ্চুদের বিলাস-ব্যসন আর বিপ্লবের কাহিনী, আজ শুধু অতীতের ইতিকথার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। কিন্তু সেই দীর্ঘ শতাব্দীগুলোর ওপার থেকে কনফারেন্সের কথাগুলো আজো মনের মধ্যে টুং-টাং করে ওঠে, বখনিই মনে পড়ে চায়না টাউনের পুরোনো দিনগুলোর কথা।

পশ্চিমে চিংপুর, দক্ষিণে যৌবাজার। তারই এপাশে সাবেক কালের বেনৌ চায়না টাউন। বড়ো রাস্তার চলতি ট্রাম-বাগ থেকে চোখে পড়ে, এদিককার হু'-চারটি চীনে ডেকিষ্টের দোকান। তাদেরই আশে-পাশে এখানে-সেখানে সন্ম-সন্ম গলি এসে পড়েছে বড়ো রাস্তার মোহানায়। তার ভেতর থেকে কখনো-সময় বেয়ে আসে শাট-প্যাট-পর্য চীনেম্যান, উদ্যম সাইকেলে টিউনিক-পর্য চীনে জ্বলের কিশোরী, মধুর রিক্সায় বাদাম-নয়না গৃহিণী। এ রকম চীনে হু'-চার জন। আর বার্য সব বেরিয়ে আসে কিংবা চুকে পড়ে গলির ভেতর তারা সব হুদলমান, নয় ইহুদী, নয় তো বা ফিরঙ্গী। বড়ো রাস্তা থেকে দেখা যায়, এ গলি সে-গলির শানিকটা। সে-সব অলি-গলি হু'-চার পা এগিয়েই ঘোড় ফিরে এ'কে-ব'কে কী যেন এক রহস্তময় অজানার মিশে গেছে। কতো গল্প এই চীনেপাড়াকে নিয়ে, বোমহর্ষক আলোচনা গামবাজারের বকে, ভবানীপুরের ক্লাবঘরে আর চৌরঙ্গীর বেস্টারী, কতো বোমাক্শিহর কল্পনা-বিলাস বটজলার গোয়েন্দা উপজ্ঞানের নিউজপ্রেস্ট পাতায়। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক ওপাড়ার ছায়া মাড়ায় না। কখনো হয়তো হু'-চার জন সখ করে সোয়ান পাণ্টাতে বায় চীনেপাড়ার বিখ্যাত রেস্টুরাঁয়। সেখানে সোনালী গাংলার কাজ-করা পরিবেশে, পুঙ্খ খোদাই করা টেবিলের পাশে মার্বেলের মঞ্চ চেয়ারে বসে চিলিস'সু দিয়ে চাও-মিয়েন, চিকেন সহযোগে বাঁশের কৌড়, সোয়া-বীন স'সু দিয়ে জিড়ি ভাজা, কাঁকড়া সেন্ড্রু এফ্রুটি চাখতে চাখতে চীনে জাকিরি ওপার থেকে জেসে-আসা অল্পবয়স্ক কাকলী শুনে সরেপ হয়ে টাটকা

হয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে ফিরে আসে চেনা পৃথিবীর নিরাপদ আবহাওয়ায়। সেই বিখ্যাত রেস্টুরাঁটির ওপাশে যে সন্ম অন্ধকার গলি ভেতরে ঢুকে গেছে, বার্য শুমোটি পরিবেশ থেকে ভেসে আসে মিহি গলায় তীক্ষ্ণ হাসির তরঙ্গ,—সেদিকে তাকায় না। এ পাশের ছোটো দোকান, বার্য ভেতর কাঠের টেবিলের চার পাশে হু'-চারজন বিভিন্ন জাতের লোক জোরগলায় হাসে আর চাপা গলায় গল্প করে, সেদিকেও ফিরে তাকায় না। ডাষ্টবিনের পাশের মাদী শূয়েরটা এড়িয়ে, হু'-চারটি নির্বিকার মুরগী আর পাতিহাঁস পেদিয়ে, শুকনো মাংসের টুকরো খোলানো, স্ট্রুটী মাছ আর শূয়েরের চর্বি সাজানো নোংরা দোকানটির সামনে পড়তেই নাকে ক্রমাল চাপা দিয়ে ব্র্যাকবার্প লেন, কিয়ার্স লেন পেছনে কেসে এগিয়ে চলে যায়।

গত ছয় সাত বছরে অনেক বদলে গেছে এ পাড়ার আবহাওয়া। অনেক চীনে চলে গেছে এ পাড়া থেকে, অল্প জাতের লোক অল্পপ্রবেশ করছে আস্তে আস্তে। সেট্রাল এভিনিউ থেকে দেখা যায় ইউডেন হসপিটালের উটো দিক থেকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাঙ্কের নতুন চওড়া রাস্তা বেরুচ্ছে, সন্ম সন্ম গলিগুলো নিশ্চিহ্ন করে, জীর্ণ বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে সুরকি-পাথরের কুচি আবর্জনা পেদিয়ে চলে যাচ্ছে চিংপুরের দিকে। মাঝখানে কাঁকা পড়ে আছে অনেকখানি জায়গা। এক পাশে ইহুদীদের সিনাগগ আর একটি মসজিদ বড়ো কাছাকাছি, অল্প পাশে হু'-চারটি চীনে দোকান, আর এদিক ওদিক ফুটকুটে চীনে খোকা-খুকদের হটগোল। দোকানগুলোর সামনে সাজানো রঙিন মোমবাতি, রঙিন ফ্রাফ্র, বাজি-পটকা, কাগজের ফুল আর ফেটন, ঝাপসা কাচের শো-কেসের ভেতর থেকে উ'কি মারা চীনে মাটির পুড়ল, আর আশে-পাশের রাস্তার থেকে চবির গন্ধ—সুগন্ধ প্রচোয় পরিবেশ বা একটুখানি টিমটিম করছে—এরই মধ্যে। এও যে আর বেশী দিন থাকবে না, কর্পোরেশনের স্ট্রামরোলায় আর বোড স্কোড সাইন দেখে বেশ বোঝা যায়। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে নতুন নতুন চার-পাঁচটা পানের দোকান। কান খাড়া করলেই বোম্বের হিল্পি ফিদের গান শোনা যায়।

সেখানেই একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল জেনী ওয়ান'এর সঙ্গে।

নানকিং এ খেতে ডেকেছিলো এক পাঞ্জাবী বন্ধু যোগীন্দ্র সিং। ঝাওয়া-দাওয়ায় পর সে চলে গেল অমিদপাড়ার দিকে। আমাদের গম্ভীর সেট্রাল এভিনিউ, তাই শটকাট কবচিলাম এদিক দিয়ে।

আকাশে তখন মেঘ করছে, সেদিন আবার মাস।

হঠাৎ দেখি, ওখান থেকে আসছে খুব চেনা-চেনা মনে হওয়া কে একজন,—প্যারাসোলের নিচে বব্, চুল, ছোটো ছোটো দুটো চোখ, চাপা নাক, লাল টুকটুক সফট, ফর্সা গলার নিচে সাদা সিলের জামা আর কালো হ্যাট, তার ভেতর থেকে রেকনো দুটো নিটোল ফর্সা হাত। সব মিলিয়ে খুব মিষ্টি দেখতে।

জেনী? জেনী ওয়াং?

ভাবলাম ডেকে কথা বলবো কি না। যদি চিনতে না পারে? সাত বছর আগেকার কয়েকটি ঝড়ের মত দিন,—সেই দিনগুলোর কথা সে যদি মুছে ফেলে থাকে তার জীবন থেকে, তা'হলে তো আমাকে আর আরো অনেককে তার মনে রাখবার কথা নয়। আর মনে রাখলেও যদি চিনতে না চায়!

কাছে আসতেই দেখি, লাল টুকটুক হোঁটের কাঁক দিয়ে এক সারি মুক্তোর মতো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সহজ হাসিতে।

“হা—লু—লো! তুমি?”

পাঁড়িয়ে পড়লাম।

জেনী বললে, “অনেক দূর থেকেই তোমায় দেখতে পেয়েছি। বছরদিন পর দেখা হোলো, তাই না? তুমি তো এদিকে আজকাল আসোই না।”

“আসি মাঝে মাঝে—।”

“তবে আগের মতো নয়, কি বলা?” হাসলো জেনী। জিজ্ঞেস করলো, “তোমায় সেই বন্ধুটি কোথায়?”

হঠাৎ বুক তুক-তুক করে উঠলো। “কেন বন্ধু?”

“সেই মিষ্টার সুলেমান?”

বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হোলো। যার কথা ভাবছিলাম, তার কথা সে জিজ্ঞেস করলো না।

“সুলেমান? সে এখন কি করচিতে আছে।”

“তাই নাকি? আর সেই বন্ধুটি?”

বুক আমার ধুলে উঠলো।

“কে?”

“হেনরি ডি'সুজা?”

বুক আবার ধ্বিৎ হোলো।

“সে এখানেই আছে।”

“আর হোগীন্দর সিং?”

“সেও এখানেই আছে। নিজের অফিস করেছে থ্র্যাণ্ড বোডে।

এতক্ষণ তো তারই সঙ্গে ছিলাম।”

“ও!” চুপ করে বইলো জেনী।

আমি ভাবলাম যার কথা এড়ানোর চেষ্টা করছি, তার কথা কি জিজ্ঞেস করবে সে?

জেনী বললো, “আজকাল আর কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। এত ব্যস্ত থাকি।”

“কান্ন করছো নাকি কোথাও?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ, আমাদের একটি নতুন স্থল হয়েছে, হং-সং-তাও মেমোরিয়াল হাই স্কুল। সেই স্থলের অফিসে কাজ করি।”

তারপর যেন আর কিছু বলবার নেই।

আর কি বলা যায়, আমিও ভেবে পেলাম না।

অনেকের কথাই মনে এলো। জেনীর ভাই হং-চ্যাং আর

চিয়েন-চ্যাং, হং-চ্যাং এর বন্ধু ফেং-জেং-শিহাং, ফেং-জেং-শিহাং এর চোখ খাঁখানো থোন টিং-লিং, ওদের বন্ধু ষ্ট্রিট রবিনসন, আর আরো অনেকে, যাদের সঙ্গে অনেক মধুর দিন কাটিয়েছি এ পাড়ায়, কে জানে তারা আজ কোথায়! তাদের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করতে পারলাম না।

শুধু বললাম, “তুমি কি এখনো সেই আগের বাড়িতেই থাক?”

“আগের বাড়ি?” জেনী তেঁসে উঠলো। “ও বাড়ি আর নেই।

সে বাস্তবাই নেই। তুমি দেখছি সব ভুলে গেছ। আমাদের বাস্তুটি কোথায় ছিলো তোমার মনে নেই? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো!”

তাকিয়ে দেখলাম চার সিক।

চার সিক কাঁকা, পাখরের টুকরো আর সুরকি ছড়ানো। কর্পোরেশনের নিশ্চল স্ট্রিমগোলারটির চালে বসে ছ'চাষটি কাক জটলা করছে।

জেনী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

“ওই যে লোকটি থাকে, ওখান থেকে বেরিয়েছিলো বিবি আমেলিয়া লেন। ওই যে মেয়েটি বসে বালি দিয়ে প্যাগোডা বানাচ্ছে, সেখানেই ছিলো আমাদের—,” হঠাৎ থেমে গেল জেনী। মুখ ফিরিয়ে নিলো কয়েক সেকেন্ডের জন্তে।

তারপর ফিরে তাকিয়ে হেসে বললো, “তুমি এত আসতে! সেই গুড্, ওল্ড্, ডেস্! মনে পড়ে?”

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এদিকে ব্র্যাকবার্ণ লেন, ওদিকে ছাতাওয়ালা গলি। আর এপাশে ছিলো জাঁকাবঁকা অস্থায়ী গলিঘূর্ণি। জানা না থাকলে বিবি আমেলিয়া লেন ঘূর্ণি পেওয়া বড়ো শক্ত। সব ভেঙে ধুড়িয়ে বড়ো বাস্তব হচ্ছে।

“কি ভাবছো?” জিজ্ঞেস করলো জেনী ওয়াং।

হেসে বললাম, “ভাবছি ওখানে একটু মার্বেল ফলক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়, যেখানে লেখা থাকবে: Here lived Jennie Wang and had fine time with her friends sometime in the summer of 1948.....”

জেনী হাসলো। উত্তর দিলো, “তা'হলেও কি কারো মনে থাকবে?”

আকাশের মেঘ আরো ঘন হয়ে এলো।

“বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে,” জেনী বললো, “এবার বাড়ি বাই।”

বলতে না বলতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি শুরু হোলো।

প্যারাসোল গুটিয়ে নিলো জেনী। বৃষ্টিতে সেটি অচল। সকাল বেলা দুটুফুটে বোন্ধুর ছিলো। এমন দিনে কেউ ছাতা নিয়ে বেবোয় না। কে জানতো যে আমার সঙ্গে দেখা হবে জেনীর! কে জানতো যে এমন বললম বোন্ধুর মুছে গিয়ে যেখ বরো বৃষ্টি নামবে!

কাছেই দূর গলিটির মোড়ে একটু ছোটো দোকান। দিনের বেলা বেশ কাঁকা, নিরিবিবি। গোটা তিন কাঠের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার।

আমরা ঢুকতেই নীল পায়জামা আর নীল জামা-পরা একটা মেয়ে-ছেলে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। মনে হোলো জেনীকে সে চেনে। তাকে দেখে হাসতেই সোনার বাধানো পাত চিকমিক করে উঠলো। চান্নে ভাষায় সে কি যেন জিজ্ঞেস করলো জেনীকে।

জেনীও উত্তর দিলো চান ডায়া।

মেয়ে-ছেলেটি ফিরে এলো এক পট চা আর পেয়াদা-শিরিচ নিয়ে।

জেনী পেয়াদার চা ঢেলে দিলো।

যেখানে আমি আর জেনী ওরা মুখোমুখি বসে, সেখানে থেকে ওঁদের কাঁকা জায়গাটি দেখা যায়। সেখানে তখন বাপসা হয়ে কুঠি নেমেছে।

কখন যেখি সেখানে আর কাঁকা নয়, বাপসা নয়। সেখানে তখন জাঁকাবাকা গলি। অনেক লোকের আসা-বাওয়া। উনিশ গো ছাত্রদের আষাঢ় মাসের সম্রল দুপুর বুছে গিয়ে আমার মন ঘিরে নামলো উনিশ গো আটচলিশের ফান্ডনের এক ধূসর সন্ধ্যা।

উনিশ গো আটচলিশের ফান্ডনের সেই ধূসর সন্ধ্যার বাগের অপেক্ষায় চূপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম বৌবাজার সেন্ট্রাল এডিনিউর মোড়ে। হঠাৎ সামনে এসে থামলো একটি উজ্জ্বল ট্যান্ডি। যে দামেলা জার পরনে থাকি পাট আর সিকের স্পোর্টস শার্ট, মুখে চুট। কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললে, "তোকে দেখে নেমে পড়লাম। কি রকম আছিল? পাঁড়া, ভাড়াটা মিটিয়ে দিই। এখান থেকে হেঁটেই বাওয়া যাবে"।

"আমি যে সিনেমায় যাচ্ছি"।

"পাগল? এখন ছুটা দশ। টিকিট পাবি না।"

"টিকিট করা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? তা'হলে ওটা কাউকে দিয়ে দে।"

"কাঁকে আবার দিতে যাবো?"

"দে' না রাস্তার যে কোনো লোককে বিলিয়ে। সে সারা জীবন তোকে মনে রাখবে।"

দিলীপ দা'র জীবনদর্শন আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারলো না। বললাম, "সে হয় না। তিনটি টিকিট কেনা হয়েছে, ছুটো আরেক জনের কাছে। বোরা আগ গিয়ে বসে থাকবে।"

"তাই নাকি? নেচার! তাদের তুই একদিনও একটু শাস্তিতে সিনেমা দেখতে দিবি না? —আরে, এই যে, সলোমন, শোনো শোনো, তোমার কথাই বলছিলাম।"

পাশ দিয়ে হন-হন করে যাচ্ছিলো একজন। এক বিষত লম্বা নাক, জেন দৃষ্টি, ফর্সা গায়ের রং, আধময়লা জামা-কাপড়, মাথায় বাটির মতো দেখতে একটি কাপড়ের টুপি।

সে থেমে পড়লো। কাছে এসে বললো, "হালো মুখার্জী, তোমার বাড়ি চার দিন গিয়ে—"

দিলীপ দা' একগাল হেসে আমার দেখিয়ে তাকে বললে, "এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বৃথি? এ আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে অন্তরঙ্গ বন্ধু রজন"। তারপর আমার দিকে ফিরে— "এই যে পাবও অম্বতরকে দেখছো এর নাম সলোমন, আমার ইতিবৃত্তি বন্ধু এবং পাণ্ডালীর। গত বছর আমার হৃদয়ে দশটা টাকার খার নিয়েছিলাম। কী বদমাইশ, এখনো তাগাদা দেয়! কিন্তু লোকটির অনেক গুণ। অভিশপ্ত ইচ্ছা জাতির মধ্যে এত বড় প্রতিভা জন্মায় নি। সমাজবিজ্ঞানে কার্ল মার্কস, মনোবিজ্ঞানে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, পরমার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইন—আর বোড়ালো-বিজ্ঞানে এই সলোমন। এত ভালো যেসের টিপস দেয়, কতো লোক যে কত

হয়ে গেছে ওর টিপস নিয়ে। না, না, বোড়া জেতে না সে কথা বলছি মা। বোড়া জেতে টিকিট। কিন্তু একটা ছুটো জিতে ভালোমাহুয়ের নেশা ধরে যায়, বাস, সহধর্মিণীর ভ্রাতা। এই লোকটি আর টিপস দেয় না, ভালোমাহুয়ের কতুর হয়ে যায়।—ওহে সলোমন, এট শনিবার সিলভার-ফিশের উপর খরবে বলে দিচ্ছি। যাচ্ছ বটে আটের দরে, কিন্তু বোড়ার মুখের খবর, উইন না হোক প্রেস যদি না পায় তো আমার খবর আমার মতো। হুজুরানের নাম দিলীপ মুখার্জী রাখেনি। টাকটা? হ্যাঁ, এসো, কালই এসো, কিছা সোমবার আমার অফিসে। ক্যানিং ট্রাটে নতুন অফিস করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি তো দেখো। তোমায় তো দেখছি ভাগানো মুশকিল। ওহে, এখন কোথায় বাচ্ছো।"

"যেখি জানি ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি গিয়ে, ওকে যদি পাওয়া যায়," সলোমন উত্তর দিলো।

"কেন, টাকার তাগাদার বৃথি? মাহুয়কে শাস্তিতে থাকতে দেবে না? এমন সোনার গোপলি, কোথায় মরদায়ে গিয়ে গাছতলার বসে চানেকাশম খেতে খেতে গুন্‌গুন্‌ করে সিনেমার স্টেটে হিই গাইবে, তা'নয়, একটি লোক সারাদিন খেটেখুটে আগামী কালের অনবজনের সন্ধান করে বাড়ি ফিরে বোয়ের হাতের তৈরী চা খেতে খেতে ঢেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে আদর করছে, শাবে তার সম্রাটি মাটি করতে। এক কাজ করো, একটি সিনেমা দেখে এসো। হ্যাঁ মেট্রোতে, খুব ভালো বই। ওহে রজন, টিকিটখানি দেখি।"

ডোবালে দিলীপ দা'।

"ওটা বাড়িতে ফেলে এসেছি," মরিয়া হয়ে বললাম, "দিলীপ দা', তোমার ট্যান্ডি অপেক্ষা করছে। চলো আমার বাড়িতে নামিয়ে দেবে।"

বলে উঠে পড়লাম ট্যান্ডিতে। দিলীপ দা'ও এলো পেছনে পেছনে।

"আমার টাকটা পরন্ত দেবে তো?" সলোমন জিজ্ঞেস করলো।

"দেখছো ছেলোটোর সামনে জীবনমরণ সম্রাটা। ওর বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর ও বাড়িতে টিকিট ফেলে এসেছে, আর তুমি আমার টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছো? আমার নাম করে পাঁচটা টাকা সিলভার-ফিশের উপর ধোয়া, বুঝলে? সিলভার-ফিশের মাসী আমার মেশোমশায়ের ল্যাণ্ডো টানতেন, নিমকের মান রাখতে সিলভার-ফিস উইন হোক প্রেস হোক, একটা কিছু করে আমার দশ টাকা নিশ্চয়ই তোমার ফিরিয়ে দেবে। আচ্ছা, বাই বাই।—চলিয়ে সদাঁরজী। সিধা মেট্রো সিনেমা। এঁ্যা, মেট্রো নয়? কোথায় তা'হলে? ও, আচ্ছা, লাইট হার্ডস চলিয়ে।"

অন্ত যে কেউ দিলীপদা'র কথাবার্তা শুনেল অবাক হতো। কিন্তু আমি ওর সাপে অপভ্রান্ত। সেই ছেলেলো থেকে দেখে আসছি দিলীপ দা'কে। আমার জ্যেষ্ঠত্বোদার দাদার ক্লাসকেও, কিন্তু আমার সঙ্গেও বখেট অন্তরঙ্গতা। প্রতিভার ছেলে, কিন্তু নিজের কেরিয়ার নষ্ট করেছে মদ খেয়ে আর রেস খেলে। কে আজ বিশ্বাস করবে দিলীপ দা' ইতিহাসে ফাষ্ট ক্লাস এম-এ? দিলীপ দা'র মা ইংরেজ। তাই দিলীপ দা'র সোনালী চুল, ফর্সা রং, তবু বাঙালীর মেজাজ।

বন্ধন খুলে পড়ে তখন ওর মা আর বাবার মধ্যে কি রকম যেন একটা গুণগোল হয়। ওর বাবাকে ডিভোর্স করে মা বিয়ে করলে আমাদের এক চাঁবাগানের সায়েবকে। তখন থেকে ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। দিলীপ দা' পিসীর কাছে মানুষ, আর তখন থেকেই একটু কি রকম যেন। সংসারে কোনো কিছুই উপরই কোনো আসক্তি নেই। মিরিয়াস নয় কোনো বাপায়ে, সব কিছুই খুব হালকা ভাবে নেওয়ার অভ্যাস। বাপের কিছু পরসাদ ছিলো। এম-এ পাশ করার পর দিলীপ দা'কে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কিছু করতে পারেনি। ও ফিরে আসবার পর বাপ চলে গেলেন গণ্ডিতেরি। তখন থেকে বাপের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই।

বিলেত থেকে ফিরে এসে একটা প্রাইভেট কলেজে প্রফেসরি পেয়েছিলো দিলীপ দা'। কিন্তু নিয়মিত রাসে যেতো না বলে, আর যখন যেতো তখন ছাত্রদের বেসের টিপসু দিতো বলে ছাত্র মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেলো না।

দিলীপ দা'র রাস নেওয়ার বর্ণনা অনেকের কাছেই শুনেছি।

...“নাইটিউ”!

“শ্রেজেন্ট স্তর!”

“নাইটিউ—কী হে আগরওয়ার, শনিবার দেখিনি কেন? কোন ঘোড়াটা খেললে? কতোর দর?—আচ্ছা, নাইটি ফোর?”

“শ্রেজেন্ট স্তর!”

“কে প্রস্তুতি দিচ্ছে হে! নিতাই বোস? কে এবারের ফেভারিট, খবর রাখো? জাহাঙ্গীরের নাম কিন্তু অনেকেই বরাছে। ওর উপর একবার ধরে দেখতে পারো। নাইটি ফাইভ?”...

এই ছিলো দিলীপ দা'।

একদিন প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন।

“দেখ দিলীপ, তোমায় কতো বার বলেছি, কলেজে একটু সযত কথাবার্তা না বললে কলেজের বদনাম হয়। তুমি এরকম ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বলে, আর বিশেষ করে মুখ্যো মশায়ের ছেলে বলে তোমায় কতো শিল্ড করে চলি। কিন্তু তুমি তো ইমপসিবল হয়ে উঠেছো। গভাণ্ডি বডি তো কিছুতেই তোমায় আর রাখতে চাচ্ছে না।”

সে তো আমি জানি। কিন্তু কান্ডকে আগামী শনিবার মর্নিং দ্রোর উপর পাঁচটা টাকা ধরবার পরামর্শ দিয়ে তাকে যদি দশ-পোনেরো টাকা বোজগার করার ব্যবস্থা করে দিই, কী অগাধতা হয় বলুন? ছেলেরা ভালো খেতে পায় না, কলেজের মাইনে দিতে পারে না, ছুটো সিগারেট হুকতে পারে না। একটু নিজে বোজগার করতে শিখুক, আপনারা নিজেরা তো ওদের কোনো রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবেন না, আর আমি যদি হু-একটা ফন্দি ফিকির বাতলে দিই তা'ও সহ্য করতে পারবেন না! সত্যি, প্রতিভার আদর আমাদের দেশে হয় না। হাক, আমি কিন্তু এর জগতে তৈরী হয়েই এসেছি। এই নিন আমার রেজিগনেশান।”

দিলীপ দা'র মুখে শোনো—প্রিন্সিপ্যাল দিলীপ দা'র রেজিগনেশান নিলেন। তার পর দিলীপ দা' যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন ডাকলেন পেছন থেকে, “দিলীপ! এক মিনিট। কোন্ ঘোড়াটার কথা বললে? মর্নিং দ্রোরি? ঠিক তো! আচ্ছা, খ্যাংক্যু।”

শিকা-জগতের সঙ্গে দিলীপ দা'র সম্পর্ক শেষ সেদিন থেকে।

কিন্তু দিলীপ দা' পড়াতো ভালো। আমি যখন এম-এ দিছি, দিলীপ দা' আমার পড়িয়েছিলো কিছু দিন। বেশ খেটে পড়িয়েছিলো, বার দরুণ আমার মতো কীকিবাঞ্জ ছেলেও একটা মাঝারি গোছের রেজাল্ট করে এম-এ পাশ করতে পেরেছিলো।

দিলীপ দা' মাইনে নিয়ে পড়াতে রাজি হয়নি, কিন্তু যতো টাকা ধার নিয়েছিলো, মাইনে দিয়ে মাটির হাথলে অনেক শস্তা পড়তো।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরনোর পর, বড় একটা সেধা হোতো না ওর সঙ্গে। শুনেছিলাম, একটু অর্থাতার বাচ্ছে। তাই আজ ট্যান্ডিতে দেখে অবাক হ'লাম।

দিলীপ দা' এখন কি করছে, সেটা জিজ্ঞেস করবো কি করবো না যখন ভাবছি, সে বললে, “সলোমনকে টিকিটটা দিলি না কেন? বেচারি এ রকম একটা ভালো ছবি মিস্ করবে।”

“সে কথা ভেবে তো টিকিট কেনা হয়নি। আরেক জনের সঙ্গে একটা সন্ধ্যা কাটাতে বলেই কেনা হয়েছে।”

“ভাত কি। না হয় তোর হয়ে সলোমন তার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে। বলতো, সে তোর বন্ধু, তুই-ই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভুললোক কি মাইণ্ড করতেন?”

“কোন ভুললোক?”

“তোর বন্ধু।”

“ভুললোক নয়, ভুলমহিলা।”

“তাই নাকি? কে রে?”

“তুমি চিনেব না। আমার এক বন্ধুর বোয়ের মামাতো বোন। আমার বন্ধুটিও সঙ্গে থাকবে অবশি। সেই সিনেমা দেখাচ্ছে আমাদের।”

“তাই নাকি? নাম কি তার?”

“আমার বন্ধুর?”

“না রে, তার শালীস—”

“বোবা। বোবা চৌধুরী।”

“বাঃ, বেশ নাম। আচ্ছা, চল তাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।”

আর কিছু বললো না দিলীপ দা'।

লাইট হাউসে পৌঁছে দিয়ে বললো, “দেখ তোমার টিকিট?”

বার করে দিলাম।

কাউন্টারে “হাউস ফুল” টাঙানো। ছুঁচার জন তার সামনে বিরা মুখে যোরাঘরি করছে।

দিলীপ দা' জিজ্ঞেস করলো, “এদের মধ্যে সব চাইতে শুশুর দেখতে কোন্ ছেলেটি বল তো? ওই সিন্ডের হাওয়াইয়ান শার্ট-পরা ছেলেটি, না?” বলে টুক করে তার সামনে কীড়িয়ে বললো, “আপনার টিকিট চাই?”

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠতে না উঠতেই সেন-সেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেটা হলের মধ্যে ঢুক পড়লো কোটার-মুখো কাঠবেড়ালীর মতো।

আমি স্তম্ভিত।

“এ কি হোলো দিলীপ দা'?”

“বা হোলো তোমার ভালোর ভজ্জই হোলো। তুমি পারতে? এমন গাধা! বন্ধুর পাঁচ বোঝো না? দেখ তো, কী উপকার করলাম! তোমার করলাম, এই ছেলেটির করলাম, তোমার বন্ধুর

শালীও করলাম। তোমরা চিরকাল আমার কাছে বাসিত থাকবে।”

আসন্ন একটি বহু-বিচ্ছেদের কথা ভাবতে ভাবতে রূথ-পনক্ষেপে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

আবার ট্যান্সি আরোহণ।

দিলীপ কী যেন বকে বাজিলো, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি বৌবান্ধার ট্রাট পেছনে বেখে ট্যান্সি চুকছে একটি গলিতে।

“এ কোথায় নিয়ে এলে দিলীপ দা’?”

“এসো, এখানে নেমে পড়া বাক। ট্যান্সি আর বাবে না। গলিটা বড় সড় এর পর থেকে।”

নামলাম।

ট্যান্সি বাক করে বেরিয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ডাইনে চীনে ডেপুটিদের দোকান, শো-কেসে তুলোর উপর কয়েক পাটি নকল দাঁত পথচারীদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বাঁয়ে একটি চীনে লণ্ডী। ও-পাশে কাচের আলমারি সাজানো একটা মনোহারী দোকান, তার সাইন বোর্ডও চীনে ভাষায়। কী রকম একটা গন্ধ নাকে এসে লাগলো। তেল নয়, চর্বিতে রাগ্না হয় সেরে খাবার, তারই গন্ধ।

“রঞ্জন, আগে কোনো দিন এ পাড়ায় এসেছো?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যাঁ, হু-একবার নানকিং-এ খেতে এসেছি। কিন্তু সে দিনের বেলা! তবে এ তো নানকিং-বাওয়ার রাস্তা নয়।”

“সেখানে তো বাজি না।”

“তা’হলে?”

“বাজি আরেকটি আড্ডায়,” দিলীপ হাসলো, “একবারে হাট অফ দি চায়না টাউন।”

দিনের বেলা চীনে রেষ্টুরায় খেতে বাওয়ার সময় দেখছি, কি রকম যেন একটা ঘুম-ঘুম নিশ্চল আবহাওয়া। কিন্তু রাতের চায়না টাউন অল্প রকম। অনেক বেশী ভিড়, অনেক বেশী হটগোল, অনেক বেশী অল্পবয়স্ক কলরব, অসংখ্য কাঠের খড়মের ঠক-ঠক পদশব্দ। হয়তো বা আচমকা হু-চায়টে বাক্সি পটকার বিক্ষোভ, একটানা ভূতুড়ে সুরে তীক্ষ্ণ ভিনদেশী বীজী, ভালো ভালো চীনে কীসের গা’ হুমহুমানো ডি ডং আওয়াজ,—সে কোনো উৎসবের আয়োজন হতে পারে, শব্দযাত্রার প্রেরণাও হতে পারে। ডাইনের বাড়ির একতলায় দরজা-খোলা বাইরের ঘর থেকে চপ-টিকের টুক-টুক শব্দ। এপাশের দোতলায় গোল গোল অথবা হাতপাখার অধঃস্থ আকৃতির জানলার ওপারে ‘মাহ্ জা’ এর আসর। হয়তো আচমকা ওপাশের এক-কাঁধ চওড়া কোনো এক অন্ধকার এঁটো গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে এক পাংখুখ মোটা ইহলী। বেরিয়ে এসে বিশেষ বাবে লোকের ভিড়ে। পেছন পেছন গলির মুখে এদে দাঁড়াতে অল্প হুঁজন লোক। তাদের মুখ দেখে আপনার পিঠে চমকে বাবে। ওরা আপনাকে লক্ষ্যই করবে না। গলির চলতি ভিড়েও ফিরে তাকাবে না তাদের দিকে। সেই হুঁজন খুব আস্তে বাঁয়ে একটি গম্বক তাকিয়ে আবার ফিরে বাবে, বিশেষ বাবে গলির অন্ধকারে।

আর বা কিছু দেখবার, আর বা কিছু জানবার—সে সব

মেখেতে জানতে সময় নেবে। প্রথম দিন প্রথম পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে আপাতত এটুকুর বেশী নয়। অনেক বছর আগে দেখা সিনেমার ঝাপসা স্মরণের মতো,—পরিহার্য খুঁটিনাটির চাইতে আভ্যন্তরীণ অনেক বেশী।

আজ শুধু মনে পড়ে এঁকে-বঁেকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে পথ বখন আরো সড় হয়ে মোড় ফিরে হঠাৎ হুম করে নির্জন নিঃসাড় হয়ে গেল, আর নিশ্চিন্ত গ্যাসলাইটের ছায়া হুমহুমে আধো-অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে এলো কোনো এক কিছরকণ্ঠে চীনে অপেরার গান, দিলীপের গা বেঁয়ে আস্তে আস্তে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম,—

“এ রাস্তার নাম কি?”

দিলীপ হেসে আরো আস্তে আস্তে বললে, “এ রাস্তার নাম?”

খুব মিষ্টি নাম—বিবি আমেলিয়া সেন।”

পথ চলতে চলতে বিবি আমেলিয়ার গল্প বলে গেল দিলীপ দা’।

“সে যুগের কলকাতার একজন নামকরা স্ত্রীদেবী ছিলো আমেলিয়া বিবি। অনেক আমীর-ওমরার রাস্তা-মহারাস্তার আসরে ডাক পড়তো তার, অনেক মহাজনের পায়ের ধূলা পড়তো তার বাড়িতেও। লোকে বলতো, সে জাতে ইহলী, যদিও তার পদবীটা আজ আর কারো মনে নেই।

সে যখন এ রাস্তায় থাকতো, তখন এ অঞ্চলে অনেক ইউরেশিয়ানের বসবাস। সিপাহী বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তার বোধ হয় উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। সে সময় একজন খুব অর্থবান সায়েব মার্চেন্ট ছিলো কলকাতায়, নাম ক্রিষ্টোফার গ্রীণ। তার খুব অল্পগ্রহভাজন ছিলো আমেলিয়া। গ্রীণ সায়েব ছিলো তখনকার লেকটেন্যান্ট গভর্নর স্ত্রীর ফ্রেডারিক হালিডের প্রিয় বন্ধু। স্ত্রীসহ তখনকার কলকাতার রাজনীতির নেপথ্যের অনেক ব্যাপারে আমেলিয়া বিবির বৈঠকখানার একটা গুরুত্ব ছিলো। লোকে বলে মিউনিসিপাল সময় আমেলিয়া তার সায়েব বন্ধুদের বিশেষ একটা উপকার করেছিলো,—যদিও সে কথা ইতিহাসের পাতায় রেকর্ড করা হয়নি।

সে সময় সিন্ধুর গদীচাত আমীরেরা থাকতো কলকাতার উত্তরে, দমদমে। কয়েক শো’ সশস্ত্র রক্ষী ছিলো তাদের সঙ্গে। ওদের একজন নিকট-আত্মীয় সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান প্রায়ই আসতো আমেলিয়ার কাছে।

কলকাতার ইতিহাসে বাক বলে “প্যানিক সানডে” (Panic Sunday), অর্থাৎ ১৮৫৭র ১৪ই জুন রবিবার—তার আগের দিন রাত্তিরে নাকি সাহেবজাদা ইফতিকার এসেছিলো আমেলিয়ার কাছে, মদের বোরে তাকে বলেছিলো, ব্যাবাকপুরের সেপাইরা তাদের সঙ্গে আত্মক বা না আত্মক, তার পরিচালনায় তাদের কয়েক শো রক্ষী গার্ডেনরীচের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ’র হাজার খানেক সশস্ত্র অস্ত্রধারীদের সঙ্গে হু’দিক থেকে কলকাতার উপর চড়াও হবে রোববার দিন সন্ধ্যাবেলা, তারপর ইফতিকার গ্রীণ সায়েবকে ময়দানের গাছে ঝটকিরে আমেলিয়াকে তার বেগম করবে। কলকাতা তখন নানা রকম গুজবে গম-গম করছে। আমেলিয়া ইফতিকারকে মদের সঙ্গে আর কি যেন মিশিয়ে খাইয়ে বেহাশ করে রেখে গাড়ি ঠাকিরে সোজা চলে গেল গ্রীণ সায়েবের বাড়িতে।

কিন্তু গ্রীষ্মকে পাওয়া গেল না। তার বোনের ছেলে হচ্ছে, সে ডাক্তার নিয়ে গেছে সেখানে।

সেদিনের রাত কেটে গেল। তার পরদিন সকালে গীর্জার মণি-মন্দির শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুহর ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যারাকপুরের সেপাইরা বিদ্রোহ করে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে, আশে-পাশের শহরতলীর লোকজনও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, বিদ্রোহপুত্র লুণ্ঠপাট করতে শুরু করেছে নবাব ওয়াজির আলী শাহ'র লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সায়েব আর ফিরিকী মহলে 'পালা পালা' রব পড়ে গেল। সায়েবরা দলে দলে ছুটলো নদীর দিকে, গঙ্গার বুকে নোঙ্গর-করা জাহাজগুলিতে আশ্রয় নিতে। আর অনেকে আশ্রয় নিলো কোর্টে। প্রাণের ভয়ে দিশাহারা সায়েবদের পাড়ায় সে কী দৃশ্য! তখনকার দিনের এক সায়েব, কর্ণেল ম্যালেসন, সেই ১৪ই জুনের কলকাতার আশ্রয় বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত 'রেড-প্যান্ডফলেটে'। জানো রজন, তিনি খোলাখুলি লিখেছেন,—It has been said by a great writer that there is scarcely a more undignified entity than a patrician in a panic. The veriest sceptic as to the truth of this aphorism could have doubted no longer, had he witnessed the living panorama of Calcutta on the 14th June. All was panic, disorder, and dismay.

এদিকে সকাল না হতেই আমেলিয়া বিবি আবার বেরিয়ে পড়লো গ্রীণ সায়েবের ঘোঁষে। গিয়ে শুনলো, গ্রীণ সায়েবের একটি ফুটফুটে ভাগে হয়েছে—আর গ্রীণ সায়েব তল্লিতরা নিয়ে কেটে পড়েছে জাহাজঘাটার দিকে। আমেলিয়াও ছুটলো সেদিকে। তার সঙ্গে দেখা হ'তে আমেলিয়া বললে যে, সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান তখনো তার ঘরে বহুশ হয়ে পড়ে আছে। শুনে তো গ্রীণ সায়েব ছুড়ী-পাড়ি ঠাকুরে তাকুণি ছুটলেন কেলভেডিয়ারে হালিডে সায়েবের কাছে। কিন্তু হালিডে সায়েব তখন বেলভেডিয়ারে থেকে আন্তানা গুটিয়ে সরে এসে ডেরা পেতেছে গুর্ভর স্কেনারেলের কাছাকাছি। গ্রীণ সায়েব ফিরে এসে শুনলেন একদল সায়েব এসে জড়ো হয়েছে, কোথায় জানো? এখন যে গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল, তখন তার নাম ছিলো উইলসন'স হোটেল,—সেই হোটেল। তাদের মধ্যে একদল হাতিয়ার জোগাড় করে গ্রীণ সায়েবের সঙ্গে চললো আমেলিয়া বিবির বাড়ি, সায়েবজাদা ইফতিকারকে খবর, আর প্রায় চল্লিশ জন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বোড়ায় চেপে টহল মারতে গেল উত্তর-কলকাতার নিরাহ বাঙালীশাড়ায়।

সেদিন রাত্তিরে যখন অযোধ্যার নবাব আর তাঁর উজীরকে বন্দী করে কোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে, আর সে খবর তখনো না জেনে কলকাতার ভয়াব্ধ ফিরিকীরা বন্ধুর এলোপাখাড়ি কাঁধে আগরাজ করে যাচ্ছে ঘটরে পর ঘটী ধরে—আর দিল্লিতে লালকেল্লার বাহাদুর শাহ তখনো হিন্দুস্থানের বাদশা—তখন নাকি আমেলিয়া বিবির বাড়িতে একটি কুইরের ভিতর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বহুশ হয়ে ঘুচ্ছিলো সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান, আর দোতলার একটি হলঘরে স্বচ হুইন্সির আসর জমে উঠেছিলো আমেলিয়া, গ্রীণ সায়েব আর অন্তান্ত খাঁটি বুটিন বীরপুরুষদের নিয়ে। কোনো

নেটিত রাজা-মহারাজা জমিদার সেদিন রাত্তিরে এশাড়ার ছায়াও মাড়িতে সাহস করেনি।

সেদিনকার সেই ফিরিকীরাহল অকল আজ চায়না-টাইন—তার মধ্যে শুধু আঁকাবাঁকা পড়ে আছে বিবি আমেলিয়া লেন।

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ বললো, "তায় প্রায় বছর তিরিশ পর আমেলিয়া বিবি যখন মারা যায়, তদিনে এসব গল্প অনেকেই ভুলে গেছে। তখন চীনে অধিবাসীতে ভর গেছে এ অঞ্চল, আর এ অঞ্চলের নামকরা দুর্ধর্ষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে আমেলিয়ার মেয়ে বেবেকা বিবি"।

"বা বললে এসব সত্যি দিলীপ না?" আমি পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম।

দিলীপ হাসলো। বললো, "চায়না টাইনের বুড়োদের মূখে নানারকম গল্প শোনা যায়।"

"তুমি কার কাছে শুনেছো এসব?"

"বুড়ো ওয়াং এর কাছে। চল না দেখবি তাঁকে"।

বলতে বলতে দিলীপ যেখানে এসে থামলো সেখানে দেখি, একটি বাড়ির একতলার সামনে একটি জীর্ণ সাইনবোর্ড, চীনে অকরে লেখা। ঘরের ভিতর হুঁটো তিনটে চৌকো টেবিল। আশে-পাশে হুঁচারখানা করে চেয়ার। লোকজন নেই। খুব কম পাওয়াবের দুটি আলো ঝলছে ঘরের দু'পাশে। মাঝখানে একটি অচল ক্যান। হুঁচারটে বাড়ুড় উড়ছে। এক পাশে একটি কাউটার। সেখানে চার-পাঁচটা বয়সে বিহুট আর এটা-ওটা-সেটা সাজানো।

"এটা কি দিলীপ দা'?"

"বেস্তরা"।

"এখানেও বেস্তরা?"

"আয় না।"

ঘরে ঢুকে কিন্তু সেখানে বসলো না। ডাইনে একটি স্ট্রিয়ার দরজা। দৌট ঠেলে এসে পড়লাম একটি প্যাসেজে। দান সবুজ আলো ঝলছে এক পাশের দেওয়ালে। সেই প্যাসেজ ঘরে ভেতর দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে একটি সমকোণে ঘুরে আরো একটু যেতেই প্যাসেজের শেষে ব্রষ্টেড কাচের দরজা। খুব উজ্জ্বল আলো আসছে কাচের ভেতর দিয়ে।

উজ্জ্বল হাসির আগওয়াজ এলো।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটি বেশ বড়ো ঘর। মাঝখানে একটি বড়ো গোল টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। দেয়ালের গায়েও দু'-তিনটে চেয়ার সাজানো। হুকোণে গোটা দুই নীচু টিপার। টিপারে ফুলশানি, তাতে দু'টো তিনটে করে কানেশান, গ্যাভিডলা আর এ্যাসটার ফুল। দেওয়ালে গোটা দুই চাইনিজ স্ক্রোল।

গোল টেবিল ঘিরে বসেছিলো কয়েক জন। আমাদের ঢুকতে দেখে উঠে ঠাঁড়ালো। "হিয়ার কামদ আগওয়ারফেও মুখার্জী—"

"এত দেরী হোলো কেন? তোমায় আশা করছিলাম অনেককাল আগে।"

"আসছো না দেখে ভালোম আঙ্গ হয়তো বেন-এ অনেক টাকা হেরেছো।"

“ও—নো। হাফক বা জিজ্ঞাস্য মুখার্জী আসবেই। হারল্ড ফুৎল তুলতে আসবে, জিজ্ঞাস্য সেলিগ্রেট করতে আসবে।”

“বাই দি ওয়ে, আজ আমাদের একজন মতুন বন্ধু এসেছে। জেনারী সঙ্গে আসছে আরো দু’জন। আর তুমিও তো দেখছি একজনকে এনেছো। লেট’স ইনট্রিডুস আওয়ার সেলভ্‌স টু ওয়ান এনাদার। স্লেম্যান, এদিকে এসো। মীট প্রোফেসার দিলীপ মুখার্জী। সে এখন আর প্রোফেসার নেই। হী ইজ ইন বিজনেস লাইক মোষ্ট অফ আস। কিন্তু অল্‌ দি সেম আমরা ওকে প্রোফেসার বলে ডাকি। এ হোসো আমার বন্ধু হাসিম স্লেম্যান। করাচী থেকে এসেছে। হী ইজ ইন টা।”

“গ্লাড টু মীট ইউ। হা’ ডু’ ডু।”

“হা’ ডু’ ডু।”

“জেনী কোথায়?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“জেনী ওর বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে তিনটির শো’তে। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।”

“মীট মাই ফ্রেণ্ড রজন।—এ আমার বন্ধু ওয়ং স্কাচা, এই রেস্টুরাঁর প্রোপ্রাইটার।”

নিখুঁত ছাঁটের স্কাটপরা, মাঝারি গড়ন। শাফ্রোবীন মোলায়েম ফর্সা মুখ। বয়েস বোঝা যায় না। তবে দিলীপ দাঁ’র চাইতে বয়েসে বড়ো হবে না নিশ্চয়ই।

“রেস্টুরাঁর ছাঁটো অংশ হরকম কেন?”

“বাইরেবটা বাইরের লোকের জন্তে, স্কাচা বললো, “ভেতরেরটা প্রাইভেট। এ শুধু বন্ধুবান্ধবের জন্তে। আসলে এমিকটার আমরা থাকি, এ বরটার সঙ্গে রেস্টুরাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।”

রেস্টুরাঁর দীন চেহারার সঙ্গে রেস্টুরাঁর মালিকের মহাখবাস চেহারার কোনো মিল নেই। তবু আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

ওয়ং স্কাচাই আলাপ করিয়ে দিলো অল্প সবার সঙ্গে।

“এ আমার ছোটো ভাই ওয়ং চিয়েন-চাং।...আমার বোন মীন ওয়ং।...আমার বন্ধু ফেং চেং-শিয়াং...”

অত্যন্ত দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, পরনে দামী রেয়নের স্কাট, স্পষ্ট মার্কিং ছাঁট। সবুজ জেড পাথরের দামী হোড্ডারে একটি ধুমায়মান সিগারেট, কড়া গন্ধে বোঝা যায় ভাঙা আমেরিকান তামাক, নাক, বেষ্ট্রু আছে, মনে হোসো অত্যন্ত উঁচু।

“চেং শিয়াং’এর বোন মিস ফেং টিং-লিং!”...

টিং-লিং মীন ওয়ং-এর চাইতে অনেক সুন্দর দেখতে। মীন ওয়ং অতি সাধারণ চীনে মেয়ে। মিষ্টি মুখলী, লিনেনের ফ্রকে প্রায় ফুলের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু টিং-লিং আশ্চর্য সুন্দর, দুধ-আলতা গোলা রং বলতে বা বোঝায় ঠিক তাই, কিংবা সাদা বরফের উপর এক কেঁটা গোলাপী দিরাশ ঢেলে দিলে যে রকম হয়,—মোমের মতো নয়, চীনে মাটির ডলের মতো কমনীয়, চীনে শিল্পীর তুলির ছাঁচার টানে আঁকা ছবির মতো। পরনে হাতকাটা চীনে গাউন, হাঁটুর ঠিক নীচে অবধি তার বুল, কিন্তু উক্কর ছাঁপ দিয়ে ধাঁটু থেকে উক্কর প্রায় মাঝ-মাঝি পর্যন্ত কাটা। ছুতো’র হীল অস্বাভাবিক উঁচু।

“আমাদের আরেক জন বন্ধু বোয়াল্লের সি।”

শেরওয়ানী আর চুড়িদার পায়জামার দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, মনে হয় বেন ময়দানের ও প্রান্তে মহুমেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। খুব

সবু করে ছাঁটা গাঁফ, ঘন চাপ দাড়ি, মাথার গোলাপী পাগড়ির আবগুতো ইলেকট্রিক আলোয় চিক চিক করছে। ফর্সা রং আর চোখা নাক, দীর্ঘ চোখ দুটো বেশ হাসিমুখী।

“হেনরী লরেন্স। শোটো কাজ করে।”

কলকাতার সাধারণ এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, ময়লা রং, বেশ মার্ট দেখতে।

“জয়প্রকাশ রিবেদী। এ এসেছে দিল্লী থেকে, একটি বৃটিশ ফার্মের এঞ্জিনীয়ার।”

জয়প্রকাশ ত্রিবেদী হাত তুলে নমস্কার করলো।

সে আমার পাশেই বসেছিলো।

সবাই বসন আবার গল্প-গুজব করতে শুরু করলো, সে আমার বললো, খুব পরিষ্কার বাংলায়, “আপনি দিল্লীপের খুব বন্ধু বুঝি? আপনাকে আগে কোনো দিন দেখিনি।”

“দিলীপ দাঁ’র সঙ্গে আমার মাঝখানে বছর দু’তিন দেখা হয়নি।

কিন্তু আপনি তো পরিষ্কার বাংলা বলেন!”

জয়প্রকাশ হেসে বললো, “আমরা দিল্লীর লোক। কিন্তু আমার মা বাঙালী।”

“আমার জন্তে বীয়ার,”—দিলীপ দাঁ’র গলা শোনা গেল।

“আমিও তাই, যা গরম আর কিছু পাওয়া যায় না।”

“হোয়াট ক্যান আই অফার ইউ?”

“আমি? আমার এক কাপ চা হলেই চলবে।”

“হোয়াট? নো ড্রিন্‌স?”

“নট বেট,”—আরেক জন কে যেন হেসে বললো।

“অল রাইট, উই গাল অল্‌ হ্যাড্‌ টা। জেনী আর ওর বন্ধুরা আসুক, তার পর উই মে স্বাভ সাম থিং এল্‌স্‌।”

“জেনী কখন আসবে? সাতটা বেজে গেছে।”

“জেনী সিনেমায়ে গেছে কার সঙ্গে,” জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

“তুমি ওর বন্ধু মাঝে মাঝে রবিনসনকে নিশ্চয়ই চেনো?”

“হ্যাঁ, একদিন দেখেছি।”

“সে আছে, আর, হেনরির গাল’ফ্রেণ্ড মা’থিন-চি আর ওর ভাই মগং জিয়া।”

“বার্মিজ?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা! আমি ভানতাম না হেনরীর একটি নতুন গাল’ফ্রেণ্ড হয়েছে। বোধ হয় এটি তোমার চার নম্বর?”

দিলীপের কথায় সবাই হাসলো।

“এ্যাণ্ড সো হোয়াট?” জিজ্ঞেস করলো হেনরী লরেন্স।

“কিন্তু না। ঠিক আছে। তুমি সেই ভদ্রমহিলার কতো নম্বর?”

টেবিলে ঘূষি মেয়ে হেনরী উঠে দাঁড়ালো।

“বাস, বাস, বুঝি,” দিলীপ বললো, “তুমি অনেক গভীর জলে তলিয়ে গেছ। তা’ না হলে তুমি চটতে না। আমি তোমার সাফল্য কামনা করি, যাতে তুমি সারা জীবন একটি বিখ্যাত বধূর বাক্যবাণ-ভজিত হয়ে সুখী হও।—আ-হা, আমার কথায় রাগ করছো কেন? একজন বিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক বলেছে, সাত বার প্রেমকরা ছেলে যদি অষ্টম বার একটি পাঁচ বার প্রেমকরা মেয়ের প্রেমে পাড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে, তা’ হলে মানবসমাজে



জিত্তোঁস' বলে কোনো কিছু থাকবে না, পারিবারিক জীবন সত্যি সত্যি শান্তিময় হবে।"

"তুমি ক'বার প্রেম করেছে। প্রফেসর?"

"জ্যাট বাব হয়ে গেছে। A cat has nine lives জানো তো! পরেরটির পথ চেয়ে বসে আছি।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি। পঞ্চমার খোঁজ করতে করতে আরো সংখ্যা বেড়ে যাবে।"

"ওহে প্রফেসর, জানো, মা-বিন-চি একজন আর্টিষ্ট। খুব ভালো ছবি আঁকে। ওদের দেশে ওর খুব নামডাক।"

"তাঁই নাকি?" একটু চুপ করে গেল দিলীপ। তার পর বললো, "দেখ হেনরী, বন্ধুর একটি পরামর্শ গ্রহণ করবে? যাকে খুশী বিয়ে করো, কিন্তু আর্টিষ্টকে নয়।"

"কেন?"

"যে মেয়ে আর্টিষ্ট, সে তো কোনো দিন তোমার সময় মতো ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খাওয়াতে পারবে না? তোমার বকাবকি করতে পারবে না, ছুটির দিনে বাড়িতে পাওনাশার এলে তুমি থাকলেও নেই বলে তাকে ভাগিয়ে দিতে পারবে না—নেহা সে যদি আমার বন্ধু সলোমন দি'র ছু'না হয়। আর্টিষ্ট শুধু বসে বসে ছবি আঁকবে, যা সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। ছবি দেখে তুমি যখন হাসবে, সে অন্য কোনো সমঝদারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ঘর ছেড়ে। মেয়ে-আর্টিষ্ট খুব ভালো স্ট্রিট-চার্ট হয়, ভালো বো' হতে পারে না।"

"কে বললে? তুমি মা-বিন-চি'কে জানো না—"

"দেখ ছোকরা, তুমি ক'জন আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছে?"

"তুমি ক'জনের সঙ্গে করেছে?"

"আমি? যখন বিলেতে ছিলাম, ব্রাইটনে একটি ফ্রেক মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছি ছু' হস্তা। যখন রিলিয়েরায় গিয়ে-ছিলাম, ক্যালিফোর্নিয়ার এক মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছি তিন দিন। যখন নেপলস-এ ছিলাম, তখন একজন হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে—"

"প্রফেসর, তোমার কি আর্টিষ্টিক কচি!"

"বেছে বেছে শুধু আর্টিষ্টরাই কেন তোমার প্রেমে পড়লো বন্ধু?"

"বাস, বাস অনেক হয়েছে। মানলাম তুমি যখনই যে সমুদ্র-তীরে গছ, সেখানেই এক বিদেশী মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছে। তা'তে কি প্রমাণ হালো?"

"বৎস, আমার কথা শেষ করতে দাও। ফ্রেক মেয়ে আমার বসিয়ে একটি ছবি আঁকলো, ছবির নাম দিলো: The dreamer from India। একজিবিশানে এক ইংরেজ ধনী সেক্‌সবি কিনতে চাইলো কয়েক হাজার পাউণ্ড দিয়ে। মেয়েটি তাকে ছবি না বেচে তাকে বিয়েই করে ফেললো। ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়েটি মন্টিকালো'র সমুদ্রের তীরে আমার একটি বিছানার চাবর হাঁটুর উপর জাঁট ধুতির মতো পরিয়ে, মাথায় একটি লাল চেক পদ্ম' লাল গামছার মতো জড়িয়ে ছাঁব আঁকলো: The fisherman from Puri। সেটি কভার পেছ-এ ছাপলো একটি বিখ্যাত মার্শিন ম্যাগাজিন। মেয়েটি সেই ম্যাগাজিনে চাকরি নিয়ে নিউইয়র্ক চলে গেল। হাঙ্গেরিয়ান মেয়েটি আর আমি নেপলস-এ এক নাইট-স্পট কেস পয় করছিলাম,

এমন সময় হলিউডের ফিল্ম কোম্পানির এক্সেকিউটিভ এসে তাকে আবিষ্কার করলো। বাস, এখন তার ছবি কলকাতায় এলে তোমরা শুভযুড় করে এ্যাডভান্স বুকিং করতে ছোটো আঁর আমি বসে ধর্মমতলার বাব-এ বসে দিলীপ হুটখি খাই। এদের বিয়ে করলে কেউ কোনো দিন সুখী হতে পারবে?"

"মনে হচ্ছে ওদের বিয়ে করতে না গেলে তুমি খুব মর্মান্ত হতে আছো।"

"যদি ওদের বিয়ে করতে তা'হলে কি তোমার আমাদের মধ্যে পেতাম?"

"তুমি কী লাকি, যেই তোমার সঙ্গে একবার প্রেম করে তারই ভবিষ্যৎ খুলে যায়!"

"আঁট যারা ভালোবাসে তারা চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

"তা'ছাড়া ওরা পশ্চিমের মেয়ে—", বললো হেনরী লরেন্স।

"মেয়েদের আবার পূর্ব-পশ্চিম কি?"

"হাজার হোক আমাদের চীন বা বর্ম বা ভারতের মেয়েরা ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের মতো নয়।"

"কি করে জানলে? তুমি বিচার করে দেখবার সুযোগ পেয়েছো?"

"তুমি পেয়েছো?"

"জ্যা—আমি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, ফ্রেকের সঙ্গে করেছি, আমেরিকান, সুইডিশ, হাঙ্গেরিয়ান, জার্মান, নিগ্রো, টার্কিশ, পাশিয়ান, স্পেনিশ, বাঙালী, মাস্রাজী—"

"বাস, বাস, প্রফেসর, আর বলতে হবে না। মানলাম তুমি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কিগার। কিন্তু আটের বেশী হয়ে গেল যে!"

"তুমি চাইনিজ মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছো কোনো দিন?"

চট করে কোনো উত্তর দিলো না দিলীপ।

"ওকে ও কথা জিজ্ঞেস করো না। চায়না টাউনের মাঝখানে বসে সত্যি কথা বলতে হয়তো ওর সৌজন্তে বাধবে—"

"দেখ, আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম তখন হংকং থেকে একটি চাইনিজ মেয়ে—"

সবাই হাসতে শুরু করলো। এমন হাসি, হাসির তোড় আর থামে না: কিছুতেই।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এমন সময় চা নিয়ে এলো মনি ওয়াং।

একটি মস্তো বড়ো লাকারের ট্রে, তা'তে সোনালী রেখার ছবি আঁকা। ট্রে থেকে একটি চায়ের পট নামিয়ে রাখলো টেবিলে নীল পোর্সিলেনের টিপ-ট, তা'তে লাল, সোনালী আর সাগর রেখার একটি ড্রাগন আঁকা। তার সঙ্গে বং মেলানো কয়েকটি ছোটো ছোটো পোর্সিলেনের বাটি, উপরটা ঢাকা। চা ঢেলে এগিয়ে দেওয়ার হোলো সবাইকে। চাকরির এক পাশে একটি কাঁক। সবাই দেখি দেখানে ঠোট লাগিয়ে চায়ের চুমুক দিচ্ছে।

বাটি ধরে আমিও চুমুক দিলাম। ওয়াং হু: চুং আমার মুখে দিকে তাকালো। "এান থিং বং উটথ্, ইওর টা?"

"না, না। চমৎকার স্নাতক, কিন্তু" আমি একটু ইতস্তত: কা বললাম, "আমারটিতে বোধ হয় দুখ-চিনি দিতে তুলে গেছেন।"

সবাই এ-ওর মুখে দিকে তাকালো।

কে চেংশিয়াং বললো, "এটা আমাদের গ্রীণ-টা। বোধ হয় তোমার অভোস নেই।"

মিনি বললো, "আজ্ঞা, আমি দুখ-চিনি দিয়ে এক কাপ চা করে আনিছি।"

"দরকার নেই," বললো দিলীপ, "ও অভোস করুক! দুখ-চিনি চায় তো এনে দাও। ওগুলো আলাদা খেয়ে নেবে। পেটে গিয়ে সব ইণ্ডিয়ান টা হয়ে যাবে। কিন্তু, জেনো ওয়াং এখনো আসছে না কেন?"

আমায় সাহসভূতি করেই বোধ হয় আর কেউ দিলীপের কথায় হাসলো না। শুধু বোকার মতো আমিই হাসলাম।

দিলীপ আমায় বললো, "জানিস, আমাদের চায়ে আর ওদের চায়ে শুধু একটি মিল। চা'কে আমরা চা বলি, ওরাও বলে চা। ম্যাগারিন চাইনিজ 'চা', ক্যাটনিক্স ভাষায় উচ্চারণে একটু তফাৎ—ওরা বলে 'ছা'। তার থেকে আমাদের বাংলায় 'চা', হিন্দিতে 'চায়'। আর হোকিয়েন ভাষায় বলে 'টে', যার থেকে ফরাসী আর ইংরেজী প্রতিলিপ এসেছে।"

"আমাদের ভাষার প্রভাব তা'হলে আন্তর্জাতিক বলতে হবে—"

"নো ভাণ্ডার, এটা ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক নয়। আমাদের সংস্কৃত ভাষা থেকেও কিছু শব্দ গেছে তোমাদের ভাষায়। যেমন? এই ধরো, ম্যাগারিন। তোমাদের দেশে রাজপুত্রকে বলে ম্যাগারিন, তোমাদের জাতীয় ভাষাকেও বলে ম্যাগারিন। এ শব্দটা কোথেকে এসেছে জানো? সংস্কৃত 'মন্ত্রিন' থেকে।"

কে চেংশিয়াং হাসলো। বললো, "আমাদের ভাষায় ম্যাগারিন বলে কোনো শব্দ নেই।"

"সে কি?"

"ওটা ইউরোপীয়েরা আমাদের সংস্কৃত ব্যবহার করে। কথটা হচ্ছে পূর্বসূরী 'ম্যাগারিন' থেকে। ওরা নিয়েছে মালয় ভাষার 'মান্ত্রি' থেকে। 'মান্ত্রি' মানে উপদেষ্টা, মালয় ভাষায় শব্দটা হচ্ছে 'মন্ত্রিন' থেকে এসেছে। 'ম্যাগারিন' ইংরেজী শব্দ।"

"তোমরা কি বলো তা হলে?"

"আমরা বলি তং-শান" এর ভাষা। তং-শান মানে 'তং' এর শব্দ। 'তং' হচ্ছে 'তাং' শব্দটির ক্যাটনিক্স উচ্চারণ। তাং রাজাদের সমলে দক্ষিণ চীন থেকে বারা বিদেশে যেতো, ওরা নিজেদের বলতো 'তং-রেন', অর্থাৎ 'তং' বা 'তাং' এর সম্ভান। চীনদেশকে বলতো 'তং-শান' অর্থাৎ 'তং' বা 'তাং' এর দেশ। তার থেকে 'তং-শান' এর আ, যাকে ইউরোপীয়রা বলে 'ম্যাগারিন'।"

"মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠকে গেলে প্রকোশার—"

"না, ঠকে বাবো কেন? আমরা সবাই সবার কাছে অনেক কিছু শিখি।"

"বেশ তো, তোমার কি শেখাবার আছে বলে?" বললো সুলেমান।

"তুমি আজ নতুন এসেছো, না?"

"হ্যাঁ।"

"রজনও আজ নতুন—"

আমি একটু হাসলাম। "বেশ শোনো। তোমাদের কাছে এভাবে নতুন গল্প। 'সু-চাং' আর 'চিয়েন-চাং' বোধ হয় জানে, কিন্তু কে আর চেংশিয়াং নাও জানতে পারে।"

সবাই নড়েচড়ে বসলো।

দিলীপ দা' প্রচুর মন্তপান করুক বা রেস খেলুক বা প্রচুর গুল ওড়াক বা বাই করুক, যখন ইতিহাসের চাটনি দিয়ে গল্প বলতে বসে, তখন যে ওর জুড়ি নেই, সে কথা সবাই জানে।

"এ কথা তোমরা সবাই জানো," দিলীপ আনন্দ করলো, "যে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চায়না টাউন নেই। সানফ্রান্সিসকো, ইলিনয়স্, লিমা, কেপটাউন, ড্রেসডেন, লণ্ডন, মাসাই, নিউইয়র্ক, কলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, জাকার্তা সব জায়গায় এরা একটি নিজেদের অঙ্গুল গড়ে তোলে। এই রজনকে জিজ্ঞেস করো, সে কি কোনো দিন জানতো যে কলকাতায় এমন পাড়া আছে যেখানে এলে মনে হয় স্বাভাবিক কি ক্যাটনে বেড়াতে এসেছি? কিন্তু কোনো দিন কি কেউ ভেবে দেখেছে! এই উপনিবেশগুলো গড়ে তোলার পেছনে আছে অনেকখানি রোমাঞ্চের ইতিহাস? তোমাদের তো ধারণা, কলকাতায় যা কিছু দেখেছো সবই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু জব চার্ণক যখন ১৬৯০'র ২৪এ আগস্ট স্মৃত্যুহ্রিট ঘাটে এসে নামলো তখন কি ছিলো এই চায়না টাউন?"

দিলীপ যখন পুরোনো কলকাতার গল্প করতে বসে তখন সে আরেক দিলীপ, যার জীবনের একটি সময় কেটেছে শুধু বইয়ের মধ্যে ভূবে থেকে।—কিন্তু সেই ভূবে থাকাও তাকে ভালোতে পারেনি যে তার ইংরেজ মা তার ছেলেবেলায় তাকে ছেড়ে, তার বাবাকে ছেড়ে, চলে গেছে আসামের এক টা-পাটায়ের সঙ্গে। সেই ছেলেবেলা থেকে কী একটা যেন খুঁজে পাওয়ার দুর্ভাগ্য অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার বেদনা তার সব-কিছু পাওয়ার সামর্থ্য নিজে নিজে করে অপচয় করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে একটি পলাতক মনোবৃত্তির মধ্যে। সে সব ভুলে গিয়ে সবুজ চা খেতে খেতে সেদিন তার মুখে গল্প শুনলাম বাঙালী, চীন, এংলো ইণ্ডিয়ান, উত্তর-ভারতীয়, পাঞ্জাবী ও পাকিস্তানীয় খবরো জনতার।

"তখন তো শুধু জলা মাঠ, এখানে-সেখানে ছ'চারটে গোল-পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। বৈদিক স্ট্রীট তখন একটি দীর্ঘ সীপ পথের অংশ যা দক্ষিণে কালীঘাট থেকে বহুদূর উত্তরে ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে চলে গেছে। সে অংশের তখনকার নাম কসাইটোলা। পুরোনো কলকাতার মাথো দেখা যায়, সে পথের পূবে শুধু জঙ্গল, যেখানে আজ আমরা বসে গল্প করছি। তখন ইংরেজরা কলকাতায় নতুন, চীনেও প্রায় অপরিচিত—যদিও কলকাতায় আসবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, মিঃ রাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজ জাহাজ চীনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতা যখন বাণিজ্যক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠলো তখন একজন হুঁজন করে চীনে দেখা যেতে লাগলো কলকাতায়। ওরা সাধারণত আসতো ম্যাকাও থেকে, যেটা পটুগীজদের দখলে চলে গিয়েছিলো পশাঙ্গী যুদ্ধের হুঁশো বছর আগে, ১৫৫৭ সালে। বাংলা দেশে যখন পলাশীর যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তখন অসংখ্য চীনাদের নাম-গন্ধ পাওয়া বাচ্ছে পুরোনো কাগজ পত্রে। সাধারণ-পাড়ার নীলাম থেকে বাঙালী জমিদার চীনে ছবি কিনে নিয়ে বাচ্ছে প্রচুর দাম দিয়ে, তারও খোঁজ পাচ্ছি। সে সময় ইংরেজরা অজান্তে ইউরোপীয়দের মতো উই-পাড়ে লেগেছে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে। আমরা,

নিংপো, তিহাই বন্দরে ইংরেজ জাহাজ আনাগোনা শুরু করেছে। তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে শিকিং'এর মাফুসজাট। পলাশীর যুদ্ধের বছর দু'য়েক পরে, কোয়াংতুং আর কোয়াংসির রাজপ্রতিনিধি লি শিচুয়াও চীন সম্রাটের কাছে লিখতে বাধ্য হোলো :—“The foreigners who come to China from afar do not know the Chinese language. They have to conduct their business transactions in Canton with the aid of Chinese merchants who know foreign languages...It is my most humble opinion that when uncultured barbarians who live far beyond the borders of China, come to our country to trade, they should establish no contact with the population, except for business...”

তখন থেকে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য শুধু ক্যান্টনেই সীমাবদ্ধ করা হোলো। যে সব চীনা ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দের ভাষা জানতো বা তাদের চীনে ভাষা শেখাতে উৎসুক হতো, তাদের সঙ্গে বেশী মাথামাথি করতো, তারা সবাই মাফুসজাটের কোপদৃষ্টিতে পড়লো। তাদেরই একজন একদিন দেশ ছেড়ে ক্যান্টন থেকে চলে এলো কলকাতায়। তার নাম তং আংছু।

পলাশীর যুদ্ধের পর যোলো-সতেরো বছর কেটে গেছে। তখন কলকাতায় গভর্ণর জেনারেল অফ কোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল—মিষ্টার ওয়ারেন হেস্টিংস।

কলকাতার ইংরেজরা তখন চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্তে খুব উৎসুক। আংছু'র সঙ্গে কলকাতার অনেক বড়ো বড়ো সাবের-সুবার সঙ্গে জানা-শোনা হয়ে গেল। শোনা যায়, ক্যান্টনের বিখ্যাত ইংরেজ সওদাগর জেমস্ স্মিটের সঙ্গে আংছু'র জানা-শোনা ছিলো। সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, এ সব জনশ্রুতি আংছু'র পক্ষে কলকাতার অভিজাত ইংরেজ সমাজে পূর্ণপোষক জোগাড় করে দেওয়ার খুব সাহায্য করলো। কে যেন ওয়ারেন হেস্টিংসকে বলেছিলো যে, ক্যান্টনের ইংরেজদের সঙ্গে আংছু'র সম্ভাব্যই তার দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হওয়ার অন্ততম কারণ।

সুতরাং, কিছুদিন পরে আংছু'র বখন সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির পাটা চাইলো, হেস্টিংস বিধিবোধ করলো না। বজবজ থেকে মাইল চতুর্কে পশ্চিমে, গঙ্গার ধারে উড়িয়া ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সেই জমির উপর ভারতের প্রথম চিনির কল বসালো সেই অজ্ঞাত-কুলশীল চীনে সওদাগর আংছু'। সেই সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির উপর গড়ে উঠলো ভারতের প্রথম চৈনিক উপনিবেশ। তার প্রতিষ্ঠাতা তং আংছু'র নামে সে জায়গার নাম হোলো আছিপুর।

তখনো কলকাতায় চীনেপাড় নেই। তখনকার ম্যাপে কসাইটোলায় দেখানো হচ্ছে মোটে তিন-চারধানা বাড়ির নিশানা। সে পথের পূর্বের জলল তখনো সাফ হয়নি, বর্ষার দিনে এত কালা যে বাতরা যায় না।

আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই এখানে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যায়, তং আংছু'র বখন দিনের কাজ সেরে গঙ্গার ধারে

বলে তার পাইপে টান দিচ্ছে, তখন এখানে বনঘোর অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে কি'কি শোকা ডাকছে।

আংছু'র চিনির কল, থাকে তখনকার দিনে বলা হোতো sugar manufactory, প্রথম দিকটা বেশ চলতে লাগলো। তখন ম্যাকাও থেকে যে সব পণ্য গীজ আর ওলকাজ জাহাজ আসতো কলকাতায় তাদের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে চীনে শ্রমিক এদেশে আনানোর ব্যবস্থা করেছিলো আংছু'। চীনের জনসংখ্যা তখন অদ্ভুতপূর্ণ ভাবে বাড়ছে। দক্ষিণ-চীনে ইউরোপীয় বণিকদের আফিং রপ্তানী শুরু হয়ে গেছে। চীনের আর্থিক অবনতি শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে। সুতরাং সুপরিবারে বিদেশে গিয়ে বসবাস করতে রাজী হওয়া চীনে শ্রমিকের অভাব হোলো না। দলে দলে অনেক লোক এলো কোয়াংতুং, ফুকিয়েন আর চেকিয়াং এদেশ থেকে। আর এলো ফেংসুং-তাও।

ফেংসুং-তাও ছিলো আময় শহরের একজন বিখ্যাত শুটার সদর। ইংরেজদের কাছ থেকে আফিং কিনে সেগুলো সে চালান দিতো কোয়েইচাও, হোনান, কিয়াংসি এসব অঞ্চলে। ফুকিয়েন প্রদেশের উপকূলে যে সব ডাকাতি হোতো তাতেও নাকি হাভ ছিলো ফেংসুং-তাও'এর। কোয়াংতুং-এর প্রাদেশিক সরকার তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টায় ছিলো অনেক দিন থেকে, কিন্তু কোনো উপলক্ষ পায় নি। একদিন চি তু-শিউ নামে কোয়াংতুং-এর রাজপ্রতিনিধির অমুগ্রহভাজন এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ফেংসুং-তাও'এর এলাকায় ছোঁরাব ঘায়ে নিহত হওয়ার পর ফেংসুং-তাও'কে গ্রেপ্তার করতে গেল আময়ের পুলিশ। কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে আময় থেকে সিঙ্গাপুর রেলুন হয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলো ফেংসুং-তাও।

তার মতন একজন লোকের প্রয়োজন ছিলো তং আংছু'র। সে তাকে আছিপুরে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে ফেংসুং-তাও ডান হাত হয়ে উঠলো আংছু'র।

হয়তো একদিন আছিপুর বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে আর হোলো না। গোলমাল বাংলা আংছু' আর ফেংসুং-তাও'এর মধ্যে।

এমন সূত্রতা বাখলো যে, আছিপুরের উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা ব্যাহত হোলো।

গোলমালের সূত্রপাত, চিরকাল যা' হয়, একটি মেরেকে নিয়ে। মেরেটির নাম জু-শী, তং আংছু'র পালিতা কন্যা।

জু-শী'কে ভীষণ ভালো বাসতো তং আংছু'। ফেংসুং-তাও এসে একদিন তং আংছু'কে কাওটাও করে বললো, জু-শী'কে বিয়ে করতে চাই।

খুব দাস্তিক লোক ছিলো আংছু'। ভুল তুলে জিজ্ঞেস করলো খুব মোলারেম গলায়, “জু-শী তোমায় বিয়ে করতে বাবে কেন?” “কেন কবে না,” ফেংসুং-তাও বললো।

“বেশ ফেংসুং-তাও, আংছু' বললো, “তুমি খুব কাজের লোক, আমি তোমায় পছন্দ করি, আমি চাই যে তুমি বিয়ে ঝা করো, তোমার কন্য বুদ্ধি হোক, ফেং পরিবারের নবাগত সম্ভানেরা তোমার পূর্ণপুঙ্খমেয় গৌরব বৃদ্ধি করুক, বাপ-পিতামহের দেহ-নিজান্ত আত্মার সন্ততি বিধান করা যে কোনো তং-য়েন্' এর কর্তব্য। কিন্তু তাই

সু-তাও, তুমি আমার বন্ধু, তোমার বন্ধুর মতো পরামর্শ দিতে চাই, জু-শী' কে নয়।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সু-তাও।

"কাব্র জু-শী' একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে," উত্তর দিলো আং-ছু, "জু-শী' নিজের কবিতা লিখতে পারে। তার শিতামহ ছিলো একজন রা-মেন্ রক্তপুরুষ। আর তোমার বাবা ছিলো কসাই, তুমি আঁকি বেচতে আময়ে, তোমার সঙ্গে জু-শী'র বিয়ে দিলে ওদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার আত্মীয়-স্বজন যে 'মুখ' হারাবে।"

সু-তাও এর ধমনিতে আময়ের গুণ্ডা সর্দারের রক্ত টগবগ করে উঠলো। সে বললে, "ও সব আমি বুঝি না। জু-শী' কে ডেকে জিজ্ঞেস করো। সে আমার বিয়ে করতে চায়।"

আং-ছু' হেসে বললো, "বেশ ভালো, এস আমার খেতে বসি। বেশ বেলা হয়ে গেছে। জু-শী'কে সেখানে ডেকে জিজ্ঞেস করছি।

ভাণেশ্বর কল্পের মূণ ও বাঁশের কোঁড় আর খুব বড়ো রাঁধা করা সুনক-সাই খেতে খেতে আং-ছু জু-শী'কে জিজ্ঞেস করলো, "আমার বন্ধু সু-তাও তোমার পাণিগ্রহণ করে সম্মানিত হতে চায়। তোমার কি মনে হয় না এরকম একটি অসম্ভব প্রস্তাব করে সু-তাও তার সাময়িক মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিচ্ছে?"

জু-শী' মাথা নীচু করে বসে রইলো। আং-ছু' তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। জু-শী' মাথা নাড়লো আন্তে আন্তে। "কী?" লাক্ষির উঠলো আং-ছু'।

সু-তাও হেসে বললো, "আজ অনেক দিন ধরে নদীর পাড়ে সন্ধ্যার পর আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই না?"

জু-শী' মাথা নাড়লো।

সু-তাও জিজ্ঞেস করলো, "মাঝে মাঝে অনেক দিন আমাদের নৌকো করে গঙ্গার বেড়িয়েছি, তাই না?"

জু-শী' মাথা নাড়লো।

"আমি তোমার বলিনি যে আং-ছু' রাগ করবে?" সু-তাও আবার জিজ্ঞেস করলো।

জু-শী' মাথা নাড়লো।

সু-তাও বলে চললো, "আর তুমি আমার বলানি যে আকাশে বতকণ চাঁদ আছে আর আমার বুক ভালোবাসা আছে ততকণ তুমি আং-ছু'র রাগকে ভর করে না?"

জু-শী' মাথা নাড়লো।

সু-তাও সামনে খুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি তোমার জিজ্ঞেস করিনি, তুমি আং-ছু'র অমতে আমার বৌ হয়ে সুখী হবে কি না?"

জু-শী' মাথা নাড়লো।

সু-তাও বস্তির নিবাস কলে বললো, "আর তখন তুমি আমার কলহে কি না যে তুমি খুব ভালো রাখতে পারো, আর আমি টাকা রোজগার করতে জানি, সুতরাং আমরা ঘর বেঁধে খুব সুখী হবো।"

জু-শী' লাল হলো একটু, লাল হয়ে মাথা নাড়লো।

আং-ছু' তখন বললো, "ওই যথেষ্ট, জু-শী' এবার বাড়ির ভেতর যাও।"

জু-শী' চলে যেতে আং-ছু' আন্তে আন্তে বললো, "সু-তাও, তুমি

আমার প্রাণের বন্ধু। তোমার কষ্ট দিতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এ বিয়ে হবে না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সু-তাও।

"আমি কাউকে কৈফিয়ত দিই না সু-তাও, আং-ছু' উত্তর দিলো।

সু-তাও টেটি কানড়ালো।

আং-ছু' বলে চললো, "আর আমার এখানে থেকে মনে কষ্ট পাওয়ার কোনো দরকার নেই সু-তাও। তুমি আজই আছিপুর ছাড়া। চলে যাও কলকাতায়। ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়েছে। ভবিষ্যতে ওরা সাধারণ ভারতেরই রাজা হবে। কলকাতা শহর আরো বড়ো হবে। ওই বর্ষসের মধ্যেই তোমার প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হবে। আমরা সভ্যজাত। আছিপুরে তোমার আর বন্ধু হবে না বন্ধু!"

"বদী না ঘাই," সু-তাও আন্তে আন্তে জিজ্ঞেস করলো।

আং-ছু' আরো আন্তে আন্তে উত্তর দিলো, "তা'হলে হয়তো ইংরেজ সরকার খবর পাবে যে, যে-সব আঁকি কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে দেওয়া হয় ক্যান্টনে চালান করে দেওয়ার জন্তে, সেগুলোর বেশীর ভাগ কে সু-তাও নামে একটি লোক চুরি করে মুন্সিাবাদ, পাটনা, লক্কাইএ চালান দেয়, আর কিছু গুম হয়ে যায় কলকাতা শহরের মধ্যে। তারা হয়তো আরো জানবে যে ওয়া-তাও-এর কাছে মে-হাওয়ার নামে যে ইংরেজ জাহাজটি লুট হয়েছিলো, তার মালপত্রের সওয়া সব তোমারই হাত দিয়ে আময় থেকে সু-তাও শহরে চালান হয়েছিলো। একথাও জানতে পারে যে আমাদের শাসনকর্তা তোমার সাক্ষ্য দেবার জন্তে পাগল হয়ে আছে। তোমার হয়তো ক্যান্টনের এক ইংরেজ জাহাজে তুলে দিয়ে তারপর আময়ে নামিয়ে দেয়া হতে পারে। আমাদের দেশে অপরাধীদের খুব কষ্ট দিয়ে মারে সু-তাও। তোমার খুব কষ্ট হলে সে আমার সহীবে না বন্ধু—।"

সু-তাও আন্তে আন্তে উঠে গেল সেখান থেকে। সেদিন রাতে সে চলে গেল আছিপুর থেকে। তার পরদিন সকালে জু-শী'কেও দেখা গেল না।

এ ব্যাপারে আং-ছু'র মনে খুব লেগেছিলো। কিন্তু সে লোক ছিলো ভালো। সু-তাওকে বা সব শাসিয়েছিলো, সে সব করলো না। হয়তো ভেবেছিলো, আমি চাইনি যে ওদের বিয়ে হোক, কিন্তু ওরা বিয়ে বন্ধন করলোই, তখন সুখী হোক ওরা।

আং-ছু'র বয়স হয়ে বাড়িলো। শরীটটা ভাজতে স্তম্ভ করলো তখন থেকে। কিন্তু সু-তাও-এর মনে শান্তি ছিলো না। তার সব সময় ভয়, কখন আং-ছু' গিয়ে ইংরেজদের সব কথা বলে দেয়, আর ইংরেজরা তাকে বাঁচ করে দেয় কলকাতা থেকে।

লোকের মুখে শুনে পেলো আং-ছু' প্রায়ই কলকাতায় আসে, সারেক-সুঝার সঙ্গে দেখা করে দু'একদিন কাটিয়ে আছিপুর ফিরে যায়।

তাঁর মনে কোনো আং-ছু' তাকে বিশেষ ফেলার চেষ্টা করছে। ভাজতে ভাজতে আং-ছু'র সম্বন্ধে একটা মৌর ভয় আর স্থা জন্মলো সু-তাও-এর মনে। সেও শঙ্কতা করতে শুরু করলো।

জু-শী'কে নিয়ে সে কিছুদিন ছিলো মুন্সিাবাদে। তারপর

দেখলো কসাইটোলার পেছন দিকের জায়গাটা খুব সুবিধের। ওদিকে খানিকটা জঙ্গল সাক করে ঘর বাঁধতে পারলে বেশ নিরিবিলা থাকি। বায়, অল্প জাতের লোকজনেরা কেউ খাঁটিবে না। তা'ড়াডা সে আকি: নিয়ে যে কারবার করছিলো, তার জন্তে একটু নিরিবিলা থাকতে পারলেই সুবিধে।

কলকাতায় তখন চার জন পাঁচ জন করে চীনে দেখা যাচ্ছে। মুগীহাটায় দোকান করেছে দু'-একজন।

কয়েকটি চীনে পরিবারকে নিয়ে কসাইটোলার পেছন দিকে জঙ্গল খানিকটা সাক করে বসবাস করতে লাগলো। স্বং-তাও। তারপর লাগলো আং-ছু'র পেছনে।

সে সময় কলকাতায় প্রায়ই জাহাজ আসতো মাকাও থেকে। সে সব জাহাজের খালী দৌলো বেশীর ভাগ চীনেমান। জাহাজের সায়েবরা খুব দুর্ভাবগার করতো তা'দের সঙ্গে। জাহাজ এসে গঙ্গার বুকে নোঙ্গর করলে অনেকেই জাহাজ থেকে পালিয়ে কলকাতায় থেকে যেতো।

তাদের খাওয়া-খাকার ব্যবস্থা করতো স্বং-তাও, তারপর তাদের কাজে লাগিয়ে দিতো। মুচির কাজ, ছুতোদের কাজ, দোকানদারী, সায়েবদের বাবুর্চি কিছা খানসামার কাজ, যা'র যাতে সুবিধে। কেউ বা ভিড়ে গেল স্বং-তাও'এর দলে, কেউ তার আঁক-এর চারা ব্যবসায়, কেউ তার অধীনে চীনের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার খবরদারী করবার কাজে—কারণ চীনেরা সরকারী আইন-শৃঙ্খলার ধার ধারতো না, নিজেগাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে থাকতো, এবং অবস্থা গতিকে তাদের নেতৃত্ব এসে পড়লো ফেং-স্বং তাও'এর উপর।

রাজা থাকলে রাজ্যের প্রজা চাই। কলকাতায় যে কয় জন চীনে সে পর্যাপ্ত নয়। স্বং-তাও নজর দিলো আছিপুরের দিকে।

আঁচুপুরের অবস্থা তখন ভালো নয়। চিনির কল ভালো চলছে না। মজুরদের আয় খুব কম। অথচ কলকাতায় প্রচুর পরস। কলকাতার বাতাসে পরস উড়ছে। ধরতে জানলে এবং ধরতে পারলেই হলো।

স্বং-চাও'এর লোকজন আছিপুরের চীনেদের গিয়ে বলতে লাগলো যে, তারা যদি কলকাতায় এসে থাকতে চায় তা'হলে স্বং-তাও তাদের সব রকম সুবিধে করে দেবে। মাকাও থেকে অনেকে এসে কলকাতায় বসবাস করেছে। তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখেই থাকবে আছিপুরের চীনেরা।

তখন আস্তে আস্তে দু'জন চার জন করে চীনেরা এসে কলকাতায় জড়ো হতে শুরু করলো। আর কলকাতা থেকে কোনো চীনে গিয়ে আছিপুরে আং-ছু'র কলে কাজ করতে রাজি হোলো না।

আং-ছু ভাবনায় পড়লো। প্রথমে নিজে চেষ্টা করলো এসব ঠেকানো। যখন পারলো না তখন কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলো যে মাকাও-এর জাহাজ পালানো চীনেরা তার অধিকারের ফুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আছিপু'র চিনির কল বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার সায়েবদের অনুরোধে। কবাণ, তখনো জাভা সুমাত্রা থেকে ব্যাপকভাবে চিনির আমদানী আরম্ভ হয়নি ইংরেজ সরকার আং-ছু'কে আশ্বাস দিলো যে, তারা তাকে বণ্যসাধ্য সাহায্য করবে।

১৭৮১র এই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিশেষ সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। তাতে জানানো হোলো যে, গভর্নমেন্ট সতর্ক করেছে "To grant every encouragement to the colony of Chinese under the direction of At Chew...and to afford him every support and assistance in detecting such persons..."

কিন্তু কথা দিয়েও ইংরেজ সরকার কিছু করলো না। কলকাতার কাউন্সিলে তখন ওয়ারেন হেস্টিংস'এর সঙ্গে অন্তিম সদস্তদের গোলমাল চলছে। এসব নিয়ে সরকারী মহল মশগুল। আং-ছু'র তুচ্ছ ব্যাপাংটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। ইংরেজ এলাকায় একজন চীনে ব্যবসায়ীর সাফল্যও অনেক ইংরেজ মাচেন্ট হাউসের কামা নয়। জাভা সুমাত্রা থেকে চিনি আমদানী করে মুনাফা করবার সম্ভাবনা তখন অনেক ইংরেজের মাথায় ঘুরছে।

১৭৮২ সনে স্বং-তাও আর জু-শী'র একটি ফুটফুটে থোকা হোলো। স্বং-তাও'এর বাড়িতে বিরাট নেমস্তল দেওয়া হোলো। নেমস্তল খেতে এসেছিলো আং-ছু'ও। জু-শী'র রান্নার প্রশংসা করে গেল সবাই।

সেদিন কেউ ভাবতে পারে নি যে, স্রু'র ভবিষ্যতে স্বং-তাও'এর এই ছেলটিটি হবে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের বিখ্যাত জলদস্যু ফেং পাও-ছু, ১৮৪০-এর ওপিয়াম-ওয়ার'এর সময় যে চীনা দেশশ্রেমিক হয়ে উঠে একটি বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করবার সময় কামানের গোলায় প্রাণ দেবে।

তার পয়ের বছর আং-ছু' খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন তার চিনির কলের পড়ন্ত অবস্থা। তার শরীর আর মন দুইই ভেঙে গেছে।

জু-শী গেল আং-ছু'র শুশ্রূষা করতে। কিন্তু আং-ছু আর বাঁচলো না। মারা গেল সে বছরই।

স্বং-তাও খুব দুঃখিত হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে কি ও কে, ইংরেজ সরকারকে জানানোর আর কেউ নেই।

এবার বাকী জীবনটা সে আর জু-শী নিশ্চিন্ত হয়ে কাটানো পারবে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠলো না। আং-ছু'র প্রাতিহিংসা যে এত ভীষণ কে জানতো?

আং-ছু'র মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরে নেসফীল্ড নামে এর ইংরেজ সলিসিটায়ের চিঠি এলো স্বং-তাও'এর কাছে তার মর্শ্ব এই:—আং-ছু' একটি বড়ো তামার বাস্ন রেখে গেছে, যার ভালো সীল করা। সেটার বর্তমান মালিক জু-শী। কিন্তু একটি শব্দ এই যে স্বং-তাও যদিও বৈধ থাকবে তদ্বিন সে বাস্ন জু-শী'কে দেওয়া হবে না।—

স্বং-তাও খুব উৎসুক হয়ে উঠলো সেই বাস্ন কি আছে জানবার জন্তে। জু-শী কিছু বলতে পারলো না। কিছুদিন পর চীনে মহলে একটি গুজব ছা'ড়িয়ে পড়লো যে সেই বাস্ন আং-ছু' এর জাহাজ গিনি রেখে গেছে জু-শী'র জন্তে। সে কথা স্বং-তাও'এর কানেও এলো।

জু-শী বললো, তার সরকার নেই এ টাকা। স্বং-তাও'এর আগে মরতে পারলেই সে খুশী হবে। কিন্তু তখন স্বং-তাও'এর কানের কাছে শরতান কিশকিশ করতে শুরু করেছে।

জু-শী যদি খাবারের সঙ্গে বিষ মেশায় ! জু-শী যদি বাড়িরে ঘুমের মধ্যে গলায় কুর চালিয়ে দেয় ! হাজার হোক জু-শী'র বয়স একুশ, তাঁ'র বয়স প্রায় চল্লিশ !

তখন মনে পড়লো যে, হ্যাঁ, তাই তো ! যাঁদের বাড়ি স্থলিনের সঙ্গে তো জু-শী'র খুব ভাল। আত্ম-কাল সে প্রায়ই আসে এ বাড়িতে।

রাতিরে আর ঘুম হয় না স্নং-তাও'র। খাবার মুখে রোচে না। আন্তে আন্তে দেখা গেল স্নং-তাও আর রাতিরে জু-শী'র সঙ্গে এক ঘরে শোয় না, জু-শী'র রাগা খাবার মুখে তোলে না। অত্যন্ত ক্লম তার ব্যবহার জু-শী'র সঙ্গে।

তার পর জামুয়ারী মাসের এক কুয়াশা-খন সকালবেলা দেখা গেল একলা ঘরে জু-শী'র মরে পাড়ে রয়েছে। স্নং-তাও সবাইকে বললে জু-শী হঠাৎ সন্ধ্যাস রোগে মারা গেছে। কিন্তু লোকে বললে অন্য কথা।

আর কিছুদিন পরে আং-ছু'র এক আত্মীয় একটি সীলকরা চিঠি এনে দিলো স্নং-তাও কে, বললো, আং-ছু'র চিঠি, সে মারা যাওয়ার আগে তাকে ডেকে চিঠিখানি রেখে দিতে বলেছিলো আর বলে গিয়েছিলো জু-শী এখন মারা যাবে তখন যেন এ চিঠি দেওয়া হয় স্নং-তাওকে।

স্নং-তাও নিজে পড়তে পারতো না। আরেক জনকে দিয়ে পড়িয়ে নিলো। তখনলো আং-ছু' লিখে গেছে :

ভাই স্নং-তাও, আমি জানি যে তুমি এমন একজন লোক বার ভীষণ প্রাণের ভয়। আর এ-ও তুমি চাও না যে তোমার বো জু-শী ধনবতী বিধবা হয়ে বেঁচে থাকুক। এখন তুমি এ' চিঠি পাবে তখন আমার কবরের মধ্যে আমি হয় তো কঙ্কাল হয়ে গেছি, কিন্তু তোমার বোয়ের কবরের মাটি তখনো নরম ও কাঁচা, তখনো হয় তো ঘাস গজায়নি তার কবরের উপর। তোমায় শুধু এ খবরটা দিতে চাই যে, নেসফিল্ডের কাছে যে তোমার বাসগৃহ আছে, তার মধ্যে রাখা যে এক হাজার গিনির গুজব তোমার কানে যাবে বলে আমি আশা করছি, (কারণ গুজবটা রটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করে যাচ্ছি) সেটা

সত্যি নয়। এক হাজার কেন, একটি গিনিও তাতে নেই। বাসগৃহ কাঁচা। আর এ-ও বলতে চাই যে জু-শী খুব ভালো মেয়ে। তোমায় খুব ভালো বাসতো। আশা করি দেবতার তোমায় ক্ষমা করবেন এবং তোমার মনে শান্তি দেবেন।—আং-ছু'।

বছর তিন-চার পর কে স্নং-তাও এখন মারা গেল তখন তার মন এবং শরীর একেবারে কাঁকরা হয়ে গেছে। ছেলে কে পাও-হুং কে নিয়ে গেল এক দূর আত্মীয়।

স্নং-আং-ছু'র চিনির কলও অচল হয়ে গেল। ১৮০৫ এর ১৫ই নভেম্বর আং-ছু'র জায়গা-কমি চিনির কল সব নীলামে চড়ানো হোলো।

আছিপুরের চীনেরা সব আন্তে আন্তে কলকাতায় সরে এলো। বছর কুড়ি পর দেখা গেল আর একজনও নেই সেখানে। সব পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতার এই কসাইটোলা আর মুর্গীহাটায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। কিছু চলে গেছে টেবায়।

আজ আর আছিপুরে চীনে উপনিবেশের কোনো চিহ্নই নেই।

শুধু গঙ্গার পাড়ে বিষুত অন্ধরে পাড়ে আছে স্নং আং-ছু'র সমাধি। বিশেষ কেউ জানে না, খোঁজও নেয় না ওটা কার। লাল সিমেন্ট-বাধানো সমাধির অবতল দেওয়ালে একটি মার্বেল ফলকে চীনে অক্ষরে যা লেখা আছে সে কেউ বুঝতেও পারে না।

খামলো মিলিগ মুখার্জী। আমরা সবাই চুপ-চাপ তনুছিলাম। আমাদের সবার মন যেন উদাস হয়ে ডেসে গেল কলকাতার বাইরে এক নদীর পাড়ে। যেখানকার বিস্তীর্ণ শ্রামল পটভূমিকায় এক নির্জন সমাধি। খুব নীচু, ঘোড়ার খুরের মতো অধ-বৃত্ত। লাল সিমেন্টে বাধানো। দেওয়ালের গায়ে একটি মার্বেলের ফলক, চীনে অক্ষরে লেখা আং-ছু'র নাম আর দূর থেকে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক।

প্রায় দু'শো বছর আগে হয়তো সে জায়গা বাজি-পটকার আওয়াজে, কাঁকর আর কাঁসরের তালে, বাঁশীর সুরে, ড্যাগন নাচে মুগ্ধ হয়ে উঠতো চীনে নববর্ষের দিন।

আজ সেই গঙ্গার তীর নিঃসাড়, নিস্তব্ধ !

[ ক্রমশঃ ]

## ● মাসিক বন্ধুসভার বর্তমান মূল্য ও

### ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে .....২৪

পাণ্ডালিক " " .....১২

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ).....২

গদ্যের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে

গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ

নিজস্বার্থে কুলনে বা পত্রে অবস্থাই গ্রাহক-সংখ্যা

উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সভাক ১৫

" বাণ্ডালিক সভাক .....৭।

প্রতি সংখ্যা ১।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৮

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১

বাণ্ডালিক " " " .....১০।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " " .....১৮

# দেখুন! মাত্র অর্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাটা যায়!



ফেনার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়ালীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অর্ধেকটি সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাটা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার দরুনই প্রতিটি  
ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকরম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিমা আছড়ে পরিত্যক্ত হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

## সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

৮ই সেপ্টেম্বর। আজ সকালে বাবা-মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। কেমন করে তা সম্ভব হল বলছি। প্রান্তরাশের সময় কর্ণেল সাহেব জানতে চাইলেন, আমি ঘোড়ার চড়তে পারি কি না; পারি না শুনে তিনি জমিদারের দিকে ফিরে বললেন, “কি রে ছানোয়া, বিজ্ঞাটা ওকে শিখিয়ে দে না?”

ও সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

“আজ থেকেই তবে লেগে যাও, অবশ্য মাল্‌মোয়াজেলের যদি অমুবিধে না থাকে; এই সুবাদে তোমার মার সঙ্গেও দেখা করে আসতে পার...”

“বাঃ, তাহলে কিন্তু খুব মজা হয়...কিন্তু...”

“আর ভবে দেবী নয়” বাধা দিলেন কর্ণেল।

“কিন্তু, আমি আবার বললাম, “আমি চড়তে পারি, তেমন শাস্ত ঘোড়া কি আছে?”

—“আলবৎ আছে”, ছানোয়া জবাব দিলেন। “বহুবথানেক আগে মা একটা সাধা রঙের মালী ঘোড়া কিনেছিলেন, ভেড়ার চেয়ে নিরীহ...”

“ভাবী জমিদার-বধূব কথা ভেবেই ওটি কেনা হয়েছিল, না বোন?” বৃহৎ করে কর্ণেল ফোঁদ দিলেন।

কীতেন্‌ হাসলেন, আর তাঁর বড় ছেলে চলে গেল সাজ-সরঞ্জাম করতে। গান্ধী'র অন্ত কাল থাকায়, সে আমাদের সঙ্গে যাবে না জানাল। প্রান্তরাশের পর ঘোড়াগুলো এনে হাজির করা হল দরজার সামনে। জমিদারের ঘোড়াটার নাম সালাত্তা, কালো কুচকুচে তার রঙ; সাধা লোমের লেশমাত্র নেই; বিরাট চেহারা, জাঁকাল বুক। মনি বর গলা পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে ডেকে উঠল। আমার ভ্রাতৃ আনা ঘোড়াটা বরফের মত সাধা; কেশব বেন গলান রূপো; সত্যিই ভেড়ার মত নিরীহ তার হাবভাব। একটি বেন শক্তি ও মহত্ত্ব; অপরটি সৌন্দর্য আর কমনীয়তা। ফতমাকে গিয়ে আদর করতে সে মুহূ ডাক ছেড়ে আমার হাত চাটতে লাগল—বেন বুঝতে পেরেছে যে, আমি ঘোড়া ভালবাসি। জমিদার রেকাবে পা দিয়ে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে উঠল তার জিনের ওপর; কর্ণেল সাহেব তাঁর ঘোড়ায় সবশেষে চাপলে কীতেন্‌ আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। “দেখিস ছানোয়া, মার্গরিতের গায়ে বেন কুটোটি না লাগে”, তিনি সতর্ক করে দিলেন।

“কিছু ভয় নেই মা”, হান্ডা গলায় সে উত্তর দিল।

আমি জিনের ওপর ঠিকমত বসেছি কি না, সে দেখে নিল।

“খুব ভালভাবেই বসেছি!” আমি বললাম।

রূপোর কাল-করা একটা চাবুক সে আমার হাতে দিল; কর্ণেল, হুককটে চেঁচিয়ে উঠলেন, “ভূমি ত দেখছি খালি চলাচ্ছ!”

আমি হাসলাম। কন্‌ম চালে আমরা শুরু করেছিলাম; থানিক বায়েই তা পুণঃগতিতে গিয়ে পৌঁছল। সাবধানতা অবলম্বন করে জমিদার আমার পাশে-পাশেই চলছিল। সকালটা কি সজীব, কি নীল আকাশ! আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে? আমাদের বাগানের সামনে এসে কারো সাহায্য বিনা আমি স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে পড়লাম ঘোড়া থেকে, এক ছুটে গিয়ে আঁকড়ে ধরলাম আমার বাবাকে। তিনি তখন চৌকাঠের সামনে পায়েচাঁর করছিলেন।

“আরে!” তিনি অবাক হয়ে গেলেন, “মা আমার ঘোড়ায় চড়ে এসেছে! বাঃ! দূর থেকে এক বরবান্ধীও দুই জন অশ্বাবোহী বোন্ধাকে এলিকে আসতে দেখে আমি ডাকলাম, বুঝি বা শ্রীমতী গোস্বয়ল তাঁর অমুবাগীদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।”

আমার দেখে তিনি কেমন বিব্বল হয়ে পড়লেন। মা ছুটে গেলেন জমিদার ও তার মামাকে অভ্যর্থনা করতে, আমি ঘোড়ার চোপে এসেছি শুনে তিনিও আহ্লাদে আঁটখানা। বটখানেক বায়ে আমরা প্রাসাদে কিয়লাম।

১১ই সেপ্টেম্বর।—ছোট্ট নদীটির ধারে আজ গিয়েছিলাম আমরা। জমিদার নৌকা-বিহারের প্রস্তাব করতে আমরা সাৎসায়ে তা অমুমোদন করলাম। বুনা গোলাপ আর বঁটি-ঝোপ ভরা দুই কুলের মাঝে সোজায়ে ভেসে চললাম আমরা,—জমিদার, তার ভাই আর আমি। কি স্বন্দরগ্রাহী দৃশ্য! বহুবদ্রে, গাছের ওপর দিয়ে দেখা বাচ্ছিল প্রাসাদের আকাশচুম্বী চূড়া। ধাক্কাহে সবই নিশ্চন্দ; নিজেদের কথা ছাড়া আর কিছুই শব্দই সেখানে ছিল না। থেকে থেকে লাল-নীল মাছেরা জলের ওপর দেখা দিয়েই তাঁদের মত ডুব লিঙ্কিল সবগে। বোঁপঝাড়ের কঁকে কঁাকে গোলাপের বাহায়ে চোখ জুড়িয়ে বাচ্ছিল। তুষার-শুভ্র একটা ফুল দেখে আমার পক্ষে লোভ সামলান লায় হল, জমিদার অমনি ডাঙার লাফিয়ে পড়ল সেটা আনবার জন্য। কিন্তু পাড়টা এমন খাড়া যে তার পা পিছলে গেল; আমি আঁতকে উঠলাম। গান্ধী'র ভাবে বিভোর হয়ে চেঁটে দেখছিল; হঠাৎ সে চমকে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জমিদার টাল সামলে নিয়ে উঠে এল, হাতে তার সেই ফুল। “এ কি, তুমি এত বিব্বৎ হয়ে পড়েছ কেন? শরীর ভাল আছে ত?” শশব্যস্ত হয়ে সে আমার ফুলটা দেবার সময় বলল।

“নাঃ, ভূমি পা হড়কে পড়ে বাচ্ছিলে দেখে বড় ভয় পেরেছি, বিশেষ কিছু না।”—ভয়ের কি আছে? আমি ত সঁাতার জানি, ছানোয়া আমার দুখের কথা কেড়ে নিল; আর বাপু ওই সাধা গোলাপের মত ক্যাকাশে দুখ করে থেক না,” হাসতে হাসতে সে অমুবেদ্য করল। আমরা ফিরে এলাম প্রাসাদে; গান্ধী'র দুখ সব শুনে কীতেন্‌ আদ্যার সময়ে কোলে ঠেলে নিলেন।



১১ই সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের সন্ধ্যাবেলায় ছাতের ওপর থাওয়া শেষে নিলাম। বাড়ীর ভেতরটা বেশ শুমেট লাগছিল। কৈতস্ আয় তাঁর ভাই কিরে এলেন যখন, সিঁদুর-বর্ণ সমুদ্রের বৃকে স্থখ তখন পাড়ি জমিয়েছে। গৌলির এই স্নান দীর্ঘস্থায়ী আলো আমাদের ঘেন আহ্বান জানাচ্ছিল আরো কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যেতে। গান্ধী ঘড়ি দেখে উঠে পাড়াল ঘাবার জন্তে। ক্র কুক্ষিত করে জমিদার তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের সামনেই ঘোঁরা, তার মধ্যে লাল মাছের বেলা দেখছিলাম; আমরাই পাশে দাঁড়িয়ে জমিদার, আত্মবিস্মৃত ভাব। স্বচ্ছ জলে মাছের ছোটোপুটি দেখে আমি বলে উঠলাম, “কি মজা! কি সুন্দর!”

সে হেসে বলল, “সত্যিই বড় সুন্দর; জলের মধ্যে সত্যিই তোমার মুখের ছায়া পড়ে।”

“হা, আমি যেন সে কথা বলছি,” অপ্রস্তুত ভাবে আমি বাগা দিলাম, “আমি ত ওই স্রুঙ্গ মাছগুলোর কথা বলছি।”

“আর আমি, আমি দেখছি স্রুঙ্গ তোমার মোহন ছায়াটা!”

দারুণ লজ্জা করত লাগল আমার; ওর প্রতিটি কথাই কানে ঘেন মাধুর্য চলে গেল। ভরাট গলায় ঈষৎ স্বরী আমেজ,—পাহাড়ের গায়ে ঢেউভাঙার মুছনা ঘেন ভেসে আসে! রাত হয়ে এল; আমরা ভেতরে গেলাম। জমিদার-গিন্নী আমার ঘরে বসলেন, ওই অঞ্চলের প্রচলিত কিছু গান গাইবার জন্ত। আমি গাইলাম। কর্ণেল সাহেব প্রশংসার মুখর হয়ে উঠলেন।

“মা-মণি, তোর গলা শুনে মনে হল, গোলাপ-বনে ঘেন বুলবুলি গাইছে,” তিনি বললেন, “এইবার ছানোয়া, এইবার তোর পালা! একটা গান শোনা দেখি?”

অসাধারণ দক্ষতার সাথে সে বেহালায় বৃকে ছড় টানল, তার পর শুরু করল তিক্তর যুগোঁগর একটা গান; তার গুরুগভীর গলায় সার ঘর ভরে উঠল,—

“আকাশ-রসে পবিপ্লুত

আছে কি সেই শামল-ভূমি?”

গানটা শেষ হলে কর্ণেল বললেন, “বাবা ছানোয়া, গেল বছর তোর গান যা শুনে গিয়েছি, তার তুলনায় তোর অনেক উন্নতি হয়েছে।”

গান্ধী এর মধ্যে কিরে এসেছে; কিছুতেই সে গাইতে রাজী হল না। আমাদের আসর ভাঙল রাত এগারোটা নাগাল। আমার ঘরে আমি ক্রুশের সামনে নতজাহ্ন্ন হয়ে বসলাম। ভগবান ঘেন ক্ষমা করেন আমার সমস্ত পাপ, কখনো তিনি ঘেন আমার তুল পাখে না যেতে দেন। হে ভগবান, আমি তোমারি দানী; দয়া কর আমার।—জানলা খুলে তাকালাম বাইরে। বাউ আর বাউ-গাছের ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী আজ শান্তিময়। ঘূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের ঢাপা গর্জন। অশ্রুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে রূপালী ঢেউ। ঠিক ছিল, আসছে কাল আমি বাড়ী ফিরব; কিন্তু কৈতস্ আশক্তি কবায় আরো দু’দিন থেকে যাব।

১১ই সেপ্টেম্বর। জমিদার আর গান্ধীর সঙ্গে আজ প্রাসাদের প্রতি অলি-গলি দেখে বেড়ালাম। কেকার গিয়ে আমরা কেকার ওপর বসে দেখলাম, ঘূরে নীল ঢেউয়ের মধ্যে কি ভাবে গিয়ে গেল হাতা টকটক স্থখ।

“জান, এই দুর্গ স্বচ্ছ একটি কাহিনী চলিত আছে?” জমিদার বলল। আমি তাকে ঘরে বসলাম, “কি কাহিনী, বল না, শুন্যী!”

গান্ধী পায়চারী করছিল। জমিদার বলতে শুরু করল,— “দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে আমাদের ভৈনৈক পূর্বপুরুষ থাকতেন এই প্রাসাদে; নাম তাঁর আঁরিজ প্রহারডেন। তখন তাঁর সম্মান বলতে ছিল রূপে স্বভাবে অতুলনীয় খোড়শী এক মেয়ে। সে জমিদারের চোখের মণি। একটি ছেলেও ছিল; ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্মযুদ্ধে সে যোগ দেবার পর বহু বছর তার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। একদিন হয়েছে কি, একটি শীতের সন্ধ্যায় প্রাসাদে এসে হাজির হল অশ্বারোহী এক সৈন্য। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। তাকে তাই তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে থেকে আনা হল। বোরাব পোশাক বরফ একদম ঢেকে গিয়েছিল।

সেকালের রীতি অনুযায়ী কাথেরিন—জমিদার-নন্দিনী—খুলে দিল সৈন্যটার কোমর-বন্ধনী। পাওয়ার সময় জমিদার আশাচারিত করে অতিথিকে বসালেন নিজের টেবিলে। লোকটার বয়স আশা করি পঁচিশ বছর। সঙ্গে কালো কুচকুচে বর্ণ; টুপিতে কেবল একটা দাগ পালক, ভূবারের মত ধবধবে সালা। লম্বা চেহারা; আবহুল; কালো কৌকড়ান চুলগুলি জুলপি অবধি লম্বিত; কপালের ওপর, চুলের কাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটা ক্ষতচিহ্ন; ঘন কালো গৌক; আর এই দাগটা মিলিয়ে লোকটার মুখে এনে দিয়েছে সুন্দর পুরুষালি এক ভাব। কালো চিন্তাকুল চোখ দুটি যে মাঝে মাঝে গৃহস্থামীর কস্তার মিকে পড়ছিল না, এমন নয়। মেয়েটিও প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়; অশ্বারোহীর উন্নত চেহারার দিকেই নিবদ্ধ ছিল তার দৃষ্টি নীল কাথ—সকলের অগোচরে। তার নম্র নিশাপ মুখ লাল হয়ে উঠছিল আগন্তকের সুহৃৎতম সন্ধ্যায় শুনে। তাকে জমিদার অনুরোধ জানালেন, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে বিশ্রাম করে যেতে সে বাবার সময় স্বত্বচিহ্নরূপে দিয়ে গেল কাথেরিনকে সালা একটা গোলাপ। “আবার দেখা হবে” না বলে সে বলে গেল, “বিদায়”

এই চূড়ার ওপর উঠে তাকে কাথেরিন অনুসরণ করেছিল আহুলতা দুটি দিয়ে, যতদূর সম্ভব। সেই মাধার পালক, সেই মনোহর গড়ন—সবই ক্রমশ ছোট ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। ও বৃকজেই, তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল কাথেরিন। তার বাবা ভ সন্ধ্যাবেলা তাকে কোথাও না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজি হলেন এখানে। স্নান শুভ্র জ্যোৎস্নার ছটা এসে পড়ছিল ঋতুখণ্ডি কাঁক দিয়ে। বিছানায়—জমিদার দেখলেন—শুয়ে আছে—তাঁর কাথেরিন, হাতের গোলাপটার চেয়েও বিবর্ণ। মাধার চুলগুলো চাঁদের আলোর জ্যোতির্গুণের রূপ নিয়েছে। জমিদার তাকে ডাকতে গেলেন; দেখলেন, সব শেষ!

ছানোয়া বলে চলল, লোকে বলে, ডিসেম্বরে, গুরুপক্ষের রাতে এখানে আজো সেই দুখ দেখা যায়, যেদুখ দেখেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ, জমিদার আঁরি!

দারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারি ধারে; পাতার মধ্যে শুকনো হয়েছে বাতাসের ক্রন্দন।

“ইস, তোমার যে ঠাণ্ডা লাগছে,” আমার গায়ে একটা চাদর জড়াতে জড়াতে জমিদার বলল, “হাত দুটো দেখছি একদম জমে গিয়েছে। চল, এবার আমরা ফিরি।”

আমরা নেমে এলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর। কর্ণেল আজ সকালে পারী চলে গেলেন। ২০শে ডিসেম্বর—জমিদারের জন্মদিন—এর আগেই তিনি ফিরবেন, কথা দিয়ে গেলেন তাঁর বোনকে। চৌকাঠের সামনে আমার হাত ধরে কপাল চূষন করবার সময় তিনি বলে গেলেন।

“মা-মণি, আমার মত বড়ো ছেলেকে বাধা দিতে নেই; শ্রীমান ছানোয়া হলে না হয় অল্প কথা, তাই না?”

হা-হাঃ করে তিনি হেসে উঠলেন। আমি দক্ষিণ চক্কায় পড়লাম। কালকেই আমার বাবার দিন। আঃ! আবার বাবার কাছে ফিরব—ভাবতেও আনন্দ। কীতেশু আমায় বার বার অনুরোধ করেছেন, যেন জমিদারের জন্মদিনে আবার প্রাশাদে আসি। জমিদার নিজের বড় বার বলেছে।

“তুমি আসবে ত, ঠিক বল। নইলে, জানই ত, তুমি ছাড়া সবই কত অনর্থক ঠকবে, তাই না মা?”

“তা কি বলতে? আসিস কিন্তু মার্গরিৎ”।

আমি কথা দিলাম।

১৩ই সেপ্টেম্বর।—এই ত ফিরে এসেছি ছোট আমার ঘর, এই ত সেই চিবপরিচিত—ঘর বার জানালা খুললেই চোখে পড়ে আমাদের বাগানটা। সাদা পদার ঘেরা এই ত আমার বিছানা, এই ত ছোট টেবিলটা, বার ওপর আমি এই দিনপত্রী লিখি।

জমিদার আর তার ভাই আমায় পৌঁছে নিয়ে গেছে। বাবা লেবগোড়ায় ঠাঁড়িয়ে ছিলেন; আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে তিনি বললেন, “মনে হচ্ছে যেন এক সপ্তাহ নয়, বছর খানেক হল তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলি অনেক দূরে।” মুখে হাসি থাকলেও চোখ দুটি তাঁর ভেঙা।

মা নিজের ঘরে কাজ করছিলেন, ছুটে গিয়ে হাজির হলাম দেখান; তিনি চমকে গেলেন, “সে কি রে? আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগে তুমি ফিরবি না। কে পৌঁছে দিল?”

“জমিদার আর পাণ্ডা”।

তিনি তরতর করে নেমে গেলেন হলঘরে, আমি তাঁকে অমুসরণ করলাম। জমিদার ওর মায়ের দেওয়া একটা চিঠি তাঁর হাতে দিল আর বার বার তাঁকে এবং বাবাকে নিমন্ত্রণ জানাল ওর জন্মদিনে প্রাশাদে বাবার জন্ত। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মা-বাবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি, বাবার ভাষায়, “আমার সঙ্গী” দেখতে গেলাম। বরগোস্বলো দেখে লুইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। রাত্তি বাবার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম লুইয়ের কোনও খবর এসেছে কি না।

মার দিকে চেয়ে তারপর তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, আজ সকালেই ওর চিঠি পেয়েছি।”

“ও ভাল আছে ত?”

“হ্যাঁ”।

“এখন কোথায় আছে বাবা?”

“কর্দিকায়”।

“তাই নাকি? ভারগাটা কেমন লাগছে? চিঠির খানিকটা পড়ে খোঁচা ও বাবা।”

কয়েক লাইন পড়েই তিনি থেমে গেলেন।

“আর লিখেছে এখানে কাটান দিনগুলির মধুর স্মৃতি সব্বদে।”

চিঠিটা ভাঁজ করে তিনি পকেটে পুরে ফেললেন। শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে গেল; কত কথাই যে জমেছিল এই কয় দিনে।

১৪ই সেপ্টেম্বর। কাল সন্ধ্যায় জমিদার এসেছিল; জানতে চাইল এতটা পথ চলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কি না। মা ও প্যারী থেকে জানা নতুন কয়েকটা বিদেশী গাছ দেখালেন। সে তাঁকে লুইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করল।

“আমি ওর সাথে দেখা করতে উদ্গ্রীব,” জমিদার তাঁকে বলল “এমন উদার চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। কি সরল দৃষ্টি, কি প্রাণখোলা হাসি,—দেখেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।”

“অল্পেবর নাগাদ ও বোধ হয় আসছে।”

“সত্যি? আমি সাগরকে অপেক্ষা করছি ওর জন্যে,—আমার মা সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।”

লুইয়ের ভীষন-কাচিনী সবিস্তারে মা থেকে বললেন। এক মাসে শুনতে শুনতে জমিদারের স্তম্ভর মুখে নেমে এল চিন্তার ছায়া।

“বেচারী!” অধীর হয়ে ও বলে উঠল, “কত সংঘাতের মধ্যেই নওকে দিন কাটাতে হয়েছে। এই কল্পনাই ইতিহাস শুনে ওর ওপর যা মার লাগছে। এই অল্প বয়সে, এত বাধা দুচ্ছ করেও ও আর কাপ্তেন।”

“বয়স ওর কুড়িও হয়েছে কি না সম্ভব! ওর বেক্সিয়েন্ট কাপ্তেনদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ছোট।” সগর্বে মা উত্তর দিলেন। খানিক কথাবার্তার পর জমিদার চলে গেল।

১৭ই সেপ্টেম্বর। আমার অন্ত্যায়লিকের চেয়ে ভাল ঘোড়া আর ক’টা বা আছে? বাবা আমায় বড় ভালবাসেন। ঘোড়ার চড়তে লিখেছি দেখে তিনি পারী থেকে আমায় আনিয়ে দিয়েছেন তেজী ঘিঘে’র রতের এই ঘোড়াটা। কি কেশবের বহর! আর স্বভাবটা ওর অতি নিরীহ; আমায় দেখা মাত্র চন্দ্ৰমুখ করে ওঠে। কাল ওকে কেনা হয়েছে; আজ আমরা সারা গ্রাম ঘুরে বেড়িলাম। ও ছোটো হাওয়ারও আগে। বাবা আর আমি যখন বাড়িলাম, জমিদারের সঙ্গে দেখা হল; তার মুখে ত অন্ত্যায়লিকের প্রশংসা ঘর না। বাবার সময় ও রহস্য করে গেল, “মনে হচ্ছে শিকার থেকে ফিরছেন দেবী ডায়ানা স্বয়ং”।

১৮ই সেপ্টেম্বর। আজ ভগিনী ভেরগিনিকের একটা চিঠি পেলাম। তাঁর অন্তর্য করেছি; খুব বাড়াবাড়ি; বাঁচার আর আশা নেই; অবিলম্বে আমার দেখতে চান তিনি। ছোট চিঠিটা দিব্য শক্তির মাঝে একান্ত একটা জীবনের স্রবাসে ভরপুর। বেচারী ভগিনী! এই ত সবে ছাত্রিশে পা দিয়েছেন,—এর মধ্যে উনি ছেড়ে যাবেন এই রেহের নীড়, যেখানে আমরা সবাই প্রতিপালিত হচ্ছি ভগবানের দয়ার মধ্যে? বাবা অল্পমতি দিয়েছেন ভগিনীকে দেখতে বাবার; মা ত চিঠিটা পড়ে কঁদে আঁকুল। প্রাতঃরাশের পর বলটার সময় আমরা বেড়িয়ে পড়ব।

২১শে সেপ্টেম্বর।—আঠারো তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ‘মাতের দোলোসো’ (Mater Dolorosa) কনভেন্টে গিয়ে পৌঁছলাম। রোগিনীঘর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন; আমার দেখে হাসলেন, ইশারায় কাছে ডাকলেন। নতজানু হয়ে তাঁর শিরের কাছে গিয়ে বসলাম। আমার তিনি আদর করলেন;

অতি পাণ্ডব হয়ে গিয়েছে ঠর চোরা। হাতীর কীতে তৈরী একটা ক্রুশ ঠর চোরা। আমি কুপিয়ে কুপিয়ে কাঁদছি দেখে উনি সন্নেহে কণি কণে বললেন, “হ্যাঁ রে মার্গরিৎ, তুই তা হলে সত্যিই আমার ভালবাসিন? কাঁদিস না বোন, একমাত্র স্বর্গে গিয়েই আমি একান্ত সুখী হতে পারব; সেখানেই আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে একদিন। এই জগতে বড় দুঃখ যে মার্গরিৎ, বড় ব্যথার এই লগৎ। কিন্তু পরম পিতার চরণতলে—সেখানে নেই শোক, নেই ক্রন্দন, নেই পরিশ্রম; সেখানে আমাদের সবার অশ্রুই ভগবান মুছিয়ে দেবেন।”

উনি থামলেন। আমাদের জাগরুণ বরণাপূত প্রতীকের ওপর ঠর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আবার উনি মুখ খুললেন।

“এই দেখছিল মার্গরিৎ, এই ক্রুশটা? কত বার যে এর আশ্রয় নিয়ে জীবনে সাহস পায়েছি! আমার ইচ্ছে, আমার সঙ্গে এটাও যেন কখনো দেওয়া হয়।”

আমি আকোরে কাঁদতে লাগলাম।

“মার্গরিৎ, বৃদ্ধি, কি অশ্রুসীমা শাস্তি যে পাচ্ছি এই পৃথিবীর মায়ী কাটিয়ে যেতে; বড় বেরনার মাঝে দিন বেটেছে বোন। এবার ওদের সবাইকেই কিরে পাব; বাবাকে, আমার মাকে, আর ব্যারনারকে।”

আমি সারা-রাত ঠর ঘরে কাটলাম; ভগিনী দর্শন-ও ছিলেন। ভগিনী ভেরোনিক আজ এত আনন্দ পাচ্ছেন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে। আমি কিছুতেই বুকে উঠতে পারছি না! “ভিক্ত দিনের মাঝেও কি নেই মধুর দিনের স্মৃতি?”

এ-অবধি কোন দিন আমি দুঃখ পাইনি; অতি সুন্দর এই জগৎ—সকালবেলা, দুঃখের সময় উনি ডাকলেন। “মার্গরিৎ, আহিস?”

“হ্যাঁ?”

“আর বোন, কান্ডে আর।”

আমি ঠর গা ঘেঁসে বসলাম; হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ঠর ঈতল ওজ্র হাত দুটি।

“ভগিনী ক্লার, পার্শ্ববর্তিনীকে উনি বললেন, “জানলাটা খুলে দে বোন, দিনের সূর্য দেখে বাই।”

অবিলম্বে জানলা খুলে দেওয়া হল। ছোট ঘরটা ভোরের উজ্জল আলোর হেসে উঠল, নীপাধারের ক্ষণ শিখাটি কেঁপে উঠেছে, এবার বৃষ্টি নিবে বার! ভগিনী ভেরোনিক সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন, রোদ পড়ে বিবর্ণ মুখ তাঁর উজ্জ্বলিত।

“আবো তেজোদীপ্ত একটি দিনের দেখা পাব এবার, বোনো জায়ের সূর্য ওঠে বাছ্যের রশ্মি ছড়িয়ে।”

হাত দুটি তাঁর প্রার্থনার ভঙ্গিতে যুগ্ম; ভগিনী ক্লারকে ডাকলেন, “বোনটি, কান্দার অগুস্তাকে একবার দেখতে চাই।”

সে বেরিয়ে গেল। ভেরোনিক নিজের মুঠোর তুলে নিলেন আমার হাত।

“মার্গরিৎ, তোকে বস হাতনা গিয়েছি, তার জন্মে আমার কমা কবিতা?”

“আপনি? আপনি ত আমার চিরদিন রেহ আর ভালবাসাই

দিয়ে এসেছেন; আমিই বরং আপনার কাছে কমা চাই।” আমি অশ্রুস্রব কণ্ঠে জবাব দিলাম।

কান্দার এলেন; নতজাঁহু হয়ে বসলেন পরলোক-যাত্রীর পাশে; শুক কবলেন প্রার্থনা। আর ঘটা কেটে গেল। নিশ্বাস প্রায় শেষে এসেছে, চোখ দুটি বন্ধ। এক মিনিটের জন্ত পান্না থামলেন। ভেরোনিক চোখ খুললেন; বিড়-বিড় করে বললেন, “হে বীত, জাগরুণ!” পরম শান্তির মাঝে আত্মা ত্যাগ করে গেল তার তহু-গৃহ। পান্না উঠে ঝাঁজলেন; নীচু গলায় ঘোষণা করলেন।

“আমাদের ভগিনী চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন; ভগবান গ্রহণ করুন তাঁর আত্মা।”

ভগিনীকে সংস্কার করতে দেখলাম চোখের সামনে; দেখলাম তাঁকে কখনো; বুকের ওপর হস্ত হাত ধরা আছে ক্রুশটি; অচেনা এক জ্যোতিতে তাঁর মুখ উজ্জল, ওঠে হাসির আমেজ; নিভিত বলে ভুল হয়; পরনে সাদা পোষাক। নীরবে অশ্রু ঝরে পড়ছিল আমার গাল বেয়ে। মনে হল, দেহত্যাগী নেমে এসেছেন এই ঘরে, ঘিরে আছেন পুণ্যাত্মাকে। উপস্থিত সকলে কবিনের ওপর এনে রাখলেন নিজের নিজের উপহার; আমি দিলাম একটি লিলি; সকালেই ওটি তুলে এনেছিলাম। বড় বড় সাদা মোমবাতি জলছিল। প্রার্থনা-গৃহের গজ্জের তলায় ঠেকে নিয়ে বাঁধা হল। সবাই প্রার্থনা করল। অমৃতানন্দের শেষে বাড়ী ফিলাম। আগেই বলেছি, ভগিনী ভেরোনিক ছিলেন আমার বড় বোনের সান্নিধ্য। বহু দিন কনভেন্টে ছিলাম, উনিই ছিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী, শিকড়ি; এখনো কানে বাজেছে ঠর মধুর গলা, এখনো বেন আমার বাইবেল পড়ছেন। মনে হত উনি যেন স্বর্গের অঙ্গুরী। তাঁর বাদের অবেগা এই পৃথিবী; কত কষ্টই না গেয়ে গেলেম এখানে! ঠেকে সর্বদা ভগবান নিজের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, হাতে করে ধনিত হতে পারে তাঁর স্তবগান অনন্তের কানে।

২৩শে সেপ্টেম্বর। আজ সকালে আমি বুড়ো হোয়েন ও তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি, ঠণ্ডের কুটির থেকে কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কি! গান্ধ! গরব দুঃখীদের কথা শু ভাবছে দেখে বড় ব্যস্তি পেশায়। ওকে কথাটা বললামও। শুনে ও বেশ লজ্জা পেল। বাবা-মা যেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। কুটিরের জান্নায়েকে দেখে যেমন আশ্চর্য লাগল, তেমনি উৎফুল্লও হল। ওরা তখনো গান্ধ সখ্যে আসেচেনো করছিল। আমার জন্ত জান্নেৎ গিয়ে হস্তস্বস্ত হয়ে চেয়ার নিয়ে এস। প্রাশাদে কাজ পাবার পর ওদের অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে দেখলাম। ওর বাপ আমার প্রাশনার আবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন দেখে তাঁকে হাসতে হাসতেই আমি থমক দিলাম, “দেখুন, যদি অমন করেন, আমি এখনি চলে যেতে বাধ্য হব।”

ভ্রমলোক চূপ করে গেলেন। ওদের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প করে আমি বাড়ীর দিকে পা ছালাম।

২৪শে সেপ্টেম্বর। আজ প্রাত্যহে বাবা আর আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধ শিশির-কণার পায়ের তলার জমি কলমল করছিল। অন্ধকার বন থেকে বার হতেই আমাদের চোখ বাঁধিয়ে গেল কীটা রোদমাখান ধূসু মাঠ দেখে; সামনেই একটা টিলা দেখে তার ওপর গিয়ে উঠলাম। নীচে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, বেড়ার

যেবা আমাদের সাধা বাড়ী,—আর রক্তিম বিগত বিখণ্ড করে  
 ঝাঁপানে প্রুয়ারডেন প্রাসাদের অতিকার চূড়া; আরো দূরে দেখা  
 যাচ্ছে সমুদ্র, যেখানে সূর্যের আলো পড়ে স্থিতি হয়েছে বেন  
 সোনা আর রূপায় গড়া হাজার তারার জেদা। প্রান্তরানের  
 সময় আমরা বাড়ী ফিরলাম। মা দরজার সামনেই  
 ঝাঁড়িয়ে ছিলেন; বাবার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন,  
 “লুইয়ের চিঠি।” বিনা বাক্তব্যে বাবা সেটি পকেটে পুরলেন  
 দেখে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ ওর চিঠি হাতে  
 পড়ামাত্রই বাবা পড়ে ফেলেন। যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর  
 সময় নেই এখন, যা থিদে পেয়েছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর।—আজ জমিদার এসেছিল। মাকে ও ঘরে  
 বসল, সামনেই ওর জম্বিন, ওর মা একা হাতে সব-কিছু পেয়ে  
 উঠেছেন না, আমি যদি তাঁকে সাহায্য করতে প্রাসাদে যাই!  
 ইতিমধ্যে মাদাম গোসরেল আর তাঁর মেয়েও এসে হাজির।  
 জমিদার জানতে চাইল, আমি নিয়ম মত ঘোড়ায় চড়ছি কি না।  
 —“নিশ্চয়ই!” আমি উত্তর দিলাম।

“চল মা, একটু বেড়িয়ে আসতে আপত্তি আছে?”

“বিলম্বিত্র না!”

মাদাম গোসরেল ঠেস দিয়ে মন্তব্য করলেন। “সে কি  
 জমিদার মশাই! ব্যাভারটা কি খুব ভাল হল? আমরাও  
 এলাম, আর তুমিও উঠেছ।”

ও চুপ করে বইল দেখে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল।

“বলি, শতাব্দীখানেক ত হল আমাদের ছায়া মাড়ো না।”

ও তখন জবাব দিল। “দেখুন, সোকের বাড়ী ঘুরে  
 বেড়ানর সময় আমার হাতে একদম নেই।”

ঘরে গিয়ে আমি ঘোড়ার চড়ায় পোষাক পরে এলাম।  
 ছানোয়া উঠে পড়ল, “দেখবে আজ কি রকম দৌড়ো হয়।”  
 বাবা জুতো পরতে গেলেন। তিনিও আসছেন আমাদের  
 সঙ্গে। স্রীমতী গোসরেল এল আমাদের এগিয়ে দিতে; ছানোয়া  
 আমার জিনের ওপর বসিয়ে দিল; তারপর চেষ্টে বদল নিজের  
 ঘোড়ায়।

“তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে কোনও পৌরাণিক যুগে আমরা  
 ফিরে গিয়েছি,” স্রীমতী গোসরেল টিপুণী কাটল। “অপূর্ব তোমার  
 এই রণরঙ্গিনী মুক্তি, মার্গরিৎ! এবার থেকে কিন্তু আমার সঙ্গেও  
 তোমার বেড়াতে যেতে হবে ঘোড়ার চড়ে।”

বাবা এসে গেছেন দেখে আমরা রওনা দিলাম। একেবারে  
 পাশের গায়ে গিয়ে ঘোড়া ধামালাম। বাড়ী ফিরলাম পাক্সা তিন  
 ঘণ্টা ছোট্টাছুটির পর। আমাদের বাড়ী অবধি জমিদার পৌঁছে  
 দিয়ে গেল।

২৬শে সেপ্টেম্বর।—মা আর আমি আজ গায়ের ফুলমাটির ও  
 তাঁর দ্বীপ সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নদীর গারেই ওদের  
 বাড়ী। সারা বছরে ভক্তলোকের বোজগার আন্দাজ আশী টাকা।  
 দ্বী বাড়ীর দেখানো করেন; ঘরে তিনটি সজ্জান, বড় ছেলের বয়স  
 বছর আটেক, সর্বদাই ছায়ার মত বাপের কাছে কাছে ঘোরে।  
 তারপর হেলেন, ছয় বছরের মেয়ে; দাদা রুদের কথা বলতে অজ্ঞান।  
 কোলের ছেলেটার বছর ছয় বয়স হল, গোলগাল হাসিখুশী চোরা।

আমরা যেতেই মালাম ভাণ্ডারোয়ান সারথী অভ্যর্থনা জানালেন। বড়  
 ছেলে রুদেক নিয়ে মাঠারমশাই ফুলে গিয়েছেন। বাপ পড়াতে,  
 ছেলে পড়তে। মাদাম ভাণ্ডারোয়ান তাঁর ছোট বাগান দেখাতে নিয়ে  
 গেলেন মাকে। আমি রইলাম বাচ্চাটার কাছে। সোলনার তরে  
 তরে ওর আর হাসির বিরাম নেই। খানিক বাদেই হাততালি  
 দিতে দিতে ঘরে এসে ঢুকল হেলেন, মেয়েটার খুশী বেন উপচে  
 পড়ছে।

“তুমি আমাদের জন্তে চকোলেট আর লবঙ্গুল এনেছ বুঝি?”  
 বলতে না বলতেই আমার কোলে উঠে ও পকেট হাতড়াতে গেল।  
 ওর অস্থিট মিলে গেলে পরম কৃতজ্ঞতায় আমরা চুমু খেল।  
 —“লবঙ্গুলগুলো আমি কিন্তু খেয়ে ফেলেছি।” ও বলল।

“লক্ষ্মীটি, সবগুলো খেয়ো না যেন; একভাগ রাখ রুদের জন্তে।  
 ফুল থেকে ফিরে এসে ওগুলো পেয়ে দাদা কত খুশী হবে বল ত?”  
 আমার কথামত ও তাই করল।

“জ্ঞান? মা-মণি সেদিন আমরা বৈশী লবঙ্গুল খেতে মানা  
 করছিল, না কি অস্বস্তি করে। আজ্ঞা, তুমি কি বল? সত্যিই  
 কি ওতে ওস্বস্তি হয়?” আমরা পেয়ে বসল ও।

“খু-উব সত্যি, তুই যদি বৈশী লবঙ্গুল খাস, নির্বাণ শরীর খাবাপ  
 হবে। অস্বস্তি হলে কি ভাল লাগে?”

“জ্যাঃ, বাবার সেদিন অস্বস্তি করেছিল; সারাটা দিন সেদিন  
 তরে কাটাতে হল, থেকে থেকে কি কাংরানি আর কাঁপনি! মা  
 বলছিল, খুব বৈশী খাটুনির এই ফল; কই মা ত বলল না বাবা  
 লবঙ্গুল খেয়ে অস্বস্তি পড়েছেন?”

এই ভাবেই আথ ঘটখানেক কাটল; ময়নার মত অনর্গল ওর  
 পুঞ্জি; একটু পরে রুদ আর ওর বাবা এলেন। আমার কোল থেকে  
 ঝাঁপিয়ে ছুটে গেল মেয়েটা দাদাকে লবঙ্গুল দিতে। মসিমে  
 ভাণ্ডারোয়ান করমর্দন করলেন; ছেলেদের তিনি অত্যন্ত রোহ করেন;  
 তাই তাদের সঙ্গে যদি কেউ ভাল ব্যবহার করে, অমনি তাকে আদ্যার  
 আদ্যার বলে উনি মনে নেন।

“স্রীমতী আর্ভের! আপনিনি কিন্তু হেলেনের মাথাটা ধাবেন,”  
 হেসে উনি বললেন, “মেয়েটার মুখে অষ্টপ্রহর ত আপননার কথাই লগে  
 আছে! আপনি কত যে রোহপ্রবণ, সহজেই অহুমান করা যায়  
 ছোটদের সঙ্গে আপননার ব্যবহার দেখে। আর ওদেরো ধক্তি বলি;  
 আপনাকে দেখেই কেমন চিনে নেয়।”

দোলনা থেকে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন উনি, “একে কেমন  
 দেখছেন বলুন ত?”

সত্যি বলতে কি বাচ্চাটা অপরূপ দেখতে; কৌকড়া কৌকড়া  
 বাবামি চুল, বড় বড় কালো হুটি চোখ। আরো আথ ঘট বাদে  
 আমরা বাড়ি ফিরলাম। যেতে যেতে মা বললেন যে জমিদার, তাঁর  
 মা ও ভাই প্রায়ই এখানকার ফুল দেখতে আসেন। বড় সন্তদর  
 জমিদার। সব দিকে ওর সমান নজর।—কাল আমরা গোসরেলদের  
 সঙ্গে শিকনিকে যাব।

২৮শে সেপ্টেম্বর। বিখ্যাত ‘গোলাপ বাগানে’ আমরা কাল  
 শিকনিক করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বহু লোকের ভাড়;  
 নিমন্ত্রিতদের মধ্যে জমিদার-বাড়ীর কাউকে দেখলাম না। স্রীমতী  
 গোসরেল আমার দৃষ্টিতে জানিয়ে তেতরে নিয়ে গেল।

“এখানে আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরাই রয়েছেন; এমন কউ নেই যাকে তুমি চেন না।”

এদের এক আত্মীয়, ম'সিয় লাস, মহা পণ্ডিত; বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন; আমায় দেখে উনি প্রশ্ন করলেন।

“কি জেনেবাল, এটিই বুঝি আপনার মেয়ে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

ভ্রলোক আমার বিনীত নমস্কার জানালেন। তার পর ঝাপঝাড়ি ভিড়িয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন একটি চিবির ওপর; সেখানে প্রাচীন কের্টিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের কিছু ভগ্নস্থপ্ন স্থাপিত আছে। অত বড় পণ্ডিত তিনি; খুব মন দিয়ে ওর ব্যাখ্যা সম্বলন করতে চেষ্টা করছি; আমার এই মনোযোগ দেখে উনি হীত হলেন। শ্রীমতী গোস্বরেল খানিক বাদে আমাদের দলে এসে ডিঙল।

হাসতে হাসতে ও বলল, “দাদা বাবু, কেন আর বেচারীকে উত্যক্ত করছ তোমার পাণ্ডিত্যের গুণে?”

“দূর,” আমি প্রতিবাদ করলাম, “এসব আমার খুব ভাল লাগে।”

ম'সিয় লাস বিজয় দর্শে টেটিয়ে উঠলেন, “সুনলে দিদি, সুনলে?”

হাজার কথার মাঝে হঠাৎ জমিদার-গিন্নীর গলা সুনতে পেলাম, “বড় দেরী হয়ে গেল বাপু, দানোয়ার হাতে কাজের আর যেন শেষ নেই!” — আর একটি গলা, সুনাই চিনতে পারলাম।

“কই, শ্রীমতী আর্ডের বুঝি আসেন নি? জেনেবাল কই?”

“হ্যাঁ, ওরা এসেছে, মার্গারিৎ ওর বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরছে, জানিনে বাপু!” মার চিন্তিত গলা ভেসে এল।

জমিদার! জানতে চাইছে আমি এসেছি কি না? আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম আমি। শ্রীমতী গোস্বরেলের বুকনি বা ম': ল'সের কচকচি এক বর্ণও আমার কানে ঢুকল না। একটি স্পর্শ আমার কাঁধে অনুভব করলাম। দেখি বাবা। গভীর ভাবে তিনি গোস্বরেলের কথা সুনছিলেন। মিনিট খানেক বাদেই দেখি ঝোপের বাধা কাটিয়ে এগিয়ে আসছে—জমিদার।

“আরে, শ্রীমতী আর্ডের, তুমি এখানে? আমি ত তোমায় চারদিকে খুঁজে হায়রাণ!”

শ্রীমতী গোস্বরেলের দিকে ও তাকাল; চল করমর্দন।

“বা: কঁতেসু-এর সাথে দেখা করে আয়,” বাবা আদেশ দিলেন।

আমি পা বাড়লাম; পেছনে জমিদার।

“অস্ত্রালিজের খবর কি?”

“বেশ ভালই আছে।”

জমিদার-গিন্নীর সাথে করমর্দন করলাম; তারপর আলিঙ্গনের পালা, “আর মা; কি সুন্দর বে লাগছে তোকে; তাই না বে, দানোয়ার?”

“একশো বার!”—ও হেসে ফেলল।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন উনি এই উত্তর শুনে।

আমার হাত ধরে তিনি গিয়ে বসলেন নদীর ধারে, যেখানে আর সলাই জটলা করছিল। শ্রীমতী গোস্বরেল বসল আমার পাশেই।

“এবার থেকে তোমায় মার্গারিৎ-এর বনলে Rose’ বলে ডাকতেই হবে। অমন রঙের বাহার দেখে গোলাপ বলেই ডাকতে সাধ হয়।” ও খোঁটা দিল। হাসের ওপরে পাতা সাঁসা চারখট্টার চার ধারে

আমরা বসলাম। আমার বাঁ দিকে গান্ড, ডান দিকে শ্রীমতী গোস্বরেল; তার ডান পাশে জমিদার; বাবা বসেছিলেন কঁতেসু-এর পাশে, আর পণ্ডিতমশাই মার পাশে। কথায় কথায় গান্ড বললে যে বহুদিন ইচ্ছে থাকার সাথেও আমাদের ওখানে যেতে পারেনি,— তার জন্তো ক্ষমাও চাইল, “বুঝলে, একদিন এত কাজ ছিল।”

দিনটা বেশ মজার কাটল স্বর্গাস্ত্রের পর কঁতেসু, তাঁর দুই ছেলে, আর আমরা—সবাই একসঙ্গে ফিরলাম। বাবাকে একটু গভীর লাগল। বাড়ী ফিরে তিনি আর মা ওদের ঘরে বসে কি নিয়ে আলোচনা করছেন, সুনতে পেলাম। অবিলম্বে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের ঘোরে যেন একটা শব্দ কাণে এল, দেখি আমার ওপর ক'কে মা আমায় আদর করছেন। তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। আশ্চর্যমন্ত অবস্থার আমি বিভ্রাড়া করে বলে উঠলাম, “মা, না-মনি!”—উনি চলে গেলেন।

আমি তখন স্বপ্নের স্বপ্নে বিভোর।

৩০শে সেপ্টেম্বর।—আজ মাসের শেষ দিন! কনভেন্ট গিয়ে দেখে এলাম ভগিনী ভেরোনিকের কবর। মাটির ওপর ঘাস গজিয়েছে, খেত পাথরের কুশটায় লেখা: “২৬ বৎসর বয়সে ভগিনী ভেরোনিকের মৃত্যুতে।”

“আজ যে তুমি অক্ষরক, সেই তুমিই স্মৃতি, কারণ আনন্দের মাঝেই তুমি আশ্রয় পাবে।”

হায় রে! কতই না কঁদেছেন, কত কষ্টই না পেয়ে গিয়েছেন উনি! এ ধরনীতে যাদের তিনি ভালবেসেছিলেন, ওখানে গিয়ে তাদের ফিরে পেয়ে তিনি কতই না জানি স্মৃতি আজ! কত দিন তাঁর পরিবারের গল্প করেছেন আমার কাছে। সব ব্যাখার, সব হৃৎকের কথাই তিনি আমায় একান্ত বলতেন। অত শোক পেয়েও অন্তরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট,—প্রিয়জনদের তিনি শীঘ্রই ফিরে পাবেন। হে দেবি, ভগবানের কাছে আমার হয়েও তুমি প্রার্থনা জানাও!

ফেরবার পথে ওক অ্যাভেনিউয়ে দেখা হয়ে গেল জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে। তারা মাছ ধরতে গিয়েছিল। আমার বাড়ী অবধি দিয়ে গেল।

১লা নভেম্বর।—আমার সঙ্গে ঘোড়ার চড়ে বেড়াতে যাবে বলে আজ জমিদার আর ওর ভাই এসেছিল। মাঠের মধ্যে দিয়ে বেয়ে যেতে হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি নামল; বাবা তাঁর শিরাদবণ খুলে আমায় দিচ্ছেন দেখে আমি হাসলাম, “আমি বাবা বৃষ্টিতে খোঁড়াই কেহা করি!” বলেই তাঁরবেগে ছুটিয়ে দিলাম অস্ত্রালিজকে।

ওরাও দৌড়তে শুরু করলেন পেছন পেছন। হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়ছে, বৃষ্টিও পড়ছে মুহলধারে। মনে হল, হাড় ক'খানি অবধি ভিজে গেল; হাওয়ার খুলে যাওয়া আমার চুল দিয়ে বড় বা মুক্তাবিন্দু করে পড়তে লাগল। বাড়ী ফিরে দেখি, মা আমাকে জন্তে অধীর ভাবে পথ চেয়ে আছেন। বৃষ্টি থামল আঁধ ঘটা বাদে হৃৎ যেই দেখা দিল জমিদাররা উঠে পড়ল।

৪ঠা নভেম্বর। আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন জমিদারের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আমার সাহায্য চান। ৯ জানশে সম্মতি দিলেন। বোল তারিখ হলো দশটার সময় এসায়ে বাব ঠিক হল। স্বর্গাস্ত্রের পর ফিরে আসব। আমাদের দুজী

তবেস গল্প করছিল যে গ্রামের ছী, পুত্র, শিশু সবাই প্রস্তুত হচ্ছে কুড়ি তারিখের জন্য।

"জমিদার ছেলেরি বড় ভাল," তবেস বলল; "আমার স্পষ্ট মনে আছে ও যেদিন ভাদ্রা, ঠিক যেন গত কালের কথা। ওর বাপ ছিলেন অতি সুপুত্র; নিজে হাতে প্রাণ গ্রামবাসিকে উনি নানা উপহার দিচ্ছিলেন। আর ছেলের আটকড়াইয়ের দিনে ত ছী ও নবজাত পুত্র নিয়ে প্রাণদাতারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, একে একে প্রত্যেকটি লোককে দর্শন দিয়েছিলেন। সেদিন সবাই এত আনন্দে যেতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং রাজপুত্রের জন্মোৎসব হচ্ছে। কি জয়ধ্বনির ঘটা! লোকে বলে কিনা এর মধ্যেই কেটে গেছে কুড়িটা বছর। মনে পড়ে, দু'বছর বাদে যুদ্ধে গিয়ে জমিদার মশাই প্রাণ দিলেন; সারা গ্রাম শোক ভেঙে পড়ল; বাছার-হেইশ বছরও হয়েছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু তারি মধ্যে গ্রামবাসীদের চোখে উনি পিতৃত্বলাভের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তরুণী জমিদার-গিন্নী পড়লেন অসুখে; সবাই ভাবল চললেন বুঝি বৈতরণীর পারে। কিন্তু না, দু'বছর বাছা ছুঁটের মাথা উনি কাটাতে পারলেন না। বেটে উঠলেন তারেরই খুব চেয়ে। জীমান চুনারোকে ত অবিকল ওর বাপের মত দেখতে হয়েছে; সেই রূপ, সেই অভিজাত আদল, সেই কালো চোখ, সেই চুল। আর ছোট্টা সেইয়েছে তাঁর খোস মেজাজ। ভগবান এদের মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা, সারা গ্রামবাসীর এই প্রার্থনা।"

তবেসের বয়স সত্তরের বেশী; আমি তার চোখে একেবারে কচি খুঁকি, কারণ আমার মা পঞ্চাশ ওর হাতে মাহুব; ওর স্মৃতির কেঁটার সাজান দিনগুলি আমার নিয়ে বার এক স্বপ্নরাজ্যে। জমিদারের জন্মদিনে এত উৎসব হয়েছিল, তাতে আর আশ্চর্য কি?

৬ই নভেম্বর।—পারী থেকে আমার ঠাটুমা জিরি বাজকরা একটি নীল ভেলভেটের পোষাক পাঠিয়েছেন। সেই সাথে একটি চিঠিও দিয়েছেন।

"মেহের নাতনী,

তোমার বারবার চিঠিতে জানলাম তোমার খবর। চিঠিটা খুলেই চোখে পড়ল—আমার জ্ঞান বত মেয়ে দেখছি; তার মধ্যে সবচেয়ে দুন্দরী—একটি মেয়ের ছবি। প্রথম বলকেই তোকে চিনতে পারলাম, যদিও গেল চার বছর তোকে দেখিনি। বহুদিন থেকেই হচ্ছে আছে, তোকে দেখি; কিন্তু আজ আমি বুড়া হয়ে গেছি, রোগাভায়ে চাপার কথা ভারতেও শিউরে উঠি। তুই যদি বাপির সঙ্গে পারাতে আসিস, বাপির এই বুড় পিসীর সঙ্গে দেখা করতে তুলিস না কিন্তু। ইতি।—

জেনেভিয়েত হেনট আর্ডের।"

পোস্টবলের বাড়ী গিয়েছিলাম। জীমতী যোকোনী আমার তার বুলায়ারে নিয়ে গিয়ে দেখাল দামী কয়েকটা পাখর; সব পারী থেকে আনিয়েছে। টেবিলের ওপর একটি বৃক্কের তৈলচিত্র ছিল; অদ্ভুত ব্যাভূর চেহারাটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"কে এই ভয়লোক?" আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"ও আমার বৃদ্ধুত ভাই।" চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ওর মুখ চিরে দিয়েছে। আমার কাঁধে হেলান দিয়ে ও বলল, "কোরা

আমায় ভালবাসত; থাইসিস হয়ে মাঝা বার অট্টেয়িয়াতে; আমি ওকে ঘিরে করতের রাজী হইনি; কারণ ওর কপদ-করীমতা; তা ছাড়া আমার পাশে ওকে দেখে লোকে কোট ভাই বলেই ভুল করত; ভগবানই আমাদের দু'জনকে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।"

আরো ছবি ও দেখাল, ওর মার ছবি, ওর স্বর্গত বাবার ছবি। বড় তই তল ওর কাছিনী তনে। লোকের খারে ঘোড়ার চেপে বেড়াতে গেলাম আমরা।

লুইয়ের একটা চিঠি এসেছিল; না দেখেই বাবা সেটি পকেটে গুঁরে ফেললেন।

"কি লিখেছে বাবা, পড় না?" আমি কৌতুহল দমন করতে পারলাম না, "কই তুমি ত আগের মত উৎসাহ নিয়ে ওর চিঠি পড় না আজ-কাল?"

"কারণ অনেক গোপন কথা ওতে থাকে যা তোমার এখন জানার দরকার নেই," মৃদু হেসে আমার গালে উনি টোকা দিলেন।

"লুইয়ের আবার গোপন কি কথা, বাবা? ওর মত সরল ছেলে?"

উনি জবাব দিলেন, "সময় যখন আসবে, ও নিজেই তোকে সব কথা খুলে বলবে মা। বা, অনেক দেরী হল; বাবার আগে একটু জিরিয়ে নে।"

খেতে বসে বাবা কথাটা পাড়লেন: শীঘ্রই লুই আসছে; ১৮ তারিখে এসে পৌঁছবে।

"বাঃ, ঠিক উৎসবের আগেই," আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। —"উৎসব? কি উৎসব? ওহো, মনে পড়েছে, জমিদারের জন্মোৎসব।" বাবা শেই পেলেন।

লুই আবার আসছে, যা খুব খুশী; সত্যি বলতে কি আমিও কম খুশী নই।

১ই নভেম্বর।—বেশ কিছু দিন হল জমিদার এমিকে আসেনি; ওর শরীর খারাপ হয়নি ত? নাঃ, তা হলে জানা যেত। বাবা আর আমি বেড়াছিলাম; তাঁকে প্রসন্ন করলাম, স্বর্গত জমিদারের চেহারা তাঁর মনে পড়ে কি না।

"তাঁকে কোন দিন দেখিই নি।"

ততক্ষণে আমরা পাহাড়টার গিরে চড়েছি; "সেখ, মার্গরিথ, কাকে যেন প্রাসাদে দেখা যাচ্ছে?"

বহু চোঁটা করেও কাটকে দেখতে পেলাম মা।

"নাঃ, বাবা, চোখে বড় বোদ পড়ছে।"

ঘোড়ার মুখ আমরা ঘুরিয়ে নিলাম।

১০ই নভেম্বর।—আজ রবিবার; সূর্য্যাস্ত গিয়েছিল।

বিকেলের উপাসনান্তেও আমরা উপস্থিত ছিলাম। যখন বেরিয়ে আগছ জমিদারের সঙ্গে দেখা; ওকে দেখে শঙ্কায়ুত ছিলাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সাথে সাথে ও এল। চেহারাটা কেমন যেন খারাপ লাগছে; জিজ্ঞাসা করলাম, অসুখ কয়েছিল?"

"উঁহ, ঠিক অসুখ নয়," ও কথাটা লুকে নিল, "সারা সপ্তাহ লালপ মাঁখাটা ধয়েছিল। সে কথা থাক, তুমি ১৬ তারিখে আসছ, মনে থাকে যেন। তুমি এসে পুরনো প্রাসাদটা যেন প্রাণ দিয়ে পায়।"

একসঙ্গেই আমার বাড়ী অবধি গেলাম।

১৬ই নভেম্বর। আজ আমার জমিদার নিতে এসেছিল, দশটায় সময়; দেখে তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগল। ও বলল, এখন ভালই আছে। গাভুঁও এসেছিল। জানাল, ওদের মামা বাবু কিবাছেন পারী থেকে। বনের মধ্যে দিয়ে বাবার সময় আমি ২৬ একটা কথা বলছিলাম না; আমি যে একমুনে শুনেছি চাই ওর কথাই; আমার ভালো-লাগা প্রসঙ্গগুলোই ও বেছে বেছে আলোচনা করছিল। প্রাসাদে আন্তরিক আলোব জানালেন কীতেন্। তাঁর ভাই, কয়দার্ন। ঘরে ঘরে ফুলের, মালার, পাতার—গাছার জিনিসের সমারোহ। এখনি আমি ঘরদোর সাজাতে লেগে যাচ্ছি দেখে জমিদার বাধা দিল।

“শ্রীমতী আর্ভের, আগে একটু বিশ্রাম করে নাও দেখি,” ও অগ্ররেখ করল।

খটখটানেক বিশ্রামের পর আমার কাজে চাত দিলাম। চারটি ছবি সাজানোর ভার পড়ল আমার ওপর—বর্গত জমিদারের জমিদার-গিল্লার, বর্তমান জমিদারের ও তার ভাইয়ের। ‘ইমর্তাস’ আর প্যাশির একটা করে মালা প্রথম দুটিতে দিয়ে কমলা ফুলের মালা দিয়ে সে দুটি জুড়ে দিলাম। অল্প ছবি দুটিতে দিলাম লাল আর লাল গোলাপের মালা, লবল পাতা আর গুটিকয়েক লিল। জমিদার গিল্লী আমার কচির প্রেংসা করলেন। জমিদারের ছবির দিকে তাকিয়ে কর্ণেল বললেন, “ছেলেটা দেখতে একদম বাগকা বেটা।”

“হ্যাঁ,” ওর বোন জবাব দিলেন, “তবে একটা তদ্যৎ আছে। চেয়ে দেখতে ওদের চোখের দিকে,—আমার আশিল-এর চোখ দুানোয়ার

গভীর ব্যাখ্যার চোখের চেয়ে কত কমনিয়। তা ছাড়া দুানোয়ার চিবুকে কেমন একটা কক্ষতার ডাব।”—“আর কেমন পুঙ্খালি, সঠাম, তাই না?” কর্ণেল জুড়ে দিলেন।

বর্গত জমিদারের ছবির তলার লেখা, “প্রুয়ারভেনের আশিল দুানোয়া, বাইশ বছর বয়সে” অল্পটার তলার লেখা: “প্রুয়ারভেনের দুানোয়া শাপ, কুড়ি বছর বয়সে।”

ভাই-বোনে ছবির বিষয় নানা কথা হচ্ছে, এমন সময় জমিদার এসে চুকল।

“তোমার কথাই তছিল দুানোয়া,” ওর মা হেসে বললেন।

“বেশ ত, এমন মিষ্টি সমালোচনায় ভয় পাবার কিছু ত দেখি না।”

ওর মার কোল বেসে বসল দুানোয়া।

গায়েব চাযারা ফল আর পাতা দিয়ে একটা তোবণ মত করে এনেছে; তলার গোলাপ দিয়ে লেখা, “তোমার জন্মদিনকে সাদর অভিনন্দন; ভগবান তোমার মঙ্গল ককুন।” জমিদারের প্রতি গ্রামবাসীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ এটি। নিজে গিয়ে ওদের ধন্যবাদ দিল জমিদার। কি সমারোহ! হলঘর, খাবার ঘর, আর ভক্ত দুটি ঘর সাজান শেষ হল। এর মধ্যে জানেৎক একদণ্ডের বেশী দেখতে পাইনি। ওকে বেশ স্নখা দেখলাম; বেচারী আমার সাথে কথা বলবার ফুসৎ মোটেই পাচ্ছে না,—“কারণ হাতে এখন যে কত কাজ রয়েছে,” বলেই সে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। সন্ধ্যাবেলা জমিদার ও তার মামা আমার বাড়ী পৌছে দিল। তখন চাঁদ উঠেছিল। জমিদার আমায় হাজার হাজার বার ধন্যবাদ জানাল ওর



উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম

পর্যবেশক—

ডি, দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনবিন্দু রোড, কলিকাতা-১



বোরোলীন

সকল ষ্টেশনাম ও  
ডাক্তারখানায়  
পাওয়া যায়।

## শৈলিত্য ও কমনিয়তায়

শীতের দিনে আপনার কোমল ষককে  
রক্ষতার হাত থেকে রক্ষা করবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা ও সজীবতা  
বজায় থাকবে।

নিয়মিত বোরোলীন ব্যবহারে আপনার  
তনুশ্রী উজ্জল ও কমনিয় হয়ে উঠবে।  
এর প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস  
সর্বদা মনকে মাতিয়ে রাখবে।

মাকে সাধা করাতে আসার জ্ঞাত। কোণগুলি দক্ষণ বসল করছে, মনে হচ্ছে কেউ ঘন গুদের গুপার ছড়িয়ে দিয়েছে রূপোর চাঁদর। যেতে যেতে দেখলাম আকাশে একটাও তারা চোখে পড়ছে না— এমনই টানে আসো! ছোট নদীটির বহু আয়নার মত জলের গুপার উইলোগাছগুলি নুঁকে পড়েছে, যেন নিজেদের গায়েই মগ্ন। পাতায় পাতায় শিরশ গুলেছে মুহূর্ত বাতাস। সবই স্নান! আমরা যুদ্ধরিতে এগিয়ে চলেছি। বাড়ী অবধি গিয়ে জমিদার ও তার মামা করমর্দন করে জানালেন শুভবাহিনী।

১৮ই নভেম্বর। আজ সকাল লুই এসেছে। বেড়িয়ে যখন ফিরছিলাম, দেখি একজন অখারোহী দৈনিক আমাদের দরজার সামনে থামল।

“ওই ত, বাবা বলে উঠলেন, “লুই এসেছে!”

যোড়া দুটিরে দিলাম তীরবেগে।

লুইও এগিয়ে এল। “স্বাগত, লুই, স্বাগতম!” বাবা যোড়া

থেকে লাফিয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর নিক।

“আরে, তুমি যোড়ায় চড়ে পায়? জানতাম না ত!”

“এই কয়েক সপ্তাহ হল শিখেছি,” আমি জানালাম।

“হলে কি হয়,” বাবা দুইগলার বললেন, “মেয়ে এখন পাকা ঘোড়গোয়ার বনে গিয়েছে!”

“সে আমি দেখেই বুঝেছি,” অন্তরলজ্জাকে আদর করতে করতে লুই জবাব দিল, “চমৎকার যোড়াটি কিন্তু!” আমরা বাড়ীর ভেতর চুকতেই মার সঙ্গে দেখা; লুইকে সরেহে ছড়িয়ে ধরলেন।

“তুই এলি বাপ, কি যে খাশি পেলাম!”

লুইকে এর ঘরে নিয়ে গেলেন বাবা। আমি গোলাম আমার ঘরে। বেতে বসে জমিদার-গিয়ারী নেমন্তন্ন-চিঠি মা দিলেন লুইয়ের হাতে। সানন্দে ও রাজী হল। বিকলের দিকে জমিদার যখন এসে ব্যক্তিগত ভাবে ওকে নেমন্তন্ন জানাল, তখনও লুই অতি আন্তরিক ভাবে তা গ্রহণ করল।

১৯শে নভেম্বর। বাবার সঙ্গে লুই আর আমি বেরিয়েছিলাম সকাল আটটার, ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। বাবার একটু আগে, হলঘরে আমি একা ছিলাম; একটা জোবাল পুরুষ-কণ্ঠে জেপে এল দু'শের বিখ্যাত কলি—

“কে মোর প্রেমিক!—আমার যদি শুধাও তবু

রাজ্য-লোভে বলব না সেই নামটি কভু!”

গান থামলে লুইকে দেখতে পেলাম বাগানে; ওকে গিয়ে বললাম। “কি মিসিয়া লফেড, আপনি এত ভাল গান জানেন, এত দিন চেপে ছিলেন কেন?”

ও সবিময়ে জবাব দিল।

“এই কি আমার গানের ছিবি?”

“একশো বার!”

“সত্যি?”

—আমরা খেতে চলে গেলাম। কাল উৎসব।

২০শে নভেম্বর। কি ভাবেই যে আজ সারাটা দিন কাটবে। বাবাকে লুই জিজ্ঞাসা করল, প্রাসাদে সামরিক পোষাক পরে যেতে হবে কি না।

“নিশ্চয়ই, তুমি এখন সৈন্যবিভাগের কর্তাবরী, আমার বয়সে, অবসর গ্রহণ করে, যা খুসী করতে পার, এখন নয়!”

প্রান্তরালেশের পরই আমরা রওনা হব, যাতে ওখানে গিয়ে চাষাদের অসুস্থতাই দেখতে পারি। আজ ওদের মহা ভোজ দেওয়া হবে। এখানেই থামি।

২০শে নভেম্বর।—কাল যে কী আমোদেই দিন কেটেছে। গিয়ে দেখলাম চাষা-পাড়ার সব একে একে জড় হাচ্ছে। লুই বাওরাত কঁতেন অতি শ্রীত হয়েছেন। গোস্বেরল্লাও এসেছিল,— ধাবে-কাছের কোনও পরিবারই বাদ যায়নি। ঘরে ঘরে আমরা সাজ-সজ্জা দেখতে লাগলাম। দুপুর বেলায় চাষাদের জন্ম টেবিল পড়ল। ওপর তলার বারান্দাতে আমরা গিয়ে বসলাম; নির্মাণতত্ত্বা দল দলে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছেন। আমরা সঙ্গে নিয়ে জমিদার প্রজাদের মধ্যে দিয়ে যখন বাচ্ছিল, তখন বলিষ্ঠ এক বড়ো মাথার চুপি গুলে অভিবাদন জানাল।

“ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।”

জমিদারের দৃঢ় অভিজ্ঞাত ওঠের মুহূর্ত হাসি আর দৃষ্টির তীব্র মাধুর্যে একান্ত হয়ে আমিও বলে উঠলাম, “ধ্যা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।” মাথায় আজ ও চুপি পাবনি; চেটে খেলানো চুলের ওপর দিয়ে চপল হাওয়া খেল বেড়াচ্ছিল, আর মাকে মাকে সেগুলি উড়িয়ে এনে ফেলছিল ওর হাতীর ষাঁড়ের মত শুভ্র কপালে। ওকে দেখলেই কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ওর সুমধুর দাক্ষ গলা শুনেও যে কি ভাল লাগছিল! এক এক করে প্রান্তরে চাষার সঙ্গই ও কথা বলছিল। সব কিছু খুঁটিনাটিতেই ওর সমান আগ্রহ। আমরা ফিরে পেলাম কঁতেন্স-এর কাছে।

“তুই যে কি বোকামি করেছিস ছানোয়া,” তিনি মুহূর্ত্তির স্বর করলেন, “এই বোধে কি চুপি ছাড়া বার হতে আছে? আবার যদি মাথা ধরে?”

আমি ততক্ষণে ওর পায়ের কাছে বসেছি; উনি সময়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জমিদার কাছেই বসল। কঁতেন্স-এর হাঁটুর ওপর মাথা রাখলাম আমি।

“সবাই আজ খুব আমোদ করছে, তাই না যে ছানোয়া?”

“ধ্যা মা!”

“বাজল ক’টা?”

“প্রায় তিনটে।”

“উঃ, সময়ের সঙ্গে আর শেরে উঠছি না বাপু!” আর্থ বকীথানেক বাদে কঁতেন্স আমার বললেন, “কি মা, তুই যে অনেক কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে?”

আমার ভাব কেটে গেল; সঙ্ক্ষেপে জানালাম।

“কিছু না।”

“তা হলে প্রায় পনের মিনিট হল তোর মুখে কথা সবছে না কেন?” উনি হেসে কেগলেন।

শ্রীমতী গোস্বেরল্ এল। কঁতেন্স উঠলেন। আমরা গিয়ে জড় হলাম মার কাছে। প্রায় পাঁচটা অবধি থব্ বোরা-বুবি হল। তার পর খাবার আগে, সবাই একটু বিশ্রাম করে নিল। এর আগে এসে দেখতে ছিলাম, কঁতেন্স আমাদের দেখানোই নিয়ে গেলেন। সময় হলে লুই গিয়ে জুটলাম বহু হলুটায়। ছাৎ থেকে ওক করে চায় দিক



জানো; সবাইই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমি সবার থেকে একটু  
। বাঁচিয়েই চলছিলাম,—চেয়ে ছিলাম জানলার কাঁক দিয়ে। সন্ধ্যার  
ক প্রশান্তি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বয়ে চলেছে। বড় ভাল লাগছিল।  
৪১২ আমার ধ্যান ভঙ্গ করে শ্রীমতী গোস্বয়ের প্রশ্ন করল।

“আচ্ছা, ওই মিলিটারি ভল্লোককে চেন না কি?”

“ও তো কান্তেন লক্ষ্যে,” জবাব দিলাম।

“তোমাদের আত্মীয় হয় বুঝি?”

“না পুরনো বন্ধু।”

ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ায় ওর সঙ্গে গোস্বয়ের আলাপ করিয়ে  
দিলাম। ও আমার কাছেই বসল। গোস্বয়েল ওকে পেয়ে আর  
হাড়তে চায় না; হাজার কথা বলতে বলতে মুখের হয়ে উঠল। খাবার

পর উৎসব-বহি জ্বালান হল। প্রাণাদে নাচের চলন নেই। বাঁচা  
গেল। কঁন্তেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোন দিন বল-এর  
ব্যবস্থা করেনি। গোস্বয়েল বেশ ক্ষুব্ধ হল।

“দূর ছাট! একটু ভালসু কিংবা কোয়াক্সি না হলে মজা  
কোথায়?” আমার বলল।

“সবটাই রুচির ওপর নির্ভর করে; প্রত্যেকেরই রুচি স্বতন্ত্র,”  
আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা।

“তার মানে, তুমি নাচ ভালবাস না?”

“বিশেষ না।”

“ও, তা হলে তুমি এখনো এলে-বেলে।” বলে সে দাঁড়ি ভ  
মেয়ে-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—পৃথিবীনাথ মুখোপাধ্যায়

## কেরানী-বধু

সৈয়দ হোসেন হালিম

প্রভাতের আলো পূর্বের আকাশে বখন বুলায় তুলি,  
কেরানীর বধু জাগে যে তখন নয়ন-পাণ্ডি খুলি।  
ও-বাড়ীর ঘড়ি সময়ের কথা ক'য়েছে ঘণ্টা হবে,  
কেরানী-বধুকে এবার উঠতে হবে।

সাঁতসেঁতে ঘর, তাহার উপরে ছেঁড়া যে মাদুর পাতা,  
কেরানী-বধুর স্বামী করে কাজ সূর্য সে কোলকাতা।

হাতেতে শ্রমীপ, মিটি-মিটি অলে আলো,  
কেরানী-বধুটি নয়নে দেখে না ভালো।  
তবু পাকশালে কোথায় কি আছে সবটুকু আছে জানা,  
নিজ হাতে তার সাজানো-গোছানো এ যে তারি কারখানা।  
ডান দিকে মুগ, তার পাশে তেল, তাহারো কিছুটা আগে  
দুটো হাঁড়ি ভোল, তার পরে ষোলো তাহাতে মশলা জাগে।  
বাম পাশে ষাণ্ড, ষাঁট কাত-করা, সামনে সব-জি-কড়ি;  
কেরানী-বধুকে বেড়াতে হয় না ঘুরি।

তবু মাঝে-মাঝে ভুল করে বধু, হয় তো মনের ভুলে  
কিশোর বেলার ভালে কথাগুলি অলখে স্মৃতির কূলে।

গোলাপের কুঁড়ি কাল ছিল ষোলো ও-বাড়ীর খোলা ছাদে,  
সেই কুঁড়ি কবে আলোকে-বাতাসে ফোটায় জন্তে কাদে।  
লাল হ'য়ে আসে দল,  
এর জীবনেতে আলো-বায়ু নাই—আছে শুধু আঁখি-জল।  
পৃথিবী যে এর চিড়ির খোলা আর কয়লার ঘোরা,  
খাল-খটি-বাটি বেগা ছেলে-পিলে ছ'হাতে ছ'-গাছি নোরা।

দিনে থাকে কাজ, রাত্রেতে আবার খুক-খুক ধরে কাশি,  
তবু-ও ব্যর্থ মন থাকে সেই শহরেতে পরবাসী।

হায় রে কেরানী-বধু,  
কি কাজ জীবনে? যদি-ই জীবনে না রহিল কিছু মধু!  
কাঁচা কয়লার একবার পুড়ে ফের হয়ে হয় লাল,  
কেরানী-বধুর এক জনমে-ই মাস গিয়ে শুধু ছাল!  
জীবন তো নয়,—যেন একখানা বন্ধ সে ঘুলঘুলি,  
আলো পায় না কো, শুধু অকারণে থাকে যে নয়ন তুলি!

নয়নেতে ঘুম—চোখেতে আঁধার—ঘন-ঘন ওঠে হাট,  
তবু খুব ভোরে কেরানীর বধু ভাত যে বেঁধেছে ভাই!

এ-কাজের দাম নাই আমি জানি মাহু-বের দরবারে,  
দাম আছে তার, যে জন চেষ্টিয়ে গলাটি কাটাতে পারে।  
ছোট মাহু-বের ছোট-খাটো সুখ, ছোট-খাটো হুখ-গাথা  
কেমনে জানবে বড় বাবু আর ধনী সেই কোলকাতা!  
কেমনে জানবে পোড়া কয়লার একজন হোল কালো,  
কেমনে জানবে যৌবনে কার জোয়ার আসে না ভালো!

হায় রে কেরানী-বধু,  
অভাবে আঁধারে শেখ হ'য়ে এলো জীবনের ফুল-মধু!  
বাঁপের বাড়ীতে হয়নিকো সুখ, কপালে-ও হোল ছাই,  
কেরানীর বধু আজিকে বাঁচার সময় এসেছে ভাই!

হাঁড়ি নয় আঁক, বল সকলেরে দাবী কিছু আলো-বায়ু  
আর দাবী আছে সকলের মতো মুক্ত সে পরমায়ু।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

পরেই উত্তরে জানালাম সম্মতি—আর নির্দেশ দিলাম হান আর কালের। দেখা হোতেই জ্ঞ আত্মায়ান প্রথমেই বললেন,—“বাধা হোয়েই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চাইলাম। কারণ, অস্ত্র কারো হাতেই মাদাম জ্ঞ আত্মায়ান এই চিঠিটা দেওয়া নিরাপদ নয়। এই চিঠিটা শীলমোহর করে আপনার হাতে দিতে হোলো বলে ক্ষমা করবেন। যদি আপনি ওর প্রকৃত বন্ধু হ'ন তবে চিঠির বিষয়বস্তু আপনারা হ'লনকেই আকৃষ্ট করবে। চিঠিটা ঠিক ওর হাতে পৌঁছেবে তো?”

—“আমি কথা দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন—”

ভাবাক্রান্ত স্বপ্নে হেনরিয়েরটার কাছে গেলাম। সব বলার পর চিঠিখানি দিলাম। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলে ও পড়তে লাগলো—লক্ষ্য করলাম, পড়তে পড়তে ওর মুখের প্রসিটি রেখার কুটে উঠছে গভীর উত্তেজনার আর আবেগের ছাপ।

—“বন্ধু আমার, লক্ষ্যটি বাগ করো না, এ চিঠি তোমাকে দেখাতে পারলাম না বলে—হু'টি পরিবারের মানসম্মত আজ বিপদ। এই ‘জ্ঞ আত্মায়ান’ ভয়লোকটির সঙ্গে আমাদের দেখা করতেই হবে, ইনি বলছেন ইনি আমাদের না কি আত্মীয় হ'ন।”

—“ও! তাহলে আগমনী শেষ না হোতেই বিসম্মতের বাজনা শুরুর হোলো? জানি না কি কুশল ওই হস্তভাঙ্গা ছায়েয়াটাকে বাড়ী চুকতে দিয়েছিলাম—” আমি আর্ন্তহবে বলে উঠলাম।

—“বিশ্বাস কর, এই জ্ঞ আত্মায়ান আমার সমস্ত ব্যাপারটাই জানেন, উনি সত্যিই সংপ্রকৃতির লোক, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না। কিন্তু প্রিয়তম, যদি ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি ভেঙে পোড়ো না, আমাকে জোর দিও, বেন সঙ্কল্পসূত না হই। বন্ধু আমার, বিশ্বাস কর, তোমার কাছে যে শান্তি আমি পেরেছি তা অনুল্ল বাখার চেঁচা আমি শেষ অবধি করবো—”

যেনে নিলাম—কিন্তু মনে নিলাম কি? হতাশার কালো মেঘে মনের আকাশ ভরা। হু'জনার প্রেমেই তখন বিবাদের স্বর বাজছে—বিদায়ের পূর্বসূচক কি? কত সময়ে হু'জনে বসে থাকি মুখোমুখি, কোনো কথাই বলা হয় না শুধু শোনা যায় হুগভীর দীর্ঘশ্বাস...

পরদিন যখন জ্ঞ আত্মায়ান হেনরিয়েরটার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আমি অস্ত্র ঘরে উঠে এলাম ভক্তনী চিঠি লেখার হুল করে—কিন্তু ঘরের দরজা খোলাই রেখেছিলাম—সামনের আরনার ছায়া পড়ছিলো ওদের। দীর্ঘ হু'টি ঘটা চললো ওদের আলাপ-আলোচনা—কথা আর লেখা। কিন্তু প্রবণে বকিত হোয়ে সে যে

সেই বাস্তবিক জ্ঞ আত্মায়ান বিষয় হোতেই হেনরিয়েরটা আমার কাছে এলো—“বন্ধু, কালট আমার এখন থেকে চলে যেতে পারি কি না বলো তো?”

—“হা ভগবান, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, কিন্তু কোথায় তোমাকে নিয়ে যেতে বলছো?”

—“যেখানে তোমার খুশী! কিন্তু পনরো দিন পরে আমাদের এখানে ফিরতেই হবে।”

আমি কথা নিয়েছি সে সময় আমার লেখা চিঠির উত্তর আমি এগান থেকেই নেবো। না, না, ভেবো না আমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছি—আসলে এ জায়গাটা আর এক মুহূর্তও সঞ্চ করতে পারছি না।

সবই ব্যুৎপন্ন—সবট ভবিষ্যৎ। গেলাম মিলানে—চোদ্দটি দিনের ভিতর এক দরজী ছাড়া আর বিত্তীয় কোনো লোকের সঙ্গে আমরা দেখা করিনি। আমি দরজীকে দিয়ে হেনরিয়েরটার জন্তে বহুমূল্য একটি পোষাক করিয়ে দিলাম—ওর বিদায়োপহার। আর ওই চোদ্দ দিনে জলের মত অকাতরে বায়ু করতে লাগলাম আমার সঞ্চয়। একটি প্রস্তাব করিনি হেনরিয়েরটা আমার এই অর্থব্যয়ের প্রাচুর্য্যে। পারমাতে ফিরলাম এখন তখন পকেটে শ'তিন-চার সেকুইন অবশিষ্ট আছে।

যেদিল এলাম তার পবদিন আবার জ্ঞ আত্মায়ানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা—আমাদের বিচ্ছেদ হোলো স্মৃতিটি। হেনরিয়েরটা এলো কাছে, জানালে উপায় নেই আর—এখন জেনিভাতে যেতে হবে আমাদের, সেখান থেকে ও চলে যাবে।

বিদায়ের মুহূর্ত এলো। দুঃসহ বেদনায় আচ্ছন্ন হু'জনার মন। সেই সীমাহীন ব্যথার প্রকাশ শুধু অবিরল অশ্রুধারায়।

—“ভাগ্য বধন বিচ্ছেদই এনে দিলে তখন আর ফিরে যেও না আমাকে—বাকি হারাতে হোলো তাকে হারিয়েই হোলো, খবরের জ্ঞাত ব্যাকুল হোলো না—যদি কখনো দেখতে পাও তবে অপরিচিতের দৃষ্টি কুটিয়ে তুলো তোমার চোখে—”

বাগার বেলায় ক্ষণ-সন্নিহিত শেষ কথা। পরদিন ছোটো একটি চিবুকট পেলাম—তিনটি অক্ষর লেখা—“বিদায়”। আমার ঘরের জানলায় চঠাং চোখ পড়লো, দেখি কাচের উপর হীরার অপ্রভাঙ্গ দিয়ে কেটে কেটে লেখা—

“ভুলে যাবে, হেনরিয়েরটাকেও একদিন ভুলে যাবে” আর একখানি চিঠি। কয়েক দিন পর পেলাম—সেই প্রথম আর শেষ চিঠি—

—“বন্ধু, অদৃষ্টই কোর করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে তোমার কাছ থেকে—আমাকে ভুলে যেও—শ্রুতির ডারে দুঃখকে আরও

নিবিড় করে তুলে না। মনে কর তিনটি মাসের এ এক নিরবচ্ছিন্ন স্তম্ভস্বর। এত আনন্দ, এমন রঙীন মায়ার, এমন স্বপ্নারসে ভরা ক্ষণগুলি সঞ্চিত থাক মনের মণিকোঠায়—যাক না ভেসে ক্ষণ-সন্ধিনি... স্বপ্নচারণী হোয়েই রইল সে। আমি ভালো আছি, তোমাকে ছেড়ে বতখানি ভালো থাকা সম্ভব। আমি আরও জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার মনের এত কাছে ছুনিয়ার আর কেউ এসেছে কি? তোমার প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে শুধু আমারি তো ঘটেছে পূর্ণ পরিচয়।

আমার অপরিবর্তন অর্ধ্য তোমার উদ্দেশ্যে—সে অর্ধ্য আমার ভালোবাসা—সে ভালোবাসা রূপায়িত হোয়েছে শুধু তোমাতেই...

কিন্তু তুমি থেকে না অপরিবর্তনীয়—ভালোবাসার আগমনী বাক্য...আবার তোমাকে সার্থক করে তুলুক আর এক হেনরিয়েরটা—বিদায়...বিদায়!

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্যারিসে এসে সব বিশেষীদের মতই আমি প্রথম উৎসুক হোলাম প্যারিসে রয়্যাল দেখার ক্ষেত্রে। নতুন অভিজ্ঞতা, পঞ্চাশটি মাস্তব-জ্ঞান সবই উপভোগ করছিলাম—মল্ লাগছিল না পথের দু'ধারে খোলা ফুটপাথের উপরই ছোটো ছোটো টেবিলে সবাইকে পানাহার আর গালগল্পে মত্ত দেখতে। আমিও একটা টেবিলে বসে এক গ্রান চকোলেটের অর্ডার দিলাম। উৎকৃষ্ট রোপাআধারে নিরুপস্থ পানীয় আশ্বাসন করতে করতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু খবর-টবর আছে কি না। সবাইওলা জানালে যে একটি ছেলে হোয়েছে। শুনেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলে উঠলেন—“বাজে কথা, ছেলে নয় মেয়ে হোয়েছে।” তৎক্ষণাৎ অল্প একটি ভদ্রলোক ওদার থেকে জবাব দিলেন—“আরে মশাই, আমি এখন ভদ্রসাই থেকে ফিরছি—ও ছেলেও নয়, মেয়েও নয়”—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন আমি নিশ্চয়ই বিশেষী। সবিনয়ে জানালাম আমি ইতালীয়। তখনি ভদ্রলোক প্যারিসের নান্দিনক্ষত্র বর্ণনায় মুগ্ধ হোয়ে উঠলেন। ঠেকে যন্ত্রবান জানিয়ে উঠে পড়লাম। প্রথম ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। হুঁজনে বেড়াতে বেড়াতে এগোতে লাগলাম। একটা দোকানের সামনে দাঁড়ি অসম্ভব ভিড়।

—“কী ব্যাপার এখানে?” আমি প্রশ্ন করলাম।

—“নস্তির কোটা ভববার ক্ষেত্রে সব ঝাড়িয়ে আছে”—

—“সে কি! শহরে আর তামাকের দোকান নেই নাকি?”

—“আরে না মশাই, বহুৎ আছে। আসলে গত সপ্তাহে ডাচেস ডাটার এই দোকানেই ছ’-তিন দিন গাড়ী ধামিয়ে নেমে এসে নস্তি কিনেছেন, বাস তাইতেই ওটা মস্ত ফ্যাসনে ঝাড়িয়ে গেল। প্যারিসের লোকেরা বাসের প্রতি মুগ্ধ হয় বাসের প্রশংসায় উজ্জ্বলিত হয় সেই সব ‘সেবতা’র বা কিছু করেন তাই নতুন আর তাই-ই ফ্যাসান। তারারও স্বযোগটা পূর্বোপরিই নেন। ঐ তামাকের দোকানওয়ালী মেয়েটি ডাচেসের স্তনজন্মেই ছিলো, তাই তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন তিনি এইটুকু কৌশলেই”—

প্যারিসের হাটচাল দেখতে দেখতে আমরা বিখ্যাত অভিনেত্রী সিলভিয়ার বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। সে রাতে দেখানো

আমার নিমন্ত্রণ ছিলো। ভদ্রলোকটি সেখানেই বিদায় নিলেন। সিলভিয়া আমাকে ভিতরে নিয়ে অজ্ঞাত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। ‘স্ট্রেবিল’ নামটি শুনেই আমি চমকে উঠলাম।

—“বলেন কি! কি সৌভাগ্য আমার! গত আট বছর ধরে আপনায় লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ। আমি কল্পনাও করিনি কোনো দিন আপনায় সাক্ষাৎ পাবো—মনে মনে অথচ কি আকাংখাই না ছিলো আমার আপনাকে দেখতে, আপনায় সঙ্গে পরিচিত হতে—আপনি অল্পগ্রহ করে আমাকে একটু সময় দিন”—

এই বলে আমি ঠেকে ওর এক বিখ্যাত রচনার আমার স্বরচিত ইতালীয় অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করে শোনালাম। কি গভীর মনোযোগের আর আনন্দের সঙ্গেই না উনি শুনেতে লাগলেন! ইতালীয় ভাষায় ওর মাতৃভাষার মতই দখল। আমি থামতেই উনি ঐ অংশটাই ফরাসীতে আবৃত্তি করলেন। আশী বছর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে নিজেই রচনা অন্তের ভাষায় আবৃত্তি করতে শুনে খুশীতে উজ্জ্বলিত তখন তিনি। আমরা দু’জনে বহুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। প্যারিস আর ফরাসীদের সখ্যে আমার যা কিছু ভালো-মন্দ ধারণা হোয়েছে সবই আমি অকপটে জানালাম। উনি বললেন, প্রথম দিনের পক্ষে বিশেষ করে একজন বিদেশী হোয়ে আমার এই সমালোচনার উনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমার বর্ণনার ক্ষমতারও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন।

—“এ দেশে পা দিয়ে অবধি আমি ভাবছি কি করে ফরাসী ভাষাটাকে আরও ভালো করে আয়ত্ত করবো। আরও মঞ্জিষ্ঠ ভাবে বলতে পারবো। আমার পক্ষে একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও কঠিন, কারণ ছাত্র হিসাবে আমি অত্যন্ত তাত্ত্বিক, সহজে কিছু মনে নিতে পারি না; তাছাড়া অত্যধিক প্রশ্ন করি, আবার এই সব প্রশ্নবলী সহ্য করবেন, এমন গীর স্থির শিক্ষক শেলেও তাঁর পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা আমার নেই”।

—“অন্ত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি আপনায় মতই ছাত্র খুঁজছি”— বললেন স্ট্রেবিল—“আপনি যদি আমার বাড়ীতে আসেন তবে আমিই আপনাকে পড়াবো, তাছাড়া পারিশ্রমিকও দেবো—আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবিদের রচনা আছে, আমি সেগুলিকে ফরাসীতে অনুবাদ করতে চাই।”

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যে রাজী হোলাম সে বলাই বাহুল্য। অল্পত প্রশংসিত লোক! চেহারা সত্যি সুপুঙ্খ—প্রায় ছ’ফুট লম্বা, আমার চেয়েও তিন ইঞ্চি মাথায় বড়। চমৎকার কথা বলতে পারেন, স্তম্ভ পরিত্রাসেও তিনি বিখ্যাত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না—সারাক্ষণ বাড়ীতে বসে থাকেন পাইপ মুখে আর প্রায় গোটা কুড়ি বেড়াল চার পাশে নিয়ে। আশ্চর্য্য ওর এই বেড়াল-প্রীতি! একটি বুন্ডা ওর গৃহস্থালী দেখাশোনা করতেন, তাছাড়া একটি চাকর আর একটি রঁথুনি এই নিয়ে ওর সঙ্গার। বুন্ডাটি সব কিছুই ভীর নিয়ে ছিলেন, টাকা কড়ির হিসাব রাখা, খরচ করা, ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব করা—শুধু কখনো হিসাব দিতেন না কাউকেই। অবশ্য স্ট্রেবিলও কখনও চাইতেন না কোনো হিসাব। স্ট্রেবিল জাতীয় সম্ভাবনায় আর

পুস্তকাদি মুদ্রণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; অনেক ধরনের লেখাই তাঁর কাছে আসতো, বুঝাটী সেই সব তাঁকে পড়ে শোনাতেন—যে সব জায়গাতে সন্দেহ হোতো সেখানে খেমে যেতো, যাকে মাঝে ছু' জনের মধ্যে এই নিয়ে শোনবার মত তরুণবিক্রম চলতো। আমিও একদিন এই বুঝাটীকে একজন নামকরা লেখককেই বলতে শুনেছিলাম—  
“আমিই সপ্তাহে আসবেন, এ সপ্তাহে আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের পড়বার সময় হয়নি”—

একটি বছর আমি জেরিল'র কাছে যাতায়াত করেছি সপ্তাহে দু'তিন বার করে। আমার ফরাসী ভাষায় হঠাৎ অধিকার সবই ঠর কাছ থেকে পাওয়া। ঠর শিক্ষা পদ্ধতিও বিচিত্র। একবার আমি আট লাইনে একটি কবিতা রচনা করে তাঁকে সংশোধন করতে দিলাম। তিনি সবটা পড়লেন তার পর বললেন—“এই আট লাইনে কোনো কুল সেই—ভাবধারাও কবিত্বপূর্ণ, ভাষাও চমৎকার, কিন্তু তবুও কবিত্বাতি একদম যাকে যোরেছে”—

—“সে কি! কেনন করে তা হয় হুখলাম মা তো!”

—“তা বলতে পারি না, কি যেন একটার অভাব আছে কবিত্বাতির মধ্যে; যেটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না অথচ অনুভব করছি। ধর একটি লোককে তোমার মনে হয় সুন্দরন, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, অমায়িক, এক কথায় তোমার মতে সম্পূর্ণ নিখুঁত। একটি মহিলা এলো, সেই ভ্রমলোকটিকে দেখলে আর যাবার সময় বলে গেল যে তার ভালো লাগেনি লোকটিকে। তুমি জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি ত্রুটি, কি অভাব অপানি ঠর মধ্যে দেখলেন?—“কিছু না, মোট কথা আমার ভালো লাগেনি, কেন তা' জানি না।”—তুমি কিরে এসে আবার লোকটিকে দেখলে—এবার আবাক হোয়ে তুমি আবিষ্কার করলে যে ঐ মোহিনী কঠোর তোমার ভালো লাগার ভাবটিকে নিয়ে উগাও হোয়েছে। তোমার সমস্ত মন যেন জোর করেই মহিলাটির ঐ স্বভঃ-সুষ্ঠ মতামতেই সায় দিচ্ছে—”

এমনই ছিল ঠর উপমা দেওয়ার ধরণ। চতুর্দশ লুই-এর রাজসভায় তিনি পনেরো বছর ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে অনেক কাহিনীই উনি শোনাতেন আমাকে। জেরিল' বিয়োগান্ত রচনা ‘ক্রমওয়েল’ উনি শেষ করতে পারেন নি চতুর্দশ লুই-এর জন্তেই। কারণ রাজা তাকে বলতেন ঐ হতভাগার উপর লিখে সময় নষ্ট না করাই উচিত। ভলটেরারের উচ্চ প্রশংসা করতেন কিন্তু এ সঙ্গে এ-ও বলেছিলেন যে সিনেটের সমস্ত দৃষ্টিই ভলটেরার ঠর রচনা থেকে চুরি করেছেন। উনি বলতেন ভলটেরার জন্ম-ঐতিহাসিক, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে বাস্তব-অবাস্তব কাহিনী ছুড়ে তাকে মনোজ্ঞ করে তোলাই তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিলো—সেজ্ঞে ঐতিহাসিক সত্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হোতো। ঠর মতে ‘ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক’ নাকি সেই রূপকথা—চতুর্দশ লুই-এরও সেই একই ধারণা ছিলো।

বিদেশীদের পক্ষে প্যারিস মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে, অবশ্য পরিচিতি-পত্র না থাকলে তো কোথাও খাওয়া সম্ভব হয় না। সেদিক থেকে আমি যথেষ্ট সোভাগ্যবান বলতে হবে। সেইজন্তে পনেরো দিনের মধ্যেই অভিজাত সমাজে আমার অবাধ গতিবিধি হোয়েছিলো।

একবার আমার সঙ্গে ‘রয়েল একাডেমী অফ মিউজিকের’ সভাপতি

এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাদাময়েজেল লা ফেল-এর পরিচয় হোয়েছিলো। একদিন তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি, তিনি তিনটি কুলের মত সুন্দর শিশুর সঙ্গে খেলা করছেন।

“আমি ওদের ভারী ভালবাসি”—তিনি বললেন—

—“আপনার ভালবাসার ওরা সম্পূর্ণ যোগ্য। অপূর্ণ সুন্দর ওদের দেখতে কিন্তু তিন জনেই তিন রকম দেখতে—”

—“আস্ধ্য নয়—শাস্ত্র যত্নে উনি বললেন—বড়টি এক জন ডিউকের ছেলে, মেজোটি কীতে ত এগ মণ্ড এর ছেলে আর ছোটোটি ম'গিরে ত মোঁসৌজের ছেলে, সম্ভ্রান্তি মাদাময়েজেল ত রোম'ভিলের সঙ্গে ওর বিয়ে হোয়েছে—”

—“মাফ করবেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারাই ছেলে ওরা—”

—“ঠিকই ভেবেছেন।”

হতভব হোয়ে গেলাম তখন আর বিজ্ঞান সিলাম নিজেকে ঐ বোকার মত প্রের করায়। প্যারিসে নতুন এসেছি, এখানের হালাচালও ভালো জানি না তখন। পরে দেখলাম এ ধরনের ব্যাপার হামেশাই ঘটছে এখানে। দুই বিখ্যাত লর্ড—বুফার্স আর লুজেনবুর্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিজাদের দ্বী বদল করলেন—বাচ্ছায়াও বদল করলো তাদের পদবী। বুফার্স'রা হোলো লুজেনবুর্গ আর লুজেনবুর্গ'রা হোলো বুফার্স।

ফস্টেনব্রুতে পৌছবার পরদিন আমি পঞ্চদশ লুই-এর রাজসভাতে গিয়েছিলাম। পঞ্চদশ লুই-এর চেহারা'র মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার ওর মুখের প্রকাশভঙ্গিই কি অপূর্ণ! আমার মনে হোয়েছিলো সত্যিকারের রাজকীয় সৌন্দর্যই আমি দেখলাম। একটুও সন্দেহ রইলো না মাদাম ত পম্পাহারের কাহিনীতে যে প্রথম নর্শনেই উনি রাজার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আর তারপর আসতে চেয়েছিলেন রাজার কাছে। সত্যি না-ও হোতে পারে, কিন্তু পঞ্চদশ লুইকে দেখার পর এ সব রটনা মন সহজেই সত্যি বলে মনে নেয়।

রাজভবনের ভিতরের মহলে দেখতে দেখতে যেতে-যেতে এক জায়গায় দেখলাম বারো জন কুরপা মহিলা এগিয়ে আসছেন—তাঁরা হাঁটছেন বললে ভুল বলা হয়, এমন বিশ্রী ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছেন যে মনে হোলো এই বুঝি মুখ খুঁড়ে পড়েন। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ওঁরা কারা, আর অমন করে দৌড়াচ্ছেনই বা কেন? শুনলাম ওঁরা রাণীর খাস পরিচারিকার দল। ওঁদের জুতার ছিল পুরো ছ' ইঞ্চি লম্বা তাই ওঁরা পড়ে বাবার ভয়ে অমন করে চলছেন।

—“নীচু হিলের জুতো পরলেই পড়েন—”

—“তাই কি হয়। উঁচু হিলই যে ফ্যাশন”

কি বেয়াদা ফ্যাশন যে বাবা! এগিয়ে যেতে যেতে বিরাট পুসজ্জিত একটি হলে পৌছলাম। দেখলাম জন বারো সভাসদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর হলের মাঝখানে বিরাট টেবিলে বিপুল আহারের আয়োজন। কিন্তু কার জন্য এত আয়োজন? উত্তর পেলাম রাণীর জন্ত, এখনি তিনি আসছেন। ফ্রান্সের রাণী এসে চুকলেন হলটায়। খুবী সালাসিবে পোষাক, মাথায় মস্ত টুপী, গালে অবধি এতটুকু রঙ লাগানো নেই। টেবিলে গিয়ে বসতেই বারো জন সভাসদ টেবিল থেকে দশ পা' পেছিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে পাঁড়ালো। আমিও তাদের পাশে পাঁড়িয়ে পড়লাম। রাণী কোনো দিকে না

# সিরোলিন

কেবল যে 'কাশি  
থামিয়ায় দেয়' তা নয়  
— একবারে জড় থোক  
দূর করে



সিরোলিন কাশির বীজাণু-  
গুলোকে ধ্বংস করে



কাশি হলেই বিপদ। কাশতে শুরু  
করলে বুঝবেন, আপনার গলা  
ও ফুসফুসের কোমল ঝিল্লীতে প্রদাহ  
হয়েছে, ফুলে উঠেছে। কাজেই,  
আপনার এমন ওষুধ চাই যা শুধু  
'কাশি থামিয়েই দেয়' না, একেবারে  
জড় থেকে দূর করে।

সিরোলিন দুটি উপায়ে কাশির  
গোড়ায় যা দেয়। প্রথমতঃ, বীজাণু-  
গুলোকে ধ্বংস করে, রোগ আর  
বাড়তে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, বুকের  
জমাট স্লেম্মা সহজে বা'র করে দিয়ে  
খুব শীগ্গির সত্যিকার আরাম  
দেয়। সিরোলিন-এ একিডিন নেই।

## নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ

বাড়ীর সবাই নির্ভয়ে সিরোলিন খেতে পারে —  
ছোটদেরও খাওয়ানো যায়, কেননা সিরোলিন-এ  
ক্ষতিকারক কোন ওষুধ বা মাদকদ্রব্য নেই।  
এর মিলি গন্ধ ছোটদের খুব প্রিয়। সব সময়ে  
বাড়ীতে এক শিশি রাখবেন।



**সিরোলিন**  
'রতি'

চেয়ে খেতে লাগলেন। যেটা ভালো লাগলো সেটা আবার চেয়ে নিলেন। তাবপর চোখ তুলে সামনে সভাসদদের দিকে চাইলেন— ভাবখানা যেন কার সঙ্গে খাঙ্করবার ভোটোখাটো বিষয়ে আলোচনা করবেন দেখে নিচ্ছেন। দেখার শেষে ডাকলেন।

—“মাসিয়ে জ লাওয়েল!”—অপূর্ণসন্দর্ভন এক রাজপুরুষ এগিয়ে এসে অভিযান জানালেন।

—“মালাম?”

—“আমার মনে হব এটা খুব উপাদেয় দুবগীর ‘ফ্রিকাসে’।”

—“আমারও সেই একই মত মালাম”—এই বলে অটল গান্ধীর সঙ্গে মার্শাল লাইওয়েল পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় গাড়লেন।

‘বার্গ’—অপজু’র বিধাত্ত বিজয়ীকে স্বচক্ষে দেখে যেমন পুসকিত চোখায় ততখানি দূর চোখায় এই দেখে যে, অত-বড় বীরপুরুষকেও সামান্য দুবগীর রাষ্ট্রার উপর অভিমত দিতে বাধ্য হোতে চোরেছে—তাও এমন ভাবে যেন রাজ্য পরিচালনার কোনো গুরুতর বিষয়ে মতামত জানানো হচ্ছে। মনে মনে ভাবলুম, আমার সৌভাগ্য যে রাণীর আতিথ্য নিতে হয়নি।

একদিন আমার এক বন্ধুকে নিয়ে সেই ল্যেবের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে বন্ধুটি বৌক ধরলে একটি ফেমিশ অভিনেত্রীকে সঙ্গে খেতে চলে। অভিনেত্রীর নাম ‘মরফি’। মেরেটি আমাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করেনি। কিন্তু বন্ধুকে এড়ানো শক্ত। গেলাম সঙ্গে। খাওয়ার পর সারা হোলে বন্ধুটি রাতটিকেও একটু লোভনীয় করে হোবার তালে বইলো। আমাকেও এমিকে ছাড়বে না, আমি কিজাসা করলাম, ঘুমোবার মত একটা সোফা চোকা অস্ত্রত ছুঁবে তো?

‘মরফি’র এটি ছোটো বোন ছিলো—বছর তেরো বয়সের কিশোরী ময়ে। সে বললে যে কয়েকটি মুক্তার বিনিময়ে ওর বিছানাটি আমার ছেড়ে দিতে পারে। রাজী হলাম। ও-মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে ঢুকে দেখি, টুকরো কাঠের উপর একটা মাদুর পাতি।

—“এটাকে তুমি বলছো বিছানা?”

—“মাসিয়ে, এছাড়া আর আমার বিছানা বলতে কিছু নেই—”

—“না; এ আমার চাই না—আর টাকাও তুমি পাবে না।”

—“প্রাণনি কি কাপড়জামা ছেড়ে শোবেন?”

—“নিশ্চয়ই—”

—“সে কি করে হবে! আমাদের তো বিছানার কোনো চামর নেই?”

—“তাহলে তোমরা জামা-কাপড় পরেই শোও?”

—“মোটো না।”

—“বেশ কথা, যেমন করে তুমি রোজ শুতে বাও তেমন করে শুয়ে পড়। টাকাটাও তাহলে পাবে।”

—“কেন বল তো?”

—“কেমন তোমার দেখার, আমি দেখতে চাই।”

—“কিন্তু তুমি আমার কিছু ক্ষতি করবে না তো?”

—“বিশ্বাস্যও না।”

মেরেটি ওই নোংরা মাদুরে শুয়ে পড়লো, গারে একটা ছেঁড়া পর্দা ঢাকা দিয়ে। সেই অবস্থায় ওর আবারের তৃষ্ণতা মনেও পড়লো না, শুধু দেখলাম অপূর্ণ সৌন্দর্যবাশি। ওর নিবারণ প্রকৃত রূপটি দেখার জন্যে ব্যগ্র হোয়ে উঠলো সারা মন। সে আকাজকা চরিতার্থ করবার চেষ্টার বাধা দিলে মেরেটি—কিন্তু আরও কয়েকটি মুক্তার বাধা গেল সবে। দেখলাম ওর সৌন্দর্যে খুঁত নেই কোথাও, শুধু পণ্ডিত্যের নিম্নরূপ অভাব। নিজের চোখে বুইয়ে দিলাম ওর সমস্ত মালিক।

পরদিন সেই ছোটো ছেলেন ওর দিদির হাতে সমস্ত মুক্তাগুলি তুলে দিলে একটিও না গোপন রেখে—কেমন করে উপায় করেছে তার বিবরণও দিলে। আমার খাবার আগে মরফি জানালে, ওদের বড় টাকার অভাব। আর আমার যদি মেরেটির উপর নজর পাড়েই থাকে ও না হয় টাকাটা কমিয়েই নেবে। আমি হেসে ফেলে বললাম, পরদিন আবার আমি ওকে দেখতে আসবো।

আমি বন্ধুটিকে ওর রূপের কথা জানাতে বন্ধুটি বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সত্যিকারের সত্যই বলে নিজের গর্ব অকুর রাখবার জন্যেই আমি জোর করলাম বন্ধুটিকে তেলেনকে দেখার জন্যে—যেমন করে আমি দেখেছি। দেখবার পর বন্ধুটি স্বীকার করলে যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরও তুলির টানে এ স্বপ্নমা ফোটাতে পারে না। ও যেন শিল্পীর সাধনা—প্রকৃতির পরম বিষয়। ওর বুদ্ধিখোয়া ফুলের মত মুখখানি শুধু দুটিকেই মুগ্ধ করে না, আত্মকেও ভরে তোলে অনাখিল আনন্দে, প্রশান্ত মাধুর্যে। ও শুধু সুন্দর নয়—অপূর্ণ। ওর নীল-আকাশের মত ছুটি আঁখি-তারায় কালো হরিণচোখের সব বিদ্যাতই স্থির হোয়ে আছে।

পরদিন আবার গেলাম ওকে দেখতে। ওর দিদিকে বললাম, আমি ওর বাড়ীতে রত বার তেলেনকে দেখতে যাবো বারো ক্রাঙ্ক করে দেবো। ‘চ’ল ক্রাঙ্ক আমার কাছে অত্যধিক মনে হোয়েছিলো, এটি নিয়ে দর কবাকবি করে ঠিক তোলাে আদা-বাওরাই করবো যত দিন না মনে করি ‘চ’ল ক্রাঙ্ক দিয়ে ওর উপর পূর্ণ আধিপত্য নেবার যোগ্যতা ওর আছে। এসব হীন দর কবাকবি ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, মরফি এমন শ্রেণীর মেয়ে বাদের নীতির কোনো বালাই নেই। অত টাকা দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারণ ওর পশারিণী রূপের প্রতি আমার একটুও আকর্ষণ ছিল না—আমি ওর কাছে লালসা তৃপ্তির ক্রেতা হোয়ে বাটিনি—ওর সৌন্দর্যের পূজারী আমি, তাইতেই আমার সব পাওরা হোয়েছিল।

ওর দিদি ভাবতো আমাকে খুব সহজেই প্রভাবিত করেছে। হ’মাসে শুধু দুটির আনন্দেই তিন শত ক্রাঙ্ক আমার খরচ হয়! ঐ অপূর্ণ দেহবল্লরী তুলির টানে রূপায়িত করার জন্যে আমার প্রবল আগ্রহ তোলাে। একজন জার্ভাণ চিত্রকরকে ভয় লুই দিয়ে আমি ওর ছবি আঁকিয়ে নিলাম। কি লীলায়িত ভদ্রী! রক্তের মধ্যে যেন নেশা লাগিয়ে দেয়—উপাধানে ভর রেখেছে পেলের দুটি বন্ধন, এলিয়ে রয়েছে কমনীয় দুটি বাহু, বিশ্বের মাধুর্য্য বৃষ্টি একত্রিত হোয়েছে ওর দেহের নমনীয় কোমল কাঙ্ক্ষিতে—আর কি অপূর্ণ প্রীতিভক্তি! রক্তহীন হৃদয়ও চূর্ণ হোয়ে যায়। প্রতিভা আছে, কচি আছে সেই চিত্রকরের, প্রতিটি ‘বুছ’ রেখাও যেন

তুলির টানে জীবন্ত হোয়ে উঠেছে—সৌন্দর্যের এমন পূর্ণ প্রকাশ বৃষ্টি কল্লনাও করা যায় না। মুগ্ধ-বিময়ে ছবিখানির তলার আমি লিখে দিলাম—“ও-মরফি” যার অর্থ “সুন্দর”।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো থাকে কেউ কি জানতে পারে?

আমার সেই প্রাচীন বস্তুটি ছবির একখানি প্রতিলিপি চেয়ে পাঠালেন। বস্তু এই সামান্য অসুযোগ রাখতে আমি চিত্রকরটিকে আর একটি একে দেবার জন্য জানালাম।

কিন্তু এই চিত্রকরটি ভাস্করিতে ডাক আসাতে সেখানে গিয়ে অল্প ছবির সঙ্গে ওই ছবিটিও প্রদর্শনীতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে মসিবে শু সেন্ট কুইন্টিন ছবিটি দেখেন, এক স্বয়ং রাজাকে দেখান। সবাই জানে, পঞ্চদশ লুই একজন প্রকৃত অসুযোগী সৌন্দর্যের। ছবিটি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হোলেন যে, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। সেন্ট কুইন্টিনের উপরই তার ব্যবস্থাপনার ভার পড়লো।

বড় বোনের কাছে প্রস্তাবটি পাঠানো হলো। মরফি তো সেট মুহূর্তেই উঠে-পড়ে লেগে গেলো বোনকে সাজাতে-গোছাতে। দু-তিন দিনের মধ্যেই ওরা ভাস্করী ব্যস্ত করলো। আনন্দে উজ্জ্বলিত হোয়ে উঠেছিলো মরফি। চিত্রকরটি তাদের সঙ্গে নিয়ে এলো। পৌছবার পর রাজার নির্দেশ মত দুই বোনকে প্রাসাদের অন্তর্গত একটি বাড়ীতে রাখা হলো আর চিত্রকরকে রাজার অভিযন্ত্রালায়। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর রাজা এলেন। একলাই এলেন। এসে পাকট থেকে ছবিটি বার করে “ও-মরফি”র দিকে চাইলেন—ভীষণ দৃষ্টিতে বার বার ওর আশাশ্রমসম্বন্ধ লক্ষ্য করলেন আর ছবিটি দেখলেন। তারপর সহর্ষে বলে উঠলেন—“এমন আশ্চর্য মিল আমি কখনো দেখিনি।”

তারপর আসনে উপবেশন করে ও-মরফিকে ওর জামুর উপর বসালেন, আরও করলেন, চুষন করলেন।

আর ও-মরফি সারাক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলো আর মুখটিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

—“হাসছো কেন তুমি?”

—“হাসছি, কারণ আপনি ঠিক সেই ব্যাং ফ্রাঙ্কের মতন দেখতে—”

ওর সেই সরল স্পর্ধার রাজা উজ্জ্বলিত ভাবে হেসে উঠলেন। তার পর জানতে চাইলেন যে, ও ভাস্করীতে থাকতে চায় কি না।

ও-মরফির নিঃসঙ্কেত উত্তর।—“দিদি যা বলবে তাই হবে—”

দিদি তো তখনই রাজী। সবিনয়ে জানালে এর চেয়ে সুখের বিষয় সে আর ভাবতেই পারে না। রাজা যাবার সময় ওদের বন্ধ করে রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেন্ট কুইন্টিন এসে ছোটো বোনকে একটা মহালে নিয়ে গেল। আর মরফিকে আশ্রয় চিত্রকরটির কাছে। চিত্রকরটিকে যাবার সময় ছবিখানির পক্ষাংশ লুই দিয়ে গেল। আর মরফিকে কিছু না দিয়ে ওদের ঠিকানা নিয়ে গেল। পরদিন মরফি হাজার লুই পেলো। চিত্রকরটি আমাকে পঁচিশটি লুই দিলে ছবিখানির দরুণ আর প্রতিজ্ঞা করলে, আমার বন্ধুর কাছের ছবিখানি দেখে সমস্ত মন দিয়ে অঙ্কন ছবি একে

দেবে। তাছাড়া বললে যত মেয়ের ছবিই আমি আঁকতে চাই সব সে বিনা অর্থে একে দেবে। সাধু প্রকৃতির সন্দেহ নেই।

অবশ্য হাজার লুই হাতে গেয়ে খুশীতে উপাচ্ছ পড়া মরফিকে দেখেও কম আনন্দ পাই নি। অর্থের প্রাচুর্য, আর আমাকেই তার একমাত্র উপলক্ষ্য ভেবে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না মরফি।

‘কিশোরী সুন্দরী ও-মরফি’—রাজা এই বলেই ডাকতেন ওকে—রাজাকে ও মুগ্ধ করেছিলো ওর সরলতায়, স্পষ্টবাদিতায় ওর আশ্চর্য রূপের চেয়ে ওর মিষ্টি চালচলন আরও বেশী মনোহর করছিলো রাজার।

‘ভিয়ার-পার্ক’র একটি মহলে ওকে রেখেছিলেন—এটা ছিলো পঞ্চদশ লুইএর হারেম। রাজা ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। অবশ্য যেসব মহিলারা রাজসভাতে উপস্থিত হোতেন তাঁদের যাবার অধুমতি ছিলো। একটি বছর পরে ‘ও-মরফি’র একটি ছেলে হোলো। কিন্তু আর সবার মত তার দশাও যে কি হোলো—কেউ তা’ জানে না। কারণ যত দিন রাণী মেয়ী বেঁচে ছিলেন তত দিন রাজা পঞ্চদশ লুইএর এই সব সন্তানদের ভাগ্য রহস্যের অন্ধকার গর্ভেই নিমজ্জিত ছিলো।

তিন বছর পরে ‘ও-মরফি’র ভাগ্যতরী অন্তলে ডুবলো—তার মূল ছিলো মাদাম জু ভ্যালেটাইন—প্যারিসে এই মহিলাটি বেশ পরিচিতই ছিলেন। তাঁর হিংসাই ওর সর্বনাশের মূল। একদিন ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে মাদাম জু ভ্যালেটাইন ওকে বলেন রাজাকে খুশী করতে হলে, হাসাতে হলে জিজ্ঞাসা করতে হয় বুঝা রাণীটির সঙ্গে রাজা কেমন ব্যবহার করেন। নির্বোধ বালিকা এই প্রতারণার জালে পা দিলে—রাজাকে এই অপমানজনক প্রশ্ন করে বসলো। পঞ্চদশ লুই ক্রোধে জ্ঞানহার্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—“বদমাইশ মেয়ে, কে তোমাকে এ প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে, তার নাম বল?”

বেচারী ‘ও-মরফি’ ভয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রাজার পায়ের তলার আঁছড়ে পড়ে সব ঘটনাই খুলে বললো। রাজা চলে গেলেন ওর মহল ছেড়ে। তারপর কখনো আর ওর মুখদর্শন করেন নি। মাদাম জু ভ্যালেটাইনকেও রাজসভা থেকে বহিস্কৃত করা হয়। এবং দুই বছরের মত প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়। রাজা পঞ্চদশ লুই ভালো ভাবেই জানতেন রাণীর প্রতি কতপাশি অন্তরায় তিনি করেছেন। কিন্তু রাণীর প্রাণ্য সম্মান দিতে এতটুকু ক্রটি করেন নি। অল্প রাণীর প্রতি একটুও অসম্মান দেখালে তিনি কখনো তা সহ করেন নি।

‘ও-মরফি’কে মাড়ে চারশ’ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে একজন ব্রেন অফিসারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

বহু কাল পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, একবার ফটোনক্সে একটি সুখী সুন্দর তরুণ যুবকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। পরিচয় বুঝলাম ‘ও-মরফি’র বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার প্রতীক ওই যুবক। মায়ের সঙ্গে আশ্চর্য সাধুত্ব—বদিও মায়ের পূর্ব-ইতিহাস সখ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমিও তাকে এ বিষয়ে কিছুই জানাতে চাইলাম না। শুধু ও অটোগ্রাফ-বইতে আমার নামটি লিখে বললাম, ওর মাকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে।

পঞ্চদশ লুই-এর সঙ্গে 'ও-গারফি'র বগন বিচ্ছেদ ঘটিলো সে সময়ে আমি প্যারিসের জীবনে আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করছিলাম। এ সময় আমার গৃহ বিজ্ঞার বলে সব প্রেমের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি বলে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করছিলাম। ক্যামিলি নামে একটি মহিলা আমার এই বিজ্ঞায় মুগ্ধ হোয়ে আমার সঙ্গে 'ডাচেস ত শাড়' এর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর প্রেমের যথাযথ উত্তর পেয়ে তিনি আমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তাঁর আরও অনেক কিছু জানবার আছে আর এই গৃহ বিজ্ঞার শক্তি সবেক আলোচনা করার ইচ্ছাও আছে। আমি তাঁকে বললাম, যদি তিনি লিখে জানান ওঁর প্রশ্নগুলি তাহলে তিন বর্ষের ভিতরই উত্তর দিতে পারি। তিনি রাজী হলেন আর বার বার আমাকে শপথ করিয়ে নিলেন কোনো দ্বিতীয় প্রাণী যেন এ সপক্ষে কিছু না জানতে পারে—আর উত্তর লিখে এনে যেন ওঁর হাতেই দিয়ে থাকি।

ডাচেসের বয়স ছাষিশ বছর। প্রাগৈচ্ছান্স আর চকলতার ভরা। অত্যন্ত আয়োগ্যপ্রিয় আর বসিকা বলেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। এক কথায় মনোহারিণী—কিন্তু একটি ক্রটি ওঁর থেকে গিয়েছিলো, সমস্ত মুখময় ভগ্নের দাগে ভর্তি। বতগুলি প্রশ্ন উনি লিখেছিলেন সবই ওঁর প্রশ্নের সংক্রান্ত, আর বর্ষের উজ্জলতা আর মন্থতা সংক্রান্ত। দাগগুলি সাবাবার জন্তে আশ্রয় চেষ্টা করতেন তিনি।

পরদিন আমার 'প্যালেস রয়্যাল' এলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, প্রেমের উত্তর জানাতে। প্রথম প্রশ্নের ঘটিত প্রশ্নটির উত্তরে শ্রেয় স্বাক্ষর করে দিল ছুঁড়লাম। দ্বিতীয়টিতে হজমের গোলমালে নিজেই ভুগে ব্রণ সবেক যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই ছিলো আমার। আর আমার ডাক্তারী বিজ্ঞার ফলেও জানতাম, কোনো জোরালো প্রলেপ কিবা ওষুধে ও সারে না।

আমি নিঃসঙ্কেচেই বললাম, যদি সাত দিন আমার কথা মত চলেন তবে এই দাগ মিলিয়ে যাবে—আর যদি এক বছর চলেন তবে স্থায়ী ভাবেই সেরে যাবে।

উনি নিয়মিত, আর আমার নির্দেশ মত পানাহার শুরু করলেন, সমস্ত রকম প্রদাহন ত্যাগ করলেন আর সকালে, সন্ধ্যার কলাপাতার নির্ধারিত মুখ ধুতে লাগলেন। আট দিন পর ঠেকে দেখলাম বাগানে বেড়াচ্ছেন, উজ্জল মন্থ হোয়ে উঠেছে চামড়া আর একটিও ব্রণ নেই। আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানানলেন। কিন্তু পরদিনই আবার দাগ দেখা দিল। তদুপী আমার জরুরী তলব এলো। আমি গিয়ে হললাম, আমার গুপ্ত গণনার ফলে জেনেছি যে আশনি আমার দেওয়া নির্দেশ ঠিক মত মানেন নি। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে একটি ছুরা আর শূকরমাংস খেয়েছিলেন সেদিন।

এই ভাবে ডাচেস প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন, অবশ্য ব্রণের চিকিৎসা করার জন্তে নয়। কারণ আমার বিধিনির্দেশ মেনে চলার ত বৈধা তাঁর আর ছিল না। মাঝে মাঝে পাঁচ, ছয় ঘটাতো 'কসকে হু' জনে বসে গল্প করত। রাতের খাওয়া, দুপুরের গাওয়াও বহুদিন ওখানেই সারতে হোয়েছে। আমি সত্যি বলতে ডাচেসের প্রেমের পড়ছিলাম—কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে

আমার আত্মসম্মানে বাধতো। একদিন ডাচেস এসে বললেন, আমার এই গৃহ বিজ্ঞা দিয়ে আমি মাদাম ত পপিলিনেয়ারের বৃকের দুঃখযোগ্য কানদার সারাতে পারবো কি না।

তখন আমি উত্তর দিলাম যে, এ ক্যানসারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক; মহিলাটি সম্পূর্ণ বহাল ভবিষ্যতে আছে।

—“কিন্তু সারা প্যারিসে জানে, উনি একের পর এক ডাক্তার দেখাচ্ছেন। কিন্তু তা' সম্বন্ধে আপনার কথাও আমি বিশ্বাস করছি”।

উনি গিয়ে ডিউক ত রিশেল্যাকে জানানলেন যে ওঁর লুচ বিশ্বাস মাদাম ত পপিলিনেয়ার সম্পূর্ণ স্বস্থ আছে। ডিউক সজ্ঞারে প্রতিবাদ জানানলেন। তখন ডাচেস এক লক্ষ ক্রান্ত রাজী রাখলেন, কিন্তু ডিউক তার বেলায় রাজী হোলেন না।

কয়েক দিন পর, ডাচেস বিজয় গর্বে আমার কাছে জানানলেন যে ডিউক স্বীকার করেছেন যে ক্যানসারটা সত্যিই ভাণ। মসিয়ে ত পপিলিনেয়ারের করুণার উদ্দেশ্যে করার জন্তে হাতে তিনি ত্রীকে স্বগা করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। ডিউক তা হাড়াও বলেছেন, তিনি আনন্দের সঙ্গেই এক লক্ষ ক্রান্ত দিতে রাজী যদি মাদাম ত শাড়র কোন গুপ্ত বিজ্ঞার বলে জেনেছেন সেটা প্রকাশ করেন।

—“যদি আশনি কিছু টাকা উপায় করতে চান তো বলুন আমি ঠেকে জানাই”—ডাচেস বললেন।

আমি ধরা পড়বার ভয়ে রাজী হলাম না। আমি জানি ডিউক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতএব তাঁকার মায়া না করাই ভালো। তা হাড়া লা পপিলিনেয়ারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সবাই জানে।

এই সময় আমার ভাই ফ্রান্সোয়া কয়েকটা চমৎকার ছবি এঁকে এনেছিল। ল্যুডার প্রশ্রয়নীতে দেবার জন্তে অনেক তহিয়ার পর আমরা একসঙ্গে একখানা বৃকের ছবি নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ঘরে রাখলাম। নিজেরাও কাছের বসেছিলাম। ক্রমেই দর্শক সমাগম হোলো। প্রথমেই একটি লোক ছবিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন্থ্য করলে বাজের আঁকা হোয়েছে। তারপরই দু' তিনজন এসে ছবিটা দেখে হেসে বললে বোধ হয় কোনো স্থলের ছেলের আঁকা। ক্রমে ক্রমে প্রচুর দর্শক সমাগম হোলো আর প্রত্যেকেই ছবিটা নিয়ে এত হাসি ঠাট্টা শুরু করলেন যে ফ্রান্সোয়া আর না সহ্য করতে শেষে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমরাও ওর সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম—আমাদের চাকরটাকে বলে এলাম ছবিটা বাড়ীতে নিয়ে আসতে। ছবিটা আসতেই ফ্রান্সোয়া সেটার উপর বাঁপিয়ে পড়ে নিজের তরবার দিয়ে সেটাকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেললো। তখন ঠিক করেও কেলে যে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবে। অজ্ঞা কোথাও গিয়ে ভালো করে শিখবে চর্চা করবে ওর পছন্দ মত শিল্পের। আমরা ঠিক করলাম ডেসডেন যাব। অগাঠের মাঝামাঝি প্যারিস ছেড়ে মাসের শেষাংশে ডেসডেন পৌঁছলাম। সেখানে মা ছিলেন, বহুকাল পরে আমাদের দুই ভাইকে দেখে উজ্জ্বলিত আনন্দে আমাদের বৃকে টেনে নিলেন।

[ ক্রমশঃ ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুত্বের উল্লেখ করবেন ]



# কলা-বিলাস



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ঐপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## চতুর্থ সর্গ

এই সব বরাসনাদের চেয়ে, বারাসনারা আরও কুটিল। কুট  
সোচাগের লাগা ছড়িয়ে তাঁরা আকর্ষণ করেন মনুষ্যের  
হৃদয়। তাঁদের কণ্ঠ আচার-বিচার-ব্যবহারের কথা আর কী বলব!  
কুবেরও ভিখারী হন। ১

তরঙ্গের বহু ভঙ্গিমা ও অধোগামিত্ব নিয়ে নদীর দল বেমন সবুজে  
গিয়ে মিশে যায়, চতুঃস্থিতি কলাবিজ্ঞাও তেমনি আপন আপন মন-  
ভোলানো মাদুর্ঘ্য ও অতি চাঞ্চল্য নিয়ে মিশিয়ে আছে বেক্সাদের  
হৃদয়ে। ২

এক এক ক'রে এই চৌবটি কলার কথা বলি শোনো।  
প্রত্যেক বারাসনাকেই এগুলি জানতে হয়, শিখতে হয়।

(১) বেশ-কলা। অর্থাৎ বারাসনা-ভবনের সৌষ্ঠব-বিধান  
নৈপুণ্য।

(২) নৃত্য।

(৩) স্নাত।

(৪) চোখ বাকিয়ে দেখার কৌশল।

(৫) কাম-বিষয়ক তুচ্ছতাক।

(৬) ধনালয়ের চাতুর্ঘ্য; বা স্তন্যের বন্দী-করণের চাতুর্ঘ্য।

(৭) সুই-পাতানো।

(৮) সুই-ঠকানো।

(৯) সুরাপান করা বা করানোর বিজ্ঞা।

(১০) নর্য পরিহাস বিজ্ঞা।

(১১) সুরত-কলা।

(১২) সপ্ত প্রকার আলিঙ্গন, যথা :—

আমোলাঙ্গিন, বুদ্ধিভালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন, আনন্দালিঙ্গন,  
কচালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন ও বিনোদালিঙ্গন;—এগুলির বিষয়ে  
নৈপুণ্য।

(১৩) চূষনকলা।

(১৪) শঙ্কতা-করণবিজ্ঞা।

(১৫) কেমন ক'রে নিদ্রা সাজতে হয়,

(১৬) আবেগ দেখাতে হয়,

(১৭) সঙ্গম নিবেদন করতে হয়,—তার বিজ্ঞা।

(১৮) ঈর্ষা-বৃক্ষের অভিনয়-কলা।

(১৯) সুরোগ বৃক্ষের কল্মস-বিজ্ঞা।

(২০) মানভঙ্গন-কলা।

(২১) প্রয়োজন-মত হঠাৎ যেমের-ভাড়া,

(২২) হঠাৎ ভুলে যাওয়া,

(২৩) হঠাৎ কৈশে-ওঠা,

(২৪) একান্তে নিম্নে-যাওয়া-স্তার বিজ্ঞা।

(২৫) প্রসাধন-বিজ্ঞা।

(২৬) যতিতৃপ্তিজনিত নৈর-নিমীলনের ভাণ,

(২৭) বা অসহ্য স্তব্ধের ভাণ,

(২৮) বা নিঃস্পন্দতার ভাণ,—তার বিজ্ঞা।

(২৯) যুতোপম-কলা;—অর্থাৎ মড়া মেজে পড়ে থাকার

বিজ্ঞা।

(৩০) বিরহ-কলা।

(৩১) অসহ্য অহুঃসাগ-প্রদর্শন-কলা।

(৩২) কোপ-বিজ্ঞা।

(৩৩) নিবারণ করার চাতুর্ঘ্য।

(৩৪) নির্ণয়-করণ।

(৩৫) নিজের জননীর সঙ্গে কলহ-কলা।

(৩৬) ভক্তগৃহে গমনের পারিপাট্য।

(৩৭) উৎসব-দর্শন-কলা।

(৩৮) নাটকের ধনাদি-হরণ-বিজ্ঞা।

(৩৯) ছন্দ: রচনা।

(৪০) কল-ফুল নিয়ে খেলা।

(৪১) সুরম্য-বীণা বাজানোর চাতুর্ঘ্য।

(৪২) চৌর-পাখিব খেলা।

(৪৩) গরিমা-প্রকাশন।

(৪৪) শৈথিল্য-প্রকটন।

(৪৫) নিম্নারণ দোষ-ভাষণ-কলা।

(৪৬) শূল-কলা।

(৪৭) তৈল-মর্দন।

(৪৮) নিদ্রা-কলা।

(৪৯) রাজস্বলাঘব-কলা।

- (৫০) কুক-কলা।
- (৫১) তীক্ষ্ণ-কলা।
- (৫২) খাড়া ধরে নায়ক-বিতাড়ন বিত্তা।
- (৫৩) ঘরে খিল-লেগন বিত্তা।
- (৫৪) পুত্রিতাক্ষ কায়িককে নিকটে ডেকে নিয়ে আসা, তাকে নিয়ে বসে বড়ানো, তাঁর স্তিতির কলা-বিত্তা।
- (৫৫) তাঁর উপনয়ন সোহাগ প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে বেড়াতে হেলাভরে শূভার-ভাব দেখানোর বিত্তা।
- (৫৬) নায়কের গৃহটিকে নিজের ঘরের সামিল করে তোলায় বিত্তা।
- (৫৭) বশীকরণ।
- (৫৮) ঔষধ-করণ।
- (৫৯) মস্তব পড়ানো।
- (৬০) বুদ্ধ-কলা।
- (৬১) কেশ-রঞ্জন-কলা।
- (৬২) ত্রিকু-কুতাপস বহুবিধ পুণ্য-কলা।
- (৬৩) দীপ-দর্শন-কলা।

এই তেইটি প্রকার কলা-বিত্তা অভ্যাস করতে করতে বারাসনা যখন শিরা হয়ে পড়েন, তখন তদন্তে তিনি অভ্যাস করেন—

- (৬৪) কুটনী-কলা। ৩-১১।

কিন্তু বঙ্গগণ, চিনে বেথো মানুষকে, তার মলিন মূর্ত্যাকে।  
কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে, একজন অজ্ঞাত-নাম-বর্ণ পুরুষের হাতে যে  
বারাসনা সমর্পণ করে দেন নিজের আত্মটিকেও, কী আশ্চর্য,  
সেই হুঁসীলার মধ্যেও সম্ভাব খুঁজে বেড়ায় মানুষ-ব্যর্থকাম  
হ'রেও।

সে ভাবে, তার হৃদয়ে শুভ প্রেমের উদয় হয়েছে, দুর্বিনীত মদন  
তাকে কেবল সন্ধান; মানুষ-টিকিয়ে-রোজগার-করা রাশি রাশি  
হলিন ঘন সে স্তবে চালতে থাকে বারাসনার ঐশ্বর্যে। আর সেই  
ঘন কে বার জানো? আর একজন পুরুষ; ...হয় তিনি গুণভগ্ন, নয়  
তিনি নর, নয় তিনি হীন। ১২-১৩।

যে বারাসনা বিশ্বজনকে প্রতারণা করে বেঁচে থাকেন, তাঁর  
আবার বলত হয় কে জানো? হয়ত কোনো নীচ বোড়-সওয়ার,  
নয় কোনো মাজত, নয় কোনো অতি খল শিল্পী। ১৪।

পূর্বাকালে এক দানী রাজা ছিলেন। তাঁর নাম "বিক্রমসিংহ"।  
প্রবল কতকগুলি অধীনস্থ ভূঁইয়ার হস্তে তাঁকে পরাস্ত হতে হয়।  
তিনি চলে আসেন বিদর্ভে। গুণ-বশবী মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে  
তিনি চলে আসেন, এবং সেখানে এক বেত্তাভবনে প্রবেশ করে  
আশ্রয় লাভ করেন। অল্প বিবর হলেও কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটে  
বহু ধন-শালিনী গণিকা "বিলাসবতী"র। ১৫-১৬।

বিক্রমসিংহের রাজকীয় ব্যবহারের মধ্যে গণিকা স্পষ্টই দেখতে  
পার রাজ-লক্ষণ। অতএব, রাজার মহাপ্রাণতা গণিকাকে যে মুগ্ধ  
করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? তাই যেন বুঝা হয়েই গণিকা  
যেবে রাজা বিক্রমসিংহের ব্যাধীন করে দিলেন নিজের স্বর্ণকোষ,  
দণ্ডি-কোষ ইত্যাদি সর্বস্ব। ১৭।

রাজাও প্রত্যন্ত করলেন, গণিকার সহজ অমুরাগ, তাঁর অচ্যুত

ওচিত্য-বোধ। বিষয়ে বিবশ হয়ে গেলেন; এবং একদিন  
মহামাতাকে বিজ্ঞানে ডেকে প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বললেন— ১৮।

"বড় আশ্চর্য ঠেকছে মন্ত্রী, আমার জন্তে কি না একটা বেত্তাও  
শেষে তুষ-বৎ নষ্ট করতে বসেছে তার বিপুল ধন-সৌলভ। কে  
না জানে, গণিকার ভালবাসার মূল থাকে দৌলভ। প্রীতির পথ  
মাড়ার না তাদের নুপু-পরা পা। সকলেই জানে, একটি দানী  
চাঁদির লোভেই বন্ধকীরা দর্শার মিথ্যে অমুরাগ। সেই তেন ঘন যে  
গণিকা যেছায় বিসম্মত মিছন, তাঁর প্রেমে কেমন করে থাকতে  
পারে সন্দেহের অবকাশ?" ১৯।

রাজার ভাষণ শুনে মন্ত্রিবর একটু হাসলেন। তারপরে বাণীতে  
কিঞ্চিৎ অমুরা মিশ্রণ করে বললেন—

"রাজন, বেত্তাদের আবার আচার-বিচার-ব্যবহার! কেউ বিশ্বাস  
করেন না তাঁদের।

মিথ্যা বই সত্য বলতে তাঁরা জানেন না। যেখানে একটি দানী  
সোনা পড়ে থাকে সেখানেই দেখবেন, মন্ত্রির মত তাঁরা লীনা হয়ে  
আছেন। সুখের মুহূর্তটাই তাঁরা কেবল অধীন। মন্ত্রির মত মধুর  
তাঁদের মুখ। বীরা বিচার-বিবেকশূন্য কেবল তাঁদের হৃদয়েই বেত্তাদের  
অবাধ প্রবেশ।

প্রথম মিলনে এঁরা দান করেন স্তম্ভ, মধ্যে ঘটান বিপদ, তারপরে  
পর-বাস। পরিণামে আসে দুঃখ-ফল, ...পুরুষদের আশালতায়, ...  
বেত্তাদেরও।

ক্রমা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ইত্যাদি অমর দেবতারাও অতাপি এঁদের  
চেনেন না—তত্ত্বতঃ। ভয় বিভ্রম মোহ-...যেমন সংসারমায়ার,  
তেমনি এই বারাসনাদেরও বিশিষ্ট ঐশ্বর্য।" ২০-২৪।

মন্ত্রীর উপদেশ কর্ণে প্রবেশ করলো রাজার। বিক্রমসিংহ তখন  
পরামর্শ করতে বসলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। শেষে স্থির হলো—...বেত্তা-  
পরীক্ষার রাজা নিজেই দান করবেন মিথ্যা-মুঢ়া। ২৫।

পরামর্শ মত রাজার মিথ্যামুঢ়া ঘটল। সম্ভিত হল চিতা।  
চিতার উপরে মন্ত্রিবর বধারীতি বিস্তার করে রাখালের শব-  
দরীর। আশুন গিয়েছেন, উজ্জল হয়ে জলে উঠছেন অগ্নিদেব,  
এমন সময়, সহসা সেখানে আবির্ভূত হলেন সালকারা গণিকা  
বিলাসবতী। এবং যেই সেই বিচ্ছিন্নতার উপরে নিজেকে  
গণিকা নিক্ষেপ করতে যাবেন আবেগে অধীরা হ'য়ে, অমনি  
অধীর আনন্দে হুঁবাহ বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফেললেন  
রাজা, বলে উঠলেন—...প্রিয়ে, আমি বেঁচে আছি।" ২৬-২৭।

গণিকার ভালবাসা যে দৃঢ় হতে পারে, সত্য হতে পারে, ...এই  
ধাধাটুকু বার-বন্ড হয়ে গেল রাজার হৃদয়ের বিচারে। অতএব  
পূর্ণ-শুষ্ট হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। বেত্তাদের গুণপণার সমাদর-বাণী লগ্ন  
হয়ে রইল তাঁর মনের মুখে। একবার নয়, বার বার নিশা করতে  
লাগলেন মন্ত্রীর বিচারকে।

এর পরে,—গণিকার বিপুল ধনসম্পত্তি মহীপতির আত্মাধীন হয়ে  
গেল। বিক্রমসিংহ সমুদ্রান করলেন গজতুরঙ্গ-ভট-বিকট এক সৈন্ত-  
বাহিনী। সেই বিপুল বল-প্রবাহের সমুদ্রে সমুদ্রে মুহূর্ত স্থির হয়ে  
ঝড়িয়ে থাকতে পারলেন না ভূঁইয়ারা। তাঁরা পরাস্ত হলেন।

এবং ডুপাল বিক্রমসিংহ...আনন্দকৃত্য পূর্ণচন্দ্রের মত লাভ করলেন স্ব-মণ্ডল। ২৮-৩০।

গণিকা বিলাসবতীকে রাজা তখন নিজের রাজ-অন্তঃপুর-কাছাদের মাথার উপর বসিয়ে দিলেন। চামরের বাতাসে দুলতে লাগল তবীর চূর্ণ কুন্তল। গণিকা উপমা হয়ে পাড়ালেন শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর।

দেখতে দেখতে কিছু দিন কেটে গেল। তারপরে একদিন, করপদ্মে অঞ্জলি রচনা করে নিতুতে রাজার কাছে এসে পাড়ালেন বিলাসবতী। প্রণাম-নতা হয়ে বললেন—

“রাজন, বরাভয় দিন। কিছু প্রার্থনা আছে। আপনি কল্পতরু, জার আমি আপনার দাসী। বহুদিন আপনার চরণসেবা করেছি। প্রভু, যদি কোনদিন আমি আপনার রাজ্যলক্ষ্মী উদ্ধারের কারণ হয়ে থাকি তাহলে আপনারও কি উচিত নয়, প্রসন্ন মনে আমারও একটি আকাঙ্ক্ষা আশা সফল করে তোলা? তার্থের মতই আপনি মহান, স্বভাব নিখল, পূণ্য-ফল-শত। পরের মলিনতা নিম্নস্তম্বে আপনি কালন করে দেন। মহত্তের সঙ্গে মিলন কখনও বিফল হয় না।

আমি একটি সুবককে ভালবাসতুম। সে-ও আমাকে ভালবাসত। এতো ভালবাসা বোধ হয় কেউ কাউকে বাসে না। ধন মান প্রাপের ক্ষেত্রেও সে আমার কাছে ছিল বেশী। কিন্তু দৈবের এমন খেলা, চোর বলে তাকে রাজ্য ধবে নিয়ে গেছেন, তাকে বন্দী করে রেখেছেন, এখন সে রয়েছে বিদূর্ণপুরে। মহারাজ, তাকেই মুক্ত করবার আশায় এত কঠিন সেবা আমি আপনাকে করেছি। এখন, আপনার হৃদয়, কুল এবং শৌখের বিধানমতে বা সমীচীন বোধ হয় তাই করুন।” ৩১-৩৬।

কী নিদারুণ প্রতারণা! বিশ্বের অভিজ্ঞত হয়ে গেলেন মহারাজ। কানের মধ্যে দুন্ডুভির মত বাজতে লাগল মহিষী-গণিকার বাণী। চোখ ছুটি নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ শুভ্র হয়ে তিনি বসে রইলেন। কেবল মনের মধ্যে বিদ্যাতের মত চিকিরে উঠতে লাগল তাঁর অমাত্যের অসুতবাক্য। ৩৭।

তার পরে গণিকার মুখের দিকে মুখ তুলে তিনি চাইলেন। তাঁকে আশ্বাস দিলেন।

বিদূর্ণরাজের সঙ্গে লড়াই হল। পরাস্ত হলেন বিদূর্ণরাজ। প্রেমিক-চোবের বন্ধন মোচন করে দিলেন বিক্রমসিংহ। গণিকার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটালেন চোবের। ৩৮।

বঙ্গগণ, এই রকমেরই হন বারবিলাসিনীগণ।

বেস্তার জিহবা একটি নয়, ...বহু ;

হৃদয় একটি নয়, ...বহু ;

ছুটিই কেবল বাহু নয়, ...বহু ;

অনন্ত তাঁর মায়া।

এই সত্যবিশীনাগের জানি না কে জানেন তত্ত্বত! ৩৯।

এঁদের চরণে কেউ হয়ে থাকেন স্তাবক-প্রেমিক ; কেউ ধন-প্রেমিক ; কেউ দাস্ত-প্রেমিক ; কেউ বন্ধ-প্রেমিক ; আবার কেউ বা হয়ে ওঠেন তাঁর নর-প্রেমিক। ৪০।

ইতি বেস্তাবৃত্ত নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

[কথনঃ]

# মুখে দুর্গন্ধের ভয় থাকবে না!

**সক্রিয় ক্লোরোফিল সংযুক্ত**

**বিশেষজ্ঞের অনুজ্ঞা কলিনস টুথপাস্ট**

- মুখের দুর্গন্ধ দূর করে
- দন্তকরী জীবাণু তাড়ায়
- মাড়ি স্নেহ রাখে
- দাঁত পরিষ্কার ও রক্ষাক করে



**ফেলার জেনোই**

**'কলিনস'-এর বিশেষত্ব!**

# অঘোর প্রকাশ

( স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষী কলজে কুহ কুহ পরীক্ষা

বড় বড় বোড়িঙের নিয়ন্তন কণ্ঠস্বাধী ও তৃত্যেরা প্রায়ই

কোমল ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে না। সেখানেও অনেক

সবর তাহাই হইত। তোমাকেও কখনও কখনও তাহার কল ভোগ করিতে হইয়াছে। একদিন তোমার তেল ছিল না। কান্দালিনীর মত তুমি সেখানকার মেট্রনের নিকট তেল ভিক্ষা করিলে, তিনি বলিলেন, আজ পাইবে না। মেথরানীর নিকট ভিক্ষা করিলে, সেও অস্বীকার করিল। তারপর চাপরানী অমুগ্রহ করিয়া একটু তেল দান করিয়া গেল। আর একদিন এক শয়দার খুনা ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার সেট মেট্রনের নিকট গেলে। নিজের ভাণ্ডার হইতে দিতে হইত না, কেবল চাপরানীকে হুকুম করিলেই সে আনিয়া দিত। মেট্রন অতিশয় কর্ণ স্বরে তোমাকে ধমক দিয়া বিদায় করিলেন। তখন মা স্ত্রননী নিকটে না থাকিলে সস্ত্র করিতে পারিতে না। তুমি মেট্রনের কর্ণ বাণী যেমন শুনিলে, অমনি বলিয়া উঠিলে, 'মার ইচ্ছা পূর্ণ হোক'।

আর একদিন, যে দাসীর উপর সকলকে তেল দিবার ভার ছিল, সে তোমাকে তেল না দিয়াই চলিয়া বাইতেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তুমি তাহার কাছে তেল ভিক্ষা করিলে; সে দিল না। তুমি বলিলে, 'আলো ধরিতেছি একটু তেল দাও'। দাসী হাত-মুখ বিকৃত করিয়া ধমক দিয়া রাগের সহিত তেল দিতে গেল। তুমি বলিলে, 'আজ্ঞা দিও না, কিন্তু বকিও না'। তখন স্ত্রদার আসিয়া তেল লইলেন; তুমি বারণ করিলে না। কিরংকাল পরে তোমার জ্ঞানের উন্নয়ন হইল। বধন অপমানের প্রথম আঘাত আসিয়াছিল, হুর্দ্বস্ত কালের জন্ত জ্ঞান হারাইয়াছিল।

আর এক দিন আগুন আনিতে গেলে; দাই বলিল, আগুন নাই, পাইবে না। চোবের মত চূপ করিয়া গাড়াইয়া রহিলে। দ্বিতীয় কিছরীর একটু দয়া হইল। আজ্ঞা দিল অস্ত্র উন্নয়ন হইতে আগুন লও। অতি সশঙ্কচিত্তে আগুন লইতে গেলে পাছে একটু আগুন পড়ে, এক কিছরীদিগের কাগরও পা পোড়েন। তাহা হইলে আর কখনও তাহার আগুন দিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক টুকরা হলন্ত অঙ্গার তোমারই হাতে পড়িল। হাত বিলক্ষণ পুড়িয়া গেল। কিছু না বলিয়া সেই অগ্নি বহন করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আসিলে।

আর এক দিন শুধু ডাল ভাত খাইতে চাইবে বলিয়া একটু মাখন গলাইতে উদ্ভ্রমের নিকট গিয়াছিল। মেট্রন অতি কর্ণ ভাবে ধমক দিলেন এবং একটু বাজা দিলেন। তোমার উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অমনি মনে হইল, তুমি যে ছাত্রী, এখন অধীন। এই মনে হইতে না হইতে বৃথিল, উত্তর দেওয়া উচিত নয়। চূপ করিয়া চলিয়া আসিলে। শুধু ডাল, ভাত খাইতে বসিলে। আহা—বধন প্রায় শেষ হইয়াছে তখন একটি ঘেরে কিছু দরস আনিয়া দিলেন।

মেট্রনের বোধ হয় দয়া হইল, তাই তিনিও একটু মাল আনিয়া দিলেন। এইরূপই হয়। মাগ্নবের প্রতিবাদ না করিয়া চূপ করিয়া থাকিতে পারিলে এইরূপেই দয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ বিভাগে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। তোমার কস্তারের অত্যন্ত কষ্ট হইত; তোমার ত কথাই নাই। কোনও দিন আহােরের সময় তোমার কোনও কস্তা কাঁদিয়া ফেলিতেন। নিজের হৃদয়ে দখি পাতিয়া প্রায় তাহারই সাংঘাত্য আহা করিতে। একদিন তোমার দৈনিক লেখা আছে—'আজ আহারের সময় লবণ, ভাত, দখি, হৃদয় সবই কষ্ট ছিল, কিন্তু অনন্দ মনে আহা করিলাম'। আর একদিন—'আজ বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিন্তু খাবার নাই। মায়ের নামই আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল'। আর এক দিন—'টাকা ভাঙাইতে পারিলাম না। খাবার কিছু নাই, কিন্তু প্রাণ শান্ত, মার কৃপার'। আর এক দিন তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছিল; মেয়েরা দুধসুজি আহা করিলেন; অসাবধানতা বশতঃ স্ত্রদার তোমার অঙ্গ কেলিয়া গিলেন; তোমার বিরক্তি না হইয়া হাসি পাইল। আর এক দিনের ডায়েরিতে দেখিতেছি যে, সে দিন শুধু শুদ্ধ-ভাত খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আর এক দিন পেটের বেদনায় বড় কষ্ট পাইয়াছিল। অনেককাল কষ্টভোগের পর উঠিয়া দেখিলে, তোমার খাবার বানরে লইয়া গিয়াছে; ব্যক্তিতে একটু হৃদয় মাত্র লবণ; কিন্তু বিরক্তি আসিল না। আর এই দিন লিখিয়াছিলে, 'আহারের স্থানে গেলে হাসি পায়। কারণ দুই কিছা তিন মিনিটে আহা শেষ হয়; কিং বাসন মাজিতে অনেক সময় লাগে। বাসন নিজেই মাজিতে হয়।' অনেক দিনই দ্বিভাত মাত্র আহা হইত। ১৮ই অক্টোবর লিখিয়াছ 'আজ খাবার কম ছিল। শয়ন করিয়া পেট কেমন করিতে লাগিল। আর কোন উপায়ও ছিল না। গাড়ে তনিয়াছিলাম, হরিনামের এমনি গুণ যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে ধায়। আর আমি সেই নাম করিতে করিতে কাপড় খুব কসিয়া পরিয়া মা নিরাপদ কোলে নিজা গেলাম। একেবারে ৪টার সময় মা ডাকিলেন তখন উঠিলাম'।

লক্ষী বাইবার পূর্ব হইতেই তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া বাইতেছিল। ওখানে গিয়া পেটের অসুখ ও মাথার অসুখ প্রায় করিত। তোমার কস্তাদেরও শরীর দুর্বল হইয়া নাসিকার রক্তস্রাব হইত। কিন্তু আহােরের রেশ তোমাকে একটুও অশান্ত করিতে পারে নাই। অত্যন্ত মেয়েরা তোমাকে উত্তেজিত করিতেন যে, তুমি কস্তার নিকটে এসকল জ্ঞাপন কর। কিন্তু তুমি তাহাতে কখন সার দিতে না। কারণ সেখানকার বিভাগের সাধারণ নিয়ম ছিল যে কোনও ঘেরে অভিযোগ করিবে না। যদিও তোমার সবচেয়ে এই নিয়ম ছিল না, তথাপি তুমি আপনাকেও এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিল।

বধন হইত কোমল হৃদয় হইতে লাগিল, মেয়েরা বিদ্রোহের গণ

লব্ধ হইয়া গেল, তখন তোমার শরীর আরও বেগা হইতে লাগিল। তোমাকে যোগা হইতে দেখিয়া মিস খোরশেদ পাইতেছিলেন। কিসে নিবারণ হয় তাহার জ্ঞান চেষ্টাও করা হইতেছিল।

এক দিন গভীর ব্যাক্তিতে তোমাদের পাশের ঘরে কি গোলমাল হইল। সুসার ভাবিলেন, ব্যাক্তি শেষ হইয়াছে, তোমাকে ডাকিলেন। একটু পরে শুনিতে ২টা ব্যাক্তি, আবার তোমার শয়ন করিলে। প্রাতঃকালে শুনিতে পাইলে, একটি মেয়ের কলেরা হইয়াছে, কিন্তু পাছে তোমাদের অসুবিধা হয়, তাই তাহাকে দূরের একটি ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বেলা ২টার সময় মেয়েটা মাথা গেল। বোড়িডের এক শতট মেরে একেবারে চুপ। বাহ্যিকের মা বাশ নিকটে ছিলেন, কতক লইয়া গেলেন। তুমি যত বাবুর কতাকে গোপাল বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। আর তুমি দুই মেয়ে লইয়া কোথায় রহিলে? মায়ের নিশান কোলে, কেন না সেই তোমার চিরমিত্রের বাড়ী ও ঘর। সেখানে বিনা চকুয়ে অশ্রুধার স্রাব দিবার নিয়ম ছিল না, তাই সন্ধ্যা নিতে পারিলেন না। ইচ্ছা হইল, দিন কয়েক স্থানান্তরে যাও, কিন্তু চকুয় পাইলে না, বলা হইল না। দেখিতে দেখিতে আর একটি বড় মেয়ের ডেন-রুম হইল। তোমার মনে হইল, যদি তোমার অল্পতর বাওয়া প্রয়োজন হয়, অবশ্যই মিসু খোরশেদ বলিবেন। এইরূপে একেত্রেও বিশ্বাসের পরিচয় দিলে। মাকে বিশ্বাস করিয়া কোন দিন ঠক নাই, বলা লাভই হইয়াছে। ১২ই নভেম্বর কলেরার সাংঘাত নিতে ইচ্ছা হইল; ভিন্ন কাগজে লিখিয়া মিসু খোরশেদের কাছে লইয়া গেলে। তিনি সাংঘাত নিতে বলিলেন, আর বলিলেন যে “সে, এখানে আর কলেরা নাই, স্থলের মেয়েরা ভাল।” তাই করিলে এবং বিশ্বাসের পরিচয় দিলে।

### সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কতক সুসারের পরীক্ষা

সেই সময়ে জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্র পুনরায় হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন। তোমার জ্ঞান এ পরীক্ষাটা বড় কি চোটে? তোমাকে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সে বৃত্তিতে পারিয়াছে যে, এ পরীক্ষাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। বাল্যকালে কিবা যৌবনে যদি এ পরীক্ষা আসিত তাহা হইলে স্বভাবতই তুমি অত্যন্ত অধীর হইতে। লোকও বৃত্তিতে পারিত যে তুমি সহ্য করিতে পারিতেছ না। বধন তোমার সমুখ তোমার শ্রীর শিতাঠাকুর দেহভাগ্য করিয়াছিলেন, তখন মোমের পুতুলের মত তুমি গলিয়া গিয়াছিলে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার ছোট ভাতার দেহভাগ্য হইয়াছিল, সেই সন্ধ্যা শুনিয়া তুমি এমন অশ্রু হইয়াছিলে যে, ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ তুমি ও তোমার কতক বিশ্বাসী ব্রহ্মসন্তানের মত এ আঘাত সহ্য করিলে।

তুমি পূর্বেই জানিয়াছিলে, সুসারের কপালে সন্ধ্যায় যাহাকে সহ্য বলে, তাহা ঘটবে না। স্বামীর ধর্মবিশ্বাস ক্ষণ হইয়া পড়িতেছে, শাওড়ী, নন্দন দেবেরা ভিন্নগণ্যবলম্বী; এমন গৃহে তোমার কতক স্থান কখনই হইবে না, ইহা তুমি জানিতে। সুসারও বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাকে বীর নারীর মত সকলই সহ্য করিতে হইবে। স্বামিসঙ্গ লাভ কখনই ঘটবে না। তাই যে কয় দিন ধর্মধামে থাকিতে হইবে, পরসেবা কিছুই ভাল করিয়া করা যায়, তাহা শিক্ষা দিবার জ্ঞান হইয়াছে লইয়া লক্ষ্যে নির্ভর্যাসিত হইল।

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২১৮ বৃন্দাবন পুনরায় বিবাহ করিলেন। তুমি সংবাদ পাইয়া লিখিলে, বৃন্দাবন যে বিবাহ করিবে তাহা জানিতাম ও প্রস্তুত ছিলাম, তাই কিছুমাত্র লাগিল না। সুসার শুনিতে অবশ্যই তাহার লাগিবে, সেই জ্ঞান তাহাকে বলিলাম না। মা বা করেন তাই ভাল, কি আঁখার, কিবা আলো। প্রকাশ-অবোধ, আশীর্বাদ কর, শেষ নিশ্বাস যেন এই বলিতে বলিতে ফেলিতে পারি, যা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সুখী করুন এই পূর্ব-জ্ঞান, এক পূর্ব-প্রস্তুতি তোমাকে রক্ষা করিল। তুমি এই পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলে যে, জীবনে অনেক এমন ঘটনা ঘটে যাহার হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। নীরবে তাহা বহন করিতে হয়। তুমি জানিতে, আইন অনুসারে বৃন্দাবনের নামে নাগিল করা যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের মধ্যে উচ্চতার পরিচয় দেওয়া হইত না। সুসারেরও কোন লাভ হইত না, ভয়ে কত দিন মানুষকে শাসন করা যায়? ভয়ে তো আর প্রেম হয় না। ভালবাসা না হইলে সকলই বুঝা। তাই লিখিলে, মা বা করেন, তাই ভাল; তাই এই ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে শুনিয়াও তুমি বলিলে, যা তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। শুণ্ড তাই নয়, তাঁহার অশ্রুর জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলে। হায়, বৃন্দাবন কি কখনও ইহা বুঝিবেন?

মাতার বৈধা ও বিশ্বাসের কথা বলিলাম। যার জ্ঞান এত, তার অবস্থা কি? সুসারের ডায়েরী পড়িলে কতকটা বুঝা যায়। সুসার শরীরে থাকিতে এ দৈনিক কেহ পড়িতে পাইত না। তুমিও বোধ্য হয় পাও নাই। এখন সুসার দেখে নাই। তাঁহার পবিত্র শোকের চিহ্ন পরিপূর্ণ এই ডায়েরীখানি এখন আমি পাইয়াছি। প্রথম প্রথম স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাসে মাসে এক একবার করিয়া লিখিতেন, “আজ এক মাস হইল,” “আজ দুই মাস চলিয়া গেল।” ডায়েরীর প্রতি মাসের শেষের এই কথাগুলি আমার চক্ষে এখন কত সুসারের স্নহেয় বিদ্ধ এক একটি নূতন নূতন শেলের মতন লাগিতেছে। ৭ই অক্টোবর ১৮১১ লিখিতহেন, “আজ কি দিব! আজ যে আমার এক আশ্চর্য দিন! মার কৃপায় আজ ৪ বৎসর মায়ের দুঃখী সন্তান হতে পৃথক হয়েছি। কেবল মায়ের কৃপায় উভয়ে বেঁচে আছি। ধন্য! মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, এইরূপই হইল। মা গো, তুমি যে তোমার সন্তানকে তোমার ঐ শ্রেয়কালে এত দিন এত সহ্য করে রেখেছ, কি করে মা তুমি এত সহ্য কর, এত ভালবাসা, জানি না। মা, তুমি কেমন মা! তোমার ভালবাসায় তুমি তোমার ছেলেকে মের্ণহত কর; দেখে সকলে সুখী হউক, জগৎ সুখী হউক। মা, ধন্য তোমার ব্যবহার, তোমার আশ্রয় ব্যবহার! এমন করে এই এত দিন কাটিয়ে দিলে; জানি না মা কোথা হতে গেল দিন! মা তোমারই কৃপায় বেঁচে আছি।” বৃন্দাবনের জন্মদিনে একবার (১১শে নভেম্বর ১৮১১) লিখিতহেন — “আজ কি দিব! আজ এক জীবনের জন্মদিন। আজ আমার পালনীয়, শ্রমণীয়। আজ আমার স্বামীর জন্মদিন। মার চক্রে শত শতবার কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম যে তিনি আজ ২৭ বৎসরে পড়িলেন। মা ধন্য! তাঁহার স্নেহ ধন্য! তিনি আমা এত ভালবাসেন। আমি তাঁর প্রেমের কথাতো আর বলিতে পারি না; দেখে দেখে অবাক! মায় কাছে প্রোক্তে উত্তরা প্রার্থন করিলাম, মা, জীবনের সন্তান বলে তিনি যখন একবার জীব

সঁপেছিলেন, তখন মার দয়া কখনও তাঁকে ছাড়িতে পারে না ; কারণ মার মত স্নেহ ভ্রগতে আর নাই। সকলে ছাড়িতে পারে, কিন্তু আমার এই ভ্রগদাতা, অসহায়ের মাতা, দুর্ভাগ্যের মাতা, কখনও সেই দুর্ভাগ্য এবং অসহায় সম্বন্ধকে ছাড়িবেন না। তাঁর এই নবজীবনের দিনে তাঁকে মা আপনাদের দিকে টানিয়া লউন।”

তুমি লক্ষ্যে থাকিতে বৃন্দাবনের পুনর্বিসাহের সংবাদ পাইয়াছিলে। তখন সুশ্রাবকে বল নাই। লক্ষ্যে হইতে কিরিয়া আসার পর বখন সুশ্রাব এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “আজ আমার জীবনের কি দিন! আজ বৈকালে জানিলাম, শ্রোণনাথ পুনরায় বিবাহ করছেন। কি আশাত! ভেবে দেখিলাম আজ যদি আমার পথম জননীর সান্নাধ্যক্রোড় না পাইতাম, কাঁদিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতাম। কেবল ভ্রগজ্ঞাননীর আশ্রয় ভেবে আমি আজ খাড়া হয়ে রয়েছি।” বহু মাতা, বহু কন্ডা! সত্যি তোমরা এই ভুল পরীক্ষাকে ব্রহ্মপুণ্ড্রণে হালকা করিয়া আপনাদের সমুদয় কৰ্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছিলে।

### অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যে ত্যাগ ও লক্ষ্যের ফল

এদিকে লক্ষ্যে ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লক্ষ্যের উৎসবে থাকিয়া তোমাকে লইয়া আসিব ও পথে কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিব বলিয়া আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়াছিলাম। তুমি ইহার মধ্যে একবার ভগিনী মহালক্ষ্মীকে দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় নিকট হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা হয় তো পথ্য হয় না, খরচ পত্রের অভাব। ডাক্তার বাহা বলিতেছেন তাহা পালন হইতেছে না দেখিয়া, আমার মত না লইয়াই, পথ্যের জন্য যে খরচ হইবে তাহা দিতে স্বীকার করিলে। লক্ষ্যে উৎসবের জন্য প্রচারক মহাশয়ের আসিবেন, তাই চাপাতোলা হইতেছিল। হাতে পয়সা নাই বলিয়া তুমি চাণার খাতার স্বাক্ষর করিলে না, অথচ ভগিনীর পথ্যের মত খরচ হয়, তাহা দিতে স্বীকার করিলে।

আমার প্রস্তাব ছিল যে তুমি ২৬শে লক্ষ্যে হইতে ফয়জাবাদ আসিয়া থাকিবে। সেখান হইতে উত্তরে প্রাচীন অব্যাবানগরী নর্দন করিয়া উৎসবের জন্য পুনরায় লক্ষ্যে যাত্রা করিব।

এই প্রস্তাব অমুসায়ে তুমি ২৬শে মহানারী মিস্ থোবর্নের নিকট বিদায় লইয়া গোপাল বাবুর বাটতে আসিলে। ফয়জাবাদ পর্য্যন্ত তোমাকে কে পৌছিয়া দিবে, গোপাল বাবু তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তুমি বলিলে, যদি কোন লোক না যায়, আমি একাকীই বাইতে প্রস্তুত। তাই গোপালচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে সামান্য বন্দনারীর পক্ষে ইহা স্বপ্নের কল্পনা। বখন দৃঢ়তা দেখিলেন, ত্রৈশনে বাইবার জন্য ঘোড়ার পাড়ী করিয়া দিলেন। ছেলেরা একজন ত্রৈশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। আর ফয়জাবাদ প্রবাসী বহু জীমুস্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারকে ডায়ে খবর দেওয়া হইল। হুই কড়া ও তুমি কোনও পুঙ্খ মাছুষ সঙ্গে না লইয়া যজ্ঞানিত স্থানে যাত্রা করিল। ফয়জাবাদ ত্রৈশনে মহেন্দ্র বাবু দেবদেব পাড়ী ভ্রমণ করিয়া তোমাদের স্বীয় বাঙ্গালার লইয়া সেলেন।

সেখানে হাউ-মুখ থুইয়া আবার ত্রৈশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে। যেমন আমাদের ত্রৈশ ফয়জাবাদ ত্রৈশনে পৌছিল, অমনি গাড়ির অতি সন্নিকটে আসিয়া পাড়াইলে, আমরা সকলেই মহেন্দ্র বাবুর, বাঙ্গালার উপস্থিত হইলাম।

মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইল। আহারাচ্ছে তুমি আমার কাছে আসিলে। নয় মাস পরে তোমাকে দেখিলাম। তপস্রায় তোমার দেহ চর্খাবশেষ, মস্তক কেশহীন, হস্ত অঙ্গদ্বারপুস্ত, পরিধান সামান্য পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, কিন্তু আমার সম্মুখে তুমি যেন দিবা জ্যোতিতে উজ্জ্বল। এ তোমার কি রূপ! এ কি দেবী না মানবী? এত দেবসৌন্দর্য কোথায় পাইলে, এ তো পৃথিবীর রূপ নয়? তখন তোমাকে প্রশ্নম করিলাম কি না মনে নাই কিন্তু প্রশ্নম করিবার সময় ছিল বটে।

দেখিলাম, এই নয় মাসে তোমার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। মন প্রশস্ত হইয়াছে; বিচূরী নারীদের সঙ্গে মিশিয়া সাহস বাড়িয়াছে; কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে মনের চিন্তা বাড়িয়াছে; হৃদয়ের কোমলতা বাড়িয়াছে, উপাসনার মধুরতা বাড়িয়াছে। লক্ষ্যে গিয়া নারীর মধ্যালা বৃষ্টিতে শিখিলে। জীবনে কি কি করিতে হইবে তাহার পূর্বাতাগ এখানেই লাভ করিলে। অজ্ঞ ধন্দ্বাবলম্বীদের সঙ্গে ক্ষিপ্রপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও এখানে শিখিলে। তোমার পরিবার ক্রিয়ণে গঠিত হইবে, বিত্তালয়ে ক্রিয়ণে কার্য করিতে হইবে, ছোট ছোট মেয়েগুলির স্বরয় ক্রিয়ণে আকর্ষণ করিবে, তাহাদের খেলার সাথী হইয়া ক্রিয়ণে তাহাদেরই একজন হইবে, ক্রিয়ণে ছেলে মাছুষের মত খেলিবে, দৌড়িবে, ক্রিয়ণে মধুমাতা হাসির দ্বারা তাহাদের শাসন করিবে, এ সকল সেখানে থাকিয়া দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিয়া আসিলে।

মহানারী মিস্ থোবর্নের সঙ্গলাভ করিয়াই তোমার এমন অপূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছিল। এই উৎসাহময়ীর সঙ্গলাভ করিয়া তোমার উৎসাহ দলগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নয় মাসে চারিখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছিলে। দুটি চারটি সরল ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতে। ইংরাজী শব্দে “Oh my” এমন মিষ্ট করিয়া বলিতে যে, তাহা আমার অনেক বার শুনিতে ইচ্ছা করিত। পূর্বে হঠাৎ পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু মিস্ থোবর্নের সঙ্গলাভ করিয়া তুমি একেবারে স্থির করিয়া ফেলিলে যে যদি বাইরে বাইতে হয়, তাহা হইলে ভ্রমোচিত বস্ত্র পরিধান করা প্রয়োজন। সাড়ীর অঙ্গল মস্তক হইতে পড়িয়া যায়। বাহারা বাহিরের কাজ করিবে, তাহাদের পক্ষে সর্বদা মাথার কাপড় উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নয়; বাহারা পরিত্রস্ত কামনার বাহিরে বাইতে তাহাদের মস্তক ও মুখ ঘোমটার আবৃত থাকিলে চলিবে কেন? মস্তক ঢাকিবার জন্য নন্দুগিরের মতন এক প্রকার মস্তকাবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলে। একদিন খেলিবার সময় মিস্ থোবর্ন তোমার দেখাশোনি ক্রমালে মস্তক আবৃত করিয়া খেলা করিয়াছিলেন। বিত্তালয়ের অধ্যক্ষ বন্দনারীর উদ্ভাবিত শিরোবসনে ভূষিত হইয়া কি স্থলর না জানি দেখিতে হইয়াছিলেন। মিস্ থোবর্নের দেখাশোনি তুমিও, না কামিজ, না অলষ্টার, গলা হইতে পলতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার পাঞ্জাবরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলে। কখনও এই পাঞ্জাবরণ সাড়ীর উপরে, কখনও বা সাড়ীর তিতরে পরিত। এই সময় হইতে জুতা মোজা ব্যবহার করিতেও অভ্যস্ত হইলে। মোজা কাটিয়া গেলে অঙ্গ পরিচ্ছদে

এক অল্প বয়ে ক্রিপে যেমত করিতে হয়, তাহা ঐ বিভ্রান্তয়েই শিখিয়া আসিয়াছিল। বঙ্গনারীর যে জড়সড় ভাব তাহা এই সময় হইতে তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। হঠাৎ বিপদ আসিলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আর তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। তুমি বঙ্গনারীর উন্নত পদবী বুঝিলে। তাহার উন্নতি করা, তাহাকে রক্ষা করা, যেন তোমার জীবনের এক মহামন্ত্র হইল। তোমার মধ্যে উৎসাহাগ্নি প্রথম হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইত জানি না, যদি তুমি খুষ্টান মহিলাদের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল না থাকিতে পাটতে। ভাষ্যচাক্রা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর সে অগ্নি কেহই নিবাইতে পারিল না। সেই অগ্নিই যেন তোমাকে গ্রাস করিল। কিরিয়া আসিবার পর কেবল তোমাকে অগ্নিময় দেখিতাম, আর ভাবিতাম সে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার হেতু খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সঙ্গে বাস। এই নয় মাসে আবার উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারাও মিস্র খোবর্ণের শ্রদ্ধা ও বন্ধু লাভ করিয়াছিল। খুষ্টানদের বাইবেল রূপে বাইতে হইত, গিঞ্জাতেও বাইতে হইত, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই। খৃষ্টের জীবনের ইতিহাস শিখিলে; তাঁহার ছোট ছোট উক্তিগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। খুষ্টানদিগের মত কার্যময় দ্বারা ব্যাপারে ক্রিপে নিযুক্ত থাকিতে হয়, বিপদের সময় বিশ্বাসীর মত ভগবানের উপর

ক্রিপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাও ঐ সময় শিখিলে। শুভতা কি বস্ত তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহে থাকিতে পাপবোধ তত প্রবল ছিল না। থাকিলা মহানারীর সজ্জাভ করিয়া তোমার পাপবোধও কেমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বোপরি কেমন করিয়া পরসেবার জন্ত আপনায় সর্ব্বন দিতে হয়, এ শিক্ষাও খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সংস্পর্শে থাকিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে।

### উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যে হইতে কিরিবার পথে

লক্ষ্যে ছাড়িয়া তোমার কানপুরে গিয়া— বাবুর বাড়িতে উঠিবার কথা হইল। তাঁহার বাটীতে বাইবার প্রস্তাবে সকলে আপত্তি করিতেছিলেন, কারণ তিনি দুই বৎসর কাল উপাসনা পরিত্যাপ করিয়াছেন; বাড়ীর উপাসনার ঘর বন্ধ। ক্রমে ক্রমে তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন। তুমি কিন্তু তাঁহার বাটীতে বাওরাই মীমাংসা করিলে। তোমার গমনে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইল। ১লা ডিসেম্বর ১৮৯১ বেলা ৯।০ টার সময় তাঁহার বাটা প্রবেশ। ১০টার সময় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উপাসনার যোগ দিলেন। নিজে উপাসনার ঘর পরিষ্কার ও প্রস্তুত করিলেন। বেশ উপাসনা হইল। অনেক দিন জম্মি পড়িয়া থাকিলে যেমন ভাল শাস্ত উৎপন্ন হয়, তেমনি



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য্য  
আগ্রার তাম্রমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

## এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০, - হুগলি-কুমিলী শ্রমিকার-গ্রাম-গিনিচাট



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

ব্রাঙ্ক:

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা নিরাস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা যায—এমন কোর জিবিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বারা বিকৃত সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আমাদের চিরাচরিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ ঘাতে কোর সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোরদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং

ভাইয়ের পয়স উপকার হইল। এমন সরল অহুতাপশের কলস অনেক দিন শুনি নাই। আবার সন্ধ্যার সময় মেয়েদের উপাসনা হইল। দুই বৎসর বাহার উপাসনার ঘর বন্ধ, আজ তাহার এক দশা? বাহিরে তিনি নিজে ধর্ম্মালাচনা করিলেন, ভিতরে তুমি মেয়েদের লইয়া উপাসনা করিলে। সকলে ভাইয়ের অহুতাপাশ প্রণাম করিল যেখানি একবারে পলায়ন করে না। স্বামিহীন উভয়ের মিলিত অহুতাবে পঁয়তিনী ৩টার আবার উপাসনা হইল। ভাই-ভগিনী উভয়েই উপাসনার বেগ দিলেন, খুব ভাল উপাসনা হইল, দুই ঘণ্টা তাহার স্থিতি। ভাই অহুতাপাশচক প্রার্থনা করিলেন ও অনেক কাদিলেন। দুই বৎসরের পর এবার কাদিলেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এখন তাঁহার বাটতে বাইবার কথা হয়, তখন বাহার আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার আজ যদি ভাইয়ের অবস্থা দেখিতেন, তাঁহারও কাদিতেন ও তোমাকে শত আশীর্বাদ করিতেন।

কানপুর হইতে আশ্রয় গমন করিলাম এবং তথায় একটি সরাইয়ের বিতল গৃহে অবস্থিতি করিলাম। দুখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইলাম। আকবর বাগসাহেব তিনটি স্ত্রী ছিলেন একজন তিলু, একজন বুঠান, একজন মুসলমান। জীবনে তিন জনার সমান সম্মান দেওয়া তাঁহারই পক্ষে সম্ভব ছিল। বিধানের প্রথম সূত্র সেইখানে। আচরণে দেখা গেলেন, সকল আত্মাই ভগবানের, সকল গর্হেই সত্য আছে। ভাঙমহল দেখিয়া ভালবাসার মহত্ব বুঝিলে।

৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে শ্রীযুক্ত বাহু—মগলশয়ের বাদায় উপস্থিত হইলাম। তোমার ভিতরে গেলে, আমি বাহিরে রহিলাম। ইহাতে তোমার মনে রেখ হইতে লাগিল। অনেক দিন অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়াছ, এখন আর কেন ভাল লাগিবে? কোনও উপায়ে একত্রে উপাসনা হইল। একত্রে উপাসনা হইবে না, ইহা কি তোমার প্রাণে নয়? তার পরদিন এই প্রাতঃকালে Dr. Miss Sheldon এর সঙ্গে উপাসনা করিলাম। আবার উপাসনার স্থান পাঠেছি না শুনিয়া Miss Sheldon স্কুল-ঘর বুন্দিয়া দিয়া সেখানে স্থান করিয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ঠিক বেন ঘণ্টের লোকের জঙ্গ আয়োজন করিয়া দিলেন। Miss Sheldon এক জন M. D. কিন্তু কোন অভিমান নাই। নিজ হাতে ঘরগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া উপাসনা করিতে অহুরোধ করিলেন। এমন করিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনার সহায়তা কে করে? এখানে

এ বিষয়ে তোমার বিশেষ শিক্ষা লাভ হইল। ৬ই ডিসেম্বর বুন্দায়ে গোবিন্দদেবের মন্দির, গোঠের মন্দির দেখা হইয়া গেল। তোমার মনে হইল, এখানকার সকলই মিষ্ট। ভিখারীগুলি অনেক দূর পশ্চাতে আটসে, একটি সিকি-পয়সা দিলেও দুট হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে চকিয়া যায়। অল্প স্থানের ভিখারীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। ৭ই সনাতনের সমাধি দেখিতে গেলাম। তিনি যে পরম বৈরাগী ছিলেন, সেই স্থানটি তাহার পঠিত দিতে লাগিল। কোনরূপ বিলাসের চিহ্ন নাই, শিশুগুলিও একটি পয়সা চাহিল না। স্থানটি সন্তোষ-পূর্ণ।

৮ই তারিখে প্রেমানন্দ স্বামী নামক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ক্রিপে সজ্জ দেখা স্বীকার করিতে চর, উচ্চ নীচ বিচারশূন্য হইয়া সকলের নিকট হাত ঝোড় করিয়া ভূমি হইয়া প্রণাম করিতে চর, এ সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিলে। তথা হইতে মথুরা, কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া ১৫ই ডিসেম্বর মোগলসরাই আসিলে। অসি নদীর তীরে একজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোকামার দিদি (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অপূর্বরুক্মি পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) সঙ্গে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নারীর বেদে অধিকার আছে কি না? সন্ন্যাসিনী বলিলেন, স্ত্রীর অধিকার নাই। কিন্তু স্ত্রীর আটটি লক্ষণ আছে। বধা, (১) অদয়া, (২) ভয়, (৩) অবিরেক, (৪) সাহসহীনতা, (৫) চকলতা, (৬) মায়া, (৭) অশোচ, (৮) অনর্থ। এই লক্ষণগুলি থাকিলে স্ত্রী বলা যায়। বাহাতে এ লক্ষণ নাই, তিনি স্ত্রী নহেন, তাঁহার বেদে অধিকার আছে।

তথা হইতে কালী হইয়া ১৬ই ডিসেম্বর খগোলে ভাই বজীপালের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলে, এবং সকলকে লইয়া বাঁকিপুর আগমন করিলে। বাঁকিপুরে তোমার জন্ত এমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করিতে ছিল, যেন তুমি মহাযুদ্ধ জয় করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাপ্ত হইয়াছ! রাজপুত্র হইতে গৃহ পথান্ত দীপমালা শঙ্করিন, আলো বাগত প্রস্তুত। মাছুবের জন্ত মাছুব এত করে তাগা পূর্বে জানিতাম না। বাটতে আসিবামার তুমি উপবের ঘরে দৌড়িয়া গেলে, প্রবেশের বিধবা পত্নীকে আলিঙ্গন করিলে, তারপর উপাসনার ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। উপাসনার ঘর খুব ভাল করিয়া সাজান হইয়াছিল।

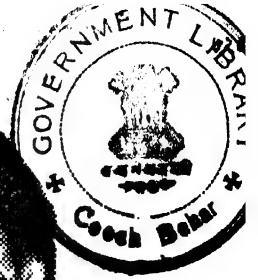
[ ক্রমশঃ ]

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিস্ফোরক দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীরা কাছে সামাজিকতা বন্ধ করা যেন এক দুর্ভিক্ষের বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মাছুবের সঙ্গে মাছুবের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বহিকিতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার সিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত সন্তুষ্ট আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রস্তুত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে থুখী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের প্রেক্ষাপটিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে বেকেন জাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।





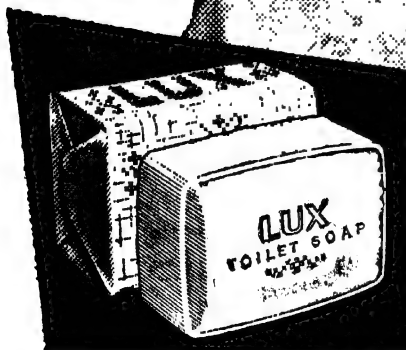
নমিতা সিন্‌হা

সর্বদা ব্যবহার করেন

লাক্স টয়লেট সাবান

“এটী যেমন শুভ্র  
তেমনিই বিশুদ্ধ”

চিহ্নিতকারকের সৌন্দর্য্যকর উপকরণ সমৃদ্ধ  
জ'ন থাকে অবশ্যই প্রয়োজন। শরীরের লাবণ্য  
উত্তমের বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করতে হয়।  
নমিতা সিন্‌হা, বাংলা দেশের উদীয়মান চিত্রশিল্পী,  
সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে তাঁর  
অকের লাভণ্যকে সতেজ সুন্দর রাখেন।



চিত্র-তারকা দে র

সৌন্দর্য্য সাবান



# উটরোগ

(নাটক)

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]  
ত্রিউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণ, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, প্রহরারত প্রহরী,  
[ প্রহরী তোরণের সামনে টহল মারছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল । ]

প্রহরী। কি চাও ?

আগন্তুক। (করজোড়ে) আজ্ঞে হজুর, ভেতরে সৈন্যেতে চাই, দয়া ক'রে কাটকটা একটু টেনে ধরুন।

প্রহরী। কে তুমি ?

আগন্তুক। দাস হরুন সিং, ওয়ল্ল ধরুন সিং, সাকিন দুর্ভট্টাড, পরগণা বনভিহা।

প্রহরী। কি দরকার ?

আগন্তুক। হজুর, গৃহপাল মহাশয়ের বাস খাওয়ার ভৈরব দাসের সঙ্গে বহুৎ দরকারী কথা আছে। আমি ভৈরব দাসের শালা।

প্রহরী। (মাথা নেড়ে) হবে না। আমি শালা লোকদের সঙ্গে যেতে দিইনে।

আগন্তুক। (হতাশ ভাবে) হবে না—তা হ'লে ১-১-কিন্তু ঐ বাঃ হজুর, গারড়ে গিরে উল্টো ব'লে ফেলেছি। আমি ভগিনীপতি, ভৈরব শালা।

প্রহরী। আমিও উল্টো ব'লে ফেলেছি, শালালোকদের সঙ্গে আমি দেখা করতে দিইনে।

আগন্তুক। তাও দেন না ? তা হ'লে ভৈরব দাস আমার বাবা বললেও বোধ হয় দিতেন না ?

প্রহরী। বাবা বললে কি ? যা বললেও মিতাম না। ভাগ—

আগন্তুক। যা বললেও মিতেন না—১-১-উঃ। আপনি কড়া

হাকিম হজুর !

[ প্রস্থান। ]

(ইতাবসরে কাটকের অপর দিকে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে)

প্রহরী। কি, দুর্গাবাই ? এত রাত্রে কোথা থেকে আসছ ?

দুর্গাবাই। তোমার আশ থেকে আসছি।

প্রহরী। আমার আশ থেকে আসছ ? আপনি তা হ'লে ঘরেই বল ? আঃ ! বাচা গেল ! কি হয়েছিল তোমার স্বামীর ?

দুর্গাবাই। নাও, নাও, কাটক টানো, বেশি বল করতে হবে না। আমার স্বামীর মরণে তোমার আশ থেকে আসব, এত ভাগি এ জন্মে ক'রে আসিনি। নাও, টানো।

প্রহরী। হুঁহাত ধরে ?

দুর্গাবাই। হুঁহাত দিয়ে।

(অদূরে জন-কোলাহল)

প্রহরী। (ফাটক টেনে ধ'রে) নাও, ঢুকে পড়, বোধ হয় মাতালরা হুলা করতে করতে আসছে।

দুর্গাবাই। (প্রবেশ করে) মাতাল নয়। চৈতমলরা রক্তনাথের পুজো দিয়ে ফিরছে। আমি দেখে এলাম উদয় সিংহের দাওদ্বারা ব'সে জিকছে ওরা।

(নিকটে জয় বাবা রুদ্রনাথ ! জয় বাবা রুদ্রনাথ ধ্বনি)

দুর্গাবাই। ঐ এসে পড়েছে।

(একে একে চৈতমল প্রকৃতি সাত জনের প্রবেশ ও জয় বাবা রুদ্রনাথ ধ্বনি)

প্রহরী। বেশি টেঁচিও না, মহারাজা নিত্রা যাচ্ছেন !...তার পর চৈতমল, পুজো দিয়ে কিরল তোমরা ?

চৈতমল। আজ্ঞে হ্যাঁ স্বরপালজী, ফিরলাম।

প্রহরী। আন্তে আন্তে ভিতরে এস।

(সকলের ফাটক পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ)

প্রহরী। তোমার মাথায় ও কি ?

চৈতমল। আজ্ঞে, এই-ই ত বাবা রুদ্রনাথের প্রসাদ।

সিংহগড়ে ঢুকে পর্বত মাথায় মাথায় বেখেছি, তুঁরে নামাইনি। রাণীমার হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

প্রহরী। রাণীমা ত' এখন নিত্রা যাচ্ছেন।

বনবর রাও। মহারাজ নিত্রা যাচ্ছেন আবার রাণীমাও নিত্রা যাচ্ছেন, তা হ'লে উপায় ?

প্রহরী। বাকি রাতটুকু তোরাও নিত্রা দিগে বা ঐ পলাশ গাছের চাতালে শুয়ে। সকালে রাণীমার ঘুম ভাঙলে তাঁর হাতে প্রসাদ দিস।

বনবর রাও। (চৈতমলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) কিন্তু প্রাসাদের কি হবে চৈতগুড়ো ? প্রসাদ ত' তুঁরে রাখা চলেবে না ?

চৈতমল। তা কখনো চলে ? বাকি রাতটুকু হুঁজনকে ভাগাভাগি করে মাথায় রাখতে হবে। তুমি আর পূরণ দাস এ কাজের ভায় নাও।

বনবর রাও। রাজি।

পূরণ দাস। আমিও রাজি। আমি না হয় প্রথম রাত ঘুমোই, আর বনবর শেষ রাত জাগুক।

বনবর রাও। (নিষিদ্ধ চিন্তে চিন্তা ক'রে দেখে) কিন্তু অন্ত্রবিধে ঠেকছে যে পূরণ, সারা রাত্রে প্রসাদ যে আমার মাথা থেকে একবারও নায়ে না !

পূরণ দাস। তা হলে প্রথম রাত তুমি না হয় আগো, শেষ রাত আমি না হয় ঘুমোই।

বনবর রাও। (প্রসন্ন মুখে) হ্যাঁ, এই ঠিক ব্যবস্থা হ'ল,—এতে আর কোনো অন্ত্রবিধে রইল না।

(জয় বাবা রুদ্রনাথ ! বলতে বলতে সকলের পলাশ-গাছের দিকে গমন)

প্রহরী। এত বড় আহাম্মোকারা কি করে পূজা দিয়ে ফিরে এল,—আশ্চর্য!

### বর্ষ দৃশ্য

স্বর্ধপালের শয়ন কক্ষ

প্রত্যাহ

চন্দ্রশীলা। মহারাজ! মহারাজ!

স্বর্ধপাল। (নিদ্রাভঙ্গ) কি বলছ চন্দ্রা!—ও! সকাল হয়েছে বুঝি?

চন্দ্রশীলা। হ্যাঁ, সকাল হয়েছে। এবার ওষুণ্ণ গেতে হবে।

স্বর্ধপাল। (শয্যা ত্যাগ করে) দেবরাজ? দেবরাজকে ডাকাতে হবে ত?

চন্দ্রশীলা। ডাকিয়েছি। উপাধ্যায়জী অলিন্দে অপেক্ষা করছেন।

(বাইরে অলিন্দে গলা খেঁকারি)

স্বর্ধপাল। খুব কান ত! সাড়া দিচ্ছে।

চন্দ্রশীলা। আসন পেতে দিয়েছি, পূর্ণমুখ হয়ে বোসো।

(স্বর্ধপালের তথাকরণ)

চন্দ্রশীলা। (স্বর্ধপালের হাতে ঔষধের বাট দিয়ে) এবার খেয়ে ফেল, সবটা একেবারে।

স্বর্ধপাল। (ওষ্ঠের কাছে ঔষধের পাত্র নিয়ে গিয়ে না খেয়ে ভূমিতে হাশপন করলেন)

চন্দ্রশীলা। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) কি হল মহারাজ! খেলে না কেন?

স্বর্ধপাল। (অপ্রতিভ মুখে) উট মনে পড়ে গেল।

চন্দ্রশীলা। ইশ! আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না খেতে গিয়ে মনে পড়ল?

স্বর্ধপাল। খেতে গিয়ে মনে পড়ল।

চন্দ্রশীলা। (দুঃখিত স্বরে) কি আর করবে বল? এক দিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে কোরো না।

স্বর্ধপাল। (কি ভাবতে ভাবতে অস্ত্রমনস্ক ভাবে) না। তা আর করব না।

(অলিন্দে গলা খেঁকারি)

স্বর্ধপাল। দেবরাজ ব্যস্ত হচ্ছে। কি ওকে বলি বল দেখি?

চন্দ্রশীলা। কি আবার বলবে? বা বলবার আমি বলে ডেকে নিয়ে আসছি।

(চন্দ্রশীলার প্রস্থান, এবং দেবরাজসহ পুনঃপ্রবেশ।)

দেবরাজ। (বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে) মহারাজ, এত করে যে কথাটা নিষেধ করে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই করে বসলেন?

স্বর্ধপাল। (অপ্রতিভ ভাবে) কি কবি বল? ইচ্ছে করে কিরকি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

দেবরাজ। তার আগেই টপ করে খেয়ে ফেললে ত হ'ত!

স্বর্ধপাল। কিন্তু তার চেয়েও আগে টপ করে মনে পড়ে গেল যে!

চন্দ্রশীলা। বা বলছেন কাল থেকে না-হয় তাই কোরো।

স্বর্ধপাল। (অস্ত্রমনস্ক ভাবে) আচ্ছা, তাই করব। (দেবরাজকে সন্বেদন করে) দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে আপনা-আপনিই পালন হয়ে যেত। জানিয়েই অন্ত্রবিধের ফেলেছ।

দেবরাজ। (চক্ষু বিফারিত করে) বলেন কি মহারাজ! এর ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে করে ফেলেন, তখন?

স্বর্ধপাল। না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে বাব কেন?

দেবরাজ। এই যে কাল আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে?

স্বর্ধপাল। কি গেরো! শুধু কি আমার উটশালাই আছে? হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?

দেবরাজ। কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত আছে?

স্বর্ধপাল। আহা-হা, আছে ত নিশ্চয়ই,—কিন্তু কথটা তুমি ঠিক ধরতে পারছ না বেবদা! যাক, তর্ক করে কোনো লাভ নেই। সম্ভাব্যবোলা ওষুণ্ণ নিয়ে আসছ ত?

দেবরাজ। অতি অবশ্য আসছি। কয়েক দিনের মধ্যে আপনাকে ষোল-আনা সারিয়ে না দিয়ে আমি নড়ছি নে এখন থেকে। আমার বা কিছু করবার সবই করছি আর করবও, শুধু আপনি তাতে একটু যোগ দিলেই বেঁচে বাই।

স্বর্ধপাল। আর কি করে যোগ দাব বল?

দেবরাজ। আর কোনো রকমেই দরকার নেই মহারাজ, শুধু একটু শক্ত হয়ে দিন তিনেক উট শকট তুলে গিয়ে যোগ দিলেই হবে। শুধু উট শকটই বা কেন, ছুঁচার দিন বর্মমালা থেকে উ অক্ষরটি সেরেফ বাদ দিয়েই চলুন। (চন্দ্রশীলার প্রতি) আপনি যদি মহারানি, অল্পগ্রহ করে আমাদের দু'জনকে একটু সাহায্য করেন তা হ'লে অতিশয় উপকৃত হই।

চন্দ্রশীলা। অন্ত করে বলে আমার প্রতি অবিচার করবেন না উপাধ্যায়জী, বা করতে হবে আদেশ করুন, আমি শ্রাণপণে করব।

দেবরাজ। আপনি কয়েক দিন মহারাজের সঙ্গে অবিবর্ত হাতীর গল্ল করে, ঘোড়ার গল্ল করে উটের কথা ভুলিয়ে রাখুন। কলাচ উটের নাম মুখে জানবেন না। ঠাঁড়ান, ঠাঁড়ান। (একটা কিছু ভেবে দেখবার চিন্তার ভাণ করে) না, হাতীর তড় বিপজ্জনক বস্তু।

স্বর্ধপাল। (সকৌতুহলে) কেন, বিপজ্জনক কেন?

দেবরাজ। মহারাজ, হাতী তড় উঁচু করলে উটের গলার মতো দেখায়। হাতী থেকে হাতীর তড় আর হাতীর তড় থেকে উটের গলা মনে পড়ে বাওয়া আশ্চর্য নয়। গলা মনে পড়লে দেখ মনে পড়তে আর কতক্ষণ!—আচ্ছা, আসি তবে এখন।

স্বর্ধপাল। এস।

দেবরাজ। জয় হোক মহারাজার। জয় হোক মহারানীর।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্তন

## সপ্তম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী বলভাচার্যের গৃহের সম্মুখ

প্রভাষ

শব্দর মিশ্র। ও বলভাচার্য! বলভাচার্য বাড়ি আছে হে? ও প্রধান মন্ত্রী মশায়!

( ভিতর হ'তে শোনা গেল, আসছি, কাঁড়াও )।

বলভাচার্য। ( নিশ্চিন্ত হয়ে ) পথে কাঁড়িয়ে কেন? বৈঠকখানায় বসবে চল।

শব্দর মিশ্র। না ভাই, বসব না, তাড়া আছে। দুটো কথা শুনে বাই। রাজবাড়ির খবর কি বল ত?

বলভাচার্য। খবর ভাল। রাজবাড়ির ওপর বখারীতি সূর্যচন্দ্রের কিরণ বর্ষণ চলেছে।

শব্দর মিশ্র। মহারাজের খবর কি?

বলভাচার্য। মহারাজ এখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, স্বর্গারোহণ করেন নি।

শব্দর মিশ্র। তাঁর রোগের খবর কি? ঢেঁড়া ত পিটিয়েছিলে চার দিন পরে হয় শূলারোহণ, নয় আনন্দোৎসব। এক মাস হ'য়ে গেল অথচ দুইয়ের মধ্যে একটিও হ'ল না—এও একটি দুর্ভেদ্য রহস্য মনে হচ্ছে।

বলভাচার্য। একেবারে দুর্ভেদ্য নয়। মহারাজের কাছে শুনেছি, এখনো এক মাত্রাও ঔষধ তাঁর পেটে যায়নি।

শব্দর মিশ্র। যারনি? কেন বল ত?

বলভাচার্য। সেই রহস্যটি শুধু দুর্ভেদ্য নয়, অভেদ্য।

শব্দর মিশ্র। এ দিকে তোমার দেবরাজ ত রাজভোগে সৈতে সৈতে ভুড়ি বাগিয়ে ফেললে। আর তার হাড়িচামড়া-সার খোঁড়াটাও রাজবাড়ির দানা খেয়ে খেয়ে সাম্প্রতিক দুটিয়েছে। আগে হু-পা চলতে পায়ে-পায়ে চৌকাঠুকি লাগত, এখন কাছে গেলে হারামজাদা জোড়া পায়ে লাথ ছোঁড়ে।

বলভাচার্য। সওয়ার আর বাহক দু'জনেরই উপস্থিতি ফুসী চলেছে শব্দর! তাই মনের সাথে একজন খাচ্ছে ছানা, আর একজন খাচ্ছে চানা। তোমার দেবরাজের মজ্জা গুঁড় লোক সমস্ত ভারতবর্ষে ছুটি আছে কিনা সন্দেহ!

শব্দর মিশ্র। ( হেসে ) তাইলে সাবধান হও। মহারাজের মেজাজ কি ক্রম?

বলভাচার্য। ও'ব' হয়ে



দেবরাজ—(করজোড়ে) আজই না মহারাজ, কাল

আছেন। মনে হয় সীতাই বোধ হয় বোমা-কাটা হবেন। কথাবার্তা কম কইছেন।

শব্দর মিশ্র। আচ্ছা ভাই, চলি।

পটশরিরতন

## অষ্টম দৃশ্য

প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষ

( সূর্যপাল, চন্দ্রশীলা ও বলভাচার্য আসীন। দেবরাজের প্রবেশ )

দেবরাজ। ( নত হ'য়ে ) জয় হোক মহারাজ!

সূর্যপাল। জয় আর আমার হ'ল না দেবরাজ! জয় ত দেখছি তোমারই। তার পর, কত দিন হ'ল বল ত?

দেবরাজ। কিসের মহারাজ?

সূর্যপাল। সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদে তোমার শুভ অধিষ্ঠানের?

দেবরাজ। ( একটু ভেবে দেখে ) তা মাস দেড়েক হবে।

সূর্যপাল। আরও কত দিন ইচ্ছে আছে, শুনতে পাই?

দেবরাজ। আমার অপরাধ কোথায় বলুন? মনে করেছিলাম দিন চারেকের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে, কিন্তু আপনি এমনই ছেলেশাসুখী আরম্ভ করেছেন যে এ পর্যন্ত আমার এক কৌটা গুণ্ড আপনায় পেটে ঢুকল না!

সূর্যপাল। ঢুকবে কেমন ক'রে? এমন ঢাকা চালিয়েছ যে, ওষুধের পায়ে হাত ঠেকিয়েছি কি, অমনি গুরুত্ব মনের মধ্যে খট খট ক'রে বেড়াতে আরম্ভ করে। শুধু আমার মনের মহোই নয়, মহারাজীরও।

বলভাচার্য। ( উৎকট বিম্বয়ে ) কি বেড়াতে আরম্ভ করে মহারাজ?

সূর্যপাল। বলছি। শোন দেবরাজ, তুমি একটি বিবস বাপ-পাবাছ, ভণ্ড, জোড়োর!

দেবরাজ। ( কাঁচুমাচু বুঝে ) কেন প্রভু?

সূর্যপাল। ( কঠোর স্বরে ) আবার চালাকি হচ্ছে, কেন, তা জান না?

দেবরাজ। ( করজোড়ে কাতরভাবে অবস্থান )

সূর্যপাল। আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার জ্বরে পাগল হ'য়ে বাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়েও ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকো দিব্যরাত্রি-মৃত্যু-স্বপ্না ভোগ করছি।

দেবরাজ। ( কষ্টে হাসি চেষ্টে ) কি রোগ প্রভু?

সূর্যপাল। হারামজাদা! আবার ভাকামি করছ? উটরোগ, তা তুমি জান না?

বলভাচার্য। ( চকিতস্বরে ) বলেন কি মহারাজ! উটরোগ?

সূর্যপাল। হ্যাঁ, উটরোগ। ওই নজ্জারটা একটা আশু উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিদ্রায় নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙলে মনে হয় উট। জেগে বতকণ থাকি ততকণ মনের মধ্যে উট খট-খট ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়। ( দেবরাজের প্রতি আরক্তমনে দৃষ্টিপাত করে )

বার কর্ব এ উট আমার মনের তেতর থেকে, নইলে তাকে শুলে চড়িয়ে আশুনে পোড়াব।

দেবরাজ। (অপরিসীম উল্লাস কণ্ঠে দমন ক'রে) মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম, নির্দিষ্টমানে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উত্ত্রিকা দাব।

স্বর্গপাল। (চিৎকার ক'রে) চোপ রও পাবণ্ড! ফের যদি উত্ত্রিকা দাব লব উচ্চারণ করছে, একশি হু-খণ্ড করব তোমাকে।

দেবরাজ। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও কার্ঘ্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বজায় থাকলে উটের বা হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোনো মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত' নিবেদন করি।

স্বর্গপাল। (ছত্রার দিয়ে) কি?

দেবরাজ। আপনার পায়ের শির ত আর টুটু করে না?

স্বর্গপাল। (সজোরে) না।

দেবরাজ। বুক ধড়ফড় করে না?

স্বর্গপাল। না।

দেবরাজ। চোখ লাল হয় না?

স্বর্গপাল। না, না,—হয় না।

দেবরাজ। মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গেছে। আপনার প্রতিক্রিয়া দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পেছনে পেছনে ঝট-ঝট করতে করতে চলে যাবে।

স্বর্গপাল। (এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে) আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রী মশায়, এই সদতানটাকে হ'ল লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাখি মেয়ে বিদায় করুন।

বলভাচার্য। মহারাজ, এর এক কৌটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে বলছেন?

স্বর্গপাল। এই সর্বদেপে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।

বলভাচার্য। (সম্ভ্রান্ত হয়ে) না, তা হ'লে দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েই বিদায় করা যাক।

স্বর্গপাল। আজই।

দেবরাজ। (করজোড়ে) আজই না মহারাজ, কাল। দেড় মাস বখন আপনার অন্ন সেবন করলাম, আর একদিন করলে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারের কোনও ক্ষতি হবে না। অল্পমতি করেন ত' একটা প্রার্থনা নিবেদন করি।

স্বর্গপাল। কি বলো?

দেবরাজ। মহারাজ, যে উপায়েই হোক, আমিই বখন আপনার রোগ সারিয়েছি ও অর্ধটা আমি চোবের মত নিয়ে বেতে চাইনে। আপনিই বা লুকিয়ে জরিমানার মত দেবেন কেন? কথা ছিল আনারোগ্যে আমার শূলদণ্ড, আর আরোগ্যে মহা-উৎসব হবে। আমার শূলদণ্ড বখন হ'ল না, আগামী কাল মহোৎসবই তখন হোক। আর সেই উৎসব-সভায় আপনি অর্ধটা পূর্বস্বাক্ষরপ মিন। তাতে আমার সন্মত আর আপনার প্রতিজ্ঞা পালন দুইই কীৰ্ত্তিত হতে পারবে।

স্বর্গপাল। (বলভাচার্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত)

বলভাচার্য। মহারাজ, উপাধ্যায়জীর প্রস্তাব সমীচীন মনে হচ্ছে। রোগ বখন আপনার আরোগ্য হয়েছে, উৎসব তা হ'লে কেনই বা না হবে?

স্বর্গপাল। কিন্তু এই উটরোগ?

বলভাচার্য। উটরোগও আপনার আরোগ্য হ'রে যাবে মহারাজ। ওষুধ বখন আর খেতে হবে না তখন উট থাকলেও উটের উষেণ থাকবে না। আজ সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখে আপনি একবার প্রায়শ পাবেন।

চন্দ্রশীলা। (সন্তরে) কিসের স্বপ্ন দেখে উপাধ্যায়জী? উটের নয় ত'?

দেবরাজ। সন্তানের খুঁত মার্কনা করবেন মহারাজি। উটের নয়, আপনার স্বপ্ন দেখে।

চন্দ্রশীলা। (আবক্ত হুখে মৌনালম্বন)

স্বর্গপাল। (সহাস্তে) দেবরাজ ওষু ওষু নয় মহারাজি, খানিকটা সরস-ও বটে। দেবরাজের প্রস্তাব সবন্ধে তোমার যা সিদ্ধান্ত তাই হবে।

চন্দ্রশীলা। উপাধ্যায়জীর প্রস্তাব আগামী কালই কার্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা করুন প্রধান মন্ত্রী মশায়।

বলভাচার্য। বখাশে মহারাজি।

য ব নি কা

### গত-কবিতা সহস্র বন্ধিমচন্দ্র

“এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পণ্ডেই লিখিত হইবে, তাহা সম্ভব কি না আমার সন্দেহ আছে। কেবল পণ্ডেই কবিতা মরে। অনেক স্থানে পণ্ডের অপেক্ষা গত কবিতার উপযোগী।”

# সন্নিবিষ্ট



## শ্রীম্মথনাথ ঘোষ

বিশেষ করে কানীর এই অঙ্কলটা, শিবালয় থেকে তুলসীবাট পর্যন্ত বিপিনের বড় ভাল লাগে। শুধু জনবিরল বলে নয়, তার ধারণা তাঁরই হাটের মাছাছা বা প্রকৃত অধ্যাত্ম রূপ যদি এখনো কোথাও অল্পতব করা যায় ত ওইখানে। ওর নির্জন ঘাটে, পুরনো ভাঙ্গা মন্দিরে, অগণিত সোপানশ্রেণীর মাথায় অবস্থিত সুবিনামা বটগাছের নিম্নদেশে, বুক পর্যন্ত গন্ধার জলে ঝাঁড়িয়ে লগ্নরত নরনারীর হৃৎকর বোমবোম ধ্বনিত। এছাড়াও ওই যে একটা-দুটো নৌকা, বেয়াবন্ধ হয়ে বাবার পর মাঝিরা ঘাসের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে ঘরে, একাকী ঘাট থেকে ঘুরে এখানে-ওখানে ঝাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল, তাদের দেখে ওর মনে হয় বেন ওরাও সারা দিনের কর্মবিরতির পর নির্জন সাধনার বসেছে। এই গুতগন্ধার ধারার সঙ্গে সারা ভারতের নদীতে নদীতে যে অজ্জন্ত বন্ধন রয়েছে তাকে বৃষ্টি ওরাও উপলব্ধি করতে চায় মর্মে-মর্মে। আবার খুব ভোরে উঠে মাথার ওপরে ঝলঝলে শুকতারাদে গন্ধার ডুব দিয়ে যে সব পুষ্যাবীয়া চুপি চুপি চলে যায় কিংবা আসন্ন সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে বন্ধন কীসরখটা বেজে ওঠে, আর তার ধ্বনি সামনের বিস্তৃত গঙ্গা অভিক্রম করে, রামনগরের বাসুচর পেরিয়ে রাজপ্রাসাদের চূড়া ও শিখরের ঘন অরণ্যের কালরেখা ছাড়িয়ে আরো উর্ধ্বে অন্ধকারে সন্তোষাণা তারাদের বৃকে কাঁপতে থাকে তখন যে দু'চারটি ভাবসমাহিত মুষ্টি নিঃসঙ্গে ঘাটের চাতালের কোথাও না কোথাও বসে থাকে, তাদের দিকে তাকিয়ে নিমেষে বিপিনের মন বেন এই সঙ্গার থেকে বহুদূরে কোন এক তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করে। কপিক হলোও এর অমুদ্রিতই তার অন্তরের গভীরে পুজার প্রতীকের মত জ্বলতে থাকে।

কিন্তু এত ভাললাগা সত্ত্বেও কখনো এদিকটার বিপিনের বাস করা হয়ে ওঠে না। বনই আসে হোটেল, ধর্মশালা কিংবা বড়লোক বন্ধুবান্ধবের ওখানে থেকে চলে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বারই বাবার সময় মনে মনে প্রতীক্ষা করে, এবার এসে আর ওই হটবাজারের কোলাহল ও টাঙ্গা, একটা, সাইকেল-রিম্মার ভীষ্মের মধ্যে থাকবে না কিছুতেই। আর বন্ধুবান্ধবের এই অঙ্কলে ঘর দেখে দিতে বললে, তারা বাধা দেয়। বলে, রামো, ওখানে কি তোমার মত লোক বাস করতে পারে? না বাধকম, না ভালো আলোর ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া বাড়ীগুলো সব পুরনো মাছাতার আয়তনের, যখন এক-একটি বোসের ডিপোতে পণ্ডিত হয়েছ।

বিপিনের মুখে-চোখে বিশ্বাসের সীমা থাকে না, সে প্রশ্ন করে, কিন্তু এত লোক জেনে-সনে তবে সেখানে বাস করে কি ভাবে?

উত্তর আসে, সব সব বুড়োবুড়ির দল—ওরা মণিকর্ণিকা পাবার আশায় ওধানকার ওয়েটিংলিটে নাম লিখিয়ে, দিন গুগছে।

বিপিনের মন কিন্তু এসব যুক্তি মেনে নিতে পারে না। সে বার ওখানে বাস করার তীব্র বাসনা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসলো যে, কাউকে কিছু না বলে একেবারে ট্রেন থেকে সোজা সাইকেল-রিম্মা চেপে সে হাজির হলো শিবালয়ে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে একটা বাড়ীতে ছ'খানা ঘরের সন্ধান পেলে। একখানা ছ'তলায়, একখানা তিন তলায়—পৃথক ভাবেই ভাড়া দেবে।

বাড়ীটা যেমন পুরনো তেমনি অন্ধকার। নীচের তলাটায় দিনের বেলাও ভাল করে দেখা যায় না—ভেতরে চুকতেই বাপসা স্যাঁতসেঁতে একটা দুর্গন্ধ নাকে এলো বিপিনের। চৌকো উঠানটা পেরিয়ে খাড়াই পাথরের সিঁড়ির উঁচু-উঁচু ধাপ ভাঙতে ভাঙতে সে ওপরে উঠলো, তার পর ছ'খানা ঘর ও একটা ছোট বারান্দা পেরিয়ে ভেতরের দিকে আরো কিছুটা অগ্রসর হতে যে ঘরখানায় এসে পড়লো, সত্যি সেটি চমৎকার। একেবারে গন্ধার ওপরে তার বারান্দাটা ফুলছে। আর একটা চামেলী ফুলের গাছ, অল্প ডালপালা নিয়ে ঘরটাকে তিন দিক থেকে ঘন ঘিরে রেখেছে। ফুটন্ত ফুলে গাছটার সর্বাঙ্গ ভরে রয়েছে, বারান্দাটার ঝরে পড়ছে আরো অসংখ্য ফুল।

এ ঘরটা মাঠাকরুণ কাউকে ভাড়া দেন না। বলে বিপিনকে নিয়ে তার পাশে আর একটা ঘরে গেল ঝি।

সে ঘরটা এর চেয়ে বড় এবং আরো বেশী কাঁকা, আলো-বাতাসও ঢোকে বেশী কিন্তু চামেলী ফুল এর ত্রিগুনমান্য নেই, তাই বিপিনের এটা পছন্দ হলো না। সে বিকে বললে, আমি ওই চামেলীফুলগলা ঘরটা চাই।

ওটা ত ভাড়া দেওয়া হয় না, আগেই বলেছি। বলে ঝি মুখটা কিরিয়ে নিলে বিপিনের দিক থেকে।

বিপিন বললে, কিন্তু আমার এই ঘরটাই পছন্দ। তোমার মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে এসো, ভাড়া দেবেন কি না। আমি কেবল দশ দিন থাকবো এখানে।

ঝি চলে বাচ্ছিল, বিপিন বললে, হী যদি সেন, তাহ'লে ভাড়াই বা কত দিতে হবে সেটাও জিজ্ঞেস করে আসতে ফুলো না।

একটু পরে ঝি কিরে এসে বললে, ও ঘরটা হবে না। তবে ওপাশের ঘরটার মাসিক ভাড়া পনেরো টাকা। দশ দিন থাকলে ওর অর্ধেক ভাড়া দিতে হবে আপনাকে। বিপিন বললে, আচ্ছা আমি যদি পনেরো টাকা পুরো দিই, তাহ'লেও কি তোমার মাঠাকরুণ ওই ঘরটার আমার দশটা দিন থাকতে দেবেন না? জিজ্ঞেস করে এসো আর একবার তাঁকে।

ভেতর থেকে ঘুরে এসে এবার ঝি বললে, আচ্ছা, তাহ'লে আপনাকে জিনিবগুণ্ডা গাড়ী থেকে নিয়ে আসুন। মাঠাকরুণ বললেন, বখন এতই পছন্দ হয়েছে আপনায় এই ঘরটা, তখন থাকুন। তিনি পুজোর বসেছেন, নইলে নিজেই আসতেন। টাকাটা কিন্তু সব আগাম এখন দিতে হবে, তিনি বলে গেলেন।

ঝির মুখের কথা শেব করবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা পকেট থেকে বার করে তার হাতে দিয়ে বিপিন চলে গেল জিনিবগুণ্ডা গাড়ী থেকে জানতে।



# ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ ক্যাস্টারাইডিন কেশ তৈল

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল ও অগ্ন্যাগ্নি উদ্ভিজ্জ তৈল  
সংমিশ্রণে এবং ক্যাস্টারাইডিন সহযোগে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ স্তন্যধর  
গন্ধে সুরভিত। কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও  
মরামাস নিবারণক।

৫ অ্যাউন্স স্তন্য আধারে পাওয়া যায়।

- নানারকম খোঁপার ছবি সহ “কেশবতী” পুস্তিকা  
চিঠি লিখলে পাঠান হয়।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

বি ঘরটা ঘুরে-ঘুরে পরিষ্কার করে দিলে, তিনিবগ্নর গোছ গাঁহ করে রেখে বিপিন গিয়ে পাঁড়ালো বাগান্দার। সামনে অব্যাহিত গলা, তাকে ছাড়িয়ে ওপারে ধু-ধু করছে রামনগরের চড়া। একটি পাল-তোলা নৌকে। তুলসীঘাটের দিক থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। ডান পাশে যে ঘাটটা তার নড়বড়ে পুরনো। সিঁড়ি ভেঙ্গে ভিত্তে কাশড়ে কমগুলা হাতে উঠে এলো এক বৃদ্ধা। বুড়ো বটগাছটার তলায় এবং কালো কালো কয়েকটা হাড়ি পাথরের ওপর বিজ-বিজ ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে গঙ্গাজল ঢেলে দিয়ে চলে গেল। ভোরের কোটা চামেলীর গন্ধ তখনো ফুরিয়ে যায় নি, বরং সূর্যের তাপ লেগে তার মাদকতা বেড়েছে আরো। সে সৌরভ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে বৃষ্টি বিহবল হয়ে যায় বিপিন। তাই আরো অনেকক্ষণ ঠিক সেই জায়গায় উদাস দৃষ্টি মেলে সে পাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ভাবে। মাহুঘের নিত্য নৈমিত্তিক তৃষ্ণাতৃষ্ণ ঘটনা বৃষ্টি তার চোখের সামনে নানা রঙের ছবি এঁকে চলে।

এক সময় যেন তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বুকে শুধু 'বাঃ' এই শব্দটা উচ্চারণ করে গিয়ে বীরে ঘবে গিয়ে ঢোক।

সে দিন ঐ অঞ্চলের ঘাটগুলো বিপিন বেড়িয়ে বেড়ালো অনেক রাত পর্যন্ত। তার পর আবার বখন বাগান্দার গিয়ে পাঁড়ালো তখন রামনগরের চড়ার ওপর ভ্রমরোশীষ্য যে চাঁদ উঠেছিল তার জ্যোৎস্না যেন গঙ্গার জল সাঁতারে পার হয়ে এসে সেই বাগান্দার ওপরের চামেলীকুঞ্জের বৃকে বাঁপিয়ে পড়েছিল। বরা ফুলে আর জ্যোৎস্নার সারা বাগান্দার যেন আলপনা আঁকা, সতরঞ্চিটা ঘর থেকে এনে এক কোণে পেতে চুপ করে বসে রইলো বিপিন। হাওরায় তার চোখের সামনে চামেলীর লতানে ডালগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠছিল রেশমী বালকের মত।

সহসা বিয়ের কঠোর স্তনে বিপিনের যেন ধ্যান ভঙ্গ হোলো। বি বললে, বাঃ, মাঠাকরুণ এসেছেন আপনাকে রসিগটা দিতে।

ও, বলে উঠে বসতেই তার সামনে এসে পাঁড়ালেন শুভ ধান-পরিহিতা এক বিধবা ভ্রমরহিলা। তাঁর দেহের কোথাও কোন ঐর্ষ্যের চিহ্ন ত ছিলই না বরং যাকে বলে একেবারে নিরানন্দরূপ। অনেকটা তপস্বিনীর মত শীর্ণা অথচ জ্যোতির্ময়ী সে মুষ্টি। চাঁদের আলো তাঁর চোখে-বুকে, সারা গায়ে এসে পড়েছিল। তারই আভার বিপিনের মনে হলো এক কালে ইনি বেশ সুন্দরী ছিলেন।

কেবল রসিগটা তিনি দিলেন না। সেই সঙ্গে আরো সাড়ে সাতটা টাকা বিপিনকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, মা গঙ্গার বৃকে বাস করে আমি অন্ত্যায় করতে পারবো না। ঘরটা পছন্দ হয়েছে বলেই যে ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে বেশী আদায় করে নেবো, তা ভাববেন না।

বিপিন জিজ্ঞাসে বললে, না না, আমি মোটেই তা ভাবিনি। ভুলমূল্যেই ঘরটি আপনি কাউকে ভাড়া দেন না, শুধু আমার যে দিয়েছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, সত্যি এ ঘরের তুলনা হয় না।" সামান্য টাকার কি এ সৌন্দর্যের মূল্য দেওয়া যায়! আহা! ক'র সুলভ চামেলী ফুল!

আপনি বৃষ্টি চামেলী ফুল খুব ভালবাসেন? মহিলাটি একটু ধমে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন বিপিনকে। বিপিন বললে, কে না ভালবাসে বলুন—এমন সুন্দর ফুল। তবে সত্যি কথা বলতে কি,

এই চামেলী ফুলের সঙ্গে আমার মনে এমন এক বিলুপ্ত স্মৃতি জড়ানো আছে যে এই ফুল দেখলেই সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায়।

ভ্রমরহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিষ্কার স্মৃতি কাঁঠ প্রশ্ন করলেন, তাই বৃষ্টি এই ঘরটার থাকবার জন্যে এত তৌক আপনায়?

বিপিন একটু ইতস্ততঃ করে বললে, হী, অনেকটা সেই ভজ্জেই বলতে পারেন। তবে সেই যে চামেলী দেখেছিলুম তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা দেওয়া যায় আপনার ঐট পাঁড়ের। ঠিক এমনি ভাবে লতিয়ে উঠেছিল এত বড় গাছটা এবং এই ভাবে বাগান্দাটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে যেন ফুলের কুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্য্য সাধু! সেই কথাটাই এখানে আসার পর থেকে বারে বারে কেবলি মনে পড়ছে। একেবারে, হবহ এক।

সে কোথায় দেখেছিলেন, এই কানীতেই নাকি?

না। সে দেখেছিলুম নিউ শিল্পীর এক ছোট সরকারী কোয়ার্টারে। বললে বিশ্বাস করবেন না, এমন কচি এমন শিল্পবোধ আমার জীবনে আর কোন দিন কোন মেয়ের আমি দেখিনি। সহসা বিপিনের মুখ-চোখ উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে কিসের আবেগে। বিপিন যেন তার মনশ্চকুর সামনে তাকে দেখছে, তাই তার কণ্ঠ দিয়ে ভাবোচ্চাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো, কি রোমান্টিক, কি সেন্টেমেন্টাল মেয়ে।

মেয়ে? আপনার তিনি কে হন? প্রশ্ন করলেন মহিলাটি আন্তে আন্তে মাথার ওপরে ঘোমটার কাশড়টা টেনে দিতে দিতে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিপিন বললে, কেউ হন না। হলে ত সারা জীবন তাকে মাথার মণি করে রাখতুম। ওরকম মেয়ে এ জগতে চুলভ। লাখে একটাও মেলে না। অথচ কি একটা বরীরে হাতে পড়েছিল। সালারের এমনি উন্মোচন নিরম। পাকা কল চিরকাল পাঁড়কাইই ভোগ করে। বলে উদাস দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার মানে? তার বামী কি তাকে মায়া-ধোর করতো?

তারলেও ত বাঁচতুম। কিন্তু সে একেবারে পাথরের দেবতা। তার প্রাণ বলতে বা অল্পস্বত্ব বলতে কিছু নেই। তাই বার বার শু তার পায়ে বার্ষ্য হয়ে মাথা খুঁড়েছে সে কিন্তু কোন সাড়া আসেনি।

মহিলাটি এবার কণ্ঠে জোর এনে বললো, মাশ করবেন। যদিও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোন কথা বলা অসোভন, তবু বড় কৌতূহল হচ্ছে, আপনার কথা শুনে। যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

হী হী বহুদেব—মানে কোন কথা রাখবেন না। এ অনেক দিন আগের কথা, এখন প্রায় গল্পে পরিণত হয়েছে। আমি তখন সব কলমে ছেড়েছি। বয়েস একশ কি বাইশ হবে।

মহিলাটি টোলের কোণে ছোট একটা হাসি চেপে নিয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেয়েটির বাপ-মা সেননি কিংবা আপনি তার প্রেমে পড়েছিলেন, বার্ষ্য হয়েছেন।

সলকে একটা নিঃশ্বাস ফেললে বিপিন। তার পর বললে, আপনার অল্পমান কোনটাই সত্যি নয়। তবে ওরকম মেয়ের প্রেমে পড়তে সবাই চায়। কবির ভাষায় যাকে বলে, 'হুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি যে পদে তপস্তার ফল।'



ওসব ত কাবোর হোয়ালি। আপনি পড়েছিলেন কি না, তাই জিজ্ঞেস করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশিণ বললে, আমার পক্ষে ত পড়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু ওপক্ষ পড়েছিল কি না সেটা আজ পর্যন্ত আমার কাছে দুস্তর হয়ে বইল। যার জন্তে কিছুতেই ভুলতে পারি না সে কথা।

কি রকম? এ যে রীতিমত একটা নভেল-নাটক বলে মনে হচ্ছে। বলে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুখের হাসি চেপে নিলেন।

বিশিণ এবার গাভীঘোর সঙ্গে বললে, নভেল-নাটকের চেয়ে অনেক বেশী গভীর। তবে বলি শুধু। আপনাকে হয়ত বলচুম না। কিন্তু আপনার কঠোর মনে হচ্ছে আপনি এমন গুরুতর ব্যাপারটাকে বিজ্ঞপের চোখে দেখছেন। তাই আপনাকে না-বলা পর্যন্ত আমার মন স্থবির হবে না কিছুতেই।

তখন সব যুক্তি সেগেছে। ভারতবর্ষে বিশেষ করে দিল্লী শহরে মিলিটারীর কড়া পাহারা। গাড়ী স্টেট করার ফলে রাস্তার দশটার সময় নিউ দিল্লীর পথে পথে আমার আত্মীয়ের বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। যে ঠিকানাটা জানা ছিল সেখানে গিয়ে দেখি, এক ইয়া দাড়ী-পৌকোলা পাঞ্জাবী বাস করে। উনচলিশ নম্বরের বাড়ী খুঁজে না পেয়ে তখন উনপকাশ, উনতিবিশ, উনষাট, উনসোত্তর প্রভৃতি নম্বরের বাড়ীগুলোতে গিয়ে একে একে কড়া নাড়তে লাগলুম। আমার তখন মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে গেছে। হয়ত নম্বরটা আমিই ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু নম্বরটার শেষে যে নয় ছিল এ সংকে আমি একেবারে সুনিশ্চিত। ট্যাঙ্কওরালটাকে সঙ্গে নিয়ে এই ভাবে ঘুরে ঘুরে হয়রাগ হয়ে যখন একটাও বাঙ্গালীর বাড়ী খুঁজে বার করতে পারলুম না, তখন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দিল্লীতে সেই প্রথম পদার্পণ করেছি। এর আগে বার কতক শুধু আগানদোল ঠেখানে নেমে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলুম। তাছাড়া ট্যাঙ্কওরালটা আরো ভয় দেখিয়ে দিলে। বললে, ধর্মশালার কটক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোন হোটেলেরও স্থান হবে না। কারণ, সব জায়গায় মিলিটারী জর্জি। তার মদ খায়, হুগোড় করে সারা রাত।

তখন সব উন নম্বরগুলো যাচাই করে দেখবার জন্তে একে একে সব বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম। এদিকে রাস্তা-ঘাট সব এত নিরুজন যে গাড়ীঘোড়া দূরে থাক, একটা পথচারীও কোথাও নজরে পড়লো না। আর রাত ত তখনো সাড়ে দশটার বেশী হয়নি। যা হোক, এমনি ভাবে মরীয়া হয়ে কয়েকটা বাড়ীর কড়া নেড়ে বার্ষ হয়ে শেষে একবারে সর্বশেষ বাড়ীটার কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন এক বাঙ্গালী। অত্যন্ত কাঠখোটা চেহারা, যেমন কালো রঙ, তেমনি শুকনো হাড়-বার-করা মুষ্টি। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠতে হয়েছে বলে বিবজ্রিতে মাথা তীর খুঁ। কাকে চান? জিজ্ঞেস করলেন এমন কক্ষরে যে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তবু সাহসে ভর করে কথা পাড়লুম, আজ্ঞে আপনি ত বাঙ্গালী?

সেখো কি মনে হয়? তিনি যোঁকে উঠলেন।

আমি তখন আমার বিপদের কথাটা সবই আত্মপ্রসিক তাকে বর্ণনা করলুম। আমার আত্মীয়ের নামটা বলে জিজ্ঞেস করলুম,

আপনি যখন বাঙ্গালী একে এখানে অনেক দিন আছেন, তখন মিল্কর তাঁর বাড়ীটা চেনেন?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, মাপ করবেন। আমি এখানকার কোন বাঙ্গালীকে চিনি না। বরং সাহেব-সুবেদারের কথা বলুন ত ঠিকানা বলতে পারি।

আমি এবার একটু খেমে বললুম, আচ্ছা উপস্থিত আজকের রাতটা কাটাতে পারি এমন কোন স্থানের সন্ধান বলে দিতে পারেন, তাহলে বড়ই উপকৃত হই।

তিনি বললেন, কোন হোটেল-টোটেলে গিয়ে দেখুন। এত বড় রাজধানী জায়গা, এখানে টাকা যোগালে শুধু হোটেল কেন, আরও অনেক কিছু মেলে। বলে আমার দুখের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢলে গেলেন।

আমি তখন প্রায় ট্যান্ডার কাছ বরাবর এসে পাড়িয়েছি, শিছন থেকে আমার তিনি ডাকলেন, ও মশায়, তুমি হাম।

কাছে যেতেই দেখি, তাঁর কঠোর একেবারে বললে গেছে। কক্ষতার বললে মাথুখা যেন বয়ে পড়ছে। বললেন, আমার স্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের ঘরে খেতে দেবার মত কোন কিছু নেই, যদি শুধু রাস্তারটা শুয়ে থাকতে চান, তাহলে আমার এই বৈঠকখানাটার থাকতে পাবেন। এখানের 'রেশন' বড় কড়াকড়ি কি না।

বদিও পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছিল, তবু মুখে বললুম বিলক্ষণ।

**Coventry**

**WATERPROOF**

**ROY COUSIN & CO.**  
4 DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA. I.  
OFFICIAL AGENTS FOR  
OMEGA & TISSOT WATCHES  
SOLE AGENTS FOR  
COVENTRY WATCHES

আমি দিল্লীর ট্রেন থেকে খেয়ে আসছি। শুধু বাতটুকু কোন রকমে একটা আশ্রয় পেলে বেঁচে যাই। কাল সকালে ঠিক তাকে খুঁজে বার করবো।

যা হোক, এই ভাবে একটু আশ্রয় পেলাম বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। অনেক ধনী ও রাজা-মহারাজার সাজানো বৈঠকখানা দেখেছি কিন্তু ওরকম পরিচ্ছন্ন অথচ সুরুচিসম্মত সাজানো ঘর কখনো দেখিনি।

বাড়ীর মধ্যে কলতলায় মুখ ধুতে গিয়ে বিশ্বয় আরো বাড়লো। যেমন কলঘর, তেমনি উঠান, তেমনি বারান্দা, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বকবক তক্ততক্ত করছে। সিঁড়র পড়লে যেন খুঁটে তোলা যায়। এই সময় ভেতরের বারান্দাটার চোখ পড়তে চমকে উঠলুম চামেলী ফুলের শোভা দেখে। সারা গাছটা যেন সেই বারান্দাটিকে ঘিরে রেখেছে তিন দিক থেকে, ঠিক এরই মতন আর অসংখ্য ফুল সাদা হয়ে ফুটে আছে তার সর্ব্বাঙ্গে। সেদিনটা ছিল এমনি শুষ্কপঙ্কের রাত। শরতের মেঘহীন নীল আকাশ থেকে জ্যোৎস্না এসে বাড়ীর ভিতরের উঠানে ও সেই পুষ্পকুণ্ডটার মাতামাতি শুরু করেছিল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রাত তখন বোধ হয় সাড়ে বারোটা হবে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। পা টিপে টিপে পাশের কাচের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শিউরে উঠল সর্ব্বাঙ্গ! দেখি অগুরূ রূপবতী একটি তক্তগী নাচছে সেই চামেলীর কুঞ্জে, তার সর্ব্বাঙ্গে চামেলী ফুলের অলঙ্কার বলমল করছে। নাচতে নাচতে ক্রান্ত হয়ে সে বখন তার স্বামীর পায়ের ওপর তার দেহের সমস্ত রূপ-বোঁদ উজাড় করে দিতে গেল তখন তার স্বামী ঘুমে অচেতন। তক্তগীটি তখন তার পায়ের কাছে বসে নিঃশব্দে ফুল ফুল কাঁদতে লাগল।

পাছে আমি জেগে আছি জানতে পারে, তাই চুপি চুপি এসে আমার বিছানার ওয়ে পড়লুম। সাগা দিনের ক্রান্ত, বোধ হয় একটু পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এবার গভীর রাতে সেই তক্তগীটির কান্নার শব্দে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার স্বামীর কণ্ঠস্বর বেশ স্পষ্টই আমার কানে এলো—কেন তুমি বৈঠকখানা-ঘরে চুকেছিলে, সত্যি করে বলো, ও তোমার কে হয়?

মেরেটি কাঁদতে কাঁদতে বত বলে, আমি বাইনি, ওকে চিনি না, ও বিদেশী। ওর স্বামী বলে, মিথ্যা কথা। নইলে আমি ওকে আশ্রয় দিতে চাইনি, তুমি নিজে ওকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে কেন?

আন্তরিক আমার বুকটা কাঁপতে লাগল। সর্ব্বনাশ! বলে কি। আমার ঘরে এসেছিল তক্তগীটি! এর চেয়ে আর বড় মিথ্যা কি হতে পারে। ভাবতে ভাবতে বেই নিঃশব্দে পাশ ক্রিয়তে বাবো অমনি একটা চামেলী ফুলের মালা আমার হাতে ঠেকলো। আমার মাথার বালিশের পাশেই পড়ে ছিল। এই বৈঠকখানা-ঘরের মধ্যে নানা পাঞ্জে চামেলী ফুল সাজানো ছিল। আর তারি হৃগন্ধে সারা ঘর ছিল মদির হয়ে। কাজেই মাথার কাছেই ওই ফুলের মালায় যে এত গন্ধ, তা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারিনি। কোথা থেকে এলো এটা এখানে? চিন্তা করতে বাচ্ছি, এমন সময় তার স্বামীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো, আচ্ছ! সকাল হোক, তখন এর ফরশালা হবে, ওই ছোকরাকে ডেকে। দেখি তুমি কত বড় চতুর। তার পর চাবুক ঘেরে তোমাদের ছুঁজনের পিঠের ছালচামড়া এক করে দেবো।

এই শব্দত বলে বিপিন হঠাৎ খেমে গেল।

মহিলাটিও যেন কিসের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। তাই উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সহসা তিনি বলে উঠলেন, তার পর কি হ'লো?

বিপিন বললে, তার পর আর কি হবে? ভোর হবার আগেই দরজা খুলে একেবারে চম্পট! ঐ, বলতে ভুলে গেছি, সেই ফুলের মালাটা পকেটে করে।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, পাছে প্রহারেণ ধনজয়' হয় সেই ভয়ে নিশ্চয়? না হয় মারই যেতেন অমন মেয়ের জন্তে?

বিপিন বললে, শুধু মার কেন, মরে যেতেও রাজী ছিলাম তার জন্তে। কিন্তু আনার সামনে তার গায়ে কেউ হাত দেবে, আর তা দাঁড়িয়ে চোখে দেখতে হবে। তা ছিল কল্লনারও অতীত। বলে সহসা খেমে গেল বিপিন।

ওদিকে ভদ্রমহিলাও মুখের কথা কে যেন হরণ করে নিলে। তিনিও তেমনি ভাবে মৌন থেকে কখন যে নিজের ঘরে চলে গেলেন নিঃশব্দে, বিপিন তা জানতেও পারলেন না।

পরদিন থেকে ভদ্রমহিলা যেমন আর বিপিনের সামনে আসেন নি, তেমনি তারও প্রয়োজন হয়নি তাঁকে। বিপিন নিজের মনেই থাকে। বারান্দার বসে বসে কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখে থাকে গঙ্গার দিকে, কখনো বা ঘাটের সিঁড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে ঘরে ফেরে।

শেষ দিন। বিছানাপতর বেঁধে গাড়ী ডাকতে বাবার আগে বিপিন ঝিকে ডেকে না গেয়ে নিজের ঘরের চাবীটা ফিরিয়ে দিতে গেল ভেতরে। কিন্তু দরজা পেরিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে যেতেই সে শিউরে উঠলো। যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না। এ কেমন করে সম্ভব? ভদ্রমহিলা তখন ঠাকুরঘরে জপে বসেছিলেন। একেবারে হতভম্ব সেই চেহারা। সেই নিউ দিল্লীর কোয়ার্টারে দেখা মুগ্ধ চামেলীর ফুলে স্বসজ্জিতা অত্যাশ্চর্য্য মহিলা! একবার বিপিনের মনে হলো, না এ কিছুতেই হতে পারে না। এ তার মনের বিকার। সে স্বপ্ন দেখছে না ত? চোখটা হু'হাতে রগড়ে নিয়ে আবার চাইতেই, তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঠাকুরঘরের সামনের দেওয়ালটার ওপর। সেখানে যে বড় বাঁধানো ফটোটা হু'ছিল, সেটা দেখে নিমেষে তার সমস্ত সংসার দূর হয়ে গেল। ঐ, এ তবে সেই! চামেলীর অলঙ্কারে শোভিতা হয়ে তার স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের সেই লোকটিকেও চিনতে তার কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। তার স্বামীর সেট চেহারা হতভম্ব!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বিপিন কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে হইলো। তারপর প্রাথমিক ভাবে, না পালাই, এ মুখ কি করে দেখাবো তাঁকে? আবার পরক্ষণেই মনে হলো, না তার চেয়ে ঠেকে ডেকে ভাল করে বিদায়টা নেবে আচ্ছ! আর সেদিনের কথাটা মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করবে। সত্যি মালাটা কি করে ওর ঘরে এলো? তবে কি সত্যিই সেই? আর উচ্চারণ করতে পারলে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলে কিন্তু তবু কিছুতেই ভরসা পেলো না। কি জানি যদি বলে, না। তখন চোবের মত চুপি চুপি চাবীটা সেখানে রেখে পালিয়ে এলো।



অম্বন

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

KP 144-X52JBG



### সন্ধ্যা বলাক

প্রোগ্রামটা দেখতে দেখতে চমকে ওঠে পল্লব। আরে কার নাম দেখছে সে। এও কি সম্ভব? আরেক বার কাগজটা খুলে দেখতে থাকে। না ঠিকই আছে, শ্রীমতী সুরতপা বানার্জী। আজ-কালকার বিখ্যাত গায়িকা। হ্যাঁ, সুরতপাই একদিন তার জীবনে এসেছিল। একেই পাবার নেশায় পল্লব উদ্ভাস্ত হয়ে উঠেছিল। নিজের সব-কিছুকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুরতপাও কি তাই চেয়েছিল? মনে পড়ে যায় বিগত দশ বছর আগেকার কথা। স্মৃতির ছোঁড়া পাতার কয়েকটা টুকরো-টুকরো ঘটনা। বাকি আজও হুড়ে যেতে দেখনি পল্লব। করুণা দিয়ে বাকি ঝটিয়ে রেখেছে। ঠিক দশ বছর আগের এমন একটা দিন।

সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা। মাকে মাকে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ কি মনে হয়েছিল পল্লবের, গিয়েছিল গুজরাটের বাড়িতে। সুরতপা তখন গুজরাদের কাছে গান শিখছিল। কি একখানা যেন বাগপ্রধান গাইছিল। গলার কাজগুলো সেদিন পল্লবের কাছে অগুরূপে লেগেছিল। গান শেষ হলে গুজরাটী ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

পল্লব বলেছিল—“সত্যি, আপনি অদ্ভুত ভাল গান গাইতে পারেন।”

সুরতপা বলেছিল—“দেখুন, এ আপনার কিন্তু ভারী অভায়। এরকম ভাবে লজ্জা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?”

কি একটা উত্তর দিতে গিয়েছিল পল্লব। এমন সময় গুজরাটী তাকে গান ধরতে বলেছিলেন। আর সুরতপার কাছ থেকেও এ বিষয়ে এসেছিল একটা ছোট ভূমিরোধ। পল্লব সেদিন গান গেয়েছিল বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব এসে গিয়েছিল মনে। গান শেষ হলে সুরতপা তাকে তাদের বাড়িতে বাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

সেদিন বাড়ী ফিরে পল্লব যেন কেমন অন্তরমনস্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারেনি। বার বার সুরতপার কথা মনে পড়েছিল। এর পর কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছিল। পল্লব কিন্তু সুরতপাদের বাড়ী যেতে পারেনি। গুজরাটীর কাছে তখনেছিল যে, সুরতপার বাবা বিখ্যাত ব্যবসারী এবং অতুল ঐর্ষ্যের অধিকারী। আর সুরতপা তাঁর একমাত্র কন্যা।

নিজের দারিদ্র্যতার সন্তোষ বোধ করেছিল পল্লব, আর সেইটাই হয়েছিল সুরতপাদের বাড়ী বাবার পাথে বাধা।

সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে পল্লব যখন “কলেজ ছোড়ারের” সামনে ট্রাম ধরবার ভজ্ঞে অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ যেন কে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিল। পিছন ফিরে দেখে, সুরতপা। জিজ্ঞেস করেছিল পল্লব—“আরে আপনি এখানে?”

সুরতপা চোঁসে উত্তর দিয়েছিল—“একখাটা বিজ্ঞ আমায়ই জিজ্ঞাসা করার কথা।”

“ও, আমি, এই কলেজ থেকে বাড়ী ফিরব বলে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আপনি এখানে কেন, কই বলেন না তা?”

“না, আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছি। তা, ট্রাম ত এখন জীবণ ভাঁড়। আপনি যাবেন কি করে? চলে আসুন না আমার গাড়ীতে।” একসঙ্গে এই এতগুলো কথা বলেছিল সুরতপা। প্রথমে পল্লব আপত্তি করেছিল। কিন্তু সুরতপার আবেদনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি সে দিন। গাড়ীতে উঠে সুরতপা জিজ্ঞেস করেছিল—“আজ্ঞা, আপনাকে এত বার বলতেও, আপনি আমাদের বাড়ী যাননি কেন বলুন তা?”

একখার আর কি উত্তর দেবে পল্লব? বলেছিল—“না, ক’দিন একটা খিসিস লেখার খুব ব্যস্ত ছিলাম কি না, তাই সময় হয়ে ওঠেনি।”

সুরতপা বলেছিল—“ও, তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি বৃষ্টি আমাকে ভুলেই গেছেন।”

হঠাৎ যেন মনের সমস্ত ধোঁয়ার ঝড় ভেসে গিয়েছিল পল্লবের। মস্তমস্তের মত বলেছিল—“তোমাকে ভুললেও, তোমার গানকে কি ভুলতে পারি সুরতপা?” কথাটা বলে ফেলতে লজ্জায় অস্বস্তি হয়ে উঠেছিল পল্লব। আর ভালো করে সাধারণ গাড়ীতে কথা বলতে পারে নি। সব সময় কেবল মনে হয়েছিল যে তাঁর এই ব্যবহারে সুরতপা হতত কি মনে করল। কিন্তু তাঁর সমস্ত ভয়মান মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল, সুরতপা যখন তাকে টানতে টানতে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল।

পল্লব শুধু একবার প্রতিবাদ করে বলেছিল—“কারণ কি?” সুরতপার কাছ থেকে উত্তর এসেছিল—“দেখুনই না।”

সেদিন সুরতপার বাবা-মার সঙ্গে পল্লবের পরিচয়ও হয়েছিল।

দিন যেতে লাগল। পল্লব আর সুরতপার পরিচয়ও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। পল্লব সুরতপাকে নিতান্তনতুন ছন্দে আবিষ্কার করেছিল। সুরতপাও তখন নিজের অলসে পল্লবের কাছে ধরা দিয়েছিল, অদ্ভুত পল্লবের দৃষ্টিতে। কিন্তু পল্লব কি বুঝতে পেরেছিল যে, এই মেয়েটিরই মনের অতল কোণে ছুরি লুকিয়ে আছে? পল্লব তখন স্ট্রিট বেশাভেই ছিল বিভোর। কোন দিন সুরতপার কাছ থেকে কি পেল না পেল, সে নিয়ে ভাবে নি। পল্লবের এই স্ট্রিট জাল একদিন হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল আর তা থেকে সুরতপার স্বরূপটাও বুঝতে ভুল করেনি পল্লব।

সেদিনটার কথা আজও কণ্ঠে কণ্ঠে চকিত বিভ্রান্তের মত মনে পড়ে যায় পল্লবের। সেদিনটাও ছিল আজকের মত এক শীতের দিন। বিকেলের দিকে কয়েক কোঁটা বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা একটু বেশী মনে হচ্ছিল। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস সোঁ-সোঁ করে বইছিল। সকাল থেকেই পল্লবের মনটা ভাল ছিল না। তাঁর ওপর—

বিকেলের টিপটিপনি বৃষ্টি মনটাকে আরও বিগড়ে দিয়েছিল। মনের জড়তাকে কাটিয়ে স্ত্রতপাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল পল্লব। বাড়ীতে তখন স্ত্রতপা ছিল না। সে জন্ত স্ত্রতপার বাবার সঙ্গেই আলোচনার ব্যস্ত ছিল পল্লব। হঠাৎ আলোচনার মাঝে ছেঁব পড়েছিল স্ত্রতপার বাবার কথায়, “আরে, এসো, এসো। দীপক যে।”

এর পরে স্ত্রতপার বাবা দীপকের সঙ্গে পল্লবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে স্ত্রতপার মা কখন ঘরের মধ্যে এসে গিয়েছিলেন। পরিচয়ের সূত্রে তিনি পল্লবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দীপক হবে এ-বাড়ীর জামাই। আর ভাবী জামাই-এর বিত্তা, বুদ্ধি, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যেরও পরিচয় দিতে বাকি রাখেন নি। কিন্তু অত কথা তখন পল্লবের কানে যায়নি। একটা কাল আছে বলে স্ত্রতপার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল সেদিন। ওদের বাড়ীর গেটের কাছে স্ত্রতপার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল পল্লবের। মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল স্ত্রতপার মনের কথা জানতে। তাই বলেছিল স্ত্রতপাকে,—“তোমার মার কাছ থেকে দীপক বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের যে খবর পেলাম তা কি সত্যি?”

প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে স্ত্রতপা বলেছিল—“হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?”

পল্লব বলেছিল—“আজ আমি জানতে চাই স্ত্রতপা, ওটা কি তোমারও মনের কথা?”

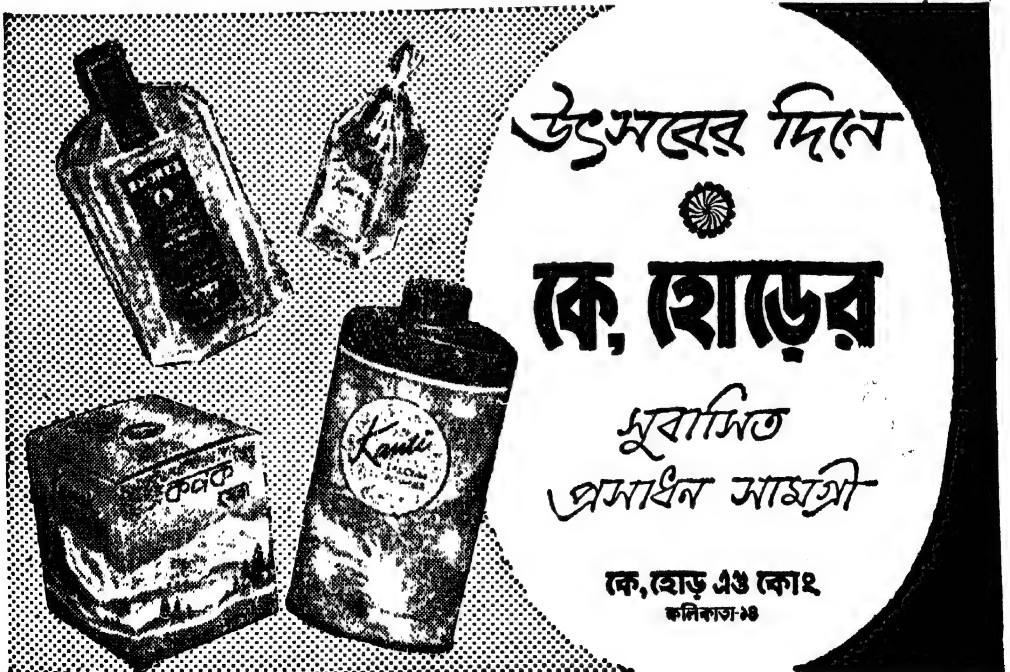
কৌতূহলের ছলে স্ত্রতপা বলেছিল—“বলি বলি হ্যাঁ।”

পল্লবের কিন্তু তখন মনের অবস্থা পরিহাস শোনার মত ছিল না। একটু দৃঢ় করেই বলেছিল—“তবে তুমি আমার সঙ্গে কেন এত দিন অভিনয় করে এসেছ স্ত্রতপা?”

এবার স্ত্রতপাও দৃঢ় স্বরে উত্তর করেছিল—“হ্যাঁ, অভিনয় বলতে পার বই কি। তোমাদের মত বোকাদের সঙ্গে একটু অভিনয়ই করতে হয়। যারা গরীবের ছেলে হয়ে বড়লোকের মেয়েকে পাবার আকাশ-কুসুম রচনা করে, তাদের সঙ্গে অভিনয় না করে উপায় কি? বাই হোক, আমার বিয়েতে আসছ ত’? একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাবে নিশ্চয়ই। বাই আমি এখন,” বলেই হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল স্ত্রতপা।

চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এসেছিল পল্লবের। মনে হয়েছিল পৃথিবীতে টাকাটাই যেন সব। ঋণ, ঋণ, সমস্তই টাকার প্রতিবন্ধিতায় ভুচ্ছ হয়ে যায়। সেদিনই সে প্রথম দারিদ্র্যাতার আঘাত পেয়েছিল।

হঠাৎ সোরগোলে পল্লবের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। চেয়ে দেখে ঠোঁড়ের ওপর স্ত্রতপা ব্যানার্জী। ভাবে, এই কি সেই স্ত্রতপা। বাক সে প্রথম দিনটিতে এমন ভাবেই গান গাইতে দেখেছিল? মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। তাই সবার অলক্ষ্যে হল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে পল্লব। স্ত্রতপা তখন গান ধরেছে। বাইরে শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। লক্ষ-কোটি যোজন দূরের তারতাল্প্রণী তারই দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে, যেন তার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনার তারাগু মুহূর্তমান।



উৎসবের দিনে

ক. হোডের

মুদ্রাস্থিত

প্রমাণিত সাক্ষ্য

কে. হোড এন্ড কোং

কলিকাতা-১৩



## ধনঞ্জয় বৈরাগী

ভক্তলোকটির সঙ্গে আলাপ হল এক যেক্ষরায়। শনিবারের দুপুর। অফিস থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, রাস্তার বিনয়ের সঙ্গে দেখা। কিছুতেই ছাড়ল না, খাবার ভঞ্জে এখানে ধরে নিয়ে এল। এ যেক্ষর! আমার অপরিচিত নয়, বিনয়ের সঙ্গে আগেও কয়েক বার এসেছি। ও বলে, এটা আমার ফেরিট জায়গা, সময় পেলেই এখানে আসি। ওর মুখে এত বার এই কথা শুনেছি যে এখন আর কারণ জিজ্ঞেস করি না। কয়েক বছর আগে বলতে গেলে এই যেক্ষর'ই ছিল বিনয়ের ঘর-বাড়ী। আর তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল চিতুলা, বিনয়ের ভাষায়, 'চিতুলা' নি গ্রেট। বিনয় বলত, চিতুলা' সকালে উঠে 'বায়ার' দিয়ে পাত মাছে, হুইকিতে চান করে, সারা বাড়ী গলজালের মত কক্টেল ছড়ায়।

ভক্তলোকটির কথা এত শুনেছি যে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। আজ এখানেই দেখা হয়ে গেল। ছিমছাম শরীর, স্নায়ব শাফ-পোষাক, রঙ ফরসা না হলেও চোখে-মুখে সেয়ানা হাসির ঝিলিক। বিনয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই বললেন, খবরদার! বিনয়ের সঙ্গে বেশী মিশবেন না, একেবারে বকিরে ছেড়ে দেবে।

উত্তর দেবার কিছুই ছিল না, আমি হাসলাম।

চিতুলা' বলে যান, বিনয় একটি টাক্সি, আরে মশাই, আমার মত এক সব ভ্রাঙ্কণকে গোলায় দিলে। সদস্যদের যে কি জিনিষ জানেন না, কি বল বিনয়, তুমি আমার সঙ্গে একমত নও?

বিনয়ের গোল মুখ চেপে ওঠে, একশ' বার। একটা চোখ ছোট করে বলে, সদস্যদের যে কি জিনিষ, আমি আর জানি না?

কথাটা শুনেই চিতুলা'র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে কত কথাই মনে পড়ে যায়। কে একজন ভক্তলোক যেন বলেছিলেন 'টুথ ইজ, ট্রেজার জান কিরসান।' খুব বাঁচি কথা। হাতের ঘড়ি উটে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলেন, আমি চলি বিনয়, একটু কাজ আছে।

চিতুলা' চলে গেলে বিনয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিজের সর্বনাশ নিজে করেছে, মদ আর মদ।

বললাম, ওর কথা একটু খুলে বল না?

—খুলে বলার তো কিছু নেই। বড়বরের ছেলে, ভাল ভাবে এম, এ পাশ করে বেক্স। পয়সার লোভে চাকরী নিলে নায়করা হোটেল 'বার'এ। ক্রমে হল 'বার' ম্যানেজার, মাইনে 'ছ' টাকার ওপর। ডিউটি বিকেল ছ'টা থেকে রাত দুটো, দিনের বেলা ছুটি।

জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ীতে আপত্তি ওঠে নি?

—কে আপত্তি করবে? বাপ-মা ছিল না। বাড়ী ছেড়ে অফিসেই পড়ে থাকত। অফিস-ঘরেরই অর্ধেকটা পার্টিশান দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে কক্ষিমের আলাপ?

বিনয় সিগারেট ধরিয়ে বলতে শুরু করে, তা বেশ কয়েক বছর। এক বছর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে চিতুর গাইক ইঞ্জিওর করতে গিয়েছিলাম। বেশ মনে আছে ওর টেবিলের সামনে গিয়ে বললাম তখন সন্ধ্যা সাতটা। চিঠি পড়েই জিজ্ঞেস করলে, কত টাকার ইঞ্জিওর করতে হবে? ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন শুনব আশা করিনি। বললাম, আপনার যত খুশী। চিঠি বললে, তাহলে তের হাজার করুন।

—তবে হাজার কেন? ঐ নথরটার ওপর আমার দুর্বলতা আছে। আমি বোঝ তের বোতল বায়ার খাই, তের পেগ হুইকি, তের ঘণ্টা কাজ করি।

কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। পরদিনই মেডিক্যাল একজামিনেশন করিয়ে চেক লিখে দিলে প্রিমিয়ারের। বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন, আপনার কিছু কেসু করিয়ে দেব।

সেই থেকে প্রায়ই যেতাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোক ধরে ধরে প্রায় পকাশ হাজার টাকার লাইফ ইঞ্জিওর করিয়ে দিল। আমি বলেছিলাম কমিশান বাবদ কিছু নিতে, তাও এক পরশা নেয়নি। আমার বায়ার খাওয়ার হাতেখড়ি ওর কাছে, পরশা লাগত না, বলে বলে দিখা গল্প করতাম। জোর করে বায়ারের গ্রাস হাতে ধরিয়ে দিত। কত দিন রাতে চিতুলা'র সঙ্গে নাইট ক্লাবে গেছি, লিগুসে স্ট্রিট, সর্ট স্ট্রিট সব জায়গায়। কলকাতার কত নামজাদা মক্কেলকে মাতাল হয়ে ছেলেমানুষি করতে দেখেছি, কত সন্ধ্যান্ত ভারতীয়কে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের কোমর ধরে নাচতে দেখেছি। চিতুলা' নেশার ঝোঁকে বলত, এবার সব হোমরা-চোমরা, দূর দূর যত সব নন্দমার পোকা। এই সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, চিতুলা'র পচিরে বাতের কলকাতার সঙ্গে, দিনের বেলায় কলকাতাকে সে চিন্ত না। নামজাদা লোকের মত অবস্থাটাই সে দেখেছে, তাদেরও যে একটা কাজের ভাবন আছে তা চিতুর কাছে বোধ হয় অজানাই রয়ে গেল! ও ভাবতো সবাই মাতাল, সবাই চরিত্রহীন। মদ খাওয়া আর মেয়েদের পেছনে ছোটা এইটাই জীবন ধারণের উদ্দেশ্য।

এক দিন ওর সঙ্গে বলে আছি, কার টেলিফোন এল। চিতুলা' চাপা গলায় রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। বুজলাম, নারী ঘটিত ব্যাপার। কান খাড়া করে রইলাম, ফোন শেষ করে বললে, চল হে, অভিদানে যাওয়া থাক।

বিনয় চায়ের পেয়ালায় ঘন ঘন কয়েক বার চুমুক দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, বেশ রাত্রি করে আমরা ট্যাক্সীতে বেরলাম। ফিরিঙ্গি পাড়ায় গাড়ী থামিয়ে ডাইভারকে দিয়ে এক তোড়া রজনীগন্ধা ওপরে পাঠিয়ে দিলাম। অল্প পরে একটি মেয়ে নেমে আসে, সাদা ব্লাউজ, সিঙ্কের সালা শাড়ী পরা, বব, চুল। একটা আহা-মরি চেহারা কিছু নয়। চিতুলা' আলাপ করিয়ে দিল, তার নাম মিসু বোসু। সেদিন আমরা একসঙ্গে হোটেল থেকে যে বার বাড়ী ফিরেছি।

বিনয় আর একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে টান দেয়, এর পর থেকে মিসু বোসুকে চিতুলা'র সঙ্গে প্রায়ই দেখেছি। ভক্তমহিলা সব সময় হুইকি খেতেন। একদিন আমাকে জোর করে ধরলেন, হুইকি খেতেই হবে। হাত জোড় করে বললাম, মাপ করবেন, আমি খাই না। মিসু বোসু ছাড়েন না, তাও কখনও হয়, চিতুর বন্ধু আপনি হুইকি খাবেন না?

সেদিন চিত্রদা' আর মিস্ বোস জোব করে আমার হুইকি খাইয়ে গিল।

বিনয় কথা বলতে বলতে অস্বাভাবিক হয়ে যায়, বোম্ব হয় আগের দিনের কথা ভাবছিল। নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিস্ বোস মেয়েটি কি রকম?

বিনয় চোট ওঠায়, কি জানি, গোড়ার দিন থেকেই মেয়েটাকে আমার বিবী লাগে। মনে হয়, বাজারের রন্ধি জিনিষ। চিত্রদা' যে কি করে ওর সঙ্গে ভিড়ল তা আমি এখনও বুঝতে পারি না। দু'জনেই মাতলামী করত, মদ ছাড়া এক মিনিট চলত না। এক দিন নেশার ঝোঁকে চিত্রদা' মিস বোসকে বসছিল আমি শুনে ফেলি, তোমার ডাক্তারটিকে ছাড়ো। মিস্ বোস উত্তর দেয়, আমি তো ছাড়তে চাই, সেই তো চায় না।

পরে জানতে পারি মেয়েটি নার্স, কোন এক ডাক্তারের কাছে কাজ করে। চিত্রদা' ওকে ছিনিয়ে আনতে চায়। বাস্তব পর বাস্তবতার এখানে সেখানে কাটাত। চিত্রদা' প্রায়ই মিস্ বোসকে বলত শুনেছি, তুমি চল এস, আমার সঙ্গে থাকো। তোমার জন্তে আমি আগাশা হাট নিয়েছি। তুমি না এসে আমি বাঁচব না।

তারপর সত্যি সত্যিই মিস্ বোস একদিন এসে উঠল চিত্রদা'র হাট, আর গেল না। এর পরের ইতিহাস বড় ট্রাজিক্। চিত্রদা'র জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কত দিন দুঃখ করে বলেছে, বিনয়, আমি নিজের পায়ে কুড়ল মেরেছি, একটা বেলাকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। ও মিস্ বোস না হাতী, দু'ছেলের মা, ছেলেগুলো পঞ্চাশ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সাত কুলের গুটিবর্গ নিয়ে হাজির, আমার সর্বনাশ না করে যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি অবস্থা?

বিনয় গলা পরিষ্কার করে বলে, ওর হাতে এখন এমন পয়সা নেই যে ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়, পুরান পলিসিটাও নষ্ট হয়ে গেল। বেচারী চিত্রদা', মিস্ বোস ওকে শুয়ে নিয়েছে।

বিল চুকিয়ে দিয়ে বিনয় উঠে পাড়ায়, চল এবার বাওয়া বাক, দেখি যদি কোথাও সিনেমার টিকিট পাওয়া যায়।

বললাম, চিত্রদা'র কথা শুনেতে কিছু বেশ লাগছিল।

বিনয় হো-হা করে হাসে, এ ধরনের লোকের সঙ্গে বেশী মেশনি বলে তাই বলছি, ওরা সব সমান।

বিনয়ের কাছে চিত্রদা'র বিষয় শুনে অবধি ওর কথা আরও জ্বাতে ইচ্ছে করত। কিন্তু স্থবির হয়ে না। অনেকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, কেউই বিশেষ কিছু বলতে পারে না। মাস দুয়েক বাদে চিত্রদা'র বিষয় আরও কিছু শোনার সুযোগ ঘটে গেল মনোব্রজনের ইন্টিভেট, মনোব্রজনের সঙ্গে খুলে পড়েছি, তারপর অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি। সম্প্রতি কলকাতার ফিরতে কোন খুল ছবি আঁকা দেখানোর কাজ নিয়ে। বাসীগঞ্জে একখানা বড় ঘরে ওর ইন্টিভেট আর থাকার জায়গা দুই-ই। সন্ধ্যার দিকে সময় পেলে ওর কাছ বাই। মনোব্রজনকে ভাল লাগে এই জন্তে যে ও সত্যিকারের শিল্পী, ছবি আঁকা বিলাসিতা নয়। কত দিন দেখেছি মনোব্রজন তদন্ত হয়ে কানভাসের ওপর বড় চড়িয়ে বাচ্ছে, আমি যে ঘরে বসে, সে খেলাও নেই।

আজ কিন্তু মনোব্রজনের কাছে সে রকম মন ছিল না, একটা

পুগান পোয়েট নেড়ে নেড়ে দেখছিল। কি মনে করে জিজ্ঞেস করলে, একে কোথাও দেখেছ?

ছবিটা দেখে আশ্চর্য হলাম, এ তো চিত্রদা'!

মনোব্রজন ততো গলায় বলে, এক নম্বর মাতাল, খাল্লাবাজ, মিথ্যাবাদী।

মনোব্রজনের কাছ থেকে কথা শোনার জন্তে ইচ্ছে করে বললাম, দেখে কিছু তা মনে হয় না। যখন লোকটার ছবি আঁকি বুঝতেই পাগিনি ও এমন একটা লোকায়। ঐ সোফায় বসিয়ে ওর পোয়েট করেছিলাম।

—তোমার সঙ্গে ক'দিনের আলাপ?

—অনেক দিনের।

মনোব্রজন উঠে এসে আমার পাশে বসে, চিত্রকে এখন চেনো, মিস বোসের কথা শুনেছ নিশ্চয়? ওর পিসতুতো বোন লীনা আমার কাছে ছবি আঁকা শিখত। তখন থেকে ওদের সঙ্গে আলাপ।

—এদের বেশ কোথায়?

—ঠিক বলতে পারব না। মিস বোসকে আমি চিনতাম মিসেস ঘোষ হিসেবে। ওর স্বামী মফঃস্বলে বড় কাজ করতেন। সেখানে মিসেস ঘোষের মন ট'কলো না। বিবাহিত জীবন পাঁচ বছর কাটিয়ে স্বামীকে ছুটি পুত্র উপহার দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তার পর থেকে কুমারী পদবী বললে মিস বোস ব্যবহার করতেন।

মনোব্রজন চশমা মুছতে মুছতে বলে, ভ্রমমহিলা নার্সিং জানতেন। এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রাইভেট নার্সিং-হোম খোলেন নিজের বাড়িতে। ঐখানেই চিত্রের সঙ্গে আলাপ। ও গিয়েছিল ঐ নার্সিং-হোমে চিকিৎসার জন্তে। এর পর মিস বোস চিত্রকে নিয়ে আমার ইন্টিভেটে মাঝে মাঝে আসতেন। লোকটাকে দেখেই আমার বিরক্তি জন্মায়, পয়সার দোমাক, প্রচণ্ড মাতাল। কথায় কথায় বড় বড় চাল মারে। কি জানি, আমার মনে হ'ত ও একটা বাফুন।

মনোব্রজনকে বাণা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিস বোসকে কি রকম মনে হত?

—ভ্রমমহিলা সাধারণের বাইরে। খুব স্মার্ট, বাড়ীর বউ হবার জন্তে তার জন্ম নয়। তার স্বামী একটা অপদার্থ, তাকে ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এখানে ফিরে এসে নার্সিং করতেন মহৎ কাজ বলই।

—শুনেছি উনি পান করতেন খুব বেশী?

—হ্যাঁ, প্রথমে পান করতে শুরু করেন চিত্রকে 'কম্প্যানী' দেবার জন্তে। মদ না খেয়ে চিত্র এক মিনিট থাকতে পারত না, তাই মিস বোস দেখলেন যে চিত্রকে এ বাণাশের 'কম্প্যানী' দিতে না পারলে মাতাল বন্ধুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। তা ছাড়া খানিকটা ভোলবার জন্তেও বটে, হাজার হোক, হিঁদুর মেয়ে স্বামী ত্যাগ করাটা তো খুব সুখের নয়। সাতা দিন কাজ নিয়ে ভুলে থাকতেন, সন্ধ্যার পর মদ খেয়ে। একটু চুপ করে থেকে মনোব্রজন আগায় বলে, চিত্রকে অধ্যাপন্যের হাত থেকে বাদি কেউ বাঁচিয়ে থাকে তো সে মিস বোস। কতকগুলো সুবিধাবাদী বন্ধু,



বিনয়, প্রোক্ত, কেউ বাধা বাধা না। সখাই গেছে চিত্তকে তব  
নেবার জন্তে। তাদের হাত থেকে মিস বোস ওকে বাঁচিয়েছে।

—কি বলছ?

—ঠিক কথাই। মিস বোস চিত্তকে ভালবাসে। আমার  
মনে আছে একদিন ঈর্ষিত্ত চোঁচামিচি। মিস বোস বলছে,  
চিত্ত, যদি নিজের ভাল চাও, বদ সঙ্গ ত্যাগ কর। চিত্ত বললে,  
তারা আমার বন্ধু।

—তুখু আড্ডা মারলেই বন্ধু হয় না। তোমার কাছে ওরা  
মজা দূরতে আসে, কেন ওদের প্রেরণ লাগে?

কথার কথার চিত্ত হঠাৎ ক্ষেপে গেল, বললে, স্ববন্দীর, আমার  
বন্ধুদের নামে যাঁতা বলবে না।

মিস বোস জোর দিয়ে বললেন, এক শ' বার বলব, সত্যি কথা  
বলতে আমি ভয় পাই না।

চিত্তুর কি বিক্ৰী রাগ, উঠে গিয়ে দমাম মারতে শুরু করলে  
মিস বোসকে। আমি তো অবাক! লোকটাকে জানোয়ার মনে  
হল। কাছে গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম, আমার থাকার চিত্ত মেঝেতে  
পড়ে গিয়েছিল। তুললে আশ্চর্য্য হবে, অত মার খেয়েও মিস বোস  
হটে গিয়ে চিত্তকে উঠতে সাহায্য করে। আমার ওপর রাগ করে  
কোন কথা না বলে, চিত্তকে নিয়ে ঈর্ষিও থেকে বেরিয়ে গেল।

মনোরঞ্জন সামনের চেয়ারে পা' দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসে,  
মিসু বোসের ভালবাসা যে কতখানি খাঁটি তার প্রমাণ পেলাম সে  
বখন নার্সিং ডাক্তারী, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চিত্তুর সঙ্গে থাকতে লাগল।  
আগের পক্ষের ছেলে দু'টিও এখন মিসু বোসের কাছেই থাকে।

ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু ওদের মিলিত জীবনও তো  
কেনেছি সুখের হয় নি, মনোরঞ্জন কৌশল করে ওঠে, সে তো চিত্তুর  
জন্তে। একটা জানোয়ার, এখনও দেখেছি কত সময় মিসু বোসের  
ওপর অত্যাচার করে। মিসু বোস মুখ বুজে সব সহ করে।  
এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত অপমান সহ করে পড়ে  
আছেন কেন?

মিসু বোস উত্তর দিল, আমি ছাড়া চিত্তুর আর কে আছে?

বললাম, ও তো একটা অমাহুষ।

যত দিন না ওর মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনছি আমার ছুটি নেই।

সেই দিনই ব্রতে পেরেছিলাম মিসু বোস কত গভীর ভাবে  
চিত্তকে ভালবেসেছে।

মনোরঞ্জন ঈর্ষিও থেকে বেরিয়ে চিত্তুর'র কথাই ভাবছিলাম।  
কি আশ্চর্য্য, দু'জনে হ'রকম ছবি আঁকল, যদিও বস্তব্য একই—  
চিত্তুরা স্ত্রী হয়নি। কিন্তু তার জন্তে দারী কে? সেইটা বোঝাই  
শক্ত। আমার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এর পর প্রায়ই যেতাম  
সেই রেষ্টুরায়, চিত্তুর'র সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়।

এক দিন দেখা হয়ে গেল। চিত্তুর'র একলা বলে এক কোণার  
টেবিলে চা খাচ্ছিলেন। আমি সোজা টেবিলের কাছে এসিয়ে  
গেলাম। পরিচয় দিয়ে বললাম, চিনতে পারছেন না বোধ হয়?  
বিনয় এক দিন এখানেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

চিত্তুর'র হাসেন, মনে আছে বই কি, বরুন।

বললাম, হু'চারটে মাফুলী কথাবার্তা। চিত্তুর'র জিজ্ঞেস করলেন,  
বিনয়কে অনেক দিন দেখিনি। ওর খবর কি?

ওকে বাড়ী পাঠানান হচ্ছে, সেই নিয়ে একটু খামেলায় আছে।  
ওদের সম্পত্তি তো কম নয়।

চিত্তুর'র হাসেন, সে আমি জানি। বরাবর ওর কাছে শুনি  
ভাইদের সঙ্গে চাটলাচি সেগেই আছে। সম্পত্তি না থাকাই  
ভাল যে ভাই, যত নষ্টের মূল এখানে।

বললাম, আমি ওসব বুঝি না। না আছে হু'পরদার সম্পত্তি  
যে তাই নিয়ে মাথা ঘামাব।

সেদিন চিত্তুর'র আমাকে কিছুতেই পরদা দিতে দিলেন না।  
বিল মেটাসেন নিজে। উঠে পাড়িয়ে বললেন, আমি বিনয়ের কাছে  
থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলাম। ইউনিভার্সিটির নামকরা  
ইন্ডেন্ট, তার ওপর এই রকম 'ম্যাট', ইচ্ছে করলেই ভাল কিছু করতে  
পারত।

—কেন, ও ত ভাল বোজগার করে?

—বোজগারটা কি সব?

আশ্চর্য্য হ'লাম, চিত্তুর'র মুখ থেকে ঠিক এধরণের কথা শুনি  
আশা করিনি। উনি আবও বললেন, বিনয় এম, এ পরীক্ষাই দিল  
না এই ভয়ে, পাছে ও সেকেণ্ড হয়ে যায়। বড় বড় কোম্পানীতে  
চাকরী পেল, এক জায়গাতেও টিকে থাকল না। এখন ইন্ডিওরেন্সে  
কাজ করে, সেও একরকম সুখের জন্তে।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেন?

—সেটা তো আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। বলেই হাতুতে  
হাতুতে হাত তুলে নমস্কার করে চিত্তুর'র চলে গেলেন।

বিনয় সম্বন্ধে ঠিক এ ভাবে কোন দিন আমি ভাবিনি। মনে  
হল চিত্তুর'র ঠিকই বলেছেন, ইচ্ছে করলে বিনয় সত্যিই অনেক বড়  
হতে পারত। কিন্তু কেন পারল না, সে প্রশ্নের উত্তরও বুঝে  
পাই না।

কিন্তু দিন দশক বাদে বিনয় যেদিন আমার কাছে এসে বললে,  
তার নামে ভাইপোরা কেশু করেছে, সম্পত্তির বখরা নিয়ে, একটা  
স্পষ্ট বুঝলাম আর যাই থাক বিনয়ের জীবনে শান্তি নেই।  
সেদিন কথাগুলো বলেও ছিলাম, ভাইপোরা যা চাইছে দিয়ে দে না,  
ঝামেলা মিটে যাবে।

বিনয় কৌশল করে উঠল, হতভাগাদের খাইয়ে-পরিয়ে মাহুষ  
করিনি, সে পরদা দেবে কে?

—আহা নিজেরই ভাইপো তো?

—ওসব বাজে কথা রাখ, ছোঁড়াগুলোর মামা একেব নম্বর  
শয়তান। মামলাবাজ। আমার শেছনে লাগার মতলব। এই  
তালে নিজে কিছু গুছিয়ে নেবে। আমিও দেখে নেব, এক ইঞ্চি  
জায়গা ছাড়ব না—

কথা হল আরও অনেক বিষয় নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম,  
বৌদিদের সব খবর ভাল তো?

বিনয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ওর তো বারমাসে অন্তর। আন্ত-  
কালকার মেয়েদের অন্তর করাটাও ফ্যাগান। কত রকম ওখু,  
ডাক্তার, বড়, সেগেই আছে। আঁসিসু না এক দিন—

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, বাব।

বিনয়কে কথা দিলেও অনেক দিন যেতে পারিনি, নিজের  
কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এক শনিবার ঠিক করলাম, অফিসের



পর ভাড়াভাড়ি করে সোজা বিনয়ের বাড়ীতেই বাব, এমন সময় মনোরঞ্জন এসে হাজির। উকো-খুকো চুল, চোখের তলায় কালী পড়েছে। জিজ্ঞাস্য কথলাম, কি হয়েছে, শরীর খারাপ না কি?

—না, কিছু টাকার দরকার।

—হঠাৎ?

—ঠিক করেছি এখান থেকে চলে যাব, বাঙ্গালোরে একটা কাজ পেয়েছি।

উঃসাহ নিয়ে বলি, সে তো ভাল কথা।

মনোরঞ্জন নীরস গলায় বলে, ভাল কিছু নয়। ক'লকাতায় বসে বসে বিরক্তি ধরে গেছে। আমার শ' দুই টাকা দিতে হবে।

—কবে?

—আজ, কাল। বত শীত সস্তর। আমি কতগুলো ছবি তোর বাসায় নিয়ে যাব। একটু চেষ্টা করলেই বিক্রী করে টাকাটা তুলে নিতে পারবি।

ওর কথা মত টাকা দিয়ে দিলাম, ষ্টুডিওর ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছি?

—ক'লকাতায় আর কোন পাট রাখব না।

পিঠ চাপড়ে বললাম, এবার বিয়ে-খা কর।

মনোরঞ্জন হালকা হাসে, সত্যিকারের আটিষ্ট কখনও বিয়ে করে না। অনেক ধনুবাদ, ভাবছি কালই চলে যাব।

মনোরঞ্জনকে বিদায় দিয়ে বিনয়ের বাড়ী যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিনয় বাড়ী ছিল না, বৌদির সঙ্গেই দেখা হল। চূপ করে ইঞ্জিনেরো শব্দ ছিলেন, আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছেন। আমার লেখে ধূনী হয়ে উঠলেন, কি, পথ ভুলে না কি?

কৈফিয়ৎ দিয়ে বললাম, নানা কাজে আসতে পারিনি। বিনয়ের কাছে অবশ্য সব খবর পাই, ও কোথায় গেল?

বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কোথায় আর, উকীলের বাড়ী।

চূপ করে রইলাম। বৌদি বলে যান, সকাল নেই সন্ধ্যা নেই উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। একটার পর একটা মকদ্দমা—

—আপনি কিছু বলেন না কেন?

—আমার কথা কে শুনবে ভাই! গরীবের ঘরের মেয়ে, বিবয় আশর কিছুই বুঝি না—

বৌদির কথার সুরটা মনে লাগল। জিজ্ঞাস করলাম, শরীরটা ভেঙ্গে ফেললেন কি করে?

স্নান হেসে বলেন, শরীর নিয়ে আর কি করব? মনটাটাই যে ভেঙ্গে পড়েছে। চিরকাল পাঁচজনকে মিলে-মিশে খেয়েছি, এই বগড়া খাটি মারামারি আর ভাল লাগে না।

প্রায় ষষ্ঠাধানেক বলে খেতেও বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল না। উঠে পড়লাম, আজ তাহলে আসি বৌদি!

বৌদি স্নান হাসেন, এসো ভাই মাঝে মাঝে। বড় একলা, কথা বলারও লোক পাই না।

বৌদির জন্তে দুঃখ হল। তারী মন নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে সদর দরজায় বিনয়ের সঙ্গে দেখা, প্রকৃতিস্থ নয় মোটেই। জিজ্ঞাস করলাম, এত দেরী যে?

জড়ানো গলায় উত্তর দিলে, কি করবে, কত কাজ!

—বৌদির এরকম শরীর খারাপ, একলাটি বাড়ীতে রয়েছেন।

বিনয় ক্রমে গুটে, আমি কি করব? কয় বৌ নিয়ে আর ঈহাতক দিন কাটানো যায়? আমিও তো একটা মানুষ।

বিনয় টলতে টলতে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যায়।

পরদিন সিনেমা থেকে বেরিয়ে চিতুদার সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা। উনি লোকান থেকে কিছু কিনে কিসিছিলেন। বললেন, অনেক দিন পরে দেখা, খবর সব ভাল তো?

মাথা নেড়ে সাহ দিলাম।

—কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, বাড়ী যাব।

—যদি না ভাড়া থাকে চলুন না আমার ফ্লাটে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাস করলাম, কত দূর?

—এই তো, পাশের রাস্তায়।

কিরীন্দী-পাড়ার দোস্তলার ফ্লাটে চিতুদার আমাকে এক রকম জোর করেই নিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে বসিয়ে হাতের জিনিষগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে চার দিক দেখি। সোফাসেটগুলো সবানো দরকার, দেয়ালে ডিস্টেন্সপার ময়লা হয়েছে, কার্পেটটাও বদলালে ভাল হয়। মিস্ বোসের কথা ভাবতেই মনে মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করি। আর বাই হোক, বিনয় আর মনোরঞ্জনের কাছে তাঁর বিষয় যা শুনেছি তা মোটেই প্রীতিজনক নয়।

খানিক বাদেই চিতুদার এক ভদ্রমহিলাকে এনে দ্বী বলে আলাপ করিয়ে দিলেন। বুঝলাম, ইনিই মিস্ বোস। হাত তুলে নমস্কার করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো আগে দেখিনি। বললাম, না, চিতুদার সঙ্গে আমার আলাপ বেশী দিনের নয়।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



• কলমে প্রস্তুত  
• স্ট্রমে সেকা  
• মোসিনে প্যাক  
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃষ্ণা  
ও সন্তোষ রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী  
কলিকাতা - ২৯

চিহ্না' আমার পরিচয় দিয়ে বলেন, বিনয়ের বিশেষ বন্ধু।

মিস বোস উৎসাহিত হ'ল, তাই না কি? কই বিনয় বাবু তো আশ-কাল মোটেই আসেন না!

বললাম, মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে ভা-বেচারি বড় খামেলার আছে।

কথায় কথায় আলাপ বেশ জমে উঠল। এক সময় উঠে গিয়ে মিস বোস ছেলের ঘরে ঢেকে আনেন, এটি আমার বড় ছেলে, জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ দিয়েছে। আর এটি ছোট, দু'জনেই এক তুলে পড়ে।

চিহ্না' আমার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে, ছোট ছেলেকে দেখিয়ে বলেন, সানি খুব ভাল 'মাইথ অরগ্যান' বাজায়। দেখি তোমার আঙ্কলকে শুনিবে নাও তো—

ছেলেটির ব্যবহারে এতটুকু আড়ম্বর নেই। প্যাণ্টের পকেট থেকে 'মাইথ অরগ্যান' বার করে কি একটা স্কিমের সুর বাজিয়ে দিলে। সকলের সঙ্গে আমিও বাহবা দিয়ে হাততালি দিলাম। বাঃ, বেশ বাজায় তো!

বড় ছেলেটি ভাইয়ের বাহাদুরীতে নিজেই এগিয়ে আসে, ড্যাড, আমি সেই রেসিটেশনটা শোনাও?

চিহ্না' সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয়। 'হি রিসাইটস ভেরী ওয়েল'।

ছেলেটি ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়।

মিস বোস বলেন, লীনা আসছে না কেন, ডেকে এলাম। সানি, বাও তো মাসীকে ধরে নিয়ে এস। সানির বাবার দরকার হ'ল না। লীনা এসে ঘরে ঢোকে, সুশ্রী তরুণী। আমার দেখে হাত তুলে নমস্কার করে। মিস বোস আলাপ করিয়ে দেন, আমার পিসতুতো বোন, খুব ভাল ছবি আঁকে। ঘরের কোণে টাঙানো অয়েল পেণ্টিং দেখিয়া বলেন, এটা ওর আঁকা।

ঘর থেকে দেখেই প্রশংসা করলাম, কার কাছে আঁকা শেখেন?

চিহ্না' উত্তর দেন, তুমি চিনবে বোধ হয়, মনোরঞ্জন, বিনয়ের বন্ধু—

—বললাম, চিনি বই কি, তুলে একসঙ্গে পড়তাম যে—

—তাই না কি? মিস বোস উৎসাহ হয়ে ওঠেন, তাহলে তো সুখবরটা এখনই দেওয়া উচিত।

লীনা সলজ্জ হাতে বাধা দেয়, আঃ দিদি, তুমি আর সারপ্রাইজটা রাখতে দেবে না দেখছি।

—আহা, উনি তো মনোরঞ্জনের বন্ধু, বলতে আপত্তি কি?

চিহ্না' কথাটা পরিষ্কার করে দেন, আমার গালিকার সঙ্গে মনোরঞ্জনের বিয়ে।

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না, আমার বলে নি তো। লীনাকে উদ্বেগ করে বলি, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন'। এই ক' ঘটনার আলাপে তুলে গিয়েছিলাম, এদের সঙ্গে আজই পরিচয় হয়েছে। চিহ্না', মিস বোস, লীনা আর ছেলে দু'টি সবাই-এর মধ্যে আমিও মিশে গিয়েছিলাম। মনোরঞ্জনের কথা উঠতেই কেমন যেন খটকা লাগে। আর বসতে পারলাম না, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সারা রাত্তা ভাবি, মনোরঞ্জন কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করল? কিন্তু আজ সকালেও বাড়ীতে ছবিগুলো দিয়ে বাবার সময় বলে গেল, রাজ্জের ট্রেনেই সে চলে যাবে। মনোরঞ্জনের ট্রিভির সামনে গিয়ে দেখি, দরজার তালবন্ধ। ঘরে একটা ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাছে এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, মনোরঞ্জনই, হালপাখ তুলে পাড়িতে উঠে

বসেছে। পাশে একটি মেয়ে। আমাকে দেখে ভাড়াভাড়া নেবে এল, হঠাৎ এ সময়? আমি তো ট্রেনে বাছি।

সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, শুনিছ লীনার সঙ্গে তোর বিয়ে? কই আমাকে বলিস নি তো?

মনোরঞ্জন চমকে ওঠে, কে বললে একথা?

—সে যেই বলুক, সত্যি কি না?

মনোরঞ্জন উণ্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমি তো বলেছি শিল্পীরা কখনও বিয়ে করে না।

তোতো গলার জিজ্ঞেস করলাম, ট্যাক্সীতে ও মেয়েটি কে?

—আমার সঙ্গে বাজারের যাচ্ছে।

—তার মানে?

মনোরঞ্জন ট্যাক্সীতে উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলে, এখন এ আমার ইন্‌শিরেশন।

আমার কথা বলার আগেই ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়; লীনার হাতোজ্জল মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বাড়ী ফিরে ঘুমুতে পারলাম না। একে একে মনে পড়ছে মিস বোস সন্ধে বিনয়ের বিজ্ঞপত্ৰা গল্প। চিহ্না'র প্রতি মনোরঞ্জনের কুৎসিত ইঙ্গিত। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে বৌদির বার্ষিক জীবনের অনুশোচনা, বিনয়ের অশান্তি ভরা দল্ল। মনোরঞ্জন পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে থেকে পালাবে কি করে?

বেচারি লীনা! মনোরঞ্জনকে সে নিশ্চয় ভালবেসেছে। কষ্ট পাবে। তবে এই সাধনা—তাকে বিয়ে করে সারাজীবন দুর্ভোগ সহ করতে হবে না।

পরদিন চিহ্না'র সঙ্গে দেখা করলাম 'বারে' গিয়ে। একদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখে খুশী হয়ে বলেন, আসুন এ কোণে গিয়ে বস।

দু'জনে বসলাম। নিজে থেকেই কথা পাড়লাম, জানি না শুনেছেন কি না, মনোরঞ্জন কাউকে না জানিয়ে কলকাতা থেকে চলে গেছে।

—তাই না কি, হয়তো কোন কাজে বেরিয়েছে।

সব কথা খুলে বললাম, শুধু ট্যাক্সীর মেয়েটির কথা বাদ দিয়ে। চিহ্না' হেসে বলেন, ও আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। নিশ্চয় বাজারের ভাল কাজ পেয়েছে, লীনাকে বোধ হয় ওখানেই নিয়ে যাবে। কথা শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারি না, মাহুবকে এত বিশ্বাস করতে পারেন!

—মাহুবকেই যদি বিশ্বাস না করবো তবে আর করবো কাকে!

একটু থেমে বলেন, জানি না, আমার কথা কিছু বলেছেন কি না? তবে এই জানাবেন, শুধু এক জনকে বিশ্বাস করে নিজের সব ভার তার হাতে দিয়েছিলাম বলেই আমার ছয়ছড়া জীবনটা আজ শান্তিতে ভরে গেছে।

বৃহস্পতি চিহ্না' মিস বোসের কথা বলেন, থামতে দিলাম না।

—তার নিজের জীবনও অনেক ঝাঁক ছিল, কিন্তু এখন সব ভরে গেছে। ছেলেপুলে সসার, কোন অভাব নেই। নাই বা হইল সন্ধ্যা আর লোকসেখানো বন্ধুর দল, সুখটা থাকলেই তো হ'ল।

বর এসে চিহ্না'কে ডেকে নিয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবলাম, আশ্চর্য, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যটা চিহ্না'রও সহজে উপলব্ধি করেছে; বা বিনয় কি মনোরঞ্জন পারলো না!



## সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে

— প্রত্যেক দিনদিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।

• যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যাহ আসি, তাতেও  
বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই  
রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক হাত্রেই লাইফবয়  
সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত  
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই স্বরত্নেরে তাজা ভাব এনে দেয়





কুন্তলা দত্ত

একটা অশ্লীল ছুতোর শব্দ—শশধর বাবু ইচ্ছে করেই মুখ তুলেন না। তিনি জানেন এ ছুতোর শব্দ কার। আজ দু'মাস ছুতোর শব্দ তাঁকে যে অসহ্য যন্ত্রণা নিচ্ছে, জীমূতের মৃত্যুও বোধ ততখানি দিতে পারে নি। ঐ ছুতোর সঙ্গে মিশে আছে একটা বিরাট আতঙ্ক, উবেগ। কালো ভেলভেটের ট্রাপ ও রবারের চক্কতলা-ওয়া ছুতোটা ঠিক শব্দ করতে পারে না, মুহূর্তখানি মাত্র পোনা যায় কিন্তু সেই শব্দই শশধর বাবুর বুকে যেন হাতুড়ির থা মারতে থাকে। মুখ তুলে তাকাতো ভয় পান তিনি, না জানি কি দেখে দেখবেন আজ অভীশাকে। কোথায় যাচ্ছে, তাও জিজ্ঞাস করেন না। যদিও সবই জানেন, তবু সেই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস তাঁর নেই, তাই তিনি মুখ লুকিয়ে থাকেন খবরের কাগজে।

ছুতোর শব্দ বীরে বীরে মিলিয়ে যায়, অভীশা চলে গেছে। শশধর বাবু মুখ তুলে তাকান, বাথরাণী এসে পাড়িয়েছেন, ডাঙাগলায় বাথরাণী বলেন—“ভূমি কি কিছুই দেখে না?”

শশধর বাবু বিবর হেসে কাগজটা ভাঁজ করে সামনের ছোট টিপরে রাখেন।

“কি দেখে বল? শিক্ষিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ে, সে যদি চির-বৈধব্যকে-অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে না পারে, আমি শুধু শাস্ত্রবচন আর উপদেশের বোঝা চাপিয়ে ওকে কি মানাতে পারব?”

“সে ত পরের কথা, এখন একটা কলেঙ্কারী হলে পর তখন—” বাথরাণীর গলা বুজে এলো। শশধর বাবু গভীর হয়ে বলেন—

—“না, বৌমা সে রকম কিছু করবে না, তেমন মেয়ে ও নয়।”

“নয় কিসে? বিধবা মেয়ে, কোলে ছেলে, তিনি চললেন অভীশারে”—মুখ বিকৃত করেন বাথরাণী—“তার পর কখন কি?”

“আঃ, আন্তে”—শশধর বাবুর ক্রূর চক্কে এলো—“চাকর-বাকরে তনবে যে—”

“ওদের কি কিছু বুঝতে বাকী আছে? রোজ যে বৌমা বেরিয়ে আর ভবেশের সঙ্গে, সে কি জানে না ওরা?”

বক্তার দিকে বলেন বাথরাণী—“আর পারি না। এই শাস্ত্রি পারার জন্মই কি জীমূতকে—কৈদে ফেলেন তিনি। এমন সময় পালেশ ঘর থেকে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি ভেসে এলো, সেই সঙ্গে শোনা গেল, হিন্দীতে আরা পিতাকে শাস্ত্রি করার চেষ্টা করছে। বাথরাণী চোখের জল মুছতে মুছতে ক্রত চলে গেলেন পালেশ ঘরে।

শশধর বাবু চুপ করে বসে রইলেন।

একমাত্র ছেলে জীমূত তিন বোনের পর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে সৌখীন অধ্যাপনা করতে করতে ২৭ বৎসরের হল। নিজে পছন্দ করে ভালবেসে বিয়ে করলে সে অভীশাকে। শশধর বাবু ও বাথরাণী যে একটু মনঃক্লান্ত হননি, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে, সে সুখী হবে বলে তাঁরা আপত্তি করে নি। তা ছাড়া অভীশা সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী, আর পরিবারও এঁদের মত অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। বধূর ব্যবহারেও তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। কাজেই একমাত্র ছেলের জন্ম তাঁরা নিজে পছন্দ করে বউ আনতে পারলেন না, তাঁদের উপেক্ষা করে নিজে বৌ পছন্দ করল, এ ক্ষোভ তাঁদের রইল না। দু' বছর পর জীমূতের ছেলে হল, তিন মাস পরে হঠাৎ ধকুইকারে আক্রান্ত হয়ে জীমূত তাঁদের ছেড়ে গেল। সে দিনটা আজো শশধর বাবুর চোখে ভাসে।

বাথরাণী নাতি জিভুকে নিয়ে সোতালার বারান্দায় বসে আছেন। বিকেল বেলা; শীতের বিকেল, ঘোঁরা আর কুয়াশায় ঢাকা ইঞ্জিচেরায়ে শশধর বাবু বসে আছেন। জামা, টুপি-মোজার আবরণে মোড়া জিভু পিট-পিট করে চাইছে, আর বাথরাণীর কথার উত্তরে খিলখিলিয়ে হাসছে। খনিক আগে শ্রাকরা এসে রূপার কোমর-পাটা ও নুপুরের ফরমাস নিয়ে গেছে, আর অভীশার জন্ম মুক্তোর কঙ্কণ।

হঠাৎ নিচে সোর-গোল উঠল। শশধর বাবু ও বাথরাণী ঝুঁকে দেখলেন ক'টি ছাত্র জীমূতকে ঘরে নিয়ে আসছে, প্রবেশ করে সে আচ্ছন্ন।

তক্ষুণি ডাক্তারকে ফোন করা হল। ডাক্তার বখন এলেন তখন জীমূতের অবস্থাকে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছু হল না। বাথরাণী মাথা খুঁড়তে লাগলেন। শশধর বাবু নীরবে মৃত পুত্রের শিরে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। প্রথম শোকের ধাক্কাটা কাটার পর অভীশা খুব ধৈর্য ধরলে। বাথরাণীকে সেই সাহসনা মিত—“মা, আপনি কাঁদবেন না। আমি ত আছি।”

বাথরাণী কৈদে উঠে বলতেন—“ওরে, সেই ত আমার বড় ছেলে। চোখের উপর তাকে দেখে দেখে এ রাহশের চিত্তা যে জলতেই থাকবে।”

তারপর দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। বাথরাণী অভীশাকে বিধবাবেশ ধারণ করতে দেন নি, শাদা জামির লালপাড় ছাড়া অন্য সব রকম পাড়ই অভীশাকে পরতে হত। আর জীমূত মারা বাবার পর এই দেড় বছর জিভু ছাড়া এ বাড়ীর কেউ-মাহু মাস মুখে তোলে নি। ডাক্তারের কথা মত চিলেকোঠার উইন খেলে বাথরাণী জিভুর জন্ম মাহু, ডিম রেঁবে দেন।

প্রথম প্রথম অভীশা কোথাও বের হ'ত না। শশধর বাবু ও বাথরাণী জোর করে বড় মেয়ে সূচিয়ার সঙ্গে ওকে বেড়াতে পাঠাতেন। শাদা রং-এর রূপালী জরিপাড় জর্জেট ও লিক পরিয়ে সূচিয়া ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। হাতে গলার গয়নাও কিছু কিছু থাকত বৈ কি।

তার পর বাথরাণী হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, শাদা জর্জেট কখন কিক সবুজে পরিণত হয়েছে, প্রসাধনে আবার আগ্রহ এসেছে, বেশ বিভ্রাসে দেখা দিয়েছে অক্ষয় হ্রাস, সর্বোপরি জেসেছে সূচিয়ার বাকীতে বাজার আগ্রহ। বাথরাণী সূচিয়ারকে কলধন কলধন

মনে করছেন, এমন সময় একদিন সূচিরা নিজেই বললে। অভীপ্সা ওর মার কাছে গিয়েছিল। সূচিরা আঙে আঙে রাধারাণীর কাছে এসে বসল—“মা, একটা কথা”। রাধারাণীর বুকে ধাক্কা করে উঠল। কোলের ওপর জিতুকে আঁকড়ে ধরে তিনি বলে উঠলেন—“কি, কি, কি হয়েছে রে?”

সূচিরা ভেঙে বলল সব। সূচিরা পিসতুতো দেওর ভবেশ সূচিরা ওখানে প্রায়ই আসে। সুন্দর চেহারা, কথাবার্তাও চমৎকার, অগাধ বিদ্যা। প্রথম প্রথম সাধুনা দিয়ে অভীপ্সাকে গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে অনেক ভাল ভাল কথা বলত ও পড়ে শোনাত। সূচিরা সেটা ভাল মনে করে শ্রবণ দিয়েছিল। কিন্তু মাস খানেক যাবৎ সূচিরা একটু কেমন কেমন ঠেকছে। ভবেশ প্রায়ই অভীপ্সাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া ওদের ভাবভঙ্গীও বেন কেমনতর। সূচিরা কথা শেষ করে অপরাধীর মত নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে—“এমন হবে, তা আমি বুঝতে পারিনি মা!”

রাধারাণী শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এক বছরের মধ্যেই জীমুতকে ও ফুল গেল? ওরা ত ভালবেসে বিয়ে করেছিল, এই জন্মে ভালবাসা? আশু-কালের মেয়েদের প্রেমের এই নমুনা? একটু পরে তিনি বললেন—“আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। আগে কোথাও যেতে চাইত না, এখন রাজিই তার ওখানে যেতে চায়। তা ছাড়া সাজগোজও বেশ শুরু করেছে।”

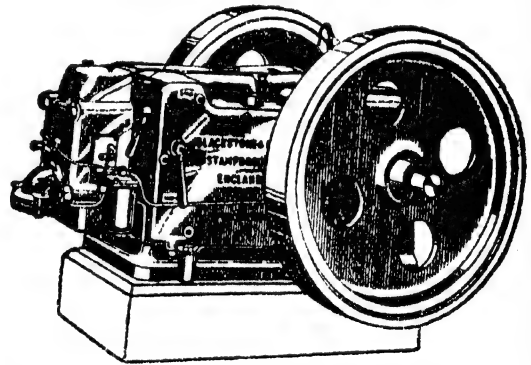
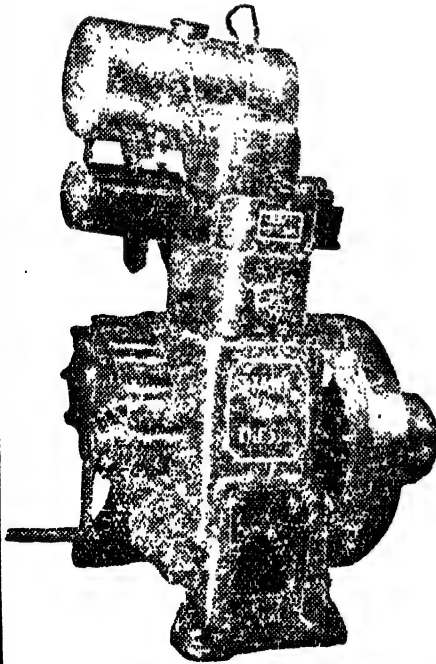
জিতুর মুখের দিকে তাকান রাধারাণী—“কি কপাল নিয়েই এসেছিল।” অস্ত্র কেউ হলে এ অবস্থায় জিতুকে বলত—“অলসুণে, রাক্ষস, বাপথেকে।” কিন্তু রাধারাণী কখনো তা বলেন না। তিনি শুধু বলেন “কপাল মন্দ।” জিতুর আরা থাকা সত্ত্বেও রাধারাণীই বেশীর ভাগ সময় জিতুকে কোলে, কাছে রাখেন, আর অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জীমুতের এই বয়সের চেলার ছাপ খোঁজেন।

মা-মেয়েতে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, সূচিরা একদিন অভীপ্সাকে বুঝিয়ে বলুক, অভীপ্সা হয় ত ঠিক বুঝতে পারছে না। বুঝিয়ে বললে সে সচেতন ও সতর্ক হবে।

সূচিরা একদিন অভীপ্সাকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করলে যখন ভবেশের আসার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সূচিরা যামী পরেশও অকসি থাকবে। অভীপ্সা বোধ হয় সূচিরা উদ্বেগ আঁচ করতে পেরেছিল। সে প্রথমে রাজী হল না। কিন্তু রাধারাণী ও সূচিরা বেশী জোর করাতো না গিয়ে পায়ল না।

সূচিরা ভয়ে ভয়ে কথাটা তুললে। এমন রূপসী অভীপ্সা, কপাল যখন পুড়েছেই তখন আচরণ, ব্যবহার সবকিছু হাতে কেউ কিছু না বলতে পারে সেটা ত দেখা উচিত। মা-বাবা কত ভাল-বাসেন অভীপ্সাকে, তার এতটুকু নিন্দা শুনলে কত ব্যথা পান— ইত্যাদি।

অভীপ্সা নতমুখে শুনছিল। মুখ তুলে সূচিরা মুখের দিকে



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটার শির ও কৃষিকাষ দেশের অন্ন ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন। লিট্টার, ব্রাকটোম ডিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং মোট, ডাভল ডিজেল ইঞ্জিন ডাভল পাম্পিং মোট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রিট, দিভল কলিকাতা-১

ফোন ১-২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—ইউন ইঞ্জিন, বরলার, ইলেকট্রিক মোটর, ডাভলমো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকে।

তাকিয়ে বললে—“বুঝছি। তুমি ভবেশ বাবুর কথা বলছ ত?”  
ওর নিঃসঙ্গতা ভাব দেখে সূচিরা খতমত খেয়ে গেল। তারপর  
একটু সামলে নিয়ে বললে—“ভবেশ বাবু অবশ্য লোক খারাপ ন’ন,  
তবু বলা ত বায় না, পুরুষ-মানুষ, কখন কি মতি হয়। শুধু শুধু  
যে তোমার ওপর ঠোক তা ত মনে হয় না।—শেষে যদি কিছু.....”

সূচিরা কথা শেষ করলে না। কথার ভলীতেই ওর বক্তব্য  
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অতীপা গম্ভীর কণ্ঠে বললে—“সে রকম  
কিছুর ভর করে না। আমরা কেউ এত তরলমতি নই।”

সূচিরা এ সবকে আর কিছু বলতে পারলে না।

সূচিয়ার মুখে সব শুনে রাধারানী মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন  
না। অতীপা অমৃতপ্ত ও হয়নি, লজ্জিতও হয়নি, এ কেমন  
কথা?

ভবেশের সঙ্গে অতীপার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলল। অতীপা প্রায়ই  
গাভী চালিয়ে বেয়িরে যায়। সূচিয়ার ওখানে বাওয়া বন্ধ করেছে।  
ভবেশের সঙ্গে সে যে অজ্ঞাত সোখা-সাক্ষাৎ করছে, তা বুঝতে  
সূচিরা ও রাধারানীর বাকী থাকে না। অতীপা কাউকে কিছু না  
বলেই বের হয়। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। রাধারানী  
মনে মনে উন্মিষ্ট হলেও ওকে কি বলবেন ঠিক করতে পারেন না।  
একদিন তিনি আকারেইসিতে অতীপাকে সচেতন করে তুলতে  
চাইলেন কিন্তু অতীপা তা গ্রাহ্য করলে না। অগত্যা রাধারানী  
আবার সূচিয়ার শরণাগত হলেন।

সূচিয়ার কথা শুনে অতীপা একটু চুপ করে রইল। তার পর  
বললে—“তোমরা চাও যে আমি ভবেশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ  
করে যবে বসে থাকি—এই ত? কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব,  
স্টো! কেউ ভাবছ না। তোমরা শুধু লোকনিষ্ঠার কথাই ভাবছ।”  
বলে সে ক্রমাল দিয়ে চোখ বুজে নিলে। তারপর বললে—  
“আমার আশা তোমরা ছেড়ে দাও। আচার, সংস্কার ও পুন্না-  
আচার মনকে ভুলিয়ে পিষে মারা আমার খায়া হবে না। আমিও  
সত্যি কোনো অজ্ঞার, অর্থব্ধ বা অশান্ত্রীয় কিছু করছি না।”

প্রথমে রাধারানীর মনে যখন ঝটকা লেগেছিল তখন তিনি  
শশধর বাবুকে সে কথা বলেছিলেন কিন্তু তখন শশধর বাবু তা  
উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর পর শশধর বাবুকে রাধারানী আর কিছু  
বলেন নি। কিন্তু সূচিয়ার কাছে অতীপার ঐ কথাগুলোতে  
তিনি শশধর বাবুর শরণাগত হতে বাধ্য হলেন। সূচিরাও মার  
কথা সমর্থন করল। শশধর বাবু চিন্তিত হলেন। অতীপার  
প্রেমের একনিষ্ঠতার তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তাই মাসখানেক আগে  
রাধারানীর কথা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিরক্তি প্রকাশ  
করেছিলেন—কিন্তু অতীপার পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য না করে  
পারেন নি। তাই সূচিরা ও রাধারানীর কথার তিনি আর অবিশ্বাস  
করতে পারলেন না। কয়েক দিন অতীপাকে লক্ষ্য করে তিনি  
বুঝলেন এখন আর কিছু করার নেই। রাধারানীর ক্রমাগত অহুমনে  
শশধর বাবু বললেন—“এখন আর কিছু করার নেই, আগে থেকে  
সাবধান হলে হয় ত কাজ হ’ত। এখন আমি বা দেখছি তাকে  
আঁক করে বাধা গিয়ে কল হবে না।”

রাধারানী কোন্ডের সঙ্গে বললেন—“আসেই ত বলেছিলেন,  
তখন ত কানে তুললে না। এখন কেমন, চল ত?”

শশধর বাবু বিষম হেসে বলেছিলেন—“আগে বুঝলেও যে কিছু  
করতে পারতাম, তা হয় ত নয়।” রাধারানী কঁদেছিলেন।

সূচিরা একদিন ভবেশকে বলেছিল যে এটা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু  
ভবেশ স্পষ্টই বলেছে, আচারের বেড়ি পরিয়ে জপ-তপস্বী হইলনায় যে  
জীবন্ত সময়ের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত, তাও প্রতি তার কোনো  
সহায়ত্ব দিতে নেই। সূচিয়ার স্বামী পরেশ সব শুনে বলেছে—  
“এখন বা অবস্থা তাতে বাধা দিতে গেলে হয় ত গোলমাল কেলেকারী  
হবে, তার চেয়ে এখন যাতে ওরা ভ্রমরতে বিয়ে করে ফেলে, সে চেষ্টা  
করাই ভাল।”

হয় ত তাই। কিন্তু তবু বুকুর ভেতরটা যে মোচড় দিয়ে ওঠে।  
অতীপার চলাচল সবই লক্ষ্য করেন শশধর বাবু, আর স্পষ্টই বুঝতে  
পারেন অতীপা তাঁদের কাছে পর হয়ে গেছে। জলের আলপনার  
মত জীমুতের স্মৃতি ওর মনে হতে উবে গেছে।

রাতের মন্ডর আকাশে শেখম মেলেছে। সেই দিকে তাকিয়ে  
চুপ করে বসে থাকেন শশধর বাবু। সান্ধ্যধুমরাশি রাস্তার  
বাতিগুলোকে নিভেজ করে দিচ্ছে।

রাধারানী অনেক ইতস্ততঃ করে শেষে একদিন মরীয়া হয়ে  
অতীপার মার কাছেই গিয়ে কথাটা বললেন। অতীপার মার  
কোনো ভাববৈলক্ষ্য দেখা গেল না। তিনি বললেন—“বেয়ান,  
আমার কানেও কথাটা এসেছে। আমি ঠিক বলেছিলাম। উনি  
বললেন—তা যদি হয়, ভালই ত। ঐ কচি মেয়ে কি বৈধব্য-গ্রস্তা  
সইতে পারে? এ ত কিছু অশান্ত্রীয় নয়। লোকনিষ্ঠার ভয়ে  
বৈধব্য পালন করা, আর স্বামী দম্পতিকে দেখে আড়ালে হা-হা-তাশ  
করা কোনো কাজের কথা নয়।”

“আমিও ভেবে দেখলাম বেয়ান, সত্যি মা-বাপ হয়ে ঐটুকু  
মেয়ের বৈধবাসনা আমার চোখে লেগতে পারছি না। বা  
গেছে সে ত গেছেই, ও যদি আবার সঙ্গারী হয় তবে তা মনে  
নেওরাই উচিত। মেয়ে মরে গেলে যদি জামাই আবার বিয়ে করত,  
আমরা কি বাধা দিতুম? মোটেই না, সেই বোকেই আমরা মেয়ে  
মনে করতুম। এই ত হালদার-গিন্নীর জামাই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে  
করেছে। সে বোঁ ত প্রায়ই হালদার-বাড়ীতে এসে থাকে, কর্তা-গিন্নী  
কত ভালবাসেন ওকে।”

শিকড়ানীতে শিক ফেলে অতীপার মা আবার বললেন,—“অর  
বয়সের বিধবার আবার বিয়ে দেওয়াই উচিত। মহাত্মা গান্ধীও  
এ জন্তে কত চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ আপনাদের বখন ছেলে নেই,  
ভবেশকেই মনে করুন আপনাদের ছেলে। ভবেশ ত ছেলে খারাপ  
নয়, অতি চমৎকার।”

রাধারানী গম্ভীর মুখে আর কথাটি না বলে উঠে এলেন। ওঃ!  
ভেতরে ভেতরে এই ব্যাপার। বেয়ানের আঁকার পেয়েই বোমার  
অন্ত বড় বুকুর পাটা। তাই ত বলি। আবার বোকাতে আসে,  
“হালদার-গিন্নীর জামাই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে”—ছেলে আর  
মেয়ে এক হল? তা ও তাঁদের একমাত্র কন্যার। নিজের যদি এমন  
একমাত্র ছেলে বেত-...-না, না, না—

চমকে উঠে রাধারানী হুত্ব, অব্যাব চিন্তার রাশ টেনে ধরেন—  
তাঁর সন্ত কপাল যেন শঙ্করও না হয়, যে ভগবান।

সব দিকে হত্যা করে রাধারানী শশধর বাবুকেই পীড়াপীড়ি করত

শ্রু করছেন। এখনও বৌমা তাঁকে একটু মানে, উনি বললে ওর কথা ঠেলতে পারেন না। কিন্তু শশধর বাবু নিজের সীমা লঙ্ঘন করে অপমানিত হতে প্রস্তুত ন'ন। তিনি নিলিঙ্গু ভাব দেখান, কিন্তু নিজেকে ত আর কাঁকি দেওয়া চলে না? বুক ভেঙে পড়তে চায় বাতনায়; পড়াশোনার নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন শশধর বাবু। রাধারাণী জিতুকে কোলে নিয়ে এসে বসেন। শশধর বাবু কিরে তাকান না। রাধারাণী বলেন—“দেখছ দাছ, বুড়োর জমোর কত? তোমার দিকে মোটে তাকাচ্ছে না। বাও, কাগজটা কেড়ে নাও।”

জিতু সোৎসাতে উঠে এসে কাগজটা কেড়ে নিতে চায়। শশধর বাবু ঠাঁই করে ওঠেন, ততক্ষণে জিতু কাগজ থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়েছে। শশধর বাবু সেটা ওর হাত থেকে নেবার লজ্জা হাত বাড়াতাই জিতু টলমল পায়ে ওপাশে ছুটে যায়, তার পর ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা মেলে ধরে চোঁচাতে থাকে, রাধারাণী বলেন—“দেখেছ? তুমি যে মধ্যে মধ্যে আমাকে কাগজ পড়ে শোনাও, তাই নকল করছে। কি দুঃখ!”

জিতু সুনতে পেয়ে বলে ওঠে—“হুত, পাঞ্জি।” এমন সময় কে ডাকে “দিদিমা!” রাধারাণী চেয়ে দেখেন অভীপ্সার ভাইপো সুরুমার। ছেলেমানুষ, বছর বাবো বয়স, কুণ্ঠিত পদে এসে শশধর বাবু ও রাধারাণীকে প্রণাম করে একটা চিঠি নিয়ে বলেন, “ঠাকুমা দিলে।”

অভীপ্সাকে কয়েক দিন নিজের কাছে রাখতে চান ওর মা। সঙ্কব হলে কালই নিয়ে যেতে চান। ভীমুত মারা যাওয়া অবধি অভীপ্সা

বাপের বাড়ীতে বাসিলাস করেনি। শশধর বাবু ও রাধারাণী কি করে জিতুকে না দেখে থাকবেন, তাই ভেবে অভীপ্সা নিজেই রাজী হয়নি। চিঠি পাড়ে রাধারাণীর মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু শশধর বাবু বলে দিলেন—“আচ্ছা, কাল সকালে যাবে।”

সুরুমার চলে গেলে রাধারাণী বললেন—“অমনি রাজী হয়ে গেলে? ওদের নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। মেয়ের নিকের জোগাড় করবেন—“নিফল কোভে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। শশধর বাবু বলেন—“যেতে না দিলেই কি আর কিছু করতে পারতাম? বা অনিবার্য! তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। আমাদের পাশাশে বুক বেঁধে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের স্নখ-স্বার্থের লজ্জা আমরা বৌমাকে জোর করে চিবাইবেধ্যা পালন করাতে পারি না।”

রাধারাণী সজল চোখে বললেন—“সবাই ত আর তোমার মত মহেশ্বর হতে পারে না?”

ঠাঁং জিতুর দিকে চোখ পড়তে ঠাঁই করে ওঠেন তিনি। সুরুমারের ডুক্কাবশেষ খাবারের টুকরো মুখে দিয়েছে জিতু। ছুটে এসে ওর মুখ থেকে খাবারের টুকরো বের করে ফেল দিয়ে চাকর-বাকরকে ধমকাধমকি করতে থাকেন রাধারাণী। কেন এতক্ষণেও উচ্ছ্রিষ্ট সরিয়ে নেওয়া হয় নি। শশধর বাবু বিশ্বাস হাঙ্গেন। আর কত দিন? এখনও মায়ী কাটাতে পারছেন না রাধারাণী, হয়ত বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তাঁদের একমাত্র অবলম্বনও দূরে চলে যাবে। অভীপ্সার মার কথামত ভবেশকে ছেলের মতন দেখতে পারলে হয়ত জিতুকে কয়েক

## শুভ বিবাহ

শুভ বিবাহে কিংবা যে কোনও শুভ কাজে যৌতুব-  
দেবার মত আধুনিক  
ম্যনোম ডিজাইনের খাঁটি  
গিনি সোনার গহনা ও  
সাঁচ্চা গ্রহরত্ন প্রচুর  
পরিমাণে মজুত আছে।  
ফোন : ৩৪-৪৯৮২

## অনুপ্রণা জুয়েলারী হাউস

মারিকানার ও স্বর্ণশিল্পী  
৮৫, বহুলাজার ফ্লীট • কলিকাতা ১২  
দ্রুত মানসন



পাওয়া যাবে কিন্তু আত্মপ্রত্যাহা করা শশধর বাবু বা রাধারানী কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এক গাছের বাকল অল্প গাছে লাগানো যায় না—লম্বাচওড়া হিতোপদেশে ওটা সম্ভব হয় না। শশধর বাবু তাই জিতুকে এড়িয়ে চলতে চান, তার মায়ী কাটাতে চান। বিখ্যেজোড়া যে মায়ার কঁাল পাঠা, তা থেকে কঁালি দেওয়া কি অত সহজ? অত্বেক চিঠি লিখে শশধর বাবু উঠে গেছেন কোনো কাজে, ফিরে এসে দেখেন জিতুর শীতস্তর লাইন সর্কাকে নিয়ে চিঠি মাটিতে পড়ে আছে, আর জিতু টেবিলের ওপর উঠে বসে পিনকুশনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দাহুকে দেখেই সে ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে হাত বাড়ালে কোলে আসার জন্য। হাক ভালই হয়েছে এবার, কল থেকে চোখের আড়াল হবে।

রাধারানী কিন্তু অত সহজে মেনে নিতে পারলেন না। আড়াল থেকে অভীপ্সাকে লক্ষ্য করে লম্বাভেনী বাণ ছুঁড়তে লাগলেন—“ভাইনী, জীমুতকে খাবার জন্ত ঢা দেখিয়ে বিয়ে করেছিল সম্প্রতির লোডে—”

শশধর বাবুর অস্থস্থিতি ছাড়া ত এসব বলা চলে না, তাই আশ মিটিয়ে বলতে পারলেন না।

পরদিন অভীপ্সার বড় ভাই এসে গুকে নিয়ে গেল। শশধর বাবু সামনে থাকার রাধারানী ভাই-বোনকে একহাত দেবার ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পারলেন না। জিতুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে শশধর বাবু বললেন—“দাহু, কবে আসবে?”

জিতু গভীর মুখে জবাব দিল “কাল আসব।” সব অনাগত দিনই ওর “কাল।”

জিতুরা যাবার পরদিনই রাধারানী বিকলে বললেন, “ওগো, একবার বাও না, জিতুকে একবার দেখে এস।”

শশধর বাবু এড়াতে চাইলেন। মিছিমিছি মায়ী আর বাড়ানো কেন? জিতু তাদের একমাত্র কলধর, পরলোকে গেলে তাঁরা তার কাছে থেকে জলগত্ব আশা করতে পারেন, কিন্তু ইহলোকে জিতুকে আর তাঁরা কাছে পাবেন না। কিন্তু রাধারানী তা বুঝতে চান না—চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ওর কথা। ভাত খেতে বসে বললেন—“কে দাহুকে ভাত খাওরাবে? এখানে আমি খাওরাইতাম, ওর দিম্মা কিছু করবে না। বোতল বোতল দুধ গিলিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। ছেলে দাহুয় করতে জানলে ত?”

কখনও বললেন—“বা গাড়ী চলে ওদের বাড়ীর ধারের রাস্তার, গুকে আর কে দেখে রাখবে বল? কখন যে কি হবে!”

রাধারানী কান্নাকাটি শুরু করতে অগত্যা শশধর বাবু বাধ্য হলেন জিতুর মাশাবাড়ী যেতে। অভীপ্সার বাবা একটা বড় রকম আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন, কিন্তু শশধর বাবু হু-এক কথার পরই বললেন, “দাহুকে একবার দেখব।”

জিতু দাহুকে দেখে মহা খুসী। তার সব মামাতো মাসতুতো বোনদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে শশধর বাবুর কোলে উঠে বসল। আর বলতে লাগল—“আমার দাহু, আমার—”

অভীপ্সার বাবা বললেন—“নাতি কম নয় বেরাই-মশাই, ওর সম্প্রতিত কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না, হাঃ-হাঃ-হাঃ। থাক, দাহু, থাক, তোমার দাহুয় কোল তোমারই একচেটিয়া থাক, ওতে কেউ ভাগ বসাবে না।”

হুঁমিন পর রাধারানী আবার বললেন—“দাহুকে দেখে এসো। কেন, পরত দেখে এসেছ বলে আজ যেতে নেই?”

শশধর বাবু কিছুতেই বাজী হলেন না দেখে রাধারানী কঁাদতে শুরু করলেন—“তোমার মুখে তবু খবরটা পেতে পারতাম, তাও হবে না, কি পাশাণ ভূমি, সবে ধন নীলমণি আমাদের, ওর কোনো খোঁজ-খবর নিছ না।”

হাউ-হাউ কবে কাদেন রাধারানী। শশধর বাবু বিব্রত হয়ে বললেন—“না হয় কোন করে খবর এনে দিচ্ছি।”

“হ্যাঁ, তবে ত সবই চল। কোনে হয়ত মিছে কথা বলবে, অন্ত্র করলেও বলবে, তল আছে, ডাক্তার দেখাবে না! ওদের কি আর বাছার ওপর মায়ী আছে একটুও, স্ন শত্বর।”

কঁাদতে কঁাদতে রাধারানী মুচ্ছা গেলেন। শশধর বাবুর চল বিপর। স্মৃতিরা এখনে নেই, চলে গেছে দিল্লিতে ওর ভাবুরে কাছে। শান্তডীর অন্ত্র, না গেলেও চল না। ও থাকলে রাধারানী একটু শান্ত হতেন হয়ত। ছোট মেয়ের স্বামী বিলিয়ে ঢাকরী করে, ও সেখানেই আছে। মেজ মেয়ে মাস্তাজে; জেসে মেয়েদের স্থল রয়েছে, নাহলে নাতি-নাতনীদের কাছে শেলে রাধারানী একটু প্রোবা মানতেন।

শশধর বাবু অগত্যা অভীপ্সার বাবার কাছে গিয়ে প্রোবার করলেন, তিনি রোজ সকালে গাড়ী পাঠাবেন, জিতুকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সন্ধ্যার সময় আবার তাকে দিয়ে যাবেন শশধর বাবু। অভীপ্সা আর শশধর বাবুর ওখানে যাবেন না, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ভবেশ বদলি হয়েছে পাটনার, ওখানেই বিয়ে হবে, রেজেষ্ট্রি করে; ভবেশের বাপ-মা ত আর নেই, অহুঠানের ছালামা করে কি হবে? অভীপ্সার বাবা যদিও শশধর বাবুকে কিছু বললেন নি, কিন্তু শশধর বাবু কিছু টুকরো খবর থেকে কিছু বা আদ্যে সবই বুঝতে পারছিলেন। অভীপ্সার বাবা শুনে বললেন—“দেখি বাড়ীতে জিজ্ঞাস করে।” শশধর বাবু ইন্তন্ত: করে বললেন—“ও ঠাকুমা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।”

অভীপ্সা ইন্তন্ত: করছিল, কিন্তু ওর মা বললেন—“উনি যা বলছেন তাই হোক। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি বলে যে ওদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।”

জিতু রোজ আসে আবার সঙ্গে, সেই সঙ্গে টুকরো খবর এঁদের কানে আসে—অভীপ্সার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। শীগিরি সবাই পটিনা চলে যাবে। রাধারানী রেগে আঙন হয়ে আবার কঁাদে ভাসান, শশধর বাবু হাসিমুখে তাঁকে শান্ত করেন।

দিন কয়েক পরে অভীপ্সার বাবা এলেন। উদ্বেগ শশধর বাবু জাঁচ করতে পেরেছিলেন। ভ্রমলোক বীরে বীরে অতি দূর থেকে আসল প্রসঙ্গে আসবার চেষ্টা করলেন—ইংরাজী শিক্ষার ফলে মনের প্রোয়ার, কুসন্ধ্যার, বিভাসাগর, মহাশা পাণ্ডী বিধবাদের সবচেঁ কি বলেছেন—

শশধর বাবুই বললেন—“বৌমার বিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের কোনো আশক্তি নেই; সেজন্ত চিহ্নিত হবেন না।”

অভীপ্সার বাবা একটু খতমত খেয়ে গেলেন, তার পর শশধর বাবু উলার স্রবের প্রোবা কর্তন করতে লাগলেন। শশধর বাবু



অসহ্য মনে হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—“তারিখ ঠিক হয়ে গেছে?”

অভীপ্সার বাবা বললেন—“এ মাসের সাতশে দিন ঠিক হয়েছে, আর পনেরো দিন মাত্র আছে। বেরাই, আপনাকে যেতেই হবে, মনে করুন আপনার মেয়ের বিয়ে, ও ত আপনার মেয়েই, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আপনাকে যেতে হবে।”

শশধর বাবু অটল থৈথৈর সঙ্গে বললেন—“এ শরীরে পাটনা বাওয়া আর পোষাবে না বেরাই মশাই! এখান থেকেই ওকে আশীর্বাদ করছি।”

উদ্বার সময় অভীপ্সার বাবা বললেন—“পরশু বিকেলের গাড়ীতে গুণের নিয়ে আমি পাটনা বওয়ানা হব। জিজ্ঞাস্য কাল আর পাঠানো সম্ভব হবে না বোধ হয়, তবু দেখব চেষ্টা করে। ওরা পাটনায়ই থাকবে এখন। ব্রহ্মেই পাবেন, পাড়াপড়শী আর আত্মীয়-স্বজনরাও কেউ কেউ অভীপ্সার ওপর খুশী নয়। আমি কি বেরাই খুব খুশী হচ্ছি? ক্রীম্ভের মুখখানা সব সময়েই মনে ভাগে। কিন্তু কি করব, মেয়েটার বিকেও ‘ত চাইতে হবে।”

শশধর বাবু আন্তে আন্তে বললেন—“বাগর আগে একবার নাটিক দেখিয়ে নিয়ে যাবেন বেরাই মশাই, এই আমার অনুরোধ।”

এর পর শশধর বাবু ও রাধারানী কি ভাবে সময় কাটাতে লাগলেন, তা না বলাই ভাল।

অভীপ্সার বাবা জিজ্ঞাস্য নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে বললেন—“তুইও আসবি না কি?”

অভীপ্সা ঘাড় নাড়লে। শাত্তরীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার তার সাহস নেই।

পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে আশ ঘন্টা কেটে গেল, কৈ বাবার ত আগার নামটি নেই। স্বড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অভীপ্সা বিরক্ত হয়ে উঠল, কি করছেন এতক্ষণ? নিশ্চয় শাত্তরী কাগজকাটি শুরু করেছেন, যত সব জ্ঞাকামী।

নাঃ শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। দরজা খুলে অভীপ্সা নেমে পড়ল। ঘরের ভেতরে রাধারানী তখন অজ্ঞানত্ব কণ্ঠে বলছেন—“একটু অপেক্ষা করুন বেরাই মশাই, রাধামাধবের নিখোলা ওর মাথার ঠোঁটোয়ানো হয় নি; সে ত কালীঘাটের নিখোলা, এটা দিই নি।”

অভীপ্সার বাবা বিপর্যয়ে বললেন—“কিন্তু এই করে করে যে দেবী করিয়ে দিচ্ছেন বেরান—”

“একটুখানি দেবীতে কিছু হবে না। ওকে প্রসাদ দিইনি—”

অভীপ্সা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। শাত্তরী কি ভেবেছেন এ রকম করে তিনি অভীপ্সাকে আটকাতে পারবেন? শাত্তরীর ত আর সে আত্মীয়ভাবনা করে চিরজীবনের জন্ত হুঃখবরণ করতে হুঃখ দিতে পারেন না। দুঃখলক্ষণে অভীপ্সা ঘরে ঢুকল।

“বাবা, ঐগঙ্গিও চল। অনেক দেবী হয়ে গেছে।”  
রাধারানী চমকে উঠলেন। সম্ভব, ব্যাভুল হয়ে বললেন,—“এই, খুনি বিহি; আর একটু—”

অভীপ্সার দিকে চাইলেন তিনি। আসন্ন, অনিবার্য সব ছায়াবীর যাতনায় আঁকুল, অসহায় সে দৃষ্টি খেন অভীপ্সাকে চাবুক মারলে। তার হাত-পা শিথিল হয়ে এল। শশধর বাবুও আজ ভেঙে পড়েছেন। তাঁরও হুই চোখে জল। জিজ্ঞাস্য হয়ে সবাই দিকে তাকান্ধে।

অভীপ্সা চর্যাং তার বাবার হাত ধরে বললে—“চল বাবা, আমরা যাই। জিজ্ঞাস্য না হয় থাকুক।”

“সে কি রে? তুই যে—”

“আঃ চলই না।”

হস্তভঙ্গ দম্পতীকে প্রণাম করে অভীপ্সা চলে গেল।

ভবেশ গুণের বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল। অভীপ্সাকে দেখে বললে—“কই, জিজ্ঞাস্য নিয়ে এসে না যে?”

“পারলুম না,—বলে অভীপ্সা পাশের ঘরে চলে গেল। ভাবী খস্তের কাছের সব শুনে ভবেশ পাশের ঘরে গেল—”

“ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?”

“পারতে হবে—” একটু খেমে অভীপ্সা বললে।

“আমার ত তুমিই আছ কিন্তু ওদের যে জিজ্ঞাস্য ছাড়া কেউ নেই তাই”—ভবেশের দিকে তাকিয়ে খুব ফিরিয়ে নিল অভীপ্সা, মুহূর্ত্ত নরম গলায় বললে—“আমিও যে মা।”

*Steps leading to happy Patients*



DEPENDABLE TEST  
QUALITY LENSES  
SCIENTIFIC FITTINGS  
COMFORTABLE FRAMES  
SMART STYLING  
RELIABLE SERVICE

Phone:  
B.B. 1717

**CALCUTTA OPTICAL CO**  
PRIVATE LIMITED  
45, AMHERST ST. CAL 9



## \* হেঁচাদের আমর \*

পূরাকালে অনেক ঘরে এক পাঠাড়ে এক দরিদ্র দল্লিতি বাস করতো। খুবই কঠোর জীবন ছিল তাদের। পাঠাড়ের এক ধারে একটা অমরুর ভূমিতে তারা আলুর চাষ করতো। রুসল হত খুব সামান্যই এবং তাতে তারা কোন রকমে কায়রুশে জীবনধারণ করতো।

ক্রমশঃ বয়স বেশী হ'তে থাকার তাদের শক্তি কমে যেতে লাগলো। এখন তাদের ভরানক ভাবনা হ'ল, বুড়ো হলে কি ক'রে তাদের দিন চলেবে, কে তাদের খাওয়াবে। তারা নিজদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো: "আমাদের যদি একটি ছেলে হ'ত, তাহলে বুড়ো বয়সে সে আমাদের ভূমি চাষ করতো, চুপো (জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেজের) নির্দিষ্ট কাজ ক'রে দিত আর শ্রুতির সময় "গ্রোৱার" (তিরতাদের প্রোভোকার বাড়িতে ঘরের মাঝখানে একটা গোলাকার গর্ত থাকে আশুন আলারার জন্ত তাতে আশুন পোয়ানোও হয় আবার বায়ার কাজও চলে) জন্ত কাঠ কেটে আনতো। তাহলে বুড়ো বয়সে আমরা একটু বিজ্ঞান করতে পারতাম।"

তারা পাঠাড় এবং নবীর সেবতার কাছে একটি ছেলের জন্ত প্রার্থনা জানাল। "ও ঈশ্বর, আমাদের একটি সন্তান লাও।" দেবতা তাদের প্রার্থনা শুনলেন কি না কে জানে, কিন্তু ছোটটি



## তিব্বতী গল্প

সন্তান-সন্তানী হল। সাত মাস পরে সে বা প্রসব করল তা মানবশিত নয়, সেটা একটা মস্ত বড় কোলা ব্যাং, তার ডাবা-ডাবা ছুটো চোখ।

বুড়ো লোকটা বললে: "কি আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটি কোলা ব্যাং, ওটাকে বাইবে ফেলে দাও।"

ছোট্টা তাতে সম্মত হ'ল না। সে উত্তর দিলে: "ভগবান আমাদের প্রতি সদয় নন। মানুষের বললে তিনি আমাদের ব্যাং দিয়েছেন। কিন্তু পেটে যখন খরোঁছ তখন ফেলে দিতে পারবো না। ব্যাং-এর পুকুরের ধারে জল-কাদার মধ্যে বাস করে, আমাদের বাড়ির পেছনে যে জলাশয়টা আছে তাতেই ওকে রেখে দেওয়া যাক।"

বুড়োটা ব্যাংটাকে নিয়ে হাবার জন্ত যেই তুলে ধরেছে, অমনি ব্যাংটা বলে উঠলো: "বাবা, মা, আমাকে পুকুরে নিয়ে এসো না। মানুষের পেট জন্মেছে, আমাকে মানুষের মতই মানুষ কর। বড় হয়ে আমি আমাদের দেশের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলব, কেউ আর গরীব থাকবে না।"

বৃদ্ধ অবাক-বিম্মনে বললে: "ওগো, কি আশ্চর্য! দেখ, ব্যাংটা ঠিক মানুষের মত কথা বলছে।"

ছোট্টা উত্তর দিলে: "কিন্তু ও যা বলছে তাতে ভালই হবে। আমাদের মত গরীব লোকদের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার, এভাবে আর চল না। ও কক্ষণে সাধারণ ব্যাং নয়, নইলে মানুষের মত কথা কয়? ও আমাদের কাছেই থাকুক।"

সেই থেকে ব্যাং-শিত তাদের কাছেই মানুষ হতে লাগল। বুড়ো-বুড়ো তাকে ঠিক মানুষের ছেলের মতই আদর-বহন করে। এই ভাবে দিন যায়।

তিন বছর পরে ব্যাংটা একদিন তার মা-বাবার কষ্ট দেখে থাকতে না পেরে বললে: "মা, আমার জন্ত একখানা মোটা আটার কুটি তৈরী করে রাখ। কাল সকালে সেটা একটা প্যাঁকেটে পুরে আমাকে দিও। উপত্যকার ওদিক এক চূর্ণো চুপো থাকে। আমি তাব কাছে বাব। তার তিনটি স্তম্ভের মধ্যে আছে। তার মধ্যে একজনের শরীবে খুব মায়ান-ময় এবং বেশ শক্ত-সমর্থ। আমি তাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবো। সে এসে তোমাদের কাঁধ করে দেবে, তাহলে আর তোমাদের কষ্ট হবে না।"

"শোনো, পাগলা ছেলের কথা শোনো একবার," বুড়ো বলল। "তোমার সঙ্গে কে মেয়ে বিয়ে দেবে বল? ব্যাং বলে সবাই তোকে ভাড়িয়ে দেবে, বাড়িয়ে দেবে, হয়ত বা নৈক্য মনে করে গায়ে ছাই দিয়ে দেবে। ওরা ভাঙি করে কি না।"

ব্যাং কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। সে বললে, "তুমি দেখো না, চুপো ঠিক রাজী হবে। তুমি কুটি তৈরী করে রেখো।"

মা কি আর কবে! শেষে রাজী হতেই চয়। "আচ্ছা বেশ, তাই হবে। তোমার বধন একান্ত ইচ্ছে, তখন কুটি করে রাখবো এখন। কিন্তু যদি তারা তোকে হত্যাগ্রাসি করে, যদি গায়ে ছাই ঢেলে দেয়?"

ব্যাং বললে: "তুমি দেখো মা, তারা কক্ষণে তা করতে সাহস করবে না।"

পরদিন সকালে মা একখানা বড় কুটি তৈরী করে একটা ব্যাগে পুরে ব্যাংকে দিলে। ব্যাং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বশবশ করে লাকাতে লাকাতে উপত্যকা অভিমুখে রওনা হল।

দুর্গের ফটকের সামনে হাজির হয়ে ব্যাং ইক দিল : "দরজা খোল, দরজা খোল।"

চুপো শুনে পেল, কে যেন ডাকছে। সে তার চাকরকে পাঠিয়ে দিলে কে ডাকছে দেখবার জন্তে।

চাকরটা অবাক হয়ে ফিরে এসে বললে : "কি আশ্চর্য! শুধু! ছোট্ট একটা ব্যাং ফটক খুলে দিতে বলছে।"

চুপোর সর্দার খানসামা বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললে : "আমি ঠিক ধরেছি শুধু! ওটা নিশ্চয়ই কোন দৈত্য, ওর গায়ে ছাই ছুঁড়ে দেওয়া থাক।"

চুপো কিন্তু এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন : "একটু অপেক্ষা কর। দৈত্য নাও হতে পারে। ব্যাং-এর সাধারণতঃ জলে বাস করে। ব্যাংটা হয়ত ডাগন-রাজের প্রাসাদ থেকে কোন বান্ধী নিয়ে এসেছে। দেবতার মত ওকে দুধ দিয়ে স্নান করানো। তার পর আমি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করবো।"

ভৃত্যেরা তখন ব্যাংকে সান্নিধ্যের অভ্যর্থনা জানাল এবং দুধ দিয়ে স্নান করাল। তার পর চুপো ফটকের নিকট এসে বললেন : "তুমি কি ডাগন-রাজের প্রাসাদ থেকে আসছ? তুমি কি চাও?"

ব্যাং উত্তর দিল : "আমি ডাগন-রাজের কাছ থেকে আসিনি। আমি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি। আপনাদের তিনটি মেয়েই বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি একটিকে বিয়ে করতে চাই। আমি আপনাদের কস্তার পানি প্রার্থী হয়ে এসেছি। অমুগ্রহ করে আপনাদের একটি মেয়েকে বিয়ে করবার অমুমতি দিন।"

ব্যাং-এর কথা শুনে তো সকলের আঙুল গুড়ুম! চুপো তাকে বললে : "তুমি একটা কলঙ্কার ব্যাং, তোমার সঙ্গে কি করে মেয়ের বিয়ে দেব! কত বড় বড় লোক আমার মেয়েদের বিয়ে করবার জন্য সাধা সাধি করছে, তাই রাজি হচ্ছি না, আর তুমি তো সামান্য ব্যাং।"

"ও, তাহলে আপনি রাজি নন?" ব্যাং বললে : "বেশ আপনি যদি বিয়েতে মত না দেন তাহলে আমি হাসব।"

চুপো ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন : "তোমার মাথা ধারণা হয়েছে। হাসতে হয় হাসগে বাও।"

তখন ব্যাংটা হাসতে আরম্ভ করল। সে কি ভীষণ হাসি! হাসির এত জোর যেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ব্যাং একসঙ্গে ডাকছে। হাসির চোটে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। চুপোর দুর্গের চূড়া কাঁপতে লাগল। মনে হল এখন দুর্গ ভেঙে পড়বে। দেয়ালে ফাট ধরল। গুলো-বাগিতে খুব ঢাকা পড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। চুপোর বাড়ীর লোকজনরা ভয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। হড়োহড়ি, ছুটোছুটি, গাধাধাক্কি, সে এক প্রলয় কাণ্ড!

একান্ত নিরপায় হয়ে চুপো জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাংকে বললেন : "ওগো ব্যাং, কোথাই তোমার, আর হেসো না, নইলে আমরা সবাই মারা পড়বো। আমি কথা দিচ্ছি, আমার বড় মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

ব্যাং তখন তার হাসি বন্ধ করল। মাটা-কাঁপা থেমে গেল, ঘর-বাড়ী সব যেমন ছিল তেমনই রইল, যেন কিছুই হয়নি।

চুপো বাধ্য হয়ে তাঁর বড় মেয়েকে ব্যাং-এর হাতে সমর্পণ করলেন। চাকরদের বললেন ছোট্টা বোড়া জানতে। একটা বোড়ার

বড় মেয়েকে চাপান হল এবং অপর বোড়ার বোকাই করা হল যৌতুক। আর আগে আগে ব্যাং ধপ-ধপ করতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বড় মেয়ের কিন্তু ব্যাংকে বিয়ে করতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি আর করবে! বাপের হুকুম। সে একটা মতলব খাঁটলে। বোড়ার উঁচর আগের দু'খানা বাঁতার পাথর সংগ্রহ করে নিলে। ভাবলে পাথর পাথর চাপা দিয়ে ব্যাংটাকে মেয়ে ফেলবে। প্রথমে সে বোড়াটাকে খুব দ্রুত চালিতে লাগল, তাতে তার বুকের আঘাতে ব্যাংটা মাথা পড়ে। কিন্তু ব্যাংটা ধপ-ধপ করে একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে এমন ভাবে লাগাতে লাগাতে বাড়িল যে কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া গেল না। তখন বড় মেয়েটা রাগে বাঁতার পাথর ছুঁড়ে ব্যাংটার ঘাড়ে ফেলে দিলে এবং ব্যাংটা মরে গেছে ভেবে বোড়ার মুখ কিরিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে চলল। কিন্তু কি আশ্চর্য! যেই না- বোড়ার মুখ কোলো অমনি শেঁখন থেকে ব্যাংটা তাকে ডাকল।

বড় মেয়ে চমকে উঠলো। ব্যাংটা তাহলে মরে নি, বাঁতার মথোর কোঁকর দিয়ে বেহিরে এসেছে।

ব্যাং তাকে বললে : "দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে বিবাহের অভিলেখ নয়। তা ছাড়া তুমিও এখন আমার বিয়ে করতে চাও না, তখন তোমার তোমার বাড়িতে বেঁচে আসি চল।" বলে ব্যাংটা বোড়ার লাগাম ধরে চুপোর দুর্গে ফিরে গেল।

দুর্গে ফিরে ব্যাং চুপোকে বললে : "আমাদের বোটক ঠিক নয়, আমি আপনাদের বড় মেয়েকে কিরিয়ে এনেছি। আপনাদের অন্য মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।"

চুপো এবার খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন : "তুই তো আচ্ছা বদমাইস! আমার মেয়েকে কিরিয়ে এনেছিস! নিজের পছন্দ মত মেয়ে বেছে নিয়ে বিয়ে করবে। তোর ন্দ্রী তো কম নয়।" রাগে কাঁপতে লাগলেন চুপো।

ব্যাং বললে : "ও, আপনি তাহলে রাজী নন? বেশ, আপনি যদি রাজী না হন তাহলে আমি কাঁপবো।"

চুপো ভাবলেন, কাঁপলে আর কি হবে, না হাসলেই হল। তিনি বিদ্রূপ করে বললেন : "কাঁদবি, কাঁদ, তাতে কারো কোন ক্ষতি নেই।"

ব্যাংটা তখন কাঁপতে শুরু করল। সে কি ভীষণ কাঁদা! বর্ষাকালের বাজিতে বমঝম করে বৃষ্টি হলে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম। চার দিক মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল, আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল, হুহুহুহু বজ্রপাত হতে লাগল। এবল বৃষ্টির কলো দাক্তন বজা হল এবং পথ-ঘাট ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা এবং এমন কি পাছাড় পর্যন্ত জলে ডুবে সব একাকার হয়ে গেল। জল ক্রমশঃ আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। চুপোর বাড়ীর লোকেরা দুর্গের ছাদে আশ্রয় নিলে। কিন্তু ক্রমে সেখানেও জল উঠলো। চুপো কোন রকমে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে ব্যাংকে বললেন : "ওগো ব্যাং, তোমার কাঁদা থামাও, আমার মেজ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

ব্যাং তখন কাঁদা থামালো। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেল এবং জলও ক্রমে সব নেমে গেল।

চুপো তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মেজ মেয়েকে ব্যাং-এর সঙ্গে

বেতে বললেন। মেজ মেয়ের কিন্তু ব্যাংকে বিয়ে করতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাপের আদেশ, কি আর করবে, অগত্য।

যেতে হল। সে তার দিগির মত বাঁটার আধখানা পাখর লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার চাপলো। দ্বিতীয় ঘোড়ার দেওয়া হল বৌভুত। ব্যাং ঘোড়ার লাগাম ধরে থপ-থপ করে যেতে লাগল তার নিজের বাড়ীর পাথে।

মেজ মেয়ে তার দিগির মত ব্যাংকে মেঝে কেলার জন্ত কোঁরে ঘোড়া চালাতে লাগল কিন্তু ব্যাং আগের মত একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে—এই রকম করে অগ্রসর হতে থাকার তাকে চাপা দেওয়া গেল না। তখন মেজ মেয়ে রাগে বাঁতা ছুড়ে মারল এবং ব্যাটা মরে পেছো ভেবে বাড়ী ফেরার জন্ত প্রস্তুত হল। কিন্তু ঘোড়ার বুথ ফেরাবা মাত্র পেছনে ব্যাংএর গলা গুনতে পেরে থমকে পড়িল।

ব্যাং বললে : “দেখ, আমাদের বিয়ে হওয়া বিধাতার অভিশ্রুত নয়, চল তোমার বাড়ী রেখে আসি।” ব’লে সে মেজ মেয়েকে নিয়ে তার বাপের হুগে ফিরে গেল। চুপোকে বললে : “দেখুন, আপনার মেজ মেয়ের সঙ্গে আমার মিলবে না, আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।”

চুপো এবার আর থাকতে পারলেন না। রেগে দাঁত-বুথ খিঁচিয়ে বললেন : “তুই মনে ভেবেছিল কি! বড় মেয়েকে দিলাম, পছন্দ হল না। মেজ মেয়েকে দিলাম, তাকেও মনে ধরল না। এখন চাই ছোট মেয়েকে। কোন মেয়েই ব্যাংকে বিয়ে করতে রাজী হবে না, আমার মেয়ে তো নয়ই। তোর বা খুদী করগে বা।”

কথাটা বল চুপোর মনে মনে কিন্তু খুব ভর হতে লাগল। না জানি ব্যাং এবার কি করে। কিন্তু সে রাগ সামলাতে পারল না।

ব্যাং তখন বললে : “তাহলে আপনি দেখছি রাজী নন? যদি রাজী না হ’ন তাহলে আমি লাকার।” ব’লে সে লাকতে আরম্ভ করল।

আর বার কোথা! অমনি সূর্য হরে গেল প্রচণ্ড স্ক্ৰাম্পন। ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত সব তোলাপাড় হতে লাগল। মাটি কেটে চৌচির হয়ে গেল। ধূলো-বালি উড়ে চার দিক অন্ধকার হল। চুপোর হুগে এমন দুলতে লাগল, যে কোন বুদ্ধিতে ভূমিসং হয়ে যাবে। চুপো তখন নাচার হয়ে চৌচিরে বললে : “জগো ব্যাং, তোমার নাচ বন্ধ কর, আমার ছোট মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব।”

ব্যাং তখন লাকান বন্ধ করল। পৃথিবী ঠাণ্ডা হল। চুপো ছোট মেয়েকে ব্যাংএর সঙ্গে বাবার আদেশ মিলেন।

এই ছোট মেয়েটির ছিল খুব দম্ভার শরীর এবং তার প্রকৃতি ছিল খুব বীর ও শাস্ত। সে ভাবলে, এই ব্যাং খুব বুদ্ধিমান। ছোট মেয়ে কেত কোন আপত্তি করলে না, বেজার গিয়ে ঘোড়ার উঠল।

এবার আর কোন গোলমাল হল না। ব্যাং তাকে নিয়ে তার নিজের বাড়ীতে হাভির হল।

[ আগামী সংখ্যার সমাপ্ত। ]

অনুবাদক—ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বিগাজ বল, ও শিসিমা, বরাত বিশ্বাস ক’রে কি চুপচাপ থাকায়? মানুষ চোটা করবে না? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?

চোটা করতে নিশ্চয় বাকী রাখোনি?

তা রাখিনি। বিশেষত বড়ো সাহেবকে পর্যাপ্ত চিঠি লিখে জানিয়েছি। এখানকার অফিসের অন্তর্য অবিচার।

তাতে কল কিছু হ’য়েছে?

কিছুই না।

তাই ত বলছিলাম, এখন তোঁর এই রকমই চলবে বিবাজ! কষ্ট পাওয়া এখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আজ যারা বিপক্ষতা করছে, তারাই তখন একেবারে জব্দ হয়ে যাবে। যুগে যুগে অনন্তকাল ধ’রে এই খেলা চলছে।

মানুষ তবু সংপথে থাকে না। তবু ভুল করে।

তোমার জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে তুমি থাকো শিসিমা, আমাদের ওতে ভগসা নেই। আমরা কাজ ক’রে যাব। কাজ বুঝ। তবে তোমার গোপাল যদি কীকতালে কিছু ক’রে দিত, আপত্তি ছিল না।

আমার গোপাল কেন হবে? তোদেরও গোপাল। গোপাল ত হুনিয়ার সকলের।

তবে যে সে বার আমার বোন সুলীলার অনুষ্ঠের সময়ে ডাক্তার এখন জবাব দিয়ে গেল, তুমি ঠাকুরঘরে খিল দিয়ে গোপালের পারে মাথা খুঁড়তে লাগলে, ঢাকা ঘরে গেল। সুলীলা সেয়ে উঠলো। সে কি ক’রে হল? সেই কালীতে। মনে পড়ে?

পড়ে বৈ কি। কি জানি সে কি ক’রে হল। রহত সুলীলারও প্রচণ্ড কেটে এসেছিল সেই সময়ে। ঠাকুর নিয়মে বাঁধা। সব পারেন, প্রাণ দিতে পারেন না। আমার আকুল প্রার্থনা এখন তাঁর পারে পৌঁছলো তখন সুলীলার সরহ এসেছে সারবার।

বিবাজ বল, মীরা এ সব কি শুনছ? তোমার ত এ বয়সে এ সব শোনবার কথা নয়?

কীখির শিসিমা বলেন, এই বয়সেই শোনাযায়। কচি বয়স থেকেই জেনে নিতে হবে জীবন কি, মৃত্যু কি। কী শোনাও এই পৃথিবী, কতো কষ্ট এ সংসারে, ও কিছুই জানে না। ঘরের নৌকোর ওকে এমন থেকেই উঠতে হবে, জীবন-সমুদ্রের বিপদের কড়কাল কাটিয়ে যাবার জন্য।

মীরার মনে পড়ে, সমুদ্র সে দেখেছে, মীল সমুদ্র আকাশ-ছোঁয়া।  
এশার সেখা যায়, ওপার নয়। মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের কথাও সে শুনেছে,  
যার লাগে কুল এসেও পৌঁছেছে। ঝড়ের সমুদ্রে রামবাইয়া  
তিলাবাটীয়া হাগিয়ে গেছে, এও তার দেখা।

পিসিমা বলছেন—ভয়নি ভীষনের সমুদ্র, এ পার দেখা যায়,  
ওপার নয়। সেই সমুদ্রে ঝড় আসে—কষ্টের ঝড়, দুঃখের ঝড়।  
সেখানে কাঠের কাটমারান চলবে না। চাই তার জন্তে ধর্মের  
নৌকা। যাতে কোনো বিপদ নেই।

পরদের থান-পরা কাঁথির পিসিমা, হাতে জপের মালা। বিকেল  
বেলার সোনা-বোদ এসে পড়েছে তাঁর প্রতিমার মতন মুখে,  
সেখানে কী সুলভ, চাঁপার মতন রং তাঁর। সাবান মাখেন না,  
হো যখন না, অথচ কী চক্চকে তাঁর গা। পীতগুলি এখনো পরিষ্কার  
বক্ককে, সাজানো। উনি না কি যোগ করেন দরজা বন্ধ করে  
দিয়ে। সে সময়ে কেউ যেতে পায় না কাছে।

কাঁথির পিসিমা পুঙ্খের বুদ্ধি, সাহস আর মেয়েদের মমতা নিয়ে  
এসেছেন নাকি?

অথচ এই রকম বিধবার কত সংসারে অশান্তি করছে, ইতিমধ্যেই  
মীরার চোখে পড়েছে। মন যত্নের ছোট হ'তে হয়, বগড়ার গলা  
যত্নের বাড়িতে পারা যায়, যত্নের নিষ্ঠুর হওয়া যেতে পারে এমন  
ক'টি বিধবার সঙ্গে তার দেখা হ'রে গেছে, ব্যাথা মনে করে একটু ব'সে  
কথকতা শুনলে আর গল্পার একটা ভূব দিলে সব পাগ খণ্ডন হ'রে  
যায়, সুতরাং যত ইচ্ছে পাগ করা।

সেদিন একজন কোট-প্যাটপরা ভ্রলোক এলো ওদের ডুয়িং-কমে।  
মি: বাহু তার নাম।

মীরা ভেবেই শেলো না বাহু কি পদবী। সে ত অনেক পদবীর  
কথা শুনেছে, বাঘ, হাতী, পখাভ, কিন্তু বাহু শোনে নি। মাম্মিক  
জিগেস করলে, বাহু কি মাম্মি?

বাহু মানে বহু, বোঙ্গ,—উনি বিলেত ঘুরে এসে বাহু হয়েছেন।  
সিনেমার ডিরেক্টর।

সে আবার কি জিনিষ?

তোমার জানবার দরকার নেই।

কিন্তু ওর জানবার দরকার হল।

কি করে?

মি: বাহুর ভরানক পছন্দ হ'রে গেল মীরার মুখ, মীরার গড়ন-  
পেটন। বললে, চমৎকার মানাবে আমার রাজকুমারীর পাট।  
প্রতিমার মতন মুখ, স্নিম চেহারা। যেন আমার স্বপ্নে-দেখা  
রাজকন্যা। আপনারা দেবেন আমার এই মেয়েটিকে?

ড্যাডি বললে, ওর পড়ার ক্ষতি হবে।

বাহু বললে, কিছু ক্ষতি হবে না। সামার ভ্যাকেশনের মধ্যে  
আমার ছবি তোলা শেষ হ'রে বাবে, অন্তত ওর পাটটা। গরমের  
ছুটি ত' এসেই গেল।

মীরা ভাবছে—স্নিম মানে কি?

বাহু নিজের মনেই বলছে, কেমন স্নিম, তোমরা বাকে তবী  
বলো, রোগা-রোগা ভাব অথচ বোগাও নয়, বেশ হাড্ডে-মাসে। লম্বা  
বয়সের মেয়েটি, সব চেয়ে এর সুখখানা ভারী ভালো লাগছে আমার।  
তেরি সুইট—ভারী মিঠি। হুও খু। হট্টারও দরকার। কারণ

আমার ছবি হবে রতীন। দাঁও ত বলে। কণ্টাষ্ট করে  
কেনি।

ড্যাডি পাইপ নামিয়ে বললে, কত দেবে?

শ' পাঁচেক।

আমাদের ত' দরকার নেই, ওর নামেই থাকবে। হাজার করে  
দাঁও না। হাজারে যখন একটা এমন মেয়ে মেলে।

তাই হল।

চুক্তিপত্রে মীরা সই করলো। মীরার ড্যাডিও সই করলো।

মীরা পেলে পাঁচশো টাকা আর নোট দু'খানা।

একখানা নোট ভাঙালেই পাঁচশোটা করকের টাকা পাওয়া বাবে?  
কী আশ্চর্য্য বলে ত!

একটা ছুটির দিন ও গেল টালিগঞ্জ। ট্রাম লাইন শেষ হ'রে  
গেল, তার পরেও কলকাতা ছিল? সেখানেও বড়ো বড়ো বাড়ী,  
বড়ো বড়ো লন্।

ওদিকেও না কি লক্ষ লক্ষ লোক থাকে।

মীরা পড়েছে—রামচন্দ্রের অবাধাও নাকি চল্লিশ মাইল  
লম্বা, বারো মাইল চওড়া ছিল। বাংলার রাজধানী গোঁড়,  
মুর্শিদাবাদও নাকি এত বড়োই ছিল। কলকাতা একদিন ভারতের  
রাজধানী হয়েছিলো, তাই এত বড়ো হ'রে গেছে। আজ শুধু ছোট  
পশ্চিম-বাংলার রাজধানী, তবু এশিয়ার সেরা শহর।

ও দেখেছে হাইকোর্টের পাশে গঙ্গার ধারে তেরোতলা বাড়ী।

"তেরোতলা বাড়ী, তেরোতলা বাড়ী।"

ডাকিছে পাহুলজনে

এই কলকাতা!—এই কলকাতা

নীরব নিমন্ত্রণে।"

ঈ ডিয়োর চুক মীরা দেখলো, সেখানে ক্রাসান আছে, সাজানো  
যার ঘরগুলি, পাড়ারগায়ের কুঁড়ে ঘর আছে, রাত্তা হাওয়া হাল্ফ উলুখড়  
ছাওয়া—গাঙ্গাচা পুকুরের ধারে, আছে বনশখ, আছে খানিকটা  
নিবিড় অরণ্য।

ঈ ডিয়োর মধ্যে হাজার রঙের বাহার ফুল ফলে লতায় পাতায়  
আছন্ন কুঞ্জবনে হাজার হাজার 'বাড়ির আলোর সামনে রঙ মেখে  
ঝলমলে সাজসজ্জা প'রে ওকে দাঁড়াতে হল, ওরই বয়সী সখীদের  
সঙ্গে।

ক্যামেরা স্রুত ঘুরতে লাগলো। মাথার ওপরে সাউণ্ড-বক্স  
হুলতে লাগলো। ওরা লাল নীল হলদে ফুল গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে  
সোনার সাজিতে ভরতে লাগলো, আর মুখ নড়তে লাগলো দেখানো  
মতন—ওদিকে ক্যামেরার আড়ালে গান হতে লাগলো, ওকেই নাকি  
বলে প্রে-ব্যাক—কত রকমের যন্ত্র, কত রকমের আগওয়াজ, কত মিঠে  
মিঠে সুর—

ফুল-বাগানের ফুলের মেলায়

ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।

শাড়ীর আঁচল বাঁচিয়ে চলি

এলিয়ে দিয়ে চুলগুলি।

ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।

ডাকছে ভামা, ডাকছে কোয়েল,

বৌ কথা কও, সুদিতা, পোয়েল।

শিউ কাঁহা ঐ পাণিয়া ডাকে

শিখ দিয়ে বায় বুলবুলি।

ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।

ছবিটা কেমন উঠলো, মীরা দেখতে পেলে না। কিন্তু আগাগোড়া রূপালী কাজকরা সবুজ বেনারসীতে লক্ষ বাস্তব আলোর গরমে ও একবারে বেয়ে উঠলো।

ওর ঠাণ্ডা হতে অনেকক্ষণ লাগলো। অনেক পাখার হাওয়া অনেক সরবং ডাব আর কমলালেবু খেতে হল। বুঝলো—যিশ্মে ছবি তোলা খুব আরামে হয় না, রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। বুক কেমন করে। শরীর কেমন করে।

ওদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল—বৃগপুরীর উদ্বোধন হ'য়ে গেছে। নতুন মুখ নতুন প্রতিভা নিয়ে নতুন রাজকতা আসছে। মীরা রায়চৌধুরী।

সিনেমার কথার জ্ঞানি তোমরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, এটা সিনেমার যুগ কিনা—মীরার কি হল? মীরার কি হল?

তাই তাতাতাড়ি সামার ভ্যাকশনে এসে পড়ি। ছুটি না হলে ত আর কিয় তোলা হবে না?

কিন্তু দিন নেই, রাত নেই, কখন গাড়ী আসে, কখন মীরাকে নিয়ে যায়, কখন কাজ হয়, কের মীরাকে দিয়ে যায়, কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। অনিয়মের চূড়ান্ত।

কিন্তু যেদিন তাকে রাক্ষসার সামনে হাজির করা হল সেদিন তার ভয় পাবার কথা, কিন্তু জানে ত ও সুরমাসি—সুন্দর তার চেহারা, আন্তে আন্তে তার চোখের সামনেই শব্দের হুড়ি বাঁটার কাটির মতন চুল করেছে, মুখে কালীর দাগ দিয়ে মুখটাকে বিভৎস ক'রে ফুলেছে, সেই রাক্ষসী তাকে স্থির মধ্যে পুঁথি নিয়ে এসে প্রকাশও প্রকাশে রাখলো, যে প্রকাশের অসখ্য ধাম, অসখ্য ঘর। সব ত শিখবোর্ডের তৈরী।

তারপর সোনার খাটে মাথা, রূপোর খাটে পা নিয়ে—সত্যি কি আর সোনা রূপা?—সোনালী পাত রূপালী পাত মোড়া কাটাই খাট। মধ্যমের বালিসে মাথা দিয়ে মীরা বখন ঘুমিয়ে পড়লো, আর দূর থেকে বাঁশি বাজতে লাগলো, আলোটা সবুজ থেকে নীল হয়ে এলো, তখন লাগছিলো স্বপ্ন-স্বপ্ন—তখন ত রাতই নয়, বাইরে জ্যেষ্ঠ মাসের হুপুর—মাথার শিরে প'ড়ে রইলো সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি বাতায়মোড়া—আসুড়ে রাজকুমার অনিলদা' পক্ষীরাজ খোড়ার চ'ড়ে আকাশপথে—সত্যি কি আর আকাশ-পথে, ফটো তোলায় কারবার পিচবোর্ডের মেঘ ভেসে বাজে, পাখাগুলো কাগজের সাদা পক্ষীরাজ কেমন উড়ে উড়ে আসছে। মীরা কি দেখেনি? হৃদয়াগর, কীরিয়াগর, যেতহতী, সবই ত কীকি।

বাক, রাজকুমার আসছে আসছে, সেদিন তোলা হয়েছিলো—আজ এসে বাবে রাজপুত্রীতে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নীল আলোজালা, রূপোর ধূপলানীতে ধূপজালা ঘরে ধূপের খোঁয়ার নিকুম রাজকুমার ঘুঁষ ভাঙাবে, কুঁচবরণ কতা বার মেঘবরণ চুল। সেই রাজকতা মীরার—এই ত গল্প—আজ এই পর্যন্ত। সামনের শনিবার বাকীটা তোলা হবে।

এলো সামনের শনিবার। নীলসায়রের মাথখানে কটককট গ্যাটিকের, তরোয়াল দিয়ে সেটা ভেঙে লাল গ্যাটিকের সিঁহদ-কোটা

হাতে নিয়ে খুলে, কাগজের কালো ভোমরাকে ধরতেই ভীষণ চীৎকার ক'রে রাক্ষসী ছুটে আসছে আখালি-পাখালি ক'রে, কাগজের লম্বা লম্বা হাত নিয়ে রাজপুত্রকে ছোঁয়-ছোঁয়—ছিঁড়ে ফেলে বুঝি টুকরো ক'রে—রাজপুত্রের হাতের তরোয়াল কালো ভোমরাকে ছ'ভাগ ক'রে দিলে, রাক্ষসী পড়লো আড়াড খেয়ে। আর ও দিকে ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করে কি জোর একটা বাজনা বাজলো, তারপর বন বন বনানং।

বাবাঃ, ভয় করে এসব দেখলে!

এই রূপকথার আগাগোড়া মীরা দেখতে পায়নি, পুরো গল্পটা কি ঠিক জানে না, দেখেছে টুকরো টুকরো ছবি নেওড়া, একদিন যখন সব একসঙ্গে জুড়ে ছবি-ঘরে দেখানো হবে তখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, ছেলেবেলার শোনা পিসিমার সেই গল্পটার সঙ্গে মেলে কি না। কিন্তু সে সুযোগ আসবে কবে?

এক বছরেও এলো না। বই তৈরী হ'য়ে গেল, হাউস পাওয়া যায় না দেখানোয়। হিন্দি বই হচ্ছে, বড়োদের বই হচ্ছে, বাচ্চাদের এ বইটা আর কিছুতে সুযোগ পাচ্ছে না।

মীরা নতুন ক্লাসে উঠে গেল। মাথায় খানিকটা বড়ো হ'য়ে গেল। দেখতে আরো সুন্দর হ'য়ে গেল। তবু বৃগপুরীর প্রাচীর-পত্র, বৃগপুরীর বিজ্ঞাপন পড়লো না।

অনিলদা'র সঙ্গে ডাব হরয়েছিলো। সে স্থল ফাইনাল পাশ ক'রে কলেজে ঢুকে গেল, তবু বইটা দেখানো শুরু হল না। ক্লাসের সব মেয়ে মীরার আশ্চর্য্য রাজকতা দেখবার জন্যে তৈরী হয়ে ছিলো, ক্রীড়ানরী পর্যন্ত; তারা ত জানে ফেরারী টেলস্ এই বকমই হয়, সেই সব মেয়ে কোথায় কোথায় চলে গেল, সকলে এ ক্লাসে এলোও না, বৃগপুরীর দেখা নেই।

শেখটা মীরা হাল ছেড়ে দিলে। মনে করলে, আর বুঝি হবে না সে বই। মিথ্যা জ্ঞাত টাকা খরচ ক'রে তোলা হল। মিথ্যে মীরার জ্ঞাত পরিশ্রম করলো!

একদিন ওরা বাড়ীর মোটরেই জিবেণী বেড়তে গেছিলো। গঙ্গার ধারে সেখানে কাগজের কল। সেখানে ডাণ্ডির ছোট ভাই বড়ো সাহেবদের এক জন। তারই বাংলোর গিয়ে খাওয়া-পাওয়া।

গঙ্গা সেখানে সর। কিন্তু কোথায় বহুনা? কোথায় বা সরস্বতী? তিন নদীর মিলন কই? এইখানে কাছাকাছ সে বাংলা দেশের গ্রাম দেখলো, কবি বাক বলেছেন 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়।' এইখানে পল্লীধু দেখলো, ঘড়ায় করে জল নিয়ে বাঁশকাড়ের ধায় গিয়ে চলেছে। কিছুই তার মনে বেধে রাখলো না। এ মাটির সঙ্গে ত তার টান নেই।

জন্ম থেকে সে দেখেছে সমুদ্র, চির-অশান্ত চিত্রকল। হুণ্ড হাওয়া হুড়হুড় ক'রে ঢেউয়ে আছড়ে পরা বালুটের ওপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আকাশ বেধানে সাদা ইম্প্যাক্টের মতন উজ্জল, জল বেধানে চোখ জুড়ানো নীল, যগড়া নেই, নীচতা নেই, কেউ টোলেও বেধানে ভনতে পাওয়া যায় না, হৃদ-সাদা সী-গাল পাখা মেলে উড়ে বেড়ার নীল জলের কাছাকাছি, অনেক দূরে মাহাজগামী জাহাজের মাস্তুল দেখা যায় দিগন্তের কোল বেঁচে।

হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় হুটো ভাইয়ের রান বিঘর মুখ। ছালা আর প্যালা। যেদিন এসেছিলো, চেয়ে চেয়ে দেখছিলো দিগির

নেই। এ বাড়ীর যা কিছু কাজ কর্তৃক পুজো-আর্চা আচার-অনুষ্ঠান সবই ওই পুজার দালানটুকু ঘিরে। দুর্গাপুজো লক্ষ্মীপুজো কালীপুজো, কার্তিক গণেশ সরস্বতীপুজো, চণ্ডীপাঠ কর্তন যাত্রা খিচোরী সবই এখানে। ভাত, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ-শাস্তি স্বস্ত্যায়ণ সবই এখানে। এ পরিবারের সকল মাসলিক কাজের মিলন কেন্দ্র আমাদের এই ছোট পুজার দালানটুকু।

পুজার দালানে ঠাকুর প্রণাম করে ছোটকাঁকা ছোট বুড়িমা ও আর আর গুরুজনদের প্রণাম করে ঘরে এসাম। ঘরে এসে দেখি, স্ট্রটকেশ এয়াব-বাগ গোছান হয়ে গেছে। নমিতা তার হাতে বাঁধান একটি খাতা দিয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখবার জন্তে বলে দিলে। মাইয়া ও বাবু মশাই ঘুমিয়ে পড়ছে। তাদের না জাগিয়ে আদর করে আর আর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। থোকা মনে আর বাবলু আমাকে কে, এস, এম-এর সিটি-খাপিস অবধি পৌছে দেবার জন্তে সঙ্গে চললো। সেখানে গিয়ে দেখি যে আমাদের সহযাত্রী বন্ধু হুটভন তখনো এসে পৌছাননি। খানিক পরেই তাঁরা এলেন আর হেণ্ডাঙ্ক অকরণ ইত্যাদি অস্ত্রাস্ত্র বন্ধুও এসে হাজির হল। কে, এস, এম, বাস বাত প্রায় ১২টার সময় ছাড়লো দমনম এয়ারপোর্ট এর উদ্দেশ্যে। যাত্রা আমাদের হলে দিতে এসেছিল তারা ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল। সূর্য পথের যাত্রা আমরা তিন বন্ধু তখন আমাদের আসন্ন ব্যাকক ও চীন ভ্রমণের বিষয় নানারূপ আলোচনা করতে করতে চললাম।

আলোচনার মধ্যে তিন জনকেই মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু অস্ত্রমনস্ক ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল—বাড়ীর জন্তে খো, ছেলেমেয়ের জন্তে মন কেমনের লক্ষণ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এয়ারপোর্টে পৌছতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। সেখানে পাশপাশে টিকিট ও অস্ত্রাস্ত্র কাগর পর দেখান শেষ হলে রিফ্রেসমেন্টরুম গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় পান করে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। তারপর প্রায় ছুটির সময় গেনে গিয়ে উঠলাম।

প্লেনটি বেশ বড় আর বসবার সিটগুলিও খুব নরম ও আরামপ্রদ। ইউরোপীয় যাত্রাই বেশী। ভারতীয়দের মধ্যে আমরা তিন বন্ধু আর দু'একজন অঙ্গ লোক। এয়ার গেস্টেস একটি ডাচ তরুণী। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, ঝং ফরসা, চেগারা মোটের উপর ভালই। চুলগুলি পুরুষের মত ছোট করে ছাঁট। শুধু মাটি বললে সবটুকু বলা হয় না, একেবারে যাকে বলে অস্ত্রাস্ত্র পরিগ্রহী। সব সময়ই কিছু না কিছু কাজ করছেন। ফ্রসং নেই এক মিনিটও। একবার তিনি সকলকে লবনচূষ দিয়ে গেলেন, তারপর নিয়ে এলেন ফলের রস। ফলের রসটা গোব হয় একটু টকই ছিল, তাই পরিবেশনের সময় মুখখানিতে হাওয়াই হাসি এনে তাকে যথাসম্ভব স্তম্ভিত করে নেবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

প্লেন ছাড়বার ঠিক আগেই "বেন্ট বাথো" খালো জলে উঠলো। দুঃখের বিষয় প্লেনটি মাটি ছেড়ে আকাশে অনেক উঁচুতে ওঠবার পরেও আমার পেট ও বেন্টের মধ্যে বোরোপড়া সাঙ্গ হয়নি। আমার ঠিক পাশের সিটেই বসেছিলেন এক প্রবীণ নবরসাক্তি সান্তেব। তাঁর অবস্থাও আমারই মতন। "বেন্ট খালো" খালো যখন জলে উঠলো তখনো রবার্ট ক্রসের মত তিনি চোঁটাই করে

চলেছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম যে দুটি কবল ও একটি বালিশ তাঁর পেট ও বেন্টের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তিনি বেন্টের দু'মুখকে কিছুতেই এক করতে পারছেন না।

সহায়ত্বভিক্ষিত মন আমার ভরে উঠলো। আড়চোখে একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে টীকে বললাম, বেন্ট বাঁধার আর দরকার নেই, বেন্ট খোলার সিগনেল পড়ে গেছে। তিনি বার দুই খান্স ইউ বলে অতি করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে এণ্ট হাসলেন। আমিও ততোধিক করুণ হাসি হেসে তাঁর জবাব দিলাম। তিনি আমতা আমতা করে আমার বললেন যে এতাবলেন গুডার সময় বেন্ট যে বাঁধতেই হবে এমন কোন কথা নেই, প্রতাপ কাছাকাছি থাকলে কি বলত জানি না, তবে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে মাথা নড়লাম।

প্লেনটি উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগলো। ক্রমে খুব উঁচুতে দাঁটে পড়লো। যখনই কোন সহর কি নগরের ওপর দিয়ে বাচ্ছিলো তখন অন্ধকারের মধ্যে নীচে পুরের আলোগুলি ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিলো। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সীটে বসে খানিক বাদেই নাক ডাকতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ বা সারা রাত ধরে সিটের উপর প্লেনের বালিশ ও কবলগুলিকে একবার এদিক থেকে ওদিক একবার ওদিক থেকে এদিক একবার উঁচু একবার নীচু করে বিনিত্র রক্তনী বাপান কংছেন, আরামসই ভাবে কিছুতেই তাদের সন্ধিয়ে উঠতে পারেননি। ঘুমের কসরৎ করেছেন খুব কিছু ঘুম হয়নি এক মিনিটও।

এ যেন সেই কাঁচা সাইক্লিষ্টএর হপ করতে করতে বাড়ী পৌঁছে যাওয়ার মত। আমি সময় কাটিয়েছি কখনো বা ছবিব বই দেখে কখনো বা একটু-আধটু পড়ে আর বেলীর ভাগ সময় বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বেশ লাগে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে। মনটা যেন কি রকম চাড়া হয়ে যায়। কত রকমের ভাবই না মনে আসতো ভাবে আসা-যাওয়া করে কিন্তু কোন ভাবনাই মনের মধ্যে দানা বাঁধতে পারে না, এ যেন অনেকটা স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি অবস্থা।

ক্রমে ক্রমে গাতের অন্ধকার যখন ফিক হয়ে এলো, ভোরের আলো যখন ফুটি-ফুট করেও ফুটতে পারতে না, তখনকার সে দৃশ্য একেবারে অপূর্ণ। প্লেনের উপর থেকে সে দৃশ্য চোখে না দেখলে ঠিক ধারণা করা যায় না। আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বিক মিলনের সে দুগ্ধটুকু বড়ই করুণ, বড়ই মনোহর। তার পর একটু আলো রংগা ফুট উঠলো তখন মনে হল যেন অন্ধকারের মায়াভাঙ্গা ছিন্ন করে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হল আমাদের এই সুন্দর ভূবন। তখন দেবের সোনার কাটির পরশে। প্লেন চলছে কখনো বা আকাশের খুব উঁচু দিয়ে কখনো বা একটু-আধটু নীচে নামছে। কোথাও কোথাও মেঘরাজ্যের মধ্যে নিম্নে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, কোথাও বা মেঘরাজ্যকে নীচে কেলে আকাশের অবিচ্ছিন্ন নীলিমার মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছে। মেঘের কত রকম রূপই না চোখে পড়ে। টুকরো মেঘ, হালকা মেঘ, গাঢ় ঘন মেঘ, প্যাক্সা তুলোর মত। কোনটি ধবধবে শাদা, কোনটি একটু লাগচে, কোন কোনটিতে আবার বায়বীয়তার রং খেলো যায়।

পরদিন সকাল প্রায় সাতটায় ব্যাকক এতটাই বেঁচে এলো দেখলাম। এতটাই-মতি মস্ত বড় আর লেখতেও খুব ভাল। পৃথিবী অনেক জায়গা থেকে বহু প্লেন প্রতিদিন এখানে যাওয়া-আসা করে।

লগ্নেজ টিকিট ইত্যাদি দেখাতে এখানে খানিকটা সময় লাগলো।  
ও দেশের অনেক মেয়েই এয়ার-খাপিলে কাজ করে। বেশ চালাক  
চতুর ও চটপটে। কথাবার্তা ভাবভাব দেখে মনে হয়, কিঞ্চিৎ  
আমেরিকান ভাবাপন্ন। পোকা-পরিচ্ছদেও ইউরোপীয় ছাপ।

খানিক বাদেই এয়ার-অফিসার তাঁদের বাসে করে আমাদের  
কে, এল, এম, হোটেল নিয়ে চললেন। হোটেলটি সেখান থেকে প্রায়  
১২।১৪ মাইল দূরে সড়কের উপকণ্ঠে। বীচ-ঢালা রাস্তাগুলি খুব  
জাল, রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ বসানো রয়েছে।

বাসে বেতে বেতে মনে হল, ঠিক যেন আমাদের বাঙ্গালান্দে।  
হাফালা দেশের মতই সবুজ মাঠ, আল-সেওয়া ধানের ক্ষেত, গাছ-পালা  
ব্যোপন্যস্ত। সেই হাসকা বিহ-বিহে হাওয়ার তিলে মাটির গন্ধ,  
সেই মীল আকাশের বৃকে সাধা মেঘের তেলা, সবই যেন খুব চেনা ও  
আপনার বলে মনে হতে লাগলো।

এখানে কাক চড়াই গোলাপায়রা সবই আছে। কোকিলের  
ডাকও শুনেছি এবং শুনে আনন্দও পেয়েছি। পথে বেতে বেতে যে  
গুটিতকত পাখী ও প্রজাপতির সঙ্গে লর্দন মিললো, মনে হল তায়ও  
যেন বাঙ্গালী! আমাদেরই মত বাঙ্গালী দেশ থেকে এখানে দিন কতক  
হাওয়া খেতে এসেছে।

কে, এল, এম, হোটেলটি অতি চমৎকার! এমন সুন্দর  
হোটেল সড়চর চোখে পড়ে না। গেটে চুকতেই খাসা সাজানো  
ক্যারিয়ার বাগান ও লাল কাঁকরের পথ। মাঝখানে খানিকটা  
গোল ভায়গা মাটি ও উট দিয়ে উঁচু করে তার উপরে চূণ ও  
হু দিয়ে K. L. M. অক্ষরগুলি ইংরাজীতে বড় বড় করে দেখা  
রয়েছে। প্লেন যখন ঘুরতে ঘুরতে নামে তখন দূর থেকে সবুজই  
সেই অক্ষরগুলির দিকে নজর পড়ে। ডান দিকে খানিকটা জলা  
আয়গার উপর লম্বা একসারি স্তম্ভ কাঠের ঘর দুটির উপরে দাঁড়িয়ে  
রয়েছে। নীচে জল। সেই জলে যখন আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে  
তখন বড়ই চমৎকার দেখায়। পাশেই সবুজ গালচের মত টেনিশ  
খেলার মাঠ, তার পরেই হোটেলের মস্ত বড় দোতলা বাড়িখানা।  
সেই বাড়ীর একতলার বিরাট হলঘরটি রিসেপশন রুম হিসাবে  
ব্যবহার হয় আর দু'তলার ঘরগুলিতে অফিসারদের থাকবার  
ব্যবস্থা। তার পরে আবার একটি প্রকাণ্ড লন, হোটেলের  
ভোজনর অবধি বিস্তৃত আর সেই লনের দু'পাশে সারি সারি  
মনোরম কাঠের দু'তলা ঘরগুলি। প্রতি ঘরের সঙ্গে সলর বাথরুম।  
পাশাপাশি দু'খানি ঘরে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হল।  
আমাদের ঘরের পিছনে আর একটি ছোট্ট পুকুর, তার চার পাশে  
ছোট-বড় গোটাকতক গাছ ও এক কোণে একটা কাঠের ঘর।  
তারও পিছনে প্রকাণ্ড বড় মাঠ ও ধানের ক্ষেত। দূরে একটি সাধা  
মন্দিরের খানিকটা দেখা যায়। মাথার উপরে নীল আকাশ।  
বড়ই মনোরম দৃশ্য!

লাড়ি কামিরে বেশ ভাল করে ব্রান করে পোবাক বদলে  
নিলাম। শরীর খুব হাল্কা মনে হল আর ক্রিপেও শেল খুব।  
তখন তিন বন্ধু মিলে খাবার ঘরে বাওয়া গেল। বেশ পরিষ্কার  
পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো গোলাকৃতি ঘরটি। চারদিকে কাঠের  
জানালা কিট করা, ওপর দিকের দেওয়ালে রঙচঙা রামায়ণের  
দ্রি আঁকা। একটি ছবিতে দেখি যে, বীর হনুমানজী এক হাতে

গদা আর এক হাতে একটি পরমাহনুদরী বোড়ীকে টেনে নিয়ে  
চলেছেন সমুদ্রের তলার দিকে।

কফি টোষ্ট জাম চীজ ডিম হাঁস-মুরগীর ঠাণ্ডা মাংস, ফলের রস  
কলা ইত্যাদি দিয়ে খুব তৃপ্তি করে প্রাতরাশ সাধা হল। তার পর  
বাক্সনের দেওয়া একটি চুকট বগিয়ে হোটেলের আপিসে এলাম  
আমাদের সেই টাকা ভানিয়ে সেখানকার টাকা মানে "টিকল"  
করে নেবার জন্তে। টাকা ভোলানো হয়ে গেলে হলর বারান্দায়  
এসে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসলাম যিনি জনে। আকাশে তখন  
একটু মেঘ করেছে, টিপি-টিপি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। সে বৃষ্টি  
পড়া দেখে বাঙ্গালী দেশের বৃষ্টি পড়ার ছবি চোখের সামনে  
ভেসে উঠলো।

চিঠি লেখা সাজ হল, সেগুলি তাকে দেবার জন্তে আপিসে যে  
মেয়েটি সাহায্যক ভাণ্ড-কর্ষ দেখা-ভুলে করে, তার হাতে বিলাম ও  
বললাম যে আমরা ব্যাংকক সড়হটি একটি ঘরে দেখে আসতে চাই।  
খাই-ভারত কালচাচাচাল লজটি কোন দিকে, তাও তাকে জিজ্ঞাসা  
করলাম। সে বললে যে, হোটেলের একটি বাস এখনি শো-আপিসের  
দিকে যাবে, আমরা স্বল্পে তাতে করে যেতে পারি। সেখান থেকে  
ব্যাংকক বাজার ও খাই-ভারত কালচাচাচাল লজ ইত্যাদি খুব কাছে,  
সেখানে বাবার কোন অসুবিধেই হবে না। ভালই হল। বাসে উঠে  
শো-আপিসের দিকে চললাম।

এ দেশের ডাইভাররা বোধ হয় আস্তে আস্তে গাড়ী চালানো বাকি বলে,  
তা জানেই না। এত জোরে গাড়ী চালাতে আর কোথাও দেখিনি।  
এত ভাল নতুন ধরনের গাড়ীও আর কোথাও নজরে পড়িনি। এমন  
কি কলকাতায়ও নাই। এক-একখানা গাড়ী একেবারে পেটায় বড়,  
বন্ধু-বন্ধু তক্ত-তক্ত করছে। চেহারা রং ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বকম-করই  
বা কত! লাল কাল সবুজ হলদে পাঁচমশেলি গাড়ি ফিকে কত  
বকম রং। লম্বা ডোঁটা মাথারি বেটে কোনটা গোলগাল ঘোটা-  
সোটা, কোনটার বা বেশ ছিপছিপে গড়ন, সিনেমায় নামবার  
মত।

কোনটার মাডগার্ড ও বডি দেখে মনে হয় আঁহা বেচোয়ার  
বোধ হয় "সিডিয়া" হয়েছে। কোন কোনটির নিত্যধর  
বাহার দেখে তাদের আর মোটর গাড়ী না বলে নিত্যধর  
বাই বলেই ইচ্ছা যায় বৈক্য কবিদের মত। সবই আমেরিকার  
তৈরী।

চারিদিকে কত যে নতুন নতুন বাড়ী হচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা  
নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। ইতুপ কলেজ হাসপাতাল আপিস  
কারখানা দোকান পত্র ইত্যাদি বিশ্বর তৈরী হচ্ছে চারি দিকে।  
ব্যাংকক আর সে পুরানো ব্যাংকক নেই। আমেরিকার সঙ্গে সে  
এখন গাঁটছড়া বেঁধেছে। আমেরিকান জিনিষপত্র কলকাতা কাপড়  
চোপড় এসেল পাউডার ইত্যাদি বাবতায় পণ্যপ্রবো ব্যাংকক তথা  
থাইল্যান্ড এখন ভর্তি বললেও চলে।

যে ব্যাংককের ব্যবসাকেন্দ্রের চেহারা আমরা দেখে এসেছি,  
তা প্রায় সম্পূর্ণ মার্কিন টাকা ও তলারকে তৈরী বলেই মনে  
হয়। ওখানের লোকদের কাছে বিদেশী মার্কিনদের আসন যে বেশ  
খানিকটা উঁচুতে, তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

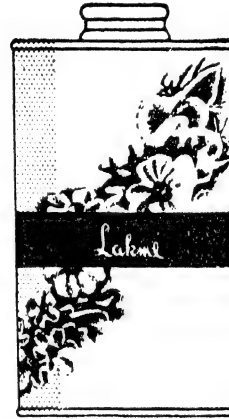
[ ক্রমশঃ





## আধুনিক ইন্দ্রজাল !

এই জীবনের  
ছোটখাটো ব্যথাবেদনা  
এর সুগন্ধে মস্তুর মতো  
মিলিয়ে যায়—



### লোকহো

ট্যা ল কা ম  
পা উ ডা র  
তিন রকমের সুগন্ধ

এটি টাটার তৈরী

লাক্‌মে প্রাইভেট লিমিটেড  
বথে হাউস, ফোর্ট, বোম্বাই—১





# বিবেকানন্দ শ্রীমদ্ভাস্কর

শ্রীমদ্ভাস্কর

৩১

আর একটা দল ছিলো, ইতিহাসে পাই—

সে-যুগের সাতেরের পৌখরা সানাই।

যদেখী আচম্বক, দিশী টাবেক,

নিজের 'হান' বোলে করে যারা খেদ।

পাদী-সাতেরের জুতার তলার

নিজের মন-প্রাণ যারা সোঁপে তার,

'আচম্ব' ভেবে বীরা আনন্দ পান,

'ভারতে পুত্র বান' বীরা কপ্তান,

—এহেন দলের সব বিশিষ্ট নেতা

'ম্ভাস্কর'কে বা লেখেন অগুণ সেটা।

অগুণ পরশ্রী চাতুরতা আর

ঈর্ষায় অগুণ চিঠির বাহার।

সবচেয়ে দুঃখের কথা শুনেবন ?

প্রথমে জীবনে যিনি ভক্ত ছিলেন,

প্রতাপ মজুমদার ১ তিনি কিনা পেয়ে

হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে মলাগোন্ধে

ঠাকুরের বিরুদ্ধে চিঠি লিখলেন।

১। স্বনামধন্য ব্রাহ্ম-প্রচারক শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮১৭ সালের Theistic Quarterly Review এর অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীশ্রীমদ্ভাস্করের যে সাক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন—সেই বৃত্তান্ত পোড়োই Max Muller (ম্যাকমুলার) নামককর্তাব্যক্তির প্রতীতি আকৃষ্ট হন এবং শ্রীমদ্ভাস্করের সম্বন্ধে প্রথমে 'Nineteenth Century' নামে ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায়, এবং পরে পুস্তকাকারে তাঁর জীবন এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ধারণা—'ম্ভাস্কর' তার কথাটা দেখেন।

অবিভক্ত কল তাকে উন্টোই হয়।

'ম্যাকমুলার'টি তো কচি-খোকা নয়।

প্রতাপ বতই তাঁক যুক্তি জ্ঞান,

মহাশক্তি 'সায়ন' ২ কি তাকে ধাবড়ান ?

পরের শ্রী দেখে যারা খালি কাতরাও,

'ম্ভাস্কর'র জবাবটা শুনে বেখে দাও।

৩২

'ঠাকুরের ভাষা নাকি ভাবি কল্পিল'—

আপনার গ্রন্থত আমি করেছি বাস্তব।

ভাষার স্রীলতা কেউ বাস্তবিন কোঁ বেখে;

সেটাও বদল হয় দেশ-কাল ভেদে।

সামুখ্য ল্যাংগো হোয়ে বেড়ায় বে-দেশে,

ভাষা কি ভরির জামা পোরবে সেদেশে ? ৩

২। 'ম্যাকমুলার' প্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁর গৃহীতশিষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাস্কর চক্রবর্তীকে বোলেছিলেন,—'সায়নই নিজের ভাষা নিয়ে উদ্ধার করতে Maxmuller (ম্যাকমুলার) রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হয়েই ঐ ধারণা। Maxmullerকে দেখে দেখাংগো আরও যেন বদল হয় হোয়ে গেছে'।

শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন,—'সায়নই যদি Maxmuller হন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মে দেখু হলে জন্মালেন কেন' ? উত্তরে স্বামিজী বোলেছিলেন,—'জীবের উপকারের ভক্ত তিনি যথা ইচ্ছা জন্মতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিজ্ঞা ও জর্ব উন্নতই আছ, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপবার খরচট বা কোথায় পেতেন ? তুমিসু ? East India Company এই স্বার্থ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিতেছিল। তাতেও কুলায়নি। তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript লিখেছেন; তারপর ছাপাতে ২০ বৎসর লেগেছে'। স্বামিশিষ্য-সংবাদ (পূর্বকণ্ঠ, পৃ: ৮৪)

৩। "As to his filthy language, we must be prepared for much plainspeaking among Oriental races. In a country where certain classes of men are allowed to walk about in public place stark naked, language too is not likely to veil what with us requires to be veiled. There is, however, a great difference between what is filthy and what is meant to be filthy. I doubt whether the charge of intentional filthiness or obscenity, which has been brought against writers like Zola, could be brought, or has ever been brought, against Ramakrishna...It should not be forgotten that in Homer, in Shakespeare, nay even in the Bible, there are passages against which our modern taste revolts, yet we object

দ্বিতীয় যে অভিযোগ, সেটা হোলো—‘তীর  
বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি মতা অবিচার।’  
আপনার একোতে আমি খুব লাম দি’না।  
জাণা চাই স্ত্রীর মনে কোন্ড আছে কি না।  
স্ত্রী যদি সত্যই তন ধৰ্ম-জীবনে,  
স্বামীর পবিত্রতা চান মনে মনে,  
তাহালে এ-অভিযোগ ঠাডায় কোথায় ?  
সবাই কি এ-জীবনে সন্তোষ চায় ? ৪

to Bowdlerised editions, because the indecencies  
are never of an intentional character, and would  
seem to have been so, if they were now removed  
by us.”—Ramakrishna, His Life And Sayings.

By Prof. F. Max Muller. (Page 62)

এ-ব্যাপারে স্বামিজীর মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।—

“ব্রাহ্মসমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ চট্টোপাধ্যায়  
আমরা স্মরণীয় যে—শ্রীমাকুলের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি  
আনন্দিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট। আমরা যাহাকে অস্বীকার বলি, এমন কথার  
সমাবেশ তাগতঃ থাকিলেও তাঁহার অপর্যাপ্ত বালবৎ কামগন্ধ-ভীততার  
জন্ত ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ দোষের না ইহা দুঃখ-স্বরূপ ইহা আছে।  
অথচ ইহাই একটা প্রবল আক্ষেপ !!”

—ভাববার কথা। (পৃ: ৬৪)

৪। “Another charge which Mozoomdar seems  
to consider as proved against Ramakrishna is  
what he calls his almost barbarous treatment of  
his wife...Vivekananda told us that when at the  
age of seventeen his wife (Sri Sarada Devi) went  
to find him (Sri Ramakrishna), he received her  
with real kindness, and that she was quite  
satisfied to live with him on his own terms, if  
he would only enlighten her mind and make her  
to see and to serve God. Such a relationship is  
by no means without a precedent, and can not  
be called barbarous...It is strange that a man of  
Mozoomdar's knowledge and experience should  
have considered the resolve of Ramakrishna's  
wife to live with him as a Samnyasini as  
barbarous treatment. She herself evidently did  
not think so, nor have I heard of any other  
cruelties on the part of her husband. If she was  
satisfied with her life, who has any right to  
complain; and is love between husband and  
wife really impossible without the procreation  
of children? We must learn to believe in Hindu  
honesty, however incredulous we might justly  
be on such matters in our country. Anyhow, I

তাঁহাড়া শুনেছি আমি স্বামিজীর কাছে।

শ্রীমার বিশেষী ভক্ত—ঐবও সায় আছে।

Mrs. S. C. Bull শ্রীমার শ্রীমুখে

যে-কথা শোনেন সেটা শোনো নিশ্চয়।—

‘When she gladly gave her husband...’

Her assent

That he should lead a Samnyasin's life,

She gained his intimate friendship,

And became his disciple,

Receiving daily instruction.

During the year's of her life with him

She was his adviser,

Praying earnestly

For such purity of motive

That she might never fail him.

She had also taken the vow

Of poverty and chastity,

And renouncing the natural joys of a mother,

She became with him

‘The spiritual parent of many children.’ ৫

“অতএব ‘আজীবন স্ত্রী-সঙ্গ নেই’

—এ ব্যাপারে আমাকে বা লিখেছেন, সেই

আপনার অভিযোগ সঙ্গত নয়।

শ্রীকে বেধে কামত্যাগ অবিচার নয়।

অবিশ্রুত আমদের ইউরোপী ধাত

আপনার অভিযোগ হোল আনা খাটে।

তাই বোলে ভারতের পুণাড়মিতে

আজীবন অমলিন শুদ্ধ শ্রীতিতে

know of no one else who has taken offence at  
Ramakrishna's spiritual marriage.”

—Ramakrishna, His Life And Sayings.

By Prof. Max Muller. (Page 64 and 65)

৫। বরন তিনি (শ্রীশ্রীদারলা দেবী) সানন্দে তাঁর স্বামীকে  
(শ্রীশ্রীমাকুলকে) সন্ন্যাসজীবন যাপনের মত দিলেন, তখন তাঁর  
স্বামী তাঁকে আরও নিবিড়ভাবে গ্রহণ কোরেছিলেন, আর সেই থেকে  
সারদা দেবী তাঁর শিষ্য হোয়ে প্রাত্যহিক উপদেশ গ্রহণ কোরতে  
লাগলেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সেই ক’বছরে, তিনিই স্বামীকে পরামর্শ  
দিতেন, এবং তাঁর প্রতি একাগ্রাশ্রিত্য ভাজে চিত্তের যে পবিত্রতার  
প্রয়োজন, তার জন্ত আত্মবিরতাবে প্রার্থনা কোরতেন। তিনি  
নিজেও তাঁর স্বামীর মত) দারিদ্র্য ও পবিত্রতার দ্বন্দ্ব গ্রহণ  
করেছিলেন, এবং যা হওয়ায় স্বাভাবিক আনন্দ ত্যাগ কোরে তিনি  
তাঁর স্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক-স্বত্ব অসংখ্য সন্তানের মা কোরেছিলেন।

—Ramakrishna, His Life and Sayings.

By Prof. Max Muller (Page 65)

যদি তুমি কোনো যোগী শুভনিষ্ঠায়  
দ্রষ্ট্রকে নিয়ে নিম্পাশ জীবন কাটায়,  
নিঃসন্দেহে আমি মেনে নি' সে কথা ;  
সন্দেহ যে জাগায় নি' না তার কথা ।  
ইউরোপ যা পারে না ভারত তা পারে ;  
ইউরোপীয়ান সেটা বিশ্বাস করে ।"

৩৩

"আর একটা প্রেক্ষাপট এনেছেন বিনি,  
কেশব সেনের কোনো আত্মীয় তিনি ।  
তীর মতে—"ঠাকুরকে শ্রীকেশব সেন  
অজ্ঞানার গুহা থেকে বাইরে আনেন ।'  
অতএব তীর মনে এই কথা ভাগে,  
কেশব সেনের স্থান ঠাকুরের আগে ।  
প্রথম যে প্রেক্ষাপট কোরেছেন তিনি,  
সেকথার প্রতিবাদ আমিও কোরিমি ।  
আমি জানি শিবাকে যত কোরেই  
প্রকাশিত হন গুরু এমনি কোরেই ।  
তাঁই বোলে কেশবের আসন আগুটে,  
—একথাতে যুক্তির ছিটে-কোটা নেই ! ৬

আর একটা অদ্ভুত অভিযোগ কিনা,  
'বেগমকে তিনি নাকি করেননি ঘৃণা ।'  
এতে শুধু এইটুকু বোলে রাখি ভাই,  
শুধু রামকৃষ্ণ নন, অনেকেই তাই ।  
সুগ-ধর্ম-প্রবর্তক বুদ্ধ ষ্ট্যান্ডি,  
এ-বাপারে সকলেই সম-অপরাধী ।" ৭

৬। "A relative of Keshub Chander Sen, however, who evidently completely misapprehended what was implied by the influence which I said that Ramakrishna had exercised on Keshub Chandra Sen, Mozoomdar, and others as his disciples, is very anxious to establish the priority of Keshub Chander Sen, as if there could be priority in philosophical or religious truth. 'It was Keshub Chander' he tells us, 'who brought Ramakrishna out of obscurity.' That may be so, but how often have disciples been instrumental in bringing out their master ?"

—Ramakrishna, His Life And Sayings.

By Prof. Max Muller. (Page 66)

৭। "He then continues to bring charges against Ramakrishna, which may be true or not, but have nothing to do with the true relation between Keshub and Ramakrishna. If, as we

সমাজের ঘৃণা থাকে যেহে চারদিকে,  
ভাগ্যত কি করেন 'অবাগালী'কে ?  
'সামরীয় মহিলা'কে বীত কি করেন ?  
ঘৃণা না অমুগ্রহ—সেটা দেখেছেন ?

অতএব রামকৃষ্ণের শুধু নন,  
অবতার সবই দেখি পতিতপাবন ।

৩৪

খুঁটান মিশনারী, বারা এতদিন  
হিন্দু-হিন্দেনকুল ধর্মবিহীন—  
এই কথা বোলে প্রেয় বগল বাতান,  
'মূল্যের' পুঁথি পোড়ে তাঁরা খাখি খান ।

আর এদিকে হিংস্রটে ব্রাহ্মের মনে,  
আশা-জল খেয়ে বারা নেবেছিলো রপে,  
জলে ওঠে ঈশ্বর তীত্র আশুন ।  
'মূল্যের' পুঁথি যেন কাটা যারে হুণ ।

৩৫

সমাজে একটা দল এখনো আছেন ।  
অবিশি সংখ্যায় ঢের কমেছেন ।  
সর্ববিষয়ে এরা গলাবেই নাক,  
থাকে বলে একেবারে বেঁড়ে-ওস্তাদ ।  
যে কোনো বিবটি ভাব মাথা তোলো বেই,  
এই সব বিজ্ঞেরা পিছু লাগবেই ।  
এদের কর্ম শুধু বাড়ি বোসে থাকা,  
চুড়ির আগুয়াজটাতে কান খাড়া রাখা ।  
দারুণ মরুৎ এরা, ঠোকে ঝাক-তাক ।  
এদের দীনতা শুধু মেয়েদের কাছে ।  
বাইরের ঘরে এরা তর্ক বাধায় ।  
বাড়ির ভেতরে গেলে কেঁচো বনে যায় ।  
তাবোলে 'সমাজ-সেবা' করে নাকি তারা ?  
মেয়েদের ফরমাস খাটে তবো কারা ?  
পাশের বাড়ির ঐ মাসিক বাজার,  
সংবান, মাখার কাঁটা, কেশু-পাউডার—  
এরাই তো কিনে আনে, তার দাম কম ?  
পরের বাড়িতে এরা ছেলের মতন ।

৩৬

এ-হেন শুভার্থীরা আমায় ডাকেন,  
'মঠে' যাই বোলে তাঁরা ফোড়ন কাটেন,—  
"সিদ্ধ-শুকবে" বৃষ্টি সানার না আর ?  
ইদানীং রামকৃষ্ণ তুমি 'অবতার' ?

are told, he did not show sufficient moral abhorrence of prostitutes, he does not stand quite alone in this among founders of religion"

—Ramakrishna, His Life And Sayings.

By Prof. Max Muller. (Page 67)

একেবারে অবতার ? খাসা মতবাদ !  
নইলে যে ঢালাদের ছুঁতে না ভাত !  
বাবুদের ভোগ-রাগ মান-সন্মান,  
নইলে যে দু-দিনেই পাবে নিধাণ !  
ঢালা, নাতি-ঢালাদের প্রয়োজনে উনি  
'অবতার বহিষ্ঠ'(৮) বুকলে স্তম্ভণ ?  
বিবেকানন্দ যদি না থাকতো, তবে  
অবতার হওয়া তাঁর ঘুচে যেতো 'কবে' .

এই সব কথা শুনে আগে রাগ হতো।  
ভাবতাম—যুটো চড় মারি অন্ততঃ।  
ইদানীং আর একটা ভাব ওঠে মনে—  
বরাতে আসেন বাঁরা যুগ-প্রয়োজনে,  
সেই অবতার ছাড়া, পৃথিবীর বৃকে  
প্রচণ্ড মূঢ়েরাও আসে যুগে-যুগে !  
যেউ-যেউ করে তারা, ঠিক অবিকল  
হাতীর পেছনে ঐ কুকুরের দল।  
সামনে এ সাহসীরা আসেনাকো কেউ।  
বেশ কিছু পশ্চাতে করে যেউ-যেউ।  
অবিশ্বি ফল তাতে উটেটাই ফলে।  
হাতীর মতিমা তাতে আরো বেশি খোলে।

দিগন্তব্যাপী ঐ খোলা মাটিতে  
যদি ছুটো বেঁটে আর জাড়া গাছ থাকে,  
মাঠের শুল্কতাটা আরো বেশি পাই।  
মাঠের মহলুটা বাড়ায় এরাই।  
সে-হিসেবে বেঁটেদের মূল্য বিঘাট।  
কুকুরই প্রমাণ করে হাতীটা বিঘাট।  
কুকুরের ডাক শুনে অতিকার হাতী,  
ঘাড় ফিরে তাকায় না, মারে নাকো লাথি ;  
হাতী সোজা চোলে যায়, কুকুরেরা তার  
তাদের হীনতা দিয়ে বাড়ায় বাহার।

একটা মহৎ কাঙ্গ আরো হেঁটা পাও,  
সেটা হোলো আহবান—“হাতী দেখে যাও।”  
কুকুরের যেউ-যেউ যেই কানে যায়,  
সকলেই ছুটে আসে হাতীর আশায়।  
হাতী জাথা হোয়ে যায় কুকুরের ডাকে।  
সে-হিসেবে কুকুরেরও প্রয়োজন থাকে।  
ঠাকুরের প্রচারক বামিজীই নন।  
যেউ-যেউ করে যারা তারা কিছু কম ?

৮। বামিজী ঈশ্বরকৃপাবশত গুরু অবতার বোলেই কান্ত  
হননি, অবতারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কোরে গ্যাছেন।  
ঈশ্বরকৃপা-প্রশাম-মন্ত্রে বোলে গ্যাছেন,—

“হাপকায় চ ধর্মত সর্ক-বর্ধবরুপিলে।  
অবতারবহিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ তে নমঃ।”

৩৭

যুক্তো কি কোরে হয় জানা যদি থাকে,  
যোঝা যাবে বিয়োখিতা কতো কাজে লাগে।  
জলের তলায় ঐ বিহুকের বৃকে  
তুলতুলে জানোয়ার থাকে যেটা ঢুকে,  
তার গায়ে যেই কোনো বালি এসে পড়ে,  
বিযাক্ত লালা দিয়ে তাকে ঘিরে যায়।  
সে ভাবে এ বিষে তাকে ভাড়াইবে ঠিক ;  
কিন্তু কপালক্রমে হয় বিপরীত !  
বালির শত্রু এই বিহু-লালাটাই  
এই ভাবে ক্রমে-ক্রমে জমে-জমে তাই  
অজান্তে একদিন সর্বপ্রকারে  
বালিকে যুক্তো কোরে তবে তাকে ছাড়ে।  
বালিকে চটাত গায়ে—এই অভিধান,  
এই যে বিহু-মত্ততা, তাখো কতো দাম।

৩৮

যে-কোনো মহানুভাব মাথা তোলে যেই,  
একদল মূর্খেরা পিছু লাগবেই।  
মায়াব প্রভাবে পোড়ে এরা না-জেনেই  
ভাবটা স্তব্ধ করে সমাজ-মনেই।  
কর্ণা যে একদিন প্রচণ্ড বেগে  
মাটি কেটে ফেঁপে-ফুলে সমতলে নেবে  
উষর সমাজটাতে ঢুকে যায় দাদা,  
তার মূলে আছে ঐ পাহাড়ের বাধা।  
শত্রু ও নিম্নক মূর্খ পাহাড়  
বাধা দিয়ে গাতবেগ এনে জায় তার।  
এইভাবে একদিন এদেরি এ-ভুলে  
ভাবের প্রোতখিনী তরল তুলে  
ঢুকে যায় সমাজের মজ্জাতে তাই।  
স্বতরাং নিম্নকও হয় নয় তাই।  
পৃথিবীতে চাও যদি কায়েমী আসন,  
‘জটীলা-কুটীলা’দের বাড়ো প্রয়োজন।  
যেখানেই অবতার সেখানে ওরাই।  
নইলে কি কোরে হবে লীলা পোঠাই ?  
আলা-জল খেয়ে এরা বত যেউ ডাকে,  
ততোই প্রচার করে ঐ বাঘটাকে।

অন্তএব করে যারা কুকুরের পাট,  
তেড়ে-ফুড়ে আসে যারা বেড়ে-গুস্তার,  
গর্বোদ্ধত ঐ সব-জাঙ্ঘারা,  
যান্-যেনে প্যান্-শেনে মাথা-মোটা যারা,  
ছটাকে-বুড়িগো জ্যাটা নাশিকক,  
আহম্মকির ঐ ভ্যাক্ত প্রোতক,  
তমঃপ্রাণ ঐ কৃপমতুক,  
মিটুমিটে বিটুলে ও পচা নিম্নক,  
মূর্খ, গৌয়ার আর পাণ্ডা শরতান,  
—তারা কেউ হয় নয়, তাদেরও প্রাণ। [ক্রন্দনঃ]



## ব্যাডমিন্টন

এবারে পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপের আয়োজন করেছিলেন শোভাবাজার ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন। দেশ বিদেশের গুণী খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন মালয়ে ৩ পো লিম, ইন্দোনেশিয়ার উনয়মান খেলোয়াড় তান জো হক, ভারতের তিন ও চার নম্বরের খেলোয়াড় পি, এস, চাওলা ও অমৃত দেওয়ান।

সিঙ্গেলস, ডাবলস ও জুনিয়র সিঙ্গেলস, এই তিনটি বিভাগ ছিল পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপের সীমাবদ্ধ। ফাইনাল ও সেমিফাইনাল খেলা ছাড়া ইনডোর টেবিলে তেমন দর্শক সমাগম হয়নি। ফলে পরিচালক প্রতিষ্ঠানকে বহু টাকা ঘাটতি পূরণের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

সিঙ্গেলস—এবারে সিঙ্গেলসের চ্যাম্পিয়ান লাভ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার তরুণ খেলোয়াড় তান জো হক। বিতীর রাউণ্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ট্রেট গেমের জয়লাভ করেছেন। ফাইনালের ফলাফল:—তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-২ ও ১৫-৭ পয়েন্টে অমৃত দেওয়ানকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—ডাবলসের খেলায় ভারতের পি, এস চাওলা ও অমৃত দেওয়ান বিশ্ববিখ্যাত মালয়ে ডাবলস জুটি ও পো লিম ও ইসমাইল বিন মজিনের পরাজয় উল্লেখযোগ্য। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ৩ পো লিম শারীরিক অসুস্থ ছিলেন। তাঁর হাঁটুতে জল জমা অবস্থার খুঁড়ে খুঁড়ে খেলেন। এবার পূর্ব ভারত খেলায় খেলতে এসে আরও একটি নতুন উপসর্গ দেখা দেয়—তৃতীয় রাউণ্ডে মনোজ গুহর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি কোমরে ব্যথা অনুভব করার আর খেলতে পারেননি। ফাইনালে ডাবলসের ফলাফল:—অমৃত দেওয়ান ও পি, এস, চাওলা ১০—১৫, ১৫—১০ ও ১৫—১০ পয়েন্টে ও পো লিম ও ইসমাইল বিন মজিনকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গেলস—পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপে জুনিয়র বিভাগে অপরূপ মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন চন্দননগরের রমেন বোষ। রমেন ভারতের জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন দীপু বোষ ও রানাস গোরা বোষের কনিষ্ঠ সহোদর। জুনিয়র বিভাগে আর একজন খেলোয়াড়ের নাম করা যায়, সে হচ্ছে সুকুমার দেব। সুকুমার রমেনের কাছে সেমি ফাইনালে পরাজিত হয়েছে। ফাইনালে রমেন বোবাজারের কে শর্মাকে পরাজিত করে।

রমেন বোষ ১৭—১৪ ও ১৫—১ পয়েন্টে কে শর্মাকে পরাজিত করে।

বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে, বিভিন্ন খেলার ফলাফল নিয়ে দেওয়া হল।

সিঙ্গেলস—মনোজ গুহ ১৫—৫ ও ২৫—১০ পয়েন্টে দীপু বোষকে পরাজিত করেন। ডাবলস—মনোজ গুহ ও দীপু বোষ ১৫—৮, ১৫—১২ পয়েন্টে প্রবাক বসু ও হরিদ্রা গুহকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গেলস—গোরা বোষ ১৫—১১ ও ১৫—১০ পয়েন্টে সুমার দেবকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র ডাবলস—গোরা বোষ ও রমেন বোষ ২৫—৮ ও ১৫—৩ পয়েন্টে সুকুমার দেব ও কে শর্মাকে পরাজিত করেন।

## ক্রিকেট

সি, এ, বি, ক্রিকেট লীগের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার তিনটি গ্রুপে সি, এ, বি ক্রিকেটের খেলা পরিচালিত হয়। প্রতি গ্রুপে ৮টি করে টীম থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দলকে ৭টি করে খেলা খেলতে হয়েছে। 'এ' গ্রুপে মোহনবাগান 'বি' গ্রুপে কালীঘাট ও 'সি' গ্রুপে রাজহান চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য এই তিনটি দলকে লীগ প্রথায় খেলে, কালীঘাট দল মোহনবাগান ও রাজহান পরাজিত করায় চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জন করে।

## এশিয়ান টেনিস

এবারের এশিয়ান টেনিসের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন মিশরের কাতিমান খেলোয়াড় জারোলাভ ডবনি। জারোলাভ ডবনি অস্ট্রেলিয়ার তরুণ খেলোয়াড় আর্থার হবারকে জুটি নিয়ে পুরুষদের ডাবলস ও মিস এ্যালাথিয়া গিবসনকে জুটি নিয়ে মিশর ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে 'ত্রিমুকুট' লাভ করলেন। এদিকে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন এ্যালাথিয়া গিবসন। এবার ছিল এশিয়ান টেনিসের ৪র্থ বার্ষিক অঙ্গুষ্ঠান। এই খেলার পরিচালনা করেন সিংহল লন টেনিস এসোসিয়েশন।

### পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

জারোলাভ ডবনি (মিশর) ৬-১, ৬-২ ও ৬-৪ গেমের গুয়ারেণ উডককে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

### পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

জারোলাভ ডবনি (মিশর) ও এ বুবার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩, ৮-১০, ৪-৬ ও ৬-৪ গেমের এক, এমান ও আর ডেইবোকে (কিলিপাইন) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

মিস এ্যালাথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-০, ৩ ও ১৩-১১ গেমের মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিসেস কে সি: (ভারত) ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট ব্রিটেন) ৬-৪ ও ৭-৫ গেমের মিস এ্যালাথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ও মিস সি কোনসেকাকে (সিংহল) পরাজিত করেন।

## মিল্লভ ডাবলস ফাইনাল

জারোপ্লাভ ভুবনী (মিশর) মিস এ্যাথলিটিক গিবসন (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৬-২ গেমের মাইকেল ডেভিস ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (স্ট্রেট-ব্রুটেন) পরাজিত করেন।

জাতীয় এ্যাথলিটিক চ্যাম্পিয়নশিপের ৮টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে পুরুষ বিভাগে ৪টি ও মহিলা বিভাগে ৪টি। একজন মহিলা দুইটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশ্বের এ্যাথলিটদের সঙ্গে ভারতীয় এ্যাথলিটদের তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় এ্যাথলিটদের মান অত্যন্ত নিম্নমুখী।

এ্যাথলিটিকদের ফেটুক চর্চা সেটা একপ্রকার সাময়িক বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যায়। সার্ভিসেস দল ইতিপূর্বে পর পর ৬ বার জাতীয় এ্যাথলিট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এবার নিয়ে সাতবার হল। পুরুষ বিভাগে ২৪টির মধ্যে ১১টিতে সার্ভিসের এ্যাথলিটরা প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিহারের এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। লোহার বল ও বর্শা ছোঁড়ায় তিনি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাইজাম্পে ত্রিবাহুর কোচিনের বসন্তকুমারী ও ডিসকাসে থেতে মহীশূরের সিলিন ও'কনেল দুইটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

## এশিয়ান টেবিল টেনিস

ম্যানিলায় চতুর্থ এশিয়ান টেবিল টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ভারত অতি অল্পের জন্য টিম-চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ভিয়েতনাম। মোট ৬টি দেশের সঙ্গে দলগত যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে ভারত ও ভিয়েতনাম উভয়েই পাঁচটি দেশকে পরাজিত করে ও একটিতে পরাজিত হয়। চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বন্দ্ব ভারত ও ভিয়েতনাম মধ্যে খেলার ব্যবস্থা হলে ভিয়েতনাম অজুহাত দেখায় তারা ২৮টি খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ভারত ২৬টি। অন্তঃসর ভিয়েতনামই বিজয়ী সাব্যস্ত হয়।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় চীন খেলোয়াড়দের অসম্ভবকার। নিয়ে ফলাফল দেওয়া হ'ল।

## পুরুষদের টিম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—ভিয়েতনাম, রাপাস—ভারত।

## মহিলাদের টিম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—তাইওয়ান; রাপাস—কোরিয়া।

## সিঙ্গলস-ফাইনাল

লাউ সেক কোক (হংকং) ১৩-২৩, ২১-১৮, ২১-১৬, ও ২১-১১ পরেটে লু লু সাংকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

## ডাবলস—ফাইনাল

মাই ভান হোয়া ও ট্রান ক্যান ডুয়োক (ভিয়েতনাম) ২২-২০, ১৪-২১, ২১-১১ ও ২১-১৩ পরেটে ম্যুয়েন কিং ছাং ও ট্রান ভান লিউক (ভিয়েতনাম) পরাজিত করেন।

## মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল

চো কিয়াং জো (কোরিয়া) ২১-১০, ২১-১৮ ২১-১৫ পরেটে উই ত্রাঙ্গ সুককে (কোরিয়া) পরাজিত করেন।

## মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

চিং পাও পো ও শী চ্যাং চাই (তাইওয়ান) ২১-১৫, ২১-১৪ ও ২১-১৮ পরেটে ইয়াও লিলিয়ান ও ইয়াও চুকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

## হকি

ক'লকাতায় হকি মনস্তম সুস্থ হয়ে গেল। অতি অল্পদিনের হকি মনস্তম শেষ হলই কলকাতা থেকে হকিকে বদায় নিতে হবে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কুশলী খেলোয়াড়রা এক হকি মনস্তমে কলকাতা মাঠে ভীড় করার আশ তেমন বিশেষ উপায় নেই তবুও আইনের বেড়াভাল টপকে কিছু কিছু খেলোয়াড়কে কলকাতা মাঠে খেলতে দেখা যায়। পৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন নতুন খেলোয়াড়ের যোগদানের খতিয়ানে মোহনবাগানের কোন ক্ষতি হয়নি। গত বাবে গুরু অস্থিত ছিলেন বলে নিজ দলকে তেমন সাহায্য করতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে, কেশব দত্ত নিয়মিত খেলবেন, তাছাড়া উত্তর-প্রদেশ থেকে কয়েক জন ব্যাটনামা খেলোয়াড়ের যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে। গতবারের রানার্স ভবানীপুরে নতুন খেলোয়াড় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। রবিদাস, হরদেও সিং ও বালু দল পরিত্যাগ করেছেন, সেই সংগে ফিরে এসেছেন হাফজাউল, ডাক ও বিয়ু। ইষ্টবেঙ্গল দলে অনেক নতুন খেলোয়াড় এসেছেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের ভোগরা, পুণাব গুরুবঙ্গ মহীশূরের ডি মেলো উদ্বুদ্ধকরণ, পাঞ্জাব স্পোর্টস থেকে শ্রেষ্ঠ ও জগদীশপ্রসাদ। রবিদাস ও বালুকে ইষ্টবেঙ্গলে খেলতে দেখা যাবে। কাষ্টমস দলের খেলোয়াড় তেমন রদ-বদল হয়নি। আগামী বাবে হকি লীগের পর্যালোচনা করার ইচ্ছা রইল।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর রায়শর্মা কিশোর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯



### ব্যাডমিন্টন

এবারে পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপের আয়োজন করেছিলেন শোভাযাত্রার ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন। দেশ-বিদেশের গুণী খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন মালয়ের ওং পো লিম, ইন্দোনেশিয়ার উদীয়মান খেলোয়াড় তান জো হক, ভারতের তিন ও চার নম্বরের খেলোয়াড় সি. এস. চাওলা ও অনূত দেওয়ান।

সিঙ্গেলস, ডাবলস ও জুনিয়র সিঙ্গেলস, এই তিনটি বিভাগ ছিল পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপের সমাৰুহ। ফাইনাল ও সেমিফাইনাল খেলা ছাড়া ইনডোর টেবিলে তেমন দশক সমাগম হয়নি। কলে পরিচালক প্রতিষ্ঠানকে বহু টাকা খাটতি পুংণের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

সিঙ্গেলস—এবারে সিঙ্গেলসের চ্যাম্পিয়ান লাভ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার তরুণ খেলোয়াড় তান জো হক। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি স্টেট গেমে জয়লাভ করেছেন। ফাইনালের ফলাফল:—তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-২ ও ১৫-৭ পর্যায়ে অনূত দেওয়ানকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—ডাবলসের খেলার ভারতের পি. এস চাওলা ও অনূত দেওয়ান বিশ্ববিখ্যাত মালয়ের ডাবলস জুটি ওং পো লিম ও ইসমায়েল বিন মজিনের পরাজয় উল্লেখযোগ্য। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ওং পো লিম শারীরিক অসুস্থ ছিলেন। তাঁর হাঁটুতে জল জমা অবস্থার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলেন। এবার পূর্ব ভারত খেলার খেলতে এসে আরও একটি নতুন উপসর্গ দেখা দেয়—তৃতীয় রাউন্ডে মনোজ গুহর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি কোমরে ব্যথা অনুভব করায় আর খেলতে পারেননি। ফাইনালে ডাবলসের ফলাফল:—অনূত দেওয়ান ও পি. এস. চাওলা ১০-১৫, ১৫-১০ ও ১৫-১০ পর্যায়ে ওং পো লিম ও ইসমায়েল বিন মজিনকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গেলস—পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপে জুনিয়র বিভাগে অপূর্ণ মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন চন্দননগরের রমেন বোষ। রমেন ভারতের জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন দীপু বোষ ও রানাস গোরার বোমের কনিষ্ঠ সহোদর। জুনিয়র বিভাগে আর একজন খেলোয়াড়ের নাম করা যায়, সে হচ্ছে সুকুমার দেব। সুকুমার রমেনের কাছে সেমি ফাইনালে পরাজিত হয়েছে। ফাইনালে রমেন বোম্বালায়ের কে শর্মা'কে পরাজিত করে।

রমেন বোষ ১৭-১৪ ও ১৫-১ পর্যায়ে কে শর্মা'কে পরাজিত করে।

বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে, বিভিন্ন খেলার ফলাফল নিচে দেওয়া হল।

সিঙ্গেলস—মনোজ গুহ ১৫-৫ ও ২৫-১০ পর্যায়ে দীপু বোষকে পরাজিত করেন। ডাবলস—মনোজ গুহ ও দীপু বোষ ১৫-৮, ১৫-১২ পর্যায়ে প্রদ্ব বসু ও হরিপদ গুহকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গেলস—গোরা বোষ ১৫-১১ ও ১৫-১০ পর্যায়ে সুমার দেবকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র ডাবলস—গোরা বোষ ও রমেন বোষ ২৫-৮ ও ১৫-৬ পর্যায়ে সুকুমার দেব ও কে শর্মা'কে পরাজিত করেন।

### ক্রিকেট

সি, এ, বি, ক্রিকেট লীগের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার তিনটি গুপে সি, এ, বি ক্রিকেটের খেলা পরিচালিত হয়। প্রতি গুপে ৮টি করে দল থাকায় প্রত্যেক দলকে ৭টি করে খেলা খেলতে হয়েছে। 'এ' গুপে মোহনবাগান 'বি' গুপে কালীঘাট ও 'সি' গুপে রাজস্থান চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্ত এই তিনটি দলকে লীগ প্রদায় খেলে, কালীঘাট দল মোহনবাগান ও রাজস্থান পরাজিত করায় চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জন করে।

### এশিয়ান টেনিস

এবারের এশিয়ান টেনিসের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন মিশরের কীতিমান খেলোয়াড় জারোলাভ ডবনি। জারোলাভ ডবনি অস্ট্রেলিয়ার তরুণ খেলোয়াড় আর্থার হবারকে জুটি নিয়ে পূর্ববদের ডাবলস ও মিস এ্যালথিয়া গিবসনকে জুটি নিয়ে মিসড ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে 'ত্রিফুট' লাভ করলেন। এগিকে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন এ্যালথিয়া গিবসন। এবার ছিল এশিয়ান টেনিসের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই খেলার পরিচালনা করেন সিংহল লন টেনিস এসোসিয়েশন।

### পূর্ববদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

জারোলাভ ডবনি (মিশর) ৬-১, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে ওয়ারেন উডকককে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

### পূর্ববদের ডাবলস ফাইনাল

জারোলাভ ডবনি (মিশর) ও এ বৃথার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪ ৬-৩, ৮-১০, ৪-৬ ও ৬-৪ গেমে এক, এমান ও আর ডেইবোর (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-০, ৩ ও ১৩-১১ গেমে মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট ব্রিটন) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিসেস কে সি (ভারত) ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট ব্রিটন) ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ও সি কোনসেকাকে (সিংহল) পরাজিত করেন।



## মিস্ত্র ডাবলস ফাইনাল

## ডাবলস—ফাইনাল

জারোপ্লাভ ভুবনী (মিশর) মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৬-২ গেমের মাইকেল ডেভিস ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (স্ট্রেট-বুটেন) পরাজিত করেন।

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপের ৮টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে পুরুষ বিভাগে ৪টি ও মহিলা বিভাগে ৪টি। একজন মহিলা দুইটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশেষ এ্যাথলীটদের সঙ্গে ভারতীয় এ্যাথলীটদের তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় এ্যাথলীটদের মান অত্যন্ত নিম্নশ্রেণী।

এ্যাথলেটিকসের ফেটকু চর্চা স্টো একপ্রকার সাময়িক বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যায়। সার্ভিসেস দল ইতিপূর্বে পর পর ৬ বার জাতীয় এ্যাথলীট চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, এবার নিয়ে সাতবার হল। পুরুষ বিভাগে ২৪টির মধ্যে ১১টিতে সার্ভিসের এ্যাথলীটরা প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিহারের এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। লোহার বল ও বর্শা ছোঁড়ায় তিনি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাট্জাল্পে ত্রিবাহুর কোচিনের বসন্তকুমারী ও ডিসকাস প্রোতে মহীশূরের সিলিন ও'কনেল দুইটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

## এশিয়ান টেবিল টেনিস

মানিলায় চতুর্থ এশিয়ান টেবিল টেনিসের চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় ভারত অতি জল্পের জল্প টিম-চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ভিয়েতনাম। মোট ৬টি দেশের সঙ্গে মলগত যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে ভারত ও ভিয়েতনাম উভয়েই পাঁচটি দেশকে পরাজিত করে ও একটিতে পরাজিত হয়। চ্যাম্পিয়ানশিপের জল্প ভারত ও ভিয়েতনাম মধ্যে খেলার ব্যবস্থা হলে ভিয়েতনাম অজুতাত দেখায় তারা ২৮টি খেলার জয়ী হয়েছে এবং ভারত ২৬টি। অতএব ভিয়েতনামই বিজয়ী সাব্যস্ত হয়।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় চীন খেলোয়াড়দের অজয়কার। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হল।

## পুরুষদের টিম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—ভিয়েতনাম, রাপার্স—ভারত।

## মহিলাদের টিম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—তাইওয়ান; রাপার্স—কোরিয়া।

## সিঙ্গেলস-ফাইনাল

লাউ সেক কোক (হংকং) ১৩-২৬, ২১-১৮, ২১-১৬, ও ২১-১১ পর্যায়ে নতুন লুড সালকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

মাই ভান হোয়া ও ট্রান ক্যান ডুয়োক (ভিয়েতনাম) ২২-২০, ১৪-২১, ২১-১১ ও ২১-১৩ পর্যায়ে নতুন কিং ছাং ও ট্রান ভান লিটক (ভিয়েতনাম) পরাজিত করেন।

## মহিলাদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

চো কিয়াং জো (কোরিয়া) ২১-১০, ২১-১৮ ২১-১৫ পর্যায়ে উই তান্ন শ্বককে (কোরিয়া) পরাজিত করেন।

## মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

চি পাও পো ও শী চ্যাং চাই (তাইওয়ান) ২১-১৫, ২১-১৪ ও ২১-১৮ পর্যায়ে ইয়াও গিলিয়ান ও ইয়াও চুকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

## হকি

কলকাতায় হকি মরশুম শুরু হয়ে গেল। অতি জল্পদিনের হকি মরশুম শেষ হলেই কলকাতা থেকে হকিকে বরাদ্দ নিতে হবে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কুশলী খেলোয়াড়রা এক হকি মরশুমে কলকাতা মাঠে ভীড় করার আর তেমন বিশেষ উপায় নেই তবুও আইনের বেড়াঙ্কাল টপকে কিছু কিছু খেলোয়াড়কে কলকাতা মাঠে খেলতে দেখা যায়। পৌরশ্রমিকা স্বরূপ খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন নতুন খেলোয়াড়ের বোগদানের খতিয়ানে মোহনবাগানের কোন কতি হয়নি। গত বারে গুরু অক্ষয় ছিলেন বলে নিজ দলকে তেমন সাহায্য করতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে, কেশব দত্ত নিয়মিত খেলবেন, তাছাড়া উত্তর-প্রদেশ থেকে কয়েক জন খ্যাতিনামা খেলোয়াড়ের বোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে। গতবারের রানার্স ডুবানীপুরে নতুন খেলোয়াড় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। রবিদাস, হরসেও নিং ও বালু দল পরিত্যাগ করেছেন, সেই সঙ্গে ফিরে এসেছেন হাক্কাউড, ডাক ও বিষ্ণু। ইষ্টবেঙ্গল দলে অনেক নতুন খেলোয়াড় এসেছেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের ভোগরা, পুণাব গুরুবঙ্গ মহীশূরের ডি মেলা উল্লিকরণ, পাঞ্জাব শোটিস থেকে শেটি ও জগদীশপ্রসাদ। রবিদাস ও বালুকে ইষ্টবেঙ্গলে খেলতে দেখা যাবে। কাষ্টমস দলের খেলোয়াড় তেমন রদ-বদল হয়নি। আগামী বারে হকি লীগের পর্যালোচনা করার উচ্ছ্বাস বইল।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের ব্যবহারী রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চার্টার্ড রাশন্যাল কিওর সেক্টর

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

# এহান্তরে বসতির সন্ধানে

ত্রিফিটীশচন্দ্র সেন

মামুষের বহন জানতে পারলো যে, সূর্যের চার দিকে যে সব গ্রহ ঘুরছে তারাও পৃথিবীর মত বস্তুপিত্ত, তাদের অভাববস্তাই জানবার আগ্রহ হ'ল যে, এ সব গ্রহে কোন প্রাণী আছে কি না এবং এ সব জায়গায় মানুষের বাসের ষোণী স্থান হবে কি না। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে গবেষণা করে কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছে।

মানুষের বাঁচবার জন্তে তিনটি প্রধান উপকরণ দরকার, বায়ু—জল, অক্সিজেন এবং পরিমিত উত্তাপ। এ সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণ না থাকলে মানুষের এ পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হ'ত না।

সব প্রাণীরই জীবন ধারণের জন্তে জল একান্ত আবশ্যক। জল না হ'লে খাদ্য পরিপাক হয় না। কিন্তু এই জল তরল হ'তে হবে, না হ'লে চলবে না। সব জলই সম্পূর্ণরূপে বরফ হ'লে কিংবা সম্পূর্ণরূপে বাষ্প হ'লে কোন প্রাণীই বাঁচবে না। কাজেই যেখানে বসবাস করতে হবে সে জায়গার উত্তাপ এ দুইয়ের মাঝামাঝি হ'তে হবে; আর্দ্রতাও উত্তাপ এত কম হলে চলবে না যে, সব জল জমে বরফ হয়ে যায়। আবার এত বেশী হলেও চলবে না যে, সব জল গরমে বাষ্প হয়ে যায়।

খাস-প্রাশাস গ্রহের জন্তে বায়ুতে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকা দরকার। এ কথা সবাই জানে যে, পৃথিবীর বত উপরে উঠা যায়, বায়ু তত পাতলা হতে থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণও কমতে থাকে। এ জন্তে এরোপ্লেনে করে অনেক উপরে উঠতে হলে খাস-প্রাশাস গ্রহের জন্তে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিতে হয়। এভাবেই বিজয়ের সময় অক্সিজেন সিলিন্ডার সঙ্গে নিতে হয়েছিল। কারণ, পাহাড়ের উচ্চত অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম। এরূপ বায়ুতে খাস-প্রাশাসের খুব কষ্ট হয় এবং একটু পরিশ্রম করলেই যথেষ্ট ক্লান্ত হতে হয়।

মানুষের খাবার জন্তে কলমুল শাকসব্জী দরকার। কাজেই যেখানে বাস করতে হবে সেখানে গাঁছপালা থাকতে হবে। গাঁছপালা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে জল ও অজান্তে দ্রব্য নিয়ে সূর্যরশ্মির তেজের মাধ্যমে পরিপাক করে। কাজেই গাঁছপালার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্তে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকা দরকার। সূর্যের আলোও আবশ্যক।

কাজেই কোন গ্রহে বাস করা যায় কি না জানতে হলে আগে ষোড়শ নিতে হবে যে, সেখানে তরল জল, আলো, বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং আবহাওয়ার পরিমিত তাপ আছে কিনা। কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যে আলো আসে তা শ্বেতকোষ বা যন্ত্রের সাহায্যে বিবেচনা করলে জানা যায় যে, সেখানে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প আছে কি না এবং কি পরিমাণ আছে।

দৃগবোধের সঙ্গে সঙ্গত নৃশ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরে অবস্থিত বস্তুর তাপ জানা যায়। ৪০০ মাইল দূরে যে মোমবাতি জ্বলছে তার তাপ হিসাব করে বলা যায়। এমনি করেই বহুদূরে অবস্থিত গ্রহ ও তারার উত্তাপ নির্ণয় করা হয়।

বৃহৎ সূর্যের সবচেয়ে নিকটে। মধ্যাহ্নে তার উত্তাপ হয় ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এত উত্তপ্ত আবহাওয়ার বাস করার কথা কল্পনাও করা যায় না। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর উত্তাপ খুব কম। হিমাক্ষয়ের চেয়েও ১৮০ থেকে ৬০০ ডিগ্রি নীচে। আমাদের পৃথিবীর কোন প্রাণী এত ঠাণ্ডায় এ সব

গ্রহে থাকতে পারে না। চন্দ্রে বাতাস ও জল দেখা যায় না, কাজেই এখানেও কোন প্রাণী বাঁচবে না।

আর বাকি রইল শুক্র ও মঙ্গল। শুক্রের চারদিকের বায়ুমণ্ডল কুছ-কটিকাময়। ভিতরের কোন বস্তু ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড খুব বেশী, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প খুব কম। বাইরের উত্তাপ ফুটন্ত জলের তাপের মত। এরূপ আবহাওয়ায় কোন প্রাণী না থাকাই সম্ভব। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, পৃথিবীতে কোন প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আগে যে অবস্থা ছিল শুক্রের বর্তমানে সেই অবস্থা।

মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা। বহির্ভাগ পৃথিবীর দেখা যায়। পৃথিবীর মত এই গ্রহেও ঋতু পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপ দিনে ৫০ ডিগ্রি হয় রাতে হিমাক্ষয়ের নীচে যায়। শীতকালে মেরুপ্রদেশে সাদা টুপির মত দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রায় থাকে না। ইহা বরফের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। কাজেই মঙ্গলগ্রহে জল আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভাগ খুব কম। বায়ুতে অক্সিজেন সামান্য আছে, পৃথিবীর এক হাজার ভাগেরও কম। এই গ্রহের উপরিভাগের প্রায় সর্বত্রই লাল হলদে রং দেখা যায়, লোহার মরিচার মত। বোধ হয় অক্সিজেন লোহার সঙ্গে মিশে এরূপ হওয়াতে বায়ুর অক্সিজেনের ভাগ এত কম গেছে। অত্বে কোন গ্রহে এরূপ দেখা যায় না। চন্দ্রে এরূপ রং মেটেই দেখা যায় না, কারণ সেখানে বাতাস নেই।

মঙ্গলগ্রহে যে সব কালো অংশ দেখা যায়, যদিও অল্পপাতে খুব কম, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা রং বদলায়। শীতকালে অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই এই সব অংশ অধিকতর বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম হয়। বোধ হয় এই গ্রহে এখনও অবশিষ্ট বা সামান্য উদ্ভিদ আছে তারই নিদর্শন। কিন্তু এই গ্রহে কোন কালে কোন প্রাণী ছিল কিনা কিংবা এখনও আছে কিনা সঠিক জানা যায় না। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, বহু যুগ পূর্বে পৃথিবী যে অবস্থায় পরিবর্তিত হবে, মঙ্গলগ্রহ এখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

কাজেই সৌরজগতের গ্রহ সম্বন্ধে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবী ব্যতীত শুক্র ও মঙ্গলে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়। বিশ্বজগতের আর কোথাও গ্রহ আছে কি না এবং সেখানে বসতি আছে কি না, একথাও স্বতঃই মনে হয়।

সৌরজগতের বাইরে কোন গ্রহ আছে কি না, এত দিন জানা যায় নি। সম্ভ্রুতি কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যের খুব কাছে যে-সব তারা রয়েছে, বোধ হয় তাদের কারো কারো অদৃশ্য সঙ্গী রয়েছে। কারণ, এই তারাগুলো একটু বেতালে ঘোরে, বোধ হয় কোন অদৃশ্য সঙ্গীর আকর্ষণে। তাহলে এসব অদৃশ্য সঙ্গীরাই তাদের গ্রহ হবে। সূর্য থেকে বহু দূরে যে-সব তারা আছে, তাদের সম্বন্ধে এখনও কোন তথ্যই জানা যায় নি। হয়তো তাদের অনেক গ্রহ আছে, যেখানে কোনরূপ প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়।

সব জগতেই যে প্রাণী এরূপ হবে এবং তাদের জীবনধারণের প্রণালীও যে একই হবে, এরূপ মনে করা সম্ভব হবে না। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের সূর্য্যবর্ত কত আকার ও কত প্রকারের কত প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল, তার সংখ্যা সেই!

# মার্গো

CHC & BEN



মার্গো সোপ



ব্যবহার করতে ভুলবেন না

অুরভি-সুন্দর মার্গো সোপের প্রচুর স্বিদ্ধ ফেপা  
লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে শরীরের মলিনতা দূর  
করে এবং শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাসেও তত্ত্বক্ষণ  
মসৃণ ও কোমল রাখে। পরিবারের সকলের পক্ষেই  
মার্গো সোপ একটি আদর্শ সাবান। কোমল ব্বেহের  
পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

ক লি কা তা - ২৯

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব প্রকাশনের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

স্বার্থপরকলেশশূল আত্মোৎসর্গীকৃত ভালবাসায় যে কী দীপ্তি, কি স্বর্গীয় আভা, মায়ের জীবনেব প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তা জ্বলিয়ায়মান। বঙ্গ ও দ্রাক্ষিক বনন মহামার্যরূপে ধ্বংসকারী হয়ে দেখা দিত, মায়ের কি ভয়ানক ব্যথিত অন্তর! চোখেই বা কত জল! সর্বস্বাধারের দুঃখ শ্রবণে তাঁর অন্তর যেন পিষ্ট হতে থাকতো। প্রদীপ্ত অক্সেলের খুঁটিনাটি সবাদ জানবার জন্য প্রতিদিন তাঁর কি গভীর আগ্রহ! কি আকুলতা! নিজের হাতে কোন প্রতিকারের উপায় নেই দেখে যেন অন্তরে এক অসহ বজ্রণ। আশ্রমবাসী ভক্ত সন্তানদের উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে তিনি ঘটনাবলি পাঠাতেন সেবার জন্য। তারা ফিরে এসে তাদের মুখে উদ্ভাবক কার্য সেবা-কার্যের বিবরণ শুনে কতই না আনন্দ প্রকাশ করতেন, কতই আশীর্বাদ করতেন তাদের।

কোনখানেই কোন দুঃখ দুর্দশার সবাদ পেলে তিনি যেন পাগল হয়ে যেতেন। মনে হত, সারাটা দুনিয়ার দুঃখেই যেন তিনি গুটিয়ে এনে আপন অন্তরে বাসা দিয়ে সবাইকে হাঁকা করতে চাইতেন। সারদা দেবীর মাতৃপরিচয় কারকে দিতে হয় না। তিনি যে মা কেন, এ প্রশ্নের উত্তর প্রশংসার ধারার মতই অক্ষুরঙ্গ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবিত কালে সারদা দেবী তাঁর কাছে যে দেবী-জ্যোতিষিত সন্ধান পেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ হলে তিনি তা কি ভাবে গ্রহণ করতেন, আত্মক্ষয়িতবে কতটা উচ্ছল হতেন, আত্মপ্রচারেই বা কত ব্যস্ত হতেন, তা সহজেই আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মিশিয়ে অনুমান করতে পারি। কিন্তু সারদা দেবী শুধু ছাত্রের মত স্বামীর অহুগামিনি অনুসারিণী হয়েই চলতেন। নিজের অস্তিত্বকে ঠাকুরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিয়েছিলেন।

এ অপরিচয় সূত্রাতিক্রম নহবৎখানার ঘরটির বাইরে পাড়িয়ে নে হয়, কি করে ভিতরে ঢুকবে? কিন্তু সারদা দেবী অবলীলাক্রমে দৈনের পর দিন এ ঘরটিতেই স্বর্গের সঙ্গে বাস করতেন। শুধু পাসস্থান নয়, সেটাই ছিল তাঁর ভাঁড়ার, রাজা ও শোবার ঘর এবং ঠাকুরের ও অতিথি সেবারও সর্ব আয়োজনের একমাত্র ঘর। ঘরোয়ানে কত অতিথিই না এ ঘরটুকুতে আশ্রয় পেতো। দ্বাধা

উপর কলতো সব ধারার বাধা শিকা, এক কোণে থাকতো ঠাকুর অঙ্গ জিয়ানো কৈ-মান্ডর মাহ। সে জন্ত তাঁর কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখবোধটুকুও ছিল না। অন্তরে সর্বদাই সন্তোষজনিত আন তিনি পূর্ণ থাকতেন। 'সন্তোষঃ স্তব্ধমুত্তমম্'-এর পূর্ণ অধিকারী ছিলেন তিনি।

তিনি যেমন ছিলেন সন্তানমাত্রেয়ই আদর্শ মা, তেমনি ছিলে আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী। দেবজ্ঞানে তিনি ঠাকুরের সেবা করতেন: সর্ববিষয়ে তিনি নিজের জীবনকে স্বামীর প্রভাবে প্রভাবাধিত করে গেলেন। দুইটি মাত্র ব্যাপারে তাঁকে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম করতে। অবশ্য তাতেও তাঁর মাতৃস্নেহেরই গভীরতা বোঝা যায়।

ঠাকুরের নির্দেশ ছিল, ছেলেরা আহায়ে সংযম করবে। হলে তাদের সাধন-ভজন জমবেনা। কিন্তু সারদা দেবী তাঁর ছেলেমেয়ে আহায়ে কৃচ্ছ্রতা সইতে পারতেন না। তিনি লুকিয়ে ছেলেমেয়ে পেট ভরে খেতে দিতেন। ঠাকুর জানতে পেরে রাগ করতেন। কিন্তু তাতে তিনি ভয় না পেয়ে বলতেন, 'ভূমি খাওয়া নিয়ে আমাদের বাহাদুরের খুঁড়ো না তো! এই তো খাবার বয়স। ওরা পেট পূরে ছুটো খাবেনি? ঠাকুর হাসতেন।

নৈতিক অধঃপতিত সন্তানদের সারদা দেবী ত্যাগ করে পারতেন না। বরং লোকদের দ্বারা ঘৃণিত, অবলোচিত বলাে তাঁর মমতা তাদের প্রতি দ্বিগুণ হত। তিনি বলতেন, 'সন্তান মায়ের কাছে সব সমান। ধূলো-কাঁদা মেখে এলেই কি মা তাতে কোলে নেবে না?' যদিও ঠাকুর অপরিচয় মানুষের সম্পাদে আসতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তবু সারদা দেবীর উত্তর শুনে কিছু বলতেন না। তিনি বলতেন, 'ঠাকুরবাবুর দেবী রাগ করতে উপায় আছে, কিন্তু নহবতের দেবী রাগ করলে উপায় নাই।' অথচ এই দুইটি কারণ ছাড়া সারদা দেবীকে স্বামীর মনোবৃত্তি অনুসারিণী, আজ্ঞাপালনকারিণী, আনন্দদায়িনী ভিন্ন অন্য কোন রূপেই দেখা যায়নি।

নিজ গণ্ডিকে কি করে পরার্থে সর্বজীবে ও সর্বভূতে বিস্তার করা যায়, কোন দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচারের অপেক্ষা না করে, তারই জীবন্ত আদর্শ ছিলেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী। মরণেই কি করে অমরত্ব অর্জন করা যায়, সাধারণ থেকে কি করে অসাধারণত্বে পৌছান যায়, নিজ জীবনের কষ্ট দিয়ে তিনি ভগবতকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বভাগী সন্ন্যাসী। কষ্টকেও তিনি বর্জন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ সন্ন্যাসীরই আদর্শ। কিন্তু সারদা দেবীর জীবন গৃহী ও সন্ন্যাসীর এক অপূর্ণ সম্মিশ্রণ।

পিতৃসম্পর্কীয় ছুটুখানি নিয়ে তাঁর গার্হস্থ্য ও সসার-কর্মের নিপুণতার পরিচয় আমরা পাই। আবার স্বামিসাহচর্যে, সেবার্টপূর্ণো আত্মনিবেগনের এক অপূর্ণ সন্ন্যাসিনী-জীবনও দেখি। আর এক দিকে দেখি, ভক্তসন্তানদের মধ্যে তাঁর মহিমময়ী মাতৃরূপ। তিনি ছিলেন আদর্শ কস্তা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী। পার্থিব সকল সম্পর্কেই তাঁর জীবনকে আদর্শ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

সাংসারিক সর্বকর্মেই যে ধর্মের অঙ্গ, এ তিনি একদিনের জন্য ভোলেন নি। তাই তিনি তাঁর অগাধ ভগবতের পথে বাশে বাশে উঠতে পেয়েছিলেন। সসারের কান্দ, ভক্তের সেবা, উদাস

ভ্রাতৃক্লেশ বরণ, রাধুর অত্যাচার, এ সব কিছুকেই তিনি তাঁর ধর্মের অঙ্গ বলে সহজ ভাবে নিতে পেরেছিলেন বলেই, তাঁর উদ্ধারার্থে কান বাধা হয়নি। এও তাঁর এক অসংখ্যগণেরই প্রকাশ। সাধারণ মানুষ সংসারের কষ্টব্যকে ধর্মপথে বিয় মানে কবে বলেই আটকে যায়। অগ্রদূত হতে পারে না। সারদা দেবীর শিকাই ছিল ধর্মের মধ্যে ভগবান লাভ করা সম্ভব।

তাই তো আমরা দেখি, আমাদের রাজরাজেশ্বরী মাকে মাটির ঘর গোবর-স্নাতা দিয়ে নিকাতে, বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে, ধান সিদ্ধ করতে ও চাউল ঝাড়তে। এক কথায় সংসারের ক্ষুদ্রাঙ্গি সকল কাজই নিজ হাতে করতে। আবার বেষ্টিয় পিতৃপরিবারের দৈন্ত-দুর্দশা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জন বরণ করে নিতে। অন্তরভরা তাঁর দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, সেবানিষ্ঠা ও অদৌম ধৈর্য। বীর অঙ্গুলি তেলনে সমস্ত কাজ মুহূর্তে সম্পাদিত হতে পারতো, বীর সম্মতিমাত্র মাটির ঘটি রাজ-অট্টালিকার পরিণত হতে পারতো, তাঁর এই নীরব কুজুহাবরণ, সেবা ও বিনয়ের মূর্তি থেকে আমরা কি বুঝবো? কি জানবো? এটুকুই কি জানবো না যে, তিনি সাধারণ মানবী নন? সত্যিই দেবী? তিনি সামান্য নন, অসামান্য?

সারদা দেবীর ভাতৃস্পৃহী রাধাকে বাদ দিলে তাঁর জীবনকথা

অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাধুর প্রীতি তাঁর মমতা ও ভালবাসা অনেকটা সংসারী সাধারণ লোকের মতই দেখাতো। প্রকৃতপক্ষে রাধুই ছিল মায়ের জীবনে মায়ার এক আবরণ। ঠাকুরের প্রারম্ভ কাজ সম্পন্ন করার জন্তই তাঁর মরদেহে অবস্থান। কাজেই মনে হয়, ঠাকুরের ইচ্ছায়ই সারদা দেবীর জীবনে রাধুর আবির্ভাব। ঠাকুরের দেহাবসানের পর কোন একটা মায়ার আবরণ না হলে মার দেহ রক্ষা করাট কঠিন হ'তো। এই সময়টা মা প্রায়ই ভাবসমাধিষ্ট থাকতেন এবং তা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হ'ত। অতি অপক্লপ রূপলাবণ্য যেন তাঁর দেহে ধরতো না। স্বর্গীয় এক আভা তাঁর দেহকে ঘিরে থাকতো। কিন্তু রাধুর আবির্ভাবের সাথে সাথে তা আর রইল না। মহামায়ার আবরণে যেন ঢেকে গেল!

রাধুকে মা দেববাবীর ইচ্ছিতে পেয়েছিলেন বলে ঈশ্বরের দান বলেই গ্রহণ করেছিলেন। চীনমুখা, অপরিণত বুদ্ধি রাধুর প্রীতি তাঁর স্নেহ ও কুমার যেন অন্ত ছিল না। মায়ার আবারনের মধ্যেও সংসারে থেকে কি করে ঈশ্বরলাভ সম্ভব, এইখানেই সারদা দেবীর জীবনে সে উদাহরণ দেখা যায়।

বাণাল মহারাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের প্রীতি ঠাকুরের স্নেহময়িক লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ একবার ঠাকুরকে

## মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোপায় গড়ালে?”  
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

সিপি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-স্বকর্ম  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনি যে আমাদের এত ভালবাসেন, শেষ পর্যন্ত আপনার কি জড়ন্তরতের মত অবস্থা হবে নাকি?”

ঠাকুর বলেছিলেন, “জড়কে ভাবতে ভাবতে লোকে জড় ব'নে যায়। আর আমি যে চৈতন্যকে ভাবি যে। যেমনি শুণু তোনিকেকে মন বাবে, সেমনি সব দূর করে তাড়িয়ে দেখো।”

রাধুর প্রতি সারদা দেবীর স্নেহাধিক্য সম্বন্ধে ঠাকুরের এই উক্তি খাটে। ভ্রাতৃপুত্রী রাধু তাঁর জীবনে মায়ার বন্ধন ছিল বটে, কিন্তু রাধুর প্রতি সন্তানবাসল্য প্রকাশে তাঁকে অত কাককে বঞ্চিত করতে হয়নি। সংসারী মানুষের মত রাধুর জন্ত তিনি পৃথক কোন পুঞ্জিও গড়ে তোলেন নি। তাঁর অনাবিল স্নেহমায়ার সহজ প্রাবল্যে সকলে যেমন ভরে উঠতো, রাধুও তেমনি। তবে স্বাভাবিকতা ও বুদ্ধিহীনতার জন্তে রাধু তাঁকে খুব বেশী রকমই জ্বালাতন করতো। ঠাকুর বলতেন, “গার্ভ সাহেবের হাতের লঠনে গার্ভ সাহেব সবাইকে দেখতে পান, কিন্তু তাঁর মুখ অন্ধকারই থাকে।” তেমনি সারদা দেবীর আত্মীয়-বন্ধনেরা সর্বদা কাছে থেকেও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারতো না। তাঁর সঙ্গে শুণু পার্থিব বার্ষ সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। রাধুকেও তাই আমরা সব সময় বার্ষ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখি।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সারদা দেবীকে দেখা যায় ক্ষমায়, ভালবাসায়, মমতায় মগ্ন হয়ে নিষ্কাম সেবা ও উপকারের উদ্দেশ্যে অনলস ভাবে কাজ করে যেতে। তাতে তাঁর কোন পারিপাশ্র্য বিচার ছিল না, সম্পর্কের নৈকট্য-দূরত্ববোধ ছিল না। আপন-পরের গণ্যকৈ তিনি অনার্যাসে ডিঙিয়ে গিয়ে এক মহামানবতার গণ্যকৈ অবলম্বন করেছিলেন।

সারদা দেবীর এই আদর্শ, সংসারে শাস্তি ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন। প্রতিদানের আশা না রেখে নিষ্কাম ভালবাসা, সেবা ও দয়া দিয়ে কাজ করলে সংসারেই কি ভাবে ভগবান লাভ সম্ভব, সারদা দেবীর গার্ভস্থ্য জীবন তারই সাক্ষ্য দেয়।

রাধু সম্বন্ধে তার স্নেহাধিক্য সম্বন্ধে তাঁকেও ভক্তরা প্রশ্ন করেছিল, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “বিদ্যাৎ আর্শিতেই চমকায়, কাঠে নয়।” অর্থাৎ ধীরা একান্ত ভাবে সাধন করেন, তাঁরা যাতেই মনোনিবেশ করেন তাই একান্ত হয়। কিন্তু বখনিই ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্রই মন উঠিয়েও নিতে পারেন, বা সংসারী সোকেরা সাধারণতঃ পারে না।

সারদা দেবী যদিও বৃহত্তর সংসারই করতেন, কিন্তু তিনি সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব ছিলেন না। কেন না, তাঁরা যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয়, তবে ভোবায় বদ্ধ জ্বলের মতই ঘোলাটে ও পঙ্কিল হয়ে ওঠে। সেট একের প্রতি তাদের মন এতটা আসক্ত হয় যে, অন্ত সকলের প্রতি সমান ব্যবহার দেওয়া তাদের সম্ভব হয় ওঠে না।

সারদা দেবীর অন্তরে ভালবাসা মুক্ত সমুদ্রের মত দীপ্তপ্রসারী ছিল। তাই রাধুর প্রতি আকর্ষণ তাঁর নিম্নের মধ্যে কোন পঙ্কিলতা বা ক্ষুদ্রতা আনতে পারতো না। তাঁর বিরাট বিশাল মাতৃহৃদয় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রতি সমভাবে মাতৃস্নেহ বিতরণ করে তাদের অন্তর ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে যেই আসতো, সেই ভাবতো, যা মুখি তাকেই বেশী ভালবাসে—তাদের প্রত্যেকের মনে এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে গভীর তৃপ্তির কারণ ছিল।

সংসারী মানুষ সাধারণতঃ বৃত্তার পূর্বে প্রিয়জনদের প্রতি অধিক

আকৃষ্ট হয়ে থাকে। শেষ সময়ে তাদের দেখার ভক্ত, কাছে পাওয়ার জন্ত অধীর চকল হয়। এতেই তারা সংসারের সঙ্গে একটা বন্ধন রেখে যায়। তাদের উর্দগমন রুদ্ধ হয়। কিন্তু সারদা দেবী বৃত্তার পূর্বে রাধুকে দেশে পাঠাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, “তর উপর থেকে আমি মন তুলে নিয়েছি। এর পর ওরা যেখানে থাকবে, ওকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও।” ভাবিতাবস্থার রাধুর প্রতি এতদিনকার আত্মতোলা ভালবাসা বৃহত্তর সংবরণ করে নিলেন তিনি।

মনে পড়ে, রাধুর প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশকে বাড়াবাড়ি বলে মনে রাখার আসার ঠাকুরের শিষ্য বোগীন মাকে ঠাকুর নিজেই দর্শন দিয়ে তাঁর সশর মিটিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, “গঙ্গার জলে কত অববিত্র ত্রয ভেসে যায় কিন্তু গঙ্গা কি অপবিত্র হয়? ওঁর প্রতিও তোমরা তেমনি সন্নিহ্ন চরো। না। গঙ্গার মতই ওঁকে পবিত্র মনে করো।”

রাধুর প্রতি মার স্নেহ কতকটা অপারিখ ছিল, এ স্নেহের কোন পারাপার ছিল না। এ স্নেহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর যে অসীম বৈরাগ্য সহ ও ক্ষমা প্রকাশ পেতো তার তুলনা নেই। তিনি রাধুকে বতই স্নেহ করতেন, রাধুর অত্যাচার ততই বেড়ে যেতো।

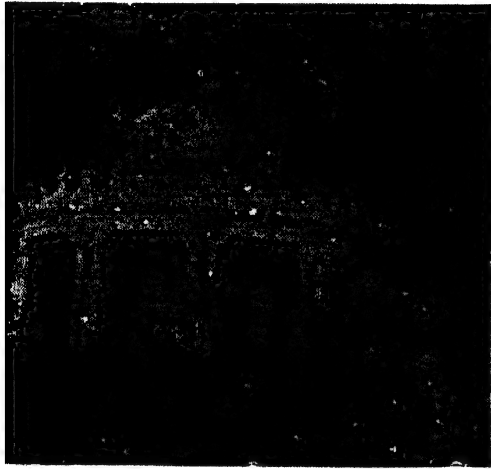
অনুগ্রহের ভক্ত রাধু আফি খাওয়া অভ্যাস করে। অনুগ্রহ সারলেও যে তা ছাড়তো না। যা যথেষ্ট চোঁটা করেও তার এই অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। একবার তো আফিএর পরসা দিতে অধীকার করার রাধু দ্বিপ্ত হয়ে তরকারীর কুড়ি থেকে একটি প্রকাণ্ড বেগুন তার মুখে এমন জোরে ছুড়ে মারে যে, আঘাতে যা বিবর্ণ হয়ে বান। সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থান ফুলে ওঠে। অথচ রাধুকে একটি কথাও বলেননি তিনি। বরং ঠাকুরের ছবির কাছে গিয়ে কন্যবাড়ে প্রার্থনা করলেন, অজ্ঞানে রাধু যে অপরাধ করেছে, তিনি যেন তাকে মাার্জনা করেন। রাধুকে তিনি নিজ পায়ের ধূলা মাথায় দিয়ে মজল কামনা করলেন। একটি কটুগাখ্যও বের হ'লো না তাঁর মুখ থেকে। তিনি শুণু রাধুকে বললেন, “তোমাদের ঘরে ভয়েছি, তোমাদের নিয়ে থাকি বলে, তোমরা আমার মূল্য বোধ না, আমার এমন কষ্ট দাঁও। ঠাকুর কিন্তু একদিনের ভক্তও আমাকে একটা কটু কথা পর্যন্ত বলেননি।” উত্তরে রাধুর অনুতাপের অঙ্গুর বয়ে পড়েছিল। স্নেহময়ী ক্ষমাময়ী পিতৃী তার ক্ষমা চাইবার আগেই তাকে ক্ষমা করে বসে আছেন। প্রণাম করার আগেই পদধূলি দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। চোখের জল ফেলা ছাড়া তার আর কি করণীয় আছে?

কলিকাতার আলম বা মঠে অবস্থান কালে সারদা দেবী, আধ্যাত্মিক আকর্ষণের খনি থাকতেন। কিন্তু নিজ পিতৃালয়ে অবস্থান কালে তাঁর রূপ যেতো সম্পূর্ণ বদলে। এ সারদা দেবী, এ যা যেন সেই মা, সেই সারদা দেবীই ন'ন। এখানে তিনি মায়ের মেয়ে, ভাইয়ের বোন, আত্মীয়ের আত্মীয়। এ যেন তাঁর পৃথক এক রূপ। জননীর পরিগ্রহ বাঁচাবার ভক্ত, ভাইয়ের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত কি অনলস পরিশ্রমই না দিবারাজ করতেন। শুণু যে মায়ের প্রিয় কন্যা ভাইয়ের প্রিয় বোন ও আত্মীয়দের প্রিয় আত্মীয়। হতেন তাই নয়, গ্রামবাসীদেরও সেই হৃদয়বৃত্তি মমতাময়ী সারদার একটুও রপান্তর হ'ত না। সর্ব অবস্থায় সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।



পত-সেবা

—আবিত্য পাল



জালিওনাৰাপ

—ভাষাপদ চক্ৰবৰ্তী



পানিয়া ভৱণে

—ভাস্কৰ দত্ত



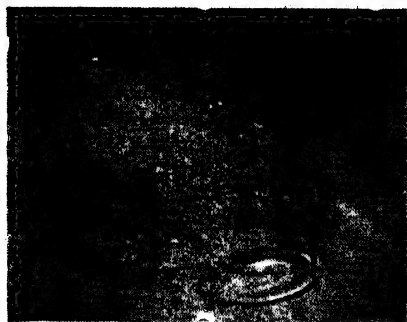


गोपनी

—दीपक चविकारी







পানপাত্র

—স্বপ্নভাষ্য বন্দোপাধ্যায়

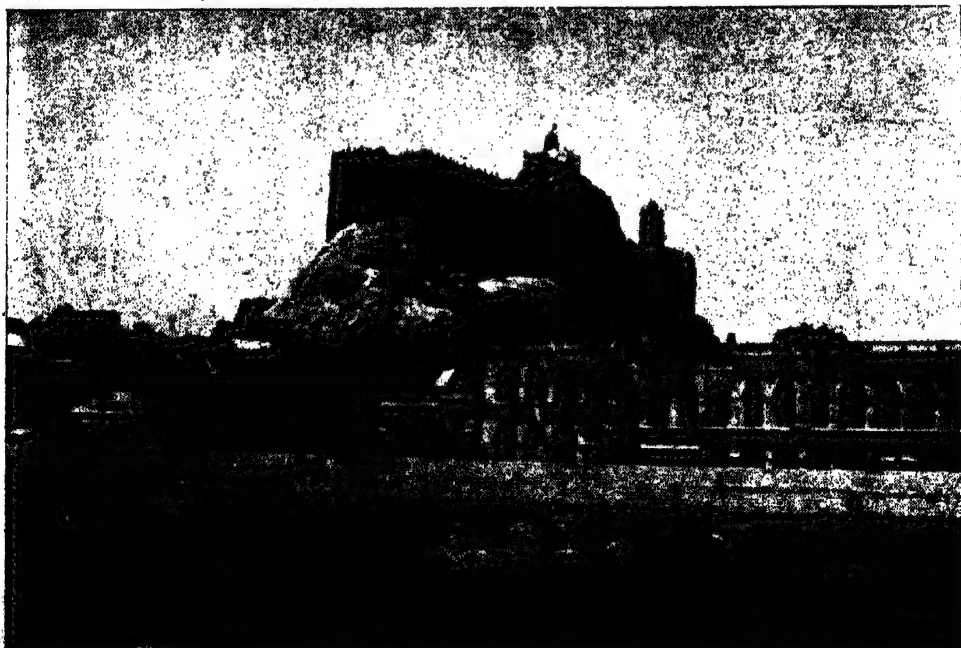


টেপ্‌এসাইড

—বিবনাথ সান্ডাল

রক-কোর্ট  
(কিটিনাপরী)

—হুমায়ূন বোম



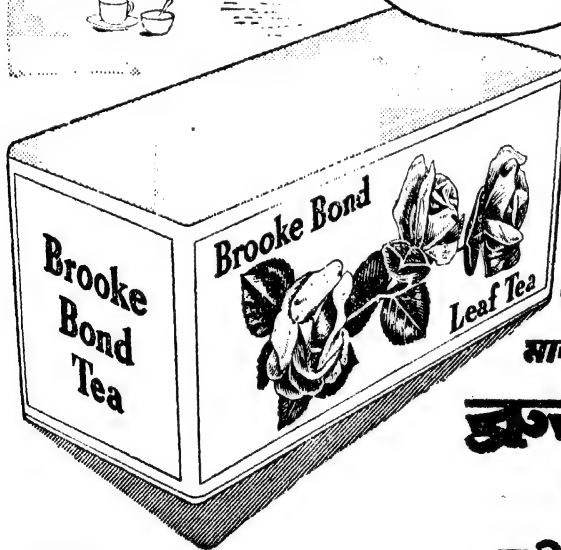
**সবাই  
জানেন -**



লোক হোক  
সাদে পাঁচ কোটিরও  
বেশী কাপ  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
থিয়ে থাকেন

বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কাঁচি  
সব চেয়ে বেশী

চটপট সববরাহ  
করা হয় বলে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
একেবারে তজা থাকে



**এই জানাই**

অন্য যে কোন  
মার্ক চায়ের চেয়ে

**ব্রুক বণ্ড  
চা**

বেশী লোকে খান !

কলিকাতার থাকা কালে ভোর সাড়ে তিনটায় তিনি ঘুম থেকে উঠেন। পুরো চুটি ঘণ্টা বিদ্যানার বসেই ভগ্ন-গান করতেন। তারপর শুষ্ক হ'ত তাঁর অনলস কাজ। ফুল-বেলপাতা বাছা, ফল-তরকারী কাটা, ভোগ বাগা করা, সকলকে প্রসাদ পরিবেশন, পান সাজা, চাল-ডাল ঝাড়া, ঘর পরিষ্কার করা, এমন কি বাসন পষাণ্ড মাজা। এত সব নিত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে মাকে ব্যস্ত থাকতে দেখে অনেকে প্রশ্নও করতেন, 'মা গো, তোমার কাজকর্ম দেখলে তো আমাদের মাঠাকুয়ার মত সাধারণ সসারী বলেই মনে হয় তোমাকে? তাহলেই মত সামান্য সাধারণ কাজ নিয়ে তুমি ভড়িয়ে থাক?' তিনি হাসিমুখে জবাব দিতেন, 'বেশ তো, আমাকে তাই জেবো।' নিজেকে অতি সাধারণ রমণীর সঙ্গে মিলিয়ে তুলনা হওঁয় তাঁর মনে কোন বিকার আসেনি। নিজের শরিরে দিতে বা তাদের মাঠাকুয়ার সাথে তাঁর নিজের তফাৎ বুঝতেও বিন্দুমাত্র সচেতন হ'ননি তিনি।

সাংসারিক কাজকে তিনি কোন দিনই কাজ মনে করতেন না। দেবসেবা ভাবতেন। ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজেও তাঁর শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও নিপুণতা ফুটে উঠতো। পরম বড়ো, পরম শ্রদ্ধায় তিনি তা সম্পন্ন করতেন। সসারের প্রাতিটি জিনিষ কাথ্যন্তে বধ্যন্যে না রাখলে চুখবোঝ করতেন। তাঁর নিয়মামুখবিত্তা ও শৃঙ্খলা সকলের পক্ষেই শিক্ষণীয় ছিল।

একদিন একটি ভক্তকে ঘর ঝাড় দিয়ে ঝাঁপাড়া ছুঁড়ে ফেলতে দেখে চুখ পেয়ে বলেছিলেন, 'অমনি অশ্রদ্ধায় কি কাজ করতে হয়? সামান্য কাজটুকুতেও শ্রদ্ধা চাই। সসার ঠাকুরের। আর সসার-সেবাকেও ঠাকুরসেবাই ভাবতে হয়। তুচ্ছতাচ্ছল্য করতে নাই'।

সাংসারিক অপচয় তাঁর চোখে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও পাপ মনে হ'ত। কল-কুলের ঝড়গুলি পষাণ্ড খালি হ'লে তিনি ফেলতেন না। তুলে বেখে দিতেন। বলতেন, 'সময়ে কাজে দেবে'। এবং সস্তি কাজে দিতও।

রামময় মহারাজ একদিন পাতে অনেকটা খিচুড়ী ফেলে উঠে গেলে তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'বাবা, এভাবে অপচয় করতে নাই'। সেট ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য তিনি একটি সঙ্গোপের মেয়েকে ডেকে তখনই দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েটি বখন খুঁসী হয়ে নিয়ে গেল, দেখে তিনি বললেন, 'দেখলে তো! বার যেটি প্রাপ্য তাকে জা দিতে হয়। বা মাছুরে ধায়, তা গরুকে নয়। বা গরুতে ধায়, তা কুকুরকে নয়। বা আবার কুকুরে ধাবে, তা বেড়ালকে নয়। আর কুকুর-বিড়ালে বা না ধাবে, তা পুকুরে ফেলে দিলে মাছে খেয়ে নেয়। ফলতরকারী কেটে খোসাগুলি পর্যন্ত ফেলতে নেই, গরুকে দিয়ে দিতে হয়।'।

সারাদেবীর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যাতে তাঁর কাছে ধীরেই আসতেন, সকলেই সহজে প্রভাবান্বিত হ'তেন। তিনি যেখানেই বসন থাকতেন, সেখানেই যেন একটা আশ্রয় গড়ে উঠতো। তাঁর আশ্রয়ের শৃঙ্খলা সবাইকে মানতে হত। কাজকর্মের কীক কীক সকলে ঠিক মত ধ্যান-জপ পূজা-আর্চনা যাতে ঠিক মত করে সেই দিকে তাঁর বখেট সজাগ দৃষ্টি থাকতো। তিনি ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'দিনে ভগবানের নাম কত বার ক'রে

ক'ব? সব সময় তাঁকে ডাকবে, তাঁর নাম জপ করবে। তাঁর নাম জপ করতে করতেই মন স্থিৎ হবে। দিনে অন্ততঃ পনেরো কি বিশ হাজার করলে শান্তি পাবে। আমি নিজে দেখছি।'।

ক্ষুদ্র চিন্তকে শান্ত করার এক অদ্ভুত নিপুণতা ছিল সারদা দেবীর মধ্যে। যেখানেই তিনি, সেখানেই এক অপূর্ণ শান্তির হাওয়া। অশান্ত মন তাঁর সংস্পর্শে এলেই যেন আপনি শান্ত হয়ে উঠতো। ভক্তরা কোন সংশয় নিয়ে এলে তাঁর কাছে আসামাত্র তা আপনি মিটে যেতো। প্রথম প্রথম নিবেদিতার মধ্যে নানা সংশয় দেখে তাই তারা বলতো, 'মাকে সাক্ষাৎ দেখেও তোমার মনে এত সংশয় কেন?'।

সারাদা দেবী যেখানেই বসন যেতেন, আপন শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হতে দিতেন না। বাইরের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠাকে সহজে হারিয়ে ফেললে, অন্তরের নিষ্ঠাতেও শৈথিল্য আসার সম্ভাবনা থাকে, এই ছিল তাঁর মত। নিয়ামত ব্যাঘাতের মতই যত করে তিনি নিজ নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখতেন। যদিও তা নিয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। সংসার ছেড়ে ছেলে-মেয়েবা আসে। তারা যেন এখানে এসেও আর এক বকমের সসারী না হয়ে পড়ে; এই তার ভাবনা ছিল। আবার সেজন্ত সর্বদাই যে শুকগাছাযে ভক্তদের তিনি বেঁধে রাখতেন, তা নয়। আশ্রমের মধ্যে সমস্ত মত একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও ব্যবস্থা রাখতেন, ধর্মগ্রন্থের অভিনয়, ভজন, গান সাকোঁন বাজনা ইত্যাদি দিয়ে। খোশ গল্পও যেন হত তা নয়। কিন্তু পরেই আবার ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে, আরতি দিয়ে, সামলিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ করিয়ে, হাওয়া বদলে দিতেন তিনি। প্রাণনা সবাইকে নিত্য করতে হ'ত। তারপর হত ধ্যান-ধারণা। কেউ বা বসতে ঘরে, কেউ বা বাবান্দায়, কেউ বা উদুতু আকাশের নাচে চাদে। নিজেরও বসতেন তাদের সাথে। একটা শাস্তির স্পন্দন যেন ছাড়িয়ে পড়তো চারিদিকে। আর তারা শীঘ্রই একত্র হয়ে ধ্যান ভুবে যেতো। এ 'প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলতেন, 'মা বখন ধ্যান করেন তখন যেন তাঁর মধ্য থেকে একটা জ্যোতিঃ বের হয়, আর আশে-পাশের সবাইকে তা আলোক করে দেয়।'।

সারাদা দেবী অত্যন্ত কোমল-স্বভাবা লজ্জাশীলা রমণী ছিলেন। তিনি পুরুষ-ভক্তদের সাথে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। অতি পরিচিত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে অত্যন্ত মৃদু স্বরে কথা বলতেন, আর অপরিচিত বা বয়স্ক ভক্তদের সাথে তিনি থোমটার আড়ালে মৃদুস্বরে কথা বলতেন কিংবা মাথা নেড়ে উত্তর দিতেন। অনেক সময় শ্রীভক্তদের মধ্যস্থতায়ও কথা বলতেন।

সারাদা দেবীকে সর্বদাই দ্বী-ভক্তরা ঘিরে থাকতো, সেজন্ত পুরুষ-ভক্তরা তাঁর মর্শন, উপদেশ ও আশীর্বাদ পেতো না বলে ক্ষুণ্ণ বোধ করতো। তাই সপ্তাহে দুই দিন তিনি তাদের মর্শন দিতেন। সে সময় তিনি তাদের কথা শুনতেন, আপনোপপাদে পরামর্শ দিতেন, সাধন-ভজনের আলাচনা করতেন। কে কত দূর সাধন-ভজনে অগ্রসর হচ্ছে, খোঁজ-খবর নিতেন। কখনো বা তাদের তত্ত্ববোধে তাদের সঙ্গে বসে সারা গায়ে কাপড় মুড়ি-মুড়ি দিয়ে বসে ধ্যানও করতেন। শক্তিমহারী সংস্পর্শে তারা একটা শক্তি অদ্ভুতব করতো। সেই অদ্ভুতটিই তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী হ'ত।

অন্যতঃ নিজের আত্মশক্তি সঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়েও কখনো

কোন ভাবেই নিজেকে সাধারণের চেয়ে উঁচুতে স্থান দেন নি। রাজা মহারাজাদের দ্বারাও পুজিত হয়ে রাষ্ট্রসম্মান পেয়ে তিনি রীনাতিশীনের মত দিনতিপাত করতেন। অথচ এর লেশটুকু মাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে।

ঠাকুর বসন্তেন, ছুঁচে হুতা পরাতে হলে সামান্য একটু বোঁয়া থাকলেও হুতা পরান চলে না। তেমনি অহং এর লেশমাত্র থাকলেও ভগবান লাভ করা সম্ভব নয়; শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে আমরা ঠিক তেমনি বোঁয়াশূন্য হুতার মতই অহংশূন্য জীবন বাপন দেখি।

বাস্তবালোকে তীর্থ পর্যটনকালে দেখানকার ভক্তদের দ্বারা তিনি যে অভাবনীয় সম্মান ও সমাদর পান, তা সাধারণ যে কোন মানুষকেই বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ফুলে ফুলে তাঁর চলার পথটুকু তারা ঢেকে দেয়। টেশনটি যেন ফুলের পাগড় হয়ে ওঠে। তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে ভক্তরা সেই গাড়ী নিজের টেনে নিয়ে চলে। সারনা দেবী এসব দেখে অভিভূত হয়ে বলেন ‘আহা, প্রভু বাবী এখানে এসবেরও কেমন পৌছতে দেখ!’

পশ্চিমসমাজ দ্বারা যখন তিনি দেবীজ্ঞানে পুজিত হতেন তখন তাঁকে বলতে শোনা যেতো, ‘প্রভু বাবী হতেছিলাম তাই।’ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুণ্য, শ্রেষ্ঠ গৌরবকেও তিনি এভাবে ঠাকুরের প্রাণা ত্রিবারে গুণ করতেন। এক দিনের তরেও নিজের কৃতিত্ব বলে গ্রহণ করেননি।

অথচ ঠাকুর কবিতা কালে সর্বদাই বলতেন ‘এ সাবন যদি এমন না হত আমার সাবন-পথের বিঘ্ন হতে পারতো। সারনা জ্ঞানদাত্রী সবধরী। এবার রূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।’ [ক্রমশঃ]

## বাণীবন্দনা

### গৌরী বিশ্বাস

দাঁকার কড়া আবার নড়ে উঠল, এই তৃতীয় বারের মতো। এক

দরজা খুলতেই সুরেশ বাবু যথারীতি চাদর খাতা হাতে

লগায়মান একদল ছেলের সম্মুখীন হলেন।

জিজ্ঞাস করলেন, “কোথাকার পুঁজো?”

চাঁই গোড়ের একটি ছেলে এগিয়ে এলো।

“আজ্ঞে, এ’ পাড়ার ‘সবুজ আলোর’ পাক

থেকে এসেছি আমরা।” এ ধরনের

একটা উত্তরই প্রত্যাশা করছিলেন সুরেশ

বাবু। কারণ, পাড়া একটা হলেও পাড়ার

পুঁজো বলতে অনেকগুলো। পশ্চিম-ব্রহ্ম

গঞ্জের ব্যবধানেই এক একটি প্যাণ্ডেল

তৈরীর তোড়জোড় চলেছে। ছেপেটি

আবার বলল, “সত্যিকারের পাড়ার বলতে

এই ‘সবুজ আলোকেহ’ বোঝায় জ্যাঠা-

মশাই।” চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন

সুরেশ বাবু কয়েক মুহূর্ত। চাদর

খাতার পাড়া উলটে বলেন, “তা কত

দিতে হবে?” এগিয়ে এলো লম্বা চুল

কিনকিনে চেচাবার আরেকটি ছেলে। “সে

আপনি বিবেচনা করে দেবেন তার,

জবরদস্তির ব্যাপার তো কিছু নেই। তবে খরচ তো নেহাৎ কম-নয়। তাছাড়া এ বারে আমরা আপনাদের আমল দেবার জন্তে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করবার কথাও ভাবছি। আলবেলা চ্যাটাঞ্জি, হুমিড্রা সেন ও বৃহ চক্রবর্তীকে আনার খুব চেষ্টা করছি এবারে।”

উল্লেখিত নামগুলোর সাথে পরিচিত নন সুরেশ বাবু। তাছাড়া মাস ছয়েক হয় এসেছেন উনি কলকাতায়, এখনো ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেন নি এখানকার আবহাওয়ায়। ছেলেরা অবিজ্ঞি নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলো না তাঁকে। আচ্ছা। ওরা ভানো আধুনিক তরুণ-তরুণীর হৃদয় হরণকারী নাহক কমলকুমারের অন্তিম সন্ধ্যাকেও উনি সমান অনভিজ্ঞ। তাই সম্মত হুখে আলোকদান করলো দলের সমীরণ। “প্রে বাক শিরী তার। আর যুগ চক্রবর্তী হচ্ছেন আজকের দিনের বিখ্যাত কমেডিয়ান।” পরিচয় দিতে গিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল সমীরণের মুখ-চোখ।

অপরেশ বাবুর বাড়ী। কয়েক ঘর ভাড়াটের বাস এখানে। ‘রক্তিম শিখার’ আলোটা ক্লাব-ঘর নেই। অপরেশ বাবুর সামনের ছোট ঘরটিতে তাই খিঘেটারের বিশদর্শন বসেছে কোজ্জার মতো। প্রায় বিশ-পঁচিশটি কিশোর আর তরুণ পূর্ণ হয়ে উঠেছে ছোট ঘরখানা। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় বিশদর্শনের পালা, চলে রাত দশটা এগারোটা অবধি। সারা বছরের ক্লাসের টাঙ্ক, কোয়ার্টারি আর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার পর একেবারে গ্রাম্যায়াল পরীক্ষার প্রমোশন শেষে একদল পিঞ্জরবদ্ধ ভীষ্ম সহস্রা পেয়েছে যেন মুক্তির বোলা হাওয়া। এখন কয়েকটা দিন অন্ততঃ একঘেয়ে পড়া মুখস্থ আর মাটির মশাটের তাড়ার হাত থেকে নিরুত্ত। সহস্রেই তাই অনেকগুলো উৎসাহদীপ্ত প্রাণ সিন্দেলে যেতে উঠেছে বাণীবন্দনার প্রস্তুতিতে। কিন্তু আসন্ন ফুল ফাটন্তাল ইন্টারমিডিয়েট আর বি-এ পরীক্ষার সাখ্যাত নেহাৎ নগণ্য নয় পাড়ার ঘর ঘরে। অপরেশ বাবুর বাড়ীর ভাড়াটে

ফোন ৩৪-০০০২

সবকুটি সম্মত  
সূন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাঙ্গ

কে,এল,সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২



'মহাসম্মেলন' দেখা গেল চিরায়িত নিয়মের পরিবর্তে বসেছে স্বাধীনগী গানের আসর। কিম্বের হিল্লি গানের মহাশক্তি এদের বোধ হয় ঠিক বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। শুনছে অনেক উৎসুক শ্রোতা। ছুঁতিনটি ভেলে উল্লেখ করছে এক পাশে। কটক এবারে একটা খোঁচা দিলে সামনের ছেসেটিকে। "কি রে, তুই যে দেখছি এখানেই গ্যাট হয়ে বসলি রে মানকে!" শিঁচু না কিরেই বলল মাণিক, তা "বেশ লাগছে রে।" তাহলে হরিসভায় বসে থাক্গে না, আরো ভাল লাগবে।" উঠেই পড়ল ছেসেট গুচ্ছ-গুচ্ছ করে।

রাত্রি বেড়ে ওঠায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বাইরের দর্শনার্থীদের ভীড় পাঁতলা হয়ে এসেছে—কিন্তু সে ঝাঁকটুকু ভেলেরা ভরিয়ে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে অক্লান্ত রেকর্ড ব্যক্তির আর নিজের বিচিত্র হৈ-ছন্দোড়ে। রেকর্ড বাদনে মিনিট খানেক ছেদ পড়তেই পাশের ঘাড়ের জানালাটি খুলে যায় সশব্দে, উজ্জত কাশির বেগ সামলে বৃদ্ধ তারিণী বাবু গলা বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা মেনো, তোদের মতলবটা কি বল তো? এক দিনেই সব শেষ করে দিতে চাসু নাকি?" মেনো গুঞ্জে মনোরঞ্জন মাথা চুলকে বিনীত হান্তে বলল, "কি যে বলেন দাছ! অহুঠান তো সব চুকেই গেছে সাত তাড়াতাড়ি। কিন্তু রাত দশটা বাজতেই যদি আসবটা ঠাণ্ডা মেয়ে যায় তাহলে—"তার বাকী কথাগুলো চাপা দিয়ে এবই মধ্যে বেজে ওঠে, "তবো দিল্লকে বালমে তো আনা মাংতা।" জেলেরা বৃন্তাকারে বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত পুঙ্খা তথা আত্মবলিক অহুঠানাদি সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা জুড়েছে মাঠের এক পাশে। বৃপ করে এসে মাঝখানে বসে পড়ল বীক। সোংসাছে পার্শ্ববর্তী সীতেশের পিঠে একটা চাপড় মেঝে বলল, "আমাদের 'বিচিত্র-চক্র' সবার গুপরে টেকা মেঝে দিয়েছে এবারে, কি বলিসু এঁা?" গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে হাসল সীতেশ, "তা আর বলতে! কিন্তু দেখিসু কালকের বিসজ্জনের প্রদেশানটাতেও 'বিচিত্র চক্রের' ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখা চাই-ই কিন্তু।"

## রোমে দু'দিন

বাণী দাশগুপ্তা

জাহাজে বসে রোম যাচ্ছি, ভাবতে ভাবতে ইতিহাসের পাতাগুলো যেন চোখের সামনে খুলে যেতে লাগলো। রোমের সভ্যতা, রোমের কৃষ্টি, রোমের ভাস্কর্যের আলো যখন ইউরোপের প্রতি কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন ছিল ব্রিটনের অসভ্য বর্বর ও নিরক্ষর। রোমের রাজ্যরা যখন জয়ের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে চলেছিল তখন কোথায় ছিল আমেরিকা—কোথায় ছিল ইংরেজ।

অশিক্ষিত রোমান সিপাহীর আগমন

বার্ভারি উঠতো জাস বুটনদের মধ্যে। এমন সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠেছিল যে রোম, আর সে রোম ছোট একটা শক্তি; পৃথিবীর মহা-মহা শক্তিদরদের মধ্যে। সময়সজ্জার, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিল্পোন্নতি ক্ষেত্রে কোথায় যেন ইতালী সে শীর্ষস্থানের নাগাল পাচ্ছে না। কোথায় যেন তার ছন্দ ভেঙ্গে গেছে।

এমনি যখন তরুর হ'য়ে ভাবছি, জাহাজের হুইসিল শুনে বুঝতে পারলাম নেপলস বন্দরে জাহাজ ভিড়ছে।

১১৫৩ সালের ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার নেপলস থেকে বগরা হ'য়ে ২৫শে রাত দশটার রোমে এসে পৌছাই আমি, আমার স্বামী ও একটি পথের ভাই খ্রীসংসদী। খ্রীসংসদী আমাদের সঙ্গে থাকতে দলও ভারী হ'ল আর হৈ-হৈর মাত্রাও বেড়ে গেল। বিশেষে ছুঁ-একজন ভারতীয়ের যুথ দেখলে সে এত আপনায় মনে হয় তা আগে কখনও উপলব্ধি করিনি। রোম ষ্টেশন যেন মনে হচ্ছিল স্বপ্নপুরী—চতুর্দিক নিয়ম লাইটে বলমল করছে—সমস্ত ষ্টেশন জুড়ে বড় বড় দোকান, তাতে কাচের 'শোকসেস' পোষাক, স্তম্ভর জুতো, সেডিস ব্যাগ ইত্যাদি অতি স্পন্দরভাবে সাজান রয়েছে—মনেই হচ্ছিল না আমরা কোন ষ্টেশনে এসেছি। আমার স্বামী ও সংসদী ভাই পরের দিন টুইস্ট 'বুরো' তো টিকিট কেনা ও অস্ত্রাস্ত্র বিষয় খবর নিতে যাওয়ায় আমি বেশ ঘুরে ঘুরে দোকানগুলো দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ষ্টেশনের কাছে Amalfi নামে এক পেনসিওনিতে উঠি আমরা। এই পেনসিওনি হচ্ছে ছোটমত হোটেল। পরের দিন ভোরে আমরা টুইস্ট বাসে রোম সহর দেখতে বগনা হই। সহরের মধ্য দিয়ে বাস চলছে আর আমাদের প্রশ্নান গাইড ইংরেজিতে সমানে পথের ত্রুষ্টিব অটালিকা মুসোলিয়ায়ের Running Commentary দিয়ে চলেছেন। রোমের রাস্তার কিছু দূরে দূরে নানা খেতপাথরের মূর্তি দেখতে

ফোনঃ ৪ ৩৪-৪৯০২

Gy

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার ; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** পূজনীয় ব্রহ্মণী  
দীপিকা ও শ্রীমতী  
১০২, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২

গ্রাফঃ ৪-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬  
(রাজা দীনেশ স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

পাওয়া যায়। ইতালীর খেতমরুর পৃথিবী-বিখ্যাত, তাই বোধ হয় এরা এত পথের ধারে ধারে মূর্তি স্থাপনা করেছেন। আমাদের বাস এসে প্রথমে থামলো 'বড়গেজে' ভিলায়। এটি প্রথমে বিখ্যাত বড়গেজে পরিবারের প্রাসাদ ছিল। এখন একটি মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানে ৪০০০ পেইন্টিং ও বহু খেতপাথরের মূর্তি আছে, এ সবই পৃথিবী-বিখ্যাত শিলার শিল। রাফেলের, মাইকেল এঞ্জেলোর নানা পেইন্টিং ও মূর্তি দেখলাম এখানে। একটি মূর্তি দেখলাম লেডি বড়গেজের, তিনি ছিলেন নেপলিয়ান পরিবারের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল বড়গেজে পরিবারে। অপকল্প সুলতানী এই মহিলা, তিনি অর্ধশায়িত একটি ডিভানে। পাথরের মূর্তি যে এত জীবন্ত, তা না দেখলে ভাবার বোঝান যায় না। মর্রবপাথরের গদির সেসের ওয়াড জায়গার জায়গার ভাঁজ হয়ে গেছে সুলতানী বসবার ভক্তিতে—কিন্তু কি আশ্চর্য, গদি ও তার ঢাকনা পরিষ্কার বোকা হচ্ছে—অথচ সবই একটা আন্তরিকতা।

বড়গেজে ভিলা থেকে বেড়িয়ে বাসে গিয়ে উঠলাম, সময় কম, আরোও অনেক দেখবার আছে। পথে যেতে যেতে দেখলাম, যে জায়গায় সম্রাট নীচো খৃষ্টিয়ানদের হিঃশ্র সিংহ দিয়ে খাওয়াত। এই জায়গার কিছু দূরেই গাইড দেখানেন নীচোর ফিল্ড বাজার জায়গা। বাস এসে থামলো বিরাট Colosseum এর কাছে। আমরা হুড়হুড় করে সব টুরিষ্টরা বেরিয়ে এলাম বাস থেকে। এই ভয়াবহ বিস্ত্রিঃ চুকবার আগে আমার স্বামী চকোলেট দিয়ে বললেন, 'তোমাদের তো ভেতরে গেলে গলা শুকিয়ে আসবে তাই চকোলেট মুখে রাখ'—এ কথা শুনে সকলেই চেসে উঠলাম। Colosseum হচ্ছে চারতলার সমান একটি গোল বিস্ত্রিঃ; এর মধ্যে খৃষ্টিয়ানদের ও বন্দীদের হিঃশ্র পশু দিয়ে খাওয়ান হ'তো। সম্রাট বসন্তেন তার পাত্রমিত্র নিয়ে তেতলার আর রোমবাসিগণ নিজ নিজ উচ্চতা অনুযায়ী এক এক তলার বসন্তেন এ নিষ্ঠুর খেলা দেখত। মতিসাগণ ছয় তলার বসন্তেন—বিস্ত্রিঃএর মাঝখানে জায়গাটা খালি, সেখানেই হ'তো এই নিষ্ঠুর খেলা। চারিদিকে গোল হয়ে এসেছে বসবার জায়গা। কোন বন্দী ক্ষমা ভিক্ষা করলে সম্রাটের দয়া হ'লে তাকে সরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। মধ্যখানে ছোট উঁচু-নীচু দেওয়াল দেওয়া আছে, যাতে মানুষটি একটু লুকাতে পারে আর সিংহ খুঁজে খুঁজে এসে ধরে, তাতে খেলাটা সহজতর ভন্নতো ভাল। সন্ধ্যা হওয়ার আর দেড়ি নেই মাত্র দু'ঘণ্টা আছে, তাই বাস ভোরে চালিয়ে কোরাঘের কাছে এসে থামলো। যে বিখ্যাত স্কোয়ারের কথা ইতিহাসে পড়েছি—তা দেখলাম সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শুধু যেখানে 'জুলিয়াস সিজার'কে হত্যা করা হয়েছিলো, সে জায়গায় পিলারগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর সেখান থেকে Mark Antony দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন, সেই স্থানটিও এখন একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি। ইতিহাসের এক একটি পাতা যেন চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। সেদিনকার মত আমাদের রাম দেখা শেষ হ'ল—পেনসিওনিতে ফিরে এলাম। ইতালীর বিখ্যাত খাবার প্লেট Spagatti এনে দিল আমাদের। যদিও আমার তত প্রিয় নয় এ খাবারটি, কিন্তু রান্না থাকার দরুন সুদিন তা অবুত লাগছিল। পরের দিন ভোরে উঠেই তৈরী হয়ে নলাম। টুরিষ্ট বাস আসবে, অন্তত ত্রিঘণ্টা জায়গায় সেদিন বাবে।

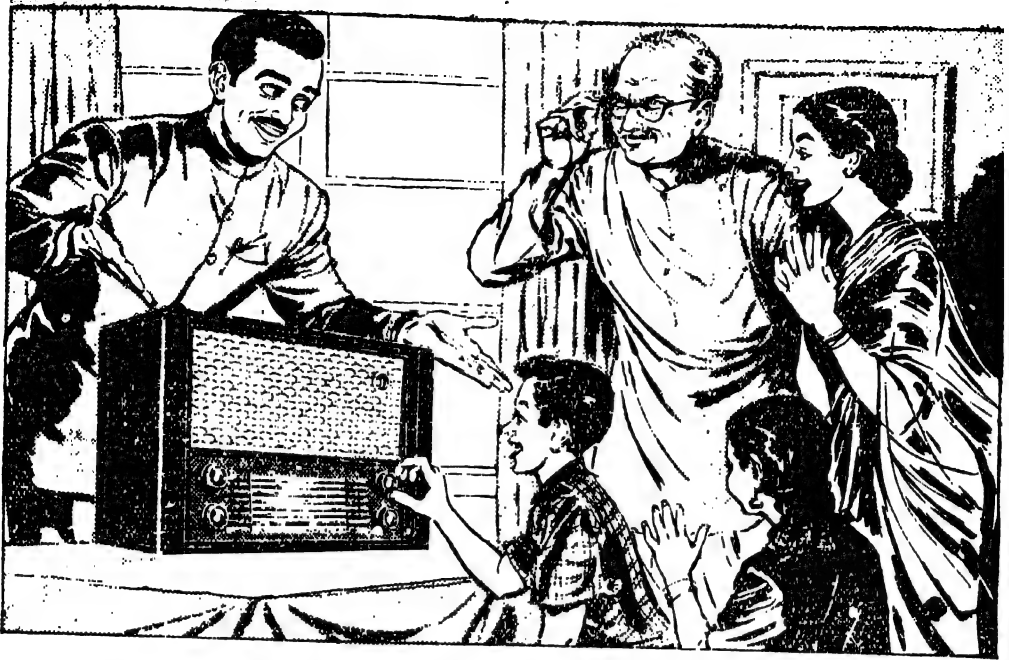
বাস এসে মটর, প্রথমে গিয়ে গেল Cats-comb এ। সেখানে ৪০০০ Crucified Monk-দের ছাড দিয়ে নানা ছাবে মিলিয়ে খেঁক সুর করে সারা দেওয়ালের গায়ে নক্সা করে সাজিয়ে রেখেছে। কিছু ককালত্বপূর্ণ করে রেখেছে। এই চার্চের basement-এ এই ছাডগুলো রেখেছে অর্থাৎ একতলার নিচে অন্ধকার আর একতলা। সেখানে চার্চের সাহায্যে আমরা চলতে থাকি, একটা বিল্ডি গন্ধ আসছিল, চলছি একের পর এক বারান্দা পেরিয়ে—এ পথ যেন শেষ হবে না। কিংবদন্তী আছে, এই নিচের পথ যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল, কেউ জানে না—তাই অনেক Monk নীচের অন্ত্যায়ারে এখানে লুকিয়েছিল আর ভেতরেই ঘুরেছে বাইরে বাওয়ার পথ খুঁজে না পেয়ে, শুকানোই মারা গেছে। আবার ভেতরকার বন্ধ হাওয়ায় যেন মাথা ঘরে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আবার সূর্যের আলো দেখে যেন বাঁচলাম। তার পর বাস রোমের সপ্ত সাহাযের রাস্তা দিয়ে চললো, ভেটিকান টেটে এই টেটের নিজস্ব ফৌজ, নিজস্ব ডাক বিভাগ সব আছে। এ টেটিকান রোমের অধীনে নয়। এখানে পৃথিবী-বিখ্যাত সেন্ট পিটার চার্চ আছে। এই চার্চের ভিতরকার ডাকঘর দেখবার মত। নানা বকম কারুকাহা ও খেতপাথরের মূর্তিতে ভেতরকার অর্চা গুলো সাজান হয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম সেন্ট পিটার এর একটা ভোজমূর্তি আছে, তার পায়ের দিকে ধানিকটা ক্ষয় পেয়ে গেছে ভক্তদের চুষনে। এইখানেই সেন্ট পিটারকে কবর দেওয়া হয়। পৃষ্ঠপথের সব চরে বড় ধন্যবাক্যক পোপ এই চার্চে আসেন এবং বিশেষ বিশেষ দিনে তিনি উপরকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনতাকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। পোপের বাসস্থান চার্চের সংলগ্ন একটি মানসন। গির্জার ভেতরে এক জায়গায় প্রবেশ-মুদ্রা দিয়ে দেখলাম, পোপের অলঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী। ভক্তরা পোপকে কেহ চোরা-বসান সোনার থালা, কেহ সোনার কাঁজকরা ভেলভেটের পোষাক, কেহ প্রেটিনামের শূকুট, ইত্যাদি নানা মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েছেন। এই বিচিত্র সামগ্রী তিনটি বড় ঘরে সাজান আছে।

রোমের সেভেন হিলস্ থেকে নেবে সেন্ট পল এর চার্চ এ গেলাম, এই গির্জার আড়ম্বর সেই অথচ এক শাস্তি বিরাজমান। মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী এক খেতপাথরের সেন্ট পল এর মূর্তি দেখলাম, যেন মুগ্ধ জীবন্ত সেন্ট পল বসে আছেন, ভাষায় এর প্রকৃত রূপ দেওয়া যায় না। চার্চ থেকে বেরিয়ে দেখি, সূর্যের বেশ চনচনে হ'য়ে উঠছেন—সংসদী বললে "বৌদি, রোমের হাওয়া খেয়েই কি আজ কাটাতে হবে?"

আমরা তাড়াতাড়ি পথে এক রেষ্টুরেন্টের সামনে নেবে পড়লাম। তখন সকলেই দক্ষিণ হস্তের কাছে লেগে গেলাম, যদিও এ দেশে দু'হাতই চালাতে হ'য়েছিল। একটা জিনিষ আমি ইতালী ভ্রমণের সময় দেখছি, প্রতি জায়গায় আমার মনে হ'য়েছে এরা আমার থেকে বেশী পরগা নিচ্ছে। কুলি ট্রেন থেকে কাটেই ইটালী-পথে এক পেনসিওনিতে নিয়ে এল—চাইল ১০০০ লিরা অথচ টুরিষ্ট অফিস থেকে আমাদের ৫০০ লিরা দিয়ে দিতে বলেছিল।

সেদিন বিকেলে আমার স্বামী বললেন "আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে Paris ট্রেন ছাড়বে, এস, অজা কিছু কেনাকাটা করা যাক" আমরা তাই বেরিয়ে পড়লাম পেনসিওনি থেকে।



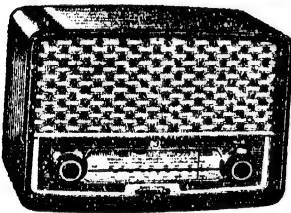


## নতুন বছরে গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদে বাড়ী ভ'রে তুলুন —সুন্দর একটি **ন্যাশনাল-একো** রেডিও কিনুন।

দেশের ঘরে ঘরে স্থাপনাল-একো রেডিও গান-বাজনা ও আনন্দের  
চেউ এনে দিচ্ছে—আপনিও বাড়ীতে একটি স্থাপনাল-একো  
রেডিও রেখে সবদিক সজে এই আনন্দের আসরে যোগ দিন!

স্থাপনাল-একো রেডিও রোজ সারাদিন ধরে আনন্দ

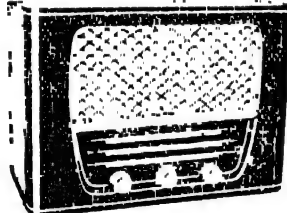
দেবে—বাড়ীর সবাই মিলে তা উপভোগ করতে পারবেন। রেডিও  
রাখা আজকাল আর বিলাস নয়। স্থাপনাল-একো রেডিও রাখলে  
আপনি চমৎকার কাজ পাবেন। ১৯৫ টাকা থেকে ১২০০ টাকার  
মধ্যে পছন্দসই বারো রকমের মডেল আছে।



মডেল ২৪১ : ৫ ভালব—এসি/ডিসি।

৫ ভালব—ড্রাই ব্যাটারী সেট। ওয়েভ  
ল্যাং ১২ থেকে ৫৫০ মিটার পর্যন্ত।

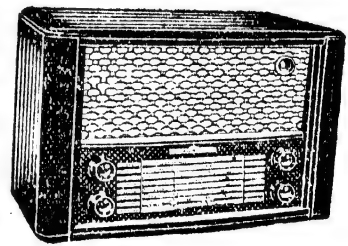
দাম—১২৫



মডেল ২৭০ : ৫ ভালব, ৩ ব্যাণ্ড।

এসির জন্ত মডেল এ ২৭০ এবং এসি/  
ডিসির জন্ত ইউ ২৭০। দাম—২৮৫

মডেল বি ২৭০/১ : ড্রাই ব্যাটারীর  
জন্ত। দাম—৩০০



মডেল এ/৩১৭ : ৭ ভালব,

৩ ব্যাণ্ড; এসি কারেন্টে চলে।

দাম—৫৮৫

এগুলি নীট দাম—এছাড়া স্থানীয় কর লাগে।

## রেডিওর মধ্যে **ন্যাশনাল-একোই** সেরা; এই রেডিও

বিনা মূল্যে : আজই  
ন্যাশনাল-একো ডীলারকে  
বাজিয়ে পোনতে বলুন।  
কিংবা সচিব বিষয়গীর জন্তে  
আমাদের কাছে লিখুন।



জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েডজ প্রাইভেট লি:

৩ ব্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪।

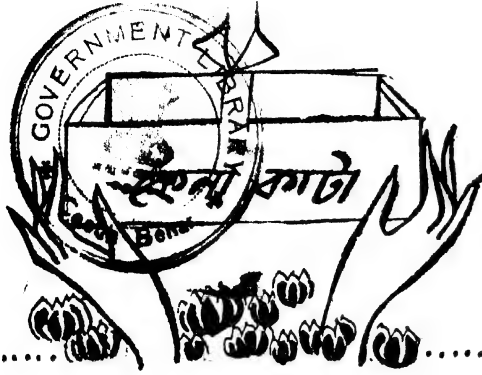
১/১৮ রাউট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭২ সিলভার জুবিলী পার্ক

রোড, বাঙ্গালোর। যোগেশ্বর কলোনি, চান্দনী চক, দিল্লী।



মন্সুনাইজড

\* সাধারণ রেডিওর চেয়ে  
গরম দেশের আবহাওয়া  
দুইতে ১৬ গুণ বেশী শক্তিশালী



## কি খাবেন ?

মায়ূবের আসল সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে তার বাহ্য। কিন্তু এ বাহ্য গড়ে তুলতে হলে—শেব অবধি এইটুকুট ও অকুর রাখতে হলে প্রধানতঃ চাই খাদ্য। খাওয়াটা কিন্তু সব সময়ই বা হোক একটা হলোই হবে না। বলকারী, রুচিশ্রম খাদ্য-খাবার বেছে নিয়ে তবেই খেতে হবে। বলতে কি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপরই হচ্ছে নিয়মিত 'ডিটামিন' সমন্বিত স্তবম ও সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ।

পরিমিত আহারের আগ্রহ ও অভ্যাস থাকা চাই জীবনাস্তরের গোড়া থেকেই। খুব কম খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, বেশী রকম খাওয়াটাও তেমনি অন্তিতকর। এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটির দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না। অথচ দেখা গেছে—মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে মানুষ কিরণ অসুখী হয় এবং কষ্ট পায়। কম খাওয়ার বাহ্য ভেসে পড়বে বা ভাল থাকবে না, এতো সহজেই অনুমেয়।

খাওয়ার ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। কেন না, বাহ্য সারকণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে খাতের ভাল-মন্দোর প্রশ্ন। অনেক সময় খেতে বেয়ে খাতের ভেতরকার মূল্যবান খনিজ পদার্থটাই বাদ দেওয়া হয়। রান্নার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খাতের ডিটামিনগুলোই হয়ত কোথায় উধাও হয়ে গেল। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিচারবুদ্ধির অভাব ছাড়া এ আর কিছু হ'তে পারে না। খাতের আসল জিনিসটাই যদি বাদ পড়ে গেল, যদি আগেরভাগেই বিনষ্ট হ'ল সবটুকু খাদ্যপ্রাণ—তা হলে খাওয়ার সার্থকতা কোথায় আর স্বাস্থ্যেরই দাবী বজায় থাকবে কিসে? খনিজ পদার্থ, প্রোটিন' বা উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের অভাবে শরীরে ক্রমশঃ রাস্তা, কুশ্রীতা ও নানারূপ আধি-ব্যাধি দেখা দিতে বাধ্য।

পরিপূর্ণ দেহ-শ্রী ও স্বাস্থ্যের জন্তে মায়ূলি আহারই যথেষ্ট হতে পারে না। এক কাপ কড়া চা আর মাখনবিহীন একটু বিস্কুট—প্রাতঃকালীন আহার যদি এই দিয়েই সমাধা হয়, তবে ফল কতটা আশা করা যায়? বিলোনের শরীরবিজ্ঞানীদের অভিমত—'ব্রেকফাস্ট' বোজই বেশ ভালরকম হতে হবে। তাঁদেরই উদ্যোগে একটি 'মেহ' বা খাদ্যতালিকা—

সকাল বেলাকার আহারে আর কিছু হোক বা না হোক—ডিম,

কুটি ও কিছু ফল চাইই। নৈশ-আহারের ঠার বিজ্ঞানবিরক ভোজনের পথটাকেও উপেক্ষা করলে চলবে না। মাংস ইত্যাদি খাওয়া রীতিমত অভ্যাস রাখতে হবে এই সময়ে। এ ছাড়াও কীকে কীকে যখনই খিদের ভাব হবে, খেয়ে নিতে হবে কোন কিছু—কখনও হয়ত একটা আপেল, কখনও বা এক গ্রাস কমলালেবুর সুস্বাদু রস।

বিশেষজ্ঞদের আর একটি মত—খাওয়ার বেলায় জিহ্বার স্ফটি আর মনের তৃপ্তিটাই সবচেয়ে বড় কথা এবং নজর রাখতে হবে সেদিকটাতেই বেশী রকম। অকৃতি ও অকৃতি নিয়ে আহার করলে, সে আহাৰ্য্য যতই উচ্চরের হোক, সহজপাচ্য হয় না এবং ফলতঃ স্বাস্থ্যের উপরও এর প্রতিক্রিয়া হয় খারাপ। আবার স্ফটি ও তৃপ্তির সঙ্গে পর্যাপ্ত ভাল, ভাত, তরী-তরকারী খেয়েও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে দেখা গেছে অনেক মানুষকেই। মোটের উপর উন্নত শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্ত চাই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, খাদ্যপ্রাণযুক্ত উপাদেয় খাদ্য। শরীরের উপযোগী খাদ্য চিনে নিয়মিত খেয়ে গেলে ক্ষয়-ক্ষতি ও দুশ্চিন্তার অবকাশ সাধারণতঃ থাকে না।

## আমরা কে কি করতে পারি ?

সম্ভবপর মত লেগা-পড়া শিখবার পরই যুবকদের সামনে একটি মস্ত সমস্যা এসে দেখা দেয়—এখন কোন লাইনে বাই, কী কাজ নিই। সবাই যে দল বেঁধে কেরানীর চাকরী নেবে, এমন তো হ'তে পারে না। যোগ্যতার দাবী বেখে মনের সঙ্গে মিলিয়ে কাজের ঠিক লাইন যে বাছাই করে নিতে পারলে, সাফল্য ও উন্নতি তারই। অতএব দেখা যাচ্ছে, কাজ গ্রহণের পূর্বে মন সত্যি কোনটা চায় এবং এর জন্তে আবশ্যক যোগ্যতা আছে কি না, এইটি নিরূপণই বড় কথা।

মনের সঠিক খবর কি ভাবে জানতে পারা যাবে? যুব-মনের উৎসাহ ও আগ্রহ একই জিনিসকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ ঝাড়িয়ে থাকে না। অথচ এর ভিতর থেকেই আসল মনটিকে চিনে নেওয়া চাই। এ জন্তে বাপ-মায়ের দায়িত্ব খুব বেশী রকম থেকে যাচ্ছে। এ নিশ্চিত তাঁরাই বুঝবেন—তাঁদের ছেলের দৈনন্দিন চলাফেরার কোন জিনিসটা নিয়ে থাকতে ভালবাসে, কোন দিকে মনের ঝোঁক রয়েছে ছেলের অতিমাত্র। এ সম্পর্ক করেক বার নমুনা বা দুঃস্বপ্নের উল্লেখ করা যায়। যেমন, (১) ছেলে যদি খোলা হাওয়ার বেড়ায়, আনন্দ পায় এবং গাছ-গাছড়া ও জীব-জন্তু বিষয়ে কৌতূহলী হয়, তবে বুঝতে হবে তার মনের পঠন হচ্ছে—মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার, সয়েল টেকনিশিয়ান, ফাওয়ার বা ফরেস্টার হওয়ার মতো। (২) কাউকে যদি দেখা গেলো, বস্ত্রপাতি নিয়ে আপন মনে কাজ করে চলেছে—তবে ধরে নেওয়া যায়, সেই ছেলের ঝোঁক ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাপ-মেকার, কম্পোজিটার বা মেকানিক হবার দিকে। (৩) যদি দেখা যায়, কোন যুবক দিন-রাত অঙ্ক, গণনা, হিসাবপত্র—এসব নিয়েই কাটাতে চাইছে, তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হ'বে এইটিই—যুবকের অবচেতন মনে ব্যাকার, একাউন্টেন্ট, এন্ট্রোনোমার, পদার্থবিজ্ঞানী বা ব্যবসারী হবার লক্ষণ বিস্তারিত। (৪) কোন ক্ষেত্রে হয়তো বাপ-মা দেখলেন—পুত্র কেবলি জটিল সমস্যাটি বিশ্লেষণে ব্যস্ত, নরাজ জিনিস আধিকারের দিকে তার বোঁক বেশী, বুঝতে হবে—ডাক্তার, ডিজাইনার, রসায়নবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী—এ সবের কোন একটা হতেই

সেই বুঝনের চাহিদা। (৫) লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের ছেলে যেখানে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাচ্ছে কিংবা ছেলেকে যদি পণ্য বেচা-কেনার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহশীল দেখা যায়, তাহলে এর মানসিক গঠন অভিনেতা, পুরোহিত, আইনজ্ঞ, সেলসম্যান ও রাজনীতিজ্ঞ—সাধারণতঃ এর কোন একটি হবার মতো। (৬) হাতে-কলমে কোন জিনিস গড়ে তোলার দিকে কোন তরুণের অব্যাহত উৎসাহ যদি দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এর মন বেশী রকম চাইছে চিত্রকর, কাগজশিল্পী, ডেকোরেশ্যন বা ডাকটসম্যান হ'তে। (৭) লেখালেখি বা পড়াশুনো নিয়ে দিন-রাত কাটাতে দেখলে, বাপ-মাকে ধরে নিতে হবে, তাঁদের ছেলে মনের দিক থেকে লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিক হ'তে চায়। (৮) কারও ছেলেকে হয়তো দেখা গেলো সব সময়ই যেতে আছে গান-বাঞ্ছনায়, আশা করত হ'বে সেই থেকেই, আলোচ্য ক্ষেত্রে বুঝনের দাবী—সে নামকরা গায়ক বা বাদক হ'বে, এক জন উচ্চবরের সুরশিল্পী। (৯) যেখানে বাপ-মা দেখলেন যে, ছেলে মানুষের সেবা ও কল্যাণরূপে আত্মনিয়োগ করে অনেক বেশী আনন্দ পায়, বুঝতে হ'বে সেই ছেলের মানসিক গঠন শিক্ষক, পুরোহিত, সমাজসেবী—এ সকলের কোন একটি হবার মতো। (১০) ছেলেকে যদি অফিস সাজাবার দিকে যথেষ্ট আগ্রহশীল বুঝা যায়, তা হলে ধরে নিতে হবে অভিজ্ঞতাবাদের—কর্মক্ষেত্রে এ হতে চাইছে সেক্রেটারী, একাউন্টেন্ট, সিভিল সার্ভেন্ট, ট্যাক্সিশিয়ান বা অফিস ম্যানজার।

বুঝনের থার্ড জন্মবার এইরূপ আরও অনেক সূত্রই রয়েছে। বাপ-মারা একটু সতর্ক ও সচেতন থেকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন—ছেলের মানসিক গতি-প্রকৃতি বা প্রবণতা ঠিক কোন দিকে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হ'বে কি বৈজ্ঞানিক হ'বে, ডাক্তার হ'বে কি ব্যবসায়ী হ'বে, অফিসার, ম্যানজার হ'বে কি অগাপক হ'বে—এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা আগেভাগেই হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে আরও একটি বড়রকম বিচার্য বিষয়—যে মন চাইলেই হ'বে না—যে লাইন বা কাজের ক্ষমতা একান্ত আগ্রহ, সেটি পেতে হলে থাকতে হবে সম্যক যোগ্যতা। যে কাজে যে সক্ষম নয়, মন চাইলে বসেই তাতে আত্মনিয়োগ করলে ব্যর্থতাকেই বরণ করতে হবে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কাজ আগ্রহেই আরম্ভ না করে, যোগ্যতার বাচাই কি করে সম্ভব? তা' ছাড়া নিষ্ঠা, উত্তম ও অধ্যবসার এ কর্তৃক মূলধন নিয়ে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে বলার মতো আর কোন গুণ বা যোগ্যতা নাই যদি থাকতো। উত্তরে বলতে হবে এটি বিশেষ অবস্থার ফল। কথ্য, সাধারণক্ষেে কাজ বা দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই যখন আগ্রহের সঙ্গে যোগ্যতার কতখানি সাম্যাপ্য আছে, দেখে নেওয়া ভাল।

আগে থেকেই যোগ্যতার মোটামুটি বাচাই-এর জন্যে কয়েকটি সূত্রও প্রয়োগ করা চলতে পারে। যেমন, (১) কোন বুঝকে যদি দেখা গেল সে বেশ লিখতে পারে, বলতেও পারে অনর্গল এবং কোন জটিল বিষয়ও বুঝতে বা বুঝাতে তার আটকায় না, তবে ধরে নেওয়া যায় সেই বুঝকের লেখক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, গ্রন্থাগারিক বা সেলসম্যান হবার যোগ্যতা রয়েছে। (২) যেখানে বাপ-মা দেখলেন, ছেলে যে কোন কাজের পরিকল্পনার দৃষ্ট, যখন

তখন একটা কঠিন প্রশ্নেরও মীমাংসার আসতে সক্ষম এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সব সময়ই আগ্রহশীল, সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ বুঝতে হবে এই ছেলের পক্ষে ডাক্তার, অফিসকর্মকর্তা, স্থপারভাইজার, শিক্ষক, আইনজ্ঞ ও বিজ্ঞানী এই ধরনের কোন পেশাই হ'বে বিশেষ উপযোগী। (৩) হয়ত দেখা গেলো কোন তরুণ রঙ, তুলি ও মাশকাটি নিয়ে দিন-রাত আঁক-জোক করছে কিংবা বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে বাজিরে চলেছে শিয়ানো বেহালা বরোণ বা অল্প কৌম বাজতন্ত্র—তাব মনে বিচিত্র বল্লম রয়েছে, স্থগিত রয়েছে দুঃখ তাগিদ—যে নিতে আপত্তি নেই, সেই তরুণ চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্য শিল্পী, ডিক্রাইনার, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা বা সুরশিল্পী হিসাবে যোগ্যতার বাহাঘুরি দেখাতে পারবে। (৪) আবার এমনটি দেখা যায়, কোন বুঝ, জটিল প্রশ্ন পেলেই সেটি সমাধান হ'বে উঠলো তৎপর, জ্যামিতিক সম্পদ ও উপপাদ্য প্রসঙ্গ তার মতি প্রিয় এবং নতুন পরিকল্পনার তার হাত খুব পাকা—সভাবতঃই বাধা করা চলে, কর্মজীবনে সে বুঝকে হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার, কাগজশিল্পী, মেকানিক, বৈজ্ঞানিক, ড্রাকটসম্যান—এইরূপ কোন কিছু। (৫) বাপ-মা যেখানে দেখলেন ছেলের অল্পত যুতিশক্তি—ইতিহাসের নাম, তারিখ বা টেলিফোন নম্বর কখনই সে ভুল করে না—সেই সব ছেলে যে কোন লাইনেই যেতে পারে। তবে যুতিশক্তিটা সেক্রেটারী একাউন্টেন্ট, লাইব্রেরিয়ান, সেলসম্যান, রাজনীতিজ্ঞ এ সকলের ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী হয়। (৬) হাতের কাছে কোন বুঝকে যদি বেশ দক্ষ দেখা গেলো, কিংবা সে যদি যন্ত্রপাতি চালিয়ে তৎপরতার সঙ্গে এক ঠিকভাবে কাজ করতে পারলো সর্বক্ষণ—তা হলে এইটুকু অনারসেই অহুমের যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে বুঝের ভিতর একজন সূর্যক শিল্পী, সাজ্জন, লক্ষ্য-চিকিৎসক বা মেকানিক-এর পক্ষে বা বা প্রয়োজন, সে গুণগুলো রয়েছে অনেকখানি। (৭) কোথাও দেখা যেতে পারে—একটি তরুণ হয়ত অল্প পেনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠছে—গাণিতিক খুব জটিলতাও তার নিকট আসে জটিল ঠেকছে না, যে কোন বিষয়ের উপলব্ধিতে সে যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্ত—তা হলে বুঝতে হ'বে, সেই তরুণের ইঞ্জিনিয়ারিং বা বুদ্ধিগতি এর কাজে সাক্ষ্য মর্শনের যোগ্যতা রয়েছে কিংবা সেলস ক্লার্ক বা ক্যানিয়ার পদের দায়িত্ব গ্রহণেও সে নিতান্ত সক্ষম।

মোটের উপর কর্মজীবনে কোন একটি বিশেষ লাইনকে বরণ করার পূর্বে সেটি পছন্দসই কি না এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে কুশলী হিসাবে প্রমাণ দিবার সত্যি যোগ্যতা আছে কতখানি—অবশ্যই ভাবতে হবে এবং সে ভাবনা সম্পন্ন হওয়া চাই গোড়াতেই। আর এইটুকুও ঠিক—কর্মক্ষেত্রে মনের সঙ্গে যোগ্যতার যেখানে সহজ মিল যোগাযোগ ঘটলো—সেখানেই নিশ্চিত সাক্ষ্য, সেখানেই অগ্রগতি।

### তৈলসম্পদ ও বর্তমান বিশ্ব

খনিজ তৈল বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উপযোগিতার দিক থেকে কয়লার ভায় এরও স্থান প্রথম পর্ষায়ে। বিজ্ঞানী মানুষ তৈলসম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে বহুদিন থেকেই। একে কেন্দ্র করে পৃথিবীর শক্তিগুলোর মধ্যে দব্য ও যেরাযেরি চলে আসছে চিরকাল।

তৈল-উৎপাদক দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম করতে হয় সকলের আগে। তৈলের জন্ম বুটেন, ক্রাল এ সব দেশকেও বাহিষ্যের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু আমেরিকা এ বাণীপারে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। সোভিয়েট রাশিয়াও এমিক থেকে পরমির্ভরীয় নয়—এইটুকু বলা চলে।

আজকের পৃথিবীর তৈলের চাহিদা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই সবচেয়ে বেশী। বুটেনের চাহিদা আমেরিকার অনেকটা নীচে এসে পড়িয়েছে। যে দেশ যতখানি শিল্প-সমৃদ্ধ হ'তে চাইছে, সাময়িক সঙ্কট দ্বারা বত বেশী, তৈলের প্রয়োজনীয়তাও তার তত বেশী পরিমাণে। তৈল না হ'লে অগ্রগতি ও উৎপাদন প্রচেষ্টা পথিকল্পনা অনুযায়ী কখনই হ'তে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তৈল ছাড়া বর্তমান ব্যায়িক যুগ একবারেই অচল।

নানা কারণেই তৈলের সন্ধান চলেছে আজ সারা বিশ্বময়। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বলিয়ে এই তৈল বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে। সেই জন্তেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর বড় বড় শক্তিগুলোর লুট ঘুটি। এক কাল বুটেন তৈল সরবরাহ করে আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই। নিজ দেশে এনে সে এই তৈল শোধন করে কাজে লাগায়। গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ তৈল বুটেন ব্যবহার করে, ১৯৫০ সালেই ব্যবহৃত হয় ইহার বিংশ পরিমিত। মহাযুদ্ধের সময়ে জাৰ্মান ও বুটেনের প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এই শ্রেণীর তৈল উৎপাদিত হয় নিয়ন্ত্রণের কয়লা থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সব কয়লিতেই তৈল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারত, আর ও পাকিস্তানের খনি সমূহ থেকেও বতটা সম্ভব তৈল নিষ্কাশন করার উদ্ভব চলছে। শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। অপর দিকে সোভিয়েট দেশে তৈল উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।

### আত্মপ্রতিষ্ঠার কয়েকটি মূলমন্ত্র

কর্ম-জীবনে দীর্ঘ আত্মপ্রতিষ্ঠা বা উন্নতিলাভ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই সব মহৎ লোকেরই কাজ ও চিন্তার রয়েছে একটি বিশেষ ধারা। কয়েকটি মূলমন্ত্র বা মূল-স্বত্র অনুসরণ করেই জীবনপথে ধাপে ধাপে তারা এগিয়ে চলে। সেই সূত্র ও মন্ত্রগুলো জানবার কৌতুহল হওয়া বিচিত্র নয়। মন্ত্রগুলোর মধ্যে প্রধান যে কয়টি, মোটামুটি এইরূপ বলা চলে:—

১। জীবনে যিনি উন্নতিকামী হবেন, হ্রদয় ও সাক্ষ্য দ্বারা চাই-ই, প্রথমেই থাকতে হবে তাঁর সরলতার দৃঢ়তা ও কাজের অধ্যবসায়। লক্ষ্য ও স্বপ্ন স্থির যদি থাকুক, আর সেই সঙ্গে যদি থাকুক একান্ত নির্ভর ও আগ্রহ তা হ'লে এগিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত হবেই।

২। কাজ করতে বেয়ে ভুল হলেও থমকে গেলে চলবে না। পরম্ব ধাক্কায় ভেতর দিয়েই নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণের জন্তে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর দেখতে হবে সবচেয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন কখনই না হয়। মোটের উপর ভুলের জন্ম দাবড়াবার কিছু নেই।—সবচেয়ে বিজ্ঞ, সবচেয়ে বিশ্বাস হযত যিনি, তাঁরও কার্যক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। তবে অজ্ঞ ও অবিবেচকের মতো একই ভুল তিনি দ্বিতীয় বার করবেন না, সেইটাই লক্ষ্য করবার।

৩। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন বাড়তে হবে দিনের পর দিন—তেমনি ক্ষমতা অর্জন করা চাই ভাল রকম, কি করে উন্নতন কর্তৃপক্ষের নিকট মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারা যায়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে এইটি একটি অস্বস্তি শিক্ষণীয় ব্যাপার। পত্র যে বিষয়টি জানাযে, সেইটির গাঁথনি হ'তে হবে খুব অল্প কথায় অথচ পরিষ্কার ব্যবহার মতো। কোন কথা না জানাবার ইচ্ছে থাকলে, সহজ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চেপে যেতে হবে সেইটি।

৪। দীর্ঘ অধীন থেকে কাজ করতে হবে, তাঁর কোন সন্ত প্রেরণ বা জিজ্ঞাসার বিরক্তি বোধ করলে চলবে না—আশুপ্তি বা প্রতিবাদ করা তো দূরের বিষয়। পক্ষান্তরে, অধীন কর্মচারীর মনে উপযুক্ত ও সম্ভাব্যজনক জবাব হাজির করার জন্তে থাকতে হবে জরুরী তাগিদ। যেখানে উত্তর জানান না থাকবে, খোলাখুলি বলে ফেলাই হবে তখন উত্তম কার্য ব্যবস্থা।

৫। কাজের সময় মনে অনেক রকম ছদ্মস্তা বা উদ্বেগ নিয়ে চলেতে হবে না। ছদ্মস্তা থাকলে কোন প্রেরণ সঠিক সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। ফলতঃ এই ভাবে কাজ আরো এগুতে পারে না, ভুলের পর ভুল হয়ে কাজ পণ্ড হবারই কারণ ঘটে। এবং পরিশ্রুতিতে কর্মোন্নতির পরিবর্তে কর্মচ্যুতি এসে দেখা দেওয়াও আলোচ্য অবস্থার বিচিত্র নয়।

৬। পদস্থ আসনে বসবার সুযোগ পাওয়া মাত্র অহঙ্কারের মারকতা যেন শেষ না বসে। সাক্ষাৎপ্রাথক অথবা পীড় করিয়ে দেখে নিজকে জাহির করবার চেষ্টা—সুনাং ও উন্নতি উভয়েরই পরিপন্থী। সহজ কথায় মনে রাখতে হবে—বখন যে কাজটি ঠিক ভাবে করা চাই, প্রতিটি যুক্তির মূল্য সম্পর্কে সচেতন না থাকলে নয়। অকিস-বর কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর—যে কেহই হোক, সাক্ষাৎকার নির্ভারিত থাকলে, সঠিক সময়ে তা সম্পন্ন করতেই হ'বে।

৭। অধীন কর্মচারীদের প্রতি অটুট আস্থা বা বিশ্বাস রাখতে হবে বরাবর। নরপ রাখতে হ'বে—এই ভাবেই কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাণ ও আত্মগুণ্ডা এবং প্রত্যাশিত কাজ আদায় সম্ভব। পদস্থ ব্যক্তি বলে অধীন লোকদের থেকে খুব একটা দূরত্ব টেনে চলেতে হবে না। কর্মক্ষেত্রে সবই সক্ষম, সবই কর্মী এই ধারণা পোষণই প্রতিষ্ঠাকারীদের পক্ষে জ্ঞেয়।

... এ ক্ষেত্রে প্রচুরদর্শন ...

এই সংখ্যার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে আদিবাসীদের একখানি আলোকচিত্র  
দৃষ্ট হইয়াছে। চিত্রটি জীবনোদ্যম জাতি কর্তৃক গৃহীত।



ডিটামিন যুগ

কোলে

**KD**

বিপ্লুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

আঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিপ্লুট

কোলে বিপ্লুট কোম্পানী  
আইডেটাল, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খিনএরারকট

মেরী

গোটটবুআরো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ডেপ্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারবার্ট

হাউসহোল্ড

সল্ট

মার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলোটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

# কৈলাকুটীৰ দেউ

(উপভাস)

শৈলজানক মুখোপাধ্যায়

১৯

পূৰ্বেৰ দিন সকাল খেকে ক্ৰমাগত লোক আসতে লাগিলে।  
সীতারামৰ বাড়ীতে। সে যে ছাড়া পেয়ে কিরে এসেছে—  
সারা শুলতানপুৰে কখাটা বোধ কৰি কাৰও আৰ জ্ঞানতে বাকি নেই।  
খাওৱা-দাওৱাৰ পৰ বুড়োশিব কাল বাতাই বসেছিল, আমি  
বাড়ী বাই।

সীতারাম বেতে দেহনি। হেসে তার বুকের পানে একটা বার  
তাকিয়েছিল শুধু। বুড়োশিব তক্ষুণি বুকে পেয়েছিল কি সে বলতে  
চায়।

বুড়োশিব বলেছিল, না না হাসি নয়। আমার কাজ  
আছে।

সীতারাম বলেছিল, তার চেয়ে বল না কেন, তোমার বাড়ীর  
লোক ভাববে। দ্বীপুত্ৰ-কথা—নাতি-নাতনী—

ঠিক এই সময় কাকন ঢুকলো ঘরে। বুড়োশিব বললে, শুধুন  
মুখ-জ্যোগিৰি, বিয়ে-খা কৰিনি বলে সীতারাম আমাকে কি বকম  
বলছে শুধুন!

কাকন একটু হাসলে। হেসেই কি একটা জিনিস নিয়ে বেরিয়ে  
গেল ঘর থেকে।

বুড়োশিব বললে, বিয়ে না করে খুব ভাল আছি সীতারাম।  
বিয়ের অনেক ছালা।

সীতারাম বললে, তা যদি জানো তো অস্ত্ৰে বিয়ে দেবার জন্তে  
এত হুঁকুটী করছো কেন?

ইঙ্গিতটা যে কোথায়—বুড়োশিব বুঝতে পারলে। বললে, তুমি  
খামো। আমি বা ভাল বুঝবো করবো। কাৰও কথা আমি  
শুনবো না।

সীতারাম বললে, তাই কৰ। আমি আর কিছু বলবো না।

সকালে সীতারাম কাকনকে ডেকে বললে, আমি নীচে গিয়েই  
বসি। লোকজনৰে যে বকম আগা-বাওৱা শব্দ হবুছে, ওপৰ-নীচে  
করতে করতে পায়ে বাথা ধবে বাবে।

যাবা এলো বাবায় চা নিয়ে।

সীতারাম বললে, বুড়োশিবকে ডাক। ওর চা এইখানেই  
সিঁয়ে বা।

মালা বললে, জোঠা তো চলে গেছে।

সীতারাম একটু বিমিত হলো।—না বলেই চলে গেল? কখন  
গেল?

মালা বললে, আমার তখনও কেউ উঠনি ঘুম থেকে।

সীতারাম প্লান একটু হাসলে। তার পর চা খেয়ে নীচে নেমে  
বাবার জন্তে উঠে পাঁড়ালো। কাকনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা  
করলে, রজন কি করছে?

রজনের নাম শুনেই মালা পালিয়ে গেল।

কাকন জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে?

সীতারাম বললে, বুড়োশিব ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে সে  
দেবেই।

কাকন চূপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সীতারাম বললে, কি ভাবছো?

কাকন বললে, বিয়ে ওদের হোক, তা আমিও চাই। কিন্তু

তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজই আমি হতে দেবো না।

সীতারাম বললে, বড় ভাবনায় ফেললে। আচ্ছা, আজকের  
দিনটা ভাল করে ভেবে দেখি। বুড়োশিব আশঙ্ক।

চাকরটা এসে পাঁড়ালো। আবার কে যেন এসেছে দেখা করবার  
জন্তে।

সীতারাম নেমে গেল।

চাকর বাড়িল তার পিছু-পিছু। কাকন ডাকলে, লখিয়া  
শোন।

লখিয়া ফিরে এলো। কাকন বললে, শিব বাবুর বাড়ী চিনিস?

লখিয়া বললে, চিনি।

—বা তো বাবা, চুই কাঁর ডেকে আন ঠকে। বলবি, যা  
ডাকছে। একুশি আশুন।

লখিয়া চলে বাড়িল। কাকন আবার বললে, খুব তাড়াতাড়ি;  
বাঁধি আর আসবি? হুই! যেন সেখানে গিয়ে বসে থাকিস না বাবা!

মালা ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞাসা করলে, লখিয়াকে ছুঁমি কোথায় পাঠালে মা?

কাঁকন বললে, তোমার জ্যেষ্ঠাকে ডাকতে।

মালা বললে, তোমার বেশ আক্সেস তো। বাবা বাড়িতে রয়েছে। লোকজন আসছে। কোনো কিছু দরকার হলে কি আমি ছুটে বাবো বাইরের ঘরে?

কাঁকন বললে, ঠিক বলেছিল। ডাক মা, ওকে কিরিয়ে আন। আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

মালা সিঁড়ির কাছে ছুটে গিয়ে ডাকল, লখিয়া! লখিয়া!

লখিয়ার জবাব পাওয়া গেল না।

মালা বললে, হ'লো তো! চলে গেছে।

রজন বেঁচে-বেঁচে বসেছিল, তারই পাশ দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। মালা ছুটে সেই সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদ থেকে বাড়ীর সুবুথের বাস্তুটা দেখা যায়। লখিয়া বেশি দূর যায় নি। ছাদ থেকে ডাকলেই ফিরে আসবে।

কিন্তু না, ছাদ থেকেও তো দেখা যায় না। তাহলে কি উড়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই সে এখনও বাড়ী থেকে ঘেঁষায় নি।

দূরে সুবুথোপুথুর দেখা যাচ্ছে। সুবুথোপুথুরের সুবুথের বাস্তু। সুবুথোপুথুরের সেই বাঁধানো ঘাট। মালার মনে পড়লো রজনের কথা। বাস্ লখিয়া। বুড়োশিবকে ডেকে আনো তো আয়ুক।

একদৃষ্টে মালা সেই বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখলে, একটি মেয়ে যেন তারের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে।

চেনা-চেনা মনে হলো মেয়েটিকে। মনে হলো—কোথায় যেন তাকে দেখেছে।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে সে। সুবুথানি চমৎকার। গায়ের রং হুশ-হালতায় গোলা।—মালাব মনে পড়লো হঠাৎ। এ সেই ইরানী নাটওয়ালী—চুমকি।

কিন্তু চুমকির পরনে সে বাথরা নেই, সঙ্গে সাথী নেই। বালালী মেয়ের মত শাড়ী পরেছে চুমকি।

মালা তাড়াহুড়াতে নীচে নেমে বাথার জন্তে যেই পেছন ফিরেছে, মনে হলো মা যেন তাকে ডাকছে।

মালা বললে, বাই মা!

কাঁকন বললে, লখিয়া বায়নি, ফিরে এসেছে।

তারের কানিশের ওপর ঝঁকে পড়ে মালা দেখলে, লখিয়া পাঁড়িয়ে আছে কাঁকনের কাছে।

মালা বললে, আমাকে ডাকছে মা?

কাঁকন ওপরের দিকে তাকিয়ে বললে, বলছিলাম লখিয়াকে আর ডাকতে হবে না; সে ফিরে এসেছে। তোমার বাবা চাব পেয়ালা চা পাণ্ডিয়ে দিতে বলেছে নীচে।

মালা বললে, এই জন্তেই বলেছিলাম তখন। বলেই সে নীচে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে। কঠাং সিঁড়ির ওপর সুবুথোপুথি দেখা রজনের সঙ্গে।

রজন দেখেছিল তাকে ছাদে উঠতে। তাই বোধ হয় তার সঙ্গে নিভুতে একটি বাথ দেখা করবার জন্তে চুপিচুপি উঠে এসেছে।



নিয়মিত

**নিম**

ব্যবহার করুন!

বাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেষ্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সমিষ্ট তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত জ্যেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের ত্বর্গক দূর করে ও বাস-প্রশ্বাস নির্যাস ও হ্রস্বভিত্ত করে।

অস্বাস্হ টুথ পেষ্ট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির

উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী

সমন্বিত নিম টুথ পেষ্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে

সমুজ্জল।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২২

৭/৫০-৫৩

রজন বললে, একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মালা। শুনতে চাও তো বলি।

মালা বললে, বল।

রজন বললে, আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। লজ্জায় আমার মাথা কাটা বাচ্ছে। তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি চুপি-চুপি চলে যাই তোমাদের বাড়ী থেকে।

মালা বললে, এখন আর তা হয় না। মা ডাকছে। আমি চললাম। আর কিছু না বলেই মালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

কাকন চা করবার জন্তে ঠোঁট কালাবার ব্যবস্থা করছিল। মালা কাছে এসে বললে, মা "মেয়েটা আসছে। সেই যে সেই ইরানী মেয়ে—চুমকি ?

কাকন বললে, তাড়িয়ে দে।

মালা বললে, না মা, তাড়াব না। কি বলে শুনি।

কাকন বললে, নীচে নেমে যা। দোতলায় আনিস মি। রজনকে দেখতে পাবে।

মালা নীচে নেমে গেল। লখিয়া তাকে দেখেই ডাকলে, দিদিমণি।

মালা থমকে থামলো।—কি যে, কি বলছিল ?

সেই নাচনেওলী মেয়েটা এসেছে দিদিমণি।

—জানি। ডেকে দে।

লখিয়া চলে বাজিল। মালা আবার ডাকলে, শোন।

—বাইরের ঘরে বাবা বসে আছে। ওকে এই দিকের এই দরজা দিয়ে নিয়ে আর।

লখিয়ার গোমরা মুখখানা চটায় বেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চুমকিকে সে খিড়কি দরজা দিয়ে চুপি চুপি ডেকে আনবে দিদিমণির কাছে—এইটেকেই সে তার দুর্ভাগ্য সোঁতাগা বলে ভাবছে।

চুমকিকে ডেকে আনতে তার মোটেই সেরি হ'লো না।

লখিয়ার পিছু-পিছু এলো চুমকি।

লখিয়া জিজ্ঞাসা করলে, দিদিমণি, নাচগান হবে না ?

মালা বললে, না। তুই বাইরের ঘরে যা। বাবা ডাকতে পারে।

লখিয়ার মুখখানি শুকিয়ে গেল। চুমকিকে ছেড়ে বুড়ো বাবুর কাছে গিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না; তবু তাকে বেতে হলো।

বেতে বেতেও আবার কিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের কিছু দরকার হবে নী দিদিমণি ?

দিদিমণি এবার চটে গেল। বললে, না না। তুই যা এখন থেকে। লখিয়া চলে যেতেই মালা চুমকির কাছে এসে তার পরনের শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বললে, বাঃ, বেশ মানিয়েছে তোমাকে কোথায় ছিলে এত দিন ? তোমাদের দল কোথায় ?

চুমকির সে হাসিখুসী ভাব নেই, মুখের ওপর কেমন বেন একটা বিষমতার ছাপ।

চুমকি মালায় মুখের পানে তার সেই টানা-টানা চোখ ছুটি তুলে তান একটু হাসলে। জেসে বললে, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। জবাব পাবে না। তুমি কেমন আছ, তাই বল।

মালা বললে, ভাল নেই।

চুমকি বললে, ভাল থাকবে না তা জানি। দেখি দিদি, তোমার হাত ?

মালা তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

চুমকি নিবিষ্ট মনে তার সেই সুন্দর হাতখানি বাব বক্তক নেড়ে চেড়ে বললে, তোমার জন্তে তোমার বাবাকে খুব কষ্ট পেতে হ'লো।

মালা বললে, সে কথা সবাই জানে। আর কিছু জান তো বল।

চুমকি বললে, তা'হলে তো সবই বলবে তুমি জানো। আচ্ছা, তবে এমন একটা কথা বলি যা কেউ জানে না। বলি ?

মালা বললে, বল।

চুমকি বললে, তোমার সঙ্গে বাব বিয়ে হবার কথা, লোকে জানে সে মারা গেছে। হয়ত তুমিও জানো। কিন্তু সে মরেনি। সে আবার একদিন ফিরে আসবে।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে যে মরেছে, সে কে ?

চুমকি বললে, সে যেই হোক, তোমার ভাত্তে কি ?

—তাহ'লেও ইচ্ছে করে না জানতে ?

চুমকি বললে, আমিই যদি জানিয়ে দেবো তো পুলিশ কি করবে ? পুলিশ তাকে খুঁজে বের করুক।

মালা এগিয়ে এলো চুমকির কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি না বল।

চুমকি বললে, বলছি। তার আগে তুমি বল—আমার একটা কথা রাখবে ?

মালা বললে, রাখবার মত কথা যদি হয় তো রাখবো।

চুমকি বললে, আমাদের দল ছেড়ে আমি পালিয়ে এসেছি। ওদের সঙ্গে আর থাকবো না। থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমাকে চারটি খেতে-পরতে যদি দাও দিদিমণি, আমি তোমার চাকরখার কাজ করবো। রাখবে আমাকে ?

মালা চুপ করে কি বেন ভাবলে। ভেবে বললে, তুমি সুন্দরী সুবতী, নাচ জানো, গান জানো—শহরে কোথাও চোঁক কর, চাকরি তোমার হয়ে যাবে।

চুমকি বললে, না, আমি তোমার কাছে কাজ করতে চাই। যে কাজ তুমি দেবে সেই কাজ করবো। আমি মাইনে চাই না, শুধু খাওয়া-পরা।

মালা বাড় নাড়লে। বললে, আমি যদি নিকোঁধ হাতাম ভাঙ্কলে হয়ত এ লোভ আমি সামলাতে পারতাম না। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার চেয়ে সুন্দরী। তোমাকে আমার সঙ্গে রেখে নিজের সর্কনাশ আমি ডেকে আনতে চাই না চুমকি। তুমি বেন কিছু মনে করো না ভাই। আমি সত্যি কথাই বললাম।

চুমকি মাথা হেঁট করে কি বেন ভাবতে লাগলো।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো ?

চুমকি মুখ তুলে চাইলে। মনে হলো বেন চোখ দুটো তার হলুদ করছে। কি বেন বলতে গিয়েও কলহে না।

চট করে উঠে পাড়িয়ে চুমকি বললে, আসি ভাই। যদি বেঁচে থাকি তো দেখা হবে। বলেই সে আর সুহৃৎমাঝ সেরি না করে যেখানে গেল বর থেকে।

মালা অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো।

[ ক্রমশঃ ]



## উনিশ

**কিঃ** টলিউডের মহাকাব্যে যিনি অতিনায়কের ভূমিকায়

অবতীর্ণ এখন পর্যন্ত সেই বিপন্নপালক দেবের কথা বলাই হয়নি। বিপন্নপালক কে? এ প্রশ্ন করে টলিউডকে লজ্জা দেবেন না। সপ্তকণ্ড রামায়ণ পাঠ সমাপ্ত হবার পর 'সীতা' রামের কে? এ প্রশ্নের চেয়েও ছেলোমাহারী জিজ্ঞাসা হবে যদি সত্যিই বিপন্নপালক কে জানতে চান। পরিচালক বিপন্নপালক সম্প্রতি টলিউডের একমাত্র পুরুষ; বাকী সবাই প্রকৃতি। তাকে চিনলেই টলিউডকে জানা হল; শুধু তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেই টলিউডের তাঁর-পরিচয় সমাপ্ত হল। এই সর্বাঙ্গময় পুরুষটিই এলাইনের ছোট-বড় নায়িকা-একস্রী সকলেরই গুরু। এমন নায়িকা নেই এঁকে গুরুদক্ষিণা না দিতে হয়েছে বাকে। নেই এমন নায়ক যিনি এঁকে না বলেছেন 'স্বর'। তিরিশ বছর আছেন টলিউডে; তার নির্বাক যুগ থেকে। তিরিশ বছরে বাট বছরের কোর্স কমপ্লিট করেছে। বিপন্নপালক টলিউডের সিদ্ধপুরুষ। তুরীর লোকে থাকেন যখন তখন তাঁর উত্তরীর পর্যন্ত ঠিক থাকে না। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলকেই সমজ্ঞানে সমান কাহিল করেন। বিপন্নপালক নম্র ব্যক্তি। তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি নিজে অনেক মহৎ।

মাইকেল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এর স্রষ্টা হিসেবে প্রোতঃস্বরগীর পুরুষ। টলিউডের অলিখিত মহাকাব্য প্রোডিউসার বধ-এর প্রধান রচয়িতা হিসেবে বিপন্নপালক আজও সমস্ত পরিচালকের জীবনে প্রোতঃস্বরগীর; রাতেও অবিস্মরণীয়। তিনি মহাজন; বা সবাই তাঁর পথই পথ বলে যেনে নিয়ে এগিয়েছে। শেষের শেষে পৌঁছবার কুতিষ অবশ্য একা তাঁরই। তাঁর ডাক নাম বাশ; পদবী 'দেব'। তিনি এখেলার বলেই নেমেছেন: পদবী 'দেব'। তিনি এখেলার বলেই নেমেছেন: বাশ (দেব কে)? উত্তরের অপেক্ষা না করে বাশ দিয়েছেন। অনেকটা যেন আরেক প্রোতঃস্বরগীর সেই ব্যক্তির উক্তির মত; সেই যে এক ভ্রমলোক বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের একটি মাত্র বাগনা হচ্ছে একটি ব্যাক করা; আর তার নাম দেওয়া: নেওরাখালি ব্যাক। ব্যাকের ব্যবহার গচ্ছিত সন্নিবে কেলবার পর যখন লোকে টাকা ফেরত চাইতে আসবে তখন তিনি ব্যাকের সাইন বোর্ডটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্গত করে শুধু বলবেন; নেওরাখালি ব্যাক শুধু নেওরা আছে; দেওরা নেই।

টলিউডে অল্পকিছু বত পাণ; বতকে অজ্ঞায়; বত কিছু অপরাধ আজ পর্যন্ত অল্পকিছু হয়েছে তার ভরা পূর্ণ হলে ভগবান পাঠিয়েছেন বিপন্নপালককে; শুধু দণ্ড হিসেবে নয়; বাসদণ্ড দিতে। বিপন্নপালক বাবার আগেই টলিউডের বশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। There will be no one to put candle into its bamboo। আর কি। পৃথিবীতে বতবার পালের ভরা পূর্ণ হবে ততবার নাকি অবতীর্ণ হবেন নারায়ণ! শব্দের মুখে তারই বোধগা: সম্ভবামি যুগে যুগে। কিঃ এ হল শ্রীভগবানের কথা; কিন্তু শ্রীমান শরতচন্দ্রের কিছু কথা আছে 'কি? সেই কথাই বিপন্নপালকের স্মৃতিস্তম্ভে পাথরের গারে উৎকীর্ণ থাকবে একদিন:

শরতচন্দ্র ভূমি যুগে যুগে ভূত পাঠিয়েছে বারে বারে

টলিউড সংসারে



## নীলকণ্ঠ

তাঁরা বলে গেল চুপে নাও সব;

মেয়ে নাও যত পার।

পশ্চাৎ হতে বিবের ছোঁল মার।

স্বরগীর তবু স্বরগীর তবু

আজি এই দিনে পুঁজিব কি প্রভু

স্মৃতির পুরস্কারে?

আমি যে দেখিছ ত্রিঘণ বিবের

গোপন পীতের ধারে,

হেনেছে প্রোডিউসারে।

আমি যে দেখিছ তরুণী নায়িকা বেশবাস খুলে ছোট

কি ময়ূরায় দেখিছে যে কাছ হাসিলের

হাসি টোটে।

লক্ষ্য আমার ভ্রষ্ট আজিকে

দণ্ড মুষ্টিহার

চারশ বিবের পারা

ঠাণ্ডা করেছে সারা টলিউড শিরায় গিয়েছে ঢুকে।

তাইত তোমার শুধাই সর্কোভুকে

বাহায়া তোমার তুলিয়াছে ধল্লা গাহিতাছে তব জর

তুমি কি তাদের বাঁচারে রেখেছ? দিরাছ কি বরাভর?

বাস্তায় কোনও অচেনা ভিখারীকে দেখলে আজও আমার যে প্রশ্ন প্রথমই মনে পড়তই উদয় হয় তা হলে এই ভিখারী কোনও এক সময়ে বিপন্নপালক পরিচালিত কোনও ছবির প্রযোজক হিসেবে কি না? হাসির কথা নয়; বিপন্নপালক সিঁপাই বিব্রাহের আদে

থেকে চলচ্চিত্রের শিশু চটকাচ্ছেন। কত লোক এল কত লোক গেল। বিপন্নপালক still going strong। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিপন্নপালক একাই কত প্রবোজককে পথে বসিয়েছেন তাই ভজ্ঞে প্রয়োজন হবে অনেকগুলি পরিচ্ছেদের এই সেদিনও নগরনাট্যের সুপ্রতিষ্ঠিত এক পরিবেশকে জিজ্ঞেস করেছেন ইংরেজিতে : If I guarantee a definite flop how much minimum guarantee can you offer ? ইংরেজি না বুঝে প্রবোজক সই দিয়েছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার মিনিমাম গ্যারান্টি পত্রে। তার পর ? তার পর এক গ্রোলোপাথিক অথবা হোমিওপ্যাথিক কি সিনেমে এক ভোজ এমন মিলেন যাতে লাভ দুয়ের কথা সেই ছবি দেখিয়ে পরিস্রবকে মিনিমাম গ্যারান্টির সিকি টাকা তোলবার অনেক আগেই বা তুলতে হবে সেটি একটি কল ; তার নাম পটল।

মহাশয় গান্ধী যেমন জাতির জনক ; মহাশয় বিপন্নপালক তেমনি টলিউডে অল্পজিভ যাবতীয় বন্ধুত্বের জনক। হাবাহনের যেমন দশটি ছেলে ; বিপন্নপালকের তেমনি দশটি সন্তান। অর্থাৎ দশটি এসিষ্টেন্ট। দশজনের মধ্যে কেউ গ্লাসক ; কেউ ডায়ে, ডাইপো ; কেউ তায়রা-তাই। বিপন্নপালক আগে ; শেহনে দশটি সন্তান। প্রবোজক অথবা পরিবেশক তারও শেহনে। কেউ বিপন্নপালক হাসলে হাসছে ; বসন্ত অস্থিবিধে হলে পায়ের তলায় ছোট্ট মোড়া ঠিক করে দিচ্ছে। বিপন্নপালক কিছু জিজ্ঞেস করলে অবদারিত তুল উত্তর দিচ্ছে। একজন পাশে খাতা খুলে গাঁড়িয়ে ; একজন নতীর কোট খুলে। একজন রেট আর পেলিল নিয়ে রেডি। বিপন্নপালকের আজ মৌন দিবস। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, রেটে তার উত্তর লিখে দিচ্ছেন। বেজার মৌন নয় ; ডাক্তার কথা বলতে বাধন করেছেন। আজ কদিন থেকে বিপন্নপালকের ভয়েস চোঁক্‌ড্‌।

বিপন্নপালকের ভয়েস চোঁক্‌ড্‌, হওয়ার ইতিহাস কিন্তু অতীত জরুর। সময় বুঝে তাঁর ভয়েস বেরোয় ; সময় বুঝে চোঁক্‌ড্‌ হয়। সেক্ষা তাহলে খুলেই বলি। বিপন্নপালকের আগাগোড়া পরিচয় এমনই পঙ্খিল ; তার ইতিবৃত্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; তার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমান ঘোরালা। জীবনে যখনই কোনও প্রবোজকের দায় হয়ত তখনই চুকেছেন কেঁচোর মত। ছবি আরম্ভ হবার সময় প্রোডাক্‌বার কেঁচো ; ছবি আরম্ভ হয়ে গেলে কিন্তু আর কেঁচো নয় ; তখন কেউটে। ছবি আরম্ভ হবার সময় বলেন : এক লক্ষ টাকার মধ্যেই ছবি করে দেব। ছবি করে নেন। ছবি আরম্ভ হয়ে গেলে কত লোকে যে ছবি শেষ হবে কি ছবির সুস্তির আগেই প্রবোজক শেষ হবে তা এক ওই বিপন্নপালকই জানেন, কিংবা তখন আর জানেন না।

এই ভাবে লক্ষ টাকার খেলার মতো বাড়ী ঘর লোর গয়নার্গিটি বেতে, হস্তিতে টাকা ধার করে এনে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হয়ে যাবার পরও যখন ছবির অর্ধেক বাকী তখন প্রবোজক আসে কাটাকাটি উদ্বেগে ; শেষ বোকাপড়া সেরে যেতে ; এসপার-ওসপার করবার মনোবৃত্তি নিয়ে। এসে দেখে বিপন্নপালক বিছানায় কাৎ ; হাতে মোট পেলিল ধরা ; তাতে লেখা : Voice choked ! Doctor advises. 'no

আপনি কতকগুলি ঋণাড়া করতে পারেন ? বোবার শত্রু নেই ! এক হাতে কতকগুলি তালি বাজে ? তাই প্রোডিউসার অবাক-বিম্বয়ে তাকিয়ে থাকে বিপন্নপালকের গল্প মত কল্প চোখের দিকে। রাগ জল হয় ; তারপর অম্বরগের বাশ্পে উবে যায় সব। বিছানায় কাৎ হয় বিপন্নপালক ; কিন্তু কাৎবার প্রবোজক। সেই আসলে হুপোকাৎ। উঠে যায় প্রবোজক ; উঠে বলেন বিপন্নপালক। উঠে বলে বলেন : ওয়ে এক কাপ চা। ব্যক্তি দিকে তাকান ; চা খাবার সময় কি এখন ? তারপর মনে পড়ে : Any time is tea-time !

লক্ষ লক্ষ টাকার রাজ্য ঘরে এগুতে এগুতে বিপন্নপালক বাড়ী করেছেন, গাড়ী করেছেন। এক লক্ষ্যে এসিয়েছেন নিজের ধন্য। নিজে ধরে। কিন্তু তার জন্তে তাঁর এসিষ্টেন্টদের কোনও সুরাহা হয়েছে, এমন নয়। বরং তাদের ক্ষতিই হয়েছে। বিপন্নপালকের সহকারী শুনে তার পক্ষে কাজের কাজ পাওয়া শক্ত। কারণ সিপাহিকা বোড়া ; কুহু নেহি ত খোড়া খোড়া ! বিপন্নপালকের সহকারী আর কিছু না পালক ছবির খরচা অন্তত বিপন্নপালকের মত করতে পারবে, এ বিষয়ে প্রবোজকরা নিশ্চিত। তাই বিপন্নপালককে তারা বত না ডায় বিপন্নপালকের সহকারীকে এড়ায় তার চেয়ে বেশি। বিপন্নপালক যে আত্মীয়-স্বজনদের সহকারী করেছেন সে বিপন্নপালকের জন্তে নয় ; খুব কম খরচার গোপালনের জন্তে। চাঁট দেবে কম ; হুং দেবে বেশি—হুং আত্মীয় ছাড়া এমন বংশসহারা গাড়ী আর কোথায় পাওয়া যাবে ? এক ডিল লোকে মারে হুপাখী ; বিপন্ন মারেন তিন। প্রথমেই প্রবোজকের সঙ্গে নিজের পারিষ্রমিক ঠিক করবার সময়েই সহকারী সমেত ঠিক করে নেন ; তারপর সহকারীকে দেবার সময় তার থেকেও কিছু সরিয়ে রাখেন। তারপর প্রচার হয় বিপন্নপালকের হুং আত্মীয়দের বিপদের দিনে কাজ দিয়ে বাঁচাবার মহত্ব।

এত বাধা বিশস্তির মধ্যেও সৈবাং যদি বিপন্নপালকের কোনও সহকারী যদি একা স্বাধীন ভাবে ছবি করবার সুযোগ পায় তাহলেও সিংহের ভাগ বসাতে ভালেন না বিপন্ন। সুশাযতিভঙ্গি করবেন বলে যে টাকা নেন পরিচালনা করে তার সিকিও পায় না তাঁর সহকারী। ছবি যদি লোপে যায় তাহলে লোকে মনে করে সহকারী শিখণ্ডী মাত্র ; আসলে অন্তরাল থেকে সত্যসত্যি কাজ করেছেন বরং বিপন্নপালক। ছবি যদি না লাগে তাহলে জীলোকেও বোঝে যে বিপন্নপালক বা পারেন তা যদি তাঁর সহকারী পারত তাহলে লোকে আর অত পরশা দিয়ে বিপন্নপালকের কাছে যেত না। এঁরা ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। সে রহস্ত ডিটেক্‌টিভ গল্পের চেয়েও চুল খাড়া করার ; চোখ কপালে তোলার ; নিশাস রক্ত হবার মত।

সে রহস্তের বন্ধ দরজার এয়ার তাহলে চিচিকীক চাষি লাগাই। বিপন্নপালক যখন অল্প প্রবোজকের কাছে কাজ করেন পরিচালক অথবা চিত্রনাট্যকার হিসেবে তখন প্রবোজকের হুং বোঝেন না। কিন্তু যখন প্রবোজকের অতাবে নিজেই প্রবোজনা এবং পরিচালনা দুইই করেন তখন প্রবোজকের হুং বোল জানা

বোঝান যে বাংলা ছবির বাজার কত ছোট; আর্টিষ্টদের বেশ টাকা দিলে ছবির Cost বেশি হয়ে গেলে টাকা উঠবে না; কলে বাংলা ছবি তোলাই বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। এমিট্টেরা বোঝায় বাকীটুকু; বলে: বিপন্নপালকের কাছে কাজ করতে পাওরাই যে কোন শিল্পীর পক্ষে কত বড় ভরসার কথা। একথানা ছবিতেই ত' ভারতজোড়া নাম হবে তার। তখন এ ছবির ক্ষতিপূরণ হয়ে লাভ হবে কত। বাস! আর বোঝাতে হয় না। বিপন্নপালকের ছবিতে নেমে জায়াছবির নায়ক-নায়িকারা যত্ন হয়; বিপন্নপালকের ছবিতে ক্যামেরার কাজ করে আলোকচিত্রকর হয় কৃতজ্ঞতাব্যর্থ।

সব শেষে পালা এমিট্টেটনের। এমিট্টেটনের বোঝান বিপন্নপালক নিজেই। একজন সহকারীকে কাছে ডেকে বলেন: শোন, নাড় গোপাল শোন; বাপাখানা বোঝ। তোমাদের আর কি? তোমাদের জন্তে আছি আমি। তোমাদের একটা হিল্লো হয়ে যাবেই একদিন না একদিন। কিন্তু আমার জন্তে আছে কে? তাই বলছি রাগ করবার আগে একবার ভাবো নাড় গোপাল; ভাবো। নাড় গোপাল আর ভাবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে কাজে এসে ঢেকে। এক নাড় গোপালের সঙ্গে বাকী সব নাড় গোপালরাও।

বিপন্নপালক প্রযোজনা করেন বটে, কিন্তু তার জন্তে গাঁট থেকে বার করেন না এক শয়সাত। তখন বান পরিবেশকের কাছে। তখনই ওঠে মিনিমাম গ্যারাটি'র কথা। অল্প সব প্রযোজকরা পরিবেশকের কাছে থেকে যে টাকা পান দকায় দকায় তা হল অগ্রিম; সে টাকা যদি ছবি দেখিয়ে না ওঠে তাহলে সে টাকা কেবল দেবার দায় থাকে প্রযোজকের। কিন্তু মিনিমাম গ্যারাটি মানে তা নয়; মিনিমাম গ্যারাটি হল ছবির ভাল বাই হক মিনিমাম গ্যারাটি'র টাকাটা দিতেই হবে; শুধু দিতেই হবে না, কোন দিন আর ফেরত চাওয়া চলবে না। তাই মিনিমাম গ্যারাটি'র উপরই বিপন্নপালকের বোঁক। অল্প প্রযোজকদের মত দকায় দকায় কাজ সারা নয় তাঁর: এক কোপেই দকায় দকায় জন্তেই তিনি। অল্প প্রযোজকদের হল শ্রাকরার ঠুকঠাক; বিপন্নপালকের হল কামারের এক যা।

কামারের সেই এক খাঁর আর মার নেই!

এত কথা না বলে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। তাতেই বিপন্নপালকের ভেতরের মানুষটি পুরো বাইরে বেরিয়ে আসবে। ঘটনাটি অঘটন-ঘটন-পটীরসী হায়াবাজোও অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা। যে ঘটনার কথা বলতে বাঙ্কি সে ঘটনার নায়ক প্রযোজক রাধামাধব ঘোষ; অভিনায়ক বখারীতি পরিচালক বিপন্নপালক। প্রযোজক রাধামাধবকে আজ আপনাবা অনেকেই দেখে থেকে থাকেন হরত বর্তমান; নয়ত বেস্টিক স্ট্রীটে পরিবেশকের দরজার দরজায় হানা দিয়ে কিরছেন। বা হাতের কবজিতে ধুতির কোঁচা কেসে রাখা; মুখে পান; নয় একটা দেশলায়ের কাঠি ধাতে খোঁচান চলছে। পায়ে চটি; গায়ে সার্ট। ট্যান্স ট্যান্স করতে করতে বাজা দিয়ে চলেছে। রাধামাধব আজকে এই; কিন্তু সেদিনকার কথা বলছি সেদিনকার রাধামাধব এই নয়। সেদিন রাধামাধব কাগজ, কার্ডবোর্ড রাবিশের সোল এঙ্গেলী পেয়ে বিরাট লোক হয়ে গেছে। আজ তার বাড়ির বকে বেঘন

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি উজ্জ্বলরস

## প্রাণতোষ ষটক রচিত র তু মা লা

“সাম্প্রতিক কালে বাঙলা ভাষার টিক এই ধরণের কোন অভিধান বোধ হয় প্রকাশিত হয়নি। শব্দের প্রতিশব্দ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। প্রতিশব্দ সৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে—কথাসিদ্ধি। এমিকে লক্ষ্য রাখলে বাংলা-সাহিত্য ভাষা আরো সম্পদশালী হবে। রত্নমালা সেই কারণেই মূল্যবান।”—আনন্দবাজার পত্রিকা

## কলকাতার পথঘাট

অতীত এবং বর্তমান কলকাতার Topography সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। মূল্য তিন টাকা।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমি., কলিকাতা - ৭

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন: “পাল’ বাকের ‘দি হাউস ডিভাইডেড’ উপন্যাস একটি একাদম্বর্তী পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস, ‘মুক্তাভঙ্গ’ একটি একাদম্বর্তী পরিবারের ক্রমিক অধঃপতনের বিশ্লেষণ।” (উপন্যাস) মূল্য পাঁচ টাকা। (দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল)

বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২

“One of our youngest writers Sri Prantosh Ghattak has already attracted discerning notice by turning out some commendable short stories and a forceful novel Akash-Patal”—বলছেন অমৃতবাজার পত্রিকা। এই

## আকাশ-পাতাল

(দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস)

বিরাট গ্রন্থ দু'বছরে সর্বসম্মত প্রায় তিন হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রথম খণ্ড, পাঁচ টাকা; দ্বিতীয়, পাঁচ টাকা; বাক্যে আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমি., কলিকাতা

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

যুগে যুগে ঘর বেঁচেছে মানুষ। বর্তমানে বাঙলা ছোট গল্পের মান পুঙ্খ উপকরণ যুগিয়েছে, নারী তার হৃদয় দিয়ে প্রেমের ঘর বেঁচেছে, সংসার পেতেছে। খেলাঘর উপন্যাসে লেখক এঁকেছেন বর্তমান কলকাতা আর তার আধুনিক সমাজের ছবি

## খেলাঘর

(মূল্য সাড়ে তিন টাকা)

সাহিত্য ভবন, কলি-১২

বর্তমানে বাঙলা ছোট গল্পের মান অনেক উঁচুতে, পৃথিবীর সাহিত্য-দরবারে। সর্বাধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে ক'জন সত্যিকার গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, লেখক তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থে লেখকের বিভিন্ন সময়ে লেখা বহু আলোচিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে।

## বাসকসজ্জা

(মূল্য সাড়ে তিন টাকা)

মিত্র এণ্ড ঘোষ, কলি-১২

পাণ্ডামাধব বসে থাকে সেদিন ঠিক এমনই লোক বসে থাকত হাঁট কাগজের আশায়। এক পরশা হয়েছে সেদিন যে ভারতবর্ষের বেখানে বসে মাসে ডিজিটাল বেনজ ছিল সমস্ত গাড়ী একের পর এক কিনেছে। বেখানে বসে বড় টেওয়ার সব ডাকছে একা। তারপর ছবির কারবারে ছুখানার পর তৃতীয় ছবিটি লগিয়েছে সাংখ্যিক। বাঁড়ের চোখে গিয়ে লেগেছে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেওয়া তীর; ইংরেজীতে বাক্য বলে hit the bull's eye! ছুখানা ডাবির প্রাইজে বা না পার লোকে একখানা ছবিতাই তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেই পড়েছে রাথব বোয়াল বিপন্নপালক বেবের পাঠায়। বিরোগাঙ্ক নাটকের সেই ত' আনন্দ। রাধামাধব সেদিন থেকেই টলিউডে নতুন নামে পরিচিত হতে আরম্ভ করল; রাধামাধব নয় আর সেদিন থেকে; সেদিন থেকে তার নতুন নাম হল: গাধামাধব যোষ।

ছবি শেষ হবার অনেক আগেই গাধামাধব ডাক ডেড়ে কান্দে। চুয়ার হাজার টাকা গেছে এসিষ্টেন্টের পেছনে; আঁঠার হাজার টাকা পেরেছে একা একজন অভিনেতা যার বাকী ভাবনের সমস্ত বোজগার মেলালেও এত টাকা হবে না। তখন যুদ্ধের বাজার; প্রেরটার পালা। প্রেরটা হচ্ছে অনেকটা রাতের পাতে ভাতটাত খাবার পরে পরোটা খাওয়ার মত গুড় দিয়ে। অর্থাৎ পশ্চিম-তিনিশ দিনের জন্মে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে থোক টাকায় কট্টা হবার পর বখন পশ্চিম দিনেও কাজ শেষ হয় না তখন নৈমিক মোটা টাকায় চলে প্রেরটার পালা। বিপন্নপালকের ত এমনতেই কোন ছবিই সময়ে শেষ হয় না; তার আবার গাধামাধবের ছবি যখন ত' দুহাতে লোটবার মরশুম। একশ দিনের বেশি হয়ে গেছে শুটিং; কট্টা পিরিয়ডে আঁট্টের বা প্রোপা তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে সে প্রেরটার। কিন্তু খরচারও শেষ নেই; ঈডিও ভাড়ারও না।

ছবির সেটে বা বলেছেন বিপন্নপালক তাই জোগাড় করে এনে দিয়েছে গাধামাধব। একটা সিঁড়ি তৈরী করতে লেগেছে কয়েক হাজার টাকা; সিঁড়ির মাথায় ঈড়িয়ে সর্গর্ষে গাধামাধব বলছে সিঁড়ির নীচে ঈড়ান বিপন্নপালককে! কেমন হসেছে সেটা? অনেকক্ষণ নাকে কমাল চাপা দিয়ে চুপ করে চেয়ে দেখবার পর বলেছেন পরিচালক প্রযোজককে: হয়েছে ত ভালোই; কিন্তু এ সিঁড়ি ত কাজে লাগবে নেই! শুনেই পিলে চমকেছে প্রযোজকের লাগবে নেই কেন? বিপন্নপালক আবার নাকে কমাল চাপা দিয়ে চুপ করে থেকেছেন অনেকক্ষণ; তারপর ফের বলেছেন: লাগবে নেই; আমি যে চিত্রনাট্য পালটেছি। সিঁড়ির মাথা থেকে গাধামাধব সেই বে গড়াতে আরম্ভ করেছে, এসে পাড়ছে একেবারে বিপন্নপালকের পায়ের কাছে।

নাচের জন্মে বহুটাকা খরচ করে জানা হয়েছে ভারতবিখ্যাত নৃত্যপটায়গীকে। চরিত্র হাজার টাকা খরচা করে তৈরী হয়েছে সেট; তারপর সব আপসেট করেছে বিপন্নপালকের সেই মোক্ষম ছবি কথার একটি ডায়ালগ: লাগবে নেই! সে কি মশাই? লাগবে নেই কেন? লাগবে নেইই ত; আমি যে চিত্রনাট্য বদল করেছি। ছবি রিলিজ হয়ে একদিন চলেই কমিশের ঠাইকে হাউস বন্ধ থাকে এক মাস। বিপন্নপালক বোঝান প্রযোজককে: এক

মুখোণ্ড আবার পাওয়া যাবে না; পারলিক রিককসন জানা গেছে অর্থাৎ এমিকে হাউসও বন্ধ। আশ্রন ছবিটাকে মেরামত করি। কলে আবার শ্রুটি; আবার সেই লাগবে নেই; এবং মেরামতে মেরামতে ছবির বাই হক, ছবির প্রযোজক ততদিনে beyond repair।

কিন্তু এসব কিছুই নয়; তাহলে আসল ঘটনাটা এবারে বলি। গাধামাধবের ছোট ছেলের সেদিন জন্মদিন। মাছের মুড়ো এসেছে তার জন্মে একটা; তাই নিয়ে তার বড় এবং ছোট ছেলেতে ভরান গোলমাল। গাধামাধব তার জ্বীকে বলেছে: হুটো মুড়ো আনলেই তত; জ্বী বলেছেন: না; এখন টানাটানির দিন। গাধামাধব চলে গেছে ঈডিওতে। সেখানে গিয়ে দেখে একটা মস্ত মাছের মুড়ো; কি ব্যাপার? শুটিং লাগবে। তারপর দেখা গেল একটি মুস্ত্র নায়ককে মাছের মুড়ো শুদ্ধ পেতে দেওয়া হয়েছে; এমন সময় ট্রেনের সময় হয়ে গেছে বলে নায়ক মাছের মুড়ো ফেলে বেখেই উঠে চলে গেল। অর্থাৎ সত্যিকারের মাছের মুড়ো আনার দরকারই ছিল না। কিংবা দরকারই ছিল; কারণ গাধামাধব মনে মনে সেট ভেবেছে যে বাক মাছের মুড়োটা সে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, অজ্ঞাত: সকালবেলায় মাছের মুড়োর জন্মে ছেলের কান্নাটিকে ত্রিবেলায় মুছিয়ে দিতে পারবে মাছের মুড়োর হাসিতে, এই ভেবে সে একটু পুলকিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার এই অকারণ পুলক উপাণ্ড হয়ে গেছে; শুটিংএর পর মাছের মুড়ো গিয়ে উঠেছে বিপন্নপালকের গাড়িতে। কেন? কেন আবার! মেনী খাবে বলে! মেনী কে? মেনী হচ্ছে বিপন্নপালকের শ্রিয় বেড়াল!

গাধামাধব একটি কথাও বলে নি। বললেও লাভ হত না। টলিউডে কুকুর বেড়াল শিম্পাঞ্জির বা দাম অনেক সময়ে মগ্নুঘেরও তা দাম নয়। তাই ছেলের কান্নাভেজা মুখ বহুই গাধামাধবের বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠুক সারা দিন, তবুও তাকে বুকে করেই ফিফতে হবে; বুক চিরে বার করবার রাস্তা নেই টলিউডের কোনও ছবির প্রযোজকের।

বৌবনের প্রারম্ভ থেকে প্রৌচস্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত টলিউডে বত উৎপাদ আনন্দক বিপন্নপালক একা করে এসেছেন তারই। অবশুস্তাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করেছে এইমাত্র। উৎপাতের কড়ি চাংপাতে বাবার পুণ্যলয় সমাগত। বিবেক এতদিনে তাঁর গলা টিপে ধরেছে। একদিন খাওয়া পরার ভাবনা ছিল; কিন্তু ঘুমের নয়। আজ খাওয়া পরার ভাবনা নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে ঘুমের হুর্ভাবনা। খাওয়া পরা হয়; ভালোই হয়। কিন্তু ঘুম আর হয় না। তার জন্মেই যেতে হয় মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসককে গিয়ে বলেন বিপন্নপালক: আমাকে বলতে পারেন কিসে একটু হেসে বাঁচব? মনোরোগ চিকিৎসক অনেক জেমে বলেন: এক কাজ করুন; বিপন্নপালক যেন বলে এক বিখ্যাত বাড়ালী পরিচালক আছেন তাঁর তোলা যে কোন ছবির কোন সিরিয়স কল্ল লুট ছবির পর্দায় দেখে আশ্রন; হেসে খুন হয়ে আপনি। লুট মনে ফিরে আসে বিপন্নপালক। গুরসা করে বলতে পারেন না যে তিনিই বিপন্নপালক স্বয়ং।

বিপন্নপালক আজ সত্যিই বিপন্ন। কপালের গুণ ফুলফুলিও দেখিয়ে কেউ যদি বলে কি হয়েছে আপনায়

বাস। হয়ে গেল বিপর্যয়ালকর। হাত মুলোয় আরক্ত হল সেই যে তার আর শেষ নেই। ডেটল, আইডিন, সিবাঙ্কল অয়েটমেন্ট লাগাতে বাকী রইল না কিছু! আধা হানপাতাল খুলে বসলেন তন্তুশি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেছে ফুলে : ব্লাডপ্রেশার বেড়েছে নাকি? বাস। হয়ে গেল বিপর্যয়ালকর। জটিল থাকলে জটিল বড়। জটিল না থাকলেও শয্যাগত; এবং যে দেখা করতে চায় তাকেই বলে দেওয়া : দেখা হবে না! এমন সময় যদি ছেলে এসে বলে : ডাক্তারবাবু এসেছেন; কি বলব? বিপর্যয়ালক না ভেবেই জবাব দেন : ডাক্তারকে বল আমি অসুস্থ; দেখা হবে না আজ। পৃথিবীতে এই প্রথম ডাক্তারের সঙ্গে রক্তীয় দেখা হয় না; রক্তী অসুস্থ,—এই কারণে।

বিপর্যয়ালক দেবের কথা লিখলাম বিপর্যয়ালক দেবকে লক্ষ্য দেব বলে, এমন দুঃখা আর সেই করুক, আমি করি না। বিপর্যয়ালককে লক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব। লক্ষ্য না পাবার ব্যাপারে তিনি বর্তমান কংগ্রেসনেতাদের লক্ষ্য দিতে পারেন। সে কথা নয়; বিপর্যয়ালকের কথা এত করে বলবার কারণ এই মাত্র যে, বিপর্যয়ালকের মত লোকেরা টলিউড থেকে বিদায় না নিলে টলিউড সত্য সত্যই বিপর্যয় হবে। বিপর্যয়ালকরা যত টাকা এই শিল্পকে দিয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশি টাকা ব্যয় করে দিয়েছেন; সবচেয়ে জনপ্রিয় এই মাগাম মাফং যন্ত্রটুকু আনন্দ দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কৃতি বিকৃতি দেশের রক্তে রক্তে অল্পপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন ভ্রাতৃ এবং শত্রুভ্রাতৃ।

আজকের ছেলো-মেয়েরা যে মা বলবার পরই সিনেমা বলতে শুরু করে তার জন্তে দায়ী বিপর্যয়ালকদের তথা টলিউডের রসীন অসুস্থ অপপ্রচার। সিনেমার কাগজ, সিনেমার বিজ্ঞাপন সিনেমার গান সমস্ত দেশ থেকে গভীর এবং গভীর চিন্তাকে বিদায় নিয়ে তবল আলতার মত হালকা ভারনার শ্রোত ভাসিয়ে দিচ্ছে যুগের ভবিষ্যৎ। সিনেমার প্রভাব আজ এত দূর প্রমত্ত করেছে বিশ শতাব্দীকে যে আদর্শের প্রচার-মঞ্চের পরিবর্তে রাজনৈতিক রসমঞ্চে আজ আর নেতা নেই; যারা আছে তারা সবাই অভিনেতা। জহরলাল আর জহর গাঙ্গুলীতে আজ আর তফাৎ সামান্যই।

কিন্তু সে কথাও ছেড়ে দিলাম না হয়। খোদ টলিউডের যে কৃতি করছে বিপর্যয়ালকরা তার ক্ষতিগুণ হবে কিসে? জোড়া বলদ অথবা কালো ধানের শীষে,—কোনও বাঁশে তোট দিলেই তা হবার নয়। বিপর্যয়ালকের অধুকারকেরা প্রয়োজককে আজও যেভাবে বধ নিয়ে চলেছে তাতে এক-আগম্বন নয়, বক্ষের কুবেরও উবে যেতে আটকাবে না। শুধু ফিল্ম ঠারেরাই যে প্রয়োজকদের বারেল করেছে তা নয়; এই সব কনফিডেন্স ট্রিক্‌টাররাও কম ভোবারনি তাদের। বিপর্যয়ালক তবু এই ইণ্ডাস্ট্রিকে সাকসেসফুল ছবি মাফং টাকা এনে দিয়েছেন বহুবার; কিন্তু এই অধুকারকের দল, এরা এই ইণ্ডাস্ট্রি

টাকা জলেই দিয়েছে; এই ইণ্ডাস্ট্রির মর্যাদা দিয়েছে ধুলার মিলিয়ে; এই ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ইণ্ডাস্ট্রি কথাটা বাদ দিয়ে বোকাতে চেয়েছে কপালই সব।

এরা নিজেরা এক পয়সা ব্যয় করবে না; এক পয়সা ব্যয় করার অবস্থাও এদের অনেকেই নয়। এরা আসলে দালাল। শিকার ধরে; শিকার খুঁজে বেড়ায়। যারা নোট ডবল করে দেব বলে লোক ঠাকার তাদের কাঁধের চেয়ে এরা কম বায় না। নোট ডবল করে দেওয়ার দল অভাব-অপরাধী; অর্থাৎ জন্ম-অপরাধী নয় এদের অনেকেই। কিন্তু যারা টলিউডের দালাল তারা স্বভাব-অপরাধী। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে এই যে এরা লোকের পর লোক পায়ও। লোক নয় গল্প। এবং দালালদের মধ্যে যারা চিন্দ্ৰ তাদের টলিউডে এই রকম 'গো'-বধে আপত্তি কর; উৎসাহ বেশি।

টলিউডে অনাদিকাল থেকে এই রকম কামচ্ছে যে পাওয়ার বাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে লোভা, কয়লা, চা, পাট, কাপড় আরই ব্যবসা করতে যায় তার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞেনে অথবা জানবার চেষ্টা করে তবে লোকে নামে। কিন্তু কিসের ব্যবসায় বোধ হয় কিছুই জানবার দরকার হয় না। অনেকটা সাহিত্যের ওপর যেমন যে কেউ মত দিতে পারে; ওকালতি-ডাক্তারী বিজ্ঞান,—এ সম্বন্ধে যে কেউ যা কিছু বলতে ভয়পায়; গল্প-উপন্যাস-কবিতা, এ ব্যাপারে কাঁকরই কিছু বলতে বাধ্য নেই। 'আমার মনে হয়'—বলে ক্লাসিক্যাল গান শুনে না বুঝে ভাল দেওয়ার মত মাথা নেড়ে যায়। ফিল্ম-ব্যবসা যে ব্যবসা নয়; রাতারাতি বড়লোক হবার রাস্তা মাত্র আজও।

আর এই অজ্ঞতারই শ্রবোণ নেয় টলিউডের দালালরা; তারা বোঝায় ছবি আরম্ভ করে দিলেই পরিবেশক দৌড়ে আসবে, অগ্রিম টাকা; মফঃস্বলের প্রদর্শক আসবে তার সঙ্গে সঙ্গেই। ছবি রিলিজ হবার পর 'হিট' করলেই টাকা দূরে আসতে আর কতক্ষণ। এর মধ্যে সব হিসেবই মেলে : মেলে না,— শুধু 'হিট' করা টুকু; ঠিকে ভুল থেকে যায়। ফলে টাকা আর দূরে আসে না; মাথা ঘুরতে থাকে সেই যথা সর্বস্ব, বাড়ী, গাড়ী, গয়না খোয়ানো হস্তী ঘরালো প্রযোজকের। বছরে এই রকম কত ছবি হিট করা দূরে থাক,— রিলিজই হয় না, রিলিজ দূরে থাক অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আধা শেষ, সিকি তোলা কত ছবি যে দিনের আলোর মুখ দেখতে পায় না,— সিকিয় তোলা থাকে, তার খবর রাখে কে? হেই রাখুন, ফিল্মের খবর কাগজ সে খবর রাখলেও দেয় না। বিপুল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র যেমন আজকে কংগ্রেসের খবর খারাপ হলে চোপে যায়; ব্যয় করে না।

তবুও যে fool এর অভাব হয় না টলিউডে, তার কারণ টলিউডের ফুল শুধু ফুল নয়; এরা হচ্ছে বিটি-fool! রূপের জন্তে রূপে গেলে এরা নিজেদের দোষ দেখে না; বলে কপালের দোষ।

[কবিতা :]



## ভাওয়াইয়া গান

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া ও চটকা গান সুপ্রসিদ্ধ। ভাওয়াইয়া কথাটির উৎপত্তি ভাব হইতে; ভাবের গান বলিয়াই এই শ্রেণীর গানের নাম 'ভাওয়াইয়া'। এই গানের সঙ্গে দোতারার বাজসঙ্গত যেন কতকটা অপরিস্কার, তাই কোন কোন অঞ্চলে এই গানের আর এক নাম 'দোতার-গান'।

নদীবহুল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ভাওয়ালিয়া বা 'ভাউলে' নামে এক শ্রেণীর ছোট নৌকা আছে, প্রেমিক নিশিযোগে 'ভাউলে' বাহিয়া প্রেমিকার অভিসারে যায় বলিয়া একটি লোকপ্রসিদ্ধি আছে। প্রেমের এই শ্রেণীর গানের নাম 'ভাওয়ালিয়া' বা 'ভাওয়াইয়া'-ও হইতে পারে।

হিন্দী উচ্চাঙ্গের নৃত্য-সঙ্গীতেও 'ভাও-বাতলান' নামক ভাব প্রকাশনের একটি প্রথা আছে। এই গানে অনুরূপ ভাববৈচিত্র্য দেখানো হয় বলিয়া ভাওয়াইয়া হওয়াও অসম্ভব নয়।

এই গানে এমন একটা বিবাহের উল্লেখ ও অতৃপ্তির কান্ধা-মিশ্রিত স্বর আছে যে, সহজেই এগুলি মনকে উদ্মনা করিয়া দেয়। সেহ অন্ধকার করিয়া জীবনের বাতি নিবাইয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, ক্রন্দনের করুণতার সুরে তাহারই ধনি বাজিয়া উঠে—

ও কি রে মনসুয়া,

একদিন ছাড়িয়া যাবু সেহ আঁকার করিয়া (রে)।

জোড়া নৌকা, জোড়া বৈঠা মন

জোড়া বাতি রে এ' অলে;

(ও) তোর দেহের বাতি নিবিয়া গেলে মন,

কে ছালাবে বাতি রে মনসুয়া।

ভাটিয়ালা ও ভাওয়াইয়ার নামের সৌন্দর্যের স্রাব গীতি-বীতিরও কতকটা সাদৃশ্য আছে। তবে ভাটিয়ালা গাওয়া হয় তাঁনা সুরে, কিন্তু এই গানগুলির সুর বেশ কাটা-কাটা। গায়কের কণ্ঠে চাক্ষুৰ না থাকিলেও এগুলি গাওয়া যায় না। ভায়া হাড়া, ভাওয়াইয়ার নিজস্ব সঙ্গভঙ্গ্য দোতারার বাজনা বাউলের একতারার স্রাব এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট ছন্দোবৈচিত্র্যের সঞ্চার করে।

পূর্ববঙ্গে সারি ও ভাটিয়ালা গানের সঙ্গেও অনেক সময়ে যে রাতারা বাজানো হয়, ভাওয়াইয়া গানের দোতার তাহা হইতে

বভ্রয়। উত্তরবঙ্গের দোতারার কাঠামো ও ইহার বাজনীতি জিন্ন প্রকাণ্ড। যেচ উপলব্ধিতির বিশিষ্ট বাজসঙ্গের কতকটা সংস্কৃতিত রূপ এই দোতার। ভাওয়াইয়া গানের সুরের সঙ্গে যেচ ও পোলিয়া আদিবাসীদের প্রেমগীতির সুরেরও বেশ মিল আছে।

উত্তরবঙ্গের উচ্চভূমির সাহুদেশকে বলে 'বাং অঞ্চল'—এই অঞ্চলের কথাভাষাতেই সাধারণত ভাওয়াইয়া গান রচিত। এ যেন গানেরই ভাষা—শব্দগুলি যেমন মধুর, তেমনই ভাবব্যঞ্জক।

ভাওয়াইয়া গান এই অঞ্চলের অধিবাসী বাউদিয়া সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট গান—

(আরে ও) ও ভাবের দোতার,

নবীন বয়সে মোক করলি রে বাউদিয়া

(আরে ও) মরি হায় রে হায়!

বধন দোতারিা নিলাম হাতে,

নিবত ক'রে মোকে পাড়ার লোকে

নিবত, ক'রে মোকে দয়াল বাণ-ভাই।

তোয় জন্ত মোর গেরামবানী, আনাত দেয় ইজহারী।

(আজ) তুই দোতারিা বাবিস মান,

রূপা দিয়া মই বাকবোরে কান

নয়া গাছের মারিক রে কথা।

দোতারিা বাজসঙ্গই প্রেমের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে, মিলন সম্ভাবনার বাজনার কান বাঁধিবার আগ্রহ রসেরই ইঙ্গিত!

এই বাউদিয়া সম্প্রদায় এক শ্রেণীর বৈরাগী সম্প্রদায়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলেই তাহার বাস করে। বাউলদের স্রাব ইহারও স্বর-সংসারের বাঁধন বা সমাজ সংস্কার মানে না, স্বর বাঁধিয়া স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করে না, ভবঘুরেদের স্রাব নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বেদিয়া হইতে তাই তাহারদের নামও হইয়াছে বাউদিয়া।

হিন্দু, মুসলমান দুই ধর্মের লোকই এই সম্প্রদায়ে আছে। বাউলদের স্রাব দুই বিভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলিত ধারায় তাহার আশ্রিত। তবে বাউলগানের স্রাব ভাওয়াইয়া গান ভগবদ্ভিত্তি নয়, ভাটিয়ালা গানের স্রাব তাহারদের গানও লৌকিক বিবাহ-বিচ্ছেদ লইয়াই রচিত—

প্রেমের আগুন জ্বলেছে খিকি খিকি

(হুই সেন জান)

বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো,

কেইনে কেইনে চক্ষের জল

মোর হ'ল সারা রে।

আরে ওই রকম, ওই নারীর প্রাণ সদাই ঝরে রে।

চন্দ্রসুখ বাজে ছলিয়া বে,

আরে ওই রকম, ওই নারীর প্রাণ সদাই ঝরে রে।

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমকাহিনী তাহারদের কণ্ঠে মধুরতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন, রতনুহ হইতে সঙ্গুহীত তাহারদের গানে আছে—'তোমার ও আমার মাঝখানে বিচ্ছেদের নদী বয়ে বাজে, এ নদী পার হওয়ার শক্তি আমার নেই, এমন কি কোন সখাও নেই, 'বে আমাকে পার ক'রে দেবে?'

যোক যদি করিতো যে পার  
দান করিতাম পলার হার,  
পার হইয়া (বন্ধু রে) যৈবন করতাম দান রে।  
উপারং বন্ধুর বাড়ী, ই-পারং হুই নারী  
মধ্যে বয় চিরল নলীর গাথা।  
অকূল দরিদ্রা আমি ক্যামনে হই পার রে।  
আমি বালুং আকিহু, আমি বালুং বাড়িহু :  
জলং ভাসাই দিলাম হাঁড়ি রে।

রঙপুরের অনেক ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বেশ কবিত্বমণ্ডিত  
সুভাবিতাকীও আছে; প্রেমিক নাগর অবিশ্রাম বর্ণণে আঙ্গিনায়  
ভিজিতেছে, কক্ষের মধ্যে নায়িকাও তাহার সঙ্গে সমানে অশ্রুবর্ণণ  
করিয়া চলিতেছে—

বারি পড়ে রিমিকিমি বাইরে ভিজে তুষ।  
ছনছাত (ঘরের ছাঁট্টে) ভিজে পরার (পরের)  
বেটা এটা বড় তুষ।  
ছনছাত কেনে ভিজ রে বন্ধু, ছনছাত কেনে ভিজ।  
কান্দিহু (ঝড়কি) আছে মানের ডেরা (পাতা)  
কাটিয়া মাথায় ধর।।

পূর্ববঙ্গের অজ্ঞাত পল্লীসঙ্গীতের স্তায় ভাওয়াইয়া গানেরও আকলিক  
বিশিষ্ট উচ্চারণ এগুলিকে একটি বিশিষ্ট মাধুর্য দান করে। ভাওয়াইয়া  
গানের এই বিশিষ্ট ভাবার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেন বলিয়াছেন—  
“বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রাচীন লোকসাহিত্যের  
প্রাসাদ গাঁথিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত লোকসাহিত্যের ভাষা  
বাঙলার বট, বকুল ও বেতসকুলের শ্রামল প্রাক্তরালবর্তী বিহগের  
কাকলীর মতই সহজাত, স্বাভাবিক ও সুলভ।”

গানগুলি পুরুষদের কণ্ঠে গীত হইলেও ভাওয়াইয়া গানের  
অধিকাংশের মধ্যেই নারীজীবনের নৈরাশ্র ও প্রেমমতি নারীদের  
জ্বালীতেই ধনিত হইয়াছে—

বন্ধু বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।  
যে জন বঁধুয়া হবে, ঘাম মুছিয়া কোলে লবে;  
বন্ধু বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।।

বাঙলার পুরুষদের বেদনার তুলনায় নারীদের বেদনাই সাহিত্যের  
উপজীব্য হিসাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পল্লীসঙ্গীতের  
আলোচক শ্রীঅন্তোব ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—“ভাওয়াইয়া গানের  
মধ্যেই নারীমনের নিরাশার (frustration) স্রব ধনিত হইয়াছে,  
আকালিক্ত বস্ত্র না পাওয়ার মধ্য দিয়াই নরনারীর মনের সুস্বতম  
ভাবগুলি বিকাশ লাভ করে; পাওয়ার মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহা  
ধারা হৃদয়ের সুস্বতম ভাবগুলি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—সেইজন্য প্রাণে  
বেথানে রিক্ততার বেদনা জাগে, সেখানেই মধুরতম সঙ্গীত জন্মলাভ  
করে। ভাওয়াইয়া গানও এই রিক্ততার বেদনার মধুর হইয়া উঠে।”

ভাওয়াইয়া গানের মূল উপজীব্য এই কাল্পনিক। এই স্রবের  
মধ্যে উন্নাদনার সঙ্গে আকুলতাও মিশ্রিত আছে, যেমন—

ওরে জীবন, ছাড়িয়ে না বাস ঘোরে।  
ওরে জীবন, ছাড়িয়া গেলে আমার করবে কে মনরারে।  
তাই বল, ভাতিআ বল রে সম্পত্তির ভাগী,  
আগে করবে রে ধনের আশা পিছে করবে গতি।।

ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বৈরাগ্যের স্রবটি প্রেকট। সঙ্গারের  
শ্রুত বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়াসী গায়কের কণ্ঠে ধনিয়া উঠে—  
আমার হাড় কালা হইল রে অস্তুর কালার লাগি;  
অস্তুরকাল হইল রে মোর অস্তুর পরবাসে।  
(ও মন রে) হাড় হইল জড়জড় মোর অস্তুর হইল ভড়া রে।  
শিরিতি ভাওয়াইয়া হাইলে আর না লাগে জোড়া রে।  
ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে দেহাশ্রুততা ছাড়া তাত্ত্বিক ভাবেরও  
কিছু প্রভাব প্রতিক্রিয়া হইয়াছে; রামপ্রসাদের কথায় স্রবণ  
করাইয়া দেয়, বখন শোনা যায়—

আপন কর্দসারে সব হারালি দেয় দিলি তুই কারে।  
মন রে ইঙ্গল পিঙ্গলার ঘর,  
ঘুমে করেছে জড়জড়

বস্ত্রে পড়ল তোর বরিশ বান্ধনের জোড়া।  
মন রে পুমান পচিমে বাও  
রাখাকুরের ভাড়া নাও  
ঠমকে ঠমকে গুঠে পানি।

এই শ্রেণীর গানের গীতবীতীর মধ্যে ভাটিয়ালী ও পাহাড়ী  
উপজাতীয়দের বীতি সম্মিলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ  
করিয়াছে।

ভাওয়াইয়া গানের গীতি-বীতি সম্পর্কে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
বলিয়াছেন—“স্রবের দিক থেকে লোকসঙ্গীত রাগবাগিনীর বীথন

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই স্বাভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বস্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-তালিকার  
লভ্য লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এল্‌গ্যান্ড ইন্সট, কলিকাতা-১

সঙ্গীতের বিশেষণ। ভাওয়াইয়ায় দুই টানা দুই, তবে পাঁচবার পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙে নিয়ে একটানা শব্দের মাঝে যেন একটু একটু থমকা দেওয়া হয়।”

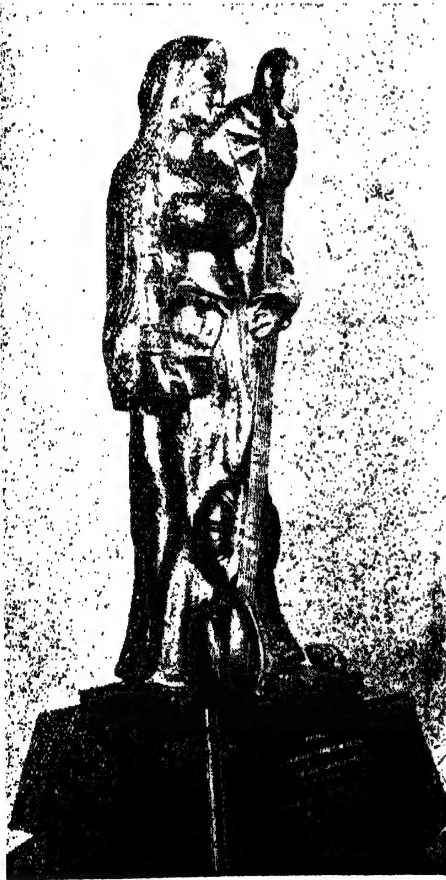
—শ্রীজয়দেব দায়।

## রেকর্ড-পরিচয়

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82728—কুমারী আক্কা বন্দোপাধ্যায়ের গাওয়া “ও গুপের নাইয়ারে” ও “আমার হাম শুকপাখি”—হু’খানি জনবত্ত পল্লীগীতি।

N 82732—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় “কোথা তুমি বনজার” (রাগ-নন্দকোব) ও “ওগো হাম মিনতি তোমায়” (কাঙ্কি-মুন্সী)—রাগপ্রধান এ গান হু’খানি বিতম্বতায় নিখুঁত।



কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে উপস্থিত স্রোতের সরস্বতী মূর্তি। কুমার রবীন দায় এই মূর্তি নির্মাণ করে এই উপলক্ষে নির্মাণ করেন।

N 82733—শ্রীমতী উৎপলা সেন “সপ্তরত্নের খেলা আকাশ-পারে” ও “বাঁড়াবাঁটির পাখাড়ে চাঁদ উঠেছে” আবেগময় আধুনিক গান।

N 82734—শ্রীমতী সচিত্রা মিত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অতীতমাত্রা জ্যেষ্ঠ শিল্পীর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের হু’খানি আধুনিক গান “একা মোর গানের ভবী” ও “কে কুমি বসি”—শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি।

## কলম্বিয়া

GE 24829—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় “মেঘ কালো আঁধার কালো” ও “বিন কেটে দিন” আধুনিক ও পল্লীগীতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গান।

GE 24830—কুমারী ছবি বন্দোপাধ্যায় “নন্দন বন হতে” এক “বাজে বন বন”—শিল্পীর দরদী কণ্ঠের ধর্মমূলক ও ভক্তন গান।

GE 24831—দীপক মৈত্র “এতো নয় শুধু গান” ও “কত কথা হলো বলা” পরলোকগত শিল্পী দীপক মৈত্রের এইটাই প্রথম ও শেষ রেকর্ড—সংগ্রহে রাখবার উপযুক্ত গান।

“শেষ পরিচয়” বাণীচন্দ্রের চারখানি গান রেকর্ড করেছেন—ভারতের প্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকর GE 30349 এবং GE 30350 রেকর্ডে।

GE 30351 রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় “শেষ পরিচয়” বাণীচন্দ্রের “আমার আকাশ মেঘলা” ও “পথ হারানো তেপান্তরে”—গান হু’খানি পরিবেশন করেছেন।

GE 24820-22, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দ অভিনীত ও গীত রেকর্ড নাটিকা “অন্নপূর্ণার আসন”—অধিনায়ক পঙ্কজ মল্লিক। এ ছাড়াও লোকরঞ্জন শাখার ‘বৃগবন্দনা’ দ্বারা GE 24823, GE 24824, GE 24828 এবং পল্লীগীতিতে GE 24825, GE 24826, GE 24827 রেকর্ডে যে নতুন ধারা প্রচারিত হয়েছে, তা সুন্দর। সব শুনিয়েই স্তব দিয়েছেন বাংলার প্রিয় শিল্পী ও স্রবকার—পঙ্কজকুমার।

GE 24819—দীর্ঘ দিন পরে কুমার প্রত্যাশারায়ণের কণ্ঠে হু’খানি সুন্দর পল্লীগীতি—“মনে লয় মোর” এবং “স্রবনীর ভায়ে”।

“নবরঙ্গ” বাণীচন্দ্রের হু’খানি জনপ্রিয় গান “আমি আঙুল কাটিয়া” ও “ওরে মন মাঝি”—গেয়েছেন যথাক্রমে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় GE 30348 রেকর্ডে।

## আমার কথা (২৬)

শান্তিদেব ঘোষ

পূর্ববঙ্গের ত্রিশুরা জেলার এক গ্রামে ১৯১০ সালে জয়প্রহর করে শান্তিদেব হাস ছয়েক পরেই শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। পিতা কালীমোহন ঘোষ তখন রবীন্দ্রনাথের আস্থানে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গঠনের কাজে নিযুক্ত। অতি শৈশবেই শান্তিদেবের স্বাভাবিক সঙ্গীত-কমতা রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের মনোবাণী আকর্ষণ করে। ছোটবেলা থেকেই বালকদের সঙ্গীত-পুতোয়ালে শান্তিদেব কেন্দ্রস্থলে আসীন। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষকতার শান্তিদেবের সঙ্গীত-পারদর্শিতা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাত্র ত্রিভূ বয়সেই তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত হলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কাণ্ডারী পদ লাভ করেন। শৈশব থেকেই শান্তিদেবের



নৃত্য ও অভিনয়েও বাতাবিক কথ্যতা ছিল। শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের প্রথম যুগে বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে ও মেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তিদেব বাড়িল, রায়বংশে প্রভৃতি লোকনৃত্য আয়ত্ত করেন।

সে যুগের বঙ্গদেশাসুখের দিন দিনেই নৃত্য-আন্দোলনের সবারাইকে নিয়ে আন্দোলনে সাক্ষর থেকে দুপুর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান গেয়ে চলতেন, তার সঙ্গে শান্তিদেবের গান ও অবিশ্রাম নৃত্য-উৎসব মাতিয়ে তুলত। কখনও কখনও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও সে আনন্দ-আসরে টেনে আনত। সেই সময়েই শান্তিদেবের নৃত্যক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ তখন নৃত্যের মাধ্যমে নিজের শিল্প-প্রতিভার আবেক মনঃ বিকাশের সম্ভাবনা দেখেছেন—তার নাটকে, আন্দোলনের উৎসবে, নৃত্যের প্রাধান্য ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। তাঁর নৃত্য-নাট্যের বিকাশ ও প্রবোজনায় একই সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যাভিনয়ে সমান পারদর্শী একজন সহকারী প্রয়োজন তিনি অনুভব করছিলেন। শান্তিদেবের মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে দেখে তাঁকে তিনি দক্ষিণাত্যে, মণিপুরে পাঠান কথাকলি, মণিপুরী প্রভৃতি নাচ শিখে আসতে। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় কথাকলির প্রভাব শান্তিদেবের হাতেই।

১৯৩১ সালে কেরলা কলামগুলম থেকে তিনি কথাকলি শিখে আসেন। “রবীন্দ্র-জীবনী”তে শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩১-র গীতোৎসব অভিনয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “এবারকার এই নৃত্যাভিনয়ে কথাকলি নাচের প্রবর্তন করেন শান্তিদেব।” (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০০) তারপর ক্রমশঃ নবীন, শাপমোচন, ভাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, জামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি রচিত হয়ে চলল, তাতে শান্তিদেব কবির পরিচালনায় তাঁর শিক্ষা ও সঙ্গীতকে স্বয়ং অভিনয় করে, অঙ্কনের শিথিয়ে রূপ দিয়ে চললেন। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনো নৃত্য-নাট্য রচনার বা পুনরভিনয়ের প্রেরণা পেয়েছেন তখনই তার রূপ-বৈচিত্র্য ঘটাবার জন্য শান্তিদেবকে ভারত বা ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশে পাঠিয়েছেন নতুন নৃত্যপদ্ধতি সংগ্রহ করে আনতে। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ “শাপমোচন” নিয়ে সিংহলে বান। শান্তিদেব ছিলেন তার প্রধান শিল্পী। সিংহলের ক্যান্ডিনুতা দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার চর্চায় শান্তিদেবকে ১৯৩৬ সালে আবার সিংহলে পাঠান। ভারতীয় নৃত্যের আসরে আজ এই ঐশ্বর্যপূর্ণ নৃত্যধারা স্থায়ী আসন করে নিতে চলেছে। এই মিলনের পথিকৃত শান্তিদেব আর তা রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে। ১৯৩৬ সালে চিত্রাঙ্গদা ও পরিশোধ (জামা) রচিত ও কলিকাতায় অভিনীত হয়। শান্তিদেবের ভার ছিল রচয়িতার নির্দেশায়ুযায়ী সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার।

১৯৩৭ সালে শান্তিদেব বর্মা দেশে বান রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্য দেখাতে এবং সে-দেশের বিখ্যাত রামাশোয়ে নৃত্যের পরিচয় বহন করে আনতে। ১৯৩৮ সালে শান্তিদেব বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত-ভবনের পরিচালক নিযুক্ত হন। সেই বছরেই কেরলা গিয়ে কথাকলির চর্চা করেন, পরে সিংহলে বান ক্যান্ডিনুতা চর্চায় ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং ভারতীয় নৃত্যের প্রচারে। সিংহল থেকে ফিরে এলে মুগ্ধ হয়, রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার মত। এর পর ১৯৩৯ সালে শান্তিদেব আবার বর্মা হয়ে জামা ও বলিবিপে বান পূর্ব-এশিয়ার নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্যকলার প্রচারে। জামা ও বলিবিপের দুজনে

অলঙ্করণ-রূপ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ঐশ্বর্য ও মাদুর বাড়াতে সক্ষম, একথা শান্তিদেব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্বচেষ্টায় পূর্ব বীপবর্তী নৃত্যের সূক্ষ্ম ভঙ্গী সংগ্রহ করে এনে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের রূপ, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের আরও সমৃদ্ধি ঘটানেন। ভারতীয় নৃত্যকলার পূর্ণসাগরের এই অর্থায়ন শান্তিদেবের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার বিকাশে শান্তিদেব ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। ১৯৩৫ সালে দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ভ্রমণের পর থেকেই যুগপৎ সঙ্গীত ও অভিনয় ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে শান্তিদেবের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় সহায় হয়। শান্তিদেবের প্রতি কবির স্নেহসূচক “সুরসেন,” “নটরাজ” প্রভৃতি সম্বোধনে তার স্বীকৃতি রয়ে গেছে।

শান্তিদেব শুধু সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের বড় শিল্পী ও শিক্ষকই নন, এ বিষয়ে তাঁর গবেষণাও স্বাধীসমাজে প্রভাবান্বিত করেছে। সঙ্গীত ও নৃত্যাভিনয়ে শিক্ষকতা, প্রবোজননা এবং চর্চায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩০ সাল থেকে শান্তিদেব রবীন্দ্র তথা ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তাঁর “রবীন্দ্রসঙ্গীত” বইটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার একমাত্র প্রামাণিক সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পড়ে কবি বলেছিলেন,

“তাঁর এই লেখাটি পড়ে মনে পড়ে গেল আমার অনেক দিনের কথা—আমার গান তখন অবজ্ঞার এমন কি বিজ্ঞপের বিষয় ছিল কিন্তু আমার জীবন ছিল রসে পূর্ণ, সেই কথা মনে করিয়ে দিল তাঁর এই লেখা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়া শেষ করলুম।”

—রবীন্দ্রনাথ। ২১:১৪১



শান্তিদেব বোম

তার বিতীয় বই “জাভা ও বলির নৃত্যগীত” আবারের দেশে ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংস্কৃতি বিষয়ে অত্যন্তর প্রেরণা। সম্প্রতি “রূপকার নন্দলাল” এবং “ভারতীয় গ্রামীন সংস্কৃতি” নামে তাঁর আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়ে কন্নী ও চিত্তাঙ্গীলসের অভিনন্দন অর্জন করেছে। বর্তমানে তিনি নৃত্যনাট্য সবক্ষেত্র একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনায়ে রত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সবক্ষেত্র তাঁর আরো একটি বই অঙ্গুর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

স্বরকার হিসেবে কাজ করার সময় তিনি বেশী পান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এলিকেও তাঁর ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের “হে মোর দুর্ভাগা দেশ” কবিতাটিতে সুর যোজনা করে। গানটি বাংলার খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী ঐশ্বর্যক্ল মল্লিকের কাছে গীত হয়েছে H. M. V. রেকর্ডে। শান্তিদেব শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের গানে সুর যোজনা করেন এবং সেই গান সমেত শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা নাটকটির অভিনয়ও করেছেন। এক সময়ে কবি নিশিকান্তের অল্পবোধে তাঁর অনেকগুলি হাসির গানের সুরও তিনি দিয়েছিলেন। স্বরকার হিসেবে শান্তিদেবের সব চেয়ে বড় কাজ হলো ঐকিত্য রায় লিখিত শিশুনাট্য “হুড়ুনীকাবা” নাটকটিতে সম্পূর্ণভাবে সুর যোজনার দ্বারা গীতনাট্যে রূপান্তরিত করে অভিনয় করানো। এই গীতনাটকটি গত মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতার খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা বর্তমান Elite নামে খ্যাত রঙ্গমঞ্চ নৃত্যনাট্য-রূপে বহু দিন অভিনীত হয়। মাস কয়েক হলো কলিকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে তা পুনঃপ্রচারিত হয়েছে শিশুশিল্পীদের দ্বারা।

তাঁর শিল্প ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতীর বাইরেও শান্তিদেবের নাম কাজে ডাক পড়েছে। ১৯৪৭ সালে বোম্বাইয়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে সঙ্গীত শাখার সভাপতিরূপে তিনি আমন্ত্রিত হন। পরের বছর জরপূরের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের ভারতীয় লোকনৃত্য, গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে কলকাতা সহরে যে কলকো প্রদর্শন প্রদর্শনী হয় শান্তিদেব তার প্রাচ্যসঙ্গীত ও শিল্পশাখার সদস্য পদে অংশগ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্র বিবরণপত্রকে প্রতি বার নয়াদিল্লীতে

যে জাতীয় লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা হয় ১৯৫৪-৫৫ এবং ৫৭ সালে শান্তিদেব তার বিচারক হন। এ ছাড়াও অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা শাখার পরিচালনা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পাঠ্যসমিতি, দিল্লীর সঙ্গীতনাটক আকাদেমির পুস্তক প্রকাশ সমিতির সদস্য পদে তাঁর সাহায্য কামনা করা হয়।

১৯৫৬ সালে ভারতীয় সঙ্গীতনাটক আকাদেমি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সঙ্গীতালোচনা সভাতেও তিনি বোণ দেন ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বছরেই ভারত-সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় তাঁকে ভারতের সর্বাধিকারক বিজ্ঞানসম্মানিত নৃত্যবিষয়ক উপসমিতির আহ্বায়ক নিযুক্ত করেন। গত ১৫ বৎসর ধাবং বিশ্বভারতীয় কতৃপক্ষের নির্দেশে অল্পসারে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী দল নিয়ে কলিকাতা ও বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে যে সাংস্কৃতিক দল পূর্ণপাঠিকস্থানে যায় শান্তিদেব তার নেতৃত্ব করেন এবং তাঁর পরিচালনায় বিশ্বভারতীর ঢাকায় শ্রাম্যর অভিনয় করেন।

বর্তমানে শান্তিদেব বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্যবিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নৃত্য রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের সাধনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত এবং একই সঙ্গে এ সবার শিক্ষকরূপেও কাজ করে যাত্বেন অবিশ্রান্ত ভাবে। এই কাজে তাঁর প্রেরণার উৎস হল মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের এই কামনা-প্রাপ্তন—

“কেবল দুটি উপদেশ আমার আছে। এই আশ্রমেই তুই মাম্বব। সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে কোন গুরুতর লোভেও নিজে কে যদি অন্তর্ভুক্ত করিস, তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে।

বিতীয়, আমার গানের সুর তোমার কাছে আছে—বিশুদ্ধ ভাবে সে গানের প্রচার করা তোমার কর্তব্য হবে। আমি তোমার পিতার শিষ্যত্ব, আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।” ইতি ২১/১/৪১

ততাবধি  
রবীন্দ্রনাথ

## ফাল্গুনী

সন্তোষ চন্দ্রবর্তী

এবারেও ফাল্গুন এলো।

ভোমার কুন্তলে কতো রজনীগন্ধা

সুবাসের ডেউ এলোমেলো ;

বাসনা রোপণ করে সেই তারা—সেই বাসনার।

এবারেও ফাল্গুন বাবে।

ভোমার সন্ধ্যার কতো নিশি-অপেক্ষার

সুতিগুলি বেলা জাগাবে।

জীবনকাণ্ডের মতো হুঁটি কথা—সেই হুঁজনার।

# সাহিত্য পরিচয়

## বাংলা বইয়ের বাজার

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু মতই পুস্তকও কারও কাছে প্রয়োজন, কারও কাছে আরাধ্য ও কারও কাছে বিলাস। আবার কারও কাছে বা সব কয়েকটাই। প্রয়োজন বলা চলে তার, যে বই থেকে জ্ঞানার্জন করতে চায়। আরাধ্য, বার পক্ষে বই পড়া শুধু সময় কাটাবার জন্ত। আর বিলাস, যিনি বাড়ীতে আসবাব রাখবার মত বইও রাখেন কখনো শুধু নিজের অহমিকাকে তুষ্ট করতে, কখনো গৃহসজ্জারূপে। এই তিন দল ছাড়া আর একটি দল আছেন ধারা পুস্তক-রসিক, কলা-রসিকের মত এঁরা বইয়ের সম্বন্ধে।

বর্তমান যুগের এই সহজ যুক্তির দিনে বই মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এত জড়িত যে, খোঁজ করলে এমন নিতান্ত অশিক্ষিতেরও ঘর পাওয়া যাবে না যেখানে একখানা কোন না কোন বই নেই।

বাঙ্গালীর প্রধানতম কৃষ্টি ও কৃতিত্ব তার সাহিত্য। ভারতের অজ্ঞাত স্থানের ঐতিহ্যে তার শিল্প আছে, সঙ্গীত আছে। নৃত্য আছে কিন্তু সাহিত্য বলতে প্রাচীন কিছু থাকলেও বর্তমান বলতে এখন বিশেষ কিছু নেই। তবুও বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত উন্নত, তবু তার যে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে সে সবক্ষেত্রেই অবকাশ মাত্র নেই। সাহিত্যের দুটি দিক আছে, একটি তার সৃষ্টি আর একটি ব্যবহার অর্থাৎ একটি কারখানা আর একটি বাজার।

বইয়ের বাজারের বয়ের মত বইয়ের বাজারেও একটি মূল্যায়ন আছে। সেই জন্ত বইয়ের ছাপা বাঁধাই ও অভ্যন্ত গুণাগুণ দেখতে হয়, শুধু সাহিত্যিক প্রতিভার উপরেই বই চলে না, যদিও সেটাই তার প্রধান গুণ। বাংলা বইয়ের সৈনিক থেকে বর্তমানে অত্যন্ত উন্নতি হয়েছে। বাংলা বইয়ের রূপসজ্জা, চিত্রায়ন, মুদ্রণ দেখবার মত। কিন্তু মনে হয় একটি বৃহৎ ক্রটি বাংলা বইতে বহুদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং এখনও মাথা চাড়িয়ে রয়েছে, তা বাংলা বইয়ের বোর্ডিংবাই। এই বোর্ডিংবাই করা মলাট বই পড়া আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়তে আরম্ভ করে এবং ছ'মাস এক বছরের মধ্যেই মলাটখানি সম্পূর্ণ খুলে যায়। প্রথম ছ'চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তার পেছনের মেক্সগুটি খুলে আসে। অমন সুন্দর একখানি প্রচ্ছদপট যখন অমনি ভাবে নষ্ট হয় বলে তা' যে কোন পুস্তকপ্রিয়ের পক্ষেই অত্যন্ত মর্মান্তিক!

পুস্তক জিনিষটা শুধু পড়ে কেলে দেবার জন্ত নয় ওটি ঘরে রাখবার জন্তও—কারণ বই ঘরে না জমলে জাতির বড় বাড়ীও হয় না। বইয়ের যে না, হারিয়ে হয় না। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বলাতে পারা যায়।

কারণ, সব মানুষই তা' আর বই ছিঁড়ে বাবার পর আবার বাঁধিয়ে এনে ঘরে রেখে দেবার মত তৎপর নয়? প্রায় বার আনা বাংলা বইই বর্তমানে সম্ভবতঃ এই ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। স্বীকার করি, ধারা বই বিক্রয় করেন তাঁরা ব্যবসা করতেই বসেছেন, পরোপকার করতে বসেন নি। তা' হলেও বলব যে তাঁরা যে দাম নেন (বাংলা বই বর্তমানে অত্যন্ত দুখূল্য) তাতে ওর চাইতে ভাল বাঁধাই দেওয়া চলেতে পারে। তাঁরা যদি মনে করেন তাতে তাঁদের লাভ থাকে না, তা হলে মূল্য তাঁরা বৃদ্ধিও করতে পারেন। যদি ছ'রকম বাঁধাইই দেওয়া যায় দেশের মানুষ ভাল এবং হারী বাঁধাইটিরই মূল্যায়িকা সম্বোধ, পৃষ্ঠপোষকতা করবেন বলেই মনে হয়। এ কথাও পুস্তক ব্যবসারীদের মনে রাখা কর্তব্য যে, তাঁরা প্রথমে বাঙ্গালী পরে ব্যবসাদার। বাংলার কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা ও এগিয়ে দেওয়া সমস্ত বাঙ্গালীর মত তাঁদেরও কর্তব্য।

আর বই বিক্রয় বার বাঁধানো যদি বা হয়ই তা' হলেও কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। প্রথম, দ্বিতীয় বার অর্থব্যয়, দ্বিতীয়, সময়ক্ষেপণ ও স্বচ্ছতা, তৃতীয়, বই বাঁধাতে গেলেই বাঁধাইওয়াল বইটিকে কেটে একটু ছোট করে দেয়। যে কোন পুস্তকপ্রিয় ব্যক্তিই স্বীকার করবেন, তাতে পুস্তকের বইটি পরিমাণে কুপহানি হয়। বস্তুর চেহারা সবক্ষেত্রে ধারা একই খুঁতখুঁতে তাঁদের পক্ষে তা অত্যন্ত মন খুঁতখুঁতে কারণ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত সমস্ত ব্যবসার মতই বইও যখন একটা ব্যবসা, তখন তার বাজারও একই পতিরে দেখা যাক। বই কেনে কে? বার অক্ষর পরিচয় হয়েছে, আর যে ভাবার বই সেই দেশের লোক। বাংলা দেশ বর্তমানে বড়ই ছোট হয়ে গেছে, যাতে করে তার বইয়ের বাজার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবাংলাকে বাদ দিয়ে বাংলা বই পড়ে কিছু পূর্বপাকিস্তান, কিছু আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার লোক। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলার গঙ্গা-পাণা হওয়ারতে ওধানকার অনেকেরই বাংলা বলতে লিখতে পড়তে জানেন এবং বাঙ্গালীও ওখানে অনেক আছেন, যাতে বইয়ের অনিচ্ছের বই পড়তেই হয়।

এরও একটি প্রকাণ্ড বাজার আছে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়া বাঙ্গালী, এবং বাংলা-জানা অবাঙ্গালী। বাংলা-জানা অবাঙ্গালী যে সারা ভারতবর্ষে কত আছে তা হঠাৎ কল্পনা করা যায় না। বাংলা বলতে পারেন এরকম লোক ত' অল্প আছেনই, বাংলা পড়তে ও লিখতে জানেন এরকম অবাঙ্গালীর সংখ্যাও কম নয়। এই বিরাট জনসমূহকে বোধ কবি বাংলার কোন পুস্তক ব্যবসারাই কোন দিন বাঁধিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন নি। তারা বই কিনতে চায় কিন্তু জানেন

না কোথায় পাওয়া যায়। আর তা জানলেও মানুষকে কোন জিনিষ কেনাতে হলে মাঝে মাঝে সেটা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়। যদিও বাংলা দেশে সমস্ত কাগজেই আজকাল বইয়ের বিজ্ঞাপন বিশেষ ভাবেই থাকে, বাংলার বাইরেও বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে বাবার ব্যবহার। এক সে বিজ্ঞাপন হতে হবে কলার। একটি ইংরেজী বা হিন্দী বা মারাঠী বা তামিল বা তেলেগু কাগজে একখানা বাংলা বিজ্ঞাপন থাকলে যিনি বাংলা জানেন তিনি তা পড়বেনই। একটা জিনিষ বিচার করবার আছে যে তাদের ছাপাখানার বাংলা হয়ক নেই, তাই সে বিজ্ঞাপন অবশিষ্ট না পাঠিয়ে পাঠাতে হবে আগাগোড়া ব্লক করে। সেই বিজ্ঞাপনের বিবরীকৃত বস্তুও আগে থেকেই প্রকাশকের সঙ্গে বলে-করে বলাবাক্য করতে হবে। কারণ যেভাবে বিশ্বের সম্পাদক বাবে না তার বিশ্ববন্ধ থাকে না বৃষ্টিয়ে দিলে সে তা ছাপাবে না। বিদেশবাসী বাঙ্গালীও স্থানীয় ইংরেজী পত্রপত্রিকা পড়ে থাকেন। এ ব্যবস্থা করলে তাঁরাও বর্তমান অবস্থা থেকে

বাংলা বইয়ের বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। তাঁরা অনেক সময় জানেনই না বাংলা সাহিত্যের প্রগতি কোন পথে চলেছে বা বাংলার নতুন কি বই বেরায়ে।

আরও একটি অল্প পুস্তক ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে পারেন, তা' প্রতিনিধির ব্যবহার। বাঙ্গারের যদি অল্পদাগ প্রতীষ্টান, ডাক্তারী প্রতীষ্টান, মোটর গাড়ী প্রতীষ্টান, বীমা প্রতীষ্টানের প্রতিনিধির দল ঘুরতে পারেন, তা হলে পুস্তকের কারাবারী প্রতিনিধিই বা ঘুরতে পারবেন না কেন? মোটর উপর বাংলা বইয়ের বাজার আরও ব্যাপক হওয়া চাই, বাংলা ভাষার আরও প্রসার হওয়া চাই, তা হলেই বাংলার বুদ্ধি, বাংলা সাহিত্য ও তথা বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল এবং সে চেষ্টা করতে হবে বাঙ্গালীকেই। বইয়ের ব্যবসার মত এমন 'রথ দেখা ও কলা বেচা' অর্থাৎ অর্থাগম ও সমাজসেবা একই সঙ্গে করতে পারবার মত কারবার খুব কমই আছে।

—ঐক্যবিরাকশঙ্কর সেন।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### কর্মবীর রাসবিহারী

ভারতের শৃংখল মোচনকারে জীবনের উবাগরে যে সকল হুজিগামী সন্তানেরা নিজেরে সর্ব্ব উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার সেবার, পরলোকগত রাসবিহারী বর সেই তীর্থযাত্রীদেরই অন্ততম। রাসবিহারী নিজেই ছিলেন জীবন্ত বিপ্লব। তাঁর জীবনের নানান অগ্নিময় ঘটনা, সারগর্ভা কাহিনী ভবিষ্যৎ ভারতের প্রত্যেক নরনারীর প্রজ্ঞা আকর্ষণ করবে। বিপ্লবীর জাতা শ্রীবিজয়বিহারী বর তাঁর অগ্রদূতের একটি জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। রাসবিহারীর জীবনী বহু প্রচলিত হয় ততই মঙ্গল। তাঁর সম্বন্ধে সুবিদিত আলোচনা, তাঁর স্বপ্ন ঘান সাধনা সম্বন্ধে পণ্ডীর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। রাসবিহারীর জীবনের অনেক তথ্যই প্রায় অজানা ছিল অনেকের কাছেই; তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন। গোমো-মানকুম থেকে শ্রীমতী ইলা বর কর্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ টাকা।

### জলে ডাঙর

'মাসিক বহুমুখী'র পাতায় দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রন্থ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে—আপা করি পাঠক সাধারণের তা পূর্ণাঙ্গ নেই। ডাঃ সৈয়দ হুজুতাবা আলীর সাহিত্যিক প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবে এবার তিনি এক নবন্ব শক্তির পরিচয় দিলেন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা যে অনন্তসাধারণ তারই পরিচয় তিনি দিলেন এই গ্রন্থবৃত্তান্তটি পরিবেশন করে। বিভিন্ন দেশে গ্রন্থন করে সে সব দেশের মানুষ, নবাল, জীবনযাত্রার জির জির প্রাণী সম্বন্ধে তাঁর যে বিরাট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে, শিশুদের উপযোগী করে সেই অভিজ্ঞতার

কিছু অংশ তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। নানা দেশের মাছদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিশুসমাজকে পণ্ডীর ভাবে আকৃষ্ট করবে। ডাঃ আলীর গল্প বলার ভঙ্গিমা এদের চিত্ত জর করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে। বেলল পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম পাঁচ তিন টাকা।

### ধূলি-ধূসর

বাঙলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতা বাঙলা কবিতার সৌরভ যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে, তা বসন্ত ব্যক্তি যাত্রাই বুঝতে পারবেন। ছোট গল্পেও তাঁর দক্ষতা কম নয়। তাঁকে ছোট গল্পের বাহুবল বলেও অভিহিত হয় না। ধূলি-ধূসর কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন অত্যন্ত সন্ধানী। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য রহস্য ছড়িয়ে আছে, তার মনে আছে কত না-বলা কথা। সেই রহস্যের উন্মোচন করা সেই না-বলা বাণীকে সর্বজন সমক্ষে রূপ দেওয়াতেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আনন্দ। ধূলিধূসর, নিশাচর, শৃংখল, ডাম্‌শের, সহযাত্রী, অসীমাসিত প্রভৃতি গল্পগুলি সম্বন্ধে বোঝা করছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলি একের মধ্যে অনেককেই তুলে ধরে, সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বিন্যাস লাভ হইল। ১০ ভাষাচরণ সে স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

### মধুচাঁদের মাল

'মধুচাঁদের মাল' নামক গ্রন্থটিতে খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক প্রমোদকুমার সান্দ্রিয় প্রসিদ্ধি গল্প সংকলিত হয়েছে।

গল্প-সাহিত্যে প্রবোধকুমার একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। জীবনের খুঁটি-নাটি অস্তব্ধ, মানব-মনের কল্পনা ও তার বিকাশ প্রবোধ-কুমারের লেখনীর বৈশিষ্ট্য। প্রভূত জীবনের চাপা করার লক্ষ আঁকুই করে প্রবোধকুমারকে। এই গ্রন্থের 'সুলিক, আলো, জুয়া, একটি সন্ধ্যার টুকরো, ভারবাহী প্রভৃতি গল্পগুলি নিঃসংশয়ে পরিচূপ্ত দেবে পাঠকচক্রে। ১০ তামাচরণ দে খ্রীট থেকে প্রকাশ করছেন মিত্র ও ঘোষ। দাম ছ' টাকা বারো আনা।

### মধুমাধবী

সুশীল রায়ের নাম পাঠক সাধারণের কাছে আজ আর অপরিচিত নেই। তার উপজ্ঞান মধুমাধবী তার কৃতিত্ব অক্ষুর রেখেছে। সামাজিক গল্প। কোন দলীয় প্রচার নয় পৌরবহানি করেনি। মাধবী ও মধুমালা দুই বোনের নাম এক করে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে মধুমাধবী। এদের পিতা পিনাকিভূষণ এই গ্রন্থের সম্পদবিশেষ, চরিত্রগুলির সূচিক্রমে, সূচিস্থিত সংলাপ প্রয়োগে সুশীল রায় এই গ্রন্থটিকে বখাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। যে পটভূমিকার তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সেটিও আকর্ষণযোগ্য। হেরব, কিতাল, আলোক তিনটি যুবক বস্ত্র চিন্তাধারা ও ভাবভঙ্গিমার অধিকারী। কারো প্রভাব কারো উপরই পড়ে না। এখানেও সুশীল বাবু শক্তির পরিচর পাওয়া যায়। ১১৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সত্যজ্ঞত লাইব্রেরী প্রকাশ করছেন। দাম তিন টাকা।

### বাংলা দেশের গ্রন্থাগার

সে যুগের পণ্ডিতরা গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে কিছুই ছিল না। আমাদের দেশের রাজা-বানশাহদের অনেকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল—যেখানে সাধারণের কোন প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না। আধুনিক যুগে কলকাতায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর এ দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'লটারী'তে সঙ্গৃহীত অর্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব হয়, যদিও কার্যকরী হয় না। ইং ১৮৩৫ সালে স্থাপিত 'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী'কেই প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায়। বর্তমানে কলকাতা তথা বাড়লা দেশের প্রায় পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ পাঠাগার দেখতে পাওয়া যায়—'লাইব্রেরী এ্যান্ড' প্রচলিত হওয়ার ফলে। এই সমস্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থ। লেখক কুমার ভট্টাচার্য বিপুল পরিমাণে এই পাঠাগার সমূহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইয়ে কলকাতা এবং হাওড়ার প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত পাঠাগারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রচনাগুলি একদা দৈনিক বসুজ্যোতিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বাড়লা দেশের প্রত্যেক পাঠাগারে এক সাহিত্যরসিক ব্যক্তির মিকট এই বইয়ের বখাযোগ্য সমাদর হবে, নিশ্চয়ই বলা যায়। দেবদত্ত এণ্ড কোং। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য আট টাকা।

## আলোকে-নিরালোকে

সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত

আলোকে-নিরালোকে আশার-সন্ধ্যাসে  
সে থাকে শিরবের কাছেই চিরদিন।  
ব্যথিত প্রণয়ের ব্যাকুল মধুমায়ে  
নীলিমা যেই দেশে নিয়ন্ত উদাসীন।

সখী সে নিরালোকে গুল্লা নিশীথিনী  
শান্ত চোখ তার খচিত জ্যোৎস্নায়।  
বাতাস অম্লরাগে বাজালে শিখিনী  
সে থাকে অবিলম্ব অলোক হুয়ার।

কি বলে ডাকি তারে; কি নাম কে তা জানে;  
বপ্রে দেখি তাকে, জানি সে চেতনার  
লুটির পড়ে থাকে, স্নায়ু কোনোখানে  
শান্তি এতটুকু মেলে না বুঝি তাই।

আলোকে-নিরালোকে সারা জীবনভর  
কে নারী মায়াবিনী কেবলি নিষ্কণম।  
হ'চোখ মেলে থাকে! হার কি নাম তার;  
—কবি ভা-অনুবাধা। প্রেরণা। যেরো মন।



# বাজায় বাজায়

উদয়ভানু

উপহারের আকাশ বেন করালমুষ্টি ধারণ করে।

একদিকে অন্ধগামী হুঁয়ার তুজলাল আলোর বিস্তার, অন্ধ নিকট ভ্রমগভীর মেঘের ভটলা। কে বে কাকে গ্রাস করবে বোকা যায় না। আমোদগের জলে বহুকালী আকাশের প্রতিচ্ছায়া কাঁপছে। হুঁরের ঘন বনভল আঁধারে অদৃষ্ট হয়েছে, কালো প্রাচীরের আকৃতি ধরেছে। কৈশাঘের অগ্নিবাহী বাতাস আর চলে না। উদ্ভাস হওবার ঘন হিমের স্পর্শ। ঘনকালো মেঘপুঙ্খকে উপহাস করে আকাশ। মেঘের ঝিলক থেকে ত্রুটি দেখা দেয় ঘন ঘন। বিদ্যুৎ চমকে চমকে ওঠে। আলোর লহরী খেলো ছুরন্ত গতিতে। বজ্রপাতের আশঙ্কার দ্রুত পথ চলে পশ্চিম জন। কালবৈশাখীর বড় আসছে কি মহা উল্লাসে নাচতে নাচতে। হাটির বুক থেকে ধূলা উড়ছে সর্পিল গতিতে। হাওয়ার আগে শুকনো পাতা উড়ছে। বিজলীর হঠাৎ-আলোর আকাশের শরীরস্থান স্পষ্ট চোখে পড়ে। আলোর আঁকা-বাঁকা রেখা না আকাশের শিরা-উপশিরা কে জানে, সহসা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় আবার। বিদ্যুতের রঙ ধরা যায় না ঠিক। কখনও সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও নীলাভ হয়ে ফুটে উঠছে। বহু দূরে কোথায় ঘন মৃদঙ্গ বেজে চলে মধ্যে মধ্যে। কে বলবে বে মেঘের গুরু গুরু গর্জন এমন সুরেলা।

ঠাটা এক বলক বাতাস এসে বিদ্যাবাসিনীর কপাল স্পর্শ করে। কেমন এক পরিষ্কার সঙ্গে হুই চোখ বন্ধ করলেন রাজকুমারী। নিমেষহীন মিস্ত্রি চোখে মেঘের বৈচিত্র দেখছিলেন না গভীর চিন্তার ময় ছিলেন—তা তাঁর মনেই জানে। উদ্বুদ্ধ ছাদের এক প্রান্তে মৌন ভক্ততার ভূবে থাকেন। পূর্তের কেশভার বেন এক খণ্ড কালো মেঘ। কপালের পরে কুণ্ডিত কুন্তল উড়ছে। রাজকুমারীর দেহ বেন আতপ্ত হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বৌবনের তরঙ্গ—কে-ই বা দেখে। অনাদৃত কুসুম, হয়তো কোনদিন ক'রে বাবে প্রতিফল হওবার। আবার আকাশের চোখ তুলসেন বিদ্যাবাসিনী। বসিনীর চোখে আকাশের অজ্ঞান বেন হুজির আবার। বাঁচার পাখী বেঘন বিদ্রুদনয়নে পূজের দিকে তাকায়, ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটেছে রাজকুমারীর চোখে। দিনের পর দিন অস্তের অধীনে থাকতে হবে, মানতে হবে কড়া পাহারার শাসন, ফলতে হবে সঙ্গস্বপ্নের সোভ—কিন্তু বুকের মাঝে স্বাধীন মন বেন কিছুই মানতে চায় না। বাইরের দেহটা বত বকনের শাসন সহ্য করতে পারে, ভেতরের মনটার ঘন নাগাল পায় না কেউ। ঘরা-হেঁদার বাইরের সেই ঘন আঁজ কেমন উল্লাস হয়ে আছে। বিবশ হয়ে আছে দেহ। চোখের চাউনিতে মৃত দৃষ্টি ফুটেছে। অবাধ্য মন বেন আর একা থাকতে চায় না। অন্ধ কোন' মনে সমর্পণ করতে চায় নিজেকে। ঘনে ঘনে বিলতে চায়।

দেখতে দেখতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। দূরের বনবোখা মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। বিদ্যুতের আলো বেন অশ্রান্ত। ঘন ঘন চমকে উঠছে। অদৃষ্ট হওবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দেয় বজ্রগতিতে। পাছের পাখীর সন্ধ্যাসে শিউরে ওঠে।

রাজকুমারী দেখলেন, ছাদের আলমের এক নীড়হারা পাখী। কোথা থেকে উড়ে এসে ব'সলো ভয়ে ভয়ে। ঝাঁক ধরেছে হয়তো, ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছে। টোট ছুটি জোড়া নেই আর, হাঁ হয়ে আছে সজয়ে। চোখে ভয়াবহ চকলা।

কি পাখী? মনে মনে শুধোলেন রাজকুমারী। হতাশ-হাসির মৃদু আভাস উঁকি দেয় মুখে। এত দুখেও তবু একবার হাসলেন বিদ্যাবাসিনী। ঘরছাড়া বাকহারা পাখীর দুঃখে হাসলেন, তা হোক। মাদুরা পাখী হয়তো, রাজকুমারী ঠাওরালেন। এমন স্বপ্ন নীলবর্ণ, এমন বৃহৎচক্ষু। শান্ত প্রসন্ন চোখে দেখতে থাকেন বিদ্যাবাসিনী।

দেখতে দেখতে কখন আঁধার ঘন হয়েছে, নজরে পড়ে না বেন। রাজকুমারী চোখ কিরিয়ে দেখলেন দূরান্তে। কিছু আর দেখা যায় না। আমোদগের জলও নয়।

শুধু নীরব অপব তীরে আলো জ্বলছে কোথায়। আকাশের দ্রুতপদ জ্বলছে বেন। লাল আর হলুদ রঙের আগুন। স্তম্ভ আঘাতের শিহরণ খেলছে থিক-থিক কম্পনে।

সন্ধ্যারামে হোমকুণ্ড জ্বলছে। বেল-কাঠ দগ্ধ হচ্ছে রাশি রাশি। কলসী কলসী গব্য ঘি পুড়ছে।

জালুদী দেবীর পুজা চলছে আজ সন্ধ্যারামে।

বিপদের আর আগদের সময় চলেছে কত কাল। শান্তি আসছে না কিছুতেই। সন্ধ্যারামের চতুর্দিকে সর্পভীতি দেখা দিয়েছে। ক'জন ভিক্ষু আর একজন নটী সর্পাঘাতে মারা পড়েছে মাত্র কয়েক মাসে। সাপের ভয় বেঘন তেমনি গর্বাঙ্ক ব্রাহ্মণের ভয়। খেতবস্ত্র আর উপবীতধারী ভিক্ষুদের ভয়। কালীকরাতীর ভক্তরা রক্তপানের লালসার মেতে উঠেছে বেন। বলিদানের বাজনা বাজে মধ্য রাত্রে—সারা মাল্যায়ণ কাল পেতে শোনে।

রাত্রি শেষ হওবার আগে ঢাকের বাড়ি খেয়ে যায়। কাঁসর খন্টার শব্দে পূর্ণিচ্ছেদ পড়ে। তখন শোনা যায়, অতিরিক্ত কার্য পানের পয় উদ্ভত ভক্তধারীদের অটহাসির বিকট ময়। শিশুর কবোটি পানপত্র—মৃত হওবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ক'রে দেয় এলোকেলী ভদ্রবাসিনী ভৈরবীর বল। কাঁদাশ্রুতির আশ-পাশে সন্ধ্যা চালিয়েছে

রাজ্য তান্ত্রিকের দল। গলিত শবের 'পরে' আসন। কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে শিশুর সন্ধানে বেরিয়েছে। ঘুমন্ত শিশুকে সাবধানে তুলে আনতে হবে গভীর নিস্তার অচেতন মায়ের বুকে থেকে।

সজ্জারামের ভিক্রম আর নটারা খেয়ে ঘুমিয়ে শুখ পায়ে না। সাপ আর বাক্স—হুই যেন এক মহাবাহির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

তাই জালুলী দেবীর পুত্রা চলেছে সজ্জারামে। হোমকুণ্ড জলছে। রাজকুমারী অন্ধমানে কিছুই বোঝেন না। সাগ্রহে দেখেন সেই অগ্নিশিখা। কখনও জোরাগো হয়, কখনও বা ঈষৎ নিঃশব্দ হয়। দাবানল জ্বলেছে হয়তো বনাকুলে। তাই বসি হয়, তবে আগুনের বিস্তার নেই কেন! দাবানলের আগুন তো ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। ঘর থেকে দেখাবে, যেন আলোর মালা।

বিদ্যাবাসিনীর কানে পৌছয় না দেবীর পূজার মন্ত্র।

ভিক্রু আর নটারা, একতানে মন্ত্র বলছে। দেবীর বেলিতে ধূপ জলছে। ধূনার ধোঁয়ার দেবীর মূর্তি দেখা যায় না। দেবীর চোখ দুটি দেখা যায়। দুই চোখে দু'খণ্ড নীলা জলছে। দেবীর বর্ণ শুভ্র। শুভ্রবর্ণী জালুলী একমুখী, চতুর্ভুজা, শ্বেতসর্পের অলঙ্কারে বিভূষিত। উপরের দুই হাতে বীণা ধরেছেন, নীচের হাতের ডাইনে অনুরুদ্ধা, বামে শুক্লসর্প।

ও ইলিমিতে তিলিমিতে ইলিতিলিমিতে দুখে দুখালিয়ে তর্ক তর্করূপে মর্মে মর্মরূপে কন্দীরে কন্দীরুদ্ধে অথো অথনে অথানানে ইলি ইলিয়ে মিলিয়ে ইলিমিলিয়ে অকাইএ অপ্যাইএ খেতে খেততুগে অননুরুদ্ধে বাঁহা!

মন্ত্রপণ এত দূরে থেকে শোনা যায় না। এই মন্ত্র না কি একবার গাইলে, সপ্ত বৎসর বাবৎ সর্প-বংশনের ভয় থাকে না। নিয়মিত পাঠ ক'রলে বাবজীবন সর্পাঘাত থেকে বন্ধা পাওয়া যায়। মহামন্ত্রটি কবচরূপেও শরীরে ধারণ করা যায়।

—পাকী এসেছে বোঁ। তোমাকে নিতে এসেছে।

আচমকা হঠাৎ কথা বললে পরিচারিকা, ছাদের দুর্য্যে পাড়িয়ে। থামলো না এক কথার শেষে। বললে,—বা দুর্ধোণ, কোথায় বা যাবে এখন!

পাকী এসেছে, শিউরে উঠলেন যেন বিদ্যাবাসিনী। ভয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়। দুখে যেন কথা আসে না। কার পাকী, কোথা থেকে এসেছে, জানতে চাইলেও মুখে যেন বলতে পারলেন না।

—সাড়াশব্দ নেই কেন গো? জপে বসলে না কি বোঁ?

প্রথম অন্ধকারের ধাঁধা পরিচারিকার চোখে। স্পষ্ট যেন দেখতে পার না কিছু। কাল-বৈশাখীর বাতাস বইছে খন শন। গুলো আর কুটো উড়ছে। বাগানের চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে গেছে, খোঁসা ছাদের দানে এসে।

জপের কথা শুনে আবার ঈষৎ হাসলেন রাজকুমারী। অকূটে বললেন,—কোথা থেকে পাকী এলো? সাতর্গী থেকে?

—সাতর্গী থেকে পাকী আসবে! কথা বলতে বলতে তান্ত্রিকের হাসি হাসলো পরিচারিকা। বললে,—না গো না, তৌধুরীবাড়ী থেকে পাকী এসেছে। তৌধুরীবাড়ী পাঠিয়েছে। কথা শেষ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে দুয়ের ত্যাগ করলো বশোদা। চোখের বাইরে গিয়ে বললে,—বাই আমি, সীমের বাতি জ্বলে আসি।

বুকে কাঁপন লাগলো। বিদ্যাবাসিনী কেমন যেন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। ভেঙ্গে পড়লেন। ধানিক নিশ্চুপ বসে থেকে উঠে পড়লেন বাঁয়ে বাঁয়ে। ছাদ ত্যাগ ক'রে ঘরে চলেছেন। বুকের কম্পন যেন ধামতে চায় না।

অন্ধকার কক্ষ। ক'দিনের স্নো-জানা, তাই অভ্যাসে এসিয়ে চললেন রাজকুমারী। ভেবেছিলেন ছাদ থেকে ঘরে গেলে ভাবনার ভয় থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে। শূন্যকক্ষে যেন আরও বেশী ভয় হয়। অন্ধকার ঘরের একোশে সেকোশে যেন কার মূর্তি ঘোরাক্ষরী করছে, মুখে হাসি মাখিয়ে। কারা না ছারা কে জানে, বিদ্যাবাসিনী ভয়ে ভয়ে দেখেন ঘরের ইদিক-সিদিক। যেন দেখা যায় সেই হাতময়ী মেয়েটাকে। আনন্দকুমারীকে। অন্ধকারে তার সোনার অলঙ্কার যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। ঢাকই লাড়ীর জরি চিকচিক করে। স্নাতক্রে বিদ্যাবাসিনী কেমন কেন জ্বধবু হয়ে পড়েন। এখনও স্পষ্ট কানে ভাসছে, আনন্দকুমারীর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে হিন্নোল তুলে সে যেমন খিলখিল হাসি হাসলো, ঠিক সেই হাসির ধ্বনি ভাসছে কানে। ঘরে থাকতে বাসরায় হওয়ার উপক্রম হয়। দুখের মধ্যে আঁচল চেপে ঢাশা-কারার বেশ সামলে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে বান রাজকুমারী।

এক বলক আসে। ঘরের মেঝের আর দেওয়ালে ছড়ালো।

পলকহীন চোখে কি দেখছেন রাজকুমারী। তাল আর নায়কল গাছের সারি ঝড়ের হাওয়ায় হেলছে চলছে। সে। সে। শব্দে বাজল বইছে সজ্জারে। ক'রা যেন কোথায় ফিসফিস কথা বলছে। আসমান-বীথির তীরে শুকপত্র নাচনাটি করছে চরতো। এককল মাতাল মাছুব যেন কি এক স্মৃতিতে হাসাহাসি করছে। বাঁজার বেশ ভীষণ। বাঁদবনে শিব বেজে চলেছে এক নাগড়ে। যেন বাঁনী বেজে চলেছে একতানা।

রাজকুমারী দালান থেকে আকাশে চোখ তুললেন। বনকলার মেঘের জটলা হাওয়ার দাপটে ঝণ্ডঝণ্ড হয়ে গেছে। মাঝারি আকাশ থেকে ভেসে গেছে অনেক দূরে, সেই বেখানে মালাবর্ণ জেগে হয়েছে সেই দিকে।

চাঁদ উঠছে কখন। মেঘমলিনতার আড়াল থেকে হেসে হেসে দেখা দেয় এককবার। ভেসে-বাওয়া মেঘের আঁলে ঢাকা-হীন এককল। ঝড়ের রাতের চাঁদ, সোনারঙে তাই যেন আঁক-আঁক তেমন জৌলুপ নেই।

—পাকী কিরিয়ে মিই বোঁ?

ঘরের কোণের কুলুর্কিতে বলন্ত পিদিম রাখতে রাখতে কল্ল বললে পরিচারিকা। তৈল-বীণের আলোর কাছাকাছি পড়ল নাচতে থাকলো।

—না। বিদ্যাবাসিনী ভাড়া পলার বললেন,—আমি বসে বসো, তুমিও আমার সহ বাবে। আনন্দর মা বিপদের সময় ডাক পাঠিয়েছেন, না বাওয়া অন্তর নয়, পাপ। আমি পাপের ভান্নী হই চাই না। ঘরের কোণের দালান থেকে রাজকুমারী কথা বলছেন, তাঁর কথার পর যেন বিব্রত। চোখ কিরিয়ে আছেন বল দিকে আনন্দবের জল-কল্লের আছাড়ি পিছাড়ি শব্দ শুনেছেন।

পূর্ণিমা আসর। চাঁদ প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুবতীকত্তার মত তাই যেন আমোদগত হইতো আর শান্ত নেই আঁখ। আকাশের সীমার দিকে তারের হাতছানি। আমোদের বেন আজ উর্ধ্বগতি করেছে। কেমন বেন উজ্জ্বলিত।

—এই ঝড়ের বাত্রে ঘরের বায় হবে কোন্ সাহসে! মরতে চাও নাকি?

—তুমি আমার সহায় হও তো সাহসের অভাব হবে না। কথায় শেষে একটি দীর্ঘবাস ফেলেন রাজকত্তা। বললেন,—ঈশ্বর ততটা দয়ালু নয় যে আমার দিকে চোখ কেরাবেন।

—গাছ পড়ছে। ঘরের ঢালা উড়ে বাচ্ছে। অজানা অচেনা পথ, বাবে এই রাতবেরাত্তে?

—তুমি প্রহরীকে ডাকো। তাকে আগে তুষ্ট করি।

—আবার ডাকবে বিশপকে? কি হ'তে কি হয় কেউ বলতে পারে? ঘরে চুরির দায়ে ধরা পড়বে যে। হাতে হাতকড়া পড়বে! কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে!

কথা শুনে শুনে চমকে চমকে উঠলেন বিদ্যাবাসিনী। ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন। সেই অবস্থায় পা চালিয়ে লালান থেকে ঘরে ছুকে বললেন,—তবে কি ক'রবো যশোলা?

—পাকী কিরিরে দিই আমি। ঝড়ে যে উড়িয়ে দিচ্ছে জিটে মাটি!

পালঙে বললেন রাজকত্তা। কপালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকলেন। বাইরে ঝড়ের গর্জন। কোথায় ভাড়া হুয়ের পড়ছে লগ্নাশে। আসমানের বৃকে নারকলের তরুশাখা পড়ছে।

ঘরে ঘরে বায় বাতায়ন বন্ধ হয়ে গেছে। এমন ধূসো উড়ছে যে চোখ মেলা যায় না। প্রথম রাত্রির অন্ধকারে ধূসার আঁধার এক হয়েছে।

—মন মানছে না যশোলা। তুমি প্রহরীকে ডাকো। তুমি আমার সহায় হও।

—এই ঘনঘটা আর ঝড়-বাতাসে এক বলক হাসলো পরিচারিকা। আকাশের বিদ্যুতের মত হঠাৎ দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় হাসি। বললে,—দেখো বৌ, তোমার জেল ঝড় বেশী।

—দোহাই যশোলা। অমত করিসু না আর।

—প্রহরীকে ডাকি তবে?

—ঈ, এখনই। আর দেবী নয়।

—জেবে চিন্তে দেখো এখনও।

—আঃ, তুমি বাও না যশো।

কণ্ঠ বিরজি নয়, কিছু বা ক্রোধের সঙ্গে ধমকানির গুরে বললেন রাজকত্তা।

শিশিরের সতেজ শিখা নরমুখী হয়ে কঁপে কঁপে উঠছে সজ্জার গুজার। কুলকীতে আছে, তাই আর নিবছে না গুরোপুরি।

আলোর সহসা নিজের দিকে চোখ পড়লো রাজকুমারী।

কলম বেশ তাঁর স্নান, বেশ বন্ধনহীন। জট প'ড়েছে হরতো চন্দ্রালের বোঝার। নিজের হাত হ'খানি দেখলেন। অলঙ্কারের লুই নেই, মাত্র সোহা আর শাখা। লাল রক্তের কড়, গালায় বালা।

জিহ্বা-বিছানায় হাত-আরনা ছিল একথানা। অস্ত্রের আরনা তুলে খেলেমন অনিচ্ছায়। দ্বন্দ্ব-বন আর নেই আগের মত। কোথায়

সেই রূপসার? ভোরের কাকাসে চাঁদের মত বেন, স্বর্ণভার চিহ্ন নেই।

কি মনে পড়লো কে জানে, আয়নাখানা আবার নামিয়ে রাখতে হ'ল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বিদ্যাবাসিনী। দড়ির আনলা থেকে বদলের শাড়ী নামালেন। লালপাড় পাটের শাড়ী। তসরের গা-ঢাকা চাদর। গায়ে যে অলঙ্কার নেই, আর কারও চোখে পড়বে না।

বাতের বেলার আয়নার মুখ দেখতে নেই, তাই হয়তো দর্পণের এই মানের হানি। নিজেকে আর দেখলেন না রাজকত্তা। সঠিরে রাখলেন তাকে। বাতে আয়নার মুখ দেখলো না কি কলঙ্ক রটনা হয় তার নামে, যে দেখে। মিথ্যা অপবাদ রটে। ছন'রাম দেখ শঙ্কলোকে। অবধা।

শাড়ী বদলের পর চাদরে উর্দ্ধাঙ্গ ঢাকলেন। এক দেখায় দেখেছেন মুখের মালিন্দ, তাই জলপাত্র তুলে মুখে জল দিলেন। তাক্তশাড়ীতে মুখখানি চেপে চেপে মুছলেন।

কোথায় কে জানে, আলপা হুয়ের পড়ছে বিস্তী লগ্নাশে। বেন বন্দুক দাগছে কে কোথায়। জমিদারের ভগ্ন দেউলের ভিত্তি কঁপে উঠছে বেন।

মনে বল সক্ষম করেন রাজকুমারী। বাজার জন্ত প্রস্তুত হয়ে ঘরে পারচারী করতে থাকেন ইমিক-সিমিক। দেওয়ালে দেওয়ালে বিদ্যাবাসিনীর সলো-ছায়া বাওয়া-আসা করে তাঁর সঙ্গে সলে।

অলো-পুড়ে ছাই হয়ে বাচ্ছে, এক দেখায় দেখে নিচ্ছেন রাজকত্তা। রূপের রূপা বিলুপ্ত হয়ে যায় দিন কে দিন। অবশ্যে, অদেখার। তা যেতে ব'সেছে, আত্মপীড়নের গুণে যেন একবার হাসলেন।

বিদ্যাবাসিনীর চলনের ভলীট বেশ। চলনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহদেখা বিকশিত হয়ে ওঠে; কেমন এক রাজসিক সর্প পদক্ষেপে চলেন তিনি। বাঘ আর কুকুরের চলার না কি অনেক পার্থক্য। রাজার ঘরে বিদ্যাবাসিনী, বাঘের বাছী। মেলের ঘরের ঘরে নয়, কুলীনকত্তা।

—তোমার প্রহরী আজ তাড়িটেনে বেহ'স হয়ে আছে বৌ। আর ডাকাডাকি করতে ভরসা পাইনি তাই।

—নেশার অটোন্ত!

—ঈ গো ঈ। হ'স নেই তার। পাশে তাড়ির কলসী উগুড় হয়ে প'ড়ে আছে। মাসের কাঁবাবে বেড়ালে মুখ দিচ্ছে। একদল মানুষ এসেছে, চৌধুরীদের পাকী এসেছে, জানেও না।

—ঘরে শেকল তুলে দাও, যশো! দীপের আলো জলুক। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—আমায় কেমন মন সার দিচ্ছে না বৌ! তবে তুমি যখন ব'লছো আমাকে যেতেই হবে। চৌধুরীসিঁরি যখন ডেকেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তাদেরও অপরাধ নেই। তাদের ঘরে তো তোমার কাছেই এসেছিল কাল রাজে।

কালরাত্রিই রটে। পরিচারিকার অপোচরে হুঃখের হাসি হাসলেন রাজকুমারী। বললেন,—চল' আর দেবী নয়। বেশী কিংব' হ'লে কিংব'ত কিংব'ত হাত ঘন হবে।

—এই কথাটি মনে রেখো। বাবে আর চ'লে আসবে, আসর জমিয়ে বসবে না। এ পোড়া দেশের মানুষ আবার হাতের বেলার



ঘরের বাইরে বেরোয় না। নেহাৎ ব্যাঘ্রা অশ্বিনবাত্রী তারা ছাড়া কেউ পথে বেরোয় না। কথা বলতে বলতে যেন হাঁকিয়ে উঠছে পরিচায়িকা।

—চল' বশো, সিঁড়ির পথ ধরো।

—হুমি এগোও, আমি ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করি।

ঘরের শেকল তুলতে তুলতে কথা বলে বশোদা। হাতের কাজ সারতে সারতে। সাবধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে।

বাইরে হাওয়া চলছে এলোমেলো। রাজকুমারী নালানে এসে পাঁড়াতেই তাঁর কেশ-বাস চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিনের শেষে এতকণে বাতাসে যেন হিমম্রিঙ্কতা ভেসেছে। কাছাকাছি কিবা ঘরে কোথায় হয়তো আকাশ থেকে ধারাবর্ষণ হয়েছে। অন্ততঃ হাওয়া তাই বলে, ঠাণ্ডা পরশে। কটিলধরা উত্তপ্ত মাটির তৃণায় দগা হয়েছে আকাশের।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে বুক দুক-দুক করে বিদ্যাবাসিনীর। বধ্যভূমিতে বাগদার আগে যেমন ভয় হয় সেই ধরণের ভীতিকাতরতা যেন। পায়ের তলার ভূমি যেন সরে বাচ্ছে। চোখে যেন শুধু আঁধার বেধতে পাওয়া যায়। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

—আমাদের জমিদারমশাই জানতে পারেন তো আর রক্ষা থাকবে না।

দুপাশিয়ে সিঁড়ি নামতে নামতে কথা বলে বশোদা। বলে,— কৈ গো বো, কোন দিকে গেলে?

কথা বলার আগে নিজের দুই চোখ আঁচলে মুছে ফেলেন বিদ্যাবাসিনী। বললেন—তোমাকে কীকি দিয়ে পালিয়ে যাবো মনে করলে?

—না না তা নয়। তোমাকে দেখতে না পেয়ে শুনিয়েছি কথাটা। কথা বলতে বলতে দম নেয় পরিচায়িকা। বলে,—তুমি যে তেমন নয় তা আমি জানি। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বাগদার মত মেয়ে তুমি নয়।

জমিদার কুমারমের গৃহপ্রাঙ্গণে মশাল জ্বলছে। পাড়ীর বাহকরা খানিক ফুরসৎ পেয়ে গাঁজার কলকের আগুন ধরিয়েছে। মশালের জোরালো আলোয় বাহকদের তৈলাক্ত কালো আকৃতি চিকণ তুলছে। মশালের উর্দ্ধগামী শিখা স্তম্ভের বাতাসের সঙ্গে যেন বুঁদ চালিয়েছে।

রাত্রি দ্বিগ পড়ায়। দিনের চাকলা রাতে থাকে না। তবুও আজকের রাত্রি যেন এক ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে এনেছে অশান্ত হাওয়া। বড়ের দোলায় তাই মান্দারণ আজ মুখর হয়ে আছে। দ্বয়ম্পর্শিত বাতাসের সোঁ-সোঁ গন্ধন, পাছে পাছে সন্ধ্যের শব্দ, শুভপঙ্কজের মর্দরধ্বনি, বাঁশবনে বাঁশীর স্রবের মত শিঘ্রের একটানা আগুয়ান—পাড়ীতে উঠতে উঠতে রাজে হুমারীর খাস যোথ হতে থাকে যেন। হাত আর পা হ'বানি যেন অবশ হয়ে আছে। ফুকার কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।

বিদ্যাবাসিনী এক লম্বাঘর দেখলেন,

চৌধুরীগৃহের মূল্যবান পাড়ী। রূপায় পাতে মোড়া। পাড়ীপাতি চিত্রবিচিত্র। লাল শালুর পর্দা কলছে পাড়ীর দুয়োরে। বাসন জন বাহক আর পাইক পেয়াল—বাড়ীদের দেখে সন্ধ্যমে উঠে পাঁড়ালো তারা। মশালটি মশাল ধ'রলো হাতে।

লাল শালুর পর্দা সরিয়ে পরিচায়িকা পাড়ীর ভেতর থেকে কিসকিসিয়ে বললে,—পা চালিয়ে যেতে হবে। চিমে তালে গেলে চলবে না।

—জোর বাতাস চলছে ঠাকরুণ, বাতাস ভেঙ্গে যেতে হবে আমাদের। যেতে একটু বিলম্ব হবে, আসতে তেমন হবে না। হাওয়ার গতি এই মুখে।

বাহকদের মধ্যে থেকে কে একজন কথা বললে। পাড়ী চ'লতে থাকলো নেচে নেচে। মশালটি আগে আগে চললো পথে আলো ছড়িয়ে। বাহকরা ছুড়া ধ'রলো এক সঙ্গে। বাতাসের শব্দে ছড়ার স্রব ভেসে ভেসে যাচ্ছে ইকি-সিকি।

—তাখ বশো, আমাদের বাওয়া-আসাই সার হবে। আনন্দকে আর কি কখনও পাওয়া যাবে? মনে তো হয় না।

—শকুনির খবর থেকে মড়া কি টেনে আনতে পারে কেউ? আনতে হয়তো পারা যায়, তবে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় না।

কথা বলতে বলতে শালুর পর্দা ঈষৎ সরিয়ে ইতি-উক্তি দেখে পরিচায়িকা। মশালের আলোয় বতদূর দেখা যায় কোথাও মাল্লবের পশুচিহ্ন নজরে পড়ে না। বসতির চিহ্ন বুঁজে পাওয়া যায় না। চোর আর ডাকাতের ভয়ে গ্রামবাসীরা উন্মুক্ত স্থানে বাসভূমি তৈরী করতে ভুলে গেছে। মাল্লব আছে মান্দারণে, তাদের ঘর আর চালা আছে। কিন্তু গোপনে লুকিয়ে আছে বনজললের মধ্যে। দুর্ভেদ বনাকুল যেন হুগের প্রাচীর।

পরিচায়িকার কথাগুলি বোধগম্য হ'তে যেন কিঞ্চিৎ দেরী হয়। রাজকুমারী যেন অনেককণ ধ'রে মনে মনে উপলব্ধি করেন বশোদার কথা। একটি দীর্ঘবাস ফেললেন। হতশাশ্বর নিশ্চয় হয়ে ব'সে থাকলেন ছাগুর মত।



কি এক আর্ন্ত চিন্তার ভেসে আসে কোথা থেকে। অনেক  
হাছবের কঠ, একসঙ্গে শোনা যায়। কান পেতে শুনেতে শুনেতে  
বিন্দুবাসিনী বললেন,—মাথের ঠোঁটের কেন?

শালুর পর্দা সরিয়ে শুনেলো পরিচারিকা। বললে,—তাইতো  
শুনছি। আগুন লাগলো না কি কোথাও।

আঁতরব এগিরে আসছে বেন। কারার একতান ছোটোছুটি  
করছে তাঁর হাওরায়। কাছাকাছি স্থান আছে না কি কোথাও।

অস্থির হয়ে ওঠে বশোনা। পর্দা সরিয়ে বুখানা বের ক'রলো।  
পাকীর দুই পাশে পাইক আর পেয়াদারা চ'লেছে। তাদের ডনিরে  
বললে,—কারা এমন অসময়ে কারাকান্ট করে?

পাইক আর পেয়াদারা বাকের হাসি হাসলো, মশালের আলোর  
শাউ দেখলো পরিচারিকা। একজন পেয়াদা হেসে হেসে বললে,—  
অসময় নয় ঠাকরপ, বড়ই হুসময় এসেছে। গ্রামে মড়ক লেগেছে।  
মহামারীর ভয় উজ্জাদ হয়ে গেল।

—কিসের মহামারী?

ভয়ে ভয়ে প্রের করে বশোনা। হাওরা বিধিরে আছে, সেই  
আশঙ্কার বেন বাস নেয় না আর।

হেসে ফেললে পাইক-পেয়াদার দল। আনন্দ না দুঃখের হাসি  
কে জানে। একজন বললে,—রোগ তো ঠাকরপ এক-আধটা নয়,  
অনেকগুলো। অরখালা, শেতলা মায়ের অল্পগ্রহ পানবসন্ত, ওলাউরা।  
এ সব রোগের কোন ঠিকিৎসে নেই ঠাকরপ! একবার ঘ'রলে আর  
সারে না।

পাকী ধামে না। দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে এগিরে চলে মের্টো  
পথ ঘ'রে। গড়বো না পৌঁছে বেন খামবে না। বাহকরা ছড়া কাটতে  
কাটতে ব'য়ে চলেছে। সন্ধ্য ছাড়া কোন দিকে চুকপাশ নেই তাদের।

কারার কোরাস ঘুরে স'রে বায় ক্রমশঃ। অরাজকতার ঐতীন  
রাখব পাশে ফেল, পেছনে ছাড়িয়ে এগিরে চললো পাকী।  
এগিরে চলে মশালের আলোকপরিধি।

অধিকরণ স্বৈর্য থাকে না রাজকন্ডার। কি কারণে কে জানে,  
কিছুকল চুপচাপ থাকতে থাকতে কেমন বেন আনচান করতে থাকেন  
বিন্দুবাসিনী। বুকের মধ্যে না মাথার মধ্যে কি এক অসহ্য জ্বালা  
ব'য়ে বেন। কান হুঁটো তেতে ওঠে তখন। কপালের দুই পাশ  
ঝিকঝিক করতে থাকে। বুকে বেন বেদনা লাগে। ঠিক গত  
রাগি থেকে বেন এই বকম এক অসহনীর অসুস্থতির জ্বালায় ভেতরে  
ভেতরে জ্বলছেন তিনি। সময় নেই অসময় নেই, যখন তখন  
চৌধুরাণীর সহাস কথা বেন তাঁর কানে ভাসছে। আনন্দকুমারীর  
খিঁচি দুখের খিঁচি কথা। তার হাত-শরিহাল।

হুঁতাত এক বলক বাতাসে পাকীর লাল শালুর পর্দা স'রে বায়।  
পাইক আর পেয়াদারা পাকীর ভেতরে ঢোকে দেয়। খেঁবে নেয় এক  
কুঁতে। মশালের আলো আর ছায়ার দেখে দেয়। দেখতে পায়,  
পাকীর ভেতরে এক অনভ্যাসধারণ রূপের পশরা। শুণু চলোচলো  
চুকখানি দেখা যায়। দেখা যায় রাজকন্ডার হৃৎস্পন্দ।

কুশানবীর বয়স্রোতে ক্রতগতিতে ভেসে চলেছে ম্যালোটের বজরা।  
একিৎসনা ঘ'রে।

প্রথম রাতির আঁধার-প্রলোমে তীরছবি অঙ্ক হয়ে গেছে। - ঠাক

বাতাস চলছে উত্তরদুখে। মাঝিরের সর্দার লণ্ডন জালিয়ে গিরে  
গেছে কখন। যেড়ীর তেলের জ্বালা।

পুরা একটি বাত ঘুর নেই চোখে, তাই হয়তো আনন্দকুমারী ঘুরে  
অচেতন হয়ে আছে। বেন এক ঘূর্ণ ঘূর্ণ হয়নি, এমনই ঘুরের ঘোর।

ম্যালোট ব'সে আছে চৌধুরাণীর পাশে। বজরার কাঠের দেওয়ালে  
হেলান গিরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। আনন্দকুমারীর মাথার পিঠে  
হাত বুলিয়ে গিচ্ছে। তার-ভরা আকাশে চোখ তুলে অন্ধকারে কি  
দেখছে ম্যালোট। আকাশের পটে নন্দ্র-অন্ধরে কি বেন দেখা আছে—  
এক পাশে পানপাত্র। ডিকেরটার আর পেগ-গ্রাশ। খাঁটি স্বচ হুঁচি  
ধায় ম্যালোট। এ বেন তার প্রাত্যহিক অভ্যাসে গাঁড়িয়েছে।

—বজরা লাগাই মারেব? মাঝিরের সর্দার বজরার গলুই  
থেকে কথা বললে।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় ম্যালোট। বলে,—নো, নো, নো।  
কথার শেষে আবার চোখ তুললো আকাশে। নন্দ্র-অন্ধরে দেখা পড়তে  
থাকলো। নেশার ঘোরে কি না কে জানে, ম্যালোট বিভ্রিভিরে বকতে  
থাকে। খেমে খেমে বলে আপন মনে। আকাশে বত তারা, তাদের সঙ্গে  
বেন কত দিনের পরিচয়। ম্যালোট খেমে খেমে বলে,—ক্যাপ্রিকর্প।  
জেমিনি। নেপচুন। সেমিসেমিটাইল। লিবরা। ইউরেনাস।

সন্ধ্যালোক ছড়িয়েছে গঙ্গার বুকে। এই মাত্র বেন দেখা দিয়েছে  
চাঁদ। মেঘের আড়াল থেকে মুখ দেখিয়েছে। নববধূ বেন, সলজ্জার  
গুঠন সরিয়েছে। আকাশের কোথাও নীহারিকা, কোথাও ছায়াপথ।  
কোথাও যুঁহুতারা। কোথাও সন্তুবিমণ্ডল।

ম্যালোটের পাশে সোনালুখী চাঁদ বেন। আকাশ থেকে কখন নেমে  
এসেছে। চোখে পড়তেই বুকে দেখলো ম্যালোট। চাঁদের কপালে  
একটি চুমা মিলে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

চোখ চাইলো চৌধুরাণী। খানিক বিম্বের চোখে তাকিরে  
দেখলো ম্যালোটকে। তার পর ফণি হাসি হেসে আবার চোখ বন্ধ  
ক'রলো। তার কপালে হাত বুলিয়ে দেয় ম্যালোট। কৌকড়া চুলের  
রাশিতে আঙ্গুল ঢালায়। আনন্দকুমারী বীরে বীরে ম্যালোটের হাতখানি  
কপাল থেকে সরিয়ে নিজের বুকের 'পরে রাখলো। ঘ'রে রাখলো  
নিজের হাতে। চেপে রাখলো।

ম্যালোট দেখছিলো বেন সাগ্রহে, ঘূষাঙ্গ তাকে কত প্রথম দেখার।  
চৌধুরাণীর আপ্যায়নমস্তক দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফুলের মত কোমল বেন  
আনন্দকুমারীর দেহ। নবর নরম পঠন। শিল্পীর দৃষ্টি ম্যালোটের  
চোখে। খেত প্রভয়ের মূর্তির মত দেখে বেন চৌধুরাণীকে। বা টসেলী,  
ম্যানটেনগনা কিংবা লিওনার্ডের আঁকা নারী মূর্তির সমতুলনীয়।

কাছে কাছে থেকে থেকে কিংবা-পশুর বেন ঘুচে গেছে চৌধুরাণীর।  
মনের কণ্ঠ থেকে গেছে। রাগের বললে বেন অহুরাগে মন জ্বিজেছে।  
মৌনভক্ততা বুছে গেছে মুখ থেকে। হাসি কুটেছে লাল অধরে।

আবার বকতে শুরু ক'রলো ম্যালোট। পান পাইতে থাকলো বেন  
স্বপ্নের ছন্দে। আর গত নয়, পত আওড়াতে থাকলো চৌধুরাণীকে  
দেখতে দেখতে। ম্যালোট বলতে থাকে উইনেসেরী কথিতা:  
"For Lo! the star which measures our time

Is like that lady who hath lit my love.

Placed in Love's heaven she is,

And as that other (star) by countenance

From day to day illumineth the world  
So doth she (illumine) the hearts  
Of gracious folk and all the valorous,  
With but the light which rests in her face ;  
And each man honors her,  
Seeing in her the light all perfected  
Which bears full virtue to the minds  
Of all who (thereby) grow enamored,  
And such is she who colors  
The heaven with light, being guide of the

With a splendour which lures by its fairness.”

কবিতা শোনাতে শোনাতে আরও যেন কাছে টেনে নেয় ম্যাগলেট।  
নিবিড় বন্ধনে বেঁধে সরিয়ে নেয় নিজের কাছটিকে। চৌধুরাণী  
আরেক বার তাকায় তন্ত্রাণী চোখে। আরেক বার ক্ষণ হাসি ফুটলো  
তার মুখে। চোখের ঈশারায় কি যেন দেখালো বাহির পানে।

মুহূর্তের ভক্ত সাবধান হর যেন ম্যাগলেট। তৎক্ষণাৎ আবার  
যেমনকার তেমনি। চোখে নেশা না ভালবাসা ফুটিয়ে আনন্দের  
মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়।

চৌধুরাণী ঈশারায় তানায়, ঘরের বাইরে আরও মাহুয আছে।  
মাকিরা আছে। ম্যাগলেট তাদের মানে না। শুধু যে গোপনেই প্রেম  
হয়, বিশ্বাস করে না ম্যাগলেট। ভালবাসাকে চেপে রাখতে পারে না।  
ম্যাগলেট মনে করে, হাচিসন্দীর মত প্রেমও গোপন থাকে না কখনও।

আশ-বুম আশ-জাগর মধ্যে থেকে ম্যাগলেটের আবেদন-নিবেদনে  
আরও যেন অনেক বেশী স্রবী হয় চৌধুরাণী। স্বর্গস্থলের মত  
পৃথিবীতে এমন আর কি আছে।

পেছনে যাদের কৈল এলোছে, যাদের পিছিয়ে রেখে এগিয়ে চলছে,  
তাদের কথা মনে আসে বখন-তখন। সেতারের তার ছিঁড়ে যায় যেন  
তখন। শব্বের বেলা খেমে যায় হঠাৎ। বজ্রের ছন্দ পাড়ে সচরা।

মান্দারপের মায়া যেন কাটে না মন থেকে। চারিদিকে বন  
আর উপবন, মধিখান্দে আমোদর নদী—এই তো গড় মান্দারপের  
ছবি। বৌদ্ধ, হিন্দু আর মুসলমানের মঠ, মন্দির আর মসজিদ  
এখানে-সেখানে। চৌধুরী মশাইয়ের চার মঙসা গৃহ মান্দারপের  
আলো। দালান, উঠান, দেব-দেউলের গণনা হয় না যেন।

আজমের নুতিমাখা মান্দারপের মায়া কাটে না মন থেকে। লজ্জী  
বহুপণী মা আছেন আনন্দকুমারীর। তাঁর রেহেব বাঁধন কখনও  
ভোলা যায় না। একটি মাত্র মেয়ে, তাঁর বৃক্কের মণি। মেয়ে চোখের  
আঁড়ালে গেলেই তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন।

জলের গতিব সঙ্গে সঙ্গে বজরা ভেসে চলেছে। হাল বাইতে হয়  
না তাই। মাকিরা জ্বিনেয় পেরেছে।

পেছনে যাদের কৈল এলোছে তাদের মুখগুলি মনে ভাসলেই চৌধুরাণীর  
মনে আর কোন স্রবের অনুভূতি থাকে না। এই সুরজলা সুরজলা  
পৃথিবীকে মনে হয় নরকের মত—যেখানে শুধু পাশাচায়ের রাজস।

মান্দারপে তখন বৈশাখী বড়ের তাণ্ডব চলেছে। গাছের  
ডাল খসে খসে পড়েছে বাতাসের দাপটে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে  
কশে কশে। হাওরাখ ঘূর্ণিতে শুকপত্র উড়ছে। রাজির অন্ধকার  
ধুলিধূল। ভাঙা-ঘরের চালা উড়ে গেল কত। বাঁশবনে বাঁশীর  
স্বরে শিব বেজে চলে অধিরাম।

বড়ের গাভিতে পাড়া এগিয়ে গেছে মেঠো-পথ ধরে।

চৌধুরীগৃহের অন্দরে পৌঁছে দিয়ে তবে খেমেছে বাহকরা। বড়ের  
হাতকে যেন পরোয়া করেনি মনিবের বিপদের রাতে।

পাকী ছুরোরে লাগতেই কোথা থেকে ছুটে আসলেন চৌধুরী  
গৃহিণী। বিদ্যাবাসিনীর পায়ে মাখা রাখলেন। তাঁর হাত ধরে  
পাকী থেকে নামালেন।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি আমার মাক্তজন। আমি তো  
আপনাকে প্রণাম করবো।

—এসো মা রাজলক্ষ্মী। বললেন চৌধুরাণী। কান্নার ছুরে  
বললেন,—তুমি যে ভ্রাক্ষণ মা! আমার তোমাদের চরণের দাসী।

চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে অন্দরে চললেন। রাজকুমারী  
হাত ধরে তাঁকেও নিয়ে চললেন সঙ্গে।

রাজকুমারী দেখলেন, অন্দরের দালানে বেলোয়ারী বেল-কণ্ঠন  
বলছে নানা রঙের। কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও হলুদ  
রঙের আলোর আভা। বিদ্যাবাসিনীর দুঃখবর্ণে রঙের খেলা চলে।  
তিনি ইতিউক্তি দেখেন, অন্দরের সাজ আর শোভা দেখেন।  
দালানে সারি সারি রূপার বড়া। মুখ-বাঁধা লাল শালুতে।  
হয়তো গল্পাভল আছে। চৌধুরাণীর পূজা আর পানের জল আছে।

—তুমি তো মা আমার মেয়ে। তুমিই তো আমার  
আনন্দকুমারী। তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। তোমাকে আমি  
প্রণাম করবো না।

রাজকুমারীর মুখে বাক্য সরে না। চৌধুরাণীর রেহ-আহানে  
চোখে জল করে। দুঃখের জীবন তাঁর, সবল একমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,  
তাই রাজকুমারীর চোখে চলচল করে।

—তুনেছি তুমি রাজার মেয়ে। এক কুলদারের ঘরে পড়ে  
তোমার না কি কপাল পড়েছে!

চলছিল চোখ, তবুও ক্ষণ হাসলেন বিদ্যাবাসিনী। বললেন,—  
যাব দিন আমার কথা, আমার ভাগ্য মন্দ।

রূপার পালকে রাজকুমারীকে বসিয়ে দিলেন চৌধুরীগৃহিণী।  
নিজেও বসলেন ঘরের মেঝের, রাজকুমারীর পায়ের কাছে।  
বললেন,—কি খাবে মা বল? পান-জল দিক।

—কিছু নয়। আপনার দর্শন পেরেছি, আবার কি চাই!

—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় মা?

—হুতাহুটিতে। এখান থেকে অনেক দূরে।

উঠে পড়লেন চৌধুরাণী। বললেন,—যবের ছুরোর কটা  
ভেজিয়ে দিই মা। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। খুব  
গোপন কথা, কেউ যেন না শোনে।

কথা বলতে বলতে চৌধুরীগৃহিণী ঘরের এককটি দ্বার বন্ধ  
করেন। ঘরের এক দিকে লম্বা পিতলের শিলপুঞ্জ। মাছুব-  
প্রমাণ উঁচু। শিলপের নীপ বলছে। দ্বার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে  
সঙ্গে ছড়ানো আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয় ঘরে। রাজকুমারীর মুখ  
আরও যেন স্পষ্টতর দেখায়।

গদ্যর অভ এক প্রাণ ধরে তখন অভ একখানি বজরা হুতাহুটি  
দিক থেকে আসছে এই দিকে। কুমার কাশীশকরের ভারী বজরা  
আসছে দলদল সমেত। কুমারবাহাদুর বঙ্গলাকুমারী পূজার সঙ্গে  
নৌকামধ্যে। শত্রুদলনীর পূজা করছেন। ও জ্যোৎস্না—

কল্যাণ



## রঙ্গপট

### স্বাগতম

এমন একটি সময় ছবির রাস্তা দেখা দিয়েছিল, যে সময় নতুন শিল্পীর আগমন একরকম বন্ধ ছিল বললেই হয়। খোড় বাড়ি খাড়া, আর খাড়া বাড়ি খোড়, এই ভাবে চলছিল ডুমকালিপি বটন। চল্লিশ বছরের মহিলাকে নিবিবাসে দেখার হয়েছিলে বোড়সী নাড়িকার কুম্বিকা। চলচ্চিত্র-শিল্প রীতিমত হয়ে উঠছিল অজন্ম। আশার কথা এই যে, আগন্তপ্রায় বা নিম্নায়মান বা যুক্তিপ্ৰতীক্ষিত কয়েকটি চিত্রে বাঙালার চিত্রমৌলিরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাবেন। সেই অনাগত নবাগত ও নবাগতদের মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। বানসী চট্টোপাধ্যায় (সিঁদুর) কাজল চট্টোপাধ্যায় (অন্তরীক) সুমলা চট্টোপাধ্যায় (প্রিয়া, খেলা ভাঙার খেলা), কাজুরী গুহ (হারানো সুর), কমলা মুখোপাধ্যায় (লুকোচুরি), সুমিতা মুখোপাধ্যায় (নৌদুটির ঝাল ও নবজাতক), শেফালী নায়ক (ভাসের ঘর), অনীতা ভট্টাচার্য (স্বপনপুরী) শ্রীতি দাস (ঐমতীর সংসার), অরুণোদয় বোমক (হাতছানি), অরুণাচল (সাতসিঁদ্ধ), অসীমকুমার (নীলাচলে মহাপ্রভু), বিশ্বনাথ মৈত্র (শ্রীশ্রী গৌর-কিশোর), পার্শ্বতী চৌধুরী (ঐমতীর সংসার) এই অনাগতদের আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। কামনা করি এঁদের উজ্জ্বল জীবনব্যাপ্ত প্রাণনা করি বাঙালার চিত্রজগৎ নবরূপ লাভ করুক এঁদের স্ব স্ব প্রতিভার গৌরবময় অবদানে।

### ঘুম

শিশুমাছুহীনা, পরগুহে গালিতা একটি যুবতীর রূপ কাহিনী 'ঘুম' নাম নিয়ে হয়েছে চিত্রায়িত। সারা দিন গৃহকর্মের গুরুদায়িত্বকে মিলুতি তো নেইই, উপরন্তু রাত্রেও যদি বা সে একটুখানি শাস্রয় নিতে যায় তব্ধায় কোলে, তার পরিত্রস্ত একটি দুহুশোষ শিতকে দিতে হয় প্রাণ ও তাকে যেতে হয় প্রায় কানিকার্ত্তর সিঁড়ির কাছে। 'ঘুম' কাহিনীর এই হচ্ছে মুখ্য উপাদান। শুধু থেকে শেষ পর্যন্ত পাতরা বার পরিচালকের অসুট হাতের সুশ্ৰুট হাশ। ছবির এক একটি অধ্যায় গতায়ুস্পতিকতা ও শৌনঃশুনিকতার ভাবে পূর্ণ। একটি ভিন্নভাবে বার বার একই ভাবে দেখিয়ে লক্ষ্যকিষ্ট করা হয়েছে বিবর্তন। ছবিত ৯৮ মিনিট কুটপাত দেখানো

হয়েছে, তা দেখে ধারাপাত পড়ে যে ছেলে, সেও ছেলে কেলেবে। রূপবাক্য করে দেখানোর কোন প্রয়োজনই তো ছিল না, মোছাম্মুজি আরম্ভ করলে ক্ষতি হ'ত কি কিছু? শেখরকে অন্ধ করাও অর্থহীন। বিমলের সঙ্গে বেলাকে একসঙ্গে দেখে ফেলে শেখর তুল বুঝলে ও মোলোমোলা বন্ধ করলে। পরে অল্পতপ্ত বিমল শেখরকে তার তুল ভেঙে দিলে—এই দেখালে বোধ হয় ছবি জমত। ভাই-কোটার দুজো বাড়ীর অস্তান্তকে দেখা গেল না কেন? একটিনাট নির্বাক দুজো ভাঙ্গু বন্দোপাধ্যায়কে হাসিয়ে লোক হাসাবার প্রয়োজন কি ছিল? সঙ্গীতায় ও চিত্রগ্রহণ নিন্দনীয় নয়। অভিনয়শে ছবি বিখাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীপক মুখোপাধ্যায়, সত্যোব সিংহ, সন্ধ্যাবানী, মধু দে, শোভা সেন, রাজলক্ষ্মী ও বাবুয়ার কুতিয় চোখে পড়ে। অসিহবরণ কাজ চালিয়ে গেছেন মাত্র। আর প্রবীরসবিতা এক কথার লাইকলেস।

### বড়মা

ঔপাতিতিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনার চিত্রায়িত হয়েছে বড়মা। জ্ঞা বন্ধ্যা হওয়ার আবার বিবাহ করে সুবিমল। যথাকালে পুত্রলাভ হলে শান্তি পায় সে। সেই শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে অশান্তি। ছেলে মাহুদ হয় শোভনার (প্রথম) কাজে, নীলিমার (দ্বিতীয়া) পিসী তাকে কোবার ছেলে বেহাও হয়ে গেল, ছেলের উপর শুদ্ধ হ'ল নির্ভাতন, শোভনা সঙ্করতে পারে না, করে গৃহতাগ। অল্পতপ্ত সুবিমল গমন করে লোকান্তরে। পিসীকে তাড়ার নীলিমা। বহু দেশে ঘুরে তীর্থ পর্যটন করে পুত্র গোপালের মাতার ফিরে আসে শোভনা সেই দিন, যেদিন শোভনার নামে স্মৃতিমন্দির তৈরী সম্পূর্ণ করে নিজের আশৈশব কল্পনার রূপ দিচ্ছে গোপাল। সেইখানেই কিশোর গোপাল ও দুইহীনা নীলিমার সঙ্গে শোভনার মিলন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? আজকের দিনে বাঙালার সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই এগিয়ে চলছে প্রসায়ের পথে নব নব উপাদানকে কেন্দ্র করে। সেখানে এ জাতীয় অসার সাবেকী বস্ত্যবাহীন গল্প পরিবেশন করার অর্থ কি? শরৎচন্দ্রের প্রভাব খুব বেশী না পড়লেও বেশ ভালো রকমের প্রভাব পাওয়া যায় বটমলা-সাহিত্যের সুখিখ্যাত ভট্টাচার্য মুগলের পুরোপ্রমোহনের 'দুই সতীন' কাহিনীটি কারোয় মনে পড়ছে কি? তাইই উপর ঐবৎ পরিবর্তনের একটি আলতো তুলি বৃগিয়ে রচিত হয়েছে বড়মা'র কাহিনী। কয়েকটি খুঁটিনাটি ঘোব তো বরা পড়েই। সুবিমলের যুতুটি বড় অল্পত লাগল, ঐ দৃষ্ট লোককে অভিভূত তো করেছে না উপরন্তু জনসাধারণের উপহাস লাভ করে। শোভনা যখন গৃহতাগ করে তখন গোপালের ঘরেন অল্পতঃ মশ থেকে বারো এবং সে নিবিড় ভাবে পেরেছিল শোভনার সাহিত্য, সেই ছেলে শোভনাকে চিনতে পারল না, এ অস্বাভাবিক। শোভনার আকৃতিও খুব পরিচিত দেখা যায় নি। জ্ঞানি না, নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের মত লক্ষ্মিনাথ শিল্পীক দু'বারমাত্র পাঁচ টানিয়ে কি লাভ করলেন নীরেন লাহিড়ী। তবে ছবির আরভটি চমৎকার হয়েছে। প্রসংসার যোগ্য নিন্দরই। 'এই দুনিয়ার ঘরে ঘরে' গানটি গীত হওয়ার সময় যমা বন্দোপাধ্যায়ের অল্পভরী অন্তত অশোভন মনে হয়। মনে হয় গানের কথাগুলির অর্থই বোধ হয় বুঝতে পারেন নি যমা বন্দোপাধ্যায়। ঐ রকম একটি গভীর

আজকের কথা নয়  
কালকের কথা নয়

চিরকালের কথা



আজকাল জিথাকট  
গ্লাইডেট লিমিটেড  
কলিকতা



বাইরে থেকে যে নারীকে দিয়েছে বিসর্জন  
অন্তরে সেই নারীকে পক্ষম দিয়েছে সিংহাসন...



• ভারতীয় বিকাশের ইতিহাস •

পরিচালনা  
জুথীর মুখার্জী  
চিত্রনাট্য  
দ্রোণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়  
সঙ্গীত: রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রুবেন রায়ের মর্ন্তের মৃত্তিকা অবলম্বনে  
ভূমিকায় : সন্ধ্যারাগী, বিকাশ, মধু, রবীন, কমল, শাহাদী, অমর মল্লিক,  
জীবন, তুলসী, রাজেশ্বরী এবং নবাগতা মানসী চট্টোপাধ্যায়  
প্রতিদিন : ২-৩০, ৫-৪৫ ও রাত্রি ১০টায়

মিনার • বিজলী • ছবিঘর

॥ এবং নবরতনীর আভাস চিত্রবহে ॥

মুহুর্তে মনে হচ্ছে তিনি যেন কোন প্রেমোদ্যমের জমিনারের বিলাস-  
কক্ষে নৃত্য-গীত পরিবেশন করছেন; অন্ততঃ তাঁর এই ধরনের  
অভিনয় তো সেই কথাটি বলতে চায়। অভিনয়ে সবচেয়ে  
উল্লেখযোগ্য বৃত্তি দেখাচ্ছেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাতা  
তিলক চক্রবর্তী। বঙালার অভ্যন্তরীণ গানের প্রেক্ষাপটের শ্রীমতী  
সম্মুখা দেবী প্রশংসা পাবেন। সন্ধ্যারাবীর অভিনয়ও ভাল  
লাগবে। দাঁতু বারও পরিচালিত দিয়েছেন দশক সাধারণকে।  
ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও স্ব স্ব চরিত্র বর্ণনায়  
গাভীরবর সঙ্গে সুরপাঠিত করেছেন। বড় গোপালকেও ভাল  
লাগল, আর একটু স্বাভাবিক হওয়া দরকার। এ ছাড়া অভিনয়ে  
আছেন কুমুদন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম শাহা, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়,  
ঐতি মজুমদার, বীরাজ দাস, জানান কাঁকাতি, লীলাবতী, অজিত  
কর, শান্ত প্রভৃতি। নায়কের চরিত্রে আশ্রিত করেছেন বিকাশ  
রায়। তাঁর হাত শিল্পীর কাছ থেকে এ জিনিস আমাদের অভ্যস্ত  
নয়। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী হীরাবতী বরোদেকারের একটি  
গান বেষ্ট পরিমাণে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বাঙলা  
সাহিত্যের একটি সম্পদবিশেষ। বাস্তব-প্রতিষ্ঠাতে, আবেগন-নিবেগনে  
সমৃদ্ধ এর আখ্যানবস্তু। রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনীত আদর্শ হিন্দু  
হোটেলের চিত্ররূপ দিচ্ছেন অর্ধেন্দু সেন। চিত্রনাট্যও অতিরিক্ত  
সুলাপ রচনার ভার গ্রহণ করেছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক জ্যোতির্ষ  
রায়। প্রথমাংশে দেখা যাবে বীরাজ ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যারাবীকে।  
অভাভাষে রূপ দিচ্ছেন—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কলী  
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমভাব বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ,  
তুলসী লাহিড়ী, অম্বুপুসার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত  
চট্টোপাধ্যায়, ৬শত বহু, রজিত রায়, চুঁচু সিং, পঙ্কজন ভট্টাচার্য,  
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, দীপ্তি রায়,  
শিখা বাগ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। \* \* \* প্রদেয়া শ্রীমতী অম্বুপুসার  
দেবীর 'গরীবের মেয়ে' গ্রন্থটিও বহুজন পঠিত। এই কাহিনীর চিত্রায়ণ  
গড়ে উঠছে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। মালা সিন্ধার  
সঙ্গে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বীরাজ ভট্টাচার্য, আশীষকুমার, অনিল  
চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতিকে দেখা যাবে এই ছবিতে। \* \* \*  
বঙালার সাহিত্যাকাশে আজকের দিনের অন্ততম উজ্জ্বল তারকা  
সদ্যবয়স বসু। সমরেশের 'পশাবিন্দী' গল্পটি অবলম্বন করে 'পুতুলের মা'  
পরিচালনা করছেন কলী লাহিড়ী। সঙ্গীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন  
প্রবীর মজুমদার। অভিনয়ে দেখা যাবে জহর গঙ্গোপাধ্যায়,  
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখলকুমার, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী  
চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীদের। \* \* \* 'ঐচাৎক্য'  
ছদ্মনামের আড়ালে খাতিমান চিত্র-সম্পাদক অজিত দাস পরিচালনা  
করছেন 'মরণের আগে' ছবিটি। এতে দেখতে পাবেন রবীন্দ্র মজুমদার,  
ঐশিত্য চৌধুরী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ,  
শোভা সেন, বনানী চৌধুরী ও অভ্যন্তর। \* \* \* তরুণ চিত্রকর  
সন্তোষ গুহ-রায় পরিচালিত প্রথম ছবি 'রাতিসেবে'। এতে

সুরোপ করছেন ভারতবর্ষের শিল্পী ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।  
চিত্রনাট্য রচনার ভার নিয়েছেন জ্যোতির্ষ রায়। চরিত্র রূপায়ণের  
ভার গ্রহণ করেছেন—পাহাড়ী সাত্তাল, রবীন্দ্র মজুমদার, অসিতবরণ,  
কলী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বুপুসার, জহর রায়,  
মুপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাবী,  
বেণুকা রায়, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গো, শ্যামলা চক্রবর্তী, হস্তা গোখামী  
ইত্যাদি। \* \* \* কালীদাস দাস পরিচালনা করছেন 'রাত  
একটা' অভিনয় করেছেন বীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সাত্তাল, রবীন্দ্র  
মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, কলী সরকার,  
শিশির মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, তপতী ঘোষ,  
শ্যামলা চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয়-শিল্পীরা। \* \* \* হরপাল  
চট্টোপাধ্যায় রচিত 'গৃহদেবতা' পরিচালনা করেছেন দিলীপ দাস।  
রূপায়ণে আছেন কাছ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ  
মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬শত বসু, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়,  
গীতঞ্জী কবিতা সরকার প্রভৃতি। \* \* \* প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর  
'সৌমন্ত্রিকা'তে রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বীরাজ ভট্টাচার্য,  
বসন্ত চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, অজিত ওস্তা, যমুনা সিংহ, প্রমীলা  
ক্রিবেরী ইত্যাদি।

খ্যাতনামা অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মিনার্ডা  
থিয়েটারে যোগদান করেছেন। বিশ্বরূপায় তাঁর অভিনীত চরিত্রটি  
রূপ দিচ্ছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০০তমের ঘর' এ সূত্রিতা সেনের  
পরিবর্তে দেখা যাবে সবিতা চট্টোপাধ্যায়কে।

## শুক্রবারের বেতার-নাট্য

১৫ই ফেব্রুয়ারি—বিয়ের খাতা, নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলজ্ঞানন্দ,  
—রামকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী, সাধন সরকার, স্বরলজ্ঞ দত্ত, শুনীত মুখো,  
কমল মজুমদার, মণি ঘোষ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বন্দ্যো,  
লাবণ্য পালিত, গীতা সিং, ঐতিহ্যার মুখো, মিহির ভট্টা, বেণু বিশ্বাস।  
\* \* \* ২২শ ফেব্রুয়ারি—খাত্তায়া, শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন ভট্ট,  
—দীপা পাল চৌধুরী, উষাবতী, সন্ত বসু, কালীদাস চক্রবর্তী, ভূপেন  
চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, ছবি বিশ্বাস, মণিপ্রদাণ চট্টোপাধ্যায়,  
চিদ্রকুমার, শিপ্রা মিত্র। \* \* \* ১লা মার্চ—ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ,  
নাট্যরূপ, দ্বিতীয় মুখো,—ঐশ্বর ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যো, সঞ্জীব দে,  
সুশীল দেব, পূর্ণেন্দু দত্ত, অম্বুপুসার, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল,  
নলিমা দাস, সাধনা রায়-চৌধুরী, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। \* \* \*  
বিহু—মল্লয়ার। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট—শোভা  
সেন, তৃপ্তি মিত্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রমা অধিকারী, নমিতা  
হালদার, শান্তা ঘোষ, পাহাড়ী সাত্তাল, সুরকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন  
মুখোপাধ্যায়, অসিত মিত্র। \* \* \* পথ ভুলে—প্রমোদ মিত্র।

## চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

কুশলী অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবযানী (উষা খাঁ)

শ্রীরমেশকৃষ্ণ গোখামী

বিশেষ বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের অংশ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র  
বিভিন্ন সাধারণ নির্বাচনের দামা বেজে উঠছে। সর্বত্রই

জগে উঠেছে উৎসাহ ও উদ্বীপনা। এই মধ্যে একদিন রওনা হলুম চলচ্চিত্র-শিল্পে শিল্পীদের মতামত জানাবো বলে শ্রীমতী দেবধানীর (উষা ঝাঁ) বাসভবনে লাউডন স্ট্রীটে। সাধারণতঃ এখানে ঝাঁর বাস করেন তাঁরা সকলেই সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। এখানে সহর ও গ্রাম একত্র হয়ে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাড়িখানির নিম্নকত্বে একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। শিল্পীদের যথেষ্ট খোঁজকি এখানে যে পাওয়া যায়, তার পথচর পেলুম শ্রীমতী দেবধানীর বাসভবনের সম্মুখে এসে। সন্ধ্যাই যেন শিল্পীর আঁকা একখানি ছবি! পূর্বেই টেলিফোনে এ সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারিত ছিল। তাই বাওয়া মাত্র আমাকে নিয়ে বসান হলো একটি সুসজ্জিত কক্ষে। শিল্পীর কৃতি এ স্থানটির সব কিছুতে পরিস্ফুট দেখতে পেলুম।

কয়েক মিনিট পরেই শ্রীমতী দেবধানী এসে উপস্থিত হলেন নিতান্ত সাদাসিধে পোষাকে। আধুনিক যুগে ঝাঁর উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চিত্ররঙ্গতে আসে—এর ভাল মন্দ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এঁদের কি ধারণা, এ জানাবো ও জানাবো বলেই শ্রীমতী দেবধানীর সঙ্গে আমার এবারকার সাক্ষাৎকার। বাঙ্গালার শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও বড় ইনি। 'এব স্বামী শ্রী এ ডি জি আই. সি, এস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদস্থ কর্মচারী। কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজেই এঁর বৈদ্য ভাগ পড়াশুনো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশুনো করেছেন। উত্তর-কলকাতার রমেশ দত্ত স্ট্রীটে এক অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে এঁর জন্ম। এ সকল দিক থেকে তাঁর চিত্ররঙ্গতে অবতরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বীকার করতেই হবে।

প্রাথমিক নমস্কার আদান-প্রদানের পরই শুরু হলো আমাদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা। শ্রীমতী দেবধানী বলতে থাকেন ১৯৫০ সালে 'বড় বউ' ছবিতে একটি ক্ষুদ্র অংশে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর অনেক ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছি। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা আজ বলা সহজ নয়। তবে এটুকু অবজি বলবো যে 'স্পর্শমণি' ছবিতে কল্যাণীর চরিত্রে রূপদান করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর এবং তৃপ্তিও পেয়েছি সেই পরিমাণে। চলচ্চিত্রে যোগদানের বিশেষ কোন কারণই ঘটেনি আমার জীবনে। তবে ছেলেবেলা থেকে স্কুল ও কলেজে আমি অভিনয় করতুম এবং এ ক্ষেত্র প্রশংসাও পেয়েছি প্রচুর। তাই এমনি 'বড় বউ' ছবির পরিচালক মশাই একদিন যখন অনুরোধ করলেন, আমিও রাজী হয়ে গেলুম। তবে এটুকু বলবো, এ লাইনে আসতে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি কোন দিনই ছিল না এবং আমার স্বামীও কোন দিন আপত্তি করেন নি। চলচ্চিত্রে শিল্পে যোগদানের পর আমার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্তনই আসে নি, এ-ও বলব। আমি আগেও যেমন ছিলুম, এখনও ঠিক তেমনই আছি।

এর পর আমি শ্রীমতী দেবধানীর দৈনন্দিন কর্মসূচীর বিষয় জানতে চাইলুম। তিনি বলে চলেন—সাধারণতঃ আমি একটু ঘেরা করে ঘুম থেকে উঠি। তার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে বেরিয়ে বাই। কোন দিন হয়তো গেলুম বাজারে, কোন দিন হয়তো বা বন্ধু বাছবীদেয় বাড়ীতে। দুপুরবেলা বাড়ীতে ফিরে এসে পড়াশুনো করি। সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে প্রভাত্যই প্রায় বেড়াতে বাই। কখনও বা সিনেমায় গেলুম। 'হাবি'র কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো,

বিশেষ কোন 'হাবি'ই আমার নেই; তবে পড়াশুনো ও ছবি আঁকতে আমি ভালবাসি। এ দুটোকে যদি 'হাবি' বলে ধরেন তাতে আপত্তি করবো না। খেলা-ধূলা সম্পর্কে যদি জানতে চান তবে বলতে পারি যে, টেনিস খেলা দেখতে আমি খুব ভালবাসি। পড়াশুনোর দিক থেকে বলতে পারি, যে পুস্তক পাঠ করলে নোতুন ধারণার জ্ঞান ও শিক্ষা পাওয়া যায়, বার ভেতর যুক্তি ও তর্কের অবতারণা থাকে, সেই সব পুঁথি-পুস্তক পাঠ করতেই আমার ভাল লাগে।

এর পর আমি শ্রীমতী ঝাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলুম। তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, সাদাসিধে ধরণের পোষাকই আমার পছন্দ। কেন না, পোষাক-পরিচ্ছদ এমন হওয়া উচিত নয় যে লোকে আসল মানুষটিকে বাদ দিয়ে তার পোষাকের উপরেই নজর দেয়। আসল কথা হচ্ছে, আসল লোকটাকেই বাড়ে চোখে পড়ে, এমনই সাদাসিধে পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে। জমকাল পোষাক আমি পছন্দ করি না এবং আমার ভালও লাগে না।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকার দরকার, আমি জিজ্ঞেস করলুম। প্রথমেই শ্রীমতী দেবধানী বললেন, অভিনয় দক্ষতা কঠোর এবং সু-চেহারা। ভাল ছবি যদি তৈরী করতে হয় তবে সর্বপ্রথম ভাল 'সিনেরিও' তৈরী করতে হবে। তার পূর্বেই অভিনেতা-অভিনেত্রী সঠিক নির্বাচন। যাকে যে চরিত্রে মানায় তাকে ঠিক সেই চরিত্রটির উপযোগী অংশে নির্বাচন করতে হবে। এ করলে অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয়ও সহজ হয়ে আসে। তার



শ্রীমতী দেবধানী



এভাবে চলচ্চিত্রশিল্পের বহু দিক আলোচনা হ'লো। শ্রীমতী  
খাঁয়ের এ শিল্প সম্পর্কে খুব গভীর জ্ঞান একথা স্বীকার করতেই  
হ'বে। তিনি এ শিল্পের উৎসর্গ সম্পর্কে চিন্তা করে থাকেন।  
এক দাঁতে এ শিল্পের সর্বোচ্চ উন্নতি হয়, এটাই তাঁর কামনা।  
পরিশেষে তিনি বললেন, চলচ্চিত্রের উন্নতি সাধন বর্ষাব্য ভাবে দেশের  
সরকারই করতে পারেন। বললেন আরও—জামি জালা বাথবো,  
ভবিষ্যতে সরকার বাহাতে এ শিল্পের উৎসর্গ সাধনে অগ্রণী হন, তবেই  
দেশে ভাল ভাল ছবি নির্মিত হ'বে।

নির্দিষ্ট।  
কোন কোন মহলে আর একটি ব্যবস্থা বা ব্যবস্থাপত্রের কথা বলা হয়—সেটি হ'ল মনকে সব সময় চিন্তার মধ্যে রেখে দেওয়া। চিন্তায় বাধ্যতি মেন বতটা সহজে কয়েত পারে, হ্রাস পেয়ে বাবে দৈহিক ওজন, অভ্যবহার তেমনটি প্রায়ই সম্ভব নয়। রাজিতে না ঘুমিয়ে কাটাবার চেষ্টা, কাজে অকালে ঘুমে বেড়ান, মাথা গুলিয়ে যায়, এমন কিছুকে হতে দেওয়া শরীরের অস্বাভাবিক নীতি কমাবার জন্তে, এ সব ব্যবস্থার কথাও গুলতে পাওয়া যায়। এগুলো অভ্যসরণ করলে, খাত-নিরন্তরের কড়াকড়ির দিকে ততখানি মনোযোগী না হ'লেও চলতে পারে, এক ক্ষেত্রী বিশেষজ্ঞদেরই এইটি লাবী।





## \* বিজ্ঞান বাস্তা \*

পঞ্চম মিশ্র

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের নিরাময়ের জন্য মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো ইনসুলিন। ইনসুলিন, এর তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্য-ব্যবহার করে ডায়াবেটিস রোগের কারণকে অতি সহজেই সাক্ষ্যের সঙ্গে আয়ত্তাধীন রাখা যায়। কিন্তু ইনসুলিনের একটি বিশেষ অঙ্গুবিধা যে, একে মুখ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, সর্বদাই ইনজেকশন করে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। ঔষধ হিসাবে ইনসুলিনের কার্যকারিতা অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও, কেবলমাত্র এই একটি অঙ্গুবিধার জন্যই বিজ্ঞানীরা এর পরিবর্তে বহুমূত্র রোগের জন্য অন্য নতুন কোন ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। কয়েকটি পদার্থ আবিষ্কৃতও হয়েছে বা মুখ দিয়ে গ্রহণ করলেই রক্তে অবস্থিত শর্করার ভাগ কমিয়ে দেয়, কিন্তু উত্তেজক ও ক্ষতিকারক ক্রিয়ার জন্য তাদের মানবদেহে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। গত মহাযুদ্ধের আগেই জার্মানিতে সিনথেলিন নামক একটি পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল; এর বহুমূত্র রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা চিকিৎসকদের সন্তোষবিধান করলেও, সিডারের উপর ক্ষতিকারক ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসামহলে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। দু'জন জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী নতুন একটি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় বস্তু আবিষ্কার করেছেন যা বহুমূত্র রোগে মুখপুঞ্জের দ্বারা গ্রহণ করলেও ক্ষয়ক্ষতি দেয়। ঔষধটির রাসায়নিক নাম সালফানিলিড এন্ড বুটাইলইউরিয়া; সাধারণ ভাবে এটি বিজেড, ৫৫ নামেই পরিচিত। বিজেড, ৫৫ পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হাসপাতালেই রোগীদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে,—সব জায়গায়ই পাওয়া গেছে একই ফল। তাঁরা জানিয়েছেন শ্রোত্র বরসে যে সব বহুমূত্র রোগী কেবলমাত্র খাদ্য সংরমের দ্বারা রোগকে দমন করে রাখতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে বিজেড ৫৫ অত্যন্ত সুকলসায়ক হবে। কিন্তু কিটোনিউরিয়া নামক জটিল বহুমূত্র রোগে এই ঔষধ ফলপ্রসূ হবে না।

করেকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী কিন্তু বিজেড, ৫৫-এর সাক্ষ্যের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এটি একটি সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ;—রোগজীর্ণির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ার জন্য এই জাতীয় ঔষধের ব্যবহারে ক্ষতি হওয়া উচিত।

সন্দেহকারী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে বিজেড, ৫৫, রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমিয়ে দেয় এবং এছাড়াও নানা প্রকার উপসর্গের উদ্ভব ঘটায়। যদিও আবিষ্কারক বিজ্ঞানীরা, এর ক্ষতিকারক কোন প্রক্রিয়াই নেই বলে দাবী জানিয়েছেন,—তবু এই ঔষধ প্রয়োগের জন্য অ্যালার্জী এবং অন্যান্য উপসর্গের দ্বারা হুঁটি রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। কয়েকটি হাসপাতালে তাই বিজেড, ৫৫কে সামান্য পরিবর্তিত করে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিবর্তিত বৈশিক পদার্থটির নাম প্যারাইটিল সালফোনিল এন্ড বুটাইল ইউরিয়া বা সক্ষেপে ডি ৮৬০। এটি সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ নয় তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এর উপসর্গও অনেক কম হবে। ঔষধটি পৃথিবীর বিভিন্ন হাসপাতালে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার এক প্রধান সমস্যা হলো বাংলাদেশে কলেজগুলিতে উপযুক্ত ল্যাবরেটরীর অভাব। ল্যাবরেটরী নিশ্চয় আছে,—কিন্তু সেখানে স্থানের একান্ত অভাব আর পরিবেশ এতটাই দুর্য্যাকর যে, স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে অবিলম্বে আমূল ক্ষয় প্রয়োজন। উপযুক্ত ল্যাবরেটরী আছে এরূপ কলেজের সংখ্যা আমার মনে হয় খুবই কম। বেসরকারী কলেজের কথা ছেড়ে দিন,—এমন অনেক সরকারী কলেজ আছে যেখানে রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণাগারকে অচ্ছুপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাস্তব চলাচলের পথ একেবারে বন্ধ, কাজের সময় ল্যাবরেটরীর মধ্যে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তা ছাত্রদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। ভারতবর্ষের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীশ্রীয়ারজন রায় তাঁর এরূপ এক সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা আক্ষেপ করে বর্ণনা করছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন কোন একটি সরকারী মহাশুল কলেজে তাদের বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করতে;—অচুতানেব পর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ল্যাবরেটরী তিনি পরিদর্শন করেন। ল্যাবরেটরীর ছুবছটা বর্ণনা করা যায় না, বাইরের বাতাসের সঙ্গে ভেতরের পরিবেশের কোনই সংযোগ নেই। সরকারী কলেজে এরূপ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে সরকারের কর্তব্যে অবহেলা করলেও,—বিদ্যালয় করছেন কি? বাংলার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষা, নিরমকাজনের জন্য প্রয়োগ করে তাঁরা কি এর প্রতিবিধান করতে পারেন না? কলেজ দরিদ্র হতে পারে জিনিষপত্র কম থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে হাতে-কলমে কাজ হবে সেখানকার পরিবেশ নির্মল থাকতেই হবে। নীচু ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো হয়,—‘বাস্তব সম্পদ’। কর্তৃপক্ষেরও এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

আপনারা বোধহয় জানেন পরমাণু শক্তি পরিত্যক্ত ২টি কুন্ডা জাহাজ আমেরিকার নৌবিভাগে ইতিমধ্যেই নির্মাণ করেছেন। কুন্ডা জাহাজ দুটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘নৌটান’ এবং ‘নৌটাক’। সম্ভ্রান্তি নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ পরমাণু-শক্তি চালিত একটি বায়ুজাহাজ নির্মাণ করতে মনস্ত করছেন। জাহাজটিতে বাতীও নেওয়া হবে এবং মালও বহন করা হবে। ১২ জাহাজ টেনে এই জাহাজটিতে বাতী ধরবে ১০০ জন, জাহাজটির নির্মাণ কার্য শেষ হবে ১৯৫১ সালে। এই জাহাজটি নির্মাণ করতে নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষকে আমেরিকার ‘অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন’ সাহায্য করেছেন। জাহাজের শক্তি

সরবরাহকারী অংশ নির্ধারণ করবেন 'এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' এবং অন্যান্য অংশ নির্ধারণ ও তৎসঙ্গে নাবিকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ। উভয় বিভাগের কর্তৃপক্ষই বহুদিন ধরে একযোগে, পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজ নির্মাণের জন্য গবেষণা করছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল আশাশ্রয় হওয়ার মুহূর্তেই সরকার তাঁদের এই জাহাজটি নির্মাণ করবার জন্য ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেছেন। পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজের, সাধারণ জাহাজের চেয়ে কয়েকটি বেশী সুবিধা আছে। সর্বপ্রথম সুবিধা স্থান সরুলান। পরমাণু-শক্তি সরবরাহের বাস্তবিক ব্যবস্থার জন্য তেল বা কয়লার বয়লারের চেয়ে স্থান অনেক কম লাগবে,—তাহাজা বিরাট আলানী ভাণ্ডারেও প্রয়োজন হবে না। বহুরে মাত্র একবার আলানী বদল করলেই জাহাজে শক্তি সরবরাহের কাজ অব্যাহত থাকবে। কতো সুবিধা হবে একবার চিন্তা করে দেখুন,— তেল আর কয়লা গ্রহণ করার জন্য জাহাজকে মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হবে না। আলানী ভাণ্ডার না থাকার জন্য; বাস্তবিক আয়োজন হাঙ্গা হওয়ার বাণিজ্য জাহাজ সমূহ অনেক বেশী মাল বহন করতে পারবে। বন্দরে বন্দরে আলানী সংগ্রহের প্রয়োজন না থাকায় জাহাজ কোম্পানী-গুলি অনেক লক্ষিপু সময়ে মাল খালাস করে লাভবান হবেন।

গোর্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ পর্যবেক্ষণ মন্দিরের পরিচালক অধ্যাপক এন. পি. বারাবাসভ বোখাণ কছেন যে তাঁরা মঙ্গলগ্রহের উপর ১৯৫৬ সালের শেষে একটি উজ্জ্বল অঞ্চল দেখতে পেরেছেন। তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা পূর্বে এরূপ উজ্জ্বল অঞ্চল এসময় আর কখনও দেখেন নি। পর্যবেক্ষণের সময় মঙ্গলগ্রহ তাঁর দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়েছিল, অধ্যাপক বারাবাসভ এর মতে জাহাই কোন বিভীর্ণ অঞ্চলে ভূবারপাতের ভিত্তি, এই অতি উজ্জ্বল মাঝা অংশ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু কারণ কি? এখন তো মঙ্গলের এই মেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল, জুন মাসে হাজার হাজার মাইল অঞ্চলে যে ভূবার জমে থাকে তা হো! সূর্যের কিরণ বতপূর্বেই গলে গিয়েছে। গত আগস্ট মাসেই ঐ বরফের চিহ্নমাত্র ছিল না, সমস্ত স্থান পৃথিবী থেকে দেখাচ্ছিল কালো। পৃথিবীর আরও বহু পর্যবেক্ষণ মন্দিরই তাঁর বিবৃতিকে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু চাই কি কারণে মঙ্গলের বৃক্কের উপর অকালে এই প্রচণ্ড ভূবারপাত হলো তার কারণকারণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

### জোসেফ জন থমসন

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন শতবর্ষ আগে ১৮৫৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ম্যাক্টোয়ের সহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক কল ভারি বাল্যকাল বইয়ের পরিবেশেই কেটেছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ম্যাক্টোয়ের ওয়েনস্ কলেজেতে তিনি ভর্তি হন এবং এখানেই কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষকের সম্পর্কে আসবার তাঁর সুযোগ হয়। এখানে বহু তাঁদের রচনামূলক বিজ্ঞান টমাস বারবার গণিত বিজ্ঞান এবং ট্রিউয়াট পদার্থ বিজ্ঞান পড়াতেন। ট্রিউয়াটের প্রভাবই থমসনকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

কলেজে ভর্তি হবার ২ বছর পরে থমসনের বাবা মারা যান। সু! এক ছোট একটি ভাইকে নিয়ে মাত্র ১৬ বছরের ছাত্র থমসনকে

আর্থিক অনটনে মধ্যে পড়তে হয়েছিল কিন্তু অভ্যন্তর মেধাবী ছাত্র হিসাবে নানা প্রকার বৃত্তি লাভ করে তিনি কৈনরকমে আর্থিক অনাবস্থা কাটিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ২০ বছর বয়সে ১৮৭৬ সালে থমসন ট্রিনিটি কলেজে একজন গবেষক হিসাবে প্রবেশাধিকার পান। ইতিমধ্যেই তিনি রয়েল সোসাইটির মুখপাত্র 'বিদ্যা শক্তি'র উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ১৮৮০ সালে জোসেফ থমসন ট্রাইপস পরীক্ষা সেকেন্ড ক্লাসের হিসাবে উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণা করবার জন্য ক্যাডেন্স ল্যাবোরেটরীতে যোগদান করলেন। লর্ড বালো অবসর গ্রহণের পরে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তরুণ বিজ্ঞানী থমসন ক্যাডেন্স অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। থমসনের পরিচালনায় ক্যাডেন্স গবেষণাগারের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। ১৮৯০ সালে থমসন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের আর একজন অধ্যাপক সার চার্লস প্যাগেটের কতটা মিস বোজ প্যাগেটকে বিবাহ করেন। মিস বোজ প্যাগেটও পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রী এবং তিনি থমসনের প্রথম ছাত্রী গবেষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে 'বিদ্যা' এবং চুখক বিজ্ঞানের উপর সাম্প্রতিক গবেষণা, নামক একটি পুস্তক থমসনের খ্যাতি আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করলো। ইতিমধ্যেই ১৮৯৪ সালে এই খ্যাতিনামা তরুণ বিজ্ঞানী ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির সম্মত পদ লাভ করেছেন। থমসন ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের রয়েল ইনসটিটিউশনের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ক্যাডেন্স অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ট্রিনিটি কলেজের মাস্টারসিপও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে দেশের সরকার থমসনের কাছ সহায়তা চাইলেন এবং তিনি সরকারের শিল্প বিভাগে উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে বুদ্ধ জয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি হন এবং পাঁচ বছর এই পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি সার উপাধি পান এবং সমগ্র জীবনে দেশে-বিদেশে এতো বিভিন্ন প্রকার সম্মান লাভ করেছিলেন তা এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব। ১৯০৬ সালে বিজ্ঞানী থমসন পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

থমসনের করণাসকল আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল অমর করে রাখবে। নেগেটিভ বিদ্যুৎবাহক ভরের অবস্থিতি তাঁর গবেষণার মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে 'ইলেকট্রনের' অবস্থিতি প্রমাণিত করে এই বিজ্ঞানী বর্তমান কালের পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের অজুতম প্রধান ভিত্তি প্রদত্ত স্থাপন করেছেন। একটি বায়ুশূন্য বদ্ধ টিউবের মধ্যে বিদ্যুৎ গুরুত্ব চালিয়ে তিনি ক্যাথোড রশ্মির গুণাগুণ নির্ণয় করেন। এই ক্যাথোড রশ্মি সারিবদ্ধ ইলেকট্রন কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ভর আছে, এই রশ্মি বৈদ্যুতিক এবং চুম্বক পরিবেশে বক্র পথ ধারণ করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাড়াও, বিশুদ্ধ গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানী থমসন কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সার থমসন ছিলেন সঙ্গীতপী, সরল মানুষ। গৃহে কি গবেষণাগারে তাঁর মন বেশীর ভাগ সময়েই গবেষণার চিন্তায় মগ্ন থাকতো, গবেষণাগারে নিপুণ কর্মী তিনি ছিলেন না, কিন্তু বিবর বস্তুর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল প্রবল। তাই তাঁর চিন্তাধারায় পূর্ণ বহু কাজ অল্প বিজ্ঞানীরা সম্পাদিত করেছেন। বিজ্ঞানী থমসন ১৯৪০ সালের ৩০শে আগস্ট, ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

## আরব-ইসরাইল বিরোধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—

ভাষ্যে ইসরাইল গাজা অঞ্চল ও তিরান এলাকা হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করার চারি মাসব্যাপী এক অচল অবস্থার অবসান হইয়াছে। সূর্য্যেজ খাল পরিষ্কার করিবার কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যেজ খাল সংক্রান্ত মূল সমস্যাটি এতদিন ধামা চাপা পড়িয়াছিল। এবার উহা আবার উত্থাপিত হইবে। তাছাড়া ইসরাইল মিশর আক্রমণ করার আরব-ইসরাইল, বিশেষতঃ মিশর-ইসরাইল সমস্যাটা নূতন ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মিশর হইতে ইসরাইলী বাহিনী অপসারণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছয় বার নির্দেশ দেওয়ার পরেও ইসরাইল দীর্ঘকাল এই নির্দেশ যে কারণে অমান্য করিয়াছে, তাহারই মধ্যে এই সমস্যা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি দাবী গাজা অঞ্চলের কামিয়ান হইতে গেরিলা আক্রমণ বন্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয় দাবী শারম-এল-শেখ-এর উপকূল বাহিনীর গোলাবর্ষণ হইতে আকাবা উপসাগরে ইসরাইলের জাহাজ নিরাপন করিতে হইবে। গত ১লা মার্চ (১৯৫৭) ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিসেস গোন্ডা যেইর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ইসরাইলী বাহিনী অপসারণ সম্পর্কে যে-পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, তাহাতে উল্লিখিত সর্ব দুইটির উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিকল্পনা উপস্থাপনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি মিঃ লজ বলেন যে, ওয়াশিংটনে ফরাসী অক্সিনারদের সহযোগিতায় মার্কিন গবর্নমেন্ট ও ইসরাইলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহা হইতে উহা বৃদ্ধা হইতেছে যে, অবিলম্বে সৈন্য অপসারণ করা হইবে এবং উহা সর্ভাধীন হইবে বলিয়া মার্কিন গবর্নমেন্ট মনে করেন না। তাহার এই উক্তির ফলে ইসরাইলী সৈন্য অপসারণ ব্যাপারে নূতন এক বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। মিশর গাজা অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হইতে এই আশ্বাস না পাইলে ইসরাইল সৈন্য অপসারণ করিবে না, এইরূপ আশঙ্কা দেখা দেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হইতে ইসরাইল কোনই আশ্বাস পায় নাই। অবিকল্প আরব রাষ্ট্রগুলি ইসরাইলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী উপস্থাপিত করে। সূর্য্যেজ খাল পরিষ্কারের কাজে মিশর বাধা সৃষ্টিও করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উপেকার বিষয় ছিল না।

ইসরাইল বিনা সন্তোষ সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। ইসরাইলের দাবী সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তো কোন আশ্বাস দেয়-ই নাট, মিশরও কোন আশ্বাস দেয় নাই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইসরাইল যে আশ্বাস পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কি আশ্বাস পাটয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ইসরাইলী সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে মিসেস গোন্ডা যেইর সাধারণ পরিষদে পরিকল্পনা উপস্থাপনের পূর্বে ইসরাইল যে মার্কিন গবর্নমেন্টের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মিঃ লজের উক্তির পর এই আশ্বাস সম্পর্কে নূতন করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ইসরাইল মন্ত্রিসভা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। ২রা মার্চ (১৯৫৭) প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট হইতে ব্যাখ্যা পাওয়ার পর সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২রা মার্চের পক্ষে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বেন গুরিয়নের নিকট কি লিখিয়াছেন তাহা অবশ্য জানিবার



### প্রিপোলালন্দ্র নিয়োগী

উপায় নাই। এ সম্পর্কে গত ৫ই মার্চ মিঃ ডালেস বাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যেসকল সন্তোষীনে ইসরাইল সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হওয়ার কথা ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উল্লেখ করেন মিঃ বেন গুরিয়নের নিকট ২রা মার্চের পক্ষে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাহার সবই মানিয়া লইয়াছেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আরব-ইসরাইল সমস্যা এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন গবর্নমেন্টের আশ্বাসের কথা বিবেচনা করা আবশ্যিক।

গাজা অঞ্চল এবং আকাবা উপসাগর সম্পর্কে ইসরাইলের দাবী যে খুবই সঙ্গত একথা অস্বীকার করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল অয়ুদমান বাষ্ট্র বলিয়াই তাহার শ্রায়সঙ্গত দাবী অজ্ঞার হইয়া গিয়াছে, একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইসরাইল মিশর আক্রমণ করার আক্রান্ত মিশর সমগ্র বিশ্বের সহায়দ্বিত অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে মিশরের বিরুদ্ধে ইসরাইলের কেসটা খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, একথাও অনস্বীকার্য। মিশর ইহার সুযোগ বাস আনা গ্রহণ করিয়া এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে ইসরাইলের কোন শ্রায়সঙ্গত দাবী নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে মিশর কতকটা সাক্ষালাভ করিলেও উহা সত্য নয়। ইসরাইল যে মিশর আক্রমণ করিয়া আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে, একথা কেহ-ই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু মিশর একেবারেই নির্দোষ, একথাও স্বীকার করা অসম্ভব। ইহা অবশ্য সত্য যে, মিশর ১৯৪৮ সাল হইতে সূর্য্যেজ খাল দিয়া ইসরাইলী জাহাজ বাইতে দিতেছে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সূর্য্যেজ খাল দিয়া ইসরাইলী জাহাজ বাইতে না দিয়া মিশর ১৯৪৮ সাল হইতেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। গাজা অঞ্চল হইতে মিশর ইসরাইলের বিরুদ্ধে চালাইতেছে গোয়িলা যুদ্ধ। স্তত্রার ইসরাইল অপেক্ষা মিশর কম আইন-ভঙ্গকারী নয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহ করা হইবে না, একথা প্রত্যেক আরবরাষ্ট্র একাত্রেই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। এ-

বিষয়ে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আরবরাষ্ট্র এবং বাগদাদ চুক্তি বিদ্যোপী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কন্ট্রানিট আক্রমণ নিরোধের জন্য প্রাপ্ত সামরিক সাহায্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে তাহারা তাহাদের অতিপ্রায়ও প্রকাশেই ব্যস্ত করিয়াছে। আরব-ইসরাইল সম্পর্কের এই পটভূমিকাতোই ইসরাইলের দাবীর কথা বিবেচনা করা আবশ্যিক। গাভা অঞ্চল হইতে ইসরাইলী সৈন্য অপসারণের পর উচা যখন পুনরায় মিশরের অধিকারে বাইবে তখন মিশর আবার যে গেরিলা-যুদ্ধ চালাইবে না সে সন্দেহ কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহাণি ইসরাইল তাহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইয়াছে। কর্ণেল নাসের কিংবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেখানে কোন আশ্বাস দেয় নাই, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে আরব তথা মিশরের আক্রমণ হইতে ইসরাইলকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবে, তাহা ভবিষ্যে দেখিবার বিষয়।

মার্কিন গবর্ণমেন্টের নীতি যে ইসরাইল রাষ্ট্রের অল্পকাল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক মনে করেন যে, বাগদাদ চুক্তিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থান হয় নাই বলিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগদান করে নাই। বুটেন, ক্রাপ ও ইসরাইলের মিশর আক্রমণ প্রে: আইসেনহাওয়ার সমর্থন করেন নাই বলিয়াই, মার্কিন গবর্ণমেন্টের নীতি ইহুদী বৈদ্যোদী হইয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার অল্পপ্রবেশ বোধের জন্য হিসাবে প্রে: আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাহার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। জাম ও কুল দুইই বজায় রাখা বড় কঠিন সমস্যা। কেন্দ্রবাহী মাসের শেষ ভাগে মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব এবং জর্ডান এই চারটি আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ কারোতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার বলিয়াছেন, "The United States would have to choose between supporting Israel and being fair to the Arabs before the Arabs could discuss co-operation with the U. S." অর্থাৎ আরবরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারার পূর্বে ইসরাইলকে সমর্থন এবং আরবদের প্রতি ঋয়সস্ত আচরণ এই দুই-এর একটি তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। আরব রাষ্ট্রগুলির কেখানে এইরূপ মনোভাব সেখানে মার্কিন গবর্ণমেন্ট ইসরাইলকে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা কার্যকারী করা বড় সহজ হইবে না। কর্ণেল নাসের প্রকাশে কোন প্রতিজ্ঞা দিবেন, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। তিনি যদি আইভেট কোন প্রতিজ্ঞা দেনও তাহা হইলে তাহার কোনও মূল্য হইবে কি? ইসরাইল তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্র-শক্তিবর্গের চেষ্টার ফলে কর্ণেল নাসের অপ্রকাশ্য কোন প্রতিজ্ঞা বিলোপ উহা কার্যকারী করিবার জন্য গাভাকে বাকার অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে। ইহার অর্থ গাভার স্বাধী ভাবে জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে রাখিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই ধরনের প্রস্তাব পাশ করা বড় সহজ হইবে না। আকাবা উপসাগর দিয়া ইসরাইলী জাহাজ বাইতে না দেওয়ার অধিকার মিশরের আছে কি না, ইহাকে একটি আইনগত প্রে: পরিণত করা বাইতে পারে।

উহা হইবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার্য বিষয়। আকাবা উপসাগর যদি পুনরায় অবরোধ করা হয় তাহা হইলে তৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি মার্কিন জাহাজ প্রেরণ করা হইতে পারে, এইরূপ ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন জাহাজ বাইতে বাধা দেওয়ার পরিণাম গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মিশর হইতে ইসরাইলী বাহিনী সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইসরাইলকে মার্কিন গবর্ণমেন্ট যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহাতে আরব-ইসরাইল সমস্যা গ্রহণ করিয়াছে নতুন রূপ। এই আশ্বাসের প্রতিজ্ঞা আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের উপর কি ভাবে হইবে তাহা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। ইসরাইলী সৈন্য অপসারিত হওয়ার সন্দেহ সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেসমস্যা লইয়া এত কাণ্ড ঘটান গেল সেই সুরেজ সমস্যার সমাধান এখন কতদূরবর্তী তাহা অনুমান করা কঠিন। অন্তর্কর্তী কোন সমাধানও এখন পর্যন্ত দৃষ্টগোচর হইতেছে না। অন্তর্কর্তী কালের জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে সুরেজ খালের শুষ্ক অর্ধেক মিশরকে এবং অর্ধেক বিশ্বব্যাপ্ত জমা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ, মিশর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মিশরের আল আহরাম পত্রিকার বলা হইয়াছে যে: বৃটিশ ও কবানী জাহাজ যে-পর্যন্ত মিশরকে শুষ্ক দিবে এবং খাল চলার সময় মিশরের আইন মানিয়া চলিবে সে পর্যন্ত উহাদের জাহাজ সুরেজ খাল দিয়া বাইতে দেওয়া হইবে। ইসরাইলী জাহাজ বাইতে দেওয়া হইবে কি না সে সম্পর্কে কর্ণেল নাসের এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

### স্বাধীন বনা রাষ্ট্র—

আফ্রিকার অন্ততম বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ড কোস্ট পূর্ব নির্ধারিত কর্তৃত্বী অনুযায়ী গত ৬ই মার্চ (১৯৫৭) স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নতুন নামকরণ করা হইয়াছে 'বনা'। প্রাচীন কালে বনা ছিল আফ্রিকার একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য। আফ্রিকার সমস্ত সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল এই বনা সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য হইতেই গোল্ড কোস্টের অধিবাসীরা উদ্ভূত হইয়াছে, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আফ্রিকার যে অঞ্চলকে সাধারণ ভাবে গোল্ড কোস্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা একটি জাতি বারা অধ্যুষিত রাজ্য নহে এবং সমগ্র অঞ্চল এক সময়ে বৃটিশের অধীনেও আসে নাই। এখানে আয়াদের স্থান এত অল্প যে, গোল্ড কোস্টের অতীত ইতিহাস সন্দেহেও উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না। সাধারণ ভাবে বাহাকে গোল্ড কোস্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা (১) গোল্ড কোস্ট উপনিবেশ, (২) অশান্তি, (৩) অজ্ঞাত উত্তর রাজ্য এবং (৪) বৃটিশ ট্রাষ্টশিপের অন্তর্গত টোগোলাণ্ড এই চারটি পৃথক অঞ্চল বা রাজ্য লইয়া গঠিত। বুটেন গোল্ড কোস্টের অংশ হিসাবেই টোগোলাণ্ড শাসন করিত। যখন গোল্ড কোস্টকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন টোগোলাণ্ডও সম্পর্কে এই প্রস্তাব করা হয় যে, টোগোলাণ্ডও হয় স্বাধীন গোল্ড কোস্টের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না হয় বৃটিশ ট্রাষ্টশিপের অধীনেই থাকিবে। তদনুসারে গত মে মাসে (১৯৫৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে টোগোলাণ্ডও গণভোট দ্বারা স্বাধীন। সংবাদপত্র

জনমত স্বাধীন গোষ্ঠ কোর্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সমর্থন করে।  
অতঃপর জুলাই মাসে (১৯৫৬) ইন্ট্রিশিপ কাউন্সিলে সম্মিলিত  
জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অছিগিরির  
অবসান ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ভারতের  
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদও উহা অনুমোদন করে।

দুই শত বৎসরেরও অধিককাল ব্রিটিশের অধীনে থাকিয়া গোষ্ঠ  
কোর্ট স্বাধীনতালভ করিল। উহার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও  
খুব পুরাতন নহে। এই প্রসঙ্গে কেনিয়া ও সিন্ধাপুরের কথা স্বতঃই  
মনে পড়ে। ব্রিটিশ গায়েনার জনগণের আত্মভাঙন ময়িলতাকে  
উৎখাত করিতেও আমরা দেখিয়াছি। কাজেই মাত্র ১০ বৎসরের  
আন্দোলনের কালে গোষ্ঠকোর্টের স্বাধীনতালভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের  
ইতিহাসে অতীব বসিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক  
ক্ষেত্রে উহাকে বিশেষ ভাবে প্রচার করা হইতহে, ইহাও লক্ষ্য করিবার  
বিষয়। ১৯৫০ সালের শাসন সংস্থারে গোষ্ঠকোর্ট আভ্যন্তরীণ  
ব্যাপারে অনেকখানি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৯৫৬ সালের  
১১ই মে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সচিব কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে,  
সাধারণ নির্বাচনে গঠিত আইন সভায় ব্রিটিশ কমন্সওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত  
থাকিয়া স্বাধীনতা দাবী করিলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাহা মানিয়া লইবেন  
এবং স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হইবে। জুলাই মাসে  
(১৯৫৬) অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কন্ডেনশন পিপলস্ পাটি  
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নতুন আইন সভার প্রথম অধিবেশনেই  
ব্রিটিশ কমন্সওয়েলথের অধীনে স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত  
হয়। অতঃপর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৭ সালের  
৬ই মার্চ গোষ্ঠকোর্ট ব্রিটিশ কমন্সওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া  
স্বাধীনতা লাভ করিবে। তদনুসারেই গোষ্ঠকোর্ট স্বাধীনতা  
লাভ করিয়াছে। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বন্য ব্রিটিশ কমন্সওয়েলথের  
অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং ইংলণ্ডের রাণী হইবেন উহার অধীশ্বরী।

চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল লইয়া বন্য রাষ্ট্র গঠিত হইলেও উহার  
শাসন ব্যবস্থা ফেডারেল না করিয়া ইউনিটারী করা হইয়াছে।  
ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ফেডারেশনের বিরোধী কেন তাহা অবশ্যই ভাবিবার  
বিষয়। বিরোধীদল উত্তর আয়র্লণ্ডের পার্লামেন্টের মত  
ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদ দাবী করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক  
পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার ক্ষমতা বিশেষ  
কিছুই নাই। বন্য রাষ্ট্র চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল লইয়া গঠিত  
বলিয়া আঞ্চলিক আশঙ্কা, সন্দেহ ও বিভ্রান্ত বর্ধান রহিয়াছে।  
এই সকল আশঙ্কা ও সন্দেহ নিরূপণের জন্য শাসনতন্ত্রে সংশোধন  
এবং আঞ্চলিক সীমারেখা পরিবর্তন সম্পর্কে খুব জটিল বিধান করা  
হইয়াছে। বন্য ব্রিটিশ কমন্সওয়েলথেও অধীনে স্বাধীনতা লাভ করিলেও  
উহার অভ্যন্তরে যে বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধান হওয়া বড়  
সহজ হইবে না। বিশেষতঃ শাসন ব্যবস্থা ইউনিটারী হওয়ার  
বিভিন্ন ও বিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আরো উপেক্ষার বিষয়  
নয়। বন্যর প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নুফুয়া যদি উল্লার সৃষ্টিজন্মের সহিত  
শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করিতে পারেন তাহা হইলেই উক্ত আশঙ্কা,  
সন্দেহ ও অন্তর্বির্ষাধ খুব করিয়া উহাকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত  
করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রিটিশের প্রভাব বড় দিন থাকিবে  
তত দিন উহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

# বহুমুদ্র

## আরোগ্য হয়

প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুদ্র  
(DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক  
রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে  
মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়  
করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা  
নিঃসরণ বন্ধ থাকে। ব্যতীত, বিশেষ কোন দ্বারী ফল পাওয়া  
যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক  
পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাসমৃদ্ধ প্রস্রাব এবং চুলকানি  
ইত্যাদি। রোগের লক্ষণ অবদার কারবাকল, কৌড়া, চোখে  
ছানি পড়া এবং অত্যন্ত জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন হুনানি মতে চুলকিত  
ভেজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করে  
হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।  
ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই  
প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব  
কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ  
অধেক সেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া  
সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে  
বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্য লিখুন।  
৫০টি বটিকার এক শিশির নাম ৬৫০ আনা, প্যাকিং  
এবং ডাক মাস্তুল ক্রী। নিয় ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B.M.)

৬-এ, কানাই শীল স্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

## ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা—

ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যা যে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যার বর্ণনা স্বল্পপটী ব্যুত্থিয়া উঠা সম্ভবী খুব কঠিন ইচ্ছা পড়িয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) প্রেসিডেন্ট সুরেকর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠকে একাংশ দেশব্যাপী বেতার বক্তৃতায় ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রকারে এক নতুন ধরণের গবর্ণমেন্ট গঠনের সময় আসিয়াছে। তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ার জনগণের উপযোগী নয়। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আদর্শ অমুখ্যারী পাশ্চাত্য গণতন্ত্র 'সত্যিকার গণতন্ত্র' নয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা। তিনি বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি বাতিল করিয়া সমস্ত দলের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন এবং একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। বাহানিগকে লইয়া এই জাতীয় পরিষদ গঠিত হইবে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁহার এই নতুন পরিকল্পনার ভাণ্ড্যো কি ঘটবে তাহা বলা কঠিন। মাসজুম্বী দলের পার্লামেন্টারী নেতা ডাঃ ব্যুহানুদীন এক পাশ্চাত্য প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে ডাঃ হাতার প্রধান মন্ত্রির পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা এবং একটি প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব আছে। নাহ্‌লভুল উলেনা পাটি ডাঃ সুরেকর্ণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মূল কোথায় ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

সুমান্দ্রায় বিদ্রোহ হইতেই যে এই সঙ্কটের সূত্রপাত একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৬) সামরিক অফিসারগণ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ সুমান্দ্রা দখল করিয়া যসেন। তাহাদের অভিযোগ এই যে, সুমান্দ্রার এই তিনটি অঞ্চলকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় নাই। সুমান্দ্রার এই বিদ্রোহের ফলে মাসজুম্বী পার্টির সমস্তরা নেশনালিষ্ট মাসজুম্বী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হইতে সরিয়া আসেন। ইহাতে মন্ত্রিসভা যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাঃ শাস্ত্রামিত্তার মন্ত্রিসভা এখনও টিকিয়া আছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শাস্ত্রামিত্তা পার্লামেন্টে এই প্রতিক্রিয়া দেন যে, সকল প্রদেশকেই স্বায়ত্তশাসন বাপক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। গত ২রা মার্চ একটি সামরিক গবর্ণমেন্ট পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার শাসনকর্ত্ত্ব দখল করিয়াছেন। পূর্বে ইন্দোনেশিয়া বলিতে সেলিসি, মোলাকাস এবং লোম্বারসুপ্রা বীপগুলিকে বুঝায়। গত ডিসেম্বর মাসে সুমান্দ্রা কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পূর্বে ইন্দোনেশিয়াও আওতার বাহিরে চলিয়া গেল। তাহাদের দাবীও পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের আধিকার। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রহিয়াছে শুধু জাভা এবং ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও।

সুমান্দ্রা ও পূর্বে ইন্দোনেশিয়া যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী

করিতেছে তাহা নয়। কিন্তু এই সকল দাবীর মূলে বিদেশী উপস্থানীয় রহিয়াছে কি না, থাকিলেও কতটুকু রহিয়াছে তাহা বলা কঠিন। ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান-প্রধান হইলেও ইন্দোনেশিয়ায় এখনো ইসলামী রাষ্ট্র বলিয় ঘোষণা করেন নাই। ভারতের সহিত ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রী সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়। এই সকল কারণে কতগুলি বিদেশী রাষ্ট্র যে ইন্দোনেশিয়ার গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করার পর হইতে ইন্দোনেশিয়া সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা বড় কম করা হয় নাই। ওয়েস্টারলিংয়ের বিদ্রোহের আগুন আল্লাইবার চেষ্টার কথা আমরা সকলেই জানি। দারুল ইসলামও একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। সেলিসি ও মোলাকাসে আরও একবার অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া এই সকল সঙ্কট পাড়ি দিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সমস্যাও বড় কম নয়।

বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী ছোট-বড় তিন হাজার বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র। কাজেই ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিকে অনেক দূরে দূরে স্থাপন করিতে হয়। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীকে সংস্কার করিয়া উঠাকে অসংহত বাহিনীতে পরিণত করিবার চেষ্টা লইয়া রাজনীতিকদের সহিত সেনাবিভাগের সংস্কারপন্থীদের মতভেদ ১৯৫২ সাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ডাঃ সোয়েকর্ণ সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ পদের জন্য শাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন সেনাবাহিনী তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। সবার বিভাগের চাপে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রামিত্তাকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরে যিনি প্রধান মন্ত্রী হন তিনিও বেশী দিন টিকিতে পারেন নাই। মিঃ শাস্ত্রামিত্তা আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। কিন্তু মত-বিরাগটা চলিতেছেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ কুসলাম আবদুল গণিকে তাঁহার সুরেজ সন্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে এরিয়া আর্মি কমান্ডারের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর অল্পবয়সে চীফ অব ষ্টাফের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ হইতে ডাঃ হাতার পদত্যাগ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি সুমান্দ্রার অধিবাসী। কিন্তু সুমান্দ্রার ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা উল্লেখযোগ্য ডাঃ হাতার চেষ্টাতেই ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহাকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা সাক্ষ্যমণ্ডিত হওয়ার আশা খুব কম। সাধারণ নির্বাচন এবং নতুন গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল অবস্থা হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই। গণপরিষদের পাঁচশত সদস্য যেখানে ৩০টি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত সেখানে সমস্যা বড় সহজ নয়। ইন্দোনেশিয়া মুসলিম রাষ্ট্র হইবে, না, লৌকিক রাষ্ট্র হইবে এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয় নাই। তারপর আছে ইন্দোনেশিয়া ফেডারেল রাষ্ট্র হইবে, না, ইউনিটারী রাষ্ট্র হইবে। এই প্রশ্নটির সহিত সুমান্দ্রা ও পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলীর সম্পর্ক খুব নিবিড় বলিয়াই মনে হয়।

# সাময়িক প্রেক্ষাপট

## ছাত্রদের দাবী

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে—কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীকে ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগকে অনুরোধ

করা হইয়াছিল, তাহারা যেন ছাত্রদিগের জন্য কিছু অল্পমূল্যে মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা করেন। উক্ত স্থান হইতেই জানান হইয়াছে—তাহা হইবে না। আমাদের মনে আছে, এককালে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী ছাত্রদিগের জন্য অশেষ্কাকৃত অল্প মূল্যে টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন—পশ্চিম বঙ্গ সরকারই যখন এ বিষয়ে বণিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তখন সে জন্য বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর নিষ্পত্তি করার সার্বভৌমতা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যে স্থানে পরমার্থ সে স্থানে—শিক্ষার বিস্তার জন্য প্রচেষ্টার স্থান কোথায়। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীতে যাত্রীর ভীড় যে অত্যন্ত আপত্তিকর তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই অভিযোগ হইতে সরকারের পরিবাহন বিভাগও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। এক্ষেত্রে “যে বাস লক্ষ্য—সেই হয় বাস।” মনে হয়, এ বিষয়ে পুলিশের অর্থাৎ সরকারের কোন কর্তব্য নাই। অত্যন্ত সভ্য দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বসনে ভীড় নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কলিকাতার তাহাই নিয়ম।”

—দৈনিক বঙ্গবন্ধু।

## পাকিস্তানের মাছ ও ডিম

“ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় মাছ ও ডিম প্রভৃতির আমদানী বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইবার কথা নয়। কিন্তু কার্য্যকারণে পূর্ববঙ্গ হইতে মাছ ও ডিমের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে এবং ফলে কলিকাতার বাজারে মাছ ও ডিমের মূল্য কিছু দিনের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে। নতুন বাণিজ্য চুক্তির পরে পূর্ববঙ্গ সরকার মাছ-ডিম চালান দেওয়ার লাইসেন্সের বিধি ব্যবহার বেশ কিছু পরিবর্তন মানন করিয়াছেন। দুইটি নির্দিষ্ট পথ (গোয়ালন্দ ও সিরাঙ্গগঞ্জ) ছাড়া মাছ-ডিম আসিতে পারে না। টাকার আলান-প্রদান ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করিতে হইবে। ইহার ফলে মাছ-ডিম নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে খরচ বেশী হয়, বিলম্ব হয়। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা দিবার ব্যবস্থা হওয়ার ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের ব্যবসার চালানো সম্ভব হইতেছে না। কলিকাতার চাহিদার একটা বড় অংশ পূর্ববঙ্গের মাছ ও ডিম মিটিয়া থাকে। বাণিজ্য চুক্তিতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, উক্ত রাষ্ট্র পারস্পরিক আমদানী-রপ্তানি ব্যাপারে

সুস্থদন বাজারের অধিকূল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিবে। পূর্ববঙ্গের মাছ ও ডিম কলিকাতায় আমদানী ব্যাপারে যে অন্তর্বিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করার জন্য ভারতের দিক হইতে কোনও কিছু করা সম্ভব নয় কি?”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সেদিন পরীক্ষাদম্ভের ফী হইতে সংগৃহীত টাকার একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির মধ্যে বিতরণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা খুব সঙ্গত হইয়াছে। ফী বাবদ পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের কত অংশ ঠিক কি কি উদ্দেশ্যে অনুমোদিত কলেজগুলিকে দেওয়া হইবে, সে সবক্ষে বিস্তারিত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেওয়া হইয়াছে সিণ্ডিকেটের উপর। প্রস্তাবটি উপাধীন করিয়া ছিলেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফী বাবদ সংগৃহীত অর্থের দশমাংশ কলেজগুলির গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতির উন্নয়ন কাজে যেন ব্যয়িত হয়। সিণ্ডিকেট ঠিক এই এই দফায় অর্থব্যয় অনুমোদন করিবেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু যে যে বিষয়ে ব্যয়ের কথা প্রস্তাবক তুলিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে ব্যয় হইলে কাহারও আপত্তি করার বোধ হয় কোন কারণ থাকিবে না। বাহা হউক, অনুমোদিত কলেজগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের এই নতুন প্রস্তাব কার্য্য রূপায়িত করার ক্ষমতা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতে, তখন এই ব্যাপারে কোন বাধ উপস্থিত না হইবার কথা। সেনেটের সদস্যগণের বক্তৃতার প্রকাশ যে, বিশ্ববিদ্যালয় আই-এ, আই এম-সি, বি-এ, বি এম-সি, বিস্কা প্রভৃতি পরীক্ষার ফী বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন। ইহার একটা অংশ কলেজগুলিকে দিলে ভ্রাতৃসঙ্গত কাজ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সময় অনুমোদিত কলেজগুলি নিজস্বের মধ্যে অন্তর্বিধা সম্বন্ধে পূর্ণ সহযোগিতা দান করি আসিতেছে। সুতরাং তাহারা পরীক্ষার ফীর একটা অংশ লা করিতে পারে, ইহা বলিলেও বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাও ত বলিয়া মনে হয়। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট যদি পৌনে ৮১ টাকা উন্নত থাকে, তবে ফী বাবদ সংগৃহীত অর্থের সমস্তটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ব্যয়ের জন্য লাগিবে না বলিয়াই ধরিয়া ল



বাঁহতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সেসেটের প্রত্যাশ সর্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য।” —মুদ্রাস্তর।

### নেতাজী এখন কুশিয়ার আছেন

“বিজ্ঞানগোষ্ঠী” পত্রিকা হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা, হিন্দুস্থানে (হিন্দী) গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে একটি চাক্ষু্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদের শিরোনাম—“নেতাজী জল ঘেঁষা হারা।” সংবাদটি আদিয়াছে পূর্ব পাঞ্জাবের কপূরথলা হইয়া, জলদ্রব হইতে। সংবাদটি নিম্নোক্ত, আজাদ হিন্দ কৌত্তের একজন পাঞ্জাবী সৈনিক। ইনি দীর্ঘ এগার বছর পরে সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশ, নেতাজী এখন কুশিয়ার আছেন। চীন এবং কুশিয়া—উভয় দেশেই তিনি বাতায়িত করিতেছেন। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি ভারতে ফিবেন যদি বৃদ্ধ লাগে অস্ত্রা আগামী অক্টোবরে আশু প্রকাশ করিবেন, কারণ, এই সময়ে বাংলা বৎসর পূর্ণ হইবে এবং মুদ্রাপ্রাধিকরণে তাঁহার বিচারের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। আজও তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রাপ্রাধিকরণে গণ্য।”

—সেমিনীপুর হিটেরী।

### বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি

“প্রাচ্য জাতি মূলত নয় মায়া, বেহ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি জ্ঞানের দুল বৃত্তিগুলিকে দমিত বা অবজ্ঞা করিয়া দুর্বল চিত্ত ও জীবনের জন্মে হাফা হইয়া বাইতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার যোহে আমরা জীবনের পূর্ণতাকে পশু করিয়া বার্ষিকের ইহকালবানী হইয়া পড়িয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশে সত্যতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে সর্বজনের, সর্বকন্দের মধ্যে। সম্প্রতি সরকার গতানুগতিক পন্থা বাদে বুনিয়াদি বিভাগের নামক এক অভিন্ন প্রণালীর শিক্ষাধারা প্রবর্তন জরু চেষ্টা হইতেছেন ইহা অবশ্য মন্দের মধ্যে আশার কথা। প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের মানসে সরকার অবহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে যে ২১ হাজার প্রাথমিক বিভাগের ৩০০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিভাগের আছে তাহাই যথেষ্ট কি আরও করা প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান করিতে মনস্ত করিয়াছেন। আশার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার বার্তাও ঘোষিত হইতেছে শিক্ষার ব্যয় বাহুল্যের কথা শুনিয়া। বিরাট বিরাট অঙ্কের অর্থসংখ্যা বাহা সাধারণ অবস্থার সঙ্গে আসে অসম্ভব মনে হইতেছে। মনে হয় যেন শিক্ষা প্রদানের নামে শিক্ষাকে সন্ধ্যাট করাই বাহা করা হইতেছে। প্রতি বৎসরই শিক্ষা ব্যয় ক্রমোন্নতি, অর্থ ভবিষ্যতে শিক্ষা, বিশেষ উচ্চশিক্ষা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হইবে অর্থ ব্যয়ের দিক হইতে। এ অবস্থার সাধারণ অর্থ জ্ঞান যেমন বাই কর্তৃক অর্থনৈতিক করা হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও এই ভাবে অর্থনৈতিক করিলে তবেই কতকটা শিক্ষাবিভাগের আশা করা বাইতে পারে। উচ্চশিক্ষা বাহার আর্থিক সামর্থ্য কুলাইবে সে উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে। তাহা হইলেও বাই কর্তৃক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জরু বিশেষ বৃত্তি বা অর্থনৈতিক উচ্চ শিক্ষালাভের প্ররোণ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। গভীর চিন্তার বিষয়, বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুস্তক ব্যবসাকে কতকালে বহুতে পাইয়াও দেশের জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্যের কথা একবারেই চিন্তা

না করিয়া পুস্তক নির্বাচন, পরিবর্তন, পরিবর্তন করিয়া দেশ মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কি লোকসমকে ক্রমে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন না? আমরা এ বিষয়ে বিভাগের কর্তৃপক্ষকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি।”

—নারায়ণ (কাঁধি)

### সাবেক খতম

“আধুনিক ও প্রগতিব মুগে সাবেক পন্থা প্রায় সব অচল। তাই ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার মূল বা কুশল স্বরূপ পঃ মন্দের অস্ত্র জেলার কথা বাদ দিয়া শুধুমাত্র কলিকাতার শিষ্টাঙ্গলসহ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর কোর্টে ২২টি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনপত্র দাখিল হইয়াছে। এই সব মামলা ১৯৫৬ সালের মার্চমাসের পর্যন্ত ১৩টা খারিজ, ২৫টা বিচ্ছেদ মঞ্জুর এবং ৩টি ক্ষেত্রে আপোষ মঞ্জুর হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে। এই সব আবেদনের অধিকাংশ মোকদ্দমাই হয় ধনী নয় মধ্যবিত্ত সঙ্গার হইতে দায়ের করা হইয়াছে এবং আবেদনকাগিপত্রের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই অধিক। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আবার মাস্তাত আমলের পরসা, আনা তুলিয়া দিয়া নয় পরসা প্রবর্তিত হইবে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর প্রায় ৭৫ ভাগ রাষ্ট্রে এই দশমিক মুদ্রার প্রচলন আছে। নয় পরসা প্রচলিত হইলে হিসাব নিকাশের যেমন সুবিধা হইবে তেমনি ছাত্রেরা ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের হিসাব নিকাশ করার সুবিধা হইবে। অবশ্য এই নয় পরসা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুরাতন পরসাগুলি বন্ধ হইয়া বাইবে না এবং এইগুলি তিন হইতে চারি বৎসর পর্যন্ত বাজারে চালু থাকিবে। অবশ্য প্রথমে এই নয় পরসা প্রচলনের ব্যাপারে হাটে বাজারে অন্তর্বিধা দেখা দিবেই। কিন্তু জনসাধারণ ১লা এপ্রিলের পর হইতে বস্ত্র শীত পুরাতন মুদ্রার বিনিময়ে নতুন মুদ্রা বদল করিয়া লইতে পারিবেন খুচরা মুদ্রা বিনিময়ের অন্তর্বিধা তত শীঘ্রই দূর হইবে। চারি আনা মূল্যের কম পরিমাণ মুদ্রা ভাঙাইতে গেলেই আনার হিসাবে ও দশমিকের হিসাবে বিনিময়ের গোলযোগে লোকসানের বা লাভের প্রশ্ন আসিতে পারে কিন্তু একসঙ্গে চারি আনা মূল্যের বর্তমান মুদ্রা বিনিময় করিয়া ২৫টি নয় পরসা লইলে আর কোন অন্তর্বিধা থাকিবে না। আবার আগামী ২২শে মার্চ হইতে ভারত সরকার নতুন পত্রিকা প্রবর্তন করিতেছেন। তাহাতে ১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ, বাংলা ১৩৬৩ সালের ৮ই চৈত্রকে ১লা ধরিয়া নতুন ১৮৭৩ শব্দক আরম্ভ হইবে। ইহাতে ইরাজী তারিখের কোনরূপ অনলবদল হইবে না এবং পূর্বাবির ছুটি বৈশাখ চলতি আছে সেইরূপ চলিতে থাকিবে। তবে ইরাজী বৎসরের ভার শব্দক ৩৬৫ দিন এবং সিংহহার ৩৬৬ দিনে বৎসর হইবে এবং সিংহ ইহারে চৈত্র মাস ৩০ দিনের বদলে ৩১ দিনে হইবে। তাই বলিতেছিলাম সাবেক খতম”।

—প্রকাশ (সেমিনীপুর)



### গুপ্ত-বিবাহ

“কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সর্বজন-প্রিয় শ্রীহরিশাধন ঘোষ-চৌধুরীর একমাত্র পুত্র জীমান অশোককুমার ঘোষ চৌধুরীর সঙ্গে হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীহরিশাধন বহুর চতুর্থ কন্যা জীমতী স্মৃতি (হৈমবতী) গুপ্ত-বিবাহ গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীবহুর রামকৃষ্ণপুরস্থ ভবনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে কমিশনার শ্রীঘোষ-চৌধুরীর কীট প্রীটস্থ ভবনে বৌভাত ও প্রীতিভোজ সাড়বরে অয়োজিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কমিশনার শ্রীঘোষ-চৌধুরীর গৃহে সমবেত হইয়া প্রীতি অমুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকণীড়রণ চক্রবর্তী, সার এস এম বহুর, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সার বীরেন মিত্র, সার বীরেন মুখার্জী, লেডী রাণু মুখার্জী, বিচারপতি হমাপ্রসাদ মুখার্জী, বর্ধমানের মহারাজা ও মহারানী, সন্তোষের রাজা ও রাণী, সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারানী স্মৃতি ঠাকুর, বিচারপতি ডি এন সিংহ, বিচারপতি এস এন গুহরায়, লর্ড সিংহ, শ্রীমহেশচাঁদ খান্না, জীমতী খান্না, জীকালীশ মুখার্জী (মন্ত্রী), ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি পি বি মুখার্জী, মাসিক বহুমুখী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীএম এন রায়, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীএম এম বহুর, ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীচীরেন্দ্রনাথ সরকার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডি আই জি, শ্রীপ্রবন্ধকুমার সেন, ডেপুটি কমিশনার শ্রীব্রজীত গুপ্ত, শ্রীডি এন জালান, শ্রীলটজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (রেজিষ্টার হাইকোর্ট), ক্যামেরিকার কনসাল জেনারেল, জার্মান কনসাল জেনারেল, ফ্রেন্স কনসাল জেনারেল, নেপালের কনসাল জেনারেল, কলিকাতা পুলিশের পদস্থ কর্মচারী ও ডেপুটি কমিশনারগণ এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

### অঙ্ককার

“সামাজ্য কয়েক বৎসরের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার সমাজ ও রাষ্ট্র নততা, সামুদ্রা ও সভ্যবাদিতা নিত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ আজ আর এগুলির দ্বারা কিছুমাত্র চিন্তা করে না। দেশের মানুষকে ইহা মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে যে, কে কোন উপায়ে অজ্ঞিত অর্থ হউক না কেন, অর্থ না থাকিলে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোন অধিকার অর্জিতে পারে না। সত্যতা, সামুদ্রা, সভ্যবাদিতা লইয়া যদি থাকিতে হয় তবে তাহাকে টাকার পাছাডের তলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে। ততঃ মাছুষও দেশের হাওয়া বুঝিয়া টাকা অর্জনের দিকে মন দিয়াছে এবং তাহাদের টাকা অর্জনের প্রতিযোগিতায় সর্বস্তরের লোক আজ দ্রুত হাং, হুঁশা ও গাড়ির অডল তলে ডলাইয়া



শ্রীঅশোককুমার ঘোষ-চৌধুরী ও জীমতী স্মৃতি (হৈমবতী) দেবী

বাইতেছে। অথচ নেতারা মুহুমুহ নতুন ধাঁচের সমাজতন্ত্রবাদের বাণী শুনাইতেছেন এবং সেই বাণী বিচিত্র করিয়া আচ্ছাদিত কতকগুলি দৈনিক সাবাদপত্র প্রচার করিতেছে। বাহার সামান্য দৃষ্টিশক্তি আছে তিনিই আজ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে নির্বাকনে টাকার বিঘট খেলা চলিয়াছে। অর্থ আমদানীর বিঘাষ নাই। বাহায়া অর্থের বিকল্পে নিজ নিজ দলের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর ভরসা করিয়া প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে অর্থ-শক্তি আজ গুণাসের নিকট প্রধান প্রতিবন্ধক। অর্থ আজ সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে এবং অর্থব্যয় না করিতে পারিলে কোন কিছুই সম্ভব সম্ভবণ হয় না। দরিদ্র ও অজ্ঞ দেশে অর্থ-শক্তি আজ মহাশক্তি হইয়া কাঁড়াইয়াছে এবং এই শক্তির এক তরফা বিঘট খেলাই চলিয়াছে। মিথ্যার অনুরূপ ভাষা এবং নির্জলা মিথ্যার জয়গান অধিকাংশ দৈনিকের পাতা পূরণ করিয়া তাহা এ দেশে বর্তমানে মানুষের সাবাদপত্র পাঠের স্পৃহা দূর করে। সত্যতা ও সাদৃশ্যের আশ্রয় লইতে মানুষ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠে। কুনীতিপরায়ণ ও অসংযুক্তির দাপটে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সত্যতা দেশের বর্তমান সময় একটা অন্ধকারময় যুগ। জনসাধারণকে এই অন্ধকার যুগে খাতের নামে অখাত খাইতে হইতেছে, ঔষধের নামে রত্ন জল সেবন করিতে হইতেছে, জুখের নামে মিক পাউডার খাইতে হইতেছে, কল্যাণকর আইন অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে, সরকারী ও বেসরকারী শোষণের পরিমাণ ও পরিধি দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে, শিক্ষার নামে অশিক্ষা কৃশিকা গ্রহণ করিতে হইতেছে, স্বাস্থ্যের নামে স্বজন শোষণের পথ প্রশস্ত হইতেছে, চোর কারবারী, কাকিবাড়, দুব আদারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তথাপি বলা হয় যে নতুন ধাঁচের সমাজতন্ত্রবাদ দেশে আসিয়া গেল। মানুষ কিন্তু ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে!

—জিজোতা মলপাইজর্জ—

## শোক-সংবাদ

এলাহাবাদ নিবাসী কৃত্তী বাঙালী সাংবাদিক কিশোরীন্দ্রনাথ মিত্র ২৮এ মার্চ মাত্র ৪১ বছরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মারা, মনোহর কচাণী ও মনোরমা নামক পত্রিকাভ্রমের ইনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলা দেশের শিশুসাহিত্য জগতের একজন প্রধান স্তম্ভ শ্রুতি সুনির্মল বহু ১৩ই ফাল্গুন মাত্র ৫৬ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে পরলোকগমন করেছেন। ইনি দেশবরেণ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতায় দৌতিয়া ছিলেন ও এর প্রকৃত নাম ছিল নির্মলচন্দ্র। জীবনের অধিকাংশ সুনির্মল অতিবাহিত করে গেছেন সাহিত্যের সেবায়। গত পঁচিশ-তিনিশ বছর ধাবৎ বাঙলা সাহিত্যকে ইনি ভরিয়ে দিয়ে গেছেন অজস্র অবদানে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, প্রকৃতি সকল বিভাগেই ছিল এর অসামান্য দক্ষতা। কিছুকাল আগে ছোটদের চরমিকা ও ছোটদের গল্প সংকলন নামে দুটি সংকলন গ্রন্থও সম্পাদন করে গেছেন। এর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দুই শত। সম্প্রতি কবিকে 'ভূবনেশ্বরী পদক' উপহার দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সুনির্মলের আত্মিক প্রাণে বাঙালার শিশুসাহিত্যের আকাশ থেকে একটি রশ্মিমান তারকা নিবে গেল।

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি তারকদাস বসুপাধ্যায়, এম-এল-সি গত ১৪ই ফাল্গুন ফুলিয়ার কাছে জীপ দুর্ঘটনায় পরলোক বাত্না করেন। ইনি ছাত্রাবস্থা থেকেই দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও জীবনের একটি দীর্ঘ অংশ কারাগারে অতিবাহিত করেন। ইনি অকৃত্যার ছিলেন ও মৃত্যুকালে এর তেরটি বছর বয়স হয়েছিল।

বিখ্যাত সমাজসেবিকা হানা সেন নয়াশিল্পী ভবনে ২০এ ফাল্গুন ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তরগমন করেছেন। তিনি ভারতের সমাজ জীবনে একটি বিশেষ আসনের অধিকারিণী ছিলেন। এর ছাত্রজীবনও ছিল সমপরিমাণে উজ্জ্বল। জনাস' সহ বি-এ পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়ে ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ খৃঃ ইনি লন্ডনের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন থেকে 'টিচার ডিপ্লোমা' প্রাপ্ত হন এবং অধ্যাপক পদাধিনের অধীনে গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত থাকেন।

বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক জমির চক্রবর্তী গত ২২শে ফাল্গুন বাক্যলাপ করতে করতে হঠাৎ বেদনা অনুভব করার অন্তর্যঙ্গই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন। মাত্র ৪৭ বছর বয়সের এই অকাল মৃত্যু চিত্র-জগতকে বিশেষ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করল। গ্রাফয়েটে হবার পর ১১৩৪ খৃঃ ইনি চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা হিসাবে বোম্বাইয়ের ছাত্রাবাস্ত্রো যোগদান করেন। এর পরিচালন কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে পুনর্মিলন, অজুন, 'বসন্ত' হামারি বাত, জোয়ার ভাঁটা, দাগ, পতিতা, বাসল, সীমা প্রকৃতি। এর শেষ ছবি দেখে কবীরারো-এরই সংক্রান্ত কথাগ্রন্থে তিনি চিরবিদায় নেন।

## মাসিক বহুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতি

১। প্রকাশের স্থান—বহুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বোবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা—১২।

২। প্রকাশের সময়—মাসিক বহুমতী।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—, ঐতিহ্যরকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম, মেড়িয়া। পোঃ, আকুনা। জেলা, হুগলী।

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—ঐপ্রাণতোষ ঘটক (চট্টোপাধ্যায়)। ৫১এ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলিকাতা—৪।

৫। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরমপত্র অনুযায়ী সংবাদপত্রের মালিকগণ এবং পার্টনারগণ কিংবা মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। বহুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বোবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা—১২। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৫১, ইন্দু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী। ৫১এ, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলিকাতা—৪। কুমারী শ্রুতি দেবী। বহুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বোবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা—১২। কুমারী উৎপলা দেবী। বহুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বোবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা—১২।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এস্টেটের পক্ষে একজিকিউটরগণ—ভবতোষ ঘটক (মৃত); শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমি ঐতিহ্যরকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর

ঐতিহ্যরকনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

তারিখ—১৫-৩-১৯৫৭।

সম্পাদক—ঐপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বোবাজার স্ট্রিট, 'বহুমতী' মাসিক মাসিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।





॥ চৈত্র, ১৩৬৩ ॥  
মাসিক বসুমতী

(রেখাচিত্র)

অভিসারিকা  
—ঐদেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত





অ্যালোসিয়েটেড-এর



এসুতিথি।



আমাদের বই



পেয়ে ও দিয়ে



সমান তৃপ্তি।

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন

৩১।

### ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের শিকারী জীবন

৩১।

### ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমরা ও তাঁহারা

৩১।

### মুপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

৩১।

### লাবণ্য পাণ্ডিতের শরীরম্ আশ্রম্

২১।

মধ্য কলকাতার হুজুরাম বাবু হাটের ল্যাট থেকে কাচ আর শিবনাথ—স্বামীজী এসে পড়ল বেলেঘাটার, ভাড়া মধ্যবিত্ত কাঠামোর পরিবেশ আর আবহাওয়া থেকে বঞ্চিত। বাসা বললই শুধু নয়, অবস্থা বলল; মির মধ্যবিত্তের খোলানো শোলমা ছিঁড়ে গড়ানো খাদে ছিটকে পড়ার কাহিনী। বেকারত্ব আর দুর্গা—মহুয়া কব্বের ইতিহাস। শুধু কুচি-শিবনাথ নয়, বেলেঘাটা বস্তির এই বারো বাসিন্দার জীবনই ক্রমগতি পতনের ইতিবৃত্ত। আধুনিক শহরে সমাজের আর বিস্তারিত মাহুয়ের সমস্তাবল্ল জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটে রয়েছে “বারো ঘর এক উঠোন”—এর পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার মধ্যে।

“ঐশ্বর্যেন্দ্রনাথ রায়ের ‘শিকারী জীবন’ বইখানি কেবল শিকারের চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী মাত্র নয়, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিও মনোজ্ঞ নিদর্শন। লেখক যে কেবল বালকের গুলীতে পতপতী শিকার করেছেন, তা নয়, তিনি শব্দের প্রদোষপশুজিতে ও ভাবের জাল পেতে সাহিত্য-কাননের সঙ্গ-পলাতক, উদ্ভ্রষ্ট পাখিকেও লক্ষ্যবিন্দু করে কলা-শিল্পের বন্দী করেছেন। কোতুলোদ্দীপক সংঘটনগুলিকে অতিক্রম করে, একটি রসাত্মক জীবন-চিত্র, জীবন রসিকতার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী বইখানিতে ফুটে উঠেছে। গল্পের কীক কীক, শিকার অহুসরণের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে তাঁর সঙ্গী সহচরদের মানবিক পরিচয়টি অলক্ষ্যে আমাদের নিখুঁত চিত্রশালার স্তরে স্তরে সাজান হয়ে আছে।” (আনন্দবাজার)।

“চিত্তাশীল লেখক ও প্রবন্ধকার হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদের নাম অবিস্মৃত। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে গভীর মনশীলতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা।” (ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, “আমরা ও তাঁহারাতে একদিকের বক্তা আমি, অন্যদিকের বক্তা তাঁহারা। নিজের মধ্যে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতের দোষগুলি লক্ষ্য করেছি বলেই একবচন ব্যবহার করেছি। আমার বক্তব্য এই যে, শিকারী মূল্য চিবন্তন হলেও উচ্চ শিক্ষাভিমानी মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বুদ্ধিজীবীর সে-স্থান এই পরিবর্তনশীল ভারতের সমাজে আর মেই। ভবিষ্যতে সে-স্থান যে আরও সুকীর্ণ হবে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।” বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের এই কথাগুলি যে কতদূর সত্য কার্জ আর তাহা বুঝাইয়া বলা নিম্নপ্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকে আর্ট, বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।” (আনন্দবাজার)।

বর্তমানের বিব-কটক-ভরিত মনের সামনে হারিয়ে গেছে যে সব অবিস্মরণীয় মুহূর্ত... যে সব মুহূর্তের নিঃশেষ কালের গুণের গড়ে উঠেছে আজকে আমাদের মানবীর সভ্যতার ইমারত—জীবন-সমুদ্র-মধুনে পাওয়া সেই সব অলোক আলোক মুহূর্তের মণি-মালা গাঁথা হয়েছে এ বইয়ের মহতী শব্দ-সূত্রে।

“লেখিকা বিখ্যাত ব্যায়াম ও যোগবীরী শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের ছাত্রী।... আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাস্থ্য চর্চায় স্বযোগ পান না, তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখিকা এই বোগ ব্যায়ামগুলি লিখেছেন, অনেক ফটো-গ্রাফের সাহায্যে পাঠগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুড়ি বাইশটি আসন ও অস্ত্রায় ব্যায়ামের কথা অতি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাতি সম্পর্কেও একটি অধ্যায় আছে। সত্যিই খুব প্রয়োজনীয় বই এখানি, প্রতি ঘরে স্থান পাবার উপযোগী।” (যুগান্তর)।

ইণ্ডিয়ান অ্যালোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রায় : কলকাতা



ঐশ্বর্য

যাথা চাওয়া যায়  
তাথা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছামত একটি সর্বজন সম্পন্ন কেশতৈল  
অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ  
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার  
কেশতৈল নির্বাচন-সমত। সমাধানে সক্ষম।  
ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ  
নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন  
নিরন্তর ব্যবহারেই আশাহত  
কল পাওয়া যায়।

ভেবল বিশারদ মণেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

**হিমকল্যাণ**

আয়ুর্বেদীয় হিমশ্রিত সুরভিত কেশতৈল।

অন্যান্য প্রসারনী

● পামিকোকো  
সুরভিত নারিকেল তৈল

● হিমকল্যাণ  
ক্যাক্টর অয়েল  
সুরভিত কেশতৈল

● তুসামলা মহোপকারী কেশতৈল

● যোজনগন্ধা সুরভি নির্ধাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ  
কলিকাতা

UPCO



৩৫শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৩

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ]

## কথামৃত

ঐশ্বর্যমক্কেব। “সাধুৱা ঈশ্বরের উপর যোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সক্ষর করতে নাই। ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সমস্ত লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে ত লবে না, আবার কাছেও রাখতে দেবে না। লক্ষ্মীনারায়ণ মাজেরারী বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসতো। বিজ্ঞান মরলা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোবো, তার সঙ্গে তোমার সেবা চলবে। বাই শুকখা বললে, জমনি যেন লাটি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চৈতন্ত হবার পর তাকে বললাম—তুমি জমনি কথা যদি আর মুখে বলে, তাহলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই। সে ভারি ক্ষুব্ধ বৃদ্ধি। বললে—তাহলে এখনও আপনার ত্যাক্স গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বললাম—আমার বাপু এত দূর হয় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন স্তরের কাছে দিতে চাইলে। আমি বললাম,—তাহলে আমার বলতে হবে—একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই ধারাপ। সে সব হবে না। আরশির কাছে জিনিষ থাকলে প্রতিবিষ হবে না?”

“মুখ জমি লিখে দিতে চাইলে,—তা লতে পারলাম না। রহখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলেছিল। আমি কালী-র থেকে তুললাম। সেস বাবু আর কদে একসঙ্গে পরামর্শ করছিল।

আমি এসে সেস বাবুকে বললাম,—ভাথো জমনি বৃদ্ধি করো না, ওতে আমার ভারি হানি হবে।”

“আমি তিন ভাগ করেছিলাম—জমনি, জম, টাকা। রঘুবীরের নামের জমিও দেশে রেজিষ্ট্রি করতে গিচ্ছলাম। আমার সই করতে বললে। আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই। জাম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সক্ষর করতে নাই।”

“সক্ষর করবার যো নাই। শত্ৰু মন্ত্রকের বাগানে একদিন গিচ্ছলাম,—তখন পোটের অস্থখ। শত্ৰু বললে, একটু একটু আকিম খেও, তাহাল কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁট একটু আকিম বেধে দিলে। বখন ফিরে আসছি ফটকের কাছে কে জানে ঘুরতে লাগলাম, যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তার পর বখন আকিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।”

“দেশে জাম পেড়ে নিয়ে আসছি, আর চলতে পারলাম না,—পাঁড়িয়ে পড়লাম। তার পর সেগুলো একটা ডোবের মত আরগার রাখতে হলো, তবে আসতে পারলাম।”

“বেটুরা করে পান আনবার যো নাই, কোন জিনিষ সঙ্গে করে আনবার যো নাই, তাহলে সক্ষর হলো কি না। হাতে মাটি দেবার দ্রুত মাটি নিয়ে বেতে পারি না।”

# বৌদ্ধ সহজিয়া গণের সাধনতত্ত্ব

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত \*

বৌদ্ধ

সহজিয়া সাধকগণের সাধনার একটা আভাস পাইতে হইলে আমাদেরকে মূখ্যভাবে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্চাপদগুলি এবং পৌরাণিককে আশ্রয় করিতে হয়; কারণ সহজিয়া সাধকগণের মন্তবাগটি এখানে যেরূপ বিতর্ক ভাবে পাওয়া যায় অল্পেরূপ সেরূপ ভাবে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধতত্ত্বগুলিতেও সহজিয়াগণের সাধনার কথা ছড়ান আছে বটে, কিন্তু সেখানে সহজিয়াদের বৈশিষ্ট্য কিছুই কুটিয়া গুঠে নাই, সেখানে নানা প্রকার 'পূজা-অর্চা', 'কিয়া-কাণ্ড' তন্ত্র-মন্ত্র, যোগসাধনার সহিত সহজিয়াদের সাধনার কথা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

সহজিয়াগণের সাধনার কথা বৃত্তিতে হইলে সহজিয়ানের ইতিহাস সৰ্ব্বদেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। মহাবান বৌদ্ধগণ হইতেই এই সকল ধারার উদ্ভব। মহাবান তাহার 'মহা বান' লইয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সমাজের সর্বস্তরের পারস্পরী লোকের জন্তই সেখানে স্থান করিতে হইল। বিভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সাধনপদ্ধতি লইয়া নানা ধরনের লোক প্রবেশ লাভ করিল মহাবানের 'মহা বান'; কলে আছে আছে মহাবানও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। মহাবানের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল দুইটি মত; 'পারমিতা-নয়' এবং 'মন্ত্র-নয়'। বাহারা পারমিতার অনুশীলনের দ্বারা বৌদ্ধ দশভূমি অতিক্রম করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের মত হইল 'পারমিতা-নয়'; কিন্তু অপর দল এত পারমিতার অনুশীলনের উপরে জোর দিলেন না,—তাঁহারা জোর দিলেন বিবিধ প্রকারের মন্ত্রের উপরে। এই মন্ত্রের সহিত আসিয়া দেখা দিল 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল'; এই 'মন্ত্র', 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' লইয়া পণ্ডন হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ নাম গ্রহণ করিল 'বজ্রবান'। এই বজ্রবানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ব্যতীত নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চা, ধ্যান-ধারণা, অজ্ঞাত তান্ত্রিক ক্রিয়াবিধি এবং কতগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা প্রবর্তিত হইল। 'বজ্র' শব্দের অর্থ শূন্যতা; শূন্যতা বজ্রবানের মূল অর্থ হইল শূন্যতা-বান। বজ্রবানের সবই 'বজ্র'; দেব-দেবী, পূজা-বিধি, উপকরণ সামগ্রী, সাধনাস্থান—সবই 'বজ্র'-চিহ্নিত। নেপাল-তিব্বতে বজ্রবানের আর একটি রূপ দেখা গেল 'কালচক্র-বান'; এই মতে ঋষি-প্রবাস-প্রবাহকেই ধরা হইয়াছে কাল-প্রবাহের বাহন বলিয়া; সেই ঋষি-প্রবাহকে নানাভাবে নিরুদ্ধ করিয়া কালচক্রকে (কালের চক্রকে) অতিক্রম করিতে হইবে। সাধনার এই দিকটার উপরে জোর দেওয়াই হইল কালচক্রবানের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ অজ্ঞানিতে 'সহজবান' এই নামে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পাই না। বজ্রবান-পন্থী একদল সাধকের কতগুলি দ্রষ্টবৈশিষ্ট্য এবং সাধনবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই এই নামটি পরবর্তী কালে গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুই দিক হইতে সার্বিকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'ও ছিল 'সহজ'—আবার 'সাধ্য'ও ছিল সহজ। প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক বস্তুই একটি

'সহজ' স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্তনশীলতার ভিত্তরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রাণে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্তই ইহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্ত কোনও বহুপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এই জন্তও তাঁহারা সহজিয়া। এই জন্ত সিদ্ধাচার্যরা বলিয়াছেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহরে বন্ধ।

নিয়ড়ি বোহি মা জাহ রে লাক।

'যজু হইল এই পথ—যজুর ছাড়িয়া কেহ যাইও না বাঁকা পথে; নিকটে আছে বোহি—যাইও না (দূর) লক্ষ্য।'

সিদ্ধাচার্যগণ সর্বত্রই তাঁহাদের দর্শিত পথকে 'উজুবট' (যজুবন্ধ) বা সোজা পথ বলিয়াছেন। বাঁকা পথ কতকে বলে? শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথ—বিবিধ-তন্ত্র মন্ত্র—আচার-পদ্ধতির পথই হইল বাঁকা পথ। সমস্ত লোকেরই হইল এই গুণ যে 'আমিই হইলাম পরমার্থে প্রবীণ'; কিন্তু কাঙ্ক্ষাপাদ তাঁহার দোহার বলিতেছেন যে 'পরমার্থে প্রবীণ' হইলে কি হইবে—বাহারা পরমার্থ-প্রবীণ তাঁহাদের ভিতরে কোটির মধ্যে একজনও যে 'নিরঞ্জন লীন' নহেন।

লোঅহ গন্ধ সমুদরই হউ' পরমপথ পবীণ।

কোড়িহ মাহ এককু গহি হোই নিরঞ্জন লীণ।

পণ্ডিতেরা মান বহন করেন কি লইয়া?—তাঁহাদের মান হইল আগম-বেদ-পুরাণের পাণ্ডিত্য লইয়া; কিন্তু এই যে সত্যের চারিপাশে পাণ্ডিত্যের গুজন ইহা হইল ঠিক একটি পাকা বেলের চারিপাশে অলির গুজন। অলি যেমন পাকা বেলের গন্ধ পায়, আর সেই গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বেলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিতে থাকে গুজন—কিন্তু বেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল বস্তুর স্বার্থ আবাদন করিতে পারে না—পণ্ডিত ব্যক্তি বাহারা, তাঁহারাও তেমনই পরমাশ্রয় 'মহাপ্রাণ' বা 'সহজানন্দ'ের চারিপাশে পাণ্ডিত্যের মত্ততা লইয়াই ঘুরিয়া মরেন—কিন্তু সত্যের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে আবাদন করিতে পারেন না।

আগম-বেদ-পুরাণে পণ্ডিতেরা মাগ বহুস্তি।

পক্ষ সিরিকলে অলিঅ জিম বাহেবিক ভমস্তি।

তিলোপাদ বলিয়াছেন, বাহা পরমার্থ-তত্ত্ব তাহা হইল সম্পূর্ণ স্ব-সংবেদ; নিজের ভিতরেই করিতে হয় তাহার অনুভব; বাহারা মন-ইন্দ্রিয়কে প্রধান ভাবে অবলম্বন করেন—বুদ্ধি দ্বারা ই লাভ করিতে চান সত্যকে—তাঁহাদের ভিতরে বাহা প্রবেশ করে, তাহা কখনই পরমার্থ নয়।

সমসংবেদ্য তত্ত্বল তীলপাঅ তুলস্তি।

জো মগপোঅর পইট্টই সো পরমপথ হোস্তি।

আরও পুঙ্খ করিয়া বলিয়াছেন সহপাথ—

অকুখব্যালা সলল জও গাহি নিরকুখর কোই।

তা সে অকুখর বোলিঅ জাব নিরকুখর হোই।



অকরে বদ্ধ হইয়া আছে সকল জগৎ—নিরক্ষর নাই কেহই ; কিন্তু এই সকল অক্ষর বাইবে থোলাইয়া, বধন কেহ হইতে পারিবে 'নিরক্ষর'।

এই শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথকে যেমন সহজিয়ারা বাঁকা পথ বলিয়াছেন, তেমনই বাঁকা পথ বলিয়াছেন সকল ক্রিয়া-কান্তের বাছাড়পথকে—সকল প্রকার যোগের 'ভড়' এবং সিদ্ধাইকে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 'সহজ'ই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধা—অর্থাৎ আমাদের রূপের মধ্যে যে একটি 'অরূপ' সত্তা রহিয়াছে, শরীরের মধ্যে যে এক অশরীরী রহিয়াছে—তাঁহাকে উপলব্ধি করাটাই হইল চরম লক্ষ্য। চর্চাকার এবং দোহাকারগণ বার বার বলিয়াছেন—এই 'সহজ' হইল বাক্য মনের অগোচর—সুতরাং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার কোনও উপায় নাই—সুধু কোনও রূপে তাহার অমুভূতির একটা আভাস-টীকিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। সরহপাদ ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, নিজের স্বভাব নিজেই জানা যায়—অন্তে তাহার কথা কি করিয়া বলিবে? সুধু গুরু উপদেশই পারে তাহা দেখাইয়া দিতে—অন্ত কিছুতে নয়।

বিষ্ণু-সহাব গুণ কহিষউ অরৈ ।

দীপ্তি গুরু উবর্গসে গ অরৈ ॥

বাহার্য নিপুণ যোগী তাঁহাদের মন নিঃশেষে যায় বিলীন হইয়া সহজের মধ্যে—যেমন জল যায় নিঃশেষে বিলীন হইয়া জলের মধ্যে।

নিম্ন মগ মুগ্ধ যে পিউগে জোই ।

শ্রিম জল জলই মিলন্তে সোই ।

বৌদ্ধতত্ত্ব দেখিতে পাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে সহজই হইল স্বরূপ—সমস্ত জগতেরই মূলস্বরূপ—সুতরাং স্বরূপই হইল নির্বাণ—অতএব সহজই হইল নির্বাণ।

তন্মাত্র সহজ জগৎ সর্ব সহজ স্বরূপযুক্ত।

স্বরূপমের নির্বাণ বিতৃষ্ণাকার-চেতসঃ । (হেবজ্ঞ-তত্ত্ব)

অন্তজ বলা হইয়াছে 'বভাবং সহজমিভূত্যং' (ঐ)। স্ব-ভাবই হইল সহজ। সেই সহজ এককিণে দেহস্থ-কারণ দেহের মধ্যে তাহার বাস, কিন্তু দেহস্থ হইলেও সে দেহস্থ নয়—'দেহস্থোহপি ন দেহজঃ' (ঐ)। দোহাকারগণ বলিয়াছেন,—সহজ হইল আদি-রহিত এবং অন্তরহিত—এই যে আদি-অন্ত-রহিত শাখত স্বরূপ ইহাকেই বজ্রগুণগণ অভিহিত করেন অক্ষর বলিয়া।

আই রহিল এহ অন্ত রহিল ।

বরগুরুপাল অক্ষর কহিল ।

এই সহজ—গুণ দোষ রহিল এহ পরমগ ।

সম্মানবেষণ কেবি পণ ।

রূপ বি বজ্জই আকিই বিহর ।

সকাজারে সো সম্পূর্ণ ।

ইহা হইল সর্বপ্রকারের গুণ দোষ রহিত—ইহাই হইল পরমার্থ ; যা হইল স্বস্বভেদ তত্ত্ব—ইহা সর্বপ্রকারের বর্ণবর্ণিত এক গাতিভিষীত, সর্বাকারে এই সহজ আছে সম্পূর্ণ হইয়া।

সরহপাদ তাঁহার দোহাতে বলিয়াছেন,—

সকপাস ত্যোদ্ধ গুরুবর্ণে ।

হ স্বপই সোপট দীপই মলনে ।

পবন বহন্তে ঐউ সো হরই ।

জলণ জলন্তে ঐউ সো উয়ই ।

যণ বরিসন্তে ঐউ সো মই ।

গউ বজ্জই গউ থমহি গউসুই ।

গউ বটই গ তগুন্তে গ বজ্জই ।

সমরস সহজাণ জাবিহই ।

শব্দাপাণ সব ছিঁড়িয়া ফেল গুরু বচনে ; এই শব্দ বুদ্ধিত হইয়া গেলে আভাস পাওয়া বাইবে সহজের, বাহ্যকে শ্রবণ কখনও শোনে না, চোখের দ্বারা বাহ্যকে যায় না দেখা। পবন বহিলে তাহা শব্দায়মান হয় না, জলন (অগ্নি) জ্বলিলে তাহা পোড়ে না ; ঘন বর্ষায় তাহা ভেঙ্গে না, তাহা বাড়েও না—তাহা ক্ষয় প্রাপ্তও হয় না। তাহা (একস্থানে) থাকে না, বিস্তৃতও হয় না—কোথায়ই যায়ও না,—সমরসই হইল সহজানন্দ।

'সহজের এই বর্ণনা পাঠ করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব ইহা গীতা প্রভৃতি জনপ্রিয় শাস্ত্রে দেহের ভিত্তিকার যে অমুভূত, অস্পৃশ, অপাণ্ড, অশ্রুত, অশোবা স্থাপ, মচল এবং সনাতন দেহীর কথা বলা হইয়াছে সেই বর্ণনার সঠিকই সমন্বয়ে গ্রথিত। জ্ঞানামের এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন কি করিয়া অনাস্ত্রবাহী বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ধৃত তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ বা সহজিয়াগণ এমন করিয়া স্পষ্ট আশ্রয়ানে না হোক, একটা স্বরূপবাদে আসিয়া পৌছিলেন। দীর্ঘকালের চিন্তার আবর্তনের ভিতর দিয়া এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার দিক হইতে আর একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে,—তাহা হইল এই যে চরম 'সাধা'রূপে তাঁহারা যে সহজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সহজকে তাঁহারা 'সহজ'রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, আবার 'সহজানন্দ'রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 'সহজ'ই 'সহজানন্দ'। সে কথার তাৎপৰ্য কি? তাৎপৰ্য হইল এই যে-সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিরিকল্প পরম আনন্দ লাভ হয়—সেই নিরিকল্প পরম আনন্দই হইল সহজানন্দ। সেই সহজানন্দকেই সহজিয়া বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন 'মহামুখ'। বৌদ্ধ তত্ত্বে এই 'মহামুখের' দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ যে চরম লক্ষ্য নির্বাণের কথা বলিয়াছেন সেই নির্বাণের স্বরূপ কি, ইহা লইয়া অভাববি পণ্ডিত মতলে বিতর্কের অন্ত নাই। নির্বাণ কথাটি সাধারণত নির + ৭ বা খাউ হইতে নিম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়,—অর্থ হইল নিভিয়া যাওয়া—নিঃশেষ হইয়া যাওয়া,—যেমন দীপধারা স্নেহক্ষয়ে নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। এই নিভিয়া যাওয়া বা জুড়াইয়া যাওয়ার অর্থটি স্পষ্টরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে পালি 'মহাভিনিক্ষমণ' সূত্রে (নির্বাণকথা)। সেখানে দেখি, বুঝাজ সিদ্ধার্থের অনিলাকরণে বৃদ্ধ হইয়া 'কিসা-গোতমী' নামক একটি কঠোরকণ্ঠা-অশ্লিষা হইতে একটি গান করিয়াছিল,—

নিরুতা নুন সা মাতা নিরুতা নুন সো পিতা ।

নিরুতা নুন সা নারী বসুণ্ডা ইনো পতি ।

অর্থাৎ 'জুড়াইয়া গিয়াছে সেই মা (মায়ের স্বপ্ন) বাঁহার এমন ছেলে, জুড়াইয়া গিয়াছে সেই পিতা (পিতার স্বপ্ন) বাঁহার এমন ছেলে—জুড়াইয়া গিয়াছে সেই স্ত্রী (স্ত্রীর স্বপ্ন) বাঁহার এমন দাবী'।

এই গাথাটির ভিত্তবকার্য 'নিরুত' (নিবৃত্ত) কথাটি বুঝায় সিদ্ধান্তকে ভাবাইরা তুলিল; তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,— এই কতটি তাহার গানে বলিল, মায়ের স্বপ্ন জুড়াইয়া যায়, পিতার স্বপ্ন জুড়াইয়া যায়—কিন্তু সত্য সত্যই কি জুড়াইয়া গেলে মায়ের স্বপ্ন, পিতার স্বপ্ন, দ্বীপ স্বপ্ন—সকলের স্বপ্নই জুড়াইয়া যায়? তাহাই দেখা দিল কুমারের মনে একটা মহাজিজ্ঞাসার রূপে, কহিলু খো নিরুতে হৃদয় নিরুত নাম হোতি?

এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর কুমার সিদ্ধার্থ নিজের বিষয়বিস্তৃত ধ্যানপরায়ণ মনের মধ্যেই লাভ করিলেন; তিনি বুঝিলেন,— 'হৃদয়' গিম্হি নিরুতে নিরুত নাম হোতি; সোমগ'গিম্হি মেটগ'গিম্হি নিরুতে নিরুত নাম হোতি—স্বপ্নের মধ্যে বহিরাছে যে রাগের আগুন, যে ধৈর্যের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাণিত হইলেই আসে স্বপ্নের বর্ণার নির্বাণ। কুমার ভাবিলেন, এই কতটি ত আমাকে বড়ই সুন্দর সঙ্গীত শুনাইয়াছে,— আমি এই 'নির্বাণ'র সন্ধান করিয়াই বেড়াইব, 'অহং হি নিরূপাং পবেচ্ছা চরামি।' (১)

এখানে দেখিতেছি স্বপ্নের আগুন নিভাইয়া কোলাই হইল নির্বাণ। এই নির্বাণকে পালি শাস্ত্রে আরও অনেক ব্যাপক অর্থ ব্যবহৃত দেখিতে পাই। সেখানে সমগ্র জীবন প্রবাহকেই একটি প্রবীণকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত আলোশিখার প্রবাহের সহিত তুলনা করিয়া হইয়াছে; বাসনাই হইল এই জীবনচাপ 'সেহ' বরুণ; ক্রেতাকর যেমন দীপের আলোশিখা-প্রবাহ একেবারে নিভিয়া যায় সেইরূপ সর্ববাসনা ক্ষয় হইলে—ক্রেণাবরণ এবং ক্রেণাবরণ নষ্ট হইলে—স্বপ্নস্বপ্নের জীবনপ্রবাহ নিঃশেষে ধামিয়া যায়—ইহাই নির্বাণ।

কিন্তু ইহা ত নির্বাণের একটা নতিবর্ক (negative) বর্ণনা মাত্র হইল; সব নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া বাইবার অর্থ কি? কিছুই কি থাকে না? দার্শনিকগণ এবিষয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব দেন নাই। যে জবাব দিয়াছেন তাহা হইতে কেচ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি কিছুই থাকে না—কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছি কিছু থাকে। সেই দার্শনিক তর্কে এখানে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমায়ের আলোচনার প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে, দার্শনিকগণ নির্বাণকে বতই নেতিমার্গে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করুন না কেন পালি শাস্ত্রে ও সাহিত্যে—এবং পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্বাণ শুধু একটা পরম 'নাতিব' মাত্র নয়,—নির্বাণই স্রুৎ, নির্বাণই শান্তি। অথবা তাহার 'সোমরানন্দ' কার্যে যেখানে নির্বাণের সঙ্গে দীপ-নির্বাণের তুলনা দিয়াছেন সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে দীপ যেমন 'সেহকর্যং শান্তিমত্যাভ্যমতি'—সেহকর্যবতঃ নির্বাণিত হইয়া অন্ত্যস্ত শান্তি লাভ করে। জীবন প্রবীণও 'ক্রেতাকর্যং শান্তিমত্যাভ্যমতি'—ক্রেতাকর্যে অন্ত্যস্ত শান্তি লাভ করে। এই যে অন্ত্যস্ত শান্তি লাভ করার সত্যটি তাহা পালি 'মিল্পন-পঞ'হো'র মধ্যে নির্বাণ সবচে বহু আলোচনার প্রসঙ্গে অনেক বুটাকের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। পালি শাস্ত্রে এই নির্বাণকে বলা হইয়াছে

'পর', 'সত্ত' (শান্ত), 'বিরহ' (বিভব), 'সত্তি' (শান্তি), 'অবব' (অবর), 'এব', 'সত্ত' (সত্য), 'অনন্ত', 'অচ্যুত', 'সমসত্ত' (শান্ত), 'অমত' (অমৃত), 'অজাত', 'কেবল', 'সিব' (নিব)। 'সত্তনিপাতে' দেখিতে পাই নির্বাণ সবচে বলা হইয়াছে—'সত্তা'তি নিরূপাং এথা' অর্থাৎ নির্বাণকে শান্তি বলিয়া জানিয়া। ধর্মপদে একাধিকস্থানে বলা হইয়াছে, 'নিরূপাং পরমং স্রুৎ'। 'অবব' নিকারে' বলা হইয়াছে—

ওপুনিয়া মলং সরম পত্তা নিরূপাং-সম্পাদ।

মুচ্চেতি সরমুপেহি সা হোতি সরম-সম্পাদ। (২)

'বিমানবৎ'তে নির্বাণকে বলা হইয়াছে অলং স্থান—যেখানে গিয়া আর শোক করিতে হয় না—'পত্তা'তে অলং-টানো বধা গত্তা ন সোচরে। 'খেরী-গাথা'র সমাজাতীয় উক্তি দেখিতে পাই,— 'নিরূপাং-টানো বিম্বত্তা তে পত্তা তে অলং স্রুৎ'।

নির্বাণকে এই যে পরম স্রুৎ বা পরম শান্তি বলিয়া বর্ণনা পরবর্তী কালের তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ এইখান হইতে তাহাদের সাধ্যবস্তুর ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করিলেন যে পরম স্রুৎই হইল নির্বাণের স্বরূপ—তাহারা ইহার নাম দিলেন 'মহাস্রুৎ'। কিন্তু তাহারা এইখানেই থামিলেন না; তাহারা বলিলেন, নির্বাণ যে মহাস্রুৎ তাহা নহে—মহাস্রুৎই হইল নির্বাণ। একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা দ্বারা চিত্তকে যদি এই মহাস্রুতের মধ্যে নির্মল্লজত করিয়া দেওয়া যায় তবে বাহ্যিক বাকি থাকে তাহাই 'সুত্তপ'—তাহাই হইল 'সহজ'; মহাস্রুতের মধ্যে সমস্ত সত্ত্ব-রিক্তের বিলয় ঘটিলেই এই সহজ-সহজ অবস্থান ঘটে; মহাস্রুৎই হইল সহজানন্দ। এই সহজানন্দ বা স্বরূপাত্মকৃতির ক্ষেত্রে কোনও জাত্যুৎক্রেম বা গ্রাহক-গ্রাহক-গ্রাহক থাকে না। গ্রাহক-গ্রাহক-গ্রাহক যাহা বরুণ তাহাই হইল অপর-বরুণ, অপরই হইল সহজ—সহজই হইল মহাস্রুৎ। সুতরাং এই মহাস্রুতের স্থিতিলাভের দ্বারা যে অপর বা সহজ স্থিতি ইহাই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার মূল লক্ষ্য। আবার দেখিতে পাইব, এই অপর-মহাস্রুত বা সহজ প্রেতিষ্ঠা এবং বোধিচিত্ত লাভ সহজিয়াগণের নিকটে একই কথা—কারণ অপরই হইল বোধিচিত্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে এই বোধিচিত্তের ধারণাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিচিত্ত শব্দে অর্থ হইল বোধিলাভের জন্ম এবং সেই বোধিলাভের দ্বারা সর্বভূতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত একটি 'চিত্ত'—অর্থাৎ ক্ষুণ্ণ চেতনা বা সঙ্কল্প উৎপাদন করা। এই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হইলেই চিত্তের উল্লংগতি আরম্ভ হয়—দশটি ভূমি অতিক্রম করিয়া চিত্ত 'ধর্মমৎ' রূপ রূপ ভূমিতে স্থিতি লাভ করে। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ এই বোধিচিত্ত একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিল। সুত্তা এবং বরুণীয় অভিজ্ঞান্যাকেই বলা হয় বোধিচিত্ত—'সুত্তা-বরুণীয় বোধিচিত্ত তত্ত্বমত'। এই সুত্তা এবং বরুণীয় অভিজ্ঞানের তাৎপৰ্য কি? এই তাৎপৰ্য নানা বিক হইতে লক্ষ্য করা বাটতে পারে। ধর্মমতের বিক হইতে বলা বাটতে পারে, বুদ্ধের সমাজ হইতে বিদ্যাত হইয়া শুধু মাত্র সুত্তা সাধনের দ্বারা নির্বাণ লাভের চেষ্টা না করিয়া বরুণ অবলম্বন

(১) এই প্রসঙ্গে বীল ডেভিড্‌স্‌ কৃত 'পালি ভাষার অভিধান' গ্রন্থে 'নিরূপা' শব্দটি বহুত।

(২) উপরিউক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্য কৃশকর্মে পথ গ্রহণ করাই হইল এই বোধিচিন্তা সাধনার তাৎপর্য। এই শূন্যতাকে বলা হয় 'শ্রোতা'—কারণ শূন্যতা-জ্ঞানই ত হইল শ্রোতা; আর করণকে বলা হয় 'উপায়'—কারণ করণাই বিশ্বজীবের মঙ্গলের উপায়। এই 'শ্রোতাপার'র মিলন হইতেই লাভ হয় বোধিচিন্তা। বর্ণনের দিক হইতে শূন্যতাই হইল গ্রাহক—principle of subjectivity; আর করণ হ ল গ্রাহক—principle of objectivity; এই গ্রাহক-গ্রাহকের দুইটি প্রবহমান ধারা নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় যে অদ্বয়-তত্ত্বে সেই অদ্বয়ত্বই হইল বোধিচিন্তা—তাহাই সহজস্বরূপ। যোগ-সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে—একটি বায়ুনা—বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহী নাড়ী, অপরটি হইল দক্ষিণা—প্রাণসবাহী নাড়ী বা অপানবাহী নাড়ী; এই দুই হইল দেহ মধ্যে সর্বপ্রকার বৈতত্বের প্রত্যক বা প্রতিনিধি; আর একটি নাড়ী আছে মধ্যগা নাড়ী—তাহাকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় অব্যুতী বা অব্যুতিকা; উভয় নাড়ীর ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করিয়া চলে সংসারের গতি—ইহারাই একটি 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটি 'নির্বাণ' (অনস্তিত্ব)—একটি সৃষ্টি—অপরটি সংহার—একটি 'ইতি', অপরটি 'নেতি'; এই উভয় ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের ষাটবার্ষিক নিয়োগ ধারাকে অব্যুতিকা পথে উৎসর্গা করিতে পারিলে অদ্বয় বোধিচিন্তা বা সহজানন্দ বা মহানুগ্রহ লাভ হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, একটি অদ্বয়ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয়-তত্ত্বের দুইটি ধারা—হিন্দু-মতে একটি হইল শিব—অপরটি শক্তি। গুণাতীত নিরুপাধি শিব হইলেন বিন্দু—তাহাই হইল নিবৃত্তিতত্ত্ব; আর ত্রিগুণাধিকা শক্তি হইলেন নাম—ইহাই হইল প্রবৃত্তিতত্ত্ব; এই বিন্দু-নাম—নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি—ইহাদের মিলনের নিয়োগ ধারায় হইল সংসারপ্রবাহ, আর তাহাদেরই মিলনের উৎসর্গা ধারায় হইল অদ্বয় প্রতীতি—সহজানন্দ বা মহানুগ্রহ-প্রাপ্তি। অদ্বয় বোধিচিন্তেও তাই একটি সাংবৃত্তিক রূপ রহিয়াছে—আর একটি পারমার্থিক রূপ রহিয়াছে। শূন্যতা এবং করণাই হইল বৌদ্ধমতে অদ্বয় বোধিচিন্তার দুইটি ধারা—একটি শ্রোতা—অপরটি উপায়, একটি বিন্দু—অপরটি নাম; একটি নিবৃত্তি—অপরটি প্রবৃত্তি। এই শ্রোতা-উপায়ের মিলনের নিয়োগধারায় হইল বহিঃসৃষ্টি—জরা-মরণ-দুঃখ-দৌর্য্যন্তের জীবন-যাত্রা; তাহাদের মিলনের একটি উৎসর্গা আছে—এই উৎসর্গাধারার পথই হইল অব্যুতিকা-মার্গ; সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া 'শ্রোতে উজ্জায়' চলিতে পারিলেই হয় অদ্বয় স্বরূপে প্রতীতি লাভ—সেই প্রতীতিতেই হয় যে মহানুগ্রহ লাভ তাহাই হইল সহজানন্দ—তাহাই হইল 'সামরত'। নিবৃত্তি-রূপিনী শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় একটি রস—প্রবৃত্তি-রূপী করণকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় সম্পূর্ণ বিকৃত ধর্মের আর একটি রস;—এই উভয় রসের ধারাই ষাটবার্ষিক ভাবে নিয়োগ। এই উভয় রস যদি মধ্যমার্গে আসিয়া মিলিয়া একেবারে এক হইয়া যায়—তবেই তাহা হয় 'সমরস'; এই 'সমরসের' বিতর্কি হইল উল্লম্বশ্রোতে; অব্যুতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া এই সমরসের ধারা বধন সর্বাঙ্গ—অবস্থিত লাভ করে, তখনই তাহা পবিত্র 'সামরত' রূপ লাভ করিল। এই পবিত্র সামরতের পূর্বত্ব রূপই হইল সহজানন্দ—তাহাই অদ্বয় বোধিচিন্তা। এই

মহানুগ্রহ বা সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিন্তা লাভই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য।

এইত সেল মোটোয়টি ভাবে বৌদ্ধ সহজিয়াদের চরম লক্ষ্যের কথা; এই বারে আসা হাক তাঁহাদের সাধনার কথা। সাধনার দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের সাধনা মূলতঃ তাত্ত্বিক সাধনা। এই তাত্ত্বিক সাধনা বলিতে আমরা কি বুঝি? এ বিষয়েও অনেক সন্দেহ এবং তর্ক রহিয়াছে—আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না। তন্ত্রসাধনার বহু বহিঃল দিক রহিয়াছে; সহজিয়া সাধকগণ সর্বদাই বহিঃল বিরোধী ছিলেন; তাই তাঁহারা তন্ত্রের বহিঃল সাধনা ছাড়িয়া মূল সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন। তন্ত্রসাধনার মূল কথা হইল দেহ-সাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তন্ত্রমতে দেহভাতটাই হইল ব্রহ্মাণ্ডের সূত্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহ্য কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার সবই নিহিত আছে এই দেহভাতের মধ্যে। সহজিয়া বলেন, আমাদের দেহের ভিতরে অবস্থান করিতেছে যে সহজ-স্বরূপ তাহাই হইল বুদ্ধ-স্বরূপ। বুদ্ধ ত তাহা হইলে অশরীরী রূপে এই শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে—

অস্মিন্নি কোই সুরীরি লুকে।

জো তাহি জাণই সো তহি মুকে।

'অশরীরী' যেহ আছে শরীরে লুকায়ি, যে তাহাকে জানে সেই হয় মুক্ত।

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।

পূই দেখুখই পাড়িবেসী পুচ্ছই।

'ঘরে (দেহ ঘরে) আছে, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিতেছ; (ঘরে) পতি দেখিতেছ, কিন্তু প্রত্যাশীকে (তাহার বৌদ্ধ) জিজ্ঞাসা করিতেছ।'

জাবার বলা হইয়াছে,—

পণ্ডিত সঙ্গল সখ বকুখাণই।

দেহই বুদ্ধ বসন্ত গুণাগণই।

'পণ্ডিত সকল করেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, জানে না সেই বুদ্ধকে যিনি বাস করেন দেহের মধ্যেই।'

সরহপাদ আরও চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

এখু সে সুরসরি জল্পগা

এখু সে গঙ্গাসাঙ্গল।

এখু পজাগ বথারসি

এখু সে চন্দ দিবাঙ্গল।

কুখেন্তু পীঠ উপপীঠ এখ

মই ভমই পটিচুটও।

দেহা সারিসা তিখ মই

সুখ আগ পীঠটও।

'এখানেই (এই দেহেই) সেই সুরসরি (গঙ্গা) ও বননা, এখানেই সেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এখানেই হইল চৈত্র দিবাঙ্গর; ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ—সবই হইল এখানে, বহু বুদ্ধ এই বুদ্ধিহা—দেহ সঙ্গ তীর্থ এবং সুখ আর কোথাও সেরে গেল না।'

চরাপদগুলির মধ্যে আমরা বহু ভাবে দেখিতে পাই এই দেহে

অবলম্বন করিয়া সাধনার কথা। কোথাও দেখিতে পাই 'দেহ নমস্কৃত'ে বিহারের কথা,—কোথাও দেখিতে পাই 'কায়-নৌকা'কে ভব-সমুদ্রের ভিতরে বিহারি বাইবার কথা। চর্চাকারগণও বারবার বলিয়াছেন, অতি নিকটেই—এই দেহেই আছে বোধি—বোধিদান্ডের জন্ত প্রয়োজন নাই লঙ্কার বাইবার, 'নিয়ড়ি বোধি মা জাহিরে লঙ্কা'। কোথাও বলা হইয়াছে কায়রূপ মায়াজাল বাহিবার কথা—'বাহম কায় কাফিল মাআজাল'; কোথাও দেখে বলা হইয়াছে স্বপ্ন (জো) রথে চড়িলা বাহবা ন জাই ইত্যাদি, কোথাও দেখে বীণা করিয়া বাজাইবার কথা বলা হইয়াছে (বাজাই আলো সহি হেক্স বীণা); দেখে নৌকা করিয়া নৌকা বাহিবার রূপকই গ্রহণ করা হইয়াছে সব চেয়ে বেশি।

সহজানন্দ-রূপ পথম সত্য দেখে রক্তরূপে অবলম্বন করিয়া দেহের মধ্যেই অন্তর্ভব করিতে হয়, এই মতকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধতাত্ত্বিকগণ—তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতগুলি চক্র বা পদের করনা করিয়াছেন, এবং মহাবান বৌদ্ধধর্মের ত্রিকায়ের সহিত একটি সংজ্ঞা-কার, বা স্বাভাবিক-কার বা বজ্রকারের যোগ করিয়া এই চারি কায়কে এই চারি চক্রে বা চারি পদে স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুতাত্ত্বিক মতে আমরা যটচক্র বা যটপদের পরিকরনা দেখিতে পাই, বৌদ্ধতন্ত্রে সেখানে এই চারি চক্র বা পদ। প্রথম চক্র হইল নাভিতে, দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে, তৃতীয় কণ্ঠে, চতুর্থ-মস্তকের সর্গাচ দেশে (তুলনীয় হিন্দু মতের সহস্রার)। নাভিতে হইল নির্বাণকায়-তত্ত্বের অবস্থিতি, মস্তকায় নাভিতে হইল নির্বাণ-চক্র; এইরূপ স্বপ্নের ধর্মচক্র, কণ্ঠে সন্তোষ-চক্র (মহাবান মতামুসায়ে অকৃত স্বপ্নে সন্তোষ-চক্র এবং কণ্ঠে ধর্মচক্র হওয়া উচিত ছিল, কীরূপ নির্বাণকারের পদে সন্তোষকায়—তাহার পদে ধর্মকায়) এবং মস্তকস্থিত 'উকীষ-চক্রে' হইল 'সহজ-চক্র' বা 'মহানুশ-চক্র'; বোধিচিন্তের স্থিতি এই উকীষ-কমলে।

আমরা দেখিয়াছি, বোধিচিন্তের দুইটি ধারা প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা—এক উপায়রূপ করুণা। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহায়াই কিন্ন-ও নাম-তত্ত্ব, গ্রাহক ও গ্রাহ্য-তত্ত্ব, নিবৃত্তি-ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব। বামনাসা-রক্ত হইতে প্রবাহিত হইয়া যে বামগা-নাড়ী (হিন্দুতন্ত্রমতে ইড়া) তাহাই হইল প্রজ্ঞা-রূপিণী, দক্ষিণ নাসারক্ত হইতে প্রবাহিত হইয়া যে দক্ষিণগা নাড়ী তাহাই হইল উপায়-রূপিণী (হিন্দুতন্ত্রমতে পিঙ্গলা); আর এই দুই নাড়ীর ঠিক মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত যে নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে সুরভা)—তাহাই হইল আমাদের পূর্বব্যাপ্যাত অগ্রভূতা বা অবধৃতিকা—ইহাই হইল অম্বর বোধিচিন্ত বা সহজানন্দ রূপের জন্ত মধ্যমার্গ। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, নানা ভাবে এই মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে। সহজিয়াদের মধ্যপথের সাধনা হইল এই অবধৃতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া। এই যে বামগা এক দক্ষিণগা নাড়ী—ইহায়াই হইল শূন্যতা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, কিন্নুনাল, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, গ্রাহক-গ্রাহ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকারের বৈতথ্যের প্রতীক। এই বৈতথ্যের প্রতীক নাড়ীযুগ্মকে আরও অনেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেহের বামদিকে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞাতত্ত্ব এবং দক্ষিণদিককে করুণারূপ উপায়তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। শূন্যতা বজ্র বলিয়া বামগা নাড়ী বজ্র, দক্ষিণ গা নাড়ী স্তম্ভাঙ্ক-রূপের প্রতীক বলিয়া পদ্র বলিয়াও অভিহিত হয়। ইহার

কুলিন-কমল নামেও খ্যাত। শূন্যতা বজ্রা বলিয়া বামগা নাড়ী শব (বা 'জালি' অর্থাৎ অকারাদিক্রমে বর্ণমালা) আর করুণা বা উপায় পরতন্ত্র বলিয়া দক্ষিণগা নাড়ী ব্যজ্র (বা 'কালি'—অর্থাৎ ক-কারাদিক্রমে বর্ণমালা)। বামা হইল গজা নদী, দক্ষিণা যমুনা; বামা চক্র (বা শব্দী); দক্ষিণা সূর্য (বা রবি); বামা হস্তি, দক্ষিণা শিবা; এইরূপে আমরা আরও নাম দেখিতে পাই, যেমন—প্রাণ-অপান, ললনা-বসনা, চমন-যমন, এ-বা, ভব-নির্বাণ ইত্যাদি। সাধনার ক্ষেত্রে এই নামগুলি নাড়ী-দ্বয় বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের বৈতথ্য তত্ত্ব বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানেই বাম-দক্ষিণ ছাড়িয়া মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই অবধৃতিকা মার্গে উল্লিখিত অম্বর-বোধিচিন্তের পথ বা মহানুশ সহজানন্দের পথ বুঝিতে হইবে।

সহজিয়াগণের আসল সাধনা হইল সর্বপ্রকারের বৈতথ্যবিস্তৃত হইয়া অম্বর মহানুশ বা সহজরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তৎসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমার্থ অন্তর্ভূতির জন্ত তাঁহার যে সাধনা করিতেন দেহই তাহার অবলম্বন বলিয়া নাড়ী-চক্রানি অবলম্বিত সাধনার উপরে তাঁহার জোর দিয়াছেন। প্রথমে বাম ও দক্ষিণা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে। তাহাদের ক্রিয়াধারা স্বাভাবিক ভাবে নিরুপা; এই নিরুপা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিস্তৃত করিয়া ক্রম করিতে হইবে—তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের সাধনা; যখন সব ধারা একীকৃত হইল মধ্যমার্গে—তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে উল্লিখিত। সেই উল্লিখিত—ধারাই আনন্দের ধারা; সেই আনন্দের মধ্যে অন্তর্ভূতির তরতম্য আছে; প্রথমে যে উল্লিখিত সাধনায় আনন্দানুভূতি তাহার নাম আনন্দ, দ্বিতীয়ানুভূতি হইল পরমানন্দ—তৃতীয়ানুভূতি বিরমানন্দ—চতুর্থানুভূতি হইল সহজানন্দ। এই চতুর্থানুভূতি সহজানন্দই হইল চতুর্থপদ প্রকৃতি-প্রকাশের সর্বশূন্য। বোধিচিন্ত উকীষ কমলস্থিত চক্র—সহজানন্দেই যতে সেই চক্রে হইতে অমৃতকরণ।

এই সহজানন্দের সাধনা—এই মহানুশের সাধনা—বা এই অম্বর বোধিচিন্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বহু চর্চাপদের মধ্যে। প্রথম পদেই বলা হইয়াছে চক্রগণিতকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে মহানুশের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া। সেই সাধনার অগ্রসর হইয়া—

ভর্ণই লুই আমহে য়াশে (সাশে) দিঠা।

ধমণ চমণ বেশি পাণ্ডি বঠা।

'লুই বলিতেছে, আমি ধ্যানে (বা সানে, অর্থাৎ আত্মসংকীর্ণিত) দেখিলাম,—ধমন-চমন দুইয়ের আসনে বসিয়া আছি।' দুইয়ের উপরে বসিয়া আছি অর্থ দুইকে এক করিয়া অম্বর মহানুশের অবস্থিত বা মগ্ন আছি।

পঞ্চম পদে চাটিলপাদ বলিয়াছেন, দুই অন্তেই কীল—মানে নাই খই। এই দুইকে তাহা হইলে মিলিত করিতে হইবে। চাটিলপাদ নীর দুই ধারে মিলাইয়া দিবার জন্ত সীকো গড়িলেন—সীকো গড়া শব্দের অর্থই দুইকে মিলাইয়া দেওয়া; এই দুইকে ছাড়িয়া সীকো গড়িবার জন্ত মোহনকে ছাড়িয়া পাট খোঁড়া হইয়াছে—অম্বর-সূত্রকে করা হইয়াছে টালি। এই সীকোতে চড়িলেন 'দাঙ্গিণ বাম বা হোহী'—গ্রহণ করিতে হইবে অম্বর মহানুশের মধ্যপথ।

কাহ্নপাদ বোধানো বলিয়াছেন ‘অলিঙ্গ কালিঙ্গ’ বাট কল্হলা—  
তখন এই আলিঙ্গকালিঙ্গ রূপ বৈতথ্যের দ্বারা পরমাখের পথ রুদ্ধ হইয়া  
গিয়াছে এই বাজনাই গ্রহণ করিতে হইবে। অল্প যোগের নিক  
হইতে ইহার অল্প ব্যাখ্যাও করা চলে,—সেখানে অর্ধ হইল, আলি  
এবং কালিঙ্গকে বিভক্ত করিয়া এবং উভয়কে একীকৃত করিয়া অবধূতা-পথ  
রুদ্ধ করিলাম বা দূর করিলাম,—অর্থাৎ সকল নিয়োগ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া  
করিয়া দিলাম। অষ্টম পদে কল্যাণপাদ বলিয়াছেন—

বামদাহিন চাপি মিলি মিলি মালা।

বাটত মিলিল মহানুহ সঙ্গ।

‘বাম-বক্ষিণ চাপিয়া মিলিয়া মিলিয়া পথে—(অবধূতিকা)  
পথেই মিলিল মহানুহের সঙ্গ।’

কাহ্নপাদ কোথাও চিত্তকে গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—  
যে মন্ত গজেন্দ্র ‘এবংকার দূত বাখোর মোড়িউ’—এ-কার এবং বংকার  
রূপ দুইটি দূত খাম মর্দিত করিয়া দিয়াছে। আবার কোথাও—

আলিঙ্গকালিঙ্গ ঘটা নেউর চরণে।

বিশদশীকুণ্ডল বিউ আভরণে।

আলিঙ্গকালিঙ্গ ঘটা-নুপুং তাহার চরণে—বিশদশী কুণ্ডলের  
আভরণ তাঁহার কর্ণে। সব কথাই বাজনা হইকে নাশ করিয়া অপর  
সহজ বা মহানুহের সামর্যে স্থিতি। বোণাপাদ আবার দুইকে  
লাউ করিয়া—চন্দ্রকে তাহার সঙ্গে তার লাগাইয়া—অবধূতাকে  
নাশখানের দণ্ড করিয়া সেহকে চন্দ্রকার একটি বোণ যন্ত্রে পরিবর্তিত  
করিয়া এই বোণ বাজাইয়াই সহজের সাধনা করিতেছেন (১৭ নং)।  
সহপাদ বলিয়াছেন—

নান ন বিনু ন বিন ন শশিমণ্ডল।

চিহ্নরাজ সহাবে মুকল।

‘নান নাই বিনু নাই—না আছে বিন-শশীর মণ্ডল—আছে শুধু  
ষভাবে মুকল চিত্তরাজ,—এই নান-বিনু, বিন-শশীর অতীত যে  
ষভামুকল চিত্তরাজ—তাহাই হইল সহজ-বরূপ। এই পদের শেষেও  
তিনি বলিয়াছেন,—

বাম দাহিন জো খাল বিখলা।

সহহ ভলই বণা উজ্জ্বলট ভাইলা। (৩২ নং)

‘বাম-বক্ষিণে খাল-বিখাল, সহহ বলে, বাপু সোজা পথ হইল।’

সহপাদ তাঁহার আর একটি পদে বলিয়াছেন—

কাশ গাওড়ি খাটি মণ কেডুজাল।

সমুদ্র বক্ষে ঘর গভবাল।

চাঁচ খির করি ধরহ রে নাই।

আন উপায়ে পার গ জাই।।

দৌবারী নৌকা টাণ গুণে।

মেলি মেলি সহজে জাউ গ আণে।

বাটত ভর খাট বি বলদা।

ভব উল্লাসে সর্ব বি বোজিআ।

কুল লই খরে সোতে উজাল।

সহহ ভলই গল্পে সমাখ।।

‘কায় হইল নৌকা, খাটি ঘন হইল ঝাঁড়; সমুদ্রের বচনে ধর  
হাল। চিত্ত খির করিয়া নাও ধর—অল্প উপায়ে পারে বাওরা  
যায় না। দৌবারী নৌকা গুণে টানে, সহজের সঙ্গে মিলিয়া মিলিয়া

আর অল্প যায় না। পথে ভয় বলবান শঠের (চন্দ্র-সুর্বেয়);  
(সেই দুই শঠের প্রভাবে) ভব (অস্তিত্ব) উল্লাসে সবই হইল  
পিচ্ছিল। কুল লইয়া খরস্রোতে উজ্জ্বল হইল—সহহ বলে গগনে  
গিয়া প্রবেশ করে।’

এখানে দেখিতে পাইতেছি, কায়-রূপ নৌকা লইয়া বাহিয়া  
আগাইয়া চলিবার প্রতিকল্পক হইল পথের বলবান শঠের—এ  
সেই ‘হুই’ শঠ। তাহাদের বশীভূত করিয়া আগাইয়া বাহিতে  
হইবে। কিন্তু সেই আগাইবার পদ্ধতিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যীয়—  
আগাইতে হইবে খরস্রোতে উজ্জ্বল—সার গিয়া পৌছাইতে  
হইবে কোথায়? পৃথিবী হইতে বওনা হইয়া পৌছাইতে হইবে  
গগনে। নৌকার গতি সাধারণতঃ অম্লক্স স্রোতের সঙ্গে  
নিম্নদিকে : সেহ-নৌকার গতিও ভব-প্রবাহের অম্লক্সে নিম্নগত;  
সেই গতি কিয়দূর হইতে হইবে; কায়কে লইয়া চলিতে  
হইবে উর্দ্বগতির সাধনায়—পৌছিতে হইবে পৃথিবী হইতে  
গগনে—বিস্ময় হইতে শূন্য—রূপ হইতে বরূপে। ইহাই হইল  
ভারতীয় যোগিগণের ‘উর্দ্বা-সাধন’ বা ‘উজান-সাধন’। কল্যাণ  
পাদও পৃথিবীর ঠাই রূপের রূপা রাখিয়া দিয়া শূন্যের সোনা লইয়া  
কল্পনার নায়ে বওনা হইয়াছেন—কোথায় বাইবেন?—‘বাহতু কামদি  
গজ্ঞণ উবেসে’ (৮নং); পৃথিবীর ঠাই রূপের রূপা রাখিয়া কল্পনা  
নায়ে শূন্যতার সোনা লইয়া তাহাকে বাহিতে হইবে গগনের উদ্দেশে—  
উর্দ্বগতিতে এই যাত্রা।

রূপকল্পে অতীন্দ্রিয় অম্লভূতি সহজানন্দে বধা বুকাইতে গিয়া  
চর্চাকারগণ সহজানন্দকে বহু স্থলে বিবিধ রূপে নানী বলিয়া কল্পনা  
এবং বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাকে দেখিতে পাই  
‘যোগিনী’ বলিয়া, যেমন—

জোহিনি গুই বিলু খনহি ন জীবরি।

তো মুহ চুখি কমলসর গীবরি। (৪নং)

কোথাও এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাখা-যোগিনীকে বলা হইয়াছে  
‘ডোবী’ কোথাও চণ্ডালী, কোথাও মাতঙ্গী, কোথাও শবরী বলিয়া,—  
বেশি স্থানেই দেখিতে পাই তাহাকে ‘স্পর্শের অব্যোগ্য নীচকুলোদ্ভবা  
বলিয়া। ইহার কারণ হইল এই সহজানন্দরূপিণী বা মহানুহরূপিণী  
যোগিনীট একেবারেই ইন্দ্রিয়াতীতা; ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা স্পর্শনীয় নয়  
বলিয়াই এই যোগিণীকে অস্পর্শ নীচজাতীয়া রমণী বলিয়া বর্ণনা করা  
হইয়াছে ‘অস্পর্শা ভবতি ধর্মাৎ তন্মাৎ ডোবী প্রকৃতিতা’। দশম  
পদে এই ডোবীর একটি বিশদ বর্ণনা পাইতেছি। এই পদে  
দেখিতেছি, এই ইন্দ্রিয়াতীতা সহজানন্দরূপিণী ডোবীর বাস হইল  
নগরের বাহিরে—অর্থাৎ সেহ-নগরের বাহিরে, ইন্দ্রিয়দিগের লাগোয়া  
বাহিরে; এই অল্প পাণ্ডিত্যভিমানী যত ব্রাহ্মণ নেড়ার দল তাহার  
ইহাকে বেন ছুইয়া ছুইয়া বায়—টিক ভাবে ছুইতে পারে না। বাহ্য  
কাপালিক বাহারা তাহারা এইজাতীর নীচ-জাতীয়া ডোবীর সঙ্গে  
একেবারে নিযুগ হইয়া; আর কাহ্নপাদ হইলেন আশ্চর্য কাপালিক  
‘কং মহানুহঃ পাশরতীতি কাপালিকঃ’ মহানুহকে পাশন কয়েল  
বলিয়াই তিনি কাপালিক—তিনি যুগার সাধারণ ভোগ করিয়া সন্ত  
করিতে চান এই সহজানন্দ ডোবীর। নাতিক্রমে (যদিপূর্বে—অর্থাৎ  
নির্বাণ-চক্রে) এই সহজানন্দে স্পন্দন প্রথম অম্লভূত হয়; এই  
যদিপূর্বের পদ হইল চৌবটি বলভুক্ত; সেই অল্পই বলা হইয়াছে যে

একটি পয়, চৌথটটি পাশড়ি—তাহাতে চড়িয়া নাচে আমরিনী ডোবী। বাহিরের ডোবী নৌকার চড়িয়া আসা-বাওয়া করে, ভিতরের ডোবী কাহার নামে যে আসা-বাওয়া করে তাহার রহস্ত কেহ জানে না। বাহিরের ডোবী তাঁত বিক্রয় করে আর করে ঢাকাড়ি বিক্রি; ভিতরের ডোবী বিক্রয় করে অবিত্যর তাঁত—বিবরাসক্তির ঢাকাড়ি। বাহিরের ডোবী পুকুর ভাঙ্গিয়া খায় যুগলখণ্ড—তাহার কলে মার খায় লোকের কাছে। অপরিত্ত্ব সাংসৃতিক রূপে এই আনন্দাহুড়তির ডোবী দেহ-সংবোধের সার্বাংগ আহার করে; বোগী তাই তাহাকে মারিতে চান—প্রাণ লইতে চান, অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা অপরিত্ত্ব আনন্দরূপিনী ডোবিকে পরিবর্তিত করিতে চান পরিত্ত্ব সহজানন্দরূপিনী ডোবিতে।

অপর একটি পদে (১৪ স:) দেখিতে পাই, এই সহজানন্দরূপিনী নৈরাশ্য দেবীকে একটি মতঙ্গ-কন্ডা রূপ ধোরার পাটনী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গলা বহুদূর দুই ধারার মাঝখানে এই সাময়িক-রূপিনী দেবী নৌকা লইয়া পারাপার করেন; এই গ্রাহ-গ্রাহকদের দুই ধারার ডেউ প্রবল—মনে হয় এই দুইয়ের মাঝখানে যে পাটনী মেয়ে পারাপারের সংযোগ ব্যবস্থা করিতেছে সে বুঝি ডুবিয়াই গেল—ঐশ্বর্য্যের বিবরানন্দই বুঝি অর্থেত সহজানন্দকে ঢাকিয়া ফেলিল; কিন্তু সাধনার বাহার অচল প্রতিষ্ঠা সে বোগীকে এই মতঙ্গ-কন্ডা ঠিক পার করিয়া দেয়। পাঁচ ঠাঁড় হইল পঞ্চতথাগত-স্বরূপ এক পঞ্চসাধন ক্রমের অবলম্বন। আর আছে পিঠে 'কাড়ি' (কড়াগড়ি) বাঁধিয়া নৌকা টানিবার কথা; ভিতরের অর্ধে দেহের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রে একটি প্রসিদ্ধ 'পীঠ'-এর কল্পনা করা হইয়াছে,—সেই চক্রে বা পীঠে বোগিক 'বন্ধ' (দেহ-মন স্থির করিবার জন্ত ও উৎসর্গ লাভ করিবার জন্ত এক প্রকারের বোগিক প্রক্রিয়া) প্রয়োগ করিতে হইবে। নৌকার জল—অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-মল—সৈচিত্রে হইবে গগন-সৈন্তিতে—অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারা। সৃষ্টি-সংহারের তত্ত্ব চক্রে-স্বর্ণ হইল নৌকার দুই চাকা—যেহা আছে মাস্তুল—অমরের প্রতীক। এই পাটনী মেয়ে কড়ি-বুড়ি কিছুই লয় না—অর্থাৎ সহজ পথে দিতে হয় না কোনও কষ্টতার বা পাণ্ডিত্যের বহুমূল্য—বহুদূর বাওয়া যায় পার হইয়া।

অন্ত একটি পদে বলা হইয়াছে, কাহু-পাদ তিন তুবন অবলীলার বাহিয়া আসিয়াছেন; কারণক-চক্রে তিন তুবন অভিজ্ঞান্দ হইলে আসে অমর-প্রতিষ্ঠা—তখনই আসে মহাস্বপ্ন-লীলার ময়তা। এই মহাস্বপ্নে মগ্ন হইলেই লাভ হয় ইন্দিরাসোচের সহজরূপিনী ডোবীর—। সেই ডোবীর সব লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ বসিতেছেন,—

কইগণি হালো ডোবী তোহোরি ভাউরিআলী।

অন্তে কুলিগজপ মারো কাবালী।

উইলো ডোবী সমল বিটালিউ।

কাজ প কারণ সমহর টালিউ।

কেহো কেহো তোহোরি বিজ্ঞা বোলই।

বিহুজন লোম তোরো কঠ ন মেলই।

কাহুে পাই তু কামচণালী।

ডোবিত আগলি নাহি জিগালী।

চক্কা ডোবীর চালাকি কিছুই যায় না বোঝা, কুলীনজনের সে বাইরে—ভিতরে থাকে কাপালিকের। কুলীন কথাটি দুই অর্ধে এখানে ব্যবহৃত। বাহার পাণ্ডিত্যভিমুখী তাহারাত্ত কুলীন, আর বাহার 'হু'—অর্থাৎ দেহে লীন—অর্থাৎ দেহ-অবলম্বনে সাধনা করিতে গিয়া দেহকে বাহার আর অতিক্রম করিতে পারে না—দেহই প্রকারান্তরে বন্ধ হইয়া পড়ে তাহারাই হইল 'কুলীন'। এই দুই প্রকারের কোনও 'কুলীন'ই পার না সহজরূপিনীর সন্ধান; সন্ধান পার 'কাপালিক'—অর্থাৎ যে মহাস্বপ্ন-রূপ 'ক'-কে (কং মহাস্বপ্ন চাকা) পালন করিতে (ভিতরে ধারণ করিতে) জানে। পুঁই বলা হইয়াছে, এই মহাস্বপ্নরূপিনী ডোবীর দুইটি রূপ আছে, সাংসৃতিক এবং পারমার্থিক—অপরিত্ত্ব এবং পরিত্ত্ব; অপরিত্ত্ব রূপে যে দেখা দেয় সর্ববিধ ক্রেশবন্ধনের কারণ বিষয়ানন্দ-রূপে—তাহাই আবার পরিত্ত্ব রূপে দেখা দেয় মহাস্বপ্ন-রূপিনী নৈরাশ্যরূপে। তাই বলা হইয়াছে, যে এই অপরিত্ত্ব সাংসৃতিক ডোবীই সকল বিটালিত (নষ্ট) করে—সেই টালিত বা নষ্ট করে উকীষকমলে চক্ররূপে অবস্থিত অমৃতময় বোধিচক্রে। এই মহাস্বপ্নের সাধনার অনেকে করেন সশর প্রকাশ—এই-জাতীয় মহাস্বপ্নে মগ্ন হওয়ার পরমার্থ কি না; কিন্তু কাহু-পাদ বলিতেছেন,—এই-জাতীয় সংশয় হইল 'অবিহুজনে'র—বাহারা ভিতরের খবর সব জানে না তাহাদের; কিন্তু 'বিহুজন' কখনও এই ডোবীকে কঠ হইতে ত্যাগ করে না। যোগের দিক হইতে কঠ হইল সজ্ঞাপ্রক—সেইখানে সহজরূপিনীর সহিত সজ্ঞাপ। সিদ্ধার্থ তাই বলিতেছেন,—রহস্তময়ী এই 'কামচণালী'র গতি—মনে হয় তাহা অপেক্ষা আর নাই কেহ অধিক চপলমতি।

পরের পদটিতে (১৫নং) কাহু-পাদ রূপকল্পে এই ডোবীকে বিবাহ করিতে চমিয়াছেন; সেই বিবাহের বাস্তব এবং অস্তিত্ব আয়োজনের এবং বিবাহান্তিক নব-মিলনের অবিচ্ছিন্নতা ও গাঢ়তার রহিয়াছে যনসংবদ্ধ বর্ণনা। অপর একটি পদে শবরপাশ এই 'সহজ-স্বপ্নরী'কে ময়ূরপুঙ্খ এবং গুজামালার শোভিত উচ্চ পর্বতবাসিনী শবরী বালিকারূপে অপরূপ কবিত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। উচ্চ পর্বত এখানে দেহস্থ সর্বোচ্চ চক্রে উকীষ-চক্রে; ময়ূরপুঙ্খ এবং গুজামালার তাহাকে বিভ্রিত করিয়া তুলিবার কারণ—তাহার সাংসৃতিক-পাণ্ডার্থিক উভয়বিধ রূপের মধ্য দিয়া যে বিভ্রিত রহস্তময়ী তাহারাই একটা অভাস দেওয়া। এই রহস্তময়ী বালিকার পাগলা দাবী (সাধক-চিত্ত) কি সব সময় তাহাকে চমিত্তে পারে? নিজের দেহ-বস্তুর 'বদরী'কেই মায়ূর চিনিতে পারে না—ইহাই হইল সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা।



# স্মৃতিচিত্রণ



পরিমল গোস্বামী

প্রথম পর্ব

৪

দাঁজিলিঙ দেখা দিল একটি রহস্য প্রসঙ্গ রূপে। হঠাৎ সব নতুন, সমতল মাটি নেই, দিগন্ত রেখা নেই, গ্রীষ্মের দাহ নেই, দৃষ্টির একঘেরেমি নেই, সব অনিয়মিত, সব অস্থির। উদ্গের মেঘ, পায়ের কাছে মেঘ, পায়ের নিচে মেঘ। আকাশে গাছ, পাশে গাছ, পায়ের নিচে গাছ। আকাশে মানুষ, পাশে মানুষ, পাতালে মানুষ। মনের যে কি অবস্থা তা বোঝানোর ভাষা নেই। শুধু একটি ভাবসমাহিত অবস্থা।

আজ আমি ভেবে অবাক হই এই অদ্ভুত উদ্গাম নিসর্গ শোভা কি করে আমাকে এমন ভোলাল। কেন অদ্ভুত আকর্ষণে চলে এলাম এখানে? তখনকার দিনে অজ্ঞ কোনো দিকে পথ খোলা ছিল না, সে জড়ই হয়তো। আজকের দিনে বালক বয়সে এরকম অযোগ্য পেলো নির্বাণ বেষে।

দাঁজিলিঙ মনের সমস্ত ধারণা ওলটপালট করে দিল। অভ্যস্ত জিনিসের বা জানা জিনিসের বাইরেও যে সত্য আছে, স্রব্দের আছে, তা মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না বলেই মন নতুনের কাছে অনেক সময় এমন পরাজিত হয়। মনের গোঁড়ামি ছাড়লেই মনের হুক্তি। তা বাঁহ্যিকর কি ক্ষতিকর সে প্রশ্ন আসাধা।

কিন্তু আমি যে দাঁজিলিঙে বসে স্বপ্ন দেখছি, এর কোনো গাম আছে কি না আমি জানি না। চোখ খুলে দিব্যস্বপ্ন দেখছি। যেথ এসে সব ঢেকে দিচ্ছে, আবার ঢাকনা খুলে গিয়ে সব বোদে বলবল করে উঠছে। পরকণেই হয়তো স্বপ্নের ক'রে বৃষ্টি হয়ে গেল সেকেন্ড ঝানেক। মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলছে, কাছের মানুষ চেনা যায় না। মনে হচ্ছে পৃথিবী এখানে এসে ফুরিয়ে গেছে, পায়ের নিচে থেকে সব শূন্য। কিছু পরেই রবারে থ্যাশেলিলের ছবির মতো একটু একটু দেখা যাচ্ছে সব।

দাঁজিলিঙের প্রথম প্রভাত উভাসিত হয়ে উঠল সোনা গলাদো তরলারিত রেবার কুটে ওঠা কাকনজন্মার অপসঙ্গ দৃশ্যে। বিছানা থেকে রাখা কুলে সে দৃশ্য দেখে ভক্তিত হয়ে গেল। একটা

অদ্ভুত পবিত্র সে দৃশ্য! এই নতুন জায়গার কোথায় আনন্দ কোথায় শেষ সব গোলমাল হয়ে গেল। কোন্ রূপকথায় রাখে এসেছি এবং এমন অপ্রতীত ভাবে। আমাকে কোনো অভিনববয়ের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। কোোনো দিকে চোখ মেলেলেই অভিনববয়ের অলঙ্কার শোভাযাত্রা। কোথায়ও পুনরাবৃত্তি নেই, শুধু চোখ মেলে বসে থাকা।

সাত দিন ছিলাম দাঁজিলিঙে। মনে পড়ে বাসিঙেন শিখের লোকান থেকে বত পারি কেবল ছবি কিনেছিলাম। কোটো পোর্টকার্ড ও কোটোর বই। একখানা বইতে বইয়ের আকারের চেয়ে বড় একখানা রঙিন ছবি ছিল কাকনজন্মার। লম্বা প্যানোরামা, অদ্ভুত স্রব্দের ছাপা, ভাঁজ খুলে দেখতে হত। কোটো পোর্টকার্ডগুলো একরঙা ও রঙিন ছ'রকমই ছিল। পোষাকের অভাব কিছু মিটিয়ে নিয়েছিলাম হোয়াইটওয়াগেয়ে লেডল'র দোকানে চুকে। সেখানকার কেনা একজোড়া দস্তানা আজও পুড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

দাঁজিলিঙে অলাপাহাড় বোডে একটু ঘুরেছিলাম। আর



একটা অদ্ভুত পবিত্র সে দৃশ্য



দেখিলাম হটানিক্যাল উভার। প্রেম থেকে ঠিক কত দূরে কোন্ এলাকায় ছিলাম এখন তা আর মনে পড়ে না। ধূরে ধূরে নানা লোকপ্রসিদ্ধ স্থান দেখার প্রবৃত্তি তখন ছিল না, ধর থেকে বেয়ে বেঁধিয়ে কোনো একটি নির্জন পথেও ধায়ে গিয়ে বসে থাকতাম। একটি বেলা কাটিয়ে দিখামি বঁসে বঁসে।

একই জায়গায় বঁসে অসহন সৌন্দর্য রহস্তের স্বাদ আমি পেয়েছি সেই বালক বয়সেই। জীবনে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বঁসে মনে পড়ে না, কিন্তু যে প্রেরণা আমি সমস্ত অন্তরে অন্তরে বালককাল থেকে অনুভব করেছি সে হচ্ছে এই সৌন্দর্যভোগের প্রেরণা। ছেলেবেলা থেকেই আমি অনেকখানি কল্পনাপ্রসূত বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছি, সে আমার নিজের গড়া কল্পনা, তা আজও সম্পূর্ণ তেজে বায়নি। সেই জগতের পরিব্রাজক আমি চিরদিন। আমার মনের গঠনটাই এই, চোটা করে হয় তো কিছু বললোনা যায়, কিন্তু মূলতঃ কোনো বল হয় না।

দার্জিলিংকে কেন এত ভাল লাগল তা বত ভাবেই ব্যাখ্যা করি, তাঁকে ঠিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। আমি ঝিঁকি বা জ্বনি না তার ব্যাখ্যা করব কি করে? দার্জিলিংয়ের ছোট গাড়ি, তার অসুত পথ, তার আদমি অরণ্যখচিত দেহ, তার কাটলে কাটলে অসুতসলিলা হেঁদারার প্রকাশ, তার নতুন মাছুর, নতুন ভাষা, নতুন ঘরবাড়ি, তার চিরতুবারমৌলি দীর্ঘপর্বতশ্রেণী, তার মেঘস্পর্শী উচ্চতা, তার অকালশৈত্য, তার অস্থির শোভা, তার বিরাটহীন রূপান্তর—সব মিলে একটা সুখরসানুভূতি মাত্র। গাড়িতে উপরে ওঠার সময় থেকে আরম্ভ করে পলকহীন চোখে শুধু একটি মাত্র প্রায়ের উত্তর খুঁজেছি মনে মনে—কি দেখছি, এ কি স্বপ্ন না সত্য? দাঁড়ে দাঁড়ে গাড়ি থেকে নেমে পাখর, মাটি, পাহাড়-বেরে-চুইয়ে-পড়া জল, স্পর্শ করে করে প্রায় করেছি নিজের মনকে—এ কি স্বপ্ন না সত্য? পথের ধারে বঁসে সমস্ত দেহ দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছি হিমালয়ের জমি। মাটিতে অর্ধশায়িত অবস্থার দু হাতে বাস মাটি পাখর চেপে ধরে শুধু অনুভব করতে চোটা করেছি, এ কি জিনিস। হাওয়া তুলে গিয়েছি। সঙ্গীকে ছেড়ে দিয়ে আমি একা বঁসে থেকেছি পাহাড়ের ধারে। কখনো কেরিওয়ালার কাছ থেকে হুঁচকার আনায় কেক কিনে বেয়ে বিকেল পর্বত একই জায়গায় বসে কাটিয়েছি, তবু তৃপ্তি হয়নি, তবু সেই চলমান রূপের কাছে আমি অবসর এবং পরাধীন।

দার্জিলিংয়ের ক'টি রিসোর্স একটি ভাবহীন উপলব্ধি নিয়ে নিতে এসে এলাম। পুলিশের আর এক জন অফিসার আমাদের সঙ্গে এসেন শিলিগুড়ি অবধি। সেখানে এসে তিনি আমাদের টিকিট কিনে নিয়ে চলে গেলেন। শেষে মনে হয়েছে এ শুধু আমাদের প্রতি রহস্য কণ্ঠই নয়, এর শিল্পে ব্রিটিশ রাজের নিরাপত্তার প্রয়োগ ছিল। একই সঙ্গে সল্টাইম আর রিডিকিউলাস, পর্বত একা দু'বিক; সর্গর এই বৈবর্য, এড়ার উপায় এই।

প্রশ্নে এসে একখানা ইংলিশম্যান কিনলাম টল থেকে। সেই কপালে সেই প্রশ্নে বঁসে জিজ্ঞেসলাল দায়ের দৃঢ়া সংবাদ পড়ে মনটা ধাঁপাণ হয়ে গেল। এই ঘটনাটা আমার বিশেষ করে মনে আছে, তার কারণ জিজ্ঞেসলাল সম্পর্কে একটি যোষাধিক ভাব ছিল। জল্পনায় নতুন করে জেনেছিলাম তারকর্ষ কপাল সম্পর্কে। তারকর্ষ

কপাল প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কি আবুল আজহ তার অপেক্ষা করছিল। এ সময় সম্পাদকের দৃঢ়া সংবাদটা ভীষণ ভাবে অপ্রত্যাশিত ছিল।

দার্জিলিং থেকে কিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যে আবার ম্যালেরিয়া ধরে কাতর হয়ে পড়ি। স্বর আর কিছুতে ছাড়ে না। শিলে হাতে লাগে এমন অবস্থা। স্বর ১০০ ডিগ্রী (কারেনহাইট) প্রায় বাঁধা। কিন্তু এই অসুখটি ক্রমে এমনই ধাতসগরা হয়ে উঠেছে যে স্বর নিয়েই বেশ চলা ফেরা করছি, অভিতাবকীয় শাসনও শিখল। শেষ কালে নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে চলে এলাম কলকাতার এবং ভ্যার্ডুত তাই মলিনীরঙ্গনের পরামর্শ অনুযায়ী লেকটেন্যান্ট কর্নেল রসিকলাল দত্তের কাছে গেলাম এক অপরাহ্নে। চৌরঙ্গী থেকে বেঁধিয়েছে এমন একটা পথ, লিগুসে স্ট্রিট, কি সদর স্ট্রিট, মনে নেই আজ, কিন্তু আর সবই মনে আছে। তিনি তখন আর, এল, দত্ত নামে প্রসিদ্ধ। কৌশল, সাহেবী শোষক পরা ডাক্তার। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। কাঠের বাটো ট্রেন্সপোপ ব্যবহার করেছিলেন বুক পরীক্ষায়। ফী দিয়েছিলাম আট টাকা। তাঁর ব্যবস্থা সবই মনে আছে। প্রেসক্রিপশনও বুধ্ব আছে অনেক রিনের ব্যবহার। সেটি এইভাবে লেখা ছিল—

Re.

(i) Arsenoferrate

one teaspoonful to be taken twice after meals.

(ii) Ferri et quini. citras

one tablet thrice daily.

(iii) Casagra

two teaspoonfuls at bedtime.

তিনটিই পেটেন্ট ওষুধ, কিনতে গেলাম শিখ ট্রান্সিলিটের দোকানে পর্বতলা স্ট্রিটে। এক ঘটনা আশ্চর্য বঁসে রইলো, তারপর শোষ ভূখ। দেবির কারণ, প্রত্যেকটি শিশির মূল লেবেল তুলে তাকে দোকানের সেবেল লাগিয়ে তার উপর ডাক্তারের নির্দেশ পরিষ্কার হাতে লিখে দেওয়া হয়েছে। ক্রিপট টাইপে "দি প্রেসক্রিপশন" শিখ ট্রান্সিলিট ইত্যাদি ছাপা একখানি মোটা খামে প্রেসক্রিপশনখানি কেবল গেলাম। ওষুধের মাত্র যে আজও মনে আছে তার কারণ ওষুধ বিধেই খুব ছেলেবেলা থেকে আমার একটি হৃদয়নীয় আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে ওষুধ নিয়ে হেসব একপেরিমেন্ট করেছি তা শুনলে তেজস্ক্রিয় জ্ঞানিত হবে, অন্তএব তা আর বলক না, তবে এই আকর্ষণ শেষ পর্বত আমাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং এককালে ডাক্তারী পরীক্ষার্থী আমার কাছে ডোজ জিজ্ঞাসা করে বৃত্তি ফালাই করে নিত। সে সব কথা ভবিষ্যতের জন্য রইল।

আর, এল, দত্তের শুধু ওষুধ ব্যবস্থা নয়, হাওয়াবল ও পথ্য বিধেও ব্যবস্থা ছিল। বলেছিলেন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকতে হবে; নকালে পথ্য হুব বাড়ি, হুপরে ভাত, বিকেলে হুব বাড়ি, বাজে কটি বা লুটি। সকালে এবং বিকেলে বেলডায়ে হয়ে নিয়মিত।



বন্ধ প্রবেশ চট্টোপাধ্যায় (পূর্বে উল্লিখিত) থাকত সাহেবগঞ্জে, সেখানে বাওরাই ঠিক করলাম। ই-আই-আর গাড়িতে এই প্রথম চড়া। এবং এই প্রথম অগ্রভব করলাম এ গাড়ি আমাদের ই-বি-এস-আর-এর গাড়ি থেকে অনেক আরামদায়ক, এতে নাকুনি অনেক কম, বেন দুধারে একটু হলে চলে চলে। নতুন জায়গার বাওরার উত্তেজনার রাখে ঘুমো সস্তব্ব ছিল না। প্রায় কাঁকা গাড়ির স্তম্ভ নির্জনতার মধ্যে আমি একা জেগে বনে আছি কাচের জানালায় নাক লাগিয়ে। শীতকালের মধ্যরাত্রি। বাংলার সীমা ছাড়তে বেরি আছে তখনও, বারুত্বের আকাশে অস্পষ্ট তালবনের সিলুয়েট দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ট্রেনের শব্দ প্রথর এক গাঢ় হয়ে উঠছে, তাকিয়ে দেখি গাড়ি দুই উঁচু জমির প্রান্তার ভেদ করে চলেছে। ক্রমে শব্দ মাটির, পাথরের মাটির, উপরে চলেতে ঢাকার সঙ্গে বেরের একটা মধুর ঠা ঠা আওয়াজ হচ্ছে। এদিকে রেলপাটা হয়েছে সমতল জমির উপরে, সেও আমার কাছে নতুন। পূর্ববঙ্গের সব জায়গায় সমতল রেল উঁচু পথের উপরে পাটা।

একটি রাত্রির অবসান আমার চোখে সব নতুন। নতুন পরিবেশ, নতুন মাছব, নতুন ভাষা। এই ছবিটিও আমার সহজ-স্বল্পগ্রাহী বালক মনে চিরচিহ্নিত হয়ে আছে। একটা অহেতুক আনন্দের স্মৃতি সকল সন্তাকে জড়িয়ে ধরে, কোনো দিন আর তাকে ছাড়ানো যায় না।

আমার চোখে তখন পাহাড় পর্বত মাঝেই অতি সন্তোষের বস্ত। সস্তব্ব এই জগতই সাহেবগঞ্জ আমার চোখে খুব ভাল লাগল, কারণ এখানেও বস্তব্ব চাই, পাহাড়শ্রেণী পূর্ব-পশ্চিমে সীমাহীন বিস্তৃত। এবং সে পাহাড়ও কুয়াসার কিছু ঢাকা, কিছু খোলা। তাতে ঘননৌ ঘন সবুজ, আর ঘন বেগুনীর মিশ্রণ। পাহাড়ের কোলে সমতল বহু-প্রশস্ত মাঠ সবুজ ঘাসে ঢাকা, তাব বৃক্ক আঁকা-বাঁকা চলার পথ। সে সব পথ দূর পাহাড়ে মিলিয়ে গেছে। তখনলাম সাঁওতালরা আসে এই সব পাহাড় পার হয়ে, সেখানে তাদের বাড়ি আছে পাহাড়ের তলে তলে। সাঁওতালও এই প্রথম দেখলাম, দার্জিলিংয়ের ভূটিয়া সেপচার কালো সস্তব্বরণ। স্তম্ভরা এ-ও অভিনব। দার্জিলিংয়ের পরেই হঠাৎ সমতল বাংলার জমিতে এসে শেষ অবধি দার্জিলিঙকে একটি স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। একটি স্পর্শযোগ্য বস্ত বেন ছুঁতে না ছুঁতে হাতছাড়া হয়ে গেল। সাহেবগঞ্জের পাহাড় দেখে সে দুঃখ কিছু জ্বলতে পেরেছিল। বেন এ একটা কত বড় আশ্রয়। আশ্রয় সমতলে বাস করে হিমালয়ের মতো এমন মহিমময় বিরটিয়ের উপলব্ধি চট করে হয় না। মনে তার ছাপ মাত্র পড়েছিল একটা স্তম্ভবর্ণের মতো। সেখান আগো ছিল স্বপ্ন, সেখান পরেও তা স্বপ্ন হয়েই রইল। চেতনার তা সত্য হয়ে উঠতে অনেক দেরি হল। ঘনের মধ্যে তাকে একটু একটু করে গড়তে লাগলাম। সাহেবগঞ্জের পাহাড় একটা ধাপের কাজ করল মধ্যপথে এসে। তাই সাহেবগঞ্জ ভাল লাগল।

বালস্থান ঠিক হল ছুনের বোজি-হাউস। এই বোজি-হাউস সম্পর্কে আমার কোনো আনন্দের স্মৃতি নেই। খাওয়া-দাওয়া এবং পরিবেশ ভাল লাগেনি। কিন্তু আমার মনোকার সেই অস্বাভাবিক নীরবে সব ঘেনে দিল সাহেবগঞ্জে পাহাড় ছিল বলে।

দুধ বার্লি ও প্রোতজরূপ ছিল ব্যবস্থা, কিন্তু বার্লি বাণ

দিয়ে চলেতে হল। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি স্মৃতি ছিল, এবং আরে খাওয়া বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও জন্মেছিল, আসে বলেছি। সে হচ্ছে আর সন্ধ্যাও খাওয়ার কঠি থাকলে খাওয়ার কঠি হয় না, কিংবা কি কঠি হয় তা আমার অজ্ঞাত। অতএব প্রবেশের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করা গেল এই যে সকালে উঠে তার সঙ্গে আমি আধ মাইল দূরে গোরালপাড়া যাব এবং সেখানে গিয়ে শুধু দুধ খেয়ে ফিরে আসব। একসঙ্গে পথা এবং প্রোতজরূপ।

কিন্তু এ ব্যবস্থা চার পাঁচ দিন পরে আর ভাল লাগল না। নিরমিত বিধিপালন আমার দ্বারা সস্তব্ব ছিল না। কাছাকাছি খাবারের দোকান ছিল, সেখানে বেলা প্রায় ৮টার পরম দুধ পাওয়া যেত। কিন্তু সকালে উঠে না খেয়ে বেলা ৮টা বাজতে দেওয়া আমার পছন্দ ছিল না। আমি সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে দোকানে চলে আসতাম। দুধ তখন মিলত না, গত দিনের বাবাড়ি (মাল্লাই) মিলত। দুধ বার্লি থেকে আগেই বার্লি বাদ দিয়েছিল, এখানে দুধও বাদ গেল, বইল শুধু সর। দুধের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই হল। কিন্তু কয়েক দিন পরে এটিও একঘেয়ে লাগতে রসগোল্লা, সন্দেশ, পাশুরা অথবা পেঁড়া। ভেবে দেখলাম দুধ বাদ দিয়ে এর একটিও গড়া যায় না, অতএব আমার বিবেক বেশ স্নেহে দিন কাটাতে লাগল। সাহেবগঞ্জে প্রবেশের বন্ধ হিসেবে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে তখন পরিচয় ঘটেছিল, তার মধ্যে সুখান্তেশ্বর মল্লিকদারকে সবচেয়ে বেশি মনে আছে। তিনি বটুলা নামে খ্যাত, তখন সস্তব্বত কলেজে প্রথম টুকেছেন। এখন তিনি সমাজসেবী সন্ন্যাসী মাছব। তিনি প্রবেশেরও বটুলা, তাই সবার প্রক্ষেপ ছিলেন, কারণ প্রবেশ নিজেও অনেক শিক্ষা-পরিবৃত ছিল, সে-ও ছিল তাদের প্রবেশ দা। সাহেবগঞ্জে পরে অনেকবার গিয়েছি এবং পরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। শীতকাল, মনে আছে। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাস। বোজি-হাউস থেকে আমার চলে আসবার সময় মনিহারীঘাট থেকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মাইনের পাল করে সাহেবগঞ্জে এসে ভর্তি হল, এবং ঐ বোজি-হাউসে এসে উঠল। হয় তো এক দিনের পরিচয় ঘটেছিল সে সময়। বলাইচাঁদের কবিতার খাতার নাম ছিল 'বনজুল'। সে সেই খাতার নাম নিজে গ্রহণ করে খাতা ছেড়ে তখনই প্রকাশ্যে বেরিয়েছে কি না, মনে নেই। তখন আমরা কেউ জানি না পরবর্তী জীবনে আমরা পরস্পর এত কাছে এসে পড়ব।



দীর্ঘায় বেনকালো দুর্ভে তাকিয়ে বান।

সাহেবগঞ্জে এক মাস ছিলাম, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হল না।  
খাওয়া। খবর দেগেই বইল। তখন (সম্ভবত জীবনে এই বিতীরা  
বার) নিজের পরিণাম চিন্তা করতে লাগলাম। বহুদের সঙ্গে  
চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতে নিয়মিত। বেশ মনে আছে কবী  
(সম্ভবত তখন কুষ্টিয়াতে) লিখেছিল, তার ভাবার্থ, লালিগিরির  
হাতো বাহ্যিকর স্থানে থেকে এসেও এত দুঃখ? চিঠি লেখা তখন  
ইংরেজীতেই চলত।

সাহেবগঞ্জে আর থাকি। সম্ভব নয়, ক্লাস-নাইনে বাস্তবিক  
পরীক্ষা দিয়ে বেগিয়ে মোজা বাড়িলিঙ গিয়েছি, এবং তারপর  
১৯১৪ সালের জানুয়ারি এসে গেছে, এখনও বাইরে বাইরে কাটাচ্ছি।  
জাই এখানে মন খারাপ হয়ে গেল। এখানে সীরিয়ার। ফেরবার  
পথে কলকাতা থেকে নতুন করে গুরু কিলদাম এবং ঐ সঙ্গে  
একটি 'প্রাইমাস-১০০', স্পিডিট, ও একটিন বিলিটি বার্লি কিনে  
দিয়ে রতনদিয়াতে এলাম। ঠিক করলাম এইখানে কিছুদিন  
থেকে শুধু সন্ধ্যার দুখাবলিটি নিজ হাতে তৈরি করে দেব, এবং  
অত্যন্ত নিয়ম সবই পালন করব। কিন্তু আর্চর ব্যাপার, অল্প  
দিনের মধ্যেই অর হেড়ে গেল এবং অত্যন্ত দুঃখ হয়ে উঠল। হয় তো বা  
এর পিছনে এতদিনের হাওয়া-বদল কিছু কাছ করেছে। এ সম্বন্ধে ঠিক  
ব্যাপারিক, তা হয়তো কারোই জানা নেই, সেহ বড়ই খামখেয়ালি।

বাক্স করলাম সাতবেড়ের উদ্দেশে। সঙ্গে ছিল হরেন্দ্রকুমার।  
গোয়ালন্দ বাট থেকে জীমারে বাক্স, হরেন্দ্রের আত্মীয়-বাড়ি ছিল  
সাতবেড়তে। আমরা বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটা আন্দাজ সময়ে  
ওয়ান আপ প্যাসেঞ্জারে গোয়ালন্দ এসে পৌঁছলাম। জীমার যে  
কখন ছাড়বে তার খবরটা নেই, শুনলাম শেষ বাক্সে ছাড়বে। সমস্ত  
বিষ কি করা যায় ভাবছিলাম, এমন সময় হরেন্দ্র বলল, বাক্স করে  
সরয় কাটাওনা বাক। বাক্সর থেকে মাটির হাঁড়ি, ঢাল, ডাল, মশলা  
প্রভৃতি কিনে টোভে রাধা হ'ল পদ্মার ধারে। হাওয়াতে কিছু  
অসুবিধে হয়েছিল, কিন্তু দমিনি। সন্ধ্যার গিরে উঠলাম জীমারে  
এক একটি গরম জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে রইলাম, বখন ইচ্ছে ছাড়ুক  
আর ভর নেই। সকালে ব'সে ব'সে অ্যাব্রাহাম লিংকন বইখানা  
জীমারে পড়েছিলাম যতটা সম্ভব।

এই বছরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে রতনদিয়াতে বোগেন্দ্রকুমার  
চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রহুসর সঙ্গে পরিচয় হয়। সে কাল্পিত  
ম্যাক্সিমিলিয়ান পড়ত, অর্থাৎ আমার সমান সমান। সে আকর্ষক  
চরিত্র ছিল। তখনকার দিনের তরুণ সন্তানবাদের চালচলনে বেশব  
বহুত এবং চরিত্রে বেশব গুণ থাকি দরকার, তা তার ছিল। ভাল  
বাস্তব, খেলাধুলোর অত্যন্ত দ্বিগ্ন এবং গুটি, সীতারের সকল কোঁশল  
জান, পাঁজের ডালে ডালে বেড়াতে পারে, নৌড়ে ওজাদ, পড়শোনার  
খুব পড়ীরা এবং ছুঁইবি বুদ্ধিতে যুগোহর। আবরণ ভেদ করলে  
অঙ্গবর্ণবাহীকে দেখা যায়। পুলিশের সাসপেক্ট হয়েছে তখন থেকেই।  
তার বৈদম্বিন ডায়েরি লেখা হচ্ছে পাশো থানার। (এর পর তার  
সঙ্গে সর্বদা পুলিশ থাকত) রতনদিয়া পাশো থানার অধীন।

প্রহুসর বর্তমানে বীসি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। স্থানীয় পৌর  
প্রতিষ্ঠানের বা অত্যন্ত বিভাগের নেতৃত্ব কাজের ভিতর দিয়ে সে  
সেখানে সম্ভ্রান্তিত। একবার সে শোটে কলকাতার আগন্তু বীসি  
ইন্সটিটিউটের নেতৃত্ব করেছিল।

প্রহুসর গ্রামে একটি নতুন হাওয়া বইয়ে গিল। সে এলে প্রহুসর  
প্রতিষ্ঠিত শোটে গ্রাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে এবং রতনদিয়ার  
তরুণদের মধ্যে আধুনিক যুগের বা কিছু পরমাধ্যমিক উদ্ভীপনা এবং  
একটা নবজাগরণের বোমাঝ তা স্পষ্ট ভেগে উঠত। প্রহুসর  
প্রতিষ্ঠা, শোটে, হাতে-লেখা কাগজ বের করা এবং আধুনিক জগতের  
নানা বিষয়ের আলোচনার সবার মধ্যে বেশ একটা পাড়া পড়ে যেত।  
বাইরে থেকে সবাই নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্ছ্বাস বহন করে  
এসে মিলত দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে। পুরো দেড় মাস ধরে সে কি  
উদ্যান। প্রহুসর কাছে তাতুয়াল ফিলসফি নামক মোটা এক  
সুচিভিত্ত একখানা পদার্থবিজ্ঞানের বই দেখি, এবং তা থেকে  
ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ের আরও একটু কোঁফুল  
চরিতার্থতার সুযোগ পাই।

সীতারের কিছু কোঁশল শিখলাম প্রহুসর কাছ থেকেই। জলে  
সেহ সম্পূর্ণ শিখিল করে, ছুখানা হাত টান করে সোজা উত্তর মেয়র  
দিকে ধিরিয়ে চিং হয়ে বতকণ ইচ্ছে জলে ভেসে থাকি শিখলাম।  
চন্দনা নদীর বড় জলে নতুন জল পদ্মা থেকে আসে আবাতের  
মারামারি। তার আগে নদী প্রার শুকনো, শ্রোতহীন, অনেক  
সময় জাওলায় ভরা। গ্রীষ্মের দূর্বে জল গরম হয়ে উঠত। কিন্তু  
তা সবেও সেখানে আমাদের সীতার খেলা চলত তত্নিতন ঘট।  
বর্ষার চন্দনার আর এক রূপ। তখন সে খরশ্রোতা, তার জল  
বর্ষার পদ্মারই মতো সেক্সার রতের। নিত্যন্তই যবোয়া পাশা নদীটি,  
বহুরে একবার জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন সে সবার আদরে আদরে  
অস্থির। বর্ষার একবার শ্রোতের মুখে একমাইল অবধি গিয়েছিলাম।  
মাথায় অত্যন্ত বস্ত্রা হয়েছিল, তারপর থেকে দীর্ঘ সীতারের আর  
চেষ্টা করিনি। রতনদিয়া থেকে পতনানী তখন লেগে মাইল দূরে।  
আমরা অনেক সময় বেড়াতে যেতাম সে দিকে। আবহাওয়া সেই পাড়ে  
পাড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। এমনি ভাবেই এক একটা দেশের  
সঙ্গে পরিচয়। তার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে অজান্তে সম্পর্ক গড়ে  
ওঠে এমনি করে। তখন বোকা যায় না, কিন্তু ছেড়ে এলে বোকা  
যায় সে শুধু ছেড়ে আসা নয়, ছিঁড়ে আসা।

নানা বিষয়ে জানবার অল্প মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল কুল  
জীবনে। ক্লাস-নাইনে পড়তে ডাকে সাহেবী সোঁকান থেকে বই  
আনিবে পড়তাম। সম্ভবত ম্যাক্সিমিলিয়ান কম্পানি থেকে  
অ্যাটীভমেটস ইনি কেমিক্যাল সায়েন্স ও দি ওয়াগুগ-অক  
ফিজিক্যাল সায়েন্স এ দুখানি বই আনিরেছিলাম ভি, পি'তে।  
ইডেট নামক একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র বেবোয়। ১৯১৩ কি  
১৪ মনে পড়ছে না। প্রথমে এক সংখ্যা নমুনা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।  
আমার বতনুর মরণ হয় গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যৌব এই কাগজের সঙ্গে  
সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তিনিই চিঠি লিখেছিলেন। 'দীপস অ্যাট  
মেনি ল্যাণ্ডস' পর্যায়ের কয়েকখানা বই পড়েছিলাম এ সময়ে। এই  
সময়েই একবার রাষ্ট্রবাড়ি ট্রেনে হকারের কাছ থেকে একখানা বই  
(দাম দু পয়সা বা চার পয়সা) কিনি, বইখানার নাম 'দি ওয়াগুগ-অক  
হাউস টাই লিড ইন'। সেখের পরিচয়, পাতার পাতার ছবির  
সাহায্যে কল্লাল দ্বারা রক্ত চলালে প্রভৃতি মেহের সর্বাঙ্গীন পরিচয়  
গল্পের ভিত্তিতে লেখা। মিশমারি বই। এই বইখানা আমাকে  
ছন্দ করল।

প্রথম মহাবুদ্ধ আরও হয়ে গেল ১১১৫ সালের অগষ্ট মাসের গোড়ায়—সারাইয়েভো-হত্যাকাণ্ডের কিছু পরেই। সেখানে শাচডিউক কার্ডিনালও নিহত হলেন সতীক। অষ্টাদশ সারিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধোপাধা করল, জার্মানি করল রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং তার পরেই বুটেন করল জার্মানির বিরুদ্ধে। তারপর আরও অনেকে এলো।

এ বুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কোনো হুজিঙ্গা ছিল না। তারা ব'লে ব'লে কেবল গুজব রটাত। বাবা কালের লোক তারা অল্প নীরব তৎপরতায় এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছিল। তারপর ১১১৬ সালে যখন বাঙালী তত্ত্বাবধায় ডাক পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন বাঙালী জাতির যেন আরও একটা আগরণের যুগ এলো। প্রথম বাঙালী মল ফরাসী চন্দননগর থেকে গেল যুদ্ধে, তারপর ব্রিটিশ বাঙালীর ডাবল কম্পানি, কার্টিনাইনথ রেজিমেন্ট। গ্রামে গ্রামে বিক্রেটমেন্টের উৎসাহ, যুদ্ধের ঢালার উত্তেজনা।

রতনদিয়ার কুহলপ্রসন্ন রায়, পুলিশে চাকরি করত, কিন্তু এক মারামারি বেশ-এ পক্ষে অল্পম্যাদি জেল হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই সে চাকরপ্রসন্ন রায় হয়ে বেগমিল বেকলী রেজিমেন্টে। ল্যান্সনায়েক বেশে তাকে দেখেছি অনেক বার। রাজবাড়ির সাব ডিভিশনাল অফিসার অ্যালফ্রেড বোস যুদ্ধোত্তম্যে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে রতনদিয়ারে আসতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন।

টেট পরীক্ষা দিয়ে পড়ায় মনোযোগী ছলাম। ১১১৫ সালের মার্চ মাসে পরীক্ষায় বসলাম পাবনা শহরে। আমাদের সময়ে ইংরেজী বা বাংলা কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল না। নির্দিষ্ট বই ছিল সংস্কৃত। ক্লাস-নাইন ও টেন-এ ইংরেজী পড়েছি লালবিহারী দেব কোকটেলস অফ বেসল, লেজেণ্ডস অব গ্রীস অ্যাণ্ড রোম, লাহিড়িস সিলেট পোয়েমস। অতিরিক্ত নিয়েছিলাম সংস্কৃত ও ভূগোল। অঙ্ক জলের মতো সোজা।

জুলাই মাসে এসাম রাজসাহী কলেজে ভর্তি হতে, যোগেশ-চন্দ্রের সঙ্গে। নাটোর-থেকে মোটরে যেতে হল। রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেটি তাঁর শিষ্যালয়। অস্ত্র-এবং ওখানে থাকার ব্যবস্থা হল। ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান পড়ব, কিন্তু অঙ্কে পিছিয়ে আছি, তাই আই-এতে একটি অন্তত বিজ্ঞানের বিষয় নেওয়া যায় কি না চেষ্টা করলাম। কর্তৃপক্ষ বললেন, আই, এসসি ভর্তি শেষ হওয়ার পর যদি জায়গা থাকে তা হলে কেমিস্ট্রিতে আমার নাম দিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে ইতিহাস নিয়ে আই-এতে ভর্তি হতে হবে। তাই হয়েছিলাম। কিন্তু এক মাস পড়ার পর জানা গেল জায়গা খালি নেই।

আমার রাজসাহীতে থাকা হল না। এখানে সাগরপাড়ার একটি বাড়িতে আরও কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে থাকতাম। সকালে গোয়ালদেবের ছেলেরা মাখন কেরি ক'রে বিক্রি করত। যবে তৈরি, বলের মতো গড়া, চার পয়সার একটি বল, ওজন অন্তত এক ছটাক হবে। ভেবে সবাই মিলে এই মাখন খেতাম তিনি দিয়ে। খাবার দর্ভ খুব শক্ত। এ রকম পরিবেশে প্রবাসীরা ফ্রুথ কোথায়? মাঝরা কয়েক জন খান করতাম এসে পড়া নীত। একটু দূর গেয়া সবেক ডাল লাগত। বর্ষাকাল তখন, ভীষণ জ্বোত। সাতার

কাটিতে গিয়ে একদিন প্রবল জ্বোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ছিল। তখন বুদ্ধি ক'রে জ্বোতের সঙ্গেই জেল তীরের দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে গিয়ে দিকি মাইল দূরে গিয়ে উঠেছিলাম। উঠে ভীষণ কঁপেছিলাম, মনে আছে।

রাজসাহী থাকা হল না, কিন্তু কেরবার সময় একটি বড় জিনিষের স্মৃতি বহন ক'রে আনলাম সঙ্গে। সে হচ্ছে কিশোরীমোহন চৌধুরীর স্মৃতি। তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তখনেছিলাম তিনি ছাত্রদের অনেক সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য অনেক সেনাগ্রস্তও হয়েছেন। বানার কেত্রে তাঁর কোনো হিসেব নেই। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র তাঁর বাড়িতে আশ্রিত। একটা লম্বা ঘরে ছ' সারিতে বসে ছাত্ররা থাকেন, তিনিও খেতেন প্রায় এই সময়। ছ'সারের মাথার একটু দূরে বসতেন। আরি বসতাম তাঁর ঝ'পালে। ঠাকুর পরিবেশন করছে—খাওয়া কিছু এগিয়েছে—ঠাকুর পুনরায় কিছু মাহ বা মাহের ভিন্ন দিতে এলো কিশোরীমোহনের পাতে, তিনি হাত তুলে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—না না, আমাকে আর নয়, ওদের লাও, ওদের লাও। ছাত্রদের দিকে দেখিয়ে দিলেন। ঠাকুর এটি জানত। তবু বেশি থাকলে জিজ্ঞাসা করতে বাগা কি, এই রকম ভাব। একদিন আমের টুকরো দিতে এলেও ঠিক এই ভাবেই, নিজে এক টুকরো অতিরিক্ত খেতে অস্বীকার করলেন। চোখে না দেখলে এমন একটি দুর্লভ জিনিষ আমার অজানা থেকে যেত। ধনীর দান বা চ্যারিটি সম্পর্কে আমার যে ধারণা তার সঙ্গে এর আসলো মিল ছিল না। এ ঘটনা আমাকে খুব বিচলিত করেছিল, আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিলাম। শুভকেশ কিশোরীমোহনের ছবিটি শুভকৃষ্ণর-মণ্ডিত হিমালয়ের ছবিটিকেই মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

এইখানে থাকতে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। সে অভিজ্ঞতা সেই প্রথম এবং সেই শেষ। একটি স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা। তখন ইউরোপে পুরোদমে যুদ্ধ চলছে, তার গোলা বারুদের আক্রমণ সম্পর্কিত



“আজ, শাসী জির আমার কোনো বন্ধু নেই।”

হুই এসেছে খুব প্রচণ্ড হাঙ্গুল, অতএব গোলায় বিক্ষোভ এবং তার কল চার দিকের অবস্থা মনে চিত্রিত হয়ে গিয়েছিল। যখন সমস্ত আকাশব্যাপী সেই বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার পূর্বের মতো এক একটা বিক্ষোভ, ঘোঁরায় অন্ধকার, তাইই কীকে কীকে বহু কালীমূর্তি, যেমন মূর্তি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। আকাশব্যাপী বিরাট এক আলোড়ন, বিজ্ঞানগুরু, ভয়াবহ। চাইলে কোথাকালসে যার।

কিন্তু এ বকম স্বপ্ন দেখা বা গোলা ভাটার সঙ্গে বহু কালীমূর্তির হুই দেখতে আমি ভুলের কিছুই মনে করিনি, যখন অসম্ভব সব জিনিস একসঙ্গে এসে মেলে, আমি চাই বা না চাই। এ স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য অন্য। আমি প্রথম স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে জেগে উঠি এবং অনেককণ ঘুমোতে পারিনি। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়লে আবার ঐ একই স্বপ্নের ধারাবাহিক রূপ দেখতে থাকি এবং আবার জেগে উঠি। তার পর ঘুমিয়েও ঐ একই স্বপ্ন দেখি বাকী রাতটুকু। স্বপ্নের এই মাসিকপত্র-মূলত ক্রমশ-প্রকাশ রূপ এক দ্বায়ে আসে। লজ্জা কি না জানা ছিল না, আর কেউ হয় তো এরকম অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন, আমাদের আর হয়নি। ক্রয়ডলিয়ারা নিচের বলতে পারবেন কিস্তিবন্দী স্বপ্ন সম্ভব কি না।

অগষ্টের মাঝামাঝি পাবনা এলামা ট্রান্সকার সার্টিকিট নিয়ে। এখানে অতীষ্ট সিদ্ধ হল, কেমিট্রি পেলাম লজ্জিক-সম্বন্ধের সঙ্গে। কয়েক মাসের জন্ম স্থানীয় উকিল কালীচরণ সেনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হল, ইনি বাবার বন্ধু। হাট্টোলে গিয়েছিলাম পুজোর ছুটির পর।

পাবনা শহরটিকে খুব ভাল লাগল। পরিষ্কার ছোট শহর। এইখানে এসে আমার চিঠির সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। প্রতি ভাকে পাঁচছ'খানা চিঠি আসা চাই-ই, নইলে তৃপ্তি হত না। বন্ধুদের চিঠি পেতে খুব ভাল লাগত। আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল চিঠি। পাওয়া ও লেখার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর মোহ ছিল। তখন এই চিঠি ও নানা প্রতিভা নিয়েই থাকত। প্রতি ভাকে আসত ব'লে পাবনা ডাকঘরে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম। সেবে আমার নামের সঙ্গে তখন পাবনা জুড়ে গিলেই চলত। একটি জেলাশহরে নবাগত আমার এ বিষয়ে বেশ একটা গর্ব ছিল।

আমার দৃষ্টিশক্তি ছেলেবেলা থেকে কদী ছিল, কম দেখতাম অনেক, কিন্তু তা নিয়ে ভাববী করিনি কখনো। ছোটবেলার টীমারের নাম পড়া নিয়ে আমি হেরে যেতাম। বন্ধুরা অনেক আপে পড়তে পাবত, অনেক কাছের এলে তবে আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে এসে এক বছর চম্পা হঠাৎ কোথেকে গিয়ে দেখি দুনিয়া হুবহুতর। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল চম্পা দিতে হবে। বাবা কখনো চম্পা ব্যবহার করেন নি। বুকের জন্মও না, কাছের জন্মও না। আদরণ বিনা চম্পার পড়ানো করেছেন। তাই চম্পার মধ্যমা বৃষিনি। এখানে পাবনার এক আলোহিত্তিমান চম্পাওহালা এসে বাসা বাঁধল কিছুদিনের জন্য। তাঁর কাছে গিয়ে তখন চম্পা কবিরে চম্পা নিলাম। মাইনাস্ ১°৫ পাণ্ডারের চম্পা। নতুন আলো এলো জীবনে।

পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধিকানারায়ণ বসু, আর, বোস নামে খ্যাত। ইয়েজী পুত্র পড়াফেল। ইয়েজী কায় পড়াফেল

হুয়েজনাথ বার। কেমিট্রি পড়াফেল জগদীপচন্দ্র দাস। লজ্জিক, বীরেন্দ্রনাথ জৌহরী। সঙ্কত, হেমচন্দ্র বার। আর, বোসের ইয়েজী বলবার ভক্তি বেশ মনোহর ছিল। হেমচন্দ্র বার সঙ্কতকে খুব চিত্তাকর্ষক করতে পারতেন। শিশুর মতো সরল এবং আপন বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অধিকার ছিল। আমাদের ইয়েজী পাঠ্য ছিল কাতালি পেশাস', (টীল অ্যাডিসন) দি হুইটার অ্যাণ্ড দি হার্ব (চালস রীড), ওয়ার্ডসওয়ার্থের কতকগুলি কবিতা ও মিলটনের গদ্য। সঙ্কত, ভাইকাব্য, রব্বশম্, লক্ষ্মীহারচরিত্রম্, সবই আশিষক। কেমিট্রি পি, সি, রায়; লজ্জিক, এ, সি, মিত্র।

কলেজ বসত ছোট একটি একতলা পুরনো বাড়ি ও তার সঙ্গে একটি টিনের আটগালা-ঘরে। তবু তো এডওয়ার্ডের মূর্তি বৃক জড়িয়ে আছে। অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিবেশের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। মাইনর খুসে ছেড়ে-আসা বন্ধুদেরও দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হল।

পাবনা থেকে কুষ্টিয়াতে একখানা টীমার বাতায়নত করত। পথের দৈর্ঘ্য বারো মাইল কিংবা ঐ বকম। পদ্মা থেকে বেরিয়ে একটি নদী কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে বশোর জেলার গিয়ে প্রবেশ করেছে, সে নদীর নাম গড়াই বা মধুমতী। কুষ্টিয়া থেকে টীমারে চড়ে সেই নদীপথে প্রথমে পদ্মার, তারপর সেখান থেকে ডান দিকে ঘুরে পাবনার দিকে বাওয়া। গড়াই নদী কুষ্টিয়া ষ্টেশন থেকে দু'মিনিটের পথ।

কলেজে আমার প্রথম পুজোর ছুটি, পাবনা থেকে রাজিবোলা সেই পথে কুষ্টিয়াতে এসে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ধরব। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র আর অধ্যাপক টীমার প্রার বোকাই। আশ্বিন মাস। বর্ষার ভরা নদী, ঢুকল হারা। টীমার ছাড়বার কিছু পরেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে এলো। অনেককণ ধরে একটা গুমোট ভাব। রাত তখন হয় তো লমটা হয়ে। কালো আকাশ, কালো জল। নদীর কোথায় আছি জানি না। মাঝারি সোতলা টীমার। চার দিক নীরস্ত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বৃক চিরে আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ অগতে লাগল হুহুহুহু। প্রবল গর্জন আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে। খোলা নদীর মেঘে-ঢাকা বৃক তার প্রতিধ্বনি অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। বিদ্যুতের আলোতেও এপার ওপার চাঁহয় হয় না।

বড় উঠে এলো অতি প্রবল বেগে। সঙ্গে ভয়াবহতীরের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির তীর। টীমার ঘুরে উঠল প্রথম বাঁকাতই। টীমারের উপরের ছাউনি মড়মড় করে উঠল। একটার পর একটা উত্তর ডেউ এসে ভেঙে পড়তে লাগল একতলার ডেকে। বৃষ্টির ছাউ বক করার জন্ম বড়ের দিকের চট্টের পর্দা। বৃষ্টির বেতরা হয়েছিল সোতলার, কিন্তু বড়ের বা বেগ ভাতে পর্দা কোলানো থাকলে টীমার থেকেনো দুহুর্ন্ত কাত হয়ে তলিয়ে যাবে। আমি ভক্তিতকৎ কাঁপিয়ে আহি মাঝামাঝি জায়গায়, চিমনির জন্ম ঘেরা জায়গা থেকে একটু দূরে। সেখানি, খালশিরা ছুই হাতে ছুটে এসে পর্দার দিকি কেটে গিল। সেখানি, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই হিমশীতল বৃষ্টির আঘাতে সমস্ত দেহ অর্জরিত করছে। সেখানি, কিন্তু কিছুই ভয়ছি না। কয়েক পা ন'রে গেলে চিমনি-ঘরের আড়ালে গিয়ে ঝাঁপতে লাগি, কিন্তু এক পা সরবার প্রবৃত্তি নেই। পান্যের মতো

স তাহে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে ভিজছি। কানে আসছে—অঘাণক  
দ্বয়ের ভয়ানক কণ্ঠে বলছেন এই তো শেষ—বিধার বন্ধুরা। সব কথা  
নে আসছে, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করছে না। লাইকবয় লাগানো  
ছে, ঠীমার ভুলে তা ধরে জালা যায়, কিন্তু কোনো ইচ্ছেই নেই।

চিন্তার এমন একটি পূর্ণ নিষ্ফলতা সচেতন অবস্থায় যে সম্ভব  
। জানতাম না। মন তার আধার থেকে বেন গড়িয়ে নিচে পড়ে  
ছে। আমি তখন সকল সুখ-দুঃখ সকল ভাল-মন্দের উৎস,  
হ-ভাবনার উৎস। প্রায় এক ঘণ্টা বড় চলেছিল, যেখানে ঠাঁড়িয়ে  
হলাম সেখান থেকে এক পা নড়িনি, ঠায় ঠাঁড়িয়ে ভিজছি।  
ইতর কীপুনি আরম্ভ হয়েছিল বড় খেমে বাবার পর। পরে  
কতে পেরেছি অনেকই আমাদেরই মতো চিন্তাশূন্য ছিল। উপায়  
নই, এমনই হয়। যেখানে ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছার কোনো  
াম নেই, সেখানে ইচ্ছা অসাড় হয়েই নিজের মান বাঁচার এই ভাবে।

অনেকক্ষণ পরে মনে হয়েছিল সাবেরের কথা। এত বড়  
বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ঠীমারকে তাঁর সমস্ত  
গলগান-নৈপুণ্য দিয়ে ভরাডুঝির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।  
বিস্ময়ে মন ভরেছিল, কৃতজ্ঞতার মাথা নত হয়েছিল।

মৃত্যু সম্পর্কে এই উদাসীনতা সম্ভবত ভয়ের শেষ অবস্থা।  
একদিন এ বিষয়ে অবহিত হলাম। ভরে এ রকম জীবমৃত হয়ে  
বাঁচতে নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব এসে। একদিন  
সচেতন হলাম মনের কোমলতা ধ্বংস করতে হবে। দেবদেবতা  
অপদেবতা প্রভৃতি আমাদের মনে কোনো দিনও স্থান পায়নি, ছেলেবেলা  
থেকেই এ বিষয়ে উদাসীন এবং সবাই মান ব'লে আমি স্বতন্ত্র  
ছিলাম। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব অনেক মত ছিল। এবারে এই  
কড়ের পর থেকে আমার আমার মনোবোগ এদিকে গেল।—ভয়  
ছাড়তে হবে। কিন্তু কি ভাবে? সব বিষয়ে, অন্তত নিজের সঙ্গে  
প্রত্যক্ষ ভিত্তি নয় এমন সব বিষয়ে, নিশ্চয় না হতে পারলে অকাণ  
ভয় বা নার্তাসনের ছাড়া বাবে না। অতএব যেখানে ভয়  
পায়ার মতো বিষয়ে আগে এগিয়ে যেতে হবে। বাড়ির কাছে  
নতুন রেলপথে এখানে চাপা পড়া ছিন্ন-বিছিন্ন মানুষকে দেখলাম  
পর পর তিন-চারটি। খুব কাছে গিয়ে মাথার ভাড়া খুলির  
মধ্যেকার মগজ কেমন দেখায়, তা আমার পড়া সেই শারীরতত্ত্ব  
বিষয়ের ইংরেজী বইখানার সঙ্গে কতটা মেলে, দেখলাম। ছিন্ন  
হাত-পায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখলাম মনকে প্রভুত করে। আগে  
এ রকম কল্পনার মন বিমোহ করত, কিন্তু মন যির করলাম বৃত্তি  
গিয়ে। সে বৃত্তি বৈজ্ঞানিকের চেয়ে দার্শনিকই বেশি ছিল, এবং  
আজও সে বৃত্তি আমি সম্পূর্ণ হারাইনি, যদিও মনের  
সে অবস্থা এখন আর নেই।

মৃতদেহের খণ্ডিত অংশের সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয়ে মনে বেশ  
একটা জোর অল্পতব করতে লাগলাম। এর কিছু দিন পর এক  
দুর্ঘটনা পাগল হঠাৎ ছাড়া গেলে যেখানে গ্রামের প্রান্তে এক বৃত্তিকে  
বীট দিয়ে কেটে কেলে। হৈ হৈ চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। খুব  
কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁতে দেখলাম, কি পরিমাণ বাটা। মনের  
এ রকম আতর্ষ পরিবর্তনে আমার ভাল লাগল। কাণ্ডপালি ট্রেন  
থেকে উঠে রেলপথ ধরে একদিন শেষ রাতে একা কিলোমিটার বাড়িতে  
(১৫-মিনিট হাঁটা পথ)। যে রেলের উপর বসন্ত ছিন্ন-বিছিন্ন

মানুষকে দেখেছি দিনের বেলায়, সেই পথের উপর দিয়ে রাত হটোর  
সময় একা চলেছি হেঁটে। মনে ভয়ের কিছুমাত্র ছিল না। এর পর  
থেকে মৃতপ্রায় বোগীর বিহীনায় গিয়ে বসতে আরম্ভ করলাম।  
ধারোমিটারে তাপ দেখে তার সঙ্গে নাতীর গতির সম্পর্ক পরীক্ষা  
করতে আরম্ভ করলাম। এ সবই নিজের মন থেকে। এ সবই  
কৌতুহল থেকে, অভিজ্ঞতা লাভের নিজস্ব উপায়। যুহু' বোগীর  
পালসু ধরে ঘটার পর ঘটা কাটিয়েছি যদি সামনে নিয়ে। কীপ  
পালসু মিনিটে ১৩০ চলেছে, কিন্তু ধারোমিটারের পারা এক ঘণ্টাও  
ওঠে না। হাত-পা ঠাণ্ডা, নাতীর গতি এলোমেলো, পাওয়া যায়  
কি যায় না, তার পর সব খেমে গেল। গলায় বড়বড় আঙুর  
এ সঙ্গে নীরব। তিনটি বছর ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার দেখলাম।  
প্রশ্নে গিয়েছি ইচ্ছে করে। পোড়ানো খুব কাছে থেকে ব'লে  
ব'লে দেখেছি। মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। জগতের সমস্ত  
স্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে এসব মিলিয়ে দেখেছি। এসব অবত তখন  
থেকে পরবর্তী তিন বছরব্যাপী প্রায়সের কথা।

ভূতের ভয় নামক কোনো ভয়ের যে কোনো অস্তিত্ব নেই আমার  
মনে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। পাবনা থাকতে কল্যাণের সন্দের  
বড় বাড়িতে আমাকে দু'-তিন রাত্রি সম্পূর্ণ একা থাকতে হয়েছিল  
এক সময়। কিছুমাত্র ভয় হয়নি। মজা করে অন্তর্কৃত ভয়  
দেখিয়েছি। সমস্ত সাজের কৌশলে যেখানে লোককে ভীষণ  
ভয় দেখানো যায় রাতে।

পূজোর ছুটির শেষে পাবনা রওনা হয়ে গেলাম, দুইভায় পৌঁছলাম  
সন্ধ্যা প্রায় ছটার। কিন্তু আকাশে দেখি মেঘ বনাচ্ছে। ট্রেন  
থেকেই অনেক রাতে ঢাকা প্যাসেঞ্জারে ফিরে এলাম, পাবনা যাওয়া  
তখন আর হ'ল না। এক মাস আগের ঝড়ের কথা মনে এলো।  
যে ভয়ের কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ বাটে না, সে ভয় জর করা কঠিন।

কিছু দিন পরে ফিরলাম পাবনা এবং এসে হটেলে জায়গা পেলাম।  
এই আমার প্রথম হটেল-জীবন। ভাল লাগল খুব। গবেষণার  
চক্রবর্তী পাবনার বিশিষ্ট উকিল ছিলেন, তিনি পাবনা ছেড়ে চলে



এক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকারের সন্ধ্যা ভেঙে গেল।

গিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে ছিল আমাদের হাটল। একতলা বাড়ি, বাড়ির সামনের উঠানের হুশাশে হুশানা বড় তিনের ঘর। ডান দিকের একখানা ঘরে সাত আট জন ছাত্রের সঙ্গে একটা সীট পেলাম।

বাড়ির শিঙনে ইছামতী নদী, এই নদীতেই স্নান করতে ভাল লাগত। বাড়ির ভূতপূর্ব মালিকের দুই পুত্র প্রবেশানন্দ ও অতুলানন্দ চক্রবর্তী এই হাটলেই থাকত। আমাদের সবার বেশ একটা সজীবন গড়ে উঠেছিল এখানে। নানা চরিত্রের বিচিত্রতা বড়ই লোভনীয় ছিল। তারাপদ সাতাল ছিল ভীষণ আয়ুর্ষ লোক। চমককার গান গাইত, বাঁশী বাজাত। হেঁ হেঁ করা ছিল তার অভ্যাস। সে সমস্ত দিন অজস্র পড়া নষ্ট করে নিজে সমস্ত রাত জেগে পড়ত। ছটমি বৃত্তিতে ডরা।

একবার হাটল সার্চ হল—রাজকোহর এখানে কি পরিমাণ বাসা বেছেছে দেখার জন্য। সবার বাস্র খুলে চিটিগায়েব সন্ধান। সার্চের ঘরন দেখে মনে হয়েছিল কয়েকজন নির্দিষ্ট ছাত্রের প্রতি ইচ্ছা ছিল, কেন না তাদের দিকেই প্রথম এক প্রাণন মনোযোগ ছিল। আমাদের ঘরে আদৌ আসেনি। তারাপদদের ঘরে দু'টার মনের বাস্র খোলা হয়েছিল। তারাপদ ছিল বিবাহিত, সে হেঁকায় তামাক খেত। পুলিশের সঙ্গে একজন অধ্যাপককেও থাকতে হয়েছিল, তারাপদ বিশদ অহমান করে তামাকের সরঞ্জাম বাইরে সরিয়ে রাখল। কিন্তু বাস্র খুলতে হল। তারাপদ পুলিশ ও তারাপদ সাতালের মধ্যে নিয়মিত বটনা জরুজিত হল।

“চিটি আছে বাবু?”

“আছে,” বলে তারাপদ একটা চিটির বাণ্ডিল বের করে পুলিশের হাতে দিল। পুলিশ তা খুলে একের পর এক তিন চার খানা চিটিতে দেখেন ‘প্রিয়তমসু’ সন্ধান এবং জীলেকের হাতের লেখা। বরক অফিসার, একটু বোঁত বোঁত করে বললেন, “এ চিটি নয়, কোন বন্ধুর চিটি আছে?”

তারাপদ আরও একটা বাণ্ডিল বের করে পুলিশের হাতে দিতে গিয়ে বলল, “ওগুলো বন্ধুর চিটি।”

পুলিশ অফিসার এবারও বিপর হলেন, “বললেন, এও তো দেখছি মেসেজেলের লেখা, কোনো পুরুষ-বন্ধুর চিটি আছে?”

তারাপদ খুব গভীর ভাবে বলল, “আজ্ঞে পৃথিবীতে আমার এক শাশী ভিন্ন আর কোনো বন্ধু নেই, ওগুলো তারই লেখা।”

পুলিশ অফিসার বিরক্ত হয়ে বললেন, “না না, এ সব নয়,”—বলে উঠে এসে সন্ধান থেকে। অধ্যাপক আগেই বয় থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাড়িরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম তারাপদের কীর্তি।

পাবনার তখন আহাৰ বস্তুর দাম বেশ শক্ত। আমাদের সীটের সমস্ত বস্তু-বস্তু টাকার মধ্যে ঢাল বেত বস্তুর মনে পড়ে। হাটলে দিন কত অভাবিত ইলিশ মাছ খেয়ে বিরক্ত হয়ে মাস ভিনেক নিরাশি খেয়েছিলাম। সকালে এক হিন্দুস্থানী প্রকাণ্ড কাঠের পয়ালে সন্দেশ ও কীরের লুটি সাজিয়ে নিয়ে আসত হাটলে। খুব হানিগুণি লোকটা, বাংলার কথা বলার চেষ্টা করত। আমাদের কলত প্রাণল বাবু। তার খাবারের বাস পাড়ার পর থেকে

আমাদের হাটল-জীবনে এক বিশেষ লেখা ছিল। আমর কয়েকজন,

মিটারলোভী খাবারওয়ালার গলা ভনতে পেলেই ছুটে বেগিয়ে এসে কাড়াকাড়ি করে সব খেয়ে ফেলতাম। সন্দেশ অনেক আনত, কিছু কীরের লুটি আমত হুড়ি পটিশখানা, তার একখানিও অবশিষ্ট থাকত না। অনেক সময় কে কত খেল, কে তার হিসেব করে, বিক্রোতা খুব দিলগরিয়া ছিল, সে খুশি হিসেব প্রাছই করত না। বার বা খুশি দিলেই চলত। আমাদের দলে মিটারপ্রিয়তার বিক দিয়ে অতুলানন্দ ছিল প্রথম শ্রেণীর প্রথম। আর তাকে নিয়ে কি মজাটাই না করা হত। তার পড়াশোনার মনোযোগ ছিল বেশি, ভাল ছাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র, কিন্তু পাবনার মতো শহরে থেকে মিটার-দুর্লভতার মূল্যচ্ছেদ না করতে পারলে সে বাসনা পূরণ হওয়া শক্ত ছিল। বয়সটা ছিল কীরের লুটির অহুতুল, এবং এর আকর্ষণ যে পাঠ-আকর্ষণের চেয়ে বেশি ছিল, তার প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যেত।

এতে পড়ার ক্ষতিই শুধু নয়, পকেটের ক্ষতি এবং পাকস্থলীর ক্ষতিও কম হত না। এত খাওয়ার পর আর পড়ার মন বসত না। এজন্য অতুলানন্দ একদিন প্রতিজ্ঞা করে বলল সে আর খাবে না। কিন্তু আমরা বারা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব না জেনে প্রতিজ্ঞাই করতাম না, সেই আমরা তাকে ছাড়ব কেন? অতএব খাবারওয়ালার এসে ঘটনাস্থানটি গার্ডেন অফ ইডেন করনা করে অতুলানন্দকে প্রলুব্ধ করতে লাগলার ঈর্ষের ভূমিকা নিয়ে। শরতান তো আমাদের আগেই তুলিয়েছে।

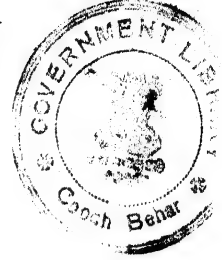
আমরা কয়েক জনে মিলে অতুলানন্দের মুখের কাছ গিয়ে তাকে পেছিয়ে পেছিয়ে সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলাম। এক মিনিটের মধ্যেই অতুলানন্দের সবম জেতে গেল, ছুটে বেগিয়ে এসে কড় আবেগ হুক্ত করে একটার পর একটা সন্দেশ খেতে আরম্ভ করল এবং তা স্বাভাবিক মাত্রা স্বভাবতই ছাড়িয়ে গেল। এরকম অনেক বার হয়েছে। তার কঠিনতম প্রতিজ্ঞা বার বার ভেঙে গেছে। এই বয়সেই মিলি সম্পর্কে তার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মূল্য আমরা।

হাটল-জীবনের বিচিত্র দিক। এমন অনাখিল আনন্দ আর কোথাও পাইনি। পাইনি তার আর একটা বড় কারণ মনে হয় এই যে, এই বালা-জীবন ছেড়ে বত এগিয়ে এসেছি, আন্তরিকতাও তত বেশি এক মাত্রা ছেড়ে ছেড়ে গেছে। বন্ধুদের বিষয়ে এমন ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মীয়তা পরবর্তী কলেজ-জীবনে আর হয়নি। পাইনি এরকম, নিইনি এরকম। সবারই এই একই ইতিহাস, সবারই জীবনে বালাকালের স্মৃতিটিই সব চেয়ে মধুর। এ মধুর অস্ত্র হাজার রকম মধুর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই হাটলের স্মৃতিটি তাই মনের মধ্যে এমন ভাবে গুঞ্জন করছে। কেউ সমস্ত রাত জেগে লজিক খুঁব্ব করছে, কেউ চিন্তার করে কেমিষ্ট্রি পড়ছে, কেউ গান করছে, কেউ গল্পের আড্ডা জমিয়েছে, কেউ নীরবে অঙ্ক করছে। এক দিন ঠাকুর এলো না, পোপাল চক্রবর্তী এবং আরও কজন ‘ওস্তাদ’ মিলে রাগাধারের গিগে হুকল। পরিবেশনের সময় বলে, “গামছা এনে এই ডালের গালাগাতেই জানটা দেবে নিই।” তার মানে ভাল ও জলে মেলেনি, শুধু জল দেখা বাড়ে উপরে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি কিছুমাত্র কম হয়নি। সব আহাৰ্যের মধ্যেই যে শব্দ আত্মীয়তার বাস।

[ক্রমশঃ]





সৈয়দ মুজতবা আলী

‘চুলীঘর’ কথাটা বাঙলা ভাষাতে কখনো খুব বেশী চালা হিন্দ না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মান্তিক হবার কোনো কারণ নেই। ইংরিজিতে একে বলে ‘কাস্টম হাউস’, ফরাসীতে ‘দুয়ান’, জার্মানে ‘খল-আমট’, ফার্সীতে ‘গুমরুক’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্যছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ বিশুদ্ধ তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারি নিয়ন্ত্রকারি, মিন-সরকারি পয়সার নিত্য নিত্য কাইরো-কালাহার, প্যারিস ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনক্যারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন তো আছেই। এই শব্দটি জানা থাকলে তড়িৎভিত্তি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিভুতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে কীকি দেবার চেষ্টা কমিনকালও করবেন না। বরঞ্চ রহস্য কাবুলীকে তার হস্তের কড়ি থেকে বক্ষিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের ‘গুমরুক’টিকে কীকি দেবার চেষ্টা করবেন না। ‘কাবুলী-ওয়ারা’ কিন্তু আমি দেখিনি। রহস্যও বোধ করি সেটাতে তার গুমরুককে এড়াবার চেষ্টা করেনি।

কেন? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকীল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন লেখক) এদের মধ্যে সন্তানের প্রথম-কার জন্মগ্রহণ হয় সে কথা বলা শক্ত। যারই হ’ক তিনি যে চুলীঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মাছুবে মাছুবে সেনসেন নিশ্চয়ই সস্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই ব্রহ্মতাই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠেছে, ‘আমার ট্যাক্সাটা ভুলে না কিন্তু—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গায়ের মোড়লই হ’ক, পক্ষাশ্রম গায়ের দলপতিই হন, কিংবা রাষ্ট্রা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি মিন, আমার তাকে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এ ব্যবসায় আমি পুরনো ধবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বিক্রি করিনি। কিন্তু যেখানে ছ’ পরমা লাভের কোনো প্রায়ই ওঠে না সেখানে বধন চুলীঘর তার নাইকের কড়ি নাহক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে স্রব্ধি জ্বালে জ্বলে কীকি দেওয়া যায় কি প্রকারে?

এই মনে করুন আপনি বাঙালিদের ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র ছোট্ট শাট খোপার মারপিট থেকে পা বাঁচিয়ে কোনো

গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইষ্টাশনে বাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শাট। বাস, আপনার হরে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুলীঘর হুলুখনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শাটটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আত্মাণ করবে এবং শেষটায় দৃষ্টান্তে যে বকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই বকম বুক জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁচর ক’খানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চী চী করে বলবেন, ‘ওতা তো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে বাছি। ওতে তো ট্যান্স লাগবার কথা নয়!’

আইন তাই বলে।

হাব যে আইন। চুলীওয়া বলে ‘নিশ্চর নিশ্চর। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন।’

তর্কহলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাসীপন ছিলেন। তাই আপনি মূর্খের দ্বায় তর্ক তুললেন, ‘পুরানো শাটও তো ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।’

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হ’ত তবে সকলোকে বিব খেতে হত না, বাঁচকে কুশের উপর শিব হতে হত না।

চুলীওয়া জানে, জীবনের প্রধান আইন, চূপ করে থাক, তর্ক করার বদভ্যাসটা ভালো না। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তি চালনা।

কি যেন এক অজানার ধোয়ানে, দীর্ঘ এয়ারলিপের পক্ষান্তে জব্বর রিকচরবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, ‘তা পারেন।’

তার পর কাগজ পেন্সিল নিয়ে কি সব ট্যে-টঙ্কা করবে। তার পর বলবে, ‘পনরো টাকা।’

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কি বদান দেব। ব্যাপারটা বধন আপনার সম্পূর্ণ জন্মজন্ম হল তখন আপনি কীপতম কণ্ঠে বললেন, ‘কিন্তু এই শাটটার লামই তো মাজ চার টাকা।’

চুলীওয়া একখানা হললে কাগজে জোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে লক্ষ্যবস্ত করেছিলেন এবং নুসল শাটটির উল্লেখ করেন নি। চুলীওয়াল কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্বাগল করে নিয়ে বাঙালিদের, পাটার করতে দেয়ছিলেন, হাতে নাতে দেখাইলী কর

করতে গিয়ে থাকা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারতো—আমি কিছা ককেইন হলে—এ বাত্রে বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রয় ছিল।

১। আপনাদের জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এক শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মুড়ার সন ও তারিখ কি?

আমি তখন শাটটির মাথা ভাগ করে ইংরাজ অভিমান ভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু এটি হবার যে নেই। আপনি যদি চুপি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। যদি কেবল দিলেই তো আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শাট কেবল দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শাটটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

চাকা থেকে ফিরে আসার সময় ভারতীয় চুঙ্গীওয়া দেখে ফেললে আপনার নতুন পেলিকান কাউন্টেন শেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই এ কর্মে নতুন, তাই প্যামোন্সকে খামখা হরণ করে। বিশেষতঃ কিলোতে বোম্ব হর চুঙ্গীওয়ার টুইস্টের নিছক মনোরাগনার্থে। তবে তখন।

আমার এক বছর প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশী বাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিশেষ বাঞ্ছন না করে আসছেন। ঐ যে বকম চাকার কুটি পাড়ওয়ান এক ডবলোককে ভি শোপের গেলি উন্টো পরে বেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না হাইতেছেন?'

তিনি সেসময়ে ইটালির তেরিস বন্দরে জাহাজ থেকে। বাত্ব ব্যবসারী লোক। তাই চুঙ্গীওয়ার সেই হলদে কাগজখানার ব্যবসার প্রব্রের সহস্রের দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাট্রিয়ার মিটার। মূল্য দশ টাকা।' অক্ষর ওয়াইন্ড বখন মার্কিং ইটকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গীওয়ার পাঁচ জনের মত তাঁকেও ডাকিয়েছিল, 'এনি থিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আত্মল দিয়ে তার বগলের বাস্টি বায় করেক ট্যাশ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ঐ কাপুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা তো ট্যাশ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হাটটা ট্যাশ করলেও কেউ কোনো আপত্তি করতে পারতো না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—বাত্বদার বণ্টি বচকে দেখেছেন বঁরা, তাঁরাই আমার কথার সার দেখেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা বেশে জাহাজের কর নয়—তাই সেদিন চুঙ্গীওয়ার সেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভল'স কিম্বা-টায়টম ম্যাচের জিড়। বাত্বদা ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে স্নান হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইটালির 'কিয়ান্সি' জিনিশটি বড়ই সরস এবং সরস। চুঙ্গীওয়ার কাঠের খোঁরোড়ের মুখে ঝাড়িয়েছিল এক পাহারওয়া। তাকে হাজার শিবের একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল কিয়ান্সি হাজার ওখারের দোকান থেকে দিয়ে আসতে। পাহারওয়া ঝাড়ি খানদানী লোকের সম্পর্কে

এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাটা নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি বাত্বদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হাট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গীওয়ার পাহারওয়া, সেপাই, চাপরাসী, কুঙ্গী সবাইকে কিয়ান্সি বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'বাস্তাপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বাত্বদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গীওয়ার কাউন্টারে। মাল খালাসীতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত ববাহুত সবাইকে দরাজ হাত হু'খানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে।' কিয়ান্সি বীবকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

বাত্বদার বাস্টিপেটার এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকতো যে, অগা চুঙ্গীওয়াও বুঝতে পারতো এগুলোর মাসিক বাস্টি জিটার তেওয়ার করা নে—তার জীবন কাটে হোটলে হোটলে। আত্মকের চুঙ্গীওয়া কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের জেলে যে বকম বানান করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদল। ডিউটিতে রোগা, পাল ছুটো ভাড়া, হাড় ছুটো জোয়ারলের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ ছুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাসের মত টিটলারী গোপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বাত্বদা বাত্ব লোক, তাই তিনি মাছদকে তার চেহারা থেকে বাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিরমের ব্যাভিচার করতে হল। লোকটাকে আড় চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে। আমাকে কানে কানে বললেন, 'শেক্সপিরার মার্কি বলেছে, রোগা লোককে সময়ে চলবে।' আমার বিশ্বাস আজ যে শেক্সপিরারের এত নাম-ডাক সেটা ঐ দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ বাত্বদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারো কাছ থেকে কখনো কানা কড়ি ধার নেন নি। তিনি খপ খপীকার করতে ঐ দিন থেকে শেক্সপিরারের বশপত্তন হয়।

চুঙ্গীওয়া শুধালে, 'ঐ টিনটার ভিতর আছে কি?'

'ইতিহাস নইটস।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কি করে হয়? ওটা আমি নিয়ে বাব লগুন। খুললে বরবাদ হয়ে বাবে যে।'

চুঙ্গীওয়া যে ভাবে বাত্বদার দিকে তাকালে তাতে বা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশ ট্যাচার পিটিয়ে কোনো বাদশাও ওরকম হুকুম জারী করতে পারতেন না।

বাত্বদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ত্রাঘর, এ-টিনটা আমি নিয়ে বাছি আমার এক বছর মেরের জন্ত লগুন—নেহাংই জিড়ি মেরে। এটা এখানে খুললে সর্বনাশ হয়ে বাবে।'

এবারে চুঙ্গীওয়া যে ভাবে তাকালে তাতে আমি হাজার ট্যাচরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাটলাশ বাত্বদা পিণ্ডের মত নরন করে সকাভরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লগুন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করবো।'

'আমরা একবারেই বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড় খরচা পড়বে।'

পাউণ্ড পাঁচেক—নিশেন।'

হুখবাস কেলেই বললেন, 'তা আর কি কথা বাব।'



কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গীওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ আইন তো সকলেরই জানা।

ঝাণ্ডা একটুখানি দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জলি ভাষায় বোঝালেন। তার অর্ধ টিনের ভিতর বাঘ-ভাল্লুক, ককেইন-হেরিয়ন বাই থাক, ও-মাল বখন সোজা লগুন চলে বাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের মল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ আছে। ‘কিয়ান্তি’-রাসীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনো হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হ’ত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সসিঁনে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ কীজ্ঞে লোকচর ঝাণ্ডে। চুঙ্গীওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘শালা, তবে খুলছি। কিন্তু বাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।’ তারপর ইরাজিতে বললেন, ‘কিন্তু তোমাকে ওটা নিয়ে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইশিয়ান মুস্টার্ড কি না।’

পরতানটা টট করে কাউটারের নিচে থেকে টিন্-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় সিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গীওলাকে বললেন, ‘তোমাকে কিন্তু ঐ মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, জাবার বলছি।’

চুঙ্গীওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। দাঁতে বেজায় টেঁট ফাটলে আমরা যে রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডা টিন কাটলেন।

কি আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিদ্রোহীরাও ঝাণ্ডা ছুরি ছুরি রসগোল্লা খুঁজতে বিতরণ করেছেন—ভ্রামণ সন্তানও বটে। কাঁটা চামচের তোয়াল্লা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর বাহ্যতীর ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসী জর্রণ ইতালীয় স্প্যানিয়ানদের।

মাতৃভাষা বাঙালীরাই বহুৎ তকলীক বরলাভ করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষার তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার কোটোগ্রাফ দি কি প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, ‘এপান্তী!’

জর্রনরা ‘ব্লক্!’

ইতালিয়ানরা ‘ব্রাত্তো!’

স্প্যানিশরা ‘দেলিচজো, দেলিচজো।’

আরবরা ‘ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।’

তামাম চুঙ্গীর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্জ, বা দাশাইজ্জের টেকনী দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গীরের পুলিশ-বরকন্দাজ, চাপরাসী-সাই সকলেবই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে কিয়ান্তি, আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমার বলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক খ্রিস্টান নিজে আমাদের হুঁধে করে বলেছিলেন, ‘খ্রিস্টান মিশনারিরা এখন আমাদের দেশে এসেছিল তখন

তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।’

আমাদের হাতে কিয়ান্তি।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডা আপনাব ডুঁড়িটি কাউটারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গীওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন—‘বাঙলাতে—’একটা খেয়ে দেখো। হাতে তার একটি সরস রসগোল্লা।

চুঙ্গীওলা ঝাড়াটা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডা নাছোড়বন্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, দেখছো তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিস নয়। তবু নিজেই চেষ্টা দেখো, এ বস্ত কি।’

চুঙ্গীওলা ঝাড়াটা আরো পেছিয়ে নিলে। ‘লোকটা অতি পায়গু। একবারের ভরে ‘সরি, টরি’ও বললে না।’

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডা তামাম ডুঁড়িখানা কাউটারের উপর চেপে ধরে ক্যাক করে পাকড়ালেন চুঙ্গীওলার কলার ঝাঁ হাতে, আর ডান হাতে খেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডার তাগ সব সময়ই অতিশয় ধারণ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলার, ‘শালা, তুমি ধাবো না। তোমার গুটী ধাবো। বাটা তুমি মস্তরা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে বাবে, চিড়িটা বজ্ঞ নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না—’আরো কত কি।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গীরের লেগে গিয়েছে ধুপুধুপু! চুঙ্গীওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরচ্ছে তার থেকে বোকা যাচ্ছে সে পরিভ্রমণের জন্ত চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইলুহুচে হুসুসোজানি—মাকখানে বহু সব কনসাল, সিগেপন মিনিস্টার, এম্বেসেডর গেনিগটিনশিয়ারি—কাল্লই গোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি জীস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিংকার-চোমেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বেজাইনী কর্ম। সরকারী চাকুরকে তার কর্তব্য-কর্ম সমাধানে বিশ্ব উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিন মণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাবার চেষ্টা করুন আর সেকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্ত আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুৎ অল্পেই কানী হয়।

ঝাণ্ডার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনপাঁচেক তাঁকে কাউটার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পদার পর পদা চড়াচ্ছেন, ‘খাবিনি, ও পরাণ আমার, খাবিনি, বাটা—’চুঙ্গীওলা ক্রীণ কঠে পুলিশকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাক কলে যেন কথা তুলি। কিন্তু কোথায় পুলিশ? চুঙ্গীরের পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডা-বরদার, ‘আস-সরদার বেকার চাকর-নবর বিলকুল বেমাশুম পায়েবা এ কি ভাহুমতী, এ কি ইলুজাল!’

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে হুঁহু হাত তুলে, অর্থনির্মালিত চক্ষে, গদগদ কঠে বলছে, ‘ধন পুণ্যভূমি ইতালি, ধন পুণ্য নগর ভেনিস! এ ভূমির এমনই পুণ্য যে যিহেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাকুল দেখাতে পারে। কোথার লাল ‘মিরাকুল অব মিলান

এর কাছে—এবে সাক্ষাৎ জাগ্রত বেবতা, পুলিশ-হুলিস সবাইকে খোঁচিয়ে বেব করে দিলেন এখান থেকে। ওহোহো, এর নাম হবে 'মিরাবল ভবনগোলা'।

উকিল মাছুব, সোজা কথা পাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোলায় নেমকহারামী করতে চায় না ইতালীয় পুলিশ—বরকন্দাজরা! তাই তারা গা ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলাম। কিন্তু কে এক কাঠ-রসিক বলে উঠলো, 'রসগোলা নয়, কিয়ান্টি'। আরো ছুঁচায় পাবও তাতে সায় দিলে।

ইতিমধ্যে বাণ্ডুলাকে বহু কঠোর কাউন্টারের একিকে নাবানো হয়েছে। চুকীওলা কামাল দিয়ে রসগোলায় খাবড়া হুহুতে বাজে দেখে তিনি চোঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুলিশ নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট নাখা ওরান!'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা কিয়ান্টি পান করে, না রসগোলা খেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু কৈসলাঙ্করবে কে? তাই এ-বেটিং রিস্ক নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে এক জন বাণ্ডুলাকে সহগমেশ দিল; পুলিশ-হুলিস কের এসে বাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।

তিনি বললেন, 'না, ঐ বে লোকটা কোন করছে। আশ্রক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলদের বোম্ব হয় সব ঢেরে বড় যুক্তি হু। এক বোতল কিয়ান্টি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাণ্ডুলা বাধা দিয়ে বললেন, 'না।'

তার পর বড় সারেরের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিল্লোর, বিকো ইউ প্রসিড, অর্থাৎ কি না ময়না-তলন্ত আরজ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইস্তরান স্কট্টস চেখে দেখুন।' বলে নিজে

হুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্ত বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হরতো অনেক রকমের ঘু খেয়ে ওকী-হাল এক তালেবর। কিখা হরতো কখনো ঘু খান নি। 'না বিইরে কানাইয়ের মা' বখন হওয়া যায় এবং বয়ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘু না খেয়েও লারোপা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি হুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে বইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। কের। আবার।

এবারে বাণ্ডুলা বললেন, 'এক কোটা কিয়ান্টি?'

কিয়ান্টির তার গভীর নিনাদে উত্তর এলো, 'না। রসগোলা।' টিন তখন ভোঁ ভোঁ।

চুকীওলা তার ফিরমান জ্ঞানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া বেত কি করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে পাড়িয়ে আছেন কি করতে? আরো রসগোলা নিয়ে আসুন।' আমরা হুড় হুড় করে বেগিয়ে বাবার সময় গুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুকীওলাকে বললেন, 'তুমিও তো একটা আশ্র গাড়ল। টিন খুলে আর ঐ সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

কিয়ান্টি না রসগোলা সে বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাভা গেরেছেন,

"ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।

অনন্ত শ্রেণ লেখা ওললাটে নিরাশার কালিমায়।"

আমিও তাঁর মরগে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।

ইতালির দেশ বর্ষ তুলিয়া হুটাই তব পার ॥

## কি কি করতে নেই

সমাজে চলাফেরার এবং দৈনন্দিন আচরণে কয়েকটি সাধারণ সূত্র মেনে চলতেই হয়। ভব্যতা বা শিষ্টাচারেরই এগুলো অপরিহার্য অঙ্গ। পরস্পর তুল বোঝাবুরির অবকাশ বাতে না ঘটে, পরস্পর মাছুবে মাছুবে নৈকট্য বাতে বৃদ্ধি পায়—সে দিকে তাকিয়েই এ সকলের ব্যবস্থা। সামাজিক ক্ষেত্রে আলোচনা বা কথাবার্তা কালে যে কয়টি দানা না যানলেই নয়, সেগুলো মোটাছুট এভাবে বলা যায় : (১) নিজেয় যুক্তি বতই বড় হোক, বতই খাঁটি হোক, অপরের যুক্তি বা বক্তব্য শোনবার বৈধ্য হারালে চলাবে না; (২) একজন বখন কথা বলছেন, তখন বাধা সৃষ্টি করা মোটেই ঠিক নয়—পরস্পর নিজের বলবার পালা বতকশ না আসছে, ততকশ আপেক্ষা করাই সমীচীন; (৩) বোল জ্ঞান নিশ্চিত না হয়ে কোন বিষয়েই একাধিপ 'চ্যালেঞ্জ' বা প্রতিবাদ ঠিক নয়; (৪) যে বিষয় বলা

হয়নি বা বলতে চাওয়া হয়নি, সে বিষয় ধরে নিয়ে তর্ক করা অসুচিত; (৫) নেহাৎ আপনার জন না হলে উপরে পাড়ে কাউকে বিতর্কণের মত উপদেশ বা পরামর্শ দিতে নেই; (৬) বীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাবে, তাঁর মনের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত ঠাটা বা উপহাস চলতে পারে না; (৭) যে কোন বৈঠক বা দরবারে নিজের 'অহংভাব'টাকে বড় করে তোলা যুক্তিবৃত্ত নয়; (৮) আলোচনা বা বিতর্ককালে যে কথা কয়টি নিত্যাত্ত প্রাসঙ্গিক, এর বেশী অবধা বলতে গেলেই ভুল করা হবে; (৯) পাঁচ জনের মধ্যে বক্তব্যপূর্ণ কথা কেখানে চলছে, সেখানে জেরার মতোভাবে পরিহার্যই উত্তম যুক্তি; (১০) সাক্ষাৎকারের হুহুর্কে যেমন, কথাবার্তা শেষে বিলার দেবার সময়ও পারস্পরিক সভায়ে তুল করা অসুচিত।

## ঐবীরেন্দ্রনাথ সরকার

[ বাঙালী চলচ্চিত্রের প্রধান পুরুষ ]

হাজার হাজার বছরের নয়, শত শত শতাব্দীর নয়, যুগ-যুগান্তরের নয়, মাত্র কিছু বেশী পঁচিশটি বছরের ব্যবধান। প্রভেদ আকাশ-পাতাল। সেদিন যে ছিল সমাজের একটি বিশেষ কোণে, নির্মলে, অস্বীকৃত অবস্থার, আজ তার স্থান সমাজের স্থানহাসনে, বিশ্বের দরবারে, আজ তার ব্যাপক স্বীকৃতি শুধু তাই নয়, ঘূর্ণায়মান বিশ্বে আজ তার অসীম প্রভাব।

সিনেমার কথা বলছি। গিরিশ-হীন যুগের অভাব, অনটন ও নৈরাশ্র ঘূর্ণির দিয়ে প্রাণভরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কীরোরপ্রসাদের 'আলমগীর' (তখন নাম ছিল ভীমসিংহ) নাটকের মাধ্যমে অধ্যাপক শিশিরকুমার যেদিন স্ক্রিনে করলেন বঙ্গজগতের নব-জন্ম, সেদিনও এই শিল্প শ্রায় অন্ধকারেই ছিল।

অন্ধকার থেকে আজ সে এসেছে আলোয়, অধ্যাতিকর বেড়াঙ্কাল ভেদ করতে হয়েছে সে সমর্থ। আপন বিশেষত্বকে মণ্ডিত করেছে মহিমায়। কিন্তু ক্ষুদ্রতা থেকে বিশালতার অভিব্যুৎ এই অভিযানের সম্ভাব্যতা আকাশ থেকে পড়ে নি, মাটি ফুড়ে ওঠে নি, ছ'রাতির খেয়ালী স্বপ্নের বিলাস বিচরণের মধ্যেও ধরা পড়ে নি। এ জিনিষ সম্ভব হয়েছে কয়েক জনের অবদানে কয়েক জনের প্রাণপাত পরিশ্রমে, কয়েক জনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিতের কাছে আত্মোৎসর্গে।

বাঙালী সেদিন সিনেমা বলতে নিউ থিয়েটারস্‌ই বুঝত, নিউ থিয়েটারস্‌ ছিল বঙ্গপ্রিয়দের একান্ত আপনায়, বাঙালী জানত যে বাঙালী দেশ থেকে ধনপতি লক্ষ্মীস্বরের রক্তের উষ্ণতা এখনও হ্রাস পায় নি। আরও একটি কথা সেদিন বাঙালী জানত, আজও জানে, চিরদিনই জানবে—নিউ থিয়েটারস্‌ হাজার হাজার কর্মীর কর্মক্ষেত্র হলে কি হবে—নিউ থিয়েটারস্‌ মানে—একের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠছে বহুর রূপ। তিনি—এই চিত্রজগতের একটি বিশেষ ভক্ত—বনামধন্য ঐযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার।

পুণ্যভ্রমক উপরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়ই করিয়ে থাকে জাতির বর্ণ পরিচয়। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মূক হয় ফার্স্ট বুক থেকে। সেই দিন থেকেই মনে গাঁথা থাকে প্যারীচরণ সরকারের নাম। প্যারীচরণের পৌত্র নৃপেন্দ্রনাথ। ভারতের আইন-জগতের একজন বিরাট পুরুষ শ্রাব নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে চলচ্চিত্রজগতে নবীতি বীরেন্দ্রনাথ।

১১০১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ভাগলপুরে জন্ম। কলকাতায় হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এস-সি। তারপর পশ্চিমে গেলেন পাড়ি। লণ্ডন থেকে ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে দেশে এলেন ফিরে। এখানে মার্টিন-বার্ণার সঙ্গে কিছুদিন শিক্ষানবীশ হিসেবে যুক্ত থেকে 'বি. এন. সরকার' নামক নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের করলেন প্রতিষ্ঠা।

এই অবধি ঠিকই আছে, যেমন যাবে যেমনটি হয়ে থাকে, শ্রাব এন-এন-এন ছেলের যেমন ভাবে জীবন কাটানো উচিত—বখাছন্দে ওজন করা। তারপরই হলো হুশপতন। এখানে পতন অর্থে ফলন নয়—মৃত্যু হৃদয়ের স্যোভদম। সাগরের দিকেই নদী বাবে কিন্তু বখাঝির্বাণিত পাখে নয়—একটু ঘুরে, অত দিকে, জীবনের



পূর্বতার দিকেই পথ চলেতে লাগলেন বীরেন্দ্রনাথ, গতিপথটাই গেল বদলে। পঙ্ক্যবাহুল ঠিকই বইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ থিয়েটারস্‌র হল প্রতিষ্ঠা। অনিশ্চিত সোনালী ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিত অন্ধকারে পা বাড়ালেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর কল্যাণে চলচ্চিত্রজগতে গেল পূর্ণতা, গেল একটি বয়সসম্পূর্ণ রূপ। আর কি গেল? গেল অসংখ্য পরিচালক, সুরকার অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অজ্ঞাত কলা-কুশলীদের নাম আমরা কাকুরই এক্ষেত্রে করব না, আজকের দিনে ধারা এ জগতের শুভরূপে স্বীকৃত তাঁদের শতকরা ছিয়ানকই জন নিউ থিয়েটারস্‌র স্থা। তাই নামোচ্চ থেকে বিরত রইলুম—কার নাম করতে কার নাম বাধ পড়ে থাকে এই জগতে। নিউ থিয়েটারস্‌ নিজের ইতিহাস আর সেই অসংখ্য সামান্ত ঐতিহাসিক ব্যয় বীরেন্দ্রনাথ।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। নিজেই বললেন "তখন কোন প্রোডাক্স এখানে ছিল না—স্বপ্নের বিষয় এখন হয়েছে।" আমার প্রশ্ন আজকের ছবিগুলির ব্যর্থতার কারণ কি? সরকার সাহেব বলেন, প্রধান কারণ পরিচালক ইচ্ছাসম্পন্নও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জগতে অনেক ইচ্ছে কাজে লাগতে পারেন না। শত শত যুগান্তকারী ছবির প্রযোজক, বীরেন্দ্রনাথকে আমার শেষ প্রশ্ন "প্রযোজক" কথাটির সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত—উত্তরে বলেন, প্রযোজক অর্থে শুধু টাকা দিয়ে খালাস হলোই চলেবে না, প্রত্যেকটি বিভাগের তাঁকে খুঁটিনাটি জানতে হবে এবং বুঝতেও হবে।

পৃথিবীর বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করে বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার আধার গ্রহণ করেছেন বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল চীন দেশ স্ক্রিনে চিত্রে একটি বিশেষ স্থান ও খ্যাতির অধিকারী, ছোটদের চিত্র-নাট্যকা পরিবেশনেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত। সারা বিশ্ব ভারতের প্রতি বর্ষেই প্রদর্শনীল এবং সে প্রদর্শনী অজব্বার।

আজ সাময়িক কর্মবিরতি এসেছে নিউ থিয়েটারস্‌র কিন্তু বিরতি তার আগামী দিনের জাগরণেরই পূর্ণাঙ্গাঙ্গ। যে নতুনদের মজুদা তুলে ধরেছিলেন তাঁরই কৃপায় চলচ্চিত্র আবার নতুন করে পাবে সম্ভাবনী শক্তি। প্রার্থনা করি, বীরেন্দ্রনাথ শতাব্দী হোন ও কতকগুলি অকৃতজ্ঞের কর্পণ টাঁকায় থামিয়ে দি। তাঁর নব নব কীর্তির অসামান্ততার। প্রমাণ করে দিন যে প্রাণহীন ঐরাবতের নির্ধারিত মূল্য এখনও এক লক্ষ টাকা।

বীরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষকু হারান।

## শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

সন ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯৮৮ সালে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলেন সেই সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়া মানভূম হইতে বাঁহারা ঐ আন্দোলনে সপরিবারে যোগদান করিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৩৯৬৬ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সর্বাগ্রগণ্য, সেই সময় শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ দুই পরিবারের শিশু-পুত্র-কন্যাদের লইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনিচ্ছিত ও বন্ধুর পথে বাঁহা শুরু করেন।

এই সংগ্রামের আহ্বানে যে সকল কর্মী আসিয়া যোগদান করিলেন তাঁহাদের সংগ্রামী জীবনের আশ্রয়স্থানরূপে “শিল্পাশ্রম” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে এবং মানভূমের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা লাভের গণ-আন্দোলনমূলক বহু সংগ্রামের শিবিররূপে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্টতম স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ সকলের ‘মাক্ষ’রূপে অভিহিতা। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃস্থানীয়া পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ইনি কারাবরণ করেন। এই সময় ইংরাজ সরকার শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৪০ সালে যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইলে তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া গণ্ডিতা হন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় সিকিউরিটি বন্দীরূপে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল কারাবাস করেন। এই সময়ও শিল্পাশ্রম সরকার কর্তৃক পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়।

ভাবা সমস্ত ছাড়াও স্বাধীনতা লাভের পর মানভূম জেলার



লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

হৃত্তিক ও খাতসমস্তা, নাগরিক অধিকার হরণ ও সংখ্যালঘুদের উপর দমনমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তা লইয়া ১৯৪১-৪৬ সালের মধ্যে জেলাব্যাপী যে সকল গণ-আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয় তাহাতে ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

মানভূমের ভাবা ও সংস্কৃতি দমনের বিরুদ্ধে যে, ঐতিহাসিক “টুং” সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়—সেই সত্যাগ্রহ পরিচালনার তত্ত্ব পাঁচ দফা অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে ১৩ মাস কারাদণ্ড এবং ৬০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। একীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লোকসেবক সংস্থার পরিচালনাধীন যে এক সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা সত্যাগ্রহী পদব্রজে কলিকাতা অভিবাসন করেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ নেতৃত্ব করেন।

## শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী ভূপেন্দ্রনাথ দাস সেধানকার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এবং দ্যাডভোকেটরূপে এক কালে ব্রহ্মদেশে সুনাম ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেজুমের উপর জাপানীদের আক্রমণ শুরু হলে তিনি তাঁর দীর্ঘ কালের প্রিয় কর্মস্থল ছেড়ে এসে কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকেন।

ঢাকা জেলার শুভদ্যা একটি বহুকুলা গ্রাম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তথায় এক সম্ভ্রান্ত মহাবিশ্ব কারু-বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৩পার্বতীনাথ দাস সে অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পরোপকার ও অজ্ঞাত ভরণের জন্তে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। ছয় পুত্রের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয়। ছাত্রজীবনেই তাঁকে অভাব-অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। মেধাবী ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে পনের টাকা মাসিক বৃত্তি (বিভাগীয়) পান। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে এক, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফুর্ডি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেন বি, এ, পরীক্ষা। পাঠ্যাবস্থার গৃহ-শিক্ষকের কাজ করে এবং বৃত্তির টাকা দিয়ে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে কনিষ্ঠ সহোদরদের পড়ার খরচাটির জন্তেও টাকা দিতেন। তাঁর বিলাসিতা ছিল ন এবং তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন।

বি, এ, পাশ করার পরে ভূপেন বাবু কিছু কাল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করেন। আদর্শ শিক্ষারতীরাপে তাঁর অখ্যাতি ছিল যথেষ্ট। ইতিমধ্যে তিনি পাশ করলেন বি, এল, পরীক্ষা। ভাগ্যাবধানে চলে গেছেন বাংলা দেশ ছেড়ে বহু ব্রহ্মদেশে। রেজুনে দ্যা কাউন্সিল জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হলেন। দু'বৎসর মধ্যে সমস্ত কাজ সেয়ে ফেলে তিনি ছুটি হওয়ার সময় পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা পড়তেন। অফিসের মাস্টারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট তা দেখতে গেয়ে অপরের অসমাপ্ত কাজগুলো তাঁর ওপর চাপালেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন; তা নিষ্পল হওয়ার ছেড়ে দিলেন কেরানীর কাজ। এর পর ভূপেন বাবু বেঙ্গল সল্বে ইন্টেনসিফাল হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হন। ওকালতি পাশ করেও তিনি তখন পর্যন্ত উকিল হন নি; কেন না শিক্ষাত্রতীর কার্যেই ছিল তাঁর আকর্ষণ ও অগ্রগতি। এখানে প্রায় সাত বছর (১৯০৫ খ্র: থেকে ১৯১২ খ্র: পর্যন্ত) শিক্ষকতা করে তিনি বশ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর বরী ভাত্রদের মধ্যে অনেকেই উত্তর কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর বা. উ. এবং অগ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মি: উ. এ. মং ভূপেন বাবু ভাত্র। ১৯১২ খ্রষ্টাব্দে বেসিন মিউনিসিপাল হাই স্কুলে গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে পণ্ডিত হল। ভূপেন বাবুরই স্রাব্য দাবী ছিল হেড মাস্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার। কিন্তু সে দাবী অগ্রাহ্য করে কর্তৃপক্ষ বিলেত থেকে মি: ই সি ডাউন নামে একজন লণ্ডন মাস্ট্রিক পাশ করা সাহেবকে এনে বসালেন সেই পদে। স্বাধীনচেতা তেজবী ভূপেননাথ সে অস্ত্রায় নীরবে নন্ত শিরে মেনে নেবেন কেন? বিদেশী সরকারের অস্ত্রায় কার্যের প্রতিবাদ করে একখানা কড়া চিঠি লিখে ইস্তফা দিলেন কাজে।

স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায় তাঁকে বেছে নিতে হল। ১৯১৩ খ্রষ্টাব্দে তিনি বেসিনে ওকালতি শুরু করলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁর পসার হল ওকালতিতে। ভাগ্যলক্ষী সুপ্রসন্ন। হালনা। ব্যাডভোকটের শ্রেণীভুক্ত হয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় বিভাগেই তাঁর পসার হল। আশাতীত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সং কার্যে এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে সাহায্য দানে ভূপেন বাবুর ব্যয়ও বৃদ্ধি পেলে যথেষ্ট। একাধিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হল। বেসিন বার এসোসিয়েশিয়েশনের সভাপতি এবং মিউনিসিপালিটির ডাইন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। একটা অশ্রামের ব্যবস্থা করে তিনি স্থানীয় হিন্দু সমাজের বহু দিনের অসুবিধা দূর করেন। বেসিন শহরের কালীবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, পৌরস্ব-আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও ভূপেন বাবুর দান উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বেঙ্গল সোশাল ক্লাবের তিনি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৪ খ্রষ্টাব্দে তিনি বেকুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেগ নির্বাচিত হন। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন বাবু প্রথমে নির্বাচিত হন বিনা প্রতিযোগিতায় ১৯২৬ খ্রষ্টাব্দে। পরবর্তী দুইটি নির্বাচনে তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আরও দুই বার আসন পেলেন আইন-সভায়। দক্ষ ও স্পষ্টবাদী পালীয়েটারিচান বলে তাঁর সুনাম শুধু ব্রহ্মদেশে নয়, ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি ছিলেন একটা ভারতীয় দলের লীডার বা নায়ক। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম অন্তরীণ ও কাব্যবদ্ধ ভারতীয় রাজবন্দীদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করে এবং তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে ভূপেন বাবুর কার্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় বোল বছর তিনি ছিলেন ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি।

কর্মব্যস্ত জীবনেও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রস-রচনাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূপেন বাবুর রচিত উপন্যাস “সাগরবন্দে” এবং “বহিঃপ্রের” (পদ্ম সঙ্গ্রহ) প্রকাশিত হয়েছে। শেবাঙ্ক

এবংর ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন সুগায়ক এবং ভাল অভিনেতা। ঢাকা জগন্নাথ হলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

গত ছয় বৎসর কাল ভূপেন বাবু ব্রাহ্মপ্রেশার ট্রোকে শয্যাশায়ী। তিনি ডা: অমল বায়চৌধুরীর চিকিৎসায় আছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “বহিঃপ্রের” পুস্তকের ভূমিকায় বা লিখেছেন, তা থেকে কিছুটা উপস্থিত করে দিচ্ছি:—

“শ্রীযুক্ত ভূপেননাথ দাস মহাশয়ের নাম বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত নহে। ব্রহ্মদেশে বেসিন নগরে বহু কাল ধরিয়া ইনি ওকালতী করেন এবং প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গ-সন্তানদের মধ্যে বঙ্গভাবের সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেন।

“প্রথম নিখিল ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন আমি ব্রহ্মদেশে বাই, তখন ইহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং ঐ সময়ে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ব্রহ্মদেশীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তৎকালিক আড়াই বৎসর কাল এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেন। এই সময়ে ইহার রচিত ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী জীবন সম্বন্ধে “সাগরবন্দে” নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সাহিত্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং ব্রহ্মদেশের জীবন ও সাধারণ বাঙ্গালী জীবন অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি ছোট গল্পও ব্রহ্মদেশে ও বঙ্গভূমিতে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকায় ইনি প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মদেশের জীবন ও উপাখ্যান লইয়া রচিত কতকগুলি গল্পের বেশ একটু বিশিষ্টতা আছে। অল্প গল্পগুলি আমাদের সমাজের কথা লইয়া। সাধারণের কাছে এগুলি ভালই লাগিবে বলিয়া আমার মনে হয়। কতকগুলি গল্প আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে।



শ্রীভূপেননাথ দাস

ঐক্য ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাপুত্রের সাহিত্য সাধনা অরবুদ্ধ হউক, আমি ইহাই কামনা করি।”

### ঐশীচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম-এ, এল-এল, বি, এম, বি-ই

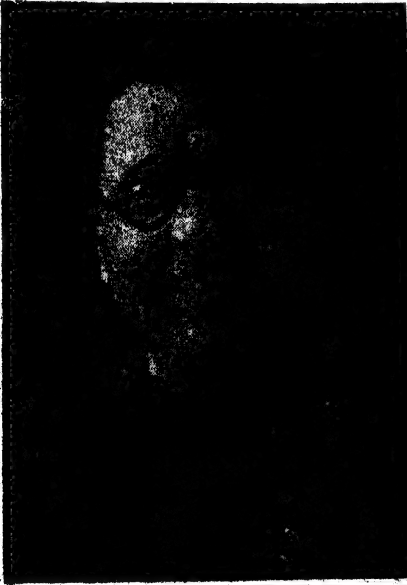
[ রেজিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্টের আদিনি বিভাগ ]

বাড়ীটির নাম “ময়দান এণ্ড” অর্থ প্রান্তর প্রান্তে। সার্বক-নামা বাড়ী। সেটি পেরিয়েই চোখে পড়ে তামল প্রান্তরের প্রান্তভাগ ধরে বিচিত্রপুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য, সান্দ্রাধান শব্দ হ’ পাশের স্বাভাবিক প্রকৃতিসম্পদের বুক চিরে চলে গেছে। তারই প্রান্ত ভাগে ছোট ‘জাহাজ বাড়ী’। বাড়ীটির বয়স বছর দশেকের কাছাকাছি হ’লেও সর্বক্ষেত্রে নবীনত্বের আভা বরে পড়ছে।

তুণু বাড়ী নয়, বাড়ীর মালিকটিও তিরনবীন। পঞ্চাশের সীমানা পেরিয়েছেন বেশ কিছুদিন হ’ল, তবুও বানপ্রস্থ গ্রহণের নিজীবতা নেই। বনে গিয়ে সাধনা করতে চান না।

ভবে সাধনা করেন—সেটা কর্মের সাধনা। ‘ধর্ম’ মানে যদি এই হয়, বা মোহকে ধারণ ক’রে রাখে বা মোহের বাক ধারণ ক’রে বেঁচে থাকে, তবে শচীন্দ্রনাথ পরম ধার্মিক। কর্মকেই যিনি ধর্মজ্ঞান করেন, এমন মোহের বাস্তব দেশে মূলভূমির। সেই মূলভূমি গুণের পরিচয় পেয়ে হুঁইয়েছিলাম; হুঁইয়েছিলাম কানকে মোহের এতো ভালবাসতেও পারে।

‘রেজিষ্টারের’ উক্তনাম (।) এবং পরমর্শনার ভীত না হ’রে মোহবটীর কাছে যদি এসোনা বার, সত্যি অভিজ্ঞ হ’তে হয়।



ঐশীচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হাইকোর্ট এবং আইনের জটিলতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন, বাকীটুকু আনন্দবিলাসী শচীন্দ্রনাথ।

সাক্ষ্য-প্রত্যক্ষী হ’রে গিয়েছিলাম একদিন। মুকেই একটু ভীত হ’রে পড়লাম—সাহেব-বাড়ী নয় তো? মাঝে মাঝে ইংরেজী কথাবার্তা ভেসে আসছে। গৃহকর্তা কতবার সঙ্গে কথা বলছেন।

বাইরের ঘর, বিলিতি কারাগার সাজান। প্রতি মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করছি, সাক্ষ্য-পোশাকে গৃহকর্তা দেখা দেবেন। দেখা মিলেন, তবে পরসের দৃতি পরে গারে কৌচর খুঁটটা জড়িয়ে। একটু হকচকিয়ে গেলাম। এই বেশে এই বাড়ীর গৃহকর্তা দেখা দেবেন ভাবি নি। সরলতার মুখে হলাম। “কি হে! কি খবর? ভালো তো সব। একটু দেরী হ’রে গেলো—পূজোর বসেছিলাম।” “পূজো?” সন্ধ্যায় প্রশ্ন করি।

“অবাক হচ্ছে। যে! বাড়ীর ছোট মেয়েটি পঞ্চদশ হ’ বেলো পূজো করে। ব্রাহ্মণের বাড়ী—পূজো করবো না কি গো?” অবাক লাগলো। কথাবার্তায় জানলাম বাড়ীতে প্রতি বছর কালীপূজো হয়। এই উপলক্ষে এবং দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি মনোমুগ্ধকর কঠোর চতুষ্পাঠ করে থাকেন। চতুষ্পাঠে তাঁর ব্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। শোবার ঘরে খাটের মাথায় মা কালীর ছবি খাটের সঙ্গে লাগানো। কালীভক্ত শচীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য-পশ্চাত্যের জীবনান্বয়ের কী নিখুঁত অহুসীল! এক দিকে ‘ডিনার’—ককটেল পাট, অন্য দিকে আফ্রিক করার প্রতি আত্মাত্মিক বিশ্বাস। এক দিকে বিলিতি সুরের সঙ্গে ‘ডান’ (মনে মনে), অন্য দিকে ঢাকীর বাজনা শুনে মাতোয়ারা হ’রে পড়া—হুই বিপরীত আদর্শের এমন সমন্বয় হুলভ বই কি।

পরিবার-জীবন নিয়ে শচীন্দ্রনাথ গর্বিত। জীব প্রসঙ্গে প্রদানত চিত্তে স্বীকার করলেন তুণু নামে নয়, গৃহের বাবতীর ব্যবস্থাপনার সত্যকার ‘রাজলক্ষী’ তিনি। ছেলেকের তুলনার মেয়েদের প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ একেবারে পঞ্চমুখ নয়, শতমুখ হয়ে উঠলেন। চার পুত্র ও তিন কন্যার গর্বিত পিতা শচীন্দ্রনাথ।

চা খেতে খেতে তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। হাওড়া শিবপুরে তাঁর পূর্বপুরুষের বাস ছিল। পিতা দায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে ডাঃ জ্যোতির্বিজ্ঞ (বর্তমানে মৃত), B. C. S-এর ভূতপূর্ব কর্মচারী ঐজ্ঞানেন্দ্রনাথ, ঐনুপেন্দ্রনাথ এবং D. I. G (Bengal) ও I. G. (Rajasthan) বর্তমানে ব্যারিষ্টার জীবাম্ববজ্ঞ। পিতা গোপালচন্দ্র ছিলেন জেলা জজ। ১৯০১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলো ৩৪৪ মি: বরিশালে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যিঞ্জ মেন স্কুলে শিক্ষালাভ শেষ ক’রে তিনি ‘ফটোশাট’ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকেই আই, এ, এবং বি, এ, পাশ ক’রে ১৯২২ সালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ, পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং বিত্তীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৩ সালে আইন পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে এগিস্ট্রেট রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। বিবাহ হয় ১৯২২ খৃ: এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর নিবাসী জাড়াগ্রামের ঐশ্বরীবরপতি দায়ের কন্যা রাজলক্ষী দেবীর সঙ্গে।

কর্মজীবনে শচীন্দ্রনাথ নতুন কীর্তি স্থাপন করলেন। হাইকোর্টের ইতিহাসে এই প্রথম আদিনি বিভাগে একজন উকিল এগিস্ট্রেট রেজিষ্টারের পদে উন্নীত হলেন। তারপরও কনোয়ারার জহবারা।

দুপে ঘাশে কর্মকর্তা শচীন্দ্রনাথ Asst. Master Referee. Deputy Registrar প্রভৃতি আরও কয়েক ব্যাপ পরিষে সর্বশেষে Registrar পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। প্রত্যেক পদেই তাঁর ব্যাবাসিক ইতিহাস রচিত হ'ল।

এই পরিচিতি শচীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের বোধ করি শতাব্দের একাংশ। স্বাউট আন্দোলনের পুরোধার শচীন্দ্রনাথ। আজও অন্য উৎসাহে স্বাউট আন্দোলনের নেতৃত্ব করে থাকেন। 'Setur Star' এর সম্মান লাভ স্বাধীন ভারতে চুল'ভ। সেই সম্মানের প্রথম অধিকারী তিনি। তা ছাড়া M. B. E. উপাধি লাভ করেছিলেন সিভিক গার্ডের কর্মকর্তাদের জন্ত। যুব আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্ত তিনি লাভ করেন কাইজার-ই-হিন্দ ইত্যাদি বহু সম্মান। যুদ্ধের সময় 'সিভিক গার্ড'দের পরিচালক হয়েছিলেন। তা ছাড়া A. A. B. B. O. A. University Institute, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রক সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রিয় সভাপতি। এই সব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত চুল'ভ। এই চুল'ভ সৌভাগ্যের অধিকারী শচীন্দ্রনাথ। খেলাধুলা—তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকুক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনেই হোক, শচীন্দ্রনাথ সমান উৎসাহে তাতে ভোগ দেন। এ ছাড়া ডিনার-পাটি, ডাল—সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি ও আগ্রহ সমান ভাবে সক্রিয়। বিলিভি মহলের কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা সম্পর্কে তিনি যেমন নিখুঁত ভাবে সচেতন, ঠিক তেমনি সচেতন নিত্যন্ত দেশীয় ঘরোয়া অন্নুষ্ঠান সম্পর্কে অর্থাৎ যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন, শচীন্দ্রনাথ তা জানেন এবং মেনে চলে। 'অন্নুষ্ঠান' পেলে তিনি ক্লাস্তিক বান তুলে। সারা রাত জেগে গান গুনতেও যেমন বিধা নেই, আবার 'মোটর বেস' পরিচালনার জন্ত সারা রাত জেগে পরের দিন ব্যথারীতি 'কোর্টে'

বেতেও ভর নেই বা বিরক্তি নেই। তাঁর জীবন-অভিযানে 'ক্লাস্তি' শব্দটি অল্পপরিচিত। বসেহিসাম, "কাজ একটু করিয়ে দিন। এতো চাপ—!"

লাকিয়ে উঠলেন, "বলো কি? মরে বাবো যে তা' হ'লে। Function আর কাজ নিয়েই তো বেঁচে আছি।".....

নেশার মধ্যে সিগারেট উপস্থিত স্থিতি—ছাড়বার চেষ্টা চলেছে। চা খান, তবে অপরিস্রব নয়। 'সুভলিখ' জমাতে পাবেন সহজেই, তার কারণ সম্ভবত। ভালো গান গাইতে পাবেন এখনও। এতো চিংকার ক'রেও কঠোর দরাজভবী নষ্ট হয়নি একটুও। আবৃত্তি, থিয়েটার (বাঙলা, ইংরেজি, সংস্কৃত) করতে পাবেন। ছাত্রাবস্থার এ সবের 'শাণ্ডা' ছিলেন। পাবেও তাঁকে 'পালের গোঁড়া' বলা হ'তো। সেজন্য বহু প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও সম্রাট স্বীকৃতি পেয়েছেন। সিনেমা দেখতে ভালবাসেন—একা নয়, সপরিবারে। বই পড়তে চান না, বলেন সময় পাই না। বাঙলার এম, এ, হ'লেও ইংরেজির ভক্ত। বলেন তিনি : "আগেককার দিনে বাঙলার এম, এ, অর্থাৎ এক লাইনও বাঙলা লিখতে হোতো না। প্রায় ইংরেজীতে, উত্তরও ইংরেজীতে।" অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, ব্যাংকিয়ার, জজ, প্রকৌশল, কেরানী, ঘটক, কটোপ্রাকার প্রেস-রিপোর্টার সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্বাপন্ন। প্রত্যেকেরই পরিচয় করিয়ে দেন সখিম্বারে কলাও ক'রে, অজ্ঞের সঙ্গে। কলজলি হয় এই যে, তাতে মনে মনে সকলেই খুশী হয়। পঞ্চায়ত যারে এলেও কনের শৈথিল্য কোনও দিকে এতটুকু নেই। বাঙলা দেশে এমন কর্মকর্তা মানুষ যদি আরও পেতোয় আমরা। আক্ষেপ করতে হয়। সর্বকর্মক্ষেত্রের যোগ্য নেতা সম্ভবত মানুষ শচীন্দ্রনাথ.....

[মাসিক বহুমতীর পক্ষ হইতে কলামাধ্যক বন্দোপাধ্যায় ও সক্রমার বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত।]

## অতিরিক্ত কর-ধারণের জের

কর-ধারণের প্রায় বর্ষান উঠে, তখন একতরফা রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য করলেই চলে না। এর পরিণতি কিরূপ পীড়াবে, বা প্রতিক্রিয়া কোন্ কোন্ দিকে হ'তে পারে, গভীর গবেষণা দায়কত সেগুলো দেখে নেওয়া দরকার আগের ভাগেই। মোটের উপর, সব ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত কর ধার্য হলে, বিশেষ করে আয়কর যদি বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় করে নির্ধারিত না হয়, তবে কল বিপরীত হয়েও পীড়িত পারে।

বিলেতে একটি চিন্তা আরম্ভ হয়েছে—অতিরিক্ত আয়কর ধার্য থাকায় সে দেশ থেকে প্রতিভাবান ও বিশেষী অনেক মানুষ এরই ভিতর চলে গেছেন অজ্ঞাত। বেকীর ভাগই বেরে কাজ গ্রহণ করছেন মার্শিয়ান ভূমিতে—কারণ সেখানে আয়কর দ্বিগুণ বা ত্রিগুণার হয় কিংবা অর্ধ জমা থাকে, ইংল্যান্ড থেকে বেশী। উচ্চাঙ্গী ও কর্মক্ষম বৃটিশ যুবকদের ভেতরই এই দেশান্তর গমনের তৎপরতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও হিসাব করে দেখেছেন—বুটেনে আয়কর ও অন্যান্য করের

মাত্রা বেধে, তাতে কোম্পানী গড়ার সময় বেশ ভেবেচিন্তে করা দরকার।

প্রতি মাসেই বলতে গেলে বিভিন্ন সংস্থা থেকে এরূপ সংবাহ পাওয়া যায়—তরুণ বৃটিশ বিজ্ঞানবিশাগ জরাজড়ি ছেড়ে কাজ নিচ্ছেন যেহে উত্তর আমেরিকার। ব্যাপার কি? অল্পসংখ্যে জানা গেছে—আয়করের মাত্রাধিকারী এর জন্তে প্রধানতঃ দারী। অথচ এইটি ঠিক—এভাবে কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের হারিয়ে বিভিন্ন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে না। তাছাড়া, এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগের কাজও ব্যাহত হতে বাধ্য।

অবশ্য বর্ধিত হারের কব এড়াবার জন্তেই যে উচ্চাঙ্গী যুবক বহির্দেশে বেরে থাকেন, এইটি সব সময় সত্যি নয়। দেশ থেকে দেশান্তরে কলি রোজগার ও অন্যান্য কর্মের সুযোগ যদি অধিক থাকলে, তবে বৌক সে দিকে না বেরে পারে না। কর্মজীবের প্রায়টি অন্তঃসংগৃহীত অন্যান্য প্রকারে মধ্যে একটি প্রধান, এইটি তা হ'লেও অনস্বীকার্য।





# কলা-বিনাস

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]  
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## পঞ্চম সর্গ

“মোহ”ই সর্বব্যাধি। প্রথমেই তিনি ভয় ক’রে নেন...  
মাহুকের বৃদ্ধি।

তিনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে বাস করেন—

“কারহ”দের মুখে এক তাঁদের কলমের ডগায়। ১

তাঁদের কলার মত গিলে গিলে পূর্ণ হ’লে বেই পৃথিবীর কৃকের  
উপর কলে উঠল সোনার কলস, অমনি এক হুহুর্ভে সেই সোনার  
সম্পত্তিকে গ্রাস করবেই করবে “দিবির” রাহব কলাভাস। কুটিল  
পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যাবে সব।

“কারহ”র আর একটি নাম “দিবির”। “দিবির”দের কিন্তু আবার  
বৈশিষ্ট্য আছে। এঁরা মজগান করেন না, মাংস খান না,  
পরের ধন গায়েব না ক’রে চলেন না, পরের অপকার ছাড়া  
উপকার করতে জানেন না, বর্গে গিয়ে চাঁৎকার ক’রে  
কঁদেন। ২

বাঁদের সম্রোহ খসে পড়েছে, এমন সব বোঙ্গীদের,—থাকতে পারে  
সসারকলা সবচেয়ে জান, কিন্তু বহ ও বিপুল বহ উঠিয়েও তাঁদের  
কারো পক্ষেই দিবির-কলাটিকে পূর্ণ জেনে বেলা অসাধ্য।

কাল গ্রাস করেন না, পৃথিবীর সমস্ত জনতাকে গ্রাস ক’রে  
বসে থাকেন দিবিরের দল। এঁরা—শত শত কুট নীতির  
শিবির, জনগণের ধন লুণ্ঠন করে এঁরা ধনের খনি হয়ে ওঠেন,  
এঁরা বহ-বাহিনীর তিমির। ৩-৪

বহলগণ, জেনে রেখো,—

এঁরাই কালপুরুষ। এঁদের ভীষণগুণের আঘাতে বাহুব মরে।  
হুয়াপননার গণনার এঁরা শিখাচ। কৃষ্ণপত্রের কলা উড়িয়ে এঁরা  
বুকে বেড়ান ধরাধামে। কুটিল এঁরা, বমরাভের বিবাণকোটের মত  
কুটিল। বীর এঁদের বিধাসের পাত্রে তাঁদের গলায় বমের দড়ি  
কঁসবেই। এতে আতর্ক হবার কিছু নেই। ৫-৬

এঁদের কলমের ডগা থেকে যে মসীকিন্দু ধরে সেগুলি রাজ্যলক্ষীর  
যেন অজল-মাথা অক্ষিকণ্ড। কারহেরাই তাঁকে লুট ক’রে একেবারে  
খিঁচা করে ছাড়েন। তিনি কঁদেন। ৭

অজ্ঞানতার বিষয়ে কারহেরা মহা বিচক্ষণ। সে এক বিষয়  
আচরণ। জীক কবতে করতে জীচড় টানা তো নয়, খেন জীক  
হলে বার বার—অজ্ঞানীর কুটিল চূর্ণ-কুটল—খাঁড়ার পাতায়। এমন  
জীব জগতে বিল, থাকে না বোকা বানিয়েছেন এই কারহের দল। ৮

কারহ আর ইন্ডিক—দুই-ই সমান। যারার খেলার ডুলি,  
বিষ ঠকিয়ে এই দুটিতেই সফল করেন কামনার ধন। বিষয়গ্রাহ  
...সমস্তই গ্রাস করেন; এক নাগাড়ে ধ্বংস করেন মাহুকে। ৯

কুটিল এঁদের লিপিবিত্তাস। যেন কালসাপ। দেখতেই  
মনে হবে, কারহদের কৃষ্ণপত্রের শিখরে কুণ্ডলী পাকিয়ে গুরে  
রায়েছে সাপ। ১০

এই দিবিরেরাই চিত্তভ্রমের সন্ধ। গুপ্তবিষয়ে এঁরা শোভ।  
একটিমাত্র রেখার বিনাশ ঘটলে এঁরা সহিতকে হত্বিত ক’রে দিতে  
পারেন। বিভিন্ন এঁদের প্রতিভা। ১১

দিবির-দের যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কলা সাধারণতঃ পৃথিবীতে সচল,  
সেগুলির সংখ্যা বহু। এঁদের গুণকলাগুলির কাছে কিন্তু সেই  
প্রসিদ্ধেরা নিম্নত। গুণগুলিকে জানেন—হয় কলি নয় কৃতান্ত। ১২  
যোলোটি বিভিন্ন রকমের এঁদের কলা। যথা:—

- (১) কথার বোরপাট ক’রে দলিলাদি সম্পাদন করা।
- (২) সমস্ত তিসাবপত্র গায়েব করার বিত্তা।
- (৩) হুহুয়ের অস্ত্রবিপাচন।
- (৪) লোকসংগ্রহ।
- (৫) বাহ-বিবর্ধন।
- (৬) মাত্র গ্রহণযোগ্যকৃত নির্ণয় করা।
- (৭) দেয় ধন আদায় করা।
- (৮) অবশিষ্টকৃত জন্তে বিবেক দেখানো।
- (৯) ঠিক দিতে দিতে সর্বভক্ষণ।
- (১০) বা কিছু উপায় হয়, সেটিকে আশ্রয় করা।
- (১১) নষ্ট হয়ে গেছে, বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে, ইতি প্রদর্শন।
- (১২) খরচ করতে গিয়ে কাউ আদায়।
- (১৩) বোজনচর্যাদি-বারা কর করা।
- (১৪) নিঃশেষে দলিলাদি দহন।
- (১৫) শেষ পর্বত প্রমাণ নাশ। এবং
- (১৬) কৃষ্ণগ্রহণ বিষয়ে ঘনহারীকে নিরালোক করা।

তাঁদের কুটিল বোলোটি কলার মত দিবিরদের এই কলা-রাশি।  
কলকের অস্ত্র নেই। সর্বগাই যেন বন্ধ্যা এঁরা হুঁকছেন। তোল  
কলান বহি যথি। মুখে-আগলে কৈশে ওঠেন। ১৩-১৭  
এঁর সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে বিরাজ করেন অর্থাৎ কুটিল। এঁদের



কতি মাত্র নিদ্রমগ্ন রয়েছে, সেটি হচ্ছে—‘না’। ওকূলের মত এরা গয়া-বিশারদ অর্থাৎ হ্যাঁকে না করেন, না-কে হ্যাঁ। এক মুহূর্তে ভিজিলেন করতে ওদের বাধে না। ১৮

এই অখিল মহীভূলে পুরাকালে বিচরণ করতেন জটনৈক জুরোড়ী। প্রত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছিলেন। এক দিন ছিল বখন তাঁর ধন-মৌলত, পদ্ম-গবামি, পোবাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই ছিল; এখন সব গেছে। পাছে আবার তিনি চৌবের পথ ধরেন, এই তরে তাঁকে পবিত্রাগ করেছিলেন বহুবার। পুণ্যের জোরে একলা তিনি পৌঁছে বান উজ্জয়িনীতে। সান্নাতি সমাপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে—বিজন এক শিবের দেউল। ১১-২০

শ্রাব্যতনে প্রবেশ করলেন জুরোড়ী। কালকরে ইতি দিয়ে, অবিশ্রান্ত চন্দন ফুল আর ফল চড়িয়ে তিনি সেবা করতে লেগে গেলেন বরদ দেব মহাকালকে। কপালে বদি থাকে, মিলতেও তো পারে বর। ২১

রাত্রির পর রাত্রি কাটে নিরাত্রীন। সারা দিন ছোত্রপাঠ, জপ, গান, দীপদান, আর বিপুল ধ্যান। জুরোড়ীর বিরাট আরাধনার। দুঃসহ সৌর্য্যতা নাশের আশার সে কী তাঁর আশ্রয় সেবা।

শত শত শুভকরীর মধ্য দিয়ে এই ভাবে তাঁর দিন কাটছে, দিনের পর দিন, একদিন হঠাৎ ভক্তিশ্রাসানিত হয়ে ভবভরহারা ভগবান ভূতপতি বেই “পুর, এই নাও;...” রাত্রি এইটুকু বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেই কপালমালার জটালিখরে নড়ে উঠলো একটি নয়কপাল, হুহুহুঃ নড়ে চড়েই বেন সচেতন করে সিলেন মহাদেবকে।

বরদানের অর্ধপথেই থেমে গেলেন কল্প। মড়ার খুলি আবার বলে কি? স্থগিত হয়ে গেল দেবতার আদীর্ঘ্য। জুরোড়ীর পুণ্যের বর তখনও বোধ হয় অধিকার করে বসেছিল দারিদ্র্য... তাই। ২২-২৫।

বান করতে চলে গেলেন জুরোড়ী।

বিজন পেটল।

বুজুটির দশন থেকে সহসা করে পড়ল জ্যোৎস্না। বেন প্রথমেই তিনি করিয়ে দিলেন গঙ্গা-দর্শন।

ভারপর বুগটকে তিনি বললেন—“এই শঠ জুরোড়ীটি—সামু জন্ত, মানব করে পড়ে রয়েছে। আমি বর গিতে গেলোম, তুমি কেন বাণা দিলে? কেন এমন করে পোষণ করলে আমার শিখর, আমার সজ্ঞা-দান করলে?”

ধ্বংস করে অগতে লাগল রুহের তৃতীয় নয়ন। ধরতাপে গলে দিয়ে অমৃত স্বরাস্তে লাগলেন মাখার চাঁদ। সেই অধারসেই বেন প্রাণে বাঁচতে বাঁচতে, মন্দ শিখিল হাতে বুগটি বললেন—“ভগবন, আপনার আত্মা স্বভাবতঃই সরল। তখন, কেন আমি আপনাকে উক্ত ভাবে সজ্ঞা দান করেছি। ঈশ্বরের সবই প্রলভ। অকারণে কি কেউ তাঁকে জান গিতে পার?”

এই শঠ ব্যক্তিটি অতি হুখী। দরির বলেই সে আজ তার নিজের ব্যবসা চালাতে পারছে না। সব কাজ কেসে এই প্রাণাসে হসে রয়েছে, অর্থাৎ রচনা করছে ফুল চন্দনের ফুপার। যে জন হুখী জিহ্ম ভগবী হন; যে জন শিখর তিনি বানী হন; যাঁর কবডা

গেছে, বিভব গেছে, তিনি সকলের প্রাণম কোড়ান, প্রিয়ভাষী হন। বিনি নিধন তিনি দেব-ব্রাহ্মণের অর্চনা করেন, গুরুদের পায়ে মাখা নোহান, মিলকে চিনতে পারেন। কিন্তু যে দেশ, এক ভাস্কর লোহা কঠিন হলোও, তপ্ত হলোই করণ্য হয়ে ওঠে। যাঁদের স্বপ্ন সত্যই দারিদ্র্যে পরিণত, স্বভাবতঃই তাঁরা সঙ্গর্য্যী হয়ে থাকেন; কিন্তু ঈশ্বরের নেশার একবার মোহিত হয়ে পড়লে তাঁদের কি আর কর-বৃত্তি থাকতে পারে?

ভগবন, এই জুরোড়ীটি ঈশ্বর চায়। আশার দড়ি গলার জড়িয়ে এ বুলছে, পরিচর্যার পুরাকাতা করছে। অতীত সিদ্ধ হলোই ওর কিন্তু আর দর্শন মিলবে না। মায়ুব স্বার্থের সন্ধানে বতকপ করে, ততকপই সে সেবক। বেই অর্ধলাভ হয়ে গেল সেবকের, সেই থেকে সে ব্যর্থ। অগতে এমন একটিও মনুষ্য নেই, কৃতকার্ষ হ’য়ে যে সেবক হয়।

হে দেব, এই প্রাণাঙ্গি বিজন। এই শঠ ব্যক্তিটি পূর্ণতা লাভ করলেই সরে পড়বে। কল-জল-কুশুমাদি নিয়ে অত কোনো মাহুইই এখানে আর সেবা চড়াতে আসবে না। সেই তেতুই বলছি, শঠটিকে এখানে এই পুণ্যায়তনে নিত্যসেবক করে রেখে দিন। একে বরদান করার অর্থ হচ্ছে আত্মসুখার নির্দাসন।” ২৬—৩৭।

বকবরির বাণী শুনে বিপুল-বিশ্বের কিঞ্চিৎ হেসে কেললেন পিনাকী। জিজ্ঞাসা করলেন—

“তুমি কে, বখাসতা আমাকে জানাও।” সজ্ঞার লক্ষ্য ক’য়ে মড়ার খুলি তখন সঘর উত্তর দিলেন,—

“সগরে আমার বাস্তব্য ছিল। কারছকুলে একলা জন্মেছিলাম। বিয়ুহ ছিলাম স্বকরে। নিরত থাকতাম ‘হান, জপ, র্তে। তাঁর্থে তাঁর্থে ঘুরে বেড়াইতাম। কবায়ত্ত করেছিলাম নিখিল শাস্ত্রার্থ। এই দীন শরীরটিকে ভাগীরথীসলিলে বিসর্জন দিয়ে অধুনা লাভ করেছি—কংপদ্য।”

ওনেই ভগবান বলে উঠলেন—

“সত্যই তুমি কারছ। বিচিত্র! খুলিসার হয়েও কোটিল্য-কলা ছাড়োনি। ৩৮-৪১

ভগবানের বৃহহাসির জ্যোৎস্নার কুহুমজজ হয়ে উঠল আশীর্বাদার দল। বান সেবে ফিরে এলেন জুরোড়ী এবং তিনি আসতেই, তাকে বরদান করলেন বরদ মনেশ।

এক শঠের হিতসাধন অস্তেই শশাকমৌলি নিজের উত্তমোত্তম মালিকপণ্ডিত থেকে, নিষ্কাশিত করে বিদ্যার দিয়ে দিলেন বুগটকে। অরাক চোখে চেরে বইলেন জুরোড়ী। ৪২-৪৩

বঙ্গগণ, বয়ের জন্মের মত এই কোটিল্যকলা। কারছদের ভটি সহস্রাত। বড় মলিন, এর কাজ জনকর। অহি-শেষ হলোও এই কলাটিকে বর্জন করেন না কোনো কারছ, একটি অতচিন্ত্য বেন সর্কাদাই কমুচিত হয়ে থাকে এঁদের কলা। ওঁরা দুই বিদ্যার মত। এঁদের সৌর্ভেবে পৃথিবীর কোন মাহুই বসো বজিতে থাকতে পারে? আত্মরীশঙ্কির কুপার যে মহাত্মার বিশেষ জ্ঞানলাভ হুটে দিবিরদের এই বকনা-শাস্ত্রে, একমাত্র তিনিই সন্মুক্ত করতে পারেন স্ববৃত্তী বহুধাক।

ইতি কারছচরিতঃ মাঘ পঞ্চমঃ সর্গঃ।

[কল্পনা]



# রাজ্য রাজ্য

উদয়ভাসু

রাজপুরীতে বুধীর হাওর। বইতে থাকে আজ।

জন্মের আঁধার-রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরের দিগ্ধ আলো ফুটেছে রাজ-অন্তঃপুরে। রাজপুরীর প্রতিটি বাহুরে বুধে হাসি লেগা দিয়েছে, আজ কত-কাল পরে। নাটরন্ধিরে সানাইয়ের সুর বেন আজ আর মানতে চায় না। একের পর এক সুর বেজে চলেছে ধীরে ধীরে গতিতে। মন্দিরে পূজা আর হোমের পালা চলেছে। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর আদেশে নানা দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। বিপত্তারিণীর জন্ত জোড়া-বলিহানের আয়োজন হয়েছে। পূজারী ব্রাহ্মণদের খাস পতনের অবকাশ নেই বেন। নৈবেদ্যের খালিতে প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে দালান। অন্নভোগের স্রব্দ খেলছে বাতাসে। রাজমাতা আদেশ দিয়েছেন, আজকের আয়োজনে বেন ক্রটি না থাকে; উপচারের বাহুল্য বেন বজায় থাকে। পূজা বেন বিয়োগ্রস্ত না হয়। শীঘ্র আর চৌপাঠ চলেছে অবিরাম।

অনাচ্ছাদিত নৈবেদ্য রান্ধসের ভোগ্য হয়, এই নির্দিষ্ট ভোগের পাঁজি পুশ আর বিধগজ নিশ্চিত হয়েছে। সুর্য, বজ্র, ভায় আর কাংগাপায়ে ভোগ দান করা হয়েছে। প্রভুর আর বজ্র-কাঠের পায়ে কল আর চিনি-সন্দেশ। অন্ন ফুল আলু আদ, কেবল রাজ বস্ত্র-জবা ও রক্ত-পত্রই উপচার। দেবীর ঐশ্বর্যে নতুন বস্ত্র পরিয়েছেন রাজমাতা। ঘোর বস্ত্রবর্ণের ঢোল। দুর্গার ফুল আর কলক বজ্রাঙ্কলে। দেবী বেন আজ বুভূতী রমণীর বেশ ধারণ করেছেন। বিলাসবাসিনী আভরণ দান করেছেন আজ। অন্ন পির পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হন দেবী। রাজমাতা ভূষণ আর উপভূষণ দিয়েছেন আজ।

বুভূতী রমণী নয়, মা বেন আজ অষ্টমবর্ষীয় কস্তুর রূপ ধারণ করেছেন। বিলাসবাসিনী তাঁকে সজিয়েছেন মনের সুখে। চন্দ্রাভরণ, নিভ্রাভরণ, হস্তাভরণ, কঠিনাস-কর্ণনীনন্দাভরণ দিয়েছেন নিজের সিন্দুক থেকে। সন্ধ্যার অলকারই হিরণ্য ও নবিসর। হস্ত, চামর ও চন্দ্রাভরণ উপভূষণ।

কারণ-অকারণ রাজমাতা আজ হাসছেন। সহস্রী পরিভ্রমিকার সঙ্গ নিয়ে দেখে গেছেন পূজার আয়োজন। কুনিষ্ঠ হয়ে অর্বাং কুনিষ্ঠে কপাল দুইয়ে প্রণামের বসন্তে কত বার মাথা পুড়েছে কে জানে? উপবাসে আছেন আজ। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করবেন না। দেবীর চন্দ্রাবৃত্ত পালির পর উপোস ভঙ্গ করবেন।

রাজপুরীতে হৈ-হৈ দানসজ্জা গুলেছেন না কি রাজমাতা বিলাসবাসিনী। ভাতার গুলে বসেছেন। আসন্নকী মোহর আর

মৌণ্যমুদ্রার গামলা পাশে নিয়ে বসেছেন। যে যেমন তাঁকে ভেমন দান করছেন। সোনা-রূপা আর বস্ত্র দান করছেন।

প্রথমে ডাক পড়েছে রাজবাসীদের। উমারাগী, সর্বমঙ্গলা আর সর্বজয়া তিনজনই এসেছেন। বড়হাণীর আঁচল ধরে এসেছে কিশোর বাজকুমার শিবশঙ্কর। কনিষ্ঠপুত্র কাশীশঙ্করের বস্ত্রপট্ট মহাশোভার সঙ্গে এসেছে তাঁর একমাত্র কস্তা বনবালা।

—তোমাদের কে কি চাও বল। যে বা চাও, তাই দেবো।

বধুমাতাদের উদ্দেশে বলছেন বিলাসবাসিনী। কথার স্নেহের সুর ফুটির বসেছেন। জলচৌকিতে বসেছেন। আশপাশে মোহর আর হুজার হুড়াহুড়ি। শালকাঠের সিন্দুকের ডালা গুলেছেন।

বড়হাণী উমারাগী বস্ত্রাবলুলত হাসি হেসে বলছেন,—রাজমাতা, আপনি আশীর্বাদ করুন আমাদের। আপনার আশীর্বাদই আমাদের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা।

কুনিষ্ঠ ক্রোধে মুখ বীকালেন বিলাসবাসিনী। বলছেন,—সোনা-দানা কিছু চাই না?

উমারাগী আবার অগ্নে হাসি মাখানেন। বলছেন,—আপনি বা দেবেন মাথা পেতে নেবো। দিতে কিছু কি বাকী রেখেছেন?

সর্বমঙ্গলা, সর্বজয়া আর মহাশোভা নীরব নর্যকের রত ঝাড়িয়ে আছেন এক পাশে। তাঁদের বেন কোন বক্তব্য নেই। তাঁদের মুখপাঞ্জী বেন উমারাগী—তাঁদের পক্ষ থেকে বেন বড়হাণী আম-মোক্তার পেরেছেন।

—আজ আমার সুদিন এসেছে বড়হাণী। অনেক ডাকডাকি আর মাথা ঘোঁড়াঘুড়ির পর বা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন।

কথা বলতে বলতে কথার সুর বেন যেমন সিক্ত হয়ে বার আনন্দের উজ্জ্বল। চোখের প্রান্ত ভিজে বার। এটা-সোটা নাড়াচাড়া করতে করতে সোনার মোহর-কলস হাতে তুলে-কালেন,—এই নাও রাজকুমার। সবার আগে তোমাকে দিই। তুমি আমার বস্ত্রের মুখ উজ্জল করবে।

কুমারকে এগিয়ে গিলেন উমারাগী। বলছেন,—কুমার, আগে প্রণাম কর রাজমাতাকে।

শিবশঙ্করের কোমল হাত বিলাসবাসিনীর পা হুঁপানি স্পর্শ করলো। সোনার মোহর আর কলস তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলছেন,—শত বর্ষ পরমায়ু হোক তোমার। লক্ষী আর সরস্বতীর বরপুত্র হও। কথার শেষে কয়েক দুহুর্ন্ত চুপাচাপ থেকে ধানিক দেখলেন বনবালাকে। দেখতে দেখতে হাসলেন মুহু মুহু। বলছেন,—আর, আমার বনবালা আর। তোকে ডাই কি দিই?

পায়ের দল বাড়িয়ে রাজমাতার কাছে বার বনবালা। হুই

হাত পাতে ভিক্ষাপ্রার্থী মত। রাজ্য হাতে রাজমাতা তুলে দিলেন একমনি টুকু। চুপী আর পান্নার অর্ধচন্দ্রে টুকুলাতে। সোনার স্নতুলী।

বনবালাকে কিছু বলতে হয় না। সে নিজেই প্রণাম করে রাজমাতাকে। বিলাসবাসিনী তার কপালে হাত রেখে বললেন,—ফুল ফুটুক, প্রজাপতি উড়ে এসে গায়ে তোমার বসুক। এক রাজার মানিকের সঙ্গে বিয়া হোক।

সলজ্জার মাথা নত করে বনমালা। মুখ মুকিয়ে হাসে মিটিমিটি। তারপর সহসা দৌড় দিয়ে পালার পায়ের মল বাচ্চিয়ে।

—এসো মা তোমরা। বধূদের ডাকলেন বিলাসবাসিনী।—এই নাও একে একে।

বিলাসবাসিনীর হাতে একনরী একরাশি। লালাত মুক্তার একনরী। এক বুঠোর বা উঠেছে তুলেছেন।

বধূমাতারা এগিয়ে একে একে প্রণাম করলেন রাজমাতাকে, কণ্ঠে জ্বালা জড়িয়ে। প্রত্যেকের গলার বিলাসবাসিনী মুক্তার একনরী পরিয়ে দিলেন। তারপর সহস্রে বললেন,—আজ আমার স্নহের দিন এসেছে। মা জননীরা আনন্দ কর' তোমরা। মুখে হাসি কোটাও। সীঁধির সিঁহুর অক্ষর হোক তোমাদের।

কথার শেষে মহাশ্বের চিবুক ধ'রে ফুললেন। প্রণামনতা মহাশ্বের মুখে বেন হাসি নেই, কেমন বেন বনমরা তিনি। চোখের কুটিলে বেন চিন্তাময়তা।

—মুখে হাসি নেই কেন মা ?

রাজমাতা ভ্রমোলেন। চাপা কষ্টের গাভীর্ষ ফুটলো তাঁর কথার সুরে। বললেন,—কানীশকরকে ছেড়ে দিয়ে মনে মনে নেই তোমার, তা আমি বুঝেছি। কথা বলতে বলতে কি জানি কেন খেমে থাকেন। আমার বলেন,—তবে তুমি মা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি বলছি, ছেলে আমার অক্ষত শরীরে কিরে আসবে। আমার কানীশকর ভাগ্যবান পুরুষ, কোন' কাজে সে বিফল হয় না।

কানীশকর রাজ্য করছেন সদলবলে। গঙ্গা নদীর বুক ধ'রে পঞ্চদশাবতারের উদ্দেশে গেছেন। মহাশ্বের মনের সকল স্নহ কেড়ে নিয়ে গেছেন বেন। দিনের আহার আর রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়ে গেছেন। মহাশ্বের পাখারের মত ছিঁড় আর নীরব হয়ে আছেন। এত অব্যর্থ দেখছেন, তবুও চোখে বেন অন্ধকার দেখছেন। রাজ্য মাতার সান্নাধ্য ভনেও বিলুপ্ত বিচলিত হ'লেন না। মুখে বেন ক্লুপ এঁটেছেন মহাশ্বের।

উমারাবীও বললেন,—ছোটকুমার পরমন্ত মাহুয, তিনি যে কাজে হাত দেন সে কাজ ঠিক সমাধা হয়। তুমি হুখে পাও কেন ভাই ?

মহাশ্বের মরশেবে বললেন,—বলা কি বার মিসি ? কি হ'তে কি হয় কে জানে। ভনেছি মাংসে বিনা লড়াইয়ে কোন' কাজ হবে না। ঠাকুরজামাই ভনেতে পাই বন্ধুগণ্যীদের পাহারা রেখেছেন। রাজকুমারী একা থাকলে ভাবনা ছিল না।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজমাতা। কুমারের সৌভাগ্যকে নানলেগু তিনিও বেন অগ্নেকের মধ্যে ভীতা হয়ে পড়লেন। কি এক চাক্ষুষ্যে লীর্ণবাস কেললেন একটি।

বড়মণি আমার বললেন,—মশ ভাবলে মশ হয়। তুমি তোমার

আরাধ্যকে ডাকো, তাঁকে জানাও। আমারও জানাই। দুধাব বাহাদুর ঠিক কাজ উদ্ধার করবেন ; তা আমি বেশ ভালই জানি।

দাসদানীদের ভীড় জমেছে ঘরের বাইরের দালালে। বড় তাঁবোদার একদু হরছে সেখানে। পাইক আর বরকন্দাওয়া এসেছে। দালী আর দালিনীরাও বাদ বায়নি। রাজমাতার মল বেন গব গব করছে। সকলেই হাত পেতে পাড়িয়ে আছে।

—তামরা যে বার মহলে কিরলে তবে আর কেউ আসবে এখানে। বাইরে সব অপেক্ষা করছে।

চোখের প্রান্তে জ্বালা মুছে কথা বললেন রাজমাতা।

মহাশ্বের হাত ধ'রে কিরে চললেন বড়মণি। মেজ আর ছোটরাণী তাঁদের পিছনে চললেন। রাজকুমার শিবদত্ত সোনার কলম-গোয়াল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যকে দেখতে গেছে করন।

—রাজমাতা, আমাকে যে ডাক দাওনি ?

কে বেন ব্যস্তকণ্ঠে কথা বলতে বলতে ঘরে এসে উপস্থিত হয়। বলে,—আমি কোন' হুখে বাস বাই।

—আর শিবানী আর ! তাকে কখনও বাদ দিতে পারি মা ?

বিলাসবাসিনী কি বেন খুঁজতে খুঁজতে কথা বললেন।—কলন,—বা দেবো তাই নিয়ে খুসী হোস যদি তবে তাই দিই।

—হী গো হী, বা দেবে তাই মাথা পেতে দেবো।

শিবানীর কেশবোশ বেন বৈরাগিনীর মত। এসো ফুল আর আলগা জ্বালা উড়ছে বাতাসে। চোখে হয় তো টাটকা কাজল দিয়েছে। কপালে খেতচন্দনের টিপ।

—রূপ বেন তোর দিন দিন খুঁজছে শিবানী। কথার শেষে খানিক খেমে আমার বললেন বিলাসবাসিনী,—হয়তো কিরের নামেই তোর এত রূপ হয়েছে।

—এ পোড়া রূপের দাম কি ! হাসতে হাসতে বলল শিবানী। রাজমাতার সামনে বলে পড়লো। বললেন,—এপ নিয়ে কি বুঝে থাকো ?

কীপ হাসি ফুটলো বিলাসবাসিনীর মুখে। বললেন,—কলন, শিবানী আর কি কিরে দেখে না তোকে ? লজ্জার অধোবন হয় শিবানী। বলে,—রাজমাতা, তোমার অহুমান সত্যি নয়। সেই মাহুযটা আমার জন্ত সব করতে পারে।

হা হা শব্দে হেসে উঠলেন বিলাসবাসিনী। হাসতে হাসতেই বললেন,—তোকে বিয়া করতে পারে ?

আসনশিঙি হয়ে ব'সলো শিবানী। বললেন,—হী ভাও পারে। আমার জন্ত মরতেও পারে।

—তোর ভাগিটা ভাল বলতে হবে। হাসির ফের টেনে ফলন রাজমাতা। বললেন,—এখন কি চাই তাই বল।

—তুমি বা দেবে তাই দেবো। আমি হুখে কিছু চাইবো মা।

—তবে কুই এই কঠোরখানা নে। তোকে বেশ মানাবে।

—বেশ কথা, এই কঠোরখানি দাও। কথা বলতে বলতে হাত পাড়লো শিবানী। তার হাতে আলগোছে কেল দিলেন রাজমাতা, এক ছুঁচা বর্ণনীর।

হঠাৎ কথার স্রব নাশিয়ে তামাসার ছলে রাজমাতা বললেন,—  
ধায়ে শিবানী, একটা সত্যি কথা বলবি ?

—হ্যাঁ। মিথ্যা আমি বলি না। মিথ্যা বলার পাপ হয়, তা আমি জানি।

—ধায়ে শিবানী, আমাদের শশিনাথের সঙ্গে তোর দেখা-  
লাক্ষ্য হয় না ?

—হ'বেলা দেখা হয়।

—কথাবার্তা হয় ?

—হ্যাঁ তাও হয়।

—পাকা কথা ক'য়েছে সে ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—তবে তো কেন্দ্রা মেয়ে দিয়েছিস্।

—বান দুই চার মোহর দেবে না রাজমাতা ?

—মোহর পেয়ে কি হবে তোর ? কি করবি। বা দিয়েছি ভাত  
মন উঠলো না ?

—তোমার পায়ে পড়ি রাজমাতা ! সারা জীবন তোমার  
নাম করবো।

—তোমার বিয়াতে কত আবার দিতে হবে।

—দিতে হবে বৈ কি। দু'চারখানা মোহর দিলে তুমি কি  
করির হয়ে যাবে না কি ?

মুখে কৃত্রিম বিরক্তি হুটিয়ে বিলাসবাসিনী বললেন,—এত বখন  
ভার খাই, তবে নিয়ে যা হ'খানা মোহর। ক'কেও যেন মুখ  
কলক বলে দিস না।

বর্ণহারা আর কঠোর অঁচলে বেঁধে ঢিপ ক'রে একটি প্রণাম  
করলো শিবানী। নিম্নেবের মধ্যে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল  
হে হাদি বাথিয়ে।

রাজমাতার মহল গম গম করছে। দালানে দালানে কাতারে  
লতায় বেহেনতী মাদ্রবের জটলা।

—রাজমাতা বিলাসবাসিনীর জর।

জরদ্বনি দেয় সমবেত জনতা। মাটির মাদ্রবের ঐকতান  
পাকশে পৌছয় বেন। রাজমাতার বিরাট মহল কঁপে কঁপে ওঠে।  
রাজমাতার বকে বেন পর্বের সকার হয়। মনে মনে ভাবেন,  
মোরবাহার কাশীপুত্র বাবা-বিপত্তি কাটিয়ে বিভ্রাকে ফিরিয়ে  
নিলে আরও কত কি করবেন। আজকে বা দান-ধরমাতা করছেন,  
দর বিপত্তি-আবার দিতে প্রস্তত আছেন তিনি।

—রাজমাতা বিলাসবাসিনীর জর।

একমুখে কত কি ভাবতে থাকেন রাজমাতা। জরদ্বনির  
কলশ-কাটা শব্দ শুনে ভারেক চমকে উঠলেন। অঁচলে চোখ  
ফুলেন, পাছে কারও চোখে পড়ে। তাঁর চোখে এখন আনন্দাক্ষ।  
বিচারিকাদের বললেন,—তোমরা সকলে এখানেই থাকো, কেউ  
না কোথাও না বাও। এত লোককে আমি একা সাহায্যে  
যাবো না। হাত তুলে তুলে দিতেও পারবো না। আমি ব'লে  
না, তোমরা তাদের হাতে তুলে দেবে। যে বেরন তাকে ডেমন  
হো।

হঠাৎ বেন বখকে গেল কলদ্বনি। আর কোন গাড়িশব্দ নেই।

এক-একটা কিলকিল কথা বলে কেউ কেউ।

এক খানসমা দেখা দেয় কক্ষের দুয়োরে। তার পেতলের  
তকমা ঝলমলিয়ে ওঠে। তার হাতে ধাপবৃত্ত বঁকা তবোয়াল  
উঁচিরে আঁছে।

জু বাকিয়ে খানিক দেখলেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—কি চাই  
তোমার ?

—রাজাবাহার আসছেন হুজুগী !

—কে ? কালীপুত্র আসছে ?

—হী হুজুগী, খোদ রাজাবাহার আসছেন।

কথা বলতে বলতে খানসমা দ্বারদ্বখ থেকে সরে যায় সৈনিকী  
কায়দায়। তবোয়াল ধাপে ভ'রে সেলাম জানায়, অর্ধনত হয়ে।  
আগন্তুক রাজার উদ্দেশে কুরনিস করে।

পাহুকার শব্দ এগিরে আসে। পেশোয়ারী কাপুলীর মত মত  
শব্দ।

ব্যাকুল চোখে দ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিলাসবাসিনী।  
হুঁজন পরিচায়িকা দুই পাশ থেকে হাত-পাখার হাওয়া বেলার,  
তবুও তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন। গোলাপ পাশ থেকে  
গোলাপজল সেওয়া হয় রাজমাতার মাথার। গোলাপের মিষ্ট  
গন্ধ ভাসে ঘরে।

—তোমরা এক দণ্ড বাও ঘর থেকে। রাজা আসছে আমার  
কাছে। আমার ছেলে আসছে !

বিলাসবাসিনী কথা বললেন সানন্দে। ঠিকঠাক হয়ে বসলেন।  
তাকিয়ে থাকলেন দুয়োরের দিকে চোখ রেখে।

—মা।

অনুত থেকে ডাকলেন রাজাবাহার। দালানে সেই ডাকের  
প্রতিক্রিয়া ভাসলো।

—রাজমাতা কৈ ?

—এই যে আমি। এসো, আমার বাছা এসো। মল্ল হোক  
তোমার।

—এসো, একটু পায়ের ধুলা লাও।

দ্বারের কাছে পৌঁছে দ্বিধ হ'লেন রাজাবাহার। আজ তাঁর  
পোষাকের ভিত্তি লক্ষণীয়।

দ্বি-বড়ের বেশমের পাশা-রাজ পরেছেন। অঁচসাঁট পায়জামা।  
মাথার উকীয়ে হীরের তাজ অলংকার করে। মল্লিনের বোমাল  
হাতে। কালো মুক্তার মালা ঝলমল করছে, কণ্ঠ থেকে বুকে  
নেমেছে। মালায় একটা ধুকধুকি—একখানি আঁটরতির পদ্মরাগ-  
মণি। প্রগক্তি মেখেছেন রাজাবাহার। বোমাল থেকে মনপাছল,  
আতরের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। হাতের আঙুলে ক'টা আঙটি কে  
জানে ? নৌকাফতির হীরার আঙটি।

রাজমাতার রঙমহল ছিল এই কক্ষ। বখন তিনি রাণীর পদে  
অভিষিক্ত ছিলেন তখন এই কক্ষ ব্যবহার করতেন—সে অনেককাল  
আগের কথা। অতি মনোহর এই বিলাসকক্ষ। যেতকুক প্রস্তরের  
হৃদয়তল। যেতমর্মরের কক্ষপ্রাচীর। পাথরে রত্নের লতা, রত্নের  
পাতা, রত্নের ফুল, কল পাখী জন্মব। প্রাচীরের কিছু উর্ধ্বে  
সোনার কামলায় বীচের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন আকারের লক্ষণ।  
ওপরে লপা-তারের চম্ভাওপ, হুতির কালর কলহে। ঘেরের  
কোষল কুল অপেক্ষাও কোষলতর সজ্জ পাগিলা পাতা।

বহুদিন এই কক্ষ চোখে পড়ে না। রাজাবাহাদুরের। বড় একটা উসুক হয় না এই বিলাসকক্ষ। কালীশঙ্কর কক্ষ মধ্যে লক্ষ্য করেন সাগরে। দেওয়ালের মস্তির কারুকাঙ্ক দেখেন—দেখে দেখে বিম্বিত হন যেন। কি অশূর্য শিরশোভা!

বিলাসবাসিনী উঠে আসেন রাজার সমুখে। বলেন,—পোষো রাজ আর পায়জামা কেন? কোথাও চললে না কি?

—নাঃ, তেমন কোথাও যাওয়ার নাই। মাড়পলে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত কপালে ঠেকানেন রাজাবাহাদুর,—একই পোষাক প্রত্যহ ভাল লাগে না। তাই এই বাস পরিবর্তন। শুধু তাই নয়, আজ নবাবের ক'জন মনসবদার দরবারে আসছে দেখা করতে। কিছু কাজের কথা আছে আমার জমিজমা সম্পর্কে।

—কোন জমি-বিক্রী নয়। বিসি বন্দোবস্তের কথা কইরো। কবার শেষে ইমির মিসির দেখে কালীশঙ্কর বললেন,—তুমি তো দেখি কুবেরের ভাণ্ডার খুঁজেছো। থাকে বা ইচ্ছা দান করছো।

—কালীশঙ্কর বাত্না করছে সেই আনন্দে। বিদ্যা এসে আরও কিছু দান করবো, মনস্ক করছি। আমার বা আছে বিলিয়ে দেবো বিলকুল। আমার মেয়েকে নিয়ে থাকবো।

হেসে কেললেন রাজাবাহাদুর। রোমালে মুখ বুদ্ধতে বুদ্ধতে কললেন,—তবে আমরা কোথায় যাবো? তোমার ছেলে ছুটাকে ত্যাগ করবে না কি?

—বাসাই বাট। এমন কথা বল' কেন? তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে! বিদ্যার গায়েও তোমাদেরই রক্ত বইছে। —প্রার্থনা জানাও কুমারবাহাদুর যেন ভালর ভালর ফিরে আসে।

—সে আর বলতে। আমি তো কত কি মানত করছি। গুণোপার্ণের ব্যবস্থা করেছি। জোড়া সত্যনারায়ণ করবো ভেবেছি। হরিষ লুট বেলে।

রাজমাতার কথা শেষ হওয়ার আগেই কালীশঙ্কর দ্বার ত্যাগ করলেন। যেতে যেতে বললেন,—এখনও একবিন্দু জলপান পর্যন্ত হয়নি। আমি বাই, সুখার উদ্রেক হয়েছে যেন।

—বলল হোক তোমার। পরমায়ু অক্ষয় হোক। মন-পছন্দ আভ্যন্তর অঙ্গক ভাগিরে রেখে গেলেন রাজাবাহাদুর।

সকলে খাঁজ হাসছে, গুণ মহাশ্বেতা নয়।

ভীর মুখে যেন আঘাটের মেঘ জমেছে। চোখে শূন্য দুই ফুটে আছে। কেমন যেন জব্ব্বু হয়ে আছেন। মুখ খুলছেন না, কথা বলছেন না। রূপের এত বাহার, তাও যেন স্তান হয়ে আছে।

উমারানী ভীর হাত ধরে নিয়ে চললেন নিজের মহলে। বললেন,—আয় মেজরাণী, আয় ছোটরাণী, মহাশ্বেতার কাছে তোরা বসবি। ওষ সঙ্গ হ' দণ্ড গল্প করবি। ওকে তুলিয়ে রাখবি।

—মিদি, আমরা তো থাকবো, আপনি যাবেন কোথায়? মেজরাণী হুঁ হুঁ হেসে জিজ্ঞেস করলেন। ভীর বাত্না অধর তানুল-হাসরক্ত। পরিধানে নীলাবরী। সোনার অলঙ্কার ধানকরেক।

নিয়ম বন্ধার জড় পয়েছেন যেন। নাকে হীরার নাকচানি নান রত্নের আভা ঠিকরোর। চোখে মিহি স্তম্ভার রেখা। পায়ের খোলা লাগে আলতা।

বড়বাণী বললেন,—আমি তোমার জলখাবারের ব্যবস্থা করি সত্যিই আচ্ছ আমাদের ততদিন এসেছে। ছোট কুমারবাহাদুর এখন গেছেন, তখন কাজ উদ্ধার হবেই। আমাদের ঘরের দেয় ঘরে ফিরে আসবে। কেউ বোধ করতে পারবে না মহাশ্বেতার স্বামী দেবতাটিকে, তিনি এমনই কৌশলী আর বুদ্ধিমান। কি বলি মহাশ্বেতা?

অল্প একটু হাসলেন মহাশ্বেতা। গর্বের ভাবটুকু লুকিয়ে স্তান হাসি হাসলেন যেন।

—মায় বনবালা, আমার সঙ্গে আর। কি লক্ষী ঘরে এই কুলের মত মেয়েটা! উমারানী রেহুপূর্ণ হয়ে কথাগুলি বললেন বললেন,—আমি বনবালা বলবো না, ওষ নাম হোক আচ্ছ খেতে বনবাণী।

সলাজ হাসি ফুটলো বনবালার কচি কোমল মুখে। মাকে ছেড়ে এ বড়বাণীর আঁচল ধ'রলো। পায়ের অলঙ্কারের কন্ডার শব্দ কুণ্ডে চললো উমারানীর সঙ্গে।

—আমি কিছু খেতে পারবো না। মেজরাণীকে শুনিতে বললেন মহাশ্বেতা। ভয়নয় হয়ে বললেন,—কিছু যেন মুখে তুলতে ইচ্ছা হয় না আর। কাল সারা রাত চোখে-পাতার এক হয়নি। ভাঁকর আর চিন্তায় কেমন যেন হয়ে আছি আমি। শাওরার কচি নৌ ঘোটে।

—মনটাকে শক্ত কর' মহাশ্বেতা। লক্ষীটি যেন আমার। মেজরাণী চাপা কণ্ঠে উপদেশ দেওয়ার হয়ে বললেন পান চিবানো ধামিয়ে। মেজরাণীর মুখ থেকে কস্তুরী তানুলের অঙ্গদ ছড়ায়।

—ভেবে ভেবে যেন ক্লকিনিয়া খুঁজে পাই না আমি। মহাশ্বেতা ভয়ানক কণ্ঠে কথা বললেন। বললেন,—হাতা-হাতি সামনা-সামনি হু হ'লে চিন্তায় কিছু থাকতো না। বন্দুক ছেঁড়া ছুঁড়িতে বড় বেশী ভয়ানক আমি। কি হ'তে কি হয় বলতে পারে। উনি নিজে বন্দুক ব্যবহারে তেমন পাকাপোক্ত নয়। সব এটি টিপ লাগতে শিখেছেন।

পরিচারিকার আহ্বানের পাত্র নিয়ে আসে। রূপার কুমকী বেকারীতে নানাবিধ স্নাত। মিষ্টি আর নোনতা খাবার। রাজতোষ মস্তিচুর, জলভরা, পোস্তার বরকী আর অমৃতী একেক বেকারীতে আরেক পাত্রে কচুরী, নিমকী, পাঁপার, আর ভাজা বাল্য। ভয়ে পাত্রে তরঙ্গক্ষেয় সর্বস্ব।

হুই হাতে ছুঁটি বেকারী ধরে মহাশ্বেতার সামনে বসিয়ে দিলে উমারানী। বাওরা আসার বেয়ে উঠেছেন তিনি। কপাল অ চিবুকের ঘাম আঁচলে মুছতে মুছতে ব'সে পড়লেন। বললেন, তুমি যদি ধাও তো আমার সকলে মিলে খাই।

—আমার যে কচি নৌ বড়বাণী! মহাশ্বেতা কথা বলতে বিব্রত করলেন।

বড়বাণী বললেন,—তবে আমরা সকলেই উপোস করি আ শাসনাধ থেকে কুমারবাহাদুর না বেরা পর্যন্ত অনশন করি।

অপ্রভত হলেন যেন মহাশ্বেতা। দীর্ঘ চোখ আরও বড়।

বললেন,—সে কি কথা! আমার জন্তে আপনার কেন কষ্টভোগ করবেন?

বুধ হাসির সঙ্গে মেজরানী বললেন,—সেই বা কেন বলি, আমার মিষ্টমেটাই খাবো আর তুমি থাকবে অন্যত্র। তা হয় না।

—অগত্যা কি করি! মহাশেভা বেন বাধ্য হয়ে বেকাবী টানলেন হাতের কাছে। বললেন,—আপনি যদি মাল্‌বট্টা তেমন সুবিধার নয়। আমাকে আমার পণ রাখতে দিলেন না। অঙ্গীকার ভাঙতে হচ্ছে আমার।

মহাশেভার মুখে জোর করে সন্দেশ পুরে দিয়ে মহাশেভা উমারানী বললেন,—কি অঙ্গীকার, কার কাছেই বা?

—আমার নিজের কাছে। মহাশেভা কিসকিসিয়ে বললেন,—পণ করেছিলার, তিনি না বেরা পর্যন্ত হুগল জাড়া আর কিছু মুখে তুলবো না। রাখতে দিলেন কৈ?

—আমার কথা রেখে খাও, দেখো সেই মাল্‌বট্টার জর হয় কি না।

কথার শেষে উমারানী নিজেও মুখে তুললেন কি বেন। বললেন,—ভবে আর মিথ্যে মিথ্যে উপোসে থাকবি কেন? রাজমাতা জানলে আর রফে থাকবে না যে। কথা বলতে বলতে একেক ছোড়া বেকাবী একেক জনের নিকট ঠেলে দিতে থাকেন বহরানী।

মহাশেভার মন বেন কোথায় উড়ে গেছে। তিনি তখন কুমার বাহাদুরের ভাবনার মগ্ন হয়ে থাকেন। বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষা বিরহের অনলে বেন গুহ হয়ে আছেন সঙ্গীত। সীঁথিতে সিঁদুর জটার পর থেকে একটি রাতের তরেও তাঁকে কখনও ছেড়ে থাকেননি মহাশেভা। অগর্ভন কাকে বলে জানা ছিল না তাঁর। অনভিজ্ঞতার

কই বেন একটু বেশী জোরালো হয়। এও ঠিক তাই। কুমার বাহাদুর কাশীশঙ্করের টিকালো স্থল্লর মুখখানি বেন কিছুতেই তুলে থাকি যায় না। তাঁকে ছেড়েও বেন এক মুহূর্ত বঁচা যায় না।

বহুরানী সকলেই যে বার পাড় টানলেন কাছে। ছোটরানী জ্বর হই বান দেখতে দেখতে। মহাশেভার কন্ড রূপ তাই দেখেন। মুখে আহার তুলে খেতে তুলে বান। মহাশেভার নীচ চোখ ছ'টিতে বেন শুভ আকাশের বিস্তার।

গঙ্গানদীর বুক ধ'রে তখন একখানি বজরা এগিয়ে চলেছে বরাহনগর, বালি আর উত্তরপাড়াকে পাশে কেলে। কুমারবাহাদুর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখছেন ইন্দিক সিদিক। একজন খানসমা তাঁর মাথায় ছাটা ধ'রে আছে। রূপার ছাতার চতুর্পার্শ্বে মণি-মাণিক্যের ঝালর। কাশীশঙ্কর গঙ্গার দুই তীরে লক্ষ্য করছেন লাগ্রহে। নদীর দুই তীরে ঘন সবুজ রঙের পাহাড় বেন। দূরবীণের চোখে ধরা পড়ে এই ভুল—স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয় গাছ আর গাছ। সবুজের আড়াল থেকে, গাছের কঁকে কঁকে দেখা যায় মন্দির আর মসজিদ। কোথাও বা একটি চার্চ। চূড়ার বীণথুনের ক্রুশ। কোথাও দু'চারখানা চালাঘর। ধনীজনের পাকাবাড়ী।

জলের বুক দূরবীণ কেলেলে কুমারবাহাদুর। এখার সেবার দেখতে থাকলেন। দেশী নৌকা আর বিদেশীদের বাণিজ্যপোত। পাতকা উড়ছে বেশ বিদেশের। মাল্‌ভে মাল্‌ভে।

আর্মাদী, পটুগীজ, ফরাসী আর ইংল্যান্ডের বাণিজ্যপোতের নীচে নিশান উড়ছে হুগল হাওয়ায়। গঙ্গার বুক ঢেউ উঠছে সারি সারি। কাশীশঙ্করের বজরাখানা পর্যন্ত সেই ঢেউয়ের বেগে টলমলিয়ে উঠছে। [ ক্রমশঃ ]

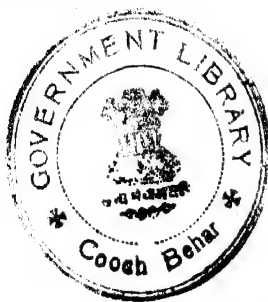
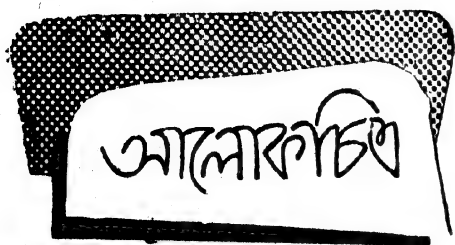
## ইতিহাস বা পড়ান হয়

বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ যে ইতিহাস পড়ান হয়, সে প্রাচীনযুগের বিভিন্ন রাজ্যরাজ্যাদের কাহিনী মাত্র। ঐক আধুনিক যুগে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রসমাজের যথোচিত পরিচয় জুড়ায়ই হয় না। এরূপ ব্যবস্থা আস্তে ঐক যে ঐক, নিশ্চয়ই একটি সঙ্গত প্রের। এই প্রের নিছক এ দেশের সম্পর্কেই নয়, বহির্বিদেশের দেশগুলোকে লক্ষ্য করেও উপাধিত হয়েছ।

কিন্তু, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া, হাইজার—এবং বিবরণেরই যদি ছড়াছড়ি দেখা যায়, হিটলার, স্ট্যালিন, গান্ধী প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার ভেতন কোন প্রবোধ না থাকে, তাহলে ইতিহাস পাঠের মূল্য হ্রাস না পেয়ে থাকে না।

কিন্তু এইরূপ অতিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্তে বিভাগসমূহ শিকশকমণ্ডলী প্রত্যেক ভাবে পরী নয়। এর দাবির আসলে মূল্য দিতে ও বিশ্ববিভাগসমূহ। অতি আধুনিক বা সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ছাত্রসমাজকে অনেক কেন্দ্রে যে অজ্ঞা রাখা

হয়, এর পক্ষেও বুদ্ধি দেখান হচ্ছে নানারূপ। প্রথমতঃ, এরূপ পাঠ্য নির্ধারিত হ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব এসে পড়তে পারে আপনা থেকেই। তা ছাড়া বলা হয়, নীর্থনির না সেলে পর ঐতিহাসিক ঘটনার গতি-প্রকৃতি বা ঐতিহাসিক চরিত্রের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি হওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নয়। এমন কি, এও বলা হয়ে থাকে যে, অল্প দিনের ব্যাপারগুলো ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত না হলেও আরও কত স্মৃতিই জানতে পারা যায়। বিশেষতঃ ছাত্রদের ইতিহাস পড়ান সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিয়ে সরকারী শিক্ষাগুরু ও শিক্ষাবিদরা অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আধুনিক কথিত্বের নাম করতে হয় বিশেষ ভাবে। কথিত্ব ইতিহাসের যে কী প্রচণ্ড শক্তি, সে সম্পর্কে সর্বদা সজাগ। বেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্ত তাঁরা বহু সময় ব্যয় করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করেছেন তাঁদের লড়াই-এর ইতিহাস। কথিত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আধুনিক কথিত্ব ও আধুনিক বিশ্ব একটুকু অপরিচিত থাকবার উপায় নেই



গলাবন্ধ  
—কল্যাণী দাপ্তর

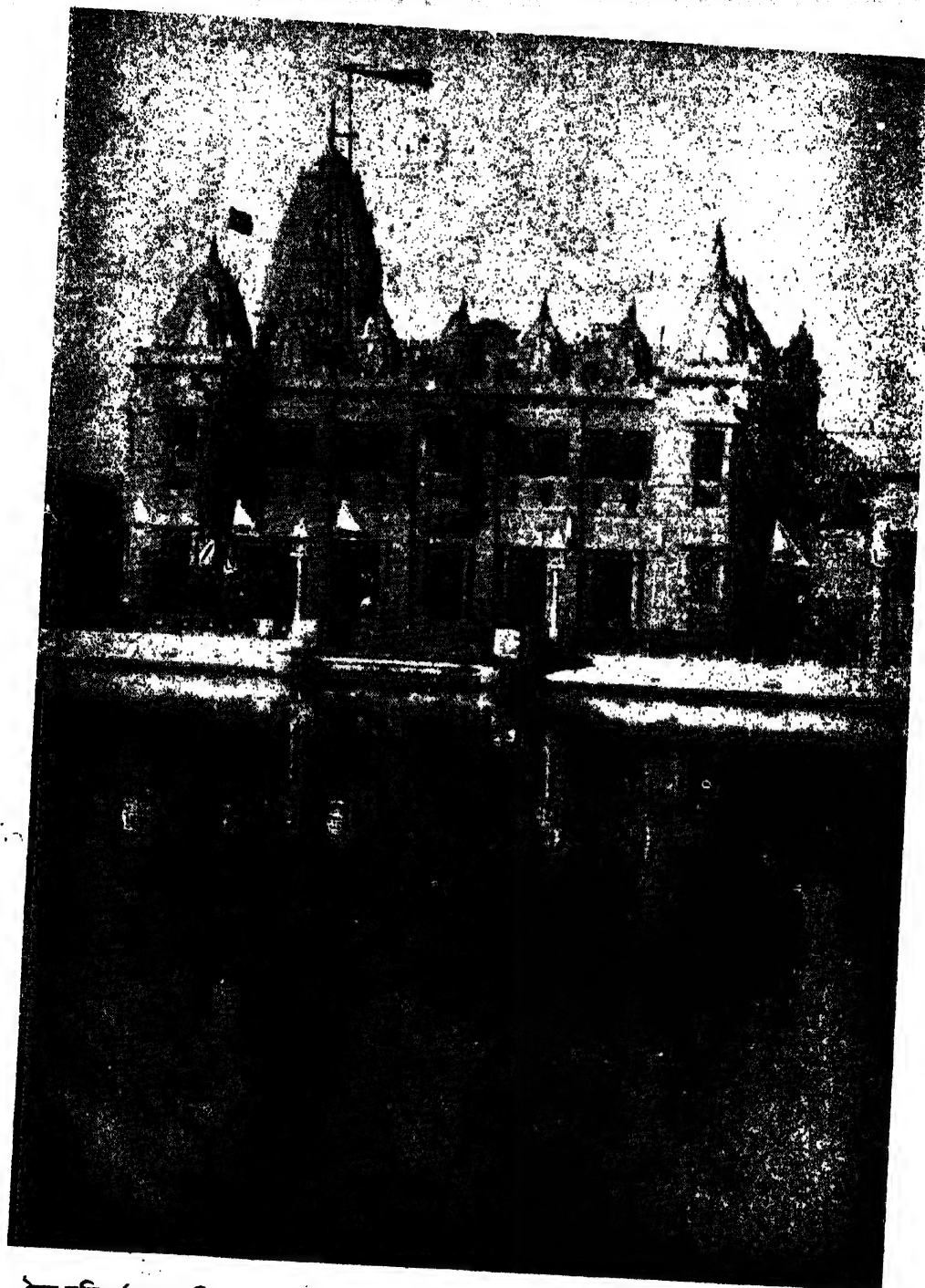
আলিপুর চিত্রশালায়

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—দিল্লী







জৈন-মন্দির ( বেলপাহিয়া )

—ঐক্যবিশিষ্ট বঙ্গোপদেশ





देवक. (महोत्तर)



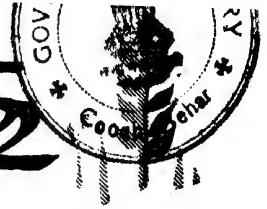
—विद्यापीठक नैन



कठिन

—वाचिनाथ कृष्णभाषा

# পদ্ম



## কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

বেলেঘাটা—চৈত্র-সংক্রান্তি '৪৮

অভূত আনন্দ-দায়কেন্দ্র—

কলকাতা।

অরুণ! তোর আশাতীত, আকস্মিক চিঠিতে আমি প্রথমটায় বেশ বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—আর আরো পুনরিত্ত হ'য়েছিলাম আর এক টুকরো কাগজে কয়েক টুকরো কথা পেয়ে। তারপর কৃতসংকল্প হ'লাম পত্রপাঠ চিঠির জবাব দিতে। আজ খুব বেশী বাজে কথা লিখবে না,—আর আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাসবর্জিতই, সুতরাং আজকে প্রধান কথাটি বলতে, সাধারণ জবাবগুলো একটু সংক্ষেপে দাবাবে। এতে আপত্তি চলবে না।

তুই যে খুব সুখে আছিস তা বৃকতেই পারছি, আর তোর অপর্য দিনগুলোর গন্ধ পেলাম তোর চিঠির মধ্য দিয়ে। তুই আমাকে তোদের কাছে যেতে লিখেছিস কিন্তু আমার ভয় ভয় পাছে কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলো হারিয়ে ফেলি। তবে আশা রইলো বৈশাখ মাসেই হয়তো লাভ ক'রবো তোর সাম্য। তবে তা বিতায় সপ্তাহে কি না বলতে পার না। আর তোদের ওখানে যাবার একটা নীট খরচ যদি জানিয়ে দিতে পারিস তবে আমার কিছু সুবিধা হয়। তোর একাকীত্ব ভালো লাগে না এবং ভালো লাগে না আমারো, এই প্রাণ সম্পর্কই আমার আশ্রয়। তবে একাকীত্ব অমূল্য নিজের সন্তোকে উপলব্ধি করার পক্ষে। একাকী মায়ুষ বা চিন্তা করে সেইটাই তার নিজের চিন্তা, নিঃসঙ্গ মায়ুষ নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্তেই, একাকীত্বের একটা উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয়, তা দীর্ঘ হ'লেও ক্ষতি নেই।

তোর কথা মতো অজিতকে শুধু জানিয়েছি তোকে দেখার কথা। আর কাজগুলো সবই ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করবো—সন্দেহ নেই। তোর চিঠি প'ড়তে প'ড়তে একটা জায়গায় থমকে গিয়েছিলাম, আমার চিঠির প্রশংসা দেখে, কারণ তোর কাছে আমার চিঠির কিছুটা মূল্য হয়তো থাকতে পারে কিন্তু জন্তের কাছে প্রশংসনীয় জেনে নিজের সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস বেড়ে গেলো, বিশেষতঃ আমার মত জলীয়, লবণাক্ত চিঠিগুলো যদি প্রশংসা পেতে থাকে, তবে চিঠির ভালোভাবে বিচার করা কঠিন হ'য়ে পড়বে মনে হ'চ্ছে। আমার সমগ্র জীবনের লেখা তোদের ওখানে নিয়ে যাওয়া অসাধ্য-সাধন-সাধনপন্থ। কারণ লেখা আমি সক্ষম করি না কখনো, যেহেতু লেখবার জন্তে আমিই বধন বধেই, তখন আমার সঙ্গে একটা অহেতুক বাধা থাকে রীতিমত অজ্ঞায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজন বাঁচিয়ে যেগুলো এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত, সেগুলো সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।

তুই আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উদ্ধার সঙ্গে তুলনা করেছিস—কিন্তু

গ্রহটা কু-গ্রহ, যেহেতু তার আগ্রহ আমার নিক্ষেপ করা কোনো এক প্রশংসা-স্থলর ক্ষেত্রে। যাই হোক, তোর এই চিঠিটা যেন নতুন জন্মের আভাস দিয়ে গেলে।

...এখন অজ্ঞাত খবর দিচ্ছি, শৈলেন ও মিতু দু'জনেই কলকাতা ছেড়েছে বহু দিন। আর বারীনদার B. A. Examination ১লা মার্চ। সুতরাং তিনি ব্যস্ত আছেন পড়াশুনায়। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

S. B

C/o Haridas Bhattacharya  
279, Agastya Kunda.  
Benaras City.

অরুণ!

যে ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব ক'রে তুলেছে, আমি এখানে আশার পঞ্চম দিনে তারই কবলে প'ড়ে সম্প্রতি আবেগ লাভ করার পথে—তাই এতো দিন চিঠি দিইনি। আজ অরুণগ্রন্থ করলুম। তুই এখন কোথায়? কোডারমায় না কলকাতায়? দু'দিন মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম কাশী দেখবার, তাতেই অনেকখানি দেখে নিয়েছি। কাশী ভালো লাগতে না : অনেক দিন পর ফিরে পাওয়া তামার পরসার মতো ম্লান লাগছে। আমার শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ একদিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট ক'রেই লিখতে হ'চ্ছে। আর লিখতে পারছি না। সকলের কুশল সাবান সহ এই চিঠির আশ্রিত বিদ্যুত জবাব চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৮/১/৪৪

S. B

C/o Haridas Bhattacharya  
279, Agastya Kunda.  
Benaras City.

২০.১১.৪৪

অরুণ!

তোর চিঠি অনেক দিন হ'লো পেরেছি; পেয়ে তোকে হতাশই করলুম। অর্থাৎ উত্তর দিতে দেরীও ক'রলুম অথচ কাশীর বর্ণনামূলক ব্যক্তিগত ভাবে চিঠিটা লিখলুম না। লিখলুম না এই জন্তে যে কাশীর একটানা নিদ্রা ক'রতে আর ইচ্ছে ক'রছে না। ওটা মুখোয়বিই করবো, তাই আপাতত হৃগিত রাখলুম। শুধু বোধ হয় দুঃখিত হবি যে আমি আবার অস্থির পড়েছি; তবে এবার

বোধ হয় অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। তাছাড়া যদি ভালো হ'য়ে উঠতে পারি, তাহ'লে আশা করা যায় আগামী ২১ তারিখে তোর সঙ্গে ক'লকাতায় আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু বেলগাটায় কিংবে যেতে আশঙ্কা হ'চ্ছে, কেন না বেলগাটাই এখন ম্যালেয়িয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেয়িয়ার বোগী হ'য়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষতঃ আমি যখন ম্যালেয়িয়া-সম্রাটের বক্তৃতা স্বীকার ক'রতে আর রাজী নই। কিন্তু আশঙ্কের কথা, তুই চিরকালে ম্যালেয়িয়া বোগী, তুই কি ক'রে এখনো টিকে আছিস? (অবশ্য এখনো কি না ঠিক বলতে পারছি না)। কেবল ম্যালেয়িয়ার কথাই বলে চ'লেছি, এখন কাশীর কথা কিছু বলি।

কাশীর আমি প্রায় সব জটাই দেখেছি। ভালো লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধ-ঘটনা ভাঙিত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজ্য মানসিংহ স্থাপিত observatory মানমন্দির। অবশ্য বিখ্যাত বেগীমাধবের ধ্রুজ থেকে কাশী শতর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেগীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর গলা এক উপাসনার মতো শুক তার ধামল পরশায়, এ দুটোই খুব উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড়ো সম্ভেদ নেই; বিশেষতঃ আজকের দিনে 'আলো বলমূল' শহর হিসেবে। অর্থাৎ এখানে 'ব্ল্যাক আউট' নেই। আর পথে পথে এখনো দেখা যায় লোকের ভিড়, কলকাতার মতোই। ধর্মাত্মক বিধবা এক অশিক্ষিত লোকেরাই এখনকার বাকী। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো ছাত্রনিবাস-দলক বিশ্ববিদ্যালয়, আর দেখলাম গাছিকী পরিকল্পিত ভারত-মাতার মন্দির। দু'টোতেই ভালো-লাগার অনেক কিছু থাকে। সন্তোষ, ধর্মের লেবেল জাঁটা ব'লে বিশেষ ভালো লাগলো না। আর সব চেয়ে ভালো লাগলো সাহনাম। তার ঐতিহাসিকতার, তার নির্জনতার, তার স্থাপত্যে, আর ভাষ্যে, তার ই-টপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমাময়। \*

সুসান্ত ভট্টাচার্য

অরুণ!

প্রথমে বিজয়ার সন্তোষ জানিয়ে রাখছি। এর পর একে একে প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে কথা হচ্ছে—'কবিতা' শেষ পর্যন্ত দিলো না—চেরেজিসাম তা সন্তোষ। তবে আগের ক'খানা রেখে দিয়েছি, সামনেও সন্তোষ থেকে সেগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠাবার সঙ্কল্প রইলো। আর...ওখানে গেলুম না নিজের নিতান্ত অনিচ্ছায়, বইখানা ওর অজান্তেই গুকে দান করলুম, তুই বরঞ্চ গুকে আর একখানা চিঠি ডাক মারফৎ পাঠাস।...কাছে বাই বাই ক'রে যাওয়া হয় নি, তবে বাবার ইচ্ছা আছে। এখানে সপ্তমীর দিন সারা দিন অবিভ্রান্ত বৃত্তির পর, রাতে ভরাবহ ঝড় সমস্ত ক'লকাতায় অল্পবিস্তর ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল। কাল গ্রামবাজারে গিয়ে প্রভূত আনন্দ

• এখন আবার স্বর আসছে।

গেলুম ওদের উচ্ছল সাহচর্যে—সঙ্গে কোলাহুলি কালকের দিনের শব্দীর ঘটনা। আর দুপুরে আমাদের উপগ্রাস্থানা গ্রামবাজারে নিয়ে গিয়েছিলাম—তোর আশুতুর্কু ওরা খুব প্রশংসা ক'রলো, আমি এখনো হাত দিই নি, এর পরের পরিচ্ছেদ লিখছে বেলু। তোর ঘরটার আজ কাল আমাদের অফিস বসছে। আচ্ছা তোর সেই মেয়েটিকে মনে আছে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল? সহসা জামবাজারে তাঁর সঙ্গে দেখা, আমার কাছে বরীন্দ্রনাথের একটা বই ছিলো, সেটি দিয়ে লাভ করলুম মেমবাতির আলোব মত তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার। তোর শরীর ভালো আছে কেনে নিশ্চিন্ত হলাম, কিংবদন্তি কবে? ভাই-বোনেরা ভালো আছে? বাগানকে আমার বিজয়ার সন্তোষ নমস্কার জানাস—তাঁরা বোধ করি ভালো আছেন? আমার বই বেচোবে তবে নতুনরা দাঁজিলি: থেকে কিংবদন্তি না এলে নয়।—সুসান্ত। রাত—১০।১ (১৯৪২) ২০শে অক্টোবর।

অরুণ!

বিয়ের দিন সকালবেলা তোর চিঠি পেলাম। তোর কথামতো শুধু বিশ্বনাথকে 'জনবন্ধু' দেওয়ার সুযোগ পেলাম না বিয়ের কাজের চাপে, অন্য অনুবোধগুলো রাখবার চেষ্টা করবো। এই চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিয়ে, এবং বিয়েও হয়ে গেলে দু'দিন হ'লো। আজ কুলশায়া। বিয়েটা আমার ভালো লাগেনি, বরং খুব নিরানন্দেই কেটেছে। বিশেষ ক'রে, আমার এক স্থানীয় পাণ্ডুর অভ্যন্ত আমি, মোটেই স্থানীয় পাইনি কোথাও, ভাঁড়ের মতো আমার অবস্থা। ...আমার ডান পাশে ঝাটের ওপর ঘুমিয়ে নববধূ (মন্দ নয়)। মেয়েতে মেজ বৌদি এবং ভূপেন। বোলা প্রায় পাঁচটা। এই আবহাওয়ায় লেখা খুব অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠেছে। কয়েক দিন বিয়ের জন্ত পাটির কাজের কামাই হ'য়ে গেলে, হয়তো তোদের ওখানে যেতে পারবো না, ছুটি না পেয়ে। না গেলে ক্ষমা করতে পারবি না?

১৬/৪/৪৪

সুসান্ত ভট্টাচার্য

আমি বাই আর না-বাই ১৫ তারিখের মধ্যে তুই কলকাতায় ফিরিস। ১৫ই A. I. S. F. Conference.

অরুণ!

৩/৭/৪৬

তুই কবে আসছিস? আমার চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের ঝড়। এসময় তোর উপস্থিতি আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য হবে। তোর ধবর ভালো তো?

আমাদের কি চলে গেছে। আমার সময় তুই যে যি দিবি বলেছিলি, তাকে জানা চাই-ই। আমার ১৩৫২র বৈশাখের 'পরিচর'খানাও আনিস। আর সবার ধবর ভালো।

সুসান্ত

[ অক্ষয়চন্দ্র বসু সৌজতে ]



[ পূর্ণপ্রকাশিতের পর ]

জরসিদ্ধা

কমলা অন্তরে পড়ল। পড়বার কথা অনেক আগেই। বচ চেষ্টায় নিজেকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারলো না। বাখাটা প্রথমে ছিল তলপেট আর কোমর জুড়ে। ক্রমে সর্বান্তে ছড়িয়ে গেল। পায়ের গাঁটগুলো যেন পাকা ফোঁড়া। একটু জোরে হাঁটতে গেলে হাঁক ধরে, বড়কড় করে বুক। দেহে বন্ধ নেই, চোখের কোলে কালি, গাল চুটো ক্যাকাসে। চুল উঠে যাচ্ছে গোছা-গোছা, গায়ের কদা'ব' তামাটে হয়ে যাচ্ছে। বয়সে হেনার চেয়ে দু'-এক বছরের ছোটই বয়স হবে। কিন্তু কোথাও কোনো লাবণ্য নেই, স্ত্রীজনী জীর্ণ দেহের সীমান্ত থেকে ক্রান্ত হচ্ছে যাচ্ছে মৌবনের বেলা।

হেনার চোখে পড়ছে অনেক আগেই। অন্তান্ত মেয়েদেরও নজর এড়ায়নি। কেউ ঠাট্টা-বিক্রম করেছে, কেউ বা স্নেহ উৎকণ্ঠায় জানতে চেয়েছে নানা কথা। কমলা একটুখানি হাসি দিয়ে এড়িয়ে গেছে, কিংবা বা হোক একটা সংক্ষিপ্ত জবাব। সেদিন একলা পেয়ে গেলেন হেনা, ব্যাপার কী বলতে?

—কিসের ভাই? জানতে চাইল কমলা।

—তুকেই বাচ্চিস কেন দিন দিন?

—তাই না কি? কই, আমি তো বুঝতে পারছি না। ওটা তোমার চোখের ভুল, হেনাদি'। হোটা আমি কোনো কালেই ছিলাম না।

হেনা হাস করে চলে গেল।

দু'-তিন দিন পর বিকাল বেলা খাটনি ঘরের পাশ দিয়ে বাড়িল। হুসীলার চিংকার শুনে চুকে পড়ল।

—কি হল মাসীমা?

—ভুল আমায় মাথা আর হুঁ। এই জাখ খাটনির ছিঁরি। মোটে তো আধ মণ ছোলা। তার এই অবস্থা! এ হাই খাড়েই বা কে, আর বাছেই বা কে? গুলামী বাবুকে এখন কি বুঝ দিই বল। সে তো আমাকেই ধরবে।

—কার খাটনি এটা? আখভাড়া হোলাগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হেনা।

—কার আবার? তোমাদের কমলমণি।

যেহে সেহে হুসীলা প্রত্যেকের মনে ঐ দৃশ্যের একটা সাদৃশ্য অলঙ্কার জুড়ে দিল। কমলা হত কমলমণি, জানা হত জাহ্নবাণী।

হেনা হাস চেপে বলল, কোথায় গেল সে? কয়েক জন মেয়ে বাঁতার ডাল ভাজছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, বাবে আর কোথায়! নঘরে গিয়ে লথা হয়েছে।

হেনা বলল, আতা, বেচারা! শরীয়াটা ওর ভাল নেই। তাই নিয়েই কাজ করছিল। আজ বোধ হয় আর শেরে ওঠে নি!

হুসীলা বন্ধার দিয়ে উঠল, শরীর ভাল না থাকে, 'সিকমান' গেলেই তো হয়। আমি এ পিণ্ড নিয়ে এখন কী করি!

—আপনি সন্ধান, আমি ভেঙে দিচ্ছি। এ আর কতক্ষণ লাগবে?

—থাক, তোমাকে আর এসব করতে হবে না।

এত দিন তো করে এলাম। ক'দিন নাস'গিরিতে প্রবেশন পেয়েছি বলে কি এই ক'টা ছোলা শিখতেও পারবো না?

কয়েক জন মেয়ের চোখে চোখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলো গেল। ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, ওকে মানা কক্কস, মাসীমা। ডাক্তার বাবু জানতে পারলে আপনাদের আর বন্ধা নেই।

হাসির রোল উঠল ঘরের একটা কোণ জুড়ে। হুসীলার অগ্নিদৃষ্টি পড়ল সেই দিকে। কিন্তু বন্ধার ছাড়বার আগেই চাপা গলায় বাধা দিল হেনা, থাক মাসীমা!

আজকার মত এমন প্রকাজ রূপ না নিলেও ইতিমধ্যে যে কিছু দিন থেকেই ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধছে, হেনার সেকথা অজানা ছিল না। ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালে যেতে আসতে, হানের'লাইনে, খাবার লোডে একানে ওখানে ছাঁখ নজরে পড়েছে দু'-চারটি মেয়ের ছোটখাটো জটগ। তাকে দেখতে পেয়েই কি করে হেমে দিয়েছে কেউ, কিংবা চিমটি কেটেছে একজন আর একজনের গায়ে। কথাগুলোতে চোখের ইশারায়। তাদের এই নীরব আলোচনার লক্ষ্য কে এক বিহবটা কী, হেনার বুঝতে কষ্ট হয়নি। না-বোঝার ভাণ করে নিজের কাজে চলে গেছে। কিন্তু একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে গিতে পারেনি। হায়ে মারে মনে হয়েছে, এর একটা জবাব দরকার। বুধ বুজ লজ কমলে দুর্নামের বুধ বন্ধ হয় না। তারপর অনেক ভেবে আর অগ্রসর হয়নি। প্রবৃত্তিও হয়নি। যমকে বুঝিয়েছি, নোংরা জিনিষ বাটলেই তার হুগুগ ছড়িয়ে যায়। আজও তাই কোনো কথা না বলে সহজ ভাবেই সে কমলার বাঁতার পাশে গিয়ে বসল। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটাকে মন থেকে সরাতে পারল না। একে আজ করেই তার জীবনের এই নতুন ক'টা দিন তাদের আনন্দ বৈদ্য লজ

ওঁ গোঁরবের পসরা নিয়ে ঐ বাঁটাটার মতই যেন তার অন্তরের নিভৃত লোক চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

‘টপ-ওয়ার’ অর্থাৎ দিনের মত কাজ শেষ করবার ঘণ্টা পড়ে গেছে। একটু পরেই খাবার আসবে, এবং নিশি না আসতেই নৈশ ভোজনের ফাইল বসবে। মেয়েরা সব বাইরে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা মাঠে কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বিশ্রাম করছে। অল্পবয়সী বারা, জমালারখীর দৃষ্টি এড়িয়ে গুহাই মধ্যে একটু ছুটোছুটি করবার চেষ্টা করছে। নির্জন বারাকে চূপ করে শুয়ে আছে কমলা। হেনা গিয়ে বসল তার পাশটিতে। পাতলা স্বচ্ছ চুলগুলোর মধ্যে বীরে বীরে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, ক’দিন থেকে বলছি, কী হয়েছে খুলে বল। ডাক্তার দেখা। কমলা চমকে উঠল, ডাক্তার! না দিদি, ওকথা বলো না। সে আমি পারবো না।

—কেন? ডাক্তার খেয়ে ফেলবে তোকে?

হেনার একটা হাত নিজের শীর্ষ হাত দুটির মধ্যে নিয়ে সলজ্জ মুহূর্তে বলল কমলা, তুমি জান না হেনাদি, এ রোগ কাউকে খুঁটে বলা যায় না।

হেনার চোখের উপর থেকে যেন একটা পরলা উঠে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখে দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আর কাউকে না বলিস, ডাক্তারকে লজ্জা করলে চলেবে কেন?

—না ভাই, অল্প ডাক্তার হলে যদি বা হত, কিন্তু ওঁর কাছে! ছি—বলে জিত কেটে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

—কেন, ওঁকে তোর ভয় কিসের?

—ভয় নয় ভাই, সে যে কী, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। ওঁর চোখ দুটো দেখেছি তো? স্বপ্ন তাকান, মাথাটা আপনাই ঘুরে পড়ে। বাপ রে! ওঁর কাছে কখনো বলা যায় এই সব নোয়া কথা!

হেনা উত্তর দিল না। তার চোখের উপর ভেসে উঠল দেবতাঘের সেই দেবোপম মুখখানা। উল্লার আরত দুটি আশ্রয়ভালা চোখ। ঠিকই বলেছে কমলা। মাথাটা আপনাই ঘুরে পড়ে। ইচ্ছা করে, ঐ পা দুটির উপর নিজেকে বিলিয়ে দিই। নিজের বলে যেন আর কিছু বাকী না থাকে। বুকের ভিতরটা কোন অজানা বেগনায় টনটন করে উঠল। নিশেধে ওঁকিয়ে রইল জানালার বাইরে, দিনশেষের বস্তুরঞ্জিত আকাশের দিকে।

—হেনা দি, যুহু কোমল স্বরে ডাকল কমলা।

—কি?

—একটা কথা বলবো? কিছু মনে করবো না?

চোখ ফেরাল হেনা। ওর মুখের দিকে চেয়ে যুহু হেসে তরল কণ্ঠে বলল, কী বল না? মনে করবো কেন?

—তুমি ভুল করছ, হেনাদি।

কমলার হাতের মধ্যে তার হাতখানা রঁপে উঠল। অল্প কণ্ঠে বলল, তার মানে? কিসের ভুল?

—আমি সব জানি দিদি। ভুলে যাও কেন, আমিও তোমারই মত মেয়েমানুষ।

—তুই কী জানিস? কতটুকু জানিস?

—সবটুকুই জানি। ক’টা দিন ভূমি সামনে বাও নি; শুধন

যদি ওঁকে দেখতে একবার! আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি, ওঁর হাত দুটো কাঁচ করছে, আর চোখ দুটো খুঁজছে তোমাকে। এমন করে দুঃখে দিয়ে আর দুঃখ পেয়ে লাভ কি?

—সে তুই বুঝি না, কমলা।

—খুব বুঝি! আমি ছেলেমানুষ নই। তা ছাড়া—হঠাৎ থেমে গেল কমলা। একটু ইতস্ততঃ করল। তার পর বলল, তা ছাড়া, এ জিনিষ তো আমার অচেনা নয়, ভাই, বলে একটু হাসবার চেষ্টা করল। হেনার বিস্মিত দৃষ্টি পড়ল তার মুখের উপর, সেটা লক্ষ্য করে বলল কমলা, তোমার কাছে লুকোবো না, দিদি, আমার সব কথাই তুমি শুনতে পাবে। কিন্তু সে আরেক দিন। আজ তোমার কথা শুনবো। বল, কেন সাড়া দিচ্ছ না তুমি, কোথায়, কিসে তোমার বাপ।

হেনা জবাব দিল না। দশকাল অপেক্ষা করে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে হাসি মুখে তাবার প্রশ্ন করল কমলা, আর কারো কাছে বাঁধা পড়েছে কি?

হেনা শিতমুখে জবাব দিল, না, রে না। বাঁধা পড়বো আবার কোথায়?

তারপর বীরে বীরে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অশ্রুট-স্বরে বলল যেন তার আপন মনের প্রশ্নের উত্তরে, আমি যে আমার নিজের কাছেই বাঁধা। শুধু এই জেলখানার কালো পাঁচিলের মধ্যে নয়। আমি বাঁধা পড়ে আছি আমার নিজের জীবনের কালো গাথুরী মধ্যে, যে জীবন পেছনে ফেলে এলাম। আমার কি আর সাড়া দেবার উপায় আছে রে?

—কি জানি ভাই, তেমনি যুহু কণ্ঠে বলল কমলা, তোমার এ সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি শুধু বুঝি, যেদিন কেলে চলে এলাম, তার দিকে স্ক্যাল-ফাল তাকিয়ে থেকে কী লাভ? যে গেল সে গেল। তার ওপর আবার কিসের টান? নতুন ডাক যদি এল, তাকে ফিরিয়ে দিতে যাবো কেন? কোন দুঃখে কিসের অভিমানে? তোমার পথ চেয়ে তো কেউ বসে নেই?

হেনা হাতের উপর চিবুক রেখে নিঃশব্দে বসে ছিল। কমলার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। শুধু তার শেষ কথাটা শুনে ওষ্ঠা-প্রোষ্ঠে ফুটে উঠল একটুখানি ঝাঁক হাসি। কমলা আবার বলল, আজ হোক, কাল হোক, এই জেলের বাঁধন তোমার শেষ হবে। তারপর? জীবনভোর শুধু ভেসে বেড়াবে? তোমার এই বয়স, এই রূপ, এই প্রাণ, এই ভালবাসা, সব বুধা হয়ে যাবে। তাতে করে কী উপকারটা হবে শুনি?

—কিন্তু তোর ঐ চোখ দিয়ে আমাকে যা দেখছিল, সেইটুকুই তো আমার সব নয়, পাগলী! পেছনে যা পড়ে রইল তাকে ঢেকে রাখি কি করে? কি করে তুলি, কোথায় এলাম, কোথেকে, কোন পথ ধরে এলাম? আমি যদি বা তুলি, গোটা সংসার তা তুলবে না, তুলতে দেব না।

—চলার বাক তোমার গোটা সংসার। বার তুলবার সে যদি ভুলে থাকে, বাকী সব নিয়ে তোমার কিসের ভাবনা?

—সেই জন্তেই তো আরো বেশী ভাবনা। শুধু ভাবনা নয়, ভয়। বলতে বলতে হেনার চোখ-মুখে ফুটে উঠল যেন কান আভঙ্কর

হায়া। স্বর নামিয়ে বলল, তাই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কাছে যেতে পারি না।

কমলার মুখে ফুটে উঠল বিষম। শুক কণ্ঠে বলল, কিসের ভয় হেনাদি?

—না, না, আমার নিজের জন্তে নয়, ভয় ঠর জন্তে। ঠর সম্মান, ঠর মর্যাদার জন্তে আমার আশঙ্কা। ঠকে বন্ধনা করছি, এই ভেবে আমার ভাবনা। কমলার মুখে একধার কোনো উত্তর এল না। নির্বাক-বিশ্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই চোখের দিকে। যেন এবা উৎকণ্ঠায় ভরা অপরূপ হাঁট চোখ। হেনা লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সযত করে সহজ হয়ে বলল, আচ্ছা, আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। তুই পারতিস? এত যে বড় বড় বক্তৃতা করছিল, তুই কী করতিস বল তো?

—আমি? হেসে ফেলল কমলা। আমার কী আছে? কে আছে? আমি যে ফুরিয়ে গেছি, দিদি! আমার আর কিছু নেই। তা যদি না হত, আমি যদি তুমি হোতাম, আর আমার জীবনে আসত এমন কেউ, তুমি কি মনে কর, তখনো তোমার মত পেছনের দিকে চেয়ে শুধু বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতাম? কখনো না। মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেছি। আমার যে অনেক চাই, ঘর চাই, আশ্রয় চাই। এক জন চাই, বাকি ধরে ঝাঁড়াতে পারি, যার হাত ধরে চলতে পারি। সে এল, আর আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম, এত বড় দুর্ভাগি আমার কোনো দিন হত না।

দুর্ভাগ্য শরীরে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে কমলা ধীপাতে লাগল। হেনা আর কথা বাড়াল না। শুধু নিঃশব্দে তার শীর্ণ হাতখানার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই স্পর্শটুকু দিয়েই বোধ হয় অমুভব করল এই রোগজীর্ণা বস্তুতা নারীর একান্ত অন্তরের অন্তঃপ্রাণ গোপন-কামনা, যা হরতো চিরদিন অসুখ থেকে বাবে। অনেককণ কেটে গেল। তার পর কমলা যখন অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে, ত্রৈহাঙ্গী মুহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল: ঘর বাঁধবার তোর বড় সাধ, না রে কমলা?

—বাং, সাধ হবে না? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কমলা। ঘর বাঁধবো বলেই তো ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছুটল এই শ্রী-ঘর—বলে হেসে ফেলল।

হেনা সে হাসিতে যোগ দিল না। গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল জানালার বাইরে।

বুড়ী অনেকখানি সেরে উঠেছে। স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। কাশি আছে, কিন্তু তার মধ্যে নেই সেই মারাত্মক রক্ত-কণা। ওজন বেড়েছে। খানিকটা বলও এসেছে দেখে। একটু আধটু উঠে-হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু বুড়ার পরোয়ানা নিয়ে যে সব আর্থবিক মহারথীর দল তার কুসকূসে হানা দিয়েছিল, তারা খানিকটা হটে গেলেও এখনো পুরোপুরি নবল ছেড়ে দেয়নি। ডাক্তার যথারীতি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন আর বোজ নয়, মাঝে মাঝে এসে তিনি শব্দকে বিকল্পে সিরিজ চালনা করেন। হেনার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। তিনি আসবার আগেই সে হাসপাতালের যেটুকু কাজ চটপট শেষ করে চলে যায় খাটানি ঘরে। কারো হাত থেকে বাঁচা টেনে নিয়ে মটর বা অড্রয় ডাক্তার—

বসে। কখনো কোনো নতুন মেয়েকে ধরে শিথিরে দেয় 'ডাল মাড়ার কোঁশল। স্ত্রীলা স্বকার দিয়ে ওঠে, তুই এখানে কি করছিল? পালা। নিজের কাজে যা।

—হু; ভাবী তো আমার কাজ; কখন সেরে ফেলছি।

কোনো কোনো দিন আবার বাঁচা না ঘুরিয়ে কাঁধা সেলাই করে স্ত্রীলার নাটনী জন্তে, কিংবা বুনতে বসে তার নাটীর গায়ের সোয়েটার।

সেমিনও সকাল আটটার মধ্যেই তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজটুকু সেরে নিচ্ছিল। মোনার মার বুক তেল মালিস করছে, এমন সময় স্ত্রীলা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। এসেই বলল, তোর টিকিটখান দে তো, হেনা!

—টিকিট কী হবে?

—দে না? বোডে যাবে।

—সে আবার কী?

—'বোড' 'বোড' তুমিগনি! কি করেই বা শুনিবি? ছোট জেলে ছিল। সেখানে তো এসব কাণ্ড নেই। বোড বসে খালি আমাদের মত 'স্টেটার' দেখে।

উৎসাহের বোঁকে যা কোনো দিন করেনি স্ত্রীলা, তাই করে বলল। চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকে পড়ল বুড়ীর ঘরের মধ্যে; কাড়িটা উঁচু করে, বখাসজব ছোঁয়া বাঁচিয়ে। হেনা বলল, বহন না ঐ চোয়ারটায়।

সে কথার জবাব না দিয়ে ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়েই হাত নেড়ে স্বর করল জমাচারী, বোড কি জানিস? কোলকাতা থেকে জেনারেল সায়েব আসে। এখান থেকে আসে কালেক্টার সায়েব, জজ সায়েব, আরো সব কারা কারা। আমাদের সায়েবও থাকে সবাই মিলে টিকিট আর কী সব কাগজপতর দেখে ঠিক করে কোন্ কোন্ কয়েদীকে খালাস দেওয়া হবে।

—মোয়াদ শেষ হবার আগেই? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল হেনা।

—জাগে মানে? অনেক আগে। আদৌক মোয়াদ খাটতে হয়নি, বেরিয়ে গেছে কত লোক।

বুড়ীও উৎকর্ণ হয়ে শুনিছিল জমাচারীর এই বোডতত্ত্বের ব্যাখ্যা। সাগ্রহে বলে উঠল, হ্যাঁ মা, সবাইকেই ছাড় তো? আমিও ছাড় পাও?

—হ্যাঁ; তা আর পাও না? প্রেমভিত্তি কণ্ঠে মুখ বিকৃত করে উত্তর দিল স্ত্রীলা। দিবা শুয়ে শুয়ে খুড়ি খুড়ি ডিম মাস দুখ-মাখনের শ্রাঙ্গ করছ! সরকারের কত বড় উপকারটি করছ তুমি! তোমাকে না ছাড়লে আর ছাড়বে কারকে?

ভারী লজ্জিত হল মোনার মা। শুকনো মুখখানা কালো হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে চুপ করে পড়ে রইল। হেনা বিরক্ত হল, হুমখিতও হল বুড়ো মানুষের উপর এই রূঢ় ব্যবহারে। কিন্তু কয়েদীর সামনে জমাচারীর আচরণ নিয়ে তো কিছু বলা যায় না! স্ত্রীলা ও সব কিছু ভ্রমকণ না করে আগের নৃত্য ধরেই বলল, সোজা ব্যাপার না কি! যে-সব ভারী মেয়াদী লোক বরাবর পুরো খাটনি দেয়, ভালো ভাবে থাকে, টিকিটে একটাও রিপোর্ট নেই, তারাই কেবল এ সুবিধা পেতে পারে। তার মধ্যেও আবার বার আছে। ডাক্তারি, জাল-জোড়, মেয়েমানুষের ওপর অত্যাচার—

এ সব কেস-এ বাসের সাজা হয়, তারা কেউ বোতাম বেতে পারেন না।

হেনা অনেকটা অকমল হয়ে পড়েছিল। শেষ কথাটা কানে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে বলল, তবে আমি বাবো কেমন করে?

—শোনো কথা! তুই কি ডাকাত না জালিয়াত, যে—কথাটা শেষ না করেই ফিস-ফিস করে বলল সুশীলা, ডিপটি বাবু তাকে বাধ দিয়েই রেখেছিল। আমার ওয়ার্ড থেকে এক ফুলবাহু ভাড়া আর কারো নাম দেখনি। তার পর জেলার বাবু কতুম দিলেন, হেনার টিকিটও নিতে হবে।

এত বড় একটা চাকসাকর শুভ সবাদ গোপনে শুনিবে হেনার কাছ থেকে কিছুটা কৃতজ্ঞতা অন্ততঃ আশা করেছিল সুশীলা। মুখে কিছু না বলুক, আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনার সুখানা যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সেইটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কই? উৎসাহের কিছুমাত্র চিহ্নও সেখানে দেখা গেল না। হেনাকে সে সত্যিই শেহ করে। তাই শুধু বিম্বিত নয়, ব্যথিতও হল সুশীলা। হেনা উঠে গিয়ে টিকেটখানা এনে তার হাতে দিতেই সে নিশ্চক্ষে প্রস্থান করল। ভাবতে ভাবতে গেল, সংসারে দুর্বোধ্য যদি কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে এই সব লেখা-পড়া জানা অল্পবয়সী মেয়েগুলোর মন-মেজাজ।

সুশীলার স্টার্ট জ্যাকেট জড়ানো বিশাল বগুখানা ঘিরে ঘিরে কোঁপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হেনা সেই দরজার মুখটাতেই ঝাঁড়িয়ে রইল নিশ্চিন্তের মত। সমস্ত মন ছেঁয়ে রইল জমাদারগীর ঐ 'বোড' অর্থাৎ তার সম্ভাব্য ষালাসের আতঙ্ক। এ তো মুক্তি নয়, অজ্ঞানী শূন্যতা। সে মিকে চাইলে চোখে গড়ে শুধু একটা অতল-স্পর্শী গহ্বর, বার মধ্যে না আছে আলোর, না আছে কোনো অবলম্বন। জেস-গেটের ওপারে যে জগৎ। তার সমস্ত ছায়ার তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা আছে শুধু পথ আর তার খর বৌয়ের দ্বারা। তার ডাইনে বাঁয়ে হাত বাড়িয়ে নেই কোনো স্নেহনীড়, আঁচল বিছিয়ে নেই কোনো গৃহস্থর। তার চেয়ে কি অনেক বেশী, আপনায় নয় এই প্রাচীরখেরা জেনানা কাটক! এইখানে এই নেবুগাছেব ছায়ার এমন বহুলাণু নিবিবাদের জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না? যদি বেত, তার চেয়ে বড় তার আর কোনো কাম্য নেই। কিন্তু একথা তো কাউকে বলা যায় না। কে বিশ্বাস করবে? সঙ্গিনীরা বুঝবে না, কেউ হেসে উড়িয়ে দেবে, কেউ আড়ালে মুখ বঁকিয়ে বলবে, ভাঝারি! সুশীলা তাকে ভালবাসে। তাকে বলতে গেলে লাভ হবে শুধু তিরস্কার। আর জেলার সাহেব? তিনি নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন। হয়তো ভাববেন, এ শুধু তার জিন, শুধু একতরফী, মিথ্যা মর্মানার ধূম তুলে রেহের দানকে প্রত্যাখ্যান। প্রকারান্তরে বলা, জেল খাটিতে এসেছি, খাটিতে দাও। তোমাদের দয়া চাই না, চাই না তোমাদের অসুগ্রহ—না, না। সেখানে সে বেতে পারবে না। কিন্তু আর এক জনকে বলা যায় না? তিনি হয়তো বুঝবেন তার একান্ত মনের কথা। কিন্তু কবে কেমন করে? ছিঃ, কী ভাববেন তিনি?

পাঁচর আড়াল থেকে যেম চুটে চুটে বেরিয়ে এল ফুলবাহু। হাসিনা মুখ। হেনা ভাড়াভাড়া দিককণ্ডিত নীল নিরঞ্জন বসে,

এগিয়ে গিয়ে ফুলবাহুর হাতটা ধরে তরল সুরে বলল, খুব খুসী দেখছি যে আজ?

—খুসী হবো না? নিজেকে দিয়েই বুঝতে পার। এক সাথেই তো বাছি।

—বেশ; তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠবো।

—সে তো আমার ভাগ্যা, দিদিমণি! কিন্তু আমাদের মত গরীবের ঘরে—

—আমার মত এই এত বড় একজন বড়লোক, বলেই খিল-খিল করে হেসে ফেলল হেনা!

ফুলবাহুও হাসল। তার পর হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, আজ, কবে ছাড়বে আমাদের? ছেলে দুটোকে কত কাল দেখিনি। বড় ছটকট করছে মনটা।

—শুধু ছেলে দুটো? তাদের বাপের জন্তে নয় বুঝি?

ফুলবাহুর মুখের উপর ফুটে উঠল একটুখানি স্নান হাসি। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিলিয়ে গেল। শুক কণ্ঠে বলল, কি জানি কী দেখবো গিয়ে? আদ্যিনে হয়তো একটা নিকে করে বসে আছে। দেশে তো পোড়া মেয়েমাছুষের আকাল নেই। আমার বপালে আবার সেই লাথি খাটো।

হেনা সাধনার সুরে বলল, না, না। এ তোমার মিথ্যা ভয়, ফুলবাহু! নিকে অমনি করলেই হল?

—করলেই বা ঠেকাবে কে? এদের কাছ আমরা তো হাঁড়িকুঁড়ির সামিল। পুরোনো হলই ফেল দিয়ে নতুন নিয়ে আসবে।

—তাই যদি হয় তুমিই বা লাথি-খাটো থাকে কোন দুখে? ছেলের হাত ধরে চলে যাবে; ঘর বাঁধবে নতুন লোকের সঙ্গে। তোমাদের সমাজে সেটা বাঁধের নয়। আইনত কোনো বাধা নেই। ফুলবাহু নিঃশ্বাস ফেল বলল, বাধা নেই বটেই কি সব কিছু পাবা যায়, দিদি? ওরা পুঙ্খ-মাহুয; ওরা পারে। আমরা পারি না।

ফুলবাহু ওদিকে গিরে বাবার পরেও হেনার মনের মধ্যে ঘুরে কিবে বেড়িয়ে লাগল তার সেই শেষ কথাটা—ওরা পারে, আমরা পারি না। কেন পারি না? নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করল হেনা। দুর্বল বলে? অসহায় বলে? দুঃস্থতঃ হয়তো তাই। কিন্তু তার মূল কারণ জড়িয়ে আছে, নারী বলে বিধাতার যে আজব স্রষ্টি, তার প্রকৃতি, তার অস্থিমজ্জার মধ্যে। একদিন হয়তো আসবে, যখন তার এই বাইরের অক্ষমতা আর থাকবে না। অর্থে, সামর্থ্যে, জ্ঞানে, গরিমায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, নারী হবে পুরুষের সমকক্ষ। তখনো হয়তো তাকে ফুলবাহুর মত নিঃশ্বাস ফেলে বলতে হবে—ওরা পারে, আমরা পারি না। বত ভালোই বাস্তব, স্বামীর কাছে স্ত্রী তার নর্থ-সহচরী। কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামী তার মর্থ-সহচর। একে অন্তকে যখন ছেড়ে যায়, পুরুষের চোখ কেটে যদি জল করে, নারীর বুক কেটে করে রক্ত। পুরুষের প্রেম তার আত্মদান, আর নারীর প্রেম তার আত্ম-বিসর্প। নিজেকে হারিয়ে কেনে ফুলবাহুর জাত জিহ্মিন কেনে এসেছে, চিরদিন কাঁদবে।

রাত্রি এসে বেঘোর বেশে দিয়েছে পারাবায়, জেলের মধ্যে তার লোকদাটা অতি স্পষ্ট। সন্ধ্যা বেলায় বীষে বীষে রাত্রির সন্ধ্যা



মিলিয়ে যায় না। রাত্রি হঠাৎ কাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে। একের বিলাস যেমন আচমকা, অন্যের আগমন তেমনি আকস্মিক!

দিনের কটন শেষ হয়ে গেছে। জেলের ভিতরকার রাস্তাখাট লোকে লোকারণ্য। চারি দিকে হীকডাক চুটচুটি। মুহূর্ত-কয়েকের ব্যবধান। হঠাৎ দেখা গেল, সব ভোজবাস্ত্রের মত মিলিয়ে গেছে। পথ শূন্য, মাঠ নিস্তব্ধ, ঘাট জনহীন। বিশাল ওয়ার্কশপগুলো দাঁড়িয়ে আছে শ্রেতপুত্রীর মত। খাঁখাঁ করছে রাস্তাঘর, খাগার হল, ব্রানের লাইন। সন্ধ্যার কোলাহল সহসা থেমে গেছে, নেমে এসেছে রাত্রির শুভ্রতা।

দীর্ঘ বায়াকগুলোর ভিতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা একটানা গুজন। নিজস্ব রাস্তায় এখানে-ওখানে লগ্নন দু'লিয়ে পাহারা দিচ্ছে বাতের সিপাই। মাঝে মাঝে হুকায় দিচ্ছে—আ—স্তে। কেউ হীকছে, মুখ বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে বাবে গুজনের স্বর। আবার ধীরে ধীরে চড়তে থাকবে তার পরদা। মাত্রা ছাড়িয়ে উঠবার আগেই গজ্জে উঠবে সিপাই বাবুর দ্বিতীয় হুকায়।

আফিম মহলের চেগারী অস্ত্র রকম। জেলের ও স্থপারের ঘরে তালা ঝলছে। কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকে বাদিকটার ডেপুটি এবং কেরাণী বাবুরা যেখানে বসেন, সে ঘরগুলো রীতিমত সগরম, উজ্জ্বল বিজলি বাস্তির নিচে টেবিলে টেবিলে নানা আকারের পোলা রেজিস্টার। তার পাশে ধীরে জমিয়ে বসেছেন, তাঁদের হাতে কলম, মুখে সিগারেট, আর তার কাঁকে কাঁকে খোস খবরের বুকনি। বাইরেরকার লৌহ-তোরণ পার হরে ভিতরের দিকে যে বিরাট কাঠের গেট তার বৃকে রাত্রির মত তালা পড়ে গেছে। দরকার মত খোলা বাবে পাশের দিকে বসানো একটা ছোট দরজা, যার নাম উইকেট গেট। আকারে ছোট হলেও তার প্রস্তাপ ছোট নয়। খোলা এবং বন্ধ করার শব্দে গোটা আফিস সজাগ হয়ে ওঠে।

আসর বেশ জমে উঠেছে। সেই উইকেট গেট খোলার সাদা পাওয়া গেল। অনেকেই উৎকর্ণ হলেন। প্রত্যাশিত বাস্তিই বটে, গলায় ট্রেবিস্কাপ-পর্য ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ, পিছনে তার কম্পাউণ্ডার। বাবুদের কারো কারো মুখের উপর খেল গেল নীরব হাসির চমক। বাক্যের শ্রোতে দেখা গেল সাময়িক ভাটার টান। সামনেরকার গেট খোলা এবং বন্ধ করার বনংকার শোনা যেতেই আবার সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। আমদানি দপ্তরের সাদেক হাশেন বলল, বড় মুড়ি পড়েছে যেন মনে হল।

কোণের দিক থেকে কে একজন যোগ করল, তেমন সুরিধে হচ্ছে না বোধ হয়।

—আবে, না, না। সুরিধা ঠিকই আছে। মান-অভিমানের পালা চলছে; এর পরেই ভাঙ্গ-গুড়িল। বৈষ্ণব কবিতা পড়নি? উত্তর দিলেন গজেন বাবু। ছুনস্ব ডেপুটি বরেন রায় বললেন, লোকটার একটা বিয়ে-খার ব্যবস্থা করুন, দাদা! শেষটায় একটা বড় রকমের কেসেদ্বারি না করে বসে। সিনিয়র ডেপুটি ব্রিজি ডায়রি লিখছিলেন। খাতা থেকে মুখ না তুলেই বললেন, জানা-শোনা মেয়ে আছে না কি তোমার হাতে?—বন্ধে করুন। থাকলেও গুর হাতে দেবার আগে ভাল ডুকিয়ে দেবার পরামর্শ দিতাম। কী taste দেখুন লোকটার। একটা confirmed criminal, বলতে গেল রাস্তার মেয়ে। তাকে নিয়ে

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কুই হলি একটা ডাক্তার, লেখাপড়া শিখেছিল, সরকারী চাকরি করছিল, বাংলার একটা মান আছে।

গজেন বাবু বললেন, আবে মশাই, এর নাম হল লত—, কবির বলছেন, প্রেম-তুধা, যার ঠেলায় লোকে নন্দমার পাক তুলে মুখে দেয়, আর এ তো—

—নন্দমা স্বর্গা হতে কতক্ষণ? বাধা দিয়ে বললেন সিনিয়র, সেই চেষ্টাই হচ্ছে, জানো না বৃকি?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেয়ে সকলেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সিনিয়র বৃকিয়ে দিলেন, আডভাইসরি বোর্ডে নাম গেছে। খালাস হয়ে গেলে আর পায় কে? কয়েকী তো গারে লেখা থাকে না?

—বার্ভ ছাড়বে মনে করেন? প্রস্ত করলেন বরেন বাবু।

—আমার তো মনে হয় না। আর ছাড়লেও গভার্ট গুনবে কি না সম্ভব! এই রকমের heinous offence! তারপর জেল-রেকর্ডও ভালো না। প্রেসিডেন্সি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ডিষ্ট্রিক্ট জেলে। সেখানেও পানিসমেন্ট আছে গোটা কয়েক।

কে একজন বলল, কিন্তু এখানে তো বেশ ভালো ভাবেই আছে। কোনো রিপোর্ট হয়নি।

—তার মানে সুরীলাটা বে ভেড়া। সব মেয়েগুলো কাঁধে চড়ে নাচে, কিছু বলে না। ওখানকার ফিলেম ওয়ার্ডার কড়া লোক। ওর সঙ্গে বনত না একেবারেই। তাই এখানে এসে ছুটেছে।

—কোন জেল? জানতে চাইলেন গজেন বাবু।

—ফরিদপুর।

—ফরিদপুর! ওও! সেখানকার জমাদারগীর্ও এক দাক্ষ চাঁক।

—কী রকম? কৌতুহলী হলেন শ্রোতার দল।

গজেন বাবু বললেন, ডিউটিতে এসেই তিনি দিবা বিছানা-টিছানা করে শুয়ে পড়বেন। তারপর চলবে অঙ্গ-সেবা। একসঙ্গে দুটো মেয়ে। একজন পায়ের দিকে, আর একজন মাথার দিকে। তাও বাক-তাকে দিয়ে চলবে না। বয়স কম হবে ও দেখতে-গুনতেও ভালো হওয়া চাই। তাছাড়া পছন্দমত কমবয়সী মেয়ে পেলে অস্ত্র ব্যাপারও চলে।

—কী ব্যাপার? সাগ্রহে প্রশ্ন করল ছোকরা মত একজন কেরাণী।

—সে সব কি এখানে বলা যায়? দাদা বসে আছেন।

—দাদার খাতিরে বাকীই বা কি রাখলে তুমি? মন্তব্য করলেন সিনিয়র। শুধু ফরিদপুর কেন, ও সব প্রেমজীলা সব জেলেই আছে। পুরুষে পুরুষে যেমন চলে, মেয়েতে মেয়েতেও তেমনি। জমাদার, জমাদারগীরীও মাঝে মাঝে অঙ্গ নিয়ে থাকেন। সাদেক বলল, তাহলে একে নিয়েও বোধ হয় সেই রকম একটা কিছু হয়ে থাকবে। জমাদারগী সুরিধে করতে পারেনি। এ-ও তো চাঁক কম নয়!

—চাঁক কম নয়, তুমি জানলে কী করে? পরখ-টরখ করে দেখেছ নাকি? অর্ধপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন গজেন বাবু।

—না, দাদা। সে সুরবোগ আর হল কই? সুরবোগ হলেও, সক্তি বলতে কি, সাহস হয়নি। তা ছাড়া কই-কাতলা যেখানে ধারল হয়ে গেল, লেখানে আমার মত চুনো-পুটি—

আমি এবার চলি, দাদা, কথার মাঝখানে হঠাৎ উঠে পাড়িয়ে বললেন বলেন বাবু। একটু বেগোতে হবে। গুডনাইট।

সিনিয়র তার খাতায় মুখ রেখেই বললেন, গুডনাইট।

সাদেক হোশেনকে ঘিরে ধরল সবাই। গজেন বাবু বললেন, তুমি তো সামাজিক লোক হে! একটা থলে হাতে করে বসে আছ! ঝাড়ো ঝাড়ো। ও সব হেয়ালি-টোয়ালি ছেড়ে সোজা বাংলায় বলো। কাতলাটি কে?

—সাদেক একেবারে আঁতকে উঠল, সর্বনাশ! সেটা একেবারে strictly confidential ভাবেই চাকরি বাবে।

—আচ্ছা নাম-খাম থাক। ব্যাপারটা বলে বাও।

—ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। ঐ মেয়েটা আসবার বোধ হয় দু'তিন দিন পর। টিকিটখানা কী কাজে এসেছিল আমার টেবিলে। কাতলার নজর পড়ে গেল। নামটা পড়া আর শেষ হয় না। তারপর বোধ হয় বয়সটা আরো গোল বাখাল। বুঝলাম কাতলা বাবুর চোখে বোর লেগেছে। ভিতরে ভিতরে খবর রাখতে শুরু করলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। একটা কী ছুতো-ছুতো নিয়ে একদিন বিকেল বেলা ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে হাজির। রীতিমত সাজগোজ করে। সুশীলা বখন থাকে, তখন নয়। ছোট জামাদারগী রাণীবালার ডিউটি। তার সঙ্গে বোধ হয় কোনো বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। হেনাকে ডেকে পাঠানো হল। গেট খুলতেই বে দেয়ালের দ্বারদাটা আছে, তার পাশে।

—জায়গাটি চমৎকার—দলের মধ্য থেকে মস্তব্য শোনা গেল।

—হেনা আসতেই রাণীবালার চলে বাচ্ছিল। সে বাধা দিল, আপনি বাবেন না। টোনটা অস্বাভাবিক নয়, একেবারে হুকুমের মত। রাণীবালাকে থাকতে হল। কাতলাও সাহস করলেন না তাকে সরিয়ে দিতে। অন্তত ফরওয়ার্ড মেয়ে। সোজা তাকিয়ে বলল, আমাকে ডেকেছেন, আপনি? কাতলা নার্ভাস। আমতা আমতা করে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোমার কেসটা মিথ্যা। উকিলের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। মোটামুটি কতকগুলো facts জানতে পারলে তোমার খালাসের জন্তে চেষ্টা করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, ধন্যবাদ। কেসটা মিথ্যা নয়। খালাসের চেষ্টারও দরকার নেই।

কাতলা হিগুন নার্ভাস। তবু কোনো রকমে বলে ফেললেন, তাছাড়া, তোমার খাটনি, মানে এই ডালভাঙাটা বললে বাতে অল্প কোনো সোজা কাজ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে আমি সাহেবকে বলবো। ভাবছি.....

—দরকার হলে আমিই বলতে পারবো। তবে, দরকার নেই।

অতঃপর কাতলার প্রস্থান। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আবার একদিন লাক ট্রাই করতে ছুটলেন কাতলা বাবু। রবিবার দুপুর বেলা। সাক্ষী দেয়ালের আড়ালেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। খবর পেয়ে হেনা বেরিয়ে এল। নমস্কার করে বলল, ওখানে কেন, এদিকে আসুন না? যেন কত খুসী ওঁকে দেখে। ওয়ার্ড সেডের বারান্দার একটা মোড়াল ছিল। সেখানে নিয়ে বসল। খাটনি বন্ধ। মেয়েরা সব ওয়ার্ডে গুরুচ্ছে। ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাতলার আনন্দ আর ঘরে না। হেনাই কথা পাড়ল, বলুন। সেক্ষেত্রে মাথা সিঁড়ির ক্রমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললেন

কাতলা বাবু, তোমাকে দেখলে বুঝতে পারি, মেয়েকয়েদীদের এই পোষাকগুলো বদলানো দরকার। যেমন মোটা কাপড়, তেমনি ব্রিফি কাটছাঁট। এ বিষয়ে আমরা লিখবো। অন্তত: তোমার মত ভদ্রব্যের শিক্ষিতা মেয়েদের জন্তে—

কথার মাঝখানেই হেনা বলে উঠল, ভদ্রব্যের মেয়ে বলে মনে করেন নাকি আমাদের?

কাতলার তীব্র প্রতিবাদ, কী যে বল! তোমাকে মানে—

হেনা তেমনি শান্ত ভাবেই বলল, কিন্তু আর কোনো অপরিচিত ভদ্রব্যের মেয়েকে 'আপনি' না বলে যদি 'তুমি' বলে আলাপ শুরু করতেন, আপনাকে কী নিয়ে ফিরতে হত জানেন?

কাতলার চোখ ছানাবড়া। উত্তরটা হেনাই দিল—অপমান! বলে নমস্কার করে চলে গেল ওয়ার্ডে।

সাদেকের কথা শেষ হতে না হতেই অফিস ফাটরে উল্লাসময় জটহাসি এবং তার পিঠের উপর সমবেত চপেটাঘাত। হুজুর্ড খামলে সিনিয়র শাস্ত কণ্ঠে বললেন, এই সরস কাহিনীটি কি সাদেক সাহেবের latest রচনা?

—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, দাদা, এর প্রত্যেকটি কথা সত্য।

source'টা কী জানতে পারি?

—মীনা বলে যে বিকাশ মেয়েটা খালাস পেল সেদিন, ঐ যে প্রায়ই আসে, তারই কাছে শোনা। রাণীবালারও স্বীকার করেছে।

—তাই বল; মাথা নেড়ে বললেন সিনিয়র, এবার বোঝা গেল ডাক্তারের গুণর বয়েন বাবুর এত রাগ কিসের—

—এক আশ্চর্যকথাটাই বা এত টক লাগল কেন? বোঝা করলেন গজেন বাবু।

আর একবার হাসির রোল।

এ কাহিনী যে সময়ের, তখনকার দিনেও জেলে জেলে কয়েদীদের জন্তে একটা করে লাইব্রেরী ছিল। বই বা থাকত, ছুঁচায়খানা ধর্মগ্রন্থ বাইবিল, বেশির ভাগই নিচু স্তরের, অন্তত: সাবালকদের পড়বার মত নয়। ও জেলে থাকতে ক্যাটালগটা আনিয়ে একবার পাতা উলটিয়ে দেখেছিল হেনা। ভূতপ্রেরিত জিন-পীরের কাহিনী, তিন আনা সিরিজের জীবনী কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর অ্যাডভেঞ্চার আর বা, তার প্রায় সবগুলোই ছেলেবেলার পড়া হয়ে গেছে আর বাকীগুলো ঘুরোখা। সবে নতুন। জেলখানার হালচাল তখনো রপ্ত হয়নি। তাই বিবরটা একদিন খোদ সুপার সাহেবের সাম্প্রতিক ফাইল-এ পেশ করে বসল। তিনি জেলার সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, এবং জেলার সাহেব তাকালেন ডেপুটি সাহেব পানউল্লার দিকে। সে বছর বই কিনবার তার পড়েছিল তারই উপর, এবং তিনি কয়েকখানা আমপাড়া বিবাদসিদ্ধ আর বাকী সব কতিমাবিধির কেছা ইত্যাদি মূল্যবান স'গ্রহ দিয়ে আলমারি ভর্তি করেছিলেন। হেনার অভিযোগের উত্তরে একটু উতালের হাসি হেসে বললেন, জেলের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর, বাকী প্রায়ই চাবান্ডা, নামমাত্র লেখাপড়া জানে। তাদের প্রয়োজনের দিক তাকিয়েই

আমাদের বই কিনতে হয়। হুঁচকার জন শিক্ষিত বা শিক্ষিতার বার্ষিক দেখলে চলে না।

হেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, বাঁরা নিরঙ্কর কিংবা সব পড়তে শিখেছে, তারা লাইব্রেরী দিয়ে কি করবে? লাইব্রেরী জিনিষটাই শিক্ষিত লোকের জন্তে। বই-এর অভাব শেষ করে তারা। তাদের যা কাছে লাগে, সেই সব বই-ই রাখা দরকার। তা না হলে লাইব্রেরী করে কী লাভ?

বলা বাতুল্য, একটা সামান্য কয়েদীর কাছ থেকে একমুঠা উক্তি কর্তার পছন্দ করেননি। নেহাৎ মেয়েমানুষ বলে শুধু একটা ক্রুদ্ধ ক্রটি নিক্ষেপ করেই প্রেতান করছিলেন; insolence impertinence এর অপরাধে আর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। এর পরের বার বই কিনিবার সময় শোনা গেল, বড় সাহেব লিপি তলব করে বসেছেন। তার কিছুদিন পবেই হেনার বদলি হয়ে গেল।

এখানকার ক্যাটালগ দেখে সে কিন্তু অবাক না হয়ে পারেনি। প্রথম দিকের বইগুলো যাই হোক, হাল আমলের সংগ্রহটা চমৎকার। সুশীলার কাছে শুনেছিল, বই নির্বাচনের ভার নাকি তালুকদার নিজের হাতেই রেখেছেন। মাঝে মাঝে হুঁ-একখানা বই সে লাইব্রেরী থেকে আনিতে পড়ত। একদিন একটা নতুন উপন্যাস পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল পেনসিলে লেখা কতকগুলো কুৎসিত কথা। শুধু এক কায়গার নয়, মাঝে মাঝেই অমন ধারা অশ্লীল মন্তব্য। গাঁটা এমন পাক দিয়ে উঠল যে বইখানা তাকে শেষ না করেই ফেৎ দিতে হয়েছিল। তারপর অনেক দিন আর বই আনিবার মত উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সুশীলার পীড়াপীড়িতে আবার একদিন কয়েকখানা বইয়ের নাম লিখে স্লিপ পাঠিয়ে দিল লাইব্রেরীয়ানের কাছে। সুশীলাকে এ ব্যাপারে নিঃস্বার্থ বলা যায় না। দুপুর বেলা হেনার ঐ মিষ্টি স্বরের গল্প পড়া না শুনে তার ভাত হজম হত না। কোনো কোনো দিন এটা ছিল তার নিম্নাকর্ষণের বস্তু। সুশীলা ছাড়া কমলা এবং আরো কয়েকটি মেয়েও ছিল পাঠের আসরের নিয়মিত সভা।

লাইব্রেরীর চার্জটা একজন কেবাণী বাবুর হাতে থাকলেও কাজ করত সব চালাত "বইটার" অর্থাৎ খানিকটা লেখাপড়া জানা একজন মাতঙ্গর কয়েদী। হেনার স্লিপ পেয়ে খানকয়েক বই পাঠিয়ে দিল ফিমেল ওয়ার্ডে। পড়তে গিয়ে তাদের একখানার মধ্যেও পাওয়া গেল তেমনি পেনসিলে লেখা অশ্রাব্য উক্তি। কিন্তু এবার আর ওসব গ্রাস না করে এগিয়ে চলল। তারপর একটা পাতা ওপটোতেই বেবিরে পড়ল এক টুকরা কাগজ। সম্বলেশা প্রেমের কবিতা। তার মধ্যে ভাব ভাবা ছন্দ সবটারই অভাব, অভাব ছিল না শুধু কুচিহ্ন। নাম গায় উল্লেখ না থাকলেও এটা যে তাবই উদ্দেশ্যে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। মাথার ভিতরটা হঠাৎ ঝাঁ করে উঠল। কবিতার শেষে লেখক তার নামটাও প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা হল জেলের সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয় কাগজখানা। তারপর ভাবল, কী লাভ হবে তাতে? আরো খানিকটা হুলিরে উঠবে পাক। একবার মনে হল আর কারো নজরে পড়বার আগে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ঐ দোরা জিনিষটা স্পর্শ করতও প্রবৃত্তি হলো না। ডিউটি

জমাদারকে খবর পাঠিয়ে সেই দিনই সে সব বইগুলো ফেরৎ দিয়ে দিল। আর কোনো দিন লাইব্রেরীর বই চেয়ে পাঠায়নি।

বড়ী অনেকখানি সেয়ে উঠবার পর হেনার হাতে বেশ কিছু সময় জমতে শুরু করল। মনটাও বেনে কিছুদিন থেকে ভাল নেই। নতুন করে আবার ভাব হয়ে উঠল বই-এর অভাব। লাইব্রেরীর ব্যাপারটা সবেমাত্র সুশীলাকে খানিকটা ইঙ্গিত দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে 'দেখে নেবো' গোছেব খানিকটা আন্দোলন করলেও শেষ পর্যন্ত সেও হেনার মতেই সায় দিয়েছিল। বলেছিল, তোর কথাই ঠিক। দেখেছি তো, এ সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দোষের ভাগী হয় মেয়েরাই, আর কলঙ্কের দাগও তাদের গায়েই লাগে।

অনেক ভেবেচিন্তে হেনা একদিন সুশীলাকেই ধরে বলল, আপনাদের জানা-শোনা কেউ নেই, মাসীমা, বেবান থেকে হুঁ-একখানা বই ধার পাওয়া যায়? পাবলিক লাইব্রেরী থেকে জানা যেত, কিন্তু সেখানে আবার টাকা লাগবে যে। সুশীলা একটুখানি কী ভাবল। তার পর বলল, আচ্ছা, পাঁড়া, দেখি তোর বই জোগাড় করতে পারি কি না।

ঠিক দুদিন পরে সুশীলা একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট হাতে করে হাসতে হাসতে পাঁড়াল গিয়ে হাসপাতালের দরজায়। সেদিকে নজর পড়তেই হেনার চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে প্যাকেটটা একরকম কেড়ে নিয়ে চৌকিরে উঠল কলকঠে, বই। কোথেকে আনলেন?

—খুলেই দাখ।

তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলাতেই বেবিরে এল তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছ। নতুন বই-এর মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল বুকখানা। বইগুলো হুঁহাতে বৃকে ভাড়িয়ে অম্বোগের সুরে বলল, আপনি আবার কিনতে গেলেন কেন এতগুলো বই? এর যে অনেক নাম।

সুশীলা মুখ টিপে হেসে বলল, নাম তো আর আমি দিইনি। যে দিতে পারে, সেই দিয়েছে।

—কে সে? হেনার চোখ-মুখে ফুটে উঠল বিষয় আর বিরক্তির কুন্দন।

সুশীলা ধমকের সুরে বলল, তা দিয়ে তোর কাজ কি? পড়তে চেয়েছিলি, পড়।

—এই বইল আপনার বই। কোথেকে পেলেন না বললে কথখনো নেবো না।

—শুনলে আবার লাগতে শুরু করবি না তো?

কেন, লাফাবো কেন?

ডাক্তার বাবু।

অকস্মাৎ বেন তাড়িতাখাতে হেনার আপাদমস্তক শক্ত হয়ে গেল। দুপ্ত কণ্ঠে বলল, তাঁর কাছে বই চাইতে গেলেন কেন আপনি? সুশীলা খানিকটা এগিয়ে এসে স্বাভাবিক রুদ্ধ স্বর বধাসাধ্য নরম করে বলল, তাখ, কথায় কথায় ওরকম মাথা গরম করতে নেই। কার কাছে চাইব তুমি? এতবড় জেলখানার এতগুলো বাবু। তার মধ্যে বই পড়ে ঐ একটা লোক। মস্ত বড় দালদারীঠাসা খালি বই। সে যদি দেখতিস? বতকশ বাড়ি থাকে, ঐ নিরেই পড়ে আছে। চাকরটার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে বাড়িরে পাওয়াই হয় না। পড়তে পড়তেই হুমিরে পড়ে।

হেনার সেই দুট ভগ্নী আন্তে আন্তে কোমল হয়ে এল। অনেকটা যেন সলজ্জ সুরে বলল, আমার নাম করে চাইলেন ?

—না ; তোর নাম করণে কেন ? আমার নাম করে চাইলাম। বললাম, ওগো, তোমাদের সুশীলা জামাদারনী এত বড় পণ্ডিত হয়ে গেল। কু'খানা বই পড়তে দেবে না ? বলে পরিহাস-তরল করে হেসে ফেলল সুশীলা। হেনা বোধ হয় স্তন্যভেদী পারিনি। আগের সুর ধরেই বলল, হি, হি, কী মনে করলেন উনি ?

—কী আবার মনে করবে ! দেখে তো মনে হল খুসীই হয়েছে। ভাড়াভাড়ি উঠে আলমারী খুলে বেছে-বেছে খান-চাবেক বই আমার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো পড়া হলে আবার এসে নিয়ে য়েও। তারপর ও মা ! বারান্দা পেরিয়ে কেবল উঠানে পা দিয়েছি, পেছন থেকে এই ডাকডাকি। 'কী চল !' 'না, না, ওগুলো নিজে হয়ে না। কাল এসো, অজ্ঞ বই দেবো।' বই কটা যেন কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে। আজ আবার যেতে ঐ বাণ্ডিলাটা দিলে। লোকে ঠিকই বলে, ডাক্তার বাবুর মাথায় বেশ একটু হিট আছে।

হয়তো তাই। কিন্তু এই 'হিট'এর পেছনে আরো কিছু আছে, বা সুশীলা না জানলেও, হেনার কাছে আজ আর অস্পষ্ট নেই। তার মনে পড়ল, দেবতাবের সেই চিঠি—'আমার কাছ থেকে তোমার 'কোনো ভয় নেই। নিজেকে আমি তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিলাম।' পাছে তাঁর নিজের ঐ ক'টি প্রিয়বস্তুর রূপ ধরে সেই 'ভয়' এসে দেখা দেয় হেনার মনের কোণে।

পাছে তার সন্দেহ জাগে, এ তো নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়, কোশলে নিজেকে নতুন করে বিস্তার করা, তাই বই এল, কিন্তু সে তাঁর নিজের কাছ থেকে নয়, তাঁর হাতের কোনো স্পর্শ লেগে নেই এয় কোনোখানে। বই ক'খানা আবার উন্টে-পাল্টে দেখল হেনা। একটা কালির আঁচড় পড়েনি এর কোনো পাতায়। কী দেখ হত যদি প্রথম পাতাটির মাঝখানে ছোট করে থাকত তাঁর নাম, আর তার নিচে বস্তু করে লেখা তাঁর একটি স্মরণ স্বাক্ষর—দেবতোষ। সঙ্গারে কার কী কতি হত ?—সহসা ঘুরে গেল চিন্তাস্রোত। কপিকের স্তব্ব ঘোর ঝেটে গেল। নিজের স্পন্দা দেখে আতর্ষ হল হেনা। আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল দুট শাসনের বন্ধনে।

বুড়ী হয়ে নেই। জানালার ধারে টুটা টেনে নিয়ে প্রথম খণ্ডখানা খুলে বসল হেনা। নিজেকে ডুবিয়ে দিল কবিত্তর এই অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে, বার জন্ম মন-প্রাণ ভূষিত-হয়েছিল কত দিন। তারপর কখন এক সময়ে অল্পভব করল, বইএর অক্ষর তার চোখে ঝাপসা হয়ে গেছে। মন বলছে তার কানে কানে নাই বা রইল লেখনীর টান, নাই বা রইল মসী-চিহ্ন। এই সাদা পাতার বুকের উপর যে অদৃশ্য লিপি তিনি পাঠিয়ে দিলেন, তার প্রতিটি রেখাই তো তার কাছে প্রত্যক্ষ। দেখা না গেলেও সে দৃষ্টমান, শোনা না গেলেও সে স্মরণময়।

বই ক'খানা তুলে নিয়ে পরম জ্ঞানভরে কপালে ঠেকাল, তার পর গভীর আবেগে চেপ ধরল বুকের উপর। [ ক্রমশঃ ]

## পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীপদ্মা গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষে বর্ষে ধারে আসি দিয়ে বাও ডাক  
পঁচিশে বৈশাখ,  
তুমি একদিন  
বাল্যালে যে জাগরণী বীণ  
"জাগো জাগো ওগো নরনারী"  
তব ধারে এসেছে অতিথি, লহ তারে বরি।"  
তব সে আহ্বান  
দিকে দিকে সঞ্চারিল প্রাণ।  
উলিল পুরব নভে জ্যোতির্ধর রবি,  
আলোকে আনন্দে গান গেয়ে ওঠে কবি।  
সেই সে প্রাণের তারে বজ্রল বে সুর  
ভাহারই নবীন তান বাজিল মধুর।  
শিহরি উঠিল ধরা, তৃণ, তরুলতা,  
মাধবীর কাণে অলি বলে সে বায়ত।  
বনভূমি ফুললে ঘটি আলিস্পন্ন  
জানাইলো প্রিয় সঙ্কারণ।  
বর্ধিত নদীর কল্লালে,  
বসন্তের পবন হিল্লোলে,  
মিবসের শাভ নীলিমার,  
রাতের আঁধারে পাঁধা তারার মাল্য,  
জুড়ে কলকলসি,

"এসেছে যে আজি তারে জানি ওগো জানি।  
নয় সে অচেনা,  
বারে বারে এই পথে তারি আনাগোণা,  
সুনেছি সে গান  
বাহার পরশ পেয়ে জেগে ওঠে প্রাণ।"  
তাই তো ধরনী  
রূপে, বর্ণে, গন্ধে ভরা অন্তরধানি  
মেলি দিল সবার সমুখে,  
তাহার সুরার পাত্র সব তুষা হরিল পলকে।  
হে পঁচিশে বৈশাখ  
আর বার দিবে না কি ডাক  
তব কবিত্তরে।  
উৎসবের সাজ খুলে কেলিরাছে ঘুরে,  
বিরহ-বিম্বা-বরা,  
লুপ্ত আজি তার প্রাণে আনন্দের ধারা,  
এসো এসো জানানো তব এ আশ্বাস-বাণী  
নহে নহে নিঃশেষিত সে মাধুর্য-ধনি।  
এনেছি বচিয়া  
সে প্রাণ-গঙ্গার ধারা, লহ গো চিনিয়া।  
কিরিরা আসিবে কবে সেই বাণী নিরা,  
আগ্রহে আকুল বরা আছে প্রতীক্ষিয়া।



অপক্লপ ও অনিন্দ্য

অপর্যাপ্ত অলকদামের শিকড় শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছলিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
ত্রিভু ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
পতাস্বীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাজেয় প্রসাধনী ।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

প্রস. এল. বনু রায়গু কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

লক্ষ্মীবিলাস বালি অতুলনীয়



## পঞ্চ ত পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(৭)

সাঁধনা ছ'টারবার অমরোথ করিতে নরেন রাজি হয়ে গেল। ইতস্তত করছিল প্রথম। কিন্তু আনন্দ জিনিসটাও হোঁচরাকৈ নয়। চাকরীর বাইরেও শুকনো পদমর্দার দিকলে আটকা পড়ে থাকবে সে মন নয় নরেন চৌধুরী।

বাদনা উৎসবে নেমন্ত্রণ করে গেছে পাগল সর্দার।

সাঁধনা শুনেছে সে এক মস্ত পর্ব। বার মাসে তের ছেড়ে তেত্রিশ পার্বণের অঙ্গুষ্ঠাই ছিল একদিন ওদের। সে দিন গেছে। পৌষে ধান কাটার উপলক্ষও আর নেই বড়। ঘেরে-পুকুরের প্রাধান্য জীবিকা এখন চাকরী। ক্ষুধার দায়ে পেশা বিকিরেছে। সে পেশার লাগাম অস্তর হাতে। তবু হুই একটা উৎসবে লাগাম ছেঁড়ে ওদের। বাদনা উৎসবে বেশ ভালো করেই ছেঁড়ে। উপযুপরি পাঁচটা দিন একটা সাঁওতাল নারীপুকুরকেও আর মড়াইয়ের ঘারে কাছে দেখা যাবে না।

ওদের এই কটা দিনের অল্পপস্থিতি মড়াইয়ের কর্মকর্তাদেরও মনে নিতে হয়। বিভিন্ন জাতের সহস্র সহস্র তুলিকামিনের মধ্যে দ্বাত্র কটা দিনের অল্প এই একমলের অল্পপস্থিতি লুকানীয় নয় এমন কিছু। উৎসবের ব্যাপারটা নরেন চৌধুরী কিছু কিছু জানে। গতবারে আগ্রাণ পেয়েছে। সাঁধনা দেখেনি কখনো। শুনেছে। শোনার পরেও আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকে কি করে।

বেতে হবে ওদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাহাড়ী ঘাড়া গবে নিচে নেমে, গোটা হুই গ্রাম ছাড়িয়ে শালমহুরার বন পেরিয়ে তার পর।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সাঁধনার। এ পথে আর আসেনি কখনো। মহুরা বনে রসে টাইটবুর মহুরা কলের মিষ্টি মাংস আতপ-আতপ গন্ধে কি একটা সাড়া জাগছে যেন চেননার তলার তলার। আসন্ন বসন্ত বাতাসে শালপিরালের বরষারানি যেন গানের মতই কানে বাজছে নরেন এটা সেটা টিগ্ননী কাটছে মাঝে মাঝে। এ পরিবেশে নীরবতাও প্রায় স্পর্শ-বাহিনী। তাই কথা বলতে হচ্ছে ওকে। নইলে চুপচাপ ওই নাগা প্রাচীরের দিকে চেয়ে থাকে অনেক বেশি সোভনীয়।

কিছুটা পথ বাকি তখনো। দূর থেকে ঢোল মালদের শব্দ কানে আসতে। সামনের বাকি একজন লোক দাঁড়িয়ে। অবাঙ্গালী।

সেপাই বা দরোয়ানের কাজটাজ করে বোধহয়। নরেন চৌধুরী মস্তব্য করল, ব্যাটা এখানেও এসে জুটেছে আবার!

কে ও?—সাঁধনা ফিরে তাকালো।

জবাব দেওয়া হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছে। লোকটা আগে দেখেনি ওদের। দেখে বেশ বিব্রত চলেছে বোকা গেল। ডাড়াডাড়ি আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল নরেন চৌধুরীর উদ্দেশে।

কেয়া বাগাহুর, দেখলে আয়া? নরেনের হিম্মি।

জবাবে লোকটা লজ্জায় ঠোঁট দুটো একবার নাড়ল শুধু। তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। নামটা শোনা শোনা লাগছে সাঁধনার। নরেনকে খুঁষ টিপে হাসতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে লোকটা বলুন না?

—বাকে দেখবে তাকেই চিনে রাখতে হবে তোমার?

সাঁধনা লজ্জা পেয়ে বলল, তবে হাসচেন কেন—?

অল্প থেকে নরেন জবাব দিল, একটুখানি কাব্য কথা মনে পড়ে গেল, ওই ফুলের লোভে লোভে কাব্য সব আসে...সেই কথা। ওর নাম বাহাহুর, জমালায়—একবারে বাহাহুর জমালায়। হেসে উঠল।

...জমালায়...বাহাহুর...

কায় মুখে শুনেছিল? কোথায় শুনেছিল? মনে পড়তে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল সাঁধনা। কিন্তু দেখা গেল না। লোকটা আড়াল নিয়েছে। তুতুবাবু মুখে শুনেছিল এ নাম। পাগল সর্দারের মেয়ে চান্দমণির সঙ্গে জড়িয়ে তুতুবাবু বলেছিল কিছু। বলেনি, বলতে বাচ্ছিল...।

—কি হল?

অপ্রতিভ মুখে সাঁধনা এগলো আবার।—কিছু না, এই লোকটা ভরানক পাখী শুনেছি।

আর একটু বিব্রত করার উদ্দেশ্যেই নরেন লোকটাকে সমর্থন করে বলল, ওর দোষ কি? ফুলের লোভে লোভে ওই কাব্য সব না এলে ফুলের জীবনই ব্যর্থ শুনেছি।

—বানু, আপনাকে আর কাব্য করতে হবে না। বলল বটে, কিন্তু হেসেই ফেলল সেও। দিন কতক আগেও পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কথায় কথায় সাঁধনা মেয়ের বিয়ের কথা তুলেছিল। সর্দারের কথা শুনে বেজার হেসেছিল সেদিন। মনে পড়তে জোরেই হেসে উঠল এবার।

—সর্দারের ওই মেয়েটার সঙ্গে হোপনের বাপলা হবে শিপগীরই জানেন? বাপলা বুঝলেন না? বিয়ে—।

বুঝলাম, তা তোমার এত হাসি কেন? তোমাকেও নেমন্ত্রণ করবে?

—করবেই তো। হাসছি ওই সর্দারের কথা শুনে। ঠিক করেছে এই চৈত্র মাসে বিয়ে দেবে ওদের—কিন্তু ওদের কিছু বলেনি এখনো—ঠিক করেছে শুধু। চৈত্র মাসে শিবরাত্রি পায় হলে দিয়েই দেবে বিয়েটা। শিব হল বাবা। আগে বাবার বিয়ে না হলে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কি করে। সে রকম নিয়ম নেই ওদের। মুখে জাঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল সাঁধনা।

নরেনের সম্মতি মন্দ নয়। হাসবে, না হাসি দেখবে...।

ঘুরে বাঁধা জমাট আসার নয় কিছু। ঘুরে আর বেরবে, গায়ে আর গরজনে, তালে আর তাগুবে একটা একাকার

পার। আবালবৃদ্ধবনিতার উৎসব। ম'রি পারানিক, ভগমারি, গপারানিক নারিক প্রকৃতি গণ্যমাজ্জের সমাবেশ। ছেলেমেয়েদের হুহুতোড়ে তার সঙ্গসরি বোগ দিচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখে মুখে গানেরও প্রভাবের আভাস। ঘোঁরােনেরা অনেক কালিহলি মেখে : সেক্ষেত্রে। অনেক আবার ময়ূরের পেখম পরেছে বা মাথার ডো বোঁধেছে। বাসন্তী র-এ শাড়ি ছুপিয়েছে মেয়েরা, কপালে টপ পরেছে, কালো চুমে শুভেতে মত্তরা কুল।

মত্ত পড়ে নারিক অর্থাৎ পুরোচিত। বলে, ওগো গীঠকানের গাফুর, ওগো 'জাহের এরা', তোমাকে প্রশ্নাম। তোমার নামে দাঙ্ক আমরা ছোট বড় সকলে এসে মিলেছি। 'জাহের এরা' দামাদের স্বথ স্বাঙ্কনা দিও। তোমায় প্রশ্নাম বাবাঠাকুর, আমাদের গারাম গীঠা টুংখাশা সব দূর কোরো, প্রাচীনকালের মত ধনে-গাঙ্গে সমুখ কোরো আমাদের 'জাহের এরা', আমাদের আঙ্কীয় কুটুখ বুদ্ধবল্লন ছোট বড় সকলের মঙ্গল হোক, আমাদের মধ্যে বগড়া বিবাদ নাশ-বিনাশ যেন সৃষ্টি না হয় ঠাকুর, নেচে গেয়ে স্তম্বে স্বচ্ছন্দ যেন আমরা থাকতে পারি। ওগো বাবাঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', প্রশ্নাম তোমাকে।

ম'রি সকলকে আশীর্বাদ করে বলে, বগড়াঝটি কোরো না, লোভলালচ কোরো না, পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোনেরা মিলে হুঁতী করো।

এই হুঁতির আমেজ লাগে ছেলেবুড়া সকলের মনে। হুরগী উৎসব হয়। সাদা রঙের আর বালামী রঙের। সুরমা পোলাও রান্না হয়। আর নাচ আর গান, গান আর নাচ। ঢাক বাজে, মাদল বাজে, নাগড়া বাজে, মোবের শিঙের বাঁশি ফোঁক। হয়। একটা শব্দ-তরলের উত্তাল আনন্দের আরতি হতে থাকে দেহের প্রতি রক্ষে।

সাম্বনা এবং নরেন চৌধুরীর পলাপণে সব থেকে খুশি পাগল সর্দার। এমনিতে অভিনিবৎসল ওরা। তার ওপর দিদিয়া এসেছে, সাতের এসেছে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু আর সকলের ওদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই খুব। নিজেদের নিয়ে নিজেরা বিহ্বল ওরা।

বিহ্বল সাম্বনাও। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রচুর হেসেছে। কিন্তু এই মত্ত আনন্দের ছোঁয়ার উজাড় করে দেবার একটা ইশারাও আছে যেন। অস্বস্তি লাগে। দেহের রক্তে সব-বিলানো নাচনের ছোঁয়া। থেকে থেকে মুখ রক্তিরে উঠেছে, চোখে ঘোর লাগছে কিসের। বাতাসে মহম্মার গন্ধ ভেসে আসছে এক একবার।

এখানে চাঁদমণিও আছে, হোপুনও আছে। এত লোকের মধ্যে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার জায়গা নয় বলেই সাম্বনা বিশেষ করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ওদের। মত্ত মাতাল খুশির নেশার যেন ঢলে ঢলে পড়ছিল মেয়েটা। কিন্তু খানিক বাদেই কি হল যেন। কির কির তাকায় সাম্বনার দিকে। সাম্বনার হাসির সঙ্গে ওর হাসি আর যেন মেলে না তখন। এই মেয়েটার প্রতি বরাবর একটা প্রহর আকর্ষণ সাম্বনার। ভেবেছিল চাঁদমণি কাছে আসবে, কথা বলবে, আর হাসবে। যেমন করে কথা বলে ও, আর যেমন করে হাসে। কিন্তু সাম্বনার হাসি দেখে ওর হাসি কমে এলো আদে আদে। আদে আদে দেখে, চলতে গাউনিতে একটা

শশিল কাঠিঙ্গ দেখা দেয় কেমন। হোপুনের কাছে এসে কানে কানে বলে কি। হোপুন ওদের দিকে ফিরে তাকায় একবার। ওর চাউনিটাও চূর্ণোধ্য মনে হয় সাম্বনার।

নরেন ভাড়া দিল, এইবার পালাই চলো, একটু বাদেই মদ সিলতে বসবে সব।

সভরে উঠে দাঁড়াল সাম্বনা। এককণ্ঠে মনে হল, ওদের এত হুঁতির উৎসটা খুব যেন স্বাভাবিক নয়। মদ খেয়েই বোধ হয় আসবে নেমেছে সব। আগর শেষ হল আবারও খাবে। পাগল সর্দার এলো। জিজ্ঞাসা করল, আখুনি বাবি তুরা?

সাম্বনা বাড় নাড়ল।

সর্দার বলল, কাল আসিস দিদিয়া, কাল ডাংরা লিরে জোর লাচ হবে।

সাম্বনা জবাব দিল না। দূর থেকে চাঁদমণি চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে। হোপুনও। ওদের মুখভাব খুব যেন সদয় নয়। মনে মনে অবাক হল সাম্বনা। ...কিন্তু হুঁচর মুহূর্তের জন্তে শুধু। তার পরেই ডুলে গেল ওদের কথা। বিশ্বাসিতরই আসর এটা। অনেকটা আচ্ছন্ন মত্তই নরেনের পাশে পাশে চলতে লাগল সে।

--ভাবছে। ভাবতে চেষ্টা করছে। এ ভল্লোকই বা এমন চূপচাপ কেন! হালকা হাসি ঠাটা কিছু করতে পারলে এ ভাবটা কাটে যেতো। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেও পারছে না। কি যেন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

হঠাৎ সচকিত হল সাম্বনা। সভবতঃ নরেন চৌধুরীও। অপ্রত্যাশিত সাক্ষ্য ঘটল আর একজনের সঙ্গে। একজন নয়, দুজন নয়, তিনজন নয়। শাল মহরা পেরিয়ে হুঁজনেই ধমকে গেল অন্দের জীপ গাড়িটি দেখে। ঘোব-ঢাকলাদারের জিপ। শুকনো মড়াইএর ধারে পাশাপাশি বিচরণ করছে রণবীর ঘোব আর আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে বরণা চ্যাটার্জি।

ওদের দেখে হরোঁফুঙ্গ মুখ এগিয়ে এলো হুঁজনেই। রণবীর ঘোব বলল, উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন নাকি? ওয়াপারফুল, না?

নরেন কিছু জবাব দেবার আগেই স্বরণা বলে উঠল, এ মা, দেখব বলে এতদূর এলাম, আর দেখা হল না। অস্বযোগ করল রণবীর ঘোবকেই, আপনায় জন্তেই তো, কেন নিয়ে গেলেন না?

নরেন বলল, জিপ রয়েছে সঙ্গে, এখনো যেতে পারেন।

স্বরণা সাগ্রহে তাকালো তার সখীর দিকে, চলুন বাই তাহলে। এগোতে গিয়েও সাম্বনার কুশোন্স্বর্ধ দাঁড়িয়ে পড়ল, কি গো মেয়ে, আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না উৎসব দেখে এলো।

চলমার ওবারে চোখ দুটো তার হেসে উঠল। ও ধরা পড়েনি, সাম্বনাই ধরা পড়ে গেছে যেন।

নরেন বলল, ওদের ওই আশ্রয়িক আনন্দ দেখে সাম্বনার মাথা ধরে গেছে। আপনায় বাবেন তো বান ভাড়াভাড়ি—সকো হয়ে গেলে আর কি দেখবেন, এসো সাম্বনা—আচ্ছা, নমস্কার।

এগিয়ে চলল আবার। ...পাহাড়ী রান্না। উঠতে লাগল। এই মেয়েটার সঙ্গে ওই লোকটার এই অন্তরঙ্গতা সাম্বনা কিছুতেই কেন বরদাস্ত করতে পারছে না। যদিও মেয়েটা কেমন খুব বন্ধুত্বের।

সেদিন ওর সঙ্গে সেই পাহাড়ে উঠতে উঠতেই বুঝেছিল। আজ আরো বেশি বৃথল।

—জন্মের এখন ওখানে যেতে বললেন যে ?

নরেন ফিরে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। সাক্ষিগুণ জবাব দিল, বললেও ওরা বাবে না, গেলে আসেই যেত।

একটা হাঁটার পর চড়াইয়ে ওঠাটা কষ্টকর বেশ। তবু যত ডাড়াডাড়ি সম্ভব সাধনা বাড়ি বেতে পারলে বাঁচে এখন। মন বললে, আসা উচিত হয়নি। এমন জ্ঞানলে আসত না। কিন্তু ভিতর থেকে আর একটা অহুত্ব ভিৎ করে তুলেছে তাকে। এই অবস্থিকর অহুত্ব ভিৎ অস্বাভাবিক নয় খুব।...বেদনা-দায়ক, কিন্তু অব্যাহত নয় বেন...।

এইখানে বসে থাক একটু। নরেন একটি পাথরের ওপর বসে পড়ল।

চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সাধনা। বসতে চায় না, তবু বসতে হল। আপত্তি করতে গেলেই এই লোকটার চোখে আরো বেন ধরা পড়ে বাবে ও। কিন্তু কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজেও না।

—কি হল বলে দেখি তোমার, এমন চুপ মেয়ে গেলে কেন ? নরেন চৌধুরী প্রায় ঘুরে বসল তার দিকে।

বড় পাথরটাও খুব বড় মনে হচ্ছে না সাধনার। বলল, ওদের ওই ভাত ঢাকঢোল শুনে মাথাটা সত্যি কিম-কিম করছে কেমন।

—বাড়ি বাবে ?

সাধনা উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, হ্যাঁ চলুন, বাবা হরত ভারচে।

বাড়ি কোবার সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাঁহু উঠে কথা বললেন। এইই মতো ফিরে এলে যে তোমার, ভালো লাগল না বুঝি ?

মাঝের কোলে বসে শিশু যেমন জাহির করে নিজেকে, বাড়ি ফিরে সাধনাও সেই চেষ্টাই করল প্রায়। হেসে বলে উঠল, ভালো আবার লাগবে না, খুব ভালো লাগল, লাকালাকি কাঁপাকাঁপি, নরেনবাবুকে ধরে রাখাই দায়।

হাসতে হাসতে ভিতরে ঢলে এলো। বতোৎসারিত নয়, ভিতরে আলোর সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল।

রাত্রি।

ঘুম নেই সাধনার চোখে। এপাশ ওপাশ করছে খালি। আর বাবে না কখনো। জীবনে আর ও মুখো হবে না। অবশ লাগছে, জ্ঞান লাগছে। অস্থি একটা। কোথায় বেন। কিসের বেন। চোখের সামনে, কানের পরদায়, আর মনের অন্তরে কি সব আনা-পোনা করছে। এলোমেলো দেখা, টুকরো টুকরো কথা, আর আশেপাশ ভালো অহুত্ব। হাসতুত্ব বোনের চপল ইচ্ছিত আর হাসিমার কথা। পাহাড়ের নির্জন টানহণি আর হোপুন আর টানহণির হাসি। মড়াইয়ে রনবীর ঘোষ আর রনবীর ঘোষের সেই ক্লোনক চাউনি। সর্দারের কথা আর তুতু বাবুর কথা আর বাহাদুর জবাপার। সর্দারের উৎসব আর ওই মেয়ে পুরুষের নাচন-মাতন আর মহাবীর গন্ধ। বরণা আর বরণার সেই বহু আর বরণা আর রনবীর ঘোষ। আর ও নিজে আর নরেন বাবু আর সেই পাথরে বসে আর সেই জন্ম আর সেই...।

আর সেই কি ?

অন্ধকারে অথর দশন করে নিজেকেই বেন চোখ রাঙাে সাধনা।

আর সেই বাতনা...আর সেই জন্ম মেশানো প্রত্যাশা।

না, আর সে বাবে না, বাবে না কখনো বাবে না।

কোন দিন না।

পরদিন খুব ভালো খুব সকালে। হাসল লাগছে, ভালো লাগছে। আর একটু নতুনও লাগছে বেন। রাতের সেই অস্বাদে বোঝা ভোলেনি। কিন্তু আজ আর সেটা তেমন সজ্ঞাচের কারণ বলে মনে হচ্ছে না। তা বলে আজ আর বাবে না কোথায়ও। আর কেন, কোন দিনই বাবে না। না বাবা, কিন্তু ভালো লাগছে।

বেলা গড়িয়ে গেল। বেয়ারার হাতে বাবার খাবারটা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলাই নিয়ে বসল একটা।...কিন্তু এখন আবার তেমন ভালো লাগছে না। পাগল সর্দার বলেছিল ডাংরা, অর্থাৎ পোক নিয়ে নাচ হবে আজ। পোক নিয়ে নাচ। সে আবার কি ? কতই জানে ওরা। বাই হোক, কিছুতেই আজ আর ও পথ মাড়াচ্ছে না সে।

কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে মন টানছে কোথায়।

কোথায় ?

সেই শাশুরমহয়ার বন পেরিয়ে, সেই হুটো গ্রাম ছাড়িয়ে সেই নাচ আর সেই আনন্দ আর সেই বিমুখিত-যন মহাবীর গন্ধ। দেশাঙ্কুরের দেশা ছাড়ায় পণ না ভাড়া পর্যন্তই যত বিভ্রম। সাধনারও সেই অবস্থা প্রায়। কেন, বাবে নাই বা কেন ? কোথায় বাবা ? কিসের বাবা ? অজ্ঞায় তো কিছু করছে না, তবে— ?

এই তবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণের একটা জমাটবীধা প্রতীবোধ সঙ্করবিচ্ছৃতির এক পলক। হাওয়ার উড় গেল। দিনের আলোর বাবে আর দিনের আলোর ফিরে আসবে।

শান্তি আর হুঁত।

বৃদ্ধ মাতৃস্বরেরা তখনো আসেনি। পুরুষ ও মেয়েরা পৃথক পৃথক রকমসে মেতে আছে। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে মরা সাক্ষিরে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা গান গাইছে :

বনোরা শুভুরি, কি ধারে আছে বেচারি।

শিকারী তো আছে বেনা বৃদ্ধ আহুত্ব।

শিকারী তো বেনা বৃদ্ধ আহুত্ব,

শুভুরি তো চিরি চিরি বেচারি।

বনের শুভুগুড়ে পাখি বেচারি কি খেয়েই বা আছে। শুভুগুড়ে পাখি তো খুব চরে চরে বেচারি, এলিকে শিকারী তো বেনোআশেরে আজলে।

কিন্তু ওদের মধ্যে আসল শুভুগুড়ে পাখিটি দেখতে গেল না সাধনা। পুরুষের মধ্যে হোপুন আছে। বসে বসে কিছুতেই বেন। হ'কো হাতে জন্ম'খি এসে মাঝে মাঝে ঘুরে বাচ্ছে। এ কটা দিন বিবর দায়িত্ব তার। কোনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে গঠিত কিছু ঘটলে সে দায় তার।

আসল আজও জন্ম খুব। কিন্তু কালকের মত লাগল না সাধনার। আজকের ব্যাপারটা যেমন আশ্চর্য্য তেমনই হল।



টি পুঁতে গোক বাঁধা হয়েছে কটা। তাদের ভেল সিঁদুর দেওয়া হয়েছে। খটি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে বেশ করে। তারপর হৈ-হুল্লোড়। হঠাৎ এক একবার মাদল নাগড়া ভেঁপু বেজে ওঠে। ভর পেয়ে লাক্ষ্মীর ওঠে গোকগুলি। তার বিগুন লাক্ষ্মীর, ওরা। মাতঙ্গরোরা দেখে আর হাসে। গোক যত ভর পায়, যত লাক্ষ্মীর ওদের ততো ফুটি। গতকাল থেকে মদ খেয়ে সব অন্তরকম হয়ে আছে, কাজেই বা করছে তাতেই আনন্দ।

চান্দমণি কখন এসেছে খোয়াল করেনি। চোখে চোখ পড়তে আর আরও বেশি অবাক হল সাধনা। এই আনন্দ মাতামাতির সঙ্গে তার তেমন বেগ নেই যেন। কালকের থেকে আজ আরো বেশি কষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। সাধনা ভাবল উঠে গিয়ে কথাবার্তা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু রকম সতক দেখে ভরসা পেল না। শুধু হোপুন নয়, আরো হুঁপাচ জনের কানে কানে বলছে কি। আর তারা যাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ওকে। সে দৃষ্টিতে আর বাই থাক সম্ভবতা আছে বলে মনে হল না সাধনার।

স্ববিধে পেলে সর্দারকে হয় তো জিজ্ঞাসা করত কি ব্যাপার। কিন্তু বুড়ো একবার থেকে হাঁকো টানছে আর বিষম হচ্ছে। এবার আর একটা আনন্দপর্ব দেখে সাধনা হেসে উঠল খুব। গান আর নাচের ভেতর দিয়ে পুরুষ আর মেয়েরা পরস্পরের নিন্দাবাদে মতে উঠেছে খুব। সাধনা ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথম, কগড়াঝাটি শুক করে দেবে না কি রে বাবা! কিন্তু না। পুরুষেরা হাত ধরে নাচতে রাক্ষি নয় মেয়েদের সঙ্গে, বলে তাদের হাত ভাঙা। আর মেয়েরাও পা মিলিয়ে নাচতে রাক্ষি নয় পুরুষদের সঙ্গে, বলে, তাদের পা গোলা। তাপার হাসির হাট এবং নাচ। ওদের এই আপসের রঙ্গ দেখে সাধনাও হেসে সারা।

কিন্তু হাসি খেমে গেল আবার চান্দমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই। তার চোখে খুশির লেশমাত্র নেই কোথাও। দর্শকদেরও অনেকেই নাচ ছেড়ে বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে।

কিন্তু এ নিয়ে আর ভাববারও সময় পেল না। বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আজ আর সঙ্গে কেউ নেই। চিন্তিত মুখে বাবার জন্ত উঠে পঁড়াল সে। হাঁকো হাতে পাগল সর্দার কাছে আসতে বলল, বাই সর্দার, ভরানক দেখি হয়ে গেল, একা একা বাব।

হুম্বুম চোখেও সর্দার ওর হুচিঙ্কাটুকু উপলব্ধি করল যেন। কি জেবে ঘুরে পঁড়িয়ে হোপুনকে ইশারায় ডাকল কাছে। সিঁদুরাঙ্ক বাড়ি পৌঁছে লিতে বলল সে।

—না না না, কিছু দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠল সাধনা, এই তো কতকণ আর লাগবে যেতে।—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিল।

কিছুদূর এসে পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখে অলস মন্থর গতিতে হোপুন আসছে পিছনে পিছনে। সাধনা পঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্তও হল মনে মনে। হোপুন কাছে আসতে বলল, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তুমি ফিরে বাও, আমি একলা খুব যেতে পারব।

ঠাণ্ডা নিশ্বাস চোখে হোপুন চের হইল শুধু।

সাধনা জোরে জোরে হাঁটতে-দুঃ করল আবার। অসেকটা

দূরে এসে পিছনে ফিরে তাকালো আর একবার। আর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

হোপুন ফিরে যাবনি। তুমি নিরীকার পদক্ষেপেই অঙ্গুসরণ করছে তাকে।

না খেমে সাধনা দ্রুত চলতে লাগল আবার। কি মতলব লোকটার? চিন্তিত চল এবারে। পরপর দু'দিনই কেমন কেমন লেগেছে। চান্দমণির কানে কানে কথা বলা আর এদের চাউনি। দু'দিন ধরে সমানে মদ টেনে চলেছে মনে পড়তে বেশ ভয়ও ধরল। যোগে গেল পাগল সর্দারের ওপর। কি দরকার ছিল সর্দারী করে ওকে সঙ্গে যেতে বলার!

বেশ জোরেই পা চালিয়েছে সাধনা। শাল-মহুয়ায় বন পেরোলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ও ধারে হুঁপাচজন লোকজনের যাতায়াত আছে।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত ভ্রমণগায় এসেই পা যেন একেবারে স্থায়ী মত আটকে গেল মাটির সঙ্গে। পাহাড়ী চড়াইয়ের ধারে রণবীর ঘোষের সেই জিপ। সঙ্গে সজিনী নেই আজ। জিপে ঠেস দিয়ে একলাই পঁড়িয়ে পঁড়িয়ে পাইপ টানছে। সামনের দিকে চেয়ে আছে, এখনো দেখিনি ওকে।

ত্রিশকু অবস্থা।

ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরে তাকালো সাধনা। যথার্থ হোপুন আসছে ঠিকই। নিজের অজান্তে হুঁটার পা পিছিয়েই গেল। হোপুন কাছে এসে পঁড়াল। সাধনা প্রায় অসহায়-দৃষ্টিতেই তাকালো ওর দিকে। হোপুন দেখল ওকে, দেখল দূরের জিপটাকেও। কিন্তু কিছু উপলব্ধি করেছে কি করেনি মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল না কিছুই। পাশাপাশি এগিয়ে চলল তারা।

নীল চশমা নেই। খুশিতে একবার বকঝকিরে উঠেছিল মুখি রণবীর ঘোষের মুখ। কিন্তু সাধনার মনে হল পরক্ষণে যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল হঠাৎ।

—কি, আজও এসেছিলেন না কি?

সাধনা বাড় নাড়ল শুধু। জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেবার আহ্বান প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে। ঘোষ বলল, আপনার আগ্রহ তো খুব! আমি এখানটার প্রায়ই আসি বেড়াতে। নিরিবিলিতে বেশ লাগে।

ওই পর্যন্তই। জিপে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ এলো না। সাধনা মনে মনে অবাকই হল একটু।

চড়াই। আর এগিয়ে বাগড়ার চেষ্টা করল না সাধনা। হোপুনের পাশে পাশে চলতে লাগল। আড়চোখে ওকে দেখলও বারকতক। ইচ্ছে হল, বা হোক কিছু কথা বলে ওর সঙ্গে। ইচ্ছে হল, চান্দমণির সঙ্গে এই চৈত্রমাসেই ওর বে বিয়ে দেবার কথা ভাবছে পাগল সর্দার সেই স্নসমাচাটরা জানিয়ে দেয়। কিন্তু একটা কথাও বলা সম্ভব হল না।...সঙ্গে আসছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন জ্যাক্স মাস্ক নয়।

ভর পেছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে তারা। আর মিনিট পনেরও লাগবে না বাড়ি পৌঁছতে। সাধনা পঁড়াল। খুব মিষ্টি করে বলল, এবারে তুমি ফিরে বাও হোপুন, এখন আমি ঠিক যেতে পারব।

ঠাণ্ডা হুই চোখ তুলে হোপুন তাকালো ওর দিকে। মাথা নেড়ে বলল, সর্দার তুকে বরতকু এখে আসতে বলেছে।

ওর স্মৃতিখে অস্মৃতিখের কথা ভেবে সঙ্গে আসছে না সে, আসছে সর্দার বলেছে বলে। চূপচাপ পথ চলা আবার। সাধনার আনন্দ হচ্ছে একটু। টানমণি বে জন্তেই ওর ওপর চটুক, আর দলের লোকের কানে কানে বাই গুলগুল ককক, ওর জোরটা বে কোথায় সেটা এরা বেশ ভালো করেই জানে।

একেবারে বাড়ির দোর গোড়া পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে তেমনি মন্থর পদক্ষেপে আবার ফিরে চলল হোপুন।

পরদিন আর নয়। আর বাওয়ার সজাবনাটা সাধনা চিন্তার থেকে বাতিল করে দিল। কিন্তু তার পর দিন আবার...। ভোরের আলোর সূর্য্য পাখির ডানা যেমন উসখুস করে ওঠে, তেমনি এক বাঁধনহেঁড়া বুদ্ধির ছোঁয়ায় তার এই একদিনের অবকাশ-আছন্ন মনের তলার তলার একটা টান পড়তে লাগল। মনের জোবও বেড়েছে। বিগত একদিনের আচরণে বর্ষাবীর ঘোবও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

পত দিনের থেকে আজ আবার অন্তরকম লাগছে সাধনার। প্রায় প্রথম দিনের মতই। নরেন বাবু পাশে থাকার অস্বস্তিও নেই। হাতের কঁকে হাত গুঁজে নাচছে একদল মেরে পুঙ্খ। নাচছে না, নিজস্বের একেবারে সমর্পণ করে দিচ্ছে বেন। অস্ত্র একদিকে গোল হয়ে বসে একদল মেরে গান ধরেছে। ভাত মাংস পরিবেশন করা নিয়ে বেন সমস্তার পড়েছে তারা :

খোয়া খোয়া মুরগী শূকর

বহ বহ কুটুম

ভাত কিখা বোল

আমি বাবা না পারি বাটতে।

কিন্তু সাধনা আসার মাত্র ঘটধানেকের মধ্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল কেমন। আসার রিমিরে পড়তে লাগল। সাধনা প্রথম ভাবলে, চারদিন ধরে ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে ওদের এই অবস্থা বোধ হয়।

কিন্তু না।

আজ আর শুধু টানমণি নয়। শুধু হোপুন বা আর পাঁচ সাত জন নয়। ওই নারীপুঙ্খেরা আজ এক প্রতিকূল স্তরভাষ্য বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে। আগে খেয়াল করেনি সাধনা। শুধু টানমণিকেই দেখেছিল। তার রাগ বিরাগের ধার ধারে না, সেটা বোঝাবার জন্তেই আর ফিরেও তাকায়নি। বোজ কাঁহাতক ভালো লাগে। একটা দিন না আসার দরুন চোখ কাণ মন দিয়ে ওই নাচ গানে ব্রি মেতে উঠেছিল সাধনা। একটু বেশিই হাসছিল বোধ হয় আজ। কিন্তু চঠাৎ একসময় মনে হল হারা নাচছে আর বাধা গাইছে তাদের সঙ্গে খুব বেন একটা যোগ নেই বাকি নারী পুঙ্খদের। থেকে থেকে বেন একটা দিখিল ছেদ পড়তে। হ্যাঁ, ওকেই দেখছে ওরা। হাতকরদেরাও অনেকে। নিজস্বের মধ্যে কি কিস কিস করছে মাঝে মাঝে। ওদের চার দিনের মদ খাওয়া বোলটো চোখে ঐতিহ্য আমেজ নেই।

সাধনা অবাক। প্রথমে সাফোটা, তারপর অস্বস্তি, তারপর ক্রম ক্রম একটু। নাচ গান করছে বারা, সার না পেরে

তারাও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে। ক্রমেই অন্তরকম লাগছে। ওদের মুখের ভাব কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। একটা অজানা আশঙ্কার সাধনা কাল কাল করে তাকাতে লাগল সকলের দিকে।

এরা এমন করছে কেন ?

এ ভাবে দেখছে কি ?

টানমণি কোণের এক দিকে শক্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে বেন পাশ দেওয়া অস্ত্র একখানা।

হোপুনের চোখদুটোও তার মুখের ওপর সংবদ্ধ—আরো মরা, আরো নিশাণ। এমন কি মাঁষি ভগমাঁষির চাউনিও অচকুস নয়। অস্ত্রত সেরকমই মনে হল সাধনার।

ভয়ে বিময়ে হকচকিয়ে গেল একেবারে। তারপরই ওর ব্যাকুল হুই চোখ বিশেষ করে খুঁজে বেড়ালো কাকে। সর্দার কই...পাগল সর্দার...!

পাগল সর্দারও তাকেই দেখছিল। দৃষ্টি-বিনিময় হতে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে বসল। শশক ভীক চোখে সাধনা তাকালো তার দিকে।

সামনের নারী-পুঙ্খদের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাগল সর্দার হঠাৎ হুকুর দিয়ে উঠল বেন।—বৈজায় বুল আকানাম ? চেং ছোয় এনা ? এনে : ই মে ! সেরিং সেরিং মে—! বেজায় নেশা হয়েছে ব্রি ? হল কি সব ? নাচ, না ! গান কর না !

বেটুকুও নাচ গান হচ্ছিল, থেমে গেল।

সর্দার সাধনাকে বলল, চল দিসিয়া তুকে বর পানে ছেড়ে আসি। বহুচালিতের মত উঠে ঠাডালো সাধনা। অজ্ঞাতসারে টানমণির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল আবারও। হিশ্র ধারালো মূর্তি, পারলে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একুনি।

অনেকটা পথ এসে পাগল সর্দারই কথা বলল প্রথম। তু উদের মাচ্চনা করে লে দিসিয়া। আতভর হাড়িয়া খেয়ে উদের মাখার ঠিক লাই।

কাতর আবেদন কথাগুলির মধ্যে। সাধনা আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো। মদ পাগল সর্দারও কিছু কম খায়নি। শুধু এ জন্তেই নয়। কারণ আছে কিছু। কথা বলতে গিয়ে টোটে কেঁপে গেল সাধনার। বলল, কিন্তু ওরা সবাই আমার ওপর বেগে গেল কেন ? আমি কি করেছি ?

বার কতক ঘাড় নাড়ল সর্দার। পরে বলল, তু কিছু করিস লাই, তু ওজ এসে খুব হাসিস, উসব ভাবল উদের সিরে তু 'সিরোগ' (ঠাটা) করতে লেগেছিল। ভদ্রানোক সিরোগ করলে পেচও বশমান হয়।

সাধনা হতভব।—কিন্তু আমি তো একটুও ঠাটা করে হাসিনি সর্দার।

সর্দার বারকতক মাথা নাড়ল আবারও। অর্থাৎ, সেটা সে খুব ভালো করেই জানে। বলল দিসিয়া বেন কিছু মনে না করে, দিসিয়া বেন 'আগ' না করে, নেশা টুটে থাক, ও ওদের সবকটাকে দেখে নেখে, সবকটাকে টেনে এনে দিসিয়ার পারের কাছে গড় করাবে।

চূপচাপ চলতে লাগল তারপর। কিন্তু ভিতরটা চূপ করে নেই সাধনার। কেন ? কেন ওরা এইন করল আজ ?

চাঁদমণি সকলকে উসকে দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে তাই।

কিন্তু কেন?

কেন মড়াইয়ে চাঁদমণি সেদিন কাজ খামিয়ে এমন জলন্ত চোখে ভ্রম করতে চেয়েছিল তাকে? কেন এখানেও এমন হীন মিথ্যা কৌশলে এই নেশাগ্রস্ত নারীপুরুষদের তার বিরুদ্ধে বিধিয়ে দিল চাঁদমণি? প্রত্যেক দিনই সাধুনা স্বচক্ষে দেখেছে সেটা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

বলবে না কি পাগল সর্দারকে, সকলকে টেনে আনতে হবে না, নিজের মেয়েকে শুধু জিজ্ঞাসা করে দেখো, তার কাছ থেকে কৈফিয়ত নাও!

কিন্তু বললে এর জের অনেক দূর গড়াবে। কিছুই বলল না। বলতে পারল না। নিঃশব্দে বাড়ি পৌছলো। নিঃশব্দে বিদায় দিল পাগল সর্দারকে। সচরাচর যা হয় না, তাই হয়ে গেল, তারপর বাগে দুঃখে অপমানের স্বরস্বর করে কেঁদে ফেললো।

আর কোনদিন গুদের সংস্রবে যাবে না, আর কোনদিন কাছে টানতে চাইবে না গুদের।

কিন্তু পরের ক'টা দিনের মধ্যে এই ছোট পরিসরে আচমকা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল একটা। এ রকম বিপদীয় এখানকার বাসিন্দারা হয়ত আর দেখেনি কখনো। মাঘের ছেড়ে মড়াই ঘেরা শুকনো পাগড়টা পর্বস্ত যেন নাড়া খেল একপ্রহর।

সাধুনা জ্ঞানত না কিছুই। গত দশ পনের দিন বাড়ি থেকেও

বেরোয়নি বড়। সেদিনের সে অপমান শুধুনা ভোলেনি। খবরটা মিল ওর গোরুর জন্ম বহাল আছে যে ছোঁকরা সে। জানালো, পাগড়ের নীচে লোকানের রাস্তায় শ'রে শ'রে লোক জমেছে আর ডাল ফেরাচ্ছে।

সাধুনা অবাক।—ডাল ফেরাচ্ছে কি রে!

—হি গো দিদিয়া, পাগল সর্দারের 'বিটলা' হবে। উঁকে মেয়ে কেটে মাটির নীচে পুঁতে ফেলাবে একেবারে।

শুনে বিদ্রোহস্পর্শের মত কাঁড়িয়ে রইল সাধুনা। বুঝল না কিছু, কিন্তু বিবম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে পাগল সর্দারের, এটাই বুঝল শুধু। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কেন রে?

ছোকরাটা ততক্ষণে আরো কিছু জানার উত্তেজনার এটুকু খবর দিয়েই আবার ছুটেছে। বিমূঢ় ভাবটা কাটতেই অস্থিরচিত্তে ঘরবার করতে লাগল সাধুনা। বাবাও নেই, সকালে নীচে নেমে গেছে, একটা খবর করারও উপায় নেই।

স্থির থাকতে না পেরে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে পায়ে পায়ে মেন কোয়ারটারসের পথে চলে এলো। কিন্তু সেখান থেকেও বোকা যাচ্ছে না কিছু। প্রায় নীচে নেমে আসার পর থমকে দাঁড়ালো। ভূতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে অনেক লোক জনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি সেখা যাচ্ছে তাদের হাতে হাতে পাতা-সমেত ছোট ছোট শালের ডালগুলো। তেতরটা বেন কাঠ হয়ে আসছে সাধুনা।

দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার। তারাও ব্যাপার

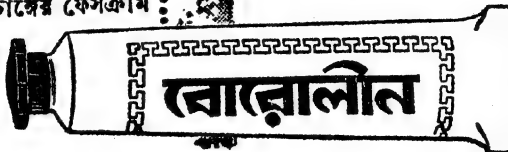


উচ্চাঙ্গের ফেসফৌর

পরিবেশক—

জি. দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনবিক্রম সেন, কলিকাতা-১



বোরোলীন

সকল ঔষধাশ্রম ও  
ডাক্তারখানায়  
পাওয়া যায়।

সেখতেই চলেছে। বলল শুধু, বিটলা হবে পাগল সর্দারের। কেন হবে? বা রে—ওর মেয়েটা যে ঘর ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে পালিয়েছে। তাই ভাল বেরাচ্ছে ওরা, গায়ে গায়ে খবর পাঠাচ্ছে।

সাহসী স্তম্ভিত!

আন্তে আন্তে ভুতুবাবু সোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যতিব্যস্ত এখন ভুতুবাবুও। সোকানের সামনে বিভিন্ন জাতীয় নরক নারী-পুরুষদের ভাড়। রাস্তার ওপরেই চা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হচ্ছে তাদের। তফাতে দাঁড়িয়ে ইশারায় সাহসী একজনকে বলল ভুতুবাবুকে ডেকে দিতে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ভুতুবাবু এসেই বলল, দেখুন কাণ্ড মা লক্ষ্মী, ওই সর্দারটাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সব—ওদের বিটলা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

ভুতুবাবুর কথা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সাহসী। বুকে শরীরের রক্ত আরো জল হয়ে গেল যেন। বিটলা অর্থাৎ সমাজচ্যুতি। তেমন বড় রকম কিছু না। ঘটলে বিটলা সচরাচর হয় না আজকাল। কিন্তু বড় রকমেরই ব্যাপার এটা। খোদ মাঝির ছেলের বউ হবে বলে বাগলতা হয়ে আছে, সে পালিয়েছে বেজাতের সঙ্গে—সোজা কথা না কি? ওই সর্দারের জন্তেই এ রকমটা হয়েছে, নইলে হোপুন তো আজ দু'বছর ধরে হাঁ করে বসে আছে চাঁদমণিকে বিয়ে করার জন্তে। সর্দারই হচ্ছে করে যেমনি বিয়ে। মাঝি মাতব্বরদের ব্যবহারই বেজায় রাগ সর্দারের ওপর—ছেলেটার জন্তেই করতে পারছিল না কিছু—এবারে ছেলেই বিগড়েছে সব থেকে বেশি—কজ্ঞেই এখন পোয়া বারো, আগের রাগও শুধে আসলে ঝালিয়ে নেবে সব। শয়ে শয়ে লোক দল বেঁধে বাবে, বাড়ি ঘর ভেঙ্গে গুড়িয়ে ধুলা করে দেবে, উঠান কুশিরে ঝাঁটা ঝাঁপ পুঁতে।... আর সর্দার?

সর্দারকে আর পারে কোথায়? বিটলা যার হয়, সে কি বাড়িতে বসে থাকে? তাকে পালাতেই হয় কোথাও না কোথাও। নইলে একেবারে ছাল চামড়া ছাড়িয়ে তাকে হুড় পুঁতে ফেল দেবে না। কেউ আটকাতো পারবে না, কেউ আসতেই সাহস করবে না এ সব ব্যাপারে। পাগল সর্দার নিশ্চয় এককণে সরে গেছে কোথাও। মিটিং করে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। পরে ফিরে আসতে পারে আবার। তখন প্রাণে আর কেউ মারবে না বটে, কিন্তু সমাজ তার কাছে একেবারে বন্ধ।

নিষ্পদের মতই সাহসী ফিরে এলো। কিন্তু বাড়ি এসে ছটকটনি চতুর্গণ বাড়ল। কি করবে এখন? কি করা যায়? কি করার আছে? ছোকরা চাকরটা এসেছে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠাল বাবাকে সংবাদ দিতে। তিনি ওপরেই যেন খেতে আসেন আজ, আর খুব তাড়াতাড়ি আসেন যেন। কি ভেবে ডাকল তাকে আবার। আর শোন, নরেনবাবুকেও খবর দিবি একটা, বলবি টীকে করে এসুনি যেন একবার আসেন, বিশেষ দক্ষার।

পাগল সর্দার বিপন্ন। এতবড় বিপদ বোধ করি কারো হয় না কখনো। কিন্তু থেকে থেকে এই অপরিণীম হৃদিস্তার মধ্যেও মনের তলার আর এক প্রাণ উঁকিঝুঁকি সিঁছে। ভুতুবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে হয়েছিল, কিন্তু হুখ হুটে জিজ্ঞাসা করতে

পারেনি। পাগল সর্দার বিপন্ন কারণ তার ওই লক্ষ্মাল পাঞ্জি মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কারো সঙ্গে—।

...কার সঙ্গে?

ওই মেয়ের খাবার সবই সম্ভব। তবু এতটা করুনাতীত। চাল-চলন যেমনই হোক, ওই হোপুন লোকটার প্রতি অন্তত...বাকুগে, গেল কার সঙ্গে?

অবনীবাবুই বাড়ি ফিরলেন আগে। হৃদিস্তাশ্রুত তিনিও। টাঁক এবং লোকজন দিয়ে নরেনকে পাগল সর্দারের খোঁজ করতে পাঠিয়েছে। বাড়িতে পাওয়া যায়নি তাকে। পেলে অন্তত বিশ তিরিশ মাইল দূরে কোথাও রেখে আসতে হবে তাকে।

অবীর প্রতীকা আবার। অবনীবাবু ফিরে অফিসে বেরবার আগেই নরেন এলো।

সর্দারের দেখা মেলেনি। ব্যাকুল হয়ে সাহসী জিজ্ঞাসা করল, কি হবে তাহলে?

—কি আবার হবে, মার খেয়ে মরার জন্তে ও এখানে বসে আছে না কি, নিশ্চয় গেছে কোথাও।

বখাসময়ে আবার আপিস করতে বেরিয়ে গেল তারা। সাহসীরা মন মানছে না। যদিই সর্দারকে ওরা ধরে ফেলে! যদিই খুঁজে বার করে। হিংসে প্রতিশোধ নিতে এবারে সবার আগে এগিয়ে আসবে মাঝির ছেলে হোপুন, যতবার মনে হয় সে কথা, ততবারই কটকিত হয়ে ওঠে। একটা অব্যর্থতার বর্ম জাঁটা হোপুনের চোখে বুধে, চাপচলনে। লোকটা সহায় হলে ভয় নেই, শত্রু হলেও রক্ষা নেই যেন।

ডু-ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম!

জাঁতকে উঠল সাহসী। হুপু গড়াননি তখনো। নাগড়া বাজানোর শব্দ আর কোলাহল একটা। বাইরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। এই পথেও পাহাড় ডিঙিয়ে দলে দলে লোক চলেছে পাগল সর্দারের ঘর বাড়ি উচ্ছেদ করতে। সমস্ত শরীর কিম্ব কিম করে উঠল সাহসীরা। বসে পড়ল সেখানেই।

সন্ধ্যার আগেই নরেন চৌধুরী এলো আবার। কিন্তু সাহসী তখন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে প্রায়।

নরেন বলল, পাগল সর্দার যারনি কোথাও, সে বাড়িতেই ছিল।

—জাঁ—। অকুট আর্জনাৎ করে উঠল সাহসী।

ভেবো না কিছু, সে ভালো আছে।

এটুকুই নয় শুধু। বিম্বয়ে অভিভূত হবার মতই শোনার ছিল আরো কিছু।

লাঠি সোঁটা কোণাল শাবল নিয়ে প্রায় হাজার লোক নাকি গিয়েছিল পাগল সর্দারের ভিটে-মাটি নিমূল করতে। সকলের আগে ছিল গাঁয়ের মাঝি হোপুনের বাবা আর অল্প মাতব্বেরা। তাদের ইঙ্গিত মাঝে নির্ভর উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়ার জন্তে প্রস্তুত সকলে।

কিন্তু মাঝি মাতব্বরদের পিছনে পটে-জাঁকা ছবির মতই দাঁড়িয়ে পড়তে হল সকলকে।

পাগল সর্দারের ভিটে আগলে পাণাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে একজন। হাতে ভীর বন্ধক, পিঠে ভীরের বোকা।

হোপুন!

আসিম হিসার আজ সকালেও যে হোপুন তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাগল সর্দারকে। মড়াইয়ের সমস্ত ইট পাথর উপড়ে ফেলে যে খুঁজে বার করতে চেয়েছে ওই বাশ-মেয়েকে। যে ছেলের এতবড় প্রতীহিংসা ঠিক তত বড় করে চরিতার্থ করার জন্যই বিটলার আরোজন মাঝির।

দূরে জনশ্রুতি দেখেই পাশাণ-মুঠি হোপুনের হাতের ধমুক বেঁকে গেছে গোল হয়ে, হিসার পড়েছে নিশ্চয় টান। ওই একটা তাঁর এক উত্তম বাজের মত সহসা এক সহস্রের গতি রোধ করে দিল বেন।

বিমূঢ়, বিভ্রান্ত সকলে।

বাণের উদ্দেশে একবার মাত্র হুকার শোনা গেছে ছেলের।—ওদের ফিরে যেতে বসো, হোপুন বেঁচে থাকতে একটা লোকও বেন তার তীরের আওতায় না আসে। সর্দার এখানেই আছে, বায়নি কোথাও, কিন্তু তাকে মারতে হলে দু'জনকেই মারতে হবে, আর অনেককে মরতে হবে! তাদের যেতে বসো! ওদের বলে দাও, বিটলা হবে না!

মাঝি কি করবে? কি হল, কেন হল, ভাবার সময়ও নেই। ছেলের হিসা মেটাতে এসে ছেলেকেই মারবে সকলের আগে? পাগল সর্দারও পালায়নি, মরবার জন্য বসে আছে প্রস্তুত হয়ে, এও এক অভিনব খবর! শুধু মাঝি নয়, বিভ্রান্ত সকলেই।

মাঝি ঘুরে ঝাঁড়াল।

মাতব্বেরাও।

বোবা পুতুলের মত সেই সংস্কারজ্ঞর সহস্রের উদ্দেশে মাঝি বলল, চলো ভাই, বিটলা হোক মারাবুজুর ইচ্ছে নয়। পরে শুনব, পরে ভাবব।

অমূল্য ছবিটা বেন চোখের সামনে ভেসেছে সাধনার। পর পর তিন তিন অধীর আগ্রহ নিয়ে মড়াইয়ে এসেছে তারপর, কিন্তু সর্দারের দেখা পায়নি। হোপুনকে দেখেছে। তেমনি উঠেছে হাতের কোদাল, তেমনি নামছে।...কিন্তু ঠিক তেমনি নয়। আঘাতে আঘাতে করে পড়ছে বেন অন্তঃকালের পৃষ্ঠীভূত রত ক্ষোভ। সাহস করে কাছে যেতে পারে নি সাধনা।

কায় সঙ্গে ঘর ছেড়েছে আর এই মানুষটাকে ছেড়েছে চাঁদমণি, সেও আর অজানা নয় কারো। মড়াই থেকে নিকুদেশ হয়েছে আরো একজন। বাহাদুর জমাদার। এ খবর শুনে কেন জানি সাধনার উত্তেজনা কমেছে অনেকখানি।

আরো দিন দুই পরে পাগল সর্দারের বাড়ি গিয়েছিল সাধনা।

...মানুষটা পাথর হয়ে গেছে।

বুকের ভিতরটা ছুঁতে মুচড়ে বেন একাকার হয়ে গেছে সাধনার। বলতে পারলে বলত, সর্দার, চেয়ে দেখো—এখনো তোমার একজন মেয়ে আছে সর্দার।

...একদিন। ছ'দিন...।

ধূধ ফুটে সর্দার কথা বলেছে তারপর। বলেছে, হোপুন মরবে দিল্লি, জমছিম বোলার (দুর্ভবেবের) ব্যাটা আছে উঃ...\*

—আরো কয়েকদিন গেছে তারপর।

সর্দার মেয়ের প্রাণ উপাশনও করেনি একবার। শুধু বলেছে, আগের দিন হল, ইতিহাসের দিন হল, রক্ত ভেসে যেত

মড়াই। ইতিহাসের যুগে, সিধু কাফুর যুগেও প্রথম রক্তের বান ডেকেছিল গোড়া সাহেবরা ওদের তিনটে মেয়ে চুরি করার পরেই।

সাধনা বলতে গিয়েছিল, তার মেয়েকে তো চুরি করেনি কেউ, আর, কোন ভুলোকেদেরও কাজ নয়। কিন্তু শাশা আগুন সর্দারের শুকনো চোখে। ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেছে সাধনা।

কিন্তু সর্দারের চোখের ও আগুন নিবতেও দেখেছে আবার।

হোপুনই বাঁচিয়েছে তাকে। আগেও বাঁচিয়েছিল। কিন্তু আগে সর্দারও বাঁচতে চেয়েছিল। এবারে কোন দরকার ছিল না। তবু বাঁচিয়েছে। মারতে এসেও বাঁচিয়েছে।

পালাতে গিয়েও ফিরে এসেছিল সর্দার। বিটলার আরোজন হচ্ছে জেনেও নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। এই সংস্কারজ্ঞর উন্নত জনতাই সব নয়, তারও শুভাখ্যাঁ সাখ্যা আছে কিছু। কিন্তু কাউকে ডাকেনি সে। হোপুন নেবে প্রতিশোধ, ডাকবে কেন কাউকে!

চুপি চুপি একজনকে দিয়ে শুধু হোপুনকেই খবর পাঠিয়েছিল সর্দার।

হোপুন এসেছিল।

নিবত্ত আসেনি। অন্য নিরে এসেছিল। জিয়াংসা নিরে এসেছিল।

সর্দার বলেছে, এসো হোপুন, আমাকে মারতে চাও তো? সেইজন্তেই ফিরে এসেছি আমি। সেইজন্তেই তোমাকে ডেকেছি।

হোপুন দেখেছে তাকে। সেই খুন-চোখে হাড় পাজির সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে একেবারে। তারপর কথা বলেছে।—চাঁদমণির সঙ্গে এত দিন আমার বিয়ে দাওনি কেন?

—গিটনি তুমি 'ছাড়ই' হতে বলে। ছাড়ই হয়ে আমার মস্ত চিরকাল জ্বলতে বলে।

আরো বলেছে সর্দার। বলেছে বিয়ে দেয়নি নিজের মেয়েকে সে চিনত বলে আর ওই মেয়ের মাকে চিনত বলে আর ওই মেয়ে কারো ঘরে থাকবে না জানত বলে।

—কিন্তু এসব বলানি কেন কখনো? নিশ্চলক চোখে চেয়ে হোপুন জিজ্ঞাসা করেছিল।

বলনি চাঁদমণি যেমন মেয়েই হোক নিজের মেয়ে বলে, আর, একদিন শুধবে যেতেও পারে, মনে মনে এই আশা না করে পারত না বলে।

—কিন্তু বিয়ে হল শুধবে যেতেও পারত? চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছে হোপুনের।

পাগল সর্দার জবাব দিয়েছে হোপুনের বয়সে সেও কম জোরান কম মরদ, কম প্রিয় ছিল না মেয়েদের। কিন্তু তবু চাঁদমণির মা কুলমণি তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। হোপুন তার বুকের পাজির। সে পাজির সে ভেঙ্গে গিতে চায়নি বলেই অপেক্ষা করছিল আর আশা করছিল।

হোপুন দেখছিল চেয়ে চেয়ে। নির্নিমেবে দেখছিল আর চোখ থেকে খুন সরে বাচ্ছিল।

তার পরে...অনেকক্ষণ পরে, পায়ে পায়ে হোপুন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

...আবার ফিরেছে।

...খুচক নিয়ে। আর তাঁর নিয়ে।

[জ্ঞান:]



### দেবার্চা

আবার চলেছি পথে। পূণ্য। পকেটে তিন আনা মাত্র পয়সা। দেশে টাকা পাঠাতে হবে অন্ততঃ পক্ষে একশো টাকা। চিঠি পেলাম পোষ্টআফিসে গিয়েই।

ঠিক করি, আজ সাহেবপাড়া দিয়ে হাঁটবো। যঠে রাহ, তুলা লর, শনি গোচের শুভ চন্দ্র একাদশে। নিষর্ষাত আজ স্নেহ সম্পর্কে ধনলাভ হবে, হবেই হবে। না হলে, একশো টাকা পাঠাই বা কি করে?

কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম, স্নেহেরা কি চিহ্ন। বই-এর পাতায়, আর অনভিজ্ঞ লোকের মনের ধারণায়—সাহেবদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। আরও তুল ধারণা আছে লোকের মনে, সাহেবরা পয়সা খরচ ক'রে জ্যোতিবীদের সাহায্য নেয়।

একবারেই তুল।

প্রথমে একটা বাড়ীর সামনে দেখলাম, লনে বসে আছেন বড়ো বুড়ী সাহেব-মেম। বুড়ী হাসলেন, বড়ো চেঁচিয়ে বললেন—হেভেন সেভ, আসু জ্রম ডকটরুল এ্যাণ্ড ফরচুন-টেলার্স। অর্থাৎ সাধা বালায় বললেন, ভগবান তাঁদের ডাক্তার আর জ্যোতিবীদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

...দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। আবার পথে হেঁটে চলি।

দরজায় দরজায় বুখা প্রয়াস। বেশী ভাগ বাংলার লেখা—বি ওয়ার অব দি ডগ—হরি হে মধুসূদন...। পথ বেন আর ফুরাতে চায় না।

হঠাৎ নকরে পড়ে সুদৃষ্ট একটি সাহেবী ধরণের হোটেল। দরজায় সাইনবোর্ড বসছে। ইনি বাউন্ডস না আউট অব বাউন্ডস—ঠিক ঠিক কি লেখা ছিল, তা আমার মনে নেই।

ল্যাণ্ডলেডী মেমসাহেব, আমার দিকে এগিয়ে আসেন বারান্দা থেকে। আমার নিবেদন শুনে একটু হাসেন; ইংরেজিতে বলেন—যাও, ওই ঘরে যাও, ওখানে কর্ণেল...আছেন।—এর আগে ঠিক নামনাগামনি মিলিটারী লাইনের বড় কোন অফিসারের সঙ্গে তেমন মোলামেশা হয় নি। যদি কর্ণেলের মেজাজটাও মিলিটারী হয়। তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নি।

কর্ণেলের মুখখানা হাসি-হাসি। সোনালী গৌর। বয়সে তরুণ, ধুবহার ভদ্র—কিন্তু তাঁর পরিহাস কড়ই যথাস্থিক।

ইংরেজিতে বললেন—আমি সত্যিই বড় দুঃখিত, পণ্ডিত। ভবিষ্যৎ সন্ধ্যাে জানবার উৎস্রুকা আমার আছে। কিন্তু বর্তমানে তোমাকে প্রের করবার সময়টাও পর্যন্ত আমার নেই। তবে যে সেই ভবিষ্যৎ সন্ধ্যাে প্রের করবার সুযোগ পাব, তাও বলতে পারি না। তুমি বরং সেই দিনরুপ গুলে এসো।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই। ল্যাণ্ডলেডী হঠাৎ পেছাে ডাকেন, বলেন—তুমি ঐ ঘবটায় যাও। ওখানে দু'জন ডক্সলোক বসে আছেন। ওঁরা হয়তো বা—

ল্যাণ্ডলেডীকে ধন্যবাদ জানাই। দরজায় পদা টাটানো ছিল না। এক কোণে কাউটার—কাউটার জনশূণ্য। কমনরুম ধরণের কামরা, বেশ প্রশস্ত, আর এক কোণে দু'জন সাহেব কুশনে বসে পাইপ টান ছিল, আর নীচু গলায় কি বেন গোপন-কথা আলোচনা ক'রছিল। একজন বয়সে শ্রৌট, কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে, আর এক জনের চুল ঘন ও কালো, চেতায় তারুণ্যের ছাপ। শ্রৌটের নাম ধরুন ফ্রেডারিক। সঙ্গীর নাম ভ্যালেন্টিনো বা ঐ গোছেব। নাম খাম পাালটিয়ে লেখাও যুক্তিসঙ্গত—বেন তা পরে বুঝবেন।

দু'জনে আমার দিকে সশ্রদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন। আমি অভ্যাস মত বক্তব্য বললাম।

এইমাত্র বলেছি মিঃ ফ্রেডারিক বসে শ্রৌট। দেখলে মনে হবে পরিতাপ্লিশের উপর বয়স তাঁর। বেশ শক্ত শরীর, একটু বেঁটে ধরণের দেখতে। একবারে লালমুখো নয়। বসে একটু হলে ধরণের। নাকটা সামান্য একটু বেঁটা, কিন্তু চেতায় কোথায় বেন একটু অভিজ্ঞতাও আছে। বচ লোকের মধ্যেও তাঁকে একবার দেখলে আর ভোলা যাবে না, এই রকমই তাঁর চেহারা। ভ্যালেন্টিনোর বয়স বিশেষ কাছাকাছি মনে হয়। বেশ সুপুরুষ চেহারা।

আমার পরিচয় পেয়ে ফ্রেডারিক চুপ করে থাকেন এক দুহুর্ন্তের জন্তে। তারপর হঠাৎ অটহাসিতে ফেটে পড়েন—হাঃ, হাঃ, হাঃ, তুমি—তুমি একজন ভাগ্যগণক! —বটে, বটে! তুমি সব গুলে বলে দিতে পার! ভূত—ভবিষ্যৎ—বর্তমান; বা বা বা—তোমার এত গুল, তবু তোমাকে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়! হাঃ হাঃ হাঃ—

ভ্যালেন্টিনো আমার দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহের সঙ্গে চোপ ঘুরিয়ে নেয়। তার ভাবটা হ'ল—আর কেন, এইবার কেটে পড়, আমাদের কথার মাঝখানে তোমার আর থাকবার দরকার নেই।

আমি ন বর্ষা, ন তর্হা। শ্রৌট সাহেবের কথার আসল উদ্দেশ্য কি, ঠিক ধরতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল, কি জানি, ইনি তো একবারেই না না না ক'রে বিদেশ ক'রছেন না। তা'হলে কি শেষ পর্যন্ত একটা কাজ পাওয়া যাবে আজ? একটা টাকাও যদি জোটে, তাহলেও ছুবেলা পেট ভরে ডালকুটি খাওয়া যাবে, তারপর সামনের দিনের কথা সামনের দিনে ভাববো। বর্তমানের জলন্ত সমস্যার তো সমাধান হোক। বেশী বেট হাঁকলে যদি কসকে যায় কাজ, তাই মনে মনে ঠিক করি, বেশী চাইব না, মাত্র এক টাকার হাত দেখতে রাজী হয়ে যাব।

ফ্রেডারিকের টোটার কোথায় বিজ্ঞপের হাসি তখনও লেগে আছে। তাঁর চোখের ভাষায় মাছুব ও জীবন সন্ধ্যাে কি যেম এক অনির্ভরীয় স্থায় ভাব। এক দুহুর্ন্তই আমার অভ্যস্ত চোখের কাছে থরা পড়ে

ন প্রৌঢ় ফ্রেডারিক। বেন মানসচক্রে আমি দেখতে পাই হঠাৎ  
বসন্ত অতীতকে।...

মরিয়া হয়ে বলে ফেলি—দেখ সাহেব, অত ঠাটা ক'রে  
।। দেয়ার আর মোর খিস ইন্ হেভেন গ্র্যাণ্ড আর্থ জানু আর  
ইউট অব ইন্ ইয়োর ফিলসফি।

ফ্রেডারিক এবার হাসেন, বলেন—হা হা, হি কোটস  
দক্সপীয়ার। কাম্ অন, বা সাটেড।

এতক্ষণ ঝাড়িয়েছিলাম। এইবার বসতে পেলাম।

ফ্রেডারিক আমাকে বাস্তিয়ে নিতে চান। প্রথমে নিজের হাত  
দেখালেন না।—হ্যাঁ তে ভাগ্যগণক, তোমার নাম কি?—চবাচারি  
—জাচ্চা, এই ভুলোকের হাত দেখ, দেখি তোমার ক্ষমতা।

ইংরেজিতে সব কথাবার্তা হচ্ছিল। যতদূর যরণ আছে, বাংলা  
করে লিখছি। মাঝে মাঝে ইংরেজিই রেখে দিলাম, দেখা দেনেন  
না।

ভ্যালেন্টিনোর হাত হাতে নিয়ে বলে বাই অভ্যস্ত প্রণালীতে।  
জানতাম বেশীক ভাগ সাহেব, বিশেষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলই বেসের  
দিকে গুদের বৌক থাকে—আর আশ্চর্য এই, 'রেসেল' যারা তারা কিন্তু  
বড় একটা জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে চায় না। হাত দেখার বার  
তারা একটু সতর্ক বেশী। একবার ভাবে, হু'বার পেছ-পা হয়।  
কোনো বদমাইদ, পাঁচ মাতাল, খুনে ডাকাত, পাকা ভুয়াড়ী আর  
সন্ন্যাসী ব্রিগ্গাভাতি—সাধারণতঃ এই ক্ষয় শ্রেণীর লোকেরা জ্যোতিষীর  
ঘর ঘরে না।

বাই হোক, আমি একে একে বেখার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা  
করে বাই। প্রৌঢ় সাহেব বলে—হাঃ হাঃ, ভেরী ফ্রেডার—ভেরী  
ফ্রেডার, ইউ নো হাউ টু গেস্। অলরাইট, কাম অন, টেল মি  
হোয়াট ইউ সি ইন্ মাই পাম।...

ফ্রেডারিকের কথা বলার ধরণ এমন একটা খোঁচা ছিল, মরা  
লোকেরও বাগ না হয়ে যায় না। সবটাই আমার আক্ষাজ বলে সে  
উড়িয়ে দিতে চায়। এতক্ষণ বকালো, পরস্য-কড়ির কথা তো মুখেই  
আনে না। শেষ পর্যন্ত কানাকড়ি মিলবে কি না সন্দেহ! যে রকম  
ভাবসার। ভাবছি, আর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে—পিপাসার  
কঠগত প্রাণ।

ফ্রেডারিকের হাত নিয়ে কি বলব চিন্তা করি। বা বলি তা  
বদি না খাটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে দেবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র  
সন্দেহ নেই। মনে মনে নীনবন্ধু আদিনিথ আর দেবী সরস্বতীকে  
স্মরণ করে সাহেবের হাত টিপতে থাকি। বলি—জাই সি মেনি  
খিস। ইউ আর এ্যানাথার অলিভার টুইষ্ট।

ফ্রেডারিকের মুখ গম্ভীর। ভাবলাম অলিভার টুইষ্টের কথা  
সাহেব জানে না হয়তো। সব বাঙ্গালী যেমন বন্ধমচন্দ্র পড়েনি, সব  
ইংরেজ যে ডিকেন্স পড়েছে তাই বা কেমন করে হয়? বাই হোক,  
হেয়ালী করে বললে কিছুটা হিন্স পাওয়া যায় জাতক সম্বন্ধে। ভুল  
ক'লেও শুধরে নেওয়া যায়।

ফ্রেডারিক বলেন—ডিকেন্সের 'অলিভার টুইষ্ট' ছেলেবেলায়  
পড়েছিলাম বটে। তা ঘটনার মধ্যে খানিকটা মিল আছে। কিন্তু  
আমি চাইছি তুমি আমার অতীত সম্বন্ধে এমন কিছু বল যাতে করে  
আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি, তুমি প্রকৃতপক্ষে হাতের ভাবা

জানো। বল দেখি আমার জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা  
কি?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমি চোখ বুজি। ইষ্টদেবীর মূর্তি  
স্মরণ করি, বলি, মা, বলে দাও কি বলব। চোখ খুলতেই  
দেখি, ফ্রেডারিকের হাতে শুকনানের উপর একটা রেখা নেমে  
এসেছে বাহুস্থান থেকে—টুক বেন, একটা বাঁকা তলোয়ার।  
বললাম—টু মান্থস এগো অর সে ইউ টুক ডাইভোস' কন্  
ইয়োর ওরাইক। হু'মাস আগে তোমার দ্বার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ  
ঘটেছে।

ফ্রেডারিক তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে কাঁড়ান, ক্যাল-ক্যাল করে  
তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে—তার পর ভরষরে বলেন—ইউ  
আর এ যোঃ।...অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব, ভ্যালেন্টিনো—এ কি  
ক'রে সম্ভব হল? তুমি ছাড়া ভারতবর্ষে আর একটি প্রাণীও তো  
জানেনা এই খবর! তুমি কি এই গণ্ডকারকে এর আগে দেখেছো  
কোথাও? কোন দিন কি আমার সম্বন্ধে এর সঙ্গে কোনো আলোচনা  
করেছ?

ভ্যালেন্টিনো এইবার নড়ে চড়ে বসে, বাড়ি নেড়ে জানায়—না, সে  
এর আগে কোন দিনই কোথাও আমাকে দেখেনি। কথা বলা তো  
দূরের কথা।

ফ্রেডারিক আমাকে এক রকম হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে  
গেলেন হোটেলের দোতলায়। কোণের একটি নাতিপ্রশস্ত ঘরে  
বসলাম আমি। দরজা বন্ধ করে এসে বসলেন ফ্রেডারিক। আমার  
সামনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে। আমার হাতে একটি সিগার দিয়ে  
আপ্যায়িত করলেন। কল টিপে আশুন বসিয়ে দিলেন আমার  
সিগারে।

বধারীতি ফ্রেডারিকের হাতের প্রিন্ট তুলি। ঘরের সঙ্গেই  
ঝকঝকে বাখ-কম। নতুন সাবান ও নতুন তোয়ালে দিলেন  
ফ্রেডারিক। হাতের কালি ধুয়ে-ঝুছে বথন চেয়ারে এসে আরাম করে  
বসি, ফ্রেডারিক দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন গট গট করে। কয়েক  
মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে এলেন; তার পর গভীর দৃষ্টিতে আমার  
চোখের উপর চোখ রেখে বললেন—কি দেখছে। আমার ভবিষ্যতে?

তার নীল চোখের প্রখরতা সজ্জ করতে না পেয়ে চোখ নামাই,  
ইতস্ততঃ করি—বদি সবই বলে ফেলি, তা'হলে কি আর পরস্য-কড়ি  
কিছু দেবে সাহেব?

বয় এসে হু'কাপ কড়ি দিয়ে যায়। আমাকে চুপ করে  
থাকতে দেখে ফ্রেডারিক বেন একটু লজ্জিত হন। উঠে কাঁড়ান  
তার পর, টেবিলের দিকে এগিয়ে পকেট থেকে একটি সজ্জ  
চাবীর কি বের করে ডয়ার খোলেন। একতড়া নোট,  
একশো টাকার অনেকগুলো নোট, তা প্রায় হাজার বিশেক টাকা  
হবে।

ভাবি লোকটা কি—অতগুলো টাকা রেখে দিয়েছে টেবিলের  
ডয়ারে! বদি কোনো বয় টের পেয়ে ড্রপিকট কোন চাবী দিয়ে সরিয়ে  
ফেল টাকাগুলো? কিন্তু মুখে কিছু বলি না।

মহামায়ার খেলা। ফ্রেডারিক আমার হাতে হু'খানা নোট  
গুণে দেন, বলেন—একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম তোমার  
প্রয়োজনের কথা।

দু'শো টাকা! জয় শুভ—জয় শিবশঙ্করী জয়! জয়...  
ইউসবীর মূর্তি পুনরায় মরণ করি। বার বার প্রণাম জানাই।  
কাজ না করবার আগেই এডভান্স টাকা! তা'ও, অপ্রত্যাশিত  
ভাবে একবারে দু'শো! আমার একান্ত প্রয়োজন যেখানে একশো—  
বড়জোর একশো পাঁচ।

পেটের ক্ষিধে তখন মরে গিয়েছে। কামরার উত্তর-পশ্চিম  
জানালা দিয়ে দেখি অনেকগুলো অর্কিড। অনেক নামনা-জানা  
বিলিভী ফুলের কেয়ারী। হোটেলের টেনিস-লনের ওপারে মেদীগাছের  
লাইনের ধারে ধারে অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ। বাতাসে  
ফুলছে পাতা—রদ্বুরের তেজও অনেক কম বলে মনে হ'ল হঠাৎ।

—অতীত সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ জানবার কোন ঝোঁতুলই নেই আমার।  
অতীত সবই তো আমার জানা। আমি শুধু জানতে চাই আমার  
ভবিষ্যতে কি আছে। তুমি মনোবোগ দিয়ে গণনা করে।  
লিখিত ভাবে আমাকে দিও। কিন্তু, বেশী দেও না, সামনের  
সত্তা-হেই আমি বাস্তবায়নের রওনা হব।

অতীতের কথা লিখতে হবে না। ফ্রেডারিকের কথায় আমি  
হাফ ডেডে বীতি। ভবিষ্যৎ মেলে মিলুক, না মেলে না মিলুক,  
কেউ তো আর এখনই বুঝতে পারছে না।।।।।

পাঁচ দিন পরে ফ্রেডারিকের হোটেল ফিরে গিয়ে তাঁর হাতে  
একটি বাঁধানো সূক্ষ্ম খাতা দিলাম—ফ্রেডারিক বইটা রেখে  
দিলেন, বললেন—অবশর মত ভাল করে পড়ে, বুকে, তোমার সঙ্গে  
আলোচনা করব। তুমি বরং কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

ছয়ার থেকে আরও দু'শো টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন,  
বললেন, চিয়ার ইউ।।।।।

পরদিন, যখন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ঘরের দরজার ধাঁড়ালাম,  
তখন দরজাটা বন্ধ ছিল। ভিতর থেকে যেন কঠোর স্তন্যলম, কে  
যেন কাঁকে কি বলছেন।

ভাবলাম কি করি, কলিং-বেলও নেই ছাই বে, সাহেবকে আমার  
উপস্থিতি সফল সচেতন করতে পারি। দরজার 'নক' করা কি  
উচিত হবে? ভিতর থেকে ছীলোকের কঠোর দরজার কীক দিয়ে,  
অথবা ভেঁটসেটর সাহায্যে ভেসে আসছে কানে। মিষ্টি গলায় কে  
যেন বার বার কি একটি বিষয়ে অমুরোধ জানাচ্ছে, আর গভীর  
পূর্বকণ্ঠে গমগম করছে—নো, নো, নো।।।

এমন সময় কি দরজার নক করা অভ্যস্ত হ'বে না?

হঠাৎ মনে হ'ল শব্দ খেমে গিয়েছে। কারা যেন উঠে  
আসছেন। ছুতোর শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে পাঁড়ালেন মিঃ  
ফ্রেডারিক। পাশ দিয়ে একটি রপসী মেমসাহেব বেরিয়ে গেল।  
আমি ভাল করে মেমসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখতে পেলাম  
না, বুধ নীচু করে, আমার দিকে না তাকিয়েই চলে গেলেন মেমসাহেব,  
করিডর বেরে। চেয়ে দেখলাম, সিঁড়ি বেরে ভরতর করে নেমে  
যাচ্ছেন তিনি। মিঃ ফ্রেডারিকের গভীর কঠোর চমক ভাঙলো।।।  
মেমসাহেব—মেমসাহেব, কেনই বা মেমসাহেব এসেছিল ফ্রেডারিকের  
কাছে? কে এই মেমসাহেব?—কি চান উনি?—নো, নো, নো—  
কেনই বা বললেন মিঃ ফ্রেডারিক? কিছুই বুঝতে পারি না,  
ফ্রেডারিককে অমূসরণ করি, ভিতরে গিয়ে বসি।

...অনেক কথার পর ফ্রেডারিক বললেন, দেখ দেবাচারী, তুমি  
আমার ভবিষ্যৎ সফলকে কিছুই লেখ নি। সোজা কথায় বলা যায়,  
আমাকে সহজ লোক পেয়ে কীক দিয়েছ। পুরো ছ' পাতা শুধু  
কবিতার লাইন তুলে দিয়েছ।।।

তার পর আমার দিকে চেয়ে হাসেন—না, না—ভর পেয়ে না,  
টাকা ফেরৎ চাইব না। কবিতার অংশগুলি সঠিক ভালে—এর মধ্যেই  
ছ'বার আমি পড়ে ফেলেছি। এবং বলতে পারো, আমি আমার  
ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রায় সব কথাই জেনে ফেলেছি।

আবার খামেন। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ ভাবে কেটে যায়।  
তার পর পুনরায় বলতে থাকেন ফ্রেডারিক—এ কবিতার লাইনগুলো  
কার লেখা? কখনও এর আগে পড়েছি বলে তো মনে হয় না?  
আমি যে কবিতা পড়তে ভালবাসি, তা তুমি ঠিক ধরছ, আমার বার  
হিসেন লগনের একজন ধনী পান্ডিত্যর। লাডগেট ছিলে ছিল  
আমাদের বইয়ের দোকান। জার্মানির বোমার দোকানটা সম্পূর্ণ  
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাস্তবায়নের আমার এক বোন থাকে, তার  
চিঠিতে জেনেছি।।।

অনেক কথাবার্তা আরও হ'ল। মিঃ ফ্রেডারিকের অতীত সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ  
অনেক কিছু জানতে পারলাম। তিনিই নিজে বলে যেতে  
লাগলেন।

তার পর বললেন—এই নাও আর একশো টাকা। তোমাকে  
পাঁচশো টাকা দেব ঠিক করেছিলাম। কলখোয় যদি বাও, তাসলে  
আমার ওখানে নিশ্চয়ই উঠবে। আমার সঙ্গে দেখা করে।  
কোনো হোটেলের উঁচুবার দরকার নেই। আমার বাগানঘেরা প্রকাণ্ড  
বাড়ী। একেবারে সমুদ্রের ধারে। শহর থেকে মাত্র আশ বটা  
জাইড। অতি সুন্দর দৃশ্য চারি দিকের। তুমি কবিতা ভালবাস,  
তোমার খুব ভাল লাগবে। আর তোমার জ্যোতিষীতে ইন্টারেস্ট  
এমন লোকের অভাব হবে না। শহরে অনেক পান্ডিত্য আছে, মারে  
মারে বাইরে থেকে টুংগি পান্ডিত্যও আসে অনেক। পরস্পর পেটে  
এরা এক এক সীমানে প্রচুর। কেউ কিছু জানে না।

আবার মৌনী হয়ে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন  
ফ্রেডারিক। তাঁর নীল চোখের মণি দুটো আমার চোখের মণির সঙ্গে  
অনেকের মতো মিলিত হয়।—সেই দৃষ্টির মধ্যে কি যেন বেদনা,  
আক্রোশ, রেহ, আশা, প্রেম, ঘৃণা—সব মিশে গেছে। এক মুহূর্ত  
মনে হয়, এ যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি সামনে পাঁড়িয়ে, চেহারা এক,  
কিন্তু প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

আমি বিস্ময় দেব দেব, এমন সময় মিঃ ফ্রেডারিক হঠাৎ চাঁকর  
করে উঠলেন—আমার পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দাও—ইউ আর জাট  
এ ব্রড—তোমার ঐ কবি—কি বললে এডউইন আরনল্ড—  
লাইট অব এগিয়া—হাঃ হাঃ, লাইট, লাইট—সেয়ারস নো  
লাইট—ক্রম ডার্কনেস উই কেম্—ইনটু ডার্কনেস উই গো।

আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বাই। ফ্রেডারিকের চোখের দৃষ্টি  
কি স্বাভাবিক মানুষের মতন? কই না, উদ্বাহ বলে তো মনে  
হচ্ছে না?

—লুক হিয়ার, ইয়ার পোয়েট সেন্স, দি হার্ট অব বিয়িং ইং  
সিসেস্টিয়াল বেষ্ট। ডিড ইউ এম্পীরিয়ানস ইউ হোয়েন্স আ  
ওয়ানটেড মাই ম্যানি ব্যাক? সি ডিউগড মি ফর ফুল সেক্ট



ইয়ার্স এ্যাভাউট হার পাঠ। ইউ ওয়াস্ট টু ডিউপ মি এগেন কব  
অল মাই ইয়ার্স ইন্ দি ফিউচার।

তোমার কবির কথা, সত্যার অন্তরে আছে স্বর্গীয় শান্তি, কেমন  
কি না। যখন আমি টাকাগুলো ফিরিয়ে নিতে চাইলাম তখন কি  
তা অমূল্য করতে পেরেছিলে তুমি? একজন ঠাকালো পুরো সাত  
বছর ধরে তার অন্তীত সখ্যকে, আর তুমি এসেছ ঠাকতে গোটা  
জীবনব্যয় সখ্যকে, আমাকে—হাঃ হাঃ হাঃ!

অটহাস্তে ফেটে পড়েন ফ্রেডারিক।

আবার শাস্তকণ্ঠে বলেন—তুমি দেখছি ভয়ানক ভয় পেয়েছ।  
কাম্‌ অন্‌ উই'ল ডাইভ।

আ, ইউ হাভ নট্‌ ইয়েট রিকভার্ড ফ্রম দি শক! মাই ডিয়ার  
পার্মিট্‌, টেক ইট ফ্রম মি—দেয়ার আর মোর থিংস ইন্‌ হেভেন এ্যাণ্ড  
আর্থ জ্ঞান আর ড্রেমট অব এন্‌ অল্‌ দি বুক্‌স্‌ অব ফিক্সন। এঃ,  
কাম্‌ অন্‌ দেবাচারী—ইটস এ জোক্‌।

প্রচুর মাল টেনেছে সাহেব। আমার ভয় হয় সাহেবের সঙ্গে  
ট্যাকসিতে উঠতে। কিন্তু তখন আমার নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে  
আর বেন কিছুই ছিল না।

ট্যাকসিওয়ালা মাঝামাঝি জিগোস করে, কোথায় যাব সাহেব?  
সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন—টু হেল, টু হেল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রায়, শাস্ত্রধরে বলেন—রাষ্ট্রা বেরে চল, দেখো  
এক্সিডেন্ট করে না। যে পথে ইচ্ছে চালিয়ে যাও, আমার আপত্তি  
নেই।

প্রায় ঘটানাকৈ ঘুরলাম সাহেবের পাশে বসে। সাহেব কোন  
কথাই বললেন না। হোটেল ফিরে এসে ট্যাকসিওয়ালাকে হিসেব  
করে টাকা মিটিয়ে নিলেন, আর আমার হাতে ছুটাকা দিয়ে  
বললেন—তোমার হোটেল ফিরে যাবার ট্যাকসি ভাড়া। আমি  
আর বাঙ্গালোরে যাব না, এ সৌজন্যটা এখানেই থাকব—তোমার  
টাকার প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে দেখা করে।

বিচিত্র ফ্রেডারিক! এমন সাহেব আর জীবনে দেখি নি।  
স্বহৃদ-মস্তক না পাগল, বুঝে উঠতে পারি না, এমন কি তাঁর  
হাতের রেখার আলোকেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না—  
সেখানে চিত্রিত আছে শুধু গভীর বেদনার ক্ষত।

সাহেবের হোটেল থেকে আমার হোটেল অবশ্য অনেকটা দূর।  
আশ্চর্য, ঠিক ছুটাকাই মিটারে উঠল।

তিন দিন পরের ঘটনা। রাত্রি তখন এগারোটা হবে।  
আমি যে কোটেলে থাকতাম তার তিনটে ভাগ আছে। মাঝখানে  
দোতলা বিজি, উপরতলা কাঠ আর সিমেন্টে তৈরী। সামনের  
দিকে অফিস, গেটে দুকতে ডান দিকে কতকগুলো টালি শেডের কটেজ,  
সেখানে সুরাচোখে অনেক স্তম্ভরী ইরাণী-তুর্কীরা চকিত চাহনি  
ফেটেছে। প্রবেশকারীর স্নায়ু আশ্রয় জ্বালাতো। মেন বিজি এ  
আসতো নামকরা বোধের একটা একুইট্‌... গেট বরাবর সোজা  
পূর্ব দিকে খানিকটা হাটলে দেখা যায় ছোট্ট ফুলের বাগান—  
বাগানের প্রান্তদেশে আবার কতকগুলো টালি ও খোলার শেড।  
আইভি বা ঐ গোছের নানা লতাপাতার ঘেরা একটি প্রাচীরের  
আড়ালে একটি কটেজের মাঝের ঘরে থাকতাম আমি। আমার  
কটেজের আর একটি ঘর প্রায়ই খালি থাকতো। আসত যেত

প্যাসেঞ্জার, কেউ একদিন, কেউ দু'দিন, কেউ বা মাত্র এক রাত্রি  
কাটিয়ে কখন যে বিদায় নিত টেরও পেতাম না।

সে রাত্রিতে কোণের ঘরটার ছিলেন এক মেমসাহেব। সকাল  
বেলায় এসে উঠেছেন, কয়েক ঘণ্টা শহরের এদিক ওদিক  
ঘুরে, ফুলির মাথায় অনেক কিছু জিনিষপত্র চাপিয়ে যখন বিকেলের  
দিকে ফিরলেন, তখন তাকে নজর দিয়ে দেখেছিলাম। নজর দিয়ে  
দেখেছিলাম মানে সত্যি সত্যি নজর দিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মেমসাহেবের দেহের গঠন দেখে বরষ ধরা বড়ই কঠিন। কখনও  
মনে হয় বাট বছরের বুড়ীকে চল্লিশ বছরের। আবার চল্লিশ বছরের  
প্রোচাকে পঁচিশ বছরের যুবতী বলে ভুল করে নি এমন বন্ধুদুষ্ট  
ভাবতীয় খুব কম দেখা যায়। বাই হোক, মেমসাহেবাটিকে  
ইতোইয়েরোরপীয়ান বলে মনে হ'ল। রঙে বেন খাদ আছে। তবে  
সব মিলিয়ে যে ইম্প্রেশন তাতে কবির ভাষায় প্রায় বলা যায়—  
নহ মাতা, নহ কস্তা হে অনন্তসৌবদ্য উর্বশী! আর রূপের বর্ণনা  
কি দিতে হবে?

মেমসাহেব যখন সন্ধ্যার দিকে বারান্দায় এসে তার ক্রমের  
সামনে চোরাটা টেনে বসলেন, তখন তার দেহের বিভিন্ন অংশের  
বক্ররেশাগুলির দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম, মেমসাহেবের কর্তা-ব্যক্তি  
কেউ আছেন—কি না, থাকলে তিনি কি করেন? মেমসাহেব  
কেনই বা এমন একা-একা হোটেল এসে উঠলেন? তাও আবার  
পুণায়? এমন একটি কিগারের উপর বার একাধিপত্য, তিনি না  
জানি কোন্‌ মেকারের?

আগেই বলেছি, রাত্রি তখন বোধ হয় এগারোটা। আমি  
বিছানার উপর নতুন-কেনা বেডশিটটি বিছিয়ে দরজা বন্ধ করি।  
টাকার নোটগুলো আবার একবার গুণে খামে পুরে বিছানার  
মধ্যে গুঞ্জে রাখি। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি, চিন্তা করি—  
আর চিন্তা কি, টেলিগ্রাম-মনিজার্ড করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি,  
ঠিক সময়েই পৌছে যাবে টাকা—হাতে এখনও চারশো টাকা মতো  
জমে গিয়েছে—আঃ কি আরাম! বিছানাটা এত নরম হ'ল কি  
করে?...

চোখে ঘুম এসে-এসে আসে না, কানে বায় মচ-মচ জুতোর শব্দ—  
কে ঘেন বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল—কোণের ঘরের দিকেই,  
চলেছে জুতোর শব্দ।

দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোন যায়, কিন্তু কই মেমসাহেব  
তো দরজা খুলছে না! ভাললাম, ঘুমিয়ে পড়েছে মেমসাহেব...এত  
গাঢ় ঘুম?—কড়ানাড়ার শব্দও ঘুম ভাঙে না।—মেমসাহেবের  
কর্তা-ব্যক্তিটিই বুঝি এলেন? পুণার আবার মিলিটারী অফিসার  
অনেক রাত কাটিয়ে বান ঐ কোণের ঘরটার। মাঝে মাঝে  
আসেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রূপসীরা—কত কথাই তো লোকমুখে শুনে  
পাই—আমার অত কথার কাজ কি।—ঘুমুনা থাক।

আবার কড়ানাড়ার শব্দ! এবার এত জোরে এবং এত  
ঘন ঘন যে সারা কটেজের দরজা-জানালাগুলো বেন কাঁপতে  
লাগলো। এই বে, সাহেবটা বুঝি মদ খেয়ে এসেছে!

পরক্ষণেই শুনে পেলাম দরজা খোলার শব্দ—বাক, বীচা  
গেল!—এইবার মেমসাহেব সামলাক মাতাল স্বামীকে বা হুগাভিবিক  
রজনীনামকে।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে তজ্জাহুর হই। তজ্জাহুরে বেন শুনে পাই চাপা নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। বাতাসে কি শব্দ ভেসে আসছে না? কাঠবেড়ালীর বাচ্চাটা কি করে এ-ঘর ও-ঘর করে? না, ইহু—ইহুই কেটে ফুটো বানিয়েছে—কীশব্দ পথ কি করে স্তম্ভ হ'ল কে জানে!...

সুইচ টিপে আলো জ্বলি। দেখি, সত্যিই আমার ঘরের সিলিং এ এসবের শিটের জোড়ায় কীক রয়েছে!...

আলো জ্বলাই থাকে। কান পেতে শুনি। পাশের ঘরে ধূসরধূসরি চলেছে বলে মনে হয়। শ্রিং এর খাট কটকট করে। টেবিলে কে বেন ঠকাস করে কি ফেলে দেয়। আর চাপা গলায় যেন মনে হয় কে বেন ক'কে কি বলেছে!...

সাহেব কি মেমের উপর সত্যিই অভয় আচরণ করছে? ভাবি কি করি!

এ অবস্থায় আমার কি-ই বা কর্তব্য থাকতে পারে? যদি স্বামী তার স্ত্রীর উপর দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বীর্য প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়, আপনাই পাশের ঘরে—তাহলে আপনি কি চাঁৎকার করে লোক জড়ো করবেন?

সাত-পাঁচ অনেক কিছু ভাবছি, আর সাহেবটার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছি। অবশেষে আর চুপ করে শুয়ে থাকা গেল না—উঠে বসলাম। তারপর দরজা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে কোণের ঘরের দরজাও খুলে গেল। দরজা দিয়ে বারান্দায় লাকিয়ে পড়ল সাহেব, আর এক লাফে বাগানে, তারপর দৌড়!...

বারান্দায় আলো সারা রাত জ্বলে। তাই বেশ পরিষ্কার দেখতে। পেলাম রক্তাক্তবদন। খেতাবিনী দিগম্বর। মা কালী মূর্তিতে দরজায় ঠাঁড়িয়ে। হাতে রক্তলবার!... একটা আশ্রয়-স্থানের ছাড়া তখন তার দেহের কোন আবরণই ছিল না!...

বদনাবরণের নথক্কে শুভ্র শুভ্রবর্ণ কলঙ্কিত। বড়হয়র নিরন্তর হয়ে কপালে ঝলে পড়েছে। কপালে ও গালের উপর। চোখের দৃষ্টিতে জিনরনার রক্ত বিস্তার।

সাহেবের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে—ঠাঁট বেয়ে রক্ত পড়ছে—নেকটাই ছিঁড়ে কোটের বোতামে লেগে আছে। বিহ্বল বলকের যতন বিবসনা অদৃষ্ট হ'ল দরজার আড়ালে। দড়াম করে দরজার পাল্লা ছুটো বন্ধ হয়ে গেল।

এত সব ঘটনা ঘটলো, আশ্চর্য, হোটেলের অজ কেউই জানতে পারলো না। পরে বুঝি, এ রকম ঘটনা এসব কটেজে প্রায়ই নাকি ঘটে থাকে। নিজ নিজ কক্ষের মস্ততায় কেউ আর বাইরের দিকে দ্রুতগত করে না।

আমি এ রকম দৃষ্ট দেখি নি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম এল না। শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে। হোটেলের বর এসেছে মর্নিং কফির পেয়ালা নিয়ে। ছেলেটি মায়ারী, একটু ল্যাঙ্গা ধরনের, ভাড়া-ভাড়া ইংরেজি বলতে পারে। বাঙ্গালী জ্যোতিষী মিঠারের উপর তার অসীম শ্রদ্ধা—তাই কফির সঙ্গে যে পাউডার, জেলি, আর মাখন বরাদ্দ, তা পেতে আমার একটুও সন্দেহ হোত না।

কুয়ের কাছে শুতলাম, এর আগে হুঁ'বার এসে দিয়ে গেছে সে। এমন তো কোন দিনই হয় না। পাশের ঘরের মেমসাহেবের কাছে

ইতিমধ্যে আমার অনেক গুণগান করে এসেছে সে। মেমসাহেব না কি আমার কি-এর কথা জানতে চেয়েছেন। বয় বৃদ্ধি করে বলেছে বাঙ্গালী মিঠার মহারাজীজ এট্রলজার—ফি ওয়ান হানড্রেড রপীজ—মেমসাহাব হি ইজ ভেরী গুড বেংগালী—হি টেক্স, টেক্স মাচ ক্রয় বাড যেন, বাট নট নট ক্রয় গুড লেডীজ—মিঠার ইজ এ আনেষ্ট্রি... এ্যাণ্ড এ্যাণ্ড—

আর ইংরেজিতে কুলোর নি।

বলতে চেয়েছিল, কি জানি, মিঠার ইজ মডারেট এ্যাণ্ড আনেষ্ট্রি টু অল গুড লেডীজ।

ঘণ্টাখানেক পরে বদন স্নান শেষে ডিনার-হলে উপস্থিত হলাম, দেখলাম, এক কোণে ঠাঁড়িয়ে কক্ষান্তরবাসিনী খেতাবিনী। আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়তেই বেন লজ্জিত হলেন। বয়কে কি বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

আমি খাওয়া দাওয়া শেষে বদন কমে এলাম, বিছানায় গা এলিয়ে ভাবছি বেকুব না ঘুমব, এমন সময় দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। নিছান! ছেড়ে উঠতেই কানে গেল মিঠি গলায় মেমসাহেব বলেছেন, যে আই কাম ইন!...

তারপর—?

তারপর, অনেক কিছু ঘটেছিল। সব কথা লিখতে গেলে পাতা বেড়ে যাবে!...

কবে, কখন যে মেমসাহেবের বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলাম!... সে মৃত্তির রোমধ্বনেও সুখ আছে!... বদন রূপসী খেতাবিনী আমাকে তার অস্তিত্বের সকল কাহিনী বর্ণনা করে চলেছিল তারই ঘরে আমাকে নিমন্ত্রিত করে, মাত্র তিন ফুট দূরে বসে—কুফা রাত্রির আকাশে অসংখ্য তারা দূরে মিটমিট করে বেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত উঁচু দেবদাস গাছ প্রায়ইর জায় নীরব হয়ে ঠাঁড়িয়ে, আর শিশির ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে শহরের ধূলায় ধূসর ও হেমেতে ঈষৎ বিবর্ণ ঘাসের ওপর—চার দিকের আওয়াল কীণ হতে কীণতর, মিলিয়ে যাচ্ছে টাঙ্গাওয়ালার গৃহাভিযুখী শেষ করাঘাত, পূণা ঠেঁশনে শেষ ট্রেনও এসে গিয়েছে অনেকক্ষণ, রাত্রীর হারা আমাদের গোটলে এসে উঠেছে তারাও বোধ হয় এককণে যে হার ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে... হঠাৎ, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি আর বারবারার মাংসখানে নর ও নারীর প্রাচীর খসে পড়েছে।—একমাত্র স্বর্গীয় কাছ শুধু দ্রীলোক যে কথা বলতে পারে, স্বামীর কাছও বলতে লজ্জা বোধ করে, সে সব কথাও বলতে আর তার কুঠা নেই। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে আমার নতুন নয়। অবশ্য এর একটু কারণও ছিল।

ফ্রেডারিকের হোটলে যে রূপসীকে ভাল করে দেখতে পাইনি সেদিন, সেই রূপসীই যে বারবার, এসেছে শুকতেই আমার মনে লাগে। হুটি মৃত্তির চলার ভঙ্গী এক। সেই রাতে যে সাহেব এসেছিল বারবারার ঘরে, সে যে ফ্রেডারিক নয়, তা অস্বাভাবিক নয়। যোটেই কটন ছিল না আমার পক্ষে। কিন্তু পাশব সাহেবটি যে ভালোচিনো, রক্তাক্ত মুখ দেখে আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি!...

আমার হুঁতাপ্য হোক, আর সৌভাগ্য হোক, বদনের দেখে

আসছি, মেয়েরা আমাকে—মোটাই ত্যজ করে না। আপনারা যারা নিশ্চয়, তাঁরা বলবেন—গ্রাস্ত করে না। আপনাদের নিশ্চয়ই আমার কণ্ডুগণ হয়ে থাকুক। আমি দাদামুদাস, নীলকণ্ঠ দাসেরও পুত্রাধী।

বারবারা বলে—তাতলে তুমিই সেদিন ফ্রেডারিকের ঘরের দরজায় ঠাড়িয়েছিলে?

আমি ষাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

কি দেখলে ফ্রেডারিকের ভবিষ্যতে?

উত্তরের জন্তে অপেক্ষা না করেই আবার বলে—যে ইউ টেল মি হোয়াট ইজ, ইন্ টোর ফর্স মি? (আমার ভবিষ্যতে কি আছে, বলবে কি?)—

আমি বলি—ইট ইজ ইন অস্ জাট উট আর দাঙ্ অর দাঙ্। (আমাদের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নিহিত)।

বারবারা ম্লান হাসি হাসে—অনেক দিন আগে পড়েছি, তুলে গিয়েছি সব, সাহিত্য চর্চায় আর শাস্তি পাই না। মনে পড়ে, শেক্সপিয়ার আর এক জায়গায় লিখেছেন—দেয়ারস এ প্রভিডেন্স দাট শেপস আওদার এন্ডস, রাম্বলিউ দেম হাউ ইউ উইল্।

—তোমার মৃত্যু-শক্তি তো বেশ প্রখর!

বারবারার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে—আমিই তো কোলবার ...মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলাম। আমিই ইংরেজি পড়াতাম।

হঠাৎ নিজেকে ধামিয়ে দেয় বারবারা। কথা বুরিয়ে নিয়ে সে বলে—তুমি জ্যোতিষী হয়েও কর্মের উপর আস্থা রাখবে, আশ্বাস্য নয় কি?

আমি—আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাগ্যকে কর্মকল বলেই বাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অদৃষ্ট মানে ন দৃষ্ট—পূর্বজন্মের কর্মের ফলভোগ করতেই হবে এ-জন্মে। গ্রহগণ ভাগ্যের কারক নয়, সাক্ষী।

বারবারা—পূর্বজন্মে ক্রীচানেরা বিশ্বাস করে না।

আমি—পূর্বজন্মে বিশ্বাস কর আর নাই কর, তাতে আসে-যায় না। ভাল কাজ করলেই ভাল ফল পাবে, মন্দ কাজ করলে মন্দ।

বারবারা—তোমার কথাগুলোই যদি সত্যি হোত!

বারবারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

বারবারা—দেবদাসী, তুমি যখন কিছুটা জানো, তখন সবটাই শোনো। বলে দাও কি এমন প্রাণর কাজ করবে, যার জন্তে আমার কপালে এই বিড়ম্বনা।

বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনাই শুধু পেয়েছে ক্রীলোকেরা পুরুষের হাত থেকে চিরদিন। ইতিহাস বেঁটে একটাও উদাহরণ কি দিতে পারো তুমি। বসো, কবে, কোথায় ক্রীলোক পুরুষের উপর অত্যাচার করেছে? পুরুষের চরিত্র আর ক্রীলোকের ভাগ্য কি এক জিনিস নয়?

...কিন্তু, আমার দেহে নানা জাতির রক্তের সম্মিশ্রণ আছে।

সম্রাট সাজেহান যখন হিন্দুস্তানের বাদশা—কালকাতার কাছাকাছি কোনো ছামলেটের জাহাজে লর্ড মারা যান। হি হাড থাওট বি ওয়াইভস। দি ইয়াংগেস্ট—সি উড নট ডাই এ সার্টি, সি রান্ এগেই। সি ফেল ইন দি হাওস অব দি পতুগীজ। সে টুক হার টু গোয়া। সে সোলড হার অ্যান্ড এ স্নেড।

কাদার স্নানভায়েজের দ্বায় তিনি ক্রীচান হয়ে মুক্তি পান।

ইটালিয়ান ক্যাথলিক ভিত্তিরিয়ার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। ভিত্তিরিয়ো ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর। শুনেছি, তাম্রমহিলের কবর ঘরের দেওয়ালচিত্রে তাঁর হাত আছে। তাঁরই বংশে জন্মেছিলেন আমার মাতামহীরা মাতামহী।

কবে যে আমার গুজরাটে এসে বসবাস শুরু করি, তা বলতে পারব না। আমার মা কাজ করতেন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে বুকিং অফিসে। বাবা মারা যাবার পর আমার জন্ম, এই নিয়ে গ্রামে মিথ্যা কুৎসা রটনা হওয়াতে মা গ্রামের বাসা তুলে দিয়ে দাদারের ছায়ী বাসিন্দা হন। ইচ্ছে করলে তিনি আর একবার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু বাবাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। বিধবা হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কোন হানেই তিনি শাস্তি শেলেন না। আমার রূপই হোল কাল।

তাঁর শত চোঁটা সন্তোই তিনি আমাকে পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তালিকা প্রকাশ করতে চজ্ঞা কবে। খুব কম পুরুষই মেগেথি সত্যিকারের পুরুষ, অসহায় বালিকা আর ক্রীলোকের উপর সুরোগ সাহেও সুরোগ নেয়নি।

কথাটা বললে খুব রূঢ় হবে, তোমরা পুরুষ মানুষ এখনও মানবত্বই অর্জন করনি, দেবত্ব তো দুবের কথা। তুই একজন তোমাদের মধ্যে একসেপশন আছিন বটে, কিন্তু মাস্কুলে, বলা যায়, ক্রীলোক এভলিউশনের পথে পুরুষের তুলনায় অনেক কম ধাপ এগিয়ে আছে। যে পৃথিবীর পুরুষেরা ক্রীলোকদের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না, সে পৃথিবীর তুথথু কোনো দিনই ঘূচবে না। এমন কি হান্ড্রেড পারসেন্ট লিটারেসী প্রেড করলেও ঘূচবে না। দি কট-কজ অব ওয়ারলড-ভিজিটার ইজ ল্যাক অব সেন্স-কন্ট্রোল।

বারবারা ধামে। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নীচ করে। ...মাত্র নব্বুর বয়স আমার বয়েস, একটা বিষ্টুট কারখানার মালিক ...গ্যা, লোকটি ছিল বুদ্ধ, দাড়ীওয়ালা—তবেটি বছরের উপর তখন বয়েস তার...অনেক সব খাৰাপ রোগে ভুগছিল সে...কে একজন ককির নাকি তাকে পরামর্শ দিয়েছে...ছ' মাসের জেল হল কারখানার মালিকের। তারপর সে ছাড়া পেয়ে গেল...কিন্তু চিরদিনের মতো কলঙ্কিত হল একটা কুমারীর জীবন।

ভালোটিনোর মা ছিলেন আমার মায়ের পরিচিত। একই বাড়ীর ভিন্ন ফ্ল্যাটে বাস করতেন তিনি তাঁর স্বামী আর ছেলে নিয়ে...

ভালোটিনো বয়েস আমার থেকে বছর থানেকের ছোট।

আমার জীবনের এই কলঙ্কের কথা ভালোটিনো জানতো। অনেক লোকেই জেনেছিল ঘটনার কথা। খবরের কাগজে তো এসব ঘটনা সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। অনেক লোকেই পড়ে। কিন্তু কম জন পাঠক নাম-ধাম স্মরণ রাখে?...

সব খুঁটিনাটি বলতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

বারবারা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঠাঁড়ায়। টেবিলের দিকে পিঠ বেঁকিয়ে হাতঘড়িটা দেখে।

—সর্বনাশ, রাত যে বারটা! বাও, তুমি ঘুমোও গে। আমার ভয়ানক অস্বাভ্য হয়ে গিয়েছে। তোমাকে এতক্ষণ ডিটেন করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নি।

আমি বলি—তুমি কাহিনী শেষ কর। আমি জানতে চাই, ফ্রেডারিকের মত সজ্জন লোকও কেন তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল ?

—ওই একমাত্র পুরুষ, আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় বাক্য দেখলাম, অভয় ব্যবহার করে নি কোনো দিনই। ওর কোন সোব নেই। সোব আমার লগাটের। ফেট, ফেট—ডার্ক ফেট ওয়াজ্ এগেন্টি মি। অব টু এডপট ইয়োর ল্যানগোয়েজ, আই হান্ টু সাক্ষার বিকল্প অব দি ডাউন অব মাই প্রিভিয়াস বার্ধ। আই মাই সে, ইয়োর হিন্ডু থিয়োরী অব প্রিভিয়াস বার্ধ এ্যাণ্ড ট্রানস-মাইগ্রেশন্ অব সোলস হাউ গট ওয়ান গ্র্যাডুঅলিট্—ইউ বিকাম রিসাইন্ড টু দি কুয়েলস্ট শাফট অব মিস্ ফরচুন।

আমি কোনো কথা বলি না।

বারবার পুনরায় কাহিনী শুরু করে—কোলাবার বধন প্রাধান শিক্ষিত্রীর কাজে ভর্তি হয়েছি, সেই সময় থেকেই ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমার আলাপ। একদিন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আওয়ারকারেটের টানে পড়ে প্রাণ বায়-বায়, সেই সময় ফ্রেডারিকই আমাকে উদ্ধার করে।...সেই ঘটনার শেষ পরিণতি, আমার উজ্জ্বল উদয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই।...

ফ্রেডারিক একদিন প্রোপোজ করলো।

বারবার আমার দিকে চায়।

আমি গম্ভীর ভাবে টিঙ্গনি করি—ফ্রেডারিক বুদ্ধিমান।

বারবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে—না না, সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। বুদ্ধিমান যদি হোত, তাহলে সে কি বুঝতে পারতো না, কে তাকে সব চেয়ে ভালবাসে, সব চেয়ে শ্রদ্ধা করে।

আসলে কি জানো, পৃথিবীর চরিত্রবান পুরুষ মাত্রই ওখেলোর মতো বোকা আর অভিমানী। ভাস লোকগুলো যেদিন বুদ্ধিমান হবে, সেই দিন স্টাটিন উইল ডাই, এ্যাণ্ড দি কিংডম অব হেভেন উইল বি সেফ্, ফর এভার।...আমি—আমি অবশ্য ডেস্‌ডেমোনা নই। আমার শরীর কলুষিত হয়েছে একাধিক বার। কিন্তু প্রোচাক-বাহেই আমি ছিলাম ভাগ্যবিড়ম্বিত, অসহায়, নিরস্ত্র নারী। আমার মন কলুষিত হয় নি কোনো দিনই।...

...ব্রিতীয় বার, মাত্রাজ থেকে বোম্বে আসবার পথে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একলা একটা কামরায়। চেন টানবারও সুযোগ পেলাম না। আমি একা, ওরা তিন জন মাতাল সোলজার—জান ছিল না আমার।...

তৃতীয় বার,—তৃতীয় বার, সে...বারবার চুপ করে বার। আমি জিজ্ঞাস্য ভাবে বারবার হুশের দিকে তাকাই। ওর চোখে বিহুতের বিসিক।...

ওকে ;...ওকে খুন করাই উচিত ছিল। ও তো আর অল্প কুসংস্কারপূর্ণ বিধুটের কারখানার মালিক নয়—অথবা স্বাভাবিক সমাজজীবন বর্জিত কাণ্ডগোলহীন মাতাল সৈনিক নয়। ও, ও একজন ইউনিভার্সিটি গ্রাডুয়েট—কথায় কথায় বার্ণার্ড শ, আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল আওডার—সভ্যতার সকল চিন্তাধারার সংস্পর্শ এয়েছে যে তাকে কি ক্ষমা করা উচিত? বীণ—বীণও বোধ হয় ওকে ক্ষমা করতেন না। নিজ হাতে গুলী করে ওকে মারতেন।

বারবার উত্তেজিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে।

আমি বলি, বোসো, উত্তেজিত হয়ো না—কে লোকটা কে? বারবারা চেয়ারে ফিরে এসে বসে, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বলে বায়—অথচ দেখ, এমন একদিন ছিল... একদিন... একদিন—ও আমাকেই পেতে পারতো বর্মের বন্ধনের মধ্যে। আমিও ওকে স্বামিরূপে স্বীকার করতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিলাম না। ফ্রেডারিকের সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয় নি।

আমার স্বপ্ন নিয়ে ছিনিমিনি বেলেছে ও। ওর বিবেক একটুও বাধে নি কোনো দিন। ক্রমাগত ও আমাকে মিথ্যা—মিথ্যা দ্বারা প্রতারণিত করে এসেছে। ও ভয়ঙ্কর, খণ্ডিতকূর শরতানবই আধুনিক পার্শ্বে—মাছুব কখনও ওর কম কোল্ড—ব্লাডেড ভিলেন হতে পারে না। ও এক হাতে তোমার বুকে ছুঁতে পারে, আর এক হাতে থবরের কাগজ পড়তে পারে, নিবিচার টেঙে। জীলোকের ধর্মনাশ ওর বিন্দুমাত্র অস্থিভাঙ্গ জাগে না মনে। অথচ জন্তে লোভ আছে, দরদ নেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্তে চক্রান্ত আছে, পরিশ্রম নেই। অথচ—অথচ—ও একজন শিকিত সন্তান ভললোক বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ইয়োগো—ইয়োগোও ওর তুলনায় ভাল লোক। ইয়োগো কোন জীলোকের সত্যিকারের ক্ষতি করে নি। সে নিজের লম্পট ছিল না। ডেসডেমোনার ভাগ্যের সঙ্গে ভগবান যদি আমার ভাগ্য বদলাবার সুযোগ দিতেন, আমি একশো বারই সে প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। দি সাকারড মেকালী, নট মর্যালী—

আমি...আমি—

বারবারা টেবিলের উপর রাখা রিভলবারটাকে হাতে তুলে নেয়—জঙ্গলপুরের ঘটনার পর পুলিশের কাছ থেকে আমার লাইসেন্স নিতে বেগ পেতে হয় নি, সিলোনে গিয়েও নতুন করে লাইসেন্স নিয়েছিলাম। ফ্রেডারিক অবাধ হয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন করে নি।...

বারবারা আমার খামে, রিভলবারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে উঠে পাড়ায়। আমার চোখে চোখ রেখে বলে—সেদিন তুমি আমার সম্মান বাঁচিয়েছ; কিন্তু শরতান তোমার জন্তেই বেঁচে গেল।

আমি বিম্বিত হয়ে বলি—সে কি! আমি কি করে তোমার সম্মান বাঁচালাম? আর শরতানই বা কে? কি করেছে বা আমার জন্তে শরতান বেঁচে গেল। তুমি কার কথা বলছো—ভালো কিটনো?

—তুমি যদি আলো না আলতে, তাহলে ও আমাকে ছাড়তো না, ক্রোয়াকের ক্রমাগতী নাকের উপর আলগা হ'ত না। আর তুমি যদি ঠিক সেই সময় দখল না খুলে বেরিয়ে আসতে, আমি ঠিক গুলী করতাম ওকে। এ্যাণ্ড নো আই টেল ইউ, আই এ্যাম এ শুড শট।...দুর্ভাগ্য আমার, রিভলবারটা ছিল প্রথম থেকেই আমার হাতের বাইরে।

—আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি আর ফ্রেডারিক কি করে বিচ্ছিন্ন হলে।

বারবারা আমার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল—দেবাচারী, আমাকে আজ ক্ষমা কর। আমি বলব, তোমার কাছে কোন কিছুই লুকোবো না, কিন্তু আজ থাক, আমার মাথার আগুন ছুটছে। ডোন্ট মাইণ্ড, শুড নাইট।

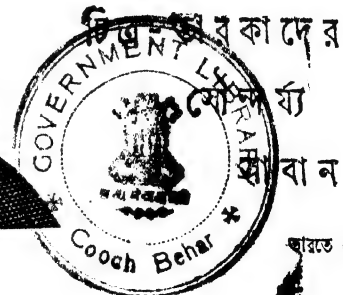
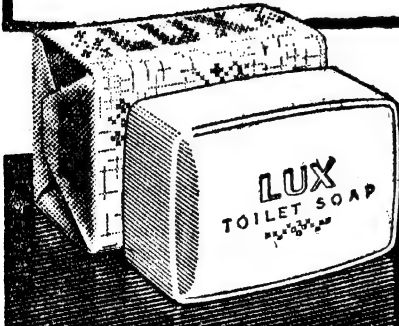
তপতী ঘোষ

সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন

লাক্স  
টয়লেট সাবান

“আমার মতে শুভ্রতম, বিশুদ্ধতম সাবান”

আপনি এঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেন; লাক্স টয়লেট সাবানের নিখলক শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় এবং সেইজন্হেই এই সাবানটী আপনার দল ভাঁসে দেয়া করবে! আর লাক্সের ফেণা! সত্যের মত নরম ও সুবাসের এই ফেণা তাকে পরিপূর্ণতার পরিচয় করে—এনে দেয় একটা তাজা ধরনের ভাব। বস্ত্র সংরক্ষণের জন্য বড় সাইজের সাবান নিতে ভুলবেন না।



বারবার বলছিল, আমাকে গোটা কাহিনীটাই ভুলিয়েছিল। কান কথাই লুকোয় নি। কিন্তু সে কাহিনী বলতে গেলে পাঁচশো পাতার উপস্থাসেও শেষ হবে না। আমি মাঝে মাঝে তার কথার বিভিন্ন অংশ তুলে দিচ্ছি, দেখুন যদি কিছু বুঝতে পারেন।

আমি কি জানতাম ও এমন কাঙ্ক্ষ করবে? আমাকে মন খাইয়েছিল প্রচুর, আর সে মনের সঙ্গে মিশিয়েছিল সুমের ওষুধ।

শিলাচ—শিলাচ—শৈলাচিক কাণ্ডকারখানাতেই ওর আনন্দ...

আমাকেই কখনো গিয়েছিলাম, কিন্তু শরতান বাধা দিয়েছিল। মলেছিলাম...বলেছিলাম...আমাকে সামাজিক সম্মান দাও।

শিল্পক্ষেত্র তায় হেসেছিল, দাঁত বের করে হেসেছিল, বলেছিল ভয় নেই...

আমি এখন বিবাহিতা—আর ওর জন্ম নয় কি ক্রীড়ান-পরিবারে?

এসেছিল একদিনের গোট হিসেবে—যেস কোর্সে মার্চই ওর সঙ্গে ফ্রেডারিকের আলোপ—থেকে গেল কলকাতায় দ্বারী বাসিন্দা হিসেবে...স্বামী বাড়ী নেই, আমি একলা...কী লক্ষ্য! —

আমারই বাড়ীতে স্বামীর অতিথি হয়ে আমাকে অপমান।

—এমন অনীল প্রস্তাবও কি কোন শিক্ষিত লোক করতে পারে? কেন আমার সম্মান হয় নি...স্বামী যদি ইমপোটেন্ট হয়, তাহলে সাবস্টিটিউট লরেন্সের লেখা লেডী চ্যাটারলীস্ লাতার পড়নি?

—না, পড়িনি—পড়বার প্রয়োজন নেই।

ও হাসে, এগিয়ে আসে। ফ্রেডারিক বাড়ী নেই। মেয়েছিলাম, মেয়েছিলাম শুকে হাটীর দিগে। সে দাগ এখনও আছে ওর ডান ক্রুর উপর।

কিন্তু, কিন্তু শরতান আমাকে এমনি কাগদায় ফেলেছিল ভয় হয়, যদি ওর কথা স্বামীকে জানাই, ওও শাসিয়েছে সব কথা কীস করে সেবে।

—কীস করে দিক, ফ্রেডারিক না হয় কতকগুলি দুঃখের ঘটনাই জানতে পারে।

না, না, থাক, ফ্রেডারিক যদি অজ্ঞ কিছু ভাবে! আমাকে সন্দেহ করবে, ও যা পিউরিটান।

—শরতান থেকে যার কিছুদিন। আশ্চর্য, অতিশয় ভয় আচরণ তার, দেখতে পাই—আমিই বোধ হয় ওর দোষটাকে বাড়িয়ে দেখেছি। থাক, আমিও চূপ করে যাই।

ও কি আর আমাদের বাড়ী ছেড়ে বাবে না?

—না, কিছুতেই বাবে না। ফ্রেডারিক বলে, আমাদের তো ছেলে-পিলে কেউ নেই, থাক না কেন ও। তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কত সুখ্যাতি করে তোমার। কম্পানীরও তো প্রয়োজন আছে। কম্পানী না, না, কম্পানী চাই না আমি।

—ফ্রেডারিককে কি করে বোঝাই? বোঝাতে গেলেই তো অনেক জিনিসই প্রকাশ করে বলতে হয়। বলি না কেন সত্যি যা। স্বামীর কাছে কি কোনো কিছু লুকানো উচিত?

মা না না—কী লক্ষ্য! তাই কি সব বলা যায়। ফ্রেডারিক হয়তো ভাববে আমারও গোপন সহযোগিতা ছিল। হিং হিং—এ সব কথা যুগ ফুটে বলবার নয়।

শরতান প্রতিশোধ নিল, অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে।...

আমাদের বিবাহিত জীবনে তো বিচ্ছেদ ঘটবেই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা সরলপ্রকৃতি অনভিজ্ঞ তরুণ ডাক্তার তার প্রাণ হারানো।...ভ্যালেন্টিনোর অনভিজ্ঞ তরুণ ডাক্তার তার প্রাণ ডাক্তার নিকলসনকে কল দিল...গায়নাকোলজিষ্টের কাল, জানতো, অত্যন্ত সচরিত্র লোকের মনেও উত্তেজনা আসতে পারে। ডাক্তার হলও—এমন কি গায়নাকোলজিষ্ট হয়েও...আগের নিকলসন ছিল শাসনিসে ধরনের...লোকচরিত্র সৎক হার খুব বেশী অভিজ্ঞতা হবার ব্যয়সও হয় নি।

শরতানের কারসাজিতে ডাক্তার নিকলসন তুল করে ডাক্তার আমি বুঝি সত্যি তার প্রতি অস্বাভাবিক।

তখনও যদি বুঝতাম নিকলসনের এই ভাবান্তরের পিছনে কার উদ্বাসি ও জালিয়াতি আছে, তাহলে হয়তো শোচনীয় পরিশ্রম থেকে সরলপ্রাণ ডাক্তারকে বাঁচাতে পারতাম। সে আমার কথা শুনতো।

কারণ—কারণ আমি জানি সে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ভালবেসেছিল, আমার দেখকে নয়।

আমার বয়েস চৌত্রিশ—কিন্তু ফ্রেডারিক বলে আমাকে নাকি সিক্সটিনের বেশী দেখায় না—সত্যিই কি তাই? সমুদ্রের ধারে অনেকগুলো নারকোল গাছের কীকে কীকে ফণিমনসার আড়ালে ঘেরা নির্জন জায়গা...আমার সব চেয়ে প্রিয় স্থান। প্রায়ই আমি এসে ওখানে বসতাম, ফ্রেডারিক প্রায়ই বাড়ীতে থাকতো না সে সময়ে।

গরমের জন্তে গা বুল...প্রায় অর্ধদশ ভাবে একটি পাথরের টুকরোর উপর আমি অসুমনস্ক ভাবে বসেছিলাম। দেখেছিলাম সমুদ্রের ঢেউ। আর ভাবছিলাম আমার যদি বিষে হোঁত হিন্দু বা মুসলমান ঘরের মেয়েদের মতো অল্প বয়েসে—আমার ছেলের বয়েস হোঁত কত?...সে কি নিকলসনের মতো কুতী ছাত্র, বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে ফিরতো না, এতদিনে...না, গায়নাকোলজিষ্টের কাছটা ভাল নয়...আমার ছেলেকে আমি ব্যাবিষ্টারী পাড়বো, সে কি হবে মস্ত নামকরা বৈজ্ঞানিক, না না—সে হবে খাইট বা বুকের মতো হিরো। অসংলগ্ন অনেক চিন্তা ওঠে আমার মিলিয়ে যায় সামনের গির্জা ফেনিল সাগরের ঢেউ-এর জায়। সম্ভব, অসম্ভব কল্পনার তরঙ্গ ভেসে বাই অনেক দূর।

একটা লাহাজ ভেসে চলেছে—আমার এক দিদির ছেলে নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বড় চাকরী পেয়েছে ব্রিটিশ নেভীতে—আশ্চর্য—তারও খুঁটো নিকলসনের মতনই সুকুমার, প্রায় এক বকমই দেখতে—আমার—আমার ছেলে ওদের চেয়েও সুন্দর হবে না কি! ফ্রেডারিকের মতন যেন সে শরীরের শক্তি আর চরিত্রের বল পায়—আর, আর—আমার মতন যেন তার রূপ হয়!...সে কি নতুন খাইট অথবা বুকের মতন হতভাগা, ঘৃণ, নিষ্ঠুর, এখনও বয়স মানব জাতিকে পরিজ্ঞাপের পথ দেখাতে পারবে?

মায়ের লালদার বিবেট কি আমি আজও বন্ধা নই? বিছুট-কারখানার মালিকের বিষ কি এখনও আছে? আমি—আমি—সন্তানের স্বপ্নে আমার স্পষ্টারও কি সীমা নেই? কিন্তু, খাইট বা বৃদ্ধের মতন ছেলের মাই বা হতে আমার বাধা কোথায়? তাঁরাও কি আমারই মতো মানুষ ছিলেন না?

হঠাৎ ডাক্তার কোথা থেকে চুপি চুপি এসে পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আবেগের সঙ্গে আমার গলায়, চোঁটে, কাঁধে, বুকে, চুলে চুষ খেলো।

টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। আমি বস বসি, কর কি, কর কি—তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ?—ও বলে' হ্যাঁ, ডালি', তুমিই তো আমাকে পাগল করে তুলেছ।

তোমার কোন ডর নেই। তোমার রক্তে সিকিলিস বা গণেশিয়ার বীজাণু আমি সত্যি পাঠি নি। ডালেন্টিনোর কাছে আমি সব তুলেছি। চিঠি না—লিখলেও 'আমি আসতাম। তুমি যখন আমাকে চাও, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমি রাজী আছি।

আরও কি যেন বলতে বাচ্ছিল, হঠাৎ কার ছায়া দেখে চমকে উঠলো। আমাকে ছেড়ে উঠে পাড়লো।

আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম।

এমনি আচমকা ভাবে ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল এমনই সম্ভব ও আকস্মিক তার কথাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছিল তখন, আমি তাকে নিবৃত্ত করার আগেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল। আমি সেই অবস্থায় আমার কি করা উচিত ছিল তাও ঠিক করতে পারিনি সহজে।

তোমাকে তো আগেই বলেছি—ওকে, ওকে দিদি—যে চোখে ছোট ভাইকে দেখে বা মা ছেলেকে, আমিও সেই চোখে দেখতাম। এখনও দেখি। নিকলসন আজ বেঁচে নেই। তবু তাকে ভুলতে পারিনি। তার সব অপরাধই আমি ক্ষমা করেছি। সেও প্রাণের বিনিময়ে পাপ ক্ষালন করেছে। জেনো, নিশ্চিত, সত্যিকারের ভিলেন যে, সে কখনও আত্মহত্যা করে না। সে বেঁচে থাকতে চায় ঠিক নয়তানেরই মতো।

যে দুটো ছায়ামূর্তি যুদ্ধের মধ্যে সরে গেল, সে মূর্তি একটি ফ্রেডারিকের, আর একটি ভালেস্টিনোর।

পরদিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল : সমুদ্রের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে উল্লীয়মান ডাক্তার ডি, নিকলসন, এম, ডি, এচ, আর, এ, এ, এম সি, ডি, জি, সি (ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেকগুলো ডিগ্রী ছিল তার) অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশের সন্দেশ। তাঁর একটা চোখ সম্পূর্ণ মাছে ঝুঁকরে নষ্ট করে ফেলেছে। তবু যুদ্ধতহক সনাক্ত করা কঠিন হয় নি। বুকপকেটে নোট বই-এর মধ্যে একটি ডিসিটিং কার্ড পাওয়া গিয়েছে। একটি মেয়েলি ছাঁদের হাতের লেখা দীর্ঘ চার

পাড়া চিঠিও পাওয়া গিয়েছে। ডাক্তার নিকলসন অবিসাহিত ছিলেন।

আমি গভীর কণ্ঠে বারবারকে জিজ্ঞেস করি—চিঠিটা কে লিখেছিল, তোমার অল্পমান?

বারবারা আমার গলার স্বরে বিম্বিত হয়ে আমার দিকে তাকায়। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার চোখের ভাষা ও প্রশ্নের কারণ বুঝতে চায়। অভিমানকৃত্ত স্বরে বলে—দেবাচারী, তুমিও কি আমাকে বিশ্বাস কর না?

...চিঠিটা কি জাল চিঠি হতে পারে না?

থরো, আমারই লেখার অনুকরণ করে যদি কেউ দক্ষ জালিয়াত চিঠি লিখে তরুণ যুবকের কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে যায়, আর তরুণটি যদি একদিন ভুল করে প্রেম নিবেদন করে, তারপর বুঝতে পারে, সে এক কুচক্রীর চক্রান্তে, জালিয়াতের কৌশলে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারই পিতৃভ্রাতা পিতৃবন্ধুর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অশোভন আচরণ করেছে, তাহলে সে কি অল্পতাপে হলে-পুড়ে আত্মহত্যা করবে না?

তারপর—?

তারপর, অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর কেটে গিয়েছে। আমি একটা সফ গলির ভাড়া দোতালার কোণের ঘরে বসে ছেঁড়া খাতায় লিখে বাচ্ছি সেই পুরোনো কাহিনী। এ কি কাহিনী? এ তো স্বচক্ষে দেখা, নিজ কানে শোনা ঘটনা।

পারলাম না—পারলাম না—'লাইট অব এলিগা' উপহার দিয়েও পারলাম না ওদের দু'জনকে বামিস্ত্রীকে, ফ্রেডারিক আর বারবারাকে মিলিয়ে দিতে। বিশ্বাস যেখানে নেই সেখানে দাম্পত্য স্বপ্ন কি আর সম্ভব? ফ্রেডারিক কিছুতেই আমার বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় না। তাঁর এক কথা, নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করা যায়? আমিও হাল ছেড়ে দিলাম। ভাড়া কাচকে জোড়া দিতে যাওয়া বুখা প্রয়াস।

অবশ্য, বারবারার মুহুরা কিছুদিন পরে, অবশেষে ফ্রেডারিক মেনে নিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন যে তিনিই ভুল করেছেন। বারবারার প্রতি অবিচার করেছেন। মদের যৌকে ভালেস্টিনো নাকি অনেক কিছু স্বীকার করে নিয়েছে বা ফ্রেডারিক ভাবতেও পারেন নি।

কিন্তু, বারবারার আত্মা তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে কোন অনুল্ল গ্রহতারকার বিবর্তন-পথে মিলিয়ে গিয়েছিল কে জানে!

বারবারা—বিড়হিতা বারবারা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল শেষ রাতে। অনেক বেলা হলেও ঘুম আর ভাঙেনি।

দরজা ভেঙে বখন আমরা ঢুকলাম তার ঘরে—সে ঘুমিয়েছিল ঠিক যেন বোড়লী কুমারী। পদ্যের পাণ্ডুর মতন তার চোখের পাতা। বহুকের মতন ক্র। তিলতুল থেকেও টিকালো নাক। প্রবালের মতন লাল টোটা।

সত্যি, এমন সুখ, এমন কিগার আর দেখিনি।

# সোবিয়তের দেহেদেহে

মনোজ বসু

ভারতীয় ভাষায় লাতক হওয়া চাটি কথা নয়। পাঁচ বছরের কোর্স। হিন্দি উর্দু ও বাংলা ভাষার ইতিহাস তো জানবেনই, ভারত সম্পর্ক সাধারণ জ্ঞানও চাই মোটামুটি। ভারতের ইতিহাস শিখতে হবে—প্রাচীন কাল থেকে এই ভাল আমল। ব্যাকরণ শিখতে হবে। কোনটা যে শিখবেন না, তা জানিনে। আচার্য বরদিকর এই লম্বা-চওড়া সিলেবাস বানিয়ে গেছেন।

নভিকভা বলে যাচ্ছেন। ফর্টি ইয়াং হল বক্তৃতা শোনা ও লরকার মতো নোট নেওয়া। ভারতবর্ষ দেশটা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে থাকিছু জানবার আছে। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব নিয়েও বক্তৃতা হচ্ছে। সেকেন্ড ইয়ার থেকে বই। বই দু-রকমের। এক হল, ওরা নিজেরাই নানা লেখার সকলন বের করেছে; আর হল, সেই সেই ভাষার মূল-বই। হিন্দিতে শ্রেমচন্দ্র সন্দর্শন এঁদের মূল-বই পড়ানো হয়; বাংলায় বক্রিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। উর্দু ছাত্রেরা কিয়ান চন্দ্রের বইও পড়ে। এদর বলছি উনিশ শ' চুয়ান্নর খবর। এর পরে কি বল-বল হয়েচে জানিনে।

বললাম, বাংলা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মোলাকাত করব। চলুন। নভিকভা চুচুক করেন : তাই তো, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে। ক্লাস তিনটেয়। একটুকু খবর পেলে তারা সব ছুটে আসত। তিনটে অবধি থাকা চলে না তো তোমাদের!

তা কেনম করে? বাইরে জুর্গিং—মেথডরা আকাশ, টিপিটিপি বুট, ঝোড়ো বাতাস ঢেঁটে দিয়েছে নেভার জলে। ছপরের খানাপিনা হয় নি। তা হলেও আমি থেকে যেত রান্জি। কিন্তু অলু সবাই? বাংলা নিয়ে কী তাঁদের মাথাবাথা হলুন।

যুনিভার্সিটি জায়গা—ছদ্ম-দণ্ডাম অবিরত বক্তৃতার বোমা ফাটে। কিছু খেল না দেখিয়ে আমাদেরও ছাড়ান নেই। বেলা হয়ে গেছে যে। তা হোক তা হোক, সংক্ষেপে ছুটার কথার সারবেন। বক্তৃতা শুনে শুনে এরা যেন ক্ষেপে রয়েছে। যে আসে তাকে ধরবে, লাগাও বক্তৃতা। এবং কান উঁচিয়ে টপাটপ বসে পড়বে।

অগত্যা আমরাও ঠাই নিলাম সামান্যামনি। প্রথম হীরেন মুখোজ্জ মশায়। এ মাসুল ঈড়লে বক্তৃতা ছাতি ফুলে ওঠে। বক্তৃতা কি বলেন, ঝিকমিকিয়ে কথার তারা কাটছে। শুনতে পাছ ভারতবাসী আমরা বলি কি বরম?

—হাস আমলের ভারতীয় লেখক বলতে আপনারা তো মুলকরাজ আমল, ভবানী ভট্টাচার্য, আকাস—এমনি ক'জনকে জেনে বসে আছেন। যে হেতু লেগেন এরা ইংরেজিতে। কিন্তু আসল সৃষ্টি মূল-ভাষায়। সেই বর্ষা আধুনিক সাক্ষিত্যের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ নেই। ভারত সোবিয়েত সঙ্ঘুতির যুবকনে ঝাঁপ পড়বে প্রাধানত সাক্ষিত্যের মাধ্যমত। অতএব আপনারা একটুখানি তলিয়ে ভারতের সাহিত্য-মণিরত্নের সবাদ নিন।

একটু ভিন্ন কথা বলে নিতে হয় যে! হীরেননাথের বক্তৃতা গুটন্ত বৃকবেন তা হলে। খেটেখুটে ওরা এক সঙ্কলন বই বে করেছে—ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। তাতে ঠাইই সব জমিয়ে আছেন—ঐ মুলকরাজ ইত্যাদি। কারো কারো গল্প চারটে পাঁচটা বাংলা ছোট গল্প আজকে ভুবনের যে-কোন সাহিত্যের সামনে বৃ-ঠুকে ঝাঁড়তে পারে। সেই বাংলা গল্পের সাবুল্যে একটি মা স্থান পেয়েছে—ভবানী ভট্টাচার্যের গল্প। সেই কথা আমি তুলেছিলাম মস্তার সোবিয়েত রাইটার্স-য়ানিয়েন। ওঁরাও সা-নেন : কি করা যায় বলুন। আমরা তো চাই ভাল ভাল লেখা—সঙ্কলনটা যাতে বখাখ হয়। কিন্তু খবর জানিনে, কল্লবাদের মাধ্যমে হালের কোন বাংলা লেখাই তেমন সামনে আসে না। বরঞ্চ মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার অত বড় সাক্ষিত্য কি মনে গেল?

বাণীপার তাই। বাংলায় লেখকের আশ্রয়—বাইরে কৈ-করবার তাগত নেই। ক্রটিতেও বাধে হয়তো। নানান দে-ঘরে ঘোটের উপর বৃক এলাম, রবীন্দ্রনাথের খুব প্রভাব—নিশে তিনি জগৎময় ঘুরেছেন, বিদেশির অমুরাগ তাই ফলে আরও বেড়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে কি হচ্ছে, কেউ বড় জানে না (শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এমন-কিছু মাতামাতি নেই বাইরে)। বাংলা সাহিত্য নিজের ঘরে থিল এঁটে রইল, আজকের এই ছোট দুনিয়ায় নড়ে চড়ে বেড়ায় না।

হীরেন মুখোজ্জের পর আমাদের ভিতরকার উর্দুওয়াল একজ-উঠলেন। দোভাষি উঠে উর্দু থেকে কবী শরৎচন্দ্র করে দিল তারপর হিন্দিতে বললেন একজন। তাঁরও বক্তৃতা হল। এবাং পালা আমাদের। আমি লোকটা কম কিসে, স্বভাবা বাংলাতেই বলব কিন্তু বাংলা দোভাষি নেই। তাই বুদুন, কি বরম যেইজ্জি আপনাদের বাংলায়। অথচ ভারতীয় ভাষার মধ্যে ওদেশের মানুষ বাংলা শিখেছিল সকলের আগে, বাংলায়ই দিল সকলের বড় খাতির আজকের গতিক, অস্থ বরতে একটি বাংলা দোভাষি সেলে না নভিকভা বললেন, আজ্ঞে আজ্ঞে এবং খুব সহজ বাংলায় বলুন—দেঁ আমি চোঁ করে।

সেই মনের কোঁভই আমি ব্যক্ত করছি : রবীন্দ্রনাথ অবঁ মোটামুটি জানেন আপনারা। ১৯৩০ অব্দে তিনি এদেশে আসেন না এলে এ জন্মের তাঁর্দর্শন অপর্য থেকে যেত—এমনি কথা লিখলে তিনি। আমরা, বারা সাহিত্য করি, তাঁই মানস-সঙ্কলন—এ যু-তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই ঘুরে যাগাব প থেকে কোঁতুল আরও উল্লস হয়েচে আপনাদের সম্পর্কে; সাংস্কৃতি-সম্পর্ক গড়ে তোলবার লোভ বেড়েছে। বুটশ-আমলে হয়ে ওঠে নি স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারত এবাং স্বাধীন-স্বাধীন করে দিচ্ছে। দুনিয়া সঙ্গে আমাদের শান্তি ও সৌভ্রাতের সম্পর্ক।



এই জেনে রাখুন, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য খেমে নেই। উচ্ছল প্রতিভার অবমাননা হতে দিই নি আমরা। বলতে পারেন, কিংবা কুণ্ডলিত আত্মা—নিজের সাহিত্যবুদ্ধি ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। শব্দী কয়েকটি সামান্য সংস্কার ভূমির ফরফরিয়ে বেড়ায়, তাতেই চোখ বুলসে আছে আপনাদের, খাটি-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা বখাওয়া সাহিত্য করব। খান কয়েক বই দিয়ে যাচ্ছি, আরও পাঠাব। আমার স্বদেশের সাহিত্যিক বস্তুত্বও এগিয়ে আসবেন। ভোকস জ্ঞানের দাওয়াত দিয়ে এনেছেন—ভরসা করি, সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনের ভার তাঁরাই নেবেন বিশেষ করে।

চটাপট হাততালি। ভিনদেশে এই এক সুবিধা—জাগড়ম-বাগডম হা-ই বসি, হাততালিটা পাওয়া যায়। নভিকভা বই ক'খানা জুগে ধরছেন। হাতে হাতে ঘুরছে। বাংলা জানেন না প্রায় কেউ, তবু উলটেপালটে লেখেন। আমার লজ্জা লাগে সামান্য জিনিষ এমন ছালাপনা দেখে। নানান প্রশ্ন বইগুলো নিয়ে—বিষয়বস্তু কি? কভারের ছবির কোন অর্থ? নভিকভা বললেন, লিখে দিন—সেলিনগ্রাড প্রাচ্য-গ্রন্থালয়কে উপহার দিলাম। বস্তুত্বের নিজের হাতে লিখে-দেওয়া বই আছে। অনেক কাল পরে আবার এক বাংলা-লেখকের লিখে-দেওয়া বই গ্রহণগারে এলো।

লিখতে কিছু সময় লাগে, দলের অজ্ঞা সবাই ইতাবসরে উঠে পড়েছেন। প্রাচ্য বিভাগে যাচ্ছি এবার। সে এক আলাদা বাড়ি। বিশাল করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। নভিকভা গা বঁসে মুহুর্তে বাংলায় ইংরেজিতে আলাপ করতে করতে যাচ্ছেন। সত্যি, কভকালের পরমাশ্রয় আমরা বেন! এই প্রাচীন বিজ্ঞানশিল্পে কত কত মহামানবী বৈজ্ঞানিক দেশনাথক ছাত্র হয়ে শড়াতনা করে গেছেন। দেয়ালের উপরে তাঁদের ছবি, দেয়ালে খোঁপ কেটে কেটে তাঁদের মূর্তি। আর, দেখুন, উচ্ছল আনন্দে কলহাস্তে একালের ছাত্রছাত্রী এখানে-এখানে বাচ্ছে এই করিডরের ভিতর দিয়ে। একাল-সেকাল এক জায়গায় মিলেছি আমরা—মাথার উপরের নিঃশব্দ ওরা, নিচেকার জীবনচকল এই এরা। নতুন কালের ছেলেমেয়েদের উপর ভরসে কৌতুক প্রশ্নর জ্বালীর্দান করে পড়েছে উপর থেকে। ঠিক সামনে মস্ত বড় ছবি—পথ আটকে যায় আমাদের সেখানে। বুদ্ধি প্রদীপ্ত এক কিশোর, মুখটা চেনা-চেনা লাগে। সেলিন। কিশোর বয়সে সেলিন এই যুগিভাগিটিকে পড়ে এখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন। তাই নিয়ে জাঁক করে এরা। জাঁক করবার মতোই বটে! এমন ছাত্র কোথায় মেলে—দেশের নতুন চেহারা এনে দিলেন যিনি, গোটা দুনিয়া নতুন আশায় মতিয়ে তুললেন? পাশের এক ঘরে নিয়ে গেলেন—এইখান থেকে সেলিন ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন। এক শ' পরিক্রম বছরের লাইব্রেরি, সাড়ে-তিন মিলিয়ন বই—এরই মধ্যে কিশোর সেলিন অনেক সময় জুবে থাকতেন।

রাস্তায় পড়েছি এবার। ফুফুফ করে বরফের গুঁড়ি স্বরছে। জোর-পায়ে আর এক বাড়ি উঠে পড়লাম। যুগিভাগিটিকেই এক বিভাগ—প্রাচ্য বিভাগের ও গ্রন্থালয়। একটু মেয়ে গ্রন্থাগার থেকে বাংলা বর্ণলতা নিয়ে বেরলেন। আমাদের দেখে ধমকে পাঁড়াল। নভিকভা বললেন, এই যে—ফিফ ইয়ারের ছুটো ঘরে এরা।

বাংলা-জ্ঞানের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাচ্ছিলে—এখন জ্ঞান নেই, কপাল শুণে এসে পড়েছে এরা। বয়স কী-ই বা, বিশ-বাইশ। উচ্ছল ঝলমলে চেহারা—একটির তো বিশেষ করে।

বাংলায় নাম লেখো তো আমার এই খাতায়—

লিখল, ইরা স্বেতোভিভা—। লিখতে লিখতে ফিক করে হেসে বলে, নামের শেষটা অস্বস্তি কঠিন—কি বলেন? শেষটুকু ইংরেজিতে লিখে দিল আগের লেখার নিচে—Svetovidova। আবার ঐ কটোমটে কথাটার বাংলা (বা সংস্কৃত) করে পুরো নাম বলল, ইরা স্বেত-দর্শনা। অপর মেয়েটা ইয়ার চেয়ে চ্যাড়া—এমন ছটফট নয়, স্থির-শাস্ত, লাজুক ধরনের হাসি হাসে একটুখানি মুখ নিচু করে। নাম লিখল—এলেনা মিনোভা। কড়া যুক্তাকরের বানান—এই কলম তুলে আমারও ভাবতে হল—এলেনা বড়াক করে লিখে দিল বাংলায়।

তারিখ করছি, বাঃ, খাসা হাতের লেখা তোমাদের। লেখক মায়াব আমি, বিনবাত কলম শিখতে হয়, আমি তো এমন পারিনে।

লেখক! কি নাম?

নভিকভা নাম বলে দিলেন। জু কুটকে মেয়ে ছুটি ভাবছে। ভেবে মানিক হৃদিস পাবে না, তোমাদের জ্ঞানের চোখাছির ভিতরে আমি নেই।

বললাম, খানকয়েক বাংলা বই দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আরও সব ভারতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

এলেনা বলে, আমাদের পত্র দিবেন, বঙ্গভাষায় লিখিবেন।

ঠিক দেবো। তোমরা জবাব দেবে তো?

নিশ্চয় দিব। বঙ্গভাষায় উত্তর দিব, দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু সে দেখা হয়ে ওঠেনি। যেহেতু আমিই লিখিনি চিঠি। বিলকুল ভুলে মেরেছি। খাতার নোট করে এনেছিলাম—খাতা উন্টাতে উন্টাতে আজ মনে পড়ে গেল। এত দিন পরে এখন আর দেওয়া যায় না, কি বলেন?

প্রাচ্য গ্রন্থাগার। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, মুখোমুখি প্রায় সমান মাপের প্রেমচন্দ্র। আর আছেন আচার্য বরনিকভ, ভারতের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে যিনি জীবনপাত করলেন। ভারতীয় হরেক ভাষার বই আলমারির থাকে থাকে সাজানো। ভারতীয় নানা বইয়ের কলীর তর্জমা। অহিকায় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা। কালাসার অনেক বই, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও একত্রিশখানা তর্জমা করে নিয়েছে। আরও অনেক, অনেক। গান্ধীজীর 'স্বতন্ত্র সন্তান' নামক চিঠি বই এবং 'রাজবিজ্ঞানকা অভিব্যক্তি'। বাংলা বই বড় কম। বস্তুত্বের নিজ-হাতে উপহারের বড়ই করে—ইটা নেড়েচেড়ে দেখছি—বিববুক, পঞ্চম সংস্করণ, ১২৯১ অব্দে ছাপা। বস্তুত্বের ইংরেজিতে লিখে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কাকে দেওয়া হল উল্লেখ নেই। মাইকেলের অনেক বই; তার মধ্যে দীননাথ সান্নায়া সম্পাদিত সচিত্র মেঘনাদ-বধ কাব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্প-গুচ্ছ ও নৌকাছবি।

সকলে ঘিরে এসে আলাপ করছে, ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছে। ইয়া-এলেনাও আছে, কিন্তু তারা ভিড়ের মধ্যে নেই। ঐ গোটা চারেক বাক্যটুকু 'গেল নাকি, লেখা সম্পর্কে উৎসাহ উবে গেল? বিষয় হয়ে গেছি। হুই সবী মাথায় মাথায় এক হয়ে শলাশুবান্দা

করছে এক শ্রোত্রে পাড়িয়ে, এক টুকরো কাগজ নিয়ে ইয়া শব্দব্যস্ত কি-সব টুকে বাচ্ছে।

অবশেষে এগিয়ে এলো। ইয়া বলে, সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। এই শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারি না, আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

কী কাণ্ড! কতকগুলো কথার ফর্দ করেছে এতকণ ধরে। এসে পড়েছি তো মাঠারি করিয়ে নেবে। প্রথম কথাটা হল—‘ভোটভুটি’। বুঝিয়ে দিলাম—ভোট দেওয়া-দেয়ার ব্যাপার, ইংরেজিতে থাকে বলে ইলেকশন।

বিষয়ে ইয়ার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে: চমৎকার! ইংরেজি ভোট থেকে বাংলা কথা বানিয়ে নিচ্ছেন?

হে হে মালদ্বী, ক্ষমতা জানো না তো আমাদের ভাষার। ছুনিয়ার তাবৎ ভাষার উপর হে! মেয়ে মেয়ে এমন বিস্তার কথা আমরা হস্তম্ব করেছি।

তার পরের কথা—‘পিটুনি’। কত রকমে চেষ্টা করছি, কিছুতে বুঝবে না। তবে তো বাড়টা দুইয়ে ধরে পিঠের উপর বুঝিয়ে দিতে হয়। শেষটা তাই করলাম—সত্যি সত্যি নয়, আকারে-ইঙ্গিতে থিয়েটারের অভিনয়ের মতন করে। জন্মে পিটুনি খেলে না, বুঝবে কি করে আনন্দমতীরা? স্মৃতি করে দেশবিদেশের ভাষা শিখছে, যে দিকে তাকাও ঝলমল করছে হৃদয়স্তাহীন উল্লসিত জীবন।

পরের কথাটা হল ‘সাগরেক’। আরও সব অনেক আছে। কী কষ্ট করে যে বাংলা শেখে! বাংলা শিখবেন তো ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবেন আগেভাগে। বাংলা থেকে ইংরেজি ছুটো অভিধান আছে—মুদ্রণ মিথ্রের ও বৈশিমাধব গাঙ্গুলির। বাংলা-শিক্ষার দুই হাতিয়ার। পড়তে পড়তে কোন কথা ঠেকে গেল তো অভিধান খুলে ইংরেজি প্রতিশব্দ দেখে নিন। তখনও না বোঝেন তো ইংরেজি-রপ্ত অভিধান খুলুন। হালফিল আমরা তো সব চলতি ভাষায় লিখছি—সে এমন যে নিজের লেখা নিজেই কত সময় বুঝেনে। ছু-খানি ভৌতা হাতিয়ারের সখলে ঐ ব্যাসকূট ওরা ভেদ করবে কেমন করে? সামনে পেয়ে আমরা তাই শরণ নিয়েছে।

কথার মানে হয়ে গেল তো উচ্চারণ। ‘জামা’ ‘ব্যাখা’ ‘কুম’—বাংলায় ঠিকঠিক উচ্চারণ কি? সংস্কৃত কিবা হিন্দি নয়, বাংলা। এক একটা করে বলছি আমি, আর জিভের উপর ফেলে বার পাঁচ-সাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুগ্ধ করে নেয়। তার পরে ধরে বদল, রবীন্দ্রনাথের কথা বলে যান কিছু, তাঁর জীবনসাহায্যের কথা। ‘পেয়ে কবিতার’ পর কি কি বি লিখেছেন?

জ্যোৎস্নার মতন ধরেছে, ছেড়ে দেবে না। নানা করে উঠে: ছুপুর গড়িয়ে গেল, দলের সবাই বেরিয়ে পড়েছেন, চলে যাবো এবার।

হাসেন কেন? যথা ধর্ম বলছি, বিত্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা নয়। দলের লোকেরা সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই সব বিদেশ জায়গার

তরুণী কিসের? রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাষার শিক্ষাতিয়েন আমি বধন সরলমতি তরুণী দুটোকে যা বলব, সেই তো বেদব্যাক্য। ‘শেষের কবিতার’ পর রবীন্দ্রনাথ ‘বউটাকুরাণীর হাট’ হাত দিলেন—বদিতাং এখন কথাই বলি, কার ঘাড়ে কটা মাথা যে আপত্তি করবে? হাত এড়ানো গেল না, বলতেই হল কিছু। আচ্ছা, কী ভঙ্গ

হয়ে গুনছে! প্রমো-বিনত দৃষ্টি। আমার সেই অশ্রুণ ভাষণ কেঁটে যে আপনারা গুনলেন না! খুন করলেও আর বলছিলেন, সে নিষ্ঠা কোথায় আপনারদের যে বলব?

শহর ছেড়ে ছুটিছি। পিচদেওয়া পথ—এমন মন্থণ পাত্ত হাটতে হলে পিছলে পড়ে যেতাম বোধ হয়। শহরতলী পার হয়েছি। গ্রাম, কত গ্রাম! মাঠের পর মাঠ। কাকুরে পোড়োজমি। বড় জঙ্গল। পথ তবু কুরোয় না। কত দূরে বাপু? বড়ো ডেক হু করে ছুটে—এবারে বোধ হয় পৌছে গেলাম।

গ্রামের নাম কোলহুসি। পাভলভনগরও বলে—বৈজ্ঞানিক পাভলভের সাধনপীঠ পাভলভইনস্টিটিউট এখানে। সেই তীর্থে এসে পৌছলাম। বাড়ির সামনে পাভলভের বিশাল মূর্তি।

তাবৎ ছুনিয়ার বিজ্ঞানীরা পাভলভকে জানেন। আনাড়ি মানুষ আমি কি বোঝাতে ধাব? টুকেও আমি নি তেমন কিছু। বিজ্ঞানে পাকাপোক্ত জন করেক আমাদের দলে—তাঁরা বলছেন, কিছু টুকতে হবে না মশায়, বাড়ি গিয়ে জলের মতন বুঝিয়ে দেবো। অনেক খোশামোদ করেছি সেই মহাশয়দের, আজ দেবো কাল দেবো করে কাটিয়ে দিলেন। তার মানে, গুঁদের কাজ হয়ে গেছে—বিদেশের দশটা জিনিষ দেখেছেন আশা এবং চর্চাচোষা উন্নয় ভর্তি করা। আবার ঘনি বাইরে বাওয়ার কথা ওঠে, লিঙ্গির দকলের উপরে দেখবেন ওরাই।

বিপ্লবের উপর বিষম খাপ্পা ছিলেন পাভলভ। জারতন্ত্র খতম হলে তিনি ইংল্যান্ডে চলে গেলেন। গবেষণা সেখানে চলেছে। এমিকের বানিকটা গুছিয়ে নিয়ে লেনিন তাঁকে আনবার জন্ত লোক পাঠালেন। দেশের গৌরব অমন এক বৈজ্ঞানিক ভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকবেন, বৃষ্টিপাত তাঁর গবেষণার ফলভোগী হবে—তা কিছুতে হতে পারে না। পাঠালেন খুদ গোঁকিকে। পাভলভ যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। লেনিন দমলেন না। আবার লোক গেল—রাজনীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক? শহর থেকে দূরে নিরিবিবিল গবেষণার সমস্ত রকম সুবিধা পাবেন। পছন্দ না হলে চলে আসবেন আবার।

এলেন পাভলভ। ব্যবস্থা দেখে খুশি হলেন। জীবন কাটিয়ে দিয়ে এখানেই তিনি দেহ রেখেছেন। ভারি মানারম জায়গা। ল্যাবরেটরি বাড়িগুলোয় পাশ দিয়ে উচ্ছল বরণ করছে, উঁচুনিচু জমি, ঘনগ্রাম গাছপালা—পাথরে মানুষের মনেও কবিতা গুণগুণিয়ে ওঠে। এহই মধ্যে থেকে তপস্বী পাভলভ আত্মবিন বিজ্ঞান সাধনা করে গেলেন।

দোতলায় উঠতে লেনিনের ছবি। ঘরে চুকে খুব বড় ছবি পাভলভের। অশ্রুতিপূর্ণ এক বৃদ্ধ—পাভলভের সাক্ষাৎ শিষ্য—এখানকার প্রাধান। মোটামুটি একটু বোঝাচ্ছেন আমাদের—শরীর ও অভ্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন। মীরা দোভাবিনী—তর্জমা করে দশে বন্ধ করে হেসে ফেলছে। খই পাচ্ছে না সেও, একরকম বোঝাতে গিয়ে অস্তরকম হয়ে বাচ্ছে। বড্ড গোলমালে ব্যাপার—বলছেও সেই কথা। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিন্তু অবিচল—বলই বাচ্ছেন তিনি। তাঁর কাছে জলের মতো তরল—অপরে কেন গুলিয়ে ফেলবে, তাঁর বোধ হয় ধারণার আসে না।

বুসলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজতে ভিজতে ল্যাবরেটোরি-বাড়ি গেলাম; দুর্গকে কঠিনো বার না নিচের তলার। বোকা-ছাগল ভেড়া ইহর ইত্যাদি জানোয়ার। এদের নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চল। মৃণ্মীপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বাঁচি। ছ-একটা পবীক্স আমানের দেখিয়ে দিচ্ছন। একটা ক্যামেরা ফ্রেমে গোলক-ধাঁটার মতো নানা পথ। তার মধ্যে ঈঁড়ুর ছেড়ে দেওয়া চল। ঈঁড়ুরের গতিবিধির ছায়া পড়ছে একটা কাঁচের উপরে—সমস্ত আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। বেলের ক্ষীণ আওয়াজ—সঙ্গে সঙ্গে দেখি মরীয়া হয়ে ইহর ছুটল। কি কারণ? ইতিপূর্বে ঈঁড়ুর দেখেছে, বেল বাজবার এক সেকণ্ড পথে ঐ জায়গায় বিদ্যুতের শক লাগে। ঠেকে শিখেছে, অতএব শক হতে না হতে সে পালাল। সোজা পথে ছুটছিল—এক জায়গায় হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে এক পাশের বাঁকা পথে মোড় নিল। কেন? আর কয়েক ঠিকি সোজা পথে এগিয়ে দেখেছে, বিদ্যুতের শক লাগে। অতএব সে বাঁক ঘুরল, এক তিল থিখা না করে।

কিন্তু লাভটা কি হল এত খরচপত্রের ল্যাবরেটোরিতে এমনিতরো পবীক্স? সাধারণ লোক আমরা—ঐ মোট হিসাবটা বুঝি। লাভ বিস্তর—মুগগি ডবল আঙা পাড়ছে, গুটি পোকা অনেক বেশি বেশন বানাচ্ছে। মুগগির বাপাবটা শুধু ন।

মুগগি একবার মাত্র ডিম পাড়ে রাতিবেলা। মোটামুটি বায়ো ঘণ্টার দিন, বারো ঘণ্টার রাত। ঘরের মধ্যে মুগগি বেখেছেন। ছ-ঘণ্টা দিনের মতো আলো দিয়ে কৃত্রিম দিনমান করুন। তার পরের ছ-ঘণ্টা অন্ধকার করে হোক কৃত্রিম রাত্রি। তার পরে আবার দিনমান, আবার রাত্রি। এক অসহ্যরাত্রির মধ্যে দুটো রাত্রি বানানো হল—মুগগি বোকা বনে গিয়ে দু'বার ডিম পাড়ল। চলল এমনি। অভ্যাস শেষটা এমন পাকা হয়ে ঝাঁড়ল—আপনা হতেই দু'বার ডিম পাড়ে, আলোর বাঁধা দেবার দরকার হয় না। ঐ মুগগির বাশের মধ্যেও দু'বার ডিম দেবার অভ্যাস বর্তে বাবে।

সন্ধ্যার পর শহরে কিয়ে এসাম। সোজা হোটলে নয়, আর এক জায়গা ঘুরে আসি। কিগোভ সংস্কৃতিভবন (Kirov Palace of Culture)। মন্ডার কিরবার তাড়া—নবম্বর-বিপ্লবের উৎসবের তিনটে দিন মাত্র বাকি। কাল রাত্রেই লেনিনগ্রাড ছাড়ছি, তার মধ্যে বতসুর সেবে নেওয়া যায়। ছোটদের সংস্কৃতিভবন আগে দেখে এসেছেন, এটা হল বড়দের। বাচ্চাদের ব্যবস্থাও আছে এখানে, তাদের জন্য আলাদা শিশু-বিভাগ। যে কোন পেশা হোক আপনার, যে ট্রেড ইউনিয়নের লোক হন আপনি (সব রকম পেশারই ট্রেড ইউনিয়ন আছে) এখানে অব্যাহতিবার। আনন্দ, আমোদ-আজাদ করুন, পড়াভরো পান-বাছনা কলাচর্চা খেলাধুলা—বেশন

অভিষ্টি। রোজ পাঁচ হাজার লোক আসে। দুটির দিন হলে আটদিন হাজার।

সাইক্রিশ বছর আগে বিপ্লবের স্কুলিং দেখা দিল এখানে—এই লেনিনগ্রাডে। সে আনন্দ—নজর আহুক আর না আহুক—বিশেষ কোনবানে ছুড়াতে হুক বাকি নেই। কমিক মানুষ খাটবে ও রোজগার করবে, শুধুযাত্র ঈঁড়ু নয়—মানল করবে তারা, সাংস্কৃতিক জীবনের বোল-লান্না অবিকার তাদেওও। এমনি সব প্রতিষ্ঠান সেই জন্মে। লেনিনগ্রাডে কমিকদের সংস্কৃতিভবনও জাব আশিটা। সেই সব প্রতিষ্ঠানের মানুষও আসেন—এটা হল কমিক মাস্তেই মেলামেণার জায়গা। ছাত্রোও আসে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union of Workers of Culture) নামে এক বিভাগ, ছাত্রো স্থানকার সভা। কুড়ি কোপক, অথবা ছাত্রের যে সরকারি বৃত্তি পায় তার এক শতক হল মাসিক টালা। আর ঐ যে শিশু-বিভাগের কথা হল—শিশুদের কিছুই লাগে না, এমনি এসে জমে। বছরের পরচ বারো মিলিয়ান কবল—সরকারই দেয় সমস্ত। তার মধ্যে এক মিলিয়ন কবল বিশেষ ভাবে শিশুদের ব্যবধে। সবই খরচ করে ফেলতে হবে কিন্তু, কবল বাঁচানো চলবে না।

কিরভ নামে এক কমিক-নেতা নিহত হয়েছিলেন উনিশ বছর আগে। তার নামে প্রতিষ্ঠান। লেনিনগ্রাড-অবরোধের সময় হাসপাতাল হয়েছিল এখানে। হাসপাতালে বোমা মেবেছিল—আনন্দ-বোমা—যোগিসের সখিয়ে ফেলতে হয়। লড়াইয়ের পর আগাগোড়া মেহামত হয়েছ।

কমিক-মানুষ যখন, নাচবে তো গৌরো-নাচ, গাইবে তো গাঁয়ের গান—এমনি এক অবস্থা পুখে রাখেন আপনার। লোক-কলা অবহেলিত নয় এ জায়গায়, কিন্তু ক্লাসিকাল অভিজাত কলারও পুতোপুচি চর্চা। নাটক করে নিজেরা—থিয়েটার-হলে তেরশ বসবার জায়গা। ভারি কদর থিয়েটারের। গোটা সোবিয়ত দেশ জুড়েই থিয়েটার-প্রীতি। টিকিট বিক্রি এজেটের মারফতে, সংস্কৃতিভবনে

ফোন ৩৪-৫০০২

সবকিছু সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস  
কে, এল, সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বঙ্গ বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কারো আসতে হয় না। কর্মিকদের ধারে দেওয়া হয় টিকিট। তিন মাস পরে শোধ করে। অপেরার দল আছে—হুশ' চল্লিশ এসে শিখে যায় তার মধ্যে আঠারো থেকে বাট সর্বশ্রেষ্ঠের লোক। জুলাই-আগস্টে দলে নতুন লোক নেওয়া হয়। বাবা সক্ষম সমর্থ এবং গলায় বাসের সুর আছে, তাগা দরখাস্ত করে। গত বছরের অপেরার পালা—কোয়ায়েট ফ্লো ডন ( Quiet Flows the Don )। এমন অনেকে আছে গানের গ জানত না, পেশাবাদের মতো এখন গান শিখে নিয়েছে। শেখানো হয় একেবারে মুখুত। লোকে টিকিট কেটে অপেরায় আসে, তাই থেকে খরচাটা উঠে আসে। লাভ করা হয় না এক পরসাদ।

ব্যালের দল আছে, দেড়শ জন দলে। এর জন্যে টিকিট নেই। নাটকে দল—একটা বড়দের, একটা বাচ্চাদের। পুরানো ক্লাসিক নাটক এবং হালের সোবিয়ত নাটক—সব রকম অভিনয় করে। সোবিয়তের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্যের চর্চা হয়। লোকবস্ত্রের অর্কেস্ট্রা এবং হাল আমলের অর্কেস্ট্রা। তরুণ ছেলেমেয়েরা সোবিয়তের ও দেশবিশেষের সঙ্গীত শেখে, সেজন্য দরজা ব্যবস্থা। ভারতীয় সিনেমা-ছবি আসছে কিছু কিছু, তার বড় আদর। টিকিট সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। এক ছবি বিশ্বর দিন ধরে চলে।

লোকচার-হল। রাজনীতি অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত আন্তর্জাতিকতা—নানান বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নামজালা গুলী-জানীরা এসে বলেন, লোকে ভিড় কবে শোনে। খেলার বিভাগ—বাইরে ছড়োছড়ির খেলা, ভিতরে রম্য ক্যানোয়ার খেলা। দাবার প্রতিযোগিতা হয়—সেটার খুব নাম। কলাচর্চার রকমারি ব্যবস্থা—

দেড় হাজার লোক এসে এসে নিখরচায় নিয়মিত শেখে। তরুণ তরুণীদের জন্য নানাবকম পাটি ও অভিনয়ের ব্যবস্থা।

লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। দশ হাজার মেসার, চাঁদা লাগে না। সব রকমের বই আছে। একটু বক্তৃতা হল : তিনটি ভারতীয় ডেলিগেশন এরই মধ্যে স্বার্থনা করোচ্চ আমরা এই জায়গায়। ভারতকে আমরা ভালবাসি—ভারত শান্তি চায়, সম্পর্কটা সেই ভর বেশি ঘনিষ্ঠ। আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা দেখে গেলে, বোলো এর কথা দেশে ফিরে গিয়ে। আমাদের বক্তৃতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল—‘ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা’।

মস্ত বড় নৃত্যশালা, সাড়ে তিন-শ ফুট লম্বা। হুশ মানুষ এক সঙ্গে নাচে। বল-নাচ নাচছে এ দেখুন। ছেলেরা মেয়েরা তো বটেই, কিন্তু মেয়ের মেয়ের বেশি। এরা জুড়ি পায়নি, মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি—লাড়াইয়ে বিস্তার ছেলে খতম হয়েছে। ছেলের ছেলের নাচছে ওদিকে ক-জোড়া। আমরা ঢুকতেই বাজনা ধামল। যে যেমন ছিল, নাচ ধামিয়ে ঠাঁড়াল। অভাবনা হবে একটুকু, তার পরে আবার নাচ। নাচবেন? আশ্বিন না—হু-পা নেচে যান। ওরে বাবা, মুহূর্তে আমরা কেটে পড়ি।

শখের ছাব আঁকা হচ্ছে একটা ঘরে। পটের মতো নিশ্চল একটি মেয়ে—তাকে দেখে দেখে ছোঁকারা চতুর্দিকে ছবি আঁকছে। লোক সঙ্গীতের ঘরে গেলাম। গান হচ্ছিল—বিপ্লবের আমাদের এক লোক-গাথা। ছেলেমেয়েরা চেয়ার ছেড়ে দিল আমাদের জন্য। ইটালীয় লোকসঙ্গীত চলল এর পরে। পুশকিনের গান গাইল এক ইজিপ্তিয়ান মেয়ে। এক বুড়ো কারিগর গান গাইলেন—মানে বুঝিনে, কিন্তু অবিকল আমাদের কালোয়াকি গান। [ ক্রমশঃ ]

## চৈত্রের দিন চলে যায়

### অসীম সেনগুপ্ত

তবুও তাকে বিদায় নিতে হলো।  
খুলতে হল আগুন-রঙা বেশ;  
চোখের তলে ঈষৎ ছলোছলো—  
মুহূর্তে হলো জলের লেখা, রেখা।  
বুকের মাঝে উঠলো বেজে আজ,  
কি এক ব্যথা : কি এক ব্যথা ভরে।  
বাবার আগে শ্রুতির ভীষণ লাজ,  
কাঁপলো নাকি দেহের রক্তে তার।  
অনেক ঘনি চরণ ছিল ছুঁয়ে—  
অনেক গানে শ্রবণ ছিল ভরা;  
আবুর দীপও নিখিয়ে দিয়ে হুঁয়ে,  
চলতে তাকে হলোই আজি ঘরা।  
চলতে হবে বলেই সে তো চলে,  
কঠে নিয়ে একটি মালাগাছ :  
পথের শেষে পথিয়ে দেবে বলে—  
নতুন কোন দ্বিধা এসে আজ।

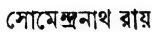
এই কথায়... কার বাড়ি...  
গত এড়ানো গেল না, বলতেই হল কি

## সবাই ড্যানেল -



এই জনাই  
অন্য যে কোন  
মার্ক চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বণ্ড  
চা**  
বেশী লোকে খান !





\*মূলতঃ যে জায়গাটির আশ্রয় পরিবারের লোক কবর দিছিল, সেই জায়গাটা অনেক কষ্টে পাওয়া গিয়েছিল। তখনলুম, ওটা নাকি হস্তশিল্পীরাই ব্যবহার করত। আশ্রয়ের সঙ্গে কবরস্থানের মতো মতো খনন

র মরম আছে শুনিছি। ওই আরগাটা যুনিগিপালিটির কাছ  
আমাকে কিনিয়ে দিতে হবে বাবু।

অকৃত্রিম বিষয়ে বলে উঠলাম, “সে জায়গা কিনে কি করবে?”  
রমজান উত্তর দিল, “বুড়োর ভীষনতি হয়েছে বড়দা। বলে,  
র কবরের ওপরে ও এমন একটা ইয়াদগার তৈরী করাবে,  
আমার ভাঙ্গমহলের সামিল হয়। সারা জীবন লোকে যেমন  
শ্রদ্ধা করেছে, মরার পর সেই ইয়াদগার দেখে যেন তারা  
নি সেলাম বাস্তায়।”

হেসে বললাম, “সারা জীবনে তাহলে অনেক টাকাই হোজাকার  
হচ্ছে মকবুল। তা ও ইয়াদগার-কার তৈরী করিয়ে কেন অনর্থক  
মানুষ করবে? ওর চেয়ে চ্যারিটেবল হাসপাতালটার দান কর  
যু, কাজের কাজ হয়।”

হাসবার চেষ্টা করল বুড়ো। বলল, “ওর কথা শোনেন কেন  
! ভাঙ্গমহল বানাতে বাজনার ঐখুঁশ লাগে। আমার যে  
না আছে, তাতে কোন রকম ছোটখাট একটা ইয়াদগার বানানো  
য়। আপনি যখন বলছেন হাসপাতালে টাকা দিতে, তখন যা  
রি দেব বই কি।”

বললাম, “মিউনিসিপালিটির জমি কিনতে হলে অনেক  
জম্ব বাশু। তাই হাসপাতালে কিছু টাকা দান করলে, ওদিক  
দেও সুবিধে হবে তোমার।”

“সে তো ভাল কথাই বাবু, আমার তো তাতে আপত্তি নেই।  
নকাল ঘনিয়ে এসেছে আমার। আপনার লোক কে-ই বা আছে  
টেক্সপিস্ট। মরবার আগে শুধু তাই তার কবর চোখের জলে  
সিয়ে আঁকি জানাই, সারা জীবন ধরে দোজখের আগুনের দহানি  
কে করবে কি প্রাচীতিবির শেষ হয়নি? কি করলে আমার গুণাগার  
শব হবে, কে হাদিশ যেন বাতলে দেয়। খোঁসাতালার মেহেরবাশি  
হাশা করি না বাবু। বারে একদিন অন্তায় করে গলা টিপে মেয়ে  
হুজুতিনুয বাগেব মাধার, তার কাছে মাক চেয়েই যেন শান্তি  
মলে মরার আগে।”

আবেগে ভারী হয়ে এসেছিল মকবুলের গলা। বড়-বড় লজ  
হাছিল স্নেহের। বললাম, “আজ্ঞা, আমি এ বিষয়ে কথা বলে  
রাখব। পরে এস তুমি।”

রমজান বলল, “হাঁ চাচা, তুমি বাও এখন। ভয় নেই। একবার  
যখন ভয়সা করে খুলে বলতে পেরেছ বড়দার কাছে, তখন কয়লালা  
একটা হবেই।”

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল মকবুল রমজানের সঙ্গে। সামনের টেবিলে  
ধরনের কাগজখানা দেখে মুখ ঘোঁরা আর গোঁষ বুলিয়ে নেব একবার  
ভাবছি, কিরে এল রমজান। বলল, “মাসখানেক হল এসেছে বুড়ো  
এখানে। খায় আমার বাড়িতে, শোয় মস্তাজ মিক্কার ডাড়া  
বৈঠকখানায়। বুড়ার অনেক পরমা বড়দা, কিন্তুক বেজায় কিল্পন।  
আমাকে গত মাসে পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছিল। এ মাসে চাইলুম।  
বলে কি না, খাওয়াস তো ভাল আর রুটি। অত টাকা খরচ হয়  
কিসে শুনি? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ইয়াদগার বানাতে বলে রেখে  
গিয়েছে, আর আমার হেল-মেয়েরা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়।”

কোন কথা না বলে মিটি-মিটি হাসতে লাগলাম আমি। রমজান

আমার মেয়েকে। ও মরে বাবার পর ওদের কবর-জিহাদ করবার  
জন্ত। কিন্তু কবে মরবে, সেই আশায় আজ পেটে কিল মেয়ে বসে  
থাকি কি করে বলুন দেখি?”

বললাম, “ওর টাকার ভরসার তো আর ছিলে না তুমি?  
না দিলে কি করতে পার বল?”

হাত-মুখ নেড়ে রমজান বলল, “করতে পারি না-ই বা কি বড়দা?  
বাটা খুঁনে এসেছেন এত দিন পরে সাধু সেজে হিবার কবরের ওপরে  
ইয়াদগার বানাতে। যদি আজ পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিই, কে এসে  
বাঁচাবে শুনি? ওর আসল পরিচয় জেনে কে ওকে নিজের বাড়িতে  
রেখে বেতে দিত? কিসের লেগে এত হেঁপা সটব আমি?”

বিরক্ত হয়ে বললাম, “তা আমি কি করব?”

“আপনিই পারেন বড়দা। ওকে বলেছি, আপনিই এ অঞ্চলের  
মাতব্বর। পুলিশের ভয়ে অস্ত্র লোকের কাছে বুড়ো যাবে না। জমি  
কেনার সময়ে আমাকে কিছু টাকা আদায় করে দিতেই হবে বড়দা।  
ওকে ঠিকিয়ে টাকা আদায় করতে কোন পাশ নেই। বউকে খুন  
করে ফেরার হল, ছেলোটো রেল-লাইনে গলা দিয়ে ম’ল। এখন উনি  
এসেছেন ওদের কবরের ওপরে ইয়াদগার বানাতে। আপনাকে বললাম  
না, চাঁদির ছুতো মেয়ে শু মাহুবেব সেলাম আদায় করতে চায়।”

বললাম, “হাতে পায়ে এক কালে সে খুন করেছিল বউকে।  
এতদিন ধরে তার জন্তে ও কম ব্যয় শেয়েছে মনে মনে। তাই ত  
মরবার আগে ছুটে এসেছে বউয়ের কবরের ওপরে ইয়াদগার  
বানাতে।”

“শোনেন কেন বড়দা!” উড়িয়ে দিল রমজান। “হুকুম করে  
বলতে পারি, চাঁচির মুখখানা মনে করতেও পারে না বুড়ো। যে মাহুয  
জাহাজে বন্দরে আজ পঁচিশ বছর কাটিয়েছে, তার অন্ততঃ পাঁচশটে  
বিবি আছে পঁচিশ জায়গায়।”

“দূর, তাই কখনো হয়? তাহলে একটি একটি করে পরমা  
জমাতে পারত কখনো?”

“হু’হাতে দোরাই কারবারের পরমা লুঠেছে বুড়ো, নিজের কুতির  
জন্তে ছাড়া আর কিছুতে খরচ করতে হয়নি। কাজেই জমবে না,  
কেন? আমাদের মত মাধার বাম পায়ে ফেলে মাগ-হেলেকে  
খাওয়াতে হত, তাহলে দেখতাম ওর ইয়াদগারের সখ আসে কোথা  
থেকে। বাই হোক, ও নিয়ে আর হু-খু করে কি করব? আপনি  
বড়দা’ মেহেরবাশি করে বুড়োর ওই জমিটা কেনার ব্যবস্থা করে  
দেবেন। বলেছে তো কবর-জিহাদ করার জন্তে গিয়ে যাবে কিছু।  
তবে ও বুড়ো ঘু-ঘু যদি ঠাকর আমাকে, ওকে ঠিক বুলিয়ে দেব,  
আপনাকে বলে রাখছি বড়দা।”

সেমিন আরও কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গিয়েছিল রমজান।  
তারপর ক’দিন ওদের সঙ্গে দেখাও হয়নি, আমিও এ বিষয়ে ভেবে  
দেখবার অবকাশ পাইনি। পরের হুবিহার সকালে হাসপাতালের  
ডাক্তার বাড়িতে এসেছিল সবাইকে কলোরা ইনফ্যুয়েন্সার দেওয়ার  
জন্ত। ওকে দেখেই মনে পড় গেল মকবুল আলির কথা। সম্পূর্ণ  
ইতিহাস গোপন রেখে প্রয়োজনীয় অংশটুকু জানালাম ডাক্তারকে।  
বললাম, “মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের বলে বলেও তো তোমার  
হাসপাতালের উন্নতি করতে পারলাম না। যেমন ওষুধের ঠিক,  
কেনি মাসের চিকিৎসা।”

“চিকিৎসার আর দোর কি দাঁদা?” বিরক্ত হল ডাক্তার। “ডাক্তার দেখলেই তো আর অস্ত্র ভাল হয়ে বাবে না! বেশ তো, ব্যবস্থা করে দিন না মুসলমান ভ্রাতৃলোকের কাছ থেকে হাজার আঠেক টাকা। তিন বেডের একটা ইনডোর ওয়ার্ড খুলে দিই। তারপর দেখবেন, আপনাদের মত লোকেরাও তাঁর সুযোগ-সুবিধে নিচ্ছেন।”

ডাক্তারের রাগ অমৌলিক নয়। আমাদের এ অঞ্চলে মানুষ কম। তাই চিরকালই মিউনিসিপ্যাল অথরিটিদের কাছে এ অঞ্চল অবহেলিত। হাসপাতাল একটা আছে, কিন্তু সে নামেই। ধানকয়েক ভাড়া বেষ্টিত। একটা ওয়ুথের আলমারি আর এই ডাক্তার আর একজন কম্পাউণ্ডার ছাড়া একটা ইনডোর বেডের প্রাচীন নেই পর্যাপ্ত। বললাম, “অত টাকা দিতে পারবে কি জানি না, তবে কিছু টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছে।”

অর্ধেক হয়ে উঠল ডাক্তার। “বাই দিক, ব্যবস্থাটা করে কেলুন না দাদা শীগগির। মানুষের মন পাটাতনে বেশী দেবী হয় না। কে লোকটা বলুন দেখি? আমি চিনি না?”

“না চিনলেও দেখেছ তাকে। পাগলা মত একটা বুড়ো, মুখে আধ হাত দাড়ি। কান্নাপাড়ার বাগানে গোরস্থানের কাছ ঘোরাঘুরি করে।”

বুড়ুর ইনস্পেকশন নেওয়া শেষ হয়েছিল। সে বলে উঠল, “কে বাবা, সেই ছেলেরা বুড়োটা? কাল সে আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমি তখন সাহু দাঁকে ডাকতে বাজিলাম। মা বলল, জিজ্ঞাসা করে আর সাহুবা সিনেমা দেখতে বাবে কি না। এই বাঃ!” বলেই জিত কটল বুহু। তারপর কালকান্দ মুখে বলল, “তুমি যেন মাকে বলে দিও না বাবা, আমি সিনেমা বাবার কথা বলে কেসেছি তোমাকে।”

ডাক্তার আর আমি হাসলাম একটু। ওর শিরে হাত বুলিয়ে ডাক্তার বলল, “কখন এসেছিল সেই বুড়ো?”

“কাল বাবা আপিস বাবার পরে।”

“কি বলল এসে?”

“কি জানি আমি শুনিনি। বা ভর পরে গিয়েছিলাম আমি। ওই বুড়োটা, জান বাবা, গোরস্থানের কবরের ধারে বসে থাকে দিন-রাত। কেউ বখন থাকে না, তখন ও মাটি খুঁড়ে মড়া বার করে খায়। সাহু দাঁ নিজে দেখেছে।”

আমি ওকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠালাম। বললাম, “সাহু মিছে কথা বলেছে।”

ডাক্তার বলল, “কবরের ধারে বসে বসে করে কি বুড়ো? কেউ মারা গেছে নাকি?”

রেগে ডেকে বললাম, “ওর বউকে কবর দেওয়া হয়েছিল ওই জারগাটার, বুড়োর ইচ্ছে, বউয়ের কবরের ওপরে ছোট একটা মুসল ইয়াদ্‌গার বানায়।”

“ও বাবা, বুড়োর প্রাণে তাঁহলে সব আছে বসে?”

“সব কি প্রেরণা, কি করে বলব? বউয়ের মৃত্যুর পর থেকে একটি একটি করে পরলা জমিয়ে যে ইয়াদ্‌গার বানাবার স্বপ্ন দেখে, তার সেই সারা জীবনের আত্মনিগ্রহ আর এবল ইচ্ছেটাকে সব বলতে পারি না। তবে ইচ্ছেটা একটু অস্বস্তি ধরনের বই কি।”

“তা সে তার জ্ঞানো পরলা দিয়ে বা খসী কলক, আপত্তি করব

না। মোট কথা, হাসপাতালে তার টাকা দেওয়া চাই। আগে মানুষের প্রাণ, না মরা মানুষের স্মৃতি? বেশ তো, তার বউয়ের স্মৃতি রাখতে চায়, টাকা দিক। হাসপাতালের ওয়ার্ড তার বউয়ের নামেই রাখা হবে।”

“আচ্ছা, তাকে কাল ডেকে পাঠাই, তুমিও এসো। তার পর কথাবার্তা হবে, কেমন?”

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা রমজানের সঙ্গে বুড়ো মকবুল আলি এর আমার বাড়িতে। ডাক্তার তখনো আসেনি। আমি বললাম, “ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। উনি বলছেন, অস্ত্র পক্ষে হাজার দশেক টাকা দিতে হবে তোমাকে হাসপাতালের উন্নতি জন্তে। অবশ্য তেমনি হাসপাতালের নাম হবে তোমার বউয়ের নামে চাও তো তোমার নিজের নামটাও ওই সঙ্গে জুড়ে দিতে পার।”

“সব তো বুঝলাম বাবু। কিন্তু অত টাকা পাব কোথায়?”

“পাবে আবার কোথায়?” রমজান ঝাঁকিয়ে উঠল। “খলি ঝেড়ে বার করবে। তোমার ইয়াদ্‌গার কার উপকারে আসবে শুনি? এতে তবু পাঁচটা লোক চিকিৎসা করতে পারবে, নাম করবে তোমার।”

“আমার তো অত টাকা নেই বাবু! সারা জীবন খালসীর কাজ করে ক’পর্যন্ত জমানো ব্যয় বলুন?” কল্লণ গলার আবেদন জানাল মকবুল আমার কাছে।

“আর তোমার চেরাই ব্যবসার টাকা? আমরা মুকু মুহু মানুষ বলে ঘাসে খুব দিয়ে চলি নাকি?”

“কেন বিশ্বাস কবছিসু না রমজান? আমার কে আছে, যে জমিয়ে রেখে বাব টাকা? যে খুদ-কুঁড়ো থাকবে, তোর মেয়ে আমিনাই পাবে।”

“রেখে দাও তোমার কাঁকা কথা। সববই তুমি হুঁকে দেবে ইয়াদ্‌গার বানাতে, তা আর জানি না?”

এই সময়ে ঘরে ঢুকল ডাক্তার। কাঁক পেয়ে বললাম, “এই যে ডাক্তার। দেখ ভাই, বলছি মকবুলকে, হাজার দশেক টাকা হাসপাতালের জন্তে দান কর, নাম হবে তোমার। তা বলছে, পাবে কোথায় অত টাকা।”

খিস্তি হয়ে ডাক্তার বলল, “সে কি মিঞা? তনলাম জাহাজের ক্যাপ্তেন ছিলে তুমি, হু’হাতে উপায় করছ। পাঁচ জনের উপকারে লাগে এমন সংকাজে ব্যয় করলে পুণ্য হবে তোমার।”

“বাবু, সত্যি কথা বলতে কি, দারে পড়ে জাহাজের এঞ্জিনে কয়লা ঠেলা এঞ্জিনারের চাকরি নিয়ে দেশান্তর হয়েছিলুম এক কাল। শেষতক মেট হয়ে কাজ ছেড়েছি। সামান্য মাইনে থেকে কটা পরলা রাখা যায়? তবু হু’চায় পরলা যে জমিয়েছি, সে নিতান্ত প্রাণের দারে। আর সব খালসী লঙ্করেরা বন্ধরে বন্ধরে স্মৃতি করে গুডাত পরলা। মন যে টানেনি কৃতিবাজিতে, তা তো নয়। কিন্তু বখনই মনে পড়েছে কৃতি-করার অবিকার নেই আমার, তখনই গাটরে পেড়ে ইচ্ছে, পরলা খরচ করতে আর মন ওঠেনি।”

“সে তো বেশ ভাল কথাই। নষ্ট না করে যে পরলা জমিয়েছ, পাঁচ জনের উপকারে যদি লাগে সে পরলা, সেই তো দেখা উচিত। শুনেছি ছেলে-বউ কেউই নেই তোমার। কার জন্তে আর রাখতে বাবে টাকাকড়ি?”



হুঁচোখ জলে ভরে এল বুড়ার। বলল, “বারা নেই, তাদের মনে করেই জমিয়েছি টাকা।” ইচ্ছে আছে, আমার বোঁবেটার। এটা ছোট ইয়াদগার গৈছে রেখে বাই।”

“তাতে আর কত খরচ হবে তোমার?”

“হিসেব করে তো দেখিনি বাবু, তবে হাজার দুই টাকা তো বাই। এখন জমির দাম পড়বে কত, সেটা আগে জানতে হলে নিশ্চিত হতাম।”

“সে আমরা ব্যবস্থা করে দেব, লাগবে না বিশেষ কিছু। দপাতালের ভিত্তে টাকাটা দিলেও সেই একই কথা হবে। তোমার ব নামেই হাসপাতালের নাম হবে। যত লোক চিকিৎসা করতে আসবে, সবাই একবার করে নাম করবে তোমাদের।”

“তাতে তো আমার আপত্তি নেই বাবু! কিন্তু আপনারা যে কার কথা বলছেন, অত টাকা তো নেই আমার! গুণে গৈছে বিনি, তবে মনে হয়, সব সমেত হাজার চার পাঁচেক টাকার বেশী বে না।”

“খুব হবে। পঁচিশ বছর ধরে জমিয়ে ওই ক’টি টাকা হয়েছে,। কি বিশ্বাস করা যায়? ভাল করে গুণে দেখ একদিন। সামান্য কিছু টাকা তোমার কাছ থেকে নিয়ে হাসপাতালের কোন স্থায়ী গঞ্জ তো হবে না। তা হতে গেলে কম করেও হাজার আটেক টাকা লাগবে। সে টাকা তোমার দিতেই হবে মিঞা!”

“আপনার পায় হাত দিয়ে বলছি বাবু, অত টাকা সত্যি নেই আমার। ইয়াদগারের ভিত্তে হাজার দুই টাকা রেখে বাকি সব ঠাকাই দিয়ে দেব আপনাদের, কিন্তু ওই হাজার দুই টাকা আমার রাখতেই হবে।”

“আহা-হা, পা ছাড়, পা ছাড়,” বিব্রত হল ডাক্তার। “আচ্ছা, ভাল করে গুণে দেখ আগে, তারপর যেমন ভাবে খরচ করলে ভাল হয়, তাই করা হবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে আর মিথ্যে বল না বাপু!”

“না বাবু, মিথ্যে বলব কেন? কম টাকার কথা বলছেন, অন্যায় উপায়ে আমিও যথেষ্ট বোজগার করতে পারতাম। পারিনি শুধু এই ভেবে, মিথ্যের পরসার ইয়াদগার বানালে পাপ আমার বেড়েই বাবে। নিজেকে যদি একটুও ভোগে রাখতে পারতাম, তাহলে আর এই বয়েসে শরীরের এই দশা হয়?”

“কত বয়েস হল তোমার?” হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলাম আমি।

“তিন কুড়ি পুরতে এখনো বছর চারেক বাকি আছে হুঁজুর!”

“সে কি হে, দেখলে তো মনে হয় সত্তর হয়ে গেছে তোমার বয়স।”

“আজ্ঞে, বছর তিনেক কাশির ব্যামো আর গলায় একটা ঘা হয়ে এত কাহিল হয়ে পড়েছি।”

“গলায় বা আছে নাকি তোমার?” প্রশ্ন করল ডাক্তার।

“আছে বই কি বাবু! জাহাজের ডাক্তার বাবু বলেছেন, খুব খারাপ ঘা নাকি। বলেছেন, এ ঘায়ের চিকিৎসা নেই কিছু। দম্বে দম্বে মরতে হবে তিন-চার বছর ভূগে। তাই তো তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে চলে এলাম। মনে মনে যে সঙ্কল্প করে বেঁচে রইলাম এতদিন, উদয়াস্ত খেটে একটু একটু করে জমাটুম পরসার, সে তো বেকরগা হয়ে বাবে হঠাৎ মরে গেলে। এক একবার বন্দন কাশির দমক

আসে, মরে বাবার মত হই, তখন আত্মাকে ডাকি শুধু। আমার গুণাগার শেষ না হতেই তোমার দরবারে টেনে নিও না আমা! দম্বে দম্বে মরাই আমার পাশের প্রাচীন্তর। তার ভিত্তে ঘাবড়াই না। কিন্তু কাজ আমাকে শেষ করে যেতেই হবে মবার আগে।”

ডাক্তার বলল, “আচ্ছা, কাল সকালে একবার আমার হাসপাতালে এস দিকি, দেখব ঘাটা।”

দিন কয়েক ওদের আর কোন খবর পাইনি। কাপড় দিতে এসে রমজান বলে গেল, “দেখলেন তো বড়না, বুড়ো কি রকম মিথ্যাক?”

আমি বললাম, “কি ব্যাপার হল?”

“কেন, আপনি কিছু শোনেন নি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে? সেদিন বলল না, হাজার চার-পাঁচ টাকা আছে মোটে ওর। ডাক্তার বাবু চপেচপে ধরতেই বেরিয়ে পড়ল সব। সাতটি হাজার টাকা জমিয়েছে বুড়ো।”

“ডাক্তার কত টাকা বাগালো মকবুলের কাছ থেকে?”

“আপাতক পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে বুড়ো। তবে ডাক্তার বাবু ছাড়বে না। গৈড়েন-মুখে বার করে নেবে ঠিক।”

আরও কিছু দিন পরে সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি, বুড়ো মকবুল বসে আছে আমাদের দরজার সামনে। আরও খারাপ হয়ে গেছে চেহারা। প্রাণপণে কেশেও সামলাতে পারছে না। একপাল কৌতুহলো শিশু-জনতা নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রশ্নগণে ভর্তুকিত করছিল বেচারাকে। কেউ কেউ হুঁ-চারটে ছোট ইটের টুকরোও ছুঁড়ে থাকবে। আমি যেতেই পালাল সব। বললাম, “কি খবর মকবুল? ছেলেগুলো উৎপাত করছিল বুঝি?”

একটু সামলে নিয়ে সে বলল, “না বাবু! সোনার টুকরো সব। আমার পোষাক-আশাক দেখে মণিরা ভয় পায়। মনে করে ছেলেধরা।”

“তার পর, তোমার খবর কি? ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কত দূর এগুলে?”

“বলছি বাবু! আপনি এখনি আপিস থেকে এলেন, ভেতরে বান। আমি অপেক্ষা করছি খানিক।”

“আচ্ছা, ভেতরে এসে বস তুমি। আমার বেশী দেরী হবে না।” ভেতরে গিয়ে মকবুলকে এক কাপ চা আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে বললাম দ্বীকে।

ফিরে এসে সুনলাম মকবুলের কাছ থেকে, ওর অসুস্থতা। ডাক্তার পাঁচ হাজার টাকা নিয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। বলেছে আরও হাজার দুই টাকা না পেলে মিউনিসিপ্যালিটির বাবুদের কিছু বলতে পারবে না। এগিকে কুল্যে আর এক হাজার সাতশ’ টাকা বাকি আছে। ইয়াদগার বানাতে হাজার দুই টাকা লাগবার কথা। আবার ওগিকে রমজান আর তার বউ শাসাচ্ছে দিন-রাত। কবর জিরেত করার ভিত্তে যে টাকা দিয়ে বাবে বলেছে সে, আগে তা দিক। না হলে কেমন করে পাড়ায় বাস করে মকবুল, আর কে ওকে খেতে দেয়, তা তারা দেখে নেবে। বললাম, “আজ-কাল খাচ্ছ কোথায় তুমি?”

“অন্নখটার ভিত্তে বাবু, খাবার তেমন ইচ্ছে হয় না।” যেদিন

বলে কি না, ওর টাকা চুরি করেছে আমি। তোর টাকা ছোঁবার আগে হাতে কুঠবাঁধি হবে না রে বুড়ো? তোমার ইয়াগার বানানো বাঁধ করছি। বেশছাড়া যদি তোমায় না করেছে তো বাপ-মারে আমার নাম রমজান দেয়নি।

অন্ন অন্ন কাশছিল মকবুল। বলল, “নীল ঢেক লুটির খুঁটে বে টাকা বাঁধা ছিল, তার হাতিস কে জানত, তোর মেয়ে আমি। ছাড়া?”  
“কে জানত তার আমি কি জানি? তোমার নীল লুঙ্গি না সবুজ সোপাটা কার খুঁটে টাকা বেখেছিলে, তার আমার কি জানি?”  
বাঁধা দিয়ে বললাম, “কি হচ্ছে রমজান? কেন বাজে চোঁচোমেচি করছ?”

“হচ্ছে করে চোঁচোমেচি করছি না কি বড়দা? বেলো তিন পহর অন্ধি দানা-পানি জোটেনি, এক-তালি কাপড় আছড়ে উঠে শুনি, বেটা খুনে আমার আমিনাকে বা নর তাই বলে গাল দিচ্ছে। বলে, ওর টাকা চুরি করেছে আমি। আমার মেয়েকে পাড়ায় ঢেলে না কে? বলুক তো দেখি কেউ তার স্বভাব খারাপ?”

“মকবুলের টাকা কিছু হারিয়েছে নিশ্চয়ই, না হলে মিথ্যা কেন বলতে আসবে বল?”

“হারিয়েছে বলে আমার মেয়ে ছুঁবি হতে হবে কোন বিবেচনার?”  
“ও কোথায় টাকা বাঁধে, তোমার মেয়ে জানত। তাই জিজ্ঞাসা করেছে।”

“না বড়দা, ও বুড়োর হয়ে বলতে আসবেন না। খাঁতির হাথতে পারব না।”

“বটে?” রাগ করে বললাম, “তাই তুমি ওকে ধরে ঠাড়াবে?”

“জালবৎ ঠাড়াব। বলেছি ত, এ পাড়ার ও কেমন করে বাস করে দেখে নেব, তবে আমার নাম রমজান।”

“বেশ, দেখে নিও কেমন পার। যদি এর পর শুনেছি কোন পোলমাল করেছ তুমি, তাহলে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে, এ বলে রাখলাম।”

“তাতে শেহ-পা নই বড়দা। খুনে আসামী, বউ-বেটাকে মেরে রেখে ফেয়ার হয়েছিল এমনি। ওর টাকার লোভে আপনাদের মত জম্মরলোকের দরদ উথলে উঠতে পারে। আমার ছেড়ে কথা কইব না। আমিও খানায় গিয়ে বলে আসছি সব। দেখি কি হয়।”

“খুব সুবিধে হবে না তাতে। ওর পরিচর আমরা কেউ জানতাম না। তুমিই ওর টাকার লোভে নিজের বাড়িতে রেখেছ এত কাল। আজ আর আশা নেই দেখে উৎপাত শুরু করেছে। সাজাটা তাহলে তোমাকেও কম পেতে হবে না।”

“ওজাকি বা করেছি তার তো আর চারা নেই। তবু সাজা পাই পাব, ও বুড়োকে ঝাঁসিতে ঝোলাবই, এ দেখে নেননি।”

ডাক্তার এর মধ্যে কখন এসেছিল দেখিনি। হঠাৎ কে পেছন থেকে বলে উঠল, “খাম তুমি। লজ্জা করে না, জোয়ান মর্দ হয়ে একটা আঘমরা বুড়োর গারে হাত তুলতে? বেশী ট্যাং হুঁ কোরো না রমজান, নিজেই বিপদে পড়বে।”

মকবুল বলে উঠল, “কমা তান কর্তারা। বেশী লাগেনি আমার। হাসের বাঁধার গারে হাত তুলেছি, তাই নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না।”

বীতবুধ খিঁচিয়ে উঠল রমজান। “ও, আমার দরদী এরকম

বে। নিজের চরকার তেল দাগাটা চাচ। আমার হয়ে কথা বলতে হবে না।”

ডাক্তার মকবুলকে ওপর ওপর পরীক্ষা করে বলল, “তুমি একবার কাঁকেও সকে নিয়ে ডিপেন্সারীতে এস, বুঝলে? একটু ডেস করে দেওয়া দরকার।”

বিরক্ত হল মকবুল। “কি আর হয়েছে বাবু, ও নিজে থেকেই সেরে যাবে। আমার সেই জমিটার কি হল বলুন দেখি মেহেরবাণি করে? পাহাণটা ঠাণ্ডা হোক।”

ডাক্তার আর আমি হেসে ফেললাম পরস্পরের দিকে চেয়ে।

দিন কতক পরে ডাক্তার হল আমার কাছে সন্ধ্যাবেলা। বলল, “মকবুল বুড়ো সত্যি সত্যি বুকে খুন করে ফেঁদার হয়েছিল নাকি সমীর বাবু?”

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন বল ত?”

“সেদিন চেয়ারম্যানকে জমিটার কথা বলতে এক কথায় রাজি হয়ে গেল, সে তো আপনি জানেন। আজ দুপুরে আমার ডেকে বলল, ওদের কানে এসেছে, মকবুল নাকি ফেঁদার খুনি আসামী। এখন তেনেসনে এমন একটা লোককে তো জমির দখল দিতে পারে না মিউনিসিপালিটি?”

বললাম, “বাপারটা সত্যি। এখন কি উপায় করা যায় বল দেখি?”

চিন্তিত হয়ে ডাক্তার ভাবাব দিল, “সেই তো ভাবছি। চেয়ারম্যানকে তো আপনি জানেন। কোন স্বামেলার মধ্যে যেতে রাজি নয় ও। আপনি একবার কমিশনার রাম বাবুকে দিয়ে যদি ইন্টারভিউ করতে পারেন, তাহলে হয়ত কাজ হতে পারে।”

হেসে বললাম, “ভাল খবর নিয়ে এলে বা হোক। এদিকে বুড়ো তো জমি জমি করে খেয়ে ফেললে আমাকে। রোজ ছুঁবার করে তাগাদা দিতে শুরু করেছে।”

বিম্মিত হয়ে ডাক্তার বলল, “বলেন কি? ওকে উঠতে পর্বত মানা করে দিয়ে এসেছি পরন্তু। শুনেছিলেন, সে দিনে ও বাবার দাখিল হয়েছিল?”

“না, তা শুনিনি। তবে চেঁহারা দেখে বুঝতে পারি, খুব কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারী।”

“কাহিল! ও উঠে বেড়াচ্ছে শুনেই ত চমকে গেছি আমি। যদি বা আর কিছু কাল পরমায় ছিল বুড়োর, এরকম করলে তো একটা সপ্তাহও টিকবে না।”

বললাম, “কালই তবে রাম বাবুর সঙ্গে গিয়ে চেয়ারম্যানকে ধরি, কি বল?”

চেয়ারম্যান সুবোধ দত্ত লোক মন্দ নন, তবে বড় সাবধানী। সহজে কি ওকে রাজি করতে পারি? রাম বাবু বললেন, “লোকটা যে হাসপাতালের ভাড়া এত টাকা দিল, তার ভগ্নেও অজ্ঞতা কিছু করা দরকার আমাদের।”

“করা দরকার বলে যে-আইনী কিছু করতে বলেন না নিশ্চয়ই?”

“সবই কি আইন-মার্কিক হচ্ছে বলতে চান? সাপও মরে লাঠিও না ভাদে, এমন একটা ব্যবস্থা করলেই হয়।”

“বেশ তো, সে রকম একটা ব্যবস্থা বাতলে দিন না?”

জোবেলিত রাম বাবু বললেন, “ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে

বা শুনেছি, তাতে লোকটা বেশী দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। তিন কুলে ওর কেউ নেই যে, পরে গুয়ারিশনের মাংসা কান্ডে আসবে। সামান্য আধ-কাঠাটুক জমি যদি ও দখল করে, এখন না হয় আমরা চোখ বুজেই বইলাম। পরে এ নিয়ে হাঙ্গামা হজ্জ্ব হলে বলতে পারব, আমাদের অজ্ঞাতগারে জমির দখল নিয়েছে বুড়ো। ইঞ্জেশান স্ট্রাট একটা কান্ড করে নিলেই চলবে তখন।”

“উহু”, বাড়ি নেড়ে গভীর ভাবে সুবোধ বাবু বললেন, “জেনে- শুনে এ অজ্ঞাতের প্রস্তাব দিতে পারি না।”

রাগ করে রাম বাবু বললেন, “কত অজ্ঞাত চোখের ওপর ঘটেছে দিন-রাত, দেখে বাজেন মূখ বুজে। আর গোরস্থানের পাশে ছ’টুক পোড়ো জমির দখল কে নিল, তার জন্তে একবারে আইন-ই-আকবরী খুলে বসতে হবে। বেশ তো, গোলমাল হয়, আমরা আছি। আপনি নিজে থেকে বাঁটাতে বাবেন না, কথা দিন।”

“তা কি করে বলি। আমি তো মিউনিসিপ্যালিটির ইন্সপেক্টর আগে দেখব। তা ছাড়া লোকটা ভাল হত, সে একটা কথা ছিল।”

“আপনার অজ্ঞাত কথা সুবোধ বাবু! পঁচিশ বছর আগে একটা লোক খুন করে থাকেও যদি, আজ মরবার সময়ও কমা পাবে না সে? ধরুন সে পঁচিশ বছর জেল খেটেই এসেছে। আর বা শুনেছি এঁদের কাছে, তাতে তার বড় কম শাস্তি হয়নি এত দিন ধরে। বাই হোক, ও ছ’চার ছটাক জমি নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না।”

“না, সে আমি এখন কথা দিতে পারি না। আচ্ছা, আরও দর কমিশনারদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, তারা কি বলেন।”

রাগ করে চলে এলাম আমরা। রাম বাবু বললেন, “দখল নিক বুড়ো ও জমির, তারপর লড়া হবে। এ্যাসেসরকে বলে রাখব, ও জমির পরচা পোলমাল করে রাখবে। দেখি কেমন করে আটকার জোরাম্যান।”

হুঁরে এলাম তিন জনে জমিটা দেখে। মন্ত একটা সিমুল গাছের শকড়ে মাথা রেখে ধুকছিল বুড়ো। ডাক্তার গারে হাত দিয়ে হল, “এ তো দেখি বেশ জর হয়েছে। তুমি আজই মরতে চাও নাকি মকবুল?”

“আমার জমিটার কি হল কর্তা?”

“জমির ব্যবস্থা হয়েছে, রাম বাবু বললেন, “তুমি কি এখানে তরী করার বসছিলেন সমীর বাবু, তার ব্যবস্থা করতে পার।”

আগ্রেই উঠে বসল বুড়ো। বলল, “জমিটা তাহলে শাওয়া বাবে আজো?”

ডাক্তার থক দিয়ে বলল, “শুনলে তো কমিশনার বাবু নিজে খেে বললেন। এত দূরে এসে তোমার সঙ্গে বসিকতা করছি বলে মনে হয় না কি?”

“আজ্ঞে অপরায় নেবেন না। ভাবনায় চিন্তার মাথার আর ঠিক হয়।”

“তবে শরীরের ওপর অজ্ঞাতার করছ কেন? হাসপাতালে ভর্তি পারবে, না আমি ওখু পাঠিয়ে দেব?”

“দেখি, নিজেই যেতে পারব বোধ হয়।”

দিন আঠেক আর কোন ধর নিতে পারিনি মকবুলের। বাইরে যেতে হয়েছিল বিশেষ প্রয়োজনে। ফিরে এসে শুনলাম ছোট ভায়ের কাছ থেকে, মকবুল বার বার করে একবার যেতে বলে গিয়েছে গোরস্থানের কাছে, তার ইষ্টাঙ্গারের ভিত খোঁড়া হচ্ছে।

মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম কিছুটা। আমার আর কোন কাজ নেই যে পাঁচশ মাইল পথ ট্রেন-জার্নি করে এসে ছুটেতে হবে গোরস্থানে? মনের সে বিরক্তিতে ইকন জোগালেন স্ত্রী, কাছেই সেদিন আর বাওয়া হয়নি। পনের দিন সকালে বাজারে বাওয়ার পথে দেখা হল ডাক্তারের সঙ্গে। বলল, “আপনি ছিলেন না সমীর বাবু! বা একচোট তুলসাম হয়ে গেল মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে। কমিশনারদের মিটিঙে মকবুলের কেসটা নিয়ে একেবারে কলেজারীর একশেষ। জমিটা দেওয়ার ব্যাপারে সুবোধ বাবুর ধ্ব বেশী অনিচ্ছে নেই। কিন্তু সুবোধ বাবুর নিজের অন্তে ওপিনিয়ান দেবার ক্ষমতা নেই। শালকের ওঁরাই আসলে চালাচ্ছেন ঠিকে। কিন্তু রাম বাবু তো ছেড়ে কথা বলার লোক নন। মিটিঙের মাঝখানে একবারে হাটে ঈড়ি ভেঙে দিয়ে কেড়ে বলে নিয়েছেন একচোট। শালকের ওঁরা চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে ওখানেই শেষ করে দিতে। কিন্তু বেগতিক দেখে সুবোধ বাবু ডেড়ে দিলেন মিটিঙ। বলেছেন আগামী পরন্ত তিনি তাঁর ডিসিসান জানাবেন সিলেক্ট কমিটির কাছে। তার পর প্রস্তাবটা ভোটে দেবার প্রয়োজন হয়, সে তখন নেমটু মিটিঙে তোলা হবে।”

বললাম, “তা হলে এখনও কোন নিশ্চিন্তি হল না জমিটার?”

“না, হল আর কই। তবে চিন্তার কারণ নেই কিছু।”

হাসলাম আমি। “চিন্তার কারণ আর তো কিছু নয়, তাগাদায় তাগাদার অস্থির হয়ে গেলাম। আট দিন পরে বেয়ারস থেকে ফিরে শুনি, মকবুল বার বার করে যেতে বলে দিয়েছে গোরস্থানে। ওর ইষ্টাঙ্গারের ভিত খোঁড়া হচ্ছে নাকি।”

“বলেন কি? আর ক’টা দিন সর্ব্ব করতে পারল না বুড়ো? দেখে দেখি। শালকের ওঁরা যে বকম চটে আছেন, হঠাৎ ওঁদের কানে গেলে এখনি আবার ট্রেন পাসের চার্জে একেবারে পুলিশ কেস না করে বসেন! তাই তো বলি, আজ সাত আট দিন ওখু নিতে এল না বুড়ো! কখন বাবেন ওর কাছে?”

“এই, বাজারটা সরেই বেকব ভাবছি। তুমি আসবে নাকি?”

“ভাবছি দেখে আসি একবার। আচ্ছা, আপনি বাজার সরে নিন, আমি একটু হুঁরে আসি। কাছেই কল আছে একটা।”

খানিক পরে ডাক্তারের সঙ্গে গোরস্থানের কাছে গিয়ে দেখি, কাঠখানেক জারগার গোল করে খোঁড়া হয়েছে ভিত। হাজার দুই ইট সাজান রয়েছে থাক থাক করে। এক পাশে মাথার ওপরে ছাউনি বেঁধে থোরা ভাজছে বেহারী মজুর ক’জন। মকবুলের চিহ্ন নেই কোথাও। ইতস্তত খুঁজে কোন হিশ না পেয়ে ভাবছি কি করা যায়, হঠাৎ নজরে পড়ল দুই সারি সাজানো ইটের মাঝখানে চট বিছিয়ে ওরে আছে মকবুল।

কাছে গিয়ে ডাকতে বাড়া খোলাটে চোখ মেলে তাকাল সে। হাত নেড়ে সেলাম করার তরী করে অনুভূত কি যে বলল বোঝা গেল না। ডাক্তার ক্রিঙ্গা করল, “কেমন আহ মকবুল?”

যত্না-বিকৃত মুখে হাঁ করে আঁড়াল দিয়ে গলা দেখাল সে।  
বুঝলাম গলায় বাধার কষ্ট পাচ্ছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই।

“গলায় বাধা বেড়েছে, আর তুমি ওষুধ-বিষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে  
এই বোদ্ধের মধ্যে শুয়ে আছে?”

কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা হতশার ভঙ্গী করল মকবুল।  
আজ্ঞে আজ্ঞে ওকে ধরে বসিয়ে দিল ডাক্তার। বলল, “নিজেকে  
তো একবারে শেষ করে এনেছ দেখছি। আজ বাদে কাল তোমাকেই  
তো ওই ভিতর মধ্যে শুইয়ে মাটি চাপা দেবে সবাই। কবর খোঁড়ার  
কষ্টটুকুও করতে হবে না কাউকে।”

দরদর ধারে জল নেমে এস বুড়োর চোখ থেকে। ডাক্তার বলল,  
“বসে থাক এখন চূর্ণচাপ, আমি রিক্সা ডেকে আনছি। হাসপাতালে  
ছ’চার দিন থাক এখন আমার নজরে। বুঝলে?”

ডাক্তারের হু’পায়ে হাত দিয়ে হাতজোড় করল মকবুল। তার  
পর হাত নেড়ে দেখাল বোঁড়া ভিত আর ভাড়া খোয়া। অনেক কষ্টে  
খনখনে গলায় বলল, “কে দেখবে?”

“সে কথা আর ভাবলে কোথায় তুমি? তা হলে কি এমন করে  
মরতে পারতে? তোমার যে অবস্থা হয়েছে, দু’টো দিনও আর বাঁচবে  
কি না সন্দেহ! মরে গেলে দেখবে কে তখন?”

মকবুলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে  
গেল ডাক্তার। নিজের বাসা থেকে ক্যাম্পাশট আনিয়ে কম্পাউণ্ডারের  
ঘরে ইন্ডোর বেড তৈরী করাল। ওষুধ, ইঞ্জেক্সন, গলায় জো  
ইত্যাদি দিয়ে দু’দিনের মধ্যেই অনেকখানি তাজা করে তুলল  
বুড়োকে। চতুর্থ দিনে আমি গেছি হাসপাতালে বুড়োকে দেখতে,  
ডাক্তার বলল, “আবার এক ফাসাদ জুটল সমীর বাবু!”

প্রশ্ন করলাম, “কি হল আবার?”

“ধানার কে খবর দিয়েছে, মকবুল ফেরারী খুনী আসামী।  
দাবোপা তাই আমার কাছে এসেছিলেন গত কাল। বলছেন, এর  
পেছনে ইন্সপেক্টরিয়াল লোক জড়িত আছে। কাজেই বাণ্যারটাকে  
চাপা দেওয়া সহজ হবে না। আই-জি অফিসে তিনি রিপোর্ট দিয়ে  
পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে ইন্সপেক্টরান না আসা পর্বন্ত আসামীকে  
নজরবন্দী রাখতে চান। আমার এখানে মরণাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসার  
জর রয়েছে জেনে আর পুলিশ পিকট রাখেন নি। এক দিক যদি বা  
সামলানো’গেল, আবার এক দিকে বেধে গেল বন্ধাট। এমন অপর্যায়  
লোক আমি বাপু জন্মে দেখিনি।”

আমি বললাম, “এক দিক সামলালে মানে?”

“আপনি শোনেন নি? মিউনিসিপ্যাল অথরিটি রাজি হয়ে  
গেছে জমিটা দিতে। অবশ্য এই নতুন ডেভেলপমেন্টটা আগে জানা  
গেলে কি হত বলা যায় না।”

“দেখ, তাহলে হয়ত পরে আবার ডিসমিসন চেজ করতেও পারে।”

“তাই তো ভাবছি। এত কাণ্ড করেও বুধি শেষ বন্ধা হয়  
না।”

“সে বাক, বা হবে দেখা বাবে। তোমার কঙ্গী কেমন আছে  
বল?”

“আছে তো ভালই। কিন্তু ধরে-বঁধে তো আর চিকিৎসা করা  
যায় না। কে যে ওকে খবর দিয়েছে ইট, চূর্ণ, সুরকি, সব নাকি  
চুরি হয়ে বাসছে ওর। ঐরাপটা পড়ে আছে বোঁড়া ভিতের কাছে।

গত কাল থেকে চূর্ণচাপ কান্দছে শুধু। ধমক দিয়েছি খুব। এমন  
করলে জমির ব্যবস্থা হবে না মোটেই।”

ডাক্তার চল গেল আউটডোরে কঙ্গী দেখতে। ভেতরে গিয়ে  
বললাম মকবুলের পাশে টুলে। জিজ্ঞাসা করলাম, “কেমন আছে  
মকবুল?”

ঝিহুজিল বেচারী। আমার প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকাল।  
বলল, “সেলাম হুজুর! ডাক্তার বাবু ওষুধে সব ব্যথা কমে  
গেছে। এখন আমাকে ছেড়ে দিতে ছকুম দিন বাবু! ওদিক  
আমার ইট চূর্ণ সুরকি সব বেরাক চুরি হয়ে গেল।”

আমি বললাম, “এ সব গল্প কে করেছে তোমার কাছে?  
আমি নিজে আজ দেখে এসেছি, সব ঠিক আছে তোমার।”

আগ্রহে উঠে বলল মকবুল। “আপনি আজ গিফ্টলেন  
ওখানে বাবু?”

মিথ্যে কথাটাকে জোর দিয়েই বললাম, “তবে আর বলছি কি?”

“কাজ-কর্ম কবছে সব? দেয়ালা গাঁথা সুরু করেছে? তবে  
তো আমি আর থাকতে পারিনি এখানে। ওদের কাছে থেকে  
না দেখিয়ে দিলে কি বানাতো কি বানিয়ে বসবে, তার কিছু ঠিক  
আছে? আপনি ডাক্তার বাবুকে মেহেরবাশি করে ছুটি করে দিতে  
বলুন আমার। চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হবে থাকব  
হজুর!”

বিস্ত্র হতে বললাম, “আরে, তোমার কাজ, তুমি না সেবে  
উঠলে কি হতে পারে? কাঁধ এখন বন্ধ আছে। তবে জিনিষ  
পত্র সব ঠিকঠাক করে রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছে। তুমি আগে  
এখানে কিছুদিন চূর্ণচাপ থেকে সেবে ওঠ ভাল করে, তারপর  
নিজে দেখাতেনা করে পছন্দমত তোমার ইয়াদগার তৈরী করিও।  
বুঝলে না? এখন বাদে হিমে কষ্ট পেলে আবার পাকিয়ে তুলবে  
অস্থর। ডাক্তার বাবু তোমার স্ত্রী কতটা করছেন সে তো দেখতে  
পাছ? ওর কথা না শোনা কি উচিত হবে তোমার?”

“আমি তো বেশ ভালো হয়ে গেছি বাবু, অম্বনরে কান্দ-কান্দ  
হতে গেল মকবুলের কষ্টবর। কত রোদে জলে পোড় খাওয়া  
শরীর, কত ধকল সয়ে তবে না টাকা জমিয়েছি পচিল বস্ত্র  
ধরে। আবার কিছু হবে না বাবু! আপনি ডাক্তার বাবুকে  
বল দিন।”

বিস্ত্র হয়ে বললাম, “সে আমি বলতে পারব না বাপু! দু’দিন  
আপেক্ষা করে শরীর সারিয়ে নিতে যদি আপত্তি থাকে তোমার,  
বা খুশী কর। আমি কিছু বলতে পারব না ডাক্তারকে।”

“রাগ করবেন না বাবু, আমার মাথার ঠিক নেই। তবু আদালত  
কত দিন আর থাকতে হবে আমাকে?”

“সে আমি কি করে বলব? ভাল ভাবে চিকিৎসা করাও যদি,  
তাড়াতাড়িই ভাল হয়ে উঠবে।”

চলে এলাম ওর কাছ থেকে। কিন্তু অপরাধী হয়ে রইলাম  
মনে মনে। সত্যি ওর জিনিষপত্র সব চুরি হয়ে বাসছে কি না কে  
জানে। হওয়া ত কিছু বিচিত্র নয়। একবার দেখা উচিত ছিল।  
কিন্তু ফিরে এসে এমনই কাজে আটকা পড়ে গেলাম যে মনে রইল  
না সে কথা।

পরের দিন সকালে চা খেয়ে বাইরে পাড়িয়ে গল্প করছি, পাড়ার

এক ডয়লোকের সঙ্গে। দেখি, হন-হন করে আসছে ডাক্তার, তার তার পেছনে ধানার দারোগা। আমাকে দেখে ডাক্তার বলল, “একবার কবরখানার দিকে যাচ্ছি সমীর বাবু! আসবেন নাকি?”

বললাম, “কি ব্যাপার?”

“আমুন, যেতে যেতে বলছি।”

চললাম, সকাল বেলা আমারই মত সবে চা খেয়ে বাইরে বেরুতে বাবে ডাক্তার, হঠাৎ তার কোয়াটারে দারোগা এসে উপস্থিত। বলল, গতকাল রাত্তিরে আই-জি অফিস থেকে অর্ডার এসেছে, সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগষ্ট যে অর্ডিন্যান্সে বহু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, মকবুলকেও সেই কারণেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যখন তার সম্পর্কে লোকাল ডাক্তার, ধানার ইনসপেক্টর এবং রেসপেক্টবল পাবলিকের সহায়ত্বিত আছে। দারোগা সব কিছু খুলে লিখেছিল রিপোর্টে। এও লিখেছিল, বেশী দিন আর বাঁচবে না আদামী। দুবারোগা ক্যানসার হয়েছে গলায়। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে বেচারী। সকালে খবরটা পেয়ে মহানন্দে ডাক্তার মকবুলকে দেখতে যাচ্ছিল। এমন সময় কম্পাউণ্ডার এসে বলল, কলী আগের বাত থেকে নাকি উঠাও।

বেগে গেল ডাক্তার। আগের বাত থেকে উঠাও, অথচ এখন সে কথা জানাতে এসেছে কম্পাউণ্ডার? উত্তরে লোকটা বলল, দোষ তার নেই। রাত নটাখ খাবার লাগার নিয়ে বিজ্ঞানায় শুটয়ে দরজায়

তালি দিয়ে তব্বে গেছে সে। কলী যদি জানলা টপকে পালায়, সে কি করতে পারে?

“কাল রাত্তিরে যে পালিয়েছে সে, জানলে কি করে?”

“মোড়ের পানওলা বলল। মকবুলকে দেখে সে প্রাণ করেছিল, কি বুড়ো, অগ্রথ ভাল হয়ে গেল? উত্তরে মকবুল একবার হ্যাঁ, বলেই দৌড় মারে অন্ধকারে।”

আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারও সেই একই অবস্থা। দারোগা বললেন, “অত জোরে ছুটেন কেন মশাই? ছ’মিনিট আগে গিয়ে আর কি লাভ হবে?”

কথার উত্তর না দিয়ে চললাম আমরা আগের মত বেগেই।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, জটলা করছে কয়েকটি বয়স্ক লোক আর ছেলেপুলে। সঙ্গে দারোগাকে বেধে সঙ্গে পাঁড়াল সবাই। আগের সেই ইটের ভূপ সত্যিই অনেকখানি নিঃশেষিত। টুকরো খোয়াও যেন অর্থক হয়ে গেছে। সেই যে গোল ভিত কাটা হয়েছিল দেখেছিলাম, তাই আছে এখনও। বাড়তির মধ্যে শুধু এক কোণায় থাক থাক করে সাজান শ’খানেক ইটের গায়ে হেলান দিয়ে বিকৃত মুখে কাঠ হয়ে মরে পড়ে আছে বুড়ো মকবুল। বিক্ষারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার অসম্পূর্ণ ইবাদগায়ের দিকে!

### — কিস্ত —

কিছুটা নিরস কারন্য কতকটা সত্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বামী নিকৃষ্ট সত্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচরিত কলানৈপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ মাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার লুচ সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোনদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নিষ্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অবসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



অজস্র চিত্রকলা  
এসোবার ভাস্কর্য  
আগ্রার ভাস্কর্য  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০-*ভূপেন-কুমারী ঈশিকার-গ্রাম-গিনি* ৫৫৮



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

ব্রাঞ্চ:

২০৮, রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা-২৯



[ ପୂର୍ବପ୍ରକାଶିତର ପର ]

## ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଫ୍ରେଗଡେନ ଥେକେ ଶୋଭା ଭିରେନା । କିନ୍ତୁ ଭିରେନାର ନିରହୁଣ,  
ବୈଚିତ୍ରାହୀନ ମହୁର ଦିନଗୁଳି ଅସହ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଏହି  
ଜନ୍ମ-ବାଧାବଦର କାହିଁ ।

ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ ନିଜେର ନେହେର କଥା—ପୁରାନୋ ଦିନଗୁଳି ପୁରାନୋ  
ବହୁ-ବହନନେର ସ୍ମୃତି ନିଜେ ଜେମେ ଉଠିଲେ । ପାଞ୍ଜି ଦିଲ୍ୟାମ ଡେନିସେର  
ପଥେ—

ଦୀର୍ଘ ତିନିଟି ବହୁର ପର ଆବାହ ଦେଖା ହୋଇଲା ଶିଫ୍ଟସମ ଅଭିଭାବକ,  
ବାହୁର ଯାସିରେ ଗ୍ୟାଗାଗିନେର ଥକେ । ଦେହେ ମନେର ଯାସ୍ତୁର୍ବ୍ୟ କୋଥାଓ  
ଏତଟୁକୁଓ କାଟଲ ଥେନି—ଠିକ ଆଗେର ମତହି ଅକ୍ସକ୍ରିମ ଆନେ  
ଓକ୍ସକ୍ରିମ ହେଉ ଉଠିଲେନ ଆମାକେ ମେରେ । ଆର ତାର ଅଭିଜ୍ଞ-ସନ୍ତର  
ବହୁ ହୁଟି ବାହାବୋ । ଆର ଜାଗୁଲୋଓ କିନ୍ତୁ କମ ହୁଣି ହୋଲେନ ନା—  
ଏହି ହୁଣିର ସନ୍ତର ମେରେ ଆମାକେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସାନ୍ଧ୍ୟେ ବହୁନ ଆନେର  
ସକେ କିରତେ ନେଧେ ।

ଆମାର ଏହିବାରେର ଗୃହେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଯୋଟେର ଉପର ଗୁଡ଼ି  
ହୋଇଥିଲେ । ଯାତି-ନୀତି ଆର ଲୋକଚରିତ୍ରେ ଇତିମଧ୍ୟେ ବାଧେ  
ଅଭିଜ୍ଞତାହି ଅର୍ଦ୍ଧନ କରେଇଲା । ନନ୍ନ ଭଜ ବାହାର, ଆଭିଜ୍ଞତାସୂର୍ଣ୍ଣ  
ସନ୍ତାନବୋଧ ସବି ଆମାର ଆରତେ । ଆର ତାର ସକେ ସାଧାରଣେର ଡେର  
ନିଜେକେ ଏକଟୁ ଉଠୁମେରେ ବଲେ ମନେ କରାଟା ଡେ । ଆମାର ହବାବେହି  
ହିଲେ—ସେହି ପୁରାନୋ ସବାଜ୍ଞା ଡାବଟାଓ ବେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ମୁଝୁହୁଡ଼ି  
କିତ ନା ତା ନର କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଏହାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା,  
ସ୍ବ ସବତ ଆର ଗଣ୍ଡାର ହୋଇ ଥାକବୋ ।

ଯାସିରେ ଗ୍ୟାଗାଗିନେର ବାଡ଼ୀତେ ଆମାର ନିଜେର ସନ୍ତାନିତେ  
ଏହି ତିନିଟି ବହୁର ପରେ ହୁକେ କି ବେ ଡାଲୋ ଲାଗଲେ । ସେଥାଲେ  
ବେଟି ବେନ ଡାବେ ରେଖିଲାସ ଡେନିମ ଡାବେହି ରରେହେ । ଏତଟୁକୁଓ  
ନଡ଼କ୍ ହସିନ କୋଥାଓ । ଆମାର କାଗଜପତ୍ରେର ଉପର ଏକ ହିକି  
ମୁକ୍ ହୁଲୋ ନେଧେ ବୁଲ୍ୟାମ, କେଉଁହି ସେଗବେ ହାତ ଡେରିନି, ସବାରିନି,  
ଆମି ବାଡ଼ି କେବାର କରେକ ଦିନେର ମଧ୍ୟେହି ଆଭିଜ୍ଞାଟିକ ଶାଗରେ  
ସକେ ବାସସରିକ ହିଲୋଥେର ହୁକ ହୋଲୋ । ଯାସିରେ ଗ୍ୟାଗାଗିନି  
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଆର ନିର୍ଦ୍ଧନତାପ୍ରିୟ ହିଲେନ । ତାହି ଏହି  
ଓକ୍ସବନ୍ଧ ଦିନଗୁଳି ଏଡ଼ାବାର ଜଡେ କରେକ ଦିନେର ମତ ପାହୁରାତେ  
ଥାକବେନ ଠିକ କଲେନ । ଆମିଓ ଡୀର ସକୀ ହୋଲାମ । ପାହୁରାତେ  
ଓକ୍ସେ ଶୌଚ୍ଚ ଦିରେ ହୁ' ଏକାଗିନି ପରେହି ଧନିବାରେର ଏକଟା ଡାକସାଞ୍ଜିତେ  
କରେ ଆମି ଡେନିସେର ପଥେ କିରଲାମ । କିନ୍ତୁ ଏଥାଲେଓ ସେହି  
କୌତୁହଲବୀ, ଡାଗାସେବୀର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତି ସଜଡେ ବଢିଲେ ଆର ଏକ  
ବିପର୍ଣ୍ଣ । ବାଦି ଏକ ମିନିଟ ଆଗେ କି ପରେ ବେବାତାସ ଡାକିଲେ

ହରତୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଡ଼ାହି ହୋତୋ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନେର ପ୍ରୀତିଟି ବାବେହି  
ବୈଚିତ୍ରାସ ବାସ ଜଡେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାର ଜଡେ ମହୁଣ ପଥ କୋଥାସ ?

ଓରିଯୋଗାର କାହାକାହି ଆସତେହି ଦେଖଲାମ, ଏକଟା ନୁସନ୍ଦିତ  
ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡବେଗେ ଆଗାହେ । ଆମାର ଗାଡ଼ିର ପାମ  
କାଟିରେ ବେତେହି ଦେଖଲାମ, ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଅମୁର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ଧାରୀ ଏକଟି ମହିଳା  
ଆର ଜାର୍ଜାମ ଅକିସାରେର ପୋଷାକେ ଏକ ଭଜ୍ଜଲୋକ ବରେହେନ ।  
କିନ୍ତୁ ମଳକମାଞ୍ଜ—ପରହୁହୁଡ଼ିହି ଆମାର ଡୋଧେର ସାମନେ ଗାଡ଼ିଟା ଗତିର  
ବେଗ ସାମଲାତେ ନା ମେରେ ଡିନେଟି ମେଲୋ ଆର ମହିଳାଟି ସଜୋରେ  
ହିଟକେ ମିରେ ନଦୀର ପାଞ୍ଜି ପାଞ୍ଜି ମେଲେନ—ସେଥାନ ଥେକେ ଏକେବାରେ  
ନଦୀର ବୁକେ ମଡ଼ିରେ ହାଲେନ ନେଧେ ଆମିଓ ଲାକ ମିରେ ଗାଡ଼ି ଥେକେ  
ନେଧେ ହୁଟେ ମେଲାମ ମହିଳାଟିକେ ବାଟାତେ । ଆମର ମୁହାଁର ହାତ ଥେକେ  
ଓକ୍ସାର ମେରେ ମହିଳାଟି କିନ୍ତୁ ନନ୍ନ ଭଜିତେର ମତ ବଲେ ବୁଝିଲେନ,  
ତାରମର ମସିତ କିରେ ମେରେ ଡିକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେନ ନିଜେର ଅନନ୍ଦ  
ବେଶବାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜଡତାର ସକେ  
ବେଶବାସ ସନ୍ଧତ କରେ ବାର ବାର ଆମାକେ ବଜ୍ରବାସ ମିତେ ଲାଗଲେନ ଓର  
ଜାମକର୍ତ୍ତା, ବନ୍ଧାକର୍ତ୍ତା ସକେ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଓର ସକୀ ଭଜ୍ଜଲୋକଟିଓ ଉଠେ  
ଏଲେନ, ତିନି ବିଶେର ଆହତ ହନିନ । ପରମ୍ପର ବଜ୍ରବାସେର ମାଳା  
ନେବ କରେ ଆବାହ ଆମାର ଗାଡ଼ିତେ ମିରେ ବସଲାମ—ଓରା ମେଲେନ  
ପାହୁରାସ ଦିକେ ଆମି ଡେନିସେର ଦିକେ ।

ପରଦିନ ଡୋରବେଳା ହୁଗାବେଳେ ଓକ୍ସବେ ବାବାର ଜଡ ହୁଗାବେଳେ ହୁ  
ଡେକେ ବୁଝାନ୍ତୋର-ଏର ଶୋଭାବାଜାର ସୋମ ମିତେ ମେଲାମ ।  
ଆଭିଜ୍ଞାଟିକେର ବିବାହୋତ୍ସବେର ସମ୍ବନ୍ଧ କୌତୁକଟାହି ନିର୍ଭର କରେ  
ଆବହାଓହାର ଉପର । ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କୌତୁକ-ଓକ୍ସବେ ସାମା ଇଓରୋପେର  
କାହି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବାପାସ । ବରା ନୋ-ନୋନାପତି ନିଜେର ଜୀବନ  
ବାଜି ରାଧେନ ଆବହାଓହାର ମଟିକ ଧବର ଦେବାର ଜଡେ । କାଗ,  
ଆବହାଓହାର ଏକଟୁ ଇତର-ବିଶେରହି ଜଳବାନିଟି ଡିନେଟି ବାବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ  
ସନ୍ତାନବା ଆର ସେହି ସକେ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ତ୍ତାବୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରତେ,  
ଓକ୍ସବନ୍ଧୀର ବିଶେସ ସନ୍ତାନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସର୍ବସମେତ 'ନୋଜ'  
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ମାଲିକ ସାମାରି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଆର ସେହି  
ଏକାନ୍ତ ପୋକାସର ବଟନା ହୁଡ଼ାପାବଳତ: ବାଦି ବାଟେ, ତା' ସକେଓ ସମସ୍ତ  
ଇଓରୋପାହି ବିଜ୍ଞାପେର ହାସି ହାସବେ—ବଲେବେ, ନେଧେ ଅବଧି 'ନୋଜ'  
ଆଭିଜ୍ଞାଟିକେର ସକେ ବିବାହଟା ମୁଖୋପରି ମାର୍ଯ୍ୟକ କରତେହି ମେଲେନ ।

ଓରିସେର ଉପର ହୁଗାବେଳା ବେଧେ ଏକ ଜାରମାର ବଲେ ଏକଟୁ କାଦି  
ବେରେ ନିଜିଲାମ—ଏମନ ସବର ଏକଟି ହୁଗାବାରୁତା ମହିଳା ଏଲେ ଡୀର  
ହାତେର ମାଧାଧାନା ମିରେ ଆମାର କାଦେର ଉପର ହୁହ ଆବାସ କରେ  
ଜଲେ ମେଲେନ । ମହିଳାଟିକେ ଅଜେନା ନେଧେ ଆମି ଆର ଓ ବିବରେ  
ବିଶେସ ମଜର ନା ମିରେ କାଦି ନେଧେ କରେ ହୁଗାବେଳା ଏଟି ବେବିରେ



**স্বাস্থ্যবান লোকেরা  
লাইফবয় সাবান দিয়ে  
নিত্য স্নান করেন**

রোজকার \* ময়লা জনিত বীজানু ইহা ধুয়ে সাফ করে দেয়।

\* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেই-জন্তু স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে সাফ করেন আর এইভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন।

লাইফবয় সাবান সেই স্বরকারে তাজা ভাব এনে দেয়





পড়লাম। ক্ষেত্রি ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, মা'সিয়ে জু জাগাদিনের গণ্ডোলা আমার জন্তে অপেক্ষা করছে। আরও একটু গিয়ে 'লা পাই' এর সেতু কাছ দেখি, সেই মুখোশটানা মহিলাটি খুব মন দিয়ে ভাষুমতীর খেল দেখছেন। দশটি করে 'সু' দিলেই খেল দেখাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম মহিলাটির কাছে। পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তখন অমন করে পক্ষ সঞ্চালনে তড়ান করার অধিকারটা তাঁর কোথা থেকে হলো।

—“ওটা তোলা একবার আমার প্রাণরক্ষা করে তারপর আমাকে না চেনার শাস্তি।”

মনে শব্দলো সেদিন গাড়ী থেকে ছিটকে বাওয়া যে মহিলাটিকে বাঁচিয়েছিলাম তিনিই। উপযুক্ত অভিযোগের পর জিজ্ঞাসা করলাম, বুঝি তোর এর উৎসবে যেতে বাজী আছেন কিনা।

—“খুব বাজী—অবশ্য যদি একটা নিরাপদ গণ্ডোলা পাই।”

—“আমার গণ্ডোলাতেই চলুন না, যদি আপত্তি না থাকে। এটা সব চেয়ে বড়ো গণ্ডোলা—”

সব্বের ভ্রমলোকটির সঙ্গে পরামর্শ করে মহিলাটি সম্মতি জানালেন। যেমনি ঠর গণ্ডোলাতে পা দিলেন, অমনি আমি অস্বস্তি করলাম ঠন্দের মুখোশগুলি খুলে ফেলতে। ঠরা বললেন, বিশেষ কারণে ঠরা লোকের কাছে অপরিচিতই থাকতে চান। তবে তাঁরা যে ভেনিসেরই লোক এটুকু নিশ্চিত ভাবেই জানালেন। আমি মহিলাটির পাশেই বসেছিলাম এবং পাশে বসার সুবিধাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য কিছু অগ্রসরও হোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই মহিলাটি সরে বসে আমার উৎসাহকে নিবৃত্ত করছিলেন। উৎসব বাজার শেষে আমরা আবার ভেনিসে ফিরে এলাম। অক্সিসার ভ্রমলোকটি আমাকে রাত্রের আহারের জন্য সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজী হোলাম—কারণ মহিলাটির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্তে অত্যন্ত উৎসুক হোয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য প্রথম দিনের সেই চকিতে দেখা রূপলবণাই আমার মুগ্ধতার কারণ। অক্সিসারটি আমাদের দু'জনকে রেখে আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এই নিভৃত কণ্টকুর প্রথম সন্ধ্যোগেই আমি মহিলাটিকে জানলাম যে আমি ঠর প্রেম্যে পড়েছি—মুখোশে মুখ ঢাকা থাকতে এতটুকু খিঁচা হোলো না বলতে—সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম যে অপেরাতে আমার নিজের একটা বন্ধ সারঞ্জি আছে। আর—আর বেশী কোথাযে না করিয়ে যদি মহিলাটির কাছে আশা পাই তবে কার্ণিভালের শেষ হওয়া পর্যন্ত ঠর কাছে বহাল থাকতে রাজী।

—“আমার প্রতি নিষ্ঠুরতাই যদি আপনার মনোগত ইচ্ছা, তবে সেটা খুলে বলুন।”

—“আপনিও খুলে বলুন, কার সঙ্গে কথা বলছেন বলে আপনার মনে হয়।”

—“একটি অতি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে—তা' সে রাজকুমারীই হোক আর গরীব ঘরের মেয়েই হোক। আশা করি অন্ততঃ আজ থেকেও আপনার মাধুর্যের প্রমাণ পাবো, না হয়তো বলুন আহারের পরই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই।”

—“বা' ইচ্ছা আপনি কখন, কিন্তু আমিও আশা করি আহারের

পর থেকে আপনিও আপনার কথাই ভুলে পবিত্র করবেন—অমন কথাই ভুলেতে কি আকর্ষণ করা যায়? আমার মনে হয় এমন একটা বোঝাপড়া হবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার, বুঝতে পেরেছেন?”

—“হাঁ বুঝি, কিন্তু প্রস্তাবিত হবার ভয়ও যে মনে রয়েছে।”

—“আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য! যে ভয়ের সূত্রতে এই ব্যাপারে বনিক পুত্রন হোতো সেই ভয়ই তোমাকে আমার চোখে নতুন করে তুললো।”

—“আজ একটু আশার বাণী পেলে আমিও নতুন মানুষ হবো। কোমল নম্র মাধুর্য্য আমিও ভরে উঠবো। এই অসম্বন্ধ প্রলাপও আর আপনাকে স্তনতে হবে না।”

—“এই চূপ—”

দরজার প্রান্তে দেখা গেল অক্সিসার ভ্রমলোকটিকে। তাঁর সঙ্গে আমরা হোটেলের নির্দিষ্ট খাবার ঘরটিতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই মহিলাটি মুখোশ খুলে ফেললেন। সেদিনের চেয়ে ঠিক আরও সুন্দরী লাগিলো। এবার মনে হলো যে প্রথমেই জানা দরকার অক্সিসারটির সঙ্গে মহিলাটির কি সম্বন্ধ। কারণ, সেই বুকেই আমাকেও এগোতে হবে। খাবার পর ঠন্দের নিয়ে অপেরায় গেলাম, সেখান থেকে আবার আমারই গণ্ডোলাতে ঠন্দের বাড়ী পৌঁছে দিলাম। বিদায় নেবার সময় অক্সিসারটি আমাকে বললেন, “কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো।”

—“কোথায়? কখন?”

—“সে তো দেখাতই পাবেন।”

পরদিন ভোরবেলাই তিনি এসে হাজির। প্রাথমিক সতর্কতা জানানোর পর আমি তাঁর আসল পরিচয় জানতে চাইলাম অস্ত খুবই সবিনয়ে। তিনি স্বচ্ছন্দেই সমস্ত পরিচয়ই দিলেন কিন্তু একটি বারও চোখ না তুলে। তিনি বললেন যে, আমার নাম পি. সি। আমার বাবা একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ধনী; কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেই আমি চলে আসি। যদিও বাবার অজ্ঞাতসারে তাঁরই বাড়ীতে একটি মহলে আমি থাকি। যে মহিলাটিকে আপনি দেখেছেন তিনি হলেন একেট'সি'র স্ত্রী। মাদাম'সি'রও তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে, অবশ্য তার মূল আমিই—আমিও মাদাম 'সি'র জন্তেই বাবার সঙ্গে বিবাদ করেছি। আমি এই অক্সিসারের পোষাক পরি, কারণ অক্সিসার সৈন্তদের ক্যাপ্টেন হিসাবে সে অধিকার আমার কাছে—কিন্তু আমি কোনো দিনই কোনো কাজ করিনি। ভেনিসেতে গৃহপালিত পশু সরবরাহ করার তার আমি শেয়েছি—সাধারণতঃ হাজরী থেকেই ওগুলি পাঠানো হয়। এই ব্যবসাতে বছরে প্রায় দশ হাজার ফ্লোরিন (ইতালীয় টাকা) লাভ থাকে। কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলি কারণে অত্যন্ত অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে—তার বছর আগেই আমি আপনার নাম শুনেছি—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাও আমার অনেক দিনের। মনে হয় পরশুর ঘটনার নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাত ছিলো—তাঁর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমার একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আপনাকে অস্বস্তি করতে খিঁচা করবো না। এর ফলে আমাদের বন্ধুও গাঢ় হয়ে উঠবে। আমাকে সাহায্য করলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি যদি আমাকে এখন অর্থ সাহায্য করেন তাহলে আপনার চিন্তার কিছু নেই; কারণ এক বছরের জন্য আমার পশু সরবরাহের ব্যবসা আপনার হাতেই তুলে



যাবে, তাইতে আমি টাকা শোধ না করতে পারলেও ঐ ব্যবসার দায় থেকেই আপনার প্রচুর লাভ হবে।”

এই দীর্ঘ বক্তৃতা সহ আবেগের ফল যে এমন করে মার্চের মাসে গিয়ে, সে কথা যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ভাবেই ভাবতে পারেননি। অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই আমি সোজাগ্রন্থিত তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলাম। মনে তাঁর বক্তৃত্যের ভিত্তি উদ্ভূত হোয়ে উঠলো। কিন্তু আমার তাঁকে ধামিয়ে দিয়ে বললাম যে, তাঁর এত জানাশোনা আত্মীয় থাকে সবেও মার চুনিদের পরিচিত আমার প্রতি এই অমুগ্রহ-বর্ষণ কেন? কিম্বা বিচলিত না হোয়েই তিনি বললেন, —“শেখন, আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধিমত্তার কথা সুপরিচিত। সেই জন্তেই আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে কতখানি সুবিধা আর লাভ হবে।”

—সবই বুঝছি। সেই সঙ্গে এটাও বুঝছি যে, আপনার প্রস্তাবে বাস্তবী হলে আপনি নিজেই আমাকে একটি গড় ছাড়া আর কিছু ভাববেন না।”

ভরসোকাটি চলে গেলেন। অবজ্ঞা সন্ম প্রার্থনা করে। বাবার আগে জানিয়ে গেলেন, সেটমার্ক ছোয়ারে মালামার্মার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন। আমার উপস্থিতিও সেখানে আশা করেন। তাইবাৎ যে জায়গায় তিনি আসছেন সেখানেও টিকানাও আমাকে দিয়ে গেলেন—বোধ হয় আশা করেছিলো তাঁর আসার পর সৌজন্য রক্ষার্থে আমিও যাবো। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, একটু বুদ্ধি থাকলেও সেখানে থাকি না। লোকটির চলনান্তে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে মহিলাটির প্রতিও আমার সব আকর্ষণ চলে গিয়েছিলো। সত্যিই আর বোকা বনবার ইচ্ছা ছিল না। তাই ইচ্ছা করেই সন্ধ্যায় সেই সেটমার্ক ছোয়ারে গেলাম না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা আমার সেই ভৌতুতময়ী ভাগ্যদেবীর ইঙ্গিতেই বোধ হয় খালি মনে হোলো, ভরতীর খাতিরেও একবার দেখা করা উচিত বৈ কি। শেষ অবধি চলেই গেলাম।

একজন চাকর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। অকিসার ভরসোকাটি আমাকে লেগে থব আনন্দ প্রকাশ করলেন। সন্ধ্যায় বাইনি বলে নৃত্ব অমুযোগও করলেন। তারপরই আবার শ্রদ্ধা করলেন বাবদার কথা—বাস্তবিকত কাগজপত্র বেহোলো—মারবার আমার মনটা তিক্ত হোয়ে উঠলো। অল্প লাভ দেখানো বখন অসহ্য হোয়ে উঠলো। তখন বাধ্য হোয়ে বললাম, এসব সম্বন্ধ আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না। এই বলে আমি বেই বিলায় নেবার জন্যে উঠলাম। তখন ভরসোকাটি জানালেন যে, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গে আমাকে পরিচিতি করতে চান। এই বলে বেরিয়ে গেলেন, মিনিট দুইয়ের ভিতরই তাঁদের নিয়ে যাব চুকলেন। মায়ের দিকে দেখলাম আভিজাত্যে, ঘেহে, সরলতার প্রকৃত মাতৃমুষ্টি। আর মেয়ে? শুধু সুন্দরী নয়—সৌন্দর্যের আদর্শ ছবি। সে রূপের দিকে চেয়ে শুধু মুগ্ধ নয়—স্বস্তিত হোয়ে গেলাম।

একটু পরেই মা আমার কাছ থেকে বিলায় নিয়ে উঠে গেলেন—মেয়েটি রইলো। মাত্র আধ ঘণ্টা—এটুকু সময়ের মধ্যেই ওর রূপ আর গুণের নিখুঁত পরিচয় পেয়ে মনে মনে স্বীকার করলাম যেহাওয়া। বনহিসরীর মত ওর প্রাণচকলতা, সরল

আনন্দের উজ্জলতা অনাম্রাত ফুলটির মত নিশাপ পরিচ্ছিন্ন চিত্তধারা—অনাবরক্ত সঙ্কোচীন সহজ মাধুর্য আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্যের দ্বার খুলে দিলে। সবার উপরে ওর আশ্চর্য রূপ। সে যেন এক শব্দ বিশ্ব।

মাগমায়াজেল ‘সি সি’ মায়ের সঙ্গে ছাড়া কখনও বেরোয় না। অত্যন্ত বাধ্য মেয়ে। বাবার বেচে দেওয়া বই ছাড়া অন্য বইও পড়ে না—বমিও উপস্থাসের প্রতি প্রচণ্ড সোভ। ডেনিসকে ভালো করে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা। বাড়ীতে কেউ বেড়াতেও আসে না—তাই আজ অবধি লোকমুখে নিজের আশ্চর্য রূপের প্রশংসা শুনে সচেতন হোতে শেখেনি।

মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা কইলাম। কথা বলার চেয়ে তার অনর্গল অল্প প্রবেশ উত্তরই দিয়েছি বললে ভালো হয়। তাও তাঁর অল্পস্ত জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করতে পারিনি। ওর মনটি যেন মুগ্ধিত শতদল—ঝালোর কিরণ সত্তাপাউ মেলেছে—চোখে লেগে আছে যুগ্মতার আবগ—মনটিকে ঘিরে আছে বিচিত্র বিশ্ব। আমি ওকে বলতে পারলাম না—সৌন্দর্যলক্ষী, আমার সমস্ত মন তোমার বন্দনাগানে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে—যে স্তুতিগানে বহু বার বহু নারীর কানে কানে শুজন করেছি—যে আবেদন-নিবেদনে তাদের মুগ্ধ করেছি—সে সবই যেন অর্থহীন হোয়ে উঠলো—মিথ্যার, ছলনার ওই সবল নিশাপ মাধুর্যকে মলিন করতে মন সাহ্য দিলে না—ও বে একক, ও বে অন্তা।

ওদের বাড়ী থেকে সেদিন ফিরলাম ভারাক্রান্ত, অতৃপ্ত মনে। মাধুর্য আর সৌন্দর্যের এই অপূরণ বিকাশ আমার সমস্ত মনকে দুরীর চক্কর করে তুলছিলো। বাড়ী এসে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করলাম, আর ওখানে যাবো না। ওকে দেখলে আমার মন কখনই বৈধ্য ধরতে পারবে না—কিন্তু ওকে বিয়ে করে এই স্বাধীন বহুল জীবনকে শৃঙ্খলিত করতে আমি চাই না—আমি যে ভগ্ন-বাবার। তবুও মনে মনে বার বার স্বীকার করলাম, আমার জীবনে সুখের আনন্দের অমুতবারা-সিঞ্চন শুধু ওই করতে পারবে।

দু’দিন কেটে গেলো। তৃতীর দিনে আমার সঙ্গে রাঙার অকিসার ভরসোকাটির দেখা হোলো। দেখা হোতেই ‘সি, সি,’ বললেন যে, তাঁর যেন না কি সারাক্ষণ আমার কথা বলে। সেদিন আমার সঙ্গে যা কিছু হোয়েছিলো সবও মনে রেখে—...প্রায়ই সে সব বলে। তাঁর মাও না কি আমাকে দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হোয়েছেন। আরও বললেন, আমার বোনের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে কিছু খারাপ হবে না। ওর বিয়ের জন্য লক্ষ হাজার মুদ্রা যৌতুক আছে। আমাকে আবার পরদিন চায়েই নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গেও দেখা হবে আবার।

নাঃ, আমি কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম কিছুতেই আর না বাবার। কিন্তু হায় রে প্রতিজ্ঞা। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও তো পূর্ণপ্রায়ে জলবিন্দু।

তিনটি ঘণ্টা কোথা নিয়ে কেটে গেল আমার মানসলক্ষীর সাহচর্য। কি মধুর তৃপ্তিতেই না মন ভরে উঠেছিলো সেদিন কোয়ার পথে। আমার সময় ‘সি সি’কে বলছিলাম সেই ভাগ্যবান পুরুষকে আমার হিসা হয়, যে তোমাকে পায়ে তায় জীবনসম্বিনীভূত। প্রথম-ওর জীবনে এই প্রথম পুরুষের কাছ থেকে পেল দুঃভার

পরিচয়—প্রথম শুনলো মুক্ত প্রাণসার বাণী। চকিতে লজ্জার দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে—সারা মুখের সে আবীর-ছড়ানো গাঢ় রক্তিমাল। আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন করে দিলো।

কোরার পথে স্থল তীক্ষ্ণ বিরোধে নিজের মনকে যাচাই করতে লাগলাম। আর নিজের মনের প্রকৃত স্বরূপ যতই ধরা দিতে লাগলো ততই মন ভরে উঠতে লাগলো আশঙ্কায়। ওকে জীবনগঙ্গিনী করার দুর্বার প্রোভনকে যেমন সংযত রাখতে পারছি না—তেমনি ওকে ছ’ দিনের বিলাসগঙ্গিনী করার ইচ্ছিতও যদি কেউ করে তবে তাকে সেই মুহূর্তে ধ্বংস করার মত প্রচণ্ড ফ্রোশকেও সম্বরণ করার মত জোর পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন এই দুই ধারার মাঝে পড়ে শিখাছারা হলো। অন্তমন্ডল হবার চেষ্টার জুরাখেলা ধরলাম। স্বপ্ন-বোমের অব্যর্থ ওষুধ বলেই জানতাম জুরাখেলাটাকে।

পরদিন আবার ‘সি, সি’ এসে হাজির। খুব উৎসুক ভাবে জানালো যে, ওর মা ওর বোনকে নিয়ে অপেরা দেখতে যেতে অস্বস্তি দিয়েছেন। আর, ‘সি, সি’ও ভারী খুশী, জীবনেও এসব দেখেনি বলে।

আরও বললে যে, যদি ইচ্ছা করি তবে আমিও ওদের সঙ্গে যে কোনো জায়গাতেই দেখা করতে পারি।

—“আপনার বোন কি জানে যে, আমিও আপনাদের সঙ্গী হবো?”

—“নিশ্চয়ই...আর তাই তো অত খুশী হোয়ে উঠেছে।”

—“আর আপনার মা?—তিনি জানেন তো?”

—“না, কিন্তু একথা শুনলে একটুও রাগ করবেন না বরং খুশীই হবেন। ইতিমধ্যেই আপনার উপর মায়ের বিশ্বাস আর আস্থা যথেষ্ট হোয়েছে।”

—“আচ্ছা, আমি একটা ‘বক্স’ নেবার চেষ্টা করবো।”

—“খুব ভালো—দার একটা জায়গা ঠিক করে বলবেন, সেখানেই আমরা আসবো।”

শরতানটা সেদিন ওর ব্যবসার কথা মোটেই তুললে না। আর যেই দেখেছে আমি ওর প্রেমিকটির প্রতি নজর না দিয়ে ওর বোনকে দেখে রীতিমত হুড় হোয়েছি, তখনই মনে মনে আঁচ করেছি, আমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে আমার কাছে বোনটিকে বিক্রী করার। তাই এত প্রোভান। সমস্ত মনটা ব্যথার ভরে উঠলো—এই শরতানটাকে দুটি নিশাপ সরলা নারী সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, স্নেহ করে। কিন্তু হায় যে মুক্ত প্রেম! তা সত্ত্বেও পারলাম না শরতানটার আয়তন এড়াতে...তবু তো আবার তার সদ পাবো... সেই কপ-বাণীর কামনার সমস্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ভেঙ্গে গেল। মনকে বোঝালুম, আমি ওকে ভালোবাসি, ওর সমস্ত বিশদ থেকে ওকে রক্ষা করাই তো আমার কর্তব্য। ভালোবাসি বলেই তো সরে পাড়াতে পারি না...যদি আর কোনো শরতান, দুচরিত্র লোকের কবলে পড়ে ওর সর্বনাশ হয়!...সে চিন্তাটাই যে আমার কাছে অসহ্য। মনে হোলো, আমার সঙ্গে থাকলে ওর বুকি কোনো ভয়-আশঙ্কাই নেই। আমার কাছে ওর কোনো অনিষ্ট সাধনই হোতে পারে না।

সেই তাহুরেল অপেরাতে একটি ‘বক্স’ কিনলাম। তার পর বহু আগেই এসে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা বখন এলো, তখন আমার কিশোরী মানসটিকে দেখেই আমার সমস্ত মন ভরে উঠলো। স্পন্দন জয়কালো ছন্দবশে সেজুতিলো ‘সি, সি’।

ভাইয়ের পরনে সেই অফিসারের পোষাক। আমার গণ্ডালাতেও ওদের আসতে বললাম। পথে ওর ভাই সেই মহিলাটির বাড়ীতে নেমে গেল। জানালো মাঝামাঝি—অত্যন্ত অস্বস্তি তাই ত দেখ করতে যাচ্ছে, পথে এগে আমাদের সঙ্গে মিলবে। আমি অবার হোলাম যে, ‘সি সি’ একটুকু বিষয় কিছা! অস্বস্তি প্রকাশ করল না আমার সঙ্গে একলা গণ্ডালাতে যেতে। ভাইটি চোখের আড়ান হোতেই আমি বুঝলাম যে, শরতানটা বোধ হয় এই মতলব ইচ্ছা করেই করেছে—লাভের আশায়।

আমি ‘সি সি’কে বললাম, অপেরা শুরু হবার সময় অবধি আমরা গণ্ডালাতেই বেড়াই। আরও বললাম, এত গরমে মুখোশে কই হবে, ওটা খুলে ফেলাই ভালো। একটুও আপত্তি না করে ‘সি সি’ তখন মুখোশটা খুলে ফেললো।

ওকে সম্মান জানানোর, ওর প্রতি কর্তব্যের যে প্রতিজ্ঞা আমার মনে ছিলো—ওর দেহের সেই শান্ত, মধুর, পরিষ্কৃত সৌন্দর্য...ওর আশ্চর্য্য সবল বিশ্বাসে ভরা মন...ওর নিস্দেশ খুশী-ভরা ব্যগ্রচকল ব্যবহার...সব মিলিয়ে যেন আমার বুকের মধ্যে বড় বইয়ে দিচ্ছিলো।

কি কথা ওকে বলবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না...মনের মধ্যে যে অল্প কথো মাথা কুটে মরছিলো, সে কথা কি ওকে শোনানো যায়? সে তীব্র অস্বস্তি, সে আবগণচকল ভালোবাসার প্রকাশ কি ও সহিতে পারবে?...সন্তক হোয়ে শুধু ওর অপরূপ লাভন্যা চকলে মুখখানির দিকে চেয়ে রইলাম...ওর ওই স্তম্ভ দেহের স্রমায় ভরা বর্জিতার দিক হোতে দৃষ্টি ধিরিয়ে। পাছে আমার কামনা-দৃষ্টিতে ম্লান হোয়ে পড়ে ওই আনন্দ-শতদল।

—“কিছু কথা বলুন...শুধু আমার দিকে চেয়েই রয়েছেন তখন থেকে, একটি কথাও না বলে। আজ আপনার সমস্তটা মিথো নষ্ট হোলো আমার জন্তে...তাই না? দাদার সঙ্গে আপসিত তো যেতে পারতেন তা নাহলে দাদার বাকবীর কাছ...তুনেছি অপসার মত সুন্দরী সে।”

—“আমি দেখেছি তাঁকে।”

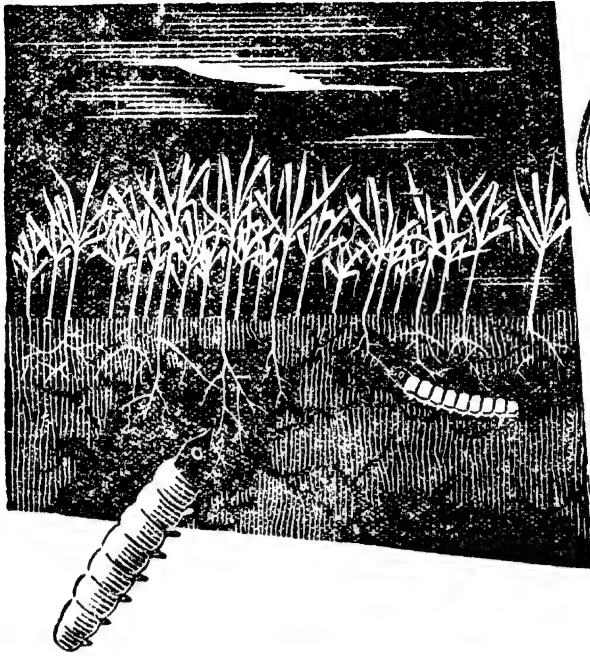
—“উনি খুব বুদ্ধিমতী না?”

—“হোতে পারে...সেটা জানার সুযোগ হয়নি আমার। আমি তাঁর বাড়ী কখনও বাইনি...বাবার বাসনাও নেই। কিন্তু ওগো সুন্দরী ‘সি সি’, তার জন্তে তোমার একটুও চিন্তা করার দরকার নেই... আমার সময় এতটুকুও বুঝা যায়নি”—

—“আমার কিন্তু তাই মনে হোয়েছিলো। সারাক্ষণ আপনি একটিও কথা বলছেন না দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি মনে মনে হুঃখিত হোয়েছেন।”

—“হেন কথা বলিনি বুঝবে কি? বলতে পারিনি...তোমার মধুর, অমলিন সান্নিধ্য আমার সমস্ত সত্যকে নিবিড় স্তম্ভে মুহূর্তের করে তুলেছে—সে গভীর অস্বস্তির অধরণ ভাবার কোটে না...”

—“আমারও ভারী ভালো লেগেছে আপনাকে...শুধু ভালো লাগা নয়, আপনার উপর নিশ্চিত নির্ভর আর বিশ্বাস আমার মনে জেগেছে। সত্যি দাদার সঙ্গে থাকার চেয়ে আপনার সঙ্গে আমি বেন অনেক নিরাপদ অনেক নিশ্চিন্ততা অনুভব করছি। বা বলুন, আপনাকে কেউ কুল করতেই পারে না—আপনি নিশ্চয়ই খুব সজ্ঞা



## আপনার জমির তলায় ভোজনপর্ব চলেছে

জমির পোকামাকড়ের আক্রমণে গাছপালার গোড়া অসহায়ভাবে উন্মুক্ত। এই সমস্ত পোকামাকড় অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা ক্ষতি সাধন করার পরেও দিবিয়া গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

শেলের শিকড়-রক্ষাকারী যুক্তিকার কীট **অলড্রিন** সাহায্যে আপনার শস্যাদি রক্ষা করুন। **অলড্রিন**

খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা চলে এবং এক বছর পর্যন্ত মাটিতে লেগে থাকে।

আখ, তুলো, চায়ের উইপোকা, আলুর সাদা পোকা, তামাক কাটপোকা ও অন্যান্য নানারকমের জমির পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে শেলের **অলড্রিন**ে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

# অলড্রিন

উৎপাতের মূলে আঘাত হানবে

**অলড্রিন** সারের সঙ্গে মিশালে সারের জোর কমে যায় না। তা' ছাড়া শেলের **অলড্রিন** ব্যবহারে দায় উঠে আসে, বরং বেশী করেই আসে, কেননা এতে ফলন বেশী ও ঢের ভালো জাতের হয়।

আপনার সবকাছের খার্বা-শেল অফিসে খোজ কোরলেই বিতরণিত বিবরণ পাবেন।

কৃষিক্ষেত্রে পেট্রোলজাত বাসায়নিকের জন্য

## খার্বা-শেল

AMPS

লোক। তাছাড়া আপনি বিবাহিতও নন। এই কথাটাই আমি মাকে সবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মনে আছে আপনার— একদিন বলেছিলেন, আমাকে যে বিয়ে করবে তার ভাগ্যকে আপনি হিসাব করেন? সেই সময় আমিও বলেছিলাম আপনারা যে বামিরূপে পাবে, সারা জেনিসে সেই সবচেয়ে সুখী নারী।”

কী অদ্ভুত সরলতা, আর অকৃত্রিম উজ্জ্বল ভাষা কথাগুলি। ওর গলাফাঁদে রিনরিনে স্বরটি অবধি যেন মনের সব ক’টি তার ছুঁয়ে যায়। ওর কোমল কিশলয়ের মত পেলব রক্তিম টুটি ওঠে আমার অল্পবয়সের চিহ্ন একে দেবার দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে দমন করলাম। —না পাওয়ার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠলো আর এক পাওয়ার তীব্র মধুর অধুভূতি—আমি পেয়েছি আমার মানসকল্লীর স্বীকৃতি— জেনেছি তার ভালোবাসা আমাকে যিরেই ভালোবাসার রূপ পেয়েছে।

—“মানসী আমার! হৃৎতার বনই যখন একই সুরে বাঁধা তখন অভিন্ন বক্তনের মধ্যেই আমার। সুরের উৎস খুঁজে পাবো— মিলনেই ভরে উঠবে আমাদের সব শূন্যতা। কিন্তু হায় যে, সবচেয়ে বড় বাধা যে আমার বার্ক্য। আমি তোমার বাবার বয়সী হবো প্রায়—”

—“বাবার বয়সী! কি ভেবেছেন! জানেন আমার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে গেছে।”

—“আর আমি যে দোদু গুণে আটান।”

—“আচ্ছা বেশ! সেখান তো একজনকেও, অন্ততঃ বার আটান বছরে আমার বয়সী মেয়ে আছে? আপনি বাবার বয়সী ভাবলেও যে হাসি আসছে আমার।”

যিরেটারের সামনে এসে আমরা গাগুলো থেকে নেমে পড়লাম। অপেরাতে চুকে বসে গিয়ে বসলাম—মুখোশ চশমাতে ‘সিসি’র মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিলো। ওর দাদার দেখা নেই—শেব হবার একটু আগে এসে পৌঁছালো। বুঝলাম এটাও ওর মতলবেরই অংশ।

এবার আমিই ওদের আহ্বানের নিমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু আহ্বানের সমস্ত সময়টা সন্তোষপ্রসূত ভাব প্রেমের অধুভূতি আমাকে এমন করে গ্রাস করেছিলো যে একটি কথাও আমি বলতে পারলাম না। ঈর্ষাতের ব্যথার ভাগ করলাম। ওরাও আমার নীরবতার এই ছলনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে। আহ্বানের শেষে ‘পি, সি’ ওর বোনকে জানালে যে আমি ওকে ভালোবাসি, আর তাই ওকে আলিঙ্গন করলে আমার ব্যথার উপশম হোতে পারে। ‘সি সি’ তখনই এগিয়ে এসে আমার কাছে—এসে ওর হাতোজল রক্তিম মধুর টেট হুঁখানি আমার বুকের দিকে তুলে ধরলে—সে আমন্ত্রণে আমার রক্তে যেন আঙন জলে উঠলো—কিন্তু ওর ওই নিষ্পাপ পবিত্র সরল মূর্তি আমার সমস্ত কামনার উপর যে প্রকাণ্ড আসন পেতেছিলো তারই জর হলো শেষ পর্যন্ত। তীব্র মানসিক যন্ত্রণার অধির হোরেও শান্ত বীর ভাবে ওর লগাটে একে দিলাম একটি স্নেহচূষন।

—“এ কী! একেমন চূষন? বান ওকে প্রকৃত প্রেমিকের মত চূষন করুন।”

ওর কথা শুনেও শুনলাম না। ‘পি, সি’র এই ওপরপড়া ভণ্ডামিতে আমার যথেষ্ট বিরক্তি বরছিলো। কিন্তু ওর বোন বুখানি কিরিরে অভিমান—কুঁকু স্বরে বলে উঠলো,—“ওঁকে জোর কোরো না লাগ! আমি হয়তো ওঁকে সন্তোষকারে আনন্দ দিতে পারিনি।”

আমার ভালোবাসা যেন মুহূর্তে সচেতন হোয়ে উঠলো প্রবল প্রতিক্রিয়ায়। আর আশ্চর্যের অসম্ভব—“কী? কি বলছো—তুমি ‘সি’—জান না তুমি আমার সমস্ত মন ভরে রয়েছো—আমার সমস্ত কল্পনাকে রূপ দিয়েছো—আমার এই কঠিন আত্মসংযমকে তুমি ভুল বুঝলে? তুমি বিশ্বাস করলে পারলে যে আমি তোমাকে তৃপ্ত নই? বেশ, বান চূষনই আমার ভালোবাসার প্রকৃত পবিত্র দিতে পারে তবে নাও, আমার সমস্ত ভালোবাসার গভীরতা নিবিড় হোয়ে কুটে উঠুক আমার চূষনে।”

প্রসারিত দুটি বাহুর মধ্যে বন্ধিনী হোলো আমার মানস প্রতিক্রিয়া। ওর স্তন্যাম তুলুতাত আমার তৃপ্তি ব্যাকুল বকের উপর টেনে নিলাম—একে দিলাম অল্পবয়সের গাঢ় চূষন, কামনার রক্ত-রাঙা রেখা দুটি কোমল বিহবল ওঠে—। কিন্তু অমৃত করলাম সেই বিন্দি, লুভ আলিঙ্গনের আড়ালে ভীক কপোতীর যন্ত্রণ কল্পিত স্বপ্নম্পন্দন।—বীরে বীরে নিজেকে আমার আলিঙ্গনমুখ কোবে নিলেও—হুটি চোখে নির্ঝাঁক বিশ্বাস—সে কি আমার প্রেমের এই দুর্বল উজ্জ্বলতার পরিচয় পেয়ে?

বীরে বীরে নিজের মুখোশটা পরে নিলে ‘সিসি’, মনের ভাবকে গোপন করার ক্ষমতাই হয়ত আমি তবু জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও সন্দেহ আছে কিনা আমাকে সত্যি করতে পারেনি এই চিন্তার?

—“না, সব সন্দেহ আপনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন।”

এইবার পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। যাবার সময় মুখোশটা পরে নিলাম। পথে ওদের নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভালোবাসার তীব্র মধুর অধুভূতিতে তখন আমার সমস্ত মন ভরে আছে—তবু মনের কোণে কোথায় যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লেগেছিলো।

পঞ্চদিন ‘পি, সি’ আমার ঘরে এসে হাঙ্গির রীতিমত বিজয়ী ভঙ্গিতে। বললে, ওর বোন নাকি মায়ের কাছে জানিয়েছে যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি আর যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে শুধু আমাকে পেলেই ওর জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব হবে।

—“ওর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, আপনার বাবা আমার হাতে ওকে সমর্পণ করতে রাজী হবেন?”

—“আমি জানি না—তবে তাঁর বয়সও বেশ হোয়েছে। বাই হোক, আপনার ভালোবাসার আশঙ্কার কিছু নেই। আশ্রয় সন্ধ্যাতো মা ‘সি, সি’কে আমাদের সঙ্গে অপেরা দেখতে বাবার অধুমতি দিয়েছেন।”

—“বেশ তো, তাহলে আমরা বাবো।”

—“কিন্তু একটা কথা, অল্পগ্রহ করে আমার একটা কার্য করবেন?”

—“আদেশ করুন।”

—“খুব ভালো সাইপ্রিয়ান মদ বিক্ৰী আছে ব সন্ধ্যায়। আমি ছাপোনোতে এক পিপে পেতে পারি, মাসিক কিন্তুতো হ’মাসে শোধ করলেই হবে। আর এ মদ এক্ষুণি রীতিমত চড়া দামে বিক্রী হোরে বাবে, এ আমি ভোর গলার বলতে পারি। কিন্তু ব্যবসায়গাটী একটু কড়া একটা জামিন চায়। আপনি যদি রাজী হন হই করতে, তাহলেই ও দেবে।”

—“আনন্দের সঙ্গেই রাজী।”

আমি ছাণ্ডেনাটে সই করে দিলাম একটুও বিধা না করে। কারণ প্রেমিকের মনে যে সঙ্গীত ভর—বদি আপত্তি করলে ও আমার প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার শোধ তোলে? সন্ধ্যায় জলের সঙ্গে কৌথার দেখা হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলাম। বাটবে বেরোবার জন্তে তৈরী হোয়ে কি মনে কবে সোজা দোকানে গেলাম। সেখান থেকে এক ডজন দস্তানা, রাশীকৃত রেশমী মোজা কিনলাম আর একটি সুন্দর এমব্রয়ডারী করা সোনার ক্লিপ দেওয়া গাটার কিনলাম, আমার নতুন পাওয়া মনভগানো বাজীর হাতে প্রথম উপহার তুলে দেবার আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম।

আমি ঠিক সময়েই আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌছলাম—কিন্তু দেখি ওরা আগেই এসে আমার জন্তে অপেক্ষা করছে। আমি যেতেই ‘পি, সি’ জানালে যে ওর কাজ আছে, তাই বোনকে আমার কাছে বেধে ওকে এখনি চলে যেতে হবে, একবারে অপেরাতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। ও চলে যেতে আমি ‘সি’সিকে বললাম, “বত্ৰঙ্গণ না অপেরা স্ত্রক হয় তত্ৰঙ্গণ গণ্ডোলাতে করে একটু বেড়ানো যাক।”

—“না, তার চেয়ে জুতার বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি চলুন।”

—“খুব রাঙ্গা আমি।”

আমি একটা সাধারণ গণ্ডোলা ভাড়া করলাম। তারপর সেট জোয়ের একটি বাগানের দিকে চললাম—আমি জানতাম এই বাগান এক সেকুইনে (ইতালীয় মুন্ডা) সারাদিনের জন্তে ভাড়া পাওয়া যায়, আর কেউ চুকতে পারে না। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের দু’জনার কারোই খাওয়া হয়নি। অতএব একটি বেশ উপায়ের ভোজের জর্ডার দিয়ে সোজা বাগানবাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লাম। সেখানে মুখোশ ইত্যাদি খুলে দু’জনেই বাগানে নেমে এলাম। ‘সিসি’ একটি তাকতার ব্লাউজ আর ওরই একটি ব্রহ ষাট পরেছিলো। কিন্তু এই ব্রহ আবরণে ওর দেহের লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিলো। আমার গভীর অন্তরঙ্গের দৃষ্টি ওর আবরণ ভেদ করে ওর পূর্ণ প্রকাশকে নশিত করলে—সমস্ত অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এলো দুর্বীর কামনা আর প্রচণ্ড সংযমের মিলিত দীর্ঘশ্বাস।

সবুজ ঘাসে পা দিয়েই আমার কিশোরী লীলাসঙ্গিনী বন-কুংসীর মত ঝঞ্ঝা হোয়ে উঠলো, দিনের পর দিন অন্তঃপুরের আড়াল থেকে এমন অবাধ মুক্তির হাওয়ায় ও যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। প্রজ্ঞাপতির মত উজ্জল আনন্দে এদিক সেদিক সমানে ছুটোছুটি করতে লাগলো। শেষ কালে ঠাকুরের উঠে ছুটে এসে আমার সামনে ধপ করে বসে পড়লো। তারপরই আমার চোখে সম্মিত যেরের মুক্ত দৃষ্টি দেখে উচ্চ মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই আবল্যার ধরলো আমার সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করবে। রাজি হলাম তখন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে একটা বাজী ফেলতে চাইলাম।

—“বে হারবে তাকে কিন্তু যে জিতবে তার সব দাবী মানতে হবে।”

—“আমি রাজী।”

দু’জনেই স্ত্রক করলাম দৌড়তে। বেশ বুঝলাম জয় আমার অনিবার্য। কিন্তু তখনি কৌতূহল হোলো, আমি হাসলে আমার কাছ থেকে ও কী দাবী করে সেটা জানাব। ইচ্ছে করে শিখিয়ে

পড়লাম—তখনও ‘সিসি’ প্রাণপণে ছুটে চলেছে—চট করে ও পৌছে গেল আমার আগেই। দম নিতে নিতে ওর মাথায় কি দুঃখবুজি এলো, চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওর আঁটিটা আমাকে খুঁজে বের করতে বললে। আমি টের পেয়েছিলাম আঁটিটা ও নিজের কাছেই রেখেছে—এতে ওকে স্পর্শ করবার অধিকার ও আপনাই আমাকে দিলে। কিন্তু আমি ঠিক কতোছিলাম অন্তরায় সুবিধা ওর কাছ থেকে কিছুতেই নেবো না—ওর সংল বিখ্যাসের অমর্যাদা করবো না।

ঘাসের উপর দু’জনেই বসে পড়লাম। আমি ওর পকেট হাতডালাম, ওর জামার ভাঁজগুলির ভিতর দেখলাম, জুতো খুলে দেখলাম শেষ অবধি ওর গাটার অবধি খুঁজে দেখলাম। হাঁটুর উপরই গাটার আটকানো ছিলো—কিন্তু সেখানেও পেলাম না। আমি ঠিক জানতাম ওরই কাছে লুকানো আছে তাই ওটা খুঁজে বের করবই, ঠিক করে আরও খুঁজতে লাগলাম। এবার আমি নিঃসন্দেহেই বুঝেছিলাম তবী তরুদেহখানির কোন গোপনে সেটি লুকানো আছে। সে কথা ভারতেই মধুর আবেশে সারা দেহ-মন যেন রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠলো। ওর উষ্ণ, কোমল স্পর্শটি বন্ধের মায় থেকেই আঁটিটা উদ্ধার হোলো—কিন্তু সেই পেলব স্পর্শে আমার হাতখানি ধরধর করে কেঁপে উঠেছিলো। শিরায় শিরায় বাঁয়ে বাঁছিল অজানা পুলকের আগুন-আলা শ্রোত...

—“অত কাঁপছেন কেন?”

—“আনন্দে...তোমার আঁটিটা অমন করে লুকানো সত্যও খুঁজে পাবার আনন্দে। কিন্তু আবার তোমাকে কিরতি প্রাণ-যোগিতায় নামতে হবে, এবার কিছুতেই তুমি জিততে পারবে না—”

আবার ছুটতে স্ত্রক করলাম। ‘সিসি’ বেশী জোরে ছুটতে পারছে না দেখে আমিও গতি মন্থর করে দিলাম নিশ্চিত ভাবে। কিন্তু ঠকতে হোলো এইবার গোড়ার দিকে এই ভাবে দম রেখে, হঠাৎ ও তীরের মত ছুটে এগিয়ে গেল। পরাজয় নিশ্চিত জেনে মাথায় জাগলো দারুণ একটা মতলব—হস্তাঘাত চাঁৎকার করে সজ্ঞারে পড়ে গেলাম মাটিতে। বেচারী সরল। কিশোরী, আমাকে পড়ে যেতে দেখেই খেমে গেল। তারপর আমাকে তোলবার জন্তে ছুটে আমার দিকে এগিয়ে এলো। যেই আমা হাত ধরে তুলেছে সেই মুহূর্তেই আমি সোজা পাড়িয়ে উঠে হাসতে হাসতে ছুট দিলাম প্রাণপণে...অনেক অনেক পিছনে ওকে ফেলে রেখে।

অভিমানিনী কিশোরী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে স্ত্রক বয়ে বললে,—  
“তাহলে সত্যিই আপনার লাগেনি?”

—“একটুও না—আমি তো ইচ্ছা করেই পড়েছিলাম।”

—“ইচ্ছা করে...আমাকে ঠকাবার জন্তে...আমি ডাকতেই পারি না আপন ঠকাতে পারেন...না, না জুরাচুরি করে জেতাটা মোটেই জেতা নয় আমি মোটেই হারিনি—”

—“নিশ্চয়ই, একশো বার হেরেছো, আমি তো তোমার আগে পৌছে গেছি। আর চালাকীর বদলে চালাকী করা খুব চলে...বল সত্যি করে, প্রথমটা আঁজ ছুটে হঠাৎ তীরের মত গতি বাড়িয়ে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করনি?”

—“ওটা খুবই চলে...কিন্তু আপনাদিটা একেবারেই অন্তরঙ্গক...ওটা মোটেই খেলাতে চলে না।”

—“কিন্তু ওইতেই তো জিততে পারলাম আমি।”

—“জয় জয়...ঐতারাণ আর সাধুতা—জার আর অজার যে পথেই তা হোক না কেন?”

—“হ্যাঁ আমার দাঁটার মুখে প্রায়ই এই ধরনের কথা শুনি। কিন্তু বাবার কাছে কখনও শুনিনি। আচ্ছা বেশ, মেনে নিলাম আমি হেরেছি—এখন বলুন কি দাবী আপনার—আমি তাই মানবো।”

—“কাঁড়াও। আপাততঃ এখানে বস। বাক, কারণ ভাবতে হবে তো...হোয়েছে, আমার দাবী হোলো তোমার সঙ্গে আমার পাটারি বদল করবো।”

—“গাটার? আমারটা দেখেছেন? বিজী, পুরানো, কিছু কাজে লাগবে না।”

—“তাতে কি হোয়েছে? দিনে অন্ততঃ দু'বার তো গাটার খুলতে হবে...দু'বারই মনে পড়বে যাকে ভালোবাসি তার মুখখানি...আর তুমিও একই সময় আমার কথা ভাবতে বাধ্য হবে।”

—“বা: বেশ মজা হবে! আমি খুব রাজী। নাঃ, আপনি ঠিকিয়ে জিতছেন বলে আর আমার কোনো দুঃখ নেই...এই যে আমার বিজী গাটারি দু'টো।”

—“আর এই যে আমারটা।”

—“উঃ কি চুষ্ট আপনি! কী চমৎকার; কী সুন্দর দেখতে ওগুলি? সত্যি চমৎকার উপহার! মা-ও কী খুশী হবেন দেখলে। নিশ্চয়ই ওটা আপনার উপহারের জিনিষ, একেবারে আনকোরা নতুন দেখছি কে...”

—“নাঃ আমাকে কেউ উপহার দেয়নি। আমিই তোমাকে দেবো বলে কিনেছিলাম...তোমাকে দেবার সুযোগ খুঁজছিলাম এমন ভাবে বাতে তুমি না ফিরিয়ে দিতে পারো। এবার বুঝেছো, তোমাকে দৌড়তে জিততে দেখে আমি কি রকম হতাশ হোয়ে পড়েছিলাম...তাই তো বাধ্য হোয়ে ছলনার আশ্রয় নিতে হোলো।”

—“কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাইতে আমি যে কী কষ্ট পেয়েছি, জানলে আপনি এমন ছলনা কখনই করতে পারতেন না—”

—“আমার সবকিছু তুমি এমন গভীর ভাবে অনুভব করো?”

—“একথা আপনাকে বিশ্বাস করানোর ক্ষেত্রে আমি কী না করতে পারি? বাহু, আমার কিন্তু ভারী ভালো লেগেছে, খুব পছন্দ হোয়েছে এই সুন্দর গাটারি দু'টো। সাবধানে রাখতে হবে, বাতে দাঁটার নজরে না পড়ে। তাহলেই চুরি করবে।”

—“সত্যি সত্যি চুরি করতে পারবে?”

—“খুব পারবে, বিশেষ করে স্লিপ দু'টো যদি সোনার হয়—”

—“ওহুটো সোনারই। কিন্তু তুমি ওকে বোলো ও ছুটো শিতলের উপর সোনার জল করা।”

—“কিন্তু কেমন করে স্লিপ দু'টো আটকার আমাকে শিখিয়ে দেবেন?”

—“নিশ্চয়ই দেবো।”

তখন দেখিয়ে দেবার জন্ত ও ব্যগ্র হোয়ে উঠলো। ওর মনে কোনো-কিছো কোনো সন্দেহের লেশ নেই। কোনো ছলনা-কলা কোনো চাতুরীই আজও ওর নিশান সরল মনটিকে স্পর্শ করতে

পারেনি। চতুর্দশ বসন্তের অনাহত মাধুরী আজও পায়নি সোহাগের আলিঙ্গন, কামনার তপ্ত স্পর্শ। সমাজ আর সঙ্গিনী দুইএরই অভাব ওকে সচেতন হোতে দেয়নি ওর বিকটোমুখ যৌবনের আগমনীতে। যৌবনের দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা কামনার লেলিহান শিখা কেমন করে ইন্ধন পেয়ে ফুলে গুঠে সে রহস্ত আজও ওর অজানা। বখন কুমারী-মনের অল্পহুজিতে প্রথম অল্পবয়সের রঙ জাগলো তখন প্রথম প্রেমের অসহ পূলকে সমস্ত মনটি নিবেদন করে বসলো—একান্ত বিশ্বাসে সরল নির্ভরতায়। কিছু গোপন কিছু অদেয় থাকবে না...তাইতেই বুঝি ভালোবাসার পরম প্রতিগান দিতে পারবে।

মোজা দু'টো এত ছোটো যে হাঁটুর উপর গাটারের স্লিপ আঁটা গেল না। তাই দেখে ‘সি সি’ বললে এবার থেকে লখা মোজা পরবে। তক্ষুপি পকেট থেকে বেশমী মোজাগুলি বার করে ওর সামনে ধরলাম—সম্মেহ অল্পবয়সী জানিলাম ওগুলি গ্রহণ করতে। আনন্দে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বসিত হোয়ে ছোটো মেয়েটির মত ছুটে এসে আমার কোলের উপর বসে পড়লো, তারপর মনের উচ্ছল খুশীতে আমাকে অঙ্গুলি চুষনে ভরে দিলে—ঠিক যেমন ভাবে ওর বাবার কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে বাবাকে আদর করতো, ঠিক তেমনি সারল্যে তেমনি খুশীভরা চাকল্যে। প্রতিপানে আমিও চুষন করলাম কামনার তপ্তবাপ বৃক্কের মধ্যে চেপে রেখে। ওর কানে কানে অক্ষুটে শুধু বললাম, ওর একটি চুষনের জন্ত সমস্ত সাদ্রাজ্যও বিলিয়ে দেওয়া যায়।

আমার কিশোরী প্রিয়া নিতান্ত অবহেলার থলে ফেললো ওর পুরানো মোজা দু'টি। আমার দেওয়া নতুন বেশমী মোজা নিয়ে বন্ধল্পে পথে নিলে—বেশ লখা ছিলো এগুলি, প্রায় ওর উক্কর মাথামাথি এলো—আমি অবাক হোয়ে দেখলাম ওর নিঃসন্দেহ আশ্চর্য্য সরলতা, ও বেন আমার সামনে কাঁদে-পড়া বস্ত্র-হরিণী সম্পূর্ণ আয়ত্তে পাওয়া, ধরা দেওয়া এই দুই শিক্ষারকে আক্রমণ করতে আমার সমস্ত পৌকষ বেন তাঁর প্রতিবাদ করে উঠলো।

আমরা দু'জনে বাগানে বেড়াতে লাগলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা অপেরাতে গিয়ে হাজির হলাম—মুখোশ টুখোশ পরে...কারণ থিয়েটারের হলটি বেশ ছোটো—যদি কেউ চিনে ফেলে। ‘সি সি’ বলেছিলো ওর বাবা যদি টের পান যে ও এই ভাবে অপেরা ইত্যাদি দেখে, তাহলে বাইরে বেরোনোই বন্ধ করে দেবেন। অপেরাতে এসে ওর দাঁতকে কোথাও না দেখে ছুঁলেই একটু আশ্চর্য্য হোলো। আমাদের ডান পাশে বসেছিলেন স্পেনের রাজপুত্র আর মাদমোয়াজেল বোলা আর বাঁ দিকে মুখোশ ঢাকা এক ভদ্রলোক আর একজন মহিলা। এঁদের দু'জোড়া চোখ সর্বদাই আমাদের অনুসরণ করছিলো। আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম কিন্তু ‘সি সি’ পিছন ফিরে ঘ্রাকাতো দেখতে পারিনি। এ অভিনয় দেখতে দেখতে এক সময় ‘সি সি’ প্রোগ্রামটি নিয়ে বাঁ পাশের বক্সের পাটশনের উপর রাখলে। মুখোশ-পরা ভদ্রলোকটি তখন হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিলেন। এই দেখে আমার সম্মেহ হোলো এঁরা নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ হবেন। ‘সি সি’কে ডেকে বলতেই ও পিছন ফিরে দেখলে, দেখেই ওর দাঁতকে চিনতে পারলে—পাশের মহিলাটি আর কেউ নন—মাধার্য সি।

দ্বিতীয় অঙ্কে ওর দাদা মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বন্ধে এসেন। অভিনয়ের পর ক্যাসিনোতে আমাদের একত্রে আহারের অনুষ্ঠান জ্ঞানালেন।

‘সিসি’ আর মহিলাটি মুখোশ খুলে পরস্পরকে আলাপন করলো। এবার টেবিলে লক্ষ্য করলাম ‘সিসি’ মহিলাটির সঙ্গে রীতিমত প্রজ্ঞা আর সম্মানের কথা বলছে—বেচারী মেয়ে... হুমিয়ার রীতিনীতি ওর সবই অজানা! মাদাম সি—কিন্তু তাঁর সমস্ত ছন্দা-কলা সঙ্গেও আমার দৃষ্টিকে ঝাঁকি দিতে পারেন নি—আমি স্পষ্ট দেখলাম গোপন ঈর্ষার ছায়া ওর মুখ-চোখে... ‘সিসি’র অনিন্দিত সৌন্দর্য্য তাঁর রূপের প্রাথমিকের ছাড়াইয়ে গেছে, মুগ্ধ করেছে আমার... সেখানেই যে পরাজয়ের দ্রুতি।

আহার-পর্বের শেষের দিকে স্ত্রীর মাত্রাধিক্য কিঞ্চিৎ উত্তেজিত অবস্থায় ‘পি, সি’ মহিলাটিকে আলাপন করলে তারপর আমাকেও উৎসাহ দিতে লাগলো ‘সিসি’কে আলাপন করতে। আমি উত্তর দিলাম মাদামোয়াজ্জেল ‘সিসি’র অনবজ সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ বটে কিন্তু বতন্মশ না ওর স্বভাবের সত্য অধিকার পাই তত দিন কোনো সুযোগই ওর উপর আমি নেবো না। ‘পি, সি’ এই নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলে মাদাম সি—, তৎক্ষণাৎ ওকে ধামিয়ে দিলেন। ওর এই নৃশংস অহুভূতির পরিচয় পেয়ে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। পকেট থেকে সেই এক ডব্বন দস্তানা বের করে ছ’টি নিয়ে তথুনি ঠেকে উপহার দিলাম, বাকী ছ’টি আমার মানসীকে নিবেদন করলাম।

সেই রাতে ‘সিসি’র স্ত্রীর মাত্রাধিক্য ঘটায় কাণ্ডজ্ঞানের খেঁচই অভাব ঘটেছিলো। ওর নিলজ প্রায়-লীলার দৃশ্য থেকে ‘সিসি’র দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করলাম... ওর মুগ্ধ, লজ্জিত বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আমিও অত্যন্ত অবশিষ্ট ভোগ করছিলাম। কোনো মতে সময়টা কাটিলে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। ক্রোধে, ঘৃণায়, তিক্ততায় আমার সমস্ত মনটা ভরে গিয়েছিলো—বেশ বুঝেছিলাম নিলজ ‘সিসি’ ওর এই বীভৎস অসীলতার মধ্য দিয়েই ওর বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করছে। পরদিন সকালেই আবার বধন এসে হাজির হলো তখন আমি আর থাকতে না পেয়ে ওই ব্যবহারের জন্য ভংগনা করলাম।

আমি বেশ অহুভব করছিলাম দিনে দিনে তিলে তিলে ‘সিসি’র প্রতি আমার অহুভাগ কি গভীর হয়েছে। এ অহুভাগ প্রেমে করুণায় কল্যাণ কামনার বেন শতবাছ বিস্তার করে ওকে ঘিরে রাখতে চাইছে সমস্ত বিপদ সমস্ত নিষ্ঠুরতা থেকে। যাতে ওর দাদা নিজের

বার্ষ সাধনের জন্য কোনো চরিত্রহীন সুবিধাবাহী কারো কবলে ওকে না ফেলতে পারে, সেজন্তে আমি জীবন পণ করেছিলাম।

আমি শুনেছিলাম ‘পি, সি’ লোকটি মোটেই সুবিধার নয়। ওর আকর্ষণে ধরে ভরা। ভিরোনোতে ও সেউলে হোয়ে বসেছিলো—এমন কি সেখানে ওর স্ত্রী-পুত্রও রয়েছে। ভেনিসে ওর কাণ্ড কারখানায় ওর বাবা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে অবশি বাধ্য হোলেন... তা সত্ত্বেও বাড়ীতে রয়েছে জেনে মনের খেঞ্জায় সে কথা না জানারই ভাগ করেন। পরজ্ঞাকে তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিপক্ষে টেনে আনতেও ওর বাধে না। তার পর সে মহিলাটির ধন-সম্পত্তি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে নিজের কুৎসিত কামনার উপাধান করে রাখতেও ওর দ্বিধা নেই। ওর মা—অন্ধ মাতৃস্নেহে ছেলেকে ‘আদর্শ’ বলেই মনে করেন। উপযুক্ত ছেলেও মায়ের সমস্ত টাকাকড়ি এমন কি দামী পোষাকগুলি অবশি হরণ করে তার প্রতিদান দিতে কুঠা বোধ করেন।

এবার আমি তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওর কথাতে কিছুতেই প্রভাব দেব না। নির্দোষ সরল্য কিশোরী বোনকে আমার সামনে প্রলোভনের মত তুলে ধরে ওর দুঃখের সঙ্গী করবে আমাকে, আর আমার ধ্বংসের কারণ হোয়ে ঈর্ষাবে সেই নিশাপা ফুলের মত মেয়েটি—এ চিন্তায় বেন আমি সইতে পারছিলাম না। আমি ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম যে, যদি আমাকে বাধ্য হোয়ে ওর বোনের সঙ্গে দেখা করতেই হয় তাহলে ওর সাহায্য ছাড়াই তা আমি করবো আর ‘সিসি’ কেও বারণ করবো, যাতে ও দাদার সঙ্গে কোথাও না যায়—ওর চোরাবালির কাঁদে বেন কিছুতেই না পা দেয়।

এসব শুনে ‘পি, সি’ খুবই কাতর ভঙ্গিতে ক্ষমা চাইলে। ওর মাতলামির জন্যে অত্যন্ত অহুতপ্ত হওয়ার ভাবও দেখালো... ক্ষমা চেয়ে অশ্রুশ্রবিত চোখে আমাকে আলাপনও করলো। আমার মনটা হৃদয়ত ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল হইল, কিন্তু এমন সময় ময়ের হাত ধরে মা ঘরে চুকলেন। আমার উপহারগুলির জন্যে মা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞানালেন। আমিও সোজাঅজ্ঞি মাকে জ্ঞানলাম যে তাঁর মেয়েকে আমি ভালোবাসি আমি তার ভবিষ্যৎ জীবনদর্শনী করার আশার, আমার ভালোবাসা তাকে দ্বীর্ঘ মর্দ্যায়ার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমি আরও বললাম যে, বখন আমি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো, আমার ভাবী দ্বীর্ঘকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার ক্ষমতা অর্জন করবো, তখন আমি নিজেই তাঁর স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাবো তাঁর কস্তার পাণিগ্রহণের।



মাথার খসড়া ডুগিয়েছেন  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করার না কেন?



ক্যালকাটা অপটিক্যাল

কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.



এই বলে আমি মায়ের হাতখানি চুষন করলাম। মনের উদ্বেজনার আর আবেগে আমার চোখ দিয়ে তখন কব-কব করে জল পড়ছিলো। সেই আবেগের ছোঁয়া মায়ের মনেও লাগলো। অশ্রু-সিক্ত হোয়ে উঠলো তাঁর দুটি আঁখিপল্লব। গভীর স্নেহে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে মনের আবেগ লুকোতেই বুঝি উঠে গেলেন ঘর থেকে—‘সিসি’কে রেখে। দুনিয়াতে এমন মা বিরল নয়। স্নেহে, মমতায় কল্পনায়, কোমলতায় এঁদের অণু-পরমাণু গড়া। সরলতাই এঁদের স্বভাব—দুনিয়া-ভোড়া কুটমতা, হিংস্রতা, লোভ আর ছলনা এঁদের সন্দেহহীন পরিচয় মনে চাই পায় না—তাই বাক্যে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, অগাধ বিশ্বাস আর অসীম নির্ভরতায় তাকেই আশ্রয় করেন।

আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতায় ‘সিসি’ও বিস্ময়ে আনন্দে হতা-চকিত হোয়ে পড়েছিলো—এ পাওয়া ওর অপ্রত্যাশিত। ওর দানব মনেও বুঝি অমূল্যোচনার বাধা জেগেছিলো। পরদিন কি একটা পরদিন ছিলো। ‘পি, সি’ জানালে বোনকে নিয়ে আমার কাছে আসবে—আমরা দু’জনে উৎসবে যোগ দিতে যাযো—ও ফিরে যাবে মাদাম ‘সি-র’ কাছে। উৎসব শেষে আমিই ‘সিসি’কে বাড়ীতে পৌঁছে দেবো—তাই ওর চাষিটাও আমাকে দিয়ে দিলে।

পরদিন নিদিষ্ট জায়গায় ‘সিসি’কে পেলাম। আগেই অপেরাতে একটা বস্তু ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু দু’জনে মিলে ঠিক করলাম এখনও অপেরার সাক্ষাৎ ঘটুক। দেবী—অতএব ততক্ষণ আবার জুন্নার সেই বাগানে বেড়াতে বাওয়াই ভালো। ‘সিসি’ তো খুশিতে উপছে উঠলো। সেদিন প্রচুর উৎসব-মত্ত নর-নারীর সমাবেশ বাগানেতে। আমরা আমাদের পুরানো কামরাটিই ভাড়া করে নিলাম।

বাগানে নামার আগে ঘরে এসে চুকতেই ‘সিসি’ উজ্জ্বল আনন্দে মুখশোণিত এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে আমার হাঁটুর উপর বসে পড়লো। ওর ঝিকিমিকি দুই চোখ-হাসির কুহক—ক্লান্ত অথব মস্তিষ্কার ভরা। ওর স্পর্শে আমার রক্তে জাগলো আগুনের হালা...ওর সব কথাতে স্তম্ভ করে দিলাম চুবনে চুবনে—

—কোনো আমার সমস্ত মন ভরে উঠছে আজ তোমার কথায়...

—আমার কথা?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মায়ের কাছে তুমি যে প্রস্তাবটি করলে সেই কথায় তুমি কত বড়, তুমি কত মহৎ...তুমি আমাকে এমন করে ভালোবাসো? ঠিকই বলছো তুমি, বত দিন না আমাদের প্রকৃত মিলন হয় তত দিন কোনো উজ্জ্বলতাকেই প্রদর্শন দেব না আমরা...আমার বড় ভয় করে লাগার ঐ উন্নত খেচ্চাচারিতা। তোমার ভালোবাসায় আমার যেন সব অভাব মিটে গেছে সব চাওয়া শেষ হোয়েছে। আবেগে ওর কণ্ঠ বৃজে আসে। দেখি সোনার কাঠির পরশ-করে রাজকন্ডার ঘূষ ভেঙেছে—

—কী ভাবছো কল্যাণ তো?

—আমি? আমি কি ভাবছি জানো? তোমাকে সম্পূর্ণ করে আমার—ভাগ্যেই যদি আমার বৃত্তা হয় কী অতপ্ত আকাংক্ষা নিয়েই না আমাকে বেতে হবে।

—অমন করে বোলো না। বেঁচে থাকবোই আমরা। কির

অমুঠান? সে তো যে কোনো দিনই সারা যায়। আর আমরা তো এখন স্বাধীন। বাবাকে নিশ্চয়ই মৃত দিতে হবে—

—ঠিক বলছো। সম্মান বাঁচাবার জন্তে অতন্ত: মৃত দিতে হবে! অবশ্য তাঁরও সম্মান রক্ষার জন্তে আমিই তাঁর কাছে তোমার পারিপার্শ্বিকতা করবো। তাহলে আশা করছি আমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিয়ের অমুঠান—

—সে কি! এত শীগগির? দেখো তুমি, বাবা নিশ্চয়ই বলবেন যে আমি এখনও অনেক ছেলেমাছুষ আছি—

—কথাটা কি খুব মিথ্যে বলবেন?

—মোটেরী না। এমন কিছু ছেলেমাছুষ নই আমি। তোমার পাশে মাঝাক খুব মানাবে। তোমার বউ হিসেবে একটুও বেমানান হবো না—

ও ভাগছে কথার ফুলফুরি আর তার আগুনের ফুলকি, এ আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাচ্ছে। হ্রস্ব বাসনা আমার চেতনাকে মাতাল করে তুললো।

—মানসী আমার...আমার প্রেম তোমাকে জাগিয়েছে...কিন্তু সন্তি বলা আমার ভালোবাসায় তোমার বিশ্বাস আছে? আমার কাছে আত্মসমর্পণের আড়ালে থাকবে তোমার একান্ত নির্ভরতা?—কোনো দিনও জাগবে না অমূল্যোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছো বলে? বলা, উত্তর দাও—

—আমার হৃদয় বিশ্বাস, তুমি কখনো আমাকে হুখে দিতে পারো না। তাইতো আমার চরম নৈবেদ্যের আড়ালে আছে শরম পরিতৃপ্তি—

—এসো আমার কল্পনাময়ী, আজ এই মুহূর্তেই আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে তোমার বরণ করে নিই। আমাদের এ বিবাহের সাক্ষী থাকুন বিধাতা—আমাদের লগ্নমন্ত্র উচ্চারিত হোক শুধু দু’জনার কানে কানে...আজ থেকে আমাদের দু’জনার ভাগ্যকরা একই ঘাটে এসে ভিড়ুক। আমাদের এই পবিত্র মিলনের বন্ধন দৃঢ় করবো তোমার বাবার অমৃত্যু নিয়ে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানের ভিত্তি দিয়ে...কিন্তু আজকের রাত সাক্ষী থাক আমাদের প্রথম মিলনলগ্নটির। আজ প্রেমের অন্তর্ভানে বরণ করি প্রেমসীকে। আজ তুমি আমার...শুধু আমার...

—ঈশ্বর সাক্ষী থাকুন, আজ আমি তোমার নিবেদন করলুম নিজেকে তোমার সহধর্মিণীরূপে—তোমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হবার লগ্নম নিলাম...

আবেগে দু’টি বাহুর আলিঙ্গনে বন্দি করলাম আমার মোচিনী মানসীকে। কানে কানে অশ্রুট আশ্রয় দিলাম...জেনো তুমি, কোনো কীক কোনো কীক নেই আমাদের বিবাহে। আমাদের লগ্নমই হোচ্ছে তোমার সত্য অমুঠান—আজ প্রথম মিলনলগ্নটি সার্থক করে তোলা আনন্দধ্বজে পূর্ণাঙ্গিত দিয়ে।

বাসরঘাটি শিহরিত করে তোলে বসন্তের পুলকোচ্ছাস...স্ববকে স্ববকে কুটে কুটে লাভগের আতপ্ত ঔষধ্য...বহির্দীপ্ত উদ্যাদনা শান্ত হয় মাধুর্যের আত্মনিবেদনে...

[ ক্রমশঃ ]

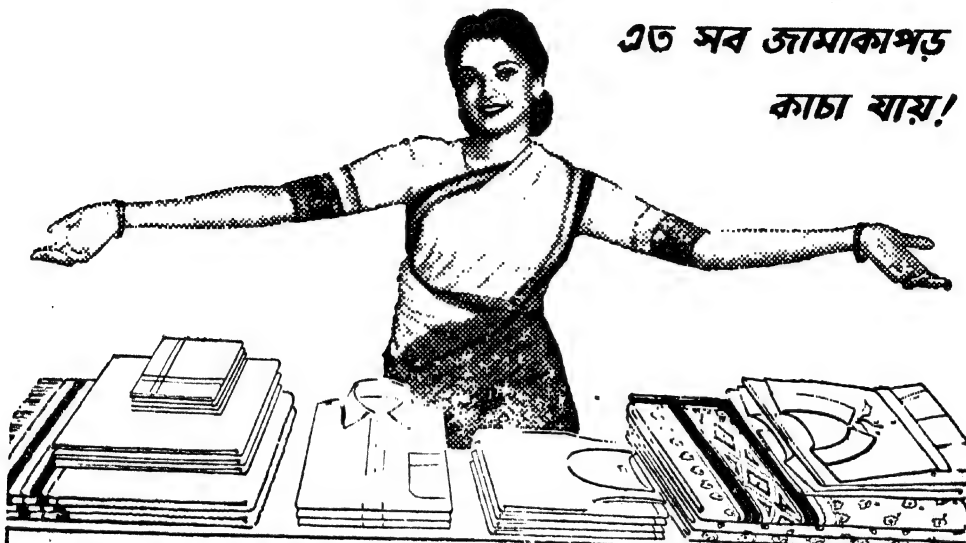
অমৃত্যুদিকা—শান্তা বসু





# দেখুন! মাত্র অল্পের সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাটা যায়!



**সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !**

ফেণার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অল্পের সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাটা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুনই প্রতিটা  
ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকর সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**

# ব্যাংককে কয়েক দিন

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীউপেন্দ্রকুমার মল্লিক

পোষ্ট-অফিসে পৌঁছে বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম।

চারিদিকেই নানা রকমের দোকান, তাতে মালপত্র বোঝাই। গাড়ী ও লোকের ভিড়ও খুব।

হোটেল থেকেই ঠিক করে এসেছি যে, থাই-ভারত কালচার্যাল লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রত্ননাথ শর্মার সঙ্গে প্রথমেই দেখা করা দরকার। শর্মাজী প্রতাপ চন্দরের বিশেষ বন্ধু। প্রতাপ বলেছে যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনিই আমাদের ব্যাংক দেখার সমস্ত ব্যবস্থার ঠিক করে দেবেন। অতএব তাঁর কাছেই আগে বাওয়া দরকার। এদিকে হুজিল যে, লজের ঠিকানাটা আমাদের ঠিক জানা নেই। ঘুরতে-ঘুরতে এক দোকানের সামনে দু'টি ভারতবাসীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কথাবার্তা জানতে পারা গেল, তারা গোরক্ষপুরের লোক, এখানে কাজ করতে এসেছে। বিশেষ-বিভূঁইয়ে সেই দেশোরাশি চুঁচনকে গেরে আমাদের যে কি আনন্দ হল, তা আর কি বলব! খানিক কথাবার্তার পর ভারতীয় আমাদের দু'টি সাইকেল-রিজা ঠিক করে দিলে আর রিজাওলাদের থাই-ভারত কালচার্যাল লজের নিশানা বাংলা দিলে। ভাড়া ঠিক হল, হয় টিকল, যান প্রায় দেড় টাকা।

লজ সেখানে থেকে কাছেই। লজে এসে দেখি, বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামনেই একটা হলে তাদের লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে অনেক ভাল ভাল ইংরাজি, বাঙলা ও থাই ভাষার বই আছে। দুটি র‍্যাসিস্ট্যান্ট, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। হুঁজনারই বয়স ২০-২২ বৎসরের বেশী হবে না। তারা আমরা নেতাজীর দেশ থেকে আসছি শুনে খুব আনন্দিত হ'ল। আমাদের আদর-বন্দ করে বসালে ও বইটাই দেখালে। পণ্ডিত রত্ননাথ শর্মা খবরও তারাই গিলে। হলের ভিতর অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দেখলাম লাইব্রেরীতে বসে গোটাকতক ছবির বই দেখছে বা পড়ছে। আর এক জায়গার দেখি, আরও গোটাকতক ছেলে-মেয়ে চুপটি করে বসে গল্প শুনেছে। দেখে ভারী ভাল লাগলো। লজের একটি ইটুল আছে। সেখানে পণ্ডিত ঘিবেদী শাস্ত্রী নামে একজন শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হল। খুব পণ্ডিত ও জমারিক ভরসো। মিষ্টার দাশগুপ্ত হচ্ছেন লজের লাইব্রেরিয়ান। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক কথাই তাঁর কাছে ও পণ্ডিত রত্ননাথ শর্মার কাছে পড়ে শুনেছি।

লজ থেকে বেরিয়ে আমরা শর্মাজীর দোকানে এসে হাজির হলাম। প্রকাশ ও বড়বাজারের মধ্যে পণ্ডিতজীর দোকানটি। এখানে তিনি প্রায় ৩০-৩২ বৎসর ধরে ব্যবসা করছেন এবং সুপরিবাসে বসবাস করছেন। দোহারী লম্বা চেহারা, বয়স বাটের কাছাকাছি। প্রশান্ত সৌম্যস্বর্তি, অতি সজ্জন। এ তরাটে বেশ পণ্যমাত্র ব্যক্তি বলেই মনে হল। আমাদের দেখে মহা খুশী। টাটকা কলের রসের মত এক প্রকার সুবাস পানীয় পান করতে গিলেন। নানান কথা-বার্তার পর তিনি বললেন, "কাল সকালে আমার বাড়ীতে আপনাদের

খেতে হবে। ব্যাংকের দেখবার মত বা কিছু জিনিষ ও জায়গা আছে তা দেখাবার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করিয়ে দেব, আপনাদের কোন চিন্তা নেই।" আমরা তখন ব্যাংকের বাজার ও দোকানপাট ঘুরে একটু দেখতে চাই শুনে তিনি তাঁর ম্যানেজারকে আমাদের সঙ্গে গিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বাজার ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। আমার কিছু টাকা ভাঙ্কানোর দরকার হয়ে পড়লো। ম্যানেজার আমাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে টাকা ভাসিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, এবার আমরা ভারতীয় টাকা-প্রতি ১০০ টাকার ৪৬০ "টিকল" হিসাবে ভাঙ্কানি পেলাম। তার মানে হোটেল যে হারে পেরেছিলাম তার চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী। বোধ হয় ফরেন কারেন্সী এক্সচেঞ্জ রেসিও বাজারে ও ব্যাংক সমান নয়।

দোকানগুলো নানারকম জিনিষে ভর্তি। দামও কিছু চড়া মনে হল। অধিকাংশ জিনিষই আমেরিকার তৈরী। এক এক জায়গায় 'দোকানগুলিতে জামা কাপড় পিস্তলদের বা ঠিক দেখেছি তাতে মনে হয় যে, কলকাতার সব চেয়ে বড় কাপড়পটীতে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগও ঠিক আছে কি না সন্দেহ! নানারকম বেসাতির অফুরন্ত ঠিক। শেষে শুনে মনে হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংক তথা থাইল্যান্ডও এগিয়ে চলেছে অতি দ্রুততালে।

ঘোরাঘুরি করে কিসে পেয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে চল যে আজ কে, এল, এম হোটেলের সাহেবীখানা না খেয়ে এখানকার দেশী হোটলে খেতে হবে। তাতে এদেশের সাধারণ লোকদের দৈনন্দিন জীবন আচার ব্যবহার সবকিছু কিছু জীবনবার সুবিধেও হতে পারে। ইতিমধ্যে শ্রীমান অনিল দাস নামে এক ভরসোলকের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে খুব ভাব করে ফেললাম। তাঁকে আমাদের মনের কথা জানাতে তিনি আমাদের একটি দেশী হোটলে নিয়ে চললেন।

হোটেলটিতে ঢুকেই যে জিনিষটি দেখে খুব সোড হল, সেটি হচ্ছে হোটেলের সামনে কুলির-রাখা আদ্র ভাঙ্কা দুয়গী। এই উপাস্যের জিনিষটি এখানে খুবই একটি সাধারণ ও চলতি ধারাব। পরে হংক চায়না ও মাকুয়িয়ার বিভিন্ন জায়গায়ও এই ধারাবটির বহুল প্রচলন লক্ষ্য করেছি। আজকাল কলকাতার গটিকতক পাঞ্জাবী হোটেলও এই জিনিষটি পাওয়া যায়।

তিন বন্ধুর মধ্যে প্রতাপই হল সব চেয়ে সম্বন্ধার ব্যক্তি। অতএব কি কি খেতে হবে তা ঠিক করার ভার তার উপরেই দেওয়া গেল। ভোজ্য-বস্তুগুলির মধ্যে গটিকতক নাম আমার এখানে মনে আছে, বাকি সব তুলে গেছি।

"কুং" মানে চিড়ী মাছ। "ক্যাং চুই" মানে ছানহীন তরকারী। "নাম গ্রা" মানে মাছের নোপতা জল (পুসের মত)। "নাম পেগ"—মানে তরল চাটনি। এর সঙ্গে ভাত দুয়গী মাই আরো যেন কি সব খেয়েছিলাম তার নাম ঠিক মনে নাই। ভোজনরসিক বলে বাজারে আমার বখেই খ্যাতি থাকলেও সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনকার ধারাব হু-একটি ছাড়া আমার একটুও ভাল লাগেনি। কি রকম যেন গন্ধ। ভেজে নেওয়া বা কবে নেওয়ার বেওয়ারজ এখানে নেই। সব রান্নাই প্রায় সিন্ধর উপর। চিড়ী মাছের টুকরোগুলোকে প্রেটের এক কোণে সরিয়ে দিতে দিতে ডাবছিলাম, "হায় যে ব্যাংককী চিড়ী, তুমি যদি

ব্যাংকের জলে অখাত ভাবে সেহু না হয়ে বাংলা দেশের হেঁসেলে সযবর তল মেখে যায়। হতে তাইহে—

খেতে খেতে অনিস দাস মশাইয়ের কাছ থেকে ওদেশী ভাষাও কিছু কিছু শিখে নিচ্ছিল। গুটিকতক কথা মনে আছে। “হু কু” মানে ভেরি হেলপফুল ম্যান। “সামসেন” মানে তিন চাকা রিক্স। “রথ” মানে গাড়ী। “চাকাবান” মানে সাইকেল। “প্রোজন” মানে প্রয়োজন—এই রকম অনেক কথার সঙ্গে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত শব্দের আশ্চর্য্য রকম মিল আছে, তবে উচ্চারণ একটু জালাল।

বাঙরা শেষ হতে রাজেন বললে, একটা বেন্ট কেনা দরকার। গেলাম বেন্টের সন্ধানে। তা হতোহ্মি। সারা ব্যাংকের বাজার চরে কেলে রাজেনের পেটের মাপসই বেন্ট কোথাও খুঁজে পেলাম না। দোকানের পর দোকান ঘুরে কতো বেন্টই না দেখলাম, কতো দোকানদারবীর বিরক্তিশূণ কটাক্ষই না সহ্য করলাম, ছোট বড় মাঝারি সব মোটা সস্তা দামী বেশী বিলাতী আমেরিকান ডজন ডজন বেন্ট বাস খুলে প্যাকেট ছিঁড়ে বেব করে ট্রাই করা হল কিন্তু হয়, কোনটাই আমার বন্ধুর পেটে জাঁটলো না! সব শেষে যে দোকানটিতে বাঙরা গেল তার মালিক হচ্ছেন একটা গোলগাল মোটামোটা আধাবয়সী খাই মহিলা। তার দোকানের সব চেয়ে বড় ও দামী আমেরিকান বেন্টটি রাজেনের পেটে পরিয়ে বখন তিনি দেখলেন যে পেটের আড়াই ইঞ্চি জায়গা তখনো বেবাক ঝাঁক থেকে যাচ্ছে, তখন তিনি আর সামলাতে পারলেন না, আচ্ছাদী পুতুলের মতন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন।

মনে মনে ভাবলাম, হায় যে, আমেরিকা পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাঁধাবিধির কত রকম ব্যবস্থাই না করেছে কত কল-কলতাই না বানিয়েছে কিন্তু আমার বন্ধুর পেট বাঁধা যায় এমন একখানা বেন্টও কি তৈরি করে ব্যাংকের বাজারে ছাড়তে পারেনি?

সে দোকান থেকে বেরিয়ে দশ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা ব্যাংক সহরটি আরও ধানিকটা ঘুরে দেখলাম। সহরটি দোকান-পাটে ভর্তি। আমাদের বন্ধুর বপুরকনী ছাড়া এমন কোনো জিনিষই নেই যা সেখানে পাওয়া যায় না। জামা কাপড় জুতো বাস্তব রেডিও গ্রামোফোন আসবাব প্রভৃতি নানারকম মনোহারা দোকানের ছড়াছড়ি।

তরিতরকারি ও ফলমূলের দোকানও অল্প। এখানে বাসের দোকানগুলো দেখে আমাদের একেবারে আকুল গুডুম। হাঁস দুবগী পায়রা ইত্যাদি নানারূপ পাখী তা আছেই, তা ছাড়া আরও কত রকমের জীবই যে মাংস হিসেবে বিক্রি হতে পারে এক লোক তা খাত হিসেবে খেতে পারে, তা ব্যাংক বাজার না দেখলে ধারণার বাইরে থেকে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরাহ থেকে শুরু করে তাম্রা হুলচর জলচর ও আকাশচর জীবজন্তু পক্ষী-কীট চারিদিকে খুলে। টিকটিকি গিরগিটি ও ব্যাং-এর মতন গুটিকতক গুটিকি জীবেরও দর্শন পাওয়া গেল। এগুলো দিয়ে কি ধরনের তরকারি বা খাবার বানায় তা ওরাই জানে। ব্যাংকে থাকা কালীন খাবার সময় এ রকম কোন খাত অজান্তে আমরা কোন দিন উদয় করছি কি না তাই বা কে বলবে।

সেনিনকার মত সহর দেখা শেষ করে মিটার দশের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলের স্কোরবার জন্তে একটি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। মিটার দশ ভাড়া ঠিক করে দিলেন ৩০ “টিকল”।

হোটেলের স্ক্রিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঘরে গিয়ে একটু গল্পসল্প করে স্নান সেয়ে খাবার ঘরে গেলাম। বাঙরা শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক হজমী হাটা হেঁটে গিয়ে আবার হোটেলের ফিরে এলাম।

পালখানেক বই নিয়ে ঘুমতে বাঙরা আমার চিরকালের বন অভ্যাস। একটা বই ভাল না লাগলে আর একটা, সেটাও পছন্দ না হলে আরো একটা অনারাসে হাতের কাছে পেতে হাতে কোন অল্পবিধে না হয়, তাই বা বা বই পাই সেগুলো বাসিনের পাশে রাখি, পড়া হোক আর না-ই হোক। বই হাতে না নিলে ঘুমই আসতে চায় না।

সেনিন সকাল থেকে সারাদিনই প্রায় ঘোরানুঘরি হয়েছিল, তাই বিছানায় শুয়ে বই হাতে নিতেই সঙ্গে সঙ্গেই “ঘুমপাড়ানি মাসি-মিসি ঘুমের বাড়ী যেও।” চোখের চশমা চোখেই রইল, হাতের বই পড়লো বৃকের ওপর। আমি ঘুমের বাড়ী বাবার পর প্রতাপজ্ঞ যদি আমার চোখ থেকে সেনিন চশমা খুলে না নিত তা হলে চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখতে পারতাম আর সেই স্বপ্নকথা সম্ভব পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করে দ্বন্দ্ব হতাম। কিন্তু কি করব, বয়স হয়েছে, বিনা চশমায় স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এখন আর নেই। এখন আর চশমা ছাড়া কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনে, এমন কি স্বপ্নও না। এর জন্তে প্রতাপ দায়ী।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেয়ে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। আজ পশুতজীর ওখানে বাঙরার নেমজ্ঞ। বাড়ীর টিকানা একটা কাগজে লিখে পশুতজী কাল প্রতাপের হাতে দিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে হাটতে হাটতে বাসট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে আমরা “অরেন্স বাসের” জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। টিকানাটা ওদেশী ভাষায় লেখা ছিল বলে আমরা সেটা পড়তে পারিনি। বাস-ট্যাণ্ডের কাছে এক খুঁটান খাই মহিলাকে কাগজখানা দেখাতে তিনি সেটা পড় বললেন “সাই ইন ছাউ” এ জায়গা আমার জানা আছে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো।

আমরা তখন বাসে না গিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তার সঙ্গে চললাম বাজারের দিকে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার একটু আগেই ডক-মহিলা গাড়ী থেকে নেমে গেলেন, অবশ্য তার আগেই জায়গাটি তিনি ভাল করে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ড্রাইভারটি বিশেষ সুবিধের লোক ছিল না। আমাদের বিশেষী ভালমাহুর গেরে একেবারে তিনগুণ ভাড়া হেঁকে বলল। আমরা তা অবাক। বাই হোক, শ্রদ্ধাজীর মধ্যহৃতায় তিন গুণের জায়গার দু’গুণ ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সিলাকে বিদায় করা গেল।

শ্রদ্ধাজীর সঙ্গে লজের হল, লাইব্রেরী ইত্যাদি আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমরা ব্যাংক সহর মন্দির প্যাপোডা ইত্যাদি দেখতে চললাম। এখানে একজন মস্ত ধনী ব্যবসারী “সিমোন্সন” প্রসাদ হচ্ছেন শ্রদ্ধাজীর অগ্রদূত বন্ধু। তিনিও নেতাজীর বিশেষ ভক্ত। আশা হিন্দু ধর্মের সাহায্যের জন্ত তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। তিনিই তাঁর একটি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী

পাড়িয়েছেন আমাদের সহর দেখাবার জন্তে। গাড়ীটি গেরে আমাদের বে খুবই সুবিধে হল তা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত রত্ননাথ শর্মা ও তাঁর বন্ধুর সৌজন্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাককের ভাল ভাল জার্সি ও জিনিব দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিলো।

এখানে মন্দির ও প্যাগোডাগুলি ভারি সুন্দর আর কত রকমের বুদ্ধমূর্তি যে আছে তার ঠিকঠিকানা নেই। প্যাগোডাগুলোর মাথা হাং বেরঙা রকমের টালি দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে তৈরি। খাক খাক করা নানান রকমের রঙ্গিন ঢালু ছাদগুলি তাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। প্যাগোডা ছাড়া অনেক সাধারণ বাড়ীর মাথাও দেখলাম রঙ্গিন টালি দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে তৈরি। মনে হয় বেন মন্দিরের মত বাড়ীগুলোও মাথার সুন্দর সুন্দর বাহারে টুপি পরেছে নিজেকে সৌন্দর্য বাড়াবার জন্তে। আমরা যেমন পাতাবাহার গাছ বলি তেমনি এখানকার মাথাবাহারে প্যাগোডা ও বাড়ীগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

এখানেই যে প্যাগোডাটি দেখতে গেলাম সেটি অতি চমৎকার! একাধিক বড় ও উচ্চ প্যাগোডাটি। তার মধ্যে উচ্চতমের ভগবান বুদ্ধের এক অপরূপ মূর্তি। মূর্তিটি “এমারেল্ড বুদ্ধ” নামে খ্যাত। দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার প্রায়  $8 \times 8 \times 6$  ফুট একটি পাথর থেকে খোদাই করা—জগতে এ-ধন মূর্তির তুলনা মেলা ভার। খাইল্যাণ্ডের লোকেরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ভগবান বুদ্ধের উপর এদের অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। এরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে এই মূর্তিটি জাগ্রত এবং এর মধ্যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এর মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর ভক্তদের, শরণাগতদের নানারূপ বিপদ-আপদ থেকে সঙ্গ-সর্বস্ব রক্ষা করছেন। প্যাগোডাটির ভিতরের কারুকার্যও অতি চমৎকার! বাহিরে চারি দিকে বাঁধানো ঢাকা বায়াল্লা। তার দেওয়ালে নানারকম হাং দিয়ে রামায়ণের লম্বজ কাহিনীটি নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করা রয়েছে। বিভিন্ন দেশবাসী বহু নরনারী মন্দির দর্শন করতে এসেছে। কারো মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব। মনে মনে তারা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি নিবেদন করছে ও নিজ নিজ মনস্কামনা জানাচ্ছে। সেই সৌম্য শান্ত প্রশান্ত মূর্তি দেখে মনে হয় বেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর নীরব ভাবার অনন্তময় হাসিমুখে শরণাগতদের আশ্বাস দিয়ে কলছেন, “ভয়ে ভয় নেই, তোদের সকলেরই কল্যাণ হবে, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, যা ভৈঃ। সত্যি সে মূর্তির দিকে একবার চাইলে আর চোখ কেমনো যায় না, সে এক অতি অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি।

সেখানে থেকে আর একটি মন্দিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আর এক অপরূপ-মূর্তি। এ মূর্তিটির নাম “শরান বুদ্ধ” বুদ্ধের স্তরে আছেন, মুখে তাঁর অদ্বুত শান্তি ও আশ্বাসমহিমা ভাব। লম্বায় প্রায় ২০০ ফুট এবং সেই অল্পপাতেই চওড়া ও উঁচু। মূর্তিটি সোনালী পাতে মোড়া স্বকৃৎ করছে। এত বড় ও এমন চমৎকার মূর্তি আর কোথাও দেখিনি বা কোথাও আছে বলে শুনিনি। মুখে মধুর হাসি, চোখে দয়া ও প্রেমের পূর্ণ আভাস মূর্তিকে অবনত করে তুলেছে। শরনের সহজ ও বাতাবিক তপস্কৃত ও বেন অপরূপ।

এই মন্দির দর্শন শেষ করে ও পথে আরও প্যাগোডা মন্দির ও দর্শনীয় স্থান দেখে আমরা হাজির হলার ব্যাককের বাহুবন্দে। লম্বা স্থানিয়ার মধ্যে ব্যাককের বাহুবন্দ একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

জগতের নানা দেশ থেকে বহু টুরিষ্ট আসেন এই বাহুবন্দটি ভাল করে না দেখলে তাঁদের ব্যাকের ভ্রম অপূর্ণ থেকে যায়। বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, চাকরলা ইত্যাদি নিয়ে যে সব মনীষীরা আলোচনা বা গবেষণা করেন তাঁদের পক্ষে এখানে আসা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এখানে বৌদ্ধধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য সবকিছু বিস্তর মৌলিক ও পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করে রাখা আছে।

প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরানো তালপাতার উপরে লেখা পুঁথি সারি সারি কাঠের বড় বড় সিল্কের মধ্যে রাখা আছে। সিল্কগুলিও ভারি চমৎকার! সিল্কগুলোর গায়ে সোনালী, লাল, কাল ইত্যাদি নানা রং-এর লতাপাতা কেটে ছবি আঁকা রয়েছে। পুরানো পুঁথি ছাড়া আরও কত রকমের কত পুরানো জিনিব রয়েছে, তা আর কি বলব। রাজা-রাজাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের হাজার হাজার বৎসরের পুরানো জিনিবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, পোসিলেনের বাসন, আসবাব পত্র, বাজনা-বাঁজি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি এক একটি ঘরে বোকাই করা ঠাসা। ঢাক, ঢোল, তবলার মত, এস্রাজ, সেতার, তানপুরার মত, বাঁশী, শানাই, বিউগল ও ক্ল্যারিওনেটের মত, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকারের ছোট-বড়-মাঝারি কত রকম বাজনা-বাঁজি যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। জলতরঙ্গ ও বোঁশার মত বাজন্তরও রয়েছে দেখলাম।

আর এক জায়গায় দেখলাম, নৌকা, জাহাজ, বজরা, পানী, সামান্য জাতীর নানারূপ জলযানে একটি ঘর একেবারে ভর্তি। খাইল্যাণ্ডে নৌনালা ও জলাভূমি খুব বেশী, অন্ততঃ এদের নানারূপ জলযানের যে সঙ্গ-সর্বস্বই প্রয়োজন ছিল ও আছে, তা বলাই বাহুল্য।

পুতুলনাচ ও ছায়াবাঁজি বা ছায়ানাচ এখানে আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। দেশবাসী জনসাধারণকে আনন্দ দেবার এই ব্যবস্থাগুলি এরা এখানে ভাল ভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছে, আমাদের মত ওগুলিকে এরা অন্যায় করেনি বা মেয়ে কেলেলা। পুতুলনাচ ও ছায়াবাঁজির নানারূপ জিনিব ও আশ্রাব্যপত্র একটি ঘরে সাজানো রয়েছে। ছায়াবাঁজি বা ছায়ানাচ করবার জিনিবগুলি বড় মজার। বড় বড় কাগজ, কাঠের বা ককির ফ্রেমে আটকে সেই কাগজে নানা ডিজাইনে নক্সা কেটে ট্রেনসিলের মত তৈরি করে লাঠির ছাওলার ওপরে আটকে দিয়েছে। ট্রেনসিলগুলি নানাপ্রকার। জন্ত, জানোয়ার, পাখী, ফুল, গাছ, পুতুল, মেয়ে, নর্তকী, রাজা, রাণী ইত্যাদি নানা রকমের নক্সাটুকরা আছে। ট্রেনসিলের এক দিকে আলো কেলে সেটি নাড়াচাড়া করলে অপর দিকে অতি মনোহরকর ছায়াছবি ও ছায়ানাচের নাচের সৃষ্টি হয়। এদের জাতীয় উৎসবে এখানে এই সব জিনিব দেখিয়ে দেশবাসীকে এরা প্রচুর আনন্দ দিয়ে থাকে।

কোথায় গেল আজ আমাদের সেপের সেই পুরানো দিগের পুতুলনাচ কথকতা পাঁচালী? কোথায় গেল সেই কবির লড়াই, বাড়িল গান বাজা, লোকনৃত্য, ইত্যাদি জনগণের সহজ ও নিম্নল আনন্দের উপাদান? তারা নেই। আমাদেরই অনায়ে হতাসের আজ তারা দুগুপ্রায়। হাল-কাসানী বিস্মেটর-বারফোণের পাশে আশ্রয়প্রাপ্ত করতে আজ তারা কুণ্ডিত। সেই কুণ্ডি হ্রু করতে হবে। কিরিয়ে আনতে হবে দেশের জিনিবকে—দেশের হারিয়ে যাওয়া জিনিবগুলিকে আবার দেশের মধ্যে জনগণের ভিতরে। তাদের আবার কাজ লাগতে হবে দেশবাসীদের আনন্দ দেবার কল, তাদের

কুটি তাদের সহজ শিরোধোষ ও সরল মনের স্বকুমার প্রবৃত্তিগুলি  
হুঙ্লিত প্রকৃষ্টিত করবার জন্যে।

বাহুবীর থেকে বেরিয়ে আরও গুটিকতক চমৎকার জিনিষ নজরে  
পড়লো। জিনিষগুলি হচ্ছে বামন বা বেঁটে গাছ। ছোট-খাট ভারি  
মজার দেখতে। কনক গাছ, কাঁটাল গাছের মত নানারকম গাছ যে  
এত বেঁটে এত ছোট হতে পারে, তা না দেখলে, ধারণাই করা যায় না।  
পূর্ণ পরিণত গাছগুলি দেড় ফুট দু'ফুটের বেশী হবে না। ভারী  
স্বন্দর দেখতে। বহুবীর প্রতাপ চন্দর হাতে পেনসিল-নোটবুক না  
নিরে কোথাও যায় না। দু-এক মিনিটের মধ্যেই গুটিকতক সুদৃশ্য  
বামনবৃক্ষ তার নোট বৃক্ষের পাঠ্যর ক্ষেত্রে হয়ে চিরঞ্জীব হয়ে রইল।

বেলা দুটো নাগাদ পশ্চিমতীরের সঙ্গে তাঁর বাড়ি এসে পৌঁছলাম।  
সঙ্গে মিঠার দাঁশগুণ্ড ও পশ্চিমতীরের লোকানের কর্ণচরীট। স্থ-গাত  
ঘুরে একটু জিরিয়ে নিয়ে খেতে বসে গেল। পশ্চিমতীরের ঘরে ও  
ভাটপো পরিবেশন করতে লাগলেন ও পশ্চিমতীরী নিজে এটা খাও,  
ওটা খাও বলে সবচেয়ে খাওয়ারতে লাগলেন। গরম গরম পুরি পকোড়ি,  
বড়ি দিয়ে রান্না অভয় দাঁশ, চমৎকার ফুলকপির তরকারি স্রালাভ  
পায়েল কলো ও বাতাবি মেসু দিয়ে খুব তৃপ্তি করে খাওয়া গেল।  
পশ্চিমতীরী ত্রী নিম্ন হাতে সব রান্না করেছেন প্রত্যেকটি জিনিষ,  
অতি উপাদেয়। অনেক দিন পরে দৌলী খাবার দৌলীর ঘরনের রান্না  
ধেয়ে যে কি ভাল লাগলো তা আর কি বলব! বড়ি দেওয়া ভাল ও  
ফুলকপির তরকারি যে পরিমাণে খেলাশ পাঁচটা সহজ লোকে মিলে তা  
খেতে পারে কি না সন্দেহ! খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার নানা  
রকম গল্প শুরু হোল।

ব্যাককের কথা হতে হতে নেতাজীর কথা, আজাদ হিন্দ কোজের  
কথা উঠলো। তাঁদের মধ্যে বা সুনন্দাম ভ্রগতের ইতিহাসে তা এক  
অপূর্ণ কাহিনী। যে কটা দিন নেতাজী সেখানে ছিলেন দেশের লোক—  
কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পশ্চিম, কি মূর্খ সকলেই তাঁকে সারা এশিয়ার  
প্রাণকর্তা বলে চিনতে পেরেছিলেন। সে দিন সেই মহামানবের  
গৌরবময় কাহিনী শুনে মন আমাদের ভরে উঠেছিলো। নেতাজী  
ও আজাদ হিন্দ সবচেয়ে পশ্চিমতীরী কিছু কিছু দেখা আছে। আমরা  
সে লেখাগুলি দেখতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, সেগুলি সংগ্রহ করে  
পরে আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। কথায় কথায় আমাদের বহুবীর  
মুখে জ্ঞানভেদ পেরেছিলেন যে নেতাজীর সবচেয়ে আমার একটি স্বরচিত  
কবিতা আছে। কবিতাটি শুনেই আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি  
সেই আবৃত্তি করে শোনাই। শুনে সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন  
এবং আবৃত্তি করে আমিও কম খুশী হইমি। কবিতাটি ১৯৫০  
সালে নেতাজী দিবস উপলক্ষে রচিত

### নেতাজী

ভারতমাতার অমর পুত্র সৌম্য শান্ত বীর,  
নেতাজী সুভাষ নেতাজী সুভাষ মহা-ভারতের বীর।  
শক্তিময় নীক তোমার যুগ্মবীরী তুমি,  
তব নামে সশা যুগ্মবীর-এই পুণ্য-ভারত-ভূমি।  
দেশের সুভাষ দেশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,  
নেতাজী তোমারে কুলেছে কুলক আমরা ত' তুলি নাই।  
স্বর্ঘ্য তোমারে শোঁচি দিয়াছে সারস দিয়াছে তুটি,  
পারিজাত দেখে হুঁসি হুঁসি চলে দিয়েছে তুটি।

আত্মশক্তি শক্তি দিয়াছে হিয়াচল দেখে মান,  
ভক্তি দিয়াছে কাঙ্গালের হরি ভক্তের ভগবান।  
দেশের সুভাষ দেশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,  
মুক্তিযজ্ঞে অধিক তুমি তোমারে ত' তুলি নাই।  
দুর্কালে তুমি করিয়াছ বীর অসহায়ে দেখে আশা,  
ভীকরে করেছ যুগ্মবীরী মুকুন্দ দেখে ভাব।  
বাদশারে তুমি ফকির করেছ কুপণেরে দাতাকর্ণ,  
ভিখারী তোমারে ভিক্ষা দিয়াছে তুঙ্গ-কণা স্বর্ণ।  
দেশের সুভাষ দেশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,  
স্বাধীনতা-বাগে পুরোহিত তুমি তোমারে ত' তুলি নাই।  
সারা এশিয়ায় প্রচারিত তব মুক্তির নব মন্ত্র,  
আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে তোমার ভয় হিন্দু মহামন্ত্র।  
বঙ্গজননী ভারতজননী জগজ্জননী আজ,  
তোমারি আশার পথ চরে আছে ওহে রাজ-অধিরাজ।  
দেশের সুভাষ দেশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,  
বাল্লা মারের নয়নের মণি তোমারে ত' তুলি নাই।

হোটলে ফিরে এসে দেখি—আমাদের কিছু জীমান বিনয়  
যানাজী ইন্সপেকশিয়া থেকে কলকাতায় স্থিতি মুখে এখানে  
কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম করতে এসেছেন। বিনয় বাবু ইউ,  
এন, ও'র বড় চাকুরে। অনেক রকম খবর রাখেন। তাঁর সঙ্গে  
কথাবার্তার বেশ আমলে সময় কাটতে লাগলো। বাবার সময়  
বলে গেলেন, "একটি ষ্ট্রাম লক ভাড়া করে এখানের মেনাম নদীটি  
অন্ততঃ ষটা দু' তিন ঘুরে আসবেন, খুব ভালো লাগবে।"

কাল ভোরের প্রেনে এখান থেকে হংকং বতনা হবার কথা।  
মেনাম নদীতে নৌকাবিহার কপালে নেই, এই কথা ভাবছি এমন  
সময় হোটেলের রিসেপশনিট এসে জানালেন যে কাল যে প্রেনে করে  
আমাদের হংকং যাবার কথা ছিল সেটা কাল না হয়ে পরন্ত হবে।  
ভালই হল। মেনামে নৌকাবিহার আমাদের কপালে নাচছে,  
কে তা খণ্ডতে পারে?

পরদিন প্রাতরাশ সেয়ে বাসে করে ষ্টেশনের দিকে চললাম।  
সেখান থেকে মেনাম নদী কোম দিকে, সে বিবর আমাদের সঠিক  
ধারণা ছিল না। প্রতাপ চন্দর কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত—অপ্রস্তুতি  
কা'কে বলে তা সে জানেও না।

পকেট থেকে চট করে ব্যাককের বিবর একটি পুস্তিকা বের করে  
ফেললে, পুস্তিকার মধ্যে ছিল ব্যাককের এক খণ্ড মানচিত্র। সেই  
মানচিত্র দেখে ও পূর্ণ পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভাল করে বিচার ও গণনা  
করে বাৎসে দিলে মেনাম নদী কোম দিকে। আমরা তিন বন্ধু তখন  
সেই দিকে যুগ্ম করে ষটিতে প্রকৃত করলাম। প্রতাপ সঙ্গে না থাকলে  
কি আশা হত তাই ভাবতে ভাবতে ষটিছি, এমন সময় রাজেন কললে  
"ওহে প্রতাপ, দিক নির্ণয় ত' করলে কিন্তু কই মেনাম নদী ত'  
এখনো এলো না। আর মিহিমিহি না ষ্টেট খান হই সাইকেল-  
রিজ ভাড়া করলে হত না?" অগম্যতান প্রতাপ রাজেন কখনো  
করে না, অতএব তার প্রত্যাখ্যান তখনই সন্নিবেদিত হল। একটি  
সাইকেলরিজের দিকে তাকাতেই চার পাশ থেকে প্রায় তেরটি বিল  
আমাদের চারিদিকে বেহাণুয় একটি "লাকবাস মুহ" মুন্ডা করে  
আমাদের ঘেরাও করে ফেললে। আর আমরা তিন অতিক্রম পল্লব

মহা হুজিরে। হাত-পা নেড়ে লেকচার পশ্চারে তখন সেই এরোদশ সারথির উদ্দেশে বললাম, দেখ বাপু, ডিনটি প্রাণী ত' তেরটি বিজয় চড়া যায় না; অতএব তোমাদের মধ্যে যে কোন হু' জন যদি আমাদের যেনাম নদীর তীরে পৌঁছে নাও ত' আমরা বিশেষ বাবিত হব, ব্যাপারটা ততক্ষণে তারাও বুঝে। তাদের মধ্যে তখন হু'খানি ছিল নিয়ে চললো আমাদের যেনাম নদীর তীরে।

যেনাম নদীটি ঠিক আমাদের কলকাতার গঙ্গার মত। তার জলও ঠিক আমাদের গঙ্গা-জলের মত দেখতে। মালপত্তর বোকাই, লোকবোকাই কত রকম-বেরকমের জলবান বে বয়েছে তা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

ছোট-বড় মাঝারি সন্ধ্যা-মোটা বেঁটে নানারকম নৌকা-জাহাজ হিঁপ সামপান ইত্যাদি। ব্যাকক জায়গাটি নদী-নালা ও খালে ভর্তি। জলের ওপরে কত পরিবার যে বসবাস করে কত লোকই যে বাবসা করে সঙ্গার চালায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নদীর ওপরেই তারা খায়-দায় থাকে, কাজ করে, বাবসা করে।

কেউ বা তরকারী কেউ বা ফল কেউ কেউ আবার রান্না ভাত-ডালমাংস খাবার-দাবার তৈরি করে নদীর ওপরেই নৌকা চালিয়ে বিক্রি করে বোজগার করে সঙ্গার চালাচ্ছে। বাছা বাছা ছেলে-মেয়েরা সব সময়ই জলের কাছে খোঁড়াগুরি করছে খেলা করছে, কেউ তাদের বন্ধে না বা খানাপা করছে না। এখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বেশীর ভাগ সময়ে আহল গায়েই থাকে, স্বাস্থ্য খোঁটার ওপর ভালই। আমা-কাপড় বা পুরে তা পরিচর্য দেখেই পুরে, ময়লা পোষাক পরে না। হুই-মিতে এরা আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মতই, তবে আমাদের দেশের মত বড়দের কাছে বকুনি-হারটার বেশী খায় না। মেয়েরাই বেশী কাজ-কর্ম করে, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অলস।

বড় বড় মহাজনী নৌকা ও বজার করে নানা রকম মালপত্তর চালান হচ্ছে দেখলাম। চালানী মাল এখান থেকে ওখানে বাচ্ছে, ওখান থেকে এখানে আসছে। চাঁদ সন্ধ্যারের দল হাজাং রকমের সামগ্রী বেসাতি নিয়ে ময়ূরখী সাজিয়ে সাত সত্ৰুদুর তের নদী পাড়ি দেবার আয়োজন করছে বা বাণিজ্য করে ফিরে আসছে। দেখতে বড়ই ভাল লাগে।

তিন বহু মিলে একটি ছোট স্নুদুগ ঠীমলকে উঠে বসলাম। ভাড়া ঠিক হল ৫০ "ডিকল"। লক্ষখানি চলতে লাগল যেনাম নদীর বুকের উপর দিয়ে। যেতে যেতে কত বড় বড় নৌকা জাহাজ বজার দর্শন পেশার, কত লোকের কত পরিবারের সমস্ত সদল দৈনন্দিন ঘর-করার ছবি দেখলাম, তা আর কি বলব! ছোট ছোট পাননী সামপানে করে গরীব বা মধ্যবিত্ত পুঙ্খ স্বাস্থ্যসারী তাদের বেসাতি নিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নৌকার ধারে অবাবে চলাফেরা করছে, জলের দিকে বুকছে, তাতে তাদের মায়েরের ত্রকপও নেই। কত পাননী সামপান আমাদের লকের পা বেঁচে চলে গেল। বাবার সময় কেউ কেউ বা খিট্ট হাসি হেসে আমাদের কাছ থেকে কিরতি হাসি দিয়ে যে যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ দিকে চলে গেল।

যেনাম নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি দাঁড়ি ও প্যামোডা। লক্ষ খানিয়ে আমরা তার মধ্যে ভিত্তিকতক প্যামোডা দেখে নিলাম।

প্যামোডাগুলি অতি সুন্দর, চারি দিকে চমৎকার সাজানো। ফুল বাগান। মাথার ছাদগুলি স্নুদুগ রঙিন পোরসিলেনের টালি দিয়ে চমৎকার ভাবে তৈরি। নীল আকাশের নীচে সে প্যামোডাগুলির চু বড়ই মনোহর। প্রতাপের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। সে উপাট ভিত্তিকতক ছবি তুলে নিলে।

হুপুর প্রায় ১২টার সময় আমাদের লক্ষখানি আবার যেনাম নদীর তীরে ফিরে এলো। সেখান থেকে রিক্স নিয়ে আমরা ঠেশান এলাম এবং সেখানে একটু বোরাকেরা করে কে এল এম হোটেল যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দুটো বাজে। বৃথ-হাত-পা ধুয়ে খাবার খাওয়া গেল। সেই আমাদের প্রথম হোটেল লাক খাওয়া।

খাওয়া লাওয়া শেষ করে ঘরে এসে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসে গেল। পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় অভূতপূর্ণ মাঠ, সবুজ ধানের ক্ষেত আর মাথার উপর নীল আকাশ। ঘরে একটি মশিয়ার চূড়ার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের পেটনের ছোট পুকুরে একটি ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে হিঁপ দিয়ে মাছ ধরছে। কিছুক্ষণ পরে ছুটি ডাচ বুক এসে হিঁপ নিয়ে মাছ ধরতে লেগে গেল।

গত কাল রান্না দিয়ে যেতে যেতে ভারি মজার এক ভিনির দেখেছি। আগেই বলেছি যে, এখানে জলাভূমি চারি দিকে এবং অনেক বাড়ী জলার উপরে কাঠের খুঁটির উপরে তৈরি। এক খাই-মহিলা তাঁর বাড়ীর বাহ্যিক উপর থেকে হিঁপ ফেলেছেন মাছ ধরবার জন্তে। জানি না উল্লে তাঁর তেল চড়ানো ছিল কি না। এ রকম সহজে অনায়াসে ঘরের বাইরে না গিয়েও মাছ ধরার প্রচেষ্টা দেখে সেদিন ভারি মজা লেগেছিল।

জলাভূমি থাকলেই সেখানে ব্যাং থাকবেই। অতএব ব্যাংকে যে ব্যাং একটু বেশী পরিমাণে থাকবে তা খুই স্বাভাবিক। শুধু হুপুরে ও সন্ধ্যার ব্যাং-এর ডাক শুনেতে বেশ লাগে। তাদের লাকিরে লাকিরে চলা দেখতেও ভারি মজা লাগে। ব্যাংএর বিষয়ে একটি ছড়া বা কবিতা রচনা করে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠিয়েছিলাম, সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ব্যাং ককাকক্ ব্যাং ককাকক্ ব্যাং ব্যাঙাব্যাং ব্যাং

ব্যাংককেতে পৌঁছে দেখি চারদিকেতেই ব্যাং

(তারের) স্ক স্ক ঠ্যাং (তার) ছোড়ে টারার ল্যাং

(আর) সেই ঠ্যাংতে লাকিরে বেড়ায় ল্যাং ডাঙাডাঙা ড্যাং।"

কাল ভোর পাঁচটার আমাদের হাকং বাত্রা—রাত্রের খাওয়া লাওয়া সেরে বাগানের বেধে বসে গল্প করছি, এমন সময় রিসেপশনিষ্ট এসে জানিয়ে গেল যে কাল ভোর পাঁচটার আমাদের স্নেন ছাড়বে। সে বলে, আমাদের উষ্মি হবার কোনো কারণ নেই। হোটেলের ওরেটার ঠিক তিনটের সময় চা নিয়ে আমাদের জানিয়ে দেবে আর চারটের সময় কে এল এম বাস এসে আমাদের নিয়ে ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ স্নেনে তুলে দেবে। কিছুক্ষণ গল্প করে সে চলে গেল। আমরাও তখন আমাদের শোবার ঘরে চলে এলাম।

সন্ধ্যা বীশী ছিল। একটু বীশী থাকিয়ে খানিকটা সময় কাটানো গেল। মাসে মাসে তিন বহু মিলে একটু-আধটু গানও গাওয়া গেল। তার পর যে বাঘ বিছানার গিলে ভুতে ভুতেই দুম।

জাহাঙ্গীর

এদিকে তোমার পরিবারের কাজও চলিতে লাগিল। তিনটি কড়া পূর্বে হইতেই আসিয়াছিলেন, এখন আরও আসিতে লাগিলেন। তুমি মাতা হইয়া ঠাণ্ডাসের শরীরের সেবা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চরিত্র পরিদর্শন, ধর্মজীবন গঠন সকলই করিতে লাগিলে। প্রভাতে সন্ধ্যায় 'পরিবারের' পরিচর্যা, বিপ্রহরে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ, ইহা ছাড়া বিদ্যালয় সক্রান্ত সহকারী সাধারণ কল্যাণভের ভার তোমারই উপরে পড়িল। কেমনে তুমি এত ভার লইয়া পাহিরা উঠিবে আমিও পূর্বে তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতাম, সকল মানবস্থায় অনন্ত শক্তির অধিকারী, তাই বৃথিতাম মার কুপায় তুমিও পাহিবে। বেবি, এখন হইতে তুমিও কাছে নিবুস্ত; আমিও নিবুস্ত; তুমি ও আমি উভয়ে নিজের নিজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভার বহন করিতে লাগিলাম। তোমাকে ও আমাকে জীবনের অবস্থার প্রভেদ আরও বুঢ়িরা বাইতে লাগিল। মিলন বাড়িতে লাগিল। এ কিরূপ মিলন? তুমি তুমি আমার মধ্যে লুপ্ত হইয়া বাইবে, তাহা নয়; তুমি আমার সমুখে নিজের সহ্য অধিকার লইয়া, নিজের স্বাধীন দায়িত্ব ভার লইয়া



পাঁতাইবে, আবার সাধনে ও তপস্তায় আমার সঙ্গিনী হইবে—  
এইরূপ মিলন। এ মিলন এক দিনে শেষ হয় না, ইহা চির-  
উজ্জ্বল। বহুই তোমার কাজ বাড়িতে লাগিল, ততই আমিও  
তোমার সাহায্য করিয়া অতি উচ্চ স্থানে পৌঁছাইতে লাগিলাম;  
আবার বধন তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে  
লাগিল, তখনই আশ্রয় ইচ্ছাত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম।  
এ শিক্ষা সব সময় সহজ হয় নাই, কিন্তু এ শিক্ষা বিনা কে কবে উচ্চ  
মিলন সন্ধান করিয়াছে?

মার্চ মাসের শেষে বিভাগের ছাত্রীসংখ্যা ২১ হইল। এ ছাড়া  
১৫টি ভিন্দুভানীর মেয়ে আসিতে লাগিল। বিশেষ হইতে কড়াগণ  
তোমার পরিবারে আসিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়  
তোমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রচেষ্টা অনুসারে  
তোমার সকল কাজকেই আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রজগোপাল  
তোমার কাছে যোগ দিতে চাহিলেন। আর এই সময়ে প্রবোধের  
বিবদা পত্নী স্বীয় কন্যাটির ভার তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স  
হইলে পাত্রস্থ করিতে বলিয়া দিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মুন্সের কাজ হাতে লইয়া তোমাকেও অনেক শিখিতে হইল।  
প্রতিদিন শত কাজের মধ্যেও খানিককণ পাঠ করিতে। এই কাজটি  
নিয়মিতরূপে করিতে। একবার মুলে ভূগোল পড়াইবার প্রয়োজন  
হইল। ভূগোল তুমি জানিতে না। তোমার প্রধানমন্ত্রী আমি,  
আমাকে আদিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি করিবে। মন্ত্রী বলিলেন,  
“একটু পড়িয়া লও না।” তুমি তাহাই করিলে, এবং মুলে গিয়া  
পড়াইলে। অল্পও জানিতে না। বধন অল্প শিখাইবার প্রয়োজন  
হইল, তখনও একরূপে নিজে শিখিলে ও তারপর শিখাইলে। একটি  
কথা তুমি খুব বুঝিয়াছিলে; তাহা এই যে, মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে  
অধিকার লোকের মনোযোগ নাই; অথচ তাহারা বাহ্যতে সসারের  
রাগান্বা প্রভৃতি কাজ করিবার উপযুক্ত হয় সে দিকে অনেকেরই  
দৃষ্টি আছে। তাই তুমি লেখাপড়া শেষার বিকটাত্তেই বেশী জোর  
দিতো। একদিন আমি বলিলাম, “মেয়েদের রাগা শেখা হইতেছে  
না।” তুমি বলিলে, “এখন যে সময় আছে তাহা পড়িতেই কুলায়  
না; তাহা হইতে রাগার জন্ত সময় কাটিলে চলিবে না। ৭।৮  
বৎসর মাত্র মেয়েরা পড়িতে পার, তাহা হইতে বেশী রাগা শিখিতে  
সম্মত কাটিয়া লওয়া যায়, তবে কিছুই শিক্ষা হইবে না। আমি ১৫  
দিনের মধ্যে মেয়েদের রাগা শিখাইয়া দিব।” বধন তুমি এই কথাগুলি  
বলিতেছিলে, তোমার ব্যাকুলতা চোখে মুখে বেন আঁকা দেখিতে  
পাইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আর আমি একটু পীড়াপীড়ি  
করিতাম না। অল্প দেখিতাম, তোমার পরিবারের মেয়েরা রন্ধনের  
প্রাইজ পাইত। পার্শ্বের স্ত্রীবধবা বাহ্যতে হয়, সর্বদা ও সকলের  
জন্ত সে চেষ্টা করিতে। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ রান্নিতে শীঘ্র দুমাইয়া  
পড়িতেন, পার্শ্বের সম্মত পাইতেন না, তাই তুমি সুবোধের চোরার  
সম্মত রান্না ১২টা পর্যন্ত খাড়া বসিয়া থাকিতে, সুবোধের নিরা  
আসিলেই জগাইয়া দিতে।

মুলে উপস্থিত হওয়া ও মুলের কাজ করা সম্বন্ধে তোমার নিয়ম  
দেখিয়া বৈতনভোগী শিক্ষকেরাও আপনাদিগকে নিয়মিত করিতেন।  
পুত্রী অল্পই থাকিলেও সহজে মুলে বাওয়া বন্ধ করিতে না। অনেক  
দিন আহাৰ করিয়া বাইতে পারিতেন না। কখনও কখনও তোমার

খাত মুলে লইয়া বাওয়া হইত, কিন্তু সে শুধু অল্প গলাধঃকরণ করা  
কঠিন হইত। অবকাশের (চিকিৎসকের ছুটির) সময় বিভাগের গিয়া  
দেখিয়াছি, মেয়েদের সঙ্গে ভূমি প্রাঙ্গণে দৌড়িতে, ক্রিকেট খেলিতে  
হয় তাহা শিখাইতেছি। তুমি এ সময়ে কিওয়ার্গার্টেন প্রণালীও  
অল্প শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলে।

এ সকল তো মুলের সময় করিতে। তারপর আর একটি কাজ  
ছিল সেটি বাড়ী বাড়ী গিয়া মেয়েদের মাংসের সঙ্গে দেখা করা। অনেক  
খোশামোদ করিয়া তবে এক একটি মেয়েকে খোঁজা করিতে।  
বিভাগের মেয়েরাও তোমাকে আপনাদের লোকের মতন ভালবাসিত।  
তারা তোমাকে “মাইজী” বলিত। “মাইজী” বলিলে বিভাগের  
বাগিকা মাদ্রেইট মন ভালবাসায় পূর্ণ হইত।

তোমার দৈনিক পড়িলে দুধা বায়, এই সময়ে তোমার কাজ কত  
বাড়িয়া চলিল। একদিনের কতগুলি কাজের তালিকা এই।  
(১) ছেলেরদের আহাৰ দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা,  
(৪) রোগীর সেবা, (৫) মুলে বাওয়া, (৬) খোঁজার বস্ত্র লওয়া  
ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) লেপ প্রস্তুত করা, (৯) নুতন  
বছুর বাটার সবাব লওয়া, (১০) ভূতাত বন্দোবস্ত করা, (১১)  
একটুকু করা এবং বেতন দেওয়া। দেখিতে ও শুনিতে হইতো সহজ,  
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মাস্টারের পক্ষে এ অনেক কাজ। ইহার  
মধ্যে দেখা করাটা একটা বিশেষ কাজ ছিল। নুতন কোন বছ  
আসিলে একবার বাওয়া নিত্য প্রয়োজন হইয়া উঠিত। কেন না,  
নুতন স্থানে কেহ আসিলে তাহাকে কত অসুবিধার পড়িতে হয়, তাহা  
তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া  
দিতো, ও সাহায্য করিতো। যদি কাহারও ফিলটার আবদ্ধ হইত,  
মিসেস্ বায় তাহা প্রস্তুত করিবে। বাসি, করলা প্রভৃতি তরকারি  
গিয়া, কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর হাঁড়ি সরাইতে হয়, তোমাকে দিয়া  
বলিয়া দিতে হইত। কখনও কখনও কোন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া  
ভ্রম পুঙ্খবদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে বাইতে হইত।

পাছে বাহিরের বড় বড় কাজে মন গেলে সসারের কর্তব্য ভাল  
করিয়া করা না হয়, তাই সলাই তুমি চিন্তিত হইতে। ছেলেরা কি  
খাইল কি না খাইল, তার তত্ত্বাবধান করিতে তুমি সলাই সম্মত  
হইতে। সেইজন্য ছেলেরদের সঙ্গে একত্রে খাওয়ার করিতে  
ভালবাসিতো। খাবার জিনিষ দেখিয়া বিষয়ে তোমার মতন সম্মত  
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। একদিন রন্ধনের কর্তব্য আমার  
পায়ে অনেক বেশী বেশী বস্ত্র লিয়াছিলেন। তারতম্য এত অধিক  
যে ছেলেরদের সম্মত বসিয়া আমার খাওয়া অসম্মত হইতেছিল। কি  
করিব জাবিতহিলাম; তোমার আহ্বানে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল।  
তুমি আসিবারাজ আমার মনের ভাব বুঝিলে এবং আমাকে কিছু না  
বলিয়াই আমার পাত হইতে ব্রব্যটি তুলিয়া লইয়া সকলকে সমান  
ভাগ করিয়া দিলে; আমি বাঁচিলাম। ছেলেরদের খাওয়া দেখা যেমন,  
তেমনি অতিথির আহ্বানের বন্দোবস্ত করাও তোমার একটা নিত্য  
ব্রতবর্ধ ছিল। অতিথির সম্মত বসিয়া তুমি আহাৰ কড়াইতে, অতের  
হাতে এ ভাব দিয়া থাকিতো না। যে কোনও সময় হউক না কেন,  
অভ্যাগত জনকে কখনও বাসী ভাত কিম্বা বাজারের বাহার খাইতে  
দিতো না। পূর্বাতে, অপরাহ্নে, বারিত্তে সর্বদাই গরম ভাত দিতে  
চেষ্টা করিতো। তাই চন্দ্রনাথ চন্দ্রাপাধ্যায় গল্প করেন, একবার তিনি



আমাদের বাড়িতে আসিয়া স্থির করিলেন, প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া ৭টার ট্রেনে গয়া যাত্রা করিবেন, এবং গয়ায় গিয়া আহার করিবেন। এই সকল করিয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। যেমন উপাসনা শেষ হইল অমনি দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে গরম খিচুড়ী প্রস্তুত। এদিকে তুমিও উপাসনায় বসিয়াছিলে, কখনই বা খিচুড়ী প্রস্তুত করিলে কেহই বুঝিতে পারিলেন না। উপাসনায় বসিবার পূর্বেই কেরোসিনের ষ্টেভে খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়াছিলে। উপাসনা কেলিয়া কখনও আহারের বন্দোবস্ত করিতে বাইতে না।

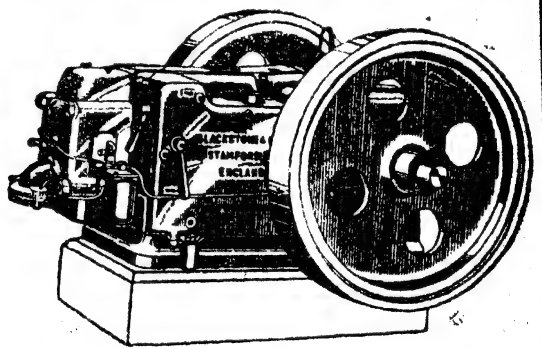
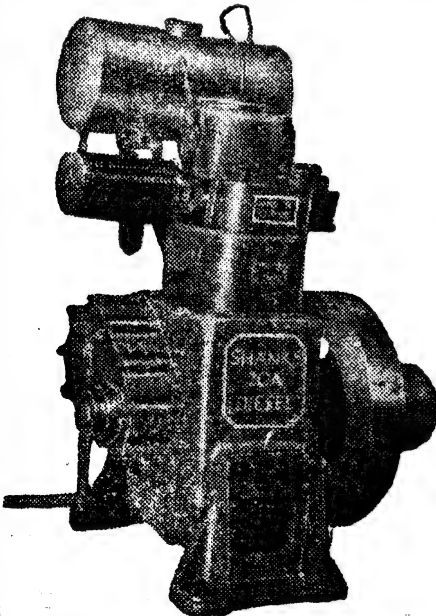
তোমার পিসিমাতারা একবার গয়া ভীর্ণ করিবার জন্য তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন, তুমি নিজে তাঁহাদের সেবার আয়োজন করিয়া দিলে, কিন্তু রন্ধন করিলে না। অস্বাস্থ্য হিন্দু কুটুম্ব আসিলেও এরূপে আহারের সব আয়োজন করিয়া দিতে, কিন্তু সাবধান হইয়া একটু অস্ত্রের অস্ত্রে থাকিতে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ব্রাহ্ম-বন্ধুরা দয়া করিয়া প্রায়ই আসিতেন। বড় মাছের অতিথি হইলে বড় মাছের মত আয়োজন করিতে হইত। তাহাতে কখনও কখনও খুঁচের অকুলান হইত। শেষে লজ্জা ভাগ করিয়া 'বাহা আছে তাহাই দিতে, এবং তাহা দিয়াই ভুক্তিভাবে সেবা করিতে।' মাসের শেষে কখনও কখনও অতিথিকে দিবার উপযুক্ত মিষ্টান্ন থাকিত না। কিন্তু প্রাপ্যস্তও বাজারে দেনা করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীবা হইলেই সন্তানদের লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিত। নিজের সন্তান ছাড়া স্থানীয় স্কুলের

ছাত্রদিগের প্রতিও তোমার দৃষ্টি থাকিত। একবার কলিকাতা হইতে ৪টা নারিকেল আসিয়াছিল। প্রিয় বস্ত্র পাইয়া আপনার ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলে না। পিঠা প্রস্তুত করিলে, আদর করিয়া সার্ভে এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে তোমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া পৌষপিঠা খাওয়াইলে।

একবার একটা সার্ফাস পাটি বাঁকিপুরে আইসে। তাহাদের মধ্যে একজন টাইকয়েড করে আক্রান্ত হন। তাঁহার পীড়া সক্রামক বলিয়া তাঁহাকে কেহ স্থান দিতে চাহে নাই। তুমি তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিলে; ঔষধ, পথ্য দিয়া ও যথাবিহিত সেবা করিয়া নীরোগ করিলে এবং স্বদেশে পাঠাইয়া দিলে। বুঝা তোমার সেবার মুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন তুলিলেন যে তুমি দেহত্যাগ করিয়াছ, তখন কানিয়া ফেলিলেন।

যে কোনও বিষয়ে লোকের একটু সাহায্য করিতে পারিলে তুমি সুখী হইতে! এক বার এক জন লোক বাঁকিপুরের মেডিক্যাল স্কুলের মাঠে বেলুন উড়াইলেন। তখন মেডিক্যাল স্কুলের মাঠ খুব বড় ছিল, হাসপাতালের বাড়ী তখনও তৈয়ারী হয় নাই। তোমার বাটা সে মাঠের অতি নিকটে। তোমার বাটার ছাতে বসিয়া বাহাতে অস্ত্র অস্ত্র বাড়ীর মেয়েরা বেলুন উঠা দেখিতে পান, তার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। কিন্তু সে বাঙ্গলা বাড়ী, তার ছাত আছে তো সিঁড়ি নাই। সিঁড়ি নাই বলিয়া তুমি এক বৃদ্ধি করিলে। খান পাঁচশেক তক্তপোষ যোগাড় করিয়া তাই সাজাইয়া একাণ্ড



অন্ন চাই, প্রাণ চাই, কুটীর শির ও কৃষিকাৰ্য্য দেশের অন্ন ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিটল, লাক্সটোন ভিকেল ইঞ্জিন, লিটল পাম্পিং নেট, ভান্ডস্ ভিকেল ইঞ্জিন ভান্ডস পাম্পিং নেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এলেকট্রস :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, দিল্লী কলিকাতা—১

ফোন ৪-২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টব ইঞ্জিন, বরলার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডায়ামো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায় সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

সিঁড়ি প্রস্তুত করাইলে। তোমার নিমন্ত্রণে অনেক হিন্দু মেয়েবাও আসিয়া বেলুন দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

মরাচৌলার বাটীতে থাকিতে একবার তোমার পার্শ্বের খোলায় ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যাশাপূর্ণমতিত্ব ও ঈশ্বর-বৃত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিবামাত্র তুমি উপরের ঘরে আসিলে; একথানা বড় সতরকি ছিল, সেখানাকে নানার ঘরের জলে ভিজাইয়া, জানালা দিরা সেই অগ্নস্তম্ভে নিক্ষেপ করিলে; তার উপর বাস্তি করিয়া জল দিতে দিতে অগ্নি নির্মূল হইল। বহন সতরকি নিক্ষেপ কর, তখন মুখে কেবল ‘মা’ ‘মা’ বলিতেছিলে।

### একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### গুপ্ত-গোদারী

লক্ষ্যে বাইবার পূর্বে প্রায়ই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে জেলার নানা স্থানে ঘুরিতে। অনেক দিন ঘুরে থাকিতে চাহিতে না। কিন্তু এখন দেবতা তোমাকে অন্য বিধির মধ্য দিয়া গড়িতে লাগিলেন। এক স্থানে ক্রমাগত থাকিয়া, দারিদ্র্যপূর্ণ ভার বহন করার যে শিক্ষা তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতে হইল। কর্তব্যের খাতিরে আমাকে বন্ধনস্থলে বাইতে হইত, কর্তব্যের খাতিরে তোমাকে প্রায়ই ঝিকপুবে ঝাঁপা থাকিতে হইত। মাঝে মাঝে ছুটি পাইলে আমার সঙ্গে বাহিরেও বাইতে। বাদের জীবনে নির্দিষ্ট কাজ আছে, তাহা বহন মাঝে মাঝে নির্জন প্রকৃতির সঙ্গ পায়, তখন তাদের কতই উপকার হয়! অন্তরে এত হয় না। তুমি এখন হইতে এ উপকার পাইতে লাগিলে।

মাঝে মাঝে আমি বহন তোমার কিছু ক্রটি ঘরীয়া লিখাম, তখন তোমার মনে কিরূপ সংগ্রাম আসিত, তোমার দৈনিক পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আগষ্ট মাসে একদিন লিখিয়াছি, “আজ স্বামী মহাপ্রভুর প্রার্থনার নিরাসের কথা শুনিয়া মন কাগিয়া উঠিল। এখনও যে ত্যাগ স্বীকার হয় তাই তাহা বুকিলাম।” তারপর প্রার্থনা কহিলে, “নিজকে ভুলিয়া তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য শেষ ক’টা দিন যেন কাটাইতে পারি। তোমার ও তোমার সন্তানের সাব পূর্ণ করাই আমার জীবনের কাজ। এই কাজ প্রাপ্ত দিয়া করিয়া শেষ দিনে উভয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া বাইব। পূর্বে আর একবার এই সাধনের ভিতর এসেছিলাম, কিন্তু এ বার তাহা অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছে। স্বামীর শরীর স্পর্শ করিবার যে সুখ তাহা ত্যাগ করিলাম, মুখ ছাড়া।” একদিন পরে আবার এ কথা কেন? দেখি, তখন তুমিও কেহী ছিলে, আমিও দেহী। বত দিন মেহ থাকিবে, বুঝি দেহের সংগ্রামও থাকিবে। ঐশ্ব্যই বহন শেষ দিন পর্যন্ত মেহের সংগ্রাম করিয়াছেন, তখন আমরা আর কোন্ হার? এ সংগ্রাম তোমার পক্ষে অনেক কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু কখনও পিছু-পাও হও নাই। এক এক বারের সংগ্রামের অবসানে তুমিই আবার সাক্ষ্য দিয়াছ, “শরীরের সুখ ত্যাগে আরও যেন ভালবাসা বাড়িয়াছে। এখন দেখিতেই বেশী ইচ্ছা করে। মা। তুমি এই দর্শন আরও বিস্তর করিয়া দেও। সত্যেরে কোন বাধা যেন আমাদের গড়িয়া দেয় না।” ভাবিতে পারে, এই আশীর্বাদ কর। পিতৃর সহিত গোপন জীব একবারে চলিয়া গিয়াছে। মা আশীর্বাদ করুন, যদি

কিছু থাকে হাড়ের ভিতরে, অজানিতরূপে, তাহাও থাক।” মিলনেও বর্ধে চলিতে হইলে গোপন করা যে অন্তর, মনের ভাব গোপন করা যে পাপের লক্ষণ, তাহা বুঝিতে পারিলে। অকস্মাত মনে কোনও ভাবের উদয় হইলে অমন দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিয়া বাইতে; পাছে মিলনধর্মের কোন ক্ষতি হয়।

৩০শে আগষ্ট দৈনিকে লিখিয়াছি,—“পিতৃর কোথাও বাইবার কথা শুনিলে বুকের ভিতর কেমন করে। তাহাতে বুঝিতেছি, এখনও অসন্তোষ আছে। নিশ্চয় ইহা বাইবে। বহন এইরূপ হয়, তখন মার পা ধরিয়া প্রার্থনা করি, পরলোক নরণ করি। মনকে এইরূপে ঠিক করি।” ক্রমশঃ শরীর স্বস্থে উভয়ের পাশবোধ সমান হইতে লাগিল। একদিন তোমার শরীর আমার শরীরে স্পর্শ হওয়াতে দুজনার সমান পাশবোধ হইয়াছিল। কাহারও কাহারও কাছে এটা একটা আশঙ্কি কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু ঐহায়া আমাদের ত্যাগের মন্ত্র জানেন, কি এক অজড় ধর্মশৈলে উঠিতে চাহিতেছিলাম তাহা ঐহায়া অল্পভব করিতে পারেন, তাহাও একধার মর্ম বুঝিতে পারিবেন, আমাদের সংগ্রামও বুঝিতে পারিবেন।

পুষ্কার ছুটিতে বিভ্রাট বক হইলে কয়েকটি কল্লাকে লইয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে গেলে। এই ভ্রমণে তোমার অনেক উপকার হইয়াছিল।

পাটনা সহরে গঙ্গাবন্দে পূর্বকালের একটি পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছিলাম। এ গৃহে ডচরা (Dutch) বেহাৱের মাল খরিদ করিয়া বোকাই করিত। তাহাদের পাকা রেক্তার গাঁথনি এখনও নষ্ট হয় নাই। এখন সে বাড়ী একজন নবাবের, ব্যবহার প্রায় হয় না। কয়েকদিনের জন্য সেই গৃহে গিয়া তোমার শরীর মনের অনেক উপকার হইল। তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলাম,—“১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২ (পাটনা, নবাবের বাগান)। প্রার্থনা—গঙ্গার নৌকা দুইকমে চলে। এক, অল্পকূল বাতাসে; দ্বিতীয় বদিয়া আছে, নৌকা আপনি চলিতেছে, খুব বেগে। আর তকমে, নৌকা প্রতিফুলে বাইতেছে; তাহাতে পাল দিয়া, চোঁটা করিয়া হাফিয়া পালের দড়ি সাবধানে ধরিয়া বদিয়া আছে; বাইতেছে খুব শীঘ্র, কিন্তু ভয় আছে, দড়ি ছিঁড়িলে নৌকা মারা বাইবে। আমার অবস্থাও তাই। ভিক্ষা করি, যা শীঘ্র শীঘ্র অল্পকূল বাতাসে আমার জীবন-নৌকাকে নিয়ে ফেল।”

২৮শে সেপ্টেম্বর আমরা চুপারে গমন করিলাম। তোমার গড় দেখিলে, গঙ্গানান করিলে। সেখান হইতে চিত্রকূট দেখিতে চলিলাম। আমা অপেক্ষা তুমি অধিক ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সীতাপুত্র পৌরহান গেল। সে রাতি ঠেলে কটান গেল। ঠেলেণটি অতি সুন্দর, বেশী লোক ছিল না। খোলা স্থানে সকলকে বন্ধা করিবার ভাবে আমি শয়ন করিলাম। বড় ভাল লাগিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে কতক গোবানে কতক পশুজন্তে চিত্রাকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বেলা ১০টার সময় গ্রামে পৌঁছিলাম। একটি বিস্তল গৃহ ভাড়া করা গেল। সে বাসাটি নিরাপদ নয়, কিন্তু সেখানে তুলনার সেটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করা গেল। নবীর তীরে রামবাট দর্শন করিয়া সকলেই সুখী হইলে। ১লা অক্টোবর গুপ্ত-গোদারী দেখিতে চলিলাম। পথে দুটি খোঁড়া ভাড়া করা হইল, অল্প কোনও বান পাওয়া যায় না। ঐযুক্ত—মহাপ্রভুর জন্য একটি অর্থ নির্দিষ্ট হইল; অপরটি আবার জন্ত। অল্প দুই গিয়া তিনি বলিলেন, অর্থ বাইতে পারিবেন না। তখন খোঁড়াটি লইয়া করা যায় কি? আর সকলকেই

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ অধারোহণে বাইতে স্বীকার করিলেন না। তখন সেই অশ্বে তোমার চড়িয়া বাইবার প্রস্তাব হইল। বননারী অর্জনক কলঙ্ক আছে; তিনি দুর্বল, ভীক। এ অপবাদ আরোপ তোমার সহ্য হইত না, স্তব্ধতা অঙ্গরোধ করিবামাত্র ৩৭ মাইল অধারোহণে চলিয়া গেল। ঘোড়াটি ছোট ও শান্ত; পশুও দোড়িবার মত ছিল না; কিন্তু তুমি তো কখনও ঘোড়ার চড়িতে শেখ নাই। শেখ নাই, তাহাতে কি? তুমি জানিতে তুমি আত্মা; উন্নতিই আত্মার স্বভাব; নতুন বাহা কিছু ভাল সমুখে আসে, তাহাতে অগ্রসর হইয়া চলাই আত্মার স্বভাব। এই স্বভাবের কাছে তোমার ষিলা, সঙ্কট ভয় সব উড়িয়া যাইত। লোকে ভাবিত তুমি নারী, তুমি কেমন করিয়া সাহসের কাজ করিবে? তুমি ভাবিতে, আমি আত্মা, আমি কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব! আমিও তুলিয়া যাইতাম, যে তুমি নারী। আমিও কেবল দেখিতাম, তুমি আত্মা; তোমাকে নিত্য নতুন নতুন পথে লইয়া যাবোঁই তোমার সেবা করা। অশিক্ষিতা বননারী তুমি যখন জিন-শূন্য অশপৃষ্ঠে চলিতেছিলে, আমার কাছে তখন দেখিতে অতি সুন্দর লাগিতেছিল। বেলা দশটার সময়, যে পর্বত হইতে নিকরিয়া বাহির হইতেছিল, সে পর্বতে আরোহণ করিলাম। অনেকটা উঁচুতে চড়িতে হয়, পথে একটা ছোট গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে হলধরের মত বিস্তৃত স্থান; তহার পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র একটি স্থান হইতে উৎস উৎসারিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। সে প্রোত কখনও বন্ধ হয় না।

এখন আমার মনে হয়, মাঘ মাসেরই মধ্যে এই গুপ্ত গোলাবরী ভাব রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্মে গুপ্ত প্রেমের প্রস্রবণ আছে। আহা, যদি কেহ তাহা আবিষ্কার করিয়া দিতে পারে, বাহিরে জানিতে পারে, পরের সেবার নিযুক্ত করিয়া দিতে পারে! তোমার মধ্যেও যেন এই ভাব ছিল। তোমাতে যেন গুপ্ত-গোলাবরী লুক্কায়িত ছিল। প্রথম জীবনে-তাহার অপ্রশস্ত ভাব ছিল; তখন স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনও ভাব তোমাকে অধিকার করিতে পারিত না। কেহ জানিতেনও পারিত না যে, তোমার জন্মধারার মধ্যে প্রেম-প্রস্রবণ লুক্কায়িত ছিল। সাহস করিয়া তোমার জন্ম-গুহায় প্রবেশ করিয়া-ছিলাম বলিয়া সেই স্থানী প্রেম-ধারা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে নিজেও সুখী হইয়াছিলাম, প্রিয়জনদেরও সুখী হইয়াছিলেন। পরসেবার সে প্রেমধারাকে নিযুক্ত করিতে সাহায্য করিয়া আমিও হইয়াছিলাম।

গুহাঙ্কিত প্রস্রবণ নর্মান্ডে সেই পর্বতে বৃক্ষতলে বসিয়া সীলাময় হরির উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ভূতা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিল। উপাসনার পর আমরা আহাৰ করিয়া গৃহাভিমুখে বাজা করিলাম। আবার তুমি অশপৃষ্ঠে আসিলে; শরীরের কোনরূপ অসুবিধা হইরাছে, এরূপ জানিতে গিলে না। বাসায় কিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে যাত্রির ঈষৎ খাটস্রব্য ক্রয় করা গেল। দুধ কিকপে লওয়া বাইবে, এই প্রশ্ন উঠিল; কারণ আমাদের সঙ্গে কোনও পাত্র ছিল না। শোকানদারের দ্বী বিক্রয় করিতেছিলেন; অরশেবে তিনি বলিলেন, “আমার পিতলের সোটার লইয়া যাও।” আমরা আগন্ত করিলাম, বলিলাম, “যদি তোমার সোটা কিরিয়া না আসে?” তিনি বলিলেন, “একবারই না!” অর্থাৎ একবার বই ছুবার তো আর সোটা হারাইবে না। কি আশ্চর্য্য বিধান! এটা হানের কণ। এখানে

কেহ কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। ঐ ঘটনা আমাদের মনে খুব ভাল ভাব উদয় করিয়া দিয়াছিল।

২২ অক্টোবর কাম্বুজানথ পাহাড় দর্শন। এ শিলা অতি সুন্দর ভাবে সুরক্ষিত। রামচন্দ্রের এ কাম্য পাহাড়, রাম-সীতা অনেক সময় এখানে কাটাঠিতেন। আমরা ঐ পর্বতে জয় করিতে গেলাম। একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী আমাদের আহাৰ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমরা তথায় পাদপদ্মে উপাসনা করিলাম। ৪ঠা অক্টোবর জনকাকুণ্ডে স্নান। পাহাড়ের নদী পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছে। একপার্শ্বে সাধকেরা গুহা প্রস্তুত করিয়া স্থায়ীকণে বাস করিতেছেন। নিকটে দোকান নাই, কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইলে তিন মাইল দূরে বাইতে হয়। কয়েক দিনের আহারের সামগ্রী একবারে লইয়া আসিতে হয়। স্থানটি বড় ভাল লাগিল, নিষ্কলবাসের বেশ উপযুক্ত স্থান। নদীর জল বড় ভাল। এক স্থানে নদীরক্কে উচ্চ হইতে জল পড়িয়া পড়িয়া জল গভীর হইয়াছিল, তাহারই নাম জনকাকুণ্ড। প্রবাহ আছে যে, এইখানে সীতা দেবী বনবাসের সময় স্নান করিতেন। এই পবিত্র স্থানে আমরাও অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। প্রোতের বেগে পরিধানের বস্ত্র টানিয়া রাখা কঠিন হইতেছিল। উপাসনার সীতার চমির ভিক্ষা করা গেল। সলিল পাথরের বাধা পাইয়া এত তেজাল হইয়াছে; সীতা দেবীও রাবণের কাছে বাধা পাইয়া এমন অতুল বীর্ঘবর্তী হইয়াছিলেন যে, রাবণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া বাইতে বাধা হইয়াছিল। এ সংসারে কত রাবণ আছে! আমরা, বিশেষতঃ আমাদের মেয়েরা, কোমল হইয়াও যেন বলশালী ও বলশালিনী হইতে পারি। সন্ন্যাসিনী আমাদের জন্ত রন্ধন করিতেছিলেন; কোথা হইতে বানর আসিয়া জোর করিয়া তাঁহার কাছ হইতে চাল কাড়িয়া লইয়া গেল। বাসায় আসিয়া ২টার সময় আহাৰ করা গেল।

২৩ অক্টোবর গৃহে প্রত্যাগমন করি বলিয়া মানিকপুর ট্রেনে অশেকা করিতেছিলাম, এমন সময় জয়লপুর হইতে সংবাদ আসিল, অজ গেল নর্থমার প্রস্রবণ দেখা বাইতে পারে। আহাৰ প্রস্তুত, কিন্তু ট্রেন আসিয়া পড়িল। তোমার আদেশ হইল, প্রস্তুত করা খিঁচুড়ী গাড়ীতে উঠাইয়া লইতে হইবে। যেমন বলা তেমনি করা; গিয়া একখানা থালি গাড়ীতে উঠিলাম। জয়লপুরে একজন বন্ধুর বাটীতে রাজি কাটান গেল। ৬টার সময় একা করিয়া জলপ্রপাত দেখিবার জন্ত বাহির হইলাম। নর্থমাতারে পৌঁছিতে বেলা ১টা বাজিল। থানিক জল ভাঙ্গিয়া প্রপাতের নিকটে সেলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সকলে স্নান করিলাম। প্রপাতের তীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করা গেল। দুই দুই জলবিন্দু আমাদের অভিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে আরাধনা করিলাম, কেন না প্রপাতের শব্দ অতি প্রবল, এরূপ কি পরস্পরের কথাও শুনা যায় না। মনে হইল আমার যেটা গলার আঙঠাও সকলে শুনিতে পান নাই। স্তব্ধতা তুমি ছাড়া কেহ বোপ দিতে পারিলেন কি না জানি না। এখন সুন্দর স্থানে উপাসনার যোগ না দিতে পারিলে আমাদের হৃদনারী বড় কোত থাকিত। সুন্দর উপাসনার পর ডাকবাংলার পার্শ্বে রন্ধন ও আহাৰ হইল। ভাষণের সৌকা করিয়া কেত

শ্রেক্তরের পাহাড় দেখিতে গোলাম। নরখা খেত পূর্বন্ত ভেদ করিয়া  
প্রবাহিত। আমরা প্রায় দুই মাইল সেই প্রবাহ বহিয়া গোলাম।  
এমন খেত মর্যের পাহাড় আর কখনও দেখি নাই। খেত  
শ্রেক্তরে জল পড়িয়া কেমন ছোট বড় পাথরের বাটী হইয়া রহিয়াছে।  
শেরিয়া তুমি আনন্দিত হইলে, আমার সমুদায় শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক  
মনে হইতে লাগিল।

এই বার দিনের ভ্রমণে যেন আমরা দুই বৎসরের শিক্ষা লাভ করিলাম। সন্তানদের বাড়ীতে রাখিয়া তুমি যে সম্মানসিনীর মত পথে পথে বেড়াইলে, ইহাতে তোমার মন কত প্রশস্ত হইল, কত উন্নত হইল। বিদ্যালয়ের কার্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-ভ্রমণের শিক্ষাও যে কত আবশ্যিক, তাহা বুঝিতে পারিলে।

কিরিবার সময় আর কোথাও থামা হইল না।

ফিরিয়া আসিবার পর নব্বের মাসের মাঝামাঝি আমরা দুজনাই খুব বিধাবিধি শাসনের মধ্যে পড়িলাম। রাত্রি চট্টার সময় উঠিয়া জপ, চিন্তা, পাঠ আলোচনা করিতে লাগিলাম। মাকে মাকে যখন আমি তোমার কোনও অশুভতা দেখিয়া অনুভবাই হইতাম তখন আমার সে অশুভ তোমার জ্বালা বিগুণ করিয়া দিত। কত সংগ্রাম করিতে, কত চেষ্টা করিতে, ভালবাসার খাতিতে কত ক্লেশ বহন করিতে। একদিন দৈনিকে লিখিয়াছি, “অশুভতা দেখাইয়া বড়ই ব্যস্ত করিতেছি। বেশ, দেখাও। না দেখিলে তো শীঘ্র কাজ করিতে পারিব না। বল দাও, বাহাতে অশুভতা দূর করিতে পারি।” আর একদিন লিখিয়াছি, “মা, তোমার দেওয়া ভার আমার বড় ভার বোধ হয়; আমি ফেলিতে ইচ্ছা করি। আর যেন বুঝা এ ইচ্ছা না হয়; সব যেন বহন করিতে পারি।” সত্য সত্যই এ সময়ে তোমার পরিশ্রম আমার অপেক্ষা অধিক হইত; গুরু পরিশ্রম নয়, নানারূপ কার্যের মধ্যে দিয়া তোমার মনের উপরে অবিচলিত চাপ পড়িতেছিল। তাই এত ভিসেবের প্রার্থনা করিয়াছিলে, “সেই চরিত্র হেলো, বাহাতে তোমাকে সুখী করিতে পারি, ও পরিবারের সকলকে সুখী করিতে পারি।” ভই প্রার্থনা করিলে,—“তোমার ভালবাসার দুখখানি যেন সর্বদাই দেখিতে পাই।” একে ভো পরিবারের সকলকেই সুখী করা কঠিন। তাতে

এই সময়ে বিধবা শাশুড়ী পরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ভিন্ন-বন্দীবলকিনী, রোগে শোকে কণ্ঠস্থিত, সকল সময়ে তাঁহার কথা কোমল থাকে না; তাঁহাকে হুসী করা আরও কঠিন। ভাগ্যে ভূমি প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছিল, তাই পারিলে।

৮ই ডিসেম্বর দৈনিক লিখিরাছি,—“আজ বড় শরীক। মা’রা কাল আসিয়াছেন। উভয়ের কর্তব্য মিলাইতে খুব কষ্ট করিতে হইল, ছয় বার প্রার্থনা করিয়া বল ভিক্ষা করিতে হইল, তবে কিছু পারিলাম। আমার প্রার্থনা এই,—“আমি আসিয়াছি এই জন্ত যে দুঃখে কেমন করিয়া স্তম্বে পরিণত করিতে হয়, তাই শিখিব, ও জগতকে শিখাইব। তবে কেন আমি স্তম্ভ চাই? মা, তাই কর, যেন স্তম্ভ না চাই।” একমিকে শাওড়ীর কাছে অস্তঃপুরের কুলবধু হইয়া তাঁহাকে স্তম্ভী করিতে, আমার নারীর উন্নতির ও মর্যাদার আদর্শ রক্ষা করিবার জন্ত সাধারণের সহিত সম্বন্ধও ট্রিক রাখিতে। যেন অভিনয় করা; এই অস্তঃপুরের সকলের চক্ষের জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশ্রিত করা, ক্ষণকাল পরে একাকী রেল গাড়ীতে বাঢ় টেলনে গমন। বাঢ়ে তখন মি: কে এন রায় ছিলেন। তিনি পুরাতন বন্ধু, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমি পূর্বেরি গিয়াছিলাম। ৮ই তারিখে তুমি একাকী গেলে, একাকী গাড়ী হইতে নামিলে। সাহস ও বিবাহ বাড়িল। কয়েক দিন বাঢ়ে মি: রায়ের বাটাতে দেবী সৌদামিনীর ভ্রম্মাশ্রমের নিকটে বসিয়া উপাসনা করিলে, এবং তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনায় অনেক সাফল্য দিলে। তিনি দেহে থাকিতে তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন, অসহী হইয়া এই দুই দিনও ছিলেন। এবারকার খুটোঁতসব বাঁকিপুরে গঙ্গার চড়ার উপরে হইল।

এইরূপে ১৮৯২ সাল আমাদিগকে পৃথিবীতে রাখিয়া চলিয়া গেল। এখন আর্থিক ব্যাপারও বাড়িতে লাগিল, কাজও বাড়িতে লাগিল। রাজগৃহের লজ সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ভোমার এবারকার প্রস্তুতির বিশেষ ভাব—“মুখ মলিন করিব না।” তুমি বলিতে, “বিরজিস্চক কথা মুখে তো বলিতে পারিবেই না, মুখের ভাবেও দেখাইতে পারিবে না।”

[ कथनः ।

● **মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য** ●

ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজি: ডাকে ..... ২৪

सांख्यिक ..... १२

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ).....২

টাকার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে  
গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকানা  
মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সম্মত  
উল্লেখ করবেন।

## ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সডাক ১৫.

বাণাসিক সভাক ..... ৭।।

ପ୍ରାତଃ ସଂଖ୍ୟା ୧।୦

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৫০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সড়ক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১-

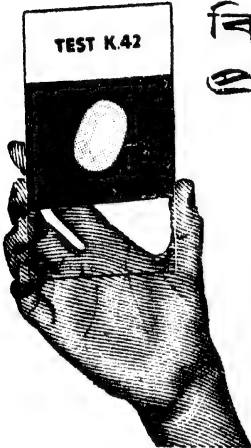
বাণ্যাসিক ..... ১০০

বিজ্ঞিত প্রাতি সংখ্যা.....১৫০

# দেখুন!

দস্তাক্কর নিবারণে

বিশেষ  
প্রতিরোধক !



## কলিনস সুপার- হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তাক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের ষাটটির (সাদার চারদিকে খুসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিষ্ট-গন্ধী সুশীতল আত্মদ।



লক্ষ্য করুন, কাপটি  
ধরবার কত সুবিধে।

OX 4776 A

জ্যাক্স ম্যানাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লি:  
বেজিটার্ড ব্যবহারকারী



# বিত্তেকানন্দ

## ১ স্তোত্র ৫

সুমনি মিত্র

৩৯

তবু কি দেখেছে। ভেবে একখাটা কেউ—  
মিশনারী, আশ্রমের শত বাধাতেও  
দিন দিন বাড়ছে কেন ঠাকুরের ভাব ?  
জীবনের উপকূলে তোলে কেন ঢেউ ?

তার মানে—হুনিয়ার প্রয়োজন বার,  
কাল্লর সাধ্য নেই গতি রোধে তার,  
আলা-কল বেয়ে তুমি বাধা দেবে যেই,  
সে-ভাব বিগুণ হবে, বৃত্ত্য তোমার।

আর যদি প্রয়োজন না থাকে কোথাও,  
যতোই প্রচার করো, কাগজে ছাপাও,  
প্রাকৃতিক আইনে সে মরবেই ঠিক ;  
তোমার সাধ্য কি যে তুমি তা বাঁচাও ?

এ-আলোকে যদি তুমি পড়ো ইতিহাস,  
Fanaticism আর কোরবেনা গ্রাস।  
তখন বুঝবে তুমি শুভ-বুদ্ধি :  
কেন গ্রীষ্ম মরে, কেন মেঘের প্রকাশ ?

ভারতের বৃক্ষে কেন বৃদ্ধ এসেন ?  
শঙ্কর এসে কেন তাঁকে লরালেন ?  
কেন এসে, কেন গালো আক্ষ-সদ্বাজ ?  
ঠাকুরই বা কেন কের মর্ত্যে এসেন ?

অগতে কিছুই নয় ত্রিকাল দ্বারী।  
আজ যেটা গালোয়ান, কাল ঘোষারী।  
বিশেষতঃ মাহুয়ের বিভিন্ন মনে  
হুস-হুসে বিভিন্ন ভাবধারা চাই-ই।

অশ্রুবিভর কিছই যে নয়।  
আজি বাতে বিশ্বাস, কাল সন্দেহ।  
যে ভাবে আজকে লাভ, মহাকলাপ,  
কালকে তা বিবৎ ফেলে দিতে হয়।

অতএব এইখানে এই কথা গুটী—  
অদ্বৈত প্রাকৃতিক খেয়ালের চোটে  
একদিন ঠাকুরের প্রভাবও তো বাবে,  
চকল হুনিয়ার যেমনটা ঘটে।

অবিশি তার আগে ভেবে ভাষা চাই  
বেদ ও উপনিষদে আমরা কি পাই।  
আগে ধারা এসেছেন যুগ-প্রয়োজনে,  
তারাি বা কি দিলেন—তাও জানা চাই।

৪০

ভারতীয় জীবনের মূল স্তর তাগ।  
অসীমের অভিসারে তুচ্ছ বিরাগ।  
'নায়ে স্বধর্ম'—এটা পাকা কোরে জেনে  
'ভূমিব স্বধর্ম' এর প্রতি অধ্বাঙ্গ।

তাই দেখি ভারতের সমাজে ও বলে  
ত্যাগের সুরটা যেন বাজে সপ্তমে।  
ত্যাগ শুধু সাধুদেরই আদর্শ নয়,  
একই সুর গৃহীণের সমাজ-জীবনে।

জীবনের প্রথমদেই ত্যাগের প্ররাস,  
ব্রহ্মচর্য আর গুরু-গৃহবাস।  
মাঝখানে নিকাম গৃহীর জীবন।  
জীবনের শেষে কের অরণ্যবাস।

সাধুদের লক্ষ্য বা গৃহীণেরও তাই।  
আদর্শ—ব্রহ্মকে জেনে নেওয়াটাই।  
সিধে এ মারা-মোহ দুব কোরে এই  
এ-জীবনে দুজনেরই সত্যকে চাই।

অতএব-সংসার নয়কো ভোগের,  
সংসার আশ্রম গুপ্ত ভোগের।  
নিকাম কর্মের বাস্তব।  
শাশ্বত মুক্তিই কাম্য ওদের।

বোদ্ধানিহিত যে তত্বটা সেই—  
হুনিয়ার হুই বোলে কোনো কিছু সেই,  
বহুবে এক ভাষা—তারই সাক্ষ্যই  
ভারতীয় জীবনের একতায় খেই।

তবু সে বাই হোক, তাকে চায় বারা  
বিবর্তনের পাথে বিভিন্ন ভাষা।  
তাই দেখি তবুও বহু ব্যক্তন,  
'এক'কে পাবার তাই একাধিক ধারা।

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে তাই  
'জ্ঞানবোধ', 'ভক্তি' ও 'কর্ম'কে পাই।  
যার থাকে যে-পথটা বেশি উপযোগী  
অন্যভাবে তার পথ সেইটাই।

আবার এক এক যুগ এক একটা চায়।  
সেই পথই সেই যুগে প্রাধান্য পায়।  
যখন যে-মার্গের প্রয়োজন ঘটে  
অবতার এসে তাইই প্রদর্শিত পায়।

৪১

ঐক্য অবতাবে আমরা বা পাই,  
সেটা হোলো 'কর্ম'র পরাকাষ্ঠাই।  
ত্যাগের নামেতে লোকে কর্মবিবুধ,  
নিকাম কর্মের প্রাধান্য তাই।

তারপর বুকের কাছ থেকে ফের  
ভারত মন্ত্র পেলো চরম ত্যাগের।  
জয়া-ব্যাধি-মৃত্যুর ছায়া-বেরা এই  
পার্বি জীবনটা ভারি হুংখের।

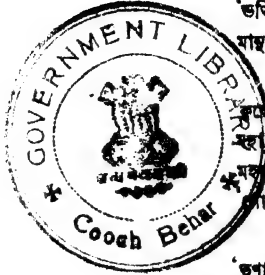
বুকের 'নির্বাণ' বের-বিপরীত।  
এটা হোলো 'শূন্যতা', তাই 'নেগেটিভ'।  
মৃত্যু-মলিন এই কল্প জীবন  
হুংখের পারাবার, স্নান ও অশিষ।

উপনিষদের ঐ 'মুক্তি'তে এই  
বৌদ্ধবাদের সেই 'শূন্য-বাধা' নেই।  
'নং-চিং-আনন্দ' তার পরিণাম।  
বুকের 'নির্বাণে' সে-স্বাস্থ্য নেই।

তারপর শব্দর এলেন বৈদিন।  
বৌদ্ধবাদের ঐ 'নেগেটিভিজম'  
বেদ ও বেদান্তের জ্ঞানের আলোয়  
ভারতের বুক থেকে হোয়েছে বিলীন।

তবু তাঁর 'মায়াবাদ'—বতোই বা হোক—  
সাধারণ জীবনে তা হয় না প্রয়োগ।  
'জগৎ মিথ্যা' বোধ হয় ক'জনের ?  
'ব্রহ্ম সত্য'—সেটা বোঝা কি সহজ ?

সিদ্ধ 'জানী'রই বলা চলে—'শিবোহম'  
তা-ছাড়া এ-মার্গের অধিকারী ক'ম।  
সাধন-ভজ্ঞানহীন জনতার তাই  
ভবের গুরো তুলে বাড়লো অহং।



তার পর নির্বেশ জ্ঞানাকাশটাকে  
বাংলার জলভরা মেঘ এসে ঢাকে।  
'ভক্তি'র প্রাবল্যেতে 'নৈশ ভেসে যায়'।  
মায়ার সমস হোলো নিমাই-এর ডাকে।

কিন্তু চেতনা এলো, তবু সে সীতার  
হৃদয় কেশবের নেই ছংকার।  
মদ্য-শ্রুত ঐ ঐক্যক সেই  
'সাপীজনবল্লভ', হাতে বাঁধী বীর।

'তৃপাদপি সুনীচেন' হোতে হোতে জীব  
অবশেষে একদিন বোনে গ্যালো ক্রীষ !  
ভক্তি-বাদের নামে মৃত জনতার  
কর্মবিবুধ হোয়ে হোলো তামসিক !

৪২

সবশেষে ঠাকুরের জীবনের তার  
সব সুরে একত্রে তোলে বন্ধার।  
পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম  
ধর্মের স্বাধীনতা, সম-অধিকার।

তবু 'জ্ঞান', 'ভক্তি' বা 'কর্ম'র নয়,  
সমস্ত ধর্মের শুভ-পরিণয় ;  
ঐক্যমুক্তদের পুরোহিত বার,  
—সেটা হোলো বিশ্বের দেবী বিশ্বয়।

অনন্তভাবময় প্রেমিক ঠাকুর  
বিশ্বমর্মবাসী—তার বতোই সুর,  
নিজের জীবন-ভাবে স্বকৃত কোরে  
ধর্মের ভেদাভেদ কোরেছেন দূর।

আগেকার অবতাবে ঠাকুরের এই  
বিচিত্র রাগিণীর স্বকার নেই।  
এক একটা মূল সুর উঠেছিলো বেজে,  
সমস্ত ধর্মের স্বীকৃতি নেই।

তাও এটা বুদ্ধির স্বীকৃতি নয়।  
এটা হোলো বোধে বোধ, বোধের প্রণয়।  
বিচিত্র জীবনের সাধনার শ্রোত  
ঠাকুরের আধারে তা একাকার হয়।

অনন্ত পন্থার—এই ভব-ভক্তি,  
তার মূলে আছে তাঁর অকালজুতি।  
প্রাপ্তির চরমেতে পৌছে তবেই  
'বত বত তত পথ'—এই উক্তিটি

মনে আছে ঠাকুরের গল্পটা সেই,  
রংগের বহুরূপী—থেকে দেখেই  
কেউ বলে লাল ওটা, কেউ বলে নীল,  
কেউ বলে—না না, ওর রঙ হলুদেই।

আবার আর একজন দেখে এসে ফের  
বলে ঐ জন্তুটা সবুজ রঙের।  
যে বা ভাখে তাই বলে, দোষ কিছু নেই  
জয়দা, বেগুনী, নীল কতো রকমের।

জন্তুর রঙ নিয়ে কথা কাটাকাটি।  
ঐ বৃষ্টি স্রুহ হয় মাথা কাটাকাটি।  
বাই হোক, ঠিক হোলো সকলে ফের  
দেখে এলে বোঝা যাবে কার কথা বাটি।

এখন যে গাছে ঐ জন্তুটা থাকে  
একজন লোক থাকে গাছতলাটাতে।  
সকলের কথা শুনে বোললে সে—ভাই  
ওটা হোলো বহুরূপী, আমি চিনি তাকে।

তোমরা বা দেখেছো তা সব সত্যিই।  
এত রঙ আছে তার, হয়না ইতিই।  
কখনো সে লাল আর কখনো সে নীল।  
আবার এমনও হয় কোনো রঙ নেই। \*

বহুরূপী সত্যের বিচিত্র চর।  
কেই বা দেখেছে তার সমগ্র রঙ ?  
যেমন যে ভাখে, ভাবে তাই বৃষ্টি ঠিক,  
অপরের মতবাদ মিথ্যা, ভুল।

\* “যে ভুল বেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক  
কোনো গুণগোল নাই। তাঁকে কোনো রকমে যদি একবার লাভ  
করতে পারা যায় তাহলে তিনি সব বৃষ্টিয়ে যেন। সে-পাড়াত্তেই  
গেলে না, সব ধর পায়ে কেমন করে? একজন বাহে গিয়েছিল।  
সে দেখলে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর  
একজনকে বললে—‘দেখ, অসুখ গাছে একটি স্তন্যর লালরঙের  
জানোয়ার দেখে এলাম।’ লোকটি উত্তর করলে,—‘আমি বখন  
বাহে গিয়েছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে বাবে  
কেন? সে তো সবুজ রঙ।’ আর একজন বললে—‘না না আমি  
দেখেছি হলুদে।’ এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে—‘না, জয়দা,  
বেগুনী, নীল’ ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলার  
গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাত্তে  
সে বললে—‘আমি এই গাছতলার থাকি, আমি জানোয়ারটিকে বেশ  
জানি—তোমরা বা বা বলছ সব সত্য। সে কখনো লাল, কখনো  
সবুজ, কখনো হলুদে, কখনো নীল, আরও সব রঙ কি হয়।  
বহুরূপী। আবার কখনো দেখি কোনো রঙ নাই। কখনো সন্তপ,  
কখনো নিগুণ।’—ঐশ্বর্যমকুৎসবসুত।

‘প্রতি’র বাখ্যা, যতো, কোরেছেন বার  
এক একটা রঙ নিয়ে খোবোছেন তাঁরা।  
রঙ নিয়ে নিশাকণ কথা-কাটাকাটি,  
অখণ্ড এ-বিশ্বের বরণীয় তাঁরা।

অচাঞ্চল্য শব্দ—তাঁর বাখ্যা  
‘অবৈত’র রঙ অতিমাত্রায়।  
রামায়ণে ‘বিশিষ্ট অবৈত’র,  
মাক্ষের বাখ্যাতে ‘বৈত’র সায়!

যে বা ভাখে তাই লেখে, মতুয়ার মন।  
কেই বা দেখেছে তার বিচিত্র রঙ ?  
বহুরূপী ব্রাহ্মের সমগ্র রূপ  
ঐশ্বর্যমকুৎসব ভাখেন প্রথম।

তাই তাঁর বাখ্যাটা এ-শ্রেণীর নয়।  
‘প্রতি’কে বিশেষ মতে টেনে আনা নয়,  
ক্রমবিকাশের পথে ঐ তিনটেই  
তিনটে সোপান—এই দৃঢ় প্রত্যয়।

অনন্তভাবময় ঠাকুরের মন  
সবকিছু, মানা নয়, কবের গ্রহণ।  
সমস্ত মার্গের মূলে গিয়ে তাঁর  
বিচিত্র ধর্মের একতা সাধন।

তিনি শুধু বহুরূপ ত্রুটাই নন,  
বহুরূপী ব্রাহ্মের চেয়ে কিছু কম ?  
‘ভক্ত’রা ভাবে তাঁকে ভক্তের রাজা।  
‘জানী’রা বোলেছে—উনি জানীর চরম।

‘ব্রাহ্মের’ বলে তিনি ব্রাহ্ম প্রধান।  
খুঁটের দূত বোলে ভাখে খুঁটান।  
বিকুর অবতার ভাবে বৈষ্ণব।  
যে যেমন তার কাছে তাই হোয়ে যান।  
তারপর ত্যাগের কি পরিমাপ হয় ?  
‘টাকা মাটি’ বোলে সেটা টাকাকে গোঁজা নয়,  
ত্যাগের চরমে উঠে উনি জাখালেন,  
তুটোই গঙ্গাজলে ফেলে দিতে হয়।

এত বড়ো ত্যাগী কেউ ভুলেছো কি আর ?  
অজান্তে টাকা ছুঁলে হাত বাঁকে বীর ?  
তাঁর ত্যাগ চুকে গ্যাছে সারা চেতনার ;  
অচেতন সত্তাও জাগ্রত তাঁর। \*

\* কামিনী ও কামন, এ দুইটি বস্তু স্পর্শ কবিবার তাঁহার  
উপায় নাই। ইহাফলে স্পর্শব্রাহ্মই তিনি অচেতন হইয়া পড়েন।



তাই বোলে সবাইকে একথা কোথাও  
বোলেছেন—টাকাটাকে জলে ফেল নাও ?  
এক জামা সকলের হবে কেন গায় ?  
'সাধুরা ছুঁয়োনা টাকা, গৃহীরা জমাও।'

'নরেনের বৈশোবাক, তোমার তা নয়।  
সকলেই খাবে, তবে হার বেটা নয়।  
বিচিত্র মানুষের বিচিত্র মন,  
হার বেটা ভাব, তাতে দূত হোতে হয়।

'নানা মত নানা পথ—তাইই ইচ্ছায়।  
সকলে কালিয়া খেলে পেট-হড়কায়।  
হার থাকে বেটা নয়, সেই পথে গেলে  
একদিন সকলেই সত্যকে পায়।'

'জামের বাগানে চুকে, গুরে বোকারাম,  
পাতার হিসেব রেখে খেয়ে নাও আম।  
ওকুনো বিচার নিয়ে তোমার কি লাভ ?  
বিচারটা বড়ো নয়, ভক্তিরই লাম।' \*

'বাড়ির কর্তা—কেউ 'খুড়ো' বলে তাঁকে।  
কেউ 'মেণো', কেউ তাঁকে 'মামা' বোলে ডাকে।  
জগৎকর্তা—তঁার হাজারটা নাম।  
কর্তা কি বোঝেন না এরা চায় ক'কে ?'

'এক জল, তেঁবে ভাখো কতো তাঁর নাম।  
তাকেই 'ওরাটার' বোলে খায় খুটান।  
হিন্দু বা বলে 'জল', কেউ বলে 'পানী'।  
নামেতে কি এসে-বার, জল তো সমান।' \*

৪৩



বহুভূতী সত্যের বিচিত্রতার  
এমন সমন্বয় হয়নি কোঁ আর।  
বিচিত্র সাধনার চরমে গিরেই  
লখণ্ড একেবারে অমৃতভিত্তি তাঁর।

যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বতো ভাব পাবে,  
অনাগত ভাব বতো আসবে ও যাবে,  
—তারা কেউ হের নয়, সবাই মহৎ।  
সবাই মিশেছে এসে তাঁর মহাভাবে।

ঠাকুরের অমরতা সেই কারণেই।  
এখানে গ্রহণ আছে, বর্জন নেই।  
আগত ও অনাগত সর্বকালের  
সর্বমোপবেশী ভাব এখানেই।

অতএব পৃথিবীর আঁহু বতোদিন  
ঠাকুরের পরমায়ু ঠিক ততোদিন।  
যদি বলে পৃথিবীটা অনন্ত, তবে  
ঐরামকৃষ্ণের মৃত্যু-বিহীন।

[ ক্রমশঃ ]

আমার সমুখে আমি কোনো মহিলাকে তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে দেখি নাই, কিন্তু কাঞ্চনের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এক দিন একটি কৌতুসী ব্যক্তি ঐরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের সভ্যতা পরীক্ষার্থে তাঁহার হস্ত চর্চায় একটি মুদ্রা স্থাপন করে। আমি তখন তাঁহার কন্কেই উপবিষ্ট। বিমিত্র হইয়া দেখিলাম, মুদ্রাটি যেন তাঁহার দেহে তড়িৎ-প্রবাহের কাজ করিল। সেই মুহূর্তে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বতরুণ না মুদ্রাটি তাঁহার হস্ত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল ততক্ষণ সে ঘেরে চেতনার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। সেদিন বুকিলাম, বৈরাগ্য তাঁহার সমগ্র চেতনার একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। —মার্চাধা শিবনাথ শাস্ত্রী।

• 'ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কতশত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এসব হিসেবে তোর কাজ কি ? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা। তুমি সত্যের ঈশ্বর সাধনের জন্ত মানব-জন্ম পেয়েছো। ঈশ্বরের পাশপায়ে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার অতশত কাজ কি ? কিলজকি ল'য়ে বিচার কোরে তোমার কি হবে ? দেখ, আংখো মদে তুমি মাতাল হতে পার। ওঁড়ির

সোকান কত মণ মদ আছে, এ হিসেবে তোমার কি দরকার ? চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার 'ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে, তাহলে ওসব হাব্জা-গোব্জা বিবয় জানতে ইচ্ছেও হয় না।'

—ঐরামকৃষ্ণকথামৃত।

• 'বস্ত এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চান্থে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে, হিন্দু বা এক ঘাট থেকে জল নিয়ে কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিয়ে চামড়ার ডোলে কোরে—তারা বলছে 'পানী'। খুটানরা আর এক ঘাটে জল নিয়ে—তারা বলছে 'ওরাটার'। যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয় পানী, কি পানী নয় ওরাটার, কি ওরাটার নয় জল ; তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনামন্ত, বগড়া, ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি, ওসব ভাল নয়। বে সময় করছে, সেই-ই লোক। অনেকের একঘেরে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। তিনিও অনন্ত, পথও অনন্ত।'

—ঐরামকৃষ্ণকথামৃত।

# শ্রীমতী আন্তের এর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

রাত এগারোটা অবধি হৈ-হুলা চলল; তারপর আমরা বাড়ী ফিরলাম। কি ভাবেই না দিনটা কাটল। প্রজাদের যুখে অনবরত শোনা বাজে, “জর জমিদারের জর। জনগণের বন্ধু দীর্ঘজীবী হোন।” কি সুন্দর লাগছিল ওরা বখন দল বেঁধে রাতের অন্ধকারে ফিরছিল মাথার টুপি দোলাতে দোলাতে, জমিদারের জর পাইতে পাইতে। প্রাসাদের দরজা অবধি জমিদার আমাদের পৌছে দিতে এল; আমাদের পায়ে একটা পুক শব্দের চারদু জড়িয়ে দিয়ে বলল,—

“সাধবান, ঠাণ্ডা লাগিয়ে না বেন, বা হিম পড়ছে। অভ্যাসমত রক্তেস আমায় আলিঙ্গন জানালেন। তারপর শুভরাত্রি কামনা করে কনকন উড়ল। কোচম্যান চাবুক ঠাকড়াল; খোড়াগুলি রক্তনা দিল। আজকে জমিদার এসে আমাদের খবর নিয়ে গেছে। মহা আনন্দে আমরা চার জন খানিকটা বেড়িয়ে এলাম,—ও, লুই, বাবা, আমি। কি ছুটটাই দিয়েছিলাম। গীর্জার বাড়িতে এগারোটা বাজল; আজ এখানেই থামি।

২২শে নভেম্বর।—রোজকার মত আজো বেড়াতে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী গোসয়েল ও তার মায়ের সঙ্গে খোঁা হল; তাঁরা পাড়ী চড়ে যাচ্ছিলেন প্রতিবেশী কোন এক মার্কিনের সাথে কথা করতে। বত শীগিরি পারি আমি বেন ওদের বাড়ী একবার বাই, অল্পোথ করল শ্রীমতী গোসয়েল; লুইকেও আমন্ত্রণ জানাতে সে বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল, “বেতে পারলে সত্যিই লুখী হতাম,” ও বলল, “কিন্তু হাতে আমার সময় বড় অল্প, আর...”

“বুঝি গো বুঝি—এই অল্প সময়টুকু নিজের বন্ধুর ওখানেই কাটাতে চান, তাই না ম’সিয়া?” টিটকিরি দিল গোসয়েল, সন্দেহও ছিল মনে—আপনাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে কেলেছে দেখছি।”

এ কথাই সে বেশ অপমানিত হয়েছে মনে হল; ক্রু হুঁচকে আমার এক বলক দেখে দিল। শ্রীমতী গোসয়েলও বুঝল লুই অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই বলে উঠল, “নিম কাপ্তেন সাহেব, আর বান করবেন না; আসা চাই; মার্গরিথ, ওকেও সঙ্গে আনিস কিন্তু।”

“কিন্তু, আমি আড়চোখে লুইয়ের দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, কারন এর আগে ওকে কোনো দিন রাগতে দেখিনি, “অন্ত পুক থেকে বহি আসার চাড় না থাকে?”

“নাহা রে। তাল্লা মাছটি উলটে খেতে জান না।” অদম্য কোড়ুকে কেটে পড়ল গোসয়েল; তারপর একটু সরল কণ্ঠে বলল, “উনি যদি বেহাং আসতে না চান, তুমি একাই এস।”

হেসে হাত নেড়ে সে চলে গেল। লুই আমাদের আগে আগে চলছিল; বাবা আর আমি ক্রত পুরক্ষেপে গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম।

“আজ্ঞা বাবা, লুই কি রাগ করল?” আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

“না, মনে ত হয় না।”

“কিন্তু শ্রীমতী গোসয়েলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও দারুণ ক্রু হুঁচকে উঠল; এখনো ওর যুখে কঠোরতার ছাপ পরিস্কট।” তিনি হাসলেন; তারপর ডাকলেন, “লুই”।

ফাপ্তেন বুঝে পাড়াল; তার অকপট সৌম্য মূর্তি আবার কিয় এসেছে; “কি ব্যাপার?” সে প্রশ্ন করল।

“মার্গরিথের ধারণা, তুমি রাগ করেছ; সত্যি নাকি?”

“হ্যাঁ, খানিক আগে সত্যিই রেগে গিয়েছিলাম; এই গোসয়েল মহিলাটি মাঝে মাঝে বড় রক্তদ্রিয় হয়ে ওঠেন দেখছি।”

খিকলে আমরা সবাই বাগানে বসেছিলাম; হঠাৎ ছোট্ট হেলেন কোথা থেকে কান্ডতে কান্ডতে ছুটে এল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে।

“জান না, আমার তাই পিরের-এর বড় অনগ্রহ, চল, তাকে সরিয়ে দিতে হবে।”

ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম; ওর হাতে মা বড় এক টুকরো কেঁক দিলেন, তারপর ও আর আমি পা বাড়লাম ওদের বাড়ীর দিকে; নীচের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

কিন-কিন করে হেলেন বলল, “ওরা সবাই শোবার ঘরে আছে।”

সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম; দরজার কবচাখত করলাম; সাড়া পেলাম না। আবার দাক্কা দিলাম, সব শান্ত; তখন নিজেই দরজা খুলে হুকে পড়লাম। চিমুনীর কাছেই ওদের মা বসে,—কোলে তাঁর ক্লর শিত। জানলার কাছে ম’সিয়া ভালপোয়ান; বিষয় দুটীতে তিনি চেয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের দিকে। ক্লর তার বাবার কোলে মুখ তুলে আছে। ম’সিয়া ভালপোয়ান এগিয়ে এলেন আমার দেখে।

লুকুটবারে তিনি বললেন, মালমোহাজেল তুমি এসেছ; দেখ, বাচ্চাটার অবস্থা খুবই ধারাপ; ওর মা দারুণ অর্ধেধ্য হয়ে পড়েছেন।

ওদের মায় পাশে গিয়ে আমি বসলাম। কী ভীষণ পাত্তর লাগল ছেলটাকে—জীবনের কোন চিহ্নই নেই। চোখ দুটি বন্ধ। হাত বাড়িয়ে ওকে আমি নিতে গেলে ভয়মহিলা বাধা দিলেন।

“না, না, নিয়ে না গো। বাচ্চা আমার কোলেই থাক, আর কতটুকুই বা থাকবে।” হুঁশিরে হুঁশিরে তিনি কান্ডতে লাগলেন।

কয়েক মণ্ড বাদেই আমাদের ছেড়ে বাহু আমার মাটির শীতল গর্ভে আশ্রয় নেবে।

“না—ভগবান ওকে বাঁচাতে পায়বেন।” বৃহৎ কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ করলাম; কেন জানি না, এ কথা শুনে তিনি ওরে

আমার কোলে শুইয়ে দিলেন। পরম কাপড়ে ওর গোট। দরীয় আমি বেশ করে ঢেকে দিলাম।

বাপকে বললাম, “মিসিয়া ভালোপায়ান, ডাক্তার ডাকছেন না কেন?” তিনি তাঁর ছীর দিকে তাকালেন। বুলায় ডাক্তার এসে হঠাৎ হয়ে চলে গেলেন। তবুও ম’ ভালোপায়ানকে ডাঃ শাঁতোর কাছে আমি পাঠালাম জোর করে। একটু পরেই বোঙ্গী চোখ খুলল; আবার তক্ষুণি সভয়ে তা বন্ধ হয়ে গেল; হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। শিশুবাখির কোনও প্রতিক্রিয়াই আমার জানা নেই, তবে মার কাছে শুনেছি যে এ রকম ভড়কা হলে গরম জলে হান করিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। তাই আমি ওকে নাইরে দিয়ে ভগবানকে শ্রবণ করতে লাগলাম। শুকনো গরম কাপড় দিয়ে বেশ করে ওর পা-হাত-পা মুছিয়ে দিতে ও চোখ খুলে তাকাল; এক বিহ্বল মুখ দিতে ঢোক গিলে খেয়ে নিল।

“ওগো, পিয়ের আমার বেঁচে উঠছে।” ওর মা চৈতরে উঠলেন, তখন ওর ছোট দোলনার ভাল করে ওকে শুইয়ে দিলাম—পরম আরামে বেচারী ঘুমিয়ে পড়ল। বোঙ্গীর মাকেও গিয়ে বিজ্ঞাম নিতে বললাম; তিনি রাজী হলেন না। আমরা ডাক্তারের প্রতীক্ষার রইলাম। ভগবানকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। শানিক বাসেই সিঁড়িতে পায়ের আওরাজ শোনা গেল, দরজা খুলে ঢুকলেন ডাক্তার বাবু, তাঁর পেছনে ম’ ভালোপায়ান। সব কথা তাঁদের খুলে বলা হল; ম’সিয়ার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। ডাক্তার এক দাগ গুণ্ধ দিয়ে বলে গেলেন, বোঙ্গীর ঘুমের বেন ব্যাধাত না হয়, আর জেগে উঠলে গুণ্ধটা খাইয়ে দিতে। বাবার সময় আমার সঙ্গে কন্ডমর্দন করলেন, মার্গরিৎ, তুই সত্যি বড় সজ্জন।” আমার জন্মের বহু আগে থেকেই ইনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত।

হুঁটা নাগান লুই আর বাবা এলেন। তখনো পিয়ের দুহুচ্ছে। আমি বখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, দেখি, হলেন লুইয়ের হাত ধরে সবিজ্ঞারে বর্ণনা করছে কি ভাবে পিয়ের “একদম সেরে উঠছে।” “আমি ঠিক জানতাম উনিই ওকে সারাতে পারবেন,” ও বলল, “বড় লক্ষ্য উনি।”

আমার দেখে এক ছুটে এসে ও আমার জাপটে ধরল। বোঙ্গীর অবস্থার পরিবর্তন দেখে বাবা বেশ সুখী হলেন। হলেনকে আমি আদর করলাম; ও লুইয়ের কাছে গিয়ে বলল, “তুমি, তুমি বৃদ্ধি আমার আদর করবে না?”

লুই হেসে কেসে ওকে কোলে তুলে নিল। আমি গিয়ে বাচ্চাটার পাশে বললাম; সত্যিই ও ভাল হয়ে গেছে। সর্বকল্যায়, তোমারই জয় হোক!

২৩শে নভেম্বর।—আজ রাতে বাওরা চুকে গেলে মা আর আমি বৈঠকখানার বসে ছিলাম; কাণ্ডেনকে নিয়ে বাবা বাগানে পায়চারী করছিলেন। দুজনেরই মুখে বলন্ত সিগার। কোনও গুরুতর বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন মনে হল; একথা যাকে বলতে তিনি হেসে বললেন, “বা রে মার্গরিৎ, ওদের না ডাকলে চলবে না; কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।”

আমি দৌড়ে বাগানে গেলাম। যেতে যেতে বাবার কথা কানে এল, “তোমাদের দুজনেরই বরল খুব কম,—তবু ওকে একবার বলে দেখ; যদি...”

এমন সময় তাঁর কাঁধে আমি হাত রাখলাম; হঠাৎ তিনি ঘুরে পাড়ালেন।

“আরে তুই খুকি!” তিনি সবিস্ময়ে বললেন। তাঁদের আলোর চারিধার অপরাধ লাগছে।—“বাবা তোমাকে আর কাণ্ডেন লকেজকে ডাকতে এলাম; মা কফি নিয়ে বসে আছেন।” তিনি তাঁর হাতের ঘুরো দিয়ে আমার হাতটা ধরলেন।

“আর এক পাক দিয়ে আসি মা! তারপর কেহা হবে।” কাণ্ডেন ততক্ষণে সিগারটা কেসে দিয়েছে।

“লুই, ওটা না কেসেলেও চলত,” বাবা বললেন, “সিগারেটের গন্ধ মার্গরিৎ সহ্য করতে পারে; ওসবে ও বেশ অভ্যস্ত; বোখ হয় গন্ধটা ওর ভাল লাগে; ওর মতে প্রত্যেক সৈনিকেরই ধূমপান করা উচিত; ও বখন ছোট ছিল, বাপি একদিন একথাই ওকে শিখিয়েছিল; বাপি ত সব সময় লোকের ভালই চায়, না মা?”

“উঁহ, সব সময় কই?” আমি হাসলাম; বুলায় ওর মাখার কোনও মংলব জেগেছে; “এই ঘর না, বখন বাবা অদর্শক বাইরে থাকেন আর মা একা-একা হয়ে অপেকা করেন, কাকির পেছালা নিয়ে তখন?”

আমার মুহু একটা চড় দিলেন বাবা।

আম্বহ ভাবে কাণ্ডেন চলেছিল আমার পাশে পাশে; তাকে আমি প্রের করলাম, “তোমার তেঁটা পার নি?”

“জান মাঝমোয়াজেল,” ও উত্তর দিল, “সিগারেট খেলেই বড় তেঁটা পার।”

“চল বাবা, আমাদের বড় তেঁটা পেয়েছে, ম’সিয়া লকেজেরও।”

“আচ্ছা মার্গরিৎ, তুই ওকে ম’সিয়া লকেজ বলিস কেন রে? ও কি তোকে মাঝমোয়াজেল আর্ভের বলে?”

“না, ও আমার নাম ধরেই ডাকে, তাই না?”—লুই সম্যক্তি পৃষ্ঠক হাসি হাসল।

“বেশ লুই, আমিও তবে তোমার নাম ধরে ডাকব।” হুঁজনে আমরা হাতে হাত মেলালাম।

“এবার না গেলে মা কিন্তু রাগ করবেন,” আমি বললাম।

মা আমার কফি পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন; প্রথম পেছালা বাবাকে দিতে তিনি আগন্তি জানালেন, “প্রথমে দিতে হর আতিথিক, পাগলী।”

“আমি প্রথমে দিই বরোজোঠকে; তোমার পরে দেব হাক, তার পর লুইকে, তার পর নেব আমি।”

“লুই” শুনে সবিস্ময়ে মা আমার দিকে তাকালেন; বাবার দিকে তাকাতেই তিনি বিজ্ঞের মত বাড় নাড়লেন। গতিক সন্ধ্যের নয় দেখে আমি বললাম, “বা রে, বাবাই ত আমার শিখিয়ে দিলেন ওকে নাম ধরে ডাকতে।” বাগানের কথা খুলে বললাম।

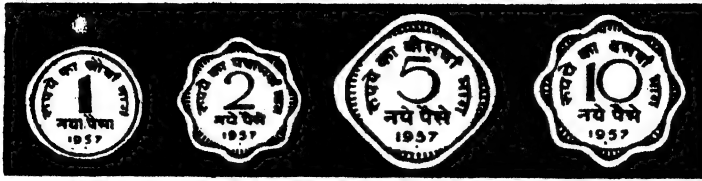
কিন্তু ও তোকে কি সোজাসুজি মার্গরিৎ বলে?” মা রাজী হলেন, “ও বলে মাঝমোয়াজেল মার্গরিৎ।”

“আমি তা হলে ওকে বলব ম’সিয়া লুই কেমন?”

“না বাপু, আমার লুই বলেই ডেক।” লুই আগন্তি করল।

“তুমিও তবে আমার তবু মার্গরিৎ বলে ডেক?”

“হ্যাঁ মা!”—



## নতুন মুদ্রার প্রচলন-১লা এপ্রিল ১৯৫৭ হতে

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার  
হিসাবে সঠিক মূল্য

- ১০ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-দশমাংশ)— ১ আনা ৭২ পাই  
৫ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-বিংশমাংশ)— — ১৬ পাই  
২ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-পঞ্চাশমাংশ)— ৮ পাই  
১ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-শতাংশ)— — ১২ পাই

১ পরমা বা ১ আনা, ২ পরমা বা ২ আনা,  
১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা এবং ৮ আনার পুরানো  
মুদ্রাগুলি উপরে উল্লিখিত নতুন মুদ্রাগুলির সাথে  
সাথে চালু থাকবে। সিকি এবং আধুলির মুদ্রাগুলি  
যথাক্রমে ২৫ নয়ে পইসে এবং ৫০ নয়ে পইসের  
সঠিক সমতুল, হুতরাং সবারকমের লেনদেনের  
কাজে সেইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারবে। টাকা  
দেওয়ার সময় এবং হিসেবের কাজে নতুন ও  
পুরানো দুইরকমের মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা (লিগ্যাল  
টেন্ডার) হিসাবে গণ্য হবে।

মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা

কিছাৎ ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় শাখাগুলিতে, অস্তান্ত এজেন্সী ব্যাঙ্কে,  
এবং ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীগুলিতে মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

কেবলমাত্র ৪ আনা এবং তার গুণিতক সংখ্যার মূল্যের মুদ্রাগুলি, যেমন ৪ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা,

১ টাকা ইত্যাদির বদলেই নতুন মুদ্রাগুলি দেওয়া হবে।

## মুদ্রাবদলের তালিকা

মুদ্রাবদলের তালিকাটিতে আনা পইসের মুদ্রার যেওরা অতের নয়ে পইসের হিসেবে বিবিধর মূল্য (সম্প্রতি সংশোধিত  
১৯৫৬ সালের ভারতীয় মুদ্রা আইনের ১৪ (২) ধারার নিচের অনুযায়ী তথ্যসংকে সম্পূর্ণ করার পর) দেওয়া হয়েছে। ১ ননা  
পইসা এবং তার চাইতে কম তথ্যসংকে বার দিতে এবং ১ ননা পইসার বেশি তথ্যসংকে ১ ননা পইসা হিসেবে ধরে নয়ে পইসের  
হিসেবে সমতুলের তথ্যসংকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

যে কোন একবার টাকা দেওয়ার সময় নয়ে পইসের হিসেবে আনা পইসের মূল্যের সমতুল।

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ	নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ	নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ	নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ	নয়ে পইসের মুদ্রার
আনা	পাই	সমতুল	আনা	পাই	সমতুল	আনা	পাই
০	৩	২	৪	৩	৩৭	১২	৩
০	৬	৩	৪	৬	২৮	১২	৬
০	৯	৪	৪	৯	৩০	১২	৯
১ আনা	৩	৫ আনা	৩১	১৩ আনা	৬১	১৩ আনা	৬১
১	৩	৮	৫	৩	৩০	১৩	৩
১	৬	৯	৫	৬	৩৪	১৩	৬
১	৯	১১	৫	৯	৩৬	১৩	৯
২ আনা	১২	৬ আনা	৩৭	১৪ আনা	৬৭	১৪ আনা	৬৭
২	৩	১৪	৬	৩	৩৯	১৪	৩
২	৬	১৬	৬	৬	৪১	১৪	৬
২	৯	১৭	৬	৯	৪২	১৪	৯
৩ আনা	১৫	৭ আনা	৪৪	১১ আনা	৬৯	১৪ আনা	৬৯
৩	৩	২০	৭	৩	৪৪	১৪	৩
৩	৬	২২	৭	৬	৪৭	১৪	৬
৩	৯	২৩	৭	৯	৪৮	১৪	৯
৪ আনা	২৪	৮ আনা	৫০	১২ আনা	৭৪	১৬ আনা	১০০

মুদ্রাবদলের তালিকায় করা। মতে ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার কাজটি কেবলমাত্র তখনই করার প্রয়োজন হবে, যখন লেনদেনের কারবারের শেষে, আনা এবং পাইয়ের হিসেবে দেয় যে কোনো পরিমাণকে নিয়ে পইসেতে পরিবর্তন করতে হবে।

নতুন অথবা পুরানো, অথবা ছরকমের মুদ্রা মিলিয়ে, যে কোনো ভাবেই আপনি টাকা দিতে পারবেন। আপনার কাছে থাকা মুদ্রাগুলির উপরেই তা নির্ভর করবে। সুতরাং কোম লেনদেনের কারবারের শেষে যখন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হবে বা খুচরো পরমা পেতে হবে, তখনই কেবল নীচে দেওয়া উদাহরণ মতে মুদ্রাবদলের তালিকার ব্যবহার করবেন।

**উদাহরণ :** (যে ক্ষেত্রে আনা/পাই-এর হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

প্রত্যেকটি ১২ আনা মূল্যের ১২টি জিনিষের মোট মূল্য হলো : টাকা ২ আনা। ফ্রেতা সমগ্র টাকা পুরানো মুদ্রায় দিতে পারেন।

**অথবা**

১ টাকা ১২ নিয়ে পইসে দিতে পারেন (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনার সমতুল হলো ১২ নিয়ে পইসে।)

উপরের উদাহরণটিতে ফ্রেতা পুরানো মুদ্রায় ২ টাকা দিয়ে অবশিষ্ট ফেরৎ চাইতে পারেন। এখানে ১৪ আনা খুচরো পরমা ফেরৎ দিতে হবে। এই পরমা কেবল আনার মুদ্রায়, — অথবা নতুন মুদ্রায় অথবা নতুন ও পুরানো ছরকমের মুদ্রায় দেওয়া যেতে পারে। ধরে নিই, ৮ আনা পুরানো মুদ্রায় এবং বাকী ৬ আনা নতুন মুদ্রায় ফেরৎ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন মুদ্রায় ৬ আনার সমতুল মুদ্রাবদলের তালিকা হতে খুঁজে বার করুন ; মোট হলো ৩৭ নিয়ে পইসে।

**উদাহরণ :** (যে ক্ষেত্রে নিয়ে পইসের হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

ধরুন, একটি জিনিষের দাম হলো ১১ নিয়ে পইসে। নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে এই দাম দেওয়া যেতে পারে। (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ১ আনা ৯ পাইয়ের সমতুল হলো ১১ নিয়ে পইসে।)

কোনো ব্যক্তি দেয় ১১ নিয়ে পইসে দেবার সময় ২০ নিয়ে পইসে দিলে তাকে ৯ নিয়ে পইসে অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে তার সমতুল ১ আনা ৬ পাই খুচরো ফেরৎ দিতে হবে।

১১ নিয়ে পইসে দিতে হলে আপনি একটি সিকি দিয়ে খুচরো ফেরৎ চাইতে পারেন। চার আনা ২৫ নিয়ে পইসের সমতুল। সুতরাং আপনাকে ১৪ নিয়ে পইসে ফেরৎ দিতে হবে। এই পরমা আপনি কেবল নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রায় ফেরৎ দিতে পারেন। মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনা ৩ পাই, ১৪ নিয়ে পইসের সমান। এ ক্ষেত্রে একটি এক আনার মুদ্রা (৬ নিয়ে পইসে) এবং নতুন মুদ্রায় ৮ নিয়ে পইসে দেওয়া চলতে পারে।

মোট দেয় টাকার পরিমাণ হিসাব করে বার করার আগে আনা/পাই-এর হিসাবে দেখানো হার বা একক মূল্যকে পরিবর্তন করার প্রচোজ্ঞন হবে না।

**উদাহরণ :**

(১) প্রত্যেকটি তিন আনা মূল্যের ৫০টি দ্রব্য কিনলে প্রথমে টাকা/আনার হিসেবে মোট মূল্য বার করে নিই। আপনাকে মোট ৯ টাকা ৬ আনা দিতে হবে।

(২) আপনার কাছে যদি শুধু নিয়ে পইসের মুদ্রা থাকে, তাহলে মুদ্রা বদলের তালিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন, ৬ আনার সমতুল হলো ৩৭ নিয়ে পইসে। সুতরাং আপনাকে ৯ টাকা ৩৭ নিয়ে পইসে দিতে হবে।

তিন আনার সঠিক মূল্য (১৮ টু নিয়ে পইসে) নিয়ে তাকে ৫০ দিয়ে গুণ করলে আপনি একই ফল পাবেন, কিন্তু আপনি যদি মুদ্রাবদলের তালিকায় দেওয়া ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করে নিরূপিত তিন আনার সমতুলকে (১৯ নিয়ে পইসে) ৫০ দিয়ে গুণ করেন তাহলে ভুল হবে।

সেইভাবেই আপনি যদি কাক্সর কাছ থেকে একই সময়ে আনা পরমার মুদ্রার হিসেবে বিভিন্ন হারে কয়েকটি জিনিষ কেনেন, প্রথমে টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে মোট মূল্যের পরিমাণ জেনে নিই। নতুন মুদ্রায় টাকা দিতে হলে আনা পাইয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাবদলের তালিকার সাহায্য নিই।

এইভাবেই যেন যেকোনো মুদ্রাবদলের হিসেবেই সহজ করে বুঝতে পারবেন।

৪ আনা ... ..	২৫ নিয়ে পইসে
৮ আনা ... ..	৫০ নিয়ে পইসে
১২ আনা ... ..	৭৫ নিয়ে পইসে
১ টাকা ... ..	১০০ নিয়ে পইসে

**উদাহরণ :**

(১) ১০-২ আনা দিতে হলে আপনি প্রথমে ৮ আনা বা ৫০ নিয়ে পইসে দিতে পারেন। অবশিষ্ট ২২ আনা হলো ১৬ নিয়ে পরমার সমান।

(২) ৩৬ নিয়ে পইসে দিতে হলে আপনি প্রথমে চার আনা বা ২৫ নিয়ে পইসে দিই। তার পরে বাকী ১১ নিয়ে পইসে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে দিতে পারেন।

—“গরিব” আমি পূরণ করে দিলাম। লুই লজ্জা পেল; ও আবার মাগুমোয়াজেল বলতে বাঙ্ছিল নির্বাং।

২৪শে নভেম্বর। আজ লুই চলে গেল। সম্ভবতঃ আমিই এর জন্ত দায়ী। খুব ভোরে উঠে টেবিল সাজাব বলে কুল ভুলছিলাম; সেই সময় লুই এসে হাজির। আমার দুই হাতেই কুল থাকার দরুণ ওর সঙ্গে কন্ডমর্দন করতে পারিলাম না। আমার বিব্রত দেখে ওর খুব মজা লাগল।

“এগুলো নিয়ে খাশা একটা তোড়া বানানো বাবে,” আমার কুল তোলা শেষ হলে ও বলল; তার পর হাসল, “কই আমার সঙ্গে কন্ডমর্দন করলে না, একবার স্ত্রীজাত পর্বন্ত বললে না?”

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ওর নাকের কাছে কুলগুলো ধরে প্রায় করলাম, “গন্ধ কি চমৎকার, না?”—বহুক্ষণ ও সেগুলির আম্রাণ নিল।

“আমার একটা কুল দেবে, লক্ষীটি?”

“সানকে, কি কুল চাও?”

“একটা মার্গরিং কুল?”

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ও ঠাটা করছে কি না; কিন্তু বেশ গভীর ভাবেই ও এ-অনুঘোষটি করল দেখে আমি বললাম, “বাঃ, তুমি যোগ্য হয় দুইটি করছ।”

“দুইটি? মার্গরিং, ওই কুলটি ছাড়া জীবনে আর কিছুটি চাই না আমি; এ আমার মনের কথা।”

বুধাই আমার কুলের গোছা হাংডালাম ওই কুলটির খোঁজে।

“নাঃ, দেখছি নেই এর মধ্যে; আচ্ছা, আমি তুলে আনিছি, করণ ধারার ও বড় প্রিয় কুল ওটি; কাছেই পাওয়া বাবে।”—আমরা গেলাম চেরি-বাগানে; কয়েকটা মার্গরিং ছিঁড়ে তোড়া বানিয়ে ওর হাতে দিলাম,

“এই নাও, লুই!”

“পারী শায়ের হতভাগী কুলওয়ালীগুলো পথিকদের অতিষ্ঠ করে তোলে—কুল কেন বাবু!”—না কিনলে পিছু ছাড়ে না, তারপর নিজে হাতে সেই কুল ক্রোতার বুক থেকে ধরে।—তোড়াটা নিজের বোতামের খোঁজে আটকানর প্রয়াস করতে করতে লুই কথাটা শোনাল।

“নাও না, আমি এঁটে দিই।”

“সত্যি বড় ভাল হয়; দেখছ ত আমি কেমন অবদার ঢেঁকি?”

তোড়াটা বন্ধন লাগাছিলাম, ও সকাটুকে লক্ষ্য করছিল আমার; হয়ে গেলে ওর দিকে চেয়ে হাসলাম; ওর মুখ চিত্তাক্ষর দেখলাম। হঠাৎ নীচু গলার আবেগের সাথে ও বলে উঠল।

“মার্গরিং, তোমার বড় ভালবাসি, প্রাণাধিক ভালবাসি তোমার; কি বলে প্রকাশ করি সে-প্রেম? আমার জীবন-সমিচী হবে মার্গরিং, প্রিয়তমা?”

সতরে আমি ওর দিকে তাকালাম; ওর কথা শেষ হতেই আমি আশ্চর্যবর্ণ করতে পারিলাম না।

“ছি, লুই, এমন কথা মুখে এন না। অসম্ভব।”

দারুণ কান্না পেল; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম আমি।

কোন্ডের সাথে ও প্রায় করল। “তুমি কি তবে আমার ভালবাস না, মার্গরিং?”

“ভালবাসি বই কি, তবে যে আতাস দিলে, সেভাবে না।”

“বেশ মার্গরিং, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ ত?”

আমি চোখ তুললাম। ও বুক পাঁড়াল; উত্তেজনার ওর সারা মুখ পাণ্ড হরে উঠছে।

“মার্গরিং, তুমি কি আর কাউকে ভালবাস?”

আমি নিরন্তর দেখে ও বিহ্বলার দিগে উঠল, “ইস্, পদ-মর্দ্যালয় ওর সমান নিজেকে মনে করে কি বোকাখিই যে করেছে।”

ও চলে বাঙ্ছিল; আমি একমুঠে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম। ও বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে আমি ছুট গেলাম ওর কাছে; ওর হাত ধরে ফেললাম; ও পাঁড়াল।

“লুই, লুই, আমার কমা কর। পোহাই তোমার বন্ধু, আমার ওপর রাগ কোর না।”

সহজে ওর মুখে কথা সরল না; পাছ থেকে শুকনো পাতা একে একে বয়ে গিয়ে লীরবে উড়ে এসে পড়ছিল আমাদের পারের কাছে; আমার অজস্রিক পাঠুর মুখ দেখে ওর বুকি দয়া হল।

স্নেহাত্মক কণ্ঠে ও শুভাল, “বল মার্গরিং, এখনো বল।”

“বলি না বলি, আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি, না লুই?”

—“নির্বাং; কিন্তু মার্গরিং, আমার যদি ভালবাসতে, ভেবে দেখ ত, কত সুখী হতাম আমরা?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, “বিদায় মার্গরিং, বিদায়।”

“এ কি সত্যি বিদায়—লুই?”

“আর কোন পথ দেখি না; কোন দিন আর এ-মুখো হবে না, আর কোন দিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।”

অসীম আবেগে আমরা কন্ডমর্দন করলাম; আমরা হাত ওর হাতে নিয়ে আনমনে ও স্বপ্নোক্তি করল, “প্রাণাধিক প্রিয় হাত দুটি। বিদায়।”

তারপর অকস্মাৎ বেন এক অদম্য শক্তির আক্রান্ত ওর তণ্ড ওঠে ছুটি নেমে এল আমার হাতের ওপর। এক মুহূর্ত বাদে ও দেখলাম বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। তাহার মত আমিও গেলাম, মন্তজাহু হয়ে বসলাম ক্রুশের সামনে; একান্ত ভাবে আমি প্রার্থনা করলাম, ‘ভগবান, আমার কমা কর, লুই বেন আমার তুলে যেতে পারে, সুখী হোক ও জীবনে।’—দরদর ধারে জল স্বরতে লাগল আমার চোখ বেয়ে... উঠে পাঁড়াল্যাম, জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। বুড়ো আলক আঙাবলে ঢুকল, লুইয়ের বোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল। সে কি, লুই চলে বাচ্ছে! ধানিক বাসেই দেখলাম, ওর সঙ্গে বাবা কন্ডমর্দন করলেন, পিছনে যা পাঁড়িয়ে তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে ও বোড়ার চেপে বসল। এত বিব্রত, এত ভয়ানক মত শুকে কখনো দেখিনি? যা শুকে আলিঙ্গন করলেন, আবার করলেন কন্ডমর্দন, ও চলে গেল। ক্রমশই শুকে বুয়ে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। আতাস মত একবারও ও ক্রিয়ে তাকাল না, টুপি নেড়ে জানাল না বিদায় অভিবাদন। জানলার একমুঠে বসে আছি, যা এসেন, সবই তিনি শুনেছেন। সোকা টেনে আমার পাশে বসলেন। আমি ওর বুক মুখ লুকোলাম।

“মার্গরিং, তুমি শুকে তাহলে ভালবাসিস, না?”

“খুবই ভালবাসি যা, তবে অদম ভাবে নয়।”

‘খানিক চুপ করে থেকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কাউকে তুমি কি ভালবাসিস না?”

“হ্যাঁ।”

এত ব্যথার মাঝে আমার মুখে না জানি হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটির কথা মরণ করে, সঙ্গীতের সেই অভিজাত গুঁহর, সেই ঘনভাষা স্তেনদৃষ্টির মাধুর্য, চন্দনগুস্ত বীরত্বব্যঞ্জক সেই কপালের ওপর চোট-খেলান কেশগুচ্ছের কথা মরণ করে।

“বেচারা লুই!” মানিষাস কেসলেন। অনেক আশা ছিল, তোরের ছটিকে এক করে গিয়ে বাব। বা হবার হল। ভগবান বা করেন তা মঙ্গলেরই জন্ত, মেনে নিলাম একথা।” তিনি আরো বললেন, “বা বাছা, কেঁদে কি হবে? চোখও তোর লাল টকটক করছে; বা, চোখ-মুখ বুয়ে আর।”

আমায় আদর করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মা গো! এত বড় অভয় করলাম, তবু একটা রক্ত কথা বার হল না তোরার মুখ দিয়ে? একি পাখাণীর মত ব্যবহার করলাম আমি? কি বলে তার হাতে আমি এ জীবন সঁপে দিতে উৎসুক—যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কোনও ইঙ্গিত দিল না? বাবার মুখেও কথা নেই। বড় গভীর লাগল তাঁকে। রাতের বেলা, বখন সবাই গিয়ে বসলাম আগুনের ধারে, তিনি আমার শিঠে হাত রাখলেন। একঘুটে চেয়ে রইলেন বলন্ত চুলটীর দিকে।

আমার ঘবে গেলাম; তাকালাম বাইরে, কুরাশাজ্বর প্রকৃতির পানে। কে বেন পা টিপে টিপে এসে ঢুকল। তেরেস; আগুনটা একটু উলকে গিয়ে ও আমার কাছে এল।

“আজ! থুতুদি, অমন সোনার টাঙ্গ ছেলেটা খামখা চলে গেল কেন রে?”

“নিশ্চয়ই ওর কাজের সুবিধা হবে বলে।”

“না গো দিদি, আমার মনে হয় তোর ওই কাজল জাঁঝিই ওর কাল হল।” আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলে চলল।—

“শোন দিদি, একটা কথা বলি। বাধা দিসনে। আমার মনে

একটা খটকা লাগে তখুনি, বখন দেখলাম অষ্ট প্রহর ওর চোখ ছুটি হোকেই বেন থুঁজে মরছে জাঁজিপাতি করে। পোড়াকপালী তুই আর সেদিকে নজর দিলি কই? আজ সকালে সিঁড়ি পড়িড়ার করছি, দেখি ব্যথামাখা মুখে, চোখ বরাবর টুপি নামিয়ে বেচারী ফিরে এল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল। আমি ত অবাক। স্পষ্ট সুনলার, হাউ হাউ করে ও কাঁদছে। দেখ বাছা, সহজ ভালবাসা নয় ওর। পনেরো মিনিট বাদে বেরিয়ে এল, হাতে একটা খলি। আমার বলল, “আদিও তেরেস, বিদার!” —কি যে করুণ হাসি দিদি, বুকেটা আমার ছঁক করে উঠল। ‘কাণ্ডেন সাহেব কি আজই রওনা হবেন না কি?’ আমি জানতে চাইলাম।—“হ্যাঁ তেরেস, বিদার!”—দেখলাম বাবু লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকল।

তেরেস একটু ধামল। জানলার ওপর কমুই রেখে কোন মতে মাখাটা ধরে বসে ছিলাম। বেচারী লুই! এত গভীর ওর ভালবাসা! ভগবান! ভগবান! আমার কমা কর।—হাতে টান পড়ল।

“থুতুদি, রাগ করলি না ত?”

“না তেরেস।”

একটু দম নিয়ে হেহের মূরে ও বলল, “ওকে একটা চিঠি লিখে দে রে দিদি। আসতে লেখ। তোর ওই থুদি হাতের একটা আঁচড় পেলেই ও ছুটে আসবে। ওকে সুখী করা চাই দিদি, লিখি ত?”

“ওঁহ তেরেস, এখন আর লেখা সম্ভব নয়।”

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“ওর জীবনটা কিন্তু মাঠে মাঠা গেল। তাকে ও এত ভালবাসে যে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে, জানিস?”

“হি তেরেস, অমন কথা বলিস না।”—চোখ আমার জলে ভরে উঠল। তবু বীর গলায় আমি বললাম, “দেখিস, ভগবান ওর অমঙ্গল হতে সেবেন না। সব কিছু তিনিই ত চালাচ্ছেন। তিনিই কি আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছেন না? আমাদের জন্য তিনি কি সলাভাগ্রত নন?”

“বেশ থুতুদি, তুই বা করিস তা কখনো কারও কতি করে দি। শুভরাত্রি; দেবদুতেরা তোর মঙ্গল করুন।”

ও বেরিয়ে গেল।

হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। মলিন হয়ে উঠল ভাড়াগুলো; আমি জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম; সত্যিই কি আমার সামনে স্রবের পেয়লা তুলে ধরা হয়েছিল, আর তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম?—না, না, অসম্ভব।—কি করে আমি তার ঘরে গিয়ে সুখী হতাম, বাকে আশাহরুণ ভালবাসতে পারলাম না? ভালবাসি ওকে বন্ধুরূপে, বনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। তার বোনী না। আমার বা কর্তব্য আমি করেছি বলেই মনে হয়।—আবার জানলা খুলে দিতেই হাড়-কাঁপানো হাওয়া ঢুকে মজা অবধি কাঁপিয়ে দিল। অব্যক্ত



আধুনিক  
বেনারসীর জন্ম  
মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল  
কলেজ স্ট্রীট জংশন • কলিকাতা

এক ব্যাধার প্রভাবে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। এঁটে দিলার জানলাটা। ক্রুশের তলার হাঁটু পেড়ে বসলাম, “ভগবান, আমার পরিভাগ্য কোর না, ভাগ্য কোর না আমার।” বহুক্ষণ ওই ভাবে বসে রইলাম। কে-বাপাশাট্টা ঘটে গেল তারই চার ধারে আমার চিন্তারামি জমা হয়ে উঠল। আমাদের সবারই শুভ কামনা করলাম; লুইয়ের জন্ত প্রার্থনা করলাম, আর প্রার্থনা করলাম আমার প্রেমাস্পদের জন্ত। রাত বারোটায় বট্টা বাজল; শুতে বাই।

২৭শে নভেম্বর।—কাল বৈঠকখানায় জানলার ধারে বসেছিলাম; কিসের চিন্তায় মগ্ন হলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল জমিদার আমার সামনে গিয়ে চলে গেল; ও এখানেই আসছে কি না, সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ওর পারের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির তলার। বাবা দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন। মোমবাতি জ্বালা হলনি; চিমনির স্নান আলো ছাড়া ঘর প্রায় অন্ধকার (বা ঠাণ্ডা পড়েছে, আঙন আঁধার-কাল রোজই আলতে হয়)। বাবা ঘটা বাজালেন; বুড়ো আলক বড় বড় বাতি নিয়ে এল; জমিদার আমার সঙ্গে করমর্দন করল।

“শ্রীমতী আর্ভের, বড় দুর্বল দেখছি তোমার; শরীর ধারাপ হয় নি ত?”

“উঁহ,” আমি জবাব দিলাম। আমার গাল দুটো বেধ করি লাল হয়ে উঠল, বা দেখে জমিদার বলল, “বাঃ এবার আশ্চর্য হলার সত্যি।”

আঙনের পাশে বসে গল্প শুরু হল। লুইয়ের খবর জানতে চাইল ও। ক্রমেই আমি চুপ করে বাছি, একমনে চিন্তি ওর আলোচনা বাবার সঙ্গে : রাজনীতি, ভূতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিষ্কার, সাহিত্য—কত বিষয়েই যে কথা হচ্ছিল। এত জিনিস ও শিখল কোথায়!—আমার ও গান গাইতে অল্পবোধ করল। তারপর কি খেয়াল হল, নিজে গিয়ে বদল শিয়ানোর সামনে; বাজাতে শুরু করল অর্ধ করেকটি সঙ্গত। বিখ্যাত ‘লা ত্রাভিয়াতা’ গানটি জেলে এল,

“Di Provenza ilmar il Suo!”

দরজা গলা গমগম করতে লাগল ছোট্ট ঘরাটতে; প্রথম ভবকের বেব লাইন ক’টি জনিত হতে থাকল দূর থেকে দূরত্বের :

“Dio mi...gui—da...Dio mi guida!”

(ভগবান, আমার পথ দেখাও, আমার পথ দেখাও!)

তারপর অতি মধুর, অতি স্নগদগ্রাহী হয়ে ও শুরু করল,

“Ah!—Il tuo...vecchio ge-ni-tor...tu non sai quanto soffri...Tu non sai quanto soffri.”

(হার পরম্পিতা, জান না মোর কত বাতনা, কত বাতনা।)

নিজের অন্তরের সিকিঁ চেয়ে শিউরে উঠছিলাম। লুইয়ের কথা মনে এল; প্রত্যাখ্যাত তার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। লজ ক্রোড়েও অঙ্গ লবণ করা তার হল। জানলার আড়ালে বসে আমি চোখ বুজে কেললাম। গান শেষ করে জমিদার উঠে এল আমার কাছে।

“বাঃ, ছানোয়া, অর্ধ তোমার গলা।” বাবা তারিক করলেন “খ্রিসি নিজেও এমন প্রশংসা দিয়ে, এত দরদ জেলে গাইতে পারতে কি না সন্দেহ।”

ও হাসল, “না জেনারেল, নেহাৎ মেহের খাঁতির একম বলছেন আপনি। শ্রীমতী মার্গারিতির গান শুনে আপনি নিয় অভ্যস্ত। আপনার মুখে একথা সাজে না।”

শিয়ানোর সামনে বসবার জন্ত ও আমার পীড়ানীতি করতে লাগল। ওর কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম—আপা গান গাইতে পারব না। তার পর বাজাতে শুরু করলাম ডাবার (weber) এর শেষ ভালসুটি। বাজান শেষ হতে ২ হতে জমিদার বলে উঠল, “এত কক্ষণ, এত মর্যাদিক বাজনা জীবতে তুমিনি; হুমু’র মতালের গানের মত, প্রেমমুগ্ধের বিদায় সম্ভাষণে মতই নিরাক্ষণ এর মূর্তনা।”

আমার পাশে বসে ও কীতসএব প্রেসল তুলল, “না হরদম তোমা কথাই বলছেন; কেনই বা বলবেন না,—তোমার মত মহাত্মক বব একটা চোখে পড়ে না, আর বাসের অন্তরাত্মা নিরুস, তারাই ও পরস্পরকে ভালবাসে, তাই না?”

“তারাই পরস্পরকে ভালবাসেন সত্যি, কিন্তু আমি ত ভাল নই মোটেই; তোমার মার কথা আলাপ—তার চরিত্র ত দেবতুল্য।”

ওর সাথে কথা বলা, ওর সান্নিধ্যে ছ’ দণ্ড বসা, ওর আয়ত ছাী চোখ পূরণ ভরে দেখা, ওর সঙ্গে ভাল রেখে একই নিখাস বুক ভরে নেওয়া, এর বড় অর্থ আমি চাই না; আমার সব ব্যথা ধুয়ে-ধুয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

“তোমার ভাইয়ের আর দেখা পাই না কেন?”

ওর কপাল কৃষ্ণিত হয়ে উঠল।

“তার শরীর ভাল আছে ত?”

“না না,” জমিদার হেসে উঠল, “গাভ’র বাহ্য চিরকালই ভাল; আমার মত বধন-তখন ওকে ভুগতে হয় না।”

ওর মার হয়ে আমার জমিদার বলে গেল, কিছুদিনের জন্ত বেন প্রাসাদে বাই আবার। যা ওকে কথা দিলেন যে আমি বাব; আমাকেও ইঙ্গিত দিলেন যে একবছর আমার পক্ষে ওখানে গেলে ভালই হবে। কথা ঠিক করলেন ঠরা,—দশ তারিখে ওখানে বাব।

২৮শে নভেম্বর। ভাসুপোয়ানদের বাড়ী গিয়েছিলাম আজ। ওদের ঘরে কেউ নেই দেখে চলে আসছি, এমন সময় হেলেন দৌড়তে দৌড়তে বাগান থেকে বেরিয়ে এল। আমার খুব বড় একটা ‘হামি’ দিয়ে ও আমার পকেট হাংড়াতে হাংড়াতে বা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। আমার দেওয়ার মিষ্টিতে কামড় মেয়ে শুরু করল ও বকবক করতে।

“আজ্ঞা হেলেন, উৎসবের দিন প্রাসাদে খুব মজা করলি না?”

“খুব মজা; জমিদার আমার কোলে তুলে আদর করেছিল, জান? আর আমার এতবড় একটা কেক দিয়েছিল,” বড় একটা ফুলকপি দেখাল ও।

“বাঃ, জমিদার তা হলে খুব লম্বী বলতে হবে?”

“ছাই লম্বী,” গলাটা নীচু করে, চাষি দিকে তাকিয়ে ও বলল, “কক্ষণো আর ওকে ‘হামি’ খাব না—রাজ্যের ল্যাবলুস দিলেও না।”

“কেন হেলেন, কেন রে?”

“ও খুব ধারাপ লোক।”



"হিঃ হেলেন, জন্ম কথা বলতে নেই। ও সব বাজে কথা।"

"কে বলল বাজে কথা? সব সত্যি; জান, মা সেদিন বাবাকে একথা বলছিলেন।"

"শোন হেলেন, জন্মদায় অতি ভাল লোক; সবটিকে ও কত ভালবাসে; তোকে ত কত বার পরশ দিয়েছে, খেলনা দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমিও মাকে তা বললাম; তিনি মাথা নাড়লেন; আমার টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।—আচ্ছা এই ল্যাবেকুসগুলোর একভাগ কি রুদের জন্য রাখতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

এ আমি কি তুললাম? বড় রাগ হল। এত মহৎ, এত পরোপকারী, তবু লোকে এর নিন্দা করে? বিশেষতঃ মাদাম ভালপোয়ান্। কি অকৃতজ্ঞ! এদের জন্ম তুলের জন্ম কী না করেছে জন্মদায়! নাঃ, মাদাম ভালপোয়ানকে অজ্ঞ প্রকৃতির লোক বলে জানতাম।—চমক ভাঙল হেলেনের তাকে।

"এর থেকে আর একটা ল্যাবেকুস নিই?"

"সব ক'টা খেয়ে ফেল, এগুলো তোরাই সব।"

"এই খানিক আগে বললে রুদের নাম করে, আর এক প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে আমি চলে এলাম তাড়াতাড়ি। বাড়ী চুকতেই বাবার সাধনে দেখা।"

"কি হল বে মার্গরিৎ? বড় চিন্তাকুল দেখছি তোকে?"

ওকে আমি ঘটনাটা খুলে জানালাম।

"তাই বলে তুই মাদামের সাথে দেখা না করেই চলে এলি?"

"দেখা করব কি? বা রাগ হচ্ছে।"

বাবা হাসলেন।

"কি আশ্চর্য। কোন দিন তুললে বিবাসই করতে পারতেন না যে তুই বাগতে পারিস।" বলে উনি আমার আদর করলেন।

"মার্গরিৎ, লুইয়ের চিঠি এসেছে।"

"ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, তবে বড় আশ্বাত পেয়েছে।"

"বেচারা।"

আমার চোখ জলে ভরে গেল। অবাধ হয়ে বাবা আমার দিকে চেয়ে বসেছিলেন। তার পর একটু দম নিয়ে বললেন, "এমন কিছু নয় মা; সরে বাবে।" বলে হাসলেন, "কিংবা হয়ত তোর মস্তের পরিবর্তন হবে।"

আমি গোমড়া মেরে আছি দেখে উনি কথার মোড় ঘোরালেন, "চল, সবই ভগবানের ইচ্ছা।"

৩০শে নভেম্বর। কাল আমরা পারী বাছি। বেশ কিছুদিন হল বাবা-মা তোড়জোড় করছিলেন—আমার বিশুদ্ধ জানতে দেন নি। আজ সকালে বাবা বখন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বা খুকি, গোছ-গাছ কবে নে; কাল জোরে আমরা পারী বাছি।"—আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম, কোথায় যেন বোমা ফাটল। বাবা আনন্দে আটপাানা, "কেমন জন্ম? হল ত?"

আমার সঙ্গেই খোঁচে নি তখনো, "সত্যি বলছ, বাবা?"

"তা নয়ত বলছি কেন?"

ঘরে গেলাম; মাল-পত্তর ঝাড়া-ছাঁদা শুরু করলাম। কবে কিরছি আমি না; কয়েক দিনের মধ্যে কিরতে পারলেই ভাল হয়। জীবনে পারী দেখি নি। লুইয়ের মুখে কত কথাই না শুনেছি। আর ঠাকুমা? ওকে নিশ্চয়ই দেখতে বাব।

বাইরের দিকে তাকালাম। সব কিছুই বিবর, স্নান। পাছ থেকে পাতার রাশি ঝরে গিয়েছে, ঘুঘু ঢলে গিয়েছে পাশে, কিকে হরে এসেছে অন্তরাগ। আমদার ঘোড়ার চড়ে আসছে, সঙ্গে ওর ভাই। ওই ত, আমার দেখতে পেয়েছে। হাত নাড়ল, হাসল। ও বোধ হয় জানে না, কাল আমরা চলে বাছি। তা হলে এসে দেখা করে নেত। কোন্ প্রাণে যে লোকে ওর নামে বলত ঘটায়। ও এমনই দয়ালু, একটা মাছি মারতে পশ্চাদ্ হাত সরবে কি না সন্দেহ। কি এমন করেছে, বাব কলে ওর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ? এত কোমল ওর অন্তঃকরণ।—অবশ্য কঠোর হতেও ও জানে; নিজের কাজ করে বাব এক মনে, অবিচল তাবে; লোকের কথার ভ্রমশ্রুণ করে না। ক্রমেই তুন্তের বাইরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর ঘোড়া; গাভু তার ঘোড়ার বেগ বাড়িয়ে দিল; ছানোয়া খামল এক দণ্ড, তার পর কদম ঢালে এগিয়ে গেল। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।

১লা ডিসেম্বর।—পারীতে এসে গেছি। ঠাকুমার এখানে উঠেছি। অকপট আগের তিনি আমাদের টেনে নিয়েছেন নিজের কোলে। বাবা আর মাকে আলিঙ্গন করে, আমার হুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"কি সুন্দর, তুই-ই আমার মার্গরিৎ?" উনি আনন্দে অবীর হয়ে উঠলেন, "কি ভাগ্যটাই না হয়েছিল, কি রূপ যে খুলেছে দিদি। পারী শহরের ছোঁড়াগুলো প্রথম দর্শনেই কাৎ হবে দেখছি।"


ফোনঃ  
৩৪-৪৯০২

Gv

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** সৃজন কুমলী  
সম্পাদক ও সন্মিলনী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিঃ- ১২



গ্রাঃ ১-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৯  
(রাজা গিনের স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

আমার কান গরম হয়ে উঠল। ঠাকুরা বাবার দিকে তাকালেন; ইমিত্তে কি কথা হল। বাবা আমার ওপরে বেতে বসলেন। উনি, মা আর ঠাকুরা খানিক বাদে এসেন। ঠাকুরা আমাদের আর কোথাও থাকতে দেবেন না; এখান থেকে এক পা যদি বাড়াই আমরা, উনি মাথা খুঁড়ে মরবেন। সারা দিন আমরা লুতর-এর বাহুবর দেখে কাটালাম। বিকেলের দিকে বাবা-মা পুন্যে এক বছর বাড়ী গেলেন। ঠাকুরার কাছেই রইলাম আমি। সবময়সী বছর মত উনি আমার সাথে কথা কইতে লাগলেন।

“আচ্ছা দিদি, এর আগে বুঝি তুই এ-ছাড়া হল নি?”

“না ঠাকুরা, বাড়ীর বাইরে, গায়ের বাইরেই বিশেষ বাই নি।”

আনন্দটার কিছু কাঠ দিয়ে উনি আমার চিম্নীর দিকে সরে বসতে বসলেন।

“আচ্ছা, তুমিইয়ের কাঁকে কাঁকে চিনিস যে? গুয়ারডেনের জানিস না?”

“হ্যাঁ।”

“কীতস ত বিধবা; হুই ছেলের-ঘেরে নিয়ে ঘর—”

“না, ওর মেয়ে নেই; দুটিই ছেলে।”

“সে-ছোটো এত দিনে বোধ হয় দারুণ লাজেক হয়ে উঠছে। বড়টার নাম কি বেন? ছানোরা?”

“হ্যাঁ ঠাকুরা, আপনি ওদের জেনেন দেখছি।”

“চিনব না?—তোদের ওখানে ওরা আদে-বার। ছেলেগুলো?”

“হ্যাঁ! কীতস আমার বড় স্নেহ করেন। বড় ভালবাসেন। প্রায়ই আমার ওর ওখানে পিরে থাকতে বলেন। গত মাসে, জমিদারের জম্মদিনে কি উৎসবটাই বে হল।”

“কর বললি? বড় ছেলেটার?”

“হুঁ।”

“ছানোরা তোদের ওখানে বার?”

“প্রায়ই ত বার।”

“রোজ?”

আমি হাসি চাপতে পারলাম না; “রোজ কি করে আসবে, ঠাকুরা? ওর বা কাজের চাপ।”

“তোকে নাকি ওর বড় মনে ধরেছে?” ঠাকুরার সুখে-তোষে চাপা কোঁতুক হুড়ান।

জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলাম, “কই, জানি না ত।”

উনি হোঁ-হোঁ করে হেসে উঠলেন, “তাতে কি? তোর বুড়ী ঠাকুরার মন মন্ধেছে তোর রূপে; আর কি চাই?”

উনি আমার একটা হাবির এলবার দেখালেন। তাতে লুইয়ের হাবিও তোষে পড়ল।

“এটা ত কান্ডেন লক্ষ্ম-এর ছবি, তাই না?”

“হ্যাঁ, চিনিস দেখছি ওকে।”

“বাং, চিনিস না? এই ত সেদিন ও আমাদের ওখানে এসেছিল।”

“আমার এখানেও এখন তখন ও আসত; পেল হুই বাস কিছু ওর পাড়া পাই নি।”

দশটা বাজল; ঠাকুরা আমার তত্বে বেতে বসলেন। ইচ্ছে ছিল, বাপ-মার লজ্ঞ অপেক্ষা করি। ঠাকুরা কিন্তু হানা করলেন, “ভবে বে এই গোলাপগুলো তকিরে বাবে।” আমার গাল টিপে

উনি বললেন, “এত রান্ধি করে কি ভুতে হয়? আমার ভিনতলার স্বরে নিয়ে গেলেন। শোবার ঘর, বুসোয়ার—হুটই ভারি শব্দর সাজানো। আমার আলিদল জানিয়ে ঠাকুরা চলে গেলেন। চিম্নীতে গনগমে আওন। পরনের শোবাক খুলে ‘কেসলাম। জেসি-পাউন হুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসলাম। হুটু গেড়ে তারপর শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩রা ডিসেম্বর।—বাবা কাল চিত্রকর ম’সিয়া বেজরকে এনেছিলেন। আমার ছবি আঁকবেন। জুসলোক শুধু একটা খেচ করে নিয়ে গেলেন। ওর থেকে তৈরি হবে তৈলচিত্র।—সাত তারিখের পর আমরা দেখে বাব। বাবার বহু বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা হল। উঃ, বড় ক্লাস্ত লাগছে।

৪ঠা ডিসেম্বর।—আজ আমার ম’সিয়া বেজর এসেছিলেন। পাকা হাত জুসলোকের। ছবিটা বে বিশেষ ধরনের হবে, আঁচ করা বাচ্ছে। তবে চার দিন হল এসেছি; এর মধ্যেই কেবার লজ্ঞ অস্থির হয়ে পড়েছি। আজ সন্ধ্যাবেলা জানলার ধারে পাড়িয়েছিলাম; হঠাৎ দেখি, পাশে ঠাকুরা।

“আচ্ছা, দিদি যে, কার ঘপে একাক্ষ হয়েছিলি রে?”

চাকরটা এখনো বাতি ছেলে বার নি, তাই রন্ধে; হঠাৎ গাল হুটো। আমার বেন লাল হয়ে উঠল; নাঃ, ঠাকুরা বড় পেছনে লাগেন দেখছি।

৮ই ডিসেম্বর।—আমরা কিংবে এসেছি। বিকেল পাঁচটার ট্রেলে এলাম। খাবার পর একটু জিহ্মিয়ে নিলাম আমার ঘরে গিয়ে। পরত আমি প্রোসাদে বাব। ও (জমিদার আর কি) নিশ্চয়ই জানে না আমরা কিংবে এসেছি। তা হলে কি একবার আসত না? কিংবা, হয়ত ওর শরীর ভাল নেই। নাঃ, কি বে আমার আজ্ঞে-বাজ্ঞে ভাবনা। কাল ও নির্ধাৎ আসবে। এবার শুয়ে পড়ি।

৯ই ডিসেম্বর।—আজও ও এল না; কি ব্যাপার? বড় কীকা-কীকা লাগছে। সারাটা সকাল হুড়ি পড়েছে। বেড়াতে যেতে পারি নি। বাবা আর আমি মৌলিয়ার পড়তে বসলাম। বাবা ত বুর্জোয়া জঁতিভগ্নের ছরবছার হেসে খুন! আমার কিছুই ছাই ভাল লাগছে না।

“কি হল রে খুকি? এত গোমড়া মেয়ে গেলি বে?”

“জানি মা বাবা, আজ কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না বেন।”

বিকেল ৩টে। হুড়ি থেমে গেছে। বাবার সঙ্গে বোড়া নিয়ে বার হলাম। দেখা হল জমিদারের সাথে। আমাদের অভিবাধন জানিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গেই চলল; ওর চেহারাটা কেমন বেন ধারাপ লাগল। বেচারী জানতই না, আমরা পারী গিয়েছিলাম। কাল ও আমার নিয়ে বাবে প্রোসাদে। চারটে অবধি যোরা পেল। মেয়ের কীক দিয়ে সুখ দেখা বাচ্ছে; বাবা জমিদারকে পারীর গল্প করছিলেন; ওর মন কিন্তু বেন অভয় রয়েছে। নদীর ধার অবধি এসে ও বিদার মিল। তর ওর শরীর ধারাপ, নয়ত অভ্য কিছুই চিন্তায় ও মগ্ন হয়ে রয়েছে। বাবার সময় কই রীতি-মাকি আমাদের দিকে একবার তাকালও না, মাথার টুপি খুলে বিদায়ও জানানো না।

১১ই ডিসেম্বর। ও আর ওর মা পাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। দেখে-শুয়ে লড়াই চলেছে; ভীষণ শীত আজ; পরম-মুখে কীতস

আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে নিজের পাশে বসলেন। জমিদার বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে মনে হল। যার আদেশে গাড়ীতেই ওকে উঠতে হল। আমার আর কীতসক চাপর দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে দিয়ে ও খড়খড়ি এঁটে দিল। সবগে গাড়ী ছুটে চলল জনহীন মাঠের বুক চিরে। আমরা প্রাসাদের বৈঠকখানার পৌঁছে বহু বিবরে আলোচনা করলাম। পাণ্ডা বাড়ী নেই। আমার ঘরে গিয়ে টুপি গরম জামা বিছানার রেখে পেলাম জানলার ধারে। চারি ধার নিজ্ঞন। বাইরে হাওয়ার আর্দ্রনাথ। পাঁতা-বো-বাওয়া নয় ভালগুলোতে লেগেছে বিশ্রী রকম হুটোপুটি। এই বিবর দূত আরও সহ হল না; আঙনের ধারে গিয়ে বসলাম। নীচে বাবার সময় সিঁড়িতে জমিদারের সঙ্গে দেখা।

“আজও বাইরে বাওয়া অসভ্য; চল, প্রাসাদের অদেখা যা’ কিছু তোমার দেখিয়ে আনি।”

আমি সোংসায়ে রাজী হলাম।

বড় বন্ধু বইটা খুলে ও প্রথমে দেখাল পুরনো বই আর ছবির রাশি। ঘরে চারটে মাত্র জাল্লা : কেমন ছবিসমূহে ভাব।

“এই দেখ সেই কাঁথেরিনের ছবি—প্রেমের বেদীতে বিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন আপন জীবন;—এই তাঁর ভাই, সেই বোন্ডার ছবি!”

একে একে প্রতিটি ছবির ইতিবৃত্ত শোনা গেল।

“প্রাসাদের সুড়ঙ্গ দেখবে?”

“চল না।”

“ভয় করবে না?”

“কিসের ভয়?”

“দারুণ অন্ধকার ওখানে; তা ছাড়া শোনা যায় যে ১০১ বুটাকে নাকি জমিদার আত্মরত প্রহারেডেন ওখানে নরহত্যা করেছিলেন। এখনো মেরেতে রক্তের দাগ আছে।”

“বাক্ না; তুমি আচ্ছ, আমার ভয় কি?”

এতক্ষণ ওর কপালে একটা জটিল রেখা দেখা বাচ্ছিল। আমার উত্তরে ও তৃপ্ত হল। ছোট্ট একটা শুগু দরজা খুলে ও আমার হাত ধরে সম্ভর্ণে অগ্রসর হল সুড়ঙ্গপথে। জালে-ঢাকা ছোট্ট একটা ফুলগুলি দিয়ে এক ছিলকে আলো এসে কেমন বিলম্বটে পরিবেশ গড়ে তুলেছে। অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি। পথ যেন শেষ হয় না। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু ও আমার হাত ধরে আছে, তাই ভয় করছে না একদম। প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটার পর অতি নীচু সর্কার একটা দরজা দেখা গেল। খোলামাত্র সামনে পড়ল ধূ-ধূ মাঠ। বৃষ্টি ঘেমে গেছে; একটা স্রাং দিয়ে জমিদার দরজাটা এঁটে দিল।

“ওঃ, ওখানে থেকে যেখানে বুক ভরে নিশ্বাস নেবার যে কী সুখ!” ও বলল।

হাওয়া অবিরাম গর্জে চলছে। তাড়াতাড়ি আমরা পা বাড়লাম প্রাসাদের দিকে। ব’সিয়া রেকামিগে, গাঁয়ের পানবী, আজ এখানেই খেলেন। অতি সু চরিত্রের লোক; বড় দয়ালু। জমিদার ও তার ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি,—নিজের সম্বানের মত ওদের ভালবাসেন।

রাতে চিমনির সামনে কাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সারা দিনের কথা। কে যেন দরজার ঢোকা দিল; কীতস এসেন। আমার পাশে বসে টেনে নিলেন আমার তাঁর কাছে। ওর কাঁধে মাথা রাখলাম। কী রেহাই, গভীর ওর স্পর্শ।

“কি ভাবছিলাম? মনে হল কি এক যথেষ্ট তুই ভুবেছিলি; স্পষ্ট তার প্রকাশ দেখলাম তোমার বদাগুত মুখে।”

উত্তরে ওর হাতে আলতো ভাবে চুমা দিলাম। তিনি যে ওইই গর্ভধারিণী; এই পৃথিবীতে তিনিই ত ওকে এনেছেন, রাহুব করেছেন নিজের বৃকের রক্ত দিয়ে। ওর প্রতি অব্যক্ত এক কৃতজ্ঞতার আমার অন্তর ভরে উঠল।

“বুকেলি, বোজ শোবার আগে আমার ঘুমন্ত হেলেনের একবার দেখে বাওয়া আমার অভ্যাস; বখন ওরা একটুই ছিল, তখন থেকেই এভাবে দেখে আসছি; আজও দেখি। তোকেও দেখতে এলাম। তোকে যে আমি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি। ছানোরা, পাণ্ডার মত তুইও আমার ভালবাসিন; না মা?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে সত্যি বড় আপন মনে হয়। আচ্ছ! গেল সপ্তাহে কি জমিদারের শরীর খারাপ হয়েছিল?”

“বিশেষ কিছু না; কিন্তু, তুই ওকে ‘জমিদার’ বলে ডাকিস কেন মা? শুধু ছানোরা বলে ডাকলেই পারিস। চার বছর বয়সে তুই যে ওকে নাম ধরেই ডাকতিস।” আমি বিধাবিধা দেখে উনি হাসলেন।

“হা মা, ঘুমিয়ে পড়; তোমার ভাল ঘুম হোক, এই প্রার্থনা করি।”

তিনি চলে গেলেন। আমি খাটের পাশে বসে প্রার্থনা করলাম।

পরম পিতার চরণে প্রার্থনা করলাম, আমাদের যেন অথবা প্রলোভন থেকে তিনি দূরে রাখেন। শোবার আগে মশারিটা একটু কঁক করে চেয়ে দেখলাম—দারুণ জ্বাধারে আর হুয়াশার আচ্ছন্ন সমস্ত পৃথিবী। জানালার জানালার জেগেছে হাওয়ার কারা। আকাশে ছড়ানো অশ্রুত তারার বীজ। কী অপরূপ! “আকাশের বৃকে ভগবানের কীতি প্রকট, আর সারা বিশ্বের বৃকে প্রকট তাঁর স্বজনী চিহ্ন।” কি সত্য। তারাতারা আকাশের দিকে চেয়ে একথাই বার বার মনে আসে। আমি শুতে পড়লাম। সমস্ত প্রাণাদ নিঃসার।

১২ই ডিসেম্বর। কাল রাতে বছরের প্রথম ভূবায়পাত। সকালে উঠেই চোখে পড়ল জানলার ওপারে সব কিছু ধবধব করছে সাগা। কি অপূর্ণ শুভ্রতা! সন্ন্যাসিনীর মত সাগা পোষাকে পৃথিবী আজ সেজেছে; বা কিছু অপরিস্কার, কালিহাময়,—তা আজ উজ্জল এই পবিত্রতার মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানেৎ এল আঙন নিয়ে। “বৃহৎ মাহমোদায়েল; কি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখছেন! আপনি ত বেশ সকাল সকাল উঠে পড়েছেন।”

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের বাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা লাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাপ্তে ২-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেক্টার

৩৬, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

‘সে কি জানে, তুই বলহিস সকাল সকাল? তুই তাহলে কোন ভাবে উঠহিস না জানি।’

ও রেসে চলে গেল। আটটা নাগাদ গেলাম বৈঠকখানার। গাভ্র জানলার ধারে ঝাড়িরে আছে, আমার দেখতে পায়নি।

‘কি ম’সির; গাভ্র, একা এখানে।’

ও ঘুরে ফিড়াল।

‘মানমোহাজেল মার্গরিথ, আজ আর বাড়ীর বাইরে এক পাও যেতে পারবে না।’

বড় বড় বরকের কুটি পড়ছে।

‘তাতে কি, দিনটা বা দুখর লাগছে, এমন যিনে কোন মতেই আমি স্থাপিত হব না।’

‘দেখ, খানিক বসে কেমন বিয়ক্তি ঘরে।’

‘না বাপু, সেশুয়া আবার নেই।’

কঁতেন এলেন।

‘হ্যানোয়ার শরীর আবার খারাপ হয়েছে, সেই মাথাধরা।’

‘তবে ও এখন আগবে না।’ আমি জানতে চাইলাম।

‘আগবে না? বা একতরে, শরীরটার বহু কোন দিন নিতে দেখলাম কই?’

ইতিমধ্যে জমিদার এসে হাজির হল। আমার স্রষ্ট্রাত জানাল। কি ক্যাকাশে লাগছে ওকে। বহু চামড়ার ভেতর দিয়ে নীল শিরাগুলে কপালের দুই পাশে বেন হুঁড়ে বেরুচ্ছে।

‘উঃ, কাল সারা রাত একটুও ঘুমেতে পারিনি।’

গাভ্র বেরিয়ে গেল।

‘নীচেতে তুই এলি নে হ্যানোয়া?’ ওর মা বকলেন, ‘আর, এই সোকাটার তরে পড় দেখি।’

ও সশব্দে তরে পড়ল চোখ বুঁজে।

‘তোমর খাবার এখানেই আনব। ভড়িস না বেন এখান থেকে।’

ও বাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আমার খাওয়ার ঘরে গেলাম। প্রান্তগাশের পর কঁতেন নিজে হ্যানোয়ার জন্ত ককি নিয়ে বাচ্ছিলেন, আমি ট্রেটা নেব বলে ধরাধরি করতে উনি আমার হাতে দিলেন বাধ্য হয়ে। হ্যানোয়া কিছুই খেতে পারল না, অসন্তবে তেষ্ঠা পেয়েছে বলে কাশ হুঁরেক ছুধককি খেল। আমার মনে হল জমিদার আর তার ভাইয়ের মধ্যে তেমন বেন সন্তাব নেই ইলানী। দিনান্তে একবারও ওদের একসাথে দেখা যায় না আজকাল। জমিদার আমার অল্পবোধ করল কিছু পড়ো শোনোতে। ওর কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারব,—এর বড় সুখ আর আমার কি আছে? আমি পড়োই চললাম। ক্রমে ক্রমে ও ঘুমিয়ে পড়ল। অনড় অচল ভাবে আমি বসে রইলাম, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। আগনের দিকে তাকিয়ে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, কি এমন ঘটেছে যার জন্ত ও এত বিচলিত হয়ে উঠেছে? নিশ্চয় ওর ইচ্ছেব বিকছে এমন কেউ কিছু করছে যার ফলে এই অবস্থা,— ঘুমের ঘোরে কেমন বেন শিউরে উঠে; অধঃকূট আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা বাচ্ছে, ভগ্নাবহ হঃঃঃঃঃ মাঝে ও আকুল হয়ে উঠে, একবার ওকে আগিয়েই দিচ্ছিলাম; কিন্তু খানিক বসে ও নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর মা এলেন; ও ঘুমে দেখে উনি আমার

পাশে এসে বসলেন; আমি ওর কোলে মাথা রাখলাম। আমার চুলে হাত বুদিয়ে দিতে দিতে উনি হেলের দিকে তাকালেন।

‘ওকে তুই ভালবাসিস?’

আমি চুপ করে রইলাম।

‘হব্ব বাশের মতই দেখতে হলে কি হবে, তাঁর মত স্বভাববৈধর ও পায়নি। ইচ্ছে ছিল ওর বিয়ে দেব। তোমর মত একটি পাত্রী যদি পেতাম, পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে চোখ বুজতাম।’

লজ্জার আমি অধোমন দেখে উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

‘তুই ওকে ভালবাসিস?’ ওর জাঁচলে আমি হুখ লুকোলাম দেখে উনি বলে চললেন, ‘কেন মা, এত লজ্জা পাচ্চিস? ও কি তোমর যোগ্য পাত্র নয় না তুই ওর যোগ্য নয়? ওর স্ত্রীত্ব তোকে দেখি বড় সাধ আমার অন্তরে। মাঝের বহু দিনে ওকে ভালবাসবার, লেখী শোনা করবার একজন কেউ আছে জেনে যেন বড় সাধনা পেতাম।’ আমার মুখে উনি চুমো খেলেন।

‘জানিস মা, সমস্ত বুক দিয়ে তোকে ভালবাসি আমি, কারণ তুই আমার হ্যানোয়াকে ভালবাসিস যে।’

আজ্ঞে আজ্ঞে হু কঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। পড়ল আমার চুলের ওপর।

‘কঁতেন হলে তোকে বা মানাবে—’ উনি বললেন। হাতে হাত রেখে আমরা ঘটাপানেক ওই ভাবে বসে রইলাম। সজ্ঞারে চঠাং দরজা খুলে গেল। গাভ্র ঢুকল। টোটে আজুল দিয়ে ইশারা করলেন কঁতেন। ততক্ষণে কিছু ওর ঘুম ভেঙে গেছে। চঠাং ওভাবে ঘুমিয়ে পড়ার দরুণ প্রথমেই ও অপ্রতিভ হয়ে আমার কাছে কমা চাইল। ও বে একটু ঘুমেতে পেয়েছে, তাতেই আমি সুখী, ওকে বললাম। প্রঙ্গর হাসিতে ওর মুখ ভরে উঠল; আমার হাত ধরে বলল, ‘আর কেউ হলে খুবই বিরক্ত হত; কিন্তু তোমার স্বপ্ন বে অতি প্রশস্ত মানমোহাজেল মার্গরিথ।’

অধীর আনন্দে আমি গেলাম আমার ঘরে। নতভালু হয়ে বসলাম। সন্ধ্যাবেলা খাবার পর আমার ঘরে যাচ্ছিলাম; বৈঠকখানার জমিদার দেখলাম কঁতেনের পায়ের এক পাশে বসে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চলে বাচ্চি দেখে কঁতেন ডাকলেন, ‘আর মা, অল্প পাশটা তোমর পথ চেয়েই খালি রেখেছি; তুই বে আমার আর একটি সন্তান।’

১০ই ডিসেম্বর।—আজ সকালে খাবার ঘরে কাটকে দেখলাম না; কঁতেন এলেন একটু পরে। ‘হ্যানোয়া, গাভ্র—এরা কই?’

‘জানি নে বাহা।’

বুড়ো চাকর আতুঁরক ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ধা রে, দাণাবাবুরা কোথায় গেল?’

‘ভোরবেলা দেখেছিলাম ম’সিয়্য হ্যানোয়া আর ম’সিয়্য গাভ্র একের পর এক বেরিয়ে গেল।’

‘কি আশ্চর্য! তাই নাকি?—চল, মার্গরিথ, ওরা এসে পড়বে খানিক বাদেই।’

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বড় হেলে এসে ঢুকল। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ওর চেহারা; কুণ্ডিত ক্রুর তলয়ার বেন বিজলী চমকাবে।

‘তোমর কি হয়েছে বল ত হ্যানোয়া, এই ঠাণ্ডার দিন সাত সকালে গিয়েছিল কোথায়?’

"ভাবলাম, বৃষ্টি একটু বেড়িয়ে এসে ভাল হবে", বলে ও সহধর্মিণী হাসি চোখের চোখ।

"পাত কই?"

"তা কি করে বলব?" স্বপ্নের বেগে জবাব এল।

বিষয়ে ও উৎসাহে কীতেন যুগ কালো করে পাড়িয়ে বইলেন। এমন সময় খুঁপ মনে গাছ" এল। হৃৎকেন্দ্রে মধ্যে এমন কিছু হয়েছিল, যার ফলে খেতে বসে কেউ একটা বা কাতল না।

পাঁচের পাদরী মিস্ত্রী বেকারিয়ে আজ হাতেও খাবার সময় এসেছিলেন। পাতকে কি একটা জরুরী কাজে ওর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। ও প্রথমে বাজী হয় নি; শেষ পর্যন্ত যেতে হল ওর আসপে।

১৪ই ডিসেম্বর।—জমিদারের অন্তর্য করেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি। ওর মাকেও এই কথাই বলতে শুনেলাম। বৈঠকখানার চুকতে বাড়ি, এমন সময় ওর কাতর কণ্ঠ ভেসে এল।

"পায়ছি না মা, অসহ, উঃ, আর আর কোর না।"

কীতেনের মোলায়েম গলা শুনেলাম, "না বাপ, তোর শরীরটা পাহাশ হয়েছিল কি না।"

"হ্যাঁ, মা গো, বেশ বৃষ্টি, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

আমি চলে এলাম। ঘরে গিয়ে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। ও অসুস্থ—বেশ গুরুতর কিছু তা' হলে। মনে হল বিরাট এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমার চার ধারে। না গো না, ভগবান! ও যেন মরে না। না না! ভগবান! রক্ষা কর ওকে। ওর শেষ পর্যন্ত অসুস্থ? উঃ, কানে বাজছে এখনো ওর আঁঠু ধর, "হ্যাঁ মা গো, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ভগবান অসুস্থ!"

দয়াময়, ভাল করে দাও ওকে, সারিয়ে তোলা। ও যেন আমার ছেলে না বাবা। বহুদূর হাট গেছে তাঁকে শরণ করলাম। উঠে পাঁড়লাম তারপর, বেশ শান্তি ও সাধনা নিয়ে। নীচের ঘরে গেলাম। কীতেন সোফার বসেছিলেন। ও তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। বড় ব্যাকুল, বড় বিপর লাগল কীতেনকে। সহস্র ভাবেই আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। নির্বাক আততায়ী চোখে মেলে ছানোয়া আমার দেখছিল। অপর এক মার্ঘ্য ওর চোখে। আমি প্রশ্ন করলাম। "এখনো কি মাথা ধরা আছে?"

"না, তবে বড় ক্লান্ত লাগছে; ঘরের কিছুই নয়।"

ওর মা উঠে গেলেন। বেশ বৃষ্টি, দারুণ কান্নার বেগে উনি এতক্ষণ সামলে ছিলেন। একটু বাদেই পাত" এসে জুটল। কোথার কোথার বুঝিল কে জানে! ও আমার বলল, "বাইরে দারুণ হাওয়া চলেছে।"

"মরতে তবে বেরিয়েছিল কেন?" বাঁকিয়ে উঠল ওর দাড়া।

"কারণ..." হেসে সলজ্জ উত্তর দিতে গিয়ে ও ঘেমে গেল।

ছানোয়ার এই উগ্র মেজাজের পরিচয় শেষে বড় হৃদয়িত হলাম। কাল বাড়ী বাব টিক করেছিলাম। কীতেন ছাড়লেন না বলে ১৭ই বাব কথা হল।

বাত দশটা নাগাদ, শুতে বাবার আগে জানলাটা খানিক খুলে দিলাম। বহু ঘরে দম-নিতে কষ্ট হচ্ছিল। শুনতে পেলাম জানলার টিক নীচে গুন্-গুন্ করে পাত" একটা 'ব'বো' গাইছে।

ঘিলিয়ে বাজছে। থেকে থেকে গলাটা বখন চক্রে, আবার ভেসে আসছে হাড়া-হাড়া কলি,—

"একটু শুষ্ক মজিকা... আর থিখ কেন  
লো চাখনি?"

জানিলা বহু করে বিলায়। ভগবান, সব অমঙ্গল থেকে আমাদের ঘরে বেধ।

২৭ জানুয়ারী, ১৮৬১। কি করে সিঁচি? কোন মুখে বলি? হায় রে! হায়! এ বা দেখলাম তার আগে আমার মরণ হল না কেন ভগবান? উঃ, কেন এর আগে মাটি হয়ে আমি ঘিলিয়ে গেলাম না? কত অভয়, কত বেমনায় অভিজ্ঞতা নিয়েই না মরণশুক লেখা আছে, "মৃতদের আমি আশীর্বাদ জানাই জীবিতদের চেয়ে বেশি।"—হে ভগবান, এ কী মরণশুক কাঁচিনী! আজ আমার লিখতে হচ্ছে। দয়াময়, পাশী আমবা, আমবা তেলিঙ্গ অসহায় ভেড়ার মত—কোন পথে জামি মা। কমা কর আমাদের, টেনে নাও আমাদের তোমার বিশাল বুকে। উঃ! জাহ্নবিতা! এত মনঃ, এত সান্নিধ্য, এত অমায়িক—কেন প্রাণে ও করতে পারল এই কাজ? মায়ের পেটের ভাই, নিজের ছোট ভাই, তাকে—উঃ, এর চেয়ে শত বার মৃত্যুও যে অধিক সহনীয়! দয়াময়, ওকে কমা কর। কমা করবে দয়াময়? অসীম ত তোমার কৃপা, অসুস্থ ও, দারুণ অসুস্থ! নিজের ইচ্ছানীল থাকলে একাজ ও কখনো করতে পারত না, তলক করে বলতে পারি। রোগের ঘোরেই এমন পাশ সম্ভব হল। ভাইকে বুক দিয়ে ও ভালবাসত, ভালবাসত প্রাণের অধিক, কোন গিন্নি তিরস্কার অবধি করেনি। দয়াময় বীণবুট্ট, কমা কর ওকে, উদ্ধার কর ওকে ওর পাশ থেকে, ওর সঙ্কট মুহূর্তে ও চায় সাধনা! সব খুশেই দেখা হোক।

পনেরোই ডিসেম্বরের কথা। ভোব পাঁচটার চাইৎ বন্ধকের আওতাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক লায়ে উঠে পাঁড়লাম। জানিলা খুললাম। সব চূপচাপ। প্রায় আধ ঘণ্টা পাড়িয়েই চটলাম। ফের শুতে বাড়ি, এমন সময় মনে হল একসঙ্গে কনকগুণে গলা শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বা হোক একটা গায়ে চাখিয়ে অস্তিত্ব ক্রত নেমে গেলাম সিঁচি বেয়ে। ভাল করে তখনো অন্ধকার কাটে নি। সুদীর্ঘ কবিরাজের আঘা আঁধারে মীতর করে দেখি, কাঁরা যেন পাড়িয়ে দেখানে। আমায় বেশে বড়ী দাইটা ছুটে এল।

"মাদোয়াজেল, এ কি হল? হায় মা! বাঁচাও ওকে পুলিশের হাত থেকে!" ও ডুকরে উঠল।

চোখে পড়ল ছুটি পুলিশের মাঝখানে জমিদার। হাতে কড়া, অস্ত্রের ভয়ঙ্কর আঘা কাছ থেকে এলেন।

"এ সব কি হচ্ছে কি?" ভৎসনার সুরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "বাঁকে বন্দী করেছেন, তিনি গৃহহরণের জমিদার, তা জানেন?"

আমার গলা শুনে জমিদার কিরে তাকাল। অকিসারটি উত্তর দিতে বাজিলেন, আমি বাধা দিলাম, "নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও ভুল আছে, আর সে ভুলের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য আপনায় প্রস্তুত থাকুন।"

[ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

২

তার পরদিন বোম্বার। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হোলো সারাটা দিন। বড়ো বেশী নিস্তরঙ্গ মনে হোলো শনিবার সন্ধ্যার কোলাহলের পর।

সকালের সিক মনেই ছিলো না। হুপূরে খাওয়া-পাওয়ার পর কী করবো ভাবছি, চঠাং বেচার কথা মনে পড়লো। বেবা—বেবা চৌধুরী, সুবিমল ভট্টাচার্য্যের বৌয়ের মামাতো বোন, যার সঙ্গে কাল সিনেমা দেখার কথা ছিলো।

তাই তো! অত্যন্ত অস্তর হয়ে গেছে। সকালেই হাতড়া উঠিত ছিলো।

সিনেমার হলে বসি দেখা যার, বই আরও হবার পরও প্রত্যাশিত ব্যক্তিটি এলো না, খালি বইলো তার চেয়ার—তা'হলে একটু দুর্ভাবনা হয় তার জন্যে, পথে কোথাও গাড়িচাপা পড়লো, না কি ঠাণ্ডা ভাঙলো ভাড়াহাড়ে করে সিঁড়ি ধরে নামবার সময়। কিন্তু বসি দেখা যার তার সীটে এসে বসলো আরেক জন অপরিচিত কেউ, যে আপনার অল্পসন্ধানের উত্তরে জানালো যে, টিকিটখানি সে কাউটারের সামনেই আরেক জনের কাছ থেকে কিনেছে, যার বর্ণনা মিলে যার আপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তিটির সঙ্গে, তখন তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করার কোনো কারণ থাকে না। আর সিনেমা দেখার আনন্দটুকু হারিয়ে যায়।

সুতরাং সুবিমল, তার বোঁ আর বেবা যে আমার অল্পপরিচিত যুব কৃতি করে সিনেমা দেখেছে, সে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

তাই আমার হাওয়া উঠিত ছিলো সকাল বেলা। গিয়ে বোম্বারনোর ফ্রেটা করা উঠিত ছিলো যে, আমার বন্ধু দিলীপ দুখাজীর অবিস্মরণীয়তার কলেই গোলমালটা হয়েছে।

সুবিমলের বাড়ি ছুটলাম তৎক্ষণি। গিয়ে দেখি, ওরা সাজসোজ করে বেরোচ্ছে।

সুবিমল বললো, “তুমি আসবে না, আগে বললেই হতো। অল্প কাউকে ভেদে নিয়ে যেতাম। টিকিটটা বেচে দেওয়ার দরকার ছিলো না।”

দিলীপের কথা বললাম তাকে। বিশদ ভাবে বর্ণনা করলাম,

সে কেমন করে আমার কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটি আরেক জনকে বেচে গিয়ে আমার ট্যাঙ্কতে তুলে একেবারে চায়না টাউনে নিয়ে গেল।

সুবিমল কোনো উত্তর দিলো না। হুখ দেখে বেশ বোঝা গেল যে, সে বিশ্বাস করলো না একটি কথাও। সে দিলীপকে চেনে না। সুতরাং তার বিশ্বাস করার কোনো কারণও নেই।

সুবিমলের বোঁ মল্লিকা শুকনো হাসি হেসে বললো, “তা'হলে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন? চীনে মেয়ে, বার্মিজ মেয়ে, এগুলো ইণ্ডিয়ান, এদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে না এসে নিচরই ভালো কাজ করেছেন? আমরা আটপোরে সেকেন্দে হাছব, আমাদের সঙ্গে চূপচাপ বসে সিনেমা দেখে আর বাড়ি ফেরার হুখে কোনো রেষ্টারীর একটুখানি চা খেয়ে কি আপনি আর সেই বৈচিত্র্য পেতেন বা কাল চায়না টাউনে পেরেছেন? আপনি অতো কুণীভ হবেন না—রজন বাবু, আমরা কিছু মনে করিনি।”

বুঝলাম, এ অভিমানের কথা।

“না, না, বৈচিত্র্য কিছুই নয়, আমার একটুও ভালো লাগেনি,” আমি বলি উঠলাম, “কিন্তু দিলীপটার পাজার পড়ে”—

“ঠিক আছে রজন,” সুবিমল বললো, “আমরা কিছু মনে করিনি। তবে টিকিটটা হলের দরজার এসে বেচে দেওয়ার কষ্টটুকু না করলেই পারতেন।”

বেবা একদম কোনো কথা বলে নি। সে হঠাৎ তড়িৎ দিয়ে বললো, “চলো, সুবিমল বাঁ, বাজো দেবী হয়ে বাছো।”

আমি বললাম, “বহি তোমাদের অল্প কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম না থাকে, তা হলে চলো সবাই মিলে একটি সিনেমা দেখে আসি কোথাও। আমি তোমাদের নিয়ে সিনেমার বাবো বলছি এসেছি।”

সুবিমল আর মল্লিকা কোনো উত্তর দিলো না। বেবা উত্তর দিলো, “আমরা সিনেমা দেখতেই বাছি। আমি তো টিকিট করে এনেছি সকাল বেলা। আপনি আসবেন তা তো জানতাম না, জানলে আপনার জন্তেও একটি করে আনতাম।”

সুবিমল আর মল্লিকা একটু হাসলো।

ওরা চলে গেল ওদের সম্ভব সিনেমা-হলের বিকে।

আমি একা-একা চলে এলাম চৌরসিকে, লাইট হাউসে এসে একটা টিকিট কিনে একলা বসে একটা সিনেমা দেখলাম, উপভোগ করলাম না একটুও, তারপর সিনেমা শেষ হতে লাইট হাউসে বাহ-এ চূপ করে বসে রইলাম এক গ্রাস অবের নিয়ে।

"চায়না টাউনে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন,"—মল্লিকার কথাগুলো কানে এসে আমার মনে।

হাসি পেলো একটুখানি।—ভালো? না, একটুও নয়। বেবার পাশে বসে চূপচাপ সিনেমা দেখা অনেক ভালো। দিলীপের বন্ধু সবারই কি রকম বেন, বেশ হৈ হৈ করে, গল্পও করলো, কিন্তু তারই মাঝে বেন উঁকি মাঝিছিলো একটু ঠোঁট, একটু মন-কবাকবি, একটা চাপা বিরোধ এর ওপর তার মধ্যে। মনে হয়েছিলো বেন আরো অনেক কিছু ভেতরের ব্যাপার আছে বা আমি জানি না। একটু ভালো লাগছিলো না ওদের মধ্যে।

মনে পড়লো, দিলীপ বলছিলো তৎ-আংছু'র উপনিবেশের গল্প, কে-সং-তাও আর জু-শা'র করুণ রোমান্সের কাহিনী।

গল্প বন্ধ শেষ হলো পর্যানি তখন নিভক। ঘুম থেকে পুরোনো প্রোমোফোনে ভেসে আসছে টানে অপেরার গান। আমার মনে ভাসছিলো গভীর পাড়ের আংছু'র সমাধির একখানি মনগড়া ছবি।

হঠাৎ কানে এলো কে-সং-তা-এর গায়, "আজ-রাত্তিরে আমার সবারই কি করছি? আমাদের প্রোগ্রাম কি?"

হেনরি লরেন্স উত্তর দিলো, "ঠিক করে কি করা যায়, আমি যে কোনো কিছুতেই রাজী।"

"কিছু থাকারের অর্ডার লাও, দিলীপ বললো, "আমি এক বোতল হইকি ট্যাও করছি। আর এখানে বসেই গল্পগল্প করা বাবে।"

"না, না, এখানে নয়, বেরোনা বাক," বললো বৌগিলের সি।

"কোথায় বাবে?" জিজ্ঞেস করলো হাসিম সুলেমান।

"অর্ডারলাস ক্লাবে বাবে?"

"না।"

"প্রিন্সেস্‌এ গিরে ক্যাবারে দেখবে?"

"না। না। ও সব নয়। আমরা নিজেরা মিলে হৈ-হৈ করবো।"

দু-একজন অজ্ঞ কয়েকটা মতলব দিলো। কেউ রাজী হোলো না।

তখন ওরা স্রু-চাং বললো, "চলো সবাই মিলে বাই গোল্ডেন স্লিপার'এ।"

"তার আগে কোথাও খেয়ে নিতে হবে," মনে করিয়ে দিলো জি-লিং।

"এখানেই কোথাও খেয়ে নেবো," বললো জরপ্রকাশ ত্রিবেদী, "আমরা চানে থাকার খর ভালো লাগে।"

"তা হলে তোমরা আজ রাতে বেরোবেই।" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। কেন, তোমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না?" কালো চিনে-চাং।

"না, তা নয়। তাহলে আমার আবার বাড়ি কিসে পোষাক বসে আসতে হয়।"

"বেশ তো," উত্তর দিলো কে-সং-তা, "আমরা সবাই আগে



নিয়মিত

নিষ

ব্যবহার করুন!

বাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেষ্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সম্মিলিত তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চল ও স্বরভিত করে।

অগ্ৰাচ্চ টুথ পেষ্ট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী সমন্বিত নিম টুথ পেষ্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।



দ্রি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২০

১/৫৫-৫৬



থেকে নি' কোথাও। তারপর আর্মার চলে বাই পোস্টেন স্লিপার'এ, তুমি বাড়ি ফিরে জামা কাপড় বদলে সেখানে এসে বোস দিও আমাদের সঙ্গে।

"রজন কি করবে?" দিলীপ ফিরে তাকালো আমার দিকে।

"আমি এখন থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো," আমি উত্তর দিলাম।

"বাড়ি কিরবে? শনিবার সন্ধ্যাবেলা?" চিরেন-চাং তার ছোটো ছোটো চোখ দুটো বসন্তাটা সম্ভব আরত করে জিজ্ঞেস করলো।

টিং-লিং একটু হেসে বললো, "আমাদের সঙ্গ বোধ হয় ওর ভালো লাগতে না।"

"না, না, তা' নয়," আমি একটু বিরত বোধ করলাম, "আমি তো বাড়িতে ব'লে আছি—"

"বলে আসোনি?" বোগীলার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, "বাড়িতে আবার বলে আসতে হয় না কি? ইয়াং ম্যান, ব্যাটেলার মানুষ, বসন্তা রাত করে খুশি বাড়ি কিরবে।"

"না, আমার বাড়ি কিরতে হবে।"

"যদি পোশাক বদলাতে বাড়ি কিরতে চান, আমি বলি কি তার দরকার নেই," হুং-চাং বললো, "আপনারা শুধু দরকার একটি টাই। সে না হয় আমি দিচ্ছি—"

"এখন বাড়ি কিরবেন কেন?" মিনি ওয়াং বললো, "আগে থেকে নিই কোথাও, তারপর সত্যিই যদি বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ পোস্টেন স্লিপার'এ বসে না' হয় একটু সকাল করে উঠে পড়বেন।"

"সেখান, আপনারা সবাই বন্ধু। আমি বাইরের লোক, আজ প্রথম এসেছি—"

"ও, এই?" বললো কে-চে-শিয়াং।—তারপর সবাই হাসি।

"রজন কি বলছে শোনো। সে একজন বাইরের লোক।

হাঃ হাঃ হাঃ—"

"মিষ্টার ওয়াং, আমি শুধু বলছিলাম—"

"না, না, মিষ্টার ওয়াং নয়, আমার বন্ধুরা আমার হুং-চাং বলে ডাকে।"

"আমার বন্ধুরা আমার ডাকে চে-শিয়াং—"

"—আমার বোগীলার।"

"—আমার হাল্পিম।"

"আমার টিং-লিং—"

"আমার তুমি জরপ্রকাশ বলবে।"

"আমি সবাই কাকে মিনি।"

"এ্যাও, অব' কোস', আমি চিরেন-চাং—"

"আর তোমার নাম, যদি আমরা ভুল না শুনে থাকি, নিশ্চয়ই রজন। নাও, রজন ডার্লিং, কি বলতে চাও বলো।"

আমি একটু চুপ করে রইলাম। বেশ ভালো লাগলো। তারপর আন্তে আন্তে বললাম, "বলছিলাম, একটি টাই দরকার। নীল রঙের উপর একটা কিছু, যা এই হুটের সঙ্গে যায়।"

সবাই মনে মনে টেবিল চাপড়ালো।

হুং-চাং বললো "এসো আমার সঙ্গে। তোমার পছন্দ মতো বেছে দেবে।"

"ইতিমধ্যে আমরা কি করছি," জিজ্ঞেস করলো জরপ্রকাশ।

"জেনী আর ওর বন্ধুদের জন্তে অপেক্ষা করছি। তাদের কেউ নিশ্চয়ই বাবো না," বললো টিং-লিং।

"ওদের একত্বপন এসে পড়া উচিত," দিলীপ খড়িয় দিকে তাকালো, শোনে আটটা এখন।"

"এসো রজন, হুং-চাং আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আমি চেয়ার পেছনে ঠেসে উঠে ঝাঁড়লাম। কিন্তু বাওয়া হলো না। ছুতোয় লক্ষ এলো বাইরে থেকে। সবাই দরজার দিকে ফিরে তাকালো।

দরজা ঠেসে ঘরে ঢুকলো একটা মেয়ে। চৈনিক মুখাঙ্গী, নিটোল শরীর, পরনে পাশ্চাত্য পোশাক, বড়ো বড়ো লাল কালো গোল গোল ফুটকি-কেওয়া চাক্রা হলধরে সূতির গাউন। তার পেছনে পেছনে এক জন জামলা বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আর একটা বামিজ মেয়ে। বামিজ মেয়েটির পায়ে ভেলভেটের ফান, পরনে সোনালী জড়ির কাঁচ করা নীল সিল্কের 'সোনিজি', গায়ে শুভ্র অরগান্ডির 'এন্জি'। তাদের সঙ্গে আরেকটি ছেলে, তিরিশের কাছাকাছি বয়স, হাফা বাবামী স্ট্রেট বেশ টিপটপ সেখতে।

"এই যে এসো, তোমাদের জন্তে বসে আছি," বললো দিলীপ।

"আমরা একটি চমৎকার প্রোগ্রাম টিক করে নিয়েছি। সবাই বাড়ি পোস্টেন স্লিপার'এ," বললো য়েং চে-শিয়াং।

"ঝাঁড়াও এর সঙ্গে জালাপ করিয়ে দিই," বললো ওয়াং হুং-চাং,

"এ আমাদের নতুন বন্ধু রজন।—এ আমার বোন জেনী, আর এ জেনীর বন্ধু ম্যাবেল,—আমাদের আরেক জন বন্ধু মজ-জি,—ওর বোন মা-শিন-টি।"

ওদের কিন্তু গজীর মনে হলো একটুখানি।

জেনী বললো, "তোমরা যদি প্রোগ্রাম করে থাকো, ভালোই। তবে আমাকে বাদ দাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমার মন ভালো নেই। আমি আজ আর বেরাবো না।"

"কেন? কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো জেনীর বোন মিনি ওয়াং।

"খারাপ খবর আছে।"

"কি?"

"আহ-কিমকে একলা পেয়ে ওরা খুব মার দিয়েছে।"

ওয়াং—আমি ভাবলাম—ওয়াং কারা? সেখলাম, সবাই হঠাৎ চুপ মেয়ে গেল। টিং-লিং নিবিকার, কিন্তু ঝাঁকা বিরূপের হাসি ফুটে উঠলো কে-চে-শিয়াং-এর মুখে।

বললো, "আহ-কিম কয়ানিট। ওরা মাঝে মাঝে এক-আধটু মারখোর খায়। আমি কয়ানিট নই। আমি জীবন উপভোগ করতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আমার প্রোগ্রাম বাতিল করবো না।"

মিনি ওয়াং তাকালো কে-চে-শিয়াং-এর দিকে। একটুখানি বিহ্বল বলসে উঠলো সেই চেয়ে।

"কাম, কাম, এখানে কোনো পলিটিক নয়," একটু বেন ব্যাং হয়ে উঠলো ওয়াং হুং-চাং, "আহ-কিম" এর খবর তোমায় কে দিলো, জেনী?"

"লাই-সাও" এর সঙ্গে রাজ্যের দেখা হলো। সেই বললো।

"ম, খুব বেশী লক্ষ্য হয়েছে?"



“দাই-সাত বলসে মাথা কেটে গেছে। আর মুকেও লেগেছে খুব। দাই-কো এখানে নেই। তাই দাই-সাত নিজেই ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলো।”

“আহ-তং এখানে নেই? কোথায় গেছে?”

“ও গ্যাছে ট্যাংরা। কাল সকালে ফিরবার কথা। আমি ভারিই আমি নিজেই ট্যাংরার গিমে ওকে খবর দেবো।”

“তুমি একা বাবে?” দিলীপ বললো, “চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।”

ওরা স্ত্র-চাং একটু ভাকিয়ে দেখলো দিলীপের দিকে। একটু বেন বিক্রম সেই চাউনী। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, “জেনীও কোথাও না বাওয়াই ভালো। আমি বং কুয়া-কান্কে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

“না, আমি নিজেই যাবো, জেনী উত্তর দিলো, “চলো দিলীপ।”

“তোমরা এখন ট্যাংরা যাচ্ছে,” মিনি ওরাং জিজ্ঞেস করলো।

“না, আগে একবার দাই-কো’র বাড়ি যাচ্ছি। আহ-কিমকে একবার দেখে আসি।”

“চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে,” মিনি বললো।

“তুমিও ট্যাংরার বাবে?” চিয়েন চাং জিজ্ঞেস করলো।

“না, আমি যাবো শুধু দাই-কো’র ওখানে।”

“চলো, দেরী করে লাভ নেই,” জেনী বললো। “গাড়াও একটু দিলীপ বললো, “রজন, একটু শোন।” আমাকে ডেকে বাইরে নিয়ে পেল সে। “ওরে দশটা টাকা হয়ে তোয় কাছে? নে তো। কাল সকালে গিয়ে তোকে দিয়ে আসবো।”

“কি হয়েছে দিলীপ দা?”

“সে অনেক ব্যাপার। তুই বুঝবি না। আহ-তং এর তাই আহ-কিমকে ওদের বিপাকসলের লোকেরা মেরেছে। ওরা ওরা পরিবারের খুব বড়। ওদের জানাশোনা প্রায় তিন চার পুরুষের। তাই জেনী মিনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।”

“দাই-কো দাই-সাতও এরা কারা?”

“ও,” হাসলো দিলীপ, “আহ-তং কে এরা বড়ো ভায়ের মত মানে, তাই ওকে ডাকে দাই-কো, মানে বড়ল। আর ওর বোকে ডাকে দাই-সাত, অর্থাৎ বড় বৌদি। আমার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। তুই অভদ্রের সঙ্গে পোক্তেন সিপারে বা।”

“না, আমি এখানে থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো।” জেনী ওরাং, মিনি ওরাং আর দিলীপ চল পেল।

কে-চে-শিয়াং বললো, “আমরা আর এখানে বসে থেকে কি করবো। চলো বেকিয়ে পড়ি।”

হাশিম উত্তর দিলো, “আমার কিন্তু মাপ করতে হবে। আমার এইমাত্র মনে পড়লো যে আমি অরেক জনকে কথা দিয়েছিলাম তার ওখানে গিয়ে ডিমার খাবো।”

“তোমার বা অভিকটি,” বললো স্ত্র-চাং, “এসো রজন, তোমার টাই বেছে নেবো।”

“আমার সঙ্গে হয় না আমার আর টাই লরকার হব,” আমি বললাম।

তোমারও কি মনে পড়লো না কি তুমি কারো

সঙ্গে ডিমার খাবে বলে কথা গিয়েছে।” জিজ্ঞেস করলো কে-চে-শিয়াং।

আমার কান একটু লাল হয়ে উঠলো। তবু হেসে বললাম, “না, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।”

“বেশ, আমরা জোর করবো না,” হাত বাড়িয়ে দিলো স্ত্র-চাং, “আজ তোমার নিশ্চয়ই মিস্ করবো, তবে আশা করি তুমি শীগগিরই একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।”

হাশিমের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে হাশিম বললো, “লেখ, ওদের এডামোর জন্তে আমি অভয় ডিমার খাওয়ার কথাটা বললাম। চলো, তুমি আর আমি মিলে কোথাও বসে পরটা কাটাব খেয়ে নিই।”

“না,” আমি উত্তর দিলাম, “আমার শরীরটা সত্যিই ভালো নেই।”

হাশিমের সঙ্গে একটু শটকাট করে বেরিয়ে এসে পড়লাম বেকি স্ট্রীটে।

লাইট-হাউস বার’এ বসে অরেক’এর গেলোসে চুষক মিতে দিতে এসব কথাই ভাবছিলুম। আশ্চর্য সব বন্ধু দিলীপের, এক মিনিটের মধ্যেই সবাই সবার বন্ধু, প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকছে, তারপর আচমকা কী বেন হয়ে গেল, এ ওর দিকে ধারালো চাউনী হানলো, একজন গভীর হয়ে গেল, আরেক

জন কক হয়ে উঠলো, অত একজন মধ্যে ডিনারের দাব করে সরে পড়লো, অত সবাই চুপ করে বইলো।

মরিকা বসি জানতো, সে কি বলতো, 'চারনা টাউনে কাল সন্ধ্যা আপনাদের ভালোই কেটেছে বসুন।'

না, একটুও ভালো কাটেনি। তার চাইতে বেবা চৌধুরীর পাশে কস সিনেমা দেখাটা অনেক সুখের।

বেবা! বেশ মিষ্টি মেয়েটি। আলাপ হয়েছিলো সুবিমলের বাড়িতেই। মরিকাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো,—রজন বাবু, এ আমার মামাতো বোন, বেবা। বেবা চা করে আনলো, গান গেয়ে শোনালো। হট্টলে থাকতো সে।

সন্ধ্যা হয়ে আসতে তাকে হট্টলে পৌঁছে দিতে হোলো আমার—কারণ সুবিমল বললো, তার কি একটা কাম আছে, সে বেবোকে পাঠাবে না।

ট্রীয়ে পাশাপাশি বসে ওকে হট্টলে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। পাশাপাশি বসে নানারকম গল্প—সিনেমার, সাহিত্যের, বিশ্বাসানীতির, কলেজের মেয়েদের, ছেলের।

তারপর আরেক দিন সুবিমলের বাড়ি নেমস্কর। এলোমেলো গল্প। ফুরাতে চার না। একঘেরে লাগে না। ভালো লাগে, নতুন মনে হয়, এলো চুল থেকে মিষ্টি ভেলের গন্ধ ভেসে আসে, কাজল চোখের চাউনি ভালোপাড় কাব ভোলেন মনকে।

কাল সিনেমার শুদ্ধতার পাশে বসে হয়তো একটু কীধে কীধে ঠেকতো, হয়তো হাতে চাত রাখতো সে, দিলিকে, ভামাইবাবুকে লুকিয়ে। ওরা টের পেতো হয়তো, টের পেরেও টের না পাওয়ার ভাণ করতো। হয়তো আক বিকলে বেবাকে একলা নিয়েই যেহোনো বেতো, হয়তো 'একলা বস বেতো কোনো নিরাপা বেতারা।'

হয়তো আক কোনো কথা আসতো না কারো মুখে। হয়তো হুজনেই আনমনা।

"কী এত ভাবছেন," সে চরশো একবার জিজ্ঞেস করতো।

ভনতো আমি বলছি, "তোমার কথাই ভাবছি বেবা।"

একটু লাল হয়ে উঠতো সে। চোখ নিচু করতো।

আমি হয়তো একটু তেরে নিতাম, আঙে আঙে বলতাম, "আজ্ঞা বেবা, আমি বসি আক তোমার বলি—

"না, না, বলবেন না," কেঁপে উঠতো রেবার গলা, "এখন না, আরো কিছু দিন থাক।"

আর হয়তো দিলীপ? এরকম একটি সন্ধ্যারনার সূত্রপাশেই আমার সিনেমার টিকিটখানি আচমকা খেঁচ দিলে আরেক জনকে। আর আমি বেন আরেকটি সিনেমা দেখে এলাম চারনা টাউনে, যা দমলে রাখা হয়ে বার।

আর ওদের ভার্য্য মাগাছি না, মনে মনে ভাবলাম। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

"হালো রজন।"

গলা শুনে চমকে উঠলাম। খুব চেনা গলা।

বৌদীকার সি এসে একটি চেয়ার টেনে বসলো। "ভূমি এখানে একা বসে আছে? ভালোই হোলো। বসে গল্প করা ভালো। ভাবছিলাম একলা বসে কি করবে। খিদে পাচ্ছে।

পাবে না? কেন? কি পাবে? আজ্ঞা আর একটা, অনেক খাও। বেরা—"

তারপর বললো, "কাল ভূমি চলে এসে ভালোই করেছো। এমন কিছু জন্মলো না। দিলীপ তো জেনী আর মিমিকে নিয়ে চলে গেল। তারপর বেশি হেনরিরও আর উৎসাহ নেই। সে চার মামিন-সিক নিয়ে বেবোকে। নতুন প্রেমে পড়েছে। খুব স্বাভাবিক। আমরা কিছু বললাম না। সে, মামিন-চি, ম-জ-জি আর ম্যাথেল বেরিয়ে গেল। ম্যাথেলের সঙ্গেও বেশ ভাল হোয়েছে ম-জ-জির। তখন চে-শিয়ার বললে সে প্রিন্সেস-এ গিয়ে ক্যাথারে দেখবে। তৎ-চা তার সঙ্গে বেতে চাইলো, কারণ চে-শিয়ার এর বোন হু-চা-কে তার খুব চোপে লেগেছে। চিরেন-চাং-বললে সে আর কোথাও বারে না, মেট্রোতে গিয়ে একটি সিনেমা দেখবে। তখন আমি আর জরপ্রকাশ কি করি? কারনানি থেকে ছুঁজন চেনা মেয়েকে শিক-আপ করে জিইলে গিয়ে বসলাম। বুঝলে রজন, শনিবার রাতিবে ট্রাং-পাটি আমার বরলাভ হয় না। হোববারটা আমি একা-একা চুপচাপ কাটাই। বাই বসো, কলকাতার লাইক নেই। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এ দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে গিয়ে সেটেল ডাউন করতে।"

বৌদীকার সি-এর আলোচনার বহল আমার ভালো লাগলো না। প্রথম পরিবর্তন করবার ভাজে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ্ঞা, ওই আহ-কিম লোভটি কে?"

"আহ-কিম?" বৌদীকার বিস্ময়ের খেলাসে চুপক দিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আহ-কিম যে টুইট্রিট একটি লতি গালায়। তাহাড়া আরো অভ্যস্ত কি সব করে। ঠিক জানি না। তবে ওদের কি একটা এসোসিয়েশন আছে। একটা কান্ডার বার করে ওরা। কেউ কেউ বলে আহ-কিম নাকি কলু-নি। হাতে পাবে। আমি মাথা ঘামাই না। হু কেবাল? পলিটিক্সের আমার একটুও ইন্টারেস্ট নেই। আমি বিজনেস কর, আমার যে টাকা দরকার, সেটা খেটে বোজগার করি, আরো বেশী বোজগার করবো বলে আশা করি, খাই খাই কৃতি করি। আহ-কিমকে আমি তেমন ভালো করে চিনি না। আমি চিনি ওর বড়ো ভাই আহ-কিংকে।

"কে এট আহ-কিং?"

"আহ-কিং জুতা-দরাল, ওর একটি জুতার লোকান আছে চিপুং বোডে। আমি তো জুতার ওর্ডার সপ্লাই করি। তাই ওর কাছ থেকে জুতা কিনতে হয় আমাকে। চমৎকার লোক। খুব সস্তার জুতা দেয়। এই যে জুতা-তোড়া পরে আমি, এর দাম কত? বলো তো?"

"স—সাতশ টাকা?"

"সাতশ হতেছে? আমি বৌদীকার সি পরতো সাতশ টাকা নামের সস্তা জুতা? আমি ঠিক সেট জুতা পরবো বার বার পরতালিগ টাকা বললে লোক একটুও অবিশ্বাস করবে না, অথ-যে জুতা আহ-কিং আমার বোলো টাকা দিয়ে করে দেবে। ভূমি যে জুতা পরে আছে, সেটা 'আহ-কিম' এর কাছে পাওয়া পাবে আটশ টাকার। এসো আমার সঙ্গে একদিন। আমি দশ টাকার মধ্যে তোমার খুব ভালো জুতা কিনিয়ে দেবো। তবে আহ-কিংকে করতে পারবে না।"

আমি একটু হাসলাম। তারপর বললাম, “জানো, বৌসীন্দার তোমার চাইনিজ বন্ধুতা খুব আশ্চর্যসিদ্ধি, বলে মনে হোলো। আমার কিছু চায়না টাউনের চীনেদের সম্বন্ধে অল্প বকম ধারণা ছিলো।”

বৌসীন্দার উত্তর দিলো, “চায়না টাউনে একদিন সন্ধ্যা কাটিয়ে ওদের সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারবো না বন্ধন। চেং-শিরাং জি-লিং-এর মতন কিছু জ্যামিনিসাইজড, চীনে আছে বটে, কিন্তু সে খুব কম। প্রায় সব চীনাট চীন দেশের চীনাদেশে মতো, সে কলকাতার তোক, সানফ্রান্সিসকোতে তোক, হেন্সেনে তোক, সিঙ্গাপুরে তোক—ওরা একটুও বলায় না। কিছু কিছু আছে জেনো, মিনি, চিয়েন চ্যাং, আং-কিম-এসের মতো, অল্প ভাতের বন্ধু সম্বন্ধে বেশ, স্নাট পুরে, ক্রক-পাউন পুরে, টিভেজি বলে, নাচে,—কিন্তু ওরাও মনে মনে খাঁটি চীনাট। এই দেখ না, আং-কিম-এর মাথা কাটলো। সে কথা তনে জেনো, মিনি এরা এলো আমাদের সঙ্গে।”

“ভাড়া, স্নাং-চ্যাং লোকটি কি বকম?”

“কেন?”

“বাটরে ও-বকম একটা মোরা ছোটো রেস্তোরাঁ, ভেতরে এত কিছুকাটা, ভরমালো?”

“তুমি বুড়ো ওয়াকে দেখেছো?”

“না।”

একটু ভাবলো বৌসীন্দার। তার পর বললো, “দেখ, আমি ওদের সম্বন্ধে বেশ কিছু জানি না। জানতে চাইও না। আমরা চৈ-চৈ করে কুতি করে বেড়াই, বাস, ওট পবন্ত। ভেতরে ভেতরে কে কি করে, কে কি বকম লোক, কে মাথা ঘামার? দিলীপকে জিজ্ঞেস করো, সে বলতে পারবে। সে ওদের খুব অন্তরঙ্গ, অনেক কথাই জানে।”

“অন্তরঙ্গ?”

“হ্যাঁ। তুমি জানো না? সে জেনো ওয়াকে বিয়ে করতে চায়।”

“এ্যা?”—আমার চোখ কপালে উঠলো।

বৌসীন্দার হাসলো। বললো, “দেখ, আমি যদি তুমি হতাম, আমি দিলীপের সঙ্গে চায়না টাউনে যেতাম না। স্নাং-চ্যাং দিলীপকে খুব পছন্দ করে না, সে চায় না যে সে জেনোর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হোক। আর স্নাং-চ্যাং-এর সঙ্গে মনোমালিন্য থাকটা খুব নিরাপদ নয়। আর দেখ, দিলীপ তোমার ওখানে কেন নিঃশেষে গেছে জানি না। যদি তোমার সঙ্গে মিনির ভাব করিয়ে দিতে চায়, আমি বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি এড়িয়ে চলবে। কাল তোমার গিরে উপস্থিত হওয়াটা চেং-শিরাং-এর খুব ভালো লাগে নি। সে অল্প কারো সঙ্গে মিনির ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ভালো চোখে দেখে না। আর চেং-শিরাং-এর মতো লোকের কাছ থেকে এক হাইল তকাত থাকটাই হোলো।

বুড়িমানের কাছ। তবে হ্যাঁ, এরা ভো খুব ভর, ভোমাকে পছন্দ না করাটাও এরা খুব জরাজীর্ণ করবে।”

“মানে?”

“মানে, এই বধো কেউ যদি তোমার ছুরি হাতে চায়, তাও খুব ভর ভাবে মারবে।”

আমি বললাম, “দেখ বৌসীন্দার, আমি ওদের মধ্যে আর যাচ্ছিও না। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানবার আমার আশ্রয় নেই। এবার অল্প কিছু আলোচনা করা যাক।”

বৌসীন্দার হাসলো, “না, ভাট বন্ধন, চীনাটা এমন লোক ভালো। সবাই চেং-শিরাং নয়। তোমরা ডিটে-কটিভ গল্প বে ছবি পাও চায়না টাউনের, আসল চায়না টাউন কিছু তা নয়। বৌসীর ভাগ লোকট সাধারণ অসভ্য লোক, খাটে, রেস্তোপার করে, খাট-দার, বিয়ে করে, সম্ভ্রান-সম্ভ্রতি উৎসাহন করে, বোভকাব করে আর খাটে, খাটে আর বোভকাব করে। বাস। এক সময় তো বেশ ছিলো এরা। চীন-জাপানের যুদ্ধের সময় কোনো গোলমাল ছিলো না এদের মধ্যে। এখন, সম্ভ্রতি যে অন্তর্নিহিত চলে, তার দরুন এখানে এসে মতো খুব গোলমাল। কি জানি, আমি ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝি না। আমরা ওদের সঙ্গে কতটুকুই বা মিশ, কতটুকুই বা জানি?”

“হ্যাঁ, যা জানি তা শুধু মনগড়া ডিটে-কটিভ গল্প থেকে।”

গেলোমে আরেক চুক দিবে বৌসীন্দার বললো, “তাও যে খুব ভাল, তা নয়। ডাকাত, খুন, হাগলার সে সবও আছে। জুয়ার আচ্ছা আড্ডা প্রাঞ্চল আড্ডা, ওপিয়াম ডেন আছে। আমি কিছু কিছু দেখেছি। তুমি দেখতে চাও?”

“না।”—আমি উত্তর দিলাম।

“যদি কোনো কিছু দেখতে চাও, তোমার বন্ধু দিলীপকে বোলো, সে চায়না টাউনকে আমাদের চাইতেও ভালো চেনে। সব একবার ঘুরে-ফিরে দেখতে পারো। মন্দ লাগবে না। তুমি তো আশ্চর্য লোক তে। আমি সাংখি তোমার দেখতে, তুমি রাজী নও। অল্পটো অনেকই শুনে লোকের ওঠে জানো? তবে হ্যাঁ। ওয়াম হাজ টু বি কেয়ারফুল। একবার আমার এক বন্ধু বা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।” বলতে বলতে হেসে উঠল বৌসীন্দার।

হাসলো, খুব হাসলো সে। পানের টেবিলে আইসক্রীম খাচ্ছিলো একটা বাচ্চা ছেলে, চমকে উঠে ফিরে তাকালো।

বৌসীন্দার বললো, “সেও একজন বাচ্চা।

পূরো নাম বললো না। এটুকু জেনে রাখো যে, সে কলকাতার কোনো এক খবরের কাগজের সাব-এডিটর। তনবে তার গল্প?”

আমি একটু সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

বৌসীন্দার সি-ব্রক করলো তার বাতালী বন্ধু সাব-এডিটর সাহিত্যের চায়না টাউনের অভিজ্ঞতার গল্প। [কথন:]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বঙ্গমতীর উল্লেখ করবেন]



## মন্ত্রাধারে 'ট্রিপিক্যাল ফিশ'

'ট্রিপিক্যাল ফিশ' বা ট্রিপিক্যাল মাছ বলতে সাধারণতঃ গরম দেশের মাছকে বুঝায়। কিন্তু আসলে এই মাছ দেশ-বিশেষের মাছ। এগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য—এরা বড়-বেয়তের হয় এবং আকারে খুব বড় হয় না। আঙ্গকাল অনেক গৃহে মন্ত্রাধার বা 'একুইরিয়াম' এদের রেখে সংরক্ষণে রাখা হয়। এখানে মাছদের রকমারি 'হবি' বা সৌধিনতার ভেতর এইটিও নিঃসন্দেহে একটি।

নবীর জলেই 'ট্রিপিক্যাল' মাছের সন্ধান পাওয়া যায় বেশীরকম। তবে সবুজের 'লবণাক্ত' জলেও যে এ প্রকার মাছ দেখা যায় না, এমন নহে। মার্কিন দেশের নদী ও দরিয়াগুলোতে বিচিরারপের 'ট্রিপিক্যাল' মাছ রয়েছে এবং সে সব মাছ যে কোন দেশের মন্ত্রা কিসার কাছেই অতি আদরীয়। মহাচীন, জাপান, ইষ্ট ইন্ডিজ—এসকল দেশের জলেও 'ট্রিপিক্যাল ফিশ' জন্মে থাকে প্রচুর। এই সময়েই নীর করতে হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রোতস্থতা-গুলোরও—যেখানে খোঁজ করলেই দেখতে পাওয়া যায় কত রকমারি 'ট্রিপিক্যাল' মাছ।

'একুইরিয়াম' বা বৈজ্ঞানিক মন্ত্রাধারে 'ট্রিপিক্যাল' মাছ পোষার যে আধুনিক ব্যবস্থা, সেটি সত্যি চমৎকার। এ মন্ত্রাধারগুলো গৃহ-পোতা ভাে বটেই, পরন্তু সাধারণ মানুষের কাছেও উহাদের একটি বিশেষ আকর্ষণ বিস্তারিত। চোখের অন্ধারালে নদী বা সমুদ্রের জলে প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে যে মাছ ঘুরে বেড়ায়, ঘরের মধ্যে সেই মাছকেই সর্বজন সঙ্গরঞ্জীল ও ক্রীড়ারত দেখলে কার না মনে আনন্দ জাগে! তাই 'ট্রিপিক্যাল' মাছ পোষার এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে দিনদিনই।

ঘরে এনেও ট্রিপিক্যাল মাছগুলোকে বাতে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, সেজ্ঞে মন্ত্রাধারগুলো বিশেষ নিয়মাবলী তৈরী করতে হয়। মাছের বাঁচবার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রাধার বা ট্যাংকেই এই কয়টি ব্যবস্থা অবশ্য চাই—প্রচুর আলোক, পর্যাপ্ত তাপ এবং যথোচিত খাদ্য। মন্ত্রাধারগুলোর লক্ষ্যের খুব ঘোঁট হবে না, বরং বড়টা বড় করে গড়া যায়, ততই ভাল। সাধারণতঃ ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১২ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১২ ইঞ্চি উচ্চাবিশিষ্ট 'একুইরিয়াম' বা মন্ত্রাধারই 'ট্রিপিক্যাল' মাছের পক্ষে উপযুক্ত। আধারগুলোতে ব্যবহারযোগ্য জল নদীর হলেই ভাল, অথবা টাই সহজে পানিপোষিত জল। ভিতরে আলোর

ব্যবস্থা, গাছ-পাছা, বালি, পাথরকুচি সবই থাকতে হবে। এদনি ভাবে সব জিনিস সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে ট্যাংকের ভিতর রক্ষিত মাছগুলোর চলাচলে অসুবিধার কারণ না হয়, বরং আনন্দে খেলে বেড়াতে পারে তারা অবিদ্যায়।

ইকুইরিয়ামজি বা মন্ত্রা-বিজ্ঞানীরা মন্ত্রাধার ও 'ট্রিপিক্যাল' মাছের প্রসঙ্গে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের সূচিন্তিত অভিমত 'একুইরিয়াম'গুলোর ভিতরকার তাপমাত্রা মোটামুটি ৭৫ ডিগ্রী রাখবার চেষ্টা করতে হবে সব সময় এবং এইটি মাছকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ থেকেই। মোটের উপর কোন অবস্থাতেই এই তাপ ৭০ ডিগ্রীর নিচে নেমে গেলে চলবে না। ঘরের ঠিক কোন বারগাটিতে মন্ত্রাধার রাখা প্রেরঃ—এ সম্পর্কেও কতকগুলো নির্দেশ রয়েছে। যেমন জানালার একেবারে কাছাকাছি না রেখে এমন দূরে মন্ত্রাধারটি স্থাপন করতে হবে—সবাসরি পূর্বের তাপ যাতে তার উপর না যায়। আর জানালার ধারে রাখতেই হলে মন্ত্রাধারের যে ধারটি জানালারুখী সেইটি সেটে দিতে হবে সূর্য টেনে কাগজে।

'একুইরিয়াম' বা মাছের ট্যাংকগুলো মাছ দিয়ে যেন ভর্তি না হয়ে যায় কখনই। জল থেকেই আলোকজন পেতে হবে মাছকে—সেজ্ঞেই এইটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার দাবী। অপর দিকে, তাতে দিয়ে 'ট্রিপিক্যাল' মাছ স্পর্শ করা কখনও উচিত নহে। এতে জন্মে বিশেষ ধরনের জ্বাল রয়েছে—প্রয়োজনের যুগুটে সেগুলোর ব্যবহারই সমীচীন। ট্যাংকের জল বদল তখন পাণ্টাতে বাধ্যও ঠিক নয়। আসল কথা মন্ত্রাধারে যে যে মাছ থাকবে, সেদের বড়টা সম্ভব উপদ্রব না করলেই ভাল। এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞানীদেরই দাবী—সাধারণ অবস্থার বৈজ্ঞানিক 'একুইরিয়াম'ের জল পরিবর্তনের তো প্রায়ই উঠে না, পরন্তু জলটা বতই পুরানো। হবে, 'ট্রিপিক্যাল' মাছের বাঁচবার পক্ষে ততই হবে সহায়ক। নবাবী আমলে কোয়ারা ইত্যাদিতে যে লাল নীল মাছ পোষা হ'তো ওগুলোর জন্মে ব্যবস্থা ছিল অবতি অন্তরূপ। অর্থাৎ সেই জল কিছু দিন পর পর না পালটালে মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারেই চলতো না।

আলোচ্য মন্ত্রাধারগুলোতে বিশেষ ধরনের কিছু বাস বা গাঁহ-গাঁহুরা না থাকলেই নয়। মন্ত্রাধারে রক্ষিত মাছের বাঁচবার জন্মেই এইটি অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া, এতে মন্ত্রাধারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং জলটাও সহস্র নষ্ট হতে পারে না। মাছের চলাকন্দের অবাধ সুযোগ রেখে বতগুলো গাঁহ সম্ভব ট্যাংকে রোপণ চমুতে পারে। ট্যাংকে ব্যবহারের পক্ষে 'ভ্যালিসেরিয়া স্পিরালি' গাছগুলো বিশেষ উপযোগী—আমাদের দেশে চলতি ভাষায় বেগুনোকে বলা হয় পাটা বাস।

মন্ত্রাধারে যে সকল মাছ রাখা হবে, সেগুলোকে সূর্য রাখার জন্মে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার। এর ভিতর 'একুইরিয়াম'গুলোর তাপমাত্রার কণাটাই বিশেষ ভাবে বলতে হয়। হঠাৎ তাপ পরিবর্তিত হলে 'ট্রিপিক্যাল' মাছ অসুস্থতাবোধ করে, এমন কি ওদের জীল সশয়ের পর্যন্ত কারণ ঘটে। আর সব দিকে নিয়ম রক্ষিত হলে এক উপযুক্ত দেখাওনা ও তত্ত্বাবধান যদি থাকে, তা হলে এক একটি মাছ চার থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত পেরে যায়।

'ট্রিপিক্যাল' মাছকে মন্ত্রাধারে রাখা অবস্থার বাতরায় খুবই সুবিধাজনক। ওদের কতকগুলো বিশেষ ধরনের খাদ্য রয়েছে,

সকলো ট্যাঙ্ক বেখে মিসেই ওরা আপন ঘরে খেয়ে নেয়। ভতিবিত্ত পাওয়ার হলেই ওদের পক্ষে মায়াম্বক হয়ে উঠে এক সেমিকেই বিশেষ জাগ থাকতে হয়, বীরা মাহ পুবে আনন্দ পান, তাঁদের। কম পাওয়া দেওয়া বরা ভাল, কিন্তু কখনও কোন অবস্থাতেই বেশী নয়। দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত যতটা ওরা খেতে পারে, ততটুকু খাভই বখেট। এসেদের একজন মন্তব্যজ্ঞানীর ব্যবস্থা—মন্তব্যাবের মাহগুলোকে ছয় দিনে খেতে নিয়ে এক দিন উপোস দাও। তাতে ওদের উপকার হবে, বেঁচে থাকতে পারবে ওরা অনেক দীর্ঘ দিন।

বহু নামধারী 'ট্রিপিক্যাল' মাহ আজকাল মন্তব্যাবে এসে স্থান নিয়েছে। এসেদ ভিতর 'গাপি', 'প্লাটি', 'সোর্ড-টেল', 'মলি', 'এক্সেল', 'টেট্রা', 'জেন্স', 'ব্লাক উইডো', 'হালো কুইন'—এসব বর্ণিত মাহগুলো উল্লেখযোগ্য। এসেদ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে—সকল মাহ সকল সময় একই ট্যাঙ্কে থাকতে রাজী হয় না। ওদের ভেতর প্রেম-প্রীতি বিনিময় যেমন হয়ে থাকে, হিংসা, ঘৃণা, মান-অভিমান প্রভৃতিও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ, গৃহে মন্তব্যাবের সাজাবার সখ জাগলে, জেনে নিতে হবে 'ট্রিপিক্যাল' মাহের এসব গতি-প্রকৃতি আগে-ভাগেই।

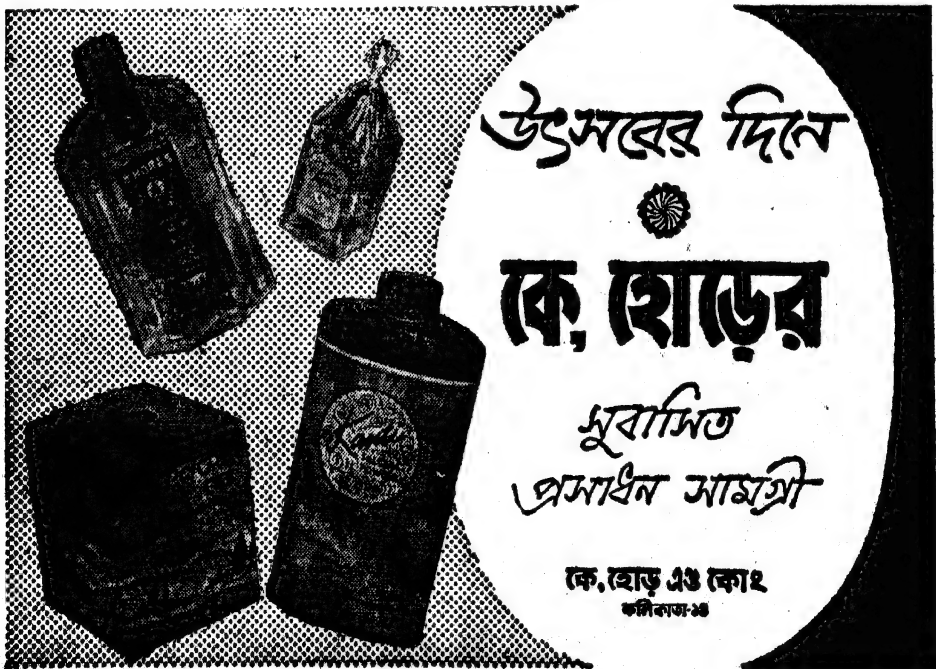
### বেকার সমস্যা সমাধানের অম্মতম উপায়

ধান, গম, কলাই, সবুজ, আলু, চিনাবাদাম, ইক্ষু, চা ও পাট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে দেশবাসী ও কৃষিগণ দম্ভু

লাভ করেন এক জনসেবাবর্ষ পালন করিতে পড়েন। একত প্রয়োজন হয়, জমিতে উন্নত ধরনের 'সার' দ্বারা কার্য সম্পাদন গ্রাহ্য বাহ্য ও শিল্প উন্নয়নের জন্য বৃক যোগ্য।

### কৃষি সার

কৃষি জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস হইলে, জমিতে কয়েক প্রকার দূষিত বীজাণু ও নামাকরণ আগাছা ইত্যাদি জমিয়া ধাত ও শস্ত গাছের বিশেষ ক্ষতি করে এবং তৎক্ষণ কল প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। একারণ কৃষি জমিতে চাষের কিছু পূর্বে ঘন ব্যরে ও পরিগ্রমে সহজলভ্য, "বাবলা বৃক্ষের" কাঁচা, পাকা, পচা বা শুখনা পাতা ও কুল প্রতি বিধা জমিতে নান পক্ষে দশ সের ও শুখনা (গাই গরুর) "গোবর শুঁড়া" দশ সের এক "কস্করাস বৃক ক্যালসিয়াম সার" দশ সের (বাছা ঘন ব্যরে আধুনিক প্রেখার কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে) একত্রে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দিয়া হাল দিয়া রাখিতে হয়। পরে সময়মত চাষ করিলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অনিষ্টকারী জীবাণু বা আগাছা ইত্যাদি জন্মাইতে পারে না। ধাত ও শস্ত গাছগুলি সবল, স্বহ ও পূর্ণ কলগ্রহ হয় এক শস্তগুলি পরিপূর্ণ হইয়া স্বহাহ ও স্বাহ্যপ্রদ হয়। অবশ্য কল উপযুক্ত বীজের উপর নির্ভর করে। সেধক বহু পরীক্ষার পর ধাত ও শস্ত চাষের জমিতে উক্ত সার ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।



উৎসবের দিনে

ক. হোড়ের

মুবাঙ্গিত

প্রমাধন মাছগু

ক. হোড় এণ্ড কোং

কলিকাতা-১৪

## বাংলা বুক

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য কৃষি জমির সীমানার ধারে অথবা সুবিধামত স্থানে “বাংলা বুক” বোপণ করা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা ভাব্যতে প্রতি বৎসর জমির সার হিসাবে পাতা ও ফুল পাওয়া যায় ও গাছের ভাল ও কাটা বহু কার্যে প্রয়োজন হয় এবং গাছের কচি পাতা ছল্লস গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। “বাংলা” গাছের সার ডালের পাতন (ডালের পরিবর্তে) প্রচাৰ ব্যবহার করিলে পাতের গোড়া শক্ত হয় ও সুখের ফলি নষ্ট হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারে পাইওরিয়া রোগে স্তম্ভল পাওয়া যায়। “বাংলা বুক” পাতা-ফুল-কল এবং ছাল একত্রে পরিমাণ মত জলে নিয়মিত সিদ্ধ করিলে কালো ‘কব’ বাহির হয়, এই ‘কব’ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ও সমিশ্রণে উত্তম দ্বারা লিখিবার কাগা ও কাউন্টেন পেনের কাগা প্রস্তুত হয় এবং এই ‘কব’ রেল লাইনের কাঠের স্লিপার ও অজ্ঞাত কার্যে, নৌকার পাল এবং পিড়, পাগড়ন, কাছি ইত্যাদিতে এবং মস্ত ঘরবার আল, ঘনী, আটোল, পোলো ইত্যাদিতে ব্যবহার করিলে বহুদিন স্থায়ী হয়; সোণাল-ল, রোয়ে, বুড়ো শীত পত্রিয়া বার না এবং উই বা অন্ত কোন পোকের দ্বারা নষ্ট হয় না। “বাংলা বুক” পরিপকু কাঠ পরিমাণ মত ডারী, শক্ত, মজবুত ও মৃদু হয় এবং ইহা উই বা অন্ত কোন পোকের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। একারণ এই কাঠে লালস, গাড়ীর ঢাকা, চরকা তাঁত ও সরঞ্জাম, ববিন, ইত্যাদি এবং কোথাল, কুড়ুল, দা, হাতুড়া, বাটালি, পাত্তি ও সোডেল ইত্যাদির বাঁট বা হাতোল এমন কি বন্ধুকের কুঁলা ইত্যাদি কার্যে ব্যবহার করা যায়। এই সহজপ্রাণ্য কাঠ হইতে কল-কাঠখানা ও সাধারণের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার হাতোল, বাঁট, বুড় ইত্যাদি তৈয়ারী করিলে বহু বেকার লোকের কার্য ক্ষমতা হয়।

“বাংলা বুক” প্রথম আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি থাকায় প্রকৃতির দ্বিধা নিকটস্থ জমিতে প্রয়োজন মত বৃষ্টিপাত হয়। একারণ এই বুক দ্বারা ও শত চাষের জমির পক্ষে বিশেষ হিতকারী ও সুকলগ্রব। জমির নিকটস্থ এই বহুকাটা বুক ও বীজাণুনাশক গাছের সাহায্যে কলস নষ্টকারী পোকা, মাকড় ইত্যাদি এমন কি পলপালের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার রসের সাহায্যে পুতুল, বানা, ডোবা ইত্যাদির বহু বাজাপুর্ন দ্রুতিত কল পরিষ্কৃত হয়

এক গাছের নীচস্থ জমির বিঘাত জীবানু নষ্ট হইয়া জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলধারার বাঁয়ের ধারে বাঁয়ে “বাংলা বুক” বোপণ করিলে উহার পাতা ফুল ও কল নিজে পড়িয়া পড়িয়া যে রস বাহির হয় এই রসের সাহায্যে বালি বা কাঁকর মিশ্রিত আলুগা মাটির বাঁধ বা পাড় দৃঢ় ও স্থায়ী হয় এবং বুকের শিকড়গুলি বহুবৎ প্রসারিত হইয়া চারি ধরনের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। একারণ প্রথম বর্ষীয় বা বস্তার বাঁধ বা পাড় বা প্রায়া সড় বা বড় রাস্তা সহজে বিধ্বস্ত হয় না। বুকগুলি বেশী উচ্চ হয় না, একারণ ভীষণ ঝড়ে বা ক্ষপাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। একত্র হঠাৎ দ্বাষ্টের মধ্যে প্রয়োজন হইলে পথচারী বা কর্মমত সেবকবৃন্দ সাময়িক আশ্রয়ের স্থল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। এ বৎসর প্রথম বর্ষীয় ও বস্তার সুন্দরবন এলাকার এবং অজ্ঞাত স্থানে মাটির বাঁধ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ সকল বাঁয়ের ছই পার্শ্বে ঘন ভাবে বাংলা বুক বোপণ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একত্র বার হয় অতি সামান্য এবং সহজে নষ্ট হইবার ভাবনা থাকে না। ভবিষ্যতে গাছ পরিপকু হইলে বহু বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পুণ্যময় ভারতের যে সকল স্থান ক্রমাগত মলুম্মিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে সেই সকল স্থানে “বাংলা বুক” বোপণ করিয়া পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার পাতা কল ও ফুলের সাহায্যে মলুম্মির এবং সাগর ও নদীতীরস্থ বালি ক্রমাগত মিশ্রিত মাটিতে পরিণত হইয়া কৃষি উপযোগী হয়। এরূপ বুক এই সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জমাইতে দেখা যায়। অল্প ভবিষ্যতে বাংলা ভারতীয় দ্বীপবাস বনজ সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবে।

সম্ভবতঃ দেশবাসীর অবগতির জন্য সিবেন এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাংলা দেশের হিটৈবী মনীষীগণের বোধ মূলধনে “বাংলা ইণ্ডাস্ট্রিজ” (Babla Industries) নামীয় প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রাচীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ বৈদ্যুতিক ও বাষ্পচালিত কারখানার প্রস্তুতি চলিতেছে। শীঘ্রই পণ্যসেবার জন্য উৎপাদন ও পরিবেশন হইবে—“বাংলা-দিবাঙ্গল,” “বাংলা (মিশ্রিত) তরল রু” ও “বাংলা (মিশ্রিত) সার,” কলকরাস বুক কালসিয়াম-সার” এবং “বাংলা ‘কাঠ’-মিশ্রিত লালস, চরকা, তাঁত-সরঞ্জাম, ববিন, ঢাকা, কল ছইল, পুলা, বুড়, হাতোল, বাঁট ইত্যাদি।

—জীবনরত্ন সেন

## সেই মেয়েটি

বীরেন্দ্রের মন

অকস্মাৎ বলে ওঠে আকাশে অগ্নি  
কে কার কঠোর হাতে গোড়ালো সে সুখি সেওন  
কৈলে ওঠে ভাতে বন, কীলে তার লতাপাতা ঘান।  
এর দ্বারা দেখি শূন্য উড়ে বার শালা-কালো ছাই  
আকাশ-জমির দেখি, মিলিলিত, কলস বাতাস,  
বজ্রের গর্জনে বলে সেই ছুর ‘বাই তবো বাই।’

সেই সন্ধ্যা আঁজো আলে জোলাকীরা আঁজো বলে বলে  
অনেক অনেক লগ্নে পাই তাকে বিধিত-সরণে  
কী যে শান্ত সেই বন কী যে শান্তি লতন-পাতার ?  
মনোহর বিশ্বর-বলে এই কি সে ? বিদ্যুৎ মেয়েটি ?  
সেই ছুর, সেই বাঁহ, লতা-সেই মিহিকালো ফুল  
চলবে অলঙ্কার কী উজ্জল বস্ত্রাঙ্গা দেখি ভাই।



ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেঙ্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেঙ্সোনা সাবান ব্যবহার করলে  
আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ,  
অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তার  
কাছ, একমাত্র সুগন্ধ রেঙ্সোনা সাবানেই  
আছে ক্যাডিল অর্থাৎ স্বকর সৌন্দ-  
র্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক  
বিশেষ সমিগ্রণ।

রেঙ্সোনা সাবানের সরের মত কোঁপার  
রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ  
করুন; এই সৌন্দর্য সাবানটি প্রতিদিন  
ব্যবহার করুন। রেঙ্সোনা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



রেঙ্সোনা—একমাত্র ক্যাডিল যুক্ত সাবান

R.P. 140-X-13 30

রেঙ্সোনা প্রোপাইটিয়ে লিমিটেড এর পক্ষে ভারত প্রকৃত





# ছোটদের আমর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যাং-এর বউকে দেখে মা তো অবাক, এত সুন্দরী মেয়েকে ও  
কি ক'রে বিয়ে করে আনলো। বউ বরণ করতে করতে  
মা ভাবেন।

মেয়েটি কিন্তু খুব কাজের। সে শান্ততীর সঙ্গে রোজ ক্ষেতে  
হায়। সব কাজে সাহায্য করে। বুড়ো শান্ততীকে বেশী খাটতে  
দেয় না বউটি। ব্যাং-এর-এর আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে  
বলেন, বাঁসা মেয়ে। বউকে খুব ভালবাসেন তিনি।

ক্রমে পরংকাল এলো। এখন সে দেশের প্রথামত প্রতি বছর  
শরৎকালে বোড়দৌড় হতো। ধনী-দরিদ্র সকলেই একটা নির্দিষ্ট  
মাঠে গিয়ে জড় হত। সঙ্গে নিত তাঁবু আর নতুন পাওরা কল  
সেখানে একরকম গাছ ছিল তার ডাল পোড়ালে ঠিক ধূপ-ধূনার  
মত সুগন্ধ বেগোত। তাই আলিয়ে তারা দেবতার পূজা করত  
নাচত, সব খেত তার পর বোড়দৌড় শুরু হত। এই প্রতিযোগিতার  
সময় তরুণ-তরুণীরা তাদের মনোমত পাত্র-পাত্রী বেছে নিত। সে  
এক বিরাট কাণ্ডকারখানা।

এবার মা ঠিক করলেন, ব্যাংকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ব্যাং কিন্তু  
খেতে রাঁধী হ'ল না। সে বললে : "আমি জত দূর বেতে পারবো  
না মা। অনেক পাহাড় ডিকুতে হবে।" ব্যাং বাড়ীতে রইল।



তিব্বতী গল্প

আর সবাই বোড়দৌড় দেখতে চলে গেল, এমন কি তার বউ  
পর্ষাদ।

এক বিরাট প্রাঙ্গণে সাত দিন ধরে উৎসব। নাচগান—ঠে-  
হানোড় আমোদ-আহ্লাদের অভাব নেই। শেষ তিন দিন বোড়দৌড়।  
প্রতিদিন পৌড়ের শেষে তরুণীরা বিজয়ীদের ঘিরে নৃত্য করতো আর  
তাদের নিজেরের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে চিকো মদ খাওয়াতো।

এবার বোড়দৌড়ের তৃতীয় দিন অর্থাৎ উৎসবের শেষ দিনে  
দৌড় আরম্ভ হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সবুজ পোষাক পরা এক তরুণ  
একটা সবুজ বোড়ার চেপে বোড়দৌড়ের মাঠে প্রবেশ করলো।  
তাকে দেখতে যেমন সুন্দর, গায়ের তায় তেমনি জোর। তার  
পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মূল্যবান সিঁতের, আর বোড়ার লাগামে  
সোনা ও মণি যুক্তো দেওয়া। বুকের ঠিক কাঁধে একটা বন্ধু খোলানো।  
বন্ধুকের বাট রোপা এবং প্রবাল দিয়ে মোড়া। সে যখন সব শেষের  
প্রতিযোগিতার যোগ দেবার জন্য অগ্রমতি চাইল, তখন সবাই তার  
দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

বোড়দৌড় শুরু হল। এই অদ্বুত বুকের কিস্ত কোন  
তৎপরতা দেখাল না। খুব আন্তে আন্তে লাগাম, জিন প্রভৃতি ঠিক  
করে নিয়ে সে যখন বোড়া ছাড়ল তখন অপর প্রতিযোগীরা তাকে  
পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

সকল প্রতিযোগীরই দৃষ্টি ছিল দৌড়ে জেতবার দিকে। অল্প  
কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর তাদের ছিল না। কিন্তু এই নবাগত  
তরুণটির সেমিকে খেয়াল আছে বলে মনে হল না। সে বোড়া  
ছোটার সময় কাঁধ থেকে বন্ধুটা তুলে নিলে। আকাশে  
কয়েকটা ঈগল পাখী উড়ছিল। তাদের দিকে টিপ করে সে  
তিন বার শুভী ছুঁড়ল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পাখী শুভীবিধ  
হয়ে মাটিতে পড়ল। তার পর বুকের বোড়া থেকে একবার  
বাঁ দিকে এক বার ডান দিকে নেমে জেলাবিধ ভাবে পাঁড়ানো নয়-নয়ীরা  
প্রতি ফুল ছুঁড়ে নিলে। তার হাবভাব দেখে সবাই ভাবলো,  
পাগল নাকি। কিন্তু একি! হঠাৎ চোখের নিম্নে সে বোড়ার  
উঠে এমন ছুট দিল যে বোড়ার ধূয়ের ধূলের সব অঙ্গকার হসে  
গেল এবং সেই ধূলের মধ্যে সে অদ্বুত হল। অপর প্রতিযোগীরা  
প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার নাগাল ধরতে পারল না। তাদের  
অনেক আগে সে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে প্রথম স্থান সুরধিকার করল।

সে বোড়া থেকে নামলে ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে ঘিরে  
পাঁড়ালো। সকলের মুখে তার প্রশংসা। "কি সুন্দর চেহারা,  
আর কি ভীষণ বোড়া ছোটাতে পারে। পোষাক-পরিচ্ছদও সব  
অমূল্য। কে এই তরুণ! এমন সুন্দর বুকের যোগ্য পাত্রীই  
বা কে হবে?"

তরুণীরা তাকে ঘিরে নাচতে শুরু করল এবং তার পর তাদের  
শিখিরে নিয়ে গিয়ে চিকো মদ খেতে গিলে। কেউ তাকে ছাড়তে  
চার না।

কিন্তু বেই মূর্খ্য অল্প গেল বুকের তাড়াতাড়ি বোড়ার উঠে  
কাজকে কিছু না বলেই বৈদিক থেকে ব্যাং-এর বউ ও তার খণ্ডর  
শান্ততী এসেছিল সেই দিকে বোড়া ছুটের চলে গেল।

সবাই অবাক বিষয়ে তার সবুজ বোড়ার বুঝাখিত ধূলির  
দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাং-এর বউও ভাবলো এই বোড়সারারটি কে? কি সুন্দর



চেহারা, পায়ে কি শক্তি! নাহট! কি, কোথায় থাকে, কিছুই জানা গেল না। অমন করে হঠাৎ চলে গেলই বা কেন? বোধ হয় অনেক দূরে বাড়ী। অস্তিত্ব সকলের মত তার মনেও নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল।

বাড়ী ফিরে গিরে সে ব্যাং-এর কাছে বোড়ারোড়ের সমস্ত ঘটনা বলতে গেলো ব্যাং বললে, “আমি সব জানি।” ব্যাং সমস্ত ঘটনা এবং সবুজ বোড়ারোড়ের কথা এমন সব বলে গেল যেন সে মাঠে উপস্থিত ছিল। ব্যাং-এর বউ-এর ভারি আশ্চর্য লাগল।

পরের বছর আবার সেই মেলা, সেই বোড়ারোড়। ব্যাং-এর মা বাবা এবং বোঁ এবারও মেলা দেখতে গেল।

বোড়ারোড়ের সময় সবাই সেই সবুজ বোড়ারোড়ের কথা ভাবতে লাগল। নিশ্চয়ই সে আসবে। এবার তার নাম ধাম সব জেনে নিতে হবে, সবাই মনে মনে ঠিক করলে।

কিন্তু তার আর দেখা নেই। এক দিন গেল, দুদিন গেল, বোড়ারোড়ের শেষ দিন হঠাৎ সে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরল। সেই শোবাক, সেই বোড়া, সেই চেহারা। এবারের শোবাক যেন আরও জমকালো। সকল দৌড়াকার বনন বোড়া ছাড়ল, তখনও সে বোড়ার উঠল না, বসে বসে চা খেতে লাগল। চা খাওয়া শেষ করে সে বোড়া ছাড়ল। বাকী জেতার দিকে তার লক্ষ্য নেই। সে আগের বারের মত এবারও তার সুন্দর বন্ধুটি নিয়ে তিনটি উড়ন্ত পাখী মারল। তার পর বোড়া থেকে নেমে নর্শকদের গায়ে ফুল ছুড়ে দিতে লাগল। শেষে সে বনন সত্যনতাই বোড়া ছোটাল তখন তার প্রতিবেশীরা বহু দূর এগিয়ে গেছে। বিদ্যাংগস্তিতে বোড়া ছুটিয়ে সে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং প্রতিবেশীদের অনেক আগেই গম্ভীর স্থানে পৌঁছে বাকী জিতল।

তার পর সুস্থ হল তাকে নিয়ে নাটগান খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু ঠিক দূর্য্য অল্প আবার সময় সে গত বারের মত হঠাৎ বোড়ার উঠে চলে গেল। এবারও তাকে জিজ্ঞেস করা হল না, তার নামই বা কি, আর সে থাকেই বা কোথায়?

ব্যাং-এর বউ-এর ভারি বিস্ময় লাগল। দূর্য্যাত্তর আগেই ও চলে যায় কেন। আমরা যেদিক থেকে আসি সেই দিকেই যায়। আরও আশ্চর্য্য, ব্যাং এ সমস্ত কি করে জানতে পারে! এ রহস্য উল্কাটন করতেই হবে। মনে মনে সে একটা ফন্সী জাঁটলে। পরের বছর বোড়ারোড়ের শেষ দিন ব্যাং-এর বোঁ তার সুন্দর শান্তভীকে শরীর ধারণ বলে আগে আগে বাড়ী চলে গেল। বাড়ীতে গিয়েই সে ব্যাং-এর খোঁজ করলে, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে উনোনের পাশে একটা ব্যাং-এর চামড়া দেখতে পেল। ঠিক তার স্বামীর মত। সে তখন চামড়াটা তুলে নিয়ে আনন্দে বিভোর হল। ‘বা সন্দেহ কবেছিলার ঠিক তাই। আমার বামী এত সুন্দর। এত শক্তিমূল্য।’ আনন্দে তার হুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ‘আজ আমার মত সুখী কে?’ কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও তার হৃৎ হতে লাগল। সে ব্যাং-এর বেশ ধারণ করে থাকে কেন? আমি কি তার উপবৃত্ত নই? কখনও কি সে মাছবের বেশ আমার বামী হবে না? তার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

চামড়াটা দেখে তার খুব রাগ হল। কি কুৎসিত! আমার এসে সে এইটা পরে ব্যাং সাজবে। সে বাতে আর ব্যাং সাজতে না পারে সেজ্ঞত সে ব্যাং-এর ছালখানা উনোনের মধ্যে ফেলে দিলে।

তখন দূর্য্য অল্প যায়-যায়। সবুজ বোড়ারোড়টি তীরবেগে বোড়া ছুটিয়ে এসে কাণ্ড দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে এসে উনোন থেকে ছালখানা তুলে নিলে, কিন্তু তখন সবই প্রায় পুড়ে গেছে, একটা পা অবশিষ্ট আছে মাত্র।

দীর্ঘকাল ফেলে তরুণটি সেখানেই বসে পড়ল। তার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে এল। ব্যাং-এর বউ বললে: “তুমি কেন এমন করে থাক। সকলে স্বামী নিয়ে কেমন আনন্দে ঘর-সংসার করে। আর আমি লজ্জার কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি নে। অথচ তুমি কত সুন্দর, কত শক্তিমূল্য, কেউ তোমার পায়ের নখের বেগাও নয়।”

তরুণ বললে: “তুমি যে বড় তাড়াতাড়ি করে কেলসে। আমি সম্পূর্ণ শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে আমার চিরজীবন সুখে কাটাতে পারতাম। কিন্তু এখন আর আমি বাঁচব না এবং দেশবাসীদেরও হুঃখ হবে না।”

তরুণীটি ভয়ে ভয়ে বললে: “আমি না জেনে অস্তর করে ফেলছি, এখন উপায়?”

“তোমার দোষ নেই, দোষ আমারই। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্জনের আগেই শক্তির পরিচয় দিতে বাওয়া আমারই অস্তর হয়েছে। এখন তো তার কাউকে সুখী করা বাবে না। আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি হল্যাম ধর্ম্মী মাতার সন্তান। উপবৃত্ত শক্তি অর্জন করলে আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারতাম। আমি এমন রাজ্য স্থাপিত করতে চাই, যেখানে দরিদ্রের উপর ধনীরা অত্যাচার থাকবে না, সরকারী কর্মচারীরা সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করবে না, দেশের পথঘাট ভাল হবে, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলেবে। কিন্তু আমার শক্তি অর্জন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ব্যাং-এর চামড়া নইলে ঐতে আমি একটা রাতও বাঁচব না, রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। উপবৃত্ত ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে এবং দেশের লোকদের হুঃখ-হৃদ্বন্দ্বী ঘুচাবার জন্য কাজ করতে পারলে আমাদের জীবন সুখের হত। কিন্তু আর উপায় নেই। আমার আর এখানে থাকা হবে না, আজ রাত্রেই আমাকে আমার মা বন্ধুভাষী কাছে চলে যেতে হবে।”

মেয়েটি তখন যুবককে জড়িয়ে ধরে কানতে কানতে বললে: “তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, কেন তুমি চলে যাবে, তোমার বাঁচতেই হবে। বল, কি করলে তুমি বাঁচতে পার। আমার বা বলবে আমি তাই করব।”

তার কান্নার যুবকের স্তন্য গলে গেল। সে তার হাত ছুঁটি ধরে বললে: “দেখ এখনো হৃদয় আমারে বাঁচান যেতে পারে। কিন্তু কাজটা একটু কঠিন। আমার যে বোড়াটা দেখছ, এর গতি অসম্ভব দ্রুত। এই বোড়ার চেয়ে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যাও। সেখানে মেঘের রাজ্যে একটা বিরাট মন্দির দেখতে পাবে। সেই মন্দিরে দেবতা থাকেন। তাঁর কাছে এই তিনটি বর চাইবে:

(১) পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্র বলে শ্রেণী-বিভাগ থাকবে না, (২) সাধারণ মানুষের উপর সরকারী আয়তন নির্ধারিত করবে না;

(৩) শিকি-এর বাজারে গিয়ে হানু ভাইদের সঙ্গে বিনিময় বাণিজ্য করা চলবে। এই তিনটি বর যদি চেয়ে নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমি আর মরব না।”

ব্যাং-এর বৌ আর দেখি করল না। তক্ষুণি ঘোড়ায় উঠে পশ্চিম আকাশে উড়ে চলল। ঘোড়া পক্ষীরাজের মত মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে লাগল সাঁ-সাঁ করে। ব্যাং-এর বউ কোন বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করল না। তার লক্ষ্য কেবল সেই মেঘরাজ্যে অবস্থিত দেবতার মন্দির। স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্ত সতীর অপূর্ণ অভিযান! বহুক্ষণ অশ্চলন্যর পর মেয়েটি দেবতার মন্দিরে গিয়ে হাজির হল। অপূর্ণ শোভা সে মন্দিরের! তার দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে তাকালে চোখ বলসে যায়। ফটিকের দেওয়াল, চূড়াটি সোনা দিয়ে ঘোড়া, মন্দিরের পায়ে অসংখ্য উজ্জ্বল মণিরত্ন। মেয়েটির কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই। সে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে মন্দিরে ঢুকল এবং দেবতার কাছে তার প্রার্থনা নিবেদন করল। দেবতা তার আন্তরিকতার খুশী হয়ে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বললেন : “তিনটি বরই তোমায় দিলাম। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের আগে এই কথা সকল লোককে জানাতে হবে। সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে একথা শোনাতে হবে। তারা না শুনেলে বর বার্থ হবে।”

ব্যাং-এর বউ মহাখুশী। সে দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে নিষ্কান্ত হল এবং হুহুত বিলম্ব না করে ঘোড়া ছুটিয়ে মিল বাড়ীর দিকে। রাত্রি প্রভাতের আগে সবাইকে সমস্ত সংবাদ শোনাতে হবে, কাজেই দেরি করা চলে না।

কিন্তু উপত্যকার প্রবেশ করে সে দেখতে পেল, তার বাবা চুপো তার দুর্গের কটকে ঝাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েকে দেখতে পেয়ে চুপো বললে : “আরে এত রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিস কোথা? কি হয়েছে?”

“সে অনেক কথা, পরে বলবে বাবা। এখন আমার সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেবতার প্রত্যাদেশ শোনাতে হবে, আমার ঝাড়বাবার সময় নেই।” মেয়েটি চলে যেতে চাইল।

কিন্তু চুপো তার পথ আটকালো। বললে : “কি প্রত্যাদেশ তুমি? আমি জেলার হাকিম, আমাকে আগে বলতে হবে।”

মেয়েটি ভাবলে, তাড়াতাড়ি বর তিনটির কথা বলে চলে যাওয়াই ভাল, নইলে অনবধক কথা-কাটাকাটিতে দেহি হবে বাবে। সে তখন তার বাবাকে বললে : “দেবতা আমার তিনটি বর দিয়েছেন। প্রথম বরে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না।”

চুপো কপাল হুটকে বললে : “বাঃ! ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন তফাৎ না থাকলে, ছোট-বড়তে যে ভেদ থাকবে না, মান মর্যাদা রাখা দায় হবে, কেউ কাউকে মানতে চাইবে না।”

মেয়েটি বলে চলল : “দ্বিতীয় বরে সাধারণ লোকের উপর সরকারী আমলাদের অভ্যুত্থান চলবে না।”

“তাই নাকি? তাহলে আমাদের কাজ করে দেবে কে?” গুরু

ভেড়া চরাবে কে, চাষ হবে কি ক’রে?” চুপোর মুখ দিয়ে আর কথা বেরল না।

“তৃতীয় বরে শিকি-এ গিয়ে হানু ভাইদের সঙ্গে বিনিময় ব্যবসা করা চলবে এবং তাহলে দেশের লোকেরা”—

চুপো আর কোন কথা শুনতে চাইল না। সে বাধা দিয়ে বললে : “বত সব বাজে কথা! ভগবান কখনো এ সব বলতে পারেন না। আমি তোমায় এ সব কথা লোকদের শোনাতে দোষ না।”

মেয়েটি বললে : “সে হয় না, আমার শোনাতেই হবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।” বলে সে ঘোড়া হাঁকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু চুপো দৃঢ় ভাবে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইল, যেতে দিল না।

মেয়েটি অনেক কাতুক্তি মিনতি করল, কিন্তু তার বাণের শরীরে ধরা যায় বলে কোন জিনিষ ছিল না।

এমন সময় মোরগ ডেকে উঠল। রাত্রি প্রভাতের আর বিলম্ব নেই। মেয়েটি বাবার জন্ত ছটকট করতে লাগল।

তার বাবা বললে : “তুই কি পাগল হলি নাকি! দেবতা কি কখনো এসব কথা বলতে পারেন? তাহলে জমি চাষ করবে কে, গরু ভেড়া চরাবে কে, সব কাজ করবে কে?”

দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল।

মেয়েটি কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। বেপরোয়া হয়ে সে ঘোড়ার শিঠি-লাজারে চাবুক মারতে লাগল। তখন ঘোড়াটি এক ঝাঁকানিতে চুপোকে মাটিতে কেলিয়ে দিয়ে ছুটেতে স্তব্ধ করল।

মেয়েটি প্রথম একটি বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছে, এমন সময় তৃতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল।

ভোর হয়ে বখন দিনের আলো ফুটে উঠল তখন মাত্র অল্প করেকটি বাড়ীর লোকদের দেবতার প্রত্যাদেশ শোনানো হয়েছে।

গভীর দুপুরে ও হতাশায় মেয়েটির শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়ল। সকাল হয়ে গেল, স্বামীকে আর বাঁচান গেল না।

তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরল। গিয়ে দেখে সব শেষ। তার স্বামীর শাত্তড়ী তার মৃত স্বামীর পাশে বসে বসে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। স্বামীর মৃতদেহের উপর কাঁপিয়ে পড়ে সে-ও হাঙ্গুল নয়নে কাঁদতে লাগল আর নিজের বাপকে ও ভাগ্যকে দ্বিধার দিতে লাগল।

পাহাড়ের উপর ভেক-কুমারের মৃতদেহ সমাধিত করা হল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি গিয়ে সেই সমাধির পাশে বসে বসে কাঁদত। শেষে একদিন সে পাথরের পরিণত হয়ে গেল।

এখনো সেই সমাধির পাশে সেই পাথরখানি দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কোন তরুণী নত হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে, আর তার মাথার আলুলায়িত কেশ শিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর সমাধিতে প্রার্থনা জানান তার কোন দিন শেষ হবে না।

অম্বাবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

# বঙ্গবতী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

## শ্রীশ্রদ্ধাতকিরণ বসু

চুঠাৎ একদিন রায়চৌধুরী সাহেবের আগ্রা থেকে ডাক এলো।

অনেক মোহর পাওয়া বাবে কী হিসাবে।

মিসেস রায়চৌধুরী আপত্তি করলো, এই সময়ে কলকাতার এত কাজ ফেলে একেবারে আগ্রা বাওয়া ঠিক হবে না।

রায়চৌধুরী বললে, দেশবন্ধু রত ব্যাট্রিয়ার হিসাবে খুব নাম ছিল জানো। লক্ষ লক্ষ টাকা বোজগার করেছেন তিনি জনৈক। সব কি হাইকোর্ট থেকে? মোটেই না। বেকীর ভাগই বাইরের আদালত থেকে। তুলে অবাক হবে, হাইকোর্টে তিনি কয়েক দফা দোষারোপ করেছেন। পটনা, ভাগলপুর, কটক, দিল্লী কোথায় না কোথায় পেছেন তিনি? আর মুঠো মুঠো টাকা এনেছেন, বিলিয়ে দেবার জন্তে।

পাঁচ দিনের জন্তে আগ্রা। মীরা খরে বললো, ড্যাডি, আমাকে দেখিয়ে আনো তাজমহল।

এক কথায় সাহেব রাজী হয়ে গেল। মেয়েরও থাকবার খরচ পাওয়া বাবে, মেয়ে আমাকে ককি, ওলালটিন ঠিক ঠিক মুখে মুখে দেবে।

আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন থেকে তাজমহলের যে চূড়া দেখা যায়, তাতে মীরা হতশ হয়ে গেল। বলেই ফেললে, এ তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

এক জন গুজরাটী সহবাত্রী বললে, ভিক্টোরিয়া তাজমহলের চতুস্তারার ধারে বৈসতে পারে না।

চতুস্তারা কোন চীজ?

ড্যাডি বুরিয়ে মিলে, চতুস্তারা হচ্ছে চাতাল।

সেই চাতাল দেখাই কি তক্ষণ হল! একি একছুটে বাওয়া যায়? হোটেল পৌছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে ড্যাডিকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হল। সে দিন আর সে রাতটা কেটে গেল। তাজমহল দেখানকার, সেখানেই বইলো। আগ্রার এসেও তাজ দেখা হচ্ছে না এ কথা মনে হ'লে কখনো ভালো ক'রে ঘুম হয়? মীরারই বা ঘুম কি ক'রে হবে?

খুব ভোরে সে উঠলো। ড্যাডিও উঠেছে। কিন্তু মীরার সাহস নেই যে বলে, ড্যাডি, তাজে চলো।

ড্যাডিই বরকে ডেকে কালো, ট্যাক্সি বোলাও। মীরাকে বললে, চলো, তাজটা গেরে আসি।

বেশটি খাওয়া হয়েছে। ওরা বেরোলো। তখনো আকাশটা রক্তা। সূর্য ওঠেনি। আগ্রার শীত-শীত হাওয়া। ঘুমন্ত ব্যক্তি হ' পাশে। তাজমহলের দেশেও এত নোয়া পল্লী! কেউ কেউ উঠে গাঁতন করছে। কেউ বা লোকানের কাপ গুঁড়োচ্ছে। চানা আর ছাতুর দোকান। পাখরের খেলনার দোকান।

তাজের কাছাকাছি আসতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাগান দেখা গেল। মীরার বুক ধুক-ধুক করতে লাগলো। বিশ্ব-বিখ্যাত মমতাজমহলের সমাধির কাছে এসে গেছে। এসে গেল মোটর লাল পাখরের কটকের সামনে, কটকটাই ত একটা ছোট-

খাটো প্রাসাদ। সেইখান থেকে পাঁড়িয়ে খিলানের মাকখান দিয়ে তাজকে প্রথম দর্শন। যেন একটা জমাট কুরাসা, ঘানগড়ীর আকাশ-ছোয়া একটা ছবি, প্রথম সূর্যের আলো প'ড়ে বিরাট-মোস্তর হালা, বহু অভ্র, না ডিমের লাল আভা সাদা খোলা দিয়ে তৈরী একটা জিনিস, যা রোদে এক রকম আর যেখানটা ছায়া পড়েছে, সেখানটা আর এক রকম। এ নাকি কিছুই দেখা হয় নি।

আরো এগোতে হবে। হু' ধারে বাড়িরের সার পার হ'য়ে, পল্লভুলে ভরা কোয়ারা-খোলা চৌবাড়ার ধার দিয়ে পায়ে পায়ে আরো এগোতে হবে সকালবেলার অনেকগুলি বাতীর সঙ্গে।

হু'ধারে সিঁড়ি। নীচে জুতো রেখে এক দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চাতাল। সেই চতুস্তারা। না, সমস্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এ চতুস্তারার কাছে লাগে না। কত কাজ, আর কী মনশ!

ভেতরে স্বরের পর স্বর, দেওয়াল, সীলিং, বাতায়নে কী শিল্প, পাখরের ফুল-পাতা, মণিবসানো কাজে অপূর্ণ।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে হু'টি সমাধি পাশাপাশি, সাজাহান আর মমতাজের। পাখরের বুক বলমলে রামধনু-রক্তের পান্না-চুপি-মরকতের লতা-পাতার আভার চোখ ঠিকরে যায়। ঘুপের ঘোঁরা উজ্জল-আলোর সমাধি-ঢাকা শালের সাজা জরীর কাজ তিনশো বছর আগের সম্রাট-বন্দিতার স্মৃতি শুধু কিরিয়ে আনে না, তিনশো বছর আগের শিল্পীদের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

বাদশার মনে ষেগেছিলো অপূর্ণ সৃষ্টির করন। তার জন্তে রাজকোষের লোহার মরজা খুলে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু শিল্পীরা না থাকলে শ্রমিকরা না এলে সে স্বপ্ন সত্য করতে কে? শিল্পী কি সহজশিল্পী? আজকের উন্নত যুগেও বার জোড়া নেই। শ্রমিক কি সোজা শ্রমিক? ইস্পাতের কেন ছিল না, লোহার লাইন ছিল না, এই সব ভারী ভারী পাথর বার। আকাশের দিকে তুলেছে, আর মিল্লী এমন ক'রে বসিয়েছে যে তিনশো বছর পরেও সে শুধু নড়লো না তা নয়, পথিকের মনে ধারণা ঢুকিয়ে দিতে পারে—যে দিনই সে আশ্রয় সেই দিন এই সৌ্য শেষ হয়েছে। তিনটে শতাব্দীর বড় জল বহুপাত সহ করেছে এই মাখনের বতন প্রাসাদ, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত সামনে পাঁড়িয়ে, ইতিহাস বলে না মিলে।

আরো নীচের তলার কাককাঁধীহীন আসল হু'টি সমাধির দিকে

ভরা আর গেল না। গেল যখনার বিকে, বার নীল এসে তাজমহলের  
আর চার মিনারের ছায়ে কীপছে তিনশো বছর ধরে।

তার পরে ওরা তাজ আর প্রধান কটকের মাঝামাঝি এমন এক  
জায়গায় গিয়ে বসিতে বসলো, যেখান থেকে সমস্ত তাজটা দেখা  
যায়, দেখা যায় সকালের আলো-ছায়ার নব নব রূপে কীপে কীপে  
উঠছে 'কালের কপোতলে এক বিলু নয়নের জল।'

সেইখানে ব'সে সাহেব বললে, সাজাহানকে বাঙালী চিনেছে  
খিলজেলার সাজাহান নাটক থেকে আর তাজমহলকে জেনেছে  
রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এ দুটিই অক্ষর কীর্তি। কিন্তু লর্ড কার্জন  
যার নামে পার্কটাও কলকাতার লোক সহ করতে পারে না, সে না  
থাকলে ভারতবর্ষের অনেক কীর্তি নষ্ট হ'য়ে যেত। শোনো সেই  
কথা। যোগেশ রাজবৎসন ভেঙে পড়লো, তখন ভরতপুরের জাঠেরা  
মাথা তুললো। সেদিন হযত এখানকার বাগানে গোলোশের  
সৌন্দর্যে আরো মুগ্ধ হ'ল, ওরা এসে নষ্ট করলো। তাজের  
বর্ণনার পড়া যায়, রূপের প্রকাশও দরজার ওপর খাঁটি সোনার অপরাধ  
কাজ ছিল, চন্দনকাঠের কাজ করা কত শিল্প ছিল, দেয়ালের গায়ে  
খোদাই করা গোলোশের পাশড়িতে আর তার পাতার এ পিঠে ও পিঠে  
নানান চূর্ণশূল মণি বসানো ছিল, আজ তার কিছুই নেই। সিপাহী  
বিরোধের পর এখানকার জঙ্গল আর দরজা-ভাঙা তাজের এমন  
অবস্থা পড়ায় যে একজন ভাইসরয়ও ঠিক ক'রে বসলো, তাজমহল  
ভেঙে কেলে পাথরগুলো বিক্রি ক'রে দেওয়া থাক। এতই বাজে  
লোক সে। কী সর্বনাশ হয়ে বাচ্ছিলো বোঝো। তাজ বুলায়  
মিশিয়ে বেত, যদি না প্রকাশ পেত, ভাঙার খরচ এত বেশী পড়বে  
যে পাথর বিক্রি ক'রে সে খরচ উঠবে না। এমন সময়ে এলো  
কার্জন। প্রেরিত বিভাগ একটা স্থলী ক'রে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত  
কীর্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে গিলে, আর আইন করে মিলে প্রাচীন  
কীর্তির এক টুকরো পাথর সরানোও অপরাধ। তাই সারনাথ,  
সাঁচীচূর্ণ, রাজগীর, নালন্দার আবিষ্কার হল। লোকে জানতে  
পারলো দশ হাজার ছাত্র পেরেছিলো ছাত্রাবাস আর বিশ্ববিদ্যালয়  
নালন্দার। খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাগুলি পরিষ্কার করা হল,  
ভিক্রুক আর চোরডাকাতের আশ্রয়না আর রইলো না। সমুদ্রের  
মধ্যে এলিক্যান্ডী পাহাড়ের অপূর্ণ মূর্তির সন্ধান হল।

অজ্ঞাতা ইলোরা তার অতীত গৌরব দেখাতে পেলো। সারনাথ  
ব্রিটিশরমের আড়াই হাজার বছর আগেকার অশোকস্তম্ভ তার  
তিন সিংহমূর্তি নিয়ে 'সত্যমেব জয়তে' করতে পেলো আজ। আর  
তাজমহল আবার পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে উঠলো। যা প্রায় কয়েক হতে  
হুসেছিলো। যে ইংরেজ আমাদের শোষণ করছে, সেই ইংরেজই  
আমাদের শির সাহিত্য ইতিহাসের মর্যাদা রাখতে শিখিয়ে গেছে।  
দেশকে কি পরিমাণ ভক্তি করতে হয়, দেশবাসীর কাছে কতটা  
সাহু হতে হয়, সেইটো যদি আমরা ইংরেজের কাছে শিখে নিতে  
পারতুম। সেই ইংরেজের ছেলে লর্ড কার্জন।

এইখানে রায়চৌধুরী সাহেবের দীর্ঘবাস পড়লো। এ কথার  
কিন্তু মীরাও অবাক হ'য়ে গেল। বললে, ড্যাঁজি, আমরা  
ইংরেজের মতন দেশকে আজো ভালোবাসতে জানি না?

সকলে শানি না। হু-চোর-বশজন জানতেন। সেই হু-চোর-বশজনের  
মধ্যে নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, বালগঞ্জের ডিক, কানাইলাল, বিহার

বাল-বীন্দ্রনাথ পড়ে। তাদের জোড়া আবার সারা পৃথিবীর ইতিহাসে  
নেই। কিন্তু জাত হিসাবে ভারতবাসী, জাত হিসাবে ইংরেজ  
যেমন দেশকে ভালোবাসে, দেশের লোককে ঠকার না, দেশের জমত  
সব রকম কষ্ট সহ করতে প্রস্তুত তেমন ভাবে আজো তৈরী হয়নি,  
এ কথা বড়ো হ'য়ে বুঝবে। যখন তোমাকে ইংরেজের মতন  
দেশপ্রেমিত দেখাতে হবে আগামী কালে। আজ ও কথা থাক।

কাউগাছের পাতার পাতার বাতাসের মধুরধ্বনি। মীরা  
বললে, লর্ড কার্জনের খোয়াল হল, কবরের মাথার যে শুল্ক  
আলো ছিল জানা গেল, যেটা চুরি হ'য়ে গেছে, তেমনি একটা আলো  
ওখানে দিতে হবে। হিন্দুস্থানের যেখানে যে কারিগর ছিল ডাকা  
হল। কেউ তেমনটি করবার ভরসা দিতে পারলো না। কার্জন  
খোঁজ নিলো আরব পারস্ত মিশরে মসজিদে মসজিদে যেখানে শুল্ক  
শুল্ক সাবক কালের বাতিদান কোলে। শেষটা অনেক খোঁজার  
পর একরকম আলো তার পছন্দ হল, যা তৈরী করতে পারবে,  
মিশরের মাত্র দুটি কারিগর। ১১০৫ সালে তাদের ওপর ভার  
দেওয়া হল, শেষ করতে লাগলো ছু'বছর। আলো যখন এসে পৌঁছলো,  
কার্জন তখন দেশে চ'লে গেছে। সেখান থেকে জর্ডার হল কোনো  
ছোটলাট ৬টি তাজমহলে টাঙিয়ে দেবে জনসাধারণের সামনে।

১১০১ সালে দশ হাজার লোক জমায়েত হল এই বাগানে। টাটানো  
হল কার্জনের উপহার ঐ আলো যা রাতের পর রাত জ্বলে  
আসছে এক ভাবে—যার দাম দশ হাজার টাকার কম নয়। কার্জন  
নেই, কিন্তু তার শিল্প-প্রীতি, আর দরদের প্রমাণ আজো অক্ষর  
হয়ে আছে, শুধু এখানে নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।  
যোর লেগে গিয়েছিলো যেন মীরাজ চলে। তার পাঁজা সাহেব  
ড্যাঁজিকো কোন দিন এমন ভাবে কথা বলতে দেখিনি। সে মনে  
করত, ড্যাঁজি ভারতবর্ষকে ভালোবাসে না। সে ভালোবাসা যে কত  
গভীর, আজ তা অল্পমান করতে পারলো।

বেলা বেড়ে গেল। হোটলে কিরে রায়-চৌধুরী কাজে চ'লে  
গেল।  
হুপুরে এসে নিয়ে গেল মীরা-কে ইংমাহুদৌলা—নুরজাহানের  
পিতার সমাধি। ওতো পাথর দেখলো না, দেখলো যেন হাতীর  
পাঁতের মূল্য জাক্কা। কোথায় গেল সেই বাসনা-বেগমরা, টাকাকে  
বারা টাকা মনে করতে না, কীতির কাছে সব তুচ্ছ ভাবত।  
আব্রা কোটের মহল-মহলে সেই সব পুরানো স্থিতি কখনো যেন  
হাফাকার তুলছে, কখনো যেন গান গেয়ে উঠছে।

কত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ, কত নাচের হুতুরের বোল, কত  
গান, কত বিষয় উৎসব তিনশো বছর পরেও যেন জেগে আছে,  
যেমন জেগে থাকে পাঁচশো বছর আগে-লেখা কৃত্তিবাসের রামায়ণ,  
চারশো বছর আগে পাওয়া ঐতিহ্যের কীর্তন, বিভাগপতির পদাবলী।  
আর আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধদেবের বাণী আর রাজা  
আশোকের অশোকস্তম্ভ।

আব্রার জ্যোৎস্না, আব্রার যখনকার ধানের জ্যোৎস্না তাকে  
যে বর্ষে তুলে নিয়ে যায়, সে কথা সত্যি। সমস্ত তাজমহল  
তার চার মিনার নিয়ে আকাশ-আড়াল ক'রে পাড়িয়ে আছে,  
যেখানটা তাদের আলো পড়ে, যেখানটা পড়ে না, সব জড়িয়ে

বর্ণনা করা যায় না—এই ভাব জগৎপরে গাড়িয়ে আছে মমতামহলের তাজমহল। এখানে-ওখানে-সেখানে বসে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান মেয়ে-পুরুষ দেখছে ত দেখছেই, তৃপ্তির শের নেই, স্রাবির আভাস নেই। খটখট পুর খটা কাটে, রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়, একা-ওয়াল টাঙ্গা-ওয়াল ট্যাঙ্কি-ওয়ালারা অপেক্ষা করে, বিরক্ত হয় না, তারা জানে, যারা এখানে এমন সময়ে আসে, তারা হুজুগে নয়, অস্ত ধরণের লোক। তাদের ভাবনা অস্ত ধরণের। একটুখানি দেখায় তাদের আশ মেটে না।

চাঁপ ডুবে বাবে। কালো আকাশে অন্ধকার নেমে আসবে। আর সেই জমাত অন্ধকারের মধ্যে খেত পাথরের তাজমহল বহন জলজল করবে শুধু তারার ঝিকিমিকিতে—সেও এক দেখবার জিনিস। তাই দেখতে কত লোক বসে বসে। এখানে তো চোর-ডাকাতের ভয় নেই। সমাধি টুটির ওপরে লর্ড কার্জনবের দেওরা আলো ঝলতে লাগলো।

ওরা দু'জনে উঠলো। উঠলো যেন অনিচ্ছাসহে। বহুনার তীরে তীরে বাঁশি বাজতে লাগলো তাদের। লোকেরা কথা বলতে লাগলো আন্তে। কেউ বা গান গাইতে লাগলো। 'তাজমহল! তাজমহল!'

আজ যারা এসেছে কত দূর দূর থেকে, তারা নিয়ে যাচ্ছে একদিনের শ্রুতি, চিরদিনের সঙ্গর করে। কেউ চিঠিতে জানাবে তার প্রিয় জনকে কী জিনিস দেখে গেল। কেউ মুখে গল্প করবে কিন্তু ভাষা পাবে না, একাঘেয়ে মনে হবে—ভারী শুল্লর, কী চমৎকার! কেউ লিখবে কবিতা, কেউ ভ্রমশকাহিনী। কেউ ছবি ছাপাবে, যে ছবি বলতে গেলে লোকের মুখই হয়ে গেছে তাজমহল না দেখেও।

মীরা কিনলো একটা বড় তাজমহল পিচিশ টাকা দিয়ে, ব্যাটারি দিয়ে তার মধ্যে লাইট জ্বালানো যায়। এই রকম একটা ছোট তাদের কলকাতার বাড়ীতে আছে, যেটা দেখে সে বুঝতে পারত না, কী এমন আশ্চর্য্য জিনিস! তাতে ঢোকবার যে ছোট সরজা দেখেছে, তার কাছে এখানকার বিরাট কটক দেখে প্রথমেই ত ধী হয়ে যাবার কথা! আর এ তাজমহলের পাথর কোথায় পাবে যে বোকায়ে কোন্ পাথরের তৈরী তাজ! শু শু শ্রুতিচিহ্ন। একবার দেখে যাবার পর ওর দিকে চাইলে মনে পড়বে, ঐ তাজ দেখে এসেছি।

পরের দিন। সিকান্দ্রা, কতপুর্বা সিকি-এ-নব মীরার দেখবার ইচ্ছে ছিল না, সে আর একবার তাজ দেখতে চায়।

ওর ড্যাডি বললে, না চলো। সময় কম। সেয়ে নাও।

আবার কবে সুযোগ পাবে, ঠিক নেই।

মাইলের পর মাইল গাড়ী চললো বাঁধানো রাস্তা ধরে। কোথায় পড়ে বইলো আগ্রা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কত গ্রাম কত ভেগাভরের মাঠ পার হ'য়ে কতপুর্বা সিকিতে বহন এলো, মীরা দেখলো লাল পাথরের পালিসঘেরা কোনো দুর্গ নয়, যেন শহর। সেলিম চিহ্নির মনোরম কবরখানা ঘিরে স্রাট আকবরের নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্তে শুধু যেন কোনো মানুষের তৈরী কাজ নয়, মরদানবের কীর্তি। মহলের পর মহল পার হ'য়ে পাঁচতলা পক্ষমহল, আভিনার পর আভিনা পার হ'য়ে হাজার ওপর হাজার ব'লে ঢোকবার কটক—

বৃন্দা সরোয়ালা—আর নীচে ছোট গ্রাম কতপুর্বা সিকি পৃথিবী বিখ্যাত হ'য়ে আছে।

সেই আকবরের শেব সমাধি একেবারে উটো দিকে সিকান্দ্রা—আড়বরহীন কাককাঁধীন মাত্র চার হাত সাধা পাথরের নীচে, ওপরে লাল পাথরের প্রাসাদ আবার চারমিনার নিয়ে—বাত উঠে দূর আঁত্রা দেখা যায়—এই কথাই মনে করিয়ে দেয় রাজা ও রাজ্য কিছুই থাকে না, ইতিহাস শুধু থাকে, পাণ-পুণ্যের বিচার প্রমাণ সবায় তুলে রাখে।

সাজাহান ও আকবরের ভালো-কাজ যেহি ছিল, মন্দ কাজও তেমন কম ছিল না, কিন্তু সব ছাপিয়ে কীর্তি বেটা ছিল, তারই জয়ধ্বজা আজো উড়ছে।

তারা শিল্প দিয়ে গেছে সেশকে। ইংরেজ যেমন ঘিরে গেছে তার সাহিত্য, যে সাহিত্যের মৃত্যু নেই। মীরার ড্যাডি বললে, এ সব কথা বড়ো হ'য়ে বুঝবে।

'সবই বড়ো হ'য়ে'—মীরার কেমন ধারণা লাগে। এখন কি কিছুই বোকা বাবে না? যেটুকু বুঝে, তা কি বোকা নয়? তার তরুণ চোখ মেলে যা দেখছে, সে কি দেখা নয়?

সাহেব বললে, এও দেখা, এও বোকা। দেখা-না-দেখা বোকা-না-বোকার মাঝামাঝি অবস্থা। নইলে তোমাকে আনব কেন? এই দেখা এই বোকা অস্ত রকম হ'য়ে তোমার জীবনে লাড়া জাগাবে বড়ো হলে। যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনশ্রুতি, কিংবা কুন্তিবাসের রামায়ণ, বা মাইকেলের মেঘনাদবধ—এখন একরকম লাগবে, বড়ো হলে দেখবে অস্ত রকম। এও ভালো লাগা, সেও ভালো লাগা, কিন্তু সে ভালো লাগা আরো অনেক গভীর। কেন তা তোমায় বোকাতে পারব না মীরা!

বোকাতে নাই পারা যাক, একথা মীরা বুঝতে পারে, বহুলজ্ঞার মধ্যে বাস করলে পৃথিবীকে ভালো করে দেখবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়, আর সেই সুযোগে জীবনকে বিকশিত করতে যে সাহায্য করে, এ কে না জানে? মন চলে যায় অনেক উচ্চত, নীচুতলার ছোট মনের অন্ধকার সেখানে জমতে পার না। সেই আবহাওয়াটা যে পাচ্ছে এখন সে বুঝতে পারলো।

তাঁট গয়া ঠেপেয়ে আসবার সময়ে কাঁথির পিসিমার কালো পাথরের বাসনগুলির কথা, গদেখরীর কথা বহন মনে পড়লো, তখন চেয়ে দেখলো অনেক অনেক পাহাড়, কিন্তু কুচুকে কালো নয়। দূরে ব্রহ্মবানি পাহাড়, ঠেগনের কাছে বামশিলা পাহাড় শুধু দেখতে পেলে, ড্যাডিকে নাম জিগেস ক'রে। বুধগরার মন্দির দেখা গেল না, দেখতে ইচ্ছে ছিল। সে নাকি অনেক দূরে নিরঞ্জন নদীতীরে।

কিন্তু ঠেগন পার হ'য়েই গেলে বস্ত নদী, তার কূলে আবার পাহাড়ের মালা।

তারপর কী জঙ্গল, কী জঙ্গল, বাঘখাকার জঙ্গল।

শ্রদ্ধাভির টানল সে তুলবে না, ঠেপে হুকতেই কামরার হুটুটে অন্ধকার দিনের বেশা।

ঘ্রাণকর্ড লাইন। এরিকেও কত কি দেখবার জিনিস। শোণ-জীর্ণ—বালি, বালি, বালি, জল, বালি, বালি, বালি, দুয়ের মতন সালা ভেঙেখালানো বালি। কতকাল, কতকাল ধরে।

আর বিকেলে কি পেলো ? সে কি ভাবতে পেরেছিলো এ পথে পাবে ! এমন আশ্চর্য্য ভাবে ? অপ্রত্যাশিত ?

ড্যাডি, ওটা কি, পাহাড় নয়, বেন যেখ করেছো আকাশ জুড়ে !

ড্যাডি একটু ইয়েকো করলার কঁকিরে বললে, পরশনাথ ছিল !

পরশনাথ ? ঐ পরশনাথ ? চার হাজার বছর আগে সাধু

পরশনাথ বেখানে তপস্বী করেছিলেন ? যেখ জমে আছে বার কোলে কোলে । মাথার ওপরের মন্দির কখনো দেখা যায়, কখনো যায় না । নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত গহন গভীর অরণ্য । তৌপ-টাচিলের কোথার রইলো দেখা গেল না ।

পরশনাথ লাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলে । ঠেঁশনের পর ঠেঁশন পার হয়ে যায়, গ্র্যাণ্ড ট্র্যাক রোড একে-বকে যায়, ইস্ত্রি, পরশনাথ ঠেঁশন কখন চলে গেছে, গোমো জশন পার হ'য়ে গেল, তবু পরশনাথ পাহাড় শেষ হয় না, দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি ছড়ানো, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার গায়ে পাহাড়, হঠাৎ আগেকার বাংলার ভ্রামল প্রান্তরে কবে মাথা তুলেছিলো, এখন পড়েছে বেহায়ে । এখানে যদি একজন গুরু সমবয়সী বান্ধবী থাকত তবে কত কথাই মীরা কইত ! কত কথাই তার মনে আসত ! ড্যাডির কাছে শু বলা যায় না । ড্যাডি এলিকে মোটেই না চেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছে । পরশনাথ দেখার তার কোনো আগ্রহই নেই ।

জীবনটা যদি শুধু এমনি হত—শুধু চলা আর চলা—বাক্য বলে পাহাড়, বাধাবর, দেশে-দেশে নিত্যনতুন ছবি দেখতে দেখতে খালি এগিয়ে চলা—কিরে না আসা, ভগবানের সৃষ্টি, মায়ুষের সৃষ্টি ক্রোধ ভাবে দেখা আর মনে রাখা, তাহ'লে কি এমন মন্ব হ'ত ? কিন্তু তা ত' হয় না ! খামতে হয় । কাজ করতে হয় । অক-হুঃখ ভোগ করতে হয় । ঘরে থাকতে হয়, সমাজে বাস করতে হয় ।

ইহার চেয়ে হেতম যদি আরও বেতুইন,

চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন ।

কবি বলেছেন । কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে উটের পিঠে যে নিষ্ঠুর মরুভাঙাত বেতুইন যায়, তার বাওরাটা সত্যি কিন্তু মনের মধ্যে কি আর কবির মতন ভাব আসে ?

সে কি উপভোগ করতে পারে এই ঘুরার ঝড় উড়িয়ে বাওরার দাবীনতার আনন্দকে ? কি ক'রে পারবে ?

পরশনাথ যখন পার চল, তখন 'ত' গাড়ীর সমস্ত বাড়ী অস্ত্র দিকে চেয়ে অস্ত্র কথা ভাবতে ভাবতে চলে এলো । তারা ত পাহাণ অশিক্ষিত বাড়ী নয়, কার্ট স্কানের ধনী ও মাঝিষ্ঠিত্তির বাড়ী ! চার হাজার বছর আগের দিনে তাদের কেউ ত' কির দল না ।

স্বর্গবার পার হ'য়ে ছোট-বড়ো অসংখ্য বাড়ী, এখন হরত লোকে ষ্ট্রী । সমুদ্রের টেউ-এর সোনালী বাসিতে লুটিয়ে পড়ার বিরাম নেই, ই অপ্রান্ত ক্রমাল কত দিন শোনেনি মীরা !

তার বাবার ঊনাকার কাজ যদি শেষ হ'য়ে যায়, তাহ'লে হরত শেষ বাড়ীতে কিরে যাবে । আর পুরীতে থাকবার কোনো কারও হবে না, প্রতিষ্ঠাও হবে না । সেদিন কি হবে মীরার ? কি আর কিরে বেতে পারবে না, কিরে বেতে পারে না তার বনের জমজুমিতে ? চিরপরিচিত সমুদ্র-হাওরার দেশে, কলকাতার র নাম দখিন দ্বাওরা ?

অন্ত ভাবতে পারা যায় না । তার মনে হয়—

ভেসে বাক জীবন-তরী

ভেসে বাক অর্থে গাঙে

দেখা বাক, কোথার বা কুল

গড়ে, আর কোথার ভাঙে ।

পথে সেমোনেড, খাবার ইচ্ছে হয়েছিলো । কোথাও পেলো না আইসক্রীম সোডা, ভিনেটো, কোকাকোলা আছে, সেমোনেড, নেই ।

কিন্তু কলকাতার ? তুমি বা চাও ।

আবার সেই বাণিগজ সাকুলার রোড, বেনিপার্ক, কাঁখি সিনিমা ।

আবার সেই অফুরন্ত আয়াম । বোম-লাগানো নেই, ট্রো ছেড়ে বাবার ভর নেই, অনিয়ম নেই । নতুন নতুন জিনিস দেখা আগ্রহের মধ্যে শরীরের ওপর যে অত্যাচার হ'য়ে যায় অজান্তে, স্বাস্থ্যকে চেপে রাখবার যে পরিশ্রম হয় মনের অগোচরে এখানে সে সব কিছুই নেই, বাড়ির কাঁটার মাথা নিশ্চিত জীবনহারা ।

আউটরাম বুক গলার বকের ওপর ভাসুছে, সমস্ত হোটেলটা । মুহূ তরঙ্গে আন্তে আন্তে দুলাছে সন্ধ্যার অন্তরাগের সামনে । কে'ক আর শ্রাণ্ডউইচএ কামড় দিতে দিতে শহরের মাটি ছেড়ে জলের ওপর বসে থাকার একটা অল্পকৃতি শুধু শহরের মাথুথাকেই বাড়িয়ে তোলে ।

ডাইনিং টেবলে বসে যে জিনিস যেমন লাগে, তাই জার্মান সিলভারের টিকিন কার্যরতারে ক'রে ভ'য়ে নিয়ে বিবেকানন্দ ব্রোজের মাঝখানে ব'সে খেলে আরো ভালো লাগবার কথা ।

আর একটা জায়গা ঢাকুরিয়া লেক । হুগও অনেক আছে । চিন্তাও নাকি খুব সুলভ । কিন্তু তার পাড়ে কি এমন দূর্ভাবাস বিছানো ? এমন বেঞ্চি পাতা ? এমন ইলেক্ট্রিক আলো ? সাপ নেই, ডাকাত নেই, এমন নিরাপদ জায়গা কি সে ?

সেইখানে ছুলের বন্ধুর সঙ্গে এসে বাসের ওপরেই ও বসলো । আজ ক্রক ছেড়ে শাড়ী পড়েছে, বাসের রঙের জ্যেষ্ঠ শাড়ী, বাসে বসতেই ভালো লাগছে । ময়লা হবে ? কাটাতো হবে ? হোক না ! এমনি ত' লুটিয়ে চলতে হয়, শাড়ীর পাড় মাটিতে ঠেকাই ক্যানশন ।

হু'জনেই চুপ ক'রে বসেছিলো জলের দিকে চেয়ে । চারি ধারে কত লোক দূর-কাছে ব'সে আছে ।

হঠাৎ একজনের গলা গুরু কানে এলো—এখানে খুঁজে খুঁজে এসেছেন আমাকে ধরতে, বিকেল বেলা এসে বসি ব'লে ? প্রকাশকদের অসাম্য কিছু নেই ।

মীরা চেয়ে দেখলো সেই লেখক, হুড়তে ছবিতে বার দেখা ।

—এবারে আমার বই নয়, ঐ লেখকের বই-ই নিন, ভালো লেখা, চমৎকার লেখা ! আমি ত পর-পর অনেকগুলি বই নিলাম আপনাদের । এবার একঘেয়ে লাগবে বাচ্চাদের । তাদের হুখ বলাতে দিন । যে লেখক তাবে, আমি ছাড়া আর কারুর লিখে কাজ নেই, যে অস্ত্র লেখককে পুষ দিতে চায় না, সে লেখক হবার অযোগ্য । ভগবানের আশীর্বাদ সে পার না । ভগবান বিশেষ ভণ দিয়ে লেখকদের পৃথিবীতে পাঠান দেখবার জন্যে, সমস্ত লোকের চেয়ে তার বন উচু কি না । যদি দেখেন, না উচু নয়, তাহ'লে তিনি

কমা করেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি। সকলকে কমা করেন, লেখককে করেন না। এই আমার বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস কুসংস্কারও হতে পারে ত ?

আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি উঠি। এই বড়ো মনের লজ্জা মাইকেল মধুসূদন মহাকবি। এই বড়ো মনের লজ্জাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। এই বড়ো মন নিয়েই কাজ করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। ছোট মন নিয়ে বড়ো লেখক হওয়া যায় না। আপনি এবারের বইয়ে অল্প আর এক জনকে সুযোগ দিলে সত্যি আমি খুশী হব। আর শুধু, যখন তখন আমার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করবেন না। যখন লিখি, তখন দেখা করি না। দেখা করলে চিন্তার জাল ভিড়ে যায়, সহজে আর বোড়া লাগে না। এইজন্তে দেখবেন, অনেক লেখক যারা একতলা কি পোতলার ফ্ল্যাটে বাস করেন, সোজা বাঁদের ঘরে ঢোকা যায়, তাঁরা জীকে বলে রাখেন বাইরে থেকে শেকল টেনে দিতে আর একটু মিছে কথা বলতে, বাবু বাড়ী নেই। দু'শোখানা বই লিখলেও আমাদের দেশের লেখকদের দুঃখ ঘোচে'না। তাঁদের একটা বই অন্ততঃ এমন স্মৃতি করতে দিন, যাতে নাম থেকে যাবে। লেখার সময়ে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তাই তাঁদের কাছে মূল্যবান। আর একটু স্বতন্ত্র থাকতে চান ব'লে লোক তাঁদের ভাবে অহঙ্কারী।

জোরে জোরে পা ফেলে মীরা তার লেখককে অদৃষ্ট হ'তে দেখলো। মীরা ভাবলো, কত বই ত' লেখা হচ্ছে, সব কি স্থায়ী হচ্ছে? বিক্রী হয়ত অনেক বই হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি কি কপালকুণ্ডলা, ঠাকুরমার ঝুলি, গীতাঞ্জলি, পথের দাবী হ'য়ে থাকছে? লেখক-মাত্রেই কি গর্ব করা সাজে? কত গান ত' লেখা হয়, বেশ মাতরস, জনগণমন কি আর কেউ লিখতে পেরেছে? আবার ফুলের মিস মিত্রের কাছে শুনেছে, তার জ্যোতিষায়ের সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পর্কে এমন পাতুলিপি লেখা আছে যে প্রকাশ হলে হৈটে পড়ে যেত। তা ব'য়ে গেল অন্ধকারে।

সন্ধ্যার পর ও বাড়ী ফিরলো বন্ধুর গাড়ীতেই। দেখে, ওদের সামনের বাড়ী মি: রায়ের বাড়ীর করিডোরে ভীষণ গোলমাল। বায় সাহেব বলছে গেট আউট। আর একজন যুবক বলছে, সেজনা, চোখ রাঙিয়ে না। আমাদের পৈত্রিক বিবর আমাদের বৃকিরে দাও। তুমি সবটা গ্রাস করে ব'সে আছ।

তার জন্তে কোর্ট খোলা আছে।

কোর্ট বাবার মত আমাদের অবস্থা নয় ব'লেই তুমি আমাদের ক'ভাইকে ঠাকবে? মাথার ওপরে কি ধ্বংস নেই?

ড্যাম ইয়োর থিং। গেট আউট আই সে।

তবু লোকটা ঠাঁড়িয়ে থাকে, কটকের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে। আর বলে, সেজনা—তখনো অন্ধ নয়।

সু সু সু শব্দ হয়, প্রকাণ্ড বুলডগটা চেন টানতে টানতে বনবন শব্দ করে চক্ষুর নিম্নে বাঁপিয়ে পড়ে লোকটির গায়ে, কাদের ওপর হু'পা তুলে দিয়ে বাঘের মতন ঢোকো সাধা মুখটা মুখের কাছে নিয়ে এসে জিত বার করে ভ্যাচাতে থাকে। তখন ওর গলা থেকে কান্নার স্বর বেরিয়ে আসে, সেজনা, সে বেন একটা আর্ডিনার।

তার পরেই এসে পড়ে বার মাটিতে। বুলডগটা তার বুকের

ওপর ঠাঁড়ায়। তবুশি বায়সাহেব নেপালী দায়েরদানকে বলে, কটক বনু কর দেও। জলদি।

সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতি লোক পানওয়ালা বিড়িওলা ফুল-কলমের ছাত্র ভিড় জমিয়ে তোলে। কটকের এখানে চেঁচামেচি স্বক হয়।

মীরারও গলা শুকিয়ে গেল। ছুটে গিয়ে ড্যাডিকে সব কথা বলতে চায়, বোঝাতে পারে না। বলে, বাঁপিয়ে কোন—পুলিশ।

এই বায়সাহেব লোকটার কী অহঙ্কার মীরার মনে পড়ে। তার মেয়ে পলি যখন-তখন এসে গল্প করে—বাঁপীর তিন হাজার টাকা মাইনে। অথচ মাসে পাঁচ হাজার টাকা সংসার খরচ।

মীরার জিগেস করতে ইচ্ছে করে, বাকী দু'হাজার কোথা থেকে আসে? সোটা কি ঘু?

পলির কেবলই চালের কথা। তার মাইরার জড়োরার স্টুট, হীরের স্টুট, সোনার তিন স্টুট গয়নার কথা।

এদিকে মাইরার চেহারা ত' একটি পেট্রী। বায়সাহেব সব সভার খিরেটারে ঐ বৌকে মিরে বায়। মেয়েও মায়ের মতন। বায়সাহেব ভাবে, মেয়ে'বৌকে সব জায়গায় নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যদি কোনো বড় চাকরের নজর পড়ে বায় পলির ওপর, আর সে তার জমাই হ'য়ে বায়। তিন হাজার টাকা মাইনের শতরের লোভে। হায়-রে হায়, কেউ ওদের খিরেও দেখে না ব'লে পাড়ার মহিলা-মহলে কত হাসাহাসি। বারা হাসাহাসি করে তারিও যে সব অঙ্গুরী তা নয়। মীরাই বরং তাদের কাছে পরী। কিন্তু সে এ সব আলোচনার কক্ষণো বেগ দেয় না।

আর এত যে চাল দেয় পলি, তবে ওর পড়ার মাষ্টার কেন সেদিন ওর বাঁপীর মোটরের কাছে এসে বলছিলো—গত মাসের মাইনেটা আজ পাব? এ মাসও ত' শেষ হ'য়ে এল।

না দেখুন, আমাদের বড়ো কষ্ট। এম, এসসি পাশ করে শুণু টিউশনিতেই সন্সার চালাই। ফুড়ি টাকা আপনি দেন, তা সাত টাকা খরচ হয়ে বারো বাসে। হিসাব করে দেখুন।

হিসাব করার দয়কার নেই। আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, আপনার অসুবিধে হলে ঢের মাষ্টার খোঁজাবি করছে।

এম, এসসি কাঠ'ব্লাস?

হ্যাঁ হ্যাঁ এম, এসসি কাঠ'ব্লাস।

গাড়ী ছেড়ে দিলো।

ফুলের বাসে উঠতে উঠতে মীরা ভাবতে লাগলো, বায়সাহেব লোকটা শুনেছে হু'বার বিএ ফেল করে তিন বারের বার পাশ করেছে আর এল-এলবি পাশ করেছে ফেল করতে করতে। ঘটনাচক্রে আজ মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে বরাটাকেই সরা ভাবছে। কাঠ'ব্লাস এম, এসসির মূল্য ও কি বুঝবে ফেল করা লোকটা।

আর মামমি সেদিন বলছিলো, মাকে ও খেতে দেয় না। ভায়েদের যে ত্যাগ করেছে, ঠাকোছে, সে তো আজই দেখা গেল।

আব্দুল্লাহ এলো। ভাইয়ের অজান নেহটা লোকজনকে দিয়ে ও তুলে দিলে আব্দুল্লাহ কানে।

কেউ বললে, কুহু কামড়ছে। কেউ বললে, ধাক্কা দি। হাসপাতালে নিয়ে গেল ইন্সপেকশন দিতে।



এখানেই তো কোনো ভাঙার ঢাকা নেই। বাইরের লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কেউ বললে মার শালাকে।

কুকুটটা বাঘের মতন ডাকতে লাগলো। ঐ কুকুটকে নাকি ঘোজ কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হয়।

আহা, লোকটার কি হল ভেবে মীরার ঘুম এলো না সে রাতে। তার ড্যাভি মাংসিহ কিছু কোনো চিন্তাই নেই। এ যেন একটা ঘটনাই নয়।

মীরার মনে কিন্তু এ ঘটনাটা বৃহৎ বীভৎস হ'য়ে দেখা গিলো, নিজের ভাইয়ের দিকে বুলুগুপ লেগিয়ে দেওয়া। যে নাকি টুটি টিপে ছিড়ে নিতে পারে ঢেকের নিমেষে। মাছুর এত নিষ্ঠুর ও হতে পারে? এত পাভী! আহুক পলি বায়, তাকে সে আছা! করে শুনিতে দেবে—তোমরা কি মাছুর?

পরদিন একটা কাণ্ড হল। কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট কলকাতার আসরে শুনে খুব ভোরে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল রায়গাহেব। দমদম এরোড্রোমে।

কিরে এলো হাড়িপান্না মুখ করে। ওয় ভাইভার মীরাসের ভাইভাসের কাছে গল্প করেছে, সে বলেছে আয়াকে, আয়া বলেছে মীরাকে—সাহেবকে নাকি এরোড্রোমে ঢুকতে দেয়নি। বলেছে, তুমি কংগ্রেসের কে?

সে যে মালা নিয়ে গেছিলো, তা নিয়ে কিরে আসতে হয়েছে। পরীক্ষক এক পরলা দেয় না, আট টাকা মালায় খরচ করেছে।

কিছুক্ষণ পরে আর একটা খবর এলো। পৃথিবীতে এত অবতনও ঘটে। বড়ো ভাইকে একটা কড়া চিঠি লিখে নাম-সই করতে গিয়ে রায়গাহেব পড়েছে আর হয়েছে।

শ্রুতাসিন্ধু। উনবাট বছর বয়সে। এত লালালালিক, এত ঠীকাঠীকি। সব শেষ।

তবুও পাড়ার বুঝাঠী, বানানঠী, বোস, ঘোষ, মিটারদের চৈতন্য হয় না। যিচি বোডের চকারবোটি বলে, আশী বছর আমার লজ্জিভিটি। লজ্জিভিটি। অত দিন বাচবে ঐ মাতাল। মীরার হাসি পায় ড্যাভির বন্ধুদের কথা শুনে। আশী বছর বাঁচতে হ'লে সায়দী হ'তে হবে না? অমনি হবে?

কাঁধির দিহুর কাছে সে শুনেছে—সময় পূর্ণ হ'লে সবকিছুই পাণের কল ভোগ করতে হয়। নিজস্ব কাঁধর নেই।

পলিদের বাড়ী থেকে কিন্তু কোনো কালার আওয়াজ এলো না। এসব পাড়ার ওসব চলেবে না। মীরার মনে হল—পৃথিবী থেকে একটা শাপ ম'রে গেল। কিন্তু তাহাতেই কি পৃথিবী হাভা হল? এই বরসেই ও দেখেছে—পাপীর সংখ্যা অত্যন্ত, অসংখ্য। ভালো মানুষের সংখ্যাই বা কম।

মুসে মীরা ডাবি রাসে যন দিয়ে ছবি আঁকত। কাগজে একদিন খবর পড়লো—দিল্লীতে ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে—ছোট ছেলে-মেয়েদের কাঁচা হাঁতের ছবির।

ও তো একখানা পাঠির দিলে—সময়ে সুখোদয়। যেমন দেখেছে, তেমনই মনে করে করে। প্রাণ ভরে ও আঁকলো সমুদ্রের ছবি, নীল, সবুজ, সাদা বেগুনী নানা রঙ দিয়ে দিয়ে। মনে হল—ডেউতলা একটার পর একটা যেন ডাকছে, কোন্সোটা আহুড় পড়ছে বাসির

ছবি পাঠিরে ও বিশের ভালো হল আশা করেনি। কি করেই বা করবে? সাতা ভাবতবর্ষের কত জাহগা থেকে কত ছবি আসবে। সেখানে মীরার সমুদ্রে সুখোদয় কি পাতা পাবে?

চিঠি এলো একদিন দিল্লী থেকে—তুমি একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছ। ঢেক নেবে, না নগর নেবে লেখো।

আনন্দ হল খুব। মান্নমিকে ডাভিকে চিঠি দেখালো। তাতাও উৎসাহ দিলো—কাজ করতেছ একখানা।

কিন্তু টাকটা সে কি করবে? কি কিনলে তার খুব আনন্দ হয়? রঙের বাস্তু? ক্যামেরা? বর্ণাকলস?

দামী কলার বস্ত্র তার আছে। বোসোশো! টাকার ক্যামেরা বাড়ীতেই আছে। পার্কার ত ক'টাই আছে।

কিন্তু এ তার নিজস্ব টাকায়। জীবনের প্রথম প্রাইজ।

চিঠি এলো হাংলো প্যাংলার—দিদি, আমাদের জামা নেই, জুতো নেই, প্যাক নেই। তুমি কি এবার পুজোর একটা কিছু দিতে পারো না? বাবার চাকরী থাকবে না। বাবা কোথা থেকে দেবেন? আমরা দেশের বাড়ীতে কিরে বাছি। কি হবে জানি না।

স্নেহের ভাইটি হেলু আর পেলু—আমার প্রাইজ পাত্তা একশো টাকা তোমাদের পাঠাছি পুজোর আগে। কিনেদের পছন্দ মতন মাপ-মতন প্যাট-জুতো-জামা কিনে বহি কিছু থাকে বাবার হাতে দিয়ে। ইতি—তোমাদের মিথো-দিদি।

এ চিঠি লিখে ওর মন বা খুদী হল, বলবার নয়। কিন্তু এত কথা ও কোথেকে শিখলো? বিশেষ করে মিথো-দিদি। মানে বুধাই ও দিদি হজ্জছে যে ভাইয়েরে কিছু করতে পারে না।

[ক্রমশঃ]

## মিনির প্রতি কাবুলিওয়াল

### বুমকি মুখেপাখ্যায়

বিশাল আমার দেহের ভিতর বত গভীর স্নেহ আছে, বাংলা দেশের ক্ষুদ্রে মেয়ে টেনে নিলে তোমার কাছে। ছোট হাতের বাঁশপা-ছাপ লুকানো আছে বুকের মাঝে, “আবার কবে আসবে বাবা?” সেই কথাটি মনে বাজে। সেই যে আমার সোনার মেয়ে শুধিয়েছিল হাতটি ধরে, অরাক হয়ে তাহেই দেখি তোমার কথা গানের সুরে। পাঁচ বছরের ছোট মিনি জান কত স্নেহের বাহু, বুখখানি যে ফুলের মত কথা তোমার ভরা মধু। বুলি ভরা এততো বালাম সব এনেছি তোমার তরে, তার বললে মিঠি কথাই নিও আমার হৃদয় ভরে। তোমার বুকের হাসির লাম আমার কাছে লুক টাকা, দেখলে পরে এত খুসি হই বায় না তাহার লেখাজোকা বাছি কিরে জেলের থেকে আটটি বছর গেছে চলে, চিনতে পেরে আবার কি-গো আসবে তুমি আমার কোলে তোমার কথা তোমার হাসি তোমার/চোখের চাহনিতে, পারে কেসে এসেছি বুবে তাহেই কাঁচ চাই যে পোতে।





কস্তুরমারী

—সোখিকলাল দাস

জলকলী

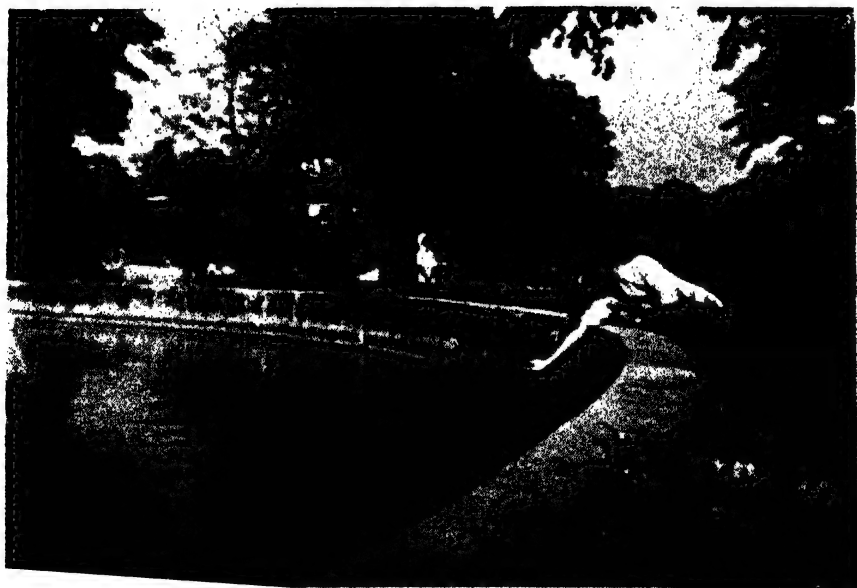


উলুবাহার

—মজিবকুমার মিত্র

## ॥ আলোক চিত্র ॥

—কুমারী বালক





খেলার মাঠে

—বিদ্যাসূক্ত সন্দিকার

পুকুর-ঘাটে

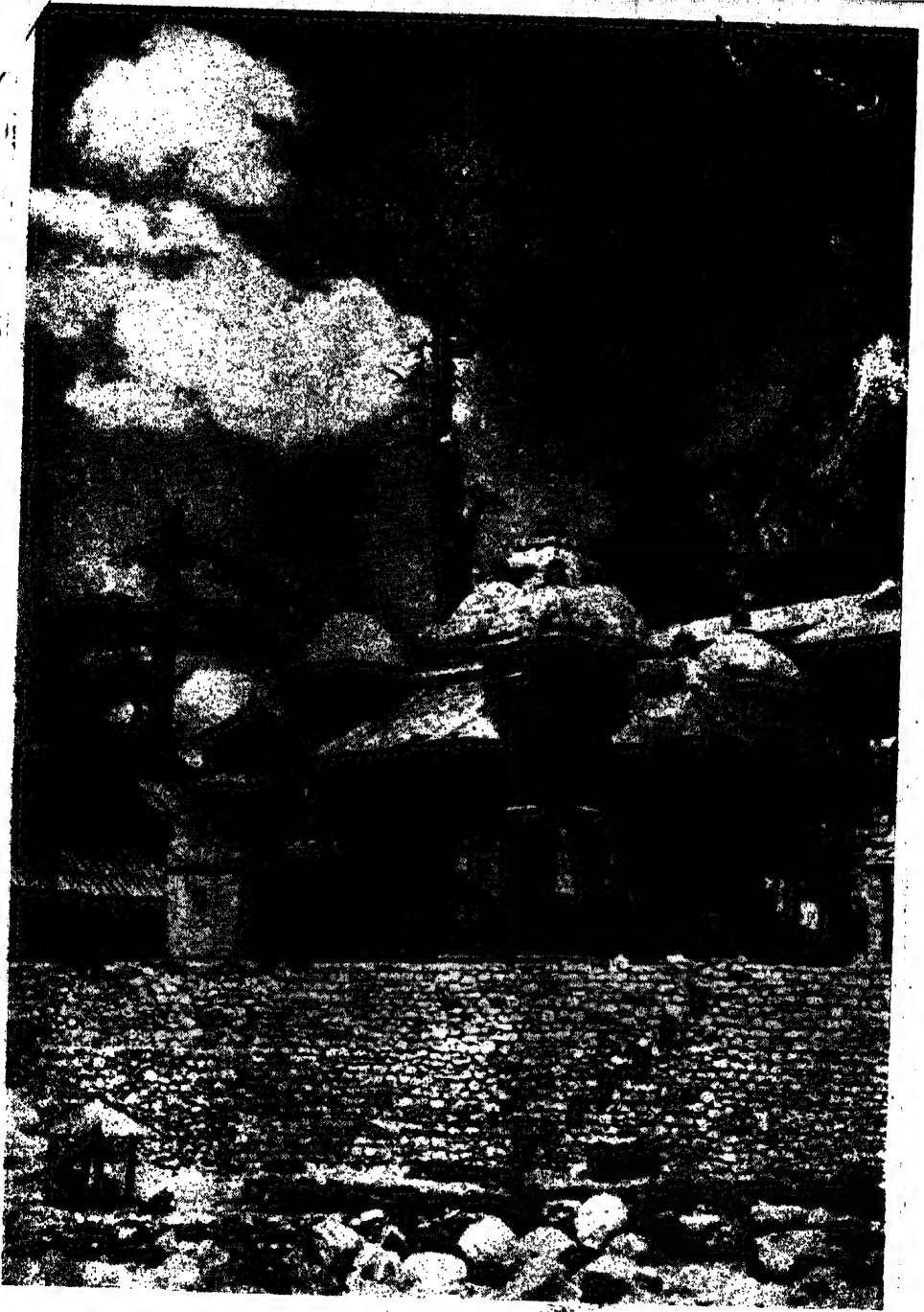
—আবদুল হক



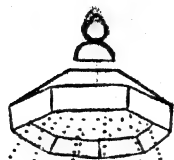


সহযাত্রী

—গোবিন্দ দাস



গঙ্গাসেবীর মন্দির (গঙ্গাজো)



নিম্ন তৈল থেকে  
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে  
প্রস্তুত সুগন্ধি  
মার্গো সোপের প্রচুর  
ফেনা যেমন  
নির্মলকর তেমনি  
জীবাণুনাশক।  
মার্গো সোপ দেহের  
কাস্তি উজ্জ্বল করে।  
কোমল ত্বকের  
পক্ষেও ব্যবহার করা  
সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্নানের সময়

ব্যবহার করতে ভুলবেন না



**মার্গো**  
**সোপ**

ক্যালকাটা কেমিক্যাল  
কোম্পানি লিমিটেড  
কলিকাতা ২২



CHC-S BEN

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ণ প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

তিন

পূর্ণরূপেও সারদা দেবীর এক অপরূপ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর আশীশব কাহিনী বা আমরা ঠাকুরের জীবনলা পর্বাত জানতে পারি। তার থেকে তাঁকে আমরা স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, সেবাময়ী, কষ্ট, ভগিনী, জায়া ও মাতারূপেই কল্পনা করতে পারি। সলজ্জ অবতরনবতী একান্ত বাসি-নির্ভরশীল ভক্তিমতী স্ত্রী বলেও ভাবতে পারি, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে এরকম গুরুপতীর জ্ঞানদাত্রী, ধর্মদাত্রী, ভক্তমূর্তি লুপিয়ে আছে, বলনাত করতে পারি না।

ভবিষ্যৎদর্শী ঠাকুর কিন্তু তা জানতেন। সেজন্তই তিনি বলে গেছেন, 'সারদা জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী। ও এবার রূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।' সারদা দেবীকেও তিনি বলেছিলেন, 'সেখ গো কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার মতই কিলবিল করছে। ওদের 'কিন্তু তুমি দেখো।'

বিস্মিতা সারদা দেবী বলেছিলেন, 'সে কি গো! আমি যে মেয়েদায়ব! আমি আবার তা কি করে পারবো?'

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আর কতটুকু করেছি? তোমাকে তো এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।'

ঠাকুরের এসব বাণী পরিহাসস্বে বলে কথা ছিল না। সারদা দেবীর জীবনে তা যে কি ভাবে কল গিয়েছিল, তা তার পরবর্তী জীবনকাহিনীর সঙ্গে বীরাই পরিচিত আছেন, তাঁরাই জানেন।

ঠাকুরের জীবনশ্রায় সারদা দেবী কিন্তু অধিকাংশ সময় অবগতিভা ভাবেই কাটাতে। ভক্তদের সঙ্গে যে তাঁর খুব একটা নিকটতম সম্পর্ক বা যনিষ্ঠতা ঘটেছিল, এখন জানা যায় না। ঠাকুরের সেহাবদানের পরই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁকে আমরা সর্বপ্রথম গুরুরূপে দেখতে পাই।

বৃন্দাবন থাকাকালে এক দিন মাকি তিনি স্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে আদেশ পান, ঠাকুরেরই তত্ত্ব বোগেনকে দীক্ষা দিতে হবে।

'বোগেনকে আমি দীক্ষা দিই নি তুমিই তাকে দীক্ষা দিও' ঠাকুরের

এই আদেশে বিব্রত বোধ কীভাবে সারদা দেবী। প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে, 'আমি যে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না সো, দীক্ষা কি করে দেবো? আর বোগেনের স্বরূপেও তো কোন দিন বেদ হইনি, লক্ষ্য করবে বা?'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'মন্ত্র বা সেবে সময়ে আমিই বলে দেবো। আর বোগেনকে লক্ষ্য কিসের? বোগেনমাকে না হয় তাহলে সঙ্গেই রেখো।'

বোগেনকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হবার আর উপায় হইল না। কাজেই সারদা দেবী বোগেনকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, সে পূর্ণদীক্ষিত কি না এবং দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে তার কি মত। বোগেন জানালে। সে এবারও দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি। ঠাকুরের কাছেই তার দীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্নে সে ঠাকুরের আদেশ পেয়েছে সারদা মায়ের কাছেই দীক্ষিত হতে। কাজেই মা যদি হয় করে তাকে দীক্ষা দেন তার মনোরথ পূর্ণ হয়।

বোগেনের এ উত্তরে সারদা দেবী স্তম্ভিত। ঠাকুরের দীক্ষা বুঝতে বাকী থাকে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত বোগেনকে দীক্ষা দেওয়াই স্থির করলেন তিনি। মন্ত্রতন্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু ভর কি? ঠাকুরই তো বলেছেন, বধাকালে শিখিয়ে দেবেন।

দীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে বোগেনকে তিনি ডেকে পাঠালেন ব্রানান্তে তৈরী হয়ে আসতে। নিজেও ব্রানান্তে ঠাকুরের সেহাবশেষ বক্ষিত কোটাটি নিয়ে ঠাকুরের ছবির কাছে এসে আসন পেতে বসলেন কিছু ফুল নিয়ে। সাথে হইলো বোগিনমা, তাঁরই একজন স্ত্রীভক্ত।

বোগেন এসে তার জন্ত বিছানো নির্দিষ্ট আসনটিতে মায়ের সম্মুখে বসলো। সারদা দেবী ধ্যানস্থ হলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ধ্যানই তিনি মন্ত্র পেলেন বা নাকি বোগেনকে দিতে হবে। বোগেনের কানে মন্ত্র বলতে গিয়ে তিনি এমন চট্টিয়ে ভঠেন যে, বাইরে বাবা ছিল পরিচার শুভতে পেল সে মন্ত্র। অচ্য সারদা দেবী কিন্তু অত্যন্ত মুহূর্তাবিশী ছিলেন। অত জোরে শব্দ করে কথা বলতে কেউ তাকে কোন দিন শোনে নি। ভাবের ঘোরেই ঐ রকম হয়েছিল।

বোগেনের দীক্ষাদান থেকেই সারদামায়ের জীবনে দীক্ষাদান ব্রতের সূত্র। তাপপর তাঁর এ ব্রত যে কত দিন ধরে কত অগণিত ভক্তদের কল্যাণ সাধন করেছে তার যেন কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দীক্ষাদান সময়ে সারদা দেবীর সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ হ'ত। সে যেন এক অস্তিত্ববী দেবীমূর্তি। প্রচন্ড তক্তিতে ও বিশ্বাসে অন্তর যেন হুইয়ে পড়তো। তাঁর সলা-প্রশান্ত হাতময়ী আননে এক গাভীধীর চাপ পড়তো। এ সারদা দেবী যেন সে সারদা দেবীই ন'ন, বাকে সকলে সর্বসময় দেখে। এ যেন নতুন অস্ত্র কেহ! কিন্তু দীক্ষাদান ব্রতের আবার অতি সহজ অতি পরিচিত আনন্দময়ী কল্যাণময়ী মাতৃরূপখানি তাঁর প্রকাশ পেতো।

ওক হিসাবে সারদা দেবীর দীক্ষাদান প্রণালীটিও অস্পষ্ট ছিল। হান কাল, জাতি, বর্ণ এসবের কোন বিচার ছিল না, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে অষ্টাঠানটি হ'ত। কোন বাধা-নিষেধের প্রচীতির ভিত্তিতে ভক্তিসম্পন্ন ভক্তকে তাঁর কাছে আসতে হত না। তাদের জন্ত তাঁর লজ্জা সর্বদাই অব্যাহত ছিল। ঠাকুরের একখানা ছবির সম্মুখে সামান্য কিছু ফুল ও পুকার উপচার দিয়েই তিনি দীক্ষা দিতে বসতেন। সময়ে আবার কোন উপচারেও প্রয়োজন

হত না। প্রথম মেমন, তখন তেমন, বাক তেমন, ভাক তেমন, সেখানে যেমন, সেখানে তেমন—ঐরা প্রচলিত এই নীতিবাক্যই তিনি তাঁর দীক্ষালান ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতেন।

ময়রীকা সাধবা দেবীই যিতেন বটে, কিন্তু অহুষ্ঠানের পর দীক্ষিত ভক্তকে তিনি ঠাকুরের ছবির দিকে আকুল দেখিয়ে বলে যিতেন 'এই যে তোমার গুরু। প্রণাম কর।'

সে প্রণয় করতো—'তবে আগনি কে?'

উত্তরে বলতেন 'আমি কিছুই না—বাবা, তিনিই সব।'

এমনি সব ঘটনা থেকে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায়, তাঁর মধ্যে অভিমানের লেশটুকুও ছিল না। তার গোটা জীবনখানিই যেন 'নাহ্য নাহ্য, তু'হ তু'হ' রবে নীরবে বয়ে চলতো। গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানলাভীরূপে তার কোন অভ্যাস হয়নি।

ভক্তের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল যন্ত্রতন্ত্র কিছুই নয়, আসল দরকার হচ্ছে ভক্তিবৃত্ত শুদ্ধ অস্ত্রবিশিষ্ট ভক্তের, আর তার আত্মসমর্পিত দীন ভাবটির। ভক্তির মধ্য দিয়েই ভগবান ভক্তের স্রগের আলোর নেন। সাধারণতঃ সাধবা দেবী প্রান ও উপাসনান্তে সকালের দিকে দীক্ষা যিতেন। কিন্তু আগ্রহযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন অনুসারে তিনি এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন। শোনা যায় একটি কৃষ্ণ ভক্তকে তিনি তার দীক্ষার জন্য আকুল বিকুল দেখে হুলসধারায়

বুটের মধ্যে সাধারণ ছাতার আবরণ নিয়ে রেলওয়ে ট্রেনেই দীক্ষা দিয়েছিলেন সামান্য একটু বুটের জল সযল করে।

কালকে শোলা ময়রীক, কালকে বার, কালকে বারাদার বসেও তিনি দীক্ষা যিতেন। শোনা যায়, আগ্রহাতিশয্য দেখে তিনি তাঁর এক বাল্যসঙ্গিনীকে নাকি পাশাপাশি তরেও দীক্ষা দিয়েছেন। যে পবিত্র শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র গ্রহণের আধারই অস্ত্র, সেই অস্ত্র বধন মন্ত্রগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহাতিশয্য হয়, তখন কোন কারণকেই তার প্রাপ্তিতে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ অস্ত্র এবং ছান কাল বা পাত্রাপাত্র বিচার তো শুধু অস্ত্রের তত্ত্ব ও পবিত্রতা বক্ষার জন্য। কাজেই কোন পবিত্র উদ্বুদ্ধ ভক্তের বধনোই ছান কাল শুদ্ধি অস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। কথিত জমিই বীজ বপনের উপযুক্ত ছান। সাধবা দেবীর ছিল এই অভিমত।

যতদূরোক্ত সাধারণতঃ দীক্ষালান নিষিদ্ধ। কিন্তু আধার বিশেষে এ প্রচলিত প্রথাকেও তিনি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে কৃতিত্ব বোধ করতেন না, এমনি সঙ্কীর্ত্ত ছিল তাঁর মন। ঠাকুরের জন্মতিথিতে এবং কসীতে তিনি মন্ত্র দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আধার বিবেচনার এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম করেছেন তিনি। দীক্ষালান কালে যদিও সাধবা দেবী ধ্যানযোগে ভক্তের ইষ্টমন্ত্র জেনে যিতেন তবু নিঃসংশয় হবার জন্য তাদের কাছেও জিজ্ঞাসা

## মনের কথা

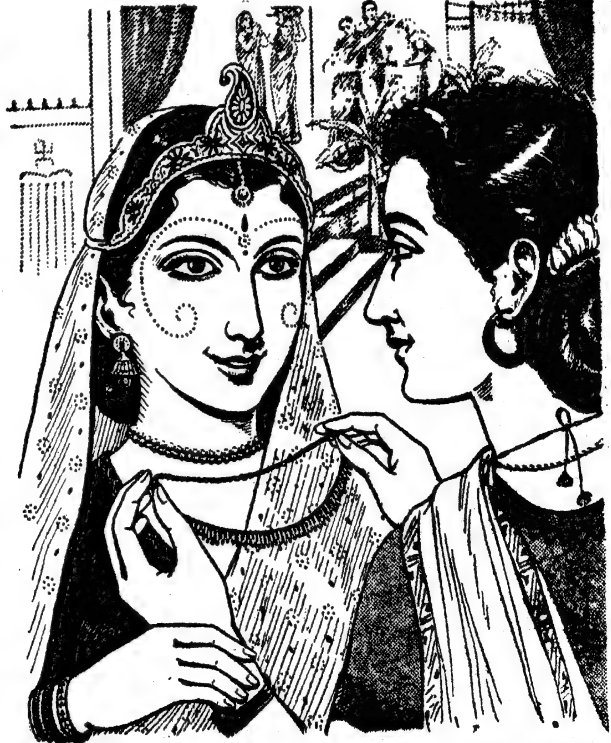
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সত্যতা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

নিম্ন সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভাস্করী  
বঙ্কাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



করে জানতেন, তারা শৈব কিংবা শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব। সময় সময় কোন কোন ভক্ত তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বলতেন কিংবা বলতেন 'তুমিই জেনে নাও'। সারনা দেবী তাদের সবচেয়ে ধ্যানে বা জানিতেন তা সব সময়েই ঠিক হত। কলে বিস্মিত ভক্তদের তৃপ্তি আনো যেতেই যেতো।

কখনও আবার পূর্ণদীক্ষিত ভক্তদের ইষ্টমন্ত্রও তিনি বললে দিতেন। তাদের বলতেন, 'তোমাদের ভাল কাজই বলছি, এইটি করে দেখ। এতে অনেক ভাল কাজ পাবে।' অনিচ্ছাসহে তারা সারনা দেবীর আদেশ পালন শুরু করে, পরে দেখতে পেতো এই মন্ত্রই ক্রমেই কল্যাণ হয়েছিল, তারা প্রকৃত শান্তি পেয়েছে।

অনেক ভক্ত আবার বধেও তাঁর কাছ থেকে দক্ষীনা পেয়েছে। সেই সব ভক্তরা হুজুতে কখনোই সারনা দেবীকে দেখেনি, এমন কি তাঁর ছবিও নয়। তারা জানতেনও পারতো না বরফুট দেবীহুজি কি। শেষে বখন তারা সারনা দেবীকে দর্শন করতো তাদের বধে-বেধা হুজির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখে পুলকিত ও হোমাঙ্কিত হ'ত। তারা আবার সারনা দেবীর কাছে-গিরে মন্ত্র দিতে চাইলে তিনি পরিচয় বলতেন 'কেন? মন্ত্র দিয়েছি তো।' তাদের আর কোন রকম সম্বোধনের অবকাশ হ'ত না। কোন সময় সারনা দেবীই তাদের ফাককে হয়তো পূর্ণদীক্ষা দিতেন ও ভিজ্ঞাসা করতেন 'কেমন গো, মিলাছে তো?' বধে পাওয়া মন্ত্রের সঙ্গে সত্যিই কোন অমিল পাওয়া যেতো না। মায়ের লীলা এমনি করেই ভক্তদের মাঝে প্রকাশ পেতো।

অজ্ঞান দীক্ষিত কোন ভক্ত নিজ গুরু সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে সারনা দেবীর কাছে এসে, তিনি তার গুরু সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজি বাতে বাড়ে তাইই উপদেশ দিতেন। বলতেন 'গুরুতে শ্রদ্ধা হারালে চল না।' আবার কখনো তিনি উপগুরু হিসেবে অনেক ভক্তদের দীক্ষাও দিতেন। গুরুর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ভক্ত বখন বিভ্রান্ত হয়, তখন তাকে তো তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না? ভিন্ন বর্ষ জিহ্ম আশ্রম বলে কোন ভক্তকে তিনি বিব্রূণ করতে পারতেন না।

তিনি বলতেন 'সব মতেইই লক্ষ্য এক, পথও একই।' সবাইকে তিনি বলতেন 'আগন্তে সময় নষ্ট করে না, জগতের হিতের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, কাজ কর।' আর বলতেন, 'সংসারে চলার রীতি বা নীতি কোন একই নিয়ম অনুসারে চলতে পারে না। প্রয়োজন অনুসারে তার রূপ বলায়। সর্ব অবস্থায় নিজেই মানিয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে শাস্তির পথ। সর্ব অবস্থায়ই নিজের মতে গড়ে তোলো মায়ের পক্ষে সম্ভবপর সকল সময় হয় না।'

এক গৃহীত ভক্ত সারনা দেবীকে একদিন ভিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সন্ন্যাস না নিলে তুমি হুজি নেই, তবে কি না আমরা সন্ন্যাসীরা হুজি পাবো না?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'সন্ন্যাস কিন্তু শুধু পুরুষদেরই আছে বাবা? গৃহীরও যে সন্ন্যাস রয়েছে। হুজি-সন্ন্যাস তাদেরও আছে। তা হচ্ছে অন্তর-সন্ন্যাস। তাদের যদি অন্তর-সন্ন্যাস ফুটে ওঠে তবে বাইরের সন্ন্যাস কোন দরকার করে না।'

যে সব গৃহীতের মন আছে সময় পান না বলে অবসাদ বোধ করেন, তাদের তিনি বলতেন 'বতটুকু সময় পাবে ততটুকুই মন দিয়ে করো। মন থাকলেই হ'ল। পরে তো ঠাকুরকে আসতেই হবে।'

অনেকে এসে অভিযোগ করতো, জপ ধ্যান করে কোন আনন্দ পায় না বলে। নীরস লাগে একথেরে লাগে বলে। তাদের তিনি

বলতেন 'মরীতে বাঁপ দিলেও শরীর তেজে, আর থাকে-দিয়ে কেনে দিলেও তেজে। ঐ তেজাটুকু দিয়েই কথা। মন তোমাদের লাভক আর না লাভক জোর করেই করতে হবে বাবা।'

এমনি ভাবে বিভিন্ন ধরণের নৈরাশ্র নিয়ে এসেও তার কাছে এসে সব ভক্তরাই বিভিন্ন ধরণের উৎসাহবাণী পেয়ে উৎসাহ পেয়েই ফিরে যেতো। সারনা দেবীর কাছে যেন সকলের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে হুজির ও শাস্তির ব্যবস্থাটুকু রাখা থাকতো। পথ খোলা, চলতেই হয়। পথের প্রান্তে পৌছাবেই। এই ছিল তাঁর অভ্যবাসী। বলতেন ভর নাই এগাও। পথ পাবে, সিঁড়িও আসবে। কি গৃহী কি সন্ন্যাসী কেউ পড়ে থাকবে না। তবে এটা ঠিক যে হুজির পথ সহজ নয়—চলতে হবে, পরিভ্রম করতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। সরল সোজা কথাই যথ্য দিয়ে শিষ্যদের তিনি অল্পপ্রাণিত করার অনলস চেষ্টা করতেন। কোম নিভঃসংযম বাণী বা জটিলতা দিয়ে তাদের পথকে তিনি কষ্টকাঙ্ক্ষী করেন নি কোন দিন। আগন্তু ভ্যাগের জন্য সবকিছু উৎসাহ দিতেন সর্বদা। জড়তা বা কাটালে জীবের স্রীষ্য ঘূরবে না—এই বুঝতে চাইতেন তিনি সকল ভক্তদের বায়ে বায়ে। গুরুর কঠোরতা নিয়ে সারনা দেবীকে কেউ কোন দিন চলতে দেখেনি, যেহেতু মায়ের অন্তর নিয়েই তিনি গুরুর আসনেও বসেছিলেন। সরল সহজ পথ ধরে ভক্তরা বাতে অগ্রসর হতে পারে তার চেষ্টা ছিল তাঁর নিরন্তর। কঠোর সংযম পালন বা কঠোর ব্রত কিংবা উপবাসই যে ইষ্টপথের একমাত্র পথ নয়, তাও তিনি উপদেশ আচরণে ভক্তদের বোঝাতেন।

তিনি বলতেন, যে কোন সম্ভারকেই মূল কেন্দ্র করে কোন ধর্মের বিকাশ হতে পারে না—বরং সম্ভারমুক্ত হলেই মুক্ত গবাক্ষে আসে প্রবেশের মত হুজির আলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সারনা দেবীর জীবনে নিজেই তিনি সর্ব-প্রচলিত সম্ভারমুক্ত হয়ে কি ভাবে চলতেন তা ক্রমেই আমরা দেখাবো।

ভক্তদের মধ্যে যে সকলেই প্রকৃত আধার নয় বা শ্রুতিসম্মত নয়, তা বুঝবার ক্ষমতাও সারনা দেবীর মধ্যে আশ্চর্য রকম ছিল। তিনি বলতেন, কারকে দীক্ষা দিতে বসে মন্ত্র যেন সহজে পাওয়া যেতে চাইতো না। অনেক চেষ্টা অনেক কষ্ট করেই তা মিলাতো। আবার তারা বখন প্রণাম করতো শরীরে যেন কেমন ঝালাখোঁপ হ'ত। অথচ ভক্তদের বেলার বেশ সহজে মন্ত্র পাওয়া যেতো, কোনই কষ্ট হত না আর তারা প্রণাম করলেও শরীর স্নিগ্ধ বোধ হ'ত। যাদের প্রণামে কষ্ট পেতেন, সারনা দেবী গলাজল দিয়ে নিজ পা ধুয়ে কেসতেন কিন্তু তাদের কোন দিনও বাধা দিতে পারতেন না।

ঠাকুরের কিন্তু দীক্ষাদান ব্যাপারে রীতিমত বাহ-বাহাই ছিল। ভক্ত নির্বাচন না করে তিনি কখনো দীক্ষা দিতেন না। সারনা দেবীর অপরূপ মাহাত্ম্যে কোন বাহ-বিচার স্থান পেতো না। ধূলো মেখে ছেলে এসে মা কি তাকে কোলে নেয় না? এই ছিল তাঁর কথা। কাজেই তাঁর গুরুত্বাবের সঙ্গে এই মাহাত্ম্যাবের সামঞ্জস্য জগতের অনেক কল্যাণ নিয়োজিত হতে পেরেছিল। বিপথগামী অনেক ভক্ত সন্ধানই তাঁর কাছ থেকে পথের দিশা পেয়ে ধ্বংস হয়েছিল।

অবশ্য সারনা দেবীকে যে এতদূর ভক্তদের কত রকম অত্যাচার সহ করতে হয়েছিল তার ঠিক ছিল না। দিনের অবসর রাত্রির বিশ্রাম টুকু পর্যন্ত ভক্তদের জন্য তাঁকে বিলিয়ে দিতে হ'ত।



জন্মের মধ্যে কোন সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না, তাদের মতিপতি বড় একটা স্থির থাকতো না। যা যাতে তাদের মনে রাখেন তার জন্ত তাদের অন্তরে একটা আকাংক্ষা থাকতো। একবার একটি ভক্ত সাধনা দেবীকে প্রশ্ন করত গিয়ে এমন জেরে তাঁর পায়ে মাথা ঠুক দিল যে, তিনি ব্রহ্মার বিবর্ণ হয়ে যান। তার অসাবধানতার জন্ত ভক্তটিকে ভৎসনা করলে সে হাসিমুখে জানায় যে, অসাবধানতা বলে ঐ ঘটনা ঘটেনি। সে ইচ্ছা করেই ওরকম করেছে। যাতে যা তাকে তাঁর সন্তর ভক্তের মধ্যে হারিয়ে না ফেলেন। মার যরণপথে থাকার কি অভিনব পন্থা। এরকম ধরনের কত যে রকমারী অত্যাচার মটক হাসিমুখে সহ করতে হতো, তা বলে শেষ করা যায় না। ধর্মীর মত অসীম সন্তানজিহ্মাশ্রিত সারদা দেবীকে একদিনের জন্তও বৈধ্য হারানো শোনা যায়নি। সন্তানদের জন্ত মা ভৈঃ মন্ত্র নিয়ে অব্যাহিতবারে অবস্থান করতেন তিনি। শ্রীতি স্মৃতি অবসার যেন পরাজয় মানতো তাঁর কাছে। কোন মহাব্যাপারীও যে এরকম গুরু পরিশ্রম ও অত্যাচার সহ্য হয় তা সহসা যেন ধারণা হতে চায় না। যখনই সময় পেতেন, রাত্রিদিন বসে বসে তিনি মালা জপ করতেন। ভক্তরা রাগ করতো 'মা, এখনো তোমার জপটি চলছে? তোমার অন্তরু করবে যে। এত কি কর তুমি সারা দিন-রাত বসে?'

'অশ্রুত করবে না রে! আমার যে কত ছেলে কত মিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কে জানে, ওরা সব ঠিক মত করতে পারছে কি না। কাল্লেই ওদের জন্ত কিছু কিছু করে রাখি।' হাসিমুখে বলতেন তিনি ভক্তদের। তারা বলতো 'তোমার ছেলে-মেয়ে তো অগুণতি। সেকসকে কি তুমি চেন, না জান? তাদের নামে নামে জপ—তুমি কি করে কর?' 'তা বাবা, বাদের নাম মনে আসে না মুখ মনে পড়ে না তাদের ভার আমি ঠাকুরের উপর দিয়ে দি, বলি ঠাকুর। আমার অনেক ছেলে-মেয়ে নানা বায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের নামও ভাল করে জানি না। কিন্তু তুমি তো সবই জানো। তুমিই তাদের দেখো। তুমিই তাদের কল্যাণ করো।'

এ সেহময়ীর মেহের কি কোন পারাপার আছে? সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর সরল সহজ ও সন্তোষ আচরণে এবং সহজ কথাবার্তা শুনে মনে হ'ত তিনি বোধ হয় কেবল ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে তাঁর ভক্ত সন্তানদের ধর্মপথে অগ্রসর করে দিতেন। অত কোন পথ সন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মগুরু হিসাবে সারদা দেবীর স্থান অনেকটাই উচ্চ। কর্তব্যোপায় ও ভক্তিবোধের সমস্ত সাধন করে তিনি জ্ঞানযোগের চরম দীর্ঘে উঠতে পেরেছিলেন। ভক্তদের প্রতি উপদেশ দেওয়া কালে তিনি আধার বিবেচনা করতেন বলে সঙ্গী বোঝা যেত না।

সাধনের বিভিন্ন সন্ধেও তিনি যে কি রকম গভীর জ্ঞান রাখতেন, তা তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি উপদেশ থেকেই বোঝা যেতো। শিক্ষিত ভক্তরা তাঁকে জটিল প্রণাম্যম সন্ধে প্রশ্ন করতেন। তিনি তাদের বলতেন—'প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্ত স্থির করা। সেই চিত্ত যদি নিজ হ'তেই স্থির হয়, তবে আর অন্যন্তক প্রণায়ামের দরকার কি? আর যদি করতে ইচ্ছা হয় তবে অঙ্গ-যন্ত্র করাই ভাল। বেশী করলে মাথা গরম হবে।' কাককে আবার প্রাণায়াম একেবারেই নিষেধ করে দিতেন।

আসন-বুড়া সন্ধেও তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, হুই তিন বটা এক সঙ্গে যে আসনে সহজে বসা যায়, কই হয় না, তাই আসন। পা কিম্বি কয়েল পা বদলে নিতে হয়। অস্ত্রাভ না। রকম যোগাসন আছে বটে, তার ভালও আছে মন্দও আছে। অনেক সময় তাতে স্বাস্থ্য উন্নতি হয় কিন্তু শরীরের দিকে মন বেশী চলে গেলে সাধনপথে শিথিলে যাবার সম্ভাবনা। আবার কার্যগতিকে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্যহানিও ঘটতে পারে।

সাধারণ সন্ধে অনেককেই তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। 'খুব জপ কর আর সংগ্রহ পাঠ কর।' আবার কাককে বলতেন 'শরৎপাত হও। প্রেম-ভক্তি অর্জন কর।'

জপ সন্ধে তিনি বলতেন, 'জপ-তপে মনের মহলা পরিষ্কার হয়। কর্তব্যকন কাটে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি প্রেম ভক্তি না থাকে ভগবানকে পাওয়া যায় না। নামে ভক্তি চাই। জপের সাথে প্রেম-ভক্তি চাই। পোশবালকেরা তো আর জপ-তপ করে ঈশ্বরকে পায়নি? তারা পেয়েছিল প্রেমভক্তি দিয়ে। আর যে, নে'রে, যাঁ'রে করে অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে। প্রেমভক্তি ও নিষ্কাম ভালবাসাই তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূল ছিল। সর্বসাধারণ যদি জপ-তপে মন নাও দিতে পারে শুধু অন্তরে প্রেম-বৈরাগ্য রাখে, তবেই তাদের ভগবানের পথে চলা হবে।'

[কমপঃ]

## বর্ষায়

### সুস্থিতা ঘোষ

অশ্রান্ত বর্ষের শ্রান্তি নেমে আসে কর্তৃহীন প্রহরের শূন্য অবকাশে। সাধারের স্নানস্তায় ধুখু করে মন, বাতাসের সিক্ত স্পর্শে জাগে এক অনাগত বিচ্ছেদের করুণ বেদন। বহু প্রেমে কুটে-ওঠা দিনগুলো মোর রত্নীনা লাভ্য নিয়ে রবে শুধু একটি প্রহর।

তার পরে স্বপ্নে যাবে বহু বেদনার উদ্ভূত তারুণ্যের সীতল করবে হৃৎ করা সীতের হাওরায়।

আজ থেকে বহু দূরে সে কোন সন্ধ্যায়  
এমনি বর্ষে যদি শ্রান্তি নামে মনে,  
সব শব্দ সন্ধ্যারে তাহার যদি থেমে যায়,  
তবে সেই মহাপ্রাণের  
বিশেষী অতীতের ছায়া হবে বিকম্পিত  
হারানোর তীব্র বেদনায়।  
কাপসা প্রাণের পায়ে  
চেষ্টে রব অপলকে  
অব্যক্ত ব্যাধির ভরা দুষ্টির সন্ধ্যারে।

## বাতিঘর

বারি দেবী

[ বাতিঘর উপজাতির কাহিনীটি কিন্তু আমার রচিত নয়, আমি শুধু এর পরিবেশিকা মাত্র। ধীর ডারেরী-উপবন থেকে ঘটনার পুশুপলি চরন করে আমি রচনা করেছি এই উপজাতি-মালিকাটি, তিনি প্রেমের তাবে এই উপজাতির পাত্র-পাত্রীর মাঝেই আত্মগোপন করে আছেন। প্রায় বছর খানেক পূর্বে একটি চাকলাকর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা প্রকাশিত হবার পর কলকাতা মহানগরীর ইট-কাঠগুলো পর্য্যন্ত উত্তেজিত আলোচনার সুখবিত হয়ে উঠেছিলো। সে দিনের হর্ষ, বিবাদ ও বিষয়মিশ্রিত উত্তেজনাপূর্ণ মহানগরীর বিভিন্ন রূপের সুস্পষ্ট ছাপ আজো হয়তো অনেকের অন্তরে আছে। সেই ঘটনা আমারও অন্তরে এনেছিলো প্রেবল আলোড়ন। তারপর ঘটনাচক্রেই আকর্ষণের মাঝে এক দিন পরিচয় ঘটলো সেই পরিবারের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে; আমার পরম বিষয় ও চরম কৌতুহলের সমাপ্তি ঘটলেন তিনি তাঁর অনবদ্য ডারেরীখানি আমাকে পাঠ করবার জন্য দিয়ে। আগল পাত্র-পাত্রীর নামগুলো গোপন করে ডারেরীর ঘটনাগুলো উপজাতি আকারে সাজিয়ে, সুবিজ্ঞ সমীপে পরিবেশনের অল্পমতি পেলাম তাঁর কাছে। ]—লেখক।

আর থেকে প্রায় দশ বছর আগেকার এক প্রেবল কড়া-বর্ণন-সুখবিত প্রাবণ-সন্ধ্যা।

ওড় বাসিগঞ্জের বিখ্যাত লালকুটির এক প্রমত্ত সুসজ্জিত হলঘরের মধ্যবর্তী স্থানে সোফা-সেটিতে জনা-দশ-বারো বাকব ও বাকবী পরিবেষ্টিত করবী হাসি-খুসির মজলিশি নাগরসোনার সুবপাক খাচ্ছিলো।

অমজরাট চায়ের মজলিশে কামরাটি সরগরম হয়ে উঠেছে। মূল্যবান বসনো ও আধুনিক আসবাব আর বিভিন্ন শিল্পদ্বারে বিরাট কক্ষটি সুসজ্জিত। দেওয়াল-গায়ে জলছে কলমলে নিউন লাইট, আবার কড়িকাঠও বিলম্বিত সাবেকি রক্সি বেলোয়ারী কাচের একশো ডালের বাড়পঠন। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় মাঝে মাঝে সবেগে হুলে উঠেছে ঝাড়টি; কাচগুলোতে জলতরঙ্গের টুটাকা শব্দভর্য তুলে।

কাঠনির্মিত কক্ষতলটি মূল্যবান পার্শ্বায়ান গালচে দ্বারা আবৃত। এক ধারে কাচের শোকেসে রকিত সেনী-বিলাতী নানা ধরনের বাজুয়। সেখ থেকে প্রায় কড়িকাঠ পর্য্যন্ত বিরাট বেলুক্সিয়াম দ্রাবের সারনার ঘরের ছাটি দেওয়াল ঢাকা।

চওড়া সোনালী কাঁককাঁধাশিত ক্রেম-জাঁটা পূর্ণপুরুষের বিরাট বিরাট অয়েলশেপটিক ছবি আর বিসেনী বিখ্যাত শিল্পীর অঙ্কিত ছবিগুলো দেওয়াল-গায়ে বিলম্বিত। কোশে কোশে অর্ধময় পাথরের ও জোজের নারীমূর্তি কোনো বিখ্যাত শিল্পীর অনবদ্য

শিল্প-প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর, রূপের কাহিনীরা কাঁককাঁধা-জাঁটার ডালে-সংরক্ষিত বসাই সোলাপের কাড়, ক্রিশেনখিমান।

মায়া দেবী মাঝে মাঝে ব্যস্ত ভাবে হলে প্রবেশ করে তলারক করছেন, সব টেবিলগুলোতে চা ও খাভলজার ঠিক মত পরিবেশন করা হচ্ছে কি না। আরো কিছু চাই কি না। বরষের ছুটোছুটিও বিরাম নেই।

ছ'টায় মিনিট অন্তর এসে তারা ঘূমারিত চা অল্প পরিমাণে পরিবেশন করে বাচ্ছে প্রত্যেকের পেয়ালার। মাত্রার পুরো হলে জুড়িয়ে বাবে গজের কীকে;—সে জন্ত মায়া দেবীর এই ব্যবস্থা।

জমাট মজলিশের ভবে ভবে সুগন্ধি চায়ের উত্তপ্ত নির্ঘাস, মজলিশক আরো স্বরগ্রাহী, আরো যনোয়ন করে তোলার সবত প্রচেষ্টা।

মজলিশ থেকে একটু পৃথক ভাবে ঘরের এক কোণখোঁগা একটি বৃহৎ পিয়ানোর সামনে বসে, পিয়ানোতে একটি কবাসী সুর বাজাচ্ছিলো 'সুহাম'।...আর তার পাশের সোফাটিতে বসে বিয়ুৎ চিন্তে শুনছিলো সুমিতা।

পিয়ানোর কক্ষণ সুরলহরী ওদের ছাটি প্রাণকে ভাবাত্তর করে তুলেছে। বিরাট কক্ষের অভ্যন্তরীতে বধন সব-কিছু মিলিয়ে একটা মোহময় পরিবেশ রচিত হয়েছিলো,—বাইরে তখন চলছে প্রমত্ত ঝড়ার স্তম্ভীনাশা মাতন-লীলা।

কোটি কোটি বিরহীর অজুপ্ত আত্মার হা-হা খাস বেন আছাড়িপিছাড়ি করছে কড় ভবনের দ্বারে দ্বারে। কোন প্রিয়হারা দিকবধু বৃকভাড়া কান্নায় বিগলিতা ধরনী শোকে সুস্থমান।

চুপে করে বসিতে রাতি আটটা বাজলো। পিয়ানোর সুরে আশিষ্ট সুমিতা হঠাৎ চমকে ওঠে। কান পেতে কি যেন শোনেন...

কড় দ্বারে হুক-হুক-হুক। কিসের আওয়াজ? 'সুহাম' পিয়ানো খামিয়ে বলে—কি হল মিটা?

আবার হুক-হুক-হুক শব্দ।

সুমিতা চকল পায়ে উঠে ঝাড়িয়ে বলে—এ শোন 'সুহাম'! কে যেন দরোজা ঠেলছে।

কৈ, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না মিটা, তুমি বোধ হয় ঝড়ের শব্দ শুনেছো!

এবারে সুনকানিয়ে শব্দ উঠলো দরোজার বাইরে। ঘরের সকলেই বিষয়ে সজ্জিত হয়ে ওঠে। কে? কে? কে এলো এমন দুর্বোজ-ভরা হাতে?

এমন কড়-জলে কুকু-বেড়ালও তো পাখে বার হয় না। সুমিতা চকল পায়ে এগিয়ে গিয়ে হলের বাইরের দিকের দরোজাটা খুলে মিলো।

হু-হু শব্দে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া প্রবেশ করলো ঘরের ভেতর। হরন্ত বাতাসের দাপট টেবিল থেকে কল-কল শব্দে কাঠ-পালের জাঁওয়ারভালগুলো গড়িয়ে পড়লো। বেলোয়ারী কাচের কাড়ে ক্রততালে জলতরঙ্গের বাজনা বেজে ওঠে।

দরোজার সামনেই আগন্তুক দণ্ডায়মান। গেরুয়া বসনধারী সুউচ্চ মন্ডক, হাতে দণ্ড, একজন দীর্ঘাকার সৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন

পূর্ব। সুকাল তাঁর সিন্ধু; মাথা, গা বেয়ে টপটপ করে জল  
বয়ে পড়ছে।

করবী প্রতিটি প্রাণী বিষয়ে হতবাক হয়ে দেবছিলো এই  
অবাহিত অনাহুত আগন্তুকটিকে।

সুমিতা অতুট করে বাবা! বাবা! তুমি এসেছো? বলতে বলতে  
ছুটে গিয়ে হুঁহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বৃক মুখ ভাঁজে ঠাঁড়ালো।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে মাতৃহীন কস্তাকে সম্মুখে বৃক টেনে নিলেন,  
গৃহবানী সোমনাথ ত্রিবেদী। মজলিশি দলটি এ, ওর মুখের দিকে  
চোখে ইসারা করে বলবলি করে...বাপার কি?

—করবী উঠে এসে বিশ্ববিধিকারিত নেত্র মেলে-বললো, ও মা  
জামাইবাবু! আপনাকে সনাক্ত করা যায় না যে, তারপর মধুর  
হাস্তেব সঙ্গে বলে-তবু ভালো, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ  
হল এত দিনে? এ, কি? বাইরে ঠাঁড়িয়ে কেন আসন, আসন,  
বড় ভিজ্জে গেছেন যে।

সুমিতা লজ্জিত ভাবে বলে-ওপরে চলো বাবা, ভিজ্জে কাপড়ে  
কতক্ষণ ঠাঁড়িয়ে আছি!

সুদাম ঠাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে; এগিয়ে এসে সোমনাথের পদধূলি  
গ্রহণ করে বলে—ভালো আছেন কাকাবাবু? আমাকে চিনতে  
পারছেন না? আমি সুদাম। আমার বাবা মহিম হালদার।

মিত হাস্তেব সঙ্গে ওর মাথার আঙ্গুরীদের ভঙ্গিতে হাত ছুঁয়ে  
বলেন সোমনাথ—তোমাকে চিনতে ভুল হয়নি বাবা। তবে এই  
পাঁচ বছরে অনেকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তোমার। মিতাও বেশ  
বড় হয়েছে দেখছি। তোমার বাবা তো এখন বুদাবনেই  
আছেন না?

—হ্যাঁ, এখন ওখানেই তিনি বাস করছেন, মাঝে মাঝে আসেন।  
বিবর সম্পত্তি এখন আমার কাকাই দেখাশোনা করেন।

করবী সোমনাথের হাত ধরে আকর্ষণ করে বলে—সব ধরন পরে  
তনবেন জামাইবাবু, এখন ওপরে চলুন তো। সুদাম ভাই, তুমি  
একটু থাকো এঁদের কাছে। আর মিতা!

ওপরে এসে করবী উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয়—মা! ও মা! দেখো  
কে এসেছেন!

মারা দেবী বাবুজিধানার তখন মুরগীর রোঁটটি চেখে দেখছিলেন,  
—কমালে মুখ মুহুতে মুহুতে রিপারের চটাট শব্দ তুলে, বারান্দার  
এসে বসলেন—কৈ রে, কে এসেছে?

—সোমনাথ এগিয়ে এসে বৃত্তকরে নমস্কার জানিয়ে গভীর কণ্ঠে  
বলেন,—আমি সোমনাথ।

সোমনাথ? ও মা, কি বেশ হয়েছে! বাবা! আঁচলে চোখ  
মুহুতে মুহুতে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন মারা দেবী।—

কোথায় রইলি কথা মা আমার! তোর অভাবে যে সোমনাথ  
আমার বিষাগী হয়ে গেল। এস বাবা এস, তোমার রাজখি এই  
পাঁচ বছর আগলে বসে আছি, এখন তুমি সব বুঝে নিয়ে আমাকে  
ছুটি দাও বাবা। তার পর জীবন ব্যস্ত হয়ে ডাক দেন—কৈ রে, করবী  
কোথায় গেলি? সোমনাথকে চা দে।

—আমি চা খাই না, কিংবা মিছারী সরবৎ দিন—আর রাজে  
হানা, আখের গুড় ও একটি কলা আমার জন্য রাখবেন।

সিন্ধু বহু পরিবর্তনের জন্ত তিনি ধীরে গ্রবেশ করলেন।

আধুনিক আসবাবের সম্বন্ধিত বস্তুগুলোর দিকে একবার নিম্পূহ  
ভাবে দৃষ্টিপাত করে কস্তাকে বললেন সোমনাথ—মিতু মা, আমার  
হোষ্টালসে কবল আছে, লাইব্রেরি-ঘরে বিছিয়ে দাও তো।

সুমিতা বিস্মিত ভাবে পিতার মুখের দিকে চেয়ে বলে,—কেন  
বাবা? তুমি খাটে শোবে না?

—না, মা। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। ধর্ম সি, মান সি,  
কাককে দেখছি না কেন? এরা কোথায়?

ওরা বড় বড় হয়ে গিয়েছিলো বাবা! ভালো রকম কাজকর্ম  
করতে পারতো না কি না, সেজন্য দিদিমা ওদের দেশে পাঠিয়ে  
দিয়েছেন।

এখন এখানে দিদিমার বাড়ীর বেরোয় হুঁজম কাজ করে।  
আমাদের লোকদের মধ্যে খালি এখনও আছে, বামভজন সি।

সুমিতা কবল বিছিয়ে দিতেই মারা দেবী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে  
বলেন—একি হচ্ছে বাবা? বিছানায় শোবে না কেন?

সোমনাথ মুহু হেসে জবাব দেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না।  
আমি কবলেই শয়ন করি। ওতে আমার কষ্ট হয় না।

কবলে উপবেশন করে মিছারীর সরবৎ পান করলেন সোমনাথ।

মারা দেবী সহাস্তে আরম্ভ করলেন এই পাঁচ বছরের নিজের  
কর্মকুশলতার কথা।

—মিতুকে কেমন দেখছে! বলো বাবা! তেতো বছরেরটি রেখে  
গিয়েছিলো, যেটির কোলে আঠারো হল। আই, এ, পাশ দিয়েছে,  
একেবারে ফাইট হয়ে, এবারে বি, এ, পড়ছে অনার্স নিয়ে। ওর  
শিক্ষার দিকে সর্বক্ষণ রয়েছে আমার এজ্জেবারে কড়া নজর  
কি না।

এই দেখ না বাবা। গান, নাচ, শিয়ানো, সিটার, সমস্ত  
শিক্ষার জন্তে এজ্জেবারে আলাশা আলাশা মাঠায় রেখেছি। ছবি  
আঁকার হাত চমৎকার, সেজন্য সেটা বাতে ভালোরকম শিখতে  
পারে, সে ব্যবসারও আমি ক্রটি রাখিনি বাবা।

করবী মুখে আঁচলে চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে—  
মা গো! সব কথাগুলো এখন বলে ফেললে? আমি ভেবেছিলাম,  
—একটির পর একটি দেখিয়ে শুঁকে একেবারে তাক লাগিয়ে  
দেব। আর প্রত্যেকটির জন্তে সার্টিফিকেট আর বংশিস আদায়  
করবো, তুমি যে সব কীস করে দিলে মা।

ধানিক পরে লাগাতে লাগাতে হুঁজুড়িয়ে ধরে ঢোকে অনিল।  
সোমনাথের দিকে একটা বড় হকম ধী করে চেয়ে থেকে সোমনাথ  
চিৎকার করে বলে—ঠিক। ঠিক বামিজীর মত আপনাকে দেখাচ্ছে  
জামাইবাবু! বাঃ! কি চমৎকার! আমারও যে ইচ্ছে করছে এই  
স্ট্রাট ছেড়ে এই রকম রং-করা কাপড় আর গাউন পরি।

করবী হাসতে হাসতে ছোড়ার পিঠে একটা থামড় বসিয়ে দিয়ে  
বলে,—রকম কর দাদা! এক জামাইবাবুকে দেখেই আমাদের  
বৈরাগ্যের উদর হচ্ছে, তার উপর আর একটা সাধুর আধিষ্ঠান হলো,  
—আমাদের গায়ে তার ছোঁয়াট লাগবে যে।

ওর মা হয় টাকা আছে, সাধুগিরি করা চলবে, তুমি আমি সাধু  
হলে লোকে মানবে কেন? পেট চলবে কেমন করে?

এসর হাস্তেব সঙ্গে বলেন সোমনাথ,—লোকমাত হবার জন্ত

অনেক উপায় আছে অনিল, তার জন্যে এ বেশ ধারণের প্রয়োজন  
হবে না।

তার পর—দেখতে তো বেশ বড় হয়েছো দেখছি, অল্প নিকের  
উন্নতি কতটা করেছে?

অনিল অব্যবহার্য আগাই মায়া দেবী মুখ খুললেন।  
সেদিকে বসেই ভালো বাবা! এম, এতে কাঠি হয়ে ফলারশিপ  
পেরেছে, বিলিয়ার্ড খেলার সোনার মেডেল পেয়েছে। আবার গুর  
বাগের মত শিকারেও কি চুবন্ত হাত হয়েছে বাবা!

গেলো বছরে জরুরি হিল-এ গিয়েছিলো বড়দের সঙ্গে, সেখানে  
কি হুঃসাহসিক কাজ করে এসেছে! একটা হাতিয়ার বাচ্চা ধরে  
এনে—কুচবিহারের মহারাজকে দিয়েছিলো,—আর বুনো গরুর;  
বাঘ, হরিণ, একশালা শিকার করেছিলো,—

সেই যে কোন্ উইকলোতে ওর এই সব হুঃসাহসের কথা  
বেরিয়েছিলো, আর বলুক হাতে ছবিও তার সঙ্গে? দেখা না কবি।

করবী বিরক্তি ভরে বলে—আর না! ছোড়দার কথা বলতে  
আরম্ভ করলে তুমি যে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলো,  
আর আমাদের বৃষ্টি কোনো গুণই নেই? বত গুণধর তোমার ঐ  
আছুরে ছেলোটি!

অনিল হুম করে একটা কিল বসিয়ে দের করবীর শির্ণে; ...  
তারপর লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে—কোনো গুণ নেই—  
তোমার কপালে আগুন! তা তোমার কপালে তো আগুনও জুটে  
না কবি, তবে জামাইবাবুর সাক্ষর যদি হতে পারিস তো,  
মন্ত্রস্তর দিয়ে আগুন আসাতে পারবি। তবে দেখিস যেন আমাদের  
ঘরে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারিস নি।

সোমনাথ এবারে উঠে দাঁড়ালেন, গভীর ভাবে বলেন: মিথু!  
ঠাকুরঘরটা কি খোলা আছে? আমার আসনে বসবার সময় হলো।

—হ্যাঁ বাবা, ঠাকুরঘর খোলাই আছে। তুমি এস! তবে  
গঙ্গাজল তো নেই! কেমন ভয়ভর চোখে দিদিমার দিকে তাকায়  
সুমিতা।

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন মারা দেবী—সে কি রে মিতা? গঙ্গাজল  
নেই তোকে কে বললে? আমি বতকণ আছি ততক্ষণ সব আছে।  
কথার আছে না! “বা নেই ভাবতে, তা নেই ভাবতে।” আমার  
টকে নেই কি? পুজোর ঘরে ছোট কাচের বোতলে গঙ্গাজল সেই  
কবে থেকে পুড়ু-পুড়ু করে রেখেছি যে!

লাইব্রেরী কক তাগ করে, ঠাকুরমার আমলের ঠাকুরঘরে প্রবেশ  
করলেন সোমনাথ। অসংখ্য দেবদেবীর ছবিতে ঠাসাঠাসি ঘরখানি।  
একটি বড় কাচের আলমারিতে সাজানো পেতলের, তামার,  
তাম্রি তারি পুজার বসন। খেত পাথরের সিংহাসনে বিরাজ  
করছেন কালো কষ্ট পাথরের নাদুগোপাল।

গোপালের কালো গায়ে হীরে-মুক্তা বসানো সোনার গহনাগুলো  
ককম্ ককম্ করছে। আড়ম্বর আছে বটে, নেই শুধু কোনো ভক্ত—  
পূজারীর গুণ-অর্ঘ্য।

সিংহাসনে জমেছে পুঙ্খ গুলোর আভরণ। বোধ হয় বহুকাল  
পরে এ ঘর খোলা হল। ঘরের মেঝেতে কবলের আসন পেতে  
বসলেন সোমনাথ, অসীমের অবস্থানে।

লিখতে বসে কলম আমার ধমকে দাঁড়ায়। হানসপটে ভেসে

ওঠে একজনের চেহারা। সেদিন আলিপুর বেলভেরিয়া, রোডে  
ব্যারিটার অনিচ্ছা বাস্তব উইকলো দেখেছিলাম, একখানি বড়  
আকারের আরেল শেটিং কটো।

—হাফা নীল রং-এর স্রাট-পরা রাইকেল হাতে এক জন সুদী  
বৃষকের চেহারা। এক মাথা এলোমেলো কাঁকড়া চুল, ইটালিয়ান  
টাইপের সুবাস্কতি। চোখে-মুখে ছড়ানো দিলখুল হাসি। সে যে  
কৌতুকভরে বলছে—আমাদের ঘরে যেন আগুন লাগাস নে কবি!

হায়! সত্যিই এক দিন কেউ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দে  
তার ঘর, পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার জীবনটা, সে কথা যখন  
কেউ জেনেছিলো তখন? মনটা কেমন বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

—সময়ের শ্রোত বয়ে চলেছে। করবী মাতার আসনে  
বহু বার বেশ পরিবর্তন করলো। রক্তবর্ণ, ধূসর, ককম  
পৈরিক, নানা বর্ণের শাড়ীর সঙ্গে মাসিনে ব্লাউস অ  
বিচিত্র অলঙ্কারে নিজেকে অপরূপা করে তোলবার চলে  
একাগ্র সাধনা।

জামাইবাবুর তত্ত্বাবধান সব সময় সেই করে। কা  
মায়া দেবীর সে অবসর কোথায়? এত বড় সংসারের দারি  
সবই তাঁর একার ওপর। কাজ কি কম?

উইকলোর কোথাও সৌন্দর্যবানি ঘটলো কি না, বাস্তবিক  
ভাষায়। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যখন খেতে বসবেন টেবিলে,  
সময় যেন সামান্য ক্রটিও তাদের চোখে না পড়ে। একেধেয়ে  
বিরক্তিকর পরিস্থিতি ওয়া যেন অসহ্য না করে। মায়ের শক্তি  
ও কত্রীকে বেম থাকে ওদের বিপুল শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাস।

সত্যায় চারের মজলিশে কেতাহুগু পরিবারের অনাগোণা  
নিতিই লেগে আছে। তাইই কি হাল্কামাটা কম? সব সময়  
সব ব্যাপারে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়, কি করে মজলিশটি সুরু  
সুন্দর করে তোলা যায়।

ছেলে-মেয়ে হুটিও তেমনি হয়েছে; সারা দিন চুলের টি  
দেখবার যো নেই। তাদেরই তো বন্ধু-বান্ধবীর দল জোটো স  
আসরে, সেজ্ঞ মাকে সাহায্য করা কি তাদের কর্তব্য;  
সব দায় কি এক জনের মাথার চাপাতে হয়?

এসব হাল্কামার মাঝে মাঝে হানা দেন তিনি জাম  
ককে। মোলায়েম বাধ্য দারা বোঝাবার চেষ্টা করেন।  
বরেন তোমার বাবা? ও-সব ধর্ম-কর্ম করবার জন্তে তো  
বয়স আছে, এখন যে সংসার-খন্ডা করা তোমার কর্তব্য।  
ধর্মের সেবা ধর্ম যে সংসার-খন্ডা। তুমি তো শাস্ত্র পড়ে  
আদরেরো তো ঐ একই মত।

কণা আমার অকালে চোলে গেলো কিন্তু কবিকে তো যে  
জন্মেই রেখেছি বাবা, সে তোমাকে বহু-অভিভা করবার জন্তে  
পারে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মিথু তো ছোট মাসী বলতে অ  
এখন তোমার মুখের একটা কথা গেলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

সোমনাথের ভাবলেশহীন দৃষ্টি শূভেই নিবন্ধ থাকে—  
জ্ঞান করেন না তিনি। অগত্যা মারা দেবীকে সরে বেতে হা  
বিরক্ত চিত্ত নিয়ে।

স্বপ্নীনা মেয়েটার জন্তে সময় সময় নাতনী সুমিতার এ  
কার বিরূপ হয়ে ওঠে।

কিছু আরো বিনয়িতা ওর অন্তরুপের ?

এই লোকের একমাত্র মেয়ে, টাকার জোরে সব ক্রটি ঢাকা পড়তো,—কিন্তু সেখানেই কি দিনে দিনে নামছে রূপের জোয়ার ? তার ছিটেকটা কি একটু আসতে নেই করবার দিকে ?

এত মজলিশের কাঁদে পাভছেন তিনি কার জন্য ? যদি কই কাঁতলা গোছের কারকে টেনে তোলা যায় মেয়েটার অন্তরে। এর দিকে আবার দৃষ্টি-পাহারাও দিতে হয় না কি ? পাছে সুমিতা এসে ওদের মাথা ঘুরিয়ে দেয় ; সেজ্ঞেই তো, ঐ নাচের গানের ছবি আঁকার মাষ্টার বেছে তাকে অন্তরুপ আঁটকে রাখার ব্যবস্থা করা।

জামাইটাও কি তেমন নির্বোধ, আর গোঁয়ার ! এত কুল, জল, তেল, সিঁহর, তবুও ভবি ভালে না ? বিধামিছ বুনিকও তো মন টলাছিলো বাপু, এটা কি তার চেয়েও অপদার্ষ ?

তা না হলে কি মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে কেউ নিজেই এমন ভাবে বস্তুত করে ? সেই ছ' বছর আগে যখন কথা মারা গেলো, বিত্তীয় সম্ভান প্রেসবের সময়-বাছাটাও বইলো না, তখনই তো উনি চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রীকে দিয়ে ভাড়া সংসার আবার জোড়া লাগাবার !

বোল বছরের মধ্যে বত্রিশ বছরের জামাইয়ের সঙ্গে বয়সে একটু বেমাননি হলে কি হবে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে। কলকাতায় এই লালচুটি ছাড়া সাহেব পাড়ার আরো দু'খানি বাড়ী। বড় মেয়েটার ছিলো লক্ষ্যপ্রতিমার মত রূপ, তাইতো দিতে পেরেছিলেন এমন ঘরে ? আর তখন কর্তব্য বেঁচেছিলেন—সে সব দিনের কথা আলাদা। কিন্তু এখন তো ঐ মেয়েটার ভাবনা বেন বুকে কাঁটার মত বিগড়ে দিন-রাত। কোথাকার হতজ্ঞাড়া সন্ন্যাসী গোপী বাস কি মস্তুর বে দিলে জামায়ের কানে, এই পাঁচ বছর বাছা ঘর-ছাড়া হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরলো ! এমন ভণ্ড সাধুর মাথার মারি হাঙ্গার বাড়ু। মনের আকোশ নীরবে বলতে থাকেন মারা দেবী।

সুসাহার মধ্যে নাতনীটা সব চৌপসচালাক নয় ! হাতের মুঠোর রাখা বাবে ওকে ! এ-ও মন্দের ভালো বলতে হবে ! তা না হলে এত আয়াম স্বপ্ন-বাছান্য এয়ারিক্রেট ফ্যামিলির সঙ্গে মেলা-মেশা চলতো কি করে ? কর্তব্য মারা বাবার পর তো রীতিমত অভাব সহ করতে হয়েছিলো ! তবু তখন মেয়ের সাহায্য ছিলো, এক-ঢোখো, বে-আজ্জলে বিধাতা তাও বাদ সাগলে !

তার পর জামাই ভাগ্যিস সব কোথা-শোনার তার তাঁর ওপর দিয়ে গুল্লর সঙ্গে তীর্থে চলে গেলেন, তাইতো রাজ্যের হালে চলছে—এই কটা বছর !

মিতার জ্ঞে তো ভাবনা কিছু নেই—জঙ্গ খেকেই বর ঠিক করা আছে। আহা, স্বপ্নাম ফেলটি বড় ভালো। যেমন রাজপুত্রের মত চেহারা, তেমনই বড় ঘর !

একটা লম্বা নিখাস ছাড়েন মারা দেবী।

[ ক্রমশঃ ]

### অন্তরাগ

( Browning এর Last ride together এর হারা অবলম্বনে )

কালকে হতে চির জীবন তরে হারিয়ে বাবে তুমি

দেখবো পাশে আমার তুমি নেই,

অন্ত-বাওয়া শেব আলোটির মত একটু-সাঁহের তরে

আমি তোমার একটু পাতে চাই।

সে চাওয়া মোর কোথাওনি তো তুমি,

পেরেছি বা পূর্ণ পেরে আমি,

কিরিয়ে দিলে যে আশাটি দিয়েছিলো চির জীবনতরে,

হারিয়ে তাকে নেইকো আমার কোভ ।

দিয়েছ বা ভুল হিয়া, পূর্ণ পরাণ, সৌরভে বিমিত

মুত্তির তাঁরায় করবো অনুভব,

গভীর কালো দৃষ্টিখানি তব, হৃদয়ে মোর ভাগিয়ে দিল সাড়া

তার মাঝেতে খেলছে আলোছায়া ।

পর্ব কোথা দেখছি তার কোমলতার ছায়া, ফুলের জয়ে জয়ে,

পরশ মোর বচিতে চায় মারা ।

তোমার হাতে, দিয়েছি তুলে আমি,

মরণ আর জীবন মালাখানি,

তুমি যখন থাকবে না মোর কাছে সৃষ্টি তখন হারাবে তার ধাম

ভয় কি আমার আনন্দ ধ্বংস নাহি ।

কতি কি তার মরণ যদি আসে জীবন কবে শুধু তাহার গতি

আজকে শুধু চলবো তুমি আমি,

আকাশ পরে আসছে কত মেঘ তোমার কম তত্ত্বলতার সম

চাঁদের আলোর উজ্জল হয়ে হাসে ।

হৃদয় পরে প্রাণ আগান দেওয়ার তরে প্রেমের মত আলো

আতপ্ত ওই হৃদয় পরে ভাসে,

তাঁহার ছোঁয়া লাও গো প্রিয়তম,

স্পর্শে তার আঙুল হিয়া মম ।

নিবিড় হতে নিবিড়তর শিরার শিরায় উজ্জল তার খেলা

আজকে শুধু তুমি বুকের পরে,

চেতনা তার তোমার বেহ হতে ছেড়ে গেল বহু ঘুরে চলে

অজানা সেই অমরবতী-তীরে ।

চলছি কোঁহে চলছে মন চলার চেয়ে অনেক বড় হয়ে

সৌরভে বার মৃত্তির পাতা ভরা,

পড়ছে মনে পুলকে ভরা শ্রবের কত নবীন খেলারানি

প্রলাপ বার সকল দুখহরা ।

চাও না নাকি আমাকে আর তুমি

ভাল কি বাসে ? ভুল করেছি আমি,

সে যাই হোক বলবে কেসে কাজ কি তাতে সে যে অবাত্তর

প্রাণে আর আছে কি প্রয়োজন ।

আর বাই হোক নেইকো কতি সবাব চেয়ে এইতো বড় কথা

পূর্ণ হিয়া বলেছি ছই জন ।

লগৎভরা কত মাহুঘ চাইছে কত অনেক বড় কিছু

কতটুকু পায় সে অবশেষে,

চাওয়ার তরে ক্লান্ত হিয়া ক্লান্ত বেহ তবু তো পথ চলে

না পাওয়ারকেও মেনে সে নেয় হেসে ।

দেশের তরে করে যে জন দান

আপন সাথে প্রিয়জনের প্রাণ,

প্রিয়ার আঁখির অঙ্গুলে দেশের পুখা করে গেল মারা

তার বললে বইলো কি তার তরে ।

ইতিহাসের একটি পাতার মুখেব ভাবা শুকনো ফুলের মালা

তায় জীবনের নৃত্য দিল বল,

কবি ভূমি জীবন ভরে গড়লে কত গান বুকের ভাষা নিয়ে  
 আজ সে ভেসে গেল কালের প্রোতে ।  
 স্বপ্ন ভূমি একেছিলে কালির আখরেতে জীবনে তা কুটলো তোমার কই  
 ব্যর্থ হল এই পৃথিবীর হাতে,  
 শিল্পী তোমার অতুল সৃষ্টিখানি  
 গড়লে ভূমি সেবা মানিক ছানি,  
 প্রাণময়ী মেয়েটিতে বা আছে তার কতটুকু পেলে তাহার কাছে ।  
 জীবন-ভরে গড়লে ভূমি বাক  
 আমি আমার তপ্ত প্রেমের উজ্জ্বল স্তবধানি দিয়েছি বার পায়ে  
 ব্যর্থ কই আজ পেয়েছি তাকে ।  
 সব কিছুকেই পাৰ যদি চরমে নিঃশেষে এই পৃথিবীর বুকে  
 বাকি তবে রইবে কি গো আর,  
 বর্গ তার পূর্ণ প্রেমে স্বপ্ন দেখা সাজ হবে তবে  
 লাগ্য কি থাকবে কিছু তার ।  
 ভবু মোরা চাইবো জীবন-ভরে  
 চলবো পথে আশার আলো ধরে,  
 পূর্ণ হব তুণ্ড হব এই পৃথিবীর পথের কূলে বসে  
 সব চাওবাকি রেখে কবিতার ।  
 এগিরে মোরা বলবো পথে কর্তৃত্বের পূর্ণ জীবন লয়ে  
 মিলবে সেখা সকল দুঃখের ।  
 কিন্তু ভূমি বুকের 'পরে এর চেয়ে আর বড় কি আর আছে  
 স্বর্গ সুখের নাইকো আমার কাজ,  
 তোমার হোঁরা আমার বুকে পাওয়ার সেবা গুণো জিরতরা  
 পরম শুভলার আমার আজ ।  
 নীরব তোমার কোন অধর হাশে  
 মন যে জাগে অসন্তব এক আশে  
 অমরতে চাইবো আমি এ স্রষ্টার স্তুতাহারা প্রাণ,  
 সেই তো সেবা সবার চেয়ে দারী  
 এই পৃথিবীর পরণারে বৃদ্ধ প্রেমে তুণ্ড হিরা লয়ে,  
 অনন্তকাল চলবো ভূমি-আমি ।  
 অমুবাদিকা—তপতী সুখোপাধ্যায় ।

## রূপ—নারীর জন্মগত আধকার

শরোষ মোদী (লাক্‌মে)

সে একদিন ছিল বধন রূপচর্চা ছিল খুব একটা হালকা  
 ব্যাপার, বিজ্ঞানের সমস্ত সম্পর্ক-বিবহিত । কিন্তু আজ তা রীতিমত  
 একটি শিল্প । আজ স্রষ্টা জীবনের একটি প্রধান আর অপরিহার্য অঙ্গ  
 হ'ল স্রষ্টার সাধনা ।

বর্তমানই প্রশ্ন আসবে স্রষ্টার বলি ক'কে ? এ এক আত্মিকালের  
 প্রশ্ন, পূর্বসূচী হইবে নতুন । প্রত্যেক নারীর কাহিনীই এক  
 জড়িয়ে আছে । আত্মিকাল থেকে তারই জঁত চলছে অভিনায় ।  
 মার্ঘ্য, বহুত, সিদ্ধ, ব্যক্তিগত—সব মিলিয়ে ঠাঁড়ায় সেই স্রষ্টার ধারণা ।

সেই ধারণার পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া বার 'সুখ' মধ্যে ।  
 (harmony) তাই সৌন্দর্য ।

ভাগ্যবান বীরা, বিধাতার এই অপরাধ আশীষকণা বুকে নিয়েই  
 তাঁরা জন্ম নেন । কিন্তু আর সবাই !—বীরের তত্ত্বতে পৌঁছাল না  
 এই আশীর্বাদেব কণিকা, তাঁরা কি করবেন ? তাঁরা তা অর্জন  
 করবেন । কারণ আজ বিশ্ব জেনে গেছি যে, সব-কিছুর মত রূপও  
 অর্জন করা যায় । এই রূপ প্রসঙ্গে ভারী স্রষ্টার কথা বলেছেন  
 স্যারসেট ম্য : রূপ-বিবলতা । এ বেন ঠিক প্রেমে পড়ার মত  
 এ বেন ঠিক তাও নয় । এই বেন প্রেম ।

বয়সের সঙ্গে রূপের কোন সম্বন্ধ নেই । আমরা কেউই  
 বেয়েবের জীবনে রূপের গুরুত্বকে অহেলা করতে পারি না । প্রত্যেক  
 মেয়েই কিছু গুণ আছে বা কেবলমাত্র তাইই ।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশিষ্ট মুখ রয়েছে । হয়তো  
 নিজেরা না জেনেই আমরা আমাদের মাথাকে উঁচু করে রাখি,  
 কখনও বা হয়তো স্রষ্টার করে হাসি বা খুব মধুর করে হাঁটি । এর  
 কারণ আমরা প্রত্যেকে নিজেকে সবচাইতে স্রষ্টার করে দেখাতে চাই ।  
 কিন্তু বাকী সময় !—বধন আমাদের অন্তর্গত আচরণ আমাদের  
 চেহারাকেও আচ্ছন্ন করে ।

বেশীর ভাগ লোকই মানুষের বাইরের দিকটা দেখে । তাই আমরা  
 বধন বিজ্ঞভাবে হাঁটি, প্রসাধনে অক্লান্ত হই, তখন মানুষ আমাদের  
 তপার একটা ধারণা ধারণাই করে ।

আরসীর সামনে ঠাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে একবার অস্ত্রের  
 চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করুন । দেখুন আপনি কী ভাবে  
 হাঁটেন । আপনি কি কুঁজো হয়ে হাঁটেন, না সোজা হয়ে হাঁটেন ?  
 আপনীর প্রসাধন কি খুব স্বাভাবিক এবং সুসমঞ্জস, না এ  
 অপপ্রয়োগে প্রকট ?

সুতরাং আরসীর সামনে বসুন, আর ভাল করে নিজেকে দেখুন ।  
 দেখুন, আপনীর চোখ কি উজ্জ্বল ? চোঁট কি স্রষ্টার আর মার্ঘ্যবন ?  
 দাঁক কি পরিচ্ছন্ন এবং মৃদু ? আপনীর চুল কি স্রষ্টার  
 করে সাজানো আর স্বাভাবিক ভরপুর ? আর দন্তকটি ? তা কি  
 শুভ্র এবং সমুজ্জ্বল ? আর আপনীর হাত কি কোমল এবং বস্ত্র  
 যুক্ত ?

সব চাইতে বড় কথা হোল, এ সমস্ত জানা আর দেখাগুলো  
 করতে দেখা । তাই নিজেকে ভাল ভাবে বিচার করুন, খুব যত্নের  
 সঙ্গে এক খুব নির্ঘম ভাবে । সমস্ত জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে  
 গ্রহণ করতে শিখুন । কারণ, আপনি হয়তো জানেন না যে, নিজের  
 মেয়ের বেসব অপূর্ণতার কথা জেবে আপনি মনে কষ্ট পাচ্ছেন,  
 সেগুলোই আপনীর সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য । কারণ, স্বাভাবিক এলিমেন্টের  
 কথা দিয়েই বলি, রূপের মধ্যে অপূর্ণতার অভাবটাই একটা  
 অপূর্ণতা ।

যদি রাখবেন, রূপ নির্ভর করে চর্চা, বস্ত্র আর অভ্যাসের ওপর ।  
 ভাল প্রসাধন জব্যের স্রষ্টা প্রয়োগ আর বস্ত্র আপনাকেও  
 স্রষ্টার করবে । আর এ সমস্ত কিছুই আপনি পাবেন লাক্‌মের  
 কাছে ।



ভিটামিন যুক্ত

কোলে

**KD**

বিস্কুট

আঁরা ওদের বিচার করেন

আঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
আইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর স্বাদু সম্ভার

খিনএরাকট

মেরী

পেটিটবুরো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ডেল্টা

ক্রামক্র্যাকার

কয়েন

ম্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

যার্ভেলক্রীম

কাফেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভাত

আরও অনেক রকম।



নীলকণ্ঠ

কুড়ি

পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বেসব অখ্যাত রাষ্ট্রবল্লভ আর জীবনের নানান ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয় পুরুষরাও আসেন কলকাতা সেখানে তাঁরা এসে কি দেখে কিয়ে বান ? কালীঘাট ; দক্ষিণেশ্বর ; চিড়িয়াখানা ; বাহুবর ; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আসেন সিঁথিকরী রাষ্ট্রবল্লভ ; তাঁরা নরদমের উজ্জ্বলহাট ঘাট থেকে সাহিবদ জনতাকে মুক্ত করে প্রত্যাভিমান জানাতে জানাতে রাজকীয় প্রবেশ করেন বোলস রয়েছে আরোহণ করে সোজা রাজ্যপাল ভবনে। সেখান থেকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ; এসেবলীতে বান একবার বিশিষ্ট অতিথির আসন আলো করতে ; গড়ের বাটের মঞ্চরূপে উঠে ঝাঁপান খাসত ভাষণ দিতে। বেকল চোবর অব কর্মাসে অবত একবার এবং বিরলাদের মিলে-কারখানার অতি অবত করেক বার বেতেই হয়। এসেছে আসবার অনেক আসে থেকেই বটা মিনিট ধরা অহুতানে বোগদান মুঠা থাকে নির্ধারিত। তুমু তাই নয় ; কোথার কোথার বাবেন নয় তুমু কোন কোন রাজ্য দিয়ে বাবেন তাও। কে জানে কলকাতার রাজ্যের ভিখারী, কুখা মিছিল আর বতীর ছেলে-মেয়েরা জানান না গিয়েই কখন বেগিরে পড়ে। আর তাই দেখে মাননীয় অতিথি মনে ব্যথা পান ; চোখে ব্যথা ; নাকে গন্ধ ; আর কানে আশঙ্কিতকর শব্দ। এরই মধ্যে কখনও কখনও কেউ কেউ আসে বারা কলকাতাকে বনে করে কাটাচারের পীঠস্থান ; তাঁরা আসে রয়ের সঙ্গা করতে। গান, নাচ, কবিতা, অভিনয়, ছবি সঙ্গা করতে আসে তারা ; পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে তাদের নৌকা নোঙর করা ; কাল

কোলা সেই বশিষ্ঠকর্তার সন্ধান, 'বে ধনে চাই' 'না ধনি' 'না ধনি'। যে ধনের মূল্য বাচাই বশিষ্ঠের মাননীয় নয় ; নয় পিত্রাটের রাজস্বও। অর্থ নয় পরমার্থের বশিষ্ঠবৃত্তি তাদের। হাঁর বশি-মাণিক্যের বট্টা পাখর নয় ; তারা হচ্ছে সেই ক্যাপা খুঁজে খুঁজে কেরে পরশ পাখর !

জাতবশিক নয়, সেই সব জাতবশিক কেউ কেউ এখনও যদি আসে কলকাতার তাহলে সমস্ত সঙ্গা শেষ হয়ে বাবার পরও তাদের কাজ বাকী থাকবে ; তাদের বেতে হবে কলকাতার কাছেই ; ব্যারাকপুর সড়ক ধরে এসিয়ে বেতে হবে একটু দূর। সেইখানে ভাঙ্গাবাড়ীর চেয়েও অধম, বাড়ীর তরাসে চিবকালের মত চলে বাঙার আর নতুন করে জলে উঠেছেন শিশিরকুমার ভাঙুড়ী। শিশিরকুমারের নামের আগে 'নাট্যাচা'—এই বিশেষণ, রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'মল্লিক' লেখার মতো। যে বৃগ কলকাতা থেকে বিদায় নিলো ; বাংলাদেশ থেকেই, সেই বৃগের শেষ সূর্য্যাস্ত হলেন এই শিশিরকুমার। প্রত্যা থেকে প্রদোষ পর্যন্ত শান্ত স্বস্ত, সৌম্য এই প্রতিভা সমানভাবে জালো বিকীরণ করে চলেছে অন্ধকার রঙ্গালোকে। সেই রঙ্গালো এখনও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নি ; তাই প্রভাত সূর্যের মতই অজমিত সূর্য আজও ভাষর হয়ে রয়েছে নৃতন জ্যোতিতে। সিরিশচন্দ্রে এই অন্ধকার রঙ্গালোকের অঙ্গ থেকে 'অপসারণ করেন বিজ্ঞার আর' কুংসাং কালোপদ' ; জাতীয় আগরনের সিংহদ্বারে উজ্জীন করেন তার পতাকা। এক সিংহদ্বার থেকে আরেক সূর্য্যসিংহদ্বারে সেই পতাকাকে পৌছে দিয়ে গেছেন একক প্রচেষ্টার যে মানুষটি সেই শিশিরকুমারকে জানাই অভিমান ; তাঁর জ্যোতির্ময়ী তপস্বীকে, —নমস্কার !

সেদিনকার এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক আজকের এই শিশিরকুমার। আজকে হয়ত আর অধ্যাপকের অভিনেতার রূপান্তর তেমন করে করে না বিশ্বয়ের উদ্রেক ; কিন্তু সেদিন তুমু বিশ্বয়ের সঙ্গার হয়নি এতে ; সেদিনকার সমাজে এ ঘটনা ছিলো দুর্ঘটনার চেয়েও বেশী। সেদিনকার সমাজে কোনও শিক্ষিত লোকের এমন দুর্গতি ( ? ), এত দূর গতি ছিলো এমন অবিখ্যাত এক অভিজ্ঞতা বুদ্ধিতে বার ব্যাখ্যা চলে না। রাষ্ট্রবল্লভ জীবন যদি উপভাসের পরিচ্ছন্ন হতো তাহলে কল্পনা করা বেত যে সেদিনকার সেই বেসরকারী কলেজের তরুণ অধ্যাপক উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বাচ্চেন সেক্সপীর, মিলটন, শেলী, রবীন্দ্রনাথ ; আর মল্লিক মৌমাছির মত বাইরের থেকেও এসে বাসেছে ছাত্রশিক্ষক একাসনে ; মল্লিকের মত বসে শুনে সেই কনিষ্ঠলীল। এমনই কোন মিলে হয়ত কোনও বন্ধুকে টেনে নিয়ে এসেছে এমনই কোন অল্পবয়সী ; তাকেও অংশ দেবার জন্যে এই অপরূপ প্রবণ-বিচিত্রায়। হয়ত সেদিন হতশ হয়েছিল তারা ; হয়ত সেদিন অধ্যাপক আসেন নি ; তুমু সেদিনই নয় ; আর কোনও দিনই অধ্যাপক আসবেন না বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যাপক। কেন ? পদাধ্যাপক দাখিল করেছেন শিক্ষারতনের সৌরব শিশিরকুমার। মাথা নীচু করে বলেছেন কলেজের কর্তৃপক্ষ যে তাঁদের মাথা নীচু হয়েছিল শিশিরকুমার কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে নয় ; মাথা নীচু হয়েছিল, অধ্যাপনা বৃত্তি ছেড়ে তিনি অভিনেতার পেশা গ্রহণ করেছেন বলে।

অধ্যাপকের একান্ত অল্পবয়সী প্রিয়ভারী, সৌম্যবর্ণ তরুণ



ছাত্রটি হঠাৎ গেছে শিশিরকুমারের কাছেই; কিরিয়ে জানতে গিয়ে কিরে এসেছে সে। আচার্য তাকে কিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে সখের অভিনেতার জীবন তাঁর কাগা নয়; অভিনয় নয় সৌখীন খামখেয়াল মাত্র। অভিনয় হবে তাঁর ধ্যান; জ্ঞাত হবেন তবেই জীবন দেবতার উদ্দেশ্য; অভিনয় হবে তাঁর সাধনা; সিদ্ধ হবেন তবেই; সিদ্ধ হবার সত্য অর্থে হবেন সিদ্ধার্থ। তাই অভিনেতার জীবিকা সমাজের উপেক্ষা আর উপহাসের জীবন; অভিনেতার ধর্ম সমাজের তথাকথিত স্বাস্থ্যরক্ষাকারীদের অবজ্ঞা আর আক্রমণের উপলক্ষ্য; এ জেনেও শিশিরকুমার কেন এই জীবনকে মেনে নিলেন সে কথা নিশ্চয়ই সেদিন সেই সাক্ষাৎকারী স্মিটজেন করেছিল তাঁকে; আর সেদিন শিশিরকুমার তাকে নিশ্চয়ই সেই উত্তরই দিয়েছিলেন যে উত্তর সব শিল্পীরই একমাত্র উত্তর। যে উত্তর অনেক দিন আগে পল গর্গা দিয়েছিলেন যে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল সেই অর্বাচীনকে; পল গর্গা বলেছিলেন সব শুনে; হেসে বলেছিলেন: 'I have got to'! হেসে বলেছিলেন জীবনশিল্পী; এই হাসির পেছনে যে কী কান্না লুকোন ছিল শিল্পী ছাড়া আর কে বুঝবে তা?

'I have got to'; আমি নিরুপায়! এই হলো সমস্ত প্রেমেরই জবাবে সকল যুগের সত্যিকারের শিল্পীর শেষ উত্তর। সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য নিশ্চিন্ততার নির্ভরতার পথ পরিচাণ করে শিল্পীরা কেন বিষমুগ্ধ, ত্রুটিপূর্ণ বাধার আর অবিচ্ছিন্ন আশঙ্কার সর্বদেশে পথে পা বাড়ায় তার উত্তর শুধু: I have got to...! আমি নিরুপায়...! যে শিল্পীর শুধু উত্তম সখল—এই উদ্দাম প্রেরণা নেই, সে শিল্পী নয়। যে গান গায়, আর যে ছবি লেখে অথবা অভিনয় করে কিংবা কবিতা আঁকে, সে যদি ওই গান গায়, ছবি লেখে, অভিনয় করা অথবা কবিতা আঁকে ছাড়া সঙ্গারের আর যে কোনও কাজের জন্তেই নিজেই অল্পম অযোগ্য অথবা অকারণ না মনে করে সে আর বাই হতে পাকুক, শিল্পী হবে না কখনও! যারা বলে সামান্য প্রেরণা আর অসামান্য পরিশ্রম, এই দুয়ের যোগফলে প্রতিভার জন্ম, তারা প্রতিভা কি বস্তু তা ধারণায় জানতে পারে না বলেই পরের কথা ধার নিয়ে এমন অর্বাচীন উক্তি করে। প্রতিভা ধারণার বস্তুই নয়; ধ্যানের বস্তু। প্রতিভার পরিমাপ পরিমাণ দিয়ে হয় না; প্রতিভা হচ্ছে পরমাণুর মতো। ওজনে নয়, শক্তিতে; সংখ্যায় নয়, প্রচণ্ডতায়; শব্দকে গতিতে যার পদক্ষেপে শব্দকল্পিতার স্রবোগে লক্ষ্যে সর্বপ্রথম উপস্থিত হওয়ার উল্লাসে পাওয়া বাবে না প্রতিভার পরিচয়; প্রতিভা হচ্ছে সেই বস্তু, যে বহুর বেদনা নিজের বুক বসে বসে এক দিন চুঃসহ বেদনার হঠাৎ বিফারিত হয় লম্ব দিক আলো করে।

উত্তম সখল করে ডাক্তার, উকীল, দালাল হওয়া যায়; সাজা যায় রাজনৈতিক নেতাও। কিন্তু উদ্দাম না হলে হওয়া অসম্ভব কবি, কথাকার, ছবিকর অথবা অভিনেতা। উত্তমে মম্ব হয়; মপাসাঁ হয় না। উত্তমে এঘনি ঈলপ হওয়া যায়; চাল'স ডিকেন্স হওয়া যায় না। উত্তমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চন্দ্র-সুখ সাজা যায়; রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র হওয়া যায় না। তেমনি উত্তমে সিনেমা-টায় হওয়া যায়; চার্লি চ্যাপলিন হওয়া যায় না। যেমন উত্তমে

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের নটরবি, নটনিলাস, নটককাল হওয়া যায়; শিশিরকুমার ভাহুড়ী হওয়া যায় না। কিছুতেই হওয়া যায় না।

চিকিৎসক, রাজনীতিজ্ঞ সাজতে গেলে সেই চিকিৎসকেরই যে সর্বপ্রথম চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে; চিকিৎসকের উদ্দেশ্য যে অসম্ভব স্বাস্থ্যের কল্প কাঁতারোক্তি করতে হয়: 'Doctor heal thyself'-বলে, এ সত্য বর্তমান পশ্চাতবল্য আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাগ্রস্থত। তেমনি অনেক বিশেষ জ্ঞাত বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথ কবি না হয়েও বা হতেন, তাতেই রবীন্দ্রনাথ হতেন, এ হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভক্তদের আশুবাণ্য। এ যেমন তাদের অগৌরব বৃদ্ধি করে, তেমনি এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভক্তি স্মৃতিত করে না কোন ক্রমেই! এ বস্তু শব্দ নয়; এ হচ্ছে নিছক ভাবকতা। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটাই তাঁর লেখা; বাকী সবটাই তাঁর খেলা। শিশিরকুমারও তেমনি অভিনেতা না হয়ে অধ্যাপক হলে ডক্টর ভাহুড়ী হতে পারতেন; কিন্তু শিশিরকুমার হতে পারতেন না কিছুতেই! অধ্যাপক, ডক্টর, পি-এইচ-ডির অভাব শিশিরকুমার অধ্যাপক না হলেও অমুভূত হত না; কিন্তু শিশিরকুমার অভিনেতা না হলে নটনাথের পূজা অসমাপ্ত থাকত। অধ্যাপক হলেও তিনি অনেকের মধ্যে এক হতেন; কিন্তু শিশিরকুমার হতেন না। শিশিরকুমার বললে আজ আর অনেকের মধ্যে 'এক'মাত্র বোঝায় না; 'শিশিরকুমার' মানে আজ একের মধ্যে যিনি অনেক।

কি পাই নি তার হিসাব মিলাতে একমাত্র শিল্পীমনই রাজী নয়; হিসাব ছাড়া সঙ্গার অচল। তাই সত্যিকারের শিল্পী সঙ্গার ছাড়া জীব। ছিন্ন বাঁধা পলাতক বালকের মত মাঠে মাঠে সে কেবলই বাঁশী বাজায়। প্রতিভা বাদের একমাত্র সখল জীবনযুদ্ধে প্রায়ই তারা পাটোয়ারী বুদ্ধি বঞ্চিত সামসারিক অর্থে নিঃসখল। সেই প্রতিভাবান শিল্পীরা যতই সঙ্গার অনভিজ্ঞ হোক তারা এত জ্ঞাত নয় যে হিসেব করে চললে যে গাড়ী করা যায়, বাড়ী করা যায়, গৃহিণীকে বুড়ে বেওয়া যায় গয়নার, অগন্তন ভিন পুরুষের অকুরন্ত অপব্যয়ের জন্তে সেখে বাওরা যায় অপরিমিত অর্থ, এ তত্ত্ব যে তাদের জ্ঞাতই এমন নয়; কিন্তু তবুও তারা পারে না; পারে না বলেই তারা শিল্পী। পারলে তারা শিল্পী না হয়ে হোত শিল্পপতি। 'মাধার ওপর বাড়ী পড়পড় তার খোঁজ রাখ কো'—গৃহিণীর এই গুঁতোয় কবি গিয়ে পড়ায় বটে রাজার সামনে কিন্তু রাজকাঁধ শেষ হয়ে গেলে তবেই তার ডাক পড়ে; উপাত্ত ঘরে আবৃত্তি করেন করিয় কঠে স্বয়ং বিশ্বকবি:

“আকাশের তলে গগনের গার  
গাগরের-জলে অরণ্য ছায়  
আবেকটুখানি নবীন আভার  
রদীন করিয়া দিব।

সঙ্গার মাঝে হ'একটি সুর  
মেখে দিয়ে বাব করিয়া মধুর  
হ'একটি কাঁটা করি দিব দূর

তারপরে ছুটি নিব।”

এক সভাশেষে মাধার কবে নিয়ে বান মণিহুতা খচিত গজকন্ত হার নয়; শুধু একখানি মালা। সে মালায় লাম বাজাবে অতি

নগ্না; কিন্তু কবির গলায় সেই মালা লক্ষ্মীর হাত দিয়ে পরানো।  
সরস্বতীর বিজয়মালা। সেই তো কবির পুরস্কার। এই কবিরাই  
হাঙ্গীর কাছে কোবাগারের কোবাগারের পদ চায় না কোন দিন;  
তার ভাব বলে: 'আমি তব মালিকের হব মালিকার'। সমস্ত  
সংসারিক উপদেশের বাইরে আরেক দেশ আছে কবির; সমস্ত  
সংসারিক বীতি-নীতির বাইরে আরেক অনিরুদ্ধ-অব্যবস্থা শিল্পীর;  
সমস্ত ধর্মকে, প্রচলিত সমস্ত সামাজিক আইনকে কখনও কখনও  
অবীকার করে আরেক ধর্ম, আরেক ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হয়  
প্রতিভার। শান্তি তাদের পুরস্কার হয়; লাহন্য সাধারণ মুকুট;  
নির্বাসন, মৃত্যুও অথবা কারাগার তাদের পথ চলার পাথর।  
এই শিল্পী, এই কবি, এই প্রতিভা হল সত্যিকারের সেই 'যে জন  
দিকসে যনের হরবে আলার মোমের বাতি।' সেই হলো শিল্পী, এর  
জন্মে বার বিলম্বিত অমৃত্যুপ নেই; কারণ 'প্রতিভা'র মধ্যে  
অমৃত্যুপের চেয়ে উত্তাপ অনেক বেশী। শিশিরকুমারও সেই জন যিনি  
দিনের বেলাতেই মোমবাতির ছন্দেই আলোতে আলোতে বলেছেন;

"My Candle burns at both ends,  
It will not last the night,  
But ah, my foes, and oh, my friends,  
It gives a lovely light!"

কোনও একজন শিল্পীর বিচার করতে বসে কলকাতা হাইকোর্টের  
কিয়ারপতি আসন থেকে ইংরেজ বিচারপতি একদিন বলেছিলেন;  
An artist is not supposed to keep his accounts।  
শিল্পীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই রায়ই শেষ রায়। মধুসূদন  
হাসপাতালে যারা গিয়েছিলেন; অনেকের কাছে এ হচ্ছে জাতীয়  
কলক। আমার কাছে নয়। নয়; কারণ মধুসূদনের হাতে কুবেরের  
অর্ধ এসেও তা উবে যেতে যুহুত কাল লাগতো। জাতীয় কলক  
তাই মধুসূদনের হাসপাতালের মৃত্যুতে নয়; জাতীয় কলক  
মধুসূদনকে বিস্মৃত হয়েছি বলে। মধুসূদন কেন মাড়োয়ারী  
কলসোবাচারীর মত যথের ঘন আগলাতে পারলো না, এ হচ্ছে করে  
লাভ নেই; প্রজাপতি কেন মোমাছি, নয় এর উত্তর প্রজাপতির জানা  
নেই; মোমাছির ডানাতেও নেই তার উত্তর। সরস্বতীর বাঁপ কেন  
জীবের গলা নয় এ প্রশ্নের উত্তর বরং সরস্বতীর পক্ষেও নেওয়া  
অসম্ভব; যাবৎ কেন সময় থাকতে বর্গের সিঁড়ি সম্পূর্ণ করে  
গেলেন না তার উত্তর না আছে বাস্তবিকিতে; না আছে কৃত্তিবাসে।  
না দিতে পেরেছেন বরং মধুসূদন মেখনাদবৎ মহাকব্যে।

শিশিরকুমার কেন হিসেব করে চলতে পারেন নি; কেন  
পুণ্ড্রজলির মত রক্তাঙ্গলিকেও জলাঙ্গলি দিয়ে আঁক তিনি নিঃব;  
নিঃব হয়েও কেন তিনি নিজেকে পরম বিত্তবান মনে করেন, আশ্রম  
এর জবাব দিতে হলে আশ্রম কারুর পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব; এ  
রহস্য জানতে হলে শিশিরকুমার হতে হয়। সূর্যকে সূর্য ছাড়া আর  
কে জ্ঞাত হতে পারে মহাকাশে? জানি, সময়ে সন্ধ্যা হতে পারলে  
এক রম্যার থেকে একাধিক রম্যারের মালিক হওয়ার বাধ্য ছিলো  
না তাঁর, সাধারণ মানুষ যেমন একখানা বাড়ীর ভাড়া থেকেই বানার  
আরেকখানা বাড়ী; জানি, পাটোয়ারী বুড়ি থাকলে আশ্রম শিশির-  
কুমারের এককায়ী এক বেসরকারী সড়কে প্রচুর বিত্তবান হতে  
পারতেন। হরত রম্যারচাতকও তাঁকে হতে হত না; হরত আশ্রম

এখানে, কাল এখানে উল্লসিত অপমান নিতে হত না গারে মেখে;  
সবই হোত তাহলে শিশিরকুমার হতেন না শিশিরকুমার। তারলে  
রামকুমার রত আকাশের গারে বরা দিয়ে আবার মিলিয়ে  
বেত না।

প্রতিভার বিকসে সব চেয়ে বড় অপবাদ, 'দস্তের'। একে  
অপবাদই বলি; কারণ এ দস্ত নয়; এ হচ্ছে আশ্রমবাস। সিংহ  
বেশন সিংহচাঁরুত গর্ভ না হলে তার কেশর থাকবেই; মধুর যেমন  
পাঁড়কাক না হলে তার পেখম; তেমনি প্রতিভা বুটো না হলে  
থাকবেই তার দস্ত; দস্ত নয় তার অসীম আশ্রমবাস। শিশির-  
কুমারও দাঙিক; শিশিরকুমারও আশ্রমবাসী। এই আশ্রম-  
বাসাদের; এই দস্তেরও কম দাম দিতে হয় নি তাঁকে সারা জীবন  
ভোর। এই সেদিনও সরকারের চরম ঘৃণারাজের অল্পবোপ হেলার  
উপেকা করে এসেছেন; বলেছেন 'নাটক-একাডেমী'র পদ নেবার জন্মে  
লোকের অভাব হবে না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না  
কোনও দিন; ও অল্প কাটকে দিয়ে দিন। বোঝাই থেকে এসেছে  
অমৃত্যুগী ভক্ত অভিনেতা; ব্যাংকপুত্রের বাড়ীতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি  
দিয়েছে লক্ষ টাকা টাঙ্গা তুলে দেবার। শিশিরকুমার বলেছেন:  
Get out। am I a beggar? অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে  
গেছে অতুল মুখোপাধ্যায় শিশিরকুমারকে দিয়ে অভিনয় করাবার  
মন্তব্য; গিয়ে বলেছে আমার নাম: ওতুল! সন্তোষ তিরস্কারে  
তৎক্ষণাৎ সাংশোধন করে বলেছেন শিশিরকুমার: বল 'অ'-তুল;  
ওতুল নয়। তারপর যা বলেছেন তা ছাপা বার না আর।  
রেডিওতে অভিনয় করবার প্রস্তাব করেছেন প্রত্যাখ্যান।

মনে পড়ছে সখ্যার একাদশী অভিনয় আরম্ভ হবার সময় অতিক্রম  
হয়ে গেছে; শ্রে আরম্ভ হয় নি। গ্যালারী থেকে উঠছে যুদ্ধভঙ্গন।  
শিশিরকুমারের ঘরে গিয়ে পৌঁছেতে সেই গুনগুন। শিশিরকুমার  
তৈরী হতে হতে আবৃত্তি করেছেন, যুদ্ধের তালভঙ্গ দেবরাজ  
ইজ্ঞা বান কবি। অর্থাৎ যুদ্ধকাল দেবী হলো গ্যালারী  
ইজ্ঞালোক ঝট্ট হন; কি বেন সেইখানেই অল্পবোপ করেছেন:  
কাল অভিনয় করবার সময় আপনার বেশবাস নাকি বেসামাল  
হয়ে গিয়েছিলো; আশ্রম বিস্তৃত সত্যক হবেন। সন্ত হান্তমুখ শিশির-  
কুমারের প্রভুত্বের এসেছে যুদ্ধের মত: ভারতবর্ষে যুদ্ধের  
বেশবাস ঠিক নেই একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী; আরেকজন  
হুসাইন শিশির ভাড়া। আজকের ভারতবর্ষে অনেক সত্যিকারের  
হুসাইন নাম মহাত্মার নাম নিয়ে তরে বাচ্ছে দেখছি; আবার  
এই দেশেই আজও শিশিরকুমারের মত মানুষও আছেন;  
নিজেকে যে হুসাইন বলতে পারে সেই তো সত্যিকারের মহাত্মা:  
তাঁকে নয়স্বয়ং।

অন্ত ও প্রত্যাহা টলিউডের কথা লিখতে লিখতে কেন  
শিশিরকুমারের কথা তুললাম, এখন সে কথা বলি। টলিউডের  
আদিমুগে, হবি বধন থেকে সবাক হতে আরম্ভ করেছে  
সেদিন শিশিরকুমারও এগিয়ে এসেছেন হবির পদীর প্রতিফলিত  
হবার জন্মে; কিন্তু এখানে তিনি টিকতে পারেন নি। পারেন নি  
কুটিল চক্রান্তে; কুৎসিত দলালির কারণে; দ্বিষিত আবহাওয়ার  
জন্মে। নিউ থিয়েটার্সকে ডোবারায় মূল বারা সেই সব খেত  
হস্তাঙ্গের অন্ততম একজন শিশিরকুমারের গলায় মাইক্রোফোন নিয়ে

লিখেছিলেন *unfit!* ধর্মক্ষেত্রে উল্লাস, হুসেলো, জড়িতস্বধকর কণ্ঠ হান্ধবের হয় না; তাঁর গলা হলো আনফিট। টলিউডে সবই সম্ভব। *Trespassers shall be prosecuted* ট্রামডিপার এই নিশানই হলো টলিউডের ত্রিবর্ণরঞ্জিত নিশান। শিশিরকুমারের মতো আরও কত জানী-প্তনী যে এরা জো আজও ট্রেসপারসার বলে গণ্য, কে তার ধবংস রাখে!

মাইকের বিরুদ্ধে শিশিরকুমারের বাতরাগ সেদিন থেকেই কি না জানি না; তবে আজকের মাইকসর্বস্ব বাংলা দেশে পৌরস্বহীন পুরুষকণ্ঠের যুগে শিশিরকুমারের একক অর্থব্য ভাবার মাইকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ অভিনন্দনযোগ্য। মাইক-ম্যানিয়া আজ এমন ভাবে পোরে বসেছে দেশকে যে আগামী কোনও দিন ঘরে বসে স্বাধীন-স্বাধীন গোপন প্রেমালাপও মাইক চাড়া অশ্রুত রইবে; অথচ রইবেও হয় তো। মাইক ব্যবহার করেন না শিশিরকুমার। মিটিংও নয়। পুরুষ মানুষ পুরুষই; মাইক ব্যবহার করে সেই সব পুরুষরা যারা লক্ষ্যের অমায়িক ভ্রমমহিলা সাজতে চার পাবলিক মিটিং। শিশিরকুমার তারই মূর্ত প্রতিবাদের প্রতীক। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই পুরুষকণ্ঠের যুগের ওপর নেমে আসবে মেরেলী জাকামির নাক্তারজনক ববনিকা।

শিশিরকুমার যেদিন আর আমাদের সামনে থাকবেন না, জানি সেদিন তাঁর জন্তে কৃত্তিবাসীশ্রবর্ণনের অভাব হবে না দেশে; তাঁর মর্যব হুঁতির আবরণ উন্মোচন করতে আসবেন হয়ত কোনও জ্বরলাল; নয়ত কোনও বিধান বার। তাঁর সম্বন্ধে সম্প্রদায় লেখা হবে দেড় কলাম; যেবা থাকবে কালোবর্ডারের বন্ধনে; বাস্তব নতুন নাম হবে তাঁর নামে। সব হবে; শুধু শিশিরকুমার বা চেয়েছিলেন তা হবে না বৈশিষ্ট্য থাকতে থাকতে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের রঙ্গালয় সম্বন্ধে দেশের নিজের সরকার অবহিত হোক। নাটক রচিত হোক; নতুন নতুন রঙ্গালয় হোক; আশ্রক নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী। সত্যিকারের শিক্ষিত লোকেরা আহুক রঙ্গালয়ের চার পাশে! তাঁর সে আশা স্বাধীন সরকার হবার পরেও পূর্ণ হবার নয়; থিয়েটার আজও সরকারের কাছে তামাশা হয়ে রইলো।

মধুসূদনের বৃহত্তরায় মহাকবি নিজের স্বী এরা সম্ভানের ভবিষ্যৎ ভেবে নিশ্চয়ই আকুল হয়েছিলেন। গোবিন্দদাস ভৌর বিকোত্তের বেদনাকে মূর্ত করেছিলেন এই বলে: ও তাই বঙ্গবাসী, আমি হ'লে আমার চিত্তার দিগ্ধ মঠ; আজ জীবনের সারাহু

ব্যারাকপুরের বাড়ীতে বসে শিশিরকুমারের মনেও এমন কোনও কোত্তের অবকাশ নেই তা মনে না করেও বলতে পারি ওই ভিন ভিনেই বিকোত্তের হুগ ছিলো আরও গভীর। সব স্বভাবী প্রতিভারই বেদনা মূগভীরের বেদনা। তার স্মৃতির কি হবে? এই প্রশ্নই বিচলিত করে সবচেয়ে বেশী। এবং এইখানেই আমাদের অপরাধ অমার্জনীয়। হাসপাতালে মহাকবির মৃত্যু জাতির হৃদয়নের লজ্জার হতে পারে; কিন্তু অমোচনীয় কলঙ্কের বা তা হলো মধুসূদনের মহাকাব্য ইতিমধ্যেই বাতালী বিদ্রুত হয়েছে; বক্রিমাত্র যে বলেছিলেন পতাকা উড়ান করে তাতে নাম লিখে দিতে শ্রীমধুসূদন, —এই মর্ষণ না রাখতে পারার যে পাণ আমরা করেছি আর কোনও দিনই তার প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। শিশিরকুমারেরও বেদনা বোধ করি এইখানেই। তিনি যে রঙ্গালয়ের পাণপ্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হয়ে দেশকে কোন অতল অন্ধকার থেকে কোন সূর্যকরোজ্জ্বল নবপ্রভাতে নতুন জন্ম দিয়েছেন তার পূর্ণ স্বীকৃতির অভাবই পীড়িত করে শিশিবাস্তুবাসীদের। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে বত বরণ্য বাতালী বরণীর করেছেন দেশকে শিশিরকুমার তাঁদের কালর চেয়ে কম নয়, একথা আমরা কবে আর বলব? শিশিরকুমারের মত মাজুবেরাই এ সত্যের একমাত্র প্রমাণ যে শুধু উদয়র পৃষ্ঠিতই মজুবা-জন্মের মোক্ষ নয়; মাজু শুধু বেড় এণ্ড বাটারেরই দাস নয়; বাটার-স্বাইয়ের স্বপ্ন দেখবার দাবীও সে রাখে। এরা যদি পাগল হয় তবু এদের পার্গামির জন্তেই আজও বন-বাগে-পুশতরা আমাদের এই বহুচ্ছরা! এরা যদি প্রতিভা হয় তবে এই হৃৎকশন প্রতিভার জন্তেই সভ্যতার জন্ম; বাকী সবাই—আমরা সবাই আসলে কি? *'We are only teachable animals'*! এঁদের দামেই আমাদের দায়।

শিশিরকুমার লেখক নন; অভিনেতা। তাই কণ্ঠবর তাঁর একদিন আর শোনা বাবে না। সেদিন বহুদূর থাক! তবু জানি, শিশিরকুমারের কণ্ঠবরও একদিন থেমে বাবে; আরও জানি, সেদিনও রঙ্গালয় চলবে; পাঁচশো হাজার রাত্রি ঘরে জন্মবে নতুন কোনও পালা; নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসবে বাবে। শুধু আমরা যারা শিশিরকুমারকে শুনেছি, তারা আর তেমন করে কালর আবৃত্তি তনে টেঁচিয়ে উঠব না স্বর্গকাসন থেকে, অতনের উপস্থিতি বৃহত্তর জন্তে বিদ্রুত হয়ে বলে উঠব না: এ কার কণ্ঠবর?

[ক্রমশঃ]

## এক্ষণে প্রচুদপট . . .

এই সখ্যার প্রচ্ছদে কোনায়কের মণ্ডিরহিত একটি বাসিন্দামূর্তির আলোকচিত্র স্থাপিত হয়েছে। আলোকচিত্র শ্রীমদন বসু গৃহীত।



## নৌলের গান

বাঙলা দেশের নিখুঁত পল্লীগায়কগণিতে আজও নাগরিক সভ্যতার প্রবল চেষ্টা গিয়া লাগে নাই। সেখানে এখনও তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। শাস্ত্র নিক্ষেপে জীবনপ্রবাহ সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী সমান ভাবে বহিয়া আসিতেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবের ঘটছটার দিন আজও কুরায় নাই।

তবে ইহানী মহামুন্দের ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূহুরপ্রসারী প্রভাব হইতে গ্রামবাসী সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দুই আজ বাতহারা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সাত পুরুষের ভিত্তি এখন হাতছাড়া হইয়াছে। তবুও পালাপার্বণে আজও সেই ভাবেই ঢাক বাজে, খেলের ধ্বনি দূর হইতে এখনও ভাসিয়া আসে।

পল্লীবাসীদের জীবন গতিবদ্ধ। বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব, কিন্তু তাহাদের জীবনে অবসরও অনেক। অর্ধের প্রাচুর্য না থাকিলেও তাহারা অবসরকাল বিনোদন করিতে চায়, তাহাদের অন্তরের জুলা মিটাইতে চায়। তাই তাহারা প্রচলিত উৎসব পার্বণগুলির একটিকেও বাদ দেয় না। এই সকল পার্বণ উৎসবের প্রধান অঙ্গই নৃত্যগীত। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার গান, মনসার ভাসান গান, নৌলের গান, শিবের পাজন গানের দ্বারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

নিজদের জীবনের সঙ্গে উপাস্তের জীবনের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া শিবের দোলা গান গ্রামবাসীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

উঠ উঠ সগাশিব নিজা কর জ্ঞ।

তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ।

খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেও দুখ গঙ্গাজল।

তোমার চরণে দানশ প্রণাম। (শিবনাথ কি মঙ্গল)।

অভ্যন্ত গানের দ্বার নৌলের গানেরও একটি বিশেষ সময় আছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাজন গানের আর পূর্ববঙ্গের নৌলের গানের আবেদন ও রাতি প্রায় সমশোভায়। প্রতিবৎসর শ্রমজের প্রভাত রোজ-কিরণ উজ্জ্বলিত, শিশুগণী জুলা রুবাসিত প্রাণশব্দে বাটে বাটে আপনা হইতেই যেমন পথিকের কণ্ঠে আগমনী গান জ্বরিয়া উঠে।

সেমনই শীতের শেষে নৃতন বাস্তব ফুহর আভিনা ভবিয়া উঠিতে থাকিলে, মলয়ানিলে গাছের কটিপাতাগুলি কাঁপিতে শুরু করিলে গ্রামবাসীরা ক্ষেত্রপাল কেশরনাথ শিবের কথা ভক্তির ভয়ে মগ্ন করে। পূর্ববঙ্গে শিবের গান নৌলকণ্ঠের গান বা নৌলের গানরূপে প্রচলিত।

একাগু রক্ষার প্রয়াসে একদিন তিনি নিজের কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়াছিলেন—তাই তিনি নৌলকণ্ঠ। নিরানন্দ গ্রামবাসি-গণের হৃৎ শোক নিজের কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি বৎসরান্তে আশা-ভরসার আশাস আনিয়া দেন, তাই তো তাহারা তাঁহারই পূজা করিয়া তাঁহারই গান গাহিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠে। শিব তো চানী গৃহস্থেরই দেবতা, তাহাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার যোগ তাই অবচ্ছেদ্য—

বৈশাখ মাসে কুবাণ ভূমিতে দিল চাব।

আবাচ মাসে শিবাকুর বুলিল কাপাঁস।

তবু তাই নয়—

কাপাঁস তুলিয়া দিলে গঙ্গার টাই।

গঙ্গা কাটিল পুতা মহাদেব বুলিল তাঁত।

শিব তো চিরকাল, ভোলানাথ; ভক্তদের কর্তব্য তাঁহাকে গৃহবাসী করা, তাঁহার সাংসারিক সুখস্ববিধার সুব্যবস্থা করা। এতদিন আগ্রহ থাকিলেও তাহাদের অবসর ছিল না, ভাণ্ডারে অন্ন ছিল না—দেহে স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ ছিল না। আজ বহুকায়র কুপার তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ, নববসন্তের পয়সে আজ তাহাদের দেহমনের ক্রান্তি বিমুক্ত হইয়াছে। শীতের হৃৎ ঘটিয়াছে। আজ তাই সবাই মিলিয়া এই নিঃশব্দ গৃহদেবতাকে সঙ্গারী করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি তো আশুভোলা ক্যাপা, তাঁহার চালচলো নাই, হ'লখোলা নাই, কবে মনে হইলে হয় তো আবার তিনি গৃহস্থালি ছাড়িয়া স্থানান্তর গিয়া আশ্রয় লইবেন। তাই অল্পপূর্ণার সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্ত ঘরে বাঁধিবার আয়োজন হয়।

দক্ষবাজে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব নিঃশব্দ জীবন বাশন করিতেছিলেন। তিনি ভাগিনেয় নায়ককে ডাকিয়া বলিলেন—

শুন নারদ কই তোমারে তরাস কর ঘরে ঘরে

কায় কড়া রূপসী কেমন।

আমি ভায়ে করব বিয়া, যাও হে তুমি ঘটক হইয়া

বিলাস না করিও এখন।

গৃহস্থদের প্রতিনিমি হইয়া নারদ দুনি তাঁহার বিবাহের ঘটকালি শুরু করিলেন। পূর্ববঙ্গে নৌলের এই শ্রেণীর গানের নাম 'পাট পোসাকি-এর বিয়ের গান'—

শুন সবে মন দিয়া

হইবে শিবের বিয়া

কৈলাসেতে হবে অধিবাস।

নারদ ক'রে আনগোনা

কৈলাসে বিয়ার ঘটনা,

শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস।

রাজসভার বড় বড় কবিতা শিবের মহা সমারোহে অহুষ্ঠিত বিবাহের বহু বর্ণনা দিয়াছেন। পল্লীকবিতা তাঁহাদের অনাড়ম্বর ভাষাতে নিজদের বিভাবৃত্তি অহুযারী বিবাহের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

পড়ল কৈলাসেতে বিহার সাড়া বাজিল ঢোল ডগর কীড়া  
সানাই শব্দ বাজে শত শত।

সেতার্য্য চৌতারা বাজে ভগবৎপন্থ মাঝে মাঝে  
মূলক তানপুরা শত শত।

সঙ্গে চলে বত জনা ঠিক বেন সব যুদ্ধের সেনা  
ঢাল তলোয়ারে ঘোরে উট্টা পাকে।

করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মাঝে মাঝে লাঠি  
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে।

শিব বিবাহের ভক্ত কৈলাসে উপস্থিত হইলেন—

শিব চটলাছেন বিহার বেশে নারদ বাজায় বীণা,

পাড়াপড়শী দেখতে এল বিহার কথা শুইয়া।

টিপ টিপ ডব্বা বাজে শিঙায় গুনগুন করে।

খৈসা পড়ল জটাজাল শিব তাই লইয়া নাচে ॥

এমন পাত্রকে দেখিয়া ভখন—

শুনি অশ্বানবাসীর কলকল

ভীর মাতা কীদে শিরে হানি কর

খেপা বয়েরে করিতে বরণ,

ভীর পিতা মনে মানেন পরমাদ।

সবাই জামাই-এর নিন্দা করিয়া বিকার দিয়া বলে—

জামাইর মাখার দেখি সাপের হেড়ে

জামাই বৃষি হয় সাপুড়ে,

সাপ খেলাই বেড়ার ভাঙ্গে ভালে।

গৌরী এমন সোনার হাইয়া বুড়ার কাছে দিল বিদ্যা

সোনার পুতুল ফেলাইল জলে।

গৃহবধূর কুমারী বেলার একদিন শিবপূজা করিয়াছে, শিবের  
ভায় গুবান সন্মানলকে পতি কামনা করিয়াছে, আজ নিজের  
গৃহস্থালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার্য্য শিবকে তুলিতে পারে না।  
আজ যখন তাহারের গোলা নবীন থাকে পূর্ণ, ঢেকির অবিরাম পাড়  
পড়িতেছে, পিঠা-পায়সের সুগন্ধে গৃহের বাতাস সুরভিত, অন্ন  
পাঁচজন ক্লিয়জন পরিজনদের সঙ্গে স্বতঃই নিরন্তর বুকু ফুটু দেবতাটির  
কথাও তাহারের মনে আসে।

তাহার পুত্রের অয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধুম পড়ে—

হেমন্ত বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডালে হে,

ও কি ভাই রে—হরের মালকে নানা ফুল।

ফুলো তুলি আঁটি আঁটি ফুলেতে ভরিল সাজি হে,

ও কি ভাই রে—হরের মালকে নানা ফুল।

অশোক অপরাধিতা সুখ্য মালতী লতা হে,

ও কি ভাই রে—হরের মালকে এত ফুল।

পৃথিবীতে পুষ্প বত তাহা বা কহিব কত হে;

ফুলপত্র দেখিতে প্রবল।

ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে ঘাই আজি হে,

কিয়ারে মনে লয় আসিও আর বার

প্রাণ কাঁকীনাথ, মনে প্রাণ ভোলানাথ, মনে

মনে লয় আসিও আর বার।

হীরা ছাড়া নীলের গানে সৌরীর শাঁখা পরানোর কথা এক  
শিবদুর্গার দাম্পত্য কলহ বিবাদের কথা আছে। সেগুলিতে

কবিত্ব না থাকিলেও দরিদ্র গৃহস্থ সংসারের একটি স্থলর চিত্র প্রকৃষ্টিত  
হইয়াছে।

দরিদ্র শিবদুর্গার শাঁখা পরার সাধ বহুদিনের, সেজন্য নিষ্ক্রিয়  
স্বামীকে কম পক্ষনা সহিতে হয় নাই—

একদিন শিবানী চরকে কছেন ডাকি

শব্দ পরিতে বড় সাধ যায় মনে,

(ও) সে শব্দ চুড়ি হীরার বালা

বিহার বয়সে কতই দিলা

শুনিয়া পড়সীরা সব হাসে।

সর্বভাগী মহাদেবের পক্ষে পত্নীর এই তুচ্ছ সাধও পূর্ণ করিবার  
সাধ্য নাই। অক্ষয় স্বামী বলেন—

শব্দ যদি পরতে চাও, বাপের বাড়ী চইলা যাও।

অশ্বানে মশানে ঘুরি, ভাঙ খুতবা গিলি,

খাত আমার ডাঙের লাড়ু বাহন আমার বুড়া গোক,

শব্দ দেওয়া আমার সাধ্য নয়।

তাহার সাধ্য না হইলেও তাহার্য্যই প্রসাদবধূতা গৃহস্থবধূতা সেদিন  
শিবের হইয়া গৌরীকে শাঁখা উৎসর্গ করিয়া থাকে। গাজন গানেও  
এই শাঁখা পরানোর কান্ডিনী আছে।

দরিদ্র গৃহস্থঘরে দাম্পত্য কলহ তো লাগিয়াই থাকে। বর্ষ  
শেষের এই সময়ে তাহার্য্য সেই সকল কলহের কথা ভাবিয়া নিজের্য্যই  
লজ্জিত হয়; তাই নীলের গানে শিবদুর্গার পারিবারিক কলহ ও  
তাহার মীমাংসার গান গাহিয়া সে অপরাধের ক্ষালন করিতে চায়—

সঙ্গীত—যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আলে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই ছাড়া-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভ্য-  
স্ততার ফলে

তাদের প্রতিটি বস্তু নিখুঁত-রূপ পেয়েছে।

কোন বস্তুর প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-তালিকার  
জ্ঞত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এল্‌গ্যান্ডেজ ইন্সট, কলিকাতা-১

নাট্যের কান্না গাঢ়ী চণ্ডী ধার তো চলিয়া  
পালঙ্কে বৃদ্ধা শিব আছে শুভ্রা ।  
নারদ ভাইয়া তাকে ডাকায় কান্নিয়া কণ্ঠিয়া ।  
ওরে মামো, ওরে মামো কান্নিক গাধাশব মায় ।  
একপাণ্ড আগাইয়া যদি মামো, কান্নিকের মুখ খাও ।  
কিরা পা আগাইয়া যদি গাধাশবের মুখ খাও ।  
কিরা পা আগাইয়া মামো আমার মাথা খাও ।

শিব এট ভাবেই আমাদের ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন ।  
ভীতাকে হইয়া ব্যঙ্গাত্মক করিতে বাধে না । কেবল নীলের গানেই  
নয়, প্রাচীন কাল হইতে আর পর্যন্ত বাঙালার লৌকিক সাহিত্যের  
সর্বত্রই শিব এবং নারদকে লইয়া বঙ্গসংস্কৃতি কতাই হইয়াছে ।

এই শ্রেণীর নীলের গানের মধ্যে সারা বৎসরের বঙ্গসংস্কৃতি কৃষক  
সমাজের বিশাখাগাণের সবই ধনিক হয়, তাই এগুলির মধ্যে ঐ লঘু  
ভরল পরিহাস বস যেটাই যেমানান হয় নাই ।

শিবের অস্তঃপুরের অশান্তির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া পল্লী-  
কবিতা আর একটি বঙ্গবন্ধব সন্ধান পাউয়াছেন । শিবের দুইটি  
পত্নী পদ্মা ও দুর্গা ; অতঃপর দুই সন্তানের কোমল লইয়া গান  
গাহিবার সুযোগ তাঁহারা ছাড়েন নাই—

( আর ) এ ভবে যাব বিয়া দুই  
তার কপালে যুখ নাই কিছুই ।  
( রেখ ) শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই বম্বী  
কায় বিবার করেন বিবাহতি ।  
একজনের বলে দুইজন বইসে  
পাট না ভরলে কান্নন আইসে ।  
( আর ) অভিমানে বাগে কথা কয় না  
গাল ফুলাইয়া হয় ।

পূর্ববঙ্গের নীলের গানগুলিকে বলা হয় ‘ভট্ট গান’ । বাহার্য  
গৃহে গৃহে গান গাহিয়া ফিরে আসাদের বলা হয় ‘নীলসন্ন্যাসী’,  
আহাদের অনিন্দ্যকর বলা হয় ‘বালা’ । সাধারণত নিরঞ্জনীর  
নিরঞ্জন হিন্দুই এই নীলসন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে ।

—জীবনসেবায় ।

## রেকর্ড-পরিচয়

এবার ভোটের বাতায় মাত করেছিল কতকগুলি পরিচিত গানের  
পায়েড়ি । বায় এবং দক্ষিণপূর্বী উভয় দলই নির্বাচন-যুদ্ধ নেমে  
করতালি দিয়ে গালাগালি ছুঁড়ছিলেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এর  
উদ্ভাস উত্তেজনার তলার তলার একটা পরিচয়ের খরস্রোত দেখা  
যাবে । চাঙ্গাচাঙ্গির মধ্যে হুহুত আমাদের অগোচরেই একটা কণ্ড  
ঘটে গেছে—আমরা ‘স্ট্রট’ এবং ‘প্রাকৃত’ বৈকার করেছি, কিন্তু  
সংস্কৃতির প্রাণ জোয়ারেও আমাদের চিরন্তন সামগ্রী এখনও  
অনপ্রিয়তা হারায় নি । প্রমাণ—আমাদের চিরপরিচিত ‘ভক্তিযুক্ত’  
—‘আমার সাধ না মিটিল, আপা না পুখিল’—গানটির বহল প্রচার ।  
কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে এটি এইরূপ পেরেছিল :—‘আমার সাধ না  
মিটিল, আপা না পুখিল, মেসার ফুরিয়ে যায় বা ।’ বলা প্রয়োজন—  
এই প্রাচীন গানটির বহল প্রচারে বঙ্গবন্ধু-আত্মা পালালো ভীতচাঙ্গের  
—আমাদের ফিরে আসে ।

বুধালকান্তির অভাব পালালো পুরিসেহন, একথা নিঃসন্দেহেই বলা  
চলে । পালালালের নতুন আরা দুটি ভক্তিযুক্ত গান এ মাসে  
বেরিয়েছে—‘আমি যদি ভুল করি মা’ এবং ‘মা গো মা বুঝ-ভরা এই  
বাধা’—কলকিত্তা বেকর্ড নং GE 24835.

কলকিত্তার অত্যন্ত নতুন গান—ঈশ্বরী প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়  
‘তোমার চ’ চোখ আমার’ এবং ‘ভ্রমরা ওহন ওহরিয়ে’ ।  
আধুনিক—GE 24832.

চৈতন্য বৃন্দোপাধ্যায়ের প্রযোগা ভাণ্ডার অমল বৃন্দোপাধ্যায়ের নতুন  
আধুনিক গান—‘আকাশে দেহালীর পদ’ এবং ‘স্বর্ষ আঁকে বঙ্গবন্ধু’  
GE24833.

ঈশ্বরী নীলিমা বন্দোপাধ্যায়ের নতুন পল্লী-সঙ্গীত—‘ওরে  
বড়িলা নাটরা বে’ এবং ‘গোকুল আঁখার হইয়াছে’—GE 24834.

একতারা চিত্তের আটটি গান কলকিত্তা বেকর্ডে বেরিয়েছে,  
ব্যাখ্যান : ‘তোমার নিঃসঙ্গের অজ্ঞান’, ‘আমি গড়ি ত্রিগুণবাণী’—  
GE 30357 ; ‘তীর ভাড়া ননী আমি’ এবং ‘হিল সো বেণু’—  
GE 30358 ; ‘নীরে ভুলে গড়লো হরি’ এবং ‘চোখের ভাসায়  
পড়লে কুটো’ GE 30359 ; ‘পথের ধূলায় লিপি লিখি’ এবং  
‘কেন পত্র বাধা বাজে’—GE 30360.

‘একতারা’ চিত্তের আরও গান বেরিয়েছে ‘চিহ্ন মার্গস’ ভয়েস  
বেকর্ডে । ‘দানশীলা’—ছয় খণ্ড N 76047-49 ; ‘বাই চলে  
আমাদের ঘরে’ এবং ‘গোবিন্দ নিমিষ’ N 76050 ; ‘চাঁদ ভগবান’  
এবং ‘কৃষ্ণকথা কই’—N 76051 ; ‘মাধব’—দুই খণ্ড N 76052.

অত্যন্ত ‘চিহ্ন মার্গস’ ভয়েস’ বেকর্ডের মধ্যে আছে মানবেন্দ্র  
বৃন্দোপাধ্যায়ের আধুনিক গান—‘দুমালা’ বাসের চাঁদ’ এবং ‘সেই  
ভালো এই বসন্ত নয় এবার ফিরে যাক’—N 82735.

ঈশ্বরী সুরঞ্জিত গোস্বামী—আধুনিক—‘টেট ওঠে সাগরে’ এবং  
‘পৃথিবী মেঘের দল চলেছে’—N 82736.

ঈশ্বরী মঞ্জু স্ত্রী—আধুনিক—‘বধূ ঘর ঘর মালা’ এবং ‘যাব না  
যাব না যাব না ঘরে’—N 82737.

‘বাক্সিমেয়ে’ চিত্তের চারটি গান ‘এত রূপ এত আলো’ এবং  
‘এ পথ আমার’—N 76046.

## আমার কথা (২৭)

### সত্যজিৎ মজুমদার

টাকা-আনা-পাঁচের কথা মনে আছে নিশ্চয় ? এর গানগুলিও  
ভারি মিষ্টি, নতুন আর কথার সুরে তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু এই গানগুলির  
সুপ্রসঙ্গ কে ? এর ছবির সুবন্দী বিনি করেছেন, তিনি হাজার  
ছবির সুপ্রসঙ্গ নন, কিন্তু কয়েকটি ছবির মাঝেই পাওয়া গেছে তাঁর  
স্বকীয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় । রাজির ভগ্নতা, মনের মন্থর শুভবাত্রা  
প্রভৃতির সবকটা সত্যজিৎ মজুমদারই হলেন টাকা-আনা-পাঁচের  
সুপ্রসঙ্গ ।

আজ্ঞাপন করে থাকতে চান সত্যজিৎ বাবু । প্রচাদের তীক্ষ্ণ  
উজ্জ্বলকে এড়াতে চান । হয়তো তাই হাজার ছবির সবকটা হতে  
পারেননি তিনি । ‘ইষ্টারভিউ’র কথা বলতে সঙ্কুচিত হলেন । রাজি  
হতে চান না কিছুতেই । অনেক বুঝিয়ে বলার পর নিজের সম্পর্কে  
যে তিনি কলকিত্তা, তা হলো এই :

‘আমার জন্ম ১৯২৫ সালে, ঢাকা বিক্রমপুরের বীরতারা গ্রামে। প্রথম জীবন ওখানেই কাটে। সুনলে অধিক হবেন হয়তো, আমাদের পরিবারে গাঠন্য-বাহিরে কেউ নেই এবং বাবা কাকা ভারেরা প্রত্যেকেই স্বল্প ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়াঙ্গণতে তাঁরা যশ অর্জন করেছেন। আমার বাবা নীরঞ্জন মজুমদার পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। আমার বড় ভাই নীধু মজুমদারের কথা শুনে থাকবেন, খেলাও হয়তো দেখেছেন। আমার ছোট ভাই এইচ, মজুমদার উরাতী, খিসিরপুর, কালীঘাট প্রভৃতি ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক আমিও এক সময় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার ক্রীড়া জীবনের সূত্রপাত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেই। এক কথায় আমাদের পরিবারে খেলাধুলার চর্চাই প্রধান ছিল। বলতে পারেন, খেলোয়াড়ের পরিবার।

তবে আমার পুত্ননীর মাতৃদেবী সঙ্গীতাধ্বাঙ্গিনী এবং সঙ্গীত বৃত্তিগ্রহণ ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে আমার পরিচিতির মূলে রয়েছে তাঁর আশের উৎসাহ ও প্রেরণা। শৈশব এবং কৈশোরে তাঁরই কাছে আমার সঙ্গীতচর্চা হাতে-খড়ি হয়। তার পর ক্রমাগত কাস্ট্রির বিখ্যাত টঙ্কাগায়ক স্বর্গত বিশিণবিসারী চট্টোপাধ্যায়, অীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে গান শিখি।

আমার শিক্ষা-জীবনের শুরুর ও শেষ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজে। ১৯৪০ সালে ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবে কলকাতায় চলে আসি এবং পরের বছর বি. এ ও আই-এ চাকরী পাই। যুদ্ধের সময় কার্য ব্যাপদেশে কয়েক বছরের মধ্যে ইংফলে বদলী হয়ে যেতে

হয়। কিছু চাকরীর সঙ্গে নিজেকে আমি কিছুতেই ব্যাপ খাওয়াতে পারিহিলাম না। তাই ১৯৪৫ সালে ইন্ডিকা মিলাম চাকরিতে। বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলাম সঙ্গীতকে। সৌভাগ্য বশতঃ এমন সময় মেগাকোন কোম্পানীর জে, এন বোব আমাকে তাঁর কোম্পানীতে প্রধান সুরকার ও শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন। বলতে গেলে জে, এন বোবই আমাকে সঙ্গীত-জীবনের পাত্থের হিসাবে তার মূল্য পরিমাপ পরিচয় করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, আমার সঙ্গীত-জীবনের পাত্থের হিসাবে তার মূল্য পরিমাপ নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই সময় আমি স্বপ্রচলিত বহু গান বিশ্লেষণ সুখোপাধ্যায়, আর্যদনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ শিল্পীদের দিগে রেকর্ড করাই। উদাহরণতঃ, ‘ফিরে যাও প্রেমের পুজারী,’ ‘তোমার আকাশে ছিঁছ আমি চাঁদ,’ ‘এলো রে আলোর পাখি’ ‘সেবা নাহি ছিল প্রেম’ প্রভৃতি গানের উল্লেখ করতে পারি। এসব গানের অনেকগুলি তখন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর পর ১৯৪৭ সালে মেগাকোন কোম্পানী ছেড়ে আমি কল্যাণদ্বারা-তে সুরকার হিসাবে যোগদান করলাম এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ওখানে কাজ করেছি। কার্যব্যপদেশে এসময়ে আমি প্রসিদ্ধ স্বর্গশিল্প স্বর্গত সুখারলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে ঢাকার স্থানান্তরিত হয়েছিলাম কয়েক মাসের জন্যে। এবং ওখানে কল্যাণদ্বার সুরকার হিসাবে কাজ করেছিলাম।

এর পর অীযুক্ত সুশীল মজুমদারের সহায়তায় আমি চলচ্চিত্রে সুরারোপ করার সুযোগ পাই। সুশীল বাবু পরিচালিত ‘দিগ্‌জ্যোত’

## শুভ বিবাহ

শুভ বিবাহে কিংবা যে কোনও শুভ কাজে যৌতুক দেবার যত আধুনিক যনোয়ম ডিজাইনের খাটি গিনি সোনার গহনা ও সাজা গ্রহণের প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।

ফোন : ৩৪-৪৯৮২

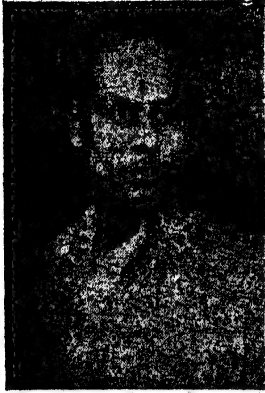
## অনুপ্রণা জুয়েলারী হাউস

মানিকগঞ্জ ও স্বর্ণশিল্পী

৮৫, বহুলাজার স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

দ্রুত মানসন





সত্যজিৎ মজুমদার

বিশ্বাশ রায়ের 'সাজবান' চিত্রে সুরবোজনা করি। আর এবছর সড় মুক্তিপ্রাপ্ত বহু প্রকাশিত টাকা-আনা-পাইতে, দেখেইছেন তো, সুরজিটার সৌভাগ্য অর্জন করতে সফল হয়েছি।

বেকর্ডে যেমন জে, এন ঘোষ, কিংস তেমনী সুরীল মজুমদারের কাছে আমি সব চাইতে বেশি ভগ্নী। বর্ত্তত, কিনা লাইনে সুরীল বাবুকে আমি 'ভক্ত' মনে করি। তাঁর সহায়তায় জতে আমি কত কৃতজ্ঞ, তা লিখে জানাবার নয়। সুরীল বাবু ছাড়া, জ্যোতির্ঘর বাবুর সঙ্গে কাজ করেও আমি আনন্দ পেয়েছি। কাজ করাতেই আমার আনন্দ, বীরা আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমি তাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সত্যজিৎ বাবুর সুরবোজিত কয়েকটি জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করছি 'কিরে বাও প্রেমের পুকারী' (আরাধনা বাল্যোপাখ্যার গীত), 'তুমি পৃথিবী' (সত্যজিৎ মজুমদার), 'দলদল ভটাচাঁও' 'তুমি তো পৃথিবী' (সত্যজিৎ মজুমদার), 'মালকে মোর ফুল থাকে না' ও 'মালখানি ভাসছে অকূল পাথারে' (দলদল ভটাচাঁও), 'সুন্দর মোর নওল কিশোর' (উৎপলা সেন), 'বাজ মনে হয় এই ভূমণ্ড' (সত্যজিৎ মজুমদার),

হবিয়ে আমি প্রেমের সুরবোজনা করি। তারপর তাঁর আরও ছ'খানি হবি 'রাত্রির তপস্বী' ও 'মনের ময়ূরেও সুরবোজনা করি। ১৯৪১ সালে কণি পাঙ্গুলী পরিচালিত 'বাজব' ও 'আন্তর্জাতিক' নামীয় দুটি ছবিতেও কাজ করি। এদের মধ্যে শেষোক্তটি এখনও মুক্তি প্রাপ্ত হয়নি। তারপর ক্রমাগত ১৯৪২ সালে জ্যোতির্ঘর রায়ের 'লক্ষ্যবাহী', ১৯৪৩ সালে চিত্ত বসুর 'গুড-ব্যাড' এবং ১৯৪৪ সালে

'কিসকি নজর' 'সে তুনে' (কল্যাণী মজুমদার), 'দিক-ভোলানো রাত' (শচীন গুপ্ত ও কল্যাণী মজুমদার), 'আর ঘুম' (বাণী ঘোষাল), 'তুমি নাই' (বিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়) এবং মুক্তিপ্রাপ্ত টাকা-আনা-পাই চিত্রের 'ভাঙা চালের ঘর' ও 'কেন যে পারি না ওগো' ইত্যাদি। এই সব গানের মধ্যে অনেকগুলি তাঁর নিজের লেখা, যেমন 'কিরে বাও', 'তুমি তো পৃথিবী', 'তুমি নাই' ইত্যাদি। একাধারে সুরকার ও গীতিকার সত্যজিৎ বাবুর গান তাই প্রায় সময়ই আবেগনের গভীরতার স্বরূপ হয়ে ওঠে।

বেকর্ড ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বাবু বলেন : "বেকর্ডে, বিশেষত বেকর্ডে ও চলচ্চিত্রে আমি সব সময়েই চেষ্টা করি নতুনদের সুযোগ দেবার। সেখান, আজ বীরা বিখ্যাত শিল্পী বলে পারিচত, তাঁরা চিরকাল তো আর সমান ভাবে গাইতে পারবেন না? তাই নতুনদের যদি সুযোগ দেওয়া না যায়, নতুন প্রতিভা যদি খুঁজে বার না করা যায়, নতুন গায়ক-গায়িকা যদি তৈরি না করা যায়, তাহলে তো বাংলা গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। অবশ্য প্রতিভার সূর্য কালঘরে হবেই। তবু সুরকারদের উচিত নতুনদের খুঁজে বার করা, তাদের উৎসাহ দেওয়া। এবং আমি বতখানি সম্ভব, তা করার চেষ্টা করিও। গান লেখা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই, গানের রচনা ও তার প্রকাশভঙ্গী বত সহজ হয়, ততই তার জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা। অবশ্য জনগণের হৃদয়ের দিকে চেয়ে গান লিখতে আমি কাঙ্ক্ষা বোধই না। এ পথই আমি প্রায় সুর-গীতিকারদেরই রচনার সুরবোজনা করেছি।

গান লেখার ব্যাপারে একটা চুৎসের ব্যাপার এই যে, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের লক্ষ্যপ্রাপ্ত কাবদের বড়ো একটা কেউ গান লেখাটা, বেকর্ড ও চলচ্চিত্র জগতের বৃদ্ধির দৈহ ও অব্যাহতির আবহাওয়ার জন্তেই হয়তো, সমানজনক মনে করেন না এবং বর্ত্তত, তাঁদের কেউ সিরাসালি গান লিখলেনও না। চার জন লিখেছেন বটে, তবে তা যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয়, তথাকথিত রেডিও-বেকর্ডের গীতিকার নয়, একমাত্র সাহিত্যিকরা গান লিখলেই বাংলার গীতি-সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। নতুবা চিরচিরিত গতাঃপাতক বাঁধা-ধরা ছক-কাটা গানের আবর্জনার একদিন বাংলার গীতি-সাহিত্যের প্রাণ ভরে উঠবে।"

## চিঠি

### শ্রীমতী স্বাতি ঘোষাল

এখনো জো সন্ধ্যায় যে চাঁদ ওঠে,  
গোধূলির চুপে মাথবী ফোটে।  
নীলিমায় আজো লেখি অলস পাখী,  
ধূসীর খেঁয়ালখানি বার সে আঁকি।  
মনে হয় তোমা বিনা বিকল সখি,  
মনের ইচ্ছেলো আঁকা রতন ছবি,  
হুঁ করে বার বার দুপির টানে।

হেঁড়া তার আঁজিকার সুরে ও গানে।  
তোমার আঁকা আজ কী সুর তোলে,  
গোধূলি ছড়ারে আসে কেমন তরে,  
পাখীদের কলরব কী জাশা হলে।  
"কেমন করা যে মন" হলো কি কারো?  
হোখায় এ সন্ধ্যার বেদনখানি—  
সুরে আর পাসে কি গো দিয়েছে টামি?



# সৌভাগ্যপূর্ণ গড়ন... চমৎকার আওয়াজ ...নতুন শ্যাশনাল-একো

২৭০/১ মডেলে

নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ!

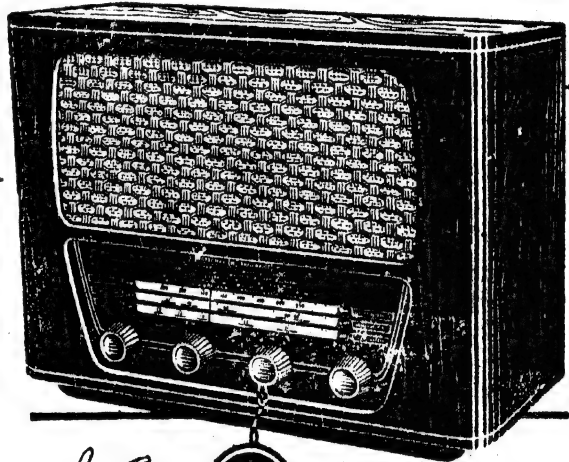


বাস্তবিকই, বিখ্যাত 'নিউকমার' রেডিওতে কতকগুলি নতুন ও উন্নততর বিধিব্যবস্থার ফলে আগেকার চেয়ে অনেক ভালো আওয়াজ পাওয়া যায়—এর স্বর-নিয়ন্ত্রণ কৌশলের উন্নতিসাধন করা হয়েছে, টিউনিং স্কেল করা হয়েছে আরো বড়ো—নির্বন্ধাটে নিখুঁতভাবে টিউনিং ঠিক করা যায়।

- ৫ ভোল্ট, • ওয়েভব্যান্ড
- যেমন খুশি ইচ্ছানুযায়ী স্বর নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- আগেকার চেয়ে সহজে টিউনিং-এর জন্য আরো বড়ো টিউনিং স্কেল (৭৭)
- বাশানী রঙের মেহগনি কাঠের বড়ো আকারের হৃদয় ক্যাবিনেট
- গ্রামোফোন পিক-আপ ও এরটেনশান লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা

শ্যাশনাল-একো মডেল ২৭০/১ :

মডেল এ ২৭০/১ এসি এবং ইউ ২৭০/১ এসি/ডিসি। অনেক নতুন নতুন সংযোগন—অথচ নীট দাম মাত্র ৩০০ টাকা ; স্থানীয় কর আলাদা। আপনার কাছাকাছি শ্যাশনাল-একো বিক্রেতার কাছ থেকে আজই স্তনে আহন!



শ্যাশনাল-একো উন্নত ধরনের রেডিও—

এগুলি 'মন্সসুনাইজ' ২

• শ্যাশনাল-একো রেডিও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সবরকম আবহাওয়ার প্রতিসম্মুখ আওয়াজ দিতে ১৬ ও ৩৭ বেগী শক্তিশালী।



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

• মাদ্রাস ১১৮, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪  
১/১৮ হাউস রোড, মাদ্রাজ • ৩৩/৭৩ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড,  
বাকালোর • শোপরিদাস কলোনি, চান্দী চক, দিল্লী।



GLA 5053



# \* বিজ্ঞান বাণী \*

পঞ্চম মিশ্র

আগে আপনাদের জানিয়েছি, মহাকাশ পরিভ্রমণের দিন সমাপ্ত। আশা করা যায়, আর ৫০ বছরের মধ্যেই মানুষ পৃথিবীর বাইরের কোন অঞ্চলে পদাৰ্পণ করতে পারবে। এখন, আপনি সেই প্রথম বহিঃযাত্রী দলের একজন, — কয়েক বছর পৃথিবীর বাইরে ভ্রমণের বন্দন করে এলেন তখন পৃথিবীর সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে বাত্মা করবার সময় আপনার নাতনীর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর, আপনার নিজের বয়স ৭০ বছর। মহাকাশের বৃক বাহ্যন্তরে পৌঁছে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখলেন, আপনার নাতনী আপনার সমবয়সী হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে যাবেন না। অনেক বিজ্ঞানীই এই কথা আজকের দিনে চিন্তা করছেন। তাঁরা গণিতসমূহ খিওরী অক রিলেটিভিটি দিয়ে হিসাব করে দেখেছেন যে, শূন্যে ভ্রমণকালে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের বয়স শূন্যায়নের বাত্মীর বয়স এতটা তাড়াতাড়ি বাড়বে না। ফলে আপনি ভ্রমণ শেষ করে পৃথিবীতে বন্দন করে আসবেন তখন দেখবেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। — অর্থাৎ এক কথায় শূন্যভ্রমণ করে আপনি যৌবনকে হয়ে বাধ্যতে পারেন। অবশ্য বিজ্ঞানীমহলে এ বিষয়ে মতভেদও আছে, — অনেক বিজ্ঞানীই এই চিন্তাকে অসম্ভব মনে করেন। বিলাতের 'লোন্ডন' পত্রিকার এই বিষয়ে হুঁকল খ্যাভনামা বিজ্ঞানী তো পদ্যপারবিষয়ী মত প্রকাশ করে রীতিমতো কলমবৃত্ত লাগিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যাঙ্কিন্সের মতে খিওরী অক রিলেটিভিটির নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর চেয়ে মহাশূন্যে বয়স ধীরে ধীরে বাড়বে। মহাশূন্যের কোন বাত্মী বাহ বৈক্যের সঙ্কটের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তাহলে সে দেখবে, শূন্য অঞ্চলে সব কিছু অনেক ধীরে ধীরে সংঘটিত হচ্ছে। বক্তির কীট, পৃথিবীর বক্তির কীটের চেয়ে অনেক দ্রুত চলবে; মহাশূন্যায়নের বাত্মীর জ্বপাণ্ডের গতি পৃথিবীর মানুষের জ্বপাণ্ডের চেয়ে হবে বহু। মহাশূন্য ভ্রমণ শেষ করে বাত্মী ফিরে এসে দেখবে, পৃথিবীর মানুষের জ্বপাণ্ড তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ বার সঙ্ঘটিত হয়েছে, তাই পৃথিবীর মানুষের বয়স পঁচাত্তর থেকে ৮০।

অধ্যাপক ডিগলে কিন্তু এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি খিওরী অক রিলেটিভিটির সাক্ষ্যেই আলোচনা করে বলেছেন, — এই অসম্ভব ঘটনা ঘটার কোনই সম্ভাবনা নেই। মহাশূন্য বা কিছুই হোক না কেন, পৃথিবীর পার্বেষে মহাশূন্যবাত্মী বন্দন ফিরে আসবে তখন সমগ্র পরিবেশকে তার নিজের সঙ্গে সমতাপস্পর্শই দেখতে পাবে। আলোচনা অবশ্য এখানেই শেষ হয় নি—আরও অনেক বখী-মহাঃখার এই সমস্তাবৃত্ত নানা ভাবে যোগ দিয়েছেন। তবে বাই হোক না, একবার কিছুদিনের ভ্রমণ মহাশূন্য না বেড়িয়ে এলে এই সমস্তার সঠিক সমাধান হওয়া প্রায় অসম্ভব।

যে কোন বিশেষ এক জনের দেহকোষ, বৃক অথবা বক্ত পরীক্ষা করে বলা যায়, সে ছেলে কি মেয়ে। ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েরই কোন দেহকোষ এবং একের বিশেষ কোন অংশের কাঠামো সম্পূর্ণ পুরুষ। সামান্য একটু বৃক টেছে নিয়ে অপরীক্ষণ বহু দ্বারা তাদের সংস্কৃত কোষ সমূহ পরীক্ষা করলে ত্রীলোকের চামড়ায় এক বিশেষ ধরণের অতি ক্ষুদ্র কাঠামোর আবিষ্কার দেখা যায়। অবশ্য এটা সব সময়ই হয় না—কোন কোন সময়ে ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। বক্তের মধ্যে বিশেষ শ্রেণিকণিকার অবাধ্বিত থেকেও ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানী ডেভিডসন ও শ্রম্ব, এই বক্তের কণিকার পুরুষ কি ত্রীলোক, তা নির্ধারণ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য সবচেয়ে সোজা উপায় হলো জিভ চুষে বৃকের এই আভরণ পরীক্ষা করে ত্রী-পুরুষ নির্ণয় করা। মিছামিছ চামড়া কেটে নেওয়া অথবা বক্ত বার করার কোনই প্রয়োজন নেই। জিভ চাছা ময়লার মধ্যেই সর্বস্বাই উপরে কিছু কিছু দেহকোষ নির্গত হয়। এই কোষ সমূহের বিচ্চণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা ত্রী-পুরুষ নির্ধারণ করা সম্ভব।

বর্তমান কালে বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা জন্মের পূর্বেই গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গও নির্ধারণ করা সম্ভব। বহুযুগ ধরে মানুষ জন্মের পূর্বেই গর্ভস্থ সন্তান ছেলে কি মেয়ে, তা জানবার জন্য প্রাণ চেষ্টা করছে, অবশেষে বিজ্ঞানের সহায়তায় তার এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলো। গর্ভস্থ ভ্রূণ, গর্ভাশয়ের মধ্যে একটি বিশেষ তরল পদার্থ দ্বারা পরিবৃত্ত। এই তরল পদার্থের মধ্যে ভ্রূণের বৃক থেকে সর্বস্বাই দেহকোষ নির্গত হচ্ছে। কোনরকমে গর্ভাশয়ের খলিকে খোঁচা দিয়ে এই তরল পদার্থ বার করে পরীক্ষা দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নিরূপণ করা চলে। মোটামুটি সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা গিয়েছে, এই ভাবে জরায়ুর মধ্যেকার তরল পদার্থে অবস্থিত দেহকোষগুলি পরীক্ষা করে বেশ নির্ভরযোগ্য ভাবে জন্মের পূর্বেই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়।

আরোপদিয়ে আলোচনা কি ভাবে সঠিক হয়েছে তা নির্ধারণ করে সম্প্রতি বিজ্ঞানী মহল বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রপূর্বে আলোচনার সঠিক সত্যকে হটি মতামত প্রচলন আছে। একটি আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান বা পোল্যোগ, পদ্যটি শূন্যতা দেহের চন্দ্রপূর্বে আখ্যাত। বিজ্ঞানী ডায় ইউভে, — শূন্যতার দেহ কর্তৃক চন্দ্রপূর্বে আভ্যন্তরীণ হুংগলার বক্তির বক্তব্যসকল সন্ধান করেন। বাই হোক,

এত দিন বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে সব-কিছুই অজ্ঞান বা ধারণা মুক্তিমূলক ছিল, এবার তাঁরা আলোবুঝী সৃষ্টির বস্তু পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। ম্যাক্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী গিলবার্ট কারেকডার, প্রাচীরের অক্ষ প্যাবিস নিম্নমিত মডেলের কৃত্রিম আঘাতের দ্বারা গবেষণাপাণ্ডে আলোবুঝী সৃষ্ণ গম্বব সৃষ্টির চেষ্টায় প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ করেন। পরে তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞানী এফ এন জনসন এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি নেদারল্যান্ডের ক্রিমিস্ট্রী, কুবিকার্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের জন্য গবেষণা-মন্ডির স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন, কুবিকার্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহারের নিমিত্ত অল্পস্টিত এক আলোচনা-সভায় মন্ত্রী হুগানথ এই ঘোষণা করেন। এই গবেষণা-মন্ডির প্রধানত: নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়েই পরমাণু শক্তি ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের বলাকল গবেষণার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

(ক) জমি সজ্জা গবেষণা, (খ) উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে, (গ) প্রাণি-বিজ্ঞানে, (ঘ) উদ্ভিদ প্রজননে এবং, (ঙ) খাদ্য সংরক্ষণে।

এই সব বিষয়ে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যেই ইউরোপে হয়েছে। বিশেষ করে সুইডেনের বনের মহৎকর সমূহের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যে সফর বৃক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, তার সাফল্য খুবই আশাপ্রদ। এই সভারই সুইডেনের বিজ্ঞানী অধ্যাপক গুস্তাফসন প্রতিনিধিত্বের জ্ঞানান যে তেজস্ক্রিয় বায়ু প্রয়োগ করে তাঁরা বালি ও নানাপ্রকার কসলার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কেবল কসলই বৈশিষ্ট্য নয়, এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে শস্তের খড়ের অংশও অপেক্ষাকৃত শক্ত হয় এবং অতি সহজেই বায়ুিক ব্যবহার দ্বারা কসল কাটা যায়। গত বছর জেনেভাতে এই সম্মেলনে অধ্যাপক গুস্তাফসন, কুশিয়ার বিজ্ঞানীদের তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাধ্যাযে কলন বৃদ্ধির গবেষণার একজন প্রধান সমালোচক ছিলেন;—এবার তিনি নিজের পরীক্ষার কলাকলর মাধ্যমে এই পদ্ধতির সাফল্যের কথা বোকার করে গিয়েছেন।

এই সম্মেলনে অধ্যাপক কুশিয়ানক-এর সভাপতিত্বে খাদ্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারের কথাও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়।

### গুগলিয়েলমো মার্কিনি

বিজ্ঞানী মার্কিনি বেতারে সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই অসাধারণ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যে-সব বিজ্ঞানীর আবিষ্কার মানবকল্যাণে সর্বোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য সহায়তা করবে, তাঁহাদেরই পুংস্কৃত করবার জন্য মঠামতি নোবেল এই বিশেষ সন্মানের ব্যবস্থা করেন। মার্কিনির আবিষ্কারের মতো আর খুব কম আবিষ্কারই মানবকল্যাণে এতো বৈশিষ্ট্য সহায়ক হয়েছে। বেতারে সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থা, বর্তমান সভ্যজগতের এক প্রধান সত্তা।

১৮৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল ইটালীতে বিজ্ঞানী মার্কিনি জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম তাঁর গুগলিয়েলমো মার্কিনি,—তিনি বলাশিক্ষা বাড়ীতেই লাল্য করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অজ্ঞান

করেছিলেন যে, বিজ্ঞানী চার্টজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বাতী প্রেরণের কাজে লাগানো যেতে পারে। অতি অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং অতিশীঘ্র সাফল্যলাভ হয়। ১৮৯৫ সালে মাত্র একশ বছর বয়সে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রায় এক মাইল দূরে বাতী সঞ্চার প্রেরণ করতে সক্ষম হলেন। ভালো যন্ত্রপাতি চাড়াই এই সাফল্য তাঁকে অত্যন্ত উৎসাহিত করলে। তাই ১৮৯৬-সালে ভাগা পরিবর্তনের আশায় তৎপর বিজ্ঞানী মার্কিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করলেন। ইংল্যান্ডেই বেতারে সংবাদ প্রেরণের পেটেন্ট তিনি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত করেন। ১৮৯০ মাইল দূরবর্তী ডাকঘর থেকে ডাকঘরে পরীক্ষামূলক ভাবে সংবাদ প্রেরণ করে তিনি তাঁর অসাধারণ আবিষ্কারের কাহিনী জন-সম্মুখে প্রচার করেন। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানী মার্কিনি তাঁর অতুলনীয় জ্ঞানিকারের জন্য সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছেন। ইটালী সংসদে মার্কিনিকে তোমো আনুগ্রহণ করে পাঠান। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে একটি ইটালীয় রণপোতে বাতী-সংবাদ প্রেরণ করে মার্কিনি ইটালীর রাজ্য ও রাণীর দুই আকর্ষণ করলেন।

বিজ্ঞানী মার্কিনির এই সাফল্যের ফলে সমুদ্রতীরে মধ্যেই ইংল্যান্ডে তাঁর পেটেন্টের কার্যকরী করার জন্য একটি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হলো, কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ঘটকো বেতার সংযোগ। বেতারকাৰ্য্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৫ মাইল দূরে যুক্ত-জাতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা আব্রহ্ম হয়েছিল। ১৯০০ সাল থেকে বিজ্ঞানী মার্কিনি দূরে বেতার-সংযোগ স্থাপনে মনোবাসী হলেন। ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বরে এলো এক পরম অসাধারণ সাফল্য। মার্কিনি তর্পণবাল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পার করে আমেরিকার নিউকাস্টল-এ সঞ্চার পাঠাতে সক্ষম হলেন।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এই বিরাট অবদানের জন্য ১৯০৯ সালে পরাধ-বিজ্ঞানে মার্কিনিকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এ চাড়াও সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি আরও বহু সম্মান লাভ করেছিলেন। ইটালীর রাজ্যও তাঁকে ইটালীর সেনেটের সভা মনোনীত করে সম্মানিত করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইটালীর সৈন্য বিভাগ ও নৌ বিভাগকে বহু ভাবে সাহায্য করেন। ইটালীর যুদ্ধ-যিশানব সন্ধ্যা হিসাবে একবার আমেরিকা বান এবং প্যাবিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সভার তিনি ইটালীর পক্ষে ভট্টপ্পা ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। ইটালীর রাজ্য তাঁকে মার্কুইস-এর আডিকাতা দেন,—কমিয়ার ভাব অর্থাৎ অক, সেই আন এবং ইংল্যান্ডের সম্রাট 'গ্রাওন্ড্রন অফ দি লিউটিয়ান অর্ডার' প্রদান করে এই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর বন্দনা করেন।

মার্কিনির বাবা ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ছিলেন আটরিশ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বহু-বংশ, অসাধারণ হৃৎকর। বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রতিও তাঁর বহুই আকর্ষণ ছিল। এই ক্ষমতাক্রিয় বিজ্ঞানী এক সময় ইটালীয় রাজনীতিতে বহুই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কিনি ১৯৩৭ সালের ২০শে জুলাই তেবটি বছর বয়সে রোগে পড়লোক গমন করেন।



## টেবিল টেনিস

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা গিভাবে জাপানের খেলোয়াড়দের মাথার বিজয় মুকুট। বিশ্বের পুরুষ খেলোয়াড়রা জাপানের খেলোয়াড়দের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

১৯৫২ সালে জাপান বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তুর্কিশটি দেশের ৩৬৫ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ। সোয়েডেনিং কাপের খেলা চারটি গুপে এবং কার্ভালিন কাপের খেলা তিনটি গুপে ভাগ করা হয়। সোয়েডেনিং কাপের চারটি গুপের বিজয়ী মধ্যে নক-আউট প্রথার খেলা হয় এবং কার্ভালিন কাপের তিনটি গুপের বিজয়ী খেলা লীগ প্রথার হয়। সোয়েডেনিং কাপে ভারত প্রথম গুপে জুড়ীয়া হান অধিকার করে।

১৯৫২ সালে জাপান বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের পর থেকেই জাপান টেবিল টেনিসে আধিপত্য বিস্তার করে। জাপানী খেলোয়াড়রা চোট ব্যাটের 'স্প্রিং ব্যাকট' স্টেন চোন্ড গ্রিপ, সেট সঙ্গে উপরূপরি আক্রমণ করে অপর পক্ষের খেলোয়াড়কে বিপর্যস্ত করে।

এবারকার কলকাতা :—

### পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনাল

জোশিয়া তানাকা (জাপান) ২১-১১, ২১-১৮, ২১-১১ গেমে গত বারের চ্যাম্পিয়ান ইচিরো ওসিমুরাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

### মহিলা দর সিঙ্গেলস ফাইনাল

মিস ফুকু ইওচি (জাপান) ২১-১৪, ২৪-২২, ১৯-২১, ২১-২০, ২১-১৯ গেমে মিস গ্রান চেডনকে (বুটেন) পরাজিত করেন।

### পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

এনজিডিস ও এন-ষ্টেক (চেকোজাতকিয়া) ২১-১০, ১৮-২১, ২১-১৯, ২১-১৭ গেমে ইচিরো ওগিমুরা ও জোশিয়া তানাকা (জাপান) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিস জিডিয়া মোজকজা ও মিস এগান্স সাইমন (চাকেরী) ১৭-২১, ২০-২২, ২১-১৮, ১৮-২১, ২১-১০ গেমে মিস জারনা বো ও মিস গ্রান হেনজকে (বুটেন) পরাজিত করেন।

## সিঙ্গেল ডবল ফাইনাল

ইচিরো ওসিমুরা ও মিস ফুকু ইওচি (জাপান) ২১-১০, ১৯-২১, ২১-১৮, ১০-২১, ২১-১১ গেমে আইত্যান এন্ড্রিয়াভিস (চেকোজাতকিয়া) ও মিস গ্রান চেডনকে (বুটেন) পরাজিত করেন।

বণজি প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে হুর্ভাগ্য বশতঃ বাংলা দলকে বণজি প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। ইন্ডোন উত্তানে বাংলা ও সার্বিসেস-এর খেলার পাঁচ দিনে দুই ইনিংসের খেলা মীমাংসিত হয়নি খেলার ফলাফল। নিয়মামুখ্যায় টস হওয়ার সার্বিসেস দল ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, এবারেই সর্ব-প্রথম সার্বিসেস দল বণজি প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলার সুযোগ লাভ করলো। অপর দিকে ভারতের অল্পতম শক্তিশালী ক্রিকেট দল বোম্বাই মাস্ত্রাককে পরাজিত করে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

বোম্বাই দল সেমিফাইনালে মাস্ত্রাককে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে। মাস্ত্রাক দল এক ইনিংস ও ৩২০ রানে পরাজয় স্বীকার করে। এই খেলার বোম্বাইয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় ভেনীর ২১৮ রান ও কুদী মোদীর ১৭২ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই দল সার্বিসেস দলের সহিত ফাইনালে প্রতিযোগিতা করে।

এবারও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিটন প্রতিযোগিতা—অল ইংল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপের শ্রেষ্ঠ অর্জন করলেন এ ডি চু। এবার নিরে এ ডি চু চার বার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করলেন। টেনিস খেলার মত ব্যাডমিটনেও বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই, তাই উইমল্ডন চ্যাম্পিয়ান ও অল ইংল্ড চ্যাম্পিয়ানকে বধাক্রমে টেনিস ও ব্যাডমিটনে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে নির্ধারিত হয়, এবারকার ফাইনালে এ বি চু পরাজিত করেন ডেনমার্কের উদীয়মান খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কাপস। কাপস বিশ্বের দুই খাত খেলোয়াড়কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন।

মহিলা প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার মিস ডেভলিন। ফাইনালে ডেভলিন তাঁরই দেশের অল্পতম খেলোয়াড় মার্গারেট ভার্ণারকে পরাজিত করেন। মিস ডেভলিনের পক্ষে অল ইংল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে তিন বছর আগে তিনি এই চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করেন।

কলকাতার হকি খেলা এখন পুরোদলে চলেছে। কীরক, কলকাতার হকির মরত্তম মাত্র দু'বাস। এর মধ্যে হকি লীগের খেলা শেষ করে বাউটন কাপ প্রভৃতির খেলা আছে। লীগপঞ্জার সোড়ে ইষ্টবেঙ্গল দল এবার এখনও পরাজিত অগ্রগামী আছে। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হকি চ্যামিটি খেলা গোলমুগ্ধ অবস্থায় শেষ হয়েছে।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল চিত্র-প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই এদিন মার্গেট দর্শকসমূহ অজ্ঞাত যে কোন দিনের খেলা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কিন্তু সেদিন হু'পক আশ্চর্যকামূলক খেলার কোন দলেরই খেলা তেমন চোখে পড়েনি। মোহনবাগান অপেক্ষা ইষ্টবেঙ্গল দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেললেও খেলাটি অসীম্যাসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত দলগত অবস্থার মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দল ১টি করে মহামেজান দল ২টি ও কাঠিমেস ৪টি পয়েন্ট হারিয়েছে। তবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, চারটি দলই এখনও পর্যন্ত অপরাধিত আছে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য বাংলার হকি টিম বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছে, সেই কারণে কলকাতার হকি লীগের খেলা একটি স্তব্ধ গতিতে চলবে।

হকি লীগে গোলন্দাজদের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জগদীশের স্থান সর্বপ্রথমে, তিনটি হাটিক সহ তাহার মোট গোল করার সংখ্যা ৩০।

ফুটবল মরত্ত্ব আরম্ভ হবে হকি মরত্ত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাই গৌরচন্দ্রিকা-রূপ প্রাপ্তি বছরের মত এবারেও খেলোয়াড়দের দল-বদলের পালার শেষ তারিখ ছিল ২৪শে মার্চ। অনেক খেলোয়াড় পুরানো ক্লাবের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে মরত্ত্বী ফুলের মতন নতুন খেলোয়াড় আমদানী হয়েছে। সর্বশেষ দিনে ২০১ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্র সই করেন।

এরিসান ক্লাবের পদ্ম মিত্র মোহনবাগানের পক্ষে ও মোহনবাগানের শুভাশীষ গুহ ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে ছাড়পত্র সই করেন।

মাত্রাজের এগমোর টেনিস ট্রেডিংমে ডেভিস কাপের ইষ্ট জেনের প্রথম রাউন্ডের খেলায় ভারত সচক্ষেই মালয়কে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে কিলিপাইনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

১৯২০ সাল থেকে ভারত ডেভিস কাপে অংশ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি বারও ডেভিস কাপের খেলা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারই সর্বপ্রথম এ খেলা মাত্রাজে অনুষ্ঠিত হোল।

মহিলাদের আন্তঃরাষ্ট্র ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ হয়ে গেছে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা 'উচ্চের কাপ' লাভ করার মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। মূল প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনালে আমেরিকা, এশিয়ান জেনের ফাইনালিষ্ট ভারতকে পরাজিত করেছে। ফাইনালে আমেরিকা ও ডেনমার্কের খেলায় আমেরিকাই বিজয়ী হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনে যখন সমস্ত দেশের পরিদৃষ্টি একেবারে জড় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন আই-এক-এর নির্বাচনের পালা।

অতি সামান্য। তাহলেও ক্রীড়ামোদীরের কাছে এর গুরুত্ব অল্প একটু আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের যে সমস্ত দলগুলি সরাসরি দপ্তর প্রেরণের অধিকার নেই, তাদের মধ্যে থেকে দুইজন দপ্তর নির্বাচিত হবেন। শিমিহপুং ক্লাবের প্রতিনিধি শ্রীসরোজ বসু অধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এদিকে বালী প্রতিভার প্রতিনিধি শ্রীসিধু দত্ত ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের প্রতিনিধি বিত্ত দত্ত সমান সংখ্যা ভোট পান। এ নিয়ে দেখা যায় এক কঠিন সমস্যা। কে নির্বাচিত হবেন? সভাপতি শ্রীবীরেন দে অল্পপছন্দ থাকার সহ-সভাপতি ভাস্কর্য পরিমল রায় লোকসভা ও বিধানসভার কাঠিং ভোটের নজির তুলে সিটিং মেম্বার 'বিত্ত দত্তের পক্ষে কাঠিং ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, এভাবে কাঠিং ভোট দেবার সহ-সভাপতির কোন অধিকার আছে বলে শোন। বারনি।

আমেরিকার খ্যাতনামা গ্রাথলীট হারোল্ড কনোলী এক চেকেন্সোভাকিয়ার খ্যাতনামা মহিলা গ্রাথলীট মিস ওলগা ফিক্সটোভা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন বলে অস্বীকার করত্ব করেছেন। মিস ওলগা চেক সরকারের কাছে থেকে হারোল্ড কনোলীকে বিবাহ করে আমেরিকায় ছাড়ী ভাবে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছে। শুভ সংবাদ নিঃসন্দেহে।

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"**



প্রতি গিডড  
২৪টি  
বড় আকারের

- কলে প্রস্তুত
- ঈসমে সঁকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

গ্রাথনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সর্বত্র বন্ধন করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কন্ফেকশনারি

কলিকাতা - ২৯



## আন্তর্জাতিক নিয়োগী

### বারমুডা সম্মেলন—

বারমুডার হামিণ্টনে গত ২১শে মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ (১৯৫৭) পর্যন্ত তিন দিন ধরিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেন-

হাওয়ার এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলনের মধ্যে যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহা আর একটি বারমুডা সম্মেলনের কথাও মরণ করাইয়া দেয়। ঐ সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমী যুদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রধানদের মধ্যে। ঐ সময় বুটেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তার উইনষ্টন চার্চিল। আলোচ্য বারমুডা সম্মেলন ত্রিপক্ষীয় না হইয়া দ্বিপক্ষীয় হইয়াছে। এই সম্মেলনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কনাসী প্রধান মন্ত্রীর সহিত ওয়াশিংটনে এক পৃথক সম্মেলনে সন্মত হইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্রাট সম্পর্কে বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ বহন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল সেই সময় উহার একটা মীমাংসা করিবার জন্য ১৯৫০ সালে বারমুডা সম্মেলন হইয়াছিল। তৎকালীন মতভেদ অপেক্ষা আলোচ্য বারমুডা সম্মেলনের পূর্বে সুরেজ খালের সম্রাট লইয়া বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদটা অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। সুরেজ সম্রাট সমাধানের জন্য বুটেন এবং ক্রাফ যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা সমর্থন করে নাই। যিশর হইতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সুরেজের ব্যাপারে মতভেদের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর মধ্যে ফাটল ধরিয়াছিল প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাহা মোরামত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিতে পাঠেন নাই। এই জন্যই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুরেজ সম্রাট দেখা দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার।

বারমুডা বৈঠকের প্রকৃত বিষয় অবশ্য কিছুই জানা যায় না। সম্মেলনের শেষে গত ২৪শে মার্চ (১৯৫৭) যে ঘোষণা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে হই প্রবাদের মধ্যে আলোচ্য মতভেদ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ লব্ধ হইয়াছিল সন্মত করা হইয়াছে। এই সকল মতভেদ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য

সম্বন্ধে মতভেদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বুটেনকে করেকটি ক্ষেপণাস্র (guided missile) দেওয়ার সম্পর্কে নীতিগত দিক হইতে মতভেদ এবং পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের গুরুত্বও কম নয়। বুটেনকে ক্ষেপণাস্র দেওয়ার কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেপণাস্র ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইবে সেগুলি পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত থাকিবে। কিন্তু এই পরমাণু অস্ত্র বোম্ব ইঙ্গ-মার্কিন টিমের মার্কিন সদস্যদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে। বুটেন না কি উহার নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করে নাই। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার ফলে যে রেডিয়েশন হয় তাহা ক্ষতিকর পর্যায়ে বাইতে পারে বলিয়া সর্বত্র যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে হই প্রাধান্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ইচ্ছা করে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে ভাবে করা হইবে সে পর্যন্ত এরূপ ক্ষতি হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। তাহাদের এই ঘোষণার অর্থ ইহাই যে, পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে ভাবেই করা হইতেছে এবং উহাতে ক্ষতির কারণ নাই। এই স্তোকবাক্য দ্বারা বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা তাহারা অবশ্যে চালাইয়া বাইতে থাকিবেন, ইহাই উক্ত ঘোষণার প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা যে সম্বন্ধে ভাবে করা হইতেছে এবং উহার রেডিয়েশনের যে ক্ষতিকর নয়, তাহার প্রমাণ কি? বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রেডিয়েশনের ক্ষতিকর শক্তির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহাদের সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাইয়া বাইতে ইচ্ছুক।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে তাহারা একটি নীতিও ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জানাইতে এবং পরীক্ষার সময় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদ্বয়কে উপস্থিত থাকিতে দিতে বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে যদি সোভিয়েট রাশিয়াও এরূপ করিতে স্বীকৃত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক বলিতে কি বুঝাইবে সে সম্বন্ধে এক ব্যাখ্যার জটিল সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, বুটেন ও আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রের যে পরীক্ষা করিবে তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে অস্বমতি দেওয়া হইবে যদি সোভিয়েট ইউনিয়নও এরূপ অস্বমতি দেয়। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহার মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাইয়া বাইতেছে বটে, কিন্তু উহা আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে নাই। বিশ্বজনমত উহার বিরুদ্ধে। বিশ্ববাসী সকলেই উহার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানাইতে ত্রুটি করিতেছে না। এই প্রতিবাদের কোন ফল হয় নাই বটে, বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধে, উহাকে উপেক্ষা করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব অস্বমতি পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জানাইয়া যদি পরীক্ষা করার এবং পরীক্ষার সময় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিত থাকার নীতি যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষাকেই আন্তর্জাতিক আইনসম্মত করা

হইল। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষাকে আন্তর্জাতিক আইনসম্মত করিয়া লওয়াই যে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্য প্রাচ্যের ব্যাপার লইয়াই ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীতে ঘৃণা ধরিয়াছে। উহাকে সূচক করাই বারমুডা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। অত্যাধিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী একমত হইয়া যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলির গুরুত্বই সর্বাধিক। বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ইচ্ছার কথাও ইচ্ছাহারা ছান পাইয়াছে। সম্মেলন সম্পর্কে গোপনতা রক্ষা করা হইলেও বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ইচ্ছার কথা ইচ্ছাহারা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেরই গত ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ হ্যাগার্টি কর্তৃক ঘোষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে বাগদাদ চুক্তি অর্থনৈতিক এবং ধর্মসাময়িক কার্যবিবরণী কমিটির সমস্ত হইয়াছে। আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন ঘোষিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটির সমস্ত হইতে চাহিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। কারণ, উহাই আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের অবশ্যস্বার্থী পরিণতি। কিন্তু বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটির সমস্ত হওয়ার তাৎপর্য্য মিঃ হ্যাগার্টি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহার অর্থ কয়ানিষ্ট আক্রমণের ব্যাপারেই শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কমিটির সমস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত কমিটির সমস্তরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্ কখন আক্রমণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ ইসরাইলের সহিত যুদ্ধ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কমিটির সমস্তরূপে ঐ যুদ্ধে যোগদান করিবে না।

গাজা ও আকাবা উপসাগর সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিগুণের গৃহীত প্রস্তাবাবলী কার্যে পরিণত করা সম্পর্কেও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান একমত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত গাজা অঞ্চল ব্রিটিশ মেন্ডেটরী রাজ্য প্যালেস্টাইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিশর ও প্যালেস্টাইনের সীমান্ত রেখা অনির্দিষ্ট ছিল না, একথা সত্য। কিন্তু যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা নির্ধারণের সময় গাজা অঞ্চলকে যখন মিশরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন উহা স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করা হয় যে, ঐ সীমারেখা রাজনৈতিক বা রাজ্যগত সীমারেখা বলিয়া গণ্য হইবে না। চূড়ান্ত সীমাংসনা হওয়া পর্য্যন্ত উভর পক্ষের দাবী, অবিকার প্রভৃতি কোন-রূপ ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই সীমারেখা স্থির করা হইয়াছে। আকাবা উপসাগর সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিরান প্রশালী যে আন্তর্জাতিক জলপথ এবং আকাবা যে বৃহৎ সাগরের অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাড়া আকাবার উপকূল মিশর, ইসরাইল, জর্ডান ও সৌদি আরব এই চারটি রাষ্ট্র অধিকৃত। কাজেই উহাকে শুধু মিশরের অধীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অধুয়ারী মিশর ইসরাইল কে-ই জল, স্থল ও আকাশ-পথে আক্রমণ চালাইতে পারে না। ইসরাইলে প্রেরিত পণ্য সরেজ খাল দিয়া বাহিত হইতে বাধ্য হওয়ার যে নীতি মিশর অঙ্গস্বরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার নিষা করিয়া ১৯৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নিষাপত্তা পরিবর্তে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার কথাও যখন বাবা

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### বাসক সজ্জিকা

“একখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের ‘বাসকসজ্জিকা’। লেখক যদিও উপভাস রচনা ক’রেই পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সকলন থেকে স্পষ্টই বোকা যায় যে, তিনি প্রকৃত পক্ষে ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ স্বন্দরগ্রাহী ও ব্যক্তনাময়। এবং স্বন্দরসের পরিবেশন-পরিমিতের কলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পর্য্যায়ের পৌছেছে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। মিত্র এও যোষ প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### মুক্তাভাস

“There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis.” —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### \* রত্নমালা \*

“এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজীতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এ রকম অভিধান আর নেই। বাংলার লেখা অভ্যাস তাদের পক্ষে এ জাতীয় একখানি সিনোনাইমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সঙ্কত, ইংরেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই বেঁটে অনেক পরিচয় ক’রে শব্দগুলি সকলন করেছেন। এ বইয়ের যথার্থ্যোপাদায় অবশ্যই হবে।”—যুগান্তর। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

“Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one.” —Amritabazar Patrika

গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা।

### কলকাতার পঞ্চমহাতি

“আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিষ্ময়প্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রন্থেও কয়েকদিনে অশ্রু শিরস্কুলসভায় সজে।”—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।



আবৃত্তক। কিন্তু মিশর কর্তৃক গাজা হইতে ইসরাইলে হানা দেওয়া এবং শারম-এল শেখ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা আকাবা উপসাগরে ইসরাইল জাহাজ আক্রমণ করা কর্তৃক রোধ করা সম্ভব হইবে, সেসবকে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ম্যাকমিলান কোন পন্থা স্থির করিয়াছেন কি না তাহা বুঝা গেল না। জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে স্থায়ী ভাবে গাজায় ও শারম-এল-শেখের বাধা ছাড়া উঠা রোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিশর তাহাতে রাজী হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও ঐক্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

সুয়েজ খাল সম্পর্কে গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৫৭) তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কেও তাহার সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়াছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ছয়টি নীতি কার্যকরী করিবার কোন পন্থা সংক্ষেপে তাহার একমত হইতে পারিয়াছেন কি? উক্ত ছয়টি নীতির মধ্যে মিশরের সার্বভৌম অধিকার সবক্ষেপে অবলম্বন কোন বিরোধ নাই। অবশিষ্ট পাঁচটি নীতির মধ্যে মিশর মাত্র দুইটি নীতি মানিতে রাজী হইয়াছে। প্রাক্তন সুয়েজ কোম্পানীর অংশীদারগণকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহা চুক্তি দ্বারা স্থিরা সালিশী দ্বারা স্থির করিতে মিশর রাজী হইয়াছে। খালের মাস্তুল হইতে কিছু অর্থ খালের উন্নয়নের জন্য পুঙ্খ কথিয়া রাখিয়া একটি তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতিও মিশর দিয়াছে। কিন্তু অপর তিনটি নীতি অর্থাৎ কোনরূপ প্রকোচে বা গোপনে বৈষম্য না করিয়া সুয়েজ খাল দিয়া অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, সুয়েজ খাল পরিচালন কে-কোন দেশের রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং মিশর ও খাল ব্যবহারকারীদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা মাস্তুল স্থির করা হইবে, এই তিনটি নীতি লইয়াই সমস্তা দেখা দিয়াছে। মিশর যে-প্রস্তাব করিয়াছে তাহার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের বলসেয়ানী প্রস্তাবের বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মার্কিন গভর্নমেন্টের রাষ্ট্র বিভাগ মনে করেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ড উভয় প্রস্তাবের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান না। কিন্তু সকল দেশের প্রস্তাবের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিয়া হইবে, ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। কারণ, মিশর যে ইসরাইলী জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়া বাইতে দিবে তাহা মনে হয় না। সুয়েজ খাল পরিচালন যে কোন দেশের রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকিবে, এই নীতি মিশর মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এখন বলিতেছে যে, বুটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করার ঐ সকল নীতি এখন অকার্যকর হইয়াছে।

সুয়েজ খাল এখন বৃহৎ জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাহাজ চলাচল আরম্ভও হইয়াছে। ডেনমার্ক, গ্রীস, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশ মিশরায় সুয়েজ কর্তৃপক্ষকেই মাস্তুল দিয়াছে। সুয়েজ খাল বরকট করার প্রস্তাব যে কেহ মানিবে তাহা মনে হয় না। ফ্রান্স এখনও বরকটের নীতিতেই দৃঢ় রহিয়াছে। কিন্তু বুটেনের পুর-কিছু নয় হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের টোরা সদস্যদের এক ধরনের বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড ঐক্য প্রস্তাব দিয়াছেন যে, দুইটি সর্বোত্তম মিশরকে খালের মাস্তুল দিতে রাজী আছে। প্রথমতঃ মাস্তুলের শতকরা ২৫ ভাগ খাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুঙ্খ

করিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মাস্তুলের সমস্তই সোনা ও ডলারে দিতে হইবে, মিশর এই দাবী করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের টোরা সদস্যরা তাহাতে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বারমুডা সম্মেলনে সুয়েজখাল সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ম্যাকমিলানের মধ্যে যে-মতৈক্য হইয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। সুয়েজ খালের ব্যাপারে কর্ণেল নাসারের বিরুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিঃ ম্যাকমিলান নাকি দাবী করিয়া ছিলেন। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার দৃঢ়তার সহিত এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। মিঃ ম্যাকমিলানের চাপে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করিতে রাজী হইয়াছেন, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের সাফল্যের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করা প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ম্যাকমিলানের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, বুটেনের বিশেষ স্বার্থ যদি বলি দিতে না হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সম্পর্কে মার্কিন নেতৃত্ব মানিয়া লইতে বারমুডা সম্মেলনে মিঃ ম্যাকমিলান রাজী হইয়াছেন।

### বারমুডা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া—

বারমুডা সম্মেলনের ফলাফল ব্রিটিশ রক্ষণশীল মহলকেও খুসী করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বারমুডার বুটেনকে আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন, এই সমালোচনার মধ্যে তাহাদের অসন্তুষ্টি অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমন কি লর্ড সেলিসবারীর পদত্যাগ যে বারমুডা সম্মেলনের ফলাফলেরই পরিণতি, এমন কথাও শোনা বাইতেছে। তিনি গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসের সংযুক্ত আন্দোলনের নেতা আর্চ বিশপ ম্যাকারিসকে মুক্তিদানের প্রতিবাদের পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, আর্চ বিশপ ম্যাকারিসকে মুক্তি দেওয়ার ডেমোক্রাসির খণ্ডগ আমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাসের' লগনশ প্রজিনিমি লিখিয়াছেন যে, লর্ড সেলিসবারীর পদত্যাগ সাইপ্রাস সমস্যা অপেক্ষাও গভীরতর প্রদেশে নিহিত। বারমুডার আমেরিকার নিকট বুটেনের আত্মসমর্পণের সহিত এই পদত্যাগের সংযোগ রহিয়াছে। ইহা সোভিয়েট প্রচারকার্য্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বুটেনের সমালোচকরাও এই কথাই বলিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা সাণ্ডে অবজারভারের বিশেষ রূপে ওয়াকিবহাল সমালোচক ৩১শে মার্চ (১৯৫৭) লিখিয়াছেন, "যদি বারমুডা আলোচনা সাক্ষাৎ হইত, সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক হইবে এবং ইসরাইলের সীমান্ত সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে, এই দাবী করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ইহা বিশ্বাস করিবার প্রকৃত কারণ যদি থাকিত, তাহা হইলে ম্যাকারিসের ব্যাপারে মনোভাব যে অন্তরঙ্গ হইত ইহা মনে না করিয়া পারা যায় না এবং লর্ড সেলিসবারী হইত পদত্যাগ করিতেন না।"



পরমাণু আন্তের পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণ সম্পর্কে বারমুন্ডায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি। পরমাণু আন্তের পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণ সম্পর্কে মি: ম্যাকমিলন যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতেও বিতর্কের স্থলি বড় কম হয় নাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাশিয়ার সহিত চুক্তি করিয়া পরমাণু আন্তের পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার একটি পরিকল্পনা প্রাক্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রী আর্থার ইডেনের ছিল। মি: ম্যাকমিলন পরীক্ষামূলক ভাবে পরমাণু আন্তের বিক্ষোষণ চালাইয়া বাটতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে গবর্নমেন্টের সমর্থক টাইমস পত্রিকা পর্যন্ত সম্মত হইতে পারেন নাই। মি: ম্যাকমিলন অবশ্য বলিতে পারেন যে, বৃটেন পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণ বন্ধ রাখিলেই যে আমেরিকা ও রাশিয়া বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে সে সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নাই। ফলে পরমাণু আন্তের ব্যাপারে বৃটেন পিছনে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণ বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে অনুসরণ বৃদ্ধি রাশিয়াও দিতে পারে। বৃটিশ শ্রমিকদল আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা পরীক্ষামূলক বিক্ষোষণ নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকি। পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে মি: ম্যাকমিলনের রাজী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অবস্থা দৃষ্ট এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, বারমুন্ডায় যে বুঝাপড়া হইয়াছে তদনুসারে পরীক্ষা বন্ধ করিবার পূর্বে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে চুক্তি করিতে হইবে।

বারমুন্ডা চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করিবে। কিন্তু এই ক্ষেপণাস্ত্র কবে যে বৃটেনে বাইরা পৌঁছিতে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেকে মনে করেন, ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বৃটেনে পৌঁছিতে কয়েক বৎসর লাগিবে। কিন্তু এই চুক্তি রাশিয়ার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২৬শে মার্চ (১৯৫৭) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ম: ব্লগানিন নরওয়েতে বিদেশী ষাঁট স্থাপনের বিপর সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া নরওয়ের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্র দিয়াছেন। উহার তিন দিন পরে ডেনমার্কের প্রধান মন্ত্রীর নিকটেও ম: ব্লগানিন অনুসরণ সতর্কবাণী সম্বলিত পত্র দিয়াছেন। অন্তঃপর ৪ঠা এপ্রিল (১৯৫৭) 'নাটো'র দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়া মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও আঘাত হানিতে ক্রটি করিবে না। বৃটেনকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম ইউরোপে ছোট ও মাঝারি দেশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেশগুলির আগাগোড়া সর্বত্র কঠোর ভাবে আঘাত হানি বাইতে পারে। আরও বলা হইয়াছে যে, পরমাণু আন্তের আক্রমণ শুধু একপাকীর হইবে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। পশ্চিম জাতিগোষ্ঠীকেও সেনাবাহিনীকে পরমাণু আন্তে সরবরাহের বহু বিপর সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি পরমাণু যুদ্ধ হয় তবে জার্মানী-ই হইবে প্রধান বণিকত্র। আরও বলা হইয়াছে যে, যে-সকল স্থানে পরমাণু আন্ত সঞ্চিত থাকিবে, সেই সকল স্থানেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী আঘাত হানাই বৃদ্ধ-বিজ্ঞানসম্মত। হল্যাণ্ডকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, যাকিন ষাঁট সোয়েটাবার্ডে যদি একটি বোমা বর্ষিত হয়, তাহা হইলে

আমস্টার্ডাম, হেগ, ইউট্রেখট, আমস্টার্ট এবং ঐ সকল সহরের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিশ্চিহ্ন করিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। রাশিয়ার এই প্রতিক্রিয়া হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে যে, বারমুন্ডা সম্মেলন ঠাণ্ডা যুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

### সাইপ্রাস সমস্যা—

গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসের সংযুক্তি আন্দোলনের নেতা ম্যাকারিসাসের আর্চ বিশপকে বৃটিশ গবর্নমেন্ট মুক্তি দিয়াছেন এক সাইপ্রাসে নিরাপত্তা আইনের কঠোরতাও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। আর্চ বিশপ ম্যাকারিসাসকে যদিও সাইপ্রাসে প্রত্যাবর্তনের অধুমতি দেওয়া হয় নাই তথাপি তাঁহার মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইনের কঠোরতা হ্রাস যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা যে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ভারতীয় প্রস্তাবেরই পরিণতি, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার অগ্রাধিক এক মাস পরেই ২৮শে মার্চ বৃটিশ পার্লামেন্টে আর্চ বিশপ ম্যাকারিসাসকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাঁহাকে সেচেনেল দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। তাঁহার মুক্তি সম্পর্কে ভুলবশত পরবর্তী দপ্তর হইতে সরকারী ভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা হয় নাই বটে, কিন্তু রাজনৈতিক মহল বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী আলান লেনো বয়েড সন্মতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আর্চ বিশপকে মুক্তিদান তাহার কিরাদী। তাঁহার মুক্তির প্রতিবাদ বৃটেনের লর্ড প্রেসিডেন্ট অব কাউন্সিল লর্ড সেলিসবারী পদত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাই তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র প্রধান কারণ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে সম্পর্কে 'বারমুন্ডা'র প্রতিক্রিয়া শীঘ্রক প্রবেশে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের প্রতিক্রিয়ার সাইপ্রাস সম্পর্কে নীমাসের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

এক বৎসর পূর্বে বৃটিশ-সাইপ্রাস আলোচনা বৈঠানে ভাগিরা দিয়াছিল পুনরায় সেই স্থান হইতেই যদি আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আলোচনা কল্যাণ হইতে পারে। আইন-সভায় গ্রীসের আত্মপাতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর্চ বিশপ দাবী করিয়াছেন। লর্ড র্যাডক্লিফের প্রস্তাবে তাহা পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু র্যাডক্লিফ নামটির সহিত আমরা বিশেষ ভাবেই পরিচিত। এইজন্যই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশঙ্কা হয়। তা ছাড়া আরও সমস্যা আছে। বৃটিশ গবর্নমেন্ট 'নাটো'র মধ্যস্থতার মীমাংসার পক্ষপাতী। এই প্রস্তাব গ্রীস অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু গ্রহণ করিয়াছে তুরস্ক। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মনে করেন, সাইপ্রাসের আজমতরূপ সমস্যা সমাধানের পূর্বে উহার আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাটাস সম্পর্কে বুঝাপড়া হওয়া আবশ্যিক। ইহাতে আবার বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এখানে আমরা সাইপ্রাস সমস্যার ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান পাইব না। ডিক্রেনী সাইপ্রাসকে 'the key to the West Asia' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

আজ পশ্চিম-এশিয়ার ব্রিটিশ প্রভাবের নামগন্ধও আর নাই। সামরিক বাঁচি হিসাবে উহার কোন গুরুত্ব আর নাই। ইহা ব্রিটিশ বুটেন বর্ষি আন্তরিকতার সহিত যীমান্সা করিতে চার তবে যীমান্সা হওয়া কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না।

### মিশর অভিযানের গুপ্ততথ্য—

ফ্রান্সের বিশিষ্ট সাংবাদিক ভ্যাক্সের সার্জ ও মেরী বোথার্স 'মিশর অভিযানের গুপ্ত তথ্য' (The Secrets of the Egyptian Expedition) নামে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে কতগুলি চাক্ষু্যকর অংশ প্যারীর বিখ্যাত পত্রিকা কিগারোর ২১শে (১৯৫৭) সন্ধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের পত্রিকার প্রকাশিত অংশে মিশর অভিযান সম্পর্কে যে চাক্ষু্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা এই অভিযান সম্পর্কে বিশ্বাসীর অস্বাভাবিকই সমর্থন করিতেছে। দেখা বাইতেছে যে, আগষ্ট মাসেই মিশরে ইক-করাসী অভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আরও বিস্তৃত বিবরণ জানা বাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইসরাইল যে ২১শে অক্টোবর মিশর আক্রমণ করিবে বুটেন ও ফ্রান্স তাহা আগেই জানিত। প্যারীর সাপ্তাহিক 'পেরী প্রেস' (Paris Presse) পত্রিকায়ও উক্ত পুস্তকের অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার উদ্বৃত্তাংশে দেখা যায়, একজন ফরাসী ঠাকু অফিসার ১৫ই অক্টোবর (১৯৫৭) বিমান যোগে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। কর্ণেল নাসের কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সমুখীন হইয়া ইসরাইল প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়া করিয়াছে, তার একটিই ইডেনকে এই সন্বাদ প্রদান করাই তাঁহার লণ্ডনে যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ১৬ই অক্টোবর প্যারীতে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রদান মন্ত্রিষর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রিষরের মধ্যে গোপন হৈঠকে ইসরাইল-মিশর যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কিগারো পত্রিকার প্রকাশিত উদ্বৃত্তাংশ হইতে দেখা যায়, ফ্রান্স একটি হালকা ধরণের অভিযানের প্রস্তাব করিয়াছিল। ফরাসী প্রস্তাবে ৩৮ কণ্টা বিমান আক্রমণ দ্বারা মিশরীয় বিমান বহরকে নিষ্ক্রিয় করা এবং প্যারান্ট ও উভয় বাহিন্য সৈন্যদের খাল বরাবর এবং শক-সৈন্যের মধ্যে নামাইয়া দেওয়ার এবং খালদখলের পর প্রয়োজন হইলে নাসেরকে শেষ করিবার জন্য কার্যায়গিক অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বুটেন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বড় অভিযানের পরিকল্পনা করে। গতাত্মগতিক রণনীতি অনুযায়ী বড় রকমের যুদ্ধ করাই ছিল বুটেনের প্রস্তাব। সার্জ বোথার্স কিগারো পত্রিকার এবং মেরী বোথার্স প্যারীপ্রেস পত্রিকার সন্বাদদাতা। তাঁহারা বটনাইল হইতে মিশরে ইক-করাসী অভিযানের সময় সন্বাদ প্রেরণ করিতেন। সন্বাদদাতা হিসাবে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। কাজেই তাঁহাদের মিশরের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের বিবরণের এক অংশের দ্বারা ফ্রান্সের প্রস্তাব পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মর্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ফরাসী প্রদান মন্ত্রিষর লণ্ডন হইতে এই পুস্তক প্রকাশ আপত্তি করা হয় নাই, ইহা বিশেষ জাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গুপ্ত তথ্য উদ্ঘাটন সম্পর্কে তার একটিই ইডেনকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন।

### জারিং মিশন—

নিরাপত্তা পরিষদে ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) তারিখে গৃহীত ত্রিশক্তি প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারে সম্মিলিত ভাতিপুঞ্জ দুইভেনের প্রতিনিধি এবং উক্ত পরিষদের প্রেসিডেন্ট মিঃ গানার জারিং কান্দীর সমস্ত সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্ট এবং পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া রিপোর্ট রচনা করিবার জন্য জেনেভা রওনা হইয়া গিয়াছেন। প্রস্তাবে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনিও এই নির্দেশ অনুযায়ী রিপোর্ট দাখিল করিতে চান। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করা হইয়া বাইবে। মিঃ জারিং ১৪ই মার্চ করাচীতে পৌছেন এবং পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা করিয়া ২২শে মার্চ নয়াদিল্লীতে আসেন। নয়াদিল্লীতে এক সপ্তাহ অলাপ-আলোচনার পর ৩০শে মার্চ তিনি আবার করাচীতে যান এবং সেখানে আলোচনার পর পুনরায় ৫ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে আসেন। ভারত সরকারের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া ১৫ই এপ্রিল তিনি করাচীতে যান এবং সেখানে হইতে জেনেভায় রওনা হইয়া গিয়াছেন। পাকিস্তান গবর্নমেন্ট এবং ভারত গবর্নমেন্টের সহিত তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ গোপনতা রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি পায় খুব স্বাভাবিক। নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে, ইহা আশা করা খুব স্বাভাবিক। সেই সময় এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যে প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারে তিনি পাকিস্তান ও ভারতে আসিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য আলোচনা করা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

কান্দীর সম্পর্কে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) হইতে নিরাপত্তা পরিষদে যে-আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহাতে ভারতের পক্ষে সর্বাসম্মত বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দেয় চতুঃশক্তির প্রস্তাবে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ার ভারতের এই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর ত্রিশক্তি কর্তৃক আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহাতে কান্দীর সমস্ত সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলাপ আলোচনা করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট গানার জারিংকে ভারতে ও পাকিস্তানে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাশিয়া উহাতে ভেটো প্রদান করে নাই, কেবল ভোটদানে বিরত ছিল। চতুঃশক্তির প্রস্তাব অপেক্ষা ত্রিশক্তির প্রস্তাব ভারতের পক্ষে কতখানি কম বিপজ্জনক, তাহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের চতুঃশক্তির প্রস্তাবের স্বরূপটি বিবেচনায় করা আবশ্যিক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বুটেন, অষ্ট্রেলিয়া, দার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা এই চতুঃশক্তি কান্দীর হইতে সৈন্য অপসারণ এবং সম্মিলিত ভাতিপুঞ্জের কৌল প্রেরণ সফল পাকিস্তানের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ববাপ্তিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

## মাসিক বসুমতী কেন কিনবেন ?

পত্রপত্রিকা অনেক আছে বাঙলা সাহিত্যের আভিনায়, কিন্তু মাসিক বসুমতীর মত মূল্যবান রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ সর্বজনপ্রিয় সাময়িক পত্র আর একটিও নেই বর্তমানে। আপনিই বলুন, আজকালের অভিজ্ঞ ও সুরচিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাদের মনের চাহিদা মিটাতে মাসিক বসুমতীর মত আর ক'খানি কাগজ আছে ? পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীষপ্লুত মাসিক বসুমতীর স্থান আজ তাঁর মতই, বাঙলার ঘরে ঘরে। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটারে ; রাজবাড়ীর সিংহদ্বার থেকে কৃষকের হৃদিমন্দিরে ; সরকারী কেরানীর বাসা থেকে বেসরকারী ব্যবসায়ীর সোফাখানায় ; ৯৯৯ ক্লাব থেকে হাঁসপাতালে ; পল্লীর সাধারণ পাঠাগার থেকে স্কুল-কলেজের হোস্টেলে ; বুদ্ধিজীবীদের চেম্বার থেকে শিক্ষকদের বইয়ের শেল্ফে ; বাবুদের বৈঠকখানা থেকে মাঠাকরণদের অন্দর-মঞ্জলিশে ; দাদামশাইয়ের দপ্তর থেকে শিশুদের খেলাঘরে—সর্বত্র মাসিক বসুমতীর অবাধ গতি আজ। প্রবীণতম থেকে নবীনতম লেখকলেখিকার সমাবেশ, হাতে আঁকা ছবি আর হাতে তোলা ফটো, নিয়মিত বিভাগের মধ্যে পত্রগুচ্ছ, রঙ্গপট, চারজন, বিজ্ঞানের কথা, অঙ্গন ও প্রাক্ষণ, ছোটদের আসর, নাচ-গান-বাজনা, সাহিত্য-পরিচয়—মাসিক বসুমতী পড়তে পড়তে যেন শেষ হয় না। কথামৃতের কথা সংগ্রহ থেকে সামান্য একটি পাদপূরণও কিসে আপনাদের আনন্দ দেবে, সেদিকে মাসিক বসুমতীর সদাঙ্গাগ্রহ দৃষ্টি আছে—তাই না মাসিক বসুমতী এত বেশী প্রিয় এত বেশী পাঠকপাঠিকার। অনেকে হয়তো জানেন না, মাসিক বসুমতী সম্প্রতি অসংখ্য অবাঙালী পাঠকপাঠিকা লাভ করেছে। এও হয়তো জানেন না, শুধু ছই বাঙলায় সীমাবদ্ধ নেই আর বসুমতী—দেশান্তরে সাগরপারেও ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। আপনি জানবেন আপনার সমগ্র পরিবারের জন্ত একখানি, মাত্র একখানি কাগজ আছে—সেখানি মাসিক বসুমতী।

### —গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন—

মাসিক বসুমতীর আর এক বছর শেষ হয়ে গেল। বৈশাখ থেকে নতুন বছর শুরু হচ্ছে। নতুন বছরের গ্রাহক মূল্য তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন তো ? নচেৎ অধিক বিলম্বে মাসিক বসুমতী না পাওয়াও যেতে পারে। আমাদের অনেক দিনের পুরানো গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ নববর্ষের টাকা পাঠানোর সময়ে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

আপনাদের অবগতির জন্ত বলছি ১৩৬৪'র মাসিক বসুমতীর নব-কলেবর বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টায় আছি আমরা। বৈশাখ সংখ্যা থেকে অনেক কিছু রদ-বদল, সংযোজন আর পরিবর্তন পাবেন মাসিক বসুমতীতে।

ঠিক সময়ের মধ্যে গ্রাহক-মূল্য না পাঠালে বিলম্বে হতাহত হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু।

### —মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য—

ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪
বাণ্যাসিক " "	— ১২
প্রতি সংখ্যা " "	— ২

ভারতবর্ষে

( ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সজাক	— ১৫
" বাণ্যাসিক সজাক	— ৭.৫০

প্রতি সংখ্যা ১.২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১.৭৫
পাকিস্তানে ( পাক মুদ্রায় )	
বার্ষিক সজাক রেজিষ্ট্রী খরচ মুদ্রা	— ২১
বাণ্যাসিক " " "	— ১০.৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১.৭৫

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট জারিকে (সুইডেনের প্রতিনিধি) ভারতে ও পাকিস্তানে প্রেরণে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবকে তিনটি স্তূপে শাণেক করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নিরাপত্তা পরিষদের এবং কান্দীর কমিশনের পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণকে বৈষম্য দিয়াছেন, তাহাও মনে রাখিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোজ সাময়িক ভাবে নির্যোগে প্রস্তাবের কথাও মনে রাখিতে হইবে। তাছাড়া কান্দীর সমস্ত সমাধানের উপযোগী অস্ত্র বিবরণের সন্ধান করিবার দায়িত্বও এই প্রস্তাব দ্বারা ভারি-এর উপর অর্পিত হয়। রাশিয়া ভেটো প্রদান না করিলে এই প্রস্তাব ভারতের পক্ষে যে কিরূপ বিশৃঙ্খলক হইত তাহা বুঝাইয়া বলা নিম্নয়োজন। নিরাপত্তা পরিষদের ১১ জন সদস্যের মধ্যে বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, চিয়া কাইশেকের চীন, কিউবা, কম্বিয়া, ফিলিপাইন, ফ্রান্স এবং ইরাক চতুষ্পক্ষি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। সুইডেনের প্রতিনিধি গানার জারিকে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছিল বলিয়াই নিরপেক্ষতার মনোভাব প্রকাশের জন্য সুইডেন ভোটদানে বিতর্ক ছিল। এই অজুহাতটা না থাকিলে সুইডেনও যে প্রস্তাবের অনুকূলেই ভোট দিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রিশতিন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক। এই প্রস্তাবে চতুষ্পক্ষি প্রস্তাবের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোজ নির্যোগের অভিপ্রায় বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাব ১০০ ভোটে গৃহীত হয়। রাশিয়া ভোট দেয় নাই। ত্রিশতিন প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোজ প্রেরণের অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার ভারতের পক্ষে জারি মিশনের বিশৃঙ্খল অনেক লম্বা হইয়াছে বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মিঃ জারিকে যে বাংলা কমতা দেওয়া হইয়াছে, একখাটা বিশ্বত হইলে চলিবে না। কান্দীর সমস্ত সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব তাঁহার কাছে সম্ভাব্যজনক বলিয়া মনে হইবে তিনি তাহাই ভারত ও পাকিস্তানের নিকট উপস্থাপন করিতে পারেন। কান্দীর হইতে সৈন্ত অপসারণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব তিনি উপস্থাপন করিতে, এমন কি জাতিপুঞ্জের কোজ নির্যোগের প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে তাঁহার কোন বাধা ছিল না। তিনি এক সময় ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর কোন চরুল্ল মুহুর্তে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি রূপে তিনি তাঁহার উপর কোন প্রস্তাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

মিঃ জারিকের দৌত্য সম্পর্কে বড়টুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয় ভারত ও পাকিস্তানে তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আলোচনার সময় গম্ভীর বর্তমান করতাল সম্পর্কে উভয় দেশের প্রতিক্রিয়াই শুষ্ক তিনি পর্যালোচনা করিয়াছেন, কোনও প্রস্তাব উপস্থাপন করেন নাই। মনে হয়, ভারতে তিনি দুই অভিব্যক্তি তুলিয়াছেন, গম্ভীর প্রেরণের সর্বত্র প্রথম অর্থ অর্থাৎ পাক-অধিবৃত্ত ক্রম হইতে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্ত অপসারণের সর্ব পাকিস্তান পালন করে নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টি আলোচনার সময় তিনি নাকি একটি কমিশনের প্রস্তাব করেন। এই কমিশন উভয় দেশের বিরোধীরা বিপরীত পক্ষে বিবেচনা করিলে। পাকিস্তান নাকি বারী

করিয়াছে যে কমিশনের সালিশের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারত এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই বলিয়াই প্রকাশ। কারণ, পাকিস্তান যে আক্রমণকারী তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভারত কান্দীর ব্যাপারে সালিশ নিযুক্ত করার পক্ষপাতী নয়। কান্দীর সমস্ত আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করার কোন প্রস্তাব না কি মিঃ জারিক করেন নাই। সন্তোষ অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই রহিয়াছে। মিঃ জারিকের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদ কি করিবেন? নিরাপত্তা পরিষদ নিজের উত্তোষেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদেও কান্দীর সমস্ত আলোচনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বুটেন ও আমেরিকা কি মনোভাব অবলম্বন করিবে তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে। এনিকে করাচীস্থিত ইকোনোমিশার সংবাদপত্র যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। যুক্তি-কৌজ দ্বারা কান্দীর ভিতরে গোল 'ও' বিশ্বাস্য সৃষ্টি করা হইবে এবং পাকিস্তান অগ্রসর হইবে উহার সাহায্যার্থে। তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে এবং এই সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদ কান্দীরকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রস্তাব করিবেন। উক্ত সংবাদপত্রটি লিখিয়াছেন যে, মার্কিন ও পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সুইডেনের এক পত্রিকার প্রতিনিধি লিখিয়াছেন যে, কান্দীর আক্রমণের একটা চেষ্টা করা হইবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইবে। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধান গণভোট গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা হইবে।

সিঙ্গাপুরে স্বায়ত্তশাসন—

সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডেভিড মার্শাল বাহা পারেন নাই বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিন ইউ হক (Mr. Lino Yew Hock) তাহাই করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সিঙ্গাপুরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গত ১১ই মার্চ (১৯৬৭) আলোচনা আরম্ভ হয়। ১ই এপ্রিল বুটেন ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত হন এবং ১১ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগামী আশুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে। আইন-সভা ৫১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। নূতন প্রথম পাল্লারম্ভে সম্পর্কে এই সর্ব হইয়াছে যে, ন্যায়কর্তা কার্যে লিপ্ত কোন ব্যক্তি সমস্ত হইতে পারিবেন না। সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা প্রথমে আপত্তি করিয়াও পরে রাজী হইয়াছেন। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও কতকগুলি সর্ব আরাণীত হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সিঙ্গাপুর স্বায়ত্তশাসন পাইবে, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে বুটেনের হাতে। বুটেন শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিতেও পারিবে। এই অবস্থার সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ কমিশনার গবর্নমেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদ সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে তিন জন হইবেন বুটেন, তিন জন সিঙ্গাপুরী এবং একজন মালয় ফেডারেশনের মন্ত্রী। সিঙ্গাপুরের সাময়িক খাঁটিগুলি থাকিবে বুটেনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে। একজন মালয়ী সিঙ্গাপুরে ইলেক্টোরাল প্রতিনিধি হইবেন। সিঙ্গাপুরে যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে চলিল তাহা স্বায়ত্তশাসনের প্রথম দৃষ্টি আর কিছুই হইবে না।

# সাহিত্য পরিচয়

## বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জন

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ স্থলে প্রধানতঃ প্রেসিডির বিজ্ঞাপন সম্পর্কেই অতিরঞ্জনের কথা আমরা আলোচনা করব। ব্যবসায়ের দিক থেকে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই, তেমনি প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ ভাবে পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অধিক ভাবে অনুভূত হয় এই কারণে যে, এর বিজ্ঞাপনের দ্বান অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ এবং একমাত্র পত্রিকাদি ব্যতীত অন্তঃ পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন সুচিহ্ন পরিচায়ক মনে হয় না। কিন্তু অধুনা একটি সঙ্গীর্ণক্ষেত্রে মধ্যে বহু-প্রকাশকের ঠেস্‌সিঁদরি-কলে বিজ্ঞাপনের মধ্যে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন দেখা দিয়েছে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে। সব করে কোন পিতা-মাতা 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' রাখলেও তা যেমন অলৌক ও অতিশয়োক্তিরই নামাঙ্কর, তেমনি একখানি অচল গ্রন্থকে বিজ্ঞাপনের ভাব্যর আড়ম্বরের সাহায্যে সজল করে তোলায় চোঁট ও অলৌক ও অতিরঞ্জন-দোষহুই। এর দ্বারা পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং সমষ্টিগত ভাবে সকল পুস্তক ব্যবসায়ীর উপরেই জনসাধারণের একটি ভুল ধারণা জন্মানোর সুযোগ ঘটে।

'বিষাট', 'অদ্বুত', 'অদ্বুতপূর্ণ', 'অশ্রুতপূর্ণ', 'বালা ভাব্যর এই প্রথম', 'ইতিপূর্বে আর হয় নি' প্রভৃতি বাক্যগুলি অবলীলাক্রমে জবাবের স্বাধীনতা পুস্তক ব্যবসায়ীদের কায়ন্ত হলেও, এ সবকে তাঁদের যেমন সত্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনি অহেতুক নিজ প্রকাশিত গ্রন্থ সবকে অতিরঞ্জন বন্ধনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষে। এ সবকে তাঁদের

সর্বদা এই কথাটাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাঁরা কোলা শুড় বা অন্য কোন চটকদারী সামগ্রীর বেসাতী করতে বসেন নি,—তাঁরা জাতীয় কুট্ট ও সংসাহিত্য প্রচারের ধারক ও বাহক। তাঁদের প্রকাশনের মান রক্ষার উপযোগিতা তাঁরা যেমন স্বীকার করেন, তেমনি বিজ্ঞাপনের ভাষা সযত্নেও অতিশয়োক্তি বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন।

## সাম্প্রতিক পত্রসাহিত্য

বাঙালার সাহিত্যক্ষেত্রে বয়সচলনার হিড়িক অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হবার পর সম্প্রতি পত্রসাহিত্যের হিড়িক দেখা দিয়েছে। এই পত্র-সাহিত্যকে পুষ্ট করার দিক থেকে 'মাসিক বহুমতী' দীর্ঘ দিন ধরে যে সাহায্য করে এসেছে তা সর্বজনবিদিত এবং এর জন্য সাম্প্রতিককালে যদি কিছু কৃতজ্ঞতা জানাবার থাকে তাহলে 'মাসিক বহুমতী'কে জানানো কর্তব্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই পত্রসাহিত্যের যে বিশেষ মূল্য আছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। প্রাচীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যের, বহু খুঁটি নাটি বিষয় ও মনুষ্য-চরিত্রের নানা দিক ব্যক্ত হয় এই পত্রসাহিত্যের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে এ সবকে নানা গ্রন্থে পত্রসাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন ব্যক্ত হয়েছে। উক্ত স্বরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙালার পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিস্বল। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃক পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙালার পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিস্বল। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃক পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙালার পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিস্বল। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃক পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙালার পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিস্বল।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### শহীদ স্মৃতি-কথা

হু'সা বহুরের স্বাধীনতার পর সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছে স্বাধীনতা। হঠাৎ স্বাধীনতা আসে নি, আকাশ থেকে বরে পড়ে নি। স্বাধীনতা এসেছে অসুখা আত্মত্যাগে, শত শত জীবন হুহুর্ভের সঙ্কটে বরে পড়েছে চিরদিনের মত, লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী হাসিখুশি নিজেদের উৎসর্গ করেছে স্বাধীনতার বৌদুসে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই আত্মত্যাগের বিবরণ ছিল না। সম্প্রতি সেই যুত্মধরী বীরগণের প্রতিভূতিসহ জীবনকথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বীরের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে ভারতের আকাশে-বাতাসে আজ অনুভূত হচ্ছে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস কোন ক্রমেই সহনীয় নয়। আত্মত্যাগের দিনে এঁদের নাম বত প্রচারা ও প্রচার লাভ করে ততই মজল। কারণ এ কথা ভুললে চলবে

না যে, এঁরাই স্বাধীনতার পথিকৃৎ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল এঁরাই। ঢাকা জেলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশন সমিতি থেকে ডাঃ ইফ্রানারাম সেনগুপ্ত (পল্লীজী খন্দরভাণ্ডার, বি-১৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট) কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে তিন টাকা।

### মাঘোৎসবের উপদেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে ক'জন দিকপালের আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রোতঃমরদীন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। বাঙালীর জাতীয় জীবনে শিবনাথের প্রভাব অনতিক্রম্য। সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়েও দেশকে তিনি বখেই উন্নতির সিঁহদারের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি অতিশ্রুতি প্রবন্ধ একত্রিত করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁর মাঘোৎসবের উপদেশ প্রকাশ করেছেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে।

রহস্যের জীবনশাভেই। অজকণ্ঠলি সারগড় প্রবচ জাতির  
মানসিক উন্নতির প্রভূত সাহায্যক। চিন্তাশক্তির উৎসর্গ শিবনাথ  
শাস্ত্রীর লেখনীর অন্তরত বৈশিষ্ট্য। পোষা পাখী ও বনের পাখী,  
নবজীবন, পাপের বীজ, ঈশ্বরের মনোনিবেশ কে? ধর্মমাজের লবণ,  
আত্মার পাকস্থলী, আসল ও নকল ধর্ম, মায়ের উপহার, বিশ্বাস ও  
নির্ভর, মহামেলা প্রভৃতি প্রবচকণ্ঠলি বিশেষরূপে পণ্ডিত্য। ২১১  
কর্ণওয়ালিশ ট্রীট সাধারণ গ্রাম সমাজ থেকে জীবনপ্রসাদ মিত্র ও  
জীবনমিত্র মিত্র সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা।

### মারুতির পুঁথি

চিক্কলাহ অবনীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ হো নিশ্চয়ই, বাঙলা সাহিত্যেও  
তিনি যে একজন দিকপাল, একথা কোন ক্রমেই করা যায় না  
অস্বীকার। অবনীন্দ্রনাথের রচনা বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ  
সম্পদ, তাঁর লেখনীর নিখুঁত টান রসে-ভাবে বাঙলার  
সাহিত্যকে নিয়ে গেছে এক আলোময় জগতে। শিশুদের ও  
বালকদের রসের গহনলোকে অবনীন্দ্রনাথের আসন অটুট।  
অবনীন্দ্রনাথের 'মারুতির পুঁথি' বর্তমানে তাঁর পরলোক গমনের পর  
প্রকাশিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে ইচ্ছামনকে  
মুখোচরিত করে এর আখ্যানবস্তুর রচিত, কয়েকটি রেখাচিত্র এর  
সমর্থন প্রদান করেছে। অবনীন্দ্রনাথের গভীর কবিতার রসই মার্ফ-  
মজিত, একেই তাই মর্যাদা সমভাবেই রক্ষিত আছে। ১০  
হারিসন বোডহু ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট  
লিমিটেড থেকে জীবিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।  
দাম তিন টাকা চার আনা বাজ।

### আপন প্রিয়

রমাপন চৌধুরীর নাম বহুভূমির পাঠক-পাঠিকার কাছে  
সুপরিচিত 'লালবাই' উপজাতির লেখক হিসাবে। বর্তমান বাঙলা  
সাহিত্যে যে ক'জন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে  
রমাপন তাঁদের অন্তরত, একথা বেশ জোরালো হয়ে বলা যায়।  
বহুবরী ভাষা, ভূবরী মত শব্দচয়ন, কাব্যমাধা বর্ণনা আর বিচিত্র  
বিবরণ—আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের বৈশিষ্ট্য। লেখকের সন্ত  
প্রকাশিত 'আপন প্রিয়' গল্পসম্বলনে লেখকের স্বনির্বাচিত বারোটি  
গল্প স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প  
পূর্বেই আমাদের সাহিত্যে সাদা ভুলেছিল। যেমন 'সত্য ঠাকুরের  
চিতা', 'রক্তকুঁড়', 'বুঝা বিবির মেলা', 'তিনতারা' ইত্যাদি।  
বাঙলা দেশের আদিবাসী আর সাঁওতাল সম্প্রদায় লেখকের লেখার  
দেয় জীবন্ত রূপ পায়। 'আপন প্রিয়' গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও  
প্রচ্ছদপট সত্যিই উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদশিল্পী রঞ্জন আশান লতা।  
বাঙলা সাহিত্যে নবাগত 'জিবেগী'র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য  
আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। জিবেগী প্রকাশন। ১০ ত্রামাচরণ  
মে ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

### মোহিতলাল মজুমদারের স্বনির্বাচিত কবিতা

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক পরেই যে ক'জন শক্তিশালী  
কবিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রোত্তর যুগ—তাঁদেরই মধ্যে  
থেকে অচল নিজস্বতার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে দেখা দিলেন  
মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে  
পরিপূর্ণ স্বরূপ করে তাকে প্রকাশ করলেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গী

মিথি। মোহিতলালের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে থেকে পাওয়া  
যাচ্ছে এক সম্ভবত চৈতন্যের স্রব। যুগবাণী ভূমিস্রাব অবসান  
ঘটতেই যেন তাঁর লেখনী বহুপরিচর। তাঁর অনেকগুলি কবিতা  
একত্রে সংকলিত করে এই স্বনির্বাচিত কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত  
হয়েছে। বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা ভূমিকাটি  
এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। মোহিতলালের কবিতাগুলির মধ্যে  
কালাপাহাড়, অঘোরপহাড়, পাপ, নাদিরশাহের ভাগরণ, ইরাণী,  
নুজহান ও জাহাজীর, পহার, রূপাট ব্রহ্ম, দুঃখের কবি, ফিরদৌসি,  
নমস্কার, গভ ও পদ্ম কবিতাগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী  
সম্মেলন। ১০ হারিসন বোডহু ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড  
পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে জীবিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা চার আনা।

### পথিক

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঙলা সাহিত্যে দেখা  
দিয়েছিল কল্লোল যুগ, সেই একাধিক ভাগ্যাবধৌ সাহিত্যসেবী  
ভক্তগণের পুরোভাগে সেদিন ছিলেন একজন তাঁর নাম গোকুল  
নাগ। বোম্বের মধ্যদেশেই তাঁর জীবনে ঘনিজে আসে  
সুভার কালোছায়া। একটি গ্রন্থের মধ্যেই তিনি বেথে গেলেন  
তাঁর প্রতিভার বাক্য। সেই গ্রন্থটি 'পথিক'। পথিকের মধ্যেই  
গোকুল নাগ যেন আজও বেঁচে আছেন। চারশ চৌদ্দটি পাতার  
স্বল্পত উপভাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি  
গোকুল নাগ এঁকে গেছেন। এর গ্রন্থমূল্য সার্বজনীন। বাস্তব সমস্যা  
ও সমাধানের আভাসও সুস্পষ্টায়িত হয়েছে এতে। পাঠক সমাজে  
এর পুনঃ প্রকাশকে সাগরে বরণ করে 'নিক এই আমাদের একান্ত  
কামনা—১০ হারিসন বোডহু ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং  
কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে জীবিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক  
প্রকাশিত। দাম সাড়ে হ' টাকা।

### সোনালী মেয়েটি

বাল্যকালের কাহিনী অবলম্বনে 'সোনালী মেয়েটি' গ্রন্থটি  
প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সত্য ঘটনামূলক ঐতিহাসিক  
কাহিনী। কবানী সাম্রাজ্যের হারাহুজতলে প্যারাতে যে তেরো জন  
বেগমোরা নাগরিকের উদয় ঘটেছিল সেই ঘটনা অবলম্বন করেই  
এর বিস্তার। অল্পবাদের অল্পবাদভঙ্গী বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।  
তাঁর নিষ্ঠা ও স্বপ্নের সঙ্গে কৃতিত্বের ছাপ পাওয়া যায়। অল্পবাদের—  
হরিকল্পের ভট্টাচার্য। জবাকুসুম হাউস, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশ  
করছেন আর্টস র্যাও লেটস। দাম দু'টাকা।

### ঘরা থেকে মাঠ

'ঘরা থেকে মাঠ' গ্রন্থটিতে ভারতের অতীত যুগের এক ঐশ্বর্যময়  
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মাঠের ইতিহাস আকর্ষণীয় ভাবে এখানে  
পরিবেশিত হয়েছে। অমণ কাহিনীর মধ্যে—কয়েকটি স্বাভাবিক  
রেখাচিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক সত্য এখানে যথেষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত  
হয়েছে। অতীত দিনের অবলুপ্ত স্মৃতি বসিকল্পে আজও আনন্দের  
দোলা লাগায়। মাঠের ইতিহাস, সমাজ, জীবনধারা, যুদ্ধ প্রথা  
বাঙলার পাঠক-পাঠিকাকে জান ও তৃপ্তি দুইই দিতে সক্ষম হবে, এই  
আশাই রাধি। লেখক শিল্পী জীবনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২০৬  
কর্ণওয়ালিশ ট্রীট সাধারণ গ্রাম সমাজ থেকে জীবিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক  
প্রকাশিত। দাম—আড়াই টাকা।



## উদ্ধা

নৌকার ভাণ্ডে এই নাটকটির কথা আর আর কাহো অজানা নেই। মঞ্চের কল্যাণে উদ্ধার কাহিনীর সঙ্গে প্রায় সকলেরই পরিচয় ঘটে গেছে। প্রদেব নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় সেই উদ্ধা এবার দেখা গিয়েছে রূপালী পর্দায়। আনন্দের সঙ্গে যোগা করছি যে, নরেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচালনা উদ্ধাকে মহিষময় করে তুলেছে। রঙ্গমঞ্চে যে উদ্ধা আমরা দেখেছি, চলচ্চিত্রে তার মধ্যস্থানি তো কোন মতেই হয় নি, উপরন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। অবশ্য এর জন্তে রঙ্গমঞ্চের পরিচালককে পোষ দিচ্ছি না; কারণ ছায়াছবিতে বা বা করা যায়, মাকলোকে ঠিক তাই-তাই করা যায়ও না। সুতরাং যতাবতই চিত্র-ভঙ্গত থেকে বলিষ্ঠ উপহারই আমরা আশা করি। নাটক থেকে কয়েকটি চরিত্র বার দেওয়া হয়েছে আবার কয়েকটি সংযোজনও হয়েছে। এতে করে ছবির মূল বস্তুবা কোথাও ব্যাহত হয় নি। স্ত্রীবেশ দেখটা কি হ'ল? পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে গেল, তার পর তার পরিণাম? পরিচালকদের একটা অনুরোধ— তাঁরা প্রধান শিল্পীদের ছাড়া 'এক্সট্রা'দের দিকেও দৃষ্টি দিন; তাহলে যে ছবির অনেকখানি সম্পন্ন—এটা তুললে চলবে কি করে? যমুনা সিংহ গান গাইছেন, তাঁকে ঘিরে আছে অনেকগুলি মেয়ে—এই অবস্থায়, তাদের মুখে না আছে কোন অভিব্যক্তি, না আছে কোন সজীবতা। এনিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। রাষ্ট্রবৈদ্ভান্বে কলহ—তাদেরই ছেলোমেয়ে নিবিড় ভাবে যোগাযোগ করছে, ছবিতে অবশ্য তার জন্তে একটি বৃত্তি ডাক্তারকে দিয়েই দেখানো হয়েছে, তবে সে বৃত্তি খেটে নয়!

অভিনয়ে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণপূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। উপরন্তু এ অভিনয়ে তাঁর বিখ্যাত লাভ চরিত্রটির ছাপ একটুও পড়ে নি— সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল তাঁর এই অভিনয়। কমল মিত্র, বীরেশ্বর সেন, জীবন বসু, অম্বপকুমার, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, হুনমা দেবী, যমুনা সিংহ ও জয়শ্রী সেনের অভিনয় ভালো লাগবে। অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনয়নাযোগ্য অভিনয় করেছেন। লিন-লিঙ্গের Candle Dance ভালো লাগবে। তবে একটা কথা, রঙ্গমঞ্চে বাঁরা অভিনয় করে গেছেন, তাঁদের অভিনয়ের কাছে কিন্তু এদের অভিনয় ঠিক যেন চোখে লাগে না। ছবির জহর রায় মঞ্চের জহর রায়ের নাগালও ধরতে পারেন নি।

### পঞ্চতপা

'চোচল' ছবিটি কিছু কাল আগে অপরূপ সাজা জাগিয়েছিল দর্শকমহলে। প্রথম আবির্ভাবেরই চলাচল জয় করে নিল দর্শকচিত্ত। চোচলের নির্মাতা-গোষ্ঠীর বর্তমান অবলান পঞ্চতপা। বলতে কিছুমাত্র বাধা নেই যে চোচলকেও অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে পঞ্চতপা। বাঙলার ছায়াচিত্র শিল্প সিনে সিনে যে জাতীয় বক্তব্যহীন, অসার ছায়াচিত্র উপহার দিচ্ছিল তারই মধ্য থেকে এই বিরাট শিল্পের উন্নতি সাধনে এদের প্রচেষ্টা লক্ষ্যীয়। বাঙলা ছবির মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী শক্তিময়ী দেখানোর দ্বারা যে সাধারণত বক্তব্য এঁরা পরিবেশন করেছেন, জনগণের সমাধার লাভ তাই হয়েছে। পঞ্চতপা একটি প্রগতিবাহী চিত্র। এর প্রত্যেকটি দৃশ্যেই দৃঢ়, ঘটনার বেশানো আছে এগিয়ে বাঙলার বা ভৈ: বাগী,



## রঙ্গপট

অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। 'বীধ' কে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এক অস্বাভাবিক চাক ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁরই অধীনস্থ এক কর্মচারীর কল্যাণ। তাদের চুক্তির মধ্যেই আছে আর এক কর্মী নরেন। সাধারণ উপরে প্রচণ্ড পূর্ব, চারপাশে চুলি ছালিয়ে মধ্যাংশে সাধারণ আসন প্রদত্ত করে সেই আগনে বলে এই অবস্থার যিনি সাধনা করে থাকেন তিনিই পঞ্চতপা। এক দিকে সোহনাথ, অন্য দিকে নরেন, সেই সঙ্গে সোহনাথের পূর্ব প্রাণবিরীণ পুনরাগমন, এইই মধ্যে থেকে বিকশিত হয়ে উঠছে সাধনা। আজকের দিনে জাতীয় জীবনের সবুজির পক্ষে বীধ যে কতখানি সহায়ক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে আজকের যুগোপযোগ্যের লেখনী 'পঞ্চতপা'র মাধ্যমে। বীধকে কেন্দ্র করা এই ছবিখানি দর্শকসাধারণকে নিম্নক আনন্দ দিচ্ছেই দৃশ্যেই দৃশ্যে না, বর্তমান কালের বীধের কর্মপ্রণালীর একটি পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দর্শকরা এর মধ্যে থেকে পাবেন। অভিনয়ে তপস্বতরঙ্গ, প্রশান্তকুমার, অক্ষয়ী যুগোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয় করেছেন। পাহাড়ী সান্তাল, কমল মিত্র, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, গঙ্গারিজাত বসুর অভিনয়ও ভালো লাগবে। আলোকচিত্রী বিভাস সোমকেও একটি ছোট ভূমিকার দেখা গেল। শুভা সেন কাজ চালিয়ে নিয়েছেন রাজ। সঙ্গীতক্ষেত্রও কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। আবার বলি, আজকের দিনে এই নিরুপাখিতার যুগে ঠিক যে জাতীয় ছবিগুলি দেখার জন্তে সত্যিকারের বসিকবুদ্ধ উৎসুক পঞ্চতপা তাদেরই একটি। এর বধ্যবোধ্য মূল্য লিখে দর্শকরা কখনই কাণ্ডাধ্য প্রকাশ করবেন না। আজকের যুগোপাধ্যায়ের ও পরিচালক অসিত সেনের আগানী অবলানগুলির জন্তে আমরা অপেক্ষার হইলুম।

### ভাষাসী

বিষাভার অপার মহিষকে শত চোঁতেও বিজ্ঞান কোন দিনই অতিক্রম করতে পারবে না আর বাঙলা দেশের মেয়ে ভিক্টোরিয়ার পর্যায়ে উন্নতিসাধনা প্রদানত এই হচ্ছে তাপনীর যুগ বক্তব্য। রমেন গাঙ্গুলীর জমিদারের ছেলে—তার জীবনে আসে হ'জন মেয়ে জীবিত ও রকনা—প্রথম পুরোহিতের মেয়ে, দ্বিতীয় অপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর মেয়ে—প্রথম প্রাচ্য শিক্ষার শিক্ষিতা, দ্বিতীয় শহরের চোখ-খানি আলোর উজ্জ্বল।

মনেন রমলাকেই চাইল, যারের শেষ ইচ্ছার থাকিতে শ্রীমতীকে বিয়ে করল সে—তবে তা তাকে কষ্ট দেবার জন্তেই—এদিকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হওয়ার রমনের ভবিষ্যতের অন্ধকারে উপলব্ধি করে রমলা তাকে করে প্রত্যাখ্যান। পথে দুজনের হোল মোটর দুখানা, দুই-শক্তি সে ফেলল হারিয়ে, শ্রীমতী নিজেই চোখ দিয়ে রমনকে বাঁচায়। তার পর অল্পতপ রমনে কমা চার শ্রীমতীর কাছে। আগাগোড়া ছবিটি বক্তব্যে পরস্পর বিরোধী। যে ছেলেকে দেখছি প্রথম থেকে বিজ্ঞানের অচ্ছ উপাসক, স্বাক্ষরমুক্ত সেই ছেলে 'সিডু ডাক' মানে কখনও? ঠাকুর দেবতার ধারে যে বায় না সেই ছেলে গায়ত্রী জপ করছে। জমিদার-বাড়ীর দেখে কলকাতা বাচ্ছে—দেখা গেল গাড়ী তৈরী, মামা প্রস্তুত, শেষে দেখছি সে একলা একটি সাইকেলে চড়ে বাচ্ছে, যে ছেলে মঙ্গলগ্রহ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খবর রাখে সে ছেলে 'হবি' কাকে বলে জানে না। যে ধরনের সংলাপ বিভূষ মুখে দেওয়া হয়েছে তা অসিতবরণের মুখে মানায়, বিভূষ মুখে মানায় না। একটি লেখাপড়া শেখা বরাপ্রাপ্ত যুবকের পক্ষে বা বলা সম্ভব একটি নাবালকের পক্ষে তা বলা সম্ভব কি? এখানে ঘটছে টিক তাই। বিভূষ কথা বলার সঙ্গে অসিতবরণের কথার খুব বিশেষ একটা তারতম্য বরা বায় না। অভিনয়ে অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটছে, প্রায় সকলেই সুঅভিনয়ই করেছেন। একবার বারেকের তার অল্পকুমার ও শুভেন মুখোপাধ্যায়কে দেখানোর কি প্রয়োজন ছিল? শিল্পীগণ্য এমনিতেই তো দেখেই। অহীন্স চৌধুরী, ছবি বিলাস, অহর গঙ্গোপাধ্যায়ী সান্তাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যো, দীপক মুখো, বীরেন চট্টো, অল্পকুমার, শুভেন মুখো, পরিমল সেন, শিশির বটব্যাল, নৃপতি, পঞ্চানন, বৈষ্ণবী, শান্তি, বিভূ, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, সন্ধ্যায়াণী দেবী, সবিতা চট্টো, বেণুকা বার, বনানী চৌধুরী, রেবা, আশা, কদালী, গীতা, কুলবল প্রভৃতি শিল্পীদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়।

### সিঁদুর

কখন যারের মর্মে বৃত্তিকা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে সিঁদুরের চিত্ররূপ। হুই তাই কুমারেশ ও কমলেশ। প্রথম জন মতপ, চরিত্রহীন, গৃহে স্ত্রী থাকে সন্তোষ আর একটি মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করে পরে অল্পশোচনীয় রক্ত হয়ে প্রথমার কাছে কমা চার, প্রথমা বিতায়ার হৃদয়ব্যব তার সেবার ভার গ্রহণ করে, বাঁচাতে পারে না, বাসিন্দার মিল হয়। বিতায়াজন অধ্যাপক-পৌত্রী (বা পৌত্রী) র প্রেমে বিভোর কিন্তু এসের বাজাপথ খুব সহজ নয় ঈশ্বর বন্ধ, শেষে অগ্রজ ও তৎপত্নীর প্রচেষ্টায় মমুর মিলন। সর্বশেষে চিত্রনাট্যকারের ছোট্ট একটি বক্তৃতা। সমস্ত ছবিটিতে আদ্য-গোড়া একটি বহু-নিষ্ঠার ছাপ হৃদয়বিহীন। কাহিনীর স্বচ্ছতাও একে অনেকখানি সহায়তা করেছে। অধ্যাপকের বই নামানো এবং ঐ বাড়ীর ভৃত্যের মাথার জল ঢালা, সপরিবারে নৃপতি চট্টো আগমন এই দুইগুলি অক্ষুণ্ণ হাসির উল্লেখ করে, দুধের বিষয় সে হাসিতে হৃদয়লাগি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। তবে এই ছবি দেখে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে যে অধ্যাপক হলেই যে একই পামলাটে হতে হবে এ রকম গারগা আঙ্কালকার পরিচালকের মাথার আসে কি করে? পাণ্ডালার হৃদয়টিকে তো

দেখে মনে হল যেন একজন নিমজ্জিত অতিথি। মুম্বরীকে তোলাবার জন্তে যে কুমারেশ ডলির সঙ্গে পালালো তাদের বাড়ীতেই ডলির হাতে কুমারেশ ও মুম্বরীর যুগ্ম আলোকচিত্র পাঞ্জরা বায় কি করে? দাবিদের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েও শেষোৎসে দেখতে পাচ্ছি কুমারেশের পকেট থেকে বেরোচ্ছে লামা সিগারেট-কেস। মুম্বরীর সবলতা কোটাতে গিয়ে একটি কিছুত কিম্বাকার বস্ত্র করে ফেলা হয়েছে—খানায় কি বা কারা থাকে এই জাতীয় প্রশ্ন শুনেও একটি বালকও হাসে ফেলে। আরও একটি উক্তি মুম্বরীকে দিয়ে করানো হয়েছে যা অত্যন্ত হাস্যকর, বিশেষ করে মুম্বরী যখন শিশু নয় সে নিজে একজন যুবতী। ক্লাবে প্রেমাসক্ত বৃক্ষে যে গানটি জোড়া আছে সেই গানটি সুলিখিত, বিশেষ করে এই গানটির জন্তেই কবি বিমল খোবাকে জানাই ধন্যবাদ।

অভিনয়শ্রেণি বিকাশ রায় অপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কয়েক ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে, ছোট ভূমিকার মধ্যেও পঙ্কিমান শিল্পী প্রেমাণ্ড বসু শক্তিরই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যশু সের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। স্বাক্ষর পাণ্ডুরের সঙ্গে আপন চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন রবীন মজুমদার। এ ছাড়া পাহাড়ী সান্তাল, কমল মিত্র, অমর মল্লিক, জীবেন বসু, তুলসী চক্র, শৈলেন মুখো, রাজলক্ষী, রেবা, চিত্রা মণ্ডল সুঅভিনয় করেছেন। মানসী চট্টোপাধ্যায় একেবারে অচল না হলেও টিক এখনও নিজেই অভিনয়ের সঙ্গে ঝাপ ঝাওয়াতে পারেনি। আশা করি এ দৃষ্টান্ত তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠবেন—কারণ, সম্ভাবনা বৈষ্ণবী মধ্য আছে তা বেশ বোঝা যায়।

### চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

#### হাস্যরসিক অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

#### শ্রীরমেশচন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বর্তমান কালে বাংলা দেশে যে ক'জন হাস্যরসিক অভিনেতা আছেন, তার ভেতর শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান খুব উচ্চ। বহু দিন থেকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত সংগ্রহ করে চলেছি এবং বহুমতীয় পাঠক-পাঠিকাদের তা উপহার দিয়েছি প্রায় প্রতি মাসেই। এবারে তাই স্থির করলুম, বিভিন্ন ছায়াছবিতে ধারা হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শক-সমাজকে আনন্দ বিতরণ করেন, তাঁদের একজনকেই পরিচিত করবো আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। এই ভেবে বছরের প্রথম দিনটিতেই বাজা করলুম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। দক্ষিণ-কলকাতার ভানু বাবু থাকেন কিন্তু নববর্ষের প্রথম দিনে তাঁকে বাড়ীতে পাবো না নিশ্চিতই, তা আমার জানা ছিল। তাই ভানু বাবুর অন্ততম-কর্মস্থল তাঁর থিয়েটারের উদ্দেশ্যে বাজা করলুম টিক সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে। এদিনে তাঁর থিয়েটারের জনপ্রিয় নাটক 'শ্রীকান্তের' অভিনয় চলছিল। এ নাটকটিতে 'নন্দ বিজ্ঞান' অভিনয় করে ভানু বাবু বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর থিয়েটারে বাবার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল বনামবন্ধ নাট্যকার ও পরিচালক বহুবুর দেখানারও উদ্দেশ্য সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং আমার উদ্দেশ্যসিধির জন্তে তাঁর সাহায্য গ্রহণ। ভানু বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আগ



যেকেই কিছু বছরের এই প্রথম দিনটিতে বাতে ব্যর্থকাম না হই সেজন্ত বন্ধুবরের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলুম। সরাসরি গিয়ে হাজির হ'লুম—ঠার খিয়েটারে দেবনারায়ণ বাবুর শীতাতপ কক্ষে। দেবনারায়ণ বাবু একাই বসেছিলেন। আমাকে দেখে দাদর অভ্যর্থনার ক্রটি হলো না। নব বর্ষের শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের পর আমার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলুম দেবনারায়ণ বাবুর কাছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ভাঙ্গ বাবুকে ডাকতে পাঠালেন এবং এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে তাঁর ঘরে বসেই আমার কাজ আমি যেন সেরে নিই। কারণ তাঁর ঘরে আর কেউ তখন আসবে না। আমার দিক থেকে এটাই আমি চাইছিলুম।

একটু পরেই শ্রীকান্তের 'নন্দ মিত্র'র বেশধারী ভাঙ্গ বাবু সশরীরে হাজির হলেন। তাঁর মেকআপ করা ছিল। পায়ে লাল টকিন; মেটে রং'এর কেডস—আমার ভগ্নাটিই বা কি অপরাধ? লোককে হাসাবার চেষ্টাই যেন তাঁর সৃষ্টি। সত্যিকারের শিল্পী ইনি। প্রতিটি কথা, আচার ব্যবহারে, চলাফেরায় প্রতিটি পদক্ষেপে এর শিল্পীর ছাপ রয়েছে। প্রাথমিক নমস্যার আদান-প্রদানের পর দেবনারায়ণ বাবু আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই ভাঙ্গ বাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—রমেন বাবুকে আমি ভালভাবেই চিনি। বলুন কি করতে হ'বে।

আমি আর কালবিলম্ব না করে সরাসরি আমার উদ্দেশ্যের কথা তাঁকে বললুম। তিনি অমনি আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ভাঙ্গ বাবু বলে চলেন, ১৯৪৬ সালে 'জাগরণ' ছবিতে আমার প্রথম আত্ম-প্রকাশ। তারপর বহু ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছি ও এখনও করছি কিন্তু কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা এক কথায় বলা আজ সম্ভব নয়। তবে এটুকু অবশ্যই বলবো যে, 'বহু পরিবার' ছবিতে 'সুদেবার পালের' ছোট ভূমিকাটিতে অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। চলচ্চিত্রলগতে বোগদানের পেছনে অন্ত কোন কারণই ছিল না, এটা আমার ক্ষেত্রে একটা আকস্মিক ঘটনা বলতে পারেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিনয়ের দিকে একটা টান ছিল এবং ছোটখাট ভূমিকায় আমি প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতুম। আমার অভিনয় দেখে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক অশীল মজুমদার, বিশিষ্ট অভিনেতা কাম্বু বন্দ্যোপাধ্যায়, কবী রায়, কুমার মিত্র—এরা আমাকে চলচ্চিত্রে বোগদানে উৎসাহিত করেন। চলচ্চিত্রে বোগদানে আমার কোন মিমাই কোন আশঙ্কা ছিল না। আর এটুকুও বলবো যে ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার

সামাজিক কি পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্তনই আসে নি।

এর পর আমি ভাঙ্গ বাবুকে জিজ্ঞেস করলুম তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা। ভাঙ্গ বাবু বললেন, আর সকলের মতই সকালে চায়ের পর্ত্ত শেষ হ'লে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা তদারক করি এবং তাদের পড়াশুনা দেখিয়ে দি। যে দিন সন্ধ্যা থাকলো সেদিন আহারাদি সেরে টুডিওতে চলে যাই, টুডিওর কাজ সেরে বন্ধুজীতে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনে গিয়ে বসি ও নানারূপ আলোচনার অংশ গ্রহণ করি। যেদিন খিয়েটার থাকে সেদিন টুডিও থেকে সরাসরি খিয়েটারেই চলে আসি।

বিশেষ কোন 'হবি' বা খেলায় আগ্রহের কিছু আছে কি, জিজ্ঞেস করলুম আমি। ভাঙ্গ বাবু যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। একটু বিলম্ব না করেই অমনি বললেন, স্ত্রীর গান শোনা। খেলার মধ্যে ফুটবল খেলা দেখতেই আমার ভাল লাগে—কারণ I always like speed. মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা প্রায় সবগুলিই আমি পড়ে থাকি। শুধু বাংলা দেশেরই নয়, সর্বভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও আমি নিয়মিত পাঠ করি এবং এজন্য আমার অর্থও



শ্রীভাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং প্রচুর। আপনাদের মাসিক বঙ্গদত্তে আমি নিয়মিত পড়ি এবং আমার ভালও লাগে। পুঁথি পুস্তকের মধ্যে 'Political Literature' ই আমার বিশেষ প্রিয়, তবে সব বইই আমি পড়ি, কেবল ডিটেকটিভ উপন্যাস আমার ভাল লাগে না। পোষাক পরিচ্ছদের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, সাদা পোষাক পরিচ্ছদই আমি পছন্দ করি এবং সাদা পোষাকই আমি পরিধান করি; কেন না, সাদা পোষাক সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? ভাষ্কর বাবু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, অভিনয় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে চাই দৃষ্টি, তাহলে কথা বলার দক্ষতা—*Impressive way of talking is essential*. অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে হলে মনে রাখতে হবে, অভিনেতা-অভিনেত্রী হ'বে, এটাই সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন অভিনেতা অভিনেত্রী হইবে, এভাবে মনে রাখলে চলাবে না—এটাই আমার শুল্লষ্ট অভিমত। ভাল ছবি তৈরী করতে হলে যেটা সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন সেটা হ'লো ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পর প্রয়োজন সুন্দর পরিচালকের। বর্তমানে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন করতে হ'লে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এ বিষয়ে। আমার মতে সরকার সাহায্য না করলে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন হ'বে না। আর একটি বিষয় আমি বলবো শিল্পীদের স্বাধ্ব্যাকা করা এক শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যিক।

চলচ্চিত্রে বাঙালী বিশেষ করে অভিজাত এক শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের অবস্থা বোঝানো করা উচিত—বললেন ভাষ্কর বাবু, তবে ক্যান্সান করে যদি কেউ এ লাইনে আসতে চান তাঁদের না আসাই ভাল। এটাকে বারী নিছক শিল্প বলে গ্রহণ করছেন কেবল তাঁদেরই এ লাইনে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।

এবারে আমি ভাষ্কর বাবুকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলাম। তাঁর গড়ে মাসিক আয় কত এবং কত দিন বাৎসরিক বৃত্তি গ্রহণ করেছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ্যামেচার হিসেবে কাশ করি। আমি বৃহত্তম তিনি এ প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। কোন ছবিতে কত টাকা পেয়েছি যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো 'জাগরণ' ছবিতে একটি পরসাত্ত আমি পাইনি। আমি ঘরে নিলুম ভাষ্কর বাবু এ সকল ব্যক্তিগত প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান। সুতরাং আমি আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লুম না এমিকে।

ভাষ্কর বাবুর প্রথম জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলে চললেন—ঢাকা সহরেই আমার বাবা ছিলেন, ঢাকা নবাব সরকারের আইন উপদেষ্টা, আমার মাও বিদুবা মহিলা। তিনি ছিলেন সে কালের গ্রাফ্রুয়েট এবং বেঙ্গল এডুকেশনাল অফিসের (মহিলা বিভাগের) একজন সদস্য। ১৯০৪ সালে

আমার মা সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্গতা সর্বোচ্চিনী নাইজু ছিলেন আমার মায়ের ধর্মভাতা ভগিনী। শৈশবে মাতার তত্ত্বাবধানেই আমার লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর পর ঢাকার স্কুল-কলেজে আমার শিক্ষা লাভ। বি. এ. পরীক্ষার ঠিক পূর্বে দুহুর্ন্তে আমাকে ঢাকা সহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তার পর ১৯৪১ সালে আমি কলকাতায় চলে আসি এবং আরম্ভ ও স্ট্রীল কটোলারের অফিসে চাকরী গ্রহণ করি। ১৯৪৫ সালে আমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হই। আমার বৈবাহিক তিন দিন পরে আমি প্রথম ছায়াছবিতে যোগদান করি। এক্ষেত্রেই এমিনটি আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৫৬ সালের ৭ই জানুয়ারী আমি সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিই এবং সেই থেকে আমি পুরোপুরি শিল্পী হিসেবেই আত্মনিয়োগ করে আসছি। শিল্পী আমি এবং শিল্প-জীবনই আমার একমাত্র কাম্য। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন শিল্পী-জীবনই আমার কাটে।

এ ভাবে আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ পথ্যারে এসে উপস্থিত হলো। আমি ভাষ্কর বাবুকে জিজ্ঞাস করলাম, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? ভাষ্কর বাবু উত্তর করলেন, সমাজে চলচ্চিত্রের স্থান খুব উচ্চ। জনশিক্ষার বড় ভলি মাধ্যম রয়েছে চলচ্চিত্র। তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আজকের দিনে।

এর পর ভাষ্কর বাবু বললেন, ছায়াছবিতে অভিনয় করলেই বে ছবি দেখতে হ'বে তার কোনই মানে নাই। সত্যি কথা বলতে কি, ছবি দেখতে আমি ভাল বাগি না, সে'বে ভাবার ছবিই হোক না কেন। বিবাহিত শিল্পীদের বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি না, ভাষ্কর বাবু জানা নেই। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন না। কারণ তিনিও একজন যেতিও শিল্পী। তিনি মনে করেন, অভিনয়টাও নিছক একটা চাকরী—এ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের এ গানের আলোচনা শেষ পথ্যারে এসে উপস্থিত হলো। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভাষ্কর বাবুর জ্ঞান সত্যি গভীর। আমার সঙ্গে এ শিল্প সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা করলেন। স্থানভাবে সব বিষয় লেখা এ স্থানে সম্ভব নয়। আমি এ বারে তাঁর কাছে শুধু জানতে চাইলুম—বর্তমানে যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে সেই ছবিগুলো সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি? ভাষ্কর বাবু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, গত তিন বছর ধরে বাংলা দেশে যে সকল ছবি তৈরী হয়েছে সেগুলো প্রশংসিত পক্ষেই এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল ছবি তৈরী হ'বে। এ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আজ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কথাত শেষ করেই ভাষ্কর বাবু উঠে পঁড়ালেন। মনে হলো ঐকান্তের 'নন্দ মিত্র'র সত্তা আবার তাঁর মধ্যে এসে গেছে। তিনি ব্রহ্মপদে নট্যকারের কক ভ্যাগ করে চলে গেলেন ঐকান্তের আসরে।



# সাময়িক প্রেক্ষাপট

## বাসগৃহ সমস্যা

“ভারতের ছোট-বড় সমস্ত সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ী অভাব একান্ত ভাবেই অনুভূত হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বাসগৃহের এই অভাব সামান্যতমও হ্রাস পাই নাই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের নিকট প্রদত্ত স্টিলিত জাতিগুণের রিপোর্টে আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ১৯৬১ সাল শুধু সহরগুলিতেই বাসগৃহের অভাব ১১৫১ হাজারের বিত্তম্ব ইবে। ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর ইহা আমাদের শ্রমণ রাখিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৫ লক্ষ বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ২১ লক্ষ বাসগৃহ নির্মিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তথাপি ১৯৬১ সালে ৫০ লক্ষ বাসগৃহের অভাব থাকিবে। সহরগুলিতে বাসগৃহের অভাব বৃদ্ধি পাইবার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে বাইরা। পল্লীর বহু লোকের সহরবাসী হওয়ার কথা ঠিক অধিকাংশ লোকের বাসগৃহ নির্মাণের ব্যয় বহনের অসামর্থ্যের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। কথটা যে ঠিক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পল্লী অঞ্চলে জীবিকানুভূত হইয়া বহু লোক সহর জীবিকার সন্ধানে আসিয়াছে এবং আসিতেছে। সহরবাসীরা মধ্যে শতকরা ১২ জনের মাত্র গৃহ নির্মাণের সামর্থ্য আছে অবশিষ্ট শতকরা ৮৮ জনেরই গৃহ নির্মাণের সামর্থ্যের অভাব নূতন গৃহ নির্মাণ কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু শতকরা ৮৮ জনের গৃহাভাব মিটাইবার উপযোগী গৃহ নির্মিত হইতেছে না।”

—দৈনিক বসুমতী।

## শুধু মুখের কথা

“নিখিল ভারত উৎপাদক সম্মেলনে বার্ষিক বৈঠকে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, বৈশেষিক দুইবার ঘাটতি নিয়ন্ত্রনকল্পে তাঁহারা যেন নিজ নিজ গৃহে সজ্জিত সোনা ও জড়োয়ার একটা অংশ সরকারের নিকট সমর্পণ করেন। আন্তর্জাতিক সেনসেনের ক্ষেত্রে সোনাট প্রকৃত মান। ইহা হাতে আসিলে বিশেষ বিক্রয় করিয়া কিবা বন্ধক রাখিয়া অন্তর্যক দেশের দুর্ভিক্ষ অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়। স্ততরা বাঁহাদের সঙ্গে প্রয়োজনান্তরিত সোনা, রূপা, জড়োয়া প্রভৃতি আছে, তাহারা পণ্ডিতজীর আহ্বানে সাড়া দিলে বৈশেষিক দুইবার ঘাটতি

পূরণ করা অতি সহজ। দেশের মধ্যে সোনারূপার পরিমাণও অল্প নয়। মাত্র পঁচ এক শত বৎসরের মধ্যে নিট আমদানীর পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকারও বেশী। কিন্তু ইহার অধিকাংশ মজুত হইয়া আছে উচ্চবিত্ত ও ধনকুবের জ্ঞেয় সিন্ধুকে বা কাশ-বান্ধে। পণ্ডিত নেহরুর আবেদনে তাঁহারা সাড়া দিবেন কি? দ্বিতীয় মহামুদ্রের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির মজুতদারীর ও কাটকাবান্ধার দ্বারা জনসাধারণের দ্বারা প্রাপ্য তাঁহারা যেভাবে গ্রাস করিয়াছেন, তাহা শ্রমণ করিলে তেমন ভরসা বোধের কারণ নাই। পণ্ডিতজীর প্রস্তাবটি সামু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কার্যকরী করার জন্য বখেট দুটো প্রকাশ করা তাঁহারা পক্ষে সম্ভব হইবে কি? দেশের বিভিন্ন স্থানে সেক্ষ ডিপজিট ভণ্ডে বেসরকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা ভাড়া লওয়া খুশীগুলি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইলে কমপক্ষে সহস্রাবিক কোটি টাকার সোনারূপা যে উদ্ধার করিতে পারা বাইবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে বিভাগের পল্লীর কথা বাইবে কে?”

—সুপাভব।

## সাধনান!

“ভারতের প্রতিরক্ষার কর্তব্য সত্বে বিশেষ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছি। আর্থিক শক্তিকে মাধ্যমিক নির্মাণের কাজে ভারত কখনই প্রয়োগ করিবে না, শ্রীনেহরু ভারত রাষ্ট্রের নীতি সুশীল ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শুধু বর্তমান ভারত সরকারের মুখপাত্র হিসাবে নহে, তিনি ভবিষ্যৎ ভারতেরও সরকার এবং জনসমাজের নামে এই ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীনেহরুর ঘোষণার আদর্শসম্মত বোদ্ধিকতা আছে, অস্বীকার করা যায় না। শান্তির শক্তিকে উৎসাহিত করিতে হইলে এইজন্য সুশীল ঘোষণাবও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্তৃত হওয়া যায় না যে, বিস্তৃত বাস্তবতা সম্মত কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নত ও শক্তিশালী করিবারও প্রয়োজন আছে। প্রতিরক্ষার অসম্মত থাকিবার এবং ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন বহু দিন থাকিবে, কিন্তু সেই প্রকৃতি ও ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং উন্নত করিবারও প্রয়োজন থাকিবে। স্ততরা শ্রীনেহরুর ঘোষিত নীতি সম্মত এবং বিধাবিহীন ও স্ববিবোধী চিন্তার দ্বারা লক্ষ্য করা সম্ভবহীন থাকিবে, কিন্তু সেই সম্ভবহীনকে অসম্মত করিবে।

চীনবল করিয়া রাখিবার কোন সুক্তি থাকিতে পারে কি? 'নতুন ঐতিহ্যের' অগ্রগতির দ্বারা ভারতীয় বাহিনীকেও আধুনিকতম সামরিক যোগ্যতার উন্নত না করিলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে হীনবল করিয়া রাখা হইবে। 'চীনের ভরতের ইতিহাসের শিক্ষা' গ্রন্থ করিয়া থাকেন। 'গ্রন্থ করা উচিত যে, ভারতে অভিযানকারী ব্যবস্থার যোগ্য বাহিনী কামান ব্যবহার করিয়াছিল এবং আশ্চর্যকর বুদ্ধে এবং দিল্লীর কোন কামান ছিল না। বলিয়াই দিল্লীকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

### নয়া পরমা

"নয়া পরমা প্রবর্তনে গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃতিশ্রদ্ধ হইবে, সরকার ও ধনীরা লাভবান হইবে, আমাদের এই যত্নবান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। নয়া পরমা প্রবর্তনে কি লাভ হইবে তাহা উদ্ধার প্রবর্তকেরা বুঝাইতে পারেন নাই। পশ্চিম নেহরু তত্ত্ব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 'শূন্য' আর্থিক করিয়াছে, নশমিক প্রথা ভারতের দান, অতএব নশমিক মুদ্রা, মাণ ও ওজন প্রবর্তন করিয়া আমরা প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছি। এখানে সর্বোচ্চ জিজ্ঞাস্য, ভারতের যে মহামানবীরা শূন্য এবং নশমিকের আর্থিকতা তাহারা নশমিক মুদ্রা ওজন ও মাণ প্রদান না করিয়া বর্তমান নিয়ম দিলেন কেন? এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কিসে পশ্চিম নেহরু বা নশমিক মুদ্রা প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য পীতাম্বর পক্ষ তাহা বলেন নাই। বামপন্থী নেতারা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, নীতিগত ভাবে তাহারা নশমিক মুদ্রা সমর্থন করেন, তবে উদ্ধার কলে সরকার যে দাম বাড়াইয়াছেন তাহা সমর্থন করেন না। ইহাতেও কোন সুক্তি নাই। নশমিক মুদ্রা মানিয়া নিজেই দাম পোটকার্ড প্রভৃতিতে মূল্যবৃদ্ধি অথবা উদ্ধার বাটতি মিটাইবার জন্য ট্যান্ডবুডি মানিতেই হইবে। নয়া পরমার ভরসে মিটাইবার উপায় নাই, উদ্ধার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরিতে গেলে দাম বাড়িবে, নিয়মিত পূর্ণ সংখ্যা ধরিলে লোকসান হইবে। সরকারের বেলায় ট্যান্ড বাড়িবে। ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ানো ছাড়া পতি নাই। কারণ ট্যান্ড তুলিয়া বাটতি মিটাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ভারত সরকার ডাকমাস্তল বাড়াইয়াছেন। আইন না। 'ইদা মুদ্রা বিনিময়ের নামে তাহা করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। ইহা যেআইনি কাজ হইয়াছে। নশমিক মুদ্রা ভাল, এই নীতি মানিয়া নিজে পরিবর্তন কালীন বিশৃঙ্খলা স্বীকার করিতেই হইবে। এমন মুদ্রা বিনিময়ে দেশজোড়া বিশৃঙ্খলা এবং অসন্তোষ 'লুট' কোনক্রমেই থাকিবে না।'

—গুণবাণী (কলিকাতা)

### পৌরসভা জলের কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

'আদানসোল জলসাধারণের একটি বিরাট উদ্ভেদনা সাধারণ নিকটস্থ শেষ হইয়া গেল। এখন গরম পড়িতে শুরু হইয়াছে, এখানে জলসাধারণের শিপিয়ার জলের জল অপূর্ণ একটি উদ্ভেদনা শুরু হইবে। এই উদ্ভেদনা এত প্রবল হইবে যে, কলের নিকট ইয়াব জল পাল্পাগলি, কাড়কাড়ি ও গরিশেষে মাঝামাঝি পর্যায় প্রবাহ হইবে। প্রতি কলের নিয়মিত এই উদ্ভেদনা দেখিতে আদানসোলবাসী অভ্যস্ত। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত প্রতিবৎসর এই বিশৃঙ্খলের প্রতিকারার্থে কিছু না কিছু করিতে করিতে

বর্ষা আসিয়া যায় এবং পৌরসভাও তাহাদের দায়িত্বে শেষ হইল মনে করেন। স্বার্থে ভাবে কিছু করার চেষ্টা পৌরকর্তৃপক্ষের এ পর্যায় দেখা যায় নাই এবং স্বার্থে ভাবে কিছু করার দায়িত্বে যে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের অক্ষম তাহা বোধ হয় তাহারা মনেও করেন না। আমরা মনে করি, এমন এই সম্পর্কে স্বার্থে কিছু করার সময় আসিয়াছে। এবং এই ব্যাপারে আর উদাসীন থাকা পৌরকর্তৃপক্ষের উচিত হইবে না। কেননা টাকার অনটন এই অজুহাত বেশী দিন চলে না। মানুষ কিছুদিন খৈয়া রাখিতে পারে কিন্তু অধিক দিন পর্যায় নিগূহীত হইতে থাকিলে অধৈর্য হইয়া ব্যাপক ভাবে প্রতিকারের জন্য জ্বরিত হইবে না একথা বলা যায় না। জনসাধারণ এখন পুরীপেক্ষা মনেও সচেতন হইয়াছে এক কি করিয়া কাজ আদায় করিতে হইবে তাহা কেলিয়াছে। সুতরাং আমাদের পরামর্শ যখন সরকারের পৌর প্রতিষ্ঠান না দিয়া কংগ্রেস দল এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে হাতে রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন স্বার্থে ভাবে জল সরবরাহে ব্যবস্থা করা উচিত।'

—আদানসোল হিটবরী।

### রোমাক

'এটি তরুণীর গতিবিধি সন্দেশজনক দেখিয়া পুলিশ তাহাদের অভিজ্ঞদের খবর দিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দিয়াছে। মেয়ে দুইটি ক্রমিক চুক্তিতে এমনই বিভ্রান্ত ছিল যে, পুলিশকে এক শত টাকার দিতেও চাহিয়াছিল। ইহাও একটি বিজ্ঞান ঘটনা নয়। স্বাক্ষর মেয়েদের বিবাহ দিতে না পারার কলে সমাধি এখন বহুদিন আচার তনিতাই হইবে। খুবই ভাল পথে চলা হইতেছে। সমাজতত্ত্ববিগ্ন দলগুলি ছাড়িয়া এখন একমুখে কাজ শুরু না করি পরিণাম যে কি পোচনীর হইবে, তাহা ভাবিতেও রোমাক হয়

—পল্লীবাসী (কালনা)

### কাজ দেখানো চাই

আমরা এখনই শুনিতে পাইতেছি, কংগ্রেস কাজ দেখাইবেন। উহা কথা। জনসাধারণ তাহাদের কথা ও কাজের পার্থক্য এবার এক দুই দিয়া বিচার করিবে। মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ আর কংগ্রেসকে জরুরী করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তর পরাজয়ের দিন তাহারা ইদুর করিয়াছে। সুতরাং জেল্লাবাসীর প্রতি কংগ্রেসের দায়িত্ব সমধিক। কাজ তাৎক্ষণিক দেখাইতে হইবে। আর নিজে কাজগুলি তাহাদের নিকট হইতে আশা করি—

- (১) মেদিনীপুর সহরের স্থলবাজার—কলেজেরী রাজপথটি, জগন্নাথ শ্রীর বড়বাজার—কোতবাজার পথটি এক বৎসরের মধ্যে পাকা করা;
- (২) ১৯৮ সালের মধ্যে নিমকলাচ হইতে পাটনাবাজার, পাটনাবাজার হইতে বরীবাজার স্থল বাজার পর্যায় পথটি পাকা করা;
- (৩) সহরের জলের অভাব দুইকালের জন্য সহরের দুই প্রান্তে দুইটি শক্তিশালী নক্ষত্র দ্বারা জলের সরবরাহ বৃদ্ধি প্রেরণ;
- (৪) সহরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আলোর খুঁটিগুলি আরও নিকটবর্তী করা এবং আলোর শক্তি বৃদ্ধি করা;
- (৫) বাড়িগ্রাম কৃষি-কলেজটিকে ডিগ্রী কলেজে পরিণত করা;
- (৬) সহরে একটি কৃষিক্ষেত্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। এই বয়েসে।

এই পাঁচটি কথা কাজ হইলে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে জাতিতে হইবে না।'

—মেদিনীপুর হিটবরী।

### যৎকিঞ্চৎ

“তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও  
পর্যায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান পুরাপুরি সেট ধরায় মিউনিসিপ্যালিটি  
একটু বিশদে পরিচালিত এবং আলোর খবর মিউনিসিপ্যালিটি  
নতুন কর দায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞানের আলোকে  
অত্যন্ত চট্টলে কর বাড়িবে, তাহাতে বলিবার কিছুই।  
কিন্তু যেখানে এইরূপ পৌরসভার পক্ষে আলোর ভর (নিষ্কর,  
বাক্যের একটা প্রাইভেট কোম্পানী ইউনিট পিছল ১৯১৪ সালের  
পর্যায় বৈশিষ্ট্য না লইয়া সাধারণের উপকারার্থ পৌরসভার  
প্রতিবেদন দেয়, সেখানে স্থানীয় বিজ্ঞান সর্বস্বত সমবায় প্রাচীর  
হাত চট্টলে সরকার প্রদান করিয়া ১০—/১৫ পরসংক্ষেপে  
সাধারণের সমান একেবারে ১০— আনা যেট লইবেন ইচ্ছা  
করার না কি? স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতাসন বিভাগীয় প্রাচীর  
গুলি সরকারের বিশেষ সাহায্য ও সহায়ত পাইবার।  
আর তাহা চট্টলে নতুন ট্যাক্স বাড়াইবারও সরকার চয়।  
লোকের হস্ত পায়। সে অবস্থায় পৌরসভা যেদিন পুরে  
তমলুকে ‘ইউনিট প্রতি বাস্তব আলো ১৯১৫ বা ১০— আনা  
কর সরকারকে চাপ দিলে কেমন হয়।” —প্রদীপ (মেম্বিনী)

### শোক সংবাদ

গত ২৬শে মাস কলিকাতার লক্ষপ্রসিদ্ধ চকুচিকিৎসক  
মিউ বেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার সুবোধকু-  
মারপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮১ সালের ১৫  
অক্টোবর তাঁহার মাতুলালয় বনগাঁও জন্মগ্রহণ করেন। তেহার  
চট্টলে এটীক ও সিটি কলেজ চট্টলে এক-এ পাশ করিয়া  
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। স্থানের সহিত এম-বি পাশ করি-  
য়া সুবোধকুমার চকুচিকিৎসকরূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লা-  
করেন। চকুতে অস্ত্রোপচারে তাঁহার দক্ষতা বাংলার বাহিরে  
প্রচারিত হয়। সুদূর উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব চট্টলেও তাঁহার নিকটে  
রোগী আসিয়াছে। জনহিতকর কাঁয়া, বিশেষ করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞান  
এসারে সুবোধকুমারের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে চিকিৎসকের  
ভাব অর্থ মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা পরিমিত দেখিয়া তিনি  
কলিকাতার একটি চিকিৎসা-বিভাগের স্থাপনে উদ্যোগী হন। ডাক্তার  
স্বামীমোহন দাস, কুমারস্বরূপ বায়, এস. সি. সেনগুপ্ত ও সুবোধকুমারের  
প্রায় গোরাচাঁদ বোডের জ্ঞানজাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও চিকিৎসক  
সম্পাতাল স্থাপিত হয়। সুবোধকুমার চিকিৎসক হামপাতালের  
ইকনমিক সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপেও কাজ করিয়াছেন। সুবোধকুমার  
নিরন্তর রাজনীতিতে আগ্রহ প্রদান করেন। অবিভক্ত বাংলার  
শ্রমিক লীগ মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক দোষাত্মক চিন্তা যখন উৎপাদিত  
তিনি তখন নিউ বেল এসোসিয়েশন গঠন করিয়া বহু বিভাগের  
সম্মেলন করতেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি ও পরে সভাপতি-  
রূপে রাজনীতিতে তিনি ডাক্তার ভায়াপ্রদাস সুবোধকুমারের সহযোগী  
হন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সুবোধকুমার বিহারের  
কলিকাতা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন  
করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক রাজ্যপন্থ আন্দোলনের  
তিনি অন্যতম প্রথম ও প্রধান উদ্বোধক। এই উপলক্ষে নিম্নের

## আজ প্রকাশিত হইল

সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ

### পলাশের নেশা

ভাবে ও ভঙ্গিতে আধুনিক যুগমানসের প্রতিক্রিয়া বাংলা গল্প-  
সাহিত্যে বীর রচনার প্রথম সার্থক রূপ পেয়েছিল, তিনি—সুবোধ  
ঘোষ। যুগ-বিরতনের পালাবদল তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আজও  
সমানভাবেই প্রতিক্রিয়া চয়। তাঁর অনপচ্যুত সৃষ্টি-কর্মতার  
নিদর্শন ‘পলাশের নেশা’। নয়নাভিরাম উজ্জ্বল প্রেক্ষণ।  
দাম তিন টাকা।

রমাপদ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ

### আপন প্রিয়

সৃষ্টি-প্রেরণার আদি উৎস আপন অমৃতদ্রুতকে আপামর সকলের  
জন্ম-স্থানে পৌঁছে দেবার আকৃতি। আপন-প্রিয় আর সকলের  
প্রিয় হয়ে উঠুক স্রষ্টার এ-অজিতাঘ ও তাই চিরন্তন। রমাপদ  
চৌধুরীর প্রিয়তার গল্পের এই সঙ্গম তীর স্ফুট পটভূমির প্রতি  
সেই সহমর্মিতার প্রীতি-অর্ঘ্য। দাম তিন টাকা।

বাল্যস্থ

### রাধা

ভার্যাস্তর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক উপন্যাস।  
ভার্যাস্তর তপু শিরীষ, তিনি দার্শনিক ও তাঁর মানসলোকের  
গভীরে তাই নিত্যনতুন ভাবের ব্যঙ্গ-কাস। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ  
এই উপন্যাসে তাঁর ভাববল্লভ বৈষ্ণবধর্মের একটি নিগূঢ় রহস্যের  
উন্মোচন ঘটেছে।

### বনভূমি

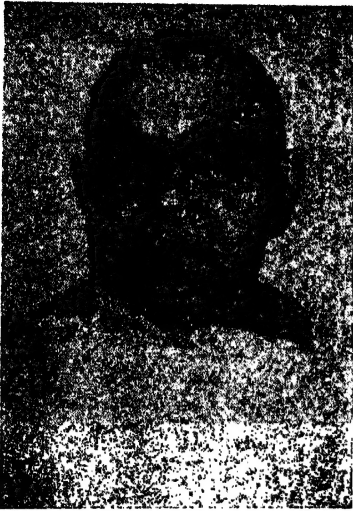
নিম্নলিখিত রচনার ক্ষেত্রে বিমল করের নাম আজ প্রসিদ্ধি।  
নর গতিপ্রকৃতির মন উদ্ঘাটনে তিনি সিদ্ধহস্ত। ‘বনভূমি’  
অগ্রগত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

### ধুবরণ

ভার্যাস্তর সুখোপাধ্যায়ের গল্পসংকলন। বাংলা-  
ভাষায় প্রথম যুগের স্বাক্ষরবাহী এই গল্পসংকলন—সেই  
সংকলন।

### প্রিবেণী প্রকাশন

প্ৰকাশক দে জীট, কলিকাতা-১২



সর্বোচ্চমাত্রার গণোপাখ্যায়

সরকারী মন্ত্রণালয়, সর্বদা স্টেটেল, পণ্ডিত নেত্র ও রাজস্ব-প্রসার  
সহিত তিনি একাধিক বার আলোচনা-আলোচনা করেন। সেই সময়ে  
প্রচুর অর্থায় ও পরিপ্রসার দ্বারা তিনি যে সকল প্রামাণিক তথ্য  
সংগ্রহ করেন, পরবর্তীকালে রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট স্বাক্ষর-লিপি  
শেষ করিতে বহু প্রতিষ্ঠান তাহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন।  
অব্যাহতমাত্রার বহুকালে দ্বী, এক পুত্র, তিন কন্যা জন্মাতা ও অগণিত  
বহুবাহুব বান্ধিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জামাতারা সকলেই কেন্দ্রীয়  
সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

স্বদেশীয় কল্যাণের রাজ্য ক্ষিত্র দেবগার মহাশয় গত ৩৪  
চৈত্র ৮৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বাঙালদেশের  
লাইব্রেরী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম চিরদিন জড়িয়ে থাকবে।  
বৈদিক ইংরাজী ইন্টার প্রেস, ইংরাজি মাসিক ডন, বাঙলা মাসিক  
পূর্ণিমা প্রভৃতি পত্রিকাগুলির তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বিশিষ্ট জননেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রতম নারদ  
মজুমদার বঙ্গোপাখ্যায় এম, সি গত ১৫ চৈত্র ৬৩ বছর বয়সে  
বুধলা কারনানী হাসপাতালে লোকান্তর গমন করেছেন। প্রায়  
তীব্রতাই টাইফয়েডে আটকান বাবদয়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে সক্রিয়  
রাজনীতিক হোগলান করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বাঙালী  
আন্দোলনের প্রতি অগ্রবর্তী ছিলেন। বিদ্রোহী স্বতন্ত্রসেহান গার  
ছিলেন এই গুরু নেতাজীর সহকর্মী তিনি বহুদিন ছিলেন। দেশের  
জন্মে তিনি বহু বার কারাবরণ করেছিলেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও জমিক নেতা বৃন্দলাকাঞ্চি বনু গত  
১০ই চৈত্র বৃন্দলা কারনানী হাসপাতালে পরলোকে প্রস্থান  
করেছেন। বৃন্দলাকাঞ্চি ৩৪ বয়স ৭১ বছর পূর্ণ হয়েছিল। তিনি

আটন বাবদয়ে লিপ্ত থাকাকালীন ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষায়  
উত্তীর্ণ হন। "স্বাধীনতা" "বেঙ্গলী" প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিরন্তর  
লেখক ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতবাঙ্গার পত্রিকায়  
সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। শেষ অবধি অমৃতবাঙ্গারের সঙ্গে ঐক্য  
যোগ ছিল, মধ্যে কিছুকাল "করোয়ার্ড" পত্রিকায় যোগদান করে  
ছিলেন। তিনি সাংবাদিক-সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ভারতে  
জমিক আন্দোলনের পুণ্ডিত থেকে তিনি ভারত সঙ্গ জড়িত ছিলেন  
ও নানা ভাবে তাঁর মঙ্গল সাধন করে গেছেন।

বাঙাল শিশুসাহিত্যে অগণতের বশিষ্ঠমান স্রষ্টা দক্ষিণাধর  
মিত্রমজুমদার গত ১৬ই চৈত্র ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।  
শিশুদের ভগ্নতে দক্ষিণাধরনের যে অটল আসন প্রতিষ্ঠিত তা এখনও  
স্থানচ্যুত হবার নয়। রূপকথার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত ভবিষ্যতের  
জন্মে গুরু হোগলার তাঁর দক্ষতা সমধিক বিস্তারিত। অধঃপতন  
পূর্বে ঠাকুরমার ঝুলি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর পূর্ব ঠাকুরদাসের  
ভুলি, ঠানদিদির খলে, বাঙালীর রূপকথা, বাঙালীর রসকথা প্রভৃতির  
মাধ্যমে শিশু সাহিত্যকে তিনি এক অনির্ণাণীয় রূপ দান করে  
গেছেন। ভূমিস্তান সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় "পা"  
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির মধ্যে লিখে পাওয়া  
যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পাদনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয়  
দেখা গেছেন (১৯৩৩)। স্বাধীনতা, ভারত-ভারতী, সাহিত্যভারতী,  
জ্ঞানসাহিত্য স্রষ্টা প্রভৃতি স্বাধীনমুখে উপাধিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান  
থেকে ভূষিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পদক ও গত  
৩৪ বাঙালসরকার কর্তৃক সর্বধনা তিনি লাভ করেন।

সুবিখ্যাত আইনবিদ্যার স্বামী শ্রীমন্তে সেনের সহধর্মিণী  
আশালতা সেন গত ১১ই চৈত্র ৫৩ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে  
লোকান্তরিত হয়েছেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত কণ্ঠ পরিবারের  
স্বনামধন্য ডি, অরুণ বাবদয়ে ৮০ বছর বয়সে বয়সে বয়সে বয়সে  
মধুর বাবদয়ে ও বরাদ্দতার জন্ম সকলের প্রভা আকর্ষণ করেছিলেন।  
শিল্প সৃষ্টির প্রতি এঁর অনুরাগও ছিল প্রবল। এঁর পুত্রের  
সর্বস্বী শৈলেন্দ্রচন্দ্র, সমরেন্দ্রচন্দ্র ও লট্টেন্দ্রচন্দ্র আইনের ক্ষেত্রে  
সবিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আমরা শোকসন্তপ্ত সেন  
পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবী অধ্যাপক নীলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ২৩ই  
চৈত্র ৬৭ বছর বয়সে শেরশিখার ত্যাগ করেছেন। বাঙাল দেশে  
জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে জাতিকে সজ্জিত পথে অগ্রসর হতে ধারা  
চিরদিন সহায়তা করে এসেছেন, নীলেন্দ্রচন্দ্র তাঁদেরই অগ্রতম। বাঙাল  
দেশের নানা স্থানে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রজীবনেও এঁর  
কৃতিত্ব অগণ্য ছিল। অত্যাধি তিনি প্রায় তিন শ' প্রবন্ধ রচনা  
করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি পূর্ণিমালাভ্যাক ও পত্রিকা  
সম্পাদকতবে নির্ধারিত সেবা করে এসেছেন। বহুসভার সঙ্গেও এঁর  
সংযোগ ছিল বহুকাল ধাবৎ। এঁর রচিত "বাঙালীর সাংস্কৃতিক  
অবদান" প্রবন্ধে বহুসভা পুণ্ডিত লাভ করে (১৯৫২-৫৩)।



## পত্রিকা সমালোচনা

মুদ্রণ বিদেশ থেকে লিখছি। মাসিক বসুমতীই বরতে গেলে প্রকাশ জীবনে সাধনা শেষ দেশের কথা শুনিবে। বসুমতী আছে— তিসে তিসে বসুমতী বেন শ্রমের থেকে মুক্ত হতে হচ্ছে। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত যোগ্য কয়েক কুতী সম্পাদকের প্রতিভাও সম্পাদনা শক্তি। চার জন, কেনাকাটা, নাচ-গান-বাঁজনা, বঙ্গপট, বেসাদা প্রকৃতি বিভাগগুলিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ক্যান্টোনার দৃষ্টিকথা ও "শ্রমী" আর্ডেরেব মিনপতী (বক দস্ত) এর ক্ষেত্রে বাক্যে শাস্তা বস ও পৃথীগ্রন্থ মূখোপাধ্যায়ের অভিনন্দন জানাই। প্রথমতঃ বলে রাখি যে, আন্তঃকর ছাত্রাঙ্গির সুগোচর সেক্ষিত্র যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হচ্ছে সাহিত্যিকদের কল্যাণে। এর ক্ষেত্রেও বসুমতী বঙ্গদেশে গারী। বসুমতীতে প্রকাশিত একাধিক কাহিনীর চিত্রকণ হয়ে গেছে, যথা স্বয়ংসিদ্ধা, বাক্সির তপস্যা, মনের মূর, নিরক্ষর প্রভৃতি ছবির কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে একমিনি বসুমতীতেই প্রকাশ লাভ করেছিল। পঙ্কতপা ও বাস্তা হলো শুধু বসুমতীতেই প্রকাশ লাভ করেছিল। পঙ্কতপা ও বাস্তা হলো শুধু বসুমতীতেই প্রকাশ লাভ করেছিল। পঙ্কতপা ও বাস্তা হলো শুধু বসুমতীতেই প্রকাশ লাভ করেছিল।

মুদ্রণা মৈত্র, নৈপিয়ায় টাউন, ময়লাপুর।  
বীর্ঘদিন ধরে আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক। জীবনের পক্ষে বাস্তব-প্রতিঘাতপূর্ণ কত ঘটনা ওলট-পালট করে দিয়েছে কিন্তু বসুমতীর ক্ষেত্রে দ্বয় যে আসন পাতা আছে তা কেউ প্রতিকূল পরিবেশই তাকে টলতে পারেনি। যথেষ্ট যোগ্য হয় এখন একমাত্র পত্রিকা যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানবিক জ্ঞাতব্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যায় প্রায় সাত-আটটি করে উপভাস প্রকাশ করাও কম নয়। আর্থিকভাবে যোবাল, নাগপুর (মধ্যপ্রদেশ)।

### মূল। ক্ষেত্র ভুলত্রুটি

বসুমতীতে পাঠক-পাটিকার চিঠিতে "মূল। কক" শব্দ অশোক সিন্ধের অভিযোগ দেখলাম। আজকাল বিকৃত উচ্চারণ বহুত্রয় দেখতে পাওয়া যায়। এর সার্থক হলো বিকৃত উচ্চারণের দলপল্লব বাধু হইবে। শ্রীমুক্ত অশোক সিন্ধ ভুল উচ্চারণ মনোবল বিবেচ্য ভুল করে বসে আছেন। তিনি লিখছেন— "মূল।" উচ্চারণ নেই, "Heard" কথাটির ফরাসী ভাষায় "হি" নয় "হি"।

"নামে তারা লিখছেন 'মূল।' কিন্তু সঠিক ফরাসীতে ওটা হবে 'মূল।'। অশোক বাবু লক্ষ্য করবেন 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপনেও নায়টীক লেখা আছে (যদিও অনুবাদটা একই ব্যক্তির নয়)। সঠিক ফরাসীতে ওটা হবে 'মূল।' (moulin)। আর এক জায়গায় লিখছেন তাঁরা আর 'একটা সাংবাদিক ভুল লিখছেন 'Le Tambourin' কে 'লো তাম্বুরিন'...এটার আসল ফরাসী উচ্চারণ হবে 'লো তাম্বুরা'।' আসল ফরাসী উচ্চারণ হবে 'লো তাম্বুরা'—'তাম্বুরা' কোনমতেই নয়। সব ফরাসী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বাংলায় লেখা সম্ভব নয়—যেমন 'রুজ' (rouge) কথাটা। বাংলা উচ্চারণটা যথার্থ নয়; কারণ ধারা ফরাসীভাষা শুনেও ভুল করে জানেন যে ওরা R উচ্চারণ করে গলায় ভেতর থেকে—ক্রিভ থেকে নয়। বাংলার 'রুজ'ই লিখতে হবে অনভ্যাপ্য হয়ে। এই ধরনের ভুল অনেকই মজার নয়। অনুবাদকর সমস্তই ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন—হয়ত তাঁরা ফরাসী ভাষাও জানেন না, কাজেই তাঁদের পক্ষে ভুল লেখা সম্ভব কিন্তু সিংহ মশাই ফরাসীভাষা জেনেও কি করে ভুল লিখলেন ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। ইতি—শ্রীমতীকান্ত গুপ্ত (শ্রীমতীকান্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক)

### লালবাঈ-এর প্রকাশক কে ?

১৩৩২ সালের মাসিক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত-রূপায় চৌধুরী মহাশয়ের "লালবাঈ" কি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ? যদি হইয়া থাকে অল্পগ্রহপূর্ণক প্রকাশকের নাম ওঠিকানা জানাইলে বিশেষ বাবিত হইবে।—শ্রীমতীকান্ত গুপ্ত। পাঠকপুত্র, জেডহাশোল। বীকুতা।

["লালবাঈ" গ্রন্থের প্রকাশক জি. এম. লাইব্রেরী। কলিকাতা-৩।—স]

### এজেন্টের বিলম্ব কেন ?

এজেন্টের কাছে বসুমতী পাঠ মাসের শেষে। অর্থাৎ শুনিবে প্রথম সমুদ্রের প্রকাশিত হয়। একটু ভাড়াভাড়া পঠাওয়ার ব্যয় করা যায় না কি ? আগামী সংখ্যায় চার জনের মতো আগমাত্র দেখতে চাই। আশা করি পাঠক-পাটিকারও এ ইচ্ছা অপর্যাপ্ত নয়।—শ্রীকালীশ্বর সিংহ। গোহালা, মহারাজপুর, বীরভূম।

[এজেন্টের কাছে পত্রিকা কেন বিলম্ব দেখে থাকেন? বুললাম না। বাই হোক, আগমাত্র অভিযোগ পত্রিকার এজেন্টের বিভাগে জানিয়েছি। আগমাত্র জীবনী প্রকাশ সম্পর্কে সত্যিকারের



কিনতে চাই

১৩২১ থেকে ১৩৪০ সালের সংখ্যাগুলি। শ্রীবিভবসেনিমা পাণ্ডা, পোঃ কল্যাণচক, মেদিনীপুর।

১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, বেচিলার ব্লক নং ২। ৩, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ডিভিসি, বহুগপুৰ, মেদিনীপুর।

১৩৪১ সালের বৈশাখ ও ১৩৬১ সালের মাঘ সংখ্যা। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর গুপ্ত, বিরাগড়, পোঃ গুজুগু, ডাকবাংলো।

বেচতে চাই

১৩৬২ সালের কাঙ্ক্ষন ও চৈত্র মাসের ও ১৩৬৩ সালের প্রত্যেকটি সংখ্যা বারো আনা মূল্যে।—শ্রীপ্রবালকুমার ভট্টাচার্য্য কামাকৌর, কোচবান্দা বোড, মজকুপুৰ।

১৩৪১ সালের আশ্বিন, ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ এক ভাস্কর্য মাসের সংখ্যাগুলি। শ্রীশৈলেনকুমার গুপ্ত, ৪১ নবীন চক্রবর্তী লেন, চাকরা, শ্রীহামপুর।

১৩৪১ সালের চৈত্র, ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ, কাঙ্ক্ষন, চৈত্র, ১৩৪৯ সালের পৌষ ও চৈত্র, ১৩৬০ সালের বৈশাখ, অগ্রহায়ণ এক কাঙ্ক্ষন, চৈত্র, ১৩৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংখ্যাগুলি। শ্রীচরণ শাস্ত্রী, সংবাদকর্তা এড্‌কট, মিয়াগঞ্জ, দুর্গাবাদ।

১৩৬১ ও ৬২ সালের প্রত্যেকটি সংখ্যা (একত্র তিনখানি করে বেজিনে বাঁধনো) মোট পঁচিশ টাকার। শ্রীসীতারদেব শ্রব, বেলগুৰ কোয়ার্টার, কোটগুট্টার স্টাডি, পোঃ বামিডিয়া, হাওড়া।

১৩৬০ সালের কাঙ্ক্ষন থেকে ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যাগুলি। এ. বাস, ১০১/৪ বি চাকরা বোড, কলকাতা ২৬।

১৩৪১ সালের মাঘ-কাঙ্ক্ষন, ১৩৬০ সালের বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, মাঘ, কাঙ্ক্ষন, ১৩৬১ সালের আশ্বিন, আশ্বিন ও চৈত্র, ১৩৬২ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, কাঙ্ক্ষন, পৌষ, কাঙ্ক্ষন মাসের সংখ্যাগুলি। তরুণ বাসুগুপ্ত, ৪/১ মেডেক-আলী বোড, কলকাতা ২৭।

১৩৪১ সালের কাঙ্ক্ষন থেকে ১৩৬৩ সালের আশ্বিন পর্যন্ত সংখ্যাগুলি। শ্রীতরুণেশ্বর সেন, ৩৬/১ গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা ৪। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি (২৬য়ের কোন উল্লেখ নেই)। শ্রীঅক্ষয়কুমার বাগচী, ২৭নং বড়াসপাড়া লেন, কলকাতা ৫৬।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে ভাস্কর্য পর্যন্ত সংখ্যাগুলি ও চৈত্র টাকার ১৩৬৩ সালের শ্রাবণের বহুমতী। ডাঃ এন. বসাক, ১ লোকনাথ চট্টাচার্য লেন, শিবপুর, হাওড়া।

পূজ পঁচ বছরের প্রত্যেকটি সংখ্যা।—মাধবী লাল, ৮-৩৪ কার্ণাটোড কলকাতা-২১।

১৩৬৩ সালের সংখ্যাগুলি (এই সংখ্যা সত) ডাকঘর বাবে ১১ টাকা মূল্য। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর গুপ্ত, বেলগুৰ বাইস মিল। পোঃ ও গ্রাম—হাউর, মেদিনীপুর।

সুভোদা-আঠায়ে বছরের পুরাতন সংখ্যাগুলি, কোন ভাল কলিকারি এইভাবে কিনা মূল্যেও নিতে পারি। শ্রীবিদ্যাসুন্দর গুপ্ত, ২৬ বার সংখ্যাসহ জেদুরী স্ট্রীট কলকাতা-৩৬।

১৩৬১ সালের বৈশাখ, আশ্বিন ও আশ্বিন-চৈত্র ও ১৩৬২ সালের কাঙ্ক্ষন, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও চৈত্র মাসের সংখ্যাগুলি। ছয় আনা ডাকমাস ও প্রতি সংখ্যার অর্থমূল্য মোট এক টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।—শ্রীমতী উষা পালিত, C/o শ্রী এ. কে পালিত, ১১ শ্রী মিশর বোড, নয়ামিলা-১।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বহুমতীর চালাবরণ ১৫ টাকা অগ্রিম পাঠালাম, গ্রহণ করিবেন।—গৌরী সেন। C/o. Sri Anil Kr. Sen, Kazibazar, Cuttack.

আমাকে মাসিক বহুমতীর গ্রাহিকা করিয়া লউবেন। আগামী ১৩৬৪ সালের বৈশাখ চাইতে আমাকে বহুমতী পাঠাবেন। বাৎসরিক টাকা মনিঅর্ডার বোণে ১৫ টাকা পাঠালাম।—সত্যীন্দ্র। C/o, Sree Dharendra Nath Chakravorty, Post Box 12. Po. Raxaul, Dist. Champaran.

Sending Rs. 13/4/- (Rs. 15/- less Re. 1/12/- deposited in advance) as subscription for another year 1364. Please do the needful. Amita Sanyal. C/o Sri S. Sanyal, Assistant Engineer N. E. Railway P. O. Narkatiaganj, Behar.

মাসিক বহুমতীর ১৩৬৪ সালের বার্ষিক টাকা ১৫ টাকা "বাসমোচন মহিলা লাইব্রেরী" তরফ চাইতে পাঠালাম।—শ্রীমাতৃবী চক, সম্পাদিকা বাসমোচন মহিলা লাইব্রেরী।

Sending herewith Rs. 8/12/- towards my subscription for the Monthly Basumati from Chaitra '63 to Aswin '64. I am a subscriber kindly arrange to send me the Magazine regularly. Sm. Jyotsna Devi C/o P. K. Chakrabarty, Asm. P. O. Baunsi, Bhagalpur.

Kindly receive my half-yearly subscription of Monthly Basumati with effect from Falgoot 1363 B.S. Gouri Biswas, Gauhati.

Six monthly subscription of Masik Basumati Mrs. Protima Chatterjee, 22, Queens Road Allahabad.

১৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠালাম। ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিত ভাবে মাসিক বহুমতী পাঠাইবেন। সে সঙ্গে ১৩৬৪ সালের ৬ষ্ঠ গ্রাহিকপ্রেমীভূক্ত করিয়া বাসিবেন।—শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবী। Kanak Kutir, Po. Nath Naga (Bhagalpur)।

Herewith Rs. 15/- being the subscription for the next Bengali year 1364 from Mrs. Anil Ghose, C/o S. N. Dutta, Barister-at-law, Patna.



